॥ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ॥

৩৫ বর্ষ ১৩৭৫
(২৭ সংখ্যা থেকে ৪৩ সংখ্যা পর্যন্ত)

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীস্বপ্নেশ চৌধুরী

(দি ৪৩২০)

IS: 21 অনুমোদিত এলুমিনিয়াম
ISI
SIC

এখন ভারতে !

আপনার রান্নাঘরের জন্য

Killicks haraldware

সর্বোৎকৃষ্ট এলুমিনিয়মের তৈরী এই প্রথম রান্নার বাসন কিলিক্স হ্যারাল্ডওয়্যার, বিদেশ থেকে এনে আজ আপনিও গর্ব অনুভব করতে পারেন। ভারতীয় মানক সংস্থা (ISI) সার্টিফিকেট প্রাপ্ত শুদ্ধ এলুমিনিয়মের সঠিক গঠন—বিশেষজ্ঞ দ্বারা সমগ্র বিশ্বে রান্নার বাসনের সুব্যবস্থাযুক্ত উপাদান বর্জিত। বীকৃত কিলিক্স হ্যারাল্ডওয়্যার ঝকঝকা সেটে এবং আলাদা আকারেও আয়তনে পাওয়া যায়, প্রত্যেকটিতে তাপ—অ্যানোডাইজ করা ঢাকনা ও তাপরোধক হাতল আছে।

এখানে রয়েছে বড় ও ছোট—সসপ্যান, ফ্রাইংপ্যান 'ক্যাসারোল—এত সুন্দর যে পরিবেশন পাত্র হিসাবেও ব্যবহার করা যায়—স্টেনলেস স্টীলের চেয়ে বেশী মজবুত, সস্তা ও পরিষ্কার, পিতল বা তামার চেয়ে বেশী স্বাস্থ্যসম্মত। কিলিক্স হ্যারাল্ডওয়্যারে কখনও কলাই করার দরকার হয় না।...একটা নরম কাপড় সাবান লাগিয়ে ধুলেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে নতুনের মত চকচক করে।

বিশেষত্ব : ঢাকনাটিকে টেবিলে বাসন-রাখা হিসাবেও ব্যবহার করা যায়—তাহলে আর টেবিলে দাগ পড়ে না।

বিশেষত্ব: উপযুক্ত ভাবে তাপ বিকীরণের জন্য নীচে খাঁজ কাটা আছে—মৃদু তাপে রান্না হয়। খাবার পুড়ে ছাই হয় না।

বিশেষত্ব: বেশী দিন চলবার জন্য পুরু এলুমিনিয়ম পাতের ধারী ও অতিরিক্ত পুরু তলা।

	সসপ্যান			ফ্রাইংপ্যান		
আয়তন মি.মি.	১৪০	১৬০	১৮০	১৮০	২২০	
লিটারের মাপ	১.২৫	২	৩			

	হাতলওয়ালা ক্যাসারোল					
আয়তন মি.মি.	১৮০	২০০	২২০	২৪০	২৬০	২৮০
লিটারের মাপ	৩	৪	৫.৫০	৭	৯	[illegible]

প্রস্তুতকারক : লালুভাই আমীচাঁদ প্রাইভেট লিঃ [illegible] রোড, বোম্বাই—৪

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

লিটকুইজ প্রতিযোগিতা নিঃসন্দেহে একটি সাহিত্যিক ও কুশলী প্রতিযোগিতা। লিটকুইজের উত্তর সুনির্দিষ্ট। আমাদের সংকলক সেগুলো ঠিক করেননি। তিনি এগুলো বদলাতেও পারেন না। এগুলো ঠিক করার জন্য কোন অ্যাডজুডিকেশন কমিটিও নেই। উদ্ধৃতিতে রচয়িতা যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন সেটিই প্রত্যেকটি সমাধানসূত্রের সঠিক উত্তর। কাজেই লিটকুইজে সাফল্য দৈব বা ভাগ্যলিপির উপর নির্ভর করে না। দক্ষতা, জ্ঞান, সংচেষ্টা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগান, নিশ্চয় সফল হবেন।

NO. 33 : 18 CLUES

(1) People will have an attraction for violent **Agitation|Revolution** so long as there is poverty, hunger, exploitation and injustice in the country.

(2) **Art|Science** is like a river **leaping** over a diverse terrain **and** moving with varying **tempo during** its long and **ceaseless** journey to reality.

(3) **Right faith, right** knowledge **and right Conduct|Thought alone** will bring about the **complete purification** of the **soul.**

(4) The **rivalry for power is the bane of Democracy|Society.**

(5) **Man** is to be judged by **what he Does|Is** and not by what he professes.

(6) **Poetry** deals with truth as coloured by **Emotion| Imagination.**

(7) **Science** deals with *facts* as they are in abstraction, unrelated to other things, and altogether devoid of **Emotional|Moral** content.

(8) Economic **Equality|Stability** and individual liberty and democracy are all values of utmost importance to the future welfare of mankind.

(9) It is not so easy to serve humanity; for even purity and knowledge may lead you astray unless you have acquired **Equanimity|Humility.**

(10) Humility and self-surrender are essential to the **Evocation| Realization** and enjoyment of blissful feeling.

(11) When there is no **External| Mental** peace man turns inward.

(12) It is because our trust is weak, our **Faith|Growth** superficial, that we do not succeed in our attempt to create peace and goodwill among men.

(13) **Inspiration|Intuition,** to be sure, is not a common commodity. Rare in its existence, it is hardly cultivable.

(14) Anything **Musical|Natural** is **harmonious.**

(15) **Individuals** can work in **solitude;** but society as a **whole can think of Normal| Spiritual** life only in plenitude.

(16) **It is** wrong to separate the **creative work** of the artist **from** his **Personality|Philosophy** or outlook on life.

(17) **In** ordinary and often **apparently** meaningless **happenings, the Poet|Saint** sees **symbols full of** deep ethical **message.**

(18) **Despite Racial|Religious** differences **the** core of every **culture is the same.**

দ্রষ্টব্য ঃ—উপরের ধাঁধাগুলি বিভিন্ন ভারতীয় লেখকদের লেখা থেকে নেওয়া কয়েকটি প্রশ্ন। এগুলি সব সম্পূর্ণ বাক্য ও নিজস্ব সম্পূর্ণ অর্থ বহন করে। লেখক/প্রবন্ধকারের নাম ও তাঁহাদের রচনার নাম সমাধানের সঙ্গে লিট-কুইজ ইন্ডিকেটরে প্রকাশ করা হবে।

১। দেশে যতদিন দারিদ্র্য, ক্ষুধা, শোষণ এবং অন্যায় থাকবে, ততদিন মানুষের হিংসাত্মক **আন্দোলন/বিপ্লব**-এর প্রতি আকর্ষণও থাকবে।

২। **কলা/বিজ্ঞান** একটি নদীর মতই, যেটি তত্ত্বের অভিমুখে তার দীর্ঘ ও বাধাহীন পথ পরিক্রমায় ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল দিয়ে এবং ক্রমপরিবর্তনশীল গতিতে প্রবাহিত।

৩। প্রকৃত বিশ্বাস, প্রকৃত জ্ঞান এবং প্রকৃত **কর্ম/চিন্তা-ই** আত্মায় পূর্ণ শুদ্ধি আনতে পারে।

৪। **ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা গণতন্ত্র/সমাজ**-এর বিষ।

৫। মানুষকে বিচার করতে হবে সে **কি (হয়)/কি করে** তাই দিয়ে, সে কি করতে চায়, তা দিয়ে নয়।

৬। কবিতার সঙ্গে **সম্বন্ধ** রয়েছে সত্যের, যেটি **ভাবনা/কল্পনা**-র রঙে রঙীন।

৭। বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধ রয়েছে ঘটনার, কেননা সেগুলি বস্তুনিরপেক্ষ, অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে সম্পর্করহিত, এবং সম্পূর্ণভাবে **ভাবনাত্মক / নৈতিক** বিষয়বিহীন।

৮। মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণে অর্থনৈতিক **সমানতা / স্থিরতা** এবং ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও গণতন্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৯। মানবজাতির সেবা করা সহজ নয়। **কেননা চিত্তের স্থিরতা/নম্রতা** অর্জন না করলে এমন কি পবিত্রতা ও জ্ঞান-ও আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে।

১০। পরম সুখের ভাবনার **উদ্বোধন/অনুভূতি** এবং উপভোগের জন্য বিনয় ও আত্মসমর্পণ আবশ্যক।

১১। **বাহ্যিক/মানসিক** শান্তি না থাকলে মানুষ অন্তর্মুখী হয়ে যায়।

১২। যেহেতু আমাদের বিশ্বাস দুর্বল, **আস্থা/বৃদ্ধি** ভাসা-ভাসা, সেইহেতু আমরা মানুষের মধ্যে শান্তি ও সৌহার্দ্য আনবার চেষ্টায় সফলকাম হতে পারি না।

১৩। সত্য বলতে কি, **প্রেরণা/অন্তর্জ্ঞান** সাধারণ **বস্তু** নয়। এর অস্তিত্ব বিরল এবং এটি **কদাচিৎ** বৃদ্ধিযোগ্য।

১৪। যা কিছু **সংগীতময় / স্বাভাবিক,** তাই মধুর।

১৫। **একক মানুষ** নির্জনে কাজ **করতে পারে।** কিন্তু **সমস্ত সমাজ** কেবল **সামগ্রিকভাবেই সঠিক / আধ্যাত্মিক জীবনের কথা চিন্তা করতে পারে।**

১৬। **কলাকারের সৃজনাত্মক কাজকে তার ব্যক্তিত্ব / দর্শন অথবা জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথক করা ভুল।**

১৭। **সাধারণ এবং কখনও কখনও অর্থহীন ঘটনার মধ্যেও কবি/সাধুসন্ত গভীর নীতিশাস্ত্রীয় বক্তব্যের সংকেত দেখতে পান।**

১৮। **জাতিগত / ধর্মীয় মতভেদ সত্ত্বেও সমস্ত সংস্কৃতির প্রাণ হল এক।**

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৫ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২৭
শনিবার ২১ বৈশাখ ১৩৭৫

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষাণ্মাসিক ,,	১৪.০০
ত্রৈমাসিক ,,	৭.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষাণ্মাসিক ,,	১৪.০০
ত্রৈমাসিক ,,	৭.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ-ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৪০.০০
ষাণ্মাসিক ,,	২০.০০
ত্রৈমাসিক ,,	১১.৫০

[illegible]
(বিমান-ডাকে)

বার্ষিক	৩১.০০
ষাণ্মাসিক	১৬.০০
ত্রৈমাসিক	৮.০০

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাশুল (অতিরিক্ত) ৫ পয়সা

DESH

Saturday 4 May 1968

পথ অবরোধ

কলকাতার অধিকাংশ প্রধান রাস্তা এখন আর ঠিক পথচারীর অধিকারে নেই। মিছিল, শোভাযাত্রা ইত্যাদিতে প্রায় নিয়তই কোনো না কোনো পথ থাকে বন্ধ, কখনও বা হামলা হাঙ্গামায় এক একটি এলাকার রাস্তা বিপজ্জনক হয়ে থাকে। এর ওপর প্রত্যেকটি বড় রাস্তার মোড়, বাজারঘাটের গায়ের রাস্তা ফেরিঅলার ভিড়ে গিজগিজ করে। এই অবস্থাটা নতুন নয়, দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসছে। তবু মনে হয়, গত কয়েক বছরে যেন অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। এই শহরে মিছিলের অন্ত নেই, যে-কোনো ব্যাপারেই মিছিল; রাজনৈতিক শোভাযাত্রা থেকে শুরু করে পরীক্ষার্থী ছাত্রদের বিক্ষোভ বা দাবি-মিছিল চোখে না পড়েছে এমন ব্যক্তি বোধ করি শহরে নেই। এর ওপর আজকাল শুরু হয়েছে অবস্থান ধর্মঘট। রাজভবনের সামনেটায় অবস্থান ধর্মঘট বছরে ক'টা হয় তার একটা হিসেব থাকা দরকার। দেখা গেছে, এই বিশেষ স্থানটি শিক্ষক, ছাত্র, সরকারী কর্মচারী, রাজনৈতিক দল—প্রায় সকলেরই শেষ গন্তব্য স্থল।

সম্প্রতি রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের 'রাজপথে অবস্থান' করার ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার একটি আইনমাফিক ব্যবস্থা নিয়েছেন। সরকারী বক্তব্য হল, শুধু সরকারী কর্মচারী নয়, যে-কোনো বিক্ষোভ বা মিছিলের বিরুদ্ধে এবার থেকে একটি আইনমাফিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে, আর তা হল দাবি আদায়ের জন্যে রাজপথে যানবাহন চলাচলে ব্যাঘাত ঘটিয়ে কাউকে রাজপথে অবস্থান করতে দেওয়া হবে না। রাজপথে অবস্থান বিক্ষোভ করলে তা বেআইনী কাজ বলে গণ্য করে নেওয়া হবে, এবং আইন অনুসারে তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আইন অথবা পুলিসের প্রসঙ্গে আমরা যেতে চাই না, কিন্তু সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমাদের মনে হয়, শহর কলকাতার পথঘাটের আজকের যে হাল, তাতে পথঘাট বন্ধ করে রাখা বাস্তবিক পক্ষেই পীড়াদায়ক। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, যে-কোনো একটি ছোটোখাটো মিছিলই যানবাহন চলাচল ও মানুষের যাতায়াতের পক্ষে কতটা বিঘ্ন সৃষ্টি করে। মিছিল বড় হলে কথাই নেই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় মাইলটাক পথ পেরুতে। কখনও কখনও এমনও দেখা গেছে, মিছিলের আকার রাস্তার প্রস্থের চেয়ে কম নয়, ফলে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটা চলাও যায় না। অধিকাংশ মিছিলই পথ অবরোধ করে এগোয়, অর্থাৎ তার যাবার অধিকার সর্বাগ্রে, মানুষ ও যানবাহন চলাচলের প্রশ্নটা গৌণ। এক ফুটপাথ থেকে অন্য ফুটপাথে আসার সুযোগও দীর্ঘক্ষণ পাওয়া যায় না। মনে রাখতে হবে, মানুষের প্রয়োজন থাকে নানারকম, বাড়ি ফেরার তাড়া থাকে, জরুরী কাজকর্মও থাকে; অযথা মিছিলের ভিড়ে আটকে পড়ে তাদের অকারণ সময় নষ্ট হয়। এর প্রতি আমাদের নজর থাকবে না কেন?

এই শহরের পথঘাট ও যানবাহন চলাচলের অসুবিধা বিবেচনা করে, সাধারণ মানুষের হাঁটা চলার কথা চিন্তা করে মিছিলের উদ্যোক্তারা যদি একটু বিবেচক হন, সহৃদয় হন, তবে অনেক অসুবিধার হাত থেকে মানুষ বাঁচে। মনে রাখতে হবে আজ যিনি মিছিলে থেকে অন্যের অসুবিধা করছেন, হয়ত কাল তাঁকে অন্যের মিছিলের জন্যে ধর্মতলার মোড়ে ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আমরা লক্ষ করেছি, অনেক মিছিলের মধ্যে এক ধরনের পদযাত্রী থাকেন, যাঁরা সহযাত্রীদের সব সময় রাস্তা অবরোধ করে যেতে বলেন। এর দ্বারা বিক্ষোভের প্রকাশ আরও কতটা তীব্র হয় জানি না, তবে অনর্থক অন্যকে কষ্ট স্বীকার করাতে বাধ্য করা হয়।

মিছিল, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ প্রদর্শনে আমাদের আপত্তি নেই, সে অধিকার অবশ্যই বিক্ষোভকারীদের আছে, তবে আমাদের একমাত্র বক্তব্য—যানবাহন চলাচল করার সুযোগ দিয়ে, পথচারীকে সামান্য রাস্তা দিয়েও মিছিল তার দীর্ঘ শরীর নিয়ে যেতে পারে, তাতে কোনো পক্ষেরই ক্ষতি নেই। গাড়িঘোড়ার ও জনসংখ্যার চাপে পড়ে এই শহরের পথঘাট এমনিতেই চলাচলের পক্ষে যথেষ্ট ফাঁকা থাকতে পারে না, তার ওপর যদি নিত্য মিছিলে ও বিক্ষোভে তার নানা স্থানে বাধা সৃষ্টি করা হয়, তবে পথ আর পথ থাকে না, প্রাচীর হয়ে ওঠে। আশা করি, সকলের স্বার্থে বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে হবে।

অবস্থান ধর্মঘট সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য, এর দ্বারা সত্যিই কি বিক্ষোভ আরও জোরদার হয়ে প্রকাশ করা যাবে?

দেশ দর্পণ

কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রণ্ট সম্বন্ধে। মূল প্রশ্ন অবশ্যই যুক্ত ফ্রণ্টের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। কিন্তু কেন? কেন উঠেছে কথাগুলো? নির্বাচনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুক্তফ্রণ্টকে আজ স্বীকার করে নিতে হচ্ছে যে, ফ্রণ্টের দলগুলোর মধ্যে বিরোধ তীব্রতর হচ্ছে। পশ্চিম বাংলা শুধু নয়, অন্যান্য রাজ্যেও যুক্তফ্রণ্ট বা সংযুক্ত বিধায়ক দলের মধ্যে বিরোধ দানা বাঁধছে। এ বিরোধের স্বরূপটা যেভাবে বাইরে প্রকাশ পেয়েছে, তাতে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এর ভিতরে দলগতভাবে বিশৃঙ্খলার প্রতি অস্বাভাবিক প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এই প্রবণতা বৃদ্ধি পাবার সুযোগ অবশ্য যুক্তফ্রণ্টই এনে দিয়েছে: কারণ, যুক্তফ্রণ্টের কোন আদর্শগত পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নি। পাওয়া সম্ভবও নয়; যুক্তফ্রণ্টের জন্ম-ইতিহাস কোন আদর্শগত মতবাদকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠেনি। এর মূল পরিচয় কংগ্রেস-বিরোধী ফ্রণ্ট। কংগ্রেস বিরোধিতা যেমন কোন মতাদর্শ নয়, তেমনি প্রধানত যুক্তফ্রণ্ট কোন রাজনৈতিক দল নয়।

গোষ্ঠী হিসাবেই এর সংগঠন। তাই গোষ্ঠিগতভাবেই প্রতিটি রাজনৈতিক প্রশ্নে যুক্ত ফ্রণ্টকে সমস্যা ও সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। রাজনৈতিক পরিচয় নেই বলেই যুক্ত ফ্রণ্টের মধ্যে গোষ্ঠিগত কোন দায়িত্ববোধ এখনও দেখা যায় নি। তাই পশ্চিম বাংলার গত এক বছরের ইতিহাসে দেখা যাবে যুক্তফ্রণ্টকে প্রতিটি প্রশ্নে ও সমস্যায় তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আজও সেই মূল প্রশ্নেই যুক্তফ্রণ্টকে সংকটের মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছে। মূল প্রশ্ন, নির্বাচনের জন্য আসন ভাগ। গত নির্বাচনের আগেও এমনি একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা হয়েছিল অ-কংগ্রেসী দলগুলোর মধ্যে আসন ভাগ নিয়ে। তখনও এই প্রশ্নই রাজনৈতিক দলগুলোর সামনে রাখা হয়েছিল যে, পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসকে "নির্মূল" করে দিতে হলে সব কয়টি "গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী" দলগুলোর মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়া প্রয়োজন, যাতে কংগ্রেস-বিরোধী ভোটগুলো বিভক্ত হয়ে কংগ্রেসের সুবিধা না করে দেয়। কিন্তু তখন কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলো মধ্যে একজোট হয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারে নি। দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী দল গড়ে উঠেছিল দুই কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। একজোট হওয়া সম্ভব হয় নি; কারণ, দুই কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে আসন ভাগ নিয়ে কোন মীমাংসা হয় নি। শুধু মীমাংসা সম্ভব হয় নি তাই নয়, একটা স্পষ্ট বিরোধিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা গিয়েছিল দুই কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে। এটা তীব্র হবার সুযোগ পেয়েছিল এই কারণে যে, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে কোন মীমাংসার পথ খোলা রাখা হয় নি বলে।

আজকের অবস্থাটাও এমনি একটা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যাচাই করা অবাস্তব মনে হবে না। আজ আর দুই কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে দুটি ভিন্ন ফ্রণ্ট বা গোষ্ঠী নেই: কারণ, দুটি গোষ্ঠীই যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে মিশে গিয়েছে। তবু আসন ভাগের প্রশ্নে সহজ ও সর্বদলসমর্থিত কোন সমাধান বা সূত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ ক্ষেত্রেও বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সূত্রকে অবলম্বন করে। এই সূত্রটা প্রথম প্রস্তাব করেন মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পশ্চিম বাংলা শাখার সেক্রেটারী শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত। তাঁর প্রস্তাবিত সূত্র অনুসারে, আসন বণ্টনের যে নীতি যুক্তফ্রণ্টের সামনে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে রাখা হয়েছিল সেই নীতি আজ দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ দলের কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়। তা নয় বলেই আসন ভাগ সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রীদাশগুপ্তের সূত্র অনুসারে, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি দাবি করেছে প্রায় এক শতটি আসন ২৮০-র মধ্যে। শ্রীদাশগুপ্তের মতে, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি এই দাবির সংখ্যা পুনর্বিবেচনা করতে পারে না; কারণ, তা হলে পার্টিকে "জনসাধারণের রায়"কে অস্বীকার করতে হয়। জনসাধারণের রায়টা অবশ্য দেওয়া হয়েছে গত নির্বাচনে এবং নির্বাচনের পর এমন কোন সমীক্ষা করা হয় নি, যাতে বোঝা যাবে, জনসাধারণের রায়ের কোন পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে করা যেতে পারে। এই যুক্তি মেনে নিলে শ্রীদাশগুপ্তের সূত্র অগ্রহণযোগ্য মনে হবে না; কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রীদাশগুপ্ত দাবি করেছেন যে, এই পরিপ্রেক্ষিতে দলত্যাগীদের আসনগুলো সংশ্লিষ্ট দলের কাছে ফিরে যাবে না। সেগুলো যুক্তফ্রণ্টের সকল শরিকের মধ্যে পুনর্বণ্টন করা চলবে। এ দাবি অবশ্যই অন্যান্য দলের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়: বিশেষ করে ভারতীয় ক্রান্তি দলের কাছে। ভারতীয় ক্রান্তি দল তথা বাংলা কংগ্রেস থেকে সর্বাধিকসংখ্যক সদস্য দলত্যাগ করে গিয়েছিল। ফলে, শ্রীদাশগুপ্তের সূত্র অনুসারে এই দলের বহু আসন অন্যান্য দলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে। এটা ক্রান্তি দলের কাছে যে গ্রহণযোগ্য নয়, তা তার দাবি থেকেই অনুমান করা সম্ভব। তা ছাড়া, এটাও বলা হয়েছে যে দলত্যাগের জন্য কোন বিশেষ দল দায়ী নয়। যদি এই দলত্যাগের কোন কারণ ঘটে থাকে, তা হলে তার দায়িত্ব সমগ্রভাবে যুক্তফ্রণ্টের। এ যুক্তি উপেক্ষণীয় নয় যে, যুক্তফ্রণ্ট কংগ্রেস-বিরোধী গোষ্ঠী বা শক্তি হিসাবে জনসাধারণের সমস্যার কোন উল্লেখযোগ্য সমাধান করতে পারে নি। যুক্তফ্রণ্টের ১৮ দফা কর্মসূচী রূপায়িত করার কোন আগ্রহ প্রকাশ করা হয় নি। দলত্যাগীদের যুক্তফ্রণ্টের বিরুদ্ধে এটাই ছিল মূল অভিযোগ।

এই কথাটা সম্প্রতি নতুন করে তুলেছেন আর-এস-পি'র শ্রীত্রিদিব চৌধুরী এবং অন্যান্য নেতারা। এঁদের মতটা যুক্তফ্রণ্ট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সময় প্রকাশ করেছিলেন শ্রীননী ভট্টাচার্য। সেই সময় শ্রীননী ভট্টাচার্য তাঁর পার্টির কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করার জন্য; কারণ, তাঁর এক রিপোর্টে তিনি বলেছিলেন যে, যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভায় থেকে জনসাধারণের কোন কল্যাণমূলক কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। কোন কর্মসূচীও রূপায়িত করা যাচ্ছে না। কারণ, যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তীব্র মতবিরোধ প্রায়ই প্রকাশ পাচ্ছে বিভিন্ন শরিকদের মধ্যে।

এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই শ্রীত্রিদিব চৌধুরী এবং ফ্রণ্টের আরও কয়েকজন নেতা এবারের আসন ভাগের আলোচনা শুরু হবার পরই স্পষ্টভাবে প্রস্তাব করেন যে, যুক্তফ্রণ্টের কর্মসূচী রূপায়ণ সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে যদি কোন হতাশা দেখা দিয়ে থাকে, তা হলে তা আগে দূর করা প্রয়োজন। এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করে রূপায়িত করা না হলে জনসাধারণের মধ্যে হতাশা আরও বাড়বে

পারে। জনসাধারণ যুক্তফ্রন্ট সম্বন্ধে আস্থা হারাবে। তাই এঁরা জোর দিয়ে দাবি জানান যে, জনসাধারণের আশু কল্যাণমূলক স্বল্প কয়েকটি কর্মসূচী নির্ধারণ করে যুক্তফ্রন্টের সকল শরিককে তা রূপায়িত করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। শুধু তাই নয়, যুক্তফ্রন্টের শরিকদের সম্মিলিতভাবে স্পষ্টভাবে একটা সময় নির্দিষ্ট করে দিতে হবে, যার মধ্যে গৃহীত কর্মসূচী রূপায়িত করা হবে। এই-রকম একটা আস্থা ও নিষ্ঠা দেখা দিলে ফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে আসন বণ্টনের নীতি নির্ধারণ করতে অসুবিধা হবে না। আর-এস-পি নেতাদের এটা বক্তব্য ছিল যে, আসন বণ্টনের ভিত্তিতে ফ্রন্টের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করার আগে কর্মসূচীর প্রতি শরিকদের নিষ্ঠা ও আস্থা সুদৃঢ় করতে হবে।

হয়ত এ কারণেই যুক্ত ফ্রন্টের বিভিন্ন বৈঠকে আসন বণ্টনের যে আলোচনা শুরু হয়েছিল, তা মুলতবী রাখা হয় এবং কর্ম-সূচী নির্ধারণের প্রতি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। হয়ত আসন বণ্টনের নীতি স্থির করতে গিয়ে যে বিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল তা স্থগিত রাখার জন্যই কর্মসূচী নির্ধারণের আলোচনা শুরু করা হয়। এই আলোচনা হয় প্রধানত কয়েকটি পার্টির পক্ষ থেকে যে খসড়া কর্মসূচী দাখিল করা হয়, তারই ভিত্তিতে। যে কয়েকটি দল তাদের কর্মসূচীর খসড়া দাখিল করেছে, তাদের নিজস্ব রাজ-নৈতিক মতবাদ ও আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এইসব খসড়া দাখিল করা হয়েছিল। স্বভাবতই, বিভিন্ন দলের মধ্যে আদর্শগত প্রশ্নে তীব্র বিরোধ আছে। সেই বিরোধকে সামনে রেখেই যুক্তফ্রন্টের কয়েকটি বৈঠকে কর্মসূচীর আলোচনা চলে; কিন্তু সে আলোচনা থেকে কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব ছিল না বলেই কর্মসূচী নির্ধারণের প্রশ্নটাও মুলতবী রাখা হয়।

এই আলোচনার সময়ই ভারতীয় ক্রান্তি দলের দিল্লীর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। ফলে, পশ্চিম বাংলায় শ্রীঅজয় মুখার্জির নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রান্তি দলের যুক্ত ফ্রন্টের মধ্যে থাকার প্রশ্নটাও দেখা দেয়। সে কারণে শ্রীঅজয় মুখার্জিকে ফ্রন্টের শরিকদের কাছে স্পষ্টভাবে জানাতে হয় তাঁর দলের কথাটা। অর্থাৎ তাঁরা যুক্তফ্রন্টে থাকবেন, কি থাকবেন না। শ্রীঅজয় মুখার্জি যে স্পষ্ট ভাষায় যুক্ত ফ্রন্টকে জানিয়েছেন তাঁরা পশ্চিম বাংলায় যুক্তফ্রন্টের মধ্যেই থাকবেন তা শ্রীজ্যোতি বসু সাংবাদিকদের প্রেস ক্লাব অনুষ্ঠানে জানিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য তাঁর সিদ্ধান্ত তখনও সরকারীভাবে ভারতীয় ক্রান্তি দলের জাতীয় কার্যকরী কমিটির অনুমোদন পায় নি; তবু পশ্চিম বাংলা শাখার কার্যকরী কমিটির সভায় যখন যুক্তফ্রন্টে থাকার প্রশ্নে শ্রীঅজয় মুখার্জিকে সিদ্ধান্ত

পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস-দলে মতভেদের যে সংবাদ রটেছে তার কারণ ব্যাখ্যা করে দলের জনৈক মুখপাত্র বলেছেন — ওটা ইচ্ছাকৃত রটনা।

দীনেশ সিং

নেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন ক্রান্তি দলের সভাপতি শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ এবং সেক্রেটারী শ্রীকুন্তে উপস্থিত ছিলেন। কাজেই শ্রীঅজয় মুখার্জি যখন ফ্রন্টকে জানান যে, তাঁর দল যুক্তফ্রন্ট ছেড়ে যাচ্ছে না তখন এটাই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, জাতীয় কমিটির অনুমোদনও পাওয়া যাবে। এই ধারণাটা ছিল বলেই যুক্তফ্রন্টের পরবর্তী বৈঠক ডাকা হয় মে মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রধানত আসন বণ্টনের নীতি নির্ধারণ করার জন্য।

এই বৈঠক আকস্মিকভাবে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। ফ্রন্টের এক মুখপাত্র বলেছেন যে, কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্র থেকে উপনির্বাচনে বিভিন্ন দলের নেতারা প্রচারকার্যে যাতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারেন, সেজন্যই এই বৈঠক বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এ বৈঠক বসবে নির্বাচন শেষ হয়ে গেলে। কৃষ্ণনগরের উপনির্বাচনের তারিখটা অবশ্য বহুদিন সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং সে উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থীর নামও অনেক আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। নেতাদের প্রচারকার্যে অংশ গ্রহণ করার প্রোগ্রামও নির্ধারিত হয়েছিল মে মাসের প্রথম সপ্তাহের বৈঠক ডাকার আগে। কাজেই বৈঠক বাতিল করে দেওয়ার যে যুক্তি দেখান হয়েছে তা অনেকের কাছেই খুব গ্রহণযোগ্য বলে হয়ত মনে হয় নি। বরং এটাই মনে হয়েছে যে, উপনির্বাচনের আগে বৈঠক ডাকার ফলে যদি আসন বণ্টনের আলোচনা মাঝপথে এসে ভেঙে যায় বা ফ্রন্টের ভিতরের বিরোধ অথবা সংকট আরও তীব্র আকার ধারণ করে তা হলে কৃষ্ণনগর নির্বাচনে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। কৃষ্ণনগরের নির্বাচনে যদি কোন রাজনৈতিক ঝুঁকি থাকে, তা হলে সে ঝুঁকির অন্ধ দিকটা স্পষ্ট করে দেওয়া হবে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতায়। হয়ত সে কারণেই মে মাসের প্রথম সপ্তাহের বৈঠক বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এই আশঙ্কাটা দেখা দিল কেন? স্বভাবতই মনে হতে পারে যে, যুক্ত ফ্রন্টের নেতারা আসন বণ্টনের আলোচনার পরিণতি সম্বন্ধে খুব নিশ্চিন্ত বা নিঃসন্দেহ নন। হয়ত মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির 'অনমনীয়' মনোভাব সম্বন্ধে অন্যান্য দল বিশেষভাবে সচেতন বলেই আসন বণ্টনের আলোচনাকে কৃষ্ণনগর উপনির্বাচনের আগে স্থগিত রাখতে হয়েছে। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির পশ্চিম বাংলার রাজ্য কাউন্সিলের সভায় গৃহীত প্রস্তাবেও মার্ক্সিস্ট পার্টির 'অনমনীয়' মনোভাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পার্টির মুখপাত্র হিসাবে শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জি এটাই সাংবাদিকদের পরিষ্কারভাবে জানাতে চেয়েছেন যে, ফ্রন্টের বড় বড় দলগুলির বিশেষ কর্তব্য যুক্তফ্রন্টকে সংযুক্ত রাখা এবং তার ঐক্যকে সংগঠিত করা। এই কর্তব্য আছে বলেই ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির পশ্চিম বাংলা শাখার রাজ্য কাউন্সিল মনে করে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি দলগত সাংগঠনিক সামর্থ্যের বহুগুণ অধিকসংখ্যক আসন দাবি করে শুধু যে, 'অনমনীয়' মনোভাবই প্রকাশ করেছে তাই নয়, সেই সঙ্গে যুক্ত ফ্রন্ট এবং যুক্ত ফ্রন্ট গঠিত ভবিষ্যৎ মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব কায়েম করার মনোভাব প্রকাশ করেছে। এটা একমাত্র ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টিরই মতবাদ নয়, ফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদেরও অনেকটা এইরকম মনোভাব।

এটাই শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তর সূত্রের বাস্তব প্রতিক্রিয়া। এ প্রতিক্রিয়া মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির অজানা নয়। শুধু, তাই নয়, এই সূত্রের কোন পরিবর্তন করতে রাজী নয় বলেই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সংগঠনকে নতুন ছাঁচে ঢালার পরিকল্পনাও তৈরি করা হয়েছে। এই নতুন ছাঁচে ঢালা সংগঠন অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়; কিন্তু উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রন্ট এবং তার ভবিষ্যৎ মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব কায়েম করতে চায় বলেই ফ্রন্টকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে চায় যাতে কংগ্রেসকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রশ্নটা অনেক সহজ হয়ে যায়। কিন্তু সে ঐক্যের একমাত্র সূত্র শ্রীদাশগুপ্তর 'ফর্মুলা'। যুক্ত ফ্রন্টে তাই আজ বিরোধ আর অনিশ্চয়তা।

একদিন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

একদিন তোমার হাত ধরে জয়পুরের রাস্তা দিয়ে বেড়াবো,
অসমাপ্ত পাহাড়কে বলবো, আমরা এসেছি!
একটা শুকনো নদীর গর্ভে নেমে গিয়ে মরা ঝাঁঝি
হাতে তুলে নিয়ে বলবো, মনে আছে।

ঝাড়লণ্ঠনের বিচ্ছুরিত আলোর মতন আনন্দ খেলা করবে শরীরে।

কোনোদিন জয়পুরে যাইনি, কিন্তু জানি কোথাও জয়পুর আছে—
চিনতে আমার ভুল হবে না!
ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে একটা ভয়হীন মিনারে ঠেস দিয়ে
হাওয়া থেকে আঁচল ফিরিয়ে আনবে তুমি
তোমার সুবর্ণ মকর-মুখো কঙ্কণে রিনঝিন শব্দ উঠলে
আমি লীয়মান সূর্যরশ্মির দিকে তাকিয়ে বলবো,
এবার অম্বা মন্দিরে ঠিক সাতটা ঘণ্টা বাজবে
শুধু শব্দ নয়, তার প্রতিধ্বনি, শুধু অর্জন নয়, তার উপহার
ফিরে আসবে তখন, কে যেন বলবে, জানতাম!
মর্মরে প্রতিফলিত মুখশ্রী প্রশ্ন করবে,
সত্যি, সব মনে আছে?
আমি সবকটা বোতাম খুলে হেসে বলবো,
বাঃ, জলের ধারে বসে থাকার ছবি কখনো মুছে যায়?

প্রতিটি নিশ্বাস দীর্ঘ—এইরকম দুঃখহীন খুশীর মধ্যে
হাত ধরাধরি করে ছুটতে ছুটতে শুনতে পাবো
রাজপুতানীদের মান-ভাঙার গান
কেউ উচ্চারণ করবে না, তবুও সবাই বলবে,
আঃ, কি সুন্দর বেঁচে আছি,
উড়বে লাল রঙের ধুলো
এক মুহূর্তের জন্য সমস্ত মৃতেরাও জেগে উঠে ধন্যবাদ দিয়ে যাবে
পাথুরে সবল রাস্তা যেখানে বাঁক ঘুরে ঢালু হয়ে নেমেছে
সেখানে আমরা থমকে দাঁড়ালে ভেসে আসবে তরতাজা দৃশ্যের ঘ্রাণ
ময়ূরের আত্মীয়ের মতন সন্ধ্যা অকস্মাৎ উল্লসিত হয়ে ঘোষণা করবেঃ
এই নাও আজ এই জয়পুর তোমাদের।

জলের আয়নাতে

প্রতিমা সেনগুপ্ত

পারবে ঠিক যেভাবে গেলাসে মুখ দেখছ
তেমনি করে মনের খাতায় তার ছবি এঁকে নিতে?
একটি চুমুকে সব আশার কল্পতরু রূপ দিতে গিয়ে
নিঃশেষ করে ফেলবে তোমার পানপাত্র।
তারপরে, ভাঙা গলায় খানিক আওয়াজ তুলে
পা না ডুবে যাওয়া জলে নদী মনে ক'রে
ডুবে যাবে স্বচ্ছন্দে।
ওদিকে দেখ তোমার ছবি হাসছে, শুধু হাসছে
রঙিন জলের ওপার হতে॥

বিদেশিকী

নতুন হাওয়া

পূর্ব ইউরোপে বসন্তের হাওয়া পূর্বদিকে কম্যুনিস্ট পাড়ায় বইছে যত জোরে পশ্চিমে ধন-গণতন্ত্রী পাড়ায় তত নয়। এ বাতাস সকলের সয় না, মস্কোর সইছে না। কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র ও সমাজের গড়নে, গতি-প্রকৃতিতে যে ডায়ালেকটিক দ্বন্দ্বসূত্রে সক্রিয় আছে, থাকতে পারে, সেটা কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রনেতারা স্বীকার করতে চান না। জীবন অনেক কিছুই শেষ পর্যন্ত স্বীকার করিয়ে নেয়, নিতে চেষ্টা করে। যাঁরা বহুকাল এক ধারায় বাঁধা লাইনে চলেছেন, বাঁধা লাইনে ক্ষমতা দখলে রাখতে চান তাঁদেরই মুশকিল। সে-মুশকিল এখন মস্কোয় সোভিয়েট কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র ও দলপতিদের। পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে বসন্তের খোলা হাওয়া, নতুন সুর, নতুন প্রাণচঞ্চলতা তাঁদের বিচলিত বিব্রত, এমন কী, ত্রস্ত করছে। কম্যুনিস্ট ইউরোপে মস্কোর এবং মস্কো লাইনের বিশ্বস্ত ভক্ত সেবক যারা তাদেরও বিপদ; ক্ষমতা, প্রতিপত্তি সবই তাদের হাত থেকে খসে পড়ছে, অতীতের বহু অপকীর্তির দায়ে আরও অনেক কিছু খসতে পারে।

কম্যুনিস্ট ইউরোপে বসন্তের হাওয়া জোর বইছে চেকোশ্লোভাকিয়ায়। কিছুকাল আগেও এ দেশের ওপর কর্তৃত্ব ছিল কট্টর স্টালিন-পন্থীদের। এরাই ঠাণ্ডা যুদ্ধের একটি সংকট মুহূর্তে প্রায় রাতারাতি ক্ষমতা দখল করেছিল, ইউরোপের পূর্ব-পশ্চিম দুই খণ্ডের মধ্যে দুর্ভেদ্য দেওয়াল ওঠে তখনই, বার্লিনের দেওয়ালের অনেক আগে। কুড়ি বছর আগে চেকোশ্লোভাকিয়ায় পূর্ণ কম্যুনিস্ট কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কারণ তবু বোঝা যায়। সে-সময় পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠীর প্ল্যান ও চেষ্টা ছিল পূর্ব ইউরোপ থেকে কম্যুনিস্ট প্রাধান্যকে পিছনে ঠেলতে ঠেলতে একেবারে আবার পোল্যাণ্ডের ওপারে রাশিয়ায় ফিরিয়ে দেওয়া। চেকোশ্লোভাকিয়ায় কম্যুনিস্ট 'কু' হয়েছিল তরই পাল্টা জবাব। ঠাণ্ডা যুদ্ধের এই প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাতে মারা পড়ল বিস্তর নির্দোষ লোক; তার মধ্যে চেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাসারিকের মৃত্যুটাই সবচেয়ে শোকাবহ। এখন অনেক রহস্যই ফাঁস হচ্ছে, মাসারিক মনে হয় নিহত হন স্টালিনের ঘাতকদের হাতে।

কম্যুনিস্ট ইউরোপে স্টালিনী তাণ্ডবের কলঙ্ক মস্কো এখন পর্যন্ত মুছে ফেলতে পারেনি। তার একটা প্রধান কারণ স্টালিনের শাসনপদ্ধতি প্রকরণ মস্কোর এখনকার কর্তারাও একেবারে বাতিল করতে পারেন না, সাহস করেন না; করলে তাঁদের নিজেদের ক্ষমতার আসনই গুঁড়িয়ে যায়। এ সমস্যা কেবল মস্কোর নয়, গোটা কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র-ব্যবস্থার। স্টালিনী ধাঁচের রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধেই চেকোশ্লোভাকিয়ায় পরিবর্তনের আওয়াজ, বসন্তের হাওয়া। স্টালিনপন্থী চেক প্রেসিডেণ্ট নভটনীকে বিদায় নিতে বাধ্য করা হয়েছে। মস্কো তাতে অখুশী। নভটনীর পদচ্যুতি তো নতুন হাওয়ায় ঝরা পাতা উড়ে যাওয়ার একটা লক্ষণমাত্র। চেক কম্যুনিস্ট পার্টি, কম্যুনিস্ট সংবাদপত্র, রেডিও ইত্যাদি সবই এখন নতুন পথের সন্ধানী। কম্যুনিস্ট দল ও দলপতিরা অভ্রান্ত, সবজান্তা, দেশসুদ্ধ লোক তাঁদের হুকুম মেনে চলতে বাধ্য—স্টালিনী শাসনের এই জবরদস্ত ধাঁচ চেকোশ্লোভাকিয়ার নতুন নায়করা খসিয়ে ফেলছেন, সবটা হয়তো নয় এবং একেবারে নয়। তবু পরিবর্তনের ধারাটা স্পষ্ট, প্রবল এবং সেটা মস্কোর পক্ষে, পরম পক্ক কম্যুনিস্ট সনাতনীদের পক্ষে সুখকর বা নিরাপদ নয়।

চেকোশ্লোভাকিয়ায়, পোল্যাণ্ডে, রুমানিয়ায় যে-নতুন হাওয়া রাশিয়াতে সে-হাওয়ার চলাচল একেবারে বন্ধ করা যাবে কী উপায়ে? মস্কোর কর্তারা স্টালিনী সন্ত্রাসের রাজত্ব আবার পুরোপুরি ফিরিয়ে আনতে সাহস করছেন না। রাশিয়ার তরুণ ছাত্র, সাহিত্যিক শিল্পীদের মধ্যে নতুন ভাবনার আলোড়ন চলছে; মস্কো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্ররা চায় না কর্তাদের হুকুম মত সনাতন পদ্ধতিতে মার্ক্সীয় ডায়ালেকটিকের আক্ষরিক ব্যাখ্যা এবং শাস্ত্রবিচার। ডায়ালেকটিক যদি সামাজিক পরিবর্তনের গতি-নিয়ামক সত্যিই হয় তা হলে সে-গতিকে দল এবং দলনায়করা তাঁদের নিজেদের সুবিধামত গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখেন কোন্ যুক্তিতে? প্রশ্ন উঠছে এবং উঠবে আরও অনেকই। এখনকার সবচেয়ে জোরাল প্রশ্ন কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে নাগরিকের ভূমিকা, চিন্তার স্বাধীনতা, শাসনযন্ত্রের সংস্কার। কলকারখানা, বড় বড় ব্যবসায় বাণিজ্য ব্যক্তিগত মালিকানায় ফিরিয়ে আনবার প্রস্তাব অবশ্য এখন পর্যন্ত ওঠে নি। ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবি অতদূর পর্যন্ত এখনও যাবে কি না কে বলতে পারে?

মোট কথা, স্টালিনবাদী কম্যুনিজমের রাষ্ট্রশাসনের ছাঁচটা এখন যাকে বলা যায় "মেল্‌টিং পটে", সমালোচনার উত্তপ্ত পাত্রে গলানোর কাজ শুরু হয়েছে। প্রাচীনপন্থী রুশ কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রনায়করা, তাঁদের প্রচার-যন্ত্রীরা ভয় দেখাচ্ছেন, ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবি, দলের একাধিপত্যের সমালোচনা ও বিরোধিতা—এসব জঘন্য বুর্জোয়া চিন্তাধারার প্রভাব, এর পেছনে নিশ্চয়ই রয়েছে "সাম্রাজ্যবাদীদের" চক্রান্ত। বুর্জোয়া প্রভাব, সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত—এ সমস্ত মামুলী অভিযোগ। অকম্যুনিস্ট দেশে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধেও সে-রকম উল্টো অভিযোগ প্রায়ই উঠে থাকে। জনসাধারণের অসন্তোষ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কম্যুনিস্ট উস্কানি কিংবা বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ফল বলে নিন্দা করা, উড়িয়ে দেওয়াটা খুব সহজ একটা রাজনৈতিক প্রচারকৌশল। হাঙ্গারিতে যা ঘটেছিল, চেকোশ্লোভাকিয়ায়, পোল্যাণ্ডে এখন যা ঘটছে তার মূলে রয়েছে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থার অসঙ্গতি, অন্তর্বিরোধ, যে অসঙ্গতি ও অন্তর্বিরোধ ওই সব দেশের মানুষকে বিচলিত, ক্ষুব্ধ করেছে।

রাশিয়ার সংকট দুটি কারণে। প্রথমত কম্যুনিস্ট তত্ত্বের ক্ষেত্রে মস্কোর সনাতনী চিন্তা কম্যুনিস্ট ইউরোপে তার পূর্ব প্রতিপত্তি হারিয়েছে। খাস রুশ-ভূখণ্ডেও সে সনাতনী চিন্তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এখন প্রবল। এই ভাবগত সংকট ছাড়াও কম্যুনিস্ট ইউরোপে সোভিয়েটের নেতৃত্ব বজায় রাখার সংকট দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমী শক্তিজোটের সঙ্গে সমতা রক্ষার উদ্দেশ্যে রাশিয়া গড়েছিল ওয়ার্শ-চুক্তিবদ্ধ কম্যুনিস্টগোষ্ঠী। যুগোশ্লাভিয়া অবশ্য প্রথম থেকেই এ গোষ্ঠীর বাইরে। গোষ্ঠীর মধ্যে প্রথম বিরোধী ভূমিকা নিয়েছে রুমানিয়া। এখন নিতে চলেছে চেকোশ্লোভাকিয়া। বিভক্ত ইউরোপে সোভিয়েট শক্তির প্রধান একটি স্তম্ভ চেকোশ্লোভাকিয়া। পূর্ব জার্মেনীর নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপর রাশিয়া কোন সময়েই ভরসা করতে পারে না। পোল্যাণ্ডের জাতীয় চেতনায় রুশ-বিরোধিতা ঐতিহাসিক কারণে প্রবল। সে বিরোধিতা কম্যুনিস্ট শাসন কোনমতে কেবল চাপা দিয়ে রাখতে পারছে। একমাত্র বুলগারিয়ায় স্লাভ জাতিত্বের টানে রাশিয়া সম্পর্কে বন্ধুত্বের ভাবটা স্বভাব-স্বচ্ছন্দ।

কম্যুনিস্ট ইউরোপে নতুন হাওয়া, নতুন ভাবনার জোয়ার কত দিন চলবে, ভাঙা-গড়া পরিবর্তন কতদূর এগোতে পারবে বলা যায় না। এটুকু বলা যায় যে, জর্জ অরওয়েলের "১৯৮৪"-র অন্ধকারময় চিত্র, যাতে "বিগ ব্রাদার"-এর জবরদস্তির জয়জয়কার, সেটা এই ১৯৬৮ সালেই অর্থহীন হয়ে পড়ছে, যবনিকা কম্পমান নয়, ছিন্নভিন্ন, পরদা খসছে; সনাতনী কম্যুনিস্টরা তো প্রমাদ গণবেই, দূরদর্শীরা কিন্তু অনেক আগেই বলেছেন, মানুষের মগজ যতই ধোলাই করা হোক না কেন, শাসন-বারণের কড়াকড়ি যত নির্মমই হোক, জীবনকে, চিন্তাকে, সমাজ-ব্যবস্থাকে নিজেদের আশাআকাঙ্ক্ষামত ভাঙা ও গড়ায় মানুষের উদ্যম দুর্জয়। স্টালিনবাদের দৃঢ় দুর্গেও তাই ফাটল।

২৯।৪।৬৮

সুনন্দর জার্নাল

'বিরাটের মুখোমুখি'

যাত্রিবাহী বিমান নয়, বাঁধা পথেও উড়ছিল না। বাঁয়ে হিমালয় আর বনভূমি, ডাইনে সমতলের নদী-ধানক্ষেত-জলাভূমির একটানা — একঘেয়ে রেখার জটিলতা। আমি ডান দিকের জানলায় বসে বসে দেখছিলুম, পড়ন্ত রোদে নীচ দিয়ে আমারই বিমানের ছায়াটা ছোট একটা ফড়িঙের মতো মাটি ছুঁয়ে চলে আসছে—পার হচ্ছে নদী, ডুব দিয়ে উঠছে বনের ভেতর থেকে।

হঠাৎ চোখের দৃষ্টি আমার চমকে উঠল। বেলাশেষের আলোয় অপূর্ব খানিকটা তুষারশীর্ষ সোনা হয়ে ফুটে উঠেছে হিমালয়ের রুক্ষ ধূসরতার ওপর। কাঞ্চনজঙ্ঘা? না—সে আমার শিশুকাল থেকে চেনা, শত লক্ষবার তাকে দেখেছি, তার প্রতিটি রেখা আমার জানা। তবে কে এ? গ্রীক গল্পের জিউসের বৃষভমূর্তির কে অমন করে আকাশ ছেয়ে দাঁড়িয়ে?

বুঝতে দেরী হল না। এভারেস্ট। আর মনে পড়ল, আমাদের ছেলেবেলায় এই পথ ধরেই তো লর্ড ক্লাইড্সডেল প্রথম এভারেস্টের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিলেন, তাঁর বিমানটিকে, এবং তাঁকেও, দেখবার দুর্লভ সুযোগ আমার ঘটেছিল।

এভারেস্ট। দিনান্তিক সোনালী আলোতে স্বর্ণ-বৃষভ জিউসের মূর্তি। যেন আর একটু লক্ষ করলে ইয়োরোপকেও আমি দেখতে পাব। মুগ্ধ চোখ মেলে চেয়ে রইলুম—প্লেনের গতিতে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা আর দূরত্বে মিলিয়ে গেল এভারেস্ট। ঘোর ভাঙল অনেক পরে—যখন পায়ের নীচে দমদমের রানওয়ে তার আমন্ত্রণের দীপালি মেলে ধরেছে।

এমনি করেই চকিতে আমরা বিরাটকে দেখি। সেই দেখার বিস্ময় আমাদের সমস্ত জীবনকে আলোকিত করে, আমাদের প্রতি-

বড়ে গোলাম আলী : মহাজাতি সদনে ॥ শিল্পী : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

দিনের ক্ষুদ্রতার ওপর মহিমচ্ছত্র মেলে ধরে। এই পঁচিশে বৈশাখের প্রাক্কালে আমার চোখের সামনে ওই স্বর্ণচূড়ার মতোই ভেসে উঠছে প্রাদেশিক সম্মেলনে ভাষণরত রবীন্দ্রনাথের সেই অনন্য রঙিন ছবিটি—গগনেন্দ্রনাথের আঁকা।

আর একটি বিরাটের স্মৃতি আজ নিবিড় বেদনায় মনের ভেতরে ফুটে উঠল।

এক বন্ধু নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'সামনে বসে তাঁর গান শুনবেন—চলুন।'

সামনে বসে গান শোনা! তাঁকে তো চোখেই দেখিনি এর আগে। রেডিয়োতে, গ্রামোফোন রেকর্ডে কিংবা জলসার রিলেতে (আগে কলকাতায় সংগীত-সম্মেলনের অনুষ্ঠান নিয়মিত রিলে করা হত) শুনেছি তাঁর মধুঝরা কণ্ঠের বিস্তার: জানি, সারা ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ গুণী তিনি, শুনেছি—বাংলাদেশের প্রতি তাঁর অসীম ভালোবাসা, এখানে গান গেয়ে তিনি সবচাইতে খুশী হন। মুখোমুখি বসে সেই মানুষটির গান শুনতে পাব? এমন সৌভাগ্য কে কল্পনা করেছিল!

দক্ষিণ কলকাতার একটি বাড়িতে বসেছিল সেই আসর। গৃহস্বামীর কিছু আত্মপরিজন, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর সংগীত-জগতের ক'জন বিশিষ্ট নরনারী এবং আমরা দুজন। ছোট্ট এবং অন্তরঙ্গ আসর।

তাঁকে সেই আমার প্রথম দেখা।

কালো শেরওয়ানী, মাথায় গোল টুপি, সাদা চোস্ত্-পাজামা। মুখে মোটা গোঁফ। সুদর্শন তিনি আদৌ নন। মধ্যবয়সের মেদে ভারাক্রান্ত শরীর। গালের এক দিকে বড়ো একটা মাংসপিণ্ড। সব মিলে প্রথম দর্শনেই স্বপ্নভঙ্গ হয়।

আমার স্ত্রী হতাশভাবে আমার কানে কানে বললে, 'উনিই?'

৪/১/৫৬

আপ্তাপরত বড়ে গোলাম আলী ॥ শিল্পী : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

বললুম, 'হ্যাঁ, উনিই।'

বোধ হয় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারল না। হতাশভাবে চেয়ে রইল।

তাঁর পেছনে তানপুরা হাতে একটি তরুণ, তাঁরই ছেলে। প্রিয়দর্শন, সুদেহী—দুজনকে পিতা-পুত্র বলে ভাবতেই কষ্ট হয়। তাঁর হাতের কাছে গ্রীক-বীণার মতো বিচিত্র ধরনের একটি বাদ্যযন্ত্র—তাঁর নিজস্ব বিশেষত্ব ওটিও।

কিছুক্ষণ খুচরো গল্প—পরিচিতদের সঙ্গে এক-আধ টুকরো কৌতুক। তারপর শুরু হল তাঁর গান। তানপুরা ধরে সুর রেখে চলল তাঁর ছেলে।

কী গান দিয়ে আরম্ভ করেছিলেন মনে নেই। হয়তো সেই বিখ্যাত গানটির : "ক্যা করুঁ সজনী, আয়ে ন বালম।" সেই প্রৌঢ়, কুদর্শন মানুষটির গলায় ঝরে পড়ল কিশোর-কণ্ঠের অম্লান মাধুর্য—সুরে ভরে উঠল ঘর।

আমার স্ত্রী আবার চমকে উঠল : 'উনিই গাইছেন?'—বিশ্বাস করতে পারছিল না—এই চেহারার মানুষ এমন করে অমৃত-বৃষ্টি করতে পারেন।

আমি ফিসফিস করে ধমক দিয়ে বললুম, 'চুপ করো—কী পাগলামি হচ্ছে! উনি ছাড়া আর কে গাইবেন!'

'শাপমোচনে'র অরুণেশ্বর কী মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কল্পনায়? কমলিকার রূপের মোহ চমকে উঠেছিল কাকে দেখে? রবীন্দ্রনাথের ধ্যানদৃষ্টি কি এইরকম কাউকেই প্রত্যক্ষ করেছিল সেদিন? বলতে পারি না। দেখতে দেখতে তিনি শরীরের সীমা ছাড়িয়ে গেলেন, সুর হয়ে উঠলেন, ছোট আসরটি সেই সুরের গভীরে তলিয়ে গেল। আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু—বিখ্যাত সংগীতশিল্পী তিনি—থেকে থেকে আবেগে 'আহা—আহা' করে উঠছিলেন। সেই মুহূর্তে তাঁর সেই উচ্ছ্বাসও যেন বেরসিকের মতো মনে হচ্ছিল আমাদের।

সব শেষে ধরলেন তাঁর সেই আশ্চর্য গান—সেই "হরি ওম্।" যে গানের পরে আর গান নেই—যে সুরের পর আর সমুন্নতি নেই। সব বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সব যুক্তিতর্ক ছাড়িয়ে যে গান হিমালয়ের স্বর্ণাভ নিঃসঙ্গ শিখরে আমাদের নিয়ে যায়, যে গান আমাদের মহাবলীপুরমের স্মৃতিস্বপ্নিত সমুদ্রের তীরে স্তব্ধ করে, যে গান স্তবের মতো উঠে সমস্ত ঘরটিকে আকাশ-ছোঁয়া মন্দিরে পরিণত করে, যে গানে গায়ককে দেবী-আবির্ভাবের মতো মনে হয়, যে গানে আমাদের সব ইন্দ্রিয়গুলো পঞ্চপ্রদীপের মতো জ্বলে ওঠে।

গান থামল। অর্ধেক শ্রোতা-শ্রোত্রী তখন লুটিয়ে পড়েছে তাঁর পায়ের তলায়। পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসে আছেন তিনি।

সেই আমি আর একবার সিরাটকে দেখেছিলুম। বেলাশেষের আলোয় স্বর্ণ-বুদ্বুদের মতো ফুটে-ওঠা হঠাৎ সেই এভারেস্ট শৃঙ্গের মতো, সেই এক নির্জন রাত্রিতে পাহাড়ের কোলে আর তালবনের বেলাভূমিতে আছড়ে-পড়া জ্যোৎস্নার সমুদ্রের মতো, গগনেন্দ্রনাথের আঁকা প্রাসেলিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের সেই ছবিটির মতো।

কিন্তু ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ আর 'হরি ওম্' গাইবেন না। কোনোদিনই না।

তৃতীয় নয়ন

সমরেশ মজুমদার

পলাশপুরে আমার বাবা কাজ করতেন। ও অঞ্চলের সমস্ত চা-বাগানগুলোর মধ্যে পলাশপুরের বেশ নামডাক ছিল তখন। উৎপাদন ও আয়তনের প্রখ্যাতি ছাড়াও পলাশপুর চা-বাগানের বাবুদের কোয়ার্টারেই প্রথম বিজলীবাতি জ্বলেছিল। ফ্যাক্টরীর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া আঙরাভাসা ঝরনার তীব্র স্রোতে হুইল বসিয়ে ডায়নামো চালিয়ে অ্যার্টকিন্স সাহেব এই বিজলীবাতি জ্বালাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। একটা পাশুটে আলো জ্বলতো কোয়ার্টারগুলোতে। রাত দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে তার আয়ু যেত দপ করে ফুরিয়ে। তবু তারই জন্যে আশেপাশের চা-বাগানগুলো ঈর্ষা করতো পলাশপুরকে। আমার বাবা ঐ ফ্যাক্টরী দেখাশোনা করতেন।

জলপাইগুড়িতে আমাদের একটা বাড়ি ছিল। আমার ঠাকুরদা পলাশপুর থেকে রিটায়ার করে ওখানে বাড়ি করেছিলেন। আমি আর দিদিভাই ঠাকুরদার কাছেই থাকতাম। দিদিভাই সেকেণ্ড ক্লাসে পড়তো বলে ঠাকুরদা কালীপুজোর ঠিক একদিন আগে আমাদের পলাশপুরে যাবার অনুমতি দিতেন। ঠাকুরদা ছিলেন বেশ রাশভারী। চাকুরীকালে তাঁর দাপটে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেতো। তিনি বলতেন, ম্যাট্রিক পাশ করলেই দিদিভাইকে বিদায় করে দেবেন।

বিরাট তিস্তার চরটা ঠাকুরদার প্রকাণ্ড ছাতির তলায় মাথা গুঁজে হাঁটতে হাঁটতে পেরিয়ে আসতাম আমি আর দিদিভাই। পেছনে স্যুটকেস কাঁধে লাটুকাকু। অনেকদিনের পুরনো চাকর বলে ওকে আমরা কাকু বলতাম। তখন তিস্তার জল নেই বললেই হয়। মাঝে একটা পা-পাতা ডোবানো জলের শীর্ণ স্রোত বইলেও রুপোলী বালির চরটা ধুধু করত। মাঝে মাঝে কাশবনের মধ্য দিয়ে পথ হয়ে গেছে হেঁটে হেঁটে। আর বিকট শব্দ করে বার্নিশ-কাছারী যাতায়াত করতো ভাঙাচোরা ট্যাক্সিগুলো প্যাসেঞ্জার নিয়ে। কেন জানি না, ওগুলোকে শহরে ঢুকতে দেওয়া হতো না। ঠাকুরদা ওগুলোকে দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। বলতেন, 'হেঁটে গেলে স্বাস্থ্য ভাল হয়।'

বার্নিশে এসে ঠাকুরদা আমাদের বাসে উঠিয়ে দিতেন। বাসে ওঠার আগে আমরা তাঁকে প্রণাম করতাম। আমাদের মাথায় হাত দিয়ে কি একটা মন্ত্র যেন তিনি পড়তেন। বাস ছাড়ার আগে ঠাকুরদা কন্ডাক্টরকে বারবার করে বলে দিতেন, কোথায় আমাদের নামিয়ে দিতে হবে। বাস ছাড়ার পর স্পষ্ট দেখতাম তাঁর চোখ ছলছল করছে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতাম, আমরা যতক্ষণ না চোখের আড়ালে যাচ্ছি ততক্ষণ উনি দাঁড়িয়ে আছেন। পেছনে বিমর্ষ মুখে লাটুকাকু।

দুধারের শাল সেগুনের আর আম-কাঁঠালের সারির মধ্যে কালো ফিতের মত তেলতেলে পীচের রাস্তাটা ধরে বাস ছুটতো। দিদিভাই বসে থাকত খুব গম্ভীরভাবে। আর মাঝে মাঝে আমাকে বলত, 'বাইরে হাত রেখো না অন্তু।' গাড়ি থামলেই কন্ডাক্টর চেঁচাতো, ময়নাগুড়ি-ধুপগুড়ি-গয়েরকাটা-বীরপাড়া। আর আমি সময় দেখতাম, পলাশপুরে পৌঁছোতে কত দেরি।

সবুজ গালিচার মত ছাঁটা চা-গাছগুলোর মধ্যে নীল রঙের জমিতে সাদা রঙে 'পলাশ-পুর টি এস্টেট' লেখা সাইনবোর্ডটা চোখে পড়তেই বুকের ভেতরটা ছটফট করে উঠত। চেঁচিয়ে বাসটা থামাতেই চোখে পড়ত মা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। পীচের রাস্তাটা, যেটা আসাম অবধি গিয়েছে, সেখান থেকে আমাদের কোয়ার্টারের বারান্দা প্রায় আধ ফার্লং। আমি স্যুটকেসটা মাটিতে রেখে

দিদিভাইকে পেছনে ফেলে এক লাফে একটা পাথরের সিঁড়ি টপকে দু'পাশের পাতাবাহার গাছগুলোর মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে মাকে প্রণাম করতাম। আমার হাঁপানো দেখে মা যখন হেসে বলতেন, 'বোকা ছেলে, দৌড়ে আসতে হয়?'—তখন মায়ের বুকে মুখ ডুবিয়ে থাকতে ভীষণ ভালো লাগত। অথচ দিদিভাই, আসত মৃদু পায়ে। মাকে প্রণাম করেই জিজ্ঞাসা করত, 'চিঠি পেয়েছিলে আমার?' সেকেণ্ড ক্লাসে উঠতে আমার তখন দু' বছর বাকী ছিল।

আর ঠিক তখনই ওদের দেখতে পেতাম। বাস থামতেই ওরা ছুটে এসেছে। আমার বুকের ভেতরে একটা চাপা আনন্দ পাক দিয়ে উঠত। দিদিভাই বলত, 'এখন যেওনা অন্তু, হাতমুখ ধোবে চল।' আমি করুণ চোখে মায়ের দিকে তাকাতাম। তখন মা কি সুন্দর করে হাসতেন। দিদিভাই-এর চাইতে মাকে আমার অনেক বেশী ভাল লাগত। দিদিভাইটা যে কবে ম্যাট্রিক পাশ করবে।

দলবেঁধে হাঁটতে হাঁটতে আমরা মাঠের মধ্যিখানে চলে এলাম। সেই ঝাঁকড়া চাঁপাফুলের গাছটার তলায় টিনের ছাউনি দিয়ে মণ্ডপ করা হয়ে গেছে। তিনদিকের অর্ধেক টিন দিয়ে ঘিরে দিয়ে গেছে বাগানের কুলি। বুড়ি মাংরার মা তখন মণ্ডপের মাটি গোবর দিয়ে নিকোচ্ছিল। মাঝখানে ইঁট আর লাল মাটিতে ঠাকুর বসাবার বেদীর জায়গা করা হয়েছে। একটা মাটিতে গোবরে মেশা গন্ধ আসছিল নাকে আর সেই সঙ্গে মিষ্টি চাঁপার বাস। ওপরের গাছটার ডাল-গুলো সোনা হয়ে গেছে ফুলে।

'ঠাকুর গড়া হয়ে গেছে রে?' আমি মণ্ডপটা দেখতে দেখতে বললাম।

'ধুস' মন্টু বলল, 'শ্রীচরণদা সবে এখন মাথা লাগাচ্ছে।'

'ডাকিনী যোগিনী?' আমার খুব কৌতূহল হচ্ছিল।

'ওদের মাথা লাগানো হয়ে গেছে। শ্রীচরণদাটা না কি বদমাস, সেই কবে মাটি লেপে গিয়েছিল আর আজ এসেছে মাথা লাগাতে। মাথা ছাড়া ঠাকুরকে দেখতে কী খারাপই না লাগছিল!' হাঁটতে হাঁটতে বিশু বলল।

আমরা, এই চা-বাগানের ছেলেরা সোনা-দের কোয়ার্টারের দিকে হাঁটছিলাম। শ্রীচরণদা ওখানে প্রতিমা গড়ছেন। সোনাদের কোয়ার্টারের সামনে এক ফালি জমিতে চালাঘর করে শ্রীচরণদা প্রতিমা তৈরি করেন।

'তোরা এতক্ষণ ওখানে ছিলি?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'হাঁ রে। তোকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে তো গেলাম। জানিস সোনা বলছিল যে, তুই এবার আসবি না।' ঝুনু বললো।

'কেন, আসবো না কেন?' আমি তো অবাক।

'তুই নাকি জলপাইগুড়িতে থেকে খুব ভাল ছেলে হয়ে গেছিস, এবারে ফার্স্ট হবি। তা আমি বললাম, অন্তু না এসে পারবেই না। তাহলে আরতি দেবে কে?' ঝুনুর কথা শুনে আমার এতো আনন্দ হলো যে আমি 'এই রেডি স্টেডি গো' বলে দৌড়তে লাগলাম।

সবার আগে সোনাদের কোয়ার্টারের তারের বেড়াটার সামনে গিয়ে দেখলাম শ্রীচরণদা একটা চ্যাপটা কাঠি দিয়ে ঠাকুরের গলার ভাঁজ ঠিক করছেন একটা লম্বা টুলে চড়ে। জিব লাগানো হয়ে গেছে। শ্রীচরণদার কুঁজো সাকরেদটা ডাকিনী-যোগিনীর তদারকে ব্যস্ত ছিল। প্রতি বছর লক্ষ্মীপুজো পেরিয়ে শ্রীচরণদা আমাদের চা-বাগানে আসেন। সোনাদের বাড়ির সামনে এই এক চিলতে উঠোনে টিনের চালাঘর করে পোয়াল দড়ি দিয়ে ঠাকুর বানাতে বসে যান। হোক না যেদিন ইচ্ছে বাবুদের কালীপুজো কমিটির মিটিং, শ্রীচরণদা জানেন বায়না তাঁর বাঁধা। এক একদিন এক এক বাড়িতে খেয়ে শ্রীচরণদা আপন অধিকার নিজেই জাহির করে, বেড়ান বাগানময়। ডিউটিতে যাবার সময় বাবুরা সাইকেল থামিয়ে হয়ত বলে যান, 'শ্রীচরণ, এবার যেন ঠাকুরের চোখ সুন্দর হয়, গতবারটা যা তেড়া করেছিলে!' সঙ্গে সঙ্গে মাটিমাখা হাত দুটো কপালে তুলে জিব কাটেন শ্রীচরণদা, 'তা কখনো হতি পারে না বাবুমশায়, মা আমার পাপ নেবেন গো!' তারপর প্রতিমাকে মাটি মাখিয়ে শ্রীচরণদা সেই যে উধাও হলেন আর দেখাই নেই। সমস্ত চা-বাগানের মানুষকে দারুণ উৎকণ্ঠায় করে রেখে শ্রীচরণদা তখন আশেপাশের বাগানগুলোর প্রতিমা গড়ছেন। আর

কালীপুজোর আগের দিন সকালে এসে একগাল হেসে হলদে ছোপ ধরা দাঁতগুলো বের করে বলবেন, 'প্রণাম গো।'

ওদের আমি দেখতে পেয়েছিলাম। এই চা-বাগানের সব ছোট ছেলেমেয়ে আর মহিলারা টুলে বেঞ্চিতে বসে আছে। সোনাদের কোয়ার্টারের এই বারান্দাটা এখন সাময়িকভাবে সবার আকর্ষণ। আতর মাসীমা, সোনার মা, বসেছিলেন একটা বেতের চেয়ারে। আমাকে দেখেই ডাকলেন, 'আয় অন্তু, ভেতরে আয়। তোর ঠাকুরমার বাতের ব্যথাটা সেরে গেছে?'

'হ্যাঁ' বলে তারের গেটটা খুলে আমি ভেতরে ঢুকলাম।

'এই যে, ছোট কর্তা এসে গেছেন দেখছি।' আমাকে দেখে শ্রীচরণদা হাত থামালেন। 'বড় কর্তার শরীর ভালো তো?' উত্তরে আমি ঘাড় নাড়লাম। শ্রীচরণদা যেবার প্রথম ঠাকুর গড়ার বায়না পান সেবার ঠাকুরদা ছিলেন পুজো কমিটির সেক্রেটারী। ঠাকুরের প্রসাদ দিয়ে সেবারই আমার অন্নপ্রাশন হয়েছিল। শ্রীচরণদা ঠাকুরদাকে বলতেন 'বড় কর্তা', আর সেই সুবাদে আমি ছোট কর্তা।

আসলে আমার এখন কী যে ভালই না লাগছিল! এই চেনা পরিবেশ, জন্ম ইস্তক যা আমি দেখে আসছি, জলপাইগুড়ি থেকে এখানে এসে এদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার বুকের ভেতরে একটা আনন্দ চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছিল। প্রতি বছরের মত সোনাদের কালো রঙের লম্বা কানওয়ালা কুকুরটা গন্ধরাজ গাছটার তলায় বাঁধা আছে। আমাকে দেখে লেজটা নাড়ছে সেটা। কানে এলো, আতরমাসীমা মুনুর মাকে বলছেন, 'ছোঁড়াটা বড় হলে ওর বাপের মত লম্বা হবে।' মুনুমাসীমা জবাবে যেন বললেন, 'অসুখে থেকে খুব শান্ত হয়ে গেছে, বেশ মিষ্টি মুখটা।'

কথাগুলো শুনতে আমার ভীষণ ভালো লাগছিল। বিশু, মুনু, মন্টুদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হলো, গতবার জলপাইগুড়ি যাবার সময় আমি কৌটোতে করে এক মুঠো মাটি নিয়ে গিয়েছিলাম। জলপাইগুড়ির বাড়ির উঠোনে সেই মাটি রেখে দিয়ে রোজ একবার করে দেখতাম আর চা-বাগানের কথা ভাবতাম। তখন মনে হতো আমি বিশুদের কাছেই আছি। এক রাত্রে এমন বৃষ্টি হলো যে পরদিন সেই মাটিটাকে আলাদা করে চিনতে পারিনি আর।

বারান্দার এক কোণে মোড়ায় একটা খয়েরী ফ্রক পরে দুই বিনুনি ঝুলিয়ে সোনা বসেছিলো হাতের চেটোয় গাল রেখে। ড্যাবডেবে চোখে আমাকে দেখছিল ও। সোনার গাল দুটো যেমন ফর্সা তেমনি ফোলা। আমরা ওকে একা পেলেই 'রসগোল্লা, রসগোল্লা' বলে খ্যাপাতাম। আর ও কিছুক্ষণ রেগে-মেগে শেষে ভ্যাঁ করে গলা ছেড়ে কাঁদত।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে কখন হলো বুঝতে পারিনি। সোনাদের বারান্দার একধারে একটা পেট্রোম্যাক্স জেলে তারের শিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। চালাঘরের এদিকে কোন লাইন নেই ইলেকট্রিকের। সাইকেলের ঘণ্টাগুলো তখন বাজতে শুরু করেছে আধো-অন্ধকার মাঠের মধ্যে। বাবুরা সব অফিস থেকে ফিরতে শুরু করেছেন। ফ্যাক্টরীটা আমাদের কোয়ার্টারগুলো থেকে কোয়ার্টার মাইল দূরে। আমরা এতক্ষণ উবু হয়ে বসে ঠাকুরগড়া দেখছিলাম। মাটির কাজ শেষ। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েই দূরে মাঠের ওপাশে চা-বাগানের রাস্তায় পাতলা অন্ধকারে সাইকেলের লাইট জেলে বাবাকে আসতে দেখে আমি [illegible] ছুটতে লাগলাম বাড়ির দিকে। এতক্ষণে আমার শীত শীত করছিল। [illegible]

জামা গায়ে না দেখলে বাবা ভীষণ রাগ করতেন মায়ের ওপর।

বাবা বাড়িতে একটা ছোটখাটো পোলট্রি ফার্ম করেছিলেন। ভাল জাতের কয়েকটা লেগহর্ন মুরগি ছাড়াও কাঁঠালগাছের তলায় হাঁসের ঘর ছিল, বাড়ির পেছনে আঙরাভাসা ঝরনার ধারে আমাদের খড়ের ছাউনি দেওয়া গোয়ালঘরে চারটে অগজপুরী গরু সারা বছর ধরে দুধ দিত। কালীপুজোর আগের দিন সেই দুধ জমিয়ে এক কড়াই ভর্তি নতুন গুড়ের পায়েস হত। লাল রঙা সেই পায়েস থেকে অদ্ভুত একটা ঘ্রাণ বেরোত। বাড়ি ফিরেই দেখতাম, মা আর দিদিভাই উঠোনের তুলসীতলায়, বারান্দায়, কাঁঠাল-তলায়, খিড়কি দুয়োরে চোদ্দপিদিম দিচ্ছেন। চোদ্দপিদিম দিলে ভূতপেত্নী আমাদের বাড়িতে ঢুকতে পারে না। তারপর মা আমাদের বাটি ভর্তি করে পায়েস খাওয়াতেন। শীতকালে সেই প্রথম আমাদের পায়েস খাওয়া।

বাবার গলা পেলেই আমার বুক দুরুদুরু করে উঠত। যা ভয় করতাম ঠিক তাই। বাবা আমাকে ডেকে পাঠাতেন। এই সময়টাই ছিল সব চাইতে মারাত্মক। বাবা আমাকে একটার পর একটা প্রশ্ন করে যেতেন। কেন গত পরীক্ষায় আমি অংকে কম নম্বর পেয়েছি, কেন ঠাকুমাকে বিরক্ত করি, কেন সন্ধ্যের আগে বাড়ি ফিরি না— এই সব। আমি কোন উত্তর দিতে না পেরে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকতাম। আর দিদিভাই তখন বাবার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আমার বিরুদ্ধে হাজার অভিযোগ যোগান দিত। বাবার সঙ্গে দিদিভাই-এর ব্যবহার ছিল সহজ। মাকেই বরং ও ভয় করতো। আমার ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। বাবার প্রশ্নে আমি যখন নাজেহাল হয়ে পড়েছি তখনই রান্নাঘর থেকে মা আমাকে পায়েস খেতে ডাকতেন। ডাকটা আমার কানে অমৃত বর্ষণ করত।

একটু বাদেই সোনাদের কোয়ার্টারের সামনে থেকে কাঁসর বাজার শব্দ আসত। ঠাকুর নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মণ্ডপে। সঙ্গে সঙ্গে আমার ইচ্ছে হত মণ্ডপে ছুটে যেতে। তাই, পা টিপে টিপে, বাইরের ঘরে রেডিওর পাশের সোফায় বসে কাগজপাঠনরত বাবার সামনে দিয়ে মুখটাকে খুব নিরীহ করে, যেন বাড়ির বারান্দায় একটু দাঁড়াচ্ছি এমনি ভঙ্গী করে যেই হাঁটতাম অমনি বাবার গম্ভীর গলা কানে আসতো, "খুকু হাতা সোয়েটারটা পরে যাও। পায়ে মোজা নেই কেন? ঠাণ্ডা না লাগালে আর চলছে না?"

একটা লম্বা চুলের হ্যাজাকটা [illegible] মণ্ডপটা ঝলমল করছে। বেদীতে ঠাকুরকে বসানো হয়েছে। কি [illegible] [illegible]
[illegible]

ভাঁজে ভাঁজে মাটিতে যেন ফাটল ধরেছে একটু। ঠাকুরের গায়ে কোথাও রঙ নেই একটুও। মন্টু বলল, 'শ্রীচরণদা না এই মাত্র আমাদের বাড়িতে খেতে গেল!'

সোনাকে নিয়ে আতরমাসীমা এইমাত্র এলেন। এ চা-বাগানের একমাত্র পুজোর সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানে মেয়েদের নেতৃত্ব করেন আতরমাসীমা। সোনাকে দেখলাম একটা ভারী শাল গায়ে জড়িয়ে এসেছে। দেখেই বুঝতে পারছিলাম ওটা আতর-মাসীমার শাল। মণ্ডপের তিনদিকের অর্ধেক খোলা জায়গাগুলোতে সুনীতদারা ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দিচ্ছিল যাতে ঠাণ্ডা হাওয়া না আসে। আজ সারা রাত জেগে

[illegible]
একটা কাগজে ডেকোরেশনের একটা প্ল্যান এ'কে বাদলদাকে বোঝাচ্ছিলেন। বিনু-মাস্টার এখানকার জুনিয়র স্কুলে সংস্কৃত পড়ান, সেই সঙ্গে ড্রয়িংও। অনেকগুলো বাঁশ আর লাল নীল কাগজ আনা হয়েছে মণ্ডপে। 'বড়রা, মানে এই বাগানের ডাক্তার-বাবু, টাইপবাবু, প্যাকিবাবু, মালবাবুরা সব গলাবন্ধ সোয়েটার অথবা চাদর আর মাথায় বাঁদরটুপি পরে গল্প করছিলেন একধারে। বনুর বাবা, এই বাগানের ডাক্তারবাবু পুজোর দিন পাঁঠা বলি দিয়ে থাকেন। উনি বলতেন, সারা জীবনে এক কোপে উনি এক শ' আটাশটা পাঁঠা বলি দিয়েছেন। এক কোপে

না কাটলে নাকি মা অসন্তুষ্ট হন। মন্টুর বাবা বললেন, 'আপনি মশাই রক্ষক আবার ভক্ষকও। ডাক্তারি করে মানুষ বাঁচান আবার এক কোপে পাঁঠাও বলি দেন।' ঝুনুর বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন। লোকে বলে, উনি নাকি শক্তিসাধনা, না কি বলে, করেন। এর মধ্যে দিদিভাইকে নিয়ে মা একবার ঘুরে গেছেন। মাকে লাল পেড়ে শাড়িটা পরায় কি সুন্দর লাগছিল! দিদিভাই এসেছিল মুখে রঙ মেখে সাদা রঙের ওপর কালো নকশা তোলা কার্ডিগান পরে। দিদিভাইকে এখানে ঠিক মানাচ্ছিল না। কেমন শহুরে শহুরে লাগছিল ওকে। ও বোধহয় তাই চেয়েছিল। চা-বাগানের অন্যান্য মেয়েরা দিদিভাইকে কেমন চোখে যেন দেখছিল। সুনীতিদারা সব কাজ থামিয়ে মায়ের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল. স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম দিদিভাই-এর সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল। দিদিভাই এখানে বেশ ডাঁট নিয়ে থাকে। এখনকার কারোর সঙ্গে মিশতে চায় না। মা আমাকে ডেকে বললেন, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে। বাবার নাকি আজ নাইট ডিউটি আছে। একটু বাদে মা আর দিদিভাই টর্চ জ্বেলে বাড়ি চলে গেলেন। সুনীতিদা গেল মায়েদের পৌঁছে দিয়ে আসতে। সুনীতিদা কলকাতায় কলেজে পড়ে।

আমরা, মানে আমি, বিশু, মন্টু, খোকন, ঝুনু ঠাকুরের সামনে একটা সতরঞ্চিতে বসে ছিলাম। সোনাও আমাদের দলে ভিড়ে গিয়েছিল। ও বললো, 'জানিস, এখনো সন্দেশ কেনা হয়নি পুজোর।' আমি বললাম, 'তোর তো সন্দেশ খাওয়ার জন্যে লাল পড়ছে।' মুখ ভেঙচে সোনা বললো, 'ইস, তুইতো অঞ্জলি দেবার সময় হাত বাড়িয়ে সন্দেশ চুরি করিস থালা থেকে, আমি দেখেছি।' 'হ্যাঁ তুই দেখেছিস!' আমার খুব খারাপ লাগলো কথাটা। মন্টু বললো, 'জানিস, আমার না কেমন ম্যাজিক লাগে। এই এখন দেখে যাচ্ছি এইরকম, আর সকালে এসে দেখবো ঠাকুর কেমন সুন্দর প্রতিমা হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'সুনীতিদাদের কি মজা না? ওরা কেমন রাত জেগে ডেকোরেশন করতে করতে ঠাকুরের প্রতিমা হয়ে যাওয়া দ্যাখে।'

ঝুনু বললো, 'ইস, আমরা যে কবে বড় হয়ে ডেকোরেশন করব!'

আমরা আমাদের বড় না হওয়া নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আফশোস করলাম। হঠাৎ আমার মাথায় একটা মতলব এলো। 'এই আজ রাতে ঠাকুর রঙ করা দেখবি?'

ঝুনু মুখ বেঁকালো, 'কি করে দেখবো? মা তো আসতেই দেবে না।'

মন্টু বললো, 'বাবা বলবে, সকালে পরীক্ষা—অসুখ করবে।'

বোঝা গেল আমাদের কাউকেই বাড়ি থেকে ছাড়বে না। একমাত্র আশা বাদ ভোরে। তখন শিউলি ফুল কুড়োবার নাম করে বেরোনো যায়। অবশ্য এই ব্যাপার রাতিও মেয়েদের একচেটিয়া, তবুও। লক্ষ্মীপুজো আর কালীপুজোর দিন অন্ধকার থাকতেই চা-বাগানের সব মেয়েরা, আঠারো থেকে পাঁচ বছরের বাচ্চা অবধি মাঠের চারটে শিউলি গাছের তলায় বসে যায় সাজি ভরে শিউলি ফুল কুড়োতে। এমন সময় বিশু কি ভেবে হঠাৎই বললো, ও আজ রাতে আসবেই। রাত ঠিক বারোটার সময় ও লুকিয়ে লুকিয়ে এসে বড় শিউলি গাছটার সামনে দাঁড়াবে। আমি বললাম, আমিও আসবো। আজ রাতে ঠাকুর রঙ করা দেখবোই। আমার মাথায় তখন ঘুরছিল, বাবা আজ নাইট ডিউটি দিতে যাবেন।

রাত দশটা নাগাদ বাবা গরম আলেস্টার, মাথায় উলের টুপি, হাঁটু অবধি মোজা পরে ডিউটিতে গেলেন সাইকেলে চড়ে তিন ব্যাটারীর টর্চ জ্বেলে। মা একটা ফ্লাস্কে কফি তৈরী করে দিয়েছেন। প্রচণ্ড শীত পড়েছে। এখন মা লণ্ঠন জ্বেলে রেখেছেন। একটু আগে ঠিক দশটা বাজতেই ইলেকট্রিক আলোটা নিভে গিয়েছে। বাবা চলে যেতেই আমি খাট থেকে নেমে মায়ের খাটে উঠে এলাম। আমাকে বাবার সঙ্গে শুতে হতো, দিদিভাইকে মায়ের সঙ্গে। মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'কিরে ভয় লাগছে বুঝি?' আমি ঘাড় নেড়ে মায় পাশে শুয়ে পড়লাম। মা তখন লণ্ঠনের আলোয় গল্পের বই পড়ছিলেন। একটু বাদে আমি ফিসফিস করে বললাম, 'মা, আমি ঠাকুরগড়া দেখতে যাব।'

মা পড়তে পড়তে বললেন, 'ঠাকুরতো হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'না রঙ করা হয়নি। আমি কখনো রঙ করা দেখিনি। ওরা সবাই আসবে। তুমি একবার বলো, মা?'

মা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না, তোমাকে যেতে দেব না। এখন বাইরে হিম পড়ছে। তোমার ঠাণ্ডা লাগবে। তোমার বাবা শুনলে ভীষণ রাগ করবেন।'

কিন্তু আমি মাকে ছাড়লাম না। বারংবার কাকুতি মিনতি শুরু করলাম। ভাগ্যিস দিদিভাইটা এখন মড়ার মত নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। যখন অনেক নাকি কান্না কেঁদে প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছি আর বিশুর কাছে মনে হচ্ছে ছোট হয়ে গেছি তখন হঠাৎ মা বললেন, 'ঠিক আছে, যাও তুমি। তবে তোমাকে কথা দিয়ে যেতে হবে।' 'কি কথা, বলো?' আমি ঝলমলে মুখে বললাম। 'তোমাকে পরীক্ষায় স্ট্যান্ড করতে হবে

প্রতি সপ্তাহে আমাকে একটা করে চিঠি দেবে আর একদম ঠাণ্ডা লাগাবে না।'

এ তো সামান্য, মা যদি আমাকে তিনদিন ভাত না খেতে বলতেন তবে তাতেই আমি রাজী হয়ে যেতাম। মা বললেন, 'এবার তুমি ঘুমোও। বারোটার সময় আমি তোমাকে তুলে দেব।' মড়ার মত ঘুমের ভান করে শুয়েছিলাম। বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজতেই লাফিয়ে উঠলাম। মা তখনো বই পড়ছিলেন। আমাকে উঠতে দেখে হেসে বললেন, 'এই ঘুম হচ্ছিল তোমার?'

গলাবন্ধ সোয়েটারের ওপর চাদর জড়িয়ে, মাফলারে কান ঢেকে ছোট টর্চটা নিয়ে যখন বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম তখন মনে হলো আমার রক্ত বোধহয় জমে যাবে। এক একটা হাওয়ার ঝাপটা লাগছে আর দাঁতগুলো ঠকঠক করে আওয়াজ তুলছে। বাইরে কি ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাড়ির সামনে বড় শিউলি গাছটার তলায় এসে দাঁড়ালাম। বিশু এখনো আসেনি। শিউলি গাছের তলার ঘাসগুলো সাদা চাদর পরেছে যেন। শিউলি ফুলগুলো গালিচার মত ছড়িয়ে আছে। মাথার ওপর টুপ টুপ করে শিউলি ঝরছিল। কান পাতলে শিশিরের শব্দ শোনা যায় পাতায় পাতায়। মাঠের ওপাশে বড় রাস্তার ওধারে মাড়োয়ারী দোকানটা অন্ধকারে ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। পীচের রাস্তাটা, যেটা আসাম অবধি গিয়েছে, সেখানে মাঝে মাঝে এক একটা লরি প্রচণ্ড বেগে ছুটে যাচ্ছিল। গাড়ির হেডলাইটে সমস্ত জায়গাটা হঠাৎ আলোকিত হয়ে পরক্ষণেই অন্ধকারের গাঢ়ত্ব তুলছিল। দূরে মাঠের মধ্যিখানে মণ্ডপ থেকে একটু-খানি আলো বাইরে পড়েছিল আর মাঝে মাঝে ওদের কথাবার্তা অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। এদিকের সব ক'টা কোয়ারটারে অন্ধকার ডালপালা মেলে দিয়েছে। পাতা-বাহার গাছগুলোর ওপাশে একটা বিরাট দেওদার গাছ আছে। ঝনু বলেছিল, ঐ গাছে নাকি একটা সাহেব-ভূত বিরাট পা ঝুলিয়ে বসে বসে চুরুট খায়। মাঠের মধ্যে ঝাঁক ঝাঁক জ্বলন্ত জোনাকি দেখে আমার সেই চুরুটের কথা যেই মনে পড়লো অমনি গা-টা ছমছম করে উঠল। দূরে সাঁওতাল লাইনে মাদল বাজছে। খেউদির গান তৈরী হচ্ছে লাইনে লাইনে। ওদের সম্মিলিত কণ্ঠের গান খুব অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল।

অন্ধকারটা একটু চোখ-সওয়া হয়ে গিয়েছিল এরই মধ্যে। হঠাৎ দেখলাম কে যেন মাঠের পাশ ধরে দৌড়ে আসছে। কাছাকাছি আসতেই টর্চটা জ্বালতেই আমি অবাক হয়ে গেলাম। অন্ধকারে টর্চটা নিবিয়ে ফেলে একবার ভাবলাম, তারপরে টর্চ জেলে কাছে যেতেই সোনা এগিয়ে এল।

'তুই?' আমি ধাক্কাটা সামলাচ্ছিলাম, 'কি করে এলি?'

'কেন? মামারা তো পাশের ঘরে শোয়। দিদা ঘুমোতেই আমি পা টিপে টিপে খিল খুলে চলে এলাম।' সোনা নির্বিকার।

'আহ্রমাসীমা ভীষণ রাগ করবেন!' আমি ওকে বোঝাতে চাইছিলাম যেন।

'ইস্, জানতেই পারবে না। আমায় দেখতে ইচ্ছে করে না বুঝি? তোরা একাই মজা করে দেখবি, না?' সোনার গলায় অভিযোগ।

হঠাৎ লক্ষ করলাম সোনার গায়ে গরম কাপড়ের নামমাত্র নেই। ফুলহাতা একটা গরমের ফ্রক পরেছে ও। তাড়াতাড়িতে হয়তো পরে আসতে পারেনি কিছু।

আমি বললাম, 'সোনা, তোর ঠাণ্ডা লাগছে?'

সোনা ঘাড় নেড়ে না করলেও বুঝতে পারছি ঠাণ্ডা ওর লাগছেই।

'বিশুটা এখনো এলো না।' আমি বললাম।

'দাঁড়া, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি।'

কিন্তু বেশ কিছুক্ষণের মধ্যে যখন বিশু এলো না তখন আমরা দুজনে আস্তে আস্তে মাঠের মধ্যে দিয়ে শিশিরে পা ডুবিয়ে এগোতে লাগলাম মণ্ডপের দিকে। একটু এগোতেই গ্রামোফোনের সুর শুনতে পেলাম। রেকর্ড বাজছে, 'আমি বনফুল গো, ছন্দে ছন্দে।' এই রাত্রে, নির্জন রাত্রে গানের সুর অতিরিক্ত আওয়াজ আনছিল। রাত জগতে হলে নাকি গ্রামোফোন বাজানো দরকার। কিন্তু কোন বাড়ি থেকে রেকর্ড দিতে চায় না বলেই এই রেকর্ডটা সুনীতদারা আমাদের বাড়ি থেকে প্রতি বছর নিয়ে যায়। মনে হচ্ছিল, এই নিশুতি চতুর্দশীর রাত্রে যখন চা-বাগানের ছোট্ট পৃথিবীটা অথৈ ঘুমে সুপ্ত, যখন জোনাকিগুলো বিরাট মাঠের মধ্যে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে আগুন জ্বালাতে ব্যস্ত, তখন মণ্ডপের ক্ষীণ আলো এত দূরে অন্ধকারে দাঁড়ানো আমার চোখে গহন সমুদ্রের আলোকস্তম্ভের কাজ করছিল। দূরে সাঁওতাল লাইনে মাদল বাজছে আর সম্মিলিত সুরে গানের ধুয়ো অন্ধকারকে চিরে এই মাঠের বুকে এসে গানের সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে আমাদের কানে কনসার্টের মতন বাজছিল। পায়ে পায়ে আমরা মণ্ডপের দিকে এগিয়ে গেলাম।

'কে রে? কে ওখানে দাঁড়িয়ে?' বিনু মাস্টার হাঁক দিলেন।

গলাটা শুনেই পাতাবাহার গাছগুলোর পাশে আমরা থমকে দাঁড়ালাম। এখন আমাদের মধ্যে দ্বিতীয় একটি ভয় সঞ্চারিত হল। ওরা যদি আমাদের ওপর খুব রেগে যায়। সোনা সিঁটিয়ে আমার গায়ের সঙ্গে লেপ্টে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে আমাদের ওরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না। এক ঝলক বাতাস মণ্ডপের ওপরের রাশ রাশ চাঁপাফুলের গন্ধ আমাদের মাখিয়ে গেল।

'আরে সাড়া দিচ্ছে না কেন? সুনীত দ্যাখ তো কে দাঁড়িয়ে আছে?' বিনু মাস্টার মণ্ডপের ভেতরে বাখারি চাঁচতে চাঁচতে বললেন। সুনীতদারা সারা মণ্ডপে বাঁশের ফ্রেম করে কাগজে আটা মাখাচ্ছিল। বিনু মাস্টারের কথায় 'ভূত টুত নয়তো বাবা' বলে মণ্ডপের সামনে এসে চীৎকার করে ডাকলো, 'কে বাবা, সাড়া দাও, নইলে বাঁশ ছুঁড়ে মারবো।'

কথাটা শোনামাত্রই আমার মুখ দিয়ে বের হল, 'আমি।'

'আমিটা কে?'

'আমি আমি অনু।'

ততক্ষণে সুনীতদা বাদলদা আমাদের কাছে এসে পড়েছে। 'আরে? তোরা?'

'তোরা কি করছিস এখানে? দ্যাখো বিনুদা—' আমাদের টানতে টানতে সুনীতদা মণ্ডপের ভেতরে নিয়ে এলো। বিনুমাস্টার আমাদের দেখে চোখ কপালে তুললেন, 'কি কাণ্ড! তোরা এখানে এত রাত্রে। বদমায়েস ছেলেরা সব, যাও যাও।' আর ততক্ষণে আমাদের নিয়ে মণ্ডপের দাদাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। 'ছোঁড়াটার জলপাইগুড়ি গিয়ে বড্ড বোলচাল বেড়ে গিয়েছে। এমন অবাধ্য সব! আজকালকার ছেলেগুলো কাউকে মানতেই চায় না। আচ্ছা, বাড়ি থেকেই বা ছাড়ল কি করতে। বাবা মার দায়িত্বজ্ঞান কিরকম। নিশ্চয়ই পালিয়ে এসেছে।' ইত্যাদি ইত্যাদি। বিনুমাস্টার বললেন, 'যাও সুনীত, ওদের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। তুমি সঙ্গে যাও।' সোনা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। কথাটা শুনেই ডান হাতটা দিয়ে চোখ রগড়ে ভ্যাঁ করে কান্না শুরু করল। সোনার কান্না শুনে শ্রীচরণদা অভিভাবকের ভূমিকা নিলেন, 'আহা, কাঁদ কেনে মা ঠাকরুন। আহা, তোমার আবার বকতিছ কেনে? আসিই যখন পাড়ছে তবে থাকুক কেনে হেথায়।' সোনার কান্না আরও বেড়ে গেল। বিনুমাস্টার আমাদের কিছুক্ষণ দেখে বললেন, 'আচ্ছা, থাক আর কাঁদতে হবে না। যাও, ঐ কোণায় গিয়ে চুপটি করে বসে থাকো। একটিবার গণ্ডগোল করলেই বাড়ি পাঠিয়ে দেব।'

আমরা সুড়সুড় করে টিনের বেড়ার পাশে সতরঞ্চির ওপর গিয়ে বসলাম। ওরা আবার কাজে আড্ডায় মশগুল হয়ে গেল। ঠাকুরের গায়ে সাদা রঙ বোলানো হয়ে গেছে। কি বিশ্রীই না লাগছিল ঠাকুরকে দেখতে। বিনুমাস্টারের বাঁশ কাটার শব্দ আসছিল মণ্ডপের সামনে থেকে। একটু বাদে আমার কানের কাছে সোনা ফিসফিসিয়ে বলল, 'কেমন বোকা বানিয়ে দিলাম বলতো। না কাঁদলে ঠিক বাড়ি পাঠিয়ে দিত।' ঠাকুরের পেছনের গ্রামোফোনে তখন বাজছিল, 'প্রলয় নাচন নাচলে যখন হে নটরাজ।'

শ্রীচরণদা নীল রঙ গুলছিলেন একটা বড় বালতিতে। রঙের গন্ধ আসছিল নাকে। শ্রীচরণদার কুঁজো সাকরেদটা ঠাকুরের পায়ের নীচে শোয়া শিবের গায়ে সাদা রঙ বোলাচ্ছিল। ডাকিনী যোগিনীকে দুটো সাদা পেত্নীর মত লাগছিল দেখতে। ভেকো...

চলছে। একটা মন্দির হবে। ঠাকুরের বেদীটা মন্দিরের ঠিক মাঝখানে থাকে। সুনীতদা কাগজ কেটে দিচ্ছিল, বাদলদারা আঠা মাখাচ্ছিল এখন। হঠাৎ সুনীতদা উঠে আমাদের কাছে এগিয়ে এলো। হাঁটু গেড়ে আমাদের সামনে বসে আমার কানটা মলে দিয়ে বলল, 'আগে থেকে প্ল্যান করে আসা হয়েছে না? খুব পেকেছ তুমি।' তারপর সোনার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তারপর সোনামণি, মাকে বলে দেবে না তো সুনীতদা সিগারেট খায়।' সোনা মাথা নেড়ে না বললো। সুনীতদা ডান হাতে সোনার ফোলা ফোলা গাল দুটো টিপে বললো, 'লক্ষ্মী মেয়ে।' সুনীতদা চলে যেতেই সোনা মুখ লাল করে বললো 'অ-সো-ব্যো!' আমার ভীষণ রাগ হচ্ছিল সুনীতদার ওপরে।

মাথার ওপরে টিনের চালে চাঁপাগাছের পাতা চুঁইয়ে শিশির পড়ছিল টপ টপ করে। সোনা আমার কাছে বসেছিল। 'তোর শীত লাগছে সোনা?' জিজ্ঞাসা করতেই ও ঘাড় নাড়লো, 'হ্যাঁ।' 'আমার চাদরটা নে তুই' বলে চাদরটা খুলে এক প্রান্ত ওর পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে আর-একটা প্রান্ত আমার গায়ে জড়িয়ে দুটো মুখ সামনে এনে পায়ের তলায় গুঁজে দিলাম। একটু বাদেই চাদরের মধ্যে বেশ একটা ওম্ হলো। সোনার কাঁধের সঙ্গে আমার কাঁধ জুড়ে গিয়ে ঠাণ্ডা আর লাগছিল না।

বাদলদা বলছিল 'শালা আমাদের বাগানে একটাই তো পুজো, তবু ডেকোরেশনের বেলায় কী কিপ্টেমি। মাল না ছাড়লে ডেকোরেশন হয়।'

বিনুমাস্টার বললেন, 'সবই পুজোর পর গাণ্ডেপিণ্ডে গিলতে চায় তো কি হবে!' ঠাকুরের গায়ে নীল রঙ বোলানো হলো। কুঁজো সাকরেদটা ডাকিনীযোগিনীকে নীল রঙ না বুলিয়ে মেটে রঙ করতে আরম্ভ করল। নীল রঙের পোঁচটা পড়ায় ঠাকুরকে কেমন যেন লাগছিল। একটা বড় তুলি রঙের বালতিতে ডুবিয়ে শ্রীচরণদা বড় বড় পোঁচ টানছিলেন ঠাকুরের পায়ে। মাথাটা এখনো নেড়া বলে মুখটা বিশ্রী লাগছিল। সোনা আর কাঁপছিল না। ওর আঙুল আমি ধরেছিলাম। কি ঠাণ্ডা ওর হাতটা।

'ঠাকুরের গায়ের রঙ কি বলতো?' সোনা জিজ্ঞেস করল।

'কেন, ঠাকুরের গায়ের রঙ তো নীল।' আমি বললাম।

'নীল রঙ হয়ে গেছে। মা বলতো কালোও রে। তাই তো নাম কালী।'

'এখনো জামা পরায়নি।'

'ধ্যেৎ, ঠাকুর জামা পরে নাকি! মা বলেছে দুষ্ট করে মানুষের হাত কেটে ঠাকুর জামা করে পরেছে।'

'শিবের বাঘছালটা কিন্তু এখনো হয়নি। ভুলে যাবে না তো।'

এখন ঠাকুরের হাতের চেটোতে, জিবে পায়ে লাল রঙ বোলোলেন শ্রীচণরদা। সুনীতদারা লাল নীল কাগজে সমস্ত মণ্ডপ জুড়ে মন্দির করে ফেলেছে। এখন আর গ্রামোফোন বাজছে না। বিনুমাস্টার রঙ তুলি সাজাচ্ছিলো। শ্রীচরণদা যখন ঠাকুরের বুকের কাছে খয়েরী রঙ বোলাচ্ছেন তখন পেছন থেকে কে যেন জিভে করে চক্‌চক্‌ শব্দ করল। শ্রীচরণদা একবার তুলিটা থামিয়ে আবার রঙ করতে লাগলেন। সুনীতদা ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে এক হাত কোমরে রেখে সিগারেট টানতে টানতে বললো, 'শালা, শ্রীচণরদার এলেম আছে মাইরী। তুলির টানে টানে মায়ের সুরৎ খুলে যাচ্ছে।' সামনে থেকে বিনু মাস্টার ধমকে উঠলো, 'এই সুনুতে, মাকে শালা বলছিস কোন আক্কেলে রে?' সুনীতদা বলল, 'এক্সকিউজ মি বিনুদা। তবে মা তো এখনো কমপ্লিট হয়নি। না আঁকা হলে তো আবার লাইফ আসে না।'

সোনা আমার হাঁটুর ওপর ঝুঁকে পড়ে

কুর রঙ করা দেখছিল। আমার এখন কুরকে দেখতে খুব খারাপ লাগছিল। শ্রীচরণদা যত রঙ বোলাচ্ছে ততই মনে হচ্ছে ঠাকুর কেমন ন্যাংটা ন্যাংটা। সাধনদা উঠে এসে সুনীতদার পাশে দাঁড়াল, 'শালা, কি করেছে মাইরী।'

সুনীতদা বলল, 'চেহারা দেখেছিস?'

বাদলদা কী যেন দেখে বলল, 'এ্যাবসার্ড'।'

ওরা খুব চাপা গলায় কথা বলছিল যাতে বিনু মাস্টার না শুনতে পায়।

বাদলদা এক সময় বলল, 'আমাদের বাগানটা মাইরী একদম সাহারা। একটাও নেই যার দিকে তাকানো যায়।'

সাধনদা বললো, 'কেন, অন্তুর দিদি!'

সঙ্গে সঙ্গে সুনীতদা ধমকে উঠলো, 'এ্যাই!' তারপর নীচু গলায় বললো, 'সোনাটা মাইরী ফিউচারে—' বলে চোখ টিপল।

'এই, আস্তে।' বাদলদা কথাটা বলে আমাদের দিকে তাকাল।

আমার খুব অবাক লাগছিল ওদের কথা শুনে। কেমন রহস্যজনক লাগছিল আমার! আমি বুঝতে পারছিলাম না। সোনার দিকে তাকালাম। ওর নাক দিয়ে জল গড়াতেই ও টেনে নিল সেটা। সাধনদা একবার বলেছিল 'কি সেপ্।' মানে কি আদল? আদল মানে, আকৃতি? ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে সাধনদা কথাগুলো বলেছিল। তারপর সোনার দিকে। সোনাকে ঠাকুরের মত কল্পনা করে আমার খুব হাসি পেল।

সোনা বলল, 'এই হাসছিস যে!'

'এমনি', আমি বললাম।

'সুনীতদাটা না খুব অসভ্যো।'

'হ্যাঁ।'

'তোর দিদির সঙ্গে ভাব আছে। চিঠি দেয়।'

'যাঃ!'

'হ্যাঁরে! আমি জানি।' সোনা কথাটা বলতেই আমার সুনীতদার ওপরে ভীষণ রাগ হতে লাগল।

'এই সোনা, তুই না বড় হলে—'

'এ্যাই!' সোনা আমাকে চিমটি কাটলো রেগে।

শ্রীচরণদা ঠাকুরের মাথায় চুল লাগালেন আঠা দিয়ে। পেছনে একটা স্টোভ জ্বলছিল বলে সোঁসোঁ আওয়াজ আসছে। বোধ হয় চা হচ্ছে। এখন বোধ হয় শেষ রাত। অন্ধকারে জোনাকি জ্বলা থেমেছে। দূরের সাঁওতাল লাইনের মাদলের শব্দ থেমে গেছে। চারপাশ কি আশ্চর্য থমথমে। শুধু মাথার ওপরে টিনের চালে শিশির পড়ছিল।

ডাকিনীযোগিনী, সাপ, শিব, শেয়াল সব রঙ করা হয়ে গেছে। সাপটাকে কি চকচকে লাগছিল। যেন জীবন্ত। বিনু মাস্টার মন্দিরের দেওয়ালে ছবি আঁকছেন একটা মেয়ে পুজোর থালা হাতে দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

সুনীতদারা সবাই ঠাকুরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠাকুরকে দেখতে দেখতে আমার ভেতরটা কেমন করছিল। এখনো চোখ আঁকা হয়নি বলে অন্ধ অন্ধ লাগছিল ঠাকুরকে। সোনার হাতটা ধরে বললাম, 'তোর হাতটা কি নরম!'

সোনা বললো, 'তোরটাও। ছেলেদের হাত এত নরম হয় না।'

'ইস। ব্যাডমিণ্টন খেলে খেলে আমার হাতে কড়া পড়ে গেছে বলে!'

'এখন ঠাকুরের চোখ আঁকবে।' সোনা কথাটা বলে ড্যাবড্যাবে চোখে ঠাকুরের দিকে তাকাল।

সুনীতদা একটা টুলের ওপরে দাঁড়িয়ে হ্যাজাকটা তুলে ধরলো। বিনু মাস্টার বলল, 'এখন কেউ ডিসটার্ব করিস না যেন, চোখ আঁকায় খুব মনোযোগ দরকার হয়।'

আলোটা ওপরে তোলায় ঠাকুরের সারা গায়ে আলো ঝলমল করছিল। মুখটা খুব ভয়ংকর লাগছিল না আমার। বুকের কাছটায় চোখ যেতেই আমার মনে পড়ল জিভের সেই চকচক শব্দটা। আমার কেমন লজ্জা লজ্জা করছিল। সোনা বড় হলে কি কালীমার মত হবে। সোনার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কালীর মুখ মেলাতে চাইলাম। 'এই সোনা, জিভ বার করতো।' সোনা অবাক হয়ে জিভ বার করতেই আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। না, সোনাকে ওরকম দেখাচ্ছে না। শ্রীচরণদা খুব ধরে ধরে দুটো চোখ আঁকলেন। সুন্দর চোখ দুটো। এবার কপালের চোখ। বিনু মাস্টার বলল, 'এবার কেউ আওয়াজ করবে না, তৃতীয় নয়ন আঁকা হবে। জ্ঞান চক্ষু। ঠাকুরে প্রাণ আসবে। সাধন, শঙ্খ বাজাবে আঁকা হলেই।' ওরা সবাই শঙ্খ, কাঁসর নিয়ে তৈরি হলো। সুনীতদা হ্যাজাকটাকে একটু ওপরে তুলে নিলো।

শ্রীচরণদার আড়ালে ঠাকুরের মুখটা ঢাকা পড়েছিল। সোনা আমার গায়ের ওপর ঝুঁকে দেখতে চেষ্টা করছিল। আমি এখান থেকে শুধু ঠাকুরের বুক আর উরু দেখতে পাচ্ছিলাম। আলো পড়ে চকচক করছে। দেখতে দেখতে আমার মাথার মধ্যে কেমন করতে লাগল। কান দুটো গরম হয়ে উঠল। আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না, শুধু আমার ঠোঁট শুকিয়ে যাচ্ছিল। আমি একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। আর কখনো, যখন ঠাকুরকে রঙ করা হয়নি বা সকালে যখন প্রতিমা-হয়ে-যাওয়া ঠাকুরকে দেখেছি তখনও এসব কোনদিন মনে হয়নি। আমি মা কালীর বুকের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সম্মোহিতের মত, সোনা মা কালী হয়ে গছে কি না, দেখবার জন্য ডান হাতটা সোনার বুকের কাছে নিয়ে গেলাম। সোনার প্রায় সমতল বুকের ওপর যখন আমার হাত তখন আচম্বিতে সোনা শব্দ করে উঠে কেঁদে ফেলল। আর তৎক্ষণাৎ শাঁখ আর কাঁসর ঘণ্টার শব্দ উঠল। কপালের চোখ আঁকা হয়ে গেছে তখন।

সোনার চীৎকারে ওরা সব ছুটে এল, 'আরে কাঁদছিস কেন, এই, এই সোনা, ভয় পেয়েছিস!' সোনা কাঁদতে কাঁদতে বাঁ হাত দিয়ে আমায় দেখিয়ে দিল। আমার ভীষণ ভয় করতে লাগলো হঠাৎ। একবার সোনার মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ ফেরাতেই দেখলাম মা কালী খাঁড়া হাতে লাল জিভ বার করে যেন তেড়ে আসছে। আমার মেরুদণ্ডে একটা শীতলতা জীবনে প্রথমবার এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে আমি হঠাৎ সেই ভোর হয়ে আসা অন্ধকারে, আলোকিত পুজো মণ্ডপ ছেড়ে, মাঠের মধ্যে দিয়ে ভয়ঙ্কর কালীমূর্তির চোখ এড়াতে প্রাণপণে দৌড়োতে লাগলাম। সমস্ত মাঠ জুড়ে থাকা ফিকে অন্ধকার যেন হঠাৎ জমাট হয়ে মা-কালীর জিভের মত আমার চোখের সামনে ঝুলছিল। কোথায় আমি পালাবো!

চিত্র প্রদর্শনী

সম্প্রতি শহরের বিভিন্ন গ্যালারীতে কয়েকটি যুক্ত ও একক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। শিল্পী পরিতোষ সেন, বিজন চৌধুরী, মহিম রুদ্র ও ভাস্কর শর্বরী রায় চৌধুরী ও প্রভাস সেন বিড়লা অ্যাকাডেমিতে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। চিত্রাংগদ সংস্থার শিল্পী পরিচালক গোষ্ঠী দক্ষিণ কলিকাতার তাঁদের কার্যালয়ে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন এবং অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস পরিচালিত স্টুডিও সভ্যগণ অ্যাকাডেমি ভবনে তাঁদের প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এ ছাড়া শিল্পী সজল রায়ের প্রদর্শনী হয় বিড়লা অ্যাকাডেমিতে এবং শিল্পী এম রাজাজি ও শ্রীমতী উষা কামারকারের প্রদর্শনী হয়. অ্যাকাডেমি ভবনে ও শ্রীমতী নিকি মালহোত্রার বাটিক প্যানেল পেন্ড-এর প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয় ম্যাক্সমুলার ভবন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে—ম্যাক্সমুলার ভবনে।

বিড়লা অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠিত যুক্ত প্রদর্শনীতে পরিতোষ সেনের সাম্প্রতিকতম বৃহৎ পাঁচখানি রচনানিদর্শন দেখা যায়। শিল্পী একটি চিত্রমালা রচনার শুরু করেছেন, নাম ট্রিপটিচ্, সম্পূর্ণ হবে ২০টি প্যানেলে। প্রদর্শনীভুক্ত তিনটি নিদর্শন এই রচনামালারই তিনটি প্যানেল বিশেষ; অপর দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনা। মাত্র কয়েক মাস পূর্বেই শিল্পী একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। যাঁরা সে প্রদর্শনী দেখেছেন তাঁরা শিল্পীর সাম্প্রতিক কাজেও শিল্পীর বৈশিষ্ট্যটুকু লক্ষ্য করে থাকবেন—অর্থাৎ নানা রঙ মাধ্যমে তিনি বিশেষ মূর্তি বা ইমেজের সৃষ্টি করেছেন। তবে তাঁর কৃতিত্ব রঙ নির্বাচনে ও বিশেষ করে রঙ ব্যবহার পদ্ধতিতে। এ হিসাবে পোর্ট্রেট উল্লেখযোগ্য। তবে অপরটি নয়, অর্থাৎ রঙ ব্যবহারের জটিলতা দোষে ক্রাউটিং ফিগার-এর অন্তর্গত মূর্তির রূপ যেন একটু অস্পষ্ট থেকে গেছে। তবে তাঁর চিত্রমালা রচনার রীতি পার্থক্য সকলেরই চোখে পড়ে। রঙের পাত্র থেকে বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করার পরিবর্তে নির্বাচিত বিশেষ কয়েকটি রঙের আঁচড়ের মধ্য দিয়েই শিল্পী সম্ভবত সমাজের একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর জীবনরূপ ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন—যেমন ২নং প্যানেল। দেখে মনে হয় জ্বলন্ত একটি সিগারেটের ধূম্ররেখা যেন আপনার মনে আঁকাবাঁকা গতিপথের মধ্য দিয়ে গিয়ে এক বিচিত্র আকারের সৃষ্টি করেছে। মাত্র তিনটি প্যানেলের মধ্য দিয়ে শিল্প রচনার বিচার করা চলে না, সুতরাং চিত্রমালাটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে কিছু বলা সঙ্গত হবে না। তবে পরিতোষ সেন অভিজ্ঞ শিল্পী, তিনটি নিদর্শন দেখে বোঝা যায় যে চিন্তাধারা ও অঙ্কনরীতি উভয় দিক থেকেই শিল্পী নতুন কিছু সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। শিল্পী বিজন চৌধুরীর রচনা অনেক বছর পূর্বে দিল্লীতে দেখার সুযোগ হয়েছিল। তরুণ শিল্পী হিসাবে বিজন চৌধুরী পরিচিত। প্রদর্শনীতে তিনি আটটি রচনা ও ১৬টি ড্রয়িং নমুনা পেশ করেন। শিল্পীর কাজে সমসাময়িক যুগের আভাস পাওয়া যায়। বর্তমান সমাজ জীবনের বিকৃত রূপ, হতাশা ও বেদনা, সংগ্রাম ও শাস্তিই যেন তাঁর রচনার মুখ্য বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। শিল্পীর অঙ্কনরীতি বলিষ্ঠ, ভাষা সুস্পষ্ট, স্থলবিশেষে কর্কশ। এই প্রসঙ্গে ট্রায়াম্ফ ও বিশেষ করে ডিফায়ান্স-এর নাম করা যায়। শেষোক্তটিতে চরিত্রগত অদমনীয়তাটুকু প্রকাশ করে শিল্পী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান যুগের শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ

দি ব্রিজ —শ্রীমতী উষা কামারকার

সমস্যা ও ডাঃ মার্টিন লুথার কিং-এর অমানুষিক হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে শিল্পী কয়েকটি রচনা সৃষ্টি করেছেন সেগুলি সমকালীন যুগের নিদর্শন হিসাবে উল্লেখযোগ্য—যেমন, দি ব্ল্যাক ক্রাইস্ট ও ড্রয়িং নং ৭০। কালিকলমে আঁকা ড্রয়িংগুলি দেখে শিল্পীর অংকননিষ্ঠা ও বুনিয়াদী শিক্ষার পরিচয় পাই। এই প্রসঙ্গে ৫৮, ৬৩ ও বিশেষভাবে ৫৯নং ড্রয়িং নিদর্শনের নাম করা যায়।

শিল্পী মহিম রুদ্র প্রদর্শনীতে ২৫টি নিদর্শন পেশ করেন। এ শিল্পীও মাত্র সেদিন একক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। তবে সাম্প্রতিক রচনা দেখে মনে হয় শিল্পী গাঢ় রঙের পরিবর্তে ঈষৎ লঘু রঙ ব্যবহারের পক্ষপাতী হয়েছেন। রচনার অধিকাংশই বিমূর্ত এবং দেখে বোঝা যায় যে শিল্পী নিয়মিতভাবে ছবি এঁকে থাকেন। শিল্পী ছোট বড় নানা আকারের ছবির মধ্য দিয়ে জ্যামিতিক ক্ষেত্র ও রেখা দ্বারা শূন্য স্থান ভাগ করার চেষ্টা করেছেন। যেমন ২৩ ও ২৪। প্রতীকজাতীয় রচনার মধ্যে ৩২নং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভাস্কর শর্বরী রায়চৌধুরী ছোট ও বড় আকারের ১৩টি নিদর্শন পেশ করেন, মাধ্যম প্লাস্টার ও ব্রঞ্জ। তরুণ ভাস্করদের মধ্যে শর্বরী রায়চৌধুরী সুপরিচিত। ১৯৫৬ সালে সরকারী আর্ট কলেজে তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করেন ও সেই সঙ্গে সুপরিচিত ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্তের স্টুডিওতে শিক্ষানবিশী করেন। বৃত্তিলাভ করে তিন বৎসর বরোদা আর্ট কলেজে শিক্ষালাভের পরে তিনি আর এক বৃত্তি নিয়ে ১৯৬২ সালে উচ্চ শিক্ষার জন্য ইতালি যান। গত বছর নিমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে তিনি আমেরিকা ঘুরে আসেন। তাঁর

বাটিক ল্যাম্পশেড

—শ্রীমতী নিকি মালহোত্রা

কাজ দেখে মনে হয় বক্তব্যটুকু প্রকাশ করার জন্য তিনি মাধ্যম-স্তূপকে নানা দিক থেকে যেন ভাষার বাহন হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। ভাস্কর প্রগতিবাদী, দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক। দীর্ঘ, লম্বমান দেহভাগ, সরু সরু হাত-পা, অস্বাভাবিক প্রশস্ত অথচ ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরী চ্যাপটা টরসো গঠনের ফলে সমস্ত নিদর্শনগুলিতেই একটি গঠনবৈশিষ্ট্য এসে পড়েছে, যেটি লিন চাডউইকের ভাস্কর্য-শিল্পে অনেকেই দেখে থাকবেন। এই প্রসঙ্গে ৪০নং উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন নিদর্শন থাকলেও দেখে মনে হয় ভাস্কর যেন একই জাতীয় মূর্তির মাধ্যমে পৃথক পৃথক মনোভাব প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তবে কয়েকটি ম্যাকোয়েট সকলের চোখে পড়ে—বিশেষভাবে রিক্লাইনিং ফিগার-এর মধ্য দিয়ে ভাস্করের চিন্তাধারা ও গঠননৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সিমেন্ট, প্লাস্টার ও ব্রঞ্জ মাধ্যমে তৈরী ভাস্কর প্রভাস সেনের সাতটি নিদর্শন প্রদর্শনীতে দেখা যায়। প্রভাস সেন শান্তিনিকেতন ও প্যারিসে শিক্ষালাভ করেন। বর্তমানে তিনি অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্রাফটস বোর্ডের পূর্বাঞ্চল শাখার অধিকর্তা হিসাবে কাজ করছেন। প্রভাস সেনের গঠনরীতি মিশ্র। প্রথাগত নিদর্শন থাকলেও কয়েকটির মধ্য দিয়ে তাঁর সমকালীন চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই অটোক্র্যাটের নাম করা যায়। প্রশস্ত বক্ষ, পেশীবহুল, বিরাট দেহভার ও বসবার বিশিষ্ট ভঙ্গীমার মধ্য দিয়ে মূর্তিটির মধ্যে ভাস্কর চরিত্রোপযোগী দৃঢ়তা ও একনায়কত্বের রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। নেগেটিভ্ ফর্মের প্রাধান্যযুক্ত কম্পোজিশনটিও অনেকের চোখে পড়ে। টুওয়ার্ডস সান একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। নবজাতক শিশুকে দুই হাতে মাথার ওপর আকাশের দিকে তুলে ধরে জননী যেন তাকে প্রথমেই পবিত্র সূর্যালোকে স্নান করাচ্ছেন। দেখে ধনরাজ ভগতের পূর্বতন ভাস্কর্য নিদর্শনের কথা মনে পড়লেও বলিষ্ঠ অথচ সবল গঠন পরিপাট্যের জন্য এটি সকলের চোখে পড়ে। অপরাপর নিদর্শনের মধ্যে কম্পোজিশন উইথ টু ফিগারস ও স্মাগলার-এর নাম করা যায়।

*

চিত্রাংশু শিল্পী পরিচালক গোষ্ঠীর প্রদর্শনীতে তেল ও জল রঙে আঁকা ছবি ছাড়া গ্রাফিক ও ভাস্কর্য নিদর্শনও দেখা যায়। প্রদর্শনীটির সুনির্বাচনপদ্ধতি অনেকেরই চোখে পড়ে, তবে উপযুক্ত স্থানের অভাবে অনেকেরই রস গ্রহণে অসুবিধা হয়। কর্তৃপক্ষ যদি অন্তত সম্মুখের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণেও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতেন তা হলে বোধহয় দর্শকদের পক্ষে অনেক সুবিধা হত। প্রদর্শনীতে পরিতোষ সেনের ছোট পরিচ্ছন্ন রচনাটি রঙ ব্যবহার বৈশিষ্ট্যগুণে সকলের চোখে পড়ে। অপরাপর নিদর্শনের মধ্যে স্বপ্নেশ চৌধুরীর টেম্পল অ্যাণ্ড গার্ডেন, বিকাশ ভট্টাচার্যের কোলাজ, দি ড্রিম, গণেশ পাইনের পেণ্টিং, সুহাস রায় ও জীবেন সেনের গ্রাফিক প্রিণ্ট-এর নাম করা যায়। পরিচিত শিল্পী শৈল চক্রবর্তীর সরল আকার প্রধান রচনা (উইমেন) ভাল লাগল। ভাস্কর্য বিভাগে সমকালীন চিন্তাধারা ও গঠনসৌকর্যের (মাদার অ্যাণ্ড চাইল্ড) জন্য মাধব ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে চিত্রাংশু সংস্থার শিল্পী পরিচালক গোষ্ঠী রচিত ও প্রকাশিত কয়েকটি পোস্টকার্ড, অভিনন্দনপত্র পুস্তিকা ও আলপনা পরিচিতির নিদর্শন দেখে সকলেই মুগ্ধ হন। পরিকল্পনা, রঙবিন্যাস ও অপূর্ব মুদ্রণ কৌশলের দিক থেকে এগুলিকে দেশের প্রাচীন শিল্পকলার প্রতীক বলা চলে। এগুলি দেখে কর্তৃপক্ষের সুরুচি ও সৃজনীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন শিল্পধারার পুনরুদ্ধারকল্পে শিল্পী গোষ্ঠীর এই প্রচেষ্টা যে প্রশংসনীয় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সজল রায় তরুণ শিল্পী, প্রদর্শনীতে তাঁর তেলরঙে আঁকা ১৭টি নিদর্শন দেখা যায়। শিল্পীর বিষয়বস্তু দেখে মনে হয় তিনি নিরাশাবাদী। সমকালীন যুগের বৈশিষ্ট্যগুলিই যেন তাঁর ছবিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বর্তমান যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের অব্যবস্থা, দৈন্য ও দুর্বলতা, বেদনা, ব্যর্থতা তথা বিদ্রোহের রূপই যেন নানাভাবে তাঁর রচনায় ফুটে উঠেছে। যাঁরা গত কয়েক মাস যাবৎ কলকাতায় বাস করেছেন তাঁরা শিল্পীর কাজের মধ্যে শহরের বিক্ষুব্ধ জীবনের কয়েকটি পরিচিত অধ্যায়ের পুনর্সন্ধান পাবেন। শিল্পীর অঙ্কনরীতি বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট, ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি নরনারীর মুখ বিকৃত করে এঁকেছেন—তা হলেও দর্শকের রসগ্রহণে অসুবিধা হয় নি। সজল রায় এক হিসাবে সমকালীন যুগের বিদ্রোহী শিল্পী, যদিও রচনাধারায় নিখিল বিশ্বাসের প্রভাব দেখা যায়। শীতকালে গভীর রাত্রে নির্জন ও পরিত্যক্ত রাস্তার এক পাশে আগুন জেবলে অসহায় নারী তার দুটি শিশুকে ক্ষীণবক্ষপটে আঁকড়ে ধরে তাদের ক্ষীণতর দেহ দুটি উত্তপ্ত করছে (উইণ্টার নাইট), কঠিন ও নির্মম মুষ্ট্যাঘাতে প্রচলিত নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে কোনও বেকার যুবক জেহাদ ঘোষণা করছে (ডেসট্রাকসন) বা অন্নবস্ত্রহীন বেকার কঙ্কালসার কোনও যুবক রাত্রির অন্ধকারে সকলের অলক্ষ্যে অলীক সুখস্বপ্ন দেখছে (মেলাঙ্কলি ড্রিম)—এক কথায় শিল্পী নানাভাবে বর্তমান যুগযন্ত্রণার বিভিন্ন রূপ প্রকাশ করেছেন। তবে শিল্পীর রঙ নির্বাচন তথা ব্যবহারপদ্ধতি আশানুরূপ নয়। এ বিষয়ে সচেতন হলে শিল্পীর রচনা আরও সার্থক হয়ে উঠত।

*

শিল্পী এম রাজাজি বোম্বাই জে জে আর্ট স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। বর্তমানে তিনি রাজামন্দ্রির ডামারলা রমা রাও আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করছেন। তেল রঙে আঁকা নৃত্যভঙ্গীর বিভিন্ন রূপের কয়েকটি ছবি তিনি প্রদর্শনীতে পেশ করেন। রঙ অধিকাংশ স্থলেই চাপা ও এক জাতীয়, রঙবিন্যাসেও কোনও বিশেষত্ব দেখা যায় নি। রচনার মধ্যে ১, ১৫ ও ২নং চোখে পড়ে।

*

শ্রীমতী উষা কামারকারও বোম্বাই জে জে আর্ট স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। ১৯৬০ সালে স্কুল ত্যাগ করার পর তিনি পুণা শহরে প্রথম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। কলকাতায় এটি তাঁর প্রথম প্রদর্শনী, এখানে তেল রঙে আঁকা ১২টি নিদর্শন দেখা যায়। শ্রীমতী উষা কামারকার প্রগতিবাদী। তাঁর রচনার মধ্যে আধুনিক চিন্তাধারা ও সমসাময়িক রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রঙের পাত্র পরিপূর্ণ, যদিও তিনি স্থান

হাংরি স্টোন —সজল রায়

বিশেষে হালকা রঙ ব্যবহার করেছেন। চিন্তাধারা ও রচনারীতির দিক থেকে স্টেলার মুভমেণ্ট উল্লেখযোগ্য—বিশেষ করে রচনাক্ষেত্রের শূন্যস্থান ব্যবস্থাপন ও কেন্দ্রস্থলের রেখাভিত্তিক কারুকার্যবহুল বিমূর্ত শ্রেণীর রচনাটি অনেকের চোখে পড়ে। আর একটি রচনাও (ক্যাটালগ বহির্ভূত) আমার ভাল লাগে—দি ব্রিজ। প্রধানত নীল ও ইটজাতীয় লাল রঙ ব্যবহার, নির্মীয়মান দেওয়ালের বৈশিষ্ট্য ও কারুকার্য এবং আলোকবিন্যাস যেন রচনাটিকে অলঙ্কারধর্মী করে তুলেছে। শিল্পীর অন্যান্য রচনার মধ্যে মুরড্ বোট্স ও স্ক্যাভেঞ্জারস উল্লেখযোগ্য।

*

বাটিক শিল্পী সম্বন্ধে আজ নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। বাটিক প্রথায় ছাপা শাড়ি থেকে শুরু করে রুমাল, নেকটাই, চাদর, কুশন ও হ্যাণ্ডব্যাগ আজকাল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং এ শিল্পের নানা বিন্যাস ও সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে নিত্য নতুন প্রয়োগরীতিরও উদ্ভাবন হচ্ছে। সুদৃশ্য বাটিকের ল্যাম্পশেড যে কিভাবে কক্ষের অভ্যন্তরীণ রুচি ও সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে ম্যাক্সমুলার ভবনে প্রদর্শিত শ্রীমতী নিকি মালহোত্রার বিভিন্ন নিদর্শন দেখেই সেটি বোঝা যায়। কক্ষ ও বিশেষ করে আলোক আধারের আকার ও দৈর্ঘ্য অনুযায়ী লম্বমান, গোল, সমচতুষ্কোণ ও ঈষৎ বাঁকা নানা শ্রেণীর ল্যাম্পশেড ও প্রয়োজনমত উপযোগী বিভিন্ন দেশী ও অন্যান্য প্রতীক বাটিক প্রথায় সৃষ্টি করে শ্রীমতী মালহোত্রা গৃহের আভ্যন্তরীণ রূপসজ্জায় এক নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছেন। উপযুক্ত রঙ নির্বাচন ও সেই সঙ্গে সরল অথচ সূক্ষ্ম কারুকার্য সৃষ্টি করে শ্রীমতী মালহোত্রা সুরুচি ও কাব্যিকলিত মনের পরিচয় দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, আলোক স্পর্শে মূর্তি পরিগ্রহ করে সেগুলি যেন এক স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করে। প্রদর্শনীটি সকলেই উপভোগ করেন।

*

শিল্পশিক্ষার্থী ও শিল্পীদের মডেল থেকে আঁকার সুবিধাদানের উদ্দেশ্যে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস কর্তৃপক্ষ কয়েক বৎসর পূর্বে একটি স্টুডিও স্থাপনা করেন। এখানে কয়েকজন ছাত্র ও শিল্প অনুরাগী শিক্ষার্থী নিয়মিতভাবে অঙ্কনবিদ্যা শিক্ষা করেন। সম্প্রতি এহেন ২১জন

শিল্পী তথা ছাত্রের একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয় অ্যাকাডেমি ভবনে। লাইফ মডেল থেকে আঁকা ৬০টি রচনা প্রদর্শনীতে পেশ করা হয়। দেখে বোঝা যায় যে সকলেই নিষ্ঠা সহকারে স্কেচ করেন এবং অনেকে পারদর্শিতাও লাভ করেছেন। যাঁদের কাজে কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে মিৎসুজি ইমুক্রোমি, তিনা মেহতা, বি আর পেমেসার, মৃন্ময় মুখার্জী, সমরেশ চৌধুরী ও অখিলেন্দু ভৌমিকের নাম উল্লেখযোগ্য।

✻

ওয়াশিংটনের গ্যালারী একোল দ্য প্যারিস কর্তৃপক্ষের অনুরোধ অনুযায়ী শ্রীমতী উমা দাশ সম্প্রতি ওয়াশিংটনে তাঁর আঁকা ১০টি ছবি পাঠিয়েছেন। ইণ্টার ন্যাশনাল মনিটারী ফাণ্ড হলে প্রদর্শিত হবার পর এগুলি আমেরিকার অপর কয়েকটি শহরেও প্রদর্শিত হবে। শ্রীমতী উমা দাশ ডাঃ নবগোপাল দাশের পত্নী ও গত বছরে তিনি অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারীতে তাঁর তৃতীয় প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন।

চিত্রপ্রিয়

কবির সঙ্গে ইয়োরোপে ১৯২৬

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

॥ ১২ ॥

প্যারিসে সপ্তাহখানেক কাটিয়ে অগাস্টের গোড়ায় লণ্ডনে পৌঁছান গেল—সেই এতদিনের শোনা, এতদিনের কল্পনা করা লণ্ডন! স্টেশনে যখন গাড়ি পৌঁছাল, কী রকম অন্ধকার, ধোঁয়াটে কালো প্ল্যাটফরম, বিশ্রী লাগল।

এবারে আমরা সকলেই একসঙ্গে এসেছি: অর্থাৎ রথীবাবু এবং প্রতিমাদি তাঁদের মেয়েকে নিয়েও কবির সঙ্গে প্যারিস থেকে চলে এসেছেন।

সাউথ কেনসিংটনে এক বাঙালী ভদ্রলোক 'রেজিনা হোটেল' খুলে ব্যবসা করছেন। বোধ হয় সিলেট কিংবা চট্টগ্রামের লোক। এঁর সঙ্গে কবির অনেক দিন আগে থেকেই জানাশোনা। কাজেই আমরা সবাই রেজিনা হোটেলে গিয়ে বাসা নিলাম। বেশ বড় বড় ঘর, খোলামেলা, গ্রীষ্মকালে থাকতে খুবই আরাম।

লণ্ডনে পৌঁছে আমার স্বামীর অনেক দিনের বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রমোদনাথ রায়ের সঙ্গে দেখা। তিনি এবং ইঞ্জিনিয়র বীরেন্দ্রনাথ দে একসঙ্গে তখন ব্যবসা করছেন ইংলণ্ডে। বোধ হয় কনট্রাক্টারের ব্যবসা।

প্রমোদ শান্তিনিকেতনের পুরনো ছাত্র। গুরুদেব এসেছেন শুনেই ছুটে এলেন দেখা করতে। তিনি, শ্রীযুক্ত দে আর তাঁর ইংরেজ স্ত্রী শ্রীমতী চম্পা লণ্ডনে একত্রে ফ্ল্যাট ভাড়া ক'রে রয়েছেন। সেই বাসায় একদিন রাত্রে আমাদের সকলকেই তাঁরা নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে এসে চমৎকার ভারতীয় রান্না মাটিতে আসন পেতে বসিয়ে খাওয়ালেন। কবি তো খুব খুশী এই একেবারে স্বদেশী কায়দায় বিদেশী গৃহিণীর ঘরে খাওয়ার আয়োজন দেখে।

আমাদের নিমন্ত্রণকর্তারা দুজনেই সাদা ধুতি ও গরদের পাঞ্জাবি পরে খালি পায়ে আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে ঘরে নিলেন। শ্রীমতী চম্পা কিন্তু শাড়ি পরেননি, সে কথা আজও মনে আছে। খেতে বসে দেখি, সব রান্নাই অতি উপাদেয় হয়েছে। পেঁয়াজ ফুলুরি, কাঁচা লংকা দেওয়া মাছের পেঁয়াজ চচ্চড়ি, মাংসের বড়া, মাংসের কারি কিছুই বাদ পড়েনি। বহুদিন হল দেশ ছেড়েছি, সকলেরই খুব আনন্দ, এতদিন পরে নিজেদের অভ্যস্ত খাবার খেতে পেয়ে।

তাঁর খুব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: বিলিতী মেয়ে এমন চমৎকার বাঙালী রান্না শিখল কেমন ক'রে?

চম্পা প্রশংসা শুনে লজ্জিত মুখে জবাব দিলেন: এরা যে এইসব খেতে ভালবাসে, তাই আমি চেষ্টা ক'রে শিখেছি।

শ্রীযুক্ত প্রমোদ রায়ের দাদা (মামাতো ভাই, যাঁকে ও'রা গোলাপদা বলতেন) শ্রীযুক্ত হিমাংশু রায়ও তখন লণ্ডনে, তাঁর 'লাইট অব এশিয়া' ফিল্মটা দেখাচ্ছেন। গৌতম বুদ্ধের জীবনী। হিমাংশু রায় নিজে তাতে অভিনয় করেছেন। সারা য়ুরোপেই এটা খুব প্রশংসা পেয়েছিল সেই সময়। হিমাংশু রায় আমাদের সব দল সুদ্ধ একদিন নিয়ে গেলেন ছবিটা দেখাতে।

তারপর দিন একটা থিয়েটারে যাওয়া হল ডেম সিবিল অর্নডাইক-এর অভিনয় দেখতে। তিনি তখনও ডেম উপাধি পাননি। তিনি এবং তাঁর স্বামী প্রধান অভিনেত্রী ও অভিনেতা। আমার জীবনে এই প্রথম ইংরেজী থিয়েটারে যাওয়া। কী অপূর্ব অভিনয়-ক্ষমতা দেখলাম, তা কোনো দিনই ভোলা সম্ভব নয়। তারপরে আরো অনেক-বার লণ্ডনে এসেছি এবং সুবিধা হলেই সিবিল অর্নডাইককে দেখতে গিয়েছি। প্রতিবারই মুগ্ধ হয়ে ফিরেছি। কিন্তু সেই প্রথম বার বলেই বোধ হয় সেদিনকার স্মৃতি মনের মধ্যে যেমন ছাপ রেখে গেছে, তেমন আর কোনো বারেই হল না।

ডেম সিবিল অর্নডাইকের কথা বলতে গিয়ে আর একজন খুব নাম-করা অভি-নেত্রীর কথা মনে পড়ে গেল এবং তাঁর গল্পটা বলবার লোভ সামলাতে পারছি না। ঐ তো আমার দোষ, একটা কথা বলতে

গিয়ে নানা ঘটনা মনে পড়ে যায় আর সেই গল্পগুলো বলবার লোভ সামলাতে পারি না।

১৯৪৬ সালে তখন সবে প্রথম আমেরিকা এসেছি। নিউ ইয়র্কে পৌঁছবার বোধ হয় চার পাঁচ দিন পরেকার কথা। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখা গেল যে জর্জ বার্নার্ড শ'র 'পিগমেলিয়ান' অভিনয় হচ্ছে। গার্ট্রুড লরেন্স হচ্ছেন প্রধান অভিনেত্রী। এঁ'র তো খুবই খ্যাতি শুনেছি, তাই উৎসাহ ক'রে স্বামী স্ত্রী দুজন সন্ধ্যেবেলা বেরিয়ে পড়লাম।

এদেশের আবহাওয়ার ধাত তখনও ঠিক আন্দাজ করবার মত অভিজ্ঞতা হয়নি। দুজনেই বিনা ছাতা ও বর্ষাতিতে বেরিয়েছি। সন্ধ্যা-ভোজন থিয়েটারের পাশেই যে-কোনো রেস্তোরাঁতে শেষ ক'রে নেব এবং বাড়ি ফিরবার সময় তো ট্যাক্সি নিতেই হবে, কাজেই বোঝা বইতে যাব কেন? দিব্যি পরিষ্কার আকাশ, কাজেই মনে কোনো আশংকাও হয়নি।

শেষ মুহূর্তে যাবার আয়োজন। কাজেই দেখা গেল, পিছনের সব সস্তা টিকিট আগেই বিক্রি হয়ে গেছে, তাই বাধ্য হয়ে একেবারে সামনের দামী টিকিট কিনতে হল। অত দামী আসনে বসব, তার উপযুক্ত সাজ পোশাকই তো হওয়া উচিত। কাজেই খুব জমকালো বেনারসী শাড়ি পরেছি, আর উনি কালো ভারতীয় গলাবন্ধ পোশাক। একে তো আমাদের বিদেশী চেহারা তাতে সাজের তারতম্যেও সহজেই লোকের নজরে পড়তে হয়।

থিয়েটারে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে মিস লরেন্স-এর অভিনয় দেখছি। কী অপূর্ব অভিনয়! অনন্যসাধারণ ক্ষমতা মহিলার। থিয়েটার শেষ হবার আগেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নাবল। একেবারে মুসলধারে বৃষ্টি। এরকম আমাদের দেশের শ্রাবণের ধারার মত বৃষ্টি বিদেশে আর কখনো দেখিনি। বৃষ্টির সময় ঘরের মধ্যে বসে রয়েছি, তাতে আর ভাবনা কী? বাইরে বেরিয়েই তো ট্যাক্সি চড়ব।

ঘণ্টাখানেক পরে অভিনয় শেষ হলে বাইরে বেরিয়ে থিয়েটার দেখার আনন্দ কোথায় মিলিয়ে গেল। কী হবে কী করে হোটেলে ফিরব, সেই একমাত্র ভাবনা। যারা নিজেদের গাড়িতে এসেছিল, তারা তো দিব্যি যে যার গাড়িতে উঠে চলে গেল। কিন্তু যারা বাস বা ট্যাক্সিতে এসেছিল তাদের একেবারে নিরুপায় অবস্থা। আকাশ ভেঙে পড়েছে, রাস্তায় জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে নদীর মত এবং একখানা খালি ট্যাক্সিও ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে না। থিয়েটারের গাড়ি-বারান্দার নীচে একেবারে ঠাসা ভিড়; আমাদের সামনে সাত আট লাইন লোক দাঁড়িয়ে।

শেষে দেখি, যেসব পুরুষ মানুষদের হাতে ছাতা ছিল, তারা ঐ বৃষ্টিতেই রাস্তায় নেমে পড়ে মোড় ঘুরে রাস্তায় গিয়ে ট্যাক্সি ধরে নিয়ে আসছে তাদের সঙ্গিনীদের জন্যে। কিন্তু উনি তো ছাতা আনেন নি। ঐ একটিমাত্র পোশাকী আচকান নষ্ট করে কী করে রাস্তায় নামবেন?

এইভাবে দুশ্চিন্তার মধ্যে প্রায় এক ঘণ্টা কাটল, অসহায়ভাবে অন্যদের গাড়িচড়া দেখছি আর নিজেদের ভাগ্যের দোষ দিচ্ছি। এমন সময় হঠাৎ দেখি, এতক্ষণ যাদের স্টেজের উপরে মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম, তাদের মধ্যে প্রধান যে কয়টি এবং বিশেষ করে প্রধানা অভিনেত্রী গার্ট্রুড লরেন্স থিয়েটারী সাজপোশাক ছেড়ে সাধারণ সাজে বেরিয়ে এসেছেন। গার্ট্রুড লরেন্স নিজের প্রকাণ্ড কালো গাড়িখানার হাতল ধরে গাড়িতে চড়বার সময় ঘাড় ফিরিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলছেন: anybody I can give a lift, I am going uptown। ভিড়ের দল তাঁর এই সৌজন্যে এত হতভম্ব হয়ে গেছে যে কারো মুখে কথা সরলো না। আবার ভদ্রমহিলা চেঁচিয়ে বললেন: anybody wants to come with me, I am going uptown.

হঠাৎ আমার মনে হল, এই সুযোগ ছাড়লে আর সারা রাতের মধ্যে এখান থেকে বেরোতে পারব না। পাছে আমার আগে আর কেউ এই সুযোগ গ্রহণ করতে দাঁড়

জানায় সেই ভয়ে আমি কোনো মতে পিছন থেকে ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গিয়ে বললাম: Thank you so much, I shall be much obliged if you give me a lift.

তখনই উত্তর এল: Come along.

গাড়ির দরজা আমার সামনে খুলে ধরলেন।

আমার স্বামী তো একেবারে হতভম্ব। দেখলেন, আমি দিব্যি গাড়িতে উঠে বসলাম। প্রকাণ্ড গাড়ি, অনায়াসে ছয় সাতজন ঠাসাঠাসি করে বসা যায়। গার্ট্রুড লরেন্স গাড়িতে চড়ে বসতেই আমার স্বামীর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ইংরেজীতে বললাম, যাতে অভিনেত্রী বুঝতে পারেন কী বলছি: তুমিও উঠে এস, আমি না হয় তোমার কোলে বসেও যেতে পারব; কিন্তু এ সুযোগ ছাড়লে তুমি বাড়ি যাবে কেমন করে?

অবাক কাণ্ড! নিজে এসে গাড়ির ভিড় বাড়িয়েছি, তারপরেও নির্লজ্জ হয়ে ওঁকে আসতে বলছি, গাড়ির মালিকের অনুমতি না নিয়েই। তখন সামাজিক ভব্যতা রক্ষা করে চুপ থাকার মত আমার মনোভাব নয়। কাজেই কিছুই গ্রাহ্য না করে ওঁকে ডাক দিলাম।

গার্ট্রুড লরেন্স তৎক্ষণাৎ খুব সহজ হৃদ্যতার সঙ্গেই বললেন: তোমার সঙ্গে আরো কেউ আছেন?

হ্যাঁ আমার স্বামী, ঐ কালো পোশাক পরা, সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

তিনি মুখ বাড়িয়ে আমার স্বামীকেও ডাক দিলেন গাড়িতে চড়তে। ভিড়ের দল অবাক হয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল এই ভারতীয় দম্পতির কাণ্ড দেখে।

গাড়ির দরজা বন্ধ করে যখন সবাই গুছিয়ে বসেছি, অভিনেত্রী বললেন: I hate to see this awful selfishness of the people. Everybody knows how hard to get a taxi in New York now a days, specially in a night like this. When so many people are stranded for the rain, others who came in their cars coolly, went away alone or two persons without offering anyone to give a lift. Why are the people so indifferent about others' difficulties, I do not understand. It does not hurt you to offer such help.

বুঝলাম, শুধু যে বড় আর্টিস্ট তাই নয়, অন্তঃকরণও অত্যন্ত উচ্চস্তরের। তারপর কথাবার্তা আরম্ভ হল। আমরা কোথায় যাব, কবে এসেছি ও কেন এসেছি এ দেশে।

আমার স্বামী বললেন, তিনি ইউনাইটেড নেশনস-এর কাজে এসেছেন। এখনও এক সপ্তাহ হয়নি, আমরা এ-দেশে পেঁৗছেছি।

ইউনাইটেড নেশনস-এর কথায় গার্ট্রুড লরেন্স খুব আগ্রহের সঙ্গে বললেন: আমারও একজন বন্ধু ইউনাইটেড নেশনস-এ আছেন। তিনি চীন দেশের লোক। তোমরা কি চীনে গিয়েছ?

বললাম: না।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমার খুব কৌতূহল আছে। [১৯৪৬ সালে ও-দেশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সকলেই খুব আগ্রহান্বিত।]—তারপর বললেন—তোমরা কি আজ থিয়েটারে ছিলে? না, এ পাড়ায় কোথাও থেকে এসে বৃষ্টিতে আটকে গিয়েছিলে?

আমরা বললাম: না, আমরা থিয়েটারে ছিলাম। বিশেষ করে তোমার অভিনয় দেখবার জন্যই এসেছিলাম। শুধু যে অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছি তা নয়, সৌভাগ্যক্রমে এই আকস্মিক আলাপে তোমার মনেরও পরিচয় পেলাম।

সামনে থেকে পিগমেলিয়ান-এর মিঃ ডুলিটল বললেন: হ্যাঁ, আমি ওঁদের স্টেজ থেকেই দেখেছিলাম—স্টেজের বাঁ দিকে তৃতীয় সারিতে ওঁরা বসেছিলেন।

কথা বলতে বলতে গাড়ি অভিনেত্রীর হোটেলের সামনে এসে গেল। আমাদের দিকে ফিরে বললেন: কিছু মনে কোরো না আমি আগে নেমে যাচ্ছি বলে। তোমাদের হোটেল আরো একটু এগিয়ে। তাই ড্রাইভারকে বলে যাচ্ছি, তোমাদের পরে নামিয়ে দেবে।

বিশেষ করে সঙ্গীর দলকে বললেন—আমরা হোটেলের দরজার ভিতরে ঢুকেছি দেখে, তারপরে যেন গাড়ি ছাড়ে।

সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। সেদিন অভাবনীয়ভাবে এই সাহায্য না পেলে কী করতাম জানি না, কারণ বারো চোদ্দ ঘণ্টার আগে ঐ বৃষ্টি থামেনি। গার্ট্রুড লরেন্সের চরিত্রের মিষ্টতা তাঁর অসামান্য অভিনয় প্রতিভার সঙ্গে জড়িয়ে মনের মধ্যে রয়ে গেল।

এর কিছুদিন পরে যখন খবরের কাগজে দেখলাম তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যু হয়েছে, তখন সত্যিই বেদনা অনুভব করেছিলাম এই মহৎ মনের মানুষটি এত কম বয়সেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন বলে। এত সুন্দর দেখতে, এত ভাল অভিনয় করবার ক্ষমতা এবং সঙ্গে এই রকম মন—এরা এত কম বয়সে চলে যায় কেন?

ডেম সিবিল থর্নডাইকও সুন্দর দেখতে। তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেও খুব প্রশংসা শুনেছি, তবে সাক্ষাৎভাবে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি। যখন তাঁর বেশ বয়স হয়েছে তখনও তিনি স্টেজে নেমেছেন; কিন্তু অভিনয়ের ক্ষমতা কমেনি। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে সকলকে মুগ্ধ করেছেন, সে কথা পরে লণ্ডনে গিয়ে শুনেছি। ১৯২৬ সালে কবি তাঁর অভিনয় দেখে খুবই মুগ্ধ

হয়েছিলেন; সেদিন আমরাও সংগে ছিলাম। বাড়ি ফিরে অনেকক্ষণ আলোচনা চলেছিল, স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই অসামান্য ক্ষমতা সম্বন্ধে।

লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথের বহুদিনের পুরনো মার্কিন বন্ধু মিসেস মুর্তি একদিন হোটেলে দেখা করতে এলেন। কবি চিরকাল খুব আইসক্রীম খেতে ভালবাসতেন। শিকাগোতে মিসেস মুর্তি বিখ্যাত ছিলেন রান্না এবং খাওয়ানোর জন্য। কবির পরম ভক্ত। লণ্ডনেও আইসক্রীম খাইয়ে গেলেন।

হঠাৎ একদিন প্রমোদ রায় আর বীরেন দে এসে বললেন : তাঁরা মোটরে ডেভন-শায়ার যাচ্ছেন, গাড়িখানা বড় আছে, কবি যদি যেতে চান খুশী হয়েই নিয়ে যাবেন।

কবির তো চিরকালই ট্রেনের চেয়ে মোটরে যেতে বেশী উৎসাহ। তখনই রাজী হলেন। ডেভনশায়ারে মিঃ এল্‌ম্‌হার্স্ট-এর বাড়িতেও একবার থেমে যেতে পারবেন। তারপরে কর্নওয়ালে 'কার্বিস বে'-তে যে মিঃ কান্‌-এর বাড়ি আছে সমুদ্রের ধারে সেইখানে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসা যাবে। প্যারিস ছাড়বার সময় কান বারে বারে অনুরোধ করেছেন কবি যেন সেখানে গিয়ে

করেকটা দিন বিশ্রাম ভোগ করে আসেন।

সমস্যা উঠল সঙ্গে যাবে কে? প্রতিমাদিরা দুজনে বহুদিন পরে লণ্ডনে এসেছেন। শহরে অনেক কিছু করবার আছে, থিয়েটার ইত্যাদিতে যাবারও শখ আছে, কাজেই হঠাৎ সাগর তীরের এই নির্বাসন প্রস্তাব তাঁদের মনে নিল না। আমার স্বামীরও সেই অবস্থা।

কিন্তু কবি তো একলা যেতে পারেন না। আমার স্বামী আর রথীবাবু আমার ঘরে এসে বললেন যে, কবি ওদের সঙ্গে মোটরে যাবার জন্য ঝুঁকেছেন। আমি আর মিঃ লাল যদি কবির সঙ্গে যাই তা হলে ও'রা দুজন একটু ছুটি পান। বিশ্বভারতীর দুই কর্মসচিবেরই কিছু কাজ আছে লণ্ডনে, কিন্তু সর্বক্ষণ কবির সঙ্গে থাকতে হচ্ছে বলে ও'দের নিজেদের কাজের ফুরসত হচ্ছে না।

আমি আর মিঃ লাল দুজনেই রাজী হলাম। আমি এই প্রথম ইংলণ্ডে এসেছি, মোটরে অতখানি পথ যেতে পারলে দেশটাকে ভাল করেই দেখা হবে। তাড়াতাড়ি করে বাক্স গুছিয়ে নিয়ে তখনই প্রস্তুত হলাম। ঠিক হল মিঃ লাল ট্রেনে চলে যাবেন মিঃ এলম্‌হার্স্ট-এর বাড়ি; আর আমি এবং রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত বীরেন দে এবং প্রমোদ রায়ের সঙ্গে মোটরে যাব।

সকাল বেলা লণ্ডন থেকে বেরিয়ে পড়া গেল। সেই সময়ে চিঠিতে লিখেছি:

Carbis Bay
Cornwall, England
10th August, 1926

শ্রীচরণেষু,

সাতই সকালে মোটরে লণ্ডন থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় ডেভনশায়ারের টটনেস শহরে মিঃ এলম্‌হার্স্টের বাড়ি পৌঁছলাম। সেখানে একদিন থেকে আবার কাল অর্থাৎ নয় তারিখে দুপুরে এগারটায় বেরিয়ে বিকেল চারটের সময় এখানে এসেছি।

লণ্ডন থেকে প্রমোদ রায় এবং তাঁর বন্ধু বীরেন দে তাঁদের গাড়িতে আমাদের এলম্‌হার্স্টের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলেন। তার পরদিন সকালেই তাঁরা চলে যান, কাজেই টটনেস থেকে এলম্‌হার্স্ট আবার তাঁর গাড়ি করে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছেন।

ছোট্ট টু-সিটার গাড়ি, কিন্তু বাইরে একটা ডিকি সিট আছে, তাতেও দুজনে বসা যায়। কবি ও এলম্‌হার্স্ট ভিতরে এবং আমি মিঃ লাল (শ্রীনিকেতনের) বাইরে বসে এসেছি। সে বেশ মজা। পথে একবার বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল, তখন আমি ও মিঃ লাল ছাতি খুলে নিজেদের মাথা বাঁচাই। কবি ব্যস্ত হতে লাগলেন, কিন্তু উপায় কী? গাড়ি যে ছোট।

কর্নওয়াল কার্বিস বে-র বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লেখিকা ও কেয়ার টেকার

প্রতিমাদি, রথীবাবু এবং আপনার ছেলে, কেউই আসেননি। খালি আমি আর মিঃ লাল কবির সঙ্গে এসেছি। প্যারিসে আমরা যে ভদ্রলোকের বাড়িতে ছিলাম, এটাও সেই মিঃ কান-এরই বাড়ি, ঠিক সমুদ্রের ধারে ছোট্ট একটি পাহাড়ের উপরে। এখানেও একজন হাউসকীপার এবং তার স্বামী কেয়ারটেকার হিসেবে আছে, তা ছাড়া আর কোনো লোকজন নেই বাড়িতে। তারা দুজন তেতালায় অ্যাটিক-এর দুখানা ঘরে থাকে। দোতলায় কবির শোবার এবং পাশেই পড়বার ঘর, সেখানে বসেই উনি সারা দিন কাজকর্ম করেন, সামনে তাকালেই সমুদ্র। তা ছাড়া আরও দুখানা ঘর আছে; সে দুটোতে আমি আর মিঃ লাল রয়েছি। একতলায় খাবার বসবার এবং রান্নার ঘর ইত্যাদি।

বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইট নেই। বোধ হয় ইচ্ছে করেই করা হয়নি। পুরনো কায়দায় ঘরের চারদিকে দেওয়ালে মোমবাতির শেজ আঁটা রয়েছে। সন্ধ্যেবেলা থেকে সারাবাড়িতে এই মোমবাতিগুলোই জ্বলে। এসব দেশে দেখেছি কাউকে খেতে নেমন্তন্ন করলে সেদিন অতিথির খাতিরে ঘরের উজ্জ্বল আলো নিবিয়ে দিয়ে খাবার টেবিলের উপর রুপোর কি পিতলের বাতিদানে মোমবাতি জ্বালায়। এটাতে খরচ অনেক বেশী হয় বলেই বোধ হয় এটার দ্বারা অতিথিকে সম্মান দেখাবার নিয়ম। বিশেষ কোনো উৎসবের দিনেও বাড়িতে মোমবাতি জ্বালাবার রেওয়াজ। আর আমাদের এখানে রোজই মোমবাতির রোশনাই হচ্ছে, রোজই খাবার টেবিলের উপর মোমবাতি জ্বলছে।

শহরের গোলমালের পর এখানে এসে খুব ভাল লাগছে। জায়গাটাও যেমন সুন্দর, বাড়িখানাও তেমনি আরামের। ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সমুদ্র দেখা যায়। বাইরের বারান্দাটাতে সারাদিন চুপ ক'রে বসে থাকতে ইচ্ছে করে।

ডেভেনশায়ারে মিঃ এলম্‌হার্স্ট অনেক জমি কিনে নতুন বাড়ি তৈরি ক'রে শান্তি-নিকেতনের আদর্শে একটা বিদ্যালয় শুরু করেছেন। কাজেই কবিকে দেখাবার জন্যে নেমন্তন্ন করেছিলেন, আমাদেরও খুব যত্ন করেছেন।

এলম্‌হার্স্ট তো আলীপুরে আমাদের বাড়িতে অনেকবার থেকেছেন। এমনকি বিয়ের একদিন পরে, যেদিন প্রথম কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট থেকে আলীপুরের বাসায় গেলাম সংসার করতে, সেদিন অত রাত্রে পৌঁছে দেখি, রথীবাবু, এলম্‌-হার্স্ট ও মিস গ্রীন বসে রয়েছেন আমাদের জন্যে। সিঁড়ি বেয়ে যখন উঠছি, ও'রা তিনজন এগিয়ে এলেন।

এলম্‌হার্স্ট হেসে বললেন : নতুন বরকনেকে অভ্যর্থনা করবার জন্য আমরা এসেছি। আসলে সেই রাত্রে খিদিরপুর ডক থেকে সাহেব জাহাজে চড়বেন, তাই তার আগে আলীপুরের বাড়িতে এসে অপেক্ষা করছিলেন। রথ দেখা কলা বেচা, দুইই হল।

তখন ফাল্গুন মাস, দোলের আগের

ত্রয়োদশী সেদিন। খোলা গাড়ি বারান্দা জ্যোৎস্নার ভেসে যাচ্ছে। আমরা সকলে সেইখানে বসে অনেক রাত্রি পর্যন্ত গল্প-গুজব করলাম। এল্‌ম্‌হার্স্টরা আর রথীবাবু দুজনে 'আমরা চাষ করি আনন্দে' গানটা গলা ছেড়ে গাইলেন। গানের শেষে তাঁরা উঠে বিদায় নিলেন, তখন জাহাজে উঠবার সময় হয়ে এসেছে। কাজেই এল্‌ম্‌হার্স্টের সঙ্গে তো বহু দিনের পরিচয়; কিন্তু তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আগে আলাপ হয়নি, এইবারে হল।

মিসেস এল্‌ম্‌হার্স্ট এঁকে বিয়ে করবার আগে মিসেস স্ট্রেট ছিলেন, নিউ ইয়র্কের অত্যন্ত উপরের স্তরের কোটিপতিদের মধ্যে একজন। ওঁর স্বামীরও যেমন টাকা ছিল, নিজেরও তেমনি। অনেক টাকা বিশ্ব-ভারতীর শ্রীনিকেতনের কাজে দিয়েছেন এবং এখনও দিচ্ছেন। বছর দুইও বোধ হয় হয়নি, এঁরা বিয়ে করেছেন এবং মাসখানেক আগে একটি মেয়ে হয়েছে।

ভদ্রমহিলাকে বেশ লাগল। মার্কিন বড়-লোকদের সম্বন্ধে মনের মধ্যে যে একটা আতঙ্কের ছবি ছিল, দেখলাম তার সঙ্গে বিশেষ মিল নেই ওঁর স্বভাবের। বেশ সহজ সাদাসিধে ব্যবহার, খুশি লাগল আলাপ ক'রে।

এখন তো এল্‌ম্‌হার্স্টের অনেক টাকা, কাজেই বিদ্যালয়ে আয়োজনের কোনো ত্রুটি নেই। খুব সমারোহ করেই কাজ শুরু হয়েছে। বাড়িটা এখনো সম্পূর্ণ শেষ হয়নি। খুব পুরনো দিনের একটা Castle কিনে সেটাকে বদল সদল ক'রে নিচ্ছেন। এখনো চারদিকে মিস্ত্রীর কাজ চলেছে। বিরাট একটা রাজপ্রাসাদের মত বাড়ি হবে স্কুলের। নাম হচ্ছে 'ডার্টিংটন হল'। হেনরি দি সেকেন্ড-এর ছিল ক্যাসলটা।

পুরনো দিনের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছগুলো এখনও রয়েছে। তারই ছায়াঘন মস্ত বাগানের মধ্যে বাড়িখানা। আজও প্রাসাদে এখনও মিস্ত্রীর কাজ চলছে বলে তারই সংলগ্ন একটা ছোট বাড়িতে। ঐ বিরাট বাড়ির তুলনায় এটা ছোট হলেও সেই পুরনো কালের থামে ঘেরা চকমিলানো দোতলা বাড়িখানাও নিতান্ত ছোট নয়। এখন এল্‌ম্‌হার্স্টরা রয়েছেন; কাজেই আমাদেরও সেইখানেই রাখলেন।

টটনেস শহরটা খুব চমৎকার জায়গা, একেবারে Dart নদীর ধারেই। সেদিন এল্‌ম্‌হার্স্টের বাড়ি একজন মার্কিন ভদ্র-মহিলা এসেছিলেন নিমন্ত্রিত হয়ে। তাঁর আমার বয়সী একটি মেয়ে আছে বলেই বোধ হয় আমাকে খুব ভাল লেগে গেল। তিনি লাঞ্চের পরে আমাকে নিয়ে মোটর বোটে ক'রে Dart নদীতে চব্বিশ মাইল বেড়িয়ে নিয়ে এলেন।

নদী যেখানে সমুদ্রের মধ্যে পড়েছে ঠিক সেই মোহানার মুখে Dart mouth বলে একটা পুরনো শহর আছে, আমরা সেই শহরটায় গিয়েছিলাম। প্রথমে একেবারে সমুদ্র পর্যন্ত গিয়ে ফেরবার পথে শহরটাতে নেমে একটু বেড়িয়ে আসা হল। Dart mouth শহর Jotnes থেকে বারো মাইল দূরে। চব্বিশ মাইল যেতে আসতে আমাদের ঠিক তিন ঘণ্টা সময় লাগল।

ডেভনশায়ার আর কর্নওয়ালটা যে এত সুন্দর দেখতে তা কল্পনা করিনি। মোটরে এবং নদীতে ঘুরে এর সৌন্দর্যের পরিচয় পেলাম। লন্ডনে ফিরে যাবার সময়ও আমরা মোটরেই যাব। বীরেন দে আসবেন আমাদের নিয়ে যেতে—কবিকে বলে গেছেন।

দু দিন পরে আর একটা চিঠিতে লিখছি: লন্ডন থেকে কার্বিস ... শ' পঁচিশ মাইল দূরে। এতখানি পথ মোটরে আসতে খুব ভাল লেগেছে। দেশটা যে এত সুন্দর দেখতে তা গাড়িতে না এলে ঠিক বুঝতে পারতাম না। ট্রেনে এলে এ রকম করে দেখা যেত না।

শনিবার ৭ই আগস্ট ঠিক দশটার সময়ে রওনা হয়ে Devon-এ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় পৌঁছলাম। অবশ্য পথে খাওয়া ইত্যাদির জন্য বার তিন চার থামতে হয়েছিল। তাতে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক সময় নষ্ট হয়। নইলে আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যেত।

ডার্টিংটন হল থেকে এই জায়গাটা আরও এক শ' মাইল দূরে। ৯ই বেলা এগারোটায় এল্‌ম্‌হার্স্টের বাড়ি থেকে রওনা হয়ে বিকেল চারটেতে এখানে পৌঁছলাম। পথে খাবারের জন্য এবং একবার রাস্তা ভুল করে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় গেল।

লণ্ডন থেকে এতখানি পথ মোটরে আসতে একটুও কষ্ট হয়নি,—যেমন সুন্দর দৃশ্য তেমনি চমৎকার রাস্তা,—গাড়ি চড়ে সুখ আছে। উঁচু নীচু পাহাড়ে রাস্তা বেয়ে ঘন বনের ছায়াঢাকা পথ দিয়ে যখন গাড়ি আসছিল মনে হচ্ছিল যেন স্বপ্ন রাজ্যে এসে পড়েছি—এত সুন্দর দেখতে। ডেভন-শায়ারের রূপের খ্যাতি সকলেই জানে; কিন্তু চোখে না দেখলে ঠিক আন্দাজ করা যায় না সেই সবুজ বনের মধ্য দিয়ে চলার আনন্দ।

এখন বসন্তকাল সবে পেরিয়েছে, ঘাসের মধ্যে নানারকম ফুল ফুটে আছে এদিকে সেদিকে। যেসব ফুল চিরকাল আমরা বীজ কিনে কত যত্ন করে বাগানে ফোটাই, সেই-রকম ফুলই হেলায় চারিদিকে আপনি ফুটে রয়েছে: দেখে রীতিমত চমক লাগল।

মনে পড়ছে ইটালীতে প্রথম যখন রেলের জানালা দিয়ে হঠাৎ দিগন্ত প্রসারিত মাঠ লাল করা পপি ফুটে থাকতে দেখেছিলাম তখন কী রকম হতভম্ব লেগেছিল। এই পপি আমরা কত যত্ন করে সার দিয়ে মাটি খুঁড়ে বীজ কিনে তবে বাগানে ফোটাতে পারি; আর ইটালীতে দেখলাম, তারা মাঠে যেন আগুন লাগিয়ে দিয়ে অমনি ফুটে আছে।

এখানে আসতেও পথের ধারে যেখানে সেখানে ভায়োলেট, ড্যাফোডিল্‌স্‌, ডেসী এবং আরও কত যে নাম-না-জানা ফুল ফুটে রয়েছে দেখলাম, তার ঠিকানা নেই।

এসেও খুব ভাল লাগছে। একেবারে সমুদ্রের ধারে ছোট একটি পাহাড়ের উপরে আমাদের বাড়িখানা। সারাদিন বসে বসে নীল আকাশ ও ততোধিক নীল সমুদ্র দেখছি আর তার গান শুনছি। বিছানায় জেগে ভোর বেলা চোখ খুলেই সমুদ্র দেখতে পাই আর মনটা খুশী হয়ে ওঠে।

সারাদিন সেই খুশিতেই মেতে আছি। কখনো নিজে গান করি কখনো কবির গান শুনি এবং কখনো শুধু চুপ করে বসে চেয়ে দেখি, বিশেষ করে লণ্ডনের পরে এ জায়গাটা আরও অপূর্ব মনে হচ্ছে। কোনো গোলমাল নেই, শুধু সমুদ্রের অবিশ্রান্ত কলরোল।

পাহাড়ের নীচেই বালির ওপরে অনেক লোক। এরা গরমের ছুটিটা সমুদ্রের ধারে কাটাতে এসেছে, সারাদিনই এখানে রয়েছে। দূর থেকে তাদের কথাবার্তা, ছোট ছেলেদের ছুটোপাটি, চেঁচামেচি গুঞ্জন ধ্বনির মত কানে আসে, সেটাতে বরং ভালই লাগে।

আমি সমুদ্রের ধারে নামি না। কারণ, অত লোকের ভিড়ের চেয়ে ঠিক উপরেই এই বাড়ির বাগান ও সামনের এই চাতালে পায়চারি করতে অনেক ভাল লাগে! নির্জনতাটা উপভোগ করতে সুখ আছে। সারাদিনই দেখছি, নীচের লোকেরা যখন তখন স্নান করছে। কীরকম প্রাণ মন দিয়ে ওরা বালির চর আর জলটাকে উপভোগ করছে, দেখতেও খুব আনন্দ।

আমাদের বাড়ির পাশেই একটা হোটেল আছে। সেইখানেই এরা থাকে। থাকে মানে খালি খেতে ও রাত্রে শুতে যায়। তা ছাড়া বাকী সমস্ত দিন নীচেই কাটায়, যেন বালির চরটাই ওদের ঘর বাড়ি। আমার ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোর খেলা দেখতে খুব ভাল লাগে; ইচ্ছে করে ওদের ছুটোছুটিতে গিয়ে যোগ দিই।

আপনার বিসর্জন-এর বর্ণনা কবিকে পড়তে দিয়েছিলাম। কবি বলছিলেন: শুধু, সাধারণ লোকদের কীরকম লেগেছে আমার একটু জানতে ইচ্ছে করছে। নিশ্চয়ই একদল লোক বলছে যে, রবি ঠাকুরের চেয়ে অনেক ভাল করেছে। সত্যিই কি তাই?

কবি সেপ্টেম্বরে ফিরবেন না। এই মাসের ২১ তারিখে আমরা নরওয়ে যাব। রথীবাবু, প্রতিমাদি যাবেন না। তারপর সুইডেন হয়ে পয়লা সেপ্টেম্বর জার্মানী যাওয়া হবে। রথীবাবুরা দুজন জার্মানীতে আমাদের সঙ্গে এসে মিলবেন। তারপর অক্টোবরের প্রথমে আবার ভিয়েনা। নভেম্বরে কবি বোধ হয় ইংলণ্ডে এসে তারপর দেশে ফিরে যাবেন।

আমরা দুজন এই সঙ্গে ফিরছি না। ওঁরা চলে গেলে আরও দু তিন মাস কোথাও নিজেদের ইচ্ছেমত কাটিয়ে তারপর ফিরে যাব। কবি যতদিন আছেন ততদিন আর ওঁর সঙ্গ ছাড়বার উপায় নেই, আমাদের ছেড়ে দিতে কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না। এমন কি ইচ্ছেটা যে, দেশে ফিরে যাবার সময়ও আমরা সঙ্গে ফিরি। রোজই আমাকে বলেন: এই তো অনেক দেখলে, তবু আশা মিটছে না? চল, এক সঙ্গে বেশ সবাই মিলে ফেরা যাবে, জাহাজে ক'টা দিন খুব আনন্দে কাটবে; তা নয়, ওঁরা আবার আরও থাকবেন।

আমরা আরও একটু থাকতে চাই। তার কারণ, এতদিন তো শুধু ওঁর প্রোগ্রাম মতই আমরা সব জায়গায় ঘুরছি। নিজেদের ইচ্ছে মত কোনো জায়গায় গিয়ে কাটানো হয়নি। উনি চলে গেলে সেইটেই অবকাশ পাব। ওঁর সঙ্গে ঘোরাতে অবশ্য যা সব দেখে নিচ্ছি, এ আর কারো ভাগ্যে ঘটে না। তবে এতে সুবিধাও যেমন পরিশ্রমও তেমনি। কোনো জায়গায় গিয়েই দু দিন স্থির হয়ে থাকবার জো নেই, কেবলই ঘুরে বেড়াচ্ছি।

উনি ইটালীর খবর বার্তা সব লিখে এবং তার কিছু কিছু ছবিও বিশ্বভারতী বুলেটিনের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন আপিসে। সেগুলো বেরোয়নি? নিশ্চয়ই এতদিনে সব খবর পেয়েছেন আপনারা।

আজ এইমাত্র খবর পেলাম, উনি, প্রমোদ, বীরেন দে প্রভৃতি আবার মোটরে করে আসছেন এখানে। কথা আছে, আমাদের লণ্ডন ফিরবার সময় আবার বীরেন দে-ই নিয়ে যাবেন। ৩২৫ মাইল ট্রেনে যাওয়ার চেয়ে মোটরে যাওয়াতে অনেক আনন্দ আছে। দেশে ফিরে একবার মোটরে বেরোবার ইচ্ছে আছে। আমি মোটে গয়া পর্যন্ত গিয়েছিলাম একবার রথীবাবুদের সঙ্গে। খুব ভাল লেগেছিল। (ক্রমশ)

আফ্রিকার চিঠি

যেদিন খবর পেলুম ভারতীয় নৌবাহিনীর ফ্রিজেট আই এন এস 'তলওয়ার' টাকোরাডি বন্দরে ভিড়েছে শুভেচ্ছা সফরে সেদিন সন্ধ্যায়ই শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার জৈনের বাড়িতে আলাপ হল এক ভারতীয় যুবকের সঙ্গে। আলজেরিয়া থেকে সাহারা পেরিয়ে সে এসেছে ঘানায়—তিন হাজার মাইল বালুময় পথ হিচহাইক করে। তার কাহিনী শুনতে শুনতে মনে হয়, আফ্রিকা মহাদেশে এমনভাবে ভ্রমণ সম্ভব হবে, একথা কি মাঙ্গো পার্ক কল্পনা করেছিলেন, ভাবতে পেরেছিলেন লিভিংস্টোন? এঁরা আর অন্য পর্যটকেরা পায়ে হেঁটে ক্যানভাসের দোলায় চেপে বা ঘোড়ার পিঠে হাজার হাজার মাইল পথ গেছেন। নদী পার হয়েছেন কাঠের ভেলায় বা ডিঙি নৌকায়। প্রাক-ইওরোপীয় যুগে সাহারার দক্ষিণে চক্রবাহিত যানের অস্তিত্ব ছিল না। বিষুব রৈখিক আফ্রিকায় ভারবাহী পশু সেৎসি মাছির দৌরাত্ম্যে টিকতে পারেনি। আদি পর্যটকদের নজরুলের ভাষায় 'জয় শ্রীচরণ ভরসা' না বলে উপায় ছিল না।

অবশ্য উত্তর আফ্রিকায় ও সাহারা মরু অঞ্চলে গাধা, ঘোড়া ও উটের ব্যবহার অবশ্য ছিল। উটের পিঠে সওদাগরেরা সাহারা পাড়ি দিত। আর ভূমধ্যসাগর উপকূল থেকে দক্ষিণে সুদানীয় তৃণভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে রাজ্য প্রসারলিপ্সু উপজাতিপ্রধান ও রাজারা অশ্বারোহী বাহিনীসহ যুদ্ধ চালাত। ষোড়শ শতকের শেষে মরক্কোর যে সেনাদল সংঘাই রাজ্য আক্রমণ করে, তার সঙ্গে ছিল আট হাজার উট ও এক হাজার ভারবাহী ঘোড়া। মরুভূমি পার হয়ে নাইজার নদী পর্যন্ত পৌঁছোতে এদের লাগে সাড়ে চার মাস। আর এই সময়ে এদের সৈনিক ও বাহকদের এক-তৃতীয়াংশ মারা পড়ে ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, রোগে আর পথের ক্লান্তিতে। উত্তর নাইজেরিয়ার হৌসা-ফুলানি আমীররাও ঘোড়সওয়ার দিয়ে যুদ্ধ চালিয়েছে। ফুলানি জিহাদের অপ্রতিহত গতির একটা বড় কারণ ছিল বোধ হয় অশ্বারোহী বাহিনীর ব্যবহার। অন্যত্র, যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায়, প্রাক ইওরোপীয় যুগে চক্রযানের অস্তিত্ব না থাকলেও বুয়েররা ১৮৩৩ সালের পর থেকে যখন কেপ প্রদেশে বৃটিশ দখল ছেড়ে শত শত মাইল অভ্যন্তরে গিয়ে নতুন প্রজাতন্ত্র গড়ে, তখন তাদের তল্পিতল্পা গোরুর গাড়িতে চাপিয়েছিল।

অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে ইওরোপীয় পর্যটকেরা আফ্রিকার অভ্যন্তর আবিষ্কারে লেগে গেলে এঁদের অনেকে ঘোড়া ও অন্যান্য পশু ব্যবহার করেছেন। ১৭৯৫ সালের প্রথম অভিযানে মাঙ্গো পার্কের সঙ্গে ছিল দুটি গাধা ও একটি তেজী ঘোড়া। লিভিংস্টোন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে যখন তাঁর প্রথম 'সাফারি' শুরু করেন, তখন বুয়েরদের সাবেক গোযানে চাপতে ভোলেননি।

আফ্রিকার গ্রীষ্মপ্রধান অরণ্য ভূমিতে মাল বহন ও যানবাহনের জন্য এইসব পশুর ব্যবহার ছিল না বা আজও বিশেষ নেই। উনিশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রিটিশ সেনাদল আসান্তের রাজধানী কুমাসি অভিযান শুরু করলে ফান্টি উপজাতিপ্রধানদের কাছ থেকে বাহক চেয়ে পাঠানো হয়। বাহকেরা শুধু খাদ্য, রসদ ও ভারী ভারী কামানই বহন করেনি, দরকারমাফিক শ্বেতাঙ্গ অফিসারদেরও কাঁধে করে নদী পার করেছে। নিজের আঁকা ছবি সহযোগে দুপাই তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন নিজ গ্রন্থে। 'হেড পোর্টারেজ' নামে খ্যাত এই ব্যবস্থা বহুদিন টিঁকে ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে ফরাসীরা ৬,২০০ টন খাদ্যদ্রব্য বহনে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার কুলি নিয়োগ করে। একই সময়ে উত্তর রোডেশিয়া (বর্তমান জাম্বিয়া) থেকে ৫০০ মাইল দূরে সেনাবাহিনীর খাবার দিয়ে যেসব বাহকদের পাঠানো হয়, তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছোতে পৌঁছোতে মাথায় চাপানো খাবারের প্রায় সবটাই সাবাড় করে দেয়। স্টীম এঞ্জিন প্রবর্তনের পর হিসাব করে দেখা যায়, নাইজেরিয়ায় এক টন মাল এক মাইল পাঠাতে রেলপথে যা খরচ হয় মোটরে খরচ পড়ে তার ছয় গুণ, আর বাহকে দিয়ে পাঠালে তার পনের গুণ।

অতঃপর রেলপথ নির্মাণ ও স্টীমার সার্ভিস পুরোদমে শুরু না হয়ে পারেনি। নায়াসা হ্রদে ১৮৭৫ সালে চালু করা প্রথম স্টীমারকে পূর্ব আফ্রিকার উপকূল থেকে যন্ত্রাংশ খুলে খুলে হেড পোর্টারেজ ব্যবস্থায় হ্রদ অবধি নিয়ে আসা হয়। সারা স্টীমারকে এমনিভাবে বইতে লাগে ৮০০ বাহক। এর বিশ বছর বাদে ভিক্টোরিয়া হ্রদে প্রথম স্টীমার ভাসানো হয়, সমবেত দর্শকদের সকলরব অভিনন্দনে। কিন্তু এত সুখ এর ভাগ্যে সয়নি। অল্পকালের মধ্যেই এটি ডুবে যায়।

এদিকে যন্ত্রকেন্দ্রিক অর্থনীতি যত সম্প্রসারিত হয়েছে রেলপথ ততই বিস্তৃতি-লাভ করেছে। আসান্তে প্রদেশের কোকো ও সোনা রপ্তানির জন্যে ঘানায় কুমাসি থেকে আক্রা ও টাকোরাডি পর্যন্ত রেলপথ বানানো হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্য আফ্রিকা ও কঙ্গোয় সোনা, হীরা ও তামা রপ্তানি ছিল রেলপথ নির্মাণের অনুপ্রেরণা। এ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যেরও অভাব ছিল না। সুদানে মাধিবিরোধী যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী যত এগিয়েছে, রেলপথও ততটাই। আসলে সেনাদলের অগ্রগতির জন্যেই লর্ড কিচেনার রেলপথ তৈরি করতে করতে এগিয়ে যান।

তারপর আসে মোটরগাড়ি: আজকের আফ্রিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় বাহন। এই শতাব্দীর গোড়ায় একটা দুটো করে মোটর-গাড়ি আফ্রিকায় আমদানী হতে থাকে। ১৯০২ সালে আনা ঘানার প্রথম মোটর-গাড়ির ইতিহাসে মিলনান্তক ও বিয়োগান্তক উভয় রসের নাটকীয় সমন্বয় ঘটেছে। গাড়িটির আবির্ভাব রীতিমত রাজকীয় আমন্ত্রণে। ১৯০০ সালে তৎকালীন উপনিবেশ-সচিব শ্রীজোসেফ চেম্বারলেইনের বুদ্ধি বাতলান, স্বর্ণ উপকূলের নেটিভদের কাছে ব্রিটিশ ইজ্জত বর্ধনে চাই একটি মোটরগাড়ি। প্রজারা যখন দেখবে সাহেব গভর্নর কলের গাড়ি চেপে হাওয়া খাচ্ছেন, তখন ইংরেজদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় তাদের মাথা নুয়ে পড়বে। চেম্বার-লেইনের প্রস্তাব অনুমোদিত হলে পাক্কা দু বছর ধরে রাজধানীর আশেপাশে পায়ে চলা পথগুলি প্রশস্ত করা হয়। তারপর ১৯০২ সালের মাঝামাঝি আক্রার সমুদ্রোপ-কূলে জাহাজে করে এসে পৌঁছোয় গার্দনার-সেরপোলে মডেল ১৯০১। ব্রিটিশ মর্যাদা বর্ধনে আনা হলেও জাতিতে ইনি ফরাসী। সংগে আসে চারটি বাড়তি টায়ার, তিনটি ল্যান্টার্ন, কিছু নাট, বোল্টু আর স্ক্রু, এবং এক হাজার গ্যালন প্যারাফিন। যে জাহাজে ইনি এলেন তার ক্যাপ্টেনকে পুরস্কার দেওয়া হল নগদ ২ গিনি। এঁর সংবর্ধনার সশব্দে ছিটকে পড়ল উচ্ছ্বসিত শ্যাম্পেন বোতলের ছিপি। আর বিগলিত সাম্রাজ্য-রক্ষীরা এঁর গালভরা নাম দিলেন 'ব্ল্যাক বিউটি'।

'ব্ল্যাক বিউটি'র সৌন্দর্য দর্শনে বিভোর সাম্রাজ্যরক্ষীদের কিছুদিন বাদে খেয়াল হল, গাড়ি চালাবার লোক লাগে। তখন [illegible] টেলিগ্রাম যায় রেল কর্তৃপক্ষের কাছে: ড্রাইভার চাই। উদ্যোগী রেলের বড় সাহেবরা তিনজন অ্যাপ্রেনটিস যোগাড় করেন [illegible] মর্যাদার লোভ দেখিয়ে। কিন্তু [illegible] দিনের মধ্যেই জানা যায়, তাদের মধ্যে এক-জন দাগী চোর। আর একজন [illegible] শেখানোর পরও পরম উৎসাহে গাড়িটাকে কার্বোরেটর আর ব্রেককে অ্যাক্সিলারেটর [illegible]

যেতে থাকে। তিন নম্বরের ওপর বড় সাহেবের অনেক আশা ছিল। কিন্তু রিপোর্ট আসে, সে বেচারার পিছু পিছু তার স্ত্রী-পুত্র পরিবার ফেউয়ের মত ঘুরছে। আর সে গাড়ি ছুঁতে গেলেই তারা হাঁ হাঁ করে ছুটে আসছে। অবশেষে বাসেল মিশনের জনৈক জর্মন ইঞ্জিনীয়ারের সহযোগিতায় গাড়ি চালানোর ব্যবস্থা হল।

কিন্তু যাদের মনে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এত আয়োজন তাদের মনে প্রতিক্রিয়া হয় অন্যরকমের। এক রবিবার ঘণ্টায় তিন মাইল গতিবেগে ব্ল্যাক বিউটি পাহাড়ের ওপর বোটানিক্যাল গার্ডেনের পাশে আবুরি শহরে এসে হাজির। আবুরির শান্তিপ্রিয় নাগরিকেরা তখন বাইবেল হাতে গির্জায় যাচ্ছিল। ব্ল্যাক বিউটিকে দেখে তারা চটপট চম্পট দেয়। সভ্য সাবেক জীবন বিপর্যস্ত হল ভেবে আবুরির মোড়ল সাহসে বুক বেঁধে আরো দু-একজনকে সঙ্গে নিয়ে এক প্রতিবাদ মোর্চার নেতৃত্ব করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, গাড়ির শ্বেতাঙ্গ আরোহীকে বিনীতভাবে আক্রায় ফিরে যেতে অনুরোধ জ্ঞাপন। প্রতিবাদ-মোর্চা যখন মাঝ-রাস্তায় পৌঁছেছে, তখন দেখা গেল পাহাড়ের ওপর থেকে ব্ল্যাক বিউটি ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে ঘণ্টায় সাত মাইল বেগে ছুটে আসছে। বলা বাহুল্য, এ দৃশ্যে প্রতিবাদ মাথায় ওঠে, এবং মোর্চা বিনা দ্বিরুক্তিতে হয় ছত্রভঙ্গ।

ব্ল্যাক বিউটির এমন দাপট কিন্তু বেশী দিন থাকেনি। বছর দুয়েকও যায়নি, গোল্ডকোস্ট সরকারের নেটিভ অ্যাফেয়ার্স বিভাগের সেক্রেটারী সাক্ষাতে লিখলেন, দুষ্টলোকে ব্ল্যাক বিউটিকে "গভর্নরের ছ্যাকরাগাড়ি" বলে ঠাট্টা করছে। দুদিন অন্তর গাড়ির একটা-না-একটা যন্ত্র সারাতে হয়। বরাদ্দ টাকাতে না কুলোলে সারাবার খরচ যায় গভর্নরের পকেট থেকে। অবশেষে স্বর্ণ-উপকূলে শুভাগমনের মাত্র ছ' বছর বাদে ব্ল্যাক বিউটিকে নিলামে বিক্রি করা হয়। মাত্র দশ পাউন্ড দিয়ে ডাক শুরু হলেও ক্রেতা সহজে মেলে না। শেষকালে জনৈক ফরাসী ব্যবসায়ী পাঁচ পাউন্ডের বিনিময়ে ব্ল্যাক বিউটির মালিকানা পান। যে গাড়ি আনতে লেগেছিল ছ' শ' পাউন্ডেরও বেশী, তার এই দশা! হায় চেম্বারলেইন! হায় ব্রিটিশ ইজ্জত!

ব্ল্যাক বিউটির শোচনীয় পরিণতি সত্ত্বেও মোটরগাড়ির প্রবর্তন ঘানা তথা আফ্রিকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন যুগ সূচিত করেছে। তিরিশের দশক থেকেই ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন আফ্রিকান দেশে রাজপথ উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলে। আর তার সঙ্গে উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যায় যাত্রী ও মাল বহন করতে থাকে মোটর, বাস, মালবাহী নানা ধরনের গাড়ি। বছর দশেক আগেকার হিসাবে দেখা যায়, আফ্রিকার প্রায় সর্বত্র সংখ্যানুপাতে গাড়ির সংখ্যা ভারতবর্ষের চেয়ে বেশী। সে সময় গাড়ি পিছু জনসংখ্যা ভারতে যেখানে ছিল ২,০০০, সেখানে অনুরূপ সংখ্যা নাইজেরিয়ায় ছিল ১৫০০, ঘানায় ২০০, রোডেশিয়ায় ৫০ ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ২০।

আজকের আফ্রিকায় মোটরগাড়ির আকার ও অবয়বের বৈচিত্র্য যাত্রীদের চেহারা ও পোশাকের বৈষম্যের সঙ্গে তুলনীয়। মোটরে যদি মোম্বাসা থেকে নাইরোবি, কিংবা লেগস থেকে কানো যান, তবে আপনার পথলব্ধ অভিজ্ঞতার এমন শ্রেণীবিভাজন সম্ভব।

প্রথমত, দৈত্যাকৃতি ট্রাক বৃষ্টির আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ক্যাম্বিস কাপড়ে পণ্য ঢাকা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এদের যাত্রী গাড়ি পিছু দু-তিনজন, অর্থাৎ ড্রাইভার, তার সহকারী ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মচারী। চুল ও গায়ের রং বাদ দিলে এদের চেহারা পৃথিবীর সর্বত্র বোধ হয় অনুরূপঃ রোদ-বাতাস-বৃষ্টিতে পোড় খেয়ে পোক্ত।

তারপর যাত্রিবাহী বাস, যার গদি-আঁটা আসনের সংখ্যা ৩০ থেকে ৪০। যাত্রীরা নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চ মধ্যবিত্ত। পরনে শার্ট-প্যান্ট, কারো কারো চোখে রোদের চশমা।

সাবেক যাত্রিবাহী পশ্চিম আফ্রিকার প্রচলিত মামেট্রাক, ট্রো-ট্রো প্রভৃতি। এদের ছাদ অনেক সময় এত নীচু হয় যে, যাত্রীদের মাথা নুইয়ে থাকতে হয়। গাড়ির তিন পাশে কাচ বা কাঠের জানলা নেই। যাত্রীরা রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ের অসহায় বলি। সাধারণত নীচের তলার মানুষেরা এমন বাহনের পৃষ্ঠপোষক। আরামের আংশিক অভাব পূরণ হয় চোখ-ঝলসানো নাম দিয়ে যেমন স্কিয়ার উওম্যান, বেসিয়া পো সিকা (নারী অর্থের প্রেমাসক্তা), ডেথ অ্যাবহর্স মানি, ইত্যাদি।

তারপর আসে প্রাইভেট গাড়ি। মর্যাদার দাঁড়িপাল্লায় এদের মূল্যায়ন হয় ওপরের দিকে মার্সিডিজ ২৫০ থেকে শুরু করে নীচের ধাপে ঝরঝরে ফক্সে ফিয়াট পর্যন্ত। পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে আছে ইওরোপীয় ও এশীয় ব্যবসায়ী ও কর্মচারী, আর আফ্রিকান ব্রীনটুরা। সঙ্গে সুবেশা নারী, তাদের মাথায় বাহারে টুপি, চোখে চিত্তরঞ্জন শৌখিন চশমা।

এসবের পাশাপাশি, একটা নেতিবাচক অভিজ্ঞতাও উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষে এমন সড়কে যে-সব যানবাহন আপনাকে ধৈর্যহীন করবে, সেই ঘোড়ার গাড়ি, গোরুর গাড়ি, সাইকেল রিকশা আর ঠেলাগাড়ির দর্শন নাস্তি। আফ্রিকার পরিবহণ-ব্যবস্থায় ধীর পদক্ষেপে বিবর্তন আসেনি। এসেছে তড়িৎগতিতে বিপ্লবঃ হেড-পোর্টারেজ থেকে মোটরগাড়ি চালু হয়েছে কয়েক দশকের মধ্যেই, মধ্যবর্তী স্তরগুলি এক লাফে পার হয়ে।

এ বিপ্লব অবশ্য মোটরগাড়িতেই শেষ হয়নি। এ শতকের চতুর্থ দশক থেকে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বিমান চলাচল করতে থাকে। আজ আফ্রিকায় এয়ার ইন্ডিয়া, প্যান-অ্যাম, এয়ার ফ্রান্সের শাখা এয়ারাফ্রিক এবং বি ও এ সি-র মত আন্তর্জাতিক বিমান কোম্পানীগুলিই শুধু সক্রিয় নয়, একটা করে এয়ার ওয়েজ থাকা এখন জাতীয় সাবালকত্ব প্রাপ্তির লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া হয়। ইথিওপিয়ান এয়ার ওয়েজ, এয়ার কংগো ও ঘানা এয়ার ওয়েজের পাশাপাশি তাই দেখি, এয়ার তোগো, এয়ার গিনে, কি মালাবি এয়ার-ওয়েজের ক্ষীণ উপস্থিতি। দিন দিন এদের যাত্রিসংখ্যা বাড়তির পথে। দিন দিন দূর-দিগন্তে পৌঁছানোর সময়ের সেতু হ্রস্বমান।

দেড় শতক আগে গ্যাম্বিয়া নদীর মোহানা থেকে টিম্বুকটু পৌঁছতে মাংগো পার্কের লেগেছিল কয়েক মাস। আর এখন সকালে আক্রায় কি লেগসে ছোট হাজরি খেয়ে জেট বিমানে চাপলে প্যারী কি বার্লিনে গিয়ে লাঞ্চ খাওয়া যায়। পরিবহণিক বিপ্লব আজ আফ্রিকার বিশালত্বকে সংকুচিত করেছে। দূরকে এনেছে নিকটে। সোকোটো কি মোপ্তির নাম শুনলে আজ আর মনে হয় না, পৃথিবীর শেষ প্রান্তে তাদের অবস্থান। পকেটে পয়সা থাকলে কায়রো ও কেপ টাউন আজ এ-পাড়া ও-পাড়া।

মজার কথা এই, পরিবহণিক বিপ্লব পৃথিবীর ভৌগোলিক অখণ্ডতা স্পষ্টতর করেও জাতি ও সংস্কৃতির পৃথক সত্তা অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে ধুয়ে মুছে দিতে পারেনি। বরং যান্ত্রিক প্রগতির ফলে

অনেক ক্ষেত্রে তার বিপরীত ফল ফলেছে। আকাশবাণীর বদান্যতায়। পাঁচ হাজার মাইল দূরের রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আশায় আজ আমরা কান ও চেয়ার পেতে বসে থাকি। ঈস্ট আফ্রিকান এয়ার ওয়েজের কল্যাণে এখন কেনিয়া থেকে টাটকা এশীয় সব্জি কয়েক ঘণ্টায় আসে লণ্ডনে। তাই রবিবারে বিলাতপ্রবাসী বাঙালী ছেলে শুক্ত আর লাউ-চিংড়ি খেতে পারে। আর সেদিন দোল-পূর্ণিমার একপক্ষ আগে, এখানকার ভারতীয় মহলে দোলে আবীর খেলার বিলম্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে যখন প্রশ্ন ওঠে, আবীরের কী ব্যবস্থা হবে, তখন এক ভদ্রলোক বলেন, "মাভৈঃ।" ঘরের কাজে দেশে যাচ্ছি কয়েক দিনের জন্যে। আমি আনব আবীর।" আপনাদের চুপি চুপি বলে রাখি, ভদ্রলোক শুধু আবীরই আনেননি, এনেছিলেন আনুষঙ্গিক অন্যান্য উপকরণ: ফুটকড়াই, মুড়কি আর গোটা তিনেক পিচকারি এবং তার সাথে মালপোয়া, এক থলি করে পান। জয় হোক জেট যুগের।

১ এপ্রিল, ১৯৬৮

অংশু দত্ত

ব্রিটিশ বিজ্ঞান সঞ্চয়ন

দ্রুততম ক্যামেরা

অতি দ্রুতগামী বা চলন্ত ঘটনার ফটো তোলা নিয়ে বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনীয়াররা মাথা ঘামিয়ে আসছেন এক শো বছরেরও বেশী হয়ে গেল। ১৮৫১ সালে ফক্স ট্যালবট নামে এক ভদ্রলোক একটি দ্রুত ঘূর্ণায়মান রোলারে লাগানো টাইমস পত্রিকার একটি পৃষ্ঠার ফটো তোলেন মুহূর্তের জন্য ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে। আলোটি এত কম সময় জ্বালানো হয়েছিল যে, ক্যামেরার চোখে তা নড়েনি বললেই চলে। তার আগে অন্য কেউ কোথাও ঐরকম ফটো তুলেছিলেন কিনা সন্দেহ।

গত ২০ বছরে অত্যুচ্চ বেগের ফটোগ্রাফীর যে উন্নতি হয়েছে তা বিস্ময়কর। বেগ বলতে বোঝায়—এক সেকেণ্ডে ক'খানি ছবি তোলা হল (যেমন সিনেমায়)। সাধারণ সিনে ক্যামেরা সেকেণ্ডে ২৪টি ছবি তোলে। সুতরাং তার চেয়ে বেশী ছবি তুললেই উচ্চবেগের ক্যামেরা বলা যেতে পারে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের বার্কশায়ার জেলার অল্ডারম্যান শহরের পারমাণবিক অস্ত্র গবেষণা সংস্থায় এমন এক ক্যামেরা তৈরি হয়েছে যার ছবি তোলার বেগ সেকেণ্ডে ৬ কোটি। এ যেন আমাদের ধারণার অতীত। অবশ্য বোঝাই যায় যে এক্ষেত্রে কোন ইলেকট্রনিক কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। আসলে একটি ইলেকট্রনিক নলের মধ্যে ছবি তোলবার জিনিসটির আলোকচিত্র ইলেকট্রন চিত্রে রূপান্তরিত হয়ে আবার আলোকচিত্রে ফিরে যায়। ইলেকট্রনিক সার্কিটের সাহায্যে সেই ইলেকট্রনিক ছবিগুলিকে যত তাড়াতাড়ি নড়ানো যায় অত তাড়াতাড়ি আলোক চিত্রকে কোন যন্ত্রের সাহায্যে নড়ানো যায় না।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠছে যে ৬ কোটি ছবির জন্য মাইল কয়েক লম্বা ফিল্ম লাগবে এবং সেটি পুরোপুরি দেখাতেও বেশ কয়েকদিন লেগে যাবে। ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, কারণ ইচ্ছা করলে ঐ ক্যামেরার বেগ সেকেণ্ডে ২০টি ছবি পর্যন্ত নামিয়ে আনা যেতে পারে যার জন্য লাগবে ইঞ্চি চারেক ফিল্ম। আসল কথাটা এই যে ঐ ক্যামেরা সাধারণ সিনেমার ছবি তোলার জন্য তৈরি হয়নি, তৈরি হয়েছে এমন সব ব্যাপারের ছবি তোলার জন্য যেগুলি সেকেণ্ডের দশ লক্ষাংশেরও কম সময় থাকে। এই ধরনের অত্যুচ্চ বেগের ক্যামেরার বেগে হিসাব করার জন্যই সেকেণ্ডকে বহু ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এইরকম ক্যামেরার পক্ষে ১ সেকেণ্ডও অত্যন্ত বেশি সময় এমন কি সেকেণ্ডের ১০ লক্ষ ভাগও তাই। সেইজন্য আজকাল নানা সেকেণ্ড শব্দটির প্রচলন হয়েছে, যা সেকেণ্ডের নিযুত ভাগের হাজার ভাগের সমান। আলোচ্য অল্ডারম্যাস্টন ক্যামেরায় প্রতি তিন নানো সেকেণ্ডে একটি করে 'এক্সপোজার' হয় যেটুকু সময়ে আলোকরশ্মি ৩ ফুট পথ যেতে পারে। প্লাজমার গতিবেগ মাপা ইত্যাদি বহু আধুনিক গবেষণায় এই ক্যামেরা ব্যবহার হতে পারে এবং হচ্ছে কালহ্যাম ল্যাবরেটরীতে।

অকালপ্রসূত সন্তান পালনের যন্ত্র

দশ বছর গবেষণার পরে অকালপ্রসূত সন্তান পালনের জন্য ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনীয়াররা এক যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। একটি আধারের মধ্যে যন্ত্রটি বসানো থাকে। যন্ত্রটি এত আঁটসাঁট যে তার কোথাও গোলমাল হলেই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সেটি পাল্টে অন্য একটি অনুরূপ যন্ত্র বসিয়ে দেওয়া যায়। যন্ত্রটির পরিচালনায় কোন জটিলতা নেই। যন্ত্রের মস্তিষ্ক ১ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত তাপ বজায় রাখতে সক্ষম। তাছাড়া বাক্সের মধ্যে তাপ নিয়ন্ত্রণ করা যায় ৫৫ থেকে ৯৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত। একটি সুইচের দ্বারা ঐ তাপ নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।

যন্ত্রটির কন্ট্রোলার এত সংবেদনশীল যে জানালা দিয়ে রোদ ঢুকলেই সঙ্গে সঙ্গে একটি অ্যালার্ম বেজে ওঠে। আরো কতকগুলি অ্যালার্ম ব্যবস্থা আছে সতর্কতার জন্য যেমন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হলেই সাইরেনের মত একটা বাঁশী বেজে ওঠে, তাপ বেশি হলে জ্বলে ওঠে একটি লাল বালব, পাখা না চললে জ্বলে ওঠে একটা নীল আলো। বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার দিকে বিশেষভাবে নজর রাখা হয়েছে।

এই অভিনব যন্ত্রে প্রয়োজন হলে

অকালপ্রসূত সন্তান পালনের অভিনব যন্ত্র

শতকরা শতাংশ আর্দ্রতা এবং ৩৫ শতাংশ অক্সিজেন যোগান দেবার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য প্রয়োজনে অক্সিজেন আরো বাড়ানো যেতে পারে। এ ছাড়া শিশুর লালন-পালনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবরকম ব্যবস্থাই রাখা হয়েছে।

নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের হাতে মাত্র ২০ পাউন্ড ওজনের একটি অপরিণত শিশু পালনের সুবহ যন্ত্র আছে। এমন যন্ত্রও আছে যার মধ্যে প্রয়োজন হলে শিশুর উপর অস্ত্রোপচার করা যেতে পারে। সোজা কথায় এটা বললে অন্যায় হবে না যে যেসব এলাকায় সুশিক্ষিত ধাত্রীর অভাব সেখানে যান্ত্রিক ধাত্রী খুবই কাজে লাগবে।

মস্তিষ্ক গবেষণার নতুন যন্ত্র—ইলেকট্রোরেটিনোগ্রাম

ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম ও ইলেকট্রোএনকেফালোগ্রামের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে, কিন্তু ইলেক্‌ট্রোরেটিনোগ্রামের

ইলেক্‌ট্রোরেটিনোগ্রাম

নামটা নতুন মনে হবে। কারণ, এই যন্ত্রটির আবিষ্কার হয়েছে সম্প্রতি। যন্ত্রটি জন্মলাভ করেছে ব্রিটেনে। চোখের উপর আলোক বা অন্য কোন উত্তেজনায় চোখের কোষগুলিতে কিভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহ বা ঘাতের উৎপত্তি হয়, ইলেক্‌ট্রোরেটিনোগ্রামের কাজ হল সেগুলি রেকর্ড করা। কয়েকটি ছোট ছোট তড়িদ্দ্বারের দ্বারা একটি চোখে লাগানো কণ্ট্যাক্ট লেন্স বা স্বচ্ছ প্ল্যাস্টিকের লেন্সের সঙ্গে যুক্ত সরলেই যন্ত্রটি তার রেকর্ড করার কাজ শুরু করে।

মেশিনটি তৈরি করার উদ্দেশ্য ছিল অক্ষিপট তার কর্তব্য অনুসারে ঠিক মত মস্তিষ্ককে সংকেত পাঠাচ্ছে কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখা। ধরুন একজনের চোখে ছানি পড়ল যার ফলে তার অক্ষিপটের সামনের দিকটা অনচ্ছ হয়ে যায়। আজকাল চোখের ছানিপড়া লেন্স কেটে বাদ দিয়ে সেই জায়গায় অন্য কোন মৃত লোকের চোখের লেন্স বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অবশ্য রেটিনা বা অক্ষিপটের পিছনের দিকটাও যদি কাজ করতে না পারে তখন ঐ কৌশলে কোন ফল পাওয়া যায় না, এবং চোখের ভিতরে পিছন দিকটা পরীক্ষা করারও কোন উপায় নেই।

ইলেকট্রোরেটিনোগ্রাম হচ্ছে এমন এক প্রথম মেশিন যা চিকিৎসক বা সার্জেনের আর চোখের ভিতর চোখ দিয়ে পরীক্ষার প্রয়োজন বাতিল করে দিয়েছে।

প্রখ্যাত মুর্ফিল্ড চোখের হাসপাতালের ইন্সটিটিউ অব অপ্যাল্মোলজিতে ডঃ জিওফ্রে আর্ডেনের নেতৃত্বে কয়েকজন বিজ্ঞানী মিলে যন্ত্রটি উদ্ভাবিত করেছেন।

সবশেষে যন্ত্রটিতে এমন সব কলাকৌশল সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে যেগুলি শুধু চোখের মধ্যেকার বৈদ্যুতিক ঘাত কেন তার ফলে মস্তিষ্কের মধ্যে কিভাবে বৈদ্যুতিক ঘাত সৃষ্টি হচ্ছে এবং মস্তিষ্কের ঠিক কোন অংশে তাও রেকর্ড করা যাচ্ছে। চোখের ঠিক কোন্ জায়গাটিতে বাইরে থেকে আসা আলো থেকে তাড়িত স্নায়বিক সংকেতের জন্ম হচ্ছে তাও জানা যাচ্ছে।

বিজ্ঞানীদের মতে চোখ হচ্ছে মস্তিষ্কেরই অংশস্বরূপ। এখন তাঁরা মেশিনের সাহায্যে জানবার চেষ্টা করছেন যে, কোন্ পর্যায়ে সংকেতগুলির কতটা প্রোসেস করা হয়, চোখ মস্তিষ্কে কোন্ কোন্ সংকেত বাছাই করে পাঠায় এবং কোনগুলি প্রত্যাখ্যান করে।

ফুলের রহস্য

কোন বিজাতীয় কোষ বা বস্তু শরীরের মধ্যে গেলে শরীরের সেটিকে আক্রমণ করে ধ্বংস করার যে ক্ষমতা আছে ব্যাক্টীরিয়া ও ভাইরাসজনিত রোগের ক্ষেত্রে সেটি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। কোন সজীব পদার্থ বাইরে থেকে ভিতরে প্রবেশ করেছে এটা খুব তাড়াতাড়ি বুঝে সেটিকে তেড়ে গিয়ে খতম করলে শরীরের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে শুধু নয়, মৃত্যুও ঘটতে পারে।

কিন্তু শরীরের এই অন্তরক ক্ষমতা আত্মরক্ষার পক্ষে যেমন জরুরী তেমনি আবার অন্যদিকে শল্যচিকিৎসকের, বিশেষ করে যাঁর শরীরের কোন ক্ষতিগ্রস্ত বা অসুস্থ যন্ত্র বা অঙ্গ কেটে বাদ দিয়ে অন্য কোন মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে কেটে নিয়ে সেই অসুস্থ দেহযন্ত্র বা অঙ্গের জায়গায় লাগিয়ে দেন, তাঁদের নানান অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। এই ধরনের অঙ্গ প্রতি-রোপণকে ইংরাজীতে বলা হয় "গ্রাফটিং"।

গ্রাফ্‌টিং-এর প্রতিকূলে প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেখা যায়নি মাত্র তিন রকমের ক্ষেত্রে। প্রথমটি হচ্ছে—চোখের বাইরে দিকের টিস্যুতে যদি গ্রাফ্‌ট করা যায় তার ফলে কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়নি। কারণ, সেটি দেহ থেকে এতটা আলাদা হয়ে থাকে (বিশেষ করে রক্তসঞ্চালন থেকে) যে, সেটির নিজের বিজাতীয়ত্ব সম্পর্কে কোন সংকেত মস্তিষ্কে পাঠানো সম্ভবই নয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি হচ্ছে—যখন দুটি যমজ ছেলে বা মেয়ের একজনের শরীরের কোন অংশ কেটে নিয়ে অন্যজনের শরীরের গ্রাফ্‌ট্ করা হয়। তার কারণ এ ক্ষেত্রে দুজনেরই প্রজনিক বংশগতি অভিন্ন। সেই জন্য একজনের অঙ্গ বা অংশ অন্য জনের মস্তিষ্কের কাছে বিজাতীয় মনে হয় না। তৃতীয় ক্ষেত্রটির ব্যাখ্যা একটু কঠিন। সেটি হচ্ছে—মায়ের গর্ভে বাড়ন্ত ভ্রূণের ক্ষেত্রে। ভ্রূণটি ঘেরা থাকে এমন একটি পাট-করা কোমল পটিকার মধ্যে (ফুল), যেটির মায়ের টিস্যুর সঙ্গে সংযোগ আছে। মায়ের রক্তবহা নাড়ীগুলি থেকে খাদ্য এবং অক্সিজেন ফুলের সীমার মধ্যে দিয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে ভিতরে যায় এবং ভ্রূণের পরিত্যক্ত আবর্জনা আবার সেইভাবে বাইরে চলে যায়। ফুলটি শরীরের পক্ষে বিজাতীয় বস্তু হলেও সেটি মায়ের শরীরের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে গ্রাফ্‌ট্ করা টিস্যুর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু বিজাতীয় বলে মায়ের দেহ তাকে আক্রমণ করে না বা কোন 'অ্যান্টিবডি' দিয়ে ধ্বংস করে না।

প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই ভ্রূণ পিতামাতার প্রজনিক বৈশিষ্ট্যগুলি বহন করে। তার মানেই ভ্রূণটি গর্ভধারিণীর পক্ষে একটা বিজাতীয় জিনিস কারণ তার সবটুকুই মায়ের বৈশিষ্ট্য বহন করছে না, পিতার বৈশিষ্ট্যও বহন করছে। প্রশ্নটা হচ্ছে—ফুলটি কেন আক্রান্ত বা ধ্বংস হয় না।

বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রনিক অনুবীক্ষণের সাহায্যে ফুলের ভাঁজ ও ভ্রূণের টিস্যুর মাঝখানকার ব্যবচ্ছেদকটি পরীক্ষা করে দেখেন যে সেই ব্যবচ্ছেদকটি হচ্ছে বিশেষ ধরনের প্রোটিন অণু দিয়ে তৈরী এবং ছাঁকনির মত কাজ করে অর্থাৎ মায়ের শরীর থেকে খাদ্য ও রক্ত তার ভিতর দিয়ে ভ্রূণে যায় এবং পরিত্যক্ত পদার্থ ও অঙ্গারক বাষ্প ভিতর থেকে বাইরে মায়ের শরীরে বার হয়ে যায়। এ ছাড়া অন্য কোন বিজাতীয় জিনিস ঐ ছাঁকনিতেই যায় আটকে। বিজ্ঞানী বহু ইঁদুরের ফুল নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন —কোন কোন ক্ষেত্রে সমজাতীয় ইঁদুরের অন্য ক্ষেত্রে দুটি প্রজাতির ইঁদুর নিয়ে। তাঁরা দেখেছেন দুটি প্রজাতির জীব থেকে যে ভ্রূণ তৈরি হচ্ছে তার ফুল বেশি পুরু হয়। এক্ষেত্রে বিজাতীয় বস্তুর অনুপ্রবেশ যাতে ঘটতে না পারে (কারণ দুটি প্রজাতির ক্ষেত্রে ঐরকম বস্তুর সংখ্যা বেশি হবে) তার জন্য ছাঁকনিটা একটু বেশি পুরু হওয়া দরকার।

এই গবেষণার সাফল্য ভবিষ্যতে গ্রাফটিংকে আরো নিখুঁত করে তুলবে সন্দেহ নেই।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

আর্থিক ভারত

শ্রম-সম্মেলনের অসম্পূর্ণ পরিসমাপ্তি

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত দুই দিন ব্যাপী শ্রম-সম্মেলনে দেশের বর্তমান শিল্প-সম্পর্কের পর্যালোচনা করা হয়েছে বটে,—কিন্তু শিল্প-বিরোধ সমাধানের নূতন কোন পথ নির্দেশিত হয়নি। বিভিন্ন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রিগণ নিজেদের রাজ্যের শিল্প-সম্পর্কে অবস্থা বর্ণনা করেছেন। দেখা গেছে, ১৯৬৭ সালে সবচেয়ে বেশি শিল্প-বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর জানিয়েছেন ১৯৬৭ সালে ৬০ লক্ষ লোকের কাজের দিন নষ্ট হয়েছে; তার আগের বছর ২০ লক্ষ লোকের কাজের দিন নষ্ট হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-শ্রমিক বিরোধের তীব্রতা সুবিদিত। কিন্তু কীভাবে শিল্পক্ষেত্রে শান্তি ফিরিয়ে আনা যায় তার কোন সঠিক পথের নির্দেশ সম্মেলনে দেওয়া হয়নি। এদিক থেকে দুইদিনব্যাপী এই শ্রম-সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত।

প্রকৃতপক্ষে বিগত দুটি পাঁচসালা পরিকল্পনায় আমাদের শ্রমনীতির কোন পরিবর্তনই হয়নি। বর্তমানে যে অস্থায়ী বাৎসরিক পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলছে তাতেও আগের শ্রমনীতিই অনুসৃত। আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে তা শুধু বিশেষ শিল্পকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠেনি। বর্তমানে সরকারী ক্ষেত্রেও শ্রমিক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের দ্বারা শ্রমিক আন্দোলন পরিচালিত না হয়, যদি শ্রমিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য হয় শুধু শ্রমিকদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করা, তবে শ্রমিক-আন্দোলনের এই সম্প্রসারণ নিঃসন্দেহে কাম্য। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মূলে দুর্বলতা দূর করতে হলে প্রথমেই ইউনিয়নগুলিকে শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত করা দরকার এবং একই শিল্পে যাতে রাজনৈতিক মতবাদের পার্থক্য থাকার দরুন একাধিক ইউনিয়নের সৃষ্টি না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া বাঞ্ছনীয়। বিভেদই অনৈক্যের কারণ,—শ্রমিক স্বার্থের ক্ষেত্রে এ কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রীজয়সুখলাল হাতি সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকর্তাদের সম্মেলনে প্রস্তাব দিয়েছেন, ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে এড়িয়ে সমস্ত কর্মীদের দ্বারা নির্বাচিত একটি শ্রম-পরিষদ গঠন করা হোক এবং প্রস্তাবিত শ্রম-পরিষদকে দর কষাকষি ও আলাপ-আলোচনা চালাবার জন্য নির্দিষ্ট কয়েক বছরের জন্য ক্ষমতা দেওয়া হোক। কিন্তু তার ফলে কি সমস্যার কোন সমাধান হবে? এভাবে ট্রেড ইউনিয়নকে এড়িয়ে শ্রম-পরিষদ গঠন করলেই যে শিল্পে শান্তি ফিরে আসবে তা নয়। মোদ্দা কথা, ট্রেড ইউনিয়নকে এড়িয়ে যাবার কোন প্রস্তাব করলেই সে প্রস্তাব শ্রমিকদের মনে সন্দেহ ও অসন্তোষের সৃষ্টি করবে, তাতে সমস্যার গুরুত্ব বাড়বে বই কমবে না। বরং প্রস্তাবটিকে পাল্টে এভাবে তৈরি করা যেতে পারে——ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ সদস্যদের নির্বাচিত (রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কর্তৃক মনোনীত নয়) একটি শ্রমিক-পরিষদকে দর কষাকষি ও আলাপ-আলোচনা চালাবার জন্য নির্দিষ্ট কয়েক বছরের জন্য ক্ষমতা দেওয়া হোক। ট্রেড ইউনিয়নের কর্মীদের নিজস্ব রাজনৈতিক মতবাদ ও চিন্তাধারা অনুসরণ করার পূর্ণ অধিকার আছে; কিন্তু সব শ্রমিকের স্বার্থ প্রায় অনুরূপ হলেও রাজনৈতিক বিশ্বাস ও মতবাদ অনুরূপ নাও হতে পারে। ট্রেড ইউনিয়নগুলি নিজেরাই যদি তা বুঝতে অক্ষম হয়, তবে দেশে প্রকৃতপক্ষে [illegible] ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে একটি বিরাট অন্তরায় থেকেই যাবে।

পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থ দপ্তরের মধ্যে মতভেদ

পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন যে, চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় ভারতে বৈদেশিক সাহায্য শতকরা ৫০ ভাগ কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষে সম্পূর্ণভাবে বৈদেশিক সাহায্য নেওয়া বন্ধ করা যেতে পারে। কিন্তু ভারত সরকারের অর্থ দপ্তর এই যুক্তি গ্রহণ করতে পারেননি। পরিকল্পনা কমিশনের এই যুক্তির ভিত্তি আগামী পাঁচ বছর যদি গড়ে শতকরা সাত ভাগ রপ্তানি বাড়ে তবেই বৈদেশিক সাহায্য অর্ধেক কমিয়ে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু অর্থ দপ্তরের মতে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় রপ্তানির পরিমাণ গড়ে শতকরা ২·৮ ভাগ থেকে শতকরা ৬·৩ ভাগের বেশি বাড়ানো সম্ভব নয়।

তাছাড়া অর্থ দপ্তরের মতে এখনই পি এল ৪৮০ অনুযায়ী সব আমদানি বন্ধ করে দেওয়া উচিত নয়। কারণ তাহলে দেশের বাজেটের উপর তার গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। প্রতি বছর এই ব্যবস্থা অনুযায়ী যে খাদ্যশস্য ভারত সরকার আমদানি করে থাকেন, তা বিক্রী করে ২০০ কোটি থেকে ৩০০ কোটি টাকা পাওয়া যায়। সুতরাং এখনই যদি পি এল ৪৮০ অনুযায়ী সব আমদানি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তবে সরকারকে টাকার জন্য বিকল্প উৎসের সন্ধান করতে হবে। ভারত সরকারের খাদ্য দপ্তরের মতেও তাড়াহুড়ো করে এ ধরনের আমদানি বন্ধ করে দেওয়া উচিত নয়।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এখনই পি এল ৪৮০ অনুযায়ী আমদানি বন্ধ করলে ভারত সরকারকে অসুবিধায় পড়তে হবে। কিন্তু এজন্য কি চিরকাল আমরা বিদেশের উপর নির্ভর করে থাকব? পরিকল্পনা কমিশনের কর্মসূচী অনুযায়ী বাৎসরিক রপ্তানির পরিমাণ শতকরা সাত ভাগ করে বাড়ানো কি একেবারেই অসম্ভব? সরকার যদি রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর উৎপাদনের অগ্রাধিকার মেনে নেন এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে পণ্য বিনিময় চুক্তি আরও জোরদার করেন, তবে রপ্তানির পরিমাণ শতকরা সাত ভাগ পর্যন্ত বাড়াবার কর্মসূচী গ্রহণ করা এবং ধাপে ধাপে পি এল ৪৮০ অনুযায়ী আমদানি কমিয়ে দেওয়া ঠিকই সম্ভব হবে। এ জন্য চাই সরকারের দিক থেকে ঐকান্তিক প্রয়াস। অধ্যাপক ডি আর গ্যাডগিলকে ধন্যবাদ, তাঁর নেতৃত্বে পরিকল্পনা কমিশন বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে এবং ভাবাবেগে চালিত না হয়ে দেশের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছেন। আমরা বিদেশ থেকে সাহায্য পেতে পেতে বড্ড বেশি পরনির্ভরশীল হয়ে যাচ্ছি—এই পরনির্ভরশীলতা ক্রমেই ভেঙে দেওয়া দরকার।

সুব্রত গুপ্ত

বড়ে গোলাম

পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

ফুলের গন্ধে ফোটার জন্যে
নারীর স্পর্শ পাবার জন্যে
ঘুমের মধ্যে কাঁদতে কাঁদতে
আমরা যেদিন যুবক হোলাম

বাইরে তখন বক্ষে বৃক্ষে
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে
আমাদের সেই কান্না নিয়ে
গান ধরেছে বড়ে গোলাম।

ফুলের কাছে নারীর কাছে
বুকের বিপুল ব্যথার কাছে
বেদনাবহ যে সব কথা
বলতে গিয়ে ব্যর্থ হোলাম

তারাই যখন ফিরে আসে
কেউ ললিতে কেউ বিভাসে
স্পন্দনে তার বুঝতে পারি
বুকের মধ্যে বড়ে গোলাম।

গানের আসর

পরলোকে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ

২৩ এপ্রিল রাত প্রায় এগারোটায় বর্তমান ভারতের সর্বাধিক জনপ্রিয় কলাকার ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ হায়দরাবাদে মরদেহ পরিত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বৎসর। তাঁর মধুবর্ষী গম্ভীর কণ্ঠের ধ্বনি এবং দৃঢ় পুরুষোচিত ব্যক্তিত্ব আমাদের কাছ থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হল। বড়ে গোলাম আলী খাঁ ওস্তাদ ছিলেন। কিন্তু ওস্তাদ অর্থে আমরা যা বুঝি তিনি তা ছিলেন না। সংগীতের টেকনিক এবং কৌশল তাঁর কাছে প্রধান ছিল না, তিনি হৃদয় দিয়ে হৃদয়কে সম্মোহিত করতেন। তাঁর অনুষ্ঠান দীর্ঘ হত না। কিন্তু একান্তভাবে চিত্তাকর্ষক হত। তাঁর সংগীতের আবেদন পৌঁছেছে সবাইকার কাছে। ওস্তাদ হয়েও তিনি ছিলেন সবাই-কার শিল্পী। জনপ্রিয়তার অতি দুর্লভ ভাগ্য তিনি তাঁর স্বাভাবিক প্রতিভায় লাভ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আর একটি জিনিস চলে গেল. সে হচ্ছে তাঁর দেশের ছোট ছোট কাব্যসংগীত—যা আর কেউ এমন সুন্দরভাবে গাইতেন না।

১৯০২ সালে তাঁর জন্ম। খুল্লতাত ভারত বিখ্যাত ওস্তাদ কালে খাঁর কাছে তাঁর সংগীশিক্ষা শুরু হয়। পরে তিনি তাঁর পিতা আলী বক্স খাঁ সাহেবের কাছে শিক্ষা করেছিলেন। তিনি পাতিয়ালা ঘরানার অন্ত-র্ভুক্ত বলে শুনেছি। লাহোরে ১৯১৯ সালে তিনি প্রথম কনফারেন্সে প্রকাশ্যভাবে গান করেন স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই তিনি সংগীত সমাজে সুবিদিত ছিলেন কিন্তু তাঁর খ্যাতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কলকাতায় স্বাধীনতার পরবর্তী কালে প্রাথমিক কনফারেন্সগুলিতে। এর পর থেকে তিনি নিয়মিত কলকাতায় এসেছেন এবং প্রতিবারই বরমাল্য জয় করে গেছেন। নিরহঙ্কার সদাশয়,—সদাপ্রফুল্ল এবং সহৃদয় এই মানুষটি শ্রোতাদের সব দাবী মেনে নিতেন। প্রতিবারই তাঁকে "আয়ে না বালম" এবং "হরি ওঁ তৎ সৎ" গেয়ে যেতে হোতো। তাঁর সুমিষ্ট সরগম, তীক্ষ্ণ-দ্রুত তান ছোট ছোট মীড়, গমক হৃদয়কে স্পর্শ করে যেত।

ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ জাতীয় সম্মান অর্জন করেছিলেন। তিনি পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। সংগীত নাটক একাডেমী তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করে-ছিলেন। এ ছাড়া ভারতে বহু বিদগ্ধ গোষ্ঠী তাঁকে সম্মানিত করেন। জনগণের অকুণ্ঠ অভিনন্দন তো তিনি সর্বদাই পেয়ে এসেছেন।

মৃত্যুর বহু পূর্ব থেকেই তিনি জানতেন তাঁকে যেতে হবে। তবু তার নিত্য সহচর স্বরমণ্ডলকে তিনি কাছ ছাড়া করেননি কণ্ঠে যতক্ষণ শক্তি ছিল ততক্ষণ গান করতে চেয়েছেন মৃত্যু ভয় তাঁকে এতটুকু ভীতি সঞ্চার করতে পারেনি। প্রকৃত সুরসাধকের মত তিনি মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন।

তাঁর দুই পুত্র এবং পরিবারের শোকে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

শার্ঙ্গদেব

আয়ে না বালম

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে পাঞ্জাবের একাধিক ঘরানার মধ্যে তালমণ্ডি, শ্যামচৌরাশি, কপুরতলা প্রভৃতির দান যথেষ্ট হলেও পাতিয়ালা ঘরনার তুলনায় তা অনেক কম। পাতিয়ালা গায়কির মূল কাঠামো প্রধানত আলীবক্স ও ফতে আলীর চেষ্টায় গড়ে ওঠে। এঁরা দুজনে একসঙ্গে গান করতেন বলে "আলিয়াফত্তু" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

এই ঘরনারই অন্তর্গত বড়ে গোলাম আলীর জন্ম লাহোরে ১৯০২ সালে (অনেকের মতে ১৯০১)। আলীবক্স ও কালে খাঁ বড়ে গোলাম আলীর যথাক্রমে পিতা ও পিতৃব্য। উভয়ের কাছেই বড়ে গোলাম শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, তবে পিতৃব্যের কাছেই বেশি। বংশগত সূত্র ছাড়া তিনি ফতে আলীর পুত্র আসিক আলীর কাছেও সঙ্গীত শিক্ষা করেন। কিন্তু এসব কথা বড়ে গোলাম আলীর ক্ষেত্রে মুখ্য বিষয় নয়। ঘরানাগত সঙ্গীত সম্পদের সম্যক উপলব্ধি এবং তার উৎকর্ষ সাধনের প্রতি দৃষ্টি না থাকলে কখনই তিনি যশের শিখরে উঠতে পারতেন না।

কতদিন ধরে সঙ্গীত অনুশীলন করছেন—এই প্রশ্নের উত্তরে প্রায় ২৪ বৎসর পূর্বে তিনি এক সাংবাদিককে বলেছিলেন, কবে যে শুরু করেছি তা মনে নেই। বংশগত-সূত্রে যে সঙ্গীতসমৃদ্ধির মধ্যে তিনি বর্ধিত হয়েছিলেন তাতে বিস্মৃতির অবকাশ আছে বলেই মনে হয়।

সঙ্গীতে মান নির্ধারণ করার ব্যাপারে মতান্তরের কথা সকলেই জানেন। কেউ বলেন, সুরেলা কণ্ঠস্বর, কেউ বলেন তানের বাহার, কেউ বলেন ভাবপ্রবণ রূপায়ণ, কেউ বলেন উপস্থিত সৃজনীশক্তি কেউ বলেন আলাপকেন্দ্রিক পরিবেশন। কোনটি যে ঠিক তা বলা কঠিন। তবে এই বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গির মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করেন।

এ সমন্বয়ের স্বাদ পাওয়া যায় বড়ে গোলাম আলীর খেয়াল ও ঠুমরী গানে। পাতিয়ালা গায়কির রসোত্তীর্ণ ধারার তিনিই ছিলেন বর্তমান কালের প্রধান মুখপাত্র। বংশের পূর্বাচার্যরা পাতিয়ালার অধিবাসী ছিলেন বলেই তাঁদের প্রবর্তিত গীতরীতিকে পাতিয়ালা গায়কি বলা হয়। ফতে আলীই তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম পাতিয়ালা গায়কিকে দীপ্তিতে ভরিয়ে তোলেন। পূর্বাচার্যদের মধ্যে এ ছাড়া ছিলেন বেহরাম খাঁ, তাবিজ খাঁ এবং কালে খাঁ, যিনি জম্মু দরবারকে রসসিক্ত করে রেখেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রায় ৬ বৎসর পূর্বে কালে খাঁ কলকাতায় এসে সর্বপ্রথম পাতিয়ালা গায়কির সঙ্গে বাংলার রসিক সমাজের পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর থেকেই এই গীতরীতির সমাদর বাংলায় বাড়তে থাকে।

পাতিয়ালা গায়কির পূর্বাচার্যদের সব সময়েই দৃষ্টি থাকতো যাতে ব্যবহারিক সঙ্গীতের কাঠামো উপযুক্ত রসসম্ভার নিয়ে গড়ে ওঠে। পঠিত জ্ঞানের চাইতে তাই তাঁরা ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি বড়ে গোলাম আলীর ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা গেছে। বহু আসরে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, কণ্ঠ সম্পদ ছাড়া তাঁর আর কিছু নেই। কয়েক বৎসর পূর্বে কলকাতার এক সঙ্গীত সম্মেলনে তিনি গান করছিলেন, সহসা ইলেকট্রিক বিভ্রাট ঘটলো এবং মাইক্রোফোন অকেজো হয়ে গেলো। কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ না করে তিনি গান চালিয়ে যেতে লাগলেন। সেই আসরের শেষ সারি অবধি সকল শ্রোতার কাছেই তাঁর কণ্ঠস্বর শ্রুতি-গোচর হয়েছিলো। কণ্ঠ-সম্পদের প্রমাণ এই ঘটনা থেকেই পাওয়া যায়।

অতি রসাল ছিলো তাঁর কথাবার্তার ধারা। বলতেন, কণ্ঠের মতো গুম্ফ-যুগলের প্রতিও তাঁর আগ্রহ সমধিক। প্রথমটি দিয়ে তিনি ব্যক্ত করতেন সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য, দ্বিতীয়টি দিয়ে শারীরিক বৈশিষ্ট্য। এই গোঁফের ব্যাপারে মনে পড়ে অনেকদিন আগেকার এক ঘটনার কথা। ১৯৪৪ সাল। এক সাক্ষাৎকারের অন্তে ফটো তোলার অনুরোধ করা হলে তিনি স্বীকৃত হলেন না, এইজন্য যে তাঁর গোঁফের দৈর্ঘ তখন খাটো। পূর্ণগুম্ফ ছাড়া সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় রূপায়িত হওয়ার বাসনা তাঁর নেই।

আহারের ব্যাপারে বড়ে গোলাম আলীর অনুরক্তির কথা অনেক শোনা যায়। সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করতে যখনই তিনি বাসস্থানের বাইরে যেতেন, ঘরের তৈরী ঘিয়ের পাত্রটি সঙ্গে নিতে ভুলতেন না। প্রমাণ পেয়েছিলাম কলকাতা রেডিওর এক অনুষ্ঠানে। তাঁর আধ ঘণ্টার একটি অনুষ্ঠান হয়ে গেলো। বাইরের কয়েকজন শ্রোতা রেডিও স্টুডিওতে উপস্থিত ছিলেন। কারণ বেতার কর্তৃপক্ষ হয়তো মনে করেছিলেন যে পূর্ণ আসরের আবহাওয়া না থাকলে গায়কির তেমন ফলাও হবে না। আধ ঘণ্টা বিরতি। এগিয়ে গেলাম কয়েকটি কথা বলবার জন্য। প্রথমেই বড়ে গোলাম বললেন—কলকাত্তামে ঘিউ আচ্ছা নাহি মিলতা। মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে ভাবলাম তাঁর মতো সঙ্গীতজ্ঞের এ ধরনের চিন্তা সত্যই অভাবনীয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো শরীরচর্চার মধ্যেই নিহিত থাকে কণ্ঠ-সম্পদের বীজ।

বিগত প্রায় ৫০ বৎসর যাবৎ বড়ে গোলাম সঙ্গীত পরিবেশনের কাজে লিপ্ত ছিলেন। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি সকল শ্রেণীর শ্রোতা তাঁর গানে পরিতৃপ্ত হয়েছে। জ্ঞানলব্ধ সঙ্গীত-সম্পদকে ব্যবহারিক প্রয়োগের রসসিঞ্চনে তিনি যেভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন, তার তুলনা হয় না। একথা তাঁর খেয়াল ও ঠুংরি উভয় শ্রেণীর গানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। গুরু ও লঘু অলঙ্কারের ঘন বিন্যাসে, সুর ও ছন্দের স্বাভাবিক গতি, সাপট তানের আকস্মিক প্রয়োগ, রাগরূপায়ণের ভাবময় ধারা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্যের লীলায়িত ভঙ্গি সমগ্রভাবে তাঁর সকল শ্রেণীর গানকে সজীব করে তুলতো।

খেয়াল গানের ক্ষেত্রে অপ্রচলিত রাগ বড়ে গোলামের কণ্ঠে বিশেষ শোনা যেতো না। ব্যবহারসিদ্ধ রাগরাগিণীর প্রতিই তাঁর দৃষ্টি ছিলো বেশি। পুত্র মুনাওয়ার খাঁ মারফৎ একবার অনুরোধ করেছিলাম, যাতে তিনি কলকাতায় কোনও সঙ্গীত সম্মেলনে অষ্টাদশ কানাড়ার পৃথক পৃথক রূপ ব্যক্ত করেন। উত্তর পেলাম—সম্মেলনে নয়, প্রাইভেট আসরের বন্দোবস্ত করুন, শোনাবো। জ্ঞানগর্ভ সঙ্গীতকে মর্যাদা দিতে রসিক শ্রোতার পরিবেশ তিনি পছন্দ করতেন।

বড়ে গোলামের ঠুমরী গানকে পাঞ্জাবী অঙ্গের ধরা হয়। কিন্তু তাঁর পুত্রের মুখে শুনেছি এ-গীতরীতি তিনি নিজেই উদ্ভাবন করেছেন। খুব কম শ্রোতাই তাঁর ঠুমরী গানের রসসম্পদকে অগ্রাহ্য করতে পারে। সুরের প্লাবনে সমালোচনার বাঁধ যেন ভেঙে যায়, বিচারবুদ্ধি পড়ে ঝিমিয়ে। সার্থক সঙ্গীতের এ যেন এক মুহ্যমান অবস্থা।

স্বাস্থ্যের অবনতি বড়ে গোলামের অনেক দিন থেকেই চলছিলো। বিগত কয়েক বৎসর ধরে তাই তিনি গীতরীতি খাটো করে নিয়েছিলেন। আর বর্তমান দরবারী কানাড়া শুনে মনে পড়তো পূর্ব-বর্তী জীবনের কথা যখন তিনি এই রাগই গাইতেন একটানা তিন ঘণ্টার পরিসরে। কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করতাম যে, "আয়ে না বালম" গানটি গাইতে অনুরোধ করলে বড়ে গোলাম আক্ষেপ করে উত্তর দিতেন—এ বালম ঘর গয়া। তাঁর মৃত্যুতে "কেয়া করুঁ সজনী" আক্ষেপউক্তি শ্রোতার মনে অমর হয়ে রইলো।

সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় দর্পণ

প্রতিভা বসু

৩১

রঞ্জন লক্ষ্মী নামটা বড়ো ভালোবাসতো। তাকে আদর করে লক্ষ্মীরানী ডাকতো। তাই মেয়ের নাম লক্ষ্মী রেখে তিনি লক্ষ্মীর মা হলেন। লক্ষ্মী সেই হাসপাতালের মধ্যেই ভৃত্য ভৃত্যা মেথর জমাদারের সঙ্গে তাদের ছেলেপুলের খেলার সঙ্গী হয়ে বড়ো হতে লাগল। চাকরিটা বদল করা দরকার ছিল। মল মূত্র থুতু কফ পরিষ্কার করার কাজে কিছুতেই অভ্যস্ত হতে পারছিলেন না। বড়ো বড়ো ঘর ঝাড়তে মুছতে ভেঙে আসতো শরীর। তবু থাকতে হল আরও কিছুদিন। লক্ষ্মীর জন্মের কথা চিন্তা করেই এই কাজ নিয়েছিলেন, জন্মের পরেও তার জন্যই থাকতে হচ্ছিলো। কাজ করতে গেলে এখানে দেখবার লোক ছিল লক্ষ্মীকে। খাইয়ে-দাইয়ে একা ঘরে রেখে গেলেও ভাবনা থাকতো না, কেউ না কেউ থাকতোই। তার উপরে হাসপাতালের ভিতরেই কোয়ার্টার বলে ছুটে ছুটে এসে তিনি নিজেও দেখে যেতে পারতেন।

কর্তাব্যক্তিদের নজরে পড়ে চাকরির অবশ্য উন্নতি হয়েছিল শেষে। তাঁর নিজের বুদ্ধি বিদ্যাও তাঁর সহায় হয়েছিল। তিনি নার্সের পদে বহাল হয়ে কথঞ্চিৎ সুস্থির বোধ করছিলেন।

কিন্তু সেই সুস্থিরতার মধ্যেও অশান্তি ছিল অনেক। ডাক্তাররা জ্বালিয়ে খেতেন। তাঁদের কুপ্রস্তাব অন্তহীন হয়ে উঠছিল। প্রত্যাখ্যানের অপমানে আস্তে আস্তে তাঁরা শত্রুও হয়ে উঠতে লাগলেন। যাঁদের সাহস দুর্জয় ছিল, তাঁরা দুর্জয় হয়েই হানা দিতে লাগলেন ঘরে দুয়োরে পথের মধ্যে।

একটা একা স্ত্রীলোকের শরীর নিয়ে পুরুষের জোঁক থেকে বেঁচে থাকা যে কী কঠিন সমস্যা, তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে আবার পালাতে হল তাঁকে।

এলেন এপারে, এই জেলা শহরে। কতোকাল পরে শহর দেখলেন একটা। যে শহরে শুধুই সাইকেল রিকশা নয়, ট্যাকসি আছে, বাস আছে, গমগমে লোকজন আছে। আছে বিপণী। খুব ভালো লেগেছিল। চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল। স্কুলটিও পছন্দ হয়েছিল সেই সঙ্গে।

দু' বছর বয়সের লক্ষ্মীকে নিয়ে গঙ্গাতীরের এই শহরে এসে অনেক দিন পরে একটু ভদ্রস্থ হলেন। সুন্দর একখানা ঘর ভাড়া পেলেন টাওয়ার হাউসের কাছে। ইলেকট্রিক লাইট আছে, কল আছে, বেড়া ঘেরা আলাদা স্নানের জায়গা আছে একটু।

বিদ্যুতের আলো! কল! যেন এক স্বপ্নরাজ্যে এসে পৌঁছেছিলেন। এসব যে কবে দেখেছিলেন, কবে ব্যবহার করেছিলেন, মনে করতে কষ্ট হল। সেকি এই জন্মের কথা? নাকি গত জন্মেই খোলসের মত পরিত্যাগ করে এখানে এসে পৌঁছেছেন!

লক্ষ্মীকে দেখাশুনো করার জন্য দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত একজন পরিচারিকাও রেখে দিলেন। জলের মতো কেটে গেল কতোগুলো মাস। আবার একটু বিশ্বাস ফিরে এলো জীবনের উপর। সন্তানের সাহচর্যে নিঃসঙ্গতার বেদনাও তখন তেমন আচ্ছন্ন করে ছিল না তাঁকে। তিনি লক্ষ্মীকে কীভাবে মানুষ করবেন, সারাদিন সারাক্ষণ এই ছিল তাঁর একমাত্র ভাবনা।

মেয়েকে সঙ্গে করে মাঝে মাঝে স্কুলেও নিয়ে যেতে লাগলেন। ঠিক করলেন, শীগগিরই ভর্তি করে দেবেন। এরই মধ্যে একটি নতুন কেরানীর মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। এক মুহূর্ত দেরি হল না চিনতে। উনাদিঘীর লোক। ডাক্তারের ল্যাজ ছিল। বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠলো থরথর করে।

লোকটিও চিনলো বইকি। হাসলো দাঁত বার করে, বলল, 'নমস্কার।'

'নমস্কার।'

'ইটি কে?' হাতে-ধরা লক্ষ্মীর দিকে নজর গেল তার।

'আমার মেয়ে।'

'আরে, এতো বড়ো মেয়ে হয়ে গেল আর আমরা জানতে পারলাম না?'

লক্ষ্মীর মা গম্ভীরভাবে চলে যাচ্ছিলেন,

বললো, শুনুন, শুনুন, উনাদিঘীর স্কুলের একটা জবর খবর আছে।'

'আমার সময় নেই।'

'তা, থাকেন কোথায়?' পিছে পিছে এলো সে।

'টাওয়ার হাউসের কাছে।'

'সে তো বেশ ভালো পাড়াতেই থাকা হয় দেখছি।'

'হ্যাঁ।'

'একদিন যাব, কী বলেন। পুরোনো কলিগ আমরা।'

'যাবেন।'

হনহন করে বাড়ি ফিরে এলেন তিনি। একটু পরেই পাকা মাথা দারোয়ান কালীচরণ এসে হাজির। এক বছর ধরে অমনিই সে রোজ আসে, বসে, বিশ্রাম করে, লক্ষ্মীকে আদর করে, লক্ষ্মীর মার কাজ করে দেয়। বাড়ির লোকের মতো সুখদুঃখেরও গল্প করে। লক্ষ্মীর মা ভালোবাসেন এই লোকটিকে। ঘরে যা থাকে যত্ন করে খেতে দেন। খেতে খেতে কালীচরণ ভরা মুখে বলে, 'বুঝলে মা, আগে আমি এক-এক বেলাতেই দেড় কিলো চালের ভাত খেতুম। আর কী

খেতুম জানো? সজনের চচ্চড়ি। উঃ, ডাঁটা চিবিয়ে যখন ফেলতুম পাতের কাছে যেন হিমালয় পব্বত জমে উঠতো।'

'তাই নাকি?' লক্ষ্মীর মা হাসতেন।

লক্ষ্মী মুখে মুখে বলত, 'হিমালয় পব্বত।'

'হ্যাঁ দিদি, হিমালয় পব্বত। আমার ভাতের কাঁড়িও থাকতো হিমালয় পব্বতের মতো, ডাঁটা চচ্চড়িও থাকতো হিমালয় পব্বতের মতো। হাহ্ হা হা।'

যতো কালীচরণ হাসত, ততো লক্ষ্মী হাসতো। এই হাসির দিকে তাকিয়ে থাকতেন লক্ষ্মীর মা। কতো দূরে থেকে ভেসে আসা গানের মতো ধূ ধূ মনে পড়ত, এই-রকম অনাবিল হাসির ফোয়ারা যেন তাঁর জীবনেও কখন উছলে পড়ত। যা এখন ইতিহাস।

লেখাপড়া তো শিখিনি, বুইজলে মাগো'—অনর্গল কথা বলতো কালীচরণ 'বাপ বইললো তুই নিপাত যা। আর আমিও অমনি নিপাত গেলুম।'

'সে কি?'

'আর কি? মা বাঁইচে নাই, ভাই মইরেছে কালাজ্বরে, আর আমি যেন বাঁধনহারা মস্ত ঘোড়ার মতো ইদিক-সিদিক ছুইটে বেড়াচ্ছি। একেবারে নষ্ট হইয়ে যাওয়া যাকে বলে।'

মাথা নেড়ে বিজ্ঞের মতো লক্ষ্মী বলল, 'নস্‌ট, দুস্‌টু।'

'ঠিক ঠিক। দিদি আমার ঠিক বইলেছে। একেবারে পুরোপুরি নষ্ট আর দুস্টু যাকে বলে। বাপ তখন পাঁচের বুদ্ধিতে পড়ে রাঙা টুকটুকে বউ এনে দিলে ঘরে।'

লক্ষ্মী বলল, 'আঙা তুকতুক।'

'হাঁ দিদি, একেবারে আঙা তুকতুক।'

'তুমি তখন কতো বড়ো কালীচরণ?' লক্ষ্মীর মা কাজ করতে করতে প্রশ্ন করেন।

কালীচরণ এইটুকু প্রশ্নেই উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে, 'তা বড়ো বইকি, আঠারো বছরের সাজোয়ান ছেলে। গায়ে কি শক্তি! আবার ডাকাতদলে ভিড়েছিলুম কিনা!'

'আাঁ!'

'ডর করছে শুনেতে? তা ডরের মতোই যে স্বভাব ছিল আমার। সেই বসে নেই তশেলবরের ডাকাতি? সারা গাঁয় যখন মশাল জ্বেলে হামাগুড়ে পালে পইড়লো, দলটা বাঁচালো কে? এই আমি? বুকের পেশী ফুইলে আমার দশ হাত বেইড়ে গেল, হাতের পেশী ভিম ভিম হইয়ে উঠলো, একটা মোটা লাঠি নিয়ে এমন বনবনিয়ে ঘুরোতে লাগলুম যে, ত্রিসীমানায় আগাতে পারলো না কেউ।'

'কী সর্বনেশে ছেলে ছিলে তুমি কালীচরণ!'

'বিয়ে করার পরেও কি ভাবছো দোষ সাইরলো? উঁহু। সুন্দর বউ ফেইলে কোথায় কোথায় চইলে গিয়েছি রাতে। যখন ফিরেছি, তখন কিন্তু মনটা টনটন কইরতো। বউটা বড়ো ভালো ছেল কিনা?'

'মা, শুইনছো?' অন্যমনস্ক লক্ষ্মীকে কালীচরণ অবহিত করতো, 'তোমাকে আমি বলাগড়ের ডাকাতির কথাটা শোনাই। ঐ আমার শেষ ডাকাতি। বলাগড়ের দত্তবাবুরা ছিলেন ঠাসা বড়োলোক। আমাদের দূতেরা টো দিইয়ে এসো মেজ দত্তের মেয়ের বিয়ে, ঘরে দু' শ ভরি সোনার গয়না এসেছে, নগদে প্রায় হাজার তিরিশেক টাকা। অমনি সাজ সাজ রব পড়ে গেল। কিন্তু মুশকিল হলো দলপতিকে নিয়ে। তাঁর পিঠের ঘা তখনও দগদগে। মাসখানেক আগে ডাকাতি করতে গিয়ে বর্শার তীর বিঁধে এই দশা হয়েছে। সে বইললো, কালী, তুই যা।

'আমি তো হাঁ। এইটুকু সময়ের মধ্যেই দলপতির পাঠ নিব কী? দলপতি হওয়া কি চাট্টিখানি কথা? কতো শক্তি, সাহস, বুদ্ধি বয়েস লাগে তার কি শেষ আছে? আমাদের দলপতি ছিলো একটা মানুষের মতো মানুষ। তার চোখের দিকে তাকালে একবার যেমন সেনেহে আদরে ভক্তিতে বুক ভইরে যায়, আবার তাকালে তেমন হাতপা কাঁপিয়ে হিম হইয়ে আসে। আর চেহারা কি? যেন রাজপুত্তুর!

'আমার অবস্থা দেইখে দলপতি হাইসলো। বললো, তুই পাইরবি। আমি জানি, তুই পাইরবি। তোর দেহে যেমন বল, মনের বলও তেমনি। তুই মিথ্যাও বলিস না, দরকার হইলে পাষাণও হয়ে যেতে পারিস। আমার তো বয়েস হইয়েছে, এবার তোকেই হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে সিংহাসনে বসাব। কথা শোন মা, বলে আমাকেই সিংহাসনে বসাবে। হাহা হাহাহা।'

লক্ষ্মীর মা কাজ ভুলে একজন সাক্ষাৎ ডাকাতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন একদৃষ্টে ছেলেবেলার কৌতূহল ভাসতে থাকে চোখের তারায়। লক্ষ্মী যে সেই সুযোগে বালতির জল ঘাঁটতে শুরু করেছে, খেয়াল থাকে না সেদিকে।

'তা বসাক। আমার তো গব্বই। মাত্র বিশ বছর উত্তীর্ণ হইয়েছি তখন। গেলুম বিশ-জনেরই একটা দল নিইয়ে ডাকাতি কইরতে। তার আগে দুপুরে দেখেশুনে আইসতে গিয়েছিনু ফেরিওলা সেইজে। কতো শখের দব্য নিয়ে গিয়েছিনু, মেয়েছেলেরা তো একেবারে মোহিত। কেউ তেল নেচ্ছে, কেউ সাবান নেচ্ছে, কেউ সোনো পমেট নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করছে—আর আমি সেই সুযোগে দুই চক্ষে টচ্‌ বাতি জেলইলে ঘরের আনাচ-কানাচ দেইখছি। এদিকে মেয়েছেলেদের

দিকেও দেখছি। ভাইবছি কুনজন মেজগিন্নী হবেন। শেষে বুঝে বুঝে ঠিক কইরলুম, বিধবাজন বড়ো, ঘোমটা দেওয়া জন ছোটো, আর এই তোমার বয়সী যিনি, যার পরনে কুচি কুচি জরিদার শান্তিপুরী শাড়ি, মুখখানা কুমারটুলির সরস্বতীর মতো, কথার মিষ্টিতে ভুবন ভোলে, তিনিই হলেন মেজ গিন্নী। এনারই মেয়ের বিয়ে, এনার ঘরেই আজ আমার ডাক পইড়েছে। আলাপ কইরলুম মিঠা সুরে, বাড়িতে যেমন বিভা বিভা গন্ধ।

'হেসে মেজগিন্নী বইললেন, হ্যাঁ, কাল আমার মেয়ের বিয়ে।

'আমি কতো খুশি দেখালুম, বকশিশ চাইলুম, শেষে সব বুঝে নিয়ে হানা দিলুম রাত্রিবেলা।

'জানলার শিক উইপরে ঢুইকে-ছিলুম ঘরে। ঢুইকলাম দশজন, দশ-জনকে রাখলাম বাইরে পহরায়। ভিতর থেইকে পটাপট সব দরজা খুইলে রাখলুম যে-কোনো দরজা দিয়ে পালাবার জন্য। ওদিকে ওরা বাইরে থেকে পটাপট বন্ধ করে দিল পাছে বাড়ির লোকেরা বেরিয়ে গিয়ে হামলা করে। শুধু সাংকেতিক শব্দ পেইলেই খুইলে দেবে, নইলে নয়।

'সোজা একেবারে মেজ দত্তের ঘরে। নিবু নিবু কইরে লণ্ঠন জেবইলে রেখেছে। মেজ দত্ত শুইয়েছে এক খাটে, মেজ গিন্নী একমাত্র মেয়ে নিয়ে অন্য খাটে। গিয়েই ঘুমন্ত মেজ দত্তের মুখ ঠেইসে ধ'রে বেঁধে দিলুম, যাতে না চিল্লোতে পারে। তারপর বললুম, চাবি দাও। আঁতকে উঠে মেজ দত্ত ধস্তাধস্তি করতে লাগলো, গোঁ গোঁ আওয়াজ বার কইরতে লাগলো মুখ দিয়ে। পেরানে তো আমাদের দয়ামায়া ছিলো না মা, কষে দুই থাপ্পড় লাগিয়ে প্রায় অচেতন কইরে ফেললুম। ধড়মড়িয়ে মেজগিন্নী উইঠে এসে হাত দুটো চেইপে ধরলো আমার, কাঁদতে কাঁদতে বইললো, বাবা, তুই আমার ছেলে, আমি তোর হাতে ধরছি, মাকে তুই বিধবা করিস না। আমার যথাসর্বস্ব নে, শুধু আমাদের প্রাণে বাঁচা।

'মাগো, সে কান্না যে কী পেলব, সে হাত যে কী নরম, সে গলা যে কী পেরান ঢালা বোঝাতে পারবো না। আমি হলাম ডাকাত দলের দলপতি, কতো আমার দেমাক কতো পোজিশন, সব আমি ভুইলে গিয়ে মায়ের ছিচরণে হাত দিলাম। বইললাম কথা দিলাম পেরানে মারবো না, চাবি দাও।

'মেজ মা তাঁর হাত থেকে ষোলোগাছা চুরি খুইলে দিলেন, গলা থেকে লম্বা হার খুইলে দিলেন, আঙুলের আংটি খুইলে দিলেন— আমি বললাম, না ঐসব না। আমার মায়ের গায়ের সোনা না। নগদ টাকা আর বিয়ের গয়না চাই। চাবি দাও।

'চাবি দিয়ে মা বইললেন, আলমারী খুলে কিছু পাবে না। গয়না সব কুটুম্বরা মেপে যাচাই করতে নিয়ে গেছে, টাকা গেছে পোদ্দারের ঘরে।

'বিশ্বাস করলাম না। খুলে খুলে তচনচ ক'রে সব দেইখলাম। সত্যই কিছু নেই। অবশ্য একেবারে কিছু নেই সে কথা ঠিক নয়। ছিলো। সাত শ' টাকা নগদ ছিলো। মেয়ের নয়, মায়ের গায়েরই আরও কিছু তোলা গয়না ছিলো। কিন্তু মনের মধ্যিখানে যে কী হলো আমার, কিচ্ছু না নিয়ে ফিরে গেলাম। আর যাবার সময় একটা ভয়ানক ভুল কইরলাম, মা কালীর পায়ে ছোঁয়ানো, দলের নাম খোদানো খাঁড়াখানা ফেইলে এলাম কেমন ক'রে। আর সেই খোদানো খাঁড়া দেইখেই পুলিশ ধ'রে ফেলেছিলো আমাদের। এইখেনে, এই শহরেই বিচার হইয়েছিলো। মেজ মা তখন গর্ভবতী ছিলেন। তিনি বইললেন, সব্বাইকে আমি চিনিয়ে দিতে পারবো, সব্বার মুখ আমার স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু এই অবস্থায় কাছারিতে যেতে পারবো না। তখন জজ সাহেব কী করলেন জানো মা? তাঁর নিজের বাড়ির একতলাতেই বিচারশালা বসিয়ে দিলেন। ডাকাত দলকে ধরে এনে সারি সারি দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন, এখন দেখুন তো মা কাকে কাকে আপনি দেখেছেন সেই রাত্রে। মা আমার যেন স্বয়ং পদ্মগন্ধা লক্ষ্মী ঠাকরুনের মতো আবির্ভূত হলেন সেখানে। পরনে লাল পাড় শাড়ি, গায়ে গোলাপী চাদর, মাথায় অল্প ঘোমটা কপালে সিঁথিতে সিঁদুর, ঠান্ডা ঠান্ডা হাঁটা—সে কী আর বলবো, মাকে দেখেই আমার বুক জুড়িয়ে গেল। মাগো ব'লে ডেইকে উঠতে ইচ্ছে করলো। ইচ্ছে করলো পাপের পেরায়চিত্ত করতে।

'দোষী নির্দোষী অনেক লোক ধইরে এনেছিলো ওরা। মা আমার আস্তে আস্তে বেছে বেছে সব ক'জন দোষীকেই সাব্যস্ত করলেন, শেষে আমার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন। ঢোক গিললেন দু'বার, দু'বার

স্নেহে ভরে তাকালেন, তারপর অচেনা ভাব দিয়ে সরে গেলেন পাশের জনের দিকে। অর্থাৎ আমাকে তিনি সনাক্ত কইরলেন না। তখন আমি ঐ কাছারি ঘরেই ফুঁইপে ফুঁইপে কাঁদতে লাগলাম।'

বলতে বলতে সেই মুহূর্তেও কালীচরণের চোখে জল এলো। হাতের পিঠে মুছে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকলো চুপ করে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'জীবন আমার বউদলে গেল মা সেই থেকে। আমি হাতের বল্লম ফেইলে দিয়ে গলায় তুলসীর মালা দিলাম, কালীচরণ থেকে নিজেকে ছাইড়ে এনে রাধাবল্লভের চরণে উৎসর্গ কইরলাম। আমি এখন বৈষ্ণব।'

গল্পটি গল্পেরই মতো। লক্ষ্মীর মা আবেগ ভরে বলেছিলেন, 'মেজ মাকে আর দেখোনি তারপর?'

'দেখিনি?' দু চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠেছে কালীচরণের, 'নিশ্চয় দেখেছি। সেরে তো মেজমার আশ্রয়েই জীবন কাটালুম। মেজসরে খালাস পেয়েই ছুটে গেলুম সেখানে। পায়ে ধইরে বললুম, মাগো, কেন তুমি আমাকে পাপের সাজা দিলে না, কেন আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দিলে না? যদি না দিলে তবে চরণে ঠাঁই দাও। মা বললেন, দেশ কোথায় তোমার?

'বললুম, আমি নদীয়ার লোক।

'কে আছে?

'বাপ আছে আর বউ আছে।

'আর?

'মা ছিলো না, মা পেইয়েছি।

'দারোয়ানি করবে?

'দারোয়ান! কার দারোয়ান! আমি তো অবাক। দারোয়ান মানেই হলো যে সবার রক্ষা করে। আমি তো সবার ভাগি। আমি কার দারোয়ান হবো?

'মা বললেন, আমার দারোয়ান। দেখছো তো কী রকম চুরি ডাকাতি হয় এসব গ্রামে। তুমি আমাদের রক্ষা করবে, পারবে না?

'ও কথা শুনে হিদয়ে যতো আহ্লাদ হ'লো ততো দুঃখ হ'লো। দুঃখে আহ্লাদে আবার আমার ফুঁইপে কান্না এলো। আমি মায়ের চরণে দাসখত লিখে সেই যে দারোয়ান হলাম, আজো আমি সেই দারোয়ান।'

'এই স্কুলে কবে এলে?'

'সে-ও তো ঐ মায়ের হুকুমেই।'

'মা কোথায়?'

'স্বর্গে। আজ দশ বছর মা স্বর্গে গেছেন। বাবার আগে এইখানে বহাল ক'রে গেছেন। মা ছিলেন ঐ দত্তদের বাড়ির বউ আর এখানে মল্লিক বাড়ির মেয়ে। বড়ো মল্লিকের মেয়ে। মা-ই ঐ এক সন্তান। স্বামীর বিষয় বাপের বিষয় সবই মা পেয়েছিলেন। আমি শেষকালে বলাগড়ের দত্তবাড়িতেই দারোয়ানিতে ভর্তি হলাম। মা আমাকে ঘর তুইলে দিয়েছিলেন, আমি বউ নিয়ে বাপ নিয়ে সেইখেনেই বাস করতে লাগলাম। বছর পাঁচেক পরে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে মেজকর্তা মারা গেলেন। মায়ের বাপ-মা তখনো জীবিত। মেয়েকে নিয়ে এলেন নিজেদের কাছে। মা আমাদেরও নিয়ে এলেন। মা লেখাপড়া জানতেন। স্বামী নেই, মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেছে অনেক বয়সে আবার যে একজন ছেলে হয়েছিলো সে হয়েই মারা গেছে। ঘর সংসার করবেন কাকে নিয়ে? দুঃখের দিন কি আর কাটতে চায়? ঘুরে ঘুরে মেয়ে জুটিয়ে একটা ইস্কুল করলেন বাড়ির মধ্যে আপন অংশে। তাই নিয়ে ভুলে থাকছেন বলে দাদাবাবু দিদিমা দু'জনেই শান্তি পেলেন। ইস্কুল যাতে চলে, যাতে বড়ো হয় তার জন্য দু' হাতে টাকা ঢালতে লাগলেন তাঁরা। তা হ'লোও। ধরুন স্থাপন হয়েছে আমার যখন এক কুড়ি ছয় বছর বয়েস, আর এখন আমি প্রায় তিন কুড়ি ধরি ধরি। হিসেব করুন। প্রায় তিরিশ বত্রিশ বছর হবে বইকি।

'আমি তো সবই দেখলুম, ইস্কুল বড়ো হ'লো, পড়ুয়া বাড়লো, নতুন বাড়ি পত্তন হ'লো, কতো ভালো ভালো মাস্টার এলেন, মাস্টারনী এলেন, দাদাবাবু দিদিমা মারা গেলেন—ছোট কর্তা আর মেজ কর্তাও মারা গেলেন, শেষে মা-ও, মারা গেলেন। বংশে বাতি দিতে রইলো কে? ঐ মেজ কর্তার নাতি সুব্য নারায়ণ।'

'তুমি এতোদিন এই ইস্কুলে কাজ করছো?'

'আগে করতুম না, আগে মল্লিক বাড়ির গেটেই থাকতুম। শেষে বহাল হলুম এখানে। আর বাকী কটা দিনও এখানেই কাটবে। যেতে যেতে তো আমার সবই গেছে! বাপ গেছে, বউ গেছে, মেয়ে গেছে—'

'তোমার বউ নেই? ছেলেমেয়ে নেই?'

'না গো মা। বুড়ো বয়সে মাত্র একটা বাচ্চা হয়েছিলো আমার। বউ সেই বাচ্চা হতেই মরে গেল। মেজ মা তখনো বেঁচে আছেন। আপন যত্নে তিনি লালন করেছিলেন আমার মেয়েকে। ছোট জাত বলে দূরে ঠেলে রাখেননি, কর্মচারীর মেয়ে বলে অবহেলা করেননি। বেঁচে থাকলে আজ তার বয়েস তোমার মতোই হ'তো। বারো বছর বয়সে সে গঙ্গায় ডুবে মারা যায়।'

'আহা!'

'এই হুগলির গঙ্গায় যে বান ডাকে আমি সেই বানে পইড়তুম। উঠতুম ডুবতুম, ঢেউয়ের দোলায় চইলে যেতুম কোথায়। লোকেরা তীরে দাঁইড়ে দাঁইড়ে দেখতো। সেদিনও অমনি বান ডাকবার কথা ছিলো, খবর পেয়ে দৌড়ে চলে গেলুম কোমরে গামছা বেঁধে, দূরে সোঁ সোঁ শব্দ আসছিলো, আমি ঝাঁইপে পড়লুম। মেয়েটা যে কখন সাথে সাথে এসে ঘাটে নেবেছে আমি এট্টুও জানতে পারিনি। একটা 'গেল' 'গেল' রব শুইনেছিলুম বানে পইড়তে পইড়তে। তখন কি জানি সে আমারই কলিজা ছিঁড়ে ভেইসে গেল?'

এই গল্প শুনে লক্ষ্মীর মার চোখ ভরে জল আসতো। কালীচরণ বলতো, 'এই যে দেখ না, লক্ষ্মীদিদি আমার মাঝে মাঝে জেদ ধরে আমার সঙ্গে গঙ্গায় যাবে, আর আমি কেমন ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠি, সে তো ঐ জন্যেই। জল যেমন শীতল তেমন রাক্ষুসী। ওর মতি মর্জির কি ঠিক আছে কিছু? কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। দুইজনে মা, সতীর শোকেও আমি পাগল হইয়ে গিয়েছিলুম মনে করেছিলুম আর নয়, অনেক দুঃখ হয়েছে আমার, এখন যিদিকে দু চোখ যায় চইলে যাবো। মেয়েটার উপর রাগ হতো। মনে কইরতুম, ও-ই আমার সবপ্রধান শত্রু। ওর জন্যই আমার বউ গেল। বউ যখন বেঁচেছিল, আমি মাগো সত্যি বুঝিনি, উহারে আমি এতো ভালোবাসি। অভাব না হ'লে মানুষ অভাব বোঝে বলো? ধরো, এই যে তোমাকে আমি মা ডেইকেছি, সে তো ঐ মেয়ের জন্য জুড়োবার জনাই? আমার মেয়েরও অভাব হইয়েছে, মায়েরও অভাব হইয়েছে, জায়গাটা ফাঁকা পইড়েছিলো, কতো দিদিমণি তো এলো গেলো রইলো, কই কাউকেই তো এমনটি মা বইলে ডেইকে উঠলুম না। তোমাকে দেইখেই মনটা আমার কোথায় কেঁইদে উঠলো। তোমার মুখে আমি দুঃখ দেখলাম। আর বুঝলাম এই আমার মা। কিন্তু বউ যখন মরলো মেয়েটাকে তখন দূরে দূরে কইরেছি। মেজ মা বইকতেন, বোঝাতেন, এই মেয়ে তো তোর বউয়েরই। তোর বউ চলে যাবে বলেই তো তোকে এই সান্ত্বনা দিয়ে গেছে। বুঝিস না কেন বোকা, যে যাবার তাকে কেউ রাখতে পারে না। ভগবানের বিরুদ্ধে কি কেউ লড়াই করতে পারে? কিন্তু দেখ, এক দুঃখ পেলি বটে, ভালোবাসবার জন্য ভগবান একটা সন্তান তো দিলেন তোকে? মার কথা শুইনে শুইনে মেয়েটাকে একদিন সাপটে ধইরলাম তপ্ত বুকে! আর যাই কোথায়! সেই যে মেয়ে আঁকড়ে ধরলো, ছাইড়লো একেবারে যাবার দিনে। ভেবে দেখ মা, সেও তো আমার পিছে পিছে গিয়েই পরানটা দিল। তখন কি আর দুঃখ রাইখবার জায়গা ছিলো আমার? ছিলো না। ভেইবেছিলাম আমিও ঐ জলের তলাতে গিয়েই শীতল হই। ভালো সাঁতার জানি, ইচ্ছে কইরলেই কি ডুবতে পারি? তারপর এই ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের দেখে দেখেই একদিন শোক ভুললাম। আবার তেমনি কাজকর্ম করতে পারলাম, খেতে পারলাম ঘুমুতে পারলাম—'

লক্ষ্মীর মা বলে উঠলেন, 'তাই হয় কালীচরণ, তাই হয়। মানুষ সব ভোলে। ভুলতে পারে বলেই পাগল হ'য়ে যায় না।'

ক্রমশ

লক্ষ্মীর কৃপালাভ ঃ বাঙালীর সাধনা

ব্যাংকিং
ও
বিনিয়োগ সংস্থা—দ্বিতীয় পর্ব ॥

রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি সমর্পণ' গল্পের যজ্ঞনাথ নিরুদ্দেশ বংশধরের জন্যে ঘড়া ঘড়া টাকা আর মোহর মাটির নীচের ঘরে জমা করে অজানতে নিজের নাতি গোকুলকেই পাথর চাপা দিয়ে যখ বানিয়ে ফেললেন। তারপর যক্ষের আসল পরিচয় পেয়ে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে পাগল হয়ে গেলেন।

সে যুগে ব্যাংক থাকলে কিন্তু গোকুলকে অমন বীভৎসভাবে মরতে হতো না। ওয়ারিশের অনুপস্থিতিতে সেই হাজার হাজার টাকা ইউনাইটেড ব্যাংক অথবা ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংকে 'ফিক্সড ডিপজিট' করে অ্যাটর্নিকে দিয়ে উইল করিয়ে রাখলে যজ্ঞনাথের সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো। টাকাটা সুদে বাড়তো, শিল্প ও বাণিজ্যে খেটে দেশের উন্নতিও করতে পারতো; আর ভবিষ্যতে গোকুল কিংবা তার বাবা বৃন্দাবন অজ্ঞাতবাস থেকে ফিরে এসে 'সাকসেশন সার্টিফিকেট' দেখিয়ে টাকাটার মালিকানা দাবী করতো।

গতবার ইউনাইটেড ব্যাংক আর তার চেয়ারম্যান বটকৃষ্ণ দত্ত মশায়ের কথা সবিস্তার বলেছি। ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংক নামে বাঙালীর যে আর একটিমাত্র ব্যাংক আছে তার কথা বলা হয়নি।

পূর্ব বাংলার ভাগ্যকুলের ধনকুবের রায়বংশের স্বর্গত যদুনাথ রায়মশায়ের চেষ্টায় ১৯৪০ সালে এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর আত্মীয় স্বর্গত প্রিয়নাথ রায় ও কুমার রমেন্দ্রনাথ রায় কলকাতায় প্রসিদ্ধ লাহা পরিবারের ভাই সত্যচরণ লাহা, এবং ইনসিওরেন্স জগতে বিখ্যাত স্বর্গত অবিনাশচন্দ্র সেন মশায়কে নিয়ে যদুনাথবাবু ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়ালের প্রথম ডিরেক্টর বোর্ড গঠন করেন।

১৯৪৭ পর্যন্ত ব্যাংকের কাজ বেশ ভালোই চলেছিল, কিন্তু পার্টিশানের পরে বিপদ হলো ব্যাংকের কয়েকটি সমৃদ্ধ পাকিস্তানী শাখা নিয়ে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি শাখার ব্যবসাতে ধীরে ধীরে ভাটা পড়ে গেল। তবুও সেই সব বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়েও ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ব্যাংকের কাজ ঢিমেতালে চলল।

ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হবার পরে অন্য ছোট ছোট বাঙালী ব্যাংকের ওপরে রিজার্ভ ব্যাংক বিশেষ দৃষ্টি রেখেছিল। ছোট ছোট ব্যাংককে একত্রিত করে শক্ত সবল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাংক যে নীতি অবলম্বন করেছিল তার বিবরণ আমি গতবারের প্রবন্ধে দিয়েছি। তদনুসারে ১৯৬৩ সালে রিজার্ভ ব্যাংক নির্দেশ দিল যে, 'প্রবর্তক ব্যাংক' ও 'ব্যাংক অব বাঁকুড়া' নামে অপেক্ষাকৃত ছোট দুটি বাঙালী ব্যাংক যেন বৃহত্তর ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়ালের সঙ্গে মিলিত হয়। তা-ই হলো এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংক ছোট ব্যাংক দুটির সম্পূর্ণ দেনা ও পাওনার দায়িত্ব নিল।

বাঙালীর আরও দুটি ব্যাংক 'মেট্রোপলিটান' ও 'সাদার্ন' তখনো একক ব্যবসা চালাচ্ছিল। (গত প্রবন্ধে উল্লিখিত 'ব্যাংকার্স ইউনিয়ন' নামে ব্যাংকটি ইতিপূর্বেই মেট্রোপলিটানের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।) ১৯৬৪ সালে ডিপজিটাররা হঠাৎ তাদের ওপর আস্থা হারালো। রিজার্ভ ব্যাংকের ক্ষিপ্র হস্তক্ষেপে সেই দুই ব্যাংক কলকাতা হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে প্রথমে পাওনাদারদের যথাক্রমে বারো আনা ও দশ আনা পেমেন্ট করে দিল; তারপরে রিজার্ভ ব্যাংকের সাহায্যে ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়ালের সঙ্গে যুক্ত হলো। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংক এখন একদিকে এই দুটি ব্যাংকের পাওনার টাকা আদায় করছে ও অন্যদিকে বাকী দেনা শোধ করছে কিস্তিবন্দী করে। গতবারে আপনাদের বলেছিলাম যে, আজকের দিনে ব্যাংক ফেল হয়ে লোকের টাকা আর মারা যায় না। এই উদাহরণ থেকে তারই সমর্থন পাওয়া যায়। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে, এই দুই দফা 'অ্যামালগ্যামেশন' সত্ত্বেও পাঁচটি ব্যাংকের একজন কর্মীরও চাকরি যায়নি।

এই সব ঝঞ্ঝাট কাটিয়ে ওঠবার পর ১৯৬৫ সালের গোড়া থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংকের কার্যক্রমে একটা উল্লেখ্য পরিবর্তন ঘটলো। পরিচালনা সংস্কারের জন্যে তৎকালীন চেয়ারম্যান স্যার ধীরেন মিত্র মহাশয় বদ্ধপরিকর হলেন। তাঁর চেষ্টাতে এক অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার পদে যোগ দিলেন। এঁর নাম শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়। ইনি প্রথম যৌবনে কিছুদিন বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেছিলেন। তারপরে কুমিল্লা ব্যাংকিং-এ বহু বছর যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে কমার্শিয়াল ব্যাংকিং-এ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। উপরন্তু, ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়ালে যোগ দেবার আগে তিনি প্রায় ১৬ বছর সরকারী 'রিহ্যাবিলিটেশন ফিনান্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' ও 'রিহ্যাবিলিটেশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল করপোরেশন'-এ যথাক্রমে ডেপুটি চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার এবং সেক্রেটারির পদাভিষিক্ত ছিলেন।

বর্তমান চেয়ারম্যান ভাগ্যকুল পরিবারের শ্রীকৃষ্ণদাস রায়ের নেতৃত্বে নন্দলালবাবু এখন ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়ালকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে নিয়ে চলেছেন। নীচের অংকগুলি থেকে এই ব্যাংকের অগ্রগতির মাত্রা বোঝা যায়ঃ—

	১৯৬৩	১৯৬৫	১৯৬৭
আমানত	*১,৭৮,৫২০০০	৪,৬১,৭৮০০০	৫,৪৬,১৮০০০ টাকা
লগ্নী	৮৯,৬৭০০০	২,৬১,০৯০০০	৩,৬৫,৯৬০০০ টাকা
ব্রাঞ্চের সংখ্যা	কলকাতায়—১৬,	মফস্বল বাংলায়—৪,	পাটনায়—১=২১

নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সফল পরিচালনায় বাঙালীর এই ব্যাংকটিও খুব শীঘ্র আরও অনেক বড় হবে বলে আমরা আশা রাখি।

ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার সুযোগ্য 'ইকনমিস্ট' শ্রী টি আর সাহ এবং তাঁর সহকর্মী শ্রীদ্বিজেন ভট্টাচার্যের কাছ থেকে যে সব তথ্য পেলাম তা থেকে বাংলা দেশে ব্যাংকিং-এর দ্রুত প্রসারের মাত্রাটাও বোঝা যায়।

বিশেষ করে স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার এবং আংশিকভাবে অন্যান্য ব্যাংকের সম্প্রসারণ নীতির কল্যাণে ১৫ বছরে ব্যাংকের শাখা এতটা বেড়েছে।

কিন্তু প্রত্যহ ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের অফিসের কাউণ্টারে ক্যাশ টাকায় বিল দেওয়ার প্রচণ্ড ভীড় দেখে মনে হয় যেন আমরা এখনো যজ্ঞনাথের যুগেই বাস করছি। ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের বিল চেকে পেমেন্ট করাও যায়; বড়ো বড়ো

সন	ব্যাংকের অফিসের সংখ্যা	কত শহরে এই অফিস অবস্থিত	গড়ে শাখা প্রতি জনসংখ্যা	ডিপজিট (আমানত)	অ্যাডভান্স (লগ্নী)
১৯৫১	১৭৭	৪৭	১,৪০,০৩৮	১৭৫½ কোটি	১৬১ কোটি
১৯৬০	...	...		২৮৬ কোটি	২১৬ কোটি
১৯৬৬	৩০২	৮৯	১,০৬,০০০	৫১৭ কোটি	*৫৭৫ কোটি

(* অন্য অঞ্চল থেকেও টাকা এনে বাংলায় লগ্নী করা হয়েছে।)

অফিসগুলিতে ডাকবাক্সের মতো বিলসহ চেক ফেলে দেবার জন্যে বাক্স রাখা আছে। ইলেকট্রিক সাপ্লাই সেই চেকের রসিদ পরে ডাকে পাঠিয়ে দেন; তার জন্যে আলাদা কিছু চার্জ দিতে হয় না। যাঁরা পারেন তাঁরা ব্যাংকে সেভিংস অ্যাকাউণ্ট খুলে চেক কেটে দিলেই পারেন; আজকাল তো কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ব্যাংকের অফিস আছে।

১৯৬৭-তে আর একটি হিসেব করা হয়েছিল। সেটা হলো বিভিন্ন খাতে সমস্ত ব্যাংকের লগ্নীর পরিসংখ্যানে সারা ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের স্থানের নির্ণয়।*

কিন্তু একথা আমাদের জানা দরকার যে বাঙালীর পরিচালিত শিল্প ও বাণিজ্যে এর কতটা নিয়োজিত হচ্ছে আর সর্বক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিক ও কর্মীর মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা কত।

রিজার্ভ ব্যাংকের সংকলিত আরও কয়েকটা তুলনামূলক পরিসংখ্যান নীচে লিপিবদ্ধ করছি। প্রথমে দেখাচ্ছি ফি-বছর বাংলায় মোট শিডিউলড ব্যাংকের সংখ্যা, তাদের আমানত ও লগ্নীর অংক ইত্যাদি:—

*সিকিওরিটি (বন্ধকী পণ্য)	সারা ভারত	পশ্চিমবঙ্গ
খাদ্যদ্রব্য	৬·২%	৩·২%
শিল্পের কাঁচামাল	৮%	৫·১%
কৃষিজাত পণ্য	৩·২%	৭·৯%
শিল্পজাত ও খনিজ পণ্য	৪০·৬%	৪৪·৮%
বিবিধ	৪২%	৩৮%
	১০০	১০০

তারিখ	ব্যাংকের সংখ্যা	ডিমান্ড লায়াবিলিটি	টাইম (মেয়াদী) লায়াবিলিটি	মোট	অ্যাডভান্স (লগ্নী)	নগদ ও ব্যাংক ব্যালেন্স
ডিসেম্বর, ১৯৪৯	৯৫	৬৬৬ কোটি	২৯৭ কোটি	৯৬৩	৪৪২	৬৭ কোটি
২৯-৩-৬৮	*৭৬	২০৩৪ কোটি	২০৪৭ কোটি	৪০৮১	৩০৩৫	২২০ কোটি

(*এই ৭৬টি ব্যাংকের মধ্যে ১৫টি বিদেশী ব্যাংক আছে।)

এইবারে আপনাদের জ্ঞাতার্থে রিজার্ভ ব্যাংকের আরও একটি তুলনামূলক পরি- সংখ্যান লিপিবদ্ধ করছি (১৯৪৯-এর অংকগুলিতে সামান্য ভুল থাকতে পারে):—

তারিখ	কারেন্সি নোটের ইস্যু	তার পিছনে রিজার্ভ ব্যাংকে মজুত সোনার দাম	রিজার্ভ ব্যাংকের স্বত্বে বিদেশীয় গভর্নমেন্ট পেপার	মোট ফরেন ব্যালেন্স	রিজার্ভ ব্যাংকের স্বত্বে ভারতীয় গভর্নমেন্ট পেপার
১৯৪৯ (জুন)	১১৮৬ কোটি	*৪০ কোটি	৬৮৫ কোটি	৭৮০ কোটি	৪১৩ কোটি টাকা
৫-৪-৬৮	৩৩১৮	**১১৬	১৬৬½	২০৪	২৯৬১ কোটি টাকা

(* ১৯৪৯-এ সোনার বাটের দাম প্রতি তোলা ২২½ টাকা করে ধরা হয়েছিল।)

(** ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে সোনার মূল্যায়ন বদল করে তোলা প্রতি ৬২½ টাকা অর্থাৎ প্রতি ১০ গ্রামের দাম ৫৩.৫৮ টাকা হিসেবে ধরা হয়েছিল। মনে হয় যে, ওপরের ১৬৬½ কোটি টাকার সোনার দাম সেই ভিত্তিতেই ধরা আছে, যদিও ১৯৬৬-তে টাকার মূল্য হ্রাসের পর থেকে সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ৮৪.৩৯ টাকা ধার্য হয়েছে। ১ তোলা=১১.৬৬ গ্রাম। ২.৪৩ তোলা=১ আউন্স। আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার সরকারী দাম এখন আউন্স প্রতি ৩৫ ডলার অথবা ২৬২½ টাকা।)

অর্থনীতির ছাত্র বাদে এই প্রবন্ধের অন্যান্য পাঠকরা ওপরের পরিসংখ্যানের সূক্ষ্মবিচার নিয়ে শিরঃপীড়ায় না ভুগে আমার নিম্নলিখিত বক্তব্যটা বুঝে দেখুন। এটা আমার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা-প্রসূত একটি কচকচানি বলেও ধরে নিতে পারেন।

আগের প্রবন্ধে আমি কারেন্সি নোটের সংজ্ঞা দিয়েছিলাম সরকারী হ্যান্ডনোট। ওপরের সংখ্যাগুলি থেকে আমরা দেখছি যে কারেন্সি নোট খাতেই আপনার আমার কাছে সরকারের দেনা কত বেড়েছে—১১৮৬ থেকে ৩৩১৮ কোটি টাকা। এর ওপর আবার আছে কিঞ্চিদূর্ধ্বে ৯০০০ কোটি টাকার গভর্নমেন্ট পেপারের (চলতি কথায়, কোম্পানীর কাগজের) বাবদ মেয়াদী দেনা: উপরন্তু ৩১-৩-৬৭ তারিখের হিসাব অনুযায়ী বৈদেশিক ঋণ ছিল ৪৬২৩½ কোটি টাকার, যার মধ্যে ডলারেই ঋণ ছিল ৩১৭৫ কোটি টাকার। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত দেনা আর দেনা। কিন্তু এইটুকুতেই শেষ করে দিলে বোধহয় ভুল হবে।

গোটা ভারতবর্ষকে যদি একটা যৌথ বিনিয়োগ সংস্থা অর্থাৎ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড বলে ধরে নেওয়া যায় তো কী দাঁড়ায়?

১৯৪৯ সালে এই কোম্পানীর বিভিন্ন কারবারের আয়তন ছোট ছিল। সম্পত্তি যেমন কম ছিল শেয়ারও তেমনি কম বেচা ছিল। ১৯৬৮ সালে আরও ঢের বেশি শেয়ার বিক্রি হয়েছে, আর ব্যাংকে ও বাজারে দেনাও বেড়েছে অনেক। কিন্তু কোম্পানীর বিষয় সম্পত্তির দামও অনুপাতে অনেক বেশি হয়ে গেছে। রেলওয়ে সম্প্রসারণ খাতেই তো প্রকাণ্ড বৃদ্ধি ঘটেছে। তারপরে আছে বিরাট বিরাট ইস্পাতের কারখানা, বড়ো বড়ো বিদ্যুতের কারখানা, হেভী এঞ্জিনীয়ারিং খনিজ ও বনজ সম্পদ, তৈল শোধনাগার, স্টীমার সার্ভিস, পরিবহণ সংস্থা, জীবনবীমার ব্যবসা। এমন কি পুস্তক প্রকাশনা ও রাস্তাঘাট আর নদীনালার সংস্কার হয়ে কোম্পানীর ভূসম্পত্তিরও দাম বেড়েছে; আর সবার উপরে আছে এই ভারতবর্ষ-কোম্পানীর জমিদারীর খাজনা আর প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করা নানারকমের জিজিয়া কর। এইবারে যদি ঘরে-বাইরে বিরাট দেনার বিপরীতে এই বিশাল সম্পত্তির হিসেব ধরা যায় তবে এই কোম্পানীর অবস্থা খুব খারাপ কী?

তবে হ্যাঁ, বলতে পারেন যে, ভারতবর্ষ-কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গ সম্পত্তি বাড়াতে গিয়ে নগদের দিকটা ভেবে দেখেননি। 'লিকুইডিটি' মানে নগদ টাকার সংস্থান না থাকাতে এখন বাজার দেনা বাড়িয়ে কাজ চালাচ্ছেন। মহাজন হলাম আমি, আপনি, হ্যারল্ড উইলসন, লিনডন জনসন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

যদি চালু কারবার বা জমিদারী হিসেবে বিশ্বের বাজারে এই ভারতবর্ষ-কোম্পানীকে বিক্রি করা যায় তো এটা ভালো দামেই বিকি হবে। (সেদিন যেমন আমাদের জ্যোতি বসু মশায় দুম করে ট্রাম-কোম্পানীটা কিনে ফেললেন, সেইভাবে এঁরা যদি ভারতীয় রেলকে বেচে দেন তাহলেই ২।৩ হাজার কোটি টাকা পেয়ে যেতে পারেন তো! অথবা, শ' দেড়েক বছর আগে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা যেমন করে ফ্রান্সের কাছ থেকে

লাইসিসআনা অঞ্চলের জমিদারীটা কিনেছিলেন তেমনি একটা বেচাকেনার কথা যদি ভাবা যায়: মানে, ইন্দিরাদি কাশ্মীর বাংলা আসাম আর কচ্ছের কিছু কিছু অংশ খয়রাত করে না দিয়ে যদি নীলামে চড়ান।)

ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামো সম্বন্ধে আমার এই জ্ঞানগর্ভ অ্যানালিসিস মোরারজী ভাইয়ের কানে কেউ তুলে দিলে নেক্সট ফিফটিনথ্ অগস্টে তিনি আমাকে পদ্মভূষণ-টুষণ কিছু একটা করে দিতে পারেন বোধ হয়! অবশ্য আপনারা রেকমেণ্ড করে দিলেই সেটা সম্ভব হয়।

ব্যাংকিং-এর বিষয়ে আপাতত আমার আর বিশেষ কিছু বলার নেই। এত সব বললাম এইজন্যে যে, পৃথিবীতে ব্যক্তি বা সমষ্টির লক্ষ্মীলাভের উপায় হলো প্রথমত ও প্রধানত ব্যাংকের সহায়তা পাওয়া। যে দেশের ব্যাংকিং যতোটা উন্নত সে দেশের সমৃদ্ধিও ততোটা। আপাতত আমাদের কর্তব্য হলো বাঙালীর দুটি ব্যাংককে আরও বড়ো করে তোলা, আর এই ব্যাংকদের দায়িত্ব হলো আগু বাড়িয়ে বাঙালী কৃষক আর বাঙালী শিল্পবাণিজ্যকে পুষ্ট করা। তাহলেই সম্মিলিত চেষ্টায় (তথাকথিত) লক্ষ্মীছাড়া বাঙালীর দুঃখদুর্দশা ঘুচতে পারে।

বিনিয়োগ সংস্থা

শিল্পোৎসাহী বঙ্গবাসী যাতে শিল্প-প্রচেষ্টায় ব্যাংকের সাহায্য ছাড়াও আর্থিক ও বাণিজ্যিক সহায়তা পেতে পারেন সেই জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েকটি সংস্থা গঠন করেছেন; তাঁরা কেউ সরকারী কেউ-বা আধা-সরকারী। তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'কটেজ অ্যাণ্ড স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ' বিভাগের জয়েন্ট ডিরেক্টর (প্ল্যানিং) শ্রীসুনীলকুমার সেনগুপ্ত মশায়ের সঙ্গে এই অধিকার-এর কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা হলো।

সুনীলবাবুর কথার মধ্য থেকে কাজ করবার, দেশের শিল্প ও সম্পদ বাড়িয়ে তোলবার, একটা প্রবল আগ্রহ ফুটে উঠছিল। জানি না, সরকারী অফিসে বসে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা তাঁদের বিভিন্ন পরিকল্পনাকে বাস্তবে ঠিক কতটা রূপ দিতে পেরেছেন বা পারবেন। সাধারণত এই সব সরকারী পরিকল্পনা পর্বতের মূষিক প্রসবের মতো ফল দিয়ে থাকে বলেই এ কথা বললাম।

সুনীলবাবু বললেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্প ও বাণিজ্য খাতে রাজ্য সরকার ৫ কোটি টাকা খরচ মঞ্জুর করেছিলেন। তৃতীয় প্ল্যানে বরাদ্দ হয়েছিল প্রায় ১০ কোটি। কিন্তু এখন তৃতীয় ও চতুর্থের মাঝে এই ছিলজুর

অবস্থায় বরাদ্দের অঙ্ক বছরে ১ কোটিরও ওপরে নয়।

এই বরাদ্দের টাকা যেভাবে নিয়োজিত হয়ে এসেছে তার বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। সরকারী বিবৃতি এবং খবরের কাগজের মাধ্যমে এ বিষয়ে বহুবিধ প্রচার হয়ে চলেছে।

এ যাবৎ যতোটা কাজ হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো State Aid to Industries খাতে ছোট ছোট শিল্পদ্যোগকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ধার দেবার রীতি। এর সাহায্যে অনেক বাঙালী নাকি ক্ষুদ্র শিল্প প্রচেষ্টায় উপকৃত হয়ে এসেছেন। সুনীল-বাবুরা উৎসাহীদের সকলকেই এই সুবিধা দেবার জন্যে উদ্‌গ্রীব। এই ঋণের জন্যে সুদের হারও খুব কম—বার্ষিক ৩% থেকে ৫% মাত্র।

কিন্তু ছোট্ট ছোট শিল্পের মালিকদের, বিশেষ করে মেশিন-শপ ও ফাউন্ড্রীওয়ালা-দের বিশেষ একটি দোষের কথা সুনীলবাবু বললেন। তা হলো যন্ত্র নবীকরণ ও উৎপাদন প্রণালী আধুনিকীকরণে তাঁদের অবহেলা। কাঁচামালের অনটন সত্ত্বেও ১৯৬৫ পর্যন্ত তাঁদের যে সুদিন ছিল সেই সময়ের মধ্যে তা করে নেবার সুযোগ-সুবিধা তাঁদের ছিল। এখন যে তাঁরা অন্ধকার দেখছেন—রেলওয়ে অর্ডারের অভাব ছাড়াও তার আর একটা বিশেষ কারণ এই অতীত অবহেলা।

অথচ, সুনীলবাবু খুব জোর দিয়ে বললেন যে, আমাদের হাওড়ার কামারশালার শ্রমিকদের কারিগরি দক্ষতা নাকি অপূর্ব। তাঁরা আলোবাতাসহীন কারখানায় পুরনো মেশিনে কাজের নানা অসুবিধা সত্ত্বেও যেভাবে খুব সূক্ষ্ম কাজও করে থাকেন তা দেখে বিদেশী পণ্ডিতরাও নাকি অবাক হয়ে যান। তাঁরা বলেন যে, এই দক্ষতা নাকি অতুলনীয়। সুনীলবাবুর মতে এই কারিগরি নিপুণতার সঙ্গে যান্ত্রিক ও উৎপাদনশৈলীর আধুনিকীকরণের সমন্বয় ঘটলে বাংলাদেশ কী-ই না করতে পারতো!

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন

ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীশীতল বসু কমার্শিয়াল ব্যাংকিং থেকে এই নবজাত সরকারী সংস্থায় এসেছেন।

১৯৬৭ সালের গোড়ায় রেজিস্ট্রি হয়ে মাত্র গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই সংস্থা কাজ আরম্ভ করেছে। ব্যাংকিং-এ দীর্ঘ ২৫ বছরের অভিজ্ঞতার ফলে শীতলবাবু ইতি-মধ্যেই অনেকটা এগিয়ে গেছেন; যথেষ্ট কার্যকরী মূলধন হাতে না পেলেও সামান্য যা পুঁজি পেয়েছেন তাই নিয়ে দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব করতে পেরেছেন। এই সংস্থার চেয়ারম্যান হলেন প্রাক্তন আই সি এস, স্বনামধন্য শ্রী ডি এন মজুমদার এবং ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীশরদিন্দু দত্ত মজুমদার আই-এ-এস (স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের চেয়ারম্যান)।

এই মাস আষ্টেকের মধ্যেই সংস্থাটি প্রায় ২২ লক্ষ টাকার দীর্ঘমেয়াদী লগ্নী মঞ্জুর করেছেন এবং বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার কেনাও মঞ্জুর করেছেন ১১ লক্ষ টাকার। এ'রা রিজার্ভ ব্যাংকের অধীনস্থ ন'ন বলে কতকগুলি বিষয়ে গতানুগতিকতা অতিক্রম করতে পেরেছেন। এমন অনেক শিল্পোৎসাহী টেকনিশিয়ান আছেন যাঁদের বিদ্যা আছে যথেষ্ট কিন্তু শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মতো সঙ্গতি নেই। শিল্পোদ্যোগে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে এই সংস্থা সহজ শর্তে আর্থিক সহায়তা করছেন।

সংস্থার অন্যান্য কয়েকটি উদ্দেশ্যের মধ্যে যেটি আমার সবচেয়ে ভালো লাগলো তা হচ্ছে ক্ষুদ্রশিল্পের মাল বিক্রির পরে বিলের টাকার ব্যাপারে সাহায্য করা। এই ছোট ছোট শিল্পপতিদের অর্থবল খুব ক্ষীণ; তাই মাল সাপ্লাই-এর সঙ্গে সঙ্গেই বিলের একটা মোটা অংশ তাঁদের হাতে না এলে তাঁদের কাজ বন্ধ হবার উপক্রম হয়। রিজার্ভ ব্যাংকের কানুন অনুসারে বিল জিনিসটিকে বন্ধকী দলিল বলে গণ্য করা হয় না; কাজেই ব্যাংকরা এই কারবারীদের বিলের ওপর টাকা ধার দিতে পারেন না। শীতলবাবু তাই এখন সেই কার্যকরী মূলধনের ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। আগেই বলেছি যে, তাঁর সংস্থা রিজার্ভ ব্যাংকের আওতায় পড়ে না। তিনি সফল হলে হীনবল ক্ষুদ্র বাঙালী শিল্পের পরম উপকার হবে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিনানশিয়াল করপোরেশন

এই সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীমানস রায়ের প্রকাশিত সুমুদ্রিত একটি পুস্তিকা দেখেই পুরনো এক প্রতিষ্ঠানের পরলোকগত কর্মকর্তার কথা আমার মনে পড়লো। স্বর্গীয় ধীরেন মুখার্জিমশায় হুগলি ব্যাংকের প্রগতি লিপিবদ্ধ করে এই-রকম সুসজ্জিত তথ্যবহুল বই বছরে বছরে বের করতেন, প্রচারের জন্য। (গত সপ্তাহের প্রবন্ধ যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন যে, যে-চারটি বাঙালী ব্যাংক যুক্ত হয়ে ১৯৫০ সালে ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া গঠিত হয়েছিল, হুগলি ব্যাংক তার অন্যতম।) ধীরেন্দ্রনারায়ণের উপযুক্ত শিষ্য মানসবাবু গুরুর এই শিক্ষাটি চমৎকার কাজে লাগিয়েছেন।

১৯৫৪ সালে এই সংস্থাটি গঠিত হয়। প্রসিদ্ধ বাঙালী প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল রাবার ম্যানুফ্যাকচারার্স কোম্পানীর চেয়ারম্যান এবং বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বারের প্রাক্তন সভা-পতি শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায় এখন এই সংস্থার চেয়ারম্যান। বিশিষ্ট বাঙালী শিল্পপতি ও রাজকর্মচারী অলংকৃত ডিরেক্টর বোর্ডে কয়েকজন নামকরা অবাঙালীও আছেন।

নীচে আমি মানসবাবুর সংকলিত এই বইটির বিশেষ কয়েকটা পরিসংখ্যান পেশ করছি:—

(১) সংস্থার কাছে ঋণপ্রাপ্ত মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা...১৭৯।

(২) আরম্ভে তাঁদের যে টাকা ধার দেওয়া হয়েছিল তার অংক...৯ কোটি ১০ লক্ষ।

(৩) এখন ১৬৩টি শিল্পের কাছে বাকী পাওনা...৬ কোটি ৩৫ লক্ষ।

(৪) এই সংস্থা বিভিন্ন যৌথ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনেছেন...৬৮ লক্ষ টাকার।

(৫) যোগ্য শিল্পপতি এই সংস্থার কাছে ঋণের দরখাস্ত করলে তা মঞ্জুর হতে লাগে...*মাত্র ৩ মাস।

(*সরকারী ঋণ পেতে- আবেদনকারীর ২৩ মাসেও তা হয় না।)

(৬) এই সংস্থার কর্তৃপক্ষ খাতকের যোগ্যতা বিচার বিষয়ে এত বিচক্ষণ যে, সময়মতো পার্টির কাছ থেকে পাওনা আদায় হতে থাকে...৯১ পারসেণ্ট।

(৭) আগেও মন্দ ছিল না, কিন্তু মানস-বাবু ভার নেবার পরে সংস্থার বার্ষিক নীট লাভ দাঁড়িয়েছে...১৫½ পারসেণ্ট।

কিন্তু এই গ্রন্থ থেকে যে দুটি বৈশিষ্ট্য আমার দৃষ্টি বিশেষ করে আকর্ষণ করলো তা হচ্ছে, (১) ৯ কোটি টাকা লগ্নী করে এই সংস্থা বাংলা দেশে প্রায় ৪৯ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য উৎপাদনে সহায়তা করেছেন, আর তার চাইতেও বড়ো কথা হলো, (২) সংস্থার সাহায্যপ্রাপ্ত শিল্পে ৩০৬৭২ জনের কর্ম সংস্থান হয়েছে, যার মানে হলো যে প্রায় ১½ লক্ষ মানুষের মুখের ভাত জুটছে।

কতকগুলি কথার মারপ্যাঁচে ডিরেক্টর বোর্ড ও মানসবাবুর যোগ্যতা এবং সংস্থার দেশ সেবার প্রশংসা না করে আমার এই বিশ্লেষণ সম্ভবত আপনাদের মনঃপূত হবে।

উপসংহারে দুটো প্রশ্ন করছি। পশ্চিম-বঙ্গ ফিনানশিয়াল করপোরেশনের কাছ থেকে বাঙালী শিল্পোৎসাহীরা আরও বেশি সহায়তা কেন পাচ্ছেন না? শুনলাম বাংলা দেশের এই সংস্থা থেকে অনুপাতে শতকরা ৫০টি বাঙালী প্রতিষ্ঠান এর সহায়তা

পাচ্ছে। যদি যোগ্যতা বিচারের মাপকাঠিতে সেই অনুপাতের সৃষ্টি হয়ে থাকে তো বিশেষ কিছু বলার থাকে না। কিন্তু শিল্পপতি যে অঞ্চলেরই হোন না কেন, ৩০৬৭২ জন শ্রমিক ও কর্মীর মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা শতকরা ৯৫ হওয়া উচিত। তাই আছে কী?

আর একটি কথা—১১-৪-৬৮ তারিখের স্টেটসম্যান পত্রিকা লোকসভায় আলোচিত 'জাতীয় কয়লা (খনি) উন্নয়ন সংস্থার' পরিচালকবৃন্দের চূড়ান্ত অকর্মন্যতা ও বেহায়াপনার দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন। সেখানে কোটি কোটি টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়ে এসেছে। এমন উদাহরণ বহু সংস্থাতেই দেখা যায়। টাকার যথেচ্ছ অপচয় করতে দেবার কথা আমি নিশ্চয়ই বলবো না, কিন্তু সরকার যখন এইসব অনাচারের মাসুল গুনে দিতে পারছেন, তখন বাঙালীর সৎ প্রচেষ্টাতে কঠিন শর্ত মুক্ত আরও সহায়তা দিন না! শতকরা ২৫ জন যদি সেই সহায়তা পেয়েও অকৃতকার্য হন তো বাকী ৭৫ জনের সফলতায় সেই ক্ষতিপূরণের পরেও সমবেতভাবে বাঙালীর যে লাভই হবে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

বিশ্বকর্মা

আলোয় কালোয়

ত্রিশঙ্কু

সাহিত্যিক বন্ধুদের মতো গড়গড় করে এক নিশ্বাসে সম্পূর্ণটা লিখে ফেলার ক্ষমতা আমার নেই। তা ছাড়া, হাতের লেখা এত খারাপ যে, কাটাকুটি সুদ্ধ খসড়াটা সম্পাদক মশাইয়ের কাছে পাঠানো যায় না। লেখা কপি করতে হয়। একদিন এই রকম একটা লেখা কপি করে খামে ভরতি করে টিকিট লাগিয়ে ঠিকানা লিখে রাত এগারোটা নাগাদ আমার আস্তানার কাছা-কাছি ডাকবাক্সে ফেলতে গেছি। পরদিন সকাল সাতটায় চালান হয়ে যাবে। লাল ডাক-বাক্সটা খুব পরিচিত আমার। তেমন সুস্থ নয়, বাতের রুগীর মতো কোমর একটু পেছন দিকে হেলানো। সামনে দাঁড়ানো মাত্র গার্ডের টুপিটা চোখের সামনে থেকে একটু তুলে ও প্রশ্ন করলো—"এবারেও লেট? প্রত্যেক সপ্তাহে তোমার লেখা পাঠাতে দেরি হয়ে যায় কেন? সবাই তো ঠিক সময়ে চিঠি ডাকে দেয়, তুমিই শুধু শেষ মুহূর্তে মাঝ রাত্তিরে চিঠি ফেলতে আসো। যাঁর কাছে লেখা, এই লাল-নীল পাড় দেওয়া খামটা তিনি পেয়ে প্রত্যেক সপ্তাহে কী গালমন্দ করেন, তুমি জানো না।" ডাকবাক্সটা আমার ভর্ৎসনা করে বললো, "তোমার গাফিলতির জন্যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের দুর্নাম হচ্ছে। এভাবে আর পারবো না। এবার তুমি নিজে গিয়ে জবাবদিহি করো। এসো, খামটার পেছন পেছন তুমি নিজেও এসে ঢুকে পড়ো!"

বকুনি খেয়ে বিষম মুশকিলে পড়লাম। কিন্তু কীই বা করা যায়! সাদা চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে সামনের দিকটা প্রায় খামের মতো বন্ধ করে ঢুকে গেলাম বাক্সটার মধ্যে। তখন রাত এগারোটা বেজে গেছে।

ডাকবাক্সটার পেটের মধ্যে বেশ আবহাওয়ার, আরাম, নাতিশীতোষ্ণ। সারা রাত একগাদা চিঠির সঙ্গে বসে-বসে আড্ডা দিলাম সেখানে। আমরা রাত্রি-যাত্রীদের মতো ওরা বকবক করতে লাগলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা—কে কোথায় যাচ্ছে, কী খবর নিয়ে যাচ্ছে, কখন পৌঁছবে, তার পর কী উত্তর নিয়ে ফিরবে আশা করছে, এইসব মেয়েলি আলোচনা। কয়েকটা সুশ্রী নীল রঙের খাম শুধু চুপটি করে বসেছিল এক পাশে। ওদের লাজুক মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, খুব গোপনীয় বার্তা নিয়ে চলেছে। বড়ো-বড়ো চোখ মেলে ওরা আমাদের কথাবার্তা শুনছিল, নিজেরা যোগ দিচ্ছিল না। আমি নিজেও খুব একটা কথা বলিনি, কারণ আমার তো শুধু জবাবদিহি করতে যাওয়া। দোষীর মতো বসে আছি, অথচ আমার খামটা খুব সোচ্চার; ওদের কাছে চাল মারছিল—'জানো, আমি কলকাতা যাচ্ছি। যেমনি পৌঁছবো অমনি সুবোধ নামের একটা ফর্সা ছেলে আমায় তুলে নেবে। ভাঁজ খুলবে, প্রথম পাতাটা আর শেষ পাতাটা হন্ হন্ করে পড়ে ফেলবে, তারপর দুটো ছবি এঁকে দেবে চটপট। ছবি দুটোর সঙ্গে তার পর আমি চলে যাবো সোজা প্রেসে। কী প্রকাণ্ড প্রেস। চব্বিশ ঘণ্টা সেখানে কাজ হয়। খুব ব্যস্ততা তখন। তিন-চারদিন ধরে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরতে হবে সারা গায়ে কালি-ঝুলি মেখে। তারপর একদিন সেজেগুজে বইয়ের মধ্যে গাঁথা হয়ে বেরুবো। দেশে-দেশে ছড়িয়ে যাবো।' এইসব চালিয়াতী কথাবার্তা ওর অন্য সকলে হাঁ করে শুনছিল ও সরল মনে বিশ্বাস করছিল।

সাতটার একটু পরে বাক্সটার জানলা খুললো কেউ। এক ঝলক আলো ঢুকলো ভেতরে। আমরা নড়ে-চড়ে বসলাম। একটা লম্বা হাত ভেতরে ঢুকে মুঠোয় ভরতি করে আমাদের সবাইকে একটা থলের মধ্যে পুরলো। খালি বাক্সটায় তারপর তালা লাগিয়ে দিল। যাবার সময় কোমর-ভাঙা

প্রথম পাতাটা আর শেষ পাতাটা.

বাক্সটা আবার টুপি তুলে বললো, "বুঝিয়ে বলো ত্রিশঙ্কু, তোমার নিজেরই দোষ হয়, আমাদের কোনো দোষ থাকে না।" বুড়ো মানুষরা এত বিবেকদংশনে ভোগে!

ভ্রমণে বেরিয়ে আমার বেশ মজা লাগছিল। এই সুযোগে চুপি চুপি কলকাতা বেড়ানো হয়ে যাবে তো। কিন্তু মুশকিল বাধলো ডাক-তারখানায় গিয়ে। প্রত্যেককে সেখানে পুঙ্খানুপুঙ্খ করে ফেললো, পেশেন্ট-এর মতো উলটে পালটে বুক পেট টিপে পরীক্ষা করতে লাগলো ওরা। একসঙ্গে ঠেলে ওরা কিউ করে সাজিয়ে দিল আমাদের। আমরা এক এক করে এগোতে লাগলাম। চোখের সামনে স্পষ্ট দেখলাম আমার সহযাত্রীরা কেমন লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেল গেট দিয়ে। ওদের শরীরে ছপাছপ করে চমৎকার গোল উল্কি পড়লো। এমন কি আমার লাল-নীল পাড় দেওয়া খামটাও। ওর অহংকারের শেষ নেই। গেটের মুখে আমি গেলাম আটকে।

শুনতে পেলাম, কে যেন চিৎকার করে বলে উঠলো—"পেয়েছি একটা বিনা টিকিটের যাত্রী।" ঝুঁটি ধরে আমায় শূন্যে তুলে বললো, "সরিয়ে দাও একে। এই লোকটা বেয়ারিং, এই লোকটা বেয়ারিং। জরিমানা সুদ্ধ যাবে এই কয়েদীটা।"

লুফে নিলো আমাকে আর একটা লোক সঙ্গে সঙ্গে। যেন মজা পেয়েছে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলো আমাকে। তারপর নিজের রসিকতায় ফ্যা-ফ্যা করে হাসতে হাসতে বললো, "কোথায় যাবে? এর পিঠে কোনো ঠিকানাও লেখা নেই। হায় রে, এর কোনো ঠিকানা নেই। বেওয়ারিশ!"

সমস্ত ব্যাপারটাকে যদি রেল স্টেশন ভাবা যায়, তাহলে বলতে হবে, ওরা তারপর আমায় ট্রেন থেকে নামিয়ে দিল ভিখিরির

সমস্ত শরীর চট্‌কে মট্‌কে তছনছ...

মতো। যদি কাস্টমস্‌ ভাবা যায়, তা হলে বলতে হয়, ওরা আমায় মুক্তি দিল না। রেখে দিল ভেতরে। চোরাই চালানকারীর মতো। চাদর মুড়ি দিয়ে চিঠি হয়ে লুকিয়ে ছিলাম, একবারও খেয়াল হয়নি, আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার পিঠে কোনো টিকিট নেই, আমার বুকে কোনো ঠিকানা লেখা নেই। বড়ো অসহায় বোধ করলাম। কাকুতি মিনতি করে জানাবার চেষ্টা করলাম—আমি কলকাতা যাবো, সঙ্গে আমার বন্ধু আছে একজন। আমাকে সেখানে গিয়ে জবাবদিহি করতে হবে। তারপরই ফিরে আসবো। তখন যা ইচ্ছে কোরো তোমরা আমাকে নিয়ে। এখন ছেড়ে দাও।

কে কার কথা শোনে! দুনিয়ায় দুঃখীর কথা শোনে না কেউ, সে তো আপনারা জানেন। মিনতি করতে রয়ে গেলাম, ওরা আমায় ডাক-তারখানা থেকে বেরোতে দিল না। বেয়ারিং করেও কলকাতা পাঠালো না। তার বদলে পাঠালো আর-এক ডাক-তারের জায়গায়।

সেই দিন রাত্রে, যখন আমার সঙ্গী লাল-নীল পাড় দেওয়া খামটা এরোপ্লেনে চড়ে কলকাতা যাচ্ছে ড্যাং-ড্যাং করে, তখন আমি এই শহরেরই এক কোণে পুরনো পচা একগাদা কাগজের মধ্যে বসে ঢুলছি। একটা সম্পূর্ণ রাত কাটাতে হচ্ছে বেওয়ারিশ রিফিউজিদের দলে। ওদের কারো কোনো ঠিকানা নেই। গতরাত্রের কথা ভেবে কান্না পাচ্ছিল আমার।

তার পরদিন দুপুর পর্যন্ত এই রকম এক মুসাফিরখানায় কাটালাম। যেন কোনো একটা দুর্ধর্ষ থানায় আটকা পড়ে গেছি। যেখানে আমার চাদর খুলে ফেললো ওরা, পকেট সার্চ করলো, বুকের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দেখলো, সেখানে কারো নাম-ঠিকানা লেখা আছে কি না। আমার একটা আস্তানা ছাড়া কী আর আছে! সমস্ত শরীর চটকে মটকে তছনছ করে শেষকালে ওরা ঠিক করলো, একে ফেলে দাও জঞ্জালের মধ্যে, কিংবা ফিরিয়ে দাও সেই বেতো ডাকবাক্সটার খোপে। সেখান থেকে যেখানে খুশি চলে যাবে।...

বাক্সটা চিনতে পারলো আমায়, যদিও চেহারার হাল দেখলে চেনার কথা নয়। নিজেরই উদ্বেগ ছিল ওর—"কী ব্যাপার? কলকাতায় গিয়েছিলে তো? বলে এসেছো, তোমাকে যা বলতে বলেছিলাম?"

—"হ্যাঁ, সব কাজ সেরে এসেছি।" মিথ্যে কথা বললাম। ভ্রমণ যে আমার ভাগ্যে নেই, আমার যে জবাবদিহি করার পর্যন্ত উপায় নেই, সে কথা তো একজন প্রতিবেশির কাছে স্বীকার করা যায় না।

বাক্সটা রুগ্ন হলে কী হবে, একটি বাস্তুঘুঘু। একটি ভুশণ্ডীর কাক হয়ে দুনিয়ায় ঢের জিনিস দেখেছে তো। আর কথা না বাড়িয়ে ও বললো, "খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমায় ত্রিশঙ্কু, তুমি বাড়ি যাও।"

এলোমেলো সাদা চাদরটা এবার গায়ে জড়িয়ে নিলাম ভালো করে। বিতাড়িত বরযাত্রীর মতো চুপি-চুপি বাক্সটা থেকে বেরুলাম। হাঁটতে-হাঁটতে এগোলাম আস্তানার দিকে। কল্পনা করার চেষ্টা করলাম, এতক্ষণে আমার সঙ্গী সেই লাল-নীল পাড়দেওয়া বালক খামটা কলকাতার সম্পাদক মশাইয়ের কাছে পৌঁছে গেছে। দু-একটা গালাগাল শুনেছে হয়তো আমার হয়ে। তবু আনন্দে নাচতে-নাচতে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রকাণ্ড আপিসটার এ ঘর থেকে ওঘর। দু-একদিন পরেই সেজেগুজে বইয়ের মধ্যে গাঁথা হয়েও ছড়িয়ে যাবে। আমাকে মনে রাখবে না।

তখন একটু ঈর্ষা হবে, দুঃখ হবে নিশ্চিত। নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করবো—কষ্ট পেয়ো না, এই নিয়ম। স্নেহ নিম্নাভিমুখী, সন্তানমাত্রই অকৃতজ্ঞ।

আঠারো

মে ফ্লাওয়ারের কোণের দিকে ইংরাজী এল হরফের আকারে যে টেবিলখানা পাতা থাকে, যেখানে স্বচ্ছন্দে ছ' সাতজন বসে খেতে পারে, যার ওপর সব সময় রিজার্ভ কার্ড লাগানো থাকে। সেইখানেই প্রতিদিন বসে মোহনচাঁদ। মোহনচাঁদ কোন প্রদেশের লোক তা বোঝবার চেষ্টা করবে শুধু বোকারা; কারণ, ভদ্রলোককে সর্বভারতীয় আখ্যা দেওয়াই সমীচীন।

এক কথায় মোহনচাঁদ একজন বিজনেস্ ম্যাগনেট। সাঁড়াকারের চুম্বক, ব্যবসার লোহা যেখানেই পড়ে থাকুক না কেন মোহনচাঁদ রূপ চুম্বকের কাছে আপনা থেকেই এসে জোটে। ব্যবসা তার রক্তে। হেঁপো বাপের ছেলে যে রকম হাঁপানিতে ভোগে, ব্যবসায়ী মোহনচাঁদের ছেলেরা পেট থেকে পড়েই ব্যবসা করতে শেখে।

বাঙালী ব্যবসা করতে জানে না। শুধু আজকের দিনের কথা নয়, রূপকথার গল্প হাতড়ালে দেখা যাবে রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, কোটালপুত্রের আর এক বন্ধু ছিল সওদাগর পুত্র। কিন্তু সে ছেলেটি কোথায় হারিয়ে গেছে। সওদাগরী অফিসের কেরানী হয়েছে বাঙালী, কিন্তু সওদাগর হতে পারেনি। কর্ণওয়ালিশ সাহেবের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দৌলতে বাঙালী জমিদার হয়ে বসল, নায়েব, গোমস্তা, মোসাহেব, প্রজা আর মেয়েমানুষ নিয়ে বড়লোকমির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল, কিন্তু বিদেশী কুঠিয়ালদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্যবসায় নামল না। বহু দূর থেকে এ কাজের জন্যে এল উমিচাঁদ-জগৎশেঠরা।

কংগ্রেসী রাজত্বে জমিদারি চলে গেল, কিন্তু ব্যবসায়ীদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত আরও পাকা হল। ক্লাইভ স্ট্রীট-এর নাম বদলে রাখা হল নেতাজী সুভাষ রোড, সাহেবের জায়গায় বাঙালী। কিন্তু ওটা শুধু নামেই, ক্লাইভ স্ট্রীটের সঙ্গে বিদায় নিল সওদাগরী অফিসের বিদেশী মালিকরা, কিন্তু সেখানে বাঙালী ঢুকতে পারল না।

সেখানে চেপে বসল মোহনচাঁদের দল। ভারবাহী পশুর মত বাঙালী আগেও যা ছিল এখনও তাই—চিরন্তন কেরানী। তফাতের মধ্যে আগে বোবা ছিল, এখন দু চারটে স্লোগান শিখেছে, হঠাৎ হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমাদের দাবি মানতে হবে।' কার দাবি, কে মানছে!

মোহনচাঁদের ব্যবসা ছড়ানো আছে সারা ভারতবর্ষে। কোন ভাই মাদ্রাজে, কোন ভাই বম্বেতে, কোন ভাই দিল্লী, এমন কি ছেলেরাও কলেজ থেকে বেরিয়ে এক একটা কোম্পানীর দায়িত্ব নেয়। কিন্তু মোহনচাঁদ বছরের বেশির ভাগ দিনই থাকে কলকাতায়। অফিস পাড়ায় সাজানো গোছানো বিরাট অফিস, কিন্তু মোহনচাঁদ সেখানে যায় না, ও বসে থাকে পার্ক স্ট্রীটের এই মে ফ্লাওয়ার রেস্তরাঁয়। রেস্তরাঁর মালিকরা মোহনচাঁদকে খদ্দের হিসেবে পেয়ে গর্ব অনুভব করে। কত ডাক্‌সাইটে ধনী তার সঙ্গে দেখা করতে আসে এখানে। মোহনচাঁদকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, আমি আর ব্যবসা দেখি না, ভাইরা দেখছে, ছেলেরা বড় হচ্ছে, আমি এখন অবসর নিয়েছি।

—তাহলে এখানে কি করেন?

—বসে থাকতে ভাল লাগে, কত লোকজন দেখি, কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে এইখানে ডাকি, খাওয়াই, গল্প করি, এই তো ভাল।

মোহনচাঁদকে রাগতে কেউ দেখেনি, প্রচণ্ড বড়লোক অথচ অমায়িক ব্যবহার। রোজই ওর সঙ্গে দফায় দফায় বহু লোক খায়। মাসের শেষে কত হাজার টাকার চেক দেয়, সে হিসেব তার অফিসের লোকেরাই জানে।

বিকেলে যখন টীন-এজারদের মত্ততা তখনও কিন্তু মোহনচাঁদ বিরক্ত হয় না। কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ছেলে-মেয়েগুলোকে লক্ষ করে। অনেকেই তার মুখ চেনা হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে মনুয়া লাহিড়ীকেও লক্ষ করেছিল বহুজনের মধ্যে তাকে এককভাবে চিনে নেওয়া যায় বলেই। সেই মনুয়াকেই ক'দিন আগে যখন মোহন-চাঁদ দেখল, মডেল হয়ে তারই মিলের শাড়ি পরে প্ল্যাটফরমের ওপর হেঁটে চলে

বেড়াচ্ছে, তখন ম্যানেজারকে নির্দেশ দিয়েছিল মেয়েটি যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে।

—কোথায়?

—মে ফ্লাওয়ারে, মেয়েটিকে আমি ওখানেই দেখেছি।

পরদিনই মনুয়া গিয়ে বসেছিল মোহনচাঁদের টেবিলে।

—আমাকে দেখা করতে বলেছেন?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—কাল ফ্যাশান প্যারেডে দেখলাম।

—আপনি ওখানে গিয়েছিলেন বুঝি?

মোহনচাঁদের ছোট্ট জবাব, যে মিলের শাড়ির প্রদর্শনী ছিল ওটা আমাদের।

এবার মনুয়ার চোখে বিস্ময় ফুটে ওঠে, ও, তাই বুঝি! আপনি তো তা হলে মস্ত বড়লোক, আপনাকে এখানে রোজই দেখি, তখন জানতাম না—

—মডেল হয়েছো কেন?

—টাকা রোজগার করার জন্যে।

—চাকরি করলেই পার।

—পারি, কিন্তু ভাল চাকরি পাব কোথায়?

—কত মাইনে তুমি আশা কর।

মনুয়া কিছু না ভেবেই উত্তর দেয়, অন্তত পাঁচ শ' টাকা।

মোহনচাঁদ হাসে, কি পার?

—তার মানে? বরং জিজ্ঞেস করুন কি পারি না।

—তুমি খুব স্মার্ট।

—সেইজন্যেই তো পাঁচ শ' টাকা চাইছি।

—বেশ, তাই পাবে।

মনুয়া যেন আকাশ থেকে পড়ে, সত্যি আপনি আমায় চাকরি দেবেন?

—নয়ত কি আমি ঠাট্টা করছি!

—আমাকে কি করতে হবে? কোথায় অফিস?

মোহনচাঁদের সহজ উত্তর, যেদিন যা করতে হবে তোমায় বলে দেব। অফিস আপাতত মে ফ্লাওয়ার, হাজিরা সকাল দশটা, লাঞ্চের খরচ আমি দেব। কাজ না থাকলে লাঞ্চের পর ছুটি, আবার কোন কোন দিন হয়ত ডিনার পর্যন্ত থাকতে হতে পারে।

মনুয়া ইচ্ছে করে চোখ দুটো পিট পিট করে, আমি তো ভাবতে পারছি না, এ রকম চাকরি আজকের দিনে পাওয়া সম্ভব।

মোহনচাঁদ তখনও কাজের ফিরিস্তি দিচ্ছে, প্রত্যেক শনিবার আমার সঙ্গে রেসকোর্সে যাবে, আমার পাঁচটা ঘোড়া আছে।

মনুয়া হাততালি দিয়ে ওঠে, উঃ কি থ্রীলিং!

—'বাটার কাপ'-এর নাম শুনেছ, ওটা আমার ঘোড়া।

—আমি কখনও রেসকোর্সে যাইনি।

—এখন থেকে যাবে, কি ভাবে বাজি ধরতে হয় শিখিয়ে দেব। আর যদি বরাত থাকে, কে বলতে পারে, তুমি হয়ত জ্যাকপট জিতে দশ টাকার বদলে লাখ টাকা পেয়ে যাবে।

—আমি আর ভাবতে পারছি না, আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন না তো! কবে থেকে 'জয়েন' করব?

—কাল থেকে। বলেই মোহনচাঁদ গম্ভীর হয়ে যায়, জিজ্ঞেস করে, তুমি নাবালিকা নয় ত?

—কেন, তাতে কি হয়েছে?

—তা হলে অভিভাবকের অনুমতি চাই। নয় ত তোমাকে কাজ দিয়ে আমি বিপদে পড়ে যাব।

প্রথমটা মনুয়া থতমত খেয়ে যায়। বাবা তাকে চাকরি করতে দেবে না সে জানে, পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, ঠিক আছে, অভিভাবকের অনুমতিপত্র আমি নিয়ে আসব।

মোহনচাঁদ আপত্তি তোলে, উঁহু, আমি তাঁর সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলতে চাই।

মনুয়ার মনে হল মুঠোর মধ্যে পেয়েও চাকরিটা ফসকে যাবার যোগাড় হয়েছে। তাই মরিয়া হয়ে মিথ্যে কথা বলল, বেশ, আমার মামাকে আমি নিয়ে আসব।

—তোমার বাবা নেই?

মনুয়া আরও বিপদে পড়ে, চোখ নামিয়ে বলে, আছেন, তবে আমাদের সঙ্গে থাকেন না।

—তোমার মা?

—মা অসুস্থ, তার জন্যেই তো চাকরি করতে চাইছি। যদি বলেন, মার চিঠি নিয়ে আসতে পারি। আর যদি দেখা করতে চান মামাকে নিয়ে আসব। উনিই আমার গার্জেন।

—সেই ভাল।

তখন থেকে মনুয়া আকাশ পাতাল ভেবেছে কিন্তু কাকে মামা বলে খাড়া করবে বুঝে উঠতে পারেনি। ওর বন্ধুবান্ধব সকলেই অল্প বয়েসী, আত্মীয়স্বজনরা

ওকে ভাল চোখে দেখে না, বেশী বয়েসী লোকেদের মনুয়া সচরাচর এড়িয়ে চলে। একমাত্র ব্যতিক্রম অনাদিপ্রসাদ। সেইজন্যেই ফোন করে তাঁকে অনুরোধ করেছিল মনুয়ার গার্জেন হবার জন্যে।

কথামত পরদিন অনাদিপ্রসাদ হাজির হলেন মে ফ্লাওয়ারে। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। তখনও রেস্তরাঁয় ভিড় হয়নি, শুধু মোহনচাঁদের টেবিলে জন চারেক লোক বসে। মনুয়াও ওদের কাছে বসে কাপে কফি ঢালছিল, অনাদিপ্রসাদকে দেখতে পেয়ে খুশিতে ঝলমল করে উঠল। মোহনচাঁদকে বলল, ঐ আমার মামা এসে গেছেন আমি নিয়ে আসছি।

দেখা হতেই অনাদিপ্রসাদের প্রশ্ন, জরুরী তলব কেন, কি হয়েছে?

মনুয়ার চোখে দুষ্টুমিভরা হাসি, সব পরে বলছি, এখন চলুন, এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। বেশি কথা বলতে হবে না, যা জিজ্ঞেস করবে হাঁ বলবেন।

—না বাবা, আমি মিথ্যে কথা বলতে পারব না।

—কিছু বলতে হবে না, আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

মনুয়ার সঙ্গে অনাদিপ্রসাদকে দেখে মোহনচাঁদ হাত তুলে নমস্কার করে, নমস্কার, বসুন। মনুয়া আপনার কথা বলছিল।

অনাদিপ্রসাদ অস্বস্তি বোধ করেন, জানতে ইচ্ছে করে, মনুয়া কি বলছিল; কিন্তু মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে পারেন না।

মনুয়া কিন্তু সপ্রতিভ, বলে, আপনার কথামত ওঁকে ফোন করে আনিয়েছি।

মোহনচাঁদ স্মিত হাসে, মনুয়ার বয়েস কম হলে হবে কি, খুব চালাক। মনে হয়, কাজে ঢুকলে খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি করবে। তবে খাটতে হবে।

অনাদিপ্রসাদ শুধু বলেন, তা তো বটেই।

—আমাদের ফার্মে অনেক মেয়ে কাজ করে, ছেলেদের চাইতে কোন অংশে তারা কম নয়। তাছাড়া কথা শোনে। মনুয়াকে 'ট্রায়াল বেসিসে' তিন মাসের জন্যে এখন আমরা নিচ্ছি পরে চাকরি পাকা হয়ে যাবে। ও নিজেই 'পাঁচ শ' টাকা মাইনে চেয়েছে, আমি তাইতেই রাজী হয়েছি।

একটু থেমে মোহনচাঁদ জিজ্ঞেস করে, আপনার নাম?

অনাদিপ্রসাদ চৌধুরী।

—কোথায় থাকেন?

—বালিগঞ্জে। পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে অনাদিপ্রসাদ মোহনচাঁদের দিকে এগিয়ে দেন।

আর কথা বলার সুযোগ হল না, বয় এসে জানাল, মোহনচাঁদের টেলিফোন এসেছে। উনি উঠে গেলেন।

মনুয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল, অনাদিপ্রসাদকে বলল, চলুন আমরা অন্য টেবিলে গিয়ে বসি।

অনাদিপ্রসাদ কিছুই বুঝতে পারেন না, কই কথাবার্তা তো কিছু হল না।

—ঐ যথেষ্ট হয়েছে, আপনি আসুন তো। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।

অনাদিপ্রসাদ রেস্তরাঁর মাঝামাঝি একটা টেবিলে বসতে যাচ্ছিলেন, মনুয়া বাধা দেয়, এখানে নয়। রোজ রোজ খেয়ে মুখে অরুচি হয়েছে, তার চেয়ে চীনে রেস্তরাঁয় যাওয়া যাক।

মনুয়া ইচ্ছে করেই অনাদিপ্রসাদকে অন্য জায়গায় নিয়ে গেল পাছে মোহনচাঁদ টেলিফোন সেরে ফিরে এসে আরও পাঁচটা প্রশ্ন করে বুঝে ফেলে যে অনাদিপ্রসাদ তার সাজানো মামা।

কেবিনের মধ্যে ঢুকে মনুয়ার উচ্ছ্বাস, মাসে মাসে পাঁচ শ' টাকা মাইনে, কম কথা!

বাবার কাছে আর হাত পাততে হবে না।

অনাদিপ্রসাদ শঙ্কিত হন, তোমার বাবা যদি রেগে যান?

—আমার বয়ে গেল।

—তোমার বয়েস কত?

—'মেজর' হতে আর মাস কয়েক দেরি আছে। তার মধ্যে বাবা এ চাকরির হদিসই পাবে না।

—কাজটা কি?

—কে জানে।

অনাদিপ্রসাদের চিন্তা আরও বাড়ে, তুমি ছোট মেয়ে কিছুই না জেনে শুনে শেষকালে কার পাল্লায় গিয়ে পড়বে।

মনুয়া খিল খিল করে হাসে, সে ভয় নেই, তবে ঐ ভদ্রলোক আমার পাল্লায় পড়তে পারেন।

—কিরকম?

—যেরকম আপনি পড়েছেন।

—সে আবার কি?

—ফোন করলেই আমার কাছে আসেন, আমি কিছু অনুরোধ করলে সেটা রাখেন।

অনাদিপ্রসাদ হাল্কা হবার চেষ্টা করেন, এসব তোমার পাল্লায় পড়ে করি না।

মনুয়ার চোখে পাখির দুষ্টুমি, তা হলে

কেন করেন? আমি যদি সুন্দরী না হতাম তা হলেও করতেন? আমার বয়েস যদি উনিশ-কুড়ি না হত তা হলেও করতেন?

—স্বীকার করছি তোমার সংগে কথায় আমি পেরে উঠব না।

—আর যা স্বীকার করছেন না তা হল—আপনি আমাকে বন্ধু হিসেবে পেতে চান। কারণ আপনার কোন মেয়ে বন্ধু নেই।

অনাদিপ্রসাদ এবার জোরে জোরে হাসেন, এরকম তরুণী বন্ধু নিয়ে ঘুরলে অনেকেই কিন্তু আমার ভাগ্যকে ঈর্ষা করবে।

প্রসংগ পাল্টে মনুয়া হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা আপনি কি বই লেখেন?

—কে বললে?

—সেদিন মে ফ্লাওয়ারে কয়েকজন ছেলে-মেয়ে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছিল, আপনার নামটা শুনে আমার কান ঐ দিকে গেল।

অনাদিপ্রসাদের কৌতূহল জাগে, কি গালাগাল করছিল?

—ওদের মতে আপনি পপুলার রাইটার। কি লেখেন? উপন্যাস? দু' একটা নাম বলুন, আমি পড়বার চেষ্টা করব।

অনাদিপ্রসাদ এড়িয়ে যান, কি দরকার?

—জানেন, আমি আপনাকে একটা প্লট দিতে পারি। একটা মেয়ের গল্প, ছোটবেলা থেকে কত সে ঝামেলা পুইয়েছে, বড় হতে চেয়েছে, কিন্তু বাড়ির বদ্ধ হাওয়ায় ক্রমশ কিরকম তার দম বন্ধ হয়ে এল। একটু বড় হতেই কত পুরুষ মানুষ জুটল। কিন্তু একজনও 'সিনসিয়ার' নয়।

এ ধরনের উচ্ছ্বাস অনাদিপ্রসাদ অনেকের মুখেই শুনেছেন তাই থামিয়ে দিয়ে বললেন, ওগুলো কাগজে নোট করে তোমার সুবিধে মত আমাকে দিও। পড়ে দেখব।

মনুয়া কিন্তু তাতেও নিরুৎসাহ হয় না, গম্ভীর মুখে তার জীবনের কল্পিত ট্রাজেডির বর্ণনা করে যায়।

ওদিকে মে ফ্লাওয়ারে মোহনচাঁদ টেলিফোন সেরে ফিরে এসে মনুয়াকে খুঁজেছিল কিন্তু দেখতে পেল না। একদিক থেকে সে খুশীই হল, অপেক্ষমাণ লোক-গুলির সংগে এই ফাঁকে সে ব্যবসার কথা সেরে নিতে পারবে।

মোহনচাঁদ চেয়ারে বসে কথা আরম্ভ করে, বলুন, কি সেবা করতে পারি।

অন্যরা কৃতার্থ হয়ে হাসে, হেঁ, হেঁ, আপনার ভাই পাঠিয়ে দিয়েছেন, আপনার সংগে কথা বলে সব পাকা করে ফেলতে হবে।

—আমি তো ওসব কাজ আজকাল দেখি না, তবে যা বলছেন তা হতে পারে। নেপালে আমাদের অফিস আছেই, এখানকার বাজার থেকে যদি চাল তুলে নেওয়া যায়, তা হলে [illegible] [illegible] [illegible] কিংবা বিহারের কিষণগঞ্জ দিয়ে ভারতের সীমানা পার করে নেপালে স্টক করা যেতে পারে।

অন্যেরা সায় দেয়, ঠিক তাই, পরে এখানে যখন চাল আক্রা হবে, বাজারে পাওয়া যাবে না, তখন নেপালী চাল বলে আমরা ভারত সরকারকে বিক্রি করব। মোটা প্রফিট্।

—ঠিক আছে ভাই, আমার ভাই-এর সংগেই কথা বলুন। ও যখন নর্থ বেংগলে রয়েছে ঐদিকটা ওই সামলাবে। আমি বলে দেব ওখানকার এম এল এ-র সংগে বন্দোবস্ত করে রাখবে।

অন্যরা সাবধান করে দেয়, নতুন এম এল এ, সুবিধের লোক নয়, ভিতরে খচ্চর। কারুর কথা শোনে না।

মোহনচাঁদ-এর মুখে বিজয়ীর হাসি ফুটে ওঠে, সে যেই হোক আমাদের পোষা মাল।

—কিরকম?

—আরে ভাই ব্যবসা চালাতে গেলে এম এল এ এম পি পুষতে হয়, একেবারে প্রথম থেকে। মনে করুন একটা সিটের জন্য তিন পার্টির তিনজন লোক দাঁড়াল। ইলেকশনের সময় আমরা তিন জনকেই চাঁদা দিই, গাড়ি দিই। এক ভাই যায় কংগ্রেসীর কাছে, আর এক ভাই যায় কংগ্রেস ভেঙে যে নতুন দল করেছে তার কাছে, আবার ম্যানেজারকে পাঠিয়ে দিই ঝান্ডা-ওয়ালাদের কাছে। ফলে যে ইলেকশনে জেতে সেই আমাদের লোক। দরকারের সময় গলায় ফুলটি দিয়ে রাইটার্স বিল্ডিং-এ নিয়ে আসি। আমাদের হয়ে সরকারের কাছে তদবির করার জন্যে। আরে বাবা, এই করেই তো রাজত্ব চলছে।

অন্যরা অবাক হয়ে মোহনচাঁদের কথা শুনছিল, প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলে, সত্যিই, এ না হলে ব্যবসা চলে! কি বুদ্ধি! তা হলে স্যার আপনার পারমিট নিয়ে আমরা চাল মজুত করতে শুরু করে দিই। একেবারে ভেল্কি দেখিয়ে দেব। ক'দিন বাদে নেপালের চাল বলে যখন বাজারে ছাড়ব তাদের ধরবার ক্ষমতা থাকবে না। একই মাল চৌদ্দ করে চক্কর দিয়ে এল।

নিজেদের রসিকতায় তারা নিজেরাই হাসে।

ঠিক এমনি সময় মে ফ্লাওয়ারের অন্য এক কোণ থেকে তীক্ষ্ণ কান্না কণ্ঠ শোনা গেল, ববি কোথায়? কেন তাকে লুকিয়ে রেখেছো?

প্রশ্ন করছে রম্ভা কুমারী, আজ তার রুদ্রমূর্তি।

—আমি ববির কোন খবর রাখি না, ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয় ব্যারিস্টার কে. ডি. র শালী।

—তুমি খুব জান, তুমি ডাকিনী, নিজের বোনকে মেরেছো, কে ডির সর্বনাশ করেছো, এবার ববিটাকে উচ্ছন্নে পাঠাবে।

—শাট্ আপ! বলে মেমসাহেবী কায়দায় কে ডির শালী উঠে পড়ে গটমট করে রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে গেল।

তখনও কিন্তু রম্ভা কুমারী চেঁচাচ্ছে, ববিকে আমি ভালবাসি। তার ক্ষতি হতে আমি দেব না, যেখান থেকে হোক তাকে আমি খুঁজে বার করব।

চেঁচামেচি শুনে ম্যানেজার ছুটে যায় ভদ্রমহিলার কাছে, চাপা গলায় বলে, প্লীজ মিসেস কুমারী, আপনি বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।

—কি করব, আমি কি করব! বলতে বলতে রম্ভা কুমারী চেয়ারের ওপর বসে পড়ে, অস্ফুট স্বরে ডাকে ববি, ববি, ববি।

ঠিক মনে হল, অতি সাধের হরিণশিশু হারিয়ে ভরত মুনি যেন কাতর কণ্ঠে ডাকছেন, আয়, আয়।

অবশ্য ম্যানেজারের বুঝতে বাকি রইল না রম্ভা কুমারী যেহেতু মাতাল সারারাত্রির পর বোধহয় এই সকাল পর্যন্ত অবিরাম মদ খেয়েছে। যার নতুন কিছু পাবার নেই তার শেষ সম্বলও অন্য কেউ ছিনিয়ে নিতে চাইছে, তারই প্রকাশ এই বুক ফাটা কান্নায়, অথচ কেউ তার দাম দেবে না।

(ক্রমশঃ)

ঘরে বাইরে

চার "চ"-এ চমৎকার গৃহসজ্জা

গৃহসজ্জা বিশেষজ্ঞ কেতকী সেন বলেন, চট, চিক, চ্যাটাই আর চাঁচাড়ি ভারতীয় গৃহসজ্জার চমৎকার উপকরণ। কথা হচ্ছিল অল্প খরচে গৃহাভ্যন্তরের সৌন্দর্যসাধন সম্ভব কিনা তাই নিয়ে। কেতকী মনে করেন ভারতীয় আবহাওয়া আর পরিবেশকে সামনে রেখে রুচিসম্পন্ন সজ্জা সামান্য জিনিসেই সম্ভব। গৃহ ও গৃহাভ্যন্তরকে সুন্দর করা বিত্তবানের অধিকারমাত্র নয়। এতদিন অনেকেই মনে করেছেন ঘর সাজানো বিত্তবানের বিলাসিতা এবং অখণ্ড অবসর যাঁদের আছে সেইসব গৃহিণীদের সখের খেয়ালমাত্র। অথচ কিছু রুচি ও রূপসচেতনতা নিয়ে যে কোনও পরিবেশকে অপেক্ষাকৃত সুন্দর করা সম্ভব।

কেতকী সেন লণ্ডনের নর্দার্ন পলি-টেকনিক থেকে ১৯৬৫ সালে শিক্ষা সমাপ্ত করে দেশে ফিরেছেন। স্নাতকোত্তর শিক্ষা কি গ্রহণ করবেন ভাবছিলেন। ছবি আঁকার হাত ছিল। প্রথম চিত্রবিদ্যা চর্চা করবেন মনে করেছিলেন। তারপর ঠিক করলেন সৌন্দর্য-বোধকে একটি ফলিতচর্চায় আনলে কেমন হয়। ১৯৬২ সালে শিল্পীর সার্থক বিকাশের অন্যতম ক্ষেত্র গৃহাভ্যন্তর সজ্জাকে শিক্ষার বিষয় স্থির করে বিদেশে যান। বিদেশের শিক্ষার পর কেতকী সেন মনে করেন প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক সমাজের, প্রত্যেক পরিবেশের গৃহসজ্জা ভিন্ন ভিন্ন রচনা। বিদেশের অধীত বিদ্যাও কার্যকরী ব্যবহারে ভারতীয় পরিস্থিতি হিসাবে পরিবর্তন সাপেক্ষ। বর্তমান ক্ষিপ্রগতি বিপর্যস্ত জীবনের একমাত্র আরাম ও আশ্রয় গৃহ। সে আশ্রয় হবে একান্ত আপন। চিপেণ্ডেল আর বার্নী এ্যান নমুনার আসবাব অথবা মখমল আর ঝাড় লণ্ঠন সেই আপনকরা পরিবেশের অংশ না হয়ে বাধাও হতে পারে। আর পাঁচটা জিনিসের মত গৃহসজ্জাও আপেক্ষিক। তার সবকিছুই সময়ে এবং ক্ষেত্রে সুন্দর অথবা অসুন্দর। এই যে আপেক্ষিক রূপ বা **relative** সজ্জা সেখানেই রচয়িত্রীর কৃতিত্ব। অন্ধ অনুকরণে কৃতিত্ব কোথায়? বাসগৃহের অভ্যন্তর সজ্জা ইংরেজ আমলের আগে আমাদের খুবই অনাড়ম্বর ছিল ধরে নেওয়া যায়। জমিতে আস্তরণ বিছিয়ে আড্ডা জমানো হ'তো, সচ্ছল গৃহে তাকিয়া তক্তপোশ আর ধনীর মখমলের গালিচা দুলিচার খবর আমরা রাখি কিন্তু তারপরই আলমারি এল, দেরাজ এল, চেয়ার, এল টেবিল এল। পোর্তুগীজ কথা আলমারি আর ইংরাজী ড্রয়ার-এর অপভ্রংশ দেরাজ—এসব থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় আসবাবের বহুলতা কোন পথে এসেছে। অথচ ভারতীয় গৃহসজ্জার উপকরণ এককালে ইউরোপকে মাতিয়ে তুলেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে তৈরী বিছানা ঢাকা বা দেয়ালে টাঙাবার কারুকার্য খচিত Wall hanging নাকি পাশ্চাত্য দুনিয়ার দারুণ আভিজাত্য ছিল। ইউরোপীয় শিল্পীর ঘোরতর আপত্তিতে ১৬৮৬ সালে ফ্রান্সে ও ১৭০০ এবং ১৭২০ সালে ইংলণ্ডে পর পর আইন করে আমদানী বন্ধ করবার চেষ্টা চলে। তা সত্ত্বেও বন্ধ হয়নি। আমরা যেমন এখন বিদেশী জিনিসের সন্ধানে সামান্য লুকোচুরি করতে প্রস্তুত, ইউরোপীয় অভিজাত তেমন গোপনে লুকিয়ে চুরিয়ে ভারতীয় সজ্জার চালান আনতো। উপ-করণের আতিশয্য আমাদের রুচি বিরুদ্ধ বলেই বোধ হয় পশ্চিমী দুনিয়ার ঘর সাজানোতেও আমরা আধিক্য বর্জিত ছিলাম। আধিক্য এসেছিল আবার সেই পশ্চিমের পথেই। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়া নমুনা নিয়ে ভারতীয় শিল্পী ছেপে পাঠালো ওক গাছের পাতা আর স্ট্রবেরীর ফল। ওক পাতা আর স্ট্রবেরী তো ভারতীয় শিল্পীর নিজস্ব নয়, তাই হ'লো অল্প

সহজ অনাড়ম্বর গৃহসজ্জার কয়েকটি জিনিস

বিকৃতর বিকৃত। পশ্চিমের অভিজাত হাঁ করে দেখে ভাবলেন এ নেহাৎ নূতন বৈশিষ্ট্য। অবশ্য ভুল জিনিস দিয়ে ভুলিয়ে রাখা কোনদিন চলে না। বিলিতী পাতা ফুলের বিকৃত নমুনা আর রাসায়নিক রং এবং ব্লক ছাপা যেমন আমাদের শিল্পীকে গ্রাস করেছে, বিদেশী রসিক সজ্জনও ক্রমশঃ নকল করায় আগ্রহ হারিয়েছে। বদং গড়ে উঠেছে ভারতীয় ঘরে ঘরে তথাকথিত ইংগবঙ্গ সজ্জা সমন্বয়। আসবাবের বাহুল্য আর অলঙ্কারের আতিশয্য। ধনী গৃহের তো কথাই নেই, মধ্যবিত্ত সংসারের গৃহাভ্যন্তর হলো এক দারুন খিচুড়ি—নানা বিসদৃশ বস্তুর সমাবেশ। সুখের বিষয় সেই হাওয়ার মোড় ঘুরেছে এবং আমরাও আসবাবের পরিকল্পনায় কিছুটা পরিবর্তন আরম্ভ করেছি। সেই পাশ্চাত্য ভাবধারায় কিছুটা নূতনত্ব এসেছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পর। যুদ্ধে বিধ্বস্ত অর্থনীতি ও কৃষ্টি নূতনত্বের সন্ধান পেল জাপানী গৃহসজ্জায়। পশ্চিমের আড়ম্বর আর জাপানী অনাড়ম্বর মিলে নূতন ধারায় সজ্জা সচেতন রসিকজন functional বা কার্যকরী ব্যবহার নিয়ে মেতে উঠলেন। গৃহাভ্যন্তর

সুন্দর করার অলংকরণের চেয়ে আরামের মূল্য বেশী এ কথা তাঁরা স্বীকার করলেন। সঙ্গে এল যন্ত্র যুগের দান—নানা ধরণের গৃহকার্যের যন্ত্র। বিজলীচালিত সুখ-সুবিধার উপকরণ। ঘর সাজানোতে Space বা শূন্য স্থানের কদর হওয়ায় দেওয়ালে ঢোকানো আসবাব আরম্ভ হলো। গৃহ ক্রমশই ছোট থেকে ছোট হতে আরম্ভ করায় ঘরে আর বাইরের সঙ্গে যোগ রাখার চেষ্টার সূত্রপাতও হলো। কাচকে আড়াল হিসাবে ব্যবহার করে স্বল্প পরিসর গৃহাভ্যন্তরে বিস্তৃতির ভাব আনবার ব্যবস্থাও এই সময়ের দান। আমাদের দেশে গৃহসজ্জার নূতন ধারায় ও পশ্চিমের functionalist-এর প্রভাব প্রচুর। ভারতীয় আবহাওয়ায় যতটুকু পরিবর্তন দরকার ততটুকু করে নিয়ে ধারা প্রতিষ্ঠিত হবে এই আশাতেই কেতকী সেন চট চিক ইত্যাদি নিয়ে নানারকম পরীক্ষা চালাচ্ছেন।

চট দিয়ে তৈরী চমৎকার সব ঘরের মেঝের আস্তরণ দেখলাম কেতকীর স্টুডিওতে। সাধারণ, চট, তার উপর রং বেরং-এর পশম দিয়ে ফুল তোলা। কেতকীর কারখানায় তার তলায় লাগানো হয়েছে ফোম রবার। তবে তিনি বললেন অল্প খরচে করতে হলে আর একখানা চট নীচে লাগিয়ে নিলে ভালই হবে। স্বল্প পরিসর কক্ষে একখানা মোটা গালিচার বদলে চটের আস্তরণ ভালই দেখাবে। আস্তরণটি হাল্কা। ইচ্ছা হলে বসবার লম্বাটে চৌকী বা ডিভান-ঢাকা করাও চলে। সবচেয়ে বড় কথা ঘরে বসে নিজে হাতে করলে খরচ খুব কম। ফুলের রং ঘরের বাকি রং-এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে তুললে ঘর সাজানোর বড় এক সমস্যা দূর হবে। চিক আর চাঁচাড়ি দিয়ে তৈরী সব পার্টিশন দেখালেন কেতকী। ফাঁক ফাঁক চিক চাঁচাড়িকে রঙ্গীন সুতোয় তোলা লতা পাতা দিয়ে সাজানো। গৃহাভ্যন্তরে Space-এর ভার রক্ষা করে আড়ালের ব্যবস্থা করতে পারে। একটি পার্টিশন খুব সুন্দর লাগলো। ছেলেদের খেলার যে সস্তা দামে বেতের ঝুমঝুমি পাওয়া যায় তাকে পর পর সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে; আবার তার পরই তিন বা চার লাইন বাঁশের চাঁচাড়ি। এমনি করে বার কয়েক টেনে সুন্দর আড়াল করার ব্যবস্থা হয়েছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে হাওয়া চলাচলের বাধা নেই, ধুলো জমলে জল ধুয়ে দেওয়াও চলে। মাদুরের সৌন্দর্যও সুশীতল মাধুর্যময়। দেওয়ালে লাগালে সুন্দর কোমলতা আসে ঘরে। ঘরের মেঝেতে, তক্তপোষের উপর যেমনভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করলে, অক্ষুন্ন থাকবে বৈশিষ্ট্য। এমনকি ছবিখানা টাঙানোর আগে দেয়ালে মাদুর লাগিয়ে টাঙিয়ে দেখবেন ছবিতে নূতন সৌন্দর্য এসেছে।

গৃহাভ্যন্তর সাজাবার Functional দিকের আর একটি কথা হচ্ছে যেখানে যে জিনিসটি যেমন থাকলে কাজকর্মের সুবিধা হয়, যতদূর সম্ভব তাই থাকা উচিত। রান্নাঘরে বা স্নানের ঘরে হাতের কাছে সহজে পাওয়া যায় এমনভাবে সব কিছু সাজানো থাকবে। অনেক মেয়েরাই এখন বাইরে কাজও করেন। তাড়াহুড়োর সময় হাতের কাছে জিনিস না পেলে দুর্দশার সীমা থাকবে না। কেতকী বলছিলেন, ভারতীয় পুরুষ চিরকাল হাতের কাছে যোগানো জিনিস পেয়ে অভ্যস্ত। যদি স্ত্রী ঠিক তাঁরই মত দশটা পাঁচটা অফিসে খেটে আসেন তাহলে যে যোগানো জিনিস আশা করবেন না তা নয়। কাজেই ঘর সাজাবার সময় তিনিও যেন হাতের কাছে সব পান তাও দেখতে হবে। কর্বুসিয়ে বলেছেন "a house is a machine to live in." বোধ হয় যন্ত্রযুগের যোগ্যই কথা। সে কলকব্জায় আরাম আনন্দ ও সুখ উৎপন্ন হবে। কাজেই দু পয়সা খরচ হলেও সুবিধার ব্যবস্থায় শেষ পর্যন্ত লাভই হয়। সুস্থ সুখী মানুষের কর্মক্ষমতা বাড়ে।

সবার শেষে কথা উঠেছিল গৃহসজ্জা উপজীবিকা হিসাবে ভারতীয় মেয়েদের কতটা উপযুক্ত। কেতকী সেন অবশ্য মনে করেন মেয়েদের, এমনকি বিবাহিতা সংসারী মেয়েদের জন্য গৃহসজ্জা চমৎকার উপ-জীবিকা। নিত্য দশটা পাঁচটা অফিস না করেও কাজের চুক্তি বা ঠিকা হিসাবে কাজ করলে নিজের অবসর মত করতে পারেন। তবে আমাদের দেশে এখনও অভ্যন্তর সজ্জার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি পড়েনি। কেতকী নাকি এক সময় নিজে বড় বড় দোকানে ঘুরে, বিনা পারিশ্রমিকে তাদের দোকান সাজাতে চেয়েছেন। দোকানীরা, অনেকেই প্রস্তাবটি গ্রহণ করেননি। তাঁরা মনে করেন বিক্রীর ব্যাপারে ক্রেতার মনে তাতে কোনই রেখাপাত হবে না। এই মনোভাব ব্যাপক ভাবে থাকলে গৃহাভ্যন্তর সজ্জায়ও একই কথা দাঁড়াবে। বরং আমাদের দেশে ঘরের ভিতরে বিশেষজ্ঞের পরামর্শের সাজ হবে এ কথা ভাবার লোক কম। কাজেই আজকাল যে গৃহসজ্জার পাঠ ব্যবস্থা মেয়েদের জন্য নানা জায়গায় চলছে তার উত্তর কালের ব্যবহারিক ব্যবস্থার কথাও ভাবা দরকার। এক সময় আমাদের দেশে এঞ্জিনিয়ারের অভাব ছিল, আজ তাদের বেকারত্ব দারুন সমস্যা হয়ে উঠেছে। মেয়েদের বেলায়ও উপজীবিকার শিক্ষাগ্রহণ কোনটা কি ভাবে কাজে লাগবে ভেবে নেওয়া দরকার। শিক্ষার্থীর চেয়েও সরকার এবং পরিকল্পনার পন্ডিতদের দায়িত্ব বেশী।

শ্রীমতী

দোকান সাজাবার নমুনা

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

বাহাত্তর

জটাধারী, গোঁফদাড়িহীন, আরক্তচক্ষু, মত্ত পুরুষ যোগোর দিকে তাকায়। তাকায় না তো, যেন আগুনের শলা দিয়ে বেঁধে। রসের ঝোঁকে শরীর একবার টাল খায়। বুকের নেহাই খানিক এগিয়ে আসে। যেন চাপা গলায় গরগরিয়ে ওঠে, 'ক্যানে, জিগেস করতে নাই?'

যোগোর অপলক দৃষ্টি একটুও এদিক-ওদিক হয় না। শুধু তীরের মত একটি শব্দ বেরোয়, 'না।'

'বটে৷?'

জটাধারীর আরক্ত চোখ একবার পাকিয়ে ওঠে। কপালের রেখা কিলবিল করে। তারপরেই চোখ দুটি ছোট হয়ে আসে। চোখের কোণ কুঁচকে যায়। মুখ শক্ত ক্রুদ্ধ দেখায়। চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'ক্যানে গ মা, নতুন ভৈরব পাকড়াও কইরেছ নাকি?'

হে বক্রেশ্বর, এ কী সম্বোধন! এ আবার কেমন প্রশ্ন। কিন্তু দেখ রাঢ়ের খোদাই করা দারু মূর্তি হঠাৎ সজীব হয়ে কেমন দুলে ওঠে। চোখের আগুন মুখে জ্বলে। ঠোঁট দুটি বেঁকে যায় ধনুকের মত। অথচ ঘাড় বাঁকিয়ে বড় যেন মিষ্টি সুরে, সুর করে বলে 'হুঁ' গ বাবা বেহ্মানন্দ অবধূত, সি খবরটো জান নাই?'

বলতে বলতে যোগো পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে আমার দিকে। কিন্তু চোখ সরায় না অবধূতের দিক থেকে। বলে, 'তবে ভৈরব লয় গ অবধূত। তোমার মতন মালা লিয়ে ই লোক ত টপো টপো জপ কইরতে জানে নাই, সাধন ভজনও শিখে নাই। উটি আমারও খেয়া ধরে বেইছে। ইটো আমার লাগর গ, লাগর! দেইখছ না, কেমন চেহারা জামাকাপড়-! এখন আমি উয়ার লাগরী।'

'খপরদার।'

মানুষ তো না বাঘের গর্জন বাজে। যেন কুটিরও কেঁপে ওঠে। খাঁচার অজগরও গর্জন শুনে জিব গুটিয়ে নেয়। আর আমার কী অবস্থা। কোথা হে বিপদঘ্ন, শ্রীমধুসূদন, গোপীদাস বাউল, তোমার চিতে বাবাজীকে রক্ষা করো এসে। ভৈরব ভৈরবীর পাল্লায় পড়ে বক্রেশ্বরেই বুঝি প্রাণটা যায়।

কিন্তু ওদিকে যেমন বাঘের গর্জন, এদিকে তার কিছুই না। ধনুকের ছিলায় আরো জোর টান যোগোর ঠোঁটের তীক্ষ্ণ বাঁকে নিষ্ঠুর বিদ্রূপের ঝিলিক। ঘাড় আরো কাত হয়ে পড়ে। ভৈরবী যোগিনীর ঘোমটা খসে যায়। বুকের কাপড় আরো নেমে আসে। রক্তিম বক্ষদেশে রুদ্রাক্ষের মালা দোলে। বলে ওঠে, 'আহা হা, অমন চটেন ক্যানে গ, অবধূত! আপনি হলোন সাধক পুরুস্ যোগী মানুস্। আমাকে খবরদার কইরছেন ক্যানে গ বেহ্মানন্দ। আমি কি আপনার মাগী? আমি এখন লাগরী হইয়েছি। দ্যাখেন ক্যানে, কেমন কাঁচা বয়সের লাগর জুইটেছে আমার। আপনার মতন বুড়া লাগর আমার আর ভাল লাগে নাই।'

'কী আমি লাগর? বেহ্মানন্দ অবধূত তোর লাগর? আমার আশ্রমে দাঁড়িয়ে এত বড় কথা? তবে র‍্যা মাগী পাপিষ্টি, তোর বুকের রক্ত আজ খাব।'

হাঁক দিয়েই ব্রহ্মানন্দ অবধূত ছুটে ঘরের এক কোণে যায়। যেদিকে যায় সেদিকেই সেই প্রকাণ্ড অজগরের খাঁচা।

এদিকে চিতে বাবাজীর প্রাণ খাঁচা ছাড়া। এ কেমন সাধক সাধিকা, এ তাদের কেমন সম্বোধন হে! তারপরে আরো ভয়ংকর কথা, বুকের রক্ত খাবে বলছে! তীর্থ ঘোরা, মানুষ দেখার সাধ মিটেছে। আর না। শরীর শক্ত করে দরজার দিকে একবার লক্ষ করি। এত সহজে কারুর লাগর হয়ে প্রাণ দিতে পারব না।

ব্রহ্মানন্দ কোণের অন্ধকারে হাতড়ে হঠাৎ একটা ত্রিশূল বের করে। আমার বুকের মধ্যে ধক করে ওঠে যোগোর দিকে ত্রিশূল তুলে গর্জে ওঠে, 'আজ তোর একদিন আর আমার একদিন। আশ্রমে দাঁড়িয়ে মাগী লাগর লাগরী দেখাল ছে।'

উদ্যত ত্রিশূল মদমত্ত ক্ষ্যাপা ভৈরবের হাতে। ভৈরবীর বুকে এসে এই বুঝি বেঁধে! কিন্তু যার দিকে উদ্যত সেই যোগোর যেন ভ্রূক্ষেপও নেই। সে যেন ভারী সন্ত্রস্ত হয়ে বলে ওঠে, 'ইস্ ইস্,

একেবারে শিবঠাকুরের মতন দেখালছে গ। সম্ভাষণ কইরবেন।' আহা, তা না হবেক ক্যানে, কত বড় সাধক দেইখতে লাইগবে ত? এত এত মদ গাঁজা টাইনতে পারে, কাঁড়ি কাঁড়ি ভৈরবী লিয়ে সাধন ভজন কইরতে পারে, শিবঠাকুরের থেক্যাও বড়। তা দাঁড়িয়ে ক্যানে, মারেন। সেইরে বুকের রক্ত খান।'

সর্বনাশ! যোগো যেমন করে বুক এগিয়ে দাঁড়ায় তার আঁচলটুকুই না খসে। তার ধনুক ঠোঁটের, অপলক চোখের আগুনে দেখে আমারই ভয় করে। ওদিকে ব্রহ্মানন্দের হাতের ত্রিশূলে আরো উঁচুতে ওঠে। চিৎকার ওঠে, 'সাবধান, হুঁশিয়ার চোপা সামাল দে বইলছি। আমার চখের সামনে থেক্যা দূর হ মাগী। কুলটা, ব্যাশ্যা...।'

'সি কী গ অবধূত, আঁ?' জাগরী বইলতে বারণ, আশ্রমে দাঁড়িয়ে কুলটা ব্যাশ্যা বইলছ? ধাম্মিক তুমি, পাপ লাইগবে না?'

যোগোর গলা যেন ক্রমেই খাদে নামে, আরো সরু হয়। কিন্তু তীব্রতা তীক্ষ্ণতা বাড়ে।

ব্রহ্মানন্দ হাঁকড়ে ওঠে, 'না, পাপ লাগে না। ব্যাশ্যাকে ব্যাশ্যা বইলছি। তুই কুলটা, তুই ছিনাল......।'

আহ্, আহ্, আর শুনতে পারি না হে। এর চেয়ে একটা হেস্তনেস্ত ভাল। কিন্তু তার কোন আশা নেই দেখে কোন-রকমে অস্ফুটে উচ্চারণ করি, 'আচ্ছা আমি চলি।'

পা বাড়াবার আগেই যোগো খপ্ করে আমার হাত টেনে ধরে। কিন্তু চোখ আমার দিকে না। জ্বলন্ত দৃষ্টি ব্রহ্মানন্দের দিকেই। কথাও বলে তার সঙ্গেই, 'তাতেই বা আপনার মান যাবেক ক্যানে গ অবধূত। আপনি যে বলেন, ব্যাশ্যা কুলটা ভৈরবী লিয়ে সাধন ভাল হয়? এখন এত গোঁসা ক্যানে?'

'চোপ, চোপ হারামজাদী। যা, দূর হ, দূর হ আমার আশ্রম থেক্যা।'

ত্রিশূলেটা কিন্তু নিক্ষিপ্ত হচ্ছে না। বুকের রক্ত খাওয়ার দৃশ্যটাও ঘটছে না। যোগো তেমনি চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'ক্যানে গ ভৈরব, লতুন ভৈরবী এনো তুইলবে নাকি?'

'হুঁ, তাই তুইলব। তুই দূর হ।'

'তবুরে ব্যা চিতের মড়া! বড় বাড় হইয়েছে তোমার, আঁ?'

বলেই যোগো আমার হাত ছেড়ে দিয়ে আমাকে বলে, 'বাবাজী, ভয় পেয়ো না, একটুক দাঁড়াও। ই কতুত বড় অবধূত হইয়েছে আমি একবার দেখ্যা লিই। মরণ তোর মিনসের নিকুচি কইরেছে, আয়, আয় দেখি কেমন শিবঠাকুর হইয়েছিস্।'

বলেই ছুটে গিয়ে ঘরের আর এক কোণ থেকে সে টেনে বের করে লম্বা একটা বর্শা। ফলায় তার জঙ্ ধরেছে বটে, তেমন করে মারলে এফোঁড় ওফোঁড় করা যায়। সেটা তুলে একেবারে সোজাসুজি ব্রহ্মানন্দের বুকে ঠেকায়। সঙ্গে সঙ্গে অবধূতের ত্রিশূল নামে। শংকিত অথচ ক্রুদ্ধ চিৎকার ওঠে, 'অ্যাই সাবধান, খপরদার বইলছি, অস্তর লিয়ে ছেলেখেলা ভাল নয়।'

'ছেলেখেলা, আঁ?'

যোগোর গলা তেমনি নিচু। কিন্তু মুখ ভয়ংকর। দৃষ্টি খুনীর। কী বিপদ! এখন কি এই হত্যা দেখতে হবে? যোগো তেমনি বলে, 'নিজে তিরশূল লিয়ে আমার বুকের রক্ত খেতে আইসছিলে এখন আমি অস্তর লিয়ে ছেলেখেলা কইরছি? তোমার রক্ত দর্শন কইরব আজ।'

অবধূতের আবার সেই চিৎকার, 'কালামুখ,

থইলাছি আর একটুক্ খোঁচা মাইরলে ঢুক্যো যাবে কিন্তুক।'

'ঢুক্যুক, ঢোকাব বইলেই ধইরেছি। বাটপাড়, মিথ্যুক, ভন্ড! জানি না ভাইবছ, না? কোন্ তোমার ছুঁচো চামচিকে যেইয়ে খবর দিয়েছে, ই ঘরকে লোক এইসেছে। তা-ই তুমি ঘর সামলাতে এইসেছ, না?'

'অ্যাই, অ্যাই দ্যাখ্ গ, ভৈরুবী...!'

ওই শোন, এখন আর ক্রোধ নেই ব্রহ্মানন্দর গলায়। উদ্বিগ্ন মিনতি। বুকে ঠেকানো বর্শার ফলাটা এক হাত দিয়ে চেপে ধরে অবধূত। আবার বলে, 'মরণ লিয়ে খেলা করিস না গ। তোল, তুলে লে।'

'ক্যানে, তুইলব ক্যানে? আমি ব্যাশ্য কুলটা। মাইরবে বল্যে বাবার তিরশূলে লিয়েছ এখন মার দেখি। এলেকাটার ঘরকে যাকে সাধনভজন বুঝাইলছ আজ দু রাত ধইরে সে যোগীর তেজ দেয় নাই, আঁ?'

বাবার ত্রিশূল তো অনেক আগেই নত হয়েছে। অবধূতের তেজ যদি কিছু থেকেও থাকে তবে আপাতত তা গুপ্ত আছে। প্রকাশের কোন লক্ষণ দেখি না। প্রথম দর্শনে যেটুকু দেখা গিয়েছিল সেই তুলনায় ক্ষ্যাপা মহাদেব এখন একেবারে বাবা ভোলানাথ। আর চেয়ে দেখ যোগো ভৈরবীকে বর্শা হাতে খোলা-চুল যোগিনী। লাল পাড় গেরুয়ার এক বেড় আঁচল, উদ্ধত বুকের ওপর থেকে অনেকখানি নেমে গিয়েছে। রোষে নিশ্বাসে দুলছে। চোখ দপ্‌দপে, মুখ ঝকঝকে।

এ মূর্তির নাম কী আমি জানি না। তবু যেন অসুরের বুকে বর্শা বেঁধানো দুর্গা প্রতিমার কথা মনে পড়ে যায়। যোগোর মুখে কিসের দাগ? হয়তো এই কটা মুখখানি পাঁচ সাত বছর আগে খুবই সুন্দর ছিল। এখন তেমন সুন্দর না। সেই অর্থে সুন্দর না, যে অর্থে নারীর লাবণ্য ভাবি। কিন্তু এখন দেখে মনে হচ্ছে আরো কী এক সৌন্দর্য যেন আছে। যে সৌন্দর্য বাস করে মনের গভীরে, শক্তিতে ভক্তিতে আনে তেজে। এখন যেন যোগোর মুখে সেই সৌন্দর্যেরই ঝলক লেগেছে।

দুজনের মাঝখানে পড়ে কোন কথা বলা উচিত কি না বুঝি না। এখন আমি অনেক নির্ভর। স্বয়ং আশ্রয়দাত্রীর হাতে এখন অস্ত্র। ভয়ে ভয়ে বলি, 'বর্শাটা তুলে নিন, আমার বড় অস্বস্তি লাগছে।'

ব্রহ্মানন্দ আয়ত চোখে চকিতে একবার আমাকে দেখে নেয়।

তার চোখ থেকে যাল [illegible] যে একেবারে অপসারিত তা মনে হয় না। আমার [illegible] এখনো যেন [illegible] একটু সন্দেহ কুটিল কটাক্ষ হানে।

যোগো আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে, অবধূতের দিকেই চেয়ে বলে, তোমার নাই, জন নাই, চেনা অচেনা নাই যার তার সামনে তুমি আমার বেইজ্জত কইরবে। ক্যানে ই ঘরকে লোক এইসেছে শুন্যে চুপ কইরে থাইকতে পাইরলে না? ভাইবলে বুঝি হাতেরটা পিছলে বেরিয়ে যেইছে তা-ই সামলাতে এইসেছ। ক্যানে, যাকে সাধন ভজন বুঝালছ তাকে লিয়ে থাক না। ইথানে মইরতে ক্যানে? বড় তুমি বেহ্মানন্দ বেহ্মচারি হইয়েছ, না? মরণ তোমার, মুখে আগুন অমন অবধূতের।'

ব্রহ্মানন্দ অবধূত যেন ধ্যানমগ্ন। দৃষ্টি যোগোর দিকে। কিন্তু আগুন নেই। কথাটি নেই। নাকি যোগো দর্শনে একেবারে অবশ হয়ে গেল।

এও যে দেখতে হবে এমন ভাবি নি। কে আমাকে পথে ঘোরায়, পথে চালায়, দিন নির্দেশ করে জানি না। সে যে আমাকে এমন দেখাও দেখাবে ভাবি নি। ভয় গিয়েছে এখন মনের ভিতরে যেন একটা তরঙ্গ দুলে উঠছে।

যোগোর বর্শা নেমে আসে। অবধূত বুকে হাত দিয়ে মুখ নামিয়ে দেখে। যেখানে বর্শার ডগা ঠেকেছিল, সেখানে বারকয়েক আঙুল বোলায়। তার মুখ আবার শক্ত হয়। বোধ হয় একটু লেগেছে। শক্ত হলেও নিষ্ঠুট বর্শা তো! আর যোগো একেবারে আলতো করেও ছুঁইয়ে রাখেনি। রোখের বশে, একটু আধটু খোঁচাও মেরেছিল নিশ্চয়।

অবধূত আর একবার আমার দিকে চায়। তারপরে ত্রিশূলটাকে ছুঁড়ে ফেলে একদিকে। বলে, 'বেশ, আমি চইললাম। তোর মুখ আর আমি দেইখতে চাই না।'

যোগো বর্শাটা মাটিতে ঠেকিয়ে বলে, 'বাঁচি, আমার হাড় জুড়োয়। তোমার মতন অবধূতের সাথে, আমাকে যেন আর না থাইকতে হয়। একদিন যেমন কর্যা এইসেছিলাম, তেমনি কর্যা চইলে যাব। তবু তোমার নষ্টামো ভন্ডামো, উতে আমি থুথু দিই। উতে আমি ন্যাকার করি।'

বাবা, প্রতিবাদের কী তীব্র ভাষা! এর বোধ হয় আর তুলনা হয় না। অবধূত বলে ওঠে, 'তবে মনে রাখিস, আশ্রমে যদি কোন অনাচার করিস, তবে মহাপাতকী হবি, শরীলে পোকা পইড়বে।'

বলে সে দরজার দিকে ফিরতে যায়। যোগো বলে ওঠে, 'যা যা, শকুনের শাপে আবার গরু মরে! তুমি যদি হেথা হোথা

দুশটা ভৈরবী জুটিয়ে সাধনভজনের ব্যাল্যা কইরতে পার, তবে আমিও পারি। করবও তা-ই।'

সম্মানে পশ্চাদপসরণকারী অবধূতের গলায় কেবল একটা তীব্র হুংকার শোনা যায়। সে বেগে ধায় দরজার দিকে। তখনই শোনা যায়, 'জয় গুরু, জয় গুরু! এইসেছ দাদা ব্রহ্মানন্দ! এইসে ইস্তক তোমার খোঁজ কইরাছি।'

কথা ঘরে বা দাওয়ায় না। একেবারে বাইরে, গোপীদাসের সঙ্গে অবধূতের দেখা। সেখানে অবধূতের গলা শোনা যায়, 'অ, তুমি। তুমি কখন এল্যে?'

'এই ত একটুক আগে। সাথে এক বাবাজীকে লিয়ে আইসছি। ছেলেমানুষ, বড় ভাল মানুষ বাবাজী, বক্কেশ্বর দশশন কইরতে এইসেছে। তা ভাইবলাম কী যে, তোমাদিগেও একটুক দশশন কইরবে, ইখানেই দুটো ফুটিয়ে লিয়ে খাওয়া হবে। তা তোমারই পাত্তা নাই। এসে থেকে কুথা?'

সঙ্গে সঙ্গে সেই গর্জন, 'নাঃ, আর ই আশ্রমে লয়। আমাকে কি না বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে মাইরতে আসে?'

'সে কী! কে গ, কে মাইরতে আসে?'

'কে আবার! ইখানে আর আছে কে। অই পাপিষ্ঠি ডাকিনী মাগী।'

অমনি গোপীদাসের গলায় ভিন সুর বাজে, আ ছি ছি অবধূতদাদা, কী বইলছ গ! যোগোদিদিকে গালি পাইড়ছ?'

ঘরের মধ্যে আমি যেমন চুপ করে শুনছিলাম, যোগোও তেমনি শুনছিল। আর বোধ হয় থাকতে পারল না। বর্শাটা নিয়েই বেরিয়ে গেল দুপ দুপ করে। বাইরে থেকে তার গলা শুনতে পাই ফুঁড়ে মাইরতে যেইছি, বেশ কইরছি। মারি নাই, সে তোমার ঠাকুরের দয়া। এখন যাবে, না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ খারাপ কইরবে?'

অবধূতের গলা শোনা যায়, 'অত, অত দেখ, মিছে বইলাছি কি না। কথা শোন একবার।'

যোগোর গলা, 'হুঁ, শুইনবে, আমার কথা শুইনবে। ক্যানে, আমাকে ব্যাশ্যা কুলটা বইলবে না আরো? বল, বল আবার, দ্যাখ ক্যানে কী করি।'

গোপীদাসের গলা 'জয় গুরু, জয় গুরু! অহ; ছি ছি ছি! এমন কথা ভৈরবীকে বইলতে আছে? এইস, এইস গ অবধূত-দাদা রাগারাগি করো না, ঘরকে এইস। দুটো ফুটানো হোক, খেয়ে লিয়ে বসো দুটো সোখ দুঃখের কথা বলি।'

অবধূতের তেড়িয়া হাঁক, 'নাঃ, আর না। উয়ার কাছে আর না। বাবার কাছে যদি ধম্মত ঠিক থাকি, তবে উয়ার জন্যে আমার সাধনভজন আটকে থাইকবে না।'

যোগো বলে, 'অ মা গ, তাই কখনো হয়! এমন ভোলানাথের পায়ে আমার মতন কত ভৈরবী গড়াগড়ি যেইছে। আমার জন্যে কখনো তোমার সাধন ভজন আটকায়?'

গোপীদাস সামাল দেয়, 'চুপ কর গ যোগো দিদি, রাগের কথা ছাড়। এইস ব্রহ্মানন্দদাদা, ঘরে এইস।'

সেখানে জবাব সেই এক, 'নাঃ যাব নাই। তবে, তুমি যদি আমার কাছকে এইসে থাক, ইখানে আর না। চল আমার সাথে চল। তোমার সাথে কে আছে, উয়াকে ডেক্যা লিয়ে এইস।'

সর্বনাশ! ব্রহ্মানন্দ অবধূতের আতি-থেয়তা! এখানে যদি বা একটু মনে মনে ভরসা পাচ্ছি, অবধূত দর্শন করে তার কিছুই পাই না। গোপীদাসের গলা শোনা যায়, 'এসেছি তোমার ঘরে যাব অন্য ঘরে, সেটা কি ভাল দেখায়? তুমি থাইকবে যোগো দিদি থাইকবে কত কথা হবা, তাতেই সোখ। আমার চিতে বাবাজীর মনেও আনন্দ হবে। এইস, ঘরে এইস। ই দ্যাখ, চাল লিয়ে এইসেছি। ঠাকরুন এখনি চাপাবে।'

আবার সেই জবাব, 'নাঃ, ইখানে লয়। চাল লিয়ে এলেকাটার ঘরকে চল। সিখানেই রান্না হবে।'

যোগো যোগ করে দেয়, 'সেথা রাঁইধবার লোকও আছে। যাও ক্যানে গোপীদাদা, তোমাদিগের অবধূতদাদার লতুন ভৈরবীর হাতে আজ একটুক পেসাদ পেইয়ে এইস। আমার হাতে ত অনেকবার হইয়েছে। ইবারে লতুন হাতে হবে।'

গোপীদাসের গলা শোনা যায়, 'অরে লতুনের ঝোঁক নাই গ যোগোদিদি। যা পাই, তা পুরনো হাতে লিয়ে থুয়ে খেতে পাইরলে হয়। তা, আমি বলি অবধূত-দাদা, সিখানে যদি কেউ থাকে, তাকে ডেক্যা লিয়ে এইস ক্যানে। না কী বল গ ঠাকরুন।'

যোগো বলে, 'সি ত পেথম দিন থেক্যা বইলাছি গ। তাকে আমি নিজে বইলাছি, এই আশ্রমে থাইকতে। থাইকবে কেমন কর‍্যা? সাধন ভজন হবো, চক্ষুলজ্জা নাই।?'

অবধূতের গলা শোনা গেল, 'চইললাম। তবে ই মাগীকে বইলে দিও, আমার আশ্রমে যেন কোন অনাচার না হয়।'

যোগোর গলায় আবার ঝাঁজ বাজে, 'আরে যা যা, অমন বেহ্মানন্দ বেহ্মচারী ঢের দেইখেছি।'

'আচ্ছা, তোর বিষ দাঁত...।'

অবধূতের গলা মিলিয়ে যায়। যোগো ডাকে, 'এইস গোপীদাদা, আর দেরী করা চলে না।'

বলতে বলতে সে ঘরে ঢোকে। আমার দিকে চেয়ে একবার হাসে। কিন্তু এ হাসি সে হাসি না। যোগো ভৈরবীর চোখের আগুন এখনো নেবেনি। মুখের রক্ত এখনো নামেনি। তবু যেন কোথায় একটা বিষাদের ছায়া লেগে গিয়েছে। মেঝে থেকে ত্রিশূলে কুড়িয়ে বর্শাসহ এক কোণে রাখতে রাখতে বলে, 'কী চিতে বাবাজী, আক্কেল একেবারে গুড়ুম হয়া গেলছে ত? এমনটি আর দেইখেছ কখনো?'

সে ঘরের মাঝখানে এসে আমার দিকে ফিরে তাকায়। আমিও তার চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম। এখন যোগো ভৈরবীর চোখে চোখ রাখতে ভয় হয় না। এখন তার আরক্ত চোখের ভাব অন্যরকম। বলি, 'না, দেখিনি।'

যোগো একটু হাসে। গায়ের আঁচল টেনে দেয়। এই মুহূর্তে সহসা যেন তাকে গৃহস্থ বধূর মত মনে হয়। শ্মশানের যোগিনী নয়।

ইতিমধ্যে গোপীদাস এসে ঘরে ঢোকে। যোগো তাকে বলে, 'লাও, তোমার চিতে-বাবাজীকে একটুক দ্যাখ গ গোপীদাদা। বেচারী অনেকক্ষণ ধইরে ভূত পেতনীর লড়াই দেইখছে। একবার ত পালাবার জন্যে পা বাড়ালাছিল, আমি ধর‍্যে রাইখাছি।'

এ ব্যাপারে গোপীদাসের তেমন উৎসাহ কৌতূহল দেখা যায় না। সে নিচু হয়ে, চালের পুঁটলি আর তেলের শিশি রাখে। আমার কাছে যা অভাবিত বিচিত্র ঘটনা, তার কাছে হয়তো পুরনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি। বলে, 'বাবাজী পালাবার মানুষ না। ঘরের বাইরে যেইয়ে বইসতে চেয়েছিল হয়ত। এ মানুষ আমার চেনা হইয়েছে ঠাকরুন। এ মানুষ সব ঠাঁই, সবকিছুতে থাইকতে পারে।'

বড় ব্যাজ, বড় ব্যাজ। এ কথা থাকুক। আমি অন্য কথা বলতে যাই। তার আগেই যোগো বলে ওঠে, 'বাব্বা! চিতে বাবাজীকে লিয়ে যে তোমার মন ভোর হইয়ে আছে গ?'

'তা আছে, সিটি বইলব। হাজারবার বইলব। একবার রেখ্যা দ্যাখ ত, এত কথা, এত ঘটনা তবু কেমন মোহন মূর্তিটি লিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।'

যোগো আবার তাও চেয়ে দেখে। কী বিশ্রী! অস্থিধিককারই লাগে প্রায়। আমি জিজ্ঞেস করি, 'আচ্ছা, ওই সাপটা কেন ওখানে?'

যোগো খাঁচার দিকে চেয়ে বলে, 'উটি অবধূতের বাহন।'

বলেই সে তাড়াতাড়ি খাঁচাটার কাছে গিয়ে বসে। খাঁচার গায়ে হাত দেয়। মুখ এগিয়ে নিয়ে যায়। খাঁচার গায়ে তার চুল এলিয়ে পড়ে। তারপরে যেন শিশু আদর করে বলে, 'আহা আমার সোনা, আমার মাণিক, আজ কদিন ধর‍্যে কিছু খেতে দিতে লাইরাছি। ঘরে বাগানে, দুটো ইঁদুরের কল পেতো রেখ্যাছি। তা মরন, ইঁদুরগুলানও চালাক হয়্যা গেলাছে। একটাতেও ঢোকে নাই। আহা, আহা!'...

অবাক হয়ে দেখি, প্রকাণ্ড সরীসৃপের, গোটা মুখখানি, খাঁচার দুই ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে পুরো বেরোয় না। কিন্তু লকলকে সরু চেরা জিভ দিয়ে, যোগোর চুলে মুখে চেটে দেয়। তার যে-চোখটিকে দেখতে পাই, সেটিকে হঠাৎ সাপের চোখ বলে মনে হয় না। যেন, স্নেহার্থী আতুর অপলক নিবিড় কোন চোখ। তবু আমার গাটা

কেমন সিরসির করতে থাকে। শিরদাঁড়ার কাছে যেন একটা কাঁপুনি লাগে।

গোপীদাস আমার দিকে চেয়ে হাসে। যোগোও আমার দিকে একবার চায়। তারপরে গোপীদাসকে বলে, 'তবু শীতকাল হইলে রক্ষা, খিদেতেষ্টা তেমন নাই। গাসিসিকালে বাছার আমার ভারী কষ্ট। তা মদনা ডোমকে বইলে রেইখেছিলাম। মাঝে মধ্যে ইঁদুর পাখী যা হক, দু একটা ধরো দিয়ে টিয়ে যায়। তিন দিন তার পাত্তাও নাই।'

গোপীদাস বলে, 'তাকে ত আজ দেইখলাম ঘাটে নাইছিল। তবে খুব রস খেইয়েছিল। উদিকে ঘাটেতে বউয়ের সাথেও এক পেস্থ হয়ে গেলছে।'

যোগো বলে, 'অই, শ্মশানের সাধক বল, ডোম বল, সব এক গোত্তর। উয়াদের কোন তফাত নাই।'

বলতে বলতে সে আবার অজগরের দিকে নজর দেয়। খাঁচার ফাঁকে হাত বাড়িয়ে মুণ্ডে বুলিয়ে বলে, 'খাবার পেইলেই দেব বাবা, এখন একটু কুণ্ডলী হইয়ে থাক। আমি উঠি।'

বলে সে উঠে চালের পুঁটলি আর তেলের শিশি তুলে নেয়। তারপরে পিছনের দরজার দিকে যেতে গিয়ে আমার দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, 'কী বাবাজী, খুব ঘেন্না কইরছে?'

প্রশ্ন শুনে আমি চমকে উঠি। ঘেন্নার কথা তো একবারও মনে হয়নি। বরং অবাক হয়ে অজগর আদরের বিস্ময়কর ঘটনা দেখছিলাম! বলি, 'না তো। কেন?'

যোগো বলে, 'কইরতে তো পারে। সবার সব জিনিস তো ভাল লাগে না। তবে আমি হাত ধুইয়ে লিব, ভেব নাই।'

বলে সে আমাকে অবাক করে দিয়ে চলে যায়। আরো অবাক লাগে এই ভেবে, কথাটা একেবারে মিথ্যা বলেনি সে। আমার গায়ের মধ্যে যে সিরসিরানি লেগেছিল, তা যে কেবলই ভয়ের, তা বলতে পারি না। ঘৃণা না হোক, চিরসংস্কারে একটা গা পাক দেওয়া ভাব নিশ্চয়ই আছে। হয়তো খাবার সময় এ কথা আমার মনে হত।

গোপীদাস বলে, 'বইস বাবাজী। ভাত ফুটবার এখনো দেরি আছে। ততক্ষণ একটুক গা পেইতে লাও।'

বলে যোগোর উদ্দেশে জিজ্ঞেস করে, 'কই গ ঠাকরুন, সপ্তমী দেবে নাকি?'

'অই মা, ভুইলে যেইছি গ।'

যোগো বাইরে থেকে ঘরে এসে ঘরের বেড়ায় গোঁজা একটা ছোট পুরিয়া এনে দেয়। জিজ্ঞেস করে, 'আর সব সামগ্গির আছে ত?'

'হুঁ হুঁ, সব আছে।'

কিন্তু এই মুহূর্তে যোগোকে যেন আরো অন্যরকম মনে হয়। তার চোখ-মুখের আরক্ত ভাব গিয়েছে। তবে, তার চোখের বর্ণই হয়তো একটু রক্তাভ। কিন্তু তার মুখের ভাবে ইতিমধ্যেই কেমন একটা অন্যমনস্কতা এসে গিয়েছে। সেই সঙ্গে বিষাদের ছায়া। সে আবার পিছনের দাওয়ায় চলে যায়।

গোপীদাস গাঁজার সামগ্রী ঝোলা থেকে বের করে নিয়ে বসে। গাঁজা ডলতে ডলতে কী একটা গানের কলি যেন গুনগুন করে। স্বর শুনি, কথা বুঝতে পারি না।

আমি বলি, 'একটু বাগানে গিয়ে ঘুরব?'

'হুঁ, হুঁ, ঘোর ক্যানে বাবাজী, যেথাতে ইচ্ছা ঘোর। কেউ কিছু বইলবে না।'

আমি পিছনের দরজা দিয়ে দাওয়ায় পা দিই। বাঁ দিকে দেখি কাঠের উনোনে কয়েক খণ্ড কাঠে পিড়পিড়িয়ে আগুন জ্বলছে। তার ওপরে হাঁড়ি চড়ানো হয়ে গিয়েছে। কাছেই পা ছড়িয়ে বসেছে যোগো। তার ছড়ানো পায়ের ওপর কুলোয় রেখে চাল। তার সেই রক্তাভ বক্ষের লজ্জা এখানে নিরিবিলি অবকাশে অনেকখানি খোলা। কিন্তু, তার চোখের কোণে যেন দুটি মুক্তা বসানো। আগুনে চিকচিক করে।

আমার পায়ের শব্দে সহসা মুখ তুলে আমাকে দেখেই ঝটিতি মুখ ফিরিয়ে নেয়। পাশ ফিরে তাড়াতাড়ি চুলার কাঠ উসকে দিতে থাকে। আমিও একটু চমকে অস্বস্তি নিয়ে তাড়াতাড়ি বাগানে নেমে যাই। কিন্তু আমার মনের মধ্যেও একটা বিষাদের ছায়া নেমে আসে। যোগো ভৈরবীর মুখখানি আমার চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

অমন যার দাপট, অমন খোদাই করা দপদপে যার চেহারা, যার চোখের তারায় আগুন জ্বলে, বর্শা নিয়ে দুর্গা প্রতিমার মত পুরুষের বুকের ওপর এলো চুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার চোখের কোণ দুটিও টলটল করে। আশ্চর্য সংসারে বল, সংসারের উপান্তে শ্মশানে বল, গৃহিণী বল ভৈরবী বল, সেই এক মন, এক প্রাণ, সবখানে রাজে। সবখানে বাজে। যত বিচিত্র হেরো সেই এক সুর বাজে।

যোগোর চোখের কোণ কেন টলমল, জানি না। কিন্তু রণচণ্ডী সব না। তারপরেও সেই মূর্তি আছে। দারুণ আগুনের পর যেখানে পায়ে পায়ে জল ঝরে। যেখানে বেদনা বাজে শান্তির মত। বাজে গভীরে নিঃশব্দে, যেন সকল কল্যাণের প্রার্থনায়। অপরের না শুধু নিজেরও।

হঠাৎ শুনতে পাই, 'অই চিন্তে বাবাজী বেড়ালছ ত ভাল কইরছ, আমাকে দুটো শুকনো কাঠ কুড়িয়ে দেবে গ?'

যোগোর গলা শুনে ফিরে দেখি সে আমার দিকে চেয়ে হাসছে। মুখে এখন তার একটি স্নিগ্ধ আভাস। বলি, 'হ্যাঁ, দেব।'

'তবে দাও। কিন্তুক ভেজা কাঠ না, আমার চখ যেন না জ্বলে।'

বলে আবার হাসে।

ক্রমশঃ

একটি [illegible] চিত্র

দিল্লির ডায়েরি

একজন চিত্রকরের সন্ধানে গিয়ে খোঁজ পেলাম শুধু তারই নয়, একটা স্কুলেরও, যা ঠিক সাধারণ স্কুল নয়। আবার ঐ বিদ্যালয়ে দেখলাম চিত্রকরটির কিছু সৃষ্টি, রঙ-তুলি-ক্যানভাস নিয়ে।

শিল্পীর নাম ধীরাজ চৌধুরী। ছবি আঁকায় আছে নেশা, যে নেশা না থাকলে শিল্পী হওয়া যায় না। ধীরাজবাবুরও আছে ঐ নেশা, যাকে আরো সহজ কথায় বলা যায় বাতিক। ওটি একটি অত্যাবশ্যকীয় গুণ, যদি কেউ শিল্পী হতে চায়, তা ছবি-আঁকা হক, গানবাজনা হক, কি গল্প লেখা হক।

অনেক গানের শিক্ষক শেখাতে শেখাতেই জীবন কাটিয়ে দেন, সংগীত শিল্পকে আপনার করার সময় তারা পান না, যেমনি পান না অনেক বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকরা সাহিত্য-বিজ্ঞান ক্ষেত্রে। ব্যতিক্রম আছে, যেমনি ব্যতিক্রম ধীরাজ চৌধুরী, স্থানীয় উইমেনস পলিটেকনিকের চিত্রশিল্প শিক্ষক, বিভাগীয় অধ্যক্ষ।

শিল্পীদের রঙের কণায় কণায় থাকে কী যেন একটা চুলকানি, অব্যক্ত অস্থিরতা। যতক্ষণ সে প্রকাশ না-করতে পারছে ততক্ষণ তার অস্থিরতা ও একটা বেদনার ব্যথা মাথা খুঁড়ে মরে প্রাণে। প্রকাশ তাকে করতেই হবে, কারণ সে শিল্পের ভৃত্য। এবং সেই প্রকাশের ইতি নেই। এমনি প্রকাশমুখী নবীন চিত্রশিল্পী ধীরাজ চৌধুরী।

নিজে ছিলেন চারুশিল্পের ছাত্র কলকাতার আর্ট কলেজে। কিন্তু হোস্টেলে থাকতে থাকতে নিজে থেকে আঁকতে লাগলেন যাকে বলা যায় ব্যবসায়িক চিত্র, কমার্শিয়াল আর্ট। হয়তো তখনই বুঝতে পেরেছিলেন যে, নিষ্ঠুর বাস্তব জগতে চারু-শিল্প (চিত্রে) জীবিকার জন্যে যথেষ্ট হয় না (অন্তত ১০।১২ বৎসর), এবং তাই তার রসশক্তিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে চাই জীবিকা অর্জনের গদ্যময় অরসিক দিক।

শিল্পেরও আছে বিবর্তন। ইনি প্রথম

শিল্পী ধীরাজ চৌধুরী

আরম্ভ করলেন প্রায়-বাস্তব চিত্রাদি, অনেকটা কথার রূপকে রঙের আকৃতিতে রূপ দেওয়া, ইলাস্‌ট্রেটিভ্‌। কয়েক বৎসরে সেই স্তর কাটিয়ে উঠেছেন। বর্তমানের স্তর তার অর্ধ-নির্বাস্তব প্রকাশের। আকৃতির রূপ, মানুষ অথবা অন্য কিছুর, এখনো তুলি থেকে অদৃশ্য হয়নি। যদিও সাধারণ চোখে সেগুলো চট করে দৃশ্যমান নাও হতে পারে।

বললেন, "আমি ধরে রাখতে চাই একটা মুহূর্তকে, ফরম এবং টেক্‌শ্চারে। রঙ অবশ্যই প্রকাশ করে আমার ভাবনাকে।" সাম্প্রতিক অনেক ছবিতেই আছে ম্যুরাল আঙ্গিকের প্রভাব। আশ্চর্যের কথা নয়। ইনি ১৯৫৭ থেকে অনেক একক প্রদর্শনী করেছেন, কিন্তু এখানকার অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস্‌ হলঘরে ইনিই প্রথম করেন ম্যুরাল চিত্রের প্রদর্শনী ১৯৬৩ সনে। পরের বৎসর উত্তর প্রদেশের ললিত কলা আকাদেমি থেকে ম্যুরাল চিত্রের জন্যে পুরস্কার পান।

"আমি ফরম্‌কে সরল থেকে সরলতর করতে চাই। চেষ্টাও করছি। কী জানি কোথায় পৌঁছব", বললেন।

আমি জানালাম : বিপদ ঐ না জানাতেই। সরলকে সরলতম করতে গিয়ে অনেক সরল এমন কাঠিন্যে এসে যায় যে, তাদের নির্বাস্তবের জগৎ হয়ে যায় উন্মাদের কুটিল জগত। তখন শিল্পী আর শিল্পী থাকেন না—হয়ে যান মেকি-দার্শনিক অথবা ক্রাফট্‌সম্যান, হস্ত-শিল্পী। ওদিকে যেতে অচলায়তন নেই। বাসনা থাকলেই যাত্রা শুরু করতে পারেন।

রঙের জগতে ধীরাজবাবুকে আরো হয়তো আবিষ্কার করতে হবে, আরো করতে হবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

কাশ্মীরী গেটের পলিটেকনিকে উনি কমার্শিয়াল আর্ট শেখান মেয়েদের। ইনিই তৈরি করেছেন এই বিভাগটি ধীরে ধীরে এবং অনেক মেয়েই শিখছে, তিন বৎসরের

প্রকৃতি

কোর্সে। যে সমস্ত মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের জীবিকা অর্জনের চাহিদা থাকে তাদের অনেকেই আসে এই পলিটেকনিকে, যদিও বাঙালী মেয়েরা এখনো খুব বেশী নেই।

শুধু ছবি আঁকা নয়, আরো অনেক কিছু আছে। যেমন : লাইব্রেরি বিজ্ঞান, সেক্রেটারির কাজকর্ম, ইলেকট্রনিক্‌স্‌, ইনটেরিয়র ডেকরেশন, স্থপতি-সহকারী। প্রথম দুটো বিষয় ও কমার্শিয়াল আর্টেই আসে অধিকাংশ ছাত্রীরা। প্রতি বিষয়েই প্রবেশার্থীর ন্যূনতম শিক্ষা উচ্চমাধ্যমিক পাশ। লাইব্রেরি বিজ্ঞানে গ্র্যাজুয়েটদের বেশী পছন্দ করা হয়।

এটির অধিকর্তা দিল্লি প্রশাসন। স্থাপিত হয়েছে ১৯৬২ সনে। এই বৎসর ছাত্রীসংখ্যা ৩৫০। কোনো হোস্টেল নেই, সুতরাং মেয়েদের বাড়ি থেকে যাতায়াত করতে হয়। নিজেদের বাড়ি পলিটেকনিকের হওয়ার কথা আছে।

ধীরাজবাবুর ছাত্রীদের অনেকে পুরস্কার পেয়েছে প্রতিযোগিতায়। তার নিজের প্রদর্শনী হবে বোম্বাই শহরে মে মাসে ও কলকাতায় জুন মাসে।

খগেন দে সরকার

ট্রামে বাসে

হ্যানয়-আমেরিকান শান্তি বৈঠক সমুদ্রের উপর একটি ডেনমারকের জাহাজে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া সর্বশেষ সংবাদ পাওয়া গেল। এই সংবাদের প্রতিক্রিয়ার কথা বিশুখুড়োকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ছেলেবেলার ছড়া কাটিলেন—"ছাগলছানা লাফিয়ে চলে, জাহাজ ভাসে সাগর জলে।"

কচ্ছ এলাকায় সীমানা চিহ্ন দেওয়া হইতেছে বলিয়া পাক বেতারে খবর দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে আগামী বছর মে নাগাদ সীমানা চিহ্ন দেওয়ার কাজ শেষ হইবে।—"ততদিনের মধ্যে পাকিস্তান নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের 'সীমার মাঝে অসীম তুমি' গানটি সড়গড় করতে পারবেন"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

সংবাদে শুনিলাম, একটি লেডিজ স্পেশাল ট্রামের জন্য মহিলা কনডাক্টর নিয়োগ করা হইবে।—"অতি উত্তম। তবে আমাদের নিবেদন, স্পেশালটি লেডিজ হইলেও উহাতে যেন অন্তত তিনটি জেণ্টেলমেনস সীট থাকে। বহুদিনের সাধ একবার বলি, জেণ্টেলমেনস সীট ছোড় দিজিয়ে"—বলেন সহযাত্রী।

ইংরেজীতে প্রশ্নপত্র বুঝিতে কষ্ট হইলে পরীক্ষা কেন্দ্রের ইন-চারজ তাহা বুঝাইয়া দিবেন। সহযাত্রী বলিলেন—"ভালো হত আরো ভালো হলে অর্থাৎ প্রশ্নের উত্তর দিতে অসুবিধে হলে সেটাও যদি ইনচারজগণ উত্তরটা বলে দেন তাহলে সব ল্যাঠাই চুকে যায় এবং পরীক্ষা ভণ্ডুল আর হয় না!!"

হাওড়া হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গেল, সেখানে কোথায় নাকি চুরি শেখার ইস্কুল স্থাপন করা হইয়াছে।—"এতদিনে 'বড় বিদ্যা'র বিদ্যালয়ের কথা শোনা গেল। কিন্তু উহার শিক্ষণের সময়-কাল, শিক্ষার্থীদের স্টাইপেণ্ডের ব্যবস্থা এবং শিক্ষা শেষে কতদিন কর্তৃপক্ষের হয়ে কাজ করতে হবে ইত্যাদি কোন খবরই সংবাদে নেই। ইস্কুলের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্যই পরবর্তী ঘোষণায় এই সব তথ্য থাকলে ভালো হয়।"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

বিশ লক্ষ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যাহ্ন-জল-খাবার প্রকল্প অর্থাভাবে বানচাল হইয়া যাইবে। আহার্য পরিবেশন পয়লা এপ্রিল হইতে শুরু হওয়ার কথা ছিল।—"পয়লা এপ্রিল তারিখটা দেখে আমরা প্রথমেই বলেছিলাম, ছাত্রছাত্রীরা এপ্রিল ফুল বনবে না ত? কার্যত দেখা গেল, আমাদের আশঙ্কাই ঠিক। সরকারের তারিফ করি, এমন অবাক জলপান আর হয় না।" বলেন বিশুখুড়ো।

পঃ বঙ্গ সরকারের মৎস্য বিভাগ এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলার বেসরকারী পুকুরে বিনা পয়সায় বড় বড় মাছের ডিম ছাড়ার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। সহযাত্রী বলিলেন—"অশ্ব প্রজনন শিল্পের উন্নতির জন্য অশ্বডিম্ব ছাড়ার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করলে খুব ভালো হতো!!"

মালদহ হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ সেখানে এক বিবাহ অনুষ্ঠানে নব-দম্পতি পরস্পরের মধ্যে বেগুন ফুলের মালা বিনিময় করিয়াছেন। সংবাদে বলা হইয়াছে কৃষিকে লোকপ্রিয় করার উদ্দেশ্যেই এই অভিনব পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।—সহযাত্রী বলিলেন—"উত্তম পন্থা। কিন্তু এই সঙ্গে 'অপচয় বন্ধ কর' নীতি জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে নেতৃস্থানীয়দের অভ্যর্থনায় ঘেঁটফুলের মালা দেওয়ার রীতি চালু হলে আরো ভালো হয়!!"

একটি সম্পাদকীয় প্রশ্নঃ দূর দূরান্তের বহু দেশের স্বাধীনতা দাবির সপক্ষে ভারতের তরফ হইতে অনেক কিছু করা হইয়াছে, অথচ ঘরের কাছেই পাখতুনীস্থান, সে দেশটির স্বাধীনতা দাবি সম্পর্কে স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রচেষ্টার সাহায্যে ভারত কিছুই করিবে না কেন? বিশুখুড়োর সংক্ষিপ্ত উত্তরঃ "কারণ গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।"

একটি নির্বাচনী জনসভায় বাম কমিউনিস্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু উগ্রপন্থীদের সমালোচনা করিয়া বলেন—"ওরা নিতান্তই অর্বাচীন।" শ্যামলাল বলিল—"সমালোচনাটি অত্যন্ত রূঢ় হয়েছে। তিনি অর্বাচীন কথাটার বদলে চ্যাংড়া শব্দটা ব্যবহার করলে পারতেন।"

সংবাদে প্রকাশ, নির্ধারিত তারিখে টেলিফোনের বকেয়া টাকা না মেটানোর জন্য টেলিফোন কর্তৃপক্ষ ব্যারাক-পুর মহকুমার চারটি থানার টেলিফোন লাইন কাটিয়া দিয়াছেন। সহযাত্রী সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন—" 'সোনার সংসার'-এ কৌতুক অভিনেতা স্বর্গত সত্য ব্যানারজ্জীর ডায়লগটি মনে পড়ছে—সব্বনাশ হইয়া গেছে গিয়া, কানেকশন কাইট্যা দিছে।"

আনন্দবাজার পত্রিকায় শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'কলকাতায় প্রাইভেট ডিটেকটিভ'-এর এক স্থানে লেখা আছেঃ আমি শুনেছি কলকাতায় এই প্রথম প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি তৈরি হয়েছে। সহযাত্রী বলিলেন—"কলকাতায় কিনা জানি নে, তবে প্রাইভেট ডিটেকটিভ বহু আগে থেকেই ছিল এবং এখনো আছে, হয়ত ফি বাড়িতেই। একটি প্রাচীন কানাকানি বিভাগের খবর মনে করুন—'ও ললিতে চাপ কলিতে একটা কথা শোনসে, রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে মুখপোড়া এক মিনসে'।"

বড়ে গোলাম আলির পরলোকগমনের সংবাদ সম্পর্কে শুনিলাম তিনি শেষের দিকে কলিকাতা থাকিবেন বলিয়াই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তাঁর সেই সাধ পূর্ণ না হওয়ায় নিরাশ হইয়া হায়দ্রাবাদ চলিয়া গেলেন। খুড়ো বলিলেন—"আয়ে না বালাম-এর অনুরাগী শ্রোতারা এই সংবাদ শুনে বিলম্বিত লয়ে আফসোস করবেন এবং নিশ্চয়ই কলকাতার একটি রাস্তার 'বড়ে গোলাম আলি' নামকরণ করবেন, নিদেন বড়ে গোলাম আলি ফুটবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করবেন!!"

সাহিত্য সংবাদ

শেষ হীরো

মহাকাব্যের হাত থেকে গদ্য উপন্যাস যখন উত্তরাধিকার গ্রহণ করলো, তখন উপন্যাসেরও প্রধান অবলম্বন ছিল অসাধারণ কোনো নায়ক-চরিত্র। আজকাল উপন্যাস তার জাত হারিয়েছে, এখন উপন্যাসে শুধু সাধারণ এক-রঙা মানুষের কথা। (ফরাসীদের মতে, কবিতা থেকে নারীও আজ নির্বাসিতা।) সেইসব ধীরোদাত্ত নায়করা আজ কোথায় যাঁরা ছিলেন আত্মশ্লাঘাশূন্য, হর্ষ-শোকে অনভিভূত এবং প্রতিজ্ঞাপালক?

শুধু সাহিত্যে নয়, জীবনেও আজ সেই নায়ক কোথায়? এখন যুগ এসেছে বিশেষজ্ঞদের, যে-কোনো উদ্যমের পিছনেই আছে সমষ্টিগত প্রচেষ্টা। যেমন ধরা যাক ইউরি গ্যাগারিন কিংবা কর্নেল শেপার্ড—যাঁরা ভূবন্ধন ছিঁড়ে মহাশূন্যে পাড়ি দিয়েছেন কিংবা অসীম মহাশূন্যে সাঁতার কেটেছেন—তাঁদের বীরত্ব ও নির্ভীকতার তুলনা নেই সত্যিই, কিন্তু তাঁদের ঠিক নায়কের সম্মান দেওয়া যায় না। কারণ, শত শত বৈজ্ঞানিক মিলে পরিকল্পনা করেছেন, যন্ত্র বানিয়েছেন, ওঁদের প্রতিটি মুহূর্ত মেপে দিয়েছেন, মহাশূন্যে পাঠিয়েও নীচ থেকে টিপেছেন চাবিকাঠি—সুতরাং শেষ পর্যন্ত গ্যাগারিন এবং শেপার্ডকেও যন্ত্রেরই অংশ বলে ভ্রম হয়। ব্যক্তিগত উদ্যম ও দুঃসাহসের প্রয়াস আজকাল সীমায়িত। সাহিত্য থেকে বিতাড়িত হয়ে নায়করা এখন কমিক স্ট্রিপে আশ্রয় নিয়ে অরণ্যদেব হয়ে টিঁকে আছেন।

আমেরিকানদেরও বিশ্বাস ওদের দেশে ও সাহিত্যে আর কোনো "নায়কের" উদ্ভবের সম্ভাবনা নেই। শেষ নায়ক ছিলেন চার্লস লিণ্ডবার্গ। সম্প্রতি লিণ্ডবার্গের একখানি অনবদ্য জীবনী প্রকাশিত হয়েছে, বইটির নাম "দা লাস্ট হীরো—চার্লস এ লিণ্ডবার্গ।" লেখক ওয়াল্টার এস রস।

অনেক বর্ষীয়ান পাঠক হয়তো এখনো লিণ্ডবার্গের সেই বিস্ময়কর অভিযানের কথা মনে করতে পারবেন। উনিশ শ' সাতাশ সালের একুশে মে—লিণ্ডবার্গ একা একটি ক্ষুদ্র বিমানে আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে আমেরিকা থেকে প্যারিসে এসে পৌঁছেছিলেন। বিফোর ক্রাইস্ট বৎসরগুলি যেভাবে গণনা করা হয়, সেই হিসেবে ঐ সময় আমার বয়েস ছিল সাত বছর, তবু সেই অভূতপূর্ব উত্তেজনার কথা আমি অনুমান ও স্মরণ করতে পারি। সেই ঘটনার পর চার্লস লিণ্ডবার্গ ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে বিস্ময়কর পুরুষ, সবচেয়ে বেশী অটোগ্রাফ সই করতে হয়েছে তাঁকে, সবচেয়ে বেশী ফটোগ্রাফ তোলা হয়েছে তাঁর, সবচেয়ে বেশী পূজা ও ভালোবাসা পেয়েছেন জনতার কাছ থেকে।

কলেজ জীবনেই লিণ্ডবার্গ পড়াশুনো ছেড়ে নেব্রাস্কার বিমান শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি হয়ে যান। তাঁর বাবা ছিলেন ওয়াশিংটনে পার্লামেণ্টের একজন প্রগতিশীল এবং স্বতন্ত্র সদস্য। বাবার কাছ থেকে তিনি শিখেছিলেন আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, সততা এবং লোভহীনতা। দুঃসাহস তাঁর নিজস্ব। বেশ কিছুদিন প্লেন চালানো শেখার পর তিনি সেণ্ট লুইস থেকে শিকাগো পর্যন্ত বিমান-ডাক নিয়ে যেতেন। লিণ্ডবার্গের বিশ্বাস ছিল এই যে, বিপজ্জনক অসাধারণ কোনো কাজ কোনো মানুষ যদি অন্তত দশ বছরও করতে পারে (তিনি নিজে দশ বছরের মধ্যে দুর্ঘটনায় মরবেন না—এই ছিল দৃঢ় ধারণা)—তবে তা অন্য যে-কোনো লোকের সারাজীবনের কাজের সমান।

তারপর তিনি নিউ ইয়র্ক থেকে প্যারিস পর্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে প্লেন চালাবার পরিকল্পনা নিলেন। একখানা ছোট মনোপ্লেন—সেখানা তিনি নিজের সুবিধে মতন সাজালেন। লিণ্ডবার্গের শরীর ছ' ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, ১৭০ পাউণ্ড ওজন—সুদর্শন বলশালী যুবা। বিমান থেকে তিনি সমস্ত অতিরিক্ত ভার কমিয়ে ফেললেন, প্যারাস্যুট পর্যন্ত রাখলেন না—এমন কি তাঁর নোটবুকের অতিরিক্ত পাতাগুলো পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলেছিলেন—খাদ্য হিসেবে নিলেন

পাঁচখানা স্যান্ডউইচ আর এক বোতল জল। "আর খাবার লাগবে কেন? যদি প্যারিসে পৌঁছোতে পারি—সেখানেই খাবার পাবো, আর যদি মাঝপথে মরি—তা হলে খাবার কে খাবে?"

১৯২৭-এর মে মাসের ২০ তারিখ সকাল ৭-৫২ মিনিটে তিনি যাত্রা করলেন। সাড়ে তেত্রিশ ঘণ্টা সারা আমেরিকা রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করেছিল। "লিন্ডবার্গ যখন যাত্রা করেছিলেন, তখন তিনি ছিলেন মাটির মানুষ, আকাশ থেকে ফিরলেন দেবতা হয়ে।" (এখন জেট বিমানে নিউ ইয়র্ক থেকে প্যারিস যেতে সময় লাগে—সাড়ে ছ' ঘণ্টা। কিছু দিন পর যে কংকর্ড চালু হবে তাতে সময় লাগবে আড়াই ঘণ্টা মাত্র। তবু সেকালের লিন্ডবার্গের কৃতিত্ব অসাধারণ মনে হয় আজও।)

ফিরে এসেও লিন্ডবার্গ নায়কোচিত ব্যবহার করেছিলেন। প্রচুর প্রশস্তি, সম্মান, সংবর্ধনার ভিড় থেকে বেরুবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, সিনেমা কোম্পানিরা তাঁকে লক্ষ লক্ষ ডলার দিয়ে নায়ক করতে চেয়েছিলেন—তিনি প্রত্যাখ্যান করেন, সরকারী চাকরি, ফাউন্ডেশন গ্রান্ট এসব কিছুই গ্রহণ না করে তিনি ছুটে যান মেক্সিকোতে তাঁর প্রণয়িনীর কাছে। সেই রাষ্ট্রদূত কন্যাকে অবিলম্বে বিবাহ করে দু'জনে আবার বিমানে হানিমুন করতে বেরিয়ে পড়েন।

লিন্ডবার্গের পরবর্তী জীবন কিছুটা বিতর্কমূলক। আমেরিকায় তাঁকে নিয়ে বিরুদ্ধ মত দেখা দেয়। অনুরাগী এবং ভক্তদের জ্বালায়ও তাঁর জীবন অসহ্য হয়ে ওঠে। দলে দলে লোক তাঁর বাড়িঘর বাগান তছনছ করে স্মৃতি চিহ্ন নেবার জন্য ব্যাকুল হয়। এরই মধ্যে তাঁর ছেলে চুরি হয়ে যায়। ছেলে-চোররা শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লেও ছেলেটিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। "আমরা আমেরিকানরা এখনো বর্বর রয়ে গেছি।" এই উক্তি করে সস্ত্রীক লিন্ডবার্গ ইওরোপে চলে যান।

দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে লিন্ডবার্গ প্রচার করতে থাকেন যে, যুদ্ধে আমেরিকার যোগদান করা উচিত নয়। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এই ব্যাপারে তাঁর ওপর অপ্রসন্ন হয়ে ওঠেন। পার্ল হারবার আক্রমণের পর অবশ্য লিন্ডবার্গ বিমানবাহিনীতে যোগ দেন এবং পঞ্চাশবার বিমান আক্রমণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধের পর, প্রায় গ্রেটা গার্বোর মতনই তিনি অদৃশ্য হয়ে যান।

লিন্ডবার্গ এখনো বেঁচে আছেন। তিনি জনতার সামনে আর আসতে চান না। জীবনী লেখক রস বলেছেন, এ বই লেখার ব্যাপারে লিন্ডবার্গ তো কোনো সাহায্য করেনই নি, বরং তিনি বাধা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

কবিতা প্রদর্শনী

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে "আধুনিক কবিতা ও কবিকথা" নামে একটি চমৎকার প্রদর্শনী হয়ে গেল গত সপ্তাহে। সুরুচি ও সুপরিকল্পনার আভায় প্রদর্শনীটি সমুজ্জ্বল।

আধুনিক কালের কবিদের আলোকচিত্র, পাণ্ডুলিপি এবং চিঠিপত্র এখানে সাজানো। এ ছাড়া অনেক বাংলা কবিতার বই ও কবিতা-সাময়িকী। কবিতায় অনুরাগীদের বিশেষভাবে উৎসুক হয়ে ওঠার মতন উপাদান ছিল বহু। দেখার সুযোগ হলো ইওরোপ থেকে সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। কবিতার নামকরণ নিয়ে জীবনানন্দ দাশের অভিমত, আর কারুর কারুর কবিতার পাশে অঙ্কের হিসেব বা আঁকিবুকি খেলা।

আধুনিক কবিতা সম্পর্কে এরকম নিষ্ঠাপূর্ণ কাজ আমাদের আগে চোখে পড়ে নি। কবিতা প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম শুনলেই আতংক জাগে। সংরক্ষণশীলতার ভ্যাপসা গন্ধ আমাদের যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের অসঙ্গে জড়িত। কিন্তু এই প্রদর্শনীতে যাদবপুরের বাংলা বিভাগ যে সহজ, স্বাভাবিক ও মুক্ত দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য ফ্যাকাল্টি ও ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের ধন্যবাদার্হ।

এই প্রসঙ্গে ওঁরা বার করেছেন একটি ছোট পুস্তিকা। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে তারাপদ রায় পর্যন্ত বয়ঃসীমার ১৮ জন কবির সঙ্গে দেখা করে তাঁদের কবিতা ও জীবন সম্পর্কে নানান প্রশ্ন করেছিলেন—তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলি নিয়ে এই পুস্তিকা। পুস্তিকাটি অনুরাগীদের সংগ্রহযোগ্য।

প্রবন্ধ-লেখকদের সম্মেলন

বাংলা দেশের প্রবন্ধ লেখকদের একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করছেন "সাহিত্য ও সংস্কৃতি" পত্রিকা। সম্মেলনের স্থান, দিন বা সূচী এখনও জানানো হয়নি, কিন্তু বাংলা ভাষায় বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও অধ্যাপকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। উদ্যোক্তারা দাবি করেছেন, এ ধরনের সম্মেলন এ দেশে এই প্রথম হবে। এই উপলক্ষে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতাও আয়োজিত হচ্ছে। উৎসাহীদের যোগাযোগ করার ঠিকানা, সম্পাদক, সঞ্জীবকুমার বসু, ১০ হেস্টিংস স্ট্রীট, কলকাতা-১।

সনাতন পাঠক

একটি চিঠি

গত সপ্তাহে সাহিত্য সংবাদের পাতায় যে চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল, সেই পক্ষেই আমার কিছু কথা সবিনয়ে জানাতে চাই। সর্বভারতীয় কবিসম্মেলনে শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিত্ব-মঞ্চে খুবই অসুস্থ ছিলেন, এ আমরা সকলেই দেখে থেকেছি। যে কারণে, তাঁর কথায় শ্রোতাদের আদৌ মনোযোগ ছিল না। এ ছাড়াও তিনি অবশ্যই মঞ্চ থেকে লক্ষ করেছেন, রবীন্দ্রসদনের মতো স্বর্গ-অলিন্দেও দোতলা, তিনতলা প্রায় ফাঁকা। মাত্র সাত-আট জন প্রাণীর উপস্থিতি—যা আমার কাছে খুবই 'দুঃখের বিষয়' মনে হয়েছিল।

আমি শুধু ভাবছিলাম, কাদের জন্যে এই সম্মেলন? এই সভাপতি, এই সম্পাদক, এই লেখকবৃন্দ, যাঁরা মানুষের ভাষাকেই এখনো ঠিকমতো বুঝতে পারেননি, নইলে কেন, হাজার হাজার টাকা ছড়িয়েও, আমরা কেন সকলের সঙ্গে মিলতে পারছি না? কেন? সভাপতি-মান্য, সুধী-সাহিত্যিক ও সদ্য-পুরস্কার প্রাপ্ত মহতী লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমার করুণ জিজ্ঞাসাবাদ ও লজ্জার বিষয় এই। সেই কারণেই আমার মনে হয়, তাঁর সভাপতিত্ব আপাতত অসুখ-কালীন সময়ের জন্যও বন্ধ রাখা উচিত।

শংকর দে
কলকাতা-৬

পুস্তক পরিচয়

ছাত্র সংগ্রামের ইতিহাস

Students Fight for Freedom by **Amarendra Nath Roy**

প্রাপ্তিস্থান—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ৬·০০।

বাংলা দেশের (১৯২৮-১৯৩৪) এই ছয় বৎসরের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস এই পুস্তকে রচিত হইয়াছে। লেখক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় নিজে এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। তিনি এই পুস্তকে অবিভক্ত বাংলার প্রথম শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন (নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি A. B. S. A)--এর আদর্শ, কর্মধারা এবং ১৯৩০-৩৪ সালের সারা ভারতব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন ও অন্যান্য বৈপ্লবিক আন্দোলনে বংলা দেশের ছাত্রদের অবদানের কথা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

যে সকল ছাত্র নেতা এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আজ জীবিত নাই, কয়েকজন ছাত্র নেতা অবশ্য পরবর্তী কালে সমাজ জীবনে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ঘটনার সূত্রপাত চল্লিশ বছর আগে। ১৯২৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী বাংলা দেশের ছাত্র আন্দোলনের পক্ষে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ভারতবর্ষ তখন ইংরাজের অধীনে। ঐ দিন পরাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র পরিবর্তন সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের জন্য বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে সাইমন কমিশনের বোম্বাই বন্দরে আগমন উপলক্ষে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সারা ভারতব্যাপী বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য সারা দিনব্যাপী এক হরতালের ডাক দেওয়া হয়। কলিকাতার ছাত্রসমাজ এই ডাকে সাড়া দিয়া এই হরতালকে সাফল্যমণ্ডিত করে। ঐদিন প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে পিকেটিং করিতে গিয়া ঐ কলেজের ছাত্র ও ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা শ্রীপ্রমোদ ঘোষাল পুলিসের দ্বারা নির্মমভাবে প্রহৃত হন।

এই ঘটনা এবং সাইমন কমিশনের আগমন উপলক্ষে বাংলা দেশের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী কলেজের ছাত্রদের এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করায় আমলাতান্ত্রিক শাসন কর্তাদের মধ্যে এক ভীষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সরকারী ও বেসরকারী কলেজের কর্তৃপক্ষ ছাত্র আন্দোলনকে ধ্বংস করিবার জন্য এক দমন নীতির প্রবর্তন করে। এই দমন নীতির বিরুদ্ধে ছাত্রদের সংগ্রামে যেসব সর্বভারতীয় নেতা সাহায্য ও সহযোগিতা করেন, তাঁহাদের মধ্যে পরলোকগত জওহরলাল নেহরু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নামে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির প্রথম অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন জহরলাল নেহরু। শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুও এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ১৯৩৪ সালে A.B.S.A-এর উদ্যোগে আহূত এক সভায় বক্তৃতা দেওয়ার ফলে জওহরলাল নেহরুকে দুই বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

এই দুই নেতা ছাড়া আর যেসব নেতা ও শিক্ষাবিদ এই আন্দোলনের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে পরলোকগত জে এম সেনগুপ্ত, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ মহম্মদ আলম, ডাঃ আর কুহার্ট, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন ও সি ভি রমণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে ১৯২৮-

১৯৩০ সাল ছিল ছাত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি কালে এবং ১৯৩০—৩৪ ছিল ছাত্র-সংগ্রামের কাল।

১৯৩০ সালে জাতীয় কংগ্রেস ছাত্র ও যুবসমাজকে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য ডাক দেয়। A. B. S. A এই ডাকে সাড়া দেয় এবং মূলত তাহাদের চেষ্টায় বাংলা দেশের ছাত্র সমাজ এই আন্দোলনে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে।

জাতীয় কংগ্রেসের অনুকরণে ছাত্র সংগ্রাম সমিতি গঠিত হয় এবং তাহাদের নেতৃত্বে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়।

১৯৩২ সালের বাংলা সরকারের আদেশে এ বি এস এ ও ছাত্র সংগ্রাম সমিতি বেআইনী ঘোষিত হয়। পরবর্তী কালে জাতীয় কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইলেও এ বি এস এ-এর উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় নাই।

স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ ছাড়াও ছাত্রদের জন্য শিক্ষা শিবির, নৈশ বিদ্যালয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মতিথি পালন ও মাসিক পত্রিকার মারফত ছাত্র-আন্দোলনের প্রচার করাও ছাত্র সমাজের কর্মসূচির মধ্যে ছিল। এ বিষয়ে ছাত্র-নেতাদের দ্বারা পরিচালিত 'ছাত্র' 'India to-Morrow' 'Voice of youth' ও 'ভাবী-কাল'-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

ইহা ছাড়া সর্বভারতীয় এক ছাত্রসমাজ গঠনের প্রচেষ্টাও এ বি এস এ-র নেতৃবৃন্দ করেন। বিদেশে যেসব ভারতীয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আন্দোলন করিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গে যোগ-স্থাপনের একটা চেষ্টা হয়।

বাংলা দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে এ বি এস এ-র বহু নেতা ও কর্মী যুক্ত ছিলেন এবং তাঁহাদের অনেককেই বিনা বিচারে বহুদিন কারারুদ্ধ থাকিতে হয়।

যেসব সর্বভারতীয় নেতা ছাত্রসমাজের আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের কয়েকজনের 'বক্তৃতা' এই পুস্তকে প্রকাশ করা হইয়াছে ও যে-সমস্ত ছাত্রকর্মী ও নেতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ও কারাবরণ করিয়াছেন তাহাদের নামও এই পুস্তকে প্রকাশ করা হইয়াছে।

প্রকৃত পক্ষে পুস্তকখানি শিক্ষা বিভাগের আমলাতান্ত্রিক শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ছাত্রদের সংগ্রাম ও ১৯৩০-৩৪ সালের আন্দোলনে বাংলার ছাত্রদের ভূমিকার একটি পূর্ণ ইতিহাস।

গ্রন্থের প্রারম্ভে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীত্রিগুণা সেনের মুখবন্ধটি উল্লেখযোগ্য।

১৪২।৬৮

পত্রিকা

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার স্মরণী গ্রন্থ। সম্পাদনা ঃ শ্রীরাণা বসু ও শ্রীবিবেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৬।৮এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯।

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগারের দ্বাবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা দিবসের স্মরণে আলোচ্য গ্রন্থখানি সংকলিত। ডঃ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, বিষ্ণু দে, মনীশ ঘটক, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আদিত্য ওহেদার, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, আশা দেবী, কণপ্রভা ভাদুড়ী, ইন্দিরা দেবী প্রমুখের রচনা সম্ভারে গ্রন্থটি সুসমৃদ্ধ। চিন্তাশীল পাঠক এতে বিস্তর মনের খোরাক পাবেন।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার শতবার্ষিকী স্মরণী। সম্পাদক ঃ শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়। যোগীন্দ্রনাথ সরকার শতবার্ষিকী জয়ন্তী সমিতি ঃ

১২০ সি আই টি রোড, কলিকাতা-১৪। মূল্য ৪.০০।

শিশু সাহিত্যের পথিকৃৎ যোগীন্দ্রনাথ সরকারের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপিত হয় '৬৬ সনের অক্টোবর মাসে। এই স্মরণী প্রকাশের সঙ্গে সেই বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হল। এই মূল্যবান স্মারকগ্রন্থে বাঙলা দেশের মনীষী, সাহিত্যিক এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু জ্ঞানীগুণী ও বিজ্ঞজনের রচনার মধ্যে দিয়ে যোগীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব, চরিত্রমাধুর্য এবং সর্বোপরি সাহিত্যে তাঁর অমর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সংক্ষিপ্তভাবে হলেও আলোচনাগুলির সাহায্যে যোগীন্দ্রনাথকে চেনবার এবং তাঁর কীর্তির সম্যক পরিচয় লাভের সুযোগ পাওয়া যায় এই সুসম্পাদিত স্মারক গ্রন্থটিতে।

উত্তরসূরী। অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। শরৎচন্দ্র আলোচনা সংখ্যা। ৯বি-৮ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা-৫০। মূল্য ২.০০।

উত্তরসূরীর আলোচ্য সংখ্যাটিতে মূলত শরৎ সাহিত্যের আলোচনা স্থান পেয়েছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস, গল্প ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন বিশিষ্ট লেখকরা—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, অমিয়ভূষণ মজুমদার, অরবিন্দ পোদ্দার, গুরুদাস ভট্টাচার্য, বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। সম্পাদকীয় রচনা অরুণ ভট্টাচার্যের। শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের এমনই লেখক যাঁর সম্পর্কে মতান্তর না হোক, মূল্যবিচারের হেরফের বরাবরই ঘটেছে। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে ইদানীংকার লেখকরা কি ধারণা পোষণ করেন তার একটা পরিচয় আলোচ্য প্রবন্ধগুলি থেকে পাওয়া যাবে।

প্রাপ্তি স্বীকার

জীবনের আলো (১ম খণ্ড)। শ্রীমতিলাল রায়। প্রবর্তক পাবলিশার্স : ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১.২৫।

সংঘগুরু শ্রীমতিলাল। শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়। প্রবর্তক পাবলিশার্স : ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১.০০।

আজব শহর কোলকাতা। নীরেন সেন। শ্রীসত্যেন সেন : ৩১ শিবচন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রীট, বেলুড়মঠ, হাওড়া। মূল্য ১.৫০।

লিখিনু যে লিপিখানি। বরেন ঘোষাল। অ্যালফা বিটা পাবলিকেশনস : ৯৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা-১৪। মূল্য ২.৫০।

উন্মাদ বৈজ্ঞানিক। জুলস ভার্ণ। অনুবাদঃ অদ্রীশ বর্ধন। অ্যালফা বিটা পাবলিকেশনস : ৯৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা-১৪। মূল্য ৩.৫০।

বিশ্ব লোকসাহিত্যের ধারা। সুশীলকুমার ভট্টাচার্য। শ্রীগুরু লাইব্রেরী : ২০৪ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ৫.০০।

তিন ভুবনের রঙ। সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। চতুষ্পর্ণী প্রকাশনীঃ ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ৫.০০।

দিগ্বলয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র। চতুষ্পর্ণী প্রকাশনী : ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ৬.০০।

আদর জানাই। সম্পাদনা : শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীবিনোদকিশোর গোস্বামী ও শ্রীসুকুমার দাস। মূল্য ৫.০০।

নতুন ফুলের স্বপ্নে। বরুণ মজুমদার। সাত্ত্বিক সাহিত্য সংস্থা : ১২০/১ রামকৃষ্ণপুর লেন, শিবপুর, হাওড়া। মূল্য ২.০০।

মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের সংবাদপত্র। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মৈত্র প্রকাশনীঃ ৯/৭বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ১.৫০।

সুরের ধারা ঝরে। শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য। ২৫/৫ ক্ষেত্র ব্যানার্জি লেন, শিবপুর, হাওড়া। মূল্য ৩.০০।

Poems of the Age. J. C. Acharyya. C.T. 52/4 Rly. Qtr., Babu Line, Gondia, M.S. Price 1.25.

Stone Wares. Editing & Final Draft, Supervision & Guidance: Sukumar Sinha. Manager of Publications: Civil Lines, Delhi. Price 8.50.

আরেক অরণ্য আছে। সন্দীপ সরকার। মনীষা : ৪/৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ২.০০।

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা, কথা ও কাহিনী। শ্রীঅর্চনাপুরী। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন : বরানগর, কলিকাতা-৩৬। মূল্য ৫.০০।

নানান দেশের নানান সমাজ। ডঃ দিলীপ মালাকার। প্রকাশ ভবন : ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১২.০০।

গোয়েন্দা হলেন পরাশর বর্মা। প্রেমেন্দ্র মিত্র। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী : ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ৪.৫০।

শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি। অতীন্দ্রিয় পাঠক। অবায় : ৪২ গড়পার রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ২.০০।

অরণ্যদেব ✲ লী ফক

মাঝ-সমুদ্রে জেট-বিমানের দস্যুদল....
এই যে আমরা!
দেখতে পেয়েছে!
বীপ-বীপ-....
বীপ-বীপ-

অদ্ভুত এদের সংগঠন! জাহাজের মধ্যে ঢুকে দেখতে হবে, আসল ব্যাপারটা কী।

দস্যুরা একে-একে জাহাজে উঠছে....
ঠিক আছে?
ঠিক আছে!

প্লেনের যাত্রীদের কাছ থেকে এসব টাকা পয়সা কেড়ে নিয়েছি। আসল মাল অর্থাৎ হীরে রয়েছে ম্যাকের কাছে।
সমুদ্রের মধ্যে চারটে আলো দেখলুম। তার মধ্যে একটা হঠাৎ নিবে গেল।
সেইটেই ম্যাকের আলো।

ওই তো ম্যাকের ভেলা! কিন্তু ম্যাক তো নেই!
একটা ব্যাগ রয়েছে!
ওটা তুলে আনো!

ম্যাক কি ডুবে গেল?
বিচিত্র নয়!

ওই ব্যাগটার মধ্যেই আছে হীরে!
কী ভাগ্যি যে, ম্যাকের সঙ্গে ব্যাগটাও ডুবে যায়নি!
এই মার্কাটা কিসের?

আরে, এ তো হীরে নয়!
আমাদের ধোঁকা দিয়েছে! ধোঁকা দিয়েছে!

অসম্ভব!
কী ব্যাপার?
@☆***!!

খেলার মাঠে

অধিকাংশের প্রত্যাশামত দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য মেক্সিকো অলিম্পিকের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ মেক্সিকো অলিম্পিকে যোগ দেবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকাকে আমন্ত্রণ করার যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল আই ও সি-র গ্রীনোবলের সভায়, আই ও সি-র লুসানের সভায় সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত বেশী ভোটে অনুমোদিত হয়েছে। শুধু মেক্সিকো অলিম্পিকই নয়, বলা যেতে পারে, অলিম্পিক সংস্থা থেকেই দক্ষিণ আফ্রিকা বাতিল হয়েছে। এবং যেভাবে অনেক জল ঘোলা হওয়ার পর এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হল তাতে মনে হয়, বর্ণ-বিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকা স্বদেশেও তার বর্ণ-বৈষম্যের নীতি পরিহার না করলে অলিম্পিক সংস্থায় ঢুকতে পারবে না।

অস্বীকার করবার উপায় নেই, জনমতের চাপে এবং অলিম্পিক সংস্থায় প্রবেশের আগ্রহে দক্ষিণ আফ্রিকা তার বর্ণ-বৈষম্যের নীতি আংশিক শিথিল করে বিদেশের মাটিতে দেশের কালো আদমীদের নিয়ে এবং সাদা-কালোদের সংগে মিলে-মিশে খেলাধুলা করতে রাজী হয়েছিল। অনেকের হয়তো মনে আছে, উৎকট বর্ণ-বিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্যের এই শিথিল করা নীতিকে আমি ভবিষ্যতের বড় পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছিলাম। এবং মন্তব্য করেছিলাম, এই নীতি পরিবর্তনে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিরও আংশিক জয়। কারণ, যারা চিরদিন কালোদের ঘৃণা করে এসেছে, কালোদের সংগে কোনরকমের সামাজিক সম্পর্ক, এমন কি খেলাধুলা করার সম্পর্কও বজায় রাখেনি তারাও তো শেষ পর্যন্ত বিদেশের মাটিতে কালোদের সংগেই খেলাধুলা করতে চেয়েছে এবং দেশের কালোদেরও প্রতিনিধি হিসাবে নিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার নীতির পরিবর্তন হলেও হৃদয়ের যে পরিবর্তন হয়নি, সাম্প্রতিক ঘটনাই তার প্রমাণ। দক্ষিণ আফ্রিকার অলিম্পিকে অংশ গ্রহণের পক্ষে বিশ্ব জনমত যখন বিরোধী এবং বহু দেশের অলিম্পিক বয়কট করার হুমকি তখনো দক্ষিণ আফ্রিকা স্বদেশে তাদের বর্ণ-বৈষম্য নীতিতেও অটল। শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি শ্রীআভেরি ব্রান্ডেজ, দক্ষিণ আফ্রিকাকে [illegible] ব্যাপারে তাঁর সক্রিয় ভূমিকার [illegible] সত্ত্বেও [illegible] দক্ষিণ

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি শ্রীআভেরি ব্রান্ডেজ সাংবাদিকদের কাছে বলছেন, 'কোন চাপে বা বয়কটের ভয়ে নয়, মেক্সিকোতে দক্ষিণ আফ্রিকার নিরাপত্তার অভাববোধে আমরা আমন্ত্রণ প্রত্যাহারের সুপারিশ করেছি'

আফ্রিকায় উড়ে গিয়ে সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি। দক্ষিণ আফ্রিকার অলিম্পিক কমিটির তরফ থেকে মেক্সিকো অলিম্পিকে যোগদানের জন্য সাদা-কালো প্রতিযোগীদের নিয়ে গড়া একটি তালিকা ব্রান্ডেজের হাতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু স্বদেশে তারা বৈষম্য নীতিতে অবিচলই ছিল।

ওখানেই সমস্যা। ভাঙ্গবে তবু মচকাবে না। বিশ্ব-আসরে মিশব কিন্তু বিশ্ব-মানবকে না মেনে। এ নীতি আর কত দিন চলবে? একলা চলার নীতিতে যদি অটল থাকতে হয় তবে বিশ্ব-আসরে মেশারই বা আগ্রহ কেন?

যদিও বলা হয়েছে, লুসানের সভায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে বর্জন করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত এবং ভোটের ফলাফলে আই ও সি-র সিদ্ধান্ত অনুমোদিত তবু এ কথা অস্পষ্ট নয় যে, বর্ণ-বিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার এখনো অনেক সমর্থক আছে। স্বয়ং আভেরি ব্রান্ডেজও তাঁদের জন্য কম ওকালতি করেন নি। এ কথাও স্পষ্ট, অলিম্পিক শিবির দক্ষিণ আফ্রিকার প্রশ্নে আজ দ্বিধাবিভক্ত এবং ব্রান্ডেজের উচ্চাসনও টলটলায়মান।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অলিম্পিক আদর্শের প্রধান পুরোহিত আভেরি ব্রান্ডেজ বলেছেন, কারো চাপে বা বয়কটের হুমকিতে নয়, মেক্সিকোতে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধিদের নিরাপত্তার অভাববোধেই আমন্ত্রণ প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়েছে। নীতির পুজারীর পক্ষে এ এক অদ্ভুত উক্তি। ব্রান্ডেজের বলা উচিত ছিল—'চাপে পড়ে বা বয়কটের ভয়ে নয়—জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে খেলাধুলা করায় সব মানুষের যে সমান অধিকার, অলিম্পিকের সেই মূল

মোহনবাগান ও বি এন রেল দলের মধ্যে হকি লীগের শেষ খেলায় রেল দলের গোলের মুখের এক দৃশ্য

নীতি পুরোপুরি না মানার জন্যই দক্ষিণ আফ্রিকার আমন্ত্রণ প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়েছে।'

যাই হোক, দক্ষিণ আফ্রিকা বাদ পড়ায় অলিম্পিকের উদ্যোগী রাষ্ট্র মেক্সিকো হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে, সারা বিশ্বের স্বস্তির নিশ্বাস পড়েছে। তবু এখনো একটি বাধা দূর হয় নি। সেটা হচ্ছে আমেরিকান নিগ্রোদের অলিম্পিক বয়কটের সিদ্ধান্ত। আমেরিকায় সাদা কালোর পার্থক্যই নিগ্রোদের অসন্তোষের কারণ। বিশ্ববিখ্যাত নিগ্রো অ্যাথলীট জেসি ওয়েন্স অবশ্য চেষ্টা করছেন যাতে নিগ্রোরা অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করে। নিহত নিগ্রো নায়ক ডঃ লুথার কিং-এর কথা বলে ওয়েন্স বলেছেন, অলিম্পিক বর্জন করলে সেটা হবে কিং-এর আদর্শবিরোধী কাজ। আশা করব, যেহেতু খেলাধুলোর ক্ষেত্রে আমেরিকায় সাদা-কালোর পার্থক্য নেই এবং খেলাধুলোয় নিগ্রোদের অবদান সবচেয়ে বেশী, সেহেতু আমেরিকার নিগ্রোরাও শেষ পর্যন্ত মেক্সিকো অলিম্পিকে যোগ দেবেন।

*

কলকাতার হকি লীগের উপর যবনিকা পড়েছে। বেটন কাপের খেলা মধ্যপথে। ফুটবলও মাঠে নেমেছে। পাওয়ার লীগ ও আন্তঃ অফিস লীগের খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। আসল লীগ মে-র মাঝামাঝি থেকে। তাই আকাশে বাতাসে এখন ফুটবলেরই আলোচনা। আলোচনা লীগের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। ইস্ট বেঙ্গল খেলবে, কি খেলবে না। একক লীগই বজায় থাকবে? না, ফিরতি লীগের ব্যবস্থা হবে? কিংবা কোনভাবে জোড়াতালি দিয়ে ইস্ট বেঙ্গলকে খুশী করা হবে? লীগ সম্পর্কে আই এফ এ দপ্তরে নতুন প্রস্তাবও আসতে আরম্ভ করেছে। দেখা যাক, আই এফ এ-র ভোটের জোরের জমিদাররা কায়েমী স্বার্থ কতটুকু ছাড়তে রাজী হন।

*

হকির কথায় ফিরে আসি। এবার হকি লীগ জয় করেছেন—গতবারের বেটন কাপ বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। উল্লেখ্য, অপরাজিত থাকার গৌরব সমেতই ইস্ট বেঙ্গলের লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ এবং এবার নিয়ে পাঁচবার লীগ জয়ের মধ্যে তিনবারই অপরাজিত থেকে লীগ জয়। তাই হকি লীগে 'অপরাজিত' থাকাটা যেন আর তেমন কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। অতীতে অনেক ক্লাবই অপরাজিত থেকে লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। গত তিন বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ন বি এন আরও তিন বছরের লীগের খেলায় পরাজিত হয়নি। এমন কি, অপরাজিত থেকে লীগ রানার্স হবার ঘটনাও কম নয়। ইস্ট বেঙ্গল ১৯৬২তে হয়েছে। এবার নিয়ে উপর্যুপরি ৬বারের লীগ রানার্স মোহন বাগান এই ৬ বছরের মধ্যে একবার মাত্র একটি খেলায় পরাজিত হয়েছে বাকি পাঁচ বছর অপরাজিত।

যাই হোক, ইস্ট বেঙ্গলের লীগ জয় খুবই কৃতিত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। কারণ গত বছরের নির্ভরযোগ্য কয়েকজন খেলোয়াড় বিশেষ করে গুরুবক্স সিং ও ইনামুর রহমানের মত খেলোয়াড় দলত্যাগ করা

সত্ত্বেও তারা যোগ্য দল হিসাবে চ্যাম্পিয়নের সম্মান পেয়েছে। ১৯টি খেলায় ইস্ট বেঙ্গল নষ্ট করেছে মাত্র একটি পয়েন্ট প্রতিপক্ষ মোহনবাগানের সঙ্গে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে। সন্দেহ নেই সে খেলায় ইস্ট বেঙ্গলেরই ছিল আধিপত্য। শেষ খেলায় গত তিন বছরের অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ন বি এন রেল দলের বিরুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গলের ২—১ গোলে জয়ও ক্রীড়াধারার সঙ্গতিসূচক ফলাফল।

অপরাজিত লীগ রানার্স মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গলের কাছে ও বি এন রেলের কাছে একটি করে পয়েন্ট হারানো ছাড়া শক্তিহীন পোর্টকমিশনার্সের কাছে একটি মূল্যবান পয়েন্ট হারিয়েছে এবং প্রথম সেই পয়েন্ট হারানোর ক্ষেত্রেই তাদের কিছুটা দুর্ভাগ্যের প্রমাণ মিলেছে। গত তিনবারের অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন বি এন আর সবচেয়ে বেশী ৪৫টি গোল করে কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও ৭টি গোল খেয়ে রক্ষণভাগের দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছে।

এই তিনটি দল ছাড়া আর কোন দলের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের সম্ভাবনা ছিল না। নীচে ফাইনাল লীগ টেবল দেওয়া হল।

ফাইনাল লীগ টেব্‌ল

হকি—প্রথম ডিভিশন

	খেঃ	জঃ	ড্র	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পয়েঃ
ইস্টবেঙ্গল	১৯	১৮	১	০	৩২	২	৩৭
মোহনবাগান	১৯	১৬	৩	০	৪৩	১	৩৫
বি এন আর	১৯	১৫	৩	১	৪৫	৭	৩৩
মহঃ স্পোর্টিং	১৯	১২	৪	৩	১৬	৮	২৮
ই আর এ এ	১৯	১২	৩	৪	৩০	৬	২৭
কাস্টমস	১৯	৯	৬	৪	২৩	১১	২৪
খালসা ব্লুজ	১৯	৮	৬	৫	২৭	১৪	২২
রেঞ্জার্স	১৯	৬	৬	৭	১১	১৪	১৮
রাজস্থান	১৯	৫	৬	৮	১১	২৫	১৬
পঃ বঃ পুলিস	১৯	৩	১০	৬	১২	২০	১৬
গ্রীয়ার	১৯	২	১২	৫	১৫	১৬	১৬
পোর্ট কমিঃ	১৯	৫	৬	৮	১০	১৮	১৬
ইঃ রেল	১৯	৩	৮	৮	৭	২২	১৪
জ্যাভেরিয়ান্স	১৯	৩	৮	৮	১৫	৩৩	১৪
পুলিস	১৯	৩	৮	৮	১২	২৫	১৪
এরিয়ান	১৯	২	১০	৭	৯	১৫	১৪
এন্টালি	১৯	৩	৭	৯	৬	২৪	১৩
খালজা স্পোঃ	১৯	৩	৬	১০	১৩	২৫	১২
পাঞ্জাব স্পোঃ	১৯	১	৫	১৩	২	২৫	৭
মেসারার্স	১৯	০	৬	১৩	১২	৩৭	৬

গৌহাটিতে আয়োজিত ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলের সেমি-ফাইনালে ভারত ৩—২ খেলায় সিংহলকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। ভারতকে এখন পূর্বাঞ্চল ফাইনালে ফিলিপাইন ও জাপানের খেলায় বিজয়ীর সঙ্গে খেলতে হবে।

যদিও হকের [illegible]

পারত। কিন্তু দুটি সিঙ্গলস ও একটি ডাবলস খেলায় জয়ের ফলে শেষ দুটি সিঙ্গলসের আর গুরুত্ব না থাকায় ভারতের দুই তরুণ খেলোয়াড় গৌরব মিশ্র এবং আনন্দ অমৃতরাজকে সিংহলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ দেওয়া হয়। গৌরব এবং আনন্দ শেষ দুটি খেলায় পরাজিত হলেও ভারতের পক্ষে তাদের প্রতিযোগিতা করার সুযোগদান বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। কারণ অভিজ্ঞতা অর্জনের জনাই আগামী দিনের যারা আশা তাদের এই সুযোগ দেওয়া উচিত।

গৌহাটিতে ডেভিস কাপের খেলার ব্যবস্থা এই সর্বপ্রথম। এ ব্যবস্থাও প্রশংসনীয়। বড় বড় শহরে আন্তর্জাতিক বা আকর্ষণীয় খেলাগুলির অনুষ্ঠান সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন শহরে তার আয়োজন করা খেলাধুলোর প্রসারের সহায়ক।

*

ছোট ছোট ঘটনা থেকেই আন্তরিকতার পরিচয় মেলে। ওড়িষার ফুটবল খেলোয়াড় বচন খুব উঁচু দরের খেলোয়াড় ছিলেন না, যদিও ওড়িষার দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর অবদান অনেকখানি। যাই হোক বচন পরলোকগমন করায় ওড়িষ্যার অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন তাঁর পরিবারকে দশ হাজার টাকা দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় ওড়িষার সঙ্গতি অনেক কম। তবু তাদের এই বদান্যতা। বাংলার প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড় যারা দুঃস্থ অবস্থায় পড়েছেন বা দুঃস্থ অবস্থায় পরলোকগমন করেছেন তাঁরা কেউ এমন সাহায্য পেয়েছেন বলে শুনিনি।

তবে পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর ছোট দানের মাধ্যমেই খেলাধুলায় তাঁর আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সেদিন বেলগাছিয়া ভিলায় নরথ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবের নতুন শুটিং রেঞ্জের উদ্বোধন করতে গিয়ে টারগেট বদলের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র স্থাপনের জন্য দশ হাজার টাকা দানের আশ্বাস দিয়ে এসেছেন।

দশ হাজার টাকা এমন কিছু বড় অঙ্কের টাকা নয়। রাইফেল শুটিংয়ে যে সব ধনাঢ্য ব্যক্তি আগ্রহী তাঁদের অনেকেই টাকাটা দিয়ে দিতে পারেন। রাজ্যপাল সেদিকে ইঙ্গিত না করে এবং রাজ্যে সঙ্গীন আর্থিক অবস্থার কথা না তুলে সে টাকাটা দেবার আশ্বাস দিয়েছেন। এতে খেলাধুলোয় তাঁর আন্তরিকতারই পরিচয় মেলে।

একলব্য

বিশ্ববিজয়ী মোটর চালকের মৃত্যু

বিশ্ববিজয়ী মোটর-চালক জিম ক্লার্কের আকস্মিক মৃত্যু মোটর স্পোর্টসে আগ্রহীদের কাছে মস্ত বড় দুঃসংবাদ। গত ৭ এপ্রিল পশ্চিম জার্মানীর হকেনহাইম-এ ইউরোপীয়ান ফরমুলা টু চ্যাম্পিয়নশিপের বিদ্যুৎগতিতে ছোটানো 'লোটাস' রেসিংকার উল্টে গিয়ে চালক ক্লার্কের মৃত্যু ঘটেছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩২ বছর। তার মধ্যেই ক্লার্ক মোটর-চালনায় দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এবং বহুবারের গ্রান্ড প্রিক্স বিজয়ী।

বলা হয়েছে, জিম ক্লার্ক যত বেশীবার গ্রান্ড প্রিক্স বিজয়ী হয়েছেন, পৃথিবীর কোন মোটর-চালক এত বেশীবার গ্রান্ড প্রিক্স জয় করতে পারেন নি। সুতরাং মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে তিনি মোটর রেসিং-এ সর্বকালের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন। আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে হয়তো আরও কিছু নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারতেন।

এখানে বলা দরকার, গ্রান্ড প্রিক্স-এর ৯টি প্রতিযোগিতা—বেলজিয়ান, ব্রিটিশ, ডাচ, ফ্রান্স, ইতালীয়ান, মেক্সিকান, সাউথ আফ্রিকান, আমেরিকান ও পশ্চিম জার্মানী। এই ৯টি গ্রান্ড প্রিক্স-এর শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে মোটর রেসিং-এ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ। এর মধ্যে মেক্সিকান গ্রান্ড প্রিক্স-এর দূরত্ব সবচেয়ে কম, ১৯০ মাইল, সবচেয়ে বেশী দূরত্বের গ্রান্ড প্রিক্স হচ্ছে ইতালীয়ান প্রতিযোগিতা। পাল্লার আড়ি ৩০৭ মাইল পর্যন্ত। ক্লার্ক ১৯৬৩ ১৯৬৫, দু'বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। আমেরিকায় পাঁচ শ' মাইল পাল্লার বিখ্যাত ইণ্ডিয়ানাপোলিস মোটর রেসিং-এ বিজয়ী হয়েছেন প্রথম ইউরোপের প্রতিযোগী হিসাবে। ওই প্রতিযোগিতায় ক্লার্কের ঘণ্টায় ১৫০·৬ মাইল গড় গতিবেগ রেকর্ডও বটে।

জিম ক্লার্ক ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী। স্কুলে পড়াশুনো করা ছাড়াও লরেটো স্কুলে রাগবী, ক্রিকেট ও হকি খেলেছেন। স্কুল ছাড়ার পর ১৮ মাস কাজ করেছেন বাবার বিরাট খামারে। ইংলণ্ড-স্কটল্যাণ্ডের সীমানায় ১২০০ একর জমি নিয়ে এই খামার। খামারে গবাদি পশুর সংখ্যা হাজারেরও বেশী। সুতরাং প্রভূত অর্থের অধিকারী ছিলেন ক্লার্ক পরিবার। খামারে কাজ করার সময়ই জিম ক্লার্কের মোটর-চালনার নেশা ধরে। বন্ধুদের পরামর্শে রেসিং-এ নেমে পড়েন। ১৯৫৬ সাল থেকে পাল্লার শুরু। ১৯৬০-এ ডাচ গ্রান্ড প্রিক্স-এ পঞ্চম স্থান। পরের বছর ফ্রান্স গ্রান্ড প্রিক্স-এ প্রথম বিজয়ীর সম্মান। তারপর সাফল্যের সোপান বেয়ে দুইবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ।

খেলাধুলার যে-কোন বিষয়ে বিশ্বপ্রধান হতে হলে সহজাত নৈপুণ্য, দক্ষতা, শারীরিক পটুতা, দূরদৃষ্টি, মানসিক স্থৈর্য—সব কিছু গুণের দরকার। কিন্তু প্রোফেশনাল স্পোর্টসে বিশ্ব জয়ী হতে তদতিরিক্ত আর কিছু গুণ প্রয়োজন। সে গুণ হচ্ছে আত্মবিশ্বাস, অবিশ্বাস্য মনের দৃঢ়তা, সাধনা, অন্তরের অনুপ্রেরণা ও জয়ের উদগ্র কামনা। ক্লার্কের সবই ছিল। তার চেয়েও বড় কথা, ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক এই স্পোর্টস সম্পর্কে ক্লার্কের ধারণা ছিল দার্শনিক স্বচ্ছ।

"মৃত্যু? সে তো একদিন আসবেই। কিন্তু আমি অসময়ে মরতে চাই না। মোটর রেসে দুর্ঘটনা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণই ওয়াকিবহাল। তবে আমার সৌভাগ্য, ও সম্বন্ধে আমার স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ।"

ক্লার্কের এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়, মোটর রেসিং-এর ভয়ংকর বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থেকেও তিনি বিপদকে জয় করতে চেয়েছেন তাঁর মানসিক স্থৈর্য দিয়ে।

"টপ গিয়ারে গাড়ির চাকায় পথের ধূলি উড়িয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলবো, শরীরের শক্তি সামর্থ্য ও ক্ষমতাকেও টেনে নেব টপ গিয়ারে। কিন্তু রাশ থাকবে হাতের মধ্যে। যদি দেখি জয়ের আশা ক্ষীণ হয়ে আসছে, কিংবা মেসিন বেইমানী করছে, প্রতিযোগিতা ছেড়ে দেব। বিপদের ঝুঁকি নেব না।"

এই ছিল মোটর রেস সম্পর্কে ক্লার্কের মতবাদ। গ্রান্ড প্রিক্স-এ দু'বার ক্লার্ককে ভয়ংকর বিপদের মধ্যে পড়তে হয়েছে। একবার বেলজিয়ান গ্রান্ড প্রিক্স-এ নিহত চালক ক্রিস ব্রিসটোর তাজা রক্তে তাঁর 'লোটাস'-এর চাকা লাল হয়েছে। আর একবার ইতালীয়ান গ্রান্ড প্রিক্স-এ ক্লার্ককে ওভারটেক করতে গিয়ে ১৭জন দর্শক সহ জার্মান চালক উলফগ্যাং ভন ট্রিপস নিহত হওয়ায় ক্লার্কের ঘাড়ে অযথা দোষ পড়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর মোটর রেসিং-এ কম করে ৫০জন চালকের মৃত্যুর কথাও ক্লার্কের অজানা ছিল না। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন, অসময়ে তাঁর মৃত্যু ঘটবে না। অদৃষ্টের পরিহাসে সেই মোটর রেসে অসময়েই ক্লার্কের জীবনদীপ নিবে গেল। বাঘ-সিংহের আক্রমণে যেমন শিকারীর মৃত্যু ঘটে, সাপের ছোবলে মৃত্যু ঘটে সাপের ওঝার, এ-ও যেন তেমনই ঘটনা।

ব্যক্তিগত জীবনে জিম ক্লার্ক ছিলেন বন্ধুবৎসল, সদালাপী ও স্বল্পবাক্ যুবক। প্রভূত অর্থ এবং বিশ্ব প্রতিষ্ঠা অর্জনের পরও কোন সময় তাঁর মাথা বিগড়ে যায় নি। সাংবাদিক এসেছেন, এসেছেন ব্যবসায়ী ও অটোগ্রাফ হাণ্টার। সবার সঙ্গে সপ্রীতি ব্যবহার করেছেন। জীবনে কোনদিন ধূমপান করেন নি। বদ নেশায় পড়েন নি। বন্ধু-বান্ধব ছিল অজস্র। বান্ধবীর সংখ্যাও বিস্তর। অনেকেই তাঁকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছেন। কিন্তু ক্লার্ক বলেছেন, 'যতদিন না আমি মাথা থেকে হেলমেট, চোখ থেকে গগলস ও হাত থেকে গ্লাভস খুলে না ফেলছি ততদিন বিয়ে আমার জন্য নয়। আমার অভিযান জীবনের ভাগ্যের সঙ্গে আর একজনের ভাগ্য জড়ানো কি ঠিক হবে?'

তাই মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আর কারো ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়িত করেন নি জিম ক্লার্ক।

মনুজেন্দ্র

বাংলা ছবি দেখানো আবশ্যিক হোক

সিনেমা আজকের দিনে শুধুই প্রমোদ-মাধ্যম নয়। এর শিল্পসত্তা আজ স্বীকৃত। বাংলা চলচ্চিত্রে শিল্প অনুশীলনেরই সন্ধান পাই। সাহিত্য, থিয়েটার এবং সংগীতের পংক্তিতেই আজ বাংলা সিনেমার স্থান। এই শিল্পমাধ্যমটির যখন ঘোর বিপদ, তখন যে-কোন শিক্ষিত ও শিল্পপ্রেমিক বাঙালীরই শংকিত হবার কথা। বাংলা চলচ্চিত্রের সমস্যার কথা বহুবার আলোচিত হয়েছে। বিষয়টি এখন আর আলোচনার নয়, আন্দোলনের পর্যায়ে। আন্দোলন শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ চিত্রশিল্প সংরক্ষণ সমিতি বাংলা এবং বাংলার চলচ্চিত্রের অবলুপ্ত মর্যাদা ও অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই সংরক্ষণ সমিতির পুরোভাগে রয়েছেন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা।

কোন প্রকার গোঁড়ামি বা প্রাদেশিকতার প্রশ্রয় দিতে তাঁরা রাজী নন। তাঁদের দাবি : বাংলা দেশে বাংলা ছবির প্রদর্শনীর সুব্যবস্থা। প্রয়োজনে বাংলার ছবি দেখানো আইন করে আবশ্যিক করতে হবে—এই তাঁদের বক্তব্য।

এই ধরনের একটি দাবি যে আজ জানাতে হচ্ছে সেটাই তো লজ্জার। বাংলা দেশে কলকাতায় তৈরি ছবি দেখাবার সুযোগ মেলে না এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কী হতে পারে। ছবি তৈরির পর প্রযোজককে মাসের পর মাস, এমন কী বছরের পর বছর বসে থাকতে হয়। প্রদর্শকের দরজায় দরজায় ঘুরতে হয়। এমন একটি পরিস্থিতি আর কোন দেশে কল্পনা করা যায় কিনা জানি না! কিন্তু বাংলা দেশে এমন ঘটে, ঘটছে। বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে একটির পর একটি সিনেমা হিন্দী চিত্রের কুক্ষিগত হচ্ছে। বাংলা ছবির রিলিজ চেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। এই দুরবস্থা দুঃসহ, অকল্পনীয়। দর্শকের রুচির বিকার ঘটাবার অধিকার তো কারো নেই। মাদকতায় মানুষ ভোলে। নেশার বস্তু পেলে অন্য মধুও মুখে রোচে না। এটাই সহজ যুক্তি। তাই বলে দর্শকের রুচি ও অভ্যাস পরিবর্তনের সৎ চেষ্টা কি আমরা প্রদর্শকদের কাছে আশা করতে পারি না? দর্শকের রুচির পালাবদল ঘটলে বাংলা ছবি দেখিয়েও যে লক্ষ্মীর কৃপালাভ হতে পারে একথা প্রদর্শকরা অস্বীকার করতে পারেন না।

আসল কথা, বাংলাদেশে বাংলা ছবি দেখাবার আশু সুবন্দোবস্ত করতেই হবে। মহারাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এ-বিষয়ে রাজ্য-সরকার আইন প্রণয়ন করে বাংলার ছবির আবশ্যিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারেন। বাংলা ভাষাভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলে বাংলা ছবির বঞ্চিত প্রযোজকরা হিন্দী চিত্রের শুভ মুক্তির মহাসমারোহ নীরবে তাকিয়ে দেখবেন এর চাইতে বেশী দুর্ভাগ্যের আর কী হতে পারে। এই প্রতিকারহীন প্রবঞ্চনা তাঁরা আর কতকাল সহ্য করবেন? এ-ব্যাপারে সরকারের কি কিছু করণীয় নেই? এই প্রশ্ন আজ চলচ্চিত্রশিল্পের সকল প্রযোজক ও কলাকুশলীর মুখে মুখে। একদিন, অচিরেই হয়ত, এই প্রশ্ন অগণিত কণ্ঠে ধ্বনিত হবে। কারণ বাংলা চলচ্চিত্রের অবলুপ্তি ঘটতে দেবেন না বাংলার জনসাধারণ। সেদিনেও রাজ্যসরকার নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকবেন?

কলকাতায় সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার উদ্যোগে এ-সপ্তাহে চেক চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হচ্ছে। উৎসবের কয়েকটি ছবির দৃশ্য (উপরে) "ক্লোজলি গার্ডেড ট্রেন"।

"তিন ভুবনের পারে" ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও তনুজা। ফটো—দেশ

চেক চলচ্চিত্র উৎসব

চেক দূতাবাস এবং ফেডারেশন অব দি ফিল্ম সোসায়েটিজ অব ইণ্ডিয়ার সহযোগিতায় সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা চেক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করেছেন। এক সাংবাদিক বৈঠকে ক্লাবের সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ লাহিড়ী এই সংবাদ ঘোষণা করে বলেন, উৎসবে যে ছবিগুলি দেখানো হচ্ছে সেগুলি চেক "নিউ ওয়েভ" চিহ্নিত। ভারত সরকারের উদ্যোগে ছবিগুলির প্রদর্শনী ইতিপূর্বে ভারতের অন্যান্য বিশেষ শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উৎসবের অন্তর্ভুক্ত ছবির মধ্যে রয়েছে শ্রেষ্ঠ বিদেশী চিত্র হিসাবে অস্কার পুরস্কারে ভূষিত "ক্লোজলি গার্ডেড ট্রেন"। জিরি মেনজেল চিত্রপরিচালক। মোট পাঁচটি ছবি দেখানো হচ্ছে। বাকি কয়টি হল : "এঞ্জেল অব ব্লিসফুল ডেথ" (স্টেপান স্কালস্কি), "রিটার্ন অব প্রডিগাল সন" (ই স্করম), "রোমান্স ফর বিউগল" (ও ভাভরা) এবং "সেভেন্থ ডে এ উইক"। ১ মে থেকে ৭ মে সরলা রায় মেমোরিয়াল হলে উৎসবের অনুষ্ঠান।

সিনে ফোরাম ও ক্যানিং সিনে ক্লাব

গত ২১ এপ্রিল চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রীঋত্বিককুমার ঘটকের তত্ত্বাবধানে অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে 'সিনে ফোরাম' নামে একটি চলচ্চিত্র-সংস্থার শুভ উদ্বোধন হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী ডি এন সিন্‌হা মানুষ এবং দেশের প্রয়োজনে সিনেমার উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা বলেন। প্রধান অতিথি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র সভ্যদের সাক্ষাৎকারের ভাল ছবি বেছে নিতে বলেন। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুধাংশু বসু সভাপতির ভাষণে চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতির জন্য দর্শক-সমাজ এবং চলচ্চিত্র-নির্মাতাদের একযোগে এগিয়ে আসতে বলেন।

এই অনুষ্ঠানে একটি চলচ্চিত্র সংক্রান্ত আলোচনায় যোগদান করেন প্রখ্যাত পরিচালক শ্রীবাসু ভট্টাচার্য, ডঃ গৌরদাস ভট্টাচার্য এবং পরিচালক শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী।

ফোরামের সভাপতি শ্রীঋত্বিককুমার ঘটক তীব্র ভাষায় বর্তমান চলচ্চিত্রশিল্পে যে সংকট ঘনিয়ে আসছে তার সমাধানে এগিয়ে আসতে বলেন।

বক্তৃতাশেষে সভ্যদের 'সপন নিয়ে' ছবিটি দেখানো হয়।

***

স্থানীয় গোবিন্দ হাইস্কুলে সম্প্রতি ক্যানিং সিনে ক্লাবের উদ্যোগে শেকসপিয়রের সুপ্রসিদ্ধ বিয়োগান্ত নাটক 'ওথেলো' ছবি প্রদর্শিত হয়।

নাটকের উপজীব্য জোরালো হলে ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা যে কোনও অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে না, মস্কোর এই ছবি তার নিদর্শন।

ছবি দেখানোর পূর্বে সংক্ষিপ্ত এক হৃদয়গ্রাহী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন ডঃ গৌরদাস ভট্টাচার্য।

তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই ধরনের প্রথম ক্লাবের উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানান।

দমদম সিনে ক্লাব

বর্তমান ফিল্ম সোসায়েটি আন্দোলনের ধারায় দমদম সিনে ক্লাব এই শিল্পনগরীতে নিঃসন্দেহে নতুন আগ্রহের সঞ্চার করেছেন। গত ৭ ও ২১ এপ্রিল তাঁদের উদ্যোগে দমদম মতিঝিল কলেজে অনুষ্ঠিত ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসবে বিভিন্ন বক্তারা এই সম্পর্কে আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ ও ডঃ গৌরদাস ভট্টাচার্য।

উৎসবে "হিরোশিমা মনামুর", "আলিন্ট ফিলিইন", "ক্লোলিক দ্য এতো" ও "মাদাম দ্য" দেখানো হয়।

'রক্তরেখা' ক্রাইম ছবিতে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও ললিতা চ্যাটার্জি। ফটো—দেশ

সাজ ও আওয়াজ-এর অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিল্পীদের সঙ্গে নবাগতদের সম্মেলক গান পরিচালনা করছেন ভি বালসারা। ফটো-দেশ

পরলোকগত শিল্পী স্মরণে সাজ-ও-আওয়াজ-এর অনুষ্ঠান

কলকাতায় এ যাবৎ যা হয় নি, সাজ-ও-আওয়াজ গত ২রা বৈশাখ মহাজাতি সদনে তা সম্পন্ন করেছেন। পরলোকগত শিল্পী মলয় মুখোপাধ্যায় ও অরুণাভ মজুমদার এবং সহশিল্পী রতন গাঙ্গুলী ও সুশান্ত মুখার্জির (গত বছর নিদারুণ মোটর দুর্ঘটনায় যাঁরা নিহত হয়েছিলেন) স্মৃতি-রক্ষায় সাজ-ও-আওয়াজ সেদিন সাত শ' কণ্ঠশিল্পীর সম্মেলক গানের ব্যবস্থা করে-ছিলেন। শিল্পীরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের শৌখিন গায়ক। তাঁদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে-ছিলেন কয়েকজন বিশিষ্ট গায়ক। যেমন শ্যামল মিত্র, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রীতি ঘোষ, সুমিত্রা সেন, নির্মলা মিশ্র, সনৎ সিংহ, বনশ্রী সেনগুপ্ত, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, রেবা ঘোষ, অরুণ দত্ত, পিণ্টু ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

প্রথমে গীতার স্তোত্রপাঠ হয়। তারপর গান। ত্রিশজন মুকাভিনেতার একসঙ্গে মুকাভিনয় এবং পাঁচ শ'জন শিল্পীর এক-সঙ্গে যন্ত্রসংগীত পরিবেশন অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। একক অনুষ্ঠানের শিল্পী ছিলেন কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ মজুমদার, পলাশ, দীপক প্রভৃতি। ভি বালসারা সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

দক্ষিণীর রবীন্দ্র-জন্মোৎসব ও প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী অনুষ্ঠান

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব ও দক্ষিণীর ত্রিংশ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উপলক্ষে আগামী ১২ মে রবিবার সন্ধ্যা ৭টায় ত্যাগরাজ হলে রবীন্দ্র-সংগীতের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হবে।

শ্রীশুভ গুহঠাকুরতার পরিচালনায় এই সংগীতানুষ্ঠানে এক শত জনের অধিক শিল্পী অংশ গ্রহণ করবেন।

বোম্বাই বিচিত্র

পরিবেশক এবং সরকারের সহযোগিতায় দ্বন্দ্ব-যুদ্ধকে শেষ অবধি প্রযোজকদের জয় হল। প্রদর্শকদের অন্যায় আবদার আর চলবে না। যদিও এখনও চুক্তিপত্রের শর্ত-গুলো সকলের চোখের সামনে আসে নি, তবু প্রযোজকদের মুখ-চোখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে যে, তাঁদের মন ভরেছে।

বম্বের প্রযোজকরা যেভাবে নামকরা তারকাদের সাহায্যে তাঁদের আন্দোলন পরি-চালনা করেছেন এবং তা যেভাবে প্রচারিত হয়েছে, এদেশে, শুধু এদেশে কেন, পৃথিবীর যে কোন দেশেই তার তুলনা বিরল।

আন্দোলন চালু থাকাকালীন দুর্দশাগ্রস্ত সিনেমা-কর্মীদের জন্য দু'বেলা ফ্রী কিচেন খোলা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় বিচিত্রানুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছে এই আন্দোলনকে ফিনান্স করার জন্য। প্রতিবছর খুব ধুম করে বম্বেতে চিত্রজগতের পাঞ্জাবীরা 'বৈশাখী রাত' পালন করেন। এবারও করেছেন। এবারকার অনুষ্ঠানে যে টাকা সংগৃহীত হয়েছে তার অনেকটাই প্রযোজকদের আন্দোলন তহবিলে যাবে।

এই আন্দোলন চলাকালীন একটি বিশেষ ঘটনাও ঘটেছে। তার অন্যতম হল রাজ-কাপুর এবং সুনীল দত্তের মিলন। বর্তমানে বম্বের বহু কাগজে রাজ এবং সুনীলের পাশাপাশি হাসি হাসি মুখের ছবি উঠেছে।

'জর্জ' বার্নার্ড শ'র বিখ্যাত উক্তি "ট্রাই টু গেট হোয়াট ইউ লাইক, অর ইউ উইল বি ফোরসড টু লাইক হোয়াট ইউ গেট"-কে স্মরণ করে প্রযোজকরা প্রদর্শকদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন তার প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে এবং প্রযোজকদের জয়লাভ হয়েছে।

প্রযোজকদের এই আন্দোলন যাতে বিশেষ-ভাবে প্রচারিত হয় তার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সে কমিটির কর্তা হয়েছেন 'গাইড' খ্যাত পরিচালক বিজয় আনন্দ। বিজয় আনন্দের হাতে প্রচারের ভার ন্যস্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এক আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন পরিবেশক এবং প্রযোজকদের কাছে। এই আবেদনপত্রে বলা হয়েছে যে, যত দিন হিন্দী ছবি দেখানো বন্ধ থাকছে, তত দিন সব হোর্ডিং এবং ব্যানার স্পেস-গুলি যেন প্রযোজকদের আন্দোলন প্রচারের কাজে ব্যবহার করা যায়। এ আবেদনপত্রকে প্রত্যাখ্যান হয়ত কেউই করতেন না, তবে বর্তমানে যা অবস্থা, তাতে হয়ত আর এ ধরনের কোন প্রচারের দরকার হবে না।

বম্বেতে বর্তমানে চিত্র-শিল্পীদের নিজে

কোন অনুষ্ঠান করতে হলে সুনীল দত্তকে ধরা ছাড়া গতি নেই। কারণ এ ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে সুনীলের ওপর।

'জয় জওয়ান : জয়কিষাণ' থীমের ওপর মনোজকুমার ছবি করলেও জওয়ানদের আনন্দ দিতে আজ কয়েক বছর যাবৎ সুনীল যে পরিমাণ উৎসাহ দেখিয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। ভারত সরকার সুনীলকে 'পদ্মশ্রী' খেতাবে ভূষিত করে সকলেরই অভিনন্দনভাজন হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা বোধ হয় অবান্তর হবে না।

সুধীর মুখার্জি প্রোডাকশন্স-এর "আঁধার সূর্য" ছবিতে রিণা ঘোষ ও মৃণাল মুখোপাধ্যায়। ফটো—দেশ

সুনীলের প্রচেষ্টাতেই বম্বের বিখ্যাত গায়ক এবং অভিনেতা-পরিচালক কিশোরকুমার জীবনে প্রথম জনসমক্ষে মঞ্চে গান গেয়েছেন কয়েকমাস আগে ভারতের পূর্ব সীমান্তে জওয়ানদের সামনে। কিশোরকে যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে জানেন, তাঁরা আন্দাজ করতে পারবেন, এরকম একটা ঘটনা ঘটাতে কত কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছে।

প্রযোজকরা নিজেদের নির্মাণকার্যে নিয়ম শৃঙ্খলা প্রবর্তন এবং চিত্র নির্মাণে ব্যয়-সংকোচন নিয়ে ঠিক খোলাখুলি আলোচনা হয়ত করতে পারছেন না। কারণ ব্যাপারটা একটু ডেলিকেট। প্রযোজকদের বর্তমান আন্দোলন সফল হবার ব্যাপারে যাঁদের সব-চেয়ে বেশী হাত, তাঁদের জন্যেই চলচ্চিত্রের ব্যয় ক্রমশ বেড়ে চলেছে এবং চলচ্চিত্র নির্মাণে শৃঙ্খলা নেই। তাই প্রথম ধাক্কাটা শুরু হয়েছে সঙ্গীত নির্দেশকদের ওপর দিয়ে। মিউজিক ডাইরেক্টরস এ্যাসোসিয়েশন এর সঙ্গে আলোচনা করে প্রায় ঠিক হয়েছে যে এবার থেকে অপেক্ষাকৃত কম খরচে সংগীত গ্রহণ যাতে করা যায় সবাই সে বিষয়ে সচেতন হবেন।

সচেতনতাই সব। এইটাই এতদিন ছিল না। এবার আসি আসি করছে। এসে গেলেই মাভৈঃ।

সরল শর্মা

পরলোকে অভিনেতা কালী সরকার

চলচ্চিত্র এবং মঞ্চের বিশিষ্ট অভিনেতা শ্রীকালী সরকার শনিবার কলকাতায় তাঁর ভবানীপুরের বাড়িতে ৬৩ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি এক ছেলে এবং দুই মেয়ে রেখে যান।

মঞ্চশিল্পী হিসাবে তিনি প্রথম যোগ দেন আলফ্রেড থিয়েটারে নাট্যনিকেতনের হয়ে। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে দীর্ঘদিন অভিনয় করেন। তাঁর স্মরণীয় অভিনয় শিশিরকুমার প্রযোজিত বিন্দুর ছেলে নাটকে মাধব চরিত্র রূপায়ণ। তুলসী লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং অহীন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গেও অনেকবার তিনি অভিনয় করেন। পরবর্তীকালে তিনি বহুরূপী, রূপকার এবং আই পি টি এ গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বহুরূপী ও রূপকারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যও ছিলেন। বহু সিনেমায় অভিনয় করে তিনি জনপ্রিয় হন। নিউ থিয়েটারসের 'অঞ্জনগড়ে' তাঁর ভূমিকা সুধীজনের প্রশংসা অর্জন করে। তিনি সত্যজিৎ রায়ের "জলসাঘর" ছবিতেও একটি বিশেষ ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন।

ওঙ্কার সংগীত সংসদ

গত ২৩ এপ্রিল হিন্দী হাইস্কুলের প্রশস্ত শীততাপনিয়ন্ত্রিত সুরম্য হলে ওঙ্কার সংগীত সংসদের ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনে কণ্ঠসংগীতে শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়কের গোরখ্-কল্যাণ ও শ্রীনিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতারে মারু-বেহাগ এ বছরের বহু সংগীত-জলসার মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট স্থান অধিকারের দাবি করতে পারে।

সুনন্দা পট্টনায়ক

কল্যাণ অঙ্গের বহু রাগের মধ্যে গোরখ্-কল্যাণের চেহারাটি বেশ একটু স্বতন্ত্র। কারণ যে সা-গা-পা (বা ইয়োরোপীয়ান সি মেজর স্কেলের প্রধান কর্ড) উপর কল্যাণের রূপ গড়ে উঠেছে, গোরখ্-কল্যাণে কিন্তু তাকেই বাদ দেওয়া হয়েছে। এদিকে সা-রে-মা-রে, ওদিকে ধা-সা, এর মধ্যে নিখাদ বক্রভাবে আসছে. ছোট্ট রাগ—রাগ-বিস্তার করা বিশেষ শক্ত.

এই অবস্থাতে শ্রীমতী পট্টনায়কের কণ্ঠে গোরখ্-কল্যাণের এক ঘণ্টার উপর বিস্তার ও রূপায়ণ উল্লেখযোগ্য। অবশ্যই তাঁর নিখাদের ব্যবহার নিয়ে হয়ত কিছু তর্ক উঠবে; কিন্তু আমাদের বক্তব্য, গোরখ্-কল্যাণের কি ঠিক একেবারে বাঁধা রূপ আছে? আর তা ছাড়া রাগের প্রধান যে কথা রঞ্জকতা তার তো কোনো অভাব ছিল না। একমাত্র দ্রুত তানালাপে তাঁর কণ্ঠে সুতীক্ষ্ণতার (pitch) কখনও কখনও ঘাটতি পড়েছে বলে আমাদের মনে হয়েছে।

তারপরে ছোট্ট ভজন, বিষয় ছিল দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকালে শ্রীকৃষ্ণস্তব। ভজনে বিষ্ণু দিগম্বর থেকে ওঙ্কারনাথের যে ভাবঘন রসসৃষ্টি করা তাঁদের ঘরের বৈশিষ্ট্য, সময়াভাবে এখানে হয়ত সেটা সম্ভব হয় নি। আজকের দিনে শিল্পীকে যখন বাঁধা সময়ের মধ্যে গাইতেই হবে, তখন হয়ত শ্রীমতী পট্টনায়ক খ্যাল অংশ কম করে ভজনে আরও একটু সময় বেশী দিলে ভালো করতেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘে শ্রীমতী শুভলক্ষ্মীর গাওয়া গানের রেকর্ড রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারি শ্রী উ থান্ট, ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীপার্থসারথি এবং শ্রীনরসিমানকে উপহার দিচ্ছেন পিটারস ইন্টারন্যাশনালের শ্রী চিৎস পিটারস।

নিখিল ব্যানার্জি

আচার্য আলাউদ্দীনের যোগ্য শিষ্য নিখিল ব্যানার্জির সেতার বাজনা বাংলা দেশের তথা ভারতের গৌরব। সম্প্রতি তিনি আমেরিকা ও ইয়োরোপে বহু যশ কুড়িয়ে দেশে ফিরেছেন। গত কয়েক বছর ধরে কয়েকটি বড় বড় জলসাতে লক্ষ করেছি, নিখিলবাবু বেহাগ-সিদ্ধ। মারুবেহাগেও তাঁর সর্মাধিক স্ফূর্তি। বেহাগেরও অন্তর্ভুক্ত এই রাগে এক দিকে যেমন শুদ্ধ মধ্যম দুর্বল, তেমনি মালশ্রীর সা-গা-মা-নি-র্স—এখানে কড়ি মধ্যম, তার সঙ্গে রেখাব ধৈবতের কিছুটা প্রবলতর ব্যবহারে, মারুবেহাগের শান্ত করুণ রসটি তাঁর হাতে পরিপূর্ণ মূর্তিতে পরিস্ফুট। আলাপের প্রথমাংশে মীড়-প্রধান রাগাবয়বের পুরো উপকরণ, পরে জোড় অঙ্গে ছন্দের মাধ্যমে রাগমূর্তিতে প্রাণসঞ্চার, তারপরে গমক ও বোলের অলংকারে রাগের সার্থক রূপটি রসোত্তীর্ণ; শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ। মহাগুরুর সার্থক মন্ত্রশিষ্য তিনি, ধ্রুপদী আলাপের পরাকাষ্ঠা তাঁর হাতে। একমাত্র দুঃখ এই যে, সময়াভাবে আলাপকে ছোট করে বাজাতে হল, কিন্তু এক ঘণ্টারও কম আলাপে অঙ্গহানি হয় নি, এখানেই শিল্পীর রসবোধের পরিচয়।

পরে খানদানী মসিদখানি গত্-এ গমকের প্রাচুর্য ও লয়কারী, দ্রুত গত-এ তিন সপ্তকের নিখুঁত তান এবং বিশেষ করে দ্রুত গতের বন্দেশ লক্ষ করবার মতন। প্রতি আওরতেই ছোট্ট ছুট্ তানে শ্রোতৃবৃন্দের মনে চমক-লাগানো (surprise) সমের আগমন।

শিল্পী নিখিলবাবুকে সময় দেওয়া হয়েছিল মাত্র এক ঘণ্টা দশ মিনিট, পরে শ্রোতৃবর্গের বিশেষ অনুরোধে বাজালেন ছোট্ট একটি ভারী মধুর পূর্বী ঠুংরী, তালের বৈচিত্র্য ৪-৪-২। শ্রীশঙ্কর ঘোষের তবলাসঙ্গত উপযোগী ও অনুগত। নিখিল ব্যানার্জির কাছে আশা আমাদের অনেক, সেটা তিনি পূরণ করবেন সে দাবি আমরা নিশ্চয়ই করব তাঁর কাছে।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সার্থক: একমাত্র ঘোষণাকারীর অতি-উৎসাহে, বাগাড়ম্বরে ও অতি-ইংরেজীপনায় এবং যত্রতত্র ক্যামেরার প্রাদুর্ভাবে সামান্য কিছু বেসুরো আবহাওয়া সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল।

শ্রীলোচন পণ্ডিত

"প্রথম কদম ফুল" ছবির একটি দৃশ্য গ্রহণের আগে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও তনুজাকে নির্দেশ দিচ্ছেন ইন্দর সেন।

এ সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা কেন্দ্রীয় খনি ও ইস্পাত মন্ত্রী শ্রীচেন্না রেড্ডির পদত্যাগ। ২৬ এপরিল অনধ্র প্রদেশ হাইকোরট তন্দুর কেন্দ্র থেকে ১৯৬৭-র নির্বাচনে রাজ্য বিধানসভায় শ্রীরেড্ডির নির্বাচন বাতিল করে দিয়েছেন। বিচারপতি শ্রীএস কৃষ্ণ রাও নির্বাচনের সময় ভোটদাতাদের ঘুষ দেওয়ার অভিযোগে ডঃ রেড্ডিকে দোষী সাব্যস্ত করেন। অভিযোগ আনেন পরাজিত নির্দল সদস্য শ্রীবন্দেমাতরম রামচন্দ্র রাও। ডঃ রেড্ডি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হলে বিধানসভার সদস্যপদে ইস্তফা দেন এবং পরে রাজ্যসভায় সদস্য মনোনীত হন। রাষ্ট্রপতি পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন। পদত্যাগপত্র পেশ করার পরই ডঃ রেড্ডি হায়দারাবাদে গিয়েছেন অনধ্র হাইকোরটের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোরটে আপীল করার জন্য। অনধ্র হাইকোরটে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্যও তিনি আবেদন করবেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২৯ এপরিল। কচ্ছ ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহকারী ১৭৫ জন কচ্ছ সমর্পণ-বিরোধী স্বেচ্ছাসেবক আজ খাবদার কাছে গ্রেফতার বরণ করেন। এই দলে আছেন পাঁচজন এম-পি সহ এগারোজন মহিলা। রাত্রে সকলকে গান্ধীধাম ও অন্যান্য স্থানে নিয়ে গিয়ে মুক্তি দেওয়া হয়।

গতকাল নিউ সেকরেটারিয়েটে হাওড়া বারন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এবং সংশিলষ্ট ছ'টি ইউ-নিয়নের প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে লিখিত চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর ওই কোম্পানীর দীর্ঘ সাত মাসব্যাপী মালিক-শ্রমিক বিরোধের অবসান ঘটে। চুক্তি অনুযায়ী ২৯ এপরিল থেকে ধাপে ধাপে কারখানা খুলবে।

২২ এপরিল। ১৯৬৫ সালে ২২ মে যে ভারতীয় পর্বতারোহী দল এভারেস্ট জয় করেন তাঁদের অন্যতম সদস্য সোনাস গিয়াৎসো আজ নয়াদিল্লির সামরিক হাস-পাতালে ক্যান্সার রোগে পরলোকগমন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী শোক প্রকাশ করে সোনাস গিয়াৎসেকে পর্বতা-রোহণের নায়ক অভিহিত করে বলেন, তাঁর নাম চিরকালই ভারতের যুব সম্প্রদায়ের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

২৩ এপরিল। রাজপথে যানবাহন ও জন-সাধারণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অবস্থান ধর্মঘট রোধ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে পুলিসকে সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারের মতে, রাজপথ পথচারী ও যানবাহনের চলাচলের জন্য এবং সে বিষয়ে যাতে কোন বিঘ্নের সৃষ্টি না হয় সেটা দেখাই পুলিসের কাজ।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পি-এস-পি দলের নবীনযুক্ত সেকরেটারি শ্রীসুনীল দাস আজ সাংবাদিকদের জানান যে, যুক্তফ্রন্টে ফিরে যাবার কোন প্রস্তাব তাঁদের দলের সামনে নেই। তিনি বলেন, রাজ্য সম্মেলনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, সম্মেলনের প্রতিনিধিরা ছাড়া তা নাকচ করার ক্ষমতা কারুরই নেই এবং ওই প্রতিনিধিদের এরকম কোন প্রস্তাব বিবেচনার কোন নোটিস এখনও আসে নি।

কলকাতায় অবস্থিত পূর্বাঞ্চলের কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো বা সি বি আই বিশেষ অভিযান চালিয়ে কয়েকটি বড় বড় প্রতিষ্ঠানকে ধরেছেন 'ওভার' ও 'আনডার' ইনভয়েস মাধ্যমে আমেরিকা, ব্রিটেন ও পাকিস্তানে বছরে দশ থেকে পনের কোটি টাকা পাচার করার অপরাধে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয় কঠোর মনোভাব নিয়েছেন।

২৪ এপরিল। কংগ্রেস সভাপতি শ্রী এস নিজলিংগাপ্পা আজ নয়াদিল্লিতে প্রেস ক্লাবে বলেন, যেসব দলের গণতান্ত্রিক নীতিতে দৃঢ় আস্থা আছে এবং যে দলগুলি সুসংগঠিত ও যাদের ঐতিহ্য রয়েছে তাদের সঙ্গে প্রয়োজন-বোধে কংগ্রেস রাজ্যগুলিতে এবং কেন্দ্রে কোয়া-লিশন সরকার গঠন করতে পারে। তিনি বলেন, হরিয়ানায় দলত্যাগীদের মনোনয়ন না দেবার যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর প্রদেশের মধ্যবর্তী নির্বাচনেও তা মেনে চলা হবে। শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার মতে, যেসব দলের কার্যকলাপ জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতা-বিরোধী এবং সমাজ-সংগঠনে পরিপন্থী সেগুলিকে নিষিদ্ধ করা উচিত।

দার্জিলিং-এর সহকারি দায়রা জজ শ্রী এম আর মল্লিক আজ ১৯৬৭-র ১০ জুন নকশাল-বাড়ির দীরসিংজোতে ডাকাতির অপরাধে জংগল সাঁওতাল, সোনিলাল মল্লিক, ঝারুলাল থারু, উধায় মল্লিক, সহেবু থারু, ফণিভূষণ দাস ও কালা সিংকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারা অনুসারে অপরাধী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

২৬ এপরিল। বাংলার অনন্য চরিত্র দাদাঠাকুর আজ তাঁর ৮৭তম জন্মদিনে নিজের বাড়ি মুরশিদাবাদের জঙ্গীপুরে পরলোকগমন করেছেন। আসল নাম শরৎ পণ্ডিত, কিন্তু সকলের কাছেই তিনি পরিচিত ছিলেন দা'ঠাকুর নামে। বাল্যে পিতাকে হারিয়ে পিতৃব্য রসিকলাল পণ্ডিতের কাছে কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়েই দাদাঠাকুর বড় হন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গিয়েছেন স্ত্রী, দুই পুত্র ও চার কন্যা।

মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রিসভা থেকে আজ জনসঙ্ঘের ৫ জন মন্ত্রী পদত্যাগ করায় সংযুক্ত বিধায়ক দলের সরকার সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। আগামী আগস্ট অথবা সেপটেম্বরে বিধানসভার অধিবেশন বসলে এই সংকটের অবস্থাটা স্পষ্ট-ভাবে জানা যাবে।

২৭ এপরিল। আজ সন্ধ্যায় কেরলের ২৪টি পৌরসভার নির্বাচনের সব কটিরই ফলাফল প্রকাশিত হবে জানা গেল, কংগ্রেস নিজে এবং কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে ১৭টি পৌরসভায় জয়ী হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট মাত্র তিনটিতে তাদের দখল বজায় রাখতে পেরেছে। চারটিতে কোন দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা [illegible] পারে নি।

বিদেশী সংবাদ

২০ এপরিল। আজ রাতে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার উইন্ডহুক শহরের অনতিদূরে লনডনগামী দক্ষিণ আফ্রিকা এয়ারওয়েজের একটি ৭০৭ বোয়িং বিমান নবনির্মিত স্ট্রাইডম বিমানঘাঁটি থেকে যাত্রার অল্প পরেই ভেঙে পড়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিমান চলাচলের ইতিহাসে বৃহত্তম এই দুর্ঘটনায় মোট ১২৯ জন যাত্রীর মধ্যে ১২৩ জন প্রাণ হারায়।

২২ এপরিল। ইনদোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুহার্তো বর্তমান সরকারের আদর্শ বিরোধী বলে মে দিবস উদযাপন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বলে আজ এক সরকারী মুখপাত্র ঘোষণা করেন।

২৩ এপরিল। রোডেশিয়ার বে-আইনী স্মিথ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্পর্কে ব্রিটেনের বক্তব্য শোনার জন্য আজ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বসে। নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি শ্রীজাকব মালিক জামবিয়া ও জামাইকার প্রতি-নিধিদের এই বৈঠকে যোগ দিতে আহ্বান জানান। ব্রিটেনের লরড ক্যারাডন রোডেশিয়া সম্পর্কে বাধ্যতামূলক অবরোধ সংক্রান্ত এক নতুন প্রস্তাব পেশ করে যে, কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে ব্রিটেন পরিষদের ও অন্যান্য দেশের সাহায্য চায়।

২৪ এপরিল। আজ রাওয়ালপিনডি থেকে সরকারিভাবে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশরিফুদ্দিন পীরজাদার পদত্যাগের কথা ঘোষণা করা হয়। তাঁর স্থলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন ভারতে পাকিস্তানের হাই-কমিশনার শ্রীআরশাদ হোসেন। পাকিস্তান বেতারে শ্রীপীরজাদার পদত্যাগের কোন কারণ দেখানো হয় নি।

২৫ এপরিল। এ বছরের শেষাশেষি মসকোর কমিউনিসট শীর্ষ বৈঠকের তারিখ ও আলোচ্য-সূচী নির্ধারণের জন্য হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেসটে বিশ্বের ৮৭টি কমিউনিসট পারটিকে এক সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আজ এই বৈঠক বসতে দেখা যায় যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, কিউবা, চীন, জাপান ও অন্যান্যদের ধরে অনেক পারটির প্রতিনিধিই অনুপস্থিত। বেসরকারী মতে, ৪০টির মতো পারটি এতে যোগ দিয়েছে।

২৬ এপরিল। পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার বন্ধের জন্য মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সকল সদস্যের কাছে আজ আবেদন জানানো হয়। উভয় রাষ্ট্রেরই বক্তব্য এক : চুক্তিটি এখনই অনুমোদিত না হলে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে; স্বাক্ষরকারী পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র-গুলিকে পরমাণু অস্ত্রহীন রাষ্ট্রগুলির কাছে তাঁদের এই সম্পর্কিত জ্ঞানের ভাগ দেওয়া হবে।

চুল উঠে যাওয়ার জন্য বিব্রত?

আজ থেকে সিলভিক্রিন ব্যবহার করে চুলের পুনর্জীবন ফিরিয়ে আনুন

বিপদের এই সব সঙ্কেত অবহেলা করবেন না

চুল উঠে যাওয়া। মাথার তালুতে চুলকানি। নির্জীব শুকনো চুল। এই সব লক্ষণ থেকেই বুঝা যায় যে আপনার চুল বেড়ে ওঠার জন্য যে জীবনদায়ী খাদ্যের প্রয়োজন তার অভাব হচ্ছে। এর ফলে অকালে আপনার মাথায় টাক পড়তে পারে। তাই এই সব লক্ষণ দেখা দিলেই বুঝতে হবে আপনার চাই—সিলভিক্রিন—যেটি চুলের জীবনদায়ী স্বাভাবিক খাদ্য।

সিলভিক্রিন কি ভাবে কাজ করে?

চুলের গঠনের জন্য যে ১৮টি অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার হয়, প্রকৃতি তা জোগায়। একমাত্র সিলভিক্রিনেই রয়েছে সেইসব অ্যামিনো অ্যাসিডের মূলতত্ত্বের নির্যাস। এটি চুলের গোড়ায় গিয়ে তাকে খাদ্য জোগায় ও শক্তিশালী করে তোলে ও সুস্থ চুল বেড়ে ওঠায় সাহায্য করে।

ব্যবহার-বিধি

প্রত্যহ দুমিনিট করে মাথার তালুতে পিওর সিলভিক্রিন মালিশ করুন। চুলের অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত পিওর সিলভিক্রিন ব্যবহার করে চলুন। একবার চুলের স্বাস্থ্য ফিরে এলে তাকে অটুট রাখবার জন্য নিয়মিতভাবে সিলভিক্রিন হেয়ারড্রেসিং মাখুন—এটি পিওর সিলভিক্রিন মেশানো একটি অয়েল বেস্‌।

বিনামূল্যে 'অল অ্যাবাউট হেয়ার' শীর্ষক পুস্তিকার জন্য এই ঠিকানায় লিখুন—ডিপার্টমেন্ট D-Z পোস্টবক্স ১২১, বোম্বাই-১।

Pure Silvikrin
ORGANIC HAIR FOOD
A LOTION WITH OIL

সিলভিক্রিন উৎপাদন পুরুষ ও মহিলা সকলেরই ব্যবহার উপযোগী।

সিলভিক্রিন

চুলের জীবনদায়ী স্বাভাবিক খাদ্য

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীসুহাস দে

ভারত সরকার

নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে :—

১। বিজ্ঞাপন নং ২৭/৬৮—দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ ৩১-৫-৬৮। ফায়ার সার্ভিস সেকশন। স্টেশন অফিসার। বেতন : ৩৫০—২৫—৫০০—৩০—৫৯০—যোঃ বাঃ ৩০—৬৮০, টাকা। নিম্নতম যোগ্যতা : অবশ্যই ইণ্টারমিডিয়েট সায়েন্স এবং নাগপুরস্থ ন্যাশনাল ফায়ার সার্ভিস কলেজ হইতে স্টেশন অফিসারস কোর্স পাস করিয়া থাকা চাই অথবা লণ্ডনের ইনস্টিটিউশন অফ ফায়ার এঞ্জিনিয়ার্স-এর ডিপ্লোমা থাকা চাই। কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত ফায়ার সার্ভিসে সাব-অফিসাররূপে অন্ততঃ ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। ভারী গাড়ি চালাইবার বৈধ লাইসেন্স থাকা চাই এবং ফায়ার এঞ্জিন, ফায়ার পাম্প এবং অন্যান্য অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রাদির ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ উত্তমরূপে জানা চাই।

২। বিজ্ঞাপন নং ২৯/৬৮—দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ ৩০-৫-৬৮। রাজস্থান অ্যাটমিক পাওয়ার প্রজেক্টের জন্য এঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্ক স্টাডি) (গ্রেড এসসি ১/এসসি ২)। বেতন : ৪০০—৪০০—৪৫০—৩০—৬০০—৩৫—৬৭০—এস জি—৩৫০—৯৫০/৪০০—৪০—৮০০—৫০—৯৫০, টাকা। নিম্নতম যোগ্যতা : মেকানিক্যাল বা প্রোডাকশন এঞ্জিনিয়ারিং বা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এঞ্জিনিয়ারিং-এ অবশ্যই গ্র্যাজুয়েট হওয়া চাই। অভিজ্ঞতা : (ক) (১) কোনো বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে টাইম অ্যান্ড মোশন স্টাডি বিভাগে অন্ততঃ ৪ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা (২) খ্যাতনামা মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং ঠিকাদারের নিকট ওয়ার্ক এস্টিমেটিং বা কস্ট এঞ্জিনিয়ারিং-এ পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতা। (খ) মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং বা প্রোডাকশন এঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা, তৎসহ উপরোক্ত ক্ষেত্রে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থিগণও বিবেচিত হইবেন। প্রার্থীকে অভিজ্ঞতা অনুসারে উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন দেওয়া যাইতে পারে। মনোনীত প্রার্থীকে কোটা হইতে ৩৬ মাইল দূরে প্রজেক্ট সাইট অণুশক্তি-তে নিয়োগ করা হইবে। "অ্যাকাউণ্টস অফিসার, আর এ পি পি, বম্বে"-এর অনুকূলে প্রদেয় ৫, টাকার (অফেরতযোগ্য) রেখিত পোস্টাল অর্ডার দরখাস্তের সহিত দাখিল করিতে হইবে। বাহির হইতে যে সকল প্রার্থীকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হইবে তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত শ্রেণীর যাতায়াতের রেলওয়ে ভাড়া দেওয়া হইবে। ডেপুটি এস্ট্যাবলিশমেণ্ট অফিসার (আর), ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেণ্টার, সেণ্ট্রাল কমপ্লেক্স, নর্থ সাইট, ট্রমবে, বম্বে-৭৪ ঠিকানায় দরখাস্তের ফরম এবং অন্যান্য বিবরণী ডাকযোগে পাওয়া যাইবে। ডাকযোগে ফরম পাইতে হইলে বিজ্ঞাপনের নম্বর ও পদের নাম লিখিয়া ৩৫ পয়সার ডাকটিকিটযুক্ত স্বনামঠিকানা লেখা খাম (২৩ সিএম × ১০ সিএম) পাঠাইতে হইবে। জেনারেল সেকশন, ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেণ্টার, ওল্ড ইয়ট ক্লাব, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ মার্গ, বম্বে ১ ঠিকানায় স্বয়ং আসিলেও দরখাস্তের ফরম পাওয়া যাইবে। ডিএভিপি ৬৪৫(৩৫)/৬৮

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৫ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২৯
শনিবার ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষাণ্মাসিক „	১৪.০০
ত্রৈমাসিক „	৭ ০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষাণ্মাসিক „	১৪.০০
ত্রৈমাসিক „	৭.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ-ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৪০.০০
ষাণ্মাসিক „	২০.০০
ত্রৈমাসিক „	১১.৫০

আসাম-ত্রিপুরায়
(বিমান-ডাকে)

বার্ষিক	৩১.০০
ষাণ্মাসিক	১৬.০০
ত্রৈমাসিক	৮.০০

দাম ৫০ পয়সা
[illegible] বিমান মাশুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

DESH

Saturday 18 May 1968

বৈশাখী দিন

বৈশাখ শেষ হল। মনে মনে এইমাত্র সান্ত্বনা, গ্রীষ্মের খানিকটা পথ পেরিয়ে আসা গেছে। অবশ্য এই পথটুকু পেরোতেই আমরা গলদঘর্ম। স্বীকার করে নিতে বাধছে না, এই শীর্ণ সন্ন্যাসীটি তাঁর রক্তনেত্র ললাটে তুলে দিব্য ধ্যানাসনে বসে আছেন, আর নদীগুলি শুষ্কজল, মাঠঘাট তৃষ্ণাদীর্ণ, শস্যশূন্য! কবি যে বলেছেন, বৃষ্টিহীন বৈশাখী দিন, তা বোধ করি এ বছরে আমরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করছি, বলা বাহুল্যে সন্তাপে প্রাণ রীতিমত দগ্ধ হচ্ছে। দুঃখের বিষয়, প্রকৃতির বিরুদ্ধে যত অভিযোগই থাক তা নিয়ে মিছিল করা যায় না, নতুবা এই গ্রীষ্মপীড়নের বিরুদ্ধে একটা বিশাল মিছিল বের করা যেত।

যে-কোনো নিগূঢ় কারণেই হোক না কেন, ইদানীং প্রকৃতির কেমন একটা খাপছাড়া চালচলন দেখছি। সাধারণত এই সময়ে, বৈশাখের এই তপ্ত দিনে বার কয়েক কালবৈশাখীর, ঝড়ঝাপটার, দু চার পশলা বৃষ্টির আবির্ভাব ঘটত, একটানা গরমের মধ্যে ওইটুকুই ছিল ক্ষণিকের আরাম; কিন্তু হালে আবহাওয়া কেমন কৃপণ ও নির্দয় হয়ে গেছে, আরামটুকু দিতে চাইছে না। যত দূর শোনা যাচ্ছে, তাতে এবার পশ্চিমবঙ্গে ঝড়ঝাপটা বা বৃষ্টির তেমন কোনো আসা যাওয়া ঘটেনি। কলকাতা শহর এবং আশেপাশে বেশ কিছু দিন আগে বার কয়েক ঝড়ের আয়োজন ঘটেছিল, তবে তা প্রবল হয়নি, বৃষ্টিও দেখা দেয়নি। পরিণামে এই দাঁড়িয়েছে যে, আমরা চাতক পক্ষী হয়ে আকাশ দেখছি, আকাশ তপ্ত ও তামাটে হয়ে আছে। মনে হচ্ছে না, আপাতত প্রকৃতি সদয় হবেন।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান যে অবস্থা তাতে আতঙ্কিত হবার কারণ দেখা দিয়েছে। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা ছাড়া এই রাজ্যের আর প্রায় সব জেলাই অল্প-বিস্তর খরার কবলে পড়েছে। এর মধ্যে পশ্চিম দিনাজপুর, হুগলি, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং মালদহ জেলার অবস্থা খুবই খারাপ। এ-সব জেলায় আউশ ও পাটের চাষ বৃষ্টির অভাবে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। প্রায় এক মাস যাবৎ এই অঞ্চলগুলিতে কোনো বৃষ্টি নেই, মাঠের আউশ ও পাট মাঠেই শুকোচ্ছে, অনেক জমিতে জলাভাবের দরুন চাষই শুরু করা হয়নি। কৃষি দপ্তর আশঙ্কা করছেন, মে মাসের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি না হলে আউশ ও পাটের চাষের যে ক্ষতি হবে তা মারাত্মক।

খরা-অবস্থার জন্যে সরকারী ধান-চাল সংগ্রহও একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। খাদ্য বিভাগের কথামতন জানা যায়, গত এক সপ্তাহে কোথাও কোনো ধানচাল সংগ্রহ হয়নি। অনুমান করা হচ্ছে, উৎপাদকরা মনে করছেন, এ-রকম খরা থাকলে আগামী মরসুমে ফসল খারাপ হবে, আর সেই ভয়ে ধানচাল তাঁরা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। জেলার বাজারগুলিতে ধানচালের আমদানি অর্ধেক বা অর্ধেকেরও কম হয়ে এসেছে, ধানচালের দরও ক্রমশ বাড়ছে।

অন্য দিকে, খরার ফলে বেশ কয়েক লক্ষ টাকার শাকসবজি নষ্ট হয়েছে, জলাভাব তীব্র হয়েছে গ্রামাঞ্চলে। সরকার পক্ষ থেকে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ বাড়ছে। শোনা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলা থেকে খরা ত্রাণের জন্যে অনুরোধ উপরোধ আসছে, জরুরী তারবার্তাও জড় হচ্ছে। অবস্থা যে আশঙ্কাজনক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষ করে গত খরার স্মৃতি আমাদের ভোলার কথা নয়। অনেকেই আশা করেছিলেন দুটি বৎসর ভাল বৃষ্টি হলে আমাদের খাদ্য উৎপাদন বাড়বে, অর্থনৈতিক দুর্ভোগেরও খানিকটা অবসান হবে, কিন্তু এ বছরের অবস্থা দেখে মনের আশা যেন ইতিমধ্যেই মরে আসছে। একমাত্র ভরসা এখন আকাশ। না জানি আকাশ-পটে কি লেখা আছে।

১৫ গ্রেসের রাজনীতিটা সামনে রাখলে কোট্টায়ামে যে কেরল রাজ্য ংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল, সেটা কোন বচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই সম্মেলনকে বচ্ছিন্নভাবে একমাত্র কেরলের নিজস্ব অধি-বশন মনে করলে কংগ্রেসের বর্তমান নীতি থকে অনেক দূরে সরে আসতে হয়। মগ্রভাবে কংগ্রেসের মূল নীতিগত প্রশ্ন াট্টায়াম সম্মেলনে উঠেছিল বলেই এই ধিবেশনে যোগদান করেছিলেন কংগ্রেস ভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা এবং কংগ্রেস তা শ্রীঅতুল্য ঘোষ। শ্রীঅতুল্য ঘোষ ন কোট্টায়ামে হাজির হলেন তখনও ম্মলনের মূল অধিবেশন শুরু নি এবং ঠিক সেই মুহূর্তে কেরল গ্রেসের নেতৃত্বের মধ্যে একটা তীব্র মত-রোধ দানা পাকিয়ে উঠেছিল। সম্মেলন রু হবার সময় অবশ্য সে-বিরোধটা গশ্যে দেখা দেয়নি; কারণ, ইতিমধ্যে মূল নটা অনেক সহজ ক'রে নেওয়া হ'য়ে-ল।

বিরোধটা দেখা দিয়েছিল নীতিগত প্রশ্ন নিয়ে। অতি সম্প্রতি কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা দিল্লীতে একটা মত প্রকাশ ক'রেছিলেন যে, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে কংগ্রেস কোন কোন ক্ষেত্রে অপর দলের সংগে কোয়ালিশন করতে পারে। অবশ্যই সে-দলের আদর্শগত নীতির সংগে কংগ্রেসের মূলগত বিরোধ না থাকলেই এই রকম কোয়ালিশন সম্ভব হতে পারে। কংগ্রেস সভাপতির এই মন্তব্যের মধ্যেই হয়ত সেই প্রশ্নটা উঠেছিল কোট্টায়ামে। অর্থাৎ অপর দলের সংগে (যথার্থভাবে গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী দলের সংগে) হাত মিলিয়ে কেরলে বর্তমানে যে কম্যুনিস্ট প্রভাবিত সাতদলের যুক্তফ্রণ্ট সরকার আছে, তার সংগে রাজনৈতিক মোকাবিলা করা।

সাধারণভাবে প্রশ্নটা হয়ত উঠত না; বিশেষ ক'রে কেরলে। কারণ, গত নির্বাচনে বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করতে না পারলেও তাদের একক শক্তি কোনমতেই নগণ্য ছিল না। বরং একক দল হিসাবে পশ্চিম বাংলার মত বিভিন্ন রাজ্যে নিজস্ব শক্তি ছিল সব চাইতে বেশী। কিন্তু কেরলে কংগ্রেস একান্তভাবে একটি নগণ্য সংখ্যালঘিষ্ঠ দল হিসাবেই পরিগণিত হ'য়েছিল। কেরলে এমন কোন অবস্থা দেখা দেবার সম্ভাবনা ছিল না, যাতে কোনভাবে যুক্ত-ফ্রণ্ট সরকারকে বিব্রত করা সম্ভব হ'তে পারে। কাজেই অন্য দলের সংগে (কেরলের ক্ষেত্রে অ-কম্যুনিস্ট দলের সংগে) কোয়ালি-শন করা বা না-করার প্রশ্নটা খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে না। কিন্তু রাজ-নৈতিক অবস্থার হয়ত কিছুটা পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে অনুমান করেই বিতর্কটা তোলা হ'য়েছিল কোট্টায়ামে।

কোট্টায়াম অধিবেশন বসেছিল কেরলের বিভিন্ন শহরে পৌরনির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হবার ঠিক পরেই। এই পৌর-নির্বাচন হ'য়েছিল রাজ্য বিধানসভার ভোটার তালিকার ভিত্তিতে। পৌর প্রতিষ্ঠানে কংগ্রেস অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ ক'রেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন কালিকট পৌর প্রতিষ্ঠানে, কংগ্রেস সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এই নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরোধিতা করেছিল যুক্তফ্রণ্টের সাতটি দল। হয়ত এই কারণেই কেরলের মুখ্যমন্ত্রী মার্ক্সিস্ট . কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ বলেছিলেন যে, তিনি এই পৌর নির্বাচনের রায় গ্রহণ করবেন। কথাটা কি অর্থে বলেছিলেন, তা অবশ্য খুব স্পষ্ট নয়; কিন্তু কংগ্রেস মহলে এই ধারণাই হ'য়েছিল যে, পৌরনির্বাচনের রায় মেনে নিয়ে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রণ্ট থেকে স'রে দাঁড়াবে, অথবা নেতৃত্ব-ভার ছেড়ে দেবে। এমনকি, একটা কথাও রটে গিয়েছিল যে, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রণ্ট থেকে বেরিয়ে আসবে।

কিন্তু ধারণাটা ছিল নিতান্তই ভিত্তি-হীন। হয়ত সে-কারণে কংগ্রেস মহলে কিছু গুঞ্জন উঠেছিল। তবে আশাভঙ্গ হ'য়েছিল অন্য কারণে। সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির কেরল সংগঠনে যে প্রত্যক্ষ ফাটল দেখা দিয়েছে, তা থেকেই কংগ্রেস মহলে দেখা দিয়েছিল উল্লাস। সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির এই ভাঙ্গনের মূল কথাটা বর্তমান রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে জানা প্রয়োজন।

এই ভাঙ্গনের মূলসূত্র এস-এস-পির জাতীয় কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, কচ্ছ প্রশ্নে জনসংঘের সংগে হাত মিলিয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন জোরদার করতে হবে। তাছাড়া এ-ও সিদ্ধান্ত ছিল যে, এই সত্যাগ্রহে এস-এস-পি নির্বাচিত সকল মন্ত্রীকে পদত্যাগ করে সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত কেরল সংগঠনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। বিশেষ করে কেরলের এস-এস-পির যে- অংশের সংগে

আগে প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টির যোগাযোগ ছিল। এই অংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে কেরল শাখার কার্যনির্বাহক কমিটিতে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, জাতীয় নেতৃত্বের নির্দেশ সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টিকে জনসঙ্ঘের রাজনৈতিক প্রভাবের মধ্যে ঠেলে দেবে। কারণ, কচ্ছ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে জনসঙ্ঘের সত্যাগ্রহীদের ভীড়ে এস-এস-পির রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যাবে। সেজন্য এস-এস-পির কেরল শাখার সভাপতি শ্রীচন্দ্রশেখর ঘোষণা করেন যে, তাঁর সংগঠন কচ্ছ সত্যাগ্রহে যোগদান করবে না এবং মন্ত্রিসভায় তাদের নির্বাচিত সদস্যরা পদত্যাগ করে বেরিয়ে আসবে না। তাছাড়া আরও একটি কারণে কেরল শাখা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ মানতে অসম্মত ছিল। সেটা হিন্দীভাষা সম্বন্ধে এস-এস-পির অনমনীয় মনোভাব। কেরল রাজ্যে হিন্দী সম্বন্ধে একটা তীব্র বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেরলের বিভিন্ন জায়গায়, এমন কি বাসেও নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে 'হিন্দী ভাষা ব্যবহার নিষিদ্ধ'।

এই সব কারণেই এস-এস-পির কেরল শাখার সিদ্ধান্ত কেরলের জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হতে পারে বলেই, শ্রীচন্দ্রশেখর সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করেন, তাদের দল জাতীয় সংগঠন থেকে পৃথক হয়ে যাবে। আজ এই দলকে কেরল এস-এস-পি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে, জাতীয় নেতৃত্ব কেরল শাখার সিদ্ধান্তকে দলগত শৃঙ্খলাভঙ্গের দৃষ্টান্ত বলে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। কোট্টায়মে কংগ্রেস অধিবেশন বসার কিছুদিন আগে এস-এস-পি নেতা শ্রীরামসেবক যাদব কেরল গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে গিয়ে কেরল শাখার কিছুটা উদ্ধার করেছেন সংখ্যালঘু অংশকে নিয়ে এবং এই অংশের নেতা হিসাবে শ্রীআবুকে ভার দেন কেরল শাখাকে পুনর্গঠন করার জন্য। শ্রীআবু কেরল বিধানসভায় এস-এস-পি সদস্যদের ১৯ জনের মধ্যে ৮ জনকে নিয়ে একটি বিশেষ দল হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের কাছে দাবী করেন যে, 'দলত্যাগী' মন্ত্রী দুজনকে বাতিল করে তাঁর দলের থেকে মন্ত্রী নিয়োগ করা হোক। শ্রীযাদবও কেরল ছাড়ার আগে শ্রীনাম্বুদ্রীপাদকে জানিয়ে দেন যে, তিনি যদি 'দলত্যাগী' মন্ত্রীদের সরিয়ে না দেন তাহলে এস-এস-পিকে নূতন করে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করে দেখতে হবে।

শ্রীযাদব অথবা শ্রীআবু কেউই বলেন নি যে, তাঁদের অংশ যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে আসবে। যুক্তফ্রন্ট থেকে হয়ত এখনই বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়, কারণ, তার রাজনৈতিক ঝুঁকি অনেক বেশী। কিন্তু এই অবস্থাটা মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট নেতা

শ্রীনাম্বুদ্রীপাদের জানা আছে বলেই তিনি এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কোন আগ্রহ দেখান নি। ফলে আজ এস-এস-পির দুটি অংশই যুক্তফ্রণ্টের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে এবং বিচ্ছিন্ন হবার আপাততঃ কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য, এটা ঠিক যে, কেরলের এই পরিস্থিতি এস-এস-পির নেতৃত্ব ভাল চোখে দেখছেন না, এবং বোম্বাইতে এস-এস-পি মহলে এই কথাটাই প্রতিধ্বনিত হতে শোনা গিয়েছে যে, কম্যুনিস্টরা যদি দলগত শৃঙ্খলাভঙ্গ করা উৎসাহিত করে তাহলে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করা অবাঞ্ছনীয় হবে না। শুধু তাই নয়, ক্রমাগত এস-এস-পি মহলে, এবং বিশেষ করে বোম্বাই সংগঠন থেকে একটা চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা হচ্ছে কম্যুনিস্ট-বিরোধী সোশ্যালিস্ট ক্যাম্প গড়ে তোলার জন্য। এই দাবী জাতীয় নেতৃত্ব কতটা গ্রহণ করবে বা করতে পারে সেটা এখনও স্পষ্ট নয়; কিন্তু কম্যুনিস্টদের সম্বন্ধে এস-এস-পির মনোভাব ক্রমেই পরিবর্তনের পথে যাবার সুযোগ খুঁজছে।

এটা অজানা ছিল না বলেই কেরলে এস-এস-পির ভাঙ্গনটা কংগ্রেস মহলে কিছুটা আশার সঞ্চার করেছিল। কেরলে কংগ্রেস নেতৃত্বের ধারণা ছিল যে, এস-এস-পির ভাঙ্গনের সুযোগ নিয়ে যদি যুক্তফ্রণ্টকে এলোমেলো করে দেওয়া যায়, তাহলে পৌর-নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়লাভকে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পূর্বাভাস হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব। তাছাড়া, আশান্বিত হবার আরও একটা কারণ দেখা দিয়েছিল পৌরনির্বাচনে। এই নির্বাচনে কংগ্রেস এবং কংগ্রেস ছেড়ে আসা কংগ্রেসীদের সংস্থা কেরল কংগ্রেসের মধ্যে একটা নির্বাচনী বোঝাপড়া হয়েছিল। অনেকের ধারণা এই বোঝাপড়ার ফলেই পৌরনির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য লাভ সম্ভব হয়েছে।

এই রাজনৈতিক ধারণার ফলেই কোট্টায়াম অধিবেশন বসার পূর্বমুহূর্তে কেরল কংগ্রেস নেতৃত্বের এক অংশ থেকে দাবী করা হয় যে, রাজনৈতিক সম-ধর্মী দলের সঙ্গে কংগ্রেসের সমঝোতা করার অধিকার স্বীকার করে নিতে হবে। এই সমঝোতা নিশ্চয় রাজনীতি হিসাবে মূলগত প্রশ্ন। তবু, পশ্চিমবাংলায় যদি যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতন ঘটার পর কংগ্রেস সমর্থিত এবং অবশেষে কংগ্রেস সংযুক্ত পি-ডি-এফ মন্ত্রিসভা কায়েম হতে পারে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে, তাহলে কেরলেই বা সেইরকম অবস্থা সৃষ্টি করার সুযোগ দেওয়া হবে না কেন? এই প্রশ্ন তুলেছিলেন কেরল কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা (সর্বভারতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন জেনারেল সেক্রেটারী) শ্রীমাধবন নায়ার এবং তাঁর সমর্থকরা। তাঁরা বিভিন্ন সম-ধর্মী দলের সঙ্গে আঁতাত করার ক্ষমতা গ্রহণ করার দাবী জানিয়েছিলেন।

এই দাবীর বিরোধিতা করেছিলেন কেরল প্রদেশ কংগ্রেসের মূল নেতৃত্ব। বিরোধিতা করার মূল কারণ ছিল কেরলে কংগ্রেসের অতীতের অভিজ্ঞতা। ১৯৫৮-৬০ সালে কেরলের শ্রীনাম্বুদ্রীপাদের নেতৃত্বে গঠিত কম্যুনিস্ট সরকারের পতন ঘটাবার জন্য কংগ্রেস বিভিন্ন দলের সঙ্গে আঁতাত করে। ফলে পরবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস বিভিন্ন দলের সমর্থনে সরকার পরিচালনের ভার পায়। কিন্তু এই আঁতাতের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে দেখা যায় পাঁচ বছরের মধ্যে কেরল কংগ্রেস দু টুকরো হয়ে গেল। শ্রীশঙ্করের নেতৃত্বের বিরোধীগোষ্ঠী কেরল কংগ্রেস হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এবং তা-ই নয়, ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের (কেরল কংগ্রেসেরও) শোচনীয় পরাজয় ঘটে গেল। তার আগেকার মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর কংগ্রেস এবং কেরল কংগ্রেসের মধ্যে আঁতাত করে সরকার গঠনের প্রশ্ন যখন ওঠে, তখন কেরলের কংগ্রেস নেতা শ্রীআব্রাহাম (বর্তমানে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য) তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজও কেরল কংগ্রেসের সঙ্গে কোনরকম আঁতাত করতে রাজী ছিলেন না।

তা ছাড়া কেরলের কংগ্রেস নেতৃত্ব মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের অভিযোগ নেতৃত্ব মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের অভিযোগ সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ অভিযোগ করেছেন যে, কংগ্রেসের কোট্টায়াম অধিবেশনে তাঁর যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে গদিচ্যুত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শ্রীআব্রাহাম, শ্রীঅতুল্য ঘোষ। শ্রীঅতুল্য ঘোষ এমনও বলেছেন যে, যদি রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা ওঠে তাহলে তিনি তা প্রতিরোধ করবেন সর্বশক্তি দিয়ে। দুই নেতাই বলেছেন, যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে হঠাবার কোন পরিকল্পনা নেই। অবশ্য কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বলেছেন যে, এই অধিবেশন কম্যুনিস্ট ও সাম্প্রদায়িক (মুশ্লিম লীগ) শক্তি প্রভাবিত অ-গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটাবার 'প্রারম্ভের প্রারম্ভ'। এটা কোন কোন মহলে অন্যভাবে গৃহীত হতে পারে বলেই কেরল বিধানসভায় কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীকরুণাকরণ বলেছেন, এটা পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে মোকাবিলা করার প্রস্তুতি।

তবু প্রশ্ন ওঠে, তাহলে পৌরনির্বাচনে কংগ্রেস কেরল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল কেন? বিশেষ করে যে কেরল কংগ্রেসের নেতাদের উপর কংগ্রেসের শৃঙ্খলা-ভঙ্গের অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এখনও চালু আছে। এই কথাটা পরিষ্কার করতে গিয়ে শ্রীআব্রাহাম বলেছেন যে, পৌরনির্বাচনে আনুষ্ঠানিকভাবে কেরল প্রদেশ কংগ্রেস কেরল কংগ্রেসের সঙ্গে কোন নির্বাচনী আঁতাত করে নি। যে সমঝোতা হয়েছিল, তা নিতান্তই স্থানীয় সংগঠনের দায়িত্বে এবং স্থানীয় রাজনৈতিক কারণে। শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলেছিলেন, পৌরনির্বাচনে প্রদেশ কংগ্রেস কোন সিদ্ধান্ত নেয় না, বিরোধ না উঠলে। জেলা সংগঠনগুলোই এইরকম নির্বাচন পরিচালনা করে এবং তাদের সুবিধা মতই কোন কোন আসনে কংগ্রেস কেরল কংগ্রেসের প্রার্থীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নি।

এই সহজ যুক্তিটা সামনে তুলে না ধরলে কোট্টায়মের অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তার বিরুদ্ধে একটা অংশ প্রবল চেষ্টা করত। এই প্রস্তাবে দলগত-ভাবে কোন সম-ধর্মী দলের সঙ্গে কংগ্রেসের আঁতাত করার কোন কথা উল্লেখ করা হয় নি, অর্থাৎ গৃহীত হয় নি। প্রস্তাবে এটাই বলা হয়েছে, সমগ্র জনসাধারণের সঙ্গে কংগ্রেস আঁতাত করে একটি নূতন অধ্যায় সূচনা করবে যার ফলে কম্যুনিস্টদের এবং সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোকে পরাস্ত করা সম্ভব হবে। আর যেসব দল কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্মসূচীর প্রতি আস্থাশীল তাদের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবে বলা হয়েছে, তাদের উচিত কংগ্রেসের সংগঠনে যোগদান করে কম্যুনিস্ট এবং সাম্প্রদায়িক শক্তি-বিরোধী সংগঠনকে সুদৃঢ় করা।

কোন দল বা গোষ্ঠীর উল্লেখ করা হয়নি প্রস্তাবে। কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কেরল কংগ্রেসকে সামনে রেখে যুক্ত-ফ্রণ্টের কম্যুনিস্ট বিরোধী দল বা উপদলের উদ্দেশ্যেই এই আহ্বান। কেরল কংগ্রেস সম্বন্ধে হয়ত কোন অসুবিধা হবে না, কারণ তাদের উপর যে নিষেধাজ্ঞা আছে তা তুলে নেবার ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। তবে এস-এস-পি সম্বন্ধে আশাভঙ্গ হয়েছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু কোট্টায়াম প্রস্তাবের একটা বৃহত্তর দিকও আছে। সেটা পশ্চিমবাংলা সম্বন্ধে। এই প্রস্তাবের যদি কোন বৃহত্তর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকে, তাহলে তা নিঃসন্দেহে পশ্চিমবাংলার লোক দল-এর মত দলের প্রতি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। লোক দলের কাছে যদি পশ্চিমবাংলা কংগ্রেসে যোগদানের জন্য কোন আহ্বান জানান হয়ে থাকে, তাহলে কোট্টায়াম প্রস্তাব তার সবিশেষ প্রতিবিম্ব। তা ছাড়া পশ্চিমবাংলা কংগ্রেসও দলগতভাবে কোন সমধর্মী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাতের বিরোধী।

তাই কোট্টায়াম অধিবেশনে শ্রীঅতুল্য ঘোষের উপস্থিতি রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য।

বৈদেশিকী

দুই জার্মেনী

ভিয়েতনামের পালা যদি কখনও শেষ হয়, শেষ না হোক, যদি ঝিমিয়ে পড়ে, তখন বোধ হয় আবার জার্মেনীর পালা শুরু। এশিয়া থেকে ইউরোপ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জলাজঙ্গল থেকে ইউরোপের হৃৎপিণ্ড জার্মেনীর অর্থ অনর্থের ভয় ও ভাবনা তো অনেক বেশী। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, এশিয়ার অশান্তি এ-কালের ইতিহাসের একটা উপসর্গমাত্র, পৃথিবীর ভাগ্য আগেও যেমন এখনও তেমনই নির্ভর করছে ইউরোপের সুস্থতার ওপর। ইউরোপের অন্তঃস্তল আপাতত সুস্থ নয়, সুস্থ হতে পারেনি। তার কারণ জার্মেনী বিভক্ত, আর পশ্চিম এবং পূর্ব দুই জার্মেনীতেই অসুস্থতার লক্ষণ প্রকট। আরও আশ্চর্য, দুই জার্মেনীর রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে ইদানীং যেন সমান্তরালভাবে গণতন্ত্রবিরোধী শক্তির মহড়া চলছে। বার্লিনের প্রাচীরটা অবশ্য মায়া কিংবা মরীচিকা নয়, পূর্ব জার্মেনীর কম্যুনিস্ট শাসনের প্রচণ্ড প্রতীকটির তাৎপর্য কারো অজানা নেই। কিন্তু প্রাচীরের পশ্চিম দিকে যেখানে গণতন্ত্রী শাসনের ঠাটবাট প্রতিশ্রুতি সবই বিধিমত সেখানকার অবস্থাও খুব ভরসাদায়ক নয়। কেউ কেউ বলতে পারেন জার্মেনীর দেহ দ্বিখণ্ডিত হলেও তার আত্মা অভিন্ন আর সে-আত্মার আত্মীয়তা আগের মত এখনও স্বৈরতন্ত্রী জবরদস্ত শাসনের সঙ্গে। সাম্প্রতিক কালে তার একাধিক নিদর্শন দুই জার্মেনীতেই।

পূর্ব জার্মেনীর একদলীয় শাসনের জবরদস্ত ব্যবস্থায় তো জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারের নামগন্ধ নেই। কম্যুনিস্ট ইউরোপে যে নতুন হাওয়া বইছে পূর্ব জার্মেনীতে তার রেশমাত্র পৌঁছতে পারেনি। পূর্ব জার্মেনীতে সম্প্রতি নতুন সংবিধান প্রবর্তিত হয়েছে; গণভোটের অভিনয় মারফত এই সংবিধান গৃহীত হলেও সংবিধানের বিধিনিষেধ গণ-তান্ত্রিক অধিকার আগের চেয়েও খর্ব করেছে। নতুন সংবিধানের পক্ষে যথারীতি বিপুল গণভোট! তবু চার লাখ লোক যে নতুন সংবিধানের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল সেটা নিতান্ত কম নয়। এ-দিকে পশ্চিম জার্মেনীতেও সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থা অনেক দূর এগিয়েছে। আপৎকালীন প্রয়োজনের অছিলায় এমন নিয়মকানুন রচিত হচ্ছে যেগুলি চালু হলে পশ্চিম জার্মেনীতে পার্লামেণ্টারী শাসন যে কোন সময়ে খতম করা যেতে পারে। এরই বিরুদ্ধে পশ্চিম জার্মেনীতে সম্প্রতি বামপন্থী যুব ছাত্র সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ। বিক্ষোভকারীদের ঘোষণা, জার্মেনীর ইতিহাসে দ্বিতীয়বার পার্লামেণ্ট অচল করা হবে, ডিক্টেটরী শাসনের পথ খুলে দেওয়া হবে, এমন ব্যাপার তারা চুপ করে সইবে না।

পশ্চিম জার্মেনীতে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সত্যিই এখনই বিষম বিপন্ন হয়েছে কি না সে কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে, আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থাটি সম্পর্কে জার্মানরা অনেকেই সন্দিহান। যুদ্ধাবস্থা দেখা দিলে আপৎকালীন বিধিনিষেধ চালু করায় কারো আপত্তি থাকতে পারে না। আপত্তি উঠছে এ-কারণে যে, আপাতত কোন যুদ্ধের আশঙ্কা নেই; যুদ্ধের আশঙ্কার যুক্তির চেয়েও মারাত্মক অছিলা 'আভ্যন্তর বিপদ' এবং তার সঙ্গে মোকাবিলার জন্য পার্লামেণ্টারী শাসনের স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক বিধান বরবাদ করার ব্যবস্থা। এই 'আভ্যন্তর বিপদ'কে ব্যাখ্যা করে বলা হচ্ছে 'উত্তেজনাকর পরিস্থিতি' ঘটলেই আপৎকালীন বিধিনিষেধ চালু হবে। তখন সব রকম নাগরিক অধিকার বাতিল; আপৎকালীন শাসন পরিষদের কর্তারা যা হুকুম করবেন তাই নির্বিচারে মান্য করতে হবে।

সোস্যাল ডেমক্রাটরা যত দিন পার্লামেণ্টে বিরোধী দল ছিল ততদিন তারা এই গণতন্ত্রবিরোধী আইন পাশ করার বিরোধিতা করেছে। এখন খৃষ্টান ডেমক্রাট ও সোস্যাল ডেমক্রাটদের 'গ্র্যাণ্ড কোয়ালিশন', তার মানে সোস্যাল ডেমক্রাটদের মুখ বন্ধপ্রায়। কিছু বামপন্থী সোস্যাল ডেমক্রাট আর ফ্রী ডেমক্রাটরা বিরোধিতা করছেন, কিন্তু তাতে সম্ভবত বিল পাশ হওয়া ঠেকানো যাবে না। পার্লামেণ্টের বাইরে শ্রমিক ও ছাত্র সংগঠন, উদারপন্থী বুদ্ধিজীবি, লেখক অধ্যাপক ইত্যাদি অনেকেই গণতন্ত্র-বিধ্বংসী সংবিধান-সংশোধন চেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাচ্ছেন। তবে তাতেও শেষরক্ষা করা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। আগামী বছর সাধারণ নির্বাচনের পর খৃষ্টান ডেমক্রাট দল নতুন নাৎসীপন্থী ন্যাশনাল ডেমক্রাটদের সঙ্গে জোট বেঁধে বিল পাশ করিয়ে নিতে পারবে মনে হয়।

এই নতুন নাৎসীপন্থী ন্যাশনাল ডেমক্রাট দল পশ্চিম জার্মেনীর রাজনীতিতে সম্প্রতি বেশ কিছু সাফল্য দেখিয়েছে। ব্যাডেন-ওয়ার্টেমবুর্গ রাজ্যের আঞ্চলিক আইনসভার সদস্য নির্বাচনে এরা ভোট পেয়েছে চার লাখ, এদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে বারোজন। এই দলের আঞ্চলিক শাখার চেয়ারম্যান একজন প্রাক্তন নাৎসী, নাৎসী আমলে ইহুদীদের উপর অত্যাচার করার অপরাধে কিছুকাল আগে এঁর কারাদণ্ড হয়েছিল। তিনি এবং তাঁর ন্যাশনাল ডেমক্রাট দল জনসাধারণের এক অংশের আস্থা অর্জন করতে পেরেছেন সন্দেহ নেই। এই নতুন নাৎসীপন্থী ন্যাশনাল ডেমক্রাট দলের জন্ম মাত্র দু বছর আগে। দু বছরের মধ্যেই এই দল ১২টি আঞ্চলিক পার্লামেণ্টের মধ্যে ৭টিতে নির্বাচিত প্রতিনিধি পাঠাতে পেরেছে। আগামী বছর কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের সাধারণ নির্বাচনে এই নতুন নাৎসীপন্থী দল আরও এগিয়ে যাবে।

খৃষ্টান ডেমক্রাট দলনেতাদের বিশ্বাস নতুন নাৎসীপন্থী দল আগামী বছর সাধারণ নির্বাচনে বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না। পারলেও খৃষ্টান ডেমক্রাট দলের তাতে খুব ভাবনার কারণ নেই। এই দলই পার্লামেণ্টারী গণতান্ত্রিক শাসনকে আপৎকালীন বিধি-নিষেধের বেড়াজালে বাঁধতে উদ্যোগী। প্রয়োজন হলে নতুন নাৎসীপন্থী দলের সঙ্গে জোটবন্ধনেও খৃষ্টান ডেমক্রাট দলের আপত্তি নেই। নতুন নাৎসীপন্থী ন্যাশনাল ডেমক্রাট দলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে মার খাচ্ছে সোস্যাল ডেমক্রাটরা। ব্যাডেন-ওয়ার্টেমবুর্গের আঞ্চলিক নির্বাচনে নাৎসী-পন্থী ন্যাশনাল ডেমক্রাটরা যেমন এগিয়ে গেছে তেমনই সোস্যাল ডেমক্রাটরা আসন হারিয়েছে দশটি, তাদের মোট ভোটের সংখ্যা কমেছে শতকরা আট ভাগ। খৃষ্টান ডেমক্রাটদের সঙ্গে গ্র্যাণ্ড কোয়ালিশনের ফলটা জনপ্রিয়তার নিরিখে সোস্যাল ডেমক্রাটদের পক্ষে লাভজনক হয়নি।

অনেকের আশঙ্কা আবার সেই হবাইমার রিপাবলিকের অন্তিমক্ষণের আলো আঁধারি অবস্থা দেখা দিয়েছে। ভাঙা জার্মেনীকে জোড়া দেওয়ার ধুয়ো তুলে নতুন নাৎসীপন্থী দ্বারা জন-উন্মাদনা সৃষ্টির চেষ্টা অসম্ভব নয়। বিভক্ত ইউরোপে তার প্রতিক্রিয়া অবশ্য প্রবল হবে; ইউরোপের পূর্ব এবং পশ্চিম খণ্ডে বহু লোক জার্মেনীতে উগ্রজাতীয়তাবাদী শক্তি প্রতিষ্ঠিত হলে সন্ত্রস্ত, বিচলিত হবে। চুরাশি বছরের জ্ঞানবৃদ্ধ জার্মান দার্শনিক কার্ল ইয়াস্পার্স আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন পশ্চিম জার্মেনীতে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র বাতিল হওয়ার পথে, শেষ পর্যন্ত কোন রকম ডিক্টেটরী শাসনই আবার চেপে বসবে। ১৯৩১ সালে অর্থাৎ জার্মেনীতে নাৎসীরা ক্ষমতা দখলের দু বছর আগে কার্ল ইয়াস্পার্স ঠিক এ-রকম ভবিষ্যদ্বাণী করে-ছিলেন।

১৩।৫।৬৮

ভিন্ন গ্রীষ্ম

কেতকীকুশারী ডাইসন

খরা নয়, খরা নয়, গরীয়ান গ্রীষ্মের দিন.
দিন যায়, রাত যায়, সুলক্ষণ, সর্বাঙ্গসুন্দর।

তাপ, তা-ও উপভোগ্য. যেমন শারীরিক সুখ,
বৈপরীত্য-রমণীয়, সান্ধ্য গাহনের গুণে:
কি সহনীয় মনে হয় সামান্য গুমট,
ললাটের স্বেদবিন্দু,
যখন পাতাদের সহস্র ঘূর্ণাবর্তে পাক খেয়ে খেয়ে
ছুটে বেরিয়ে যায় এক স্রোত হাওয়া.
প্রকৃতির একান্ত আপন হাতপাখা
আদরে উদ্বেল করে কার্পাস বস্ত্রের বুনট।

এ মোদিত গ্রীষ্মে নেই প্রেত শস্যচ্ছায়া.
চৌচির মৃত্তিকার অভিশাপ.
বা মুমূর্ষু গৃহপশুদের তিতিক্ষু দৃষ্টি.
বরং আমন্ত্রণ করে আসন্ন আহরণোৎসব
দিকে দিকে পূর্ণবৃক্ষ প্যাটল ফলভারনত:
কদাচিৎ কুমারসম্ভবোচিত অরণ্যে,
যেখানে সমুন্নত চিরহরিৎ.
চিরলুপ্ত যার কিরাতবৃন্দ—যাদুঘরে সমর্পিত মৃগয়ার বেশ—
অসতর্ক ধূমপায়ীর নিক্ষিপ্ত শলাকা থেকে জাগে
দাবাগ্নি।
অথবা দিন শেষে নেমে আসে বনভোজনের তাঁবুতে
ভল্লুক পিপাসা-পাগল, দিশাহারা-থাবা।

প্রতি সন্ধ্যায় কাঁদে মার্ক প্রতিবেশীর তিন বছরের ছেলেটি,
অভিমানে, অনুনয়ে আক্ষেপে আকুল আবদারে.
সে জানে না এ গ্রীষ্মে কাগজে কি কি খবর—
স্বরাজ্যের শতবার্ষিকী মধ্যপ্রাচ্য জাতিবিরোধ
দুর্ভিক্ষ দূরে ভারতবর্ষে, বা ভিয়েৎনামের কুরুক্ষেত্র—

কিন্তু আলোর পাল-তোলা সংহতযৌবন অস্তাকাশকে ছেড়ে
সে চায় না পর্দা-টানা শয্যাগৃহে যেতে.
অথচ তার আস্কন্ধ-খড়রঙ চুল আর্টিস্ট মায়ের
সময় নেই তাকে খেলা দেবার, চাই কফির অবকাশ।
তার কান্নায় আমার মনে পড়ে নিজের শৈশব.
যখন বাংলার গ্রীষ্মের বোল-ধরা গভীর গভীর দুপুরে
প্রচণ্ড অনীহা ছিলো মাতৃ-আদিষ্ট দিবানিদ্রায়,
বরং যেখানে জাগ্রত চিল, ঘুঘু, পিঁপড়ে বা মুরগি,
সেখানেই মনে হতো আদিগন্ত অ্যাড্‌ভেঞ্চার।
আশ্চর্য এক যাচ্ঞা,
বালক চায় সে যাকে ভাবে বয়স্কের সাংঘাতিক স্বাধীনতা—
মিষ্টান্নের চেয়ে লোভনীয়—
বয়স্ক ফিরে তাকায় তার স্মৃতিসঞ্চারী
চিন্তাহীন অভিলাষমুকুলিত দুর্বার বাল্যের দিকে:
এ গ্রীষ্মের উপযুক্ত মার্কের বুভুক্ষু কান্না

তবু বিদায় হবে এ গ্রীষ্ম-ও।
এখনই, এই দীর্ঘদ্যুতি দিনের মধ্যেই,
কোথাও ঘনীভূত হচ্ছে গুরুভার মেঘপুঞ্জ,
তার সেতারের কান মোচড়াচ্ছে,
টোকা মারছে তার তবলায়.
যেদিন সে আসরে নামবে সেদিনের সকালে
দিগন্তে সিংহাসনচ্যুত হবে নীল গিরিশ্রেণী,
মুছে যাবে আকাশের স্লেট থেকে
যেন কখনোই কেউ তাকে আঁকেনি
আর দিনভর নতুন সম্রাটকে সম্মান
শায়িতপ্রায় স্নিগ্ধ-আঁখি পুষ্পকাননে
তারপর রাত্রির অন্ধকারে সন্তর্পণে নড়ে উঠবে মৃদু বৃষ্টি.
প্রাথমিক, পরীক্ষামূলক,
গর্ভস্থ শিশুর প্রথম অঙ্গসঞ্চালনের চেষ্টার মত।

শ্রমিকের উক্তি

শ্রীবিজয়া মুখোপাধ্যায়

অন্ধকারে প্রতিদিন সুদীর্ঘ বহন
কুণ্ঠিত নীরন্ধ্র ভার
শুধু ধ্যান মেলে রাখা অভ্যন্তরে—
কক্ষপথে যদি ফোটে আলো
কোনদিন যদি দেখি আলো
কোনদিন যদি দেখি ব্যক্তিগত কামনার সার
অলৌকিক আকাঙ্ক্ষাপ্রতিমা

প্রতীক্ষাপোষণ দীর্ঘদিন
শুধু দীর্ঘদিন
পরিপার্শ্ব—প্রকৃতি অধীন
হৃদয়, বিশাল ইচ্ছা, স্বাধীনতা, নিয়মবিদ্রোহ।
স্নিগ্ধ সব মোহ

চলে গেছে দূরে কোন চিকণ আশ্রয়ে
সুসময়ে।

এখন শুধুই ধরে থাকা
সন্তর্পণে রাখা
খাঁচার ভেতরে পাখি
তার অভিমান
উত্তাপ সন্ধান
নিহিত সন্ধির শর্তে যত্নে বাঁধা আঁখি।

অন্ধদৃষ্টি স্নেহের ক্ষরণ যদি পাপ
অর্থহীন শূন্যহাতে ধরে রাখা
আশ্রিত সন্তাপ।

'দাদা ঠাকুর'

দাদা ঠাকুর 'বিদূষক' কাগজ বের করেছিলেন। আর বিদূষক বিশেষণটা টেনে নিয়েছিলেন নিজের ওপর।

কিন্তু কেমন বিদূষক ছিলেন তিনি? সেই সংস্কৃত-সাহিত্যের রাজার প্রগল্‌ভ পারিষদ যাঁরা ছিলেন, তিনি কি সেই দলের? মোদক ভোজনে যাঁরা সুপটু, রানীর দাসীর সঙ্গে কপট-কলহে যাঁরা সুচতুর, রাজার নিভৃত প্রণয়লীলায় সাহায্য করতে গিয়ে যাঁরা সব ভণ্ডুল করে বসতেন, যাঁরা চূড়ান্ত কাপুরুষ আর বচনে দিগ্বিজয়ী—দাদা ঠাকুর কি তাঁদেরই একজন? কিংবা তিনি শেক্‌স্‌পীয়রের সেই অমর স্যার ফল্‌স্টাফ্—পৃথিবীর সাহিত্যে যিনি সব চাইতে "Beloved Rogue"।

না—দাদা ঠাকুর সংস্কৃত নাটকের মাধব্য-মৈত্রেয় নন, তিনি ফল্‌স্টাফ্‌ও নন। তাঁর কথা ভাবলেই আমার রবীন্দ্রনাথের 'দা-ঠাকুর' 'ঠাকুর্দা'কে মনে পড়ে : "এই যে আমার মনের মানুষ দাদা ঠাকুর।" তিনি মূর্তিমান আনন্দ, তাঁর পাকা চুলে গিরিচূড়ার অম্লান তুষারের মতো চির-তারুণ্য, নিত্যকালের যৌবনকে ডাক দিয়ে তিনি এগিয়ে চলেন। আবার সত্যের শক্তিতে তিনি অমিতদীপ্তি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে খড়্গপাণি। তিনি বিদূষক নন—কোটিপতির নন—কারো পরিচর্যা করেন না—মাথা সোজা করে—নিজের পথ ধরে এগিয়ে চলেন। রবীন্দ্রনাথের 'দাদা ঠাকুর'কে বাস্তবে আমরা অনেকখানি দেখেছি জঙ্গীপুরের শরৎচন্দ্রের ভেতর। শ্রদ্ধেয় নলিনী-কান্ত সরকার বাঙালীর কাছে তাঁকে চিনিয়ে দিয়েছেন। উজ্জ্বল সপ্রাণ কৌতুকের বিদূষণাই তাঁর বিদূষকত্বের একমাত্র লক্ষণ—আর কোনো অর্থেই তিনি বিদূষক নন—ভাঁড় নন—ক্লাউনও নন।

তাঁকে প্রথম দেখি একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক-সাংবাদিকের বাসায়। হাওড়া স্টেশন থেকে হেঁটে এসে পৌঁছেছেন কৈলাস বসু স্ট্রীটে। খালি পা, মালকোঁচা করে পরা কাপড় হাঁটুর ওপর, গৌরবর্ণ রঙ রোদে তামাটে, পাকা চুল, পাকা গোঁফ, দীপ্ত চোখের দৃষ্টি। খালি গায়েই এসেছিলেন কিংবা উত্তরীয় গোছের কিছু একটা ছিল—মনে পড়ছে না।

সাহিত্যিক বললেন, 'হাওড়া স্টেশন থেকে যদি হেঁটেই এলেন, তা হলে জঙ্গীপুর থেকে বাকীটুকুই বা হেঁটে এলেন না কেন?

দাদা ঠাকুর অম্লান মুখে বললেন, 'তাও পারি।'

সেই বইয়ে ঠাসা আবছায়া ছোট ঘরটি তাঁর প্রাণের আলোয় ঝক ঝক করে উঠল দেখতে দেখতে। শুরু হল তাঁর গল্প। কথালাপের সঙ্গে যদি কথাশিল্পের ব্যুৎপত্তিগত যোগ থাকে—তা হলে সেদিক থেকে তিনি যে কত বড়ো শিল্পী—কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিচয় পাওয়া গেল তার।

যেমন একবার ট্রেনে চেপে দক্ষিণ ভারতে চলেছিলেন দাদা ঠাকুর। পথে এক সহযাত্রী উঠে তাঁর পাশে বসে দক্ষিণী ট-বর্গ যোগে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন।

দাদা ঠাকুর দমলেন না। পত্রপাঠ তিনি এই ধরণের একটা জবাব দিলেন : "এণ্ডা-কেণ্ডা-কট্টরু-গড্ডড়-কুট্টুস!'

দক্ষিণী ভদ্রলোকটিকে খুব বিস্মিত দেখা গেল। তিনি আবার ট-বর্গ সহকারে তাঁকে কিছু প্রশ্ন করলেন এবং অবিলম্বে দাদা ঠাকুর বললেন : 'কুট্টুরু-কুড়ুনুল-গড়্গড়-টরেটক্কা-করেণ্ডসম্!'

ভদ্রলোক এবার হাঁ করে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কোন্ ভাষায় কথা বলছ?'

দাদা-ঠাকুরের পাল্‌টা প্রশ্ন : 'তুমি কোন্ ভাষায় বলছ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি তামিল বলছি।'

দাদা ঠাকুর বললেন, 'আমি তো তেলেগু বলছি।'

'না—তুমি তেলেগু বলছ না।'

দাদা ঠাকুর বললেন, 'তুমিও তামিল বলছ না।'

ভদ্রলোক এবার চটে গেলেন : 'কী আমি তামিল বলছি না? জানো—তামিল আমার মাতৃভাষা?'

দাদাঠাকুর বললেন, 'জানো—তেলেগু আবার মাতৃভাষা?'

আরো চটে গেলেন ভদ্রলোক। বললেন, 'হতে পারে না। তেলেগু কখনো তোমার মাতৃভাষা নয়। তোমাকে দেখেই বুঝেছি, তুমি বাঙালী।'

দাদা ঠাকুর বললেন, 'তাই যদি বুঝেই

পিতেবাবু কি দাদা ঠাকুরকে গাড়ি চড়তে দেখেছেন? তবে এমন গাড়ি চড়তে বলছেন কেন?

থাক বাপু, ইংরেজিও যখন বলতে পারো—তখন কট্‌-কট্‌ করে মাতৃভাষা কেন চালালে আমার ওপর? তোমাদের ভাষা আমি জানি না—সেটা নিশ্চয় দুঃখের কথা, কিন্তু আমি বিদেশী—তোমাদের দেশে অতিথি—আমাকে এভাবে বিপন্ন করে কী লাভ হল তোমার? একেই কি ভদ্রতা বলে?'

হা-হা করে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। করযোড়ে ক্ষমা চাইলেন. তারপর দাক্ষিণী-হৃদয়ের সব ঔদার্য দিয়ে আপন করে নিলেন দাদা ঠাকুরকে—ট্রেনের কামরায় যথোচিত আতিথ্য দিয়ে অপরাধের প্রায়শ্চিত করলেন।

আর একবার তাড়াহুড়োয় গাড়িতে উঠে পড়েছেন। টিকেট কেনার সময় পান নি—সঙ্গে এক বিরাট ট্রাঙ্ক—তাও লাগেজ করা হয়নি। অথচ যথাকালে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান টিকেট-চেকার এসে পৌঁছেছেন গাড়ির কামরায়। কী করা? একেবারে টার্মিনাস থেকে চার্জ করবে যে!

মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। টিকেট-চেকার কাছে এসে দাঁড়াতেই, গাল বাঁকিয়ে আধ-খানা জিভ করে দাদা ঠাকুর নিপুণ, বোবা কালার ভঙ্গিতে বললেন, 'আ-বা-বা—'

'হোয়াট?'

'আ-বা-আঁ-কাঁউ-কাঁউ—'

'ডেফ্‌ অ্যান্ড্‌ ডাম্‌! আ—পুয়োর্‌ ফেলাহ্‌—' সহানুভূতির নিঃশ্বাস ফেলে কামরা থেকে নেমে গেলেন চেকার।

সেদিন প্রসন্ন আনন্দের যে বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন দাদা ঠাকুর, আমাদের বিরক্ত-ক্লান্ত জীবনে এমন দুর্লভ মুক্তি কচিৎ কখনো ঘটে। সেই এক দাদা ঠাকুর—যিনি মরা ঘাসে ফুল ফোটাতে পারেন, যিনি আমাদের বন্ধ-ঘরের সব দরজা-জানলা খুলে দিয়ে বয়ে আনতে পারেন বসন্তের বাতাস।

তাঁকে আর একবার দেখেছিলুম। একটু দূরে থেকে।

হ্যারিসন রোড-আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়। সন্ধ্যার মুখ। দুজন যুবক হাওড়া স্টেশনে যাওয়ার জন্য ট্যাক্সি ধরবার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। একটা ছোট স্যুটকেস্‌ তাঁদের একজনের হাতে।

তাঁদের পাশ দিয়ে হন হন করে হেঁটে যাচ্ছিলেন শরৎ পণ্ডিত। একবারের জন্যে থমকে দাঁড়ালেন।

'গাড়ির জন্যে কেন হেঁদিয়ে মরছ বাবা? কতটুকু রাস্তা আর হাওড়া স্টেশন—হেঁটে যাও, হেঁটে যাও। দাঁড়াতে শেখো নিজের পায়ে।'

যুবক দুটি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। বোধ হয় ভাবল, পাগল।

এই আর এক দাদা ঠাকুর।

হাসির রাজা আরো অনেকেই হয়তো আসবেন। কিন্তু নিজের পায়ে আমাদের ভর দিতে যাঁরা বলবেন, তাঁদের শেষ মানুষটিও বোধ হয় চলে গেলেন।

কবির সঙ্গে ইয়োরোপে ১৯২৬

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

॥ ১৩ ॥

মিঃ এলমহার্স্ট ৯ই আগস্ট আমাদের কার্বিস বে-তে পেঁছিয়ে দিয়ে একদিন থেকে এগারোই টটনেস ফিরে গেলেন।

তার আগের দিনই শ্রীযুক্ত মুকুল দে ও শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বোস আগে কিছু খবর না দিয়েই সেখানে এসে উপস্থিত। বাড়িতে আর বাড়তি ঘর নেই। এঁরা দুজনেই কবির পুরনো ছাত্র। কাজেই কবি নিঃসংকোচে খুব বকুনি দিলেন দুজনকে, এইরকম করে তাঁকে বিপদে ফেলবার জন্যে। কিন্তু এসে পড়েছেন যখন, তখন তো আর উপায় নেই। হাউস-কীপার তাদের নিজেদের দুখানা ঘরের মধ্যে একখানা ঘর এঁদের জন্যে ছেড়ে দিয়ে কবির দুশ্চিন্তা দূর করে, তবে নিশ্চিন্ত।

মুকুল দে তখন লণ্ডনে গরিব আর্টিস্ট, ছবি বিক্রি করেই তাঁকে খরচ চালাতে হয়। কবিকে তো সহজে মুঠোর মধ্যে পাওয়া যায় না। তাই এখানে চলে এসেছেন, এই সুযোগে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলো এচিং করে নেবেন বলে।

দূরদৃষ্টি আছে। এই এচিং, কবি যখন জার্মানীতে বক্তৃতা দেবেন, সেই সময়ে বিক্রি হবার খুবই সম্ভাবনা। সেই কল্পনাতেই খবর-বার্তা না দিয়ে সোজা চলে এসেছেন, পাছে জিজ্ঞাসা করতে গেলে কবি বারণ করেন আসতে।

পুরনো ছাত্ররা তাদের গুরুদেবের মেজাজ ভালো করেই জানে। প্রথমটা রেগে আগুন হবেন, তার একটু পরেই জল। বকুনি না-হয় একটু দিলেনই বা। ঠিক তাই হল। কবি প্রথমেই ঝেঁকে উঠে বললেন : তোরা কি আমাকে কোথাও একটু শান্তিতে থাকতে দিবি না? পালিয়ে চলে এলাম লণ্ডন থেকে, আর তোরা এখানেও পিছন পিছন ধাওয়া করে এসেছিস?

মুকুল খুব বিনীতভাবে বলল : গুরুদেব, আপনাকে একটুও বিরক্ত করব না। আপনি নিজের মনে কাজ করে যাবেন, আমি শুধু দূরে বসে বসে আপনাকে আঁকব। আপনাকে এইরকম নির্জনে তো সহজে পাওয়া যাবে না। ছবি আঁকবার এমন সুযোগ ছাড়ি কী করে?

একটু পরেই গুরুদেবের বিরক্তি কোথায় মিলিয়ে গেল। মুকুলেরও ছবি আঁকা শুরু হল।

চৌদ্দই আগস্ট দুপুরে টেলিগ্রাম এল যে, বীরেন দে সস্ত্রীক, প্রমোদ রায় ও প্রশান্তচন্দ্র মোটরে সন্ধ্যেবেলা পেঁছবেন ও রাত্রে ডিনার খাবেন আমাদের সঙ্গে। প্রতি দিনই আমরা একটু সকাল সকাল খাই, কিন্তু সেদিন কবি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রইলেন, ওঁরা এলে সবাই একসঙ্গে খাবেন বলে। শেষে রাত যখন প্রায় ন'টা বাজে, তখন আমরা খেতে বসলাম। কিন্তু সকলেরই খুব দুশ্চিন্তা, কেন এত দেরি হচ্ছে? মোটরে এতখানি পথ আসা, রাস্তায় কোনো দুর্ঘটনা হওয়া বিচিত্র নয়, কাজেই আশংকা হতেই পারে।

আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গেল, তবু যাত্রীদের কোনো চিহ্ন নেই। কবি কিছুতেই শুতে যেতে রাজী হলেন না। শেষে 'আরও একটু দেখি', 'আরও একটু দেখি' করতে করতে যখন রাত দুপুর পেরিয়ে গেল, তখন আর বসে থাকা চলে না। আমরা ধরেই নিলাম পথে একটা অঘটন কিছু ঘটেছে। আমাদের তো করবার কিছু নেই। সকলেই উদ্বিগ্ন মন নিয়ে যে যার ঘরে চলে গেলাম কিন্তু বাড়ির দরজাতে চাবি বন্ধ করা হল না, যাতে পথিকরা যত রাত্রেই আসুন, বাড়িতে ঢুকতে যেন অসুবিধা না হয়। এ বাসায় তো বিজলীবাতি নেই; মোমবাতিগুলো সন্ধ্যে থেকে জ্বলে জ্বলে প্রায় সারা হয়ে গেল। এক মুশকিল যে, শেষকালে অন্ধকারে হাতড়ে না বেড়াতে হয়।

সমস্ত বাড়ি নিষুতি হয়ে গেছে। সবাই ঘুমে অচৈতন্য। রাত প্রায় দুটো বেজেছে। এমন সময় ওঁরা এসে পেঁছলেন। শুনলাম, রাত বারোটা থেকে এরই কাছাকাছি ক্রমাগত ঘুরে বেড়িয়েছেন; কিন্তু কিছুতেই বাড়ি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। একেবারে গ্রাম-দেশ, রাস্তায়ও কাউকে পাবার উপায় নেই। শেষে

হওয়ার সমস্যাভঞ্জন হয়েছে।

গল্প শুনলাম ডেভনশায়ারের কুয়াশার। শুধু সৌন্দর্য দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলাম। মায়াবিনীর বিপদে ফেলবারও যে এমন ক্ষমতা আছে, তা কে জানত? ও'রা নাকি এই কুয়াশাতে অসহায় না হলে রাত ন'টার মধ্যেই এসে পৌঁছতে পারতেন। ওই গভীর বনের মধ্যে নীরন্ধ্র কুয়াশা। গাড়ির সামনে দু' হাতের বেশী আর কিছু দেখা যায় না। হেডলাইট জ্বালিয়েও কোনো লাভ নেই এমন অবস্থা। শেষে শামুকের গতিতে ধীরে ধীরে এগিয়ে রাত বারোটায় কার্বিস বে-তে পৌঁছে তারপরে আর বাড়ি খুঁজে পান না।

আমার স্বামী বললেন : ইংরিজী সাহিত্যে White mist-এর কথা পড়েছি, কিন্তু এইবারে সাক্ষাৎ পরিচয় হল এই বিপদের সঙ্গে। আজ যে পাহাড়ে রাস্তায় গড়িয়ে গিয়ে খানায় পড়ি নি, এই আমাদের অনেক ভাগ্য। দুর্গতি কপালে লেখা থাকলে ঠেকাবে কে?

কবি তো চিরকালই রাত তিনটে থেকে চারটের মধ্যে উঠে পড়েন। ও'র ঘড়ির সঙ্গে শয্যাত্যাগের কোনো সম্পর্ক নেই; আকাশের আলো দেখে ঘুম থেকে ওঠা। যেসব দেশে রাত তিনটের আগেই ভোরের আলোতে ঘর ভেসে যায়, সেসব দেশেও কবি জানলার পরদা টেনে ঘর অন্ধকার করতে দেবেন না শুতে যাবার আগে। সেদিন তো উদ্বিগ্ন মন নিয়ে শুতে গিয়েছিলেন, কাজেই অনেক আগেই উঠে পড়েছেন। তখন কিন্তু মোটর-

[illegible] আমার কাছে শুনলেন, ও'দের কী ভোগ ভুগতে হয়েছে।

বীরেন দে-র স্ত্রী চম্পাও এসেছেন এইবারে। কবি খুব খুশী তাঁকে দেখে। আমাদের লণ্ডন থেকে ডেভনে পৌঁছে ফিরে যাবার সময় মিঃ দে কবিকে বলেছিলেন : আপনি যদি অনুমতি করেন তা হলে ফিরবার সময়ও আমিই গাড়ি ক'রে আপনাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য লণ্ডন থেকে আসব।

কবি খুশী হয়ে রাজী হলেন এবং মিঃ দে-কে সস্ত্রীক কর্নওয়ালে আসবার জন্য নেমন্তন্ন করেছিলেন। সেই ডাকে মিসেস দে-ও এবারে এসেছেন।

সকালে সকলে ঘুম থেকে উঠে প্রাতরাশ সেরে তৈরী হয়ে নিলে কবিকে নিয়ে আমরা একটু বেড়াতে বেরোলাম। কবি চিরকালই মোটরে ঘুরতে ভালবাসেন; খুশী হলেন আশেপাশে ঘুরে জায়গাটা দেখে। এই গরমের সময় চারদিকে ফুলের ছড়াছড়ি।

রবীন্দ্রনাথ রঙকানা ছিলেন। লাল রং ওঁর চোখে পড়ত না, সেটা সবুজের কাছ ঘেঁষা হলেই দেখতেন। কিন্তু নীল রং সম্বন্ধে চোখ অতি সজাগ ছিল। সামান্য নীলের ছিটেও ওঁর চোখ এড়াত না। গরমের সময় ঘাসের মধ্যে জংলী ভায়োলেটের ছড়াছড়ি; আজও মনে পড়ে ঐ অজস্র নীল ফুল চারিদিকে দেখে কবির আনন্দ : দেখ, দেখ! আহা! চোখ জুড়িয়ে গেল।

বীরেন দে-র নতুন পেজো গাড়িখানা প্রকাণ্ড এবং রাস্তাও চমৎকার। কাজেই খুবে আরামেই ঘোরা গেল। রবীন্দ্রনাথ বেড়ানোটা উপভোগ করছেন দেখে ভদ্রলোক খুব উৎসাহ ক'রেই আমাদের ঘুরিয়েছেন।

কার্বিস বে-র কাছেই একটা গ্রামে স্বনামধন্য বার্ট্রাণ্ড রাসেল তখন রয়েছেন জেনে কবি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবার প্রস্তাব করায় তাঁকে টেলিফোন ক'রে জানান হল। তিনি খুব খুশী হয়েই কবিকে আহ্বান করলেন। ঠিক হল, লাঞ্চের পরে একটু বিশ্রাম করেই বেরিয়ে পড়ব।

তিনটের সময় রওনা হয়ে গ্রামটা তো খুঁজে পাওয়া গেল কিন্তু বাড়ি পাওয়া যে দুষ্কর। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি; চারিদিকে শুধু চাষীদের বাড়ি, কিন্তু রাসেল কোথায় আছে? একে জিজ্ঞাসা করা যায়, তাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, কিন্তু কেউই বলতে পারে না। শেষে হতাশ হয়ে যখন ফিরে যাওয়া হবে ঠিক হচ্ছে, এমন সময়ে একটা বাড়ির সামনে একজন চাষীগোছেরই পোশাক পরা লোক, মাথায় নাইট ক্যাপটা বেঁকিয়ে পরা, মুখে একটা পাইপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে প্রমোদ রায় এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : এখানে বার্ট্রাণ্ড রাসেল কোথায় আছেন বলতে পারেন?

তিনি একটু হেসে বললেন : আমিই সেই লোক।

আমরা তো তাঁকে দেখে অবাক! কে বলবে, আশেপাশে যারা চাষ করছে তাদের মধ্যেকার একজন মানুষ নয়? যেমনি পোশাক, তেমনি রোদে পোড়া তামাটে রং, জুতো জোড়াতেও কত দিন রং পড়েনি কে জানে। ইনিই হলেন জগদ্বিখ্যাত বার্ট্রাণ্ড রাসেল? কবি আগে এবং আমরা তাঁর পরে একে একে সবাই গাড়ি থেকে নেমে এলাম।

রাসেল এগিয়ে এসে কবিকে অভ্যর্থনা ক'রে বললেন : আমি ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে আপনার জন্যেই অপেক্ষা ক'রে আছি। একবার ঐ বড় গাড়িখানা এই-খান দিয়েই না থেমে চলে যেতে দেখে ভাবলাম, অন্য কারো গাড়ি হবে।

কথা বলতে বলতে সকলে সামনের বসবার ঘরে পৌঁছলে রাসেল বললেন : আমার স্ত্রী এখনই আসবেন, আপনারা সবাই বসুন, তিনি বাড়ির ভিতরে একটু ব্যস্ত আছেন।

যখন আমরা এই বাড়ির পাশ দিয়ে আসছিলাম, ভিতরে কচি গলায় তারস্বরে কান্না একাধিক শিশুর, ক'টি হবে জানি না, তবে দুটি তো নিশ্চয়ই। কেউ মারছে, না পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছে বোঝবার জো নেই। যাই হোক, ততক্ষণে কান্না থেমে এসেছে।

কবি এবং রাসেল কথাবার্তা আরম্ভ করেছেন, আমরা সকলে মন দিয়ে শুনছি এবং ঘরের এদিক ওদিক তাকিয়ে আসবাব-পত্র দেখছি। আসবাব বিশেষ কিছুই নেই;

মুখে আমাদ্য আধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ও দেশে যেমন থাকে তাই।

এমন সময় অদ্ভুত পোশাকে একটি ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকলেন। বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, খুশিতে উদ্ভাসিত সুন্দর মুখ। রূপসী না হলেও ভাল দেখতে বলা যেতে পারে। মাথার মাঝখানে সিঁথি করে, লম্বা চুল বেণী পাকিয়ে, কানের দু' পাশে দুটো বিঁড়ে খোঁপা বাঁধা। সাদা ভয়েলের লম্বা হাতের জামা। নানা রঙের সুতো দিয়ে বলকান দেশের মেয়েদের মত সারা বুকে ও লম্বা আস্তিনে কারুকার্য করা। আর তার নীচেই খাকী হাফ প্যান্ট এবং বিনা মোজায় পায়ে এক জোড়া সাদা ক্যানভাসের টেনিস শু পরা।

শরীরের উপরিভাগ এমন সুশ্রী মেয়েলী সাজে সজ্জিত আর তারপরেই কেন এই-রকম নিদারুণ পুরুষালী বিশ্রী পোশাক? আধুনিক কালে অনেক মেয়েই চুল ছেঁটে পুরুষ সেজে বেড়াচ্ছে; কিন্তু ১৯২৬ সালে এটা তখনও এরকম চলতি হয়নি। তাই দেখেই কীরকম মনে একটা ধাক্কা লেগেছিল।

ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকতেই রাসেল তাঁকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি এই দেরিতে আসার জন্য ক্ষমা চেয়ে বললেন : আমি আমার ছেলেদের বিছানায় পাঠাবার আগে স্নান করাচ্ছিলাম, তাইতে দেরি হয়ে গেল। ওদের এখন শুতে যেতে মোটেই ইচ্ছে ছিল না, তাই ঐরকম কান্না। আপনারা বাড়ি ঢোকবার আগেই নিশ্চয়ই ওদের তীব্র প্রতিবাদের নমুনা পেয়েছেন।

আমরা সকলে হেসে উঠলাম। এই ভদ্রমহিলার নামই ডোরা রাসেল। এর পরে বোধ হয় বার্ট্রাণ্ড রাসেলের আরো তিনবার বিয়ে হয়েছে। পঞ্চম স্ত্রী হচ্ছেন মার্কিন দেশের মেয়ে, বৃদ্ধা স্কুল টীচার, কয়েক বছর আগে লণ্ডনে থাকতে এই বিয়ের খবর কাগজে পড়েছিলাম। কিন্তু ডোরা রাসেলই লোকের কাছে বেশী পরিচিত নিজের ব্যক্তিত্বের জন্য।

খানিকক্ষণ কথাবার্তাতে বেশ আনন্দে কাটল। তারপর বিদায় নিয়ে আবার আমরা বাসায় ফিরে এলাম। কারণ, পরদিন সকালেই আবার লন্ডনের মুখে রওনা হতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ খুব খুশী, ঐ গ্রাম-দেশে অপ্রত্যাশিতভাবে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বলে। আমরা তো খুশী বটেই। কারণ, ভাবিইনি যে, এই সুযোগ জীবনে ঘটবে। একজনের সম্বন্ধে যতই পড়া থাক, চাক্ষুষ দেখলে যেরকম সমগ্র ছবিটা মনের মধ্যে আঁকা হয়ে যায়, এরকম তো বইয়ের পাতার ভিতর দিয়ে হতে পারে না। কারণ, তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের জৌলুস কেমন করে ফুটবে, কথায়বার্তায় হাসিতে উত্তর প্রত্যুত্তরে যেমন ঝলক দিয়ে ওঠে!

এর কয়েক মাস পরে লণ্ডনে রাসেলের আর এক মূর্তি দেখলাম যেদিন—ব্রিটিশ জঙ্গী জাহাজ চীনের বন্দরে গোলাবর্ষণ করেছে বলে শহরে প্রতিবাদ-সভার আয়োজন হয়েছিল। রাসেলই একমাত্র বক্তা। কী তীব্র ভাষায় অথচ শান্ত ব্যঙ্গোক্তিতে এই বর্বরতার নিন্দা জনসাধারণের সামনে করলেন। সেদিনকার বক্তৃতা না শুনলে ধারণা করতেই পারতাম না যে, কী অসামান্য ক্ষমতা ও'র বলবার। সমস্ত ঘরখানা একেবারে লোকে ঠাসা, কিন্তু একটুও শব্দ নেই। সমস্ত শ্রোতারা হতবাক হয়ে শুনল যে, ব্রিটিশ রাজ কীরকম নির্লজ্জ বর্বরতার সঙ্গে অসহায় চীন দেশের ঘাড়ে পড়ে অত্যাচার করেছে ও করছে।

বললেন, তিনি ইংরেজ বলেই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার দায়িত্ব তাঁর আরো বেশী। বললেন : আমরা নিজেদের উন্নত, সভ্য জাত বলে মনে করি। কিন্তু আমি চীন দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে দেখেছি, ওদের সূক্ষ্ম সুরুচিসম্পন্ন ব্যবহার, ওদের নম্রতা, ওদের ঐতিহ্য সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্ত্য জাতের বোঝবার ক্ষমতা এখনও হয়নি। বিশেষ ক'রে আমাদের সৈন্যবাহিনীর কর্তাদের ওদের পাশে যখন দেখেছি, লজ্জায় মাথা হেঁট হয়েছে। তাঁরা বুঝতেও পারেন না ঐ প্রাচীন সভ্যতার পাশে তাঁদের কীরকম অসভ্য বর্বর বলে মনে হয়।

সমস্ত ঘরে কেউ কথা বলল না; শুধু একজন ইংরেজ প্রৌঢ় মানুষ বারে বারে লাফিয়ে উঠে রাসেলকে বাধা দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর রাসেলের কথা শুনে মেজাজ বেজায় গরম। প্রত্যেকবারই রাসেল বেশ ব্যঙ্গভরা হাসিমুখে চুপ ক'রে ধৈর্যের সঙ্গে তাঁর অপমানজনক কথা শুনলেন।

কিন্তু যেই তিনি বসছেন, রাসেল তৎ-ক্ষণাৎ তাঁর কথার জবাব আরো বেশী ব্যঙ্গের সঙ্গে দিয়ে তাঁকে আরো হাস্যাস্পদ করে তুলতে লাগলেন। তাঁকে বললেন : আমি নিজের চোখে দেখেছি, একজন সম্ভ্রান্ত চৈনিক ভদ্রলোক তাঁর নিজের দেশী পোশাক পরে পিছনে কুলির মাথায় বোঝা চাপিয়ে স্টীমারে উঠতে যাচ্ছেন, এমন সময় আমাদের

দেশের মিলিটারী পোশাক পরা একজন উচ্চ-পদস্থ সৈনিক পিছন থেকে এসে এই ভদ্র-লোকের লম্বা চুলের বেণী ধরে টান দিয়ে লাথি মেরে ফেলে দিল। ভদ্রলোকের কী অপরাধ? তিনি এই ইংরেজ সেনাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে এসে স্টীমারে চড়তে গিয়ে-ছিলেন। এ ঘটনা সেখানে রাতদিনই ঘটছে। কিসের জোরে এটা হতে পারছে? আমাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র বেশী আছে এইটাই তো একমাত্র যুক্তি? না, তোমার মতে এইরকম ব্যবহার করাকেই সভ্যতা বলে? যদি আজ এ দেশে এসে তোমার সঙ্গে কেউ এরকম ব্যবহার করে, তখন তুমি তাকে কী কর?

কিন্তু চীনেরা ধৈর্যের সঙ্গে আমাদের এইসব বর্বরতা মুখ বুজে সহ্য করছে কেন? ওদের ঐতিহ্য আমাদের চেয়ে কম বলে নয়, তাদের যুদ্ধজাহাজ হাতে নেই: মারণ-অস্ত্রে আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। তাই আমরা দেশে দেশে সৈন্য পাঠিয়ে নিজেদের দম্ভ প্রচার করছি।

এর পর আর সেই লোকটি রাসেলের কথার উত্তর দিতে চেষ্টা করল না। যারা এই প্রতিবাদ-সভায় যোগ দিতে গিয়েছিল, তাদের বেশীর ভাগই অবশ্য উদার মতাবলম্বী। তাই এই সভার আহ্বান তাদের কানে পৌঁছেছিল। তাই বক্তৃতার পরে হাত-তালির চোটে ঘর ফেটে যাবার যোগাড়।

প্রথম দিন কর্নওয়ালের গ্রামে দেখা সেই নিরীহ মূর্তির সঙ্গে এই মানুষের যেন কোনো সাদৃশ্য নেই, এমনই চোখে মুখে ঠিকরে পড়া ঘৃণা এবং তীব্র প্রতিবাদের চেহারা। রবীন্দ্রনাথের বাণী মনে পড়ল ঃ 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে'।

এর পরে আবার রাসেলকে দেখলাম ১৯৬১ সালে লণ্ডনে। নব্বইয়ের উপরে বয়স হয়ে গেছে। একেবারে সাদা মাথা, রোগা চেহারা, কিন্তু মন যে বুড়ো হয়নি তা কথাবার্তায় রসিকতায় ধরা পড়ে। আমার স্বামী Pugwash Committee সম্বন্ধে কিছু পরামর্শ করবার জন্য Prof. Rotblat-এর সঙ্গে রাসেলের কাছে যাচ্ছিলেন। যাবার আগে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমিও যেতে চাই কিনা। আমি ও আমার বন্ধু ডাঃ প্যামেলা রবিনসন উৎসাহের সঙ্গে রাজী হয়ে ওঁদের সঙ্গ নিলাম।

লণ্ডনের বাসার দোতলায় ছোট্ট বসার ঘরে গিয়ে আমরা বসলে এই সাদা মাথার ক্ষীণ দেহ কিন্তু সিংহের মত মানসিক বলের মানুষটি আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে আমাদের সকলকে সম্ভাষণ জানালেন।

আমার স্বামী বললেন ঃ ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কর্নওয়ালে তোমার বাড়িতে আমরা গিয়েছিলাম। তারপর Pugwash Conference-এ অস্ট্রিয়ায় গত বছর আবার আমার তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু আমার স্ত্রী আর তারপরে তোমাকে দেখেননি। তাই আজ এখানে আসছি শুনে উনি এবং আমাদের বন্ধু ডাঃ প্যামেলা রবিনসনও সঙ্গে আসতে চাইলেন। তাই নিয়ে এসেছি।

ভদ্রলোক হেসে আমার হাত ঝাঁকিয়ে বললেন ঃ স্পষ্ট মনে আছে কর্নওয়ালে টেগোরের সঙ্গে তোমাদের আমার বাড়িতে আসার কথা। তোমরা বাড়ি খুঁজে না পেয়ে অনেকক্ষণ ঘুরেছিলে।

আশ্চর্য, নব্বই বছরের উপরে বয়স, কিন্তু স্মরণশক্তি তো কমেনি দেখছি। এর পরে ওঁদের কাজের কথাবার্তা শেষ হলে আমরা চলে এলাম।

ওঁর বৃদ্ধা বর্তমান স্ত্রী আসবার আগে ঘরে এসে আমাদের বিদায় দিলেন। দেখলাম ব্যঙ্গ রসিকতা করবার ক্ষমতা সেকালের মতই এখনও বজায় আছে এবং সে সময় চোখ মুখ সেইরকমই ঝলমল করে ওঠে। কী কথা বলতে গিয়ে কোনখান থেকে কোথায় চলে এসেছি।

কর্নওয়ালে সেদিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে রাতটা সেখানে কাটিয়ে পরদিন সকালে আবার ফিরতি পথ মোটরে রওনা হওয়া গেল। বীরেন দে-র প্রকাণ্ড গাড়ি। তাই আমরা দু'জন, কবি, প্রমোদ ও দে-পরিবার, সকলেই মোটরে যেতে পারলাম। বাকী যাঁরা ছিলেন তাঁরা ট্রেনে ফিরে গেলেন।

ঠিক হ'ল রাতটা আবার এলমহার্স্টের বাড়িতে কাটিয়ে পরের দিন লন্ডন পোঁছনো হবে; তা হলে কবির আর কোনো কষ্ট হবে না। সাহেবকে আগেই খবর দিয়ে রাখা হয়েছিল। কাজেই তাঁদের আর কোনো অসুবিধায় ফেলা হ'ল না।

এবারে গিয়ে দেখি, তাঁরা নিজেরা বড় বাড়িতে উঠে গেছেন, আর আমাদের সকলের জন্য ছোট বাড়িতে জায়গা হয়েছে। অবশ্য খাবার সময় সকলে একসঙ্গেই খেলাম।

আবার দিনের বেলা সারা পথ দেখতে দেখতে চলা, চোখের তৃপ্তি, মনের আনন্দ। এততেও হ'ল না। পরদিন সকালে উঠেই ফের কবির সঙ্গে মোটরে অক্সফোর্ড যাত্রা। এবারেও বীরেন দে-রই গাড়ি এবং তিনিই সারথী।

তদানীন্তন লেখা একটি চিঠিঃ

Regina Hotel, London
18th August 1926

শ্রীচরণেষু,

কাল রাত্রে লন্ডন ফিরে আপনাদের চিঠি পেলাম। পরশু কর্নওয়াল থেকে বেলা এগারটায় বেরিয়ে বিকেলে ডেভন-শায়ারে পোঁছই। সেখানে এল্‌ম্‌হার্স্টের বাড়িতে রাতটা কাটিয়ে আবার কাল সকালে দশটায় রওনা হয়েছিলাম এবং রাত দশটায় এখানে পোঁছেছি। ফের আজই সকালে একটু খেয়ে-দেয়ে অক্সফোর্ড যাওয়া হয়েছিল।

কর্নওয়াল থেকে সারা পথই মোটরে এসেছি। মিঃ দে আমাদের আনতে গিয়েছিলেন; সঙ্গে মিসেস দে, আপনার ছেলে ও প্রমোদ। গাড়িতে আসতে একটুও কষ্ট হল না, বরং খুব আনন্দই হয়েছে। প্রায় সমস্ত ইংলণ্ডটা মোটরে ঘুরে নেওয়া গেল। কী যে অপরূপ দৃশ্য, সে আর কী বলব। বিশেষত এই গরমের সময় ফুলের ছড়াছড়ি। রাস্তাও চমৎকার আর মস্ত গাড়িখানাও নতুন পেজ। খুব আরামেই ঘোরা গেল। ভদ্রলোক খুব উৎসাহ করে আমাদের ঘুরিয়েছেন।

কার্বিস বে-র কাছেই একটা গ্রামে বিখ্যাত বার্ট্রান্ড রাসেল রয়েছেন। কবি বীরেনের গাড়ি ক'রে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, আমরাও সঙ্গে ছিলাম। এতদিন নাম শুনে আসছি, এইবার নিজের চোখে কাছ থেকে ভদ্রলোককে দেখলাম। কবির সঙ্গে রয়েছি বলে কত লোকের সঙ্গেই যে এরকম দেখা হচ্ছে!

আজ অক্সফোর্ডে যাবার কারণ হচ্ছে, ওখানে ডক্টর রবার্ট ব্রীজেস-এর কাছে কবির লাঞ্চের নেমন্তন্ন ছিল; এবং আমাদের নেমন্তন্ন মিঃ এডওয়ার্ড টমসনের কাছে, তিনি আমাদের খেতে ও রাত্রে থাকতে বলেছিলেন, কিন্তু আমরা থাকাটা বাদ দিয়ে শুধু খেয়ে এলাম।

রবার্ট ব্রীজেস-এর বাড়িতে কবিকে নামিয়ে দিয়ে টমসনের বাড়ি যাওয়া হল। সেই সময় ব্রীজেস আবার আমাদের বিকেলে গিয়ে চা খেতে বললেন। ওদের দু'জনেরই বাড়ি কাছাকাছি এবং শহর থেকে পাঁচ মাইল বাইরে। এই দুই বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতেই দিনটা কোথা দিয়ে কেটে গেল, অক্সফোর্ডের আর কিছু দেখা হ'ল না। আবার শীতকালে গিয়ে কয়েক দিন থাকবার জন্য টমসন বিশেষ করে অনুরোধ করেছেন। ইচ্ছে আছে, তখন গিয়ে সব ভাল ক'রে দেখব।

শহরের ভিতর দিয়ে মোটরে যেতে যেটুকু দেখলাম সেটুকু অবশ্য খুব ভাল লাগল। তা ছাড়া সারা পথ মোটরে যাওয়াটা খুব উপভোগ করেছি। গাড়ি ক'রে তো কম ঘুরলাম না, একেবারে কর্নওয়ালের শেষ সেই Lands End পর্যন্ত ঘুরে এসেছি। সেইটাকেই ইংলণ্ডের শেষ বলে। তারপরেই অ্যাটল্যান্টিক, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আতলান্তিক আরম্ভ। ল্যান্ডস্ এন্ড পর্যন্ত যাওয়া আসায় আট শ' মাইল, তারপর আজ আবার অক্সফোর্ড যাওয়া আসায় এক শ' বাইশ মাইল হল। অথচ সেরকম কিছুই ক্লান্ত হয়নি। কিন্তু ট্রেনের চেয়ে আনন্দ পেয়েছি ঢের বেশী। তার কারণ, একেবারে সব শহর গ্রামের ভিতর দিয়ে গিয়েছে, তাই দেশটার চেহারাটা স্পষ্ট ক'রে দেখতে পেলাম। অবশ্য স্কটল্যান্ডের দিকটা এখনও হয়নি, পরে একবার যেতে হবে।

আমরা ইংলণ্ডে আর মোটে দু' দিন আছি, কাল আর পরশু, তারপর এবুলে নরওয়ে রওনা হব। রথীবাবুরা যাবেন না, শুধু আমরা দু'জনে আর মিঃ লাল (সুরুলের) কবির সঙ্গে যাচ্ছি। সেপ্টেম্বরের প্রথমে রথীবাবুরা আমাদের সঙ্গে এসে মিলবেন। এ মাসটা আমরা স্ক্যান্ডিনেভিয়াতেই কাটাব। আর ক'টা দিনই বা।

লর্ড সিংহও কবির সঙ্গে যাবেন বলেছেন। আমাদের ইচ্ছে আছে, আবার নভেম্বরে ইংলণ্ডে ফিরে আসতে। এল্‌ম্‌হার্স্ট, টমসন প্রভৃতি অনেকে নেমন্তন্ন করে রেখেছেন।...

আমরা কর্নওয়াল যাবার আগের দিন সুধীরবাবু আর আমাদের দু'জনকে মিস কলেট চায়ে নেমন্তন্ন করেছিলেন। বৃদ্ধা মহিলাকে চমৎকার লাগল। ইনি সেই মিস কলেটের ভাইঝি—যিনি রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত লিখেছেন।

একখানা ছবি আমার আর কবির একসঙ্গে; এটা আমাদের হোটেলের ঘরে একজন ফটোগ্রাফার এসে ভিয়েনাতে তুলেছিল তাদেরই নিজেদের গরজে, তাই বিনে পয়সায়। এই ছবিখানা শুনলাম জার্মানীর কোন খবরের কাগজে বেরিয়েছে; প্রতিমাদি বলছিলেন, আমি নিজে দেখিনি।

এই ছবিখানা সম্বন্ধে একটু বক্তব্য আছে। যখন ভিয়েনাতে সেই ফটোগ্রাফার এসে কবির কাছে অনুমতি চাইল তাঁর ছবি নেবার, তখন তিনি কী একটা লিখছিলেন। একটু পরে আমাকে ডাক দিলেন কোনো একটা জিনিস দিয়ে যাবার জন্য। আমি ঘরে ঢুকতেই ফটোগ্রাফার কবির কাছে এসে বিনীতভাবে বলল : যদি আর একবার অনুমতি করেন, আমি আপনাদের দু'জনের একসঙ্গে একটা ছবি তুলতে চাই।

কবি আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন : ওঁর ছবি নেবার অনুমতি দেবার অধিকার আমার নেই। ওঁর মালিক রয়েছেন পাশের ঘরে, তাঁর কাছে অনুমতি চাইতে হবে।

সে লোক নাছোড়বান্দা।

প্রশান্তচন্দ্র বললেন : হ্যাঁ, ছবি তুলতে পার; কিন্তু কথা দিতে হবে যে, কোথাও ছাপাবে না।

সে তৎক্ষণাৎ অম্লান বদনে কথা দিয়ে দিল। বলল : এ দেশে ভারতীয় মেয়ে বেশী দেখা যায় না; আমি শুধু আমাদের দোকানে এই ছবিটা সাজিয়ে রাখব।

ছবি তুলে মাত্র একটি কপি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ইতিমধ্যে জার্মানী কাগজে বেরিয়ে গেছে যে, রবীন্দ্রনাথ সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানীর নানা শহরে ঘুরে বক্তৃতা দেবেন। ঠিক সেই সময়েই স্বাঁইফোটি ছবি নিতে এসেছিল।

তারপরে নরওয়েতে জাহাজ থেকে নামতেই প্রফেসর স্টেন কোনো একখানা

জার্মান পত্রিকা কবির হাতে দিলেন, যার মলাটে সেই ছবিটা প্রকাণ্ড বড় ক'রে ছাপা হয়েছে।

কবি ছবিটা দেখেই বললেন : প্রশান্ত, এই দেখ, কীরকম কথা রেখেছে। এ না হলে আর ব্যবসাদার হয় ?

এই ছবিটা ছাপিয়ে সেই দোকান যে কত টাকা করেছিল তার ঠিকানা নেই। জার্মানীর যে শহরে কবি বক্তৃতা দেন, দেখি সেই শহরেই দোকানে দোকানে এই ছবি বড় ক'রে সাজানো এবং বক্তৃতার পরে প্রত্যেকের হাতে এই ছবির পোস্টকার্ড। তারা সকলেই রবীন্দ্রনাথের হাতের সই নেবে বলে একটা ক'রে ছবি কিনেছে।

অথচ আমাদের দু'জনের ছবি যদিও তবু মাত্র এক কপি কবিকে উপহার পাঠিয়েছিল; ভদ্রতার খাতিরেও আমাকে এক কপি দিতে পারেনি। কবি তাঁরটাই আমাকে দিয়ে দিলেন।

ইংলণ্ডের লর্ড সভার প্রথম ভারতীয় সভ্য স্বনামধন্য আইনজীবী লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ তখন লণ্ডনে। তিনি রবীন্দ্রনাথের পুরনো বন্ধু। শান্তিনিকেতনের 'সিংহসদন' এঁ'রই দানের টাকায় তৈরী বলে কবি ঐ নামকরণ করেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বললেন যে, তিনিও কবির সঙ্গে নরওয়ে, সুইডেন এবং জার্মানী ইত্যাদি এক মাস ঘুরতে চান। কারণ, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হয়ে ঘুরলে সব জায়গাতেই শ্রেষ্ঠ মনের সঙ্গে পরিচয় হতে পারবে সহজেই। একা বেড়ালে এরকম সুযোগ পাওয়া যাবে না।

কবি তো খুব খুশী। লর্ড সিংহের মত মানুষের সঙ্গ তো তাঁকে আনন্দই দেবে।

একুশে আগস্ট সকাল সাড়ে ন'টায় লণ্ডন থেকে ট্রেনে নিউ কাস্‌ল্‌ যাত্রা করে, বিকেলে পোঁছে তখনই জাহাজে চড়তে হবে। বিকেল পাঁচটায় জাহাজ ছাড়বে। প্রতিমাদি, রথীবাবুরা কবির সঙ্গে যাচ্ছে না; শুধু আমরা দু'জন ও সুরুলের মিঃ লাল কবির সহযাত্রী; তা ছাড়া লর্ড সিংহও সঙ্গে আছেন।

বন্ধের খুব উৎসাহ, কবির সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছেন বলে। স্টেশনে তাঁর পুত্র শ্রীযুক্ত সুশীল সিংহ এবং তাঁর স্ত্রী এসেছেন তাঁকে তুলে দিতে। কিছু দিন আগে লর্ড সিংহ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তাই বিলেতে এসেছিলেন শরীর সারতে। এখন শরীর বেশ ভালই আছে, তাই খুশী মনে চলেছেন।

তবু বাড়ির লোকের ভাবনা যায় না। পুত্র এবং পুত্রবধূ বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যেন এটা খেতে না ভোলেন, ওটা করতে না ভোলেন। বিশেষ করে বউমারই বেশী উদ্বেগ। বারবার বলে দিলেন, কোথায় কোন বাক্সে কোন ওষুধটা দিয়েছেন ইত্যাদি।

ট্রেন ছাড়বার পূর্বমুহূর্তে পুত্র ইংরিজীতে বাবাকে বললেন, কোন্ বাক্সটা কোন্ বেঞ্চির তলায় রেখেছেন; বলতে বলতে গাড়ি ছেড়ে দিল। পুত্রবধূ রমলা বাংলাতেই শ্বশুরের সঙ্গে কথা বলছিলেন; কিন্তু তাঁর স্বামী ইংরিজীতে।

গাড়ি ছাড়তেই সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন রবীন্দ্রনাথের দিকে ফিরে তাকিয়ে কৌতুক ক'রে বললেন : ব্যাটা আমার বাংলা জানেন না। দেখলেন তো মশাই, বউমা আমার কেমন মিষ্টি করে বাংলায় সব বলে-টলে দিল, আর ছেলের আমার মুখ দিয়ে বাংলা বেরোল না।

কবিও তৎক্ষণাৎ পাল্টা জবাব দিলেন : ওকে দোষ দিচ্ছেন কেন? আপনিই তো ওদের এইরকম করে মানুষ করেছেন, এখন অপছন্দ করলে কী হবে? বউমাটিকে তো আপনি মানুষ করেননি, তাই ওঁর মুখ দিয়ে বাংলা বেরোচ্ছে। এসব মশাই আপনারই কর্মফল। আপনারা ব্যারিস্টাররা একেবারে সাহেব বনে গিয়ে ছেলেমেয়েদের পুরো সাহেবী কায়দায় মানুষ ক'রে এখন স্বদেশীয়ানা চাইলে চলবে কেন?

ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ ত্রুটি স্বীকার করে বললেন : বড় ভুল করেছি, এখন সেজন্যে অনুতাপ করি। দেখুন, আমি এবং আমার স্ত্রী, আমরা বাইরে যতই সাহেবী কায়দায় চলি না কেন, আসলে আমরা পুরোপুরি বাঙালী। কিন্তু ছেলেমেয়েরা তা হ'ল না। তাই আমার এই বউমাটিকে বড় মিষ্টি লাগে। ও যে আমার কী সেবাযত্ন করে, তা আর কী বলব! দেখলেন তো? বারবার 'বাবা, ঐ ওষুধটা খেতে ভুলবেন না', 'এটা যেন মনে থাকে' ইত্যাদি কীকরম সব সাবধান করে দিল। বড় খুশী হয়েছি ওকে পেয়ে।

লর্ড সিংহ ব্রাহ্মসমাজের লোক। আমার পিতৃদেব হেরম্বচন্দ্র মৈত্রর সঙ্গেও বহু দিনের পরিচয়। একসময় যখন ও'র এরকম পসার হয়নি, সবে প্র্যাকটিস শুরু করেছেন তখন উনিও আইনের ক্লাসে পড়াতেন সিটি কলেজে। ওঁকে দূর থেকে বহুবার দেখেছি এবং উনিও আমার এবং আমার স্বামীর পরিবারের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে পরিচিত। কিন্তু সেবারে এক মাসের উপর একসঙ্গে প্রতিদিন খাওয়া, বসা, ঘোরার ভিতর দিয়ে যেমনভাবে ওঁর স্নেহ পেয়েছিলাম সেটা বাইরে থেকে কখনো সম্ভব হত না। কাছে এসে সন্তানস্নেহে ওর কত বড় মন তার পরিচয় পেয়ে ধন্য হয়েছি। এত বড় মানী ও ধনী লোক, কিন্তু ধনের গরিমা বা মানের গর্ব বিন্দুমাত্রও প্রকাশ পায়নি এক মুহূর্তের জন্যেও। যেরকম অসুবিধার ব্যবস্থাই হোক না কেন, তার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে একটুও দেরি দেখিনি। সর্বদা অন্যের সুবিধা-অসুবিধার দিকে সজাগ দৃষ্টি; কিন্তু

সাধারণ, সহজ, স্বাভাবিক ব্যবহার; হাসিতে-কৌতুকে উজ্জ্বল চরিত্রের মাধুর্য; স্নেহে অভিষিক্ত অন্তঃকরণ; এ কি এরকম রাতদিন কাছে কাছে না থাকলে বুঝতে পারতাম?

লর্ড সিংহের স্নেহের স্মৃতি মনের মণিকোঠায় চিরকাল সঞ্চিত হয়ে আছে। যেদিন ওঁর মৃত্যু হয়, সেইদিনই সকালে কলকাতায় দু'জনে ওঁর বাড়ি গিয়েছিলাম দেখা করতে। কারণ, উনি ইংলণ্ড থেকে চলে আসবার কিছু দিন পরে আমরা দেশে ফিরেছিলাম।

উনি প্রিভি কাউন্সিলে চাকরি নিয়ে পাঁচ বছরের জন্যে ইংলণ্ড চলে যাচ্ছেন,

তারই তোড়জোড় আয়োজন চলেছে বাড়িতে। কোথাও রুপোর থালাবাটি জড়ো করা; এখানে ওখানে বাক্স-তোরঙ্গের ডালা খোলা; চারিদিকে আসন্ন যাত্রার ছবি ফুটে। আমরা যেতেই তার মধ্যেই ডাক দিলেন আগ্রহ ক'রে : এসো, এসো, এই ঘরেই এসো। আবার কতদিন পরে দেখা হবে কে জানে? রানী, এই বাক্সটা চিনতে পারছ? কতদিন তোমার হাতে হাতে এটা ঘুরেছে। এবারে আর এটা তুমি বয়ে নিয়ে বেড়াবে না।

ছোট একটা কুমীরের চামড়ার ব্রাউন রঙের লেখবার বাক্স, তাতে সোনার কব্জা আর সোনার টিপকল লাগানো। বাক্সটা টেবিলের উপর খোলা রয়েছে। কলম কাগজ সব সাজাচ্ছেন। ঐ বাক্সটা সর্বদা আমি হাতে ক'রে নিতাম স্টেশনে রওনা হবার সময়। তাই জিজ্ঞাসা করলেন, চিনতে পারছি কিনা। খুব খুশী, আমরা দেখা করতে গিয়েছি বলে।

বললাম : আজই আমরা দুপুরের গাড়িতে শান্তিনিকেতন চলে যাচ্ছি। তাই এই অসময়ে দেখা করতে এসে বোধ হয় বিরক্ত করলাম।

না, না, কী যে বল! তোমাদের সঙ্গে বেড়াবার কথা কি আমি ভুলে গিয়েছি? কতদিন পরে আজ আবার দেখা। কী আনন্দে সবাই একসঙ্গে ঘুরেছিলাম। আর এরকম হবে না। শান্তিনিকেতনে যাচ্ছ? রবিবাবুকে আমার নমস্কার জানিও। বলো, আজ বিকেলে আমি সুশীলের কাছে বহরমপুর যাচ্ছি। দেখা শোনা করা সেরে নিই; কারণ, দেশ ছাড়তে আর তো বিশেষ দেরি নেই। যাচ্ছি তো সেই পাঁচ বছরের জন্যে।

রবিবাবু বলেছিলেন : মশাই, জীবনের পাঁচ পাঁচটি বছর আম খেতে পাবেন না এই চাকরির জন্য। সেটা কি ভেবে দেখেছেন? আমি হলে তো এই কারণেই এমন চাকরির প্রস্তাব কানেও নিতুম না।

তাঁকে বলেছিলুম : লণ্ডনেও আমি আম খেয়েছি। তবে অবিশ্যি একটা আম এক গিনি দিয়ে কিনতে হয়েছিল। এখন হয়তো দাম একটু কম হবে। তা হলেও অন্য ফলের তুলনায় নিশ্চয়ই ঢের বেশী। আম খাবার নিতান্ত লোভ হলে ওটুকু টাকা খরচ করতেই হবে, কী আর করা যাবে?

এই রুপোর বাসন-টাসন নিয়ে চলেছি। ঠিক করেছি, ডিনার খাওয়াতে হলে দেশী মতে থালাবাটিতে খেতে দেব। এবারে আমার স্ত্রী যাচ্ছেন সঙ্গে, কাজেই কোনো ভাবনা নেই।

প্রণাম ক'রে দুজনে চলে এলাম। বন্ধু হাসিমুখে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে স্নেহের সঙ্গে বিদায় দিলেন।

পরদিন বিকেলে শান্তিনিকেতনে অবাক হয়ে শুনলাম, গত রাত্রে হার্ট ফেল ক'রে লর্ড সিংহ বহরমপুরে মারা গিয়েছেন। বিকেলে ছেলে তাঁদের জন্য মস্ত পার্টি দিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ রাত্রে শুতে গিয়েছেন। কিন্তু সকালে আর ঘুম ভাঙল না। স্ত্রী পাশে শুয়েও কিছুই টের পাননি যে, কখন চলে গিয়েছেন। এ কি বিশ্বাস করা সম্ভব? এই তো কয় ঘণ্টা আগেও অফুরন্ত প্রাণভরা জীবন্ত সতেজ মানুষটির সঙ্গে কথা বলে এলাম; আর এরই মধ্যে তিনি নেই? চিরকাল মনে রয়ে গেল তাঁর স্নেহের বিদায়।

জাহাজটা ছোট্ট, মাত্র তিন হাজার টনের। আমরা সবসুদ্ধ পঁচিশটি যাত্রী। প্রথম রাতটা তো খুব আরামেই কাটল।

আমার চিরকালই জলযাত্রা খুব পছন্দ। দেশের বাড়ি হিজলাবট গ্রামে যেতে হলে কুষ্টিয়া স্টেশন পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে বারো মাইল পথ পানসি নৌকোতে গোরাই নদী বেয়ে যেতে হ'ত। ছেলেবেলা থেকেই এই নৌকোতে দুলতে দুলতে যাওয়াটা বাড়ি যাবার আর একটা প্রধান আকর্ষণ ছিল। জল আমার মনকে টানে। তাই নিউ ক্যাসল্ থেকে যখন জাহাজ ছাড়ল, তখন খুব আনন্দ। (ক্রমশ)

উপরক্ষেপদী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

'আপনার সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট কী?'

সেদিন আপনার এই প্রশ্ন শুনে আমি নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম কল্যাণবাবু। আপনি লক্ষ করে থাকবেন অনেকক্ষণের মধ্যে আমি হঠাৎ কোন কথা বলতে পারিনি। আমি এত বক বক করি, সময়ে অসময়ে গিয়ে আপনাকে জ্বালাই, কিন্তু সেদিন আমি একটি কথাও বলিনি। আপনার মুখের দিকে চুপ করে চেয়েছিলাম। আপনার মুখ প্রিয় বন্ধুর প্রসন্ন মুখ। তবু ঠিক সেই মুহূর্তে আপনার মুখ আমি দেখছিলাম না। আমি দেখছিলাম নিজেকে। ভাবছিলাম নিজের জীবনের কথা। নতুন করে [illegible] বয়সের [illegible] পনেরো [illegible] এক [illegible]।

অ্যাচিভমেন্ট। [illegible] আমি [illegible] কল্যাণবাবু। [illegible] [illegible] [illegible] কিছুক্ষণ সেই গুলিটা আমার বুকে বিদ্ধ হয়ে রইল। প্রিয়বন্ধুর পিস্তলের গুলি।

প্রথমে ভাবলাম আপনি কি পরিহাস করছেন? যদিও আপনি আমার চেয়ে বিশ বছরের ছোট তবু আমাদের ব্যবহার তো বন্ধুবৎ। আমরা বয়স্যের মত হাসি পরিহাস করি। সাহিত্য শিল্প যৌন-জীবন ধর্ম আধ্যাত্মিকতা কিছুই আমাদের আলাপের সীমার বাইরে থাকে না। ভাবলাম সেই বন্ধুত্বের সুবাদে আপনি আমাকে ঠাট্টা করলেও করতে পারেন। কিন্তু আপনি তো নিষ্ঠুর কৌতুকে অভ্যস্ত নন। তাই একটু অবাক হয়েছিলাম।

অথচ কৌতুক [illegible] কী। [illegible] মানুষটি আইবুড়ো থেকে থেকে বুড়ো হল, যার স্ত্রী হলনা, ছেলে হলনা, মেয়ে হলনা [illegible] নিজের হাতে মানুষ করতে হলনা, [illegible] আর নেই, এই আধা গৃহস্থ সিকি সন্ন্যাসীকে হঠাৎ আপনি তার কৃতিত্বের কথা কেন জিজ্ঞেস করলেন তাই ভাবছি। তার কি কোন ক্রিয়াকর্ম আছে যে কৃতিত্ব থাকবে? সে কি আপনাদের মত বই লিখেছে, ছবি এঁকেছে, মূর্তি মন্দির অন্ততপক্ষে দুটি একটি বাড়ি কি ব্রীজ তৈরি করেছে যে কোন কৃতিত্বের কথা সে মুখ বাড়িয়ে বলতে পারবে? না কল্যাণবাবু, আপনি তো জানেন তার জমার ঘরে ওসব কিছু নেই।

কিছু নেই। কিন্তু আজ এই পথের প্রান্তে এসে মাঝে মাঝে মনে হয় কিছু থাকলে মন্দ হত না। নিজের হাতে কিছু করতে পারলে ভালোই লাগত। এমন কিছু যা বাস্তব, যা নিজের চোখে দেখা যায়, যা পাঁচজনকে ডেকে দেখানো যায়। যার নাম কীর্তি। মানুষ নাকি তার মধ্যেই বেঁচে থাকে। যদিও জানি সেই অক্ষয় কীর্তি-

ধরের সংখ্যা খুব বেশি নয়। বেশির ভাগ কীর্তিই ক্ষণজীবী। তা দীর্ঘায়ুতার জন্মবেশ পরে আসে। নিজের কীর্তিকে অটুট রেখে ক'জনে মরতে পারে? এই অর্থে তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ অনেকেই। মৃত কীর্তির দিকে তাকিয়ে কতজনকে হাহুতাশ করতে দেখলাম। কত নিষ্ফল আক্রোশ আর অভিমান সেই সব কীর্তি-মানের। তাদের দশা দেখে মনে হয়েছে ভাগ্য ভালো অমন কীর্তির দিকে হাত বাড়াইনি। ফোঁটা কয়েক যশের ভিতর থেকে জীবনের সমস্ত রস তুলে নিতে চাইনি। এ জীবনে কম তো দেখলাম না। নাট্যালয়ে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা নিয়ে এসেছি। দেখলাম অনেক। কত ধনবানকে নিঃস্ব হতে দেখলাম, কীর্তিমানকে অবজ্ঞার অন্ধকারে তলিয়ে যেতে দেখলাম, প্রেমিককে প্রবঞ্চক হতেও দেখেছি। তাই বলে আমাকে একচক্ষু হরিণ মনে করবেন না। চোখ পরিতৃপ্ত হয় এমন বস্তুও দেখেছি বইকি। মানুষের মহত্ত্ব বিশালত্ব দেবত্ব দেখেছি বই কি। দেখেছি আর প্রেক্ষাগৃহের পিছনের সারিতে বসে হাততালি দিয়েছি। আজও দিই। আপনি জানেন এখনো সভাসমিতিতে যাই। কারো বক্তৃতা ভালো লাগলে কান পাতি। বক্তা যেখানে আমার মনের কথা বলেন তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

'প্রভাস, তোর ওই বুড়ো রোগা হাতে অত জোর তালি বাজে কী করে রে।' এক সমবয়সী বন্ধু সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন।

আমি তাকে বলেছি, 'কবজির জোর তো আর নেই ওই তালির জোরটুকুই আছে।'

আপনাকে বলতে বাধা নেই কল্যাণবাবু নানা কালে নানা স্থানে ছোট বড় মাঝারি নানা ধরনের অভ্যর্থনা সমিতির আমি সদস্য হয়েছি। এখনো আছি। সেই সমিতি থেকে আমার নাম কাটা যায়নি। চাঁদা বাকি পড়েনি। ছেলেবেলায় জ্ঞানীগুণীদের আসরে সভাপতির গলায় মালা পরাবার সময় আমার ডাক পড়ত। স্কুল-কলেজে যখন পড়েছি সহপাঠী বন্ধুরা অভ্যাগত-দের অভিনন্দন, মাস্টারমশাইদের বিদায়-বাণী লেখার কলমটি আমার হাতে গুঁজে দিত। তারা বলত, 'মহাপ্রভু তুমিই লেখ। ওসব প্রশস্তি প্রশস্তি তোমারই ভালো আসে।'

আমার যদি সামান্য কোন দক্ষতা থাকে তা ওই পত্র আর মানপত্র রচনায়। জীবনভর বন্ধুদের ঝুড়ি ঝুড়ি চিঠি লিখেছি। সব তারা ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়েছে। এ কাঠামোয় এমন কিছু লেখা আর হল না কল্যাণবাবু, 'শুম্ভনিশুম্ভ বিশ্বে' বলে সবাইকে যা ডেকে শোনাতে পারি। আমার সব বলাই যেন জনান্তিকে বলা। শুধু পাশের বন্ধুটির কান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। তার বাইরে গলা যায় না। তার বাইরে বলাও যায় না। লজ্জা করে। বক্তব্য কিছু থাকলে তো বলব। 'ঘৃণা লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়।' আমাকে তো দেখেছেন। আমি মোটেই তেজীয়ান পুরুষ নই। আজই না হয় বুড়ো হয়েছি। যৌবনেও অন্তর জরায় আচ্ছন্ন ছিলাম। পৌরুষের যা লক্ষণ—তীব্র ঘৃণা আর বিদ্বেষ—আমার মধ্যে তা অপ্রকট। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মতই তা নিয়ত অনুপস্থিত। কিন্তু লজ্জা আর ভয়ের কোন সময় জো হাজির থাকতে বাধেনি। তারা নিজেরাই রাজরানীর মত সিংহাসন জুড়ে বসে আছে আর কাউকে ঘরে ঢুকতে দেয়নি।

এই লজ্জা আর ভয়কে জয় করতে পারলে সাধারণ মানুষও যে কত অসাধারণ হয়ে ওঠে ঐহিক সাফল্যের চূড়ায় গিয়ে চড়ে বসে তা নিজের চোখে কত দেখলাম। কখনো কখনো ভেবেছি ওই সফল পুরুষ-দের কোন একজনকে মডেল করে নিজের জীবন গড়ে তুলি। কিন্তু যতবার সে সঙ্কল্প করেছি ততবার তা চুরমার হয়ে গেছে। শেষপর্যন্ত দেখেছি আমার মডেল আর কেউ নয়, আমি নিজেই। শেষ প্রান্তে এসে দেখছি ভালো হোক, মন্দ হোক, আঁকা হোক, বাঁকা হোক আমি শুধু একটি মূর্তিই গড়েছি সে মূর্তি নিজের মূর্তি। সে মূর্তি দেবমূর্তি নয় বলা বাহুল্য। পুরোপুরি মানুষের মূর্তিও নয় বলা বাহুল্য। আবার রাক্ষস-পিশাচের মূর্তি যে নয় সে কথা বলাও অনাবশ্যক। তবে এ মূর্তির নাম কী? বলতে পারব না। আপনি তো শিরোনামা আর পাদটীকা রচনায় অভ্যস্ত। আমার মূর্তির ক্যাপশন আপনি নিজেই দিয়ে নেবেন।

কৃতিত্ব কিছু নেই, কারণ কর্মও কিছু ছিল না। সরকারী অফিসে কেরানী হয়ে ঢুকেছিলাম। প্রমোশন পেয়ে পেয়ে মেজোবাবুর চেয়ারটি পর্যন্ত উঠতে পেরে-ছিলাম। তার জন্যে চেষ্টাচরিত্র কিছু করতে হয়নি। বয়স যেমন বিনা চেষ্টায় বেড়েছে ওই সামান্য পদগৌরবটুকুও তেমনি অনায়াসলব্ধ। তারপর অবসর গ্রহণ।

বিদেশী সরকারের সেবা করেছি। দেশী সরকারের কাছ থেকে পেনসন পাই।

আমার সরকারী জীবনের এই হল সংক্ষিপ্তসার। কিন্তু বেসরকারী জীবন? তা কি অমন দু-চার কথায় সারা যায়?

আমার জীবনের সেই অন্দরমহলের দিকে আপনি বারবার আড়চোখে তাকিয়ে-ছেন। আমিও কি কম সেয়ানা? দোর বন্ধ করে পর্দা এঁটে রেখেছি।

কেন রাখব না বলুন? প্রাইভেসি আপনার আছে, আমার নেই? আপনার জেননা আছেন রক্তমাংসের গৃহিণী, আমাদের কি দু-একটি মানস-সুন্দরীও থাকতে নেই? সেই পুরসুন্দরীকে আপনি কেন সভাকক্ষে দশজনের সমক্ষে টেনে আনতে চান, দুঃশাসন?

শুধু আপনাকে কেন যে কোন কৌতূহলী বন্ধুকেই আমি এইভাবে তিরস্কার করেছি, বলেছি জানতে চেয়ো না, জানতে চেয়ো না। আমার গোপন কথা আমার সিন্দুকেই বন্ধ থাক।

এতদিন তাই রেখেছিলাম। সযত্নে যক্ষের ধনের মত নিজের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা আসক্তি আবেগ রুদ্ধ করে রেখেছিলাম। তারপর সেদিন কী খেয়াল হল। চাবি হারিয়ে গেছে। যাদুঘরের জংপড়া তালাটি ভেঙে ফেললাম। ভিতরে ঢুকে ঘরজোড়া সিন্দুকের ডালাটি তুলে ধরলাম। গহ্বরে মুখ বাড়িয়ে দেখি এ কী। সিন্দুক ভরা সোঁদো গন্ধ আর কতকগুলি আরশোলা চামচিকে ইঁদুরের উল্লাস-নৃত্য। আমার সেই গুপ্তধন হীরা জহরত মণিমাণিক্যের কণাটুকুও নেই। সব কালগর্ভে বিলীন। স্মৃতির সম্পদ বিস্মৃতির অতলে লীন।

বিস্মৃতি? কথাটা ঠিক চলতি অর্থে নেবেন না। আমার স্মরণশক্তি দুর্বল নয় সে পরিচয় আপনি পেয়েছেন। আমার জীবনকালে দেশকালের ইতিহাস মোটামুটি আমি মুখস্থ বলে দিতে পারি। নিজের জীবনের ঘটনাপঞ্জী সাল তারিখ তিথিনক্ষত্র সুদ্ধ আমার ঠোঁটস্থ। কিন্তু তাই কি সব? কোথায় গেল সেই জীবনরস? নীরস তিন আনা সংস্করণের এক চটি জীবন-বৃত্তান্ত কি তার জায়গা নিতে পারে? কোথায় গেল সেই হর্ষ বিষাদ উল্লাস আর উচ্ছলিত শোকসিন্ধু? তীব্র সুখদুঃখের তীক্ষ্ণতম অনুভূতি? কোথাও তা নেই। সব কর্পূরের মত উবে গেছে। যিনি স্রষ্টা তার সেকালও নেই, একালও নেই। অন্যের জীবনকে তিনি যেমন আত্মসাৎ করতে জানেন, নিজের অতীতকেও তেমনি মৃতসঞ্জীবনী সুধায় বর্তমান মুহূর্তটির মত জীবন্ত করে তুলতে পারেন। তাঁর অতীতের কথা স্মৃতি কথা নয়। রূপ কথা। তাঁর স্মৃতি সৃষ্টির উপকরণ মাত্র। কিন্তু আমরা যারা সাধারণ মানুষ, হাড়মাস শুকিয়ে শেষ বয়সে কঙ্কালসার হয়ে বাঁচি তারা আর দ্বিতীয়বার বাঁচতে জানিনে। নিজেদের অতীত জীবনকে প্রাণস্পন্দনহীন একটি কঙ্কালের মত দশজনের সামনে এনে হাজির করি।

আমি সেই অপচেষ্টা করব না। আপনাকে আজ আর স্মৃতি কথা শোনাতে বসব না।

কোন্ কথায় কোন্ কথা এসে পড়ল। বুড়ো বয়সের এই এক দোষ। প্রসঙ্গ ঠিক থাকতে চায় না। যার যার প্রসঙ্গের কাঁটা

তায়ের ঘোড়া লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে যাবার লোভ হয়। এই বয়সে অন্য পাঁচরকমের লম্ফঝম্প তো শেষ। কেবল প্রসঙ্গকে ডিঙোবার সাধ্যটুকুই আছে।

কৃতিত্বের কথা হচ্ছিল। কৃতী হওয়ার খুব যে একটা স্বপ্ন দেখেছি তা নয়, তবে লেখাটেখার দিকে একটু ঝোঁক ছিল। কাগজে একটু-আধটু আঁচড় কেটে দেখেছি এ সামান্য ঝোঁকের ব্যাপারে নয়। জীবনভর ঝুঁকে পড়া থাকা চাই। যাকে বলে একাগ্রতা। কিন্তু আমি এক জীবনে আরো পাঁচ-রকমের অগ্রভাগ দেখে দেখে চেখে চেখে বেরিয়েছি। একাগ্র হবার তেমন আগ্রহ বোধ করিনি। অবশ্য নিষ্ঠা থাকলেই কি হয়? কত নিষ্ঠাবানকে তো দেখেছি। তাঁদের তো হল না। অবশ্য যাঁকে বাইরে থেকে একনিষ্ঠ মনে হয় ভিতরে ভিতরে তিনি হয়তো অনেকনিষ্ঠ। মানুষকে বুঝবার জো নেই মশাই। সে কি নিজেই নিজেকে চেনে? বুঝতে পারে কোনটা তার স্ববেশ, কোনটা ছদ্মবেশ?

সৃষ্টির আনন্দ বরাতে জোটেনি। কিন্তু যন্ত্রণা এড়াতে পারেনি। বন্ধ্যা যে নারী তার প্রসব-যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় না, কিন্তু আর সব যন্ত্রণাই মুখ বুজে সইতে হয়। শুধু সন্তানের মুখ দেখবার অপার সৌভাগ্য তার হয় না।

তা ছাড়া সৃষ্টির জন্যে দানবীয় শক্তির দরকার। দেবদ্বিজে আমার ভক্তি আছে। তবু আমার কি ধারণা জানেন? দেবতারা ভোগ করেন, সম্ভোগ করেন, কিন্তু সৃষ্টি করে দনুজেরা। সেই দানব ভুল করে। ব্যাকরণের ভুল, আচরণের ভুল, তথ্যের ভুল, তত্ত্বের ভুল আরো হাজার রকমের বিভ্রান্তি তার সৃষ্টিকে ছেয়ে রাখে। তার পান থেকে চুন মুহুর্মুহু খসে পড়ে। তবু তার মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। দেবতাদের স্বর্গে সুখ আছে, সম্ভোগ আছে, কিন্তু সৃষ্টি নেই। ঋষির ধ্যানাসনে জ্ঞান আছে, মুক্তি আছে কিন্তু সৃজন প্রক্রিয়া নেই। জৈব আর অজৈব দুই অর্থেই।

সারাজীবন আমার এই দোটানার টানা-টানির মধ্যে কাটল। কখনো আমি রূপস্রষ্টাকে উঁচু আসনে বসিয়েছি, আবার কখনো বা জ্ঞানীকে সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছি। গুণীকে টেনে নামিয়েছি প্রাকৃতজনের পর্যায়ে। তাদের কৃপার পাত্র বলে মনে করেছি। আসলে জ্ঞান আর রূপেপণা যে সত্যিই দরজা-জানালা আঁটা দুই পৃথক কামরার বাসী নয় একথা বুঝতে আমার সময় লেগেছিল। যখন বুঝতে পারলাম তখন সৃষ্টির শক্তি চলে গেছে, স্পৃহাও আর নেই।

[illegible] কথা বলছিলাম। [illegible] সেই [illegible] শক্তি সবার থাকে না। যাঁদের [illegible] তাঁদের [illegible] জিজ্ঞাসী

বন্দোবস্ত নিয়ে আসেন তা নয়। কারো পাঁচশালা বন্দোবস্ত, কারো বা দশশালা। সারাজীবনের দখলী স্বত্ব যিনি নিয়ে আসেন তিনি ক্ষণজন্মা।

অল্প বয়সে আমার এক বন্ধু দম্পতীর প্রণয়-ক্রিয়া দেখবার সুযোগ বা দুর্যোগ হয়েছিল। দিনে দুপুরে ঢুকে পড়েছিলাম তাদের ঘরে। উদ্দেশ্য ছিল তাদের চমকে দেওয়া। কোনরকমে বাইরে পালিয়ে এলাম। তারাও অপ্রস্তুত আমিও অপ্রস্তুত। প্রণয়াসক্ত নরনারীর সেই মিথুন মূর্তি আমাকে সেদিন মোহিত করেনি, কামার্ত করেনি। বরং হাসির খোরাক জুগিয়ে-ছিল। বহুদিন সেই দৃশ্য মনে হতেই আমি কেবল হেসেছি। ভেবেছি এর চেয়ে অ্যাবসার্ড কম্পোজিসন আর হতে পারে না। দুটি নারী পুরুষকে এক সঙ্গে দেখলেই আমার সেই চরম দৃশ্যের কথা মনে হয়েছে। মনে মনে হেসেছি আর ভেবেছি এইতো ব্যাপার! চূড়ান্ত লক্ষ্য তো ওই। অনেক পরে বুঝেছি গাছের বিচ্ছিন্ন গোড়াটা যেমন সব নয়, চূড়াটাও তেমনি সব নয়। তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শাখাপ্রশাখা পুষ্প-পত্র পল্লব সব মিলিয়েই সে পূর্ণাঙ্গ। রূপ আর রসের আধার।

যৌনক্রিয়ার মত বহু পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের মানস সৃষ্টির ক্রিয়া প্রক্রিয়া আমাকে হাসিয়েছে। সৃষ্টির সামান্য ক্ষমতায় কেউ মত্ত, কেউ উন্মত্ত, কেউ মূঢ়, কেউ রূঢ়। কদাচিৎ আমি তাঁদের মধ্যে যুক্তিবুদ্ধি শাসিত সম্প্রীতি, পরিমিতি খুঁজে পেয়েছি। দেখে দেখে আমার মনে হয়েছিল সৃজনশীল ব্যক্তিমাত্রেই দুঃশীল।

স্রষ্টাদের সঙ্গ ছেড়ে আমি অন্য সঙ্গ ধরেছি। কিন্তু নাড়ীর টানের মত কিসের একটা টানও অনুভব করেছি। সে প্রায় অন্ধ জৈব আকর্ষণের মত। আমি তাঁদের ছাড়তে পারিনি। তাঁদের অনেকের লেখায় মধ্যে আমি নিজেকে পেয়েছি, কিছু বা দিয়েছিও। অবশ্য সেই সহায়তা একান্তই বাইরের।

আজ যখন আপনি আমাকে আমার ব্যক্তিগত কৃতিত্বের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, বুঝিয়ে বলতে পারব না, কিসের যেন একটা আঘাত লাগল। এ আঘাত আপনার দেওয়া নয়, এ আঘাত আমার হাতের, আপন মনের। আপন মন সব সময় মাধুরীই মেশায় না, বিষও মেশাতে জানে। আপনি হয়তো কিছু ভেবে বলেননি, কিন্তু কথাটা সারাদিন আমাকে ভাবিয়ে ছাড়লে। ভেবে দেখুন যে বয়সে দেহটা ঝুনো নারকেলের মত আর হৃদয় মন পাথরের নুড়ি, সেই

বয়সেও কী স্পর্শকাতরতার মধ্যে আমার বাস।

সারাদিন ভাবলাম। সারাদিন জমা খরচের খাতা উলটে পালটে দেখলাম। জমার ঘরে কিছুই দেখতে পেলাম না। মনে হল সারাজীবন কেবল পার্শ্বচরিত্র হয়েই কাটালাম। রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্রস্থলে এসে দাঁড়াতে পারলাম না, মূল ভূমিকা নিতে পারলাম না।

আর কিছু না হোক, বয়সকালে একটা বিয়ে তো করতে পারতাম। বউ হত, ছেলেমেয়ে হত, নাতিনাতনী হত। চিরপরিচিত একটা প্যাটার্নের মধ্যে নিজেকে ধরে দিতাম।

আপনি অনেকদিন জিজ্ঞাসা করেছেন, আরো অনেক বন্ধু মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করেছে কেন বিয়ে করিনি। ঠিক সদুত্তর দিতে পারিনি। আপনি ভেবেছেন জবাবটা আমি এড়িয়ে গেছি। তা নয়। আসলে আমি ভুলে গেছি। এই চির-কৌমার্যের মূলে গভীর আধ্যাত্মিকতা কি ধর্মস্পৃহা নেই। দেশোদ্ধারের ব্রত নয়, আর্থিক অনটন নেই, ব্যর্থ প্রেম নেই। তবে কী। হয়তো ঈষৎ মাত্রায় সবগুলিই ছিল। সবগুলি এক সংগে নয়। একেক সময় একেকটি।

কিন্তু কোনটাই তীব্র ছিল না, কোন বাধাই পার হওয়া দুঃসাধ্য ছিল না। তবু পারঙ্গম হতে পারিনি।

'সকালবেলা কাটিয়া গেল বিকাল নাহি যায়।' বিকালে সাধারণত বেরিয়ে পড়ি। ভালো কোন মিটিং টিটিং থাকলে সেখানে যাই। গিয়ে পিছনের সারিতে বসি। না থাকলে আমাদের আড্ডায় যাই। আমার মত কয়েকজন বুড়ো আর প্রৌঢ় সেখানে আসেন। সেই বৈঠকে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সব রকমের আলোচনা হয়। মুখরোচক পরচর্চাও চলে। সদস্যদের মধ্যে আমার মত অকৃতদারও আছেন, আবার কৃতদার মৃতদারেরও অভাব নেই।

কিন্তু আজ আর কোন মিটিং-এ যেতে ইচ্ছা হল না। আড্ডার আকর্ষণও শিথিল হয়ে গেল।

বইয়ের শেলফের দিকে তাকালাম। কিছু কিছু বই চুরি গেছে। ঠিক চুরি নয়। কোন কোন বন্ধু ধার নিয়েছেন। আর ফেরত দেননি। আমি দুএকবার তাগিদ দিয়ে মনে মনে সে বই তাঁদের ধরে দিয়েছি। তবু নিজস্ব কিছু বই আছে। যা আমার প্রায় নিত্যপাঠ্য। তালিকাটা দিলাম না। আপনার রুচির সংগে নাও মিলতে পারে।

কিন্তু আজ অনিত্যতা আমাকে এমনই পেয়ে বসল সেই নিত্যপাঠ্যের দিকেও হাত এগোল না। বুঝতে পারলাম নিজের মন নিজের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে।

বাড়ির অন্দরমহলে দাদা থাকেন। পুত্র নাতিনাতনী নিয়ে বিপুল সংসার। আমার ঘরের সংগে সেই সংসারের কংক্রীটের পাকা ব্রীজ আছে। নিয়মিত যাতায়াত চলে। তবু একেক সময় মনে হয় সেই সেতুটি অদৃশ্য হয়েছে। মাঝখানে দুস্তর পারাবার। তিনি গৃহী, আমি অতিথি। বড়জোর পেয়িং গেস্ট।

চুপচাপ বসেছিলাম। পাশের ঘরে ফোন বেজে উঠল। ফোনটা দাদার ঘরেই থাকে। তাঁরই ফোন টোন আসে। তিনি ভালোবাসেন ফোনে কথা বলতে।

আজ দাদা মুখ বাড়িয়ে হেসে বলে গেলেন, 'ওরে প্রভু, তোর ফোন এসেছে।'

হাসির কারণ ছিল। ফোনটি বামা কণ্ঠের। মেয়েরা বড় একটা আমাকে আজকাল আর ডাকে না। আজকাল মানে বহুকাল। যখন ডেকেছিল সাড়া দিইনি।

ফোনে ডেকেছেন আমার এক পুরোন বন্ধুর স্ত্রী। বন্ধু আমার মতই বৃদ্ধ। বান্ধবীও বুড়ী। শুনেছি ছেলেবেলায় তাঁর ওই ডাক নামই ছিল। এখন নাম আর রূপ এক হয়ে গেছে।

বান্ধবী বললেন, 'কী ব্যাপার? তুমি যে কদিন ধরে আসছ না?'

বললাম, 'যেতে চাইলেই কি আর যাওয়া যায়? বুড়ো বয়সে বাতের ব্যথা আছে, দাঁতের ব্যথা আছে।'

তিনি বললেন, 'বাজে কথা রাখো। তোমার কোন ব্যথাই নেই। দু পাটি দাঁত বাঁধিয়ে নেওয়ার পর তোমার দন্ত অমূলে নির্মূল হয়েছে। আর বাতের কথা বলছ? বাত বুঝি তোমার ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারে? এখনো সারা কলকাতা টহল দিয়ে বেড়াও আমি বুঝি আর জানিনে সে কথা?'

হেসে বললাম, 'তাই নাকি?

তিনি বললেন, 'আসলে আমাকে খোঁটা দেওয়া হচ্ছে। ওই দুই রোগের কষ্টই যে আমার।'

বললাম, 'একজনের কষ্টে বুঝি আর একজনের কষ্ট হয় না?'

তিনি বললেন, 'তাই হয়। শোন, আজ একবারটি এসো। তোমার আদরের নাতনী মিঠুর জন্ম হয়েছে। সেই থেকে ভালো দাদু ভালো দাদু করছে। সেই বিরহকাতরাকে একবার দেখে যাও।'

সংসারে দুটি আকর্ষণের তীব্রতা বেশি। যৌবনে পত্নীর, বার্ধক্যে নাতনীর। এক আকর্ষণের হাত এড়িয়েছি, আর এক আকর্ষণ এড়াতে পারিনি। পাতানো নাতনী আমার আরেক আছে।

আমার এই বন্ধুপরিবারের কথা কি আপনাকে এর আগে বলেছি? বোধ হয় বলিনি। বলবার কথা কিন্তু একটু আছে। তবে ওই একটু মাত্রই। খবরদার আপনি যেন তিলকে তাল করবেন না।

এই বন্ধু আর আমি পশ্চিমের একটি শহরে এক অফিসে কাজ করতাম। অফিসের পর এক সংগে তাঁর বাসায় যেতাম।

সেই শহরে আর কোন পরিবারের সংগে আমার জানাশোনা ছিল না। ওই একটি পরিবারই ছিল মরুভূমিতে ওয়েসিস। বন্ধুর স্ত্রী শিক্ষিতা ছিলেন, সুন্দরী ছিলেন। যেমন রাঁধতে পারতেন তেমনি চুল বাঁধতে। যেমন সেবাযত্নে তেমনি হাসি পরিহাসে তাঁর জুড়ি ছিল না। বিকাল হলেই আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠত। কখন সন্ধ্যা হবে, কখন তাঁর সংগে দেখা হবে।

এই আকর্ষণটা এক পক্ষের ছিল না। আমি যাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি তাঁকে আকর্ষণ করতেও পেরেছি একথা জানবার পর সুখের কি আর কিছু বাকি থাকে? কিন্তু সেই সুখ নিষ্কণ্টক ছিল না। আমার অকৃত্রিম বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের জন্যে আমার কেমন যেন লজ্জা হত, অনুশোচনা হত। যদিও তার কোন কারণ ছিল না। আমার এই ভালোবাসা ছিল অদৈহিক। অদৈহিক? আমরা তাবার ভুলে শুধু ত্বককেই দেহ বলি। একটি ইন্দ্রিয়কেই সমস্ত শুচিতা অশুচিতার আধার বলে জানি? কিন্তু আমার দৃষ্টি দেহজ, হাসি দেহজ, কথা দেহজাত। এই ব্যাপক অর্থে আমাদের ভালোবাসা দৈহিকও ছিল। আমরা পরস্পরকে দেখা দিয়ে ভালো-বাসতাম।

আমি আরো একটু বেশি ভালো-বাসতাম তাঁকে, ভালোবাসতাম আমার চোখ

দিয়ে। আমি তখন ডায়েরি রাখতাম। তাঁর জন্যেই ডায়েরি রাখতাম। আমার ডায়েরি তাঁর কথাতেই ভরা থাকত। নিষ্কাম শিল্পের চর্চা বলে যদি কিছু থাকে সে হল এই ডায়েরি। ডায়েরি হল art for one self, art for own self, ডায়েরিতে কেউ যশ আর অর্থের প্রত্যাশা করে না। এইদিক থেকে আমার সেই ডায়েরি নিষ্কাম ছিল। অন্যদিক থেকে সকাম। সেই ডায়েরির প্রতিটি লাইন প্রতিটি অক্ষর আমার মনের কামনা বাসনা দিয়ে গড়ে তুলতাম। আমার সেই বান্ধবী আমার লেখার কথা জানতেন। কথায় কথায় আমিই একদিন তাঁকে বলেছিলাম। তারপর থেকে তিনি আমাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, 'তোমার ডায়েরি আমাকে কবে শোনাবে?'

স্বামীর সাক্ষাতে নয়, আড়ালেই দিতেন এই তাগিদ। একদিন আমি বললাম, 'একজনের ডায়েরি কি আর একজনকে শোনানো যায়?'

তিনি বললেন, 'তা হলে লেখা কেন?'

আমি বললাম, 'লেখা নিজের জন্যে।'

তিনি হেসে বললেন, 'যে লেখা অন্তত একজনকেও শোনানো যায় না সে লেখা কি লেখা? আমাকে না শুনিয়ে পারবে না।'

'কখন শুনবে বলো?'

'কাল দুপুরে চলে এসো আফিসে পালিয়ে। না হয় কামাই করে দিয়ো আমার জন্যে।'

তখন তাঁর ভরা যৌবন। আমারও তাই। কিন্তু তাঁর চলন বলন দেখে মনে হল যেন এক চপলা কিশোরী কুলের আচার চুরি করে খাওয়ার আনন্দে স্বর্গ হাতে পেয়েছে।

নিজের ঘরে ফিরে এলাম। সারারাত ঘুম হল না। দুঃখের অনিদ্রা নয়, তীব্র সুখানুভূতি আমাকে জাগিয়ে রাখল। দূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত অবাধ অসম্ভব সব কল্পনা বিচিত্র বর্ণজালে আমাকে আচ্ছন্ন করতে লাগল। তার বর্ণনা ডায়েরিতেও লেখা যায় না।

পরদিন অফিসে গেলাম না। সকালটা লিখে লিখে কাটালাম। সে লেখা শুধু নিজের জন্যে নয়, আরো একজনের জন্যে।

সকাল থেকে আকাশ মেঘে ঢাকা। বেলা বুঝবার জো ছিল না। দিবাঅভিসারের পক্ষে একটি মনোরম প্রশস্ত দিন। কিন্তু সেদিন যদি খররোদও থাকত আমার কিছু এসে যেত না। আমার মোহ আর বাসনায় আচ্ছন্ন মন চারদিকে আঁধারের পর্দা টেনে দিয়েছিল।

তখন রোজ [illegible]। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাঁচি হাতে [illegible] শোভন সুন্দর করে তুলতাম। নিজের [illegible] নিজের [illegible] আমার [illegible]।

সেই দেখার মধ্যে আরো দুটি চোখের দেখা মিলে ছিল।

বেরোতে যাব হঠাৎ দেয়ালের একখানা ছবির দিকে আমার চোখ পড়ল। আমার সেই বন্ধুর আর আমার একখানি গ্রুপ ফটো থেকে আমি চোখ ফেরাতে পারলাম না। আমাদের বহুদিনের সৌহার্দ্য আমরা দামি ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছি। এক কপি তাঁর ঘরে আছে, আর এক কপি আমার ঘরে। এতক্ষণ আমি বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলাম। এবার সেই ফোটোর দিকে তাকালাম। দেয়ালে স্থির চিত্র একখানাই ছিল। কিন্তু মনের পর্দায় প্রদর্শনী চলছিল চলচ্চিত্রের। তার যেন আর শেষ নেই।

তারপরও আমি বেরোলাম বটে, কিন্তু বন্ধুর বাসায় আর গেলাম না। সোজা গিয়ে হাজির হলাম গঙ্গার ঘাটে। সারি সারি বহু নৌকো। আমি তার একখানি ভাড়া করলাম। এ তরীতে আজ আমার একা ওঠার কথা ছিল না। তবু একাই উঠলাম, একাই ভাসলাম। তারপর খানিক দূর এগিয়ে মধ্য গঙ্গায় এসে ডায়েরিখানা ফেলে দিলাম।

মাঝি হায় হায় করে উঠল, 'আপকি কিতাব গির গিয়া বাবুজী'।

আমি বললাম, 'যাক।'

একটি আকাঙ্ক্ষা দিয়ে গাঁথা এক জীবন আমার সেই একখানি গ্রন্থ। বাসনার আগ্নেয় স্বাক্ষর। গঙ্গার জলে সেই আগুন আমি নেবাবার চেষ্টা করলাম।

তারপর আর কোনদিন ডায়েরি লিখিনি। প্রায় কিছুই লিখিনি।

সরস্বতীকে দুষ্টা সরস্বতী ভেবে কাঁধ থেকে নামিয়ে বাঁচলাম। শিষ্ট হলাম, শান্ত হলাম। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর সরস্বতীর দেখা পেলাম না।

মাঝিকে বললাম, 'আমাকে ওপারে নিয়ে চল।'

কেবল নদীর ওপারে নয়, ভোগবতীর অপর পারে, মর্ত্যসীমার অন্য পারে চলে যেতে পারলে যেন বাঁচি।

তা তো যাওয়া সম্ভব নয়। তবে চেষ্টাচরিত্র করে স্টেশন বদলালাম। পশ্চিম থেকে পুবে সরে এলাম।

বন্ধুর সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ রইল না। অনেকেই ভাবল আমাদের মধ্যে মারাত্মক ঝগড়া হয়ে গেছে। অনেকে অনেক রকম অনুমানও করল। সেসব কানাঘুষা আমার নিজের কানে এসেও পৌঁছেছিল।

চল্লিশ বছর—প্রায় আধখানা শতাব্দীবাদে সেই বন্ধুর সঙ্গে ফের দেখা। এ জি বেঙ্গলে দুজনেই পেনসনের টাকা নিতে গেছি। এখানেই পুরোন সহকর্মীদের তোবড়ানো মুখে বাঁধানো দাঁত দেখতে পাই। এই বন্ধুর [illegible] দেখলাম।

সে বলল, 'আরে তুমি?'

আমি বললাম, 'আরে তুমি!'

দুজনের চোখেই পুরু লেন্সের চশমা। আমার মাথার চুল সবই প্রায় সাদা, তার মাথায় চুলের বালাই নেই।

সে আমাকে কিছুতেই ছাড়ল না। নিয়ে চলল তার টালিগঞ্জের বাড়িতে। দেখলাম গাড়িও করেছে। যেতে যেতে তার পারিবারিক খবর শুনতে লাগলাম। বাড়ি করেছে। দুই ছেলে কৃতবিদ্য। দুজনেই চাকরি বাকরি করে। বিয়ে থা করেছে।

তবে কেউ বাপ মার কাছে থাকে না। তারা নিজেরাই এখন বাবা হয়েছে। কাজের জায়গায় ছোট ছোট কোয়ার্টারে ছোট ছোট সংসার। মেয়ে দুটিরও বিয়ে হয়ে গেছে। জামাইদের নাম সগৌরবে উচ্চারণ করল আমার বন্ধু।

'ছেলেমেয়েদের মায়ের কথা বললে না?' হেসে জিজ্ঞাসা করলাম।

বন্ধুও হাসল, 'অপেক্ষা করছিলাম। মনে মনে বাজি রেখেছিলাম তুমি মুখ ফুটে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত আমি মুখ খুলব না। চল দেখতে পাবে।'

এই পরম বন্ধুর মুখে এর আগে কত সন্দেহ সংশয় বিদ্রূপ বিদ্বেষের বিদ্যুৎ জ্বালাই না দেখেছি। আজ দেখলাম প্রশান্ত নির্মল হাসি কর্ণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত। আজ আর কাউকে নিয়ে কারো কোন ভয় নেই। দুজনের একই কষ্ট—জরার। দুজনের একই ভয়—মৃত্যুর। দুজনেরই একই প্রেম—আত্মরতি। ফের আমরা দুজনে অভিন্নহৃদয়।

গিয়ে দেখলাম আমার সেই বান্ধবীকে। চল্লিশ বছর পরে চোখাচোখি। চালশে আমাদের অনেকদিন কেটে গেছে। চশমার দৌলতে ফিরে পেয়েছি দিব্যদৃষ্টি।

কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে মনে হল ফিরে না পাওয়াই বুঝি ভালো ছিল। সেই তন্বী মনোমোহিনী আজ বপুষ্মতী। মেদভার মেদিনীরই মত। মাথাভরা তাঁরও পাকা চুল। তবে সিঁদুরে রাঙা।

বাক্যহারা আমরা দুজনে দুজনের দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইলাম। 'সে ভাষা ভুলিয়া গেছি।'

তাঁর দৃষ্টিতে মোহের কাজল নেই, আমার দৃষ্টিও মোহমুক্ত।

'সব অঙ্গ খেয়োরে কাক না রাখিয়া বাকি—'

জরারূপী কাক ঠুকরে ঠুকরে আমাদের সব খায়। অনুরোধের অপেক্ষা রাখে না।

শুধু রূপ দর্শনের জন্যে চোখ দুটি বাকি রাখে। সে রূপ জরতীর নয়, যৌবনবতীর।

ভুলে গেলাম শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আমিও সত্তর পার হয়েছি। আমিও আর রূপ লাবণ্যের আধার নই। তবু রাধাকে কে কবে বৃদ্ধা বলে কল্পনা করতে পেরেছে?

কিন্তু অশুভ দৃষ্টির সেই অনাত্মীয়তা বেশিক্ষণ রইল না। খানিকক্ষণ বাদেই তিনি পরমাত্মীয়ার মত পাশে বসলেন। সুখ দুঃখের কথা চলতে লাগল।

আমি বললাম, 'তোমার তো দুঃখের মধ্যে দেখি এক বাত।'

তিনি বললেন, 'বায়ু পিত্ত কফ যখন যেটা আসে সেইটাই বড়ো।'

তারপর তিনি তাঁর নিজের হাতের তৈরি মিষ্টি খাওয়ালেন। চা করে দিলেন নিজের হাতে। আর দিলেন তাঁর পাঁচ বছরের নাতনীটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে। তাঁর ছোট মেয়ে নিজের মেজো মেয়েটিকে দয়া করে বাবা মাকে ধার দিয়ে গেছে। নাম মিঠু। বুলবুলির মতই মিষ্টি বুলি। ভারি মায়াবিনী। খানিকক্ষণের মধ্যেই সে আমার কোলে এল। গলা জড়িয়ে ধরল। আমিও তো নিতান্ত প্যাসিভ ছিলাম না। প্রণয় ব্যাপারে পুরুষের সক্রিয় ভূমিকায় এতদিনে আমি সচেতন হয়ে উঠেছি।

নাতনী আমার গলা জড়িয়ে ধরে দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'দিদা এ আমার কোন দাদু?'

বান্ধবী বললেন, 'এ তোমার কালো দাদু। দেখছ না আলকাতরার মত রঙ।'

বন্ধু বললেন, 'নারে মিঠু, ও তোর ভালো দাদু। তোর দিদাকে জিজ্ঞেস কর অত ভালো সে আর কাউকে দেখেছে নাকি? অত ভালো আর কাউকে—'

বান্ধবী তাঁর স্বামীকে ধমক দিয়ে বললেন, 'আঃ, কী হচ্ছে?'

নাতনী ভালো নামটাই নিল। সেই থেকে আমি ওর ভালো দাদু। ভালোবাসার মানুষ।

ফোনে ওর জ্বরের খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি করে টালিগঞ্জে গেলাম। জ্বর এমন কিছু বেশি নয়। ওর গায়ে মাথায় হাত বুলাতে লাগলাম, গল্প বলতে লাগলাম। পরীর গল্প। মিঠু তার ছোট মুঠির মধ্যে আমার হাতখানা ধরে রাখল। ঘুমিয়ে পড়বার পর সেই হাত আমি ছাড়িয়ে নিলাম।

বন্ধু বাড়ি ছিলেন না। বান্ধবী চা করে দিতে দিতে হঠাৎ বললেন, 'তোমার মত বোকারাম আর দেখিনি।' শুনে আমি বোকার মত তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

তিনি বললেন, 'সেদিন অমন করে পালালে কেন। আমি তোমাকে একদিনই আপিস পালাতে বলেছিলাম।'

এতদিন বাদে একথার কি কোন জবাব আছে?

আমি মূক বধির হয়ে রইলাম।

খানিক বাদে মিঠুর জ্বর ছেড়ে গেল, আমারও।

ও'দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসে উঠে পড়লাম। বেশি রাত্রের বাসে এখনো মাঝে মাঝে উঠি। বসে বসে ভাবতে ভালো লাগলো না কল্যাণবাবু, জীবনে কৃতিত্ব কিছু নেই। নিজের হাতে কিছু কি করেছি যে কৃতিত্ব থাকবে? বন্ধুরা খেলেছে আমি তাদের পিছনে বসে দাবার চাল বলে দিয়েছি। এ জীবনটা সেই চালিয়াতিতেই কাটল।

আমার আর কোথাও কিছু নেই।

শুধু কয়েকটি আত্মীয় বন্ধুর ঘর এখনো খোলা আছে। সকাল সন্ধ্যায় যখনই যাই এই বাইরের মানুষটিকে তারা ভিতরে ডেকে নেয়। কেন যে নেয় কী জানি। আমার মত অকিঞ্চনের দেবার তো কিছু নেই। শুধু হাত পেতে নিতেই জানি।

দানের কৃতিত্ব আমার নেই। কিছু করার কৃতিত্ব আমার নেই। জীবনভর শুধু অনুভব করে গেলাম। অপ্রকাশ্য অপ্রকাশিত সেই অনুভূতির রস। জীবনভর শুধু দেখে গেলাম। সেই দেখার কথা লেখায় রেখায় ধরে দেওয়া হল না।

কৃতিত্ব কিছু নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারি অকৃত্য কিছু করিনি। আপনার বাবামার আশীর্বাদে এই নেতিবাচক সান্ত্বনাটুকু নিয়ে যেন চোখ বুজতে পারি।

পাজের [illegible] —গোপেন রায়

[illegible] —[illegible]

চিত্র প্রদর্শনী

যে কথা স্থির হয়েছিল সেইমত রাজপুত্র দক্ষিণ দিকে, মন্ত্রিপুত্র উত্তর দিকে ও কোটালপুত্র পূর্ব দিকে চলে গেলেন। এদিকে দেখতে দেখতে রাত হয়ে গেল... রাজপুত্র আর কি করেন! গভীর বনে একটি গাছে ঘোড়াটিকে বেঁধে রেখে তিনি গাছের ওপর উঠে পড়লেন...

তারপর?

তারপর? সেই গাছে এক ব্যাঙ্গমা ও ব্যাঙ্গমী থাকত—বুঝলে খোকন? রাজপুত্রের কচি মুখ দেখে ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীকে বলল—আহা রে, রাজপুত্রের সামনে ভীষণ বিপদ...কাল সেই বিরাট অজগরটা একে খাবার জন্যে ঠিক ছুটে আসবে—তবে এ রাজপুত্রের খুব সাহস... পাশ কাটিয়ে যদি তলোয়ার বার করে এক কোপে...

তা-র-প-র?

তারপর? তারপর ছোট ঘরের ছোট্ট জানালার মধ্য দিয়ে নীল আকাশের বুকে ভাসমান ধনুকবাঁকা চাঁদের দিকে চেয়ে থেকে মা-ঠাকুমা-দিদিমার মুখে এই বিচিত্র রূপকথার কাহিনী শুনতে শুনতে এক কালে বাংলা দেশের শত শত 'দুষ্টু ও দস্যি' ছেলেমেয়ে ঘুমিয়ে পড়ত ও রূপালী স্বপ্নের মধ্যে অপূর্ব সুন্দরী বন্দিনী রাজকুমারীর দর্শন পেত। সম্প্রতি অ্যাকাডেমি ভবনে অনুষ্ঠিত শিল্পী গোপেন রায়ের 'শিশু-স্বপ্ন' প্রদর্শনী দেখতে দেখতে ফেলে-আসা জীবনের প্রথম দিকে শোনা কাহিনীর কথা যেন মনে পড়ে গেল ও নিজের অজ্ঞাতসারেই বুঝি কোন সময়ে রূপকথার রাজ্যে পৌঁছে গিয়েছিলাম। জানি না, আধুনিক যুগে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রাত্রে বিছানায় শুয়ে এমন বিচিত্র গল্প শোনার সুযোগ পায় কিনা, তবে রূপকথার বিভিন্ন কাহিনী [illegible] [illegible] [illegible]

তার প্রমাণ পেয়েছি প্রদর্শনীকক্ষে আগত শত শত ছেলেমেয়েকে দেখে। শিল্পী গোপেন রায় শিশুজগতে বাস করেন ও শিশুদের ভালবাসেন। ছোট ছেলেমেয়েদের মন মুগ্ধ করার মত উপযোগী রঙ ও তুলি তিনি ব্যবহার করতে জানেন ও রঙ-তুলির যাদুমন্ত্র দিয়েই তিনি তাদের হৃদয় জয় করেছেন। পরিকল্পনা, রঙ নির্বাচন তথা সরল অঙ্কনপ্রথার দিক দিয়ে ছবিগুলি শিশুমনে গভীর রেখাপাত করে। বিশেষভাবে কোনও ছবির উল্লেখ করার প্রয়োজন এখানে নেই—কারণ, বিভিন্ন কাহিনীর পরিপূরক হিসাবে এগুলি যেন একই সুতায়

[illegible]

বিভিন্ন ফুলের গাঁথা মালাবিশেষ। তবুও সোনার কাঠি ও রূপার কাঠি ও ঘুমন্ত পুরীর ছবিগুলিই যেন বিশেষ করে মনের পটে দাগ কাটে। শিল্পী এই সঙ্গে পাশাপাশি দুটি গ্যালারীতে গত কয়েক বছরে আঁকা ছবির বহু নিদর্শন পেশ করেন। গোপেন রায়ের মাধ্যম জলরঙ—বিষয়বস্তু নানাজাতীয়। পেনসিলে আঁকা সমুদ্রতীর ও পর্বতশিখরের ছোট ছোট স্কেচ থেকে শুরু করে প্রভাতের প্রথম আলোকবন্যা, রাত্রির শান্ত সমাহিত রূপ তথা প্রাকৃতিক নানা দৃশ্যই এখানে স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া স্থাপত্যপ্রধান কয়েকটি রচনাও চোখে পড়ে। চতুষ্কোণজাতীয়, আলোছায়ার সম্মিলিত পরিবেশে এগুলিকে দেখে গগনেন্দ্রনাথের রচনাধারার কথা মনে পড়ে যায়। এই প্রসঙ্গে শিল্পীর কুইন অব দি ডার্ক ও ডেজার্টেড প্যালেস-এর নাম করা চলে। শিল্পীর নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাস প্রশংসনীয়। বিশেষ করে রঙের স্তর-তারতম্য মাধ্যমে তিনি প্রকৃত বাতাবরণ বর্ণনা করতে পারেন। গভীর রাত্রি, আকাশের বুকে চাঁদ সমাহিত হয়ে আছে, তারই স্নিগ্ধ অথচ অস্পষ্ট আলোকধারায় চারিদিক ভরে গেছে—রূপসী রাত্রির রহস্যময়ী মায়াবিনী রূপটুকু শিল্পী নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন (ট্র্যানকুইলিটি, সিলেসচিয়্যাল বাথ)। শিল্পীর নিষ্ঠা অসীম শিশুচিত্রসম্ভার রচনার জন্য তিনি কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। তবে তাঁর অন্যান্য রচনা দেখে মনে হয় তিনি এখনও পুরানো প্রথার পক্ষপাতী। তাঁর রচনাশ্রেণী হয়ত বিশেষ কোনও সম্প্রদায়ের ভাল লাগতে পারে, কিন্তু সেটাই সব কথা নয়। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রেও রুচি, অঙ্কনপদ্ধতি তথা প্রকাশভঙ্গিমায় বিবর্তন ঘটেছে। শিল্পী প্রতিভাবান। সুতরাং শিল্পী হিসাবে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে হলে তাঁকে যে সমসাময়িক যুগের দাবি মেনে নিতে হবে, আশা করি এ কথা তিনি স্বীকার করবেন

হোল্ডিং দি মাইটি হর্স — সুধাংশু দাস

ও অদূরে ভবিষ্যতে তাঁর যুগোপযোগী রচনা-নিদর্শন দেখার সুযোগ দেবেন। (তা ছাড়া, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারেই হোক, মাত্র নীল রঙের স্তর-তারতম্যকে কেন্দ্র করে তিনি দু'-একটি আধুনিক রচনাশৈলীর পরিচয়ও প্রদর্শনীতে দিয়েছেন।)

✲

শিল্পী অনিমেষ সেনগুপ্ত তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন অ্যাকাডেমি ভবনে। তেলরঙে আঁকা ১৬টি নিদর্শন প্রদর্শনীতে দেখা যায়। ইতিপূর্বে কয়েকটি সম্মিলিত প্রদর্শনীতে অনিমেষ সেনগুপ্তের রচনা দেখার সুযোগ হয়েছে। শিল্পীর সাম্প্রতিকতম কাজে একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ছবি দেখে মনে হয় শিল্পী যেন বিশেষ কোনও কারণে গভীর রেখা-জালের মধ্যে সমগ্র রচনাক্ষেত্রটিকে বন্দী করে ফেলেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, খেলনাজাতীয় রঙীন কাচের দূরবীন দেখেই তিনি নাকি এই অঙ্কনপদ্ধতির সূত্রলাভ করেছেন। কার্যত কিন্তু তিনি সেই অভিজ্ঞতাটুকু ব্যক্ত করতে পারেন নি। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রচনা অপেক্ষা রেখাজালেই দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে যায়। তবে যে স্থলে শিল্পী গাঢ় রঙ ব্যবহার করেছেন, সেখানেই রেখাজালের প্রাধান্য লোপ পেয়েছে, ফলে তিনি সফলতা লাভ করেছেন, অর্থাৎ সে-গুলির মধ্যে তিনি রঙীন কাচের কারুকার্যের সৃষ্টি করেছেন, যেমন অর্জুন, মাই ড্রিম অ্যান্ড শী, ও মিথুন। অপরাপর ছবির মধ্যে হার্টলেস লায়ন উল্লেখযোগ্য।

✲

উত্তরপাড়ার চৈতন্য কলাবিজ্ঞান কেন্দ্রের সভ্য শিল্পীগণ অ্যাকাডেমি ভবনে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ৬জন শিল্পীর মোট ৩৩টি রচনানিদর্শন প্রদর্শনীতে পেশ করা হয়। কলিকাতায় [illegible] সংস্থার তৃতীয় প্রদর্শনী।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত এই ছোট সংস্থাটি ইতিমধ্যেই চিত্রকলাক্ষেত্রে জন-প্রিয়তা লাভ করেছে ও ললিতকলা অ্যাকাডেমিও সম্প্রতি এটিকে নিয়মিত অর্থ-সাহায্য করতে শুরু করেছেন। সংস্থার শিল্পী-সভ্যগণ পরিচিত শিল্পী চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করেন। সংস্থার প্রায় সব সভ্যই প্রথাগত রীতির পক্ষপাতী, যদিও একজনের কাজে আধুনিক চিন্তাধারার পরিচয় পাই। দু'-জনের রচনা প্রথমেই চোখে পড়ে—মুকুল ভাদুড়ী ও সুধাংশু দাশের। মুকুল ভাদুড়ী গাঢ় রঙ ব্যবহার করেন এবং এই রঙের নানা স্তরভেদের মধ্য থেকেই তিনি নতুন আকার সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য, মাই বিলাভেড ও বিশেষ করে রাজা ও রাণীর উল্লেখ করা যায়। দুঃখের বিষয়, প্রতিকৃতি হিসাবে ২০নং নিদর্শন দুর্বল। সুধাংশু দাশের রচনা মিনিয়েচার-জাতীয়। শিল্পীর কল্পনা ও অঙ্কনশৈলী উল্লেখযোগ্য। সরলতা ও রঙ নির্বাচনের জন্য হোলডিং দি মাইটি হর্স ছবিটি সকলের চোখে পড়ে। সুপ্রিয় রাহার রচনা এক হিসাবে বিন্দুপ্রধান (Pointillistic)। এগুলি দেখে শিল্পী কিরণ সিংহের রচনার কথা মনে পড়ে যায়। তা হলেও কয়েকটি ছবি কাব্যধর্মী। তপস্বিনী উমা ও হোলির পরে-র নাম এই প্রসঙ্গে করা চলে। শচীন ব্যানার্জীর কালিকলমে আঁকা আরও কয়েকটি নিদর্শন দেখলে বিচার করার সুবিধা হত। শুকদেব চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি [illegible] ভাল লেগেছে। রঙ-ব্যবহার-কৌশলের জন্য দিলীপ মুখার্জীর কয়েকটি নিদর্শনকে [illegible] বলে মনে হয়, যেমন [illegible] ভেনচার ও দি নিউ ফেনমেনন।

[illegible]

দ্বিতীয় দর্পণ

প্রতিভা বসু

৩২

সেদিন কালীচরণের কাছে নতুন কেরানীটি কবে এসেছে জিজ্ঞেস করছিলেন লক্ষ্মীর মা।

স্কুলের সব খবর কালীচরণের নখদর্পণে। সে মাথা নেড়ে খেদোক্তি করলো, 'মাগো, সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। মল্লিক কর্তারা সব এক একজন কী মানুষ ছিলেন! জানি তো সব! এ হিস্যেতে ছিলেন চার ভাই। বড়ো, মেজ, সেজ, ছোটো। দানে-দয়ায় ধর্মে-কর্মে সব তাঁরা মানুষের মতো মানুষ। আমি যখন এ সংসারে এলুম, তখন সবাই প্রবীণ। তাঁদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে হচ্ছে একে একে। বড়ো কর্তার তো ঐ এক মেয়ে, মেজ কর্তার এক ছেলে, সেজ কর্তার পাঁচ মেয়ে দুই ছেলে, ছোট কর্তার দুই মেয়ে। বংশে এঁদের পুত্র কম। তার মধ্যে মেজ কর্তার ছেলেটি অকালে মারা গেলেন। সবে একটা বাচ্চা হয়েছিলো বউদিমণির। শোকে একেবারে পাগলপারা। আমার মেজ মা-ই বুকে তুইলে নিলেন শিশু আর শিশুর মা দু'জনকেই। বাচ্চাটার ছেল কপাল মন্দ, তার মা-ও খুব বেশী দিন বাঁইচলো না। ছেলেটা বলতে গেলে আমার মেজ মারই হয়ে গেল। কিন্তু হলে কী হবে? আদরে আদরে একেবারে মাটি কইরে ফেললেন। নাম রেখেছিলেন সূর্যনারায়ণ। রামো, রামো, এ যদি সূর্য হয় তবে অন্ধকার কারে কয় বল দেখি?'

'আমাদের স্কুলের যিনি কর্তা, সেই সূর্যনারায়ণ আর এই সূর্যনারায়ণ কি এক?'

'আবার কী? মা তো একেই সবস্ব দিয়ে গেছেন। বাপের ভাগে যা পেইয়েছিলেন, তা দিলেন এই ছেলেকে, স্বামীর বিষয় যা পেইয়েছিলেন তা দিলেন মেয়েকে। তা দিন, কিন্তু জেনে শুনে মার মতো দুর্দিন মানুষ যে কী [illegible] এর হাতে [illegible] গেলেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তো [illegible] [illegible]

আর একটি অকম্ম কইরে চইলে যান।'

'এই কেরানীটিকে বুঝি ইনিই এনেছেন?'

'মার আমলের পুরনো কেরানীবাবুকে ছাড়িয়ে একে বসিয়েছেন।'

'সে কি! প্রণববাবু নেই?'

'সাত দিন আগে জবাব হলো যে। অবশ্য তিনি বুড়ো হইয়েছিলেন। তা হোন। কাজ বুঝতেন কতো। মানুষ কতো ভালো ছিলেন। স্কুলটা ছিলো তাঁর প্রাণ। এক দিন দু' দিন তো নয়, আজ পঁচিশ বছর কাজ কইরেছেন তিনি।'

'তা হলে প্রণববাবুর জায়গায় ইনি এসেছেন?'

'লোকটা হচ্ছে হাড় পাজী। কত্তার ইয়ার-বকসীর আত্মীয় যে।'

'চেন নাকি?'

'কেন চিনবো না? আগেও তো এসেছে দু' চারবার। ঐ সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গেই এসেছে। যাকে বলে একেবারে জুতোর শুকতলা। পাশের গাঁয়েরই লোক তো।'

'আগে তো অন্য জায়গায় ছিলো।'

'জানি। ওর শ্বশুরবাড়ির দেশে ছিলো। কদ্দিন আগে ফিরে এসেছে গাঁয়ে, বোধ হয় দাদাবাবুকে খুব ধইরে পইড়েছিলো—'

'তা হলেও একজনকে অকারণে ছাড়িয়ে দিয়ে এভাবে আর একজনকে বসানো খুব অন্যায়।'

'অন্যায়ের পরিসীমা নেই সংসারে। মল্লিকবাড়িতে এখন কী হচ্ছে দেখি আর কপাল চাপড়াই।'

'উনি এসেছেন বুঝি?'

'এসেই হইহল্লা, গানবাজনা, মেয়েমানুষ —ছি। মা বেঁইচে থাকলে ছেলের রকম দেইখলে গলায় দড়ি দিতেন। স্কুলের সব্বময় কত্তা তুমি, এইসেছ স্কুল পরিদশ্যন কইরতে, তার মধ্যে এইসব! আমি ছাড়িনি, আমি বইলেছি, "না পার ছেইড়ে দাও। খালি লাভটা দেখবে আর উন্নতি দেখবে না তা হয় না।" চোখ রাঙিয়ে বলে, "চুক্ কর।" আরে বাবা, নামে তো তুমি মেজ মায়ের ছেইলে, কোলে-কাঁখে নিয়ে বড়োটা কইরলো কে? খাওয়াও রে, নাওয়াও রে, ঘুম পাড়াও রে, গাড়ি ঠেলে বেড়াও রে, সব তো তখন কালীদাদা। আর এখন আমাকে "পাজী শুয়োর গাধা হারামজাদা" কিছু বলতে বাকী রাখে?'

'আমি তো এতো দিনের মধ্যে এঁকে কোনো দিন দেখিনি!'

'কী কইরে দেইখবে। এই তো এলো।'

লক্ষ্মীর মা চিন্তান্বিত হলেন। ঝড়ের পূর্বাভাষ দেখতে পেলেন তিনি।

এর মধ্যেই স্কুলের আপিস-রুমে ডাক পড়লো এক দিন। গদি-আঁটা চেয়ারে বসে আছেন সূর্যনারায়ণ, স্কুলের সর্বময় কর্তা, পাশে মোসাহেব কেরানী সুরেন [illegible]

লক্ষ্মীর মা এক পলক তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমাকে ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ, বসুন।'

লক্ষ্মীর মা বসলেন।

'আপনিই তো আমাদের নতুন শিক্ষয়িত্রী, না?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'স্কুল কেমন লাগছে?'

'ভালো।'

'যা মাইনে পান তাতে আপনার চলে?'

'না চললেই বা উপায় কী!'

'উপায় নিশ্চয়ই আছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থার ক্ষমতা স্কুল কর্তৃপক্ষের নিশ্চয়ই আছে।'

'এটা তো বিশেষ ক্ষেত্র নয়।'

'আপনার যখন স্কুলটা ভালো লাগছে, আমাদেরও যখন আপনাকে ভালো লাগছে তখন এটা বিশেষ বইকি।'

'আপনার সঙ্গে কিন্তু এখনো আমার পরিচয় হয়নি।'

'ও। আমার নাম সূর্যনারায়ণ মল্লিক, এই স্কুল আমার।'

'নমস্কার।'

'নমস্কার।'

'তা হলে আমি আজ উঠি?'

'বসুন না।'

'ক্লাস আছে। মেয়েরা বসে থাকবে।'

'থাক না। দু' মিনিট কম পড়লে ক্ষতি হবে না কিছু।'

লক্ষ্মীর মা নিরুত্তর রইলেন।

সুরেন পৈত বললো, 'আপনার পুষ্যি মেয়েটি কেমন আছে?'

'পুষ্যি!'

'সেদিন সঙ্গে দেখলাম।'

'আমার নিজের মেয়ে।'

'নিজের?' সূর্যনারায়ণ বললেন, 'কী ব্যাপার?'

'আজ্ঞে কর্তা, একটু জটিল। উনি আমার শ্বশুরবাড়ির দেশেও মাস্টারি করতে গিয়েছিলেন কিনা। এই তো সেদিনের কথা, তখন কুমারীই ছিলেন—আনে—?'

'আমি যাচ্ছি।' নমস্কার ক'রে দ্রুত পদে বেরিয়ে এলেন লক্ষ্মীর মা। রাগে তিনি কাঁপছিলেন।

পরের দিন একখানা সোনার [illegible] লেখা কার্ডে চায়ের নিমন্ত্রণ এলো [illegible] নারায়ণের কাছ থেকে। কার্ডখানা [illegible] নিয়ে বসে রইলেন তিনি। [illegible] কাছে এই মানুষের যা বর্ণনা [illegible] আর যার মোসাহেব সুরেন পৈত [illegible] নিমন্ত্রণে যাওয়াটা কতো দূর [illegible] হবে, বুঝতে পারছিলেন না। [illegible] তিনি, ধূলির ঝড়কেই তাঁর [illegible] ভ্রম হয়, আর এ তো সত্যই [illegible]

একবার ভাবলেন, কালী[illegible]

করেন। কিন্তু খারাপ লাগলো এই ভেবে, হাজার হোক কালীচরণ একজন স্কুলের দরোয়ান বই তো নয়। যদিও কালীচরণকে এভাবে দেখাটা তাঁর অন্যায় হয়েছিলো। কালীচরণ কতোটা সম্মানের যোগ্য সে কথা তখুনি তাঁর বোঝা উচিত ছিলো। বোঝেন নি। কী করে বুঝবেন? তিনি যে ভদ্রলোক। যাদের নাম ভদ্রলোক তারা কি ছোটলোককে ততোখানি সম্মান দিতে পারে? ওরা বোকা, মূর্খ, দরিদ্র, সরল। বলতে গেলে মনুষ্যপদবাচ্যই নয়।

অনেকক্ষণ চিন্তা করে শেষে বিনীত-ভাবে অসম্মতি জানিয়ে চিঠি লিখলেন একটা। লিখলেন, 'আমার মেয়ে ছোট, তাকে রেখে বিকেলের দিকে কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আশা করি এই অনিচ্ছাকৃত অনুপস্থিতির জন্য আমাকে মার্জনা করবেন।'

চিঠিটি যে বেয়ারা নিয়ে এসেছিলো, তার হাতেই দিয়ে দিলেন।

খানিক বাদেই সেই বেয়ারা ফিরে এলো আবার। এবার কার্ড নয়, সূর্যনারায়ণের নিজের হাতে লেখা চিঠি। তিনি মেয়েকে নিয়ে যেতে অনুরোধ করেছেন এবং জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ি পাঠাবেন।

তাঁর মতো একজন স্কুলের নিচু ক্লাসের অল্পবয়সী শিক্ষয়িত্রীর উপর কর্তার এই অনুগ্রহ কিছুতেই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছিলেন না। ভয়ে প্রায় আধমরা হ'য়ে যাচ্ছিলেন। পরে মনে হলো, এমনও তো হতে পারে, শুধু তাঁকেই নয়, স্কুলের অন্যান্য টিচারকেও ডেকেছেন।

কিন্তু জানবার উপায় নেই। আজ শনিবার স্কুল শেষ হয়েছে, কাল রোববার, কারো সঙ্গে দেখা হবে না।

বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে জবাবের জন্য। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বললেন, 'ঠিক আছে।'

সেই রাতে তাঁর ঘুম হলো না ভালো ক'রে। পরের দিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এক ফোঁটা শান্তি পেলেন না মনের মধ্যে। শেষে নির্দিষ্ট সময়ে নিজে এসে বুকে বল বেঁধে মেয়েকে সাজিয়ে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে উঠে বসলেন গাড়িতে।

কতোটুকু বা শহর, তার মধ্যেই বা কতোটুকু। ঐ তো দেওয়াল-ঘেরা বিশাল মল্লিকবাড়ি। কতো বাগান, কতো ফোয়ারা, কতো গাছপালা। শোনা যায়, চার কর্তার চার মহলা বাড়ি, এক মহল থেকে অন্য মহলে যেতে পাকা রাস্তা হয়। [illegible] মতো কতো [illegible] আর কতো [illegible]।

[illegible]

চরণকে দেখে মুখ বার করলেন তিনি। লক্ষ্মী ডেকে উঠলো, 'কায়ীভাডা।'

'আরে, আমার লক্ষ্মী দিদি যে! এখানে? এখানে কেন?' কালীচরণ দৌড়ে এসে গাড়িটা থামিয়ে দিয়ে বললো, 'এখানে কেন মা?'

'উনি আজ আমাদের চা খেতে ডেকেছেন।'

'চা খেতে? উনি তো বোটে করে গঙ্গা বেড়াতে যাচ্ছেন একটু বাদে।'

'কিন্তু আমাকে তো উনি—আমি তো ভাবছি বুঝি স্কুলের সবাইকেই—'

'আচ্ছা, তুমি যাও, আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

কালীচরণ চলে গেলে বাগানের মোড় পেরিয়ে চিড়িয়াখানা পাশে রেখে গাড়ি এসে শ্বেতপাথরের চত্বরে থেমে গেল। সিঁড়ি উঠে প্রশস্ত বারান্দা, বারান্দা পেরিয়ে কার্পেট-মোড়া হল-ঘর।

লক্ষ্মীর মা কম্পিত বক্ষে মেয়ের হাত ধরে নামলেন। সঙ্গে সঙ্গে কালোপাড় কুঁচোনো ধুতি লুটিয়ে ফিনফিনে পাঞ্জাবি উড়িয়ে চকচকে পাম্পশু পায়ে মচমচিয়ে এগিয়ে এলেন স্বয়ং সূর্যনারায়ণ নিজে। 'আরে আসুন, আসুন'—একগাল হেসে অভ্যর্থনা করলেন।

ঘরে এসে বসলেন লক্ষ্মীর মা। লক্ষ্মী অচেনা পরিবেশে অচেনা মানুষের মুখে চেয়ে আঁকড়ে ধরলো মাকে।

সূর্যনারায়ণ প্রায় হুমড়ি খেয়ে টানাটানি লাগালেন, 'আরে খুকু, এসো, এসো, ভয় কী? কিচ্ছু ভয় নেই। চকোলেট খাবে? লজেন্স খাবে? কেক? কেক খাবে?'

এই টানাটানিতে লক্ষ্মীর মা ভীষণ বিব্রত বোধ করলেন। তাঁর কাপড় সরে যাচ্ছে গা থেকে, সূর্যনারায়ণের হাত লাগছে এখানে ওখানে, হঠাৎ ঠাস ক'রে একটা চড় মেরে মেয়ের আঁকড়ে থাকা হাতটা তিনি ছাড়িয়ে নিয়ে সরে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে উঠলো লক্ষ্মী। দু'পাশ থেকে দু'জন ঝি ছুটে এলো। সূর্যনারায়ণ বললেন, 'আহা, মারলেন কেন? খুব অন্যায়। যাও তো, ওকে নিয়ে পাখি দেখিয়ে আনো।'

লক্ষ্মীর মা তাড়াতাড়ি ক্রন্দনমুখী মেয়েকে কোলে টেনে এনে বললেন, 'থাক, ও যাবে না।'

লক্ষ্মী মার বুকে মুখ লুকিয়ে নিঃশব্দে ফোঁপাতে লাগলো।

সূর্য মল্লিক বসে আছেন মুখোমুখি। ঘরটা নিঃশব্দ, চুপচাপ। অন্য আর কোনো লোকের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

[illegible] বললেন, 'মিসেস মাল্লক এখানে নেই?'

'আমার স্ত্রী। হ্যাঁ—'

'তাঁকে দেখছিনে।'

'আজকে হ'য়েছে কি জানেন, চায়ের ব্যবস্থাটা আমরা বোটে করেছি, আমার স্ত্রী মেয়ে সব ওখানে। গঙ্গার ঘাটে—আমাদের বাঁধানো সিঁড়ি আছে, ঘর আছে, বেড়াবার বোট আছে। আমি বলছিল্ম, তোমরা মেয়েরা এসে ও'কে অভ্যর্থনা করো। আমার স্ত্রী বললেন, ততোক্ষণে কাপড় কেচে আমি প্রস্তুত হ'য়ে নি. তুমি অপেক্ষা করো ও'র জন্য।'

'ও।'

'তা হ'লে চল্ন, বোটে গিয়েই বসি না।'

'কিন্তু—'

'ও'রা আসবেন।'

'আমি ভাবছিল্ম—'

'চল্ন।'

'মেয়ে নিয়ে আমি নৌকোয় যাবো না।'

'আরে পাগল নাকি। নৌকো কি দাঁড় টানা নৌকো নাকি? এ যে স্টীমে চলে? ডুববে না।'

'কিন্তু—'

'চলুন, চলুন। আর কিন্তু নয়, ওরা বোধহয় এতোক্ষণে এসেও গেছেন।'

মল্লিক উঠলেন। লক্ষ্মীর মা উঠলেন না। বললেন, 'স্কুল থেকে কি শুধু আমাকেই বলেছেন?'

'আপনার জন্যই তো স্পেশ্যাল বন্দোবস্ত।'

'কেন?'

'আমার স্ত্রীর আবদার। তিনি কার কাছে শুনেছেন স্কুলের নতুন টিচারটি নাকি দেখার মতো সুন্দরী। অতএব তাঁর আলাপ করার শখ হ'লো।'

'তা হ'লে উনি আসুন। আলাপটা অন্তত হোক, তারপর না হয় যাবো।'

'তা মন্দ নয়। আচ্ছা বসুন আমি দেখছি।'

ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে ভিতরে চলে গেলেন উনি। একটু যেন ভরসা হ'লো। আর যাই হোক, বাড়িতে যখন স্ত্রী আছেন মেয়ে আছে, ভয়াবহ কোনো পরিস্থিতি নিশ্চয়ই হবে না।

একটু পরেই একজন দাসী ডাকতে এলো তাঁকে। অন্দরমহলে যাবার অনুরোধ।

মেয়েকে হাতে ধ'রে লক্ষ্মীর মা এসেছিলেন অন্দরমহলে। ঘরের পর ঘর পেরিয়ে বারান্দা পেরিয়ে কোণের দিকে এক মস্ত নির্জন শয়ন কক্ষে ঢুকেও ছিলেন। ঘরে কেউ ছিলো না, চারপাশেও কেউ ছিলো না, দাসী তাকে বসিয়ে মেয়েকে নিয়ে যাবার জন্য টানাটানি করছিলো। বলছিলো বাগান দেখাবে, পাখি দেখাবে, বাঁদর দেখাবে —লুব্ধ হ'য়ে লক্ষ্মী মায়ের আঁচল ছেড়ে তার কাছে গিয়েও ছিলো। এবং পিছন দিকের কোনো ঘরের দরজা খুলে সূর্যনারায়ণের পত্নী নন, তিনিই স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে 'বসুন, উনি আসছেন' ব'লে সামনের দরজাটি বন্ধ করতেও উদ্যত হ'য়েছিলেন। এরই মধ্যে প্রায় ঈশ্বরের দূতের মতো কালীচরণ এসে হাজির হ'লো।

'কী চাস এখানে?' গর্জে উঠলেন সূর্য মল্লিক।

'মাকে ডাইকতে এসেছি।'

'কী দরকার তোর?'

'লক্ষ্মীদিদি কাঁদিছে।'

'সে আমি দেখবো, তুই যা।'

'আমি যাবো না।'

'আলবত যাবি।'

'মাকে নিয়ে তারপর যাবো।'

লক্ষ্মীর মা সভয়ে এগিয়ে এসেছেন ততোক্ষণে। হাত বাড়িয়ে কালীচরণ তাঁকে প্রায় টেনে বারান্দায় নিয়ে এলো। আরক্ত চোখে [illegible] দিকে তাকিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হবে তা আমি ভাবিনি। আমার কী ইচ্ছে করছে জান? জন্মের মতো তোমার সব পাপ ঘুইচে দিতে।'

'চোপ রো উল্লুক। ভকত সিং—'

'শুধু ভকত সিং-এ হবে না, পার তো সারা বাড়ি সব কুকুরগুলোকে যোগাড় কর। এই আমি সকলের সামনে দিয়ে মাকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি।'

মিনমিন করতে করতে সূর্য মল্লিক দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেন।

৩৩

নিরাপদে মেয়ে সহ বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ঘাম মুছে কালীচরণ বললো, 'মাগো, হরিণ হইয়ে কখনো বাঘের খাঁচায় ঢুইকতে আছে? একটু বুদ্ধি তোমার হ'লো না?'

লক্ষ্মীর মা তখনো ভয়ে কাঁপছেন, ধরা গলায় বললেন, 'আমাকে ও'র স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করাবেন ব'লে নিয়ে গিয়েছিলেন।'

'স্ত্রী! বউমা আবার এখানে কোথায়? পেরায় দু' বচ্ছর পড়ে আছেন বাপের বাড়ি। আনে নাকি হতচ্ছাড়া ছেলে? তোমাদের ভদ্দরনোকের মেয়েদের মতো দুঃখী বাপু আমাদের মধ্যে নেই। এমন হারামজাদা স্বামী হ'লে দুই ঝাঁটার বাড়ি মেইরে পালিয়ে যাবে। গতর খাটাবে, খাবে। পাইলেও যায় নতুন মানুষের সঙ্গে। হঃ বইলতে পার, যৌবনে আমি যখন ডাকাত ছিলাম, আমার বউ কেন আমাকে ত্যাগ করেনি। আরে বাবা, বউকে যে আমি পেরানভুইরা ভালোবাসতাম। তাকে ছাড়া অন্য মেয়েছেলের পানে তাইকেছি কখনো? নেশা করেছি ঠিক, তা বলে নেশা নিয়ে ঘরে ঢুকিনি। আমরা ছিলাম গিয়ে ডাকাত, মেয়েছেলেকে মাত্তিজ্ঞান আমাদের পেরধান ধম্ম।'

'কালীচরণ, তুমি আজ এখানে থাকবে? আমার ভয় করছে।'

'ভয় কী! এই তো এক পায়ের রাস্তা ইস্কুলের গেট, টুং কইরে আওয়াজ হ'লেই চইলে আসবো।'

'এরপরে আমি কী ক'রে কাজ করবো এই স্কুলে, বলো তো?'

'তা আর কী? ও কি থাইকবে নাকি? বচ্ছর শেষ, তাই হিসাব নিতে এইসেছে। স্কুলে কি আমাদের সোজা আয় হয়?' সব্বমোট এই একটাই তো হাই স্কুল। আর এই যে নীচু শ্রেণীগুলো কইরেছে, কে জি ওয়ান, কে জি টু, কে জি থিরি-- এ তো সেরেফ ধাপ্পাবাজী। কেবল লাভের গুড়। বাচ্চাগুলিনকে আটকে রেইখে পয়সা নেওয়া। মাইনেটা দেখছো তো? আর মাস্টারদের কি মাইনে দেয়? সে বেলা চিপ্পুস্য। জল গলে না আঙুলের ফাঁকে।'

পথে আসতে আসতেই লক্ষ্মী ঘুমিয়ে

পড়েছিলো, তাকে শুইয়ে মশারী টাঙিয়ে কালীচরণকে বিদায় দিলেন তিনি। দরজা বন্ধ ঘরে আবার নতুন ক'রে চিন্তার পিঁপড়েরা তাঁকে ছেঁকে ধরলো।

তারপরে কয়েকটা দিন যে কী অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে গেছে তার কোনো তুলনা নেই। চাকরী থেকে তো বরখাস্ত হ'য়েই-ছেন, দুর্নামেও টিঁকতে পারেন নি পাড়ায়। সুরেন পৈতের দয়ায় এ কথা জানতে কারো বাকী ছিলো না যে লক্ষ্মী তাঁর কুমারী অবস্থার সন্তান।

সেই রাত্রির কথা মনে পড়ছিলো তাঁর, যে রাত্রিতে তিনি প্রকৃতপক্ষেই রঞ্জনের স্ত্রী হ'য়েছিলেন। খেয়ে উঠে রঞ্জন বলেছিলো 'অনেক রাত হ'য়ে গেলো, তুমি শুয়ে পড়ো।' 'তুমি?'

'আমি একটা বইটই পড়ি গিয়ে ওঘরে বসে।'

বাড়িতে একটি বিছানা নেই, একটি ছাড়া তক্তপোশ নেই। লক্ষ্মী'র মা বললেন, 'তা কখনো হয়! তুমি এ ঘরে ঘুমোও, আমার স্কুলের খাতা দেখা আছে, তাই দেখি গিয়ে।'

রঞ্জন হেসে বললো, 'পাগল! একটা শিভালরি দেখাবার এমন সাংঘাতিক সুযোগ আমি নষ্ট করি আর কি। বউকে বীরত্ব দেখাতে কোন স্বামী না ভালোবাসে বল? তুমি নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে ঘুমোবে আর আমি গুহামানবের মতো ঢাল তলোয়ার নিয়ে বাঘভাল্লুক তাড়াবো, তবে তো?'

'তা হ'লে আমিও বসে থাকি।'

'তার চেয়ে এসো না, দু'জনেই শুয়ে থাকি?'

'বিছানা যে একটা।'

'আমি কি দু'টো বিছানার কথা বলেছি! নাকি আমাদের সেই সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক এখনো হয়নি।'

'হয়নি?'

'না।'

'তা হ'লে কোন সুবাদে প্রহরায় বসে আছি?'

'বিপন্ন নারীকে রক্ষা করছো।'

'তারপর পাড়াপড়শিরা এসে ভোজ খেয়ে সাক্ষী থেকে যখন বলবে "যাও, এখন গিয়ে অন্ধকার ঘরে দরজা বন্ধ করো" অমনি তুমি স্বামী বলে লুটিয়ে পড়বে বিছানায় না?'

'হ্যাঁ।'

'কাল সকালবেলা একটা তৃতীয় শ্রেণীর অশিক্ষিত রেজিস্ট্রারের চোখের কাছে দু'টো সইয়ের সেপাই খাড়া করলেই তুমি গ্রহণ করবে আমাকে, না?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে রাগিয়ো না। এমনিতেই সমাজের এই জারিধর্ম কুসংস্কার স্ত্রী-আচার লোকাচার ইত্যাদির উপর আমি সারাদিন চটে লাল হ'য়ে থাকি, সারাদিন সব ভেঙে চুরে তচনচ ক'রে দিতে ইচ্ছে করে, তার উপর যাকে মনে প্রাণে স্ত্রীই বলো প্রেমিকাই বলো, যাই নাম দাও, অভিন্নহৃদয় বলে জানি তাকেও যদি এতো কিছুর পরে একজন তেরো বছরের নাবালিকার মতো ব্যবহার করতে দেখি তখন আর কিছুরই কোনো অর্থ খুঁজে পাই না।'

উঠে দাঁড়িয়ে রঞ্জন ও ঘরে গেলো, যেতে যেতে বলে গেলো, 'ভেবো না আমি একজন খুব কামুক লোক। সুযোগ সুবিধা পেলে রাক্ষসের মতো খেয়ে ফেলতে চাইছি। শুধু বোঝাতে চাইছিলাম যা শুধু একটা কুসংস্কার মাত্র তার উপরে কোনো আস্থা রেখো না।'

'কুসংস্কারটা কী?' লক্ষ্মীর মাও পিছনে পিছনে তাঁর বসবার ঘর আমক চলতে জারগাটুকুতে দাঁড়ালেন।

'তুমি আর আমি যে পরস্পরকে ভালো-বাসছি, নিশ্চয়ই কারো কাছে জিজ্ঞেস ক'রে নয়। নিশ্চয়ই সমাজের অনুমোদন নিয়ে আমরা এতোখানি অগ্রসর হইনি। আমরা যে বিয়ে করবো তার নিশ্চয়ই কারো অনুমতি সাপেক্ষ ছিলো না। আমরা আমাদের যুগল জীবনে কী করবো বা করবো না হঠাৎ সেখানে এসেই জগৎ পারাবারের লোকের কাছে অনুমতির অঞ্জলি পেতে বসবে, সেটা আমি বরদাস্ত করতে পারি না। এর নাম প্রহসন, বুঝলে?' এই বলে রঞ্জন সামনে যে শক্ত কাঠের চেয়ারটা পাতা ছিলো, তাতেই এগিয়ে বসলো। বসেই চোখ বুজলো। আর সবচেয়ে আশ্চর্য, মিনিট কয়েকের মধ্যেই মনে হ'লো তার তন্দ্রা এসে গেছে।

দু দিন যাবৎ যে ভীষণ ঘোরাঘুরি গেছে সে কথা জানতেন লক্ষ্মীর মা। কাল সারাদিনে একবার আসে নি। এখন মনে হ'লো নিশ্চয়ই মধুপুরে আর উনাদিঘি করছিলো বিয়ের ব্যাপারে। এবং এই মুহূর্তে ক্লান্তির শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে।

চুপ ক'রে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে এলেন নিজের ঘরে, বিছানায় বসলেন, বসেই রইলেন। যাকে তিনি এই মুহূর্তে আপন প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসছেন, যার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার কোনো শেষ নেই, যার মতো মানুষ এই একজনকেই এতোখানি বয়সে তিনি দেখলেন, তাকে ঐ শক্ত চেয়ারের কয়েদী আসনে বসিয়ে নিজে নরম শয্যায় শুয়ে আরামে নিদ্রা যাবেন সেটা সম্ভব মনে হ'লো না।

রাত বাড়লো। নির্জনতা নিশ্ছিদ্র হ'লো, দ্বিতীয় প্রহরের পাখিরা পাখা ঝাপটিয়ে শান্ত হ'লো, কুকুর ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠলো কোথায়, কোথায় ব্যাঙ ধরলো সাপে, ঝিঁঝির ডাক নিবিড় হ'লো, তখনো তিনি তেমনিই চুপ ক'রে বসে রইলেন।

তারপর উঠলেন। ভেবেছিলেন এঘরে এসে ঘুমন্ত রঞ্জনের ঘাড়ের তলায় অন্তত একটা বালিশ গুঁজে দেবেন। এসে দেখলেন, সে সোজা হ'য়ে বসে আছে।

'এ কি, তুমি ঘুমোওনি?'

'না।'

'কখন জাগলে?'

'ঘুমুইনি, সুতরাং জাগার প্রশ্ন নেই।'

'আমি তো তোমাকে ঘুমুতেই দেখে গেলাম।'

'ছলনা।'

'মানে?'

'মানে না ঘুমুলে তোমার ভয় করতো।'

'কী?'

'ভাবতে রক্ষকই এখন ভক্ষক।'

'ছি।'

'ছি কি? সত্য কিনা বুকে হাত দিয়ে বলো?'

'সেই থেকে এইভাবে নিশ্চুপ হ'য়ে বসে আছ? কী আশ্চর্য মানুষ।'

'সেও তোমার কথা ভেবেই।'

'মানে?'

'মানে, আত্মাকে পেলেই ভাববে এই বুঝি ঘুমন্ত দানব জেগে উঠেছে। তখন তোমার হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হ'য়ে যাবে।'

'কেবল বাজে কথা।'

'সত্য কথা।'

'চল ওঘরে শোবে। বিছানায় শোবে।'

'না।'

'কেন?'

'আমি তো জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসী নই যে, প্রিয়ার শয্যায় শয়ন ক'রে তাকে পাশে অনুভব ক'রেও এই গভীর রাত্রির ভীষণ ষড়যন্ত্রের মন্ত্রে সাড়া দেব না। আমার ইচ্ছে করছে তোমাকে ভালোবাসতে। ভয়ংকর ভয়ঙ্কর, ভালোবাসায় আমি অন্ধ হ'য়ে যাচ্ছি।'

'এসো।' হাতে ধ'রে লক্ষ্মীর মা তাকে নিয়ে এসেছিলেন এ ঘরে, বলেছিলেন, 'যে আমাকে মানসম্মান, আশ্রয়, নিরাপত্তা সব দিয়েছে, তাকে আমার অদেয় কী আছে রঞ্জন?'

'শুধু সেইজন্যে?'

'না। তাকে আমি ভালোবাসি ব'লে। ভালোবাসি ব'লেই সর্বস্ব সমর্পণ ক'রে নিঃস্ব হ'তে চাই। তুমি আমাকে নাও।'

সেই প্রেমোৎপল এই লক্ষ্মী, সেই সততার ফল এই লক্ষ্মী, যে লক্ষ্মী যার একরাত পরে গর্ভে এলে সে জারজ হ'তো না, বেজন্মা হ'তো না, অসচ্চরিত্র কুমারী মায়ের সন্তান ব'লে লোকেরা থুতু ছিটোতো না তাদের গায়ে।

(ক্রমশ)

বিশ্ব বিজ্ঞান

চিকিৎসা শাস্ত্রের নতুন দিক

ওয়াশিংটনে রক্ষিত একটি কম্পিউটার ইউরোপে অবস্থিত এক হৃদ্‌রোগীর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বিশ্লেষণ করে ১৯৬৭ সালে বিশ্বের চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক যুগান্তরের সূচনা করেছে। এই বিস্ময়কর ব্যাপার যে অদূর ভবিষ্যতে সারা দুনিয়ার সমস্ত দেশের জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষার সহায় হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। একটি মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহের (স্যাটিলাইট) মারফত ইউরোপীয় অসুস্থ লোকটির হৃৎক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য ওয়াশিংটনে পৌঁছায় এবং ৩০ সেকেণ্ডের মধ্যে লোকটির চিকিৎসক তার হৃৎক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি ঐ স্যাটিলাইট মারফত জানতে পারেন। যে-কোন দেশের যে-কোন রোগীর ক্ষেত্রে এইভাবে রোগের তথ্য নির্ণয় করা এইভাবে সম্ভব হবে যদি সেই দেশে স্যাটিলাইটের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকে। ১৯৬৭ সালেই এই ধরনের স্যাটিলাইটের সঙ্গে কম্পিউটারের সহকারিতার প্রথম ভিত্তি স্থাপনা করা হল এবং অদূর ভবিষ্যতে কয়েক ডজন দেশে এই ব্যবস্থা চালু করা হবে। অবশ্য এই ব্যবস্থা সামরিক স্বার্থেও ব্যবহৃত হবার আশঙ্কা যে নেই তা নয়।

যে ব্যাপারটির কথা বললাম তাতে ফ্রান্সের তুর্স্‌ শহরনিবাসী এক যুবক হৃদ্‌রোগীর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া ওয়াশিংটনে কম্পিউটারের দ্বারা বিশ্লেষিত হয় একটি ইলেকট্রো-কার্ডিয়োগ্রাফের সাহায্যে। তারপর সেই তথ্য ফরাসী রোগীর চিকিৎসকের কাছে পাঠানোর পর ৩০০ জন চিকিৎসক, ইঞ্জিনীয়ার ও বৈজ্ঞানিকের এক সম্মেলন পাঠানো হয় পরীক্ষার জন্য। তাঁরা সেখানে সমবেত হন মেডিক্যাল ইলেকট্রনিকস্‌ ও বায়োলজিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং নিয়ে আলোচনা করার জন্য। এই ব্যাপার থেকে এটাও বোঝা যায় যে, আজকাল চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ইঞ্জিনীয়ারিং-এর মধ্যে সহযোগিতা ক্রমশ বেড়ে [illegible] ১৯৬৭ সালে কৃত্রিম [illegible]

এই স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটারের মধ্যে ১ চামচ রক্তের নমুনা দিলে [illegible] সঙ্গে ১২ রকমের রাসায়নিক পরীক্ষার ফল পাওয়া যায়। ফলে সময় ও অর্থ দুইই বাঁচে। চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ারদের সহযোগিতায় এই যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে।

সফল্যলাভ করে নি। তবে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এই কাজে শল্যচিকিৎসকরা পূর্ণ সাফল্য লাভ করবেন।

চিকিৎসক ও ইঞ্জিনীয়াররা একযোগে কাজ করে হৃৎপিণ্ড ছাড়াও দেহের অন্যান্য যন্ত্রের কাজ-কর্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। ডঃ মরিস হিলম্যানের নেতৃত্বে সেইরকম একটি দল যেসব রোগের ভাইরাস নিয়ে কাজ করেছেন এবং টিকা তৈরি করায় সাফল্য লাভ করেছেন, হাম ও কর্ণমূল প্রদাহ সেগুলির মধ্যে অন্যতম। পেন্সিলভানিয়ার মার্ক্‌ ইন্সটিটিউট অব থেরাপিউটিক রিসার্চে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেন যে, জীবদেহে কোন্‌ কোন্‌ জাতীয় রিবোনিউ-ক্লিক অ্যাসিড (আর এন এ) ইঞ্জেকশন দিলে জীবটির শরীরের মধ্যে ইন্টারফেরন তৈরি হয়, যা শরীরের মধ্যে ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি রোধ করতে সক্ষম। মানুষের শরীরের স্বাভাবিকভাবেই ইন্টারফেরন তৈরি হয় সাধারণত ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত হবার পর অর্থাৎ রোগে ধরার আগে নয়, পরে। স্বাস্থ্যবান লোকের শরীরে ইন্টারফেরন তৈরি করতে গিয়ে এতদিন কিছু নতুন কুফল বা উপসর্গ দেখা যেত। এখন ডঃ হিলম্যানের আবিষ্কারের পর আশা করা যায় যে, এমন-ভাবে শরীরে ইন্টারফেরন জন্মানো যাবে, যা দেহকে ভাইরাসের [illegible] রক্ষা করে [illegible] কোন নতুন উপসর্গ দেখা দেবে না। [illegible] মানুষের দেহের উপর [illegible] দেখা হয় নি।

চিকিৎসার [illegible]

সূক্ষ্ম হয়ে উঠছে ততই চিকিৎসাশাস্ত্রের এক নতুন দিকে অগ্রগতি লক্ষ করা যাচ্ছে। সেটি হচ্ছে ভবিষ্যদ্বাণীসূচক বা পূর্বাভাষ-সূচক রোগনির্ণয়ের কলাকৌশল। কিছু দিন অন্তর অন্তর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা করানোর রেওয়াজ পাশ্চাত্যের দেশে দেশে চলে আসছে বহুকাল যাবৎ যাতে কারো কোন রোগ হয়ে থাকলে গোড়ার দিকেই তা ধরা পড়ে। কিন্তু বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন যাতে রোগ হবার আগেই তার উপযুক্ত প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এই চেষ্টা সার্থক করতে হলে প্রতিটি রোগ হবার পূর্বলক্ষণ-গুলি ধরতে পারা চাই এবং সেগুলি বিচার করে আগে থাকতে প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। আমেরিকায় এই পূর্বাভাষসূচক চিকিৎসা-কৌশল নিয়ে বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছেন। তাঁদের ভাষায়, তাঁরা কাজ করছেন "আগামীকালের চিকিৎসা-কৌশল" নিয়ে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, চিকিৎসকেরা এতদিনকার চিকিৎসা-পদ্ধতিগুলি বর্জন করবেন। দেহের তাপ-মাত্রা, নাড়ির স্পন্দনবেগ, রক্তচাপের মাত্রা— এ সবই তাঁরা নির্ণয় করবেন স্টেথোস্কোপ ইত্যাদি যন্ত্র দিয়ে, অভ্যস্ত হাত আর আঙুল দিয়ে ঠুকে ও চাপ দিয়ে শরীরের ভিতরে চামড়ার ঠিক নিচেকার যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করবেন, চোখ, নাক, কান, মুখ, গলা সবই দেখবেন, চামড়ার নিচে স্নায়ু-গুলির প্রতিবর্তী (রিফ্লেক্স) বিচার করে দেখবেন, রক্ত ও মলমূত্রের রাসায়নিক

এখানে কম্পিউটারের সাহায্যে লালা (প্যারটিড ফ্লুইড) পরীক্ষা করা হচ্ছে। এই পরীক্ষালব্ধ তথ্য থেকে বোঝা যাবে যে পরীক্ষাধীন লোকটির বহুমূত্র, বৃক্কব্যাধি, যকৃৎপীড়া ও হৃদ্‌রোগের দি কে প্রবণতা আছে কিনা

বিশ্লেষণ করবেন, প্রয়োজনবোধে এক্স রশ্মির সাহায্যও নেবেন। তারপর সব ক'টি পরীক্ষা এক সঙ্গে মিলিয়ে বিচার-বিবেচনা করে তাঁরা রোগ নির্ণয় করে ওষুধপত্র দেবেন। পূর্বাভাসসূচক চিকিৎসাশাস্ত্রের যুগেও এইসব পরীক্ষার প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে না। কিন্তু যেটা হবে সেটা হচ্ছে চিকিৎসকের এইসব পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বহু স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র কাজে লাগানো হবে। কম্পিউটারের সাহায্যে চিকিৎসক রোগী সম্পর্কিত তথ্যগুলি আরো অনেক সহজে ও নির্ভুলভাবে পেতে ও সঞ্চয় করে রাখতে পারবেন। যেমন বলা যেতে পারে যে, আমেরিকায় যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে যার নাম দেওয়া হয়েছে "রবট কেমিস্ট"। সেই যন্ত্র প্রতি ঘণ্টায় ১২০ জন রোগীর জন্য টেস্ট টিউবের পরীক্ষা সাঙ্গ করতে পারে। অন্যান্য প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে কম্পিউটার থেকে পাওয়া তথ্যগুলি মিলিয়ে দেখে রোগ হবার আগে থাকতেই চিকিৎসকরা বলে দিতে পারবেন যে, পরীক্ষাধীন লোকটির রক্তবহা নাড়ীগুলির রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আছে কিনা, পাণ্ডুরোগ, গ্রন্থিবাত ইত্যাদি বিভিন্ন আসন্ন রোগের সম্ভাবনা অব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় আছে কিনা। রবট কেমিস্টের দ্বারা লালার রাসায়নিক বিশ্লেষণের সঙ্গে অন্যান্য পরীক্ষালব্ধ তথ্যগুলি বিচার-বিবেচনা করে তখন ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবে যে, লোকবিশেষের হৃদ্‌রোগ, বহুমূত্র, যকৃৎরোগ বা বৃক্করোগের দ্বারা ভবিষ্যতে আক্রান্ত হবার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা। প্ল্যাস্টিকের থলির মধ্যে কারো প্রশ্বাসবায়ু জমা করে এবং সেটি বিশ্লেষণ করে তখন বলে দেওয়া যাবে যে, লোকটির শ্বাসযন্ত্রে ভবিষ্যতের কোন রোগের পূর্বলক্ষণ প্রচ্ছন্ন রয়েছে কিনা।

টেক্সাসের হাউস্টন শহরে অবস্থিত অ্যান্ডার্সন হাসপাতালের ডঃ রাসেল লালা পরীক্ষার এমন এক পদ্ধতি বার করেছেন, যা থেকে এক্স রশ্মির আলোয় ধরা পড়বার বহু দিন আগে বলে দেওয়া যাবে, লোকটির ভবিষ্যতে কর্কট রোগে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা আছে। তেমনি সান ফ্রান্সিস্কোর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ [illegible] রোগীকে পরীক্ষা করবার (স্ক্রীনিং) এক [illegible]

নমুনার সঙ্গে একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ মিশিয়ে পরীক্ষা করে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে, লোকটির মধ্যে [illegible] হবার কোন পূর্বাবস্থা আছে কিনা। ফিলাডেলফিয়ার জেনারেল হাসপাতালের ডঃ স্যামুয়েল বেলেট (হৃদ্‌রোগ-বিশেষজ্ঞ) কোন লোক যখন কঠোর পরিশ্রম করছে ঠিক সেই সময়ে তার হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক সংকেত রেকর্ড করে বলে দিতে পারেন যে ভবিষ্যতে তার হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হবার কোন বিপদ আছে কিনা।

এই ধরনের অসংখ্য বহুপরীক্ষিক পরীক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার করে চিকিৎসকরা ভবিষ্যতে প্রত্যেকটি নাগরিকের রোগ-বিশেষের দিকে প্রবণতা সম্পর্কে বহু দিন আগে থেকেই পূর্বাভাষ দিতে পারবেন বলে আশা করেন এবং তখন থেকেই সেই রোগ যাতে হতে না পারে তার জন্য প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন, ফিরিয়ে আনতে পারবেন শরীরের মধ্যেকার রাসায়নিক সুসঙ্গতি, পরীক্ষাধীন ব্যক্তির খাদ্য, পথ্য ও ধূমপান করার মত অভ্যাস সম্পর্কে, খেলাধুলো ও বিশ্রাম সম্পর্কে, এমন কি স্থান ও পেশা পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে সে সম্পর্কেও পরামর্শ দিতে পারবেন তখন, যখন রোগবিশেষ তার ত্রিসীমানায় আছে বলে মামুলী পরীক্ষায় ধরা পড়ে না।

পূর্বাভাসসূচক চিকিৎসা আমেরিকায় শুরু হয়ে গিয়েছে ১৯৬৬ সাল থেকে। ঐ বছরের অক্টোবর মাসে ২২০০০ শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গকে ঐভাবে বহুমুখী পরীক্ষা করা হয় এবং বছরে ২ বার করে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা হয়। কারণ, এইভাবে বার বার পরীক্ষা করে তার ফলগুলি বিচার বিশ্লেষণ করে বলে দেওয়া যায় যে, তার স্বাস্থ্যের প্রবণতা ও গতি কোন্ দিকে, যা মামুলী পদ্ধতিতে ওজন, রক্তচাপ ও রক্তের উপাদান পরীক্ষা করে বলা যায় না।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মানুষের শরীর বহু জটিল ও সূক্ষ্ম যন্ত্র-উপকরণ; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমষ্টি। কোন যন্ত্রই মাঝে মাঝে পরীক্ষা না করে ব্যবহার করার বিপদ আছে। যেমন মনে করুন, প্রতিটি এরোপ্লেনকে প্রতিবার আকাশে ওড়বার আগে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয় আর কোথাও কোনো যন্ত্রে কলকব্জায় কোন গোলমাল বা বৈকল্য আছে কিনা। পূর্বাভাসসূচক চিকিৎসাপদ্ধতির লক্ষ্যও তাই। ভবিষ্যতের অসুখ বিসুখ সম্পর্কে পূর্বাভাস দিয়ে এই পদ্ধতি মানুষকে বহু আধিব্যাধি থেকে রক্ষা করবে, হাসপাতালে ভর্তি হবার [illegible]

[illegible]

বার্লিনের চিঠি

ইদানীংকালে ভারত সম্পর্কে আগ্রহ আর কৌতূহল বিদেশে ক্রমশই বর্ধমান। বিদেশীদের এই কৌতূহল নানান লক্ষ্যে প্রবাহিত। এতকাল ভারত সম্পর্কে জরমানদের কৌতূহল ইতিহাস অন্যভাবে বলে এসেছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের বাইরে ভারত-জরমানের সম্পর্কটা ছিল সংস্কৃতির আর সংস্কৃতের। মহৎ সাহিত্যিক আর মনীষীরা সে বন্ধনে নিজেদের বিপুল আবেগে জড়িয়েছেন। সেদিন কি ভারতবর্ষের, কি জরমানীর চেহারাটা ছিল ভিন্ন জাতের।

পৃথিবী এতটা সভ্যতাসম্পন্ন ছিল না। সভ্যতার বিষবৃক্ষে এত বিষফলও ধরেনি। রেডিয়ো, টেলিভিশান আর ক্যামেরার কারসাজি ব্যবসাবুদ্ধিতে আবদ্ধ ছিল না। তাই সেদিন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমার বাইরে হাজার হাজার মাইল দূরের কোন এক দেশে বসে গ্যেটে-হাইনের মত মহৎ কবিরা ভারতবর্ষকে স্বচক্ষে না দেখেও কল্পনায় ভারতবর্ষের ওপর কত কবিতা লিখে গেছেন। গঙ্গার স্রোত হাইনের হৃদয় পর্যন্ত আপ্লুত করেছে। তাই তাঁর কলমে প্রবাহিত হয় ভারতের ওপর কবিতা গঙ্গার স্রোতের মত—

"সঙ্গীতে সুরের ডানা মেলে দিয়ে দূরে
এখনি তোমায় আমি হৃদয়ের রানী
ঘর্ষেনিই উপত্যকা গঙ্গা বহে দেশে
সেখানে সুন্দরতম আছে আছে জানি।
চাঁদের আলোর নীচে নির্জন সভার
ফুটেছে রক্ত কমল, ফুলেরা বাগানে,
পদ্মের পাপড়ি দল প্রতীক্ষায় কাঁপে
কখন আসবে বোন সোনামনি জানে।
রাতের "ফাইলশেন" ফুলেরা তাকায়
আলিঙ্গনে কল্লোলিত নক্ষত্রে ডাকিয়ে
সঙ্গোপনে কথা কয় গোলাপ ফুলেরা
কানে কানে মধুময় রূপকথা নিয়ে।
....
চলো না সেথায় যাই, চলো মগ্ন হয়ে
নারিকেল কুঞ্জবীথি শাখাদের নীচে
শান্তি আর ভালবাসা সব স্নিগ্ধ পানে
প্রসন্ন বুকের প্রেম মুগ্ধ স্বপ্নে ভিজে।

সে যুগের মহৎ কবিদের দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। সেই যুগকে পৃথিবী আর কোনদিনই ফিরে পাবে না। সে আধ্যাত্মিক যুগ বর্তমানের অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক যুগের চাপে কোন অতলে ডুবে গেছে। এ যুগেও দেশে দেশে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রয়েছে—হয়ত তা বিপুল পরিমাণে বেড়েই চলেছে। ভারত বলতে আমেরিকার হিপ্পীর দল, ইংলন্ডের বিটলস্‌রা আর ইউরোপের [illegible] একেবারে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

রাজনৈতিক কারণ। হয়ত এ যুগে এই রাজনৈতিক কারণকে একেবারে অস্বীকার করার উপায় নেই, তাই সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের পূর্বে রাজনৈতিক সম্পর্কটাকে আরো বেশী গভীর বন্ধনে বেঁধে নেওয়া হয়—আর রাজনৈতিক কোলাকুলিটাও ত অর্থনৈতিক প্রেমালিঙ্গনেরই আর একটা দিক।

মহার্ষি মহেশ যোগী

এদেশের বহু সৎ লোক ও বুদ্ধিজীবী তাঁদের নিজেদের মানুষ কিভাবে এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে শোষণ করছে সে ব্যাপারে সচেতন এবং তাঁরা তার বিরুদ্ধে সংগ্রামও চালিয়ে যাচ্ছেন। এটা যেমন এঁদের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য জীবনের একটা দিক, তেমনি অন্য একটা দুর্বল দিক—এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির ব্যাপারে—এঁদের রয়ে গেছে যেখানে এদেশের এক ধরনের ছবির পত্রিক কেবল কুৎসিত খবর খুঁজে বেড়ায়। যেমন কিছুকাল পূর্বে, এদেশের কোন এক পত্রিকায় বিশাল হরফে ফলাও করে ছাপা হল, ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই [illegible] তাঁর নিজের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এদেশে

এমন চাঞ্চল্য আনে যে, জরমনদের তার ওপর অজস্র প্রশ্নে ভারতীয়দের প্রাণ যায় আর কি। এরপরে এঁদের আশা কোন অস্বাভাবিক নয় যে, এরা সব ভারতীয়রাই তাঁদের নিজ নিজ মলমূত্র নিজেরাই উপভোগ করে। আমাদের মন্ত্রী মহোদয়রাই যদি এ ধরনের খবর বিদেশী সাংবাদিকদের বিতরণ করে থাকেন, তবে এঁদের তা ছেপে টু পাইস করতে আপত্তি কি?

তাছাড়া কলকাতার ওপর খবর ত এদের লেগেই আছে। ছাত্র আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন আর হিন্দু-মুসলমানের কাটাকাটি, পথের ভিক্ষুক, ডাস্টবিন আর প্রায়মৃত কঙ্কালসার মানুষের সারি। ভারতবর্ষের পরিচয় আজ দুর্ভিক্ষের ক্রন্দনধ্বনিতে, ভারতবর্ষের পরিচয় তার ভারসাম্যবিহীন বিপুল জনস্ফীতিতে, ভারতের পরিচয় দলবদ্ধ ভ্রাতৃহত্যায়, ভারতের পরিচয় গোহত্যা নিবারণ আন্দোলনে, ভারতবর্ষের পরিচয় রাজপথে ধর্মের ষাঁড়দের উদাসীন পদযাত্রায়, ভারতবর্ষের পরিচয় তার মানুষের রোগশোক দুঃখ আর অনাহারে অকালমৃত্যুতে, ভারতবর্ষের পরিচয় তাঁর উলঙ্গ সন্ন্যাসীদের ভৈরবমন্ত্রে আর আফিম-গঞ্জিকায়। আজকের ভারতের পরিচয় অবশ্য তাঁর রবিশংকর আর মহার্ষি মহেশ যোগীর বিটল্‌স্ কাহিনীতে। মহার্ষির কাহিনী এখানে উল্লেখ করা হয়ত অবান্তর হবে না।

কিছুদিন পূর্বে মহার্ষি মহেশ যোগী এলেন বারলিনে। তাঁর আগমনের কয়েকদিন পূর্বে থেকেই সব টিকিট ফুরিয়ে গেল। পরিচিত আর অপরিচিতদের মুখে কেবলই মহার্ষির ওপর নানান প্রশ্ন। মহার্ষির ওপর ব্যক্তিগত প্রশ্ন, ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনের ওপর, তাঁর যোগাসন আর মেডিটেশানের ওপর প্রশ্নের পর প্রশ্ন। রেডিয়ো আর টেলিভিশানও লেগে গেল মহার্ষির প্রচারে। তিনি কি খান, কি গান, তাঁর কে কে শিষ্য, তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, তাঁর সব অলৌকিক কাহিনী। তাঁর কাহিনী আর গুজব ছুটে চলল মুখ থেকে মুখে। বিশেষ করে তরুণ ছাত্রছাত্রী আর যামলায়া মেতে উঠল তাঁর নামে। ফলাও করে প্রচার করা হ'ল (অর্থাৎ মহার্ষি কোন এক ইণ্টারভ্যুতে তাঁর বাসনা প্রকাশ করলেন) তাঁর সময় এতই অল্প যে, তাঁর ব্যক্তিগত এরোপ্লেন আর এরোড্রোম ছাড়া তাঁর পক্ষে তাঁর বাণী প্রচার করা আর সম্ভব হয়ে উঠছে না।

যাই হোক, বারলিনে মহেশ যোগী এসে নামলেন। মাত্র দু'খানা বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংগীত বিশ্ববিদ্যালয়ে।

রুডি দুচেকে—তাঁর আমেরিকান স্ত্রী ও শিশুকন্যা সহ

ঢুকতে গিয়ে দেখি বহু পরিচিতদের মুখ। সবাই চঞ্চল। সবার কথাবার্তায় আর মুখে একটা বিপুল কৌতূহলের ভাব। আজ এই সন্ধ্যায় বুঝি কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটতে চলল। যেখানে বিটল্‌স্‌রা থেকে আরম্ভ করে পশ্চিম গোলার্ধের বহু রথীমহারথী তাঁর অলৌকিক শক্তিতে বশীভূত, তখন এই অতিমানবজন না জানি আজ কোন ভৌতিক কাণ্ডকারখানার মধ্য দিয়ে এক নতুন উপলব্ধিতে পেঁছে দেন। পশ্চিমী সভ্যতার বিলাসব্যসনে নিমজ্জিত কোন সন্ধ্যার তাই সেদিন তাঁর আগমনে এই নগরীতে দেখা দিল প্রায় এক মিনি কুম্ভমেলা।

সাধুসন্ন্যাসীদের ব্যাপারে আমার হৃদয়দৌর্বল্য একটু বোধ হয় বেশীই আছে। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় আমি যতটা না আমার ধর্মভীরুতার জন্যে গিয়ে হাজির হলাম, তার চাইতে বেশী ছিল আমার আর দশজন নিরীহ ভারতীয় হিন্দুর মতই অন্ধ জাতীয়তাবোধ। মহেশ যোগীর প্রচারে আমার বুক গর্বে অনেক পূর্ব থেকেই ফুলতে শুরু করেছিল। মনে মনে আশা বাঁধতে শুরু করেছিল—এই বুঝি জগৎসভায় দ্বিতীয় বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটল, এতদিনে বুঝি ভারতের অধ্যাত্মবাণী পশ্চিমের হাততালির মধ্য দিয়ে আবার ধন্য হতে চলল। আমরাও ধন্য হতে পারলাম। বিদেশে ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালীদের মধ্যে একটা প্রবল চেতনা রয়েছে যদি কোন বিদেশী রবীন্দ্রনাথকে না চেনে কিংবা আমেরিকায় বিবেকানন্দের বক্তৃতার প্রারম্ভে আমেরিকানদের তিন মিনিট ধরে হাততালি—এই জাতীয় ভারতীয় ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকেন, তা হলেই ধরে নিই সেই বিদেশী একেবারেই মূর্খ। সেদিন সন্ধ্যায় আমিও সেই বিদেশীদের মূর্খ না ভেবে পারিনি—কেননা মঞ্চে তাঁর আবির্ভাবে আর সম্বোধনে তিন মিনিট ধরে হাততালি পড়েনি। অবশ্য সভাশেষেও আমার সেই একই মনোভাব ছিল—তবে অন্য কারণে। এবার তিন মিনিট ধরে হাততালি পড়েনি বলে নয়, বরং তার উল্টো কারণে। যাবার শেষে মনে হল—সাহেবদের পকেটে বড্ড বেশী টাকা হয়ে গেছে। এদের পক্ষে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে টাকা কিভাবে খরচ করা যায়। এ'দের পকেট কাটা কত সহজ। ভারতীয় আধ্যাত্মিক জগতের ঐশ্বর্যের সামান্য অংশকে একটু রঙচং মিশিয়ে অর্থাৎ এশিয়ার কাঁচামালকে পশ্চিমের যন্ত্রে ফেলে নতুন চালে মানুষের সামনে ফেলে দিয়ে কিভাবে রাতারাতি কোটিপতি হওয়া যায়, তার দৃষ্টান্ত।

মহার্ষি এসে মঞ্চে তাঁর আসনে উপবেশন করলেন। দুই পাশে সাধুবেশে দুই নন্দী ভৃঙ্গী স্থান গ্রহণ করল। একজন দোভাষিণী। মহাঋষি কেবলই হাসছেন—কোমল, উদার, সাম্য। হাতে একটা ফুল—কেবল নাড়ছেন। সারাক্ষণ বক্তৃতায় কেবলই ফুলটার কথা বলে চললেন—মানুষ ইচ্ছা করলেই এই ফুলটার মত হতে পারে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেবল কোমল হাসি আর এই এক কথা। কিন্তু কিভাবে এমন দৈহিক এবং আত্মিক সুন্দর হওয়া যায়—কোন পদ্ধতিতে, কোন অনুশীলনে, কোন আধ্যাত্মিক মানসিক সংগঠনে—শ্রোতাদের বারবার প্রশ্নেও সে উত্তর তিনি দিলেন না। তার পরিবর্তে কেবলই বলতে লাগলেন—আমি ইউরোপের সর্বত্র মেডিটেশানের স্কুল খুলেছি—সেখানে এসে শিক্ষা গ্রহণ করলেই মনের সব রোগ সেরে যাবে। "সন্তায়-শেষে আমোদস্ফূর্তির জন্যে আপনাদের অনেকেই ত দেড় শ দু শ মার্ক খরচ করেন। সেই টাকা খরচ করে আমার স্কুলে এর চাইতে বেশী আনন্দ পেতে পারেন। মনের স্বর্গীয় আনন্দ।" এই নিয়ে সভাস্থলে চলল মহাঋষি আর দর্শকদের মধ্যে টাগ-অব-ওয়ার। তরুণদের মধ্যে বেশীর ভাগই বিরক্ত হয়ে হল থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল। ওরা খুবই হতাশ—কোন ভুতুড়ে কাণ্ড ব্যাটা ত দেখালই না—শুধু শুধু এতগুলো টাকা গেল।

প্রশ্নটা টাকার নয়। প্রশ্নটা আরো গভীরের। সত্যি কি ভারতের অধ্যাত্মবাদের পক্ষে ভোগবাদী পশ্চিমের বিলাসব্যসনে নিমজ্জিত পথভ্রষ্ট সভ্যতার মনের গুরু হতে পারা সম্ভব? এ'দের নিজেদের ধর্ম অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম দিনে দিনেই সরে পড়ছে সনাতন ধর্মের স্থান থেকে। খ্রীষ্টধর্ম এখন অনেক বেশী রাজনীতির দিকে প্রবাহিত, চার্চের ভূমিকা এখন ছায়া সরকারের—ধর্ম বলতে মানুষ পূর্বে যীশুকে বুঝত, ভগবান বলে কিছুকে বিশ্বাস করত, তাঁর পায়ে মানুষ দ্বিধাহীন চিত্তে আত্মসমর্পণ করে এক পরম নির্ভরতাকে উপলব্ধি করত। যন্ত্র-সভ্যতা মানুষের সেই বিশ্বাসের গোথিক তোরণকে অবিশ্বাসের ট্যাঙ্ক আর বুল-ডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলছে। সেখানে ধর্মের বেদীমূলে আসন পাতছে সমগ্র মানবসমাজের জন্য, আণবিক যুগের জন্য এক অন্য মানবতাবোধ। ইউরোপের চিন্তাশীল প্রোটেস্টান্ট, ধর্মযাজকেরা তাই খ্রীষ্টধর্মের নামে কেবল প্রভু যীশুর প্রচার করবার চেষ্টা করছেন না, করছেন মানবতার বোধের—যে মানবতা-চৈতন্য ব্যতিরেকে আজকের মানুষের মুক্তি নেই। যীশুর নামে তাই তাঁরা আজ মানবতারই প্রচারে নামতে বাধ্য হচ্ছেন। আজকের অনেক তরুণ জার্মান ধর্মযাজকের মুখে তাই শুনতে পাই অন্য বাণী। দু একজন মিশনারী ধর্মযাজককে আমি চিনি—যাঁরা এখনো ভারত ও আফ্রিকায় মিশনারী কাজে হয় কোন টেকনিক্যাল বা মেডিক্যাল প্রোজেক্ট নিয়ে মানুষের সেবায় ব্যস্ত, তাঁরা আজ পরিষ্কারভাবে বলেন—মিশন আজ সাহায্য করে সেসব দেশের গ্রামের মানুষকে ধর্মান্তরিত করবার জন্যে নয়, তার কোন প্রয়োজনও নেই। আমাদের এই সাহায্যের উদ্দেশ্য সেখানকার গ্রামের তরুণেরা যাতে কারিগরি বিদ্যায় স্বাবলম্বী হয়ে নিজের গ্রাম আর দেশকে সাহায্য করতে পারে। মানুষকে যেন না খেয়ে মরতে না হয়। মানুষের স্বাধীনতা, আর গণতন্ত্র যেন রক্ষা পায়। তারপর যদি কেউ নিজের ইচ্ছা থেকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে চায় [illegible] ব্যাপার। তবে আমাদের [illegible] চার্চের [illegible]

কাউকে প্রলোভন বা জোর বা কায়দাকানুন করে ধর্মান্তরিত করা নিষিদ্ধ। প্রচুর চার্চ অনেক ভুল করেছে। এদের কাছে তাই যীশুর বাণী প্রচারের উদ্দেশ্য হল—দেশে দেশে মানবতাবোধ জাগ্রত করা। এমন কি এদেশের উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে যখন কোন ধর্মালোচনার সভা বসে, সেখানে ছাত্রছাত্রীরা যাতে কেবল খ্রীষ্টধর্মের বক্তব্য শুনতে না পায়, সেই সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মের বক্তব্য শুনতে পায়, সে জন্যে সেখানে অন্যান্য ধর্মের প্রতিনিধিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয় সেখানে আলোচিত সমস্যা সম্পর্কে অন্যান্য ধর্মের মতামত জানবার জন্যে। এমন দু-একটি আলোচনা সভায় লেখক নিমন্ত্রিত হবার সুযোগ পেয়ে হিন্দু ধর্মের কথা তুলে ধরতে পেরেছে, যেখানে পরস্পরের প্রতি সহনশীলতাই প্রকাশ পেয়েছে।

আমার এই চিঠির গোড়ার দিকে বর্তমানে পৃথিবীর দেশে দেশে সাংস্কৃতিক সংযোগের প্রশ্ন তুলেছিলাম। সেখানে ভারত-জারমানের সম্পর্কের প্রশ্নও রয়েছে। যেসব ভারতীয় কেবলই অভিযোগ জানান—ওরা কেবল আমাদের খারাপটাই খুঁজে বেড়ায়, তাঁদের সবিনয়ে জানাতে হয়—এদের একটা বৃহৎ অংশ আমাদের ভালটাও খোঁজে। আমাদের ব্যাপারে এদের চিন্তা বা আগ্রহ বহু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্বচ্ছ সম্পর্কের মেঘের আড়াল থেকে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত বেরিয়ে পড়ে। অনেক সময়ে এদের আগ্রহকে আমরা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারি না। আজকের ভারতবাসীমাত্রই ব্যক্তি স্বার্থ-সন্ধানী। তার ভারত রত্নদের কাছ থেকে হতভাগা দেশ কতটুকু আর আশা করতে পারে! সেখানে নিজে বাঁচলে বাপের নাম।

ধর্ম প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। এককালের হিন্দুস্থান স্ট্যানডারডের প্রাক্তন সহ সম্পাদক, বর্তমানে বারলিনে ভারতীয় কনসাল জেনারেল শ্রীপরেশ দাশগুপ্ত সেদিন তাঁর বাড়িতে এক ঘরোয়া আসরে বারলিনে একটি কালী-মন্দির স্থাপনের বাসনা প্রকাশ করে ফেললেন। বারলিনে খ্রীষ্টমন্দির-গুলির মাঝে মুসলমানদের মসজিদ আছে, বৌদ্ধদের বৌদ্ধমন্দির আছে, ইহুদীদের ইহুদী গীর্জা আছে, নেই কেবল হিন্দুদের কালীমন্দির। সেদিক থেকে প্রস্তাবটি [illegible] কেবল ধর্মের দিক থেকে [illegible] সাংস্কৃতিক যোগাযোগের দিক থেকেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হিন্দুদের [illegible] [illegible] [illegible]

আচ্ছন্নমণ্ডিত হবে কি না জানি না, [illegible] নির্ভর করছে ভারতীয় হিন্দুদের কর্ম-তৎপরতার ওপর। তবে এই [illegible] হতে পারলে হিন্দুধর্মের কথা বলার ব্যাপ্তি পৃথিবীতে আর একটু বাড়তে পারত। তাঁর এই প্রস্তাবের জন্য শ্রীদাশগুপ্তকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

সত্যি কথা বলতে কি, ছেলে ছেলের বৌ নাতিনাতনী সহ বিদেশে সস্ত্রীক দাশগুপ্ত পরিবারের আতিথেয়তা—পালং শাক থেকে আরম্ভ করে নিজের ঘরে তৈরি রসগোল্লা পর্যন্ত বহু ব্যঞ্জনে পরিপূর্ণ আহার কল্পিতর যে একবার খেয়েছে, সেই কেবল জানে সেই বাড়ীতে ঢুকে মাতৃতুল্য শ্রীমতী দাশগুপ্তকে বলতে ইচ্ছা করে কি না—"মাসীমা, মালপোয়া খাবু!" আরে দূর! ঢাকা-বরিশাল বা কি, বারলিনই বা কি! সব দূরত্বই একাকার—যেখানে অমন শাক-চচ্চড়ি-রসগোল্লা আর আড্ডা পাওয়া যায়। বাঙালীর ঘর সেখানেই। শ্রীদাশগুপ্ত হচ্ছেন ঢাকার আর শ্রীমতী দাশগুপ্ত হচ্ছেন কলকাতার মানুষ। সুতরাং তাঁর বাড়ীতে বাঙালঘটির বিতর্কের আকর্ষণটাই বা কম কি!

লেখাটা শেষ করেছিলাম, সেই সময় খবর এল আজ এইমাত্র বিকেলের প্রকাশ্য রাজপথে ক্যুরফুরসটেনডামের ওপর দিয়ে রুডি দুচকে, SDS ছাত্রনেতা ও পার্টি ইডিয়োলজিসট, সাইকেলে যখন পার্টি অফিস থেকে ঘরে ফিরছিল, সেই সময় এক শ্রমিক আততায়ী তাঁকে সাইকেল থেকে ধাক্কা মেরে পথে ফেলে দিয়ে হাতে লুক্কায়িত রিভলবার থেকে পর পর তিনবার মাথায় গলায় গুলি চালায়। পরে আহত অবস্থায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

রুডির ওপর আততায়ীর আক্রমণের খবর সঙ্গে সঙ্গে [illegible] জরমানিতে ছড়িয়ে পড়ল। খবর ছড়িয়ে পড়ল বারলিন থেকে হামবুরগ, ফ্রাংকফুরট, মিউনিক প্রভৃতি বড় বড় শহরে, বিশ্ববিদ্যালয়ে। খবর ছড়িয়ে পড়ল জরমানির বাইরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। লণ্ডনে, প্যারিসে, আমস্টারডামে, ডেনমার্কে, সুইৎসারল্যাণ্ডে, ইতালীতে যেখানে জরমান রাষ্ট্রদূত অফিসগুলির সম্মুখে বিরাট বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। লণ্ডনে জরমান রাষ্ট্রদূত অফিস থেকে জরমান পতাকা নামিয়ে এনে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

জরমান বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সঙ্গে সঙ্গে জমায়েত হয়ে ইসটারের দিন-গুলিতে একটানা জরমানির সংবাদপত্রের একচ্ছত্র অধিপতি আলেকস স্প্রিংগার প্রকাশনীর বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করল। শুরু হল আক্রমণ হামবুরগ, বারলিন, ফ্রাংকফুর্টের বিশাল বিশাল স্প্রিংগার অট্টালিকা আর তার কাগজ, তার গাড়ি, তার শো-কেসগুলিকে। সেই এক দৃশ্য! তাদের অভিযোগ, একটা গণতান্ত্রিক দেশে একজনের হাতেই দেশের শতকরা ৭০ ভাগ প্রচারযন্ত্র থাকলে সেই দেশের গণতন্ত্র অতি বিপন্ন—এই হচ্ছে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের অভিযোগ এবং তারই বিরুদ্ধে আন্দোলন। কোন কোন পত্রিকা আর রাজনৈতিক নেতা এই আন্দোলনকে আখ্যা দিচ্ছেন বিদ্রোহ বা রিবেলিয়ন। তবে চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, এই বিদ্রোহের শরিক একমাত্র ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীর দল, সেখানে তাঁদের সব চাইতে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী চাষী ও শ্রমিক শ্রেণী।

সন্তোষকুমার ব্রহ্ম

মনের সাগরে পুতুল

উনিশ

সেদিন মে ফ্লাওয়ার রেস্তরাঁ থেকে রত্না কুশারীকে সহজে বাড়ি পাঠানো যায় নি। সে টেবিল আঁকড়ে বসে ছিল, ববির নাম ধরে চীৎকার করে ডেকেছিল, অবুঝ বালিকার মত কেঁদেছিল। হোটেলের কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করেছিল, ববিকে টেলিফোনে ধরতে, পারে নি। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে খবর দিয়েছে বেসরকারী সওদাগরী অফিসের ডিরেক্টার মিঃ কুশারীকে, স্ত্রীকে নিয়ে যাবার জন্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যে মিঃ কুশারী মে ফ্লাওয়ারে এলেন। নিখুঁত স্যুট, স্ট্রাইপ্ড্ টাই, মুখে পাইপ, চকচকে কালো জুতো, কপালের দুপাশে সাদা চুল, পালিশ করা চেহারা, আভিজাত্য ঠিকরে পড়ছে। কারুর দিকে না তাকিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হলেন স্ত্রীর কাছে। ডাকলেন, রত্না, বাড়ি চল।

রত্না কুশারী প্রথমটা শুনতে পায় নি, তারপর আস্তে আস্তে চোখ খুলে তাকাল। কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে ফ্যাল্‌কা হাসল, কি ব্যাপার, তুমি এখানে?

—তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

—এত দয়া? আজকাল তো কোথাও নিয়ে যাও না।

—এখান থেকে আমায় ফোন করেছিল। মিঃ কুশারীর গলার স্বর কঠিন, ছি, ছি, লজ্জা করে না, তোমার জন্যে অফিস ছেড়ে এইখানে আসতে হল, গেট্ আপ্।

—আমি উঠব না।

—এটা একটা পাবলিক রেস্তরাঁ, ভদ্রলোক—

—তাতে কি হয়েছে, তোমাকে তো আমি ডাকিনি, তুমি চলে যাও। ববিকে না নিয়ে আমি যাবো না।

মিঃ কুশারী [illegible]

[illegible]

—তাহলে তুমি যাবে না?

রত্না কুশারীর কি খেয়াল হল, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল স্বামীর দিকে, বলল, যেতে পারি, যদি আমাকে তোমার ফ্ল্যাটে নিয়ে যাও।

মিঃ কুশারীর চোখে মুখে বিরক্তি, আমার ফ্ল্যাটে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার ফ্ল্যাটে। রত্না কুশারীর জড়ানো গলার স্বর, যেখানে সেই মেয়েমানুষটাকে রেখেছ, যাকে নিয়ে বম্বে-দিল্লি উড়ে বেড়াও, যার সঙ্গে রেসকোর্সে যাও, যার বিছানায় রাত কাটাও, তার কাছে আমায় নিয়ে চল।

এই অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় ভেবে মিঃ কুশারী রাজী হলেন, বেশ, তাই চল।

রত্না কুশারীর বিশ্বাস হয় না, ঠিক বলছো?

—বলছি তো।

—যদি সেখানে নিয়ে না যাও, আমি কিন্তু গাড়ি থেকে নামবো না।

—ঠিক আছে, চল।

রত্না কুশারী উঠে দাঁড়াল কিন্তু চলতে পারলো না, স্বামীর কাঁধের উপর তার দেহটা নেতিয়ে পড়ল। রেস্তরাঁর ম্যানেজারের সাহায্য নিতে বাধ্য হলেন মিঃ কুশারী; দুজনে মিলে ধরাধরি করে কোনরকমে রত্না কুশারীকে রেস্তরাঁ থেকে বার করে নিয়ে গেল।

এ দৃশ্য দেখে হয়ত অনেকে হাসল, অনেকে বিদ্রূপ করল; কিন্তু তারা বুঝল না, আজকের নগরকেন্দ্রিক সভ্য সমাজে বাস করার এ এক নিদারুণ ট্র্যাজেডী। যতদিন চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে ততদিন মানুষ মানুষের মত বাস করে, মান আর হুঁশ দুটোই বজায় থাকে; কিন্তু যাদের জীবনে পাওয়ার মাত্রা বাড়তে থাকে, আর নতুন করে চাইবার কিছু থাকে না তারা তখন বাস করে এক কৃত্রিম জগতে। এই রত্না কুশারীরা সবাই যে মুখে দুধের [illegible] চামচে নিয়ে জন্মেছে তা নয়, কিন্তু এদের ওপর ভগবানের অভিশাপ, এরা যা চেয়েছে তার চেয়ে বেশী পেয়েছে। কুমারী রত্না কুণ্ডুরী শিবপুজোর অছিলায় চেয়েছিল এমন বর যার নাম করলেই সমাজের লোক চিনতে পারবে। শিবঠাকুর অন্য মেয়েদের প্রার্থনা শুনেছিলেন কিনা জানা নেই, কিন্তু রত্না কুণ্ডুরীর সত্যিই ডাকসাইটে বর জুটল। তার জন্যে বেশী কাঠখড় পোড়াতে হয়নি, মিঃ কুশারী নিজে থেকেই যেচে রত্নাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, দাবিদাওয়া কিছুই ছিল না। বিয়ের রাত্রে আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবাই কোরাসে বলল, কি ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিল রত্না, নয়ত এমন বর পায়!

এ তো জীবনের শুরু। শাড়ি, বাড়ি, গাড়ি, মেয়েদের যা স্বপ্ন তা বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছিল, চাইতে হয়নি। প্রতি বছর দুবার করে চেঞ্জে যাওয়া, বিলাত আমেরিকা সফর, ঘরে বাইরে বড় বড় পার্টি। কিন্তু তারপর?

এর উত্তর কে দেবে। এমন একটা জায়গায় রত্না কুশারী গিয়ে পৌঁছল যখন আর চাইবার কিছু নেই। সোশ্যাল ওয়ার্ক, শুকনো হাততালি, মিথ্যে বাহবা, আর কিছুই ভাল লাগে না। এসব মেয়েমানুষের পেছনে অনেকরকম পুরুষ জোটে। রত্নার কপালেও জুটল, ক'দিন মাছি ভনভন করল, মদ আর দেহের উত্তেজনায় কোথা দিয়ে সময় কেটে গেল রত্না বুঝতে পারল না।

(সি-৪৮৯৬)

ঘুমাল যে রাত্রে প্রথম সে বাড়ি ফিরল না। ভেবেছিল তার জন্যে মিঃ কুশারী দুর্ভাবনায় রাত্রে ঘুমতে পারবে না, হয়ত পুলিশে খবর দেবে; কিন্তু পরদিন বাড়ি ফিরে যখন শুনল সাহেব একবারও রত্নার খোঁজ করেনি, অভ্যাসমত ব্রেকফাস্ট সেরে অফিস করতে চলে গেছে, রাগে দুঃখে সে জ্বলে উঠল। তখুনি টেলিফোন করল অফিসে।

—হ্যালো, আমি রত্না কথা বলছি।

মিঃ কুশারীর এক কথার জবাব, বল।

—আমি কাল রাত্রে আটকে গিয়েছিলাম পিসীমার বাড়ি, টেলিফোনটা খারাপ ছিল তাই তোমায় খবর দিতে পারিনি। তুমি রাগ করনি তো?

মিঃ কুশারীর অত্যন্ত সহজ উত্তর, ওমা, আমি জানতাম না তুমি বাড়ি ফেরনি। আমি ক্লাব থেকে ফিরেছি দেরিতে, সানিদের সঙ্গে খেয়ে বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়েছি। ব্রেকফাস্ট টেবিলে তোমাকে না দেখে ভাবলাম বোধ হয় ঘুম থেকে ওঠনি, তাই আর বিরক্ত করিনি। আজকেও আমার ফিরতে একটু দেরি হবে ডার্লিং। একটা স্ট্যাগ্ পার্টি আছে। কাল সকালে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। বাই, বা।

রত্না কুশারী বাই বাইও বলতে পারেনি। এই প্রথম সে বুঝতে পারল পাওয়ার স্রোতে সে ভেসে গেছে, আর তার কিছুই চাইবার নেই জীবনে। স্বামীকে এড়িয়ে পুরুষ-সঙ্গ চেয়েছিল তা এত পেয়েছে যে, এখন আর তার মধ্যে কোন উত্তেজনা নেই। কোন দিন ভাবতেও পারেনি স্বামীর দিক থেকেও আকর্ষণ ক্রমশঃ কমে আসছে। দুজনেরই এখন বয়েস হয়ে গেছে, মিঃ কুশারী চান রত্না কিছু নিয়ে ভুলে থাকুক, তাঁকে বিরক্ত না করলেই হল। আর রত্না কি চায় তা সে নিজেই জানে না। কিছুদিন ববিকে আঁকড়ে ধরে ভেবেছিল কিছুটা শান্তি পাবে, পরে বুঝতে পারল কিছুই নয়, আলেয়া। আজ সে মাতাল, চরিত্রহীন, সব সত্যি, কিন্তু কিসের জন্যে। সমাজের যে স্তরে চাওয়ার চেয়ে পাওয়ার যোগান বেশি সেই স্তরের ছেলেরা মেয়েরা এই ভাবেই নৈরাশ্যের হাঁড়ি কাঠে বলি হয়—রত্না কুশারীর জীবনও তার ব্যতিক্রম নয়।

গাড়িতে ওঠার পর রত্না কুশারী কিন্তু আর কোনরকম দাপাদাপি করেনি। গাড়ির ঝাঁকানিতে ক্রমশ সে ঝিমিয়ে পড়ে, বোধ হয় শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ে যে জন্যে বাড়িতে পেণছে দারোয়ান বেয়ারাদের সাহায্য নিয়ে রত্নাকে ওপরের বিছানায় শুইয়ে দিতে অসুবিধা হয়নি।

তখনকার মত হাঁফ ছাড়লেও মিঃ কুশারী বুঝতে পেরেছিলেন বাচ্চাদের ভুলিয়ে ঘুম পাড়ালেও ঘুম থেকে উঠেই তারা কাঁদতে শুরু করে যদি না মুখে চুষি কাঠি ভরে দিয়ে ভুলিয়ে দেওয়া যায়। রত্না কুশারীরও চুষিকাঠি দরকার কারণ, মায়ের দুধের যোগান দিতে তিনি নিজে অপারগ, সে স্পৃহা তাঁর নেই। অগত্যা ববি চুষি-কাঠিকে খুঁজে বের করতেই হবে।

ববির বাড়ি ড্রাইভারটা চিনত। মিঃ কুশারী নিজে গেলেন তার সঙ্গে দেখা করতে। তখনও ববি ঘুমচ্ছে, বেরিয়ে এল তার মা।

মিঃ কুশারীর ঘোষণা, আমি ববির সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—সে শুয়ে আছে।

—আমার বিশেষ দরকার।

—ডেকে দেখি।

—বলুন, মিঃ কুশারী কথা বলতে চায়।

এ নামটা ববির মার অনেকবার শোনা। গাড়িটাও অচেনা নয়। এই গাড়ি করে রাত্রে যতদিন ববি বাড়ি ফিরেছে তার কোটের পকেট থেকে সে কুড়িটা করে ঘুষের টাকা পেয়েছে। কিছুদিন হল সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। ছেলেকেও এর কারণ পরিষ্কার করে জিজ্ঞেস করতে পারেনি, তাই এই অপরিচিত ভদ্রলোকের আগমনে হঠাৎ তার মনে হল ভাগ্য বোধহয় প্রসন্ন, আবার হয়ত ঘুষের টাকা পাওয়া যাবে। সদা ব্যস্ত কলকাতার শহরে হাজার রকম শব্দের মাঝখানে ববির মা পরিষ্কার শুনতে পেল ঝন ঝনে রুপোর টাকার আওয়াজ।

ব্যস্ত ভাবে মিঃ কুশারীকে বসতে দিয়ে ভদ্রমহিলা ডাকতে গেল ববিকে। মিঃ কুশারী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরের চারদিকটা দেখে নিয়ে বুঝে নিলেন এদের আর্থিক অবস্থা। এদের কিনতে বেশি পয়সা লাগে

না, একটু বাহবা, কিছু নেশা আর কতকগুলো টাকা, ব্যাস, তাহলেই গলায় চেন লাগিয়ে বাড়িতে বসিয়ে রেখে দাও। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ল্যাজ নাড়বে আবার লেলিয়ে দিলে ভৌ ভৌ করে চীৎকার করে অন্যদের ভয় দেখাবে।

ঘুম জড়ানো চোখে ববি উঠে এল। হাসবার চেষ্টা করে বলল, কি খবর মিঃ কুশারী? আপনি নিজে এলেন আমার কাছে! একটা খবর পাঠালেই পারতেন, আমি যেতাম।

মিঃ কুশারীও শুকনো হাসলেন, তুমি যাচ্ছ না বলেই তো আমায় আসতে হল। বোধহয় তুমি জান না আমার স্ত্রী অসুস্থ।

—কেন কি হয়েছে?

—নতুন করে তোমাকে আর কি বোঝাব। আমার মনে হয় তোমার অভাব ওকে পীড়িত করছে।

ববি চুপ করে কি যেন ভাবল, বলল, আমি কি করতে পারি বলুন?

—তুমি আগের মত আমাদের বাড়িতে এস, রত্নাকে নাচ শেখাও। ওর সঙ্গে—, রাত কাটাও কথাটা বলতে বোধহয় মিঃ কুশারীর রুচিতে বাধল।

এবার ববির স্পষ্ট উত্তর, কি করে তা সম্ভব হবে! একসময় আমি যেতাম, সে তো আপনি জানেন। মাঝখানে আপনার স্ত্রী কোথায় উধাও হয়ে গেলেন। সেই সময় আর একজন নতুন ছাত্রী আমি নিয়েছি. এখন তাকে কি বলব?

—কে তিনি, জানতে পারি কি?

—ব্যারিস্টার কে জি র শালী, অনুভা।

আর বলতে হল না, নাম করা সোসাইটি 'ক্যানডেল'-এর নায়িকা অনুভাকে কে না চেনে! তার নিত্য নূতন বব চুলের ফ্যাশান আজও বহু নবীনাকে অনুপ্রাণিত করে। ব্লাউজের কাট, শাড়ির পাড়, মুখের মেক-আপ, লিপস্টিকের রং, ভুরু আর টিপের বৈচিত্র্য মেয়ে মহলে আলোচনার বিষয়। সেই অনুভার খপ্পরে পড়েছে ববি, তার কাছে রত্না কুশারী তো ছেলেমানুষ।

মিঃ কুশারীর চিন্তিত স্বর, তোমাকে যে রত্নার প্রয়োজন।

ববি হাসল, অনুভার প্রয়োজনও তো ঠিক ততটাই।

—তা হলেও আমি বলব, সময়টা ভাগ করে নাও।

—কোন সময়? সন্ধ্যা নিয়েই তো মারামারি, দিনের বেলা আমি ঘুমোই।

মিঃ কুশারী বুঝতে পারলেন ববিকে বুঝিয়ে পেরে ওঠা যাবে না, এ রাস্তা ধরে নিজেকে [illegible] তাই [illegible] কথা পাড়লেন, [illegible] হবে [illegible] পোষাবে?

ববি [illegible] মানে?

—[illegible]

ছেড়ে তুমি রত্নার কাছে ফিরে আসবে? তোমার ডিউটি হবে তাকে খুশী রাখা, দরকার হলে চেঞ্জে যাবে, যেখানে রত্না যেতে চায় নিয়ে যাবে, তার সব খরচা আমি দেব।

ববির অজান্তে তার চোখ দুটো চকচক করে উঠল।

মিঃ কুশারী বুঝতে পারেন হাওয়াই ধরেছে। বললেন, এই হচ্ছে তোমার রোজগার করার সময়, শরীর আছে, চেহারা আছে। টাকাওয়ালা অনেক মেয়েই তোমায় চাইবে। যেখানে বেশি পাবে নিয়ে নাও, কারণ তোমাদের তো কোন সেন্টিমেন্টের বালাই নেই। রত্নাকে তুমি ভালবাস না আমি জানি, অনুভাকেও না। সে স্টেজ ওরা পেরিয়ে গেছে। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, হিসেব করে দেখ। নেশার ঘোরে সব মেয়েমানুষকেই সমান মনে হবে। এই বেলা টাকাটা জমালে পরে পছন্দমত বিয়েথা করে সংসার করতে পারবে।

ববি বাঁ হাত দিয়ে চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে আনমনা হাসল, বলল, ওসব কথা আর ভাবি না। বয়েস আমার বেশি নয়, আপনাদের মত অভিজ্ঞও নই। একদিন শখ করে মদ খেতে শুরু করেছিলাম, এখন কিন্তু না খেয়ে থাকতে পারি না। লাঞ্চের সঙ্গে বীয়ার, চায়ের বদলে জিন, আর রাত্রে এনতার হুইস্কি। যতক্ষণ না বেহুঁশ হয়ে যাই থামতে ইচ্ছে করে না।

মিঃ কুশারীর শুকনো মন্তব্য, ওটা বয়েসের দোষ।

ববির চটপটে জবাব, ওইজন্যেই কিন্তু আপনার স্ত্রী কে· জি·র শালী আমাকে পছন্দ করে।

—আশ্চর্য নয়।

—তবে গোলমাল কোথায় জানেন! মদের মতই ঐ বিগতযৌবনারা আমার রক্তে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। মনে হয় না নিজের বয়সী কোন মেয়েকে নিয়ে আমি সুখী হতে পারব।

কথাটা মিঃ কুশারীকে ধাক্কা মারল। অস্ফুট স্বরে ইংরাজীতে বললেন, বড় বেদনাদায়ক উপলব্ধি।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল ববিকে ধরে নিয়ে যেতে না পারলে চলবে না। রত্নার চুষিকাঠি চাই, নয়ত জীবনে অশান্তি। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব রাখলেন, মাসে হাজার টাকা।

ববি বড় বড় চোখ করে তাকায়।

—কি, রাজী?

—আমাকে একটু ভেবে দেখতে সময় দিন।

—ভেবে দেখতে চাও দেখ, কিন্তু তোমাকে আমার প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত ভাল কথাই বলছি, হাজার টাকা পারিশ্রমিক দিতে চাইছি। কিন্তু তাতেও রাজী না হলে আমাকে শক্ত হতে হবে।

—তার মানে?

মিঃ কুশারী হাসলেন, কলকাতার শহরে ছেলেধরার অভাব নেই জান ত? রোজই কত ছেলে হারাচ্ছে, কতজন গায়েব হয়ে যাচ্ছে। অতএব ববির অন্তর্ধানেও বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে না। মাসে মাসে টাকা পাঠিয়ে তোমার মার মুখ আমি বন্ধ করে দেব। সার্কাসের বাঘসিংহকে ইনজেকশান দিয়ে ঝিমিয়ে রেখে দেয়, সে তুলনায় তুমি তো ছেলেমানুষ।

ববি এবার ভয় পায়, এসব কি বলছেন?

মিঃ কুশারীর সদম্ভ ঘোষণা, এ পর্যন্ত জীবনে আমি হারিনি, যা চেয়েছি তাই পেয়েছি। এখন তোমাকে আমার প্রয়োজন, তোমাকে আমি চাই। তাই যেরকম করে হোক পেতে হবে। আমার কাছে তোমার একমাত্র পরিচয় তুমি আমার স্ত্রীর চুষিকাঠি। এখন চলি। আশা করি শিগগীর দেখা হবে।

মিঃ কুশারীর গাড়ী সজোরে স্টার্ট নিয়ে বেরিয়ে গেল। চিন্তিত ববি নিজের ঘরে ঢোকে, দেখতে পায় তার মা আড়াল থেকে সব কথাই শুনেছে।

মিঃ কুশারীর হাজার টাকার টোপ বিধবা আগেই গিলেছে, তাই লজ্জার মাথা খেয়ে বলল, ওরা তোর পুরোনো বন্ধু, ওদের কাছে যাস না কেন?

ববি কোন উত্তর দিল না, কিন্তু বুঝতে পারল মিঃ কুশারীর হুমকি মিথ্যে নয়, ছেলে গুম হয়ে গেলেও টাকা পেলে তার মা মুখে রা কাড়বে না। রূঢ় স্বরে বলল, ঘর থেকে বেরোও, আমাকে বিরক্ত করো না।

বিধবা অপমান গায়ে মাখে না বলে এরা খুব বড়লোক তাই না? দেখলেই বোঝা যায় অনেক টাকা।

ববি চীৎকার করে ওঠে, টাকা, টাকা! কি অভিশাপ! তুমি আমার মা, কিন্তু আমি তোমার ছেলে নই, একটা টাকা রোজগারের যন্ত্র। আর ওদের কাছে আমি চুষিকাঠি। চমৎকার! আর সোহাগ দেখিও না। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে যাও।

ববি আর কোনদিকে না তাকিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে। যদি একটু ঘুম আসে এই আশায়।

ববি কিন্তু ঘুমোতে পারলো না, চোখ দুটো জ্বলতে লাগল। ক্রমে সেই জ্বালা ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত শরীরে। বিকেলের মধ্যেই উঠে পড়ে সেজেগুজে ট্যাক্সী ধরে বেরিয়ে পড়ল ব্যারিস্টার কে. জি-র বাড়ির উদ্দেশ্যে। সব কথা অনুভাকে খুলে বলা দরকার, নয়ত ভদ্রমহিলা তার সম্বন্ধে কি ভাববে।

এককালের দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্যারিস্টার কে. জি এখন নিজে হাঁটতে পারে না, পক্ষাঘাতে অর্ধেকটা দেহ অবশ হয়ে গেছে। চাকা দেওয়া চেয়ারে বসে এঘর থেকে ওঘরে ঘুরে বেড়ায়। একজন সেবিকা আছে দেখাশোনা করে, কয়েকটা খবরের কাগজ, নানারকম ইংরেজি পত্রিকা তার সংগী। বাড়ির কর্ত্রী অনুভা। সে অবশ্য অনেকদিন থেকে, বলতে গেলে শ্রীমতী কে. জি-র মৃত্যুর আগে থেকেই। কেন যে কে. জি অনুভাকে বিয়ে করেনি তা কেউ জানে না। অনুভা আজও অবিবাহিতা। তবে তারা দুজনে বরাবর একসংগে থেকেছে, স্বামী-স্ত্রীর মতই ঘুরে বেড়িয়েছে, তাদের নিয়ে সোসাইটিতে মুখর আলোচনা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। কে. জি অসুস্থ হয়ে পড়ায় অনেকে ভেবেছিল অনুভা তাকে ত্যাগ করবে। কিন্তু তা সে করেনি। এখনও ওই বাড়িতেই আছে, তবে তার মহল আলাদা। সে মহলে নতুন বন্ধু বান্ধবের আনাগোনা। তারা কে. জি-কে নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না, পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে সোজা গিয়ে হাজির হয় অনুভার ব্যক্তিগত ড্রইংরুমে।

ববির সংগেও অনুভার ঐ ঘরেই দেখা হল। সংগে সংগে উতলা কণ্ঠের প্রশ্ন, কি হয়েছে ববি? ফ্যাকাশে মুখ, চোখগুলো গর্তে ঢুকে গেছে!

—একটা দুর্ভাবনায় পড়েছি।

—কি নিয়ে?

—আজ দুপুরে মিঃ কুশারী এসেছিলেন আমার বাড়ীতে।

কথাটা শুনেই অনুভার চোখ মুখ কঠিন হয়ে উঠল, কেন, কি চায় সে?

রত্নাকে আবার নাচ শেখাতে হবে।

অনুভার গর্জন, খবর্দার, ঐ মাতালটার কাছে তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না। আজ যে শাওয়ারে কি কাণ্ড করেছে তুমি জান না। লজ্জায় সকলের মাথা কাটা গেছে।

ববির মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, হাজার টাকা মাইনে দেবে বলছে।

আগুনে যেন ঘি পড়ল। সাপিনীর মত ফুঁসতে লাগল অনুভা, মুখের মার্জিত মুখোশ খসে পড়ে গেল, নোংরা, ইতর, ছোটলোক, আমাকে জব্দ করার জন্য টাকা দিয়ে তোমায় কিনতে চায়। খবর্দার তুমি যাবে না, যদি যাও আমিও তোমার সর্বনাশ করব। দরকার হলে—

ববি সভয়ে কথার শেষটুকু [illegible] ত্রস্ত হয়ে থাকে।

—দরকার হলে অ্যাসিড [illegible] ঐ সুন্দর মুখখানা বীভৎস [illegible]

ববির মনে হল [illegible] যেন [illegible] ঘুরছে, বনবন করে চরকি[illegible] মাথা ঘুরছে, সেই সঙ্গে [illegible] সব কিছু। শুধু দুটো মুখ [illegible] ভেসে উঠছে আর তাদের [illegible]।

একটা বাঘ একটা [illegible] কুশারী আর অনুভা [illegible] হিংস্র দৃষ্টি। তাদের [illegible] সে ববি।

লক্ষ্মীর কৃপালাভ: বাঙালীর সাধনা

বাঙালীর সাইকেল ব্যবসা ও সাইকেল শিল্প

বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের বরিশাল জেলার অন্তর্গত বাসণ্ডা গ্রামের সেন বংশের পরিচয়টি প্রথমেই লিপিবদ্ধ করছি।

'মানসির রানী', 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ', 'মহারাজা নন্দকুমার', 'টমকাকার কুটীর' প্রভৃতি উনিশ শতকের বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস ও অনুবাদ-গ্রন্থের রচয়িতা চণ্ডীচরণ সেন (১৮৪৫—১৯০৬) পেশায় ছিলেন সবজজ, ধর্মে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত।

তাঁর নটি সন্তানসন্ততির মধ্যে জ্যেষ্ঠা ছিলেন 'আলো ও ছায়া', 'দীপ ও ধূপ' প্রভৃতি সেকালে সমাদৃত কাব্যগ্রন্থের রচয়িত্রী কবি কামিনী রায় (১৮৬৪—১৯৩৩)। ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদকে ভূষিতা হয়েছিলেন। দ্বিতীয়া ডাঃ মিস যামিনী সেন, আই এম এস (১৮৭১—১৯৩২)। বিলেতের 'সোসাইটি অব সার্জনস অ্যান্ড ফিজিশিয়ানস'-এর 'ফেলো' ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র যতীন্দ্রমোহন (১৮৭৩—১৯০৬) প্রথমে অধ্যাপক [illegible]

তাঁর অবদান ভোলবার নয়। ১৯৩৯ সালে তিনি কলকাতার মেয়র নির্বাচিত হন। চণ্ডীচরণের তৃতীয় পুত্র প্রভাতচন্দ্রও বিখ্যাত ব্যারিস্টার ছিলেন। তিনি পূর্ণিয়া শহরে প্র্যাকটিস করতেন। এঁরা কজন ছাড়াও চণ্ডীচরণের আরও দুই কন্যা প্রেমকুসুম সেন ও চিন্ময়ী দত্ত শিক্ষা ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং চতুর্থ পুত্র ললিতমোহন ছিলেন বিলেত-ফেরতা কৃতী এঞ্জিনীয়ার।

আজকের প্রবন্ধের প্রধান চরিত্র সুধীরকুমার (১৮৮৮—১৯৫৯) চণ্ডীচরণের কনিষ্ঠ সন্তান। তিনি ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারের কন্যা মীরা দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁর দুই পুত্র ও এক কন্যার মধ্যে সেন-র‍্যালের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর অভিজিৎ জ্যেষ্ঠ। ছোট ছেলে সঞ্জয় ন্যাশন্যাল ট্যানারির চেয়ারম্যান। কন্যা শ্রীমতী সুমিত্রা সেন কনিষ্ঠা। অভিজিৎ সেনের পত্নী অমিয়া দেবী জলপাইগুড়ির বীণা (দাশ) ভৌমিকের ভগিনকন্যা এবং সঞ্জয় সেনের স্ত্রী রত্না দেবী হলেন বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত সুরেন্দ্রমোহন বসুর কন্যা।

যে বিশিষ্ট পরিবারটির ঐতিহ্য ছিল সরস্বতীর সাধনা সেই বংশে জন্মগ্রহণ করে সুধীরকুমারের মতো এক পুরুষেই [illegible]

ও বাণিজ্যবিমুখতার কারণ বোধ হয় এই ছিল যে, বাঙালী সরস্বতীর আরাধনাতেই বেশি তৃপ্তি পেতো। সেই সাধনার ফলে যদি ভগিনী লক্ষ্মীর কৃপাও কিঞ্চিৎ জুটে গেল তো ভালো, নইলে বাঙালী পরোয়া করতো না। কিন্তু নিষ্ঠার সঙ্গে লক্ষ্মীর ভজনা করলে ভারতের অন্য অঞ্চলের বাসিন্দার চাইতে কম সময়েই বুদ্ধিমান বাঙালী দেবীর কৃপালাভ করতে পারতো, এই আমার বিশ্বাস। অবশ্য সেই নিষ্ঠার মধ্যে 'ডিসিপ্লিন' গুণটিও যে থাকা দরকার, এ কথা বলা বাহুল্য।

সুধীরকুমারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যতীন্দ্রমোহন সামান্যভাবে ব্যবসাতে নেমেছিলেন বটে, কিন্তু অকালমৃত্যু তাঁর ক্ষেত্রে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিল। পুরো ইতিহাসটি বলতে গেলে প্রবন্ধ বেশি বড়ো হয়ে যাবে বলে কয়েকটি ধাপ বাদ দিয়েই আমি সুধীরকুমার ও 'সেন অ্যান্ড পণ্ডিতের' কাহিনী আরম্ভ করবো। আশা করি এই সংক্ষেপ তাঁর জীবনীকে ক্ষুণ্ণ করবে না।

স্বর্গীয় সুধীরকুমার সেনের জীবনীকার বলেছেন, "সুধীরকুমারের জীবনেতিহাস প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে সাইকেল ব্যবসায় ও সাইকেল শিল্পের উন্নতি, বিকাশ ও পরিণতির ইতিহাস।" 'পরিণতি' শব্দটিতে আমার আপত্তি আছে, কারণ সুধীর সেন মশায়ের দুই পুত্র শ্রীঅভিজিৎ ও শ্রীসঞ্জয় সেনের উদ্যম সেন-র‍্যালে ও সেন অ্যান্ড পণ্ডিতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ভবিষ্যতে উৎকর্ষের কোন্ পর্যায়ে নিয়ে যাবে তার নির্ণয় আপনি আমি করে উঠতে পারবো না। এই প্রসঙ্গে পূর্বাহ্নেই একটা কথা বলবো। এই বিরাট রথের রশি টানার কাজে সেন পরিবারের সঙ্গে যাঁরা নিজেদের সমস্ত শক্তি, সামর্থ্য ও মমত্ববোধ ঢেলে দিয়েছেন,

সেই কর্মী-গোষ্ঠীর সহযোগিতা না পেলে কোনো কিছুই সম্ভব হতো না।

সেন অ্যান্ড পণ্ডিতের আদিকাণ্ডে যেমন স্বর্গত কিরণ চট্টোপাধ্যায় ও রাজেন দাশগুপ্ত মহাশয়দের মতো বিশ্বাসী ও দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং জেনারেল ম্যানেজার না পেলে সুধীরকুমারের পক্ষে প্রতিষ্ঠান চালানো অসম্ভব হতো, বর্তমান পরিচালক ও কর্মীদের বিষয়েও একই মন্তব্য করা চলে। সুদক্ষ প্রবীণ কর্মচারীরা পরিচালনার রাশ ধরে রয়েছেন। তাঁদের অধস্তন নবীন অফিসার ও কর্মীরা যেন সব হীরের টুকরো ছেলে। জনে জনে সকলের কথা বলার সুযোগ হবে না, কিন্তু প্রবন্ধের মধ্যে প্রসঙ্গ-ক্রমে কয়েকজনের কথা না বললে এই সুপরিচালিত সংস্থাগুলির পরিচিতি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

এটা যে 'করপোরেট ইকনমি'র যুগ, 'ফিউড্যালিজম' যে আজ অচল—সেন প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার কাঠামো সেই নীতিটাই ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছে। দক্ষতার পরিচয় দিতে পারলে সময়ে সবাই পরিচালনার বিশিষ্ট আসনে বসতে পারবে তারই ইঙ্গিত সেন সংস্থার সর্বত্র বিরাজ করছে। মেশিন ও পণ্য উৎপাদনের আগে সেই লক্ষণগুলির দিকেই আমার নজর বেশি করে পড়লো।

পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রাখতে হলে ইংরেজী অনার্স নিয়ে বি এ পাসের পর ব্যারিস্টার বা জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে সুধীর সেন মশায়কে কর্মজীবন যাপন করতে হতো। সে সম্ভাবনাও বেশি করেই হয়েছিল। কিন্তু তাতে ব্যাঘাত ঘটিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর বড়-দাদা যতীন্দ্রমোহন। তাঁর গড়া ছোট্ট দোকানটি তাঁর অকালমৃত্যুর পর চালাতে গিয়েই ছোট ভাই সুধীরকুমার বাণিজ্যের আস্বাদ পেলেন। তা-ও তাঁকে রাজকর্ম কিংবা আইনজীবিকা থেকে রক্ষা করতে পারতো না, যদি না তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলি' কাগজে 'বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তার অপব্যবহার' শীর্ষক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বিখ্যাত প্রবন্ধটি পড়ে পথনির্দেশ পেতেন।

কিন্তু ক্ষুদ্র 'সেন অ্যান্ড সেন'-এর ব্যবসা বাড়াতে গেলে আরও মূলধনের দরকার; অথচ সুধীর সেনের তখন সম্বল স্বোপার্জিত চার শ' টাকা। বাড়ির কারও কাছ থেকে তিনি ঋণ বা দান নেবার কথা বাদই দিয়ে-ছিলেন, কারণ উপার্জনক্ষম দাদা দিদি কত কষ্টে টাকা রোজগার করেন তা তিনি বুঝতেন। সেই উপার্জনের সামান্য অংশও ব্যবসাতে লাগিয়ে ঝুঁকি নেওয়াকে সুধীর সেন উচিত মনে করেন নি।

একটি আকস্মিক ঘটনা—হঠাৎ দেখা এক ভদ্রলোকের সহায়তা থেকে তাঁর মূলধনের অভাব মোচন হলো।

কলকাতা হাই কোর্টের [illegible]

বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের রামচন্দ্র নামে এক পৌত্র অমৃতসরের ন্যাশান্যাল ইনসিওরেন্স অ্যান্ড ব্যাংকিং কোম্পানীর কলকাতা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার ছিলেন। সুধীরকুমারের সঙ্গে তাঁর একদিন পরিচয় হয়ে গেল ডালহাউসি পাড়ায়। বল্লভদাস নামে ধর্মতলার এক বিশিষ্ট গুজরাটী ব্যবসায়ী ভদ্রলোক সুধীরবাবুকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁর কাছ থেকে একটি সুপারিশ যোগাড় করে সুধীরবাবু সদ্য-পরিচিত রামচন্দ্র পণ্ডিতের কাছে গেলেন 'সেন অ্যান্ড সেনের' জন্যে কিছু ঋণের আশায়। সেই থেকে দুজনের মধ্যে এমন একটা বন্ধুত্ব হলো যে, রামচন্দ্র নিজের কাছ থেকেই সুধীর সেনকে কিছু মূলধন দিলেন।

সেন অ্যান্ড পণ্ডিতের জন্ম হলো। তা সত্ত্বেও সেন অ্যান্ড সেনের পৃথক অস্তিত্ব বহুকাল ধরে বজায় ছিল।

রামচন্দ্রের কিন্তু এই বাণিজ্যে স্পৃহা ছিল না; তাঁর উৎসাহ ছিল ব্যাংকিং-এ। তাই ১৯১০ সালে সেন অ্যান্ড পণ্ডিতের স্থাপনার বছরখানেক পরেই এই কারবারের মালিকানার অংশ সুধীরবাবুকে বেচে দিয়ে রামচন্দ্র পণ্ডিত পাটনায় গিয়ে ব্যাংক অব বিহার প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু তাঁর অনুমতি নিয়ে সুধীরকুমার ফার্মের নামটি সেন অ্যান্ড পণ্ডিত-ই রেখে দিলেন, কারণ অল্প দিনেই বাজারে তার বেশ একটি 'গুড-উইল' হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুধীর সেনের বন্ধু বল্লভদাসের ১৭০নং ধর্মতলা স্ট্রীটের অফিসের ছোট্ট একটি ঘরেই সেন অ্যান্ড পণ্ডিতের প্রথম অফিস খোলা হয়েছিল।

সেন অ্যান্ড পণ্ডিতের ক্রমবিকাশের সঙ্গে ভারতীয় সাইকেল ব্যবসা ও সাইকেল শিল্পের ইতিহাস জড়িত; আর সেই ইতিহাসের কেন্দ্রস্থলে আছেন সুধীরকুমার সেন। তার বিশদ বিবরণের আগে বাইসিকল নামক দ্বিচক্রযানটির ইতিহাস আমাদের একটু জানা দরকার।

সতেরো আঠারো শতকে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে 'হবি হর্স' (Hobby Horse) নামে এক রকমের দুই চাকা ও স্যাডেল-বিশিষ্ট পেডাল-হীন কাঠের সাইকেল ছিল। পা দিয়ে মাটিতে ধাক্কা মেরে মেরে সেটা চালাতে হতো। ১৮৩৯ সালে ইংল্যান্ডের ডামফ্রিজশায়ারে কার্কপ্যাট্রিক ম্যাকমিলান নামে এক কর্মকার এই হবি হর্সে দুটি প্যাডেল লাগিয়ে বাইসিকলের আদি রূপ দিলেন।

এ ছাড়াও আদি সাইকেলের ইতিহাসের একটি জরুরী সংযোজন আছে। ১৭৭৯ সালে নাকি রাজা [illegible] ... (Velocipede) [illegible]

ছিল। এই ফরাসী যন্ত্রটিই নাকি পরে ব্যারন ফন ড্রাইজ নামে এক অভিজাত ভদ্রলোক 'ড্রাইজিয়েন' নাম দিয়ে ইংল্যান্ডে চালু করে দিয়েছিলেন। এটার চাকা দুটো ছিল লোহার; তাই এতে চড়ে খানিকটা দৌড়লে চালকের দেহের হাড়গোড় আলগা হয়ে যাবার উপক্রম হতো। নামকরণে ওস্তাদ ইংরেজ এর নাম রাখলো বোন-শেকার (Bone-shaker)। উপরন্তু, সে যুগের ভয়ানক দামী সাইকেল কেনবার সামর্থ্য সাধারণ লোকের ছিল না বলে এর আর এক নাম রাখা হলো ড্যান্ডি-হর্স (Dandy Horse), মানে বাবুলোকদের ঘোড়া।

হাওয়া ছাড়া সলিড-রবার টায়ারের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলের রূপও খানিকটা বদলালো। বোন-শেকারের চাকা দুটি ছিল সমান বেড়ের; এখন হলো সামনের চাকাটা মস্ত বড়ো আর পেছনেরটা অনেক ছোট। সেইরকম সাইকেলের খেলা সার্কাসে এখনো দেখানো হয়। চেহারা দেখে ইংরেজরা এরও এক মজার নাম দিল—পেনি-ফার্দিং (Penny-farthing)—ইংল্যান্ডের মুদ্রা পেনি ও ফার্দিং-এর ছোটবড়ো আকারের মতো। কিন্তু এই পেনি-ফার্দিং-এর স্যাডল এত উঁচুতে থাকতো যে, পড়ে গেলে চালক বেশ চোট পেতো। তাই ১৮৮৫ সালে চেহারার পরিবর্তন হয়ে নীচু Safety সাইকেল তৈরী হলো।

১৮৮৭ সালে খেলার ছলে হঠাৎ এক দারুণ আবিষ্কার হয়ে সাইকেলে যুগান্তর এনে দিল। জন বয়েড ডানলপ ছিলেন স্কটল্যান্ডের এক গোবৈদ্য, মানে, চলতি কথায় আমরা যাকে বলি ঘোড়ার ডাক্তার। তাঁর ছোট একটি ছেলে এক ট্রাই-সাইকেল রেসে নাম দিয়েছিল। বাবা-ডানলপের হঠাৎ কি খেয়াল হলো ছেলের সাইকেলে রবারের পাইপ লাগিয়ে হাওয়া দিয়ে ফুলিয়ে দিলেন। ছেলে সেই প্রতিযোগিতায় প্রথম হলো (১৮৮৭)। এই আকস্মিক আবিষ্কারের স্বত্ব 'পেটেন্ট' করিয়ে নিয়ে তিনি আরও কয়েকজনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ১৮৮৮ সালে ডানলপ রবার কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করলেন। আজকের ডানলপ কোম্পানীকে দেখে তার উৎপত্তির কথা ভাবলে কী অদ্ভুতই না লাগে! তখন মোটরকারের জন্ম হয়নি; এই নিউম্যাটিক টায়ার ও টিউব কেবল সাইকেলেই ব্যবহৃত হতো।

ডানলপের আবিষ্কারের পর থেকে সাইকেলের জনপ্রিয়তা খুব বেড়ে গেল। সাইকেল শিল্পের বিরাট বিস্তার হলো। সাধারণ ব্যবহার ছাড়াও নানা দেশে নানা শহরে সাইকেল ক্লাব গঠিত হলো।

১৮৮৯ সালেই নাকি কলকাতাতে প্রথম সাইকেলের আমদানি হয়। তার কিছু পরে বিদেশের মতো কলকাতাতেও কয়েকটা ক্লাব গঠিত হলো। আর বিদেশের মতো এখানেও কমপাল্লা ও দূরপাল্লার সাইকেল রেসের প্রবর্তন হলো। সেইসব ক্লাবের মধ্যে ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাব এখনও বিরাজমান, যদিও এখনকার সভ্যরা আর সাইকলিং না করে ফুটবল, হকি খেলা নিয়েই ব্যস্ত; আর বছরে একবার দুবার লটারী করে আপনাদের কারও কারও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে লাখ টাকা ঢেলে দিতে উদ্‌গ্রীব।

আমাদের বিখ্যাত ফিল্ম ডিরেক্টর শ্রীনীতীন বসু ও ক্রিকেটার শ্রীকার্তিক বসুর বাবা একদা-প্রসিদ্ধ 'কুন্তলীন' কেশ-তৈল ও 'দেলখোস' সেন্টের স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় এইচ (হেমেন্দ্রমোহন) বোস নিজেই শুধু সাইকেল চড়তে ভালোবাসতেন না, অন্যকেও উৎসাহ করে শেখাতেন। তাঁর তিনজন প্রধান শিষ্যের নাম আমরা সকলেই জানি—স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও স্যার নীলরতন সরকার।

দৃশ্যটা কল্পনা করে দেখুন! মালকোঁচা এঁটে দাড়িওয়ালা আচার্য রায় সাইকেলে চড়ে ভ্রমণ করছেন আর এইচ বোস হ্যান্ডেলের নীচের রড একবার ধরে আর একবার ছেড়ে দিয়ে বরেণ্য ব্যক্তিটিকে প্যাডেল করুন, এবারে ডাইনে ঘোরান, আরে আরে আরে, শিগগীর ব্রেক কষুন, ব্রেক কষুন!" এইসব বলে জোর গলায় নির্দেশ দিচ্ছেন। (আহা! সত্যজিৎ রায় যদি তখন মুভি ক্যামেরা নিয়ে পাশে খাড়া থাকতেন তো ফিল্মটা জাতীয় সংগ্রহশালায় রাখবার মতো ছবি হতে পারতো। হেমেন্দ্রমোহনের স্ত্রী আবার সত্যজিৎ রায়ের বাবা সুকুমার রায়ের আপন পিসী ছিলেন কিনা, তাই আইডিয়াটা হঠাৎ আমার মাথায় খেলে গেল।)

ইতিহাস ঘেঁটে দেখছি যে, সে যুগের মনীষীরা সকলেই সাইকেল চড়তে খুব ভালোবাসতেন। বার্নার্ড শ' তাঁর প্রেয়সী শার্লট পেইন টাউনসেন্ডকে নিয়ে সাইকেলে করে ইংল্যান্ডের পাড়াগাঁয়ে বেড়াতে চলে যেতেন। ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও বিবাহবন্ধন বিষয়ে শার্লটের মনের গতি বোধ হয় বিলম্বিত লয়ে চলছিল; সাইকেলই ঘটনাটাকে দ্রুত করে দিল। একবার সাইকেল ভ্রমণের সময়ে পড়ে গিয়ে কড়া রকমের জখমই হলেন বার্নার্ড শ'। উদ্বিগ্ন শার্লট তাঁর সেবার ভার নিয়ে শ'-এর এত কাছে এসে গেলেন যে, আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গেই শ'-এর বাসনা পূর্ণ হলো। তাঁদের পরিণয় মঙ্গলোৎসব ঘটে গেল। অথচ অকৃতজ্ঞ বার্নার্ড শ' মানুষের সাইকেল চড়া নিয়ে উত্তরকালের রচনায় জোর হাসিমস্করা করেছিলেন।

শ'-এর ক্ষতবিক্ষত সাইক্লিং-জীবনই বোধ হয় এইসব ব্যঙ্গকৌতুকের জন্য দায়ী। একবার শ' আর তাঁর দুই বন্ধু—বিখ্যাত ফেবিয়ান এবং লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সিডনী ওয়েব ও মনীষী বারট্রান্ড রাসেল—সাইকেলে করে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। রাসেল ছিলেন আগে, বার্নার্ড শ মাঝে আর সিডনী ওয়েব সবার পরে। উঁচুনীচু রাস্তার এক উঁচু জায়গায় এসে শ' মনের আনন্দে শোঁ শোঁ করে নীচের দিকে সাইকেল ছোটালেন। শ'-এর নিজের উক্তিতে আছেঃ "ঠিক সেই মুহূর্তে গণিতশাস্ত্রী রাসেল নির্ভুল গণনা করে তাঁর সাইকেলের ব্রেক কষে আমার ছুটন্ত সাইকেলের সামনে এমন কায়দায় দাঁড়ালেন যে, আমার তারস্বরে চেঁচামেচি ডাইনে বাঁয়ে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে বাঁচবার চেষ্টা ব্যর্থ করে সেদিন আর একটু হলেই গণিতশাস্ত্র এবং নাট্যসাহিত্যের সব আশা ভরসা নির্মূল হয়ে যেতো। নেহাত কপালজোরেই রাসেল আর আমি সেদিন বেঁচে গেলাম।"

এইচ বোস মশায় হ্যারিসন রোডে একটা সাইকেলের দোকানও খুলেছিলেন। সুধীরকুমার ছাত্রাবস্থায় তাঁর প্রথম 'রোভার' সাইকেলটি নাকি সেখান থেকেই কিনেছিলেন। সাইকেলের ইংরেজ ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান দোকানদারদের কেন্দ্র ছিল ধর্মতলা। বাঙালীর মধ্যে সেখানে প্রথম দোকান খুললেন স্বর্গত হরিদাস নন্দী। ১৯১০-এ ধর্মতলায় সেন অ্যান্ড পন্ডিতের যে অফিস খোলা হয়েছিল, বছর দুই তিন পরে সাইকেলের নতুন (এবং বর্তমান) কেন্দ্র বেন্টিংক স্ট্রীটে সেই দোকান স্থানান্তরিত হলো। এইটাই সুধীরকুমারের প্রথম নিজস্ব অফিস।

সে যুগে সাইকেল কেনবার সামর্থ্য বেশি লোকের ছিল না। তা ছাড়া তখন সাইকেল ততোটা জনপ্রিয় হয়েও ওঠেনি। তাই সাইকেলের দোকানদাররা অন্যান্য জিনিসের কারবারও করতেন। সুধীর সেনের কর্মসূচীও তাই ছিল; কিন্তু সাইকেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে তিনি সেদিকেই বেশি ঝুঁকলেন।

যে রথটি আগে শ্বেতাঙ্গ আর এ-দেশীয় ধনীদের শখের জিনিস ছিল, দৈনন্দিন জীবনে তার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিয়ে সুধীরকুমার শুধু নিজের এবং বাঙালী ও ভারতীয় সাইকেল ব্যবসায়ীদের উন্নতির পথই করলেন না, জনসাধারণেরও এতে পরম উপকার হলো। বি এস এ, র‍্যালে প্রভৃতি দামী সাইকেল থেকে শুরু করে 'ফিলিপস' ও 'প্রিমিয়ার'-এর মতো মাঝারি দামের এবং ৩০/৩৫ টাকা দামের 'হারকিউলিস' ও 'ওয়ারিঅর' সাইকেলের আমদানি করে তিনি বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরের মানুষকে সাইকেল ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করলেন। যেন একটা সামাজিক বিপ্লব ঘটালেন।

নেহরু একবার বলেছিলেন যে, সাইকেল থেকে অটোমোবাইলের যুগে উত্তীর্ণ হওয়ার চাইতে গরুর গাড়ির আমল থেকে সাইকেল-যুগে পৌঁছনো ব্যাপারটা সমাজের পক্ষে ঢের বড়ো বিবর্তন। আর আমাদের রসিকশিরোমণি চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী বলেন যে, বাইসাইকেল হচ্ছে মানুষের প্রিয়তম সখা ও সাথী। কুঁদুলে বউয়ের মতো সে খুনসুটি করে না, বেশি খাটালে গাইগুঁই করে না; চুপচাপ নিজের কাজটি সারে। ঘোড়ার মতো সাইকেলকে খোরাক যোগাতে হয় না—একেবারে ব্যাকে বলে বামনের গরু।

সাইকেলের প্রচারের জন্যে সুধীর সেন আবার ১৯১৭ সালে 'ইন্ডিয়ান সাইকেল অ্যান্ড মোটর জারন্যাল' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন; আজও সেটা চলছে।

উপরন্তু, পুরো সাইকেল ছাড়া সাইকেল পার্টস আমদানিতেও সেন অ্যান্ড পন্ডিতের ধাপে ধাপে উন্নতি হলো। ভারতের শহরে শহরে ছাড়াও ইংল্যান্ড-জার্মেনিতেও সেন অ্যান্ড পন্ডিতের অফিস খোলা হলো।

মার্কেটিং ও সেলসম্যানশিপের রাজা সুধীরকুমারের প্রকৃত ব্যবসায়ী-জীবনের সূচনা হয়েছিল ১৯১২ সালে প্রথম ইংল্যান্ড সফরের সঙ্গে সঙ্গে। উপলক্ষটি ছিল ভারতে সাইকেল প্রচলন বৃদ্ধির জন্য বিলিতী সাইকেল শিল্পপতিদের আয়োজিত এক বাণিজ্যিক সম্মিলন। লন্ডনে এই আসন্ন সম্মিলনে যোগ দেওয়ার জন্য কলকাতার দেশীয় সাইকেল ব্যবসায়ী মহল সুধীরকুমারকে অনুরোধ করলেন এবং তাঁদের মধ্যে একজন শরৎচন্দ্র দাস সুধীরবাবুর বিলেত যাবার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। ফলে সুধীরকুমার বিলেতের শিল্পপতিদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলেন। ইংরেজরাও সাইকেল ব্যবসাতে সুধীর সেনের অভিজ্ঞতা বুঝতে পেরে অতঃপর ভারতে তাঁদের ব্যবসা প্রসারের বিষয়ে সেন অ্যান্ড পন্ডিতের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতেন। তাই স্বাধীনতার পরে যখন কোলাবোরেশনের যুগ এলো তখন র‍্যালে-র মতো বিরাট ইংরেজ প্রতিষ্ঠান ভারতের অন্যতম বৃহৎ বণিক গোষ্ঠীর হাজার অনুরোধ উপরোধ ঠেলে হাত মেলালো অর্থবলে অনেক ছোট সুধীর সেনের সঙ্গে। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কাছে টাকার জোর ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি হেরে গেল।

সেই ১৯১২ সালে সুধীরকুমার সেনের যে বাণিজ্যযাত্রার শুরু হয়েছিল উত্তরকালে তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাৎসরিক অভিযান। প্রতি বৎসর এপ্রিল-মে মাসে তিনি সওদা করতে বেরোতেন, আর ইংল্যান্ড, জার্মেনি, আমেরিকার মতো সব দেশ পরিক্রমা করে স্বদেশে ফিরতেন সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ। এমনি করে বিংশ শতাব্দীর এই চন্দ্রধর সওদাগর প্রায় অর্ধ শতক ধরে চৌদ্দ ডিঙা ছাড়াই দেশে দেশে বাণিজ্য করে শেষ পর্যন্ত সেই বিদেশ জার্মেনিতেই ইহলোক ত্যাগ করলেন। তারিখটা ছিল ১৯৫৯ সালের অগাস্ট মাসের আটাশে।

এতক্ষণ বণিক সুধীরকুমারের কথা বলেছি; এবারে শিল্পপতি এস কে সেনের কাহিনী আরম্ভ করি।

সেন-র‍্যালে কোম্পানীর প্রচার সচিব শ্রীসুধীন দাশগুপ্ত এবং সহ সচিব শ্রীঅমূল্য দাশশর্মা তাঁদের সুবিন্যস্ত প্রচার বিভাগের আলমারী ও দেরাজ থেকে নানান তথ্য আমাকে যোগালেন। আর খানিকটা দিলেন সর্বাধ্যক্ষ শ্রীঅভিজিৎ সেন এবং সেক্রেটারি শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯২০ সালেও একবার সুধীর সেন মশায় সাইকেল [illegible] নাম দিয়ে এ দেশে সাইকেল [illegible] প্রতিষ্ঠান [illegible] চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু সে সময়ে বন্যা এসে পড়াতে কাজ বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। তখন লড়াইয়ের জন্য ও ঠিক তার পরে আমদানি খুব কমে যাওয়াতে দেশের নানা শহরে ছোট ছোট সাইকেলের কারখানা বসেছিল; মন্দার জন্য তারাও বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারে নি।

১৯৩৮-এ ইণ্ডিয়া সাইকেল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেড নামে বাঙালীর একটি প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করেছিল; কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দরুন তাঁদের আর পুরো সাইকেল তৈরী সম্ভব হয়ে উঠলো না; তাঁরা কেবল সাইকেলের সরঞ্জাম তৈরীতেই সীমাবদ্ধ রইলেন। ১৯৩৯-এ বোম্বাইয়ে হিন্দ সাইকেলস লিমিটেড হলো। পাটনায় হিন্দুস্থান বাইসাইকেল ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল করপোরেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনার অল্প দিনের মধ্যেই কাজ গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হলো। তবুও এই দুটি কোম্পানী যুদ্ধের সময়ে ৫৫০০০ সাইকেল বানিয়ে মিলিটারি সাপ্লাই করেছিল। যন্ত্রশিল্পে নিপুণ পাঞ্জাবীরাও তখন পাঞ্জাবের আনাচে-কানাচে সাইকেল ও তার সরঞ্জাম তৈরীর ছোট ছোট অনেক কারখানা গড়ে তুলেছিলেন।

১৯৪৩-এ সাইকেল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন নামক সঙ্ঘটি স্থাপিত হয়ে ১৯৪৫-এ টারিফ বোর্ডের কাছে সংরক্ষণ দাবি করলো। তদন্ত হয়ে ১৯৪৭ সালে সাইকেল শিল্প সংরক্ষিত-শিল্প পর্যায়ে গণ্য হলো। কিন্তু সর্বনাশা দেশবিভাগ এসে সংরক্ষণের মাধ্যমে যা ভালো ফল পাওয়া যেত তা দিল নষ্ট করে। এইসব কারণে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সাইকেল বিদেশ থেকেই মোটা আমদানি হয়ে চললো। ১৯৫১-তে দেশে ৪০০টি ইম্পোর্টার ফার্ম ছিল আর প্রায় ৩ লক্ষ সাইকেল আমদানি হয়েছিল।

১৯৪৮-এ জাতীয় সরকার সাইকেল শিল্পকে বে-সরকারী শিল্পের তালিকাভুক্ত করলেন। তার পরের বছর দ্বিতীয় টারিফ বোর্ড আমদানি-করা সাইকেলের ওপর চড়া ডিউটি বসিয়ে দেশীয় শিল্পকে প্রকৃত সংরক্ষণ দিলেন। তারপরেই আরম্ভ হলো কোল্যাবোরেশন আর তার ফলে জন্মালো মাদ্রাজের টি আই সাইকেলস অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড (হার্কিউলিস ও ফিলিপসের নির্মাতা) এবং বাংলার সেন-র‍্যালে ইণ্ডাস্ট্রিজ অব ইণ্ডিয়ার মতো ভারতের বৃহত্তম দুটি প্রতিষ্ঠান।

অনেকক্ষণ গল্প বলেছি। এবারে খানিকটা পরিসংখ্যান দিয়ে আমাদের দেশের বাইসিকল-সভ্যতার প্রগতিটা বোঝাবার চেষ্টা করি।

(ক) ভারতে সাইকেল উৎপাদন:—	১৯৬০	—প্রায় ১৩ লক্ষ সাইকেল।
	১৯৬৬	—প্রায় ১৭ লক্ষ সাইকেল।
	১৯৬৭	—প্রায় ১৮ লক্ষ সাইকেল।

(গড়ে ১৫০ টাকা করে প্রতি সাইকেলের দাম ধরলে ১৯৬৭-র উৎপাদনের দাম দাঁড়ায় ২৭ কোটি টাকা।)

(খ) সরঞ্জামের উৎপাদন:—	১৯৫৬	—প্রায় ৩½ কোটি টাকা দামের।
	১৯৬১	—প্রায় ৬ কোটি টাকা দামের।
	১৯৬৬	—প্রায় ১০ কোটি টাকা দামের।
*(গ) সাইকেল ও সরঞ্জাম রপ্তানি:—	১৯৬৪/৬৫	—প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা দামের।
	১৯৬৫/৬৬	—প্রায় ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা দামের।
	**১৯৬৬/৬৭	—প্রায় ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা দামের।

(*প্রধান ক্রেতা ছিল মধ্য ও পূর্ব এশিয়ার এবং দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ।)
(**১৯৬৬ সালে ডিভ্যালুয়েশনের আগের দাম ধরলে এর দাম হতো ৯০ লক্ষ টাকা।)

ভারতের পথেঘাটে এখন প্রায় ১½ কোটি সাইকেল, সাইকেল রিকশা এবং সাইকেল ডেলিভারী-ভ্যান চালু রয়েছে। আমরা এখন গর্ব করে বলতে পারি যে, এই সাইকেলগুলির পার্টসের ৯৯ পারসেণ্ট এবং শ্রমের পুরোটাই স্বদেশী। সাইকেলের টায়ার-টিউবও সংখ্যায় বছরে প্রায় দু' কোটি করে ভারতেই তৈরী হয়। কাঁচামালের আমদানি এখনো যা করতে হয় তা হলো নিকেল ধাতুটি এবং ইলেকট্রো-প্লেটিং করার মালমসলা। স্পেশাল স্টীলের অভাব প্রায় মিটে এসেছে।

সাইকেলের ব্যবহার সবচাইতে বেশি রাজধানী দিল্লীতে—প্রায় ৪ লক্ষ। তার পরেই জোড়া শহর হায়দ্রাবাদ-সেকেন্দ্রাবাদে—প্রায় ২ লক্ষ; সেখানে আবার ১৭০০০ সাইকেল রিকশাও চলে। আর পাটনায় চলে প্রায় ৭৫০০ সাইকেল রিকশা, যা চালিয়ে সেখানে ২০০০০ লোকের রুজি জোটে।

বিলেতের প্রসিদ্ধ র‍্যালে কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রথমত ১ কোটি টাকা মূলধন নিয়ে (এখন এর বর্ধিত পেড-আপ ক্যাপিট্যাল ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা) ১৯৪৯ সালের জুন মাসে 'সেন র‍্যালে ইণ্ডাস্ট্রিজ অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড' (অধুনা সেন র‍্যালে লিঃ) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রস্তুতিপর্বে ইংল্যাণ্ডে সুধীরকুমারের সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন তাঁর বড়ো ছেলে অভিজিৎ এবং ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীশচীন চৌধুরী। মাঝে বছরখানেক বাদ দিয়ে চৌধুরী মশায় প্রথম থেকে বরাবরই সেন র‍্যালের ডিরেক্টর বোর্ডে আছেন। আর ছিলেন বাঙালীর আর এক নাম-করা প্রতিষ্ঠান ভারত ব্যাটারি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীশচীন্দ্র-প্রসাদ [illegible]। [illegible] সেন র‍্যালের ডিরেক্টর [illegible]।

তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তা ও উৎসাহেই এই কোল্যাবোরেশন সম্ভব হয়েছিল। শিল্পে বাঙালী পিছিয়ে আছে, স্বাধীন ভারতবর্ষে বাংলা দেশে বাঙালীর হাতে নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠুক, এই ছিল তেজস্বী শ্যামাপ্রসাদের সংকল্প। সুধীর সেনকে তিনি বলেছিলেন, "দেরি করবেন না, তাড়াতাড়ি দরখাস্ত দিন। আমি যথাসাধ্য করবো।"

ইস্পাত ও কয়লা উৎপাদনের কেন্দ্র আসানসোলের সংলগ্ন কন্যাপুরে বিরাট এক খণ্ড জমি কিনে ১৯৫১ সালের গোড়ায় ভিত্তিস্থাপনের পর পনেরো মাস ধরে রোদে পুড়ে, জলে ভিজে সুধীরকুমার ১৯৫২ সালের জুন মাসে তাঁর কীর্তিসৌধ সেন-র‍্যালে ফ্যাক্টরীর প্রতিষ্ঠা করলেন। যা ছিল বিস্তীর্ণ উঁচু নীচু, সাপ আর জোঁকে ভরা এক নির্জন প্রান্তর তা আজ পরিণত হয়েছে এক উপনগরে। সেখানে আজ সৃষ্টি হয়েছে স্কুল পাঠশালা হাসপাতালে অলংকৃত এক কর্মরত মানুষের বসতি।

নিজের ছেলেরা ছাড়া সেই সময়ে যাঁরা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁরই মতো শত কষ্ট স্বীকার করে এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখ্য হলো সেন-র‍্যালের বর্তমান সেক্রেটারি শ্রীকালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম। ইনি হলেন সেনদের সেই গোত্রের বিশ্বস্ত বুদ্ধিমান কর্মচারী যাঁর মধ্যে অতীতে রাজেনবাবু কিরণবাবুরা ছিলেন; আর আছেন সেন অ্যাণ্ড পণ্ডিতের

বর্তমান জেনারেল সেলস ম্যানেজার শ্রী টি এইচ বি অ্যাঙ্গডানি, যিনি আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই প্রতিষ্ঠানের উজ্জ্বলতম ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে এঁদেরই দেখে।

সকলের আড়ালে আর একজন আছেন, শ্রীমতী মীরা সেন। সুখে দুঃখে স্বামীর মনে শক্তি যোগানোর মূলে ছিলেন তিনি।

শুধু তাই নয়—দার্শনিক এমারসন একদা বলেছিলেন Men are what their mothers make them। সেই উক্তি যদি যথার্থ হয় তবে আজ যে আমরা বাঙালীরা অভিজিৎ ও সঞ্জয়ের কৃতিত্বে গর্বিত, তা-ও তো ঘটেছে তাঁদের মা মীরা দেবীর জন্য। এমন কি, পুত্রবধূদের বাণিজ্যকর্মেও আছে তাঁরই উৎসাহ।

১৯৫২ সালের শেষভাগে উৎপাদন আরম্ভ হয়ে ১৯৫৩ সালে কন্যাপুরে ৩৭৮০৭টি সাইকেল তৈরী হলো। হাতে তখন আরও এক লক্ষ সাইকেলের অর্ডার।

কন্যাপুরের সেই সুরম্য সেন-র‍্যালে আজ সেখানে তৈরী করছে বছরে প্রায় ৮ কোটি টাকা দামের সাইকেল ও তার সাজ-সরঞ্জাম। শুনলেও অবাক লাগে যে, ১৪০০টিরও বেশি সংখ্যক পার্টসের সমন্বয়ে একটি সাইকেল তৈরী হয়।

১৯৬৭ সালে এই প্রতিষ্ঠান ২০ লক্ষ টাকার সাইকেল ও পার্টস রপ্তানি করেছিলেন। গত বছরে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা মূলধনের এই কোম্পানীর লাভ হয়েছিল প্রায় ৪১½ লক্ষ টাকা।

সেন র‍্যালেতে সাইকেলের উৎপাদন তো বছরে বছরে বেড়েই চলেছে, অধিকন্তু শীঘ্রই নাকি 'মোপেড' নামে মোটরচালিত একরকম সাইকেল তৈরী আরম্ভ হচ্ছে।

চেয়ারম্যানের ভাষণে ১৯৬৭ সালে শ্রীঅভিজিৎ সেন উল্লেখযোগ্য যে কথাটি বলেছেন তা হলো এই প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩৩০০ কর্মীর (যার শতকরা ৯৮জনই বাঙালী এবং ১৯৬৬ সালে সহযোগী র‍্যালে কোম্পানীর ইংরেজ উপদেষ্টারা চলে যাবার পর যে প্রতিষ্ঠান এখন সম্পূর্ণভাবে বাঙালীর পরিচালনায় আছে) কর্মতৎপরতা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি মমত্ববোধের প্রশংসা। ক্রমবর্ধমান এই শ্রমিক গোষ্ঠী আজ পনেরো বছর ধরে সুস্থ ও একাগ্র চিত্তে কাজ করে চলেছেন। কন্যাপুরে কোনো দিন না হয়েছে স্ট্রাইক, না লক-আউট।

আমার একটি বাঁধা বুলি আছে—গুড ম্যানেজমেণ্ট। অভিজিৎ সেন আর তাঁর সহযোগীরা আমাদের সামনে সেই উদাহরণ তুলে ধরেছেন।

কন্যাপুরের সেন র‍্যালের তৈরী র‍্যালে, রবিন হুড, রাজ ও হাম্বার সাইকেল কন্যাকুমারিকা থেকে কাশ্মীর ও কাথিয়াওয়াড় থেকে কামরূপ পর্যন্ত ছেয়ে যাক, আর তারা গরিব চালক, ভারতবাসীর প্রধান বাহন হয়ে উঠুক, এই আমরা কামনা করি।

সুধীর সেন বলেছিলেন, "বাঙালী বড়ো অল্পেতে ছেড়ে দেয়, টিকে থাকে না। যদি টিকে থাকতে পারে তা হলে বাঙালীর প্রতিভা ও পরিশ্রম অসাধ্য সাধন করতে পারে। অন্তত, আমি তাই পেরেছিলাম।......নেমেছিলাম তো মাত্র চার শ' টাকা সম্বল করে, কিন্তু অন্তর থেকে একটা প্রেরণা বোধ করতাম যে, সেন অ্যাণ্ড পণ্ডিত দাঁড়াবেই।" তা সেন অ্যাণ্ড পণ্ডিত ৫৮ বছর ধরে দাঁড়িয়েই আছে, সেন-র‍্যালে [illegible] হয়ে উঠেছে, আর [illegible] এগিয়ে চলেছে। সে সব [illegible] বাঙালী [illegible] থাকবে।

আর্থিক ভারত

কলকাতার অর্থনীতি

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কলকাতা শহরের উন্নয়নের জন্য ১০০ কোটি টাকা সাহায্য চেয়েছেন। টাকাটা চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় যাতে পাওয়া যায় সেজন্য চেষ্টা চলছে। তবে চেষ্টা যে কতদূর ফলপ্রসূ হবে বলা কঠিন। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ নগরী এবং কমনওয়েলথের দ্বিতীয় বৃহৎ নগরী কলকাতা শহরের সমস্যা এত বেশি যে ৫০০ কোটি টাকা সাহায্য পেলেও এ শহরটিকে আধুনিকতম নগরীতে রূপান্তরিত করা যাবে কিনা সন্দেহ।

নাগরিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হচ্ছে জল সরবরাহ, জল নিষ্কাশন, আবর্জনা দূরীকরণ, পরিবহণ ব্যবস্থার সংস্কার এবং জনস্বাস্থ্যমূলক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন, বৃহত্তর কলকাতার অধিবাসীদের এখনও পাকা নর্দমার এবং প্রচুর জল-সরবরাহের সুবিধা ভোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। আবর্জনা এবং জঞ্জালে রাস্তাঘাট পরিপূর্ণ; কর্পোরেশনের পক্ষেও সব ময়লা দূর করা সম্ভব হচ্ছে না। জনসাধারণের বিক্ষোভ, শ্রমিক আন্দোলন, ছাত্র-আন্দোলন, প্রভৃতি তো আছেই। কলকাতার অধিবাসী সব প্রকার আন্দোলনেই অভ্যস্ত। কিন্তু আজ সবচেয়ে বড় পরিবহণ সমস্যা। কলকাতা শহর চক্রবেড় রেল ব্যবস্থার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। শ্রী এস কে পাতিল যতদিন রেলমন্ত্রী ছিলেন ততদিন খরচের দোহাই দিয়ে কলকাতা শহরের জন্য চক্রবেড় রেল পরিকল্পনা চাপা দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি ভারত সরকারের রেল দপ্তর এ ব্যাপারে একটু সচেষ্ট হয়েছেন। বিশেষ করে রেল দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপরিমল ঘোষ এ ব্যাপারে সক্রিয় প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

শহরের পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আজ যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা চক্রবেড় রেলপথ নয়, তা হচ্ছে ভূগর্ভস্থিত রেলপথ।

সুখের বিষয় নীতিগতভাবে কলকাতার এই প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে। ইউরোপের সব বড় বড় শহরে, যেমন লণ্ডন, মস্কো, প্যারিস, বার্লিন, রোম প্রভৃতিতে মাটির নীচ দিয়ে রেলপথের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমন কি কলকাতার তুলনায় ছোট শহর গ্লাসগোতেও ভূগর্ভস্থিত রেলপথের ব্যবস্থা আছে। সম্পূর্ণ শহরে এ সুবিধা যদি নাও দেওয়া যায়, [illegible] বার্লিন, রোম প্রভৃতি শহরে যেমন আংশিকভাবে এ ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে, কলকাতা শহরেও তেমনি আংশিকভাবে ভূগর্ভস্থিত রেলপথের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে। চক্রবেড় রেলব্যবস্থা চালু করারও অনেক অসুবিধা আছে। প্রথমত, কলকাতায় যদি চক্রবেড় রেলপথ চালু করতেই হয়, তবে সে রেলপথ যাবে চিৎপুর এবং স্ট্র্যাণ্ড রোড হয়ে। চিৎপুর ইয়ার্ডের পক্ষে দ্রুতগতি-সম্পন্ন পাঁচ মিনিট অন্তর যাত্রীবাহী রেলগাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে কি? তাছাড়া স্ট্র্যাণ্ড রোড, আউটরাম ঘাট, খিদিরপুর ও গার্ডেনরিচ হয়ে যদি রেলগাড়ী প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর চালাতে হয়, তবে কলকাতা বন্দরের উপরেও তার চাপ পড়তে পারে। চক্রবেড় রেলপথের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা বন্দরের উপর চাপ সৃষ্টি করা ঠিক হবে না। তার চেয়ে খরচসাপেক্ষ ব্যাপার হলেও মাটির নীচ দিয়ে রেলপথের ব্যবস্থা করলেই কলকাতা শহরের পক্ষে পরিবহণ ও যানবাহন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে। মহানগরীর রাস্তা যেমন চওড়া হওয়া উচিত তা নয়—তা ছাড়া বড় বড় রাস্তার সংখ্যাও খুব বেশি নয়। চিৎপুর রোড এবং কলেজ স্ট্রীট-কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে যানবাহন আটকে গেলে সেন্ট্রাল এভিনিউ-এর উপর দিয়ে সব গাড়ী যাতায়াত করে। আপার সার্কুলার রোডেও শেয়ালদা স্টেশনের কল্যাণে সর্বদাই ভীড় লেগে আছে। তার উপর আছে ট্রাম লাইন। সংকীর্ণ চিৎপুর রোড ও কলেজ স্ট্রীট থেকে ট্রাম সরিয়ে দেওয়াও সম্ভব হচ্ছে না। অথচ মাটির নীচ দিয়ে রেলপথের ব্যবস্থা করলে অধিকাংশ নাগরিকের পক্ষে শহরের উপরে রাস্তার ভীড় এড়িয়ে মাটির নীচ দিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। সে ক্ষেত্রে মহানগরীর রাস্তা থেকে ট্রাম উঠিয়ে নিলেও অসুবিধা হবে না। যত টাকা খরচ হোক না কেন এ মহানগরীর অধিবাসীদের যাতে ট্রামে-বাসে ঝুলে যাতায়াত না করতে হয় এবং দিনের পর দিন দুর্ঘটনার সংখ্যা যাতে না বাড়ে তার জন্য ভূগর্ভস্থিত রেলপথের ব্যবস্থা করতেই হবে। লণ্ডনে যা বহু আগেই সম্ভব হয়েছে, কলকাতারও তা সম্ভব হবে না কেন?

কলকাতা অর্থনীতির ভিত্তি সুদৃঢ় হতে পারে যদি উপযুক্ত অর্থের সংস্থান হয়। কলকাতা কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। রাস্তাঘাট সংস্কার করা তো দূরের কথা, কর্মচারীদের নিয়মিত ভাবে বেতন দেওয়াই কর্পোরেশনের পক্ষে দুঃসাধ্য। শহরটি পরিচ্ছন্ন রাখলে যে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব কমে যাবে একথা পৌরপিতাগণ যে জানেন না তা নয়। কিন্তু সব কিছুর গোড়ায় হচ্ছে টাকার অভাব। টাকার অভাবে ফুটবল খেলার জন্য একটা বড় স্টেডিয়াম স্থাপন করাও এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। কলকাতা শহরের শিশুদের খেলার জন্য চাই আরও পার্ক ও মাঠ, বস্তিগুলির উচ্ছেদ করে বস্তিবাসীদের জন্য চাই পাকা বাসস্থান। ফুটপাতের উপরেই যাঁরা বাস করেন তাঁদের বসবাসের জন্য চাই বিকল্প ব্যবস্থা—সব কিছুই সম্ভব হতে পারে রাজ্য সরকার এবং কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের যুগ্ম প্রচেষ্টায়। কিন্তু রাজ্য সরকারের আর্থিক অবস্থা কর্পোরেশনের চেয়েও শোচনীয়। এ অবস্থায় যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বারবার চেয়েও প্রয়োজনীয় এবং ন্যায্য টাকা পাওয়া না যায়, তবে কলকাতা শহরের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। মনে রাখতে হবে, ভারত সরকার আয়কর বাবত যে রাজস্ব আদায় করেন, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অবদান অন্য সব রাজ্যের চেয়ে বেশি। কলকাতার সমস্যা জাতীয় সমস্যা। ভারতের সব রাজ্যের লোক ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং উপার্জনের আশায় এ রাজ্যে আসেন। ভারতের সবচেয়ে বড় শহরের দুর্গতির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি কতদূর আকৃষ্ট হয়েছে জানি না; তবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল যে এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন এটাই সুখের কথা। বিগত

কুড়ি বছর যারা এ রাজ্য শাসন করেছেন তাঁরা কলকাতার দাবী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করেও সুফল পাননি। কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে কলকাতা মহানগরী বিভীষিকাময়,—অশান্ত মিছিলের নগরী। কিন্তু এই বিভীষিকার জন্য যে আর্থিক দুর্গতি দায়ী, অজস্র মিছিলে যোগদানরত নরনারীর যে সুস্থ জীবন যাপন করার দাবী, তার কথা কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ একবারও চিন্তা করেছেন কি? কলকাতার সমস্যা যে শুধু পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাই নয়, কলকাতার শ্রীবৃদ্ধিতে যে ভারতেরই শ্রীবৃদ্ধি—এ জিনিসটা বুঝেও যাঁরা বুঝতে চান না, তাঁদের চৈতন্যোদয়ের বিকল্প পন্থা কি আছে জানি না। কিন্তু এটুকু বুঝি, এ মহানগরীর সমস্যার সমাধানের জন্য চাই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর সব দিক থেকে চাপ। রাজনৈতিক চাপ নয়। কোন রাজনৈতিক দলবিশেষের ঘাড়ে এ দায়িত্ব না চাপিয়ে দিয়ে আজ সবার উচিত কলকাতার দাবীকে জোরদার করার জন্য সব সম্ভাব্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

সুব্রত গুপ্ত

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

তিয়াত্তর

ব্রহ্মানন্দ অবধূতাশ্রমের কঞ্চির বেড়ার সীমায় কোথায় শুকনো কাঠ জানি না। কিন্তু যোগো ভৈরবীর কথা কানে লেগে থাকে। ভেজা কাঠ যেন তাকে না দিই। তার চোখ যেন না জ্বলে। একটু আগে তার চোখের কোণে টলটলানো মুক্তোর ফোঁটা দেখেছি। কেন, চোখ চোঁয়ানো সেই মুক্তা-বিন্দু কি শুকনো কাঠের ধোঁয়ার জ্বালায়?

হয়তো সেইটুকু তার সান্ত্বনা। বলতে চায়, যোগোর চোখে যা দেখেছ তা প্রাণ চোঁয়ানো না। নিতান্ত ধোঁয়ার জ্বালা। বেশ তো, তাই হে, তাই। তাতে যদি মান বাঁচে, বাঁচুক। তার চেয়ে বাঁচোয়া, যদি প্রাণের ধোঁয়া একটু যায়।

কিন্তু কাঠ কোথায়? বাগানের চারপাশে সব তো সাফসুরত্ পরিষ্কার। শুকনো কাঠ-পাতার ভাজও নেই। একবার এদিকে যাই, আবার ওদিকে। তখন ভৈরবীর গলা আবার শোনা যায়, 'অ মা, কুথা যেইয়ে খুঁইজছ? কাঠ কি সবখানে ছড়ান ছিটান রইয়েছে নাকি? ই কি তোমার বনজঙ্গলে কাঠ কুড়নো?'

তবে? জিজ্ঞেস না করে তার দিকে চেয়ে দাঁড়াই। সে আমার দিকে চেয়ে এক প্রস্থ হেসে কাঁপে। তারপরে লাউমাচার কাছে এক জায়গায় আঙুল দেখিয়ে বলে, 'উই দ্যাখ ক্যানে, কাটকুটো ডাঁই করা রইয়েছে উখানে। তোমাকে কি আমি বনে বনে কুড়তে বইলছি? উখান থেকা কিছু শুকনো কাঠ লিয়ে এইস।'

তা বটে। কিন্তু [illegible] কথা হয়েছিল। [illegible] না। তাইতেই প্রমাদ। [illegible] হাত দিই। টান দেবার আগেই ছপ্ করে কী যেন একটা হাতের কাছে এসে পড়ে। পড়েই হাতের ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে মাটিতে পড়ে কিলবিলিয়ে চলে যায়। আমিও চমকে উঠে হাতের ঝটকা দিয়ে একটু সরে আসি। গাটা সিরসিরিয়ে ওঠে।

ভৈরবী দাওয়া থেকে উদ্বেগে বেজে ওঠে, 'কী গ বাবাজী, কী?'

আমি বলি, 'টিকটিকি।'

'টিকটিকি।'

পুরো উচ্চারণ করতে পারে না। তার আগেই ভৈরবীর মুখে আঁচল চাপা পড়ে। শরীর কেঁপে ওঠে। ঘর থেকে গোপীদাসের মোটা গলা শোনা যায়, 'কী হল গ'

যোগো বলে, 'দ্যাখ এইসে ক্যানে, তোমার চিতে বাবাজীর কী দোগ্‌গতি।'

ঘরের ভিতর থেকে ঝিমঝিমনো মোটা গলায় উদ্বেগ ফোটে, 'কী দোগ্‌গতি গ ঠাকরুন?'

যোগোর দৃষ্টি আমার দিকেই। তার রক্তিম চোখে হাসির ঝিলিক। বলে, 'তুমি এখন দম দিয়ে বইসে আছ, দেইখবে কেমন কইরে। টিকটিকি গ টিকটিকি।'

'টিকটিকি?'

'হ্যঁ। বাবাজীর হাতে পইড়েছে।'

'অই।'

গোপীদাসের গলায় স্বস্তির সুর বাজে। বলে, 'তাই বল ক্যানে। তা আচমকা পইড়লে একটুক চমক লাইগবে। সি তোমার বনের চিতার গায়ে পইড়লেও লাগে।'

গোপীদাসের গলায় এত ঝিমনো আর অস্পষ্ট সব কথা বোঝা যায় না প্রায়। শুধু [illegible] তো না। প্রেমের পাঁজা। তার আবার [illegible] জামাইয়ের [illegible]। একটু জোর [illegible] বইকি। আমি ততক্ষণ থেমে নেই। শুকনো কাঠের পাঁজা হাতে তুলে নিই।

যোগো জিজ্ঞেস করে, 'কোন্ হাতে পইড়ল হে বাবাজী? ডাঁয়ে, না বাঁয়ে?'

তার মত করেই জবাব দিই, 'ডাঁয়ে।'

'যাক, তবু ভাল।'

'আর বাঁয়ে পড়লে?'

'বিটিছেল্যাদিগের ভাল।'

অর্থাৎ মেয়েদের। জীব টিকটিকি। তার ডাইনে বাঁয়ে পড়াপড়িতেও ভাল মন্দ। শুকনো কাঠের পাঁজা এনে যোগোর সামনে রাখতে রাখতে বলি, 'কী ভাল?'

'তা জানি নাই। অই শুইনেছি, সবাই ভাল বলে, তা-ই বলি।'

কিছু না ভেবেই বলি, 'কেন, আপনি তো ভৈরবী, আপনি জানেন না?'

যোগো হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে এমন করে তাকায়, আমার অবাক লাগে। একটু বিব্রতও হই। তার সেই বড় বড় দপদপে চোখের দৃষ্টি যেন আরো ধারালো, তীর হয়ে ওঠে। কেমন একটা সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসার তীর হানে। আমার মনে অপরাধের ছায়া ঘিরে আসে। অন্যায় কিছু বললাম নাকি?

যোগো আবার হঠাৎ-ই চোখ ফিরিয়ে নেয়। দেয়ালের কাছে পাট করা পুরনো শাড়ির পাড় দিয়ে মোড়া চটের আসন একটা খুলে পেতে দেয় তার কাছাকাছি। না তাকিয়ে বলে, 'বইস।'

বলে কুলো কাত করে হাঁড়ির মধ্যে চাল ফেলে দেয়। হাঁড়ির মুখে ঢাকনা ঢেকে উনোনের মধ্যে কাঠ দিয়ে আগুন খুঁচিয়ে উসকে দেয়। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছে আমার দিকে ফিরে বলে, 'কী হলো, বইসবে না?'

বসব বটে, মন যে খাড়া। কোথায় যেন একটু বেসুর বেজেছে মনে হয়। কিন্তু কোথায় কেমন করে তা জানি না। যোগোর কাছাকাছি আসলে বলতে বলতে বসি, 'এই যে বসি।'

কিন্তু যোগো বিন্দু না। একটু যেন ভয়ে ভয়েই বসি। না জেনে যদি কোন অপরাধ করে থাকি, এখুনি হাত জোড় করে ক্ষমা চাইতে রাজী। তা-ই জিজ্ঞেস করি, 'আপনি কি রাগ করেছেন আমার ওপর?'

"কইরেছি।"

সহজ কথা, সোজা জবাব। কিন্তু যোগোর মুখে তার কোন ছাপ নেই। এমন কি একটু আগের ধারালো তীক্ষ্ণতা সমেত, কিছুই নেই। বরং তার রক্তিম চোখের কোণে কেমন একটা টানা রোদের ঝিকিমিকি। তাতে নানা ছায়া খেলা করে। বলে, "ভৈরবী হলো বুঝি সব জাইনতে হয়?"

এই কথা! তার জন্যে রাগ কেন? মন্দ ভেবে কিছু বলি নি। যোগো অবধূতানীকে ঠাট্টাও করি নি। এই কেমন একটা ধারণা, শ্মশানবাসিনী ভৈরবী, টিকটিকির ডাইনে-বাঁয়ের যুক্তিও তার জানা আছে বা। যে কথা অন্যে জানে না, ভৈরবী তা জানে। সে যে ভৈরবী। তার জগৎ ভিন্ন, যোগ আলাদা। সে জানে অনেক কিছু। এই ধারণা থেকে বলেছি। তাড়াতাড়ি বলি, 'আমি কিন্তু অন্য কিছু ভেবে বলি নি, বিশ্বাস করুন। আমি ভাবলাম, আপনি ভৈরবী, একজন সাধারণ মেয়ে তো নন। আপনি নিশ্চয় জানেন।'

যোগোর ঠোঁটের কোণে যেন একটু চিকুর হানা হাসি খেলে। তার সারা চোখে মুখেই এমন একটা রক্তাভ জ্বলজ্বলে ভাব আছে, হাসির ধারে তা যেন আরো তীব্র দেখায়। বলে, 'তা-ই বুঝি? তা, অই কী বলে ছাই, অসাধারণ কুথা দেইখলে গ?'

বলতে বলতে তার শরীরে কেমন একটা দোলা লেগে যায়। ঘাড় কাত হয়ে পড়ে, চোখ দুটি আধবোজা ভাব করে, দৃষ্টিতে আবেশ ফোটায়। তার কাঠ-খোদাই শরীরে যেন কেমন আগুনের খেলা। পুষ্ট, শক্ত, উদ্ধত উজ্জ্বল। লালপাড় গেরুয়া শাড়ির ঢাকায় অঙ্গার যেমন জ্বলজ্বল করে। চোখ রাখা যায় না। তবু সাপের মত রুদ্রাক্ষের মালা দোলানো বারে বারে চোখ টানে। রক্তাভ স্ফীত দুই স্তনান্তরের মাঝখানে যেন জগৎজনের অন্ধকারকে দারুণ দীপ্তিতে হানে।

আমি বলি, 'সংসারে যাদের দেখি, তাদের সঙ্গে আপনাদের মেলাতে পারি না। মনে হয় অনেক তফাত।'

'ক্যানে গ?'

বলে গায়ের আঁচল তুলে রুদ্রাক্ষের মালা টেনে দেখিয়ে বলে, 'ইয়ার জন্যে?'

এমন করে দেখায়, যেন এখুনি সব টেনে খুলে ফেলে দেবে। বলি, 'না, এ জন্যে নয়। কেবল বসনভূষণ কেন, সবই।'

'অই, শ্মশানে মশানে থাকি, তা-ই?'

শুধু তা-ই বা কেন। বসনভূষণ বাসস্থান ছাড়াও জীবনযাপন আচার-আচরণ আছে। তার চেয়ে বড় কথা, অবধূতের ভৈরবী। সে কি কখনো সংসারের আর দশ নারীর মত হতে পারে? যার জীবনে সব কিছুর মূলে সাধনভজন সার। যে কারণে সংসারের বাইরে এসে আশ্রয় নিতে হয়েছে এ মহাশ্মশানে। ঘরে যাদের নরমুণ্ডের কঙ্কালের গোড়া, ত্রিশূল গাঁথা, খাঁচায় অজগর। আমি বলি, 'আপনি ভৈরবী, সাধিকা।'

'থাক, উ কথা বলো না।'

আমার কথার ওপরেই ঠেক দেয় সে। তারপরে হঠাৎ আঁচল গুছিয়ে ঘোমটা টেনে বসে, আমার দিকে চেয়ে বলে, 'দেখ তো, তা-ই কি আমাকে ভাল লাগে?'

দেখতে দেখতে যেন যোগোর ভাব [illegible] জীবিকা [illegible] [illegible] [illegible]

সকলই কেমন গভীর গাম্ভীর বিষণ্ণ লাগে, যোগোকে তেমনি দেখায়। এমন কি, তার রক্তিম চোখেও ছায়ার নিবিড়তা। জলের রঙ যেমন হোক, আকাশের ছায়ায় বদলায়, তেমনি। তার গলার স্বরেও যেন দূর গভীরের সুর বাজে। তবু একটুখানি হাসি তার মুখে, তাতে ছায়ার প্রসন্নতা। বলে, 'তফাত কুথা দেইখলে বাবাজী? সম্‌সারে যা বইন বিটি ঝি থেক্যা আলাদা কী দেইখছ বল। একজনের ঘর করি, সম্‌সার করি, তার মত থাকি। আর ত কিছু জানি নাই।'

বলতে বলতে যোগোর চোখের রঙ বদলায়। লাল কুসুমের দুটি ডাগর পাতা যেন হিমে ভেজা। আরো বলে, 'সে যিখানে লিয়ে যাবে, সিখানেই যাব। যেমন রাইখবে, তেমন থাইকব। সে যেদিন ভৈরবী হতে বলে ত ভৈরবী। যোগিনী করা্যা রাখে ত যোগিনী। আর ত কিছু জানি নাই ভাই বাবাজী।'

বিন্দু বিন্দু হিম বড় ফোঁটায় টলে। আর আমার কানে যে কথাগুলো বাজে, তা আসে যেন সংসারের মাঝখান থেকে, সেই পুরাতন দিনের সুরে। এক নিয়ে থাকি, এক মনে, এক বেশে। তার বেশী আর কিছু না। শুনতে শুনতে আমার কথা ফুরিয়ে যায়। আমার বুকে কিসের উত্তাপে বাষ্পের সঞ্চার হয়। একটা ব্যথা ধরে যায়। তবু বিস্ময়ের ঝলকে অপার কৌতূহলে চেয়ে থাকি। কথা বলতে পারি না। সংসারে শ্মশানে যেখানে মেশা-মিশি, যোগো যেন সেইখানে নিয়ে যায়। যেখানে স্থান-কালের সীমা নেই।

সংসারে যে আছে, শ্মশানেও সে-ই। কৈলাসে শ্মশানে এক মন, এক প্রাণেরই লীলা। যোগো আবার বলে, 'তাও দ্যাখ ক্যানে, সম্‌সারে ঝগড়া বিবাদ মারামারি। হেঁথাতেও তা-ই। লোকে বলে, "মাগ-ভাতারের বিবাদ, পাড়ায় যেন ডাকাত পইড়েছে।" ইও ত তা-ই। ঘরে দব্য থাইকলে ফোটাই, রাঁধি বাড়ি, দিই খাই। আর ত কিছু জানি নাই। ইয়াতে যদিন তফাত বল ত বল। ই যদিন সাধন ভজন হয়, তা হল্যে সাধন ভজন। আর ত কিছু জানি নাই।'

আর কিছু জানে না যোগো। যোগো ভৈরবী, ব্রহ্মানন্দ অবধূতের শ্মশান-সাধিকা। চোখ তার জলে ভরে যায়। গলায় দোলে রুদ্রাক্ষের মালা। কিন্তু সে আর তো কিছু জানে না। পরমের পিছে পিছে মরম চলে। রাঁধে বাড়ে খায়, ঝগড়া বিবাদ করে। হয়তো কাঁদালে কাঁদে, হাসালে হাসে। সুখ দুঃখ নিয়ে ফেরে একের পিছে পিছে। মরম ফেরে পরমের পিছে পিছে। একে যদি তুমি সাধন ভজন বল তবে তাই।

শিলা যেমন জলে ভাসে, তেমনি। কাষ্ঠের সঙ্গে পীরিতি করে লোহাও যেমন জলে ভাসে, সেইরূপ। সমর্পণে নিবেদনে প্রেম বাজে, যোগোর কথায় সেই বাণ। ধ্যান। সেই তার সাধন।

এ কি সংসারের বাইরের কথা? অন্তরে বাহিরে সীমান্তে সেই এক কথা। কিন্তু ভৈরবীর মুখে না শুনলে বুঝতে পারতাম না। এ রূপে, সে রূপে, নানা রূপের ধন্দ। অরূপের সীমা নেই, এক সুরে বাজে। তখন কথা ফুরায়। তখন বুঝি মনে, যে জান রসের সন্ধান।

যোগোর দিকে চেয়ে আমার মনের একদিকে যখন টলটলিয়ে ওঠে, আর একদিকে তখন খুশির ঝোরা ঝরে। তারপরে সহসা চিড় খাওয়া মেঘের ফাঁকে যোগোকে দেখি আর এক রূপে। এত কথা যোগো এই নতুন চেনা লোকটিকে এমনি বলেনি। চোখের জল অকারণে গলেনি। ব্রহ্মানন্দ অবধূত শেল হেনেছে ভৈরবীর বুকে। সেই শেল আছে, একেকাটার ঘরে।

সংসার, সংসার এই। শ্মশানে মশানে তীর্থে, নগরে বন্দরে গ্রামে, সেই এক খেলা-খেলি। বৃন্দাবনে গোকুলে সেই নায়ক-নায়িকা লীলা। যোগো আজ বেজেছে বড় বেদনায়। সাধিকার কোথাও লাগেনি, যোগিনী ভৈরবীর কোথাও বাজেনি। বেজেছে সেই এক মানবীর প্রাণে।

যোগোর মত নারীও আমার চোখের দিকে চেয়ে সহসা লজ্জা পায়। চোখে জল নিয়েই একটু হেসে, তাড়াতাড়ি মুখ ফেরায়। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে উনোনের কাঠ ঠেলে আগুন উসকে দেয়। এখন নিশ্চয়ই ভেজা

কাঠের ধোঁয়ার জন্যে না। জল লেগেছে, প্রাণের আগনেই।

কিছুই বলতে হয় না, জিজ্ঞেস করতে হয় না। চোখে চোখ পড়ে, হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিজেই যেন সকল জানাজানি হয়ে যায়। অবিশ্বাসী কপট ভৈরব, ভৈরবীকে কাঁদিয়েছে।

ওদিকে ঘরের মধ্যে কোন সাড়া শব্দ নেই। বোগো আমার দিকে আবার বলে, 'কী, কথা বইলছ না যে বাবাজী।'

বলি, 'আপনার কথাগুলোই ভাবছি।'

হঠাৎ যেন হাত তুলে মারতে আসে বোগো। কথার মাঝখানেই বলে ওঠে, 'অই, তুমি আর আমাকে আপনি আজ্ঞে কর্যো না হে, শুইনতে পারি না।'

তা-ই ভাল। ভাবলাম, না জানি আবার কী অপরাধ করেছি। বলি, 'সে ত্রবে। নতুন তো।'

অমনি বোগোর চোখে দপদপানি। ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, 'তা আর জানি নাই। নতুন বেলা তোমাদিগের জোড় হাত। পুরনো কইরতেই বা কতক্ষণ লাগে।'

বলে, দাঁত কোপে হাসে। তা বটে। নায়ক পুরুষের লক্ষণ সেরকম বটে। বৃন্দাবনে লীলা করে মথুরাতে চলে যায়। নতুন বেলায় মানভঞ্জন, নৌকাবিলাস। পুরনো হলেই বিশ্বের দরবারে।

একটু ভয়ে ভয়ে দ্বিধায় জিজ্ঞেস করি, 'উনি কি আর সত্যি আসবেন না?'

বোগো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কে?'

'মানে—আমি অবধূত মশাইয়ের কথা বলছি।'

সঙ্গে সঙ্গে বোগোর ঠোঁট দুখানি ধনুকের মত বেঁকে যায়। চোখেও সেই পরিমাণ বিদ্রূপ হানা। যেন আমাকেই প্রায় হানে। যেন আমাকেই জিজ্ঞেস করে, 'কুথা যাবো?'

'অ্যাঁ?'

'কুথা যাব্যে, জিগেস করি?'

আমিই ঢোক গিয়ে বলি, 'তা তো জানি না।'

'হুঁহু, মরণ! তোমাদিগের যেজ্ঞালপট্টই কি জানে নাকি?'

বলে ঘাড়ে ঝটকা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। হাঁড়ির ঢাকনা খুলে, বগবগানো হাঁড়িতে হাতা দিয়ে ভাত তুলে দেখে। ঘটি থেকে একটু জল ঢেলে দিয়ে ফিরে বলে, 'অমন কতই দেইখলাম। বেরালের আড়াই পা জানতো?'

'শুনেছি।'

'অই সিরকম। ছোকছোকানি থাইকলে মাঝে মধ্যে অইরকম মরণ ধরে। ই বেলাটা পার হল্যে বাঁচি। অবধূতের আমার হয়্যা গেছে।'

সেটা খানিকটা আন্দাজেই অনুমিত। মহাশয়ের অবধূতীর তেজ তখনই যেন কেমন নিবু নিবু হয়ে এসেছিল। তবে সেটা নিতান্ত প্রাণের ভয়ে। কেননা বুকে বর্শা বিঁধিয়ে প্রাণ নিয়ে ছেলেখেলার উদ্বেগ সেটা। কিন্তু যেভাবে শাসিয়ে গেলেন তাতে তো মনে হল এ মুখো আর কোনদিন হবেন না। অবিশ্যি তাঁর আশ্রমে অনাচার হচ্ছে কিনা তা দেখতে আসতে পারেন।

ভৈরবী আবার বলে, 'অমন কতবার কত জনাকে সাধন ভজন শেখাতে গেল, কিন্তুন মরতে সি বোগমতীর কাছকে। তা নইলে ওরাঁর আদত মরণ হয় না।'

এ মরণ কী তার আবার আদত বে-আদত কী, তা জানি না। কিন্তু বোগোর কথা শুনে আমার মনের ভিতরটা কুলকুলিয়ে ওঠে। এসব বাক্য নেহাত বাক্য না। প্রাণের জোর না থাকলে বলা যায় না। এবার ভাবো হে ব্রহ্মানন্দ অবধূত, সেদিন তোমার কেমন।

ভৈরবী জিজ্ঞেস করে, 'বুকে জাম হয় জান ত?'

'জাম?'

'হঁ গ, জাম, সর্দি কাশির জাম লাগে না? তখন পুরনো ঘিয়ের মালিশ লাগে। জাম লাগুক, তখন আইসবে। যখন আইসবে তখন আমিও দেইখব। এই সারাটো জেবন খইয়ে দেখ্যা এলাম। উ মিনসেকে আমি চিনি না?'

মিনসে! ব্রহ্মানন্দ অবধূত মিনসে? এ যে কেবল সংসারের কথা না। সংসারের জমজমাট চাকের বচন! তার ওপরে আমিও যেমন উদোমাদা মানুষ। ফস করে জিজ্ঞেস করে বসি, 'আপনাদের বিয়ে হয়েছে কতকাল?'

'কী বইললে? বিয়ে?'

'হ্যাঁ, মানে—'

'মরণ!'

বলেই হাঁড়িতে হাতা ডোবায়। ভাত দেখে হাতা দিয়ে হাঁড়ির মুঠে ঠক ঠক ঝাড়ে। ঘটি কাত করে, হাতে জল দিয়ে আঁচলে মুছতে মুছতে বলে, 'বিয়ে কুথা দেইখলে হে?'

তাও তো বটে, সাধন ভজনে আবার বিয়ে কিসের। একি সমাজ সংসারের বিষয় নাকি যে সাতপাকে বেঁধে স্বামীর ঘর করবে। তবু একটা কিছু নিশ্চয় আছে। নইলে আর দুজনের দেখাসাক্ষাৎই বা হল কেমন করে। পরিচয়ই বা কীভাবে। কিন্তু বোগোমতীর দিকে চেয়ে সে কথা জিজ্ঞেস করতে ভরসা পাই না। তার চোখমুখ তো আবার সেই অসুরসংহারিণী। তাতে আবার একটু সন্দেহের ছোঁয়া। তাড়াতাড়ি বলি, 'না, মানে জানি না তো।'

আমার কথা শুনে মুখ দেখে সন্দেহটা বোধ হয় ঘোচে। বলে, 'মিনসে বিয়ে আর মাইনল কুথাক। আমি হলাম তাঁতীদের বউ. আর উ হল্য বামুন।'

নাও, শোন এবার কথা। কথা কোন্ দিকেতে বহে। প্রায় হাঁ করেই চেয়ে থাকি বোগোমতীর দিকে। ব্রাহ্মণ অবধূত, তার ভৈরবী তাঁতীদের বউ। কী দিয়ে কী মেলাবে, এখন বসে বসে ভাবো। কেবল গলা দিয়ে শব্দ করি 'অ।'

বোগোমতী বলে, 'তবে্যা? আমাকেও ঘর কইরতে দিলে না, নিজেও জয়জাতি সমসার ফেলো, শ্মশানে একা [illegible] কইরছে।'

অবাক হয়ে উচ্চারণ করি, 'জয়জাতি সংসার মানে?'

'ইয়ার আবার মানে কী। [illegible] বামুনী রইয়েছে, বিটাবিটি রইয়েছে। [illegible] খামার চাষবাস পুজো [illegible] রইয়েছে। সব ফেল্যে থুয়্যে আমাকে [illegible] পাতকে ডুবিয়ে নিয়ে চল্যে এল।'

'নিয়ে চলে এল!'

'অ কী বইলছ, আমি নিজে [illegible] এইসেছি?'

সবনাশ, কথা উলটো [illegible] তাড়াতাড়ি বলি, 'না না [illegible] অবধূতের কথা বলছি। [illegible] একেবারে নিয়ে চলে এল।'

'অ মরণ [illegible]

বলে ভৈরবী উনোন থেকে হাঁড়ি নামায়। ফ্যানের মালসার অত বড় হাঁড়িটা উপড়ে করে অনায়াসে ঠেকো দিয়ে রেখে ছেড়ে দেয়। আবার হাত ধোয়। দাওয়ার কোণ থেকে হাত বাড়িয়ে ধোঁয়া কড়াই নিয়ে আঁচল দিয়ে মুখে উনোনে চাপায়। তাতে জল ঢেলে দেয় অনেকখানি। আমি তখনো সেই মরণের রূপের কথা ভাবছি। বারে-বারেই যে মরণ ধরার কথা শুনি, সেই মরণের সংজ্ঞা কী কে জানে।

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ভৈরবী একবার আমার দিকে চায়। আবার মুখ নামিয়ে ঠোঁট টিপে ডালের কুনকে তুলে কয়েক মুহূর্ত নাড়াচাড়া করে। তারপরে হঠাৎ বাগানের দিকে চেয়ে বলে, 'তবে খালি ত উয়ার মরণ ধরে নাই, আমারও ধইর্যেছিল। তা লইলে কী আর আসি?'

সেটা একটা কথা। একা ব্রহ্মানন্দর না, যোগোমতীরও মরণ ধরেছিল। যোগোমতী ঘাড় ফিরিয়ে ভুরু বাঁকিয়ে যেন কৈফিয়তের মত করে বলে, 'তা কী বল, তখন চৌদ্দ পনর বছর বয়স, উদিকে বামুনের নজর সরে না। এখন দেইখছ ইরকম, তখন অবধূতের অন্য মূর্ত্তি। এখন তো পুড়ো গেললে, পোড়া কাঠ মূর্ত্তি হইয়েছে। তখন সোন্দর চেহারা, গোরা রঙ, মিছা বইলব না, হঁ, মনে হত কন্দর্পকান্তি। আর যেমন তেমন ঘর ত লয় বে, খালি অগ্‌গদানীদের মতন ছেরাদ্দের পিন্ডি খেয়ে বেড়াল্‌ছে। বাঁকড়োর নাম-করা শাক্ত বংশ। ঘরে ধুমাবতীর নিত্যি পুজা, ধুমাবতী উয়াদের ঘরের দেবী। পালা পাবোনের কথা বাদ দাও, সে ভারী ধুমধাম ব্যাপার। তা হলোই বুঝ ক্যানে, ঘোষাল ঠাকুর কেমন মানুষ। অই তোমার বেহ্মালন্দর কথা বইলছি গ, ঘোষাল বামুন ত। শিবঠাকুরের ছোট বিটার নামে নাম, ময়ূর যার বাহন, নামটো আর মুখে লিতে পাইরব নাই বাপু, বুইঝলে ত?'

তা বুঝি, তবু জিজ্ঞেস করি, 'কার্তিক ঘোষাল তো?'

'হঁ হঁ, অই অই।'

অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ অবধূতের গৃহস্থ নাম শ্রীযুক্ত কার্তিক ঘোষাল। কিন্তু নিজেরও মরণ ধরার কৈফিয়ত দিতে গিয়ে প্রথমে যেমন যোগো ভৈরবীর গলায় ক্ষোভ খেদ বেজে-ছিল, এখন আর তেমন বাজে না। এখন যেন বাঁকুড়ার কোন এক গ্রামের তাঁতী বউয়ের গলায় কোন এক শাক্ত পরিবার ঘোষালদের রসুরসা বার্তা শুনি।

যোগোমতী কড়াইয়ের জলে কুনকের ডাল ঢেলে দিয়ে খুন্তি দিয়ে একবার নেড়ে দেয়। আবার আমার দিকে ফিরে বসে। এ মুখ আর সে মুখ নেই। মুখ এক পনর বছরের তাঁতী বউয়ের। যে মুখে অন্য এক জীবনের বিস্ময় কৌতূহল, ভর-তরাসের মায়া [illegible] যেমন অজোর বুকে আলোছায়ার নানা ঝাকঝমক। ঘাড় কাত করে আমার দিকে চেয়ে বলে, 'তা বল, পাড়ায় যার ছায়া দেইখলে বুক ধড়াইসো মরি, সে যদিন দিনরাত যোগো যোগো করে, তা হল্যে ঠিক থাকা যায় কেমন কর‍্যা, অাঁ? অ্যাই লম্বা খাঁড়ার মতন ঝকঝকে মূর্ত্তি, কপালে সিঁদুর, মাথায় ঝাকড়া চুল, গলাতে রুদ্দাক্ষর, হাতের তাগাও তাই। গলাখানিও তেমনি মিঠে, মায়ের নাম লিয়ে গান ধইরলে মনে হয়, ঘোষাল ঠাকুর সাক্ষাৎ মায়ের বিটা। ক্যানে কী জানি, আমার তাই মনে হত।'...

বলতে বলতে যোগোমতী মুখ নিচু করে। নিজেরই পায়ের পাতায় আঙুল ঘষে। বেশ কয়েক দিন আগের আলতার আবছা দাগ এখনো তার নিটোল পায়ে রয়েছে। হয়তো সেই ঘোষাল ঠাকুরের গানের সুর তার কানে বাজে। সে কী [illegible] যেন সাক্ষাৎ মায়ের ছেলে। সে কী করবে বল। যার ছায়া দেখলে বুক ধড়াসে যায়, সে যদি বারে বারে নাম ধরে ডাকে তবে কেমন করে ঠিক থাকা যায়। বাঁশী লাজ মানে না। বড় নিষ্ঠুর, প্রাণও মানে না। সে নাম ধরে বেজে যায়। যার নাম ধরে বাজে, সে যে লাজে মরে। প্রাণেও মরে।

তবু যোগোমতীর দিকে চেয়ে আমি রুদ্ধবাক। কী এক আশ্চর্য কথা যেন শুনি এমনি অবাক হয়ে কিসের একটা ঘোরে যেন ডুবে থাকি।

যোগোমতী বাগানের দিকে মুখ তুলে চায়। দৃষ্টি তার বহু দূরে, দূর কালে, বাঁকুড়ার এক গ্রামে। গলাও যেন তেমনি দূর থেকে আসে, 'অই, কী বইলব গ, ঠাকুর কী দেইখল আমার মধ্যে, যিখানে যাই সে আমার সামনে। ঘাটকে যাই, ঘাটকে।

[illegible] তা'পরেতে একদিন বলে কী, 'অই যোগো, তোকে আমি পূজো কইরব গ!" অই মা, কী পাপ গ, আমাকে পূজো কইরবে কী গ। এমন কথা কি বইলতে আছে! "বইলতে নাই ক্যানে গ, ধূমোবতীর আদেশ হইয়েছে যে। তুই যে ধূমোবতীর অংশ!" আঃ হায় হায় গ, আমার গায়ে কাঁটা, মূচ্ছো যাই শূনে। বলে কী ঘোষাল ঠাকুর!...আমাদিগের ঘরকে ঠাকুর যেইলে, সব্বাই এইসে পায়ে হূমড়ি খেয়্যা পড়ে। মায়ের নাম লিয়ে থাকে, ঠাকুরের কত পাগলামি, কেউ কিছু মনে কইরত নাই। যখন তখন আইসত। বস্যে বস্যে গান গাইত, শাশূড়ী ননদ বস্যা বস্যা শূইনত। আমিও শূইনতাম। আবার সবার সামনেই আমাকে বইলত, "ইয়ার মধ্যে দেবীর অংশ আছে, ইয়াকে সাবধানে রেখ্য গ তাঁতী দিদি।" আমার শাশূড়ীকে দিদি বইলত। তা'পরেতে একদিন—'

ইঠাৎ থামে যোগোমতী। সে যেন কেঁপে ওঠে। চোখ বূজে চুপ করে থাকে। আমি অবাক হয়ে এই মূর্তির দিকে চেয়ে থাকি। একদিন কী হয়েছিল? কী ঘটেছিল? যোগোর কাঁপূনি যেন আমার গায়েও লাগে। সে ফিসফিস করে বলে, 'গাঁয়ের উত্তর পাড়ায় মোচ্ছব হচ্ছিল। সিখানে গেলছিল শাশূড়ী ননদ। সোয়ামী ত ঘরকে থাইকবার মানূষ ছিল নাই। সাঁজবেলাতে বাতি দেখিয়ে মাত্তর উঠান থেক্যা ঘরকে যেইছি, শূইনতে পেলেম ঘোষাল ঠাকুর গান কইরতে কইরতে আইসছে। ঠাকুর এল্য, একেবারে ঘরের ভিতর এল্য। এইসেই উপূড় হয়্যা পড়্য। আমার পায়ে হাত। দূ হাতে পা চেপ্যা ধর্যা কেঁদে বইললে, 'অই গ যোগো, যোগোমতী, যোগমায়া তুই। মহামায়া তুই। আমাকে উদ্ধার কর গ। তুই আমার পূজো না লিলে আমার সব বেরথা। ধূমোবতীর আদেশ হইয়েছে, আমি তোকে ছাড়ব নাই।" '

বলতে বলতেও যোগো যেন কাঁদতে থাকে। তার চোখে মূখে ভয়তরাসের ছাপ। দৃষ্টি তার দূরে। যেন সাঁজবেলাতে ঘরে ঢূকে ঘোষালের সেই পায়ে ধরা দেখছে। একটূ থেমে আবার বলে, 'সিই আমি পেথম কথা বইললাম ঠাকুরের সাথে, "এমন করবেন নাই গ, পা ছাড়েন। আমার যে পাপ লাইগছে। আমার ভয় লাইগছে। ছাড়েন, পা ছাড়েন।" না ছাইড়বে না। বলে, "ছাইড়ব না মা, তোমার পা ছাইড়ব না, ই পায়ে পইড়ে থাইকব।" তা বইললে কী হয়। কেউ দেইখলে কী বইলবে। ঘরে রাইখবে ক্যানে আমাকে। ঠাকুর বইললে, "দরকার নাই। চল ক্যানে, দূজনায় চল্যে যাই। সিখানে যেইয়ে তোমার পূজো কইরব।" কিন্তুক কথা কি বইলতে পারি। আমার শরীলে তখন যেন কী হলছিল গ। আমি বইসে পইড়লাম। ঠাকুরের পা ধইরলাম। মিছা বইললে আমার পাপ লাইগবে, ঠাকুর যেন আমার ধ্যান জ্ঞান হয়্যা যেইছিল। খেত্যে শূত্যে চইলতে ফিরতে, ঠাকুরকে দেইখতাম। হক না অনেক বড়, বয়সে ত ঠাকুর আমার থেক্যা অনেক বড়, তা হক্‌গা, আমার মনটা সব সোমায় ঠাকুর ঠাকুর কইরতো। তাকে যেন আমার সাক্ষাৎ শিব মনে লিত।...আর পাইরলাম না। ঠাকুরের পায়ে হাত রেখ্যা বইললাম, "যা বইলবেন তাই হবেক গ, কিন্তুক কুথাক যাবেন? আপনার এত বড় সমস্যার—।" বইলতে দিলে না। বইললে, "কিছু চাই না মা, এ জেবনটা তোমার পূজো কর্যা সাথক কইরব।" তা পরেই ত...।'

একটূ থামে যোগো। কী বলতে গিয়ে আবার কী যেন মনে পড়ে যায়। ঘাড় নেড়ে নিজের মনেই বলে, 'তব্বে, হ', ইয়ার ভিতর একটো কথা আছে। দশ বছর বয়সে বিয়া হয়েছিল। সোয়ামীকে দেইখতাম, পাড়ার জান, বড়ো এক ছোঁড়ার সাথে দিনরাত ঘোরে। তার সাথে খায়, রাতে তাকে লিয়ে ঘরে শোয়, মাঠে যেইয়ে থাকে। আ মরণ, জান্‌ ছোঁড়া শাড়ি পর্যা থাইকতো। আমাদিগের মতন বিটি জামা গায়ে দিত, কপালে ফোঁটা, পায়ে আলতা ঢং ঢাং সব বিটিঝিদের মতন। মনে লিত, উয়াকে ঝাঁটা পিটা করি নূড়ো জেলে দিই মূখে। তা সোয়ামী হয়্যা তুমি যদি আমাকে না দেইখলে, আমার কী হয় গ। তাই ঠাকুর যত যোগো যোগো কইরত, আমার মনটোও ঠাকুর ঠাকুর কইরত। তা'পরে সি সাঁজবেলার তিন দিন পরে সাঁজবেলাতেই ধূমোবতীর নাম লিয়ে ঠাকুরের সাথে ঘর ছেড়্যা গেলাম। খূইরতে ঘূইরতে এই [illegible]রে। সি কি ই দিনের কথা! পেরায় আঠার বচ্ছর হয়্যা যেইল...।'

যোগো থামে। চুপ করে তাকিয়ে থাকে দূরের দিকে। তারপরে হঠাৎ উনোনের দিকে ফিরে কড়াইয়ে হাতা চালায়। আমি আবিষ্ট হয়ে থাকি। যে কাহিনী শূনি, সে কি কোন সাধক-পূজকের কথা শূনি? নীতিবিগর্হিত কোন নরনারীর পাপ কথা শূনি কী? নাকি সব মিলিয়ে এও এক পীরিতি পরম কথা। ধূমাবতী আদেশে, কার্তিক ঘোষাল কহে, পূজিতে গিয়ে তাঁতীবালা যোগমতীকে।

এমন কি আর কোথাও ঘটে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে, অন্য মনে! যোগোর দিকে চেয়ে দেখি। তার সেই কথাটি আবার মনে পড়ে যায়, 'আর ত কিছু জানি নাই।' ব্রহ্মানন্দ বিহনে সে আর কিছু জানে না। কই একবারও পাপ মনে হয় না। যোগোকে ভ্রষ্টা স্বৈরিণী স্বামী সংসারত্যাগিনী অন্ধকারের প্রাণী বলে মনে হয় না। এর নাম সাধন ভজন, তার বিচ্যুতি নেই। এক মনে এক সাধন। তবে ব্রহ্মানন্দকে সে চিনবে না কেন? সেই তো চেনে।

আমি জানি, যোগো মূখ ফিরিয়ে আছে। কিন্তু চোখ তার শূকনো নেই। কঙ্কাল ত্রিশূলে না, এই তো সাধন। [illegible], বিবাদে, বিরহে, চোখের জলে এই তো সাধন।

আমার ভিতরেও কোথায় যেন [illegible] যায়। তাতে যদি চোখের জলের [illegible] থাকে, একটা খূশির [illegible]। [illegible] যত লাগে, মূখ তার বেশী। [illegible] এইটূকু প্রাপ্য। কী খূঁজে [illegible] না। পথ চলাকে গড় করি, [illegible] নমঃ বিচিত্র, নমঃ জীবন। [illegible] কোথায়, কে জানে। [illegible] এই অপরিচয়ের পরিচয়ে নমঃ [illegible] নমঃ নমঃ।...

গানের আসর

—শার্ঙ্গ দেব

ছন্দ, তাল, লয়

সঙ্গীত এবং সাহিত্যের মধ্যে মিলটা নিবিড় যার ফলে সঙ্গীত সাহিত্যের অনেকটাই অধিকার করেছে। সঙ্গীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কবিতা ক্রমে গান হয়ে উঠেছে—তার পাঠ্যটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব হয়নি। সংস্কৃতে বা প্রাকৃতে ছন্দের অভাব নেই এবং সেই ছন্দ বজায় রেখে গান করলে তা কতটা মনোজ্ঞ হয়, সে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা বহুদিন থেকেই শুরু হয়েছে। প্রাচীন ভারতে যখন নাট্য আন্দোলন আরম্ভ হয় তখন দেখা গেল অনেক ক্ষেত্রে যবনিকার অন্তরাল থেকে গীতি প্রয়োগে ভাব প্রকাশের সুবিধা হয় এবং আবেদনটা অনেক পরিমাণে ঘন হয়ে ওঠে। সেই সময় থেকেই ছোট ছোট পদগুলিকে গান হিসাবে ব্যবহার করা শুরু হল এবং ছন্দগুলিকেও যথানিয়মে রক্ষা করা হল। বড় বড় তাল তখনও ছিল, কিন্তু ছন্দেই তালের কাজটা পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় তালের প্রয়োগকে আবশ্যিক বিবেচনা করা হয়নি। ক্রমে তালবদ্ধ সঙ্গীতের পাশাপাশি বহু ছন্দোবদ্ধ পদও সঙ্গীত পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে এল। ত্রয়োদশ, চতুর্দশ শতকেও এই রকম সঙ্গীত প্রচুর ছিল। চর্যাপদই হচ্ছে তার একটি উদাহরণ। সাধারণত পজ্ঝটিকা ছন্দেই চর্যাগুলি গাওয়া হত।

আজ আর এইভাবে গান রচনার প্রচেষ্টা দেখা যায় না। তার কারণ বাংলা ভাষায় ছন্দের এত বৈচিত্র্য আনা সম্ভব নয় এবং গানের রীতিনীতিও পাল্টেছে। এ ছাড়া বোধ করি সংস্কৃত বা প্রাকৃতে ছন্দ রেখে গান করলে যত সুন্দর শোনায় বাংলায় তেমন শোনাবে না। সব ভাষার সব রকমের প্রকাশ মানায় না। বিভিন্ন ভাষা প্রকাশের রীতিকে বিভিন্নভাবে মেনে নিয়েছে। তথাপি এ চিন্তা যে কারুর কারুর মনে জাগ্রত হয়নি এমন নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ "সঙ্গীতের মুক্তি" প্রবন্ধে এই সম্ভাবনার উল্লেখ করেছিলেন এবং কবিতার ছন্দকে বজায় রেখে কি করে গান করা যায় তা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েও দিয়েছিলেন।

এইখানে প্রশ্ন উঠছে কবিতার ছন্দকে বজায় রেখে যদি গান করা যায় তাহলে তাকে তাল বলব না ছন্দ বলব? সঙ্গীত শাস্ত্রে এই নিয়মকে তাল বলা হয়নি। এর ভাগ করা হয়েছে ছন্দশাস্ত্রের গণনিয়ম অনুসারে। অতএব এ প্রশ্নও স্বভাবতই উঠছে যে ছন্দই বা কি আর তালই বা কি? এই দুই-এর মধ্যে তফাৎ কোথায়? কবিতার ক্ষেত্রে যাকে ছন্দ বলে নির্দেশ করি গানের বেলায় তাকে বিনা দ্বিধায় তাল বলতে পারি কিনা।

বিষয়টি ভাল করে ভেবে দেখলে বোধ করি এ যুক্তিকে স্বীকার করা সম্ভব হয় না; অর্থাৎ ছন্দ এবং তালকে এক পর্যায়ে ফেলা যায় না। কেন যে কাব্যের ছন্দ গানে সর্বতোভাবে স্বীকৃত হল না এবং শেষ পর্যন্ত আমরা সাঙ্গীতিক নিয়মে তালকেই অবলম্বন করলাম তার একটা কারণ আছে। ছন্দের নিয়মে গান করার একটা প্রবল অসুবিধা এই যে এর প্রকাশ অতিশয় সীমিত। এইভাবে যে গান হবে তা সুর করে পড়ে যাবারই নামান্তর। বর্ণসমাবেশকে অতিক্রম করবার ক্ষমতা এ গানের নেই। কিন্তু তাল প্রয়োগ করলে শিল্পী অনেক বেশী স্বাধীনতা পেতে পারেন কারণ বর্ণের শাসন সেখানে বড় কথা নয় কালের ভাগটাই হচ্ছে তাল। কথাটা বোধ হয় একটু খুলে বলা দরকার। ছন্দ হচ্ছে অক্ষর বা বর্ণসমাবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মাত্রাবৃত্ত বা জাতিগোষ্ঠীর ছন্দও অক্ষর-বিন্যাসেই নির্ণীত হয়। তাল শব্দের অর্থ আরও ব্যাপক, কেবলমাত্র বর্ণসমাবেশের ওপরেই তাল নির্ভর করে না। তালের নিয়ামক হচ্ছে কাল। এখানে কাল অনুসারেই মাত্রা নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

সুখের। লাগিয়া। এ ঘর। বাঁধিনু।

এই যে বিভাগ এ হল ছন্দ, কেবলমাত্র বর্ণদ্বারা রচিত। কিন্তু—

গা মা পা। না র্সা না। পা ক্ষা পা।

গা মা গা।

আ....................

এ হল তাল। এতেও মাত্রা আছে কিন্তু অক্ষর এখানে আবশ্যিক নয়। এই বিন্যাসকে আড়ি দিয়ে অনেক কমপ্লেক্স করে গাওয়া যায় কিন্তু ঠিক জায়গাতেই সম এসে পড়বে। এখানে সময় বা কালই হচ্ছে তাল বিভাগের একমাত্র অবলম্বন। তাই শাস্ত্র বলছেন কাল প্রমাণের দ্বারাই তাল অভিসংজ্ঞিত হয়। কাল বিভাগের এই ভিত্তিই হচ্ছে তাল। তল্ ধাতুর উত্তর ঘঞ প্রত্যয় যোগ করেই তাল শব্দ নিষ্পাদিত হয়েছে। এই তল্ ধাতুর অর্থ প্রতিষ্ঠা বা প্রতিপাদন করা। এই জন্যই কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দ বোঝাতে আমরা কখনও তাল বলি না। মন্দাক্রান্তা ছন্দ না বলে মন্দাক্রান্তা তাল বললে সংগত হবে না। মেঘদূতের দু একটা পদ যদি মন্দাক্রান্তা ছন্দ রেখেই গাওয়া হয় তথাপি তাকে মন্দাক্রান্তা তাল না বলে ছন্দ বলাই সংগত হবে, কেননা এ গানটি ছন্দেই প্রকৃষ্টরূপে আবদ্ধ হয়েছে। জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দ ছন্দ অনুসারে গাইতে পারতেন কিন্তু তিনি তাল প্রয়োগ করেছেন অর্থাৎ প্রশস্ততর পন্থা অবলম্বন করেছেন। কাব্যের সঙ্গে ছন্দ যেমন অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত গানের সঙ্গে তাল তেমনভাবে শৃংখলিত নয়। কাব্যের ক্ষেত্রে যে ছন্দে কবিতা রচিত হয়েছে তাকে অনুসরণ করতেই হবে, কিন্তু সঙ্গীতে এমন বাধ্যতা নেই। "নৃত্যের তালে তালে" গানটি পড়তে গেলে যে বিধি অনুসরণ করতে হয় গাইবার বেলায় তা হয়নি। গানে তাল পরিবর্তন করা হয়েছে। "হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে" কবিতার বেলাতেও তাই। এরকম বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। অতএব সুরের দিক দিয়ে বিচার করলে গান যেমন নিজের ঐশ্বর্যে বড় তেমনি ছন্দের বেলাতেও সে নিজের গতির অনুকূলে ছন্দকে প্রস্তুত করে নিতে পারে। তাই যে কবিতা পড়বার বেলায় একান্তভাবে ত্রিমাত্রিক ছন্দ—সে গানের বেলায় অনায়াসেই চতুর্মাত্রিক, পঞ্চমাত্রিক বা সপ্তমাত্রিক তাল হতে পারে। বীণা, বাঁশীর সঙ্গে যখন মৃদঙ্গ বাজে তখন কেবলমাত্র ধ্বনিকে অনুসরণ করে তার তালবিধির আন্দাজ করে নেওয়া হয়। অতএব কেবলমাত্র অক্ষর সংখ্যাকে বিচার করে তাল নির্ণয় করলে গানের দিক থেকে ন্যায়পরায়ণতা রক্ষা করা হয়েছে বলা চলবে না। তাল এবং ছন্দের মধ্যে এইটিই হচ্ছে মূলগত প্রভেদ।

লয় শব্দটাও এই কালকেই অধিকার করে আছে। সঙ্গীতের মাত্রাগুলি একটি নির্দিষ্ট নিয়মে চলে। এই নিয়মটি বিলম্বিত, মধ্য এবং দ্রুত গতি অনুসারে পরিবর্তিত হয়। এই গতিটিই হচ্ছে লয়। গানের ক্রিয়াটা যে কালকে অবলম্বন করে চলেছে তার সমতাকেই লয় বলে নির্দেশ করা হয়। লয় শব্দের অর্থ সংশ্লেষ। লী ধাতুর উত্তর অল্ প্রত্যয় যোগ করে "লয়" শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। লী ধাতুর অর্থ সংলগ্ন হওয়া। একটা নির্দিষ্টকালের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে আছে বলেই একে বলা হয় "লয়"। সাধারণভাবে ধরলে সমতাকে বোঝাতেই লয় শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে। কবিতা বা গদ্য যাই হোক না কেন পড়বার একটা লয় আছে কিন্তু গানের মত এক্ষেত্রে লয়ের বিচিত্র পরিবর্তন হয় না। এই জন্যই কাব্যপাঠের সঙ্গে মৃদঙ্গ বাজে না কিন্তু সঙ্গীতে মৃদঙ্গ অপরিহার্য। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনোহর আবৃত্তির সঙ্গেও খোলের সঙ্গত করেছিলেন। কবিতার ছন্দের সঙ্গে মৃদঙ্গের বোল খুব সুন্দর মিলে গিয়েছিল। প্রাচীন প্রবন্ধ

সঙ্গীত যখন ছন্দে গাওয়া হত তখনও বোধ হয় এই রকম একটা প্রথা ছিল।

কলকাতায় চার্লি বার্ড কোয়ার্টেট

সম্প্রতি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউটের বিবেকানন্দ হলে আয়োজিত চার্লি বার্ড ও তদীয় আরও তিনজন সহযোগীর যন্ত্র-সঙ্গীতানুষ্ঠান শোনবার সুযোগ হয়েছিল। এ'রা আমেরিকার জাজ শিল্পিগোষ্ঠী হলেও ক্লাসিকাল রীতির প্রয়োগও এ'দের বাজনায় লক্ষণীয়। প্রধান শিল্পী চার্লি বার্ডের গীটারে অভিনবত্ব আছে। আমাদের দেশের গীটারশিল্পীরা এ'র অনুষ্ঠান থেকে নতুন প্রেরণা পেতে পারেন। বার্ড রচিত ব্র. সোনাটা এবং ব্ল্যাক অরফিউস-এর পরে হ্যাণ্ডেল, পনস্, ডিউক এলিংটন প্রভৃতি সুরকারের রচনা বাজানো হয়। এই গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন মারিও দার্পিনো (বাঁশী), বিল রাইখেনবাক্ (ড্রাম) এবং চার্লির ভাই জো বার্ড (বাস্)। সুরবিহারে মারিও দার্পিনো বাঁশীতে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। ভারতীয় সঙ্গীতেও তাঁকে উৎকৃষ্টভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। অপর বাদকদের অনুষ্ঠানও প্রশংসনীয়।

সঙ্গীতাচার্য শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী

এ সম্পর্কে আয়োজকদের কাছে আমাদের নিবেদন যদি তাঁরা ভারতীয়দেরই এই জাতীয় বাজনা শোনাতে চান এবং তার সৌন্দর্য উপলব্ধি করাতে চান তাহলে এমন একটা ভূমিকা প্রস্তুত করা দরকার, যাতে আমেরিকান সঙ্গীতের বিশেষত্বগুলি ভালভাবে তাঁদের গোচরে আসে। এইভাবে কয়েকজন ভারতবাসীর উপস্থিতি উভয়-দেশের সঙ্গীত উপলব্ধির পক্ষে তেমন সহায়ক হয় বলে মনে হয় না।

পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের অনুষ্ঠানেও আজকাল ভারতীয় সঙ্গীতানুষ্ঠানের মত অবিরাম লোকের আসা যাওয়া এবং অসুবিধাকর আচরণ দেখা যাচ্ছে। এটা বন্ধ হওয়া দরকার।

রবীন্দ্রসদনে রুশ শিল্পী ফ্ললভ এবং বেলচেঙ্কো

বাংলা সরকারের উদ্যোগে রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত ইগর ফ্ললভ এবং ভ্যালেণ্টাইন বেলচেঙ্কোর অনুষ্ঠান আমাদের মনোরম লেগেছে। ফ্ললভের বেহালা এবং বেলচেঙ্কোর পিয়ানো এককভাবে এবং দ্বৈতভাবে সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও চিত্তাকর্ষক। আমাদের কাছে এই ধরণের ক্লাসিকাল বাজনাগুলিই ভাল লাগে কারণ উচ্চসঙ্গীতের রসে মনটা একটা সার্থক সঙ্গীত শুনে তৃপ্ত হয়।

এক্ষেত্রেও আমাদের বক্তব্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজেরাই যখন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন তখন সমগ্র অনুষ্ঠানটা কি আরও হৃদ্যতার সঙ্গে হতে পারত না? উভয়দেশের সঙ্গীতশিল্পের আদান-প্রদান ঘটাতে গেলে এই প্রণালীতে কনসার্ট দিয়ে বিশেষ লাভ নেই।

সঙ্গীতাচার্য শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী জন্মদিন

সম্প্রতি সঙ্গীতাচার্য শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী মহাশয়ের ৫৯তম জন্মদিবস পালন করেছেন তাঁর শিষ্য এবং বন্ধুবর্গ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী শ্রীযামিনী গাঙ্গুলী মহাশয়। শ্রীমতী কৃষ্ণা বসুর উদ্বোধন সঙ্গীতে সভা আরম্ভ হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানে যাঁদের নাম ঘোষণা করা হয় তাঁরা হচ্ছেন শ্রীমতী চিত্রা কাঞ্জিলাল, শ্রীনিরতী চক্রবর্তী, শ্রীমতী শ্রীলা চক্রবর্তী এবং শ্রীমণিলাল নাগ। তবলা সহযোগিতায় ছিলেন শ্রীশ্যামল বসু, শ্রীদ্বিজেন ঘোষ এবং শ্রীগোবিন্দ বসু। পরিশেষে শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী জয়ন্তী রাগে খেয়াল এবং পরে বাংলা গান গেয়ে শোনান। আমরা তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

আলোয় কালোয়

ত্রিশঙ্কু

প্রথম বিবাহবার্ষিকী কীভাবে উদ্‌যাপন করা যায়, এই নিয়ে আমাদের জয়ন্ত তার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করছিল একদিন। দুজনেরই ইচ্ছে, অনুষ্ঠানটি একেবারে ঘরোয়া ধরনের হয়, অথচ বৈচিত্র্যপূর্ণ। একটু উদ্ভট হলেও মন্দ হয় না। শহর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোনো এক ডাকবাংলোয় সেই দিনটা কাটিয়ে আসা যায় নির্জনে; কিন্তু তাতে কোনো মজা নেই। আবার কিছু আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করে একত্রে পানাহার ও অধিক রাত্রি পর্যন্ত আড্ডা দেওয়া যায়। কিন্তু সেরকম আড্ডা তো মাঝে মাঝেই হয়ে থাকে। কিংবা সকালবেলা হঠাৎ কারো বাড়ি গিয়ে হাজির হওয়া এবং তাদের সব কাজ ভণ্ডুল করে সারা দিন গান-বাজনা হইচই—প্রস্তাবটা নেহাত বাজে বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবু ব্যাপারটা যেন গতানুগতিক থেকেই যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত একটা ব্যবস্থায় রাজী হন দুজন। জয়ন্তর স্ত্রী উমা নিমন্ত্রণ করবে ওর এককালের বান্ধবী মানসী ও তার স্বামী তিনকড়িকে। যোগাযোগ না থাকলেও ওদের ঠিকানা জানে। মানসীর প্রতি জয়ন্তর প্রচণ্ড দুর্বলতা ছিল একসময়ে। শোনা যায়, কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে সে প্রেম নিবেদন করেছিল মানসীকে, সাড়া পায় নি। তারপর ঢের কান্নাকাটি, হৃদয়বিদারক দৃশ্য। ও বলেছিল অপেক্ষা করবে, যদি কখনো মানসীর মতিগতি পরিবর্তন হয়। অপেক্ষাও করে নি।...জয়ন্ত নিমন্ত্রণ করবে ওর কলেজ-কালের বন্ধু অসিত ও তার স্ত্রী লক্ষ্মীকে। দেখা-সাক্ষাৎ নেই অনেককাল, কিন্তু ওদের হদিস জানে। অসিত নাকি ছিল উমার বিশেষ গুণগ্রাহী, ওর গানের সমঝদার, ওর পাণিপ্রার্থীও। একেবারে হাল ছেড়ে দেবার আগে পর্যন্ত বোঝবার চেষ্টা করেছে—জয়ন্ত অস্থির প্রকৃতির ছেলে, সমর্পণের যোগ্য পাত্র নয় ও, কিন্তু তা সত্ত্বেও উমা বোঝেনি। উমা চিরকাল [illegible]। [illegible] [illegible]

উমার বড়ো অ্যাকাডেমিক, নীরস মনে হয়েছিল হয়ত।

যাই হোক, দুনিয়ায় কেউ-ই পড়ে থাকে না। এই পৃথিবীতে সবাই দুজন দুজন করে ভূমিষ্ঠ হয় সম্ভবত। একেবার দুর্ভাগ্য না হলে নিজের সঙ্গী প্রত্যেকেই পেয়ে যায় কোন দিন না কোন দিন। মানসী পেয়েছে তিনকড়িকে, অসিত পেয়েছে লক্ষ্মীকে। জয়ন্ত না উমা, কে কাকে বেশী পেয়েছে, ঠিক করে বলা মুশকিল। মোদ্দা কথা, ওদের একত্র জীবন প্রায় এক বছর পূর্ণ হতে চলল। এক জোড়া জুতোর মত ওরা পরস্পরের পরিপূরক হয়ে গেছে এর মধ্যে। তাই বিবাহবার্ষিকীতে ওদের সহজ ও অনায়াস জীবনটাকে একটু ঘুরিয়ে দেখতে হচ্ছে।

দৃশ্যটা কল্পনা করা যাক। ওদের কথোপকথন কিছু কিছু অনুধাবন করা যাক। প্রায় দাবার ছকের মধ্যে ঘুঁটির মতন ওরা দুজন বসে আছে, কোন খেলোয়াড় নেই, ঘুঁটিরাই হেঁটে হেঁটে নিজেদের চাল দিচ্ছে। তিনকড়ি ও লক্ষ্মী এই খেলায় দুজন বাইরের লোক, তাই ওদের প্রতি আপনি সম্বোধন।

গৃহস্বামী জয়ন্ত আপ্যায়ন জানাল—"আসুন তিনকড়িবাবু, আসুন আসুন লক্ষ্মীদি। আপনারা দেরি করে ফেলেছেন।" লক্ষ্মীদি একটু লজ্জিত বোধ করলেন—"আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে। বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়িয়ে আসা তো। আয়ার কাছে কিছুতেই থাকবে না। বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে এঁদের সঙ্গে দেখা।" তারপর একটা ছোট্ট উপহারের প্যাকেট উমার হাতে দিলেন।

অসিতের দিকে চেয়ে উমা বলল—"এসব কেন আবার? (তোমাদের বাচ্চা হয়েছে তা হলে। ছেলে, না মেয়ে? কী নাম রেখেছ? কত বয়েস? কার মত দেখতে হয়েছে বল না অসিত। তোমার চাকামুখো বউটার মতন, না তোমার মতন? যত শান্তশিষ্ট ভেবেছিলাম, ততটা নও তুমি—বউটার আদুরে চেহারা দেখেই তা বুঝতে পারছি।...ছি ছি।

আমি কেন উত্তেজিত হচ্ছি, আমার কী! তুমি সুখী হয়ে থাকলে ভালো, কেনই বা হবে না। দুনিয়ায় উমাই তো একমাত্র অভীষ্ট রমণী নয়।...একটু মোটা হয়েছ দেখছি, নাগালের মধ্যে তৃপ্তি থাকলে আরামে মানুষ যেরকম পৃথুল হয়।)"

অসিত, স্মিত হেসে জানাল—"এ আর এমন কী, তোমাদের মনে করে সামান্য একটা শুভেচ্ছার প্রতীক। বিয়ের সময় তো আসতে পারি নি। (আজও আমার আসার ইচ্ছে ছিল না। তুমি জয়ন্তর সংসার আলো করে আছ, দেখে আমার মাথায় খুন চেপে যাচ্ছে। তোমাকে নিয়ে সংসার পাতার স্বপ্ন তো আমিই দেখেছি উমা।...লক্ষ্মী বড়ো সরল মেয়ে, ওর মনে কষ্ট দিতে চাই নি, তাই আসা।...হাসিখুশি মুখ দেখে তোমাকে ব্যভিচারিণী মনে হচ্ছে, ইচ্ছে করছে হাত ধরে টানতে টানতে তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে যাই এখান থেকে, তোমার সর্বনাশ করি। প্রতিশোধের সময় হয়তো ফুরিয়ে যায় নি।)"

তিনকড়ি একটা ফুলের তোড়া এনেছেন। উমার হাতে দিয়ে গদগদ হয়ে বললেন—"বছরের পর বছর—পঞ্চাশ বছর—আপনাদের বিবাহবার্ষিকীতে যেন নিমন্ত্রণ পাই।" উমা খিলখিল করে হেসে উঠল—"এত দূর পর্যন্ত ভেবে রেখেছেন! আপনার কল্পনাশক্তি কবিকেও হার মানায়।"

—"রোগের চিকিৎসা করা আমার পেশা, কিন্তু—" তিনকড়ি একটু গর্বের সঙ্গে বললেন, "আজ সন্ধ্যেবেলা মনে হচ্ছে পৃথিবীতে কোথাও কোন অসুখ নেই।"

জয়ন্ত তিনটে গ্লাসে সমান করে পানীয় ঢালছিল, সোডা ও বরফ মেশাচ্ছিল। মেয়েদের জন্য কমলালেবুর সরবত। কথার সূত্র তুলে নিয়ে ও বলল, "নিয়মিত দু' আউন্স করে এই বস্তুটি সেবন করলে ছোটখাট অসুখ কাছে ঘেঁষে না। ফুর্তিরও অভাব হয় না। কী বলেন তিনকড়িবাবু! (মানসীর মত মেয়েকে পেয়ে তুমি ধন্য হয়ে গেছ হারামজাদা। জান কি, তুমি ওর নখের যোগ্য নও? পচা ঘা আর কুমি ঘেঁটে টাকা রোজগার করছ—সেই টাকাতেই মুগ্ধ করে রেখেছ সোনার প্রতিমাকে। কিন্তু মোহ একদিন ভাঙবে মানসীর। একদিন ও বুঝতে পারবে, যতই লম্বা-চওড়া কথা বল বানিয়ে বানিয়ে, তুমি তিনকড়ি হালদার আসলে অ্যানাটমি ছাড়া কিছু বোঝ না। কোন দিন বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত কনকনে ব্যথা অনুভব করেছ শুয়োর?)"

—"তা বলে গুচ্ছের স্পিরিট গিলে যে কৃত্রিম উত্তেজনা সৃষ্টি কর তোমরা, তার সঙ্গে সুখ বা আহ্লাদের কোন সম্পর্ক নেই।" মানসী মুখ খুলল। তিনকড়ির দিকে চেয়ে বলল, "তুমি ওই একটার বেশী খাবে না। তোমাকে গাড়ি চালাতে হবে মনে থাকে যেন।

"(জয়ন্ত, তোমার বদ অভ্যেসটা যায় নি এখনও দেখছি। মনে হয় বেড়েছে একটু। চিরকাল তুমি বে-হিসেবী রয়ে গেলে।...উমা একটু সামলায় না কেন।...তোমার অস্বস্তিটা কী, কোনদিন জানতে পারলাম না। আত্ম-বিশ্বাসের অভাব ছিল, তোমার ওপর নির্ভর করতে পারলাম না, তাই শেষ পর্যন্ত সব বাদ দিয়ে শুধু নিরাপত্তা বেছে নিয়েছি।... এবং আমি ভাল আছি জয়ন্ত।...তুমিও তো পেয়েছ তোমার মনের মত সঙ্গী একজন, সুখী হও, স্বাভাবিক হও...তোমার কুশলে আমি কুশল মানব।)"

লক্ষ্মী বললেন, "বড়ো কড়া শাসন দেখছি তিনকড়িবাবুর সংসারে। অবিশ্যি, শাসন না থাকলে শৃঙ্খলা থাকে না, শৃঙ্খলা না থাকলে শান্তি। (সত্যি কথা বলতে কী, আজকের সন্ধ্যার এই আসর আমার একদম ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে, সবাই নিয়ম ছেড়ে ব্যতিক্রমের কথা ভাবছে। এই যে জয়ন্তবাবু, মানসী, উমা ও আমার স্বামীটি পর্যন্ত— এরা সবাই এক অজানা রহস্যের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। স্পষ্টতায় সন্তুষ্ট না থেকে এরা যেন অন্ধকারের ভেতরে বোকার মতন নিজেদের দেখার চেষ্টা করছে। মুখে বলছে না কিছু, কিন্তু ওদের ব্যবহারে আমি স্বস্তি পাচ্ছি না, অসহায় বোধ করছি।) আমাদের কিন্তু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। বাচ্চাটা জেগে উঠলে কান্নাকাটি করবে।"

—"আমাদের বাচ্চাকাচ্চা নেই বটে, কিন্তু তার বদলে দুটি স্প্যানিয়েল আছে। ওদেরও আদর আবদার মানুষের চেয়ে কিছু কম নয়।" —তিনকড়ি ডাক্তার রসিকতা করলেন। —"তাড়াতাড়ি ভোজনপর্ব চুকিয়ে আমাদেরও ফেরা দরকার। কাল ভোরেই একটা রুগী... (কিছু একটা নিয়ে থাকা আর কি! নাকের বদলে নরুন, কিংবা নরুনের বদলে নাক। তফাত কী! বাচ্চার বদলে স্প্যানিয়েল, স্প্যানিয়েলের বদলে রুগী, রুগীর বদলে সাহিত্য, কবিতা, রাজনীতি আন্দোলন। কিংবা তার পরিবর্তে আরও বিমূর্ত কিছু —প্রেম, বিরহ, নিঃসঙ্গতা—তোমাদের বুদ্ধিজীবীদের যাবতীয় ব্যাধি।...মানসী? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না। মানসীরা থাকলে অনেক ব্যাপার সহজ হয়ে যায়। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—তথাকথিত জীবনমরণ সমস্যা—হাত বাড়ালেই সমাধানের জন্য এগিয়ে আসে।...কী তোমরা চাও, তা কি জান? যখন জান না, তখন যা পাচ্ছ, তাকেই সেরা বিকল্প ধরে নাও। নাকের বদলে নরুন, নরুনের বদলে নাক একই কথা, জীবননির্বাহ।)"

......সব মিলিয়ে ভালই কাটল সন্ধ্যেটা। অভ্যাগতরা আহার সেরে চলে যাবার পর আমাদের জয়ন্ত ও তার স্ত্রী উমা দুটো চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। একটু ক্লান্ত। উমা বলল, "এখন ক্লান্ত দম্পতী, গত বছর এমন সময় তুমি আমার হাতের ওপর হাত রেখে মন্ত্র পড়ছ, মনে আছে? (তিনকড়িবাবু বললেন, পঞ্চাশ এইরকম বিবাহবার্ষিকীতে নিমন্ত্রণ পেতে চান তিনি। এক জীবনে একটার বেশী এইরকম সন্ধ্যে কাটানো মুশকিল। বড্ডো অসহায় লাগছে, হাতের মুঠো খুলে যাচ্ছে।)"

জয়ন্ত বলল—"হুঁ।"

একটি সাক্ষাৎকার
(সমাজসেবা সম্বন্ধে ডাঃ ফুলরেণু গুহ)

কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের রাজ্যমন্ত্রী ডাঃ ফুলরেণু গুহ বলেন, একটি সংসারে একটি মা যদি একটি শিশুকেও উত্তরজীবনের সুস্থ ও সার্থক নাগরিক করে গড়ে তুলতে পারেন তবে তা হবে সমাজকল্যাণের মহা এক ব্রত উদ্‌যাপন। এই প্রসঙ্গে এক গল্প মনে পড়ে গেল। বাগ্‌দাদের এক মস্ত খলিফা। দরবারে তাঁর ধনীর অন্ত নেই। দানের কদর করেন খলিফা খুব বেশী। দরবারীদের একজন একদিন সগর্বে ঘোষণা করলেন, তাঁর যথা-সর্বস্ব তিনি সমাজের মঙ্গলের জন্য, সকলের কল্যাণের জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন। খলিফা চুপ করে রইলেন। কেন? সর্বস্ব দেওয়া সত্ত্বেও কি তিনি খুশী হন নি? দানবীরের মনে দারুণ দ্বিধা। তারপর এলেন আর এক সভাসদ্‌। তিনি বললেন, 'আমি দিয়েছি অর্ধেক জনহিতে, আর অর্ধেক রেখেছি আপন পরিবারের প্রয়োজনে।' খলিফা বললেন, 'সাবাস্‌।' সভাসীন সবাই স্তব্ধ, হতচকিত। সর্বস্ব যে দিয়েছে তার চেয়ে যে অর্ধেক দিয়েছে সেই বড় কল্যাণব্রতী? খলিফা বুঝিয়ে বললেন কথাটা। ঘরের মঙ্গল সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পরের মঙ্গল করা যায় না। ঘরের সকল দায়িত্বের দাবি মিটিয়ে তবে মঙ্গলকর্মের দ্বিতীয় সীমারেখা। আপনার আমার ঘরও তো সমাজেরই অংশ। বরং আমাদের সম্পর্ক ঘরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ।

ডাঃ গুহ নিজে আজীবন সেবাব্রতী। তাঁর মুখে কথাগুলি শুনতে খুব ভাল লাগছিল। সেই কবে সিলহেট স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী হিসাবে তাঁর সমাজ-সেবার প্রথম অধ্যায় আরম্ভ হয়, আর তারপর দিনের পর দিন, বছরের পর বছর সমস্ত শক্তি, সমস্ত শিক্ষা, সুযোগ, উদ্যম, নিষ্ঠা সব বিলিয়ে দিয়েছেন অপরের মঙ্গলসাধনে। তাঁরাও একান্ত বিশ্বাস, মেয়েদের সমাজের কাজ করতে হলে বাড়ির বাইরেই করতে হবে এমন নয়। বিরাট ক্ষেত্র রয়েছে নিজের সংসারে। মাঝে মাঝে মনে হয়, বহির্মুখী সভ্যতার ঝোঁকে বা আমাদের মেয়েরা ভেসে যাবে বাইরের টানে। ঘরের কাজের মর্যাদা তাদের কাছে ছোট হ'য়ে আসবে। আপনজনের সেবার নিরভিমান সার্থকতা সে যেমন করে দিতে পেরেছিল, তেমন করে বুঝি আর পারবে না। আর নিজেই অর্থনৈতিক পরিবর্তনের স্রোতে মেয়েরা অনেক সময় সংসারকে [illegible] সময় ও শ্রদ্ধা বা অনুরাগ দিয়ে উঠতে পারে না। তার উপর অন্য কারণে [illegible] অবহেলা করলে ঘরের সমষ্টি যে সমাজ তার ভবিষ্যৎ ভাবনার বিষয় হ'য়ে উঠতে পারে।

অবশ্য একথা আলোচনা করবার জন্য সেদিন ডাঃ গুহের কাছে যাইনি। আমার প্রথম জিজ্ঞাসা ছিল স্বেচ্ছাসেবা অথবা বৃত্তিমূলক বা পেশাদারী সেবা দুটির মধ্যে কোনটিকে তিনি আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বেশী উপযোগী মনে করেন।

ডাঃ ফুলরেণু গুহ

ফুলরেণুদি বলেছিলেন, [illegible] দুটিই সমান দরকার এবং দুটির [illegible] সহযোগিতায় সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সফল হতে পারবে। এই বিরাট উপ-মহাদেশে কল্যাণকর কর্মসূচীর সীমা নেই। অর্থশক্তি সীমারিত। কাজেই দুটি পাশাপাশি ধারা চলা ভিন্ন উন্নতির উপায় নেই।

Professional বা বৃত্তিমূলক সমাজ-সেবা ব্যবস্থাটি এদেশে এমন কি সমৃদ্ধ সবদেশেও অপেক্ষাকৃত নূতন। আমাদের বেলায় সরকার সক্রিয়ভাবে সমাজসেবীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন স্বাধীনতার পর। বৃত্তিমূলক সেবাও সেই সঙ্গে স্বীকৃতি পেয়েছে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও কিন্তু সমাজসেবার বৃত্তিমূলক এবং প্রায়োগিক বিদ্যা হিসাবে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা নেহাত সেদিনের। সভ্যতার আদিকাল থেকে দান-ধ্যান পরোপকার হ'য়ে এসেছে সত্য, কিন্তু তার রূপ ছিল ভিন্ন। দারিদ্র্য দোষ ছিল কিছুটা ভাগ্যের বিড়ম্বনা। তাকে সুযোগ দিয়ে সমান করবার চেষ্টা হ'তো না, তবে করুণা দিয়ে কাবু করা কখনও কখনও হ'তো। অর্থনীতির Laissez faire সেদিনও মধ্যবিত্ত ও ধনী সমাজকে কর্তব্যের অন্য পথ দেখিয়েছিল। অন্যের দুর্ভাগ্য দূর করায় হস্তক্ষেপ করা সে সমাজে মেনে নেওয়া হয়নি বলে শাসনতন্ত্রও এ বিষয়ে বিশেষ উদাসীন থাকতো। অথচ ব্যক্তিগত দয়াধর্মকে যথেষ্ট প্রশংসা করা হ'তো। প্রচুর লোকহিতকর কাজ ধর্মকর্মের মাধ্যমেও সব দেশে সবকালে চলে এসেছে। বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিন গরীব ও দুঃস্থের জন্য নিজের সময় ও অর্থ অকাতরে বিলিয়ে এসেছেন কিন্তু তিনি দুর্দশাগ্রস্তের জন্য সরকারী সাহায্যের প্রতিবাদে মুখর ছিলেন। ইংলণ্ডে poor laws আগেও কারখানার একটি আইন হয়েছিল। সেটি আবার কল্যাণকর্মে সরকারী সহানুভূতির নিদর্শনও বলা যেতে পারে। এই আইনে যেসব বালক বালিকা কারখানায় কাজ করতো এবং তাদের মধ্যে যাদের বয়স নয় থেকে তেরোর মধ্যে ছিল তাদের দিনে দু ঘণ্টা স্কুলে যাবার অনুমতি কারখানার মালিককে দিতে হতো। এইরকমই মিশ্র মনোভাবের দোলায় পশ্চিমেও যন্ত্র যুগের প্রথম অধ্যায় কেটেছে। মধ্যবিত্তও মন থেকে সম্পূর্ণ-ভাবে সহানুভূতিশীল হয়নি। দারিদ্র্য, দুঃখ, মহামারী, চুরি ইত্যাদি কিছুটা [illegible] করে নিম্নবিত্তের নতমস্তকে [illegible] ভাবনার পথ বন্ধ করাই অনেকটা সেকালের ধনী ও সংগতিপন্নের বোধ হয় উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু যন্ত্র যুগের অগ্রগতিতে [illegible] যেদিন মুষ্টিমেয়কে বিত্তবান করে তুলে মধ্যবিত্তকে হার মানতে বাধ্য করলো সেদিন

মধ্যবিত্ত মহাচিন্তায় পড়ে গেল। সত্যই তো অর্থনীতির সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থা তাদের কাজে লাগলো না। প্রতিযোগিতায় তারা দারুণ পিছিয়ে যাচ্ছে। তখনই শাসনযন্ত্রের হস্তক্ষেপের প্রশ্ন উঠলো। তারপর এল ত্রিশ শতকের মন্দা বাজার, নানারকম শ্রম আন্দোলন ইত্যাদি। সেই সূত্রেই পাকাপাকিভাবে মানুষের সমাজ-কল্যাণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মত পালটে গেল। দশের জন্য দেশের যে শাসনব্যবস্থা তার কাছে সমাজের অল্পভাগ্যজনের সাহায্য আশা ও দাবি করার দিন এল। সঙ্গে সঙ্গে পেশাদারী বা professional সমাজসেবীর জন্ম। অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করার বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত কর্মী-দলের উপজীবিকা হলো কল্যাণকার্য। পাঠ্য বিষয় হিসাবে নানা স্তরে সমাজসেবার শিক্ষা গ্রহণ আরম্ভ হ'লো। তার ঠিক পরেই আমাদের স্বাধীনতা এসেছে। স্বাধীন দেশের প্রত্যেকটি নাগরিক, প্রত্যেক শিশু যুবা বৃদ্ধ আপন অধিকারে সরকার ও সমাজের কাছে তার সমান সুযোগ দাবি করতে পারে। অন্তত সমাজবাদী গণতন্ত্রে তাই আশা করা যায়। আমাদের দেশেও সমাজকল্যাণের একটি ধারা সরকারী ও শাসনব্যবস্থার অঙ্গ।

ফুলরেণু গুহ মনে করেন, আজকের সমাজসেবা দয়ার দান নয়, সমাজের অংশ হিসাবে যেজন নীচে আছে তার দাবির প্রতিষ্ঠা। তাই পরস্পরনির্ভরশীল জন-গোষ্ঠী একে অন্যকে অবহেলা করলে নিজেরও মঙ্গল সম্ভব নয়। সমাজসেবার বিড়ম্বিত মানুষের সাহায্যের মধ্য দিয়ে সমাজের অন্য অংশের সমন্বয় হয়। যে পিছনে আছে তাকে টেনে সমান করার কাজে সকলের অংশ গ্রহণ, সকলের শিক্ষা, সকলের সাধনা হ'লে পরিবর্তনের নূতন ভাবধারা সহজ হবে। একটি দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের উপর করুণা করে তাকে দয়ার পাত্র বানিয়ে রাখা নয়।

মেয়েরা কি সমাজসেবার বেশী উপযুক্ত? জিজ্ঞাসা করলাম ডাঃ গুহকে। "অপরের প্রতি সহানুভূতিতে মেয়ে পুরুষ সমান। সমাজসেবার কর্মীও তাই কেউ কম নয়। তবে সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের সাহায্য-প্রাপ্ত সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের ৬,০০০টির মধ্যে ৪,০০০টি মহিলা প্রতিষ্ঠান।"

হয়তো বা আজও মেয়েদের হাতে কিছু সময় বেশী, তাই স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে তারা সমাজের কল্যাণে কিছু সময় দিতে পারে। পুরুষ ও মহিলা সমাজসেবীর প্রভেদ সম্বন্ধে একবার একটি পুরুষ কর্মী আমাকে তাঁর নিজস্ব মতামত উল্লেখ করেছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন, মেয়েরা পরের দুঃখে বেশী সহজে নরম হ'য়ে যায়। পুরুষ অগ্রপশ্চাৎ বেশী বিবেচনা করে বলে আপাত-দৃষ্টিতে তাকে কঠিন মনে হয়। আমাদের মনে হয়, অপরের প্রতি সহানুভূতির ব্যাপারে জোর করে কিছুই বলা যায় না। মানুষে মানুষে যতটা তফাত মেয়েপুরুষেও সম্ভবত ততটাই তফাত। তবে ফুলরেণুদি যে সমাজের দুঃখদুর্দশার প্রতি সচেতনতার কথা বলেছেন, সে ক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে বেশী কাজ করতে পারেন। তাঁদের প্রভাব ব্যাপক ও গভীর। বিড়ম্বিত মানুষের বিড়ম্বনা দূর করা তার প্রতি দয়া বা করুণা নয়, আমাদের দায়িত্ব। সরকারও আমাদের নিজস্ব সরকার। তাই সরকারী হোক, বেসরকারী হোক, বঞ্চিতজনের দাবি প্রত্যেক পর্যায়ে মানতে হবে।

সমাজকল্যাণকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের এক বিশেষজ্ঞ বড় সুন্দর বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে সমাজ কল্যাণ বা social welfare হ'চ্ছে "organised activity that aims at a mutual adjustment of individuals and their social environment." সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির অবিরোধ সমন্বয়-সাধনাই সমাজসেবা। গণতন্ত্রের শাসনযন্ত্রে অথবা সাধারণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নিষ্ঠায় সেই সমন্বয় সমস্ত কর্মতৎপরতার উদ্দেশ্য।

আমাদের মেয়েরা সমাজসেবাকে স্বেচ্ছা-সেবাভাবে গ্রহণ করুন অথবা উপজীবিকা হিসাবে বিশেষজ্ঞের পর্যায়ে পৌঁছে যান, দুটিই সমান নিষ্ঠায় যোগ্য। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে ফুলরেণুদিও সে কথাই বলেছেন। সেবার গুণ নির্ভর করে সেই নিষ্ঠার উপর। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি নিয়ে উপজীবিকা হিসাবে যে সমাজকল্যাণে ব্রতী হয় তার সেবা উৎসর্গ করা স্বেচ্ছাসেবার সমান নাও হ'তে পারে। তবে সমাজসেবাও ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। কাজেই সেবার কোন কোন পর্যায়ে বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত professional সেবীর বিশেষ প্রয়োজন। ক্রমশ বৃত্তি হিসাবে সেবাব্রত গ্রহণের সুযোগ আসবে। আমাদের মেয়েদেরও নিষ্ঠা দিয়ে হিতব্রতকে উপজীবিকা হিসাবে নেবার সম্ভাবনা বাড়বে। সেখানেও সমাজে সামগ্রিক সচেতনতা বিশেষ প্রয়োজন। বৃত্তিধারী সমাজসেবিকারাও সে কথাই বলেন। সবার সচেতনতা ভিন্ন তাঁদের কাজও অসম্ভব।

ডাঃ ফুলরেণু গুহ বারবার যে কথা বলেছেন, আমাকেও সে কথা আবার বললেন। সেটাই সমাজকল্যাণের প্রধান কথা। সংসারে হোক, আপন পারিপার্শ্বিকে হোক, বৃহত্তর সমাজে হোক, সহানুভূতি সবার উপর। সহানুভূতিশীলতার প্রসার যদি আমাদের মেয়েরা করতে পারেন তবে উদার-হৃদয় সমাজসেবীর অভাব হবে না।

শ্রীমতী

কলিকাতায় সম্প্রতি যথারীতি রবীন্দ্র-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। এইদিনে ছুটির ব্যবস্থাও ছিল, তবে সেই ছুটি ঘোষণা করিয়াছেন শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকার; কেন্দ্রীয় সরকার হয়ত 'আরাম হারাম হ্যায়' নীতি মনে করিয়াই রবীন্দ্র

বিশ্বকবি জোড়াসাঁকোর

জন্মোৎসবের ছুটি দেন নাই। বিশু খুড়ো বলিলেন—"কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মনিষ্ঠার তারিফ করতে হয়। আমরা বলি, রবীন্দ্রনাথ যখন শুধু জোড়াসাঁকোর কবি তখন ছুটিটা শুধু জোড়াসাঁকো এলাকা অধীন অফিস এবং বাণিজ্য সংস্থায় সীমায়িত রাখলে একসঙ্গে রথ দেখা আর কলা বেচা দুই-ই চলে!"

বিহারের জনৈক সদস্য রাজ্যসভায় অনুযোগ করিয়াছেন, তাঁহার রাজ্যে চোরাপথে প্রচুর চীনা চিনি আসিতেছে। হিন্দী চিনি আর চীনী চিনির মধ্যে ফারাক বাহির করার জন্য শ্রীমোরারজী দেশাই সদস্যদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"মনে হয় হিন্দী চিনিটা মৃন্ময় এবং চীনী চিনিটা চীন্ময়; লাঁও মার্কা আর মাও মার্কাও হয়ত আছে কিন্তু আমাদের মতো চিনির বলদ অতশত জানবেই বা কী করে।"

সংবাদে শুনিলাম : কলিকাতা কর্পোরেশনের সাম্প্রতিক উপ-নির্বাচন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সহযাত্রী বলিলেন—"বিঘ্নবিনাশকে যাঁরা উল্টে দিয়েছেন তাঁদের কাজ নির্বিঘ্নে হওয়া একটা সংবাদের মতো সংবাদ, হয়ত মানুষের কুকুর কামড়ানোর চেয়েও জোর নিউজ।"

প্যারিসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর ভিয়েৎনাম শান্তি বৈঠক বসিতেছে জানিতে পারিয়া সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্ট নাকি বলিয়াছেন : বহুদিন পর একটি সুখবর পাওয়া গেল। খুড়ো বলিলেন—সুখবর বটেই। তবে আমাদের কথা হল—[illegible] জাতিসংঘ [illegible] তেল দেওয়াটা [illegible] এবং [illegible] কিছু [illegible]।"

একটি [illegible] পত্রিকায় : [illegible] হাজার [illegible]

ট্রামে বাসে

অসংখ্য।—"নিশ্চয়ই অসংখ্য এবং তাঁদের একটা নামকরণও করা হয়েছে—বি এন জি এস অর্থাৎ বিলেত না গিয়ে সাহেব"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

গুণ্ডাতালিকা হইতে বৃদ্ধ ও নিষ্ক্রিয় গুণ্ডাদের নাম বাদ দিয়ে সক্রিয় উঠতি গুণ্ডাদের নাম তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।—"কিন্তু শুনেছি, কাগজের ওপর নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। মাগগীগণ্ডার বাজারে তালিকার জন্য কাগজ সংগ্রহ করতে গিয়ে মজুরি পোষাবে"—মন্তব্য অন্য এক সহযাত্রীর।

শ্রীমোরারজী দেশাই বলিয়াছেন,—দীর্ঘ ৫০ বৎসর পড়াশোনা করার পর আমি বুঝিয়াছি, মিঠাই প্রভৃতি দ্রব্যাদি খাইতে সুস্বাদু বটে, কিন্তু ঐগুলির কোন পুষ্টিগুণ নাই। সহযাত্রী বলিলেন—"কিন্তু দিল্লীর লাড্ডুর পুষ্টিগুণ না থাকলেও তুষ্টিগুণ আছে।"

পৌরসভায় সংবাদে শুনিলাম, জঞ্জাল পোড়ানর যন্ত্র বসান হইতেছে।—"কলকব্জার কথা ত কিছু বলা যায় না, তার চেয়ে রবীন্দ্রনাথের আগুনে জ্বালো, আগুনে জ্বালো, ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেল' গানটি পৌরপিতারা সমবেত কণ্ঠে সকাল-সন্ধ্যা গেয়ে দেখতে পারেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

পৌরসভা প্রসঙ্গে মনে পড়িল, দিল্লীর ডেপুটি মেয়র বলিয়াছেন, দুই ধরনের কাজ আছে—ভিজা আর শুকনা। যে কাজে উপরি মিলে সেটা ভিজা আর যাতে তা মিলে না সেটা হইল শুকনা। খুড়ো বলিলেন—"এটা শুধু দিল্লীর কথা নয়, একেবারে পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ-র কথা, কোথাও কোথাও [illegible] জন্য উপরির ঢল নামে!!"

ডঃ রাইট দুই হাজার ব্রিটিশ পুরুষ সম্পর্কে একটি সমীক্ষা চালাইবার পর এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, তারা অফিসে সিংহ, বাড়িতে মেষ।—"এই সমীক্ষাও অর্থ এবং সময়ের অপচয় ছাড়া কিছু নয়। সিংগী মশাইরা বাড়িতে এসে যে একবারে ভেড়া বনে যান তা প্রমাণের জন্য সমীক্ষার প্রয়োজন নেই, না ব্রিটেনে, না কোন দেশে" বলে আমাদের শ্যামলাল।

কেপ টাউন হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, জনৈক বৃদ্ধ (৯৪) সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করে এক বৃদ্ধাকে (৭৫) বিবাহ করেন। নবদম্পতির পূর্ব-বিবাহের সূত্রে ১৫ জন নাতি-নাতনী এবং ৫ জন প্রপৌত্র-প্রপৌত্রী আছে।—"এজ ইজ নো বার এবং লুপ সেখানে লুপ্ত" বলেন সহযাত্রী।

কলিকাতায় প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, পাকিস্তানী সেকটর কমাণ্ডার নদীয়ায় ভারতীয় সেকটর কমাণ্ডারকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, পাকিস্তানের তরফ হইতে আর গুলিবর্ষণ হইবে না।—"ভারতীয় সেকটর কমাণ্ডার নিশ্চয়ই বলেছেন—সম্রাট মহানুভব"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

রাজ্যসভায় শ্রী পার্থসারথি মোরারজী দেশাই সম্পর্কে বলেন : মোরারজী অফ ব্রেক বলে ইস্পাতের আসবাবপত্রকে বোল্ড করিয়াছেন, লেগ ব্রেকে করিয়াছেন মিষ্টদ্রব্যকে, মাদক দ্রব্যকে সাবাড় করিয়াছেন গুগলি দিয়া। সহযাত্রী বলিয়া উঠিলেন—"মাদক দ্রব্যের বেলায় তিনি গুগলি ছাড়েননি, ছেড়েছেন একটি "বীমার" !!"

সোনার সংসারের" টেলিফোন কাইট্যা দিছে ডায়লগটি সত্য ব্যানার্জির নয়, সত্য মুখার্জির, এই কথা জানাইয়াছেন জনৈক পত্রপ্রেরক। তাঁকে ধন্যবাদ, লেখার সময় আমাদেরও বুঝি স্মৃতির তার "কাইট্যা গেছিল"।

আলোচনা

সর্ব ভারতীয় কবি সম্মেলন

কলকাতার রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠিত সর্ব-ভারতীয় কবি সম্মেলনের প্রথম দিনের অনুষ্ঠান সম্পর্কে সনাতন পাঠকের মন্তব্য-গুলি পড়ে বিস্মিত হয়েছি। অনেক বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও এমন একটি সম্মেলন খুব সার্থকভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ায় বোধ হয় তিনি খুব দুঃখিত হয়েছেন। তা না হলে কি করে কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে তিনি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বলে আবিষ্কার করলেন? কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এই সম্মেলন উদ্বোধন করায় তিনি খুব ক্ষুব্ধ। কিন্তু সনাতন পাঠক মশাই লক্ষ করলে দেখতেন যে, এই ধরনের সর্বভারতীয় সম্মেলনে এটা খুবই স্বাভাবিক এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে ডেকে উদ্যোক্তারা যথার্থই সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত সনাতন পাঠক এই সম্মেলনের সভাপতি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, তাতে আমাদের সমগ্র সম্মেলনকেই অপমান করা হয়েছে। শ্রীসতীকান্ত গুহকে সনাতন পাঠক নিশ্চয়ই চেনেন। কারণ, তাঁরই আমন্ত্রণপত্র হাতে নিয়ে তিনি সম্মেলনে প্রবেশ করেছেন। সারা ভারতের যে-সমস্ত কবি এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য এসেছিলেন, তাঁরাও তাঁর আমন্ত্রণেই। এ ছাড়াও সমস্ত অনুষ্ঠানটিই হয়েছে শ্রীসতীকান্ত গুহের তত্ত্বাবধানে। সনাতন পাঠকের নিশ্চয়ই তাঁকে জানা উচিত ছিল। শুধু তাই নয়, সনাতন পাঠক নিজেই কয়েকবার সম্মেলনের সংবাদ প্রকাশ করবার সময় তাঁকে সভাপতি হিসেবে উল্লেখ করে-ছেন। হঠাৎ এক রাতে স্মৃতিভ্রষ্ট হলেন কি করে? এই ধরনের সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। উত্তরে আমি স্মারকগ্রন্থ থেকে শ্রীবুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য তুলে ধরছি—"বিশেষত ভারতবর্ষের মতো বহুভাষী ও বিচিত্র দেশে, যেখানে নিকট প্রতিবেশীর সত্তাও অনেক সময় আমাদের কাছে অস্পষ্ট, সেখানে পারস্পরিক প্রত্যক্ষ সংযোগের ফলে, আশা করা যায়, আমরা অন্তত পরস্পরকে আরো একটু বাস্তবভাবে জানতে পারবো, এবং 'ভারতবর্ষ' বলতে সত্যি কী বোঝায়, সে বিষয়েও আমাদের ধারণা কিছুটা পরিচ্ছন্ন হবে।"

আশিস সান্যাল
সম্পাদক, সর্বভারতীয় কবি সম্মেলন

রবীন্দ্র সদনে রবিশঙ্কর

"রবীন্দ্র সদনে রবিশঙ্কর" শীর্ষক রচনাটির জন্য লেখক [illegible] অর্থাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ও [illegible] এই অনুষ্ঠানের [illegible] সমালোচনা প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ সম্পাদককেও। ওই রচনায় অনুষ্ঠানের নানা ত্রুটির উল্লেখ আছে। উদ্যোক্তাদের একজন হিসাবে সেই ব্যাপারে কিছু বক্তব্য পেশ করতে চাই।

এক : সুরেশ সংগীত সংসদ সেদিন যে অনুষ্ঠান করেন তার দুটি ভাগ ছিল—(ক) জন্মদিন উপলক্ষে রবিশঙ্করের সংবর্ধনা, (খ) সংগীতের আসর। আলাদা হলেও অবশ্য একটি অংশ অপরটির সঙ্গে যুক্ত। 'দেশ' পত্রিকার রচনাটিতে প্রথম অংশকে মনে হল যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া হয় নি। মোটরকেড, পতাকা-সজ্জা ইত্যাদির উল্লেখে যেন বিদ্রূপের একটি ভাবই লক্ষ করলাম। গুণী শিল্পীকে রাজকীয় মর্যাদায় বরণ করার চেষ্টা কি উপহাসের বস্তু? প্রসঙ্গত, সংবর্ধনা শুরু হবার মুহূর্তে পটকা ফাটানো হয় নি, এরকম অনুষ্ঠানে পটকা ফাটালে কাজটা নিঃসন্দেহে বিসদৃশ হত; তা ছাড়া সামনে যে একটি হাসপাতাল, সেই কথাও উদ্যোক্তাদের স্মরণে ছিল। আসলে আকাশে কিছু হাউই উড়েছিল তারা কেটে কেটে। লেখকের কাছে এটা যদি "ছেলেমানুষি" মনে হয় তো বলব, অনুষ্ঠানের যে-কোনও আড়ম্বরই ছেলে-মানুষি—সংবর্ধনার ব্যাপারটাকেও কেউ কেউ ওই আখ্যা দিতে পারেন।

দুই : কমেণ্টারি সহ স্লাইড দেখিয়ে রবিশঙ্করের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপনের প্রয়াস লেখকের ভাল লাগে নি, বোঝা গেল। কিন্তু এর বিকল্প কী ছিল? বক্তৃতা, বক্তৃতা এবং বক্তৃতা—যা শ্রোতাদের শুধু বিরক্তই করে। সেই বস্তুটিকে সংসদ সুকৌশলে এবং বলা যেতে পারে নির্মম-ভাবে ছেঁটে বাদ দিয়েছিলেন। সভাপতি বলেছিলেন দুই মিনিট, মানপত্র পড়তে লেগেছিল বড় জোর তিন মিনিট, আর সংবর্ধিত শিল্পী তো একটি বাক্যেই তাঁর বক্তব্য শেষ করেছিলেন। রবিশঙ্করের সেই একটি উচ্চারিত বাক্য : "সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, এখন কোনও কথা বলব না, যা বলবার বলব সেতারে।" আমরা এই দিক দিয়ে কৃতার্থ, আমাদের প্রয়াসের স্বীকৃতি তিনি দিয়েছেন। আমরা সত্যিই "সুন্দর পরিবেশ" সৃষ্টি করতেই চেয়েছিলাম।

স্লাইড দেখানো (যাকে ম্যাজিক লণ্ঠন বলে ঠাট্টা করা হয়েছে) সংসদের এই প্রথম নয়। এর আগে প্রতি অনুষ্ঠানেই স্লাইডের সাহায্যে ঘোষণা করা হয়েছে। এবং সেইসব অনুষ্ঠানের সমালোচনায় দেশ পত্রিকায় ওই ব্যাপার নিয়ে কখনও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয় নি। বরং প্রতি অনুষ্ঠানকে "মনোজ্ঞ" অথবা "পরিচ্ছন্ন" বলা হয়েছে। এই জিনিসটি বর্তমান রচনার লেখকের কেন গ্রাম্য মনে হল, জানি না। সঙ্গে কমেণ্টারি ছিল বলে? রবিশঙ্কর সম্পর্কে তাঁর নিঃসন্দেহে সব কথাই জানা ছিল—কিন্তু আসরের অন্য সকলের দিকটাও তো ভাবতে হয়। ধারা-ভাষ্যের উচ্চারণ গদগদ হয়েছিল কিনা সে প্রসঙ্গে যাব না; কারণ, এটা সম্ভবত লেখকের ব্যক্তিগত মত।

তিন : জাতীয় সংগীতের ব্যাপারে যে ত্রুটির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তা অনস্বীকার্য। অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা হিসাবে এর জন্য আমার পরিতাপের সীমা নেই। কিন্তু সেদিনের সেই বিচ্যুতি কি জাতীয় পতাকা পোড়ানোর সমান অপরাধ—একই রকম দণ্ডণীয়? জাতীয় পতাকা পোড়ানো দেশদ্রোহিতা—সেখানে সেই মনো-ভাবই সক্রিয় থাকার কথা। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির ফলে যদি জাতীয় পতাকার অসম্মান হয় তবে তা নিশ্চয় বেদনাদায়ক ঘটনা, কিন্তু তাকে বোধ করি দণ্ডণীয় অপরাধ বলা সঙ্গত নয়। অনুরূপ "অপরাধ" যে হামেশাই নানা প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়!

সব শেষে আমার বক্তব্য, সংসদের অনুষ্ঠানে "ছেলেমানুষি" থাক বা না-ই থাক, গোটা ব্যাপারটাতে একটা পরিকল্পনার চিহ্ন ছিল, আর একটি ত্রুটি ছাড়া সে পরিকল্পনার রূপায়ণও, আমাদের ধারণা, পরিচ্ছন্ন হয়ে-ছিল। তার স্বীকৃতি দেশ পত্রিকার সমা-লোচনায় পেলাম না বলেই যা দুঃখ।

কানাইলাল বসু
যুগ্ম-সম্পাদক,

কে-এক-সতীকান্ত গুহ

দেশ পত্রিকার 'সাহিত্য সংবাদ' বিভাগে শ্রীসনাতন পাঠক মশাইয়ের সর্বভারতীয় কবি-সম্মেলন সম্পর্কিত আলোচনা পড়ে যারপর-নাই ক্ষুব্ধ এবং বিস্মিত হয়েছি। সনাতন পাঠক দেশের মতন একটা বহুলপ্রচারিত সাপ্তাহিকে একটি নিয়মিত সাহিত্য সংবাদের ফিচার লিখছেন অথচ শ্রীসতীকান্ত গুহ মশাইয়ের মতন একজন নাম-করা "কবি, ঔপন্যাসিক, ছোট গল্প লেখক, সম্পাদক এবং শিক্ষাজীবী"র নাম জানেন না এটা নিঃসন্দেহে দুঃখের। সনাতন পাঠকের হয়ত ধারণা, যেহেতু কোনো প্রামাণ্য কবিতা-সংকলনে সতীকান্ত গুহ মশাইয়ের কবিতা নেই, অতএব তিনি কবি নন। কোনো কাব্য-

সংকলনে সতীকান্তবাবুর কবিতা নেই ত কি হয়েছে, সর্বভারতীয় কবি-সম্মেলনের যে সুভ্যেনির প্রকাশিত হয়েছে তাতে ত তাঁর কবিতা রয়েছে। উক্ত কবিতাবলী কি সনাতন পাঠকের চোখে পড়ে নি? কিন্তু একেবারে দৃষ্টিশক্তিহীন না হলে সেগুলিও চোখ এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়। কারণ, উক্ত সুভ্যেনিরে সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন কোনো কবিরই ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী কবিতা নেই একমাত্র সতীকান্ত গুহ মশাই ছাড়া। এর চেয়ে সতীকান্ত গুহের কবি-পরিচিতির আর কি প্রমাণ চান সনাতন পাঠক? যেখানে উমাশংকর যোশী, কা না সুব্রামনিয়ম, শচী রাউথরায় প্রভৃতি খ্যাতিমান কবিবৃন্দের জন্যে তিন থেকে চার পাতা বরাদ্দ সেখানে সু-দী-র্ঘ ছয় পাতাব্যাপী কবি সতীকান্ত গুহ মশাইয়ের উপস্থিতি [illegible] সনাতন পাঠক Convinced নন?

জানি না, সনাতন পাঠক মশাই তুলনা-মূলক পর্যবেক্ষণে বিশ্বাসী কিনা, যদি হতেন তা হলে বুঝতেন যে, সর্বভারতীয় বিচারে সতীকান্ত গুহ মশাই অন্তত কা না সুব্রমনীয়মের চেয়ে 'তিন লাইন' বড় কবি। কারণ, প্রথমোক্ত জনের সম্বন্ধে পরিচিতি

দেওয়া হয়েছে পাঁচ লাইনে, এবং দ্বিতীয় জন মাত্র দুটি লাইনের যোগ্য বলে বিবেচিত।

এ ছাড়া আর একটি বিষয়ের দিকেও অমনোযোগী সনাতন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 'গৌরবে বহুবচন' আপ্তবাক্যটির সার্থক প্রয়োগ সম্ভবত ভারতবর্ষে একমাত্র সতীকান্ত গুহ সম্বন্ধে করা চলতে পারে। কারণ, সাহেবদের সতীকান্তবাবু 'একজন' নন—বহু! পরিচিতির দুটি লাইন উদ্ধৃত করলেই আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে : poet, novelist, shortstory writer, editor and educationist; writers both in English and Bengali, ... [বড় অক্ষর আমার]

এ-হেন একাই-এক শ' গ্রন্থের কবি সম্বন্ধে সনাতন পাঠক 'কে এক সতীকান্ত গুহ'-এর মতন লাইন লিখেছেন ভেবে আমি অন্তত বিক্ষুব্ধ।

বিমল রায়চৌধুরী
কলকাতা-২৫।

রপ্তানি বৃদ্ধির সরকারী চেষ্টা

"দেশ"-এর ১৬ মার্চ তারিখের সংখ্যায় আলোচনা বিভাগে শ্রীশংকর চট্টোপাধ্যায়ের লেখা "রপ্তানি বৃদ্ধির সরকারী চেষ্টা" পত্রে যে মন্তব্য রয়েছে তা বিভ্রান্তিকর ও ভিত্তিহীন।

প্রথমত, শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ যে, প্রদর্শনীতে "ইণ্ডিয়ান স্টল" একটি উপেক্ষিত স্থানে স্থাপিত হয়। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, এই উপলক্ষে রপ্তানি বাড়ানোর কাজে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতাবাসের কোন উদ্যোগই ছিল না। দুর্ভাগ্যবশত এই সমালোচনা অপ্রাসঙ্গিক। কারণ ভারত সরকার Gruene Woche নামে পরিচিত এই কৃষি-প্রদর্শনীতে যোগদানের সিদ্ধান্তই নেননি। উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে তা স্থির হয়। আমি তাই বিস্মিত হচ্ছি, যেখানে ইণ্ডিয়া স্টল-ই ছিল না, শ্রীচট্টোপাধ্যায় কী করে তা সেখানে আবিষ্কার করলেন।

দ্বিতীয়ত, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ndian Cashew and Spices xport promotion council ই প্রদর্শনীতে বেসরকারীভাবে যোগ য়েছিলেন। শ্রীচট্টোপাধ্যায় এই স্টলটির খা ভেবে থাকতে পারেন। কিন্তু তিনি স্টলের উপরে সাইন-বোর্ডটিও দেখেননি? হেতু সরকার প্রদর্শনীতে যোগ দেননি ং অর্থব্যয় করেননি তাই স্টলটিও ছিল টে। এবং কাউন্সিলের নিজস্ব [illegible] তে সাজানো ছিল—যা [illegible] মতই খাচ্ছিল। অবশ্য ব্যবসায়িক দিক ক এই স্টলটি [illegible] হয় এবং লক দর্শকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

জার্মানীর প্রেসিডেন্ট শ্রীল্যুবকেও ছিলেন দর্শকদের মধ্যে একজন।

দুঃখের বিষয়, শ্রীচট্টোপাধ্যায় নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেননি। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতাবাসের সংগে যোগাযোগ করলেই তা পাওয়া যেত। তা না করে তিনি ভুল তথ্য প্রকাশের জন্য ব্যগ্র হলেন। ব্যাপারটি সত্যিই দুঃখজনক।

পি দাশগুপ্ত
কনসাল জেনারেল বার্লিন

লক্ষ্মার কৃপালাভ–বাঙালীর সাধনা

এ দেশে গেঞ্জি, জারসী বা মোজা জাতীয় বোনা বস্ত্র উৎপাদন সম্বন্ধে (দেশ—২০-৪-৬৮) একটি তথ্য উল্লেখ করছি যাতে দেখা যাবে যে, বোম্বাই অঞ্চলে এই ধরনের বস্ত্র উৎপাদন 'চ্যানেল আইল্যান্ডস' বা বাংলা দেশের অনেক আগেই হত। বম্বে সম্বন্ধে লেখা স্যামুয়েল টি শেপার্ড-এর একটি পুস্তকে আছে—

"From London in 1683 came a demand for cotton knit stockings said to be made at Goa and Bombay, which cost there about 12 d to 16 d per pair and some finer to 18 d."

এতে বোঝা যায় যে, ভারতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে বোনা মোজা ইত্যাদি বাংলা দেশে উৎপাদিত হবার অনেক আগেই বিদেশে চালান যেত।

সলিল ঘোষ
বোম্বাই-১৪

প্যারিসের চিঠি

১৩ই এপ্রিলে প্রকাশিত দেশ পত্রিকায় শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্যারিসের চিঠিতে লেখা একটি বক্তব্যের তথ্যগত ভ্রান্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "কলকাতায় মেট্রো গাড়ি অচল বাংলার নরম মাটি পরীক্ষা করে রায় দিয়েছেন রেঁপিত' প্রেনাফ ..." এই বক্তব্যটি বহুপ্রচারিত একটি ভ্রান্তি। এটা প্রমাণ করার জন্য ভূগর্ভ রেল (মেট্রো) সম্বন্ধে কিছু তথ্য আমি তুলে ধরছি।

১৯৪৯-এ পশ্চিম বাংলা সরকারের আমন্ত্রণে "Companie du Chemin de Fer Metropolitan de Paris একটি বিশেষজ্ঞদল পাঠান। এঁরা সমীক্ষা করে একটি রিপোর্ট পেশ করেন কলকাতার ভূগর্ভ রেল সম্বন্ধে। এ ছাড়া আর কোনও ফরাসী বিশেষজ্ঞ এই ব্যাপারে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন বলে আমার জানা নেই। তবে শ্রীরেঁপিত'-রেন্যাফ এই বিশেষজ্ঞদলে থাকতে পারেন। উপযুক্ত রিপোর্টের সুপারিশ হল কলকাতায় দুটো ভূগর্ভ রেলের রুট নির্মাণ করা—একটা হাওড়া ময়দান থেকে শিয়ালদহ (৩·৯১ মাইল), আর একটা পাইকপাড়া থেকে কালিঘাট (৭·১৪ মাইল)। এই দুটো রুটই ডালহৌসী স্কোয়ার হয়ে যাবে। এর নির্মাণ খরচের একটা আনুমানিক হিসাব এতে দেওয়া আছে। ফরাসী বিশেষজ্ঞদল যদি মনে করতেন মাটি নরম বলে ভূগর্ভ রেল অচল, তাহলে নিশ্চয় এ সুপারিশ হতে পারে না।

আর একটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে এই বিশেষজ্ঞ দল মাটি সম্বন্ধে যে জরিপ করিয়েছিলেন তা ওপর ওপর এবং এর ওপর ভিত্তি করে কোনও সুনিশ্চিত সুপারিশ সম্ভব নয়।

ফরাসী রিপোর্টের নবম অধ্যায়ে যেখানে মাটি সম্বন্ধে বলা হয়েছে সেটা নিচে তুলে দিচ্ছি। এখানে দেখা যাবে—(১) কোথাও বলা নেই কলকাতার মাটি নরম বলে ভূগর্ভ রেল সম্ভব নয় ও (২) কলকাতার মাটি সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে তা ওপর ওপর।

"The Calcutta subsoil is constituted on almost the whole of its surface of an agglomeration of argillaceous alluvium, of varied appearance but nearly allied in kind and of practically indefinite depth. It seems, however, that this alluvium is traversed in certain places by a thick layer of sand, probably quick sands, and situated at a depth below 45 feet. Upto the present, sounding operations have only touched one of these points, on the left bank of the river, and close to it. Nevertheless, there may well be others. Alluvium and sand are entirely saturated, the level of the layer of "phreatic" water below the surface of the soil."

এ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য নগরীর, যেখানে ভূগর্ভ রেল চালু আছে, মাটি সম্বন্ধে কিছু তথ্য তুলে ধরা অবান্তর হবে না। শিকাগোতে ভূগর্ভ রেল তৈরী হয়েছে ১৯৪০-এ। শিকাগোর মাটি কলকাতার মতই নরম। অসলোতে ভূগর্ভ রেল নির্মাণের কাজ ১৯৬০-এ আরম্ভ হয়েছে। অসলোর মাটি কলকাতার চেয়ে অনেক নরম।

কলকাতার নরম মাটিতে ভূগর্ভ রেল সম্ভব নয় এই ভ্রান্তিটির বিরুদ্ধে তথ্যগত প্রমাণ উপস্থাপিত করার সুযোগ আমি হারাতে চাইলাম না। কারণ এই ভ্রান্তিটি বিশেষ প্রচার লাভ করেছে। এটা দৈনিক পত্রিকার প্রকাশিত হয়েছে, [illegible] নিয়েছেন, দুঃখের বিষয় অনেক [illegible] মেনে নিয়েছেন, [illegible] এই ভ্রান্তিটিকে ব্যবহার করা হয়েছে [illegible] ভূগর্ভ রেলের দাবিকে [illegible]

পার্থসারথি [illegible]

আমি ফরাসী

আদিত্য সেন

দিল্লীর গ্রীষ্মকালের এক দুপুরবেলা কনট্‌প্লেসের এক বইয়ের দোকানে শূন্য মনে বসে ছিলাম। কাজের তাগিদ নেই, কোথাও যাবার তাড়া নেই। অলস মনের ভাবনা নিয়ে লোকজনের চলাফেরা দেখছিলাম। এক বৃদ্ধ বিদেশী ভদ্রলোককে দেখে কোনমতেই কৌতূহল সংবরণ করতে পারলাম না। গায়ে সামান্য খাকি শার্ট—ততোধিক ময়লা প্যান্ট। বেশভূষায় খেয়াল নেই। চোখ দু'টি উজ্জ্বল, ঘন নীল। চওড়া, সামান্য কুঞ্চিত মুখমণ্ডলে ঘন পল্লবিত দাড়ি কাঁচাপাকা দাড়ি দৃষ্টিকে গভীর করেছে, মুখে এঁকে দিচ্ছে অভিজ্ঞতার ছাপ।

যতটুকু মানুষ, তারচেয়েও বেশী বোঝা। কিট-ব্যাগ উপচে পড়ছে দ্রব্যসামগ্রীর চাপে। হাতে নোটবুক। পৃথিবীর ঠিকানা লেখা।

এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কি জার্মান দেশের অধিবাসী?

ভদ্রলোক হেসে চোস্ত ইংরেজীতে জবাব দিলেন—হতে পারলে ভাল হতো।

কিছুই বুঝলাম না। উত্তরটা সোজা হলেও জটিল।

ভদ্রলোক আমার মুখের বিস্মিত ভাব দেখে বললেন—জার্মানীতে বহু দিন ছিলাম। জার্মানীরা গর্বিত জাত। নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখেছি, আমার গর্ব তাদের চেয়ে বেশী। আমি ফরাসী, অধ্যাপনা আমার কাজ।

কফি খাওয়ার আমন্ত্রণ জানালাম। ভদ্রলোক খুশী হয়ে বললেন—পানীয় জিনিসে ফরাসীদের মজ্জাগত লোভ, নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার সাহস নেই।

'নানকিনে' যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলাম এদেশে কি উদ্দেশ্যে এসেছেন?

—বৃদ্ধ বয়সেও দেশে দেশে বিচিত্র মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহ কাটিয়ে উঠতে পারিনি। চোখে দেখার লোভ জন্মগত। মানুষের সংস্পর্শে এসে তাদের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদানের আকাঙ্ক্ষা এত দূরে টেনে এসেছে—অধ্যাপকের নীল চোখ দু'টি উজ্জ্বল হল।

'নানকিনে' আরাম করে বসে অর্ডার দিলাম স্পেশ্যাল ক্রিম কফি। টোস্ট, মাখন। ভারতীয় মিষ্টি। খুব তৃপ্তি করে খেলেন। এত মনোযোগ সহকারে কাউকে খেতে দেখিনি। বহু দিন।

ফরাসী অধ্যাপক এম বারিইঅঁকে (M Barillon) নিয়ে আরও দু'-এক জায়গায় ঘুরেছি। একদিন [illegible]-এ নিমন্ত্রণ [illegible] [illegible]। আরও একদিন তাঁর দুর্লভ সঙ্গ পেয়েছি মতিমহলে। পরিষ্কার নিখুঁতভাবে খেতে দেখে যেমন বিস্মিত হয়েছি, তেমনি হয়েছি তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে।

তিন দিনই নানা দেশের ইতিহাস শুনলাম। কোথায় সেই আরব দেশ, সুইট্‌জ্যারল্যেণ্ডের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, ইরাণের অতিথিপরায়ণতা, জার্মানীর একাগ্রসাধনা ও আন্তরিকতা, ফরাসীর জীবনদর্শন, ভারতবর্ষের নৈর্ব্যক্তিক মনোভাব। সব দেশ ঘুরে ঘুরে পাঞ্জাব হয়ে তিনি দিল্লী এসেছেন।

কথা বলার ফাঁকে হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন—দেখুন, আমিই শুধু কথা বলে যাচ্ছি। আমরা ফরাসী, লোকের সঙ্গে কথা না বলতে পারলে যেন হাঁপিয়ে উঠি।

এবার নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য নিয়ে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—মতিমহলে তন্দুরী ও মুরগীর মাংস খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম।

মাংসের হাড়গুলো এক পাশে সাজিয়ে রেখে প্রফেসর বলে গেলেন—বই লিখবার জন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি। পাকিস্তানে গিয়েছিলাম। তার আগে পাড়ি দিয়েছি আরব রাজ্যে। আরববাসীরা খোসগল্প বিলাসী। বিদেশী দেখলেই রেস্তোরাঁয় আলাপ জমায়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঘরের কথা বলে। লজ্জা নেই, দ্বিধা নেই। এত মিশুকে লোকেদের সঙ্গে কথা বলতেও আরাম। প্রাণ খুলতে না পারলে প্রাণের কথা বের হবে কি করে?

দিল্লী থেকে তিনি যাবেন কলকাতায়, সেখানে থেকে কাঠমান্ডু। তারপর সিংহল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশেও যাবেন। সেখান থেকে আবার ভারতে ফিরে আসবেন। ভারত থেকে প্যারিস, সোনার স্বদেশভূমি।

বললাম—আপনার দেশের কথা শুনতে চাই। লিগ্ অফ নেসন্স-এর যুগের ফ্রান্সে আপনি একটি ফরাসী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে ফ্রান্সকে দেখতে চাই।

অধ্যাপক বারিইঅ' একটি কথার মধ্যে ফরাসী চরিত্রের ব্যাখ্যা করলেন—ফরাসীরা জীবন ভালবাসে। জীবনকে সুখের করতে চায়। আলোকিক সত্যে হয়তো অত বিশ্বাসী নয় কিন্তু ফরাসী চরিত্রের মধ্যে গোঁড়ামি নেই বললেই চলে।

—স্পেনে গিয়ে দেখি বহু সাধু ভৌতিক দুনিয়ার রহস্য উদ্ঘাটনে তন্ময়। কিছু না পেলে নিশ্চয় লেগে থাকা যায় না। কিন্তু জীবনকে বঞ্চিত করে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি হয় না। ভারতবর্ষে এসে আমার মনে হল, ভারতবর্ষের সাধু জীবনের নির্জলতা বা নির্লিপ্ততা আমি স্পেনে দেখিনি। সেখানে থেকে কিছু 'আলৌকিক' লোকের সংগে আলাপ করে মনে হয়েছিলো, মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতা ভ্রান্ত অতিরঞ্জিত চিন্তায় ও বিশ্বাসে ভারাক্রান্ত।

ফরাসীরা এই 'অতিরঞ্জিত' চিন্তায় অতটা বিশ্বাসী নয়। তবে একটা কথা দ্বিনাদ্বিধায় বলা যায়। ফরাসীরা শিল্প অনুরাগী। প্রত্যেকের মধ্যে শিল্পচেতনা সার্থকরূপ নেয় কিনা, সেটা বড় প্রশ্ন নয়। জীবনকে ভালবাসা, সহজ সুন্দর জীবনে বিশ্বাস গড়ে তোলার মধ্যেই শিল্পচেতনার অঙ্কুর রয়েছে।

রোণ (Rhone) নদীর এপার-ওপারে

উত্তর ও দক্ষিণ ফ্রান্স। দক্ষিণ ফ্রান্সে রাজনৈতিক চিন্তা প্রসারিত, উত্তর ফ্রান্স শিল্পের ও চিন্তাশীলতার উৎসকেন্দ্র। রাজনৈতিক ফ্রান্সের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আমি অত নিখুঁতভাবে বলতে পারব না। তবে শিল্প-জগতের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রত্যক্ষ। ফ্রান্সে কয়েক লক্ষ শিল্পী আছেন। অনেকের সঙ্গে আলাপ আছে। আর্টের বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়। দেশজোড়া প্রচেষ্টা দেখে তৃপ্তি পাই। স্বীকৃতি বড় কথা নয়, শিল্পসাধনা বড় কথা। এত লক্ষ শিল্পীর মধ্যে হয়তো দশ-বারোজন শিল্পী সমৃদ্ধ, স্বীকৃতির চরম শিখরে উঠেছেন। বাকি যারা তাদের শুধু কঠোর সাধনা। খাওয়া নেই, পরা নেই, কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে শুধু শিল্প চর্চা। স্বীকৃতির পরোয়া করলে কি এত সাধনা করা যায়? প্রখ্যাত শিল্পীদের এক-একটা পেইন্টিং মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হয়। কিন্তু যাঁরা নাম করেন নি, শিল্পসাধনা করে পেটে অন্ন জোটানো মুশকিল। হয়তো একটা পেইন্টিং বিক্রি হলো। তা দিয়েই সারা বছরের খাওয়া-পরা সংস্থান করতে হল। কেউ কেউ আবার দু-একটা পেইন্টিং বিক্রি করে যা পয়সা পায়—তা নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। জীবন তাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। জীবনে অনিশ্চয়তা নিশ্চয় আছে কিন্তু অনিশ্চয়তাই শিল্পীকে নতুন পথের সন্ধান দেয়।

প্রফেসর একা মানুষ। কয়েক বছর হল স্ত্রী মারা গেছেন। একটিমাত্র ছেলেও কিছু দিন আগে বাসে চাপা পড়ে মারা গেছে। জীবনের সবচেয়ে প্রিয়জনকে হারিয়ে আজ পথে পথে প্রিয়জন খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

নিজের দুঃখের কথা বলতে গিয়ে অধ্যাপকের ছোটবেলার কথা স্মরণ হল।—ছোটবেলায় একবার আমার খুব অসুখ হয়েছিলো। ডাক্তারের আদেশে পড়াশুনা বন্ধ করতে হল। শরীর সারাবো কোথায়? গেলাম আলপস্ পর্বতের কাছাকাছি একটা জায়গায়। দু' বছর নির্জনবাসে আমার জীবনের এক নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছিলাম। একজোড়া সাইবেরিয়ান 'সিলভার ফক্স' নিয়ে গিয়েছিলাম। তাদের পরিচর্যা করতেও অনেক সময় বেরিয়ে যেতো। একজোড়া নিয়ে গিয়েছিলাম বটে কিন্তু তিন বছরের মধ্যে অনেকগুলো 'সিলভার ফক্সে'র মালিক হয়ে গেলাম। পশুজগৎ সম্বন্ধে আমার এ অভিজ্ঞতা একেবারে ফেলা যায়নি। কোনো এক সময়ে জাতীয় পার্ক স্থাপন করার জন্য ফ্রান্সের তদানীন্তন কর্তৃপক্ষকে আমি যে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলাম, আলপ্সে পর্বতের কোলে সে অভিজ্ঞতা ও প্রেরণার সন্ধান পেয়েছিলাম।

—নিজের ছেলের কথা যখন স্মরণ করি, কেন যেন জীবনের আর একটা ঘটনার কথাও মনে পড়ে। তখন দক্ষিণ ফ্রান্সের রোণ (Rhone) নদীর তীরে থাকি। অপূর্ব জায়গাটা। যেখানে থাকতাম, জায়গাটা একেবারে নির্জন। রোজ সকাল-সন্ধ্যায় লক্ষাধিক রঙ-বেরঙের পাখি উড়ে আসতো। সে কি অপূর্ব দৃশ্য। লক্ষ লক্ষ রঙীন পাখি নদীতে মাছ শিকার করছে, সে প্রাণ মাতানো দৃশ্য আজও ভুলতে পারিনি। জীবন থেকে আঘাত পাই, তখন এ দৃশ্যের কথা ভাবি। বহু জীবন এসে নদীতে মিলছে। একজনের জীবনদীপ এসে নিবে গেলেই বা ভারসাম্যের কি ব্যাঘাত হয়?

প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আর্ট অর্থে আপনি কি বোঝেন?

সহজ, সরল উত্তর পেয়ে বিস্মিত হলাম। অধ্যাপক বারিইঅ' বললেন—আর্টের প্রকাশ মনের আন্তরিককতায়। প্রকাশ করার ক্ষমতার সে আন্তরিকতা সম্পূর্ণে। আর্ট অর্থে বুঝি, মানুষকে অনুভব করার দৃষ্টি, মানুষকে দেখবার দৃষ্টি। শুধু চোখের দৃষ্টি নয়, অনুভূতির দৃষ্টি চাই। সব চিন্তা শিল্প হয়ে ওঠে না। কারণ, অসংলগ্ন চিন্তায় ঐক্য বা সামঞ্জস্য নেই। যে চিন্তা ও অনুভূতির মধ্যে স্পন্দন আছে, ঐক্য আছে—প্রকাশের তাগিদে তা হয়ে ওঠে সাহিত্যসৃষ্টি। আর্টের অপর নাম 'হারমনি।' 'আর্ট ইজ হারমনি অফ ফিলিং।'

'হারমনি'র অনুভূতি সব মনে সমান নয় বলেই, সার্থক সৃষ্টি সবার ধরা হয় না। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ব্যালেন্স—যাকে বলি সামঞ্জস্য। পরস্পর পরস্পরকে ঐক্যবোধে আবদ্ধ করাকে বলে ব্যালেন্স। প্রত্যেক ফুলের পাপড়ি এক ছন্দে গ্রথিত হয় বলেই সে ফুলের অপরূপ পরিবেশ রচনা করে। তেমনি প্রত্যেকটি চিন্তার সামঞ্জস্য রাখতে পারলে হয় অনুচিন্তা। এই সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টাই শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সাধনার বস্তু।

অধ্যাপক বারিইঅ' কফির পেয়ালাটা নিজের কাছে টেনে বললেন—যেকোন শিল্প-

কার্যের জন্য চাই পরিশ্রম, অভ্যাস। রঙ্গ-মঞ্চে যে সুন্দরী মেয়ের নৃত্য দেখে মুগ্ধ হই, তার পেছনে রয়েছে বহু দিনের অভ্যাস ও সাধনা। যে নর্তকী সহজ অপূর্ব ভঙ্গীতে অন্তরের ভাবনা ও বেদনা প্রকাশ করতে পারেন, তার মূলে রয়েছে অভ্যাসের কারিগরি। লেখক ও শিল্পীদের এটা ভুলে গেলে চলবে না। প্রতিভা স্ফুরণের পেছনে পরিশ্রমের অবদান বোধহয় অনেক বেশী।

প্রত্যেকটি মানুষ নিজের সংগ্রাম নিয়ে অফুরন্ত, অসীম। এই মানুষটিকে আমি চিনি না। কথা শুনতে শুনতে শুধু ভেবেছি, দেশে দেশে, মানুষে মানুষে বিভিন্নতা সত্ত্বেও, অন্তরে কত আপন, চিরকালের সত্যে ভাস্বর, উজ্জ্বল।

এই বিভিন্নতার জনাই এক একজন মানুষ এক-একটি ইতিহাস। এই বিচিত্র, বিভিন্ন জীবনের মধ্যে মাঝে মাঝে যে অন্তরে ঐক্যতানের সুর শুনি, তার কারণ অধ্যাপক বেরিইঅর মত কিছু যাযাবর সারা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে জীবন থেকে অনুপ্রেরণা পেতে চান, জীবনবোধের যথার্থ সার্থকতা খোঁজেন এবং প্রয়োজন হলে দশজনের সামনে মাথা উঁচু করে তা বলতে দ্বিধা করেন না।

নববর্ষের সাহিত্য বাসর

প্রতি বছর বৈশাখ মাসের কোনো একদিনে ইনফরমেশন সেন্টার-এ সাহিত্যিক ও সাহিত্য অনুরাগীদের এক সমাবেশ হয়। উপলক্ষ্য, সংবাদপত্র-সাময়িক পত্রিকা মণ্ডলী আয়োজিত সাহিত্য পুরস্কার। এই মণ্ডলীতে আছেন, আনন্দবাজার পত্রিকা-হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড-দেশ; অমৃতবাজার পত্রিকা-যুগান্তর; মৌচাক পত্রিকা; উল্টোরথ পত্রিকা। ১৩৭৫ সালের পুরস্কৃতদের জন্য এ বছরের অনুষ্ঠান হলো গত বৃহস্পতিবার। পুরস্কারপ্রাপ্ত ছ'জন লেখক লেখিকাদের মধ্যে পাঁচজন উপস্থিত ছিলেন মঞ্চে—গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুনীলচন্দ্র সরকার। অপর একজনের কথা আমরা আগেই জানিয়েছি, মৌচাক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এবং দীর্ঘকালের সাহিত্যসেবী সুধীরচন্দ্র সরকার কয়েক মাস আগে প্রাণত্যাগ করছেন, এবারের শিশিরকুমার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তাঁকে, মরণোত্তর ভাবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার। তিনি তাঁর অদীর্ঘ ভাষণে বলেন, পূর্বকালে সাহিত্যিকরা সম্বর্ধিত হতেন রাজদ্বারে। রাজা কবি ও শিল্পীকে শিরোপা দিতেন, দিতেন বিত্ত। কিন্তু সেই

সাহিত্য সংবাদ

প্রথা খুব হিতকর ছিল না। মত প্রকাশ ও সৃষ্টির স্বাধীনতাই লেখকদের বড় সম্পদ। কিন্তু পুরস্কৃত লেখকরা রাজ-স্বীকৃতি পেয়ে বড় বেশী অভিভূত হয়ে পড়তেন। তাঁরা হয়ে উঠতেন রাজার স্তুতিপাঠক ও চাটুকার। চাটুকারিতার এমন দৃষ্টান্তও আছে যে কোনো মুসলমান নবাবের কৃপাধন্য এক হিন্দু লেখক সেই নবাবের প্রশংসা করতে করতে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে শেষ পর্যন্ত সেই নবাবকে স্বয়ং একালের কৃষ্ণের অবতার বলতেও দ্বিধা করেন নি! বৃটিশ আমলে এ দেশীয় লেখকদের পুরস্কার দেবার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। এখন, রাজার বদলে কেন্দ্রিক ও প্রাদেশিক সরকার সেই ভার গ্রহণ করেছেন। ডঃ মজুমদারের মতে, সরকারী পুরস্কারেও লেখকদের আনুগত্য দাবি করার সম্ভাবনা আছে। সরকারী পুরস্কারগুলিও সব সময় যোগ্যতম লেখকদেরই দেওয়া হয়—তার কোনো মানে নেই, অন্যান্য অনেক শর্ত কাজ করে।

বরং, তাঁর মতে, বেসরকারী এই সংবাদ-সাময়িক পত্রিকা আয়োজিত পুরস্কারের মূল্য বেশী। এখানে সাহিত্যকৃতিই প্রধান বিচার্য। সাহিত্যিক ও সংবাদপত্রের মধ্যে সৃষ্টি ও প্রকাশকের সম্পর্ক—আর কোনো বন্ধন নেই। দেশ ও জাতি গঠনে লেখকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে—মুক্ত মন নিয়ে লেখকদের সেই কাজে ব্রতী থাকতে হবে।

অশোককুমার সরকার ধন্যবাদ জ্ঞাপক ভাষণ দিতে উঠে বললেন, পুরস্কারের চেয়েও বড় কথা প্রতিভার স্বীকৃতি। এই পুরস্কার পেয়ে লেখকদের ধন্য হবার কোন প্রশ্ন নেই, বরং লেখকদের প্রতিভার সামান্য স্বীকৃতি জানাতে পেরে তাঁরাই কৃতার্থ বোধ করছেন। লেখকরা কোনো কিছুর প্রত্যাশা না করেই সৃষ্টি করেন, সেই সৃষ্টিকে স্বীকার করে তাঁরা সম্মান জানাচ্ছেন। সেই সূত্রেই লেখক ও সাহিত্যানুরাগীরা এখানে এসে সমবেত হন।

তুষারকান্তি ঘোষ পুরস্কারের পটভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে সুধীরচন্দ্র সরকারের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। সুধীরচন্দ্র সরকার জীবিত থাকতেই কয়েকবার তাঁকে এই পুরস্কার দেবার প্রস্তাব করা হয়েছিল—কিন্তু তিনি উদ্যোক্তাদের অন্যতম বলে কিছুতেই রাজী হন নি। এই প্রকার মনোভাবই বিশুদ্ধ আবহাওয়ার সৃষ্টি করে।

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় বললেন, এই স্বীকৃতি এক হিসেবে গুরু দায়িত্ব। আরও ভালো লেখার দায়িত্ব। তিনি এই মর্ম রক্ষা করবার চেষ্টা করবেন। মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য বললেন, এই পুরস্কার উপলক্ষে তাঁর জীবনের কয়েকটি বিশেষ অংশ সম্মিলিত হয়েছে। এই সম্মানে তিনি কৃতজ্ঞ। তিনিও দায়িত্বের কথা উল্লেখ করলেন।

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, ছন্দ নিয়ে এক সময় তিনি অনেক পরীক্ষা ও খেলা করেছেন। তার স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে এই শিশু সাহিত্যের পুরস্কার দেওয়ায় তিনি আনন্দিত।

সুনীলচন্দ্র সরকার বললেন, পুরস্কারের মূল্য সাময়িক। কোনো কবিতা পড়ে কোনো পাঠক যদি খুশী হয়, সংগীর দিকে ফিরে বলে, বাঃ বেশ তো—তা হলে সেই সাময়িক স্বীকৃতির কথা শুনেও কবির আনন্দ হয়। এই পুরস্কারের মধ্যে তিনি সেই 'বাঃ' শব্দ শুনতে পাচ্ছেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্বর্ধনা

সাপ্তাহিক বসুমতীর উদ্যোগে ২৫শে বৈশাখ সন্ধ্যেবেলা বিখ্যাত উপন্যাসিক ও ছোট গল্প লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জানানো হলো। 'উপনিবেশ' থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত তিনি অনেক সার্থক উপন্যাসের রচয়িতা, তাঁর অসংখ্য ছোট গল্প নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল—একজন বিদগ্ধ সমালোচক হিসেবেও তিনি সুপরিচিত। কয়েক বছর ধরে তিনি সাহিত্যের আর

একটি শাখার সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটিয়েছেন। সংক্ষিপ্ত ও সরস পটভূমিকায় তিনি আধুনিক কাল ও জীবনের নানান্ ঘটনা নিয়ে জার্নাল ধর্মী সংবাদ-রম্য রচনা প্রকাশ করছেন। সংবাদপত্রে যে-গুলো নিছক বিবরণ হিসেবে প্রকাশিত হয়—তিনি সেই সব ঘটনা অবলম্বন করেই নিবিড় রস ও সাহিত্যস্বাদ এনে দিয়েছেন। অনেকের ধারণা, এই সব সাময়িক ঘটনার সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক নিছক রসাভাসের। কিন্তু সাহিত্যও তো এক ধরনের সংবাদই, এজরা পাউণ্ডের ভাষায়।

অনুষ্ঠানে অনেক প্রখ্যাত লেখক এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুরাগীরা উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং মনোজ বসু প্রমুখ ঘরোয়া ভঙ্গিতে ভাষণ দেন। অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন জয়ন্তী সেন।

বেতার বিভ্রাট

সরকারী আমলাতন্ত্র যখন সাহিত্য-শিল্পের স্পর্শকাতর এলাকায় প্রবেশ করে—তখন কত রকম বিভ্রাট ঘটে, তার নবতম নিদর্শন আমাদের হাতে এসেছে।

আকাশবাণী কলকাতার বাংলা মুখপত্রের নাম 'বেতার জগৎ'। পুজোর সময় এই পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা বেরোয়—তাতে কিছু গল্প-উপন্যাস-রম্যরচনা থাকে। লেখকদের কাছে এঁরা লেখা আমন্ত্রণ করেন। সরকারী আমলাতন্ত্রের মধ্যে একটা বিকট নৈর্ব্যক্তিকতা আছে—যোগ্যকে সম্মান জানানোর ভাষাও যাদের জানা নেই। বলাই বাহুল্য, যে-ব্রিটিশদের কাছ থেকে এই আমলাতন্ত্রের দীক্ষা, সেই ব্রিটিশ জাতও যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই আমলাতন্ত্র শিথিল করে বিবেচনাবোধের পরিচয় দেয়—আমাদের এখানকার কর্তারা তা শেখেন নি। লেখকদের কাছে রচনা আহ্বান করার যোগ্য সহবৎ জ্ঞান থাকা দরকার। বিশেষ করে একজন লেখক—যাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি, যিনি গত তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত—তাঁর কাছে পাঠানো চিঠির নমুনা আমরা এখানে তুলে দিচ্ছি। বেতার জগতের সম্পাদক পি বি রায় স্বাক্ষরিত এই ডি ও লেটার :

... The contribution is to reach this office not later than June 15, 1968. I need hardly emphasise that the contribution is expected to be of a very high literary and ethical standard. You are perhaps aware that there is a system of paying suitable honoraria to the writers of this magazine which may vary between Rs. 75|- and Rs. 100|- depending on size and quality.

চিঠিখানা দেখলে রাগের বদলে হাসিরই উদ্রেক হয়।

[illegible]

বিতর্কমূলক তথ্যগ্রন্থ

পুস্তক পরিচয়

অকথিত কাহিনী। লেঃ জেঃ বি.এম কল। সম্পাদনা : বিজন চক্রবর্তী। সান্যাল অ্যান্ড কোম্পানী : ১/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২। কুড়ি টাকা।

'অকথিত কাহিনী' লেঃ জেঃ কলের বিখ্যাত 'The Untold Story' বইটির অনুবাদ। বহুবিদিত এই বইটিকে কেন্দ্র করে আজ সর্বত্র বিতর্ক ও উত্তেজনার ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে। সেদিক থেকে প্রকাশকের এই অনুবাদ-প্রচেষ্টা যথেষ্ট সময়োচিত এবং ব্যবসায়িক কর্তব্যপ্রসূত। প্রায় সাড়ে পাঁচ শ' পাতার বিশাল গ্রন্থটি লেঃ জেঃ-এর শৈশব থেকে শুরু করে সামরিক জীবনের অবসান পর্যন্ত বহু বিভিন্ন স্মৃতিকথা, বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং বহু বিশ্ববিখ্যাত মানুষের ঘনিষ্ঠ বিবরণে সমৃদ্ধ। আত্মজীবনের সাধনা, স্বপ্ন, প্রেম ও দুঃসাহসিকতার বর্ণনায় বইটির একাংশ যেমন ব্যক্তিগত, তেমনি তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত বহু কূটনৈতিক ও সামরিক অভিযানের বিবরণে বা আমাদের সরকারী দপ্তরের বহু গোপন আত্মকলহ ও অকর্মণ্যতার সংবাদে সর্বসাধারণের কৌতূহল ও ভাবনার বিষয়।

অবশ্য বইটির সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর সংবাদ নেফা রণাঙ্গনে আমাদের শোচনীয় বিপর্যয়ের দিনানুদৈনিক প্রত্যক্ষ বিবরণ। যে তথ্য এতদিন সরকারী দপ্তরের 'top secret' ফাইলে আত্মগোপন করেছিল, জেঃ কল তাকে নিরাপত্তার প্রচলিত নিয়ম অগ্রাহ্য করেই সাধারণের সমক্ষে উদ্ঘাটিত করেছেন। যে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ফলাফল ভারতবাসী মাত্রই এখনো বহন করে চলেছেন তৎসম্পর্কিত প্রকৃত ঘটনা ও সরকারী রটনার আকাশপাতাল পার্থক্য দেখে যে-কোন পাঠকই বিচলিত বোধ করবেন। এবং সেনা বিভাগের বহুঘোষিত 'মরাল' বা 'যে-কোন আক্রমণের মোকাবিলায় প্রস্তুত' ইত্যাদি সরকারী প্রচার যে প্রকৃতপক্ষে কতখানি ফাঁকির উপর দাঁড়িয়ে ছিল তা দেখেও আমাদের ক্ষোভের অন্ত থাকে না।

যদিও প্রশ্ন উঠেছে, কোর কম্যান্ডার হিসেবে কলের পক্ষে যে-সমস্ত যুদ্ধের বিবরণ ও তৎসম্পর্কিত গোপন প্রশাসনিক কার্যাবলী জানা সম্ভব ছিল তা প্রকাশ করার অধিকার সামরিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পরও তাঁর আছে কিনা। এ নিয়ে এখনও তুমুল বিতর্ক চলেছে, অনেকে কলকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার দাবিও তুলেছেন।

সর্বশেষ সংবাদে জানা যায় যে, আমাদের প্রতিরক্ষামন্ত্রী কলের বিবৃত তথ্য বা অভিযোগগুলিকে পুরোনো বা 'Out of date' আখ্যা দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেছেন। আসলে সরকারী উদারতার প্রকৃত কারণটিও তিনি গোপন করেন নি যে, এ ধরনের ব্যাপার নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করলে আরও অনেক অবাঞ্ছিত এবং অস্বস্তিকর ঘটনা বেরিয়ে পড়তে পারে। সুতরাং কেঁচো খুঁড়ে সাপ না বের করাই শ্রেয়।

বলা বাহুল্য, ভারত সরকারের এ উদ্বেগ অহেতুক নয়। কারণ, সেনাবাহিনীর চলাচল, সমরসজ্জা, সরবরাহ ব্যবস্থা বা গোয়েন্দা দপ্তরের কর্মপদ্ধতি সর্ব দেশে এবং সব কালেই অতিগোপনীয় বিষয়। এ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনায় অংশগ্রহণ জন-নিরাপত্তার কারণেই সর্বসাধারণের নেই। কিন্তু জেঃ কলের বইটি পড়বার পর হয়ত এ কথাও কারো কারো মনে হতে পারে যে, দীর্ঘকাল ধরে ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক কলহের অনুপ্রবেশে যদি আমাদের দেশরক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তবে নিরাপত্তার অজুহাতে সেই বিপর্যয়ের সংবাদ কতদিন গোপন রাখা উচিত। জেনারেল অবশ্য বর্তমান গ্রন্থে গোপনীয়তা ফাঁস করার ঝুঁকি নিয়েছেন অনেকটাই নিজস্ব স্বার্থে। সীমান্ত-যুদ্ধে পরাজয়ের দায়িত্ব যে তাঁর একার নয় এ কথা প্রমাণের জন্যেই তাঁর আয়োজন বিস্তৃত। এবং সমালোচকদের যোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্যেই তাঁর মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত অংশত বিশেষ দুঃসাহসিক।

নেফা ছাড়াও লাদাক, গোয়া বা হাল আমলের কাশ্মীরের যুদ্ধগুলিরও সমালোচনা এবং বিবরণ ঐ গ্রন্থের বিষয়। লেখকের বর্ণনাভঙ্গি সর্বত্র সজীব ও স্বচ্ছ। জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরী সম্পর্কে লেখকের তীব্র সমালোচনা অনেককেই আহত করবে। অভিযুক্ত ব্যক্তির যখন আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নেই তখন এ ধরনের একতরফা খোঁচা বা বিদ্রূপের তীর নিক্ষেপ সামরিক নীতির বিচারেও হয়ত অশোভন। বইটির নানাবিধ আকর্ষণ ছাড়াও একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কারণে এর চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি লাভ করবে। কারণ, ভারত সরকার ভবিষ্যতে এ ধরনের বইয়ের প্রকাশ নিষিদ্ধ করার কথা ভাবছেন। যে জন্যে আপাতত সারভিস রুলের সংশোধন বা পদস্থ অফিসারদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতিপত্র আদায় ইত্যাদির জল্পনা চলছে। আর যেখানেই নিষেধের প্রশ্ন, সাধারণের প্রবেশ লাভের বাসনা সেখানেই ত চিরকাল বেশী।

১৬।৬৮

ভ্রম-সংশোধন

২১ বৈশাখ-এর 'দেশ'-এ ...তী নির্মলকুমারী মহলানবিশের ... Dame Sybil

Thorndike-এর নাম ভ্রমক্রমে ডেস সিম্বল অলডাইক ছাপা হয়েছে। এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। —সঃ দেশ

প্রাপ্তি স্বীকার

তিন কন্যা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪·০০।

উপনিষদ। চিত্রিতা দেবী। জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১০। মূল্য ৫·০০।

ভাস্বর দিগন্ত। ব্রজমাধব ভট্টাচার্য। অরুণা প্রকাশনী : ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য ১৬·০০।

কিশোর বিচিত্রা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড : ১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪·০০।

পত্রমিতা। শিশির কর। শ্রীমনোতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় : ২৯ পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬। মূল্য ৩·০০।

বেটন কাপের সেমিফাইনালে বি এন আর , ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলায় রেল দলের রাউত বিজয়সূচক গোল করছেন। এই গোলের গতবারের বেটন বিজয়ী এবং এবারের অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গলকে বেটন থেকে বিদায় নিতে হয়

খেলার মাঠে

চার বছরের ব্যবধানে এক একটি অলিম্পিক আসর। একটি অলিম্পিক শেষ হতেই আর একটি আসরের প্রস্তুতি। এ প্রস্তুতি প্রতিযোগীদের। ব্যবস্থাপকদের প্রস্তুতির সূচনা আরও আগে। একটি অলিম্পিক শেষ না হতেই। যেমন ১৯৬৮-র মেক্সিকো অলিম্পিক এখনো শেষ হয়নি, কিন্তু ১৯৭২-এর মিউনিক অলিম্পিকের জন্য তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেছে বহু দিন আগে পরিকল্পনামত স্টেডিয়াম ও ক্রীড়া-কেন্দ্র তৈরী হচ্ছে।

যদিও প্রতিযোগীদের প্রস্তুতির কোন সময় বাঁধা নেই, তবু সাধারণত একটি অলিম্পিকের পর থেকেই পরবর্তী অলিম্পিকের জন্য পরিকল্পনা মত অনুশীলন আরম্ভ হয়। কিন্তু তার মাঝে নৈপুণ্যের পরখ হয় কমনওয়েলথ গেমস বা এশিয়ান গেমসের মাধ্যমে। প্রতি দেশের বাৎসরিক জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান তো আছেই, আছে ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপ, দৈবত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা। কিন্তু প্রধানত কমনওয়েলথ গেমস যেমন কমনওয়েলথ দেশগুলির প্রতিযোগীদের নৈপুণ্য পরখের অঙ্গন, ইউরোপীয়ান গেমস ইউরোপীয় প্রতিযোগীদের নৈপুণ্য যাচাইয়ের কষ্টি-পাথর। কিংবা প্যান আমেরিকান গেমস বা প্যাসিফিক গেমস আমেরিকার অ্যাথলীটদের প্রস্তুতি বোঝার মাধ্যম। তেমন এশিয়ান গেমস এশিয়ান ক্রীড়াবিদদের প্রস্তুতি ও নৈপুণ্য পরখের এক বড় সোপান। তা ছাড়া ৪ বছরের ব্যবধানে সারা এশিয়ার ক্রীড়াবিদদের মহামিলনের পুণ্যভূমিও এশিয়ান গেমস।

প্রধানত ভারতের পরলোকগত দুই ক্রীড়া পরিচালক জি ডি সোন্ধী এবং এন্টনী ডি'মেলোর প্রচেষ্টাতেই এশিয়ান গেমসের সূচনা এবং ১৭ বছর আগে এই ভারতের রাজধানীতেই এশিয়ান গেমসের প্রথম অনুষ্ঠান। কিন্তু কে জানত এই ক'বছরের মধ্যে এশিয়ান গেমসের মত এমন একটি সুন্দর অনুষ্ঠান অনিশ্চয়তার মুখে এসে দাঁড়াবে; আজ ১৯৭০ সালের এশিয়ান গেমস কোথায় হবে সে সম্পর্কেই অনিশ্চয়তা।

১৯৬৬ সালে ব্যাঙ্ককে এশিয়ান গেমস চলাকালেই এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের সভায় ঠিক হয়েছিল। যেহেতু দক্ষিণ কোরিয়া আয়োজনে বিশেষ উৎসাহী সেহেতু ১৯৭০-এর এশিয়ান গেমস দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলেই অনুষ্ঠিত হবে। বলা বাহুল্য, এশিয়ান গেমস-এর আয়োজনের জন্য দক্ষিণ কোরিয়া যথেষ্ট আগ্রহী ছিল এবং গেমস-এর পরিচালনা-ভার পাবার জন্য বেশ কিছু অর্থও খরচ করেছিল। কোন সন্দেহ ছিল না যে, দক্ষিণ কোরিয়া শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে পড়বে। কারণ, এ পর্যন্ত যারা এশিয়ান গেমসের দায়িত্ব নিয়েছে—যেমন ভারত, ফিলিপাইন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড—কেউই দায়িত্ব ত্যাগ করে নি। কিন্তু গত জুলাই মাসে সহসা একটি অ্যাটম বোমা ফাটানোর মত দক্ষিণ কোরিয়া হঠাৎ ঘোষণা করল, তারা ১৯৭০-এর এশিয়ান গেমস পরিচালনা করতে অক্ষম। কারণ? এর জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সরকার তা দিতে অক্ষম।

এশিয়ান গেমস ফেডারেশন বিপদে পড়ে জাপানকে অনুরোধ জানালেন ষষ্ঠ এশিয়ান গেমসের দায়িত্ব নিতে। কারণ, এ জি এফ-এর ধারনা, যেভাবে জাপান নিখুঁতভাবে ১৯৫৮ সালের এশিয়ান গেমস এবং ১৯৬৪ সালের অলিম্পিক গেমস পরিচালনা করেছে তাতে একমাত্র জাপানের পক্ষেই এত অল্প সময়ে এই মহাযজ্ঞের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব। কিন্তু যেহেতু ১৯৭০ সালে টোকিওতে বিশ্ব প্রদর্শনী এবং ১৯৭২ সালে জাপানে উইন্টার অলিম্পিকের আসর বসছে সেহেতু জাপানও জানাল, তাদের পক্ষে এশিয়ান গেমসের ভার নেওয়া সম্ভব নয়।

অগত্যা এশিয়ান গেমসের প্রবর্তক ভারত এগিয়ে এল। ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন দায়িত্ব গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করে এবং দিল্লিতে ষষ্ঠ এশিয়ান গেমসের আয়োজন করতে চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মতামত চাইল। কিন্তু কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীভগৎ ঝা আজাদ প্রায় এক কথায় নাকচ করে দিলেন ভারতীয়

দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে এশিয়ান যুব ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারত ও মালয়েশিয়ার খেলায় দুই দলের খেলোয়াড়কে একটি বল হেড করার চেষ্টা করতে দেখা যাচ্ছে

অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের পরিকল্পনা।

রাষ্ট্রমন্ত্রী আজাদের বক্তব্য : জাপান এবং ব্যাংককে যেমন সাফল্যমণ্ডিতভাবে এবং বিরাটাকারে এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সংগে তাল রেখে এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করা দুই বছরের মধ্যে সম্ভব নয়। অর্থেরও দরকার প্রায় ৫০ লক্ষের মত। পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির মত সময় হাতে নেই। তার চেয়েও বড় কথা, ভারতে এমন দায়িত্বসম্পন্ন ক্রীড়া-পরিচালক নেই যাঁরা এত কম সময়ে এই বিরাট অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন।

শ্রীআজাদের বক্তব্যের সংগে অবশ্য ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাজা বালিন্দার সিং একমত হতে পারেন নি। বরং মন্ত্রীর উপর চটে গিয়ে এক বিবৃতিও ... করেছেন। সে কথা পরে। আসল কথা, সরকারের অমতে ভারতে এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠানের কোন সম্ভাবনা নেই। এ জি এফ আবার দক্ষিণ কোরিয়াকে অনুরোধ করেছেন তাঁদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে। কিন্তু অর্থ-নৈতিক কারণের চেয়ে রাজনৈতিক কারণই যে দক্ষিণ কোরিয়ার অক্ষমতা জ্ঞাপনের প্রধান কারণ সে কথা এখন আর অজানা নেই। সেখানে এখন দুটি বড় সমস্যা। একটি উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যবর্তী সামরিক অবরোধমুক্ত অঞ্চলের রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা। অপরটি 'পুয়েবলো' জাহাজ আটকের ব্যাপারে আমেরিকার সংগে মনকষাকষি। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত হয়তো এসব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজনৈতিক আবহাওয়া যেমন উত্তপ্ত তাতে খেলাধুলোর বিরাট ব্যাপারে মধ্যে জড়িয়ে পড়ার মত তাদের মনোভাব নেই।

১৯৭০-এর এশিয়ান গেমস আয়োজনের শেষ ভরসা তাইল্যান্ড। ১৯৬৬তে শেষ এশিয়ান গেমসের আয়োজনকারী এই দেশ জানিয়েছে, 'যদি এশিয়ার সব দেশ তাদের সংগে সক্রিয় সহযোগিতা করে তবে তারা ১৯৭০-এর এই মহাক্রীড়ানুষ্ঠানের ভার নিলেও নিতে পারে। দেখা যাক কি হয়।

*

রাজা বালিন্দরের কথায় ফিরে আসা যাক। রাজা বালিন্দার বলেছেন, দিল্লিতে এশিয়ান গেমস-এর সম্ভাব্যতা নিয়ে আমরা যে পরিকল্পনা করেছিলাম তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের অন্তত ২০ দিন পর্যালোচনা করার সময় ছিল। কিন্তু শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মাত্র ২০ ঘণ্টার মধ্যে তা নাকচ করে দিয়েছেন। কোন পরীক্ষানিরীক্ষা করেন নি। এমন কি, ক্রীড়া বিভাগের কর্মকর্তা বা বিশেষজ্ঞ মহলের সংগেও আলোচনা করেন নি।

এশিয়ান গেমস-এর মত বিরাট ব্যাপার এত অল্প সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা করার মত লোকের অভাব বলে রাষ্ট্রমন্ত্রী যে মন্তব্য করেছেন, আই ও এ-র সভাপতি রাজা বালিন্দার সিং তাতেও উষ্মা প্রকাশ করেছেন। অর্থের ব্যাপারে বলেছেন, দিল্লিতে এশিয়ান গেমস-এর আয়োজন করা হলে অন্তত ৩০ লক্ষ টাকার মত বিদেশী মুদ্রা আয় করা যেত। তা ছাড়া দেশের মধ্যে খেলাধুলোর প্রসার ও উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের পক্ষে এ দায়িত্ব নেওয়া উচিত ছিল বলেও রাজা মন্তব্য করেছেন।

৫০ লক্ষ টাকা খরচ বা ৩০ লক্ষ টাকার বিদেশী মুদ্রা আয় বড় কথা নয়। ভারতের মত দেশ, যেখানে কোটি কোটি টাকা অপব্যয় হচ্ছে সেখানে এশিয়ান গেমসের জন্য অবশ্যই ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করা যেত। বিদেশী মুদ্রায় এবং দর্শনী থেকে কিছু টাকা উঠেও আসত। কিন্তু টাকার উদ্যোগ-আয়োজনই এখানে বড় কথা। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এন্টনী ডি'মেলো বা গুরুদত্ত সোন্ধীর মত যোগ্য ক্রীড়া-সংগঠক ও ক্রীড়া পরিচালক এখন ভারতে নেই। যদি থাকত তবে জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে এমন বে-বন্দোবস্ত হত না। প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানেই এখন বে-বন্দোবস্ত, দর্শক

উচ্ছৃংখলতা এবং পরিকল্পনাহীন পরিচালন ব্যবস্থা। ছোট ছোট অনুষ্ঠানের সুষ্ঠুতা দিয়ে বড় অনুষ্ঠানে সাফল্যের আভাস মেলে। ভারতের ক্রীড়া সংগঠকরা নিজেদের মনকেই জিজ্ঞাসা করতে পারেন এশিয়ান গেমস-এর দায়িত্ব পালনে তাঁরা কি সক্ষম? রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআজাদ খোলা ছাড়িয়ে কথাটা বলে ফেলেছেন, এই তাঁর দোষ।

✲

সংগঠন, পরিচালন এবং পরিকল্পনায় গলদের জন্যই ভারতের ক্রীড়ামান আশানুরূপভাবে এগুতে পারছে না। খেলাধুলোর প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা পেছনের বেঞ্চের পড়ুয়া হয়ে পড়ছি।

সিউলে আয়োজিত এশিয়ান যুব ফুটবলের কথাই ধরা যাক। এশিয়ান যুব ফুটবলে অংশগ্রহণকারী ১২টি দেশ-এর মধ্যে নিঃসন্দেহে ভারত সব চেয়ে বড় এবং জনবহুল দেশ। কয়েকটি দেশ তো ভারতের এক একটি রাজ্যেরই সমান। অথচ এশিয়ান যুব ফুটবলের সেমিফাইনালেও ভারত উঠতে পারেনি। গ্রুপ লীগের তিনটি খেলার মধ্যে মালয়েশিয়ার কাছে ২—১ গোলে এবং ইস্রাইলের কাছে ২—০ গোলে পরাজিত হয়েছে। একটি খেলায় তাইওয়ানকে পরাজিত করেছে ৩—০ গোলে।

নামে যুব ফুটবল হলেও যে সব খেলোয়াড় নিয়ে ভারতের দল গড়া হয়েছে তাদের অনেকেই দেশের প্রথম সারির খেলোয়াড়। অবশ্য উঠতি তরুণের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু খেলার ফলাফল হতাশাব্যঞ্জকই বলতে হবে।

ফুটবল কেন, অন্যান্য খেলাধুলোতেও কোন আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না। যে হকিতে ভারত বিশ্বশ্রেষ্ঠ সেই হকির শ্রেষ্ঠত্ব নিয়েও এখন সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

এত বড় দেশে খেলোয়াড়ের অভাব নেই। খেলাধুলোর আয়োজনও কম নয়। কিন্তু ক্রীড়াক্ষেত্রে অগ্রগতি নামে মাত্র। শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি, পরিকল্পনার অভাব সংগঠনে গোঁজামিলই এর প্রধান কারণ। রাষ্ট্রমন্ত্রীর রূঢ় মন্তব্যে ক্রীড়া সংগঠকদের গোসা হতে পারে। কিন্তু কথাটি কি ঠিক নয়?

আমি বলতে চাই না সংগঠকদের আন্তরিকতার অভাব আছে। খেলাধুলোর দেশকে এগিয়ে নেবার জন্য অবশ্যই তাদের আন্তরিকতা আছে। যেমন আন্তরিকতা আছে কলকাতার ক্রীড়া পরিচালক ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কলকাতায় একটি বড় আকারের স্টেডিয়াম তৈরি করায়। কিন্তু ৩০ বছরের চেষ্টার মধ্যেও কলকাতায় যেমন স্টেডিয়াম গড়ে ওঠেনি, তেমন ভারতের ক্রীড়া পরিচালকদের আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও খেলাধুলোয় আশানুরূপ অগ্রগতির পরিচয় নেই। এটা ভারতের ক্ষেত্রে অভিশাপও হতে পারে।

পরিকল্পনা তো কম হল না। স্বাধীনতা লাভের সংগে সংগে রাজকুমারী অমৃত কুমারীর শিক্ষা পরিকল্পনা চালু হল। বিদেশ থেকে খেলাধুলোর কোচ আনানো হল। পাতিয়ালা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টস স্থাপিত হল বহু অর্থ ব্যয়ে। সেখান থেকে বহু কোচও বেরুল।

খেলাধুলোর উন্নতি, প্রসার ও প্রচারে সরকারকে পরামর্শ দেবার জন্য কেন্দ্রে গঠিত হল নিখিল ভারত স্পোর্টস কাউন্সিল। রাজ্যে রাজ্যে গড়ে উঠল রাজ্য ক্রীড়াসংস্থা। শিক্ষণ শিবিরও কম খোলা হল না। কিন্তু এত সত্ত্বেও ক্রীড়াক্ষেত্রে অগ্রগতি কতটুকু? নামে মাত্র। একেবারে কিছু হয়নি একথা অবশ্যই সত্য নয়। কিছু উন্নতি নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু সে কতটুকু? যৎসামান্য।

সংগঠন ও পরিকল্পনায় যে গলদ আছে পুনর্বিন্যাসের প্রচেষ্টাই তার প্রমাণ। এন আই এস-এর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। পাতিয়ালা থেকে ওই শ্বেত হস্তীকে সরিয়ে দিল্লিতে আনারও কথা উঠেছিল। এখন আবার কথা উঠেছে—কেন্দ্রীয় ক্রীড়া সংস্থা অর্থাৎ নিখিল ভারত স্পোর্টস কাউন্সিল উঠে যাবে। ওই সংস্থার নাকি এখন প্রয়োজনই নেই। তাছাড়া বহুদিন থেকে সংস্থার সুপারিশ এবং পরামর্শও উপেক্ষিত হচ্ছে সরকার এবং ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে।

এ দিকে ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন অভিযোগ তুলেছেন, সরকার তাঁদের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আই ও এ-র অভিযোগ সরকারের বিরুদ্ধে, সরকারের অভিযোগ এন আই এস-এর বিরুদ্ধে, নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের অভিযোগ ক্রীড়াসংস্থাগুলির বিরুদ্ধে, খেলোয়াড়দের অভিযোগ ক্রীড়াসংস্থার বিরুদ্ধে। আর দেশের ক্রীড়ানুরাগী জনসাধারণের অভিযোগ ও অবিশ্বাস সবার বিরুদ্ধে। এ অবস্থায় কি খেলাধুলোর আশানুরূপ উন্নতি সম্ভব?

একলব্য

দিলীপ ওঝা

বাবা রাখালচন্দ্র ওঝা ছিলেন চাঁপাতলা ইয়ংমেনস জিমন্যাস্টিকস ক্লাবের নাম-করা জিমন্যাস্ট। ওয়ান লেগ ব্যাম্বু ব্যালান্স, আয়রন বল, অ্যাক্রোবেটিকস প্রভৃতি বিষয়ে বেশ সুনাম কিনেছিলেন। খুব ছোটবেলায় বাবারই সাহায্যকারী ছিল দিলীপ ওঝা। বাবার কাছ থেকেই জিমন্যাস্টিকসের প্রথম তালিম নিয়েছিল। কিন্তু গুরু হিসাবে মেনে নিয়েছিল ওই ক্লাবেরই খ্যাতনামা জিমন্যাস্ট নরেন গলকে। সুতরাং প্রদর্শনী জিমন্যাস্টিকসে দিলীপ কখনো বাবার, কখনো নরেন গলের সাহায্যকারী। ব্যাম্বু ব্যালান্স, রোলার ব্যালান্স, হুইল-ল্যাডার, চেয়ার পিরামিড, ব্লক অ্যান্ড স্টিয়ারিং প্রভৃতি প্রদর্শনীতে যখন ও দর্শকদের হাততালি পেতে আরম্ভ করে তখন বয়স মাত্র চার কি পাঁচ বছর। শুধু হাততালিই নয়, ওই বয়সেই ও দর্শকদের বিস্ময়াবিষ্ট করে তুলেছিল বুকের উপর দিয়ে এক টন রোলার চালিয়ে। চার বছরের ছেলের বুকের উপর দিয়ে এক টনী লোহার রোলার গড়িয়ে যাবার সময় অনেকেই চোখ বুজে থাকত কি হয় কি হয় ভেবে। অনেকে ভাবত ছেলেটা বুঝি শেষ হয়ে গেল। কিন্তু রোলার গড়িয়ে যাবার পর ছেলেটা যখন তড়াক করে লাফিয়ে উঠে হাসিমুখে দর্শকদের অভিবাদন জানাত তখন দর্শক-ঠাসা আসরে দেখা যেত হাসির ঝলক।

ছোটবেলায় দিলীপ ছিল একেবারেই সাদামাটা। চালাকচতুর ছেলেরা যেমন ছটফটে হয় তার কোন লক্ষণই ছিল না। ক্লাবের সবাই বলত, 'ও বুকের উপর দিয়ে লোহার রোলারই চালাক, আর প্রদর্শনীর প্যাঁচপয়জারই দেখাক, কোন দিন সত্যিকারের জিমন্যাস্ট হতে পারবে না।' কিন্তু গুরু নরেন গলের ভবিষ্যৎবাণী ছিল—দিলীপ একদিন বড় জিমন্যাস্ট হবে।

জিমন্যাস্টিকসে ওর ন্যাক, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতি এবং সহজাত বুদ্ধি দেখেই নরেন গল ওই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। তবে শিষ্যকে মন্ত্রদানের মত কানে কানে দিলীপকে বলে দিয়েছিলেন, 'নিষ্ঠা এবং সাধনাই সাফল্যের চাবিকাঠি।'

ছোটবেলার একটি ঘটনা গুরু-শিষ্য দুজনের মনে আত্মবিশ্বাস জাগার সহায়ক হয়েছিল। দিলীপের বয়স তখন ছয় কি সাত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। চাঁপাতলা জিমন্যাস্টিকস ক্লাব গিয়েছে ব্যারাকপুর মিলিটারী ক্যাম্পে জিমন্যাস্টিকসের প্রদর্শনী দেখাতে। আমেরিকার নিগ্রোদের মিলিটারী ক্যাম্প। প্রতি শো-র শেষে ঘন ঘন হাত-তালি। নিগ্রোরা ছোট ছেলেটির নৈপুণ্য দেখে আনন্দে ডগমগ। প্রদর্শনী শেষে দিলীপকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একজন বড় অফিসার দিলীপের পাত্তা দিলেন। দেখা গেল ক্যাম্পের একটি ঘরে দিলীপ বসে। হাতে লজেন্স, বিস্কুট, টফি ও নানারকমের উপহার। চারপাশে নিগ্রোদের ভিড়। দলের লোক দিলীপকে নিয়ে আসতে চায়। ওরা ছাড়তে চায় না। বলে, 'কেন দেব? ও তো আমাদেরই ছেলে, দেখছ না আমাদের মত গায়ের রঙ। তোমরা ওকে চুরি করে নিয়েছ। ও আমাদের ক্যাম্পেই থাকবে।'

শুধু দিলীপ নয়, গুরু নরেন গল সম্বন্ধেও নিগ্রোদের একই দাবি ছিল। কারণ গুরু-শিষ্য দুজনের গায়ের রঙ যেমন মিশ কালো, চুলও কিছুটা কোঁকড়া। আসল কারণ কিন্তু রঙও নয়, চুলও নয়—প্রদর্শনী দেখে দুজনকে ভালবেসে ফেলেছিল নিগ্রো সোলজাররা।

তারপর থেকে দিলীপের আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে গেল। অনুশীলন আরও জোরদার হ'ল।

উনিশ শ' পঞ্চাশে দিলীপের প্রথম কম্পিটিশন বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপে। ফ্লোর এক্সারসাইজে ও দ্বিতীয়, অশোক মান্না প্রথম। অশোক পেল একটি শীল্ড, দিলীপ একটি ছোট কাপ। কাপ পেয়ে দিলীপের কি কান্না। প্রথম স্থানের জন্য কান্না নয়। ওর লক্ষ্য ছিল বড়সড় ওই শীল্ডটার দিকে। নরেন গল ওকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, ও শীল্ড তো তুচ্ছ, ভালভাবে প্র্যাক্টিস কর, অমন কত শত শীল্ড আসবে তোর হাতে।

সত্যি এসেছে। এসেছে রাশি রাশি পুরস্কার। আজ ভারতীয় জিমন্যাস্টিকসে দিলীপের স্থান দ্বিতীয়, কয়েকটি বিষয়ে প্রথমও বটে।

জাতীয় জিমন্যাস্টিকসে দিলীপের প্রতিযোগিতা ১৯৫৮ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত বালক বিভাগে। ১৯৬২ তে পুরুষ 'বি' বিভাগে, ১৯৬৩ থেকে এ বিভাগে। দিল্লি, পুনা, পাতিয়ালা, গোয়ালিয়র, ঝাঁসি, বোমবাই, রুপার, আগরতলা—যেখানেই জাতীয় আসর বসেছে সেখানেই দিলীপ ওঝার হাতে এসেছে পাঁচ ছ'টি করে পুরস্কার। বেশীর ভাগই প্রথম স্থানের। এর মধ্যে '৬২ সালে গোয়ালিয়রের সাফল্য বিশেষভাবে বলবার মত। অবশ্য বি বিভাগে। ওখানে দিলীপ পোমেল্ড হর্স, লং হর্স, হোরাইজেন্টাল বার, প্যারালেল বার, ফ্লোর এক্সারসাইজ—পাঁচটি বিষয়েই প্রথম হয়েছিল। শুধু ফ্লাইং রিং-এ কোন প্লেস পায়নি।

আগরতলায় বিগত জাতীয় জিমন্যাস্টিকসে প্যারালেল বার, ফ্লাইং রিং ও হোরাইজেন্টাল বারে প্রথম, ভল্টিং হর্স ও ফ্লোরে দ্বিতীয়, পোমেল্ড হর্সে তৃতীয়। সব মিলিয়ে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বিতীয় স্থান। প্রথম স্থান সার্ভিসেস দলের ভিখারি ভোঁসলের।

আগরতলার নৈপুণ্যের নিরিখেই মেক্সিকো অলিম্পিক ট্রায়ালে দিলীপের নির্বাচন এবং পাতিয়ালার ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগদান। কিন্তু মেক্সিকোতে জিমন্যাস্ট প্রেরণের জন্য আই ও এ-র কোন পরিকল্পনা নেই দেখে দিলীপ এখন বেশ মুষড়ে পড়েছে।

মুকুল

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

রেডিয়ো ভেঙে দিয়ে, লুটপাট চালিয়ে তারপর প্যারাসুট ছাড়াই শূন্যে ঝাঁপ দিল! ঠিক সেই আগের বারের মত!

অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

আবার ডাকাতি!

এও একজন ডাকাত! একে ফেলে রেখেই এর সঙ্গীরা সরে পড়েছে!

লোকটার চোয়ালে ও কিসের ছাপ?

অতলান্ত সমুদ্র...

?!

জাহাজের মধ্যে অরণ্যদেব....

এগুলি নকল-হীরে!

অসম্ভব!

বাঁচাও... আ...

অন্ধকার ডেকের উপরে বিদ্যুৎবেগে চলছে অরণ্যদেবের ঘুষি!

বাইরে ও কিসের শব্দ?

"ভদ্রমহোদয়েরা" আপনাদের ডাকাতির পালা এখানেই শেষ!

এবং হে "ভদ্রমহিলা", আপনিই যে হীরে-চালানের খবর যোগাতেন তাও আমি বুঝতে পেরেছি!

ওঃ!!...

১১/২৬

বন্দরে ঢুকব! আমার সঙ্গে বিমান-ডাকাতের দল!

জানি না। বলছে, মাঝরাতে জাহাজ এসে বন্দরে ঢুকবে। ওই আসছে!

ও খবর কে পাঠাল?

চালকের ঘরে তো কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না!

তাই তো! ব্যাপার কী!

জাহাজের মধ্যে প্রত্যেকেরই হাত-পা বাঁধা! এ কাজ কে করল?

পাঠিয়েছিল, সম্ভবত সে-ই। নাম বলেছিল "ওয়াকার"*

*অরণ্যদেবেরই অন্য নাম "ওয়াকার"

বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে গেল খবর। বন্দরে-বন্দরে শুরু হল কানাকানি...

নিশ্চয়ই তিনি অরণ্যদেব!

?!

আগামী সপ্তাহে: নতুন কাহিনী ১৬

অরণ্যদেব ✫ লী ফক

নতুন গল্পের সূচনা—

আমরা এখন কোথায় ক্যাপটেন?

এইখানে। এর কাছাকাছি কয়েকটা জায়গায় জল খুব অগভীর, জাহাজ আটকে যায়।

গোলডি!

কী বলছ, ডাডি?

ক্যাপটেনের কাছে ঘুরঘুর করছ কেন?

জানতে এসেছি আমরা এখন কোথায়।

অদূরে সোনা-বেলার উপরে জেড-পাথরের সেই বাড়ি, সপ্তদশ শতকে-----

··· অরণ্যদেবের এক পূর্বপুরুষকে সম্রাট জুনকর যা উপহার দিয়েছিলেন-----

পুরুষানুক্রমে এই সম্পত্তি তোমরা ভোগ করবে।

এই বাড়িতেই অরণ্যদেবের পূর্বপুরুষরা তাঁদের বিবাহ-যামিনী যাপন করেছেন-----

12/3

এই বাড়িতেই বসন্তকালে লংগো আর ওয়াম্বেসি গোষ্ঠীর বিবাহের ধুম লেগে যায়।

এই পবিত্র ভবনকে সাক্ষী রেখে তোমরা আজ দম্পতি হলে।

সমুদ্রে—ভাড়া-করা প্রমোদ-জাহাজে ঘুরছে দুর্বৃত্তদল-----

হোহো, এ দান জিতলাম।

@✫!!▲#! বড্ড বেশী জিতছিস যে!

···এবং তাদের প্রমোদ-সঙ্গিনীরা

লোকগুলো তাস না-খেলে একটু বাইরে এসে বসলেই তো পারে—

বেশ লাগছে বিন্দু!

যা বলেছ!

দূরে ওই দ্বীপের মাটি কী সুন্দর! একেবারে সোনার মত চকচক করছে!

বি-এফ-জে-এ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

বি-এফ-জে-এ অনুষ্ঠানে যথাক্রমে বাংলা ও হিন্দী ছবির দুই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—উত্তমকুমার ও সুনীল দত্ত। ফটো—দেশ

গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে এবং যথাবিহিত আড়ম্বরের মধ্যে গত সোমবার ৬ মে সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদনে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন-এর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। সংস্থার সভাপতি শ্রীঅশোককুমার সরকার প্রথমে সকলকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর ভাষণে বি-এফ-জে-এ পুরস্কারবিজয়ীদের অভিনন্দন জানান। যাঁরা এবার পুরস্কার পানান তাঁদের কাজেরও তিনি প্রশংসা করেন এবং বলেন, একযোগে যদি তাঁরা চেষ্টা করেন তবে এ-দেশের ফিল্মের উচ্চমানই শুধু রক্ষিত হবে তা নয়, মান উন্নততর করেন।

শ্রীসরকার অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। তিনি প্রযোজকদের কাছে আবেদন জানান, তাঁরা যেন বক্স-অফিসের বেদীতলে সৌন্দর্যবোধকে বিসর্জন না দেন। তিনি চিত্রনির্মাতাদের সাহিত্য ও আর্টের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করতে বলেন। এবং তাঁরা যদি ঐক্যবদ্ধ হন তবে শ্রীসরকার আশা প্রকাশ করেন, ভারতীয় সিনেমা থেকে অসৌন্দর্য ও অশালীনতা দূর হবে। প্রসঙ্গত "পিওর সিনেমা"-র কথাও তিনি বলেন। এবং এই মন্তব্য করেন, আর্টের মাধ্যম হিসাবে ফিল্ম যাতে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে সে কারণে "পিওর সিনেমা"-র প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই সিনেমার প্রচেষ্টা সীমিত হতে বাধ্য। কেননা তা অনুধাবন করার মত উন্নত রুচি সর্বস্তরের দর্শকের নেই। সব ছবিই "পিওর সিনেমা" হতে গিয়ে যদি বক্স-অফিসে "ফ্লপ" করে তবে ফিল্ম ইনডাস্ট্রির মরণদশা উপস্থিত হবে। অতএব বোদ্ধা দর্শকের জন্য কিছু ছবি থাকুক, বাকিগুলো যেন দর্শকসাধারণকে আনন্দ দিতে সক্ষম হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রী কে কে শাহ। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বাংলা ছবির শিল্পগত উৎকর্ষের কথা বলেন, এবং এই মন্তব্য করেন যে, ভারতীয় ছবির আন্তর্জাতিক সমাদর যদি বেড়ে থাকে তবে তার মূলে অল্প-বাজেটে তৈরী বাংলা ছবির দানই সমধিক। শ্রীশাহ বাংলার চিত্রপরিচালক ও শিল্পীদের অভিনন্দন জানান- এই কারণে যে, তাঁরা নাগরিকজীবনের প্রগতিশীলতা এবং গ্রাম্য পরিবেশের বাস্তবতার চিত্র তাঁদের ছবিতে প্রকাশ করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয়

অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন বি-এফ-জে-এ সভাপতি শ্রীঅশোককুমার সরকার—তাঁর ডাইনে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রী কে কে শাহ ও শ্রী বি এন সরকার এবং বাঁয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী ডি এন সিংহ। ফটো—দেশ

অনুষ্ঠানের পর শ্রীঅশোককুমার সরকার প্রদত্ত ডিনার পার্টিতে (উপরে ডাইনে) কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীশাহের দুই পাশে মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় ও দীনা গান্ধী (মাঝখানে) শ্রী ও শ্রীমতী সরকারের সঙ্গে (ডাইনে) হেমন্তকুমার ও দীপচাঁদ কাংকারিয়া (নীচে) কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে শ্রীমতী সরকার, শ্রীসরকার এবং পূর্ণিমা দত্ত (উপরে) বাঁয়ে শ্রী ও শ্রীমতী সরকারের সঙ্গে মুকেশ (নীচে) নেপাল দত্ত ও পূর্ণিমা দত্তর সঙ্গে আলাপরত শ্রীসরকার।

ফটো—দেশ

মন্ত্রী তরুণ মনে সুরুচি ও সুস্থ দৃষ্টি-ভঙ্গী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে চিত্রপরিচালকদের দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন।

ফিল্ম সেন্সর বোর্ড সম্পর্কে শ্রীশাহ বলেন, এই আশ্বাস আমি আপনাদের দিতে পারি যে, ছবি শুধু কেটে বাদ দেওয়াই সেন্সর বোর্ডের লক্ষ্য নয়। বোর্ড শুধু দেখতে চান, আপনারা আপনাদের সামাজিক দায়িত্ব যথাযথ পালন করছেন কিনা। ছায়া-ছবির বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে আলোচনাকালে শ্রীশাহ বলেন, আধুনিক ভারতীয় ছবিতে রাধা-কৃষ্ণ উপাখ্যানের বিশেষ স্থান নেই। এইসব উপাখ্যান সহজেই জনসাধারণকে আকৃষ্ট করতে পারে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী ডি এন সিংহ বলেন, বাংলাদেশে টাকার জন্য ছবি তৈরী হয় ঠিকই, কিন্তু তা কখনও "এসথেটিক" রস বিসর্জন দেয়নি। তিনি চিত্রনির্মাতাদের সামাজিক সচেতনতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। ফিল্মে রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যানের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একটি বিষয় ভেবে দেখতে হবে যে, রাধা-কৃষ্ণ অধিক দর্শক আকর্ষণ করবে, না চার্লি চ্যাপলিন এবং বব হোপ। শ্রীসিংহ এই আশা প্রকাশ করেন যে, একদিন বি-এফ-জে-এ পুরস্কার ওস্কার পুরস্কারের মতই বিখ্যাত হয়ে উঠবে।

সভাপতি শ্রীঅশোককুমার সরকার বিদেশে ভারতের ছবির মর্যাদা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে বলেন, দুর্ভাগ্যবশত বিদেশীরা ভারতীয় ছবি দেখবার সুযোগ পান কম। বিদেশে ছবি দেখাবার তেমন কোন ব্যবস্থাও নেই। বিদেশে আমাদের দূতাবাস এ বিষয়ে অনেক কিছু করতে পারেন। তাঁরা ভারতীয় ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলে বিদেশীরা তা দেখবার সুযোগ পেতে পারেন। সাগরপারে ভারতীয় ছবির জনপ্রিয়তা বাড়াবার ব্যাপারে আমাদের দূতাবাস প্রায় নিষ্ক্রিয়।

অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রী বি এন সরকার। পুরস্কারবিজয়ীদের পক্ষ

থেকে বোম্বাইয়ের অভিনেতা শ্রীসুনীল দত্ত তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বি-এফ-জে-এ পুরস্কারের মর্যাদার কথা বলেন এবং এই মন্তব্য করেন যে, প্রত্যেকেরই উচিত নিজে এসে নিজের হাতে পুরস্কার নেওয়া। ফিল্ম-জগতের দুর্নীতি সম্বন্ধে যেসব অভিযোগ শোনা যায় সে সম্পর্কে শ্রীদত্ত বলেন, দুর্নীতি সর্বত্রই রয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্র যদি দুর্নীতিমুক্ত হয় তবে ফিল্ম-জগতের দুর্নীতিও দূর হবে।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীশাহ, প্রধান অতিথি শ্রীসিংহ, সভাপতি শ্রীসরকার এবং শ্রী বি এন সরকারকে মাল্য-ভূষিত করেন বি-এফ-জে-এ-র সহ-

পুরস্কার নিচ্ছেন উত্তমকুমার, সুনীল দত্ত ও বিকাশ রায়। ফটো—দেশ

নন্দিনীকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন অরুন্ধতী দেবী। ফটো—দেশ

পুরস্কার নিচ্ছেন অরুন্ধতী দেবী, নয়না সাহু ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। ফটো দেশ

সভাপতি শ্রীমহেন্দ্র সরকার। উদ্বোধন-সংগীত এবং পরে জাতীয় সংগীত গেয়ে শোনান শ্রীচিন্তাপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং পরে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রী বি ঝা। শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ এবার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাঁর প্রেরিত বাণী পাঠ করে শোনান শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ। বি-এফ-জে-এ সম্পাদক শ্রীসেবাব্রত গুপ্ত সংক্ষিপ্ত বার্ষিক বিবরণে সংস্থার পরলোকগত সদস্য শ্রীশৈলেন রায় এবং শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যালের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রীসুনীল দত্তের একটি মন্তব্যের উত্তরে সম্পাদক জানান, আঞ্চলিক ছবির (যথা তামিল, তেলুগু, অসমীয়া, ওড়িয়া প্রভৃতি) পুরস্কারের প্রবর্তন করার ইচ্ছা থাকলেও বি-এফ-জে-এ-র পক্ষে তা সম্ভব নয়। কারণ, সভ্যদের এইসব ছবি দেখবার সুযোগ নেই।

পুরস্কার নিচ্ছেন মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, নন্দিনী মালিয়া ও দীনা গান্ধী। ফটো—দেশ

অন্য বছরের তুলনায় এবারের অনুষ্ঠান হয়েছিল সব চাইতে বেশী চিত্তাকর্ষক। পুরস্কৃত প্লে-ব্যাক শিল্পীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমান্না দে, শ্রীমুকেশ ও শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা সকলেই একটি করে গান করেন। শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালকের পুরস্কারে ভূষিত শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায়ও একটি রবীন্দ্র-সংগীত গেয়ে শোনান।

বি-এফ-জে-এ পুরস্কার নেবার জন্য বোম্বাই থেকে এসেছিলেন শ্রীসুনীল দত্ত, শ্রীমতী নয়না সাহু (হিন্দী ছবির অন্যতম শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী), শ্রীহৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমুকেশ, শ্রীবিমল দত্ত ও শ্রী ডি এন

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীশাহের সঙ্গে আলাপরত বি-এফ-জে-এ সভাপতি শ্রীসরকার, ডাইনে প্রধান বিচারপতি শ্রীসিংহ (মাঝখানে) অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাধবী মুখোপাধ্যায়, রাখী বিশ্বাস, সুমিতা সান্যাল প্রভৃতি (নীচে) মৌসুমীকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন শমিতা বিশ্বাস ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। ফটো—**দেশ**

মুখার্জি (অনুপমার চিত্রনাট্যকার), শ্রীমতী দীনা গান্ধী (হিন্দী ছবির শ্রেষ্ঠা সহ-অভিনেত্রী) এবং শ্রীরাজন চাওলা (উসকি কহানীর অন্যতম প্রযোজক)। মাদ্রাজ থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত দুই শব্দযন্ত্রী শ্রী কে

আর রামস্বামী এবং শ্রীনিবাসন এসে উপস্থিত হন। কলকাতার পুরস্কার-বিজয়ীরা প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রীউত্তমকুমার, শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী, শ্রীবিকাশ রায়, শ্রীমতী মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়,

শ্রীমতী সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী নন্দিনী মালিয়া, শ্রীবিমল কর, শ্রীগৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, শ্রীসুব্রত মিত্র, শ্রীবংশী চন্দ্রগুপ্ত, শ্রীসুবোধ রায়, শ্রীনৃপেন পাল, শ্রীঅনিল তালুকদার এবং প্রযোজকদের মধ্যে শ্রীনেপাল দত্ত (ছুটি), শ্রীসুনীল জিন্দল (কেদার রাজা), শ্রীমতী পূর্ণিমা দত্ত (হাটে বাজারে) প্রভৃতি। অনুষ্ঠানে বাংলা চিত্রজগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। চিত্র-তারকাদের অনেকেই এসেছিলেন। শ্রীমতী নয়না সাহুর পিতা বিশিষ্ট অভিনেতা-পরিচালক শ্রীকিশোর সাহুও উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানের পরে এক প্রীতি-সম্মেলনে সকলে মিলিত হন। ঐদিন রাত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বি-এফ-জে-এ

যমুনা বড়ুয়ার হাত থেকে সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা প্রদত্ত পি সি বড়ুয়া স্মৃতি পুরস্কার (রৌপ্যফলক) নিচ্ছেন অরুন্ধতী দেবী। ফটো—**দেশ**

পুরস্কারবিজয়ীদের সম্মানার্থে সংস্থার সভাপতি শ্রীঅশোককুমার সরকার এক ভোজ-সভার ব্যবস্থা করেন। বোম্বাইয়ের এবং কলকাতার আর সব পুরস্কারবিজয়ী যা বলেছেন, শ্রীমুকেশও তা বলে গেলেন, "এমন সুন্দর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান কোথাও দেখিনি। বোম্বাইয়ে এমন হয় না। এখন কষ্ট হচ্ছে, গতবার কেন আসিনি।"

সুগায়ক শ্রীমান্না দের কথায়ও এই একই অনুশোচনা। এবার নিয়ে তিনি তিনবার শ্রেষ্ঠ প্লে-ব্যাক শিল্পী হিসাবে পুরস্কার পেলেন। অন্যান্যবার তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। দর্শকদের ঘন ঘন করতালির মধ্যে শিল্পীরা একের পর এক মঞ্চে উঠে পুরস্কার নিলেন। শ্রীসুনীল দত্ত ও শ্রীউত্তমকুমারের নাম ডাকা হল শেষের দিকে। তখন যেন হাততালি থামতেই চায় না। দর্শকের বিপুল অভিনন্দন পেলেন

শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী, শ্রীবিকাশ রায়, শ্রীমান্না দে, শ্রীনৃকেশ, শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী নয়না সাহু, শ্রীমতী মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী নন্দিনী মালিয়া, শ্রীমতী সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী দীনা গান্ধী, শ্রীহৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বি-এফ-জে-এ-র বিচারে শ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিচালনার জন্য যিনি পুরস্কৃত, সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা তাঁকে 'পি সি বড়ুয়া মেমোরিয়াল প্রাইজ' দেন। একটি রৌপ্য-ফলক। শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী এই পুরস্কার পান। বি-এফ-জে-এ-র বিচারে শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যের (বাংলা) পুরস্কার যাঁর প্রাপ্য, তিনি পান প্রসাদ সিংহ স্মৃতি পুরস্কার। একটি সোনার মেডেল। শ্রীবিমল দত্ত ও শ্রী ডি এন মুখার্জি সহ এই পুরস্কারও পেলেন শ্রীমতী অরুন্ধতী। এত পুরস্কার ধরছে না।

রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠান

পাঁচিশে বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের ১০৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতায় বহু অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। রবীন্দ্রকাননে রবীন্দ্রমেলা আয়োজিত পক্ষকালব্যাপী উৎসবের উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅশোককুমার সরকার। জন্মদিনের গান করেন অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সহ শিল্পিবৃন্দ। বাণী ঠাকুরের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় নৃত্যনাট্য "ঋতুরঙ্গ"। তা ছাড়া মেলা ও প্রদর্শনী-প্রাঙ্গণে গান, আবৃত্তি এবং ছায়াচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও ছিল। রবীন্দ্রমেলার পক্ষকালব্যাপী উৎসবে বহুরূপী, মহিলা শিল্পী মহল, রূপকার, দক্ষিণ পরিষদ, ত্রিবেণী, সংগীতচক্র প্রভৃতি বহু সংস্থা বিভিন্ন দিনে নাটক ও নৃত্যনাট্য পরিবেশন করবেন। তা বাদে বিশিষ্ট শিল্পীদের

শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর পুরস্কারে ভূষিত মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, অভিনন্দন জানাচ্ছেন শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়কে। ফটো—দেশ

বি-এফ-জে-এ পুরস্কার নেন (বাঁদিক থেকে) হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, বিমল কর, সুব্রত মিত্র, বংশী চন্দ্রগুপ্ত, নৃপেন পাল, সুবোধ রায় ও নেপাল দত্ত। ফটো—দেশ

গানের আসরের ব্যবস্থাও রয়েছে। মেলা, প্রদর্শনী ও ছায়াচিত্র প্রদর্শনী অন্যতম আকর্ষণ।

রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

রবীন্দ্রসদন পরিচালক কমিটি বারো দিন-ব্যাপী রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের আয়োজন

বি-এফ-জে-এ অনুষ্ঠান দেখছেন নয়না সাহু, মুকেশ, বেলা মুখোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

ফটো—দেশ

করেছেন। পঁচিশে বৈশাখ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে যে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় তার উদ্বোধন করেন নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়। গান করেন শান্তিদেব ঘোষ, সুচিত্রা মিত্র, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, পূরবী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। আবৃত্তিতে যোগ দেন জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, কাজী সব্যসাচী, পার্থপ্রতিম দত্ত, নন্দনী চৌধুরী, রাধামোহন ভট্টাচার্য, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। উদয়শঙ্কর ইণ্ডিয়ান কালচারাল সেণ্টার "অর্ঘ্য" নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করেন। রবিচক্র, বাণীচক্র, ক্রান্তি শিল্পী সংঘ, গণনাট্য সংঘ প্রভৃতি সমবেত সংগীতের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ২৫ বৈশাখ থেকেই রবীন্দ্রসদনে প্রত্যহ নাটকাভিনয় ও নৃত্যনাট্যের কর্মসূচী শুরু হয়েছে। অভিনেতৃ সংঘ, গীতবিতান, শৌভনিক, সুরঙ্গমা, বহুরূপী ও রবীন্দ্র-ভারতী নাটক ও নৃত্যনাট্য অভিনয় করেন। ১৭ মে বিশিষ্ট শিল্পীরা গান গাইবেন। ১৮ মে থেকে ২২ মে যথাক্রমে সি-এল-টি, শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ, রূপকার, রবিতীর্থ এবং দক্ষিণীর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সুরঙ্গমার সমাবর্তন

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম হলে সুরঙ্গমার সমাবর্তন উৎসব সম্পন্ন হয়। বিশ্ব-ভারতীর উপাচার্য ডাঃ কালিদাস ভট্টাচার্য সমাবর্তন ভাষণ দেন। ওইদিন সুরঙ্গমা দুজন প্রবীণ শিল্পীকে সংবর্ধনা জানান

[illegible] কুমার
[illegible] ও শ্রীমতী কনক বিশ্বাস। শ্রীদস্তিদার অসুস্থতাবশত উপস্থিত হতে পারেননি। তাঁর কন্যা শ্রীমতী সুনন্দা চৌধুরী পিতার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার। গান ও "চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্যের ব্যবস্থা ছিল। নীলিমা সেনের গান সকলকে আনন্দ দেয়।

বোম্বাই বিচিত্রা

সতেরই মে বম্বের বিখ্যাত প্রেক্ষাগৃহ অপ্সরায় তপন সিংহ পরিচালিত বাংলা ছবি 'হাটে বাজারে' রিলিজ হবে। পারসেনটেজ বেসিস চালু হবার পর 'হাটে বাজারে'ই প্রথম বাংলা ছবি যার কপালে পারসেনটেজ প্রথার সুযোগ গ্রহণের সৌভাগ্য ঘটল। ঐ একই শর্তে 'হাটে বাজারে'র পর অপ্সরায় 'ছুটি' দেখানো হবে। 'হাটে বাজারে' বাংলা ছবি হলেও এ ছবির প্রধান দুটি চরিত্রে আছেন হিন্দী জগতের দু'জন নাম-করা তারকা, অশোককুমার এবং বৈজয়ন্তীমালা। সুতরাং বম্বের বাঙ্গালী মহল ছাড়াও অন্য আর এক মহলও এ ছবি সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসুক। কিছু দিন যাবৎ বম্বে চলচ্চিত্র-জগতের কলাকুশলীরাও বাংলা ছবি সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহশীল হয়েছেন। এ যাবৎ এঁরা বাংলা ছবিকে মন্থর গতি, নাকে কান্নায় ভরা 'গুডি গুডি' ছবি বলে উপেক্ষা করে এসেছেন। কিন্তু কয়েক বছরের নজির দেখে এঁরা বাংলা ছবি সম্বন্ধে হঠাৎ সজাগ। বেশ কয়েকটি বাংলা ছবির রিমেক হিন্দী ছবি হিসেবে অত্যন্ত সাফল্য লাভ করেছে স্টার সিসটেমকে অগ্রাহ্য করেও। যেমন 'দোস্তি', 'মেরে লাল', 'মমতা।' মাদ্রাজ থেকে গত কয়েক বছরে যে সব সামাজিক চিত্র ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেছে তারও অধিকাংশ বাংলা ছবির মাদ্রাজী সংস্করণ।

বর্তমানে বেশ কয়েকটি বাংলা ছবি আবার হিন্দীতে হচ্ছে। অসিত সেন 'দীপ জ্বেলে যাই'-এর হিন্দী করছেন। তরুণ মজুমদার করছেন 'পলাতক'-এর হিন্দী 'রাহগীর'। তারাচাঁদ বারজাতিয়া বাংলা ছবি 'জীবনমৃত্যু'র রাইটস কিনেছেন। সম্ভবত সত্যেন বোস 'জীবনমৃত্যুর' হিন্দী ভারসান পরিচালনা করবেন। এখন বম্বের চিত্রজগৎ নানা কারণে একটু 'বাঙ্গালী-ঘেঁষা' হয়ে উঠেছে। তার প্রধান কারণ হ'ল বাঙ্গালীরা ছবিতে জমিয়ে গল্প বলতে পারে এবং এটাও প্রায় হঠাৎ আবিষ্কার করেছে যে, সু-অভিনীত এবং সুপরিচালিত গল্পটাই শেষ অবধি বক্স-অফিসের মান নিয়ন্ত্রণ করে। শুধু নাম-করা তারকা আর সঙ্গীত নির্দেশকেই চলবে না, ভাল গল্প চাই এবং সেটা ভালভাবে চিত্রায়িত করাও বিশেষ প্রয়োজন।

সরল শর্মা

বি-এফ-জে-এ অনুষ্ঠানে গান গাইছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকেশ ও মান্না দে। ফটো—দেশ

পুরস্কার নিচ্ছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মুকেশ, মান্না দে ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানের পর প্রীতিসম্মেলনে সুমিত্রা সান্যাল, পূর্ণিমা দত্ত, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, বিমল দত্ত ও মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। ফটো—দেশ

বি-এফ-জে-এ পুরস্কার বিজেতাদের কয়েকজন

ফটো—দেশ

রেকর্ড সমালোচনা

রবীন্দ্রসংগীতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীদের গান সৌভাগ্যবশত আজও আমরা শুনতে পাই। আরও কিছুকাল শুনবও হয়ত। তারপরেই কি সব শেষ? এই নিরাশার কোন কারণ নেই। পূর্বসূরীরাও এসে গিয়েছেন—রবীন্দ্রসংগীতের আগামী যুগ যাঁদের। প্রথম পংক্তিতে তাঁদের স্থান হবে অচিরেই। রবীন্দ্রজয়ন্তীতে হিজ মাস্টার্স ভয়েস এবং কলম্বিয়া রেকর্ডে এই শিল্পী দলের পরিচয় পেলাম। তাঁদের অনেকের গান আগেও শুনেছি। যেমন ঋতু গুহ, অর্ঘ্য সেন, শৈলেন দাস, পূর্বা সিংহ, সাগর সেন প্রভৃতি। ঈ-পি রেকর্ডে কারো দুটি, কারো চারটি গান প্রকাশিত। গানগুলি শুনে ভরসা পেলাম, রবীন্দ্রসংগীত অনধিকারীর হাতে পড়েনি। গাওয়ার ঢঙে এবং দরদে এঁরা সকলেই রসজ্ঞ শ্রোতার মন জয় করতে সক্ষম। গ্রামোফোন কোম্পানি এবার কয়েকজন নতুন শিল্পীকেও গানের সুযোগ দিয়েছেন। সীমা মুখোপাধ্যায়, রিনী চৌধুরী, সুশীল মল্লিক, বলবুল সেন, মানসী পাল ও সুমিত্রা ঘোষ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন। প্রতিশ্রুতি এঁদের সকলের কণ্ঠেই আছে। সীমা মুখোপাধ্যায় ও রিনী চৌধুরীর গান শুনে যেন বেশী আশ্বাস পেলাম।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের যশস্বী শিল্পীদের মধ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র ও সুমিত্রা সেনের চারটি করে গান ঈ-পি রেকর্ডে বের করা হয়েছে। সব কয়টি রেকর্ডই বাড়িতে সাগ্রহে সংগ্রহ করে রাখার মত। এই সব কয়টি রেকর্ডই তো রবীন্দ্রসংগীত - প্রেমিকের নিত্যসংগী। শিল্পীরা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মেজাজ অনুসারে গানগুলি গেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গান শ্যামল মিত্রর গলায় এত ভাল বোধহয় এর আগে শুনিনি। "না, না গো না, করো ভাবনা" কিংবা "হে মাধবী দ্বিধা কেন" বার বার শোনার মত। ৭৮ আর-পি-এম রেকর্ডে তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় দুটি রবীন্দ্রসংগীত সুন্দর গেয়েছেন।

কবিপক্ষে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র-সংগীতের তালিকা (মতভেদ সাপেক্ষে) এই হতে পারে: "তুমি মোর পাও নাই পরিচয় (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়), "তোমায় নতুন করেই পাব বলে" (কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়), "সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি" (সুচিত্রা মিত্র) "আমার যে দিন ভেসে গেছে চোখের জলে" (চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়), "এ দিন আজি কোন ঘরে গো" (সুমিত্রা সেন), "না, না গো না, করো না ভাবনা" (শ্যামল মিত্র), "এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ" (ঋতু গুহ), "অনেক কথা বলেছিলাম" (দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়), "তারে দেখতে পারিনে কেন প্রাণ খুলে গো" (শৈলেন দাস), "যাত্রী আমি ওরে" (তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে কোম্পানি "চিরকুমার সভা" নাটকটি রেকর্ডে উপহার দিয়েছেন। রাধামোহন ভট্টাচার্য (রসিক), সবিতাব্রত দত্ত (অক্ষয়), চারুপ্রকাশ ঘোষ (চন্দ্রবাবু), নির্মলকুমার (পূর্ণ), মৃণাল মুখোপাধ্যায় (শ্রীশ), দ্বিজু ভাওয়াল (বিপিন), ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (দারুকেশ্বর), অজিত চট্টোপাধ্যায় (মৃত্যুঞ্জয়), রুমা গুহঠাকুরতা (নীরবালা), শর্মিষ্ঠা (নৃপবালা), গীতা দত্ত (পুরবালা), গীতা ঘটক (শৈলবালা), মীরা রায় (নির্মলা), রেবা দেবী (জগত্তারিণী) প্রভৃতি এতে অভিনয় করেছেন। অভিনয় এঁদের সকলেরই নিখুঁত। বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে গানও সংগীত। পরিচালনাও (রাধামোহন ভট্টাচার্য-কৃত) সুষ্ঠু। শুধু শুনে "চিরকুমার সভা"র রস যতখানি পাওয়া যায় রেকর্ডে তা লভ্য।

ভারতী রেকর্ডে সমর গুপ্ত দুটি রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েছেন। দুটি গানই সুশ্রাব্য। বিশেষ করে "যৌবন সরসী নীরে"।

প্রতিবাদে পদত্যাগ

পশ্চিমবঙ্গ চিত্রশিল্প সংরক্ষণ সমিতির জনসংযোগ সচিব ও প্রচার সম্পাদক জানাচ্ছেন যে তাঁদের অ্যাকশন কমিটির সদস্য পরিচালক শ্রীতপন সিংহ এবং শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চলচ্চিত্র উন্নয়ন কমিটির সভ্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন।

এ সপ্তাহের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হচ্ছে ১০ মে থেকে প্যারিসে হ্যানয় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলের মধ্যে ভিয়েৎনাম যুদ্ধ-বিরতি ও শান্তি স্থাপন বিষয়ে বৈঠক। প্রেসিডেন্ট জনসন ভিয়েৎনামে যুদ্ধ-বিরতির ইচ্ছা প্রকাশ করার পর প্রায় সপ্তাহ তিনেক ধরে বৈঠকের স্থান নির্বাচন নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে মতানৈক্য চলতে থাকার পর অবশেষে প্যারিসের নাম প্রস্তাব হতে উভয় পক্ষই সম্মতি জানান। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলের প্রধান হলেন শ্রীঅ্যাভারেল হ্যারিম্যান এবং উত্তর ভিয়েৎনামের দলনেতা হলেন শ্রীজুয়ান থুই। শ্রীথুই মসকো হয়ে ৯ মে প্যারিসে সদলে উপস্থিত হন। ১০ তারিখের বৈঠকে উভয় পক্ষের প্রতিনিধি কার্যপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা শুরু করেন এবং পরদিন তাঁরা ঘোষণা করেন যে, সরাসরি আলোচনায় যে কার্যপদ্ধতি অনুসৃত হবে সেবিষয়ে তাঁরা ঐক্যমতে উপনীত হয়েছেন। ১৩ মে থেকে প্রকৃত শান্তি সম্মেলন শুরু হবে।

দেশী সংবাদ

৪ মে—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ১১ এপারিল সরকারি কর্মচারী, বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক এবং বেসরকারি স্কুলের ও কলেজের অশিক্ষক কর্মচারীদের অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা বাড়ানোর কথা ঘোষণা করে জানান যে, সরকারি আর্থিক অবস্থা সুবিধের না হওয়ায় বাড়তি ভাতার অর্ধেক দেওয়া হবে নগদ আর বাকি অর্ধেক প্রভিডেন্ড ফান্ডে জমা অথবা ক্ষুদ্র সঞ্চয় পরিকল্পনায় জমা দেওয়া হবে। আজ সরকারি-ভাবে ঘোষণা করা হয় যে উক্ত অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতার সবটাই নগদে নিতে পারা যাবে।

বাম কমিউনিসট পার্টির নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য ক্রান্তি দল সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে জানান যে, পশ্চিম বঙ্গ ক্রান্তি দল যদি যুক্তফ্রন্টে থাকা সম্পর্কে 'স্বার্থহীন স্পষ্ট সিদ্ধান্ত না নেন' তাহলে মারকসবাদী কমিউনিসট পারটি তাঁদের সাময়িকভাবে ফ্রন্টে রাখার বিরোধিতা করবেন এবং ক্রান্তি দলকে আগামী নির্বাচনে কোন আসন ছাড়বেন না।

৫ মে—পশ্চিম বঙ্গ ক্রান্তি দল সম্পর্কে গতকাল শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত যে মন্তব্য করেন ডান কমিউনিসট নেতা শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় আজ সেটিকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও প্রচণ্ড 'সংহতিনাশক' বলে উল্লেখ করেন। ফরওয়ারড ব্লকের শ্রীঅশোক ঘোষ বলেন মন্তব্যটি অত্যন্ত দুঃখের এবং ওর দ্বারা যুক্ত ফ্রনট বিরোধীদের হাতই শক্ত করবে। ক্রান্তি দলের শ্রীঅশোক রায় বলেন, প্রমোদবাবুর বিবৃতিটি বিস্ময়ের ও বেদনাজনক।

ফরাক্কা সম্পর্কে ভারত-পাকিস্তান নদী বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাবিত বৈঠকে শেষ মুহূর্তে পাকিস্তান প্রতিনিধি দলে একজন নদী বিশেষজ্ঞের বদলে প্রধান সরকারি অফিসার শ্রীজাফরিকে নেতা নির্বাচিত করায় নয়াদিললিতে আশংকা করা হচ্ছে যে বৈঠকটিকে রাজনৈতিক মোলাকাত-এ পরিণত করা হতে পারে। বৈঠকের দিন ধার্য ছিল ১০ মে; এখন ঠিক হয়েছে ১৩ মে। উল্লেখযোগ্য, এই বৈঠকের প্রাক্কালে গত কদিন ধরেই পাকিস্তান রেডিও বলে যাচ্ছে যে, প্রস্তাবিত ফরাক্কা বাঁধ পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষতি করবে।

কোট্টায়ামে আজ কেরল প্রদেশ কংগ্রেসের রাজ্য সম্মেলনের প্রতিনিধি সভায় খাদ্য সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে আই এন টি ইউ সি নেতা শ্রী সি এম স্টিফেন বলেছেন, মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীনামবুদিরিপাদ আগে চাল নিয়ে চোরা কারবার, মুনাফাবাজি এবং মূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করুন, রাজ্যে যা চাল পাওয়া যায় তা যথাযথ বণ্টন করুন। এর আগে খাদ্যের ব্যাপারে দিললিতে ধরনা দেবার জন্য তাঁকে যেতে দেওয়া হবে না, বরং কেরলে শ্রীনামবুদিরিপাদের বিরুদ্ধেই ধরনার ব্যবস্থা হবে।

৬ মে—আজ কলকাতায় ডান কমিউনিসটদের রাজ্য পারটি সম্মেলনে শ্রীসুকুমার গুপ্ত যে রাজনৈতিক রিপোরট পেশ করেছেন তাতে বাম কমিউনিসটদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, 'বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্য যখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন' ঠিক তখনই পশ্চিমবঙ্গে বাম কমিউনিসট পারটির নেতৃত্বের ঐক্যবিরোধী মনোভাব উগ্র হচ্ছে। শ্রীগুপ্ত দুঃখ করে বলেছেন যে, দীর্ঘ তিন বছর ধরে দেখা যাচ্ছে বাম কমিউনিসটরা এই ঐক্য প্রচেষ্টায় সহযোগী হচ্ছেন না, সম্প্রতি ঐক্য-বিরোধী কথাবার্তা ও ক্রিয়াকলাপ বেড়েছে।

৭ মে—লোকসভায় আজ কয়েকজন সদস্যের সক্রোধ প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং জানান, পাক সরকার রাওয়ালপিনডিতে ভারতীয় হোটেলগুলিকে শত্রু সম্পত্তি বলে ঘোষণা করেছেন। ভারত সরকার এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং যে সব ভারতীয় সম্পত্তি পাকিস্তান হস্তান্তর করেছেন বা কাজে লাগিয়েছেন, সে সম্পর্কে ভারত সরকার ক্ষতি-পূরণ চাইতে পারেন। বাণিজ্যমন্ত্রী জানান, ভারত সরকারও কিছু পাকিস্তানী সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি বলে ঘোষণা করেছেন।

৮ মে—উপপরিবহণ মন্ত্রী শ্রীভক্তদর্শন আজ রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন: ভারত সরকার কলকাতা ট্রামওয়ে কোমপানিকে ট্রাম পরিচালনার ভার ফিরিয়ে দিতে চান না। যুক্ত ফ্রনটের আমলে পশ্চিম বঙ্গ সরকার ট্রাম কোম্পানির পরিচালন ভার গ্রহণ করেন।

৯ মে—আজ রাজ্যসভায় বহির্বিষয়ক দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী বি আর ভগৎ জানান যে, পশ্চিম বঙ্গের লাঠিটুলা-ডুমাবাড়ি এলাকায় প্রায় ৭৪৮ বিঘা জায়গা পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। শ্রীভগৎ বলেন, ওই সব জায়গা অবশ্যই ভারতের। ১৯৬২তে এক গুলি বিনিময়ের পর থেকে ওই জায়গা পাকি-স্তানের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পাকিস্তান বলেছে, বেরুবাড়ি প্রশ্নের নিষ্পত্তি না হলে এই সব জায়গা হস্তান্তর বিষয়ে তারা আলোচনা করবে না।

১০ মে—পানজাব ও হরিয়ানা হাইকোরটের এক স্পেশ্যাল বেনচ আজ ১৯৬৮ সালের বাজেট সম্পর্কিত দুটি ব্যয়ানুমোদন আইন এবং বিধান-সভার আর্থিক বিষয় নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজ্যপাল যে অরডিন্যানস জারি করেছেন, সেটি অধি-কাংশের মতানুযায়ী সংবিধান বহির্ভূত সুতরাং অবৈধ বলে ঘোষণা করায় পানজাবে বড় রকমের সাংবিধানিক সংকট দেখা দিয়েছে। হাইকোরট অবশ্য রাজ্য সরকারকে সুপ্রীমকোরটে আপীলের অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু হাই-কোরটের রায় কার্যকর করা স্থগিত রাখার আবেদন অগ্রাহ্য করেছেন।

বিদেশী সংবাদ

বিদেশী সংবাদ

৪ মে—চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিসট দলনেতা শ্রীআলেকজানডার ডুবচেক আজ এক প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধি দল নিয়ে হঠাৎ মসকোয় এসে পৌঁছেছেন। কেন এই সফর সে সম্পর্কে সরকারিভাবে কিছু ঘোষিত হয়নি। প্রাগ থেকে প্রচারিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে এই সফর সংক্ষিপ্ত এবং ভ্রাতৃত্বমূলক। তবে পর্যবেক্ষকদের ধারণা যে, দু দেশের নেতাদের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি কোন বিষয় আলোচনা অবশ্যম্ভাবী।

সোভিয়েট রাশিয়া আজ ঘোষণা করেছে যে, একটি রুশ-মারকিন কনসাল পর্যায়ের চুক্তি অনুমোদিত হয়েছে। দু দেশের মধ্যে এই প্রথম দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি অনুমোদিত হল। এর ফলে দু দেশেই বাণিজ্যিক দূতাবাস স্থাপিত হবে। মারকিন সেনেট এই চুক্তি অনুমোদন করেন ১৯৬৭-র মারচ মাসে। সুপ্রীম সোভিয়েট অনুমোদন করেছেন গত ২৬ এপারিল।

৫ মে—আজ সায়গনের রাজপথে লড়াইয়ের ফলে ভিয়েতকংরা একজন পশ্চিম জারমান কূটনীতিক এবং চারজন বিদেশী সাংবাদিককে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। নিহত সাংবাদিকদের মধ্যে একজন ইংরাজ এবং বাকি তিনজন অসট্রেলীয়। জানুয়ারি অভিযানের পুনরাবৃত্তি করে ভিয়েতকংরা আজ দক্ষিণ ভিয়েতনামের ১২০টি শহর ও সামরিক ঘাটিতে আক্রমণ চালায়। এক মারকিন মুখপাত্রের ধারনা শান্তি আলোচনার তাদের দাবি জোরদার করার জন্যই ভিয়েতকংরা এমন মরিয়া হয়ে আক্রমণ চালিয়েছে।

৮ মে—পাক জাতীয় পরিষদে পাকিস্তানের সংযোগরক্ষা মন্ত্রী খান এ সবুর আজ ঘোষণা করেছেন যে, ভারত যদি এককভাবে ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণ করতে থাকে, তাহলে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের জন্য চেষ্টা করতে পারে। ভাগীরথীর জন্য একটি 'ফিডার ক্যানেল'-এ জল সরিয়ে দেওয়াই ভারতের এই বাঁধ নির্মাণের লক্ষ্য। পাকিস্তানের বক্তব্য এই প্রকল্প পূর্ব পাকিস্তানে চাষের ক্ষতি করবে।

হংকং-এ পাওয়া একটি রেড গারড পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, চেয়ারম্যান মাও ও তাঁর ঘনিষ্ঠতম উপদেষ্টাদের গদীচ্যুত করার চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর অস্থায়ী চিফ অফ স্টাফ জেনারেল ইয়াং-চেং-উ, জেনারেল য়ু লি চান এবং পিকিং গ্যারিসনের কম্যানডার জেনারেল ফু চেন সি-কে বরখাস্ত করা হয়েছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

নূতন বই ॥ নূতন বই

বিমল মিত্রের নবতম গ্রন্থ

কলকাতা থেকে বলছি ৬,

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর প্রথম বাংলা বই

বাঙালী জীবনে রমণী ১০,

লীলা মজুমদারের

আর কোনোখানে ৫,

প্রবোধকুমার সান্যালের নূতন উপন্যাস

নগরে অনেক রাত ৪৷৷

রঃ চৌধুরীর নূতন উপন্যাস

জরির আঁচল ৪৲

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস

আঁধি ৭৷৷

॥ নূতন মুদ্রণ ॥

তারাশঙ্করের চিরনূতন

রাধা ৮৲ গন্নাবেগম ৮৲

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের

ঈস্ট বাকল্যাণ্ড রোড ৮৲

জরাসন্ধের — প্রবোধকুমার সান্যালের

বন্যা ৪৲ বিবাগী ভ্রমর ৮৲

আশাপূর্ণা দেবীর

প্রথম প্রতিশ্রুতি ১৪৲

॥ ষষ্ঠ মুদ্রণ প্রকাশিত হ'ল ॥

সুবর্ণলতা ১৩৲

; তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হ'ল

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

একদা কী করিয়া ১৩৲

॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হ'ল ॥

বাংলার অভিজাত মাসিক সাহিত্য পত্রিকা

কথাসাহিত্য

বৈশাখ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে

বৈশাখ হতে রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত আশাপূর্ণা দেবীর বিখ্যাত উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' ও 'সুবর্ণলতার' শেষ পর্ব 'বকুল কথা' ও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সরস রচনা "একই শহরের দুই প্রান্তে" ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে শুরু হল। এছাড়া প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাস "বিপুল সুদূর তুমি যে." জরাসন্ধের "নিঃসঙ্গ পথিক." আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের "শতরূপে দেখা" ও নীহাররঞ্জন গুপ্তের "সেই মরুপ্রান্তে" নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। বৈশাখ সংখ্যায় "দাদাঠাকুর ক্রোড়পত্র" পাঠকদের পক্ষে একটি বিশেষ আকর্ষণ। এই ক্রোড়পত্রে দাদাঠাকুর-প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দ। এছাড়া দাদাঠাকুরের রচনা, হস্তলিপি, আলোকচিত্র ক্রোড়পত্রে সংকলিত হয়েছে।

দাম : ৬৫ পয়সা । সডাক বার্ষিক চাঁদা ৮·৫০

॥ প্রমথনাথ বিশী ॥

রবীন্দ্র সরণী (৩য় মুদ্রণ) ১০,

বঙ্কিম সরণী (নূতন মুদ্রণ যন্ত্রস্থ) ১০,

॥ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ॥

কুয়ারী গিরিপথে ৫৷৷

॥ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস ॥

অন্য দেশ অন্য দাহ ১৫৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২ || ৩৪-৮৭৯১

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীফাল্গুনী দাশগুপ্ত

আরশোলা মারার যে নতুন ওষুধ সারা পৃথিবীতে ব্যবহার করা হয়

এখন তা ভারতেই পাওয়া যাচ্ছে

বিশ্ব আলোড়নকারী 'বেগন' এখন ভারতে তৈরী হোচ্ছে। সবরকমের আরশোলা মারতে একমাত্র 'বেগন'ই সক্ষম। এক লিটার জলের সাথে এক বোতল 'বেগন' মিশিয়ে 'স্প্রে' করুন—'ফ্লাসিং' উপায়ে সবপোকা লুকানোর জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসতে বাধ্য হবে। 'বেগন' সম্পূর্ণভাবে আরশোলা বিনাশ করে।

25 ml
Baygon
concentrate
Insecticidal concentrate against obnoxious cockroaches and other household pests.

বেগন
Baygon®

বিশ্ববিখ্যাত 'বায়ার' (জার্মানী) কোম্পানীর 'ফরমূলা' অনুসারে ভারতে প্রস্তুত।

BAYER®

বায়ার (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড (বোম্বাই-১) ট্রেড মার্কের রেজিষ্ট্রীকৃত ব্যবহর্তা।

NO. 34 : 18 CLUES

(1) As soon as a woman forgets that it is her function to please, and begins to rule, she has lost claim on the **Affections|Attentions** of her husband.

(2) The **Artist|Scientist** can never derive any real pleasure in his work by sheer anticipation of physical comfort or material well being.

(3) Cultures are alive only when they are **Creative|Receptive**, and respond to some new challenge, physical, social or spiritual.

(4) There are powerful forces tending towards ever increasing centralisation in politics, economics and even **Cultural|Educational** activities.

(5) Our success in shaping the future we seek depends upon the sense of **Duty|Unity** and the spirit of dedication that move us, or can be evoked in us.

(6) We are **Egoists|Moralists**, one and all.

(7) Translations, however adequate, generally miss the poetic **Fire|Flavour** of the original.

(8) True **Friendship|Statesmanship** ignores political affiliations.

(9) Peace is essential for the preservation of **Humanity|Sanity** in this thermo-nuclear age.

(10) The summit is a strange point. It is rather difficult to remain there too long. The fall, generally and relatively, is always **Immanent|Imminent**.

(11) **Justice|Providence** is not cruel—it is above the ordinary limits of pain and pleasure.

(12) There seems to be a **Mental|Social** satiefaction in feeling that the criminal suffers for his deeds.

(13) Man, shaking with fathomless fears and consumed by ineradicable hatred, is **Not|Yet** a product to be proud of.

(14) Placed under the sway of conflicting urges, we are yet given the **Poetic|Stoic** quality of composing a harmonious life.

(15) True, youth has been traditionally somewhat **Reckless|Restless**.

(16) Science is always **Revealing|Revolutionary**.

(17) Children are the most **Ruthless|Thoughtless** people in creation. While you're breaking your heart worrying about their feelings, they've forgotten about you and are having fun.

(18) **Peace** should flow out of **Strength|Truth**.

দ্রষ্টব্য:—ওপরের ধাঁধাগুলি বিভিন্ন ভারতীয় লেখকদের লেখা থেকে নেওয়া কয়েকটি প্রশ্ন। এগুলি সব সম্পূর্ণ বাক্য ও নিজস্ব সম্পূর্ণ অর্থ বহন করে। লেখক/প্রবন্ধকারের নাম ও তাঁহাদের রচনার নাম সরকারীভাবে সমাধানের সঙ্গে লিট্‌-কুইজ উইকলিতে প্রকাশ করা হবে।

১। নারী যখনই সন্তুষ্ট রাখতে ভুলে যায়, শাসন করতে শুরু করে তখনই সে তার স্বামীর **অনুরাগের/মনোযোগের** ওপর নিজের দাবি হারিয়ে বসে।

২। **শিল্পী/বৈজ্ঞানিক** শুধু দৈহিক সুখ বা ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্য চাইলে নিজের কাজে সে কখনোই সত্যিকারের আনন্দ পেতে পারবে না।

৩। সংস্কৃতি ততক্ষণই বেঁচে থাকে যতক্ষণ তা **সৃজনশীল/গ্রহণশীল** হয়, নতুন যে কোন প্রাকৃতিক, সামাজিক বা আধ্যাত্মিক পরিবেশের যোগ্য হ'তে পারে।

৪। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এমন কি **সাংস্কৃতিক/শিক্ষার** ক্ষেত্রকেও ক্রমেই আরো বেশী কেন্দ্রগত ক'রে তুলবার জন্যে প্রবল শক্তি সক্রিয় রয়েছে।

৫। যে ভবিষ্যৎ আমরা চাই, তাকে গড়ে তুলবার ব্যাপারে আমাদের **কর্তব্যবোধ/একতা** আর নিষ্ঠার প্রতি জাগ্রত চেতনার ওপরেই সাফল্য নির্ভর করে।

৬। আমরা প্রত্যেকেই **আত্মানুরাগী/নীতিপরায়ণ**।

৭। অনুবাদ যতই সুন্দর হোক না কেন মূলগ্রন্থের কাব্যময় **দীপ্তি/সৌরভ** সাধারণতঃ তাতে ফুটে ওঠে না।

৮। সত্যিকারের **বন্ধুত্ব/কূটনীতিজ্ঞতা** রাজনৈতিক সম্পর্ককে তুচ্ছ করে।

৯। এই তাপ আণবিক যুগে **মানবিকতা/মতিস্থিরতা** বজায় রাখবার জন্যে শান্তি একান্ত দরকার।

১০। শিখর এক বিচিত্র বিন্দু, সেখানে বেশিক্ষণ থাকা বেশ কষ্টকর। সাধারণতঃ আর আপেক্ষিকভাবে সেখান থেকে পতন সবসময়েই **অন্তর্নিহিত/সন্নিহিত**।

১১। **ন্যায়/দৈব** নিষ্ঠুর নয়—সাধারণতঃ তা দুঃখ বা আনন্দের ঊর্ধ্বে।

১২। অপরাধী তার কাজের সাজা পায় এই অনুভূতির মধ্যে এক **সামাজিক/মানসিক** তৃপ্তি পাওয়া যায়।

১৩। অন্তহীন ভয়ে কম্পিত, অনিবার ঘৃণায় নিমজ্জিত মানুষ গর্ব করবার মত লোক **নয়/এখনো নয়**।

১৪। পরস্পরবিরোধী আকাঙ্ক্ষায় আন্দোলিত হয়েও সমন্বয়পূর্ণ জীবন গড়ে তোলার এক **কাব্যময়/নির্বিকার** মন আমাদের আছে।

১৫। সত্যি, যুবসম্প্রদায় পুরুষানুক্রমেই বেশ কিছুটা **দুঃসাহসী/চঞ্চল**।

১৬। বিজ্ঞান সবসময়েই **প্রকাশশীল/বৈপ্লবিক**।

১৭। শিশুরা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী **নির্দয়/অবিবেচক**। যখন ওদের মনের কথা ভেবে আপনার হৃদয় টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, ওরা কিন্তু আপনাকে তখন ভুলে গেছে আর বেশ মজা করছে।

১৮। **শক্তি/সত্য** থেকেই শান্তি প্রবাহিত হওয়া উচিত।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৫ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৩০
শনিবার ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	২৭.৫০
ষাণ্মাসিক „	১৪.০০
ত্রৈমাসিক „	৭.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	২৭.৫০
ষাণ্মাসিক „	১৪.০০
ত্রৈমাসিক „	৭.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ-ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৪০.০০
ষাণ্মাসিক „	২০.০০
ত্রৈমাসিক „	১১.৫০

আসাম-অঞ্চলে
(বিমান-ডাকে)

বার্ষিক	৩১.৬০
ষাণ্মাসিক	১৬.০০
ত্রৈমাসিক	৮.০০

দাম ৫০ পয়সা
আসামে বিমান মাশুল (অতিরিক্ত) ৫ পয়সা

DESH

Saturday 25 May 1968

কলকাতার উন্নয়ন

কথায় বলে গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। কলকাতা শহর বোধ করি এই রকম এক গেঁয়ো যোগী, এ-দেশের যোজনা আর উন্নয়ন পরিকল্পনার তহবিল থেকে তার জন্যে মুষ্টি বরাদ্দ জোটে হয়ত কিন্তু তাতে যোগীর ভিক্ষা-ঝুলির কোণাও ভরে না। জব চার্ণকের হাতে যে নগরীর পত্তন তার যত ইতিহাস আর ঐতিহ্যই থাকুক না কেন, তবু সে তো গেঁয়ো, তার ঝুলিতে ভিক্ষা দিতে, আমাদের দেশী সরকারের তেমন কিছু আগ্রহ নেই। পরিণামে অবস্থাটা আপাতত যা দাঁড়িয়েছে তাতে কলকাতার চেহারা হয়েছে জরাজীর্ণ, তার সর্বত্রই নড়বড়ে ভাব, সবখানেই দৈন্য আর শ্রীহীনতা। অভিযোগের তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই, তবু কে না জানে এই শহরের পথঘাটের কী হাল, পানীয় জলের কী রকম শোচনীয় অবস্থা, জঞ্জাল অপসারণের ব্যবস্থা কতটা অকিঞ্চিৎকর। এই রকম অভাব বহু, অভিযোগ অজস্র। সি-এম-পি-ও যথারীতি খসড়া দিয়ে এই শহরকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন বটে, তবে খসড়ায় কি হয়, টাকা কই, কে দেবে কোটি কোটি টাকা, কার গরজ! ভারত সরকারের গরজ তেমন নেই। নয়ত তৃতীয় পরিকল্পনায় অল্পস্বল্প কিছু হত। কিছু হল না দেখেই বিশ্বব্যাঙ্ক ব্যাপারটা কবর খুঁড়ে তুলে আনলেন, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা আর রাষ্ট্রসংঘের গলার আওয়াজ চড়ল। অতএব ভারত সরকারের টনক নড়ল। চতুর্থ যোজনায় সি-এম-পি-ও বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়নের জন্যে নিরানব্বই কোটি টাকার যে পরিকল্পনা তৈরি করলেন তার প্রায় অর্ধেকটা মঞ্জুর হল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। এই পঞ্চাশ কোটি টাকার কতটা যে সাহায্য আর কতটা ঋণ তা অবশ্য জানা যায়নি।

যাই হোক, অবশেষে বিদেশী সাহায্য কলকাতাকে উদ্ধার করতে আসছে বলে শোনা যাচ্ছে। টাকাটা অবশ্য আমেরিকার। মার্কিন সরকারের এজেন্সি ফর ইণ্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট তিরিশ কোটি টাকা সাহায্য দিতে রাজী হয়েছেন। ১৯৬৮-৬৯ ও ১৯৬৯-৭০ সনের জন্যে টাকাটা পাওয়া যাবে। নিতান্ত কপাল মন্দ না হলে এখন অবশ্য আশা করা যায়, বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়নের জন্যে কিছু অর্থ পাওয়া যাবে। উপরন্তু হুগলী নদীর ওপর দ্বিতীয় সেতু নির্মাণের জন্যে আট কোটি টাকা পাওয়া যেতে পারে বলেও শোনা যাচ্ছে। অতএব আমরা কিঞ্চিৎ আশাবাদী হতে পারি।

কলকাতা শহরের উন্নয়নের জন্যে আশু কয়েকটি কাজে হাত দেবার রয়েছে। প্রথমত, পানীয় জল। পলতায় আরও অধিক পরিমাণে জল পরিশোধনের ব্যবস্থা, পুরোনো পাম্পের বদল, পলতা-টালা পাইপ লাইন মেরামত ও বদল ইত্যাদি কাজগুলি জরুরী। এই শহরে পানীয় জলের ব্যবস্থা শুধু অপর্যাপ্ত নয়, স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকারক। দ্বিতীয় জরুরী প্রয়োজন হল, আবর্জনা পরিষ্কারের ব্যবস্থা। নতুন লরি কেনার টাকার অভাবে এই শহরের পথে পথে পাহাড় প্রমাণ আবর্জনা জমছে নিত্য। অবস্থাটা মারাত্মক।

তৃতীয় জরুরী প্রয়োজন হল, জল নিকাশী ব্যবস্থা। বানতলা-কুলটি জলনিকাশী খালের সংস্কার, পলিথিতানো যন্ত্রপাতি বসানোর ব্যবস্থা ইত্যাদি না হলে বর্ষার দিনে কলকাতায় যে প্লাবন নামে তার সুরাহা হবে না। রাজ্য সরকার সম্প্রতি এই কাজের ভার নিয়েছেন। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

বস্তি উন্নয়ন ও বস্তি অপসারণের কাজটাও বিশেষ জরুরী। টাকার অভাবে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের কাজ এগোচ্ছে না বলে শোনা যায়। আশা করা যায়, এবার কিছু টাকা এই বাবদ ব্যয় করা হবে।

নিছক টাকা পেলেই যে কলকাতার উন্নতি ঘটে যাবে এমন আমরা মনে করি না। তবু আশা করি, হাতে টাকা এলে কোমরে জোর পাওয়া যাবে। যাঁদের হাতে এই উন্নয়ন-কর্মের দায়িত্ব তাঁরা যদি দক্ষ ও হিসেবী হন, আশা করা যায় এই মরা-শহর কলকাতা ও তার আশপাশের জরাগ্রস্ত অবস্থাটা সামলে নেওয়া সম্ভব হবে।

হরিয়ানায় একটা নির্বাচন হয়ে গেল। মধ্যবর্তী নির্বাচন। গত চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর যে কয়েকটি রাজ্যে অ-কংগ্রেসী শাসন কায়েম হয়েছিল, তার মধ্যে কয়েকটি রাজ্যে ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করতে হয়েছে। কারণ, এই সব রাজ্যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল। সেই অনিশ্চয়তাকে দূরে করার জন্যই প্রয়োজন হয়েছে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করা, রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দেওয়া এবং মধ্যবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে পাকাপোক্ত শাসন প্রবর্তন করা। প্রধানত এই কারণেই রাজ্য সভাগুলো ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তারই ফলে কয়েকটি রাজ্য মধ্যবর্তী নির্বাচনকে মেনে নিয়েছে। সেই রাজ্যের মধ্যে প্রথম নির্বাচন হয়ে গেল হরিয়ানায়।

কংগ্রেস শিবির থেকে বার বার বলা হয়েছে, এবং পশ্চিম বাংলায় বিশেষভাবে বলা হচ্ছে যে, মধ্যবর্তী নির্বাচনে একটি দলের নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা না থাকলে অনিশ্চয়তার সংকট দূরে হবে না। সে কারণে, কংগ্রেসের মূল বক্তব্য একমাত্র কংগ্রেসই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সুনিশ্চিত করতে পারে। এই কারণেই কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ বিশেষভাবে পশ্চিম বাংলায় কোন দলের সঙ্গে নির্বাচনী বোঝাপড়া করতে রাজী নন। অবশ্য এ কথাটা তিনি এবং কংগ্রেসের আরও কয়েকজন নেতা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, যেসব দলের নির্বাচনী ইস্তেহার আদর্শগত ও নীতিগতভাবে কংগ্রেসের অনুরূপ হবে সেইসব ক্ষেত্রে সেইসব দলের সঙ্গে সমঝোতা সম্ভব। কেরলের কংগ্রেস সম্মেলনে কংগ্রেস নেতারা এটাই প্রচার করেছেন যে, জনসাধারণের সঙ্গে কংগ্রেস মিলিত হয়ে ভিন্ন একটি ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত করবে কম্যুনিস্টদের নেতৃত্বকে খর্ব করার জন্য।

শ্রীজ্যোতি বসু মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট দলের মুখপাত্র হিসাবে সম্প্রতি কেরলে বলেছেন, কংগ্রেস কম্যুনিস্টদের জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। একঘরে করার চক্রান্ত চলেছে কেরলে, পশ্চিম বাংলায়। যদি এটা চ্যালেঞ্জের ভাষা হয় তা হলে এই একঘরে করার সুযোগ নিশ্চয়ই আসবে মধ্যবর্তী নির্বাচনের সময়। এই একঘরে হবার সম্ভাবনা থাকবে দুটো অবস্থায় : প্রথমত, অ-কংগ্রেসী দলগুলো সংযুক্ত বিধায়ক দল থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়লে এবং দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষভাবে মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হলে। কেরলে ঠিক এই দুটো সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছে কম্যুনিস্টদের রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে একঘরে করার। কেরলেও প্রথম অবস্থার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বলেই রাজনৈতিক দল হিসাবে যুক্ত ফ্রন্ট থেকে আলাদা হয়ে পড়ার ইঙ্গিত নিশ্চয়ই আছে। দ্বিতীয় অবস্থা হিসাবেও দেখান হয়েছে কেরলের পৌর নির্বাচনে কম্যুনিস্টদের পরাজয়। এমনকি, কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ বলেছেন, পৌর নির্বাচনের রায় মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে উপেক্ষণীয় নয়।

এই সম্ভাবনাগুলো আজ বিভিন্ন অ-কংগ্রেসী রাজ্যে দেখা দিচ্ছে বলেই মধ্যবর্তী নির্বাচন সম্বন্ধে কংগ্রেস এবং কংগ্রেস-বিরোধী ক্যাম্পে আজ সচেতনতা এসেছে। এই সচেতনতা আরও বেশী দেখা দিয়েছে হরিয়ানার নির্বাচনের পর। মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর হরিয়ানায় যে রাজনৈতিক চেহারাটা দেখা দিয়েছে, তাতে হয়ত বাহ্যত কোন পরিবর্তন চোখে পড়বে না। কারণ, মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলে কংগ্রেস একক দল হিসাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। কিন্তু এটা কোন পরিবর্তনের সূচনা করেনি; কারণ, গত চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনেও কংগ্রেসের সাফল্য বর্তমান সাফল্যের কম বা বেশী ছিল না। কিন্তু গত সাধারণ নির্বাচনের পর প্রধানত যে কারণে হরিয়ানায় অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল, তার প্রধান উপসর্গ ছিল দলত্যাগের হিড়িক। এই উপসর্গ প্রধানত দেখা দিয়েছিল চতুর্থ নির্বাচনে কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব প্রবলতর হবার সুযোগ পেয়েছিল বলে।

কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব অনুমান করা হয়েছিল কংগ্রেস সংগঠনের দুর্বলতার মাপকাঠি। সেই মাপকাঠির বিচারে কম্যুনিস্ট এবং অন্যান্য অ-কংগ্রেসী দলের মধ্যে এটাই ছিল স্থির বিশ্বাস যে, কংগ্রেস সংগঠন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির পাটনা কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক দলিলের এটাই ছিল মূল কথা যে, ভাঙনশীল কংগ্রেস সংগঠনকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দেওয়া সম্ভব "বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি"র ঐক্যবদ্ধ আক্রমণে। এই আক্রমণ করা সম্ভব কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটিয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত করে এবং বিভিন্ন রাজ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচন দাবি করে। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি শুধু পশ্চিম বাংলায় নয়, বিহার, পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশে মধ্যবর্তী নির্বাচন দাবি করেছিল। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে মধ্যবর্তী নির্বাচন একমাত্র ক্ষমতা অধিকারের হাতিয়ার নয় : সর্বতোভাবে মধ্যবর্তী নির্বাচন কংগ্রেস এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করার প্রধান হাতিয়ার।

মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যবর্তী নির্বাচন সম্বন্ধে মতামত অত্যন্ত স্পষ্ট। পশ্চিম বাংলায় যুক্ত ফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার কিছু দিন পর থেকেই মধ্যবর্তী নির্বাচন সম্বন্ধে স্লোগান দিয়ে আসছে। এই দাবির পিছনে রাজনৈতিক চিন্তাধারা নিশ্চয়ই ছিল। কারণ, যে সময় এই স্লোগান দেওয়া হয়, সেই সময় পশ্চিম বাংলার যুক্ত ফ্রন্টে বিশেষভাবে এক অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে দেখা দিয়েছিল। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে যুক্ত ফ্রন্টের মধ্যে কম্যুনিস্ট এবং অ-কম্যুনিস্ট দলগুলোর মধ্যে এক তীব্র রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছিল। ঠিক এমনি একটা সময়ে, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পশ্চিম বাংলার নেতৃত্ব মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবি জানিয়েছিল।

এই দাবির পিছনে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির একটা বিশেষ চিন্তাধারা ছিল। যে চিন্তাধারা গত সাধারণ নির্বাচনের আগেই নানাভাবে প্রকাশ করা হয়েছিল। এই চিন্তা-

ধারার মূল কথা ছিল কংগ্রেস ও মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে রাজনৈতিক শক্তিকে দুই স্পষ্ট বিরোধী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। এই চিন্তাধারার স্পষ্ট উদ্দেশ্য, কংগ্রেস-বিরোধী হিসাবে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টিকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য ছোট বড় অ-কংগ্রেসী দলগুলোকে এমনকি সম্ভব হলে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টিকেও পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। এই রাজনৈতিক বিচারধারা ছিল বলেই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট এবং ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে দুই পরস্পর বিরোধী ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হয় চতুর্থ নির্বাচনের আগে। নির্বাচনের পর প্রয়োজনের খাতিরে দুই ফ্রন্ট এক হয়ে যুক্ত ফ্রন্টকে মেনে নেয়; কিন্তু মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি তার মূল চিন্তা-ধারা থেকে কোন সময় বিচ্যুত হয়নি। তাই যুক্ত ফ্রন্টের মধ্যে যখন অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তখন এর সম্পূর্ণ সুযোগ নেবার জন্যই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি মধ্যবর্তী নির্বাচনের ডাক দেয়।

এই দাবির পিছনে পরোক্ষ উদ্দেশ্যও যে ছিল না, এ কথা আজ আর বলা সম্ভব নয়। মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবির এটাই যদি রাজনৈতিক যুক্তি হয় যে, ছোটখাট অ-কম্যুনিস্ট দলগুলো ভেঙ্গে পড়বে, তা হলে যুক্ত ফ্রন্টের ভাঙ্গনকেই প্রচ্ছন্নভাবে সমর্থন জানান হয়। এই ইঙ্গিতটা ছিল বলেই দলত্যাগের প্রসঙ্গটা এত সহজে পশ্চিম বাংলা এবং অন্যান্য রাজ্যে কংগ্রেস ও অ-কংগ্রেসী দলরা মেনে নিয়েছিল। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির উদ্দেশ্যটা অজানা ছিল না বলেই দলত্যাগের খেলার পিছনে কংগ্রেস এবং অ-কংগ্রেসী দলগুলোর উৎসাহটা কোন সময় চাপা ছিল না। হরিয়ানা, পশ্চিম বাংলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি প্রতিটি রাজ্যে দলত্যাগের হিড়িককে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাকে এত দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠার ফলেই মধ্যবর্তী নির্বাচন এসেছে বিভিন্ন রাজ্যে। এই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাই মধ্যবর্তী নির্বাচনের মূল 'ইস্যু' বা প্রধান রাজনৈতিক প্রশ্ন।

এই অনিশ্চয়তাকে যদি রোধ করতে হয়, তা হলে দলত্যাগের খেলাটাই হবে মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রধান রাজনৈতিক প্রশ্ন। যেসব সদস্য দলত্যাগ করে মধ্যবর্তী নির্বাচনকে সামনে এনে দিয়েছে, তাদের প্রতি জনসাধারণের মনোভাব সুস্পষ্টভাবে জানা গেলেই রাজনৈতিক নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। তা যদি সম্ভব নয়, তা হলে কংগ্রেস এবং অ-কংগ্রেসী দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক শক্তিকে সুস্পষ্টভাবে ভাগ করে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। অর্থাৎ পোল্যারাই-জেশনের পথ সুগম করে দেওয়া যায়। এই জাগাজাগিতে যদি কংগ্রেসের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, তা হলে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়।

সেই কারণে মধ্যবর্তী নির্বাচনকে সামনে রেখে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে দুটো বক্তব্য সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টা চলেছে। একটা বক্তব্য কংগ্রেসকে সম্পূর্ণরূপে 'খতম করো'; এবং দ্বিতীয় বক্তব্য সেই সঙ্গে দলত্যাগীদের এবং গণতান্ত্রিক দল হিসাবে পরিচিত বৃহৎ স্বার্থের সমর্থকদের সম্পূর্ণরূপে 'খতম করো'। কংগ্রেসকে 'খতম' করার দাবি সম্বন্ধে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির কোন দ্বিতীয় মত অবশ্য নেই; কিন্তু দ্বিতীয় বক্তব্যে তাদের অন্য মত নিশ্চয়ই আছে। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি বৃহৎ স্বার্থের সমর্থকদের বিরোধী, তবু 'জাতীয় গণতন্ত্রে'র খাতিরে তারা বিভিন্ন কংগ্রেস-বিরোধী দলের সঙ্গে সমঝোতা করা এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষপাতী। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির ধারণা এই ঐক্য আরও সংঘবদ্ধ করে কংগ্রেসকে 'খতম' করা সম্ভব মধ্যবর্তী নির্বাচনে সকল কংগ্রেস-বিরোধী দলের সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত করে। অবশ্য প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলো সম্বন্ধে এদের বিচারধারা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। "গণতান্ত্রিক এবং বামপন্থী" দলের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করে কংগ্রেসকে 'খতম' করা সম্ভব; কারণ, এদের মতে, কংগ্রেস আজ জনসাধারণের কাছ থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছে। মোট কথা, দুই কম্যুনিস্ট ক্যাম্পের মূল কথা কংগ্রেস সংগঠনকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করা মধ্যবর্তী নির্বাচনে।

এটারই মাপকাঠি ছিল হরিয়ানার মধ্যবর্তী নির্বাচন। একদিকে কংগ্রেস যে জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় সেটা প্রমাণ করা, এবং অন্য দিকে, দলত্যাগীদের নির্বাচকরা সমর্থন করে না এটা প্রতিষ্ঠিত করা। সে কারণে, হরিয়ানায় রাজনৈতিক দল হিসাবে কম্যুনিস্টরা বিশেষ শক্তিশালী না হলেও হরিয়ানার মধ্যবর্তী নির্বাচন কম্যুনিস্ট ক্যাম্পের কাছে, এবং বিশেষ করে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হরিয়ানার নির্বাচনে দুটো ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক, নির্বাচকদের কাছে দলত্যাগীরা সম্পূর্ণরূপে অ-গ্রহণযোগ্য এবং দুই, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বলে পরিচিত দলগুলো প্রত্যক্ষভাবে বিপর্যস্ত। সেই সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে, কম্যুনিস্ট প্রার্থীরাও নির্বাচকদের কাছে অ-গ্রহণযোগ্য এবং নির্বাচকদের রায়ে কংগ্রেসের রাজনৈতিক শক্তি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি।

হরিয়ানার নির্বাচন যদি অন্যান্য রাজ্যের এবং বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার মধ্যবর্তী নির্বাচনের অগ্রদূত হিসাবে গণ্য করা হয়, তা হলে সে নির্বাচনের ফলাফলে প্রধান লক্ষণগুলো মিলিয়ে দেওয়া উচিত। মিলিয়ে নেবার চেষ্টা যে হচ্ছে সেটা ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। স্পষ্টতই হরিয়ানার নির্বাচন পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস সংগঠনকে অনেকটা নিশ্চিন্ত করেছে; কারণ, এই নির্বাচনের ফলাফলে নির্দেশ লক্ষ্য করে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস আজ অন্যান্য সমধর্মী দলের সঙ্গে নির্বাচনী আলাপ-আলোচনা অনেক সহজ করে নিতে সক্ষম হবে। পশ্চিম বাংলায়, একটা দলের সঙ্গেই কংগ্রেস নির্বাচনী আলাপ-আলোচনা শুরু করেছে এবং সেটা শ্রীহুমায়ুন কবিরের লোকদল।

শ্রীকবিরের ধারণা যাই হোক না কেন, লোক দলের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে একটা রাজনৈতিক অস্বস্তি ফুটে উঠেছে। বেশ কিছু সদস্য আজ আর সম্পূর্ণরূপে লোক দলের উপর নির্ভর করে মধ্যবর্তী নির্বাচনে সম্মুখীন হবার ভরসা পাচ্ছে না। এদের ধারণা, কংগ্রেসের কাছাকাছি থেকে অ-কংগ্রেস দল হিসাবে কাজ করলে মধ্যবর্তী নির্বাচনে ফলাফল খুব ভাল হবে না। তাই এদের পক্ষ থেকে দাবি উঠেছে কংগ্রেসের সদস্যভুক্ত হওয়া। এতে শ্রীকবিরের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ক্ষুণ্ণ হবে কিনা, সেটা বড় প্রশ্ন না, বড় কথা সংগঠন হিসাবে কংগ্রেস আজ সুযোগ পেয়েছে তার রাজনৈতিক শক্তিকে বৃদ্ধি করার। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস নেতৃত্ব সে সুযোগ কিভাবে গ্রহণ করবে এবং গ্রহণ করতে পারবে কিনা, সেটা ভিন্ন প্রশ্ন; কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে হরিয়ানার নির্বাচন পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস নেতৃত্বকে অনেকাংশে সংগঠিত করে দিয়েছে।

মনে হয়, এটা যুক্ত ফ্রন্ট ক্যাম্পেও লক্ষ করা হয়েছে। কারণ, ফ্রন্টের মধ্যে মূলে যে দ্বন্দ্বগুলো অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করছিল, সেগুলো হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে ভারতীয় ক্রান্তি দলের নেতা শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি এবং শ্রীসুকুমার রায়ের যে আলোচনা হয়েছে, তাতে আর যাই হোক, যুক্ত ফ্রন্ট ভেঙ্গে দেবার উৎসাহ আর কোন মহলে দেখা যাচ্ছে না। অথচ এই দ্বন্দ্বটা এত তীব্র আকারে দেখা দিয়েছে যে, এক সময় অনেকেরই ধারণা ছিল, ভারতীয় ক্রান্তি দল মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে পারবে না। এ ধারণাটা ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যেও ছিল। তাদের সম্প্রতি গৃহীত প্রস্তাবে এটাই বলা হয়েছে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের বিভেদ নীতি যেন 'গণতান্ত্রিক শক্তি'কে পিছিয়ে দিতে না পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে। এই 'বিভেদ নীতি'র প্রতিবাদ শুধু পশ্চিম বাংলায় নয়, কেরলেও উঠেছে। তাই আজ হরিয়ানার নির্বাচনের পর কংগ্রেস-বিরোধী ক্যাম্পে এবং বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার যুক্ত ফ্রন্টে একটা নূতন রাজনৈতিক চেতনা দেখা দিয়েছে। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে সে চেতনা এসেছে রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে 'একঘরে' হবার সম্ভাবনাকে অসম্ভব করার জন্য।

বৈদেশিকী

তরুণের দুঃস্বপ্ন

সারা পৃথিবীর ছাত্র-রাজনীতিতে উনপঞ্চাশ পবনের মাতামাতি। দশ বছর আগেও কল্পনা করা যায়নি অবস্থাপন্ন দেশগুলির ছাত্ররা কখনও ক্ষেপবে, রাস্তার লড়াইয়ে নেমে পড়বে। মার্ক্স কিম্বা মাও সে তুং কেউই এই নতুন ক্ষ্যাপামির হদিশ দিতে পারেননি। ইউরোপ-আমেরিকায় যে-ছাত্র বিক্ষোভ আন্দোলন তার নেতৃত্ব বনেদী কম্যুনিস্ট সোস্যালিস্ট পার্টির নয়; রাশিয়ায়, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে ছাত্র বিক্ষোভ তো স্পষ্টই কম্যুনিস্ট দলীয় শাসনের বাঁধন ছিঁড়বার জন্য। স্পেনে, লাতিন আমেরিকায় ছাত্রদের আন্দোলন তেমনই আরেক রকমের জুলুমতন্ত্রের বিরুদ্ধে। এগুলির কারণ মোটামুটি বুঝতে পারা যায়। পুরনো তন্ত্রমন্ত্রের শাসন, স্বাধীন চিন্তায় বাধা কম্যুনিস্ট শাসিত দেশগুলিতে সাধারণ মানুষকেও বিক্ষুব্ধ করেছে। কম্যুনিজমের এক-রঙা ছবিতে এখন নানা রং, সব কম্যুনিস্ট পার্টির গলা এক সুরে মিলছে না। মার্ক্সের দেড়শত বার্ষিকীতে দেখা যাচ্ছে মার্ক্সবাদ এখন নানা ঘরানা; কম্যুনিস্টদের মধ্যেও যত পথ তত মত। এখন জনমতও কম্যুনিস্ট রাজনীতিতে একটা স্বতন্ত্র শক্তি হিসেবে সক্রিয় হচ্ছে। ওয়ারশ, মস্কো, প্রাগের ছাত্র যুব সম্প্রদায় ও বুদ্ধিজীবিদের সাহসিক উদ্যোগেই এটা সম্ভব হয়েছে।

ইউরোপ-আমেরিকায় স্বচ্ছল গণতন্ত্রী দেশগুলিতে ছাত্ররা যে বিদ্রোহ করছে সেটাই আপাত বিচারে আশ্চর্য। "সেক্স", মারুইয়ানা অর্থাৎ চরস গাঁজা, এল এসডি, যোগচর্চা, হিপি, বীটনিক, মডস্, রকার ইত্যাদি কত না মন-ভুলানো মাথাঘোরানো চটকদার ব্যাপার ও বিকার নিয়ে কয়েক বছর ধরে রসাল আলোচনা চলেছে। অনেকে ধরে নিয়েছেন, ইউরোপ-আমেরিকায় ছেলে-মেয়েরা উচ্ছন্ন যেতে বসেছে, প্রচুর পয়সা-কড়ি, রকমারি নেশা ও স্ফূর্তি; এরা গোলমেলে রাজনীতির ধার ধারবে কেন? কে জানত তলায় তলায় আরও কিছু ঘটছিল যা পাশ্চাত্য সমাজের একেবারে গোড়া ধরে টান দিতে চায়। এডগার হুভার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা দপ্তর এফ বি আই-এর বড় কর্তা। তিনি তাঁর দপ্তরের জন্য চলতি বছরের বাজেটে ২০ কোটি ৭৩ লক্ষ ডলার বরাদ্দ দাবি করেছেন। কারণ দুটি—নিগ্রো বিক্ষোভ আর নব-বাম ছাত্র আন্দোলন। হুভার বলছেন, ছাত্রদের আন্দোলন। রীতি "সাবভার্সিভ", নাশকতা-মূলক এবং এর বিপদ বাড়ছে।

ভিয়েতনামের যুদ্ধ-বিরোধিতা মার্কিন নব-বাম ছাত্র আন্দোলনের একটা দিকমাত্র। বার্কলিতে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ হাজার ছাত্রের জমায়েত অভিনন্দন জানিয়েছে ৮০০ তরুণকে, যারা সৈন্যবাহিনীতে ভর্তির আদেশ মানেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০ অধ্যাপকও কর্তৃপক্ষের নিষেধ অগ্রাহ্য করে ছাত্রদের এই জমায়েতে উপস্থিত থেকেছেন। বার্কলি থেকে কলাম্বিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নুইয়র্ক, মার্কিন মুলুকের দুই প্রান্তসীমা। সেই কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-বিক্ষোভ এবং হাঙ্গামা সম্প্রতি প্রচণ্ড হয়েছিল। এটা ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদ সংক্রান্ত নয়। নিগ্রোদের দাবি, ছাত্রদের স্বাধিকার দাবি ইত্যাদি মিলিয়ে মার্কিনী ছাত্র বিক্ষোভ শিক্ষা, রাজনীতি এবং সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে কতকগুলি মূল প্রশ্ন তুলে ধরেছে প্রবীণদের সামনে।

বিজ্ঞরা কেউ কেউ বলছেন, এমনটি যে ঘটবে সেটা অনেকদিন আগেই বোঝা উচিত ছিল; কলাম্বিয়ার ঘটনাবলীর পর দেখা দিয়েছে, "মোমেন্ট অব ট্রুথ", সত্যের মুখো-মুখি হওয়ার সময়। সত্যটা যে কী সে বিষয়ে যেমন কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে তেমনই গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে কর্তা ব্যক্তিদের ধারণা এক-রকম, তরুণদের আরেক রকম। এমন নয় যে, আমেরিকা, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মেনী, ইতালিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, কিম্বা পড়াশোনা চালানোর সুযোগ সামর্থ্যের খুব অভাব। স্কলারশিপ, আংশিক সময়ে কাজকর্ম করে পড়াশোনার খরচ চালানোর সুযোগ সবই প্রচুর। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা অবশ্য বেড়ে চলেছে, ফ্রান্সে কুড়ি বছরে দেড় লাখ থেকে সাড়ে পাঁচ লাখ; আমেরিকাতেও ওই হারে কিম্বা আরও বেশি। কলেজে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যেখানেই ভিড় সেখানেই পড়া-শোনার ব্যবস্থা রুটিন বাঁধা, প্রায় কল-কারখানার মত নৈর্ব্যক্তিক। সে যেমন এদেশে তেমনই এখন স্বচ্ছল দেশগুলিতেও। ছাত্র-যুব সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ অনেকখানি এই যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে, আর সে যান্ত্রিকতা কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখা-পড়া ব্যাপারে নয়, কম্পিউটার-কেন্দ্রিক যন্ত্র-শিল্প সভ্যতায় প্রত্যেকটি ক্রিয়াকর্মে। স্বচ্ছলতাতেও দেখা যাচ্ছে স্বস্তি নেই, সেই স্বচ্ছলতায় যখন মানবিক মূল্যবোধ পিষ্ট হয়, সবাইকে প্রায় ৪১-গ, ২০-ক ইত্যাদি এক একটা সংখ্যায় সামিল করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছুকাল পর থেকে অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন, ডলার-সভ্যতার প্রভাবে ইউরোপ এশিয়ায় বহু দেশের সংস্কৃতি হয়ে যাবে কোকাকোলা মার্কা। সেটা যে হয়নি তা নয়। কিন্তু উল্টো হাওয়াও বইছে, আর সে হাওয়ার কিছুটা অন্তত আসছে "টিচ-ইন", "সিট-ইন", "ভিয়েতনিক" ইত্যাদি মার্কিনী নব-বাম ছাত্র আন্দোলনের ধারা থেকে। এই নব-বাম ছাত্র আন্দোলন কোনও বামপন্থী রাজনৈতিক দলের নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে না। কাস্ত্রো, গুয়েভেরা, মাও সে তুং-এর লালরক্ষী তরুণদের ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে এই নব-বামের কিছু কিছু আত্মিক সাদৃশ্য আছে ঠিকই, রাজনৈতিক যোগা-যোগ অথবা আন্তর্জাতিক সংগঠন যতদূর সম্ভব নেই।

পশ্চিম ইউরোপের নব-বাম ছাত্র আন্দোলনের পিছনে কেউ কেউ একটা আন্তর্জাতিক সংগঠনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন। মজা এই যে, সে সংগঠন বনেদী কম্যুনিস্টপন্থী নয়। পশ্চিম ইউরোপে নব-বাম ছাত্র আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয়ান কংগ্রেস অব সিণ্ডিক্যালিস্ট স্টুডেণ্টস। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড পর্তুগাল, পশ্চিম জার্মেনীতে এই সিণ্ডিক্যালিস্ট ছাত্র-নেতারাই নব-বাম আন্দোলনে অগ্রণী। "টিচ-ইন", "সিট-ইন", স্বাধীন বিশ্ব-বিদ্যালয়" ইত্যাদির কলাকৌশল এবং ধুয়ো এরা ইউরোপে এনেছে মার্কিনী নব-বাম ছাত্রদের কাছ থেকে; মার্কিনী নব-বামদের "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথপ্রদর্শক" নামে এক-খানা বই-এর অনুবাদ পশ্চিম জার্মেনীর ছাত্র মহলে প্রচারিত হচ্ছে। সিণ্ডিক্যালিস্ট রাজনীতি এবং সিণ্ডিক্যালিস্ট কর্মকৌশল বনেদী কম্যুনিস্টদের চিরকালই খুব অপছন্দ। আশ্চর্য নয় তাই ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মেনী এবং ইতালির নব-বাম ছাত্র আন্দোলনকে ওইসব দেশের কম্যুনিস্ট পার্টি খুব সুনজরে দেখছে না। পশ্চিম জার্মেনীর সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি তো বার্লিন ও বন-এর ছাত্রদের সংগ্রামী আন্দোলনের ওপর খাপ্পা। ফ্রান্সে শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে নব-বাম ছাত্রদের কিছুটা বোঝাপড়া হয়েছে মনে হয়। সিণ্ডিক্যালিস্ট ছাত্র-নেতাদের আশা তাদের আন্দোলনে শ্রমিকরাও ক্রমে ক্রমে সাড়া দেবে। সে নিতান্ত আশাই। নব-বাম ছাত্রদের আন্দোলন শেষ পর্যন্ত বড়জোর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষাব্যবস্থায় কিছু কিছু পরি-বর্তন ঘটাতে পারবে, তার বেশী নয়।

২০।৫।৬৮

দুটি কবিতা

হরপ্রসাদ মিত্র

উপমা

জোড়া জোড়া নরনারী কী সুখে যে চাঁদ দেখে আকাশে,
বাসা বাঁধে নিজেদের মনে মনে বিশ্বের কেন্দ্রে,
অথচ বিশ্ব থাকে চুপচাপ চুপচাপ বাইরে,
যেন বরফের ঘর গলছে না সাহারার সূর্যে।
পাখি-ফুল-গানই যেন জীবনের নির্গলিতার্থ.
কতো চিত্রাঙ্গদা, আহা কতো মহাবল পার্থ।
তারা তো জানে না কেউ সময়ের অতিশয় মূল্য।
তাদের উপমা এই—তারা শুধু নিজেদেরই তুল্য।

উপহার

শোনো, পথে যেতে যেতে মনের গানের কলি কে কাকে
কখন দিচ্ছে তার নিখুঁত হিসেব কষে একজন—
মস্তো লম্বা দাড়ি ধপধপে জমকালো বুড়োটির।
তার কথা মনে এলে হীরে-চুনি-পান্নার জৌলুস
হয় যেন কী রকম নিষ্প্রভ, নিষ্প্রভ, রিক্ত—
মনে হয়, সে-ই যেন অনাদি, অশেষ, আর বাকি যা—
কিছুই থাকার নয়,—ফাঁকি যেন, ফাঁকি যেন—মিথ্যে।
তাই বাজু দিতে চাই নায়িকার মৃণাল-বাহুতে,
দেবো না কবজি-ঘড়ি তন্বীর মিহি মণিবন্ধে।
সময় ভোলায় যে সে নিয়ে যাক সময়ের বাইরে।
আকাশে দেয়াল-ঘড়ি ঝুলুক সে বুড়োটিরই জন্যে।

এক দেশে এক রাজা ছিলেন

মঞ্জু মিত্র

এক দেশে এক রাজা ছিলেন
তিনটি রানীর রূপের হাটে
নিত্য নতুন কায়দা-কানুন
বাজার রাজা ছিলেন যিনি
তিনিই পুরুত রানীর হাটে
রাজা মশাই রাজ্য দেখেন
পুরুত হলেন রানীর খসম
রাত বিরেতেই যখন তখন
রানীর তলব পুরুত আসেন
চক্ষু মুদে রাজা ঘুমোন
পুরুত ঠাকুর রাজা সাজেন
রানীর হাটে পুরুত ঠাকুর
যখন আসেন তিনটি রানী
গোসা করেন কার পিরিতে
কার সোহাগে গা ভাসাবেন
ভেবেই মরেন পুরুত ঠাকুর
রাজার কাছেই বিচার মাগেন
রাজা মশাই চক্ষু মুদেই
রায় লিখে দেন এবার থেকে
আমি পুরুত তিনটি রানীর॥

বন্দনা

শংকর দে

প্রশ্ন করলে, আমি তো কিছুই বলতে পারবো না।
কেননা, মন বলতে এতদিন, তোমার পাশেই ঘুমিয়েছিলুম
শীতের ভোরবেলায়
যেরকম আকাশ দেখা যায় না, আকাশের অনেক নিচে
এই পৃথিবীতে
এই নদীর ভোরেই আজ দু চোখ বুজে রয়েছি,
প্রশ্ন করলে
এখন আমার আর কোনো দুঃখকষ্টই নেই।

দেখ, তোমার হাতেই আজ প্রকৃতিকে জয় করে
বসে রয়েছি।

এখন আমার আর কোনো দুঃখকষ্টই নেই।

কেননা, মন বলতে যা নিজেকেই বোঝেনি
জলের থেকে
বুকের কাছাকাছি কেউ ঝরে পড়লে, আমি তো কিছুই
বুঝতে পারবো না।
কেননা নিজেকেই, সাজিয়ে দেখার মতো রক্তকপাল
চিন্তার কাঠেই আজ ছুঁয়ে দেখলে, তুমি
আর যাই করো, আমাকে
ভালোবেসে তো বাঁচিয়ে রাখতে পারলে না।

সুনন্দর জার্নাল

কিঞ্চিৎ লবণাক্ত ভাবনা

পরম কারুণিক শ্রীভগবান একদা একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠীকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'তোমরা হচ্ছ পৃথিবীর লবণ।'

প্রথমটায় সন্দেহ হয়, শ্রীঈশ্বর গালাগাল করলেন না তো? লবণ না বলে তিনি মধু বলতে পারতেন, দুধ কিংবা পনির বলতে পারতেন, দু'-চারটে রসালো ফল কিংবা মনোহর কিছু ফুলের উল্লেখ করতে পারতেন, ভাজা মাংস-টাংস বললেও মন্দ শোনাতো না। কিন্তু লবণ!

মুসার অনুগামীরা প্রথমটায় ঘাবড়ে গিয়েছিলেন কিনা ঠিক বলতে পারছি না—অন্তত ওলড টেস্টামেন্ট কিংবা প্রাচীনতম হিব্রু সাহিত্যে তাঁদের সেই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার কোনো বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ নেই। কিন্তু আচিরাৎ তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, মোক্ষম 'দশটি অনুজ্ঞা'রও ইতরবিশেষ করা চলে—প্রকাশ্যে না হোক, গোপনেও চলে. কিন্তু 'লবণত্ব' লাভ আর শুকত্ব লাভ একেবারে এক কথা। 'দেয়ার্‌স ন্যাথিং লাইক'—'লেদার' নয়, 'সল্ট'!

কিন্তু অহোরাত্র লবণাম্বুধির তীরে বাস করছি বলে এবং একদা লবণ সবচাইতে সস্তা ছিল বলে (অবশ্য পরে আর তা থাকে নি, এক ছটাক লবণ সংগ্রহ করতে বাংলা দেশের লোককে এক সময় গলদ্‌ঘর্ম হতে হয়েছে) আমরা তাকে কোনো গুরুত্ব দিই নি। অকালপক্ব বালকের বোল্লিকপনায় বিরক্ত হয়ে আমরা বলি : 'এমন হতচ্ছাড়াকে আঁতুড়ে নুন খাইয়ে মেরে ফেলা হয়নি কেন?' অতি-মুখর ব্যক্তির বহুভাষিতায় আমরা সন্দিগ্ধ হয়ে ইংরিজী মতে বলি, 'ওর কথাগুলোতে এক চিলতে লবণ মিশিয়ে নেওয়া উচিত।' কোনো পরম সুন্দর মুখেও বুদ্ধির চিহ্ন না দেখলে নাসা কুঞ্চিত করে বলি—'এঃ, চেহারাটা আলুনে।' এর মধ্যে 'নুনের গুণ' আমরা কিছু কিছু স্বীকার করি বটে, 'নিমকহারামি'ও করতে চাই না—হার্টের রোগ না থাকলে কিংবা মহাত্মাজীকে সম্পূর্ণ অনুসরণ না করলে লবণহীন রান্নাও আমাদের দুঃসহ। তবু লবণ হতে পারা—বা একেবারে লবণাক্ত হয়ে যাওয়াই যে পুরুষার্থ—এমন চেতনা আমাদের মধ্যে কখনও বিকশিত হয়নি।

বিশেষ ধরনের রোগীদের বাদ দিলে লবণ যে কী ভীষণ দরকারী—এ সম্পর্কে ডাক্তারেরা আমাদের প্রতিদিন অবহিত করে তুলছেন। ভালো টনিকের লেবেলে লক্ষ করি, তাতে কী পরিমাণ মিনারেল সল্ট রয়েছে; ফ্রুট-সল্ট ছাড়া তো অনেকের দিনযাত্রাই চলে না। শুধু রান্নার বা রসনার প্রয়োজনেই নয়, লবণ আমাদের বেঁচে থাকবার পক্ষেই অপরিহার্য। তাই কেবল মানুষই লবণাশ্রিত নয়, বুনো জন্তুরাও জঙ্গলের মধ্যে নোনা মাটি খোঁজে—সেই মাটি চেটে জীবনীশক্তি তারা সংগ্রহ করে। হুঁ, 'দেয়ার ইজ ন্যাথিং লাইক'—

জল খেলে ভোট দিতে হবে, নিমকহারামী করতে পারবে না।

আর, এই লবণের রাজাধিরাজ হচ্ছে স্বয়ং সমুদ্র। দিগভ্রষ্ট নাবিক নোনা-সাগরে মধ্যে মধ্যে তৃষ্ণার জল না পেলে সঙ্গত কারণেই চটে যায়, কবিতাও লেখা হয় তা নিয়ে—কিন্তু তা থেকে কিছুই প্রমাণিত হয় না। লবণ-সাগর তো শুধু মৃত্যুর অতল নয়, তা মহাজীবনের রত্নাকর।

প্রমাণ? তিমিমাছের দিকে তাকান। 'সেতাসিয়া'-গোষ্ঠীর এই বিপুল প্রাণীদের পূর্বপুরুষেরা তো এককালে ডাঙার অধিবাসীই ছিল; কিন্তু তাদের মধ্যে যারা মাটিকেই আঁকড়ে রইল—তারা গেল বিবর্তনের ধারায় লুপ্ত হয়ে—আর যারা নোনা জলে নামল তারা বেঁচে রইল ব্লু হোয়েল-স্পার্ম হোয়েল-নারহোয়াল ইত্যাদি হয়ে—বিশাল দেহে, বিস্তৃত আয়ুতে।

সেই সেণ্ট হেলেনার বিরাট সামুদ্রিক কচ্ছপটির ছবি দেখেছেন—হয়ত বা স্বয়ং নাপলেয়ঁই যার পিঠে হাত বুলিয়েছিলেন—এবং যে আজও টিঁকে আছে? সেই যে কী বলে 'কোয়েলা কান্থ' না 'সিলা কান্থ' (উচ্চারণের অপরাধ পণ্ডিতেরা মাপ করুন)—এই লবণাক্ত সমুদ্রের কল্যাণেই কি সে আজও প্রাগৈতিহাসিক কালের ধারা রক্ষা করছে না? একেই বলে নুনের গুণ—অমের জীবনশক্তি—আশ্চর্য উদ্বর্তনের ক্ষমতা।

বুঝতে পারছি, এতক্ষণে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি হচ্ছে। খামকা যে লোকটা হঠাৎ জ্ঞান দেবার চেষ্টা করতে থাকে—তার মতো যন্ত্রণা সংসারে আর নেই। তা হলে আরও সোজাসুজি সিদ্ধান্তে চলে আসি। আমাকে উদ্বুদ্ধ করছে কিঞ্চিৎ নোনা জল—অর্থাৎ কিনা—কর্পোরেশন-বিতরিত সেই অচিন্তনীয় কলের জল।

আহা—একেবারে সমুদ্রের স্বাদ! আর একটু আঁশটে গন্ধের মিশেল থাকলে আর কিছুই বলবার ছিল না। চোখ বুজে, দুরন্ত গ্রীষ্মের দুপুরে সেই জল গিলতে গিলতে, মনে হয়—যেন নির্জীব একটি বঙ্গ-সন্তান

পুরীর ব্রেকারে নাকানি-চোবানি খাচ্ছি! সেই জলে তৈরি চা খেতে খেতে—একটি 'লাবণিক' (ব্যাকরণে চলবে তো?) স্বপ্ন ভেসে ওঠে চোখের সামনে—যেন মার্কিনী ফিল্মে দক্ষিণ-সাগরের কোনো দ্বীপে চলে গেছি—চারদিকে সমুদ্র-বাতাসে নারকেল-বীথির মর্মর—আর আমার পাশে মাথায় গলায় ফুলের মালা পরে—উঁহু, এই পর্যন্তই থাক।

গৃহিণী বললেন, 'রান্নায় আর নুন দিতে হচ্ছে না—এই যা লাভ!' কিন্তু রান্নাঘর-সর্বস্ব মেয়েদের ইম্যাজিনেশন এর বেশী

নুন খাই যার
গুণ গাই তার

আর কত দূরে এগোবে। আমি আরও অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি।

দেখছি—এই লবণজল ক্রমশ আমাদের দেহ-মনকে লবণায়িত করে তুলছে। ইজরাইল-বংশীয়েরা জন্মসূত্রেই লবণ, আমরা সাধনা দিয়ে লবণত্ব অর্জন করছি—যাকে বলে পার্ফেকশন!

কিন্তু এসব তো ভাবের কথা। 'বিধাতার বরে বাঙালী অমর'—এইরকম উচ্চাঙ্গের প্রতিশ্রুতি বঙ্গজ কবিরা বারে বারে দিলেও কার্যক্ষেত্রে সেটা প্রমাণিত হয়নি, আমরা বরাবর মারাই গেছি। মনে হচ্ছে এতদিনে অন্তত কলকাতার বাঙালীর সামনে একটি স্বর্ণদ্বার খুলে যাচ্ছে। চিরকাল বেঁচে থাকাটা অবশ্য একটু গোলমেলে, আর বাঁচলেও সুখে থাকা যায় কিনা সেটাও সন্দেহ—কিন্তু শনৈঃ শনৈঃ কলকাতার কলের জলে যেভাবে লবণ বাড়ছে, তাতে কচ্ছপ, তিমি-তিমিঙ্গিল কিংবা 'সিলাকান্থ'র পরমায়ু আমাদের ঠেকায় কে!

• লিখতে লিখতে দারুণ উত্তেজনায় গলা শুকিয়ে এল, টেবিল থেকে এক গ্লাস জল তুলে ঠোঁটে ঠেকাতেই—

নাড়ী উলটে আসে যে!

তা হোক—তা হোক। লবণত্ব—অর্থাৎ কিনা পার্ফেকশনে পৌঁছোতে গেলে অমন এক-আধটু শারীরিক বিপর্যয় ঘটেই।

অসুখ / দিব্যেন্দু পালিত

ব্যস্ততা ও ছুটোছুটি সত্ত্বেও ওরা যখন স্টেশনে পেঁছল, কলকাতার ট্রেন তার কিছুক্ষণ আগেই চলে গেছে।

দিনে দু'বার ট্রেন যায়, আসে—খুব না হলেও কিছু ভিড়, লোকজন এই সময়টা চোখে পড়ে। এখন কিছু নেই। প্রায় ফাঁকা প্ল্যাটফর্মের এক কোণে চার-পাঁচজন মুটে মজুর দাঁড়িয়ে জটলা করছিল। ফাঁকা বলেই শেডের আলোটা জোরালো লাগে।

পরের ট্রেন সেই সকাল দশটায়। কাল। মাঝে ভোরের দিকে একটা এক্সপ্রেস যায় বটে; কিন্তু, কুলি বলল, এই ছোট স্টেশনে সে-ট্রেন দাঁড়াবে না। তার মানে পুরো একটি দিন মাটি হল।

হেমন্ত এইরকমই আশঙ্কা করেছিল। এমন হতে পারে ভেবেই নিজে সাবধান হয়েছিল, নির্মলাকে তাড়া দিয়েছিল বার বার, এই বাসে না এসে আগের বাসটা ধরার পরামর্শ দিয়েছিল। ঘণ্টা দু আড়াই আগে এলে এমন কিছু ক্ষতি হত না। বসে বা পায়চারি করে বা ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে কাটিয়ে দেয়া যেত।

নির্মলা শোনে নি। বরং হেমন্তর ব্যস্ততা লক্ষ করে ক্ষুণ্ণই হয়েছিল। 'আপনার তাড়া থাকলে চলে যান', বলেছিল, 'এমন ঘড়ির কাঁটা ধরে চলবেন জানলে আপনার সঙ্গে আসতুম না। গরজ আমার, আমি একাই ফিরতাম।'

এভাবে বলার কোন কারণ ছিল না নির্মলার। ঠিকই, গরজটা নির্মলার। তার দায়, দারিদ্র্য, দুর্ভাবনা বেশি। তা ছাড়া, মানসিক ক্লেশ, অশান্তি ওকে কিছুটা বেপরোয়া ও জেদী করে তুললেও অবাক হবার কিছু নেই। তবু এরকম তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার কোন মানে হয় না। গরজ না থাকলেও একা নির্মলার পক্ষে মাইল মাইল পথ পাড়ি দিয়ে অসুস্থ স্বামীকে দেখতে আসা সম্ভব হবে না জেনেই দ্বিরুক্তি না করে চলে এসেছিল হেমন্ত।

নির্মলা সে-কথা বুঝবে না। হেমন্ত সম্পর্কে কোনরকম গুরুত্ব আরোপ তার স্বভাববিরুদ্ধ। এটা হেমন্তর ধারণা। শুধু আজ বলে নয়, পরিচয় হবার পর থেকে গত সাত-আট বছর ধরে ব্যাপারটা লক্ষ করে আসছে হেমন্ত। অসুবিধে হল, তার গায়ের চামড়া যে-কোন মানুষের মতো, কিছুটা ভদ্রতা, কিছু বা অসহায়তা দিয়ে তৈরী।

'এখন কি করবেন? এভাবে দাঁড়িয়ে তো থাকা যায় না!' হেমন্তর মুখের দিকে সোজাসুজি না তাকিয়ে নির্মলা বলল।

হেমন্ত সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিল না। রুচিতে বাধল। লতানে গাছ, যেদিকে তুলে ধরবে সেইদিকেই বাড়বে। অনুশোচনা হলেও নির্মলার ভাব, ভঙ্গীতে তা প্রকাশ হবে না। হেমন্ত সঙ্গে থাকার কতগুলো সুবিধে আছে।

হেমন্ত নির্মলাকে দেখল না। তোমার জেদের জন্যেই গাড়িটা মিস্ করতে হল, অন্যায় জেদের জন্য—কথাটা মুখে এসেছিল, বলতে পারল না। বলা মানেই হাত-পা নেড়ে নির্মলা একটা সীন করবে। এই দূর স্টেশনে সেটা অভিপ্রেত নয়। হেমন্তর রাগ হল; সে ক্ষুব্ধ হল। ক্ষোভরে প্রকাশ মাথার

লম্বা চুলের ভিতর দুতে হাত চালানোয়। বরং কলকাতায় ফিরে বলা যাবে, এই শেষ, বন্ধুকৃত্য ঢের হয়েছে। দরকার হলে তুমি অন্য ব্যবস্থা করো।

হেমন্ত ব্যাগটা জল হতে দিল। কুলিকে মালগুলো নামিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়ে নির্মলাকে অপেক্ষা করতে বলল। এর আগে বার দুয়েক এলেও জায়গাটা সম্পর্কে তার পরিষ্কার কোন ধারণা নেই। স্যানাটোরিয়াম এখান থেকে বেয়াল্লিশ মাইল দূরে, যেতে হয় বাসে। স্টেশন থেকে বেরিয়েই বাসটা যায় শহরের বিপরীত দিকে। ইয়ার্ড পেরিয়ে কংক্রীটের রাস্তার দু' পাশে সবুজ নির্জনতা। সেই পথেই ফিরে আসা স্টেশনে, ট্রেন ধরা। শখের বেড়ানো নয় যে খুঁজে পেতে দেখে নেবে।

আপাতত রাতের বিশ্রামের জন্য একটা জায়গা দরকার। টিকিট আগেই কিনে রেখেছিল, হয়তো বদলাতে হবে। ওয়েটিং রুমে থাকা যেত, কিন্তু, নির্মলা সঙ্গে থাকায় সেটা নির্ভাবনার নয়। তার ওপর শীত আছে। মাসটা যদিও ফাল্গুন, বাতাসে কনকনে ভাব নেই, তবু শীতের ভাবটুকু এখনো যায় নি। গলায় কম্ফর্টার থাকায় আরামই লাগছিল।

স্টেশন মাস্টারের ছোট কেবিনে ঢুকে হেমন্ত জায়গাটা সম্বন্ধে খোঁজখবর নিল। মাইল দুয়েকের মধ্যেই একটা ভদ্রগোছের হোটেল আছে, থাকা যায়। টাঙায় চড়ে দশ-বারো মিনিটের পথ মাত্র। আর যা যা জানার ওরই মধ্যে স্বল্প আলাপে জেনে নিল।

কেবিন থেকে বেরিয়ে হেমন্ত দেখল প্ল্যাটফর্মের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে কুলিটা মালপত্তর পাহারা দিচ্ছে। নির্মলা বেশ কিছুটা দূরে, করোগেট শেড যেখানে শেষ হয়েছে, প্ল্যাটফর্মের সেই দূরত্বময় প্রান্তে মলিন জ্যোৎস্না ও কুয়াশায় মাখামাখি আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। নির্মলার গড়ন লম্বা ও ছিপছিপে, জায়গা মতো মাংসল, স্বাস্থ্য ভাল, কার্ডিগানের ওপর দিয়ে ঘাড়ের ওপর আলগা খোঁপা এলানো। সংস্পর্শে না এলে, দূর-দর্শনে ও যে-কোন পুরুষের পক্ষে লোভের শরীর। দূর থেকে দেখে হেমন্তর মনে হল, যেখানেই থাকুক, ওয়েটিং রুমে বা হোটেলে, আজকের রাতটা তার অস্বস্তিতেই কাটবে।

হেমন্ত হঠাৎ নির্মলার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল। হয়তো কামভাব নয়, নিতান্তই এক ধরনের অস্বস্তি—আকস্মিক জ্বরের মতো, গোটা শরীরে শীত জানিয়ে থেমে গেল আবার। গলা থেকে কম্ফর্টারটা খুলে নিল হেমন্ত। নির্মলা তাকে আকর্ষণ করছে। মৃগী রোগীর মতো শরীর শক্ত করে আস্তে আস্তে শৈথিল্য আনল সে। রোগটা পুরনো, নির্মলার ঐ শরীর, শরীরের ঋজু টান টান ভঙ্গী—মাঝে মাঝে মনে হয় দূরত্ব দিয়ে নির্মলা তাকে আকর্ষণ করে। এখনো।

হেমন্ত নিজেকে সংযত করল। এতদিন পরে এই ধরনের দুর্বলতা প্রশ্রয় দেওয়ার কোন মানে হয় না। তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নির্মলা আরো কঠিন হবে, আরো নিষ্ঠুর। হেমন্ত উৎপলের মুখ মনে করল—যেমন করে থাকে; বন্ধুকৃত্যের মধ্যে খানিকটা উৎসর্গের ভাব থাকে, নিজেকে কিছুটা সরিয়ে আনা যায়।

শীত। কম্ফর্টারটা আবার গলায় জড়িয়ে নিল হেমন্ত। প্ল্যাটফর্ম ক্রমশ ফাঁকা হচ্ছে। রাত বাড়ছে, সেই সঙ্গে হাওয়া। জ্যোৎস্না ও কুয়াশার দিকে অন্যমনস্ক তাকিয়ে হেমন্ত শীত অনুভব করল। নির্মলা ফিরে আসছিল।

'খোঁজ নিলাম', আলগা গলায় বলল হেমন্ত, 'মাইল দুয়েকের মধ্যে একটা হোটেল আছে। ভালই। সেখানে যাওয়া যেতে পারে।'

'হোটেল! হোটেল কি হবে?'

নির্মলার স্বর জড়তামুক্ত। ঠিক রুক্ষ হয়তো নয়, নিরুত্তাপ। হেমন্ত এড়িয়ে গেল।

'না হলে ওয়েটিং রুমে থাকতে হয়। তুমি ভেবে দেখ।'

'আপনি কি বলেন?'

'আমার কথা নয়, তুমি নিজের সুবিধে অসুবিধে বোঝ।'

হেমন্তর কথায় ঝাঁঝ ছিল, নির্মলা তা ধরতে পারল। একটু সময় নিয়ে বলল,

'বেশ। চলুন।'

হেমন্ত দ্বিধা করল না। কুলির মাথায় মালপত্তর তুলে দিয়ে ঘড়ি দেখল। আলগোছে ডাকল, 'এসো।'

আগে আগে হেমন্ত, লটবহর মাথায় মাঝখানে কুলিটা। পিছনে, কিছুটা ব্যবধান রেখে, নির্মলা। আস্তে আস্তে হাঁটছে। ওভারব্রীজের ওপরে উঠে একবার পিছনে তাকিয়ে হেমন্ত দেখল, নির্মলা তখনো কংক্রীটের সিঁড়িতে। একবার মনে হল ওর চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে, আর একটু লক্ষ করতেই ভুলে ভাঙল। মনে মনে হাসল হেমন্ত। তোমার ছলাকলা আমি বুঝি, নির্মলা। রাগে এখন আমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করছ, করো। তোমার জন্য আমাকেও কম ভুগতে হল না। বরং তোমার চেয়ে বেশি। না হলে আমার কি স্বার্থ! অসুস্থ বন্ধুর জন্য কষ্টস্বীকার এই এক বছরে অনেক করলাম, হয়তো আরো করতাম, যদি তুমি আমার দুর্বলতার সুযোগ না নিতে। আর নয়, আমি আমার সহ্যের সীমানায় পৌঁছে গেছি।

স্টেশনের বাইরে চত্বরে এসে ওরা প্রথম শীত পেল। নির্মলার ঠাণ্ডা লাগার ধাত আছে, হেমন্ত কিছু বলার আগেই ও শাড়ির আঁচল টেনে গলায় জড়াল। চাপা গম্ভীর মুখে দূরত্বে দাঁড়িয়ে ও হেমন্তর ব্যস্ততা লক্ষ করছিল। হেমন্ত টাঙা ডাকল, গন্তব্যের নাম, নির্দেশ দিল। জিনিসপত্র, অল্পই ছিল, গাড়িতে তুলে দিয়ে কুলিটা ফিরে যাচ্ছিল, শীত। সিগারেট ধরিয়ে হেমন্ত ডাকল, 'এসো।'

পিচের রাস্তায় ঘোড়ার ক্ষুরের টকাটক শব্দ উঠছিল। বেতো, নির্জীব ঘোড়া, গাড়িতে ওঠার পরই অভ্যাসে কোচোয়ান বার দু'তিন চাবুক চালিয়ে ছিল, তাতে টাঙাটা দুলে ওঠা ছাড়া আর কোন কাজ হয় নি। অন্তত গতি বাড়ে নি। যেতে যেতে কিছুক্ষণের মধ্যেই হেমন্ত অজানা নির্জনতা বোধ করতে শুরু করল। ক্ষুরের টুক টুক শব্দটা পেণ্ডুলামের মতো শব্দের বুকের ভিতর দুলতে থাকল। হাওয়ার দাপটে হাতের সিগারেটটা তাড়াতাড়ি পুড়ে আসছিল।

পাশে নির্মলা, দূরত্ব বজায় রাখার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও স্পর্শ বাঁচাতে পারে নি। এখন কিছুটা অনোন্যাপায় হয়ে নিশ্চল বসে আছে—একই সময়ে ওর কঠিন শরীর এবং শরীরের প্রবল গন্ধের সংস্পর্শে অস্বস্তি হচ্ছিল হেমন্তর। সন্দেহ কি নির্মলা বিরক্ত হয়েছে, তাকে সহ্য করতে পারছে না। নিতান্তই মেয়ে, রাত ঘন হচ্ছে ক্রমশ এবং জায়গাটাও অচেনা, এই সময় ও পরিবেশে শত্রু হলেও পরিচিত জন নিরাপদ, না হলে নির্মলা হয়তো তার সঙ্গ ধরত না। ব্যাপারটা চিন্তা করে হেমন্তর প্রবৃত্তি ঠাট্টা করে হেসে উঠল।

'উৎপল কবে ছাড়া পাবে, কিছু শুনলে?'

'না।'

'ওরা কিছু বলে নি?' সহজ হবার সাধ্যমত চেষ্টা করল হেমন্ত, 'জিজ্ঞেস করেছিলে?'

নির্মলা প্রথমে কোন উত্তর দিল না। গাড়ির দোলায় স্পষ্টই ওর অসুবিধা হচ্ছে। খানিক সময় নিয়ে আচ্ছন্ন গলায় বলল, 'ক'দিন বাদে স্ক্রীন করবে, তারপর জানা যাবে।'

'ও।' সহানুভূতি দেখাল হেমন্ত, 'তোমার খুব অসুবিধে হল। পিছনে সরে বসো; জায়গা আছে।'

নির্মলা নড়ল না, নড়ার ভঙ্গী করল মাত্র। তাকাল। হেমন্ত ওর চোখ দেখতে পেল, দৃষ্টির তারতম্য বুঝল না। আকাশের আলো কুয়াশায় জড়িয়ে যাচ্ছে। এইরকম আলোয় শব্দ ছাড়া আর কিছু পরখ করা যায় না।

'আমার আর অসুবিধে কি! অসুবিধে আপনার, বেগার খাটা। এবার থেকে অন্য ব্যবস্থা করব।'

কথাটা জোরেই বলেছিল নির্মলা। হেমন্ত শুনল, উত্তর দিল না। নির্মলার কথার অর্থ খুব স্পষ্ট। এতক্ষণ ও নিজেকে তৈরী করছিল, সময় বুঝে প্রয়োগ করল। আমার অসুবিধে নয়, কারণ উৎপল আমার স্বামী। উৎপলের প্রতি তোমার কোন দায়িত্ব নেই, হেমন্ত, কর্তব্য নেই, তুমি বেগার খাটছ। হেমন্তর মুখে জবাব এসে গিয়েছিল, তাই করো, আমার আর পোষাচ্ছে না। তবু মুখ বুজে অপমানটা হজম করল। আর তখনই হঠাৎ তার মনে হল, দু'জনের বসার পক্ষে জায়গাটা বড়ই ছোট।

অকৃতজ্ঞ। হেমন্তর নিঃশ্বাস ভারি হল, শ্বাসকষ্টের মতন একটা অস্বস্তি গলা পর্যন্ত উঠে আসছিল। এই শীতেও কপালে ঘাম জমতে শুরু করল, কম্ফর্টারটা খুলে ওট দিয়েই কপাল মুছল সে। স্টেশনে ভুল খবর পেয়েছিল; দশ-বারো মিনিট নয়, দূরত্ব আরো বেশি। কোচোয়ানকে তাড়া দিল, কেয়া জী, জলদি চল। উত্তরে শুধুই চাবুকের শব্দ, ডাইনে বাঁয়ে গাড়িটা দুলে উঠল। আবার যথারীতি ক্ষুরের শব্দ, নৈঃশব্দ্যের মধ্যে পেণ্ডুলামের মতো অব্যাহত। হেমন্ত ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়ছিল।

নির্মলা অকৃতজ্ঞ, তা না হলে সামান্য কৃতজ্ঞতা অন্তত আজ সে জানাতে পারত। বা, মনে যা'ই থাকুক, অত স্পষ্ট করে তাকে কিছু বলার প্রয়োজন ছিল না। ক্ষুব্ধ হলেও সে কোন অনুযোগ করে নি; নির্মলার স্বভাবের বৈপরীত্য ও খামখেয়ালিপনাকে উৎপলের অসুস্থতাজনিত অশান্তি বলেই মেনে নিয়েছিল। অথচ, ভেবে দেখলে, সে ব্যস্ত মানুষ, কাজকর্ম ফেলে এইভাবে হঠাৎ হঠাৎ চলে আসায় সত্যিই তার অসুবিধে হয়, হচ্ছে।

আজ তার ফেরার তাড়া ছিল। নির্মলার আচরণের অনিশ্চয়তা অনুমান করেই এখানে আসবার আগে প্রশ্ন তুলেছিল, 'ঠিক সাত দিন তো?'

'বিশ্বাস হচ্ছে না', একটু বা ঝাঁঝ মিশিয়ে বলেছিল নির্মলা, 'এত ঠেস দিয়ে কথা বলেন কেন! দেরি হলে আপনার ফেরার পথ বন্ধ করব না।'

নিজের প্রয়োজনে উপযাচিকা হয়ে এসে নির্মলার এই ব্যবহারে অকারণ ঔদ্ধত্য ছাড়া আর কিছু খুঁজে পায় নি হেমন্ত। একবার ভেবেছিল ফিরিয়ে দেয়; সময় নেই বা কাজের চাপ, এই ধরনের কিছু বলে বিদায় করে ওকে। পরে ভাবল, কি লাভ! ব্যাপারটা হয়তো শেষ পর্যন্ত উৎপলের কানে যাবে, উৎপল চিন্তিত হবে, দুঃখ পাবে। আকস্মিক অসুস্থতার জন্য ও এমনিতেই বিব্রত হয়ে আছে, এর মধ্যে নতুন কোন আঘাত দেওয়া ঠিক হবে না।

শেষ পর্যন্ত উৎপলের কথা ভেবেই যেন রাজি হয়েছিল হেমন্ত, 'ঠিক আছে, যাওয়া যাবে। তুমি গোছগাছ করো।'

মাত্র ক'দিন আগের ঘটনা। ব্যাপারটা তিক্ততায় শেষ হতে পারত, হয় নি। হেমন্তর উদারতার জন্যই হয় নি বলা যায়। হেমন্ত উৎপলের কথা ভেবেছিল, নির্মলার কথাও। ভুলে যাবার কোন কারণ নেই নির্মলার।

অথচ, নির্মলা যেন নির্বিকার। এই ক'দিন যেমন তেমন ছিল, সহজ ও স্বাভাবিক, উৎপলের সান্নিধ্যে এসে হেমন্ত যেন পুরনো নির্মলাকে খুঁজে পাচ্ছিল। হাসি খুশি, উচ্ছল, এক ধরনের কমনীয়তা ছায়া ফেলেছিল ওর চোখে। উৎপলকে বলেছিল হেমন্ত, 'তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে নে। নির্মলার জন্যে ভাল হওয়া দরকার তোর।'

হেমন্তর কথায় কোন চাতুরি ছিল না। বরং এই ক'দিনে নতুন এক অনুভব তাকে ব্যাকুল ও স্পর্শাতুর করে তুলেছিল। তোমার স্বার্থের বাইরেও একটা জগৎ আছে, নিজেকে বুঝিয়েছিল হেমন্ত, তার মূল্যও বড় কম নয়। এরই জন্যে যদি তাকে আবার আসতে হয়, অসুবিধে হলেও সে আসবে, বার বার আসবে।

আজ দুপুরে থেকে নির্মলা নিজেকে বদলাতে শুরু করল। বিকেল থাকতে থাকতেই তাদের বেরিয়ে পড়ার কথা। গোছগাছ করা ছিল, হেমন্তও তৈরী। শুধু মালপত্তর রিকশায় তুলে বাসস্টপে যাওয়ার অপেক্ষা। তবু, অকারণে সময় নষ্ট করতে শুরু করল নির্মলা। খানিক গড়িমসি ভাব দেখাল, খানিক এলোমেলো ঘুরে বেড়াল। হেমন্ত বেডিং বাঁধছিল, ঘর থেকে বেরিয়ে নির্মলাকে খুঁজে পেল না। যখন ফিরল, তখন বিকেল শেষ হয়ে আসছে। বাস ধরার সময় চলে গেছে।

'তোমার ব্যাপার কিছু বুঝি না, নির্মলা', ক্ষুব্ধ গলায় বলেছিল হেমন্ত, 'শুধু শুধু দেরি করার কি মানে হয়!'

'আমার ব্যাপার বোঝার কোন দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয় নি।' জবাবটা মুখেই লেগেছিল, যেন নির্মলা জানত হেমন্ত কি বলবে এবং সে কি জবাব দেবে, বলল, 'আপনি চলে গেলেন না কেন!'

'অসভ্যের মতো কথা বল না—', বলতে গিয়েও নিজেকে সংযত করল হেমন্ত। এখানে নয়, ভাবল, যা বলার ফিরে গিয়ে বলবে। এতদিন অনেক দুর্ব্যবহার মুখ বুজে সহ্য করেছে। আর নয়। নিজের দুর্বলতার ওপর শক্ত পায়ে হাঁটার চেষ্টা করল হেমন্ত।

ইতিমধ্যে লোকান্তর শুরু হয়েছিল। বাজার মতন একটা জায়গা পেরিয়ে এল ওরা। হেমন্ত নড়েচড়ে বসল, রাস্তার স্বল্প আলোয় ঘড়ি দেখল। দশটা বেজেছে কিছুক্ষণ; ছোট শহর বলেই সম্ভবত এরই মধ্যে পথ নির্জন, প্রায় জনবিরল। ইতস্তত দু'একজন রাত মুখে হাঁটছিল, যাত্রী বোঝাই একটা বাস চলে গেল পাশ দিয়ে। নির্মলা, এতক্ষণ শান্ত ও একাগ্র হয়ে বসে থাকার পর, উদ্‌গ্রীব হয়ে সম্মুখের পথে বাসটাকে চলে যেতে দেখল। আর তখনই, রঙ দেখে খেয়াল হল হেমন্তর, এই বাসেই যেন তারা এসেছিল। নির্মলা কি ফেরার কথা ভাবছে!

একাগ্র হবার চেষ্টা সত্ত্বেও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল হেমন্ত। মাথার ভিতর একটা শিথিল জ্বালার মতন ভাব; ঠিক রাগ নয়, যথেষ্ট রাগতে পারছে না বলেই হয়তো, এই মুহূর্তের যাবতীয় অনুভব নিয়ে হেমন্তর অস্বস্তি। শীতটা ক্রমশ গা-সওয়া হয়ে যাচ্ছে।

ওরা পৌঁছে গেল। সদর বন্ধ, ভিতরে আলো জ্বলছে। দারোয়ান মতো একটি লোক এগিয়ে এসে কোচোয়ানের সঙ্গে কি

কথাবার্তা বলল. তারপর, নির্দেশ ছাড়াই জিনিসপত্র নামাতে শুরু করল। টাঙা থেকে নেমে আবার শীত। ততক্ষণে সদরের দরজা খুলেছে. নির্মলা রাস্তা থেকে বারান্দায়। ভাড়া মিটিয়ে হেমন্তও উঠল.

যা ভেবেছিল তা নয়। এক নজর তাকিয়ে দেখল হেমন্ত। দস্তুর মতো হোটেল এটা। কাউন্টার আছে, চাবি ঝুলছে কী-বোর্ডে, নেম-প্লেটের খোপে খোপে কার্ড। একবার চোখ বুলিয়েই হেমন্ত কটা ঘর শূন্য দেখল. দেখে নিশ্চিন্ত হল, যাক, রাতটুকু ঘুমনো যাবে। আড়াই ঘন্টা বাস জার্নি, স্টেশনে ছুটোছুটি এবং আবার টাঙায় চড়ে ফিরে আসায় রীতিমতো ক্লান্তি লাগছিল। মেজাজ খারাপ না হলে এতক্ষণে কাতর হয়ে পড়ত।

নির্মলা উদাসীন। দৃষ্টি সামনে, তাকিয়ে আছে, কিন্তু বিশেষ কিছু ও দেখছে বা লক্ষ করছে বলে মনে হয় না। এই এক ধরনের চেহারা—হাত, পা, কোমর, বুক, মুখ, চোখ সব আলাদা করে চেনা যায়, কিন্তু রাগ বা অভিমান বা ক্ষোভ কিছুই বোঝা যায় না।

কাউন্টারের ভদ্রলোক খাতা খুলে-ছিলেন, হেমন্ত এগিয়ে গেল।

'আমরা শুধু আজকের রাতটুকু থাকতে চাই। প্ল্যান চেঞ্জ করেছি, কাল সকালেই চলে যাব।'

'কোথায় এসেছিলেন?' মুখ না তুলেই শুধোলেন ভদ্রলোক।

'ডিগর স্যানাটোরিয়ামে।'

এই প্রথম ভদ্রলোক চোখ তুললেন! ভুরু উঠল। একবার হেমন্ত, তারপর নির্মলার মুখে তাকিয়ে কিছু খুঁজলেন, কিছু আঁচ করার চেষ্টা করলেন যেন। নির্মলার মুখ আগের মতই থমথমে. ভারি. প্রশ্ন বা উত্তর কিছুই তার কানে যাচ্ছে বলে মনে হয় না। অন্যমনস্কভাবে হাই তুলল। চেয়ার দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'দাঁড়িয়ে কেন. বসুন না।'

নির্মলা বসল, হেমন্তও। ওরা বসতে বেল টিপে ভদ্রলোক বয়কে ডাকলেন, 'দোতলার ছ' নম্বর ঘরটা খুলে দাও—'

ভদ্রলোকের কথা শেষ হবার আগেই নির্মলা বলল, 'আমাদের দুটো ঘর চাই। আলাদা।'

কথাটা হেমন্তই বলত, ভেবে রেখেছিল বলবে। ঘটনাটা এমন হঠাৎই ঘটল যে, রুম-বয় দাঁড়িয়ে পড়ল, ভদ্রলোকও তাকালেন অপ্রতিভ চোখে। নির্মলা স্বভাবের বাহ্যিকতা রক্ষা করেছে, এখন আবার চুপচাপ। একা হেমন্ত রাগে, দুঃখে, অপমানে মূক হয়ে গেল। তার মুঠো শক্ত হল, আসুরিক প্ররোচনায় রক্তের বেগ দ্রুত হল। তুমি কি ভেবেছো, নির্মলা, এই হোটেলে আমি তোমাকে নিয়ে রাত কাটাতে এসেছি! দাঁতে দাঁত ঘষে এই মুহূর্তের অসম্ভব ক্রোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করল হেমন্ত।

'সকালেই চলে যাবেন তো?'

ভদ্রলোকের গলার স্বরে কৌতুক ও রহস্য টের পেল হেমন্ত। এখন ক্রুদ্ধ হলেও কিছু বলা যাবে না। অপমান হজম করে হেমন্ত বলল, 'বলেছি তো।'

'ঠিক আছে। এগারো বারো নম্বর দুটো দিয়ে দাও।' বয়কে নির্দেশ দিয়ে ভদ্রলোক আলাদা করে হেমন্ত ও নির্মলার নাম ঠিকানা খাতায় তুললেন। 'আপনারা ওর সঙ্গে যান। কাল আবার ঘর দুটো বুকড্ হয়ে আছে।'

অর্থহীন কথার উত্তরে কথা বাড়াল না হেমন্ত। ও উঠে দাঁড়াল, জানে, নির্মলাও আসবে। আসুক, না আসুক তার আর দেখার দরকার নেই। আপাতত সে ঘরে ঢুকবে ও ঘুমোবে।

অলস পায়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে রাতের ঘনত্ব টের পেল হেমন্ত। অন্ধকারে হাওয়ার শব্দ; কুয়াশা আকাশটাকে অনেক নিচু করে এনেছে। কুয়াশা বা মেঘ, হেমন্ত ঠিক ঠাহর করতে পারল না। হতে পারে মেঘ, জ্যোৎস্নার শেষ আবরণটুকু নিশ্চিহ্ন হবার পর কুয়াশার ভিতর দিয়ে অন্ধকার পথ করে নিচ্ছে। হাওয়ায় শীতসহ কেমন একটা জলীয়ভাব, থেকে থেকে গুম গুম শব্দ উঠছিল। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ রহস্যময় মেঘ, অন্ধকার ও দূর-বিস্তৃত নিশুতি চরাচরের ওপর দৃষ্টি স্থির রাখল হেমন্ত। এখানে দাঁড়িয়ে দিক নির্ণয় করা যায় না। হতে পারে মাইল মাইল নিঃশব্দ চরাচর পেরিয়ে কোনখানে আছে সেই অদ্ভুত স্যানাটোরিয়াম, যেখানে উৎপল আছে, ঘুমে কিংবা প্রেমে আচ্ছন্ন হয়ে। এই রাত্রির ঘটনার কিছুই তার গোচরে নেই। দুই কিংবা তিনদিন পরে স্যানাটোরিয়ামের ঠিকানায় পুরো তুমি নির্মলার চিঠি পাবে, এক বিশ্বাসহন্তার বিবরণ। আমি দোষী নই, উৎপল, মনঃস্থির করার মুহূর্তে স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ করল হেমন্ত. হয়তো তুমি আমার ওপর অত্যধিক বিশ্বাস আরোপ করেছিলে। তোমার সাধ্বী স্ত্রী, নির্মলা, কোনদিন আমারও স্ত্রী হতে পারত। হয় নি। আমার দুর্বলতা আজও আমি নিঃশব্দে বহন করে বেড়াচ্ছি। একে তুমি বন্ধুকৃত্য বল, ভালো; তবু একটি দিনের জন্য আমি নিজের মতো হয়ে দাঁড়াতে চাই; যে আমি আমার সত্য, আমার ন্যায় আমার মানবিক প্রবৃত্তি।

অন্যমনস্কতার ভিতর অন্ধকার আরো ঘন, আরো গভীর হতে দেখল হেমন্ত। অবসাদমুক্ত হবার জন্য ল্যাভাটরীতে গেল, হাত মুখ ধুল; শীতে অনুচিত জেনেও ট্যাপের নিচে মাথা পেতে রাখল অনেকক্ষণ। জ্বালাটা গেল না। নিজের ছায়ার মতো অপমানটা হেমন্তর গায়ে গায়ে লেগে থাকল। অস্বস্তিকর এই অবস্থা, দূরত্বে যাবার চেষ্টা সত্ত্বেও নির্মলা যেন তাকে অনুসরণ করছে সর্বত্র!

পাশাপাশি দুটো ঘর। মাঝে দরজা। রুম-বয়কে ডেকে নির্মলার স্যুটকেশ বেডিং পাশের ঘরে দিতে বলল হেমন্ত। তারপর, নির্মলা শুনতে পায় এমনভাবে সশব্দে দরজার ছিটকিনি তুলে দিল। যেন তার মানসিক ক্লেশ ক্রমশ সঞ্চারিত হচ্ছিল শরীরে। বেরিয়ে এসে হেমন্ত নির্মলাকে খুঁজল। হয় সে ঘরের ভিতরে না হয় ব্যালকনিতে, হেমন্ত খুঁজে পেল না।

এই জ্বালা, বহুদিনের জমে ওঠা রাগ দ্বেষ অপমান ঈর্ষা হেমন্তকে ক্রমশ অসহিষ্ণু করে তুলল। নিজের কাপুরুষতাকে ধিক্কার দিল হেমন্ত, মনে মনে শক্ত করল নিজেকে। অপমানটা যেন তার রক্তের ভিতর ঢুকে গেছে, শিরার ভিতর তার সবেগ ছুটোছুটি; গ্লানিকর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এই প্রথম হেমন্ত নিজেকে ভালবাসতে শুরু করল।

নির্মলা তোমার কে? বা, উৎপল? বন্ধুত্ব, সে কেমন ভূমিকা! কিংবা, এমন যদি হয়, যা ঘটবে ও ঘটতে পারে, তার পর উৎপল বা নির্মলার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক থাকল না, একটা পরিচয় নষ্ট হল, কি যায় আসে তোমার!

অস্বস্তিকর এই চিন্তা। যত ভাবছে ততই নতুন অস্বস্তি কুক্ষিগত করে ফেলছে। প্রায় আচ্ছন্নতার ঘোরে ও নিচে নামল। ডাইনিং হল তখন শূন্য। বলা ছিল, সুতরাং খাবার পেতে অসুবিধে হল না। বয়-বয় নিজেই তদারকি করছিল। তখন ক্ষুধায় প্রচণ্ড একাগ্রতা হেমন্তর, ওরই মধ্যে অকারণে লোকটি জানিয়ে দিল মেমসাহেবের খাবার সে ঘরেই দিয়ে এসেছে। মেমসাহেব! হাঃ, মেমসাহেব! তীক্ষ্ণ দাঁতে সশব্দে মুরগীর মাংস চিবোতে চিবোতে কথাটা শুনল হেমন্ত। আমল দিল না। বস্তুত, নির্মলা তখন তার কাছে একটা শরীর মাত্র, শ্রী, উন্মুখ শরীর; আমিষ গন্ধে লোভাতুর সর্বাঙ্গে শরীরময় নির্মলার জন্য প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব করল হেমন্ত।

আমার আত্মত্যাগের কোন মূল্য নেই। এমনও হতে পারে আমি সে-জন্য তৈরী হই নি, অন্যায় ও অযাচিতভাবে আমি কিছু উপকারের চেষ্টা করেছি মাত্র। এটা ভুল। আরোপিত এক সত্তা নিয়ে এতদিন নিজেকে আড়াল রেখে স্তোকবাক্য শুনিয়েছি। এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কি হতে পারে। অন্ধকার ঘরে পায়চারি করে পরস্পরবিরোধী নিজের দুই অস্তিত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শেষবারের মতো হেমন্ত বিবেকের মুখোমুখি হবার চেষ্টা করছিল। সবই কি তোমার বন্ধুকৃত্য, বা অন্য কিছু? বন্ধুকৃত্য ভেবে নিলে অনেক সমস্যা সহজ হয়ে আসে, অনায়াসে আড়াল করা যায় নিজেকে। কিসের আড়াল! নিজেকে ছিঁড়েখুঁড়ে লালাসিক্ত দাঁত শরীর বের করে আনল হেমন্ত। ভুয়া বিবেকের আড়াল দিয়ে এতদিন এই শরীর, প্রিয় শরীরকে আড়াল করেছি আমি। অথচ, নির্মলার চোখে চিরাচরিত আমি, এক ও অপরিবর্তিত, ছোট, ছোট, ছোট। আজ রাতে যদি অভাবিত অচিন্তনীয় কিছু ঘটে যায়, তাহলে আর কতোটা নামব!

যেন মনে মনে নিজের দৈন্যের পরিমাপ করে নিল হেমন্ত। কাঠগড়ার আসামীর মতো নিজেকে বিচার করে অবাধ লোকচক্ষুর সম্মুখে দাঁড় করাল।

হেমন্ত আর কিছু ভাবতে পারছিল না। কখনো কখনো এমন হয়, রক্তে বিপরীত স্রোত বয়, ধর্মাধর্মের বাইরে তৃতীয় কোন আলোড়নের চাপ সবরকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যেমন এখন। অন্ধকার ঘরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে, কখনো বা অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে চিন্তায় ভিতর নির্মলাকে উলঙ্গ করে দেখল হেমন্ত। তারপর স্থির হয়ে দাঁড়াল, অপেক্ষা করল। নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ঘোড়ার ক্ষুরের অবিশ্রাম টুকটুক শব্দ কানে আসছিল। একবার নির্মলার কাশির শব্দ শুনতে পেল। আর সব শব্দহীন।

হেমন্ত বাইরে এল। ব্যালকনিতে দাঁড়াল। নিচু আকাশ, সামনে কুয়াশা ও শীতে আচ্ছন্ন অন্ধকার। এত কাছে যে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করা যায়। নিঃশ্বাস নিতে অন্ধকারের গন্ধ ঢুকে পড়ল বুকের মধ্যে। সম্মুখে চোখ মেলে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল হেমন্ত। সন্দেহ কি, নির্মলা এখন গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন; সারা দিনের ক্লান্তির পর এখন তার জেগে থাকার কথা নয়। খানিক আগে ঘুমঘোরে হেমন্ত ওর কাশির শব্দ শুনেছিল। এতদিনের অভিজ্ঞতায় ঘুম ও জাগরণের বিভিন্ন শব্দ স্পষ্ট ও আলাদা করে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না।

পাশাপাশি ঘর। মাঝখানের দরজার ছিটকিনি আগেই তুলে দিয়েছিল হেমন্ত। শরীরে অসম্ভব প্রতিক্রিয়া শুরু, হাতে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ও কিছুক্ষণ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। নিঃশ্বাসে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ, অপচয়িত প্রতিটি মুহূর্ত এখন কপালে, গলায় ঘাম হয়ে জমছে। আবার নিঃশ্বাস নিয়ে ছিটকিনি খোলার জন্য কম্পিত হাত বাড়াল হেমন্ত। যেন সে অনুমান করতে পারছিল, অতর্কিত শব্দে নির্মলা জেগে উঠেছে, হেমন্ত তাকে দরজা খুলতে বলছে। ইত্যাদি গণনায় উত্তেজিত হতে হতে ছিটকিনিটা খুলে ফেলল হেমন্ত।

আশ্চর্য, দরজাটা খোলা। নির্মলা কি শোবার আগে এই দরজার কথা ভুলে গেছে! বা, প্রয়োজন মনে করে নি। ভেবে, দু'এক মুহূর্ত নির্মলার জেগে ওঠার অপেক্ষা করল হেমন্ত। তারপর আস্তে আস্তে দরজা ফাঁক করে ভিতরে ঢুকল।

অন্ধকার ঘরে নির্মলার নিঃশ্বাসের শব্দ। উত্তেজনায় শরীরময় ঘাম। খাটে ধাক্কা লাগতে সরে এসে নির্মলাকে খুঁজে পেল হেমন্ত। যেন কোন আগুনে হাত রেখেছে, হেমন্ত বুঝতে পারল না এই উত্তাপ কার। তার, না নির্মলার!

'কে!' নির্মলার শরীরে হাত রেখে ওর ভয়ঙ্কর শুষ্ক গলা শুনতে পেল হেমন্ত। নির্মলা জেগে উঠেছে। হেমন্ত ভয় পেল, আকস্মিকভাবে একটা ঠাণ্ডা সাপ যেন তার শরীর বেয়ে নেমে গেল নিচে।

তৎক্ষণে বেডসুইচ টিপে আলো জ্বেলেছে নির্মলা। চোখ প্রায় রক্তবর্ণ, আর্দ্র; ওই চোখে রাগ, ঘৃণা, উষ্মা কিছুই খুঁজে পেল না হেমন্ত। যেন স্বপ্নের ভিতর হঠাৎ জেগে উঠেছে নির্মলা; কয়েক মুহূর্ত অপলকে হেমন্তর উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'হেমন্তবাবু, আপনাকে আমি মিথ্যে বলেছিলাম। উৎপল বাঁচবে না। আজ ডাক্তার আমায় বলেছে, ও অসুখ সারবার নয়।'

টিটেনাস আক্রান্ত রোগীর মতো হেমন্তর মেরুদণ্ডটা একবার কেঁপে উঠেই থেমে গেল। নতমুখ নির্মলার দিকে তাকিয়ে ও শুধু অনুভব করল, বুকের গভীরে কোন লুকোনো ক্ষত থেকে টুপটাপ রক্ত ঝরছে। আর, নির্মলার সামনে ও ক্রমশ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে যাচ্ছে।

মুখখানি ফুলের পাপড়ির মতো কোমল আর তাজা রাখতে হ'লে চাই

ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রভাব ধ'রে রাখা।

পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীমের বিশেষ উপাদান 'হিউমেক্‌ট্যান্ট' এই আর্দ্রভাব ধরে রাখে—চামড়াকে ধুলোবালি ও রুক্ষ আবহাওয়ার হাত থেকে বাঁচায়। তুষার-শুভ্র ও হাল্‌কা এই পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম লাবণ্যে অম্লান রাখবে আপনার রমণীয় রূপ আর কমনীয় ত্বক। □ শুধু পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম মুখে মার্জিতভাব এনে দেয়; আবার এর ওপর পাউডার মাখাও চলে—তাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেক-আপ নিখুঁত থাকবে। □ পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম—বিশ্বের সেরা সুন্দরীদের মনের মতো প্রসাধন।

পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম—নিখুঁত পাউডার বেস্

চীজব্রো-পণ্ডস ইনক (সীমিত দায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমিতিবদ্ধ)

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

চুয়াত্তর

গোপীদাস কখন এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে টের পাই নি। যোগোও পায় নি। তার মুখ তখনো উনুনের দিকে ফেরানো। গোপীদাস বলে ওঠে, 'সব শুনতে পেইয়েছি গ ঠাকরুন।'

যোগো নড়ে ওঠে। বলে, 'পেলোই বা নতুন কথা ত লয় দাদা। তোমাদিগের জানা কথা।'

বলতে বলতে মুখ ফিরিয়ে রেখেই আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। আবার বলে, 'তোমার চিতে বাবাজী জিগেসা কইরলে যে কবে বিয়া হইয়েছে। তাই বইললাম।'

গোপীদাসের লাল চোখ দুটি এখনো ছোট, ঢুলুঢুলু ভাব। দাড়ি দুলিয়ে বলে, 'আমিও ত তাই বইলছি গ যোগো দিদি। তিন আখরের ভাগদ আলাদা, সেথা বিয়া শাদীর কী কথা। অই তিন আখরে বাঁধে তিন আখরে ছাড়ে। তিন আখরে সতী তিন আখরে কুলটা। যা বইলবে তাই অই তিন আখর সব—পি-রী-তি। পিরীতি-কলে যে পইড়েছে, তার আর ঘর সমসার বিয়া বিটা বিটি সব ফোক্কা।'

বলে ঘড়ঘড়ে মোটা গলায় গেয়ে ওঠে।

'কলে কলে কল কইরেছে
কল দেখ্যে মন ভুল্যে আছে
কলের কলে কল পইড়েছে
হ কল হারাল্যে চইলবে না হে।'

যোগো বলে ওঠে, 'ছাই। অমন কলের মরণ, পিরীতির মুখে আগুন।'

গোপীদাস বলে, 'তা দাও গা। যত খুশি আগুন দাও গা পিরীতির মুখে। না, কী বল হে বাবাজী?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ দিই 'হ্যাঁ।'

যোগো ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে চায়। তার চোখে মুখে আবার সেই আগের ভাব ফিরে এসেছে। লাল কুসুমের পাতার মত চোখ দুটিতে ঝিলিক হেনে ভ্রূকুটি করে বলে, 'উ বাবা ই যে দেখি বিন্দার শুকপাখি গ। কথা বইলবার আগে আওয়াজ দেয়।'

গোপীদাস আবার বলে, 'তা হতে পারে। পিরীতির কথা যে। না, কী বাবাজী?'

আমি আবার জবাব দিই, 'তা-ই।'

যোগো বুঝি এতটা আশা করে নি। আর চোখে কৌতূহল আর বিস্ময়। কয়েক মুহূর্ত ঠায় চেয়ে থাকে আমার মুখের দিকে। তারপরে হঠাৎ হেসে কাঁপে সর্বাঙ্গে। বলে 'অই গ গোপীদাদা, ই যে সত্যি চিতে গ।'

'তবে? এমনি এমনি কী আর বইলেছি। দেখে শুনে বইলেছি।'

আমি মিটিমিটি হাসি আর মনে মনে বলি, তো যা বল আর তা-ই বল অচেনার ভয় আর আমার নেই। পিরীতির মুখে তুমি যত আগুনই দাও সে পোড়াতে তুমি অংগার হয়েছ। অংগারের নিচে পিরীতির মরণে যে সোনা তার রূপও দেখেছি। দেখেছি বলেই সাহস পাই। যোগোমতী ভৈরবীকে ভয় পাই না আর। তার দপদপানো সংহারিণী রূপের আড়ালে যে বিগলিত ধারা বহে, এখন আমার চিনু পরিচয় সেখানে।

যোগো আমার ওপর থেকে চোখ নামায় না দেখে না বলে পারি না, 'যা সত্যি, তাই বলব তো।'

যোগো প্রায় হুমকে ওঠে, 'বটে। দেখি শালার চিতের চখ গেল্যে দিই।'

বলে একেবারে খুন্তিটা উঁচিয়ে ধরে আমার মুখের সামনে। আমি তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে বলি, 'দোহাই।'

সঙ্গে সঙ্গে যোগো খুন্তি রেখে হেসে

বেজে ওঠে। গোপীদাসও।

তারপরে যেন যোগোর হঠাৎ খেয়াল হয় বেলা পড়ে গিয়েছে। মিথ্যে না শীতের বেলায় রোদ ঢল খেয়ে গিয়েছে গ্রাম বক্রেশ্বরের পশ্চিমের ঢালুতে। মুখের লাজে লাজ নেই, মহাপ্রাণী অতি ক্ষুধার্ত। যোগোও সেটা টের পায়। নিমেষের মধ্যেই ডালের সম্বরায় ঝাঁজ ছড়িয়ে ছুটোছুটি করে ঘর থেকে শালপাতা পেতে খেতে দেয়। আমাকে আর গোপীদাসকে ভাত বেড়ে দিয়ে কড়া চাপিয়ে আলু বেগুন ভাজে।

আমি জিজ্ঞেস করি, 'আপনি খাবেন না?'

ভাজার ছ্যাঁকছ্যাঁক শব্দে যোগোও যেন ছ্যাঁকা দিয়ে কথা বলে, 'ক্যানে হে, শ্মশান বল্যে কি নিয়ম নাই? অতিথি না খাইয়ে খাব আমি?'

তা বটে। বলি, কোন লজ্জায় তা-ই ভাবি। এমন খাওয়া যে কপালে ছিল তাও কোনদিন ভাবি নি। মহাশ্মশান ক্ষেত্রে, অবধূতাশ্রমে, ভৈরবীর হাতে। বলি, 'ভুল হয়ে গেছে।'

যোগো ভ্রুকুটি করে হাসে। গোপীদাস দাড়ি গোঁফে মাখিয়ে খায়। যোগো ভাজার দিকে চোখ রেখে বলে, 'তোমার চিতে বাবাজীর লক্ষণ ভাল না গোপীদাদা।'

'ক্যানে?'

'অবধূত ঠিক বইলেছে। ই আশ্রমে থাইকলে অনাচার হত্যে পারে।'

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠি, 'না না, সে কী!'

গোপীদাস আর যোগো দুজনেই হেসে ওঠে। গোপীদাস বলে, 'অনাচার ক্যানে গ ঠাকরুন। সি ত রসিকের আচরণ গ।'

আমি খাওয়া থামিয়ে দুজনের দিকে চেয়ে থাকি। লজ্জাও করে বিব্রতও হই। যোগো হাত তুলে মারার ভঙ্গি করে বলে, 'দ্যাখ ক্যানে তবু হা করে চেয়ে থাকে। ভাত খা চিতে ভাত খা।'

যাক, ঠাট্টা তবু ঠাট্টাই। যোগোর সম্বোধনে বচনে ভাষণে সেটা আরো বেশী করে বোঝা যায়। তার চেয়ে বেশী তার প্রীতি আর বন্ধুত্ব যেন নতুন সুরে বাজে। মাঝখানে যেটুকু বা সংশয়ের অস্পষ্টতা থাকে সেটুকুও কাটিয়ে দেয়।

আমাদের খাওয়া হয়ে গেলে যোগো সব গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখে। আমরা পাত ফেলে দিয়ে হাত মুখ ধুই। যোগো ততক্ষণে উনুন আর দাওয়া লেপে নেয়। ভাবি সে হয় তো চান করে এসে খাবে। গোপীদাস আর আমি ঘরে গিয়ে বসি।

গোপীদাস জিজ্ঞেস করে, 'বাবাজী কি রাতটো বক্রেশ্বরেই থাইকবে?'

'কোথায় থাকব?'

আমার অবাক হওয়া দেখে সে বলে, 'ক্যানে, ইখানেই থাইকবে, ই ঘরে।'

বক্রেশ্বরে আর কেন থাকব তা জানি না। নতুন করে কিছু দেখবার আছে বলে মনে হয় না। তবু এই মুহূর্তে মনে হয় একটা রাত্র থেকে গেলে ক্ষতি কী? এই মহাশ্মশান, উষ্ণ কুণ্ড, শত শত মন্দির, বক্রেশ্বরের খোয়াই গাছপালা সব মিলিয়ে কেমন একটা উদাস, বৈরাগ্যের গাম্ভীর্য। অথচ ঘর ছাড়া মনকে এখানে কে যেন হাত ছানি দিয়ে ডাকে। অঙ্ক দিয়ে বসায়। একটা অচেনা আকর্ষণে টানে।

কিন্তু এই ঘরে! শুধু যে ব্রহ্মানন্দ অবধূতের মুখ মনে পড়ে তা না। ঘরের কোণে অজগরের খাঁচা, বেড়ার গায়ে নরমুণ্ডের কঙ্কাল—ভাবতেই অস্বস্তি লাগে।

গোপীদাস হেসে বলে, 'কী বাবাজী ইদিক উদিক দেইখছ যে? সাপের জন্যে ভয় লাইগছে? কোন ভয় নাই। অনেক থেক্যেছি ই ঘরে। খাঁচা থেক্যা সাপ বের হতে পাইরবে না। আমি ত থাইকব তোমার কাছেই।'

সেটা একটা ভরসা। কিন্তু তা যেন হল, অবধূত মশাই এসে যে অনাচারের দায়ে ত্রিশূলে খুঁচিয়ে দণ্ড দেবেন না তা জানব কেমন করে। জিজ্ঞেস করি, 'আর অবধূত?'

গোপীদাস হেসে আমার পিঠে গা'ত দেয়। বলে ওঠে, 'অই অই উয়ার কথায় ভয় লাইগছে তোমার? উ ভারী ভাল লোক গ বাবাজী। যদি আসে কথাবার্তা শুইনলে বুইঝবে। উ সব উয়ার মুখের কথা, ভৈরবীর সাথে বিবাদ হইয়েছে তা-ই।'

তবু যেন ভরসা পাই না। মাঝ রাতে এসে হুংকার দিলেই হল। যোগোমতী রক্ষাকর্ত্রী আছে। কিন্তু বিড়ম্বনা রোধ করা যাবে কি না কে জানে।

গোপীদাস আবার বলে, 'আর যদি নিতান্ত তোমার মন না চায় অন্যত্তর থাইকতে পারি। গাঁয়ে যেইয়ে থাইকতে পারি। ঠান্ডার দিন, তা-ই। তা না হল্যে যিখানে সিখানে রাতটো কেট্যা যেত। একটুক কইসে গড়ায়ে লাও, তা'পরে ঘুর্যে ফির্যে দেইখে ঠিক করা যাবে।'

সে-ই ভাল। সেরকম দেখলে সন্ধ্যা-বেলার বাস ধরে দুবরাজপুর চলে যেতে বাধা কী। দুবরাজপুর ইস্টিশনে একটা রাত কেটে যাবে। কিন্তু সব যেন কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। আমার আর গোপীদাসের ধূমপান শেষ হয়ে যায়। তারপরেও অনেক-খানি সময় পার হয়ে গেল। ভৈরবীর এখনো দেখা নেই।

জিজ্ঞেস করি, 'উনি কোথায় গেলেন?'

'কে, যোগো দিদি? বাইরে বস্যে, খাইচ্ছে বোধহয়।'

কিন্তু তা কেমন করে হবে। খাবার তো সব ঘরেই তোলা হয়েছে। যোগো যে খাবার বেড়ে নিয়ে যায় নি, তা দেখেছি। বাইরের দাওয়ায় কারুর কোন সাড়া শব্দও নেই। বলি, 'খাবার তো সব ঘরেই ঢাকা দেওয়া রয়েছে।'

গোপীদাসের একটু ঝিমনো ভাব এসেছিল। মুখ তুলে চেয়ে বলে, 'তা-ই তো। গেল কোথা। লাইতে যেইয়ে কি এত দেরি কইরবে?'

গোপীদাসের সঙ্গে আমিও চোখ তুলে দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাই। সেখানে শিবমন্দিরের মাথায় গায়ে গাছের ডালে পাতায় বিকেলের পড়ন্ত রোদ। ছায়ার বিস্তার বেশী, ফাঁকে ফাঁকে পড়ন্ত বেলার লাল রোদ।

গোপীদাস ডেকে ওঠে, 'অই গ যোগো দিদি, বাইরে আছ নাকি?'

নেই সে বিষয়ে সন্দেহ কী। থাকলে এতক্ষণে তার সাড়া পাওয়া যেত। কিন্তু অবাক হয়ে শুনি তার গলার শব্দ আসে বাইরের দাওয়া থেকে, 'আছি।'

আছে! গোপীদাস আর আমি দুজনেই চোখাচোখি করি। গোপীদাস জিজ্ঞেস করে, 'খাইতে যাও নাই?'

বাইরে থেকে জবাব আসে, 'সি আমার সকালবেলাই হয়্যা যেইছে।'

'খাবে না?'

জবাব আসে না আর। অতিথির খাওয়া হয়ে গেলে সে খাবে তা-ই জানতাম।

গোপীদাস আবার জিজ্ঞেস করে, 'খাবে না ঠাকরুন?'

কেমন যেন উদাস গলার আওয়াজ আসে, 'খাব পরে।'

ব্যাপারটা কেমন যেন শক্ত ধরায়। যোগোমতী ঠিক সুরে যেন বাজছে না। গোপীদাস ওঠে। আমিও কৌতূহল না চাপতে পেরে তার পিছু পিছু যাই। দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি ভৈরবী দুই হাঁটুতে মাথা রেখে চুপচাপ বসে আছে বাইরের দাওয়ায়। আমাদের দেখে একটু লজ্জা পেয়ে হাসে। গোপীদাস বলে, 'ক্যানে, পরে আবার কখন খাবে গ?'

যোগো বলে, 'রাতে খাব!'

বলে আবার হাসে। কিন্তু সে-ই বেসুরে। কেমন একটা খটকা লাগে তার হাসি দেখে। চোখের কোল দুটি এখন যেন আরো বেশী বসা মনে হয়। তীক্ষ্ণ মুখটি যেন আগের থেকে শীর্ণ দেখায়। খিদের জন্য কি না জানি না। কিন্তু সাত-তাড়াতাড়ি আমাদের রেঁধে-বেড়ে খাওয়ালে, তারপরে নিজে সব গুছিয়ে চুপচাপ বসে আছে! দেখে ভাল লাগে না। মন খারাপ হয়ে যায়।

গোপীদাস আবার অবাক হয়ে বলে, 'রাতে খাবে কী গ। গোটা দিন না খেইয়ে থাইকবে?'

যোগো কোন কথা বলে না। সে দূরের দিকে চেয়ে থাকে। আর সেই মুহূর্তেই সহসা আমার মনে একটা চমক লেগে যায়। মনে হয় আজকের গোটা দিনটিই শুধু না। হয় তো এমন কয়েকটা গোটা দিনরাত্রিই না খেয়ে কেটেছে। আমি ঘরের বাইরে এসে বলি, 'এটা ভাল লাগছে না। আপনি খেয়ে নিন।'

যোগো মুখ তুলে ভুরু কোঁচকায়। বলে, 'আবার আপুনি আগ্গো কইরছ?'

বলি, 'তা না হয় করব না। কিন্তু খেয়ে নিতে হবে।'

যোগো কথা এড়িয়ে যায়। গোপীদাসকে বলে, 'দেইখছ ত তোমার চিত্তে বাবাজীকে। আমার জন্যে মইরছে।'

অনায়াসে বলে উঠি, 'মরছি।'

'বাবা রে! সত্যি সত্যি ম'রো না যেন।'

সে চোখ ঘুরিয়ে ঘাড় বাঁকায়। গোপীদাস বলে, 'কিন্তুক খেয়ে লাও যোগো দিদি।'

যোগো কী বলবার জন্যে মুখ তোলে। হঠাৎ আবার মুখ নামিয়ে নেয়। আবার যখন মুখ তোলে তখন তার ভাব আলাদা। বলে, 'গোপীদাদা উদিকে ত একজন একেকাটার ঘরে যেইয়ে সাধনভজন শিখালছে। মদ গাঁজাও খুব চইলছে। পেটে কটা দানা পইড়েছে একবার জিগেস করগা দেখি।'

বলে যেন রুষ্ট কোপে ঘাড়ে ঝটকা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর আমার বুকের কাছে হঠাৎ যেন একটা খোঁচা লেগে যায়। খোঁচা লেগে ব্যথা করে ওঠে। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে থাকি। তা-ই তো পরমের মুখ চেয়ে মরমের বসে থাকা। রেঁধেবেড়ে তাড়াতাড়ি অতিথিকে খাওয়ানো যায়। অতিথি যদি দেবতা তার বড় দেবতাও তো আছে। সে সাতপাকের পতি না হোক পতির চেয়ে বড়। সে যে গৃহত্যাগিনী তাঁতীবউয়ের সতীত্বের সুন্দর। নারীত্বের একমাত্র নর। জাতিকুলমান সকলই আনু। সে আর যা-ই করুক তবু সে সেই মানুষ যার জন্যে সব ত্যাগ শ্মশানবাস। তাকে রেখে কি যোগোমতী খেতে পারে কখনো!

আমি যেমন থমকে যাই গোপীদাসও তেমনি। কারুর মুখে হঠাৎ কোন কথা যোগায় না। যোগো আবার নিজের মনেই বলে, 'কী বইলব বল। এমনিতেই ত হাঁড়ি চড়ে না! তা রোজ রোজ দু' বেলা না খেল্যেও এখন আর কষ্ট হয় না, এক বেলাতেই যথেষ্ট। অথচ, ই মানুষের কিসের অভাব ছিল। দ্যাখ যেইয়ে তার ঘরের ভাত কে খায় তার ঠিক নাই। শিব-ঠাকুর শ্মশানে বস্যে ভিক্ষে কইরছে।'

যোগো চুপ করে। আমরা কেউ কথা বলতে পারি না। একটু পরে সে আবার বলে, 'রোজ রোজ বেড়ে দেব এত ভাগ্য করি নাই। আর যদি বা একবেলা দিতে পারি তা-ই বা কে ল্যায়, কে খায়।'

মুখ তুলে গোপীদাসের দিকে চেয়ে বলে, 'তোমরা রাগ করো্য নাই গোপীদাদা। ঠাণ্ডার সময় কিছু নষ্ট হবেক নাই। চারজনার ভাত রেঁধ্যেছি একজনের ভাত হাঁড়িতে পড়্যে থাইকবে?'

গোপীদাস বলে, 'দুজনারটোই বা থাইকবে ক্যানে?'

যোগো হাসে। গোপীদাস আমার দিকে চেয়ে বলে, 'চল ত বাবাজী, অবধূতকে ধইরে লিয়ে আসি।'

'যইস ক্যানে। নিজেই আইসবে।'

গোপীদাস দাড়ি ঝাঁকিয়ে ঘাড় নাড়ে। বলে, 'না, সে আসতে চইলবে না। আইসবে ত জানি, যাবে কোথা। কিন্তুক এখন যেইয়ে যেতে্য হবে। চল ত বাবাজী চল।'

আমার মনে একটু দ্বিধা। যা মূর্তি দেখেছি সামনে যেতে ভরসা পাই না। সেখানে গিয়ে কী দেখব তা-ই বা কে জানে। একবার ভৈরবীর দিকে তাকাই। তারপর গোপীদাসের সঙ্গে যাই। কয়েকটা মন্দিরের এপাশ ওপাশ দিয়ে উঁচুনিচু খোয়াইয়ের ঝোপজঙ্গল পেরিয়ে খানিকটা পুবে গিয়ে প্রায় একটা হেলেপড়া ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। ছোট নিচু বেড়ার ঘর। মাথায় খড় প্রায় নেই। তার বদলে নানান গাছের ডালপালা পাতা দিয়ে খড়ের অভাব মেটানর চেষ্টা হয়েছে। দরজাটা খোলা। দিনের বেলাও ভিতরটা অন্ধকার। কারুর কোন সাড়া, শব্দ নেই।

গোপীদাস আওয়াজ করে, 'জয়গুরু। খেক্ষ্যানন্দদাদা আছ নাকি?'

কোন সাড়া নেই। তবে একজনের দেখা পাওয়া যায়। সে দরজার সামনে এসে অচেনা মানুষদের দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে থাকে। চোখে তার সন্দেহ, কৌতূহলও বটে। তারপরে একটু যেন ভয়ে ভয়ে, ভাব জমাবার ভাব করে ল্যাজ নাড়ে। শ্মশানের সারমেয় বটে, কালো কুচকুচে রং, হলদে চোখ।

গোপীদাস এগিয়ে যেতেই, শ্মশানবাসীটি ঘরের বাইরে এসে একটু দূরে সরে যায়। গোপীদাস নিজের মনেই বলে, 'কেউ নাই নাকি! অই গ খেক্ষ্যানন্দদাদা, কোথা গেল্যে?'

ভিতর থেকে কেমন যেন চমক খাওয়া মোটা গলা ভেসে আসে, 'কে?'

স্বরেতেই মালুম দেয়, কণ্ঠস্বর ব্রহ্মানন্দ

অবধূতেরই বা। কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ কুকুরটিও কি এ ঘরের বাসিন্দা নাকি! নাকি, শ্মশান-বাসীদের প্রাণিজগতেও কোন ভেদাভেদ নেই।

গোপীদাস আর এগোয় না। একবার আমার দিকে দেখে, বল্লে, 'আমি গোপীদাস। একবার বাইরে এইস।'

এবার আর চমক খাওয়া স্বর না। প্রশ্ন আসে, 'ক্যানে, কী হইয়েছে?'

'এইস ক্যানে একবার।'

'তুমি এইস ক্যানে।'

পাল্টা ডাক আসে। গোপীদাস আবার আমার দিকে তাকায়। তার চোখ দেখে বুঝতে পারি, ঘরে ঢুকতে দ্বিধা। দ্বিধার কারণ, আর একজনের কথা ভেবে। ব্রহ্মানন্দ যাকে এ ঘরে সাধন ভজন শেখাচ্ছে, যার জন্যে সে যোগোমতী ত্যাগ করে আশ্রম ছাড়া হয়েছে। কিন্তু গরজ কার? গোপীদাসের না ব্রহ্মানন্দর। গোপীদাসেরই। তার গরজের পিছনে, যোগোমতীর উপবাসী মুখখানি জেগে আছে। অতএব, সে পায়ে পায়ে খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, মাথা গলিয়ে দেয় ভিতরে। এদিক ওদিক দেখে, ঘরের ভিতর এক পা দিয়ে, জিজ্ঞেস করে, 'একলা রইয়েছ নাকি?'

মোটা গলার জবাব শুনি, 'হুঁ। সংসারে একলা এস্যেছি, একলা যাব।'

গোপীদাসের গলায়, দীর্ঘশ্বাসে বাজে, 'জয় গুরু!'

আমারও তো সেই অবস্থা। অবধূত মহাশয়ের গলায় যেন কেমন বৈরাগ্যের সুর বাজে। ওবেলায় জোয়ারের তোড়। এ বেলায় ভাটার টান। প্রকৃতির নিয়মই তা-ই।

গোপীদাস পিছন ফিরে আমার দিকে চায়। বিটলে বাউল পিট পিট করে, আমাকে চোখ টিপে ইশারা করে। ডাক দিয়ে বলে, 'এইস গ চিতে বাবাজী, দাদার কাছে এইস।'

আমিও তার পিছে পিছে ঘরে গিয়ে ঢুকি। এমনিতেই বিকেল হয়ে গিয়েছে। ঘরের ভিতরটা যেন ঘুটঘুটি অন্ধকার গহ্বর মত। প্রথমে কিছুই চোখে পড়ে না। কেবল একটা বিশ্রী গন্ধ নাকের মধ্যে ঢোকে। তারপরেই, অন্ধকার কোণে, দুটি চোখের সঙ্গে আমার দৃষ্টি মেলে। চোখ তো না, দুই খণ্ড অঙ্গার। আস্তে আস্তে গোটা মানুষটা জেগে ওঠে। ব্রহ্মানন্দ অবধূত বটে। আমার মনে পড়ে গেল, ধূমাবতীর সাধক, শাক্ত কার্তিক ঘোষালের কথা। সন্দিগ্ধ প্রশ্ন শোনা যায়, 'ইটি কে?'

গোপীদাস আঁতে বিনয়ে জানায়, শান্তি-নিকেতন থেকে বাবাজীর আগমন। বক্রেশ্বর দেখবে, সেই সঙ্গে, অবধূত দর্শন করবে, তা-ই সে আমাকে নিয়ে এসেছে। সে যতক্ষণ বল্লে, ততক্ষণই অবধূত আমার দিকে চেয়ে থাকে। সেই অবসরে, যোগোমতীর কথা আমার মনে পড়ে যায়, 'হুঁ, মনে হতে কন্দর্প কান্তি।' অবধূত কন্দর্প কান্তি ছিল, সন্দেহ নেই। এই মদরক্ত চক্ষু, মাথার জট পাকানো চুল, চোখের কোলে গর্ত, কয়েক দিনের আকাটা গোঁফ দাড়ি, পোড়া মূর্তির মধ্যে, কোথায় যেন এখনো সেই একদা কন্দর্প-কান্তিকে দেখা যায়।

গোপীদাস তার পাশে আমাকে বসিয়ে বসে, জিজ্ঞেস করে, 'আর কে যেন ছিল হেথাকে?'

ব্রহ্মানন্দ উদাস চোখে দরজা দিয়ে বাইরে তাকায়। বলে, 'উ মাগীটা বড় বজ্জাত, খেদিয়ে দিইছি।'

গোপীদাস চোখের কোণে একবার আমাকে দেখে নেয়। কিন্তু কিছু বলে না। আমি মনে মনে বলি, জয় গুরু, আপদ গিয়েছে। কিন্তু, এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এত বড় বিপ্লব ঘটে গেল কেমন করে। ও বেলার কথা শুনে তো কিছুই বুঝতে পারি নি। অবধূত নিজেই নিজের মনে বলে, 'উ সব হল্য রাকুসি বরাহী। সাধনের নামে খালি কামাচার কইরবে আর গিলবে। উয়াদের কোন শক্তি নাই।'

গোপীদাস ভাল মানুষটির মত, আঙুলে আঙুল ঠোকে। আওয়াজ করে, 'অ।' অবধূত বলে ওঠে, 'হুঁ, শক্তি বইলব কাকে? যার মধ্যে প্রকৃত শক্তি আছে। তুমি নামেও বাশ্যা বুলটা, কামেও তা-ই, আবার মনেও তা-ই, তা হল্যে আর কী রইল তোমার? রইল খালি একখানি স্ত্রী অঙ্গ। ঝাঁটা মার শালা, ঝাঁটা মার। হুঁ শাস্ত্রে আছে বটে, কুকুটিও শক্তি হত্যে পারে, কিন্তু মনে মনে তোমাকে সাধিকা হত্যে হবো, তবে ত।'

গোপীদাস সায় দিয়ে বলে, 'হ', সবাই কি আর আমাদিগের যোগোদিদি।' তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ গর্জন, 'কী বইলল্যে, তোমাদিগের যোগোদিদি? উয়ার কথা আর আমাকে বল্যো না।'

অবধূত বসেছিল একভাবে। গোটা শরীরে ঝটকা মেরে, পাশ ফিরে বসে। চোখ জ্বলে ধকধক। বলে, 'উয়ার বড় বাড় হইয়েছে। অত কিসের হ্যা, অাঁ? আমাকে খালি ঠাট্টা অচ্ছেদ্দা কইরবে, গালাগাল দিবে। ক্যানে, আমি যদি সিরকম হত্যাম, তা হল্যে তোমাকে আজ একপাল বিটাবিটির হাতে ধর্যে ভিখ্ মাগতে যেতে হত্য। আমি যদি লম্পট হত্যাম, কে তোমাকে দেইখত, অাঁ? উ নিজেকে দুর্গা ভাবে, না কালী ভাবে। উয়ার অহংকার দেইখলে আর কাছকে যেত্যে ইচ্ছা করে নাই। তা উ ছাড়া কি আর আমার শক্তি জুটবে নাই?'

গোপীদাস চুপ। আমার তো কথাই নেই। কিন্তু যা জুটছে, অবধূতের নিজের ভাষায়, সব তো 'রাকুসি বরাহী।' অর্থাৎ শূকরী।

গোপীদাস একটু পরে, বড় মিহি সুরে বাজে, 'সি তোমার মতন সাধকের শক্তি জুইটবে না, তা-ই কি হয়। তবে হ', আমাদিগের যোগোদিদির মেজাজটা একটুক চড়া।'

'একটুক? একটুক বইলছ তুমি গোপী-দাস, অাঁ। যা লয় তাই চোপা কইরবে, আবার আমাকে মাইরতে আসে? উ ভুল্যে যেইছে, আমি কে, আর উ কে, অাঁ?'

বেসুর বেসুর, বড় বেসুরে বাজে যেন। অবধূতের গলায় যেন কার্তিক ঘোষালের স্বর শুনি। কথায় যেন সেই ইঙ্গিত, সে হল কার্তিক ঘোষাল আর যোগোমতী এক তন্তুবায় বধূ। কিন্তু আর কি সে হিসাবের দিন আছে! শ্মশানে, সাধনে, আশ্রমে আর গ্রাম-গৃহের কী সম্পর্ক!

তবে পিরীতি বিবাদে কোন বাদানুবাদ না চলে? কারণ, পিরীতি থাকলে সব রীতিতেই কথা বলা যায়। গোপীদাস আবার বলে, 'তবে ব্রহ্মানন্দদাদা, যা-ই বল আর তা-ই বল, যোগোদিদি তোমাকে ছাড়া কিছু জানে না। অমন পবিত্তির সাধিকা আর হয় না।'

বলে গোপীদাস কপালে হাত ঠেকায়। ব্রহ্মানন্দ চুপ করে থাকে। ইচ্ছা না থে, চুপ করে থাকে। প্রতিবাদযোগ্য কথা যেন ঠিক হাতড়ে পায় না। আর আমি দেখি, গোপীদাসকে। বুড়া বাউলের দাড়ির [illegible] ভাঁজে, ধূর্তামি চোখ দেখে বুঝতে পারি, কোন সাপের কোন মন্ত্র, ঠিক জানা আছে। চোখের কোণে বারে বারেই আমার দিকে চায়। অর্থাৎ ইশারায় জিজ্ঞাসা, [illegible] বুইঝছ বাবাজী?'

ব্রহ্মানন্দ আর একবার [illegible] 'বেচাল আমি দেইখতে পারি না। [illegible] দেখেই মাগীটিকে খেদিয়ে [illegible]

থেক্যা জনার্দন চক্কোত্তি খান কয় বেগুন-পোড়া আর ভাত পাঠিয়ে দিইছিল। মদন হাঁড়ি ভরাতি কর্যে কারণ রেখ্যে গেল্যাছিল। ফিরে এস্যা দেখি, বিটি বেবাক খেয়্যা নিয়েছে, অ্যাঁ? তুমি ইখানে খালি গিলতে এইসেছ অ্যাঁ? আবার হাইসতে হাইসতে বইলছে, সব খেয়্যা নিয়েছি। তব্যে র‍্যা মাগী, অ্যাঁ, তুই খালি ইসব কইরতে এইসেছিস? যা, দূরে হ, দূর হয়্যা যা। কারুরে বেচাল আমি সইব না, সি তুমি যে হও।'

গোপীদাস তেমনি নরম মিহি সুরে নিশ্বাসে বলে, 'আর উদিকে দ্যাখ যেহুয়ে, যোগোদিদি রেঁধে-বেড়ে বইসে আছে। আমাদিগে খাইয়ে-দাইয়ে সব তুলে পেড়ে রেখ্যে দিয়েছে। জিগেস কইরতে বইললে, তোমাদিগের অবধূতকে না খাইয়ে কোনদিন খাই নাই, আজ কী কর্যে খাব বল। ছি ছি ছি, আগে জাইনলে আমরাই কি খেতাম। যোগোদিদির মুখখানি দেখ্যা বড় কষ্ট লাইগল।'

গোপীদাস চুপ করে। অবধূতও নীরব। একটু পরে আর একবার পাশ ফিরে বসে বলে, 'ক্যানে, খেয়্যা নিলেই হত্য।'

কিন্তু গলার স্বরে তেমন ঝাঁজ নেই। গোপীদাস বলে, 'উ কথা বল্যো না দাদা। তা-ই কি হয়, না হইয়েছে কোন দিন।'

অবধূত আবার চুপ। গোপীদাসও। তবে, তার জপানোর ভাবখানা একবার দেখ। এদিকে হাত জোড় করে বসে। ওদিকে, আমার দিকে ঘন ঘন চোখের কোণে দৃষ্টি-পাত। আর এতক্ষণে সহসাই যেন আমার দিকে অবধূতের দৃষ্টি পড়ে। জিজ্ঞেস করে, 'তোমার নাম কী?'

নাম বলি। তারপরে ধামের ঠিকানা, কর্মের সন্ধান সবই হয়। গোপীদাস এক ফাঁকে নিবেদন করে, 'দাদা, তা হল্যো আর দেরি ক্যানে। তোমারও পেটে কিছু নাই, উদিকে একজন উপবাস দিচ্ছে। চল যাই।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপরে অবধূত বচন, 'যেত্যে ইচ্ছা করে নাই।'

'কিন্তুক যেত্যে হবে।'

'ইবারটো যেইছি চল, কিন্তু মন্দ কিছু বইললে আমি থাইকব নাই।'

'সি আমি দেইখব, তুমি চল।'

গোপীদাস উঠে দাঁড়ায়। আমিও। একটু পরে অবধূতও গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। কারণ-বারির উত্তাল অবস্থা আর নেই। অনেকখানি ঝিমিয়ে গিয়েছে। ঘরের বাইরে এসে মনে মনে বলি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি!...

অবধূতাশ্রমের কাছে এসেই গোপীদাস হাঁক পাড়ে, 'যোগোদিদি, ভাত বাড় গ, দাদার ভাত বাড়।'

আমরা ঘরে ঢুকতেই যোগোমতী মেঝে থেকে উঠে বসে। সে শুয়ে ছিল বোধ হয়। আমাদের সঙ্গে [illegible] দেখে ঘোমটা টেনে দেয়। দিদু, [illegible]

দেখ অবধূতের চেহারা। যে লোককে সাধ্য সাধনা করে ধরে বেঁধে নিয়ে আসতে হয়, এ কি সেই লোকের মুখ! যেন, নতুন মানুষের, কুটুমের সংকোচ। শান্ত মুখখানি নিচু করে থাকে।

যোগো আবার ঘরে আসে। আসন পেতে জল গড়িয়ে, আমাদের মত পাতা পেতেই খেতে দেয়। অবধূত কোন কথা না বলে বসে পড়ে। আমি গোপীদাস একটু দূরে বসি। কেউ কোন কথা বলে না।

কিন্তু ভাতে হাত দিয়েই, অবধূতের চেতন জাগে। যোগোর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে 'তোমার আছে ত?'

যোগোর দৃষ্টি মাটির দিকে। মুখের ভাব শান্ত, নির্বিকার। ভাতের হাঁড়ি, ডালের কড়া, সব এনে বসিয়ে দেয় অবধূতের সামনে। অর্থাৎ, দেখে নাও, আছে কি না-আছে। এর বেশী, কথা খরচ করতে সে নারাজ।

অবধূত প্রায় হুংকার দিয়ে ওঠে, 'জয় ধূমাবতী!' তারপরেই মুখে গরাস পুরে দেয়। মুখে ভাত নিয়েই বলে, 'বুইঝলে গোপীদাস, সাধন কইরতে হল্যো—।'

যোগোমতী অমনি ঘাড় বাঁকিয়ে, গোপীদাসের দিকে তাকায়। গোপীদাস বলে ওঠে, 'পরে হব্যে, খেইয়ে লাও ক্যানে আগ্যে।'

অবধূতও চকিতে একবার যোগোর দিকে দেখে, চুপ করে খেতে থাকে। তার খাওয়া দেখে ভাবতে ইচ্ছা করে, মা ধূমাবতী এত ক্ষুধা কোথায় রেখেছিলেন। আর এই মুহূর্তে, আর একটি কথাও আমার মনে পড়ে যায়। যে-মানুষ আজ এখানে বসে এ ভাবে খাচ্ছে, সেই কার্তিক ঘোষালের ঘরে অন্নের অভাব নেই। সংসারের সেই সুখ ছেড়ে, এ মানুষ, যোগোমতীকে নিয়ে শ্মশানে এসে আশ্রয় করেছে। যখন যেমন জোটে, তখন তেমন খায় পরে।

আমি সাধন ভজন জানি না, বুঝি না। কিন্তু এই যে মানুষ খাচ্ছে, ক্ষুধার তৃপ্তি মুখে ছড়িয়ে পড়ছে, যোগোমতীর দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছে, তাকে দেখে তো একবারও মনে হয় না, একটা উচ্ছৃঙ্খল বাউণ্ডুলে জীবনযাপনের জন্যে সে ঘুরছে।

বিকার? বিকারগ্রস্থ মানুষের আর যা-ই থাক, দুঃখ বহনের শক্তি থাকে না। মনের বিকার নিয়ে সংসারের সুখভোগের মধ্যেই তার দিন চলত ভাল।

কী জানি, শেষ নাহি যার, শেষ কথা কে বলবে। মানুষের শেষ কোথায়, তল কোন গভীরে, কতটুকু জানি। কেবল অবধূতকে দেখে, তার খাওয়া দেখে, সেই মত্ত রুদ্র মানুষটিকে এখন সহসা অন্যরকম লাগে। সংসার ছেড়ে যে শ্মশানে এসেছে। অথচ সংসারের সকল দুঃখের ঢেউয়ে যে মানুষ দোলে, নানা রূপে জাগে। হয়তো সংসারের সুখের চৌহদ্দি ছোট লেগেছিল। শ্মশানের অসীমেই সে বাঁচে।

অবধূতের খাওয়া হয়ে যাবার পর, সেই পাতাতেই যোগো নিজের ভাত বাড়ে। কথাটি না, তাকে সাধাসাধিও করতে হয় না। আমাদের দিকে পিছন ফিরে বসে খেতে থাকে। আর অবধূত হাত ধুয়ে, ঘরে এসেই, একেবারে গলা ছেড়ে গান ধরে দেয়,

'ই সব ক্ষ্যাপা মায়ের খেলা।
যার মায়ায় ত্রিভোবন বিভোলা
মাগীর আপ্তভাবে গুপ্ত লীলা—।'

যোগো মুখ ফিরিয়ে একবার গোপীদাস আর আমার দিকে চায়। কিন্তু এবার ক্রুদ্ধ কোপ কটাক্ষ না। ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক। আর অবধূত যেন ক্ষুধার্ত শিশুটি, পেট ভরতেই গানের গলা খুলে যায়। সে আমাদের কাছে এসে বসে। বলে, 'বুইঝলে হে, আসল জিনিস, তার চেহারা আলাদা। অ্যাই তোমায় মায়ের ভাবের কথা বইলছি।'

বলে আবার গান ধরে,
'সগুণে নির্গুণে বাধায়ে বিবাদ
ঢ্যালা দিয়া ভাইঙছে ঢ্যালা
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজী
নারাজ কেবল কাজের বেলা।'...

যোগো আর একবার মুখ ফিরিয়ে চায়। দেখি তার চোখে মুখে হাসির ছটা। মনে হয়, নতুন রূপে আর এক মানভঞ্জনের পালা দেখি। (ক্রমশ)

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

নজরুল ইসলাম

আবার ২৪শে মে ঘুরে এল। মৌন কবির বাসভবনে উৎসুক জনতার ভিড়। তারা সেই মুখর প্রাণচঞ্চল ব্যক্তিটিকে খুঁজছে—একদা যাঁর কণ্ঠে সঙ্গীত এবং হাস্য পরিহাসের বিরাম ছিল না, যিনি একটা আসর একাই মাতিয়ে রাখতেন নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে। আজ তাঁর দেহে বার্ধক্য পরিস্ফুট, দৃষ্টি শূন্য, উদ্‌ভ্রান্ত, কণ্ঠ অবরুদ্ধ—কেবলমাত্র একটি শরীর-সত্তা বর্তমান। আটষট্টি বৎসরের আজকের এই আকৃতিটিই এক সময়ে ছিল বাংলার যুবশক্তির একটি প্রতীক এবং বাংলার সঙ্গীতের নবজাগরণের প্রধান নায়ক।

নজরুলকে আমরা দেখেছি—আমরা তাঁর সবচেয়ে উজ্জ্বলতম মুহূর্তের সঙ্গে পরিচিত। আমাদের কৈশোর এবং যৌবন নজরুলের গানে, কবিতায় ছেয়ে আছে। মনে পড়ছে আগরতলা থেকে কলকাতায় আসছি, ভরা বর্ষা। চারদিকে, জল, শুধু রেলের রাস্তাটা জেগে আছে। ট্রেন চলেছে আস্তে আস্তে। কুমিল্লা থেকে উঠলেন একটি যুবক। গান ধরলেন—"কে বিদেশী বন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে"। এই গানটি তখন নজরুলকে দেশবিখ্যাত করেছে। কুমিল্লার সঙ্গে নজরুলের অনেক স্মৃতি জড়িত এবং কুমিল্লায় বহু প্রখ্যাত গায়কেরও বাস। মুগ্ধ হয়ে শুনলুম সেই গানটি। আমাদের কালের লোকেরা কোনদিনই ভুলতে পারবেন না এই গানটি—একদা যা তাঁদের মনে স্বপ্নময় আবেশ সৃষ্টি করেছিল। এর পরে কত গান বেরুল, কত গজল, কত দাদ্‌রা, কত রাগপ্রধান কিন্তু নজরুলের প্রথম যুগের গানগুলি যেন মাদকতায় ভরা, বিশেষ করে তাঁর গজলগুলি। বাংলা গানে গজল রচনা করে তিনি একটি নতুন সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে দিয়ে গেছেন। ফারসিতে নজরুলের দখল ছিল। হাফিজ তিনি উত্তমরূপে পড়েছিলেন। সুতরাং ফারসি ঢঙে তাঁর যে সব রচনা, তার একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে। অনেকের ধারণা গজল হালকা রচনা এবং সাহিত্য বা সঙ্গীতের দিক থেকে এর তেমন গুরুত্ব নেই। কিন্তু যাঁরা উর্দু বা ফারসি গজলের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা উপলব্ধি করতে পারবেন এর মাধুর্য। নজরুল এই প্রাণস্পর্শী ধারাকে আমাদের সঙ্গীতে প্রবাহিত করে তাঁর প্রাণশক্তির অপূর্ব পরিচয় প্রদান করেছেন। তাঁর এই ধরণের গানের মধ্যে কতরকম মনোহর কাজ রয়েছে। "বাগিচায় বুলবুলি তুই", "আমারে চোখ ইশারায়", "কেউ ভোলে না কেউ ভোলে", "এ আঁখিজল মোছ পিয়া", "কেন আন ফুলডোর", "রঙমহলের রংমশাল মোরা", "আসল যখন ফুলের ফাগুন", "করুণ কেন অরুণ আঁখি", "ভুলি কেমনে আজও যে মনে", "বসিয়া বিজনে কেন একা মনে", "মুসাফির মোছরে আঁখি জল", "এত জল ও কাজল চোখে" প্রভৃতি গানের বিচিত্র আবেদন বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এই বৈচিত্র্য বাংলা গানে নজরুলের পূর্বে রচিত হয় নি।

নানান ধরণের দাদ্‌রায় নজরুলের কৃতিত্ব কম নয়। "রুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ কে এলে নূপুর পায়", "মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর"—এই দুটি গানের মনোহারিত্ব অতুলনীয়। "কোন কূলে আজ ভিড়ল তরী" এই ঠুংরী দাদ্‌রাটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দিক থেকে অতুলপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর রচনার সাদৃশ্য দেখা যায়।

ফারসি উর্দু ঢঙে সুর করে কাব্যপাঠ যাকে "শেয়র" বলা হয়—সেটিও বোধ হয় নজরুলই প্রথম আমাদের গানে প্রয়োগ করেন। আজ এই সব ধরণ খুব সাধারণ এবং সুপ্রচারিত হয়ে গেছে।

পরবর্তীকালে তিনি নানারকম বিদেশী ঢং তাঁর গানে আনতে চেষ্টা করেছিলেন, "শুকনো পাতার নূপুর পায়ে"—এইরকম একটি চমকপ্রদ রচনা। এর সুর একরকম আরবী সুর থেকে নেওয়া। মরুভূমির ঘূর্ণী হাওয়ার চঞ্চলতা যেন গানটিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

লোকসঙ্গীতের ঢঙে নজরুলের রচনাও কম নয়। বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় তাঁর বাউল ধরণের গানটি "আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল আমার দেউল আমারি এই আপন দেহে"। স্বর্গত শিল্পী ধীরেন দাসের সুমিষ্ট গম্ভীর কণ্ঠে এ গানটি যে কী আবেদন জাগাত তা যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই কেবল উপলব্ধি করতে পারবেন। এই একটি শিল্পী আজ আমাদের স্মরণে পড়ে না। কিন্তু একদা নজরুলের কত দেশাত্মবোধক গান এবং কাব্যসঙ্গীত যে তিনি গ্রামোফোনে গেয়েছেন তা আমাদের স্মৃতিপটে মুদ্রিত আছে। কাজীসাহেবের গানকে অমর করে রাখতে গেলে বিশেষ করে এঁর এবং লোকান্তরিত কে মল্লিক এবং শ্রীমতী ইন্দুবালার কিছু গান লঙ্ প্লেইং রেকর্ডে পুনঃপ্রচার করা একান্ত আবশ্যক বলে মনে হয়। গ্রামোফোন কোম্পানী কি এ অনুরোধ রাখবেন? হয়তো অনেকে বলবেন এঁদের ঢংটা কিছু পুরাতন কিন্তু সব ক্ষেত্রে তা নয়। ধীরেন দাসের অনেক গান এখনো অনায়াসেই সমাদৃত হতে পারে। কে মল্লিকের গাওয়া "করুণ কেন অরুণ আঁখি" বা "মুসাফির মোছরে আঁখি জল" এ যুগেও অচল নয়। শ্রীমতী ইন্দুবালার "রুমুঝুমু রুমুঝুমু কে এলে নূপুর পায়" বা "মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর" কি এখনও চমৎকার নয়? এখনকার স্বরলিপি থেকে তোলা গানে এই সব ঢঙের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না। নজরুলের গান কেমন ছিল সেটা জানতে হলে তাঁর গৌরবের দিনে যে সব গান গ্রামোফোনে বেরিয়েছে সেগুলি শোনা দরকার।

শেষ জীবনে কবি শুদ্ধ রাগসঙ্গীত অবলম্বন করে কিছু বিচিত্র গান রচনা করেছিলেন। সুখের বিষয় এই ধরণের গানের স্বরলিপি অনেকগুলি প্রকাশিত হয়েছে।

নজরুলের দেশাত্মবোধক গানের কথা বলাই বাহুল্য। এ সব গানের যথেষ্ট চর্চা এবং আলোচনা হয়েছে। এর আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা দেখি না।

জরুলের সঙ্গে একদিক দিয়ে প্রলালের সাদৃশ্য আছে। ইনিও ঠিক রণের প্রাণচঞ্চল বলিষ্ঠ কবি। আবার র দিক দিয়ে অতুলপ্রসাদের সঙ্গেও থেষ্ট মিল আছে। সেই লালিত্য র্মস্পর্শী সুরসঞ্চরণও তাঁর গানে াবে বর্তমান। গজল এবং ঠুংরীর উভয়েরই অসাধারণ প্রীতি ছিল। বাংলা গানে আজ যে একটা অতিরিক্ত নমনীয় ভাব দেখা দিয়েছে যা ক্লান্তিকর বললে অত্যুক্তি হয় না তা নজরুলের মধ্যে ছিল না। তাঁর কথাবার্তা, চালচলন, পঠন-পাঠন এবং সঙ্গীত কোনটাতেই নুয়ে পড়া ভাব ছিল না। অথচ কাব্যসঙ্গীতের কোমলতা তাঁর গানে কোথাও ব্যাহত হয় নি। তাঁর সঙ্গীতের এই পুরুষকার আজ আবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

নজরুলের জীবন এবং সাহিত্য নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে,—কিন্তু তাঁর সঙ্গীত প্রতিভা নিয়ে আলোচনা খুবই সামান্য হয়েছে। তাঁর বহু গানের পরিচয় আজও অনেকের জানা নেই। নজরুলগীতি নিয়ে যথাসম্ভব আলোচনার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আজ উপলব্ধি করা আবশ্যক।

কবির সঙ্গে ইয়োরোপে ১৯২৬

॥ ১৪ ॥

নর্থ সী-র আচরণ সম্বন্ধে তখনও কোনো অভিজ্ঞতা হয়নি। কিন্তু মাঝরাত্রে সে কী দারুণ ঝড়! ছোট্ট জাহাজখানা একেবারে অসহায়ভাবে মোচার খোলার মত জলের উপর আছাড় খেতে শুরু করে দিল। এমন অবস্থা যে, বিছানায় শুয়ে থাকা মুশকিল। একেবার গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যাই, আবার উলটো দিকের দেওয়ালে আছড়ে পড়ি।

ক্যাবিনের ঘুলঘুলির দিকে তাকালে একবার দেখি, আমরা জলের নীচে, আবার দেখি আকাশের চাঁদ দেখা যাচ্ছে। সেদিনটা বোধ হয় পূর্ণিমা ছিল, যত দূর মনে পড়ে। কোনো মতে তো রাত্ত কাটল। সকালে সকলের ঘরে গেলাম খোঁজ খবর নিতে। রবীন্দ্রনাথ চিরকালই বলেছেন, তিনি কখনও সমুদ্রপীড়ায় ভোগেন না। আমার স্বামীরও অভিজ্ঞতা সেই রকম। সেদিন দেখি দুজনেরই মুখ শুকিয়েছে।

জোর করে উঠে খাবার ঘরে যাওয়া হল প্রাতরাশ খেতে। কিন্তু খাবে কী করে? এক ধাক্কায় সমস্ত বাসনপত্র মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে খান খান হয়ে গেল। কবি বললেন : চল, উপরে উঠে ডেক-এ গিয়ে বসি। উপরে খোলা ছাদে পরিষ্কার বাতাসে তবু একটু আরাম।

একটা ডেক চেয়ারে এনে রবীন্দ্রনাথকে তাইতে বসান গেল। দুখানা কাঠের বেঞ্চি পাতা। ইচ্ছে হলে আমরা সকলে বসতে পারি। আমার স্বামী বললেন : ঘুরে বেড়াতে তাঁর বেশী ভাল লাগছে।

আমার যদিও মোটেই গা বমি করছিল না; কিন্তু ঘুরে বেড়াতে গেলে জাহাজের ঝাঁকুনীর সংগে যে-রকম লড়াই করে নিজেকে খাড়া রাখতে হয়, তাতে প্রতি মুহূর্তেই অস্বস্তি। তার চেয়ে বসে থাকা ঢের সহজ। আমার এবং লর্ড সিংহের শারীরিক অস্বস্তি কিছুই হয়নি; কিন্তু চলা ফেরা করা বেজায় পরিশ্রম বলে আমরা কবির কাছে কাঠের বেঞ্চিতে বসে রইলাম।

আমার স্বামী জোর ক'রে দু চার পা চলেই জলের উপরে মুখ বাড়িয়ে : ওয়াক।

কবি বললেন : প্রশান্ত, এসে বোস না কেন?

—না, না, আমার ওটা কিছু নয়। যেমন কাসি এলে কেসে নিলেই সেটা কেটে যায়, সেই রকম আর কি।

এই কথা বলা শেষ হতে না হতেই আবার : ওয়াক।

আমি তো একেবারে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠেছি। কারণ গোড়া থেকেই ও'কে বসতে বলেছি, কিন্তু কিছুতেই কথা মানেন নি। ভাবখানা এই যে, রানী যখন ঠিক আছে তখন আমিই বা কেন কাবু হব? কিন্তু শরীরের সংগে তো জবরদস্তি চলে না। কারো ধাতই এমন যে গা বমি করে না, কারো করে। এতে লজ্জারও কিছু নেই বাহাদুরীরও কিছু নেই। কাজেই আমি চুপ করে বসেছিলাম পরিণামটা দেখবার জন্য। ঐ রকম দু-তিনবার ওয়াক করা দেখে যা হেসে থাকা যায়?

কবি নিজে কষ্ট পাচ্ছিলেন, তাই আমার হাসিতে বেজায় রেগে গেলেন : তুমি হাসছ? তোমার লজ্জা করছে না হাসতে? জানো, ও কী রকম কষ্ট পাচ্ছে? ধরে নিয়ে এসে কোথায় বসাবে, না উনি হাসছেন! নিষ্ঠুর মেয়ে। প্রশান্ত, শীগগির এসে বসো। আর দাঁড়িয়ে থেকো না, ওতে আরো কষ্ট।

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

এবার অধ্যাপক অপ্রস্তুত মুখে গুটি গুটি এসে বেঞ্চিতে বসলেন। কবি আমার দিকে চেয়ে ঝেঁকে বললেন : ওঠ, ওকে ভাল করে বসতে জায়গা দাও।

আমি কিন্তু তখনও হাসছি। কবির রাগ দেখে আমার আরো বেশী হাসি পেয়েছে। একটু পরেই রুগীরা আস্তে আস্তে উঠে, ছোট মইসিঁড়ি বেয়ে নেমে নিজের নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিলেন। মিঃ লাল তো মোটে সকালে বিছানা ছেড়ে ওঠেনই নি।

লর্ড সিংহ আর আমি এই দুটি মাত্র যাত্রী শুধু খাড়া আছি। উপরের ছাদ থেকে

নীচে নামবার সময় সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সমূদ্রের এক ঝাপটায় উপরের ধাপ থেকে সিঁড়ির নীচের ধাপে এসে বসে পড়লেন। আমি ছুটে গেলাম, কোথাও লাগল কিনা দেখতে।

হেসে বললেন : লাগেনি। ভয় পেও না। শুধু ঝাঁকিয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু তুমি মেয়ে তো বড় কম নয়। এততেও তোমার কিছু হচ্ছে না? আশ্চর্য! আমি চিরকালই সমুদ্র সইতে পারি, কিন্তু তোমাকে দেখে অবাক হচ্ছি।

কবির ঘরে গিয়ে বললেন : দেখুন রবিবাবু, এই বাঙালী মেয়েকে দেখে গর্ব হচ্ছে। এই ঝড়েও ওর কিছু করতে পারল না? ওকে তো যুদ্ধে পাঠিয়ে দেওয়া চলে।

কবি হেসে বললেন : শান্তিনিকেতনে ওর নাগরদোলা চড়া তো দেখেন নি। এক সংগে দেড় দু ঘণ্টা ঘুরলেও ওর কিছু হয় না। সাতুই পৌষের মেলায় উনি যান বোধ হয় নাগরদোলায় চড়তেই। সেই জন্য তাদের ওঁকে খুব পছন্দ।

আমি হাসতে লাগলাম। সারাদিন আমি আর লর্ড সিংহই সকলের ঘরে ঘরে গিয়ে তত্ত্বতল্লাশ করে বেড়ালাম।

কবির বিছানায় শুয়েও অন্যের জন্য

উদ্বেগের বিরাম নেই। ক্ষণে ক্ষণে প্রশ্ন : দেখে এস লালের' কী দশা। প্রশান্ত কিছু খেয়েছে কি?

আমি বললাম : আপনার খাবার কী হবে? সকাল থেকে যে প্রায় উপোসে রয়েছেন।

—আঃ, জ্বালিও না। শরীরের এই কষ্টে কি খাবার কথা মনে আসে? সারাক্ষণ এইরকম ঝাঁকুনীর চোটে আমার বুকের মধ্যে কেমন করছে। আমি জাপানে যেতে টাইফুনের মধ্যেও পড়েছি, কিন্তু কোনোদিন আমার কিছু হয়নি। এই প্রথম আমি এই রকম কষ্ট পাচ্ছি। কোনো মতে অসলো পৌঁছতে পারলে বাঁচি।

সন্ধ্যে ছটার সময় কার্ড দিয়ে কাপ্তেনের কাছে খবর নিয়ে জানলেন, রাত আটটার সময় বোধ হয় আমরা এই অশান্তির হাত থেকে মুক্তি পাব, জাহাজ সমুদ্র পেরিয়ে ফিয়োর্ডে পৌঁছবে। এই কথা শুনে অবধি, কবি ক্রমাগত ঘড়ি দেখতে লাগলেন। আটটা পার হয়ে গেল, ন'টা পেরিয়ে প্রায় দশটায় পৌঁছতে যায় তবু ঝাঁকুনী থামে না। বিরক্ত হয়ে আমাকে বললেন : কাপ্তেন এরকম বাজে কথা বলে কেন? কোথায় আটটায় শান্তি হবে এই তাণ্ডব লীলা; দশটা বাজতে চলল কিন্তু এখনও তার কোনো চিহ্ন নেই।

আমি চেয়ে দেখি ও'র মুখ একেবারে কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে। এ রকম ফ্যাকাশে চেহারা আমি কখনো কবির দেখিনি, বললাম : প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আপনি কিছু খাননি। এবারে কিন্তু না খেলে চলবে না। আমি আপনাকে খাইয়ে তারপর শুতে যাব। আশা করা যাক, আর বেশীক্ষণ কষ্ট পেতে হবে না।

কবি বললেন : কী খাওয়াবে? আমি কিন্তু জলীয় কিছু খেতে পারব না; খুব সহজে যা খেতে পারব, এমন কিছু ভাব।

শরীরে তো কিছু শক্তি চাই, কী দেওয়া যায়? হঠাৎ মনে পড়ল, সঙ্গে স্যানাটোজেনের বোতল আছে। ওটা বরাবরই কবির সাথের সাথী, খেতে আপত্তি হবে না। বললাম : বিনা জলে তো স্যানাটোজেন গিলতে পারবেন না। একটা কাজ করুন। কলা দিয়ে স্যানাটোজেন মেখে দিই, তাই একটু একটু ক'রে খেয়ে ফেলুন। পেটেও কিছু পড়বে আর হয়ত গা কেমন করবে না।

এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। অনবরত অনুরোধ ক'রে ক'রে প্রায় জোর ক'রেই বড় একটা কলা আর বড় চামচের দু চামচ স্যানাটোজেন চিনি দিয়ে মেখে খাইয়ে দিয়ে মন নিশ্চিন্ত হল। কারণ, খাওয়ার দরুন কোনো রকম অস্বস্তি থাকল না।

মাঝ রাত্রে কখন সমুদ্র শান্ত হয়ে গেছে, আঃ, সে কী আরাম। সকালে বাইরে চেয়ে দেখি, শান্ত ফিয়োর্ডের মধ্য দিয়ে জাহাজ চলেছে। সকলেরই মুখে হাসি। আমরা জাহাজ

জাহাজের জন্য যাত্রীদেরও সেইদিনই প্রথম ঘরের বাইরে দেখা গেল। সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে জাহাজ থেকে ডাঙায় নামবার জন্য।

অসলো বন্দরে পৌঁছে দেখি, অনেক লোক কবিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য উপস্থিত। তাঁদের অগ্রণী হয়ে প্রফেসর স্টেন কোনো। মুখে আনন্দের হাসি এবং হাতে একখানা খবরের কাগজ। তাঁরা কবির জন্য উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় এই গত দুদিন কাটিয়েছেন। কারণ, যেদিন আমরা রওনা হয়েছিলাম, সেইদিনই রাত থেকে ইংলণ্ডে দারুণ ঝড় বয়ে গেছে। কত বাড়ি ধ্বংস হয়েছে, কত লোক মরেছে, সেই সব খবর ও'রা কাগজে পেয়েছেন। ঝড়টা নর্থসী-র উপর দিয়েই গিয়েছে, তাই ও'দের এত উদ্বেগ। কারণ, জানেন আমরা ছোট্ট জাহাজে আসছি এবং ফিয়োর্ডে পৌঁছবার আগে এই জাহাজের কোনো হদিস পাওয়া যায়নি।

সেই সময়ে বাড়িতে চিঠি লিখেছি :

Fred Olsens Liner
Oslo
S.S. 'Bessheim'
on way to Oslo
23rd August, 1926

শ্রীচরণেষু,

জ্যাঠাইমা,

পরশু দিন নিউ কাস্‌ল্‌ থেকে জাহাজে চড়ে নরওয়ে অভিমুখে চলেছি। পরশু সকাল সাড়ে ন'টায় লণ্ডন থেকে ট্রেনে চড়ে নিউ কাস্‌ল্‌ রওনা হয়ে বিকেল বেলা সেখানে পৌঁছেই জাহাজে উঠেছিলাম এবং পাঁচটায় জাহাজ ছেড়েছিল।

আজ এখন বেলা সাড়ে দশটা, এখনও অসলো পৌঁছইনি। দূর থেকে শহরটা দেখা যাচ্ছে। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাব।

জাহাজে বসে কালই চিঠি লিখবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু নর্থ সী এমন ভীষণ কাণ্ড

কল্পনা যে কোনো কিছু কাজ করা একেবারে অসম্ভব। আজ সমুদ্র পেরিয়ে এসে জাহাজ শান্ত হয়েছে। তাই তাড়াতাড়ি কয়েক লাইন আপনাকে লিখে নিচ্ছি। লেখা দেখেই বোধ হয় বুঝতে পারবেন, কত কষ্ট ক'রে লিখছি।

আমরা দুজন, কবি, লর্ড সিংহ এবং মিঃ লাল (শ্রীনিকেতনের কর্মী) এই কয়জন চলেছি। প্রতিমাদিরা এলেন না, জার্মানীতে আসবেন। লর্ড সিংহ কবির সঙ্গে বেড়াতে চান বলে এসেছেন; সমস্ত জার্মানীটাও এক সঙ্গে ঘুরবেন।

কাল অসম্ভব কষ্ট গিয়েছে সকলের। কবি যে কখনও Sick হন না;—তিনিও সারাদিন কিছু খেতে পারেন নি বা মাথা তুলতে পারেননি। আমি কিন্তু বমি করিনি। আপনাদের ছেলে খুব কাবু হয়েছিলেন। লর্ড সিংহ কিন্তু খুব ভাল ছিলেন। আমিও ঘুরে টুরে বেড়াচ্ছিলাম, যদিও সারাক্ষণই একটু অস্বস্তি লাগছিল। কবি বলছিলেন : আমার জীবনে কখনো এত কষ্ট হয়নি।

পরশু মাঝরাত থেকেই অসম্ভব ঝড় আরম্ভ হয়েছিল, আর কাল মাঝরাতে থেমেছে। জাহাজের ক্যাপ্টেন বলছিলেন : অনেকদিন পরে এ রকম কান্ড হল। আমি অনেক বছর ধরে এই পথে যাতায়াত করছি, কিন্তু এরকম বিশ্রী অশান্ত সমুদ্র বহু দিন দেখিনি।

প্রায় পৌঁছেছি। এবার চিঠি বন্ধ করি। এদিককার দৃশ্য অতি অপূর্ব সুন্দর, পাহাড় ও সমুদ্র এক সঙ্গে। এখন অসলো'র ফিয়োর্ডের মধ্য দিয়ে চলেছি।

প্রফেসর স্টেন কোনো শান্তিনিকেতনে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে প্রায় এক বছরের কাছাকাছি সেখানে সস্ত্রীক বাস করে এসেছিলেন। তাঁর আগ্রহেই কবি অসলো এসেছেন। কিন্তু তাঁর বাড়িটাতে আমাদের সকলকে রাখবার মত জায়গা নেই। তাছাড়া সেটা একেবারে শহরের মধ্যে।

আমাদের দুজনকে এবং কবিকে তাঁদের একজন বিশেষ ধনী বন্ধুর বাড়িতে রাখবার ব্যবস্থা করে মিঃ লালকে নিজের বাড়িতে নিলেন এবং লর্ড সিংহর হোটেলে জায়গা হল। তিনি থাকবেন সারাদিন কবির সঙ্গেই, শুধু শুতে যেতে হবে অন্যত্র।

যাঁদের বাড়িতে আমরা গেলাম,—মিঃ ভালা হান্‌সন,—নরওয়ের একজন ধনী ব্যবসাদার। বাড়িখানা শহরের একটু বাইরে পাহাড়ের চূড়ার উপরে। বাগান এবং ঘরের জানলা দিয়ে ফিয়োর্ড, তার গায়ে পাহাড় এবং দিগন্ত প্রসারিত নীল আকাশ নজরে পড়ে। কবির ঘরখানার প্রায় চারদিকেই জানলা। কোথাও আলো এবং দৃষ্টির বাধা নেই। বাড়িটা রবীন্দ্রনাথকে রাখবার মতই জায়গা বটে।

ছোট পরিবার। গৃহস্বামী, তাঁর পত্নী হিলডা আর একটি ছেলে ও দুটি মেয়ে। সন্তানরা নিতান্তই শিশু নয়। কাজেই বাড়িতে কান্নাকাটি গোলমাল কিছু নেই। গৃহিণী অতি-বুদ্ধিমতী মেয়ে। জানেন কী ক'রে অতিথিকে সত্যিই আরামে রাখা যায়। অর্থাৎ আতিশয্য কিছু নেই। না ব্যবহারে, না কথায় অথচ সর্বদা সজাগ দৃষ্টি, যাতে কোনো অভাব না ঘটে।

রবীন্দ্রনাথের বরাবরই অত্যন্ত ভোরে ওঠা অভ্যাস এবং পাঁচটা কি ছ'টার মধ্যেই ব্রেকফাস্ট পেলে ভাল হয়। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায়, দেখি তারা রাতকে দিন এবং দিনকে রাত করতেই ভালবাসে। ছ'টার সময় ব্রেক ফাস্ট খাবার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

আমরা প্রথম দিন মিঃ ভালা হানসনের বাড়িতে গিয়ে ঘরে গুছিয়ে বসবার পর গৃহকর্ত্রী আমার সঙ্গে গল্পচ্ছলে জেনে নিলেন,—রবীন্দ্রনাথ কখন ওঠেন, কখন শুতে যান সকালে প্রথম খাবারটা কখন খান, কী কী খাওয়া অভ্যাস ইত্যাদি।

আমি বললাম : ও'র আর কোনো বিষয়েই মুশকিল নেই; খাবারে কোনো বাছ বিচার নেই। শুধু একটা মুশকিল ভোরে ওঠায়, সকলের খাওয়াটা ছ'টার মধ্যে হলেই ভাল হয়। সে সময়, আমরা তিনজনেই কবির ঘরে বসে একত্রে খাই।

হিলডা বললেন : তাতে কোনো অসুবিধা হবে না।' তোমাদের সকলের খাবার ঘরেই ভোরবেলা দিয়ে যাবে। শুধু আমরা একটু দেরীতে উঠি বলে আলাদা খাব,—তাতে, তোমরা কিছু মনে ক'রো না। ন'টার আগে আমাদের ব্রেকফাস্ট শুরু হয় না।

কবি শুনে খুব খুশী যে, এক সঙ্গে না খেয়ে আমরা তিনজনে নিরিবিলি ভোর বেলাতেই খেতে পাব, সেজন্য কোনো অসুবিধা হবে না।

বাড়ির চাকর বাকররা কখনও এত ভোরে উঠে কাজে লাগে না। কিন্তু মিঃ ভালা হানসনের তো টাকার অভাব নেই। গৃহিণী বিশেষ ক'রে ভোরে এসে আমাদের খেতে দেবার জন্যে একজন আলাদা মেয়েকে [illegible] করলেন। তার কাজ হবে ভোরে [illegible] আমাদের খেতে দিয়েই চলে যাওয়া।

কবির এই ভোরে ওঠা নিয়ে [illegible] ঘটনা মনে পড়ল। কবির [illegible] হচ্ছে, আকাশের আলোর দিকে [illegible]

শ্রীমতী নির্মলকুমারীর সঙ্গে অসলোতে রবীন্দ্রনাথের আতিথ্যদাত্রী মিসেস হিলডা ভালা হানসন তাঁদের বাড়ির বাগানে

বিছানা থেকে উঠে পড়া। সূর্যোদয়ের আগে পর্যন্ত চুপ ক'রে নিজের মনে পূব দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকতেন। তারপর সূর্য ওঠা দেখে চা খেতে আসতেন।

ঘরের পর্দা টেনে রাত্রে ঘর অন্ধকার করে দেওয়া এই কারণে বারণ ছিল। অন্ধকার মোটে পছন্দ নয়। কিন্তু য়ুরোপে তো গ্রীষ্মকালে রাত তিনটেতে কোনো কোনো জায়গায় সূর্য উঠে যায়; ঘর অন্ধকার না করলে তো তার পরে ঘুমোনোই যায় না। কিন্তু এসব যুক্তির কোনো মূল্য ছিল না রবীন্দ্রনাথের কাছে।

কবি নিজে ভোরবেলা স্নান করতেন না। লাঞ্চের আগে তাঁর স্নানের নিয়ম। আমরা দুজন কিন্তু যত ভোরেই হোক না কেন, বিছানা ছেড়ে উঠেই প্রথমেই স্নান সেরে নিয়ে সারা দিনের মত নিশ্চিন্ত হয়ে যাই। কাজেই কবির সংগে পাঁচটায় কি ছ'টায় খেতে বসলে তার অনেক আগেই উঠতে হয়, নিজেদের তৈরী হবার জন্য।

একদিন গভীর ঘুমের মধ্যে হঠাৎ দরজায় খুব ধাক্কা এবং কবির গলা : তোমরা কি আজ ঘুম থেকে উঠবে না? বেলা যে দুপুর হয়ে গেছে তা কি জান?

আমাদের ঘর পর্দা টানা অন্ধকার। ধড়মড় ক'রে বিছানা থেকে উঠে পড়েছি। কোনো দিন তো উনি ডেকে তোলেন না! আজ কি এতই ঘুমিয়েছি আমরা যে কবি নিজে ডাকতে এসেছেন? খুব লজ্জিত হ'য়ে ঘরের বাতিটা জ্বালিয়ে ঘড়িতে দেখি, তখন রাত তিনটে বেজেছে। আগের দিন একটা ভোজসভা থেকে বাড়ি ফিরে শুতে শুতে প্রায় রাত একটা হয়ে গিয়েছিল। মাত্র দু ঘণ্টা ঘুমিয়েছি। দরজার এদিক থেকে খুব চেঁচিয়ে বললাম : আপনি কি আমাদের পাগল ক'রে দেবেন? দু ঘণ্টা ঘুমিয়ে আমরা বাঁচব কেমন ক'রে? এখন ক'টা বেজেছে জানেন? ঘরে গিয়ে ঘড়িতে দেখবেন, এখন সবে তিনটে।

কবি খুব অপ্রস্তুত হয়ে বললেন : সত্যি বলছ? ঘর যে রোদে ভেসে যাচ্ছে। সূর্য প্রায় মাথার উপর এসেছে। আচ্ছা, আচ্ছা, আর একটু ঘুমিয়ে নাও।

কবি ব'লে চলে গেলেন। আমরা দুজনে খুব হাসলাম। কিছুতেই ঘর অন্ধকার করতে দেবেন না আর, ঘড়ির দিকেও তাকাবেন না।

সেদিন সকালে যখন খেতে গেলাম, হাসতে হাসতে বললেন : তোমরা সত্যিই আজ খুব লজ্জা দিয়েছ আমাকে। বাবা, ভদ্রমহিলার কী বকুনি। আমি কি জানি তিনটে? কখন থেকে চেয়ে আছি, এই বারে তোমরা আসবে বলে। দেখি কিছুতেই আর আসে না, দেখতেও পাই না। এদিকে সূর্য প্রায় দুপুরের মত মাথার উপরে চড়ে গেছে। ভাবলুম, আর অপেক্ষা না করে এইবার ডাক দেওয়া যাক। তা না হলে আজ যে আজ

ভালা হানসনের লাইব্রেরীতে রবীন্দ্রনাথ

ভাঙছেই না, তাই গিয়ে তোমাদের দরজা ধাক্কালুম। সত্যি, আজ আকাশ আমাকে বেজায় ঠকিয়েছে। ও'র তাড়া খেয়ে ঘরে এসে প্রথম ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি সত্যিই মোটে তিনটে। তোমরা তো জান, আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সকালে উঠিনে। আলো উঠবার আগে আমার আপনিই ঘুম ভেঙে যায়। আজও তাই হল। এবার থেকে আর কখনও এ কাজ করব না। তোমাদের ডাকাডাকি না ক'রে চুপ করে বসে থাকব, যখন আসে আসুক।

তিনজনেই সেদিন এই নিয়ে খুব হেসেছিলাম। আমি বললাম : এবার থেকে আপনার ঘরের পর্দা টেনে দেব রাত্রে, নইলে নরওয়েতে তো গ্রীষ্মকালে সূর্য ডোবে না; তাহলে কি আপনি মোটেই বিছানায় যাবেন না?

—ঐ কাজটি কখনও ক'রো না। অন্ধকার ঘর আমি সহ্য করতে পারি না। আমি প্রতিদিন আমার আকাশের মিতাকে দেখব বলে অপেক্ষা ক'রে থাকি। সেইজন্যেই চিরকাল এত ভোরে ওঠা স্বভাব হয়ে গেছে। এই বয়সে সেটা তোমরা বদলাবে কী ক'রে বল?

অসলোতে কয়েকটা দিন খুব আরামেই কাটল। শহরের আশেপাশে মোটরে খানিকটা ঘোরাফেরা করলেও মফঃস্বলে আর কোথাও যাওয়া হয়নি। যেদিনই বিকেলটা ফাঁক থাকত সেইদিনই হিলডা তাঁদের গাড়ি ক'রে কবিকে এবং আমাদের নিয়ে দূরে কোথাও বেড়িয়ে আনতেন। (ক্রমশ)

লক্ষ্মীর কৃপালাভ ঃ বাঙালীর সাধনা

চর্মশিল্প ও বিবিধ

আমরা বাঙালীরা ইয়োরোপের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে বহুকাল ধরে ইয়োরোপীয় ধাঁচে অসংখ্য জীবনচরিত প্রণয়ন করে এসেছি। কিন্তু ইয়োরোপীয় জীবনীকারের ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং স্বচ্ছ দৃষ্টি আমাদের মধ্যে না থাকাতে কোনো কোনো ক্ষমতাশালী আদর্শবাদীর জীবন-চরিতেও আমাদের জীবনীকার অনেক ক্ষেত্রে মস্ত ফাঁক রেখে গেছেন। সমাজের ও জাতির চোখের সামনে তুলে ধরবার মতো অনেক জীবনচরিত আবার অলিখিতও থেকে গেছে। এমন উদাহরণও আছে যে, মহৎ ব্যক্তিবিশেষের আত্মপ্রচারে অনীহার জন্যেও জীবনীকার বিপদে পড়েছেন। বড়োলোকটি কোনো মতেই নিজেকে জাহির করতে চান নি বলে স্বজনবন্ধুকেও নিজের কাজকর্ম সম্বন্ধে কিছু জানতে না দেবারই চেষ্টা করেছেন। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর পরে গুছিয়ে কেউ সবটা বলতে পারেন নি। আর আমাদের জীবনচরিত-প্রণেতারও অবকাশ থাকে নি যে, চিঠিপত্র গল্পগুজবের আবর্জনা ঘেঁটে চরিত্রটিকে যথাযথ রূপদান করবেন। (এই কাজটি ইয়োরোপীয় জীবনীকার কিন্তু বহু ক্লেশে সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করে থাকেন।)

তাই বোধ হয় সমারোহ করে জন্মশত-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হওয়া সত্ত্বেও নীরব কর্মী ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারের প্রকৃত জীবনালেখ্যটি লিপিবদ্ধ করা হয় নি।

চব্বিশ পরগনার নেতড়া গ্রামের ক্ষুদ্র ভূস্বামী নন্দলাল সরকারের দ্বিতীয় পুত্র নীলরতন (১৮৬১—১৯৪৩) কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়ে মানুষ হয়েছিলেন। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে এল-এম-এফ পাস করে নীলরতনের মেডিক্যাল কলেজে ঢোকা এবং সেখান থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এম-বি ও -এম-ডি পাস করার পর্ব আমাদের জানা আছে। উত্তরকালে লর্ড কারমাইকেলের পৃষ্ঠপোষকতায় ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর এবং ডাক্তার সুরেশ সর্বাধিকারীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে কারমাইকেল মেডিক্যাল স্কুল ও হাসপাতালের (অধুনা আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ) স্থাপনা করা কিংবা ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের (অধুনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) স্থাপনা ও অর্থসাহায্য করা—স্যার নীলরতনের এই সব জনকল্যাণমূলক কীর্তির বিবরণ আমরা অনেকেই জানি।

কিন্তু বাংলা দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের স্থাপনা ও উন্নয়নের জন্যে নীলরতন নীরবে কত কাজ করে গেছেন তার খবর আমরা ক'জন রাখি? নীলরতনের অন্তরঙ্গ সুহৃদ আচার্য রায়ও তাঁর আত্মচরিত (১৯৩২-এ প্রকাশিত) বন্ধুর জীবনের এই দিকটার কোনো খবর যোগান নি। কেন, তা জানি না।

স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র এবং নীলরতনের জামাতা শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সেদিন আলোচনার আগে পর্যন্ত আমি জানতাম না যে, এই শতকের একেবারে গোড়ায় স্যার নীলরতন সরকার জলপাইগুড়ি অঞ্চলের সাবদা, চাঁদমণি, কমলা প্রভৃতি নাম-করা কয়েকটি চা-বাগিচার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মানে, বলতে গেলে বাঙালী চা-করদের তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। জানতাম না যে, শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে অণ্ডালের উখড়া অঞ্চলের কয়েকটি কয়লার খনির খননকার্য থেকে শুরু করে সেই খনির কয়লা রীতিমতো বাজার চালু করিয়েছিলেন। তাঁর প্রিয়শিষ্য শিশুসাহিত্যিক ভ্রাতা যোগীন্দ্রনাথ এবং বন্ধু শশীভূষণ বসু ও সত্যানন্দ বসুর সহযোগিতায় 'ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' করে শিবিড়ির বারগণ্ডা অঞ্চলটিকে নীলরতনই যে স্বাস্থ্যনিবাস হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন তা আমাদের অনেকের অজানা। আর আমি এ-ও জানতাম না যে, তাঁর ৬১ নং হ্যারিসন রোডের বসতবাড়িতে ওয়ার্কশপ খুলে তিনি মেশিন তৈরীর কাজেও লিপ্ত ছিলেন। ধন্বন্তরী নীলরতন যে এইভাবে তাঁর স্বোপার্জিত লক্ষ লক্ষ টাকা ঢেলেছিলেন তা, খালি আমার কেন, খুব কম লোকেরই জানা ছিল।

আমি শুধু জানতাম যে, নীলরতন বেঙ্গল কেমিক্যালের ভ্রূণ অবস্থা থেকে বরাবর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে সাহায্য করে-ছিলেন; আর জানতাম যে, তিনি ন্যাশানাল ট্যানারির স্বত্বাধিকারী এবং অধুনালুপ্ত ন্যাশানাল সোপ ফ্যাক্টরির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এটাও জানতাম যে, জগদীপতি স্বর্গত প্রবোধচন্দ্র মহলানবিশের (অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্রের পিতা) সঙ্গে অংশীদার হয়ে স্যার নীলরতন 'কার অ্যান্ড মহলানবিশ' নামে চৌরঙ্গীতে খেলার সরঞ্জাম ও গ্রামোফোনের বিরাট একটা দোকান করে-ছিলেন।

এসবের বাইরে আরও একটা দিক আমরা জানতাম। নীলরতন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সেজুতি'

কাব্যগ্রন্থটি নীলরতনকে উৎসর্গ করেছিলেন।

এই প্রবন্ধে স্যার নীলরতন সম্বন্ধে এর বেশী আর কতটুকু লিখতে পারবো! কতটা শক্তি থাকলে একজন লোক এই বিশাল দেশের চিকিৎসক-শিরোমণিত্বের তুমুল ব্যস্ততা সত্ত্বেও সময় করে দেশের হিতের জন্যে বহুমুখী শিল্পোদ্যোগে এমনভাবে প্রবৃত্ত হতে পারেন তার আনুপূর্বিক দুর্দান্ত কোনো বলিষ্ঠ লেখনী লিপিবদ্ধ করুক, এইটাই আমরা চাইবো; ইতিহাসও তাই দাবী করে।

সারা ভারতের অভিজাত মহলে চিকিৎসাবৃত্তি করে স্যার নীলরতনের উপার্জনের কোনো ঠিকঠিকানা ছিল না। সেই উপার্জনের অধিকাংশ তিনি শিল্প ও বাণিজ্যে নিয়োগ করতেন। ট্যাক্সের গুরুভার-মুক্ত যুগে তিনি যা উপার্জন করতেন তা দিয়ে তিনি তালুকদারকে কিনে ফেলতে পারতেন।

এক কথা বারবার বলার মানে হলো যে, নীলরতনের এই শিল্পোদ্যোগ ছিল বাঙালীকে জাগিয়ে তোলার, উদ্বুদ্ধ করার সাধনা—মুনাফা-লোলুপতা নয়।

এই শতকের আরম্ভে নীলরতন কী

যেন একটা কাজে একবার মাদ্রাজের দিকে গিয়েছিলেন। তিনি দেখলেন যে, সেখানকার চর্মশিল্পের কেন্দ্র থেকে বছরে ১৪।১৫ কোটি টাকার কাঁচা চামড়া বিলেতে রপ্তানি হয়, আর দেশের মুচীরা ভালো চামড়া পায় না। দেশে ফিরে তিনি কলকাতায় একটা ট্যানারি গড়ে তোলবার সংকল্প করে ফেললেন।

কলকাতার পূর্ব উপকণ্ঠের তিলজলা, তোপসিয়া, ট্যাংরা প্রভৃতি অঞ্চল আজকের মতো সেকালেও ছোট বড়ো চামড়া ট্যানিং কারখানার কেন্দ্র ছিল। তিলজলার ন্যাশান্যাল ট্যানারি প্রতিষ্ঠানটির মালিক ছিলেন হরেকিষণ নামে এক পাঞ্জাবী। ব্যক্তিগত কারণে হরেকিষণজী নাকি সেই ট্যানারিটি বিক্রি করে দেশে ফেরবার উপক্রম করছিলেন। ডাক্তার সরকার খবর পেয়ে সেটি কিনে নিলেন। প্রথম থেকেই অনেক টাকা তিনি এতে ঢাললেন। ন্যাশান্যাল সোপ ফ্যাক্টরিও (পরবর্তী কালের ন্যাসকো-র সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ ছিল না) সমসাময়িক।

বছর তিনেক পরে ডাক্তার সরকার তিলজলার কিছু দূরে পাগলাডাঙ্গায় বিঘা পঁচিশেক জমি কিনে ট্যানারিটা উঠিয়ে নিয়ে গেলেন।

ট্যানিং-এর সংজ্ঞা হলো চামড়াকে কাঁচা পচনশীল অবস্থা থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পাকাই করা। সোজা কথায়, ট্যানারি হলো মুচীর কারবার। তায় আবার ছাগল ভেড়া ছাড়াও গরু মহিষের চামড়া নিয়ে ব্যাপার। ভদ্র বাঙালী সে কাজে নামার কথা সেকালে ভাবতেই পারতো না। কিন্তু কয়েক বছর পরে ডাক্তার সরকারের সঙ্গে আরও দুজন বাঙালী সক্রিয়ভাবে এতে যোগ দিলেন। তাদের নাম সুরেন্দ্রনাথ রায় ও রায়বাহাদুর বিরাজমোহন দাস। নীলরতনের মূলধন, সুরেন রায়ের পরিশ্রম এবং বিরাজমোহনের ট্যানিং-এর জ্ঞান, এই তিনে মিলে ন্যাশান্যাল-কে উন্নতির পথে নিয়ে চললো। বিরাজমোহন ছিলেন ভারতের প্রথম বিদেশী ডিগ্রীধারী লেদার টেকনোলজিস্ট। তিনি ১৯১৪ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত ন্যাশান্যাল ট্যানারিতে ছিলেন। তারপরে যখন স্যার নীলরতনের উদ্যোগেই কলকাতায় সরকারী 'বেংগল ট্যানিং ইন্সটিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হলো তখন নীলরতনই চেষ্টা করে বিরাজমোহনকে সেই শিক্ষায়তনটিকে দাঁড় করাবার জন্যে নিযুক্ত করালেন। ১৯৫৩ সালে বিরাজ-মোহন মাদ্রাজে অবস্থিত 'সেন্ট্রাল লেদার রিসার্চ ইন্সটিটিউটের' প্রথম ডিরেক্টর নিযুক্ত হয়েছিলেন। বর্তমানে ভারতে যে সব বিখ্যাত ট্যানিং-বিশারদ আছেন তাঁরা অধিকাংশই নাকি বাঙালী এবং অনেকেই বিরাজমোহনের শিষ্য। আর পরবর্তী কালে নীলরতনের জামাতা সুধীরকুমার সেন যখন ন্যাশান্যাল ট্যানারির ভার নিলেন, তখন বিরাজমোহনের পরামর্শেই সুধীর সেন মশায়ের ছোট ছেলে সঞ্জয় সেন (কোম্পানীর বর্তমান চেয়ারম্যান) আমেরিকায় গিয়ে চর্মশিল্পে বিশেষজ্ঞ হয়ে এসেছিলেন।

কিছুকাল পরে কিন্তু ন্যাশান্যালের ব্যবসাতে ভাটা পড়তে শুরু করলো। চামড়ার বাজারে মন্দা এলো। তাই ১৯২৯ সালে নীলরতন আর একজন বিখ্যাত বাঙালী, মার্টিন কোম্পানীর স্যার রাজেন মুখার্জিকে ট্যানারিটির ভার নিতে অনুরোধ করলেন। মার্টিন কোম্পানী পরিচালনার ভার নিতে রাজী হলো। নিজের কয়েক লক্ষ টাকা এতে আটকে থাকা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাবার জন্যে ডাঃ সরকার এই ব্যবস্থা করেছিলেন। নীলরতনের কন্যা

শ্রীমতী মীরা সেন আমাকে বললেন যে, এই সব বিরাট লোকসানেও নীলরতন কখনো বিচলিত হন নি। 'টাকাটা দেশের সেবায় গেল', এই-ই তিনি ধরে নিতেন।

উনিশ বছর চালাবার পর ১৯৩৮।৩৯ সালে মার্টিন কোম্পানীও এই প্রতিষ্ঠানের ভার আর বইতে চাইলেন না। তাঁরা তখন ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়মুক্ত হয়ে ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টীল প্রভৃতির বিরাট প্রকল্পের সুপরিচালনার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন। ফলে, বছর দুই-তিনের জন্যে ন্যাশান্যাল ট্যানারির কাজ বন্ধ রইলো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জমে ওঠার পর রোগশয্যায় শায়িত স্যার নীলরতন তাঁর জামাতা বিখ্যাত সাইকেল ব্যবসায়ী সুধীর সেন মশায়কে ডেকে ন্যাশান্যাল ট্যানারির ভার নিতে অনুরোধ করলেন। এত পুরনো এবং স্যার নীলরতনের এত সাধের প্রতিষ্ঠানটির পুনরুজ্জীবনের ভার সুধীর সেন নেওয়া স্থির করলেন। ঐতিহ্যময় বাঙালী সংস্থাটি বাঁচলো। এটা হলো ১৯৪১ সালের কথা।

টাকার দরকার—তা যোগালেন কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিখ্যাত ব্যাংকার ডাঃ শান্তিভূষণ দত্ত ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল। বাঙালীকে শিল্প ও বাণিজ্যে সহায়তা করা ছিল শান্তিভূষণের ব্রত।

প্রথমেই মিলিটারি কনট্র্যাক্ট নিয়ে ন্যাশান্যাল ট্যানারি আবার সচল হলো। বাধ্য হয়েই সুধীর সেন তা নিলেন। কারণ, ব্রিটিশ সরকার লড়াইয়ের সরঞ্জামের জন্যে ভারতবর্ষের সমস্ত ট্যানারির উৎপাদন দাবি করেছিলেন। সেই অর্ডারের মাল সরবরাহের ব্যবস্থার জন্যে সুধীর সেন কোমর বেঁধে লাগলেন। সঙ্গে নিলেন অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সে সদ্য এম-এসসি পাস বড়ো ছেলে অভিজিৎকে। যুদ্ধের জন্য সাইকেল আমদানির ব্যবসায় তখন প্রায় অচল অবস্থা। তাই সুধীর সেন তাঁর সমস্ত শক্তি ট্যানারির কাজে নিয়োগ করতে পারলেন।

পেট্রল রেশনিং-এর যুগ। বাপবাটা রোজ সকালে খালের ধার দিয়ে চার মাইল সাইক্লিং করে ন্যাশান্যালের পাগলাডাঙ্গার কারখানায় যেতেন—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। ট্যানারির কাজের তদারক করে যেতেন লালবাজারের অফিসে; আবার দিনের শেষে পার্ক সার্কাসের বাড়িতে ফিরতেন—সবই সারতেন সাইকেলে।

ন্যাশান্যাল ট্যানারির বর্তমান ডিরেক্টর শ্রীমতী মীরা সেন বললেন যে, তাঁর স্বামীর দূরদৃষ্টি ও সৌভাগ্য ছিল অতুলনীয়। তাই সুধীর সেন কোম্পানীর ভার নেবার পর দ্বিতীয় বছর থেকেই ন্যাশান্যাল ট্যানারি শেয়ারহোল্ডারদের ডিভিডেন্ড দিতে আরম্ভ করেছিল।

আর একটা কথা মীরা দেবী বললেন—

১৯১৯ সালে বিবাহের পর থেকে ১৯৫৯-এ সুধীরকুমারের পরলোকগমন পর্যন্ত সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরে তিনি তাঁর স্বামীকে কখনো ভীত বা বিচলিত হতে দেখেন নি। সব ব্যবসাদারই জীবনের কোনো না কোনো সময়ে অর্থসংকট বা তেমনি কোনো বিপদে পড়েন বলে শোনা যায়। সুধীর সেন নাকি কখনো তেমন বিপদের সম্মুখীন হন নি। মীরা দেবীর মতে, সুধীরকুমারের দূরদৃষ্টির জন্যেই সেটা সম্ভব হয়েছিল। দুই ছেলে অভিজিৎ ও সঞ্জয়ও নাকি পিতার সেই গুণের অধিকারী।

সেদিন ন্যাশান্যাল ট্যানারির পাগলাডাঙ্গার বিশাল কারখানাটিতে ঢুকে প্রথমেই

যে দুটি গুণ আমাকে মুগ্ধ করলো তা হলো যন্ত্রের আধুনিকতা ও যন্ত্রীর তারুণ্য ও সপ্রতিভতা। অবশ্য সদাব্যস্ত চেয়ারম্যান সঞ্জয় সেনের সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপে আমি বঞ্চিত। কিন্তু সৌম্যদর্শন ম্যানেজিং ডিরেক্টর অনুপম সেন-এর মিষ্ট ব্যবহার এবং অভিনিবেশ অনুকরণীয়।

'ফিনিশড লেদার অ্যান্ড লেদার ম্যানুফ্যাকচার্স এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল'-এর চেয়ারম্যান সঞ্জয় সেন পরের দিনই যাচ্ছেন ইংল্যান্ডের 'লেস্টার' মেলায় যোগ দিতে। উদ্দেশ্য, ভারতের বর্তমান ৭০।৭৫ কোটি টাকার চামড়া ও জুতো রপ্তানি বাড়িয়ে কী করে ১০০ কোটির সীমা পার করানো যায়, বিদেশী খরিদ্দারদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তারই ব্যবস্থা করা। ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্যে পাট, চা ও কাপড়ের পরেই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চতুর্থ স্থান হলো কাঁচা ও ট্যানড চামড়া এবং পাদুকাশিল্পের। এদেশে গরু, ষাঁড় ও মহিষের সংখ্যা আনুমানিক ২০ কোটি ছাগলের সংখ্যা ৭২ কোটি আর ভেড়া আছে ৪ কোটি আন্দাজ। ১৯৬৬ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে সেই বছরে আমাদের উৎপাদিত গরু ও মোষের চামড়া তৈরী হয়েছিল ২ কোটি ছাগলের চামড়া ৩২ কোটি আর ভেড়ার চামড়া হয়েছিল ১ কোটি ৫০ লক্ষ আন্দাজ। আমি যেদিন ন্যাশানাল ট্যানারি দেখতে গেলাম সেদিন সঞ্জয় সেনের অসুস্থ বাবা নিয়ে অনুপম সেনও খুব ব্যস্ত ছিলেন।

কিন্তু তার জন্যে আমার পরিক্রমায় কোনো অসুবিধে হলো না। কম সময়ে অল্প কথায় এমন একটি বৃহৎ শিল্পের খোদ কথাগুলি আমার মতো এক নিপট আনাড়িকে বুঝিয়ে দেওয়া সহজ কাজ নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু ন্যাশানালের অভিজ্ঞ ওয়ার্কস ম্যানেজার জ্যোতির্ময় সিংহরায় ঠিক সেই কাজটিই করলেন।

'অভিজ্ঞ' শব্দটা শুনলেই কেমন যেন পাকা দাড়ি পাকা চুল বা টাক আর ভুঁড়ি সংবলিত রাশভারী পুরুষসিংহ অথবা বিরসবদন ডিস্পেপটিকের ছবি এতকাল আমার মনে জেগে উঠতো। সেন মহাশয়দের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সুপুরুষ কর্মীদের দেখে আমার সেই কনসেপশনটা এবার যেন বদলাতে শুরু করেছে। জ্যোতির্ময়বাবু তো ছেলেমানুষ; বয়স মাত্র ৩৪ বছর। ডেপুটি ওয়ার্কস ম্যানেজার আশিস চক্রবর্তী, 'অ্যাপ্লিকেশন ইঞ্জিনীয়ার' অশোক রায়, 'এক্সপোর্ট ফোরম্যান' অমিতাভ ভট্টাচার্য এবং আরও ১২।১৩ জন লেদার টেকনোলজিস্ট —সকলেই তরুণ, ত্রিশের এদিক আর ওদিক। আর অনেকেই বেঙ্গল ট্যানিং ইন্সটিটিউটে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করে ইংল্যান্ড জার্মেনি থেকে 'পাকাই' হয়ে এসেছেন। ৫০০ শ্রমিক ও কর্মী বিশিষ্ট এই বৃহৎ কারখানার এঁরাই হলেন পরিচালক।

কত পরিভাষা-ই না শিখছি! 'পাকাই' —মানে চামড়া ট্যানিং। জুতোর সোল (sole-এর পরিভাষাটি বোধ হয় এখনো তৈরী হয় নি) বানাবার চামড়া পাকাই করতে হয় ছাল-পাকাই (ভেজিটেবল ট্যানিং) প্রণালীতে। তাতে লাগে বাবলা, হরতুকি আর বিদেশী ওয়াটল-এর ছাল কিংবা ছালের নির্যাস। এই ছাল-পাকাই পদ্ধতিতে ভারতের কয়েকটি অন্ত্যজ জাতি আবহমান কাল ধরে চামড়া ট্যান করে এসেছে। এই চামড়া সাধারণত গরু ও মহিষের চামড়া; তা-ও আবার বিদেশের মতো Slaughter house-এ জবাই করা জন্তুর চামড়া নয়—ভাগাড় থেকে কুড়নো মরা জানোয়ারের চামড়া, যাকে চর্মশিল্প বিশারদরা বলেন fallen hides। এই ফলেন হাইডের মান যে স্ট্যান্ডার্ড হাইডের চাইতে নিকৃষ্ট হয়ে থাকে, তা বলাই বাহুল্য। তাই পাকাইয়ের পরেও তার মান বিদেশী ছাল-পাকাই চামড়ার মতো হয় না। ছাল-পাকাইয়ে মাদ্রাজ ও কানপুরে কলকাতার অগ্রগণ্য। খবরের কাগজে যে (Madras) East India Kips-এর কথা প্রায়ই চোখে পড়ে তা হচ্ছে বিশেষ এক ধরনের ছাল-পাকাই চামড়া।

ক্রোম পাকাইয়ে কিন্তু কলকাতার নাম বেশী। আর কলকাতার চীনেদের ছোট ছোট ট্যানারি হিসেবে ধরলে ক্রোম-পাকাইয়ে কলকাতার উৎপাদন নাকি মাদ্রাজ কানপুরের চাইতে বেশী।

আর এক রকমের ট্যানিং আছে; সেটা হয় তেলের মাধ্যমে। আপনার মোটরগাড়ির ক্লীনারকে যে শ্যাময় লেদার ব্যবহার করতে দেন তার পাকাই হয় এই প্রণালীতে।

মাদ্রাজ ও কলকাতার চাইতেও নাকি 'সোল' তৈরীর ব্যাপারে কানপুরের লোক বেশী দক্ষ; আর কুটিরশিল্প পর্যায়ে আগ্রার পাদুকাশিল্প হচ্ছে অগ্রণী। সঞ্জয় সেন তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছেন যে, ভারতের জুতো তৈরীর কারখানাগুলির শতকরা ৯০টিই কুটিরশিল্পের পর্যায়ে পড়ে। তার জন্যে আমাদের প্রধান অসুবিধে দাঁড়িয়েছে যে, সমতা ও সামঞ্জস্যের অভাবে রপ্তানির মালের মান বজায় রাখা যায় না। সেই কারণ দেখিয়ে শ্রীসঞ্জয় সেনের নেতৃত্বে চর্ম উন্নয়ন এবং চর্ম রপ্তানি উন্নয়ন সংস্থা দুটি চর্ম ও পাদুকা শিল্পের কারখানাগুলির উৎপাদনের মানোন্নয়নের এবং আরও বড়ো বড়ো কারখানা স্থাপনার সুপারিশ করেছেন।

সরকারের হয়েছে 'শ্যাম রাখি, না কুল রাখি' অবস্থা। বৃহৎ শিল্পোদ্যোগে উৎসাহ দিয়ে কুটিরশিল্পের ক্ষতি করতে দিতে চান না, আবার আধুনিক পদ্ধতিতে চামড়া পাকাই এবং জুতো তৈরী না হলে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনও ব্যাহত হয়। তবুও, উৎপাদনের ৫০ পারসেন্ট রপ্তানি করতে হবে এই কড়ারে কেন্দ্রীয় সরকার ন্যাশানাল ট্যানারিকে ও মাদ্রাজের একটি প্রতিষ্ঠানকে সম্প্রতি জুতো তৈরীর অনুমোদন দিয়েছেন। তাঁরা শীঘ্রই উৎপাদন শুরু করবেন।

ভারতে এখন মাত্র পাঁচ চারেক বড় ট্যানারি আছে—কলকাতার ন্যাশানাল ও বাটা শু কোং, মাদ্রাজের গর্ডন উড্রোফ কোং ও ক্রোম লেদার কোং এবং কানপুরের কুপার অ্যালেন ('ফ্লেক্স' জুতোর কারখানা)।

কলকাতার বাটা কোম্পানী বেশী রপ্তানি করেন তৈরী জুতো, চামড়া কম। ন্যাশান্যাল প্যাকাই চামড়ার রপ্তানিতে বাটার চাইতে বড়ো। টমাস বাটার মাতৃভূমি চেকোস্লোভাকিয়া ভারত থেকে অনেক চামড়া কেনে। ন্যাশান্যালের কাছ থেকে অনেকখানি কেনে।

ন্যাশান্যাল ট্যানারির ক্রমবর্ধমান রপ্তানির বৃত্তান্তটি শোনবার মতো। ১৯৬২—৯৭ হাজার টাকার; ১৯৬৪—৪৫ লক্ষ টাকার; ১৯৬৬—১ কোটি ২১ লক্ষ টাকার এবং ১৯৬৭-তে ২ কোটি ৭ লক্ষ টাকার পাকাই চামড়া ন্যাশান্যাল রপ্তানি করেছে। এঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৭২ সালে রপ্তানি হবে ৬ কোটি টাকার পাকাই চামড়া ও জুতো।

একটি বিশেষ ধরনের বেল্টিংও ন্যাশান্যালে তৈরী হচ্ছে। দু দিকে চামড়া ও মাঝখানে সূক্ষ্ম নাইলনের পাত দিয়ে তৈরী এই বেল্টিং-এর টেনসাইল বা প্রসারশক্তি নাকি দুর্দান্ত।

উঃ—কী গন্ধ! এই ছাল-পাকাই বিভাগের পাশে যদি ফুটন্ত ফুলে ভরা এক হাজারটা বসরা গোলাপের গাছও থাকতো। তবুও আপনার আমার অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসতো। এইসব ছেলেরা বোধ হয় নিজেদের নাসারন্ধ্রও পাকাই করে নিয়েছেন, না হলে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কেমন করে এখানে কাটান! জ্যোতির্ময়বাবুর সঙ্গে কারখানার ভেতরে ঘুরতে ঘুরতে সেই কথাটাই ভাবছিলাম। কিন্তু যখন বার্নিশ করা তৈরী চামড়ার বিভাগে এলাম তখনকার গন্ধটা ছেলেবেলার জন্মদিন আর পুজোপার্বণের কথা মনে পড়িয়ে দিল। বাবা দাদার হাত ধরে যখন কলেজ স্ট্রীটের দোকান থেকে নতুন জুতোর বাক্সটি সগর্বে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরতাম—আঃ—কোথায় গেল আমার নতুন জুতোর (আর নতুন বইয়েরও) গন্ধে ভরা অনাবিল আনন্দের সেই সব দিন।

অনেক ঝড়ঝাপটা সয়ে ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারের সাধের ন্যাশান্যাল ট্যানারি আজ বাঙালীর শিল্পোদ্যোগের এক আলোকস্তম্ভে পরিণত হয়েছে। এখন আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি যে, তাঁর দৌহিত্রদের দক্ষ পরিচালনায় এ প্রতিষ্ঠান বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে।

সেন অ্যান্ড পণ্ডিত ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

মাঝে মাঝে নিজের চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি। সরকার—তা কেন্দ্রেরই হোক বা রাজ্যের হোক, তার খুঁত দেখতে পেলে আমি মাছির মতন ভনভন করে উঠি কেন? আমি তো মৌমাছি হতে চাই, মাছি নয়! তবু এ ছিদ্রান্বেষণ কেন? বোধ হয় প্রতিদিনের বড়ো বড়ো সরকারী বুলির ফাঁপা আওয়াজে বিশ্রী রি-অ্যাকশন হয় বলেই মনটা আমার এমন হয়েছে।

যেমন ধরুন উপনগর কল্যাণীর কথা—ডাক্তার বিধান রায়ের মানস-কন্যা এই আজব নগরীটিতে তাঁর মৃত্যুর পরে ছ'সাত বছরে উন্নতিটা কী হয়েছে? একটা নবগঠিত পৌরশাসন অধিকারের কাছ থেকে ন্যূনতম যেটুকু প্রাপ্য তাও নাকি কল্যাণীর বাসিন্দারা পান না। বর্ষা নামলে শহরের স্থানে স্থানে ড্রেন পায়খানার নোংরা জল ওপরে উঠে এসে মানুষের হাঁটু অবধি ডুবিয়ে দেয়; শহরের ময়লা ঠিক মতো পরিষ্কার হয় না; আগুন লেগে গেলে, এই আধুনিককালেও কল্যাণীর ফায়ার-ব্রিগেডের নাকি ক্ষমতা নেই, সাজসরঞ্জাম নেই যে, তা নেবাতে পারে. আর কেউ যদি সন্ধ্যের অন্ধকারে পকেটে কিছু নিয়ে বেরোন তো ছেনতাই অবধারিত।

৬৩০ জন কর্মীর জীবিকার যোগান দেয় যে সেন অ্যান্ড পণ্ডিত ইন্ডাস্ট্রিজ তার কারখানা দেখতে গিয়ে পরিচালক কানাই দে ও তাঁর সহকারী প্রভঞ্জন সেনের কাছ থেকে এই সব কথা শুনে এলাম।

ডাক্তার বিধান রায়ের অনুরোধ এড়াতে না পেরে কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের

এক শেড-ভাড়া নিয়ে সুধীর সেন মহাশয় সাইকেলের সরঞ্জাম তৈরীর এই বড়ো কারখানাটা বসাতে রাজী হয়েছিলেন। ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে ১৯৫৮ সালে সেন অ্যান্ড পণ্ডিত ইন্ডাস্ট্রিজ স্থাপিত হয়েছিল। তৈরী কারখানা বাড়ির দখল নিতে গিয়ে দেখা গেল সরকারী স্থপতির কেরামতি আছে। যেখানে শেড-এর উচ্চতা করা উচিত ছিল ১৭।১৮ ফুট সেখানে তা করা হয়েছে বারো না তেরো ফুট। ফলে টিনের চালের এই নীচু নীচু ঘরগুলিতে চৈত-বৈশাখের প্রখর তাপে শ্রমিকরা ভাজা ভাজা হয়ে যায়। পরে অবশ্য সম্প্রসারণের সময়ে সেন-পণ্ডিত তাঁদের নিজেদের তৈরী শেড-গুলিতে এই গলদ শুধরে নিয়েছেন. কিন্তু পুরনো সরকারী কীর্তিসৌধ তো খাড়াই রইলো। কোম্পানী এখন জমিসুদ্ধ কারখানা বাড়িটা সরকারের কাছ থেকে কিনে নিচ্ছেন। সরকারী ইমারতের সংস্কার করার খরচ তাঁদের ঘাড়েই পড়ছে। এই কাণ্ডকারখানা দেখার পরে কি আমরা সরকারকে অভিনন্দন জানাবো?

এই প্রতিষ্ঠানেও কুশলী নবীন সব এঞ্জিনীয়াররা আছেন আর তাঁদের উপরে আছেন যুগ্ম ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীকালিদাস গঙ্গোপাধ্যায় এবং সেন গোষ্ঠীর আর একজন অতি পুরাতন কর্মী শ্রী টি এইচ বি অ্যাডভানি। ফ্যাক্টরী-অফিসে আছেন চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট নিখিল মজুমদার। নিখিল-বাবুর যোগ্যতার বিষয়ে কালিদাসবাবু খুব প্রশংসা করলেন।

প্রধানত টিউব ভালভ্‌, বটম্‌ ব্র্যাকেট, বেয়ারিং-এর জন্য ইস্পাতের খুদে খুদে বল এবং রিম প্রভৃতি কতকগুলি সাইকেল পার্টস এই কারখানায় তৈরী হয়। এ তো সামান্য কয়েকটা। এক-একটি সাইকেলে নাকি ১৪০০টিরও বেশী সাজসরঞ্জাম থাকে। বিস্ময়কর ব্যাপার।

সেন অ্যান্ড পণ্ডিত ইন্ডাস্ট্রিজের তৈরী পার্টসের প্রায় সমস্তটাই সেন-র‍্যালে কিনে নেয়। কেবল টিউব ভালভ্‌ জিনিসটির সামান্য রপ্তানিও হয়। ১৯৬৬-তে মাত্র ২২০০০ টাকার রপ্তানি হয়েছিল, আর ১৯৬৭-তে হয়েছে ৬৪০০০ টাকার। বিশেষ কিছুই নয়, তবু সংখ্যাটা ঊর্ধ্বগামী। এই প্রতিষ্ঠানের সুবিধে এই যে, এ'দের উৎপন্ন ৮০।৮৫ লক্ষ টাকা দামের মাল সেন-র‍্যালের কাছে সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে যায়। কাজেই পড়তাটা নীচের দিকে রাখতে পারলে লাভ অবধারিত।

পশ্চিম জার্মেনিতে শিক্ষিত প্রোডাকশন সুপারিন্টেন্ডেন্ট বিমল ব্যানার্জি আমাকে ফ্যাক্টরী দেখাচ্ছিলেন। এখানে প্রায় সব কাজেই শব্দ আছে প্রচুর, কিন্তু তাতে একটা লয়ও আছে। বড়ো বড়ো ইমপোর্টেড মেশিনগুলির কাজ দেখতে ভালো লাগে। এই ছন্দোবদ্ধ হট্টগোলের মধ্যে প্রকাণ্ড একটি মেশিন প্রায় নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে—সেটা হলো ইলেকট্রোপ্লেটিং মেশিন।

ঝকঝকে তারুণ্যে ভরা কর্মীদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি মমত্ববোধটা বিমলবাবুর কয়েকটি কথার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠলো। 'আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, পশ্চিম জার্মেনির ব্যয়সাপেক্ষ শিক্ষালাভের মূল্য তিনি এখানে পাচ্ছেন কি না। উত্তরে বিমলবাবু বললেন যে, শ্রমমূল্য আরও বেশি হওয়া উচিত বটে, কিন্তু কোম্পানীর বর্তমান অবস্থায় তিনি তা কী করে দাবি করবেন—সে হবে নিজের কাছ থেকেই দাবি করা। কোম্পানীর সামর্থ্য বাড়লে চেয়ারম্যান সঞ্জয় সেন বা ম্যানেজিং ডিরেক্টর কালিদাসবাবুকে বলতে হবে না; তাঁরা আপনা থেকেই সকলের পারিশ্রমিক বাড়িয়ে দেবেন। সেন প্রতিষ্ঠানের নিয়মই তাই।

এই সুর আজকাল বেশি শোনা যায় না। এ যেন তিমিরবরনের সেই লুপ্ত রাগিণী উদ্ধারের মতো।

সেন অ্যান্ড পণ্ডিত ইন্ডাস্ট্রিজের ৬৩০ জন কর্মীর প্রায় শতকরা ৯৯ জনই বাঙালী; ৪০০ জন আবার উদ্বাস্তু বাঙালী। আর তাঁরা সবাই তরুণ, সবাই তাজা।

অ্যানসিলারি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

ডিরেক্টর শ্রীশমীন বসু ও সেক্রেটারি শ্রীসোমেন গুপ্ত পরিচালিত এই কারখানার সমষ্টি কল্যাণীতে সেন-পণ্ডিতের কারখানার সংলগ্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটেই অবস্থিত। তরুণ ওয়ার্কস সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রী এস মুখার্জির নেতৃত্বে এই কারখানা তিনটিতেও প্রায় ৩০০ বাঙালীর কর্মসংস্থান হয়েছে।

এ'দের প্রধান কাজ হলো সাইকেলের Lugs ও Cranks তৈরি করা। খরিদ্দারও প্রধানত সেন-র‍্যালে।

এস কে সেন অ্যান্ড সন প্রাইভেট লিমিটেড

শ্রীঅভিজিৎ সেনের পত্নী অমিয়া দেবী এবং শ্রীসঞ্জয় সেনের পত্নী রত্না দেবী এই প্রতিষ্ঠানের যুগ্ম ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এ'দের ব্যবসা হলো প্রধানত ভারতীয় কারুশিল্প রপ্তানি করা। এই উপলক্ষে পরলোকগত শ্বশুর মহাশয়ের মতো রত্না দেবীও নিয়মিত ইয়োরোপ-আমেরিকাতে বাণিজ্যযাত্রা করেন। এ'দের পণ্য বিদেশের বাজারে সমাদৃত হয়েছে; বাণিজ্যপদ্ধতিও প্রশংসা পেয়েছে। সম্ভ্রান্ত কুলবধূরা দাসদাসী-পরিবৃতা হয়ে আরামে ঘরকন্না করতে পারতেন; তা না করে স্বামীদের মতো কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, সে কথা ভাবলেও কত ভালো লাগে। বিশেষ করে তাঁরা বাঙালী ঘরের মেয়ে বলে।

সেদিন এক অশীতিপর বয়স্ক পাঠকের কাছ থেকে সুন্দর একটি চিঠি পেলাম। প্রশ্নের ব্যক্তিটি নাকি কর্মজীবনে সাংবাদিক ছিলেন। নানা সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; এমন কি, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের ইংরেজী দৈনিক 'বেঙ্গলি'-তেও লিখতেন বলে জানিয়েছেন। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "বাঙ্গালীর দুর্নাম অপগত হইয়াছে এবং বাঙ্গালী এখন ব্যবসা জগতে প্রধান স্থানের অধিকারী হইতেছে জানিয়া বিশেষ গর্ব ও আনন্দলাভ করিতেছি" ইত্যাদি।

কিন্তু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও স্যার নীলরতনের আদর্শবাদ কি আমরা সত্যিই গ্রহণ করতে পেরেছি? বোধ হয় এখনো নয়; 'দিল্লী এখনো অনেক দূর'। তবে, বাঙালীর এই সব প্রতিষ্ঠান দেখলে মন আশায় ভরপুর হয়ে ওঠে। ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকলে আমরা আরও দ্রুতবেগে এগিয়ে যেতে পারি। লক্ষ্মীলাভ করতে হলে আরও দুটো গুণ থাকা বাঙালীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন—শৃঙ্খলা ও মমত্ববোধ।

বিশ্বকর্মা

বিশ্ব বিজ্ঞান

আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার সুফল ও কুফল

বারাউনি তৈল শোধনাগারের নিকটে মুঙ্গের অঞ্চল থেকে গঙ্গার জলে প্লবমান অগ্নিশিখাবিশিষ্ট কিছু জিনিস সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর ঐ অঞ্চলে কিছু প্রাণহানির খবর আসে। খবরে প্রকাশ যে, দূষিত জলপানের ফলে নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে কিছু লোকের প্রাণ যায়। এই থেকে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে গঙ্গার জলে বারাউনির তৈল পরিশোধনাগার থেকে কিছু বর্জ্য পদার্থ গিয়ে মেশার ফলে গঙ্গার জলস্রোত হয়ত দূষিত হওয়ার জন্য এই দুর্ঘটনাগুলি ঘটা বিচিত্র নয়। তবে নিশ্চয় করে এখনো কেউ কিছু বলেননি সম্ভবত প্রমাণের অভাবে। ঠিক হয়েছে, ব্যাপারটি সম্পর্কে এক তদন্ত কমিশন বসানো হবে। সেটাই উচিত। তদন্তের পর যদি প্রমাণিত হয় যে পরিশোধনাগারের আবর্জনাই এই ব্যাপারে দায়ী তাহলে এমন সুরক্ষা বা প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে এই ধরনের শোচনীয় ব্যাপারের ভবিষ্যতে আর পুনরাবৃত্তি ঘটতে না পারে। সেই রকম ব্যবস্থা আজকের এই বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে নেওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব। ব্যাপারটা আমাদের মত সবে উন্নতিশীল দেশের কাছে প্রথম বা নতুন হলেও শিল্পোন্নত দেশগুলিতে তা নিশ্চয়ই নয় যেমন, জনবসতি ও নগরের ধোঁয়াশা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা সেখানে নতুন নয়। যন্ত্র সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বহুবাঞ্ছিত সুফলের সঙ্গে কিছু কিছু অবাঞ্ছিত কুফলও দেখা দেয়। এটা তারই দৃষ্টান্ত। কিন্তু কুফলগুলির সম্পর্কে আমেরিকা ইংলণ্ড প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশের লোক সজাগ এবং মানুষের প্রাণের দাম সেসব দেশে বোধ হয় আমাদের দেশের চেয়ে বেশি। তাই সেখানকার বিজ্ঞানী ও পৌর-সংস্থাগুলি ধোঁয়াশা, জলদূষণ প্রভৃতি ব্যাপারে বিচার বিশ্লেষণ করে নানা রকম কলাকৌশল বার করেন সেগুলি নিবারণ করার জন্য। আমাদের এই কলকাতা শহর শীতকালে ধোঁয়াশার জ্বালায় বাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে প্রতি বছর, কিন্তু সেই সমস্যার মীমাংসা করার কোন চেষ্টা কারো নেই এটাই সবচেয়ে বড় আফসোসের কথা। অথচ আজ থেকে বহুকাল আগেই ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিকরা ধোঁয়াশার বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে বিভিন্ন আইনকানুন পাস করে (যেমন "ক্লীন্ এয়ার অ্যাক্ট") ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে সেই সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় তৎপর রয়েছেন যাকে আগে প্রায় সর্বপ্রকার রোগের মূল বলে লোকে মনে করত। সর্বপ্রকার না হোক ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের বিভিন্ন অসুখ-বিসুখের জন্য ধোঁয়াশার আংশিক দায়িত্ব অনস্বীকার্য। আমেরিকাতেও লস্ এঞ্জেলেস প্রভৃতি শহরে ধোঁয়াশা আগে চরমে উঠত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে সেই বিপদ অনেকখানি কমানো সম্ভব হয়েছে। কলকারখানার বর্জ্য পদার্থের দ্বারা জল দূষিত হওয়াটাও সেখানে কিছু নতুন ব্যাপার নয়। তবে আমাদের দেশে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষার অভাবে লোকে, বিশেষ করে গ্রামের লোকে, যেভাবে অম্লান বদনে বিনা দ্বিধায় নদীর জল পান করে, শিল্পোন্নত দেশের মানুষ হয়ত তা করে না। তাছাড়া বিহারে এমনিতেই তো জলাভাব ও জলকষ্ট আছে, আছে বিশুদ্ধ জলের নলকূপের অভাব। সেইজন্যও লোকে অনেক সময় নদীর জল পান করতে বাধ্য হয়।

এখন আসল কথাটা হচ্ছে যে বিশুদ্ধ জল সরবরাহ, খাদ্যে ভেজাল প্রভৃতি নিয়ে আমাদের নেতারা বিশেষ মাথা ঘামান না। লোকসভা বা বিধানসভায় কখনো ঐ সব সমস্যার কথা কেউ তুললে কিছু বাদানুবাদ চলে, এই পর্যন্ত। তারপর আবার আগের মতই গড্ডলিকাপ্রবাহ গড়িয়ে চলে। এ বিষয়ে যে কোন ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত নেই তা বলছি না কিন্তু সেগুলি সংখ্যায় কম এবং গুরুতর কিছু একটা না ঘটলে কারো টনক নড়ে না।

এই জন্যই আমাদের দেশে কোথাও বন্যা হলে তারপরই সেই অঞ্চলে রোগবীজাণুর সংক্রামণ ঘটে এবং বিভিন্ন মারাত্মক রোগ মহামারীর আকারে আত্মপ্রকাশ করে। আগে থাকতে সাবধানতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করলে প্রকৃতির এই অভিশাপ অনেক ক্ষেত্রে অকার্যকর করা সম্ভব যদিও সর্বক্ষেত্রে এইসব অভিশাপের জন্য প্রকৃতিই যে একমাত্র দায়ী তা নয়। আরো বহু কারণ

সুদূর প্রাচ্যে সাইবিরীয়ার তাইগা বনভূমিতে গড়ে ওঠা নোভোসিবীর্স্ক বৈজ্ঞানিক জনপদের অজৈব রসায়ন ইন্সটিটিউটের লেবরেটরীর অন্তর্দৃশ্য

ব্রিটেনে পরিকল্পিত সাগর জল নির্লবণ করার জাহাজের নকশা

আছে/ আজকালকার যন্ত্র সভ্যতার যুগে যেগুলির অনুসন্ধান করা ও সমাধান করা অবশ্যকর্তব্য।

বিশুদ্ধ জলের অভাব দেশে দেশে বেড়েই চলেছে যত দিন যাচ্ছে। সেই কারণে পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বিশুদ্ধ জলের সরবরাহ বাড়াবার জন্য বহু আয়াস প্রয়াস চলেছে যেগুলির মধ্যে একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে সমুদ্রের লবণাক্ত জল লবণমুক্ত করে পানীয় জলে রূপান্তরিত করা। আমেরিকায় এই কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশেও হচ্ছে। গত বছর মে মাসে এথেন্সে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনের অধিবেশনে জানা যায় ভূমধ্যসাগরের আশপাশের ঊষর অঞ্চল এবং নিকট-প্রাচ্যের কঠোর জলাভাবগ্রস্ত অঞ্চলগুলির বাসিন্দাদের জলকষ্ট কমাবার উদ্দেশ্যে ব্রিটেন এমন একটি ১৩০০ টন জাহাজের পরিকল্পনা রচনা করেছে যার মধ্যে সন্নিবিষ্ট একটি সমুদ্রজল নির্লবণ করার কারখানা প্রতিদিন ২ লক্ষ গ্যালন করে পানীয় জল সরবরাহ করতে পারবে। পরিকল্পকদের মতে জাহাজটি ঘণ্টায় ১০ নট বেগে চলে প্রতিদিন ১০০ মাইল এলাকার মধ্যে উজন খানেক জনপদে অন্ততঃ ৫০০০ লোকের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জল যোগান দিতে পারবে। ঐসব অঞ্চলে কোন ঘনবসতি বা বহু জনাকীর্ণ জনপদ নেই একথা মনে রাখলে ৫০০০ সংখ্যাটি খুব কম নয়। তিন মাস অন্তর জাহাজটি একবার করে ঐ এলাকার প্রতিটি বন্দরে গিয়ে ভিড়ে প্রায় এক সপ্তাহ করে থাকবে এবং ১৫ লক্ষ গ্যালন নির্লবণ বিশুদ্ধ জল পাম্প করে দেবে উপকূলবর্তী জলাধারগুলিতে। ফলে সংবৎসর লোক প্রতি জলের দৈনিক সরবরাহের পরিমাণ হবে ১২ লিটার যার দাম ১ পেনির বেশী হবে না।

দৃষ্টান্তটি কিছুটা ধান ভানতে শিবের গীতের মত হলেও একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়; কারণ, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব আমাদের এই প্রবন্ধের প্রধান বিষয়বস্তুর সঙ্গে জড়িত। এবার নদীর ধারে নির্মীয়মাণ কলকারখানার আবর্জনা নদীর জলে পড়ে জল দূষিত করার প্রশ্নটি বিবেচনা করা যাক। শহরে লোকের ঘরবাড়ি থেকে দৈনিক যে জঞ্জাল রাস্তায় বা ডাস্টবিনে ফেলা হয় সেগুলি শহরের রাস্তা কি রকম নোংরা ও দুর্গন্ধময় করে তা আমরা কলকাতা পৌর সংস্থার দয়ায় মর্মে মর্মে জানি। এই পত্রিকায় প্রসঙ্গটি নিয়ে আগে আলোচনা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যে, সেই সব আবর্জনাই আমেরিকা প্রভৃতি উন্নত দেশে কিভাবে বিশেষ ধরনের কারখানায় নিয়ে

গিয়ে 'কম্পোস্টে' রূপান্তরিত করে চাষের জমির উন্নতির জন্য কাজে লাগানো হয় যার ফলে আবর্জনা সংগ্রহ ও তা থেকে কম্পোস্ট উৎপাদনের পড়তা খরচার বেশ কিছুটা উঠে আসে।

কারখানার বর্জ্য পদার্থ জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়ে চলেছে; কারণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের শিল্পায়নেরই আনুষঙ্গিক। জলের অশুদ্ধ হওয়া বা রোগ-বীজাণু মিশ্রিত হওয়া কিছু নতুন ব্যাপার নয়। এমনিতেই যারা নদনদী বা বদ্ধ জলাশয়ের ধারে বসবাস করে তারা আবর্জনাগুলি জলেই ফেলে থাকে। তার উপর কলকারখানা, যেগুলির পরিচালনা জলের উপর নির্ভরশীল (বাষ্পের প্রয়োজনে) সেগুলির বর্জ্য পদার্থগুলিও অনেক ক্ষেত্রে নদীর জলে গিয়ে মেশে। কিন্তু যে হারে আজকাল জল দূষিত হচ্ছে সেই হারে নতুন বিশুদ্ধ পানীয় জলের আধার বা উৎস বাড়ছে না। সুতরাং চিরপ্রবহমাণ নদনদী থেকেই মানুষকে পানীয় জল যোগাড় করতে হয়, সেই জলে কারখানা শিল্পজাত বা অন্য আবর্জনা মিশে ভেসে আসা সত্ত্বেও। প্রতিকার কোথায়?

বছর দুয়েক আগে আমেরিকায় শিল্পজাত আবর্জনায় নদীর জল দূষিত হবার সমস্যাটি এমন গুরুতর হয়ে ওঠে যার ফলে ১৯৬৫ সালে একটি আইন পাস করতে হয় যার নাম 'ওয়াটার কোয়ালিটি অ্যাক্ট'। সেই আইনে জলের বিশুদ্ধতার একটি মান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ১৯৬৬ সালে ঐ ধরনের আরো একটি আইন (ক্লীন্ ওয়াটার রেস্টোরেশন অ্যাক্ট) পাস করে আবর্জনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিহিত করা ও গবেষণা করার উদ্দেশ্যে এক বিশাল প্রতিষ্ঠান নির্মাণকল্পে ৩৯০ কোটি ডলার কেন্দ্রীয় কোষাগার থেকে মঞ্জুর করা হয়; কারণ, সমস্যাটা নগর বা রাজ্যবিশেষের একার নয়, নদনদীর সমগ্র অববাহিকা ও জলবিভাজিকার।

কিন্তু শুধু আইন পাস করলে আর টাকা মঞ্জুর করলেই কোন সমস্যার মীমাংসা হয় না, সেই সঙ্গে চাই জনসাধারণের সচেতন সমর্থন ও সহযোগিতা। এটা যে কত সত্য সে তো আমাদের দেশেই আমরা দেখতে অভ্যস্ত। প্রায় দেড় শো বছর ধরে নিউইয়র্ক শহর অশুদ্ধ জল ও জলকষ্টে ভুগেছে। ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় ঐ শহরে মোট লাখ তিনেক লোক বাস করত বলে কুয়ার জলে তৃষ্ণা নিবারণ তখন অসম্ভব ছিল না। কিন্তু পরে কুয়ার জলও দূষিত হওয়ার ফলে বিশুদ্ধ জল সরবরাহে ঘাটতি পড়ে। তারপর ১৮৫৩ সালে সারা শহরে বিরাট অগ্নিকাণ্ড ঘটার পরে ক্রোটন নদী থেকে শহর পর্যন্ত একটি জলনালী (অ্যাকোয়েডাক্ট) নির্মাণের পরিকল্পনা হয় যাতে একটি সংরক্ষিত জলাধার থেকে দৈনিক ৯ কোটি গ্যালন বিশুদ্ধ জল প্রবাহিত করার

নিউ ইয়র্কে হাড্সন্ নদী যার জল বিশুদ্ধ করার বিরাট কর্মসূচী রূপায়িত হচ্ছে

বন্দোবস্ত ছিল। ১৮৬৯-৭০ সালের অনাবৃষ্টিজনিত জলাভাবের ফলে বোঝা গেল যে, মাত্র একটি জলনালী যথেষ্ট নয়। তখন ঐ রকম আরো একটি জলনালী ও জলাধার নির্মাণ করা হল। তারপর যখন বিংশ শতাব্দীর আবির্ভাব হল তখন শহরের জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাড়ে ৩৪ লক্ষের মত। সুতরাং পুরানো ব্যবস্থার পক্ষে অত লোকের জলের চাহিদা মেটানো অসম্ভব। দেড় শ' মাইল দূরে অবস্থিত ক্যাট্স্কিল গিরিমালা থেকে শুরু করে কতকগুলি জলবাঁধ, জলাধার ও সুড়ঙ্গের মত প্রণালীর জাল রচনা করে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা যখন হল তখন ১৯১৭ সাল। ১৯২৭ সালে শহরের জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো যখন দ্বিগুণ তখন সিভিল ইঞ্জিনীয়াররা আরো দেড় শ' মাইল দূরে গিয়ে ডিলাওয়ার নদীর উৎসের জল শহরে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করেন। ১৯৫০—৫১ সালে আবার অনাবৃষ্টি ও জলাভাব দেখা দিলে তাঁদের হাড্সন নদীর শরণ নিয়ে কতকগুলি পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ করতে হয়। কিন্তু হাডসন নদীর

জল দোষমুক্ত ছিল না। তার উপনদীগুলির ক্ষেত্রেও একই কথা। কারণ, ঐ নদীর ধারের বহু কলকারখানার আবর্জনা নদীর জলে গিয়ে মিশত। সেই সমস্যা প্রতিরোধের জন্য নিউইয়র্ক রাজ্য সরকার ১০০ কোটি ডলার বরাদ্দ করলেন নদীর ধারে সারি সারি আবর্জনা নিকাশ ও প্রোসেস করার কারখানা নির্মাণের জন্য। সেই কাজ এখনো চলেছে এবং আশা করা যায় অদূরভবিষ্যতে হাড্‌সনের জল বিশুদ্ধতা লাভ করবে। অন্যান্য নদীর ক্ষেত্রেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। যেমন মিসিসিপি ও মিসৌরী। এই সব নদীর জল এখনো আইন-নির্দিষ্ট বিশুদ্ধতার মানে পৌঁছায় নি।

সেই সঙ্গে নদীজলের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বিভিন্ন কলকারখানার কর্তৃপক্ষ ওহিও নদীতে ইস্পাতচুল্লির নল থেকে বার হওয়া ছাই নদীতে ফেলা বা নদীর ধারে গাদা করা বন্ধ করেছেন। একটি ইস্পাতের কোম্পানী ৫ লক্ষেরও বেশী ডলার খরচ করে এমন একটি কারখানা করেছেন যেখানে ঐ ছাই থেকে এত ইস্পাতের ধাতুকণা নিকাশ করা গিয়েছে যে, যা বেচে মুনাফা হয়েছে ৬ লক্ষ ডলারের কাছাকাছি অর্থাৎ কারখানা গড়ার

খরচ পুষিয়েও বেশ কিছু লাভ হয়েছে। টেক্সাসের এক রাসায়নিক কারখানা আগে বছরে লক্ষ টন অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ঐভাবে ফেলত। বর্তমানে দোষণ প্রতিরোধী ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে সেই বর্জিত পদার্থ থেকে বছরে যে ৫০ হাজার টন ক্লোরাইড উদ্ধার করা যাচ্ছে তা কাগজ শিল্পে ফটকিরির বিকল্প বস্তু হিসাবে বিক্রয় করা হচ্ছে। তেমনি আর একটি কারখানার বর্জ্য পদার্থ বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে প্রচুর খাদ্যপ্রাণ পাওয়া গিয়েছে যা আলাদা করে নিয়ে বাজারে বেচা যাবে। কোম্পানীটি এখন খাদ্যপ্রাণ উদ্ধারের দিকেই ঝোঁক দিয়েছে বেশী।

আরো দেখুন মদ চোলাই-এর কারখানার শুষ্কীকৃত পরিত্যক্ত পদার্থগুলি গবাদি পশুর পক্ষে উৎকৃষ্ট খাদ্য হতে পারে। সাল্‌ফাইট জাতীয় আবর্জনা আজকাল সুরাসার ও ভ্যানিলা উৎপাদনে এবং লেবুর খোসার রস গুড় উৎপাদনে ব্যবহার হচ্ছে. কর্নফ্লাওয়ার জাতীয় খাদ্যের কারখানার বর্জিত তরল পদার্থ থেকে তৈরি হচ্ছে পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, ঈস্ট ও খাদ্যপ্রাণ খ। সেইরকম কয়লার গুঁড়ো এবং তেল কারখানার আবর্জনার ট্যাংকে জমা জিনিসগুলি থেকেও অনেক কিছু উদ্ধার করা যেতে পারে। তারপর ধরুন বাল্টিমোরের পৌরসংস্থা দৈনিক ৫ কোটি টন শিল্পজাত আবর্জনা বেথ্‌লেহেম ইস্পাত কোম্পানীকে বিক্রয় করেন ইস্পাত উৎপাদনের কাজে শীতলীকরণে ব্যবহারের জন্য। শিকাগো, উইস্কন্‌সিন, মিচিগ্যান, ক্যালিফর্নিয়া, ওহিও প্রভৃতি শহরের শিল্পজাত ও অন্যান্য জল অশুদ্ধকারী বর্জিত পদার্থ থেকে উঁচু দরের সার তৈরি হচ্ছে যার ফলে লাভ হচ্ছে পয়সার দিক থেকে এবং চাষের জমি পাচ্ছে সারমাটি। বিশুদ্ধ জল সম্পর্কিত আইন ও জনচেতনার জন্যই এসব সম্ভব হয়েছে।

পানীয় জলের বিশুদ্ধকরণের জন্য বৈজ্ঞানিকরা গবেষণায় নিবিষ্ট রয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য দুটি—(১) জলের নির্বীজাণুকরণ; (২) বর্জিত পদার্থের অর্থনীতিক্ষেত্রে পুনর্ব্যবহার ও সেগুলি থেকে বহু প্রয়োজনীয় পদার্থ উৎপাদন।

আমেরিকার তিনজন বিজ্ঞানী হালে রজনের মত এমন এক পরিস্রাবক বস্তু আবিষ্কার করেছেন যা জলের মধ্যে কোন রোগের ভাইরাস থাকলে সেগুলিকে আটকে পরিস্রুত জল বার করে দেয়। তাঁদের লিখিত একটি রচনা ব্রিটিশ 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা সেণ্ট লুইসের মন্সাণ্টো কোম্পানীর লেবরেটরিতে সংক্রামক ন্যাবা রোগ নিয়ে কাজ করতে করতে এই পরিস্রাবক (ফিল্টার) বস্তুটির সন্ধান পান। তাঁদের নাম ডঃ ফীল্ডস, ডঃ জনসন ও ডঃ ডার্লিংটন। ঐ ফিল্টারের সাহায্যে তাঁরা তামাক ভাইরাস মুক্ত করেন ষোল আনা এবং পোলিও ভাইরাস ফিল্টারের ক্ষেত্রে শতকরা ৯৯·৯৯ ভাগ সফল হন। ডঃ ফীল্ডের মতে জলের যে কোন ভাইরাসের ক্ষেত্রে ঐ বস্তু দ্বারা ফিল্টার করা যেতে পারে এমন কি যেগুলি জল ফোটালেও মরে না সেগুলি পর্যন্ত। বস্তুটি পলিমার বিশেষ অর্থাৎ একই জাতের ছোট ছোট অণুর সমষ্টির ফলে উৎপন্ন বড় বড় অণু। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, বায়ু পরিষ্করণের জন্যও নিউ জার্সির ন্যাশন্যাল লেড্‌ কোম্পানীর টিটানিয়াম বিভাগে এক অতি সরল পরিস্রাবক যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে যা শিল্পজাত সমস্ত রকমের ময়লা ও দুষ্ট জিনিস ফিল্টার করতে সক্ষম হবে। যে কাজ অন্য কোন পদ্ধতির পক্ষে অসাধ্য। মার্কিন স্বাস্থ্য বিভাগের পারমাণবিক আন্তর্জাতিক কেন্দ্রেও এই সব কাজের নিত্য নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হচ্ছে। একটির নাম 'গলিত লবণ পদ্ধতি।' বাষ্পচালিত কারখানার চুল্লীর ধোঁয়ার মধ্যেকার সালফার ডায়ক্সাইড অপসারণ করা হয় ঐ পদ্ধতিতে। কারণ ঐ জিনিসটি বিশেষভাবে বায়ু দূষিত করে এবং আবহ-মণ্ডলে মিশে সালফিউরিক অ্যাসিডের জন্ম দেয় যার ফলে শ্বাসকষ্ট হয়, গাছপালার ক্ষতি হয় এবং বহু জিনিস ক্ষয় করে। এক রকমের গলিত খনিজ লবণের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে তাই থেকে উৎপন্ন হয় হাইড্রোজেন সাল্‌ফাইড এবং সালফার বা গন্ধক বা বাজারে বিক্রয় করা যাবে। ঢালাওভাবে উৎপাদন করতে পারলে যা মুনাফা হবে তা সামান্য নয়—কোটি কোটি ডলার।

ভারতবর্ষ অতুল প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী হয়েও এখনো গরীবের দেশ—তার সঙ্গতিও পর্যাপ্ত নয়। সেইজন্য আমেরিকার মত সমৃদ্ধ দেশ যা করছে তার অনেক কিছুই আমাদের পক্ষে করা সম্ভব না হলেও জল ও বায়ু, জীবনের এই দুটি অপরিহার্য উপাদানের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য অন্য দেশের গবেষণালব্ধ তথ্য শিখতে ও যেখানে সম্ভব প্রয়োগ করতে আমাদের হবেই। উপরে যা কিছু বলা হল তা থেকে বলা যায় যে, যন্ত্র সভ্যতা বিস্তারের আনুষঙ্গিক কুফল-গুলির সঙ্গে বহু সুফলও ফলে শুধু নয় সেই কুফলগুলিকেও সুফলে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

মনের পুতুল সাগরে

কুড়ি

বয়সে অপরিণত বলেই কে জি-র আরিস্টোক্র্যাট শ্যালী অনুভার কর্কশ ব্যবহারে বিস্মিত হয়েছিল এবং তার চেয়েও বিরক্ত হয়েছিল বেশী। অশিক্ষিত গ্রাম্য মহিলার সঙ্গে অনুভার সে কোন পার্থক্য খুঁজে পায়নি। এই সোসাইটি মহিলা কত না কেতাদুরস্ত, কত রুচিসম্মত তার ব্যবহার, কি মার্জিত ভাষা, অথচ সবই খসে পড়ল হিংসের জ্বালায়। সংসারে অভিজ্ঞ হলে ববি বুঝতে পারত অনুভা কোন ব্যতিক্রম নয়, চিরন্তন নারী-চরিত্রের প্রতীক। একজন মেয়ে আর একজন মেয়েকে সহ্য করতে পারে না যেমন সহ্য করতে পারে না সমধর্মী চুম্বক। সম্পর্কের কোন বালাই নেই সে শাশুড়ী বউ, ননদ, ভাজ, সপত্নী, জা—এমন কি সহোদরা বা মা, মেয়ে হোক না কেন, পরস্পর পরস্পরকে হিংসা করে। বাইরে থেকে বোঝা কঠিন, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, নারীচরিত্রের এ সহজাত ধর্ম। দ্রৌপদীকে নিয়ে পঞ্চপান্ডব সুখে ঘরকন্না করেছেন, গৃহবিবাদ করেননি, কিন্তু দ্রৌপদী সহ্য করতে পারেননি সুভদ্রাকে, নববিবাহিত অর্জুনকে শ্লেষবাণে বিদ্ধ করেছেন। পান্ডুজায়া মাদ্রী গান্ধারীকে শতপুত্রের জননী হতে দেখেও ঈর্ষান্বিতা হননি, কিন্তু সপত্নী কুন্তীর তিন পুত্রকে জন্মাতে দেখে হিংসায় তিনি ফেটে পড়েছেন। নারী যাকে ভালবাসে বা যাকে সম্পূর্ণভাবে পেতে চায়, সেই পুরুষের ভালবাসার এক ক্ষুদ্রাংশও অন্য কোন নারীর প্রতি যায়, তা সে সহ্য করতে পারে না। সেই নিয়েই তামাম দুনিয়ার শাশুড়ী-বউ-এর ঝগড়া, ননদ-ভাজের কলহ। কোন সতীনের ঘর করা যে নরক যন্ত্রণার শামিল, তার কাহিনী নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। আধুনিক যুগেও তার প্রকাশ সর্বত্র, নয়ত ব্যারিস্টার কে. জি-র স্ত্রী স্বেচ্ছায় নিজেকে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে কেন? তার মূলে হিংসা—কারণ সহোদরা অনুভা।

ছোটবেলা থেকে অনুভার চরিত্র ঐ একই ধরনের। যাকে আঁকড়ে ধরে, তাকে আর ছাড়ে না। বাবাকে সে ভালবাসত, কিন্তু সে ভালবাসা এতই একরোখা, এতই প্রবল যে, শেষ পর্যন্ত ওর বাবার দমবন্ধ হবার যোগাড় হয়েছিল। অন্য ছেলেমেয়েদের কাউকে তিনি কাছে ডাকতে পারেননি, অসুস্থ বাবাকে সারিয়ে তোলার জন্যে অনুভা তাঁকে নিয়ে যায় গিরিডিতে চেঞ্জে। সেইখানে মেয়ের জেদের শিকার হয়ে এক-রকম বিনা চিকিৎসায় ভদ্রলোক বেঘোরে প্রাণ হারালেন। সকলে বুঝল দোষ অনুভার, কিন্তু পরিষ্কার করে কেউ বলতে পারল না। একবার অনুযোগ করেছিল কে জি-র স্ত্রী, অনুভা, এ তোর উচিত হয়নি। যখন সামলাতে পারবি না, কেন বাবাকে নিয়ে গেলি?

অনুভার স্পষ্ট জবাব, বাবার জন্যে ভেবে যেন তোমরা ঘুমতে পারছিলে না। তোমাদের তো শুধু পার্টি আর সোসাইটি, বুড়ো মধ্যবিত্ত বাপের কথা ভাববার অবসর কোথায়? তবু আমি গিরিডিতে নিয়ে গিয়েছিলাম বলে শেষ কটা দিন শান্তিতে কেটেছে।

—এ শুধু তোর জেদ।

—আমি বাবাকে তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসতাম।

—সে তোর দম্ভ।

—বাবাও আমাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসত।

—সেই কথা ভেবে মনে সান্ত্বনা পা।

অনুভা রাগে ফুলতে থাকে, তাই নাকি! ঠিক আছে, দেখা যাবে। অনুভা সেদিন কি দেখে নেবে বলে শাসিয়েছিল, তার দিদি সেদিন বুঝতে পারেনি, কিন্তু হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারল বছর না ঘুরতেই। বাবা মারা যাবার পর ভাই-বোনরা সকলেই অবিবাহিতা অনুভাকে ডাকত তাদের বাড়িতে দিন কাটাবার জন্য।

অনুভা কিন্তু বেছে নিল ব্যারিস্টার কে জি-কে। মাসের বেশীর ভাগ দিনই কাটাত সেই বাড়িতে। হাসতে, গল্পে, ব্যবহারে সে মাতিয়ে রাখত কে জি-র সংসার, কে জি-র পার্টির অতিথিদের কাছে অনুভা হল প্রধান আকর্ষণ। অসহায় দিদি একদিন বুঝতে পারল অনুভা তার স্বামীকে আচ্ছন্ন করেছে। একদিন না বলে পারল না, অনু, কিছুদিনের জন্য তুই বরং দাদার কাছে যা।

অনুভা একটা ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করল, কেন?

—আমাদের ঘরোয়া জীবনে শান্তি নষ্ট হচ্ছে।

—আমার জন্যে নয়।

—তাহলেও আমি চাইছি না।

—বেশ তো, কে জি নিজের মুখে বলুক তবে আমি যাব।

সেই দিন থেকে অনুভার দিদি বুঝতে পারল, কেন বাবা মারা যাবার পর সে দেখা যাবে বলে চ্যালেঞ্জ করেছিল।

বাবার পর অনুভার শিকার হল কে জি। ক্রমশ নিজের অধিকার সেখানে পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠা করল। কিন্তু ইচ্ছে

করেই বিপত্নীক কে জিকে সে বিয়ে করেনি। কে জি অজে পক্ষাঘাতে পঙ্গু, চাকাওয়ালা চেয়ারে বসে ঘুরে বেড়ায়। অনুভা তাকে ত্যাগ করেনি। শাড়ী কিন্তু ওর সম্বন্ধে আর কোন আগ্রহও নেই।

এখন তার একমাত্র লক্ষ্য রবি। দুজন মেয়ের কবল থেকে সেই ছেলেটাকে ছিনিয়ে এনেছে। পয়সাওয়ালা বড়লোকের বউ রত্না কুমারী আর যৌবনের জোয়ার-ভরা টীন এজার মনুয়া, এইখানেই তার জয়। রবির উপর পূর্ণ অধিকারের স্বীকৃতি সে পেতে চায়, তারপর ঐ অর্বাচীন ছেলেটার উপর আর কোন আগ্রহ থাকবে কিনা বলা মুশকিল।

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্ দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।

•

রবি অনুভার ঘর থেকে একরকম না জানিয়েই পালিয়ে এল। অনুভার কাছে সে এসেছিল পরামর্শ করতে, ভেবেছিল মিঃ কুমারীর হাত থেকে বাঁচবার মতলব সে দেবে। কিন্তু তার বদলে অনুভার ভেতরকার নির্লজ্জ চেহারা দেখে নিজেই সে ভয়ে শিউরে উঠেছে। জীবনে কঠিন সমস্যার সামনে পড়লেই মানুষ বন্ধু খোঁজে—যার সঙ্গে আলোচনা করতে পারে। কিন্তু আজ সে কার কাছে যাবে? রত্না কুমারীর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই, সে নির্বোধ—এক বস্তা সেন্টিমেন্ট। মার সঙ্গে কথা বলেও কোন ফল পাওয়া যাবে না, কারণ, সেখানে স্বার্থ জড়িয়ে পড়েছে। মিঃ কুমারীর হাজার টাকা মাইনের টোপ গিলে বসে আছে। কথা বলতে গেলেই গলায় বঁড়শির টান পড়বে। অনুভার স্বরূপ তো সে জানতেই পেরেছে। তার সমবয়সী ছেলে বন্ধুরা আরও ছেলে-মানুষ, তারা শুধু নাচে আর মদ খায়। আর বাকি থাকে মনুয়া।

সোজা মে ফ্লাওয়ারে গিয়ে মনুয়ার সঙ্গেই দেখা করল রবি। সে তখন মোহন-চাঁদের টেবিলে বসে পাঁচজনের সঙ্গে গল্প করছিল। রবি তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আর এক কোনায় বসল, খুলে বলল মিঃ কুমারী আর অনুভার কথা অকপটে, কোন কথা গোপন না রেখে।

কিন্তু একটাও সমবেদনার কথা বেরল না মনুয়ার মুখ থেকে। নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে বলল, রবি, তুমি একটা গাধা। বলেছিলাম ঐ ডাইনীদের কাছে যেও না, এখন ওরা তোমার ঘাড় মটকাবে।

রবি তিরস্কার শুনতে চায়নি, নিজের মনেই বলে, এখন যে কি করি।

—কিছুদিনের জন্যে কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যাও।

—কোথায়?

যেখানে খুশী,... কিছুদিন গা-ঢাকা দাও। ঐ ডাইনী দুটো বাজার থেকে চুরিকাঁচি যোগাড় করুক, তারপর তুমি ফিরে এস।

—এতদিন বাইরে থাকব সে টাকাই বা কোথায়?

মনুয়ার বিস্ময়, কেন বুড়ী গাই-গুলোকে দুয়ে নিতে পারনি?

রবির সহজ উত্তর, সে তো মাকে দিয়ে দিয়েছি, সংসারের জন্যে।

মনুয়া পিংপং বলে চাপস্ মারার মত বলল, তোমার মাটাও একটা ডাইনী।

এইবার রবি ফিরে তাকাল মনুয়ার দিকে, ঐটুকু মেয়ে, ফুলের পাপড়ির মত সুন্দর, কিন্তু তারও চোখ দুটো জ্বলছে বাজপাখির মত। রবি এই প্রথম উপলব্ধি করল অনুভা, রত্না কুমারী, তার মা, মনুয়া, সবাই সমান। বয়সের হয়ত তফাত আছে, তফাত আছে অর্থের মর্যাদার, কিন্তু তারা চারজনই নারী—সকলেই কতগুলো জটিল স্নায়ুর সমষ্টি —এদের সকলেরই মূলধন ঈর্ষা।

রবি উঠে দাঁড়াল, আমি যাই।

—কোথায় যাচ্ছ?

—জানি না।

—আমার কথা শোন, তুমি যেখানে হোক চলে যাও। টাকা না থাকে আমি তোমায় যোগাড় করে দেব।

এও সেই চিরকেলে নারীর উক্তি, নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করাতে চায়। রবির আর কথা বলার ইচ্ছে করে না, বলে, জানা রইল, দরকার হলে বলব।

মে ফ্লাওয়ারের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল রবি। মনুয়ার মনে হল ছেলেটার বয়েস হঠাৎ যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। মনে মনে সে হাসল, সময় থাকতে ছেলেটা যদি তার কথা শুনত, অন্তত ঐ ডাইনী-গুলোর হাতে পড়ত না। যাকগে, কি হবে পরের কথা ভেবে! মনুয়া আবার মোহনচাঁদের টেবিলে ফিরে গেল। তাকে হাসতে হবে, গল্প করতে হবে, সেই-জন্যেই তো তার পাঁচ শ' টাকা মাইনের চাকরি।

রবি রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে ভেবে পেল না। তখনও সন্ধ্যা নামেনি, পার্ক স্ট্রীটের রাস্তায়, দোকানে সবেমাত্র আলো জ্বলতে শুরু করেছে, অফিস-ফেরত সাহেবদের গাড়ির ভিড় তখনও কমেনি। রবি উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে হাঁটতে মোড় পর্যন্ত এগিয়ে গেল। সামনে গান্ধীজীর স্ট্যাচু, জালের ঘেরাটোপের মধ্যে রোগা মানুষটা লাঠি ধরে দাঁড়িয়ে। স্থির অচঞ্চল প্রহরী, সদা-ব্যস্ত রাস্তার ওপর জাগ্রত দৃষ্টি রাখছে।

শিল্পীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে ব্রোঞ্জের মুখে তাঁর বেদনার প্রকাশ। তাঁর স্বপ্নের ভারতকে বাস্তবে রূপ দেওয়া গেল না ভেবেই বোধ হয় এই অনুশোচনা।

ববির কাছে গান্ধীজী অবশ্য বিশেষ কেউ নয়; কারণ, তার জন্মের আগেই গান্ধীজীর মৃত্যু হয়েছে। ছোটবেলা থেকে লক্ষ করেছে, ঐ মানুষটার ছবি ঘরে টাঙিয়ে সমাজের মাথাওয়ালা লোকেদের ভণ্ডামি। ছাত্রজীবন থেকেই ধারণা হয়েছে যারা মাথায় গান্ধী টুপি পরে, তারা ব্ল্যাকমার্কেটীয়ার। নিজের হাতে সুতো কেটে স্বাধীনতার পর থেকে কেউ আর খদ্দর পরে না। সবাই বাজার থেকে কিনে আনে। খদ্দর আর মিটিংকা কাপড়া নয়, রীতিমত রাজবেশ। মর্যাদা অনুযায়ী দামও বেড়েছে, মিহি খদ্দরের ধুতি, শাড়ি পাঞ্জাবী ধনী ছাড়া কারুর পরবার সামর্থ্য নেই। সেই করণেই ববিদের কাছে খদ্দর কোন দিনই শ্রদ্ধার আসন পায়নি। গান্ধীজীকে বোঝবার সুযোগ পায়নি ববিদের বয়সী ছেলেরা। দোষ তাদের নয়, দোষ মহাত্মার ভাব-শিষ্যদের, যারা চিরকাল গান্ধীজীর নামে কপালে হাত ছুঁয়ে প্রণাম করল, কিন্তু তাঁর দর্শনের ব্যাখ্যা করল না। পাছে নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগে। তাই না দেশের এই দুর্দশা।

ববিকে অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটি পায়জামা-পরা লোক কাছে এগিয়ে গিয়ে কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, গার্ল স্যার, ফ্রেশ ফ্রম দি কলেজ, কলেজ কি ছোকরি, বিশ রুপেয়া। আইয়ে হামার সাথ।

ববি বিরক্ত হয়, আঃ, ভাগো।

—বহুত খুবসুরত। ফটো দেখিয়ে, ফটো।

—শাট আপ্! ববি আবার পেছন ফিরে পার্ক স্ট্রীটেই ঢুকে পড়ে। কলকাতার শহরের এইটেই তার সবচেয়ে পরিচিত রাস্তা। আজকে মন যখন ভারী, যাবার কোন জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না, কোথায় আর পথে পথে ঘুরে বেড়াবে! তাই ঢুকে পড়ল একটা পরিচিত বারে। বেশী সময়ের ব্যবধান না দিয়ে খান চারেক বড় পেগ দিশী হুইস্কি প্রচুর বরফ আর সোডা দিয়ে খেল।

নেশা যত বাড়ে যুক্তির গিঁট তত আলগা হয়। এতক্ষণ ববির মনে হচ্ছিল না বলে কয়ে বিপদের যে ঝড় উঠেছে তার জীবনে তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। চারদিকেই যেন কয়লো জমাট অন্ধকার। কিন্তু নেশার ফলে অন্ধকারের মধ্যে একে একে তারা ফুটল। এমন কি ধীরে ধীরে চাঁদও উঠল।

হুইস্কি আরও হুইস্কি। আর সোডা নয়, শুধু বরফের টুকরো। গিলতে গিয়ে গলা জ্বলছে কিন্তু বুক জ্বলছে না। সেখানে ঠাণ্ডা আমেজ। চাঁদের আলোর মতই ঠাণ্ডা, নরম।

চিন্তার প্রবাহকে যদি বাধা দেওয়া না হয় শেষ পর্যন্ত তার খেই খুঁজে পাওয়া যায় না। নরমের অনুভূতি থেকেই বোধ হয় ববির মনে হল ডানলোপিলোর নরম বিছানার কথা। ঐ বিছানায় শুলে সহজে ঘুম ভাঙতে চায় না। কত বেলা গড়িয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল দার্জিলিং-এর কথা, পাহাড়ী রাজ্যে বেলা বয়ে গেলেও বোঝা যায় না, সারাদিনই একটা মেঘলা আবহাওয়া। ঝির ঝিরে বৃষ্টি পড়ে, আবার শীতকালে তুষার, সাদা সাদা নরম পাখির পালকের মত ধুনুরীতে ভাঁজা পেঁজা তুলোর মত, তার ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যাওয়া। চারপাশে লোকজনের সংখ্যা খুব কম, এক একজোড়া মেয়ে পুরুষ। চিন্তার জগতে ববি নিজেকে দেখতে পেল, পাশে একটা

গরম মেয়ে। মুখটা ঝাপসা। মনের কাচে ওয়াইপার চালাতেই ফুটে উঠল রত্না কুশারীর মুখ, ক'টা দিন ভীষণ হইচই করে কেটেছিল, ঐ ঠাণ্ডায়, ঐ দার্জিলিং-এ ঐ গরম মেয়ে নিয়ে।

ম্যানেজার এসে পাশে দাঁড়াতেই ববি মুখ তুলে তাকাল।

—শরীর ঠিক আছে তো?

ববি আশ্চর্য হয়, কেন আমার কি হয়েছে?

—না, এমনি জিজ্ঞেস করছি।

ববি বলল, কত বিল হয়েছে জানি না, তবে আমার কাছে বেশী টাকা নেই।

—সে ঠিক আছে, আজ সই করে দিলেই হবে।

—ধন্যবাদ, বলে ববি দাঁড়াতে গেল, কিন্তু পারলো না, মাথাটা টলছে। পা ফেলতে ভয় পেল, যদি সেটাও টলে, লোকে মাতাল ভাববে। হাসবার চেষ্টা করল, বোধ হয় বেশী পান করেছি। একটা ট্যাক্সি ডেকে দিলে ভাল হয়।

ম্যানেজার ববির পরিচিত লোক, নিজেই ধরাধরি করে ট্যাক্সিতে তুলে দিল। কোন-রকমে একটা ঠিকানা বলে পেছনের সিটে এলিয়ে পড়ল ববি। ঠাণ্ডা হাওয়া পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল।

একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ড্রাইভার ববিকে ডেকে দিল, নামুন, ঘর এসে গেছে।

ট্যাক্সি থেকে নেমে ববি ভাড়া চুকিয়ে দিল। এ কোথায় নামল সে, এ তো তার বাড়ি নয়! গেটে রত্না কুশারীর দরোয়ান সেলাম করে ববিকে আপ্যায়িত করে। ববি কিছুতেই মনে করতে পারে না এখানে সে এল কেন। ঐ ট্যাক্সি ড্রাইভারটা কি মিঃ কুশারীর ভাড়া করা লোক? না, ঐ বার ম্যানেজারটা ওর সঙ্গে বদমাইশি করেছে? একবারও ববির মনে পড়ল না রত্না কুশারীর ঠিকানা সে নিজেই দিয়েছে ড্রাইভারকে। প্রথমটা ইতস্তত করলেও পরে দরোয়ানের সাহায্যে ববি আস্তে আস্তে দোতলায় উঠল। রত্না কুশারী বিছানায় শুয়ে, ঘরে একটা নীল আলো। দরোয়ান ফিস ফিস করে জানাল, মেম সাহেবের শরীর খুব খারাপ। ববি তাকে বিদায় দিয়ে রত্না কুশারীর বিছানায় গিয়ে বসল। কপালে হাত দিতেই চোখ মেলে তাকাল রত্না, ভয়-মাখা সে চাহনি, শুধু বলল, তুমি এসেছ!

দু' চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল ভদ্র-মহিলার।

ববি জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে তোমার?

—জানি না, শুধু মরে যেতে ইচ্ছে করছে, আমি সুইসাইড করতে চাই।

—আঃ, কি আজেবাজে বকছ!

রত্না কুশারী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, কার জন্যে বেঁচে থাকব, কেউ তো আমাকে চায় না। আমি মরে গেলে তোমরা সবাই খুশী হবে। তুমি, মিঃ কুশারী—

ববি বোঝাবার চেষ্টা করে, এ তোমার ভুল ধারণা, আমি তোমাকে ভালবাসি।

রত্না ববির হাতটা নিজের বুকের ওপর টেনে নিয়ে বলে, আমি তোমায় কষ্ট দিতে চাই না। যাকে তোমার ভাল লাগে তার কাছেই যাও—অনুভা, মনুয়া, আমার কোন আপত্তি নেই। তবে আমার কাছেও এস। কারণ, আমার কেউ নেই, আমি বড় একা।

নেশার ঝোঁকে ববি কথা দেয়, শুধু আসব না রত্না, আমি তোমার কাছেই থাকব। অনুভা, মনুয়া, এদের সঙ্গে মেশাও আমার দরকার ছিল। আমি এখন বুঝে ফেলেছি, ওরা কত ছোট। তুমি অনেক বড় রত্না, তোমার হৃদয় আছে, তুমি মানুষকে ভাল-বাসতে জান। দুর্ভাগ্য মিঃ কুশারীর, সে তোমাকে বুঝতে পারে নি।

রত্না কুশারী সদ্য-বিধবার মত হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল, জিজ্ঞেস করল, ববি, তুমি সত্যি কথা বলছ?

—সত্যি বলছি।

—তুমি আমায় ভালবাস?

—বাসি।

রত্না কুশারী বিছানার উপর উঠে বসে, আমার শরীর খুব খারাপ জানো? এই ক'দিনে শরীরের ওপর বড় অত্যাচার করেছি। আত্মহত্যা করব বলেই বোতলের পর বোতল মদ খেয়েছি। কয়েকদিন আমাকে নিয়ে দার্জিলিং-এ যাবে? সেই দার্জিলিং—

আর বলতে হল না, ববিরও উচ্ছ্বাস পেয়ে বসল, তুমি বললে বিশ্বাস করবে না রত্না, আমিও বারে বসে দার্জিলিং-এর স্বপ্ন দেখছিলাম। চল ক'দিন ঘুরে আসি, আমারও রেস্ট দরকার।

রত্না কুশারী ববিকে একেবারে কাছে টেনে নিল, আমি ভাবতে পারছি না ববি, এটা সত্যি না স্বপ্ন। ক'দিন পাগলের মত তোমায় খুঁজেছি, আজ তুমি আমার পাশে বসে। তুমি বলেছ আমাকে দার্জিলিং-এ নিয়ে যাবে, এই যথেষ্ট। আঃ, আমার সমস্ত জ্বালা তুমি জুড়িয়ে দিলে, আমি বাঁচতে চাই ববি, মরতে আমার বড় ভয়।

ববিরও চোখে জল আসে, কে তোমাকে মরতে দিচ্ছে! দার্জিলিং-এ গিয়ে আমরা নতুন প্ল্যান করব, কলকাতায় ফিরে এসে নতুন জীবন শুরু করব, নতুন কাজ, নতুন স্বপ্ন।

দুজনেই মাতাল। এ স্বপ্ন, এ প্রতিশ্রুতির কি দাম, কে বলতে পারে? তবু এ মুহূর্তটা সর্বহারা ধনী রত্না কুশারীর জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

(ক্রমশ)

দিল্লির ডায়েরি

প্রদর্শনী? দেখবার ও দেখাবার? অতি প্রাচীন, অতি আধুনিক, তা দর্শনী থাকুক কি না থাকুক। আজকাল দর্শনী না দিয়ে প্রদর্শনীর দর্শন শাস্ত্রই বেশী চালু, তাতে লোক হয় বেশী, দ্রষ্টব্য থাকুক কি না থাকুক।

খুব চট করে আমার বিষয়ে আসছি না, প্রয়োজন নেই। সেই ধরুন ভাবী বরের মা ও বন্ধু এসেছে ভাবী কনের প্রদর্শনীতে: "মা একবার হাঁটো তো? চুলটা খুলে দাও। বাঃ, চমৎকার! মা-টি! শুক্তো রান্না জানো কি?"

আরো কতো প্রদর্শনী। চিত্রজগতের

একটি দেহাতি শিশু

কথা ছেড়েই দিলাম। ঠোঁটে রঙ মাখা দেহ-প্রদর্শনী, শাড়ি-জোড়া নারী, কৃষ্ণচূড়া গাছে এক মাথা আগুনে আগুনে ফুল, রূপসীদের প্রদর্শনী অশোকা হোটেলে, শাড়িকাপড়, বাটিক, হস্তশিল্প, কাঁথা প্রদর্শনী, বোবি প্রদর্শনী, প্রজাতন্ত্র দিবস প্রদর্শনী, কুস্তি ও মাসল্ প্রদর্শনী,—গোটা বাঁচাই যেন প্রদর্শনী।

এমনি প্রদর্শনী দর্শন শাস্ত্রের একটা অত্যাধুনিক অধ্যায় এবার খুলেছে এখানকার মনোরম রবীন্দ্র ভবনে। খুব ভারিক্কি নাম, শুনলেই ইচ্ছা হয় গেয়ে উঠি, 'জনগণমন অধিনায়ক হে,—"ভারত,—দেশ ও তার লোক"। মস্ত বড় ফটো দিয়ে সাজানো প্রদর্শনী, ঘুরে ঘুরে অনেকবার দেখলেও আরো দেখতে ইচ্ছা করে, একটা জানাশোনা জগৎকে কে বা কারা যন্ত্র-দৌলতে ধরে রেখেছে ফটোর কাগজে। অনেকগুলো ছবি। ভারতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ফটো-গ্রাফারের তোলা ছবি, ইউনিয়ন কারবাইড কোম্পানীর সৌজন্যে (টুরিজম বিভাগের সাহচর্যে)।

ইংরিজী কবি লংফেলোকে উদ্ধৃত করে তাঁরা জানাচ্ছেন: "দেশ যেন কবিতা-গাথা; শহর নাটকীয়; একত্রে তারা যেন অতি চমৎকার একটি গীতি-নাট্য", ভারতের নানা ধরনের নরনারীর ছবি, নানা দিকে তুলেছেন: আমেদ আলি, সৈয়দ, অমলেন্দু সেন, অমিয় তরফদার, অশ্বীন মেহতা। অশ্বীন গাথা, হোমি খারাস, মিস্তর বেদি, মানো মিত্র, বিজয়াকাত, চিনওয়ালা, কৃষ্ণন, আসাদ ও সুনীল জানা। অতি প্রশংসনীয় তাঁদের হাতের কাজ, তাঁদের সূক্ষ্ম শিল্প-দৃষ্টি যন্ত্রের মাধ্যমে।

জানা জগতের প্রদর্শনী। মহৎ জগৎকে ছোট্ট জায়গায় তার প্রতিলিপি প্রতিকৃতি যেন আসল জগতের বস্তু থেকে আরো বেশী ভাল লাগে। বাস্তব জগতে আমরা হয়তো সামগ্রিকভাবে খুব কমই দেখতে পারি, তাই ফটোগ্রাফে দেখলে ঐ একই জিনিস আরো ভালো লাগে। এমন কি নিজের ছবিও।

এই অসামান্য প্রদর্শনীটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত: দেশ ও জনগণ, কাজ, অবসর যাপন, শিশুরা ও শিল্প-কারখানা। শুরুতেই লংফেলোর খাটো কবিতা, আর তারপর আরম্ভ মুখের দেহের মানুষের মিছিল, যার ভিতর আমি-আপনি হয়তো হঠাৎ খাপ খাবো না, কিন্তু যা আমার আপনার একান্ত জগৎ, দেশের মানুষ-জগত।

মাঝে মাঝে ছাপানো উদ্ধৃতি ডলতেয়ার থেকে, ভারত সরকারের তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক যোজনা থেকে। "দেশ আমার সেইখানে যেখানে আমার হৃদয়" (ভল-তেয়ার); "আমি যদি কাজ না করি, গোটা জগৎ হবে বিনষ্ট" (ভগবদ্গীতা); "অবসর-যাপন হল প্রেমের পারিতোষিক" (জন্ রে); "স্বাধীনতা স্বপ্নের মতো এই পঞ্চ-বার্ষিকী যোজনার পরিকল্পনা,"—ইত্যাদি। কথার চাইতে ছবি ভাল।

দার্জিলিং-এ যাওয়ার প্যাঁচানো পাহাড়ে রেল পথ। কাশ্মীরের অমরনাথে যাওয়ার বরফ রাস্তার শাদা-কালো; আসামের কামাখ্যামন্দিরের গম্বুজ (যেখানে মানুষকে ভেড়া বানিয়ে রাখা হত—বানানোর কী প্রয়োজন জানি না); একটি চমৎকার কাশ্মীরী যুবতীর মুখ; মনিপুরের বৈষ্ণব রমণীরা, ঠোঁটে একটু হাসি; কলসী

উপজাতীয় মেয়েদের নাচ

মাথায় রাজস্থানী মেয়েরা, গর্বভরা নাগা যুবকের মুখ, বানারসের ঘাট, হাটবাজার, বাঙলার কৃষক, আরো কতো।

দেখলাম ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরা অনেক স্থানে উপজাতীয়দের দিকে তাক্ করা। উপজাতীয় পার্বত্য মেয়েদের দেহের নিরাবরণ দিকে। এরা সহজ সরল মানুষ। এখনো রাষ্ট্রজীয় সভ্যতার পর্যায়ে আসেনি,

আর তাই শহুরে লোকদের তাক্ তাক্ লোভী দৃষ্টি। সাঁওতাল, মুরিয়া, মহারাষ্ট্রের ওয়রলি, মধ্যপ্রদেশের ভীল। ক্যামেরার চক্ষু নূতন-অন্বেষী এবং সন্ধান কাজটিতে খুব পরিশ্রম করতে হয় না, কিন্তু ভারতের মধ্যবিত্ত সমাজের আবরণ-আভরণ জগতের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বেশ বাহবা পেয়ে যায়। সস্তায়। কিস্তি। ছবি যদিও ভাল—তেমনি একটি পার্বত্য কিশোরীর দুই হাটুতে ধরা একটি আদরের অজ-শাবক।

এই বিভাগে আমাদের শহর-সভ্যতা প্রায় নেই বললে চলে। ওটা হয়তো মেকী ভারত-কিংবা, কি জানি কী। থাকলে ভাল লাগতো বইকি।

তারপর "ওরা কাজ করে"। জাল দিয়ে

হাতের কাজ

মাছ ধরা, ক্ষেতের কাজ, কামার, কুমোর, সেচের জল দেওয়া, চা বাগান, কেরলের ধানক্ষেত। কাঁধে কাঠের বোঝা গায়ে ঘাম, কাঠি দিয়ে কান-সাফ করা, কত্তো কিছু। কিন্তু এখানেও অনুপস্থিত দেশের মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত মানুষের কাজ, তাদের কাজ যেন কাজই নয়। যদিও হঠাৎ করে আছে তিনটি ছবি, সবগুলো রাসায়নিক গবেষণা নিয়ে, ঐ টেস্ট টিউব, বুনসেন্ বার্নার।

অতঃপর অবসর যাপন, কাজের পারিতোষিক হিসেবে। অনেক লোকনৃত্য, দোকানে চা-খাওয়া, গাছের ছায়ায় কল্কে তামাক খাওয়া, সমুদ্রের ধারে শান্তা রাও-এর "ভারতনাট্যম" (সপ্রু হাউসে মোটেই নয়), ফুটবল খেলা, তাস খেলা, ঝাঁকাতে বসা কুলি-মজুর, "কবডি জবালানো," একটি "বাও মা—সামনে ন্যাংটো ছেলেটা—মা লেস্ বুনছে, শান্তিনিকেতনের নাচ, ঘুড়ি ওড়ানো এবং উরু-উদর প্রদর্শনময়ী লাস্য-ভরা নাইট ক্লাব নর্তকী।

হ্যাঁ, ভুললে চলবে না। এই অবসর যাপন বিভাগে আছে একটি বিস্ময়কর জিনিস: বিবাহ। বিয়ের প্রথম কয়েক মাস হয়তো অবসর বিনোদনই চলে, কিন্তু বিয়েটা যেন ঠিক ঐ বিভাগের জন্যে নয়। যেমনি নয় মসজিদের নমাজ ও গুরু নানকের মিছিল, গঙ্গাস্নান।

শিশুচিত্র বিভাগটি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। একটি ছবির কথা বলব। বাচ্চা দেহাতী মেয়ে বাঁকানো গাছ ডালের নিচে ঘুণ্টন ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে। বড় মায়া লাগে দেখতে। যেন বাবার জন্যে রাস্তায় অপেক্ষা করছে, ছোট মুখখানায় দুশ্চিন্তা। অনেক সমাজ-স্তরের বাচ্চারা স্থান পেয়েছে, ধনী দরিদ্র, উঁচু নিচু, হাসি কান্না অভাব প্রাচুর্য, সব স্তর। খুবই ভাল সিলেকশন।

সুইনবার্নের উদ্ধৃতি ভাল: "যেখানে শিশু নেই, স্বর্গ নেই সেইখানে"। দুঃখের কথা এই, ভারতে সব শিশুর বাস্তব জগৎ স্বর্গীয় নয়।

খগেন দেওয়ানজী

প্যারিসের চিঠি

হেমেন্দ্র মৈত্র মশাইয়ের প্রাতঃস্মরণীয় উক্তি "জানি, কিন্তু বলব না" আমার মনে যথেষ্ট দ্বিধার সঞ্চার করছে। কারণ, যদিও 'প্যারিস থেকে' শিরোনামায় এই চিঠি লিখছি, সত্যি বলতে কি আমি এখন প্যারী-তে নেই। কথাটা হেঁয়ালির মতো লাগছে? গেছোদাদা কোথায় কোথায় নেই আগে জানা দরকার ব'লে মনে হচ্ছে?

শুনুন তা হলে। আমি এখন মিউনিকের থ্রি উটেনভোল্‌ফ্‌স্ট্রাসের দুই নম্বর বাড়ির পাঁচতলার এক ঘরে ব'সে নির্ভেজাল জার্মান মতে ফ্রু-স্টুক (ফরাসী-দের প্যাতি-দেজ্যনে বা ভূষণবাবুর ভাষায় "পতি-দুজনে" বা ইংরেজদের ব্রেকফাস্ট বা আমাদের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছোটা-হাজরি) পর্ব শেষ ক'রে ব্যাভারিয়ান লোক-সংগীত শুনতে শুনতে দেশের কথা ভাবছি। প্রাতঃকাল না হলে প্রাতঃস্মরণীয় উক্তির উল্লেখ করতাম না, হলফ ক'রে বলা দুরূহ। তবে আজ প্রাতে যার জন্যেই সূর্য ওঠা সফল হোক না কেন, মুান্‌শেনের এই আকাশ দেখে, কুলোয় ছেটানো ছাইয়ের কাঁচের মতো ছোট-বড় বরফের চাকলায় উড়ে বেড়ানো লক্ষ ক'রে "মলিন হাতে ছুঁয়েছে সে ছুঁয়েছে সব ঠাঁই। পাগল মেয়ের জ্বালায় পরিচ্ছন্ন 'কিছুই নাই'" বারে বারে কানে বাজছে। বেশ ক'দিন হ'ল এখানে এসেছি: ফরাসী ললনা আর জার্মান দুহিতাদের আচার-ব্যবহার চলন-বলন যথেষ্ট তুলনা করবার অবসর পেয়েছি, পারীসিয়াদের প্রসাধিত হাসির পাশে এদের হঠাৎ হাসির চমক দেখে মুগ্ধ হয়েছি; কিন্তু এমন পাগল মেয়ে যে এ মুল্লুকে ছিল আগে জানতাম না।

গোচর-বহির্ভূত বহু অজানার সঙ্গে আমার পরিচয়-সাধনের জন্য যে রসিক আমার দীর্ঘ দেড় যুগের অভ্যস্ত অভ্যন্তর থেকে টেনে বার করেছেন, তাঁর নতুন খেয়ালের কথা বলি। অর্থাৎ—

ফরাসী বেতার-কিতাবের 'ক্লাস-আতের' অনুষ্ঠানে দিন না একুশে মার্চ এ দেশের গোপাল ভাঁড় যখন ঘোষণা করলেন যে, বসন্ত জাগ্রত দ্বারে, আমি তখন দক্ষিণ প্যারী-তে আমার ঘরে ব'সে বিস্ফোত (উত্তর মেরু বিস্কুট) চিবোচ্ছি আর পড়াশুনো করছি একটানা ক'দিন। তারই ফাঁকে ফাঁকে আমার নজরে পড়ছে উত্তরোত্তর অরুপণ আকাশের তেঁতুল-মাজা চেহারা। একটা মোটা রকম নুরোত্থায় পৌঁছেছি বাইশে, এমন সময় চৌধুরী মশায়ের ফোন এল, "মনে আছে তো?"— ওঁর পুত্রের প্রথম জন্মদিন উপলক্ষে বেশ কিছু ভারতীয় ও ভারতপ্রেমিক ফরাসী-দের সমাবেশ হয়েছিল সেদিন ওঁর ফ্ল্যাটে; সেখান থেকে রাতে বাড়ি ফিরছি, সাক্লাক মেট্রো স্টেশনের মোড়ে দেখা হ'ল আল-ফন্সোর সঙ্গে।

"আরে, পুংভিন্দ্রা, তোকেই খুঁজছি।"

"হঠাৎ?"

"পাক্‌ (ইস্টার)-এর ছুটিতে কোথাও যাচ্ছিস?"

"কিছু ঠিক করিনি—"

"ব্রে বিয়ে" (দে গরুর গা ধুইয়ে)—"

"সেজাদির? (এক্সপ্লেন উইথ রেফারেন্স টু দি কনটেক্সট)"

আলফন্সোর দেশ পেরু-তে। ডাক্তারি পাস করে এখন প্যারী-তে রয়েছে সঙ্গীতের উচ্চশিক্ষার বৃত্তি নিয়ে। চেলো বাজায়। বিখ্যাত ফরাসী সুরশিল্পী আঁদ্রে নাভারা-র ছাত্র। ওর ঠাকুর্দা ছিলেন আমীর মানুষ এবং ভাল চেলো বাজাতেন। ওর বাবাও ওকালতি থেকে অবসর নিয়ে এখন চেলো বাজান। তস্য পুত্র আলফন্সো মস্কেলিনকস জ চেলো বাজাবে না, এ-কথা অকল্পনীয়। আলফন্সো আমার বলল যে, সন্ধ্যাবেলা মার্চ সন্ধ্যাবেলা ওর লাল টুক-টুকে ফোক্‌স্‌-ভাগন্‌ (Volks-Wagen)-এ সওয়ার হয়ে প্যারী-র পূর্বী দরওয়াজা পার হয়ে ও উধাও হচ্ছে জার্মানী অভিমুখে, একা। আমি যদি চাই, ওকে সঙ্গ দিতে পারি।

মিউনিকে ওর বোন কাতিনা থাকে; ছবি আঁকে কাতিনা। তার সঙ্গে আলাপ করবার ও করাবার ঔভয়িক বাসনা আমা-দের দুই বন্ধুর মধ্যে বহুকাল প্রবল। সে-সম্ভাবনা এমন হুট ক'রে দেখা দেবে তাই-বা কে জানত।

আমতা আমতা করছি। বেপরোয়া আলফন্সো বলল, "অত কথা জানি নে, ভায়া। ছাব্বিশে রাত এগারোটার সময় আমি ঘুমুব; তার আগে পর্যন্ত সময় দিলাম—যা স্থির হয় জানিও। বন্‌ ন্যুই (গুড্‌ নাইট্‌)!"

আলফন্সো খানিক গিয়ে আবার ফিরে এল।

"জার্মানী যাচ্ছি বিশেষ কারণে।"

"কাতিনার সঙ্গে দেখা করতে?"

"না। পয়লা ও দোসরা এপ্রিল রস্ত্রোপভিচ্‌-এর বাজনা আছে মুন্সেনে-এ। আমি জানি তুমি রস্ত্রোপভিচের ভক্ত।"

শুধু আমি কেন। পাবলো কাসাল্‌সের পরেই জীবিত চেলো-শিল্পীদের পুরো-ভাগে স্থান রস্ত্রোপভিচের। গত বছরে আমাদের চিলীয়ান বন্ধু খর্‌খে রোমান্‌-এর মুখে কত শুনেছি রস্ত্রোপভিচের কথা। খর্‌খে (Jorge) চেলো বাজালেও পেশায় ডেন্টিস্ট; রস্ত্রোপভিচ চিলী গিয়ে একবার দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন জেনে খর্‌খে বিনামূল্যে তাঁর চিকিৎসা ক'রে তাঁর দাঁত বাঁধিয়ে দেয়। রস্ত্রোপভিচকে সেই সূত্রে ও ঘনিষ্ঠভাবে জেনে।

পরিচিতি: (বাঁ দিক থেকে ডানদিকে): ১—কাতিনা; ২—বিখ্যাত ফরাসী চেলো শিল্পী আঁদ্রে নাভারা; ২—আলফন্সো

বয়সে বেশীদিন চল্লিশের কোঠায় পা না দিলেও রস্ট্রোপভিচ যন্ত্রশিল্পী-রূপে সত্যিই বিস্ময়কর খ্যাতির অধিকারী। ১৯৬০ সালে গ্রীসে ভ্রমণকালে ইংরেজ সুরস্রষ্টা বেঞ্জামিন ব্রিটেন 'সোনাটা ইন সি ফর চেলো অ্যান্ড পিয়ানো' রচনা করেন রস্ট্রোপভিচের শিল্পের প্রতি সশ্রদ্ধ অনুরাগ নিয়ে এবং তাঁকেই উৎসর্গ করেন এই কম্পোজিশনটি। আরো আনন্দের কথা: গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্য স্বয়ং ব্রিটেন পিয়ানো এবং রস্ট্রোপভিচ চেলো বাজান এই সোনাটাতে।

গত দেড় বছরের মধ্যে কত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আনাগোনা করেছেন পারী-তে, কিন্তু রস্ট্রোপভিচ কখনো আসেন নি।

এ-হেন শিল্পীর বাজনা শুনতে পাব সামনে বসে, আমার নিজের কানকে অবিশ্বাস করবার হেতু না থাকলেও কেমন যেন সংশয় থেকে যাচ্ছিল।

"তা হলে কথা রইল, ছাব্বিশে আমায় ফোনে জানিয়ে দিচ্ছিস, যাবি কিনা। রাজী? বন্ ন্যুই!" আলফন্সো বলল।

আমি নীরব। যে যার পথে পা বাড়ালাম।

যাব, কি যাব না—ভাবতে ভাবতে ছাব্বিশে দুপুর গড়িয়ে গেল। আমাদের গ্রীক বন্ধু আন্দ্রেয়াস সাসালস জিজ্ঞেস করল, "কাল তা হলে জার্মানী যাচ্ছ?" কথাটা শুনে বুঝলাম যে, আলফন্সো ধরে নিয়েছে আমি যাবই। অগত্যা বার হলাম পুলিস বিভাগ থেকে দেশত্যাগের ও প্রত্যাবর্তনের অনুমতি সংগ্রহ করতে: সাড়ে সাত ফ্রাঁ খরচ ক'রে অনুমতি পকেটস্থ হ'ল।

অতঃপর আলফন্সোকে ফোন করা, প্রায় ভুলে যাওয়া জার্মান ভাষার দু'-চার পাতা উলটে-পালটে দেখে নেওয়া, এবং সাতাশে সকালে পথে নামা।

ফ্রান্সের পূর্ব অঞ্চলের দিকে এই প্রথম পদক্ষেপ। সেইন নদীর এলাকা পার হয়ে মার্ন নদীর কোল ঘেঁষে অটোরুট চলেছে: এপের্নে, শাল, ভিত্রি প্রভৃতি ছোট ছোট শহর পেছনে ফেলে বেলা দুটো নাগাদ নাঁসী-র কাছাকাছি পৌঁছলাম।

মোজেল নদীর পুল দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। চোখে পড়ল বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষারত ফরাসী একদল তরুণ মার্চ করতে করতে মাঠে যাচ্ছে। মনে পড়ল, আমার বন্ধু পিয়ের ক' বছর আগে এখানে এমনি এক ক্যাম্প থেকে চিঠি লিখত; ইউনি-ফর্ম, বন্দুক, ট্রেঞ্চ—এসবের প্রতি তার বিরাগ আমার চেয়েও গভীর। কারণ, সে প্রত্যক্ষদর্শী।

পারী-তে আমরা যে নুন খাই, তার অনেকটা আসে দ'বাল হ্রদ থেকে। আলফন্সো চশমার আড়ালে চোখ মুছে আমায় বলল, "দূরে ওগুলো কি চকচক করছে বলতো? মরীচিকা দেখছি নাকি?"—প্রখর রোদ। আমিও ভাল করে চশমা উঁচিয়ে নিতে নিতে দেখি পথের ধারে লেখা আছে, দ'বাল। নীল আকাশের নিচে এমন সাদা ও নীলের শোভা পারী-র দীর্ঘ শীতে অভ্যস্ত চোখ আমাদের ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল।

বিকেল পাঁচটার পরে স্ত্রাসবুর্গ। সীমান্তে পাসপোর্ট প্রভৃতির পরীক্ষা, শ' ফ্রাঁ পিছু আশি মার্ক করে মুদ্রা বিনিময়, কাত্রিনাকে ফোন করে জানানো যে আমরা জার্মান মাটিতে গাড়ির চাকা চালিয়ে চলেছি।

জার্মান আটোবান আর ফরাসী অটো-রুটের পার্থক্য দুটো জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের স্পষ্ট পরিচায়ক। ফরাসীরা শৃঙ্খলার দিক থেকে বাঙালী মেজাজের কাছাকাছি। ফ্রান্সের অটোরুটে তাই স্টিয়ারিংধারীর অপ্রসন্ন (কথাটা মোলায়েম মনে হতে পারে ভুক্তভোগীদের কাছে) দৃষ্টি-ক্ষেপ ক্ষুদে মঙ্গলবারের শামিল নয়। সেই সঙ্গে সুশ্রাব্য 'ম্যাদ' (কাঁচা শী—) সম্ভাষণ যত ঘনঘন শোনা যায়, সে তুলনায় মের্সেদেস আরোহী জার্মানের 'শাইসে' দুর্লভ; বোধ হয় শ্রুতিমাধুর্যের হীনতা এর কারণ। না, আমি ডিকশনারি অব স্ল্যাং রচনা করতে বসিনি। কাজেই ও আলোচনায় বিরতি এবার।

রাইন নদী অতিক্রম করে কেল-এর দিকে সবে গাড়ি ঘুরেছে ফুরফুরে হাঁওয়ায় প্রাণটা থই তাথই করব ভাবছে, এমন সময় আলফন্সোর দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিও ন যযৌ ন তস্থৌ: নীল নয়, ফিকে গোলাপী শাড়ির আঁচল উড়িয়ে এক দেশোয়ালী বহিন বোধ হয় বাজার করতে যাচ্ছেন। পারী-র পথে এ বড়ই বিরল দৃশ্য।

বাডেন-বাডেন-এর অঞ্চল দিয়ে যেতে যেতে মনে পড়ল, ট্যুবিঙ্গেন থেকে আমায় চিঠি লিখতেন ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের জার্মান সহযোগী সুপণ্ডিত হেলমুট ফন্ গ্লাসেনাপ—স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ডাঃ ভূপেন দত্তের বন্ধু। মনটা ক্ষোভে ভরে

কার্ল্‌স্‌রুয়ে-র কাপেস-দম্পতি

কার্লোস ও হাইডির সঙ্গে : 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন'

রইল : সেই এলাম; ক' বছর আগে এলে তাঁর দেখা পেতাম।

কার্লসরুয়ে, স্টুটগার্ট পড়ে রইল পথের পাশে। রাত প্রায় পৌনে এগারোটা; ম্যনশেন আর চার কিলোমিটারের পথ। আলফন্সোর গলায় 'মা নিষাদ' সুলভ ওভারটোন : "তেল ফুরিয়ে গেছে!"...যাক—কাছেই এক পাম্প পাওয়া গেল। অবশেষে গন্তব্যস্থলে পেঁাছে নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম আমরা।

✻

পরদিন লাঞ্চের জন্য আমরা জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেস্তোরাঁয় খেতে গেলাম। বাইরে থেকে মেনু দেখেই কাতিনা বলে উঠল, "নাঃ, আজ এখানে অচল।" অন্যত্র গেলাম : জিলিপির প্যাঁচের মতো কিউ পড়েছে প্রকাণ্ড হলঘর জুড়ে। কাতিনার বান্ধবী হাইডি বলল, "চল না দোতলায় খাওয়া যাক।" অর্থাৎ প্রলেতারিয়া শ্রেণী থেকে বুর্জোয়াতে উন্নতি।

এখানে পানীয় সমেত খাদ্যের মূল্য এক মার্ক আশি পেনী: 'খাদ্য' কথাটি গৌরবার্থে; কারণ, না মানে, না পরিমাণে, একে আমাদের ফরাসী রেস্তো য়্যু'র সঙ্গে তুলনা করতে পারি। খেয়ে নিলাম চোখ-কান বুজে, বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে করতে। কিন্তু পেট ভরল না। প্যারী-তে আমাদের রেস্তোরাঁয় এক ফ্রাঁ পঞ্চাশ সাঁতিম-এর বিনিময়ে যথেষ্ট রুটির সঙ্গে প্রতি বেলা একটা সালাদ (অথবা ঠান্ডা মাছ বা গাজর কিংবা বীট কুচি), গরম সবজির সঙ্গে এক প্লেট মাংস অথবা মাছ ভাজা, একটা চীজ অথবা ইয়োঘুর্ত (দই), একটা ফল অথবা মিষ্টি; এর ওপরে চল্লিশ পয়সা (অর্থাৎ সাঁতিম) দিয়ে এক বোতল বিয়ার অথবা লাল মদ. ষাট পয়সার বিনিময়ে আধ লিটার দুধ কেনা যায়। এতে যদি পেট না ভরে, 'রাব্' বা বাড়তি ডিশ নেওয়া যায় বিনে পয়সায় : স্যাকারিন, নয় মটর সেদ্ধ, নয় জার্দি নিয়ে (বিভিন্ন তরকারি সেদ্ধ)। পুরো জিনিসটা জার্মান খানার তুলনায় একাধারে মুখরোচক এবং স্বাস্থ্যকর। প্রতি দিন দু বেলা মেনু বদলায়।

✻

আলফন্সোর গাড়ি এত দূরের পথশ্রমের শেষে কিছু বিশ্রাম ও চিকিৎসার জন্য গ্যারেজ যেতে বাধ্য। আলফন্সো গেল তার তদারক করতে। কাতিনা আর হাইডি বলল, "তোমাদের পারী-তে এখনো যায়নি ফরাসী দুই চিত্রকরের প্রদর্শনী। এখানে তোমায় দেখিয়ে দিতে পারি। পারী যেতে এখনো এক মাসের ওপর লাগবে এই প্রদর্শনীর।" চিত্রকর দুজন হচ্ছেন বনারের বন্ধু জাভিয়ে রুসেল (১৮৬৭—১৯৪৪) এবং এদুয়ার ভুইলার (১৮৬৮—১৯৪০)।

হাইডির গাড়িতে চেপে বসলাম তিনজনে। কাউল্‌বাথ্‌স্ট্রাস থেকে হাউস ডেয়ার কুন্‌স্ট ক'মিনিটের পথ মাত্র। কিন্তু আমায় দেখানোর জন্য ওরা বেশ বড় চক্কোর মেরে শোয়াবিং (অর্থাৎ পারী-র লাতিন কোয়ার্টার বা কলকাতার কলেজ স্কোয়ার) অঞ্চলে ঘুরল। দেখাল একটা ব্রিজ বা মাত্র একদিনে (রাতারাতি) নির্মিত হয়েছে; অদূরেই সেই বাড়িটি, যেখান থেকে হিটলার ভাষণ দিতেন।

প্রদর্শনীতে আমাদের পেঁাছে দিয়ে হাইডি গেল একটা রিহার্সালে : ও খুব ভাল বেহালা বাজায়, আর একই অর্কেস্ট্রায় ওর কর্তা কার্লোস বাজায় চেলো। ওকে বললুম, "চাও (ciao), হেইডি হাইডি হাই!" প্রেমেনবাবুর কবিতা হাইডি পড়েনি নির্ঘাত, কিন্তু আমার গলার স্বর যে তাৎপর্যবর্জিত নয়, হৃদয়ঙ্গম করলাম ওর জবাব শুনে, "চাও পুৎ, চাও ভীন, চাও প্রানাথ।"

পনেরো বছর বয়সে পিতৃহীন, হলেও, নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে ভুইলার তাঁর মায়ের উৎসাহে শিল্পচর্চা থেকে বিরত হননি; ঘরোয়া জীবনের মাধুর্য তাঁর তুলিতে যেভাবে ফুটে উঠেছে, তার প্রেরণার উৎস সম্ভবত গর্ভধারিণীর

বাৎসল্য, যে বাৎসল্যের স্বাদ দুর্ভাগ্যক্রমে এ-সমাজে সকলের অদৃষ্টে জোটে না। "মানুষকে তিনি ভালবাসতেন বলেই পোর্ট্রেটগুলো তাঁর এত সার্থক হয়ে উঠেছে," কাতিনাকে বললাম কথা প্রসঙ্গে, গ্যালারির একটা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে।

কাতিনা ঘুরে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে আরো কি অমৃতবাণী বিতরণ করেছি শিল্প-প্রসঙ্গে, আমার হুঁশ ছিল না। "আচ্ছা, সাত্য ক'রে বলতো," কাতিনার জেরা, "তুমি ছবি আঁক না?"

আমার হাসি পেল।

কপট রাগের ঝংকার উঠল, "হাসির কি পেলে?"

"বলি? ভয়ে, না নির্ভয়ে?"

ওর মুখে মাভৈঃ শুনে বললাম, "জনৈক ফরাসী লেখক স্যা-তেকজুপেরির লেখা 'এল্ প্রিন্থিপিতো' (ছোট্ট রাজকুমার)—স্প্যানিশ অনুবাদে—তোমার ঘরে দেখেছি; আশা করি কেতাবখানার পাতা উলটে দেখেছ?"

"বাঃ, ও বইটা প'ড়ে অবধিই আমি ফরাসী ভাষায় মূল বইটা পড়ব বলে ফরাসী শিখেছিলাম জান?"

"আর আমি তোমাদের স্প্যানিশ ভাষা শিখেছিলাম কবি খুয়ান রামন্ খিমেনেথের 'প্লাতেরো ই ইয়ো' পড়ব ব'লে, জান? কিন্তু সে কথা থাক। 'ছোট্ট রাজকুমার' বইয়ের গোড়াতেই কি দুঃখের কাহিনী লেখা আছে, মনে করতে পার?"

তারাকুল-লোচনা কাতিনাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, ছোটবেলায় লেখক স্যাঁ-তেকজুপেরি তাঁর চিত্রশিল্পী জীবনের প্রথম স্বাক্ষর রূপে এঁকেছিলেন একটি "অজগর সাপ" এবং গুরুজনদের সামনে সগৌরবে ছবিটি দেখিয়ে জানতে চেয়েছিলেন ছবি দেখে তাঁদের ভয় করছে কিনা। মূর্খ গুরুজনেরা বিস্মিত হয়েছিলেন, "টুপি এঁকে এনেছ, তা দেখে ভয় পাব কেন, বাছা?" "বড়রা কিচ্ছুটি জানে না", লেখক তখন ভেবেছিলেন।

কাতিনার মুখে হাসি ফুটল। বাধা দিলাম, "কিছুই বোঝনি এ কাহিনীর। আরো দুঃখের কথা বলি। আমার ছেলেবেলায় মাস্টারমশাই জয়ন্তীলালদা একটা ঘট এনে ক্লাসে রাখলেন প্রথম দিনেই এবং কার ঘটে কতটুকু শিল্প সম্ভাবনা আছে নির্ণয় করতে তিনি নির্মম হুকুম দিলেন, সব্বাইকে ঘট আঁকতে হবে।" অঘটনের ঘটা সবিস্তারে বলিনি কাতিনাকে। তবে আমার আঁকা সেই "ঘট" দেখে আমার জীবনের সেই প্রথম ও শেষ শিল্পকীর্তির সামনে দাঁড়িয়ে জয়ন্তীলালদার সুন্দর মুখে মৃদু মোনালিসা-মার্কা যে হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল, তাই যে আমার মোহমুদ্গরের কাজ দিয়েছিল, শুনে কাতিনার গলায় মাঝারি ধরনের অট্টহাস্য জাগল।

প্যারীতে আমি পারতপক্ষে ভাল ভাল কনসার্টগুলোর আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করি না। ফলে, বরেণ্য বহু সুর-শিল্পীর বাজনাই শুধুমাত্র শুনিনি, প্রথম শ্রেণীর বহু পরিচালকের (conductor) সামনাসামনিও হতে পেরেছি। আজ থেকে এক যুগ আগে মাদ্রাজের বিভিন্ন দেশী-বিদেশী লাইব্রেরি চষে পাশ্চাত্য সংগীতের বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখা কিছু বই পড়েছিলাম; তার মধ্যে লিওপোল্ড্ স্টকোভ্স্কির লেখাগুলো আমার মনে বিশেষ দাগ কেটেছিল। তাঁর পরিচালনায় ওয়াল্ট্ ডিজনীর 'ফ্যান্টাসিয়া' ছবিটি ক্লাসিক রূপে পরিচিত। গত বছর জুন মাসে প্যারীতে স্টকোভ্স্কি-প রি চা লি ত বীঠোফেনের 'এগমণ্ট', ব্রাম্স্-এর প্রথম সিম্ফনী, মরিস রাভেলের 'রাপ্সোদি এস্পাইয়োল' এবং শোস্তাকোভিচ-র প্রথম সিম্ফনী শুনেছিলাম প্লেইয়েল্-এ, আমার পরিচিতা "উদীয়মতী" চেলো-শিল্পী তেরেস পোলের আমন্ত্রণে। অনুষ্ঠানশেষে স্টকোভ্স্কির সঙ্গে অল্প-ক্ষণের আলোচনাতে বুঝলাম যে বয়সের ছাপ তাঁর দেহের গণ্ডী ছাড়িয়ে মনের আঙিনায় এখনো ঢুকতে পারেনি।—স্টকোভ্স্কির কথাই হচ্ছিল সেদিন: মিউনিকের হের্কুলস্সাল্-এ র স্ত্রো প ভি চে র অবিস্মরণীয় বাজনা শুনে আমরা ক'জন আসর জমিয়েছিলাম লিওপোল্ড্স্ট্রাসের ইতালীয় রেস্তোরাঁয়। ভিভাল্দি, বোকারিনী এবং হাইড্ন ছিলেন সেদিনের প্রোগ্রামে: রস্ত্রোপোভিচের বাজনা শুনে হাততালি আর থামে না; উনি তখন বসলেন যন্ত্র হাতে নিয়ে, বাজালেন পর পর দুটি বাখ্—ফাউ আর কি। তারই রেশ তখনো কানে বাজছে আমাদের, পিৎজা খেতে খেতে সেই

music in my heart I bore,
Long after it was heard no more—

—অবস্থা কাটানোর জন্যে কে যেন গল্প শুরু করল মনে নেই। গল্প করতে করতে হের্বার্ট ফন কারাইয়ান, অটো ক্লেম্পারার, ম্যানুইন্, রুবিনস্টাইন, স্টকোভ্স্কি—কতজনের যে প্রসঙ্গ উঠল, তার ইয়ত্তা নেই। কথার পিঠে আমি বর্ণনা করছিলাম, রোমে জুবিন্ মেহ্তা পরিচালিত পুচ্চিনি-র "তুরান্দো" অপেরা শোনার অভিজ্ঞতা: হাইডি আর কার্লোস শিসিয়ে উঠল, "ওঃ, জুবিন মেহ্তা? জীবনে ভুলব না ওঁর পরিচালনা: ভারতীয় না হলে ওঁর মধ্যে সংগীতের উপলব্ধি, ওঁর মুদ্রার সংযম ও ব্যঞ্জনা, ওঁর সমস্ত শরীর দিয়ে সংগীতের বক্তব্য ফুটিয়ে তোলার সাফল্য সম্ভব হত না।" আমি মনে মনে বললাম, "অর্থাৎ—বন্দনা মোর সংগীতে আর ভংগীতে বিরাজে?"

হাইডি ব'লে রাখল, পরদিন ও আমায় নিয়ে যাবে ওদের রিহার্সাল শুনতে: কার্ল রিখ্টের্-এর পরিচালনায় চলছে বাখের "সেন্ট ম্যাথুস্ প্যাশান"। এ আমার বহুদিনের স্বপন, বিখ্যাত কোনও পরিচালকের রিহার্সালে উপস্থিত থাকা।

ডয়চেস মিউজিয়াম হল্-এ রিহার্সাল। এই সূত্রে ব'লে রাখি ডয়চেস্ মিউজিয়ামে আমার অভিজ্ঞতার কথা। পদার্থবিজ্ঞান, বলবিদ্যা প্রভৃতি বিচিত্র এবং বিভিন্ন বিষয় ছাড়াও শুধুমাত্র সংগীতের যন্ত্রের প্রদর্শনী রয়েছে এক জায়গায়। সেখানে ঢোকবার আগেই একটা তারের যন্ত্র চোখে পড়ল, যার সাহায্যে অনায়াসে বাইশটি শ্রুতির অস্তিত্ব নৈর্ব্যক্তিক এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রমাণ করা যায়। ভারতীয় যন্ত্রগুলির আলমারির গায়ে একটা বোতাম—টিপলেই ব্যাখ্যা সমেত রেকর্ডে বেজে উঠে আমাদের মার্গসংগীতের নমুনা। এর পাশে হার্প-সিকর্ড এবং পিয়ানোর বিভাগ: বাখের একটা পরিচিত Variation-এর স্বরলিপি হার্পসিকর্ডের ওপর খোলা রয়েছে দেখে মনে পড়ে গেল, অল্গার ক্লাসে ওটা শিখেছিলাম ছেলেবেলায়: কার্লোস আর আমি গুনগুনে করে সুরটা ভাঁজছি, পুলিসী পোশাক পরা জাঁদরেল রক্ষী এসে পাশে দাঁড়ালেন। ভয় হল, "এবার কেটে পড় দেখি," বলবেন হয়তো। পরিবর্তে ভদ্র হাসিতে আপ্যায়িত করে উনি বললেন, "আপনাদের সংগীতে অনুরাগ দেখে এগিয়ে এলাম; এই যন্ত্রগুলির ক্রমবিকাশ লক্ষ করুন, আমি বাজিয়ে শোনাচ্ছি।" নীরস শালপ্রাংশু কলেবরের মোড়কে যে শিল্পীর অবস্থান, অসামান্য তাঁর প্রতিভা। হার্প-সিকর্ড শুনলেই আমি স্মরণ করি ভান্দা লান্দোভ্স্কা-র কথা; আমাদের পণ্ডিচেরীস্থ সাধিকা দিয়ানোর (Diana) উনি ছিলেন গড্-মাদার; দিয়ানার চিঠিতে আমার সংগীত-জিজ্ঞাসার পরিচয় পেয়ে লান্দোভ্স্কা উপহার পাঠিয়েছিলেন তাঁর 'গোল্ড্ব্যার্গ ভেরিয়েশন্স্'; সেই কথা

ভাবছিলাম, মিউজিয়মের রক্ষী বলে উঠলেন, "এই দেখুন, এই যন্ত্রটি হচ্ছে লান্দোভস্কা যে যন্ত্র বাজাতেন, ঠিক তার মতো।" বেরিয়ে আসছি, রক্ষী বললেন, "আর একটা জিনিস আছে, এদিকে।"

অতি মূল্যবান একটি পিয়ানোর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ডালাটা খুলে ধরলেন রক্ষী : মোনোটাইপের কাগজের কাটিম ঘুরতে ঘুরতে যেমন টাইপগুলো বেরিয়ে আসে, একটা বোতাম টিপতেই তেমনি একটা কাটিম ঘুরতে লাগল আর ঝরে পড়তে লাগল সুরের স্রোত, অশরীরী এক যাদুকর পিয়ানিস্ট যেন শুম্যানের 'আরাবেস্ক' বাজিয়ে চলেছেন; রুদ্ধশ্বাস রক্ষী বললেন যে বিখ্যাত পিয়ানিস্ট হরোভিৎস-এর রেকর্ড এটা, ঠিক উনি যেমনটি বাজিয়েছিলেন, তেমনি বাজছে।—মনে এল, প্যারীতে বুলভার্দ সাঁ-মিশেল (বুলভার্দ সাঁ-মিশেল) ধরে যেতে যেতে এই প্রণালীরই এক শিশু-সংস্করণ দেখেছিলাম অন্ধ এক ভিখারীর হাতে।

হাইডির সঙ্গে কনসার্ট হল্‌-এ ঢুকে উৎকণ্ঠ হয়ে রইলাম। রিখটের স্বভাবতই তখনো আসেন নি; হাইডি তার বেহালা নিয়ে গিয়ে মঞ্চে বসল এবং মাঝে মাঝে, সুর

দোলানোর ফাঁকে ফাঁকে সহাস্য কৌতূহলে লক্ষ করতে লাগল আমি উপভোগ করছি কিনা।

রিষ্‌টের ঢুকলেন। সাদা নাইলনের জামা পরনে এবং হাতে পরিচালকের যাদুদণ্ড : মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল সমস্ত কলরব। রিষ্‌টের স্টেজের বাঁ দিক থেকে ডানদিক পর্যন্ত নিপুণ রণনায়কের মতো এক পলক দেখে নিলেন। তাঁর ছোকরা ধরনের চেহারার সঙ্গে খ্যাতির আকাশ-ছোঁয়া পরিধি তুলনা করতে গিয়ে হিমসিম খেতে হত, যদি না আমার নজরে পড়ত প্রতিটি কণ্ঠ এবং যন্ত্র-শিল্পীর চোখে এই গুণীর প্রতি জনালা শ্রদ্ধার দীপশিখা। রিষ্‌টেরের বাঁদিকে স্টেজের পুরোভাগে ডবল বেস্‌, চেলো, বেহালা, বাঁশি ইত্যাদি যন্ত্র, তাদের সামনেই প্রধান দু'জন মহিলা গাইয়ে (সোপ্রানো ও আলতো সোলো), এবং ঠিক যন্ত্রগুলোর পিছনে জন-পঞ্চাশ্‌ স্কুলের ছেলেমেয়ের কোরাস; ডান দিকেও আর এক সেট যন্ত্র, তাদের সামনে প্রধান দু'জন পুরুষ গাইয়ে (টেনর ও বেস্‌ সোলো, যথাক্রমে এভাঞ্জেলিস্ট ও যীশু); সবার পিছনে সারি সারি শ'খানেক গাইয়ের কোরাস; অর্থাৎ সবসুদ্ধ আড়াইশ' শিল্পীর এই অর্কেস্ট্রা; পরিচালনা করতে করতে স্বয়ং রিষ্‌টের হার্পসিকর্ডও বাজাচ্ছেন।

পরিচালনা প্রসঙ্গে রিষ্‌টেরেরও সংযত অঙ্গভঙ্গীর উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। গত-এর চাল এবং পরিচালকের মেজাজ ও ঘরানা অনুযায়ী পরিচালনার ভাষা এতদূর বিচিত্র হতে পারে, ইওরোপে এসে তা অতি স্পষ্ট উপলব্ধি হচ্ছে : কোথাও কখনো উদাস বৈরাগ্যের ভংগীতে পরিচালক স্মরণ করিয়ে দেন, "রইল তোমার এ ঘর দুয়ার......", কোথাও-বা দুলকি-চালে "হাসছি কেন কেউ জানে না, পাচ্ছে হাসি হাসছি তাই...", কোথাও আবার "এমন দিনে তারে বলা যায়" ভাবের জোয়ারে টলমল করে পরিচালকের মুখ-চোখ। কিন্তু রিষ্‌টেরের পরিচালনায় দেখলাম কথা, সুর, ভংগী, সবকিছুই সংগীত-সম্রাট বাখের ভাব-সম্বন্ধ মর্যাদায় উনি অটল রেখেছেন : যেখানে সোপ্রানো কণ্ঠে গীত হচ্ছে, Wohin? Wohin?......(কোথায়? কোথায়?......), রিষ্‌টেরের হাতের ছড়ি সেখানে নচিকেতার অভীপ্সার মতো ঊর্ধ্বমুখী হয়ে চলেছে "হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে" বাণী নিয়ে।—দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা রিহার্সাল চলল, স্বরলিপির পাতা একের পর এক উলটে যেতে যেতে শেষ পাতায় পৌঁছলাম। হাইডি বেহালা নিয়ে নেমে এল, "কেমন?" "ভাষা দিয়ে বলতে পারব না, ধন্যবাদ!" আনন্দে ভরে উঠল হাইডির স্মিত পরিতৃপ্ত মুখ।

*

পারী ছাড়বার আগের দিন ডিনার ছিল হাইডেলব্যার্গের প্রাক্তন ছাত্র রসিওয়ালার ফ্ল্যাটে। তার ভাই এসেছে দেশ থেকে পেঁড়া নিয়ে, এবং হাইডেলব্যার্গ থেকে অধ্যাপক বাজাজ এসেছেন, এই দুই উপলক্ষের সঙ্গে ত্র্যহস্পর্শ ঘটেছিল আমার জার্মানী যাত্রার সংবাদ। বাজাজ বললেন, "আমি কিন্তু ধরে নিচ্ছি আপনি হাইডেল-ব্যার্গ আসছেন!" রসিওয়ালা বলল, "তুমি কার্লসরুয়েতে ফাদার কাপেস্‌কে চেনো না?"

"বিলক্ষণ চিনি। কিন্তু তুমি—?"

"বাঃ, উনি কতবার হাইডেলব্যার্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এসেছেন শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ-যোগের বিষয়ে বক্তৃতার আমন্ত্রণ নিয়ে। বলতে লজ্জা নেই, ও'র কাছেই আমি শ্রীঅরবিন্দের লেখার মর্ম প্রথম উপলব্ধি করি এবং ও'র বাড়িতে আমাদের ভারতীয় ছাত্রদের নিয়মিত যাতায়াতও এই সূত্র ধ'রেই। উনি তো এখন সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে শ্রীঅরবিন্দের গ্রন্থাবলী জার্মানে অনুবাদ ক'রে ত্রৈমাসিক পত্রিকা Integraler Yoga রূপে ছাপছেন। বুড়ো-বুড়ীর স্নেহ আমরা ভুলব না।"

মিউনিকের বিভিন্ন মিউজিয়াম, শিল্প-প্রদর্শনী আর কনসার্টের সমারোহে দেখতে দেখতে দিনগুলো কি ক'রে কেটে গেল, আগে খেয়াল করিনি। হাইডেলব্যার্গ এবং কার্লস্‌-রুয়ে যাবার প্রসঙ্গ তুললেই আজ নয় কাল ক'রে ক'রে কাতিনারা আটকে রাখছে; ওদিকে পারী ফেরবার দিন ঘনিয়ে এল। বুধবার সকালে ঘুম থেকে উঠে তল্পি-তল্পা বাঁধছি দেখে আগেরবারের মতো আনাকলো ও কাতিনা হাঁ হাঁ ক'রে উঠলেও আমি সে-কথায় কর্ণপাত না ক'রে মিসেস কাপেসকে ফোন ক'রে দিলাম যে আমি সকাল সাড়ে দশটার ট্রেন ধ'রে স্টুটগার্টে গাড়ি বদলে বেলা পোনে তিনটে নাগাদ কার্লসরুয়ে গিয়ে পৌঁছচ্ছি।—ও'রা এতদিন এই ফোনটিরই অপেক্ষায় ছিলেন। কথা রইল, পরদিন আলফন্সো আমায় কার্লসরুয়ে থেকে তুলে নিয়ে পাড়ি জমাবে পারী অভিমুখে।

প্ল্যাটফর্মে, নামতেই সদাহাস্য দিদিমায়ের প্রতিচ্ছবি এরিকা অর্থাৎ মিসেস কাপেস আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন, "পৃথ্বীন, তোমায় কোনদিন এখানে দেখব, স্বপ্নেও কি ভেবেছিলাম?"

হাইন্‌ৎস ও এরিকা দু'জনেই বহু বছর ধ'রে ভারতে যাতায়াত করছেন: নাৎসী আক্রান্ত জার্মানী ত্যাগ ক'রে ও'রা মধ্য-প্রাচ্যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন। তখন ভারতের কৃষ্টি ও দর্শন নিয়ে বিশদ পড়াশুনো করতে করতে এ'রা শ্রীঅরবিন্দের রচনাবলীর সংস্পর্শে আসেন। সেই সূত্রে ভারতে যাতায়াত শুরু। কার্লস্‌রুয়ের প্রটেস্টান্ট চার্চের প্রধান যাজকের পদ থেকে

[illegible] হল হাইন্‌ৎস অবসর নিয়েছেন। ক্যাথলিকদের প্রতি যেমন, তেমনি জগতের সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধা পোষণ করেন হাইন্‌ৎস্ এবং সকলেই তাঁকেও শ্রদ্ধা করে।

দাদু-দিদিমার আপ্যায়নের বহর দেখে আমার কেন জানি না বারে বারে স্মরণে জাগছিল আলফঁস দোদে-র লেখা একটি গল্পের কথা। "আচ্ছা, তুমি মুরগি খাও তো?" জলযোগের সময় এরিকা সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করলেন। আমি সর্বভুক জেনে আশ্বস্ত হলেন, "আজ তোমায় তা হলে মুরগির ঝোল-ভাত রেঁধে খাওয়াব।"

সন্ধ্যেবেলায় খাওয়া-দাওয়ার শেষে হাইন্‌ৎস বললেন, "তুমি বাঁশি বাজাও, ভুলিনি আমি। কি রেকর্ড শোনাই, বল?"

কানু ছাড়া যেমন গীত নেই, বাখ্ ছাড়া তেমনি আর কারো কথা এমন লগ্নে আমার মনে আসে না। বাইরে গোধূলির ধ্যানের রং আকাশ পৃথিবী প্লাবিত করে দিয়েছে; সেদিকে তাকিয়ে বললাম, "ব্রাণ্ডেনবুর্গ কন্‌চার্টো আছে?"

"ঠিক আমার মনের কথাটি বললে হে," দুষ্টু হেসে হাইন্‌ৎস রেডিওগ্রাম চালিয়ে দিলেন।

খানিক বাদে এক পাদরি এসে উপস্থিত। "আমায় শ্রীঅরবিন্দের ওপরে বক্তৃতা দিতে হচ্ছে পরশুদিন আউগস্‌বুর্গে; যদি আপনি কিছু নোট্‌স্ দেন, ফাদার কাপেস!" ভারী গোলগাল লোক। প্রয়োজনীয় নোট্‌স্ এবং বইপত্র নিয়ে ভদ্রলোক চ'লে গেলে এরিকার কী হাসি, "বললে বিশ্বাস করবে না, পৃথ্বীন, উনি হচ্ছেন ক্যাথলিক চার্চের কর্তা, কোনদিন এ-বাড়িতে আসেননি; আজই তুমি এলে, আর অদ্ভুত যোগাযোগ যে উনিও দিন বুঝে উপস্থিত হলেন।"

"ওগো, বড় তেষ্টা পেয়েছে," গিন্নীকে ডাকলেন হাইন্‌ৎস, "তোমার অতিথিকে কি এইভাবেই খাতির করবে? বলে আবার চোখ টিপলেন। অর্থাৎ ইস্রায়েল থেকে ওঁদের গুণমুগ্ধ কে একজন একঝুড়ি টাটকা সরস জাফনা'র কমলা পাঠিয়েছেন, তার সদ্ব্যবহার করতে হবে।

পরদিন আলফন্সো এসে পড়তে দেরি নেই দেখে বিদায় নিচ্ছি, হাইন্‌ৎস বারে বারে বললেন, 'রসিওয়ালাকে আর মজুমদারকে প্যারিস পৌঁছেই আমাদের শুভেচ্ছা জানিও। চিঠি দিও।'...এরিকার মুখ চোখ থমথম করছে, আমার হাতে একটা থলি দিয়ে বললেন, "তোমার বন্ধু ও তুমি এতটা পথ যাবে, কিছুই দিতে পারলাম না।"—পরে দেখেছিলাম, থরে থরে নানা ধরনের স্যাণ্ডুইচ, ঘরে বানানো কেক, ফল ইত্যাদি কিছুই বাদ দেননি, মায় মুখ মোছবার জন্যে সুন্দর কয়েকটা ক্লিনেক্স পর্যন্ত।

*

প্রত্যাশিত সময়ের আগেই পারী পৌঁছে যাচ্ছি দেখে আলফন্সো গাড়ি নিয়ে খানিক এলোমেলো ঘুরল। তারপর 'শারাঁত' দরওয়াজা দিয়ে মহানগরীতে প্রবেশ করছি, লাল আলো জ্বলে উঠল। পাশেই গাড়ি যেটা থামল, হাসি-ঝলমলে দুই পারী-নন্দিনী তার জানলা দিয়ে মুখ বার ক'রে আমাদের এক ঝলক দেখে নিলেন। এই অভ্যর্থনায় আলফন্সোর পথক্লান্ত মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। সবুজ আলোর নিশানা পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা চললাম আমাদের পথে, ক্ষণিকের সহযাত্রীরা চলে গেলেন নিজেদের পথে। আলফন্সো গুনগুনিয়ে শিস্ দিতে লাগল, "পা, সা । পা, সা । জ্ঞা, রা । া, া৹া পা, না । পা, না । রা, সা । া..."; এনরিকো মাসিয়াস নামক জনপ্রিয় গাইয়ের বিখ্যাত গান এটি:

J'allais le long des rues
Comme un enfant perdu,
J'etais seul et j'avais froid.
Toi Paris, tu m'as pris
dans tes bras!

কল্পনা করুন গানটির অর্থ। রাজধানীর পথ দিয়ে চলেছে একা পথিক। নিঃসঙ্গতার সঙ্গে কনকনে শীতের হাওয়ায় পীড়ন। এমন সময় এক পুরবালা পাশ দিয়ে যেতে যেতে এক ঝলক তাকাল বিদেশী পথিকের দিকে, জানাল নীরব হাসির অভিনন্দন, নীরবেই চলে গেল নিজের পথে। পথিকের আর বিদেশী বলে মনে হল না নিজেকে। ইট-কাঠ-পাথরে গড়া নগরীর হৃদ্‌স্পন্দন সে অনুভব করতে লাগল তার প্রতি পদক্ষেপে। সে অনুভব করতে লাগল, মহানগরী তাকে আপন ক'রে বুকে টেনে নিয়েছে!

আলফন্সো আর আমিও ফিরে [illegible] পারী-নগরীর বুকে আমাদের [illegible] —বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালায়।

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অর্থ ভারত

পশ্চিমবঙ্গের জন্য কেন্দ্রীয় আর্থিক সাহায্যের একটি দিক

রাষ্ট্রপতি শাসনাধীনে পশ্চিমবঙ্গের শাসনব্যবস্থার সমুদয় ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। কিন্তু এ-কারণে যে পশ্চিমবঙ্গের জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ বেড়েছে তা নয়। পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য সমস্যা। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্তও বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় নি; বলা বাহুল্য তার প্রধান কারণ আর্থিক সংগতির অভাব। রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হলেও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য কোনও অতিরিক্ত আর্থিক দায়িত্ব নিতে কেন্দ্রীয় সরকার নারাজ। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গকে নিজের আর্থিক সংগতির উপর নির্ভর করতে হবে এবং অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার যেরূপ আর্থিক সাহায্য প্রদান করে থাকেন, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও তাই প্রযুক্ত হবে। কিন্তু সব রাজ্যকেই আর্থিক সাহায্য প্রদান করার ক্ষেত্রে একই নীতি কেন্দ্রীয় সরকার অনুসরণ করেন নি। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও ঠিক সুবিচার করা হয়েছে বলে মনে করা যায় না। প্রথমেই দেখা যাক, বিভিন্ন ফিনান্স কমিশন কীভাবে পশ্চিমবঙ্গকে সাহায্যের সুপারিশ দিয়েছেন।

১৯৪৯ সালে শ্রীচিন্তামন দেশমুখ ভারত সরকার কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন রাজ্যকে রাজস্বের অংশ প্রদান করার ক্ষেত্রে কতিপয় সুপারিশ প্রদান করেন। আশ্চর্যের বিষয় দেশমুখ বাটোয়ারায় পশ্চিমবঙ্গ এবং পাঞ্জাব আগে যা পেত তার চেয়ে অনেক কম রাজস্ব পায়, এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, আসাম ও উড়িষ্যার অংশ বেড়ে যায়। অথচ দেশ-বিভাগের ফলে আর্থিক দুর্দশা সবচেয়ে বেশী ভোগ করতে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ও পাঞ্জাবকে। পশ্চিমবঙ্গ ১৯৪৯ সালের আগে (নিমেয়ার বাটোয়ারা অনুযায়ী) রাজ্যগুলির প্রাপ্য মোট রাজস্বের শতকরা ২০ ভাগের অংশীদার ছিল; দেশমুখ বাটোয়ারায় তা দাঁড়িয়েছিল শতকরা ১২ ভাগ। অপরপক্ষে বোম্বের অংশ শতকরা ২০ ভাগ থেকে শতকরা ২১ ভাগ পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। অথচ প্রতি বর্গ মাইলে বসতি ঘনত্ব এবং আয়কর ও অন্যান্য কর আদায়ের ভিত্তিতে বোম্বাই অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য বেশী হওয়া উচিত ছিল।

দেশমুখ বাটোয়ারার পর প্রথম ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫২ সাল থেকে নূতন রাজস্ব-বণ্টন নীতি প্রবর্তিত হল। শতকরা ৮০ ভাগ জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং শতকরা ২০ ভাগ আয়কর আদায়ের ভিত্তিতে —আয়কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশ বণ্টন করার নিয়ম প্রবর্তিত হল। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য অংশ দাঁড়াল রাজ্যগুলির মোট প্রাপ্য অংশের শতকরা ১১·২৫ ভাগ। অথচ ভারতের মধ্যে এই রাজ্যেই আয়কর আদায় হয় সবচেয়ে বেশী। কিন্তু সবচেয়ে বেশী অবিচার করা হল পাটের উপর রপ্তানি-শুল্ক থেকে পশ্চিমবঙ্গের পাওনা অংশ তুলে দিয়ে সাহায্য-অনুদান প্রবর্তিত করায়। কেননা, এই অনুদান যে নীতিগুলির উপর ভিত্তিশীল সেগুলি হচ্ছে—(১) সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বাজেটের অবস্থা, (২) সমাজসেবা বজায় রাখার মান এবং (৩) অপেক্ষাকৃত অনুন্নত রাজ্যগুলির জন্য অধিক বরাদ্দ। প্রথম ফিনান্স কমিশনের আমলে এই খাতে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছিল মাত্র ৮০ লক্ষ টাকা। অথচ এর আগে পাটের উপর রপ্তানি শুল্ক বাবত পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য ছিল ১০৫ লক্ষ টাকা।

দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশনের আমলে পশ্চিমবঙ্গের আয়কর রাজস্বের অংশ আরও কম হল। কেননা দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশন রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশ বণ্টনের সুপারিশ করলেন শতকরা ৯০ ভাগ জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং শতকরা ১০ ভাগ আয়কর আদায়ের ভিত্তিতে। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের পাওনা অংশ শতকরা ১১·২৫ ভাগ থেকে কমে শতকরা ১০·০৮ ভাগে দাঁড়ালো। এই ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশী লাভবান হল উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং মধ্যপ্রদেশ। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা গণনা করা হল ১৯৫১ সালের জনসংখ্যার ভিত্তিতে; কিন্তু তারপর ছয় বছরে যে অগণিত উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছেন, জনসংখ্যার ভিত্তির উপর রাজস্ব বণ্টন কালে তা বিবেচিত হয়নি. দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশনের আমলেও পশ্চিমবঙ্গ রপ্তানি- শুল্কের অংশের পরিবর্তে ১৫২·৬৯ লক্ষ টাকা সাহায্য অনুদান পেল। কিন্তু ১৯৫৯-৬০ সাল থেকে তাও বন্ধ হয়ে গেল।

তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের আমলে সব রাজ্যেরই পাওনা কিছু বেড়ে গিয়েছিল। তাছাড়া তৃতীয় ফিনান্স কমিশন শতকরা ৮০ ভাগ জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং শতকরা ২০ ভাগ আয়কর আদায়ের ভিত্তিতে রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশ বণ্টন করার সুপারিশ প্রদান করায় আয়কর-রাজস্বে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য অংশ দাঁড়ালো তার শতকরা ১২·০৯ ভাগ। কিন্তু অপর দিকে কেন্দ্রীয় সাহায্য-অনুদান থেকে পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত হল। দেশ বিভাগের ফলে নানাবিধ আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদান তো দূরের কথা,—গুজরাট, মাদ্রাজ, মহীশূর, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা প্রভৃতি রাজ্যের প্রতিটি যেখানে তিন কোটি টাকা থেকে ছয় কোটি টাকা পর্যন্ত সাহায্য পেল, সে ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ কিছুই পেল না।

আশা করা গিয়েছিল, চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় অবস্থার কিছু পরিবর্তন হবে। কিন্তু পরিবর্তন কিছুই হয়নি; শুধু পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য অংশ শতকরা ১২·০৯ ভাগ থেকে শতকরা ১০·৯১ ভাগে কমে এসেছে। কেন্দ্রীয় সাহায্য-অনুদান থেকে এবারেও পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত।

এই আলোচনা শুধু আয়কর থেকে প্রাপ্য রাজস্বের অংশ এবং কেন্দ্রীয় সাহায্য-অনুদানকে (grant-in-aid) কেন্দ্র করেই। আবগারী শুল্কের অংশ বণ্টনের ক্ষেত্রেও একই নীতি অনুসৃত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতি একই ধরনের অবিচার করা হয়েছে। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, অবিচারের জন্য শুধু পশ্চিমবঙ্গই ক্ষতিগ্রস্ত। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর একটি রাজ্য—মহারাষ্ট্র। পশ্চিমবঙ্গের পরই আয়কর ও আবগারী শুল্ক সবচেয়ে বেশী আদায় হয় মহারাষ্ট্রে। অথচ মহারাষ্ট্রও কেন্দ্রীয় সাহায্য-অনুদান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দেশ-বিভাগের অভিশাপ পাঞ্জাবকেও বহন করতে হয়েছে। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রেও ভারত সরকার আর্থিক সাহায্যদানের জন্য আরও একটু উদার নীতি গ্রহণ করতে পারতেন।

বর্তমানে পঞ্চম ফিনান্স কমিশন কাজ আরম্ভ করেছেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসেই পঞ্চম ফিনান্স কমিশনের অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট বেরোবে। পঞ্চম ফিনান্স কমিশনে পশ্চিমবঙ্গের কোন প্রতিনিধি নেই বলেই যে আমরা সুবিচার পাব না তা নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, পঞ্চম ফিনান্স কমিশন কী নীতি অবলম্বন করবেন;—যে নীতিই অনুসৃত হোক না কেন, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তাই অনুসৃত হবে। সেজন্য প্রয়োজন ফিনান্স কমিশন যে নীতির ভিত্তিতে আয়কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের একটি অংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনের সুপারিশ করেন, সেই নীতির পরিবর্তন করা। আমাদের মনে হয়, আয়কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্বে রাজ্যগুলির অংশ শতকরা ৮০ ভাগ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত (এখন তা হচ্ছে শতকরা ৭৫ ভাগ), রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশ বণ্টনের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার ভিত্তিতে শতকরা ৭০ ভাগ এবং কর আদায়ের ভিত্তিতে শতকরা ৩০ ভাগ বণ্টনের ভিত্তি গ্রহণ করা উচিত। সাহায্য-অনুদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যের বিশেষ বিশেষ সমস্যাগুলির প্রতি আরও বেশী দৃষ্টি দেওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ভারতের বৃহত্তম মহানগরী কলকাতার

উন্নয়নের জন্যই প্রচুর টাকা সাহায্য করা উচিত। এই সাহায্য যে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে দেওয়া উচিত, তা নয়, সমগ্র ভারতের স্বার্থ তার সাথে জড়িত। বোম্বাই, নয়াদিল্লি এবং এমন কি মাদ্রাজের তুলনায়ও কলকাতা শহরের অবস্থা খুব শোচনীয়। কলকাতা শহরের পরিবহণ ব্যবস্থার এবং পৌর জীবনের অন্যান্য দিকের উন্নতি না করতে পারলে সমগ্র ভারতের প্রাণকেন্দ্রটি ক্রমশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে। ভারতের ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল এই মহানগরী। যে দুটো সামগ্রীর রপ্তানি থেকে ভারত সরকার সবচেয়ে বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন, —অর্থাৎ, চা ও পাট,—সেই দুটো সামগ্রীর রপ্তানি কলকাতা বন্দরের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। কলকাতা বন্দরের অবস্থাও খুব শোচনীয়। পশ্চিমবঙ্গের এই সমস্যাগুলোর কথা বিশেষ বিবেচনা করে পঞ্চম ফিনান্স কমিশন এই রাজ্যে কেন্দ্রীয় সাহায্য অনুদানের পুনঃপ্রবর্তন করবেন এবং জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে সেই সাহায্য অনুদানের পরিমাণও যথা সম্ভব বাড়াবেন বলে আশা রাখি।

সুব্রত গুপ্ত

আলোচনা

'গান্ধীবাদ কি অচল ?'

॥ ১ ॥

২০ এপ্রিলের দেশ-এ অধ্যাপক অম্লান দত্তের লেখা "গান্ধীবাদ কি অচল ?" প্রবন্ধটি পড়লাম। লেখক লিখেছেন যে, হিংসাত্মক আন্দোলন যেহেতু লোকচক্ষুর আড়ালে গড়ে ওঠে তার ভিত্তি হচ্ছে অসত্য: এবং অসত্যকে ভিত্তি করে যা গড়ে ওঠে তার পরিণাম হয় ভয়াবহ। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায় থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং রাশিয়ায় স্ট্যালিন যুগের নৃশংসতার কথাও উল্লেখ করেছেন। লেখককে আমার একটি ছোট্ট প্রশ্ন করার আছে। গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্যে কোন কিছু লোকচক্ষুর আড়ালে করলেই তা অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এ সত্য সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁছলেন কি করে? বরং আমার তো মনে হয় যে, গোপনীয়তা জীবনের একটা অঙ্গ। রাষ্ট্রীয় জীবনে গোপনীয়তা তো বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতেও অনেক সিদ্ধান্তই লোকচক্ষুর আড়ালেই নিতে হয়। তবে তো গণতন্ত্রকেও অসত্যভিত্তিক ও ভয়াবহ বলা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না! রবীন্দ্রনাথ তাঁর চার অধ্যায়ে কোথাও সন্ত্রাসবাদকে ছোট করেছেন বলে মনে হয় না, বরং তাঁর লেখা যত্ন সহকারে পড়লে এ কথাই মনে হয় যে, সন্ত্রাসবাদে অনুপ্রাণিত আদর্শবাদী যুবকদের আত্মত্যাগ তাঁকে গভীরভাবে পীড়িত করে তুলেছিল; তা না হলে বিপ্লববাদে বিশ্বাসী সুভাষচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ কখনও অকুণ্ঠ সমর্থন জানাতে পারতেন না। রাশিয়ায় স্ট্যালিনী নৃশংসতা যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও মিথ্যাচারের ফলস্বরূপ—লেখকের এ সিদ্ধান্তই কি নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া চলে? স্ট্যালিন যখন ক্ষমতায় আসেন তখন রাশিয়ার অত্যন্ত দুর্দিন। তার কৃষি, তার শিল্প, তার সামরিক ব্যবস্থা অত্যন্ত নিম্নমানের। উপরন্তু তখন সারা পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক দেশগুলি তার বিরুদ্ধাচারী। তারা চায় রাশিয়ার সাম্যবাদের অবসান ঘটাতে। রাশিয়ার তখন জীবনমরণ সমস্যা। এই জীবনমরণ সমস্যা থেকে রাশিয়াকে উত্তীর্ণ করার দায়িত্ব স্ট্যালিনের হাতে থাকায় তাঁকে ক্ষেত্রবিশেষে নির্মম হতে হয়েছে। তাই তাঁর অন্তরঙ্গ সহকর্মী বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা যাঁরাই তাঁর বিরোধিতা করেছেন তাঁকে হয় সাইবেরিয়ার নির্বাসনে যেতে হয়েছে, নয়তো গুলির মুখে প্রাণ হারাতে হয়েছে। নৃশংসতার সঙ্গে নিজের নীতির অনুসরণ করার ফলে স্ট্যালিনের মৃত্যুসময়েই দেখা গেল যে, রাশিয়া পৃথিবীর দুটি বৃহত্তম শক্তির অন্যতম। বর্তমানে রাশিয়া নিজের দেশ ভালভাবে সামলাতে সক্ষম হওয়ায় এবং দ্রুতগতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে রাশিয়াবাসীর জীবনযাত্রার মান উচ্চস্তরে পৌঁছনোয় আজ রাশিয়া যে কিছুটা পরিমাণে ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা চিন্তা করতে পারছে সেদিন তা করা সম্ভব ছিল না। ফলে স্ট্যালিনী নৃশংসতা কেবলমাত্র মিথ্যাচার ও পারস্পরিক অবিশ্বাসের ফল হিসাবে বিচার না করে বরং এ কথাও মেনে নেওয়া উচিত যে, সেদিন রাশিয়ার বাঁচার আর কোন পথ খোলা ছিল না।

লেখক লিখেছেন যে, বিপ্লবীরা ভাঙ্গার কাজে যত পটু, গড়ার কাজে নয়; ফলে ভাঙ্গনের মধ্যেই তাদের সব শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়। কথাটা কি সম্পূর্ণ সত্যি? ফরাসী বিপ্লব কি কেবল ভাঙ্গার মধ্যেই শেষ হয়েছিল? রুশ বিপ্লবের পর রাশিয়ায় কি গড়ার কাজ কিছুই হয় নি? মাও-সে-তুং-এর চীন কি কেবল ভাঙ্গার কাজেই নিয়োজিত? আমাদের অনেক সময়ই ভাঙ্গার কাজে হাত লাগাতে হয় নতুন কিছু গড়ার জন্যে। সমাজে বা রাষ্ট্রে যখনই অচলায়তনের সৃষ্টি হয় তখনই জীর্ণ পুরাতনকে ভেঙ্গে ফেলা দরকার নতুন সৃষ্টির প্রয়োজনে। সুতরাং সৃষ্টির জন্যেই ধ্বংসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

গান্ধীজী গঠনমূলক কাজের পক্ষপাতী ছিলেন। গ্রামীণ ভারতকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন, যাতে আমাদের শিল্পভিত্তিক নগরসভ্যতা গ্রামগুলিকে শোষণ করতে না পারে। সমবায়ভিত্তিতে গ্রামজীবনের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হওয়া খুবই ভাল কথা, কিন্তু আধুনিক শিল্প-যুগের বিরোধিতা করা, চরকার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা, আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও ঔষধের বিরোধিতা করা প্রভৃতি বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর মতবাদকে যুক্তিবাদী

মননশীলতা দিয়ে সমর্থন করা যায় কি? দেশ স্বাধীন হবার পর রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি কি আমাদের বাস্তব সমস্যা মোকাবিলা করার সাহসের অভাবের কথাই মনে পড়িয়ে দেয় না, যাতে আমরা অতীতের স্বপ্নময় মোহঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে পারি? রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, যে জাত মনে করে যে, অতীতের মধ্যেই তার সব কিছু সত্য নিহিত আছে এবং কেবলমাত্র অতীতের চিন্তাতেই যে মঙ্গল সে জাতের মৃত্যু ঘটেছে। সেইদিক দিয়ে বিচার করে দেখলে অনেক বিষয়েই কি আমরা গান্ধীজীর মানসিক চিন্তার স্থবিরতা লক্ষ করি না?

গান্ধীজী নিয়মশৃঙ্খলার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন; আবার আইনভঙ্গের ব্যাপারে তিনি নেতৃত্বও দিয়েছেন। সুতরাং প্রশ্ন উঠবে—ব্যক্তি কখন আইনভঙ্গ করতে পারে? গান্ধীজীর মতে, যে, কোন ব্যক্তি দেশ ও দশের কল্যাণে আইনভঙ্গ করতে পারে এবং আইনভঙ্গ করার শাস্তিও তাকে মাথা পেতে নিতে হবে। এখন দেখা যাক, গান্ধীজীর এই মত কতটা গ্রহণযোগ্য। ব্যক্তিকে যদি এইভাবে আইনভঙ্গের অধিকার দেওয়া হয়, তবে ব্যক্তি যখন-তখনই আইন-ভঙ্গ করে বোঝাতে চাইবেন যে, দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্যই তিনি আইনভঙ্গ করেছেন। সুতরাং আইন কোন ব্যক্তির স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলেই তার আইনভঙ্গের অধিকার যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। ব্যক্তির হাতে আইনভঙ্গের অবাধ অধিকার রাষ্ট্রীয় জীবনে বিশৃঙ্খলাই ডেকে আনবে। রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে নাগরিকদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো। সুতরাং রাষ্ট্রীয় আইন যদি অধিকাংশ নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করে তখনই কেবল রাষ্ট্রীয় আইন ভাঙ্গা উচিত। এখন প্রশ্ন উঠবে যে, সাম্যবাদীরা কেন প্রচলিত আইনের বিরোধীতা করে থাকেন? সমাজতন্ত্রবাদী লাসকী আইনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন:

Law is those rules of behaviour which secures the purpose of the society's class-structure and will be, if necessary, enforced by the concise power of the state.

সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে, বর্তমানে পুঁজি-বাদী সমাজে আইন মুষ্টিমেয় পুঁজি-বাদীর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে তৈরী হয় বলেই সে আইন অধিকাংশের স্বার্থের পরিপন্থী হিসাবে কাজ করে। যেহেতু ধনতান্ত্রিক সমাজে আইন অধিকাংশ লোকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থী, সুতরাং, সমাজ-তন্ত্রীদের মতে, জনগণের সে আইনভঙ্গ করার ন্যায়সংগত অধিকার রয়েছে।

মার্ক্সীয় দর্শনের সমালোচনা করে লেখক লিখেছেন যে, যাতেই এক শ্রেণীর লাভ তাতেই অন্য শ্রেণীর ক্ষতি হয় না। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি বলেছেন যে, বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতিতে শুধু শ্রেণীবিশেষই লাভবান হয় নি। কিন্তু প্রশ্ন তা নয়—প্রশ্ন হচ্ছে শিল্পের অগ্রগতির ফলে পুঁজিবাদী শ্রেণী যতটা লাভবান হয়েছেন, শ্রমিকশ্রেণী কি ততটা পরিমাণে লাভবান হয়েছেন? ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মার্ক্স শ্রমিকদের শোষণ সম্বন্ধে যে কথা বলে-ছিলেন তা কি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছে?

মার্ক্স শ্রমিককে কেবলমাত্র শ্রমিক হিসাবেই দেখেছেন এবং তাঁকে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু হিসাবে না দেখে ছোট করেছেন, এই অভিযোগ তুলে বুদ্ধিজীবি অম্লান-বাবু আমাদের হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কথাটা কি সর্বাংশে সত্যি? মার্ক্সের মতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেহেতু শ্রমিকেরা শোষিত হন, সুতরাং শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের মাধ্যমে শাসন

[illegible] করবার কথা ও শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত। মার্ক্স শ্রমিকের' রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতা দিতে চেয়েছিলেন, যাতে তিনি পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু হিসাবে অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে তাঁর কর্তব্য-গুলি আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হন।

ভারতীয় জাতীয়তা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর একটি বড় অবদান অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। এই আন্দোলনের মূল বক্তব্য হচ্ছে শাসকের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে কোনরূপ হিংসাত্মক মনোভাব পোষণ না করেও জীবনপণ রেখে অসহ-যোগিতা করা যাতে শাসক সম্পূর্ণ পরাভূত হতে বাধ্য হন। সুতরাং গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যেও বলপ্রয়োগের মনোভাব সম্পূর্ণ বর্তমান। যদিও তার প্রয়োগ পরোক্ষ। যুক্তিসংগতভাবেই প্রশ্ন তোলা যায় যে, গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ইংরেজের শাসন ব্যবস্থায় কতটা ফাটল ধরেছিল বা শাসকগোষ্ঠীর কতটা হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটেছিল?

'শত্রুকেও ভালবেসে জয় করো' নীতি হিসেবে মহৎ হলেও সংগ্রামের সময় এই নীতিকে কার্যকরী করতে গেলে সফলতা লাভে বিঘ্ন ঘটবেই। আর তাই গান্ধীজী প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সমাপ্তি বিফলতার মধ্যে সমাপ্তি লাভ করেছে।

এখন প্রশ্ন উঠবে গান্ধীবাদে এত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা বিশেষ অধ্যায়ে গান্ধীজী দেশকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিলেন কি করে? উত্তরে সুভাষচন্দ্রের "The Indian Struggle" থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি: In 1920 India stood at cross-roads. Constitutionalism was dead; armed revolution was sheer madness. But silence acquiescence was impossible. The country was grouping for a new method and looking for a new leader. Then there sprang up India's man of destiny—Mahatma Gandhi—who had been biding his time all these years and quietly preparing himself for the great task ahead of him. He knew himself—he knew his country's needs and he knew also that during the next phase of India's struggle, the crown of leadership would be on his head. No false sense of modesty troubled him—he spoke with a firm voice and the people obeyed.

গান্ধীজী বা গান্ধীবাদের সাময়িক সাফল্যের মূল কারণ এর মধ্যেই নিহিত আছে বলেই মনে হয়।

সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে ভারতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব কিনা—এ প্রশ্নের আলোচনায় মধ্যে না গিয়েও এ কথা বলা চলে যে, গান্ধীবাদ যুগধর্মের অনুকূলে নয় বলেই তা নিষ্ফল হতে বাধ্য।

সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র
কলিকাতা-৫

॥ ২ ॥

অম্লান দত্ত মহাশয় এবার সশস্ত্র বিপ্লব ও হিংসাত্মক পথ পরিহার করে গান্ধীবাদী অহিংসার পথ গ্রহণ করবার উপদেশ দিয়েছেন। সৎ উপদেশ। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ঐতিহাসিক প্রয়োজন (historical necessity) বড় নির্মম, বড় স্পষ্ট। শ্রীদত্তের উপদেশ কেউ শুনবে বলে মনে হয় না।

শ্রীদত্ত মনে করেন, হিংসাত্মক আন্দোলনে অসত্যের ব্যবহার ও মিথ্যাচারণ অনিবার্য। কিন্তু কেন—তা স্পষ্ট বোঝা গেল না। তাঁর মতে, হিংসাত্মক আন্দোলনে গোপনীয়তা আছে। এবং গোপনীতা থাকলেই নাকি অসত্যকে গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। গোপনীয়তা থাকলেই অসত্যকে গ্রহণ করতে হবে? যে-কোন দেশের সামরিক বিভাগের কার্যকলাপের মধ্যে গোপনীয়তা আছে এবং সেটা প্রয়োজন। শ্রীদত্ত কি বলবেন এই গোপনীয়তা রাখাটা বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় নয়? এবং প্রতিটি দেশের সামরিক বিভাগ অসত্যকে গ্রহণ ক'রে বসে আছে? শ্রীদত্ত বলতে পারেন সামরিক বিভাগে এই গোপনীয়তা আছে বলেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিশ্বাসের মধ্যে এত ফাটল। এটা যদি স্বীকার করেও নিই, তবুও বলতে হবে, বাস্তব অবস্থার বিচারে এ গোপনীয়তা প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হিসাবে এই গোপনীয়তাকে ত্যাগ করতেও কেউ রাজী হবে না। এবং রাজী হলে সেটা আত্মহত্যারই শামিল হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে সেই বহু পুরোনো ভদ্রলোক মেকিয়াভেলিকে মেনে নিতেই হচ্ছে, স্বীকার করতেই হচ্ছে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কোন উপায়ই শ্রেয়।

আসল কথা—হিংসাত্মক আন্দোলন বা সশস্ত্র বিপ্লব রোগের লক্ষণ—রোগটা অন্যত্র। এ রোগটার একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এ কথা আজ অস্বীকার করে লাভ নেই যে, বর্তমানে শ্রেণীবিভক্ত, শোষণভিত্তিক সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বই এ রোগের উৎস। 'আজকের পৃথিবীর দিকে তাকালে আমরা মূলত চারটি দ্বন্দ্বেরই সম্মুখীন হই।

(১) সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে ধন-তান্ত্রিক শিবিরের দ্বন্দ্ব।

(২) ধনতান্ত্রিক দেশে শোষক ও শোষিতের মধ্যে দ্বন্দ্ব।

(৩) শোষিত জাতির (oppressed nations) সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীর দ্বন্দ্ব।

(৪) সাম্রাজ্যবাদী এবং একচেটিয়া পুঁজি-পতীদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব।

এখন এই দ্বন্দ্বগুলোর মধ্যে যে-কোন একটি পরিণতি লাভ করলে হিংসাত্মক বা সশস্ত্র আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। শোষক শ্রেণী হিংসাত্মক শক্তি ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করে না। সাম্প্রতিক কালের ভারতের ইতিহাসের শিক্ষাও এই। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন-গুলো যতক্ষণ শান্তিপূর্ণ থাকে ততক্ষণ শোষক শ্রেণীর টনক নড়ে না। কিন্তু হিংসাত্মক হলেই প্রথমে চলে দমন নীতি এবং পরে নতিস্বীকার।

শ্রীদত্তের মতে, "আপামর জনসাধারণ" অহিংসভাবে আমৃত্যু অসহযোগিতা (আদর্শ অহিংসাবাদ) করলে শাসকশ্রেণী নতিস্বীকার করতে বাধ্য।

প্রথমত, ধরে নেওয়া গেল 'আপামর জনসাধারণ' আদর্শ অহিংস আন্দোলন করল (যেটা স্বপ্নের রাজ্যে সম্ভব) এবং শোষক শ্রেণী নতিস্বীকার করল। এখন প্রশ্ন হল —শোষক শ্রেণী কেন তাদের স্বার্থ ছাড়ল? হয় তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটলো, তারা বিবেকবান হল, না-হয় তাদের শোষণের সুবিধা রইল না। ইতিহাস এবং শোষক-শ্রেণীর চরিত্র বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় প্রথমটি অবাস্তব অলীক এবং ইতিহাস বিরুদ্ধ।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক চাপের মুখে নিতান্ত বাধ্য হয়েই তারা তাদের স্বার্থ ছেড়েছে। অন্যায়কে প্রতিরোধ করার জন্য একটি বিশেষ অস্ত্রের প্রয়োগে তারা লড়াইয়ে পরাজিত হয়েছে। সূক্ষ্ম বিচারে এই অস্ত্রের প্রয়োগও কি হিংসা নয়? শুধু-মাত্র রক্তপাতই কি হিংসা? বর্তমান যুদ্ধে নানাভাবে শত্রুপক্ষের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করার চেষ্টা হয় (বোমা না ফেলেও)। এটা কি হিংসা নয়? অবশ্য এই অবাস্তব আদর্শ অহিংসাবাদের প্রয়োগ বর্তমানে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সম্ভব নয়—এ কথা শ্রীদত্ত নিজেও জানেন। তাই সাধারণ মানুষের সামর্থ্যের মাপে তাঁর আদর্শকে তিনি খাটো করতে রাজী আছেন (সুবিধাবাদী আদর্শ?)। হিংসাত্মক উপায়ে আইন ভঙ্গ করার নৈতিক অধিকার আছে—এ তিনি স্বীকার করেন (!)। তবে তিনি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। বলেছেন—এতে কিন্তু কতকগুলি কুফল আছে।

কি কুফল? কেমনভাবে সেগুলো আসে? অহিংস অস্ত্রের প্রয়োগে সেগুলো আসে না কেন? সহিংস আন্দোলনেই বা আসে কেন? এইসব স্বাভাবিক প্রশ্নের উত্তর লেখক আলোচনা করেননি। তাঁর মতে স্তালিন যুগে "বিপ্লবের মহৎ আদর্শকে ব্যঙ্গ করে পারস্পরিক অবিশ্বাস দেশ ও দলকে গ্রাস করেছিল।" এটা তথ্যের বিকৃত ব্যাখ্যা

হওয়াই স্বাভাবিক। আর শ্রীদত্তের কথাই যদি সত্য হয় তাহলে তার জন্য সশস্ত্র বিপ্লব ও তার গোপনীয়তাই দায়ী—এটা কিরকম যুক্তি, বোঝা গেল না। আমাদের দেশ তো সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীন হয়নি। এখানে কেন পারস্পরিক অবিশ্বাস, সাম্প্রদায়িকতা, রাজ্যে রাজ্যে হিংসা, নেতৃত্বে অনাস্থা দেশকে গ্রাস করছে?

রবীন্দ্রনাথ সেনশর্মা
গোরালটুলি, হুগলী।

॥ ৩ ॥

শ্রীঅম্লান দত্তের 'গান্ধীবাদ কি অচল?' (৭ই বৈশাখ) প্রবন্ধটির জন্য লেখককে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। প্রবন্ধটির মধ্যে লেখক যে-সব বিষয়ের অবতারণা করেছেন, তা সত্যিই প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু মুশকিল হল এই, আজ আমাদের জীবনের সকল স্তরে যে দুষ্ট রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তাতে আজকের দিনে লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী কাজে অগ্রসর হওয়া বেশ কঠিন। স্বাধীনতালাভের পর আজ বিশ বছর কেটে গিয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমরা দেখছি, যে জাতির প্রাণ ছিল ধর্মগত, সে জাতি আজ অধর্মের পথে পা বাড়াতে শিখেছে। এর কারণ আর কিছুই নয়, বিদেশের কাছ থেকে ধার-করা রাজনীতির কাছে আমাদের আত্মসমর্পণ।

একথা স্বীকার্য যে, স্বাধীনতালাভের পর আমাদের দেশে রাজনীতির প্রসার অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই রাজনীতি তখনই মারাত্মক ও ভয়বহ হয়ে ওঠে যখন এই রাজনীতি ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই কারণেই গান্ধীজী রাজনীতির সংগে ধর্মকে যুক্ত করার সুপারিশ করেন। তিনি এক জায়গায় বলেছেন—'If I seem to take part in politics, it is only because politics to-day encircle us like the coils of a snake from which one cannot get out, no matter how one tries. I wish to wrestle with the snake....I am trying to introduce religion into politics.'

লেখক তাঁর প্রবন্ধে গান্ধীজীর রাজনীতি সম্বন্ধে এমন একটা সুন্দর মতবাদের সুস্পষ্ট আলোচনা করেননি। অথচ আজ এই যুগে ধার-করা রাজনীতির জন্য আমাদের দেশের সকল পর্যায়ের মানুষের জীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছে। এই নোংরা রাজনীতিই আজ গান্ধীবাদকে অচল করেছে।

শ্রীবারিদবরণ ঘোষ
দাসপাড়া, চুঁচুড়া

॥ ৪ ॥

২০-৪-৬৮ তারিখের "দেশ" পত্রিকায় শ্রীঅম্লান দত্ত তাঁর প্রবন্ধে প্রশ্ন করেছেন, "গান্ধীবাদ কি অচল?" এ প্রশ্নের উত্তর তো তাঁর লেখার মধ্যেই রয়েছে। গান্ধীবাদ যে কেন অচল সে কথা তাঁর লেখার ভিতরেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

লেখক বলছেন, যে-কোন অন্যায় ব্যবস্থাই কার্যকরী হতে পারে না যদি আপামর জনসাধারণ মৃত্যুপণ করে সমস্ত সহযোগিতা থেকে অহিংসভাবে বিরত থাকেন।" অতএব গান্ধীবাদ সফল হওয়ার পূর্বশর্ত, 'যদি আপামর জনসাধারণ মৃত্যুপণ করে সমস্ত সহযোগিতা থেকে অহিংসভাবে বিরত থাকেন।" এই পূর্বশর্ত যে সম্পূর্ণ অবাস্তব ও কার্যত অসম্ভব গান্ধীবাদীও তা জানেন। "আদর্শ অহিংসা সাধারণ মানুষের শক্তির অতীত", তাই তিনি "তাঁর বক্তব্য রাখবেন একটি নিম্নতর স্তরে।" নিম্নস্তর মানে, "যদি অহিংস প্রতিরোধ সম্ভব না হয় তো অহিংসা থেকে বিচ্যুত হয়েও অন্যায়ের বিরোধিতা করা শ্রেয়ঃ।" সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, যখন "আদর্শ অহিংসা সাধারণ মানুষের শক্তির অতীত" তখন অহিংসা থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্যায়ের বিরোধিতা করাই কর্তব্য অর্থাৎ তখন গান্ধীবাদ অচল। "অহিংসা থেকে বিচ্যুত হওয়া"কে অহিংসার নিম্নস্তর হিসেবেই বলা চলে না; ইহা সোজাসুজি অহিংসা নীতি পরিত্যাগ। বর্তমান জগতে প্রতিপক্ষ হিংসার ব্যবহারে সম্পূর্ণ বিবেকবর্জিত হওয়াই সম্ভব। সুতরাং অহিংস আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য। অহিংস অসহযোগের দ্বারা এমন কি "সর্বজয়ী আদর্শ অহিংসা"র দ্বারাও, আণবিক আক্রমণে আত্মরক্ষা করা যায় না। অতএব, এই আণবিক যুগে গান্ধীবাদ সম্পূর্ণ অচল।

লেখক বলছেন, মার্কসবাদের "শব্দগুলির একটা মাদকতা আছে, কিন্তু মার্কসীয় মত সর্বাংশে সত্য নয়।" গান্ধীবাদের শব্দগুলি সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা যায়। গান্ধীবাদের কথাগুলি শুনতে খুবই ভাল, তার আধ্যাত্মিক সৌরভ মনকে মুগ্ধ করে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের সময় তার অবাস্তবতা ধরা পড়ে এবং সেই জন্যেই গান্ধীজীর সবচেয়ে বড় ভক্তরা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে গান্ধীবাদ কার্যত পরিত্যাগ করেছিলেন।

লেখক বলেছেন যে, গান্ধীজীর কল-কারখানার প্রতি অতিবিরূপতা "সমগ্রভাবে গ্রহণ করা" সম্ভব নয়। সামাজিক ও আত্মিক সংকট সম্বন্ধে তাঁর সাবধানবাণী তিনি যে সুরে বেঁধেছেন, তাতে লেখকের মতে "যুক্তিবাদী মননশীলতা উৎসাহিত হয় না।" এগুলিও গান্ধীবাদের অবাস্তবতার প্রমাণ।

গান্ধীবাদের অবাস্তবতার আরো প্রমাণ যে জগতের বাস্তব ঘটনাবলীর মধ্যে গান্ধীবাদের সমর্থন মেলে না। জগতের সমস্ত জাতি সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারাই স্বাধীনতা অর্জন করেছে, রক্ষা করেছে ও করছে এবং তার ফলে ঐ সব জাতির উন্নতিই হয়েছে এবং সারা দুনিয়ার রাজনৈতিক চিন্তাধারা মোড় নিয়েছে। যেমন, American war of independence, French revolution প্রভৃতি। জগতের বাস্তব ঘটনাবলী গান্ধীবাদের অহিংস নীতির অবাস্তবতাই প্রমাণ করে।

পৃথিবীর অনেক দেশেই একদিন দ্রুত শিল্পায়নের যুগ এসেছিল। কিন্তু "দেশের শিল্প কলকারখানার কেন্দ্রগুলির শাসন ও শোষণ থেকে গ্রামকে রক্ষা করার একমাত্র পথ গ্রামোদ্যোগ ও গ্রামরাজ্যের কোথাও দরকার হয়নি ও চরখাকে cult-এ পরিণত করারও দরকার হয়নি, যার ফলে 'টিটিকিরা কালচার'-এর সৃষ্টি হয়েছিল।

লেখক বলেছেন, "যে যুগকে তিনি (গান্ধী) গ্রহণ করতে পারেননি, বহু সংকটের ভিতর দিয়ে সে-যুগ শেষে অতীত হবে, সমস্তো নীতি তখনও বাঁচবে তাঁর 'অরণ্যে রোদন' আজকের বহু নাগরিক কোলাহলকে অতিক্রম করে সেদিনও মানুষের মনে একটি শাশ্বত-বাণীর মত ধ্বনিত হতে পারবে"। মানুষের সভ্যতা হাজার হাজার বছর ধরে বুদ্ধ, খৃষ্ট প্রভৃতি মহাপুরুষের বাণী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বহু যুগ, বহু হানাহানি, বহু কাটাকাটির সংকটের মধ্য দিয়ে এসে নিজের প্রাণশক্তিতেই আজও বেঁচে আছে। ভবিষ্যতে যদি নিজের প্রাণশক্তিতে বাঁচতে না পারে তো গান্ধীবাদ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। এই সংকটময় আণবিক যুগ অতিক্রম করতে গান্ধীবাদ কোন কাজেই লাগবে না সুতরাং এই সংকটময় যুগ পার হয়ে যাওয়ার পরে, অনাগত যুগে তখন গান্ধীবাদ একটি নৈতিক কল্পনাবিলাস হিসেবে ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়বস্তুরূপে গণ্য হবে, তার বেশী কিছু নয়।

শ্রীগোপালদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা-১৯

রবীন্দ্র সদনে রবিশঙ্কর

"রবীন্দ্র সদনে রবিশঙ্কর" লেখাটি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হবে বুঝতে পারিনি। যদিও বোঝা উচিত ছিল, আড়ম্বর যাঁরা দেখাতে চান, তাঁরা আর যাই হোক, ওই আড়ম্বরের নিন্দা সহ্য করতে পারেন না। আমাত যদি [illegible]

আসে, তবে আর রইল কী। শ্রীকান্ত [illegible] বসু লিখেছেন, "আসলে আকাশে কিছু [illegible] উদ্ভিজ্জ, তারা ? কেটে, কেটে। লেখকের কাছে এটা যদি 'ছেলেমানুষি' মনে হয় তো সম্ভব. অনুষ্ঠানের যে-কোনও আড়ম্বরই ছেলেমানুষি"—আড়ম্বর মাত্রই ছেলেমানুষি কেন বলব? তবে আড়ম্বর কোথায় অপরিহার্য কিংবা কী ধরনের আড়ম্বর আভিজাত্যপূর্ণ, সে প্রশ্ন তো থেকেই যায়। কবি, চিত্রশিল্পী, সংগীত-শিল্পী—এঁদের সংবর্ধনা এবং দেশনেতা সমরনায়ক বা বিপ্লবী বীরের সংবর্ধনা কোন দেশেই এক ধরনের হয় না। অন্তত আমাদের দেশে তো নয়ই। ১৯৩৯ সনে টাউন হলে কলকাতার নাগরিকবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর জয়ন্তী উপলক্ষে তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলেন। সেখানে মোটর-কেড সাজানো বা [illegible] ওড়ানো হয়নি। 'পটকা' না-হয় ভুলই লিখেছিলেন। তারা কেটে কেটে আকাশে উড়ে নিঃশেষ হবার পর [illegible] যেমন [illegible], তা পটকার চেয়ে কম [illegible] নয়। আসলে [illegible] [illegible] প্রশ্ন। "এক্সিবিশনিজম" দৃষ্টি-[illegible] [illegible] [illegible] এ কোনটাই প্রশংসনীয় নয়। বিশেষ করে রবিশংকরের [illegible]।

[illegible] যদি সময়োপযোগী, সুন্দর ও [illegible], তাহলেও কি তা ক্লান্তিকর? [illegible] যদি কিছু ভাবতে [illegible] স্লাইড কেন? সিনেমা হাউস [illegible] দেওয়া হয় স্লাইডে। স্লাইডের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনের স্মৃতি—"সেন্স অব অ্যাসোসিয়েশন" তো ইচ্ছা করলেই [illegible] থেকে দূর করা যায় না—মনে জাগে স্বর্গত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও রবিশংকরের [illegible] পবিত্র ও ভাবগম্ভীর ভাব ও পরিবেশ যে স্লাইডের জন্য অনেকখানি [illegible] হয়েছে, তা এখনও বলি। তা ছাড়া, স্লাইড দেখাতে গিয়ে উদ্যোক্তারা প্রথমেই স্বর্গত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে স্লাইডের মাধ্যমে উল্টো দেখিয়ে অনুষ্ঠানের মর্যাদা নষ্ট করেছেন। স্লাইডে প্রদর্শিত ছবি ও মন্তব্য স্মারক-পুস্তিকায় মুদ্রিত ছিল। তথাপি পর্দায় এগুলি দেখানোর উদ্দেশ্য কী? চমক দেওয়া নয় কি? ওই এক ঘণ্টা সময় হাতে পেলে রবিশংকরের কাছ থেকে অন্তত একটি ধুন বা ঠুংরি শোনবার সুযোগ পাওয়া যেত।

শ্রী বসু আর একটি প্রশ্ন তুলেছেন। সংসদের পূর্বেকার অনুষ্ঠানে স্লাইড দেখানো নিয়ে কখনও 'ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ' করা হয়নি। এর উত্তর সহজ। 'দেশ'-এর বিভাগীয় সম্পাদকের [illegible] নিকষানন্দ(?) অর্ণব একমত [illegible] [illegible] [illegible]।

সংসদের আগের অনুষ্ঠানে স্লাইড দেখার দুর্ভোগ ও যন্ত্রণা দিকশূন্য অর্ণবের হয়নি। যদি হত এবং সম্পাদক যদি তাঁকে সমালোচনা করার সুযোগ দিতেন, তবে নিশ্চয়ই তারও প্রতিবাদ হত।

জাতীয় সংগীত সম্বন্ধেও আমার কিছু বক্তব্য আছে। সিনেমাগৃহের অনুকরণে রবীন্দ্র সদনে জাতীয় সংগীত বাজাতে গিয়ে সে সংগীতের অমর্যাদা ঘটলে তা নিশ্চয়ই অপরাধ। এই অপরাধ দেশদ্রোহিতার নয় নিশ্চয়ই, তবে অবিমৃষ্যকারিতার। জাতীয় সংগীত নিয়ে এই হাস্যকর পরিস্থিতি ঘটাতেই ক্ষোভের সঙ্গে 'দণ্ডনীয়' কথাটি ব্যবহার করেছিলাম। শব্দটি হয়ত এক্ষেত্রে বেশী রূঢ় শুনিয়েছে। তবে আমার মত অনেকেই সেদিন ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, তাতে আমি নিঃসন্দেহ।

সবশেষে শ্রী বসু বলেছেন, "গোটা ব্যাপারটাতে একটা পরিকল্পনার চিহ্ন ছিল"। তাতে সন্দেহ নেই। তবে, সুপরিকল্পিত এবং মর্যাদাসম্পন্ন হলে কোন দুঃখ থাকত না।

দিকশূন্য অর্ণব

দ্বিতীয় দর্পণ

প্রতিভা বসু

৩৪

সেই স্কুল থেকে চাকরি শুধু তারই গেলো না, মেজ মার স্থাপিত স্কুল থেকে মেজমার পুষ্যি ছেলে কালীচরণও বিতাড়িত হলো। কালীচরণ আজীবন মল্লিকবাড়ির খেয়ে পরে মানুষ, এ বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক যে অচ্ছেদ্য বলেই জানতো। এ বাড়ির অন্যান্য ছেলেপুলের মতো নিজেকেও সে একজন বলে ভাবতো। বিশেষত এই স্কুল, এই শচীরানী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় তো বলতে গেলে তারই বিন্দু বিন্দু স্বেদ দিয়ে তৈরী। মেজমার হুকুমে, মেজমার ইচ্ছাপূরণের তাগিদে, মেজমার একা জীবনকে ভরে দিতে সে কী না করেছে? বাড়ি বাড়ি ঘুরে বাচ্চা যোগাড় করা, তাদের দিয়ে আসা, নিয়ে আসা, রক্ষণাবেক্ষণ, সব তো সে। সেই তো। সেই তো সব কাজে মেজমার ডান হাত বাঁ হাত ছিলো।

আর তারই বা কী ছিলো, এই মেজমা আর মেজমার স্কুল ছাড়া? বাপ গেল, বউ গেল, শেষে মেয়েটাকেও নিয়ে নিলেন গঙ্গামা। স্কুলের বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে, তাদের বকে ধমকে ভালোবেসেই তো আবার দিনের দেখা পেয়েছিলো সে।

তখন স্কুলের নাম ছিলো অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। মাত্র চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ছিলো। মেয়ে জুটোবার জন্য মা বেতন নিতেন না। বাচ্চা মেয়েরা চার ক্লাস পরীক্ষা দিতে পারলে, প্রথম দ্বিতীয় হলে তাদের উঁচু ক্লাসে ভর্তির জন্য বৃত্তি দেওয়া হতো।

একদিন মা বললেন, 'কালী, তোর মেয়েটাকেও দে, তুইও একটু লেখাপড়া শেখ।'

স্কুলের মাস্টার তখন কে? মা নিজে, নাট কর্তার মেয়ে বিজারানী, বিজা— মাসীমাও বিধবা ছিলেন আর ওনাদেরই আর একজন জ্ঞাতি বোন। আর কর্মচারী বলতে একা কালীচরণ।

খুশী হয়ে মায়ের স্কুলে ভরতি করে দিল মেয়েকে। আর নিজের বেলায় জিব কাটলো। পাগল নাকি? সে গিয়ে বসবে কি মায়ের সামনে! তবু কি মা ছাড়েন? আলাদা করে ঐ বুড়ো বয়সেই তাকে নামসই করতে শেখালেন। যোগ বিয়োগ শেখালেন।

ধীরে ধীরে সেই অবৈতনিক চতুর্থ শ্রেণীর বিদ্যালয় পঞ্চম শ্রেণীর হলো। আট আনা বেতনের বন্দোবস্ত হলো, পঞ্চম শ্রেণী ষষ্ঠ শ্রেণী হয়ে অবৈতনিক শব্দটা মুছে দিয়ে উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয় নাম হলো। আবার সেই নাম বদলে একদিন শচীরানী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় হয়ে গেল। কালীচরণই জেদ করেছিলো স্কুলটা মেজমার নামে করে দিতে। মেজমা কী খুশী।

মারা যাবার আগের বছর দুটো ভাগ হয়ে গেল স্কুলের। একটা রইলো প্রাথমিক, মেয়েরা সেখানে ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়বে, পরীক্ষা দিয়ে ভালো করলে তেমনি বৃত্তি পেয়ে হাই স্কুলে আসবে। মার ইচ্ছে ছিলো ঐ চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিকই থাকুক। এই পুত্র, এই অকাল-কুষ্মাণ্ড সূর্য তখন লায়েক হয়ে উঠেছে, দু'বার ফেল মেরে তিনবারের বার ম্যাট্রিক পাস করে আই-এ ক্লাসে ভর্তি হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে, সেই সঙ্গে মাও যেন কেমন ছেলের বশ হয়ে গেছেন, যা বলছে তাই যেন মহা কথা। সে বললো, না, না, ওসব অবৈতনিক—টবৈতনিক চলবে না। বেতন দিতে হবে। সূর্য বলেছে, তবে আর কী? অমন বুদ্ধিমান ছেলে কি দুর্জন হয়? সুতরাং বেতনের বন্দোবস্ত হলো।

চিরটা কাল নিজের বুদ্ধিতে চলে

বুড়ো বয়সে যে কী হলো মার, শেষে এইখানে এসে ঠেকলেন। বুঝলেন না, এ কেবল টাকাটাই দেখতে পাচ্ছে, লেখাপড়া, নাম, যশ কিছুই এর কাছে কিছু না।

কেন? মেজমার নামে না-হয় থাকতোই একটা অবৈতনিক স্কুল। গরীব ছেলে-মেয়েরা তো পড়তে পারতো! মেজমার কি টাকার অভাব ছিলো? গয়নাই তো ছিলো লক্ষ টাকার।

সব গয়নাও মেজমা সুবালা বউদিকে পরিয়ে দিয়েছিলেন বউভাতের দিন। এই হতভাগার বউ সুবালা। কতো খুঁজে পেতে পুতুলের মতো বউ এনেছিলেন মেজমা। কতো ধুমধাড়াক্কাই না হলো বিয়েতে। মল্লিকদের উষ্টিগুষ্ঠি যে যেখানে ছিলো সবাইকে খরচ পাঠিয়ে পাঠিয়ে আনানো হলো, এতো বড়ো সাতমহলা বাড়ি একেবারে গমগম করতে লাগলো যাত্রা থিয়েটার আর আলোর মালায়।

কালীচরণের মনেই কি তখন কম আহ্লাদ হয়েছিলো? কতো কথা মনে পড়ছিলো তার। এইটুকু সূর্য, যার নাওয়া-খাওয়া ঘুম সব ছিলো তার হাতে, সে বড়ো হলো, বিয়ে করলো, আনন্দ হবে না?

কিন্তু সে আনন্দ স্থায়ী হলো কই? সুবালা বউদির মুখে কে কবে হাসি দেখেছে? আস্তে আস্তে কে না জেনেছে, এটা একটা কুকুর-বেড়ালের মত পুরুষ। উড়েছিলো তখনই, চাপাচুপি ছিলো, ভয় ছিলো, লজ্জা ছিলো, যাতে মেজমার কানে না যায় চেষ্টা ছিলো তার জন্য। মেজমা মারা যেতে একেবারে উদ্দাম হয়ে উঠলো।

কালীচরণ কি সেজন্য ছেড়ে কথা বলেছে? আপন অধিকারেই সে এই ছেলেকে বকেছে ধমকেছে, নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছে। তারপর তো কলকাতাই চলে গেল।

কিন্তু তার যে শেষ পর্যন্ত এতোখানি স্পর্ধা হবে, একজন স্কুলের মাস্টার-দিদিকে কৌশলে নিয়ে গিয়ে শোবার ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করবার চেষ্টা করবে, এটা কালীচরণ স্বপ্নেও ভাবে নি। ছি ছি! এর নাম ভদ্রলোক? বড়োলোক? ইচ্ছে করছিলো হাত দিয়ে নয়, নরাধমটাকে পায়ের ঠেলায় ফেলে দেয় দোতলা থেকে এক তলায়। অনেক কষ্টে সেদিন সে ক্রোধ সংবরণ করেছিলো।

ওর বয়েস কতো? ঐ তো যে বছর বন্যা হয়ে দেশ ভেসে গেল, শেষ রাত্রে ব্যথা উঠলো ওর মার। সকাল ছটায় জন্মালো এই ছেলে। মেজমা বাপের বাড়ি এসে-ছিলেন তখন, মেজকর্তা জীবিত ছিলেন। সে এসেছিলো সঙ্গে—না দেখে দেখে মনেই বা বেলা গেল কি? বছর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ তো হলেই। না কি বেশী? তা কি কম? তার নিজের বয়েস বাহান্ন? পঞ্চান্ন? না ষাট? না সাতান্ন?

মনেও পড়ছে না এতো কালের কথা সব। আর এতো দিন পরে, এতো কিছুর পরে, একমাথা পাকাচুল নিয়ে তাকে জীবনের শেষ অংশে পৌঁছে দৌড়িয়ে আসতে হলো আপন জায়গা থেকে?

প্রথমটায় কালীচরণ হতভম্ব হয়ে গিয়ে-ছিলো। সেই ধূর্ত নেকড়ে সুরেন পৈতেটার কথা সে বিশ্বাস করে নি।

বলেছিলো, 'যান, যান, নিজের চরকায় তেল দিন গিয়ে। এই স্কুল থেকে আমাকে সরাবে এমন লোক এখনো জন্মায় নি। আপনার মতো ঢের মোসাহেব এ বাড়িতে এইসেছে গেছে, দরকার হলে আমিই তাদের বার কইরে দিয়েছি।'

সুরেন পৈত চোখ ছোট করে বলে-ছিলো, 'কর্তার হুকুম! না মানলে তো নতুন দারোয়ান এসে ঘাড়ে হাত দেবে।'

'মুখ সামলে কথা কইলো হে পৈতের পুত।'

'ঠিক আছে।' বেল বাজালো সে. কুকরি হাতে এক মধ্যবয়সী নেপালী এসে দাঁড়ালো। সুরেন পৈত সূর্য মল্লিকের নিজে হাতে লেখা হুকুমনামা দেখালো।

এর পরে সে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে-ছিলো। ভয়ে নয়, দুঃখে নয়, ক্ষোভে নয়, যেন মোহাচ্ছন্ন মানুষ মনে হয়েছিলো

নিজেকে। যেন কিছুই বোধগম্য হচ্ছিলো না। শেষে চোখে জল এসেছিলো। স্থাণুর মতো সে এসে বসেছিলো লক্ষ্মীর মার দরজায়।

কালীচরণের বজ্রাহত চেহারার দিকে তাকিয়ে একটুখানি থমকে ছিলেন লক্ষ্মীর মা। তারপরে নিজের দুঃখ ভুলে গেলেন। শ্রেণীভেদের ব্যবধান চুকিয়ে এসে হাত ধরে বললেন, 'চলো, আমরা মা ছেলে এই সব ভদ্রলোকের সংস্রব ছাড়ি। তুমি আমাকে যেখানে হয় নিয়ে যাও। তুমিই আমার ধর্মবাপ।'

আবেগ ভরে কালীচরণ বলেছিলো, 'ঠিক কথা। হিংসে, দ্বেষ, পিরতিশোধ, এসবের কথা আর আমি ঠাঁই দেব না মনে। রাগের মাথায় ভেইবেছিলাম পেরথমে পৈতের বাচ্চাকে খুন কইরবো, শেষে কলকাতা গিয়ে সূর্য মল্লিকের মুখোমুখি হবো। ওর সর্বস্ব লুণ্ঠন কইরে এক কাপড়ে পথে দাঁড় কইরে দিয়ে বলবো, এবার কইরে খাও। পিরথিবীটাকে দেখ। তারপর ফাঁসি হোক আর জেল হোক।'

'না, না, ছি।' লক্ষ্মীর মা শান্ত করলেন তাকে। ঠাণ্ডা জল দিলেন, খাবার দিলেন, কাছে বসে নরম গলায় বললেন, 'এখানে আর আমাকে ওরা টিঁকতে দিচ্ছে না। সারা রাত আমি ভয়ে ঘুমুতে পারি না! কারা ঢিল ছোড়ে, কুৎসিত কথা বলে, তুমি স্কুলের কাজ করলে আমাকে দেখবে কে?'

'তাই তো।'

'তুমি দূরে কোথাও ঘর খোঁজো কালীচরণ।'

'তাই খুঁইজবো।'

'আমি অন্য চাকরি খুঁজছি। তুমি বুড়ো হয়েছ, আমি চাকরি পেলে তোমার আর কাজের দরকার কী? যা পাবো, আমাদের চলে যাবে।'

এই কথাতেই কালীচরণের বুক জুড়িয়ে গেল। সে ঘর খুঁজতে বেরুলো। ঘরও খুঁজলো, চাকরিও খুঁজলো। ঘর পেলো বস্তির মধ্যে, চাকরি পেলো না। চাকরি অত সহজে পাওয়া যায় না। সেও পেলো না, লক্ষ্মীর মাও পেলেন না। আর সেজন্যই বস্তির ঘর নিতে হলো। ভাড়াটা তো আয়ত্তের মধ্যে থাকা চাই! কী সম্বল আছে তাদের? লক্ষ্মীর মারও নেই, কালীচরণেরও নেই।

৩৫

মেয়ের হাত ধরে সজল চোখে বস্তির ঘরে ঢুকতে ঢুকতে লক্ষ্মীর মা বললেন, 'তুমি দুঃখ ক'রো না কালীচরণ, এই বেশ। ঘরখানা তো ভালোই।'

কালীচরণের চোখও সজল হলো, কপালে করাঘাত করে বললো, 'হায় ভগবান! এই তোমার ভালো? রাজেন্দ্রাণীকে আমি ভিখারিনী কইরে কাদের মধ্যে নিয়ে এলাম?'

হাহাকার কালীচরণই করেছিলো, তিনি নন। তাঁর আর হাহাকার করবার মতো অবশিষ্ট কিছু ছিলো না। এই শহর না ছাড়া পর্যন্ত সুরেন পৈতের দয়ায় যে যে-কোনো ভদ্রপাড়া থেকেই তিনি অচিরে উচ্ছন্ন হবেন তা তিনি জানতেন। বরং এই ভালো। আর যাই হোক, এরা অন্তত মুখোশ এঁটে থাকবে না। এদের ঝগড়া চেঁচামেচি, নৈতিক নীতি, সবই নিশ্চয় অনেক খোলা-মেলা। তবু যে কালীচরণের মতো একজন মানুষকে তিনি অভিভাবক করে পেলেন সেজন্যই কৃতজ্ঞ হলেন।

তখন অবিশ্যি লক্ষ্মীর কথা ভাবেন নি। অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল সেটাই সবচেয়ে বড়ো কথা। নিজে যেভাবেই থাকুন, এই পরিবেশে লক্ষ্মীকে মানুষ করে তোলা খুব কঠিন। এখানকার শিশুদের ধরনধারণ বুলি কিছুর সঙ্গেই লক্ষ্মীকে মেলানো অসম্ভব। অথচ এটাই শিক্ষার প্রারম্ভ। এই কাঁচ মাটিতে যে বীজ ছড়াবেন তাই অঙ্কুর হয়ে দেখা দেবে। স্কুলে দেবারও সময় হলো। কোথায় দেবেন? একটা মিশনারি স্কুল আছে বটে, অনেক দূরে, অনেক মাইনে। তা ছাড়া এই পিতৃপরিচয়হীন সন্তানকে কোথাও ভর্তি করতে তো কী বিড়ম্বনা।

পাগলের মতো যে কোনো একটা চাকরির জন্য তিনি আবেদন নিবেদন আর হাঁটাহাঁটি করে ক্লান্ত হয়ে গেলেন। কোথাও মিললো না। মেলা সহজ নয় বলেই মিললো না। আগে নিচু ক্লাসের শিক্ষিকাদের জন্য বিশেষ কোনো ট্রেনিং-এর বন্দোবস্ত ছিলো না। এখন তো হয়েছে। এখন নতুনভাবে কোনো স্কুলে ঢুকতে গেলেই সেই বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় প্রয়োজন। এই স্কুলে তিনি একজন নার্সের পরিচয় সূত্রে ঢুকেছিলেন। বোধহয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সেই নার্সের কোনো সম্পর্ক থেকে থাকবে।

একজন অসময়ে বিনা নোটিসে ছেড়ে গিয়েছিলো, কম মাইনেতে ঢুকিয়ে নিয়েছিলো তাঁকে। সেটা ভাগ্যের কথা। ভাগ্য গুণেই পেয়েছিলেন। কিন্তু সে ভাগ্য আর তকে দয়া করতে রাজী নয় বোধ হয়।

কালীচরণ বলে, 'ভাবনা কি, আমি আছি।'

নিশ্চয়ই সে আছে, তবু চলে কই?

বস্তিতে আসার তিন সপ্তাহের মধ্যেই বেশ ভালো মাইনের একটা কাজের সন্ধান পেয়েছিলো কালীচরণ। রেলের চাকরি। নৈহাটিতে। লক্ষ্মীর মা যেন একটা আশার আলো দেখতে পেয়েছিলেন। আর কিছুর জন্য নয়, এ শহর ছাড়তে পারবেন বলেই একটা ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গিয়েছিলো তিরতির করে। আর কালীচরণও উৎসাহে ফুটছিলো টগবগ করে। বলেছিলো, 'আর বেশী দিন নয়, দু-চারটা দিন টিঁকে থাক এখানে, তারপর বুক ফুইলে, পেঁতের বাচ্চার মুখে থুতু ছিইটে চলে যাবো মালগুদামে। আমি কোয়ার্টার পাবো। হেঁ হেঁ বাবা, এ ঐ মল্লিক-ফল্লিকের বাড়ি নয়, সরকারী কাজ। মাইনে দিবে এক শো প'চিশ।'

এ কথা সে স্কুলের আশেপাশে গিয়ে চেঁচিয়ে বলে এসেছে। বলেছে, 'সদ্যি মল্লিক বুঝি ভেইবেছিলো আমাকে ভাতে মাইরবে। পারলো কি? শোনো, কী চাকরি আমি পেয়েছি, শুইনে রাখো। আরে বাবা, আমারে তাড়িয়ে তুই কী লক্ষ্মীলাভ করবি, তোর লক্ষ্মী তো তোকে কবেই ছেইড়ে গেছে। তবু আমি এতোকাল ছিলাম বলে বারো ভূতে লুইটেপুটে বাড়িঘরটাও চেটে খেতে পারেনি, এখন তো একটা একটা করে ই'ট খইসলো বলে, শিয়ালকুত্তার বাথান হতে আর দেরি নেই।'

মনের দুঃখে এসব বলেছে সে। আপন মমতার জায়গা থেকে উন্মূল হয়ে তার বুধ বুক ফেটে যাচ্ছিলো।

লক্ষ্মীর মা সব বুঝতেন। বুঝে আর কী করবেন! প্রাণপণে নিজের একটা জীবিকার বন্দোবস্ত করা ছাড়া আর তাঁর করবারই বা কী ছিলো! ভেবেছিলেন তিনিই চাকরি করবেন, কালীচরণ খাবে, এখন কালীচরণের উপার্জনের উপরই হয়তো নির্ভর করতে হবে তাঁকে।

কিন্তু রেলের চাকরিটা সব ঠিক হয়ে গিয়েও ভেস্তে গেল। তার ঐ প্রচারের ঠেলাতেই ভেস্তে গেল। খোঁজখাঁজ ক'রে বোধ হয় সুরেন পৈত্ত গিয়েই সর্বনাশটি ক'রে এলো।

কালীচরণ মুষড়ে পড়েছিলো। কয়েকটা দিন আর কোনো কথা ছিলো না তার মুখে। অত আদরের লক্ষ্মীদিদির দিকেও নজর দিতে পারেনি। তারই মধ্যে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা কালেক্টার সাহেবের কুঠি থেকে বৃন্দাবন মালী এসে হাজির। কালীচরণের একমাত্র বন্ধু।

'ওরে ভাই কাজ করিবু? মাইনে ভালো আছে। নতুন সাহেব এসে গেছে কিন্তু রাঁধিবার লোকো নেই।'

কালীচরণ উজ্জীবিত হয়ে উঠলো। তখুনি চলে গেল পরিষ্কার ফতুয়া গায়ে দিয়ে। ফিরে এলো হাসিমুখে।

কালেক্টার সাহেবের কুঠিতে কাজ, কম সম্মান নয়। কিন্তু রান্নার সে জানে কি? ভয়ে ভয়ে বলেছিলো, 'দুটো একটা ভালো পদ শিখিয়ে দাও তো মা। বরং একটা কাগজে লিখে দাও, টাঙিয়ে রাখবো, দেখে দেখে রাঁধবো।'

লক্ষ্মীর মা মৃদুহাস্যে তাকে সেই রাতে অনেক তালিম দিয়েছিলেন এবং বুঝেছিলেন এ বিষয়ে ওর আর কোনো উন্নতি হবার নেই। এবং এও বুঝেছিলেন, এ কাজের মেয়াদ সাত দিন, চোদ্দ দিন অথবা এক মাস। তার বেশী কখনও নয়। কালীচরণ নিজেও তার চেয়ে বেশী আশা করে নি।

কিন্তু কেটে তো গেল কতোগুলো মাস। এখন তো কালীচরণ বেশ নিশ্চিন্ত। সে বোধ হয় বুঝেছে, সাহেব বাবুর্চি পেলে ঠিকই রাখবেন, কিন্তু তাই বলে তার চাকরি যাবে না। উপরন্তু দশ টাকা মাইনে বেড়ে গেল।

কাল লক্ষ্মীর জন্মদিনে ভদ্রলোককে খাওয়াতে পেরে কী খুশী! ফিরে এসে আর গল্প ফুরোয় না। 'বুঝলে মাগো অনেক পুণ্যি করলে তবে এমন মুনিব মেলে।' কথা শুনে তিনি হাসছিলেন। কালীচরণ শিশুর মতো সরল। কালীচরণকে বস্তুতই তাঁর একটি সন্তানের মতো মনে হচ্ছিলো। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ভীতও হচ্ছিলেন। কে জানে, যেমন ওখানকার সম্বন্ধে এখানে একে গল্প করছে, তেমনি ওখানে গিয়েও তাঁর সম্বন্ধেই কিছু বলে এসেছে কিনা। কালীচরণের সরলতাই কালীচরণের শত্রু। তার মনিব লক্ষ্মীকে ভালোবাসেন ক্ষতি নেই, যদিও এতো ভালোবাসার কারণ কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি, তবুও না-হয় কালীচরণের ভাষায় ভাবা গেল একা থাকে, একটা বাচ্চাকে সঙ্গী পেয়েই খুশী, কিন্তু এর পরের ধাপ যদি তার মা পর্যন্ত এসে পৌঁছয় সেই ভয়েই বুক কাঁপে। তিনি ঘরপোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘেও তাঁর আতঙ্ক। হাসপাতালের ডাক্তাররা, কর্মচারীরা লক্ষ্মীকে শিখণ্ডী করেই অগ্রসর হয়েছিলো আসল শিকারের দিকে।

কালীচরণ যতোই বলুক, কে ভালো কে মন্দ তা কেউ বুঝতে পারে না উপর উপর। হোন তিনি জেলার শাসনকর্তা, লক্ষ্মীর মারও উচিত নয় চট করে বিশ্বাস করা। তা ছাড়া আজ না শুনুক, কাল না শুনুক, একদিন শুনবেই একজন সহজলভ্য অসহায় স্ত্রীলোক আছে এখানে, যার কুমারী অবস্থার সন্তান এই লক্ষ্মী। তখন? তখন কী দুর্বুদ্ধি হবে লোকটির কে জানে। ইচ্ছে যেতো যে একদিন তিনিই পৌঁছবেন না, তবে বা ঠিক কি? লক্ষ্মীকে আর যেতে দেবেন না কালীচরণের সঙ্গে। ও যতোই কাঁদুক, কালীচরণ যতোই নিয়ে যাবার জন্য ঝুলোঝুলি করুক, তিনি কঠিন হবেন কাল থেকে নিশ্চয়ই কঠিন হবেন।

ভাবতে ভাবতে বেশী গরম লাগলো তাঁর। হাত পাখাটা ঘন ঘন নাড়তে লাগলেন। আর সেই মুহূর্তেই প্রবল বেগে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো লক্ষ্মী।

'মা, মা গো, দেখ, দেখ—' উপহারের বোঝা নিয়ে সে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লো মার গায়ের উপর। উত্তেজনায় সে হাঁপাচ্ছিলো, তার রং টুকটুকে দেখাচ্ছিলো, খুশিতে কাঁপছিলো থরথর ক'রে।

আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ায় ব্যথা পেলেন লক্ষ্মীর মা। সচকিত হয়ে ফিরে তাকালেন মেয়ের দিকে। অবাক হয়ে বললেন, 'কার সঙ্গে এলি? কালীচরণ কোথায়? একা দেখছি কেন?'

'তুমি দেখ, আগে দেখ—'

এতোক্ষণে লক্ষ্মীর মা খেয়াল করলেন লক্ষ্মীর হাতভর্তি চকোলেটের বাক্স, বুকে পুতুল, চেন বকলস পরিহিত কুকুর ছানাটা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কাবাকের বাসী খাবারের গন্ধে প্রলুব্ধ। একটা পলক। তারপরেই বিদ্যুৎবেগে তিনি উঠে বসলেন। সনিশ্বাসে বললেন, 'এ কি? এসব কী? এসব তোকে কে দিল? কোথায় পেলি?'

'হুজুর, হুজুর দিয়েছে।' লক্ষ্মীর গলা আহ্লাদে গদগদ।

'হুজুর দিয়েছে!'

'হ্যাঁ। ছাহেব। ছাহেব দিয়েছে।'

'কী বলছিস তুই?'

'বলছি তো বাবু দিয়েছে।' মায়ের ভঙ্গি দেখে এতোক্ষণের খুশীমুখ ভয়ে নীল দেখালো লক্ষ্মীর।

'বাবু কে?'

'বাবু তো।'

'ঠিক ক'রে বল, ভালো ক'রে বল।' ঝাঁকানি দিলেন তিনি।

'বাবুকে চেন না? বাবু?' কান্না ফুটলো লক্ষ্মীর গলায়, 'ঐ যে হুজুর। ঐ যে বিন্দাবনদাদা বলে ছাহেব, আর কালীদাদা বলে হুজুর আর—'

'আর তুমি বাবু বলো, না?' ঠাস ক'রে এক চড় মারলেন মেয়ের গালে। কচি গালে পাঁচটা আঙুল চেপে বসে গেল। রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'অসভ্য মেয়ে। কেন এনেছ এসব? কেন? কেন?'

চোখে জল গড়িয়ে পড়লো লক্ষ্মীর, কিন্তু অন্য সময়ের মতো শব্দ করে কাঁদলো না, মুখটা শক্ত করে রাখলো।

'বলো, কেন এনেছ?'

মায়ের সান্নিধ্য ছেড়ে সে ছিটকে দরজার ধারে এসে দাঁড়ালো।

'বল, বল কেন এনেছ এসব?'

'দিয়েছে।'

'তুমি চেয়েছিলে?'

'না।'

'নিশ্চয়ই চেয়েছিলে।'

'ন্না।'

'তবে কেন দিল?'

'দেবে তো।'

'কী বলছো?'

'হ্যাঁ।'

'লক্ষ্মী!'

'হ্যাঁ।'

'আবার জেদ করছো?'

'হ্যাঁ।'

'পাজী মেয়ে। লোকের কাছে চাইতে তোমার লজ্জা হয় না? ভিক্ষুক কোথাকার।'

'আমি চ্চাইনি, চ্চাইনি, চ্চাইনি?' লক্ষ্মীর জেদী কচি গলা উঁচু পর্দায় উঠে কাঁপতে লাগলো।

নিষ্ঠুর হয়ে মা ওর হাত থেকে জাপটে ধরা পুতুলটা টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দূরে; সঙ্গে সঙ্গে রাংতা মোড়া টফির বাক্সটা লক্ষ্মী নিজেই খোলা দরজা দিয়ে ছুঁড়ে দিল উঠোনে, তারপর মাটিতে উপুড় হয়ে চোখ ঢেকে হেঁচকি তুলে তুলে কাঁদতে লাগলে নিঃশব্দে।

গোলমাল দেখে কুন্টী খাওয়ার গন্ধ ভুলে তাকিয়েছিলো ঘরের ভিতরে, লক্ষ্মীকে কাঁদতে দেখে সে ঘেউ ঘেউ করলো, নিষিদ্ধ জেনেও ঘরে ঢুকে মাথা চেটে দিল, ছোটো ছোটো থাবা দিয়ে আঁচড়াতে লাগলো জামা।

লক্ষ্মীর মা ক্রন্দ বকলস সুদ্ধ তাকে বাইরে ঠেলে দিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলেন।

'একটা কথা শোনো' মেয়ের হাত ধরে উঠোবার চেষ্টা করে বললেন, 'তোমাকে আমি বলেছি না, তুমি কারো কাছ থেকে কিছু নেবে না!' শোনো চোখের জলে কপালে মুখে লেপটে যাওয়া চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'বলেছিলাম না আর তুমি ওখানে যাবে না! এদিকে ফেরো, কেঁদো না, আমার কথা না শুনে হাত ছাড়িয়ে কেন তুমি কালীদাদার সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে চলে গেলে?' পিঠে হাত বুলোলেন, 'খুব অন্যায় করেছিলে; আর কখনো যাবে না, কেমন? বলো, বলো আর কখনো যাবে না?'

'যাবো।'

'কী?'

'আমি যাবো।'

'আমি বারণ করছি, তবু মুখে মুখে বলছো যাবে?'

'আমি—আমি হুজুরের কাছে যাবুবোই।'

'আবার হুজুর বলছো?'

'আমি ছাহেবের কাছে রোজ যাবো।' হেঁচকি তুলে তুলে কথা বলছিলো লক্ষ্মী। মার ধমকে হুজুর শব্দটা বদলালো।

'আবার সাহেব বলছো?'

'বাবু।'

'না, বাবু নয়।'

'কী তবে?'

'কিছু নয়।'

'হ্যাঁ।'

'লক্ষ্মী!'

'বাবু, হুজুর, ছাহেব, ছব।'

'লক্ষ্মী।'

'আমি যাবো, যাবো, যাবো।'

রেগে লক্ষ্মীর মা আর একটা চড় মারলেন। লক্ষ্মী তার ছোট্ট শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে চুলভরা মাথাটা ঝাঁকিয়ে একটা দুর্জয় ক্রোধে ঠেলে দিল মাকে, বড়ো বড়ো চোখে, বড়ো নিশ্বাসে সমান জেদের সঙ্গে আবার বললো, 'আমি যাবো, যাবো, নিশ্চয় যাবো। বাবু আমাকে ভালোবাসে, আমাকে তাড়িয়ে দেয় না, ওরা বললে ওদের বকে দেয়, আমি বাবুকে ভালোবাসি, আমি যাবো।'

এবার লক্ষ্মীর মা অসহ্য রাগে দুঃখে মেয়েকে এলোপাথাড়ি চড়চাপড়ে বিধ্বস্ত করে দিলেন। বলতে লাগলেন, 'যাবে না, যাবে না, কক্ষনো যাবে না। তোমাকে আমি তালা বন্ধ করে একা ঘরে রেখে দেব।'

মার খেতে খেতে শ্রান্ত হয়ে লক্ষ্মী আর কোনো কথা বললো না। তার এখানে-ওখানে কালসিটে পড়ে গেল।

মেয়েকে বুকে চেপে ধরেছিলেন লক্ষ্মীর মা। লক্ষ করলেন কখন যেন ভিড় জমে গেছে দরজায়। বাচ্চাদের ভিড়, বয়স্কদের ভিড়, পুরুষ স্ত্রীলোকের ভিড়। ঠেলাঠেলি করে দরজাটা খুলে ফেলেছে তারা। উঠোনের টফিগুলো কুড়িয়ে খাচ্ছে শিশুর দল।

ক্রমশ

আলোয় কালোয়

ত্রিশঙ্কু

এক এক সময় ভাবতে বেশ মজা লাগে. এই দু' শ' আড়াই শ' কোটি লোকের পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তেই একটা দুর্ঘটনা ঘটছে। কোথাও না কোথাও। এই যে রাত ন'টার সময় আমার ছোট্ট টেবিলটার ওপর ঝুঁকে লিখছি, কিংবা সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ সবুজ প্ল্যাস্টিকের কাপটায় কাটা-ভাঙা গরম জল নিয়ে দাড়ি কামাবার তোড়জোড় করছি—ঠিক এই সময় ইয়াকোহামায় কিংবা বুদাপেস্টে কিংবা আলেকজান্দ্রিয়ায় বা ভেনেজুয়েলায়, নিদেন-পক্ষে আমাদের দেশেই কোথাও কোন বিয়ের আসরে বা মেলায় একটা প্রকাণ্ড দুর্ঘটনা হচ্ছে। একটু কান খাড়া করে দাঁড়ালেই আমি গন্ধ পাই পোড়া ঘরবাড়ির বা অর্ধেক পচে-ওঠা মানুষের শবের। শব্দ পাই আর্তনাদের—বাঁচাও, বাঁচাও। কোথায় ঘটছে ব্যাপারটা বুঝতে পারি না, তবে আর্তনাদ যেহেতু সব 'ভাষাতেই একরকম শোনায়,—আমার অনুমান করতে কষ্ট হয় না। জানি, পরদিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, ছবি সুদ্ধ সেই অঘটনের খবর ফলাও করে বেরোবে—রসিয়ে-রসিয়ে পড়ব পরের দিন চা খেতে খেতে। একদল অপরিচিত অসহায় প্রাণীর জন্য মন খারাপ করব খানিকক্ষণ, কখনও বা দুর্বৃত্ত সেজে যারা দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে, নিয়তির সেইসব দালালদের প্রতি রুষ্ট হব। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে বা দুঃসাহসী ফোটোগ্রাফারের হাত-যশের ফলে বীভৎসরসটা যদি বেশ গাঢ় হয়ে ফোটে, তা হলে আমার আপিস যেতে দেরি হয়ে যাবে।

এই কারণে খবরের কাগজ পড়তে আমার এত ভাল লাগে। আসল খবর মানে তো দুর্ঘটনা—সচরাচর যা হবার নয়। যেভাবে দিনটা কাটলে নিশ্চিন্ত থাকা যেত, কারো কারো পক্ষে দিনটা হঠাৎ অন্যরকম হয়ে যাওয়া। কাগজে দু'-একটা যে সুখবরের ভেজাল থাকে না, তা নয়। কোন অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার, হঠাৎ কারো লক্ষপতি হয়ে যাওয়া, জনসাধারণের সুখসুবিধের জন্যে কোথাও একটা বাঁধ বা সেতু নির্মাণ—আর তাই নিয়ে হয়তো একদল গোদা বাঁদরের নিখরচা হামবড়াই। সবাই জানে আসলে এক কানের জল আর এক কানে ঢালা। তা ছাড়া থাকে পয়সা খরচ করে ব্যবসায়ীদের ঢাক পিটোনো এবং সম্পাদকীয় বলে এক বা একাধিক নিরাকার অশ্বডিম্ব। এইসব জঞ্জালের ভেতর থেকে পিছলে-পিছলে দু'-দশটা ছোট বড় খাঁটি সুস্বাদু অঘটনের দেখা পেয়ে যায় চোখ দুটো। ঘটনা চিনতে পেরে স্বস্তি হয়।

এখন কোথাও কোন মহামারীর টিকি পর্যন্ত দেখা যায় না। সেরকম দিনকাল নেই যে, ইচ্ছে করলেই একটা বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটানো যাবে। সেই যে এক বেগমের গল্প আছে, যিনি শোবার ঘরের জালি-কাটা দেয়াল থেকে যমুনার ওপর লোক-ভরতি নৌকো দেখে নবাবের কাছে আবদার করে-ছিলেন, ওটাকে উল্টে দাও না গো. নৌকো-ডুবি দেখি নি কখনও; আর অমনি একটা ছিপ নিয়ে কয়েকজন মাঝনদীতে ছুটে গিয়ে হুকুম তামিল করে এল। কিংবা, উপোসী সিংহের সামনে একজন বলবান যুবককে নিরস্ত্র ছেড়ে দিয়ে তার টাটকা রক্তের ফোয়ারা দেখা। জনমতের চাপ এত প্রবল হয়ে উঠেছে আজকাল যে, প্রভূত ক্ষমতাশালী সম্রাটস্থানীয়েরাও একটু-আধটু শখ মেটাতে পারেন না সোজা পথে। ছলা-কলার আশ্রয় নিতে হয়, উদ্ধার করবার নাম করে আমোদ করতে হয়। সভ্যতা আমাদের এত ভণ্ড করে তুলেছে। নগণ্য লোকেদের তো সেটুকু সুযোগও নেই। ফলে, খবরের কাগজ পড়ে দুধের সাধ পিটুলিগোলা দিয়ে মেটানো। ক্বচিৎ কখনও বেড়াতে-বেড়াতে শ্মশানে চলে যাওয়া।

ছেলেবেলায় আমার দুর্ঘটনা দেখার বা

সংবাদ পড়ার আগ্রহ কিছু কম ছিল না. তবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতাম পীড়িতদের সঙ্গে, নির্যাতিত নিহতদের দুঃখে কাতর হতাম। এই সেদিন পর্যন্ত—কুড়ি বছর আগে—গান্ধীজীর হত্যার খবর রেডিয়োয় শুনে হাহাকার করে কেঁদে উঠেছিলাম! শ্যামাপ্রসাদবাবুর মৃতদেহ যেদিন কাশ্মীর থেকে এনে ভবানীপুর দিয়ে শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, জনারণ্যের মধ্যে দু'চোখে অবিরল অশ্রু নিয়ে সেদিন ছেলেমানুষের মত হেঁটেছিলাম আমিও। কেন এমন হয়, কেন প্রতিদিন যমদূতেরা এসে ছায়ার মত দাঁড়ায় নিরীহ লোকগুলোর পেছনে, গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় হঠাৎ, তখন বুঝতে পারতাম না।

গত পনেরো-কুড়ি বছর সময় আপনাদের দুনিয়ায় কাটিয়ে আর কিছু না পেরে থাকি, অগ্নিকাণ্ড, নরহত্যা, দুর্ভিক্ষ, শোক—এই-সব থেকে নিজের ভাবপ্রবণতাকে সরিয়ে রাখতে শিখেছি। যে যাই বলুক, যে যাই করুক, সবাই বাঁচার আনন্দে বাঁচে। আর একজনের মৃত্যুকে নিজের সর্বনাশ মনে করতে নেই—এইটুকু জানলেই অভিজ্ঞতার রকমটাই বদলে যায়। পিতার জ্বলন্ত চিতার দিকে পিঠ ফিরিয়ে তর্ক জুড়ে দেওয়া যায়—আমাদের নিমতলা বড় শ্মশান না বুনিদের কেওড়াতলা। জানা যায়, সরু নালার পাশে হলে কী হবে, অর্বাচীন কেওড়াতলায় যেসব বিখ্যাত লোকেরা পুড়েছে আজ পর্যন্ত, তার হিসেব করলে বুড়ো নিমতলার দেশী উনোনগুলো লজ্জায় নিবে যাবে।

অথচ, এই যে ভাবছি, এখন রাত ন'টার সময় পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও একটা দুর্ঘটনা ঘটছে, বাজনা বাজছে—গন্ধ পাচ্ছি—তার বিশদ বিবরণ পড়ে খানিকক্ষণ উত্তেজিত হবার লোভ আমার আগামীকাল সকাল পর্যন্ত সামলাতে হবে রুদ্ধশ্বাসে—এই স্বাভাবিক ভাবনাকে কেউ কেউ হৃদয়হীনতা বলে নিন্দে করবেন; এই হল ভদ্রলোকদের নিয়ে মুশকিল। আরে বাপু, আমি তো ঘটাচ্ছি না, আমার অপরাধবোধ কীসের? দুঃখিত না হয়ে দুঃখের ভান কেন করব? পৃথিবীতে আদৌ কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে, চোখের সামনে প্রতিদিন একটা-না-একটা অকালমৃত্যু না দেখলে নিজেদের বেঁচে থাকার মজাই পাওয়া যায় না। আপনার যদি লুডো খেলার অভিজ্ঞতা থাকে, অনুমান করতে পারবেন, চিকেয় বসে-থাকা ঘুঁটির কী আনন্দ যখন সারা বোর্ড জুড়ে কাটা-কুটির তাণ্ডব চলছে। ওই তাণ্ডবের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত বোকামি আর কিছু আছে?

অন্যের সর্বনাশ দেখলে কার না ফুর্তি হয়! যে খাঁড়া আমার মাথায় পড়তে পারত, তা আর কারো মাথায় পড়েছে ভাবলে মন খুশিতে নেচে ওঠে না? বিশেষত, যখন আমি ঘটাবার মধ্যেও নেই, ঠেকাবার মধ্যেও নেই? যেদিন খাঁড়া আমার নিজের মাথায় পড়বে, সেদিন, সবাই পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে ভাবতে একটু কষ্ট হয় অবশ্য, তবু যতদিন না ঘটছে, ততদিন বিমর্ষ হয়ে থাকি কেন? ছোট ছোট সর্বনাশেভরা দুনিয়াতে দাবার ঘোড়ার মত আড়াই পা করে লাফিয়ে যত দূর যাওয়া যায়, যতদিন খেলা যায় এই বাঁচা-বাঁচা খেলা, ততদিন মনের আনন্দে কবিতা লিখে যাই। উনিশ শ' আটষট্টি সালের মত কবিতা লেখার এমন সুসময় আর কখনও আসেনি।

খুব শীঘ্রই হয়তো দাউ দাউ করে সর্বস্ব জ্বলবে—রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, রিপোর্টার, সমুদ্র, ব্রীজ, ফটোগ্রাফারের ক্যামেরা, দমকল পর্যন্ত, তখন নিজেও জ্বলব, সিংহের চামড়া খুলে ফেলে গাধার মত কাঁহা কাঁহা করে ডেকে উঠব, লাথি ছুঁড়ব পেছন দিকে। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও যে খিতাকিচ্ছির কাণ্ড এতকাল ঘটাতে পারিনি, তাই ঘটাব সেদিন নাচতে নাচতে। সর্বনাশের মধ্যে সর্বনাশ হয়ে হইহই করব—ভাবনা কীসের, কোন প্রত্যক্ষদর্শী তো সেই ঘটনার বিবরণ লিখতে আসবে না। আমি সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় দিন গুনছি।

ট্রামে বাসে

পাঁচটি প্রশ্নের সদুত্তর না পাইলে ক্রান্তি দল কমিউনিস্টদের সঙ্গে জোট বাঁধিবে না বলিয়া এক সংবাদ পাঠ করিলাম। বিশু খুড়ো বলিলেন—"বকরূপী ধর্মের প্রশ্নের জবাব দিয়ে যুধিষ্ঠির জলপানের অধিকার পেয়েছিলেন এইরূপ একটি আখ্যান মহাভারতে বর্ণিত আছে। বর্তমান মহাভারতের আখ্যায়িকায় বর্ণিত প্রশ্নের জবাব পেলে জলের বদলে 'জোট' মিলবে এবং সবাই হয়ত সমবেত কণ্ঠে বলবেন—কিমাশ্চর্যমতঃপরম!"

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী এস পি সেনবর্মা বলেন : ছোট ছোট রাজনৈতিক দল এবং গোষ্ঠী গঠনের যে হিড়িক দেখা যাইতেছে তাহা শীঘ্রই কাটিয়া যাইবে। বহু দলের অসুবিধাকে তিনি স্বাস্থ্যবান শিশুর দাঁত ওঠার অসুস্থতা বলিয়া উল্লেখ করেন। জনৈক সহযাত্রী এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে মন্তব্য করিলে—"প্রকাশ থাকে, আক্কেল-দাঁত নয়!!"

কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী শ্রী কে কে শাহ বলিয়াছেন, বাংলা সিনেমার জন্যই ভারতের আন্তর্জাতিক মানের গর্ব।—"হয়ত তাই। কিন্তু আন্তঃ প্রাদেশিক মানের বাজারে মার খাচ্ছে বাংলা সিনেমাই"—বলে শ্যামলাল।

অন্য এক সংবাদে শুনিলাম, ফ্রন্ট লইয়া শীঘ্রই একটি শান্তি বৈঠক বসিতেছে।—"অবশ্য হ্যানয়-মার্কিনের মতো শান্তি বৈঠকের সাইট নিয়ে টানা-হেঁচড়ার কোনো খবর পাই নি"—বলে শ্যামলাল।

পঃ বঙ্গের ৭৪৮ বিঘা জায়গা নাকি পাকিস্তানের "সাময়িক" নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে।—"রবীন্দ্রনাথ দুই বিঘা জমির দুঃখে বিচলিত হয়েছিলেন, আমরা ৭৪৮ বিঘা জমি ছেড়ে দিয়ে সর্বপতৈলসিক্ত নাসিকায় পরমানন্দে নাক ডাকাচ্ছি"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

বুদাপেস্ট হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, অস্ত্রোপচারের সাহায্যে একটি কিশোরীর বুকে একটি শূকরের হৃদ্‌পিণ্ড স্থাপন করা হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল — "বিনা অস্ত্রোপচারেই অনেক শূকরের হৃদ্‌পিণ্ড অনেক কিশোরীর বুকে স্থাপিত হয়ে আসছে বহু যুগ আগে থেকে!!"

হরিয়ানায় কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় ফিরিয়া আসিয়াছে।—"এবং ভোটারগণ হয়ত কংগ্রেসকে জানিয়েও দিয়েছেন—মনে রেখো একবিন্দু দিলাম শিশিরে"—মন্তব্য বিশু খুড়োর।

দাম্পত্যজীবন সুখময় করিতে হইলে স্বামী-স্ত্রীকে চল্লিশ বছর একটানা একই শয্যায় থাকিতে হইবে বলিয়াছেন বিলাতের এক ধর্মযাজক। সহযাত্রী কোনো মন্তব্য না করিয়া জনৈক কবিয়ালের একটি গান শুনাইলেন—"যার জন্যে পাতলেম শয্যা, শ্যাম এল না পেলেম লজ্জা, হলেম উদাসী; আমার অঙ্গে নেই সে বল কী করি তাই বল, যে জ্বালা জ্বলালে কালোশশী ঐ পোহালে নিশি, করলেম কৃষ্ণপ্রেমের একাদশী"। গান শেষ করিয়া সহযাত্রী বলিলেন—"একই শয্যায় থাকতে হবে বললেই যে থাকা হয় না তা ধর্মযাজককে কে বোঝাবে!"

শহরের জল অপেয়, লবণ বৃদ্ধির রেকর্ড"—একটি সংবাদ-শিরোনাম। খুড়ো বলিলেন—"পৌর-পিতাদের গুণগ্রাহীর সংখ্যা নিতান্ত সীমাবদ্ধ বললেও সবটা বলা হয় না। হয়ত নুন খাইয়ে গুণ গাওয়াবার শেষ চেষ্টাই চলছে!!"

সংবাদে শুনিলাম, অশ্লীল সাহিত্যের বিরুদ্ধে নাকি অভিযান চালানো হইতেছে।—"সুতরাং কাজে কাজেই অশ্লীল সাহিত্যের কাটতিও থাকবে বাড়তির মুখে"—বলেন সহযাত্রী।

বীটলরা দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, মহেশ যোগীর কাছে যোগাভ্যাস শিখিতে যাওয়া ঠিক হয় নাই।—"এতদিনে ভস্ম বিবেক কথাটার একটা মানে পাওয়া গেল"—বলেন সহযাত্রী।

গঙ্গার জলের উপর পাকিস্তান নাকি হিস্যার দাবি করিয়াছে।—"ধর্মস্থানি কথাটা হয়ত পাক কিতাবে নেই, নইলে গঙ্গাযাত্রায় লোভ, তোবা তোবা"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

মহারাষ্ট্রের কোনো এলাকার এক পঞ্চায়েতী নির্বাচনে নটি আসনের মধ্যে নটিতেই মহিলা নির্বাচিত হইয়াছেন। সংবাদে বলা হইয়াছে, এই নির্বাচনে কোনো পুরুষ প্রার্থী নাকি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই।—"আর যে কথাটা সংবাদে বলা হয় নি তা হল—পুরুষদের তরফ থেকে নিশ্চয়ই সংগীতে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে—তোমার কাছে যে হার মানি সেই ত মোর জয়"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

মা ... এক জাপানী মহিলা শ্রীমতী এইকো বলিয়াছেন, পুরুষকে যদি বশ করিতে হয় তবে তাহাকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে হইবে। তিনি আরও বলেন : এক টোকিও শহরেই শতাধিক রান্নার বিদ্যালয় আছে।—"খুব ভালো কথা। কিন্তু আমাদের দু বেলা জোটে না রাঁধে না, তন্ত আর পান্তা' অবস্থা। সুতরাং পুরুষকে বশ করতে হলে বশীকরণ মন্ত্র ছাড়া আর উপায় নেই"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

সাহিত্য সংবাদ

নতুন পত্রিকা

বেশ কয়েকটি নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্র পক্ষে। একসঙ্গে এরকম কয়েকটি রুচি-শোভন, সুমুদ্রিত এবং শুদ্ধ সাহিত্যের পত্রিকার আবির্ভাব বিস্ময়কর। এদের সম্পর্কে কিছু বলার আগেই প্রার্থনা জানাই, যেন সবাই বেঁচে থাকে। বাংলা দেশে নতুন, পরীক্ষামূলক এবং বিশ্লেষণধর্মী রচনার জন্য আরও পত্রিকার প্রয়োজন ছিল। আশা করি, এই পত্রিকাগুলি দীর্ঘকাল সেই দায়িত্ব বহন করবে। নিছক মৌসুমী ফুল হবে না।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, দিলীপকুমার গুপ্ত এবং অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত "সারস্বত"। মলাট থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এমন সৌষ্ঠবপূর্ণ পত্রিকা বাংলা দেশে আগে আমাদের চোখে পড়েনি। "সারস্বত" প্রকাশের আগেই এ প্রত্যাশা আমাদের ছিল, দিলীপ-কুমার গুপ্তের নাম জড়িত কোনো মুদ্রিত বস্তু প্রায় সব সময়ই অনন্য। দিলীপকুমার গুপ্ত—মুদ্রণ, প্রকাশনা ও প্রচার-জগতে যিনি ডি-কে নামে পরিচিত—বাংলা দেশ তাঁর কাছে ঋণী। আজকের বাংলা বইয়ের যে মুদ্রণ-পারিপাট্য ও প্রচ্ছদ-সজ্জা—এর শুরু হয়েছে তাঁরই দৃষ্টান্তে। আজ থেকে ২০ বছর আগে প্রকাশিত যে-কোনো বাংলা বই হাতে নিলেই তফাত বোঝা যাবে। মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জায় তিনি শুধু সর্বজ্ঞ নন্, রূপের আবিষ্কারক—এবং সত্যজিৎ রায়কে দিয়ে প্রচ্ছদ আঁকিয়েছেন। বাংলা কবিতার জন্য তাঁর অনুরাগও সর্বাবিদিত। এক সময়, তরুণ কবিদের কথা তো দূরে থাক্—প্রতিষ্ঠিত কবিরাও কাব্য-গ্রন্থের প্রকাশক পেতেন না। সিগনেট প্রেসের কর্ণধার হিসেবে ডি-কে নবীন-প্রবীণ কবিদের কবিতার বই যথাযোগ্য শ্রদ্ধার সঙ্গে ছাপিয়ে বহুসংখ্যক পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ১৪ বছর আগে তিনি সিনেট হলে যে দু'দিনব্যাপী কবি সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন—তা আজও তুলনারহিত হয়ে আছে।

এবার তিনি পত্রিকা-সম্পাদক হিসেবে এসেছেন। সহযোগী অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ও "কবিতা পরিচয়" নামে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পত্রিকা প্রকাশ করে দু' এক বছর আগে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। প্রকাশক হিসেবে আছেন চিত্রকর রঘুনাথ গোস্বামী। সুতরাং আমাদের প্রত্যাশা অনেক। প্রথম সংখ্যা দেখলে দৃঢ় ধারণা হয়, এই পত্রিকা নিছক ব্যবসাবুদ্ধি বা রাজনীতি সম্পূর্ণ পরিহার করে শুধু সাহিত্য-শিল্প বিষয়েই মনোযোগী থাকবে। এ সংখ্যায় আছে শিল্পী নিখিল বিশ্বাস সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ, তাঁর অনেকগুলি ছবি সমেত। প্রমথ চৌধুরীর স্কেচ, তাঁর সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর রায়ের বক্তব্য, সবুজ পত্রের প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়ের পুনর্মুদ্রণ। কবিতাবলী, গল্প, অনুবাদ। এবং গ্রন্থ-সমালোচনার ওপর খুব মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রথম সংখ্যার সব রচনা পাঠে অবশ্য তেমন তৃপ্তি আসে না। কয়েকটি লেখা কাঁচা ও অবান্তর। কবিতা সম্পর্কে বিদেশী কবিদের টুকরো মন্তব্য সংবাদপত্রের রিপোর্ট হিসেবে মানায়—সাহিত্য পত্রিকায় এর কোনো উপযোগিতা আছে বলে মনে হয় না। সম্পাদকীয় বা লেখকদের প্রতি বক্তব্য—বড় বেশী গম্ভীর গম্ভীর। রচনায় নতুনত্বের বদলে কৃত্রিমতা বেশী। শুধু দেখতে সুন্দর নয়, আশা করি, পরবর্তী সংখ্যাগুলি মানস-সম্পদেও পূর্ণ হবে।

জ্যোতির্ময় দত্তের সম্পাদনায় বেরিয়েছে মাসিক 'কলকাতা'—তারুণ্য ও বিদ্রোহের আঁচ এর সর্বাঙ্গে। জ্যোতির্ময় দত্তের কবিতা, নাটক এবং প্রবন্ধ যাঁরা পড়েছেন—তাঁরা জানেন, এই তরুণ লেখক কোনো শক্তি মিথ্যে কিংবা ভণ্ডামির সঙ্গে কমপ্রোমাইজ করবেন না। শুধু প্রতিবাদ এবং বিদ্রোহই নয়—সব সময়ই তাঁর নিজস্ব নতুন কথা বলার থাকে—এবং সেই বক্তব্য প্রকাশের জন্য এমন ধারালো ঝকঝকে ভাষা বহুকাল বাংলায় দেখা যায়নি। 'কলকাতা' পত্রিকায় জ্যোতির্ময় দত্তের এই তীব্র ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। বাংলা দেশের তরুণ লেখকদের পরীক্ষামূলক রচনার মুখপত্র এই পত্রিকা। প্রথম সংখ্যায় আছে তারাপদ রায় ও জ্যোতির্ময় দত্তের অপ্রতিরোধ্য কবিতা, শঙ্কশীল বসুর একটি সম্পূর্ণ নতুন স্বাদের ছোট গল্প, পল ভালেরি সম্পর্কে অমিয় দেবের রচনা, কলকাতা শহরের সংকট সম্পর্কে শান্তিকুমার ঘোষের আলোচনা, নবনাট্য আন্দোলনের সমালোচনা। শুধু সাহিত্য নয়, এই বিভ্রান্তিকর সময়, আমাদের প্রিয় শহরের এই বিনাশ দশা, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির গোলমেলে রূপ সম্পর্কে তরুণদের অকপট বক্তব্য থাকবে এই পত্রিকায়—এমন প্রতিশ্রুতি আছে।

বিমল রায়চৌধুরী সম্পাদিত দৈনিক কবিতার একটি নতুন সংকলন এবার প্রকাশিত হয়েছে কবিতা সিংহের সম্পাদনায়। গত বছর এর একটি সংখ্যা শ্রেষ্ঠ মুদ্রণের জন্য সরকারী পুরস্কার পেয়েছিল। কবিতা এবং কবিতা বিষয়ক রচনাসম্ভারে সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। অনেকগুলি নতুন কবিতা, বিভিন্ন দশকের কবিদের সম্পর্কে অপর কবিদের আলোচনা, কবি সম্মেলনের উপযোগিতা সম্পর্কে বিতর্ক, বিদেশী কবিতার অনুবাদ সব কিছুই আকর্ষণ তীব্র করে তোলে। জীবনানন্দ এবং তাঁর স্ত্রীর একটি দুর্লভ ফটোগ্রাফ এবং লাবণ্য দাশের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ—একটি অত্যন্ত মূল্যবান রচনা।

নতুন পত্রিকা আর একটি, ছোট গল্পের। 'গল্প ও গল্পকার'—বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় এবং রক্তেশ্বর হাজরা সম্পাদিত। ছোট গল্পের অনেক পত্রিকা বেরোয়, বন্ধ হয়ে যায়। এই নতুন ত্রৈমাসিকটির প্রথম সংখ্যায় লিখেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, পূর্ণেন্দু পত্রী, শিশির লাহিড়ী, নিখিলচন্দ্র সরকার প্রভৃতি।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'অলিন্দ' পত্রিকারও নতুন সংখ্যা বেরিয়েছে। বিশুদ্ধ কবিতার এই পত্রিকাটি সম্পূর্ণ পৃথক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। অনর্থক হই-হল্লা, কাব্য-আন্দোলনের নামে শোরগোল কিংবা ব্যক্তি-পূজা অর্থাৎ কবিতার বদলে কবিদের নিয়ে মাতামাতি করার থেকে সাবধানে দূরে থেকে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ কাব্য রচনা ও আলোচনা প্রকাশই এর সম্পাদকের একমাত্র উদ্দেশ্য। সত্যকার কবিতা-পাঠকদের কাছে এই পত্রিকা নিত্য আকর্ষণীয়।

সুশীল রায় সম্পাদিত ধ্রুপদী এবং জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত কবি ও কবিতারও নতুন সংখ্যা বেরিয়েছে। মাসিক ধ্রুপদীর ১০০তম সংখ্যা অবিলম্বে প্রকাশিত হতে চলেছে। কবিতার জগতে এটা একটা রেকর্ড। পূর্ণেন্দু ভরদ্বাজ সম্পাদিত ঝকঝকে রূপালী মলাটে বেরিয়েছে সিংহাসন। আর একটি কবিতার পত্রিকা।

কয়েক বছর ধরেই রবীন্দ্র পক্ষে নানান্ কবিতা পত্রিকা প্রকাশের যে রীতি শুরু হয়েছে— এ বছরও তা বজায় আছে। একসঙ্গে এত কবিতার পত্রিকা—পৃথিবীর আর কোথাও হয় না—শুধু এটাই বড় কথা নয়—কোন্ প্রেরণা এর পিছনে কাজ করছে সেটাই বিস্ময়কর। প্রতিটি পত্রিকাতেই থাকেন কিছু সম্পূর্ণ নতুন কবি—এবং তাঁদের অনেকেরই কবিতা নতুন স্বাদের। পঁচিশে বৈশাখ সকালবেলা বিভিন্ন উৎসব-প্রাঙ্গণে নারী-পুরুষের হাতে হাতে দেখা গেছে যোগব্রত চক্রবর্তী সম্পাদিত 'পঁচিশে বৈশাখের কবিতা'। এক লাইনও গদ্য নেই। এতে আছে ৩৬ জনের নতুন কবিতা। সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মিহির রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় বেরিয়েছে 'সাময়িকী'। এতে আছে ১৮ জনের কবিতা—চেনা-অচেনা নামের। শুভঙ্কর ঘোষ ও শ্যামসুন্দর দত্ত সম্পাদিত পত্রিকার নাম 'অম্বর'-এর লেখক-গোষ্ঠী নিজেদের নাম দিয়েছেন ট্র্যাজিক জেনারেশান। আবার আলাদা ধরনের পত্রিকা অন্বীক্ষণ—এতে সবই অনুবাদ কবিতা ও গল্প-প্রবন্ধ। সত্যব্রত সান্যাল, শান্তনু নাগ ও দীপক ঘোষ সম্পাদিত।

সনাতন পাঠক

পুস্তক পরিচয়

রাজনৈতিক প্রবন্ধ

গণযুগ ও গণতন্ত্র। অম্লান দত্ত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯। মূল্য তিন টাকা।

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে ভারতবর্ষের রাজনীতি এক জটিল সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। বিশ বৎসরব্যাপী কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ শাসনের ফলে আশাহত বিরোধী দলগুলি প্রায় সবাই সংসদীয় গণতন্ত্রে আস্থা হারাতে বসেছিলেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন সম্ভব নয় বলে যাঁদের ধারণা দৃঢ়মূল হতে যাচ্ছিল, চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল তাঁদের সেই অবিশ্বাসের মূলে আঘাত হানল। দেশের সামনে একটা নূতন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হল। শাসক দলকে ক্ষমতাচ্যুত করবার একটা শান্তিপূর্ণ পথের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। এই প্রতিশ্রুতিকে কেন্দ্র করে অধ্যাপক অম্লান দত্তের "গণযুগ ও গণতন্ত্র" পুস্তকের প্রবন্ধগুলি লিখিত হয়েছে।

আত্মপ্রত্যয়হীন মানুষ গণতন্ত্রের রক্ষক হতে পারে না। গণতন্ত্রের মূলে সুর বাঁধা আছে আত্মপ্রত্যয়ী মানুষের স্বাধীন মতামতের উপর। যখনই মানুষ আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে তখনই গণতন্ত্র বিপন্ন হয়েছে। অধ্যাপক অম্লান দত্ত আত্মবিশ্বাসকে গণতন্ত্রের পক্ষে একটা বড় সম্পদ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে এই আত্মবিশ্বাসের অভিব্যক্তি হয়। তাই এই সময় থেকে এ দেশে গণযুগের সূচনা হল বলে তিনি মনে করেন।

নানা ঘটনার আবর্তে পড়ে মানুষ ইদানীং কালে আত্মবিশ্বাস প্রায় হারাতে বসেছে। মানুষের অন্তর্জগতে এই অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে বৈজ্ঞানিক চিন্তার অভাব। একদা যে উদার যুক্তিবাদী চিন্তাস্রোত এ দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল তা উপরতলার মানুষদেরই প্রভাবিত করেছিল, কিন্তু নিচের তলার মানুষদের স্পর্শ করতে পারেনি। ফলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে একটা ভাবগত ব্যবধান রয়ে গেছে। গণযুগে এই ব্যবধান যত শীঘ্র দূর করা যায় ততই গণতন্ত্রের মঙ্গল। তাই এই ব্যবধান দূর করবার জন্য তিনি বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনার উপর জোর দিয়েছেন। শিক্ষার প্রসার না হলে বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা সাধারণ মানুষের বোধগম্য হবে না। ফলে মানুষ আত্মপ্রত্যয়ী হবে না এবং মানুষ আত্মপ্রত্যয়ী না হলে পরিণামে গণতন্ত্র বিপন্ন হবে।

স্বভাবতই আত্মপ্রত্যয়ী মানুষের আনুগত্য কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীবিশেষের প্রতি নয়। নিজের প্রতি আনুগত্য আত্মপ্রত্যয়ী মানুষের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন হলে দেশের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য হবে। অধ্যাপক অম্লান দত্ত এটার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আলোচ্য পুস্তকে "ধর্ম, যুক্তিবাদ ও সমাজ" নামক প্রবন্ধে।

যুক্তি নির্ভর ভাবনা-চিন্তা শিক্ষার দ্বারা অর্জিত হয়। তাই তিনি শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। আমাদের দেশে শিক্ষার প্রসারতার সঙ্গে ভাষা সমস্যা জড়িয়ে আছে। ভাষা সমস্যাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সংহতির মূলে একটা কঠিন আঘাত হানা হয়েছে। অধ্যাপক অম্লান দত্ত মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী। কিন্তু তাই বলে তিনি আন্তঃ-ভারতীয় যোগাযোগের জন্য ইংরেজী ভাষাকে বর্জন করার পক্ষপাতী নন। তাঁর মতে মাতৃভাষা ও ইংরেজীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিণামে আমরা লাভবান হব।

কেবলমাত্র ভাষা সমস্যার সমাধান হলে শিক্ষা ক্ষেত্রের অন্যান্য সমস্যার সমাধান হবে না। পড়াবার পদ্ধতি ও পরীক্ষা ব্যবস্থা এই দুয়েরই পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে অধ্যাপক অম্লান দত্তের মতামত উল্লেখযোগ্যভাবে বাস্তবপন্থী এবং গ্রহণ করলে সমগ্রভাবে সবাই উপকৃত হবেন বলে মনে করি।

অধ্যাপক অম্লান দত্তের আলোচ্য পুস্তক সকলের নিকট আদৃত হবে। কেননা, এই পুস্তকে তিনি যেসব সমস্যা আলোচনা করেছেন তা এ দেশের প্রতিটি মানুষের সমস্যা। এইসব সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি যে যুক্তিনিষ্ঠ পথ-নির্দেশ করেছেন তা বস্তুনিষ্ঠ এবং সেই কারণে সহজেই গ্রহণযোগ্য।

শিল্প ও সমাজ

ললিতকলা ও জনমানস। আরুইন এডম্যান। অনুবাদ। ডাঃ সুধীরকুমার নন্দী। সাহিত্যশ্রী। মূল্য দুই টাকা।

নিত্য-প্রবহমান কালাশ্রয়ী জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাসমূহ নিয়েই মনুষ্যসমাজ। শিল্প হল সেই অভিজ্ঞতাসজাত প্রাণময় বিষয়রূপ। তাই শিল্পের সাথে সমাজের যোগাযোগ নিবিড়। সুদূর অতীত হতে আধুনিক কাল পর্যন্ত শিল্প ও সমাজের নৈকট্য লক্ষ করলে দেখা যায় যে, কখনও সমাজ শিল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, কখনও বা শিল্প সমাজকে প্রভাবিত করেছে। আলোচ্য গ্রন্থে অধ্যাপক আরুইন এডম্যান এরই বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আলোচনা মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। শিল্প

ও সমাজকে পাশাপাশি রেখে বিচার করে তিনি দেখিয়েছেন যে, জীবনের সাথে শিল্পের চর্চা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাই তাঁর মতে শিল্পচর্চা জীবন চর্চারই নামান্তর।

ডঃ সুধীরকুমার নন্দী এই দুরূহ বিষয়বস্তুকে স্বচ্ছন্দ অনুবাদের দ্বারা বাঙালী পাঠকের নিকট পরিবেশন করেছেন। সাধারণ পাঠক এই অনুবাদে ললিতকলার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নানা জটিল প্রশ্নকে অনুধাবন করতে পারবেন এবং সেই সব প্রশ্নের সহজ এবং যুক্তিনিষ্ঠ মীমাংসাও খুঁজে পাবেন।

উপন্যাস

রাতের কুয়াশা। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। রূপরেখা। ১২৩/১এ, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা-৪। পাঁচ টাকা।

উপন্যাসের নায়ক শঙ্কর গুপ্ত সাংবাদিক। প্রতিবেশিনী নায়িকা চন্দ্রা থিয়েটার গার্ল, ঘরে রুগ্না মা এবং দানব ভগিনীপতি রাজীববাবু। পনের কুড়ি বছর আগেকার চায়ু বাংলা চলচ্চিত্রের ঘটনার মতই চন্দ্রার রুমাল কুড়িয়ে তাকে ফেরত দেবার আছিলায় লেখক নায়ক শঙ্করের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন। এর পর হরেকরকম পদ্ধতিতে নায়ক-নায়িকার সান্নিধ্যসাধনে লেখক কল্পনার সূত্রকে যথেচ্ছ মেলে দিয়েছেন। চন্দ্রা সাজাহান নাটকে অভিনয় করবার জন্যে শঙ্করদের অফিস থিয়েটারের নায়িকা নির্বাচিত হয়েছে। সেই সুবাদে লেখক শঙ্কর-চন্দ্রা কাহিনীকে বেশ জমজমাট করে তুলেছেন। তারপর, যেহেতু উপন্যাসকে এক জায়গায় এসে থামতেই হবে, সেই হেতু একেবারে শেষের দিকে চন্দ্রা তার বিড়ম্বিত জীবনের অশ্রুসজল বৃত্তান্তের কথা শঙ্করকে জানিয়েছে। কামুক এবং বিবেকহীন রাজীবের জঘন্যতার কথা জেনে স্পর্শকাতর শঙ্কর চন্দ্রাকে ঘরে তুলে নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য চন্দ্রা আত্মহত্যা করে পত্র মারফত দুটি ছত্রে শঙ্করকে বলে গেছে, 'কলঙ্কিত এ দেহ তোমাকে নিবেদন করা যায় না। ক্ষমার চন্দন মাখিয়ে দিলেও সব ফুলে দেবতার পুজো হয় না।'

উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে জীবন ও মানুষ সম্পর্কে যে ধ্যান এবং অন্তর্মুখিনতার প্রয়োজন তার কণামাত্র 'রাতের কুয়াশায়' পাওয়া যাবে না। লেখকের মনোযোগ সেদিকে ছিলও না। কেবলমাত্র একটা বিষয়কে উচ্চাবচ ঘটনার দোলায় আন্দোলিত করে শেষের দিকে অতি নাটকীয়ভাবে সমাপ্তি-রেখা টেনে দেওয়া—এই ব্যাপারটাই উপন্যাসে প্রকট হয়ে উঠেছে। বস্তুত, একটা সাদামাটা ছোট গল্পকে অযথা বাড়াতে গেলে তার সৌন্দর্য ও সামঞ্জস্য যতটুকু নষ্ট হয়ে যায় এ ক্ষেত্রেও তেমনটা হয়েছে। এ ছাড়া বিরজা মিত্র-বনমালী-যুগবাণী ক্লাব ইত্যাদি দুর্বল ও প্রয়োজনহীন প্রসঙ্গের অবতারণা করে রচনাটিকে অকারণ পল্লবিত করা হয়েছে। নায়ককে সাংবাদিক করার পেছনে

লেখক প্রকারান্তরে যে যুক্তি উপস্থিত করেছেন, বিষয়ের দিক থেকে বিচার করলে তার কোনই প্রয়োজন ছিল না। উপন্যাসটিতে তথ্যের দিক থেকেও ছোটখাটো কিছু ত্রুটি ধরা পড়ে। তবে ভাষা ব্যবহারে এবং ঘটনা বিস্তারে এক ধরনের জৌলুস এবং গতিবেগ আছে, যার ফলে তরতর করে উপন্যাসখানি পড়ে ফেলা যায়।

৬৪।৬৮

বিবিধ

কুশদহের ইতিহাস। হাসিরাশী দেবী। শ্রীদেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৬বি নন্দলাল মেস লেন, কলিকাতা-৩। মূল্য ৪·০০।

ভাগীরথী নদীর পূর্বপ্রান্তে বর্তমান নদীয়া ও চব্বিশ পরগনার কিছু অংশ এবং যশোহরের (বর্তমানে পাকিস্তান) বৃহৎ অংশ জুড়ে কৃষি, শিল্প ও সংস্কৃতিতে বাংলা দেশের একটি গৌরবের অঞ্চল ছিল কুশদহ বা কুশদ্বীপ। প্রভূত পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় সহকারে লেখিকা এই অঞ্চলটি সম্পর্কে বহু প্রামাণ্য তথ্য আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সংকলিত করেছেন। নানা নির্ভরযোগ্য আকর থেকে তথ্যাবলী আহরণ দ্বারা লেখিকা কুশদহ সম্পর্কে অমূল্য জ্ঞাতব্য বিষয় পরিবেশনে সক্ষম হয়েছেন যা বিশেষভাবে ইতিহাস অনুরাগীদের বহু কৌতূহল নিবৃত্তিতে সহায়ক হবে। সেকালের জীবন, জীবিকা ও সমাজের বেশ একটা চিত্র পাওয়া যায়। লেখিকার ভাষা ঝরঝরে।

বেদান্ত ও তন্ত্রে আলোকপাত। সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮ প্রামাণিক ঘাট রোড, কাশীপুর। কলকাতা-৩৬। দুই টাকা।

ভূমিকায় আছে, আস্তিক সাধনার দুটি প্রধান ধারা—বৈদিক ও তান্ত্রিক। গ্রন্থকার এই দুই ধারার নিগূঢ় রহস্য সম্বন্ধে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা ক্ষুদ্র হলেও আমাদের মনে হয়, আধ্যাত্মিক রসপিপাসুদের গ্রন্থখানি ভাল লাগবে।

স্বাস্থ্য দীপিকা। পরিচালনা সম্পাদক : নিতাইপদ মুখোপাধ্যায়। ২ ফরডাইস লেন, কলিঃ ১৪। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৬০ পয়সা।

সর্বসাধারণের উপযোগী বাংলা ভাষায় অন্যতম জনস্বাস্থ্যমূলক মাসিক পত্রিকা। এই সংখ্যায় পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী এবং শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী আশা দেবী, ডাঃ গৌরসেন, ডাঃ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ সুনীলকুমার দাশগুপ্ত, ডাঃ অজিত ভৌমিক, ডাঃ ফাল্গুনী ভট্টাচার্য, ডাঃ কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ ই এ মোল্লা, ডাঃ সনৎকুমার দত্ত ও আরো অনেকে। শিক্ষামূলক, তথ্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী বর্তমান সংখ্যাটি আগ্রহী পাঠকমাত্রেরই ভাল লাগবে।

প্রাপ্তি স্বীকার

হ্যান্স এন্ডারসন-এর রূপকথার রাজ্য। অনুবাদ : সন্তোষকুমার দে। অশোক প্রকাশন : এ৬২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩·০০।

কেমন করে এলো। অমরনাথ রায়। অশোক প্রকাশন : এ৬২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২·৫০।

ভগিনী নিবেদিতা। ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ। শ্রীদেবাঞ্জন প্রামাণিক : ১৫এ ক্ষুদিরাম বসু রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য ২·৫০।

শ্রীরাপদ শতদল। ইন্দ্রনাথ দে ৩৪ বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯।

গীত মাধুরী। অসিতকুমার গোস্বামী। নীরাজনা প্রকাশনী : ৩৫।সি মতিলাল নেহরু রোড, কলিকাতা-১৯। মূল্য ২·০০।

বিদেশী কবিতা। সামসুল হক। বাংলা কবিতা প্রকাশনী : ১৮ পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা-২০। মূল্য ৩·০০।

রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি। সুধাংশুবিমল বড়ুয়া। সাহিত্য সংসদ : ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ১০·০০।

প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া। শ্রীপরেশ দাশগুপ্ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ অন্তর্গত প্রত্নতত্ত্ব অধিকার।

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা। জ্যোতির্ময়ী দেবী। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী : ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪·৫০।

পেয়েছি অন্য মনে। অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ। ভাব ও লেখা : ১০/এ তেলিপাড়া রোড, কলিকাতা-২৫। মূল্য ২·০০।

দখিণবিলের ধারে। অজিতেন্দ্র সিংহ। উদয়ন : ই/১২ আই. এ. আর. আই. পুষা, নিউ দিল্লি-১২। মূল্য ২·০০।

আগুনরাঙা। ছবি বসু। কথাশিল্প : ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪·০০।

গোর্কি (নাটক)। ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ইন্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড : ৫৭সি কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১·৫০।

সেবা-সদন। রমণীমোহন পাল। চলন্তিকা প্রকাশক : ২২১/২ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩·০০।

হোমিওপ্যাথিক রত্নহার। ডাঃ সূর্যকান্ত ভট্টাচার্য। শ্রীসত্যেন্দ্র ভট্টাচার্য : ১৩৪ আনন্দ পালিত রোড, কলিকাতা-১৪ মূল্য ২·২৫।

নানান দেশের নানান সমাজ। ডঃ দিলীপকুমার মালাকার। প্রকাশ ভবন : ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪·০০।

খেলার মাঠে

হকি লীগের অপরাজিত রানার্স মোহনবাগান পর্বে ভারতের শ্রেষ্ঠ হকি প্রতিযোগিতা 'বেটন'ও জয় করেছে। এর অর্থ—সারা মরসুমে অপরাজিত থেকে লীগ রানার্সের সম্মানের সঙ্গে মোহনবাগানের বেটন কাপ জয়ের গৌরব। লীগের ১৯টি খেলা এবং বেটনের ৪টি খেলা, মোট ২৩টি খেলার মধ্যে মোহনবাগান করেছে ৫১টি গোল, তাদের বিরুদ্ধে গোল মাত্র একটি। এই হিসাব থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় মোহনবাগানের আক্রমণভাগ যেমন সংহতিপূর্ণ, রক্ষণভাগ তেমন সুদৃঢ়।

গোল করা এবং গোল খাওয়ার হিসাবে এবারের অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ন এবং বেটনের সেমিফাইন্যালে বি এন রেল দলের কাছে পরাজিত ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের রেকর্ড মন্দ নয়। লীগ ও বেটনের মোট ২৪টি খেলায় সপক্ষে ৩৫টি গোল, বিপক্ষে তিনটি। গোল করায় বেটন ফাইন্যালে পরাজিত এবং লীগে তৃতীয় স্থান অধিকারী বি এন রেল দলের রেকর্ডও অবশ্য ভাল। মোট ২৪টি খেলায় সপক্ষে ৫০টি। কিন্তু বিপক্ষে ৯টি। এই হিসাব থেকে সন্দেহ করবার কারণ আছে যে, রেল দলের রক্ষণ-ব্যূহ ছিল ক্ষণভঙ্গুর। চাপের মুখে ভেঙে পড়েছে।

খেলার ফলাফলের দিক দিয়ে ইস্ট বেঙ্গল বা বি এন আর-এর রেকর্ডও মন্দ নয়। সারা মরসুমে বেটনের সেমিফাইন্যালের একটি খেলাতেই শুধু ইস্ট বেঙ্গলের পরাজয়। বি এন আর-এর পরাজয় লীগের একটি মাত্র খেলায় এবং বেটন ফাইনালে। লীগে ইস্ট বেঙ্গলের কাছে, বেটনে মোহনবাগানের কাছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, লীগ এবং বেটনে মোহনবাগান, ইস্ট বেঙ্গল ও বি এন আর-এর শক্তি ছিল উনিশ-বিশ বা আঠারো-বিশ-এর মত। মহমেডান স্পোর্টিং, ইস্টার্ন রেল অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন বা কাস্টমস শক্তিশালী দল হিসাবে পরিগণিত হলেও শীর্ষস্থানীয় তিনটি দলের সমকক্ষ ছিল না।

ফুটবলের মত কলকাতার হকিতেও এখন তিন প্রধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়েছে। স্থানীয় প্রতিযোগিতা শুধু লীগের খেলাতেই নয়—সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা বেটন কাপের আকর্ষণও এখন প্রধানত এদের খেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ১৯৫৭ সাল থেকে হিসাব নিলে দেখা যাবে ১২ বছরের মধ্যে বেটন কাপ কলকাতার বাইরে গিয়েছে মাত্র ৪ বার। ৮ বারের ফাইন্যালে বেটনের বিজয়ীর পুরস্কার দুই প্রধান ইস্ট বেঙ্গল ও মোহনবাগানের মধ্যে ভাগাভাগি। কিন্তু যুদ্ধোত্তর হকির প্রথম ৯ বছরের মধ্যে বেটনে কলকাতার দলের সাফল্য মাত্র 'দেড়বার'। একবার জয়, একবার যুগ্ম-জয়।

বাইরের শক্তিশালী দলগুলির বেটনে খেলতে আসার সাম্প্রতিক অনাগ্রহ কলকাতার দলগুলির প্রাধান্যের আংশিক কারণ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। অপর কারণ, কলকাতার ক্লাবগুলিতে খেলবার জন্য বাইরের নাম-করা খেলোয়াড়দের আগ্রহ। কি মোহনবাগান, কি ইস্ট বেঙ্গল, কি বি এন আর—সব ক্লাবই বাইরের খেলোয়াড়ে পুষ্ট।

অস্বীকার করবার উপায় নেই, ফুটবল ও হকিতে কলকাতা সর্বভারতীয় ক্রীড়াকেন্দ্র। তাই এখানে বাইরের গুণী খেলোয়াড় সমাগম। ফলে খেলার মান উন্নত না হলেও বজায় আছে। যাঁরা বাইরের খেলোয়াড়ের নামে নাসিকা কুঞ্চন করেন, আর বাঙালী খেলোয়াড়দের দরদে করেন আ-হা-হা তাঁদের ভেবে দেখতে বলি, বাইরের খেলোয়াড় আমদানি করা না হলে কলকাতার হকি ও ফুটবলের কি হাল হত। ক্রিকেটে বাইরের খেলোয়াড়ের অনুপ্রবেশ কম। তাই ক্রিকেটে বাংলা চিরদিনই পেছনের সারির পড়ুয়া। অবশ্য ক্রিকেটে উন্নতি না হবার আরও কারণ আছে। আবহাওয়ার অসুবিধা একটি বড় কারণ।

যাই হোক, আমার বলবার কথা, হকি মরসুমে বাইরের গুণী ও কৃতী খেলোয়াড়দের সমাগম ঘটে বলেই কলকাতার হকির আকর্ষণ জীইয়ে আছে। বাইরের খেলোয়াড় না এলে মান এবং আকর্ষণ দুই-ই কমে যেত।

বেটন কাপের ফাইন্যালে পুরস্কার বিতরণ উৎসবের সভাপতি হিসাবে মেয়র শ্রীগোবিন্দ দে-ও বলেছেন, 'বাইরের খেলোয়াড়ের অনুপ্রবেশে আমি কোন দোষ দেখি না। তবে গ্রামের মাঠ থেকে সম্ভাবিত তরুণ বাঙালী খেলোয়াড়দের খুঁজে বার করতে হবে।'

বাংলা দেশের আবহাওয়া ক্রিকেটের যেমন উন্নতির পরিপন্থী তেমন ফুটবল ও ক্রিকেট মরসুমের মাঝে 'স্যাণ্ডউইচড' হওয়া স্বল্প-কালীন হকি মরসুমও হকির উন্নতির পরিপন্থী। তাই সারা বছর ধরে হকি খেলার অনুশীলনের জন্য বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত মেয়র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে-র কাছে আবেদন জানালে শ্রী দে তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ক্রীড়ানুরাগী মেয়র তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করলে হকি খেলার উন্নতির চেষ্টার একটি কার্যকরী পদক্ষেপ হবে।

*

আগেই বলেছি, বাইরের অনেক নাম-করা দলেরই এখন বেটনে খেলতে অনাগ্রহ। প্রতি বছরই তার পরিচয় মিলছে। শক্তিশালী দল হিসাবে পরিচিত হিন্দুস্থান এয়ার-ক্র্যাফট, ভূপাল একাদশ, সাদার্ন রেল, এ এস সি সেণ্টার, ইণ্ডিয়ান নেভি, সার্ভিসেস, এম ই জি, পেরাম্বুর কোচ ফ্যাক্টরী, কিরকি ইঞ্জিনিয়ারিং, উত্তরপ্রদেশ, ওয়েস্টার্ন রেল প্রভৃতি দল এবারও বেটনে খেলতে আসেনি। বাইরের যে ৯টি দল নিয়ে বেটনের খেলার তালিকা তৈরি করা হয়েছিল তাদের মধ্যে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (প্রাক্তন পাঞ্জাব পুলিস) কোর অব সিগন্যাল, ভিলাই স্টীল, সেণ্ট্রাল রেল, মহীশুর একাদশের অবশ্যই সুনাম আছে। কিন্তু একমাত্র ভিলাই স্টীল ছাড়া বাইরের কোন দলই সেমিফাইন্যাল পর্যায়ে পৌঁছুতে পারেনি। গতবারের বেটন রানার্স ভিলাই দলও সেমিফাইন্যালে অতি সহজে মোহনবাগানের কাছে হার স্বীকার করেছে। কয়েকজন অলিম্পিক-খ্যাত খেলোয়াড় নিয়ে গড়া বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সও তাদের খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে না পারলেও গোল্ড কাপ জয়ের গৌরবের পর বেটনের কোয়ার্টার ফাইন্যালে বি এন রেল দলের কাছে তাদের পরাজয় অপ্রত্যাশিত ফলাফল। ক্রীড়াধারারও সঙ্গতিসূচক ফলাফল নয়। রেল দলের ২—১ গোলে জয়লাভ কিছুটা সৌভাগ্যপ্রসূত। বি এন আর সেমি-ফাইন্যালেও ইস্ট বেঙ্গলের বিরুদ্ধে ভাল খেলে বিজয়ী হতে পারেনি। আর ফাইন্যালে মোহনবাগানের সঙ্গে তো একেবারেই ভাল খেলতে পারেনি। খেলার ধারা অনুযায়ী মোহনবাগানের বেশী গোলেই ফাইন্যালে জেতা উচিত ছিল। কিন্তু পুরোভাগের খেলোয়াড়দের সুযোগ কাজে লাগাবার ব্যর্থতায় মোহনবাগান একটির বেশী গোল করতে পারেনি।

সেমিফাইন্যালে বি এন আর-এর কাছে পরাজিত ইস্ট বেঙ্গলের বেটনের সামগ্রিক খেলা কিন্তু লীগ খেলার সঙ্গে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। লীগে সত্যিই ইস্টবেঙ্গল খুব ভাল খেলেছে। কিন্তু বেটনে তৃতীয় রাউণ্ডের প্রথম খেলায় মাঝারি শক্তির কাস্টমস দলের সঙ্গে দুই দিন গোলশূন্য-ভাবে খেলা শেষ করে তৃতীয় দিনে ১—০ গোলে বিজয়ী হতে হয়েছে ইস্ট বেঙ্গলকে।

বি এন আর ও ইস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে তুলনায় বেটনে মোহনবাগানের প্রতিটি খেলায় সামঞ্জস্যপূর্ণ আত্মবিশ্বাসী প্রতিযোগিতা,

বেটন কাপ ও লীগ রানার্সের পুরস্কার সহ ১৯৬৮-র কলকাতা হকি মরসুমের অপরাজিত দল মোহনবাগান

প্রতিটি খেলায় প্রতিপক্ষ নৈপুণ্য ও গতি-বেগে পরাভূত। তাই তাদের বেটন জয় যোগ্যের যোগ্য পুরস্কার লাভ। দুবার যুগ্ম-জয়ের হিসাব সমেত এবার নিয়ে ৬ বার বেটন কাপ লাভ করল মোহনবাগান।

*

এ বছরের বেটন প্রতিযোগিতায় বাইরের খেলোয়াড়দের মধ্যে ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যে কেউ তেমন সুনাম কুড়োতে পারেননি। তবু, বম্বের সিকিউরিটি ফোর্সের ফরোয়ার্ড হারসেন সিং, সন্তোষ সিং ও মদনমোহনের খেলা চোখে পড়েছে। ভিলাই স্টীলের পালসারি ও আরম্যান মোটামুটি ভাল খেলেছেন। সেন্ট্রাল রেলের ব্যাক মতিলাল ডায়াস রীতিমত দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। কলকাতার খেলোয়াড়দের মধ্যে কেউই ধারা-বাহিকভাবে ভাল খেলতে পারেন নি—একমাত্র বি এন আর-এর ব্যাক সেলিম বেগ ছাড়া। ফাইনাল খেলার দিন মোহনবাগানের বিরুদ্ধে অবশ্য বেগ বেশ কিছুটা নিষ্প্রভ ছিলেন। তবু বেটনের বেস্ট খেলোয়াড় হিসাবে তাঁর প্রতীপ গুপ্ত স্মৃতি কাপ লাভ বিচারকদের সুবিবেচনার পরিচয়।

সমভাবে লীগের বেস্ট খেলোয়াড় হিসাবে মোহনবাগানের ব্যাক গুরুবক্স সিং-এর নির্বাচনও সুবিবেচনাপ্রসূত। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং অতীত দিনের হকি খেলোয়াড় ডঃ কে ডি ঘোষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বি এইচ এ-র তরফ থেকে এ বছরই লীগের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সবশেষে বলব, এক দিন হকি আম্পায়ার-দের হঠাৎ ধর্মঘট এবং দুই একটি খেলায় দুই একটি ইটপাটকেল ছোড়ার ঘটনা ছাড়া এ বছরের হকি মরসুম ছিল প্রায় শান্তি-পূর্ণ। প্রতি দেশে খেলাধুলায় উচ্ছৃঙ্খলতার পরিপ্রেক্ষিতে এটা অবশ্যই ভাল লক্ষণ।

নীচে এ বছরে বিভিন্ন হকি প্রতি-যোগিতার বিজয়ী ও রানার্সের নাম দেওয়া হল।

বেটন কাপ—বিজয়ী মোহনবাগান; রানার্স—বি এন আর।

প্রথম ডিভিসন লীগ—বিজয়ী ইস্ট বেঙ্গল; রানার্স—মোহনবাগান;

দ্বিতীয় ডিভিসন লীগ—বিজয়ী আলেক-জাণ্ডার রেমণ্ড; রানার্স—আর্মেনিয়ান্স।

তৃতীয় ডিভিসন লীগ—বিজয়ী ব্রিটিশ পেণ্টস; রানার্স—হাওড়া পুলিস।

লক্ষ্মীবিলাস কাপ—বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং; রানার্স—রেঞ্জার্স।

কাইজান কাপ—বিজয়ী বেঙ্গল ইউনাই-টেড; রানার্স—রিভার সাইডার্স;

ল্যাগডেন শীল্ড—বিজয়ী রেঞ্জার্স; রানার্স—এণ্টালী এ সি।

একলব্য

বাংলা ছবির আবশ্যিক প্রদর্শন

সুসংবাদ এই, বাংলা ছবির প্রদর্শনী ন্যূনতম সময়ের জন্য আবশ্যিক করার প্রস্তাব রাজ্য সরকার নীতি-গতভাবে মেনে নিয়েছেন। এই পরিকল্পনা কী-ভাবে কার্যকর করা যায় সে সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আইন দপ্তরের পরামর্শ চেয়েছেন।

রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের জনৈক মুখপাত্র সাংবাদিক সাক্ষাতকারে এই সংবাদ ঘোষণা করেন, এবং জানান যে, এ ব্যাপারে সরকার কোনপ্রকার প্রাদেশিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা মোটেই প্রভাবিত হননি। বাংলা ও বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পের দূরবস্থার কথা ভেবেই তাঁরা এ বিষয়ে আশু সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন.

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ চিত্র-শিল্প সংরক্ষণ সমিতি সরকারের নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করেছেন তারই ভিত্তিতে সরকার বাংলা ছবি দেখানো আবশ্যিক করার ব্যাপারে অগ্রসর হয়েছেন। এই স্মারকলিপি থেকে সরকার জেনেছেন যে, ১৯৩৯ সনে যেখানে চৌদ্দটি স্টুডিও চালু ছিল, এখন সেখানে কাজ হচ্ছে মাত্র চারটি স্টুডিওয়। এবং বাংলা চিত্রপ্রযোজনার হারও যে নিম্ন-গামী তাও সরকার জেনেছেন। এর ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগও দিনে দিনে সংকীর্ণ হচ্ছে। বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পের এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার বাংলা ছবি দেখানো আবশ্যিক করার কথা ভাবছেন। এই সরকারী প্রয়াস সাধুবাদার্হ সন্দেহ নেই। তার আগে অভিনন্দন জানাতে হয় পশ্চিমবঙ্গ চিত্রশিল্প সংরক্ষণ সমিতিকে। অল্পকালের মধ্যে তাঁরা বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পের সমস্যা সম্পর্কে সরকারকে সজাগ করে তুলতে পেরেছেন। এবং কলকাতায় তৈরি ছবির আবশ্যিক প্রদর্শনীর আইনগত ব্যবস্থার কথাও যে রাজ্য সরকার আজ ভাবছেন তাও সমিতির কর্মপ্রচেষ্টা এবং আন্তরিকতার জন্যই সম্ভব হয়েছে।

গোরা পিকচার্স-এর "নতুন পাতা" (পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত) ছবিতে আরতি গাঙ্গুলি ও মীনা সেনগুপ্ত।

সমিতির সামনে আরও অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। বাংলা ছবির রিলিজের সমস্যা নিয়েও সমিতি ভাবছেন। ইতিমধ্যে সমিতির উদ্যোগে চিত্রপ্রযোজক ও পরি-বেশকরা এক সভায় স্থির করেছেন যে, ভবিষ্যতে একটি রিলিজ কমিটির মাধ্যমে বাংলা দেশে তৈরি ছবির মুক্তির ব্যবস্থা হবে। এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়েও রিলিজ কমিটি কতগুলি পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন. বলা বাহুল্য, কলকাতায় তৈরি ছবির মুক্তির সুবন্দোবস্ত হলে এই রাজ্যের চলচ্চিত্র-শিল্পের সংকট অনেক পরিমাণে কমবে।

আসল কথা যেসব অব্যবস্থা ও দুরবস্থা প্রতিকারের কোন চেষ্টাই এতকাল হয়নি এবার হয়ত সেগুলি একে একে দূর হবে। এ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ চিত্রশিল্প সংরক্ষণ সমিতি যে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন তা সত্যই অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য।

নাট্য-সমালোচনা ঃ "সতীশ সেন"

আধুনিক জীবন সম্পর্কে হয়ত কিছু অস্বাভাবিক সত্য (রক্ষণশীল বিচারে যা 'অপ্রিয় সত্য') কথা বলবার আছে। গল্প-উপন্যাসে তা বলা শুরু হয়ে গেছে। নাটকে ওই সব কথা কখনও অস্পষ্ট কিংবা অনুক্ত, স্পষ্টত বলতে গিয়েও নাট্যকার বিব্রত অথবা ভীত। একটু ইঙ্গিত দিয়েই সংযত। এদিক থেকে নাট্যকার জ্যোতির্ময় দত্ত, "সতীশ সেন"—এর রচয়িতা, তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করতে কোন দ্বিধা বা সংকোচ অনুভব করেননি।

"সতীশ সেন" নাটকে একটি মুহূর্ত আছে, যেখানে নিয়ম ভাঙ্গার খেলা। সাহিত্যিক সতীশ সেনের এক মন্তব্য থেকে এই খেলার সূত্রপাত। কোন বিবাহিত পুরুষ কিংবা রমণী কি যথাক্রমে অন্য কোন নারী অথবা পুরুষের (নাট্যকারের ভাষায় "সম্মত" স্ত্রীলোক এবং "অধীর" যুবক) প্রতি কখনও আকর্ষণ বোধ করে না? —মোটামুটি এই হল সতীশ সেনের উক্তি। এর ফলিত রূপ নাটকে দেখানো—আবছা আলোয় সতীশ সেনের স্ত্রী ইন্দ্রাণী স্বামীর বন্ধু মৃন্ময়ের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ। অপর-দিকে সতীশ সেন সোনালি নামে একটি মেয়ের বাহুবন্ধনে বন্দী। "সতীশ সেন" নাটকটিও যেন এমনি একটি খেলা। অন্য কোন নাট্যকার তাঁর মনের কথা বলতে যতই কুণ্ঠিত বোধ করুন না কেন, জ্যোতির্ময় দত্ত এক্ষেত্রে নিঃসংকোচ। নাট্যকার তাঁর ভাবনা, অন্যের কাছে তা অভাবনীয় হলেও, প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দর্শকের তা সহ্য হোক বা না হোক। নিয়ম, শাসন, শৃঙ্খলা এবং তথাকথিত বাধ্যবাধক-

প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তেমনি দেশের বহু ছেলেমেয়ে আজ ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীত-শিক্ষাকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছে; সরকারের আনুকূল্যে ন্যাশন্যাল স্কলারশিপ ইত্যাদিরও ব্যবস্থা হয়েছে, যদিও আরো বহু কিছু করা নিশ্চয়ই বাকী আছে।

সংবর্ধনার উত্তরে আলি আকবর খাঁ সাহেব বিনম্র কণ্ঠে যা বললেন, সেটি আমরা এখানে জনসমক্ষে নিবেদন করতে চাই। তিনি বললেন :

আমার পিতার (আচার্য আলাউদ্দীন খাঁর) কাছে যে ধনরত্ন আছে, আমি তার সামান্য মাত্র অধিকারী এবং এখনও সেই রত্ন সংগ্রহের প্রচেষ্টায় নিযুক্ত আছি। আমার বাবার কাছে শুনেছি যে, যতো দিন চন্দ্রসূর্য দেশে দেশে আলো ছড়াবে, ততো দিন আমাদের দেশের এই পুরনো জ্ঞান জন-সাধারণ্যে বিতরিত হবে।"

সত্যই, গৌড়জন (বিশ্বজনও বটে) আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

আমরা আলি আকবর রবিশঙ্করের কাছে আশা কেন, দাবি করবো—তাঁরা আমেরিকার মতো আমাদের দেশেও আবাসিক সঙ্গীত-শিক্ষালয় গড়ে তুলুন। সরকারকেও সেদিকে নজর দিতে বিশেষ অনুরোধ করি।

শ্রীলোচন পণ্ডিত

বোম্বাই বিচিত্রা

এতদিনে স্টুডিও-ও খুললো। দেখতে দেখতে আবার কর্মচঞ্চল হয়ে উঠছে বম্বের স্টুডিওগুলো। সবাই এখন শুটিং করতে চায়। কিন্তু সমস্যা ডেটের। সাধারণ অবস্থায় তারকাদের ডেট নিয়ে যাঁরা চিত্রনির্মাতাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরান সেই সেক্রেটারীর দল বর্তমানে মহা ফাঁপড়ে পড়েছেন। কারণ, শোনা যাচ্ছে যে, একটি নবগঠিত কমিটিই বর্তমানে ঠিক করে দেবেন কোন তারকা কোন নির্মাতাকে কতদিন ডেট দেবেন এবং কোন নির্মাতা বর্তমানে কতদিন শুটিং করবেন। ঠিক হয়েছে, যেসব ছবি সমাপ্ত প্রায় সেই ছবিগুলিই অগ্রাধিকার পাবে। সুতরাং যেসব নির্মাতা কিছু দিন আগে ছবি আরম্ভ করেছেন তাঁরা বর্তমানে শুটিং কন্ট্রোলের দীর্ঘ লাইনের শেষের দিকে দাঁড়িয়ে মাছি মারবেন।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এবার বুঝি সব ঝামেলার শেষ হল, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখার সুযোগ যাঁদের আছে তাঁরা দেখছেন যে বম্বের চলচ্চিত্রের সমস্যা যে তিমিরে ছিল এখনো সেই তিমিরেই রয়ে গেল। অ্যাকশন কমিটির গ্রীন সিগন্যাল পেয়ে তাড়াতাড়ি শুটিং-এর কাজ শুরু করতে পেরে যেমন অনেকে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন তেমনি আবার একদল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন। যাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন তাঁরা বলছেন যে, সমস্যাগুলোর ঠিকমত সমাধান না করে এ ধরনের টেমপোরারী রিলিফ এর দ্বারা শেষ অবধি চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের কোন উন্নতিই সম্ভব নয়। নির্মাতাদের সেই ক্ষুব্ধ দল এই ধরনের হুমকিও দিয়েছেন যে, তাঁরা দরকার হলে আবার নতুন করে আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

চিত্রতারকাদের পক্ষ থেকে শ্রী আই এস জোহর ঘোষণা করেছেন যে, এখন থেকে যেসব তারকারা কালোটাকা নিতেন তাঁরা আর নেবেন না। তবু কিছু তারকা এ কথাও বলছেন যে, 'ভারতীয় জীবনধারায় সর্বত্র যদি কালোটাকার চল থাকে তা হলে আমরা কেন কালোটাকা নেব না। আমরা যদি আমাদের পুরো রোজগারের টাকাটাকে সাদা হিসেবে দেখাই তা হলে আয়কর দিয়ে আমাদের হাতে থাকবেটা কি? আমাদের যখন কাজ থাকবে না তখন আমাদের কে দেখবে? এ প্রসঙ্গে যতক্ষণ না সরকার কোন দায়িত্ব নিচ্ছেন ততক্ষণ কালোটাকার লেনদেন বন্ধ করা যাবে না। মুখে যে যত বড় কথাই বলুক না কেন কাজের বেলায় দেখা যাবে আগে যেমন ছিল এখনো তাই রয়ে গেল।' কালোটাকার আলোচনা প্রসঙ্গে একজন রসিক ব্যক্তি বললেন, 'চলচ্চিত্রের সঙ্গে কালো বা অন্ধকারের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। যে ফিল্ম দিয়ে ছবি তোলা হয় সে ফিল্ম-এ আলো লাগলে তা আর ব্যবহার যোগ্য থাকে না। নেগেটিভ ডেভলপড্ হয় কালো ঘরে। ছবি দেখাবার জন্য অন্ধকার অপরিহার্য। ফিল্মের মোস্ট ইমপরট্যাণ্ট ব্যাপারগুলোই কালোর মধ্যে হয় সুতরাং আর এক ইমপরট্যাণ্ট ব্যাপার টাকা সেটাও কালোই হবে"।

সরল শর্মা

বেঙ্গল মোশান পিকচার ডায়েরি

বেঙ্গল মোশান পিকচার ডায়েরি (১৯৬৮) সবে বেরিয়েছে। নামে 'বেঙ্গল মোশান পিকচার' কথাটির উল্লেখ থাকলেও এই ডায়েরিতে ভারতের এবং বিদেশের চলচ্চিত্র সংক্রান্ত বহু তথ্য ও সংবাদ রয়েছে। চলচ্চিত্রশিল্প সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় তো আছেই। তা ছাড়া আধুনিক কালের ফিল্ম সোসায়েটি আন্দোলন এবং বিভিন্ন দেশে চলচ্চিত্র অনুশীলনের বিষয়ও এই ডায়েরিতে লভ্য। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব সক্রান্ত অনেক তথ্য এই গ্রন্থের বিশেষ আকর্ষণ। এ বছরের ডায়েরিতে যোগ করা হয়েছে অস্কার পুরস্কার [illegible] তালিকা (১৯২৭-১৯৬৬)। "[illegible] অব ফিল্ম টার্মস" অধ্যায়টিও [illegible] এক কথায় দেশ-বিদেশের [illegible] যাঁরা জানতে ইচ্ছুক তাঁদের [illegible] ডায়েরি অপরিহার্য মনে হবে। [illegible] পরিশ্রমের ভিতর দিয়ে [illegible] ডায়েরি সম্পাদনা ও সংকলন [illegible] পাবলিকেশনস, ৩।১ [illegible] কলিকাতা-১৩)।

The অরণ্যদেব — লী ফক

হরিয়ানার অন্তর্বর্তিকালীন নির্বাচনে কংগ্রেস আবার নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। ১৪ মাস পরে কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় ফিরে এল। হরিয়ানার বিধানসভার আসন সংখ্যা ৮১। এর ভেতর কংগ্রেস পেয়েছে ৪৮টি আসন। বিশাল হরিয়ানা দল পেয়েছে ১৩টি, জনসংঘ—৭, স্বতন্ত্র—২, বি কে ডি—১, রিপাবলিকান পার্টি—১, নির্দল—৯। এখানে উল্লেখযোগ্য, দলত্যাগীদের কেউই এই নির্বাচনে জয়ী হতে পারেননি। নবনির্বাচিত হরিয়ানা কংগ্রেস দলের নতুন নেতা নির্বাচিত হয়েছেন চৌধুরী বংশীলাল।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১১ মে—বিজয়বাড়ার এক সংবাদে প্রকাশ, গতকাল এখান থেকে ২০ মাইল দূরে গোপচর-পুগুদেম গ্রামে একটি বিবাহ মণ্ডপে আগুন লাগার ফলে ৬২ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের প্রায় সকলেই নারী ও শিশু।

কলকাতা প্রেস ক্লাবে বক্তৃতাকালে এস ইউ সি নেতা শ্রীসুবোধ ব্যানার্জি আগামী অন্তর্বর্তী নির্বাচন সম্পর্কে যুক্ত ফ্রন্টের বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, এ ব্যাপারে যুক্ত ফ্রণ্টের অঙ্গীভূত দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার অভাবজনিত সংকট দেখা গিয়েছে।

১২ মে—ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির একাদশ রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন উপলক্ষে ময়দানে এক বিরাট জনসমাবেশে পারটি নেতৃবৃন্দ যুক্ত ফ্রণ্টের ঐক্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বক্তৃতা করেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী।

কাশীপুরের রতনবাবুর ঘাটে গতকাল সন্ধ্যায় একটি যাত্রী বোঝাই নৌকা মাঝগঙ্গায় ডুবে যায়। অনেক রাত পর্যন্ত ৪ জনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। সন্দেহ করা হচ্ছে, নিখোঁজের সংখ্যা ৩৫।

১৩ মে—১৮ মে বাম কমিউনিস্ট পার্টি ও ক্রান্তি দলের মধ্যে যে শান্তি বৈঠক হচ্ছে, সেখানে অজয়বাবু প্রমোদবাবুর কাছে সোজাসুজি ৫টি প্রশ্ন রাখবেন বলে শোনা যাচ্ছে। এই ৫টি প্রশ্নের সদুত্তর না পেলে ক্রান্তি দল বাম কমিউনিস্টদের সঙ্গে জোট বাঁধবে না।

বহির্বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী শ্রী বি আর ভগৎ আজ রাজ্যসভায় বলেন, পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট এবং চীনের সিনকিয়াং-এর মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী রাস্তা যে ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক সরকার তৎসম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত আছেন। শ্রীভগৎ উত্তেজিত সদস্যদের বলেন, ভারতের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে।

১৪ মে—ষোল মে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারীদের প্রস্তাবিত ধর্মঘট সম্পর্কে রাজ্য সরকার অত্যন্ত কঠোর মনোভাব অবলম্বন করেছেন। এ সম্পর্কে মঙ্গলবার রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর সাংবাদিকদের বলেন, ওইদিন ধর্মঘট হলে সরকার যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করবেন। ওই দিনই সন্ধ্যায় মনুমেণ্ট ময়দানে রাজ্য সরকারী কর্মচারী ইউনিয়নসমূহের সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় ১৬ মের প্রস্তাবিত ধর্মঘট সফল করার জন্য এক আবেদন জানানো হয়।

১৫ মে—কৃষ্ণনগরের এক খবরে জানা গেছে, প্রচুর পরিমাণে চাল রাখার জন্যে ৩১ জনকে পুলিস ধরে। ধৃত ব্যক্তিদের হাতকড়া পরিয়ে কৃষ্ণনগর শহরের রাস্তায় ঘোরানো হয়। কালীগঞ্জ থানার মাতিয়ারী গ্রামে হানা দিয়ে পুলিস লক্ষাধিক টাকার বেআইনী মজুত চাল উদ্ধার করে। ধৃত ব্যক্তিদের পথে পথে ঘোরাবার সময় শত শত লোক তাদের টিটকিরি দিচ্ছিল।

দার্জিলিং-এর খবরে জানা গেছে, গত ১৪ই মে খড়িবাড়ি পুলিস থানার ফুলবাড়ি ও থাকনজোড়া চা বাগানে হানা দিয়ে পুলিস ৫ জন ফেরার নকশালপন্থী নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে। বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের একটি মামলাসূত্রে এঁদের খোঁজা হচ্ছিল।

১৬ মে—কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের ব্যাপক ধর্মঘট হয়। সরকারী নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে রাজ্য সমন্বয় কমিটি একদিনের জন্য এই প্রতীক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন। সরকারী কর্মচারীদের এইরূপ ঘোষিত প্রতীক ধর্মঘট এই রাজ্যে এই প্রথম।

কলকাতায় পানীয় জলে লবণের ভাগ যে পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে শহরের জল অপেয় হয়েছে।

ভুপালের এক সংবাদে প্রকাশ, ভুপাল থেকে ১২৩ কিলোমিটার দূরে একটি প্রহরীহীন লেভেল ক্রসিংয়ে একটি প্রাইভেট বাস এবং একটি একসপ্রেস ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে সাতাশ জন মারা গিয়েছেন। আহত হয়েছেন ৩৬ জন। হতাহতদের সকলেই ছিলেন বাসযাত্রী।

বিলম্বে পাওয়া এক সংবাদে জানা গেছে, ভারত-জাপান মহিলা অভিযাত্রী দল গত ১৩ মে হিমাচল প্রদেশের ছাম্ব জেলায় উনিশ হাজার ফুট উচ্চ কৈলাস পর্বতশিখরে সাফল্যের সঙ্গে আরোহণ করেছেন। ভারতীয় পর্বতারোহণ সংস্থার উদ্যোগে এবং শ্রীমতী নন্দিনী এম প্যাটেলের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়।

ভারত পাকিস্তানী বিশেষজ্ঞদের ফরাক্কা বাঁধ অঞ্চল দেখতে দিতে রাজী হয়েছে। জুনের শেষের দিকে ওই বিশেষজ্ঞরা আসতে পারেন। পাকিস্তান ১৯৬০ সাল থেকে ফরাক্কা বাঁধ দেখার জন্যে পীড়াপীড়ি করছিল। পাকিস্তানও তাদের পূর্ব পাকিস্তানের গঙ্গা-কোবাদক প্রকল্পটি ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের দেখতে দিতে সম্মত হয়েছে।

বিদেশী সংবাদ

১১ মে—প্যারিসের এক সংবাদে জানা গেল মার্কিন ও উত্তর ভিয়েতনামী প্রতিনিধিরা সরকারী আলোচনায় যে কর্মপদ্ধতি অনুসৃত হবে সে বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন।

১৩ মে—ভিয়েতনাম নিয়ে প্যারিসে আজ ঐতিহাসিক বৈঠক শুরু হয়েছে। দুই পর্যায়ে এই আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ হ্যারিম্যান ও উত্তর ভিয়েতনাম প্রতিনিধি শ্রীলুই আলোচনায় বসেছেন।

১৪ মে—প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় গতকাল ছাত্র ও শ্রমিকদের প্রতিবাদ মিছিল ও সর্বত্র সাধারণ ধর্মঘট পালনের পর আজ সকালে ছাত্রনেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ চলতে দেওয়া হবে না বলে হুমকি দিয়েছেন।

১৫ মে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ সীমিত করার উদ্দেশ্যে অন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য উত্তর ভিয়েতনামকে আবেদন জানায়। উত্তর ভিয়েতনাম অবিলম্বে বোমা বন্ধের দাবি জানায়।

১৭ মে—উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিনিধি দলের মুখপাত্র শ্রীভান সাত আজ সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি নিঃশর্তে উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ এবং অন্যান্য আক্রমণাত্মক কাজকর্ম বন্ধ করে, তাহলে হ্যানয় ভিয়েতনাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান নিয়ে কথাবার্তা বলতে রাজি আছে।

গতকাল শেষ রাত্রিতে একটি ব্রিটিশ জেট বিমান ১৪৬ জন যাত্রী নিয়ে লণ্ডনের হিথরো বিমান বন্দরে বৈমানিকের সাহায্য ছাড়াই অবতরণ করেন। বিমানে পাইলট, ক্যাপ্টেন ছিলেন বটে, কিন্তু বিমান অবতরণের সময় তিনি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ছিলেন। নিচে থেকে বিমানটিকে কণ্ট্রোল করা হয় এবং বিমানটি সেই মত মাটিতে অবতরণ করে।

১৭ মে—প্যারিসের এক খবরে প্রকাশ, শান্তি বৈঠকে উত্তর ভিয়েতনাম দাবি করে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবিলম্বে উত্তর ভিয়েতনামের উপর বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে হবে। জবাবে মার্কিন প্রতিনিধি দাবি করেন যে, দক্ষিণ ভিয়েতনামে উত্তর ভিয়েতনামী সৈন্যের অনুপ্রবেশ ঘটেছে—একথা স্বীকার করতে হবে। উভয় পক্ষের মধ্যে রুদ্ধ বিতণ্ডার পর অধিবেশন বুধবার পর্যন্ত স্থগিত আছে।

উত্তর জাপানে হোকাইডো ও হনসু দ্বীপে গতকাল (১৬ মে) প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়। ফলে ৩৭ জন মারা গেছে, নিখোঁজ ১১, আহত ১৮। ৪৬৬টি বাড়ি জলমগ্ন হয়েছে, ৮২টি বাড়ি আগুনে পুড়েছে।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রী এ. রামচন্দ্রন

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৫ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৩১
শনিবার ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২০-২২৮৩ ২০-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫·০০
ষাণ্মাসিক	১২·৫০
ত্রৈমাসিক	৬·২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	২৭·০০
ষাণ্মাসিক "	১৪·০০
ত্রৈমাসিক "	৭ ০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	২৭·০০
ষাণ্মাসিক "	১৪·০০
ত্রৈমাসিক "	৭·০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ-ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৪০·০০
ষাণ্মাসিক "	২০·০০
ত্রৈমাসিক "	১১·৫০

আসাম-ত্রিপুরায়
(বিমান-ডাকে)

বার্ষিক	৩১·০০
ষাণ্মাসিক	১৬·০০
ত্রৈমাসিক	৮·০০

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাশুল (অতিরিক্ত) ৫ পয়সা

DESH

Saturday 1 June, 1968

হিন্দীর গোপন হাত

বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই নাকি সর্বনাশের আশঙ্কা দেখলে অর্ধেক ছেড়ে দিতে রাজী থাকেন। অতি লোভের চেয়ে মাঝারি লোভ, পুরোপুরি সর্বনাশের চেয়ে কিছু ক্ষতি যে ভাল—এটাই সাংসারিক বুদ্ধিতে বলে। হিন্দীঅলাদের বেশির ভাগের দেখছি সে বুদ্ধিটুকুও নেই। দেখেশুনে ঠেকেও তাঁদের এ জ্ঞান হচ্ছে না যে, হিন্দী হিন্দী রব তুলে অত্যধিক চেঁচামেচি করে তাঁরা জল বেশ ঘোলা করে তুলেছিলেন, একটা আঞ্চলিক হানাহানি প্রায় বেঁধে উঠেছিল, সেটা আরও বাড়তে পারত, দক্ষিণ থেকে পুবেও সে আগুনের প্রসার ঘটে যেত। সুখের বিষয়, অনেক কষ্টে সেটা সামলে নেওয়া গিয়েছিল। অবশ্য, সামলে নেওয়ার অর্থ এই নয় যে, বিপদটা কেটে গেছে, নেবা আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে এইমাত্র।

অথচ হালচাল দেখে মনে হচ্ছে, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের ধারণা, হিন্দী-বিরোধিতার ভাবটা কেটে গেছে, এখন আর আশঙ্কিত হবার কারণ নেই। বোধ করি এইরকম একটা মনোভাব গড়ে ওঠার দরুন সম্প্রতি দিল্লি থেকে ফরমান জারি করে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত স্কুলে এখন থেকে আর ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া চলবে না, শিক্ষার মাধ্যম হবে হিন্দী। বলা বাহুল্য, আগের নিয়মে ইংরেজী আর হিন্দী দুইই ছিল চলতি মাধ্যম। এখন থেকে ইংরেজী বাতিল হল। কিঞ্চিৎ সুবিধের মধ্যে এই যে, আপাতত ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত এটা বাধ্যতামূলকভাবে চালু হল, পরে প্রতি সেসনে এক ধাপ করে হিন্দীকে চড়াতে হবে যতক্ষণ না শীর্ষ ধাপে হিন্দীর আসন পাকা হয়। অর্থাৎ হরেদরে সেই হিন্দীই একমাত্র মোক্ষ।

হিসেব মত এ দেশে ১৮টি কেন্দ্র-পরিচালিত স্কুল, ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার। আমাদের যত দূর ধারণা, কেন্দ্র-পরিচালিত এই স্কুলগুলি প্রধানত সরকারী কর্মচারীদের ছেলেমেয়ের জন্যে চালু রাখা হয়েছে, কে কখন কোথায় বদলি হন কে জানে, ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার যেন ক্ষতি না হয়, সেই উদ্দেশ্যে স্কুলগুলি চলছে। সাম্প্রতিক সরকারী নির্দেশ থেকে মনে হতে পারে, সরকারী কর্মচারীরা সবাই হিন্দীভাষী, হিন্দীর দৌলতেই তাঁদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষাদীক্ষা হোক কেন্দ্রের সেইরকম শুভ ইচ্ছা। মনে যাই হোক, এটা নিশ্চয় সত্য নয় যে, সরকারী সমস্ত কর্মচারীই হিন্দীভাষী, উত্তর ভারত বাদ দিয়েও অন্যান্য অংশের মানুষ সরকারী চাকরি নিশ্চয় করে, সেক্ষেত্রে তাদের মাতৃভাষা হিন্দী হতে পারে না। তা হলে বুঝতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা দফতর নিজের আওতার মধ্যে পেয়ে তাঁদের স্কুলগুলিতে হিন্দীকে বাধ্যতামূলক করছেন। এটা উদ্দেশ্যমূলক হতে পারে, ভয়েও হতে পারে: তবে নীতি হিসেবে নিন্দার যোগ্য। প্রথমত, সরকারী কর্মচারী হলেই তাঁকে ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্যে হিন্দী বেছে নিতে বাধ্য করা হবে কেন? কেন তাঁর এ স্বাধীনতা থাকবে না যে, ইংরেজীতেও তাঁর ছেলেমেয়ের শিক্ষা হোক এটা তিনি দাবি করতে পারেন! বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এঁরা ইংরেজীর মাধ্যমেই লেখাপড়া শেখাতে চান ছেলেমেয়েদের। তা ছাড়া, এই রীতিতে যদি বছরে ষাট হাজার করে সরকারী বাবুদের হিন্দী দিগগজ ছেলেমেয়ে বেরিয়ে আসে তবে আগামী দশ-বিশ বছর বাদে কি হবে? কেন্দ্র থেকে শুরু করে রাজ্য সরকারের দফতরে দফতরে হিন্দীর ঢালাও কারবার কি শুরু হয়ে যাবে না? কেন্দ্রীয় সরকারের আন্তরিক ইচ্ছাটা কি সেই রকম?

আমাদের ধারণা, কেন্দ্রের চতুর্দিকে যে হিন্দী-প্রেমিকরা উঁচিয়ে আছেন তাঁদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কৌশলে পড়ে এই অদ্ভুত, অসঙ্গত নির্দেশটি সরকার প্রচার করেছেন। এর ফল ভাল হবে না। ভাষা-দ্বন্দ্বের উগ্রতা আপাতত কিছুটা মোলায়েম ছিল, এই নব-নির্দেশ আবার সেই বিরোধিতাকে জিইয়ে তুলবে। হিন্দী-অলাদের প্রতি বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা যদি এতে বাড়ে, কারও কিছু বলার নেই। দক্ষিণ ভারতে যে তাণ্ডব পূর্বে ঘটে গেছে, সেই তাণ্ডব যদি এখন দক্ষিণ সমেত অন্যত্র দেখা দেয় তখন কোনো আহিংসা দিয়েই তাকে আর সামলানো যাবে না। চরম সর্বনাশের আগে হিন্দীঅলারা অর্ধেক অর্ধেক ছাড়তে শিখলে ভালই হয়। নতুবা

দেশ দর্পণ

কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্র থেকে উপনির্বাচনের রায় রাজনৈতিক ঘটনা হিসাবে চমকপ্রদ। প্রধান কারণ, এই উপনির্বাচন প্রত্যক্ষভাবে গত সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম উপনির্বাচন। গত সাধারণ নির্বাচনের যে চটক ছিল, তা সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনসাধারণের যে ক্ষোভ ছিল তারই প্রকাশ মাত্র। এই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করেই দেখা দিয়েছিল কংগ্রেস-বিরোধী রাজনীতি। সে নীতির মূলে কেন্দ্র অবশ্যই ছিল যুক্ত ফ্রণ্ট, যার প্রধান বক্তব্য ছিল সংগঠন হিসাবে কংগ্রেস বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে এবং পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক মতামত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে। এ ধারণাটা শুধু যুক্ত ফ্রণ্ট মহলেই সীমাবদ্ধ ছিল না, কিছু কিছু কংগ্রেস নেতাদের মনেও পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস সম্বন্ধে দ্বিধা ছিল, যেমন ছিল প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মনে। এই ধারণা ছিল বলেই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী মন্তব্য করেছিলেন অন্তরঙ্গ মহলে যে, কৃষ্ণনগর উপনির্বাচনে কংগ্রেসের জয়ের কোন সম্ভাবনা পর্যন্ত নেই।

এই ধারণাটা ছিল বলেই কৃষ্ণনগর উপনির্বাচন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত সাধারণ নির্বাচনের পর, এবং বিশেষ করে যুক্ত ফ্রণ্ট সরকার খারিজ হবার পর জনসাধারণের রাজনৈতিক মতামত নির্ধারণের কোন সুযোগ ঘটে নি। এই উপনির্বাচনই সে সুযোগ এনে দিয়েছে। তা ছাড়া এই উপনির্বাচন মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ। তাই রাজনৈতিক মহলে এই উপনির্বাচন সম্বন্ধে একটা প্রবল ঔৎসুক্য দেখা দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম বাংলার বাইরেও এই উপনির্বাচন সম্বন্ধে একটা চাপা উত্তেজনাও ছিল। সে কারণেই কৃষ্ণনগর উপনির্বাচনে কংগ্রেসের জয় এতটা চমকপ্রদ। হয়ত বিস্ময়করও।

এই উপনির্বাচনে জয়লাভ করেছেন শ্রীমতী ইলা পাল চৌধুরী। শ্রীমতী চৌধুরী লোকসভায় নবাগতা নন। অনেক আগে এই কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করেছেন; কিন্তু ১৯৬২ সালের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন। চতুর্থ নির্বাচনে তিনি প্রার্থী ছিলেন না, তাঁর পরিবর্তে শ্রীচণ্ডীপ্রসাদ মুখার্জি কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। শ্রীমুখার্জি পরাজিত হন। গত নির্বাচনের খতিয়ান লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এই কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী পরাজিত হয়েছিলেন প্রায় ৩৩ হাজার ভোটের পার্থক্যে। তা ছাড়া কৃষ্ণনগর কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পাঁচটি কেন্দ্রেই কংগ্রেস পরাজিত হয়। এই সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের মোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে গত সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস এবং কংগ্রেস-বিরোধী প্রার্থীদের মধ্যে ভোটের পার্থক্য ছিল প্রায় ৬২ হাজার।

কাজেই সাধারণভাবে বিচার করলে এই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রভাব ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। অবশ্য এটাও সেই সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, কংগ্রেসের প্রভাব ক্ষুণ্ন হবার প্রধান কারণ ঘটেছিল বাংলা কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং মুসলমান নির্বাচকদের কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব। বিধানসভার সাতটি নির্বাচন কেন্দ্রের তিনটি কেন্দ্রে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছিল বাংলা কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীর কাছে এবং আর দুটিতে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট ও সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টির কাছে। তবু ৬২ হাজার ভোটের ব্যবধান কোন রাজনৈতিক দলের কাছে উপেক্ষণীয় নয়। সবদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, লোকসভা কেন্দ্রে যে ৩৩ হাজার ভোটের ঘাটতি ছিল, সেটা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবারের উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষে ৪২ হাজার ভোটের উদ্বৃত্ত নিয়ে। অর্থাৎ কংগ্রেসের পক্ষে ৩৩ হাজার এবং ৪২ হাজার, মোট ৭৫ হাজার ভোট লাভ হয়েছে এই উপনির্বাচনে। হিসেবটা মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে। বিধানসভা সাতটি কেন্দ্রে যে ৬২ হাজার ভোট ঘাটতি ছিল তা মুছে গিয়ে প্রায় ১৩ হাজার ভোট উদ্বৃত্ত হয়ে গিয়েছে।

কংগ্রেসের পক্ষে এই উদ্বৃত্ত ভোটের তালিকা থেকে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্র, অর্থাৎ বিধানসভার সাতটি কেন্দ্র আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে পড়বে কিনা। এ প্রশ্নের সমাধান বা উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ, মধ্যবর্তী নির্বাচন হবে আরও কয়েক মাস পরে। তা ছাড়া গত দেড় বছরের ব্যবধানে যদি কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটে থাকে, তা হলে আগামী কয়েক মাসের ব্যবধানে অন্য কোন পরিবর্তন যে দেখা দিতে পারে না এমন কথা মনে করার সঙ্গত কোন হেতু নেই। এই সঙ্গে এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলা কংগ্রেসের যে রাজনৈতিক প্রভাব গত চতুর্থ নির্বাচনে ছিল, আজ আর তা নিশ্চয়ই নেই। এমনকি সাতটি বিধানসভার যে তিনটি কেন্দ্রে বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী জয়লাভ করেছিল সেখানে দলত্যাগের ফলে বাংলা কংগ্রেসের চেহারাটা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে।

হয়ত যুক্ত ফ্রণ্টের চেহারাটাও অনেকটা বদলে গিয়েছিল উপনির্বাচনের আগে। যে যুক্ত ফ্রণ্ট কংগ্রেস-বিরোধী দলের সংযুক্ত মোর্চা হিসাবে দেখা দিয়েছিল, তার সংহতি সম্বন্ধে একটা প্রবল দ্বিধা এবং সংকট দেখা দিয়েছিল নির্বাচনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে। এই সংকট এসেছিল নানা কারণে; সচেতন হবার প্রয়োজন ঘটেছিল এই কারণে যে, কৃষ্ণনগর উপনির্বাচনের জন্য যুক্ত ফ্রণ্টের প্রার্থী নির্বাচনে প্রচণ্ড মতান্তর দেখা দিয়েছিল ফ্রণ্টের মধ্যে। বেশ কয়েকটি নাম ওঠে বিভিন্ন পার্টির কাছ থেকে এবং একটি নাম ছিল ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থিত। হয়ত প্রধানত এই [illegible] দলগতভাবে প্রত্যক্ষভাবে [illegible] নামকেই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি[illegible] থেকে শেষ পর্যন্ত সমর্থনের [illegible] হয়। সেই অনুসারে মার্ক্সি[illegible] পার্টি শেষ পর্যন্ত [illegible] সান্যালের অনুকূলে সমর্থন [illegible]

কিন্তু প্রচণ্ড বিরোধি[illegible] ফ্রণ্টের আর এক শরিক, [illegible]

পার্টির ...
পার্টির ...
শ্রীসান্যালের বিরুদ্ধে ...
শ্রীসান্যাল "যুক্ত ফ্রন্টের প্রথম শত্রু" ছিলেন বিগত সাধারণ নির্বাচনে; কারণ, তিনি দুই কম্যুনিস্ট পার্টির প্রার্থীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে "কংগ্রেসকে জয়ী করেছিলেন।" আর একটি অভিযোগ যে, সংখ্যালঘু অর্থাৎ মুসলমানদের সম্বন্ধে শ্রীসান্যাল সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে নন। (উপনির্বাচনের আগে কংগ্রেস পক্ষ থেকে শ্রীসান্যালের বিরুদ্ধেও এই অভিযোগ অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে আনা হয়েছিল। এমন কি, সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে শ্রীসান্যাল যেসব উক্তি করেছিলেন বিভিন্ন সময়ে সেগুলি ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছিল)। আর, সর্বশেষ অভিযোগ যে, ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রার্থীকে মনোনয়ন দেবার বিরোধিতা করার জন্যই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি শ্রীসান্যালকে 'নির্দলীয়' প্রার্থী হিসাবে শেষ পর্যন্ত সমর্থন জানিয়েছিল।

ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির অভিযোগ থেকে এটা স্পষ্ট হওয়া স্বাভাবিক যে, কৃষ্ণনগর উপনির্বাচনে মুসলমানদের ভোট ব্যাপকভাবে যুক্ত ফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী শ্রীসান্যালের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে। আর এটাও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, উপ-নির্বাচনের নির্বাচনীপ্রচারে যুক্ত ফ্রন্ট বিশেষ যুক্ত ছিল না। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির যে প্রচেষ্টা কৃষ্ণনগরে দেখা গিয়েছিল, অন্যান্য যুক্ত ফ্রন্ট দলের 'নিরপেক্ষতা'-ও ছিল তেমনি উল্লেখযোগ্য। ফলে, যুক্ত ফ্রন্টের মধ্যে যে রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব বর্ধমান প্লেনামের পর থেকে প্রবল হচ্ছিল সেটাও প্রত্যক্ষভাবে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণনগর নির্বাচকদের সামনে।

নিঃসন্দেহে বলা চলে, যুক্ত ফ্রন্টের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে কংগ্রেস পক্ষ। শুধু অন্তর্দ্বন্দ্বই নয়, যুক্ত ফ্রন্টের নেতৃত্বের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক শৈথিল্য নিঃসন্দেহে দেখা দিয়েছিল কৃষ্ণনগর উপনির্বাচনের আগে। এই শৈথিল্য প্রকাশ পেয়েছিল যুক্ত ফ্রন্টের বিভিন্ন নেতাদের উক্তিতে। যুক্ত ফ্রন্টের মধ্যেও এই শৈথিল্যের প্রশ্ন তোলা হয়েছে। হয়ত এমনি একটা অবস্থার মধ্য দিয়েই কৃষ্ণনগর উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর জয়ের পথটা সুগম হয়ে গিয়েছে। এই জয়কে কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে পশ্চিম বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র মনে করেন। তিনি বলেছেন, কৃষ্ণনগর উপনির্বাচনে রাজনৈতিক হাওয়া বদলের নির্দেশ পাওয়া গিয়েছে।

...

... বেশ রেখেছে ... বিশেষ করে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি বেশ কিছুটা সচেতন হয়েছে। এই চেতনা অবশ্য নূতনভাবে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি এবং ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে বিস্ময়ের ...

... পার্টিকে ... করতে হলে ভারতের ... সঙ্গে বিরোধিতাকে আরও ... হবে।

হয়ত এই কারণেই, মার্ক্সিস্ট ...

[illegible] শ্রীসাহরায়ের বিরুদ্ধে যে [illegible]কতার অভিযোগ আনা হয়েছে, তার [illegible] দিতে গিয়ে তিনি অভিযোগ [করে]ছেন যে, ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির মত [এত] বড় মুসলমান-বিদ্বেষী পার্টি কোন কম্যুনিস্ট পার্টিকে হতে দেখা যায় নি। [এত] বড় অভিযোগ স্বভাবতই ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জি সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন যে, শ্রীসুন্দরাইয়া নিজের পার্টির অপরাধ ঢাকবার জন্যই এরকম মিথ্যা দোষের অভিযোগ করেছেন ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে। শ্রীমুখার্জির মতে, জনসংঘের প্রতিদ্বন্দ্বীকে সমর্থন জানিয়ে মার্ক্সিস্ট পার্টি যে অপরাধ করেছে তাকে চাপা দেবার চেষ্টা করছেন শ্রীসুন্দরাইয়া। তাছাড়া উগ্রপন্থীদের চ্যালেঞ্জটাও ভুলতে পারছেন না মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি; তাই তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতে হচ্ছে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টিকে: কিন্তু সবচাইতে বড় কারণ ছিল মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে বিভিন্ন যুক্ত ফ্রন্টের শরিকদের এবং বিশেষ করে ভারতীয় ক্রান্তি দলের প্রত্যক্ষ বিরোধ। এই বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল নিঃসন্দেহে ভারতীয় ক্রান্তি দলের [illegible] সিদ্ধান্তকে [illegible] সিদ্ধান্তের মূলে কথা ছিল, জাতীয়তা-বিরোধী, গণতন্ত্র-বিরোধী এবং অসাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী কোন শক্তি বা দলের সঙ্গে ক্রান্তি দল কোনরকম সম্পর্ক রাখবে না। এই সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়েছিল এমন একটা সময়ে যখন পশ্চিম বাংলায়, কেরলে এবং বিভিন্ন রাজ্যে একটা প্রত্যক্ষ কম্যুনিস্ট-বিরোধী রাজনৈতিক প্রভাব ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ খুঁজছিল।

স্বভাবতই যে কম্যুনিস্ট বিরোধী মনোভাব ধীরে ধীরে দানা বাঁধছিল, তা মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির এবং ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। এটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে পশ্চিম বাংলার কম্যুনিস্ট বিরোধের ঝোঁকে প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কম্যুনিস্টদের সংগঠিত মোর্চা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। এই বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতীয় ক্রান্তি দলের জাতীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্তকে বিচার করা হয়। ফলে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি ক্রান্তি দলের কাছে স্পষ্ট দাবি জানায় যে, পরিষ্কার করে বলতে হবে জাতীয়তা বিরোধী দলের মধ্যে কোন কোন দলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেটা না জানলে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি কোনমতেই ক্রান্তি দলের সঙ্গে বসে যুক্ত ফ্রন্টে মধ্যবর্তী নির্বাচনের আসন বন্টনের নীতি নিয়ে আলোচনা করতে রাজী নয়। ফলে, যুক্ত ফ্রন্টের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা প্রচন্ড সন্দেহ দেখা দেয়। কৃষ্ণনগরের উপনির্বাচনের পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত এই সন্দেহ ছিল।

অবশ্য এই সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছেন পশ্চিম বাংলায় ক্রান্তি দলের ও যুক্ত ফ্রন্টের নেতা শ্রীঅজয় মুখার্জি। তিনি মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত এবং শ্রীজ্যোতি বসুর সঙ্গে একটি যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিয়ে এ কথা ঘোষণা করেছেন যে, যুক্ত ফ্রন্টের ঐক্য বজায় রাখার জন্য তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তা ছাড়া কথাটা যখন যুক্ত ফ্রন্টের বৈঠকে ওঠে, তখন শ্রীঅজয় মুখার্জি তাঁর প্রেস ক্লাবে প্রদত্ত উক্তি উল্লেখ করেন। প্রেস ক্লাবে শ্রীমুখার্জি বলেছিলেন যে, পশ্চিম বাংলার যুক্ত ফ্রন্টের মধ্যে তিনি কোন জাতীয়তা বিরোধী দল বা শক্তি খুঁজে পান নি।

শ্রীমুখার্জির এই বিবৃতিকে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরো স্বাগত জানিয়েছে এবং পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী শ্রী পি. সুন্দরাইয়া সাংবাদিকদের বলেছেন, ক্রান্তি দলের সিদ্ধান্ত নিয়ে [illegible] বিতর্ক [illegible]

[illegible] তাদের [illegible] মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি। [illegible] মতে, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি [illegible] "জাতীয়তা-বিরোধী"। আরও উল্লেখযোগ্য শ্রীসিংহ বলেছেন, শ্রীমুখার্জি এটা ভালভাবেই জানতেন এবং তিনি কথাও দিয়েছিলেন যে যুক্ত ফ্রন্ট থেকে [illegible] তিনি বেরিয়ে আসবেন। তবু শ্রীঅজয় মুখার্জি সে কথা রাখেন নি: বরং তিনি শ্রীসিংহকে বলে দিয়েছেন যে, যুক্ত ফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে আসা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

এ কথাটা শ্রীঅজয় মুখার্জি যখন শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহকে জানিয়েছিলেন, তখন তিনি কৃষ্ণনগর উপনির্বাচন সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। শুধু তাই নয়, এটাও তিনি তখন অনুভব করেছিলেন যে, যুক্ত ফ্রন্টের বাইরে এসে প্রজা সোস্যালিস্ট বা অন্য কোন কংগ্রেস-বিরোধী অ-কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে মিলিত হয়ে তৃতীয় শক্তি হিসাবে মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব নয়। কারণ, প্রজা সোস্যালিস্ট বা অন্য কোন দলের রাজনৈতিক প্রভাব পশ্চিম বাংলায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নয়। অন্য একটা কারণও হয়ত ছিল। সেটা শ্রীঅজয় মুখার্জির ক্রান্তি দলের সঙ্গে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পর্ক। গত সাধারণ নির্বাচনে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির যে নির্বাচনী আঁতাত হয়েছিল তার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া তাঁর পক্ষে হয়ত সম্ভব নয়।

এই অসম্ভাব্যতা আরও দেখা দিয়েছে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির [illegible] পরিবর্তনে। বর্ধমান প্লেনামের পর থেকেই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের মধ্যে একটা প্রচন্ড প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছিল 'নয়া-সংশোধনবাদের' দাগটুকু মুছে ফেলার জন্য। উগ্রপন্থীদের চ্যালেঞ্জ মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং [illegible]। প্রধানতঃ এই কারণেই বর্ধমান প্লেনামের পর মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের কাছ থেকে একটা উল্লেখযোগ্য [illegible] দেখা দেয়। এই পরিবর্তনের ফলেই [illegible] কৃষ্ণনগর উপনির্বাচন [illegible] কম্যুনিস্ট পার্টি অত্যন্ত সচেতন [illegible]

এই আক্রমণ প্রতি [illegible] কংগ্রেসের কিছু নির্বাচনী [illegible] যে আনতে পারে না এমন [illegible] কিন্তু রাজনৈতিক [illegible] হয়ত ভুল হবে। [illegible]

বিদেশিকী

ভারত মহাসাগরে "শূন্যতা"

উইনস্টন চার্চিল প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পোর্টল্যাণ্ড বন্দরে প্রথম দেখেছিলেন সারি সারি ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজের বিরাট সমাবেশ। তখনকার কালে ব্রিটিশ নৌবহরের তুলনা ছিল না, তুলনা ছিল না ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরও। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আজ লুপ্ত স্বপ্ন, ব্রিটিশ নৌবহরের শক্তিও ফুরিয়ে এসেছে প্রায়। ব্রিটিশ নৌবহর ছিল চার্চিলের সাম্রাজ্যিক অহমিকার শীর্ষবিন্দু। শুধু কি অহমিকা? সুয়েজের পূব থেকে শুরু করে ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে জিব্রালটর ছুঁয়ে সুদূর অতলান্তিকের ওপার পর্যন্ত ব্রিটিশরাজের আশ্রিত দেশগুলি, 'ডমিনয়ন', উপনিবেশ এবং আরও কত কী, সবাই ব্রিটিশ নৌবহরের ছত্রছায়ায় নিরাপদ বোধ করেছে, কারোরই নিজেদের নৌবহর গড়বার দরকার হয়নি। আজ যে "শূন্যতার ভয় সুয়েজের পূব দিকে, সিঙ্গাপুর থেকে ব্রিটিশ নৌবহর বিদায় নেওয়ার অদূর সম্ভাবনায়, সে-ভয় উইনস্টন চার্চিলের একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। চার্চিল লিখেছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের পর, ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজগুলিতে জল ঢুকবার ছিদ্রপথের ছিপি যদি সব খুলে দেওয়া যায়, যদি জাহাজগুলি ডুবিয়ে দেওয়া যায়, মাত্র কয়েক মিনিটে, বড় জোর আধঘণ্টায় সারা পৃথিবীর চেহারাই তাহলে বদলে যাবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিলীন হবে স্বপ্নের মত... সাম্রাজ্যিক ঐক্যের কেন্দ্রশক্তি ভেঙে পড়বে। ("Open the seacocks and let them sink beneath the surface and in a few minutes, half an hour at most, the whole outlook of the world would be changed. The British Empire would dissolve like a dream . . . the central power of union broken"—The World Crisis).

ব্রিটিশ নৌবহর কেউ ডুবিয়ে দেয়নি; সাম্রাজ্যের বিলয়ে, প্রয়োজন ফুরিয়েছে সপ্তসমুদ্রবিহারী ব্রিটিশ নৌবহরের; ক্ষয়িত হয়েছে ব্রিটেনের বৈষয়িক শক্তি-সামর্থ্য। ইংরেজের স্বজাতিরা যে-সব দেশের অধিবাসী, যারা কিছুকাল আগেও ছিল ব্রিটিশ ডমিনিয়ন সেই কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ডও এখন আর ব্রিটেনের ভরসায় নেই। মার্কিন নৌবহর, মার্কিন অর্থ অস্ত্র এবং শক্তিজোট এখন তাদের নিরাপত্তার আশ্রয়। ব্রিটেনের নিজের অবস্থাই বা কী? লিখে-পড়ে না হলেও, ব্রিটেন এখন কার্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম স্টেট। ব্রিটেনের সেরা শিল্প-ব্যবসায়গুলিতে মার্কিন লগ্নী মূলধনের পরিমাণ কয়েক লক্ষ কোটি ডলার; ব্রিটিশ পাউণ্ডের স্বাস্থ্য তো মার্কিন দাক্ষিণ্য নির্ভর। সুয়েজের পূব দিক থেকে ব্রিটেন যে তার সাম্রাজ্যিক দায়দায়িত্ব গুটিয়ে নিচ্ছে সেটা নিতান্ত ভালমানুষী নয়। যাকে বলা হয় "ভ্যাকুয়াম", শূন্যতা, এ-ক্ষেত্রে শক্তি-শূন্যতা তার মূলে খাস ব্রিটেনেই। তাহলে এখন গতি কী? কেউ কেউ বলেন, প্রকৃত জগতে যেমন শূন্যতা কখনও সয় না, তেমনই সামরিক শক্তির দুনিয়াতেও। সুয়েজের পূব দিক থেকে, ভারত মহাসাগর থেকে, সিঙ্গাপুর নৌঘাটি থেকে ব্রিটিশ শক্তি অপসারিত হলে সে শূন্য স্থান কখনই শূন্য রইবে না। সিঙ্গাপুরে, ভারত মহাসাগরে তাহলে ব্রিটিশ নৌশক্তির শূন্য স্থান পূরণ করবে কে?

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই শূন্যতার প্রশ্নকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন না, পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন। বলছেন, ভারত মহাসাগরীয় এলাকায় বাইরের কোনও শক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা না হওয়াই ভালো। ভালো ঠিকই, কিন্তু এতকাল বাইরের শক্তি ব্রিটেনই ভারত মহাসাগরের খবরদারি করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নতুন স্বাধীন দেশগুলি এই খবরদারির দায়িত্ব নিতে পারে এমন সামর্থ্য নেই। তাছাড়া এই দেশগুলি সামরিক জোট বেঁধে, ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তারক্ষা করতে রাজী হবে কি না সন্দেহ। পাকিস্তান তো কখন ভারতের সঙ্গে এ ব্যাপারে বোঝাপড়া করবেই না। ভারত মহাসাগরে শক্তিশূন্যতার দুর্ভাবনা আপাতত সিঙ্গাপুরের সবচেয়ে বেশি, তবে সেটা সামরিক প্রয়োজনের চেয়ে বৈষয়িক লোকসানের আশঙ্কায়। সিঙ্গাপুর থেকে ব্রিটিশ নৌঘাটি বিদায় নিলে সিঙ্গাপুরের ব্যবসা-বাণিজ্যের বড় একটা অংশ একেবারে বরবাদ হবে। এই বৈষয়িক শূন্যতা অবশ্য ভারতের পক্ষে পূরণ করতে পারা সহজ নয়। কিন্তু শূন্যতার সমস্যাটি তবুও সঙ্গীন। সেটা কেবল সিঙ্গাপুরের নয়, ভারতের পক্ষেও।

ব্রিটিশ নৌশক্তির অন্তর্ধান পর্বটা হঠাৎ ঘটছে না, শুরু হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে। ভূমধ্যসাগরে এক সময়ে ছিল ব্রিটিশ নৌবহরের একাধিপত্য, এখন সেখানে মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহর সর্বক্ষণ হাজির। প্রশান্ত মহাসাগরে চীন দরিয়ার কূল ঘেঁষে ভিয়েতনাম, থাইল্যাণ্ড পর্যন্ত মার্কিন সপ্তম নৌবহরের বিরাট সমাবেশ। কম্যুনিস্ট চীনের নৌবহর এখনও নামমাত্র, চীনা নৌবহর মার্কিন সপ্তম নৌবহরের লৌহ-বেষ্টনী ভেদ করে ভারত মহাসাগরে বড়রকমের উপদ্রব করতে পারে এমন সুযোগ দেখা যায় না। নতুন যা দেখা যাচ্ছে সেটি হল দুনিয়ার নৌশক্তির প্রতিযোগিতায় মার্কিন নৌবহরের পিছু পিছু সোভিয়েট নৌবহরের আবির্ভাব।

করাচিতে গত সপ্তাহে দুখানি সোভিয়েট যুদ্ধ-জাহাজ সৌজন্য-সূচক দর্শন দিয়ে গেছে। কিছুকাল আগে ভারতও সোভিয়েট নৌবহরের এই সৌজন্য-সংস্পর্শ পেয়েছে। পেয়েছে ইরাকও। ভারত মহাসাগরে সোভিয়েট নৌবহরের আনাগোনা ব্রিটেনের শূন্যস্থান পূরণের ইঙ্গিত কি না কে বলতে পারে? আমেরিকার মত সোভিয়েট ইউনিয়নও এখন মহাশক্তির পদবীধারী: আমেরিকা যেখানে উপস্থিত অথবা উপস্থিত হতে চায়, সোভিয়েট ইউনিয়নও সেখানে উপস্থিত থাকার অধিকারী, এই সম্ভবত সোভিয়েট সমর নায়কদের যুক্তি। ভূমধ্যসাগরে মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহরের পাশাপাশি সোভিয়েট নৌবহর এখন সর্বক্ষণ উপস্থিত। সোভিয়েট নৌবহরের অবশ্য কতকগুলি গুরুতর অসুবিধা: ভূমধ্যসাগরে কিম্বা ভারত মহাসাগরে তার পাকাপাকি ব্যবহারযোগ্য কোন ঘাটি নেই, আমেরিকার যা আছে। মার্কিন ষষ্ঠ এবং সপ্তম নৌবহরের মুখোমুখি দাঁড়ানোর মত শক্তি সোভিয়েট নৌবহরের এখনও নেই। তবে ভূমধ্যসাগরে, ভারত মহাসাগরে মার্কিন-ব্রিটিশ নৌবহরের একাধিপত্যে ফাটল ধরিয়েছে সোভিয়েট নৌবহরের উপস্থিতি। ভারত মহাসাগরে "শূন্যতার" প্রশ্নটা এর ফলে আরও জটিল হওয়া সম্ভব।

২৭-৫-৬৮

স্থিতি এবং স্থানের মধ্যে

জগন্নাথ চক্রবর্তী

স্থিতি এবং স্থানের মধ্যে
মনকে আমি মনে পাইনে,
যখন জানি এখন—জানি
এখানে নয়, কোথায় যেন?
কাল তো আমার মুঠোর মধ্যে
স্থানটি শুধু খুঁজে পাইনে।
বুকের মধ্যে সুপারসনিক
শব্দ শুনি, কিসের শব্দ?
কাল তো জানি নিরবধি
স্থান কি তবে অনারব্ধ?

কেবলমাত্র স্থানের অভাব;
স্মৃতির পটে স্মৃতির স্বভাব
জলের মধ্যে তলিয়ে যাওয়া,
স্থানের নামটি সেই অতলে—
তাই তো দুঃখ বারোমাস্য
প্রতিশ্রুতি অত্যবশ্য
রাখতে এসেও রাখতে পাইনে।

বুকের মধ্যে হিসেব করা
প্রতিশ্রুত সময় এল,
কোথায় যেন চলেছিলাম
কোথায় কথা বলেছিলাম
রাত-উথানো চোখের পুবে
আশায় জ্বলা সপ্ত অশ্ব
কোথায় যেন বলেছিলাম
আসবো আবার অত্যবশ্য।

নিখুঁত টুকে রেখেছি নাম
তারিখ, বার ও সঠিক প্রহর
স্থানটি শুধু হয়নি টোকা
বুকপকেটের ডায়েরি-বুকে;
এখন আমি একা, সামনে
প্রকাণ্ড এই গঞ্জ শহর,
প্রশ্ন শুধু মনের মধ্যে
কোথায় যেন কোথায় যেন?
দ্রাঘিমাহীন অক্ষরেখায়
ভ্রমান্ত এই ভ্রমণ কেন?
স্থিতি এবং স্থানের মধ্যে
মনকে আমি মনে পাইনে।

সহজ-সুন্দরী

কবিতা সিংহ

যে কথা বলতে পারিনে
সে কথার নাম দিয়েছি;
আমি যে নাম দিয়েছি
সে নামের ভাষা জানিনে;
যে নামের ভাষা জানিনে
আমি তাকে স্পষ্ট দেখেছি;
আমার সেই সত্যিকার দেখা
এ পোড়া চোখ যে মানে না;
যাকে এ নয়ন মানে না
তাকে যে ছুঁয়ে দেখেছি;
আমার সেই সত্যিকার ছোঁয়া
এ পোড়া দেহ জানে না;
এ পোড়া দেহ জানে না।

ভাবি, এ দেহ না হ'ত
সে কথা বলতে কি পারতেম?
ভাবি, যে নামটি দিয়েছি
সেই নাম লিখে দেখাতেম?
ভাবি, যে রূপটি দেখেছি
সেই রূপ এঁকে দেখাতেম?
ভাবি, যে কান্তি ছুঁয়েছি
সে ছোঁয়া ছুঁইয়ে [illegible]?
ভাবি, যে দুঃখ বুঝেছি
সে সুখে কেঁদে ভাসাতেম?

শহরের জল, গ্রামের কাদা মিলেমিশে একাকার

সুন্দর জানালা

'সুখ'

কলকাতা থেকে ছত্রিশ মাইল। ট্রেনে আর মোটরে প্রায় একই পথ। কিলোমিটারে হিসেব করলে দূরত্বটা আর একটু সুন্দর চেহারা নেয়।

তবু মাত্র ছত্রিশ মাইল পার হয়েই মনে হচ্ছিল যেন অনেক দিগন্ত ছাড়িয়ে এসেছি—অনেকখানি বয়েসকেও ফেলে এসেছি পেছনে। যিনি নিমন্ত্রণ করে এনেছেন, তাঁর দোতলার ঘর আর বৈদ্যুতিক পাখার আতিথ্য না নিয়ে চলে এসেছি তাঁর বাগানটিতে। মাটির ওপর একটি চাটাই বিছিয়ে—একটা তাকিয়া নিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছি। জ্যৈষ্ঠের রোদ খাঁ-খাঁ করছে, কিন্তু আমাকে নম্র-শীতল আশ্রয়ে ঢেকে রেখেছে ফলে ভরা দুটি নিবিড়পত্র জামরুল গাছের ছায়া।

দক্ষিণ সাগরের সব হাওয়া এসে আছড়ে পড়ছে বাগানটির ওপর। সার বাঁধা নারকেল গাছে দুপুরের অশ্রান্ত উদাসী মর্মর। অতিকায় মুক্তোর এক একটা তোড়ার মতো জামরুল দুলছে ডাল-পাতার সঙ্গে সঙ্গে। চারদিকের আমগাছে এবার অবারিত ফলের উৎসব—রঙ ধরতে শুরু করেছে, খ্যাপা বাতাসে দুটো একটা পাকা আম টুপ-টুপ করে ঝরে পড়ছে—বাড়ির দিক থেকে দু-একটি শিশু এসে কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কখনো।

পাতা, হাওয়া আর ছায়া মিশে আমার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে যেন সবুজ সমুদ্রের ঢেউ। পাখিরাও আছে বই কি। হঠাৎ কে যেন আম গাছে খ্যাচ্ খ্যাচ্ করে বিরক্ত মেজাজে ডেকে উঠল, চেয়ে দেখি অকালের কোকিল—জ্যৈষ্ঠের রোদে তার গলা বেসুরো হয়ে গেছে। ওদিকের সজনের ডালে একজোড়া বুলবুলির কী যেন জরুরি আলোচনা। জামরুল গাছের গা-বেয়ে একদল লাল পিঁপড়ে ওঠা-নামা করছে, কোত্থেকে একটা টুনটুনি খুব তাড়াতাড়ি এসে ব্যাপারটা কী দেখে গেল। ও পাশের নারকেল গাছের ডগায় দুটি হলদে পাখি ঘন ঘন আসা-যাওয়া [করছে], খুব সম্ভব তাদের বাসা বাঁধতে হবে। আমাকে ঘিরে ঘিরে চিরকালের গাছ-পাতা-পাখির পৃথিবী—যেখানে কাজ [illegible] [illegible] যেখানে

গ্রামের [illegible] [illegible]
ট্রানজি[illegible]

আমরা ছেলেবেলাকে নিঃশেষে ফেলে এসেছি—আর কোনোদিন যাকে ফিরে পাব না।

সামনে পুরোনো মস্ত পুকুরটার বনেদী সিঁড়িটা আধখানা নেমে মাটি আর লালচে ঘাসের মধ্যে হারিয়ে গেছে। তার অনেক নীচে এতটুকু তিরতিরে জল, এক ধারে এক বুড়ী বসেছে বাসনের পাঁজা নিয়ে আর সেখানে জলে যেন বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে—পুঁটি মাছের উল্লাস। এই রকম দুপুরে কঞ্চির ছিপ নিয়ে বসার স্মৃতিটা ফিরে এল। নিশ্বাস ফেলে চোখ বুজলুম, মনে পড়ে গেল আর খানিক পরেই এই মাটি—এই সবুজ—এই পাখি—এই হাওয়া, সামনের ওই পুঁটির ঝাঁক—সব পেছনে ফেলে, একটা আতপ্ত মোটর গাড়িতে শরীরটাকে গুটিয়ে নিয়ে, আমাকে ছত্রিশ মাইল দূরের কলকাতায় ফিরে যেতে হবে।

এই পাতাদের আমি কালও দেখতে পাব—কলকাতার বাজারে। হাজার হাজার আমের

বাড়িতে জামাই এসেছে
—আম কিনতে শহরে যাচ্ছি তাই.

মাটির থেকে ছড়িয়ে-দেওয়া পাতার পাঁচের পথ গালিচার মতো নরম হয়ে যাবে, হাঁটু অবধি ডুবে যেতে চাইবে তার ভেতরে। তার মধ্যে ছড়িয়ে থাকবে জামরুলের ছিবড়ে, আমের আঁটি, মড়ার খুলির মতো ডাবের খোলা। সেগুলো মাড়িয়ে থলে-হাতে বাজারে ঢুকতে ঢুকতে আমি হাতের ঘড়িতে সময় দেখব। এই বিশ্রাম, এই হাওয়ার দুপুর, এই পাখি-ফল-পাতার উৎসব তখন আমার একবারও মনে পড়বে না।

আপাতত এইখানে এসে সেই আমির সঙ্গে বহু দিন পরে দেখা হয়ে গেল—যে আমি এইসব গাছ-পাতা-পাখি-পুরোনো পুকুরের পুঁটির ঝাঁকের শরিক ছিল—যে আমি সেদিনের সেই মালিকানা চিরকালের মতো হারিয়ে এসেছে। কত সহজ ছিল সুখ, বেঁচে থাকা কত স্বাভাবিক ছিল, কী সরল পাখিদের মতো মন ছিল তখন। আর এইখানে, এই মাটির ওপরে শুয়ে থেকে, হাওয়া আর পাতার সমুদ্রে ডুবে গিয়ে—আজকের জীবনটাকে কী অর্থহীন মনে হয়।

অনেকক্ষণ বোধ হয় চোখ বুজে ছিলুম, চটকা ভাঙল মেঘের ডাকে। দেখি রোদ নিবে গেছে, উত্তর-পুবের আকাশ ছেয়ে কালো-কাজল মেঘ নিবিড় হয়ে এসেছে। চাকতে মাতাল হল হাওয়া—ঠাণ্ডা হল তার ছোঁয়া, তারপরে ঝড় এল। তারও পরে আর একবার ছেলেবেলায় ফিরে যাওয়া—বৃষ্টির ফোঁটা নেমে না আসা পর্যন্ত আম কুড়োনোর পালা।

কলকাতা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে চলে এসে ছত্রিশ বছর পেছনে ফিরে যাওয়া। আজকের ক্লান্ত ধূসর জীবন থেকে কিছুক্ষণের জন্যে অকৃপণ আর আনন্দিত মুক্তি। এ যেন সেই জুডাস ইসক্যারিয়টের অভিশাপের দাহন থেকে একটি দিনের জন্যে আইসবার্গের শীতলতায় বিশ্রাম—পরের দিন আবার তাকে নরকে ফিরে যেতে হবে।

আমাকে ফিরতে হবে কলকাতায়। একটু পরেই।

গৃহস্বামীর ঘরে এসে আলাপ চলছিল। কথায় কথায় বললেন, ওদিকে যে বড়ো আমের বাগানটা দেখা যায়, তাতেও তাঁর অংশ আছে।

'আম পান?'

'নিই না।'

'কেন নেন না?'

একটু বিষণ্ণতার ছায়া পড়ল মুখে। বললেন, 'ওদিকে আমার শরিকেরা রয়েছে—দেখেছেন তো? ভারী কষ্ট তাদের। ছেলে-পুলেগুলো লেখাপড়া শেখেনি—বলতে গেলে কিছুই নেই—প্রায়ই এক বেলা ভাত খায় ডুমুরের তরকারি দিয়ে। তাই ওই আম ক'টা বেচে ওরা যা পায় নেয়—আমি চেয়ে দেখি নে।'

...।'

'সকালে প্রায়ই আমের ঝুড়ি নিয়ে কলকাতায় যায় ছেলেরা। কী করা বলুন—বাঁচতে তো হবে।'

আমার আবার মনে পড়ল, পাঁচের পথ ঢেকে গেছে আমের পাতায়, চলতে গেলে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায় তার মধ্যে। আমি যখন তার ভেতর দিয়ে চলতে চলতে এমনি একটা ছায়াভরা হাওয়ালাগা আমবাগানের সুখের স্বপ্ন দেখি—তখন এই গ্রামে ক'টি ক্ষুধিত মানুষের চোখে আর এক স্বপ্ন—শহর কলকাতার, তার ধূসর পাঁচের পথের—তার বাজারের—যেখানে ঝুড়ি বয়ে নিয়ে গেলে এক মুঠো বেশি ক্ষুধার অন্ন, এক-টুকরো মাছের সুখ।

না—সুখের কোনো বস্তু নেই কোথাও। কোনো রেখাও না। বাইরে পাতার ওপর বৃষ্টি পড়ার শব্দে আমার মন বিষণ্ণ হয়ে গেল।

নিলাম

নির্মল চট্টোপাধ্যায়

আমি নিখিলেশের অনেক প্রকার খেয়াল দেখেছি, কিন্তু আজকেরটা বুঝি তুলনারহিত।

খেয়াল নিখিলেশকে সাজে। বাপের মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারসূত্রে একটা প্রসাধনদ্রব্যের, একটা গেঞ্জির, আর একটা পেরেকের—মোট তিনটে কারখানার মালিক যুবক নিখিলেশ যদি কিছু খামখেয়ালী, কিছু অমিতব্যয়ী না হয়, তবে সেটা প্রায় একটা প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ ব্যাপার হয়ে যায়।

আর নিখিলেশের অজস্র বিচিত্র খামখেয়ালের আমি নীরব সাক্ষী। কেননা, আমি নিখিলেশের বাল্যবন্ধু। বাল্যবন্ধু অর্থে 'মনেপ্রাণে এক—' এই জাতীয় কিছু ভাবলে ভুল হবে। ছেলেবেলায় বন্ধুত্ব তৈরি হতে জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী, রাজনৈতিক মতামত ইত্যাদি ব্যাপারগুলোর ভূমিকা প্রায় নগণ্য বললেই হয়। মোটামুটি ক্রিকেট বা ফুটবলে দল-সমর্থনে বা ক্লাসে নিদ্রামগ্ন সেকেন্ড পণ্ডিতের কোমর [illegible] ফেলে তাঁকে চমকে দেওয়ার প্রস্তাবে [illegible] হলেই বন্ধুত্ব যেন নিবিড় ও [illegible] হয়ে ওঠে। সুতরাং [illegible] এক ক্লাসের ছাত্র [illegible] বাসিন্দা আমাদের [illegible] দেরি হয়নি। [illegible] থাকি, সেই বন্ধুত্ব [illegible] জীবিকার ভিন্নতল ও অসমান ক্ষেত্রে দাঁড়িয়েও এখনও টিঁকে আছে। অবশ্যই ছেলেবেলার সেই ঘনিষ্ঠতা আজ মত-পার্থক্যের দরুন ও আর্থিক সঙ্গতির ভিন্নতা হেতু আজ আমার বন্ধুত্বের চেয়ে বন্ধুত্বের জ্ঞান বেশী।

নিখিলেশের তরফের কথা জানি না। তবে দেখি যে, রাস্তায় দেখা হলে সে এখনও অকৃত্রিমভাবে উৎফুল্ল হয়। আর মাঝে মাঝে ওর চকচকে সুন্দর মোটরগাড়িখানা বিকেলবেলায়, আমি যেখানকার এক সামান্য কেরানী, সেই অফিস-বাড়ির সামনে থেকে ছুটির পরে আমাকে তুলে নেয়। তারপর ওর সঙ্গে একটা দামী নামী বারে গিয়ে দু-এক পাত্র পান করে, কিছু অপরিচিত বিচিত্র-স্বাদ খাদ্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, নাচের হলে প্রদর্শিত কিছু শারীরিক নগ্নতা দেখে একটু বেশী রাত্রে উত্তপ্ত মস্তিষ্ক আর ভিন্নতর বুভুক্ষা নিয়ে ঈষৎ টলায়মান পায়ে বাড়ি ফিরে আসি। অবশ্য এ থেকে কিছুই বোঝা যায় না। এমনও হতে পারে যে, ওর বেসামাল অবস্থায় ওকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারব বলেই নিখিলেশ আমাকে সঙ্গে নেয়। [illegible], নিখিলেশ [illegible], আমার পক্ষে [illegible] সুনাম আছে। তা ছাড়া আমি আমার আশু অবসরণীয় সরকারী চাকুরে বাবা ও ক্রমক্ষীয়মাণা মায়ের দৃষ্টিতে একটি হীরের টুকরো আর কয়েকটি ছোট ভাইবোনের শ্রদ্ধার পাত্র। সুতরাং আমি যা কিছু করি, তা আমাকে অনেকের মুখ চেয়ে ও মানসিকতা বাঁচিয়ে করতে হয়।

যাই হোক, আমাদের এই সান্ধ্য প্রমোদ-যাত্রার কালে আমি নিখিলেশের নানা খেয়াল ও খেয়ালের বশবর্তী হয়ে নানা অদ্ভুত কার্যকলাপ লক্ষ করেছি। এই কিছু দিন আগেও ওর সর্বশেষ বিচিত্র ক্রিয়াকাণ্ডর কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। ওর গাড়িতে ড্যালহাউসি থেকে পার্ক স্ট্রীটে আসছিলাম। তখনও সন্ধ্যা হয়নি, তবে ছায়া গাঢ় হয়ে নেমেছে। অফিস ছুটির পর সমস্ত অঞ্চলটা টগবগ করে ফুটছে। কার্জন পার্কের কাছে এসে নিখিলেশ সহসা গাড়িটাকে ফুটপাতের ধার ঘেঁষে দাঁড় করাল আর কিছু বলবার বা বুঝবার আগেই দরজা খুলে নেমে গেল। একটু দেরি করে আমিও নামলাম ও ওকে অনুসরণ করলাম। কার্জন পার্কের ভিতরে বাঁকের দু' দিকে ঝোলানো তারের বোনা গোটা কয়েক খাঁচা আর খাঁচার মধ্যে অজস্র মুনিয়া পাখি পাশে নিয়ে এক মুসলমান পাখিওলা বসে বসে বিড়ি টানছিল। নিখিলেশ [illegible] দরজা ঠেলে পার্কের

[illegible] [illegible] সঙীন পাখিওলার কাছে হাজির হল, আর সামান্য দরদস্তুরের পর বিস্মিত পাখিওলার কাছ থেকে খাঁচা সমেত সমস্ত পাখিগুলোকে কিনে ফেলল। আমি খুব বিস্মিত না হলেও প্রশ্ন না করে পারলাম না—"এত পাখি দিয়ে কি করবি?" উত্তরে নিখিলেশের চোখে মুখে অপার করুণা আর বেদনা ফুটে উঠল, বলল—"আহা, পাখিগুলোর কি কষ্ট বল ত!" তারপর নিখিলেশ সেই কার্জন পার্কের মধ্যেই একটা একটা করে খাঁচাগুলোর দরজা খুলে দিল। কিন্তু খাঁচায় স্বল্প পরিসরে ও নিশ্চিত আহারে অভ্যস্ত মুনিয়া পাখিরা খাঁচার দরজা খোলা পেয়েও উড়ে পালাতে চাইল না। তখন নিখিলেশ খাঁচার দরজা-পথে খাঁচার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে হাত মুঠো করে একটা একটা করে পাখি বাইরে আনল, আর হাত মেলে মেলে তাদের কার্জন পার্কের ছাই ছাই আকাশে উড়িয়ে দিল। আমি বললাম—"পাখি উড়িয়ে দিবি তো খাঁচা কিনতে গেলি কেন?" উত্তরে নিখিলেশ পাখিওলাকে দেখিয়ে বলল—"খাঁচা থাকলেই ও আবার পাখি ধরবে। তাই—"। আমাদের ঘিরে বেশ একটি জনতার সৃষ্টি হয়েছিল। তারা নিখিলেশকে হয় পাগল ভাবছিল, আর না-হয় ভাবছিল বুঝি পক্ষী-দুঃখে বিগলিত কোনো দয়াবান রূপবান তরুণ দেবতা মর্ত্যে আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু আমি জানতাম, নিখিলেশ এর কোনোটাই নয়। গাড়ি চালাতে চালাতে কার্জন পার্কের দিকে দৃষ্টি পড়তে বোধ হয় পাখিওলাকে দেখেছিল নিখিলেশ, আর একটা তাৎক্ষণিক প্রেরণার বশবর্তী হয়েই ও সব কিছু করে যাচ্ছিল। কিছু পরেই তার এই পাখিদের বন্দীদশায় কাতরতা যেমন সহসা অনুভূতির উপরের স্তরে ভেসে উঠেছিল, তেমনই সহসা আবার তলিয়ে যাবে। যদিও আমি অবাক বা বিস্মিত হই নি, যদিও সমস্ত ব্যাপারটার অর্থহীনতা অসংলগ্নতা আমার কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট ছিল, তবু সেই কার্জন পার্কের আসন্ন সন্ধ্যায় আধো-অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিখিলেশ মুঠো খুলে খুলে একটা একটা করে পাখি উড়িয়ে দিচ্ছে, তার মুখে এক অপার্থিব প্রশান্তি, সুখস্বপ্ন দেখার তৃপ্তি—এই দৃশ্যটা ভাবলে আজও আমার ভাল লাগে। শান্তি পাই।

কিন্তু নিখিলেশের আজকের খেয়াল বুঝি তার অতীতের সব কিছুকেই ছাপিয়ে যায়। আমি আর নিখিলেশ নিয়মমত নিখিলেশের গাড়িতে ধর্মতলা স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছিলাম। বিকেলবেলার ব্যস্ততা, ভিড়, ট্রাম-বাসের উঁচু-নীচু স্রোতের ফলে সংকীর্ণ ধর্মতলা স্ট্রীটে মোটেই জোরে গাড়ি চালানো যাচ্ছিল না। বরঞ্চ বলা ভাল, গাড়ি চলার চেয়ে থামছিল বেশী। এইরকম অবস্থায় ফুট-পাতের দিক থেকে একই সঙ্গে আমাদের দুজনের কানে ঘণ্টাধ্বনি ভেসে এল। আমরা উভয়েই ফুটপাতের দিকে তাকালাম। মধ্যবয়স্ক অবাঙালী মুসলমান একটি লোক একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সজোরে ঘণ্টা বাজাচ্ছিল ও বিকৃত উচ্চারণে তারস্বরে চিৎকার করছিল : আসুন বাবু, আসুন। নিলাম হচ্ছে, নিলাম। ভাল ভাল চিজ নিলাম। খাট, আলমারি, ওয়ার্ডরোব, ড্রেসিং টেবিল নিলাম। রেডিও, রেকর্ড-প্লেয়ার, ঘড়ি নিলাম। চলে আসুন। চলে আসুন।—দোকানের সামনে একফালি ময়লা চট টাঙানো থাকার দরুন দোকানের ভিতরের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

রাস্তা পরিষ্কার হওয়ার জন্য আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল নিখিলেশ। তারপর অধৈর্যভাবে বলল—"ধুস! তার চেয়ে চল নিলাম দেখে আসি।" আর নিখিলেশের কাছে কোনো কিছু ভাবা মানেই করা। সুতরাং আমার সম্মতি-অসম্মতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে সে ফুটপাত ঘেঁষে গাড়ি রাখল ও দরজা খুলে নেমে পড়ল। অগত্যা আমিও নামলাম। নিখিলেশ ফুট-পাতে উঠে সটান সেই ঘণ্টাবাদকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘণ্টাবাদক নিখিলেশের বেশ ও সহজাত সম্ভ্রান্ত চেহারা দেখেই শাঁসাল মক্কেল বলে ধরতে পারল ও সসম্ভ্রমে বলল—"আইয়ে বাবু, আইয়ে। অন্দর চলা যাইয়ে। বহুত পহেলা কিসিম কী মাল হায়—"

আমরা চটের পরদা সরিয়ে দোকানের ভিতরে ঢুকলাম। দোকানের ভিতরটা আন্দাজের তুলনায় কম প্রশস্ত ও বেশী গভীর। দোকানের এই অসংগতিপূর্ণ আকৃতির জন্য আমরা ঢুকেই থমকে দাঁড়ালাম। আমাদের ঠিক মাথার উপরে টিমটিম করে একটি কম পাওয়ারের বাল্ব তারের প্রান্তে দোদুল্যমানভাবে জ্বলছিল। সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা দোকানের গভীরে তাকিয়ে দেখলাম। সেখানে উজ্জ্বল-ভাবে আলো জ্বলছে। উদ্ভাসিত আলোর মধ্যে অনেক মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে আমাদের দৃষ্টিকে প্রায় আড়াল করে নিলাম দেখছে। নিশ্চয়ই উঁচু পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে ছিল, যার জন্য আমরা নিলামওলার শুধু মুখখানা দেখতে পাচ্ছিলাম। মুখ কাঁচাপাকা দীর্ঘ দাড়ি, আর পাক-দেওয়া দু'কান ছোঁয়া গোঁফ। বলিষ্ঠ প্রৌঢ় মুখ। সহসা সেই মুখের দু'খানা ঠোঁট নড়ে উঠল ও আমাদের কানে মন্দ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর গম-গম করে উঠল—"শও পচাশ, শও পচাশ, শও পচাশ—" নিশ্চয়ই নিলামওলার সামনে কাঠের টেবিল ছিল ও তার হাতে হাতুড়ি ছিল। কেননা, আমরা প্রতি বার 'শও পচাশ' উচ্চারণের তালে তালে হাতুড়ির তীক্ষ্ণ ধ্বনি শুনতে পেলাম। বুঝলাম, এক শ' পঞ্চাশ টাকায় কিছু বিকিয়ে গেল।

নিখিলেশের [illegible] আগেই ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল। আমি [illegible] গায়েবোটের মত ওকে অনুসরণ করলাম। আজন্ম সচ্ছলতা, সাস্থ্যসম্মত খাদ্য ও শারীরিক যত্ন মানুষের চেহারায় এমন এক জৌলুস এনে দেয়, যা ব্যক্তিত্বের ছদ্মবেশে খেটে-খাওয়া দুঃখী মানুষের কাছ থেকে সম্ভ্রম ও সমীহ আদায় করে। নিখিলেশের চেহারাতেও সেই ব্যক্তিত্বের নির্মোক ছিল। সুতরাং একটু পরেই নিখিলেশ ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমি ভিড়ের একেবারে সামনের সারিতে নিলাম-স্থলের খুব কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালাম। সামনের সারিতে পৌঁছেই নিখিলেশের মুখ থেকে প্রশংসাসূচক ধ্বনি বেরুল—"বাঃ—!" আমি নিখিলেশের দিকে তাকালাম ও তার মুগ্ধ দৃষ্টি অনুসরণ করলাম। উঁচু পাটাতনের উপর দণ্ডায়মান নিলামওলার পাশে একটি ছোট টেবিলের সামনে একটি যুবতী বসে আছে। টেবিলের উপর কিছু কাগজপত্র। একমনে কি লিখে চলেছে। কোনোদিকেই তাকাচ্ছে না। তার মাথা নিলামওলার অনেক নীচে থাকার দরুন আমরা প্রথমে ভিড়ের আড়াল থেকে দেখতে পাই নি। এখন ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম মেয়েটি সুন্দর। নীল সাটিনের শালোয়ার ও কামিজ পরনে, সুর্মার টানে দীর্ঘায়িত দুটি চোখ। শালোয়ার ও কামিজের আড়াল থেকে তার শরীরের সমস্ত রেখা, ভাঁজ ও খাঁজগুলো কোথাও ছুরির ফলার মত, কোথাও সূচাগ্র বর্শার মত উদ্ধত উদাত্ত। মেয়েটির বসার ভংগীতে এক পরম ঔদাসীন্য ছিল। সেই সঙ্গে এও মনে হচ্ছিল, সে যেন সম্ভাব্য কোনো আক্রমণের বিরুদ্ধে শরীরের সমস্ত অস্ত্রকে শানিয়ে রেখেছে। আমার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। আমি নিখিলেশের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললাম—"চল, চলে যাই—"

উত্তরে নিখিলেশ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—"দাঁড়া, নিলাম ডাকি!—"

অগত্যা আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে সেই যুবতীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। তার পরনের শালোয়ার-কামিজ উজ্জ্বল নীল, তার নিরাবরণ গাত্রত্বক উজ্জ্বল ফরসা, চোখের জমি নিষ্কলঙ্ক সাদা ও মণি গাঢ় কৃষ্ণ। মাথায় ঝর-ঝরা ঝালরের মত একরাশ চুল উজ্জ্বল বাদামী। নিলামের জায়গায় ওর অস্তিত্বের একটাই অর্থ খুঁজে পাচ্ছিলাম। তা হল, ক্রেতাকে আকৃষ্ট ও আবিষ্ট করা। এই অর্থ অনুধাবন করার সঙ্গে সঙ্গে আমার পোষ-মানা মধ্যবিত্ত [illegible] ঠাণ্ডা স্রোত বইতে লাগল। আমি [illegible] নিখিলেশের কানের কাছে [illegible] বললাম—"চল নিখিলেশ। [illegible] যাই—"

উত্তরে নিখিলেশ সেই [illegible] থেকে দৃষ্টি একবারও না [illegible]

✻ আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি উপন্যাস ✻

পরিচয়
বিমল কর ॥ ৪·০০

লোকটা
গৌরকিশোর ঘোষ ॥ ৩·০০

তুঙ্গভদ্রার তীরে
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৬·০০

সূর্যসাক্ষী
নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ ১৪·০০

সেতুবন্ধন
নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ ৫·০০

জিয়া ভরলি
সুবোধ ঘোষ ॥ ৬·০০

বসন্ততিলক
সুবোধ ঘোষ ॥ ৫·০০

পঞ্চশর
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ ৩·০০

মনের মানুষ
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ ৩·০০

ভ্রষ্টলগ্ন
প্রফুল্লকুমার সরকার ॥ ২·৫০

চলো কলকাতা
বিমল মিত্র ॥ ৫·০০

পরাজিত সম্রাট
রমাপদ চৌধুরী ॥ ৪·০০

প্রেম
সৈয়দ মুজতবা আলী ॥ ৪·০০

গ্রহণ
বিমল কর ॥ ৪·০০

স্বর্ণসজ্জা
মনোজ বসু ॥ ৪·০০

দোলনা
আশাপূর্ণা দেবী ॥ ৫·০০

রং বদলায়
বিমল মিত্র ॥ ৩·৫০

সারারাত
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ ৫·০০

রূপসী রাত্রি
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ॥ ৬·০০

অনাগত
প্রফুল্লকুমার সরকার ॥ ২·০০

রাতের পাখি
আশাপূর্ণা দেবী ॥ ৪·০০

বালিকা বধূ
বিমল কর ॥ ৩·৩০

অমাবস্যার গান
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৩·০০

বন উপবন
সুবোধ ঘোষ ॥ ৪·০০

খড়কুটো
বিমল কর ॥ ৪·০০

নিবেদন ইতি
বিমল মিত্র ॥ ৫·০০

প্রতিধ্বনি ফেরে
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ ৪·০০

রূপবতী
মনোজ বসু ॥ ৩·০০

শতাকিয়া
সুবোধ ঘোষ ॥ ৮·০০

লোকারণ্য
প্রফুল্লকুমার সরকার ॥ ৪·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলকাতা ৯ ॥ ফোন ৩৪-১৪৮৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৭৭/১ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা ৯ ॥ ফোন ৩৪-৮২৬৪

"দাঁড়া। ভয় পাচ্ছিস কেন! নিলাম ডাকি।"

ইতিমধ্যে ছোট চ্যাপটা টিফিন-বাক্সের আকৃতির একটি ছোট ট্রানজিস্টর সেট নিলামে উঠল। জিনিসটা অভিজাত ও চকচকে নতুন। যত দূর মনে হয়, বে-আইনী আমদানিকৃত। সেই বহুদর্শী বৃদ্ধ নিলামওলা তার ভরাট গম্ভীর কণ্ঠস্বরে সেইটির উচ্চ ঘরানা ও গুণপনার বিষয় ব্যাখ্যা করতে লাগল। অবশেষে এই অমূল্য দ্রব্যটির সর্বনিম্ন হাঁক মাত্র দু' শ' টাকা—এই ঘোষণার দ্বারা নিলামওলা তার নাতিদীর্ঘ ভাষণটি শেষ করল। অতঃপর সামনে জমায়েত জনতার উপর একটি প্রশ্রয়-পূর্ণ উদার দৃষ্টিতে তাকিয়ে মৃদু মধুর হেসে বলল—"বলিয়ে জি বলিয়ে, কুছ ত বলিয়ে। ডাকেন বাবুলোক, ডাকেন। কুছু কুছু ডাকেন—"

নিখিলেশ প্রথম হাঁক দিল—"পাঁচ শ'—"

উপস্থিত সবাই চমকে ঘুরে নিখিলেশকে দেখল। সকলের মধ্যে একটা গুনগুনানি দানা বেঁধে উঠল, বোধ হয় প্রথমেই দামটা এত উপরে ঠেলে তোলার জন্য। নিলামওলার প্রসন্ন দৃষ্টি যেন নিখিলেশকে উৎসাহ দেবার জন্যই ওর দিকে তাকিয়ে হাসিতে চকচক করতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য, সেই সুন্দরী যুবতীটি কিন্তু একবারের জন্যও চোখ তুলে নিখিলেশকে দেখল না। দ্বিতীয় হাঁকের জন্য নিলামওলা সামান্য অপেক্ষা করে হাতুড়িতে তিনবার আওয়াজ তুলে ট্রানজিস্টর সেটের বিক্রয় ঘোষণা করল। তারপর সেই নীলবসনা যুবতীকে বলল—"আশমান, বাবুসে ফয়শলা কর লে!"

তখন সেই মেয়েটি, যার নাম এখন আশমান, উঁচু পাটাতন থেকে লঘুপদে নেমে এগিয়ে এল ও কোমর পর্যন্ত উঁচু রেলিং দেওয়া পার্টিশনের এক ধারে লাগানো দরজা খুলে তাচ্ছিল্যভরে নিখিলেশকে বলল—"আইয়ে—"। নিখিলেশ ওর সংগে ভিতরে ঢুকে গেল ও দাম চুকিয়ে ট্রানজিস্টর সেট নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম সমস্ত লেনদেনটাই খুব ঠান্ডাভাবে চুকল। নিখেলেশ বাইরে বেরিয়ে এলে দেখলাম ওর মুখ গম্ভীর, যদিও ওর গাম্ভীর্যের কারণ বুঝতে পারলাম না।

এর পর নিখিলেশ একটা ওয়াল ক্লক, একটা ক্যামেরা ও একটা রেকর্ড-প্লেয়ার কিনল। এবং বলা বাহুল্য, প্রতিবারই নিখিলেশের ডাক এমন একরোখা উঁচু হল যে, আর কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগই পেল না। ফলে, নিখিলেশ ক্রমে ভিড়ের মধ্যে উজ্জ্বল দ্যুতিময় ও ভাস্বর জ্যোতিষ্কের মত হয়ে উঠল। কিন্তু আশ্চর্য, উপস্থিত প্রতিটি মনুষ্যই যখন নিখিলেশের প্রচন্ড উপস্থিতি সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন হয়ে উঠল, তখনও কিন্তু আশমান নামে সেই মেয়েটি তার সেই অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্যের ভূমিকাটি যথাযথ বজায় রেখে চলল। একবারও সে নিখিলেশকে দেখল না বা দেখলেও দৃষ্টিতে কোনো মনোভাব প্রকাশ পেল না। প্রতিটি জিনিস কেনার পর নিখিলেশ সেই ঘেরা জায়গায় গিয়ে দাম দিয়ে এল ও গম্ভীরতর হয়ে ফিরে এল।

অবশেষে দিনের সর্বশেষ বিষয়—একটা টেপ-রেকর্ডার নিলামে উঠল। সর্বনিম্ন হাঁক ঘোষিত হল পাঁচ শ' টাকা। নিলামদার সাড়ম্বরে টেপ-রেকর্ডারটির কৌলীন্য, দুষ্প্রাপ্যতা, প্রায় নতুনত্ব ব্যাখ্যা করতে লাগল। হঠাৎ কাঁধের উপর চাপ অনুভব করলাম ও চমকে তাকিয়ে দেখলাম, নিখিলেশ আমাকে কাঁধ ধরে টানছে—"শোন—"

আমি নিখিলেশের টানে তার সংগে সংগে ভিড়ের বাইরে চলে এলাম। ভিড়ের বাইরে এসে সেই টিমটিমে আলোর নীচে ফাঁকা জায়গায় নিখিলেশ দাঁড়াল। বললাম—"কি বলছিস?"

নিখিলেশ বলল—"আমি ওই টেপ-রেকর্ডারটা কিনতে চাই।"

অবাক হলাম। বললাম—"বেশ তো। কিনবি। কিন্তু সে কথা আমাকে কেন?"

নিখিলেশ বলল—"আমি ওটা অনেক বেশী দামে কিনতে চাই।"

অবাক হয়ে বললাম—"তোর কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—"

নিখিলেশ বলল—"আমি ওই টেপ-রেকর্ডারটা অনেক লড়ে অনেক দাম দিয়ে কিনতে চাই এবং সে ব্যাপারে তোর সাহায্য চাই—"

আমি চুপ করে রইলাম। নিখিলেশের খাম-খেয়াল কোন্ দিকে ধাবিত হচ্ছে তা বুঝবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। অগত্যা মনে হল, দূর ছাই! আমার কি! নিখিলেশের খেয়াল এবং টাকা দুই-ই আছে, সুতরাং টাকার পালে খেয়ালের হাওয়া লাগিয়ে নিখিলেশ যদি গোল্লায়ও যায়, তাতেই বা আমার কি!

নিখিলেশ বলল—"এত ভাববার কি আছে?"

বললাম—"আমি তোকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?"

—"খুব সহজ। তুই শুধু আমার রাইভ্যাল সেজে দাম চড়িয়ে যাবি। আমি যা ডাকব, তার ওপর দশ বিশ চাপিয়ে তুই দাম ঠেলে তুলবি—"

হঠাৎ আমার মাথায় বিদ্যুৎচমকের মত একটা ভাবনা খেলে গেল। একটু হেসে বললাম—"নিখিলেশ, তোর মতলব আমি বুঝেছি। তুই আমাকে ফাঁসাতে চাইছিস।"

নিখিলেশের মুখে অকৃত্রিম বিস্ময় ফুটল—"ফাঁসাতে চাইছি! কিরকম!"

—"আমি তোর কথামত একটা আবোল-তাবোল ডাক হাঁকব, আর তুই ডাক ছেড়ে দিয়ে আমাকে ডোবাবি। তখন কোথায় আমি টাকা পাব আর দাম দেব! ওসবের মধ্যে আমি নেই—"

নিখিলেশ একটু আহত হল। একটু [illegible] করে থেকে বলল—"তুই দেখে [illegible] এমনি ভাবলি! যাক গে। ঠিক আছে [illegible] ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি—"। [illegible]

সাই করে চেকখানা আমার সামনে বাড়িয়ে ধরল—"নে। তোর কাছে এটা রেখে দে—"

অবাক হয়ে বললাম—"ও দিয়ে আমি কি করব?"

নিখিলেশ বলল—"চেকটা তোর নামে আছে। টাকার ঘর খালি রেখে দিলাম। ডাক ছেড়ে দিয়ে যদি তোকে বিপদে ফেলি, তুই টাকাটা বসিয়ে ব্যাংক থেকে তুলে নিবি। আর ভয় রইল না তোর—"। বলতে বলতে নিখিলেশ চেকখানা আমার হাতের মধ্যে গ‍ুঁজে দিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢ‍ুকে গেল।

চেকখানা হাতে নিয়ে আমি কয়েক পলক নির্বোধের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর মনে মনে 'দ‍ুর ছাই' বলে চেকখানা দ‍ু ভাঁজ করে পকেটে রেখে নিখিলেশের তল্লাশে ভিড়ের মধ্যে ঢ‍ুকলাম। অনেক কসরত করে যখন ভিড়ের সামনের সারিতে পে‍ৗঁছ‍ুলাম, তখন দেখলাম, নিখিলেশের চোখ আকুলভাবে আমাকে খ‍ুঁজছে। আমাকে দেখতে পেয়ে ও নিশ্চিন্ত হল ও চোখ টিপে ইশারা করল। আমিও চোখ টিপলাম। সব ঠিক আছে।

নিলামওলা ডাক তুলবার জন্য আমন্ত্রণ জানাল। প্রথমেই নিখিলেশ হাঁকাল—"ছ' শ'—"

ম‍ুহ‍ূর্তে আমার গলা শ‍ুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। নিলামওলার গলায় দামটা প‍ুনর‍ুক্তি সহযোগে 'কোই হায়, কোই হায়' রবে নিনাদিত হতে লাগল। আমি বলতে চাইলাম, কিন্তু আমার গলা দিয়ে স্বর ফ‍ুটল না। নিখিলেশের চোখে চোখ পড়ল। তার কপালে বিরক্তির ভ্রূকুটি, চোখে জিজ্ঞাসা। আমি গলা ফাটিয়ে ডাকলাম—"ছ' শ' দশ—"। আমার নিজের কানেই তা অস্ফ‍ুট শোনাল।

উপস্থিত সমস্ত ম‍ুখগ‍ুলো আমার দিকে ফিরল। মনে হল যেন হাজার পাওয়ারের হাজার হাজার বাল‍্ব আমাকে তাক করে একসঙ্গে জ্বলে উঠল। ঠকঠক করে আমার পা কাঁপতে লাগল ও ব‍ুকের মধ্যে ধপধপ করে হাতুড়ি পড়তে লাগল।

নিখিলেশ হাঁকল—"ছ' শ', পঞ্চাশ।"

ছ' শ' পঞ্চাশ, ছ' শ' পঞ্চাশ' হাঁকটা সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিয়ে দ্বিগ‍ুণ রবে চিৎকার করতে লাগল নিলামওলা। মাঝে মাঝে চোখের দ‍ৃষ্টিতে আমাকে উৎসাহ দিতে চাইল। যদিও তখনও স্নায়বিক দৌর্বল্য প‍ুরোপ‍ুরি কাটিয়ে উঠতে পারি নি এবং ম‍ুখের মধ্যে টাগরা ও জিব নীরস কাঠের মত শ‍ুকনো ঠেকছিল, তব‍ু এবারে আমি অনেক বেশী জোরের সঙ্গে বলতে পারলাম—"সাত শ' [illegible]!"

আর নিখিলেশ [illegible] মত [illegible] [illegible]—"[illegible] শ' [illegible]—"

[illegible]

জড়তা ক্রমে কেটে গেল। এমনকি ধীরে ধীরে নিখিলেশের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ছলে এই নিলামের দর হাঁকাহাঁকির কাজটা আমার কাছে কোনো মজাদার খেলার মত উপভোগ্য হয়ে উঠল। নিখিলেশ আর আমি মুখ বদল করে করে টেপ-রেকর্ডারের দামটা উপর দিকে ঠেলে তুলতে লাগলাম।

ক্রমে দরটা চার অঙ্কে পেঁৗছে গেল। আমার আর নিখিলেশের এই দাম নিয়ে পাল্লা লড়ার ব্যাপারটাকে একটা খাঁটি জেদা-জেদি বলে ধরে নিয়ে উপস্থিত জনতা বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠল। ওদের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হচ্ছিল, এখন যদি আমাদের মধ্যে যে কেউ নিলাম ডাকা বন্ধ করে দি, তা হলে ওরা বড়ই বঞ্চিত হবে, ব্যথা পাবে: স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী ওরা ওদের অজান্তেই নিজেদের মধ্যে দু'টো দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। দু' দলের সমর্থন আমাকে আর নিখিলেশকে নিয়ে পর্যায়ক্রমে উল্লসিত হতে লাগল। আমি বা নিখিলেশ, যে যখন অপরের দেওয়া দরকে ছাপিয়ে নতুন দর ঘোষণা করি, আমাদের পরস্পরের সমর্থক-বৃন্দও লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে হাততালি ও উল্লাসধ্বনি সহযোগে সাময়িক বিজয়োৎসব পালন করতে লাগল। বস্তুত, দরের হাঁকা-হাঁকি, নিলামদারের উত্তেজিত হাতুড়ির আওয়াজ জনতার হইচই শোরগোল—সব মিলে নিলামের উত্তেজনা তুঙ্গে চড়ে গিয়েছিল। আর এরই মধ্যে চরম বৈপরীত্যের নিদর্শনরূপে আশমানের উত্তাপহীন ভাব-লেশহীন নিস্পৃহ ও নির্বিকার অথচ সুন্দর নয়ন-মনোহর উপস্থিতি বিরাজ করতে লাগল।

ক্রমে দরটা দু হাজারের অংকও অতিক্রম করে গেল। আর তখন সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে হাস্যকররকমের অর্থহীন বলে মনে হতে লাগল। আমার আচরণে দর হাঁকায় একটা নির্লিপ্ত ও নিস্পৃহা দেখা দিতে লাগল। নিখিলেশ হাঁকল—"দু' হাজার চার শ' পঞ্চাশ—"

পরম নির্লিপ্তভাবে বললাম—"চার শ' ষাট—"

নিখিলেশ গমগম করে বলল—"চার শ' আশি—"

—"নব্বই—"। আমার কণ্ঠস্বরে প্রায় অস্ফুট হয়ে এল।

—"আড়াই হাজার!" নিখিলেশ ফেটে পড়ল।

সহসা আমি খুব ক্লান্ত বোধ করলাম। ক্লান্ত আর পরিশ্রান্ত। মনে হল নিখিলেশের সঙ্গে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ছল যেন এবার বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পেঁৗছে গেছে। তখন আর আমি নিখিলেশের দেওয়া দরের উপর দর চাপানর তাগিদ অনুভব করলাম না। সৌম্যকান্তি দাড়িওলা নিলামদার হাতুড়ির ঘা সহযোগে ঘোষণা করতে লাগল—"ঢাই হাজার, ঢাই হাজার—"। জনতা গুঞ্জন করতে লাগল। কারো কারো বিদ্রূপধ্বনি তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল—"ধক্ মিটে গেছে, রস মরে গেছে—"। কিন্তু কোনো কিছুই আর আমার ধরাশায়ী উৎসাহকে উত্তেজিত, উত্তোলিত করতে পারল না। অগত্যা নিখিলেশের আড়াই হাজার দরটাই টেপ রেকর্ডারের দর হিসেবে টিঁকে রইল।

তখন খেলা-ভাঙ্গা দর্শক-জনতার মতই উপস্থিত সুখী পরিতৃপ্ত লোকেরা ঘরমুখো হল ও কয়েক পলকের মধ্যেই জায়গাটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। নিখিলেশ ওর থমথমে মুখ নিয়েই রেলিং দেওয়া দরজা ঠেলে কাঠগড়ার ও পাশে গেল দাম মেটাতে। আশমানের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিখিলেশ পকেট থেকে ওয়ালেট বার করল, ওয়ালেট থেকে চেক-বই বার করল, চেক লিখল, তারপর [illegible] আশমানের সামনে ঠেলে দিল। [illegible] আশমান টেবিলের কাগজপত্র দেখল, চকিতে ডাইনে বাঁয়ে তাকাল, কিন্তু ভুলেও একবার নিখিলেশকে দেখল না। নিখিলেশ চেকখানা সামনে ঠেলে দিলে আশমান নির্বিকারভাবে চেকখানা তুলে নিল ও দুহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দিয়ে দুপাশে আলগাভাবে ধরে চোখের সামনে তুলে ধরে একমনে দেখতে লাগল। নিখিলেশ ভুরু কুঁচকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল—"যারা মুশকরা দে তু আউর ভি খুব মিল যায়—"

তড়িতে চোখের সামনে থেকে চেকের আবরণ সরে গেল আশমানের। তীক্ষ্ণ তীব্র অপলক দৃষ্টিপাতে নিখিলেশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। নিখিলেশ কিন্তু চোখ ফেরাল না। আশমানের দু চোখের ধারাল দৃষ্টি দুখানা ছুরির ফলার মত ঝকঝক করতে লাগল। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে দেখতে লাগলাম। আলোয়ার-কামিজ পরিহিতা উজ্জ্বলা আয়তনয়নাক্ষী সুন্দরী কুপিতা ভ্রূকুঞ্চিতা আশমানকে মরুদ্যানবাসিনী সাহসিকা কোনো তুর্কি মেয়ের মত লাগছিল। মনে হচ্ছিল, আশমান বুঝি এখনই তার বেশবাসের মধ্যে কোনো গুপ্ত স্থানে রক্ষিত লুকায়িত তীক্ষ্ণতম ছুরি সহসা টেনে বার করে নিখিলেশের বুকে বিঁধিয়ে দেবে। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে অপলকে ওদের দেখতে লাগলাম। দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর আশমানের মুখ আস্তে আস্তে নরম হয়ে এল। কপালের উপর থেকে জটিল-কুটিল আঁকিবুকিগুলো মুছে গেল ক্রমে, জ্যা-মুক্ত ধনুকের মত ভ্রূ দুটি স্বাভাবিক হয়ে এল, চোখের দৃষ্টিতে কোপ এবং ক্রোধের তীব্র আলো নিবে গিয়ে কিছু কৌতুক, কিছু কৌতূহলের মৃদু আভা জ্বলে উঠল। এই পরিবর্তনগুলো এত ধীরে ধীরে ও সূক্ষ্মভাবে হতে লাগল যে, এক-দৃষ্টে তাকিয়ে থাকা সত্ত্বেও বুঝতে পারলাম না যে, কখন আশমানের ওষ্ঠাধরের [illegible] আবদ্ধতার আগল খুলে গিয়ে [illegible] আভাস দেখা দিল, কখন ঠোঁটে স্মিত হাসির আভা লাগল এবং কিভাবে তা [illegible] মধুর হাসিতে [illegible] হল। নিখিলেশের চোখের উপরে [illegible] নিঃশব্দ মধুরহাসিনী আশমান [illegible] তুম দিওয়ানা হো—"

উত্তরে নিখিলেশ শুধু [illegible] হাসল ও চোখ [illegible] অসহায়তার ভঙ্গী করল।

গাড়িতে উঠে [illegible] "আচ্ছা নিখিলেশ, [illegible] করেছিলি কেন?"

নিখিলেশ এক [illegible]

তার সে গাম্ভীর্য আর নেই। মুখের চেহারায় সুখ ও পরিতৃপ্তি। বললে— "আশমানের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য।"

আমি নির্বাক হয়ে বসে রইলাম। নিখিলেশের এতক্ষণের আচরণ আমার কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হচ্ছিল। এখন তা দুর্বোধ্যতর হয়ে উঠল। নিখিলেশ মনের খুশিতে লোকজন গাড়ি-ঘোড়া বাঁচিয়ে দ্রুত বেগে গাড়ি চালাতে লাগল।

আমার গল্প যদি এখানেই শেষ হত, তা হলে বোধ হয় সবচেয়ে বেশী খুশী হতাম আমি নিজে। (পাঠক, আমি আপনার একটু মনোযোগ ভিক্ষা করি। লক্ষ করুন, আমি বলেছি আমার গল্প। আমার লেখা গল্প নয়, গল্পের প্রধান পুরুষ হিসেবে আমার গল্প। না, নায়ক নয়। বলতে পারি, শিকার।)

পরের দিন কি কারণে যেন সব অফিস ছুটি ছিল। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর আমার আশু অবসরণীয় বৃদ্ধ বাবা আমাকে ডাকলেন। বললেন—"শোন। জানিস তো, সামনের মাসেই আমার রিটায়ারমেণ্ট—"

বুঝলাম এটা ভূমিকা। চুপ করে রইলাম।

বাবা বলতে লাগলেন—"ভাবছি একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই করা দরকার। শেষ নিশ্বাসটা স্বাধীনভাবে ফেলতে চাই।"

আমি চুপ করে রইলাম।

—"আর তা ছাড়া তুইও তো বিয়ে করবি। তোর মায়ের ভীষণ শখ নাতির মুখ দেখে মরবে। কিন্তু এভাবে তো তা সম্ভব নয়—"

একটু চুপ করে থেকে বাবা আবার বলতে লাগলেন—"প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের যা টাকা পাব, তাতে টেনেবুনে খান তিনেক ঘর হয়ে যাবে। কিন্তু মুশকিল তো জমি নিয়ে। যা দাম—"

আমি নীরব। বাবা বলে চললেন— "অন্তত কাঠা তিনেক জমি কলকাতা থেকে কিছু দূরে হলেও হাজার পাঁচেক টাকা। বলছিলাম, তুই যদি হাজার পাঁচেক টাকা দিস জমির দাম বাবত—"

আমার অট্টহাস্য করে উঠতে ইচ্ছে হল। বাবা আমাকে খুব বড়রকমের পুঁজিপতি ঠাউরে বসে আছেন। পাঁচ বছর চাকরি করছি, বছরে হাজার টাকা কি আর জমাই নি। হাসির দমক আমার পেটে ও বগলে বেয়াড়ারকমের বেরসিকের মত সুড়সুড়ি দিতে লাগল। বাবা নিজেই আমাকে তার সামনে হেসে ফেলার অসৌজন্য থেকে বাঁচালেন—"ঠিক আছে। তুই ভেবে দেখ। তাড়ার কিছু নেই—"

আমি নিজের বারান্দাকে পার্টিশন দেওয়া ঘরে গিয়ে [illegible] আহারান্তিক সিগারেট [illegible] সিগারেটের ধোঁয়ার [illegible] প্রস্তাবটাও [illegible]

সাড়ে শেষ নিশ্বাস ফেলা। নাতির মুখ দেখে মরা! হুঃ! যত সব বস্তাপচা সস্তা সেন্টিমেন্ট!

কিন্তু স্বল্পস্থায়ী দিবানিদ্রাটুকু ভাঙলে লক্ষ করলাম একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটে গেছে। ঘুমের মধ্যে অগোচরে কে যেন সিঁদ কেটে আমার মনের প্রশান্তি হরণ করে নিয়ে গেছে। 'তোরও তো বিয়ে করা দরকার' বাবার এই কথাটা, যা কিনা আমি উড়িয়ে দিলাম বলে ভেবেছিলাম, আসলে তা আমার গভীরে ডুব দিয়েছিল মাত্র। এখন এই ঘুমের অসাবধানতার সুযোগে তা আবার উপরে ভেসে উঠেছে, আর এবারে আমি আর কিছুতেই তাকে উড়িয়ে দিতে বা দমন করতে পারছি না।

বিকেলবেলা বেরিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমাতে চাইলাম। সন্ধ্যায় রাস্তায় দলবলে দাঁড়িয়ে ভ্রমণশীল তরুণীদের দেহ দু' চোখে লেহন করতে চাইলাম, রাত্রে সস্তা বারের টেবিলের নকল মার্বেল পাথরে চাপড় সহযোগে গলাবাজিতে যোগ দিতে চাইলাম, কিন্তু কিছুতেই আমি বাবার ওই কথাটা ভুলতে পারলাম না। তারপর একটু বেশী রাত্রে যখন প্রায় নির্জন ও নিস্তব্ধ রাস্তা দিয়ে একা একা বাড়িমুখো চলতে লাগলাম, তখন ঈষৎ নেশাগ্রস্ত মস্তিষ্কে আমার মনে হতে লাগল, যেন বাবার কথাটা আমার মস্তিষ্কের মধ্যে একটা সুতোর গুলির মত ঢুকে গিয়েছিল। স্বল্প ঘুমের অবসরে সেই গুলিটা শরীরের অভ্যন্তরে গড়িয়ে গড়িয়ে সুতো খুলে গেছে। ক্রমে গড়িয়ে গড়িয়ে সুতো খুলে খুলে আমাকে এখন যেন ভিতর থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। আমার আর নিস্তার নেই।

বাড়ি ফিরে আচ্ছন্নের মত রাত্রের খাবার খেলাম ও শুতে গেলাম। শোয়ার আগে পরনের শার্টটা যখন মাথার উপর দিয়ে উলটে খুলছি সহসা বুক-পকেট থেকে ঝপ করে একরাশ কাগজপত্র মেঝেয় পড়ে গেল। তাকিয়ে দেখলাম, পড়বার সময় একখানা ভাঁজ করা কাগজ কাগজের রাশ থেকে পৃথক হয়ে দু' ভাঁজের দুই ডানা মেলে উড়তে উড়তে একটু দূরে গিয়ে আলগোছে বসল। জামাটা খুলে হ্যাঙারে টাঙিয়ে রাখলাম। তারপর ধীরে-সুস্থে পড়ে-যাওয়া কাগজ-গুলো তুললাম। কৌতূহলবশত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কাগজখানার ভাঁজ খুলতেই দেখলাম, সেখানা নিখিলেশের দেওয়া গত-কালের ব্ল্যাঙ্ক চেক।

আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ঙ্কর ভাবনা আমার মাথার মধ্যে হিংস্র বাঘের মত গর্জন করে উঠল। গর্জন করতে লাগল। অধীরভাবে লেজ আছড়াতে লাগল। সেই চিন্তার ভয়াবহতায় আমি ভীত হয়ে উঠলাম। সবেগে মাথা ঝাঁকানি দিয়ে সেই ভয়ঙ্কর অন্যায় নীতিবিরুদ্ধ চিন্তাটাকে তাড়াতে চাইলাম। কিন্তু বৃথা। কে যেন মনের মধ্যে থেকে অবিরত মন্ত্রণা দিতে লাগল : ভয় কি! অন্যায় কি! নিখিলেশের অনেক আছে। এত আছে যে, তার হিসেব নেই। তোমার কিছু নেই। এতটুকুও নেই যে, তোমার বাবার ইচ্ছা, তোমার মায়ের সাধ মেটাও। নিখিলেশের ভগ্নাংশটুকু পেলেই তোমার মা-বাবার সেইসব একাগ্র চাহিদা-গুলো মেটে, যা তুমি সস্তা সেন্টিমেন্ট বলে উড়িয়ে দাও। আর তোমার একটা বউ হয়। বউ! ভেবে দেখ, বউ। একটি সুন্দর মিষ্টি উজ্জ্বল মেয়ে। তোমাকে ভালবাসবে। তোমার ঘর গুছোবে। একেবারে তোমার। অফিস থেকে ফিরতে দেরি হলে চুল বেঁধে, গা ধুয়ে, কপালে সিঁদুরের টিপ পরে উৎকণ্ঠিতভাবে তোমার জন্য ঘর-বার করবে। তারপর তারা আসবে। সেইসব স্বর্গের শিশুর দল—। আমি বাধা দিয়ে অসহায়ের মত বলতে চাইলাম : কিন্তু নিখিলেশ

আমার বন্ধু! উত্তরে বিদ্রূপাত্মক জবাব পেলাম। হ্যাঁ! বন্ধু!

আমি নীচু হয়ে একটা বিস্ফোরক পদার্থের মত সন্তর্পণে চেকখানা মেঝে থেকে তুলে নিলাম। ভাঁজ খুলে টান-টান মেলে সুদৃশ্য নীলাভ চেকখানার দিকে তাকিয়ে রইলাম। বড় একটা ব্যাঙ্কের উপর বেয়ারার চেক। টাকার ঘরটা ফাঁকা। যে-কোনো অঙ্ক আমি ওখানে বসিয়ে নিতে পারি। পাঁচ হাজার, দশ হাজার, এক লাখ। তারপর ছোটখাট ছিমছাম বাড়ি। বউ, ছেলেমেয়ে, সুখ, শান্তি, আনন্দ—

উত্তেজনায় আমার হাত কাঁপতে লাগল। তাড়াতাড়ি ভাঁজ করে চেকখানাকে বালিশের তলায় চালান করে দিলাম। তারপর ঘর অন্ধকার করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ঘুমোতে চাইলাম। ব্যর্থ চেষ্টায় বন্ধ করে রাখলাম দু' চোখ। কিছুতেই ঘুম এল না। এ পাশ ও পাশ করতে লাগলাম। কানের পাশে যেন অবিরত ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছিল, শুনতে পাচ্ছিলাম।

অবশেষে যেন একটু তন্দ্রা এল। ঠিক নিদ্রা নয়। অচেতনতায় ডুবে যেতে যেতে সহসা আবার চেতনার তীরে সবেগে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলাম। চেতনা ও অচেতনার মধ্যে ভাসমান অবস্থায় আমার চোখের সামনে কতগুলো খাপছাড়া অর্থহীন দ্রুত অপস্রিয়মাণ খণ্ড খণ্ড স্বপ্নদৃশ্য রচিত হচ্ছিল, আবার মুছে যাচ্ছিল। সেইসকল দৃশ্য দেখতে দেখতেই আমার মস্তিষ্কের চেতন অংশ বিস্মিত বিষণ্ণ হচ্ছিল আর অর্থহীন অসংলগ্নতায় সঙ্গতি খুঁজে পেতে চাইছিল। আমি দেখছিলাম : এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল। শূন্যে খাঁচা দুলছে। নিলাম ডাক হচ্ছে। আশমানের বিস্মিত চকিত মুখ। ঘণ্টা বাজছে। আকাশ-ছোঁয়া গির্জার চূড়ো। বাবা পুজো করছেন। ঘণ্টা বাজছে। নিষুতি রাতের নির্জন রাস্তায় ঘণ্টা বাজিয়ে দমকল চলে গেল। হেলমেট-পরা আরোহীদের পাথরের মত মুখ। প্রাচীন মন্দিরে জাগ্রত দেবতার আরতি হচ্ছে। ঘণ্টা বাজছে। মা এগিয়ে এলেন সামনে। মার হাতে পুজোর সামগ্রী। মার লোলচর্ম করুণ বিষণ্ণ মুখ দু' চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। মার মুখ ক্রমশ বড় হয়ে এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে—

আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম-ভাঙা চোখে আমি অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলাম। অন্ধকারের পটভূমিতে অশেষ দেখা মায়ের বিষণ্ণ করুণ অশ্রুসিক্ত মুখ ভেসে উঠল। মায়ের সিক্ত নিষ্প্রভ দুই চোখে অব্যক্ত বেদনা। সেই মুখ, সেই চোখ কিছুতেই মুছতে চাইল না। অন্ধকারে চোখ [illegible] আবার [illegible] সেই [illegible] আমার [illegible]

কষ্ট করেছেন, দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু চান নি কোনো দিন, এত দিন স্বামীকে ভয় পেয়েছেন, এখন ছেলেকে ভয় পান। মা আমার। মা গো—

সম্মোহিতের মত আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম। আলো জ্বালালাম। টেবিলের কাছে গিয়ে কলমটা নিয়ে এলাম। বালিশের তলা থেকে চেকখানা বার করে টাকার শূন্য ঘরটার দিকে তাকিয়ে রইলাম একটু। তারপর অলৌকিক জগৎ থেকে ভর-করা আত্মার জাগতিক মাধ্যমের মত আবিষ্টভাবে লিখে গেলাম : পাঁচ হাজার।

৮

তারপর অনেক দিন অতিবাহিত হয়েছে। আজ আমি বিবাহিত। দুটি সন্তানের স্নেহময় পিতা। শহরতলিতে নিজস্ব ছোট একতলা বাড়িতে আমার ছোট শান্ত সংসার। আমি অফিসে যাই। আবার বাড়ি ফিরি। ফিরতে দেরি হলে আমার সুখী সুন্দরী স্ত্রী উৎকণ্ঠিতার মত ঘর-বার করে। ফিরে এলে আমার দুটি ছেলেমেয়ে আমাকে সানন্দে ঘিরে ধরে। আমি সুখী।

কিন্তু আজ কিছু দিন যাবৎ একটা অহেতুক ভয় অকারণ আতঙ্ক আমার মধ্যে ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। এ ভয়টা আগে ছিল না। কিন্তু কেন জানি না, ইদানীং বুকের মধ্যে ঝিমঝিম করে ওঠে। স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করতে করতে বা ছেলেমেয়েকে আদর করতে করতে সহসা আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাই। সহসা বুকের মধ্যে কে যেন ফিসফিস করে ওঠে : যদি নিখিলেশের মনে পড়ে। আমি নিশ্চিত যে, নিখিলেশের কোনো দিন মনে পড়বে না, পড়তে পারে না। কিন্তু তবু আমার বুকের মধ্যে আমার শান্তি, আমার সুখ দ্বিধায় কম্পিত হয়ে ওঠে। যদি নিখিলেশ হঠাৎ বলে কোনো দিন : আমার সেই ব্ল্যাঙ্ক চেক নিয়ে তুই কি করেছিস! যদি নিখিলেশ সন্দিগ্ধ হয়ে ওর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট চেক করে! তখন আমি নিখিলেশকে কি বলব! কিভাবে ওর সামনে দাঁড়াব!

এই ভয় ও আতঙ্ক ক্রমশ রাহুর মত আমার সুখ ও শান্তিকে গ্রাস করল। ভীত-ত্রস্তভাবে আমি এখন সর্বদা নিখিলেশকে খুঁজে বেড়াই। কথাবার্তায় ওকে ভুলিয়ে রাখতে চাই। ওর মনে না পড়ে। আবার বেশীক্ষণ ওর সামনে থাকতে সাহস পাই না। যদি ওর মনে পড়ে যায়। পালিয়ে যাই।

আমার তেমন জোর নেই যে, নিখিলেশকে আমি খুন করি। এমন উপায় নেই যে, সব কিছু ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাই। তেমন সাহস নেই যে, আত্মহত্যা করি। নিখিলেশের [illegible] মনে পড়ে যাওয়ার [illegible] আমার উপরে [illegible] [illegible] কোনো উপায় নেই।

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

পঁচাত্তর

আমি আমার সিগারেটের বাক্স বের করে অবধূতের দিকে এগিয়ে দিই। বলি, 'নিন, সিগারেট খান।'

সদানন্দ গলায় বলে, 'দাও। ইতে আমার কিছু হয় না, তবু একটুক টানি।'

সিগারেটটি ধরিয়ে আবার গান ধরে,

কালী তুই ভাবিস,
আমি তোর ছলনা বুঝি না।
ডাকিনীরে দিস আপন বেশ
তোর লজ্জা করে না।
ধন্দে ফেল্যে করিস খেলা
মনে ভাবিস জানি না,
এবার দেখ মাগী তোর ডাকিনীরে
খোলস ছেড়্যে করে কান্না।

গোপীদাস 'জয় গুরু' ধ্বনি দিয়ে ওঠে। কিন্তু লক্ষ্য যোগোমতীর দিকে। ওদিক থেকে যোগোমতীও পাশ ফিরে তার সঙ্গে চোখাচোখি করে। এখন যোগোর মুখে কেবল হাসির ছটা না—অমন যে দপদপানো মুখখানি, চোখ দুটি, তাও যেন লাজে লাজানো ব্রীড়ার ভরা। সার্থক অবধূত। স্তুতি জানে বটে। নিজেই জানিয়ে দেয়, এলেকাটার ঘরে যে শাক্তির বেশে এসেছিল, সে আসলে ডাকিনী। তার সঙ্গে অবধূতের কী সম্পর্ক। কালী এখন উপলক্ষ। গানের লক্ষ্য যোগোমতী। যে তার শক্তিস্বরূপিণী ভৈরবী।

কিন্তু গোপীদাসের জয় গুরু শুনেই [illegible]

[illegible]

'না বাবা, আমি তোমাদিগের উই নেড়া নেড়ীতে নাই।'

গোপীদাস বলে, 'থাইকবে ক্যানে। তুমি ভৈরব ভৈরবীতে থাক।'

যোগোর ঘোমটার পাশে এলানো চুল। চুলের পাশে মুখ, আবার মুখ ফিরিয়ে গোপীদাসের দিকে চোখাচোখি করে। অবধূত আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কিসে আছ হে?'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'আমি?'

'হু', ভৈরব ভৈরবীতে, না নেড়া নেড়ীতে?'

জবাব দেয় গোপীদাস, 'বাবাজী ত আর তোমার আমার মতন ভেক ধর‍্যা নাই। যেমন দেইখছ সিরকমই আছে।'

ব্রহ্মানন্দ বলে, 'তব্যে মাগ্ ভাতারে আছে বল্য।'

গোপীদাসই দাড়ি দুলিয়ে বলে, 'না গ।'

'তব্যে?'

গোপীদাস চোখ চুলঢুল করে বলে, 'নাম যাতে তাতেই দাও গা দাদা, সবাই যাতে আছে, বাবাজীও তাতেই আছে, বুইঝলে? বাবাজী প্রেমে আছে।'

প্রায় যেন ভয়ে ভয়েই উৎকর্ণ ছিলাম, কী না জানি বলে গোপীদাস। কথা শুনে অবাক খুশিতে তাকাই তার দিকে। কোন্ প্রেমের কথা বলে সে জানি না। প্রেমে আছি কী না, তাও জানি না। কিন্তু গোপীদাসের মনে এমন ভাবনা সহসা আসে কোথা থেকে। এমন কথা পায় কোথায়। এমন একটা জবাব তো মাথা কুটলেও নিজের ভাষায় খুঁজে পেতাম না।

গোপীদাস আমার দিকে চেয়ে ঘাড় দোলায়। অবধূত ঝেঁজে বাজে, 'ধু-র শালো, সব কথাতেই খালি প্রেম। তোমাদিগের উসব চালাকি। বাবাজীর সাধন ভজন আছে কী না বল্য।'

'ক্যানে থাইকবে না। বাবাজী প্রেম ভজে হ্যা।'

'শালো, আবার প্রেম?'

'ক্যানে নয় গ। তোমার সাধন ভজনে প্রেম নাই? যোগো দিদির সাথে প্রেম না থাইকলে কি ভইজাতে পাইরতে?'

বলে চোখের ইশারায় আবার যোগোকে দেখিয়ে দেয়। অবধূত একেবারে বিগলিত হয়ে মোটা গলায় গল্‌গলিয়ে হেসে ওঠে। বড় ভাল লেগেছে কথাটি। অবধূতের প্রাণ মাতানো কথা যেন। বলে, 'শুইনলি গ ভৈরবী, শালো জয় গুরুওয়ালাটো বেজায় বদ্।'

ভৈরবী কিন্তু চোখাচোখি করে গোপীদাসের সংগেই। তারপরে পাতা গুটিয়ে উঠে পড়ে। খাওয়া হয়ে গিয়েছে তার। অবধূতের কথায় কোন জবাব দেয় না। তাতে কিছু যায় আসে না। ভৈরব চিৎকার করে গান ধরে দেয়,

'মা! তোরে পুজ্যো মন তুষ্ট হয় না।
ইবার পূজা ছেড়্যো পিছে ঘুইরব
খুঁজ্যো লিব ঠিকানা।'

যোগো ততক্ষণে ঘরের বাইরে। এ'টো পাতা ফেলে দিয়ে এসে হাঁড়িকুড়ি তুলে পেড়ে হাত মুখ ধুয়ে আসে। ইতিমধ্যে ঘরে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। বাইরের সামান্য আলোয় এখনো সবই অস্পষ্ট দেখা যায়। এর পরে আর যাবে না। বাইরেও অন্ধকার ঘনিয়ে এল বলে।

যোগো দেশলাই জ্বালিয়ে মাটিতে গাঁথা ত্রিশূলের কাছে প্রদীপ জ্বালে। সিঁদুর-মাখা ত্রিশূল যেন নতুন রূপ পায়। সেই সংগে নরমুণ্ডের কঙ্কালটিও। প্রদীপের কাঁপানো শীষে নরমুণ্ডও যেন কাঁপে।

গোপীদাস আমাকে ইশারা করে। বলে, 'চল বাবাজী, আমরা একটুক ঘুরো বেড়্যো দেখ্যে আসি।'

সে উঠে দাঁড়ায়। আমিও। যোগো তাড়াতাড়ি ফিরে অবাক হয়ে বলে, 'কুথাক গ?'

অবধূত বলে ওঠে, 'আরে, তোমার বাবাজীর সংগে আলাপ করা হল্য না য্যা!'

গোপীদাস বলে, 'হব্যে, হব্যে, চলো যেছি না ত। বাবাজীকে একটুক দেখিয়ে লিয়ে আসি, বাবার থানটো দেখুক ক্যানে।'

যোগো কাছে এসে আমার দিকে চেয়ে গোপীদাসকে বলে, 'দেখ্য গোপীদাদা, যিখানে সিখানে লিয়ে যেইয়ো না। জায়গা ভাল না, ডাকিনীতে ঘাড় ভেঙ্যা দিবে।'

অবধূত তাড়াতাড়ি সায় দেয়, 'হু', খোব হোশিয়ার।'

যোগোর ভুরু কুঁচকে ওঠে। এক মুহূর্তের জন্যে। অর্থাৎ, তার কথায় তুমি অবধূত কেন কথা বলতে এলে। অবধূতের ফোঁপরদালালি চলছে না?

যাবার আগে যোগো আমাকে বলে, 'দেখ্য বাবাজী, ইখানে চিত্তে আমার কষ্ট আছে।'

এবার আমিও জবাব দিই, 'সাবধানে থাকব।'

যোগো আবার বলে ওঠে, 'গোপীদাদা, ঠ্যাঙাবাবাকে দেখিয়ে লিয়ে এস ক্যানে।'

গোপীদাস বলে, 'দেখাব।'

অবধূত অমনি বলে ওঠে, 'হু', হু', তবে দূরে থেক্যা, উ শালোকে বিশ্বাস নাই। হাত্যের কাছকে পেল্যে দিবে ক্যানে দুচার ঘা।'

ব্যাপার বুঝতে পারি না। ঠ্যাঙাবাবা কে, দুচার ঘা দেবেই বা কেন। কাকেই বা দেবে।

গোপীদাস শব্দ করে, 'হু', হু', জানি।'

'যাতে থাব্যে ত?'

যোগোর কথা শুনে গোপীদাস দাঁড়ায়। আমার দিকে তাকায়। আমি একবাক্যে অসম্মতি জানাই, 'আমার দরকার নেই।'

'আমারও নাই।'

অবধূত বলে, 'কারুরই নাই।'

অতএব বেরিয়ে পড়া যায়।

বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। সেই সংগে শীতের বাতাসও। হঠাৎ পশ্চিম হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে। বক্রেশ্বর গ্রামের আকাশে ক্ষীণ এক ফালি চাঁদ প্রথমা না দ্বিতীয়া, কে জানে। পাশে এক নক্ষত্র। আরো কয়েকটি তারা অস্পষ্ট ঝিকিমিকি করে আকাশের কাছে ও দূরে। ঝিঁঝি ডাকে একটানা নানা বিচিত্র স্বরে। শিব মন্দিরগুলোর চেহারা বদলাতে থাকে। নিরেট কিম্ভূত স্থির কালো মূর্তির মত দেখায়। জংগলের ঝুপসি ঝাড় বাতাসে কাঁপে, দোলে, শব্দ ওঠে হায় হায়।

কয়েক পা অগ্রসর হতে না হতেই শিয়াল ডেকে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যেই যেন বক্রেশ্বরের রূপ বদলে যায়। দিনের আলোয় সে ছিল এক, রাত্রে আর এক। দিনের আলোয় যাকে চিনেছিলাম, রাতের অন্ধকারে সে অচেনা। এখন মনে হয়, যা দেখেছিলাম তার চেয়ে অদেখাতেই বেশী রয়ে গিয়েছে। কী রয়েছে, তা জানি না। এখনো দেখতে পাই না। যা আছে তা যেন আমারই অনুভূতির গভীরে, দূরে অন্ধকারে।

গোপীদাস কোথা দিয়ে নিয়ে যায়, পথ চিনতে পারি না। সহসা এক মন্দির [illegible] ওঠে অন্ধকারে। টিমটিম বাতির [illegible] দু'এক মানুষ মূর্তি মন্দিরের [illegible] গোপীদাস বলে, 'কালী মন্দির।'

একবার কাছে গিয়ে দেখি। [illegible] মালিনী ঘোর কৃষ্ণ ভয়ংকরী, [illegible] বদনী, নগ্না চতুর্ভুজা। [illegible] রাত্রির সকল অন্ধকার [illegible] আর এক রূপে। বাইরে বেরিয়ে [illegible]

পড়ে দাঁকণে আগুনের শিখা। কালো রাত্রির বুকে লাল আগুনের শিখা কেবল বাতাসে ঝাপটা খাওয়া ঊর্ধ্বমুখী না। নীচে তার অবিকল প্রতিবিম্ব দেখি পাপহরার* নাতিশীতোষ্ণ জলে। চিতা জ্বলে, বক্রেশ্বর মহাশ্মশান। এ চিতা কখনো নেবে না।

দূর থেকে আগুনের আলোয় যাদের অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দেখি, কাছে যেতে যেতে তারা স্পষ্ট হয়। একটি না, তিনটি চিতা জ্বলে। যাদের চিতা জ্বলে তাদের যারা শেষ বিদায় দিতে এসেছে তাদের মধ্যে সব রকম মানুষ। গুচ্ছ গুচ্ছ হেথা হোথা ছড়ানো ছিটানো মেয়ে-পুরুষ। তার মধ্যে সব থেকে বেশী নজরে পড়ে দু তিন বছরের শিশুকে বুকে জড়ানো একটি যুবতীকে। চোখে তার জল নেই, দৃষ্টি তার চিতার আগুনে। সেই আগুনের আলোয় এখনো তার এলো চুলের সিঁথায় অস্পষ্ট সিঁদুরের দাগ। মুছেও তুলতে পারেনি। কিন্তু হাত তার শূন্য। শাঁখা ভেঙেছে, নোয়া খুলেছে।

অবাক লাগে শিশুটির দিকে চেয়ে। সে আগুনের দিকে চেয়ে নেই। গায়ে মোটা কাঁথার মত কী একটা জড়ানো। সে যুবতীর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। মনে করি যুবতী তার মা। মায়ের মুখের দিকেই সে অবুঝ অবাক চোখে চেয়ে রয়েছে।

একটা গুচ্ছের মধ্যে এক বৃদ্ধা কাঁদে বুক চাপড়ে চাপড়ে। কী যেন বলেও, বুঝতে পারি না। কে যেন সান্ত্বনা দেয়, 'কাইন্‌লে কী হব্যে বল্য।'

তাতে কান্না বাড়ে। আর অবাক হয়ে শুনি শ্মশানরক্ষী, শ্মশানবাসী কালো এক ডোম পুরুষ বলে, 'তা বইললে কি মন মানে। কেন্দ্যে লিক।'

অথচ মহাশ্মশানের অনির্বাণ চিতা সে প্রতিদিন জ্বালে। কান্না কিছুই ফিরিয়ে দেয় না, তার থেকে আর কে বেশী জানে। কিন্তু তারই আপত্তি নেই কান্নার।

পাপহরার জলের কাছে কে এক গেরুয়া-পরা মানুষ বসে। মাথার চুলে জটা। চিতার আগুনের দিকে চেয়ে বসে আছে। এক গেরুয়াধারিণী কপালে সিন্দুরচর্চিতা প্রৌঢ়া ত্রিশূল নিয়ে একজন শ্মশানবাসীর সংগে বসে কী যেন বলছে। কেউ কেউ তার কথা শুনছে। এখানে-ওখানে ছাইগাদার এলিয়ে পড়ে আছে কয়েকটা কুকুর। তাদের আধবোজা চোখের দৃষ্টি যেন চিতার আগুনের দিকে। ওদের খিদের আশা কে জানে।

দাঁড়িয়েছিলাম। কাঁধে স্পর্শ লাগতে ফিরে তাকাই। গোপীদাস আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। বাতাসে ঝাপটা খায় তার দাড়ি। বলে, 'চল, আর একটুকু ঘুরো আসি।'

সে আমাকে টানে। পূব দিকে নিয়ে যায়। স্নানের সময় দুপুরে দেখেছিলাম অঘোরী বাবার আশ্রম। সামনে খোলা কুঁড়ে ঘরের মত একটি ঠাঁই। তার মধ্যে টিমটিম করে আলো জ্বলে। সেই অস্পষ্ট আলোয় চোখ ফিরিয়ে সেই অশ্বত্থের গোড়ার দিকে তাকাই। স্তূপীকৃত নরমুণ্ডের কংকাল। যেন দলা পাকিয়ে ভিড় করে আছে অনেকগুলো মুখ। তাদের মুখে মাংস নেই, চামড়া নেই, কোন অভিব্যক্তি নেই। অথচ চোখের কালো গর্তে যেন দৃষ্টি আছে। যেন এদের নিষ্প্রাণ মৃত কংকাল বলে মনে হয় না। নির্নিমেষ তাদের দৃষ্টি, কিন্তু ভয়ংকর বীভৎস লাগে না। বরং, কাছে থেকেও তারা যেন কোন্ দূরে ওপার থেকে ভাবলেশহীন মুখে চেয়ে আছে।

এরা কারা কে জানে। কেন পুড়ে ছাই হয়নি তাও জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হয় না। এরা কে নারী, কে পুরুষ, কিছু লেখা নেই। নাম ধাম পরিচয় কিছু ছিল একদা। এখন এক পরিচয়, কঙ্কালের মুণ্ড।

কুঁড়েতে টিম্‌টিম্ বাতি, বাইরে অন্ধকার। গাছের আঁধার কোলে কঙ্কাল করোটি। সহসা জোনাকি জ্বলে চিকচিক। পাপহরায় জলে ঈষৎ চঞ্চলতা। বাতাসের ঝাপটায় কাঁপে। তাই যেন জলের গায়ে ঝিকিমিকি দেখা যায়। একেবারে স্থির থাকলে দেখা যেত না। ওপারে গাছপালা মন্দির। সর্বোচ্চ বক্রেশ্বর চূড়া। তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি। আমি কী মানি বা না-মানি, তার চেয়ে বড় আমার সমগ্র চেতনা জুড়ে যেন এক অস্পষ্ট অচিন ঘোর। জীবনেরই

* বিস্মৃতিমগ্ন পাপহরা [illegible] ইতিপূর্বে [illegible] করেছি। [illegible] যারা [illegible] পৈতৃক [illegible] বক্রেশ্বর [illegible]

দুয়ারে দাঁড়িয়ে আমি যেন কোন্ এক লোকে, কোন্ এক দূর কালে দাঁড়িয়ে আছি। যে কালের হিসাব পিছনে ফিরে পাই না। সামনে তাকিয়েও অথই পারাবারে। আমি নিজেও আমার এই অনুভূতিকে চিনি না।

এ সময়ে কার ভারী মোটা গলা শোনা যায়, 'কে উখানে?'

গোপীদাস জবাব দেয়, 'চিনতে লাইরবে গ, আমি গোপীদাস।'

কোথা থেকে জিজ্ঞাসা আসে টের পাই না। দিক অনুমান হয় পূবে। দক্ষিণে এক পাকা বাড়ি। দিনেও দেখেছি। রাত্রে তার কোথাও আলো নেই, ইমারতের অবয়ব মাত্র। এখানে এই পরিবেশে বাড়িটা যেন বেমানান অপরিচিত। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে না কার ঘর, কার বসত।

গোপীদাস ডাকে, 'এইস বাবাজী। আমার হাত ধর্যে এইস।'

সে নিজেই আমার হাত ধরে। পাপহরার ধার দিয়ে আরো পূবে নিয়ে যায়। ছোট ছোট গাছপালা জঙ্গল, ফাঁকা ফাঁকা লাগে চারদিক। তবু তার মধ্যেই মানুষের অস্পষ্ট অস্ফুট সাড়া পাওয়া যায়। বাতির ক্ষীণ রেশ চোখে পড়ে।

কিছু দূর যাবার পরেই পুরুষের তীক্ষ্ম তীব্র চিৎকারে আর গালাগালিতে শ্রবণ যেন জ্বলে যায়, 'শালো কুত্তার বাচ্চা...।'

বাকী কথা উচ্চারণ করা দায়। তারপরেই প্রচণ্ড মারের শব্দ। চটাপট থাপ্পড়, গুপ্ গুপ্ ঘুষি। শুনতে শুনতে ততক্ষণে একটা কুঁড়ের অদূরে দাঁড়িয়ে পড়েছি। সেখান থেকে অবাক সভয়ে দেখি, এক জটাওয়ালা নেংটি-পরা খালি-গা মানুষ একজনকে প্রহার করছে। যাকে করছে, সে উপুড় হয়ে পড়ে মার খাচ্ছে। তার কোন আত্মরক্ষার চেষ্টা নেই, প্রতিবাদ নেই। কেবল একটা কান্নার শব্দ উঠছে অন্ধকারের মধ্যে। গোপীদাস বলে, 'ঠ্যাঙাবাবা।'

জিজ্ঞেস করি, 'মারছে কেন?'

'ঠ্যাঙা বাবা য্যা। সবাই বলে, উনি যদি দয়া কর্যো মারেন, তব্যে জাইনবে উদ্ধার হল্যো। তব্যে জাইনবে, মনবাঞ্ছা পূরণ হব্যে।'

কী ভীষণ বিপদের কথা! একজন জটাধারী ক্ষ্যাপা এই মারাত্মক বুলিতে গালাগাল দিয়ে এমন ভয়ংকর উত্তম মধ্যম দিলে তবে উদ্ধার, পুণ্য, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ! প্রহারের বহর দেখে দূর থেকে আমারই গায়ের মধ্যে কেমন করে ওঠে। অথচ, যে মার খাচ্ছে, সে শুধু কাঁদে না। আমি তার আর্ত আকুতি শুনি, 'অই গ বাবা, মার, আমাকে মের্যে ফ্যাল গ, আমার পাপ ঘুচুক।'

এমন গভীর আর্ত আকুতি আর কখনো শুনি নি। কেবল একজনের গানের কথাই সহসা আমার মনে পড়ে যায়, 'আরো আরো আরো প্রভু আরো/এমনি করে আমায় মারো।'

ঐ লোকটার এত বিশ্বাস কোথা থেকে আসে। বিনামূল্যের শৌখীন বিশ্বাস না। আপন রক্তমাংস নিগ্রহের মূল্যে এ বিশ্বাস কেমন করে আসে। আমি তো ভাবতে পারি না। তার কান্নার মধ্যে দেহের কষ্ট ফোটে না। প্রাণেরই যন্ত্রণা জাগে। আমি তো কোন দিনও পারব না। একজন জটাধারী নেংটি-পরা মানুষকে দূরের কথা, যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করি না, তিনি এলেও পারব কী না জানি না। অথচ এই মার খাওয়া মানুষকে কেবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকারের মানুষ ভেবে ঠোঁট বাঁকিয়ে চলে যাব, সে সাহস আমার নেই। আমি তা ভাবতে পারি না।

আর যে মারছে, সে যেন কী এক ভয়ংকর রুদ্ররাগে জ্বলে উঠছে। ভীষণ আক্রোশে পিটিয়ে মারছে। আমি যেন শারীরিক অস্বস্তিতে বলে উঠি, 'কী আশ্চর্য, কতক্ষণ

গোপীদাস বলে, 'না বাবাজী, মের্যে মারবে? মেরে ফেলবে নাকি লোকটাকে?' ফেইলবে না। সিরকম শুনি নাই কখনো।'

গোপীদাসের গলা শুনে বুঝতে পারি, মারের আঘাত যেন তার গায়েও লাগছে। তার গলার স্বর অস্পষ্ট, ভেজা ভেজা।

কুঁড়েটার কাছে আরো লোকজন রয়েছে। সামান্য একটা লম্ফর আলোয় চুপচাপ বসে থাকা মূর্তিগুলোকে যেন এই জগতের মানুষ বলে মনে হয় না। কিম্ভূত তাদের আকৃতি। মুখ চোখ পরিষ্কার দেখা যায় না। দলা দলা অন্ধকারের মধ্যে তাদের কালো মূর্তির গায়ে মাঝে মাঝে লম্ফর আলো হিলহিলানো সাপের মত কেঁপে কেঁপে উঠছে। আলো যেন ছুবলে ছুবলে খাচ্ছে। জটাধারী কুৎসিত গালাগালিতে চিৎকার করছে। তার মধ্যেই মেয়ে-গলায় কে যেন জয়ধ্বনি করে ওঠে, 'জয় ঠ্যাঙাবাবা, জয় ঠ্যাঙাবাবা।'

ঠ্যাঙাবাবা! অদ্ভুত নাম। অদ্ভুত ঘটনা। এমন আশ্চর্য বিচিত্র ব্যাপার কি পৃথিবীর আর কোথাও ঘটে!

গোপীদাস বলে, 'এতদিন খালি শুইনেছি, ওয়াঁকে চখে দেখি নাই। এই পেত্থম দেইখলাম। শুইনেছি, বেশী দিন আসেন নাই, বেশী দিন থাকেন না কোথাও।'

প্রহারটা হঠাৎই থামে। ঠ্যাঙাবাবা যেন ক্লান্ত হয়ে সরে গিয়ে খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে পড়েন। গালাগালও বন্ধ হয়ে যায়। মুখটা পাশ ফিরিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে থাকেন।

গোপীদাস জিজ্ঞেস করে, 'কাছে যেইয়ে দেইখবে বাবাজী?'

'অ্যাঁ?'

শুনেই চমকাই। বলি, 'কিন্তু যদি মারে?'

গোপীদাস আমার পিঠে হাত দেয়। বলে, 'এখন আর মাইরবেন না। মার খাবার পিত্যেশে সবাই আসে। উনি সবাইকে মারেন না।'

তবু ভয়। তবু কৌতূহলও। পায়ে পা[illegible] যাই গোপীদাসের সঙ্গে। দরজা বলে কি[illegible] নেই। সামনে বেড়াও নেই। কোনরকমে এক[illegible] বেড়া ঘিরে মাথায় আচ্ছাদন করা হয়ে[illegible] সামনে বসে থাকা লোকগুলো সবাই [illegible] সঙ্গে আমাদের দিকে ফিরে তাকায়। চো[illegible] তাদের বিস্ময়ের থেকে অনুসন্ধিৎসাই বেশ[illegible] চোখে জিজ্ঞাসা, এরা আবার কী চায়।

এদের মধ্যে দুজন স্ত্রীলোকও রয়ে[illegible] একজন আমাদের দেখে আবার নিচু হয়ে [illegible] যেন করতে থাকে। লক্ষ করলে দেখা [illegible] গাঁজার ছিলিম তৈরী হচ্ছে। আলো অন্ধক[illegible] দোলানো কাঁপানো ছায়া ছায়া মানুষগু[illegible] যেন বিষণ্ণ। কী একটা আর্ত ভাব যেন তা[illegible] মুখে। সকলেই এরা মার খেতে এসে[illegible] সকলেই এরা উদ্ধারের আশায় বসে। গভ[illegible] বিশ্বাসেই তারা বিষণ্ণ, আর্ত। মার-খা[illegible] মানুষটি তখনো পড়ে আছে। ফুলে ফ[illegible] কাঁদছে। ঠ্যাঙাবাবা আমাদের দিকে ফি[illegible] তাকান না। কাছে থেকে দেখে মনে [illegible] মানুষটির খাড়া তীক্ষ্ম নাক। চোখ দ[illegible] বড়। মুখখানা একদা যেন সুন্দরই ছি[illegible] মুখে কোন প্রসন্নতা নেই। এখন মনে [illegible] রাগ বা ঘৃণাও নেই। যেন কিসের এ[illegible] যন্ত্রণার জ্বালা। গভীর ভাবনায় স্থির [illegible] অথচ একটা কষ্টের ছাপ। কে ইনি? [illegible] মারেন? কেন এদের এত বিশ্বাস?

ধর্মাধর্ম জানি না, বুঝি না। ভাবি [illegible] বৈচিত্র্য এই সংসারে। কত বিচিত্র মান[illegible] এমন বিচিত্র দৃশ্য যে কোন দিন দেখব, ক[illegible] মুহূর্ত আগেও ভাবি নি। আমার চ[illegible] পথের ধারে শেষ পর্যন্ত কেবল বুকের ক[illegible] দু' হাত জড়ো করে স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁ[illegible] থাকি।

আবার গায়ে স্পর্শ অনুভব ক[illegible] গোপীদাস বলে, 'চল বাবাজী, এইস।'

তার সঙ্গে পূবের দিকেই এগিয়ে য[illegible] দক্ষিণে বাঁক নিয়ে। গোপীদাস কথা বলে [illegible] আমিও কথা বলতে পারি না। মনে হয়, য[illegible] সবই ফুরিয়েছে। রাস্তা ক্রমে ঢালুতে নে[illegible] যায়। পায়ের নিচে পাথর অনুভূত হয়। [illegible] সঙ্গে বালি। সামনের দিগন্ত অনেকখা[illegible] খোলা মনে হয়। প্রকৃতি অনেকখানি উ[illegible] আকাশ বড় হয়ে ওঠে। দূরে নিচে এক [illegible] জলের রেখা দেখতে পাই। [illegible] আর এক দিক। পশ্চিম থেকে [illegible] উত্তরে বেষ্টন করে নদী দক্ষিণে নেমে [illegible]

সহসাই সামনে দেখি একটি [illegible] কাঠের আগুন জ্বলছে [illegible] আগুনের আলোয় দেখি, [illegible] পুরুষ বসে আছে। চুপচাপ, [illegible] দুরান্তের প্রকৃতির দিকে [illegible] মধ্যে অস্পষ্ট ছায়ার মত [illegible] নারী না পুরুষ, বুঝতে পারি [illegible]

আলোয় কালোয়

ত্রিশঙ্কু

ডাঙার মানুষ আমরা—গাছপালা, ঘর-বাড়ি, যানবাহন ও মানুষের কোলাহল সবাঙ্গে মেখে ঘুরে বেড়াই। এদের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখলে বিচলিত হই। এই সব নির্জীব ও সংকীর্ণ পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করি আমাদের অভিজ্ঞতা। অনেক ছোট ছোট ব্যাপার প্রচন্ড গুরুত্ব নিয়ে হাজির হয় আমাদের সামনে। মনেই হয় না, সমুদ্র বা মরুভূমির মতো একটা বিশাল পট পিছনে টাঙিয়ে রাখলে আমরা কত নগণ্য হয়ে যেতে পারি।

ছোট ঘরটিতে বসে একজন পরিচিত লেখক বন্ধুর সঙ্গে গল্পসল্প হচ্ছিল। নানান জাগতিক বিষয়ের আলোচনা হতে হতে ক্রমশ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে পড়লো। আপনার বউমাটি বেফাঁস প্রশ্ন করে বসলো বন্ধুকে—'এই ছন্নছাড়া জীবন একটা ব্যাধি-বিশেষ, আপনি মানেন? হাত পা ছেড়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো একটা জায়গা পেয়ে গেলে দেখবেন, অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।'

বন্ধুটি হো-হো করে হেসে উঠলো—'ভালোবাসার কথা বলছেন ভাবীজী? এতই সহজ নাকি জীবনটা যে, উপদেশ দিয়ে দিক বাতলানো যাবে! উপন্যাস যেখানে শেষ হয়, জীবনের রুক্ষতা সেখান থেকে শুরু, মানেন আপনি? জীবনের রস চুষতে হয়: কেউ ঢেলে দেয় না মুখে।'

প্রতিপ্রশ্নে ভাবীজী একটু বিপন্ন বোধ করলো। ভিমরুলের চাকে ঢিল পড়েছে। তটস্থ হয়ে প্রসঙ্গ পালটাবার জন্যে বললো, 'তা হয়ত ঠিক।...আচ্ছা, বলুন, আপনি এখন কী লিখছেন?'

—'একটা গল্প লেখার চেষ্টা করছি কয়েক দিন থেকে, পারছি না।'—বন্ধুটি নিজেই একটু সচেতন হয়ে উঠলো।—'নিজের চোখে দেখা একটা ঘটনা, তাকেই সাজিয়ে-গুছিয়ে তৈরি করার ইচ্ছে। কিন্তু ডাঙায় বসে সমুদ্রের সিচুয়েশন কিছুতেই ধরতে পারছি না। এক পাতা করে লিখছি—এত বোকার মতন লাগছে—আবার ছিঁড়ে ফেলছি।'

—'আপনার মুখেই শুনি না।'

—'শুনে হাসবেন না তো?'—এই বলে একটা সিগারেট ধরিয়ে শুরু করলো বন্ধুটি:

বছর ছয়-সাত আগের কথা। ভবঘুরের মতো অনেক দেশ ঘুরে নিজের দেশে ফিরছি সেবার। কাঁধে একটা ঝোলা সম্বল। মাঝপথ থেকে জাহাজ ধরবো। স্পেনের দক্ষিণ সীমান্ত পার হয়ে জিব্রালটার বন্দর—সেখানে ইয়োরোপ ও আফ্রিকা মুখে মুখ ঠেকিয়ে রয়েছে প্রায়। মাঝ-দরিয়ায় জাহাজ দাঁড়িয়ে, আমরা নৌকো করে রাত দশটা নাগাদ উঠলাম। নৌকো থেকে সিঁড়ি বেয়ে জাহাজের খোলে ঢুকছি সারবন্দী আট-দশজন যাত্রী, এমন সময় সামনেই একজন স্কার্ট-পরা ভদ্রমহিলা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল দেখলাম। বছর তিরিশ বয়স হবে। [illegible]

শুঁকতে শুঁকতে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটোছুটি করছি আহ্লাদে। দরজা খুলে ডেক-এ বেরোলাম, গুঁড়ি গুঁড়ি জলের ছাট লাগছে গায়ে, শীত করছে। তবু সমুদ্রকে তখন এত জীবন্ত লাগছিল যে, ম্যাকিনটোশটা গায়ে জড়িয়ে ডেক-এই নেমে দাঁড়ালাম। কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম, ডান দিকে আমার দুর্ধর্ষ আফ্রিকা আর বাঁ দিকে রোমান্টিক ইয়োরোপ। জল ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছিল না অবশ্য। ডেকটাও নির্জন। যাত্রীরা এদিক-ওদিক তাস খেলে সময় কাটাচ্ছে, কেউ চিঠি লিখছে, বই পড়ছে। কেউ বা ওপরের কাউন্টারে বসে বিয়ার খাচ্ছে আর জাহাজের গতি নিয়ে জুয়া খেলছে। শুধু গত রাত্রের সেই ভদ্রমহিলা চুপটি করে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে একটু দূরে।

জাহাজ ও সমুদ্রের গর্জন। কাছে গিয়ে চিৎকার করে আলাপ করলাম—'আপনার শরীর ভালো না, এই খোলা জায়গায় কেন?'

মহিলা একটু থেমে সংক্ষেপে বললেন, 'ভালো লাগছে।'

—'কাল রাতে ভদ্রলোকটি আপনাকে ধরে না ফেললে আপনি জলে পড়ে যেতেন।'

—'উনি আমার স্বামী।'

কথা বলতে ভালো লাগছিল না ওর। চারদিকে কোথাও ডাঙা দেখা যাচ্ছিল না, তবু গতির বিপরীত দিকে যেখানে জিব্রালটর—এক দৃষ্টে চেয়েছিল উদাস।

আমি অকুতোভয়। খানিক চুপ করে থাকার পর আবার চেঁচিয়ে প্রশ্ন করলাম—'মন কেমন করছে?'

—'না, না।' ভদ্রমহিলা এবার বব-চুল ঝাঁকিয়ে উড়ন্ত স্কার্ট সামলাতে সামলাতে পিছন ফিরলেন। ভারী দরজা টেনে ঢুকে গেলো জাহাজের খোলে।

সমুদ্রের এমনই প্রভাব যে, কাউকেই একা থাকতে দেয় না। এক দিন দু' দিন পরেই প্রত্যেকে কথা বলার সঙ্গী খুঁজতে ব্যাকুল। ঘুরতে-ফিরতে হাজারবার টের পাচ্ছি বিলেত ফেরত চার-পাঁচটা ভারতীয় ছেলে আমার সঙ্গে ভাব করতে উৎসুক। আমি পাত্তা দিচ্ছিলাম না। আমার নজর অন্য দিকে।

একটা দিন চোখে চোখে হেসেই কাটলো। পরের দিন তার পাত্তাই পেলাম না। তৃতীয় দিন সন্ধেবেলা আহার সাঙ্গ হলে পর বিরাট লাউঞ্জটায় হাউসি হাউসি খেলা হচ্ছে। দেড় শ' দু' শ'জন লোকের ভিড়ে ও আলোর মধ্যে ও একলাটি বসে ছিল। হাতছানি দিয়ে ডেকে পাশে বসালো আমাকে। নিজে হেরে যাচ্ছে বলে আমার সঙ্গে ভাগ্য মিলিয়ে খেলতে চায়। আমার ভাগ্যের জোর কত। তার ওপর

শুনছো, ওদিকে ওয়ালস বাজছে। নাচবে একটু?

জুয়ো খেলার জন্যে অত টাকা পাবে কোথায়! ও দু' শিলিং দেয় তো আমি ছ' পেনি দিই। তবু এইভাবে কিছু জিত হল ওর। আমাকে বললো, 'তুমি খুব লাকি।'

—'চলো, একটু কফি খাওয়া যাক।'—জিজ্ঞেস করলাম, 'কাল সারা দিন কোথায় ছিলে? কত খুঁজলাম তোমাকে।'

—'শুয়েছিলাম।'—ও বললো, 'খুব বমি হচ্ছিল। আজ ভালো আছি।'

একটু প্রশ্রয় পেয়ে প্রশ্ন করলাম, 'তোমার নাম কি?'

—'হেকমত।'

—'স্বামীটিকে দেখছি না? সমুদ্রচাপে উনিও অসুস্থ নাকি?'

—'না, আসেন নি। আমাকে জাহাজে পৌঁছে দিয়েই ফিরে গেছেন।'

—'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

—'বাপের বাড়ি। পোর্ট সৈদ।'

রসিকতা করার চেষ্টা করলাম, 'তাই বুঝি মন খারাপ ছিল প্রথম দু' দিন? শকুন্তলার মতো বিরহে এত কাতর নায়িকা তোমাদের দেশেও আছে? বিদেশী প্রণয়ীর জন্যে এত কাতর?'

—'বিদেশী প্রণয়ী নয়, বিদেশী স্বামী।' হেকমত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললো, 'উনি স্পেন দেশের লোক। আমাদের আর দেখা হবে না।'

ব্যাপারটা ঘোরালো মনে হচ্ছে। আরব-আফ্রিকার মেয়ে হেকমত-এর পারিবারিক গোলমালের কাহিনী সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে শোনার ইচ্ছে হচ্ছিল না। থামাবার জন্যে বললাম, 'বাদ দাও সাংসারিক কথাবার্তা। শুনছো, ওদিকে ওয়ালস বাজছে। নাচবে একটু?'

অবলীলায় উঠে দাঁড়ালো। আমরা খানিকক্ষণ কাঁধে কাঁধ রেখে নাচলাম। কিন্তু উত্তেজনা হচ্ছিল না। মৃদু বাজনার ফাঁকে ফাঁকে ও ফিশফিশ করে বলতে লাগলো—'কাল ভোরে পোর্ট সৈদ পৌঁছবো।...এই বোধ হয় আমার শেষ সমুদ্রযাত্রা।'

বললাম—'কোনো বিদেশীকে বিয়ে করলেই আবার চলে আসতে পারবে।'

—'তা হয় না।' হেকমত আস্তে আস্তে বলতে লাগলো—'আচ্ছা, কোনো মেয়ের বাচ্চা না হওয়া কি অপরাধ?...আমি তো শুধু ভালোই বাসতে পারি—সব ছাড়তে পারি—আর কী সম্ভব বলো?'...আমার হাতের মধ্যে ওর হাতটা ঘামছিল।—'দশটা বছর একসঙ্গে থাকলাম, ফুর্তি করলাম, ঘর সাজালাম, ঝগড়াও করলাম। তারপর হঠাৎ একদিনে সব ছিঁড়ে গেল।...ও বললো, একঘেয়ে লাগছে, তুমি ফিরে যাও। এর মতো নিষ্ঠুরতা আর আছে?'

নিজের কেবিনে শুয়ে শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত আমি হেকমত-এর কথাই ভাবলাম। ভূমধ্যসাগরের দুই প্রান্তে দু'জন নরনারীর ভালোবাসার গ্রন্থিটা কোথায়? নাকি নেই আদৌ? প্রয়োজনের সঙ্গে প্রয়োজনের মিল হয়নি বলেই সব ধসে গেল? কী জানি।

সকালে উঠতে দেরি হল বেশ। বেরিয়ে এসে দেখি, জাহাজ পোর্ট সৈদ ছেড়ে সুয়েজ খাল ধরে গুটি গুটি এগোচ্ছে। হেকমতকে বাপের বাড়ি নামিয়ে দিয়ে আমরা রোমাণ্টিক ইয়োরোপ ও দুর্ধর্ষ আফ্রিকা ছেড়ে এশিয়ায় ঢুকে পড়েছি। ডেক-এর রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সুয়েজের দু' পাশে ধুলো বালি ও [illegible] দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল, কখনো কখনো এই মরুভূমির বালি মানুষদের [illegible] যায়। আমার হাতের [illegible] হেকমত-এর সুগন্ধির ছাপ ছিল।

চুপচাপ একা দেখে সেই ভারতীয় [illegible] তিনজন পাশ থেকে [illegible] করলো, 'পাখি উড়ে গেছে [illegible] করে কী হবে! আসুন এক [illegible] যাক।'

—'ব্রিজ?'—আমি [illegible] ব্রিজ? বেশ, চলুন।'

...সমুদ্রের ওপর ব্রিজ? বেশ, চলুন

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

॥ ১৫ ॥

একদিন এইরকম বেড়াবার পথে যেতে যেতে কবি বললেন : একটা কথা মাঝে মাঝে ভাবি, আধুনিক কালের ছেলেমেয়েরা কিন্তু রোমান্স করতেও জানে না। তাই আধুনিক সাহিত্যের আজকাল এইরকম চেহারা। সবই যেন স্থূল। কোনো সুন্দর জিনিসই সুশ্রীভাবে ভোগ করতে জানে না। সবেতেই লোলুপতার ছাপ লেগে কুশ্রী হয়ে ওঠে। আগেকার দিনে বিরহটাকেও লোকে রসিয়ে ভোগ করতে পারত। তাই মিলনের সমানই তাতে আনন্দও পেয়েছে বেদনার মধ্য দিয়ে। এ দেশের পুরনো কালের সাহিত্যে তার পরিচয় পাই। আর আজকের দিনে যাকে সকলে আধুনিক সাহিত্য বলছে, তার মধ্যে কেবলই বাস্তবের দোহাই দিয়ে সুন্দরের অপমান। বিধাতা আমাদের কল্পনাশক্তি দিয়েছেন কেন? প্রতি দিনের জীবনযাত্রার দৈন্যের মধ্যেও নিজের কল্পনাশক্তি দিয়ে সৌন্দর্য রচনা করে তো সে দৈন্য খানিকটা ঘোচাতে পারি। সাহিত্য তো সেই কাজই করবে।

ধর, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে পরস্পরকে ভালবাসে এবং তারা পেয়েওছে পরস্পরকে। তবু তারা এমনভাবে চলতে পারে যাতে গোড়াকার রোমান্স চিরকালই বজায় রাখা যায়। যেমন, একটা ভাল মিউজিক কখনও পুরনো হয় না। ধর, তারা নিয়ম করল প্রতি দিন দেখাশোনা হবে না। যেদিন হবে [illegible] সাজসজ্জা করবে। মেয়েটি যদি বাজাতে জানে এমন হয়, তবে তার যন্ত্রটা কাছে নিয়ে তার প্রিয়তমের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। আকাশে চাঁদ উঠেছে, জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভেসে যাচ্ছে, সমস্ত প্রকৃতি যেন আজ বিশেষভাবে প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। মেয়েটি আস্তে আস্তে তার বীণায় ঝঙ্কার দিচ্ছে আর ভাবছে, এই বুঝি এল। দু দিকে দুখানা বাড়ি, মাঝখানে দীঘি দিয়ে পৃথক করা, আর তার উপরে সাঁকো। মেয়েটির কাছ থেকে অনুমতি না পেলে ছেলেটি তার কাছে আসতে পারবে না, এ নিয়ম তারা নিজেরাই করে রেখেছে।

এই পর্যন্ত শুনেই আমি খুব হেসে উঠলাম।

—কী? হাসছ যে?

বললাম : এ বেশ একটা রোমান্টিক ছবি হল মানছি; কিন্তু বাস্তব জীবনে এটা চালানো কি সম্ভব? বাজারের খরচ কে দেবে? টাকার দরকার হলে, দেখা না করলে মেয়েটি টাকা পাবে কোথা থেকে?

—ঐ দেখ, কোথা থেকে কিসে এনে ফেললে। ঐজন্যেই তো বলছিলুম, তোমরা বড় বেশী বাস্তব হয়ে উঠেছ।

আমি বললাম : আপনি বসে বসে কল্পনায় একটা ছবি আঁকলেন, আমাদের শুনতেও বেশ ভাল লাগল, তাই বলে যদি ঐরকম রোমান্সের অনুকরণ করতে যাই, তা হলেই হয়েছে।

পরে যখন 'শেষের কবিতা'য় লাবণ্য আর অমিত রায়ের রোমান্সের কল্পনা দেখলাম, মনে পড়ল, নরওয়েতে ১৯২৬ সালে মোটরে বসে এর বর্ণনা শুনেছিলাম। কবিকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনিও হেসে বলেছিলেন : আমার মনে আছে। দেখো না,

সেদিন একটা ছবি এ'কেছিল্ম; মনের মধ্যে সেটা ল্‌্কিয়ে ছিল; এখন কাজে লেগে গেল।

কতদিনের কত ছোট ছোট ঘটনা এই-রকম হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যায়। অসলোর গল্প বলতে গিয়ে সেদিনকার বেড়াবার সঙ্গেধোটা, তার সমস্ত কথাবার্তা ছবি নিয়ে মনের মধ্যে ভেসে উঠল।

মিঃ আর মিসেস ভালা হানসন (Walla-hansan)-দের সঙ্গে অনেক লেখক, কবি ও বিশিষ্ট লোকেদের ভাব। প্রফেসর স্টেন কোনোও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট নাম-করা সংস্কৃতের অধ্যাপক। কাজেই এ'দের বন্ধ্-বান্ধবরা সকলেই কবির কাছে সহজেই হাজির হ'তে পারলেন। রোজই কোথাও না কোথাও তাঁর জন্যে সংবর্ধনা, অভ্যর্থনার আয়োজন হ'তে লাগল। তাইতে আমাদেরও সুযোগ হল, বহ্‌ গ্‌ণীমানী লোকের কাছে আসবার।

হিলডার সঙ্গে ন্যাট হামস্‌নের বেশ ভাব। তিনি হামস্‌নের লেখার খ্‌ব ভক্ত। তাঁর খ্‌ব আগ্রহ হয়েছিল, কবির সঙ্গে যাতে হামস্‌নের আলাপ হয়। কিন্তু দ্‌র্ভাগ্যবশত সাহিত্যিক তখন দ্‌রে কোথায়

হাওয়া বদল করতে গেছেন বলে দেখা হতে পারল না।

জন বয়ারও অসলোর বাইরে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আগমন-সংবাদ পেয়ে তার করে জানালেন যে, তিনি দেখা করতে আসছেন। যেদিন আমরা নরওয়ে থেকে বিদায় নিলাম, সেইদিনই সকালে ভদ্রলোক এসে পৌঁছলেন। সারা দিন একসঙ্গে থেকে খেয়ে তারপর স্টেশনে এসে গাড়িতে তুলে দিয়ে গেলেন।

লর্ড সিংহ সর্বদাই কবির সঙ্গে সঙ্গে থেকে সকলের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় করেছেন। ভদ্রলোককে যে দেখেছে, সেই মুগ্ধ হয়েছে, এমনই তাঁর আকর্ষণী শক্তি। কবি একদিন ঠাট্টা করে বললেন : মশাই, যেখানে যাচ্ছেন, সেখানেই আপনি সকলের চিত্ত জয় করে আসছেন দেখে খুশী হচ্ছি। এরা জানুক যে, ভারতবর্ষ নিতান্ত নগণ্য দেশ নয়। আপনার মত লোকদের দেখলেই সে কথা এরা বুঝতে পারবে সহজে।

তিনি হেসে বললেন : আমাকে আর কী দেখবে বলুন? আমরা তো সকলে basking in your sunshine.

লর্ড সিংহের মত এরকম methodical লোক আমি দেখি নি। ঐরকম প্রতিভার সঙ্গে এইরকম স্বভাব না হলে কি এত উন্নত জীবনে হতে পারতেন? নতুন কোন একটা দেশে যাবার আগে সেই দেশের সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি, যা কিছু জানবার আছে সে সম্বন্ধে যা যা বই পাওয়া যায় দোকানে নিজে গিয়ে বেছে কিনে এনে রাতারাতি সব পড়ে ফেলে একেবারে তৈরী হয়ে তবে সে দেশের মাটিতে পা দিয়েছেন। তাই লোকেরা যখন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখত যে, তারা নিজেরা তাদের দেশ সম্বন্ধে যা জানে, এই বিদেশী আগন্তুক তার চেয়ে ঢের বেশীই জানেন, তারা একেবারে অবাক হয়ে যেত। এর উপরে তাঁর রসিয়ে গল্প করবার অসাধারণ ক্ষমতা, ওরকম প্রত্যুৎপন্নরসিকতা, একেবারে সাদাসিধে ব্যবহার—এই স্বভাবের গুণে একটুও দেরি হত না সকলের অন্তরে প্রবেশ করতে। সকলেই জানত—অনন্যসাধারণ মানুষ না হলে ইংরেজরা লর্ড সভায় বসাত না, অথচ ওঁর মধ্যে কোনো আত্মাভিমান খুঁজে পাওয়া যেত না। কবি বলতেন : ভদ্রলোক পার্টিতে গিয়ে এক মুহূর্তের মধ্যে সবাইকে মুগ্ধ ক'রে তাদের ভিতরে নিজের জায়গা করে নিতে পারেন। ভাগ্যি ওঁকে এনেছিলুম, তাইতে আমাদের দেশের প্রেস্টিজ আরো বেড়ে গেল।

অসলোতে সব সুদ্ধ এগারো দিন থাকা হয়েছিল। সে সময়কার চিঠিতে অনেকখানি গল্প পাওয়া যাবে।

অসলো : নোবেল লরিয়েট জন বয়ারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও নির্মলকুমারী

শ্রীযুক্তা মণিকা মহলানবিশ
শ্রীচরণেষু,

Glott
Rus. V. Aker
Oslo, Norway
30th August '26

জ্যাঠাইমা, আমরা আসবার দিন জাহাজ থেকে যে চিঠি লিখেছিলাম, তাতেই তো আমাদের এখানে আসবার খবর পেয়েছেন। এখানে যাঁদের বাড়িতে আছি, তাঁরা অতি চমৎকার লোক। এত আরামে আছি যে, বলতে পারি না। তার কারণ, এ'রা ঠিক আত্মীয়ের মত ব্যবহার করেন। কোনোটাতেই বাড়াবাড়ি নেই। অথচ কোনো জিনিস দরকার হবার আগেই দেখি, ঠিক যথাস্থানে রয়েছে. না চাইতেই। বেশ বাড়ির মত থাকা গিয়েছে।

যিনি গৃহকর্ত্রী, তিনি আপনাদের ছেলের বয়সী হবেন, খুব বুদ্ধিমতী ও হাসিখুশী মানুষ। যদিও এ'র স্বামী খুব ধনী ব্যবসাদার, ইনি কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সমাজের হাল্কা স্বভাবের ফ্যাশানেবল মেয়ে নন। একটা সহজ গাম্ভীর্য ও মাধুর্য আছে—তাই কবিরও এ'কে খুব পছন্দ হয়েছে। বেশ সহজ মনে এ'দের বাড়িতে আছেন। আমার চেয়ে বয়সে বড় হলেও আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গিয়েছে। যাবার সময় সত্যিই মনে হবে একজন বিশেষ বন্ধুকে ছেড়ে যাচ্ছি।

বেড়াতে এসে এইটেই এবারে বারে বারে অনুভব করছি। কত দূর থেকে এসে কতজনের সঙ্গে মোটে কদিনের দেখাশোনা, আলাপ-পরিচয়, এমন কি বন্ধুত্বও হয়েছে; অথচ তারপরই আবার ছেড়ে চলে আসছি। হয়ত আর কখনও তাদের সঙ্গে দেখা হবে না। তবু এইটুকু সময়ের মধ্যেই কত আদর যত্ন, এমন কি ভালবাসাও পাচ্ছি সব জায়গায়। আদর বলতে শুধু বাইরের ভদ্রতা নয়, সত্যিই একটা আন্তরিকতা, এটা কি কম কথা? কত দেশের কত মানুষের

অসলো ভাস্করের বাড়িতে। বাঁ দিক থেকে : মিঃ লাল, প্রঃ মহলানবিশ, লর্ড এস পি সিংহ, লেখিকা ও রবীন্দ্রনাথ

ব্যক্তিত্বের ছাপ মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গেল। পরে হয়ত অনেককে মনেও থাকবে না, তবু বরাবর অনুভব করব, বিদেশে বেড়াতে এসে অনেক বন্ধু রেখে গেলাম। এ যেন সেই ট্রেনে কারো সঙ্গে আলাপ হবার মত। কয়েক ঘণ্টার জন্য আত্মীয়তা ক'রে তারপর যে যার নিজের পথে চলে যায়, জীবনে কখনো আর দেখা হয় না। তবু এইটুকু সময়ের জন্যও যেটুকু বন্ধুত্ব হয়, সেটাই বা কম কী? এমন কি, অনেক সময় দেখেছি, হঠাৎ হঠাৎ এক একজনের কথা মনে পড়ে মন কেমন করে আর দেখা হবে না বলে। এটা ভাবলে আমার ভারী আশ্চর্য লাগে।

মানুষের স্বভাবই বোধ হয় এই যে, না ভালবেসে থাকতে পারে না। দু দিনের জন্যও কোথাও থাকলে সে নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। এর উলটোটাই আমার মতে অস্বাভাবিক। হিংসে, ঝগড়া, মারামারি, কাটাকাটি, এগুলো বোধ হয় চেষ্টা করে শিখতে হয়েছে। ভারী গোলমেলে ব্যাপার। আপনি হয়ত ভাববেন, আপনার সঙ্গে জ্যাঠামি করছি। কিন্তু একমাত্র আপনার কাছেই এ ধরনের কথা—যা মনে আসে—অসঙ্কোচে বলে যাই। আর কারো কাছে বলতে সত্যিই বাধে। এবারে বেড়াতে এসে কথাটা বারে বারে মনে ঘা দিচ্ছে। সব জায়গায় যখনই এরকম আন্তরিক প্রীতি অনুভব করেছি তখনই মনে হয়েছে—কী যোগ্যতা আছে যে, এমন ক'রে পাচ্ছি? ভেবে দেখলে বুঝতে পারি, প্রীতির ক্ষেত্রে যোগ্যতার বিচার নেই। এটাই হল আমাদের অর্থাৎ মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা। তাই মানুষ যখন পশুর মত ব্যবহার করে, বুঝতে হবে, কোথাও একটা কল বিগড়েছে। অনেক লম্বা বক্তৃতা হয়ে গেল, এবারে খবর লেখা যাক।

আমাদের বাড়িটা শহরের ঠিক বাইরে ছোট একটা পাহাড়ের উপরে। কোনো গোলমাল নেই। বাড়ির সঙ্গে চমৎকার বাগান। সামনে জানলা দিয়ে একটু দূরে ফিয়োর্ড (Fjord) এবং তার গায়ে পাহাড়ের উপরে শহরটা দেখা যাচ্ছে। কী যে অপরূপ শোভা, সে আর কী করে বোঝাব? Bojer, Ibsen-এর বই পড়েছিলাম যখন, তখন তাঁদের দেশটাও দেখবার এত ইচ্ছে হয়েছিল! তখন কিন্তু স্বপ্নেও ভাবি নি যে, সে ইচ্ছে আমার পূর্ণ হবে।

সত্যিই আমার মত সুযোগ খুব কম বাঙালী মেয়েরই ঘটেছে। পৃথিবীটাকে একরকম মন্দ দেখে নিলাম না। শুধু দেশ দেখাই নয়, দেশে দেশে কত গুণী জ্ঞানী মানুষকে কাছ থেকে দেখা, তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হওয়া, এটাই সবচেয়ে ভাগ্যের কথা। এখানে এসেও অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছে। প্রায় প্রতি দিনই কোথাও না কোথাও একটা নেমন্তন্নর আয়োজন এবং প্রত্যেক বাড়িতেই আবার অনেক নতুন লোকের সঙ্গে দেখা, এমনি ক'রে ক্রমশ পরিচয়ের পরিধি বেড়েই চলেছে। এমন এখন হয়েছে যে, অনেকের মুখ চিনি; কিন্তু নাম মনে নেই। কারণ, এদের নাম এমন কটমট যে, হাত মিলানোর সঙ্গে সঙ্গেই নামটা প্রথমে কানে পৌঁছতে চায় না। আর যদি বা ঠিক ধরতে পারি, পরে অনেক সময়েই মনে থাকে না। আমার নাম উচ্চারণ করতেও এদের সেই অবস্থা। কবি উপস্থিত থাকলে তখনই বলে ওঠেন : ওকে রানী বলে ডাকো, আর কিছু বলতে হবে না।

তাই আমি এদের কাছে, কখনো 'মাদাম রানী', আবার কখনো 'কাউণ্ট প্রফেসর'।

প্রফেসর স্টেন কোনো কবির জন্য একদিন প্রকাণ্ড চায়ের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে এখানকার প্রধানমন্ত্রী মিঃ ন্যানসেন (যিনি উত্তর মেরুতে গিয়েছিলেন) ও তাঁর স্ত্রী; তা ছাড়া এখানকার লেখক, সাহিত্যিকের দল ইত্যাদি এবং আরো বহু লোক এসেছিলেন। কবির সঙ্গে রয়েছি, সকলেই আমাদের সঙ্গে এগিয়ে এসে আলাপ করলেন।

আমরা যাঁদের অতিথি সেই ভদ্রলোক মিঃ ভাল্গা হ্যানসনও কবির জন্য একদিন চা ও দু তিন দিন লাঞ্চ ও ডিনার পার্টি দিলেন। এখানকার একজন বড় কবি (আজকের দিনে ইনিই নাকি এখানকার সবচেয়ে নাম-করা কবি); দু চারজন লেখক-লেখিকা; ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী এবং আরো জন কতক লোককে দেখতে পেলাম।

আর একদিন আর এক জায়গায় লাঞ্চে গিয়ে সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর স্ত্রী; এখানকার একজন বিশপের স্ত্রী এবং আরো দু-একজনের সঙ্গে আলাপ হল। বিশপটি বছর তিনেক হল মারা গিয়েছেন। স্ত্রীটিকে চমৎকার লাগল। বেশ বয়স হয়েছে, অত্যন্ত মার্জিত রুচির মানুষ, তেমনি মিষ্টি কথাবার্তা। পিয়ানো বাজানোতে নাম আছে, অনেকক্ষণ ধরে বাজিয়ে আমাদের শোনালেন। আমাকে বারে বারে বললেন: তোমাকে দেখে ভারী খুশী হলাম। আমাদের দেশে ভারতীয় মেয়ে খুব কমই এসেছে, তাই তোমাকে দেখে আরো খুশী হয়েছি।

পরশু বিকেলবেলা এক জায়গা থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে বাড়ি ফিরে এসে দেখি, আপনাদের ছেলের নামে একটা প্যাকেট এবং কতকগুলো গোলাপ ফুল এসেছে। কবি খুব ঠাট্টা করছেন: রানী, দেখো, সুবিধের নয়। ওকে আবার কে ফুলটুল পাঠাতে আরম্ভ করল! এই বেলা ওকে নিয়ে এখান থেকে পালাও। কিংবা আর একটা জিনিসও হতে পারে। হয়ত আমার সেক্রেটারীর মারফত আমাকেই পাঠিয়েছে। নিশ্চয়ই ভেতরে আমার নাম পাবে।

এইসব কথাবার্তার পরে কাগজের মোড়কটা খোলা হল। ভিতরে একটা কার্ডে 'মিসেস মহলানবিশ' লেখা। কবি দেখেই আমাকে বললেন: এঃ, আমার এত জাঁক সব গেল? তোমাকে নিয়ে দেখছি আমার আর ঘোরা চলবে না। বরাবর চকোলেট (প্যাকেটটা চকোলেটের বাক্স), ফুল ইত্যাদি আমার ভাগ্যেই জুটেছে। এবারে তুমি সঙ্গে এসে সব আমার গেল। এরকম লোকসান আমি কী করে সইব? প্রশান্ত, তোমার ঘরের লোকটির কাণ্ড একবার দেখেছ? আমার পসার একেবারে মাটি করলে গো!

আমরা তো সবাই কবির কথায় হেসে অস্থির। আমি ফুলগুলো ও'র টেবিলে সাজাচ্ছি দেখে বলে উঠলেন: না, না, ও ফুল তুমি নিয়ে যাও। আমি কিছুতেই ওদিকে তাকাতে পারব না। যতবার দেখব, আমার তত বেশী কষ্ট হবে। হায় রে! এও কপালে ছিল? রানীর কাছে ফুল আসে আর সেই ফুল আমার টেবিলে সাজাতে হয়?

এতক্ষণ খুব ঠাট্টা তামাশা চলছিল; কারণ, কোথা থেকে ফুল এল, কিছু বুঝতে পারছিলাম না। তারপর প্রফেসর স্টেন কোনো এলে তাঁকে দিয়ে নামটা পড়িয়ে নিয়ে বোঝা গেল যে, সেই বিশপের স্ত্রী পাঠিয়েছেন। তাইতে সব ঠাট্টার অবসান। বৃদ্ধা মহিলার হয়ত আমার মত কেউ ছিল। তাইতে আমাকে দেখেই ও'র এত ভাল লেগে গেছে। যাবার আগে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে যাবার ইচ্ছে আছে।

এখানে আসবার পরদিনই রাজা কবিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন দেখা করবার জন্য। তার পরের দিন এখানকার য়ুনিভার্সিটির হলে কবির বক্তৃতা হল, রাজাও শুনতে এসেছিলেন। বক্তৃতা, সভায় কবি উপস্থিত হওয়া মাত্র রাজা সুদ্ধ সমস্ত ঘর-ভরা লোক একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল এবং তারপরে রাজা এগিয়ে এসে হ্যাণ্ডশেক করে কবিকে বসালেন। বক্তৃতার আরম্ভে প্রফেসর স্টেন কোনো যখন শ্রোতাদের কাছে কবির পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন, তখন হঠাৎ দেখি, একে একে আমাদেরও নাম হচ্ছে। আমরা তো অবাক! এমন অপ্রস্তুত বোধ হচ্ছিল, কী বলব! সব লোক যখন একসঙ্গে আমাদের দিকে ফিরে তাকাতে আরম্ভ করল, ঠিক মনে হল যেন এক একটি সঙ্ বসে আছি।

বক্তৃতার পরে একটা পিছনের ঘরে কবির সঙ্গে রাজা কথা বলছিলেন। আমরা সে ঘরে যেতেই নিজে থেকে এগিয়ে এসে আমাদের সকলের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, য়ুরোপ কী রকম লাগছে, আগে আর কখনো এসেছি কি না ইত্যাদি। তারপরে বললেন: খুব কমই ভারতীয় মেয়ে নরওয়েতে আসে। তোমাকে দেখে ভারী খুশী হলাম। প্রফেসর কোনোর কাছে আগেই তোমাদের কথা শুনেছিলাম।

স্টেন কোনোর বাড়িতে বাঁ দিক থেকে: লর্ড সিংহ, অধ্যাপক মহলানবিশ, লেখিকা, প্রোঃ স্টেন কোনো, মিসেস কোনো, মিঃ লাল ও রবীন্দ্রনাথ

অত্যন্ত সাদাসিধে অমায়িক ব্যবহার। কোনোরকম আড়ম্বর বা কিছু নেই। সকলের কাছেই শুনলাম, ওঁর প্রজারা ওঁকে ভারী ভালবাসে। ওঁকে দেখে বুঝতে পারলাম, তার কারণটা কী?

আমরা তেসরা সেপ্টেম্বর এখান থেকে স্টকহোম যাচ্ছি; তারপরে জার্মানী। বেশী সময় নেই বলে আর সুইডেনে থাকা হবে না। জার্মানীর সব বড় বড় শহরে কবির বক্তৃতার নেমন্তন্ন; কাজেই বোধ হয় মাস খানেক লাগবে। জার্মানীর পরে হয়তো ভিয়েনা যেতে হবে। এবারে আবার ভিয়েনা গেলে বুডাপেস্ট দেখে আসব। উড়ো-জাহাজে গেলে ভিয়েনা থেকে দু ঘণ্টা মাত্র লাগে। গতবারেই যাবার কথা ছিল; কিন্তু আবার ফিরে যাব বলে সে যাত্রা স্থগিত রাখা হল।

এখানে পরশুদিন জন বয়ের কবির সঙ্গে দেখা করতে আসবেন বলে টেলিগ্রাম করেছেন। তিনি শহরে ছিলেন না। যেখানে আছেন সেখান থেকে আসতে দু দিন সময় লাগে। বয়েরকে দেখব বলে খুব খুশী লাগছে। এইসব বড় বড় গুণী লোক, যাঁদের বই পড়েছি, কাগজেই নাম দেখেছি, যাঁদের নিজের চোখে দেখতে পাব স্বপ্নেও ভাবিনি, তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছে, এ সৌভাগ্য যেন বিশ্বাস করাও শক্ত।

ডায়ারী লিখতে খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু কিছুতেই সময় করে উঠতে পারি না। যেটুকু সময় পাই, আপনাদের চিঠি লিখি। সারা সপ্তাহ ধরে একটু একটু করে লিখতে লিখতে তবে ডাক যাবার দিন চিঠি শেষ করতে পারি। একটা ডাক বাদ পড়লেই তো আবার এক সপ্তাহ বসে থাকতে হবে। আপনি বলেছেন, এত বড় চিঠি নিশ্চয়ই কষ্ট করে লিখি। তা কিন্তু ঠিক নয়। অনেক সময় মনে করি ছোট্ট একটুখানি লিখেই শেষ করব। কিন্তু লিখতে বসে ইচ্ছে করে সব খুঁটিয়ে গল্প বলি। কারণ, জানি আপনারা আমার কাছে গল্প শুনতে ভাল-বাসেন। কাজেই শেষ পর্যন্ত ছোট্ট চিঠি আর হয় না।

এখানে খুব শীত। সারাক্ষণই ঘরে চিমনিতে আগুন জ্বলছে। তবু এটাই এদের গ্রীষ্মকাল। চারদিকে দেখি, সব পাতলা সিল্ক পরে বেড়াচ্ছে। আর কিছু দিন আগে এলে আমরা দুপুর রাত্রে 'মিডনাইট সান' দেখতে পেতাম। এখন সে সময় পেরিয়ে গেছে। তবু রাত বারোটার সময়ও আমাদের দেশের গোধুলিলগ্নের চেয়েও বেশী উজ্জ্বল আলো আকাশে। এ যেন রূপকথার দেশ।

আমরা ভাল আছি। কবি একটু ক্লান্ত, তা ছাড়া ভালই আছেন। এখানে বক্তৃতা ছাড়াও আর একদিন নিজের কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলেন। দেড় হাজার লোক সেদিন উপস্থিত। এখানকার লোকেরা ওঁকে নিয়ে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছে।

রোজই এত এনগেজমেণ্ট রক্ষা করতে হচ্ছে যে, তাইতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আশা করি একটু বিশ্রাম করতে পারলেই আবার তাজা হয়ে উঠবেন। আপনার চিঠি এসেছে শুনে কবি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কেমন আছেন। তাঁর কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে বললেন।

প্রফেসর স্টেন কোনোরাও আপনাদের সম্ভাষণ জানাতে বললেন। আরো বললেন, লিখে দিও, তাঁদের একটুও ভুলে যাই নি, অনেক সময়েই স্মরণ করি। ইতি—

স্নেহের বউমা

পুঃ—গৃহকর্ত্রী তাঁর বাগানে নিজে আমার আর কবির ছবি তুলেছিলেন। আপনাকে পাঠালাম। উনি তখন বাড়ি ছিলেন না, তাই বাদ পড়ে গিয়েছেন।

(ক্রমশ)

মেলবোর্নের চিঠি

ইতিহাস সম্ভবত সব দেশেই আদিবাসীদের শত্রু। প্রাগৈতিহাসিক যুগের বাসিন্দাদের নাম, ভাষা সংস্কৃতি মুছে দিয়ে এবং তাদের ঘাড়ে দাসত্ব চাপিয়ে আগন্তুক প্রবল নিজেদের মহাসমৃদ্ধিশালী সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। অনেক পণ্ডিতের মতে, [illegible] প্রথম অধিবাসীরা ছিল নিগ্রো নরগোষ্ঠীর লোক; এখন তাদের শেষ চিহ্ন [illegible] দক্ষিণ ভারত এবং আন্দামানের [illegible] উত্তর-পূর্বে অস্ট্রেলিয়ান [illegible] ইয়োরোপীয় ঔপনিবেশিকদের হাতে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের চরম [illegible] আমরা জানি। [illegible] ঔপনিবেশিকরাই ইতিহাসের [illegible] আদিবাসীদের যথার্থ [illegible] হয় নি।

[illegible] এই [illegible] প্রায় তিন লক্ষ [illegible] পরের [illegible] ছিল অন্য [illegible] সভ্যতার [illegible] সংস্পর্শে আসার ফলে [illegible] মধ্যে টাসমানিয়ার [illegible] লোপ পায়। অস্ট্রেলিয়ায় এদের সংখ্যা কমতে কমতে ১৯০০ সালে এসে দাঁড়ায় সত্তর হাজারে। বর্তমান [illegible] এদের রক্ষা করার জন্য কিছু কিছু [illegible] হয়েছে, এবং তার ফলে এদের সংখ্যা এখন [illegible] লক্ষের কিছু বেশী। [illegible] মধ্যে প্রায় অর্ধেক অবিমিশ্র (full blood), বাকী ষাট-পঁয়ষট্টি হাজার [illegible] বর্ণসংকর (half castes) অর্থাৎ [illegible] এদেশের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে [illegible] এদেশের মত আদিবাসী।

পণ্ডিতদের মতে, [illegible] থেকে আঠারো হাজার বছর আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে এই আদিবাসীরা অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে প্রবেশ করে। মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতের অনেকগুলি আদিম কোম, সিংহলের ভেড্ডা এবং মালয় উপদ্বীপের সাকাইদের সঙ্গে এদের আকৃতিগত মিল স্পষ্ট; কোনো কোনো নৃতাত্ত্বিক সে কারণে এই সব কোমকে অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। (টাসম্যানিয়ার আদিবাসীরা কিন্তু নিগ্রোবটুদের স্বজন এবং ফলে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের থেকে ভিন্ন।) সম্ভবত বিভিন্ন সময়ে এরা ছোট ছোট দলে আদিম ভেলা কিংবা কোনমতে চড়ে ধাপে ধাপে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ পেরিয়ে অস্ট্রেলিয়ার উত্তর উপকূলে পৌঁছয়, এবং ক্রমে এই মহাদেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে যায়। মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের মত এদের সঙ্গে নবাগত একটি প্রাণীও এদেশে পৌঁছেছিল—সে হল অস্ট্রেলিয়ার বুনো কুকুর ডিঙ্গো (dingo)।

কিন্তু এ দেশের ভূপ্রকৃতিতে আর যাই থাক মানুষের প্রতি দাক্ষিণ্যের চিহ্নও ছিল না। অস্ট্রেলিয়ার বেশীর ভাগ জায়গা মরুভূমি, অথবা ধূধূ প্রান্তর; মাত্র এক-চতুর্থাংশে চাষবাস করার মত জল পাওয়া যায় এবং সেখানেও বৃষ্টি অনিশ্চিত। এ

কাঠের চালের ওপরে দুজন আদিবাসী ছবি আঁকছেন

দেশের ত্রিরিশ লক্ষ বর্গমাইল ভূখণ্ডের মধ্যে তের লক্ষ বর্গমাইলে শুধু কাঁটাঝোপ আর গুল্ম ছাড়া কিছুই গজায় না। একমাত্র পূব-দক্ষিণের সমুদ্রতীর ধরে কিছুটা অঞ্চল চাষবাসের উপযোগী; কিন্তু সেখানেও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং প্রয়োগবিদ্যার সাহায্য না পেলে কৃষিসভ্যতা গড়ে তোলা কঠিন হত। মোদ্দা, আদিবাসীরা উত্তর এবং মধ্য অস্ট্রেলিয়ার যে অঞ্চলে আশ্রয় পেয়েছিল সেখানে বিকাশের কোনো স্বাভাবিক সুযোগ তারা পায় নি এবং ফলে ইয়োরোপীয়রা এদেশে আসার আগে পর্যন্ত হাজার হাজার বছর ধরে তাদের আদিম জীবনযাত্রায় বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

খাদ্যের জন্য এরা নির্ভর করত শিকার এবং প্রকৃতিজ ফলমূলের ওপরে। এদের প্রধান অস্ত্র ছিল ঘসে মেজে নেওয়া পাথরের টুকরো; পরে এরা কাঠ এবং জন্তু-জানোয়ারের হাড় ব্যবহার করতে শেখে। এদিক থেকে এদের প্রধান এবং অতুলনীয় আবিষ্কার হচ্ছে বুমেরাং। চাষ কিংবা পশু-পালন এরা জানত না, কিন্তু এই রুক্ষ দেশে কোথায় এতটুকু জল লুকিয়ে আছে তা

খুঁজে বার করায় এরা আশ্চর্য দক্ষতা অর্জন করেছিল। ক্যাঙ্গারু, গোসাপ, মাছ ইত্যাদি শিকার করে কাছিমের ডিম, ঝোপের গোড় থেকে সুস্বাদু পোকা, বনের ফল, মধু, ঘাসের বীজ এবং নানাজাতীয় কন্দ সংগ্রহ করে এরা খিদে মেটাতো। জল এবং খাবারের অভাব ঘটলে এরা বাসস্থান বদলাতো, কিন্তু তা বলে পুরোপুরি যাযাবর ছিল না। মাটি গাছের বাকল এবং ডালপালা দিয়ে এরা ঘর বানাতো, এবং সেই ঘরের ওপরে এদের টান ছিল।

যদিও প্রায় আঠারো হাজার বছরের প্রাগৈতিহাসিক জীবনে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা প্রস্তরযুগকে অতিক্রম করতে পারে নি, তবু এদের সমাজ-সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধতর কল্পনার বহু চিহ্ন চোখে পড়ে। অবশ্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কোমের জীবনযাত্রায় অনেক পার্থক্য আছে, তবু সাধারণভাবে এদের আচার-আচরণ, ধর্মবিশ্বাস এবং শিল্পকর্মে যে সূক্ষ্ম বোধের পরিচয় পাওয়া যায় তা বিস্ময়কর। আধুনিক সভ্যতার চাপ এবং মিশনারীদের প্রবল প্রচার সত্ত্বেও এদের সংস্কৃতি এখনো পর্যন্ত পুরোপুরি লোপ পায় নি, এবং গত তিরিশ-চল্লিশ বছরে নৃতাত্ত্বিকদের সতর্ক অনুসন্ধানের ফলে সে সম্পর্কে কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

আদিবাসীদের পুরাণ কাহিনীতে তাদের উৎপত্তির কালকে বলা হয় স্বপ্নযুগ (altjira বা bugari অর্থাৎ dream

উবার উৎসব। দু'জন পুরুষ পায়রা সেজেছে—এই পায়রাদের নাম জাউল। তাদের মাঝখানে কাঠের পবিত্র বাদ্যযন্ত্র উবার। লাল জমিতে হলদে, সাদা, কালো এবং কমলা রঙ

time)। এই যুগে নাকি তাদের আদিপুরুষরা দীর্ঘ দিনের ঘুম থেকে জেগে ওঠে, এবং প্রত্যেকে আপন আপন বাসস্থানের নিরাকার মাটিস্তরকে ভঙ্গ করে বিভিন্ন প্রাকৃতিক রূপের জন্ম দেয়। এদের ধর্মবিশ্বাস অনুসারে শুধু আদিবাসীরা নিজেরা নয়, প্রত্যেক জীবজন্তু, গাছপালা, নদী, পাহাড় এই আদিপুরুষদের সন্তান। আদিবাসীদের কাছে তাই প্রকৃতির সব কিছুই অর্থপূর্ণ; সামান্য পতঙ্গ থেকে প্রচণ্ড ঝড় এদের কল্পনায় আদিপুরুষদের ইঙ্গিত বহন করে।

জাগরণের পর এই আদিপুরুষেরা আপন আপন বাসস্থান ছেড়ে ঘুরতে বেরোয়। ঘোরার পথে কখনো তাদের পরস্পরের মধ্যে লড়াই বাধে, কখনো তারা পরস্পরের প্রেমে পড়ে, আর ভ্রমণ, যুদ্ধ এবং ভালবাসার ফাঁকে ফাঁকে তারা নদী, পর্বত, গাছ, প্রাণী রচনা করতে করতে যায়। তারপর একদিন তারা আবার ঘুমে ঢলে পড়ে, কিন্তু প্রকৃতিতে যে রূপবৈচিত্র্য এবং প্রাণশক্তি তারা সঞ্চার করেছিল তার ক্রিয়া নিঃশেষ হয় না। তাদের উপস্থিতির দ্বারা চিহ্নিত বস্তুরাজির মধ্যে এই আদিপুরুষদের যাদুকাঠি প্রচ্ছন্ন থাকে—পরম্পরানির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই শক্তিকে প্রয়োজনমত জাগিয়ে তোলা যায়। এদের ধর্মের সঙ্গে ম্যাজিক তাই অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

প্রকৃতির যেসব বস্তু, ঘটনা অথবা অবস্থা এই আদিপুরুষদের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত তারা আদিবাসীদের কাছে পূজনীয়। নৃতাত্ত্বিকেরা এদের নাম দিয়েছেন টোটেম। আদিবাসী ধর্মের প্রধান পূজাবস্তুর সাধারণ নাম চুরিঙ্গা (Tjuringa)। আদিপুরুষদের এই প্রতীকগুলি কাঠ অথবা পাথরে তৈরী, সাধারণত এদের আকার গোল অথবা লম্বা ডিমের মত, দৈর্ঘ্য কয়েক ইঞ্চি থেকে তিন-চার ফুট পর্যন্ত। এদের গায়ে আদিপুরুষের পরিচয়সূচক নানা প্রতীকী জ্যামিতিক ডিজাইন খোদাই করা থাকে।

আদিবাসীদের সমাজজীবন এবং সংস্কৃতি এই টোটেমদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে আলাদা কোনো পুরোহিত

মৃতপুরুষের অস্থি রাখার জন্য ফাঁপা কাঠের খোলের ওপরে আঁকা বিভিন্ন টোটেমের ছবি। শিকারী আদিপুরুষের সঙ্গী ওয়ালাবি, এমু, সাপ, পোসাম ইত্যাদি। লাল পটভূমিতে কালো, হলদে, সাদা এবং গোলাপী রঙ

সম্প্রদায় নেই। আদিপুরুষদের কাহিনী, তাদের জাগাবার এবং প্রসন্ন করবার ক্রিয়া-পদ্ধতি, প্রতি কোমের নিজস্ব রীতিনীতি, অর্থাৎ এদের সমাজ-সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক হচ্ছেন প্রতিটি কোমের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা। যেহেতু এদের কোনো অক্ষরনির্ভর ভাষা বা লিখিত সাহিত্য নেই, সমস্ত পুরাণ-কাহিনী, ধ্যানধারণা, আচার-অনুষ্ঠান পরম্পরাক্রমে জ্যেষ্ঠরা কনিষ্ঠদের শিখিয়ে দিয়ে যান। ধর্মের যেসব গুহ্য দিক তা মেয়েদের শেখানো হয় না। সাধারণত আট বছর বয়সে ছেলেদের প্রথম কোমধর্মে দীক্ষা দেওয়া হয়। বারো বছর বয়সে প্রধান অনুষ্ঠান, এবং তারপরও প্রায় আরো ছয়-সাতটি ধর্মানুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে যাওয়ার পর যুবক আদিবাসী তার কোমের পূর্ণ সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

ফলত আদিবাসীদের জীবন রীতিবোধ দ্বারা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত। এতে একদিকে যেমন তাদের সমাজ অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, অন্য দিকে তেমনি সেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং উদ্ভাবনার সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। বহু কাল আগেই প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে তারা এমন একটি সুসমঞ্জস সম্পর্ক গড়ে তোলে যে, পরবর্তী কালে প্রকৃতির কোনো কিছু নিয়েই নতুন কিছু চিন্তা অথবা কল্পনা করার সামর্থ্য তাদের লোপ পায়। অপর পক্ষে, সমস্ত ক্ষমতা বয়োজ্যেষ্ঠদের হাতে থাকার ফলে তরুণ-মনের সৃজনধর্মী বৃত্তিগুলি শীর্ণ হয়ে আসে। আধুনিক কালে আদিবাসীদের মানস-দারিদ্র্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে নৃতাত্ত্বিক স্ট্রেলো সাহেব লিখছেন ঃ

"Tradition and the tyranny of the old men in religious and cultural sphere have effectually stifled all creative impulse; and no external stimulus ever reached central Australia which could have freed the natives from these insidious bonds. It is almost certain that native myths have ceased to be invented many years ago.... The present day natives are on the whole merely the painstaking, uninspired preservers of a great and interesting inheritance.... They are in many ways, not so much a primitive, as a decadent race." (T. G. H. Strehlow, Aranda Traditions).

আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের যে দিকটা সবচাইতে সমৃদ্ধিশালী সেটি হল এদের চিত্রশিল্প। এদের মধ্যে চিত্রকর বলে আলাদা কোনো শ্রেণী ছিল না, সকলেই আঁকত; তবে যাদের আঁকার হাত ভালো, কোমের মধ্যে তারা বেশী খাতির পেত। কারণ, অক্ষরনির্ভর ভাষার অভাবে ছবির মাধ্যমেই এরা নিজেদের ইতিহাসকে রক্ষা করে এসেছে; তা ছাড়া চিত্রকর্মের সঙ্গে এদের সমস্ত যাদুক্রিয়া এবং ধর্মানুষ্ঠানের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। ঐহিক বিষয় নিয়ে অথবা অলঙ্করণের উদ্দেশ্যে এরা যে ছবি আঁকে নি তা নয়, তবু মুখ্যত ধর্মবিশ্বাস ছিল এদের শিল্পকর্মের প্রধান প্রেরণা। বিভিন্ন প্রতীকের সাহায্যে এরা এদের আদিপুরুষদের কীর্তিকাহিনী আঁকত,

এবং এই সব ছবির মাধ্যমে সেই আদিপুরুষদের ভজনা করত। অর্থাৎ এদের কাছে দেবতা আর মানুষের মধ্যে এই সব ছবি হচ্ছে একটি প্রধান যোগসূত্র। অঙ্কিত রূপেরা তো প্রতীক মাত্র নয়, তাদের মধ্যে আদিপুরুষদের শক্তিও নিহিত।

ম্যাজিক এবং ধর্মের সঙ্গে নিগূঢ় যোগের ফলে চিত্রাঙ্কনের রীতিপ্রকরণও ঐতিহ্যের দ্বারা নির্দিষ্ট হয় এবং ব্যক্তিগত উদ্ভাবনার সুযোগ সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে। তা সত্ত্বেও যুগ, কোম, অঞ্চল, মাধ্যম এবং বিষয়ের পার্থক্যে আদিবাসী চিত্রকলায় প্রচুর বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। বহু ছবি পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা কিংবা গুহার দেওয়ালে আঁকা। সমতল জমিতে, কাঠে, পাথরের টুকরোয়, মানুষের দেহে এবং কঙ্কাল-করোটিতেও এরা এদের ধর্মবিশ্বাস এবং পুরাণ-কাহিনীকে রঙে রেখায় রূপ দিয়েছে। তবে আধুনিক কালে এরা প্রধানত বাকলের টুকরোর ওপরে ছবি (bark painting) আঁকে। প্রথমে গাছ বাছাই করে বিশেষ পদ্ধতিতে তা থেকে ছাল ছাড়িয়ে নেয়; তারপর বালির নীচে রেখে ভারী কাঠ দিয়ে ঘসে তাকে চেটাল করে। ফুল অথবা লতার রসের সঙ্গে লাল, হলদে অথবা গেরুয়া মাটি কিংবা পোড়া কাঠের গুঁড়ো মিশিয়ে সেই বাকলের ওপরে প্রলেপ দিয়ে মসৃণ পটভূমি তৈরী হয়। তারপর সেই পটভূমির ওপরে তারা ছবি আঁকে—নানা মাপের থেঁতলানো ডালের ডগা এবং পাখির পালক দিয়ে তুলি বানায়।

যদিও অধিকাংশ ছবির বিষয়বস্তু হচ্ছে আদিপুরুষদের কাহিনী, তবু এদের আঁকার বিভিন্ন রীতি আছে। অনেক ছবিতে প্রাকৃতিক রূপের সাদৃশ্য রচনার চেষ্টা স্পষ্ট; আবার অনেক ছবি সম্পূর্ণভাবেই অ্যাব্‌স্‌ট্র্যাক্‌ট্‌। পশ্চিম আর্নহেম অঞ্চলে এক্‌স্‌-রে আর্ট (X-ray art) নামে যে রীতির প্রাধান্য তাতে জীবজন্তুর দেহের অভ্যন্তরকেও দেখানো হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে বাকলে শুধু একটি কি দুটি প্রধান মূর্তি থাকে, পটভূমিতে কিছু আঁকা হয় না। অন্যত্র বাকলে প্রায় কোনো ফাঁক না রেখে আগাগোড়া বিচিত্র মূর্তি এবং ডিজাইন দিয়ে ভরা হয়। কোথাও বা পরিলেখে সরল রেখা এবং কোণের প্রাধান্য, কোথাও বাঁকা রেখা এবং বৃত্তাকৃতির প্রাবল্য স্পষ্ট। তা ছাড়া যদিও এদের প্রধান রং চারটি, তাদের প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে নানা পার্থক্য দেখা যায়।

তবে মোটামুটি এই আদিবাসীদের চিত্রকর্মে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম বর্তমান। যেখানে সাদৃশ্য রচনার চেষ্টা আছে সেখানেও প্রতীকের প্রয়োগ অপরিহার্য এবং এই প্রতীকদের অর্থ বোঝার জন্য এদের ধর্ম এবং পুরাকাহিনীর সঙ্গে পরিচয় প্রয়োজন।

পুরুষ ক্যাঙারুর প্রতিকৃতি। প্রলেপ না দেওয়া বাকলের ওপরে ফিকে লাল, সাদা এবং কালো রঙে আঁকা। দেহের অভ্যন্তর দেখানো হয়েছে

অধিকাংশ ছবিতেই কোনো কাহিনী বলা হয়েছে এবং সেই কাহিনীর সঙ্গে চিত্রকরের কোমের বিশেষ যোগ আছে। ছবিগুলি ধর্মানুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান অঙ্গ এবং তাদের বিশিষ্ট রীতি ও পরিকল্পনা ঐতিহ্যের দ্বারা নিরূপিত। আমাদের মত বাইরের দর্শকের কাছে এই সব ছবির প্রধান আবেদন রূপগত হলেও এদের অনুভূতিতে

এই সব রূপ আদিপুরুষদের বাদুশক্তির দ্বারা অন্বিত।

আদিবাসীদের আঁকা বল্কলচিত্রের এখন এদেশে প্রচুর চাহিদা। এই কারণে আজকাল অনেক আদিবাসী ছবি এঁকে জীবিকা নির্বাহ করে। ফলে এই সব ছবির চরিত্র ক্রমশ বদলাতে শুরু করেছে। কিন্তু এ চিঠিতে শুধু আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি সম্বন্ধে কিছু লেখার চেষ্টা করেছি।* পশ্চিমাগত অস্ট্রেলিয়ানদের অধীন হওয়ার পর আধুনিক কালে এদের যে কী অবস্থা হয়েছে, এবং এদের ভবিষ্যৎ-ই বা কী, সে সম্পর্কে আগামী চিঠিতে আলোচনা করব।

শিবনারায়ণ রায়

---

* যাঁরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান তাঁদের জন্য কয়েকটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের নাম দিচ্ছি :

1. **Aboriginal Man in Australia**, edited by R. M. and C. H. Berndt.
2. **Australia's Aborigines** by F. D. McCarthy.
3. **The Australian Aborigines** by A. P. Elkin.
4. **Australian Aboriginal Art**, edited by R. M. Berndt.

বিশ্ব বিজ্ঞান

ধাতু ভাণ্ডারের নতুন সম্পদ টিটানিয়াম

টিটানিয়াম বলে যে ধাতুটির নাম এই মহাজগৎ বিজয়ের যুগে ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে, সেটি আবিষ্কৃত হয় আজ থেকে ১৫০ বছর আগে ইংলণ্ডের কর্নওয়াল জেলার সাগর-সৈকতে। ধাতুবিৎ ও রসায়নবিজ্ঞানীরা এই নতুন ধরনের ধাতুটি দেখে বিস্মিত হন। তাঁরা তখন বহু চেষ্টা করেও খনিজবিমিশ্র বা অসংস্কৃত ধাতু থেকে বিশুদ্ধ টিটানিয়াম আলাদা করতে পারেন নি। ষোল আনা খাঁটি টিটানিয়াম অসংস্কৃত ধাতু থেকে আলাদা করার চেষ্টা সফল হয় ১৯১০ সালে। কিন্তু তবুও এই বছর কুড়ি আগে পর্যন্ত ধাতুটি ছিল লেবরেটরীর গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ২০ বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় অসংস্কৃত ধাতুপিণ্ড থেকে খাঁটি টিটানিয়াম আলাদা করা, সেটিকে যন্ত্র নির্মাণের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা ইত্যাদি বহু ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকরা সাফল্য লাভ করেছেন, সার্থক হয়েছে তাঁদের টিটানিয়াম সংক্রান্ত নানা কারুকৌশলীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা, যার ফলে ধাতুটি আজ গ্রহণযোগ্য হয়েছে শিল্পজগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

অত্যুচ্চ বেগসম্পন্ন বিমান, রকেট ও আরোহিবাহী মহাকাশযান নির্মাণে আজকাল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে টিটানিয়াম। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে মহাসাগরের বহু গভীরে যেসব ডুবোজাহাজের যাতায়াত সেগুলিতেও এবং সমুদ্রের লবণাক্ত জল নির্লবণ করার যন্ত্রেও এই ধাতুটি ব্যবহার করা যাবে। তার মানে ধাতুশিল্পের এই সমস্যাকীর্ণ চরিত্রের শিশুটি এবার নওজোয়ান হয়ে উঠছে।

আমেরিকার বিমান নির্মাণের উপকরণ হিসাবে প্রথম টিটানিয়াম ব্যবহার হয় ১৯৫০ সালে। তখন থেকেই শুরু হয়ে যায় মার্কিন বিমানশিল্পে টিটানিয়াম সংগ্রহের জন্য বহু লোকের হুড়োহুড়ি—সোজা কথায় ইংরাজীতে যাকে বলা যেতে পারে "টিটানিয়াম রাশ"। ইঞ্জিনীয়াররা এই অভিনব ধাতু সম্পর্কে বহু আশা-নিরাশার মধ্য দিয়ে গিয়ে আজ যে সাফল্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তার ফলে আন্দাজ করে বলা যায় যে, প্রতি বছর এই ধাতুর চাহিদা শতকরা ১০।১৫ শতাংশ বেড়ে চলে ১৯৮০ সালে গিয়ে দাঁড়াবে ৭০ হাজার টনে। এখন টিটানিয়ামকে বলা হচ্ছে "মহাজাগতিক যুগধাতু"।

ধাতুশিল্পবিৎ, ইঞ্জিনীয়ার ও শিল্পের ডিজাইনারদের কাছে আমাদের এই মহাজগৎ বিজয়ের যুগের এক অন্যতম ধাতু হিসাবে এত কদর কেন? প্রথম, ধাতুটি ওজনে হাল্কা। এর ওজন অ্যালুমিনিয়াম ও নিষ্কলঙ্ক ইস্পাতের ওজনের মাঝামাঝি। টিটানিয়াম অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে ৬০ শতাংশ বেশী ভারী অথচ সংকর জাতীয় ইস্পাতের চেয়ে ৪৫ শতাংশ হাল্কা।

টিটানিয়াম সাধারণ ইস্পাতের মতই টেঁকসই এবং সেইজন্য নিষ্কলঙ্ক ইস্পাতের বিকল্পে নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ছাড়া প্রসার্যতার দিক থেকেও টিটানিয়াম খুবই উপযোগী। টিটানিয়ামের সঙ্গে অন্য ধাতু মিশিয়ে (অ্যালয়) যে মিশ্র ধাতু তৈরী হবে সেই ধাতু অ্যালুমিনিয়াম ও ইস্পাতের চেয়েও অনেক বেশীক্ষণ কাজ করলেও অবসন্ন হয়ে পড়ে না। অধিকাংশ অম্ল, লবণাক্ত জল ও অন্যান্য ক্ষয়কারী জিনিস টিটানিয়ামের গায়ে আঁচড় কাটতে বা ক্ষইয়ে দিতে পারে না।

খুব বেশী বা খুব কম তাপমাত্রা টিটানিয়ামের কাজের কোন ক্ষতি করতে পারে না। ১০০০ ডিগ্রী ফারেনহাইটেও তার কর্মক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে। সেইজন্য ধাতুটি মহাকাশযান নির্মাণে এত উপযোগী।

বৈমানিক ও মহাবৈমানিক ইঞ্জিনীয়াররা মনে করেন যে, টিটানিয়ামের সাহায্যে এমন সব বিমান নির্মাণ করা যাবে, যেগুলি বেগ, পাল্লা ও পরিচালনার দিকে আজকালকার বিমানগুলিকে অনেক পিছনে ফেলে যাবে। শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী বিমান, রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের এক উপযোগী উপাদান হচ্ছে টিটানিয়াম যা দিয়ে সেগুলির বহু যন্ত্রাংশ নির্মিত হয়।

অধুনা-ব্যবহৃত অধিকাংশ মার্কিন বাণিজ্যিক জেট-বিমান নির্মাণে ৭০০ থেকে ২৫০০ পাউণ্ড পর্যন্ত টিটানিয়াম ব্যবহার হচ্ছে। মার্কিন বিজ্ঞানী ও ইঞ্জি-

টিটানিয়ামের তৈরি এই 'ফ্যান স্টেজ' জেটচালিত ইঞ্জিনকে শতকরা ৩০ ভাগ শক্তি বাড়াতে সাহায্য করবে

এই বি-৫২ শ্রেণীর এক্স-১৫ মডেলটির নির্মাণে প্রচুর টিটানিয়াম ব্যবহার করা হয়েছে

নীয়ারদের ধারণায়, ভবিষ্যতে যেসব বিমানের বেগ দাঁড়াবে ঘণ্টায় ২০০০ মাইল (শব্দভেদী) সেগুলির প্রতিটির জন্য প্রয়োজন হবে ৯০ হাজার পাউন্ড টিটা-নিয়ামের। সুপারজেট-এ১১ মডেলের বিমানটি সেই জাতীয়, যার বেগ শব্দের ২।৩ গুণ অথচ টিটানিয়ামের দৌলতে তার ওজন অন্য ঐ ধরনের বিমানের চেয়ে লক্ষ পাউন্ড কম। রকেট ও মহাকাশযান নির্মাণেও এই নতুন ধাতুটির ব্যবহার খুবই ব্যাপক হয়ে উঠছে। আমেরিকার প্রথম যাত্রিবাহী মার্কারী শ্রেণী মহাকাশযান-গুলি। টিটানিয়াম ব্যবহারের ফলে এইসব বিমানপোত ও মহাবিমানপোত নির্মাণে বছরে ৯ লক্ষ ডলারের মত খরচ কমে যাবে। জেমিনী মহাকাশযানেও টিটা-নিয়াম ব্যবহার করা হয়েছে এবং অ্যাপোলোতেও।

নোনা জল ও নোনা হাওয়া টিটা-নিয়ামকে ক্ষয় করতে পারে না বলে মার্কিন নৌবহরের বিজ্ঞানী ও ইঞ্জি-নীয়াররা সমুদ্রগামী জাহাজ ও ডুবো-জাহাজ নির্মাণের উপাদান হিসাবে ধাতুটি ব্যবহার করা যায় কিনা তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। বছরের পর বছর নোনা জলে ফেলে রেখে দেখা গিয়েছে ধাতুটির কোনই ক্ষতি হয় নি। ধাতুবিৎরা বলছেন যে, লোহার মত টিটানিয়ামে মরচে ধরে না এবং কোন উদ্বায়ী অম্ল তার ক্ষয় করতে পারে না।

এসব ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও টিটানিয়াম বহু কাজে ব্যবহার হচ্ছে। রাসায়নিক, ইলেকট্রোপ্লেটিং, শল্য-চিকিৎসার সাজসরঞ্জাম, কাপড়ের প্রভৃতি বহু জিনিসের নির্মাণশিল্পে টিটানিয়ামের চাহিদা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ডায়ক্সাইডের আকারে টিটানিয়াম ব্যবহার হচ্ছে রঞ্জন-শিল্পে, প্ল্যাস্টিকস ও কাগজশিল্পে, রবারের জিনিসে, বিভিন্ন ধরনের বস্ত্রশিল্পে ইত্যাদি। টিটানিয়াম টেট্রাক্লোরাইড ব্যবহার হয় আকাশের উপর লেখায় এবং ধূম্রজাল সৃষ্টিতে। কেলাসিত টিটানিয়াম হীরার মত অত কঠিন না হলেও হীরার চেয়েও বেশী ঝকঝকে।

এটা অবশ্য কেউ মনে করেন না যে, টিটানিয়াম এসে শিল্পক্ষেত্র থেকে লোহা ও ইস্পাতকে হটিয়ে দেবে। কিন্তু যেসব শিল্পে হাল্কা ওজন, মজবুতত্ব ও ক্ষয়-প্রতিরোধী গুণের প্রয়োজন সেগুলিতে টিটানিয়ামের ব্যবহার হবে বেশী চাদর, ফলক প্রভৃতি নানান আকার গড়োপিটে নিয়ে।

সাধারণ অবস্থায় অবশ্য টিটানিয়ামকে অন্য ধাতুর সঙ্গে সংযোজিত (ওয়েল্ড) করা যায় না, কিন্তু দস্তার মত ঝালাই করে বা অতিশব্দ, লেসার রশ্মি বা ইলেকট্রন রশ্মির সাহায্যে টিটানিয়ামকে অন্য ধাতুর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়।

এখন বৈজ্ঞানিকরা মাথা ঘামাচ্ছেন, কি করে গুণাগুণের কোন ক্ষতি না করে কম খরচায় টিটানিয়াম নিকাশ করা যায়। তাঁরা আরো বেশী করে জানতে চান প্রসার্য, ওয়েল্ড করা ও অ্যাজয় টিটানিয়ামের যান্ত্রিক গুণাগুণ এবং টান সহ্য করার ক্ষমতা সম্পর্কে। এইসব ব্যাপার নিয়ে এখনো বহু গবেষণা ও পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হবে। নিকেল ও ক্রোমিয়াম মিশিয়ে যেসব মিশ্র ধাতু তৈরী হয়, তার বিকল্পে টিটানিয়াম ব্যবহার করা সম্ভব এবং নিকেল ও ক্রোমিয়ামের পৃথিবীতে প্রাচুর্য নেই। সেইজন্য টিটানিয়াম উৎপাদনের পড়তা খরচা কমানোর জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হচ্ছে।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

একুশ

কলকাতার হালচাল সম্বন্ধে যাঁরা ওয়াকিবহাল, স্বদেশী বিদেশী যিনিই হোন না কেন, তিনি জানেন এ শহরের বিশেষণ হল 'মিছিল নগরী'। স্লোগান দিয়ে বলা চলে কলকাতার আর এক নাম, প্রোসেশান প্রোসেশান। বলা নেই কওয়া নেই, শহরের যেখান থেকে খুশি অলিগলি থেকে কেঁচোর মত মিছিল বেরিয়ে পড়ে। মনুমেণ্ট পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে ক্রমশ দেহ স্থূল হতে থাকে, শেষ পর্যন্ত কেঁচো পরিণত হয় অজগরে।

অজগর মিছিলের ভয়ে বিদেশী পর্যটকরা আজ শঙ্কিত। গামফুলো গোবিন্দর মাকে যেমন চালতাতলায় যেতে বারণ করা হয়েছিল, কারণ 'চালতাতলায় গরুর ঠ্যাঙ কলকে নাচে ড্যাডাং ড্যাং।' তেমনি বিদেশের পত্রিকা পর্যটকদের নিয়ত সাবধান করে দিচ্ছে, খবরদার ভাই, কলকাতায় যেও না। কারণ, 'বিস্ফোরক কলকাতা' যেদিন খুশি ফাটলেই হল। 'সাম্প্রদায়িক কলকাতা' মানুষের রক্ত নিয়ে এরা নাকি হোলি খেলে। 'বস্তির শহর কলকাতা', দারিদ্র্য রোগ মহামারী, তার ওপর মিছিল নগরী কলকাতা, এ যেন গোদের ওপর বিষফোঁড়া।

তবে যারা কলকাতার লোক তারা রাতে মশা দিনে মাছির সঙ্গে মিছিলকেও মেনে নিয়েছে। এসব ব্যাপারে আর তাদের আগ্রহ নেই, উৎসাহ কোন দিনই ছিল না; মাঝে মাঝে কৌতূহল জাগত, এখন তাও নিবে গেছে। কলকাতাবাসীর কাছে আতঙ্ক হল এই শহরের সাংস্কৃতিক রূপ।

সংস্কৃতির নামে আজকাল এক ধরনের হুল্লোড় শুরু হয়েছে এই আজব শহরে। যাঁকে নিয়ে সবচেয়ে বেশী লেবু চটকান হয়েছে তিনি বেচারী রবীন্দ্রনাথ। ভদ্রলোক বেঁচে থাকলে নির্ঘাত পুলিস ডেকে এই রবীন্দ্র জয়ন্তী ওয়ালাদের নির্বাসনে পাঠাতেন। বৃষ্টির ভয়ে একটা প্যাণ্ডেল, মাইক, কিছু ফুলের মালা, কবিগুরুর একখানা ছবি জোটাতে পারলেই হল। কোনরকম একখানা সভা ডাকতে পারলেই সভাপতি পাওয়া যাবে, এর জন্য সাধারণত লেখকদের ডাকা হয় যাঁদের এখন লেখবারও কিছু নেই, বলবারও কিছু নেই। তবু মালা পাবার লোভে তাঁরা সভাপতি হন। ইনিয়ে বিনিয়ে বক্তৃতা দিয়ে প্রমাণ করেন রবীন্দ্রনাথ একজন কবি ছিলেন। বলবার জন্যে তাঁরা তৈরী হয়ে আসেন না, কারণ জানেন শ্রোতারা সভাপতির ভাষণ শোনে না। তারা অপেক্ষা করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্যে। প্রথমেই কয়েকজন কণ্ঠ শিল্পীর গান। গানের মানে না বুঝেই নিজের পছন্দ মত যে কোন একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে দেয়, এমন কি উদ্বোধন সঙ্গীতও শোনা যায়, 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না, বেলা হল মরি লাজে।' নামকরা অনুষ্ঠান হলে নাম করা গায়কদের সারি। তারা বেসুরো গাইলেও বলবার কিছু নেই। আর ছোটখাট জায়গা হলে পাড়ার উঠতি গায়ক গায়িকাদের রবীন্দ্র সঙ্গীতের নামে আর্তনাদ। তাও নীরবে সহ্য করতে হবে।

গানের পর নাটক। কবিগুরুর মৃত্যুর পর থেকে এই দীর্ঘ দিন নাটক অভিনয়ের পর আর এখন নাটক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। উপন্যাস, ছোট গল্পের দফারফা করা হয়ে গেছে। কবিতা, চিঠিপত্র, কিছুই ছাড়া পায়নি তারই ওপর নাটক কিংবা নৃত্যনাট্য। একদিনের রবীন্দ্র জয়ন্তীর পালা শেষ হয়ে গেছে, কমপক্ষে তিন দিন অনুষ্ঠান না চালালে প্যাণ্ডেলের খরচা ওঠে না। যত বড় প্যাণ্ডেল, তত দীর্ঘ দিনের অনুষ্ঠান। কোথাও সপ্তাহব্যাপী, কোথাও পক্ষকাল।

যখন বোঝা গেল ঠিক গুছিয়ে করতে পারলে এ ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বেশ দু' পয়সা রোজগার হয় তখন উদ্যোক্তারা রবীন্দ্র নামটি বিবৃত করলেন। শুধু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বললেই যথেষ্ট, সাড়ে বত্রিশ ভাজা পরিবেশন করার চমৎকার আসর। সংস্কৃতির নামে কিনা চলে! যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান, সিনেমা, নাচ, আবৃত্তি যা হোক একটা কিছু স্টেজে তুলে দিলেই হল। হাজার হাজার সভ্য দর্শক দর্শনী দিয়ে এই সাংস্কৃতিক পাগলামি দেখছে। সংস্কৃতির নামে সবাইকে ধাপ্পা দেওয়া যায়। সরকার কর ধার্য করতে পারে না, কারণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—সে যে লজ্জাবতী লতা। যারা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে তারা দক্ষিণা চাইতে ভয় পায়, তাতে যদি তাদের অসাংস্কৃতিক আচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। তাদের প্রাপ্তি ট্যাক্সি ভাড়া আর এক প্লেট জলখাবার। প্যাণ্ডেলওয়ালা জানে এসব অনুষ্ঠানে বিলের টাকা পাওয়া যায় না; তবু প্রাণের ভয়ে মাচা বেঁধে দিতে হয়, আর মনে সান্ত্বনা এত লোকের কাছে ওদের কোম্পানীর পাবলিসিটি হচ্ছে। উদ্যোক্তারা শুধু ফাঁকি দিতে পারে না নাটুকে দলগুলোকে। তারাও সেয়ানা, তাই সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হয়। সংস্কৃতির নামে এই প্রগতিবাদী নাট্য গোষ্ঠীগুলিও তো কম ধাপ্পা দিয়ে বেড়ায় না! তাই উদ্যোক্তাদের ভাঁওতায় তারা ভোলে না, মুখে রঙ মেখেই পর্দা তোলার আগে প্রযোজনার খরচ বাবত টাকাটা হাতিয়ে নেয়। সে আর কতটুকু খরচ! উদ্যোক্তারা জানে তাদের সারা বছরের খরচা এই এক-একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উঠে যায়। তাই তাদের স্লোগান হল, 'বাংলার সংস্কৃতি জিন্দাবাদ।'

এই ধরনের এক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি পর্ব চলছিল মধ্য কলকাতার কোন এক পার্কে। অনাদিপ্রসাদ সামনের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ডাবের জল পান করতে করতে লক্ষ

করছিলেন ডেকরেটারদের লোকদের প্যাণ্ডেল বাঁধার কাজ। এমন সময় পেছন থেকে কে এসে পিঠে একটা চাপড় মারল, হেসে বলল, আরে মশাই, আজ আপনাকে ঠিক চিনতে পেরেছি। আপনি সেই লেখক, যিনি পর্নোগ্রাফি না লিখে সাহিত্যিক হবেন ভাবছেন। আপনি সেই ভ্যাবা গঙ্গারাম দি গ্রেট, যিনি রুটি শব্দের অর্থ না বুঝে পুলিসের হাতে ধরা পড়েছেন। কি, ঠিক চিনেছি কিনা?

অনাদিপ্রসাদও চিনতে পারলেন। এ সেই প্রেসিডেন্সী কলেজের সামনে দেখা লোকটি. আবার যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সরস্বতী পুজোর দিন বন্ধুদের পাড়ায়, ফটিকের বাবা যেদিন খুন হল। অনাদিপ্রসাদ অকপটে স্বীকার করেন, আপনার নামটা কিন্তু আমি ভুলে গেছি।

ভদ্রলোকের চটপটে উত্তর: তাতে কোন ক্ষতি হয় নি। আপনাকে তো বলেই ছিলাম নাম আমার প্রায়ই পাল্টে যায়। শেষবার যখন আপনার সঙ্গে দেখা হয় তখন আমার নাম ছিল অনন্দো।

—আর এখন?

—পুলকেশ।

—ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—সহজ ব্যাপার। যখন কোন কালচারাল ফাংশান-টাংশান করি তখন আমি পুলকেশ। নামের মধ্যে একটা কালচারের গন্ধ থাকা চাই তো, যেখানে মারামারি খুনোখুনি, সেখানে আমি ঝুনুদা দি গুণ্ডা সাপ্লায়ার, আবার যখন—

অনাদিপ্রসাদ থামিয়ে দেন, আর দরকার নেই, মাথা গোলমাল হয়ে যাবে। তা পুলকেশবাবু, এত বড় প্যাণ্ডেল হচ্ছে—

—আমার ক্লাবের ফাংশান, আমি সেক্রেটারী আর বাস্তুঘুঘু পেট্রন। প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট এনতার আছে। বছরে একবার এই ধরনের একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করি, তাইতেই ক্লাবের সারা বছরের খরচা চলে যায়, আমরাও পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকি। চলুন না আমাদের ক্লাব ঘরে গিয়ে বসবেন। একটু জমিয়ে গল্প করা যাবে।

—না থাক, দেরি হয়ে যাবে।

পুলকেশ ছাড়বার পাত্র নয়, কি এমন রাজকার্য পণ্ড হবে শুনি? ভাল চা খাওয়াব, সেই সঙ্গে পান, কড়া জর্দা।

—আমি খাই না।

—মাল টাল চলে?

—না। তা ছাড়া এই ঠিক দুপুরে বেলায়—

পুলকেশ হাসল, মালের আবার সময় কি মশাই! সকালেও মাল, দুপুরেও মাল, রাত্তিরেও মাল। আসুন আমার সঙ্গে।

অগত্যা অনাদিপ্রসাদকে যেতেই হয় পুলকেশের সঙ্গে। লোকটির বেশভূষারও কিন্তু নামের সঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে। ঢিলে পায়জামা, হলদে আর গেরুয়ার মাঝামাঝি রঙের বড়ুয়া-গলা পাঞ্জাবি। কাঁধে শান্তিনিকেতনী ঝোলা। সাবান মাখা উস্কোখুস্কো চুল, চোখে রোদ আটকাবার চশমা।

অনাদিপ্রসাদ না বলে পারেন না, এ সাজে আপনাকে বেশ দেখাচ্ছে।

—কেমন, দেখলেই ইন্টেলেকচুয়াল মনে হচ্ছে না? সাংস্কৃতিক কিছু করতে গেলে ডেকের দরকার—আমি এর নাম দিয়েছি কালচারাল কস্টিউম।

অনাদিপ্রসাদের মন্তব্য, আপনি বেশ চালু লোক।

পুলকেশের সহজ স্বীকৃতি, নইলে এই ক্লাব চালাব কি করে? বছরে একটা ফাংশান করি মশায়, বাংলা দেশের কোন আর্টিস্টকে বাদ দিই না। সে লাল নীল হলদে যে রঙেরই হোক না কেন। প্রগতিবাদী, প্রাচীনবাদী, শোধনবাদী সব মক্কেলকে এক মঞ্চে জড় করি। মাত্র এক জায়গায় ওদের আদর্শের মিল সেটা আমি ধরে ফেলেছি, এরা সকলেই সুবিধাবাদী।

—এ তো দার্শনিক তথ্য।

—সে যাই বলুন। আমাদের পেট্রন বাস্তুঘুঘু, অতএব টাকার স্বাচ্ছন্দ্য, আর রাজনৈতিক পার্টিরা আমার কব্জায়; কারণ, ওদের মিছিলে লোক সাপ্লাই করতে হয় তো।

এ প্রসঙ্গ শেষ হবার আগেই তারা ক্লাব ঘরে এসে পড়ল। হ্যারিসন রোড পেরিয়ে সরু গলির মধ্যে একখানা বাড়ি। সামনে দিয়ে ঢোকবার পথ নেই, ক্লাবঘরে ঢুকতে গেলে বাড়ির পেছনের দিকে যেতে হয়, তার জন্য নিজস্ব আরও সরু একটি গলিপথ আছে। ক্লাবঘরটি মাঝারি আকৃতির, শতরঞ্চি পাতা। এক পাশে কতকগুলো ছাপা কাগজপত্র বোধ হয় এই অনুষ্ঠান সংক্রান্ত। দুটি ছেলে উবু হয়ে বসে গুছিয়ে রাখছিল। পুলকেশকে দেখে তারা জানাল, প্রেস থেকে সব ছাপিয়ে এনেছি।

—ভাল করেছিস, বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছিল।

একজনকে অনাদিপ্রসাদ চিনতে পারলেন। সে লম্বু। তাই জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ প্রেস, অশোক জানায়?

লম্বু এতক্ষণে অনাদিপ্রসাদকে লক্ষ করে, আরে, আপনি এখানে?

পুলকেশের মন্তব্য, উনি সর্বঘটে কাঁঠালী কলা।

—অশোকের খবর ভাল? অনেকদিন দেখা হয়নি।

লম্বু জানায়, হ্যাঁ, দিব্যি আছে, পায়ের ওপর পা তুলে ব্যবসা করছে। তা হলে ঝুনুদা, আমরা চলি। পাঁচটা টাকা দিন, বড্ড খিদে পেয়েছে। কোথাও রুটি মাংস খেয়ে নেব।

পুলকেশ একটা নোট এগিয়ে দেয়, যা যোতিন, তুইও লম্বুর সঙ্গে খেয়ে আয়।

তারা দুজনে বেরিয়ে যায়।

অনাদিপ্রসাদ বিস্ময় প্রকাশ না করে পারেন না, যত দূর মনে পড়ছে লম্বু আর যোতিন দুই বিরুদ্ধ পার্টির লোক। তারা মিলে গেল কি করে?

পুলকেশ হইহই করে হাসে, আপনিও যেমন, এই ভাব এই ঝগড়া, সবই এদের অভিনয়। সকালে হয়তো দেখবেন এ ওকে ছুরি মারতে যাচ্ছে, আবার হয়তো সেই রাত্রেই দেখবেন ওই দুই মক্কেল বোতল গেলাস নিয়ে এক জায়গায় বসে গলায় গলায় ভাব। এরাই তো আমার ডান হাত, বাঁ হাত। মিছিল, দাঙ্গা, বারোয়ারি পুজো, মড়া পোড়ানো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যা কিছু বলুন ওরাই সামলায়। আমার বুদ্ধি, ওদের মেহনত।

কথায় আবার ছেদ পড়ল, একটি ছেলে ঢুকল ঘরে। হাতে খাতা বই, দেখলেই বোঝা যায় কলেজের ছাত্র। পুলকেশকে দেখে ম্লান হাসল, এই যে ঝুনুদা, এলাম।

পুলকেশের উদার আহ্বান, কিন্তু একলা কেন? তোমার বান্ধবীটি কোথায়?

ছেলেটির সলজ্জ উত্তর, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

—সে আবার কি কথা! ভেতরে ডেকে নিয়ে এস, আমি তো সব ব্যবস্থা করেই রেখেছি। পাশের ঐ ছোট ঘরে চলে যাও। নিরিবিলিতে পড়াশুনো কর।

ছেলেটি আর কথা বাড়াল না, বেরিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে এল, ফ্যাকাশে রোগা মেয়ে, কলেজেরই ছাত্রী। দুটো বিনুনি করা, মুখটা ঘেমেছে। হাতে লাল পাড় ছোট্ট রুমাল, বড় বেশী আত্মসচেতন। কারুর দিকে ভাল করে না তাকিয়ে ছেলেটির সঙ্গে দ্রুত পায়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

অনাদিপ্রসাদ এতক্ষণ নাটক দেখছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন, ওরা এখন পড়াশুনো করবে?

পুলকেশ একটা চোখ টিপল, বুঝতেই

তো পারছেন। তবে আর লজ্জা দিচ্ছেন কেন।

—তা নয়, তবে এখানে—

—আহা, বেচারীরা কোথায় যাবে বলুন তো? কলেজের ছাত্রছাত্রী এদের প্রেম করবার একটা জায়গা রেখেছেন? চারদিকে ভিড়, বেচারিরা যে দুটো মনের কথা বলবে তার উপায় নেই। তাই আমি ঐ পাশের ঘরের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

—আপনার উদারতার প্রশংসা না করে উপায় নেই।

পুলকেশ আরও পুলকিত হয়, এর ফলে এই ছেলে মেয়ে দুটি আমার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে। কারণ, এদের সিক্রেট আমি জেনে গেছি। এদের দিয়ে আমি ফাংশানের টিকিট বিক্রি করাবো, ভলেন্টিয়ার করে খাটাবো। আবার হয়তো ঐ ছেলেটাকে মিছিলে যোগ দিয়ে স্লোগান দেবার কাজে লাগাবো।

অনাদিপ্রসাদ নিজের মনেই বলেন, এ তো দেখছি আপনার মোক্ষম খব।

—আরে মশাই কলকাতার শহরে খান কয়েক ফাঁকা ঘর থাকলে কত কাজে লাগান যায় জানেন! দিনের বেলায় ঐ পাশের ঘরে নিরিবিলিতে পড়ার ব্যবস্থা, আর সন্ধ্যের পর লম্বুরা ঐ ঘরে জুয়ো খেলে। আমি বিনা পয়সায় মদের যোগান দিই, অতএব বুঝতে পারছেন ডান হাত বাঁ হাত খসবার কোন ভয় নেই।

অনাদিপ্রসাদ বাহবা দিয়ে ওঠেন, খাসা লোক মশাই আপনি। আপনার উচিত ছিল মুখ্যমন্ত্রী হওয়া। তা হলে এই দেশটা বেঁচে যেত। আপনার সঙ্গে আরও মিশতে হবে।

পুলকেশ আনন্দে উচ্ছল, আরে মশাই যখন খুশি আসবেন। দুপুরবেলা নিরিবিলিতে পড়াশুনো করার জন্যে মেয়েছেলেও নিয়ে আসতে পারেন, নয় তো সন্ধ্যের সময় জুয়োর আড্ডায় পকেট ভর্তি কাঁচা টাকা নিয়ে আসবেন, আপনাকেও বিনা পয়সায় ধেনো খাওয়াব।

অনাদিপ্রসাদ হাসতে হাসতে বলেন লোভনীয় প্রস্তাব সন্দেহ নেই। তবে বয়েসটা হয়ে গেছে তো, কয়েক বছর আগে আপনার সঙ্গে দেখা হলে পরে সুবিধে হত। আলাপ করে ভাল লাগল, আজ উঠি।

পুলকেশ কিছুক্ষণ জোর জবরদস্তি করল যাতে অনাদিপ্রসাদ ঐ ক্লাব ঘরে আরও কিছুক্ষণ কাটায়, যাতে অন্তত এক কাপ চা কিংবা কফি খেয়ে যায়। শেষে আটকে রাখতে না পেরে বলল, তৈরি থাকবেন মশায়। প্রোগ্রামে অনেক সাহিত্যিকের নাম ছাপিয়েছি যদি কেউ এসে না পৌঁছয় আপনাকে সাবস্টিটিউট হিসেবে ধরে নিয়ে আসব। আপনি যখন সাহিত্যিক বা হয় কিছু মাইকে বলে দেবেন, পাবলিসিটি হয়ে যাবে। তবে আগে থেকেই জানিয়ে রাখছি, সাবস্টিটিউটদের ট্যাক্সি ভাড়া আমরা দিই না। আসা-যাওয়ার ট্রাম ভাড়া আর টিফিন।

অনাদিপ্রসাদ কোন উত্তর না দিয়ে হাসতে হাসতে নমস্কার করে রাস্তায় নেমে পড়লেন। মনে মনে পুলকেশের কথাই ভাবছিলেন এরাই কলকাতার সংস্কৃতির ধারক বাহক। এরা ঠকাচ্ছে জেনেও কেউ প্রতিবাদ করে না, মিছিল নগরী কলকাতায় প্রতি সন্ধ্যায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। সামান্যতম ত্রুটির বিরুদ্ধেও সোচ্চার প্রতিবাদ। অথচ এই সাংস্কৃতিক কালোবাজারীদের সম্বন্ধে জনতা নীরব কেন? কোথায় রাজনৈতিক নেতারা, তাঁরাই বা অন্ধ হলেন কি করে! এঁদেরও সম্বন্ধটা কি মাসতুতো ভাই-এর?

একটা সিনেমা হলের সামনে দিয়ে অন্যমনস্কভাবে হাঁটছিলেন অনাদিপ্রসাদ। একটি মেয়েলী কণ্ঠের আবেদনে তিনি থামলেন।

—আমার একটা টিকিট বেশী হয়ে গেছে, আপনি যদি কেনেন।

অনাদিপ্রসাদ ভুরু কুঁচকে বলেন, আমি তো সিনেমা দেখতে আসিনি।

—টিকিটটা বেশী হয়ে গেছে তাই বলছিলাম। বিক্রি করতে না পারলে আমার লোকসান হবে।

—কাউণ্টারে দিয়ে দিন না।

—একটু বেশী দামের টিকিট কিনা, ঐ ক্লাসটা এখনও ফুল হয়নি।

—কত দাম?

—তিন টাকা।

—ঠিক আছে আমি টাকা দিয়ে দিচ্ছি। অনাদিপ্রসাদ টাকা দিয়ে টিকিট নেন, সঙ্গে সঙ্গে বলেন, তবে ছবি দেখব কিনা বলতে পারছি না।

—কেন দেখবেন না, আমি বলছি ভাল লাগবে।

অনাদিপ্রসাদ টিকিটটা পকেটে ফেলে বই পাড়ায় গিয়েছিলেন নতুন কি বই বেরিয়েছে তাই দেখতে, ভেবেছিলেন দেরি হবে; কিন্তু কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। মনে পড়ল পকেটে সিনেমার টিকিট রয়েছে, ছবি না দেখলেও কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা ঘরে কাটিয়ে দিতে দোষ কি। তখন শো শুরু হয়ে গেছে, অনাদিপ্রসাদের টিকিট দোতলার। ওপরটা মোটামুটি ফাঁকাই বলতে হবে, টিকিট চেকার তাঁকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল একপ্রান্তে। বসার সঙ্গে সঙ্গে পাশের সিটে মেয়েলী কণ্ঠস্বর শোনা গেল, যাক্ শেষ পর্যন্ত এসেছেন তা হলে?

অনাদিপ্রসাদ চমকে ওঠেন, কে? তারপর মেয়েটির দিকে ভাল করে তাকিয়ে বলেন, ও আপনি?

মেয়েটি ফিক করে হাসল, কেন, আর কেউ হবে ভেবেছিলেন বুঝি?

—আমি কিছুই ভাবিনি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। মেয়েটি আস্তে আস্তে হাত রাখল অনাদিপ্রসাদের হাতের উপর। অনাদিপ্রসাদ সসঙ্কোচে হাত সরিয়ে নেবার চেষ্টা করেন, মেয়েটি ধরে ফেলে, মিথ্যে লজ্জা পাচ্ছেন কেন, আশেপাশে কেউ নেই।

অনাদিপ্রসাদ বিরক্ত হন, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

মেয়েটির সহজ প্রশ্ন, বিকেলে কি করছেন, পাঁচটার পর? আমি ফ্রি আছি। যদি চান বেড়াতে যেতে পারি ,ময়দানে, ভিক্টোরিয়ায়, গঙ্গার ধারে।

অনাদিপ্রসাদের বিস্মিত প্রশ্ন, কিসের জন্যে?

মেয়েটি শব্দ করে হাসে, ন্যাকা, এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না।

অনাদিপ্রসাদ কঠোর কিছু বলার জন্যে পাশ ফিরতেই দেখেন, বড় বড় দুটো চোখে অসহায় গরুর মত তাকিয়ে রয়েছে পাশের মেয়েটা। রূঢ় কথা বলতে কষ্ট হল। জিজ্ঞেস করলেন, কি চাও?

—টাকা।

—কেন?

—তা ছাড়া আমাদের সংসার চলে না।

—বাড়িতে কে আছে?

—বাবা, মা, ভাই—

—তাঁরা জানেন, তুমি এইভাবে রোজগার কর?

—জানলেও জানতে চান না, শুনলেও শুনতে চান না, বুঝলেও বুঝতে চান না। কারণ, তাঁদের দরকার টাকা।

—হুঁ। অনাদিপ্রসাদ কি যেন চিন্তা করেন, আমার কাছে দু'খানা দশ টাকার নোট আছে, রেখে দাও। বেশী থাকলে আরও দিতাম। আমি উঠছি, ছবিটা ভাল লাগছে না।

এবার মেয়েটি অবাক হয়, আপনার নাম ঠিকানা?

—তা জেনে কি লাভ? আবার হয়তো কোন সিনেমায় দেখা হয়ে যাবে।

এবার মেয়েটি বিরক্ত হয়, টাকার খুব প্রয়োজন না থাকলে আপনার এই ভিক্ষা আমি নিতাম না। আমিও মানুষ, শুধু ভাগ্যের বিপর্যয়ে—যাক গে সে কথা, সাহায্য যখন করেছেন, এই কাগজটা দিলাম, আমার নাম ঠিকানা লেখা আছে।

অন্ধকারের মধ্যেও অনাদিপ্রসাদ চেষ্টা করে পড়লেন, মেয়েটির নাম আরতি বসু।

ক্রমশ

লক্ষ্মীর কৃপালাভ ঃ বাঙালীর সাধনা

স্টোরেজ ব্যাটারি শিল্প

"What Bengal thinks today India thinks tomorrow"—মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলের এই প্রসিদ্ধ উক্তিটি বাঙালী রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বস্তাপচা হয়ে গেছে। এখন পরের অনুকরণ করাটাই যেন অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছে; মৌলিক আর কিছুই নেই। দুর্নীতির নকলটাই যেন আবার মাত্রায় বেশী। শ্রমিকশোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করবার অছিলায় নির্বিচারে প্রযুক্ত 'ঘেরাও' নামক মালিক-পরিচালক পীড়নের কৌশলটিও বাঙালী পোলিটিশিয়ানকে শেষে কিনা মহারাষ্ট্র থেকেই আমদানি করতে হলো! 'ঘেরা ডালো' মন্ত্রটি বছর তিনেক আগে প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল বোম্বাইয়েই। আমাদের নকলনবিস মহারথীরা তো মহারাষ্ট্রের ভালো কিছুর অনুকরণ করতে পারেন না—তাঁরা ওই 'ঘেরা ডালো'-কেই বেছে নিলেন মালিক নির্যাতনের মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে। স্বীকার করতে হয় যে, প্রয়োগের বেলায় বাঙালী শ্রমিক নেতারা গোখলে-কথিত মৌলিকতা বেশ কিছুটা দেখিয়ে দিলেন। যত দূর মনে পড়ে, মহারাষ্ট্রের শ্রমিককুল ফ্যাক্টরী ও অফিসেই তাদের 'ঘেরা ডালো' সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন; বাঙালীরা মালিক ও পরিচালকের বাড়িতে সুদ্ধ চড়াও হয়ে ঘেরাও চালালেন। তাঁদের নেতারা নির্দেশ দিলেন, "আমৃত্যু ঘেরাও চালাও।" অবশ্য, কার মৃত্যু, মালিকের না শ্রমিকের, না উভয়ের সেটা বোধ হয় তাঁরা উহ্য রেখেছিলেন। সকলকে পথে বসিয়ে তাঁরা নেতৃত্বের উচ্চাসনেই এখন পর্যন্ত মোতায়েন রয়েছেন।

১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি বাঙালীর, তথা ভারতের, স্টোরেজ ব্যাটারি নির্মাতাদের অন্যতম পথিকৃৎ শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ সাহা সপরিবার "ঘেরাও"-এর বলি হতে চলেছিলেন। কারখানাতে ঘেরাওয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বোমা ও পটকাবর্ষণ তো হয়েইছিল, অধিকন্তু তাঁর বসতবাড়ি পর্যন্ত ৯ দিন 'আমৃত্যু' ঘেরাও থেকেছিল। ভাগ্যক্রমে প্রথম দিন ভোরবেলায় বাড়ি ঘেরাও শুরু হবার অল্পক্ষণ আগে প্রতিবেশীর সংকেতে শচীনবাবু তুরক-পরিবেষ্টিত রাজা লক্ষ্মণ সেনের মতো সপরিবার গৃহত্যাগ করে কয়েক মাইল দূরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে সাময়িকভাবে আত্মগোপন করতে পেরেছিলেন।

ব্যাপারটা ঘটেছিল কলকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলের রাজপথের ওপর—বেলঘরিয়ার ইন. মিত্রের এলাকায় নয়।

বলা বাহুল্য, যে বাংলা দেশে তখন গণভোটে নির্বাচিত এক সরকার হইহই করে রাজত্ব করছিলেন এবং তাঁদের বাণী ছিল, "আইনের পথে রাজ্যশাসন করবো; দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করবো।" তাঁদের করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে রব আকাশ-আধি উদ্‌ঘোষিত হলো বহু কারখানা ও অফিস বন্ধ হয়ে—বাংলা দেশের শিল্প ও বাণিজ্যকে বানচাল করে। (ঈশ্বর করুন, বাকিটা যেন আর আমাদের দেখতে না হয়!) মালিক-পরিচালকরা মার খেয়ে খেয়ে টিট হয়ে গেল। আর শ্রমিক? শ্রমিকের ওপর মরণের জোট হলো আজও নিরাসনে।

অনাহার আর অর্ধাহারের জ্বালায় তাঁরা হলেন মৃতপ্রায়।

দিন কয়েক আগে চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের ডিরেক্টর মেজর জেনারেল অনিলকুমার গুপ্ত মহাশয়ের কাছে মর্মান্তিক একটি খবর পেলাম। সেবাসদন হলো মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত মহিলাদের প্রসূতি ভবন এবং চিকিৎসা ও আরোগ্য কেন্দ্র। জেনারেল গুপ্ত বললেন যে, রোগিণীদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা অপুষ্ট ও অর্ধপুষ্ট। এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে একবাক্যে প্রায় সব মহিলাই নাকি বলেন যে, স্বামী বা ছেলে কিংবা ভাই অমুক কারখানা আর তমুক অফিসে কাজ করতেন, তা ধর্মঘট বা লক-আউট হবার পর থেকে কচি ছেলেমেয়ে সুদ্ধ পরিবারের সবাই প্রায় খেতেই পান না—পুষ্টি হবে কোথা থেকে?

এমনিতেই আমাদের গরিব দেশের বিপুল জনসংখ্যা অভাব অনটনে পুষ্টিকর খাদ্য কমই পায়। তবু সংখ্যালঘু কারখানার শ্রমিক আর অফিস-কর্মীদের যা একটু সুযোগ সুবিধে ছিল তা-ও যদি এমনি করে রাজনীতির বলি হয়ে দাঁড়ায় তো বৃথাই আমার এই বাঙালীর লক্ষ্মীলাভের লম্বা-চওড়া গল্প বলা।

প্রবন্ধটা বোধ হয় একটু জ্বালাময়ী হয়ে উঠছে। কিন্তু কী করি! বণ্ডেল রোডে ভারত ব্যাটারি ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রাইভেট লিমিটেডের কারখানা পরিক্রমা করবার পর এই মন্তব্য না করে উপায় নেই। দেশের আদি প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করবার এমন স্থূল চেষ্টা আর পরিচালকদের এমন লাঞ্ছনা! কেন, দেশে কি ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আইন ছিল না? শচীনবাবুর পরিচালনায় যদি গলদ ছিল তো নিরসনের

জন্যে আইনকানুনের আশ্রয় নিলে আট ন' মাস ধরে কারখানা বন্ধ থাকতো না। প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার পণ্য উৎপাদন মাঠে মারা যেত না।

আমি যাঁদের কথা লিখতে বেশী ভালোবাসি, অর্থাৎ যাঁরা খুব সামান্য অবস্থা থেকে উদয়াস্ত খেটে স্বয়ংসিদ্ধ হয়েছেন, শচীনবাবু সেই বর্ণের লোক। এ'রা পায়ের ওপর পা তুলে প্রজা শাসন করেন না; নিজেরা খেটে দশজনের কর্মসংস্থান করেন। অন্তত এ'দের ক্ষেত্রে আমাদের খড়্গপাণি শ্রমিক নেতারা যেন সুবিচার করবার পরে আঘাত হানেন।

শচীন্দ্রপ্রসাদ সাহা মশায়ের দেশ ছিল বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের যশোর জেলার শোলকুপা গ্রামে। শচীনবাবুর বাবা ছিলেন রেল-কর্মচারী এবং জ্যাঠামশায়ের ব্যবসা ছিল পাট ও ভূষিমালের।

১৯২৭ সালে বনগাঁ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও ১৯২৯-এ আই এস-সি পাসের পর শচীন্দ্রপ্রসাদ যাদবপুরের ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনে কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে ভর্তি হন।

বাণিজ্যিক ঐতিহ্যে বাংলা দেশের বৈশ্য সাহাদের কৌলীন্যের কথা সবিস্তার বলা নিষ্প্রয়োজন। শচীনবাবু সেই ছাত্রাবস্থা থেকেই চাকরির কথা না ভেবে ব্যবসার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। মধুসূদন মজুমদার নামে যাদবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের এক প্রাক্তন ছাত্র কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং-এ বিদেশী ডিগ্রী নিয়ে এসে অধুনালুপ্ত 'মিনার' টর্চ লাইট ও টর্চ ব্যাটারির নির্মাতা হাসান মনজুর কোম্পানীতে চাকরিতে ঢুকেছিলেন। মধুবাবুর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে শচীনবাবু জানলেন যে, মোটরকার, লরি বা বাসে ব্যবহৃত 'সেকেণ্ডারি' অর্থাৎ 'স্টোরেজ' ব্যাটারি এ দেশে তৈরী হয় না।

'ব্যাটারি' শব্দটির আভিধানিক অর্থটি আমাদের কাছে শব্দটির চেয়ে বেশী কঠিন—'বিদ্যুৎ উৎপাদনার্থ ধারক-কোষ ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি দিয়া নির্মিত যন্ত্রবিশেষ'। ওটি অভিধানেই থাক; আমরা ধারক-কোষকে সেল (cell) বলবো আর ব্যাটারিকে বলবো ব্যাটারি-ই।

আমরা যখন টর্চের একটি সেল হাতে নিয়েও বলি টর্চের ব্যাটারি, শাস্ত্রমতে সেই উক্তিতে ভুল থেকে যায়। যতক্ষণ না একাধিক সেল টর্চ লাইট, রেডিও বা ট্রানজিস্টারের খোলের মধ্যে পুরে যুক্ত করে দেওয়া যায়, ততক্ষণ 'ব্যাটারি'-তে পরিণত হয় না।

ব্যাটারিরও প্রকারভেদ আছে। টর্চের সেলগুলি হলো প্রাইমারি সেল এবং তার সমষ্টি হলো 'প্রাইমারি ব্যাটারি'। আমাদের কাছে প্রাইমারি ব্যাটারির সহজ সংজ্ঞা হচ্ছে, যে ব্যাটারির শক্তি একবার শেষ হওয়া মানে নিঃশেষ হয়ে অকেজো হয়ে যাওয়া; যার আর পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়। আর 'সেকেণ্ডারি' বা 'স্টোরেজ' ব্যাটারি হচ্ছে সেই ব্যাটারি যার শক্তি ক্ষয় হয়ে গেলে বারবার 'চার্জ' করে বছর-দেড় বছর চালানো যায়। উদাহরণঃ—মোটরগাড়ির, ট্রেনের কামরার বাতির, ডুবোজাহাজের, ট্যাংক কামান প্রভৃতি রণক্ষেত্রের বিবিধ যন্ত্রের, আর আজকের মহাকাশযানের জন্য নানারকমের ব্যাটারি। মোট কথা, স্টোরেজ ব্যাটারি সেইসব ক্ষেত্রেই অপরিহার্য যেখানে তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারের উপায় নেই।

ব্যাটারির আবিষ্কর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটি নাম হলো ফরাসী গাস্তোঁ প্লাঁতে (Gaston Plante) ও ফোঅর (Faure) এবং তাঁদের অনেক পরে, আবিষ্কারকদের মহামহোপাধ্যায় টমাস অ্যালভা এডিসন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্লাঁত-ই স্টোরেজ ব্যাটারি বস্তুটির উদ্ভাবন করেন; ১৮৮০ নাগাদ ফোঅর তার কিছুটা উন্নতিসাধন করেন; আর এই শতকের প্রথম দশকে এডিসনের হাতে ব্যাটারির প্রগতি দ্রুততর হয়।

মোটরগাড়িতে স্টোরেজ ব্যাটারি জুড়ে সেল্ফ-স্টার্টারের আবিষ্কার হলো ১৯১১ সালে। স্টোরেজ ব্যাটারি ও মোটরগাড়ি—যন্ত্র দুটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই এখানে মোটরগাড়ির ইতিহাস ও সামান্য কিছু পরিসংখ্যান পরিবেশন করলে বোধ হয় মন্দ হয় না।

১৮৮৬ সনে জার্মান বৈজ্ঞানিক ও এঞ্জিনীয়ার গত্তিলেব ডেইমলার (Gotteleb Daimler) মোটরকার ও মোটর সাইকেলের আবিষ্কার করে মানবসভ্যতার অন্যতম যুগপ্রবর্তক হলেন। তখন যদিও সেল্ফ-স্টার্টারের বালাই ছিল না; 'পরশুরাম'-এর ভাষায়, হাণ্ডেল মারলেই গাড়ি চলতো ভটর ভটর ভোঁ টোকিলা-

সংখ্যাটি নিধিকেশটের ডায়গ্রাম দ্রষ্টব্য)। প্রায় ২৫ বছর ধরে হ্যান্ডেল স্টার্টের পর ১৯১২-তে স্টোরেজ ব্যাটারির সাহায্যে সেলফ-স্টার্টার হলো। পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশের মোটর-যানবাহনের একটি বাসী পরিসংখ্যান (তাজা খবর সংগ্রহ করতে পারলাম না) নিম্নে লিখিত হলো—

** ১৯৬৪ সালে চালু গাড়ির মোটামুটি সংখ্যা

মহাদেশ	মোটর কার	লরি	বাস	মোট
উত্তর এবং মধ্য আমেরিকা	৭৮৪ লক্ষ	১৫৭½ লক্ষ	৩¾ লক্ষ	৯৪৫¼ লক্ষ
দক্ষিণ আমেরিকা	২৬ লক্ষ	১৭¾ লক্ষ	১½ লক্ষ	৪৫¼ লক্ষ
ইয়োরোপ	৪০০ লক্ষ	৯২½ লক্ষ	২০ লক্ষ	৫১২½ লক্ষ
এশিয়া	৩৫½ লক্ষ	৪৪¾ লক্ষ	২¾ লক্ষ	৮৩ লক্ষ
অস্ট্রেলিয়া	৩৩ লক্ষ	১০¼ লক্ষ	৪ হাজার	৪৩¼ লক্ষ
পৃথিবীতে মোট	১২৭৮½ লক্ষ	৩২২¾ লক্ষ	২৮ লক্ষ	১৬২৯¼ লক্ষ

(** তথ্য পরিবেশক আমাকে সঠিকভাবে বলতে পারলেন না যে, রাশিয়া, লাল চীন প্রভৃতি দেশের পরিসংখ্যান এর অন্তর্গত কিনা। অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকলে লরি ও বাসের সংখ্যা নিশ্চয়ই অনেক বাড়বে। মোটর কারের সংখ্যা বোধ হয় বেশী বাড়বে না। ওসব দেশের নেতারা ছাড়া জনসাধারণ কি মোটর কারে চড়বার বেশী সুযোগ পান? কী জানি!)

আর একটি পরিসংখ্যান : ৩১ মার্চ ১৯৬৫-তে ভারতবর্ষে চালু মোটর-যানবাহনের সংখ্যা ছিল ৭,৭০,৪৪৪টি।

ভারতবর্ষে প্রথম মোটর কার ইমপোর্টেড হয়েছিল ১৮৯৮ সালে।

আমাদের সরকারী হিসেবমতো ১৯৬৫ সালে অটোমোবাইলের উৎপাদন হয়েছিল সংখ্যায় ৭২,৫৮৫, মোটর সাইকেল ২১,০৬৪ এবং স্কুটার ও মোপেড ২৬,০৬৪।

পরিসংখ্যান বিচার করে দেখলে মনে হয় মোটর কার, লরি ও বাসের জন্যেই এখন আমাদের দেশে বছরে লাখ আষ্টেক স্টোরেজ ব্যাটারি লাগে। এর বাইরে আছে দেশরক্ষা বাহিনীর প্রয়োজনীয় ব্যাটারি: রেলওয়ের, ডাক ও তার বিভাগের, জাহাজ ও স্টীমারের এবং এইরকম নানা কাজের জন্য প্রয়োজনীয় স্টোরেজ ব্যাটারি।

ভারতবর্ষে ১৯৬৫ সালে উৎপাদিত স্টোরেজ ব্যাটারির সরকারী মতে মোট সংখ্যা ছিল ৭,৪৫,০০০টি। বাজার চালু নাম-করা ব্যাটারি ছাড়া শহরে শহরে যেসব ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের শুল্ক এড়িয়ে ব্যাটারি তৈরি ও বিক্রি হয় তার হিসেব নিশ্চয়ই এই পরিসংখ্যানের অন্তর্ভুক্ত নয়। যে প্রতিষ্ঠানের কর্মিসংখ্যা ৫ জনের বেশী নয় তাঁদের স্টোরেজ ব্যাটারি উৎপাদনের ওপর শুল্ক দিতে হয় না। তার বেশী হলে শুল্ক লাগে প্রত্যেক ব্যাটারির ওপর দামের শতকরা ১৬ টাকা এবং কেবলমাত্র ব্যাটারির সাজ-সরঞ্জামের ওপর শতকরা ১১¼ টাকা। সেইজন্যে দেশে এখন বহু ক্ষুদ্র ব্যাটারি-মেকারের উদ্ভব হয়েছে। শুল্কের প্রবর্তন হয়েছিল ১৯৫৫ সালে অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখের সময়ে।

যা বলছিলাম—শ্রীমধুসূদন মজুমদার শচীন সাহা মশায়কে বললেন যে, এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্টোরেজ ব্যাটারি তৈরি করা খুব শক্ত; কেউ করেও না। (সেই বিশ বা ত্রিশ দশকে এয়ারকণ্ডিশনিং-এর চলও হয় নি।) তবুও চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

বাবার কাছ থেকে হাজার চারেক টাকা নিয়ে ১৯৩১ সালে শচীন সাহা ব্যাটারি তৈরির শিল্পোদ্যোগে নেমে পড়লেন কলেজের থার্ড ইয়ারে উঠেই। এই ব্যবসায় আরও দুই শরিক হলেন। শ্রীঅজিত রায়-চৌধুরী নামে শচীনবাবুর এক তরুণ আত্মীয় আরও হাজার চার পাঁচ টাকা মূলধন যোগালেন আর মধু মজুমদার হলেন শূন্য বখরাদার ও টেকনিক্যাল এক্সপার্ট। প্রতিষ্ঠানের নাম হলো শক্তি ব্যাটারি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী: ঠিকানা, কালীঘাট।

শচীনবাবু অবশ্য কলেজ ছাড়লেন না। ১৯৩২-এ ফাইন্যাল ইয়ারে উঠলেন। এই ইয়ারের ছাত্রদের ওপর নির্দেশ ছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শিল্প সংক্রান্ত সমস্যার ওপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ (থীসিস) রচনা করা। কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং-এর প্রফেসর স্বর্গত হীরালাল রায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে শচীন সাহা 'স্টোরেজ ব্যাটারি' বিষয়টি বেছে নিলেন। কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল কাজ করবার জন্যে যে জায়গাটুকুর দরকার সেকালের ক্ষুদ্র যাদবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে তারও অকুলান ছিল। মুরগি রাখার ঘরের মতো ছোট্ট একটা স্থান খুঁজে নিয়ে শচীনবাবু সেখানেই তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন। আর যাতায়াত শুরু করলেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। সেখানে ডাক্তার জ্যোতিঃপ্রকাশ সরকার নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো।

জ্যোতিঃপ্রকাশের কর্মজীবনটি ছিল অদ্ভুত। ইনি ছিলেন ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারের আপন ভাইপো। ডাক্তারি পাস করেছিলেন, কিন্তু করতেন বৈজ্ঞানিক আর এঞ্জিনীয়ারের কাজ। জ্যোতিঃপ্রকাশ সরকার মশায় শচীনবাবুকে জানালেন যে, আচার্য জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক প্লাটের অনুসরণ করে দুটি শিসের পাত দিয়ে স্টোরেজ বা সেকেন্ডারি ব্যাটারি তৈরি করেছেন। কিন্তু প্লাটের আবিষ্কারের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের কাজের পার্থক্য ছিল। জগদীশচন্দ্রের পদ্ধতিটি ছিল উন্নততর।

বসু বিজ্ঞান মন্দির ছাড়াও হাওড়ার ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কারখানায় ব্যাটারি প্লেট তৈরির চেষ্টা হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিলেত থেকে ব্যাটারি প্লেট আমদানি ব্যাহত হওয়াতে রেলওয়ে কোম্পানীরা ট্রেন লাইটিং-এর ব্যাপারে খুব অসুবিধায় পড়েছিল। সেই অসুবিধা দূর করবার জন্যেই ই. আই রেলওয়ে এই প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হয়েছিল, কিন্তু লড়াই মিটে যাবার পরে রেল কর্তৃপক্ষ তা নিয়ে আর মাথা ঘামালেন না।

ওদিকে শক্তি ব্যাটারি কোম্পানীর কাজ

...লো নামো করে চলছিল। আমদানি করা ব্যাটারির পুরনো জালি সংগ্রহ করে চেঁছে মুছে তার ওপরে শিসে ঢালাই করে তরল সালফিউরিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে ব্যাটারি তৈরী হচ্ছিল, সংখ্যায় যদিও খুব কম। ঐ সময়ে হার্ড রবারের ব্যাটারির বাক্স তৈরি করতো 'বেঙ্গল রবার মিলস' নামে টালিগঞ্জের এক অখ্যাতনামা বাঙালী প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু ১৯৩৩ সালে শক্তি ব্যাটারি কোম্পানী বন্ধ হয়ে গেল। দুই সক্রিয় অংশীদার অজিত রায়চৌধুরী ও মধুসূদন মজুমদারের মধ্যে মতের অমিল হয়েই ফাটল ঘটলো। শচীনবাবুর বাবার কষ্টার্জিত চার হাজার টাকা জলে গেল। তবুও কিন্তু শচীন সাহা দমলেন না। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যাটারি তৈরি করে যে সুনাম লাভ করা যায় সে বিষয়ে শচীনবাবু তখন নিঃসন্দেহ হয়েছেন। ইতিমধ্যে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ডিপ্লোমাও পেয়ে গেছেন।

এবারে তিনি তাঁর মায়ের শরণ নিলেন এবং পরিবারের সামান্য পুঁজি থেকে আরো কিছু টাকা পেলেন।

শক্তি ব্যাটারি তৈরী হতো ইমপোর্টেড প্লেট থেকে; শচীনবাবু এখন থেকে mould (ছাঁচ) তৈরি করিয়ে তা থেকে ব্যাটারি সেল-এর প্লেট বানাবার ব্যবস্থা করলেন। ভারত ব্যাটারি ম্যানুফ্যাকচারার্স কোম্পানীর জন্ম হলো। শচীন সাহা-র করা ব্যাটারি নিজস্ব প্লেট থেকে তৈরী ব্যাটারির নির্মাতা হিসেবে ভারতবর্ষে প্রথম বলেই শুনেছি।

এ দেশে তখন একটিমাত্র বিদেশী প্রতিষ্ঠান সেকেন্ডারি ব্যাটারি তৈরি করতো—'ক্লোরাইড এক্সাইড' (বর্তমান 'এক্সাইড') কোম্পানী। কিন্তু তারাও ইম্পোর্টেড প্লেট ব্যবহার করতো।

১৯৩৪ সালে বালিগঞ্জের ম্যান্ডেভিল গার্ডেন্সের এক পাশে শচীনবাবুর ক্ষুদ্র কারখানায় দিনে মাত্র ২০০।২৫০ প্লেট তৈরি হতো। বাক্স সমেত পুরো ব্যাটারি তৈরি তখনো তাঁর কাছে সুদূরপরাহত ব্যাপার। শচীনবাবু নিজেই দিনের উৎপাদন সেই সামান্য ক'টি প্লেট সাইকেলের ক্যারিয়ারে বেঁধে কালীঘাটে বাস আর ট্যাক্সির গ্যারেজে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে আসতেন। ইম্পোর্টেড ব্যাটারির বিক্রেতা 'অসলার' (Osler) প্রভৃতি কলকাতার বড়ো বড়ো কোম্পানী তাদের ব্যাটারি প্লেট বেচতো শতকরা ৪৮ টাকা দামে; সেই জায়গায় শচীনবাবু বিক্রি করতেন শতকরা ২৫ টাকায়। তফাত ছিল এই যে, ভারত ব্যাটারির বিক্রি ছিল নগদ আর বিলিতী কোম্পানীরা বেচতো ধারে।

মন্থর পদবিক্ষেপে উন্নতি হলো ১৯৩৩ সালে বার্ষিক ১২০০০ টাকার জায়গায় ১৯৩৮-এ ভারত ব্যাটারির বিক্রি এসে দাঁড়ালো ৪৫০০০ টাকায়। বছরে ১৩।১৪০০০ টাকা উদ্বৃত্ত হচ্ছে। ম্যান্ডেভিল গার্ডেন্সে স্থানেরও অকুলান হচ্ছে দেখে ভারত ব্যাটারির কারখানাকে স্থানান্তরিত করা হলো। বাঙালীর আদি ইলেকট্রিক বাল্ব নির্মাতা 'বেঙ্গল ল্যাম্প ওয়ার্কস'-এর কারখানা যাদবপুরে উঠে যাওয়াতে তাঁদের পরিত্যক্ত বালিগঞ্জের ডিহি শ্রীরামপুর লেনের কারখানা-বাড়িটি ভাড়া নিয়ে শচীনবাবু ব্যাটারির কারখানা তুলে নিয়ে গেলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় মেশিনারির অভাবে তখনো ভারত ব্যাটারির বহু সাজ-সরঞ্জাম নিজ ফ্যাক্টরীতে তৈরী হতে পারতো না।

ইতিমধ্যে ১৯৩৭ সাল নাগাদ শক্তি ব্যাটারির অন্যতম উদ্যোক্তা মধুসূদন মজুমদার মশায় চাকরি নিয়েছেন জামসেদপুরের শিখ শিল্পপতি সর্দার বাহাদুর ইন্দ্র সিং-এর সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'ট্রপিক্যাল অ্যাকিউমিউলেটার্স' লিমিটেড'-এ। কিন্তু মধুবাবুর সময়টা বোধ হয় ভালো চলছিল না। ১৯৪০ সালে ইন্দ্র সিংজী ঠিক করলেন যে, 'ট্রপিক্যাল' আর চালাবেন না। খবর পেয়ে শচীনবাবু দরাদরি করে 'ট্রপিক্যাল'-এর মেশিনারি কিনে নিয়ে কলকাতায় ভারত ব্যাটারির কারখানায় তুলে আনলেন। 'ভারত' এখন এক স্বয়ংম্ভর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলো। কিন্তু এই অতিরিক্ত অর্থ নিয়োগের জন্যে মূলধনের টানাটানি শুরু হলো। তাই ১৯৪০ সালে শচীন্দ্রপ্রসাদ নেপালের এক রানা পরিবারকে ৭০০০০ টাকা মূলধন লাগাতে রাজী করলেন। কোম্পানীকে প্রাইভেট লিমিটেড করা হলো; রানাদের সত্তর হাজার আর শচীনবাবুর ৫০০০০ টাকা নিয়ে নতুন কোম্পানীর পেড-আপ ক্যাপিট্যাল হলো ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকায়।

১৯৪১-এর শেষ ও ৪২-এর গোড়ায় কলকাতায় জাপানী বোমা পড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাংলা দেশের দুয়ারে পৌঁছতেই রানা সূর্য শামসের এখানকার বিষয়-সম্পত্তি গুটিয়ে নেপালে ফিরে যাওয়া ঠিক করলেন। তাঁর টাকা ফিরিয়ে দিতে শচীনবাবুর বেশ অসুবিধায় পড়তে হলো ঠিকই, কিন্তু আর এক দিক দিয়ে তা হলো শাপে বর; প্রতিষ্ঠানটি পুরোপুরি বাঙালীর হয়ে গেল। সব শেয়ারই শচীন্দ্রপ্রসাদের পারিবারিক সম্পত্তি হলো।

১৯৪৮ সালে ভারত ব্যাটারির কারখানাতে আবার স্থানের সংকীর্ণতা দেখা দিল। ইতিমধ্যে শচীনবাবু একটি মৌলিক কাজ করলেন। এ যাবৎ স্টোরেজ ব্যাটারির প্লেটগুলিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখার জন্যে বিদেশে ও দেশে পাতলা কাঠের seperator ব্যবহার হতো। শচীনবাবুই নাকি প্রথম কাঠের বদলে রবারের সেপারেটরের প্রবর্তন

করলেন। উত্তরকালে আরও এক ধাপ এগিয়ে শচীনবাবু নিজের পরিকল্পিত মেশিনে প্লাস্টিকের সেপারেটার তৈরি করলেন; এখনো তাই তৈরি ও ব্যবহার হচ্ছে। আগেই বলেছি, হার্ড রবারের ব্যাটারির বাক্স নির্মাণের প্রবর্তন করেন টালিগঞ্জের বাঙালী প্রতিষ্ঠান অধুনালুপ্ত 'সেন রবার মিলস'; এঁরা ছাড়াও জামশেদপুরের বিরাট ইংরেজ প্রতিষ্ঠান 'ইণ্ডিয়ান কেবল্ কোম্পানী'-ও উন্নত ধরনের শক্ত রবারের বাক্স তৈরি করলো। শচীনবাবু ভারত ব্যাটারিতে আরও ভালো রবারের বাক্স করা শুরু করলেন; এবং প্লাস্টিক সেপারেটার প্রভৃতি তাঁর প্রবর্তিত সব কিছুরই 'পেটেন্ট' নিলেন। শুধু তাই নয়, শচীন্দ্রপ্রসাদ ব্যাটারির নানা সাজ-সরঞ্জাম তৈরির মেশিন নির্মাণেরও উদ্যোগ করলেন।

ডিহি-শ্রীরামপুরে লেনের ভাড়াটে কারখানা-বাড়িতে এত সব করার জায়গা ছিল না বলে বালিগঞ্জ প্লেসের কাছে বণ্ডেল গেটের গায়ে দুই বিঘা জমি কিনে ভারত ব্যাটারির কারখানা বসানো হলো।

ভারত ব্যাটারির গোড়ার কথা প্রায় সবই বলা হয়েছে; ক্রমোন্নতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আর দিতে চাই না। নিম্নলিখিত ক্রমবর্ধমান বিক্রয়ের হিসেবটিই ছবিটাকে পরিষ্কার ফুটিয়ে তুলবে:—

১৯৩৩—১২,০৮৬ টাকা; ১৯৩৮—৪২,২২৮ টাকা; ১৯৪৬—১,৪৪,৩৮৫ টাকা; ১৯৫১—৯,০২,৭২৯ টাকা; ১৯৫৬—১৩,৬১,৩৩৭ টাকা; ১৯৬১—১৯,৩২,৮১৭ টাকা; ১৯৬৬—৩৬,৮৭,৮২৪ টাকা।

বর্তমানে ভারত ব্যাটারি সম্প্রসারণের (শচীন্দ্রপ্রসাদ কথিত) বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলি। বণ্ডেল রোডে ২নং কারখানার সংলগ্ন দুই বিঘার আরও এক খণ্ড জমি নেওয়া হচ্ছে আর হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইনে বইঁচি স্টেশনে ১২ বিঘা জমির ওপরে ভারত ব্যাটারির ৩নং ফ্যাক্টরী স্থাপিত হয়েছে। শচীনবাবু দিল্লিতেও এক কারখানা বসিয়েছেন ভিন্ন নামে এবং মীরাটের কোনো এক স্থানীয় প্রতিষ্ঠান 'ভারত ব্যাটারি'র সঙ্গে বন্দোবস্ত করে সেখানেও এই মার্কার ব্যাটারি তৈরির আয়োজন করছেন। আর সবচেয়ে বড় কথা হল যে, শচীনবাবুর কর্মক্ষেত্র এখন সাগরপারেও প্রসারিত হচ্ছে; শীঘ্রই নাকি আফ্রিকার ট্যানজানিয়াতে ভারত ব্যাটারির একটি কারখানা স্থাপিত হবে।

ভারত ব্যাটারি ছাড়া অন্যান্য বিখ্যাত ব্যাটারি নির্মাতাদের মধ্যে যাঁরা প্রাচীন অর্থাৎ যেসব প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল সেই ত্রিশ শতকেই, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটা নাম:—

(১) বিচারপতি ডাঃ দ্বারকানাথ মিত্র মশায়ের ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান ব্যাটারি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং প্রাঃ লিঃ ('মিটার' ব্যাটারি)—বর্তমান কর্তা শ্রীসুনীল মিত্র;

(২) ইলেকট্রিক স্টোরেজ ব্যাটারি প্রাঃ লিঃ ('সেনকো')—বর্তমান কর্তা শ্রীকিরণ সেন; এবং

(৩) ইস্টার্ন অ্যাকিউমিউলেটর কোম্পানী ('ভিক্টর')—বর্তমান কর্তা শ্রী ডি কুমার।

পরবর্তী কালে শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত প্রতিষ্ঠিত 'জেনারেল লেড ব্যাটারিজ প্রাঃ লিমিটেড'-এর নামও উল্লেখযোগ্য। এঁরা হলেন 'গোল্ড' ব্যাটারির নির্মাতা।

ব্যাটারি নির্মাতাদের সঙ্ঘের নাম 'অল ইণ্ডিয়া ব্যাটারি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন'।

ভারতবর্ষের আর একটি বিখ্যাত স্টোরেজ ব্যাটারির কারখানা হল মহীশূরের 'অ্যামকো' ব্যাটারি তৈরির প্রতিষ্ঠান 'অ্যাকিউমিউলেটর ম্যানুফ্যাকচারার্স কোং লিঃ'। এরও উৎপত্তি বাঙালীর চেষ্টায়। অরবিন্দ বসু নামে এক বাঙালী ভদ্রলোক বহু কাল আগে বোম্বাই অঞ্চলে 'হিন্দুস্থান অ্যাকিউমিউলেটর ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী' নাম দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা করেছিলেন। পরে মহীশূরের প্রগতিপন্থী মহারাজা বাহাদুরের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় সেই সংস্থার কেন্দ্রীয় ইত্যাদি মহীশূরে উঠিয়ে আনা হয় এবং কোম্পানীর নামেরও পরিবর্তন হয়।

এ দেশে এখন প্রাইমারি অথবা ড্রাই ব্যাটারির উৎপাদনও বিরাট। বহুজাতিক সংস্থা (মূলত আমেরিকান) 'ইউনিয়ন কারবাইড কোম্পানী'র ১৯৬৭ সালে টর্চ-সেল বিক্রি নাকি হয়েছে প্রায় ১৭ কোটি টাকার। এ ছাড়া 'এস্ট্রেলা', 'টিউডর' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানেরও প্রচুর বিক্রি আছে।

শচীন্দ্রপ্রসাদের বড় দুই ছেলে সমরেন্দ্রপ্রসাদ ও সৌরেন্দ্রপ্রসাদ স্কুল-জীবনে শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন। পরে সমরেন্দ্র পশ্চিম জার্মানী, হল্যাণ্ড ও ইটালীতে কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে এখন ভারত ব্যাটারির ফ্যাক্টরী পরিচালনায় বাবাকে সাহায্য করেন। সৌরেন্দ্রও প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক দিকটায় বাবার সহকারী। তিনি এখন 'বিজনেস ম্যানেজমেন্ট'-এ বিশেষ বিদ্যালাভের উদ্দেশ্যে ইয়োরোপে আছেন। কনিষ্ঠ সঞ্জীবপ্রসাদ ভারত ব্যাটারির হেড অফিসে শিক্ষানবিশি করছেন।

শচীনবাবু 'অল ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স অর্গানাইজেশনে'র পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি এবং 'বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার'-এর কার্যকরী সমিতির সভ্য।

শ্রমিক-আন্দোলনে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত এবং বিশেষ করে নিজের প্রতিষ্ঠানের কর্মিবৃন্দের দুর্ব্যবহারে মর্মাহত সাহা মশায় আমাকে দুঃখ করে বলছিলেন যে, বাংলা দেশের রাজনীতির শোধন না হলে এ অঞ্চলে শিল্প ও বাণিজ্যের সমৃদ্ধি কী করে হবে? দেশের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত কত দিন চলবে?

আমরা জানি যে, এই প্রশ্নটির উত্তর কেবল শচীন্দ্রপ্রসাদ সাহা-ই নয়, আমরা শতকরা ৯৫ জন বাঙালীই খুঁজে বেড়াচ্ছি; কিন্তু সমস্যার সমাধান হচ্ছে না, হবে না: মুষ্টিমেয় জন পাঁচেক ভ্রান্ত ক্ষমতালোলুপ রাজনৈতিক ও শ্রমিক-নেতার বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য। আর কত দিন আমরা এই পরিস্থিতি বরদাস্ত করে চলব?

বিশ্বকর্মা

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রতি পদক্ষেপ

গত ১৭ই এবং ১৮ই মে তারিখে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। উন্নয়ন পরিষদের সদস্যগণ কয়েকটি বিষয়ে একমত হয়েছেন, আবার কয়েকটি বিষয়ে তাঁদের মধ্যে জোর মতভেদ দেখা গেছে। সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়েছে যে, চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় অন্ততঃ শতকরা পাঁচ ভাগ করে প্রতি বছর জাতীয় আয় বাড়াতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন-হারও অন্ততঃ শতকরা পাঁচ ভাগ করে বাড়াতে হবে। আশা করা যায়, কৃষি-উৎপাদন প্রতি বছর শতকরা পাঁচ ভাগ করে বাড়লে শিল্প-উৎপাদন অন্ততঃ শতকরা সাত ভাগ থেকে দশ ভাগ করে বাড়বে। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সদস্যগণ এ বিষয়েও মোটামুটি স্থির করেছেন যে, বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমিয়ে দেওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে ডক্টর গ্যাডগিল রপ্তানির পরিমাণ শতকরা সাত ভাগ বাড়ানোর কর্মসূচী স্থির করার সুপারিশ করেন। কিন্তু সদস্যগণ মনে করেন, রপ্তানির পরিমাণ এতটা বাড়ানো সম্ভব হবে না। অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের অভিমত হচ্ছে, রপ্তানির পরিমাণ শতকরা তিন ভাগের বেশী বাড়বে বলে আশা করা যায় না। সুতরাং এখনই বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব কার্যকর করা উচিত হবে না।

অধ্যাপক গ্যাডগিল প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করা যায় কিনা ভেবে দেখতে বলেছেন। অবশ্য তিনি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার গুরুত্ব অস্বীকার করেন নি। তিনি যা বলতে চেয়েছেন তার অর্থ, অনুৎপাদনমূলক ব্যয়ের পরিমাণ আরও কমানো যেতে পারে এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সব কিছু বজায় রেখেও ব্যয়-সংকোচনের সম্ভাবনা আছে কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। তা ছাড়া, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে যে মূলধনী ব্যয় হয় তার সঙ্গে দেশের শিল্পোন্নয়ন কর্মসূচীর সম্পর্ক আরও নিবিড় করা যেতে পারে। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য আরো আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ করার উপর ডক্টর গ্যাডগিল বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তা ছাড়া, আমদানির বিকল্প সামগ্রীর উৎপাদন, রপ্তানি উন্নয়নের জন্য দেশের কিছুটা ত্যাগ স্বীকার, অত্যাবশ্যক কৃষি-সামগ্রীগুলির জন্য একটি মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা প্রভৃতির উপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করার ব্যাপারে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ অনেকটা একমত হয়েছেন। আরো বেশী করে আর্থিক সম্পদ সংগ্রহের জন্য অধ্যাপক গ্যাডগিল পরিকল্পনার বহির্ভূত

আর্থিক ভারত

ক্ষেত্রে ব্যয়-সংকোচের উপর এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্বৃত্ত বাড়াবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অতিরিক্ত কর ধার্যের ব্যবস্থা একেবারে শেষ ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে; কিন্তু এ ব্যবস্থা গ্রহণ করার আগে সম্ভাব্য সব আর্থিক উৎস থেকে কতটা সম্পদ সংগ্রহ করা যেতে পারে তা বিশেষভাবে পরীক্ষা করা দরকার। কৃষকদের যে বাড়তি আয় হচ্ছে, তার উপর কিছু পরিমাণে কর ধার্য করা যে খুবই যুক্তিসংগত সে বিষয়ে কিছুটা উল্লেখ ডক্টর গ্যাডগিলের ভাষণে পাওয়া যায়। আর্থিক সম্পদের সরবরাহ বাড়াবার জন্য ডক্টর গ্যাডগিল গ্রামাঞ্চলে ডিবেঞ্চার ছাড়ার সুপারিশ করেছেন। পরিকল্পনার সুফল যাতে দেশের সব ক্ষেত্রেই সমানভাবে ও ন্যায়সংগতভাবে বণ্টিত হয় তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন; অধ্যাপক গ্যাডগিল এ কথার সূত্র ধরে বলেন যে, বিগত তিনটি পরিকল্পনার সুফল থেকে কয়েকটি ক্ষেত্র বঞ্চিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ভূমিসংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়। গুরুভার শিল্পগুলি ছাড়া কল্যাণাশ্রয়ী ব্যয়ের মাধ্যমে এবং বেশী করে শ্রমিক নিয়োগ করা যায় এ-জাতীয় দ্রুত ফলদায়ক বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ করার উপর ডক্টর গ্যাডগিল গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ-প্রেরণা বাড়াবার জন্য যাতে সরকারী নিয়ন্ত্রণের কাঠামোর মধ্যেই বিভিন্ন বাধা অপসৃত হয় তার ব্যবস্থা চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় থাকা দরকার—এই যুক্তির সমর্থনে ডক্টর গ্যাডগিল সরকারী নিয়ন্ত্রণ যাতে বেসরকারী শিল্প-প্রয়াসে বাধাদানকারী না হয়েও নিজের কার্যকারিতা বজায় রাখতে পারে সেজন্য বিনিয়োগ-নীতির পুনর্বিন্যাস করার কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে ব্যাংকের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কিছুটা কাজে আসতে পারে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ এবং বৈদেশিক সাহায্য কমাবার সুপারিশ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশাই ডক্টর গ্যাডগিলের সঙ্গে একমত হয়েছেন। আরো কর ধার্য না করে প্রতি বছর কীভাবে ২০০ থেকে ৩০০ কোটি টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত টাকা সংগ্রহ করা হবে সে বিষয়ে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সদস্যগণ কোন সুনির্দিষ্ট মীমাংসায় আসতে পারেন নি। ডক্টর গ্যাডগিল মনে করেন, যদি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং সমবায় সংস্থাগুলি পরিকল্পনার কর্মসূচী সঠিকভাবে কার্যকর করার জন্য আরও সক্রিয়ভাবে চেষ্টা চালান তবে স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহের প্রচেষ্টা আরও জোরদার হবে।

কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির যে প্রবণতা সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে তা যদি আরও বাড়তে থাকে, অথবা তা বাড়াবার জন্য যদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বিত এবং কার্যকর হয়, তবে কৃষিক্ষেত্রে সুনিশ্চিতভাবে উদ্বৃত্ত আর্থিক সংগতির সৃষ্টি হবে। এই অতিরিক্ত আর্থিক সম্পদ যদি উৎপাদনমূলক বিনিয়োগের কাজে ব্যবহার করা হয়, তবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির অবদান অনেক বেড়ে যাবে। এজন্য প্রয়োজন এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে কৃষিক্ষেত্রে অর্জিত উদ্বৃত্ত নিছক ভোগ-সামগ্রী ক্রয়ে ব্যয়িত না হয়।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয়-সংকোচের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে এ কথা শুনিয়ে শ্রীদেশাই বলেন, প্রকৃতপক্ষে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বেশী পরিমাণে সঞ্চয়ের কোন সম্ভাবনা নেই। শ্রীদেশাই কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরও সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, এবং বলেন যে, উভয় ধরনের সরকারেরই নিজ নিজ ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব সম্পদ সংগ্রহের জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োগ করা উচিত। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীদেশাই বলেন, তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার ১১০০ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্য সামনে রেখে মোট ২২৭৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিলেন, এবং রাজ্য সরকারগুলিও ৬১০ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্য সামনে রেখে মোট ৬১৩ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। তার থেকেই প্রমাণিত হয়, পরিকল্পনার অর্থসংস্থানে জনসাধারণের অবদান উপেক্ষণীয় নয়। আরও বেশী করে আর্থিক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত কর ধার্য করার উপায় যে সীমাবদ্ধ তা স্বীকার করে শ্রীদেশাই বলেন, বেশী করে সঞ্চয় করা, আরও ভাল পদ্ধতিতে কর ধার্য করা ও রাজস্ব সংগ্রহ করা, এবং কর ফাঁকি

ও কর প্রদানের কড়াকড়ি এড়িয়ে যাওয়া বন্ধ করা প্রভৃতি ব্যবস্থা যদি আরও জোরদার হয়, তবে অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।

কেরালার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ বলেন, যদিও ভারত সরকার নীতিগতভাবে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় সমাজ গঠন করতে চান, চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার রূপরেখা সম্পর্কে যে প্রাথমিক ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তাতে সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য এবং সমাজতন্ত্রের আদর্শ রূপায়ণের কোনও প্রচেষ্টা স্থান পায়নি। হয়তো কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পরিকল্পনাটির বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন, তবুও এ কথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না, সাধারণ মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক অভাব মেটানাই আজ সবচেয়ে বড় দাবি। দেখতে হবে, চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা যেন অর্থনৈতিক শক্তির অসাম্য দূর করে দেশের সকলকেই পরিকল্পনার সম্ভাব্য সুফলের অংশীদার করে। কিন্তু জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের আলোচনা থেকে এ-জাতীয় প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়নি।

সুব্রত গুপ্ত

দ্বিতীয় পর্ব

প্রতিভা বসু

৩৬

বস্তির জীবনে আজ একটা প্রবাহ। এমন ঘটনা কি আর কখনও ঘটেছে যে, একটা গাড়িওলা লোক এসে দাঁড়িয়েছে তাদের দরজায়? তাও কি যেমন তেমন লোক? স্বয়ং হাকিম সাহেব। কী টকটকে চেহারা, কী চকচকে গাড়ি, বেল্ট কোমরে কী রকম পোশাকের আরদালী। লক্ষ্মীকে কেমন হাত ধরে নামিয়ে দিল সে। স্বয়ং কর্তা কেমন হেসে হেসে আদর করলেন। সব যেন অলীক মনে হচ্ছিল, স্বপ্ন মনে হচ্ছিল, লক্ষ্মী আর লক্ষ্মীর মাকে নতুন চোখে দেখছিল তারা।

তারা তো জানে এই ভদ্দরলোকের মেয়ের মতো চেহারার পরমাসুন্দরী মেয়েছেলেটাকে কেন মাস্টাররা তাড়িয়ে দিয়েছে স্কুল থেকে, কেন ভালো পাড়া ছেড়ে তাদের গরীব বস্তিতে এসে উঠেছে, এই বেজম্মা মেয়েটাকে নিয়ে কেন আর কোথাও থাকতে পারছে না, কাজ যোগাড় করতে পারছে না। সবই জানে। এর-ওর কানে কানে শুনে অনেক বাড়িয়েই জানে। শুধু এটাই জানে না, ও কেন ওদের আসল পাড়ায় ঘর ভাড়া না করে এই বস্তিতে কালীচরণের আশ্রয়ে এসে উঠেছে।

বস্তিতেও কি এসব চলে না? চলে। কত ঘরেই চলে। তবু তার মধ্যে ঢাকঢাক গুড়-গুড় আছে। চেহারাটা গৃহস্থ গৃহস্থ। গরীবরা থাকে বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে, এটাই তার আসল পরিচয়। তা নইলে রাত্রিবেলা উঁকি মার না, কত ঘরে দেখবে দিব্যি যে যার নাগর নিয়ে ব্যস্ত। কেউ কিছু মনে করে না সেজন্য। বস্তি-জীবনের এ একটা অলিখিত সম্মতি। শুধু ও পাড়ার সঙ্গে এটাই তফাত, সন্ধ্যা লাগতেই রঙ মেখে দাঁড়িয়ে থেকে কেউ মানুষ জোটায় না। সেটা নিন্দের। সেখানে নিষেধের গণ্ডি টানা আছে। যাদের স্বামী আছে, ছেলেমেয়ে আছে এমন লোকের সংখ্যাই এখানে বেশী, কিন্তু তা বলে ঠিকে ঝিয়ের সংখ্যাও কিছু মন্দ নয় কোথাও কোথাও। একখানা ঘর নিয়ে তারা একা থাকে, সকাল না হতে বাড়ি বাড়ি কাজে ঘোরে, সন্ধ্যে হলে নিশ্চিন্ত। সকলেরই বাঁধা খদ্দের আছে, যদি বা জোটাতে হয়, বাইরে থেকেই জুটিয়ে আসে।

আবার কেউ কেউ মাত্র একজন পুরুষের সঙ্গেই কাটিয়ে দিচ্ছে বছরের পর বছর। যেমন আতরবালা। সেও ঠিকে ঝি। হরিপদ মিস্ত্রীর সঙ্গে একেবারে স্বামী-স্ত্রীর মতোই থাকে। ঝগড়া হয় খুব, আবার মিলও হয়। বাচ্চাও হয় বছর বছর। এ নিয়ে কেউ টেঁপাটোঁপ করে না।

বস্তিটা বেশ বড়ো। প্রায় তিরিশ ঘর বাসিন্দা বাস করে এখানে। তার মধ্যে নন্তু, আতরবালা, ফুলমণি, সোহাগী, সৈরভী, বিন্দি, বাসনা, সখির মা সবাই ঠিকে ঝি, সবারই রাতের লোক আছে। একজনই নয়, বদলও আসে। কিন্তু ওদের বাচ্চা হয় না।

তবে এসব হল গরীব গরবার ঘরের ব্যাপার। যারা বাপ খেদানো, মা খেদানো, স্বামী খেদানো, তার মধ্যে কেউ কেউ হয়ত ফুটপাতে জন্মেছে, কেউ হয়ত চোখ খুলেই নিজেকে একা দেখেছে, এসব মেয়েরা আর কী করতে পারে? তাদের তো পুরুষেরা যৌবন শুরু হতে না হতেই একা পেয়ে নষ্ট করে ফেলেছে, রক্ষা করার আর আছে কি তবে? স্বামী না হলেও বিভিন্ন পুরুষের সংগমে তারা অভ্যস্ত। তা নিয়ে অকারণে চেঁচামেচি করে সতীত্ব রক্ষার দায় নেই তাদের। বরং স্নো, পমেটম, দু-একখানা কেমিকেলের গয়না, আর পাটের শাড়ি পরে শখ মেটাতে পারে। সেজেগুজে কত দিন দল বেঁধে তারা ষণ্ডেশ্বরতলায় পুজো দিতে যায়, তারকেশ্বরে গিয়ে হত্যা দেয়। ওপারে পাটকলে গিয়ে রামলীলা দেখে আসে। শরীরে মনে কোনোখানেই উপবাসী হয়ে থাকে না। কিন্তু এসব হল নীচু জাতের কথা। কিন্তু যার চেহারা পটের বিবির মতো, যে লেখাপড়া জানে, গলার স্বর যার নীচু, যে কখনও ঝগড়া করে না, চর্চা করে না, গন্ধে গন্ধে চলে যায় না এর-ওর ঘরের খবর নিতে, সে যে কেন মরতে এসেছে এই বস্তিতে এটাই তারা ভেবে পায় নি কোনো দিন। আর আজ হাকিমের গাড়ি আসতে দেখে তারা যেন বিহ্বল হয়ে গেছে।

'শিশিরমণির কথা মনে আছে পটলি?' সৈরভী ফিসফিস করছিল।

'বাবা, তা আর থাকবে না? বিদ্যেধরী তো আসতেন গঙ্গাস্নানে।'

'দেখেছিস তো ডাইনে দাসী বাঁয়ে দাসী, বাবুদের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত বটতলায়—'

'পিছনে আলতা মেখে পাতলা নম্বরী শাড়ি পেটিকোট ছাড়া পরে ঢুলতে ঢুলতে এসে গা রগড়াতেন দামী সাবান দিয়ে।'

'কী এমন চেহারা ছিল বল? রঙ তো বলতে গেলে শ্যামলাই। তবে হ্যাঁ, চোখ দ'্টো বেশ ঢ্ল্ঢ্ল্ ছিল, মটকাতো খ্ব। ওই-ট্কুই। তাইতেই কী দেমাক! যেন পা পড়ে না মাটিতে! আর এর চেহারা দেখ। কী রঙ, কী ম্খ—'

'একেবারে আগ্নের খাপরা!'

'তবে? তবেই ব্ঝে দেখ, মেয়েকে পেণছ্তে হাকিমের গাড়ি কেন এসে দাঁড়ায়!'

হাকিমের গাড়ি! লক্ষ্মী হাকিমের গাড়ি চড়ে বাড়ি এসেছে? এত দ্রে! এত দ্রে পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে লোকটা! লক্ষ্মীর মা উদ্‌ভ্রান্ত চোখে দরজার দিকে তাকালেন, ওদের আলোচনা তাঁর কানে গরম সীসে ঢেলে দিল।

মনে আছে সেবার মল্লিকবাব্দের বাড়ি এক মাস ধরে ঢপগান হল ঝ্লনের সময়? মাইরি, কী মন-মাতানো গলা! দেখতেও তেমনি। কী যেন নাম ছিল?'

'দাঁড়া, বলছি—'

'পট্লি, পট্লি—!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পটলকুমারী দাসী—'

'সেই ছোটো তরফের কর্তার সঙ্গে কেমন ইয়ে হ'য়ে গেল!'

'যাই বলিস চেহারা একখানা ছিলো বটে!'

'সেও তো শ্নেছি লেখাপড়া জানতো। ছিলো ভদ্দরঘরেরই বউ, কে বার ক'রে নিয়ে এসে লাইনে নামালো!'

'নামালে কী হবে! স্বভাবে চরিত্তিরে তখনো ভদ্দরলোকের মেয়েছেলের কান কাটতো। কতো নাম ডাক হ'লো, কলকাত্তা ছেড়ে এইখেনে এসে গঙ্গার ধারে বাসা নিল, ছোটো তরফের কর্তাকে তো কানে ধ'রে ওঠাতো বসাতো। অবিশ্যি অন্য কোনো বাব্ও নিত না তাকে ছাড়া দেখতে দেখতে কেমন মিশে গেল সকলের সঙ্গে। কেউ তাকে ঘেন্না করতো না, বেবস্যা বলতো না, দিব্যি পথে ঘাটে চলে ফিরে বেড়াতো, অস্খে বিস্খে এর ওর বাড়ি যেতো—'

'আর গোলাপী?'

'বাব্বা, সে এক মেয়েছেলে বটে! কতো প্র্ষের কান কেটেছে। এসেছিলো শ্রীমানীদের নাটমঞ্চে নাটক করতে। ব্যাস'—

'তুই আর কী জানিস! ছিলি তো এইট্কু কুলের বিচি। আমি তো ঘর মোছার কাজ করি সেখানে। ওরে বাবা, অযোধ্যা শ্রীমানীর সঙ্গে যা লটকালটকি হ'তো মজলিস-ঘরে। ইয়ার বন্ধ্রা তাল দিত, মেয়েটা ঘ্ঙ্রে বোল তুলে গান ধরতো আর অযোধ্যা শ্রীমানী ছ্টে ছ্টে গিয়ে জড়িয়ে ধরতো ব্কের মধ্যে। মদ খেয়ে তো আর জ্ঞানগম্যি থাকতো না কিছ্!'

'যাই বলিস, লোকটা ছিলো এক নম্বরের বদমাশ। মেয়েছেলে দেখলে আর থাকতে পারত না।'

'তা বাপ্, আমি খ্ব দোষ দিতে পারি না। কোন ছেলেবেলায় বাপ শ্রীমানী ধ্মধাড়াক্কা ক'রে নিজেদের শখসাধ মিটিয়ে, ফাইফ্ট্নি দেখিয়ে, মল্লিকবাব্দের সঙ্গে পিরতিযোগিতা ক'রে বিয়ে দিয়ে-ছিলো, যৈবন আসতে আসতে বউ তো বাসী ম্ড়ি। প্র্ষের মন, আর কি বশ মানে?'

'তা তুই তো বলবিই। আশনাই রোশনাই কি তোর সঙ্গেও কিছ্ ছিলো না? শ্রীমানীদের বাড়ি গেছিস ঘর মোছার কাজ নিয়ে, গায়ে গতরে অমন দলদলে মাংস, আগ্ন ছ্ঁয়ে বললেও বিশ্বাস করবো না ঐ শরীরে একদিনও অযোধ্যা শ্রীমানীর ছোঁকা না খেয়ে গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসী-পাতা থেকেই কাজ ছেড়ে দিয়েছো।'

'বাজে কথা রাখ!'

'বল না ভাই!'

'শেষে কী ভালোবাসাই হ'লো অযোধ্যা শ্রীমানীর সঙ্গে! একেবারে সত্যিকারের ভালোবাসা!'

লক্ষ্মীর মা বড়ো বড়ো নিঃশ্বাসে এগিয়ে এলেন, র্দ্ধ স্বরে বললেন, 'দয়া ক'রে আপনারা অন্য জায়গায় গিয়ে কথা বল্ন, আমি—আমি—দরজা বন্ধ ক'রে দিচ্ছি। আমার শরীর খারাপ হ'য়েছে।'

'দেমাক লো, দেমাক! অন্য সময় তো দেখেছি ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না, ম্খে একেবারে মিছরির পানা! সেই ম্খেই কি ছ্রির ধার! দিনের দেখা পেয়েছে বে!'

'স্বয়ং হাকিম এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে, আর কি চাই!'

একজন বুড়ী ঘরের মধ্যে পা বাড়ালো, সহানুভূতির স্বরে বললো, 'মেয়েটাকে অমন তুলো ধুনলে কেন গো, পীরিতের রীতই এই; ঝিকে মেরে বউকে শেখানো। তোমার মেয়েকে সোহাগ করা মানেই তোমাকে সোহাগ করা। এই চেহারা, এই বয়েস, এই তো সময়। অত লজ্জা থাকলে কি চলে?'

'আহা, এসব যেন আর উনি জানেন না! লোক দেখিয়ে ভালোমানুষ সেজে থাকলে শেষ নিজের কপাল নিজেই থাবড়াবে। কাজ আর কী?'

'আরে বাপু, কালীচরণেরই তো মানিক, একদিন রাত্রে চলে গেলেই হয় মেয়েটাকে ঘুম পাড়িয়ে।'

এবার দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে লক্ষ্মীর মা দাঁত দিয়ে কেটে ফেললেন ঠোঁটটা।

কুঞ্জলতা এ বস্তির শৌখিন মেয়ে, বয়েস কম, রং ফর্সা, বুক ভারী, গড়ন পিটন ভালো। এই বস্তির এতোদিন সেই ছিলো মক্ষিরানী। অনেক মৌমাছি গুনগুন করে তাকে ঘিরে। সেও বরদাত্রীর মতো একে হাস্য বিতরণ ক'রে তাকে মোচড় মেরে, ফষ্টি-নষ্টির জগতে অবাধে বিচরণ করে। একজন বড়োলোকের বাড়িতে সে বাচ্চা রাখতে যায় সকালে। তার পরনে ঘুরিয়ে কুঁচিয়ে পরা রঙিন শাড়ি থাকে, গায়ে খাপে খাপে বসানো ব্লাউস থাকে, পায়ে চটি থাকে। মাথায় ফুল গুঁজে চুল বাঁধে, বেণীতে লাল সবুজ সিল্কের ফিতে পত্-পত্ ওড়ে।

সকালে যায় দুপুরে ফেরে, আবার তিনটের সময় যায়, ফিরতে রাত এগারোটা বারোটা। নাকি একটা দু'টো। কে জানে!

'এতো রাত অব্দি কী করিস লা ছুঁড়ি?' বয়োজ্যেষ্ঠারা প্রশ্ন করে মাঝে মাঝে।

ভুরু কুঁচকে ঠমক মারে কুঞ্জলতা, 'তা তোমরা বুঝবে কি। মা-ছোড় একটা ছেলেকে রাখা যে কী কষ্ট সে শুধু যে রাখে সেই বোঝে।'

'আর বোঝে ছেলের বাপ। ঘুমটা তো তাকেও পাড়াতে হয় কী বলিস।'

কুঞ্জলতার সমানবয়সী কুচ্ছিত কালীদাসী, ট্যারা চোখে ঘৃণা উদ্গার ক'রে বলে, 'রাখো রাখো, অত না। যতো বলে ততো না। বাবুদের তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই কিনা।'

'কাজ আছে কি নেই তার তুই কি বুঝবি?' কুঞ্জলতার ভারি বুক দুলে ওঠে রাগে, একবার কাপড়টা টেনে দেয় একবার ফেলে দেয়। ওর উত্তেজনা হ'লে এই ওর বদদোষ। সেইজন্য ছোকরাগুলো ওকে ক্ষেপাতে ভালোবাসে, রাগাতে ভালোবাসে, ওরা উন্মাদনার শেষ সীমায় পৌঁছে বলে 'আর যে পারি না।'

কালীদাসী সমানে সমানে মুখ ভ্যাংচায়, 'রেখে দে, বেশী অহংকার করতে যাস না। তাই যদি হবে, ঘর ভাড়া গুনিস কেন—যা না, সেখানেই গিয়ে থাক। ঘাড় ধ'রে তো দেয় তাড়িয়ে।'

'ঘাড় ধ'রেই তাড়ায় না হাত ধ'রেই খাটে তোলে একদিন দেখিস গিয়ে টেরি।'

'খবরদার টেরি টেরি করবি না।' টেরির কান্না এসে যায়।

যে তিরিশ ঘর বাসিন্দা, বহুকাল ধ'রে সুখে দুঃখে বিচ্ছেদে মিলনে একত্র হ'য়ে আছে, সত্যি বলতে কুঞ্জলতা চেহারার প্রতিযোগিতায় সকলকেই প্রায় টেক্কা দিয়ে আছে। আর এই চেহারাটুকু আছে বলেই প্রৌঢ় সতীকান্ত অমন আদরে সোহাগে রেখেছে তাকে। লোকটা দু'টো বিয়ে ক'রে একটা বউও টেঁকাতে পারেনি। বড়ো বউ মারা গেছে অনেক দিন আগে। তার ছেলেপুলেরা সব বড়ো বড়ো। দুই ছেলের দু'জনই ডানলপে চাকরি করে, থাকেও সেখানে, মেয়েরও বিয়ে হ'য়ে গেছে। দ্বিতীয়বার বিয়ে করবার পরেই বাপকে ছেড়েছে তারা। অর্থাৎ প্রথম পক্ষের সন্তানদের সহ্য করতে পারেনি তাদের বিমাতা। দশ বছর ঘর ক'রে পাঁচটি সন্তান উপহার দিয়ে বছর দুই আগে কোলেরটিকে এক বছরের রেখে সেও গত হ'য়েছে।

এতোগুলোকে এখন সামলায় কে? তবু মেয়েটা সকলের বড়ো তাই রক্ষা। পিঠো-পিঠি দুই ভাইবোন দু'টিকে সেই সামলে রাখে। একজন গেছে মামাবাড়ি। সকলের ছোটটাকে নিয়েই পড়েছিলো মুশকিলে।

বয়েস যথেষ্ট হ'লেও সতীকান্তর দেহের ক্ষুধা মেটেনি। অথচ আটান্ন বছর বয়সে আবার একটা বিয়ে করারও লজ্জা আছে। এজন্য যতোবার ছেলের জন্য দেখেশুনে একটু সুশ্রী এবং ভদ্র চেহারার ঝি রেখেছে, নিজের দাবিটা স্পষ্ট ক'রে তুলে ধরতে না ধরতেই পালিয়েছে তারা। শেষে এই গজেন্দ্রগামিনী পূর্ণযুবতী কুঞ্জলতা।

প্রথম দিন অবশ্য একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলো। বাবুর জোড়াখাটের দুগ্ধফেননিভ শয্যায় পা উঠিয়ে শুতে লজ্জায় মরে গিয়েছিলো, আদর ক'রে বাবু বলে-ছিলেন, 'ভয় কি কুঞ্জ, এসো, কাছে এসো।' এই ব'লে টিপ ক'রে আলোটা নিবিয়ে দিয়েছিলো।

খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে শোয়াতে এসেই এই দশা। বাবুর অন্য ছেলেমেয়েরা অন্য ঘরে শুতো, শুধু বাবু শুতো ছোট খোকাকে নিয়ে। কুঞ্জ স্বপ্নেও ভাবেনি, এই ঘটনাটা ঘটবে সেদিন। এর আগে আর কোনো বাবু এমন নজরে দেখেনি তাকে। সেও বাবুদের এই নজরে দেখতে অভ্যস্ত নয়। মা তো মরে গেছে কবেই। অনাথ হ'য়েই তো বেড়ে উঠেছে। এর ওর দরজায় খেয়ে থেকেই মানুষ।

কোনো বাড়িতে কাজ করতে গেলে যারা জ্বালিয়েছে তারা বাড়ির বাবু নয়, বাবুদের চাকর। বড়ো হ'য়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই এই জ্বালায় জ্বলতে হ'য়েছে সারাক্ষণ। তারপর একদিন বুঝেছে এর হাত থেকে নিস্তার পাওয়া আর লাফিয়ে পর্বত ডিঙোনো দুইই সমান কঠিন। অনেক-গুলোর হাত থেকে বাঁচবার জন্য শেষে একজনকেই অবলম্বন করেছে হয়তো। হয়তো ভালোবাসাও হ'য়েছে, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই টেঁকেনি। লোকগুলো ভুলিয়ে-ভালিয়ে চেটেপুটে খেয়ে পালিয়ে গেছে। পালাক। বয়েস হ'তে হ'তে সেও কম চালাক হয়নি, বাড়ি বাড়ি কাজ ক'রে যা না রোজগার হ'য়েছে, ঘর ভাড়া নিয়ে স্বাধীনভাবে থেকে লাভ করেছে তার দ্বিগুণ।

কিন্তু তারা কারা? সাইকেল সারাইয়ের দোকানের ছেলে, জলের কলের মিস্ত্রী, রেস্তোরাঁর ছোকরা, বড়ো জোর কোনো বাবুর বাড়ির ড্রাইভার। ইচ্ছে হ'লে ঘরে ঢুকতে দিয়েছে, না হ'লে চেঁচিয়ে পড়শীকে ডেকে ঠেঙিয়ে তাড়িয়েছে। আপন ঘরে জোর হ'য়েছে তার। আর যেহেতু ভদ্রলোকের মেয়েদের মতো সবেতেই লজ্জায় প্রাণ যায়নি, দরকারমতো গালিগালাজের তুবড়ি ছুটিয়ে টিট রেখেছে কুত্তাগুলোকে

তার মধ্যে হঠাৎ এতো বড়ো একজন

বাবু, যে বাবু প্যাণ্ট কোট প'রে ওকালতি করতে যায়, চেহারা সুন্দর, টাকা আছে, ছবির মতো সাজানো বাড়িতে বাস করে—সে এমন হাত ধ'রে প্রায় উপড়ে নিল বিছানার উপর।

না, পুরুষের লোভে আবাল্য অভ্যস্ত কুঞ্জলতা চেঁচায়নি, শুধু অবাক হ'য়ে গিয়েছিলো। বাপের বয়সী লোকটাকে তৃপ্ত করতে হয়েছিল।

কিন্তু ঐ একদিনই। তারপর থেকে নির্দিষ্ট সময়ে আর পাঁচটা কাজের মতো এই কাজটাও করেছে সে। তার জন্য টাকাও পেয়েছে। খারাপও লাগেনি। কেন লাগবে? হাজার হোক একজন বাবু তো, মুচী মুদী মিস্ত্রীর চেয়ে ঢের ভালো। মনে মনে গর্ব হ'য়েছে কুঞ্জলতার, আপন জাতের লোক আর চোখে দেখেনি। আপন শ্রেণীর লোকেদের চেয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র মনে হ'য়েছে।

এর মধ্যে লক্ষ্মীর মা যখন একজন ব্যতিক্রম হয়ে এসে ঢুকলেন, সে মোটেই ভালো চোখে দেখে নি। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝেছিল এ তার সমগোত্র নয়, সমব্যবসায়ী নয়। পূর্বে কী ছিল না-ছিল এখন সে কথা অবান্তর, একটা মেয়ে হয়েই বোধ হয় মানুষটা গেরস্ত হয়ে গেছে। নিশ্চিন্ত ছিল সে।

কিন্তু আজ হাকিমের গাড়ি থেকে বাচ্চা মেয়েটাকে নামতে দেখেই তার চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। এও যে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে আর রুই-কাতলার সন্ধানে জাল ফেলে রেখেছে এ বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। এটা সে আগেই লক্ষ করেছিল, কালীচরণ আজকাল রোজই মেয়েটাকে কুঠিতে নিয়ে যাচ্ছে। তার মানে, এই করে করেই খেলিয়ে খেলিয়ে আনবার মতলব ছিল। তা মতলব তো প্রায় হাসিলই হল। শেষে মেয়েটাকে আঁকশি করে এত বড়ো ফলটাকে পেড়ে নিয়ে এল?

কী বজ্জাত স্ত্রীলোক! কী ভয়ঙ্কর শয়তান! লেখাপড়া জানা মেয়ে বলেই এত শয়তানি। এমন ধড়িবাজ! দেখতে-শুনতে এমন পঞ্চসতী, আর তলায় তলায় এই? ইনিয়ে বিনিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কত পত্রই না জানি পাঠিয়েছে মেয়েটার হাতে। কত ইঙ্গিতই না জানি দিয়েছে। এখন আবার মারছে মেয়েটাকে। মারবেই তো। দরজায় এসে যে শিকার ফসকে গেল। আসল কথাটা তো এই যে, আমি আসব ভিজা বেড়ালটি হয়ে, দেখেশুনে মনে হবে যেন একখানা শীতলপাটি, আর চারদিকে জাল ছড়িয়ে এমনিই সব রুই-কাতলা তুলে আনব।

হিংসায় জ্বলতে জ্বলতে সে শরীর নাচালো, বন্ধ ঘরের উদ্দেশে গলা খুলে জিবের ডগায় বিষ ছড়িয়ে বলল, 'কীরকম মা গো তুমি? ওইটুকু একটা মেয়েকে দিয়ে আর কত চাও? বুক পর্যন্ত উপহার নিয়ে বাড়ির দরজা পর্যন্ত যখন টেনে এনেছে, তখন ঘর পর্যন্তও আনতে পারবে। বলি, এই বস্তিতে বসে দেমাক না দেখিয়ে নিজের পাড়ায় যাও না। সত্যি বলছি বাপু, আমরা গরীব-গরবা লোক, অতশত মারপ্যাঁচ কষতে শিখিনি, ঘোমটার তলায় খেমটা নাচ ওই তোমাদের ভদ্দরলোকের মেয়েছেলেরই রীত।'

"আমিও তাই বলি', ভালোমানুষ কানী বুড়ী গলায় দরদ দিল, 'এখানে কি মানায় তোমার মতো মেয়ে? অমন বয়েস, অমন চেহারা, পুরুষের মাথা ঘুরতে তো দণ্ডও লাগবে না। তবে শোনো গল্প বলি, এই যে আমাকে এখন এমন দেখছ—'

'চুপ কর, কেবল বাজে কথা', কুঞ্জলতা এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিল।

বুড়ী বিকৃত মুখে ঝঙ্কার দিল, 'তুই থাম ছুঁড়ী, আর তোকে ছটা ঘুরিয়ে বলতে হবে না, বোঁচা থ্যাবড়া মুখ নিয়েই ভেবেছিলি, আমি কি হইনুরে, ফুইলা হইনু কোলা ব্যাঙ। এখন তাকিয়ে দেখ, ওই মেয়েব জুতোর শুকতলিও তোর চেয়ে সুন্দর।'

'ভালো হবে না কানী—', ঝামরে উঠল কুঞ্জলতা।

মধ্যস্থ হয়ে খোলা গলায় সখির মা এগিয়ে এল, 'নে, নে, এখন থাম তো তোরা, ঝগড়া ছাড়া কথা নেই।' সখির মায়ের সারা গায়ে ঘা হয়েছে। একটা গন্ধ ছড়ালো চারদিকে। কুঞ্জলতা নাকে কাপড় দিল। সঙ্গে সঙ্গে সখির মা ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, 'নাকে কাপড় দিলি যে বড়ো?'

সামনে নর্দমা থাকলে সবাই নাকে কাপড় দেয়।'

হি হি করে হেসে উঠলো দুটো উঠতি বয়সের মেয়ে। স্নান করতে করতে ভেজা কাপড়েই ছুটে এসেছে তারা, উদ্ধত কচি শরীর ফুটে উঠেছে ভেজা কাপড়ের তলা থেকে। অদূরে দাঁড়ানো কয়েকটা কৌতূহলী বেকার ছোকরা তাকিয়ে দেখছে তাদের।

হাসি শুনে সখির মা আরও খেপে গেল, গলার স্বর সপ্তমে তুলে অনর্গল অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগল সকলকে। কিন্তু সকলেরই শান দেওয়া জিব এবং সে জিবের নর্তন তাদের পক্ষে একটা রীতিমত স্নায়বিক সুখ। বুক চিতিয়ে সেই বাক্-যুদ্ধে সকলেই একে একে যোগ দিল এসে।

অল্প বয়সী মেয়ে দুটো কলকলিয়ে উঠল, 'কেন, কেন, কেন হাসব না, আমরা কি তোরটা খাই, না পরি?'

'আমারটা খাবি-পরবি কেন লো বারো-ভাতারী, তবে আর ভিজা কাপড়ে গতর দেখাচ্ছিস কাকে?'

'দেখাবই তো গতর থাকলেই গতর দেখায়। তোর মতো তো চিতৈ পিঠে নয় সকলে।'

'কী বললি? কী বললি হারামজাদী?'

'যা বলেছে ঠিকই বলেছে।' কুঞ্জলতার তেজালো গলা রা রা করল।

'ঠিকের মুখে কুরকুষ্ঠি হোক। যখন খসে খসে মরবি হারামজাদী, তখন বুঝবি ঠিক কাকে বলে।'

'তা বাপু কুষ্ঠির গপ্পো এবার খপ্পো হয়েছে সে কথা মিছে নয়।'

'নে, নে, তোর আর সাচা-মিছার বিচার করতে হবে না। নিজের বাপের ঠিকানা ঠিক কর গিয়ে।'

'কী বললি লো ছারকপালী, যত বড়ো মুখ না ততো বড়ো জিব! আমি কি তোর মতো আস্তাকুঁড়ের বাচ্চা?'

'না, তা আর কে বলেছে, একেবারে খাটে শুয়ে সোয়ামীর কোলে মাথা দিয়ে তোর মা যে তোকে বিইয়েছিল তা কি আর আমরা দেখি নি?'

কোমরে কাপড় গুঁজে লাফিয়ে ঝাঁটা হাতে নেমে এল অন্য পক্ষ, এ পক্ষও ততোধিক বেগে এগোল, গলার তীক্ষ্ণতায় একটা কাক কা কা করে উড়ে গেল, দেখতে দেখতে একটা ব্যারিকেড তৈরী হয়ে গেল সেখানে, দু' পক্ষ তৈরী হল, তারপর লেগে গেল ধুন্ধুমার কিল চড় ঘুষি লাথি চিৎকার, সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত জ্যাজ-সংগীতের সৃষ্টি হল সেখানে। ছেলেগুলো হাততালি দিয়ে এ পক্ষ ও পক্ষ দু' পক্ষকেই উস্কানি দিয়ে নারদ নারদ জপতে লাগল। বোঝা গেল পাকা দু' ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার মতো এখন এরা নিশ্চিন্ত। এই দুর্জয় ঝড়ে এরা কখনও ক্লান্ত হবে না, কখনও অসুখী হবে না, কখনও নিবৃত্ত হবে না। ওদের এই জীবনের এই একমাত্র চিত্তবিক্ষেপ। এরই নাম বস্তির জীবন।

দরজা-বন্ধ ঘরে মেয়ে বুকে নিয়ে লক্ষ্মীর মা থরথর করে কাঁপতে লাগলেন।

(ক্রমশ)

ঘরে বাইরে

একটি মহিলা পরিচালিত পঞ্চায়েত

ভারতবর্ষে মহিলা পরিচালিত পঞ্চায়েতের সংখ্যা একটি-দুটি করে বেড়ে চলেছে। গুজরাটের পিপারিয়া পঞ্চায়েত পথ-প্রদর্শকদের মধ্যে একটি। ভাবনগর বন্দর থেকে মন্দিরবহুল পালিতানার পথে পিপারিয়া ছোট্ট একটি গ্রাম। চারদিকে তার পাহাড়। খুব মস্ত পাহাড় নয়। কিন্তু সে পাহাড়ের নাম শত্রুঞ্জয়। সত্যই শত্রুঞ্জয়। সেই পাহাড়ের আড়ালে যে ছোট্ট গ্রাম তার ৫৬৮ মাত্র লোকসংখ্যা আর তার আয়তন ৩৩০৮ একর। সেখানে কেউ কারও শত্রু নয়। পরম মিত্রতায় তাদের গ্রামখানির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে।

শ্রীবৃদ্ধির জন্য যাঁরা প্রাণপণ পরিশ্রম করছেন, তাঁদের প্রতিনিধিমণ্ডলী সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত। পিপারিয়ার যে অতুল ঐশ্বর্য আছে, তাও নয়। আয়তন কম, তার উপর সেই আয়তনের ৮১২ একর জমিতে চাষ হয়, ২৭৮ একরে গোচারণ-ক্ষেত্র। ৪৫০টি গৃহপালিত পশু আছে অথচ চাষ-আবাদের পরই পশুপালন গ্রামবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। মেয়েরা ভাল উপার্জন করেন। তাঁদের উপার্জনের পথ কাথিওয়াড়ী এম্ব্রয়ডারী।

পিপারিয়ার পঞ্চায়েত সম্ভবত সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত পঞ্চায়েতের প্রথম। ১৯৬২ সালে গ্রামসভার মনোনয়ন ব্যবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে এই পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ পর্যন্ত চারটি ইলেকশন হয়েছে। সেই পঞ্চায়েতে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা পর্যন্ত করেননি। আশ্চর্য, প্রত্যেক মনোনয়নের আগে গ্রামবাসী একত্র হন। তাঁরা সাতটি সভ্য সম্বন্ধে মনস্থির করেন। যাঁরা ভাল কাজ দেখাতে পারেননি, তাঁদের স্থানে নূতন 'পঞ্চ' আসবার ব্যবস্থা হয়। তারপর বিনা দ্বিধায় তাঁদের বরণ করে পঞ্চায়েত পর্ব সমাধা হয়।

পিপারিয়ার বাঁধানো রাস্তাঘাট প্রশস্ত, সেখানে বিদ্যালয় আছে আর আছে পশুপালনের সমবায় সমিতি। সপ্ত 'পঞ্চ'-এর একটি মহিলা হরিজন। পশুপালক কোলি জাতের মেয়ে। দুজন ব্রাহ্মণ। সবাই একযোগে একপ্রাণে কাজ করেন। অফিস-ঘরের দেওয়ালে টাঙানো মস্ত ফটো, সেটি মহাত্মা গান্ধীর।

কেমন করে এই অজানা এক গ্রামে এমনভাবে মহিলা সমাজ স্বীকৃতি পেলেন ভাবলে অবাক হতে হয়। কয়েক বছর আগে তাঁদের পাশের শহর সোনগড়ে এক মহিলা শিবির হয়। সেই মহিলা শিবিরে পিপারিয়ার কয়েকটি মেয়ে ছিলেন। ফিরে এসে তাঁরা আলোচনা করতেন। তাই তো, মহিলারা তো কত কাজই করতে পারেন! গ্রামের উন্নতির প্রয়োজন। পানীয় জল চাই, স্বাস্থ্য চাই, সুযোগ চাই, পরিচ্ছন্নতা চাই। সবই মেয়েরা বুঝবেন ভাল। ক্রমশ প্রতি গ্রামবাসীর মুখে ঐ কথা, মনে ঐ চিন্তা ছড়িয়ে পড়লো। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায়, শীতের সকালে একই আলোচনা। তবে কি পঞ্চায়েত মেয়েদের হাতে তুলে দিলে মঙ্গল হবে?

পিপারিয়ার প্রত্যেক অধিবাসী একমত হয়ে তাই করলেন। বিধবা উজামবেন হলেন সরপঞ্চ। তাঁর ১২টি "গির" গরু আছে। যে গিরের সিংহ ভারতবর্ষের গৌরব তার গরুও কি কম? গরুর মালিকও শক্তিময়ী মহিলা। তাঁর অধিনায়কত্বে গ্রামে পানীয় জলের অভাব নেই, স্কুলের ছেলেমেয়ের জন্য দুগ্ধ-কেন্দ্র খোলা হয়েছে। শিশু ও মাতৃ-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান চলছে। বালওয়াড়ী হয়েছে। মেয়েদের সেলাই শেখার ব্যবস্থা, অম্বর চরকা-কেন্দ্র সবই এই মহিলা পঞ্চায়েতের সার্থক প্রচেষ্টার প্রমাণ।

পিপারিয়ার পাশাপাশি গ্রামগুলি যে একেবারে চুপ করে বসে আছে তাও নয়। তারা অবাক হয়ে লক্ষ করে যাচ্ছে এই নতুন ভাবধারার কাজকর্ম। মাঝে-মধ্যে ঠাট্টা-তামাশাও তারা করে। একবার একটি রাখাল-ছেলেকে পেয়ে পাশের গাঁয়ের কজন

বলেছিল, "ছি ছি, তোমরা কেমন মরদ! মেয়েদের মাথায় তুলে তাদের শাসনে কাবু হয়ে আছ!" রাখালবালক ছেলেমানুষ। শুনে সে মনমরা হয়ে ফিরলো গাঁয়ের মুরুব্বিদের মাঝে। তাঁরা তখন সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আরে তুমি ছেলেমানুষ, তাই উত্তর যোগায় নি। পাহাড়ের ওপারের মানুষগুলি নেহাত বোকা। তাদের বুঝিয়ে বলো, মায়ের চেয়ে বড় কেউ নেই। সন্তানের শাসনও যদি প্রয়োজন হয় তবে মা-ই করবেন।'

অল্পবিস্তর ঠাট্টা-তামাশা সত্ত্বেও প্রতিবেশী গ্রামবাসীরা মেনে নিয়েছেন পিপারিয়া একটি অসাধারণ গ্রাম আর তার উন্নতিও হয়েছে অসাধারণ। ছোট ছোট টালির চালের ঘরগুলি থেকে আর সকাল সন্ধ্যায় কালো বা ধূসর ধোঁয়া ওঠে না, কারণ বেশীর ভাগ গৃহে নূতন ধরনের চুলা। গ্রামের গোবর বা আবর্জনা এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত থাকে না। সারের জন্য যে গর্ত করা হয়েছে, সেখানে গোময় থেকে নিয়ে সব জঞ্জাল ময়লা জমানো হয়। তাতে করে যে গ্রাম পরিচ্ছন্ন থাকে মাত্র তাও নয়, পিপারিয়ার শস্যক্ষেত্র খুশিতে ঝলমল করে ওঠে। সারপত

উজামবেন-এর ৫৪ বছর বয়স, কিন্তু উৎসাহে উদ্যমে তিনি যুবতীকেও হার মানাতে পারেন। উজামবেনের সাথীরাও নিঃস্বার্থ কর্মী। উজামবেন যেমন নিজের ঘরের কয়েকটি গরুর সেবা করে সময় পান দেশের আর এক অধ্যায়ে আসতে, ঠিক তেমনি করে অন্যান্য "পঞ্চ"রাও শত গৃহ-কাজ সামলিয়ে চলে আসেন তাঁদের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র গ্রামের মঙ্গলসাধনে। হরিজন সভ্য সোনাবেন তো তাঁর চার বছরের ছেলেটিকে সঙ্গে করেই আসেন পঞ্চায়েতের অফিস-ঘরে। কার কাছে তাকে রেখে আসবেন ভাবনা করার চেয়ে এই বা মন্দ কি! আর ছেলে তো তাঁর কাজে বাধা দেয় না। বরং চোখ মেলে চেয়ে থাকে মায়ের কাজের পানে, ছজন অন্য পঞ্চের পানে। তারা কেউ মালধারী জাতের মেয়ে, কেউ বা ব্রাহ্মণ, কেউ বা আর কিছু। শিশু বোঝে তার মাও যেমন মা, এরাও তেমন মা। ভারতবর্ষের আগামী দিনের ভিত্ত গড়ে ওঠে তার ভিতর দিয়ে।

পিপারিয়ার মহিলা পঞ্চের মত আরও অনেক পঞ্চায়েত হয়েছে। মহিলাদের উদ্যমের অভাব নেই। উৎসাহ ও সহযোগিতা পেলে তারা পিপারিয়ার মত শত শত গ্রামকে নূতন পথে নিতে পরবেন সন্দেহ নেই। বরং পঞ্চায়েতের যা কাজ, তা গাঁয়ের মেয়েরাই পুরুষের চেয়ে বুঝবেন ভাল। স্বার্থ নিয়ে দ্বন্দ্ব বাধবার সম্ভাবনা কম। মেয়েদের সবার স্বার্থই যে সর্বজনীন কল্যাণ।

টুকিটাকি

মুরগিপালন একটি লাভজনক ব্যবসায় তো বটেই, ঘরের ব্যবহারের জন্য ছোট একটি মুরগিপালন ব্যবস্থায় গৃহস্থের দারুণ উপকার হয়। মুরগিপালন সম্বন্ধে আমরা পরান্তরে আলোচনা করবার আশা রাখি। আজ ডিম তাজা কিনা পরীক্ষার কথা ভাবছি। প্রতিবেশী অথবা জানাশুনো প্রতিষ্ঠান থেকে মুরগি বা হাঁসের ডিম কিনবার সুযোগ কজনেরই বা হয়। কাজেই ডিম চিনে কিনবার উপায় আমাদের জানতেই হবে।

যেসব ডিমের দোকানে কেনাবেচা বেশী, সেখান থেকে ডিম কেনা ভাল। তাতে পুরোনো, বাসী ডিম আপনার ভাগ্যে পড়বার ভাবনা কম। ডিমের দোকানে আজকাল বিভিন্ন দামের ও বিভিন্ন "grade"-এর ডিম থাকে। সামান্য বেশী দাম হলেও ভালটি কেনা দরকার।

ডিম কিনেই (১) আপনার যদি রেফ্রিজারেটর থাকে তাতে রাখবেন, নয়তো (২) অন্ধকার ঠাণ্ডা জায়গায় রাখবেন। বাজারে আজকাল জমানো কাগজের যে ডিম রাখবার খাঁজ করা আধার পাওয়া যায়, তাতে ডিম ভেঙে যাবার ভয় কম থাকে। প্ল্যাস্টিকেরও পাওয়া যায়, কিন্তু জমানো কাগজের মোলায়েম আধারকে বেশী উপযোগী মনে হয়।

একটি গভীর পাত্রে জল ভরে ডিম ফেললে একেবারে টাটকা ডিম তখনই ডুবে যাবে। অপেক্ষাকৃত পুরোনো ডিম ডুবতে দেরি হয়। যদি সেরকম ডিম কখনও ভুলক্রমে কেনা হয়ে যায়, তবে সেগুলি আগে খরচ করে ফেলবেন।

এবার বাতি দিয়ে ডিম পরীক্ষার কথা বলছি। সাধারণত ডিমের দোকানে একটি ইলেকট্রিক বালব থাকে, লক্ষ করে থাকবেন। কেরোসিনের ডিবে বা মোমবাতি হলেও কাজ চলে যাবে। আর লাগবে একটি শক্ত কাগজের বোর্ড। কাগজের বোর্ডে একটি গোল ফুটো করবেন। ফুটোটি ডিমের চেয়ে ছোট হবে। এবার ঐ বাতির আলোয় ভাল করে ডিমটি দেখুন। বোর্ডের ফুটোয় ডিমটি রাখবেন। একেবারে টাটকা ডিমের কুসুম খুব স্পষ্ট দেখা যাবে। কুসুম-এর সঙ্গে যে একটি হাওয়ার বুদবুদ মতন থাকে, সেটি থাকবে ছোট। পুরোনো ডিমে এই বুদবুদকে দেখাবে বড়, আর ডিম-এর সাদা অত স্বচ্ছ বা নির্মল দেখাবে না। আরও বেশী পুরোনো ডিমে কুসুমের গায়ে দাগ হয় ও কুসুম ঘোলাটে হয়। তারপর যত পুরোনো ডিম হবে, এই ঘোলাটে ভাব বাড়তে থাকবে। এমন কি, ডিমের সাদা ও কুসুম মিশে যাবে। আর ঐ যে ডিমের কুসুমের মাথায় (ডিমের যেদিকটা মোটা ও গোল সেদিকে থাকে) বুদবুদ সেটা ক্রমশ বড় হয়ে উঠবে। এইভাবে ডিম নিজেরা পরীক্ষা করে কিনলে গ্রীষ্মেও পচা ডিম কিনে ঠকে যাবার ভয় থাকবে না।

শ্রীমতী

বন্ধুত্ব

ঈশ্বর যার বন্ধু, সে কোনও দিন বন্ধুহীন হয় না।

—বলেছেন ইউরিপাইডিস

তবু ধর্মগ্রন্থেও মানুষে মানুষে সখ্যের সুখ্যাতি আছে প্রচুর। বাইবেলে আছে সখ্যের শতমুখ প্রশংসা। একলেজিয়াস-টিকাসে আছে—"পুরোনো বন্ধুকে পরিত্যাগ ক'রো না; পুরাতনের সঙ্গে নূতনের তুলনা হয় না। নূতন বন্ধু নূতন সুরা। পুরোনো সুরার মত পুরোনো বন্ধু পরম আনন্দদায়ক।"

বাইবেলে আরও আছে, "লোহা যেমন লোহার ধার বাড়ায়, বন্ধু তেমন বন্ধুর যশের কারণ হয়।"

সেজন্যই "বন্ধুকে আঘাত ক'রো না। বন্ধুর আঘাত বন্ধু ভুলে যেতে পারে না।"

কবিরাও কত কথা, কত উপদেশ দিয়েছেন। শেক্সপীয়র মনে করেছেন, "যে, তোমার বন্ধু হয়েছে, যার সখ্য স্বীকার সফল হয়েছে তার সঙ্গে তোমার আত্মার আত্মীয়তা লৌহবন্ধনে বেঁধে রাখ।"

কবি বাইরন বলেছেন, "সখ্য সেই প্রেম, যে প্রেমের পাখা নেই, উড়ে যায় না।"

"বন্ধুত্ব কি?" অলিভার গোল্ডস্মিথ সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন খুব ভাল, "দুটি মানুষের মধ্যে নিঃস্বার্থ আদান-প্রদান হচ্ছে বন্ধুত্ব।"

এমার্সন আরও চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন, "সখ্য মহান নদীর মত। যতই এগিয়ে যায় ততই গভীর হয়, মোহানার মুখে দিগন্ত-প্রসারী শক্তিতে অসীম হয়ে ওঠে তার গরিমা।"

ট্রামে বাসে

একটি সংবাদে শুনিলাম, অধিকাংশ ফ্রন্ট-নেতা নাকি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কৃষ্ণনগর উপ-নির্বাচনে পরাজয়ের কারণ "আত্মতুষ্টি"। বিশু খুড়ো বলিলেন—"তা জানি নে। তবে শুধু বলতে পারি যে, কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়াতে আত্মতুষ্টি অনিবার্য !!"

মেলবোর্ন-এ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নাকি বলিয়াছেন যে, গণতন্ত্রই ভারতের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পথ।—"হয়ত তাই। কিন্তু ট্রাফিক জ্যাম সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা না হলে সে পথে চলা দুষ্কর"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

প্রসঙ্গত অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"পথ কি, এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির মহাজনদের চলার যে পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই মহাজন আজ দুর্লভ। শ্রীমতী গান্ধী মহাজনের কথাটা না বলে ভালোই করেছেন বর্তমান পরিবেশে, বর্তমান অর্থে যাঁরা ভারতের মহাজন, তাঁদের পথ ধরে চলাও বিপজ্জনক !!"

কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রীজয়সুখলাল হাতী ইউনিয়ন নেতা এবং শিল্পপতিদের সঙ্গে আলোচনার পর মন্তব্য করিয়াছেন—আবহাওয়া যেন অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে।—"কিন্তু মুশকিল হল, আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বিশ্বাস স্থাপন করা কঠিন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

ক্রান্তি দল ও বাম কমিউনিস্ট সম্পর্কে 'বিতর্ক কি শেষ হয়েছে'—একটি সংবাদ-শিরোনামা। সহযাত্রী পালটা প্রশ্ন করেন—"তৈলাধারে পাত্র, না পাত্রাধারে তৈল সম্পর্কে বিতর্ক কি শেষ হয়েছে?"

শ্রী জয়সুখলাল হাতী রাইটার্স বিল্ডিং-এ শ্রম মন্ত্রকের দফতর পরিদর্শন-কালে এক গ্লাস জল চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তখন সংশ্লিষ্ট দফতরের বেয়ারা উপস্থিত ছিলেন না। অর্থ মন্ত্রকের বেয়ারাকে জল আনিতে বলিলে তিনি নাকি বলিয়াছেন, এ কাজ শ্রম মন্ত্রক দফতরের বেয়ারার। এই লইয়া বেশ একটা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। খুড়ো বলিলেন—"ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। বেয়ারাগণ নিশ্চয়ই কলকাতার লবণাক্ত জল মন্ত্রী মশাইকে এনে দিতে সমীহ বোধ করেছেন, তাঁদের বুদ্ধির তারিফ করতে হয় বইকি।"

সংবাদে প্রকাশ, ফ্রান্সের বিক্ষোভে সেখানকার সাহিত্যিকগণ নাকি অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁরা ফরাসী লেখকদের মেলামেশার জায়গা, বিদ্বজ্জন সমিতির সদর কার্যালয় দখল করিয়া রাখেন। তাঁরা বলেন—শ্রমিকের সঙ্গে সংহতির অভিব্যক্তি হিসাবে তাঁরা এই কাজ করিয়াছেন। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"আমি কিছুই বলি নে, শুধু বলি, সাধু সাবধান।"

সিনেমার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অন্য এক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"সগৌরব সপ্তাহ অনেক দেখেছি, এবার অগৌরব সপ্তাহের পালা !!"

দুইজন রোমান পণ্ডিতের মধ্যে নাকি যীশুর দৈহিক উচ্চতা লইয়া বিতর্ক চলিতেছে. একজনের মতে, ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি; অন্য জনের মতে, ৬ ফুট ২ ইঞ্চি।—"আমার মনে হয়, যে ক্রুশ-কাঠে যীশুকে বিদ্ধ করা হয়েছিল, তার সন্ধান পেলে হয়ত যীশুর উচ্চতার পরিমাপ সম্ভব হত, কিন্তু পণ্ডিতদ্বয় ক্রুশে বিশ্বাস করবেন না, মাঝখান থেকে বেচারী যীশুরে এতকালের সম্মান বুঝি আবার ক্রুশে বিদ্ধ হয় !!—মুখ বিকৃত করিয়া বলেন সহযাত্রী।

অভিযোগে প্রকাশ, রাজ্য সরকারের সরবরাহ বিভাগের ভোগ্যপণ্য শাখার সাড়ে চার শ' ফাইল ১৯৬৬ সাল হইতে নিখোঁজ। খুড়ো বলিলেন—"ভোগ্য সম্বন্ধে ভারতের মহান আদর্শ নিশ্চয়ই এতে ক্ষুণ্ণ হয় নি; উপনিষদের বাণী, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, ফাইল ফুঃ !!"

ফ্রান্সের শান্তি-বৈঠক প্রসঙ্গে বিশু খুড়ো বলিলেন — "হ্যানয়-মার্কিন শান্তি-বৈঠক পর পর ক'দিন চলেছে, হ্যানয় বলছেন, বিনা শর্তে বোমা বন্ধ কর, মার্কিন বলেন, দক্ষিণ ভিয়েতনামে অনুপ্রবেশ স্বীকার কর এবং বন্ধ কর। দু' পক্ষই এই দু'টি কথার বাইরে কিছু বলেন নি। এখন বাকী দু' পক্ষেরই এক দিন অকস্মাৎ ফ্রেঞ্চ-লীভ নেওয়া !!"

পাকিস্তান আমেরিকাকে পেশোয়ারের ঘাটি বন্ধ করার নির্দেশ দিয়াছেন—"এবং নিশ্চয়ই এই নির্দেশনামার কপি সীলমোহরাঙ্কিত হয়ে ইতিমধ্যে পিকিং-এ চলে গিয়েছে"—বলেন সহযাত্রী।

কৃষ্ণনগর উপ-নির্বাচন সম্পর্কে একটি সংবাদে পড়িলাম, একটি বুথ-এ ব্যালট বাক্সের একটি ভোটপত্রে দেখা যায়, ভোটজ্ঞাপন কোন চিহ্ন নাই, শুধু বাংলা এবং ইংরেজীতে লেখা আছে—মাও সে-তুং লাল সেলাম, চেয়ারম্যান মাও সে-তুং লং লীভ, জয় চায়না—। সহযাত্রী বলিলেন—"বয়স্কের ভোটাধিকার এবং প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ !!"

টোকিও হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে শুনিলাম, মৌমাছিবাহী একটি লরি উলটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দশ লক্ষ মৌমাছি যানবাহন অচল করিয়া দেয় এবং মৌমাছি-পালক, পুলিস, যাকে সামনে পাইয়াছে তাকেই হুল ফুটাইয়া দেয়। দুই ঘণ্টার পর একটি রানী মৌমাছির সাহায্যে তাদের আয়ত্তে আনা হয়।—"ও' মধু, ও' মধু, ও' মধু; রানী মৌমাছির হস্তক্ষেপে তেমন তেমন হুলও ভোঁতা হয়ে যায়, তা সে টোকিওর হোক বা টাকীর হোক"—বলেন সহযাত্রী।

চিত্র প্রদর্শনী

শ্রীমতী বিজয়া হিরেমথ সম্প্রতি অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারিতে এক বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। বাটিকের শাড়ি, চাদর, পরদা, রুমাল আজকাল বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বাটিক প্রথায় চিত্র রচনা বিষয়েও অনেকে নানা পরীক্ষা করে দেখেছেন, এবং ইতিপূর্বে এখানেও বিশেষ করে দিল্লীতে এ জাতীয় কাজ দেখার সুযোগ হয়েছে। তবে বাটিক প্রথা অবলম্বনে কেবলমাত্র বিচিত্র চিত্রসম্ভার প্রদর্শন করে সম্ভবত শ্রীমতী হিরেমথ এ বিষয়ে পথপ্রদর্শন করলেন। শিল্পী কলাবিদ্যার স্নাতক। সুদীর্ঘকাল কলকাতায় বাস করে ও বাটিকের প্রচলন দেখে তিনি আকৃষ্ট হন ও যত্ন সহকারে এ বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং সেই সঙ্গে এই প্রথায় উপযুক্ত চিত্র রচনা করার জন্য নানা পরীক্ষা করেন। তাঁর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় যে সার্থক হয়েছে তা প্রদর্শনীটি প্রদক্ষিণ করলেই বোঝা যায়। মাত্র কয়েক মাস পূর্বে তিনি লন্ডনে এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। বলা বাহুল্য, সেখানে তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেন। শিল্পীর প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর অংকনবিদ্যায় পারদর্শিতা। তার ওপর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়বস্তু অনুযায়ী তিনি বাটিকের মধ্য দিয়ে প্রয়োজনমত এক একটি রঙের স্তরভেদ সৃষ্টি করেছেন। প্রয়োগরীতি অতিশয় জটিল ও সূক্ষ্ম। ফলে, কারিগরী বিদ্যার গন্ডী অতিক্রম করে শিল্পীর রচনাগুলি যেন কলাজগতের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে মোম ব্যবহারের কৌশল ও রঙ প্রয়োগের গুণে কয়েকটি রচনায় যেন কাব্যের ছন্দবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়েছে। শিল্পীর রচনারীতি আধুনিক; কয়েক ক্ষেত্রে স্থিরচিত্রের বিশেষত্ব দেখা যায়— অর্থাৎ ক্লোজ-আপ লেন্সের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে —যেমন এস্কেপ। ধাবমান একটি লোকের অস্বাভাবিক বৃহৎ পদদ্বয় প্রথমেই চোখে পড়ে। শিল্পীর মোম ব্যবহাররীতির মধ্যে মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। নানা আঁকাবাঁকা রেখা (cracks) সৃষ্টি করে রচনাক্ষেত্রে তিনি অপূর্ব কারুকার্য তৈরি করেছেন। এই প্রসঙ্গে স্টর্মি ডে-র প্রথমেই নাম করা যায়। নীল রঙের তারতম্যের জন্য কেরালা বেল অনেকের মনে রেখাপাত করবে। অপরাপর রচনার মধ্যে ফিশার উইমেন ও আফটারনুন কোর উল্লেখযোগ্য।

ফিশার উইমেন —শ্রীমতী বিজয়া হিরেমথ

গ্যালারীর অপর পাশে শ্রীমান আনন্দরূপ চক্রবর্তীর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। আনন্দরূপের বয়স মাত্র ১৩, স্কুলের ছাত্র। শৈশব থেকেই তার অংকনবিদ্যার দিকে ঝোঁক থাকায় তার মাতাপিতা তাকে উৎসাহ দেন ও জনৈক যোগ্য শিল্পীর কাছে তার শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। প্রদর্শনীতে জলরঙ, প্যাস্টেল ও অন্যান্য মাধ্যমে আঁকা ২৩টি নিদর্শন দেখা যায়। রচনা দেখে বোঝা যায় যে, আনন্দরূপ নিষ্ঠা ও যত্নসহকারে অংকনবিদ্যা শিক্ষালাভ করছে। জলরঙে আঁকা ছবির মধ্যে ফার্মার্স ইন দি ফিল্ড, সী গাল্‌স এবং এ ফ্রেস্কো প্রশংসা দাবি করে। তবে বালক-শিল্পীর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় দুটি কোলাজ নিদর্শনের মধ্যে, বিশেষ করে আন্ডার দি ওয়াটারে শিল্পীর সৃজনশীল মনের সন্ধান পাই।

বালির ওপর বিভিন্ন রঙে আঁকা নিদর্শনও চোখে পড়ে। এই প্রসঙ্গে স্নেক চার্মার উল্লেখযোগ্য। তবে আনন্দরূপ এখন ছাত্র, বয়স অল্প; মনে হয় বিভিন্ন মাধ্যমে পরীক্ষা করার চেয়ে কোন নির্দিষ্ট মাধ্যমে ছবি আঁকাই তার পক্ষে এখন সমীচীন হবে।

স্নেক চার্মার —আনন্দরূপ চক্রবর্তী

*

শিল্পী বারীন দে-র প্রদর্শনীর আয়োজন

বাবুলাল —বারীন দে

হয় কলকাতা তথ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে কেন্দ্রের প্রদর্শনী-কক্ষে। তরুণ শিল্পী হিসাবে বারীন দে পরিচিত। অল্প সময়ের মধ্যেই কলকাতায় তিনি পর পর কয়েকটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন এবং সম্প্রতি দিল্লীতেও তাঁর কয়েকটি নির্বাচিত ছবি প্রদর্শিত হয়। এবারের প্রদর্শনীটি বৃহৎ। গত কয়েক বছরে রচিত ছবির মধ্য থেকে ৩৪টি নির্বাচিত রচনা এখানে দেখা যায়। পরিচিত ও কয়েকটি পুরানো ছবি ছাড়া প্রদর্শনীতে শিল্পীর নতুন রচনাও দেখলাম। যেমন ইন্‌ডাস্‌ট্রিয়াল রিভলিউশন। বর্তমান বৈজ্ঞানিক শিল্পযুগের প্রতীক হিসাবে রচিত ও সময়োপযোগী হলেও ছবিখানি কিন্তু রেখাভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। তবে শিল্পীর কয়েকটি প্রতিকৃতি রচনার নিদর্শন এখানে প্রথম চোখে পড়ল। এগুলি দেখে মনে হয়, প্রতিকৃতি রচনায় শিল্পীর দক্ষতা আছে। এই প্রসঙ্গে বাবুলাল-এর নাম করা যায়। অপরাপর রচনার মধ্যে দি বেডরুম, এক্সপ্লোশন ও দি লেক উল্লেখযোগ্য। বারীন দে নিষ্ঠাবান ও উৎসাহী শিল্পী। কপর্দক-হীন অবস্থায় একমাত্র অঙ্কনবিদ্যাকে পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করে তিনি শীঘ্রই আফগানিস্তান, ইরান ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্য দিয়ে পদব্রজে অথবা বিনামূল্যে, সুবিধামত অপরের গাড়িতে চেপে (hitch-hiking) লণ্ডনের পথে রওনা হচ্ছেন। উদ্দেশ্য, যেতে যেতে নানা স্থানে পথ-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা তথা ছবি বিক্রি করা ও মাত্র এই একটি উপায়েই বিদেশে থাকা-কালীন আত্মনির্ভর হওয়া। শিল্পীর উদ্দেশ্য মহৎ, তাঁর প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক।

✻

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস ভবনে সম্প্রতি একটি পুরানো শাড়ির স্থায়ী গ্যালারীর উদ্বোধন হয়ে গেল। মুর্শিদাবাদের সুবিখ্যাত ও প্রায় অধুনালুপ্ত বালুচর শাড়ি থেকে শুরু করে নানা দুর্লভ ও মূল্যবান বেনারসী, কাশ্মীরী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, ওড়িশী ও মাদ্রাজী শাড়ি গ্যালারীতে রুচিসম্মতভাবে সাজানো আছে। বিশেষভাবে চোখে পড়ে মুর্শিদাবাদ নবাব-পরিবারে ব্যবহৃত অপূর্ব বালুচর শাড়ি ও হাতির দাঁতের খড়ম। এককালে যত্ন সহকারে ব্যবহৃত হয়ে থাকলেও দেখে বোঝা যায় যে, প্রত্যেকটি শাড়িই পুরানো, সম্ভবত দেড়শ' থেকে দু' শ' বছর আগে কেনা। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, কারুকার্য ও রঙবৈচিত্র্য দেখে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে লেডি রানু মুখার্জি এগুলি সংগ্রহ করেন। শুধু তাই নয়, এই সঙ্গে মুখার্জি-পরিবারে বংশ-পরম্পরায় সঞ্চিত সংগ্রহসম্ভার থেকে গৃহীত কয়েকটি মূল্যবান শাড়িও এই গ্যালারীতে দেখা যায়। সর্বভারতীয় এই বিচিত্র ও মূল্যবান শাড়িসম্ভার অ্যাকা-ডেমির স্থায়ী গ্যালারীতে দান করে শ্রীমতী মুখার্জি সকলের ধন্যবাদভাজন হলেন। বেনারসী শাড়ির রঙ ও জরির বিচিত্র কারু-কার্যের পাশে বাংলা দেশের কাঁথা, ঢাকাই শাড়ির সূক্ষ্ম বুনানি ও বালুচর শাড়ির পাড় ও আঁচলের অপরূপ নকশা দেখে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। এইসঙ্গে গ্যালারীতে ভারতের নানা স্থান হতে সংগৃহীত পিতল, ঢোকরা ব্রঞ্জ, পোড়ামাটি ও হাতির দাঁতের নানা মূর্তি, প্রদীপ ও দীপাধারও দেখা যায়। বস্ত্র ও কারুশিল্পি-গণ যাতে শাড়ির বিভিন্ন অলংকরণ-পদ্ধতি ও নকশার প্রতিলিপি নিতে পারেন সেজন্য গ্যালারীর একপাশে উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, যে-কোন দর্শক গ্যালারীতে পদার্পণ করে ভারতের নানা জাতীয় শাড়ির সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করবেন।

✻

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারীতে সম্প্রতি নিখিল বঙ্গ কার্টুন চিত্রের দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। উদ্যোক্তা সমরজিৎ এবং উদ্বোধন করেন মেয়র শ্রীগোবিন্দ দে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি, আশা করি পাঠকগণ ক্ষমা করবেন।

কয়েক বছর আগে দিল্লিতে পশ্চিম ভারতের এক সুপরিচিত কার্টুন-শিল্পী তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি এক দিন বলেন যে, বাংলা দেশে প্রতিভাবান শিল্পীর অভাব নেই; তবে দুঃখের বিষয়, কেউই কার্টুন-চিত্র আঁকার বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন না। শিল্পী হয়ত অতিশয়োক্তি করেছিলেন, তবে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে যে কিছু সত্য ছিল, সে

রিকশওয়ালা —কে সি প্রাশর

বিষয়ে সন্দেহ নেই। এককালে ব্যাপক-ভাবে সামাজিক কার্টুন-চিত্রের প্রচলন করেন স্বর্গীয় গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে বিনয় বসুও "সচিত্র শিশির" মাধ্যমে সুনাম অর্জন করেন। রাজনৈতিক কার্টুন এঁকে যাঁরা আজ দেশ-বিদেশে খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশের জন্ম-স্থানই কেরালা। এঁরা সকলেই প্রথম থেকে কার্টুন-শিল্পকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। এখন অবশ্য বাংলা দেশেও রাজনৈতিক কার্টুন-শিল্পী দেখা যায় এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে পরিচিতও বটে। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তাঁদের মধ্যে কেউই কেরালার শিল্পীদের পর্যায়ে উঠতে পারেন নি। রাজনীতিক কার্টুন-শিল্পে কটি জিনিসের প্রয়োজন : বিদ্যা, রাজ-নৈতিক দূরদৃষ্টি, দেশ তথা বিশ্বের সম-কালীন রাজনীতিক পরিস্থিতি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি এবং স্বল্প রেখায় রাজনৈতিক জগতের নেতাদের অবিকল চেহারা ও চরিত্রচিত্রণের ক্ষমতা। বাংলা দেশের কার্টুন-শিল্পীদের মধ্যে অনেকের প্রথম গুণটি আছে, দ্বিতীয়টি অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় না—অর্থাৎ নেতাদের চেহারা তাঁরা সঠিকভাবে আঁকতে না পেরে ছবির পিঠে তাঁদের নাম লিখে দেন। ফলে কার্টুন-চিত্র উপভোগ্য হয় না। ব্যতিক্রম অবশ্য আছে, তবে তা নগণ্য। বলা বাহুল্য, কার্টুন-চিত্রে সংবাদপত্রের, বিশেষ করে সম্পাদক তথা বার্তা-সম্পাদকের দায়িত্ব গুরুতর। দৈনন্দিন রাজনৈতিক পরি-স্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কার্টুন-চিত্রের বিষয়বস্তুর নির্দেশ দেন। এ কথা সকলেই জানেন যে, খ্যাতনামা শঙ্করের কার্টুন-চিত্রের সাফল্যের মূলে ছিল হিন্দুস্থান টাইমস্-এর তৎকালীন

সুযোগ্য সম্পাদক পোথান জোসেফ-এর চিন্তাশক্তি ও দূরদৃষ্টি।

নিখিল বঙ্গ কার্টুন প্রদর্শনীতে রাজনৈতিক কার্টুনের চেয়ে সমাজের সমসাময়িক সমস্যামূলক কার্টুনের সংখ্যাই ছিল অধিক। তা হলেও প্রথমেই শৈল চক্রবর্তীর কার্টুন-চিত্র চোখে পড়ে। শিশুশিল্পী তথা সাহিত্যিক হিসাবে আজ পরিচিত হলেও এককালে 'মুসাফির' নামে তিনি কার্টুন-জগতে নাম করেছিলেন। প্রদর্শনীতে পরিবার পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গমাতা ও ক্রমবর্ধমান বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব অবলম্বনে রচিত কার্টুন সকলেরই ভাল লাগে। এই প্রসঙ্গে অমল ও চণ্ডী-কৃত কার্টুনগুলিও যুগোপযোগী ও উপভোগ্য। এঁদের সকলেরই অঙ্কনপদ্ধতি বলিষ্ঠ ও বিষয়বস্তুর মধ্যে চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। অপরাপর শিল্পীদের কাজের মধ্যে চিন্তাশক্তির সন্ধান পেলেও বলিষ্ঠ রেখা তথা প্রকাশভঙ্গিমার পরিচয় পাওয়া যায় না, অবশ্য *রেবতীমোহন ছাড়া। তা হলেও সুরজিৎ, সুফি, জিরি, পিজি ও কে ঘোষের* কার্টুন উল্লেখযোগ্য। একটি প্রশ্নই মনে জাগে : লো, নিকোলাস বেণ্টলি, শঙ্কর ও আবুর মত বাংলা দেশে কি একজন কার্টুন-শিল্পীরও কোনও দিন উদ্ভব হবে না?

✻

শিল্পী বিবেক সাহা ও কে সি প্রশেরও অ্যাকাডেমি ভবনে তাঁদের যুক্ত প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। বিবেক সাহা তরুণ—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি চিত্রকলারস গ্রহণ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষালাভ করেন ও ইতিপূর্বে কয়েকটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। শিল্পীর অঙ্কনপ্রথায় বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি আদৌ আঁকেন না বা তুলি ব্যবহার করেন না। তুলির পরিবর্তে তিনি জলরঙে আঙুলের ছাপ দিয়ে ছবির কাঠামোটুকু তৈরি করেন। হাতে রঙ লাগিয়ে কাগজে ছাপ দিলে যে রূপ ফুটে ওঠে, তাঁর অধিকাংশ ছবিতেই সেই রূপ দেখা যায়। তবে শিল্পীর কৃতিত্ব এই যে, প্রায় প্রত্যেক রচনাতেই তিনি স্বল্প ও প্রয়োজনবোধে অতি সংক্ষিপ্ত একটি বা বহু আঙুলের ছাপ মাধ্যমে বিভিন্ন অথচ সম্পূর্ণ বিষয়বস্তুটি প্রকাশ করেছেন। শিল্পীর একটি নিজস্ব ভাষা আছে, যেটি সকলের কাছে সহজবোধ্য। সংক্ষিপ্ততার জন্য ছবিগুলি দ্রুত ও অবলীলাক্রমে আঁকা স্কেচ বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে হাঙ্গার, জেস্ট ফর লাইফ, বিশেষ করে ডেস্টিটিউট-এর নাম করা যায়। সবগুলিই সমকালীন, বিষয়বস্তুর পাত্রপাত্রী, আমাদের অতি পরিচিত, শহরের রাস্তায় আমরা প্রায়ই তাদের দেখে থাকি। এইসঙ্গে প্রতিকৃতি-জাতীয় কয়েকটি ছবির কথাও উল্লেখ্য। যেমন, অ্যাগনি ও জিপসী গার্ল।

হাঙ্গার —বিবেক সাহা

প্রথমটির মধ্যে শিল্পী অভাব ও যন্ত্রণা-কাতর করুণ একখানি মুখমণ্ডল ও দ্বিতীয়টিতে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে জানি না, নতুন প্রথায় রচিত স্কেচ-জাতীয় এ-হেন ছবির সম্ভাবনা কতটুকু? নানা পরীক্ষা-মাধ্যমে শিল্পী যদি এই প্রথায় বৃহৎ আকারের চিত্রসম্ভারের সৃষ্টি করতে পারেন, তবেই তাঁর এই নতুন পদ্ধতির রচনার সার্থকতা থাকবে, নতুবা নয়।

শিল্পী কে সি প্রাশর হিমাচল প্রদেশের প্রাকৃতিক লীলাভূমি কুলুর বাসিন্দা। শিল্পী ভূতত্ত্ববিদ্‌, চিত্রকলা বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোন শিক্ষালাভ করেন নি। তবে শখ হিসাবে স্কেচ করতে ভালবাসেন। শহরের পথে চলতে চলতে যে বিভিন্ন দৃশ্য তাঁর ভাল লেগেছে সেগুলি তিনি ফেল্ট কলমে স্কেচ করেছেন। শিল্পীর রচনা অনেকটা ক্যালিগ্রাফি-জাতীয়। বলা বাহুল্য, পেশাগত শিল্পীর নৈপুণ্য তাঁর কাছে আশা করা ভুল হবে। তবে কয়েকটি স্কেচ ভাল লাগে, যেমন মিল, রিকশাওয়ালা, পণ্ড ও রিপেয়ার্স।

*

বিড়লা অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ তাঁদের দক্ষিণ কলকাতার গ্যালারীতে একটি পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। উদ্বোধন হয় রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে। প্রদর্শনীতে বাংলা দেশের গত ও সমসাময়িক কালের সাহিত্যিক তথা প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীদের মৌলিক পত্র থেকে শুরু করে কবিতা, গল্প ও উপন্যাস রচনা-কালীন অংশবিশেষের পাণ্ডুলিপি দেখা যায়। সেইসঙ্গে আছে ভারতের অন্যান্য ভাষার খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিকদের রচনার পাণ্ডুলিপির নিদর্শন। এটিই এই প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য। বাংলা পাণ্ডুলিপির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রচিত নানা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রুচিসম্মতভাবে প্রদর্শন করে বিড়লা অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ সকলের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

বাংলা বিভাগের প্রধান দ্রষ্টব্য গীতাঞ্জলির অবিকল প্রতিলিপি (photostat) ও কবির সঙ্গে চীন ও জাপান ভ্রমণকালে ক্ষিতি-মোহন সেন লিখিত অপ্রকাশিত রোজনামচা। এ ছাড়া বঙ্গ বিভাগ উপলক্ষে রচিত রবীন্দ্র-নাথের কবিতার অংশ, স্বর্ণকুমারী দেবী ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখিত পুরানো পত্র। এই সঙ্গে চোখে পড়ে 'প্রফুল্লকুমার সরকারের ১৯৩৩ সালে লিখিত একটি রচনার পাণ্ডুলিপি—বিশেষ করে তাঁর স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন ও টানা লেখা। সমকালীন সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রবোধকুমার সান্যালের হস্তলিপির ('মহাপ্রস্থানের পথে') সৌন্দর্য দেখে অনেকেই মুগ্ধ হবেন। আর একটি দ্রষ্টব্য বুদ্ধদেব বসুর "পাতা ঝরে যায়"-এর

১৯১৭-র ১২ই এপ্রিল সিয়ারসোল স্কুলের ছাত্র নজরুলের লেখা 'নীরব আশীষ' কবিতার পাণ্ডুলিপি

সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। সমকালীন অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়, নজরুল ইসলাম, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ও শৈলজা-নন্দ মুখোপাধ্যায়ের রচনার পাণ্ডুলিপি উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, লিখনপদ্ধতি ও হস্তলিপির ধারা দেখে প্রত্যেকের বিশি অথচ বিভিন্ন মানসের পরিচয় পাওয়া যায়

ভারতীয় অন্যান্য সাহিত্যিকদের মধ্যে পি এল দেশপাণ্ডে, এন এস ফাড়কে (মারাঠী), শঙ্কর কুরুপ ও কে পি কেশ মেনন (মালয়লাম), নানকি সিং (পাঞ্জাবী ভি রাঘবন (সংস্কৃত), কে ভি জগন্নাথ (তামিল), রয়াপ্রলু সুব্বারাও (তেলুগু ও নলিনীবালা দেবীর (অসমীয়া) রচনা পাণ্ডুলিপি চোখে পড়ে। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা না বলে পারলাম না। কর্তৃপ যথেষ্ট শ্রমস্বীকার করে বিভিন্ন ভাষ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছেন, সেজন্য তাঁ ধন্যবাদার্হ। তবে যে স্মরণীয় মারাঠ সাহিত্যিক সমগ্র বঙ্কিম ও শরৎচন্দ্রে রচনাবলী বাংলা থেকে মারাঠী ভাষ অনুবাদ করে সাহিত্যনিষ্ঠা ও বাং সাহিত্যপ্রীতির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রেখে গেছে প্রদর্শনীতে তাঁর এক লাইন পাণ্ডুলিপি কোথাও চোখে পড়ল না। আমি প্রে 'মামা ওয়ারেরকারের কথা বলা সে যাই হোক, এই বিরাট পাণ্ডুলি প্রদর্শনীর আয়োজন করায় বিড়লা অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ যে সকলে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন, সে বিষয়ে সন্দে নেই।

চিত্রপ্র

ইংরেজের জাতীয় চরিত্র প্রসঙ্গে

ডক্টর শশধর সিংহ

"Are the English human?" চল্লিশ বছরেরও উপরে, যখন আমি প্রথম ইংলণ্ডে যাই, ঐ সময়ে এই নামের ইংরেজীতে অনূদিত একখানা ওলন্দাজ বই প্রকাশিত হয়। এ বইয়ের চমকপ্রদ পদবী স্বতঃই আমাকে আকৃষ্ট করে, কিন্তু লেখায় কোন মৌলিক চিন্তা না থাকতে আমি নিরাশ হই।

পরে কয়েক বছরের মধ্যেই আরো দুইটি একই জাতীয় বইয়ের আবির্ভাব হয়। জার্মেনীতে ডিবেলিউস লেখেন তাঁর প্রণীত "England", আর ফ্রান্সে প্রকাশিত হয় "England's Crisis", আঁন্দ্রে সিগ্‌ফ্রিডের রচনা। মনে পড়ে, এগুলি নিয়ে খুব আলোচনার সূত্রপাত হয়, বিশেষভাবে শেষোক্তটি সম্বন্ধে।

অবশ্য, ডিবেলিউসের পুস্তকে পাণ্ডিত্যের অভাব ছিল না, যদিও সাধারণ পাঠকের পক্ষে, এ বই হয়ত কিঞ্চিৎ গুরু-পাঠ্য বলে মনে হতে পারে। অন্য দিকে, সিগ্‌ফ্রিডের লেখা ফরাসীসুলভ সুখপাঠ্য, ঝরঝরে। এই গ্রন্থের একটা বিশেষত্ব হল এই যে, এতে নানা তীক্ষ্ণ মন্তব্যের সমাবেশ ছিল এবং এ লেখার আরো গুণ হল—এইসব মন্তব্যের গুরুত্ব এখনও হ্রাস পায়নি।

সব সময়ে মনে রাখা কর্তব্য যে, অতীতে প্রায় সব বিদেশী লেখকই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, এঁরা কেউ কল্পনা করতে পারেন নি যে, কালক্রমে এই সাম্রাজ্যের অবসান ঘটতে পারে। সুতরাং, সহজেই বোধ্য যে, এঁদের মতামত ছিল মূলত বাহ্যিক, কোন গভীর চিন্তা বা বিশ্লেষণের উপর স্থাপিত নয়। সেইজন্য সাধারত তাঁদের আলোচনার উপর কোন দীর্ঘমেয়াদী গুরুত্ব আরোপ করা চলে না। বস্তুত, ইংরেজদের গুণগান করাই, এই ধরনের লেখার প্রধান সার্থকতা এমন কি অজুহাতও বলা যেতে পারে।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইংরেজ চরিত্রের একটা দিক হল আত্মরতি (narcissism) প্রসূত যদিও আত্মপ্রীতি অল্পবিস্তর সব জাতির মধ্যেই আছে, অর্থাৎ তা এদের একচেটিয়া বস্তু নয়। তথাপি, মানতেই হবে যে, ইংরেজের বর্তমান সংকট, অনেকাংশে, নিজেদের সম্বন্ধে সমালোচনা গ্রহণ করার অপারগতা না হলে ইংলণ্ডের অধুনাকার গভীর পরিস্থিতি হয়ত দেখা দিত না এবং সময়ে বর্তমান সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধান পাওয়া সম্ভব হত।

সমালোচনা সহ্য করার জাতীয় অক্ষমতার কারণ আর কিছু নয়—ব্রিটেনের সাম্রাজ্য। স্ট্র্যাচীর কথায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে, সাম্রাজ্যপ্রেম শ্রেণী ও নরনারী নির্বিশেষে ইংরেজ জাতির ধ্যানধারণা, "national purpose" হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেইজন্য, সর্বপর্যায়ের নরনারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষমতাবর্ধন, ধনদৌলতের প্রাচুর্য, গৌরব ও প্রতিপত্তি সম্বন্ধে একই মত পোষণ করত।

এই সম্পর্কে, একটা গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই থেকে সকলেই উপলব্ধি করবেন যে, অতীত গৌরব ও ক্ষমতার ছাপ ইংরেজ চরিত্রে এখনও বর্তমান আছে এবং এদের সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে।

১৯৩০ সাল ও তৎপরবর্তী কয়েক বছর হল "ক্ষুধা মিছিল" (Hunger March)-এর যুগ। চারিদিকে কর্মের অভাব ও ক্ষুধার তাড়না। সর্বত্র হাহাকার পড়ে গেছে। ঐ সময়ে আমার একটি স্বদেশীয় বন্ধু একদিন লণ্ডনের রাস্তায় যেতে যেতে একটি ভিক্ষুকের সম্মুখীন হলেন। তার পোশাক পরিচ্ছদ দেখে তাঁর মনে হল যে, সে এক ভদ্রসন্তান, দুর্দিনে পড়েছে। ফলত তাঁর দয়ার উদ্রেক হল এবং তিনি তাকে এক পেয়ালা চা খেতে আমন্ত্রণ করলেন। বিনা বাক্যব্যয়ে তক্ষুনি সে তাঁর সঙ্গে যেতে রাজী হল এবং খেয়ে-দেয়ে তাঁরা দুজনে যখন পার্ক ছেড়ে বার হচ্ছিলেন, তখন সেই ভিক্ষুকটি আর ভিক্ষুক নেই, তার চেহারা ও আচরণে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটেছে। তখন সে নিজের দারিদ্র্য ও অভুক্ত অবস্থার কথা ভুলে গিয়ে "Empire"-এর প্রসঙ্গ তুলল। এই কথা শুনেই তো আমার বন্ধুটি কেবল অবাক নয়, একেবারে নির্বাক হলেন!

জাতি হিসাবে ইংরেজদের আজ একই অবস্থা। আমেরিকার কাছ থেকে প্রভূত অর্থসাহায্য পাওয়ার দরুন এবং ফলে এদের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি অব্যাহত থাকাতে অনেক ইংরেজ এখনও মনে করে যে, এদের সাম্প্রতিক অবস্থা তাদের নিজেদেরই শক্তির পরিচায়ক।

অল্প কথায়, ইংরেজ জাতি এখনও ভুলতে পারছে না যে, বর্তমান পৃথিবীর অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এটা আর পূর্বের জগৎ নাই। বাহ্যত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামো এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে: এটা এখন কমনওয়েলথের আকার ধারণ করেছে সত্য, কিন্তু ক্ষমতার প্রেক্ষিতে এটা অন্তঃসারশূন্য। ব্রিটেন আর বৃহৎ শক্তিদের অন্যতম নয়, যদিও এইভাবে গণ্য হবার অভিলাষ ইংলণ্ড এখনও ছাড়তে পারেনি বা ছাড়তে পারার সম্বন্ধে জনমতের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনেরও সূচনা হয়নি।

মোদ্দা কথা হল এই যে, ব্রিটেন তার সাম্রাজ্য হারিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষমতাও কমতে বসেছে। অর্থাৎ, সে কেবল যে রাজনৈতিক প্রভাব হারিয়েছে তা নয়, তার আর্থিক ক্ষমতাও পড়ন্ত।

বলা বাহুল্য, এই পরিস্থিতির জন্য ব্রিটেনের রাজনৈতিক নেতারা অনেকাংশে দায়ী। ক্ষমতা নেই, অথচ ঠাট বজায় রাখা চাই। তা না হলে প্রতিরক্ষার জন্য ইংলণ্ডের পক্ষে এত ব্যয় বহন করার কি কারণ থাকতে পারে? "East of Suez" শোনায় ভাল, কিন্তু এই মনোভাব পোষণ করা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

তথাপি, নেতৃস্থানীয় অনেক ইংরেজ এখনও বিশ্বাস করেন যে, এঁদের ক্ষমতার বিশেষ কিছু পরিবর্তন ঘটেনি। এই অবস্থা যে পরমুখাপেক্ষী, এই চৈতন্য এখনও সকলের দ্বারা অনুভূত হয়নি।

এখন বেশ বুঝতে পারি, যুদ্ধোত্তর যুগে স্টালিন কেন "মার্শাল" সাহায্য নিতে আগ্রহী হননি দেশের ব্যাপক ক্ষতি ও দুরূহ অর্থনৈতিক অবস্থা সত্ত্বেও। তিনি সব সময় সচেতন ছিলেন যে, এই ধরনের সাহায্য নিলে পর রাশিয়ার জাতীয় মনের অবস্থা চিরকাল অপরিবর্তিত থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত তা দেশের প্রগতির পরিপন্থী হবে।

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যে কত দূরদর্শিতার

পরিচয় দিয়েছিলেন, তা সর্ব বিষয়ে রাশিয়ার বর্তমান অগ্রগতি সাক্ষ্য দেয়। জাতীয় সংহতি, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের উন্নয়ন এখনও দ্রুত তালে চলেছে। বস্তুত, বর্তমান জগতে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রচণ্ড প্রতাপ ও প্রভাব আজ রুশদের নিজেদেরই চেষ্টার ফল। জাপান ও য়ুরোপের অনেক রাষ্ট্র সম্বন্ধেও একই মন্তব্য করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশ সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। যুদ্ধোত্তর জগতে আমাদের খানিকটা যে উন্নতি হয়েছে, তা অস্বীকার করে লাভ নেই। সঙ্গে সঙ্গে এও জিজ্ঞাস্য, কেন আমাদের আশানুরূপ উন্নতি হয়নি?

এ বিষয়ে, আমাদের সঙ্গে ইংলণ্ডের সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য। ঐদেশের মত আমরাও পরমুখাপেক্ষী এবং এই নির্ভরশীলতার জন্যই আমাদের সামাজিক জীবন অপেক্ষাকৃত অচল। উপরন্তু, ইংরেজ নেতৃবৃন্দের মত আমাদের নেতারাও তাঁদের ভুয়ো প্রচারকার্য দ্বারা নিজেদের নিষ্ফলতা ঢাকতে সর্বসময়ে সচেষ্ট। বলা নিষ্প্রয়োজন, আত্মনির্ভরশীল হওয়া ছাড়া, দেশের মুক্তির কোন পথ নেই।

সে যাই হোক, ইংরেজদের বর্তমান সংকটের গভীরতা দেখে আমাদের আত্মপ্রসাদ লাভ করার কোন হেতু নাই। কারণ, এদের বিপর্যয় সত্ত্বেও ইংরেজ সমাজ এখনও সক্রিয় এবং তাদের ভবিষ্যৎ এই সক্রিয়তার উপরই স্থাপিত। ব্রিটিশ মনীষীরা, এমন কি রাজনৈতিক নেতারাও, তাঁদের সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ। এই হল তাঁদের ও আমাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তফাত।

মিঃ পেণ্ডেরেল মুন (Penderell Moon) তাঁর রচিত "Divide and Quit" পুস্তকে গান্ধী সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন যে, গান্ধী "had an infinite capacity for self-deception"। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের সমাজ সম্বন্ধেও এই উক্তি অল্পবিস্তর প্রযোজ্য।

ইংলণ্ডের সঙ্গে আমি অর্ধ-শতাব্দীরও উর্ধ্বে জড়িত ছিলাম, বিশেষভাবে গত মহাযুদ্ধের সময়। সুখে দুঃখে, ঐ দেশের নারী-পুরুষদের সঙ্গে পরিচিত হবার সম্যক সুযোগ আমি পেয়েছি। সুতরাং এ কথাটা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে, এদের জাতীয় গুণগুলি পেলে পর আমাদের দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হত। এদের দায়িত্বজ্ঞান, দেশের সংস্কৃতির জন্য প্রয়াস ও সামাজিক ঐক্যবোধ নানা দোষত্রুটি সত্ত্বেও ব্রিটেনকে বহু সংকটের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

আমাদের অনেকে কেবল সাহেবিয়ানা, অর্থাৎ এদের বাহ্যিক আদব-কায়দা অনুকরণ করতে শিখেছি, কিন্তু ইংরেজদের প্রকৃত গুণগুলি, মুখ্যত এদের জাতীয় সংযম, অনুসরণ করতে শিখিনি। চলন্ত নদীর মত ইংরেজের সামাজিক জীবন থেকে কালে সব আবর্জনা অন্তর্ধান করবে এবং সেখানে এক নির্মল স্রোত প্রবাহিত হতে শুরু করবে বলে আমার দৃঢ় প্রতীতি আছে।

এ কথা অবশ্যস্বীকার্য যে, সাম্রাজ্য হারাবার পর থেকে ব্রিটিশ সমাজে নানা প্রতিক্রিয়াশীল বিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছে। এইসব পরিবর্তনের কথা ভেবে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন এবং এইসব সমাজ-বিরোধী প্রতিক্রিয়াকে নানাভাবে প্রতিরোধ ও সংশোধন করার জন্য এঁরা সক্রিয় হয়েছেন। কর্মবিমুখতা, বিশেষত যুবসমাজে, একটা জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপরন্তু, ভোগবিলাসের স্পৃহাই এঁদের সামাজিক জীবনের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। আমাদের মত পরমুখাপেক্ষী হওয়াও এঁদের একটা জাতীয় রোগ বলা যেতে পারে।

সেইজন্য অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি য়ুরোপীয় আর্থিক গোষ্ঠী (European Economic Community)-তে যোগ দেবার জন্য এত উৎসুক। এঁদের চক্ষে এই প্রচেষ্টার অর্থনৈতিক দিকটা হল গৌণ। কারণ, এঁরা মনে করেন যে, য়ুরোপের সঙ্গে যুক্ত হলে ব্রিটিশ নরনারী নিজেদের য়ুরোপীয়দের সঙ্গে তুলনা করতে শিখবে এবং এইভাবে কঠিন শ্রম ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ব্রিটিশ সমাজের উন্নতি সাধিত হবে। তখন ক্রমে ব্যাপক য়ুরোপীয় প্রগতিই নিজেদের উন্নতির মানদণ্ড হবে।

বিশেষভাবে প্রণিধান করা কর্তব্য যে, ব্রিটিশরা রাজনৈতিক রেষারেষি থেকে অপেক্ষাকৃত মুক্ত। রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা অবশ্য এরা উপেক্ষা করেন না, কিন্তু আমাদের মত ব্রিটেনে সর্ব বিষয়ই রাজনীতিসাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়নি। সুতরাং দেশ উচ্ছন্ন গেলেও আমাদের অনেকে রাজনৈতিক প্রভাব ও ক্ষমতা বিস্তারের জন্য যত মত্ত, ক্রিয়াশীল কর্মে তত নয়।

অন্য দিকে, ব্রিটিশ সমাজও আমাদের সমাজের মত একটা বিভক্ত সমাজ। সেখানে ধনী-নির্ধনের প্রভেদ ক্রমবর্ধমান এবং এই প্রভেদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধনিকদের আধিপত্য সামাজিক উন্নয়নের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার স্থির বিশ্বাস যে, এই হল শ্রমিক সরকারের অপেক্ষাকৃত অসাফল্যের মূল ও প্রধান কারণ।

বলা নিষ্প্রয়োজন, সব দেশের ধনিক সম্প্রদায়ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও সহযোগ অভিলাষ করে; কারণ, বর্তমানের সামাজিক কাঠামো অটুট রাখতে হলে এই সহযোগ ও সাহায্য এঁদের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। বস্তুত ব্রিটেনে প্রকৃত সমাজকল্যাণ রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন করার প্রচেষ্টার মুখ্য পরিপন্থী হল আমেরিকা। ব্রিটিশ ধনিকরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুচর মাত্র।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক সরকার দ্বিধাবিভক্ত। এর প্রধান কারণ হল এই যে, নেতারা অনেকেই রক্ষণশীল নেতৃবৃন্দের মত উত্তর আমেরিকার সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ (special relationship) বজায় রাখা নীতির পরিপোষক। না হলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন বারংবার আমেরিকা সফরে যাবেন কেন? সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার্য যে, এইসব সফর বর্তমান আর্থিক সংকটের সঙ্গে অংশত সংশ্লিষ্ট, কিন্তু ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে রাজনৈতিক সম্বন্ধ সুদৃঢ় করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

অবশ্য এই নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা উপায় হবে ব্রিটেনের য়ুরোপীয় আর্থিক গোষ্ঠীতে যোগদান করা। দ্য গলের জীবিতাবস্থায় ও কতকাল তাঁর ক্ষমতা অপ্রতিহত থাকবে, এই আশাকে দুরাশা না বললেও সহজলভ্য নয় বলতে হবে।

প্রতিযোগিতা ও কন্টিনেন্টের আদর্শে উদ্ভূত হলে ইংরেজ চরিত্রের নৈতিক উন্নতি হবে বলে সন্দেহ নেই। এই বিশ্বাস যে অমূলক নয়, তা য়ুরোপীয় যুব সম্প্রদায়কে দেখলেই বোঝা যায়। প্রকৃতপক্ষে ইতিমধ্যেই য়ুরোপীয় নরনারী ক্রমে একটা য়ুরোপীয় "type" হয়ে গড়ে উঠছে। তাই তাদের বেশভূষা, চালচলন ও দৃষ্টিভঙ্গী আজ একই চেহারা ধারণ করছে। বলা বাহুল্য, এই বিবর্তন খুব আশাপ্রদ। "Great European"-এর আদর্শ বুঝি এতদিন পর বাস্তবে পরিণত হতে চলল। সুখের কথা এই যে, এই প্রকার বিবর্তন আমাদের দেশেও ঘটতে শুরু করেছে। সুতরাং আন্তর্জাতিকতা আজ কেবল মুখের কথা নয় বলে আমার মনে হয়। বিশ্বশান্তির পক্ষে এ যে কত বড় ঘটনা, তা শান্তিকামী সকলেই অনুভব করবেন।

যে-কোন কারণেই হোক, দ্য গলপন্থীরা মনে করেন যে, যতকাল পর্যন্ত ব্রিটেন ও আমেরিকা অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত থাকবে ততদিন ব্রিটেনকে য়ুরোপীয় আর্থিক গোষ্ঠী থেকে দূরে রাখা বাঞ্ছনীয়। বস্তুত এ'রা মনে করেন যে, ইংলণ্ড এ যাবং প্রকৃত য়ুরোপীয় শক্তি হিসাবে গড়ে উঠতে সমর্থ হয়নি। এ'দের মতে, অধুনা ইংলণ্ডের আন্তর্জাতিক ভূমিকা হল সর্ববিষয়ে মার্কিন প্রভাবের প্রসারণ; তাঁদের মতে, ইংলণ্ড হল যুক্তরাষ্ট্রের ট্রোজান ঘোড়া (Trojan horse) স্বরূপ।

কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইংলণ্ডের হতাশ হবার কোন কারণ নেই। সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংকট, বিশেষত গত নভেম্বর মাসের অবমূল্যায়নের ফলে ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নানা সামাজিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন এবং ভিয়েতনামেও মার্কিন-বিরোধী নীতির কথাও ভাবছেন। কারণ, আমেরিকার উপর নির্ভর করা এক কথা, কিন্তু মার্কিন আন্তর্জাতিক নীতি নির্বিবাদে অনুমোদন করা অন্য ব্যাপার। যথার্থত, এ কথা সব সময়েই মনে রাখা কর্তব্য যে, আমেরিকা অনেক বিষয়ে ইংলণ্ডকে সাহায্য করতে বাধ্য হয় নিজেরই দায়ে। সুতরাং ইংরেজরা একেবারে অসহায় নয়।

দ্য গলকে ব্রিটিশরা গাল দেয় সত্য, তথাপি এও সত্য যে, সর্বত্র য়ুরোপীয় লোকমত ক্রমেই মার্কিন রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রভাব বিস্তারের ঘোর বিরোধী হয়ে উঠছে, ইংলণ্ডেও। প্রকৃতপক্ষে, এই মনোভাব পৃথিবীব্যাপী গণমনোভাবের জয় দয়া করে ঘোষণা করছে। আমেরিকাও এই জগৎময় প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে একেবারে উদাসীন নয়। এবং সেখানেও যুদ্ধ ও বর্ণবিদ্বেষ-বিরোধী জনমত ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

"Man does not live by bread alone" এই উক্তির গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করবেন। একসময়ে আমেরিকা ভেবেছিল যে, টাকা দিলে সব করা যায়, কিন্তু এই বিশ্বাস যে কত অমূলক, তা আজ প্রমাণিত হতে চলেছে সর্বত্র। লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, আমেরিকার উপর বহুলভাবে নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপানী জনমত ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই জাগতিক প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত হয়ত বা মানবিক প্রতিক্রিয়া মাত্র বলে মনে হয়।

"Are the English human?" এই শীর্ষক একখানা ওলন্দাজ পুস্তককে উল্লেখ করে আজকের আলোচনার সূত্র-

পাত্ত করেছিলাম। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই পদবীটির অন্ত-র্নিহিত কথাটা কত অসত্য, তা ইংরেজদের সঙ্গে যাঁদের নিকট পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন। ইংরেজ চরিত্রের অনেক দিক, প্রধানত এদের জাতীয় ঔদ্ধত্য ও বর্ণবিদ্বেষ, বিদেশীদের বিশেষত এশিয়া ও আফ্রিকাবাসীদের, ভাল লাগে না সত্য, কিন্তু এরাও যে আমাদের মতই মানুষ এবং সুখে-দুঃখে এরাও যে হাসে ও কাঁদে, তার পরিচয় পেয়েছে গত মহাযুদ্ধের সময়। যখন এদের মধ্যে এমন অনেক জিনিস দেখেছি, যা সচরাচর লোকচক্ষে বড় পড়ে না।

এদের কর্তব্যনিষ্ঠা ও সহিষ্ণুতার সম্বন্ধে তো সবাই অবগত আছেন, কিন্তু যা আমার চোখে একটা প্রীতিকর অভিজ্ঞতা বলে মনে হয়েছে, তা হচ্ছে ছোটখাট ব্যাপারে এদের আচরণ। তখন বুঝতে শিখেছি যে, এদের আন্তরিকতা মূলত একটা জাতীয় সম্পত্তি এবং এই দিকটা উপলব্ধি করা সময়সাপেক্ষ। একবার কাউকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করলে পর এরা এই প্রীতির সম্বন্ধ অব্যাহত রাখে, তখন তাদের মধ্যে আপন-পর ভাব অন্তর্ধান করে।

এই সম্পর্কে দুএকটা অতি তুচ্ছ ঘটনা মনে পড়ে। গত মহাযুদ্ধে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানানোর দরুন Con-scientious Objectors' Tribunal আমাকে রেহাই দেয় এবং পড়ানোর কাজে বহাল করে। তখন আমি London County Council ও W E A (Workers Educational Association)-এর পক্ষ হয়ে পড়াতে শুরু করি। আমার বিষয়বস্তু ছিল Current Affairs, যাতে সব রকম জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনা করা চলত। সুখের কথা এই যে, এই ক্লাসগুলি খুব জনপ্রিয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং আমার ক্লাসে যোগদান করতেন অনেক প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষ।

একবার আমি শ্রমিক মেয়েদের জন্য বিকালবেলায় ক্লাস নিই। প্রথম হত ঘণ্টাখানেকের বক্তৃতা, তারপর মেয়েরা চা তৈরি করত এবং সর্বশেষে প্রশ্নোত্তরের পালা। এরা আগ্রহের সঙ্গে কত বিষয় জানতে চাইত, তা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। এদের মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত বয়স্কা ছাত্রী ছিলেন। খুব ইতস্তত করে একদিন তিনি আমাকে একটি ডিম উপহার দিলেন এবং বললেন যে, সেটা তাঁরই বাড়ির। আপত্তি করলে তিনি বললেন, "ডক্টর সিনহা, তুমি তো মাসে একটা মাত্র র‍্যাশনের ডিম পাও, তোমাকে এটা নিতেই হবেই, আমাদের মুরগী অনেক ডিম দেয়।" অগত্যা নিরুপায় হয়ে সেটাকে নিতেই হল।

আর একটা ওয়েলসের ঘটনা। সেখানে আমি মাস খানেক ছিলাম। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে W E A বক্তৃতার উপলক্ষ্যে। Swansea ছিল আমার প্রধান ঘাটি এবং সেখান থেকে আমি দক্ষিণ ও মধ্য ওয়েলসে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতাম। এরা জাতিতে ইংরেজ নয়, কিন্তু ওয়েলশ (Welsh)-দের জাতীয় চরিত্র ইংরেজদের দ্বারা বহুলভাবে প্রভাবিত হয়েছে। বস্তুত, বাইরের লোকের কাছে এরা ইংরেজদের মতই, যদিও উত্তর ওয়েলসে ওয়েলশ ভাষার ও ওয়েলশ ঐতিহ্যের প্রভাবই উল্লেখযোগ্য। অন্যত্র ইংরেজী ভাষাই হল এদের ভাষা, উচ্চারণের প্রভেদ সত্ত্বেও।

সেখানে বিভিন্ন শহরে বক্তৃতার পর আমি রাত্রিবাস করতাম স্থানীয় পাদ্রী বা প্রধান শিক্ষকের বাড়িতে। এঁদের সৌজন্য ও আতিথেয়তা জীবনে ভুলবার নয়।

সব শহরেই বক্তৃতায় খুব ভিড় হত। ওয়েলশ নরনারী-দের বক্তৃতা শোনবার ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল দেখে আশ্চর্য না হয়ে থাকতে পারিনি। উল্লেখযোগ্য, ওয়েলশ-দের অনেকে মনে করেন যে, তাঁরা এখনও ইংরেজ দাসত্ব থেকে ভুগছেন। এমন কি, বহু জাতীয়তাবাদী ওয়েলশ (Nationalist Welsh) আমার কাছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করতে এসেছেন।

আমি তাঁদের বলি যে, তাঁদের পক্ষে ইংরেজদের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকাই শ্রেয়। কারণ, আমার মতে, ছোট দেশের আর কোন স্বাধীন রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নাই। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ওয়েলশদের নানা অভিযোগ আছে জানি, কিন্তু এই-সবের সমাধান হবে ইংরেজদের সহযোগিতায়, বিশেষভাবে যখন এঁদের সামাজিক ব্যবধান অতি অল্প।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন আমি সমুদ্রতীরবর্তী টেনবি (Tenby) শহরে এসে উপস্থিত হলাম। সেখানে বিকালের বক্তৃতায় সভাপতিত্ব করবেন স্থানীয় পাদ্রী। বক্তৃতা শুনতে অনেক গণ্যমান্য লোক এসেছেন এবং বক্তৃতা-শেষে সভাপতি ঐ শহরের প্রধান সলিসিটারকে বক্তৃতার জন্য আমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে আমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু তাঁর মতে, এই বক্তৃতা ইংরেজ-বিরোধী বলে তিনি ধন্যবাদ দিতে অসম্মত হলেন।

তখন সভার পশ্চাৎ থেকে একটি সৈনিক দাঁড়িয়ে উঠে বলল যে, সে আমাকে ধন্যবাদ দিতে প্রস্তুত আছে। কারণ, আমার বক্তৃতায় আমি যা বলেছি, তার একটা কথাও অসত্য নয়। ফলে চারিদিকে হাততালি ও শোরগোলের সৃষ্টি হল। তখন সভাপতি বেচারী নিরুপায় হয়ে "God save the King" গাইতে শুরু করলেন। এই সমবেত সংগীতের মধ্যে সভা ভঙ্গ হল।

পরে সবাই এসে আমার চারদিকে ভিড় জমিয়ে দিল ও আমার বক্তৃতার খুব প্রশংসা করতে লাগল।

ইংলণ্ডে আমি বহু বছর কাটিয়েছি এবং ক্রমে প্রায় ব্রিটিশ সমাজের একজন হয়ে গিয়েছিলাম, কেবল বাহ্যত নয়, মনের দিক দিয়েও। এই পরিণতির একটা কারণ হতে পারে যে, ব্রিটিশ নরনারীর প্রতি আমার কোন হীনতার ভাব (inferiority complex) ছিল না। তাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল সহজ। আমি তাদের আমারই সমতুল্য বলে ধরে নিয়েছিলাম। সুতরাং এঁরাও সময়ে আমার সঙ্গে সহজ-ভাবে আচরণ করতে শিখেছিল। তাই এই আচরণ ছিল নিঃস্বার্থ, এর মধ্যে কোন arrière pensée ছিল না।

প্রতাপগড় দুর্গ

ঐতিহাসিক হত্যার মূক সাক্ষী

অরুণ সোম

শীতের রাত। রুক্ষ সাতপুরা পর্বতমালার বুকে হিমেল হাওয়ার প্রথম শিহরন লেগেছে। এই রাতে প্রতাপগড় দুর্গে একটি ঘরে একজন খর্বকায় ব্যক্তিকে অশান্ত পদচারণা করতে দেখা গেল। প্রদীপের ম্লান শিখায় লোকটির ছায়া দেওয়ালে দেওয়ালে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। পাহারারত প্রহরী ছাড়া দুর্গের অন্য সবাই ঘুমে অচেতন। ঘুম নেই আমাদের এই লোকটিরও চোখে।

দূরে হঠাৎ শৃগালের পাল ডেকে উঠল। রাত্রির তৃতীয় যাম অতিক্রান্ত। ভোর হতে দেরি নেই। তবু পদচারণার শেষ নেই লোকটির, শয্যাকক্ষের দিকে গেলেন না তিনি।

"এভাবে শান্তি কিনতে পারব না, এ অসম্ভব।" তাঁকে বলতে শোনা গেল। স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলেন বাইরের অন্ধকারের দিকে।

"শেষে বিজাপুর সুলতানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে? এক সাধারণ জায়গীরদার, এই হবে আমার পরিচয়? অসম্ভব!" শেষ কথাটি বিশেষ জোর দিয়ে উচ্চারণ করলেন তিনি।

"স্বাধীন মারাঠা-রাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তা হলে স্বপ্নই থেকে যাবে? না, না, তা হতেই পারে না। চাই না শান্তি। দাসত্ব-মূল্যে শান্তি কিনতে পারব না। কিন্তু মন্ত্রীরা যে বলছে সন্ধি করতে হবে। আফজল খাঁর মোকাবিলা করার মত শক্তি আমাদের নেই। বিজাপুরকে এখন চটান ঠিক হবে না। মোগলের মুখোমুখি হতে হলে বিজাপুরের সঙ্গে বন্ধুত্ব দরকার। সবই বুঝি, কিন্তু কি করব! কি করে বিশ্বাস করি এই আফজল খাঁকে? বেইমান বিশ্বাসঘাতক। এর মধ্যে দু-দুটো হত্যা করেছে বন্ধুভাবে আলোচনা করার ছল করে। আমাকেও নাকি ডাকতে চায় আলোচনা করার জন্য। তার মানে আমাকেও মারতে চায়। হে ভবানী, তুমি বলে দাও, আমি কি করব। কি করব!"

প্রদীপের শিখাগুলি ম্লান হতে হতে অন্তর্হিত হল। বাইরের অপেক্ষমাণ অন্ধকার এইবার হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। হঠাৎ সেই অন্ধকারে

আফজল খাঁর সমাধিসৌধ

শিবাজীর মূর্তি—জওহরলাল উদ্বোধন করেন

আবির্ভূতা হলেন এক জ্যোতির্ময়ী মূর্তি।

"ভয় নেই শিবা, আফজলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। তোমার জয়লাভ সুনিশ্চিত। কোন অমঙ্গল তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।"

মূর্তি অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিবাজী ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। "এ কি স্বপ্ন দেখলাম? এ কি সত্যি।"

ছুটে গেলেন দেবী ভবানীর মন্দিরে।

"আমি জানতাম মা, তুমি আমায় বাঁচাবে, আমি জানতাম।" চোখের জলে গাল ভিজল শিবাজীর।

সকালে জরুরী সভা আহ্বান করা হল। শিবাজী দৃঢ় পদক্ষেপে সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন।

"সভাসদগণ, আপনাদের পরামর্শমত বিজাপুরের সঙ্গে সন্ধি করতে আমি অক্ষম। সারা রাত চিন্তা করে আমি এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, স্বর্গে দাসত্ব করার চেয়ে নরকের স্বাধীনতা অধিক বাঞ্ছনীয়। অতএব আমার স্বাধীনতা আমি কোন মতেই খর্ব করতে পারব না। বিজাপুরের গোলাম হওয়ার আগে আমি মৃত্যু বরণ করব। এখন বলুন, আপনারা কি চান—যুদ্ধ, না শান্তি?"

"যুদ্ধ।" ফেটে পড়ল সভাকক্ষ মিলিত গর্জনে।

তখন শিবাজী বললেন, দেবী ভবানীর আশীর্বাদের কথা। প্রস্তুতি শুরু হল বিজাপুরের সঙ্গে মোকাবিলা করার।

শিবাজী খুঁটিয়ে নির্দেশ দিলেন, কিভাবে রাজ্য চালাতে হবে তাঁর অবর্তমানে। কোঙ্কনে মোরো ত্রিম্বক পিঙলে ও ঘাটে নেতাজী পালকরের কাছে নির্দেশ গেল অবিলম্বে তাঁদের বাহিনী নিয়ে প্রতাপগড়ের কাছাকাছি হাজির হওয়ার জন্য।

পরদিন এলেন কৃষ্ণাজী ভাস্কর। আফজল খাঁর দূত, আলোচনা করার আমন্ত্রণলিপি নিয়ে। শিবাজী তাঁকে সসম্ভ্রম অভ্যর্থনা জানালেন, অনুরোধ করলেন প্রতাপগড়ে রাত্রিবাস করার জন্য।

সে রাতেও ঘুম নেমেছিল প্রতাপগড়ের ঘরে ঘরে। কিন্তু ঘুম ছিল না শিবাজীর চোখে।

কার হাতের নাড়ায় ঘুম ভেঙে গেল কৃষ্ণাজী ভাস্করের।

"ভয় পাবেন না ভাস্করজী, আমি শিবাজী।" অন্ধকারে শোনা গেল শিবাজীর শান্ত কণ্ঠস্বর।

"এত রাতে?"

"ভাস্করজী, আপনি মারাঠী ব্রাহ্মণ, আমিও মারাঠী। আমার বিনীত অনুরোধ, মারাঠী হয়ে আর এক মারাঠীর সর্বনাশ সাধনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা নেবেন না। মারাঠী হয়ে মারাঠীকে বাঁচান। দয়া করে বলুন, আফজাল খাঁর আসল মতলব কি।"

"আমি দূত মাত্র, আমি কি করে তা জানব, বলুন।" কৃষ্ণাজীর উত্তর।

অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর কৃষ্ণাজী জানালেন যে, আফজল খাঁর মতলব ভাল নয়, শিবাজীকে বন্দী বা হত্যা করা হতে পারে।

"আমিও তাই ভেবেছিলাম। আপনাকে অসীম ধন্যবাদ। আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত করার জন্য দুঃখিত।" শিবাজী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন কৃষ্ণাজী ফিরে গেলেন। সঙ্গে শিবাজীর অতি চতুর অনুচর পন্থজী গোপীনাথ। গোপীনাথ আফজল খাঁকে জানালেন, শিবাজী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজী। তবে এক শর্তে। তাঁর নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। আফজল খাঁ সেই প্রতিশ্রুতি দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না।

গোপীনাথের পক্ষে পদস্থ সেনানীদের কাছ থেকে প্রকৃত খবর সংগ্রহ করা বিশেষ কঠিন হল না। আফজলের সঙ্গে শিবাজীর সাক্ষাতের পরিণাম তাঁর বন্দিত্ব কিংবা মৃত্যু!

আফজল খাঁ প্রতাপগড় থেকে প্রা বিশ মাইল দূরে ওয়াইতে ঘাঁটি গেড়ে ছিলেন। শিবাজী জানালেন, অত দূরে গিয়ে খাঁ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা তিনি সাহস পাচ্ছেন না। খাঁ সাহেব যা দয়া করে প্রতাপগড়ের আরও কাছে আসে তা হলে সাক্ষাৎ হতে পারে। আফজল নিজে উদ্দেশ্য লাভ সম্বন্ধে এত নিশ্চিন্ত ছিলে যে, তিনি তাতেই রাজী হলেন।

প্রতাপগড় থেকে ওয়াই পর্যন্ত ঘ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ কাটা হল। পথে দু' ধারে লুকিয়ে রইল শিবাজীর দুর্ধ মাওলি বাহিনীর নিপুণ তীরন্দাজে প্রতাপগড় দুর্গের পাদদেশে এক টি

মাথায় শামিয়ানা খাটান হল। দামী কার্পেট ও আসবাব দিয়ে সাজান।

সাক্ষাতের লগ্ন এগিয়ে এল। শিবাজী বিশেষভাবে তৈরী হলেন। কোনরকম ঝুঁকি তিনি নিতে চাননি। আঙ্গরাখার নীচে লোহার বর্ম, পাগড়ির নীচে ইস্পাতের টুপি, বাঁ হাতে বাঘনখ, আস্তিনের আড়ালে। ডান হাতের আস্তিনে সরু অত্যন্ত ধারাল ছুরি বিছুয়া। তাঁর সঙ্গে দুইজন অনুচর—জীব মাহালা ও শম্ভুজী কাভজী। দুজনেই তরোয়াল চালনায় নিপুণ। দুজনেরই কোমরে দুটি করে তরোয়াল ও হাতে ঢাল।

দুর্গ থেকে বেরোবার আগে তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ালেন রাজমাতা জীজাবাই, হাতে প্রসাদী ফুল। শিবাজীকে আশীর্বাদ জানালেন, "জয়োস্তু।" তারপর অনুচর দুজনকে বললেন. "এই প্রসাদী ফুল স্পর্শ করে শপথ করো যে, দেহে প্রাণ থাকতে শিবাকে ছেড়ে আসবে না।"

জীব ও শম্ভুজী শপথ করলেন, তাঁরা জীবিত থাকতে শিবাজীর অঙ্গ স্পর্শ করা কারুর পক্ষে সম্ভব হবে না।

ইতিমধ্যে আফজল খাঁ রওনা হয়েছেন সাক্ষাৎকারের জন্য। তাঁর সঙ্গে দু'জন সশস্ত্র সৈন্য ছাড়াও ছিলেন সৈয়দ বান্দা, দুর্ধর্ষ তরোয়ালবাজ। ব্রাহ্মণ দূত দুইজন গোপীনাথ ও কৃষ্ণাজীও ছিলেন সেই দলে।

আফজলই প্রথম পেঁছান। শামিয়ানার চাকচিক্য দেখে ভ্রূ কুঁচকে উঠল তাঁর।

"জায়গীরদারের ছেলের এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। এত খরচ করার কি দরকার ছিল।"

"এ সবই বিজাপুররাজের জন্য, এগুলি তাঁকেই উপহার দেওয়া হবে।" গোপীনাথ তাঁকে শান্ত করার জন্য বললেন।

এতক্ষণে শিবাজীও এসে পেঁছেছেন। কিন্তু সৈয়দ বান্দাকে দেখা মাত্র তিনি থমকে দাঁড়ালেন। "এই লোকটি এখানে থাকলে আমি খাঁ সাহেবের সঙ্গে দেখা করব না। ওকে এখনই সরাতে হবে।"

বান্দাকে স্থান ত্যাগ করতে বলা হল। শিবাজী শিবিরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। দু' দিকে সারি দিয়ে চারজন করে দাঁড়িয়ে প্রধান ব্যক্তি, দুজন সশস্ত্র অনুচর ও একজন দূত। বাইরে থেকে শিবাজীকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র দেখাচ্ছিল। যেন অনুতপ্ত বিদ্রোহী ক্ষমা প্রার্থনা করতে এসেছেন। অথচ আফজল খাঁর কোমরে ছোরা ও তরোয়াল দুটোই ছিল।

অনুচরেরা নীচে দাঁড়িয়ে রইল। শিবাজী সিঁড়ি দিয়ে ধীর পায়ে উঠতে লাগলেন। আফজল খাঁকে কুর্নিশ জানালেন। সিংহাসন থেকে উঠে আফজল খাঁ এগিয়ে এলেন শিবাজীকে আলিঙ্গন

আবদুল্লা বুরুজ

করার জন্য। শিবাজীর তুলনায় আফজল অনেক লম্বা। শিবাজীর মাথা তাঁর কাঁধ পর্যন্ত পেঁছাল না। হঠাৎ শিবাজীর কণ্ঠলগ্ন আফজলের বাঁ হাতের চাপে তাঁর শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হল। খাঁ সাহেবের ডান হাত ততক্ষণে কোমর থেকে দু' দিক

দুর্গের অভ্যন্তরে ভবানী মন্দিরের একাংশ

ধারাল ছোরাটি টেনে ওপরে উঠেছে সবেগে নীচে নামার জন্য। ক্ষণিকের জন্য শিবাজী হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু কি ঘটতে চলেছে তা উপলব্ধি করার সঙ্গে তাঁর বাঁ হাতের বাঘনখ বিদ্যুৎগতিতে আফজল খাঁর পেট চিরে দিল। তারপর ডান হাতের আস্তিন থেকে বিছুয়া বেরিয়ে আফজলের পাঁজরে আমূল বিদ্ধ হল। খাঁ সাহেবের শিথিল হস্ত থেকে নিজেকে মুক্ত করে শিবাজী ছুটে গেলেন নিজের অনুচরদের দিকে।

"বেইমানি! খুন করল। বাঁচাও, বাঁচাও।" আফজলের আর্তনাদ।

অনুচরেরা দু' দিক থেকে ছুটে এল, সৈয়দ বান্দা শিবাজীকে আক্রমণ করলেন। তাঁর দীর্ঘ তরবারি শিবাজীর মাথায় তীব্র বেগে নেমে এল। পাগড়িকে দু' ভাগ করে ভেতরের ইস্পাতের টুপিতে তা প্রতিহত হল। ততক্ষণে জীব মাহালার কাছ থেকে একটি তরোয়াল নিয়ে শিবাজী লড়তে শুরু করেছেন। পিছন থেকে মাহালা দ্বিতীয় তরবারির আঘাতে বান্দার ডান হাত ছিন্ন করলেন। বান্দা নিহত হলেন। কাভজী আফজল খাঁর মাথা কেটে বিজয়গর্বে নিয়ে গেলেন প্রতাপগড়ে।

গাইড আঙুলে দিয়ে দেখালেন, "ঐ যে বুরুজটা দেখছেন, ওটাই হল আবদুল্লা বুরুজ। ওরই নীচে আফজল খাঁর শির প্রোথিত আছে।"

প্রতাপগড় কেল্লার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বুরুজটি, ভবানী দেবীর মন্দির থেকে বেশী দূরে নয়। কেল্লা থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে বোম্বাইয়ের আফজল খাঁ স্মৃতিরক্ষা কমিটি একটি সমাধিস্তম্ভ তৈরি করেছেন, সেখানে আফজল খাঁ ও তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর সৈয়দ বান্দা পাশা-পাশি শায়িত।

বম্বে, পুনা ও সাতারা থেকে প্রতাপগড়ে মোটরে যাওয়া যায়। মহারাষ্ট্রের শৈলাবাস মহাবালেশ্বর থেকে বারো মাইল দূরে এই কেল্লাটি।

সেই ঐতিহাসিক হত্যার মূক সাক্ষী কত উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে একদিন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছিল। প্রায় দশ বছর আগে প্রতাপগড় আর একবার জেগেছিল। জওহরলাল নেহরু এসেছিলেন অশ্বারূঢ় শিবাজীর মূর্তির উদ্বোধন করতে।

ভয়াল রাড়তোণ্ডি নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে আজকের নিদ্রিত প্রতাপগড়ের দিকে। কথিত আছে, রাস্তা সংক্ষেপ করার জন্য ওই ভয়ঙ্কর পর্বতশিখর থেকে শিবাজী হস্তীকে চালনা করেছিলেন। ওই দুর্গম পথে পা ফেলতে গিয়ে হাতীর চোখেও জল এসেছিল। সেই থেকে পাহাড়টির নাম হয়েছে রাড়তোণ্ডি। সাতপুরা পর্বতমালার ওধারে সূর্য কখন অস্ত গিয়েছে, টের পাইনি। দুর্গের ভেতরে কাল ছায়া। হঠাৎ মনে হল, কারা যেন আশেপাশে চলে বেড়াচ্ছে। জোড়া জোড়া চোখ যেন আমার প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ করছে। মনে হল, প্রতাপগড় আবার জাগছে।

সর্বভারতীয় কবি সম্মেলন

'দেশ' পত্রিকার ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫ তারিখের সংখ্যায় শ্রী আশিস সান্যালের পত্রখানা প'ড়ে মনে হ'লো তিনি আমাকে 'সর্বভারতীয় কবিসম্মেলনে'র একজন সমর্থক হিশেবে চিহ্নিত করতে চান। আমি সম্প্রতি বাদানুবাদে অত্যন্ত অনিচ্ছুক হয়ে পড়েছি, তবু সত্যের খাতিরে এর প্রতিবাদ না-ক'রে পারছি না। সম্মেলনটির বিষয়ে আমি অণুমাত্র আগ্রহ কখনো অনুভব করিনি; আমার অনুপস্থিতি নিঃশব্দে তা ঘোষণা করেছে, আশা করা যায়। আমার এই অনীহার প্রথম কারণ: সভা, সমিতি, পরিষৎ, প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান ইত্যাদি যাবতীয় সাহিত্যসম্পর্কী আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা, যা, স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে, আমার বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে জ্যামিতিক হারে বর্ধমান। দ্বিতীয় কারণ— শ্রী আশিস সান্যাল। সম্মেলনের কিছুকাল পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার এমন একটি অবাঞ্ছিত সংযোগ ঘটে যে দ্বিতীয়বার তাঁর সম্মুখে আসার আকাঙ্ক্ষা আমার মন থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হ'য়ে যায়। ঘটনাটি উল্লেখের যোগ্য, কেননা প্রত্যেক সাহিত্যিকের জীবিকা ও বিবেক তার সঙ্গে জড়িত, এবং একটি সামাজিক অনাচারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই আমাকে এই চিঠিখানা লিখতে হচ্ছে।

কয়েক মাস আগে এক প্রভাতে 'Bengali Literature' নামে একটি ইংরেজি ভাষার পত্রিকা আমার হাতে আসে (বর্ষ ২, সংখ্যা ১, হেমন্ত, ১৯৬৭)। পত্রিকাটির প্রকাশস্থল কলকাতা, 'Editor-in-chief' পূর্বোক্ত শ্রী আশিস সান্যাল, 'উপদেষ্টামণ্ডলের মধ্যে আছেন সাতজন ব্যক্তি, তার মধ্যে দু-জন ডক্টরেট-ডিগ্রিধারী। চাঁদার হার মুদ্রিত হয়েছে বিলেতি, মার্কিন, ফরাশি, ইতালীয়, জর্মান, অস্ট্রেলীয়, বর্মি, মলয়েশীয়, থাই, ইস্রায়েলি, জাপানি ও সর্বশেষে ভারতীয়, পাকিস্তানি ও সিংহলি মুদ্রায়; আমার কপিটি রবার স্ট্যাম্পে 'Complimentary' ব'লে চিহ্নিত। এই পত্রিকা যা আপাতত বহুলভাবে সম্পাদিত ও বহু দেশে প্রচারিত, যার অবৈধ বিক্রয় নিবারণের জন্য রবার স্ট্যাম্প পর্যন্ত ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে, এবং যার অস্তিত্ব সুদ্ধ এ-যাবৎ আমার কাছে অস্পষ্ট ছিলো, তারই সূচিপত্রে অকস্মাৎ আমার নাম দেখতে পেয়ে আমি যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হলাম। পাতা উল্টে দেখি, 'To a Dog' নামে আমার একটি কবিতা মুদ্রিত হয়েছে— 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর অন্তর্ভুক্ত 'কোনো কুকুরের প্রতি' কবিতার অনুবাদ, অনুবাদক হিশেবে একজন মহিলার নাম দেখলাম। অনুবাদটি প'ড়ে আমার কেমন

আলোচনা

চেনা-চেনা লাগলো, হঠাৎ স্মরণে এলো যে আমি একবার ঐ কবিতাটি ইংরেজিতে ভাষান্তরিত করেছিলাম, মনে হ'লো সেই প্রথম অনুবাদের সঙ্গে দ্বিতীয় অনুবাদের সাদৃশ্য যেন বড্ড বেশি। কৌতূহলবশত আমার সম্পাদিত 'কবিতা'র শততম সংখ্যাটি খুলে, (বর্ষ ২৪, সংখ্যা ২, পৌষ ১৩৬৬, জানুয়ারি ১৯৬০) তুলনা করলাম; প্রতিটি পঙক্তি, প্রতিটি শব্দ অবিকল এক, 'বেঙ্গলি লিটারেচার'-এর নূতনত্ব প্রকাশ পেয়েছে শুধু কতিপয় মুদ্রাকরপ্রমাদে, দু-একটি শব্দের স্থানচ্যুতিতে, সর্বোপরি অনুবাদকের নামে। তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও কোথাও আমার প্রতি, বা 'কবিতা' পত্রিকার প্রতি, বা 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর প্রকাশকের প্রতি কোনো স্বীকৃতি পাওয়া গেলো না। রচনাটির লেখক ও অনুবাদক আমি, মূল ও অনুবাদের স্বত্বাধিকারী আমি; অথচ পূর্বে আমার অনুমতি নেয়া দূরে থাক, আমাকে কিছু জানানো হয়নি পর্যন্ত —বাহুল্যবোধে অর্থমূল্যের উল্লেখ করলাম না। অর্থাৎ, ঘটনাটি একটি বিশুদ্ধ সাহিত্যিক ডাকাতি, ইংরেজিতে যাকে 'পাইরেসি' বলে, তা-ই। আমি পত্রদ্বারা শ্রী সান্যালকে আমার প্রতিবাদ জানিয়েছিলুম, জানতে চেয়েছিলুম কেমন ক'রে অনুবাদকের নামের এই অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটলো, এবং আমার রচনার এই অপব্যবহারের জন্য তিনি কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে প্রস্তুত আছেন কিনা। যে-উত্তর পেলাম, তাতে স্পষ্ট ক'রে কিছুই বলা হয়নি, পরবর্তী সংখ্যায় 'ভ্রমসংশোধনে'র একটা দুর্বল আশ্বাস ছিলো, মনে পড়ে। সেই 'সংশোধন'টুকুও আজ পর্যন্ত ছাপা হয়েছে কিনা জানি না।

পরে আমি লক্ষ করি যে একজন 'প্রধান সম্পাদক' ও সাতজন 'উপদেষ্টা'র দ্বারা পরিচালিত এই পত্রিকার পরস্বাপহরণ শুধু একটি কবিতাতেই সীমাবদ্ধ নয়। 'Our Contributors' বিভাগে অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিষয়ে যা লেখা হয়েছে, তারও অনেকগুলো অংশ সাড়ে-সাত বৎসর পূর্বে প্রকাশিত 'কবিতা'র শততম সংখ্যার 'About our Contributors' বিভাগ থেকে উদ্ধৃত—অবশ্য উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার না-ক'রে, এবং মাঝে-মাঝে বানান ভুল বা ছাপার ভুল ঘটিয়ে। (পাঠকের কৌতূহল হলে 'বেঙ্গলি লিটারেচার'-এর উক্ত সংখ্যায় ১২১-১২৪ পৃষ্ঠা ও 'কবিতা'র শততম সংখ্যার প্রথম সংস্করণের ১৪৯ পৃষ্ঠা বা দ্বিতীয় সংস্করণের ৮৪ পৃষ্ঠা তুলনা করতে পারেন।) 'পরিচিতি' অংশে 'বেঙ্গলি লিটারেচার' আমার বিষয়ে মৌলিক রচনার প্রয়াসী হয়েছেন, এবং সেই সাত পঙক্তি গদ্যের মধ্যে আমার চোখে পড়েছে অন্তত ছটি বানান ভুল বা ছাপার ভুল, এবং একটি তথ্যের ভ্রান্তি; আমার জন্মের তারিখ বদলি হয়েছে ১৯০৮ থেকে ১৯০৪-এ।

'বেঙ্গলি লিটারেচার'-এর উক্ত সংখ্যায় আর-একটি বিস্ময় আছে—কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত রচিত যামিনী রায় বিষয়ে একটি দীর্ঘ ইংরেজি প্রবন্ধ। সুধীন্দ্রনাথ যেহেতু জীবিত নেই, এবং ধ'রে নেয়া যায় তাঁর অমর আত্মা কোনো মীডিয়মের সাহায্যে এটি বিশেষভাবে 'বেঙ্গলি লিটারেচার'-এর জন্য রচনা ক'রে দেননি, তাই প্রশ্ন ওঠে, প্রবন্ধটি পাওয়া গেলো কোথায়? এ কি তবে সেই প্রবন্ধ, যা বহুকাল পূর্বে 'লংম্যান্স মিসলেনিতে' বেরিয়েছিলো? আমি মিলিয়ে দেখার সুযোগ পাইনি, কিন্তু প'ড়ে আমার তা-ই মনে হ'লো; এবং, আমি যতদূর জানি, সুধীন্দ্রনাথ যামিনী রায় বিষয়ে দ্বিতীয় কোনো প্রবন্ধ লেখেননি। কিন্তু প্রবন্ধটি প্রাপ্তির উপায় বিষয়ে 'বেঙ্গলি লিটারেচার'-এ কোথাও কোনো উল্লেখ বা স্বীকৃতি নেই, এবং সুধীন্দ্রনাথের রচনাবলির সর্বস্বত্বের বর্তমান কর্মাধিকারী শ্রী শৌরীন্দ্রনাথ দত্তের অনুমতি যে নেয়া হয়নি, এবং তাঁর জ্ঞাতসারেও প্রবন্ধটি মুদ্রিত বা পুনর্মুদ্রিত হয়নি, সে-বিষয়েও আমি ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চিত।

কৌতুকের বিষয়, এই পত্রিকারই পৃষ্ঠদেশে, উদ্ধৃতিযোগ্য বাবু-ইংরেজিতে, ঘোষিত আছে :

'All rights are reserved. Any article, poem, short story, etc. may not be reproduced without the permission of the Editor-in-Chief, except for short extracts as quotations.'

দ্বিতীয় বাক্যটি ব্যাকরণ অনুসারে অর্থহীন হ'লেও এর অভিপ্রায় স্পষ্ট; কিন্তু পরিচালকবর্গের আইনের জ্ঞান যদি এতই সূক্ষ্ম, তাহ'লে তাঁরা মূল্য না-দিয়ে, অনুমতি না-নিয়ে, এমনকি সাধারণ সৌজন্য অনুসারে কৃতজ্ঞতা স্বীকার পর্যন্ত না-ক'রে, অন্যদের রচনা অপহরণ ও অপব্যবহার করেন কেমন ক'রে? অন্যের সম্পত্তি অপহরণ ক'রে, তারই উপর ছাপার অক্ষরে নিজের অধিকার ঘোষণা করা—এ-রকম একটি চমকপ্রদ প্রহসন এই হতভাগ্য বাংলাদেশেও বোধহয় ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। বস্তুত, যাকে বলা যেতে পারে মৌলিক নীতিজ্ঞান বা কাণ্ডজ্ঞান, তার

লেশমাত্র পরিচয় 'বেংগালি লিট্‌রেচার'-এ নেই; এতে প্রকাশ পাচ্ছে (অন্তত আমার আলোচ্য সংখ্যাটিতে) যুগপৎ অশিক্ষা ও দম্ভ, অপটুত্ব ও অসাধুতা, আলস্য ও স্বেচ্ছাচার, এবং সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের বিষয়ে এক শ্রদ্ধাহীন, প্রগল্‌ভ ও মূর্খ মনোভাব। এবং এই সাহিত্যিক অনাচারের জন্য প্রধানত যে-'প্রধান সম্পাদক'কে দায়ী করা যায়, তিনিই যেহেতু 'সর্বভারতীয় কবিসম্মেলনে'রও সম্পাদক, তাই ও-বিষয়ে আমি প্রথম থেকেই বীতস্পৃহ ও বীতশ্রদ্ধ ছিলুম।

এবং এইজন্যেই সম্মেলনের সংগে কোনোভাবেই যুক্ত থাকতে আমি রাজি হইনি, স্বাক্ষর করিনি তৎসংক্রান্ত আবেদনপত্রে, 'সভাপতি' বা 'প্রধান অতিথি'র পদ গ্রহণ করতে প্রবলভাবে অস্বীকার করেছিলুম। অথচ শুনেছি, কোনো-এক তারিখে আমার নাম 'সভাপতি' বা 'প্রধান অতিথি'রূপে প্রচারিত হয়েছিলো। শুনেছি মাত্র, চোখে দেখিনি; কেননা উদ্যোক্তারা কোনো প্রচারপত্র, অনুষ্ঠানলিপি বা নিমন্ত্রণপত্র আমাকে না-পাঠিয়ে অনুগৃহীত করেছিলেন। যে-স্মারকগ্রন্থ থেকে শ্রী সান্যাল আমার রচিত পঙক্তি ক'-টি উদ্ধৃত করেছেন, সেটিও আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি; আমার রচনাটি সেখানে সম্পূর্ণ ও অবিকৃতভাবে মুদ্রিত হয়েছে কিনা, সে-বিষয়েও আমি নিশ্চিত নই।

প্রশ্ন উঠতে পারে, যদি আমি সম্মেলন বিষয়ে এতই বিতৃষ্ণ ছিলাম, তাহ'লে স্মারক-গ্রন্থের জন্য রচনা পাঠিয়েছিলাম কেন। তার কারণ, আমি এখনো চক্ষুলজ্জা একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারিনি; উদ্যোক্তাদের বহু অনুরোধ উপেক্ষা করার পর এই সর্বশেষ প্রস্তাবে অগত্যা রাজি হয়েছিলাম। নিতান্তই দায়ে প'ড়ে, ঘোর অনিচ্ছা কাটিয়ে। আমার সেই ক্ষুদ্র রচনাটির প্রথম অংশে আমার বক্তব্য ছিলো যে কবিতা যেহেতু একজন ব্যক্তির দ্বারা নির্জনে রচিত সামগ্রী, তাই কবিতা ও কবিদের পক্ষে এই ধরনের সম্মেলন অবান্তর ও অর্থহীন। এ-পর্যন্ত লিখে আমার মনে হয়েছিলো যে (আমি যেহেতু বয়স্ক এবং উদ্যোক্তারা তরুণ) দু-একটা উৎসাহজনক বাক্য আমার বোধহয় বলা উচিত; শেষ পর্যন্ত শ্রী সান্যাল কর্তৃক উদ্ধৃত অংশটি জুড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এই অংশেরও ভাবার্থ এই যে কবিসম্মেলন ও অনুরূপ সব ঘটনার রাষ্ট্রিক বা সামাজিক উপযোগিতা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের দিক থেকে তা নিষ্প্রয়োজন। আমার সম্পূর্ণ রচনাটি যদি ছাপা হ'য়ে থাকে, তাহ'লে বুদ্ধিমান পাঠকের কাছে এই ইংগিত প্রতীয়মান হবে ব'লে আমার বিশ্বাস। সনাতন পাঠক যা বলেছেন ও বলতে চেয়েছেন, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তা সমর্থন করে; দিল্লিতে, এর্নাকুলমে ও কলকাতায় কয়েকটি সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলনে বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত থেকেছি ব'লেই, আমি এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে এগুলোর একমাত্র সম্ভবপর সার্থকতা রাজনৈতিক বা সামাজিক, সাহিত্যিক কখনোই নয়।

বুদ্ধদেব বসু

গান্ধীবাদ কি অচল?

লেখকের বক্তব্য

আমাদের সেযুগের সন্ত্রাসবাদীরা শ্রদ্ধেয়। তাঁদের অনেকেরই চরিত্রে এমন কিছু গুণ ছিল যাতে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতে হয়। কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিগত চরিত্র বিশ্লেষণ আমার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়।

রুশদেশেও উনিশ শতকে এক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। লেনিন নিজে মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী বিপ্লবী ছিলেন। কিন্তু দলগঠনের প্রশ্নে জার্মান মার্ক্সীয়দের সংগে তাঁর মতের পার্থক্য ছিল—এ বিষয়ে তাঁর চিন্তায় রুশদেশের সন্ত্রাসবাদীদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। লেনিনী দলসংগঠন গণতান্ত্রিক ছিল না। লেনিনের সমকালীন বিখ্যাত কম্যুনিস্ট নেতা রোজা লুক্সেমবুর্গ থেকে আরম্ভ করে অনেকেই এই সমালোচনা উচ্চারণ করে গেছেন। এদেশের কম্যুনিস্টরাও লেনিনেরই মতো পূর্বতন সন্ত্রাসবাদীদের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত। এ কথা আমি কারও প্রতি ব্যক্তিগত অশ্রদ্ধা থেকে বলছি না। বিশেষত বাম কম্যুনিস্টরা লেনিন ও মাওয়ের কাছ থেকেই দল সংগঠন সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা লাভ করেছেন।

কয়েকটি বিশেষ শর্ত পূর্ণ না হলে গণসমর্থন সত্ত্বেও কম্যুনিস্ট আন্দোলন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথে ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম হবে না একথা এংগেলস নিজেই শেষ জীবনে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে গিয়েছিলেন। আবার বিশেষ কিছু শর্ত পূর্ণ হলে অধিকাংশের সমর্থন ছাড়াও সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ক্ষমতালাভ সম্ভব এ কথা লেনিন বুঝতে পেরেছিলেন। এদেশে লেনিনী মতের এক অথবা একাধিক দল আছে, কিন্তু বিপ্লব সফল হবার শর্তগুলি অপূর্ণ।

লেনিনী দলের একাংশ গোপনীয়তা-রক্ষাকে সংগঠনের একান্ত প্রয়োজনীয় শর্ত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে লেনিনের লেখা থেকে আমার প্রবন্ধে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছি। উদ্ধৃতিটি পাওয়া যাবে মস্কো থেকে প্রকাশিত 'Lenin : Selected Works' গ্রন্থের প্রথম ভল্যুমে ১৯৪৭ সালের সংস্করণে ২৩৯-৪০ পৃষ্ঠায়। সম্পূর্ণ বাক্যটি এই :

"Secrecy is such a necessary condition for such an organization that all the other conditions (number and selection of members, functions, etc.) must all be subordinated to it."

বন্ধনীর ভিতরের খুঁটিনাটিতে সাধারণ পাঠকের কৌতূহল থাকার কথা নয় বলে মূল প্রবন্ধে সেটা উদ্ধৃত করি নি। এই খুঁটিনাটির ভিতর functions শব্দটি উল্লেখযোগ্য। লেনিনের উদ্ধৃতি ছাড়াও এই ধরণের সংগঠনের বৈশিষ্ট্য অনেকেই হয় তো কিছু কিছু জানেন। দলের কার্যাকার্য শুধু যে দল বহির্ভূত লোকের কাছ থেকে গোপন রাখা হয় তাই নয়, দলের কর্মীদের ভিতরও নানা বিষয়ে পারস্পরিক গোপনতারক্ষার বিধান আছে।

গোপনতারক্ষার সংগে অসত্য ভাষণের সম্পর্ক নিয়ে দু'য়েকটি কথা যোগ করা যেতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনে বহু বিষয়ে আমরা নীরব থাকি। সেই নীরবতা অনেক সময়ে সংগত। যে-কথা শুধু আমারই সে-কথা সবাইকে শোনাবার চেষ্টাও অনেক ক্ষেত্রে নিজের ও অপরের প্রতি অত্যাচার। কিন্তু যেখানে দশজনকে নিয়ে আমাদের কাজ সেখানে কেবল নীরবতা দ্বারা গোপনতা রক্ষা হয় না, বরং একটি সত্য গোপন করার জন্য প্রায়ই অপর একটি মিথ্যা সশব্দে ঘোষণা করতে হয়। তারপর এক মিথ্যার পিঠে আর এক মিথ্যা জুড়ে মিথ্যার বন্ধন বিস্তৃত হতে থাকে। মিথ্যাও একেবারে গোপন থাকে না; কাজেই মিথ্যার সংগে সংগে আসে পারস্পরিক অবিশ্বাস।

গোপনতায় অতি অভ্যস্ত একটি সংগঠনও তত বিপদের কারণ হয় না যতক্ষণ সমাজের মূল জীবনধারা থেকে তাকে যথা-সম্ভব বিচ্ছিন্ন রাখা যায়। উদাহরণত গুপ্ত পুলিশবাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু ঐ রকম একটি দল যখন সমাজের হর্তাকর্তা হয়ে বসে তখন সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

হিংসা অথবা মিথ্যা দ্বারা কখনও কিছু লাভ করা যায় না এমন নয়। হিংসা সদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে এবং সাময়িকভাবে সফলও হতে পারে। কিন্তু হিংসার সাফল্যেও বিপদের সম্ভাবনা আছে। যা-কিছু সফল হয় তারই উপর আমাদের আস্থা ও নির্ভরতা বাড়ে। সত্য ও অহিংসা একবার জয়ী হলে সত্য ও অহিংসাকেই আমরা আবারও গ্রহণ করতে চাই। হিংসা দ্বারা কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে হিংসাকেই আমরা আবারও আশ্রয় করতে চাই। মিথ্যা দ্বারা একের জয় হলে মিথ্যাকেই অপরেও অবলম্বন করতে চায়। কিন্তু হিংসা ও অহিংসা, মিথ্যা ও সত্যের ভিতর একটি মূল প্রভেদ আছে। সত্য ও অহিংসা এমন বস্তু যার প্রসারে সমাজের মঙ্গল। হিংসা ও মিথ্যার সাময়িক সাফল্য সম্ভব, কিন্তু তার প্রসারে সমাজের ক্ষতি। হিংসা, মিথ্যা অথবা অবিশ্বাসের সেই শক্তি সেই যে তাকে ভিত্তি করে কোনো সমাজ দাঁড়াতে পারে। কাজেই

হিংসা যেখানে সাময়িকভাবে সফল সেখানে তার সাফল্যজনিত প্রসারের বিপদ সম্বন্ধেই বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এই সতর্কবাণী উচ্চারণেই অহিংসাতত্ত্বের প্রধান মূল্য।

দয়া, প্রেম ইত্যাদিকে আমরা অনেকে ভাবালুতা বলি। কিন্তু হিংসার মতো মাদকতা কম বস্তুতেই আছে। দয়ায় আমরা মাত্রা ছাড়িয়ে যাব এ বিপদ তত নয় হিংসার উন্মাদনায় মাত্রা অতিক্রম করবার সম্ভাবনা যত। তাই মাত্রারক্ষার জন্য অহিংসাতত্ত্বের একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বিজ্ঞান ও সহযোগিতা সুস্থ সমাজের ভিত্তি। স্তালিনী বিভীষিকাকে কেউ কেউ সমর্থন করেছেন এই বলে যে, সোভিয়েত দেশের উন্নতির জন্য এর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এ ধারণা ভুল। এর বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। স্তালিন ক্ষমতায় আসবার পর কম্যুনিস্ট দলের কেন্দ্রীয় সমিতির অধিকাংশ সদস্যকে মিথ্যা অভিযোগে হত্যা করা হয়। সোভিয়েত দেশের উন্নতির জন্য এই মিথ্যার প্রয়োজন ছিল না। প্রতিবেশী দেশ জার্মানির মতোই সোভিয়েত দেশেরও উন্নতির মূলে আছে বিজ্ঞান ও শ্রম।

গান্ধীজী আজ আমাদের নিন্দা স্তুতির ঊর্ধ্বে। তাঁকে আমাদের স্মরণ করতে হয় তাঁর প্রয়োজনে নয়, আমাদেরই আজকের জীবনের প্রয়োজনে; তাঁর সকল উক্তিই সমান গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু গঠনমূলক দৃষ্টি ও কর্ম ছাড়া বাংলার আজ কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

ইতি
অম্লান দত্ত
কলকাতা-৫০

অটোমেশন প্রসঙ্গে

গত ১৩ এপ্রিল ১৯৬৮ সংখ্যায় 'বিশ্বকর্মা' লিখিত 'লক্ষ্মীর কৃপালাভঃ বাঙালীর সাধনা' পড়লাম। লেখক তাঁর লেখায় অটোমেশন-বিরোধীদের সম্বন্ধে কতগুলি অযৌক্তিক উক্তি করেছেন। ভারতবর্ষে কি ধরনের অটোমেশন চালু হচ্ছে ও তার ফলাফল কি, সে সম্বন্ধে লেখকের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ মনে হল। শুধুমাত্র শ্রীঅন্নপূর্ণা মিলটি দেখেই তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের অটোমেশনের উপরে মন্তব্য করেছেন। অ্যান্টি-অটোমেশন তাত্ত্বিকদের উত্তর দেবার পূর্বে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত পর্যালোচনার প্রয়োজন ছিল।

আধুনিকীকরণে অবহেলা অটোমেশন-বিরোধী আন্দোলনের লক্ষ্য নয়। যে ধরনের যন্ত্র বিদেশ থেকে বিভিন্ন অফিসে আমদানি করা হচ্ছে, বর্তমান অনুন্নত ভারতে তার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না সেটাই প্রশ্ন। অটোমেশনের যুগে প্রবেশের পূর্বে শিল্প এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কতগুলি স্তর অতিক্রম করার প্রয়োজন। ভারতবর্ষ কি তার প্রাথমিক স্তরই অতিক্রম করতে পেরেছে? পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি এত উন্নত হওয়া সত্ত্বেও সেখানে অটোমেশন সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, আর আমাদের অনুন্নত ভারতবর্ষে এ যে এক প্রধানতম সমস্যা হবে, এতে আর সন্দেহ কী। অটোমেশনের ফলে হাজার হাজার লোক কর্মচ্যুত হবে এবং নতুন নিয়োগ বন্ধ হবে। উদাহরণস্বরূপ ক্যালটেক্স, রেলওয়ে ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে ইতিমধ্যেই ছাঁটাই শুরু হয়েছে অটোমেশনের ফলে। যেখানে কৃষি অনুন্নত, গবেষণাগারগুলি অবহেলিত, এমনকি গ্রামে গ্রামে সামান্য জল সরবরাহের যন্ত্রপাতি পর্যন্ত নেই, সেখানে সেইসব যন্ত্রের প্রাথমিক চাহিদাকে নস্যাৎ করে বিভিন্ন অফিসে যন্ত্রের আমদানি করে মনুষ্যশক্তিকে পঙ্গু করার কি যুক্তি থাকতে পারে?

অনুন্নত, বেকার সমস্যাপীড়িত দরিদ্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তো দূরের কথা, উন্নত পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে অটোমেশন কি বিপদের সূচনা করেছে এবং সেখানে কি হারে কর্মসংকোচন হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, লেখক 'বিশ্বকর্মা' যদি জানতে চান, তা হলে তাঁকে সংখ্যাতত্ত্ব দিয়েও জানাতে পারি। ইলেকট্রনিক কম্পিউটার যাঁরা আবিষ্কার করেছেন, তাঁরাই বলেছেন যে, এই যন্ত্রের প্রধান কাজই হল মানুষকে ছাঁটাই করা।

লেখক রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোন্ অবস্থায় কোন্ ধরনের যন্ত্রীকরণের কথা বলেছিলেন তা একটু বোঝা দরকার। রবীন্দ্রনাথ সাধারণ যন্ত্র সম্বন্ধে উক্তি করেছিলেন; কারণ, তখন এই ধরনের ইলেকট্রনিক কম্পিউটার আবিষ্কারই হয় নি। আমি বহু বিখ্যাত ব্যক্তির উক্তি উদ্ধৃত করতে পারি, যাঁরা ভারতবর্ষে অটোমেশনের বিরোধিতা করছেন। পরিশেষে বলি, রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের ভারতবর্ষ স্বপ্নই রয়ে গেছে। স্বাধীনতার বিশ বছর পরেও এই লক্ষ লক্ষ বেকার ও দারিদ্র্যের দেশ রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেছিলেন কি?

এ. মুখার্জি
জলপাইগুড়ি

লেখকের বক্তব্য

প্রথমেই শ্রীমুখার্জির দুটি কথার উত্তর দিয়ে নিই।

অটোমেশনের জন্য রেলওয়ে একটি কর্মীকেও বরখাস্ত করেন নি এবং করার কোনো পরিকল্পনাও নেই। এ বিষয়ে পূর্ব রেলওয়ের সাময়িক পত্রিকা 'যোগাযোগ'-এর মার্চ সংখ্যায় একটি উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ করছি :—"...কোন কোন মহলে অটোমেশনের ব্যাপারে যে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে তা অন্তত রেলের ক্ষেত্রে আদৌ প্রযোজ্য নয়। কারণ, রেল কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত আশ্বাস দিয়েছেন যে, কম্প্যুটার যন্ত্র স্থাপনের ফলে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কোন রেল-কর্মীর চাকুরির ব্যাপারে কোন ক্ষতি হবে না। রেল-কর্মীদের নিজ বিভাগ ছাড়া অন্যান্য বিভাগের কাজে নিয়োগ করা হলেও তাঁদের সম্মতি ছাড়া বাইরে কোনখানে স্থানান্তরিত করা হবে না।"

ক্যালটেক্স কোম্পানীর ব্যাপারটা একটু স্বতন্ত্র। ভারত সরকারের নিজস্ব উদ্যোগ ইণ্ডিয়ান অয়েল করপোরেশনের সম্প্রসারণের ফলে ভারতে অবস্থিত বিদেশী অয়েল কোম্পানীদের ব্যবসাতে মন্দা এসে পড়াতে ১৯৬৬ সালে ক্যালটেক্স প্রথমত কলকাতা থেকে পাততাড়ি অনেকখানি গোটাবার ব্যবস্থা করেন। সেই পরিকল্পনা অনুসারে কলকাতার মেইন অফিস বোম্বাইয়ে স্থানান্তরিত করেন। একই সঙ্গে তাঁরা হিসাবরক্ষার উৎকর্ষের জন্য ইলেকট্রনিক কম্পিউটার চালু করার ব্যবস্থা করাতে জনমতের চাপটা ওই অটোমেশনের বিরুদ্ধেই পড়েছিল। যাই হোক, কলকাতা অফিসের শতাধিক কর্মীর একজনও নাকি বরখাস্ত হন নি। কর্মীদের ইউনিয়ন থেকে আমাকে বললেন যে, কর্মীদের হাতে কোনো কাজ নেই, তাঁরা এক বছর সাত মাস ধরে বসে বসে মাইনে পেয়ে যাচ্ছেন। ক্যালটেক্সের কলকাতার কর্তৃপক্ষ বললেন যে, বোম্বাই হাই কোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি

শ্রীগোখলেকে নিয়ে একটি তদন্ত কমিশন বসেছে। সেই কমিশনের কাজ হলো, বিভিন্ন অফিসে কর্মী-সংখ্যা উদ্বৃত্ত আছে কিনা তার অনুসন্ধান করা। ক্যালটেক্সের কেস-টিও তিনি বিচার করবেন। কিন্তু বর্তমান কর্মীদের কাউকে নাকি বরখাস্ত করা হবে না।

অতএব, শ্রীমুখার্জির ধারণা দুই ক্ষেত্রেই ভুল বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু এই-ই যথেষ্ট নয়। শ্রীমুখার্জির সুচিন্তিত মন্তব্য বিশেষ পর্যালোচনার বিষয়।

ভারতবর্ষ 'অনুন্নত' দেশ নয়, 'উন্নতিশীল' দেশ। সেখানে প্ল্যানিং কমিশন ও সরকারী অবিমৃষ্যকারিতার ফলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে নি। প্রথমেই পরিবার পরিকল্পনার কার্যসূচী হাতে নিয়ে নিয়ন্ত্রিত পরিবারের ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থার দিকে নজর দেওয়া উচিত ছিল। তারপরে অন্য বড়ো বড়ো কথা ভাবা উচিত ছিল। Population explosion ও খাদ্যের আমদানির জন্যেই আমাদের সমস্যার জটিলতা এতটা বেড়ে গেছে। পরিকল্পনার প্রথম যুগে সরকার বাহাদুরের স্বাস্থ্য মন্ত্রকটির ভার পড়লো নিষ্ঠাবতী ক্যাথলিক রাজকুমারী অমৃত কাউরের ওপর। জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়টি ক্যাথলিকদের কাছে নরহত্যার শামিল। কাজেই সেদিকটা সম্পূর্ণ বাদ পড়ে গেল। দ্বিতীয় ভুল হলো, কৃষির উন্নয়নে অবহেলা। সেচের ব্যবস্থা রইলো শোচনীয়। তা না হলে অনাবৃষ্টিও আমাদের এমন করে মারতে পারতো না।

এইভাবে পর্যায়ক্রমে এগিয়ে গেলে সরকারী পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলা চলে এবং প্রত্যহ তা বলা হচ্ছেও। অতএব, সেদিক দিয়ে আমরা শ্রীমুখার্জির সঙ্গে একমত না হয়ে পারি না, অর্থাৎ স্বীকার করতে হয় যে, স্টেপ বাদ দিয়ে অঙ্ক কষার মতো 'শিল্প ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের প্রাথমিক স্তরগুলি অতিক্রম' না করেই অজস্র অর্থব্যয়ে অটোমেশনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করা কেন? শুধু অর্থব্যয়ই নয়, বলতে হয় যে, অটোমেশন পুরনো কর্মীর কর্মচ্যুতির কারণ না হলেও নতুন কর্ম-সংস্থানের প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে ও দাঁড়াবে।

এখন বিষয়টিকে অন্য দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করা যাক। আমার প্রথম প্রশ্ন—অটোমেশন না হলেই কি বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারী ও বেসরকারী অফিসগুলিতে নতুন কর্মসংস্থানের পথ প্রশস্ত হচ্ছে? অথচ অটোমেশনের দ্বারা efficiency'র উন্নতিতে যদি overhead-এ ব্যয়সংকোচ হয়ে লাভের অঙ্ক বাড়ে বা লোকসানের অঙ্ক কমে এবং সংস্থার সম্প্রসারণের পথ খুলে যায় তবেই নতুন কর্মসংস্থান সহজ হবে না কী?

দ্বিতীয় প্রশ্ন—যে সরকারের অতীত ভ্রান্ত পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ দেশের অর্থনীতির ভারসাম্যে টাল খাইয়ে দিয়েছে সেই সরকারের পক্ষে এখন কি ভ্রম সংশোধনের জন্যে ব্যয়সংকোচমূলক কার্যধারা অবলম্বন করা উচিত নয়? মাথাভারী প্রশাসনের কুফলে দেশের অর্থনীতির কী অবস্থা হয় তা কি আমরা আজ হাড়ে হাড়ে বুঝছি না? আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করে কত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তা-ও কি আমরা দেখছি না?

তৃতীয় প্রশ্ন—আমরা কি ধরেই নিয়েছি যে, আমরা সবাই সর্বদা শহরে বসে চাকরি করবো? ডাক্তারি ওকালতি শিক্ষকতা পেশা ছাড়াও গ্রামাঞ্চলে গিয়ে কৃষি বা দোকানদারি করেও আমরা স্বাধীন বৃত্তি নিতে পারি না কি?

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় অটোমেশন ছিল না; থাকলে তিনি তার সপক্ষে বা বিপক্ষে বলতেন কিনা তা আমরা জানি না। কিন্তু তাঁর যে উক্তিটি আমি আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলাম তার সঙ্গে আমার মন্তব্যের নীতিগত পার্থক্যটা কোথায় তা আমি বুঝলাম না। তবে, একটা কথা আমি স্বীকার করি যে, সরকার যদি জনসাধারণকে (প্রচারের দ্বারা) অটোমেশন বিষয়ে পূর্বাহ্নেই পুরোপুরি ওয়াকিবহাল করে নিতেন, সাত-তাড়াতাড়ি মেশিন বসিয়ে না দিতেন তা হলে এই উত্তেজনা হত না।

বিশ্বকর্মা

যমজ শরীরে গ্র্যাফ্‌টিং

গত ২১ বৈশাখ 'দেশ'-এর নিয়মিত বিভাগে বিশ্ববিজ্ঞানের নিবন্ধকার লিখেছেন যে, গ্র্যাফ্‌টিং-এর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেখা যায় নি মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে এবং তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে, 'যখন দু'টি যমজ ছেলে বা মেয়ের একজনের শরীরের কোন অংশ কেটে নিয়ে অন্যজনের শরীরে গ্র্যাফ্‌ট করা হয়। তার কারণ, এক্ষেত্রে দু'জনেরই প্রজনিক বংশগতি অভিন্ন।' নিবন্ধকার এই তথ্য পরিবেশন করেছেন অসম্পূর্ণভাবে এবং তার ফলে উক্ত তথ্যের যথার্থতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে করি।

যমজ সন্তান দু'রকমের হতে পারে—ভিন্নডিম্বজ এবং একডিম্বজ। কখনও কখনও পৃথকভাবে দু'টি কিংবা ততোধিক ডিম্ব প্রায় একই সঙ্গে নিষিক্ত হবার ফলে যমজ সন্তানের সৃষ্টি হতে পারে। এই ধরনের যমজ সন্তানদের ভিন্নডিম্বজ বলে। এদের পরস্পরের মধ্যে বংশগত গুণাবলীর সাদৃশ্য কিংবা পার্থক্য একমাতৃগর্ভজাত ভাইবোনদের মত হয়ে থাকে। আবার একটি নিষিক্ত ডিম্ব মাতৃগর্ভে দুই বা ততোধিক অংশে বিভাজিত হলে যমজ সন্তানের সৃষ্টি হতে পারে। একই নিষিক্ত ডিম্ব থেকে উদ্ভূত বলে এই ধরনের যমজ সন্তানদের বলা হয় একডিম্বজ।

নিবন্ধকারের বক্তব্য অনুযায়ী বলা যেতে পারে যে, ভিন্নডিম্বজ যমজদের বংশগতি অভিন্ন নয় বলে এদের পরস্পরের মধ্যে গ্র্যাফ্‌টিং-এর ফলে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। উক্ত তথ্যানুসারে যমজদের ক্ষেত্রে গ্র্যাফ্‌টিং-এর সমীচীনতা নির্ভর করবে যমজ কোন প্রকারের—ভিন্নডিম্বজ কিংবা একডিম্বজ—তার উপর। অর্থাৎ যমজ হলেই তাদের পরস্পরের মধ্যে গ্র্যাফ্‌টিং-এর প্রতিক্রিয়া অনুকূল হবে এমন কথা বলা যায় না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। নিবন্ধকার লিখেছেন, 'প্রজনিক বংশগতি'। 'প্রজনিক' কথাটির তাৎপর্য ঠিক বোঝা গেল না। 'বংশগতি' কথাটুকুই কি আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে যথেষ্ট নয়? ইতি—

দিলীপকুমার দাস

সোদপুর

লেখকের বক্তব্য

পত্রলেখক গ্র্যাফ্‌টিং ও যমজ সন্তান সম্পর্কে যা লিখেছেন, সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, মূলে উৎসস্বরূপ প্রবন্ধগুলি থেকে তথ্য আহরণ করে প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল, সেগুলির প্রত্যেকটি পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের রচনা। ওইসব লেখায় দুই প্রকার যমজের কোন উল্লেখ নেই বলে দিলীপবাবু যা বলেছেন, আমার পক্ষে তা লেখা সম্ভব হয় নি। কারণ, আমি নিজে তো চিকিৎসক নই। অথচ আমাকে বিজ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্র নিয়ে লিখতে হয়। তাই বহু বইপত্র ও প্রবন্ধ পড়ে তথ্য-সংগ্রহ করে আমি লিখি এবং যে বিষয়ে আমি বিশেষজ্ঞ নই, তার মধ্যে নিজের বক্তব্য রাখি না।

প্রজনন শব্দটি genetics-এর বাংলা হিসাবে রাজশেখর বসু মহাশয় প্রথম ব্যবহার করেন। সেইজন্য genetical heridity-র বাংলা প্রজনিক বংশগতি করা হয়েছে।

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

দিল্লীর ডায়েরি

অথ গ্রীষ্ম-কথা। "দারুণ-অগ্নিবাণ"-বিদ্ধ হয়ে ছটফট হাঁসফাঁস ও অনর্থক শাপান্ত, করা ছাড়া উপায় নেই। কি বড়লোক কি ছোটলোক, কি ধনী কি দরিদ্র— সবাই যেন পর্যবসিত এক পর্যায়ে যখন "প্রখর তপনতাপে। আকাশ তৃষ্ণায় কাঁপে। বায়ু করে হাহাকার"।

মাত্র দুই শ্রেণীর লোক আছে এই খরকর তাপদগ্ধ রাজধানীতে যাঁরা হয়তো ঐ সমপর্যায়ভুক্ত হন না—যাঁরা খুবই ধনবান (অথবা জীবিকার জন্যে কোনো কাজ না করলেও চলে) আর যাঁরা অত্যন্ত দরিদ্র। কী শুভক্ষণে বৈজ্ঞানিকরা বের করলেন শীততাপ-নিয়ন্ত্রণ করার যন্ত্র, আর ভাগ্যবানদের বাড়িতে, আপিসে এমন কি মোটর গাড়িতেও বসে গেল সেই সব আরাম-যন্ত্র। ভাল ভাল সিনেমা ঘর, বিলাসী হোটেলের খাওয়ার ও নাচার হলঘর সব-খানেই ঐ যন্ত্র। সুতরাং পয়সার গুণে তাঁরা জানেন না (সাধারণত) "তপোবহ্নির" সেই বৈরাগীকে কিম্বা সেই নিঠুরকে যে "তুমি তাকিয়েছিলে মৃত্যুক্ষুধার মতো। তোমার রক্ত নয়ন মেলে।" তাঁরা জানেন না তাপসের "শুষ্ক কঠোর রূপের গভীর রসে" কাদের মনপ্রাণ উদাস হয়ে যায়, অতি-গ্রীষ্মের চাবুক খেতে খেতে, কাদের আসে জীবনের প্রতি ঔদাসিন্য ঐ বৈশাখী বৈরাগীর মতো। জানার প্রয়োজন নেই তাঁদের।

সমাজের নিচের তলার লোকেরা কোনো কিছুর তোয়াক্কা করে না, মানে শীতের দিনগুলো ছাড়া। গ্রীষ্ম তাদের গায়ে লাগে কিনা, কে জানে। টাটা রোদ, আগুনের মতো গরম বালির তুফান, নাম যার আঁধি, নিদ্রাহরা গুমোট—তারা তোয়াক্কা করে না। একটা গাছের কিম্বা বারান্দার ছায়াই যথেষ্ট, নয়তো আছে পুলের নিচে ছায়াচ্ছন্ন স্থান।

এপ্রিল থেকে অগস্ট অবধি, বিশেষত জুনের শেষ অবধি প্রখর গ্রীষ্মের এই তাড়না এই রাজধানীতে এবং গোটা উত্তর ভারতে। যার প্রকোপে অন্তত একটি সাম্রাজ্য (পাগলা তুগলকের) একদা গিয়েছিল শকুনের পেটে, তুগলকাবাদে যার অবশিষ্ট দেখলে এখনো প্রাণের একটা স্থান অকারণে কেঁপে ওঠে : প্রেতময় প্রান্তরে রুক্ষ-রুষ্ট পাহাড়ে ভাঙাচোরা ইমারতের দাঁত বের-করা উচ্ছিষ্ট। যেন এই গ্রীষ্মের অভিশাপের প্রতিকৃতি, কুতুবমিনার থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।

রবীন্দ্রনাথের গ্রীষ্মের গান নিশ্চয়ই দিল্লিকে মনে করে রচিত হয়নি। কিন্তু বীরভূমের গ্রীষ্মের সঙ্গে এতো মিল যে, মনে হয় তাঁর গানগুলো আমাদের জন্যেই তৈরি হয়েছিল (যদিও গান শোনার বেলায় গ্রীষ্মের অপ্রিয়তার কথা মোটেই মনে হয় না)। আগেকার উদ্ধৃতিগুলো তাঁরই লেখনি-নিসৃত। ছেড়ে ছিলাম তাদের। শুনুন এবার।

"দারুণ অগ্নিবানে রে, হৃদয় তৃষ্ণায় হানে রে (কতো গেলাস জল খান, একবার আঙুলে গুনুন!)। রজনী নিদ্রাহীন দীর্ঘ দগ্ধ দিন। আরাম নাহি যে জানে রে।" "ভয় নাহি ভয় নাহি। গগনে রয়েছি চাহি। জানি ঝঞ্ঝার বেশে দিবে দেখা তুমি এসে। একদা তাপিত প্রাণেরে"।

অক্ষরে অক্ষরে ঠিক। দগ্ধ দিন আরম্ভ আমাদের সকাল দশটা থেকে। সূর্য তো নয়, যেন ফেটে-যাওয়া একটা অ্যাটম বোমা। আকাশটায় সেই নীলের চঞ্চল প্রাণ—আকাশটা যেন মরা মাছের চোখের মতো ঘোলাটে (বরফে ছিল তিন-দিন)। তার গায়ে শকুনের গায়ের গন্ধ। বালির পলেস্তারা দিনরাত, তার সঙ্গে মিশে যায় নীলের আভাস আর যাকে বলা যেতে পরে মেঘের প্রাণ (দুই মাসের মাত্র)। ভালো নীলাকাশ এখানে বেড়াতে আসে শুধু শীতের মরসুমে, যখন আসে আমেরিকা ও জার্মেনী ও রাশিয়া থেকে নারী পুরুষ টুরিস্টরা খাজুরাহোর যৌন-মূর্তি দেখতে এবং যখন রাজধানীর খোলা রাস্তায় শীতের প্রকোপে প্রাণ ত্যাগ করে গরীবেরা, যখন সস্তা ফুলকপি খেয়ে খেয়ে মধ্যবিত্তরা গায়ে হয় মোটা। তার আগের আকাশ ফ্যাকাশে, অগ্নিবাণ-বিদ্ধ-মৃত।

গ্রীষ্মের এই দিনে আমরা সকলেই আজ অর্ধমৃত; কিন্তু গা-সওয়া এবং ওতেই অভ্যস্ত!

এখানে ওখানে কোণায় খামচায় বিক্রি হচ্ছে তরমুজ—ইয়া বড়ো সবজে তরমুজ। তরমুজ, যার ভেতরটা ঠাণ্ডা লাল, যমুনা নদীর বালি থেকে ওঠা তরমুজ, যেন গ্রীষ্মের প্রবল প্রতিবাদ। তরমুজের ছোট ভাই খরমুজ, আরো আছে সবজে-সবজে, জল-ছিটানো কাঁকড়ি। আর গাড়িভরা ঠাণ্ডা পানি, বিক্রি হচ্ছে এন্তার গেলাসে গেলাসে, "মেশিন-কা-পানি" আইসক্রিম, কোকাকোলা, চিনি মেশানো রঙীন জল, আমাদের স্বদেশী কুলফি-ফালুদা (ওরে বাপস্, ভাং মেশানো থাকলে তো কথাই নেই!!), আর ঐ সুরাট-এর ঠাণ্ডা জল!

হায় হায়, এই গ্রীষ্ম। "নাই রস নাই, দারুণ দাহন বেলা।/খেলো খেলো তব নীরব ভৈরব খেলা।" আমাদের ভৈরব খেল কাল-বৈশাখীর সন্ধ্যা-আকাশ ঢাকা হুংকার নয়, সে আসে না "বেড়া ভাঙার মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে"। কিন্তু সে আসে। রাজপুতানার বালুকা-সমুদ্রের ঢেউ নিয়ে সে আসে এখানে, বিকেলে ও সন্ধ্যায়, অন্ধ ঝড়ের নাম নিয়ে সে আসে, নাম তার আঁধি, যখন মরুভূমি পৃথিবী থেকে উড়ে আসে বাতাসে আর ঢেকে দেয় সূর্যকে তার পলেস্তারায়। আকাশ কালো-করা বৈশাখী নয়; এটা একটা মরা মাছের চোখ: বাসি: কিন্তু বীভৎস, আঁধির বালুকা-তরঙ্গের মতো বীভৎস!

ধরনীর এমনি তপস্বিনী দিনে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন গান, "সংযমে বাঁধুক লতা কুসুমিত চঞ্চলতা,/সাজুক লাবণ্যলক্ষ্মী দৈন্যের ধূসর ধূলিবাসে।" গুরুদেব নমস্য। তাঁর কুসুমের চঞ্চলতা দেখলাম এখানে কৃষ্ণচূড়া গাছের মাথায় মাথায়। লাল লাল প্রাণ-রঙের রঙ-নেওয়া রক্তিম কৃষ্ণচূড়ায়, আর আমলতাসের (বাঁদর-নাড়ি) হলদে ফুলের ঝরনায়। আবার এই গ্রীষ্মের জবাব আমরা দিই গাছের ছায়ায়, হাজারো গাছের লক্ষ-কোটি পাতার হাজারো ছায়ায়। যেখানে দু-আনার ছাতু খেয়ে নির্বিঘ্নে ঘুমোয় মজুরে ছেলে, প্রধান মন্ত্রীর বাড়ির উল্টোদিকে। গ্রীষ্মের দিনে রাজধানীর প্রাণ হল শহরের গাছে গাছে, অগুনতি গাছে গাছে। সবুজে সবুজে প্রত্যুত্তর তাপসের পিঙ্গল জটার, একটা আশ্চর্যের মহিমা;

আসুন আমার সঙ্গে একটা ছোট্ট পরিক্রমায়। জাম গাছ, নিম গাছ, বট গাছ

ইত্যাদির নিবিড় ছায়ায় আমরা যেন ঠেকিয়ে রেখেছি প্রচণ্ড গ্রীষ্মকে। মহাদেবের অভিশাপকে। আর তখন মনে পড়ে : ওমা! গাছ কতো ভালো, গাছের ছায়া, পাতার ছায়া, ওমা! কতো ভাল॥ এই গ্রীষ্মের দিনে!

এই গরমের দিনে আসুন আমার সঙ্গে। আমরা দেখি ছায়াকে আসুন। শীতল বৃক্ষ-ছায়াকে, যেখানে মাথার নিচে হাত দিয়ে ঘাসে ঘুমিয়ে থাকে একজন শ্রমিক, যখন আমরা হাঁসফাঁস করি নরম বিছানায়। আসুন দেখি গাছের ছায়াকে। রাজধানীতে আমাদের শ্রেষ্ঠ গর্ব হল গাছ। স্বাধীনতার আগের গাছ, পরের গাছ, তাদের ছায়া একই রকমের।

শংকর রোডে আছে বট গাছ আর কাইজেলিয়া। কালিবাড়ির রাস্তায় আছে অনেক বট গাছ, কিন্তু তারই কাছে সুমরু প্লেসে আছে এক বিরাট হলদে রঙের সমাবেশ, আমলতাসের রাস্তা—লেবেরনাম গাছের ফুলভরা রাস্তা (বিড়লা মন্দিরের কাছে) এবং তারপরেই রামকৃষ্ণ মিসন রাস্তা, যাকে আমি দেখেছি শিমুল ফুলের লাল রঙে লাল। তার নাম হোল "বোমবাক্স", "বোমবাক্স মালাবারিকান"।

আসুন হার্ডিঞ্জ রোডে। সেখানে নিম গাছের মেলা, যেমনি মেলা নিম গাছের আছে কার্জন রোডে, পৃথিরাজ রোডে, আর তালকোটরা রোডে। আরো অনেক জায়গায় এই নিম গাছ, এই জাম গাছ, এই বট ও অর্জুন গাছ, এই তেঁতুল গাছ, আরো কতো কী।

গোটা আকার রোডের দুপাশে দেখলাম তেঁতুল গাছ, মস্ত বড় তেঁতুল গাছ। পার্লামেণ্ট রোডে ছিল জাম গাছ, রফি মার্গ, রাইসিনাতে নিম গাছ, রাজপথের দুইদিকে গোছা গোছা জাম গাছ—আরো ছিল আফ্রিকার কাইজেলা গাছ, কৃষ্ণচূড়া আর বাঁদর-নড়ি গাছ, চমৎকার জারুল গাছ। সবুজের মাঝে মাঝে লাল আর হলদে। ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে যেমনি আলো আর রোদ আর আগুন।

গ্রীষ্মের অভিশাপকে মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি আমি গাছের সন্ধানে। দেখেছি তাদের রাষ্ট্রপতি ভবনের আশে-পাশে। উইলিংডন হাসপাতালের কাছে। দেখেছি পুরোনো দিল্লিতে আর নতুন দিল্লির নতুনত্বে। দেখলাম কতো পাতা কতো ডাল কতো গাছ। সবুজে লেগে গেছে রঙ। গ্রীষ্মের অবলুপ্ত বিদেশ রঙ। তবু তারা রঙ।

ঘুরে যখন বাড়ি এলাম ফিরে, তখন রজনী নিদ্রাহীন॥

খগেন [illegible]

সাহিত্য সংবাদ

জ্ঞানপীঠ পুরস্কার

ভারতীয় জ্ঞানপীঠ প্রবর্তিত পুরস্কারের তৃতীয় বছরের প্রাপকদের নাম সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে। এবারের পুরস্কার দুজন কবিকে যুগ্মভাবে দেওয়া হয়েছে। গুজরাটের উমাশংকর যোশী এবং মহীশূরের কে ভি পুট্টাপ্পা।

এই পুরস্কার প্রথম বছর দেওয়া হয়েছিল—১৯২০ থেকে ৫৮ সালের মধ্যে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য মালয়ালম কবি শংকর কুরুপকে। দ্বিতীয় বছর, ১৯২৫ থেকে ৫৯ সালের মধ্যে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য আমাদের তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এবারের নির্বাচন হয়েছে ১৯৩৫ থেকে ৬০ সালের মধ্যে প্রকাশিত রচনার মধ্যে। পুরস্কারের ১ লক্ষ টাকা দুজনের মধ্যে সমান ভাগ হবে। এই পুরস্কারের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সারা ভারত জুড়ে প্রায় দেড় শ' জন সাহিত্য-বিশেষজ্ঞ জড়িত থাকেন। উদ্যোক্তা ভারতীয় জ্ঞানপীঠ প্রেরিত বিবরণ থেকে এ খবর জানা গেল।

উমাশংকর যোশী

উমাশংকর যোশী বাংলাদেশে পূর্ব-পরিচিত। বিভিন্ন সাহিত্যসভা উপলক্ষে তিনি কলকাতায় এসেছেন, এই কিছুদিন আগের সারা ভারত কবি সম্মেলনেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। কলকাতার অনেক সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতার সম্পর্ক আছে। তিনি বাংলা পড়তে ও বলতে জানেন—বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। বাংলায় তাঁর বেশ কয়েকটি রচনা অনূদিত হয়েছে।

উমাশংকর যোশীর জন্ম ১৯১১ সালে গুজরাটের বাসনা নামে এক ছোট্ট গ্রামে। ছাত্র বয়েসে পড়াশুনোয় খুব ভালো ছিলেন, কিন্তু কলেজে পড়ার সময়ই স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন এবং দু'বার জেল খাটেন। পাঁচ বছর পরে জেল থেকে বেরিয়ে তিনি আবার পড়াশুনো শুরু করে বি এ এবং এম এ দুটোতেই ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন। অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে বর্তমানে তিনি গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার।

যোশী মূলত কবি, কিন্তু ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি সমান দক্ষ। তাঁর প্রবন্ধাবলীতে বিরল বৈদগ্ধ্যের চিহ্ন আছে।

তাঁর প্রথম কবিতা তিনি প্রকাশ করেছিলেন ১৮ বছর বয়েসে। সেই কবিতার নাম 'বিশ্বগীতা'—গুজরাটী সাহিত্যে অতি প্রসিদ্ধ। তাঁর সাতখানা কবিতার বইয়ের মধ্যে তৃতীয়টির নাম 'নিশীথ'—এই [illegible] নামেই তাঁকে [illegible] 'নিশীথ' [illegible] সঙ্গে [illegible]

এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলি গা... গুজরাটে অত্যন্ত বিখ্যাত। কয়েকটি সনেটও গুজরাটী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হয়ে আছে। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের নাম 'গঙ্গোত্রী', 'প্রাচীনা', 'আতিথ্য', 'বসন্ত-বর্ষা', 'মহাপ্রস্থান'।

উমাশংকর যোশীর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩০। এছাড়া 'সংস্কৃতি' নামে একটি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য মাসিকের সম্পাদনা করছেন তিনি গত ১৫ বছর ধরে।

কে ভি পুট্টাপ্পা

আধুনিক কনাড়ী ভাষায় মহাকাব্য 'রামায়ণ দর্শনম' এর জন্য কে ভি পুট্টাপ্পাকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। আমরা এই লেখক ও তাঁর রচনা সম্পর্কে অবহিত নই, প্রাপ্ত বিবরণ থেকে কয়েকটি তথ্য উদ্ধার করছি।

এবারের একটি আকস্মিক যোগাযোগ এই, পুরস্কারপ্রাপ্ত দুজন কবিই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার।

পুট্টাপ্পার জন্ম ১৯০৪ সালে মহীশূরের এক সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে। শৈশব থেকেই তিনি প্রকৃতির প্রতি নিবিড়ভাবে মুগ্ধতা-বোধ করতেন। মহীশূরের রামকৃষ্ণ আশ্রমে থেকে তিনি পড়াশুনো করেন এবং অধ্যাপক বি এম শ্রীকান্তিয়া'র সংস্পর্শে আসেন এবং তিনিই এই তরুণ কবির সামনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের দ্বার খুলে দেন। এম এ পাস করার পর অধ্যাপনা শুরু করে তিনি শেষ পর্যন্ত মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হন এবং ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ঐ পদে নিযুক্ত ছিলেন।

পুট্টাপ্পা প্রথমে কবিতা লিখতেন ইংরেজীতে। ঠিক সময়ে তিনি মাতৃভাষায় ফিরে আসেন। এ পর্যন্ত তাঁর ২১টি কাব্য-গ্রন্থ, ১১টি নাটক, ৯টি প্রবন্ধের বই, এছাড়া ছোট গল্প, উপন্যাস, শিশুসাহিত্য, অনুবাদ প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের দু'টি জীবনীও লিখেছেন।

'রামায়ণ দর্শনম'-এর দৈর্ঘ্য কয়েক হাজার লাইন, গত কয়েক দশকে রচিত কানাড়ী ভাষায় শ্রেষ্ঠ কাব্য হিসেবে গণ্য। এই কাব্য সম্পর্কে কবির বক্তব্য, "এই কবিতাটি আমার সচেতন মনের রচনা নয়। [illegible] এবং [illegible] আমার [illegible]

উমাশংকর যোশীর সঙ্গে একটি সকাল

খুব সকালে সময় দিয়েছিলেন। ভোরের রোদ তখনও সবটুকু শিশির মুছে নিতে পারেনি ঘাসের বুক থেকে। ইউনিভার্সিটির এদিকটা নির্জন—ঘাসপাতায় ছলছলে, হঠাৎ কোন পাখির ডাক। লন পেরিয়ে বাংলোর সামনে হাজির হতেই এক মহিলা—শুভেচ্ছা জানাতেই এসেছিলেন নিশ্চয়—বললেন, উনি ঘরেই আছেন, চলে যান।

ছোটখাটো পাতলা চেহারার [illegible] মানুষ, ফর্সা গায়ের রঙ, পরনে সকালের এলোমেলো পাজামা আর ঘরোয়া পাঞ্জাবী, চোখে চশমা। একমুখ হাসি নিয়ে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন।

কথা বলছিলেন অস্পষ্ট, মন্ত্রোচ্চারণের মতো। মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়। বললেন এই তো সবে কলকাতা থেকে ঘুরে আসছি। হ্যাঁ, আমার খুব ভালো লেগেছে। এ ধরনের সম্মেলনটির প্রয়োজন আছে। পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার উপযোগী একটা আন্তরিক পরিবেশ তৈরী পাওয়া যায়। সবচেয়ে যেটা আমাকে বিস্মিত করেছে সেটা হল কবিতার প্রতি সাধারণ মানুষের ঔৎসুক্য।

কলকাতার প্রশংসায় বুকটা ভরে উঠছিলো। কিন্তু পাছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হাতের সব ক'টি প্রশ্নবাণ নিক্ষেপের ব্যত্যয় ঘটে—তাই অন্য প্রসঙ্গে চলে যাই :

উদ্যোক্তারা ঘোষণা করেছেন—সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই এই জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের আয়োজন। আপনি কি সত্যিই মনে করেন নগদ অর্থের সার দিয়ে সাহিত্যের ফলন বাড়ানো সম্ভব? নোবেল পুরস্কার তো অনেক ক্ষেত্রেই নিতান্ত সম্ভাবনাময় সাহিত্যেরও কবর রচনা করেছে অকালে। বিশেষ করে কবিতা নির্জনতার ফসল। বাইরে টেনে এনে এত ঢক্কানিনাদ করলে কি কবিতার অস্বস্তি বাড়ানো হয় না?

বললেন, অর্থমূল্যই সব নয়। পুলিৎজার পুরস্কারের অর্থমূল্য তো নগণ্য—কিন্তু তার সম্মান? রবার্ট ফ্রস্ট তো একাধিকবার এই পুরস্কার পেয়েছেন—এর দ্বারা তো কই তাঁর সৃষ্টিশীলতার ক্ষতি হয় নি! পুরস্কার-টুরস্কারগুলো হল মানুষ যাকে ভালবাসে তাকে সম্মান জানাবার একটা উপায়মাত্র, এর সঙ্গে সৃষ্টির কোনরকম সম্বন্ধ নাও থাকতে পারে। আর এই সম্মান প্রকৃত শিল্পীকে আরও বিনীত করে তোলে। আমিও বিনয়ের সঙ্গেই এই পুরস্কার, মানুষের এই ভালোবাসা, মাথা পেতে নিয়েছি। তা ছাড়া এই সব পুরস্কার সমাজের মধ্যে এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করে যার মধ্যে সাহিত্যের আরও সমৃদ্ধি হওয়া সম্ভব। দেখতে হবে কি মনোভাব নিয়ে এই সব পুরস্কার দেওয়া [illegible]

—আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা? এই সব বিটল, হাংরি, অ্যাংরি—এদের সম্বন্ধে আপনি কি অভিমত পোষণ করেন?

প্রথমে কৌতুক করে বললেন, হাংরি আর অ্যাংরিকে যুক্ত করে আমি বলি—হ্যাংরি। তারপরই মুখ গম্ভীর, একটু চিন্তা। বললেন—আধুনিক কবিতা সবকালেই ছিলো, আছে, থাকবে। সব যুগেই নতুন করে জমি কর্ষণের প্রয়োজন হয়...নতুন কিছু পরীক্ষা ...এবং তা ঘোষণার জন্য উচ্চকণ্ঠও প্রয়োজন। তবে—মুখে হাসি এনে বললেন—মাঝে মাঝে একটু বাড়াবাড়ি। অবশ্য আজকে যা আধুনিক কাল তাই-ই ঐতিহ্য। এবং সেই ঐতিহ্যকে হঠাৎ একদিন আবার হয়তো নতুন প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়।

টিপয়ের উপর একটা লাল গোলাপের তোড়া—কোন অনুরাগী হয়তো একটু আগেই দিয়ে গেছে—মৃদু গন্ধ ছড়িয়ে ঘরখানা ভরিয়ে দিচ্ছিল। কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা। রবীন্দ্রনাথের ছবির দিকে চোখ পড়ায় এরপর প্রশ্ন করি—আপনার কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কতোখানি?

—প্রথম দিকের কবিতায় বেশ কিছু, বলেন আবেগের সঙ্গে, নিজে ঘোর রবীন্দ্র-ভক্ত—এড়াই কেমন করে? তা ছাড়া এগিয়ে যেতে গেলে পূর্বসূরীদের কাছে পাথেয়ের জন্য সকলকে হাত পাততেই হয়। অবশ্য পরে কে কোন দিকে যাবে সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার।

রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে স্মরণ করলেন ১৯৬৩ সালে কলকাতা এবং ১৯৬৬ সালে পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওঁর রবীন্দ্রবক্তৃতা। প্রশ্ন করি—বাংলাতেই রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন নিশ্চয়ই?

এতক্ষণ ইংরিজীতে প্রশ্নোত্তর চলছিলো। এবার পরিষ্কার বাংলায় বললেন—হ্যাঁ, বাংলা জানি একটু একটু। এবার কলকাতায় বাংলাতে একটা বক্তৃতা দেবার ইচ্ছে ছিলো—সময়ে কুলিয়ে উঠতে পারিনি।

প্রথম কবিতা রচনা সতেরো বছর বয়সে, আবু পাহাড়ের দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে। "তখন ছিলো ছন্দের ব্যায়াম"। পুরস্কারপ্রাপ্ত কাব্যগ্রন্থের নামে যে 'নিশীথ' কবিতা—তার জন্ম বোম্বাই শহরতলির ট্রেনে, রাত্রে, ২১ বছর বয়সের রচনা। লিখেছিলেন এক কবিবন্ধুর চিঠির ফাঁকা জায়গাটুকুতে। ওঁর নিজের মতে যেটি শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ সেটি গান্ধীজীর জীবনদর্শন নিয়ে লেখা। বললেন—শেষ বইখানা দিয়েও গান্ধীজীরই পূজা করবো ভাবছি।

প্রশ্নঃ গুজরাতী ভাষায় সূক্ষ্মতম ভাব প্রকাশে কখনো কি কোন অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়েছে?

একটু তপ্ত হয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—কখনই না। আমার মাতৃভাষা আমাকে কখনই অসুবিধেয় ফেলেনি। তা ছাড়া গুজরাতী ব্যাকরণ রচয়িতা রেভঃ টেলর এক শ' বছর আগে যা বলে গেছেন আমিও সেটা বিশ্বাস করি—বক্তা যেমন, ভাষাও তেমন।

বললেন—এমনিতে মনে হবে কবিতার কোন কাজ নেই। নেই একখানা পাঁপড় ভাজবার ক্ষমতা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কবিতা নির্জনে তার কাজ করে চলেছে। সমাজের মূলে কবিতা করে রসসিঞ্চন—যাতে অংকুর একদিন মহীরুহে পরিণত হয়। বললেন—কবিতা ছাড়া সমাজ বাঁচতে পারে না। আদিবাসীদের দিকে তাকিয়ে দেখুন না, ওরাও কবিতার ভক্ত। ওদের নিজেদের পন্থায় নানাভাবে নিরন্তর তার সেবা করে চলেছে।

বলি—ভাষা না জানার ফলে আপনার কোন কবিতা আজও পড়তে পারিনি। তাদের মধ্যে কি দুঃখের গান বেশী গেয়েছেন, না আশার?

প্রবল বিশ্বাসের সুরে উচ্চারণ করেন—আমি চির আশাবাদী। তবে জীবনের থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছি এমনও নয়। একাঙ্ক নাটকগুলিতে আমি গ্রামজীবনের দুঃখ-দুর্দশার ছবিই এঁকেছি। তবে মানুষই পারে সব দুর্যোগ এড়াতে।

—জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন কোনটি? এ প্রশ্নে একটু লাজুক হেসে উত্তর দিলেন—ভুলে গেছি। কিন্তু উত্তরটা কি আর অজানা রইলো? আশাবাদী কবির স্মরণীয় দিন প্রেমের দিন ছাড়া আর কি হবে?

বহু গুণের অধিকারী। সংস্কৃত পণ্ডিত। ইদানীং ঈশোপনিষদের নতুন ব্যাখ্যায় ব্যস্ত। ভবভূতি ও কালিদাসের উপরেও গবেষণা করার ইচ্ছে আছে। (এইসব পুরস্কার তো আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধেই সচেতন করে তোলে)। বয়স ৫৭। সাহিত্য আকাদেমীর সদস্য। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট এবং ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব অ্যাডভান্স স্টাডিজের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট। একখানি সাহিত্য পত্রিকায় (সংস্কৃতি) সম্পাদন করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেওয়ার কারণে দুবার কারাবরণ করতে হয়েছে।

প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা বিশ। তার মধ্যে আটখানি কাব্যগ্রন্থ। বাকি সব ছোটগল্প, সাহিত্য সমালোচনা ও একাঙ্ক নাটক। অনেক বিদেশী পত্রিকার নিয়মিত লেখক। শিক্ষকতা দিয়ে হয়েছিলো জীবনের শুরু, আজ গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

—একজন কবি হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধ্যক্ষের কাজ কি করে সামলান? এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন—কেন, দুয়ের মধ্যে বিরোধ কোথায়? সব কিছু নিয়েই জীবন। অর্থশাস্ত্রের পণ্ডিত উমাশংকর বললেন—কবিতার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে একটু ফাঁকি দেই এমন ভাববেন না। সব কাজ সারা হলে তারপর আমার কবিতা।

সবশেষে দ্বিধা করেও শেষ পর্যন্ত অস্বস্তিকর প্রশ্নটা করে ফেললাম—পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে কি করবেন ভাবছেন?

কিন্তু এ প্রশ্নের [illegible]

পুস্তক পরিচয়

ধর্ম ও দর্শন

অশ্বিনীকুমার রচনাসম্ভার। অধ্যয়ন ঃ ২০-এ গোবিন্দ ঘোষ লেন, কলি-১২। কুড়ি টাকা।

ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ প্রণেতা মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের বহুমুখী প্রতিভা ও তাঁর অলোকসামান্য চরিত্র আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের এক গৌরবময় স্মৃতি, এক অক্ষয় অনুপ্রেরণার উৎস। বিশেষত দেশব্যাপী হতাশা আর উন্মার্গগামিতার অভিশাপে জর্জরিত বর্তমান কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মত মানুষের জীবন ও রচনাবলীর পর্যালোচনা যেন আজ একটি বহুবাঞ্ছিত প্রসঙ্গ। অশ্বিনীকুমার যে কেবলমাত্র একজন জননায়ক, শিক্ষাবিদ বা সমাজসেবক ছিলেন তাই নয়, প্রকৃতপক্ষে তদানীন্তন বাংলার সুদূর প্রত্যন্ত প্রদেশের যুবমানসেও তাঁর চরিত্র ও দেশপ্রেমের আদর্শ এক প্রচণ্ড আলোড়ন জাগাতে সমর্থ হয়েছিল। সমকালীন বিপিনচন্দ্র অশ্বিনীকুমারের কর্মোদ্যম এবং সমাজসেবার স্বীকৃতি জানিয়ে ঠিকই লিখেছিলেন ঃ 'আমাদের বর্তমান কর্মিগণের মধ্যে কেবল একজন মাত্র প্রকৃত লোকনায়ক আছেন বলিয়া আমার মনে হয়, তিনি অশ্বিনীকুমার দত্ত। তাঁর মতন এমন সত্য ও সাচ্চা লোকনায়ক বাংলার প্রসিদ্ধ কর্মিগণের মধ্যে আর একজনও আছেন বলিয়া জানি না।' বলা বাহুল্য, বিপিনচন্দ্রের এই মন্তব্যে যে অতিরঞ্জন ছিল না তা উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথম ভাগের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস লক্ষ করলেই বোঝা যায়।

বাংলা দেশের এমন একজন মনীষী ব্যক্তির সমগ্র রচনাবলীর কোন প্রামাণিক সংস্করণ এতদিন ধরে অপ্রকাশিত থেকে যেন আমাদের সুপরিচিত আত্মবিস্মরণের অপবাদটিকেই সমর্থন করেছে। প্রকাশক বর্তমান সংকলনটি প্রকাশ করে সেইজাতীয় লজ্জা থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। অবশ্য বিচ্ছিন্নভাবে ভক্তিযোগ বা কর্মযোগ অশ্বিনীকুমারের বহুল-প্রচারিত জনপ্রিয় গ্রন্থ। এ দেশের সর্বত্র এবং বিদেশের মনীষী-দের কাছেও এই গ্রন্থদ্বয় অসামান্য আদর ও প্রশংসা লাভ করেছিল এবং মোটামুটি তারাই এ পর্যন্ত অশ্বিনী-কুমারের রচনাকর্মের প্রতিনিধিত্ব করে এসেছে। কিন্তু তাঁর লেখা, গান, চিঠিপত্র, বক্তৃতাবলী এবং বিবিধ রচনা যার মধ্য দিয়ে এই মহাপ্রাণ দেশনায়কের একটি অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য পাওয়া যায় তা এতদিন সাধারণ পাঠকের নাগালের বাইরে ছিল। এগুলি ছাড়াও বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের (১৯০৬) অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যানরূপে অশ্বিনীকুমারের স্মরণীয় ভাষণটিও এই গ্রন্থের আর একটি সম্পদ। বাংলা দেশের সেই অভাবনীয় উদ্দীপনা, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে সম্প্রদায় নির্বিশেষে জাতীয় ঐক্যের অগ্নিগর্ভ অঙ্গীকার, ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' মাথায় তুলে নেবার উদাত্ত আহ্বান এখনও যেন এই দৃপ্ত দীর্ঘ ভাষণটির মধ্যে জীবন্ত হয়ে আছে ঃ

'Bengal is not dead....she will prosecute the agitation and the movement for the eschewance of British goods by all the lawful and righteous means she can command and will never desist until the partition is withdrawn. The sleep she was sleeping is done; she is on the eve of a national revival....' যেদিন সেই 'ন্যাশানাল রিভাইভ্যাল'-এর নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস লিখিত হবে সেদিন নিশ্চয়ই এই কর্মযোগী মহাত্মা এর অন্যতম প্রেরণাদাতা নায়ক বলে চিহ্নিত হবেন।

বিশাল গ্রন্থটির বিষয়সূচীতে আছে ভক্তিযোগ, দুর্গোৎসবতত্ত্ব, প্রেম, কর্মযোগ, আত্মপ্রতিষ্ঠা, বক্তৃতাবলী, গান, চিঠিপত্র ও বিবিধ রচনা—যা অশ্বিনীকুমারের সমগ্র রচনাবলী ও চিন্তাধারা হিসেবে ভক্ত পাঠক ও গবেষকদের কাছে মূল্যবান একটি সংকলন-রূপে আদৃত হবে। বইটির মুদ্রণ ও অঙ্গ-সজ্জা প্রশংসাযোগ্য। সূচনায় শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষের লেখা তথ্যবহুল অথচ সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটিও এই গ্রন্থের উপযুক্ত পরিচায়িকা।

৬১।৬৮

উপন্যাস

চাতকের মেঘ। সুনীল সরকার। পরিবেশক ঃ এন ভট্টাচার্য অ্যান্ড কোং ঃ ৬ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২। পাঁচ টাকা।

অনাবৃষ্টি আর দুরন্ত খরায় দেশ ঝলসে গেল, জমি-জমা খেত-খামার ফেটে চৌচির। অনাহার অর্ধাহারে জীর্ণ একদল মানুষ অবশেষে একদিন দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল নতুন রুজি-রোজগারের আশায়। গদাই মহাতো, অর্জুন মহাতো তাদের আত্মীয়-বন্ধু-পরিজন-পরিবার সবার সামনেই এক অনিশ্চয়তার অন্ধকার, এক আসন্ন বিপদের সংকেত। তবু স্ত্রী পুত্রের মুখ চেয়ে, ফেলে-আসা দিনের অনেক সুখ স্মৃতির কথা মনে রেখে তারা নতুন সাহসে বুক বাঁধে; লাঙ্গল-ধরা শক্ত সবল হাতে যে-কোন হাতিয়ার, যে কোন অবলম্বন আশ্রয় করে ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করতে এগিয়ে যায়। গ্রামীণ চাষীর অসহায়তার সুযোগ গ্রহণ করে কোলিয়ারির ঠিকাদারবাবু। দু' মুঠো অন্নের সংস্থান হয়ে যায়, কিন্তু তার বদলে সরল মানুষগুলি মাটি কাটা, পাথর কাটা বা কয়লা তোলা শ্রমিকের কাজের মধ্যে ক্রমশ দলাদলি, একে অপরকে সন্দেহ, প্রতারণা প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে। প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ঠিকাদারবাবু বা তার মুন্শীদের ধাপ্পাবাজির সঙ্গেও লড়তে শেখে। একদা

তাজা প্রাণের অধিকারী জোয়ান অর্জুন মহাতো পরিণত হয় সুরাসক্ত কোলিয়ারির শ্রমিকে—তার সুখের সংসার দুর্ভাগ্যের প্রকোপে আজ তছনছ, একমাত্র পুত্র অনাহারে অচিকিৎসায় মৃত, স্ত্রী ঠিকাদারের মুনশীর লালসার লক্ষ্য। কিন্তু এভাবেই চিরদিন চলে না, ছিন্নমূল হতোদ্যম মানুষগুলির মনে অফুরন্ত স্বপ্ন আর প্রত্যাশা জাগিয়ে একদিন আকাশে বর্ষার নবীন মেঘ ঘনিয়ে আসে। চাতকের মত উৎফুল্ল হয়ে তারা দুর্দিনের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির কথা ভুলে নিজেদের খেত-খামার জমির টানে আবার ফিরে যায়।

মোটামুটি এভাবেই 'চাতকের মেঘ' উপন্যাসটির কাহিনী আগাগোড়া একটি আকর্ষণের সূত্র বজায় রাখে। শ্রমিক-চাষীর জীবন বা কোলিয়ারির পরিবেশ এ কাহিনীর উপজীব্য হলেও এর আসল কৃতিত্ব হয়ত সাদাসিধেভাবে একটি নিটোল গল্প বলায়। কুলি, কামিন আর কোলিয়ারি নিয়ে লেখা উপন্যাস অবশ্য একদা যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল আমাদের সাহিত্যে। সেদিন হয়ত বিষয়মুক্তির নজির বা নিছক বাস্তবতার তাগিদই ছিল তাদের বিচারের নিরিখ। কিন্তু এখন দিন বদলেছে, মাত্র বিষয়-মাহাত্ম্যেই আর এ ধরনের লেখার শিরোপা জোটে না। এমন কি, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ বা নির্ভেজাল অভিজ্ঞতার প্রয়োগও এখন ছদ্মবেশী রোম্যাণ্টিকতা বলে অভিযুক্ত হতে পারে, যদি না ধরা দেয় লেখকের স্বতন্ত্র কোন অ্যাটিটিউড। আলোচ্য উপন্যাসটি অনেক আয়োজন সত্ত্বেও সেই বিশেষ দৃষ্টির অভাবেই একটি ছকে বাঁধা কাহিনীর অতিরিক্ত আমাদের আর কিছুই দিতে পারে না। ৪৩২।৬৭

প্রাপ্তি স্বীকার

পঞ্চম রাগিণী। বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। আধুনিক কবিতা প্রকাশনী : ১ মিডল রোড, কলিকাতা-৩২। মূল্য ২·০০।

মস্কো থেকে মাদ্রিদ। ডঃ দিলীপ মালাকার। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা লিমিটেড : ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা-১২। মূল্য ৫·৫০।

বিমল মিত্রের গল্প। বিমল মিত্র। ত্রিবেণ প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড : ২ শ্যামাচর দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪·৫০।

নির্জন মমতা। গৌর দাশ। প্রসাদ মিশ্র মালদহ। মূল্য ২·০০।

আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ। আবু সয়ীদ আইয়ুব। ভারবি : ২৬ কলেজ স্ট্রী কলিকাতা-১২। মূল্য ৮·০০।

সোনচাঁপা। সমর বসু। কর্নওয়ালি বুক স্টল : ১১৪এ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪। মূল্য ৪·০০।

জন্মান্তরবাদ। শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচা শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য : স্বারিক জংগ রোড, ভদ্রকালি, হুগলী। মূল্য ০·৮০।

চক্ষে তাহার তৃষ্ণা। তরুণেন্দু দে ডি-লাইট বুক কোম্পানী : ১৭৩/৩ বি সরণী, কলিকাতা—৬। মূল্য ৪·৯০।

ধূসর সংরোগ। সুনীল রায়। ডি-ল বুক কোম্পানী : ১৭৩/৩ বিধান স কলিকাতা-৬। মূল্য ৩·০০।

খাড়িউর্জা। দস্তয়েভ্‌স্কি। অনুবা দেবব্রত রেজ। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী : বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা-১২। মূল্য ৪·০০।

দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে আয়োজিত এশিয়ান যুব ফুটবলে ভারত ও ইজরাইলের খেলার এক দৃশ্য

খেলার মাঠে

মাস খানেক আগে কলকাতা ময়দানে ফুটবল নামলেও এবং দিল্লীর লীগ প্রতিযোগিতায় ফুটবলের আসর সরগরম হয়ে উঠলেও এখনো প্রথম ডিভিসনের খেলা আরম্ভ হয়নি। কেন হয়নি সে কথা সবারই জানা। রিটার্ন লীগের বদলে আই এফ এ-র তাড়াহুড়ো একক লীগ পরিচালনার অবাস্তব সিদ্ধান্ত। তাতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের আপত্তি এবং পাকে-চক্রে লীগ বয়কটের হুমকি এবং সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ক্লাবের একক লীগের বদলে আংশিক ফিরতি লীগ বা একক লীগের পরে নক-আউট প্রথায় চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ধারণের দাবি। প্রধানত এই তিনটি কারণেই এতদিন প্রথম ডিভিসন লীগের খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। কলকাতার ফুটবল ইতিহাসে এ একটি নতুন নজির। কারণ কলকাতা ফুটবলের দীর্ঘ ইতিহাসে মে মাসের পর লীগ খেলা আরম্ভের নজির নেই।

আই এফ এ-র পরিচালক সমিতি দুটি প্রধান ক্লাবের দুই প্রতিনিধি, ইস্টবেঙ্গলের শ্রী জে সি গুহ এবং ইস্টার্ন রেলের শ্রী কে কে দত্তের আপত্তি ও প্রতিবাদে সভা ত্যাগ করা সত্ত্বেও গত ফেব্রুয়ারী মাসে একক লীগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তারপর ইস্টার্ন রেল আপত্তি না জানালেও ইস্ট-বেঙ্গল কার্যকরী সমিতির সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে বসল একক লীগে তারা খেলবে না। ক্লাবের বিশেষ সাধারণ সভায় সেই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হল। কিন্তু লীগে খেলবে কি খেলবে না তার সম্পূর্ণ ভার অর্পিত হল সাধারণ সম্পাদক শ্রী জে সি গুহের উপর। অর্থাৎ অবস্থা বুঝে শ্রীগুহ ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। যদি মনে করেন আইন বাঁচাবার জন্য দুই একটি খেলায় যোগ দেওয়া দরকার, যোগও দেবেন। কারণ, কলকাতা ফুটবলের একটি আইন—লীগে অংশ না নিলে পরিচালক সমিতি অনুপস্থিত দলের জায়গায় অন্য দলকে নিয়ে পরের বছরে শূন্য স্থান পূর্ণ করতে পারেন। লীগের দুই একটি খেলায় যোগ দিলে আইন বেঁচে যায়।

যাই হোক, ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের না খেলার সিদ্ধান্ত এবং একক লীগের আয়োজনে এদিকে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হল। বড় বড় ক্লাবের সভ্যরা তাঁদের মেম্বারশিপ কার্ড রিনিউ করতে তেমন আগ্রহ বোধ করছেন না। কারণ, একক লীগে খেলা দেখার সুযোগ কম এবং ইস্ট বেঙ্গলের অংশ গ্রহণের অনিশ্চয়তায় লীগের আকর্ষণ হানির আশংকা। ফলে অনেক ক্লাবই একক লীগের পুনর্বিন্যাসের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠল। প্রকারান্তরে একে অর্থনৈতিক চাপও বলা যায়।

যেহেতু পাকো শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত দিল্লীর লীগে অংশ গ্রহণকারী তিনটি বড় ক্লাব—ইস্ট বেঙ্গল, মোহন-বাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং-এর সভ্যদের সভ্য কার্ডের বদলে বিনা পয়সার টিকিট নিয়ে খেলা দেখার সুযোগ ছিল সেহেতু বেশীর ভাগ ক্লাব সভ্যই সভ্য কার্ড রিনিউ করে ফেলেছেন। সুতরাং বড় বড় ক্লাবের অর্থনৈতিক চাপ বেশ খানিকটা কমে গিয়েছে। তবে ছোট ক্লাবের উপর এই চাপ এখনো আছে। কারণ একক লীগের বদলে রিটার্ন লীগে তাঁদের সভ্যদের আগ্রহ বেশী। প্রধানত বড় তিনটি ক্লাবের সঙ্গে লীগের ৬টি খেলা দেখার জন্যই তাঁদের সভ্যরা হাঁ করে থাকেন।

সর্বপ্রথম আয়োজিত মেয়েদের ভলিবল লীগ প্রতিযোগিতার শেষে পশ্চিমবঙ্গ ভলিবল ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীঅশোককুমার সরকার চ্যাম্পিয়ন টালিগঞ্জ সুভাষ সঙ্ঘের অধিনায়িকার হাতে চ্যাম্পিয়নশিপ কাপ দিচ্ছেন

সেই খেলার টিকিট ও গেট স্লিপের বদলে যে 'ডোনেশন' আদায় করেন তার দ্বারা ক্লাবের অনেক খরচ মিটে যায়। একক লীগে স্বভাবতই এই সুযোগ থেকে ছোট ছোট ক্লাব বঞ্চিত হচ্ছে।

ফলে একক লীগের পূর্বসিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য পরিচালকমণ্ডলীর ১৫ জন সদস্যের স্বাক্ষরে আই এফ এ-র এক তলবী সভা আহ্বান করা হচ্ছে। আগামী ৬ জুন সভার দিন তারিখও ঠিক হয়ে গেছে।

কিন্তু একক লীগ পুনর্বিন্যাসের যে প্রস্তাব আছে তাতে প্রথম ডিভিসনের ছোট ছোট ক্লাবের সুবিধা কি হবে ভেবে পাচ্ছি না। প্রস্তাব আছে, একক লীগের পর লীগ টেবলের উপরের চারটি দলকে নিয়ে চ্যাম্পিয়ানশিপ মীমাংসার প্রশ্নে নক আউট প্রথায় খেলা পরিচালিত হবে।

চারটি দলের মধ্যে নক আউটের অর্থ তিনটি খেলা। দুটি সেমিফাইনাল, একটি ফাইনাল। ডাবল লেগের সেমিফাইনাল হলে বাড়বে দুটি খেলা। এতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে উপরের চারটি দল। ধরে নেওয়া যেতে পারে মোহনবাগান, ইস্ট বেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং, বি এন আর অথবা ইস্টার্ন রেল। ছোট ছোট ক্লাবের এতে কি লাভ হবে? লীগের আকর্ষণই বা কতটুকু বাড়বে? তার চেয়ে টেবলের উপরের চারটি দল নিয়ে ফিরতি খেলার ভিত্তিতে আবার লীগের ব্যবস্থা করার জন্য ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব পরে যে প্রস্তাব দিয়েছে, সে ব্যবস্থায় খেলা হলে লীগের আকর্ষণ অনেক বেড়ে যেত। এবং প্লাটিনাম জয়ন্তী বছরে আকর্ষণীয় অনেকগুলি খেলার আয়োজনে আই এফ এ-র কোষাগারও ভরে উঠত। তবে এ ব্যবস্থায়ও ছোট ক্লাবের বিশেষ কোন সুরাহা হত না। তবে বাড়তি অর্থাগমের ভাগে কিছু পেতে পারত।

*

যদিও ১৫ জন সদস্য স্বাক্ষরিত একক লীগ পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব রদবদল সাপেক্ষ, তবু যত দূর বোঝা যাচ্ছে, লীগের পর চারটি দলের ফিরতি লীগের প্রস্তাব পাস হবে না। কারণ, পেছন থেকে যিনি কলকাঠি নাড়ছেন এবং আই এফ এ সংস্থায় এখনো যাঁর অপ্রতিহত ক্ষমতা, যাঁর কথায় আই এফ এ ওঠে বসে তাঁর এতে আপত্তি।

কর্মকর্তা ও পরিচালক সমিতির সদস্য মিলিয়ে আই এফ এ পরিষদে ভোটের সংখ্যা ৪০। কোন নিয়ম পরিবর্তনের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন। দুই-তৃতীয়াংশ তো বটেই, তার চেয়েও বেশী ভোট নিয়ন্ত্রণ করেন প্রতিপত্তিশালী ওই ভদ্রলোক। সুতরাং তিনি যেমন ইচ্ছা করবেন সেইভাবেই প্রস্তাব পাস হয়ে যাবে। তা না হলে একক লীগের অনুপযোগিতার কথা এবং ফুটবলের অবনতির কথা জেনেও কিভাবে সর্বসম্মতিক্রমে গত ফেব্রুয়ারী মাসে একক লীগ প্রস্তাব পাস হল? কিভাবেই বা ওঠা-নামা-বিহীন লীগ ব্যবস্থার মধ্যে প্রথম ডিভিসনে দল বাড়াবার ব্যবস্থা হল? ভোটের জোর থাকলে ইচ্ছেমত সব কিছুই করা যায়।

কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, যে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের আপত্তির জন্যই আজ তলবী সভার আহ্বান, সেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের যে প্রস্তাবে সায় নেই সেই প্রস্তাব গ্রহণের সার্থকতা কি হবে?

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রস্তাবই গ্রহণ করতে হবে, এমন কথা কেউই বলবে না। কিংবা তাঁদের দাবি যদি অযৌক্তিক এবং ফুটবলের উন্নতির পরিপন্থী হয় সে দাবির কাছেই বা আই এফ এ কেন নতি স্বীকার করবে? আই এফ এ পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের ভেবে দেখতে হবে দাবির পেছনে যুক্তি আছে কিনা। প্রস্তাব ফুটবলের উন্নতি ও আকর্ষণ বৃদ্ধির সহায়ক কিনা। সেটা যদি ভেবে না দেখেন তবে তলবী সভার প্রয়োজন কি ছিল? ইস্টবেঙ্গল আপত্তিই করুক আর লীগ বয়কটের হুমকিই দেখাক, একক লীগের সিদ্ধান্তে অবিচল থেকে এতদিন খেলা আরম্ভ করে দেওয়াই উচিত ছিল। তলবী সভার প্রহসন করে লীগের সঙ্গে নক-আউটের লেজুড় জুড়ে দেওয়া কেন? লীগের সঙ্গে নক-আউটের ব্যবস্থা লীগ খেলার মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। পৃথিবীর কোথাও এ ব্যবস্থা আছে বলে আমার জানা নেই। নক আউটের সঙ্গে লীগ আছে। পত্রপাঠ কোন দলকে যাতে বিদায় নিতে না হয় তার জন্যই সেই ব্যবস্থা। আন্তর্জাতিক নক আউটে অংশ গ্রহণকারী দেশ যাতে একাধিক খেলায় নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারে তার জন্যই নক-আউটের প্রথমে গ্রুপ লীগের আয়োজন। কিন্তু লীগের সঙ্গে নক আউটের আয়োজন আই এফ এ পরিচালকমণ্ডলীর পঞ্চদশ সদস্যের উর্বর মস্তিষ্কের নতুন আবিষ্কার।

*

মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংকে নিয়ে পত্রিকা শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ত্রি-দলীয় ফুটবল লীগে মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। প্রথম খেলায় ইস্টবেঙ্গল ১—০ গোলে মহমেডানকে পরাজিত করে। মোহনবাগান মহমেডান স্পোর্টিং-এর দ্বিতীয় খেলা ২—২ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। শেষ খেলায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে ২—০ গোলে হারিয়ে মোহনবাগান ল[illegible] করে চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মান। লীগ টেবলে মোহনবাগান পায় ৩ পয়েন্ট, ইস্টবেঙ্গল [illegible] পয়েন্ট ও মহমেডান স্পোর্টিং ১ পয়েন্ট। চ্যাম্পিয়ন দলের সঙ্গে আই এফ এ এর দশের অতিরিক্ত খেলাতেও মোহনবাগান ১—০ গোলে বিজয়ী।

এই ত্রি-দলীয় লীগের খেলা থেকে তিনটি দলের এ বছরের শক্তির বি[illegible] আভাস মিলেছে। সে সম্পর্কে [illegible] আলোচনা করা যাবে। আপাতত এই কা[illegible] বলতে চাই, তিনটি খেলার ধারা অনুয[illegible] মোহনবাগানের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ যুক্তি[illegible] পূর্ণ। গতবারের অপরাজিত [illegible] চ্যাম্পিয়ন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব যা[illegible]

[illegible] শক্তির বিশেষ তারতম্য ঘটেনি— দলের বিরুদ্ধে ২—০ গোলে পিছিয়ে থেকেও দুটি গোল শোধ করে মোহনবাগানের একটি পয়েন্ট লাভ নিঃসন্দেহে দৃঢ়তা ও দক্ষতার পর্যাপ্ত পরিচয়। তারপর শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গলকে ২—০ গোলে পরাজিত করাও কম কৃতিত্বের কথা নয়। তীব্র গতিবেগ এবং সুতীব্র উত্তেজনার মধ্যে অনুষ্ঠিত এই খেলায় ইস্টবেঙ্গলও কম আক্রমণ করেনি। তাদের খেলাও মন্দ হয়নি। তবে মোহনবাগানের আক্রমণে তীব্রতা ছিল বেশী, আক্রমণের সংখ্যাও ছিল বেশী। তবু মনে হয়েছিল খেলাটি গোলশূন্যভাবে শেষ হবে। কিন্তু শেষ ১০ মিনিটে পর পর দুটি গোল করে মোহনবাগান বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে।

দুটি গোলের ক্ষেত্রে মোহনবাগানের আক্রমণভাগের যেমন কিছু বুদ্ধির পরিচয় মেলে, তেমন ইস্টবেঙ্গল রক্ষণভাগের খেলায় মেলে শ্রান্তির ছাপ।

উঁচু করে করা দুই দলের সাতটি কর্নার কিক ব্যর্থ হবার পর অষ্টম কর্নার কিকে কানন কিছু বুদ্ধির পরিচয় দিলেন নিচু করে কিক করে। তার ফলে ইস্টবেঙ্গল রক্ষণব্যূহে হল ভুলবোঝাবুঝির সৃষ্টি। প্রথম গোল তারই ফল। দ্বিতীয় গোলের ক্ষেত্রে নানাকের গতিবেগই কার্যকারণ।

খেলার শেষে সিউল থেকে ফিরে আসা ফুটবল দলের ম্যানেজার আক্ষেপ করে বলেছেন, কানন যদি সিউলে এই খেলা খেলত, কিংবা সীতেশ দাস ও হাবিব এই খেলার আংশিক পরিচয়ও রাখতে পারত— তা হলে কি ভারতের যুব দল সিউল থেকে ব্যর্থতা নিয়ে ফিরে আসত?

কথাটা একটুও মিথ্যে নয়। আমরা খেলোয়াড়দের কাছেও শুনেছি—প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকেও জেনেছি—সিউলে [illegible] ভারতের ব্যর্থতার আংশিক কারণ হলেও প্রতিষ্ঠিত অনেক খেলোয়াড়ই তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী খেলার চেষ্টা করেননি। পা বাঁচিয়ে, ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে হাল্কা চালে খেলার চেষ্টা করেছেন। কারণ নাকি তাঁদের সামনে ফুটবলের ভরা মরসুম। তাঁদের দুখানি পটু পায়ের দাম অনেক। একখানি পায়ে যদি চোট লাগে বা একখানি পা যদি অপটু হয়ে পড়ে প্রচুর ব্যক্তিগত লোকসান। জাতির লোকসানের চেয়ে ব্যক্তিগত লোকসানকে যাঁরা এভাবে বড় করে দেখেন তাঁদের জাতীয় দলে আর স্থান দেওয়া উচিত কি না ফুটবল কর্তৃপক্ষকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

*

যৎসামান্য খরচে ছোট্ট একটু চত্বরের উপর বল পারাপারের খেলা 'ভলিবল' সম্বন্ধে বাংলার যুবকগোষ্ঠী এতদিন চর্চায় মাতলেও এবার এগিয়ে আসছে বাংলার মেয়েরা। এ বিষয়ে জোরদার চেষ্টার প্রথম নিদর্শন পশ্চিমবঙ্গ ভলিবল ফেডারেশন আয়োজিত প্রথম মহিলা ভলিবল লীগ প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসর। পয়লা অনুষ্ঠানের উৎসাহী দল ছিল চারটি, প্রথম বিজয়িনী দল হল টালিগঞ্জ সুভাষ সঙ্ঘ। নিষ্পত্তিমূলক খেলায় তাঁরা ১৫—১২, ১৫—৮, ১২—১৫ পয়েন্টের ব্যবধানে হাওড়া ইউনিয়নকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

এই প্রচেষ্টা সাধুবাদযোগ্য। কেননা, বাংলা দেশে মেয়েদের শরীরচর্চার দিকটা এতকাল উপেক্ষা পেয়ে এসেছে। এই অবস্থার উপর কিছু চিন্তা রেখে গত ডিসেম্বরের জাতীয় ভলিবল অনুষ্ঠানে বাংলার মেয়েরা সাহসভরে এগিয়ে গিয়েছিল। অন্য রাজ্যের অভিজ্ঞ মেয়েদের বিরুদ্ধে তারা ভাল খেলতে পারেনি। কিন্তু লজ্জায় কুঁকড়ে যায় নি। তারই প্রমাণ এই প্রথম পদক্ষেপ।

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলেই প্রতিযোগী বা প্রতিযোগিনীদের দক্ষতার কথা ওঠে। বাংলার অল্পবয়সী মেয়েরা ভলিবলে এখনো দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি ঠিকই।

পঃ বঃ ভলিবল ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীঅশোককুমার সরকার তাঁর ভাষণের কয়েকটি কথায় এই প্রসঙ্গে বলেছেন, বাংলার মেয়েরা যদি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে এই খেলাটিকে গ্রহণ করেন তা হলে উন্নতির পথ প্রশস্ত হবেই।

বাংলার মেয়েদের ঘরের বেড়াজাল কাটিয়ে খেলার মাঠে টেনে আনা এক সমস্যা বটে। কিন্তু এখন অনেকেই বুঝতে পেরেছেন, দেশ ও জাতিকে শারীরিক সম্পদে শক্তিশালী ও খেলাধুলোর অগ্রণী করতে হলে মায়ের আগে গড়তে হবে তাঁদের স্বাস্থ্য।

আশা করব, মেয়েদের প্রথম ভলিবল লীগে যেখানে চারটি দলে চল্লিশটি মেয়ে অংশ নিয়েছে সেখানে পরের বছর গণ্ডির কোঠা পেরে যাবে এবং দিন দিন ভলিবল খেলায় মেয়েদের আগ্রহ বাড়বে। সভাপতি শ্রীসরকারের প্রত্যাশানুযায়ী মেয়ে স্কুলগুলিও অল্প খরচের এই খেলার মাধ্যমে মেয়েদের স্বাস্থ্যচর্চার সুযোগ দেবেন। জাতিকেও খেলাধুলোর আগ্রহী করতে হবে।

একলব্য

শত মিটারে স্বর্ণপদকের সম্ভাবনাময় দৌড়বীর

ক্রীড়াকীর্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে অলিম্পিকে যাঁরা স্বর্ণ পদক লাভ করেন খেলাধূলোর ইতিহাসে তাঁদের নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকে। এঁদের মধ্যে আবার যিনি শত মিটার দৌড়ে সোনার মেডেলের অধিকারী তাঁর এক বিশেষ সম্মান —'ফাস্টেস্ট হিউম্যান অব দি ওয়ার্লড' হিসাবে এক দিনেই বিশ্ববিখ্যাত।

আগামী অক্টোবরে মেক্সিকো অলিম্পিকে কে পাবে শত মিটারের স্বর্ণ পদক এবং ফাস্টেস্ট হিউম্যান অব দি ওয়ার্লড-এর সম্মান।

চার্লি গ্রীণ

বড় শক্ত প্রশ্ন। দাবিদার অনেক। বিশ্ব রেকর্ডের পাশেই তিনজনের নাম। তিনজনই অসাধারণ গতি ও শক্তির মধ্যগগনে বিরাজমান। তা ছাড়া বিশ্ব রেকর্ড ১০ সেকেন্ড থেকে ১০·১ সেকেন্ডের মধ্যে এক শ' মিটার দৌড়েছেন পৃথিবীতে এমন দৌড়বীরের সংখ্যা কম করে ১২জন। আবার বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ করতে পারেন নি অথচ রেকর্ড সৃষ্টিকারীকে পরাজিত করেছেন এমন ঘটনারও অভাব নেই। যাই হোক, ১০০ মিটারে দৌড়ের স্বর্ণ পদকে যে দেশের প্রায় এক চৌদ্দ অধিকার সেই আমেরিকার অ্যাথলীট বিশারদদের ধারণা চার্লি গ্রীণ মেক্সিকোর ১০০ মিটারের স্বর্ণ সম্ভাবনাময় দৌড়বীর।

তবে কিন্তু আছে। চার্লি গ্রীণের বয়স ২৩ বছর। আর গ্রীণের স্বদেশীয় বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টিকারী জিম হাইনসের বয়স সবে ১৯। উনিশ শ' সাতষট্টির নাম-করা প্রতিযোগিতার মধ্যে গ্রীণকে জামাইকার মিলার ও স্বদেশীয় হাইনস-এর কাছে মাত্র একবার হার স্বীকার করতে হয়েছে। তবে মার্কিন কমনওয়েলথ-এর ওই দ্বৈত দৌড় প্রতিযোগিতায় গ্রীণ পুরো প্রস্তুতি নিয়ে নামতে পারেন নি। দৌড়ের কয়েক দিন আগে মিলিটারি অফিসার্স ট্রেনিং কোর্স শেষ করে এসেছেন। ওই দৌড়ে হাইনস ও মিলার-এর সময় হয়েছিল ১০·১ সেকেন্ড, গ্রীণের ১০·২ সেকেন্ড।

কিন্তু উনিশ শ' সাতষট্টিতেই ১০০ গজের এক আকর্ষণীয় দৌড় প্রতিযোগিতায় গ্রীণের কাছে স্বদেশীয় টমি স্মিথকে হার স্বীকার করতে হয়েছে। হাইনস-এর সঙ্গে ৯·১ সেকেন্ডে ১০০ গজের বিশ্ব রেকর্ডের পাশেও এখন চার্লি গ্রীণের নাম। এবং প্রভোর হাই অলটিচিউডে আমেরিকার ন্যাশন্যাল কলেজিয়েট চ্যাম্পিয়নশিপে গ্রীণ এই বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। তা ছাড়া এক শ' মিটারে ওঁর সময় এখন ১০·১ সেকেন্ড, ২২০ গজে (টার্ন) ২০·৭ সেকেন্ড, ৪৪০ গজে ৪৬·৫ সেকেন্ড।

চার্লি গ্রীণের নিজের কথা : ভগবদ্দত্ত ক্ষমতা এবং সহজাত শক্তি ও গতি ছাড়া শত মিটারে স্বর্ণ পদক লাভ সম্ভব নয়। তাই অনুশীলন সম্পর্কে অপরাপরের মত সিরিয়াস নয়, যদি বছরে ৬ মাস এবং সপ্তাহে ৪ দিন নিয়মিত দৌড়ের রেওয়াজ রাখেন।

গ্রীণের কোচ ফ্রাঙ্ক সেভাইনের ধারণা, গ্রীণের স্টার্ট যেমন সুন্দর, গতিবেগ যেমন সাবলীল ও সৌন্দর্যমণ্ডিত, পায়ে যেমন অশ্বের শক্তি তাতে গ্রীণ ৯ সেকেন্ডে ১০০ গজ, এমন কি ৯·৯ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়বার ক্ষমতাসম্পন্ন দৌড়বীর।

আবার কিন্তু আছে। চশমা পরা আমেরিকার এই নিগ্রো দৌড়বীর মার্কিন মুলুকের আর কয়েকজন অসাধারণ দৌড়বীরের মতই দুর্ভাগা। ১৯৫২-র অলিম্পিকে যেমন জিম কলিডে, ১৯৫৬য় যেমন লেমন কিং, ১৯৬০ সালে যেমন চার্লি টিডওয়েল শত মিটারের স্বর্ণ সম্ভাবনায় থেকেও চোট আঘাত এবং শারীরিক অপটুতায় অলিম্পিক অংগনে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ পান নি, তেমন ১৯৬৪তেও টোকিও অলিম্পিকে প্রতিযোগিতার সুযোগ পান নি চার্লি গ্রীণ।

টোকিওর স্বর্ণ পদক বিজয়ী বব হেজের সমকক্ষ দৌড়নিয়া গ্রীণ অলিম্পিক ট্রায়ালে সেমিফাইনালে এক শ' মিটারের ১০ গজ বাকি থাকতে অপর প্রতিযোগীদের চেয়ে ৩ গজ এগিয়ে ছিলেন। সহসা তাঁর পায়ে শিরায় টান ধরে। তবু পা টেনে দৌড়ে ১০·২ সেকেন্ডে তৃতীয় স্থান দখল করে। দু' মাস পরে ট্রায়ালের ফাইনাল। গ্রীণের পায়ে তখনো শিরার টান। কিন্তু অলিম্পিক নির্বাচনের কথা ভেবেই গ্রীণকে ট্র্যাকে নামতে হয়। ১০·৪ সেকেন্ডে গ্রীণ দখল করেন ষষ্ঠ স্থান। টোকিওতে আর যাওয়া হয়ে ওঠে না।

পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি দীর্ঘ নিগ্রো দৌড়বীরের অলিম্পিক পদক জয়ের এটা শেষ সুযোগ। এখনো তিনি ক্ষমতার মধ্যগগনে। আবার কিন্তু দেখা দিয়েছে নিগ্রো অ্যাথলীটদের মেক্সিকো অলিম্পিক বয়কট হুমকিতে। স্পষ্টবাদী গ্রীণ বলেছেন গোলমাল যতই থাক আমি একজন আমেরিকান এবং আমেরিকান হিসাবে অলিম্পিকে যোগ দিতে চাই। যদি যোগ দিতে না পারি অলিম্পিক পদকের স্বপ্ন আমার শেষ হয়ে যাবে।

মনু

চলচ্চিত্রের সংকটে

লেখকরা বিচলিত

"অদ্বিতীয়া" : মাধবী মুখোপাধ্যায় ফটো-দেশ

বাংলা চলচ্চিত্রের সংকট নিয়ে আলোচনা চলছে অনেকদিন ধরেই। দুশ্চিন্তা প্রকাশেরও বিরাম নেই। কিছুদিন ধরে অবশ্য দুর্দশা মোচনের সক্রিয় চেষ্টা চলছে। এ-ব্যাপারে নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ চিত্রশিল্প সংরক্ষণ সমিতি অগ্রণী। বিপদ কত ভয়াবহ তা সমিতি বাংলার জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করেছেন। সংকটমুক্তির জন্য আন্দোলনও তাঁরা আরম্ভ করেছেন। এই আন্দোলনের তরঙ্গ এসে বাংলার লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, শিল্পী ও শিক্ষাব্রতীদের মনকেও এসে আঘাত করেছে। বাংলা চলচ্চিত্রের সংকটে আজ তাঁরাও বিচলিত। বাংলা সংস্কৃতিকে তাঁরা ভালবাসেন। বাংলা চলচ্চিত্র বাংলার সংস্কৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সিনেমা ও সাহিত্যের সম্বন্ধ চিরকালের। অন্য দেশের কথা জানি না, বাংলা চলচ্চিত্র সাহিত্যের রসে লালিত। তাই আজ বাংলা চলচ্চিত্রের দুর্দিনে বাংলার লেখক-গোষ্ঠী এবং সকল বুদ্ধিজীবী আশঙ্কিত। গত সপ্তাহে এক সভায় মিলিত হয়ে তাঁরা শুধু ভয়-ভাবনা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হননি। বাংলা চলচ্চিত্রের নিদারুণ সমস্যা দূর করার জন্য সরকার-সমীপে দাবির আকারে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করেছেন। প্রথমেই তাঁরা বলেছেন, বাংলা ছবির প্রদর্শন আবশ্যিক হোক। দ্বিতীয় দাবি, বাংলা ছবির উন্নতি ও প্রসারের জন্য সরকারের সর্বপ্রকার সাহায্য চাই। কারণ সরকারী সাহায্য ছাড়া আঞ্চলিক চিত্র বাঁচতে পারে না। তৃতীয়, শিল্পসমন্বিত ছবি প্রদর্শনের জন্য আর্ট থিয়েটার তৈরি হোক। ভাল ছবি অনেক সময় বক্স-অফিসের আনুকূল্য পায় না। সাধারণ প্রেক্ষাগৃহে এ-সব ছবির মুক্তির সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত।

শিল্পধর্মী চিত্র যদি না চলে তবে সৎপ্রচেষ্টাও বন্ধ হবে। চতুর্থ, চিত্রগৃহের অভাব বাংলা ছবির সমস্যার অন্যতম কারণ। আরও বেশী প্রেক্ষাগৃহ তৈরির ব্যাপারে সরকার তৎপর হোন।

এই কয়টি দাবির একটিও অযৌক্তিক নয়, সরকারের অসাধ্যও নয়। এবং এগুলি পেশ করেছেন বাংলার লেখকগোষ্ঠী, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী শিক্ষাব্রতী ও সাংবাদিকরা। তাঁদের দাবি সরকার উপেক্ষা করবেন না, এই বিশ্বাস আমরা নিশ্চয়ই পোষণ করতে পারি।

"গুপী গাইন বাঘা বাইন" : তপেন চট্টোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ ফটো—দেশ

গুপী গাইন বাঘা বাইন-এর সেটে

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে জাঁকজমকপূর্ণ সেটে (বংশীচন্দ্র গুপ্ত-কৃত) সত্যজিৎ রায় "গুপী গাইন বাঘা বাইন" ছবির একটি দৃশ্য গ্রহণ করলেন। সেটটি ছিল রাজ-দরবারের, বরঞ্চ বলা যেতে পারে দরবারী আসরের। সংগীতপ্রিয় রাজার দরবারে গান গাইছে গুপী (তপেন চট্টোপাধ্যায়), বাঘা বাইন (রবি ঘোষ) সঙ্গে রয়েছে। দরবারের চারিদিকে সমঝদার ও সঙ্গতকারীর দল। রাজার বেশে ছিলেন সন্তোষ দত্ত। প্লে-ব্যাক শিল্পী অনুপ ঘোষালের গাওয়া গানের দৃশ্য সেদিন নেওয়া হল। সেটটি এমন কৌশলে তৈরি যাতে ছবিতে তা

"মার্বেল প্যালেস"-এর "ইলিউশন" সৃষ্টি করতে পারে।

'গুপী গাইন...'-এর শ্যুটিং অনেকখানি হয়ে গেছে। আউটডোরের কাজ প্রায় শেষ। ছবিতে গান অনেক। পরিচালক শ্রীরায় নিজেই সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরীর এই গল্পের চিত্ররূপ দেবার ইচ্ছা শ্রীরায়ের অনেকদিন যাবতই ছিল। ছবিটিকে সকল বয়সের দর্শকের কাছে চিত্তাকর্ষক করে তোলার কাজে শ্রীরায় কোন ত্রুটি রাখছেন না। শ্রীরায় বিশ্বাস করেন, এই ছবি হবে তাঁর এক বিশেষ "এক্সপেরিমেণ্ট"।

''অদ্বিতীয়া'' শেষ

এ-আর-সি প্রোডাকশন্সের "অদ্বিতীয়া" ছবির শ্যুটিং সমাপ্ত। ছবিটির সম্পাদনা চলছে। নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত এ ছবির প্রধান স্ত্রীচরিত্রের শিল্পী মাধবী মুখোপাধ্যায়। সৌমেন্দ্র নায়ক চরিত্রের শিল্পী। অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় বিকাশ রায়, লিলি চক্রবর্তী, দিলীপ রায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেইজি ইরাণি, গীতা দে, পদ্মা দেবী, প্রেমাংশু বসু প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। সংগীত পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

"অদ্বিতীয়া"-র প্রযোজক অরুণ রায়-চৌধুরীর পরবর্তী ছবি "প্রথমা"। ডাঃ নমিতা চক্রবর্তীর "শাশ্বতী" কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করবেন নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়।

গান রেকর্ডিং : গান রেকর্ড করার মধ্য দিয়ে "বিলম্বিত লয়"-এর কাজ আরম্ভ হয়েছে, ছবিতে অগ্রগামীগোষ্ঠীর সরোজ দে (বাঁয়ে) এবং কণ্ঠশিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায় ও মান্না দে (নীচে) "দৃষ্টিদর্পণ" ছবির গান রেকর্ডিং অনুষ্ঠানে পরিচালক রঞ্জন মজুমদার সংগীত পরিচালক শ্যামল মিত্র এবং প্রযোজক ভাইয়া ঘোষ

পুরীতে রবীন্দ্রজন্মোৎসবে শিশুশিল্পীদের নৃত্যানুষ্ঠান

পুরীতে রবীন্দ্র জয়ন্তী ও বুদ্ধ জয়ন্তী

(বিশেষ প্রতিনিধি)

পুরীতে ১১ ও ১২ মে পুরী হোটেল প্রাঙ্গণে যথাক্রমে রবীন্দ্রজয়ন্তী ও বুদ্ধ-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। দুদিনেই রবীন্দ্র-সংগীত ও গীতিনাট্য উপস্থিত দর্শকদের আনন্দ দেয়। সংগীত পরিচালনা করেন বিজয়া সাধু ও মাখনলাল হালদার। কুমারী বাণী হালদার নৃত্য পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাহ করেন। সঙ্গীতে যোগ দেন মাখনলাল হালদার, কুমার হালদার, বিজয়া সাধু, অঞ্জলি মুখার্জি, শুভ্রা গঙ্গুলি ও মণিকা লাহা। নৃত্যে ছিলেন মমতা হালদার বাণী হালদার, দীপিকা লাহা, কণিকা লাহা, অল্পনা সেন, কৃষ্ণা লাহা, নিবেদিতা গুপ্ত ও বাণী মল্লিক। গীতি-আলেখ্যর কথিকা পাঠ করেন মণিকা লাহা, মহামায়া লাহা, বিজয়া সাধু ও সুধাংশু দাশ। কবিতা আবৃত্তি করেন সুধাংশু দাস ও সমীর চট্টোপাধ্যায়। রূপসজ্জা, মঞ্চসজ্জা আলোক-সম্পাত ও শব্দযোজনার কাজে ছিলেন যথাক্রমে বীণা মুখার্জি, হরিসামন্ত রায় রাজ হালদার, কুমার হালদার ও ভ্রমর জেনা। বাংলার বাইরে সাধারণত এমন উপভোগ্য অনুষ্ঠান কমই দেখা যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রাণী হালদার

এডিনবরায় রবীন্দ্র জয়ন্তী

এডিনবরা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ১০ মে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে সত্যজিৎ রায়-কৃত জীবনী চিত্র "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" দেখানো হয়। এ ছাড়া বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ এ কে সেন সভায় ভাষণ দেন।

বোম্বাই বিচিত্রা

সংগ্রাম সমাপ্ত। সংগ্রামে তাঁরাও মেতে-ছিলেন পুরোমাত্রায় যাঁদের কোন কাজ নেই। এখন তাঁরা বেকার। যাঁদের কাজ ছিল এবং কাজ করার সামর্থ্য ছিল তাঁরা সবাই বর্তমানে ব্যস্ত। বেকার দলের হাতে কাজ না থাকলেও মাথায় এখনো উত্তেজনা আছে। সুতরাং এখনো উঁচু গলার নানা কথা শোনা যাচ্ছে এখানে ওখানে। বম্বের চলচ্চিত্র জগতে আশার যেমন সীমা নেই, হতাশাও তেমনি সদা 'জাগ্রত দ্বারে'। ফ্রাসট্রেশনের উস্কে দেওয়া আগুনে অনেকেই জ্বলছে। আন্দোলন যখন চলছিল তখন কাজের এবং অকাজের লোক সকলেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যা করার তা করেছেন। এখন আন্দোলন নেই, সুতরাং আবার অনিবার্য কারণেই দু দল আলাদা হয়ে গিয়েছে। তাই যাঁরা বেকার ছিলেন তাঁরা এখন অবহেলিত বোধ করছেন। তাঁদের আশা ছিল যে, এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এমন একটা অঘটন কিছু ঘটবে যে বম্বের চলচ্চিত্র জগতে আর কেউ বেকার থাকবে না। কিন্তু তেমনটি যে কোন কারণেই হবার নয় সেটা তাঁরা উত্তেজনায় রাজ্য মুহূর্তে ঠিক উপলব্ধি করতে পারেননি। তাই তাঁরা বর্তমানে আহত এবং আশাহত।

বম্বের প্রায় প্রতিটি স্টুডিও কর্ম-চঞ্চল। অনেক ছবি সমাপ্তির পথে। কিন্তু নতুন ছবির প্ল্যানিং আশাতীতভাবে কম। প্রোডাক্‌শন মেকারদের কথায় আর ফিনান-সিয়াররা কর্ণপাত করছেন না বলে বাজারে গুজব। তবু দু-একটি নতুন ছবির পরি-কল্পনা হচ্ছে। রিজভি ভ্রাতৃদ্বয় সলিল চৌধুরীকে দিয়ে ছবি করাচ্ছেন। নিজের গল্প নিজের সুরে। সলিল চৌধুরীর ছবির নাম 'ছোটি মা'। সুনামধন্য চিত্রনির্মাতা শশধর মুখার্জি চিত্রপরিবেশনার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান করেছেন। তাঁর ছেলেদেরও দু-একজন নাকি এ ব্যাপারে ওঁকে সহায়তা করবেন। বম্বে চলচ্চিত্র জগতে যে ঝড় উঠেছিল তাতে যে অনেক কিছুই বেশ আলোড়িত হয়েছে সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। প্রদর্শকরা ছবি প্রযোজনা করছেন। প্রযো-জকরা পরিবেশক হবার কথা ভাবছেন। সরকার নতুন প্রেক্ষাগৃহের জন্য লাইসেন্স দেবেন এমন কথাও শোনা যাচ্ছে। অর্থাৎ এতদিন যে "এমনিভাবেই যায় যদি দিন যাক না" ভাবটা ছিল সেটা আর নেই। এখন ভাবটা একটু পালটেছে অর্থাৎ সবাই একটু ভাবিত হয়েছে। এই আর কী!

*

সম্প্রতি কলকাতায় বি এফ জে এ ফাংশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বম্বের চলচ্চিত্র জগতে বি এফ জে এ-র পুরস্কারের যথেষ্ট সম্মান আছে। তাই এ জগতের যারা পুরস্কৃত হন তাঁরা নেহাত অসুবিধা না থাকলে বি এফ জে এ-র অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করেন। এই প্রসঙ্গে গত বছরের একটি ছবি সম্বন্ধে কিছু বলব। গত বছর কলকাতায় মাত্র এক সপ্তাহের জন্য একটি হিন্দী ছবি দেখানো হয়েছিল। ছবিটির নাম 'উসকী কাহানী'। আমার স্মরণ-শক্তি যদি খুব খারাপ না হয় তা হলে এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে গত বছর 'উসকী কাহানী' যত ভাল সমালোচনা পেয়েছিল কলকাতার চিত্র-সাংবাদিকদের কাছ থেকে তা বোধ হয় অন্য কোন হিন্দী ছবি পায়নি। যাই হোক, বি এফ জে এ-র বিচারে 'উসকী কাহানী' গত বছরের শ্রেষ্ঠ দশটি ভারতীয় ছবির একটি হিসেবে পুরস্কৃত। এবং এ ছবির অভিনেত্রী শ্রীমতী দীনা গান্ধী শ্রেষ্ঠ সাপোর্টিং অ্যাকট্রেস হিসেবে গণ্য হয়েছেন। এই ছবিটির প্রযোজক হিসেবে নাম ছিল দুজনের—একজন শ্রীরাজেন চাওলা, অন্য জন শ্রীমুখনী আব্বাসী। আসলে এ ছবির প্রযোজক এ ছবির প্রতিটি কর্মী এবং কলাকুশলী; কারণ, এ ছবিতে কেউ কোন ভূমিকায় এক কপর্দকও নেননি কারো কাছ থেকে। এ কাহিনীর অবতারণা যে জন্যে করলাম সেইটেই এখনো বলা হয়নি। শ্রীমতী দীনা গান্ধী এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং শ্রীরাজেন চাওলাও এসেছিলেন পুরস্কার নিতে। কিন্তু সহ প্রযোজক শ্রীমুখনী আব্বাসী এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন; কারণ, এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার সামর্থ্য নেই তাঁর। উসকী কাহানীর প্রযোজকদের একজন শ্রীরাজেন চাওলা এবং অভিনেত্রী শ্রীমতী দীনা গান্ধীরও যদি ব্যক্তিগত সামর্থ্য না থাকত, তা হলে হয়ত তাঁরাও এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতেন। 'উসকী কাহানী'র নির্মাতা এবং কলাকুশলীদের এ ট্র্যাজেডি বম্বের চিত্র জগতের প্রগতিশীল প্রয়াসের ট্র্যাজেডি। যে ছবি মাত্র এক সপ্তাহ দেখানো হওয়া সত্ত্বেও কলকাতায় আলোড়ন তোলে, সাংবাদিকদের দ্বারা পুরস্কৃত হয় সে ছবি বম্বেতে প্রদর্শিত হবার কোন আশা নেই। জানি না বর্তমানের পরিবর্তিত অবস্থা 'উসকী কাহানী'র মত ছবির জন্য কোন আশার বাণী বহন করে আনবে কি না!

সরল শর্মা

অজয় করের পরিচালনায় নির্মীয়মাণ "পরিণীতা"-র একটি দৃশ্যে বিকাশ রায় ও মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় ফটো-দেশ

মহিলা শিল্পীদের বদান্যতা

অভিনেত্রী শ্রীমতী তারা ভাদুড়ি অসুস্থা। তাঁর চিকিৎসার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কলকাতার মহিলা শিল্পীরা গত ১৫ মে মহাজাতি সদনে "শেষরক্ষা" নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করে-ছিলেন। গীতা দে, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপিকা দাস, বাসন্তী চাটার্জি, লতিকা দাশগুপ্তা, ইরা মিত্র প্রভৃতি এই সাহায্য অনুষ্ঠানের পুরোভাগে ছিলেন। শিল্পীরা শ্রীমতী তারা ভাদুড়িকে "অর্থ সাহায্য" করেছেন বলতে চান না। তাঁদের ভাষায় এই সাহায্য সম্মান দক্ষিণা। অর্থাৎ শ্রীমতী ভাদুড়ির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্যই অনুষ্ঠানের আয়োজন তাঁরা করেছিলেন। অভিনয় করে মোট ৫৮২৫ টাকা তাঁরা তুলেছেন। কলিকাতার মেয়র শ্রীগোবিন্দ দে ৩০০ টাকা দিয়েছেন। তা-ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে অর্থ সাহায্য করেছেন আশা দেবী, রাজলক্ষ্মী দেবী, কেতকী দত্ত, প্রতিমা দাশগুপ্ত, গীতশ্রী দেবী,

অভিনেত্রী তারা ভাদ্দুড়ির সাহায্যার্থে সংগৃহীত অর্থ শিল্পীর আত্মীয়ের হাতে তুলে দিচ্ছেন মেয়র শ্রীগোবিন্দ দে, পিছনে গীতা দে, বাসন্তী চ্যাটার্জি, ইরা মিত্র

দীপিকা দাস, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসন্তী চ্যাটার্জি, লতিকা দাশগুপ্ত, ইরা মিত্র, কল্পনা ভট্টাচার্য, নীলিমা চক্রবর্তী, অজন্তা চৌধুরী, শাশ্বতী রায়, কল্পনা দেবী জ্যোৎস্না বিশ্বাস, শৈল দেবী, ইন্দিরা দে, রেণু ঘোষ, ভারতী রায় অঞ্জলি চ্যাটার্জি, মালা নাথ, গীতা প্রধান, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, লীলা মুখার্জি, সন্ধ্যা রায়, লীলা মুখার্জি, ডলি সরকার, গীতা দে প্রভৃতি। মহিলা শিল্পী মহলের সাহায্য ও সহযোগিতাও এখানে উল্লেখ্য।

মহিলা শিল্পীদের "শেষরক্ষা" অভিনয় পরিচালনা করেন প্রেমাংশু বসু।

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

রবীন্দ্র জন্মোৎসব এবং সংস্থার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে "ফাল্গুনী"র শিল্পীরা দক্ষিণ কলকাতার রঘুনাথ হলে রবীন্দ্র-সংগীত সহযোগে ছবি দাশগুপ্তার একক নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করেন। শ্রীমতী দাশগুপ্তার নৃত্য উপস্থিত সকলের প্রশংসা অর্জন করে। গানও চিত্তাকর্ষক হয়। গীতাঞ্জলি ক্ষেত্রী ও বরুণা রায়ের গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ২৪ পরগণা ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার শাসক ও স্থানীয় রবীন্দ্র পরিষদের আমন্ত্রণে স্থানীয় এক প্রেক্ষাগৃহে রবীন্দ্রনাথের 'সাগরিকা' নৃত্যনাট্যটি পরিবেশন করেন কলকাতার 'মহুয়া' শিল্পিগোষ্ঠী। সংগীত পরিচালনায় ছিলেন 'মহুয়া' সংগীত শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষা মানসী পাল। পরিচালিকার কণ্ঠে 'সাগরিকা'র গানগুলি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন পদ্মনাভ তাপে। সংগীতে মানসী পাল, গীতা চ... কবিতা মুখার্জি, তৃপ্তি ঘোষ, মঞ্জুশ্রী গুপ্ত... পার্থ পাল, অমল চাকী, শ্যামল রায়, ধনঞ্জয় হাজরা প্রভৃতি সকলকে আনন্দ দান করে। নৃত্যে কৃতিত্ব দেখান নীলিমা চক্রবর্তী, কবিতা সেন, পামেলা নন্দী, মৈত্রাণী পা... সুদীপ্তা সিংহ ও পদ্মনাভন তাপে।

রেকর্ড সমালোচনা

নজরুল-গীতি

কাজী নজরুলের গাওয়া গান ও কবিতা পাঠ একদিন যাঁরা শুনেছেন, হিজ মাস্টার্স ভয়েস রেকর্ডে কবিকণ্ঠে "রবিহারা" আবৃত্তি এবং "ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে" শুনে হয়তো তাঁরা মুহূর্তের জন্য সেই পুরনো দিনগুলিতে আবার ফিরে যাবেন। হারানো ধন ফিরে পাওয়ার আনন্দ তাঁদের। এবং বিস্ময় ও রোমাঞ্চ অনুভব করবেন তাঁরা কবিকণ্ঠ শোনার সৌভাগ্য যাঁদের হয়নি। এঁদের উভয়ের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন দি গ্রামোফোন কোম্পানি। ই-পি রেকর্ডের এক দিকে কবির গাওয়া গান ও আবৃত্তি। অপরদিকে কবিপুত্র সব্যসাচীর আবৃত্তি (নমো নমো নমো বাংলা দেশ মম, দুর্গম গিরি কান্তার মরু, আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে এবং দৃষ্টিতে আর হয় না সৃষ্টি)। সব্যসাচীর কণ্ঠ-মাধুর্য এবং গাম্ভীর্য শ্রোতাদের অজানা নয়। কবিতা তিনি সাধারণভাবে পড়ে গেলেই শুনতে ভাল লাগে। এই চারটি কবিতার অংশ তিনি বিশেষ তালে ও ঢঙে আবৃত্তি করেছেন। সংগে রয়েছে মর্মানুগ আবহসুর। ফলে আবৃত্তি আরও বেশী রমণীয়।

নজরুল-জয়ন্তীতে কোম্পানি মোট তিনটি রেকর্ড বের করেছেন। একটি এল-পি রেকর্ডে নজরুলের বারোটি প্রেমগীতি পরিবেশিত। গানগুলি বিখ্যাত। গাওয়া অতি সুন্দর: গেয়েছেন ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র (নীলাম্বরী শাড়ি পরে এবং শাওন আসিল ফিরে), মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই এবং কেন আনো ফুলডোর আজি বিদায় বেলায়), শ্যামল মিত্র (নূরজাহান, নূরজাহান এবং নয়ন ভরা জল গো তোমার), সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় (অঞ্জলি লহো মোর সংগীতে এবং হারানো হিয়ার নিকুঞ্জ পথে), প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় (মোর না মিটিতে আশা এবং শুকনো পাতার নূপুর পায়ে) ও মাধুরী চট্টোপাধ্যায় (আমায় নহে গো ভালবাসো মোর গান এবং তুমি শুনিতে চেয়ো না আমার মনের কথা)। গায়ক-গায়িকাদের সকলেই নজরুল-গীতিতে যেন প্রাণসঞ্চার করেছেন। বার বার শোনার মত প্রতিটি গান। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় রেকর্ডে নজরুল-গীতি গেয়ে আগেও সুনাম অর্জন করেছেন। এবার তাঁর গান যেন আর ভাল লাগল। একথা শ্যামল মিত্র ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় সম্পর্কেও বলা চলে। বিশেষ অবাক করেছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাধুরী চট্টোপাধ্যায়। ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রর গাওয়া দুটি গান রেকর্ডটির মর্যাদা বাড়িয়েছে।

অপর রেকর্ডটি যন্ত্রসংগীতের। নজরুলের চারটি গানের (মোর ঘুমঘোরে এল মনোহর, পথহারা পাখি, দূর দ্বীপবাসিনী ও রুম ঝুম রুম ঝুম) সুর ইলেকট্রিক গীটারে বাজিয়েছেন কাজী অনিরুদ্ধ। আবিষ্ট হয়ে শিল্পীর বাজনা শুনতে হয়।

তরুণ মজুমদার পরিচালিত "রাহগীর" চিত্রে বিশ্বজিৎ ও সবিতা চ্যাটার্জি

❋

রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে প্রকাশিত এইচ-এম-ভি ও কলম্বিয়া রেকর্ডের সমালোচনায় যশস্বী রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীদের চারটি করে গানের ই-পি রেকর্ডের উল্লেখ ছিল। তাতে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের রেকর্ডের কথা বলা হয়নি। যদিও কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গানের তালিকায় শ্রীমুখোপাধ্যায়ের একটি গান অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হিন্দুস্থান রেকর্ড

রবীন্দ্রজয়ন্তীতে হিন্দুস্থান রেকর্ডে রবীন্দ্রসংগীত উপহার দেওয়া হয়েছে। মোট নয়টি রেকর্ড বেরিয়েছে। এর মধ্যে নীলিমা সেন (প্রভু তোমা লাগি আঁখি এবং জীবনে আমার যত আনন্দ) ও অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের (আমার সকল রসের ধারা এবং অসীম ধন তো আছে তোমার) গানের রেকর্ডের কদর হবে বেশী। নীলিমা সেনের দুটি গান জনপ্রিয় হবে। অন্য শিল্পীরা হলেন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় (কাছে যবে ছিল এবং পাখি আমার নীড়ের পাখি), দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (লুকালে বলেই খুঁজে বাহির করা এবং আমার মনের কোণের বাইরে), কবি মজুমদার (আয় তবে সহচরী এবং শুনে নলিনী, খোলো আঁখি), অনুভা মৈত্র (জীবন আমার চলছে যেমন এবং সখী দেখে যা এবার এল সময়), এবং কল্যাণী ঘোষ (সে কোন বনের হরিণ এবং এবার বুঝি ভোলায় বেলা হল)। সকলেই আন্তরিকতার সংগে গেয়েছেন। এবং রতীশ রায়। এঁদের মধ্যে শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গান বেশী ভাল লাগল। একটি রেকর্ডে বেহালায় রবীন্দ্রসংগীতের সুর (নয় এ মধুর খেলা এবং বড়ো আশা করে) বাজিয়েছেন সলিলকুমার মিত্র। বাজনা সুশ্রাব্য।

কিছুদিন আগে হিন্দুস্থান রেকর্ডে দীপেন মুখোপাধ্যায়ের দুটি ব্যঙ্গগীতি (আমি যে ইলেকট্রিকের এবং আমি স্পুটনিক) বেরিয়েছে। "অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি" ছবির "আমি যে জলসাঘরের" প্যারডি আমি যে ইলেকট্রিকের। দুটি প্যারডিই উপভোগ্য।

একটি স্ত্রী চরিত্র

সম্প্রতি পাভলভ ইনস্টিটিউট অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস ভবনে ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "একটি স্ত্রী চরিত্র" অভিনয় করেন। নাটকটি মনস্তত্ত্বমূলক। চিত্রিতা নামে একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে নাটকের ঘটনা আবর্তিত। দুরূহ মনস্তত্ত্বের এই নাটক মঞ্চস্থ করা কঠিন। পাভলভ ইনস্টিটিউটের শিল্পীরা অবশ্য অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। । প্রধান স্ত্রী চরিত্রে সবিতা মুখোপাধ্যায় চমৎকার অভিনয় করেছেন। অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় জ্যোতিষ মল্লিক, ধীরেন গুপ্ত, সুনীল বিশ্বাস, গুরুদাস লস্কর, দেবকুমার দে, সন্তোষ বসু এবং পাভলভ ও ফ্রয়েডের বেশে যথাক্রমে সমর গুপ্ত ও ধূর্জটি দত্তর অভিনয় চরিত্রোচিত। নাট্যপরিচালনা করেছেন মমতাজ আহমেদ।

সংগীতশিল্পীর বিদেশযাত্রা

শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরী কলোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভারতীয় সংগীত বিভাগে অনুষ্ঠান-সহ বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত

হয়েছেন। তা-ছাড়া পশ্চিম জার্মানীর বিভিন্ন শহরে এবং প্যারিস, লণ্ডন অক্সফোর্ড ও ক্যাম্ব্রিজে সংগীতবিষয়ক বক্তৃতা এবং সেতার ও সুরবাহার বাজনা পরিবেশনের জন্যও আমন্ত্রণ পেয়েছেন। শ্রীরায়চৌধুরী প্রথমে ওস্তাদ এনায়েৎ হোসেন খাঁ সাহেবের কাছে সেতার ও সুর-বাহার বাজনা শিক্ষা আরম্ভ করেন। সংগীত শাস্ত্রে তিনি বিস্তর গবেষণা করেন। তাঁর রচিত "ভারতীয় সংগীত কোষ" বহু প্রশংসিত। ইংরেজীতে তিনি "দি ডিকশনারি অব নর্থ ইণ্ডিয়ান

বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী

ক্ল্যাসিকাল মিউজিক" এবং "দি গ্রামার অব নর্থ ইণ্ডিয়ান রাগজ" নামে দুটি বই রচনার কাজ শেষ করেন। অধ্যাপক রায়চৌধুরী "ইমদাদখানি স্কুল অব সিটার" এবং "ইমদাদখানি কলেজ অব মিউজিক" প্রতিষ্ঠান দুটির প্রবর্তন করেন। বিড়লা একাডেমি অব আর্ট অ্যাণ্ড কালচারে তিনি বর্তমানে সেতার ও সুরবাহার বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন।

রংপুরে জমিদার পরিবারে ১৯১১ সনে শ্রীরায়চৌধুরীর জন্ম।

শিশু রংমহলে বীরেন মঞ্চের উদ্বোধন

ডক্টর কে পি এস মেনন ২৫শে বৈশাখ বীরেন মঞ্চের উদ্বোধন করেছেন অবনমহল প্রাঙ্গণে। এই উপলক্ষে সংগীত নাটক আকা-দেমির সহ-সভাপতি বলেন, "রুশ দেশের বাইরে শিশুদের এমন একটি সর্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান দেখিনি।"

জন্মসপ্তাহ উপলক্ষে শিশুরংমহলে অন্যান্য অভ্যাগতদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিম-বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর। শ্রীধর্মবীর বলেন, "সংগ অফ ইণ্ডিয়া" ও অবনমহল একই সুরে বাঁধা। দেখে আনন্দ হল যে শিশুরংমহলে শিশুদের ভারতীয় হবার জন্য উদ্বুদ্ধ করছে এবং সারা দেশে এটিই হওয়া উচিত।"

বোম্বাইয়ে রবীন্দ্র-জয়ন্তী

বোম্বাই বান্দ্রার "বাঙালী মেসে"র উদ্যোগে রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। "প্রেম ও প্রকৃতি" নামে যে গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয় তাতে পনেরোটি গান ছিল। উপভোগ্য অনুষ্ঠানে বহু প্রবাসী বাঙালী যোগ দিয়েছিলেন। আবৃত্তি করেন শিবদাস চট্টোপাধ্যায়, ধীরা ভট্টাচার্য, চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী ও রাধা ভট্টাচার্য। গীতি-আলেখ্যর শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন বন্দনা গুপ্ত, শীলা ঘোষ, সবিতা চক্রবর্তী, মালা মুখোপাধ্যায়, সুপ্রভা চক্রবর্তী, সাগরী গুপ্ত, মহুয়া ঘোষ, অনিরুদ্ধ ঘোষ, সুশীল দাশগুপ্ত, অরুণ দাশগুপ্ত, সুনীল মাশচাটক, গোপাল বরাট, প্রবীর গোস্বামী (তবলা) প্রভৃতি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরি-চালনা করেন মিলন মুখোপাধ্যায়।

মণ্ট্রিয়লে "শাপমোচন"

(বিশেষ প্রতিনিধি)

সম্প্রতি স্থানীয় ভিক্টোরিয়া হলে ইণ্ডিয়া-ক্যানাডা অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রবীন্দ্র-

নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের শিল্পীদের "শ্যামা" নৃত্যনাট্যে মধুতপা দত্ত (বজ্র সেন) ও শুক্লা সেনগুপ্ত (শ্যামা)

কিশোরকুমার সম্প্রতি কলকাতায় এসে একাধিক বাংলা ছবিতে কণ্ঠদান করেন : "সাবরমতী" চিত্রের গান রেকর্ড করার সময় কিশোরকুমার ও ইলা বসু

নাথের নৃত্যনাট্য "শাপমোচন" মঞ্চস্থ করা হল। মণ্ট্রিয়লে এ ধরনের প্রচেষ্টা এই প্রথম, এবং এই প্রথম প্রচেষ্টাই অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছে।

স্থানীয় দর্শকদের সুবিধার্থে প্রথমে ইংরেজী ও ফরাসীতে কাহিনীটির সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ ব্যাখ্যা করা হল। নৃত্যনাট্যের গদ্যাংশটি ইংরেজীতে কাব্যনাট্যের ধরনে সুন্দরভাবে রূপদান করেন শ্রীমতী দানিয়েল মুখার্জি। এর জন্য সংগীতাংশের কোন অদলবদল করা হয় নি বা মূল নাটকের কোন রসবিচ্যুতিও ঘটে নি।

নীলা বসু ও আশা নাইডু যথাক্রমে অরুণেশ্বর ও কমলিকার ভূমিকায় অপূর্ব নৃত্যকুশলতার পরিচয় দেন। অন্যান্য ভূমিকায় সংযুক্তা দাশগুপ্তা, সুনন্দা বসু, কে রেইনিন, সুনন্দা মুখার্জি, নন্দিনী কুলকারনি, রিসা শ্রাগার, সুপ্রিয়া রায়, সুজান গল্যো, লুইজ ভট্টাচার্য ও সীমা ভড়ালকারের নাচ দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। নীলা বসুর নৃত্যপরিকল্পনা ও পরি-চালনার মান খুবই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল।

আবহসংগীতে ভাস্কর নাইডুর সেতার দর্শকদের মুগ্ধ করে ও নাটকের রসসৃষ্টিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গীটারে সুব্রত মৈত্র, ম্যাণ্ডোলিনে সুনীল নাগ, আর বাঁশীতে প্রবীর হাজরা। একক গানগুলি দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করেন শিপ্রা পাল আর নিউ ইয়র্কের অমি ব্যানার্জি। সমস্ত নৃত্যনাট্যটিতে নিখুঁত তবলা বাজিয়ে সকলকে আনন্দ দেন কুমার মুখার্জি।

অরণ্যদেব ✯ লী ফক

এখানে আমিই কর্তা। ভাল চাও তো জাহাজকে তীরে নিয়ে চলো।

জাহাজ চড়ায় ঠেকে যেতে পারে! বিপদ ঘটবে!

রাউডি, উনি যা বলছেন, শোনো।

ক্যাপটেনের কথা অমান্য করা ঠিক নয়।

চোপ! আমি যা বলছি, তাই করতে হবে!

ভাড়া-করা প্রমোদ-জাহাজে ক্যাপটেনের সঙ্গে গুণ্ডাদের সংঘর্ষ.....

ব্যাপার কী রাউডি?

ক্যাপটেন-ব্যাটা আমার কথা শুনছে না, যেখানে যেতে বলছি সেখানে যাচ্ছে না —

বটে?

কী হে, রাউডির কথা শুনছ না কেন?

ওরে বোকারা, শুনছি না, তার কারণ, জাহাজ চালানোর ব্যাপারটা ওর চাইতে আমি ভাল বুঝি!

?!

ওরে গুণ্ডারা, মাথার উপরে হাত তুলে দাঁড়াও, নয়ত তোমাদের শেষ করে ছাড়ব।

ক্যাপটেন যা বলছেন, শোন!

আমি ক্যাপটেন, আমার নির্দেশই চূড়ান্ত, বাধা দিলে তোমাদের প্রত্যেককে গ্রেফতার করব।

!?

আকাশে অলক্ষ্যে মেঘ জমেছিল। হঠাৎ প্রবল ঝড় উঠল.....

!?!

সামাল! সামাল!

12/17

ব্যাপার কী?

ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েছি, প্রপেলার ভেঙে গেছে! লাইফবোট নামাও!

কড়্-কড়্-কড়াৎ

দু-টুকরো হয়ে গেল!

অন্য বোটটা নামাও —

রাউডি!

দাঁড়াও গোলডি, ওটার কী হয় দেখি!

মড়্-মড়াৎ

বোকা! লাইফ-বেলট ছাড়াই ঝাঁপ দিয়েছে!

আ আ আ আ আ

৩

ফরাসী প্রেসিডেনট দ্য গলের প্রস্তাবিত শাসন সংস্কার ঘোষণার পরবর্তী পরিস্থিতি এই সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঘোষণার অব্যাহিত পরেই ছাত্র-পুলিস সংঘর্ষ তীব্র রূপ নিয়েছে। আট শ' বছরের ঐতিহ্যসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সরবোন অবরুদ্ধ দুর্গের চেহারা ধারণ করেছে। তার ভিতরে আছেন ছাত্রছাত্রীরা। বাইরে পুলিস। সারা এলাকা জুড়ে পড়ছে বোতল-বোমা ওরফে মলটোভ ককটেল, পাথর ও নানারকমের বস্তু (এগুলি ছাত্রদের); আর দমাদম ফাটছে কাঁদানে গ্যাসের শেল এবং হাতবোমা (এগুলি পুলিসী জবাব)। চারিদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার। তারই মধ্যে একজন ছাত্র বললেন এক বিদেশী সাংবাদিককে, "দ্য গল বলেছেন যে, তিনি আমাদের সমস্যা বোঝেন। তাঁর সমঝদারির নমুনা দেখে যান নিজেদের চোখে। দেশে ফিরে বলতে ভুলবেন না।"

দেশী সংবাদ

২০ মে—গত রবিবার সন্ধ্যায় আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় কয়েক হাজার লোকের এক ক্রুদ্ধ জনতা সিদলি থানা আক্রমণ করলে পুলিস তাদের ছত্রভঙ্গ করতে শূন্যে ২ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। কেহ হতাহত হয়নি।

দিল্লির দরবারে রাজ্যপালের আবেদনে সাড়া পাওয়া গিয়েছে। জুন থেকে সেপ্টেম্বর—অনটনের এই চার মাস পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রের কাছ থেকে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টন করে খাদ্যশস্যের সরবরাহ পাবে।

২১ মে—কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যালের চেয়ে ৪১,৯৬৫ বেশী ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছেন।

পানজাবের ১৯৬৮ সালের দুটি ব্যায়ানুমোদন আইন সংবিধানবিরোধী ঘোষণা করে পানজাব ও হরিয়ানা হাইকোরট যে রায় দিয়েছিলেন, সুপরিম কোরটের কনসটিটিউশন বেনচ আজ তা কার্যকর করা স্থগিত রাখার আদেশ দিয়েছেন।

২২ মে—আসামের গোয়ালপাড়া জেলার কোকরাঝাড় শহরে ভাতমারিতে আজ সন্ধ্যায় এক উচ্ছৃঙ্খল জনতার ওপর পুলিস নয় রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এর আগে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিস কাঁদানে গ্যাস ছাড়ে এবং লাঠি চারজ করে। গুলিবর্ষণ ও লাঠি চারজের ফলে পনেরজন পুলিস সহ পঞ্চাশজন আহত হয়। কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। কোকরাঝাড় শহরে আজ রাত্রি সাতটা থেকে আগামীকাল বেলা তিনটা পর্যন্ত কারফিউ বলবৎ করা হয়েছে।

কলকাতা বন্দরের সর্বশেষ প্রশাসনিক রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৯৬৬-৬৭ সালে ৩ কোটি ১১ লক্ষ টাকার বেশী লোকসান হয়েছে। গত বছরে লোকসানের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা।

২৩ মে—যুক্তফ্রন্টের আলোচনার পর বৃহস্পতিবার ফ্রন্টের এক মুখপাত্র বলেন যে, কৃষ্ণনগরের পরাজয় নিয়ে তাঁরা এইদিন বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ওই মুখপাত্র বলেন যে, প্রধানত আত্মসন্তুষ্টিই এই পরাজয়ের কারণ বলে ফ্রন্টের অধিকাংশ নেতা মনে করেন।

খাদ্য সরবরাহ বিভাগে ভোগ্যপণ্য শাখার প্রায় সাড়ে চারশ' জরুরী ফাইল ১৯৬৬ সাল থেকে নিখোঁজ। দীর্ঘদিন খোঁজাখুঁজি করেও ফাইলগুলির কোন পাত্তা পাওয়া যায়নি।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৪ মে—লোকদলের নেতারা কংগ্রেসে যোগদানের সিদ্ধান্তে নাকি একমত হলেন। কী শর্তে তাঁরা কংগ্রেসে যেতে চান শুক্রবার লোকদলের নেতৃবৃন্দ তাও ঠিক করে ফেলেছেন। সাধারণভাবে শর্তটি হচ্ছে : লোকদলের বর্তমান নেতা ও কর্মীদের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি থেকে শুরু করে ওয়ার্ড কংগ্রেস কমিটি পর্যন্ত সর্বস্তরে উপযুক্ত স্থান দিতে হবে।

গত দু'মাসে খাদ্য কর্পোরেশনের দশটি ট্রাকে এক শ' কুড়ি টন গম ও চাল কলকাতা থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। এই খাদ্যশস্য বন্দর থেকে উত্তর কলকাতায় একটি সরকারী গুদামে নিয়ে যাওয়ার পথে নিখোঁজ হয়।

২৫ মে—সিনেমা কর্মী সংস্থার এক প্রতিনিধি দল শনিবার মহাকরণে রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরের সঙ্গে আলোচনাকালে জানিয়েছেন, ৩১ মে-র মধ্যে ধর্মঘটের মীমাংসা না হলে তাঁরা কয়েকটি সিনেমা হাউসের দায়িত্ব নিতে চান।

সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃসম্মেলনের নয়জন সদস্যই আগামী ১ জুন থেকে আসাম বিধান-সভার সদস্যপদ ত্যাগের জন্য আজ পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন।

২৬ মে—ভারত ও পাকিস্তানের জলসম্পদ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে পূর্বাঞ্চলের নদীগুলির ব্যবহার সম্পর্কে ১৪ দিনব্যাপী যে আলোচনা চলছিল তা আজ উভয় পক্ষের তীব্র মতানৈক্যের মধ্যে শেষ হয়। এই মতভেদ পূর্বেও যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। ভারতের মতে এ বৈঠক ষোল আনা ব্যর্থ হয়নি। আরও আলোচনার প্রস্তাবও করা হয়। অন্য দিকে পাকিস্তান বিশেষজ্ঞরা এই বৈঠককে পরিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক বৈঠকে পরিণত করেন।

পশ্চিমবঙ্গের আগামী অন্তর্বর্তী নির্বাচনে যে মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আসন রফা হবে রবিবার সে সম্পর্কে যুক্তফ্রন্ট কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। এদিন আসন রফার মূলনীতির প্রশ্নে যুক্তফ্রন্ট কমিটি সাধারণভাবে আলোচনা করেন মাত্র। এ ব্যাপারে যুক্তফ্রন্ট আবার ৩০ মে বৈঠকে বসছেন। এইদিন ফ্রন্টের এক মুখপাত্র জানান, ৫ জুনের মধ্যেই যুক্তফ্রন্ট আসন রফার পর্বটি শেষ করে ফেলতে পারবেন বলে আশা করছেন।

বিদেশী সংবাদ

২০ মে—ফ্রান্স আজ গভীর সঙ্কটে। ১৯০৬ সালের পর থেকে এমন সংকট দেখা যায়নি। পঞ্চাশ থেকে ষাট লক্ষ শ্রমিকের ধর্মঘট আন্দোলন সরাসরি দ্য-গল সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে। ব্যাঙ্ক-কর্মীর ধর্মঘট করতে পারেন আশঙ্কা করে সন্ত্রস্ত ফরাসীরা ব্যাঙ্ক থেকে তাঁদের টাকাকড়ি তুলে নিতে থাকেন। রয়েল ব্যাঙ্ক অব কানাডা জানা সব টাকা ফুরিয়ে যাবার পর ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

২১ মে—ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অচলাবস্থা ও সংসদে নিন্দাসূচক প্রস্তাবের হুমকিতে বিব্রত ফরাসী মন্ত্রিসভা আজ সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাস্তার লড়াই-এ হিংসাশ্রয়ী কাজের জন্য যে স ছাত্র অভিযুক্ত হয়েছেন—যার পরিণতিতে সা দেশে ধর্মঘট—তাঁদের শাস্তি দেওয়া হবে ন ফ্রান্সের সঙ্কট দূর করার চেষ্টায় প্রেসিডে চারলস দ্য-গল সারা দেশে গণভোট নে বিষয়ও বিবেচনা করছেন বলে জানা গিয়েছে

২২ মে—প্যারিসে ভিয়েতনাম শা আলোচনায় গোপন কূটনৈতিক তৎপর চালাবার জন্য একটি আমেরিকান প্রস্তাব উ ভিয়েতনাম আজ অগ্রাহ্য করেছে। উ ভিয়েতনাম এমনও ইঙ্গিত দিয়েছে যে, দী প্রতীক্ষিত আলোচনা ভেঙে যেতে পারে।

২৩ মে—আজ প্যারিসের 'লা কোয়ার্টার্স'-এ ছাত্রদের সঙ্গে পুলিসের ন করে জোর সংঘর্ষ হয়েছে। ছাত্ররা গাড়ি আগুন লাগান, পাথর ছোঁড়েন এবং রীতি গেরিলা তৎপরতার পরিচয় দেন। পুলি অস্ত্র ছিল কাঁদানে গ্যাস এবং জল-কামান।

২৪ মে—চূড়ান্ত জয় না হওয়া পর্য ভিয়েতনামীরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে বলে উ ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফাম ভ্যান ডং ঘোষণা করেন। এ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট হো মিনের সংক্ষিপ্ত বাণীও বেতারে প্রচার করা হ

২৬ মে—টোকিওর গভর্নর আজ কয়েকজন অধস্তনের অপরাধের দায় ঘাড়ে নি নিজের বেতনের কিছু অংশ না নেবার সিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। গভর্নর সাংবাদিক জানান উৎকোচ গ্রহণের সঙ্গে আংশিকভ জড়িত ৭০ জন সরকারী কর্মচারীকে শা দেওয়া হয়।

আজ পাক বেতারে বলা হয়েছে, আগা মাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার হবে। পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভাইস এডমি এ আর খান আজ লাহোর থেকে ঢাকায় পৌ বলেন, পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকি থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য যারা ষড়যন্ত্র করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় সে আসামীদের বিচার করবেন একটি স্পে ট্রাইবুনাল। পূর্বেই ট্রাইবুনালটি গঠন হয়েছে।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

*

দেশ

৩৫ বর্ষ, ৷৷ সংখ্যা ৩২
শনিবার ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫

*

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
৩০-২২৮০   ৩০-৮৫৪১

*

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	...	২৫.০০
ষান্মাসিক	...	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	...	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষান্মাসিক ..	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ..	...	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষান্মাসিক ..	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ..	...	৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	...	৫২.০০
ষান্মাসিক ..	...	২৬.০০
ত্রৈমাসিক ..	...	১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	৩৮.০০
ষান্মাসিক	...	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	...	১০.০০

*

দাম ৫০ পয়সা
আসামে বিমান মাসুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday 8 June 1968

জলাভাব ও নলকূপ

গ্রীষ্ম প্রায় শেষ হতে চলেছে। সাধারণত একনাগাড় গরমের মধ্যে মাঝে মাঝে প্রকৃতির কিঞ্চিৎ দাক্ষিণ্যের পরশ পাওয়া যায়, কখনও কালবৈশাখীর বয়ে আনা ধুলো আর ঝড়ের সঙ্গে সুদূরের কিছু শীতলতা, কখনও দু চার পশলা বৃষ্টি। এবারে কালবৈশাখী পথ ভুলে দু' চার বার এসেছে অবশ্য কিন্তু তার তেমন ভয়ংকরতা ছিল না, বৃষ্টি আদপেই নয়, আকাশ একেবারে শুকনো। একেবারে সম্প্রতি কিছু ঝড় বৃষ্টি দেখা দিয়েছে এই যা রক্ষে। গত দু তিন মাসের মধ্যে বৃষ্টি প্রায় না হওয়ায় ভয়ের কারণ দেখা দিতে শুরু করেছে। বিহার, উড়িষ্যা, রাজস্থানে খরার তীব্রতা যেমন উদ্বেগের সৃষ্টি করছে সেই রকম পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গা থেকে খরার সংবাদ এসে পৌঁছচ্ছে। বীরভূম, নদীয়া, হাওড়া জেলার গ্রামাঞ্চলে নিদারুণ জলাভাব, বাঁকুড়া পুরুলিয়া রীতিমত খরার কবলে। জলাভাবের জন্য সব রকম চাষবাসের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, আউস ও পাট চাষ প্রায় বন্ধ, সবজির ক্ষেতখামার রৌদ্র তেজে দগ্ধ হয়ে তরিতরকারি শুকিয়ে যাচ্ছে। পানীয় জল পাওয়া যায় না, নলকূপ শুকনো, পুকুর শুধু কাদার সমষ্টি। আমাদের দেশে, বিশেষ করে এখানে পশ্চিমবঙ্গে, গ্রীষ্মের এই চেহারা নতুন নয়: কিন্তু এই চেহারা ভীতিকর; খরার পূর্ব-স্মৃতি স্মরণ করলে আতঙ্ক জাগে, ভয় হয়, আবার না সেই দুঃসহ খরার কবলে পড়তে হয়।

জলাভাবের কথা স্মরণ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি-দপ্তর এবার এক পরিকল্পনা রচনা করেছেন। মনে রাখতে হবে, কৃষি-দপ্তর কৃষির জন্যেই দায়ী, সুতরাং তাঁদের পরিকল্পনা মুখ্যত কৃষির উন্নতির জন্যে, পানীয় জল সরবরাহের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এই নতুন পরিকল্পনা অনুসারে স্থির হয়েছে এই রাজ্যে চল্লিশ হাজার নলকূপ বসানো হবে। অবশ্য গভীর নলকূপ নয়, অগভীর নলকূপ; এবং কাজের প্রথম পর্যায়ে কুড়ি হাজার মাত্র। শোনা যাচ্ছে, এই বছরেই যাতে প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু করা যায় তার জন্যে কৃষি-দপ্তর বিশেষ চেষ্টা করছেন, অর্থও ঋণ হিসেবে পাওয়া গেছে। অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাও মোটামুটি করা আছে।

কৃষি-দপ্তরের এই নব পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উৎফুল্ল হবার কথা। যেখানে জলের অভাবে চাষবাস বন্ধ থাকে, খরার দহনে তৃণলতা পর্যন্ত দগ্ধ হয়, সেখানে জলের ব্যবস্থার কথা শুনলে আশান্বিত না হবার কারণ নেই। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, সরকারী তৎপরতার কথা শুনলেই মন্দ লোকে হাসে। যেমন, এই নলকূপ বসানোর কথায় কেউ কেউ কিছু পুরোনো প্রসংগ তুলে আনবেন। যত দূর মনে হচ্ছে, নলকূপের পূর্বতন ইতিহাস তেমন আশাপ্রদ নয়। ইতিপূর্বে, তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রায় হাজার খানেক গভীর নলকূপ বসানোর কথা ছিল, এবং তা বসানোও নাকি হয়েছিল, কিন্তু বিদ্যুতের অভাবে পাম্প না চলায় দীর্ঘ সময় অনেকগুলি নলকূপ নাকি অচল হয়ে রয়েছে। দ্বিতীয় দফায় প্রায় তিন শো নলকূপ বসানোর কাজের অর্ধেক মাত্র সারা হয়েছে, এখনও বাকি নলকূপের কাজ চলছে। এ রকম অবস্থায় নতুন নলকূপ বসানোর কথায় কেউ যদি হতাশা বোধ করেন তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

তবু, গভীর নলকূপ বসানোর নানা হাংগামা ও খরচের কথা ভেবে অগভীর নলকূপ বসানোর ব্যবস্থা না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু সেখানেও বাধ সাধছেন ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা। এঁদের আপত্তি নীতিগত এবং এঁদের বক্তব্য, অগভীর স্তর থেকে জল তুলে নিলে আশপাশের গাছপালা মরে যাবে, ভূগর্ভের ওপরের স্তরে আর জল থাকবে না, মাটি নিরস হয়ে যাবে, গাছপালা লোপ পাবে, পুকুর শুকিয়ে যাবে, জমির উর্বরতা নষ্ট হবে। ভূতাত্ত্বিকদের এই সাবধান বাণী নাকি কৃষি-দপ্তর কানে তুলছেন না। স্বভাবতই তাঁদের কানে না তোলারই কথা। আমাদের বড় দোষ, কাজ দেখানোর জন্যে নব নব পরিকল্পনা রচনা করতে আমরা সিদ্ধহস্ত কিন্তু তার মধ্যে বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা থাকে না বলে শেষ পর্যন্ত কোনো কাজই সফল ও সার্থক হয় না। অগভীর নলকূপ ও গভীর নলকূপের মধ্যে যে তফাত, আমাদের কাজেকর্মে সে রকম একটা তফাত থাকলে ভাল হত।

দেশ দর্পণ

শ্রী হুমায়ুন কবীর গোপালপুরে গিয়েছেন। হাওয়া বদল করতে। হয়ত প্রয়োজন ছিল। রাজনৈতিক কারণ কিছু ছিল কিনা জানা নেই; তবে গোপালপুরে যাবার আগে তিনি লোক দলের সম্পাদক এবং অন্যান্য সদস্যদের যে কথাটা বলে গিয়েছেন সেটা ইঙ্গিতপূর্ণ। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন বিভিন্ন জেলায় জেলায় লোক দলের সংগঠন জোরদার করতে। এই নির্দেশটা দিয়েছেন কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর মতানুসারে "শেষ" কথা হবার পর। তিনি মনে করেন "শেষ" কথার পর আর কোন কথা নেই। অন্ততপক্ষে আপাতত নেই। কারণ, যে রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে লোক দলের সঙ্গে কংগ্রেসের আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছিল সে প্রশ্নটার মীমাংসা হবার সুযোগ আর নেই। এটাই ছিল শ্রীহুমায়ুন কবীরের ধারনা, এটাই ছিল লোক দলের কিছু সদস্যদের বক্তব্য।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে কথাটা ঠিক যেভাবে শ্রীহুমায়ুন কবীর চাপা দেবার চেষ্টা করেছিলেন সেভাবে চাপা দেওয়া হয়নি। শ্রী হুমায়ুন কবীরের গোপালপুর যাত্রার পরেই লোক দলের প্রেসিডেন্ট ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ আবার কথা বলেছেন। শ্রীহুমায়ুন কবীরের অনুপস্থিতিতে যে কথা হয়েছে শ্রীঅতুল্য ঘোষ এবং ডঃ ঘোষের মধ্যে, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এইটাই রাজনৈতিক মহলে অনুমান করে নেওয়া হয়েছে যে, লোক দলকে খুব শীঘ্রই পুনর্গঠিত করতে হবে এবং এই পুনর্গঠনের পুরো দায়িত্ব নেবেন শ্রীহুমায়ুন কবীর। পুরো দায়িত্ব অবশ্য তিনি তখনই নেবেন যখন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং তাঁর কিছু সমর্থক লোক দল থেকে বেরিয়ে যাবেন এবং কংগ্রেসে যোগদান করবেন।

এই সম্ভাবনার ইঙ্গিতই পাওয়া যায় শ্রীঅতুল্য ঘোষ এবং ডঃ ঘোষের আলোচনা থেকে, বিশেষ করে যে আলোচনা হয়েছিল শ্রীহুমায়ুন কবীরের অনুপস্থিতিতে। এই অনুপস্থিতিটা উল্লেখযোগ্য। শ্রীকবীরের নির্দেশে লোক দল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, কংগ্রেসের সঙ্গে কোন আলোচনা ডঃ ঘোষ নিজ দায়িত্বে করতে পারবেন না। কংগ্রেসের যে আলোচনা হবে তাতে যোগদান করবেন তিনজন একসঙ্গে—ডঃ ঘোষ, শ্রীহুমায়ুন কবীর এবং শ্রীচণ্ডীপদ মিত্র। এই আলোচনার জন্য ভার-প্রাপ্ত কমিটি নিয়োগের পিছনে একটা বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যায়। এই কমিটি নিয়োগ করা হয়, ডঃ ঘোষ কৃষ্ণনগর উপনির্বাচন সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নিজের দায়িত্বে, সেটা ঘোষিত হবার পরেই।

ডঃ ঘোষ কৃষ্ণনগর উপনির্বাচনে প্রার্থী হবার জন্য মনোনীত হয়েছিলেন লোক দলের সম্মতিক্রমে এবং প্রধানতঃ শ্রীহুমায়ুন কবীরের সিদ্ধান্ত অনুসারে। এই সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়েছিল কিছুটা আকস্মিকভাবে। যখন ঘোষণা করা হয়েছিল যে, ডঃ ঘোষ কৃষ্ণনগর উপনির্বাচনে লোক দলের প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, তখন কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরীর নাম ঘোষণা করা হয়ে গিয়েছে। এটা শ্রীহুমায়ুন কবীরের অজানা ছিল না যে, ডঃ ঘোষের সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্বের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গিয়েছে তাঁর মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পর। ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভার পিছনে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসনেতৃত্ব শুধু সমর্থনই জানায় নি, ডঃ ঘোষের প্রতি অনুরাগও প্রকাশ করা হয়েছিল।

যুক্তফ্রণ্ট থেকে দলত্যাগীদের নিয়ে ডঃ ঘোষ যখন প্রগ্রেসিভ ডেমক্র্যাটিক ফ্রণ্ট গঠন করলেন, তখন তাঁর দলের প্রতি সমর্থন জানাতে গিয়ে কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ একথাটা স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ডঃ ঘোষ কোন অর্থেই দলত্যাগী নয়। ডঃ ঘোষ ছিলেন নির্দলীয়। তিনি নির্দলীয় ছিলেন বলেই তাঁর অধিকার ছিল যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে থাকা বা না থাকার সিদ্ধান্ত নেবার। তার পরেও শ্রীঅতুল্য ঘোষ এটাই সব সময় বলে এসেছেন যে, মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডঃ ঘোষের বিরুদ্ধে কংগ্রেস কোন প্রার্থী দেবে না। ডঃ ঘোষের প্রতি কংগ্রেসের আনুগত্য ছিল ভিন্ন পর্যায়ের, যে পর্যায়ের মধ্যে শ্রীহুমায়ুন কবীর বা লোক দলের অন্য কোন নেতাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই আনুগত্যের নিদর্শন হিসাবে মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটি নির্বাচনের মনোনয়ন তালিকা স্থির করার সময় ডঃ ঘোষের প্রতি শর্তহীনভাবে সমর্থন জানান হয়েছে। মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস স্থির করেছে যে, কংগ্রেস নেতৃত্বের অনুমোদন নিয়ে ডঃ ঘোষকে অনুরোধ জানান হবে ঝাড়গ্রাম কেন্দ্র থেকে আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রার্থী হবার জন্য। এই অনুরোধ বা সমর্থনের পিছনে কোন শর্ত ছিল না; এমন কি একথাও বলা হয়নি যে ডঃ ঘোষকে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

এই আনুগত্য ছিল বলেই কৃষ্ণনগর উপনির্বাচনে লোক দলের প্রার্থী হিসাবে ডঃ ঘোষকে মনোনীত করা কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে রাজনৈতিক চাপ ছাড়া আর কিছুই মনে হওয়া সম্ভব নয়। এই চাপটা স্পষ্ট-ভাবেই শ্রীহুমায়ুন কবীর সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন, কারণ, শ্রীহুমায়ুন কবীর কংগ্রেসের কাছে তাঁর রাজনৈতিক প্রস্তা-

জনীয়তা প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ খুঁজেছিলেন। হয়ত এই প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত করারও প্রয়োজন ছিল। কারণ, গত দেড় বছরের ইতিহাসে শ্রীহুমায়ুন কবীরের রাজনৈতিক ব্যর্থতা হয়ত তাঁরও দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। গত নির্বাচনের আগে তিনি যখন কংগ্রেসের সংশ্রব ত্যাগ করলেন তখন তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন সর্বান্তঃকরণে কংগ্রেসের বিরোধিতা করে। তবু সেই বিরোধিতাকে সক্রিয় করার জন্য তাঁকে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল শ্রীঅজয় মুখার্জির প্রাধান্য, শুধু বাংলা কংগ্রেসের শিরোমণি হিসাবে নয়, পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ 'বিদ্রোহী' হিসাবেও। সে হিসাবে শ্রীহুমায়ুন কবীরের প্রতিষ্ঠা ছিল সীমাবদ্ধ। তা ছিল বলেই, আন্তরিকভাবে তাঁর মনে কম্যুনিস্ট বিরোধিতা থাকলেও ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত নির্বাচনী মোর্চাকে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল।

তিনি রাজনৈতিক নেতৃত্বকে স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভারতীয় ক্রান্তি দলের সংগঠনের সূত্রপাত থেকে নিজের প্রাধান্যকে প্রচার করেছিলেন। তবু সেখানেও ছিল বহু নেতা, বহু ব্যক্তিত্ব এবং শ্রীঅজয় মুখার্জি। তাই ২ অক্টোবরের ঘটনা শ্রীহুমায়ুন কবীরের আধুনিক রাজনৈতিক জীবনে ছিল এত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীঅজয় মুখার্জির নেতৃত্ব অস্বীকার করে ভারতীয় ক্রান্তি দলের মধ্যে তাঁকে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ঠেলে দেবার এটাই ছিল প্রথম সুযোগ। তাই তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, এরপর থেকে (২ অক্টোবরের পর) শ্রীঅজয় মুখার্জির নেতৃত্ব সম্পূর্ণরূপে মুছে গিয়েছে। আরও ঘোষণা করলেন, যে যুক্তফ্রন্টকে সংগঠিত করতে তিনি সাহায্য করেছিলেন সেই যুক্ত ফ্রন্টকেই তিনি ভেঙ্গে টুকরো করে দেবেন। সেটা শেষ পর্যন্ত যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভাকে বাতিল করার মধ্যেই হয়ত সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এখান থেকেই শুরু হয়েছিল ভারতীয় ক্রান্তি দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতাকে প্রতিষ্ঠিত করা। ঠিক এই কারণেই ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের পি-ডি-এফ মন্ত্রিসভার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে শ্রীহুমায়ুন কবীর শান্ত হতে পারেন নি। তাঁর সমর্থনের চাইতেও পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস নেতৃত্বের এবং বিশেষ করে শ্রীঅতুল্য ঘোষের সমর্থন ছিল ডঃ ঘোষের কাছে অনেক বেশী প্রয়োজনীয়, অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

ঠিক এই কারণেই, ডঃ ঘোষের পি-ডি-এফ মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর যখন রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থা চালু হল, পশ্চিম বাংলায় তখন পি ডি এফ নামটাকে অতি দ্রুত মুছে দিতে হল। প্রতিষ্ঠিত হল লোক দল। তবু ডঃ ঘোষের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সামনে রাখতে হল, কারণ, কংগ্রেসের সঙ্গে প্রধান সেতুবন্ধ ছিলেন ডঃ ঘোষ। হয়ত সে কারণেই লোক দলের গোড়াপত্তন করেই শ্রীহুমায়ুন কবীর প্রচার করলেন তৃতীয় শক্তি সংগঠনের কথা। তাঁর কাছে তৃতীয় শক্তি সংগঠনের প্রচেষ্টা ছিল নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজী। সে স্ট্র্যাটেজীর মূল কথা ছিল এমন এক শক্তি সংগঠিত হবে যা পোলারাইজেশনের নীতিকে অস্বীকার করে কংগ্রেস-বিরোধী এবং সেই সঙ্গে কম্যুনিস্ট বিরোধী মোর্চা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং পশ্চিম বাংলার মধ্যবর্তী নির্বাচনের রাজনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে। এই স্ট্র্যাটেজীর পিছনে শ্রীহুমায়ুন কবীরের ব্যক্তিগত রাজনীতির যে সম্পর্কই থাক না কেন, তৃতীয় শক্তির রাজনৈতিক প্রকৃতি নিঃসন্দেহে ছিল কংগ্রেস-বিরোধী, যেমন ছিল কম্যুনিস্ট-বিরোধী।

তাছাড়া তৃতীয় শক্তি সংগঠনের প্রচেষ্টা যখন করছিলেন, তখন এ কথাটাই শ্রীকবীর বার বার সামনে রাখার চেষ্টা করছিলেন যে, একক শক্তিতে কংগ্রেসের পক্ষে আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা অসম্ভব বলেই ধরে নিতে হবে। কারণ, তাঁর কাছে যুক্তফ্রন্ট-বিরোধী মতাদর্শ কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাবের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিরোধটা ছিল পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে: এবং বিশেষভাবে শ্রীঅতুল্য ঘোষের সঙ্গে। সেই নেতৃত্বকে 'সমঝে' দেবার জন্যই তিনি উত্থাপন করেছিলেন ডঃ ঘোষের নাম কৃষ্ণনগর উপনির্বাচনের আগে। তখন 'সমঝিয়ে' দেওয়াটা প্রয়োজন ছিল তাঁর দিক থেকে। কারণ, তাঁর তৃতীয় শক্তি সংগঠনের প্রচেষ্টা খুব বেশী দূরে এগোয়নি। হয়ত তৃতীয় শক্তি সংগঠনের প্রচেষ্টা ব্যর্থতার পর্যায়ে এসে গিয়েছিল, বিশেষ করে এই কারণে, যে সব দলের সঙ্গে এই তৃতীয় মোর্চা গঠন করা সম্ভব তাদের কাছে প্রয়োজনীয় উৎসাহ বা সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। তাঁর ধারনা ছিল যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ভারতীয় ক্রান্তি দল ছাড়াও এমন কিছু অ-কম্যুনিস্ট দল আছে যারা কম্যুনিস্ট নেতৃত্বের পরিবর্তে তাঁর তৃতীয় শক্তির নেতৃত্বকেই মেনে নেবে।

নেয়নি। প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে রায়গঞ্জে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কম্যুনিস্টদের সংগঠিত কোন মোর্চার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার জন্য। কিন্তু প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির এই খণ্ডিত প্রতিকৃতি আর যাই হোক তৃতীয় শক্তির শক্তিবৃদ্ধির কাজে খুব বেশী সহায়ক নয়। তাছাড়া প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির বিরাট এক অংশ আজ চেষ্টা করছে রায়গঞ্জ সিদ্ধান্তকে পুনর্বিবেচনার জন্য। এমনকি মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টভুক্ত কোন দলের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা করা যাবে কি না সে সম্বন্ধেও পশ্চিমবাংলা শাখা নির্দেশ চেয়েছে প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির জাতীয় নেতৃত্বের কাছে। হয়ত আগামী বোম্বাই বৈঠকে এ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট সিদ্ধান্তও নেওয়া হবে। কিন্তু আপাতত এটাই লক্ষণীয় যে, শ্রীহুমায়ুন কবীরের তৃতীয় শক্তি সংগঠনের প্রচেষ্টার প্রতি কোন উৎসাহ দেখান হয়নি বিশেষ কোন দলের কাছ থেকে। তাছাড়া আরও একটা রাজনৈতিক ঘটনা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।

সেটা ঘটেছে নূতন মুসলমান সংগঠনের প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। এই নূতন সংগঠন প্রগ্রেসিভ মুশ্লিম লীগ নামে পরিচিত এবং শ্রীহুমায়ুন কবীরের ধারণা এই সংগঠনের পিছনে কংগ্রেস নেতৃত্বের হাত থাকা অসম্ভব নয়। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, শ্রীহুমায়ুন কবীরের নেতৃত্বের প্রতি মুসলমান ভোটদাতাদের বড় এক অংশের আস্থা আছে, তাহলে প্রগ্রেসিভ মুশ্লিম লীগ নিঃসন্দেহে সেই আস্থার প্রতি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ অবশ্য স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, কংগ্রেস কোন সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না; কিন্তু শ্রীহুমায়ুন কবীর সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাই শ্রীহুমায়ুন কবীরের কাছে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা এড়িয়ে যাবার জন্য একটা প্রত্যক্ষ পথ খোলা ছিল; তাঁর নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে কংগ্রেসের সঙ্গে লোক দলের সমপর্যায়ে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা এবং মধ্যবর্তী নির্বাচনে লোক দলের পক্ষে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা অবলম্বন করা।

হয়ত এ কারণেই শ্রীহুমায়ুন কবীর ডঃ ঘোষের নামটা প্রচার করেছিলেন ঠিক কৃষ্ণনগর উপনির্বাচনের আগে। ডঃ ঘোষ যদি শেষ পর্যন্ত লোক দলের প্রার্থী হিসাবে উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন, তাহলে প্রত্যক্ষভাবে ডঃ ঘোষকে কংগ্রেসের সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে হত, অথবা কংগ্রেসকে ডঃ ঘোষের প্রতি আনুগত্য দেখাবার জন্য নির্বাচন থেকে কংগ্রেস প্রার্থীকে প্রত্যাহার করতে হত। এই দুই অবস্থার কোন অবস্থাই যে কংগ্রেসের কাছে বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য নয় এটা জানতেন বলেই শ্রীহুমায়ুন কবীর ব্যবহার করেছিলেন ডঃ ঘোষের নাম রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির জন্য।

নিঃসন্দেহে বলা চলে, শ্রীহুমায়ুন কবীরের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। কারণ, লোক দলের প্রার্থী হিসাবে ডঃ ঘোষের নাম প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসকে আসতে হয়েছিল লোক দলের সভাপতি ডঃ ঘোষের কাছে। প্রকৃতপক্ষে লোক দলের সঙ্গে কংগ্রেসের কোন কোন নেতার আলাপ-আলোচনা হয়ত আগে থেকেই শুরু হয়েছিল; কিন্তু কৃষ্ণনগর উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে আলোচনা শুরু হয় তারই জের টানা হয়েছে পরবর্তীকালীন আলোচনায়। তবু শ্রীহুমায়ুন কবীর ক্ষুণ্ণ এবং ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যখন ডঃ ঘোষ তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করেই কৃষ্ণনগর উপনির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে রাজী হলেন। তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে গঠিত হল লোক দলের কমিটি আলোচনা চালাবার জন্য।

পরবর্তী পর্যায়ে যে আলোচনা হয় লোকদলের সঙ্গে তাতে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র এবং শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। অপরদিকে ছিলেন লোক দল কমিটির তিনজন সদস্য—ডঃ ঘোষ, শ্রীহুমায়ুন কবীর এবং শ্রীচণ্ডীপদ মিত্র। আলোচনার মূলে বিষয়বস্তু ছিল তিনটি : কংগ্রেসের সঙ্গে লোকদলের সংযুক্ত হয়ে যাওয়া, অথবা রাজনৈতিক আঁতাত দুই দলের মধ্যে, অথবা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে আসন ভাগাভাগি করে নেওয়া। তৃতীয় প্রশ্ন কোন পর্যায়েই আলোচিত হয়নি; কারণ, কংগ্রেস নেতৃত্ব এটা প্রথমেই বাতিল করে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় প্রশ্নেও কংগ্রেস নেতৃত্ব রাজী হননি; কারণ, তাঁদের বক্তব্য ছিল যে রাজনৈতিক আঁতাতের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, বিশেষতঃ নির্বাচনের সময় আঁতাতের ফলে কংগ্রেসের পাশে লোক দলের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য প্রচার করার কোন সুযোগ থাকবে না। ফলে, প্রথম প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা হয়েছে বেশী এবং এই প্রশ্নেও কংগ্রেস নেতৃত্বের বক্তব্য ছিল খুব স্পষ্ট। কংগ্রেস নেতৃত্বের বক্তব্য ছিল যে, লোক দলের অস্তিত্ব মুছে দিয়ে সদস্যদের বিনাশর্তে কংগ্রেসে যোগদান করতে হবে। এই বক্তব্য রাখা সম্ভব হয়েছিল নিঃসন্দেহে কৃষ্ণনগর উপনির্বাচনের ফলাফল কংগ্রেসের অনুকূলে গিয়েছিল বলে; কিন্তু শ্রীহুমায়ুন কবীর এটা কিছুতেই মানতে রাজী ছিলেন না। হয়ত শ্রীহুমায়ুন কবীরের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া সম্ভবও ছিল না। কারণ, বিনাশর্তে কংগ্রেসে যোগদান তাঁর কাছে আত্মসমর্পণের মতই হয়ত মনে হয়েছে। আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়, এটা শ্রীহুমায়ুন কবীরের কাছে বেশী স্পষ্ট হয়েছিল এই কারণে যে, কংগ্রেসের মধ্যে ডঃ ঘোষের প্রতিষ্ঠা তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্বকে ক্ষুণ্ণ করে দেবে।

ডঃ ঘোষ অবশ্য বিনাশর্তে কংগ্রেসে যোগদানের পক্ষপাতি। কিন্তু শ্রীহুমায়ুন কবীর রাজী হননি বলে আলোচনাকে থামিয়ে দিয়ে তিনি গোপালপুর চলে গিয়েছেন। তবু আলোচনা হয়েছে ডঃ ঘোষ এবং শ্রীঅতুল্য ঘোষের মধ্যে শ্রীহুমায়ুন কবীরের অনুপস্থিতিতে। আজ এটাই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, ডঃ ঘোষ এবং তাঁর অন্তরঙ্গ সমর্থকেরা লোক দল ছেড়ে দিয়ে হয়ত শীঘ্রই কংগ্রেসে যোগদান করবেন। তা যদি করেন, তাহলে লোক দলের রাজনৈতিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক মনে হবে না। আর এটাও অস্বাভাবিক মনে হবে না যে, শ্রীহুমায়ুন কবীরের কাছে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা বেছে নেওয়া ছাড়া আর কোন পথ আপাতত খোলা থাকবে না।

বৈদেশিকী

দ্য গল সারাৎসার

ফ্রান্সের জনজীবন গত পনের দিন ধরে প্রতিবাদে বিক্ষোভে বিদ্রোহে টলমল। মনে হয়েছিল বিপ্লব বুঝি ওই আসে, ওই আসে। ফ্রান্স মানেই বিপ্লব, ইতিহাসের এই পুরনো পাঠ অনেকের মনে গাঁথা হয়ে আছে। আর সে বিপ্লবের দাবিদারও তো কম নয়, প্রতি চারজন ফরাসীর মধ্যে একজন কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে, এ ছাড়া খুচরো বাম, অতি বামপন্থীরা। মজুর সংগঠনের মস্ত একটা অংশ কম্যুনিস্টদের নেতৃত্বে। এর পর আছে সংগ্রামী ছাত্র সংগঠন, ফ্রান্সের রাজনীতিতে হঠাৎ চমক লাগিয়েছে এই সংগ্রামী ছাত্রদের বিদ্রোহ। বিশ্ববিদ্যালয় দখল, রাজপথের লড়াই, প্রেসিডেন্ট দ্য গলের সুখী রাজত্বে ফুটিয়ে তোলে প্রথম অসুখের লক্ষণ। ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টি জিনিসটা মোটেই পছন্দ করেনি, বলেছে এসব হল মাও-পন্থী, অতিবামমার্গী তরুণদের হঠকারিতা। বিদ্রোহী ছাত্রনেতারাও কম্যুনিস্ট পার্টির শাপান্ত বাপান্ত করেছে। বিপ্লবের এই নতুন দাবিদারদের চোখে কম্যুনিস্ট পার্টি আর দ্য গল দুই-ই সমান, দুই-ই স্থিত-স্বার্থের রক্ষক। শেষ পর্যন্ত কম্যুনিস্ট পার্টিকেও ছাত্র বিদ্রোহীদের পাশে দাঁড়াতে হয়েছে খুব উৎসাহের সঙ্গে অবশ্য নয়; পার্টির বামপন্থী বিপ্লবী প্রতিপত্তি বজায় রাখতে ফরাসী কম্যুনিস্ট নেতারা এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন সংগ্রামী আন্দোলনের সমর্থনে। জোড় তবু মেলেনি, ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে রাজনৈতিক বোঝাপড়ায় ফাঁক রয়ে গেছে, ফাঁক আছে ট্রেড ইউনিয়ন কর্তাদের এবং সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যেও। আশ্চর্য নয়, তাই বিপ্লব ওই আসে-আসে করেও বিপ্লবী উত্তেজনা শেষ পর্যন্ত থিতিয়ে এসেছে।

ফ্রান্সের অবস্থা কি সত্যিই বৈপ্লবিক বিস্ফোরণের কাছাকাছি এসেছিল? বৈপ্লবিক অবস্থা কাকে বলে? সংকট যখন এমনই কঠিন হয় যে, শাসকশ্রেণী কোন উপায়েই সনাতন পদ্ধতিতে রাজত্ব চালাতে পারেন না এবং জনসাধারণের বড় একটি অংশ সনাতন পদ্ধতিতে কিছুতেই আর শাসিত হতে চায় না তখনই দেখা দেয় বৈপ্লবিক সংকট। ফ্রান্সে কি সে অবস্থা দেখা দিয়েছিল? বিদ্রোহী ছাত্রদের মূল অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ে মান্ধাতার আমলের নিয়মকানুন পরিচালন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। সমাজব্যবস্থায় উলট-পালট ঘটানোর দাবিটা বেশির ভাগ ছাত্রের নয়, অতিবামপন্থী সামান্য কিছু ছাত্রই তুরন্ত বিপ্লবের প্রবক্তা। ফরাসী শ্রমিক শ্রেণীর মনোভাবই বা কতদূর বৈপ্লবিক? মজুরীবৃদ্ধির দাবি, কতকগুলি সামাজিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যে ঘাটতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, এগুলি শ্রমিক অসন্তোষের খুব চেনা বাঁধাধরা লক্ষণ। শ্রেণীসংগ্রামের একটা দিক পুরোপুরি অর্থনৈতিক, যাকে বলা হয় রুটি ও মাছের রাজনীতি। সে রাজনীতিতে দরদস্তুর চলে, মজুরী ও মুনাফার ভাগবাটোয়ারায় কিছু অদলবদল করে শ্রমিক অসন্তোষকে ঠাণ্ডা করা যায়। ফ্রান্সে ঠিক সেই চেষ্টাই চলছে। কম্যুনিস্ট পার্টি হোক বা অতিবামপন্থীরা হোক, তুরন্ত বিপ্লবের আওয়াজ দিলেই মজুরশ্রেণী যে তুরন্ত সব খোয়ানোর অভিসারে বেরিয়ে পড়বে, সেটা আশা করা বৃথাই।

বিপ্লবের হিসাব-নিকাশে জমার অঙ্ক সবটাই মজুরশ্রেণী অথবা বামপন্থী বিপ্লবীদের দিকে নয়। বিপ্লবের দাবিদার যেমন আছে, তেমনই আছে প্রতিবিপ্লবের সংগঠিত শক্তি। সে শক্তির মূলাধার আবার সংগঠিত সৈন্যবাহিনী। ফরাসী পুলিশের বড় একটা অংশ মজুর-ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ হতে পারে। কিন্তু ফরাসী সৈন্যবাহিনী? বামপন্থীরা যদি বৈপ্লবিক পন্থায় ক্ষমতা দখল করতে যায় তাহলে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য। আর সে যুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর ভূমিকা কী হতে পারে বা হবে সেটাই আসল কথা। বলশেভিক বিপ্লব কিম্বা চীনে কম্যুনিস্ট বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল কারণ সৈন্যবাহিনীর রাষ্ট্রিক আনুগত্যে বড় রকমের ভাঙন বিপ্লব-বিরোধীরা কিছুতেই রোধ করতে পারেনি। ফ্রান্সে নিশ্চয়ই সেরকম পরিস্থিতি দেখা দেয়নি। ১৭৮৯ সাল থেকে বার বার দেখা যায় ফ্রান্সে বিপ্লবের জোয়ার সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারী রাজত্ব অনায়াসে কায়েম হয়েছে। ফ্রান্সের ইতিহাসে বিপ্লবের চেয়েও মর্মান্তিক সত্য প্রতিবিপ্লবের সাফল্য।

দ্য গল জানেন কোথায় তাঁর শক্তির উৎস; ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টিও বার বার ঘা খেয়ে জেনেছে বিপ্লবের ডাকে সাড়া যতটুকু পাওয়া যাবে তার চেয়ে অনেক বেশি সাড়া পাবে প্রতিবিপ্লবী জোট। বনেদী মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমাজব্যবস্থায় উলটপালট ঘটানোর বিরোধী। গণতন্ত্রী সোস্যালিস্টরা দ্য গল-শাসনের অবসান চাইলেও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম তাদের কোনকালেই ধাতস্থ নয়। অতিবামপন্থী ছাত্রদের রাজপথে লড়াই-এর কায়দাও বিপ্লব ঘটাতে কাজে লাগতে পারে না, সৈন্যবাহিনী যতক্ষণ রাষ্ট্রশক্তির সহায়। ফরাসী মজুর মহলে ধর্মঘটের উৎসাহ খুবই নাটকীয় বটে, কিন্তু মনে রাখা দরকার ফরাসী মজুর শ্রেণীর সাত ভাগের এক ভাগ মাত্র ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনভুক্ত। ট্রেড ইউনিয়নেও রংবেরং-এর দলীয় ঘোঁট; একটানা ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার মত টাকা-কাঁড়ির জোরও ফরাসী ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেই। ট্রেড ইউনিয়ন কর্তারা তাই অকারণে আপসরফার চেষ্টা করছেন না।

প্রেসিডেন্ট দ্য গল অতএব ধরেই নিয়েছেন তাঁর রাজত্ব সহজে খতম করবার সাধ্য কারো নেই। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারে তিনি রাজী, বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের বড় একটা অংশের বৈপ্লবিক উত্তেজনা এতে প্রশমিত হওয়া খুবই সম্ভব। মজুরশ্রেণীর ধর্মঘটী উৎসাহে ভাঁটার টান ইতিমধ্যেই দেখা গেছে, বৈপ্লবিক উলটপালট ঘটানোর উৎসাহ আগেও দেখা যায়নি, এখনও না। সেজন্য ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টির দ্বিধা কিম্বা ভীরুতাকে হয়তো দায়ী করা যেতে পারে, অন্তত অতিবামপন্থী ফরাসী ছাত্রনেতারা কম্যুনিস্ট পার্টিকেই দায়ী করছে বৈপ্লবিক সুযোগ নষ্ট করবার জন্য। জনসাধারণের বৃহৎ একটা অংশ বিপ্লবের জন্য উন্মুখ হলে বৈপ্লবিক পার্টি যদি নেতৃত্ব দিতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম হয় তবেই বলা যায় সে পার্টি বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। কিন্তু ফ্রান্সের জনসাধারণের বৃহৎ অংশ কি সত্যিই বৈপ্লবিক পন্থায় ক্ষমতা দখলে আগ্রহী?

দ্য গল জানেন ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টির সংগঠন শক্তিসামর্থ্য কী পরিমাণ। গত দশ বছরে প্রেসিডেন্ট দ্য গল যে প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলেছেন তার সাহায্যে প্রতিটি কলকারখানার শ্রমিকদের ঠাণ্ডা করার ক্ষমতা তাঁর আছে। গণতান্ত্রিক ঠাট দ্য গল এখনও বজায় রেখেছেন। কিন্তু জানিয়ে দিয়েছেন, দরকার হলে বিশেষ ক্ষমতার হাতিয়ারও প্রস্তুত। কম্যুনিস্টদের কোণঠাসা করবার জন্য রাজনৈতিক কলা-কৌশলও কাজে লাগবে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের সময়। পুরনো ফরাসী পার্লামেন্টে দ্য গলপন্থীরা ছিল গরিষ্ঠ, নতুন নির্বাচনে তারা কী পরিমাণ জনসমর্থন হারাবে বলা যায় না। কম্যুনিস্ট সোস্যালিস্ট ও মেঁদে ফ্রাঁসের রিপাবলিকান গোষ্ঠী দ্য গল-বিরোধী বামপন্থী জোট বাঁধবে কি না তারও নিশ্চয়তা নেই। আর বামপন্থীরা ভোটে জিতলেই বা কি? প্রেসিডেন্ট দ্য গল তাঁর বিশেষ ক্ষমতা সমেত রাষ্ট্রনায়কের পদে তো অধিষ্ঠিত থাকবেনই। অতএব প্রেসিডেন্ট দ্য গলই যাবজ্জীবেৎ তাবৎকাল ফরাসী রাজনীতির সারাৎসার।

৩।৬। ৬৮

বিষ্ণুর্ঋষির্মহালক্ষ্মীর্দেবতা

মণীশ ঘটক

চিন্তা স্মরণ ধ্যান যে অতলে নিত্য বহমান.
ভাষার দুয়ার রুদ্ধ, প্রতিহত বাক্য ফিরে আসে,
ফিরে ফিরে আসে মন, যাত্রা করো তাহার সকাশে,
নীরব নিস্তব্ধ স্থির যেথা সেই সান্দ্র সরস্বান।

কামনা, বিক্ষেপ, যত পুঞ্জ পুঞ্জ বিষয়ের স্তূপ,
অনড় অনপনেয় শিলাসম বিষয়ের ভার
অপসারি প্রকাশিবে অত্যুজ্জ্বল সত্যের স্বরূপে
কোথা সেই মহাপ্রাণ, মহালক্ষ্মী দেবতা যাঁহার?

ভাবের ধারক ভাষা কায়াহীন ভাব তবু থাকে:
সঘন প্রশ্বাস মুক্ত ঊর্জিক ছন্দেতে গীতিগানে
সঞ্চারিবে পুনঃ প্রাণ মৃতপ্রায় নির্জীব সত্তাতে
শক্তিরূপা, সে কোথায়? বীজমন্ত্র কোথা, কোনখানে?

সত্যের দুয়ারে আসি সত্যপ্রাণ, হও অমিময়
অমৃত সেখানে রাজে, জিনে লও জীবন অব্যয়॥

মৃত্যু বলয়ে

কালীপদ কোঙার

একবার দুবার তিনবার
বারবার
মরে আমি দেখেছি,
এতে কোনো আনন্দ নেই।

আজ মৃত্যুকে তুচ্ছ করে
মৃত্যুবলয়ে
সাহসের সঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে
স্বাদ পেলাম জীবনের।

জীবন, সাহসিকতা, আনন্দ, সংগ্রাম
এইসব
বড়ো কাছাকাছি অর্থময় হয়ে
আমাকে নিঃশব্দে ডাক দেয়॥

হাতসাফায়ের খেলা

অশ্রুকুমার সিকদার

১

হৃদয়বনে ঝুরি-নামা আছে ছায়াবট,
সিঁদুর-লেপা পাথর আছে, পল্লবিত ঘট,
কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে
শান-বাঁধানো বেদীর ধারে
সড়কি-লাঠি হাতে নিয়ে আছে ঠগীশঠ।

২

অনুভবে আছে আমার নদী কলস্বরা
সবুজতম শস্যক্ষেত্র অন্য দিকে চরা—
অন্তর্গতি অপর দেখে
বড় কঠিন বিনয় শেখে
পূর্ণকুম্ভের মধ্যে দেখে শূন্য জলের ঘড়া।

৩

সাদা মেঘ রে, সাদা মেঘ রে, ভাসিস চিদাকাশে
তোর উপমা ছোটবেলার আশ্বিনের কাশে।
কিন্তু যদি তাকে শুধাও,
বজ্র জানে, হানে শিলাও,
তাই বুঝি সে শিউরে ওঠে বিদ্যুতে সন্ত্রাসে।

৪

স্থল জল শূন্য জুড়ে মানসপুরের মেলা
ভেলকির মধ্যে যাদু দেখে দিচ্ছে সবাই প্যালা—
একের থেকে অন্য বেরোয়
যাদুর দণ্ড যেই না ছোঁয়।
মনশ্চক্ষু মানেই হচ্ছে হাতসাফায়ের খেলা॥

সুনন্দর জার্নাল

'সিনেমা বন্ধ'

এ কটা মানুষের মাথা চার ফুট! হরিবল্! এ আবার লোকে পয়সা খরচ করে দেখে? এবং আরো ভয়ানক—একে আবার আর্টও বলা হয়ে থাকে!'

—না—কোনো স্কাল্‌প্‌চার সম্পর্কে নয়, সিনেমা-সম্বন্ধেই এক সময় এই ধরণের কিছু মন্তব্য করেছিলেন অলডুস্ হাক্‌স্‌লি। তাঁর চতুর উক্তির আক্ষরিক রূপ আমার হাতের কাছে নেই, কিন্তু বক্তব্যটা যে এই রকম ছিল, সেটা মনে পড়ছে।

কিন্তু কালো হি বলবত্তর। নিদারুণ বুদ্ধিজীবী হাক্‌স্‌লিকে যথাকালে 'ভাববাদী দর্শনে' আত্মনিমজ্জন করতে হল এবং যে চলচ্চিত্রকে তিনি এক সময় বিদ্রূপ করতেন—তারই চিত্রনাট্য লেখক হিসেবে তিনি সর্বতীর্থসার 'হলিউডে' গিয়ে বাস্তু বাঁধলেন।

যা ছিল পর্দার ওপরে নিছক ছায়াবাজীর ম্যাজিক, ক্রমে ক্রমে তা উঁচু দরের আর্ট হল, সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ রূপে দেখা দিল। অন্যান্য সব শিল্পের মতো সিনেমাতেও এলেন বিদ্রোহী নবীন বীরের দল, এল নতুন বক্তব্য, নতুন পরীক্ষা, নতুন রীতি। জনপ্রিয় বই আর বিশুদ্ধ সাহিত্যের মতো এল 'ক্লাস পিক্‌চার' আর 'ম্যাস পিক্‌চার'। সিনেমার লাইনে দাঁড়াতে না পারলে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার অর্ধেক আকর্ষণ মাটি, সিনে-ক্লাবের সদস্য না হলে বুদ্ধিজীবী অপূর্ণ।

> **গ্রাহকগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি**
>
> সাম্প্রতিক ভারতীয় ডাক মাসুল বৃদ্ধির দরুন ডাকে প্রেরিত সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার সডাক মূল্যে বৃদ্ধি অনিবার্য হইয়া পড়ায় গত ১লা জুন ১৯৬৮ হইতে উক্ত চাঁদার হারের পরিবর্তন করিতে আমরা বাধ্য হইলাম। পরিবর্তিত চাঁদার হার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের পাশে দ্রষ্টব্য এবং গ্রাহকগণকে ভবিষ্যতে উক্ত পরিবর্তিত হারে চাঁদা পাঠাইতে অনুরোধ করা হইতেছে।
>
> প্রচার অধ্যক্ষ

আজকে কলকাতার চৌরঙ্গী এলাকার কয়েকটা ইংরেজি ছবির শো-হাউস ছাড়া সারা পশ্চিম বাংলার সিনেমাগুলোতে রুদ্ধ দুয়ার। হাউসের মালিকেরা বলছেন, 'তোমরা চুক্তিভঙ্গ করছ, আমরা পাদমেকং ন গচ্ছামঃ!' কর্মীরা বলছেন, 'আমরা খেতে পাচ্ছি না—তোমাদের পেট মোটা হচ্ছে।' মালিক বলছেন : 'আমরা কি লস্ দিয়ে ব্যবসা চালাব?' কর্মীরা বলছেন, 'তোমাদের মিথ্যে হিসেবের প্যাঁচে আমরা ভুলছি না—তোমরা আমাদের না খাইয়ে মারতে চাও।' মালিকেরা বলছেন, 'সরকার দশ পয়সা টিকেট প্রতি বাড়াতে দিলে তবেই তোমাদের দাবি বিবেচ্য।' এদিক থেকে গলা তুলে চিত্র-নির্মাতারা বলে বসছেন, 'হে রাঘব বোয়ালেরা, ফিল্‌ম ইন্‌ডাস্ট্রি তো তোমরাই প্রায় গ্রাস করতে বসেছ—ওই দশ পয়সা থেকে পাঁচ পয়সার শেয়ার যদি আমরা না পাই—তা হলে এবার খোলাখুলি লড়াই!'

খুব গোলমেলে ব্যাপার। কিন্তু নীট রেজাল্‌ট্ : দিশি সিনেমার দরজা বন্ধ। কর্মীরা কেউ কেউ খুচরো ছবির প্রদর্শনী দিচ্ছেন এখানে ওখানে, কেউ কেউ বা চা-সিঙ্গাড়া-তেলেভাজার দোকান করছেন। ক্ষুধার তাগিদ—বেঁচে থাকার দাবি।

এদিকে সাধারণ মানুষের ক্লান্ত-ধূসর সন্ধ্যা আর কাটতে চায় না। থিয়েটারগুলোতে অসম্ভব ভীড়। কর্মবীরেরা হাতাহাতি করে সাতদিন আগে থেকে বিলিতি ছবির টিকিট কিনছেন। কিন্তু এসব তো মরুভূমিতে বৃষ্টির বিন্দু।

চলচ্চিত্র

ভাবনাটা আচমকা হোঁচট খেলো অ্যাম্‌প্লিফায়ারের গগনভেদী ধ্বনি-তরঙ্গে। একটি রেকর্ড-নাট্য উদ্ঘোষিত হচ্ছে। বক্তৃতা দিচ্ছেন বাংলা-বিহার-ওড়িশার নবাব সিরাজদ্দৌলা।

সিরাজ বেশিক্ষণ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবার সুযোগ পেলেন না। মাঝপথে তাঁর কণ্ঠরোধ করে দিয়ে জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের গান শুরু হল। তারপরে এল আরো মনোরম হিন্দী সংগীতের সুধা ধারা : 'এসো, টুইস্ট্ করি',

'এসো—প্রেম করা যাক'—এই রকম ভালো ভালো রসাবেদনে তারা ভরপুর।

'ব্যাপার কী, শীতলা পুজো-টুজো নাকি?'

'উঁহু, বিয়ে।'

'কোন বাড়িতে?'

'ওই যে ওদিকের চারতলার মালিক—রাধাবাজারে তিনখানা দোকান আছে যার। পুতুলের বিয়ে হচ্ছে তাঁর ওখানে।'

'পুতুল কে? তাঁর মেয়ে বুঝি?'

'না—না, খেলার পুতুল। ভল। পুপে। বুঝেছ?'

বাংলা-ইংরিজি-ফরাসীর ত্রিমুখী ভাষা, বুঝব না কেন? কিন্তু শুনে আমায় খাবি খেতে হল। ভেবেছিলুম পুতুলের বিয়ে, বাঁদরের বউ-ভাত, বেড়ালের অন্নপ্রাশন—এসব একশো বছর আগেকার 'বাবু-কলকাতা'র সঙ্গে সঙ্গেই তিরোহিত হয়েছে। কিন্তু ট্রাডিশন যাবে কোথায়? হাতে কিছু বাড়তি টাকা এলেই অ্যানাটমির নেপথ্য থেকে বাবুশ্রেণীর আদিম ল্যাজটি চট্‌চট্‌ করে নেচে ওঠে।

কিন্তু আমার বিরক্তি লাগলে কী হবে—সেই দুর্বার নাট্য-সঙ্গীত-কমিকের মহোৎসবে পাড়ার অধিকাংশ মানুষকে বেশ পুলকিত মনে হল। খুব সম্ভব সিনেমা দেখবার এবং তার হৃদয়হরা সঙ্গীত শোনবার সাধ এতেই চরিতার্থ হচ্ছে খানিকটা। বিকল্প।

বিকল্প ছাড়া কী আর! বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখি বস্তির সামনে হিজড়ের নৃত্যকলা। আমাদের পাড়ায় কারণে-অকারণে [illegible] প্রায়ই অনুষ্ঠিত হয়—বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু আজকের দ্রষ্টব্য তার দর্শক-সংখ্যা। অনেকগুলি বিক্ষুব্ধ বয়ঃসন্তান আজ এই হিজড়ে-নাচের সমঝদার হয়ে চক্রাকারে দাঁড়িয়ে। এও সিনেমার বিকল্প। কী করা—সময়টা তো কাটাতে হবে। চোখ বুজে, কল্পনাকে আর একটু ছড়িয়ে দিলে এই নৃত্যরতা (কিংবা রত?)-কেই কোনো দুরন্ত চিত্রতারকা ভেবে নেওয়া চলে—এই বস্তিকে টৌকিও কিংবা প্যারী ভাবতেও বাধা নেই।

সেখান থেকে থলে হাতে আমি বাজারের দিকে এগিয়ে গেলুম। সকালে সময় পাওয়া যায়নি—এ বেলা কিছু মাছ-তরকারি জোগাড় করা দরকার।

'দাও—দাও—এক কিলো পোনা মাছ দাও আজ—' এক মাথা বলেই ভদ্রলোক প্রায় নাচতে লাগলেন: 'একটু ভালো করে খেয়ে বাঁচি।'

'এত ফুর্তি যে বাবু—কী হয়েছে?'—চেনা মাছওলার সকৌতুক জিজ্ঞাসা।

'ফুর্তি হবে না?'—নাচ থামিয়ে হঠাৎ হিংস্র হয়ে গেলেন ভদ্রলোক: 'গিন্নী একদম ঠাণ্ডা! সিনেমা—সিনেমা! এণ্ডিগেণ্ডি নিয়ে হপ্তায় একদিন করে যেতেই হবে সিনেমায়! যাও এখন কচুপোড়া, দ্যাখো সিনেমা। চিরকালের মতো বন্ধ থাক সিনেমা—একটু ভালোমন্দ খেয়ে বাঁচি।'

মধ্যবিত্ত চিন্তার আর একদিক। সিনেমার বিকল্প এক কিলো কাটা পোনা!

বাড়ি ফিরে এসে দাঁড়িয়েছি বারান্দায়। চোখে পড়ল—ওদিকের প্রায় অন্ধকার ছাতে একটি শীর্ণ মেয়ে বাইরের দিকে চোখ মেলে যেন পরম শূন্যতার মধ্যে তলিয়ে আছে।

মেয়েটিকে চিনি। ওর বাপ একটা সিনেমা-হাউসের গেট-কীপার।

সত্য প্রায়ই সরল; বলা মাত্রই মনে হয়, এ তো সহজ কথা। তবু যে তাকে আবিষ্কার করা কঠিন তার একটি কারণ এই যে, সত্যের মুখোশ পড়ে সভা জাঁকিয়ে বসে থাকে বহু অসত্য। এই ভিড়ের ভিতর থেকে সত্যকে বরণ করে নেওয়া কঠিন। মুখোশ পড়া মিথ্যা সত্যেরই অনেকটা সমাকৃতি, তবে একটু চেঁচার বেশী। কাজেই তার দিকেই অধিকাংশের দৃষ্টি পড়ে প্রথমে। এ কথাটা শুধু পারমার্থিক সত্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নয়। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সরল সত্যকে পরিবৃত করে থাকে বহু ছলনা ও ভ্রান্তি।

উন্নতির শর্ত

অম্লান দত্ত

(১)

আর্থিক উন্নতির মূল শর্তগুলি সরল। প্রকৃতির উপর মানুষের কর্তৃত্ব যে-পরিমাণে বাড়ে সেই পরিমাণেই আর্থিক উন্নতিও সম্ভব হয়। প্রকৃতির উপর মানুষের কর্তৃত্ব বেড়েছে বিজ্ঞানের বলে। অতএব শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার প্রসার এবং কৃষি ও শিল্প, উভয় ধনোৎপাদনের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানের প্রয়োগের সাহায্যে মানুষের উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধিই আর্থিক উন্নতির মূল কথা। শিল্পোন্নত দেশগুলির ভিতর অন্যান্য নানা পার্থক্য দেখা যায়, যেমন বিভিন্ন দেশে রাজনীতিক ব্যবস্থা এক নয়। কিন্তু শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসার এবং বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ ভিন্ন কোনো দেশেই আর্থিক উন্নতি সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে প্রয়োজন নিয়মিত কঠিন পরিশ্রমের অভ্যাস এবং শ্রমের প্রতি একটা শ্রদ্ধাবোধ। এ কথাটা বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক এরিক ফ্রমের ভাষায় বলা যাক। ফ্রম লিখেছেন:

"The drive for relentless work was one of the fundamental productive forces, no less important for the development of our industrial system than steam and electricity." (The Fear of Freedom)

বাষ্পীয় শক্তি ও বৈদ্যুতিক শক্তির আবিষ্কার ছাড়া যেমন শিল্পবিপ্লব সম্ভব হত না শ্রমে একান্ত অনুরাগও তেমনই শিল্পপ্রগতির জন্য ছিল অত্যাবশ্যক।

আধুনিক যুগের গোড়ায় পাশ্চাত্ত্য সমাজে ধার্মিক ও নাস্তিক বহু চিন্তাশীল মানুষ শ্রমের প্রতি নিষ্ঠা সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছেন। উদাহরণত খ্রীষ্টান পিউরিটান আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রকৃতির বিবিধ সম্পদ মানুষকে দান করেছেন ভগবান। পার্থিব সম্পদ নানাভাবে বাড়িয়ে তুললে ঈশ্বরের এই দানের প্রতি সম্মান দেখান হবে এবং ভগবান তাতে তুষ্ট হবেন। এ জাতীয় একটা চিন্তা ষোড়শ শতকের শেষভাগ থেকে ক্রমশ পশ্চিম ইয়োরোপের উন্নতি দেশগুলির ভিতর ছড়িয়ে পড়ে। জাপানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সবাইকে শিখিয়েছে কঠিন পরিশ্রমকে কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করতে। বিজ্ঞান ও শ্রম—আর্থিক উন্নতির এই যুগ্ম ভিত্তি। যে-দেশ বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহী ও ধনোৎপাদনের জন্য কঠিন পরিশ্রমে অভ্যস্ত তারই উন্নতি অনিবার্য।

ব্যক্তি বিশেষ চৌর্যের সাহায্যে বড়লোক হতে পারে। কিন্তু কোনো বৃহৎ সমাজ অথবা দেশের আর্থিক উন্নতি শুধু লুঠতরাজ ও প্রবঞ্চনার উপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আমাদের ভিতর অনেকের বিশ্বাস যে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির আর্থিক উন্নতির মূলে আছে ঔপনিবেশিক শোষণ। এ ধারণা বহুব্যাপ্ত হলেও অভ্রান্ত নয়। শুধু পরস্বাপহরণের পুরস্কারস্বরূপ ইতিহাস কোনো দেশকে আর্থিক উন্নতির বরমালা দান করেনি। এ জন্য অন্য গুণের প্রয়োজন। বিজ্ঞান ও শ্রমে অনুরাগই স্থায়ী সমৃদ্ধির মূল শর্ত। এই শর্ত যে-দেশে পূর্ণ হয়নি ঔপনিবেশিক শোষণের সুযোগ পেয়েও সে বেশী দূর এগোতে পারে নি। ষোড়শ শতক থেকে ইংল্যাণ্ড ও স্পেন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় এবং পরবর্তীকালে পৃথিবীর অন্য কয়েকটি অংশে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। লুঠতরাজে সে যুগে স্পেনের জুড়ি মেলা ভার। অথচ আর্থিক দিক থেকে স্পেন ইয়োরোপের একটি পশ্চাৎপদ দেশ হয়েই রইল। অপর পক্ষে যে-সব দেশে আর্থিক উন্নতির মূল শর্ত পূর্ণ হয়েছে উপনিবেশের উপর নির্ভর না করেও তারা এগিয়ে যেতে পেরেছে। ইয়োরোপে আজ জীবনযাত্রার মান সবচেয়ে উঁচু সুইডেনে। উপনিবেশের সাহায্য ছাড়াই সুইডেনের উন্নতি সম্ভব হয়েছে। সুইজারল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, নরওয়ে প্রভৃতি দেশ সম্বন্ধেও একথা বলা চলে। জার্মানী, জাপান, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ উপনিবেশ হারাবার পর আরও দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আর্থিক উন্নতির জন্য বাণিজ্য যদি-বা প্রয়োজন উপনিবেশ না হলেও চলে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার মূলে নেই ততটা সুচিন্তিত স্বার্থবুদ্ধি যতটা আছে যুক্তির চেয়েও আদিম জঙ্গী মনোবৃত্তি। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বরং একথাটাই বলা উচিত যে, কোনো দেশেরই আর্থিক উন্নতির জন্য উপনিবেশ অপরিহার্য নয়; এমন কি অবস্থা বিশেষে এর অস্তিত্ব শোষক ও শোষিত উভয় দেশেরই উন্নতির পথে বাধা।* আঠার শতকের শেষভাগে সেকালের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার

---

* আঠার শতকের শেষভাগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা নির্লজ্জভাবে বাংলা লুঠ করে। এই লুণ্ঠন কিন্তু বাংলার [illegible] ক্ষতি [illegible] ইংল্যাণ্ডের [illegible] লাভ হয়নি। এ বিষয়ে [illegible] 'The End of Empire' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

বিরোধিতা করে অনুরূপ কথাই বলেছিলেন। মার্কিন দেশ ইংল্যাণ্ডের হাত ছাড়া হওয়ার পর উভয় দেশই আখেরে উপকৃত হয়েছে। শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির আর্থিক উন্নতির প্রধান কারণ ঔপনিবেশিক শোষণ নয়, বরং বিজ্ঞান ও শ্রমনিষ্ঠা। এ বিষয়ে আমাদের ভুল ধারণার সংশোধন প্রয়োজন। কারণ এরই ফলে আমরা আজও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনায় যতটা উৎসাহী দেশীয় অন্ধতার বিরোধিতায় ততটা নই। সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা ভালো, কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়।

আগেই বলেছি যে, বিজ্ঞানচর্চা ছাড়া আর্থিক উন্নতির স্থায়ী ভিত্তি নেই। এখানে খানিকটা ব্যাখ্যা প্রয়োজন। তা নইলে ভুল বোঝার সম্ভাবনা থেকে যায়। আঠার শতকের শেষভাগে ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লব শুরু হয়; ফরাসী দেশে তখনও শুরু হয়নি। অথচ বিজ্ঞানচর্চায় ফ্রান্স সেদিন পিছিয়ে ছিল বলা চলে না। উনিশ শতকের রুশ দেশেও বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ছিলেন বেশ কয়েকজন। এঁদের ভিতর মেণ্ডেলেভ সর্বজনবিদিত; কিন্তু লমনসভ থেকে শুরু করে আরও কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানের চর্চায় উপরতলার গুণী-জ্ঞানীদের কথা ধরলে উনিশ শতকে রুশদেশ মার্কিন দেশের চেয়ে খাটো ছিল না। অথচ আর্থিক উন্নতিতে মার্কিন দেশই সেদিন এগিয়ে গেল।* এসব তথ্য থেকে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়। অভিজাত বংশীয় কয়েকজন গুণী ব্যক্তি বিজ্ঞান চর্চায় ডুবে থাকলেই আর্থিক উন্নতি ঘটে না। বিজ্ঞানকে উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা কৃষি ও শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করাও প্রয়োজন, ক্ষেতে ও কারখানায় বিজ্ঞানকে টেনে আনা আবশ্যক। একাজ যে দেশে সুসম্পন্ন হয় সে দেশ আর্থিক উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। আঠার শতকের ফরাসী দেশের তুলনায় ইংল্যাণ্ডের, উনিশ শতকের রুশ দেশের চেয়ে আমেরিকার, শ্রেষ্ঠত্ব ছিল এখানেই।

আমাদের দেশের দিকে তাকালেও একথাটাই স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এদেশে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক একেবারে জন্মান নি এমন নয়। তবু জাপান এগিয়ে গেছে আর আমরা পিছিয়ে আছি। এদেশের শিক্ষিত মানুষ যেমনভাবে কৃষি ও শিল্পে বিজ্ঞানের ব্যবহারে এগিয়ে যাননি যেমনভাবে ওঁরা গেছেন জাপানে। কৃষির ক্ষেত্রে এই দৈন্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। উনিশ শতকের শেষভাগে বিজ্ঞানের প্রয়োগে জাপানে কৃষির দ্রুত উন্নতি শুরু হয়ে গেছে। আর এদেশে ওপরতলায় কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে কিছু গবেষণা সত্ত্বেও নীচের তলায় তেমন কিছু ঘটেনি। শিল্পের ক্ষেত্রেও এদেশে বিজ্ঞানের সঙ্গে ব্যবহারের সুষ্ঠু সংযোগ স্থাপিত হয়নি। এদেশের শিল্পপতিরা আজও বিজ্ঞান ও গবেষণায় উৎসাহী নন। সমৃদ্ধ শিল্পপতিরাও প্রায়ই গবেষণায় অর্থ ব্যয় করতে নারাজ। অথচ শুধু সরকারী গবেষণাগারে বিজ্ঞান-চর্চাই আমাদের শিল্পের উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট নয়।

আগেই বলেছি যে, দ্রুত আর্থিক উন্নতির জন্য চাই বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে শ্রম-নিষ্ঠার সংযোগ। নিয়মিত শ্রমের অভ্যাস গড়ে তুলতে হলে একদিকে যেমন প্রয়োজন শ্রমের মূল্য সম্বন্ধে সমাজের চেতনাকে জাগ্রত করা অন্যদিকে তেমনই চাই শ্রমের সঙ্গে পারিশ্রমিকের যোগসাধন ও শ্রমে অবহেলার জন্য দণ্ডবিধান। প্রাচীন সমাজে যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় শ্রমের সঙ্গে পারি-শ্রমিকের সম্পর্ক ছিল শিথিল। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে এ দুয়ের যোগ ঘনিষ্ঠ। ধন-তান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় ব্যবস্থাতেই এটা লক্ষ্য করা যায়। সমালোচকেরা কখনও বলে থাকেন যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকের কাজে উৎসাহ থাকা সম্ভব নয়, কারণ শ্রমের সম্পূর্ণ ফল শ্রমিক লাভ করেন না। কিন্তু সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত না হলে শ্রমিকের মনে কাজে আগ্রহ আসে না এই ধারণার সঙ্গে তথ্যের সামঞ্জস্য নেই। পশ্চিম জার্মানির তুলনায় পূর্ব জার্মানিতে, ইংল্যাণ্ডের তুলনায় পোল্যাণ্ডে, অথবা জাপানের তুলনায় সোভিয়েত দেশে শ্রমিকের কাজে উৎসাহ বেশী একথা বলা চলে না। আসলে সোভিয়েত ও প্রাগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ভিতর মজুরী ব্যবস্থার সাদৃশ্যই উল্লেখযোগ্য। শিল্পোন্নত দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ব্যাপারে সর্বসাধারণের কল্যাণে নানাভাবে প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা আছে। কিন্তু শ্রমের সঙ্গে দণ্ড ও পুরস্কারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন ভিন্ন নিয়মিত পরিশ্রমের অভ্যাস তৈরী করা কঠিন একথাটা সোভিয়েত ও ধনতান্ত্রিক দেশগুলি সমভাবে বহুদিন আগে মেনে নিয়েছে।

কৃষির ক্ষেত্রে নানা বিকল্প ব্যবস্থা সম্ভব। যেমন কৃষক যদি তাঁর জমির মালিক হন তাহলে সরকারকে কর দেবার পর তাঁর শ্রমের ফল তিনি নিজেই লাভ করেন। কাজেই যে-কৃষক জমির মালিক তাঁর কাজে উৎসাহ বাড়বার সম্ভাবনা বেশী। অবশ্য যে-দেশে অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র ও অশিক্ষিত সেখানে দেশময় ছোট ছোট স্বাধীন চাষী সৃষ্টি করলেই যে চাষের উন্নতি হবে এমন বলা যায় না। কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ব্যবহার কি উপায়ে দ্রুত চালু করা যায় সেটাই প্রধান প্রশ্ন। জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াবার জন্য চাই জল, সার, ভালো বীজ ইত্যাদির প্রয়োগ এবং নানা-ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষার ভিতর দিয়ে কৃষি-পদ্ধতির ক্রমাগত উন্নতিসাধন। এই ধরণের পরীক্ষানিরীক্ষায় অপেক্ষাকৃত বড় চাষী অনেক সময়ে অগ্রণী হন। তিনি পথ দেখালে অপেক্ষাকৃত ছোট চাষীও নতুন পথ গ্রহণ করেন। চাষের উন্নতি নানা পথেই সম্ভব; কিন্তু এখানেও মূল শর্ত ঐ একই, বিজ্ঞান ও শ্রমের সমন্বয়।

অর্থনীতিজ্ঞেরা এককালে আর্থিক উন্নতির মূল শর্ত হিসাবে একটি বিষয়ের উপরই বিশেষভাবে জোর দিতেন, সেটি হল মূলধন গঠন। মূলধন গঠন প্রয়োজন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিজ্ঞানের সহায়তায় যে-দেশে উৎপাদনপদ্ধতির ক্রমাগত উন্নতি-সাধন না হচ্ছে সেখানে মূলধনের ব্যবহারে খুব বেশী ফললাভ হয় না। মূলধন গঠন করাও সেদেশে কঠিন। অর্থনীতির ছাত্র মাত্রেই জানেন যে, কৃষিপদ্ধতি অপরিবর্তিত থাকলে শুধু বাড়তি শ্রম অথবা মূলধন নিয়োগ করে ফসল সমান হারে বাড়িয়ে যাওয়া যায় না। বরং ফসলবৃদ্ধির হার এ অবস্থায় ক্রমেই কমে আসে। বিজ্ঞানের নিত্য নতুন প্রয়োগের দ্বারাই উৎপাদন ক্রমাগত বাড়িয়ে চলা সম্ভব। বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়েই মূলধন সমাজের পক্ষে ফলপ্রসু হয়।

অবশ্য বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগের জন্যও মূলধন প্রয়োজন। কাজেই উন্নতিশীল সকল দেশকেই শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে সঙ্গে মূলধন গঠনের প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়। এই অর্থে একেও আর্থিক উন্নতির অন্যতম শর্ত হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া যায়।

(২)

বিভিন্ন দেশে মূলধন গঠনের প্রয়াস বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। জাপানে "জাইবাৎসু" গোষ্ঠী দীর্ঘকাল যাবৎ শিল্প ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বহু বড় বড় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন। ব্যবসায় থেকে একদিকে যেমন তাঁরা অনেক লাভ করেন অন্যদিকে তেমনই এই লাভের একটা বড় অংশ মূলধন হিসাবে বিনিয়োগ করেন। সোভিয়েত দেশে ভিন্ন ব্যবস্থা। বৃহৎ শিল্প ও ব্যবসায়ের কর্তৃত্ব সেখানে রাষ্ট্রের হাতে। দীর্ঘদিন যাবৎ সোভিয়েত সরকার ভোগ্যবস্তু যে-খরচে তৈরী হয় তার চেয়ে অনেকটা বেশী দামে বিক্রী করে এ দুয়ের পার্থক্যটা একটা

---

* প্রসঙ্গত উল্লেখ করা আবশ্যক যে, উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে রুশ দেশেরও দ্রুত আর্থিক উন্নতি শুরু হয়ে যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী ত্রিশ বৎসরে রুশ দেশের শিল্পোৎপাদন জার্মানির মতোই উল্লেখযোগ্য গতিতে বাড়তে থাকে। এতে বিদেশী পুঁজির একটা ভূমিকা ছিল; কিন্তু শুধু বিদেশী পুঁজি নিয়োগে কোনো দেশের দ্রুত উন্নতি সম্ভব নয়।

কর হিসাবে গ্রহণ করছেন। অর্থাৎ, ক্রেতার দাম ও বিক্রেতার খরচের ভিতর পার্থক্যটা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুঁজিপতির হাতে যাচ্ছে লভ্যাংশ হিসাবে, আর সমাজতান্ত্রিক দেশে সরকারের হাতে যাচ্ছে বাড়তি রাজস্ব হিসাবে। এই টাকারই অংশবিশেষ পরে মূলধন হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে শিল্পের প্রসারের জন্য।* জাপানী সরকার ভূমিকরের সাহায্যে কৃষকের আয়ের একাংশ নিজে গ্রহণ করেন। জাপানে আর্থিক উন্নতির প্রথম পর্যায়ে এটাই ছিল সরকারী রাজস্বের প্রধান উৎস। সোভিয়েত দেশে ব্যবস্থা ছিল ভিন্ন। যৌথচাষ প্রথায় চাষীকে ফসলের একটা অংশ সরকারের হাতে তুলে দিতে হত নামমাত্র দরে; বাজারদরের চেয়ে সেটা অনেক কম। সরকারের অর্থলাভের এটা ছিল একটা উল্লেখযোগ্য উপায়।

অর্থাৎ, বিভিন্ন দেশে ব্যবস্থা বিভিন্ন। কিন্তু সব কিছুর ভিতর একটা বড় মিলও আছে। সব দেশেই চাষী ও মজুর অথবা সাধারণ ক্রেতার হাত থেকে জাতীয় আয়ের একটা অংশ প্রথমে সরিয়ে নেওয়া হয়, তারপর সেটা নিয়োগ করা হয় মূলধন হিসাবে আর্থিক সম্প্রসারণের জন্য। উৎপাদিত ধনের একটা অংশমাত্র সরাসরিভাবে মজুরী হিসাবে শ্রমিকের হস্তগত হয়। উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যয় হয় অংশত মূলধন হিসাবে; তা ছাড়া প্রতিরক্ষা ও শাসনযন্ত্র চালাবার খরচ আছে, 'পরিচালক'গোষ্ঠীর ব্যয়ভারও আছে। ধনতান্ত্রিক সমাজের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্ক্স এই ব্যাপারটাকে নাম দিয়েছিলেন "শোষণ"। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ধনতান্ত্রিক অথবা সমাজতান্ত্রিক কোনো সমাজেই উৎপাদিত ধনের সমস্তটা শ্রমিকের হাতে পেঁৗছে না।

সাম্যবাদী এখানে একটা আপত্তি তুলতে পারেন। তিনি বলবেন যে, সমাজতান্ত্রিক দেশে ধনের একটা অংশ শ্রমিকের হাত থেকে সরকার সরিয়ে রাখেন বটে, কিন্তু সেটা নিযুক্ত হয় দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য, এই আর্থিক উন্নতির ফলও শ্রমিকই অবশেষে ভোগ করেন। আর ধনতান্ত্রিক দেশে পুঁজিপতি অর্থ বিনিয়োগ করেন নিজের স্বার্থে। এতে কিন্তু সবটা বলা হল না। মার্ক্স বলেছিলেন যে, আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার দ্বারা ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত হয় না; পুঁজিপতির ব্যক্তিগত ইচ্ছা দিয়েও শ্রমিকশ্রেণীর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় না। মার্ক্স দেখেছিলেন যে, ধনিকশ্রেণী তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ব্যবসায়ে মন্দা ও সংকট ডেকে আনে। কিন্তু আর একটি ব্যাপার তিনি তেমন গভীরভাবে লক্ষ্য করেন নি। ধনতন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীরও অবস্থার উন্নতি হয়েছে। আজকের জাপানী, জার্মান বা ইংরেজ শ্রমিক যে বিশ অথবা পঞ্চাশ বৎসর আগের তুলনায় অনেকটা সচ্ছল অবস্থায় আছেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। "সাম্যবাদী" পূর্ব জার্মানিতে শ্রমিকের অবস্থার যে-উন্নতি হয়েছে "ধনতান্ত্রিক" পশ্চিম জার্মানিতে উন্নতি তার চেয়ে কম হয় নি। পুঁজিপতি হয় তো পুঁজি বিনিয়োগ করেন নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই, যদিও জাতিকে শক্তিশালী করবার কথা তিনি যে কখনও ভাবেন না এমন কথাও জোর করে বলা যায় না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি যাই চিন্তা করুন না কেন পুঁজি বিনিয়োগের ফলে উৎপাদন পদ্ধতিরও উন্নতি ঘটে। অবশ্য মূলধনের অপচয় ও অপব্যবহারও আছে এবং তা থেকে কোনো দেশই মুক্ত নয়।* তবু ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে মূলধন গঠনের সঙ্গে উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতির যোগ স্পষ্ট। বিশেষত যে-সব দেশ বিজ্ঞানে প্রাগ্রসর তাদের সম্বন্ধে কথাটা খুবই সত্য। উৎপাদনপদ্ধতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণী ক্রমশ দক্ষ ও শিক্ষিত হয়ে ওঠে, শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়। দক্ষ, শিক্ষিত ও সুসংবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার মান অনিবার্যভাবে ক্রমশ উন্নত হয়ে ওঠে। ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় দেশেরই বর্তমানকালের ইতিহাসের এটা একটা প্রধান ঘটনা। সকল দেশেই পুঁজিগঠনের গোড়ার কথা হল ধনের একটা অংশ শ্রমিকের হাত থেকে সরিয়ে রাখা, আর তার শেষ ফল হচ্ছে শ্রমিকের উৎপাদিকা শক্তি ও জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন। এই [illegible]ত কোনো দেশেই সহসা ঘটে নি এবং বিনা কষ্টেও সম্ভব হয় নি। এ কথাটা তবু স্বীকার্য যে, যাকে "শোষণ" বলা হয় এবং যা ছাড়া মূলধন গঠন সম্ভব নয়, তাই আবার বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শ্রমিকের জীবনের মানের উন্নতিরও কারণ।

* অবশ্য সমাজতান্ত্রিক দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানেও মুনাফা বা লাভের একটা ভূমিকা আছে। কিন্তু সে আলোচনায় এখন যেতে চাই না।

* ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই সমস্যা নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ আলোচনা চলেছে। সাম্যবাদী দেশেও মূলধনের অপচয় পূর্ব ইয়োরোপের অর্থনীতিজ্ঞদের ভিতর আজ প্রধান আলোচ্য বিষয়।

(৩)

কোনো সামাজিক ব্যবস্থাই অন্যায় থেকে মুক্ত নয়, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা তো নয়ই। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মূলধনের উপর কর্তৃত্ব প্রধানত অল্পসংখ্যক লোকের হাতে। সাম্যবাদী সমালোচক এই ব্যবস্থার পরিবর্তন চান। এ ব্যাপারে সাম্যবাদী আদর্শের একটা যৌক্তিকতা আছে। ধনতান্ত্রিক দেশে মূলধনের যাঁরা মালিক তাঁরা অনেক সময় শিল্পের পরিচালক নন। তাঁদের অনেকেই শিল্পের "ঘুমন্ত" বা কর্মহীন অংশীদার। এই ব্যবস্থাতে আমাদের ন্যায়বোধ পীড়িত হয়। যাঁদের ভূমিকা ছাড়াই শিল্পকর্ম চলতে পারে তাঁদের আয় ন্যায্য বলে মেনে নেওয়া কঠিন। আদর্শের দিক থেকে বৃহৎ শিল্পে যাঁরা কর্মে অংশীদার তাঁদেরই কর্তৃত্ব বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু এই আদর্শকে অবিলম্বে রূপদান করা কঠিন। শান্তিপূর্ণ পথে অগ্রসর হলে সহসা কোনো বৃহৎ পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। আবার হিংসাত্মক উপায়ে উদ্দেশ্যসাধন করতে চাইলে তার ফল অনেক সময়েই আদর্শের বিপরীত হয়। হিংসার অস্ত্র হিসাবে যে দল গঠিত হয় অত্যাচারের যন্ত্রে তা অবশেষে পরিণতি লাভ করে। পুঁজিপতির অন্যায়ের চেয়ে এই দলীয় অত্যাচার কম পীড়াদায়ক নয়। তা ছাড়া গৃহযুদ্ধের ফলে শান্তি ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়লে তাতে আর্থিক দিক থেকেও দেশ পিছিয়ে যেতে পারে।

শিল্পোন্নয়নের প্রথম যুগে সামাজিক ভাঙাগড়ার মাঝখানে বিপ্লব ডেকে আনা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু অনুন্নত দেশে "সমাজতন্ত্র" নামধারী কোনো ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও সেই ব্যবস্থা বিকৃত সমাজতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই হয় না। পুঁজিপতি শ্রেণীর অস্তিত্বে সমাজে অসাম্য বৃদ্ধি পায় বটে; কিন্তু মনে রাখা ভালো যে, আর্থিক উন্নতির প্রথম যুগে

বিনা কষ্টে মূলধন গঠন কোনো ব্যবস্থাতেই সম্ভব নয়। মূলধন গঠনে সহায়তা করাই পুঁজিপতি শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা। এই শ্রেণীর উচ্ছেদের পর মূলধন গঠনের কাজ গিয়ে পড়ে রাষ্ট্রের হাতে, অর্থাৎ রাজনীতিক দলবিশেষ ও আমলাতন্ত্রের হাতে। অনুন্নত দেশে মূলধন গঠন ইতিহাসের এক "নোংরা" কাজ। হিংসাত্মক বিপ্লবের পর এই কাজের ভার গিয়ে যখন পড়ে ভ্রাতৃহন্তা এক সমাজে পারস্পরিক সন্দেহে কলুষিত একদল মানুষের হাতে তখন সেই শাসক দলের অধঃপতন রোধ করা যায় না। এরই ফলে ঘটে সমাজতন্ত্রের বিকৃতি। শোষণমুক্ত সমাজের নামে হিংসাত্মক বিপ্লবের প্রচণ্ড আঘাত দেশকে ভেঙে তচনচ করলেই আদর্শসমাজের দ্বার উন্মুক্ত হয় না।

ধনতন্ত্রের বহু গলদ আছে। তার বিরুদ্ধে সজাগ ও সচেষ্ট হওয়া নিঃসন্দেহে প্রয়োজন। দুয়েকটি উদাহরণই যথেষ্ট। শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষত গোড়ার যুগে, দেশের একাংশে শ্রীবৃদ্ধি ও অন্যাংশে দারিদ্র্য ও অভাব বৃদ্ধি ঘটতে দেখা গেছে। শুধু শ্রেণীগত অসাম্য নয় আঞ্চলিক বৈষম্যও সামাজিক ব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সমৃদ্ধ সমাজেও সম্প্রদায়বিশেষের ভিতর অস্বাভাবিক দারিদ্র্যের উদাহরণ আছে; যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের কথা প্রথমেই মনে পড়ে। এ জাতীয় বৈষম্যের প্রতিকারের জন্য ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগ যথেষ্ট নয়; রাষ্ট্রেরও একটি সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন। ধনতন্ত্রের আর একটি সমস্যা "শোষণ"কে কেন্দ্র করে। একটি তুলনার সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কৃষক যখন বীজধান সরিয়ে রাখেন তখন তিনি জানেন যে, তাঁর নিজেরই ভবিষ্যতের জন্য এটা প্রয়োজন। পুঁজিপতি যখন উৎপাদিত ধনের একটা অংশ শ্রমিকের হাত থেকে সরিয়ে নেন, তখন সমাজের ভবিষ্যতের সঙ্গে এই "শোষণে"র ও পুঁজিগঠনের যোগটা মোটেই প্রত্যক্ষ নয়।* এই জটিলতার উপর যোগ হয়েছে শ্রমিকের সঙ্গে মালিক ও পরিচালকের সামাজিক দূরত্ব ও মনান্তর। সব সমাজব্যবস্থার মতো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থারও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্তনের ভিতর যদি কোনো দিগ্‌বোধ রক্ষা করতে হয় তো উন্নততর সহযোগিতাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। একথা শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে যেমন সত্য বৃহত্তর সমাজ-জীবন সম্বন্ধেও তেমনই। সমাজে উন্নততর সহযোগিতা তাকেই বলি যাতে একই সঙ্গে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে, মানুষে মানুষে অসাম্য লাঘব হয় ও ব্যক্তি স্বাধীনতার বিস্তৃতি ঘটে।

উন্নতির এই বিভিন্ন উপাদানের ভিতর সামঞ্জস্য বিধান সহজ নয়। আমরা আগেই দেখেছি যে, বৈপ্লবিক উল্লম্ফনে হঠাৎ সাম্য, স্বাধীনতা ও উৎপাদিকা শক্তির মহান শিখরে আরোহণ করা যায় না। অসাধ্য-সাধনে মত্ত হলে অকারণে দুর্দশা বাড়ে। পরীক্ষানিরীক্ষার ভিতর দিয়ে সাধ্যের সীমানা ক্রমশ বিস্তৃত করেই মানুষকে

* এটাকে শুধু ধনতন্ত্রের সমস্যা বললে অবশ্য একটু ভুল হয়। আধুনিক সমাজে উৎপাদনপ্রক্রিয়া এমন দীর্ঘসূত্রে বাঁধা, পণ্যবিনিময়ের ব্যবস্থা এমন জটিল এবং পরিবর্তন এতো দ্রুত যে, আজ যা মানুষের হাত ছাড়া হয় ও কাল যা হাতে আসে তা এক বস্তু নয় এবং এ দুয়ের মধ্যে তুলনাও কোনো শিল্পোন্নত দেশেই আজকের বীজধান ও কালকের নবান্নের সম্পর্কের মতো সরল নয়।

এগোতে হয়। এ পথে কিছু ফল লাভ যে সম্ভব এ শতাব্দীর ইতিহাসে তার উদাহরণের অভাব নেই। মার্ক্সবাদী বিচারে ধনতন্ত্রের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রাম ক্রমশঃ তীব্র হয়ে ওঠে; ধনতন্ত্রের সংকট বৃদ্ধি পায়; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই সংকট প্রতিফলিত হয় ঘোরতর দ্বন্দ্বে ও যুদ্ধে। এই তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে কিন্তু এ যুগের ইতিহাসের গতির গুরুতর অমিল আছে। শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিপ্লবের আকর্ষণ কমে এসেছে; দারিদ্র্যের উপশমের সঙ্গে সঙ্গে জীবনধারণের সংগ্রামের মতোই শ্রেণীসংগ্রামও এসব দেশে অপেক্ষাকৃত সংযত আকার ধারণ করেছে। শিক্ষা ও সংগঠন-শক্তির ফলে শ্রমিকের প্রতি অন্যায়ের প্রতিরোধ ক্রমে সহজ হয়েছে; যে-অন্যায় একদিন ছিল অতি সাধারণ, আজ তা ব্যতিক্রম। উনিশ শ' ত্রিশের দশকের গোড়ায় ধনতন্ত্রের সংকট যতটা তীব্র ছিল আজ ততটা নেই। ব্যবসায়ের উত্থান পতন আছে বটে, কিন্তু উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে এখন পরিকল্পনার সাহায্যে আর্থিক সংকট নিয়ন্ত্রণের শক্তি বেশী। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা আজ দ্রুত অবক্ষয়ের পথে। আর উপনিবেশ হারিয়েও শিল্পোন্নত দেশগুলি আগের চেয়ে সংকটমুক্ত ও আরও দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ধনতন্ত্রের গলদ আছে; কিন্তু বৈষয়িক অর্থে তার সাফল্যও অস্বীকার করা যায় না।

(৪)

তবু এসব কিছুকে খর্ব করে যে-সমস্যা আজও অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার চরিত্র ভিন্ন। আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব আজকের পৃথিবীতে তীব্র ও নিষ্ঠুর। এই দ্বন্দ্বকে ধনতন্ত্রের সংকটের প্রতিফলন বলা ভুল। ধনতান্ত্রিক দেশ যেমন ধনতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে সাম্যবাদী দেশও তেমনই আজ সাম্যবাদী দেশের শত্রু হয়েছে। এর মূলে আছে জাতিতে জাতিতে অবিশ্বাস ও ক্ষমতার নেশা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ মূলত বাজার নিয়ে দ্বন্দ্ব নয়। ইন্দোনেশিয়া হাত ছাড়া হওয়াতে হল্যান্ডের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে নি; ভিয়েতনাম হাত ছাড়া হলেও মার্কিন অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়বে না। বিজ্ঞানকে যদি বলি উন্নতির পরম বন্ধু, যুদ্ধকে যদি বলি শত্রু, তবে একথাও স্বীকার করতে হয় যে, এ যুগের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ কীর্তি ও যা-কিছু চূড়ান্ত কলঙ্ক তার কোনোটারই ব্যাখ্যা চলে না শুধু শ্রেণী সংগ্রামের সূত্র ধরে। ধনতন্ত্র অথবা সমাজতন্ত্রকে আমরা যে বাস্তবের চেয়েও ভয়ঙ্কর অথবা রমণীয় করে আঁকি এরও মূলে আছে হয় তো যুক্তির চেয়েও আদিম প্রবৃত্তি, আদর্শের ছদ্মবেশে যুযুৎসা। মানুষের সব উন্নতির পথে আজ বড় বাধা যুদ্ধ। যুদ্ধ ও যুদ্ধের প্রস্তুতিই এ যুগে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের সবচেয়ে ভয়াবহ উদাহরণ। বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার কলহ ছাপিয়েও আজ তীব্র হয়ে উঠেছে জাতিতে জাতিতে ক্ষমতার লড়াই। সারা পৃথিবীতে অচিরে ধনতন্ত্র অথবা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে এমন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু শান্তি আমাদের চাই। এ যুগের প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞান ও শান্তি।

মানুষের ইতিহাসে বিজ্ঞানের প্রাধান্য সাম্প্রতিক ঘটনা। এই অল্পকালের ভিতর বিজ্ঞান আমাদের জীবনের বহিরঙ্গে এনেছে বিরাট পরিবর্তন। কিন্তু মানুষের মনের গভীরে পরিবর্তনের গতি মন্থর: সেখানে আজও প্রাগৈতিহাসিক শক্তিরই প্রাধান্য। প্রকৃতি একদিন মানুষের কাছে ছিল বুদ্ধির অগম্য ভয়ঙ্কর শক্তির লীলাক্ষেত্র। প্রাচীন আফ্রিকার অরণ্যের মতো অন্ধকার ও বিপদসংকুল। মানুষের জীবন ছিল সেদিন অজ্ঞাত শত্রুর আক্রমণে প্রতিক্ষণ বিপন্ন। অগণিত শতাব্দী জুড়ে মানুষ বেঁচেছে প্রতি মুহূর্তে অতি ভয়ে। যেখানে প্রতিক্ষণ প্রাণ বিপন্ন সেখানে প্রাণী যেমন ভীত তেমনই হিংস্র। সেই অন্ধ, ক্ষমাহীন প্রাগৈতিহাসের কবল থেকে মানুষের মন আজও মুক্তি পায় নি। বিশ শতকের বিজ্ঞান মানুষের মনের সেই স্তরের অন্ধকার এখনও দূর করতে পারে নি। ব্যক্তিগত-ভাবে যদি-বা আমরা ভদ্র এবং কিছু পরিমাণে দায়িত্বজ্ঞানও রাখি, সমষ্টিগতভাবে আমরা প্রায়ই দায়িত্বজ্ঞানহীন ও হিংসার অধীন। আমাদের মনের ওপরের দিকটার যেহেতু আমরা যুক্তি ও গণনায় অভ্যস্ত অতএব সব কিছুর একটা আর্থিক ব্যাখ্যা আমরা সহজে গ্রহণ করি; কিন্তু আজকের যুগের বহু সমস্যার মূলেই আছে যুক্তির চেয়ে প্রাচীন যৌথ আতঙ্ক ও হিংসা। মার্কিন দেশে নিগ্রো সমস্যার মূলে শ্বেতাঙ্গদের আর্থিক লাভক্ষতির গণনার চেয়েও অযৌক্তিক বর্ণবিদ্বেষই প্রধান। আরব-ইজরায়েল অথবা ভারত-পাকিস্তান বৈরিতার গোড়ায় আছে ধর্মবিদ্বেষ। গণতন্ত্র, শ্রেণী-সংগ্রাম, সমাজতন্ত্র কিছুই আজ সামষ্টিক বিদ্বেষের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথ ছোট-আমি ও বড়-আমির ভিতর পার্থক্য করেছিলেন, কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ কপট বড়-আমি। ছোট-আমি যখন নিজের ক্ষুদ্র ভয়কে লুকোতে চায় কোনো অতিকায় উত্তেজনার আড়ালে তখনই বিপত্তির সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। প্রকৃত বড়-আমি হিংসার অধীন নয়; সে চলে শান্ত বুদ্ধিতে। তারই হাতে বিজ্ঞানের শক্তিও নিরাপদ।

মানুষের গড়বার ও ভাঙ্গবার শক্তি একদিন ছিল ছোট সীমায় বাঁধা। তার সমস্ত আস্ফালন সত্ত্বেও সে পৃথিবীর কোনো একটি কোণে মায়ের কোলে দামাল শিশুর মতো সামান্য আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারতো মাত্র। আজ পৃথিবী ধ্বংস করবার ক্ষমতা তার হাতে। এই প্রচন্ড শক্তি নিয়ে যদি তাকে বাঁচতে হয় তো সেই সঙ্গে চাই বিজ্ঞানকে গড়বার কাজে প্রয়োগ করবার যোগ্য ভয়বিদ্বেষমুক্ত বুদ্ধি। এ যদি না হয় তো প্রকৃতিকে পরাভূত করেও মানুষ মানুষকে বাঁচাতে পারবে না। উন্নতির শর্ত সরল তবু কঠিনসাধ্য।

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

ছিয়াত্তর

আমি গোপীদাসের দিকে তাকাই। গোপীদাস আমার দিকে। একটু ঘাড় দুলিয়ে ইশারা করে। অপেক্ষা করতে বলে। নগ্ন পুরুষ আমাদের দিকে ফিরে তাকায় না। তাকে ধ্যানমগ্নও বলি না। চোখ খোলা দৃষ্টি দূরে—অন্ধকারের কোথায় যেন। গায়ে ভস্ম মাখা। ঋজু শক্ত শরীর। রুদ্রাক্ষ বা কোন কড়িরই মালা বালা একটিও নেই। কপালে বা অঙ্গে কিছুর রেখা টিকা নেই। চুল দাড়ি সকলই মুণ্ডিত। এমনই নির্বিকার নিশ্চল স্থির, মনে হয় ধাতব মূর্তি। অরণ্যে, যেমন গাছ, পাথর, মাটির ঢিবি, তেমনি প্রকৃতিরই আর এক অঙ্গ।

তবু শীত বলেও কি কিছু নেই! শীতের রাতের তীক্ষ্ণ প্রখর ঝাপটাও কি একটু কাবু করে না! দূর অন্ধকারের দিগন্তে কী রূপ দেখে এমন বাহ্যজ্ঞানশূন্য! যেন এই জগতে নেই। যেন জগৎ সংসারের ওপারে অলক্ষ্যে চলে 'কিসের খেলা খেলা'। তুমি আমি নেই সেথায়।

ঘরের ভিতর থেকে 'অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি' বেরিয়ে আসে। একটি পুরুষ। অল্প অল্প চুল দাড়ি আছে। তারও দেখি, আমাদের দিকে নজর নেই। সামনে এসে জ্বলন্ত কাঠ খুঁচিয়ে আগুনে উসকে দেয়। নিজে সেখানেই বসে। কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই। আশপাশ ঝাড়ে বাতাসের ঝাপটা। ঝিঁঝির ডাক। অরণ্যের অধিবাসীদের কাছে শুনেছিলাম, ঝিঁঝি কাঁদে।

গোপীদাস সহসা বসে পড়ে প্রণাম করে। নগ্ন পুরুষ সেই সময় মুখ ফেরায়। গোপীদাসের দিকে চায়। ভেবেছিলাম মানুষটি মৌন। কিন্তু এখন তার গলার স্বরও শুনি, 'একখান গান শুনিয়ে যাও।'

সে আমার দিকে ফিরে তাকায় না। কিন্তু তার চোখ দুটি যেন ভাসা ভাসা ভেজা ভেজা। দৃষ্টি গভীর। মুখে হাসি নেই, অথচ কী এক অনির্বচনীয় ভাব। তীব্রতা নেই, তীক্ষ্ণতা নেই, ঝিলিক ঝলক নেই। মাধুর্য গাম্ভীর্য গভীরতা স্নিগ্ধতা সব মিলিয়ে একেবারে অন্যরকম। গলার স্বরটিও সেইরকম। যেন মুখেরই ভাষার মতো গভীর। মহাশ্মশানবাসীর আর এক রূপ।

গোপীদাসের দেখি আর এক রূপ। যেন তার সারা শরীরে তরঙ্গ খেলে যায়। চোখে নতুন জ্যোতি। বুড়া লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। হাত জোড় করেই বলে, 'জয় গুরু, জয় গুরু, এত কিরপা কইরলে গ!'

তারপরে গান তো না, যেন গানের সুরে ভাঙা গলায় হাত নেড়ে নেড়ে নগ্ন পুরুষকে জিজ্ঞেস করে,

'মনের মানুষ খুঁইজলে কোথা মিলে?
আমি (আমি গ আমি আমি) আমি
দুখের দুখী দেইখতে পাই না,
আত্মসুখী সকলে।
বল, খুঁইজলে কোথা মিলে?'

নগ্ন পুরুষ মাথা ঝাঁকায়, আপন মনে ঘাড় নাড়ে। গোপীদাস তার দিকে দু' পা এগিয়ে নিচু হয়ে বলে, 'বইলবে গ, কোথা মিলে?'

গোপীদাসের বুড়া চোখ ছলছলায়। নগ্ন পুরুষ বলে, 'খুঁইজতে খুঁইজতে।'

গোপীদাস চোখ বুজে ঘাড় নাড়ে। নিজের বুকে ঠুকে গায়,

'কিন্তন আপগরজী ভাব জানো না
গরজে সদাই চলো
গরজ পেলো গরজ কথা
কইবে গ হেস্যে খেল্যে।
(বল্য বল্য বল্য গ, পায়ে ধরি বল্য)
খুঁইজলে কোথা মিলে।'

একতারা দোতারা বাঁয়া ডুপকি কিছু নেই। তবু যেন মনে হয়, গোপীদাসের ঘড়ঘড়ে গলায় এমন চাপা নিচু মিঠে সুর আর শুনি নি। এমন আত্মভোলা মগ্ন রূপও দেখি নি। নগ্ন পুরুষের শরীরেও যেন কিসের তরঙ্গ

লাগে। যেন মধু পানে গোলাপী নেশায় আবেশে চোখ ঢুলুঢুলু। আবার বলে, খুঁইজতে খুঁইজতে।'

গোপীদাসের চোখ টলটলিয়ে দাড়ি ভিজে যায়। তেমনি ঘাড় নাড়ে। গায়,

'কিন্তুন খুঁইজব কী বলো
পরোয়ানা হারিয়ে গেলো।
(কাছারির পরোয়ানাটো হারিয়ে ফেইলছি যে গ। তল্লাশ কইরব কী দিয়ে?)
এখন পইড়েছি মায়াজালে
কত দোষ কইরেছি আমি
শ্রীগুরুর চরণ ভুলে।
বল খুঁইজব কী ছলে।'

নগ্ন পুরুষের শরীর হঠাৎ কেঁপে কেঁপে ওঠে। মুখ ভরা হাসি, চোখ ফেটে জল পড়ে। হাসে না ফুঁপিয়ে কাঁদে, বুঝি না। হঠাৎ দিগম্বর উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ায়। বুড়ো বাউল সেই হাতে গিয়ে ঝাঁপ খেয়ে আলিঙ্গন নেয়। দুহাতে দোহাঁ জড়ানো জড়িয়ে দোলে। এ ওর কাঁধে মাথা রাখে, হাসে না কাঁদে এখনো বুঝি না। দিগম্বর বলে, 'সবই খুঁইজতে খুঁইজতে মিলে। হারানোটাও মিলে।'

এ ভাবের নাম কী, আমি জানি না। কিসের ভাব তাও জানি না। ছাইভস্ম মাখা এক দিগম্বর পুরুষ, এই একটু আগেও স্থির। যেন এই জগতে নেই, এখানে দেহ রেখে ভিন্ন জগতে কী করছিল। তারপরেই দেখ, কোথা থেকে কথা আসে। গান জাগে। চোখের জল গলে। শরীরে শরীরে হিল্লোলিয়া যায় তরঙ্গ। ল্যাংটায় জড়ায় গেরুয়া আলখাল্লা ধরে।

যেন মুহূর্তেই কি ঘটে যায়। যখন ঘটে, তখন বোধ হয় এমনি করেই ঘটে। আমি বুঝি না কিছু, কিন্তু দুজনের আলিঙ্গন হাসি কান্না, সবই আমার ভিতরেও যেন কিসের স্রোত বইয়ে দেয়। তার কুলকুলু নাদ শুনি। অর্থ বুঝি না। শ্মশানের চারদিকে অন্ধকার আগুনের আলোয় কী এক বিস্ময়কর গভীর মানব লীলা।

দৃশ্যের পর দৃশ্য। ব্রহ্মানন্দ অবধূত ভৈরবী যোগময়ী শ্মশানের চিতা অঘোরী আশ্রমের নরমুণ্ডের কংকাল, মুক্তির প্রহার, ভাবের আলিঙ্গন। যেন সুর থেকে অন্য সুরে তাল থেকে অন্য তালে। বিচিত্র রাগিণীতে ফিরি।

যে ঘর থেকে এসে আগুন উস্কে দিয়েছিল সে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভুলে এই দৃশ্য দেখে। তার চোখও জলে টলমল।

এক সময়ে দুজনেই শান্ত হয়। দুজনেই বসে। দুজনেই চুপচাপ। আমি ভাবি, হঠাৎ কেমন করেই বা গানের কথা এল। গান শুনতে শুনতে এমন ভাবের উদয়ই বা হল কেমন করে। দুজনের চিন্ন পরিচয় আছে বলে, গোপীদাসের মুখে শুনি নি। এই নগ্ন পুরুষ কিসের সাধক, কোন পন্থী, কেমন তার সাধন পদ্ধতি, কিছুই জানি না।

নগ্ন পুরুষ চোখ বোজে। গোপীদাস বলে, 'ঘাই বাবা।'

চোখ না খুলেই সে বলে, 'এইস।'

গোপীদাস আমাকে ইশারা করে ডাকে। আগুনের আলো পেরিয়ে চারদিকেই অন্ধকার। এক ফালি চিকন চাঁদ এখন কোথায়, দেখতে পাই না। গোপীদাস আমার হাত ধরে। আমি জিজ্ঞেস করি, 'ইনি কে?'

গোপীদাসের গলায় এখনো ভাবের রেশ। ভেজা ভেজা মুগ্ধতা। বলে, 'জানি না বাবাজী, দেখি নাই কোনদিন। এ তীর্থ-ক্ষেত্তরে কত সোময় কত মহাপুরুষ আইসেন। কিছুদিন থাকেন, আবার চলে যান। এহাঁকে আর দেখি নাই, তোমার ভাগ্যে দেইখতে পেলোম বাবাজী।'

অবাক হয়ে বলি, 'আমার ভাগ্যে কেন?'

'কারে লয় বাবাজী। তুমি না এলো কি আস হত। এহাঁর মধ্যে শক্তি আছে, দেইখলেই মনে লায়। এহাঁর হইয়েছে, নিশ্চয় হইয়েছে, দেখ্যে বুইঝলে ত বাবাজী।'

কী হয়েছে, তা ই জানব কেমন করে। জিজ্ঞেস করি, 'কী হয়েছে?'

'সিদ্ধি গ, সিদ্ধি। চখ মুখের ভাব দেইখলে না! উনি পেইয়েছেন, খুঁইজতে খুঁইজতে পেইয়েছেন।'

'কী পেয়েছেন?'

'তা কি আমি জানি বাবাজী। কী পেলে সিদ্ধিলাভ হয়, পাঁচুরে কি তা জাইনতে পারে।'

গোপীদাসের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। সে চুপ করে পথ চলে। গভীর অন্ধকার আমার চারপাশে। ডাইনে বক্রেশ্বর নদী। দেখে আমরা উত্তর দিকে চড়াইয়ে উঠতে থাকি। অন্ধের মত চলি। মনোভঙ্গিহীনের মত শুনি। কী খোঁজে, কী পায়, কিসে সিদ্ধিলাভ ঘটে কিছুই জানি না। যে তার আপন খোঁজার নাম জানে না, হদিস পায় না, সে কেমন করে বুঝবে। তবু গোপীদাসের কথায় দিগম্বর মানুষটির মুখ আমার চোখে ভাসে। সংসারে অনেক দেখা মানুষের সঙ্গে সেই মুখের যেন অনেক অমিল। তার নির্বিকার নগ্নতা, স্নিগ্ধ দৃষ্টি, প্রসন্ন গম্ভীর মুখ, শিশুর মত হাসি কান্না সব মিলিয়ে ভিন্ন? অন্য। খুঁজে ফিরে যে পায় তার রূপ কি এমনি? কে জানে। দীর্ঘশ্বাস সংক্রামক কিনা জানি না। অন্ধকার শ্মশান ও শিবক্ষেত্রের পথে আমারও দীর্ঘশ্বাস পড়ে। আর ভাবি, কত বিচিত্র, কত বিচিত্রতর এই মানুষের লীলা।

আমি জিজ্ঞেস করি, 'উনি উলঙ্গ কেন?'

গোপীদাস বলে, 'আমিও সি কথাটো ভাবি বাবাজী, উনি ল্যাংটা কানে। আমি অঘোরীবাবাকে দেখেছি' তিনিও ল্যাংটা ছিলেন। চুল দাড়ি ওহাঁরও দেখি নাই। গায়ে যে কত কী মেখ্যে বস্যে থাইকতেন, অই গ, কোন কিছুতে বিকার নাই। বাউলেরও বিকার থাইকতে নাই, তবে অঘোরীবাবা সব গায়ে মেখ্যে বইসে থাইকতেন। রস বিষ্ঠা সব। কারণবারি ছাড়া পান ছিল না। তাও বাবাজী কংকালের খুলির খোলে। হাঁড়ির ভাত কংকালের হাড় দিয়ে লাইড়তে দেখেছি। গরম ভাতে ঘিয়ের মতন চিতার থেকে তুলো লিয়ে আসা মানুষের মাথার ঘিলুর ভিটা দিয়ে খেতে দেখেছি। আমি অঘোরী-বাবার চুল দাড়ি দেখি নাই। কিন্তুন ও'য়াকে দেইখলে ভয় লাইগতো। সামনে যেতে বুক কাঁইপতো। আবার এ'য়ার দেখ, অন্যরকম। এ'হারও চুল দাড়ি নাই, ছাইভস্ম মাখা ল্যাংটা মানুষ, এই ঠাণ্ডায় বাইরে বস্যে রইয়েছেন, ক্ষ্যাপা ভাবের কোন লক্ষণ নাই। মুখখানি দেইখলে ত, যেন ভাবের নদী। আনন্দের ঢেলখেল হচ্ছো।...জয় গুরু। কার যে কী হয় জানি না।'

গোপীদাসও জানে না। সারা জীবন যার সাধনের সাধনায় গানের মন্ত্রে কেটে গেল, মানুষের আত্মজ্ঞানের বিচারে যার সন্ধ্যা ধ্যানের সেও জানে না। অচিনের পথ চলার অন্ধকারের মানুষ, আমার তো কোথাও ক্ষীণ রেশও নেই।

গোপীদাস আবার বলে, 'তবে বাবাজী, অঘোরপন্থী হলেই যে সব একরকম হয় তা নয়। আমার গুরুকে দেখেছি, তিনিও ক্ষ্যাপা ছিলেন। উলঙ্গ হয়ে হেসো খেলে ফিরতে দেইখেছি। ধুলোবালি বিষ্ঠা গোবর, কোন কিছুতে বিকার ছিল না। তবে সব সোময়ে লয়। যখন ক্ষ্যাপার দশা হয়েছে তখন। উ যার হয় সি বোঝে। আমরা কি বাবাজী, ক্ষ্যাপা দশায় যখন গুরুকে দেখেছি, তখন মনে হত কী যন্ত্রণায় যেন জ্বইলছেন গ, যেন জ্বইলে পুড়ে মইরছেন। খুব দুঃখু লাইগলে, মানুষ যেমন হেসো ওঠে, তেমনি হেসো উইঠতেন। আবার চখ মুখ পাকিয়ে একেবারে ডাক ছেড়ে হাঁক দিতেন, "ডবুরে র‍্যা শালো, আমাকে তু ডুবাতে আইসছিস? আয় আয় ক্যানে।" বল্যে হাতে ঢ্যালা লিয়ে ছুইটতেন। কাকে যে মাইরতে যেতোন, দেইখতে পেতোম না।'...

বিচিত্র সেই জগতের, সেই মানুষদের কথা কিছুই বুঝি না। অঘোরীবাবা, গোপীদাসের গুরু, সদ্য দেখে আসা নগ্ন ভাবানন্দ পুরুষ। লোভ আর আকাঙ্ক্ষার পাপেই জীবন কাটে, তাই ভয় ফেরে আমার ভিতরে ছায়ার মত। ক্ষ্যাপার কথা জানি কেবল আপন ভোগের বঞ্চনায়। অবিচারে যদি বা ক্ষিপ্ত হয়েছি, তা আমাকে সিদ্ধিলাভের মুক্তি দেয়নি। তাই ভিন্ন জগতের, ভিন্ন কথায়, কেবল অবাক মানি। মানুষের অপার রহস্যের অন্ধকারে চোখ উদ্দীপ্ত করে চেয়ে থাকি।

অন্ধকারে সব ঠিক ঠাহর পাই না।

মস্ত বড় এক গাছ। তার নিবিড় ঘন অন্ধকার তলে গোপীদাস দাঁড়ায়। কাছেই ঘর দেখা যায়। বাতি জ্বলে ঘরে, ফোকরে ফাকরে টের পাওয়া যায়। মানুষের অস্পষ্ট কথাবার্তাও শোনা যায়। অল্প একটু আগুনের শিখাও এক পাশে লক্ষ্য পড়ে।

গোপীদাস বলে, 'উটি মৌনীবাবার আশ্রম। ইটি হল অক্ষয় বট।'

অক্ষয় বট নাম শুনলেই কল্পনার রূপ যায় বদলে। প্রয়াগের কথা মনে পড়ে যায়। এলাহাবাদের কেল্লার সীমানার মাটির গর্ভে অক্ষয় বট নামে এক গাছের ডালের প্রদর্শনী হয় কুম্ভ মেলার সময়ে। সেখানে ধূপদীপ জ্বলে পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করে। দর্শনার্থী আর বট স্পর্শকামীরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। পয়সা দিয়ে চলে আসে।

কিন্তু এক সত্যান্বেষীর সাহায্যে আসল অক্ষয় বটের চিহ্ন দেখেছিলাম, দুর্গের নিষিদ্ধ অন্য প্রান্তে। অতীত ইলাহাবাদের মোগলের প্রাচীন প্রাসাদের ধারে। যেখানে দুর্গের প্রাকার-নীচে গঙ্গা বহে যায়। সেইখানে ছিল সেই অক্ষয় বট। যে বৃক্ষে উঠে একদা গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, অনেকে প্রাণ বিসর্জন দিত। সেই তাদের পুণ্য। তাদের মুক্তি।

এখানেও দেখি এক অক্ষয় বট। যার অন্ধকার বুপসিতে জ্বলে জোনাকি মিটি-মিটি। এই বটের তলাতেও আগুন জ্বলে। দুই তিন মানুষের অস্তিত্ব এখানে। সাধু না সংসারী কে জানে।

পথ পশ্চিমে চলে। গাছপালা শিব মন্দির মিলিয়ে অন্ধকার যেন অন্য রূপের নিবিড়তা পায়। অন্ধকারে বক্রেশ্বরের মন্দিরের চূড়া দেখে চিনতে পারি। প্রদক্ষিণের পর মন্দির এখন দক্ষিণের আকাশে।

তারপরেই ব্রহ্মানন্দ অবধূতাশ্রম দেখেই চিনতে পারি। উত্তর দিকের বাগান ঘুরে দক্ষিণ দরজায় যখন আসি, তখন ব্রহ্মানন্দর গলা শুনতে পাই, 'একটু পেসাদ করো দে গ ভৈরবী। এত কষ্ট কর‍্যে মদনা বিটা দিয়ে গেল, দে, একটুক পদোদক কর‍্যে দে।'

জবাবে শুনি, 'লাও, লাও, হইয়েছে। আমি আগুন কইরছি এখন।'

'তা করিস ক্যানে, আগে একটুকু পেসাদ কর‍্যে দে।'

মেয়েটার গলা আর শোনা যায় না। দরজা বন্ধ, ঘটনা দেখতে পাই না। কেবল গোপীদাস নিচু স্বরে বলে, 'খোয়ারি চইলছে এখনো।'

তারপরে গলা তুলে আওয়াজ করে, 'জয় গুরু!'

এক আওয়াজেই দরজা খুলে যায়। ব্রহ্মানন্দ অবধূত দরজা খুলে দেয়।

টিমটিমে বাতি। সেই আলোয় দেখি মেঝেতে মস্ত বড় এক মাটির পাড় বসানো ঘরের উত্তর ঘেঁষে। কুয়োর ভিতরে মাটির যেমন পাড় বসায় সেই জিনিস। আধ হাত উঁচু তার গা। দু-হাত বৃত্তের ফাঁদ। তার মধ্যে মোটা মোটা শুকনো গাছের ডাল সাজানো হয়েছে। ফাঁকে ফাঁকে মেলাই ছোটখাটো কাঠের টুকরো।

পাড়ের বেড়া ঘেঁষে যেখানে ছেঁড়া চাটাই পাতা আছে, তার পাশেই ছোট এক মেটে কলসী। পাশে একটি নর করোটি। আমরা ঘরে ঢোকবার মুহূর্তেই মেয়েকে দেখি, সে চাটাইয়ের সামনে থেকে মুখ ফিরিয়ে উঠে যায়। আঁচলটি তার মুখে চাপা এক হাত দিয়ে। সে গিয়ে বসে মাটির পাড়ের কাছে। কাঠ সাজিয়ে দিতে থাকে। কাঠ সাজাতে সাজাতেই উঠে এসেছিল বোধ হয়। যা যেন শুনেছিলাম

পেসাদ পদোদক করে দেবার কথা। তা-ই করতেই উঠেছিল নাকি যোগো ঠাকরুন। কিন্তু কিসের পেসাদ, কিসের পদোদক, কে জানে।

ব্রহ্মানন্দ ডেকে বসায়, 'এইস, এইস। কুথাক যাইরলে?'

গোপীদাস বসতে বসতে বলে, 'এই চাদ্দিকে একটো পাক দিয়ে এল্যোম।'

যোগো হঠাৎ উঠে উত্তরের দরজা খুলে বাইরে যায়। একটু পরেই আবার ফেরে। ছোট এক আঁটি খড় নিয়ে এসে কাউকে উদ্দেশ না করেই বলে, 'দিয়াশলাই দাও।'

অবধূতকে গোপীদাস পাপরাত্রার ওপারের গল্প বলে। আমিই উঠে দেশলাই এগিয়ে দিই। যোগো তখন আমার দিকে চায়। তার চোখ দুটো যেন কেমন চকচক করে। বলে, 'বসো।'

মাটির ওপরেই তার সামনে বসি। সে কাঠি জেলে খড়ে লাগায়। খড়ের আগুনে গুঁজে দেয় মাটির পাড়ের চারপাশে সাজানো শুকনো কাঠের মধ্যে। দেখতে দেখতে আগুন জ্বলে ওঠে। ঘরটা কাঁপানো আলোয় ভরে ওঠে।

সেই আলোয় দেখি যোগোমতীর কপালে মস্ত একটা টকটকে সিঁদুরের ফোঁটা। সিঁথিতেও দীর্ঘ রেখায় গাঢ় করে সিঁদুর টানা। পান চিবিয়েছে কি না ইতিমধ্যে কে জানে। ঠোঁট দুটো তা নইলে এত লাল হল কেমন করে? পা দুখানি আলতায় রাঙানো। মুখে কি একটু রসেরও গন্ধ? আগুনের আলোয় তার কণ্ঠা আর বুকের উপরিভাগ যেন আরো রক্তাভ দেখায়। রুদ্রাক্ষের মালাটি কাপড়ের ওপরে বুকে দুলছে।

'কী দেইখছ?'

যোগো ঘাড় ফিরিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে। আমি যেন চমকে উঠি। বলে উঠি, 'না—হ্যাঁ মানে আপনাকে এখন অন্যরকম লাইগছে।'

অবধূত মাটিতে ভর রেখে আগুনের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলে, 'কী, বাবাজী কী বইলছ হে?'

জবাবের প্রত্যাশা না করে ছোট লাল কলসী আর করোটি হাতে তুলে এগিয়ে নিয়ে আসে। ডেকে বলে, 'কই হে গোপীদাস ইদিকে এইস।'

গোপীদাস এগিয়ে আসে। ভৈরবীর এক পাশে বসে অবধূত। আর এক পাশে আমি। আমার পাশে গোপীদাস। তারপরেই হঠাৎ চমকে দেখি আরো দুটি কালো কুচকুচে জীব ঘরের অন্ধকার থেকে এসে আগুনের সামনে উপস্থিত হয়। ঘন ঘন লেজ নাড়ে, পিট্‌পিট্‌ করে চায়। অবধূত হাত তুলে বলে, 'বস্‌ হারামজাদীরা, কাছে এসো বস্‌।'

তৎক্ষণাৎ দুটিতেই একেবারে অবধূতের কোল ঘেঁষে এসে বসে। হাঁড়ির দিকে তাকায়। অবধূত বলে, 'খাবি?'

দুই সারমেয়-বালা লেজ নাড়ে। অবধূত আদর করে হেসে বাজে, 'হারামজাদী!'

যোগোকে জিজ্ঞেস করে, 'পেসাদ করেছ?'

যোগোমতী ঘাড় কাত করে সম্মতি জানায়। তারপরে আমার দিকে চেয়ে হাসে। অবধূত করোটি ডুবিয়ে কলসী থেকে একটু কারণ তুলে বাঁ হাতের গণ্ডূষে নেয়। কালো জীব দুটির মুখের সামনে এগিয়ে দেয়। দেখি, দুটিতেই চক্‌ চক্‌ করে চেটে খেয়ে নেয়। চমৎকার! এমন আজব দৃশ্য জীবনে কখনো দেখিনি। অপরাধ না হলে কারণকে যদি মদ বলি, তবে কুকুরকে কোন দিন ও বস্তু খেতে দেখিনি।

যোগোমতী হঠাৎ বলে ওঠে, 'চিতে বাবাজীকে দাও।'

'তুমি লইবে তবে?'

করোটিতে মদ তুলে অবধূত আমার দিকে এগিয়ে দেয়, 'এইস হে বাবাজী, লাও?'

আমি? কানে ভুল শুনিনি তো! শ্মশানের কারণবারি, তায় আবার নর করোটিতে! তাড়াতাড়ি বলি, 'না, না, আমার দরকার নেই।'

'দরকার নেই কীহে?'

প্রায় হুমকে ওঠে ভৈরব। বলে, 'ধর, ধর।'

দেখি, যোগোমতী থরথরিয়ে কাঁপে। হাসিতে কাঁপে। চোখের ছটায় ঝিলিক হানে। গোপীদাস তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'থাক না বেম্মালন্দদাদা, শরীল খারাপ-টারাপ কইরবে তা'পরে?'

'আরে তু থাম্‌ দিকিনি বিটা বাউল। তোদিগের ত খালি গাঁজার দম মাইরলেই হয়। আর প্রকৃত ঠাকরুনটি থাইকলেই হয়।'

গোপীদাস বলে ওঠে, 'জয় গুরু!'

আমি তখন যোগোমতীর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে। জানি সে অগতির গতি। বক্রেশ্বরের শক্তি যেমন মহিষমর্দিনী, শিবের শক্তি যেমন কালী, জগৎজনের আশ্রয় জগদ্ধাত্রী, সে এখন আমার তেমনি।

তবু যোগো বলে, 'একটুক দ্যাখ ক্যানে।'

হাত জোড় করে বলি, 'পারব না।'

সদ্যপূর্ণ করোটি নামিয়ে রেখে অবধূত বলে, 'ওহে শোন শোন, "মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ মুদ্রা মৈথুনমেব চ। মকারপঞ্চকঞ্চৈব মহাপাতকনাশনম্‌॥" বুইঝলে হে?'

মনে মনে বলি, তা বুঝেছি। মদ্য মাংস মৎস মুদ্রা মৈথুন পঞ্চমকারে মহাপাতক বিনাশিত হয়। কিন্তু সে তো সাধকের। আমাকে কেন। আবার বলি, 'আমি সাধারণ মানুষ, আমার পাতক ঘোচবার নয়। আমাকে ছেড়ে দিন।'

'অই অই বুঝেছি হে, শহরে মদ খাবো মাংস খাবো' ব্যাশ্যাবাড়ি যাবো, সিটি পাইরবে, ইটি লাইরবে, অাঁ?'

রীতিমত আক্রমণ। কিন্তু জানি ওকে যাওয়া বৃথা। তাই যোগোমতীর দিকেই বারে বারে চাই। যোগোমতীর এবার করুণা হয়। বলে, 'বাবাজীকে উসব বইলছ ক্যানে গ। না, উ কি কথা, ছি। থাকু, বইলছে যখন পাইরবে না, ছেড়্যে দাও।'

অবধূতের দ্বিতীয় কথা নেই। বাঁ হাতের মাঝখানে দুই আঙুল মুড়ে, তর্জনী, কনিষ্ঠা আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলে মাঝখানে কারণপূর্ণ করোটি স্থাপন করে। কী যেন বিড়বিড় করে। ডান হাত দিয়ে বুকের কাছ থেকে কম্পিত উপবীত টেনে নিয়ে স্পর্শ করে। তারপরে ভৈরবীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে। যোগোমতীও অবধূতের দিকেই তাকিয়ে ছিল। অবধূত একবার ঘাড় নেড়ে সবটুকু এক চুমুকে গলাধঃকরণ করে। একটু যেন চোখ বুজে ঠোঁটে ঠোঁট টিপে স্থির হয়ে থাকে। তারপরে গলা খুলে গোঙানো স্বরে প্রথমেই বলে, 'এ বাবাজীটোর মাথা খাইছে ই বিটা বাউল।'

গোপীদাসের সঙ্গে যোগোর চোখাচোখি হয়, দুজনেই হাসে। আর অবধূত আমাকে বলে, 'দ্যাখ ক্যানে বাবা যিখানেই থাক, নারীর পূজা কইরবে। তবে জাইনবে, শক্তি ধারণ। ভৈরবী পেসাদ করে্য দিয়েছে, তুমি পর্শ কইরলে না, এ খোব খারাপ।'

'আচ্ছা হইয়েছে উয়াকে আবার উসব কথা ক্যানে। বাবার যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে।'

যোগো ভুরু কুঁচকে বলে, আমার দিকে চেয়ে হাসে। এ আর এক বিচিত্র পরিবেশ। জীবনে কখনো যার সম্মুখীন হইনি।

ক্রমশঃ

শিক কাবাব

শিশির লাহিড়ী

চাপা গলার গানটা হেঁচকি তোলা—জিন্দগীমে নেকী কর বন্দে। মুফতকা খানা ছোড় দে॥ না হোতা কিসিকা ভালা। তো বুরা ভি করনা ছোড়দে॥

ছোকনু বিড়ি টানতে টানতে নন্দুয়ার গান শুনছিল আর হাসছিল।—জীবনে অন্যের ভাল কর, ফোকটে খানা খেও না। কারও ভাল না করতে পার, খারাপ কর না।

ছোকনু হাসবে না ভেবেছিল, তবু হেসে ফেলল, হাতের তালু-চাপা খুকখুকে একটা হাসির শব্দ ছড়িয়ে পড়ছিল। নন্দুয়া বাঘের মত খ্যাক করে তেড়ে উঠল, এইও! হানসতা কেও? দিল্লাগী মিলা?

মুখের হাসি মুখে চেপে ছোকনু হাসির দুখ করে বলল, হাসিনি তো ওস্তাদ।

অবিশ্বাসের দৃষ্টি বুলিয়ে নন্দুয়া ছোকনুর মুখটা চকিতে দেখে নিল। তারপর বলল, হাঁ। হাসো মত। ফিন হাসি করলে এক লাথি মেরে বাহার নিকলে দেব ছোকনু।

ছোকনু মুখ ফিরিয়ে আবার হাসল।—তুমি শালা নন্দলাল ওরফে নন্দুয়া, জাত বাঙালী, তোমার মেজাজ ভাল থাকলে তুমি ভুল ভাল হিন্দী মিশিয়ে বাঙলা বলবে, অন্য জাতের, অন্য ডোরার বাঘ হতে চাইবে।—যাঃ! শাল্লা! তারপর চাপা গলায় ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, চিঁড়িয়াটা নিয়ে কি করবে ওস্তাদ?

বোতল থেকে খানিকটা মদ ঢকঢক করে গলায় ঢেলে দিয়ে নন্দুয়া নিজেই এবার হাসল। মোটা ভারি গলা, দন্তুর মুখ, হাসির সে দাপট ঘন দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে ঝড় তুলে ছোকনুর মুখে শীতল বাতাসের ঝাপ্টার মত এসে লাগল।—কাবাব বানাব! শিক কাবাব! —খাবি?

মুখের মধ্যে আঙুল ভেঙে হুই, হুই, শিসের শব্দ তুলল ছোকনু।—তোফা। তোমার নজর আছে ওস্তাদ, মাল চেন।

চিঁড়িয়াটার মুখের দিকে তাকিয়ে ছোকনু অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল, নধর মুরগীর মত একতাল মাংস, একটু আঁচে সেঁকলেই সিদ্ধ হয়ে যাবে, তারপর কামড় মার, হাড় মাংস চিবোও। কচি কচি হাড়ের চুর-চুর শব্দ যেন ছোকনু শুনতে পাচ্ছিল, স্বাদে জিভে জল আসছিল, নাল গড়াচ্ছে। বাঁ হাতের চেটো দিয়ে ছোকনু ঠোঁট মুছে নিল, হাতটা কেমন গরম-গরম বোধ হল ছোকনুর।

শেষ বিকালের কথা ছোকনুর মনে হচ্ছিল। ভারি লোহা-লক্কড়ের মাল ডেলিভারি দিয়ে খালি লরি নিয়ে ফিরে আসছিল নন্দুয়া। মাঝখানে সিংয়ের দোকানে ঢুকে চাটের সঙ্গে খানিকটা মদ খেল। পর পর দুটো দিন বড় পরিশ্রম গিয়েছে। রেল-ইয়ার্ডের চোরাই মাল, এক লরি ডেলিভারি দিতে পারলে অনেক টাকা। পকেটে ঝমঝম করে টাকা বাজাচ্ছিল ওস্তাদ। ছোকনুকে বলেছিল, আজ আর ডেরায় ফিরে যাব না। চল পটিতে গিয়ে একটা খপসুরত মেয়ে জোগাড় করি, খাই দাই—মজা লুটি। কুমড়োর বিচির মত বড় বড় হলদেটে দাঁতে হেসেছিল ওস্তাদ, বুকের ছাতি ঠুকেছিল, এ মার্সেডিস-বেঞ্জকো ভি দেখতে হবে ছোকনু। খালি পিট্রোল-মবিল দিলে হবে না, মাঝে মাঝে সারভিসিং ভি কোরাতে হবে। খ্যা-খ্যা করে নন্দুয়ার হাসিটা বিউগিল হর্নের মত বাজছিল।

বাঃ! বেশ বলেছিল।—এ চিঁড়িয়াটাকে দিয়ে ফোকটে সারভিসিং করিয়ে নেবে ওস্তাদ। ঝকঝকে নতুন মেসিন, ছোকনু মনে মনে হাসল, শালা গুরু একখানা চীজ।

ফাঁকা লরিটা গাঁক গাঁক করে চালাচ্ছিল নন্দুয়া। রাক্ষুসে দুটো হেডলাইট জ্বালা, অ্যাক্সিলেরেটারে চাপ দিচ্ছে তো দিচ্ছেই। স্পিডোমিটারে কাঁটা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিল, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর।

একটু আস্তে চালাও ওস্তাদ। সন্ধ্যেবেলা

শিয়াল-কুকুর বেফিকির ছুটছে। ছোকন্ বলেছিল।

শালা বুজদিল। নন্দুয়া স্পীড বাড়িয়ে গাড়িটাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

মেজাজ ভাল থাকলে নন্দুয়া বুজদিল বলে, খারাপ থাকলে বলে হারামি-কা-বাচ্চা! তা মিথ্যে বলে না ওস্তাদ, ছোকন্ ভিজে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়েছিল, দাঙ্গার সময় গুন্ডারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল মাকে, তারপরই না ছোকন্।

—আর বুজদিল। সেও সত্যি। মার সেই ভয়-ভয় ভাবটা পেয়েছে ছোকন্। উত্তেজনাকর কিছু হলেই চমকে ভীত হয়ে ওঠে, গলার কাছে জিভটা শুকিয়ে টেনে ধরে, কেমন যেন হাত-পা কাঁপতে থাকে ছোকনের, অবশ অবশ লাগে।

নন্দুয়া পা ছড়িয়ে বসে বসে মাল টানছিল। ছোকন্ পুরনো ভাবনায় আবার ফিরে গেল। ধূর্ত শিয়ালের মত নন্দুয়ার চোখ দুটো জ্বলছিল, পটিতে যাবার তাড়া ছিল। ঝুপসি, রোঁয়া ঢাকা জ্বলজ্বলে চোখ তুলে নন্দুয়া এক সময়ে তীক্ষ্ম শিসের সুর তুলেছিল—তোবা! তোবা!

হাতে কাগজের মোড়ক, লম্বা বেণী, শেষ অগ্রহায়ণের অল্প শীতে মেয়েটা বোধ হয় কেনাকাটা সেরে দেরি করে ফিরছিল. কিম্বা কোথাও মজা মারতে গিয়ে দেরি করে ফেলেছে। জোরে জোরে হাঁটছিল মেয়েটা। চলার ঠমক আছে, তানপুরার লাউ-এর মত পেছন, কেমন যেন গা দুলিয়ে দুলিয়ে যাচ্ছে। লম্বা বেণীতে লাল ফিতের ফুল একটা। বাঘের চোখের আলোয় ধরা পড়া হরিণের চোখের মত সেটা কাঁপছিল। ছোকন্ দেখতে দেখতে বলেছিল—আবার হিলতোলা জুতো পরেছে গুরু!

ওস্তাদের চোখে-চোখে লেখাটা পড়ছিল ছোকন্। নির্জন ফাঁকা রাস্তা। খ্যাপলা জাল ফেলে মাছ ধরার মত একটানে তোল, দেখ যেন চিৎকার না করে, হাত পা-মুখ বাধ, তারপর তেরপল ঢাকা দিয়ে নিয়ে যাও। গাড়ি সাঁ-সাঁ করে ছুটবে, ঘণ্টাখানেক ছুটলেই চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল রাস্তা কাবার। তারপর বড় রাস্তা ছেড়ে নির্জন কোনো লোকালয়ে শূন্য-বাঁকা পথে গাছের আড়ে গাড়ি দাঁড় করাও, বনেট খুলে দাও, ছিঁড়িয়াটাকে টেনে নিয়ে বনের মধ্যে যাও, বনের মধ্যে কাঠ-কুড়ুনিদের ঝোপড়ি আছে. না থাকে কুছ পরোয়া নেই, ওপরে আকাশ, নিচে মাটি, মাঝখানে আমি তুমি।

ঝাঁকড়া মাথা অশত্থ গাছটা, ঝুপসি অন্ধকার। ওখান দিয়ে ঢালু মাঠের দিকে পথ, মাঠের পথ চিরে অল্প দূরে বাড়ি। সেখানে আলো জ্বলছে।—আলো চেকনাই মারছে।

স্পীড কখন কমিয়ে ফেলেছে নন্দুয়া, ছোকন্ বুঝতে পারেনি।—মেয়েটা এবার মাঠে নামবে, ছোকন্ বলেছিল। কখন যেন মার-জান জোরে হর্ন মারল ওস্তাদ, আলো নেবাল, ঘচাং করে ব্রেক কষল। ছোকন্ অন্যমনস্ক ছিল, সামনে ছিটকে পড়ে ধাক্কা খেল, রগের কাছটা কেটে গেল একটু।

ছোকন্ কাটার জায়গাটায় আঙুল চিপে বসেছিল। ভোজবাজির মত মিলিয়ে গেল নন্দুয়া, গাছের শিকড়ে আটকে পড়া আচমকা মেয়েটা আর্তনাদ করেছিল কিনা ছোকনের মনে নেই। এক ঝটকায় সিঙি মাছ কোটার মত মেয়েটার রগ টিপে ধরে ডালায় এনে ফেলেছিল নন্দুয়া, মাথার পাগড়ি মুখে মাথায় জড়িয়ে দিয়েছিল।—ছোকন্! জলদি! গাড়িতে লাফিয়ে উঠে স্টার্ট দিতে দিতে বলেছিল নন্দুয়া, হাত-পা বেঁধে ফেল।—বেঁধে ফেল।

গাড়ির স্যানটিং, গীয়ার বদলানো, হর্নের আওয়াজ, ছোকন্ আর কিছু বুঝতে পারেনি। তার বুকের মধ্যে ঢাক বাজানোর আওয়াজ উঠছিল।

ছোকন্ ডালায় বসে কাঁপছিল। কাঁপতে কাঁপতে পায়ে দড়ির ফাঁস পরাচ্ছিল ছোকন্। মেয়েটা যেন মরে গেছে। মরা একটা মেয়ে কোলে নিয়ে বসে আছে ছোকন্, এমন কিছু ছোকনের বোধ হচ্ছিল।

কখন যেন নন্দুয়া বলল, দড়ি-টড়ি খুলে দে ছোকন্। একবার দেখি।

একটানা একটা তীক্ষ্ম কর্কশ চিৎকার তার আচ্ছন্ন চেতনাকে অনেকক্ষণ ধরে করাতের মত ঘষে ঘষে কাটছিল। এক এক ধরনের শব্দে গা কির-কির করে, পেট গুলিয়ে ওঠে, মনে অস্বস্তি জাগায়, এখন সে সেই ধরনের শব্দ শুনতে শুনতে অচেতনে কিছু আত্মস্থ বোধ করছিল। এতক্ষণ যেন শিরাহীন দেহ, কোষহীন মস্তিষ্ক ছিল, এখন শিরায় শিরায় রক্তের প্রবাহ, মস্তিষ্কে চেতনা ঘর্মাক্ত ভয়ে

গরম তেলে ছাড়া ভাজাভুজির মত ছ্যাক্ ছ্যাক্ করে উঠল।

সে ক্রমশ জ্ঞান ফিরে পাচ্ছে, চেতনা জাগছে, চোখের কোণ কুঁচকে আসছে, রগ দপদপ করছে। কাটা কইমাছের মত সে শরীরের চলকে ওঠা অনুভব করছিল, চোখের কোল বেয়ে ঈষদুষ্ণ জল গড়িয়ে পড়ল। সে হাত নাড়তে চাইল পারল না, পা সরাতে চাইল পা বাঁধা। একটা তেল চিটচিটে ময়লা নাকড়ার মত কিছু মুখে ঢোকান, মুখ ঘুরিয়ে শক্ত গিঁটে ঘাড়ের কাছে বাঁধা। দুর্গন্ধ, ইটে-ইটে স্বাদে তার ওয়াক উঠছিল। কখন যেন সে ফিরে শুয়েছে, ঘেয়ো কুকুরের মত মাটিতে মুখ ঘষেছে। কপাল জ্বালা করছে, নাকের ছাল-চামড়া ওঠা। বোবা বেদনায় তমতম করতে করতে ফিরে চিত হয়ে শুল। শুয়ে ধীরে ধীরে চোখ মেলল।

বিষণ্ণ আলোর মত অস্বচ্ছ কিছু জ্যোতি, সে ঠিক দেখতে পাচ্ছিল না। মোটা কাঁচের চশমার ভেতর দিয়ে যেমন দেখায় তেমনি আবছা-আবছা। বার কয়েক চোখ পিটপিট করে আলোর খোঁজে ইতিউতি চাইছিল।—ভাঙা চাল, আধপোড়া হাড়ের মত নোংরা কাঠের বাতা ঝুঁকে ঝুলছে, তারই ফাঁকে কাস্তের মত আধখানা চাঁদ।—সে কি?—কোথায়?—কেন?—সে মনে করতে চাইছিল, কিছুই মনে পড়ল না তার। আবার চোখ বুজে দম বন্ধ করে সব কিছু স্মরণ করবার চেষ্টা করছিল, সে খুঁজছিল, নিজেকে হারিয়ে ফেলে খুঁজছিল—কে সে?—কে?—কে?—কোথায়?—কেন?—খুঁজতে খুঁজতে তখনই সেই একঘেয়ে কর্কশ টানা টানা করাত চালার মত শব্দটা শুনল। তীক্ষ্ণ লুব্ধ চঞ্চু, গোলগোল চোখ, কাছে কোথাও গাছের কোটরে পেঁচাটা ডাকছিল। তার গা রি-রি করে উঠল।—আর তারপরই অকস্মাৎ ভয় পেয়ে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল সে। মনে পড়েছে, সব মনে পড়েছে। আচমকা চিৎকারে দম বন্ধ হয়ে সে বিষম খেল মাথা ঝিমঝিম করছিল, সারা গায়ে বিজ বিজ করে ঘাম ফুটছে, বুকের মধ্যে আনচান করছিল। তার কান্না পাচ্ছিল, আকুল কান্না। চোখের জল ছাড়া মুখে সে শব্দ করে কাঁদতে পারছিল না, তার কান্নাটা যেন ঘাম হয়ে ফুটে বের হচ্ছে। মাথার চুল বেয়ে ঘাম পড়ছে, মাথা সুড়সুড় করছে, কপালের ঘাম রগে গড়িয়ে পড়ল, রগের ঘাম কানের লতিতে। বুক, বগল ভিজে যাচ্ছে। জামা ভিজে গায়ের সঙ্গে সেঁটে যাচ্ছে। সায়া পায়ের সঙ্গে আটকানো। শরীরের রক্ত তার জল হয়ে যাচ্ছে। সে মরে যাচ্ছে যেন।

মরে যাওয়াই ভাল, সে ভাবছিল। সে মনে মনে নিজের মৃত্যু-কামনা করতে করতে আরও ভীত বিহ্বল হচ্ছিল, ভয়ের সঙ্গে কাঁপুনি জাগছিল। তার শরীরের মাংসপেশীগুলো যেন তার নিজের ইচ্ছাধীন নয়, কেমন যেন চলকে চলকে লাফাচ্ছে, গায়ের লোম পেরেকের মত শক্ত কঠিন, নাগরদোলার মত ঘুরন্ত মাথা, বুকে জ্বালা। দু' চারবার জোরে জোরে নিশ্বাস নিল সে, মনে হল দাস্ত হবে, তলপেট ঘুলিয়ে উঠছে। পায়ের ফাঁকে পা চেপে নিজেকে চাপতে চাইল সে, অল্প পরে বুঝল, সে সহ্য ক্ষমতা হারিয়েছে, তার গরম লাগছিল।

বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে ছোকনু বাঁধন খুলতে এল। গায়ে হাত দিয়ে এ্যঁ-হেঁহেঁ করে লাফিয়ে উঠে ময়লা প্যাণ্টে হাত মুছল। —ওস্তাদ! ছোকনু হাসির গলায় বলল, চিড়িয়াটা কাপড়া ভিজিয়েছে।

মত্ত গলায় নন্দুয়া উত্তর দিল।—কাপড়া উতার দে। একদম নাঙ্গা।

লম্বা শিসের ধ্বনি তুলে ছোকনু কোমরে হাত রাখল। সতর্ক অথচ লোভী দৃষ্টিতে তাকিয়ে শাড়ির গিঁট খুলে, সায়ার দাঁড় আলগা করে দিল। একবার ভালবাসার হাত রাখল পেটে, উত্তপ্ত হাতে সায়া ধরে একটা হ্যাঁচকা টান মারল। তারপরই আবার লাফিয়ে উঠল।—বাপস্! আবার চাট মারে ওস্তাদ।

শেয়ালের ডাকের মত টেনে টেনে হেসে উঠল নন্দুয়া। —তেজী টাট্টু আর বিচ্ছু আওরৎ না হলে, মরাম্মৎ করে কুছু সুখ নেই ছোকনু। শালা পিরেমের সময় সাপের মত ছোবল মারবে, তবে না মেয়েছেলে!

মুখের বাঁধন খুলতে খুলতে ছোকনু দাঁড়িয়ে পড়ল। —যদি চ্যাঁচায়?

—চ্যাঁচায়। নন্দুয়া চোখ টেনে টেনে বলল, —সোর মচাবে? চাকিতে কোমরের গেঁজে থেকে ছুরিটা বার করে স্প্রিংটা চিপে ধরল নন্দুয়া। ঝকঝকে ছুরির ফলাটা চাঁদের

আলোয় চকচক ক'রে উঠল। —সোর মচাবে?
—মচানে দে। নন্দুয়া ঘড় ঘড় করে হাসল।

ফণাতোলা সাপের চোখের দিকে তাকান জন্তুর মত সে ছুরিটার দিকে তাকিয়ে ছিল। অস্ফুট গলায় সে একসময় বলল,—জল।

ছোকনুর বুকের মধ্যে কেমন কেমন করে উঠল, একটু মমতা বোধ করছিল সে।
—একটু জল দেবে ওস্তাদ।

—জল কোথায় পাবি? নন্দুয়া চোখ কুঁচকে তাকাল,—দে শালা একটু মদ দিয়ে দে, ভিরমি কাটবে।

বোতল থেকে কয়েক ঢোক মদ মুখের মধ্যে ঢেলে দিল ছোকনু। ঠোঁটের কোণ কাটা, জিভ আড়ষ্ট, সে গিলতে পারছিল না। কষ বেয়ে কিছু গড়িয়ে পড়ল, অল্প কিছু কণ্ঠনালী বেয়ে বুকে যেন ছ্যাঁকা দিয়ে পুড়িয়ে দিল তাকে। ঘুমের মধ্যে মশারিতে আগুন লাগা মানুষের মত সে অকস্মাৎ গুমরে চিৎকার করে উঠল,—না। না।

নন্দুয়া সজোরে একটা চড় মারল। চুপ রহো, চিল্লাও মাত্।

ছোকনু দড়ির মত পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। ওস্তাদ রাগলে যম, জানে খেতে পারে।

মাটিতে পড়ে কিছুক্ষণ ভাম হয়ে থাকল সে। একটা অসহ্য জ্বালা গালের থেকে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে, গালটা ফুলতে ফুলতে জ্বলছে, গায়ে কেউ যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সে শব্দ করে কাঁদতে চাইল, কাঁদতে পারল না, ভেজা নোংরা ময়লা ভীতু বেড়ালছানার মত অন্ধকার কোণে সরে গিয়ে চুপ করে কাঁপতে থাকল।

কিতনা টাইম? নন্দুয়া চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল।

ছোকনু আন্দাজ লাগাল। —দশ।

বহুৎ খুব। বারহ বাজে নিকলেংগে।
—বাত্তি বা?

এ-পকেট ও-পকেট খুঁজে ছোকনু ছোট টর্চটা বার করে দিল। নন্দুয়া কাঁচ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলোর বৃত্ত ছোট একটা সীমা-রেখার মধ্যে টেনে এনে হাতের তালুতে ফেলে দেখল।

ব্যাটারী বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছে। অনুজ্জ্বল, ম্যাড়মেড়ে আলোয় একটা লালচে আভা, মেয়েটার ঘি রঙের শরীরে সে আলো কিছু কষিত কাঞ্চন বর্ণ ফুটিয়ে তুলল।

ছোকনু অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছিল। দ হয়ে বসে আছে মেয়েটা। মাটির ওপর কলসীর মত ভাঁজ নিটোল মাংসল উরু, চিকন শিং-এর মত দীঘল ঠ্যাং, মেদহীন মুঠিভোর কোমর, চওড়া আড়ার হর্ন বুক, দু' হাঁটু জড়িয়ে মুখ ঢেকে বসে বসে মেয়েটা কাঁদছিল, চুলের বেণী লতানে সাপের মত কাঁধের পাশে পেঁচিয়ে জড়িয়েছে, তাতে লাল একটা ফিতের ফুল, অন্ধকারে জ্বলছে যেন।

ছোকনু ফাটা ফাটা চোখে চেয়ে দেখতে দেখতে অবশ হয়ে আসছিল। যে শরীর লুকিয়ে রাখার, সঙ্গোপনে সযত্নে তিল তিল করে গড়ে তোলার, সে শরীরটা যে এখন দু' জোড়া চোখের ন্যাংটো দৃষ্টির সামনে খোলামেলা একথা যেন মনে নেই মেয়েটার। এ শরীর যেন ওর নিজের নয়, অন্য কোন একটা মেয়ের, ঐ মেয়েটা হাবা চোখ দিয়ে দেখছে, বোবা মন দিয়ে বুঝছে। —আচ্ছা কষ্ট হচ্ছে না ওর?

মেয়েটার কষ্টটা যেন বুঝতে চাইছিল ছোকনু। সেটুকু বুঝতে গিয়ে মা'র কথা মনে পড়ে গেল ছোকনুর। আচ্ছা, মাকে যখন ধরে নিয়ে গিয়েছিল গুন্ডারা, তখন মা'র মনে মনে যা যা হয়েছিল, ঐ মেয়েটার মনেও কি সে রকম ভয়, আশংকা, লজ্জা, ঘৃণার কথা মনে উঠছে! —বাঁচবার, পালিয়ে যাবার, মরবার, মারবার ইচ্ছে হচ্ছে? কেন, কেন হবে না? মা'ও তো তার ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ে ছিল, এ মেয়েটাও তাই। —ছোকনুর মাথার মধ্যে গুলিয়ে যাচ্ছিল, দব দব করছিল, মেয়েটার দিকে তাকালে মা'র কথা কেন যেন বারে বারে মনে পড়ছে।

নিজেকে একটা কুৎসিত গাল দিল ছোকনু। শালা বেজম্মা! —তবু যেন নিজের ভয়-ভাবনার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছিল না। গলার জিভটা ক্রমশ ঢুকে যাচ্ছে, পর পর কয়েকটা ঢোক গিলে ছোকনু পেটের ভেতর থেকে কিছু ওস টেনে নিয়ে গলা ভিজিয়ে নিতে চাইল, শুকনো ঠোঁটে শুকনো জিভ বোলাল। বুকের মধ্যে একটা অসহায় বেদনা, ছোকনু ক্রমশ অসাড় বোধ করছিল, মনে হচ্ছিল এখনি যেন ঐ মেয়েটা মা'র গলায় ডেকে উঠবে,—ছোকনু বাপ আমার! —ছোকনু!

অথচ শরীরে একটা জ্বালা বোধ করছিল ছোকনু। একটা তীব্র উত্তেজনা তলপেট চিরে গল্পের বাতাপীর মত বের হয়ে আসতে চাইছে। ছোকনু প্যান্টের পকেটে হাত চেপে দাঁতে দাঁত দিয়ে বসল, ঠাণ্ডা শীতের রাতে নাক ঘামছিল।

নন্দুয়া কাঁচাপাকা গোঁফের ডগা দাঁতের ফাঁকে চুষতে চুষতে জুলজুলে চোখে তাকাচ্ছিল, ঠোঁটের পাশ দিয়ে লাল গড়াচ্ছে। হাতের পৈছায় লাল মুছতে মুছতে নন্দুয়া চাপা গলায় ডাকল,—ছোকনু! সে ডাক লোভ আর কামনায় গর গর ক'রে উঠল।

নিজের গলা চিনতে পারছিল না ছোকনু, কেমন যেন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ফ্যাঁস-ফ্যাঁসে শোনাচ্ছিল,—ওস্তাদ!

অন্যমনস্ক নন্দুয়া পাজামা ছাড়তে ছাড়তে বলল,—কুছ নেহি।

কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখ দুটো বন্ধ করল ছোকনু,—অন্ধকার, অন্ধকার। ডুবন্ত মানুষের মত কেউ যেন নখে করে বাতাস আঁচড়াল, অসহায় একটা কান্নার ঢেউ অস্পষ্ট শোনাল। ছোকনু ধীরে ধীরে চোখ খুলল।

অস্ফুট একটা গালাগাল দিয়ে নন্দুয়া হাঁটু দিয়ে গোঁত্তা মারল একটা। হাড়িকাঠে ফেলা বলির পাঁঠার মত মেয়েটাকে মুড়ে বেঁকিয়ে ওপরের দিকে তুলে ধরল। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল,—বিচ্ছু কাঁহিকা।

নন্দুয়ার নিশ্বাস বিষম হয়ে আসছিল। কেমন একটা ঘোঁত ঘোঁত শব্দ উঠছিল গলায়। জড়ানো গলায় নন্দুয়া বলছিল, —জানিস ছোকনু আমি যখন প্রথম বিয়ে করি—

ছোকনু শুনছিল না। ধাঙড় পাড়ার শুয়োর মারার দৃশ্যটা সে চোখে দেখছিল। রাত, অনেক রাত, মিটমিটে মশাল জ্বলছে, চারটে খুঁটোয় বাঁধা চারটে পা, মাদল বাজছে। ঘুঁটের আগুনে গরম লালচে একটা শিক, মেটে মেটে আভা বের হচ্ছে, তাকান যাচ্ছে না, চোখে গরম লাগে। শুয়োরটার হৃৎপিণ্ডটা পুড়ে গেল, গরম শিক, পশুটো চিৎকার করছিল, সে চিৎকার পোড়া-পোড়া, আর্ত, কাঁপছিল।

—একদিন কি হয়েছে জানিস ছোকনু—

ছোকনু কান চাপা দিল, নন্দুয়ার কথা বোঝা যাচ্ছে না, জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে, কি যেন বলছে,—পেয়ারী—রাম পেয়ারী—মেরী মোহব্বৎ—

নন্দুয়া উঠে পড়ল। গুরু ভোজনের পর পর কয়েকটা উদ্গার তুলল যেন, তারপর মুখ-খারাপ করল একটা।

জল তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছে মেয়েটা। ঠোঁট ফোলা, কষ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, অসহ্য যন্ত্রণায় দুমড়ে মুচড়ে মুচড়ে উঠছে, ছোকনু সেদিকে তাকিয়ে আবিষ্টের মত এগিয়ে গেল।

নন্দুয়া গা ঝেড়ে বোতলের তলানি মদটুকু এক ঢোকে খেয়ে নিয়ে বলল,—ছোকনু। খানা তৈয়ার।

ছোকনু সে কথা শুনতে পেল কি পেল না। মুঠি বাঁধা হাত পকেট থেকে বের করে নিল। হতাশভাবে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে চোখ ভিজিয়ে ফেলল যেন।

ঘোলাটে চোখদুটো ধুরতে ধুরতে ছোকনুর মুখে স্থির হয়ে চেয়ে থাকল। চোখের পাতা পড়ছে না, ফড়িং-এর পাখার মত কাঁপা ভোমরা, ছলছলে এলো চোখে মেয়েটা বলল,—উ—ল।

ছোকনুর গা ঘুলিয়ে কান্না গলায় উঠে এল। ছোকনু জেগে না স্বপ্ন দেখছে: মাটির থেকে অনেক উঁচুতে আড়াআড়ি শুয়ে আছে মেয়েটা, সাদা কাপড়ে ঢাকা দেহ, মুখ দেখা যাচ্ছে না, মাঝে মাঝে রক্তের ছোপ, সে সাদা চাদরে লালপদ্ম ফুটিয়েছে। কারা যেন হরিধ্বনি দিচ্ছে,—বল হরি! হরি বোল। বল হ-রি-হরি-বো-ল! ছোকনু আর্ত গলায় চিৎকার করে উঠল—ওস্তাদ!—মেয়েটা মরে যাবে ওস্তাদ! তারপর দুহাতের তালুতে মুখ ঢেকে কচি ছেলের মত চাপা কান্নায় গুমরে উঠল—ওস্তাদ!

—যেতে দেও। নন্দুয়া মত্ত গলায় উত্তর দিয়ে জানোয়ারের মত তাকাল। নন্দুয়ার সেই চেহারা, হাতের থাবা উদ্যত, এলোমেলো নোংড়া চুল, লাল চোখ, হাড়-চিবানো কুকুরের মত খ্যাক করে উঠল নন্দুয়া—ভাগ শালা! নিকম্মা কাঁহিকা!

গাড়িটা ঝড়ের বেগে উড়াচ্ছিল। আকাশে মেঘ জমেছে, জোরে জোরে বাতাস দিচ্ছিল। হাতের থাবায় মুখ ঢেকে বসেছিল ছোকনু। মার কথা মনে হচ্ছিলো।—আচ্ছা! মার কি দোষ ছিল?—ঐ মেয়েটার কি দোষ? ছোকনু আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল, অদ্ভুত কিন্তু ভাবনা জাগছিল মনে—আচ্ছা ঐ মেয়েটা যদি এখন ভগবানের কাছে যায়, গিয়ে বলে, আমার এমন সর্বনাশ করলে কেন?—আমার কি দোষ?—কোন অপরাধ?—কি বলবে সেই ভগবান?—সেই গোলা হারামি ভগবান?

ছোকনু বোধ হয় চিৎকার করে উঠেছিল। নন্দুয়া আড় চোখে তাকিয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলল—দেখ ছোকনু দেখ। কেমন বৃষ্টি পড়ছে। শালা আজ জবর ঘুম হোবে।

হু হু করে গাড়ি চালাচ্ছে নন্দুয়া। জলে ভাঙ্গা হেড লাইটের আলো গলে গলে যাচ্ছে। মেয়েটার মুখটা আর মনে করতে পারছিল না ছোকনু, বৃষ্টির জলে সে মুখ যেন ধুয়ে ধুয়ে যাচ্ছে।

অ্যাক্সিলারেটারে পা চেপে নন্দুয়া চাপা গলায় গান ধরল—ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম—

ছোকনু হাসল। সে হাসি বড় বিষণ্ণ। ছোকনু ভাবছিল, এর পর থেকে কোনদিন মায়ের দিকে তাকাতে পারবে না ছোকনু মায়ের মুখটা ক্রমশ ক্রমশ ঐ মেয়েটার মুখের মত হয়ে আসছিল

কবির সঙ্গে ইয়োরোপে ১৯২৬

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

॥ ১৬ ॥

শ্রীযুক্ত অমলহোম

Grand Hotel &
Grand Hotel Royal
Stochholm
3rd September 1926

অমলবাবু,

আমরা আজ এই মাত্র সকালবেলা অসলো থেকে এসে পৌঁচেছি। লণ্ডন থেকে ২১শে আগস্ট নরওয়ে যাত্রা ক'রে ২৩শে সেখানে পৌঁছান হয়। তারপর আবার ২রা তারিখ নরওয়ে ছাড়লাম। এ কয়দিন বরাবর অসলোতেই ছিলাম। এত অসম্ভব ব্যস্ততায় কেটেছে যে, চিঠি লিখতে পারি নি আপনাকে। ইচ্ছে ছিল একটা পিকচার পোস্টকার্ড পাঠাবার, তাও হয় নি।

ইতিমধ্যে আপনার দু'খানা চিঠি পেয়েছি। একটা অসলোতে এবং কাল একখানা আসবার সময় স্টেশনে মোটাতে আপনাদের বর্ষা-মঙ্গলের এবং শিশির ভাদুড়ীর 'জয়সিংহের' খবর দিয়েছেন। এর আগের চিঠিতে খবরের কাগজের টুকরোটা এসেছিল।

চিঠিখানা স্টকহলমে আরম্ভ করেছিলাম, কিন্তু শেষ করবার সময় পাইনি। ইতিমধ্যে পরশু অর্থাৎ ৬ই সেপ্টেম্বর ভোরে কোপেন-হেগেনে এসে উপস্থিত হয়েছি। আজই রাত্রে জর্মানী রওনা হয়ে কাল সকালে পৌঁছব সেখানে এবং দু দিন থেকে তারপরে বার্লিন। বুঝতেই পারছেন কীরকম ঘূর্ণির মধ্যে আছি।

কবি সেখানে এক দিন বক্তৃতা এবং এক দিন রিডিংস দিলেন। দু' দিনই যথারীতি লোকে লোকারণ্য। ওঁর বক্তৃতাটা ওরা সেই সভা-ঘরেই ব্যবস্থা করে ব্রডকাস্ট করেছিল।

আমরা চলে আসার দিন জন বয়ের সকাল থেকে সমস্ত দিনই আমাদের বাড়িতে ছিলেন। মানুষটি অতি চমৎকার এবং আনন্দে ও প্রফুল্ল স্বভাবের লোক। অত অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে যাওয়াতে ভাল লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সারা দিন থেকে বিকেলবেলা স্টেশনেও তুলে দিতে এসেছিলেন।

স্টকহলম-এও অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। বেড়ানোর এই আনন্দটাই সবচেয়ে আনন্দের। সব দেশ-গুলোরই শ্রেষ্ঠ লোকের সঙ্গে পরিচয় হওয়াটা কি কম সৌভাগ্য!

স্টকহলম-এ বিখ্যাত এক্সপ্লোরার সোয়েন হেডিন (Sven Hedin), পারহ্যালে স্ট্রম (Perhalle Strom—যিনি স্টকহলম-এ গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে অফিসিয়াল রিপোর্ট দেন) এবং আরও অনেকের সঙ্গে হেডিনের বাড়িতে লাঞ্চ খেতে গিয়েই আলাপ হল। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই কেউ লেখক, কেউ কবি এবং সকলেই সুইডিশ আকাদেমীর সভ্য।

ডঃ সোয়েন হেডিন তো আকাদেমীর সভ্য বটেই। কবি এর আগে একবার যখন এ দেশে এসেছিলেন, সেই সময় সোয়েন হেডিনের সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্ব হয়। এঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন।

আর এক দিন আর এক জায়গায় নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে সুইডেনের বর্তমান রাজার ছোট ছেলে প্রিন্স উইলহেলমকে দেখলাম। কথা-বার্তাও হল। কারণ, লাঞ্চ টেবিলে তাঁরই পাশে আমার জায়গা পড়েছিল। ইনি নিজেও একজন কবি, তাই রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন-ভোজে এঁরও ডাক পড়েছিল—কবির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য। এত সব খুঁটিয়ে লিখতে গেলে চিঠি আজ আর শেষ হবে না।

স্টকহলম শহরটা অতি সুন্দর দেখতে। চারদিকে লেক, মাঝে সাঁকো দিয়ে জুড়ে জুড়ে এধার ওধারের রাস্তাকে মিলিয়েছে। এইসব হ্রদের ভিতরে ছোট ছোট দ্বীপ এবং তাতে চমৎকার সব বাড়ি ঘর আছে। রাত্রে

সমস্ত শহরের আলোর ছায়া যখন জলের উপরে পড়ে তখন চারিদিক ঝলমল করে ওঠে। মনে হয়, রোজই যেন দীপালি উৎসব হচ্ছে।

এইবারে কোপেনহেগেনে পড়ে চিঠি শেষ করা যাক। শহরটা সুন্দর, তাতে সন্দেহ নেই। অসলো এবং স্টকহলম-এর চেয়ে অনেক বড়ও বটে। তবে দু' দিন ধরে ক্রমাগত মেঘ বৃষ্টি হওয়ায় মনটা বিশেষ প্রফুল্ল লাগছিল না। কী ভাগ্য যে, আজ যাবার দিনে অন্তত সূর্যদেব দয়া করে সকাল থেকে একটু ঘোমটা খুলেছেন, তাই আজকে মনটা কিছু খুশী আছে।

এখানে কালরাত্রে কবি রিডিংস দিলেন। দেড় হাজার লোক শুনতে এসেছিল। চিরা-চরিত প্রথা অনুসারে মুগ্ধ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। আজ রাত্রেই আমরা আবার জার্মানী যাত্রা করছি। রথীবাবু ও প্রতিমাদি বার্লিনে এসে আমাদের সঙ্গে মিলবেন। এ কয়দিন আমাদের জিম্মায় কবিকে দিয়ে তাঁরা একটু ছুটি ভোগ করে নিচ্ছেন।

এখানকার সব মিউজিয়াম ইত্যাদি কিছু কিছু দেখে নেওয়া গেছে। কাল রাত্রে এক জায়গায় ডিনারের নেমন্তন্ন ছিল। সেখানে বিখ্যাত দার্শনিক হফ্‌ডিং (Hoffding)-এর সঙ্গে আলাপ হল। বৃদ্ধ ভারী মজার মানুষ। তিরাশি বছর বয়স এখন। বছর দুই হল, একটি পঁচিশ বছরের মেয়েকে বিয়ে করেছেন। মেয়েটি নিজে ফিলজফির ছাত্রী ছিল। খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। তার সঙ্গেও আলাপ হল। বিয়ে সে-ই নিজে ভালবাসায় পড়ে জোর করে করেছে। বৃদ্ধ স্বামী যেন তার কোলের শিশুপুত্রটি। ভারী ভাল লাগল দেখে। সারাক্ষণ ব্যগ্র স্নেহের সঙ্গে স্বামীকে চোখে চোখে রেখেছে, যেমন মা তার একমাত্র সন্তানকে রাখেন।

স্বামীরও সমস্ত নির্ভর ঐ স্ত্রীর উপরেই। খাবার সময় খানিকটা খেয়েই দেখি, স্ত্রীর দিকে তাকিয়েছেন। স্ত্রীর তো দৃষ্টি তাঁর দিকেই ছিল। স্বামী তাকাবামাত্র ঈষৎ ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিত করতেই ভদ্রলোক খাওয়া বন্ধ করলেন। এইরকম আরো অনেক ছোটখাট জিনিস নজরে পড়ল। বুঝলাম, সম্বন্ধটা কীরকম।

মেয়েটি দেখতেও খুব মিষ্টি ও সুন্দর। প্রকাণ্ড লম্বা সোনালী রঙের চুলের বেণী জড়িয়ে জড়িয়ে মস্ত বড় একটা খোঁপা বাঁধা। ছিপ্‌ছিপে লম্বা সুন্দর গড়ন। হাসিতে উজ্জ্বল মুখ। নীল চোখ। দেখতে রীতিমত সুন্দরী। অসাধারণ ভালবাসা বলতে হবে। নইলে এত সুন্দর মেয়ে এই বয়সে সকলের মতের বিরুদ্ধে জোর করে এই তিরাশি বছরের বুড়োকে বিয়ে করে না। টাকার লোভও নেই। কারণ, হফ্‌ডিং-এর প্রথম পক্ষের ছেলেরা বিয়েতে খুব আপত্তি করায় মেয়েটি প্রতিজ্ঞা করেছে যে, স্বামীর মৃত্যুর পরে য়ুনিভার্সিটি থেকে যে পেন্সন ওর প্রাপ্য হবে, তা নিজে এক পয়সাও নেবে না, ছেলেরা যেন সব নেয়। সত্যি, বাহাদুরি আছে।

এর আগের বারে কবি যখন এখানে এসেছিলেন তখনই হফ্‌ডিং-এর সঙ্গে ওঁর আলাপ হয়েছিল। কিন্তু বৃদ্ধের এই বিয়ে তখন হয় নি। এবারে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে যখন দেখা হল, প্রথমে বৃদ্ধ খুব সংকুচিত হয়ে অপরাধীর মত বললেন : বলতে লজ্জিত হচ্ছি, এই সুন্দরী ছেলেমানুষ মেয়েটি আমারই স্ত্রী। আমার উচিত ছিল না একে বিয়ে করা, তবুও করেছি।

স্ত্রী তো তৎক্ষণাৎ এক ধমক দিয়ে উঠেছে : তুমি থাম তো। বারবার সকলের কাছে আমাকে বিয়ে করা নিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে না। বিয়ে তো তুমি ইচ্ছা করে কর নি। আমিই জোর করে করেছি।

কবির দিকে ফিরে বলল : It is true.

বৃদ্ধ শিশুর মত হাসতে লাগলেন।

কবি বললেন : খুব বিশ্বাস করছি কথাটা। তোমার স্বামীর ভাগ্য যে, এমন ভালবাসা পেয়েছেন।

লজ্জায় মেয়েটির মুখ লাল হয়ে উঠল। মেয়েটি পরে আমাকে বলল : আমার ভারী রাগ হয়, যখনই আমার স্বামী নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় অপ্রস্তুত মুখে বলেন, আমার উচিত হয় নি বিয়ে করা, ইত্যাদি। এত অ্যাপলজি কেন? আমাকে তো কেউ জোর করে ও'র সঙ্গে বিয়ে দেয় নি।

স্টকহলম-এর খবরের কাগজে যে ছবি বেরিয়েছিল, পাঠাচ্ছি। স্টেশনে গাড়ি থেকে নামবার পরেই তুলেছিল। অসলোতে জাহাজ থেকে নামবার আগেই যে ছবি তুলেছিল তাও পাঠালাম। সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে যে, এখনকার খবরের কাগজ থেকে আবার আমারও ইণ্টারভিউ নেবার জন্য লোক

অসলোতে কনভোকেশন থেকে বেরিয়ে আসার সময়

…ছিল। আজকের কাগজে বেরিয়েছে … ছবিটা কী মজার এঁকেছে দেখাবার জন্য পাঠাচ্ছি। চিনতে পারেন? কথা বলবার … এঁকেছিল। ভাষা জানি না, … কী সব যা-তা লিখে দিয়েছে … পারলাম না। কবি এবং উনি তো …সেই অস্থির।

কবি বললেন: এমন জানলে আমি কখনো … আসতুম না। আমার পসার … মাটি করলে গো। ওর ইন্টারভিউ-এর জন্যে আসবে, এও সহ্য করতে হবে?

…তে প্রবোধচন্দ্র মহলানবিশ

Hotel D' Angleterre
Copenhagen
6th September 1926

…েষু,

আমরা ২রা সেপ্টেম্বর বিকেলে অসলো থেকে রওনা হয়ে ৩রা ভোরে স্টকহলম পৌঁছে ৫ই রাত্রে অর্থাৎ কাল আবার সেখান থেকে রওনা হয়ে আজ সকালে এখানে এসেছি। এসেই আপনাকে চিঠি লিখতে বসেছি।

অসলোতে ক'দিন খুব আনন্দে কেটেছে। সেখানে সকলের কাছ থেকেই কত যে আদর যত্ন পেয়েছি তা বলতে পারি না। তাই আসবার সময় কষ্ট হচ্ছিল। মনে হল যেন কতদিনের পুরনো বন্ধুবান্ধব ফেলে যাচ্ছি। আর কখনও হয়ত জীবনে দেখা হবে না।

আসবার দিন দুপুরে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব ছিল। কবির সঙ্গে আমরাও নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। অনুষ্ঠানটা দেখতে বেশ লাগল। অনেক ছেলে মিলে একসঙ্গে বাজনা ও গান করল। সমস্ত সভা-ঘর গমগম করে উঠল। খুব গম্ভীর অনুষ্ঠান। সভার শেষে ঘর সুদ্ধ সমস্ত লোক একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ওদের জাতীয় সংগীতটা সমবেত কণ্ঠে গান করলে পর সভা ভঙ্গ হল। আমাদের মন্দিরে বন্দনা-গান দিয়ে শেষ করবার মত। সেই দিনই বিকেলের ট্রেনে রওনা হব, তাই দুপুরে আমরা যেতে একটু ইতস্তত করেছিলাম। গিয়ে মনে হল, ভালই হয়েছে এসে।

য়ুনিভার্সিটি থেকে বেরোবার সময় সে এক ব্যাপার। ভিতরের সব লোক এবং বাইরে থেকেও প্রকান্ড দল রাস্তায় সার বেঁধে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে কবিকে একবার শেষ দেখা দেখবে ও বিদায় দেবে বলে। এমন কান্ড যে, ভিড়ের চোটে কবিই গাড়ির কাছে এসে পৌঁছতে পারেন না। শেষে অনেক কষ্টে প্রফেসর স্টেন কোনো ভিড়ের মধ্যে পথ করে করে কবিকে গাড়ির কাছে নিয়ে এলেন। আমরাও সেই সুযোগে ওঁর পিছন পিছন বেরিয়ে পড়তে পারলাম।

রাস্তার দু' ধারে অনেক দূরে পর্যন্ত সার বেঁধে লোক দাঁড়িয়ে। যদি এক মুহূর্তেও কবিকে দেখতে পায়। গাড়িখানা যখন তাদের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে চলে এল, সবাই একসঙ্গে হাত তুলে ওঁকে বিদায়-সম্মান জানাল। এই দৃশ্য কবির মনকে খুবই স্পর্শ করেছিল। দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় যে, ধনী দরিদ্রনির্বিশেষে এসব দেশের লোকেরা ওঁকে কীরকম ভালবাসে। হৃদয়ের গভীর ভালবাসা প্রকাশের চেহারা সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি।

কতদিন বক্তৃতায় গিয়ে, পিছনের লোক বলাবলি করছে, শুনেছি: দেখেছ? আমাদের Saviour-এর মত চেহারা, ঠিক যেন সেইরকম দেখতে, তাই এত Great.

অনেক লোকের ওঁকে দেখেই প্রথম ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উৎসাহ জেগেছে এবং সব কিছু জানতে ইচ্ছে হয়েছে। আমার খুব গর্ব হয়, যখন দেখি, দেশে বিদেশে আমাদেরই কবিকে লোকে এইরকম করে ভালবাসছে, শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

অসলো থেকে আসবার দিন দেখলাম, প্রত্যেক স্টেশনে লোকে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কবিকে একবার দেখবে বলে। গাড়ির সামনে একটা রীতিমত ভিড়। আমরা প্রথমে বুঝতে পারি নি। শেষে একজন গাড়ির ভিতরে উঠে এসে বললেন: কবি যদি একবার উঠে এসে দরজার কাছে দাঁড়ান তা হলে ওঁকে সবাই দেখতে পাবে এবং কৃতজ্ঞ হবে। অনেকক্ষণ ধরে লোকেরা অপেক্ষা করছে শুধু একবার দেখবে বলে। কাগজে সবাই পড়েছে উনি আজ স্টকহলম যাচ্ছেন, তাই স্টেশনে এসেছে।

কবি এই কথা শুনে, উঠে গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়ালেন এবং প্রত্যেক স্টেশনেই বারে বারে দাঁড়াতে হচ্ছিল অনেক রাত পর্যন্ত। তারপর রাত আরো বেশী গভীর হলে এ ব্যাপার চুকল। লর্ড সিংহও খুব খুশী হচ্ছেন কবির এই সম্মানে। বললেন:

ভাগ্যে সঙ্গে এসেছিলাম, তাই দেখতে পেলাম।

অসলো থেকে আসবার দিন সকালবেলা নোবেল প্রাইজ পাওয়া ও দেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক জন বয়ের-এর সঙ্গে আলাপ হল। তিনি বিদেশে ছিলেন। কবির সঙ্গে দেখা করবেন বলে সেই দিনই ভোরে এসে পৌঁছেছেন। সকালেই আমাদের বাড়ি চলে এসে একসঙ্গে লাঞ্চ খেয়ে য়ুনিভার্সিটিতে গিয়ে, বাড়ি ফিরে, একসঙ্গে ডিনার খেয়ে, স্টেশনে এসে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাটিয়ে গেলেন কবির সঙ্গে। ভদ্রলোককে খুব চমৎকার লাগল। খুব হাসিখুশী আমুদে মানুষ। শিশুর মত সাদাসিধে সরল স্বভাব। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ঝলক চোখে-মুখে। মোটে তো ক' ঘণ্টার পরিচয়, কিন্তু ঐটুকু সময়ের মধ্যেই যেন আমাদের আপন করে নিলেন।

নরওয়েতে দেখলাম, বেশীর ভাগ মানুষই যেন বেশ সহজ সাদাসিধে, হাসিখুশী। সমাজের আড়ষ্ট বন্ধনে অস্বাভাবিক হয়ে যায় নি। ইংরেজীতে যাকে বলে unsophisticated, তাই।

দক্ষিণের লোকেরা, অর্থাৎ ইটালী, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের লোকেরা তো বটেই, একটু বেশী formal গোছের। তবু ইংলণ্ডের একটা বিশেষত্ব এই যে, যদিও সহজে ওদের মন খোলে না তবে একবার যদি আড়ষ্টতা ভাঙে তা হলে সেটা সত্যিকারের বন্ধুত্বে পরিণত হয়। কিন্তু আরও দক্ষিণে এ নিয়মের ঠিক উলটো। উচ্ছ্বাসের অন্ত নেই। দেখবামাত্র প্রায় জড়িয়ে ধরতে চায়, অথচ পিছন ফিরলেই আর এক মূর্তি। ওদের ওপর তাই নির্ভর করা শক্ত।

জার্মানীতে এখনও যাই নি। কাজেই নিজে কিচ্ছু জানি না; তবে শুনেছি, তারা খানিকটা ইংরেজ ও স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার ছাঁচেই চলা। বেশী দেখানো উচ্ছ্বাস নেই, কিন্তু একেবারেই Cold নয়। যদি বন্ধুত্ব হয় তো তার উপর নির্ভর করা যায়। এ তো আমরা প্রফেসর উইণ্টারনিট্‌স্‌, প্রফেসর লেসনী, এঁদের দেখেই বুঝতে পারি।

উত্তরের মানুষদের একটা বৈশিষ্ট্য, যা অতি সাধারণ গরিব মানুষ, যেমন হোটেলের চাকরবাকর শ্রেণীর লোকের মধ্যেও চোখে পড়ে। তার একটা নমুনা দিলেই আপনি বুঝতে পারবেন। হোটেলের বিল যা হবে তার উপরে আরো দশ পার্সেণ্ট বেশী ধরে দিতে হয়। সেই টাকা একটা সরকারী তহবিলে জমা হলে হোটেল থেকেই সেই টাকা সবাইকে সমান ভাগে বিতরণ করে দেবে।

এই নিয়মটা করতে হয়েছে মার্কিনদের জ্বালায়। তারা এত বেশী বকশিশ দিত যে, চাকরদের অভ্যাস খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। যে যত বেশী দিত, তার কাজ তত বেশী ভাল করে হত। ফলে গরিব লোকেদের অসুবিধার সীমা ছিল না। কাজেই এই নিয়মটা হয়ে ভালই হয়েছে, ধনী-নির্ধনের তফাত হয় না।

ইটালীতে দেখলাম এই নিয়মটা খুব কড়া করে থাকা সত্ত্বেও সেখানে সর্বত্র বকশিশের জন্য পীড়াপীড়ি করে এবং আদায়ও করে। উপরওয়ালা দেখেও দেখে না। নিয়মটা নামে মাত্র আছে।

সেদিন স্টকহলম থেকে আসবার সময় হোটেলের বিলের সঙ্গে টাকা দেওয়া সত্ত্বেও আমাদের নিজেদের ঘরে যে দু'জন চাকর কাজ করত—বিশেষ করে ছেলেমানুষ যে ছেলেটি খাওয়ার সময় প্রতি দিন উপস্থিত থাকত, তাদের আলাদা করে কবি বকশিশ দিতে চান বলাতে আপনার ছেলে তাদের হাতে কিছু টাকা ধরে দিলেন। তারা হাসি মুখে ধন্যবাদ দিয়ে নিয়ে গেল। কবি ওঁকে বললেন : দেখলে? তুমি বলছিলে নিয়ম নেই বলে ওরা নেবে না। বেশ তো খুশী হয়েই নিল। আহা, ওরাই বিশেষ করে আমার সেবা করল এই দু' দিন। ওদের সঙ্গেই আমার পরিচয়। নীচে যারা থাকে তাদের কিছুই চিনি না। কাজেই আমার ইচ্ছে হচ্ছিল এরা দু'জন একটু বেশী পাক। খুশী হলুম ওটুকু দিয়ে। এতক্ষণ তুমি বৃথাই আমার সঙ্গে তর্ক করলে।

এইরকম কথাবার্তা যখন হচ্ছে, তখন দেখি সেই বাচ্চা ছেলেটি টাকা হাতে আবার ফিরে এসেছে। সম্ভ্রমের সঙ্গে কবিকে সেলাম করে বলল : তোমরা তো বকশিশের জন্যে সরকারী তহবিলে একবার টাকা দিয়েছ দেখলাম। কাজেই এ টাকা আমরা নেব না, ফিরিয়ে নাও।

কবি আর উনি দু'জনেই ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন অনেক করে যে, ও টাকা বিশেষভাবে আলাদা করেই ওদের দেওয়া হয়েছে, এই দু' দিনের সেবা যত্নে আমরা খুশী হয়েছি বলে। কিন্তু কিছুতেই অতটুকু ছেলেকে রাজী করানো গেল না। সেই এক কথা : অনেক ধন্যবাদ তোমরা খুশী হয়েছ বলে। কিন্তু ক্ষমা কর, টাকা নিতে পারব না।

শেষ কালে বেশী তর্ক না করে আস্তে নোটটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে চলে গেল। যাবার সময় খুব বিনীতভাবে আমাদের সকলকেই আবার সেলাম করে গেল, পাছে আমরা অপমানিত বোধ করি। আমি তো দেখে অবাক : টাকাটা নিলে কেউ টেরও পেত না। তা ছাড়া ওরা চেয়ে কিংবা ঠকিয়েও নেয় নি। কিন্তু নিয়ম যা আছে তা কিছুতেই ভাঙবে না। এটা যে একবার ঘটল তা নয়। স্টেশনে রওনা হবার সময় গাড়িতে যখন উঠতে যাচ্ছি তখন যে দারোয়ান দরজা খুলে দিল, কবির নির্দেশে উনি তার হাতে আবার একটা ক্রাউন দিতে গেলেন। সে সম্ভ্রমের সঙ্গে সেলাম করে ঘাড় নেড়ে প্রত্যাখ্যান করল। ট্রেনের কণ্ডাক্টর কী যেন একটা সাহায্য করেছিল যেটা তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। তাকে বকশিশ দিতে যাওয়ায় সেও আপত্তি জানাল।

এটা কখনো ইটালী বা ফ্রান্সে সম্ভব হত না। তাইতেই বুঝতে পারলাম, এখানে অতি সাধারণ লোকেদের মধ্যেও এমন একটা সততা আছে, যা ল্যাটিন জাতের মধ্যে আমি অন্তত দেখি নি। এবারে বেড়াতে বেড়াতে এরকম ছোটখাট জিনিস নজরে পড়েছে, যা চোখে না দেখলে শুধু শুনে ঠিকমত বুঝতে পারতাম না। আগেই শুনেছিলাম, উত্তর আর দক্ষিণ জাতের মধ্যে ব্যবহারের অনেক পার্থক্য আছে। এবারে সেটা প্রত্যক্ষ দেখা গেল। এই-জন্যেই বলে, অভাবে স্বভাব নষ্ট। দক্ষিণ দেশের চেয়ে উত্তরের দেশের লোকেদের আর্থিক অবস্থা বেশী ভাল; সেইজন্যেই বোধ হয় এটা ঘটেছে।

মস্ত বক্তৃতা হয়ে গেল, নিশ্চয় পড়ে হাসবেন। (ক্রমশ)

বাইশ

অনাদিপ্রসাদ কেন সেদিন আরতির সঙ্গে বসে সিনেমাটা শেষ পর্যন্ত দেখলেন না? কেন ঐ মেয়েটির আহ্বান উপেক্ষা করলেন, কেন তাকে নিয়ে বেড়াতে গেলেন না—ময়দানে, ভিক্টোরিয়ায়? এ কি লোক লজ্জা? না সংস্কারের দুর্বলতা? না ভয়? হাতে তাঁর যথেষ্ট সময় ছিল, সুযোগ ছিল পকেটে, তবু লেখক অনাদিপ্রসাদ আরতিকে বোঝবার চেষ্টা করলেন না।

আরতি একটি মধ্যবিত্ত মেয়ে, তার চেহারার বর্ণনা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কারণ তার মধ্যে বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। আর পাঁচটা কম বয়েসী মেয়ের মতই আরতি। বয়েসের যাদু আছে, দেহে যৌবন, তা ছাড়া সব কিছুই সাধারণ। মনও সাধারণ। উপন্যাসের নায়িকাদের মত তার হৃদয় মহত্ত্বে ভরা নয়, ওর চেয়ে সুন্দরী মেয়েদের আরতি হিংসে করে। ওর চেয়ে যাদের অবস্থা ভাল তাদের সহ্য করতে পারে না। নিজের ক্ষতি হলে বস্তীর মেয়েদের মত ঝগড়া করে। যে অবস্থার মধ্যে সে মানুষ হচ্ছে তাতে সে সুখী নয়, তার ভাল খেতে ইচ্ছে করে, দামী শাড়ি পরতে ইচ্ছে করে, আর পাঁচটা মেয়ের মতই অনেক ইচ্ছে, অনেক স্বপ্ন। যার জন্যে তাকে এই পথে আসতে হয়েছে। না এসে উপায়ও ছিল না। বাবা মা ভাই আর পাড়ার মণ্টুদা, তাছাড়া মাঝে মাঝে দিদি জামাইবাবুরা আসে, তাদের একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে। যে ক'দিন বাড়িতে থাকে, এক মিনিট শান্তিতে তিষ্ঠোন যায় না, সারাক্ষণ চ্যাঁ, ভ্যাঁ, কান্নাকাটি মারামারি।

এই নিয়ে দিদির সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়।

—তুই তো গায়ে ফঁু দিয়ে বেড়াস।

আরতির প্রশ্ন, কি করতে হবে?

—বাচ্চাগুলো 'মাসী' 'মাসী' করে তোর কাছে যায়, একবারও তো কোলেও তুলিস না।

যা আপদ তোমার ছেলেমেয়েগুলো, কোলে উঠেই পেচ্ছাব করে দেয়।

—বেশ, নিজের ছেলেমেয়ে হোক।

আরতি মুখখানা ভেটকি মাছের মত করে বলে, ওসব আপদের দরকার নেই।

দিদি চটে যায়, বিয়ে করবি না?

—তোমার বিয়ে দিয়েই তো বাবার পাঁচ হাজার টাকা দেনা হয়েছে। মার গায়ে একরত্তিও সোনার গয়না নেই, আবার আদিখ্যেতা করে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে আমি বিয়ে করব কিনা? হুঁ!

চিল খেয়ে দিদিও পাটকেল ছোঁড়ে, সবাই জানে ঐ মণ্টুটার সঙ্গে ধিঙ্গিপনা করে ঘুরে বেড়াস, তাই বিয়ে করতে চাস না। দেখি ক'দিন মিষ্টি লাগে। পুরুষ মানুষকে খুব জানি, ক'দিন মজা লুটে নিয়ে তোর ছিবড়েটা ফেলে দেবে।

আরতির আস্ফালন, সেরকম পুরুষ মানুষ এখনও জন্মায় নি, যাকে ইচ্ছে আমি বাঁদর-নাচ নাচাতে পারি!

দুই বোনের ঝগড়ার মধ্যে কতখানি সত্য নিহিত আছে বলা কঠিন। কিন্তু আজ সিনেমা থেকে বেরিয়ে বিনা পরিশ্রমে অনাদিপ্রসাদের কাছ থেকে কুড়ি টাকা পারিশ্রমিক পেয়ে আরতির মনে হল মণ্টুদার কাছেই যায়; কারণ, অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি।

মণ্টুদা একই পাড়ার ছেলে। সেও অতি সাধারণ। ময়লা রঙ, পাতলা শরীর, বড় বড় চুল চোখে চশমা। এম-এ পর্যন্ত পড়েছিল, দুতিন জায়গায় অস্থায়ী চাকরি করেছে, কিন্তু কোথাও পাকা হতে পারেনি। সকাল বিকেল কতগুলো টিউশানী করে সেই রোজগার থেকেই বাবার সংসার চালায়। গুরুজনেরা মণ্টুর মত ছেলেকে বাহবা দেন। কারণ, সেণ্টিমেণ্টের নেশায় এরা বন্দী হয়ে থাকে। বাবা, মা, ভাই, বোন—তাদের সমস্যার কথা ভাবতে গিয়ে নিজেদের দিকে আর তাকাতে পারে না। বাড়িতে অবিবাহিতা বোন থাকায় কোন মুখে সে নিজে বিয়ে করবে? আরতির মত মেয়েকে এই মণ্টু

ভালবাসে। কিন্তু বিয়ে করার সামর্থ্য নেই। তবে হাতে পয়সা থাকলে কম দামের সিটে সিনেমা দেখায়, রেস্তরাঁয় বসিয়ে কাটলেট খাওয়ায়, আবার মাঝে মধ্যে এক আধখানা শাড়িও উপহার দেয়। মণ্টু-মোল্লাদের দৌড় এই মসজিদ পর্যন্ত।

বড় রাস্তার মোড়ে যে চায়ের দোকানে বসে মণ্টু সাধারণত আড্ডা দেয় আরতি সেইখানে গিয়ে হাজির হল। বলা বাহুল্য, আরতিকে দেখে মণ্টু খুশী হল। ব্যস্ত-ভাবে দোকান থেকে বেরিয়ে এসে বলল, আরে কি খবর আরতি? কতদিন পরে দেখা হল।

আরতির পাল্টা জবাব, তুমিও তো কই খবর নাও না।

—বিকেলের দিকে দু'দিন গিয়েছিলাম, তুমি বাড়ি ছিলে না।

আরতি স্বীকার করল, আজকাল বিকেলের দিকটা কাজে আটকে যাই।

মণ্টুর প্রশ্ন, নতুন কোন কাজ করছ?

হ্যাঁ। চল না বেড়াতে বেড়াতে গল্প করা যাক, এখানে বড় ভিড়। কোন একটা নির্জন জায়গায়—.

—চল। একটা টিউশানী ছিল, আজ আর যাব না পড়াতে।

ওরা গিয়ে বসল নির্জনে জলের ধারে। সন্ধ্যা নেমে এসেছে, ঝাপসা অন্ধকার, ভাল করে কারুর মুখ দেখা যায় না। অনেকে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে, তবে জলের ধারে জোড়ায় জোড়ায় তরুণ-তরুণীদের বসে থাকতে দেখলে তারা বিরক্ত করে না।

প্রথম প্রথম বাড়ি থেকে পালিয়ে মণ্টুদার সঙ্গে এই ধরনের কোন নিভৃত জায়গায় বসে আলাপ করতে আরতির মনে রোমাঞ্চ হত। একটুকু ছোঁয়া লাগা, একটুকু কথা শোনা, তাই দিয়ে মনে মনে রঙে রসে জাল বোনা। চাঁদ উঠত, হাওয়া বইত, কতরকম শব্দ শোনা যেত, সবে মিলে সৃষ্টি করত একটা স্বপ্ন রাজ্য যেখানকার চিরকেলে রাজকুমারী আরতি আর সেই আদ্যিকালের রাজকুমার মণ্টুদা।

কিন্তু যতদিন যায় স্বপ্ন আর থাকে না। কঠিন বাস্তব দৈত্যের রূপ নিয়ে এসে জোর করে রাজকুমার আর রাজকুমারীকে আলাদা করে দেয়। মণ্টুদা সেই দিন থেকে খুঁজছে সোনার কৌটো। অফিসে অফিসে দ্বারে দ্বারে ঘুরেছে, কিন্তু আজও টাকা রোজগারের উপায় খুঁজে পায় নি। তবে আর কেমন করে সে দৈত্যের প্রাণ-ভোমরাকে মেরে স্বপ্নের রাজকুমারী আরতিকে পাবে!

আর অন্য দিকে? আরতিকে কে জাগিয়ে দিয়েছে সোনার কাঠির স্পর্শে, নির্ভীক মনে সে প্রবেশ করেছে যৌবরাজ্যে। প্রতিটি সন্ধ্যায় নতুন নতুন পুরুষমানুষ, আলাপের চাবিকাঠি সিনেমার টিকিটে। পাশাপাশি বসা, হাতে হাত রাখা, তারপর আলাপ।

পাহাড়ে মাঠে বেড়ানো, হয়ত বা রেস্তরাঁর কোণে বসে খাওয়া, কিছু আড্ডা, রাতে বাড়ি ফেরা। দিনের পর দিন একই ধরনের জীবন, কিন্তু নতুন নতুন অভিজ্ঞতা। এ রাস্তায় আরতিকে নিয়ে এসেছিল মীনাদি। বুলাও আরতির সচ্ছল সংসারের গৃহিণী হয়ে বেঁচে থাকার বাসনা ছিল। তখনও চাকরি খুঁজেছিল।

—যা হোক তুমি আমায় একটা কাজ দাও মীনাদি। [illegible] করব, বসন মাজব, কাপড় কাচব, ইত্যাদি—

মীনাদি [illegible] এ [illegible] [illegible] [illegible] আর বাড়ি [illegible] পাকড়াও।

আরতি বিরক্ত হয়েছিল, এসব কি কথা বলছ মীনাদি?

[illegible] পারে।

—সবাই [illegible]।

[illegible]

[illegible] [illegible] সামনে অন্ধকার মাঠে।

[illegible] দিয়েছে। সিনেমার হলে ঢুকে বসল আরতি আর মীনাদি দুটি সীটের মাঝখানে। বাইরের লোকের কাছে দুটিকেই মনে হবে কিছু নেই। তারা ভাবছে এরা একই সঙ্গে এসেছে। কিন্তু ছবি চলতে চলতে মীনাদি উঠিয়ে ফেলল ছেলেটির সঙ্গে। পুরো ছবি দেখতেও আর তার আগ্রহ রইল না। ইন্টারভালে তিনজনেই বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ টাক্সি চড়া, তারপর [illegible] সামনে অন্ধকার মাঠে।

চতুর মীনাদি হঠাৎ বলে উঠল, ও মা, আমাকে যে পিসীমার বাড়ি যেতে হবে, একদম ভুলে গিয়েছিলাম। আমি এখন চলি, আপনি আরতির সঙ্গে গল্প করুন, কাল এবং তুই আমার কাছে আসিস আরতি।

আরতিকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই মীনাদির প্রস্থান।

সম্পূর্ণ একটি অচেনা পুরুষের সঙ্গে অন্ধকারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকার অভিজ্ঞতা আরতির এই প্রথম। তখনও জানেনা কৌতূহল, এর পর কি হয়? আশ্চর্য, সেই বোকা ছেলেটি কিন্তু মুখর হয়ে উঠল। আরতির পরিচয় জানবার জন্যে প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করে মারল। হাতে ধরাধরি করে হাঁটল, পাশাপাশি বসে গালে ঠোঁট দিয়ে চুমু খেল, কৃতজ্ঞতাভাবে আদর করল। আরতির ব্যাগের মধ্যে দশটা টাকা ভরে দিল। আবার ট্যাক্সিতে করে বেরিয়ে পাড়ার মোড়ে একটা চক্কর মেরে আরতিকে নামিয়ে দিয়ে গেল তারই নির্দেশমত একটা রাস্তার মোড়ে।

আরতির এই প্রথম রোজগার। কই, খারাপ তো কিছু লাগল না, মনে কোন গ্লানি নেই। মন্টুদা তো তার সঙ্গে এরকমই করে, শুধু শেষকালে টাকাটা দিতে পারে না এই যা। তবে তফাত মন্টুদার সঙ্গে ঐ লোকটির মনোবৃত্তির তফাত কি? মীনাদি ঠিকই বলেছে, সব পুরুষমানুষই সমান—সবাই আদেখলে।

পরদিন আরতি কিন্তু আর মীনাদির সঙ্গে দেখা করে নি, জানায়ও নি তার এই নতুন অভিজ্ঞতার কথা। কিন্তু সেই দিন থেকে এই ব্যবসা শুরু হয়ে গেল। প্রতিটি সন্ধ্যায় প্রসাধন করে সিনেমা হলের সামনে দাঁড়ানো। টিকিট কাটা—বাবু ধরা।

মন্টুদা জিজ্ঞেস করল, কোথায় কাজ করছ?

আরতির মিথ্যে বলা ছাড়া উপায় ছিল না, একটা ছোট কোম্পানীতে, ওরা মাথার তেল, গায়ে মাখার সাবান তৈরি করে। আমাদের রেখেছে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ওদের জিনিস বিক্রি করার জন্যে।

—কত মাইনে?

—সত্তর টাকা। তা ছাড়া ভাল বিক্রি করতে পারলে কমিশন দেয়।

—এ সুখবরটা আমায় আগে দাও নি। কে চাকরি করে দিল?

—মীনাদি।

এবার আরতির প্রশ্নের পালা, মন্টুদা, তোমার বাড়ির খবর কিরকম?

—একরকম।

—বাবা কেমন আছেন?

—আজকাল আর বাইরে বেরুতে পারেন না, খাটেই শুয়ে থাকেন।

—মা?

—ব্লাডপ্রেসার কখনও বাড়ে, কখনও কমে।

—লালটু?

—এ বছরেও ফেল করেছে।

—দাদা বউদি?

—আগে যাও বা খবর-টবর নিত, আজকাল তাও বন্ধ করেছে।

—তার মানে তোমার ঘাড়েই সব।

—একরকম তাই, ঘাড়টা খুব শক্ত তাই ভাঙেনি।

আরতি টিপ্পনী না কেটে পারল না, তুমি বড় বোকা মন্টুদা।

মন্টুদা স্বীকার করল, সবাই তো তাই বলে।

আরও কিছুক্ষণ কথা চলল। বৈচিত্র্যহীন সংলাপ। গত দু' বছর ধরে যা আলাপ চলছে তারই পুনরাবৃত্তি। খানিকটা মসলা-মুড়ি খাওয়া হল, কিছুটা চানাচুর গরম, তারপর আলুকাবলি। এক সময় উঠে পড়া। মণ্টুদার চিরন্তন জিজ্ঞাসা, আবার কবে দেখা হবে?

আরতির দায়সারা উত্তর, দেখি, আবার কবে সময় করতে পারি।

বেচারির দোষ নেই, সেই বা কি করে পারবে, আবার কবে অনাদিপ্রসাদের মত কোন আহাম্মক বিনা পরিশ্রমে পারিশ্রমিক দিয়ে যাবে। যখন আরতি ক্লান্ত পায়ে সন্ধেবেলা জলের ধারে বসে এইভাবে মণ্টুদার সঙ্গে একঘেয়ে খবরের জাবর কাটবে।

আরতি যখন রাত্রে বাসায় ফেরে, বাবা তার আগেই ঘুমিয়ে পড়েন। সত্যি ঘুমোন কিনা বলা মুশকিল। তবে খাটের ওপর চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকেন এবং ঘরের আলো নিবানো থাকে। নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারের বাড়ির কর্তা। আগের যুগের কর্তাদের সঙ্গে আরতির বাবার কোন মিল নেই। আজকের জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে গিয়ে এ ভদ্রলোককে অনেকখানি স্বার্থপর হতে

গ্যারান্টিযুক্ত

● জোরালো ঠাণ্ডা হাওয়ায় গা জুড়োয় ● নিঃশব্দে চলে ● চমৎকার ভারসাম্য বজায় থাকার ফলে নিখুঁতভাবে কাজ করে ● যে কোনো দিক থেকে সমগতিতে এপাশে ওপাশে ঘোরাফেরা করে। ● ভিতর থেকে গড়া পুশ-বটন-কনট্রোলটি নির্ভরযোগ্য ও সুপরীক্ষিত

র‍্যালিফ্যানে [illegible] কাই একেবারে নিরাপদ আর এর [illegible]। চার রকম চমৎকার প্যাস্টেল রঙের পাবেন (ধূসর, নীল, সবুজ, আইভরি)— পছন্দমত বেছে নিন। বিশেষ ব্যবস্থায় তৈরী হাতল থাকায় এখানে-সেখানে আনা নেওয়ার সুবিধে। আজই আপনার র‍্যালিফ্যান ডীলারকে চালিয়ে দেখাতে বলুন।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় আপনার গা জুড়িয়ে দেবে!

র‍্যালিফ্যান

র‍্যালি গ্রুপের তৈরী

মনে রাখবেন, প্রতিটি র‍্যালিফ্যান দু বছরের গ্যারান্টিযুক্ত, ফলে তৈরীর সময় ত্রুটি থেকে গেলে তা সারিয়ে দেওয়া হয়। রকমারি র‍্যালিফ্যান পাবেন— সিলিং, পেডেস্টাল, ওয়াল এবং এগ্‌জস্ট ফ্যান।

র‍্যালিফ্যান সম্পর্কে বিনামূল্যে রঙিন পুস্তিকার জন্যে এই কুপনটি আজই ডাকে পাঠান—ঠিকানা: র‍্যালিস ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ২১, র‍্যাভেলীন স্ট্রীট, বোম্বাই-১

নাম ______________________

ঠিকানা ______________________

____

টোকিওর চিঠি

সাকুরা সাকুরা
যায়োই নো সোরা ওয়া
মিওয়া-টাস্ন কাগিরি
কাস্নুমি কা ঘুমোকা
নিওই শে ইযুরু
ইযু়া ইযায়া
মিনি য়ুকোন।

Sakura Sakura—flowering in the
pale April sky—
Like a mist or cloud—as far as
the eye can see—
Exhaling its fragrance . . . Oh,
Let us go to see.

বসন্তের শিশিরসিক্ত সকাল, উপরে শান্ত নীল আকাশ। তারই উন্মুক্ততার অবগাহনে রত মেঘ আর কুয়াশা। থোক বেঁধে তারই যেন ছড়িয়ে রয়েছে এখানে সেখানে। তা বুঝি নয়। ওরা মেঘও নয়, কুয়াশাও নয়। বসন্তের আহ্বান; উপচে পড়া যৌবন; জোয়ারের ডাকে পাড় ভাঙার আকুলতা; তাই তো সাকুরার দল ভরা-যৌবনের ডালি সাজিয়ে আবাহন করছে বসন্তের নতুন দিনগুলিকে।

নিঃসাড় নিশ্চুপে সারা বছর দিন গোনা। শীর্ণ দেহে বছরের বেশীর ভাগ দিন মানুষের মনে আশ্বাস এনেছে তারা। শীতের কুটিল বাতাসের তীক্ষ্ণতার মুখে মানুষ যত্নে তাদের ঢেকে দিয়েছে। শুধু বসন্তের দিনগুলির আশা। তারাও চুপি চুপি বলেছে "ভয় নেই, আমি আসব, আমি আবার আসব—ফুটব—হাসব; তোমাদের ভরিয়ে দেব আমার যৌবনের উচ্ছলতায়।"

টোকিও জুড়ে এসেছে সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত সাকুরার দিনগুলি। জাপান জুড়ে নয়, হক্কাইডো, হনসু আর কিউসু। জাপানের উপর থেকে নীচ। বিধবার আবরণ ছেড়ে শীত হক্কাইডো থেকে একটু দেরীতেই বিদায় নেয়। সব আগে শীতের বিদায়ের পালা আসে কিউসু, তারপর হনসু, সব শেষে হক্কাইডোয়। সেই সূত্রে কিউসু-র পর হনসুর পরিপূরক টোকিওতে সাকুরা পেখম মেলেছে।

সারা বছরই প্রায় পাতা নেই গাছগুলোর। তারপর একটু গরমের শুরুতেই কেমন ফুল-কুঁড়ি উঁকি মারে। সেই সঙ্গে মানুষের মনেও বুঝি কেমন একটা সুর গুন্ গুন্ করতে থাকে। কথার মাঝে আপনা থেকেই এসে পড়ে "সাকুরা দেখতে যাচ্ছ না?" চোখের উপর ভেসে উঠে—সমস্ত গাছগুলি ঘিরে যেন লাখ মৌমাছি চাক বেঁধেছে। কুঁড়ি-বাঁধা গাছের নীচে যদি কখনও একাকী থমকে থাম, কান পাতলে শুনবে বাতাসের সুরে সুর মিলিয়ে কে যেন বলছে, "দাঁড়াও, আর একটু দাঁড়াও..." দু-এক পশলা বৃষ্টি এসে পড়ে; এরই মাঝে হাওয়া বইতে শুরু করে সন্ সন্ করে। মানুষের মনে কেমন একটা ভয়, গাছগুলো যে বাইরে একা। কোমল বৃন্তচ্যুত হতে যে ওইটুকুই যথেষ্ট। ছুটির সকালে তাই দলে দলে টোকিওর মানুষ ছুটে চলে তাদের আদর জানাতে। সকালের আবছা আঁধারে যা থোক-বাঁধা মেঘ আর কুয়াশা মনে হয়েছিল, দিনের কাঁচা সোনা-রোদে তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। ঝলমলে রোদে চক্ চক্ করে উঠল সাদা আর আবছা বেগুনী রঙের ঘের দেওয়া সাকুরার দল। গাছে কোন পাতা আসেনি। ডাল ঘিরে শুধু ফুলের বাহার। গাছের ডালের অসম-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কত রকমারি বাহারই না এনেছে! পুরনো দিনের সেই কোন নাম না জানা কবি যদি এদের মেঘ আর কুয়াশা বলে ভুল করেই থাকেন তাহলে তাঁর তো কোন দোষ নেই।

প্রেম আর চাঁদের মূর্ত প্রতীক, সাকুরা তার ভরা-যৌবনের ডালি সাজিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে আবাহনে রত।

সাকুরা—ইংরাজী নাম Cherry। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ মানুষের কাছে ইংরাজী নামটাই বেশী পরিচিত। জাপানী পরিবেশে আমার কিন্তু 'সাকুরা' নামটাই বেশী পছন্দ। জাপান দেশে বসে 'Cherry' ভাবলেই কেমন সাহেব-সাহেব গন্ধ এসে পড়ে, এখানে কেমন বেমানান মনে হয়।

অনেক ছোটবেলায় যখন জাপান দেশের কথা পড়তাম তখন থেকেই কানে লেগেছিল এই ফুলের নামটা। অবশ্য আমারও ইংরাজী তর্জমাটাই জানা ছিল। তারপর একদিন জীবনের জটিলতায় এসে পড়লাম জাপান দেশে। প্রথম সেই সাকুরা দেখার কথাটা আজও মনে পড়ে। সবে শুনেছি, সকলের মুখেই এক কথা, 'সময় পড়েছে একটু একটু, ইমা সাকুরা নো হানা ওয়া সাকিমাস্—এবারে সাকুরা হানা ফুটেছে; হানামি নি ডেকাকেমাস্কা—ফুল দেখতে যাবে না?' জাপানীতে 'হানা' শব্দের অর্থ যদিও 'ফুল', তবুও 'হানা' কথাটি নাকি 'সাকুরা'র সঙ্গে যতটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে, অন্য কোন ফুলের ক্ষেত্রে ততটা প্রযোজ্য নয়।

এমনিতেই জাপানের মানুষ ফুল এবং গাছপালা সম্বন্ধে বেশী সচেতন। শীতের প্রারম্ভে প্রায় প্রত্যেকটা গাছকে 'খড়' এবং সেই সঙ্গে জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে সমস্ত শরীরটা ঢেকে রাখে। দু পাশে কাঠ বা বাঁশের অবলম্বন দেওয়া থাকে, যাতে 'টাইফুন' বা বাতাসে পড়ে না যায়। আমাদের দেশের সাদা চিন্তাধারায় জিনিসটা আশ্চর্য শোনালেও এ কথা সত্য। তারপর যখন গাছগুলোতে ঘন সবুজ পাতা আসে—একটু রাতে দেখা যাবে রাস্তার দু'পাশের গাছগুলোকে হোস্-পাইপ দিয়ে জল দেওয়া হচ্ছে। সারাদিনের নোংরা আবর্জনা ধুয়ে আবার তারা নতুন দিনে চক্ চক্ করে উঠবে।

ফুলের ক্ষেত্রেও জাপান পিছিয়ে নেই। ফুলকে সাজানর কায়দায় কত রকমারি। পৃথিবীর সর্বত্র জাপানের এই ফুল-সাজানর

উল্লাস আর উচ্ছাসের ভাগ নিতে হাতছানি দিল, সাকুরার আগমনে নৃত্যে, গানে ও পান-এ এরাই এমন করে মুখর হয়ে ওঠে, হারিয়ে যায় যান্ত্রিক জীবনের ছক্‌ বাঁধা ছবি।

একটা বিশেষ স্থান আছে। ফুল-সাজান শেখবার জন্য বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছড়াছড়ি। নূতন পরিচিতিতে বিদেশিনীদের কাছে এটা একটা আলোচনার অঙ্গ "...কি flower arrangement শিখছ তো...?" কিছুটা আভিজাত্যবোধের মাপকাঠিও বুঝি অন্তর্নিহিত। তবে বলাই বাহুল্য, বেশ কিছু খরচ সাপেক্ষ। মাইনে যাই হোক না কেন—ফুল তোমার নিজে কিনতে হবে। লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বা সরকারী কর্মচারী ছাড়া, বড়লোকের দেশে আজকের গরিব দেশের আমাদের মতন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে তাই বুঝি একটু চিন্তা করে চলতে হয়, অনেক কিছু শেখবার থাকলেও শেখা হয়ে ওঠে না।

বলতে গেলে সাকুরা জাপানী জীবনে ভীষণভাবে জড়িয়ে আছে। যদিও সাকুরা জাপানের জাতীয়-ফুল নয়। কেউ কেউ জাতীয় ফুল হিসেবে জাপানী ভাষায় "কিকু" বা "ক্রিসেনথিমাম"কে সম্মান দিয়ে থাকেন। কারণ, জাপানের সম্রাটের প্রতীক চিহ্ন হিসাবে এই "কিকু" শোভা পায়। তবুও কোথাও বিশেষভাবে বা সরকারীভাবে এই "ক্রিসেনথিমাম"কে জাতীয় ফুলের সম্মান দেওয়া হয়নি। তুলনামূলক বিচারে দেখতে গেলে সাকুরা ওই "কিকু"র তুলনায় জাপানী জীবনে অনেক বেশী প্রাধান্য বিস্তার করেছে। হয়ত এর আবির্ভাবের জাঁকজমকই এর জন্য দায়ী।

পাতার আগেই ফুল। গাছ ভরা শুধু ফুল, কত রঙবেরঙের সাকুরাই না আছে! লাল, গোলাপী, হালকা হলুদ, বেগুনী আর সাদা। তার মাঝে সাদা আর আবছা বেগুনীর ছায়া ফেলা সাকুরার দলই বেশী। কুঁড়ি ধরে যে মৌচাক মনে হয়েছিল, প্রস্ফুটিত যৌবনে মনে হল—গাছ ঘিরে যেন প্রজাপতির মেলা।

শুধু তাই নয়। আমার মনে হয় এই ফুলের বুঝি একটা নিজস্ব জ্যোতি আছে। বহু দূর থেকে নিজের অজান্তেই কেমন দৃষ্টিকে অকারণ আকর্ষণ করে। রাতের আঁধারেও গাছের চারধার আলো করে কেমন একটা ছটা বিচ্ছুরিত হয়। ফুলের একক সৌন্দর্যকে ছাড়িয়ে, সকলে একজোট হয়ে এক অপার মাধুর্য বয়ে আনে, যা মানুষের চোখ ও মন ভরিয়ে দেয়। একক চিন্তাধারার বাইরে এই বুঝি কেউ সেদিন নিঃসঙ্গ একা বার হয় না। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুরুজনের হাত ধরেছে, [illegible] তারা ঝুলছে মা ঠাকুমার পিঠে; ওই যেন হাত ধরাধরি করেছে, স্ত্রী চলেছে স্বামীর পাশে পাশে, প্রেমিকা জড়িয়ে আছে প্রেমিককে: শুধু তার বান্ধবীতে দল বেঁধে এখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে। কেউ গাইছে, কেউ নাচছে, কেউ খেলছে, কেউ বা খাচ্ছে। রোদে পিঠ দিয়ে নরম ঘাসে গা এলিয়েছে কতজন। তারই মাঝে এক পাশে একটু সরে, সাকুরার ছায়া ঘেরা আলো আঁধারে ঠোঁটে ঠোঁট রেখে পরম নিশ্চিন্তে একে অপরকে উপভোগে রত যুবক যুবতী: ভগবান যেন সৃষ্টির পূর্ব-মুহূর্তে সকলকে ডেকে দেখাচ্ছেন "...আমি জেগে রই তৃষিত হিয়ার প্রণয়-ক্ষুধায়...।"

সব মিলিয়ে কেউ একা নেই। থোক্‌ বাঁধা সাকুরার সঙ্গে সঙ্গে, মানুষও কেমন থোক্‌ বেঁধে ঘিরে ঘিরে গুঞ্জনে রত। সেখানে নেই যান্ত্রিক জীবনের ছক্‌বাঁধা ছবি।

অবাক হয়ে সেদিন তাকিয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ। একজন অন্ধ ভদ্রমহিলা এসেছেন একটি মেয়ের হাত ধরে। বুঝি বা সে তার নাতনীই হবে। এক একটা গাছের কাছে নিয়ে যাচ্ছে সেই অন্ধ মহিলাটিকে। কত যত্নে তাঁর হাতটা একটু এগিয়ে দিচ্ছে প্রস্ফুটিত ফুলগুলির দিকে। পরম আবেগে কত সন্তর্পণে সেই ভদ্রমহিলা হাত রেখে রেখে অনুভব করছেন সেই ফুলের রূপ রস গন্ধ। মনে হল, 'সাকুরা'র জীবন এই মুহূর্তে সার্থক হল। সেও যেন পরম আহ্লাদে তার সর্বস্ব সমর্পণ করল, দৃষ্টির বাইরে ওই অন্তর্দৃষ্টির সোহাগের হাতে। একটা পাতা ছিঁড়ল না, একটা পাপড়ি ঝরল না—তারা আবার এগিয়ে গেল আর কোন নূতনের সন্ধানে। সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল, না—আমি পারিনি, অমন করে সাকুরার সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে পারিনি। সাকুরাও বুঝি অমন আপন হয়ে আর কারো কাছে ধরা দেয় নি।

সাকুরা যে শুধু এই ক'টা দিনের জন্যই জাপানের জীবনে ধূমকেতুর মত আসে আর যায়, তা নয়। দিন দশেকের মাঝেই সাকুরার জীবন শেষ। আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বিদায়, তাই বুঝি কাল গোনার অবকাশ সবথেকে বেশী। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাকুরাকে ধরে রাখবার প্রচেষ্টা।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। অনেক জায়গায় 'সাকুরা' তাদের প্রতীক চিহ্ন। সাকুরা-হানার ছবি, বুকে ঝুলিয়ে তারা চলেছে স্কুলে। টেলিফোন গাইড খুঁজলে পাওয়া যাবে হাজার হাজার মানুষের নাম, যাঁদের পরিচয় বহন করছে 'সাকুরা'—নিসাকুরা। হয়ত কোন এক সময়ে কোন এক সম্মানসূচক পদমর্যাদা লুকিয়ে আছে ওই নামের সার্থকতায়। পুরোনো দিনের অনেক জায়গায়, পথে হাঁটতে হাঁটতে চোখ তুলে চাইলে দেখা যাবে সাকুরা নামের কোন পথ। এই নামে আছে অসংখ্য হোটেল আর রেস্তোরাঁ; আছে পাহাড়, পর্বত, ছোট ছোট টিলা, এক্সপ্রেস ট্রেন। কত যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার অন্ত নেই। রোজকার ব্যবহারী দ্রব্যের নানান সরঞ্জাম, ছবির ফিল্ম কাপড়-জামা, খাবার ওষুধ-পত্র, এমনকি কোন এক সময় সাকুরা-বীয়ার লোক সমাজে ভীষণ রকম পরিচিত ছিল। চেরী-সিগারেট দেখতে পাওয়া যেত মানুষের হাতে হাতে। যুদ্ধোত্তর যুগে Imprial Navyর যুদ্ধ জাহাজের নাম ছিল Sakura kan. ইদানীং সাকুরা-মারু নামে কত যে ছোট বড় জাহাজ তৈরী হয়েছে তার ঠিক ঠিকানা নেই।

এই সাকুরাকে কেন্দ্র করেই রচনা হয়েছে কত অসংখ্য কবিতা, কাব্য, গদ্য-গ্রন্থ। ইতিহাসের পাতায় জাপানী জীবনের প্রথম শুরুর দিন থেকেই সে তার নিজের জায়গা করে নিয়েছে। হয়ত তারও আগে, এই দ্বীপপুঞ্জে মানুষের পায়ের সাড়া জাগবার আগে থেকেই, সাকুরা একাকী জীবনে আপন খেয়ালে সৌন্দর্যের ডালি সাজাত, সকলের অলক্ষ্যে।

টোকিওতে সাকুরা দেখবেন? প্রথমেই পা বাড়ান শিনজিকু বাগানে। কোন এক সময়ে সম্রাটের বিলাস-ব্যসনের সামগ্রী আজ সকল মানুষের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, টোকিওর বাইরে উন্মুক্ত আকাশ আর প্রান্তরের, হারিয়ে যাওয়া নিঃঝুম নিঃসীমতায় যাদের অভিসার, আপন-হারা বন্য মত্ততায় সে যে বেশী গরবিনী হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? একটা করে সাজিয়ে ধরা, পাশাপাশি সার বাঁধা সাকুরার সারিও কিন্তু কম যাদু জানে না। দূর থেকে তাদের দেখলে সত্যই মনে হবে, আকাশ থেকে যেন মেঘের দল নেমে এসে ধরার বুকে নজরবন্দী হয়ে আছে। কোন এক সীমারেখায় সে এপাশ ওপাশ দোল খাচ্ছে আপন মনে। তারই কোল ঘেঁষে কত নারী-পুরুষ আনন্দ আর উল্লাসের পসরা সাজিয়েছে।

আর যাবেন "ইয়াসকুনি জিনজায়"। সমস্ত প্রান্তরটাই প্রায় ছোট ছোট পাথরের নুড়ি ছিটোন। তার মাঝে পড়ে থাকা সাকুরার পাপড়িগুলি প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়ে দিচ্ছে নিজেদের অস্তিত্বকে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, এক পশলা বৃষ্টি ঝরে যেন ছোট ছোট শিল ছড়িয়েছে। পা রাখতে কেমন মায়া হয়। রাস্তার দু' পাশ ঘেঁষে বসেছে ছোট ছোট দোকান। মনে পড়ল ছোট বেলার সেই পৌষ-পার্বণের মেলার কথা। সেই পোকা তুলোর মত চিনির খেলনা, কতরকমেরই না খাবার, গাছ, ফুল, পাখি—কি নেই! তার মাঝেই গোল হয়ে বসে কতজন 'সাকে' আর বীয়ারের আমেজে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছে। চোখ ভরে দেখলাম আনন্দ আর উচ্ছ্বাস কেমন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, সমস্ত প্রতিপক্ষকে এক পাশে রেখে উল্লাসে নৃত্য করছে।

পরিখা-ঘেরা ইম্পিরিয়াল প্যালেস-এর পাড় দেওয়া উঁচু পাঁচিলের গায়ে গায়ে সাকুরা সারি আপনাকে চলার পথে একবার অন্তত দাঁড় করাবেই। সাকুরা-র গান জাপানের প্রত্যেকটা মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। সবে কথা ফুটেছে এমন ছেলেমেয়েও দেখা যাবে আধো আধো স্বরে এই গান গেয়ে চলেছে। জাপানের আকাশবাণী N.H.K থেকে বিদেশে প্রচারের পূর্বমুহূর্তে এই "সাকুরা" গানের সুর শোনান হয়। প্রথম কে বা কার কণ্ঠে এই গানের সুর ও স্বর ধ্বনিত হয়েছিল সে কথা আজ অজ্ঞাত; কিন্তু আবহমান কালের গতির তালে একে অপরের হাতে এর সুর-স্বর ও ছন্দ তুলে দিয়ে বিদায় নেয়।

সাকুরাকে ফুলের রানী বললে ভুল হবে। সে যেন ছোট্ট দেব-কন্যা। বসন্তের আদর-মাখান সকলের ছোট্ট বোনটি। রবির কিরণে স্নান সেরে, হালকা হাওয়ায় গা ঝাড়া

মুক্তি সংগ্রামের সেই দিনগুলি, জীবনের নবীন উদ্দীপনায় ছুটে চলেছেন দুই মহান্ দেশ নেতা; উদ্দেশ্য সমগ্র দেশবাসীকে জাগাতে হবে। কিন্তু আজ?

দিয়ে সে তার নরম পেলব পাপড়িগুলিতে রকমারি রঙ মেখে আহ্লাদে আটখানা। সেই সোহাগের রেণু ছড়িয়ে ছিটিয়ে মিটিমিটি হাসির সঙ্গে নেশা ধরিয়েছে মানুষের মনে আর প্রাণে।

আজ লেখবার এই মুহূর্তে সাকুরা বিদায় নিয়েছে। সব গাছ ভরে কাঁচ পাতার ভিড়। কিন্তু ভোলা যায় না সাকুরার সাড়া। আবার একটা বছর পথ চেয়ে বসে থাকা। হয়ত কে কোথায় হারিয়ে যাবে। কিন্তু সেই গাছগুলো একই জায়গায় ফুল ফুটিয়ে নূতন করে সকলকে ডাকবে।

এইসবের মাঝেই কিছু দিন আগে এখানের কোন এক জনবহুল পরিবেশের কোন এক সুবৃহৎ সওদা-খানার (Departmental Store "SEIBU") চত্বরের এক পাশে "JAWAHARLAL NEHRU AND NEW INDIA EXHIBITION" শেষ হয়ে গেল। ভারত সরকারের প্রচেষ্টা এবং SEIBU-র কর্মকর্তাদের সহযোগিতা এই প্রদর্শনীর মুখ্য সফলতার কারণ। নূতন করে দেখলাম ভারতের জওহরলাল আজও নিজস্ব ব্যক্তিত্বে বিদেশে স্বমহিমায় স্বতঃস্ফূর্ত। নূতন ভারতকে বিদেশীর চোখের সামনে Nehru-র সঙ্গে একসঙ্গে তুলে ধরবার প্রাক্কালে আর একবার মনে এল, সব কিছু সমালোচনার বাইরে ভারতের ভাবনার সঙ্গে আজও জওহরলাল এসে পড়েন। বেশীর ভাগ অবশ্যই নেহরু-জীবনের ঘটনাবলীকে দেখান হয়েছে; পৃথিবীর অমর মনীষীদের সঙ্গে আলোচনারত জওহরলাল; জাতীয় সংগ্রামের ভূমিকায় বিভিন্ন দেশনেতার সঙ্গে তাঁর ছবি। বলতে গেলে প্রায় সবটাই নেহরুর পরিচিতি। তার পাশে ভারতের নূতন প্রগতির যে ছবি তুলে ধরা হয়েছে সেটা তুলনামূলক বিচারে খুবই সামান্য। ভারত সরকার যখন নেহরুর পরিচিতি-টাকেই মুখ্য ভূমিকা দিয়েছেন তখন অবশ্যই এই প্রচেষ্টা সার্থক; কারণ, নেহরুর পৃথিবী-জোড়া ব্যক্তিত্ব আর বৈশিষ্ট্যকে দেখতে এসে ভারতকে যাঁরা অন্তত কিছু দেখলেন, আমাদের সেইটুকুই লাভ, সেইটুকুই গর্ব। সব মিলিয়ে ভারত সরকারের এ প্রচেষ্টা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য এবং প্রশংসনীয়। সরকারি মহলের এইসব উদ্যোগের ভার যাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল সেই শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরীর কাছ থেকে জানলাম যে, "SEIBU"-র কর্মকর্তাদের নিঃস্বার্থ সহযোগিতায় শুধু টোকিওর মতন ব্যয়সাপেক্ষ জায়গায় এই প্রদর্শনী সম্ভব হয়েছে। আমাদের সরকারের শ্রদ্ধা রইলো এদের আন্তরিক সহযোগিতার প্রতি। বাইরের রাস্তায় নেমে বিরাট জওহরলাল নেহরুর ছবিটার সেই স্মিত-স্বচ্ছ আপন-করা হাসিটার দিকে সকলকে তাকাতে দেখে গর্ব অনুভব করলাম। একবার ভাবলাম, প্রত্যেকটা মানুষ যাঁরাই অন্তত বিদেশে যে কারণেই আসুন, বিশেষ করে যাঁরা আসেন বিদেশীদের কাছে নিজের দেশকে সঠিকভাবে তুলে ধরবার দায়িত্ব নিয়ে তাঁদের প্রত্যেকের প্রথম প্রধান কর্তব্য ওই হাসিটুকুকে শেখা বা ধরে রাখা। কিন্তু তাঁদের অনেকেই মনে করেন, কথা বলার সঙ্গে হাসি, সে যে ব্যক্তিত্বের নিঃশেষতা, অতএব নৈব চ নৈব চ। আবার ভাবলাম, আর কতদিন আমরা এই একক ব্যক্তিত্বকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরে দিন গুজরান করব?

বিকাশ বিশ্বাস

জুন মাসে পৃথিবীর সঙ্গে আইকারাস গ্রহাণুর সংঘর্ষ হবে কি?

আমাদের এই পৃথিবীতে কোন এরোপ্লেনের সঙ্গে যদি একটা পাখির ধাক্কা লাগে তাতে পাখিটাই হবে আহত, এরোপ্লেনের কিছুই হবে না। কিন্তু আকাশের অনেকখানি উপরে যদি সেইরকম ধাক্কা লাগে একটি অতিদ্রুতগামী জেট বিমানের সঙ্গে একটা চিল বা শকুনির? সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিন্তু দাঁড়াবে সাংঘাতিক। বছর কতক আগে আকাশে ঐ রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল। একটি বোমারু বিমান উড়ে যেতে যেতে তার ডানার সঙ্গে একটা উড়ন্ত গাংচিলের সংঘর্ষ হয়, যার ফলে বিমানটির ডানায় ১৫০-২০০ মিলিমিটার একটা গর্ত হয়ে যায়। ঠিক তেমনি মহাকাশে মাত্র এক মিলিগ্রামের মত ওজনের একটি বস্তুকণিকা (উল্কাকণা-জাতীয় ঐরকম বস্তুকণা প্রতি দিন পৃথিবীতে এসে পড়ে দশ কোটির মত) যাকে ধূলিকণাও বলতে পারেন, যদি সেকেণ্ড দশ বিশ কিলোমিটার বেগে ছুটে এসে মহাকাশচারীর শরীরে বা জাহাজের খোলে ছিটকে এসে পড়ে, তার জোর হবে বেশ বড় একটি পিস্তল দিয়ে একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে গুলি মারার মত। ভেবে দেখুন পর্বতোপম একটি বরফের চাংড়ার সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে বিখ্যাত টাইটানিক জাহাজের কী গতি হয়েছিল তা আজও আমাদের মনে আছে। কিন্তু মহাজাগতিক বেগে মহাশূন্যে ধাবমান একটি পাহাড়ের মত জিনিসের সঙ্গে কোন গ্রহান্তরগামী মহাকাশযানের সংঘর্ষ হলে? ঐরকম সংঘর্ষের পর মহাকাশযানটির লেশমাত্রও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ইদানীং পাশ্চাত্ত্যের কিছু পত্র-পত্রিকায় পরিচিন্তনজাত (স্পেকুলেশন) এক 'সংবাদ' প্রকাশিত হয়েছে যে, এই বছরের জুন মাসে আইকারাস নামে গ্রহাণুটি তার কক্ষপরিক্রমার পথে পৃথিবীর এত কাছে এসে পড়বে যাতে পৃথিবীর সঙ্গে তার সংঘর্ষ ঘটা কিছু বিচিত্র নয়। ১৯৪৯ সালের জুন মাসে আবিষ্কৃত এই গ্রহাণুটি প্রতি ১৯ বছর অন্তর একবার করে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে যখন দুটির মধ্যে দূরত্ব দাঁড়ায় ৬০ লক্ষ কিলোমিটার। আর যখন পৃথিবী থেকে সে সবচেয়ে দূরে চলে যায় তখন সংখ্যাটি দাঁড়ায় ৩০ কোটি কিলোমিটার। ১৯৪৯ সালে গ্রহাণুটি যখন পৃথিবীর কাছে এসেছিল তখন ছিল জুন মাস। সুতরাং এই ১৯৬৮ সালের জুন মাসে অর্থাৎ ১৯ বছর পরে সে আবার আমাদের সবচেয়ে কাছে আসবে।

বিশ্ব বিজ্ঞান

গ্রহাণুগুলি ছোট ছোট তারার মত জ্বলজ্বল করে (ধার করা আলোকে) বলে সেগুলিকে ইংরাজীতে বলা হয় "অ্যাস্টেরয়েড।"

সুপ্রাচীনকালের জ্যোতির্বিদরা হিসাবপত্র করে দেখেন যে, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে যে ব্যবধান রয়েছে সেটা গ্রহজগতের অবস্থিতি সংক্রান্ত কোন নিয়মের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। তাঁদের মতে ঐ

আইকারাসের কক্ষপথ

দুটি গ্রহের মধ্যে অতখানি দূরত্ব থাকা উচিত ছিল না। তাই থেকে তাঁরা এই অনুমানে পৌঁছান যে সেই ব্যবধানের মধ্যে আর একটি গ্রহ থাকার কথা। কিন্তু বহু চেষ্টা চরিত্র করেও যখন সেখানে কোন গ্রহের হদিস মিলল না তখন কেউ বললেন যে তাহলে সেখানে কোন গ্রহ নেই, কেউ বা বললেন যে, হয়ত আছে, কিন্তু সেটি এত ছোট্ট যে পৃথিবী থেকে দেখা যায় না।

সেইদিনটি ছিল ১৮০১ সালের ১লা জানুয়ারী। সেই দিন জনৈক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর দূরবীনে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্তী মহাশূন্যে একটি ছোট্ট গ্রহের মত জিনিস দেখতে পাওয়া গেল। অমনি তার নামকরণ হয়ে গেল 'সেরেস' (রোমের পুরাণে কথিত কৃষিদেবতা) কিন্তু মাপজোক করে দেখা গেল সেটির ব্যাস ৭৭০ কিলোমিটার (সৌদ্ধিকোর সমতুল্য)। তার মানে আয়তনে সেটি চাঁদের ১/৮০ ভাগ এবং পৃথিবীর ১/৪০০০ ভাগ। কিন্তু তবু এটা তো প্রমাণ হল যে, বৃহস্পতি ও মঙ্গলের মাঝখানে গ্রহ ধরনের একটি কিছু আছে। আর এক বছর পরে মহাশূন্যের সেই খণ্ডেই আরো একটি গ্রহের মত জিনিস দেখা গেল, যা আয়তনে সেরেসের প্রায় সমতুল্য। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গেলেন ঘাবড়ে। কারণ, ঐ জায়গায় সূর্য থেকে প্রায় সমান দূরত্বে আরো একটি গ্রহের অবস্থিতি তাঁদের গণনার মধ্যে ছিল না। যাই হোক, তার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত যখন হলই তখন তার নাম তো একটা দিতেই হয়। নামকরণ হল গ্রীক জ্ঞানদাত্রী দেবতা পাল্লাসের নামে। কিন্তু ব্যাপারটা গড়িয়েই চলল। ১৮০৪ সালে আবিষ্কৃত হল তৃতীয় আর একটি 'গ্রহ' এবং ১৮০৭ সালে চতুর্থ আর একটি। এই দুটির নাম হল জুনো এবং ভেস্তা। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চিন্তাসাগরে ডুবে গেলেন এই ভেবে যে, তাই তো যেখানে একটি বড় গ্রহ থাকার কথা সেখানে পাওয়া যাচ্ছে ছোট্ট আকারের চার চারটি। তবে কি ঐখানটায় কোন এক মহাজাগতিক প্রলয়োপম কাণ্ডের ফলে একটি গ্রহ ভেঙ্গে চার টুকরো হয়ে গিয়েছে? এই ধরনের ধারণাটা কিন্তু তাঁদের পছন্দ হল না। সেই সময়কার প্রখ্যাত জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী কার্ল গাউস তাঁর এক বন্ধুকে লিখিত এক পত্রে বললেন :—"ধর কয়েক বছরের মধ্যে এটা নিশ্চিত বুঝতে পারলাম যে, পাল্লাস ও সেরেস এক সময়ে সম্মিলিত এক অখণ্ড দুনিয়া ছিল। কিন্তু সেটা কি মানুষের স্বার্থের দিক থেকে ক্ষতিকর ও অবাঞ্ছনীয় হবে না? তখন ভগবদ্ভক্ত ও ভগবদ্ভক্তিতে অবিশ্বাসীদের মধ্যে কি সাংঘাতিক বিবাদ বাধবে ভাবলে শিউরে উঠতে হয় না কি? কোন গ্রহ যে ধ্বংসনীয় এই কথা সত্য প্রতিপন্ন হলে ধর্মে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠতে বাধ্য। সৌরজগৎকে যারা এত দিন অপরিবর্তনীয় বলে ভেবে

কতগুলি গ্রহাণুর কক্ষপথ

আসছে তারা তখন কী জবাব দেবে যখন তারা দেখবে যে তাদের এতদিনকার তত্ত্বের ভিত্তি বালুকার উপর খাড়া?...তাই আমি মনে করি ঐ রকম কোন সিদ্ধান্ত করা থেকে আমাদের বিরত থাকাই শ্রেয়ঃ।"

যাই হোক মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে আর একটি গ্রহের অস্তিত্ব ছিল এটা আরো অনেকে বিশ্বাস করতেন এবং এখনো করেন। তাঁদের মতে ছোট্ট মঙ্গলের অল্প শক্তিমান মহাকর্ষ ও সুবৃহৎ বৃহস্পতির প্রচণ্ড শক্তিমান মহাকর্ষের টানাহ্যাঁচড়ার মধ্যে পড়ে গ্রহটি ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। অলবার্স ও জ্যাভারিৎস্কি নামে জ্যোতির্বিজ্ঞানী দুজনেই এই মতে বিশ্বাসী। অলবার্স সেই গ্রহটির নাম দেন 'ফিথন' (সূর্যপুত্র—গ্রীক পুরাণ), যা পিতৃদেবের অগ্নিরথের ঘোড়াগুলি পরিচালনা করতে ও বশে আনতে না পেরে ধ্বংস হয়ে যায়।

গ্রহাণুপুঞ্জের উৎপত্তি সম্পর্কে আর একটি মত হচ্ছে যে সেগুলি ভেঙে যাওয়া ধূমকেতুর খণ্ড। রকেট বিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যাখ্যাকার সিয়লকভস্কি স্বয়ং নাকি এই মত পোষণ করতেন। ধূমকেতুগুলি যেমন কিছুকাল অন্তর অন্তর ঘুরে আসে যখন আমরা সেগুলিকে দেখতে পাই, ঠিক তেমনি হিডালগো নামে একটি গ্রহাণু ১৯২০ সালে আবিষ্কৃত হবার পর সেটি আস্তে আস্তে উধাও হয়ে যায়। সেটিকে পুনরাবিষ্কার করেন (মানে আবার দেখা যায়) সোভিয়েত বিজ্ঞানী নিউইমিন। হিডালগোর কক্ষপথ যে-কোন গ্রহাণুর কক্ষপথের তুলনায় বৃহত্তর। সূর্য থেকে সবচেয়ে বেশী দূর বিন্দুতে (অ্যাপহেলিয়ন) সে যখন পৌঁছায় তখন সূর্য থেকে তার দূরত্ব পৃথিবীর দূরত্বের তুলনায় ১০ গুণ এবং তখন সে শনির কক্ষপথের গা ঘেঁষে যায়। আবার সূর্য থেকে দূরত্ব সবচেয়ে কমে যায় যে বিন্দুতে (পেরিহেলিয়ন) তখন সে এসে পড়ে মঙ্গলের কাছাকাছি এবং সূর্য থেকে তার দূরত্ব পৃথিবীর দূরত্বের তুলনায় দাঁড়ায় মাত্র দেড় গুণ। হিডালগোর কক্ষপথে এক পাক ঘুরে আসতে ১৪ বছর সময় লাগে।

গ্রহাণুর উদ্ভব সম্পর্কে আর একটি অনুমিতি হচ্ছে, যে গ্রহটি ভেঙে সেগুলি তৈরী হয়েছে সেটিতে জৈবসভ্যতা এত দূর এগিয়েছিল যার ফলে আকস্মিক কতকগুলি পারমাণবিক বিস্ফোরণের দুর্ঘটনায় সেটি ভেঙে ফুটিফাটা হয়ে গিয়ে গ্রহাণুগুলির জন্ম দেয়।

কোন্ অনুমিতিটি যে ঠিক তা আজও নিশ্চয় করে কেউ বলতে পারেন না। এইটুকুই শুধু জানা গিয়েছে, নির্ভুলভাবে গ্রহাণুপুঞ্জ এক বলয়ের আকারে সম্বদ্ধ হয়ে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্তী মহাশূন্যে সূর্য প্রদক্ষিণ করে চলেছে। আজ পর্যন্ত যে ৬ সহস্রাধিক গ্রহাণু আবিষ্কৃত হয়েছে তারা মধ্যে মাত্র ১৬০০-র মত গ্রহাণু তালিকায় (এফিমেরাইড ক্যাটালগ) স্থান পেয়েছে। কারণ, বাকিগুলির কক্ষপথ ইত্যাদি তথ্য বিজ্ঞানীরা এখনো জানতে পারেননি। বিজ্ঞানীদের ধারণা গ্রহাণুর সংখ্যা লাখখানেক হবে। আরো জানা গিয়েছে যে, তাদের সূর্যকেন্দ্রিক কক্ষপথ গ্রহগুলির তুলনায় অনেক বেশী উপবৃত্তাকার অর্থাৎ অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘায়িত। কতগুলির ক্ষেত্রে সেই পথের সূর্য থেকে দূরতম বিন্দু বৃহস্পতি ও শনির কক্ষের খুব কাছে এবং তারা আবার যখন সূর্যের নিকটতম বিন্দুতে পৌঁছায় তখন তারা পৃথিবী, শুক্র ও মঙ্গলের কক্ষপথের ভিতরের দিকে এসে পড়ে। সেইসব গ্রহাণু যেগুলি পৃথিবীর এত কাছে আসে (যেমন আইকারাস), সেগুলিকে কি আমরা অন্য গ্রহে যাবার পথে স্টেশন হিসাবে ব্যবহার করতে পারব না? তাদের পরিবার মোটে ছোট নয়। তাদেরই একটির নাম 'ইরস', যার আবিষ্কার ১৮৯৮ সালে। এই গ্রহাণুর অবস্থিতির সাহায্য নিয়ে বিজ্ঞানীরা সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব আগের চেয়ে বেশী নির্ভুলভাবে নির্ণয় করতে পেরেছেন। এই গ্রহাণুটি নিখুঁত গোল নয় এবং সবচেয়ে চওড়া জায়গায় ব্যাস মোটে ২৫ কিলোমিটার। সেটি যখন পৃথিবীর নিকটতম হয় তখন পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব মঙ্গলের দূরত্বের মোটে ২/৫ ভাগ দাঁড়ায়। অর্থাৎ ২ কোটি ২৫ লক্ষ কিলোমিটারের মত। ১৯৩১ সালের জানুয়ারীতে সে ঐরকম কাছে এসেছিল, আবার আসবে ১৯৭৫ সালে। সেই সময় দূরবীন দিয়ে তাকে দেখা পাওয়া যাবে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

লক্ষ্মীর কৃপালাভঃ বাঙালীর সাধনা

কাচশিল্প—প্রথম পর্ব ঃ নিউট্র্যাল এবং উচ্চতাপসহ কাচ তৈরির কারখানা

ননীগোপালবাবু, [illegible]

[illegible] অন্যতম অংশীদার সদস্য রণজিৎ রায়।

রণজিৎ রায় এবং তাঁর পরলোকগত ছোট ভাই অমিয়নাথ জন্মেছিলেন বড়ো ঘরে রূপোর চামচে মুখে করে। তাঁদের বাবা ছিলেন সেকালের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাঃ ডি এন. রায়, বড়ো মেসোমশায় ছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় অভিনন্দিত ভারতের প্রথম সারির র‍্যাংলার (ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত পরীক্ষায় উচ্চতম অনার্স প্রাপ্ত) ডাঃ প্রসন্নকুমার রায় আর ছোট মেসোমশায় ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। মা ছিলেন বাংলা দেশে নারী জাগরণ ও প্রগতির অন্যতম হোতা এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পিতৃব্য দুর্গামোহন দাসের কনিষ্ঠা কন্যা শৈলবালা।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির পুণ্যতম পরিবেশে মানুষ রণ রায় তাঁর হিসাব-পরীক্ষকের পেশা ও পসারকে গৌণ রেখে শিল্পোদ্যোগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং অকালে প্রাণ দিয়েছিলেন সেইজন্যেই।

'সিগকল' অর্থাৎ সায়েন্টিফিক ইন্ডিয়ান গ্লাস কোম্পানী লিমিটেড ছিল তাঁর একাধিক শিল্পপ্রচেষ্টার অন্যতম। [illegible] ছিলেন এঁরা।

[illegible] ঘটলে ভারতবর্ষে ল্যাবোরেটরির কাচের ফ্লাস্ক, টেস্ট-টিউব, হাইড্রোমিটার, ফানেল বা ব্লাড ব্যাংকের রক্ত রাখার বোতল, কিছুই বোধহয় ভারতে কোনোদিন তৈরী হতে পারতো না। অথচ আমরা যে স্বদেশী ভ্যাকুয়াম ফ্লাস্কে গরম ঠাণ্ডা জল, চা, দুধ, কফি রাখি তাও আসতো ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মেনী অথবা এদিকে জাপান থেকে। তাই [illegible] এক্ষেত্রে বাঙালীর, তথা ভারতের, ধন্যবাদের পাত্র। গোড়াতেই কথাটা বলেছিলেন সিগকল-এর সর্বাধ্যক্ষ ডিরেক্টর শ্রীননীগোপাল সরকার।

নিজেকে পার্শ্বচরিত্রে রেখে ননীবাবু, তিন ঘণ্টা গল্প-আলোচনার মধ্যে ঘণ্টা দেড়েক বললেন রণ রায়ের মহত্ত্বের কথা, ঘণ্টাখানেক বললেন কাচশিল্পে বাঙালীর অন্যতম পথপ্রদর্শক স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ সেন এবং শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ তাঁর পুত্রদের কথা, এবং রুড়কি এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল স্বর্গত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী, আর আমার নির্বন্ধাতিশয্যে বাকী আধ ঘণ্টা বললেন নিজের কথা।

বোম্বাইয়ের ইব্রাহিম পীরমহম্মদ কোম্পানী ছিল প্রাচীন বেঙ্গল গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড-এর মালিক। কলকাতার দমদম ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত তাঁদের প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার ভার তাঁরা দিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের অনুচর ও কংগ্রেস নেতা বৈকুণ্ঠনাথ সেনের ছোট ভাই প্রসিদ্ধ উকীল হেমেন্দ্রনাথ সেন-কে। পরে এই কোম্পানীটির পুনর্বিন্যাস হয়ে সেন পরিবারের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 'নিউ ইন্ডিয়ান গ্লাস ওয়ার্কস প্রাঃ লিমিটেড'-এ পরিণত হলো। হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় এখন এই প্রাচীনতম বাঙালী প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার।

ল্যাবোরেটরির যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম তৈরীর বিষয়ে নাকি এদেশে প্রথম গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন রুড়কি এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের উপাধ্যক্ষ জার্মেনীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বর্গীয় বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়। শুনেছি তিনিই প্রথম কাচ তৈরীর জন্য [illegible] ও [illegible]

[illegible]

ননীগোপাল এই বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শিষ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে [illegible] ভাগনে শ্রীজ্ঞানেন্দ্র [illegible] মামার কাছে গ্যাস তৈরী শিখেছিলেন। [illegible] পর নিজের চেষ্টায় [illegible] একটি বড়ো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। তার নাম 'গ্যানসন [illegible] লিমিটেড'। সুযোগ পেলে অদূর ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানের বিষয়েও কিছু লেখবার আশা রাখি।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাস ছাড়াও গ্যানসন-এ উৎপাদনসূচী [illegible] খবর পেলাম তার কিছু কিছু এখানে বিক্রি করে গ্যানসন এর পূর্বাঞ্চলের এজেন্ট কলকাতার ইংরেজ প্রতিষ্ঠান কিলবার্ন কোম্পানী।

কিন্তু আমি ভাবছিলাম যে, কলকাতা কি আমাদের আর বোম্বাই-গ্যাস আমদানী করার দরকার হবে? বামপন্থীদের রাজনৈতিক গ্যাস-এর সঙ্গে কিছুটা 'দুর্গাপুর' ব্লেন্ড করে নিলেই তো আমাদের সব কারখানা অষ্টপ্রহর চালু থাকতে পারবে!

অসুস্থতাবশত ননীগোপালবাবু, এক

থেমে থেমে কথা বলছিলেন। রণ রায় থেকে জ্ঞান ব্যানার্জি'র কাহিনীর বিবরণের মধ্যে মধ্যে নিজের কথা যা যা বললেন তাতে ভদ্রলোককে পার্শ্বচরিত্র করে রাখা সম্ভব নয়। তার কথা কীভাবে বললে কম করে বলা যায় সেটা ভেবে নিতে নিতে একবার সায়ান্টিফিক (বৈজ্ঞানিক) কাচের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাসটা ঘেঁটে নেওয়া থাক। উচিত ছিল দেশী ও বিদেশী কিংবদন্তী-সম্মত সাধারণ 'কাচমণি'-র জন্মবৃত্তান্ত দিয়ে শুরু করা; কিন্তু সায়ান্টিফিক কাচের বেলায় ইতিহাসের কথাটাই প্রবল, তাই কিংবদন্তী এবারে মুলতবী থাক।

সায়ান্টিফিক কাচ নানারকমের; তার মধ্যে প্রধান হলো Opthalmic বা চশমার কাচ এবং Optical বা বীক্ষণ কাচ। দ্বিতীয় সারিতে আছে Neutral অর্থাৎ অম্ল ও ক্ষারের প্রভাবমুক্ত কাচ এবং Heat Resistant বা উচ্চতাপ-সহনশীল কাচ। রাসায়নিক পরীক্ষার কাজে শেষোক্ত দু-রকমের কাচ একান্ত প্রয়োজনীয়।

এইগুলি ছাড়াও অসাধারণ আরও দু-এক রকমের আধুনিক কাচের কথা এখানে বলা যেতে পারে। Foam Glass Fibre

Glass এবং Glass Wool। এগুলি ঠিক সায়ান্টিফিক কাচের পর্যায়ে পড়ে না। শোলা বা কর্কের বদলে ব্যবহার যোগ্য ফোম-কাচ এখন আমাদের দেশেও তৈরী হচ্ছে। কেন্দ্রীয় কাচ ও সেরামিক গবেষণা সংস্থার (C. G. C. R. I.) বৈজ্ঞানিক শ্রীসন্তোষ মুখোর্জি, প্রচার বিভাগের সহ-সচিব শ্রীরণজিৎ রায় এবং উপ-গ্রন্থাগারিক শ্রীঅজয় রায় আমাকে এইসব তথ্য যোগালেন। ফাইবার কাচ অর্থাৎ কাচের সুতো দিয়ে নাকি আজকাল সিনেমার পর্দা তৈরী হয় আর সেই পর্দার ওপরে ফেলা ছবি হয় সাধারণ কাপড়ের পর্দায় ফেলা ছবির চাইতে ঢের বেশী উজ্জ্বল। কাচের সুতো এখনও আমাদের দেশে তৈরী হয় না আর গ্লাস-উলও হয় না। বিদেশে এখন বাক্সের মধ্যে পণ্য ভরে তার পাশে কাঠের গুঁড়োর বদলে এই গ্লাস-উলও ব্যবহার করা হয় অনেক সময়ে।

কথিত আছে যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইটালির ফ্লোরেন্স শহরের এক ধর্মযাজক চশমা আবিষ্কার করেন। ছাপাখানার আগে, মানে খৃীষ্টীয় পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত চশমার ব্যবহার প্রায় ছিলই না। মুদ্রণ-যন্ত্রের উদ্ভবের সঙ্গে মানুষের পাঠে আসক্তি জন্মালো; তাই চশমার ব্যবহার অনেক বেড়ে গিয়ে সারা ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়লো।

দূরবীন বা টেলিস্কোপ যন্ত্রটি নাকি ১৬০৮ সাল নাগাদ হ্যান্স্ লিপারশাই নামে হল্যান্ডের এক চশমা ব্যবসায়ী হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও (১৫৬৪–১৬৪২) দূরবীনের অনেক উন্নতি করেন এবং তাঁর দূরবীন দিয়ে বৃহস্পতির উপগ্রহগুলির সন্ধান পান। তাঁর পূর্বসূরী পোল্যান্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপারনিকাসের (১৪৭৩–১৫৪৩) মতাবলম্বন করে গ্যালিলিও প্রচার করলেন যে, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই মতবাদের জন্যে সেকালের শক্তিধর গোঁড়া ধর্মযাজকরা তাঁকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবার যোগাড় করছিলেন। তাঁদের শাস্ত্র বলতো যে, সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। গ্যালিলিও নাকি প্রাণের ভয়ে মত বদলে ফেলেছিলেন। 'ঘুরুক ব্যাটা সূর্য পৃথিবীর চারদিকে আমি বেঘোরে মরতে যাই কেন?'—ভাবটা বোধ হয় এই ছিল গ্যালিলিওর।

প্রায় দেড় শ' বছর পরে এলেন উইলিয়াম হার্শেল (১৭৩৮—১৮২২)। তিনি আসলে ছিলেন জার্মান। ইংল্যান্ডে গিয়ে সঙ্গীত চর্চা আর শিক্ষাদান করতেন; সঙ্গে সঙ্গে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনুশীলন করতেন। রাজা তৃতীয় জর্জ তাঁকে রাজসভার জ্যোতির্বিদের পদে অভিষিক্ত করে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করলেন। স্যার উইলিয়াম ও তাঁর ছেলে স্যার জন হার্শেল (১৭৯২—১৮৭১) দূরবীন ছাড়াও কাচ ও ধাতুর তৈরী নানা-রকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কারক। 'ইউরেনাস' বা আমাদের আধুনিক পাঁজিকা মতে 'ইন্দ্র' গ্রহটিকে স্যার উইলিয়ামই দূরবীন দিয়ে আবিষ্কার করেছিলেন বলে তার আর এক নাম 'হার্শেল'।

এরপর থেকেই বীক্ষণ ও চশমার কাচের বিবর্তন ও বিকাশের কাজটি জার্মান বৈজ্ঞানিকরা হাতে নিলেন। সে কথায় পরে আসছি।

ননীগোপাল সরকারের পারিবারিক ইতিহাস এবং তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবনের কৃচ্ছ্রসাধনার কাহিনী উহ্য রেখে একেবারে ১৯২৭ সালে চলে আসি। ইতিমধ্যে পিতার কর্মস্থল এলাহাবাদে থাকতে থাকতে তিনি বেনীমাধবের শিষ্য রাধারমণ দাসের কাছে পেট্রল থেকে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাস' তৈরীর প্রণালীটি শিখে নিয়েছেন। আধুনিক যন্ত্রশালায় এই গ্যাসের ব্যবহার প্রায় অপরিহার্য।

শ্রীধীরেন সেন প্রমুখ স্বর্গীয় হেমেন্দ্র-নাথের ছেলেদের পরিচালিত বেঙ্গল গ্লাস ওয়াকর্স-এর কথা আগেই বলেছি। ননী-গোপাল সেখানে একটি চাকরি পেলেন। এইখানেই গ্যাস তৈরীর মাধ্যমে তিনি কাচ-শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হলেন।

উচ্চাভিলাষী ননীগোপাল কিন্তু দেশে যেটুকু কাজ শিখেছিলেন তাতে মোটেই খুশি ছিলেন না; বিদেশে যাবার পথ খুঁজ-ছিলেন, কিন্তু পাথেয়র কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। কিছুদিন কাজ করার পর সেন মশায়দের কাছ থেকে আংশিক অর্থ সাহায্য পেয়ে বাকীটা নিজে যোগাড় করে ১৯২৭ সালে ননীবাবু সাগরপাড়ি দিলেন। পৌঁছলেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাস ও সায়ান্টিফিক কাচ-শিল্পের তীর্থ জার্মেনীতে। কিছুকাল মেলেনবাখ-এ গ্যাস ও বার্নার (burner) বিষয়ে শিক্ষালাভ করে তিনি ল্যাবরেটরির কাচের সরঞ্জাম প্রস্তুত-কেন্দ্র ইলমেনাও শহরে গেলেন। বলতে গেলে, সায়ান্টিফিক কাচ তৈরীতে তাঁর হাতে খড়ি এই ইলমেনাও শহরেই। সেখানেও কিছুদিন কাজ শেখবার পর ননীবাবু বীক্ষণ ও চশমার কাচ তৈরীর বিশ্ববিখ্যাত কেন্দ্র থুরিংগিয়া অঞ্চলের ইয়েনা (Jena) শহরে উপস্থিত হলেন।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ একটি নাম—কার্ল ৎসাইস (Carl Zeiss)—১৮১৬/৮৮। আপনাদের মধ্যে যাঁরা বিশত্রিশ বছর আগে ক্যামেরা, বাইনোকুলার বা দূরবীন ব্যবহার করতেন তাঁদের কাছে এ এক আদরের নাম ছিল নিশ্চয়ই।

আমার এক বাল্যবন্ধুর জীবনে কার্ল জাইস মস্ত বড়ো অংশ নিয়েছিলেন। বন্ধুবর তাঁর বাড়ির ছাদ থেকে জাইসের লেন্সওয়ালা বাইনোকুলার দিয়ে অদূরে এক

উঁচু পাঁচিলে ঘেরা বাড়ির প্রাঙ্গণে এক সুন্দরী তরুণীকে দেখে মুগ্ধ হন। অনেক কষ্টে আলাপ করে সুযোগ বুঝে জাইসের 'টেসার' লেন্সের দামী ক্যামেরা দিয়ে সুন্দরীর কয়েকটা ছবি তুলে ফেলেন। সেই ছবির পায়ে দিনের পর দিন ফুলের অর্ঘ উৎসর্গ করে একদিন তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হলো; মানসীকে ঘরনী করে নিয়ে এলেন। পরে তিনি জাইসের লেন্সের দূরবীন দিয়ে প্রেয়সীকে চাঁদের কলংক দেখাতেন কিনা তা আমার জানা নেই। কারণ, স্ত্রৈণ বন্ধু বিয়ের পর থেকে আমার কাছে দুর্লভ হয়ে উঠেছিলেন।

১৮৪৮ সালে ইয়েনা শহরে কার্ল জাইস তাঁর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির কারখানা স্থাপিত করেন; কিন্তু তখন কাচ বা লেন্সযুক্ত সরঞ্জাম বিশেষ করে তৈরী হতো না। ১৮৭৫ সালে প্রফেসর আর্নস্ট আব (১৮৪০—১৯০৫) নামে এক প্রতিভাধর তরুণ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপনা ছেড়ে জাইসের শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অংশীদার হয়ে যোগ দিলেন। শট্ অ্যাণ্ড জেন গ্লাস ওয়ার্কসের মালিক অটো শটকেও আব নিজেদের মধ্যে টেনে আনেন। তারপরে যান্ত্রিক জাইস এবং কাচশিল্পী শট্-কে নিজের বিরাট ব্যক্তিত্ব ও বৈজ্ঞানিক প্রেরণা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করে প্রফেসর আব অতুলনীয় এক সমন্বয়ের সৃষ্টি করেন। প্রতিষ্ঠান যখন বিশালাকার ধারণ করলো তখন কিন্তু এই নিঃস্বার্থ বৈজ্ঞানিক নিজে কর্মকর্তা হয়েও মহত্ব দেখালেন প্রতিষ্ঠানের নাম 'কার্ল ৎসাইস্ ফাউণ্ডেশন' দিয়ে।

এই শতকের দ্বিতীয় দশকে ইয়েনা শহরে এক পরমাশ্চর্য আবিষ্কার হয়। জাইস কোম্পানীর উদ্যোগে পৃথিবীর সর্বপ্রথম প্ল্যানেটেরিয়াম প্রতিষ্ঠিত হলো। আমাদের কলকাতার প্ল্যানেটেরিয়ামের সমস্ত যন্ত্রপাতিও জাইসের ইয়েনা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আনানো হয়েছিল। জার্মেনী বিভাগের পরর জাইস প্রতিষ্ঠানও খণ্ডিত হয়েছে। এক ভাগ, 'ইয়েনা' রয়ে গেছে পূর্ব জার্মেনীতে, আর এক ভাগ চলে এসেছে পশ্চিম জার্মেনীতে অবস্থিত দুটি কারখানাতে।

আমাদের যাদবপুরের কেন্দ্রীয় গ্লাস ও সেরামিক ইনস্টিটিউট এখন বছরে ৪।৫ টন করে বীক্ষণ কাচ ইত্যাদি তৈরি করছেন। তাছাড়া আমাদের দুর্গাপুর প্রকল্প-ও বীক্ষণ এবং চশমার কাচ তৈরী শুরু করছে। সাধু প্রচেষ্টা—কিন্তু ভয়ের কথা যে, এটাও একটা সরকারী উদ্যোগ।

বীক্ষণ ও চশমার কাচ শিল্পে জাইসের পরেই নাম করতে হয় প্যারিসের 'পারামাতোয়া' প্রতিষ্ঠানের। এও এক ইতিহাস প্রসিদ্ধ সংস্থা। ইংল্যাণ্ডে এই শ্রেণীর কাচ প্রস্তুতকারকদের মধ্যে

[illegible], বৃটিশ হীট রেজিস্ট্যান্ট গ্লাস কোম্পানী ও ফিনিক্স ওয়ার্কসের নাম করলেন ননীগোপাল সরকার।

ননীগোপালের জার্মানি পরিক্রমা পর্ব এক কৃচ্ছ্রসাধনার কাহিনী। দারুণ অর্থ-কষ্টে তিন মাসের পর মাস একবেলা খেয়ে কাটাতেন। যথেষ্ট গরম কাপড়-জামার অভাবে প্রচণ্ড শীতের কামড়ের (ফ্রস্ট-বাইট) ভয় থাকা সত্ত্বেও ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে সূর্যোদয়ের অনেক আগে কাজে বেরোতে হতো। সামান্য উপার্জন থেকে সঞ্চিত টাকা দিয়ে একটা ওভারকোট কিনেছিলেন, তাও চুরি গেল।

সমসাময়িকদের অবস্থা যদিও প্রায় একই ছিল তবুও তাঁদের মধ্যে অনেকেই নামকরা ব্যক্তি ছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর স্ত্রী, আমাদের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুর দুই ভাই বীরেন ও হীরেন চট্টোপাধ্যায় এবং বোন সুহাসিনী নাম্বিয়ার, আর [illegible] [illegible] ইংরেজ কমিউনিস্ট হয়েছিলেন। এই দলে আরও একজন [illegible] ব্যক্তি ছিলেন; তাঁর নাম চন্দ্রশেখর পিল্লাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 'এমডেন' নামে যে জার্মান রণতরীটি এসে মাদ্রাজে গোলাবর্ষণ করেছিল, চন্দ্রশেখর পিল্লাই সেই জাহাজে ছিলেন। বড় বিপ্লববাদী ছিলেন বলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নাৎসিরা চন্দ্রশেখরকে গ্যাস চেম্বারে হত্যা করেছিল বলে শোনা যায়।

এইসব বড় বড় মার্কসবাদী ও বিপ্লবীদের নিকট সংস্পর্শে এসেও উত্তরজীবনে ননীগোপাল কী করে শিল্পপতি হয়ে গেলেন, এ প্রশ্ন করাতে তিনি মৃদু হেসে বললেন, "না, দু' একবার বিপ্লবীদের জন্যে হাতবোমার 'ফিউজ' তৈরি করে দেওয়া ছাড়া স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দেওয়া আমার হয়ে ওঠেনি। তবে কেবল কয়েক দিনের জন্যে স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিসের হেফাজতে থাকতে হয়েছিল, এই যা।"

উনত্রিশ সালে শিক্ষা শেষ করে দেশে ফিরে ননীগোপাল আবার বেঙ্গল গ্লাস কোম্পানীতে কাজ নিলেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে ঢাকা জেলার এক কাচ-শিল্পপতির আহ্বানে বেঙ্গল গ্লাস ছেড়ে ননীবাবু নারায়ণগঞ্জে চলে গেলেন। সেখানে ওই শিশি বোতল গেলাস তৈরীর মাঝে মাঝে মনমরা ননীগোপাল ঘুরে আসতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্সের প্রফেসার (অধুনা জাতীয় অধ্যাপক) সত্যেন বসু ও কেমিস্ট্রির প্রফেসর জ্ঞান ঘোষ (উত্তরকালে স্যার জ্ঞান ঘোষ) মহাশয়দের কাছ থেকে। উদ্দেশ্য, যদি কোনোরকমে শিশিবোতল উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে সায়াণ্টিফিক কাচ-ও তৈরি করতে পারেন।

ননীগোপাল অবশ্য নারায়ণগঞ্জে বসেই বাঙালীর প্রথম ইলেকট্রিক বাল্‌বের কারখানা 'বেঙ্গল ল্যাম্প'-এর জন্য কিছু কিছু কাচের খোল তৈরি করে দিতেন।

নারায়ণগঞ্জের সেই কারখানাটি হঠাৎ একদিন রহস্যজনকভাবে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ননীবাবু বেকার হলেন।

সত্যেন বসু ও জ্ঞান ঘোষ মহাশয়রা তরুণ ননীগোপালকে স্নেহ করতেন এবং কাচ শিল্পে এঁর অভিজ্ঞতার বিষয়ে তাঁদের যথেষ্ট আস্থা ছিল। তাঁদের দুজনের আশীর্বাদ ও শংসাপত্র নিয়ে ননীগোপাল ১৯৩৫ সালে কলকাতায় ফিরে এলেন। সম্বল ওই পণ্ডিত যুগলের দেওয়া মহামূল্য সার্টিফিকেট দুখানা।

কলকাতায় এসে তারাপদ চ্যাটার্জি নামে এক পূর্ব পরিচিত ভদ্রলোকের সহায়তায় স্বর্গীয় প্যারীমোহন মুখার্জির সঙ্গে ননীবাবুর আলাপ হলো। প্যারীবাবু ছিলেন বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের ছাতকে অবস্থিত 'আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট' কোম্পানীর অন্যতম কর্তা ব্যক্তি।

প্যারীমোহনের সঙ্গে 'রায় অ্যান্ড রায়' অডিট ফার্মের রণজিৎ রায় মশায়ের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। প্যারীবাবু এও জানতেন যে ভবিষ্যত উজ্জ্বল, এমন সব শিল্পোদ্যোগে রণ রায়ের দারুণ উৎসাহ।

রায় ভ্রাতাদের নিজেদের অর্থবল তো ছিলই, অধিকন্তু প্রয়োজন মত অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতাও ছিল যথেষ্ট। প্যারী-মোহনের সুপারিশে ননীগোপাল রণ রায়ের কাছে গেলেন। দরিদ্র বেকার ননী-গোপাল সরকার এত দিনে এক নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছলেন। শুধু নিরাপদ নয়, রণ রায়ের সান্নিধ্য ছিল সাধুসঙ্গের মতো।

সত্যেন বসু ও জ্ঞান ঘোষের শংসাপত্র পড়ে কালবিলম্ব না করে ১৯৩৭-এর ১৫ ডিসেম্বর 'সায়াণ্টিফিক ইণ্ডিয়ান গ্লাস কোম্পানী লিমিটেড'-এর রেজিস্ট্রি করানো হলো। মূলধন হলো কিঞ্চিদূর্ধ্ব ৬০০০০ টাকা। ডিরেক্টর বোর্ডে যোগ দিলেন রণজিৎ ও অমিয়নাথ রায়, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের রসায়নশাস্ত্রী প্রফেসর এন সি নাগ এবং কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের বর্তমান চীফ এঞ্জিনীয়ার মুর্শিদাবাদ-নিবাসী জনাব মহম্মদ ইসমাইল সাহেব।

ভারতের প্রথম সায়াণ্টিফিক কাচ তৈরীর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলো। গোবরা অঞ্চলের ক্রিস্টোফার রোডে একটি বাড়ি ও জমি ভাড়া করে ১৯৩৮ সালের গোড়ায় কাজ আরম্ভ হলো। তোড়জোড় করতে না করতেই বছর দেড়েকের মধ্যে হিটলারের দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইয়োরোপে যুদ্ধ বাধিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে নিউট্রাল আর হীট-রেজিস্ট্যাণ্ট কাচের আমদানি বন্ধ হলো। ফলে নবপ্রতিষ্ঠিত সিগকল-এর মালের চাহিদা হলো উৎপাদনের অনুপাতে অনেক বেশি। ভারতে অবস্থিত বৃটিশ সেনা-বিভাগ তখন সেই মাল কেনবার জন্যে সর্বদাই ব্যগ্র হয়ে থাকতো। শুধু তাই

নয়, সিগকল-এর কারখানা সম্প্রসারণের জন্যে গভর্নমেন্ট ক্রিস্টোফার রোডের সেই ভাড়া বাড়ি সহ ১৯ বিঘা জমি ননীবাবুদের খুব সস্তায় কিনিয়ে দিলেন।

নতুন ফ্যাক্টরী ও আনুষঙ্গিক ঘরবাড়ি তৈরী, মেশিন কেনা, চুল্লি বসানো, কাঁচামাল সংগ্রহ আর শ্রমিক ভর্তি করা—সিগকলে কাজের ধুম লেগে গেল। সেও যেন এক যুদ্ধের প্রস্তুতি। নামের মর্যাদা রেখে রণজিৎ রায় সে লড়াইয়ে জয়লাভ করলেন। তাঁর প্রধান সেনাপতি ছিলেন ননীগোপাল। পাত্রদের মধ্যে ছিলেন ডিরেক্টরবর্গ এবং মিত্রদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন বাঙালী ওষুধের কারখানা 'স্ট্যান্ডার্ড ড্রাগ'-এর কর্তা ডাক্তার হেমেন ঘোষ, 'বেঙ্গল ইমিউনিটি'-র ডাক্তার উমাপ্রসন্ন বসু, ডাঃ শৈলেশ চৌধুরী স্বর্গীয় ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত এবং স্বর্গীয় অমূল্য বিশ্বাস। এই অমূল্য বিশ্বাস মহাশয়ের কথা বিশেষ করে বলতে হয়। ইঁনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক প্রতিভাসম্পন্ন এক অভিজাত ব্যক্তি। তিনি বহু পূর্বে তাঁর কলকাতার নিজস্ব মেশিন-শপে নানা জটিল সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করতেন। এখন থেকে ৩৪।৩৫ বছর আগে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায়ের অনুরোধে শান্তিনিকেতন আশ্রমের জলাভাব দূর করার কাজে সাহায্য করে-ছিলেন এবং উত্তরকালে ছাতকের 'আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট' কোম্পানীর চীফ এঞ্জি-নীয়ারও ছিলেন।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রবিক্রেতা ইন্দো-জার্মান প্রতিষ্ঠান 'অ্যাডেয়ার ডাট' কোম্পানীর ম্যানেজার শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য মশায়ও সিগকলের প্রস্তুতি পর্বে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন এবং উৎপাদন শুরু হবার পর অ্যাডেয়ার ডাট কোম্পানী সিগকলের এজেন্সিও করেছিলেন।

সিগকল-এর প্রথম কয়েক বছরের অগ্রগতি আমি নীচে কয়েকটি অংক দিয়ে দেখাচ্ছি :

১৯৪১/৪২-এ জাপানীরা বর্মা ও আন্দামান দখল করে প্রায় বাংলার দরজায় পেঁৗছে গিয়েছিল। বৃটিশ সরকার তাই অত্যাবশ্যক যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরীর প্রতিষ্ঠানদের বলছিলেন যে তাদের কারখানার অংশ কলকাতা থেকে যেন অন্তত ১৫০ মাইল দূরে তুলে নিয়ে যান অথবা সেই দূরত্ব বজায় রেখে তাঁদের দ্বিতীয় ইউনিট চালু করেন। সিগকলের প্রতিও সেই নির্দেশ ছিল। রণ রায় তেমন একটি জায়গা খুঁজছিলেন। ময়ূরভঞ্জের মহারাজা বাহাদুর এবং তাঁর দেওয়ান শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী মশায় অনেক সুযোগ সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রণ রায়ের ময়ূরভঞ্জে সিগকলের দ্বিতীয় কারখানার স্থাপনা করতে আহ্বান করলেন।

সাল	উৎপন্ন দ্রব্যের দাম	কোম্পানীর লাভ	মূলধন	ডিভিডেন্ড	
১৯৩৯	১৩৭০০ টাকা	১১৭৫ টাকা	১৬৫০০ টাকা	—	
১৯৪০	১,৯৬,০০০ টাকা	২৭০০০ টাকা	১,৩৫,০০০ টাকা	১৫%	(আয়কর বাদে)
১৯৪১	৫,২৫,০০০ টাকা	৭২০০০ টাকা	ঐ	২৪%	ঐ
১৯৪২	৭,৬০,০০০ টাকা	৮৭০০০ টাকা	ঐ	২৪%	ঐ

ইংরেজী ১৯৪৩, মানে বাংলা ১৩৫০—বাংলা দেশে মন্বন্তরের বছর; আর সেই সঙ্গে সিগকলের ওপর দিয়ে বয়ে গেল ভয়ংকর এক ঝড়, অপূরণীয় এক ক্ষতি।

সিগকল-এর বদলে ময়ূরভঞ্জ গ্লাস ওয়ার্কস লিঃ নাম দিয়ে রণজিৎ রায়

রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়ন

১৯৬৭-৬৮ সালে ভারতের মোট রপ্তানি) প্রায় ১১ শত কোটি টাকা হয়েছে বলে খবর প্রকাশ। ১৯৬৬-৬৭ সালের তুলনায় ১৯৬৭-৬৮ সালে রপ্তানি আয় বেড়েছে ৫৮ কোটি টাকা, এবং মোট রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে ৫·৬ শতাংশ। রপ্তানির এই বৃদ্ধি যে মুদ্রামূল্য হ্রাসের দরুন হয়েছে, তা নয়। গত আর্থিক বছরে ভারতে খাদ্যশস্যের ফলন বেশ বেড়েছে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় জাতীয় আয়ের পরিমাণও অনেক বেড়েছে; অর্থাৎ এক বছরের মত জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি লক্ষ্য ছাড়িয়ে গেছে। অর্থনৈতিক অবস্থার এই উন্নতি রপ্তানি বৃদ্ধির মধ্যে প্রতিফলিত। এ রপ্তানি বৃদ্ধির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পূর্বইউরোপের দেশগুলিতে বাণিজ্যের সম্প্রসারণ। লৌহ ও ইস্পাত, তামাক, চামড়া, চিনি, পাটজাত সামগ্রী প্রভৃতির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাতেও ভারতের রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার দেশগুলিতে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু চতুর্থ পরিকল্পনায় যদি বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ কমিয়ে দিতে হয়, তবে রপ্তানির পরিমাণ বছরে অন্ততঃ শতকরা ৭ ভাগ বাড়াবার চেষ্টা করতে হবে। সম্প্রতি রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করার জন্য বাণিজ্য বোর্ডের সাব-কমিটি একটি এগার দফা পরিকল্পনা দিয়েছেন। প্রস্তাবগুলি যে নতুন তা নয়। অনেক সময়েই এ-জাতীয় প্রস্তাব বিভিন্ন কমিটি দিয়েছেন; কিন্তু সব প্রস্তাব কার্যত রূপায়িত হয়নি। অবশ্য তার জন্য দায়ী আমাদের আর্থিক সংগতির অভাব, শ্রমের কম উৎপাদনী শক্তি এবং প্রশাসনিক দুর্বলতা।

বাণিজ্য বোর্ডের সাব-কমিটি যে ১১ দফা কর্মসূচী দিয়েছেন সেগুলি হচ্ছে,—(১) কৃষি, খনি ও শিল্পক্ষেত্রে দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি করে রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা করা; (২) যে সব শিল্পে রপ্তানিযোগ্য সামগ্রী উৎপাদিত হয় সেইগুলিতে অর্থবিনিয়োগ ও সম্পদ বরাদ্দের জন্য অগ্রাধিকার দান করা; (৩) বাড়তি উৎপাদনের একটি বড় অংশ যাতে রপ্তানি করা সম্ভব হয় সেজন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা; (৪) রপ্তানি সম্প্রসারণের চেষ্টা চালিয়ে যাবার জন্য উৎপাদকদের ও ব্যবসায়ীদের সবরকম সুবিধা প্রদান করা; (৫) দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে রপ্তানির জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য প্রদান; (৬) রপ্তানি-যোগ্য সামগ্রী উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস এবং মান উন্নয়ন করে রপ্তানি সামগ্রীর প্রতি-

আর্থিক ভারত

যোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা; (৭) বিদেশের বাজারে ভারতীয় সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা আরও উন্নত করা; (৮) সহজ কিস্তিতে ঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা; (৯) রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে আরও ব্যাপক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা; (১০) রপ্তানি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার বরাদ্দ করা; এবং (১১) বিদেশে ভারতীয় সামগ্রী যাতে অবাধে প্রবেশ করতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বাণিজ্য বোর্ডের সাব-কমিটি তার রিপোর্টে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, বিভিন্ন শিল্পের জন্য সাজসরঞ্জাম এবং বৈদেশিক ঋণের দরুণ আগামী কয়েক বছর অনেক বৈদেশিক মুদ্রার দরকার হবে। সুতরাং এখন প্রয়োজন, আমদানির তুলনায় রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া। তা না হলে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথ ব্যাহত হবে। সরকারের রপ্তানি নীতির উল্লেখ করে কমিটি বলেন, সরকারের নীতি হচ্ছে উন্নত ধরনের চাষবাসে উৎসাহ দেওয়া এবং কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা ও ঋণ প্রদান করা। কৃষি, শিল্প ও খনি যাতে রপ্তানি সম্প্রসারণের সহায়ক হতে পারে সেজন্য সরকার প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত। তা ছাড়া পরিবহণ, বন্দর উন্নয়ন ও জাহাজেও অনেক টাকা বিনিয়োগ করা হবে। শিল্পের ক্ষেত্রে সরকার এমন শিল্পকে সাহায্য করতে চান এবং ব্যাংকগুলির বিনিয়োগ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে চান যেন শিল্প রপ্তানির ব্যাপারে বিনিয়োগ অগ্রাধিকার লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় ঋণ পরিষদ গঠন করার কয়েকটি উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি হচ্ছে রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণে সাহায্যকারী শিল্প-গুলিতে ব্যাংকের বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার প্রদান করা।

রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য বাণিজ্য বোর্ডের সাবকমিটি যে প্রস্তাবগুলি দিয়েছেন সেগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে কাহারও কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। কিন্তু রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের পথে যে সকল প্রতিবন্ধক বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে, যেমন, উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি, উৎপাদিত সামগ্রীর গুণগত উৎকর্ষ হ্রাস, উপযুক্ত প্রচারের অভাব, ইত্যাদি, সেগুলি আগে যথাসম্ভব দূর করতে হবে। নূতন নূতন সামগ্রী রপ্তানি করার চেষ্টাও জোরদার করতে হবে।

ভারত-সাহায্য ক্লাবের প্রতিশ্রুতি

গত ২৪শে মে ওয়াশিংটনে একটি বৈঠকে ভারত-সাহায্য ক্লাবের (Aid India Club) অধিবেশনে স্থির হয়েছে যে বর্তমান বছরে এই সংস্থা ভারতকে ১·৪৫ বিলিয়ন ডলার সাহায্য দেবে। তার মধ্যে ১ বিলিয়ন ডলার থাকবে পরিকল্পনা-বহির্ভূত প্রকল্পের জন্য। বিশ্ব ব্যাংকের উদ্যোগেই এটা সম্ভব হয়েছে এবং এই সাহায্যের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবদান সবচেয়ে বেশি। যদি এই সাহায্য প্রকৃতই পাওয়া যায় তবে ভারতের পক্ষে গত দু' বছর যাবত যে উদার আমদানি নীতি

চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা কতদূর রাখা সম্ভব হবে। কিন্তু ভারত-সাহায্য ক্লাবের প্রতিশ্রুত অর্থ সম্পূর্ণ আদৌ পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে এখনও সন্দেহ আছে। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষ বছর থেকেই, বিশেষ করে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর থেকেই দেখা যাচ্ছে, এই সংস্থার কোন কোন সদস্য ভারতকে প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে খুব আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। বিদেশী অর্থ গ্রহণ করলে আমাদের কতিপয় প্রকল্প খুবই উপকৃত হবে সন্দেহ নেই; কিন্তু এজন্য যখনই যতটা পাওয়া যায়, তখনই তা গ্রহণ করার বিপক্ষেও যথেষ্ট যুক্তি আছে। কেননা, তার ফলে পরনির্ভরশীলতা খুব বেড়ে যায়। আমাদের উচিত, এখন যতটা সম্ভব রপ্তানি বাড়িয়ে এবং আমদানির বিকল্প জিনিসের উৎপাদন বাড়িয়ে বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরতা কমিয়ে ফেলা। বিদেশী মূলধন পেয়ে আমাদের নেতৃবৃন্দ খুব আনন্দিত, কিন্তু যদি এই মূলধন ঠিক ঠিকভাবে কাজে লাগানো না হয়, তবে এই বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা বহন করতে হবে ভবিষ্যতের নাগরিকগণকে।

সুব্রত গুপ্ত

দ্বিতীয় দর্পন

প্রতিভা বসু

৩৭

হ্যাঁ এরই নাম বস্তির জীবন। লক্ষ্মীর মার জীবন এখন এসে এইখানে ঠেকেছে। গলায় দড়ি না দেওয়া পর্যন্ত এ থেকে আর তিনি মুক্তি পাবেন না। আর তাঁর মুক্তির পরে লক্ষ্মী হবে কুঞ্জলতার সগোত্র। এ ছাড়া আর কী হতে পারে সে? ঐটুকু একটা মেয়ে, যার মা নেই, বাপ নেই, কেউ নেই ত্রিসংসারে তার ভবিষ্যৎ তো অঙ্কের মতো সোজা। একেবারে দুয়ে দুয়ে চার।

লক্ষ্মী কী করবে তখন? যার কেউ নেই সেই লক্ষ্মী? কাঁদবে, কেঁদে কেঁদে দোরে দোরে ঘুরবে দুটি খাবার আশায়, ক্ষুধায় তৃষ্ণায়, শ্রান্ত হয়ে তারপর ঘুমিয়ে থাকবে ফুটপাতে? তারপর? তারপর আবার সকাল, আবার রাত, আবার কান্না, আবার ঘুম আবার ভিক্ষা। একদিন হয়তো ঠাঁই মিলবে কোনো বড়োলোকের ঘরে, তাদের বাড়ির বাচ্চা ঝি হবে। ফুটফরমাশ খাটবে, হাত পা টিপবে, মার খাবে, এই করতে করতে বড়ো হয়ে উঠে শেষে পাকাপোক্ত ঝি হবে। বাসন মাজবে ঘসর ঘসর করে, শক্ত হাতে মসলা পিষবে দশ বাড়ির, ফষ্টিনষ্টি করবে চাকর-বাকরের সঙ্গে, ঘর ভাড়া নেবে বস্তিতে, হয়তো এই বস্তিতেই, প্রতি রাতে নতুন পুরুষের সঙ্গে দরদস্তুর করবে—

শিহরিত হয়ে মৃত্যুর বাসনা পরিত্যাগ করতে হয় বইকি। যতো দুঃখই আসুক, নিতে হবে। নিতেই হবে। তবু তিনি মরতে পারবেন না লক্ষ্মীকে অসহায় করে। লক্ষ্মীর জন্যই তাঁর জীবন মূল্যবান, তাঁর বেঁচে থাকা প্রয়োজন।

কিন্তু এ জীবন যে কী দুঃসহ কাকে বলবেন সে কথা? কেমন করে বহন করবেন? আর তিনি পারেন না। পারেন না। এ জীবন মৃত্যুর চেয়েও অন্ধকার, মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর। মৃত্যু মানুষের অবসান, এ জীবন জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকার অনন্ত যন্ত্রণা।

ঘরের মধ্যে বসে ভাবতে ভাবতে তিনি আর এই নরকের সত্যিই শেষ দেখতে পান না।

আর দুঃখ কি এক রকমের? দারিদ্র্যের দুঃখও কি এর চেয়ে এক ফোঁটা কম? যেদিন ঘর ছেড়েছিলেন, একেবারে নিঃস্ব ছিলেন না। কিন্তু লম্বা পথ চলতে চলতে এখন যেখানে এসে আটকে গেছেন, সেখানে অশন-বসনেও টান ধরেছে। প্রায় ছ' মাস চাকরি নেই, হাতের পুঁজি একেবারেই শূন্যের কোঠায়। সম্বল শুধু কালীচরণের মাইনের টাকা ক'টা। ছি! কী লজ্জাই যে করে! মাসের শেষে প্রথম তারিখটিতে যখন সব ক'টা টাকাই ধরে দেয় তাঁর হাতে, তিনি আর মুখ লুকোবার জায়গা পান না। সংকোচে হাত তার অবশ হয়ে আসে। তারপর সেই অবশ হাতের ঘর্মাক্ত মুঠোর টাকা ক'টা দিয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় মা মেয়ের।

কালীচরণের আর খরচ কী? সে তো তার মনিবের ওখানেই খেয়ে আসে, আগে পান খেতো, এখন পায় না, বলে দাঁত ব্যথা করে। লক্ষ্মীর মা জানেন, এসব কালীচরণের বানানো অছিলা। খরচ বাঁচানোই তার আসল উদ্দেশ্য। শুধু বিড়ি খায় মাঝে মাঝে। সেটা একেবারে ছাড়তে পারে নি বোধ হয়।

কালীচরণের মনিব ভালো রান্নার লোক খুঁজছিলেন, এক একবার মনে হয়, সেই কাজটাই নিয়ে নেন। তবু যে কোথায় দ্বিধা, কোথায় থাপ পাতা বেড়ালের মতো অহমিকার হিংস্রতা, তা তিনি জানেন না। আর এখন? এখন তো রীতিমতো ভয়ের ছায়াই দেখতে পাচ্ছেন।

ভয়ের ছায়া! হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল নিজের মনের বিকার দেখে। একজন অজানা অচেনা সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, যাকে তিনি কখনো চোখে দেখেন নি, যিনি তাঁকে কখনো প্রত্যক্ষ করেন নি, সেই ভদ্রলোক সম্বন্ধে কতোখানি অলীক কল্পনা করে মিছিমিছি মারলেন মেয়েটাকে। বাড়ির একজন ভৃত্যের সঙ্গে একটা ছোট্ট মেয়ে, নাতনী হয়ে রোজ রোজ যাচ্ছে আসছে, কৃপাপরবশ হয়ে যদি তাকে মনিব একটু প্রশ্রয়ই দিয়ে থাকেন, বাচ্চা বলে মমতাই করে থাকেন তার অর্থ কেমন করে এই হয় যে তিনি অসৎচরিত্র হয়ে তার মাকেই কামনা করছেন! ছি, ছি, ছি মন তার কীভাবে কাজ করছে, কী ছোট হয়ে গেছে! যেমন অবস্থায় পড়েছেন, মনও লাফ দিয়ে নেমে এসেছে সেইখানে।

লক্ষ্মীর মা হতচেতন হয়ে বসে থাকলেন। ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে গ্লানিতে ভরে গেল হৃদয়। তিনি নড়তে পারছিলেন না। উঠতে পারছিলেন না। বুকটা তাঁর ফেটে যাচ্ছিলো।

বেলা বেড়ে উঠলো ক্রমে ক্রমে, রোদে তাপ বাড়লো, ভ্যাপসা গন্ধে আরো বেশী ঘন হলো বন্ধহাওয়া, ঘরের মধ্যে মাছি ঢুকলো দল বেঁধে, লক্ষ্মীর মা আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লেন মেয়ের পাশে। আজ তাঁর রান্না নেই, খাওয়া নেই, কালকের যা কিছু অবশিষ্ট লুচি আছে, লক্ষ্মীর পক্ষে যথেষ্ট। আর তিনি? না, খেতে আর তাঁর বাসনা নেই। খাওয়া আর ঘুম, দুই-ই তাঁর অনেক কমে এসেছে।

কী ভেবে ক্ষণিকের জন্য উঠে লক্ষ্মীর ছড়ানো-ছিটোনো উপহারগুলো গুছিয়ে

রাখলেন যত্ন করে, দরজা খুলে বারান্দায় অপেক্ষমান চেন বকলস বাঁধা ভুলুকে খেতে দিলেন কিছু, তারপর মনে মনে ভদ্রলোককে কৃতজ্ঞতা জানালেন। লক্ষ্মীর জীবনে এই প্রথম উপহার। এই প্রথম ওকে ওর মা ছাড়া আর কেউ কিছু দিয়েছে আদর করে। আর তিনি কিনা নিষ্ঠুরের মতো ওর সব আনন্দ আহ্লাদ মুহূর্তে কেড়ে নিলেন বুক থেকে। আহারে! মেয়ের চোখের জলে ভেজা গালে আবেগে চুম্বন করলেন।

দিন চারেক বাদে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে উঠোনে একটা ছায়া দেখে তিনি আঁতকে উঠলেন। উনুনে আঁচ দিয়েছিলেন সেই প্রজ্বলিত আগুনের আভায় ছায়াটা কার সেটা বুঝতে একটা পলক খরচ হলো না। আতঙ্কিত গলায় বললেন, 'কে?'

'আজ্ঞে আমি।'

'আপনি! আপনি কে?'

'আজ্ঞে আমি সুরেন, সুরেন পৈত, উনার্দাঘর—'

'কী চান, কী চান এখানে?' কম্পিত উত্তেজিত গলা তাঁর স্বাভাবিক পর্দা ছেড়ে উঁচু গ্রামে উঠে গেল।

'কী আর চাইবো বলুন' সুরেন পৈত সহাস্যে নস্যি নিল এক টিপ 'খবর পেলুম এখানে আছেন, ভাবলুম পুরনো আলাপী, দেখে আসি একটু।'

'কে খবর দিল আপনাকে?'

'কে আর দেবে, ফুল ফুটলে আপনিই তার গন্ধ বেরোয়।'

'আপনি যান, চলে যান এখান থেকে।'

'মাইরি, অনেক খোঁজ-খাঁজ করেও ঠিক বুঝতে পারছিলুম না চট করে বাড়ি ছেড়ে কোথায় ডুব মারলেন।'

'আমার কাজ আছে, আমার এখন কথা শোনবার সময় নেই।'

'উহু, শেষে যে বস্তিতে এসে ঘর নিয়েছেন এ কিন্তু আন্দাজ করিনি। যাক্‌গে, হোক এক সময়ে তো মানী লোকই ছিলেন। তবে মান যে বস্তিতেও এসে হানা দিয়েছেন সেইটি টের পেলুম বুধবার সকালে। বাজার থেকে ফিরছিলুম, দেখলুম আমাদের কালেক্টার সাহেবের গাড়িখানা দাঁড়িয়ে অন্ধ গলির মুখে।'

লক্ষ্মীর মা ঘরে ঢুকে আসছিলেন, সুরেন পৈতে পথ জুড়ে দাঁড়ালো, 'আমি তো অবাক! কর্তার গাড়ি এখানে কেন? উনি কি শেষে বস্তি সংস্কারে নামলেন নাকি? নাকি গরীব শিশুদের চিঁড়াগুড় বিতরণ করতে এসেছেন। দাঁড়িয়ে গেলুম। বুঝতেই তো পারছেন একটু কৌতূহল হলো। ভাবলুম ব্যাপারখানা দেখেই যাই। শুনেছি কিনা লোকটির আবার দুই নম্বরেই দারুণ আপত্তি। মানে মদ আর মেয়েমানুষে।'

'আপনি সরুন' আমি ঘরে যাবো।'

'দেখা [illegible] তারপরে দেখছি আমাদের কন্যাকুমারিকা, শাহ্‌যাদী হা, অর্থাৎ [illegible] করলে যার অর্থ দাঁড়ায় কুমারীকা কন্যা— তিনি, নামছেন গাড়ি থেকে। আর [illegible] আমাদের আদর করছেন পিঠে হাত দিয়ে।' সুরেন পৈত গলা খাটো করলো, 'কবে থেকে আলাপ?'

'এটা ইয়ারকি করবার জায়গা নয়।'

'ছি ছি, ছি! এ কি অনিষ্ট বলেছি? বস্তিতে আবার ইয়ারকি করে নাকি কেউ! তা বঁড়শিতে ভালো মাছই গেঁথেছেন, অবিশ্যি বরাবরই তা গাঁথেন—'

'এটা আমার বাড়ি, আপনি যদি—'

'আহাহা রাগ করেন কেন? ঘরটা অবশ্যই আপনার, তা আমি কি ঘরে ঢুকেছি নাকি? দাঁড়িয়েছি তো উঠোনে। উঠোনটা নিশ্চয়ই আপনার একার নয়।'

'শুনুন, আপনি যদি ভালো [illegible] না যান—'

'লোক ডাকবেন তাড়িয়ে দিতে এই তো?'

'ঠিক তাই।'

'আপনি বোধ হয় অবগত নন যে, এই বস্তির সবগুলো ঘরের সবগুলো লোক [illegible] মারকাটারির মতো [illegible] [illegible] বাহির করে বসাতে হয়।'

'বস্তির লোকই একমাত্র লোক নয়। যাদের ডেকে আপনার মতো একটা পশুকে বার করে দেয়া যায়, তারা—'

'সে তো নিশ্চয়ই, সে তো নিশ্চয়ই। আপনার হাতে এখন কতো ক্ষমতা—'

'আমি পুলিস ডাকবো।'

'তা তো ডাকবেনই। পুলিস কেন, খবর দিলে আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসে হয়তো মিলিটারি নামিয়ে দেবেন।'

'আমি বলছি আপনি আর একটাও বাজে কথা বলবেন না।'

'তা হ'লে শুনুন, কথায় কথা বাড়লো

তাই। নইলে আমি একটাও বাজে কথা বলতে আসিনি। এসেছি কর্তার হ‍ুকুমে।'

'কে?'

'আমি মল্লিকবাব‍ুর কথা বলছি।'

'আমি তাঁর বিষয়ে শ‍ুনতে রাজী নই।'

'রাজী থাকুন না-থাকুন তা আমার দেখার কী দরকার! বলবার ভাগ আমি ব'লে যাবো।'

লক্ষ্মীর মা এবার পাশ কাটিয়ে বারান্দায় উঠলেন, কিন্তু ঘরে যেতে পারলেন না, ঘরের দরজা জ‍ুড়ে দাঁড়ালো স‍ুরেন পৈত। নরম ক'রে বললো, 'কর্তা আপনার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।'

'ক্ষমা! কিসের ক্ষমা?'

'বলছিলেন, ঝোঁকের মাথায় আপনাকে স্কুল থেকে বরখাস্ত করে তাঁর ভারি লজ্জা হয়েছে, অন‍ুতাপ হয়েছে। কর্তার স্ত্রীও দ‍ুঃখিত হয়েছেন খ‍ুব। তিনি বলছিলেন বাড়িতে গিয়েও কেন সেদিন আপনি অমন ক'রে ফিরে গেলেন। আলাপ করার জন্য খ‍ুব ব্যস্ত হয়েছিলেন তিনি। এবারও এসে থেকেই কেবল বলছেন, একদিন নিয়ে এসো, একদিন নিয়ে এসো—'

'আপনি সর‍ুন আমি ঘরে যাবো।'

'আপনার মেয়ে কোথায়?'

'বেড়াতে গেছে।'

'কোথায় গেছে?'

'আপনার তা দিয়ে দরকার আছে কিছ‍ু?'

'একট‍ু তো আছেই। কর্তা এক বাক্স টফি পাঠিয়েছেন কিনা।'

'ফেরত নিয়ে যান।'

'কালীচরণ কোথায় আছে বলতে পারেন?'

'না।'

'সেও বোধহয় এখানেই থাকে কী বলেন?'

'আপনার সঙ্গে কথা বলার সময় নেই আমার।'

'ঐ লোকটাকে পেলে আস্ত গিলবেন আমাদের কর্তা।'

'আপনার বোধহয় জানা নেই, ভয় নামে কোনো বস্তু কালীচরণ জানে না। দরকার বোধ করলে কালীচরণও আপনাদের কিছ‍ু শিক্ষা দিয়ে দিতে পারবে।'

'তাই নাকি?'

'সরে দাঁড়ান, ঘরে যাবো।'

'তা হ'লে কথাটা শেষ করি, কর্তা প্রস্তাব পাঠিয়েছেন তিনি চান আবার তাঁর স্কুলে যোগদান করুন।'

'না।'

'প্রাইমারী সেকশনটা সম্প‍ূর্ণভাবে তিনি আপনার হাতে তুলে দিতে চাইছেন।

'আমার কোনো প্রয়োজন নেই।'

'কিসের প্রয়োজন নেই? চাকরীর?'

'হ্যাঁ।'

'সব ভার কি তা হ'লে আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবই—'

'হ্যাঁ।'

'মানে, বেশ ভালো [illegible]—'

'হ্যাঁ।'

'ক' রাত যেতে হয়?'

'চ‍ুপ কর‍ুন।'

না, বলছিলাম—'

'একটা কথা নয়।'

'আমাদের কর্তা যদি তার চেয়েও বেশী টাকা—'

'ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে ব'লে গ‍ুণ্ডাদের যেভাবে টিট করতে হয়, তাই করবো।'

'এতোদ‍ূর?'

'তার চেয়েও বেশী দ‍ূর। ভুলে যাবেন না, দেশে আইন আছে, আদালত আছে।'

'এবং আপনি সে সবের দেখা পেয়েছেন।'

'ঠিক তাই।'

'আচ্ছা আসি তা হ'লে। সময় মতো দেখা হবে আবার।'

একদলা থ‍ুত‍ু ফেলে হন হন ক'রে চলে গেল স‍ুরেন পৈত।

রান্নাবান্না উন‍ুনে সব ফেলে ঘরের মধ্যে ঢ‍ুকে লক্ষ্মীর মা দিশাহারা ভয়ে দরজা বন্ধ ক'রে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন স্থির হয়ে।

৩৮

কিন্তু এটা তাঁর ভয় পেয়ে ল‍ুকিয়ে থাকার সময় নয়। ভয় পেয়ে এই বস্তির ঘরে ল‍ুকিয়ে তিনি তাঁর কিছ‍ুই রক্ষা করতে পারবেন না। মান, সম্ভ্রম, নারীত্ব, সন্তান, সব—সব ধ'রে এবার টান দেবে এরা। যে কোনো স‍ুযোগের অপেক্ষায় এখন ওত পেতে থাকবে, প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ নেবার ভীষণ চেষ্টায় সতর্ক থাকবে। উন‍ুনের আগ‍ুনে খড় গ‍ুঁজবে এই লোকটা।

লোকটা ঠিকই বলেছে, মল্লিকবাড়ির মচ্চী ম‍ুন্দাফরাশ এলেও এরা কাঁপন করবে, এই বস্তির লোকেরা। না, এই বস্তির একটি লোকও বিপন্ন হলে সহায় হয়ে দাঁড়াবে না তাঁর পক্ষে। এখানে তাঁর কেউ বন্ধ‍ু নয়, স্বজন নয়, সমকক্ষ বা সহযোগী নয়। এখানে তিনি তেল আর জলের মতো আলাদা হয়ে ভেসে আছেন। এখানে তিনি একটা স্বতন্ত্র জীব মাত্র, যাঁর প্রতি এদের কৌত‍ূহলের দরজাই শ‍ুধ‍ু নিত্য অবারিত।

তা হলে? তা হলে এখন তিনি কী করবেন? কী করতে পারেন? কী করা উচিত?

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের দোহাই দিয়ে তাড়িয়েছেন তবে কি সত্যিই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের দরজায় গিয়েই ধর্না দেবেন? কেঁদে পড়বেন বিপন্নকে রক্ষা করার আবেদন নিয়ে? সত্যিই কি আইন আদালতের সাহায্য চাইবেন? কী করবেন? কী করবেন?

কিন্তু তার মতো একজন অনাথ অসহায় মহিলার কথায় বিশ্বাস করবেন কেন তিনি? কেন সাহায্য দিয়ে নিজের সময়ের অপচয় করবেন? কেউ তা করে না। ইনিও করবেন না। বরং শহরের শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তিটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উল্টে স‍ূর্যনারায়ণের কথাকেই অভ্রান্ত বলে মনে করবেন। ভাববেন ওরা নয়, তিনিই ব‍ৃথা সম্মানিত ব্যক্তিদের নামে কলঙ্কলেপন করে কিছ‍ু লাভ করতে চাইছেন। যেমন খবরের কাগজে অনেক সময়ে সে রকম অনেক দ‍ুশ্চরিত্র মেয়ের কথা পড়া যায়।

কিন্তু তব‍ু, তব‍ু তিনি চেষ্টা করবেন। নালিশ জানাবেন। কেন জানাবেন না? এ জেলার তিনিই প্রভু, এ জেলার প্রত্যেকটি অধিবাসীকে আপদে বিপদে রক্ষা করা তাঁর কর্তব্য। সে কর্তব্য যদি তিনি পালন না করেন, সেটা হবে তাঁর অপরাধ। অন্যায়। হ্যাঁ, আমি যাবো, নিশ্চয়ই যাব, নিশ্চয়ই তিনি আমার দ‍ুঃখ ব‍ুঝবেন। আমি যে কতো হতভাগ্য নিশ্চয়ই জানাবো তাঁকে। নিশ্চয়ই। আর তিনি তো অচেনা নন। কালীচরণ কাজ করে তাঁর কাছে, লক্ষ্মীকে তিনি ভালোবাসেন, সেই পরিচয়ের দাবি নিয়েই আমি দাঁড়াবো গিয়ে।

ভাগ্যক্রমে সেদিন একট‍ু তাড়াতাড়িই ফিরে এলো কালীচরণ।

লক্ষ্মীকে দিয়ে যেতে এসেছে। দ‍ুপ‍ুরে বাড়ি এসেছিলো একবার, আর ওকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি চলে গেছে সঙ্গে। আজকাল ওকে না নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে। কান্নাকাটি চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় করে তোলে না নিয়ে গেলে। এখন

লক্ষ্মীর মা হাল ছেড়ে দিয়েছেন। আর কালীচরণও বলে, 'থাক না মা, বাবু ওকে খুব ভালোবাসেন। বরং না গেলেই বারে বারে জিজ্ঞাসা করেন।

'তুমি এসেছ কালীচরণ?' দরজা খুলে দিয়ে লক্ষ্মীর মা প্রায় রুদ্ধস্বর হলেন।

কালীচরণ ব্যস্ত হয়ে বললো, 'কেন মা? কী হয়েছে?'

'সুরেন পৈত এসেছিলো।'

'সুরেন পৈত?'

'হ্যাঁ।'

'এখানে?'

'হ্যাঁ।'

'এখানেও ধাওয়া করেছে সে? কী কইরে সে জাইনলো আমরা এইখেনে আছি? ঠিকানা পেইল কোথায়?'

'সেদিন যে সকালবেলা তোমার মনিব গাড়ি করে লক্ষ্মীকে পোঁছে দিতে এসেছিলেন তাইতেই টের পেয়েছে। বাজার করে নাকি এই পথে ফিরছিলো, গাড়ি থেকে লক্ষ্মীকে নামতে দেখেই খোঁজ করেছে।'

'কী গুণ্ডা, কী পাজী! কী বদমাশ!'

'কালীচরণ—'

'কী বইললো হারামজাদার বাচ্চা?'

'আমি জানি না কালীচরণ, আমি শুধু বুঝেছি আর আমার কোনো উপায় নেই।'

'আবার অপমান কইরেছে?'

'আর আমার কী প্রাপ্য আছে ওদের কাছে?'

'ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি।'

'কোথায়?'

'আর নয়। এইবার একটা ফয়শালা কইরতেই হবে কুত্তাগুলানের সঙ্গে। ঘেউ-ঘেউ করলে লাঠির ঘা-ই উয়াদের ঔষধ। এবার আর লাঠি নয়, আমি এবার গলা টিপে ধইরবো।'

'না, না—'

'তুমি জান না মা, ফেউ যখন দেখা দিইয়েছে, বাঘও আইসবে সাথে সাথে।'

'হ্যাঁ। সূর্য মল্লিকও এসেছে।'

'এইখেনে এইসেছিলো?'

'না। কলকাতা থেকে এসেছে। ওকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে, আমি আবার স্কুলে কাজ করতে রাজী কিনা।'

'তুমি কি বইললে?'

'আমি বেরিয়ে যেতে বললুম।'

'তারপর?'

'কিছুতেই যায় না।'

'শেষে?'

'শেষে আমি তোমার মনিবের নাম করে ভয় দেখালুম।'

'ঠিক। ঠিক কইরেছ। উয়াদের শাসন মনিবের হাতেই ছেইড়ে দেব। মনিবই এর বিহিত করবেন। কিন্তু আমার কী ইচ্ছে কইরছে জানো, একটা খুন কইরে ফাঁসি যেতে। কিন্তু মা গো, তোমার জন্য আমি তা

পাইরবো না। আমি না থাইকলে তোমার বাড়া ভেইঙে যাবে, মোষ গরু সব উদাইমে ঢুকে ঘরে ঢুইকবে। না, আমি নিজে হাতে পাইরবো না, কিন্তুক, মনিবকে দিয়ে সব করাবো। আমি এখুনি চইললাম।'

'কালীচরণ—'

'মনিবের আজ কোথায় নিমন্তন্ন আছে গো মা, তাড়াতাড়ি যান, উনি বেইরিয়ে গেলেন নইলে।'

'কালীচরণ, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।'

'তুমি যাবে? তুমি যাবে? তবে তো খুবই ভালো হয় মা। নিজের কষ্ট তুমি যতো ভালো কইরে নিবেদন কইরতে পাইরবে, আমি তো পাইরবো না। আর আমার রাগ বেশী, আমি বইলতে বইলতে ক্ষুব্ধ হইয়ে হয়তো সব নষ্ট কইরে দিব। তাই ভালো, তুমিই চলো।'

'তোমার মনিব তো শুনেছি খুব ভালো লোক, তিনি নিশ্চয়ই আমার কথা বিশ্বাস করবেন।'

'সে আমি হলপ কইরে বইলতে পারি। আমার মনিবের তুলনা নেই। তা হলে তুমি প্রস্তুত হইয়ে নাও।'

'হাঁ।' লক্ষ্মীর মা দেয়ালে টাঙানো আয়নার কাছে দাঁড়ালেন এসে। চুলে জট পড়েছে, একটু পরিচ্ছন্ন হয়ে নিতে হয়। শাড়িটাও পালটাতে হবে।

বারান্দায় বসে কালীচরণ গজরাতে লাগলো। 'আমি তো উয়ারে হাড়ে হাড়ে চিনি, কেন চিনবো না। কোলে কাঁখে কইরে মানুষটা কইরলো কে? শেষে তুই এই হইয়ে গেলি? তুই না মেজমার ছেইলে? ছি, ছি, ছি! কী দুঃখ, কী লজ্জা! কতো মেয়ের আর সব্বনাশ কইরবি শুনি? কতো পাপ কইরতে তোর জন্ম হইয়েছিলো রে?'

সামান্য একখানা ইস্তিরি করা চওড়া পাড় তাঁতের শাড়ি পরে, মাথা আঁচড়ে, চটি পায়ে বেরিয়ে এলেন লক্ষ্মীর মা। তাঁকে লক্ষ্মীপ্রতিমার মতোই দেখাচ্ছিলো। বললেন, 'কী বলছো তুমি একা একা?'

'কী আর বইলবো।' কালীচরণ কপাল চাপড়ালো, 'বইলছি মানুষের অদেষ্টর কথা। নিজের হৃদয়ের কথাও বইলছি। তুমি বুইঝে দেখ, একটা টান তো আছেই বটে! একদিন তো আপন বুইকে কইরেই ঘুইরে বেইড়েছি। এইটুকুন বাচ্চা, আর কী সোন্দোর। মমতা কি যায় গো মা? কিন্তু এও জানি, ওর সাজা হওয়াই দরকার। হেন কম্ম নেই, ও না পারে। কতো মেয়েকে ধুলোয় মিশিয়ে দিল ও। এখন এই যে তোমার উপরে নজর দিইয়েছে, এ আমি ভালো দেইখছি না। ধর গে, আমি তো বাড়ি থাকি না সারা বেলা, কখন এইসে রমরমিয়ে কী কইরবে, কে বইলতে পারে? তক্কে তক্কে থাইকলে একদিন না একদিন নাগালের মধ্যে পাবেই? তখন? উয়াকে হয় আমার খুন কইরতে হবে, নয় কর্তার কাছে নালিশ জানিয়ে হাজত বাস করাতে হবে।' কালীচরণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো, 'এ কি আমার পক্ষে কষ্টের নয়?'

লক্ষ্মীর মা আপন অন্তর দিয়ে কালীচরণের অন্তরটা বুঝতে পেরে চুপ করে রইলেন। তারপর দরজায় তালা বন্ধ করতে করতে বললেন, 'সে তো নিশ্চয়ই।'

পথে বেরিয়ে কালীচরণ বললো, 'জগৎ আলো করা রূপ তোমার মা। এই লাল-পাড় শাড়িতে যেন দেবীর মতো দেখাচ্ছে। আমার মেজ মাও এমনই রূপবতী ছিলেন।'

আঙুল ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছিলো লক্ষ্মী। মা আর কালীদাদার সঙ্গে আবার বেড়াতে যাচ্ছে ভেবে খুব ফুর্তি হয়েছিলো তার, কালীচরণ তাকে কোলে তুলে নিল।

বস্তির গলি ছাড়িয়ে বড়ো রাস্তায় পড়তেই সাইকেল-রিকশা এগিয়ে এসেছিলো, বারণ করলেন লক্ষ্মীর মা। বললেন, 'না, না, রিকশা দিয়ে কী হবে, আমি হেঁটেই যাবো।'

কালীচরণ বললো, 'তুমি পারবে না মা। দূর তো কম নয়।'

'পারবো কালীচরণ। আমি এর চেয়েও দূরে দূরে হাঁটি। লক্ষ্মীকেও নামিয়ে দাও, ও-ও হাঁটুক। এই তো গঙ্গার ধারে ধারে চলে যাবো। কোর্টের কাছেই তো তোমাদের কুঠি?'

লম্বা সড়ক, এঁকেবেঁকে চলে গেছে হাসপাতালের পাশ দিয়ে। তিনি দ্রুত পা চালালেন। কিন্তু হাঁটতে তাঁর সত্যিই কষ্ট হচ্ছিলো, শরীর খারাপ লাগছিলো। বড়োবাজার ছাড়িয়ে গঙ্গার ধারে আসতে আসতে প্রায় হাঁপাচ্ছিলেন তিনি।

শেষ পর্যন্ত পৌঁছুলেন এসে। মস্ত ফটকের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে কালীচরণ বললো, 'চলো মা, পিছনের দিক দিয়ে যাই। বাবু বোধ হয় ভিতরের ঘরে আছেন। এখনো যখন গাড়ি দেখছি না, তখন বেরুতে নিশ্চয়ই দেরি আছে।'

বাগান পেরিয়ে জামগাছের তলা দিয়ে তাঁকে নিয়ে কালীচরণ রান্নাঘরের সামনে চলে এলো। খাবার-ঘরের নীচের সিঁড়িতে থেমে বললো, 'বাবু দেখছি বসবার ঘরেই রইয়েছেন। আমি খবরটা দিই আগে, তুমি একটু দাঁড়াও।'

লক্ষ্মীর মা সভয়ে মেয়ের হাত ধরে বললেন, 'ওকে রেখে যাও।'

লক্ষ্মী শক্ত হয়ে রইলো কালীচরণের কাছে, মার কাছে থাকবে না সে। কালীচরণ বললো, 'এক্ষুনি তো আসবো, আমি ওকে নিয়ে বৃন্দাবনের ঘরে বসবো গিয়ে, তুমি নিরিবিলিতে ভালো কইরে বইলতে পাইরবে সব কথা।'

নিরিবিলিতে! বুকটা থরথর করে উঠলো ত্রাসে। মনে হ'লো দৌড়ে ফিরে যান আবার বস্তির ঘরে।

আকাশে মুখ তুলে তাকালেন তারপর—পুঞ্জ পুঞ্জ তারার দিকে তাকিয়ে একটা নির্দিষ্ট তারাকে খুঁজলেন, ছেলেবেলায় বাবা বলতেন, 'আমি মরে গেলে আকাশে তারা হয়ে ফুটে থাকবো, তুই তাকালেই দেখতে পাবি আমি তোকে চোখ টিপছি; তখন তুই জানিস আমি আছি; তোর সব বিপদে আমি আছি।'

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

আলোয় কালোয়

ত্রিশঙ্কু

—[illegible] আছে। [illegible] গেছে।

হয়েছিল: এর মধ্যে ভরে গেছে।

শরণার্থী কোথা থেকে আসছে?

—খ—তাই তো। নতুন কে কে ভরতি হয়েছেন, হাত তুলুন।

(ঙ ও চ ছোট ছোট হাত তুললো)

ক—বেশ বেশ। নমস্কার।

খ—কেমন লাগছে এই দুনিয়াটা?

ঙ—আমায় বলছেন? বেশ ভালো। ঠাণ্ডা, আরাম, হাত-পা মেলার অজস্র জায়গা। তবে বড়ো তীব্র আলো। চোখে লাগে।

ক—আর চ, আপনার?

চ—দূর! আমার একদম ভাললাগছে না।

বয়স নিয়ে অহংকার করার মতো আত্ম-প্রবঞ্চনা বোধ হয় আর নেই। বয়স মানুষকে অভিজ্ঞ করে নিশ্চিত, কিন্তু [illegible] সীমা পর্যন্ত এবং পাণ্ডিত্যের সঙ্গে [illegible] কিছু অহংও বাড়িয়ে দেয় রোজ—এই সহজ সত্যটা প্রবীণরা বুঝতে চান না। তাই তো প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক যুগে প্রতিদিন [illegible] অপ্রিয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমাদের দেখতে হয়। এসো তোমরা হাল ধরো হে [illegible]—উৎসাহীরা হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে, গুরুজনরা সসম্মানে [illegible]। কিন্তু 'তোমরা কে হে ছোকরা, কী চাও?' বললে তারাই শেষ [illegible] কেড়ে নেয়। সে লাঞ্ছনার দুঃখ বড়ো করুণ।

বয়সের প্রত্যেক স্তরে একই ঘটনা। যুবক প্রৌঢ়কে পাত্তা দেয় না; প্রৌঢ় যুবার [illegible] সন্দেহে নাক সিঁটকোন; যুবা অহংকারে উড়িয়ে দেয় কিশোরকে; আবার কিশোর বালককে চাঁটি মারে; বালক শিশুকে মানুষ বলেই গণ্য করে না। শিশুকে আমরা কেউই মানুষ ব'লে গণ্য করি না, বাস্তবিক। ওরা অসহায়, ওরা অবোধ, ওরা নিষ্পাপ। অন্তত আমাদের তাই ধারণা। এই ভুল ধারণা আমারও থেকে যেত যদি না গতকাল মধ্যরাত্রে একটি দৃশ্য স্বচক্ষে দেখতাম।

একটি ছোট নার্সিং হোম। বসার ঘরটা পার হয়ে গেলেই সামনে নার্সদের অফিস। তার পাশে কাচ দিয়ে ঘেরা বড় ঘর একটা—সদ্যোজাত শিশুদের ক্রেশ। বাইরে থেকে দেখা যায় দাঁড়ের মতো ছ'টি ছোট ছোট দোলনা পাশাপাশি, পাখার হাওয়া লেগে ঈষৎ দুলছে। রাত আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ ওদের পরিষ্কার করিয়ে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে সেবিকারা বিশ্রাম করছে বাইরে। কান্নার শব্দ পেলে ভেতরে যাবে।

তখন রাত এগারোটা বেজে গেছে। চুপ-চাপ। রোগীরা নিজের নিজের ঘরে বা ওয়ার্ডে শুয়ে ঘুমোচ্ছে—বা ঘুমোচ্ছে না। অন্য কারণে আমি বাইরে বসার ঘরটায় পায়চারি করছিলাম। কী রকম কৌতূহল হল, ক্রেশটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম একবার, এবং তখনই মৃদু আলোয় ভেতরের এক অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখলাম।

অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখলাম

সন্ধেবেলাতেও যারা ছোট্ট রোগা লালচে শরীর নিয়ে উলটে-দেওয়া পোকার মতো হাত পা নাড়ছিল, দন্তহীন মুখটি খুলে অস্বস্তি জানাচ্ছিল—তারা সবাই দোলনায় উঠে বসে আছে সটান! তিনজন করে দুই সারিতে ছ'জন প্রায় মুখোমুখি ব'সে যেন মীটিং করছে। সবাই ওরা দেখতে এক রকম। ওদের কথোপকথনের বিবরণ দিতে হলে একটা কোনো নামকরণ দরকার। বাঁ দিক থেকে পেছনের সারিতে ধরা যাক ক, খ ও গ,—এবং সামনের সারিতে ঘ, ঙ ও চ।

ক—ব্যাপার কী, আজ যে দেখছি হাউস ফুল।

ভেতরে বেশ ছিলাম। নরম অন্ধকারের মধ্যে, কোনো পরিশ্রম নেই, ক্লান্তি নেই। একলা। এ কোথায় এলাম! এখানে বড়ো ভিড়।...জানেন, আমি বেরুতে চাইনি। যতবার বাইরে থেকে আমার ঘাড় টিপে নামাবার চেষ্টা করেছে ওরা, আমি পিছলে সরে গেছি, পালিয়ে গেছি এদিক ওদিক। হারামজাদারা সিঁদ কেটে ঢুকে আমায় টেনে আনলো।

গ—যাক গে, আর তো কোনো উপায় নেই। এখন কি ফেরবার পথ আছে? সুতরাং সমবেত ভদ্রমণ্ডলী আসুন, আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এখনই ঠিক করে ফেলি। কয়েকদিনের মধ্যেই ওরা আমাদের ছত্রভঙ্গ করে দেবে। নিয়ে যাবে যে যার কয়েদখানায়। বিভিন্ন ছাঁচে ফেলে আমাদের তৈরী করতে চাইবে। নিজেদের ভাষা শেখাবে; ভালোমন্দ উচিত-অনুচিত, পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে নিজেদের তৈরী ওষুধ গেলাবে এন্তার। বলা যায় না, আমরা অনেকেই হয়ত প্রাণের দায়ে মেনে নেবো সেই বন্দিত্ব। তার চেয়ে বরং...

—খ—ঠিক ঠিক। এখনই আমাদের একটা ছোট মতন পঞ্চাশ-শালা পরি-কল্পনা ফেঁদে নেওয়া দরকার। আমরা যে যেখানেই থাকি, যে ভাষাই শিখি, আজকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করবো। আমার প্রস্তাব, যে ধেড়েগুলো আমাদের ডেকে এনেছে, তাদের স্কন্ধে ভর করে গা ভাসিয়ে দেবো হাত-পা ছেড়ে। ঢের কষ্ট সয়েছি, আর না।

ক—কিন্তু ওরা তো চিরকাল থাকবে না। কিছু দিন পরেই তো ওদিকের দরজা দিয়ে

কথা শুনবো না, কাঁদবো

বেরোতে শুরু করবে এক-এক করে। তখন?

খ—আহা, সামান্য কথাটা বুঝছেন না আপনি। ওরা তো কিছু নিয়ে যেতে পারবে না সঙ্গে। আমাদের মতন ন্যাংটা হয়েই বিদেয় হবে। তখন ওদের ছেড়ে যাওয়া জিনিসপত্র অধিকার করবো। ভোগ করবো নিশ্চিন্তে। নির্ভর করে থাকার মতো আরাম...

ঘ—আমি এ প্রস্তাব সমর্থন করছি। আমিও আরাম চাই। সাজবো-গুজবো—ঘুরঘুর করবো। অকারণ দৌড়-ঝাঁপ ক'রে সুস্থ শরীর ব্যস্ত করার মতো ঝামেলা—

গ—(উত্তেজিত) খ আর ঘ, আপনারা দুজনেই চুপ করুন তো। বড়োলোকের মেয়ে হয়ে জন্মেছেন, আপনাদের ভাবনা কি? কারো-না-কারো কাঁধে চেপে থাকবেনই। তা ছাড়া খ-এর মতো রং আর ঘ-এর মতো ফিগার থাকলে কোনো মেয়েকেই নিজের ভবিষ্যৎ ভাবতে হয় না। (চাপা স্বরে গুঞ্জন—কী অসভ্য!) কথা হচ্ছে আমরা যারা পুরুষ, যারা সংগ্রামী, তাদের সম্পর্কে প্রধানত।

চ—(ক্ষুদে চোখ দুটো কপালে তুলে) প্রতিশোধ চাই আমরা। এই আলো বাতাস সুগন্ধ ও রুক্ষতা ভরতি মেলায় এনে যারা আমাদের হাত ছেড়ে দিয়েছে, মজা দেখাবো তাদের। বিরক্ত করবো পদে পদে, কথা শুনবো না, কাঁদবো, জিনিসপত্র ভাঙবো—একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলবো ওদের জীবন। অসহায় অবস্থাটা কাটুক একটু।

ঙ—এ কোনো কাজের কথা নয়। কেন বলছেন এমন কথা? কী সুন্দর এই বাইরের জগৎটা, দেখুন। আলো একটু বেশি এই যা। চোখে একবার সয়ে গেলে তারপর খুব ভালো লাগবে। আমার কোনো রাগ নেই ধেড়েদের ওপর। ওরা চেয়েছিল বলেই তো এসেছি আমরা। আবার কৃতজ্ঞতাও নেই—তার মানে, নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনেছে বলে যেমন খুশী তেমনি চালাবে, আমি মানি না। আমি নতুন লোক, অনেক দিন বাঁচতে চাই। বাইরের দুনিয়াটা কত বড়ো, কত দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে দেখতে চাই। ঢের জিনিস রয়েছে, চেখে-চেখে ভোগ করতে চাই সব।

ক—(নেতার ভঙ্গীতে) আপনারা অদ্ভুত মানুষ আপনারা! প্রত্যেকে বাঁচার চিন্তা করছেন! চারদিকে এত সব কী দেখতে পেলেন বলুন তো? এই যে দোলনা-গুলোতে আমরা বসে আছি [illegible] নাড়িয়ে দিলে দোলে না, অথচ ওপরের পাখাটা আপনি-আপনি ঘুরছে: [illegible] আরো একটু সবুজ হওয়া উচিত ছিল। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী, আপনাদের কারো কি একবারও মনে হয়নি, বোতলের মধ্যে পুরে যে বস্তুটি ওরা বারবার খাওয়াচ্ছে, তা বিস্বাদ, তার চেয়ে সুস্বাদু খাদ্য আছে, আমরা পাচ্ছি না? আসল কথা, বাইরের জগৎটায় সবই আছে, ঠিকঠাক গোছানো নেই। বড়ো এলোমেলো, অব্যবস্থা। আপনাদের সবার চেয়ে আগে তো আমি এসেছি। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি—ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার। আমার প্রস্তাব, পঞ্চাশ-শালা পরিকল্পনার মূল সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত—যতটা পেরেছি, ঠিক আছে। কিন্তু ক্রমে সব আয়ত্তে আনতে হবে। ধেড়েদের রুচি ও মর্জির ওপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। ওদের কবল থেকে একবার বেরোতে পারলেই আমরা নিজেদের বাসযোগ্য ও সকলের মনের মতন পৃথিবী তৈরী করে নেবো। পরিশ্রম করতে হবে, ঝুঁকি নিতে হবে—সাহস চাই। আমরা দ্বিধা করবো না। ধেড়েদের ক্ষমতা কেড়ে নিতে দরকার হলে চেঁচামেচি-হট্টগোল করতে হবে। খ এবং ঘ—আপনারা আমাদের সংগ্রামে উৎসাহ যোগাবেন—যেখানেই থাকুন—কথা দিন। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, আপনারা একসঙ্গে বলে উঠুন —"মনের মতন ব্যবস্থা চাই"।

(সমবেত কণ্ঠ শোনা গেল—
ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া)

অমনি চিৎকার শুনে হন্তদন্ত হয়ে একজন নার্সকে ছুটে আসতে দেখে ওরা ঝুপঝুপ করে শুয়ে পড়লো বিছানায়। যেন কিছুই হয়নি। শুধু চ তার দন্তহীন মুখটি অবোধ নিষ্পাপ শিশুর মতো খুলে কান্নার ভান করছে। নার্স তুলে নিল ওকে, চাদর-বালিশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে পরীক্ষা করলো—ভিজেছে কি না। সব ঠিক আছে। তা হলে হয়তো স্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠেছে, এই ভেবে দোলনায় আবার দিল শুইয়ে। জোরে জোরে দোল দিতে লাগলো।

জানলার সামনে থেকে আমি নিঃসাড়ে সরে এলাম। যেন কিছুই দেখিনি।

চিত্র প্রদর্শনী

অ্যাকাডেমি ভবনে সম্প্রতি শিল্পী অমল চাকলাদার তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। শিল্পী তরুণ, ১৯৬০ সালে সরকারী আর্ট কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ইতিপূর্বে কয়েকটি প্রদর্শনীতে শিল্পীর কাজ আমার চোখে পড়ে। বর্তমান প্রদর্শনীতে তিনি গত দশ বছরে আঁকা বিভিন্ন রচনা থেকে নির্বাচিত ২৭টি ছবি ও কয়েকটি স্কেচ পেশ করেন। এটি শিল্পীর প্রথম একক প্রদর্শনী। এর মধ্যে দুখানি

অভিসার —অমল চাকলাদার

ছবি সম্প্রতি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত প্রদর্শনীতে দেখা যায়।

অমল চাকলাদার প্রধানত প্রথাগত রীতির পক্ষপাতী, তাঁর মাধ্যম টেম্পারা। তবে এ প্রদর্শনীতে কয়েকটি আধুনিক রচনার নিদর্শনও দেখা যায়। সব দিক দিয়ে বিচার করলে মনে হয়, শিল্পী ভারতীয় তথা প্রথাগত গণ্ডীর মায়া কাটিয়ে সমসাময়িক যুগের উপযোগী রচনায় সচেষ্ট হয়ে নানা পরীক্ষা করে চলেছেন, এবং অনেক ক্ষেত্রে তিনি প্রথাগত ও আধুনিক রীতির সমন্বয় করার চেষ্টা করছেন। তবে যে স্থলে শিল্পী বহির্জগতের কোনও বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন সেখানেই তিনি সফলতা লাভ করতে পারেন নি। তা ছাড়া তাঁর রচনায় অনেক ক্ষেত্রে অহেতুক অলঙ্কারপ্রীতির আভাস পাওয়া যায়। যেমন দি রিচ অ্যান্ড দি পুওর। কয়েকটি আধুনিক উচ্চ ইমারতের পুরোভাগে শিল্পী দরিদ্রের বাসোপযোগী কয়েকটি আবাসস্থল এঁকে দুটি সমাজের জীবনযাত্রার পার্থক্য বোঝাতে চেয়েছেন। স্থাপত্যধর্মী ছবিখানি কিন্তু রসোত্তীর্ণ হয় নি। পুরোভাগের আবাসগুলি সুবিন্যস্ত ও আলংকারিক গুণে ভারাক্রান্ত—ফলে শিল্পীর মনোভাব এখানে প্রকাশিত হয় নি। এ ভিলেজ বিহাইন্ড দি ওয়াল-ও পারিপ্রেক্ষিতের দিক দিয়ে সার্থক রচনা নয়। প্রকৃত কথা এই যে, বহির্জগতের বিষয়বস্তুর রূপ উপলব্ধি করে শিল্পী সঠিকভাবে সেগুলিকে নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন না। তবে যে স্থলে তিনি বিশেষ কোনও মনোভাব ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন সেখানেই তিনি আশাতীত সুফল লাভ করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই অভিসার-এর নাম করা যায়। রূপসী, রহস্যময়ী রাত্রি। আকাশের বুকে যেন স্তরে স্তরে মেঘদল শয্যা বিছিয়ে দিয়েছে। জ্যোৎস্নার রূপালী আলোকে যেন চারিদিক ঝলমল করছে। আর তারই মধ্যে সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ মেঘের মায়াজালের মধ্যে মিলনবাসরশয্যা রচনা করে আকুল আগ্রহে বসে আছে এক তরুণী তার প্রিয়তমের অতি পরিচিত পদক্ষেপ শোনার আশায়। রচনাটি রূপকথা-জাতীয়—অনেকের মনে গাঁথা হয়ে থাকবে। আধুনিক রচনার মধ্যে চতুষ্কোণ রীতিতে আঁকা কিং অব দি ডার্ক চেম্বার এবং বিশেষ করে দি ডিভাইন ফেস চোখে পড়ে। আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা রেড ফিশেস। ছোট হলেও বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গিমার জন্য কয়েকটি স্কেচ নজরে পড়ে। অভিসার-জাতীয় ছবি দেখে এ. এ. রাইবার রচনারীতির কথা মনে পড়ে যায়। তা হলেও অমল চাকলাদারের প্রতিভা আছে। আশা করি, নানা পরীক্ষা মাধ্যমে অচিরেই তিনি যুগোপযোগী পথের সন্ধান পেয়ে যাবেন।

*

শিল্পী রাজ বর্মাও অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। মাত্র কয়েক মাস পূর্বে অনুষ্ঠিত এই শিল্পীর প্রদর্শনী যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে, গত কয়েক মাসের মধ্যে শিল্পীর মানস ও রচনারীতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মাধ্যম হিসাবে শিল্পী এবার ব্যাপকভাবে তেলরঙ ব্যবহার করেছেন এবং প্রধানত রঙকে কেন্দ্র করেই নানা বিমূর্ত বা প্রায়বিমূর্ত রচনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। ইতিপূর্বেও বলেছি এবং এখনও বলি যে, অল্পকালের মধ্যে বারবার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা তাঁরই সাজে, যে শিল্পী নতুন বা বিশিষ্ট কোনও পথের সন্ধান পান। এ শিল্পীর কাজ দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, আপনার খেয়াল ও খুশিমত তিনি রঙ রেখা মাধ্যমে নানা পরীক্ষা করে গেছেন। ফলে, কোনটিই ঠিক শিল্পপদবাচ্য হয়ে ওঠে নি। তার ওপর এবারে তিনি রচনাক্ষেত্রের পরিধিও বাড়িয়েছেন। সকলেই জানেন, বিমূর্ত রচনায় শূন্যস্থান সঠিকভাবে সুবিন্যস্ত করা অতীব দুরূহ, অভিজ্ঞ শিল্পী ছাড়া কেউই এ-হেন কঠিন কাজে হস্তক্ষেপ করতে চান না। অর্থাৎ খেয়ালমত বৃহৎ রচনাক্ষেত্রটি এক বা একাধিক রঙে ভরিয়ে ফেলে দুই একটি আকার সৃষ্টি করলেই বিমূর্ত রচনা হয় না। শিল্পী রাজ

কালী —রাজ বর্মা

বর্মা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, ফলে অধিকাংশ রচনাই এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। তবে শিল্পীর কাজের মধ্যে চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। এই চিন্তাধারা বজায় রেখে শিল্পী যদি আরও কয়েক মাস গভীরভাবে রঙ, রেখা ও শূন্যস্থান নিয়ে পরীক্ষা করে যান তা হলে অবশ্যই তিনি সুফললাভ করবেন এবং চিন্তাধারা ও প্রকাশভঙ্গিমার সমন্বয়ে সত্যকার শিল্প সৃষ্টি করতে পারবেন। প্রদর্শনীতে একটি রচনা চোখে পড়ে—বাই নাইট। রঙ ও আকার সংমিশ্রণ-গুণে এটি অনেকেরই ভাল লাগে। অপরাপর রচনার মধ্যে কালী উল্লেখযোগ্য।

*

পার্ক হোটেলে নিজ নতুন অফিস ভবনে সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব আর্ট ইন ইনডাস্ট্রির বিজ্ঞাপন ও ফলিত শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। উদ্বোধন করেন পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর।

ফলিত শিল্প ও শিল্পচর্চায় এই সংস্থার অবদান সর্বজনবিদিত। বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে লুপ্তপ্রায় পুরানো ও একদা প্রচলিত নানা মোটিফ তথা প্রতীক দেশের নানা স্থান থেকে উদ্ধার করে সমসাময়িক যুগের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী সেগুলিকে শিল্প মাধ্যমে নতুনভাবে প্রয়োগ করে এই সংস্থা সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। দেশের বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান এই সংস্থার সভ্য। বলা বাহুল্য, তাঁদের ও এই সংস্থার সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই দেশের ফলিত শিল্প আজ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। বর্তমান যুগে বিভিন্ন ফ্যাক্টরীতে কেবল ভোগ্যবস্তুর উৎপাদনই একমাত্র কথা নয়—সেই সঙ্গে প্রয়োজন ব্যাপকভাবে যুগোপযোগী, রুচিসম্মত বিজ্ঞাপন, প্রচার-পত্র তথা তথ্য প্রকাশন ও বিতরণ। ইনস্টিটিউট অব আর্ট ইন ইনডাস্ট্রি এ বিষয়ে সচেতন ও গত কয়েক বৎসর যাবৎ নানা শিল্পক্ষেত্রে শিল্পীদের উৎসাহ ও সাহায্য দান করে আধুনিক বিজ্ঞাপন তথা প্রচার-পদ্ধতির মান উন্নত করেছেন। প্রদর্শনীতে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন, প্রচার-পত্র, তথ্যপুস্তিকা, ক্যালেণ্ডার, প্রতিষ্ঠান পত্রিকা (house journal) ও পুস্তকাদি পেশ করা হয়। অক্লান্ত পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে কর্তৃপক্ষ প্রায় এক হাজারের ওপর প্রচার সম্বন্ধীয় নানা নিদর্শন পেশ করেন; তবুও কর্তৃপক্ষের প্রদর্শনীসজ্জা রুচির তারিফ করতে পারলাম না। প্রদর্শনীতে স্থানাভাব—নিদর্শনগুলি একেবারে পাশাপাশি স্থাপিত—ফলে দর্শকের দৃষ্টি ব্যাহত হয়। শুধু তাই নয়, উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের গুরুত্বও হ্রাস পায়। তবে ফলিত শিল্পের রূপ ও মান যে আজকাল কত উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে তা প্রদর্শনীভুক্ত নানা নমুনা দেখেই বোঝা যায়। শুধু তাই নয়, ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রচারকার্য তথা বিজ্ঞাপন দেখে জানা যায় যে, পরিকল্পনা ও প্রকাশন ব্যাপারে কোনও প্রতিষ্ঠানই অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হন নি। যে সকল প্রতিষ্ঠানের কাজ বিশেষভাবে চোখে পড়ে তাদের মধ্যে টাটা টেক্সটাইল, মুকান্দ স্টীল, ফিলিপস, ডানলপ, ন্যাশন্যাল ও গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক, এয়ার ইণ্ডিয়া উল্লেখযোগ্য। অভিনন্দনপত্রের জন্য রেডিয়্যাণ্ট প্রোসেস-এর কাজ প্রশংসা দাবি করে। প্রতিষ্ঠান পত্রিকার মধ্যে ডানলপ গেজেটের নাম করা যায়।

চিত্রপ্রিয়

প্রথম বাংলা সাময়িক ও সংবাদপত্র

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

বাংলা সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের ইতিহাসের দেড় শত বৎসর পূর্ণ হল। বাংলা ১২২৫, ইংরেজী ১৮১৮ সালে প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ'-এর কিছু দিন পূর্বে সাময়িকপত্র 'দিগ্দর্শন'-এর প্রকাশ ঘটে। উভয় পত্রিকাই বাঙালীকে উপহার দেন ইংরেজ-পণ্ডিত সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যান।

বাংলা দেশে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কোন সাময়িকপত্র বা সংবাদপত্র নেই—এ অভাব প্রথম অনুভব করলেন মার্শম্যান ১৮১৮-র গোড়াতেই। পাঠ্যপুস্তক দিয়ে সীমায়িত কয়েকজনকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া যায়, কিন্তু সমগ্র দেশের মানুষের দিকে যদি তাকাতে হয়, তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির যদি উন্নতি করতে হয়, তবে অবিলম্বে সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের প্রকাশ প্রয়োজন। মার্শম্যান ১৩ই ফেব্রুয়ারি মাসিক পত্রিকা দিগ্দর্শন প্রকাশের জন্য শ্রীরামপুরে মিশনের অনুমোদন ও আনুকূল্য চাইলেন। মিশন থেকে অনুমোদন পাওয়া গেল, কিন্তু শর্ত হল এই যে, এতে কোন রাজনৈতিক সংবাদ প্রকাশ করা যাবে না এবং এমন কোন রচনা বা মন্তব্য থাকবে না যা সরকারের বিরোধী হতে পারে। এতে কেবল বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা যাবে এবং দেশীয় ছোট বড় খবর ও সাধারণ সকল সংবাদ মুদ্রিত করা চলবে।

এই নির্দেশ অনুসারেই মার্শম্যান তাঁর সম্পাদিত সাময়িকপত্র প্রকাশ করলেন। নাম হল 'দিগ্দর্শন অর্থাৎ যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ'। কোন রাজনৈতিক কারণে নয়, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বিদ্যা বিতরণের উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িকপত্র প্রকাশিত হল।

পত্রিকাটির আকার ডিমাইয়ের মত। সূচীপত্রে লেখকদের নাম থাকত না, রচনার উপরে বা নীচেও কোন লেখকের নাম প্রকাশিত হত না। দিগ্দর্শনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল বাংলা ভাষায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হওয়ার কিছু পরে স্বতন্ত্রভাবে এর একটি ইংরেজী-বাংলা সংস্করণ এবং একটি সম্পূর্ণ ইংরেজী সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা এবং ইংরেজী-বাংলা সংস্করণের প্রতি পৃষ্ঠার মাথায় মাস, বছর, রচনার নাম ও পৃষ্ঠা-সংখ্যা থাকত। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তেইশটি করে ছত্র এবং প্রতি ছত্রে গড়ে নয়টি শব্দ মুদ্রিত হত। ফোর্ম সংখ্যা ১৬, কোন সংখ্যায় বা ২৪ পৃষ্ঠা থাকত। তবে বাংলার সঙ্গে ইংরেজী অনুবাদ যুক্ত হলে পৃষ্ঠার পরিমাণ ঠিক দ্বিগুণ, অর্থাৎ ৩২ বা ৪৮-এ দাঁড়াত।

'দিগ্দর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যান

ইংরেজী-বাংলা সংস্করণে পত্রিকার বিজোড় পাতা অর্থাৎ ডান পৃষ্ঠাতে বাংলা রচনা থাকত এবং তারই পূর্বের বাম পৃষ্ঠায় সেই রচনার ইংরেজী অনুবাদ মুদ্রিত হত। বিষয়-বিন্যাসে, সম্পাদনে বং মুদ্রণ ব্যাপারে বাংলা এবং ইংরেজী-বাংলা সংস্করণের মধ্যে নানা বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এমন কি, উভয় সংস্করণে ভাষা ও পাঠের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন ও পরিমার্জন লক্ষ করা যায়। আমরা এখানে উভয় সংস্করণেও প্রথম সংখ্যার সূচী উদ্ধৃত করছি। বাংলা সংস্করণ : আমেরিকার দর্শন বিষয়, হিন্দুস্থানের সীমার বিবরণ, হিন্দুস্থানের বাণিজ্য, বলুন দ্বারা সাদলর সাহেবের আকাশগমন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বিবরণ, শঙ্কর তরঙ্গের কথা। ইংরেজী-বাংলা সংস্করণ : এই সংস্করণে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বিবরণ ও শঙ্কর তরঙ্গ শীর্ষক রচনা দুটি নেই। পরিবর্তে বিসুবিয়স পর্বত বিষয়ে একটি অতিরিক্ত প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে।

দিগ্দর্শনে নানা বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হতে দেখা যায়। তার মধ্যে ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয় বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। নিম্নে দিগ্দর্শনে প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে কয়েকটির নাম উল্লেখ করছি। যেমন : কলম্বসের বিবরণ, কোম্পাসের গুণ, হিন্দুস্থানের উৎপন্নবস্তু, পোর্তুগীশেরদের কালিকত শহরে পঁহুছনের কথা, ভারতবর্ষের স্বাভাবিক বৃক্ষ, মিসর দেশের বিবরণ, হস্তীর বিবরণ, ছাপা কর্মের উৎপত্তির বিবরণ, বিদ্যুৎ ও বজ্র বিষয়, পদার্থের অসংখ্য ভাগ, প্রতিধ্বনি বিষয়, চীন দেশের মহাপ্রাচীর, দিল্লীর রাজা কোতবুদ্দীনের বংশাবলি ইত্যাদি। প্রবন্ধগুলি পাঠ করলে বোঝা যায়, প্রত্যেক লেখকই তাঁদের রচনা চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক করে তুলতে চেয়েছেন। রচনা নির্বাচনে সম্পাদক বা সম্পাদকমণ্ডলীর বিচারবোধ ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি প্রবন্ধই তথ্যভিত্তিক কিন্তু নিতান্ত নীরস নয়। কোন কোন প্রবন্ধ কথোপকথনের ছলে রচিত হয়েছে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে পৃথিবীর আকর্ষণের বিবরণ শীর্ষক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধটির আরম্ভ এইরকম :

"গোপাল। বৃক্ষ হইতে কি কারণ ফল পড়ে।

কালিদাস। আমি শুনিয়াছি যে ইংলণ্ডের মহাজ্যোতির্বিৎ নিউতন বৃক্ষ হইতে ফল পড়িতে দেখিয়া নানা বিতর্ক দ্বারা পৃথিবীর যথার্থ ব্যবস্থা স্থির করিলেন।

গো। ফলের পতনের আশ্চর্য কি।

কা। ইহাতে কিছু আশ্চর্য ছিল না, কিন্তু তিনি দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

গো। তিনি কি ভাবিলেন।"

এইভাবে প্রশ্ন ও উত্তরের [illegible] বিজ্ঞানকে সহজভাবে পাঠকের [illegible] ধরবার চেষ্টা হয়েছে। সাধু [illegible] ব্যবহৃত হলেও এ ভাষা প্রায় মুখের ভাষা, স্বচ্ছ ও সহজ। এ ভাষা বিদ্যাসাগর-যুগের অনেক পূর্ববর্তী এবং পূর্ববর্তী বলেই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভাষার উদাহরণ হিসেবে আর একটি রচনার অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। হস্তীর বিবরণ শীর্ষক প্রবন্ধের কয়েকটি ছত্র, "পশুর মধ্যে হস্তী

সকল হইতে মান্য বুদ্ধি বিষয়ে কেবল মনুষ্য হইতে ন্যূন। বানরের যেমত সকল কর্ম হস্ত দ্বারা হয় সেমত হস্তীর শুণ্ড দ্বারা সকল কর্ম হয়। শুণ্ড দ্বারা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বস্তু গ্রহণ করিতে পারে। এবং মুখেও দিতে পারে কুকুরের ন্যায় মনুষ্যের সহিত প্রীতি করে যত্ন করিলে মনুষ্যের অধীন হয় কিন্তু বলের দ্বারা নয় ও জ্ঞানপূর্বক প্রাণপণে বিপদ হইতে আপন প্রভুকে রক্ষা করে যুদ্ধ সময়ে কাষ্ঠনির্মিত ঘর শস্ত্রধারী মানুষ সুদ্ধ আপন পৃষ্ঠেতে বহন করে অনেক ঘোড়াতে যে কল চালাইতে পারে তাহা এক হস্তী চালায় তাহার বল অতিশয় ও সে নির্ভয় ও দূরদর্শী ও গভীর ও অতিক্রোধ সময়েও আজ্ঞা পাইলে নম্র হয়।"

পত্রিকাটির মধ্যে লেখকদের নাম থাকত না, কিন্তু বিভিন্ন রচনার ভাষা বিচার করে অনুমান করা যায় যে, এ পত্রিকায় লেখক-সংখ্যা খুব কম ছিল না। কিন্তু প্রত্যেকেই ভাষার ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট মান বজায় রেখেছিলেন। বিষয় নির্বাচনে সম্পাদক লেখকদের নির্দেশ ও পরামর্শ দিতেন বলে মনে হয়।

দিগ্দর্শন বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িকপত্র, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও সম্পাদক পত্রিকার মুদ্রণ ও প্রকাশন কার্যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিক কালে কয়েকটি পত্রিকা বাদ দিলে প্রায় সকল পত্রিকারই মুদ্রণ ব্যাপারে সম্পাদকদের উদাসীনতা বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এক একজন লেখকের বানানপদ্ধতি এক একরকম। পত্রিকায় এক শব্দের একাধিক বানান, ভুল বানান, মুদ্রণপ্রমাদ সর্বদাই সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিকে পীড়া দেয়। কিন্তু মার্শম্যান শুধু বিষয় নির্বাচন বা রচনা সংকলনে নয়, পত্রিকার মুদ্রণসৌষ্ঠবের দিকেও বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। দিগ্দর্শনের বাংলা সংস্করণের মোট ২৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই মুদ্রণত্রুটি বা প্রমাদ লক্ষ করা যায়।

এই পত্রিকায় বাংলা রচনার সঙ্গে যে ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হত, অনুবাদ-কর্মের প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে এখানে ইংরেজী অংশ থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করছি। পূর্বে হস্তীর বিবরণ প্রবন্ধটি উল্লিখিত হয়েছে, নিম্নে প্রদত্ত অংশটি সেই প্রবন্ধেরই ইংরেজী অনুবাদ :

"The elephant is the most noble of all beasts, and in intelligence is inferior only to man. As the monkey performs every office with his hands, the elephant assists himself with his trunk. With it, he can take up the most minute, as well as the largest things, and carry them to his mouth. Like the dog he seems greatly attached to man. With kindness and attention he may be brought into complete subjection, but not by violence."

পত্রিকার ইংরেজী অংশে তিন-চার রকমের ছাপার হরফ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাংলা মুদ্রণে মূলত এক রকম হরফই সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে।

দিগ্দর্শনের বাংলা এবং ইংরেজী-বাংলা সংস্করণের পাঠ যে সম্পূর্ণ এক নয় সে কথা পূর্বে বলেছি। এই প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে উভয় সংস্করণ থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

(ক) দিগ্দর্শনের বাংলা সংস্করণের ১ম সংখ্যার ১ম পৃষ্ঠার কয়েকটি ছত্রের পাঠ :

"অনুমান হয় তিন শত ছাব্বিশ বৎসর হইল আট শত আটানব্বই সালে আমেরিকা প্রথম জানা গেল তাহার পূর্বে আমেরিকা কোন লোক কর্তৃক জানা ছিল না এই নিমিত্তে তাহার প্রথম দর্শনের বিবরণ লিখি।

যেহেতুক পৃথিবীর মধ্যে যেং কর্ম হইয়াছে সেং কর্ম হইতে এ কর্ম বড়।..."

(খ) দিগ্দর্শনের ইংরেজী-বাংলা সংস্করণের ১ম সংখ্যার ১ম পৃষ্ঠার পাঠ :

দিগ্দর্শন।—

প্রথম ভাগ।—

আমিরিকার দর্শন বিষয়।—

পৃথিবী চারি ভাগে বিভক্ত আছে ইওরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকা। ইওরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা এই তিন ভাগ এক মহাদ্বীপে আছে ইহারা কোন সমুদ্রদ্বারা বিভক্ত নয় কিন্তু আমেরিকা পৃথক্ এক দ্বীপে প্রথম দ্বীপহইতে সে দুই হাজার ক্রোশ অন্তর। অনুমান হয় তিন শত ছাব্বিশ বৎসর হইল আট শত আটানব্বই শালে আমেরিকা প্রথম জানা গেল তাহার পূর্বে আমেরিকা কোন লোককর্তৃক জানা ছিল না এই নিমিত্তে তাহার প্রথম দর্শনের বিবরণ লিখি।—

'দিগ্দর্শন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিচিত্র

"তিন শত ছাব্বিশ বৎসর হইল এক হাজার চার শত নিরানব্বই ইংরাজী সনে ও আট শত আটানব্বই বাঙ্গালা সনে আমেরিকা প্রথম জানা গেল তাহার পূর্বে আমেরিকা কোন লোক কর্তৃক জানা ছিল না। তাহার প্রথম দর্শনের অনেক বিবরণ এখন লিখি যেহেতুক পৃথিবীর মধ্যে যেং অদ্ভুত কর্ম হইয়াছে তাহার মধ্যে এই এক।..."

এই দুটি অংশ পাঠ করলেই উভয় সংস্করণের মধ্যে পাঠভেদের পরিচয় পাওয়া যায়। ভিন্ন সংস্করণ প্রকাশের সময় রচনার পাঠ যখন পরিবর্তন করা হয় তখন সে পরিবর্তন যে সর্বক্ষেত্রে মূল লেখক কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছিল তা মনে হয় না। এ-সকল পাঠ-পরিবর্তন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পাদক-গোষ্ঠী কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। যাই হোক, পাঠ পরিবর্তনের ফলে ভাষা যে কিছু পরিমাণে পরিমার্জিত হয়েছিল বলা যায়।

দিগ্দর্শন প্রকাশের প্রায় এক মাস পরে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই জানান হয়েছে, প্রতি সংখ্যায় কি কি সমাচার মুদ্রিত হবে। সমাচার দর্পণের বিজ্ঞপ্তি :

১ এতদ্দেশের জজ ও কালেক্টর সাহেবলোকদের ও অন্য রাজকর্মাধ্যক্ষেরদের নিয়োগ।

২ শ্রীশ্রী যুত বড় সাহেব যেং নূতন আইন ও হুকুম প্রভৃতি প্রকাশ করিবেন।

৩ ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যং প্রদেশ হইতে যেং নূতন সমাচার আইসে এবং এই দেশের নানা সমাচার।

৪ বাণিজ্যাদির নূতন বিবরণ।

৫ লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া।

সমাচার দর্পণ।

১ সংখ্যা] শনিবার। ২৩ মে সন ১৮১৮। ১০ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৫।

সমাচার দর্পণ।

কথক মাস হইল শ্রীরামপুরের ছাপাখানাহইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক মাসং ছাপাইবার কল্পও ছিল তাহার অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের নিকটে সকল প্রকার বিদ্যা প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তকে সকলের সম্মতি হইল না এই প্রযুক্ত যদি সে পুস্তক মাসং ছাপা যাইত তবে কাহারো উপকার হইত না অতএব তাহার পরিবর্ত্তে এই সমাচারের পত্র ছাপাইতে আরম্ভ করা গিয়াছে। ইহার নাম সমাচার দর্পণ।—

৫ লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া।

৬ ইওরোপ দেশীয় লোককর্ত্তৃক যেং নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল পুস্তকহইতে ছাপান যাইবে এবং যেং নূতন পুস্তক মাসেং ইংগ্লণ্ডহইতে আইসে সেই সকল পুস্তকে যেং নূতন শিল্প ও কল প্রভৃতির বিবরণ থাকে তাহাও ছাপান যাইবে।

৭ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান লোক ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ।

এই সমাচারের পত্র প্রতি শনিবারে প্রাতঃকালে সর্ব্বত্র দেওয়া যাইবে তাহার মূল্য প্রতি মাসে দেড় টাকা।

বিক্রয় হইবেক নীচে দফাওআরী লিখিত মতে জানিবা।

বাদ্দা আয়ুফল প্রথম রকম ৭৫০০ পোল

দুয়ে দোমরা রকম ৭৫০০

যাবা— নীরস ১০০১

এয়াবোয়ানা আয়ুফল খোষ্মানয়েত ৮০

বান্দ্রা জৈত্রী প্রথম রকম ১০০০০

যাবা নীরস ২০১

ওয়াবোয়ানা নীরস ১৪১

২ দফা এক টাকা ফিলাট বায়না ও আমানত ফিশত ১০ দশ টাকার উপর দিতে হইবেক নিলামের সময় যাতবরির করণ তাহাতে কোন কসুরি করে তবে ঐ লাট

'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

৬ ইউরোপ দেশীয় লোক কর্তৃক যেং নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল পুস্তক হইতে ছাপান যাইবে এবং যেং নূতন শিল্প ও কল প্রভৃতির বিবরণ থাকে তাহাও ছাপান যাইবে।

৭ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান লোক ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ।

সমাচার দর্পণ তার বিজ্ঞপ্তি অনুসারেই যে কার্য সম্পাদন করেছিল তা পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যাগুলি লক্ষ করলেই বুঝতে পারা যায়।

মার্শম্যান তাঁর দিগ্দর্শন পত্রিকাটি প্রতি মাসে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু সমাচার দর্পণ সংবাদপত্র-রূপে পরিকল্পিত হওয়ায় তার প্রকাশ প্রতি সাত দিন অন্তর হয়। নতুন নতুন সংবাদ ও সমাচার সংগৃহীত হয়ে পত্রিকাটি প্রত্যেক শনিবার সকালে প্রকাশিত হয়।

সমাচার দর্পণের পৃষ্ঠার আকার সাধারণ বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে অনেক বড়। প্রতি পৃষ্ঠা তিনটি কলামে বিভক্ত। ছাপার কাজ দিগ্দর্শন থেকে আরও কিছু উন্নত। বড় ছোট মাঝারি নানারকমের হরফ পত্রিকায় ব্যবহৃত হয়েছে। ১৮১৮র ৪ঠা জুলাই থেকে প্রতি সংখ্যার সমাচারে একটি সংস্কৃত শ্লোক মুদ্রিত হয়। শ্লোকটি এই :

দর্পণে মুখসৌন্দর্যমিব কার্যবিচক্ষণাঃ।
বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

অর্থাৎ, দর্পণে যেমন মুখ-সৌন্দর্য দৃষ্ট হয়, এই সমাচারের দর্পণ পাঠ করে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা তেমনি বিবিধ বৃত্তান্ত অবগত হন। মার্শম্যান মূলে সম্পাদক হলেও তৎকালীন বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা সম্পাদনা কার্যে যে নানাভাবে সাহায্য করতেন তা জানা যায়।

বিভিন্ন বিষয়ক সংবাদ সমাচার দর্পণের পাতায় কিভাবে প্রকাশিত হত এখানে তার কয়েকটি নমুনা দেওয়া গেল :

শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।—সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য শ্রীযুত বিচারক সাহেবেরদের নিকটে চারি মাসের বিদায় লইয়া কাশী তীর্থ দর্শনার্থ যাত্রা করিয়াছেন। [১২ ডিসেম্বর ১৮১৮]

শ্রীরামপুরের টোল।—শ্রীরামপুরস্থ সাহেবেরা মোং শ্রীরামপুরে এক কালেজ অর্থাৎ বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে ক্রমে২ বিদ্যার্থিগণ নিযুক্ত হইতেছে এই কালেজে নানাপ্রকার বিদ্যা ও বহুপ্রকার পুস্তক ও বিবিধপ্রকার শিল্পাদি যন্ত্র থাকিবে ও প্রতি শাস্ত্রের এক২ জন পণ্ডিত ক্রমে২ নিযুক্ত হইবেন যেহেতুক এই মহাবিদ্যালয় এককালে প্রস্তুত হওয়া ভার তৎপ্রযুক্ত ন্যায় ও ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতির পণ্ডিত ক্রমে২ নিযুক্ত হইবেন এখন কেবল জ্যোতিষশাস্ত্রের পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন। [২০ মার্চ ১৮১৯]

কৃত্রিম ঘৃত।—পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে এই কলকাতা নগরে কএক ঘৃত বিক্রেতারা ঘৃতের সহিত চর্বি মিশ্র পূর্বক বিক্রয়ের নিয়ম করিয়াছিল এ ব্যাপার কএক জনের দৃষ্টিগোচর হইব তন্মধ্যে এতদ্দেশ জাত একজন সাহেব পুরঃসরে পুলিসে সংবাদ দিবাতে বি কর্তারা ঘৃত বিক্রেতারদিগকে ঘৃতের স আনয়ন করিতে পদাতিকে আজ্ঞা দি পদাতিক কর্তৃক কএক জন ঘৃত বিক্রেতা হইয়া পুলিসে উপনীত হইল বিচারান্তে ডাক্তর সাহেবের দ্বারা ঘৃ পরীক্ষা হইবাতে চরবি মিশ্রিত সপ্রমাণ এমতে বিচারকর্তারা তাহারদের মধ্যে জনকে সে দিবস অপরাধী বোধ করিয়া পঞ্চাশ২ মুদ্রা দণ্ড এবং ছয়২ মাস কারা স্থান প্রদান করিয়াছেন অবশিষ্ট বিক্রেতা সে দিন বিচার না হইবাতে দণ্ডের হইল না আগামীতে যাহা জানা যায় করা যাইবেক। [১ সেপ্টেম্বর ১৮২৭

সমাচার দর্পণ ১৮১৮ থেকে ১৮৪ ২৫শে ডিসেম্বর পর্যন্ত একটানা এর পর ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় একজন দেশীয় সম্পাদকের সম্প ১৮৪২-এর ফেব্রুয়ারিতে পত্রিকার প্রকাশ ঘটে, কিন্তু ১৮৪৩-এ এর আবার বন্ধ হয়। সর্বশেষ ১৮৫১ যে সমাচার পুনরায় আবির্ভূত হয় এব বছর যেতে না-যেতে পত্রিকাটি সম্পূ লুপ্ত হয়ে যায়।

এয়ার চিফ মার্শাল অর্জুন সিং মিউজিয়ম দেখাচ্ছেন আরক্ষা মন্ত্রী স্বরণ সিং-কে

কাছে পাওয়া যায়। মিউজিয়মে দিয়েছেন স্কোয়াড্রন লিডার যোগ।

এর পরের ঘরটি বলা যেতে পারে পাক-ভারত যুদ্ধের স্মারক। কাচের বাক্সে কয়েকটি চিঠি সাজানো। একটি লিখেছে একজন কিশোর পুনা থেকে এয়ার (চীফ) মার্শাল অর্জুন সিং কে, সেপ্টেম্বর (১৯৬৫) ১৯ তারিখে। ইংরিজীতে সে বলছে : শুনলাম যে, পাকিস্তান আমাদের একটি হাসপাতালে এক হাজার পাউণ্ড বোমা ফেলেছে। আমাদের বৈমানিকদের বলবেন তারা যেন দু হাজার পাউণ্ড বোমা ফেলে পাকিস্তানী বিমান বাহিনীর বিল্ডিং-এ। ছেলেটির নাম অনন্ত পট্টবর্ধন। (লক্ষ করবার বিষয়, কিশোর অনন্ত প্রতিশোধ কামনায় চায়নি পাকিস্তানী হাসপাতালে বোমা ফেলতে)।

অন্যান্য চিঠির দুটো লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এয়ার (চীফ) মার্শাল অর্জুন সিং-কে। প্রথমটি ৪ঠা সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ পাকিস্তানের কাশ্মীর আক্রমণের তিন দিন পর। আমাদের বিমান বাহিনী তখন অপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে সেনা বাহিনীর সহায়তায় এসেছে সমস্ত ফ্রন্টে—জম্মু-জৌরিয়াঁ থেকে খেমকারন।

শাস্ত্রীজী বলেছেন : ভারতীয় বিমান বাহিনীর চমৎকার কার্যের জন্যে আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আমার প্রশংসা ও শুভেচ্ছা জানাবেন বিমান বাহিনীর সকলকে।

মিউজিয়মের একটি ঘরে। বাঁ দিকের দেয়ালে জাপানী রাইফেল

অন্য পত্রটি শাস্ত্রীজী লিখেছেন ২৩শে অক্টোবর। যুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে। এয়ার (চীফ) মার্শাল পত্র দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে আনন্দ জ্ঞাপন করেছিলেন। তার উত্তরে শাস্ত্রীজী জানাচ্ছেন যে, ভারতীয় বিমান বাহিনী পাকিস্তানী প্রতিদ্বন্দ্বীদের মোকাবিলা করতে যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিল, তার মাধ্যমে সে তার নিজস্ব জায়গা করে নিয়েছে। প্রশংসনীয় নেতৃত্ব ও কাজের জন্যে অভিনন্দন। বাহিনী অধ্যক্ষ মহোদয় চিঠির পাশে হাতে নোট লিখেছেন চিঠির কপি সমস্ত ইউনিটে পাঠাতে বলে।

একটা কাচের বাক্সে এটা-সেটা জড়ো, যে-সমস্ত জিনিস ধৃত-মৃত পাকিস্তানী বৈমানিকদের কাছে পাওয়া গিয়েছিল, তার কিছু কিছু। যেমন : হাতঘড়ি, চশমা, মানিব্যাগ (টাকা সহ; একটিতে পাকিস্তানী নোটের মধ্যে পাঁচ টাকার একখানা ভারতীয় নোট), পরিচয় পত্র, ফটো।

ঐ ঘরে উপরের দিকে দেয়ালে আছে একটা পাকিস্তানী বিমানের প্রপেলার। স্কোয়াড্রন লিডার কালির ঐ বিমানকে গুলি করে নামিয়ে ফেলেছিলেন ১৬ই সেপ্টেম্বর।

আরো আছে। একটি [illegible] স্থলবাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল [illegible] চৌধুরী সৈন্য বাহিনীর তরফ থেকে দিয়েছেন ভারতীয় বিমান বাহিনীকে। পাকিস্তানী বৈমানিকের কাছে পাওয়া গিয়েছে, শিরস্ত্রাণ। একটি ট্যাংক-ধ্বংসী ছোঁড়া মিসাইল, যা পাকিস্তান কিনেছিল পশ্চিম জার্মানী থেকে। একটি [illegible] [illegible] লাগানোর পর ৫টি [illegible] [illegible] ট্যাংকের পুরু ইস্পাত ভেদ করে ট্যাংক ধ্বংস করবে।

দেয়াল-জোড়া বিমান বাহিনীর সেই সমস্ত বীরদের নাম যারা সর্বোচ্চভাবে কর্তব্য পালন করেছেন ঐ ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে। তাদের কেউ কেউ দিয়েছেন প্রাণ। কিন্তু জাতি জনসাধারণের কাছে তারা সকলে গৌরবময়। তারই সংলগ্ন দুটো তৈলচিত্র আমাদের বিমান আক্রমণ করছে, গুলি দাগছে পাকিস্তানী বিমান ও ট্যাংকের দিকে, বিমান পড়তে পড়তে ছুটছে, ট্যাংক ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়ছে।

ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে মনে পড়ে খেমকারনে ট্যাংক-যুদ্ধের কথা। আমরা এসে বারকি-খেমকারন-ফ্রন্টের লড়াই খবর নিতাম কাছাকাছি জায়গা থেকে। ট্যাংক স্কোয়াড্রনের একজন মেজর, যার গায়ে তখনো ছিল যুদ্ধের বারুদ-গন্ধ, বললেন যে, ঐ দিনটা ছিল একটা ক্রাইসিস। পাকিস্তান মরণ-কামড় দিয়ে এগিয়ে আসতে চাইছে এমন একটা পরিকল্পনায় (আমরা পরে জানতে পেরেছিলাম) যাতে তারা গোটা অমৃতসর এলাকার সমস্ত সৈন্য বাহিনীকে অর্ধচক্রাকারে বেষ্টিত করতে পারে।

সেই যুদ্ধে যেমনি ছিল ট্যাংকে ট্যাংকে যুদ্ধ সদর রাস্তায় আর মাঠে আর আখের খেতে, তেমনি হেনেছিল আকাশ থেকে আঘাত আমাদের বিমান বাহিনী। খেমকারন যাওয়ার বড় রাস্তাটা ট্যাংকের চাকার চাপে সেদিন ক্ষতবিক্ষত। একটা জায়গায় আমাদের মেজর বললেন : "দাঁড়াও, ঠিক এইখানে সেদিন দেখেছিলাম আগুনে পুড়ছে একটা পাকিস্তানী প্যাটন ট্যাংক। হঠাৎ ট্যাংকের হ্যাচ খুলে বেরিয়ে এল একজন অফিসার। সে লাফিয়ে নামল রাস্তায় ট্যাংকের পাশেই। পা থেকে মাথা তার আগুনে জ্বলছে। একটু পরে পুড়তে পুড়তে পড়ে গেল রাস্তায়।"

"এই দেখ।" বলে পোড়া ট্যাংকের পাঁচ গজ দূরে দেখাল একটা জায়গা। একটা মানুষের মরা শরীর কাদা-কাদা হয়ে গেছে। কয়েকটা হাড়গোড়, মাথাটা কাছেই, একটা শিরস্ত্রাণ। "ও মরার আগে ও পরে অনেক ট্যাংক অনেক মোটরযান দেহটার উপর দিয়ে গেছে। তাই দেখছ কেমন কাদা-কাদা হয়ে আছে।"

মরা মাথাটা কাত হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে ছিল। আমি কাছের শিরস্ত্রাণটা দেখিয়ে বললাম, ওটা বাড়ি নিয়ে যাই যুদ্ধের স্মারক হিসেবে। অমনি সঙ্গী সাংবাদিকরা হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, "আরে বলে কী? ওতে টিটেনাস, গ্যাংগ্রিন বীজাণু কী নেই? পাগল নাকি?" (ওটা আনা আর হল না। মেজর সাহেব হাসছিল। ওখানে সেদিন মরা ট্যাংকের অভাব নেই, মরা প্যাটন ট্যাংক। একটা থেকে কুড়িয়ে নিলাম বিমানধ্বংসী গুলি মেশিনগানের গুলি, আর একটা প্যাটন ট্যাংকের কামান গোলা, ওজনে প্রায় ১৫।২০ সের, যে অতি অবহেলায় বারো ইঞ্চি পুরো ইস্পাতও ভেদ করে যেতে পারে।)

এবার এলাম সেই হ্যাংগারে, মানে এরোপ্লেনের গ্যারাজ। চারদিকে সাজানো আসল বিমান, আর সেখানেই আমাদের কামাকাজি "ওকা"। এর কোনো এনজিন নেই, আছে রকেট। সন ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বর মাসে এর প্রথম ব্যবহার হয়েছিল। বলা যেতে পারে আজকের রকেট-চালিত চন্দ্রগামী যন্ত্রদের "ওকা" ছিল এক ধরনের পথিকৃৎ।

কুড়িটা রকেট চালায় এই "ওকা", ভিতরে বসে বোতাম টেপে একজন চালক। বিস্ফোরক থাকে ভিতরে ২,৬৪৫ পাউন্ড ওজনের। সাতাশ হাজার ফিট ওপর থেকে "ওকা" শুরু করে তার আত্মবলি অভিযান। প্রথম সে ঘণ্টায় ২৩০ মাইল বেগে চলে সোজা, তারপর রকেট ফায়ার করতে করতে গতি বেগ হয় ঘণ্টায় ৫৩৪ মাইল এবং ৫০ ডিগ্রি কোণ থেকে "ওকা" যদি ঝাঁপ দেয় তার শিকারের দিকে তখন গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ৬২০ মাইল। গোটা জিনিসটা লক্ষ্যস্থলে গিয়ে ফেটে যায়, মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা নিয়ে।

হ্যাংগারে বিমান

"ওকা" মাত্র এইটুকু বড়। লম্বায় ১৯ ফিট ১১ ইঞ্চি, ওজন (শুধু "ওকা"র) ৯৭০ পাউন্ড, মৃত্যু-ঝম্পের সময়ে ৪৭১৮ পাউন্ড।

নাম তার "চেরি-পুষ্পগুচ্ছ" জাপানের জাতীয় পুষ্প চেরি।

সেই হ্যাংগারে রয়েছে আস্ত বিমান, যারা গত মহাযুদ্ধে এমন কি প্রথম মহাযুদ্ধেও সক্রিয় ছিল। অনেক ধরনের নাম। বিদেশের সরকার (যেমন যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা) মিউজিয়মকে দিয়েছে। আর আছে আমাদের তৈরী ন্যাট বিমান, যার চালকেরা অবহেলায় খুন করেছিল পাকিস্তানের আমেরিকা-প্রদত্ত স্যাবার জেট।

গুলি করে মারা ঐ সমস্ত আমেরিকান বিমানের ভগ্নাংশ রয়েছে। রয়েছে কামান, মেশিনগান, বোমা, আর একটি নকল বিমান চালক। দেখার মতো, ভাবার মতো।

খগেন দে সরকার

ট্রামে বাসে

নির্বাচন কমিশনার আগামী নির্বাচনে বি কে-ডি-কে প্রতীক হিসাবে "লাঙ্গল" ব্যবহার করার অনুমতি দিয়াছেন।—"বামুন গেল ঘর লাঙ্গল তুলে ধর—কথাটা মনে পড়ল, [illegible] বললেন বিশু খুড়ো।

[illegible] পরিবর্তে ফ্রন্ট [illegible] সমস্যূচী [illegible] যাহা [illegible] ৩২। তেষট্টি; এতই যখন হল তখন আর একটা বাড়িয়ে ৩৬ করলেই ডবল হত!!"

নদীর জল ভাগাভাগির প্রশ্নে ভারত বিশ্ব ব্যাঙ্কের হস্তক্ষেপ সহ্য করিবে না'—একটি সংবাদ।—"জলের ব্যাপারে আমরা ছোঁয়াছুঁয়ি পছন্দ করি নে এটা বোধ হয় বিশ্ব ব্যাঙ্ক জানেন না"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরের অপসারণ দাবি লইয়া কলিকাতা পৌর সভায় আবার দক্ষযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রশ্ন—"বেচারা রাজ্যপাল নূতন করিয়া আবার কাহার পাকা ধানে মই দিলেন?" সহযাত্রী বলিলেন—"মই অবশ্য তিনি দেন নি, তবে পাকা ধান মরাই থেকে টেনে এনে গুদোমে তোলার ব্যবস্থা করছেন, সুতরাং কাজে কাজেই!!"

কৃষ্ণনগর উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী মনোনয়নে বামপন্থীরা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এ কথা বলিয়াছেন ডানপন্থীরা। বামের উত্তর : 'এই মনোনয়নে ডানের সমর্থন ছিল, এখন ন্যাকা সাজলে চলবে কেন।' এই 'ন্যাকা' প্রসঙ্গে শ্যামলাল বলিল—"বহু বহু দিন আগে 'জ্ঞানীর সংজ্ঞা' শীর্ষক একটি কবিতা পড়েছিলাম, তার একটি চরণে ছিল—কিছু কিছু চাই বিদ্যা বুদ্ধি/কিছু কিছু চাই বোকামি/ কিছু কিছু চাই চটপটে/কিছু কিছু চাই ন্যাকামি—। কবির সংজ্ঞা ঠিক হয়ে থাকলে ন্যাকামিও জ্ঞানীর লক্ষণ!"

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী আসাম রাজ্যের অভ্যন্তরে যে স্বয়ংশাসিত খাসিয়া-জয়ন্তিয়া-গারো পাহাড় রাজ্য গঠিত হইবে তার নাম হইবে 'মেঘালয়'। —"এই মেঘে এক ফোঁটা বৃষ্টির প্রত্যাশা আছে কি না, শুধু প্রভাতে মেঘডম্বর"—বলেন বিশু খুড়ো।

সংবাদে শুনিলাম পঃ বঙ্গের শিল্পপতিরা বারাণসীতে কল-কারখানা খুলিতেছেন। সহযাত্রী বলিলেন—"আমাদের বলবার কিছু নেই তবু বলি, স্থানটা ব্যাসকাশী না হলেই হয়!!"

একটি বৈদেশিক সংবাদে শুনিলাম, আমেরিকায় আরো এক ব্যক্তির দেহে অন্যের হৃদ্‌যন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছে। সহযাত্রী বলিলেন—"ভ্যানাম-মার্কিন হৃদ্‌যন্ত্রের আদান-প্রদানে এই ধরনের শল্যচিকিৎসা কার্যকর হলে আর শান্তি-বৈঠকের প্রয়োজন হ'ত না!!"

বাংলা ভাষার জন্য যাঁহারা প্রাণ দিয়াছেন সেই সব শহীদদের স্মৃতিতে পাক রাজধানী নাম ইসলামাবাদের পরিবর্তে শহীদনগর রাখার পরামর্শ দিয়াছেন নির্দল সদস্য শ্রীঅলিম-অল-রাজী। "কিন্তু পাক সরকার রাজী নন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

চিকাগো হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, জনৈক মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তার নাকি এক প্রবন্ধে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মেদবহুল শরীরই দেখিতে ভাল।—"কিন্তু রেশনের বাজারে এ কথাটা না বলাই ছিল ভালো। অবশ্য ডাক্তার বললেই যে রাতারাতি আমাদের রুচির পরিবর্তন ঘটবে তা নয়; রাজশেখরবাবুর বর্ণিত—মাথা থেকে পা পর্যন্ত একদম চাঁচাছোলা, কোথাও একটু উঁচুনিচু টক্কার নেই জাতীয়া সুন্দরীদের অগ্রাধিকার প্রায় মৌরসী পাট্টা করা হয়ে গেছে"—বলেন সহযাত্রী।

প্রগতিশীল রপ্তানি নীতির জন্য ১১ দফা কর্মসূচী নির্ধারিত হইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"আশা করি, চুল রপ্তানি এই তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং কোরিয়ার চাহিদার কথাও মনে আছে।"

ফলিবার্জার-এর তিনশত রূপবতী তরুণী প্যারিস সত্যাগ্রহে যোগ দিয়াছেন। প্যারিসের নিশিবাসরে এঁদের খ্যাতির পিছনে অন্যতম দুইটি কারণ,—বসনহীন সৌন্দর্য আর উচ্চ নজরানা। সুন্দরীরা নাকি বলিয়াছেন,—আরো কড়ি চাই, নয়তো কাপড় পরিলাম। সহযাত্রী সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন — "একবারে পাশুপাতং মহাস্ত্রম।"

খেলার মাঠের নির্দেশঃ গোলকীপাররা অতঃপর চার পা চলিবেন। খুড়ো বলিলেন—"অতঃপর-এর পরেও তৎপর আছে অর্থাৎ সপ্তপদীও তো হতে হবে সবকো সড়গড় হয়ে যাক!!"

গান্ধীজীর কলিকাতাস্থ মর্মর মূর্তি চতুষ্পার্শ্বস্থ রেলিং উঠাইয়া নেওয়া কথা নাকি সরকার চিন্তা করিতেছেন খুড়ো কান্তকবির কবিতার মন্তব্য করিলে —"পাতলা একটা যবনিকা আছে! কাজ কি সেটাকে ঘুচিয়ে!!"

কেন্দ্র পরিচালিত সরকারী স্কুলগুলিতে অতঃপর শিক্ষার মাধ্যম হইবে হিন্দ —দিল্লী দফতরের ফরমান। সহযা বলিলেন—"কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠে শেখে। ফরমানদাতার দেখছি কোন শিক্ষ রপ্ত হয়নি, তিনি চাইছেন ঠেকে শেখা!

ঘরে বাইরে

গর্ভনিরোধের নতুন আবিষ্কার

ভারতবর্ষে প্রতি ঘণ্টায় ১৩০০ শিশু জন্মগ্রহণ করে। দিনে দেশের জনসংখ্যা বাড়ে প্রায় ৩০,০০০ করে। বছরে বাড়ে ১২০ লক্ষ। পৃথিবীর সমগ্র ভূভাগের ২·২ অংশ আমাদের দেশ অথচ সমগ্র জনসংখ্যার ১২·৮ এদেশে বাস করে। এক সময়ে মৃত্যুর হার ছিল হাজারে ৪৮·৬। আজ সে হার হ'য়েছে হাজারে ১৬র কম। দারিদ্র্য, দুঃখ, অনাহার অর্ধাহার সত্ত্বেও ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ইত্যাদির মৃত্যুর খবর শোনা যায় না। এখন যদি জন্মহার হাজারে ৪৮-এর বেশী থাকে তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আমাদের খাদ্য সমস্যা থেকে নিয়ে উন্নতির সব পর্যায়ের সমস্যা হ'য়ে উঠবে। পরিবার পরিকল্পনা প্রয়াসের উদ্দেশ্য তাই আজকের হাজারে ৪৯-এর হার থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে হাজারে ২৫ করা। তারপরে কমিয়ে ১৮তে নামানো। এর ফলে ১৯৭৫ সালে জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৬০৫০০০০০০। ১৯৮৫ সালে ৬৯৩-০০০০০০ হবে আমাদের লোকসংখ্যা। লক্ষ্য উঁচু সন্দেহ নেই তবে সে লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য সরকার উঠে পড়ে লেগেছেন।

নানা ধরনের গর্ভনিরোধক, শল্যচিকিৎসা ইত্যাদি পরীক্ষার পর ব্যাপকভাবে I U C D বা Intra Uterine Contraceptive Deviceকেই ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের সবচেয়ে কার্যকরী ও সহজ উপায় বলে ধরা হ'য়েছে। সম্প্রতি I U C D সম্বন্ধে সমাজের বিভিন্ন স্তরে কিছু মন্তব্য শোনা যাচ্ছে। শারীরিক সুস্থতার অন্তরায় কিনা এমনও প্রশ্ন হ'য়েছে।

কতটা বিরুদ্ধ ভাব সমাজে থাকতে পারে তার একটা মোটামুটি ধারণা করার জন্য কিছু সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল। ৭০টি বিবাহিত মহিলার সংগে কথাবার্তা বলা হয়। প্রত্যেকের সংগে ২৫ মিনিট আন্দাজ সময় আলোচনা হয়েছে। মহিলারা সাক্ষাৎকারে বলেন প্রতিবেশী, ধাত্রী বা ডাক্তার আত্মীয়স্বজন, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ইত্যাদি থেকে তাঁরা I U C Dর খবর পেয়ে সে সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হ'য়েছেন। সাধারণত I U C D ব্যবস্থার জন্য ক্লিনিকে যাবার সংগী প্রতিবেশী মহিলারাই হ'য়েছেন।

শতকরা ৯৩টি মহিলা বলেছেন, I U C D ব্যবহার করে তাঁদের কোন অসুবিধা হয়নি। কেউ কেউ রক্তপাত বা দুর্বলতাবোধ সম্বন্ধে অনুযোগ করেছেন। কারও বা আতংকের ভাব একটা হ'য়েছে। মোটামুটি শতকরা ৮৩টি মহিলা বলেছেন তাঁদের মনে কোন ভয় বা চিন্তা একদম হয়নি।

মহিলাদের মধ্যে শতকরা ৮৪ জন গর্ভনিরোধক সম্বন্ধে যথেষ্ট জানতেন। শতকরা ৫০ জন নানা গর্ভনিয়ন্ত্রক ব্যবহার করেছেন। কিন্তু নির্ভরযোগ্য ও ব্যবহারের সহজ ব্যবস্থার জন্য তাঁরা I U C D গ্রহণ করেছেন।

বেশীর ভাগ মহিলা I U C Dর ইচ্ছামত ব্যবহার ও অপসারণ বিশেষ বাঞ্ছনীয় গুণ বলে মনে করেন। I U C D ব্যবহারে সন্তান ধারণের ক্ষমতার এতটুকুও ক্ষতি হয় না। অপসারণ সহজ। Vasectomy বা Tubectomyতে সেটা সম্ভব হয় না। সন্তান ধারণ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়।

সবচেয়ে লক্ষ্য করবার মত কথা হ'চ্ছে যে, সব মহিলাই বলেছেন, ছোট পরিবারই বর্তমান অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান। তার মধ্যে বেশী মহিলাই বলেছেন, তিনটি

মাদ্রাজের এক পরিবার পরিকল্পনা প্রদর্শনীতে পল্লীরমণীর আগ্রহ

সন্তান বাঞ্ছনীয়—২টি ছেলে, ১টি মেয়ে। কথাবার্তায় বোঝা গেছে I U C D সম্বন্ধে বিরূদ্ধ ভাব কোথাও কোথাও স্বামীরা পোষণ করেন। সংখ্যায় অল্প হ'লেও বিরূদ্ধ মনোভাবযুক্ত স্বামীর অস্তিত্ব যখন অস্বীকার করা যায় না তখন I U C D সম্বন্ধে কিছু তাদেরও জানা প্রয়োজন।

শিশুদের ফুল সাজানো

আধুনিকভাবে ফুল সাজানোর প্রয়াসটি আমাদের অনেক দিনের নয়। পাশ্চাত্য জগতে ছিল ফুলের রকমারি ঘর সাজানোর মত ব্যবহার কিন্তু তার প্রকাশ ছিল একটু মোটাসোটা ধরনের। ফুলদানিতে ফুলের বোঁটা ঢুকিয়ে ব্যাসার্ধ বরাবর ফুলগুলি বিকীর্ণ হবে এই ছিল মোটামুটি পরিকল্পনা। তারপর এল জাপানী ফুল সাজানোর প্রভাব। এই প্রভাবে প্রথমে অনুপ্রাণিত হ'লো মার্কিন দেশ। তারপর ক্রমশ একে একে ঘর সাজানোর অঙ্গ হিসাবে ফুল, পাতা, লতা, ডাল, কাঠকুটো পাথর ইত্যাদি সব দেশেই স্বীকৃতি পাচ্ছে। ছবির মত এ সজ্জাও একটা কুশলী রচনা। রং, রেখা, আলোছায়া সব দিয়ে গাঁথা একটি সমগ্র প্রকাশ। জাপানে যদিও পুষ্পসজ্জার ঐতিহ্য ও শিক্ষা তাদের পরম কৃষ্টি, এবং বিশেষ নির্দেশ মেনে তাকে চলতে হয়, অন্যত্র যে প্রভাব এসেছে তাতে অনুশাসনের ধরাবাঁধা নিয়ম অনেক কমেছে। রয়েছে সৌন্দর্য সৃষ্টির ইঙ্গিত মাত্র।

ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ শিক্ষা আধুনিক শিকার বিশেষ অঙ্গ। রং নিয়ে, তুলি নিয়ে শিশু শিল্পী আপন মনের রূপ ঢেলে দেবে বলে কতই না আয়োজন হয় দেশ বিদেশে। সবাই চিত্রকর হবে এ আশায় আয়োজন নয়, ব্যবস্থা হয় শিশু চেতনা রূপের স্পর্শ যা পাবে তার সৌন্দর্যে তার মন আকৃষ্ট হবে তাই। এই সৃষ্টির আর একটি প্রকাশ হ'তে পারে ফুল সাজানো দিয়ে। ফুল সাজানোর যে খেয়াল বয়স্কদের দুনিয়ায় নূতন আগ্রহ এনেছে, শিশুর দুনিয়াও সে আগ্রহের অবকাশে সৌন্দর্যবোধকে জাগিয়ে তুলতে পারে।

আর পাঁচটা সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি করার অভ্যাস যেমন ছোটদের মধ্যে চালু করার চলন হ'চ্ছে, তেমন ফুল নিয়ে রচনা করার উৎসাহ তাদের দিলে ভালই হয়। উপকরণ সামান্য, সাধারণ। স্কুলে না হ'লেও ঘরে ঘরে তারা রূপ সৃষ্টির রসগ্রহণ করার এই সহজ উপায় মাঝে মাঝে ব্যবস্থা করতে পারে। নেহাৎ অবজ্ঞায় ফেলে রাখা কাঠকুটো, নুড়িপাথর, শুকনো ডাল ইত্যাদি থেকে কত সুন্দর জীবন্ত রচনা হ'তে পারে তা দেখে ছেলেমেয়েরা নিজেরাই উত্তরোত্তর আগ্রহী হ'য়ে উঠবে। প্রথম তাদের উৎসাহিত করা দরকার মাত্র। খেলার ছলে এ আয়োজন তাদের মনকেও দেবে নূতন আনন্দের সন্ধান।

জীবনের লেখা

"And Life Wrote" বইখানির রচয়িত্রী এলিস ওটেসেন জেনসেনকে সুইডেনে সবাই আদর করে বলে ওটার। ওটারের বয়স আজ ৮০। 'অ্যান্ড লাইফ রোট' তাঁর স্মৃতি কথা। স্মৃতি কথার আরও অধ্যায় বাকী আছে। ওটার আশা করেন সবটা প্রকাশ করে যাবার সময় পাবেন। জনসংখ্যা সমস্যা, মায়ের স্বাস্থ্য আজকের সুইডেনের সমস্যা নয়। কিন্তু ওটারের বয়স তখন কম ছিল, সে সুইডেন ছিল আলাদা। আলাদা ছিল বলেই ওটার যা করেছেন তার জন্য নানাভাবে জগতের উন্নততম দেশ সুইডেনে ওটারকে ঘরে ঘরে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। International Planned Parenthood Association-এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি বহু দিন।

ওটার সুইডেনে জীবনের অনেকটা কাটিয়েছেন, কিন্তু জন্ম তাঁর পশ্চিম নরওয়ের এক পাদ্রী সংসারে। ১৮টি ভাইবোনের একজন। ১৮টির মধ্যে ১১টি শৈশবের সীমানা পার হ'য়ে বেঁচে ছিলেন। পাদ্রী পিতা ছিলেন প্রভুত্বপরায়ণ, কঠোর ও নির্মম। তবু জীবনের লেখায় ওটার পিতার কথা সন্তানোচিত স্নেহেই স্মরণ করেছেন। ওটারের স্বাধীন চিন্তাধারা পিতা সহ্য করতে পারতেন না। ধর্মের সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির মধ্যে তাই শৈশব কাটিয়ে বিদ্রোহ করেছিল তাঁর মন। অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়ে তাঁর বোন পিতার অত্যাচারে তিলে তিলে বিকৃতমস্তিষ্ক জীবন যাপন করে মারা যায়, কেমন করে এক পেনি চুরি করার জন্য ছোট্ট ওটার নির্যাতন সহ্য করেছিল—এইসবই জীবনের ছোট ছোট লেখা। মা ছিলেন স্নেহশীলা কিন্তু ব্যক্তিত্ববিহীন। ১৮টি সন্তানের জন্ম দিয়ে ক্লান্ত অবসন্ন মার অস্তিত্ব পরিবারে মুছে যাওয়া ছবির মত মনে হ'তো।

পিতা প্রতিবাদ পছন্দ করতেন না বলে ওটারের সঙ্গে ছিল বিষম আড়াআড়ি। খাপছাড়া, অদ্ভুত, বিদ্রোহী এইসব বিশেষণে তাঁকে বর্ণনা দিতেন তিনি। মনে হ'তো বুঝিবা ওটার পরিবারের বাইরের কেউ। এই দুর্দান্ত শাসনের মাঝে গড়ে উঠেছিল পাদ্রী ছেলেমেয়েরা। ভালমন্দ বিচারের ভার বাপের, সেখানে ছিল তাদের অদ্ভুত এক নিষ্ক্রিয় অস্তিত্ব। বাইরের জগৎ অজানা। দাসীর মুখের শোনা অন্ধকার আবছা। ভূতপ্রেত, শয়তান নরক ইত্যাদিতে ভরা। মার্টা নামে একটি মেয়ে নদী থেকে জলভরে পাদ্রীসাহেবের বাড়ি এনে দিত। তার একটি ছেলে ছিল। তাকে সবাই অবজ্ঞাভরে বলতো "জারজ"। ওটার ভাবতেন জারজ আবার কি?

একদিন এক প্রশ্নে এই দ্বৈত অস্তিত্বের সমাপ্তি হ'লো। "সত্যই কি বাবা যা বলেন, সব তিনি বিশ্বাস করেন?" সন্দেহের সমুদ্রে তুফান উঠলো। তুফানের শেষে কিনারা পেলেন। সামাজিক ন্যায় অন্যায়ের সঙ্গে লড়তে হবে। হঠাৎ এক বিস্ফোরণে দু' হাতের দুটি বুড়ো আঙ্গুল হারালেন। তখন তিনি দন্ত চিকিৎসার ছাত্রী। ডাক্তার হ'তে চেয়েছিলেন কিন্তু পড়বার খরচ যোগাড় করতে পারেননি। বাজনা বাজাতে ভালবাসতেন কিন্তু আঙ্গুল হারিয়ে পিয়ানো আর বাজানো হ'লো না। কিন্তু অনন্যা অনমনীয়া তিনি। লিখতে আরম্ভ করলেন। কাপড়ের কলে কাজ করে যে মেয়েরা তাদের অবস্থা দেখে মর্মাহত হ'য়ে বিপ্লবী কাগজে জড়িত হ'য়ে গেলেন। মেয়েরা কেন সমান কাজ করে কম পারিশ্রমিক পাবে, কেন গরীব ঘরের মা বহু সন্তান প্রসব করে সারা জীবন দুঃখ পাবে, কেন নৈতিক ভালমন্দ বিচারের ধরাবাঁধা নিয়মে নির্যাতিত হবে দরিদ্র, বুভুক্ষু অজ্ঞ সাধারণ—এইসব ছিল তাঁর সমস্যা। বক্তৃতা দিয়ে, লিখে সেদিনের সুইডেনবাসীকে বোঝাতে পারেন নি প্রথমে। ট্রামে বাসে তাঁর নাম করলে সেই নির্যাতিত সাধারণই থুথু ছিটিয়ে ছি ছি করতো। কিন্তু বেশীদিন নয়। নরনারীর যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে স্বাস্থ্যকর শিক্ষা যে অজ্ঞজনেরই বেশী প্রয়োজন ধীরে ধীরে তা তারা বুঝেছিল।

জীবনের লেখার এক জায়গায় ওটার বলছেন, যেদিন তাঁর কথায় সামাজিক সংঘর্ষ তীব্র হ'য়ে উঠেছিল সে সময় তিনি তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গরীব গৃহস্থ ঘরনীদের আশে পাশে বক্তৃতা দিয়ে একান্তে আলোচনা করে আনন্দ পেয়েছেন। যে সমস্যা সম্বন্ধে সমাজ চোখ বন্ধ করেছিল সে সমস্যা ছিল দারুণ সত্য। তাই আলোচনার বাধার বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। কখনও বা বরফে ঢাকা পরিত্যক্ত পর্ণকুটির হ'য়েছে চাষী-বউদের নিয়ে মিটিং-এর স্থান, কখনও বা শৌচাগার হয়েছে একান্ত আলোচনার সম্বল! একবার এমনি একটি পরিত্যক্ত পর্ণ কুটিরে আহূত সভায় এসেছে এক ভগ্নস্বাস্থ্য যুবতী। পাঁচটি সন্তানের মা সে। জানতে চায় কেমন করে কি ব্যবস্থায় ভবিষ্যতে অনাহারক্লিষ্ট সংসারে নূতন অতিথির আর আগমন হবে না। ওটার তাকে পরীক্ষা করলেন। হায়, সে তখন আবার সন্তানসম্ভবা। যুবতীর চোখে জল ভরে এল, ধরা গলায় অস্ফুট স্বরে শুধু বলতে পারলো, "আমরা যে বড্ডই গরীব।"

ওটার তাই বলছেন, বনজঙ্গলে ঘুরে পোকামাকড়ের কামড় খেয়ে যতই ঘুরেছেন, দেখেছেন সম্বলহীন সংসারে সন্তান সংখ্যা বেশী হওয়া কি অভিশাপ। বাসস্থানের অভাব, খাদ্যের অভাব, দারুণ যক্ষ্মারোগ তার মাঝে সব ভেঙ্গে পড়া, উৎসাহবিহীন বহু সন্তানপ্রসবিনী মা অসহায় আতঙ্কে জীবন কাটাচ্ছে। রাত্রের ঘোর, অন্ধকারের মত তাদের অস্তিত্ব চারদিকে নিবিড় কালিমায় ঢাকা।

১৯৩৭ সালের আগে সুইডেনে গর্ভ-নিরোধক বিক্রি আইনবিরুদ্ধ ছিল। ওটার তাতে দমবার পাত্র ছিলেন না। ১৯২০-৩০ সালের সুইডেনে এ সব আলোচনাও ডাক্তার বা ধাত্রী না হ'লে করা কঠিন ব্যাপার ছিল। তবু অসহায় মেয়ের যেখানে দুঃখ যেখানে ব্যথা সেখানেই এলিস ওটেসেন-এর বলিষ্ঠ মনের সমস্ত সহানুভূতি ছিল বলে আজ সুইডেন সামাজিক উন্নতির উদাহরণ হয়ে উঠেছে।

স্ত্রীপুরুষের যৌন সম্বন্ধ, শিশুর জন্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে অজ্ঞতা বা শিক্ষার অভাব থেকে কি বিষময় ফল হ'তে পারে তা এলিস ওটেসেন দেখিয়েছেন নিজের ছোট

মিনিকয় দ্বীপের মেয়েরা

বোনের জীবন থেকে। ওটেসেন যখন পিতার আশ্রয় থেকে বাইরে এলেন তখন তার একটি ছোট বোন পিতামাতার কাছে ছিল। অন্য ভাইবোন সবাই আগেই চলে এসেছে। কাজেই সে ছিল সম্পূর্ণ একা। ষোড়শী তরুণী, পাশ্চাত্ত্য দেশের মাপকাঠিতে বালিকামাত্র। নির্মম পরিবেশ। কোন এক মুহূর্তের ভুলের বোঝার স্বীকৃতি নিষ্ঠুর পিতাকে নিষ্ঠুরতর করে তুললো। ঘরে স্থান নেই, বাইরের জগৎ বিভীষিকাময়। নিজের অবস্থা ও কারণ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানও নেই। তাকে ধরে পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো ডেনমার্কে। সেখানে যে স্ত্রীলোকের আশ্রয়ে তাকে নির্বাসিত করা হ'লো সে কি বা কে তা ভাল করে জানা ছিল না। গর্ভস্থ সন্তানের সম্বন্ধে কেউ তাকে কিছু বলেনি। সন্তান জন্মের পর তাকে অপরিচিত ঘরে দিয়ে দেওয়া হ'লো। ভারমুক্ত জননী নার্সের কাজ শিখতে চাইল। কিন্তু সে তো পতিতা। তার পরিচিতিপত্র বা identification papers-এ সর্বত্র ছাপমারা আছে যে সে অবৈধ সন্তানের মা। সে ছাপ চিরজীবনের সাথী। দুঃখে, দারিদ্র্যে, অপমানে সে যখন বিপর্যস্ত তখন এক পাগলা গারদে রাতে রোগী পাহারা দেবার কাজ পেল। গারদে কর্মীর অভাব ছিল। সেই গারদেই নস আত্মহত্যা করে। সামান্য কিছুদিন কাজ করার পর তার সেই হারিয়ে যাওয়া সন্তানের সন্ধান করতে আরম্ভ করেছিল। পায় নি। পাগল হ'য়ে ঐ গারদেই কেটেছে ক' বছর। খবর পেয়ে এলিস এসেছিল। কিছুই তার আর ছিল না। একটি মাত্র বাক্স ছিল তালাবন্ধ করা। খুলে দেখলো স্তরে স্তরে সাজানো উলের পোশাক আর কত সব রেশমী জামা। সব নূতন। বছরের পর বছর ধরে বানানো। ছোট থেকে বড়। সবচেয়ে বড় জামাটি বছরর দশেকের মেয়ের উপযুক্ত। তার সন্তানটি তখন বছর দশেকের হবে!

মিনিকয়ের মেয়ে

মরুমক্কয়ম বা নারীর প্রাধান্য স্বীকৃতির দেশ কেরালার কূল থেকে মাত্র শ' দেড় শ' মাইল দূরে লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিভি প্রমুখ দ্বীপপুঞ্জ। বঙ্গোপসাগরের প্রবাল দ্বীপমালা যেমন আন্দামান গোষ্ঠী, আরবসাগরের প্রবাল দ্বীপমালা তেমন লাক্ষাদ্বীপগোষ্ঠী। একই রকম রোমাঞ্চকর রূপের রাশি। তেমনই ঘন সবুজ আর ফিরোজার সমাবেশ, তেমনই বালুবেলা আর ছায়াঘেরা নারিকেলকুঞ্জ। নিস্তরঙ্গ উপহ্রদ, সোনালি সূর্যের আলো পাশাপাশি পরস্পরকে হাতছানি দেয়। মানুষগুলি আলাদা। তাদের রীতিনীতি আর এক রকম।

লাক্ষাদ্বীপের নাম নিয়ে নানা গল্প আছে। সবচেয়ে প্রচলিত গল্প হচ্ছে—লাক্ষাদ্বীপ মালয়ালম "লক্ষ" এবং "দিভু" অর্থাৎ লক্ষ দ্বীপ থেকে এসেছে। আবার কেউ বা বলেন বহু দিন আগে কানানোরের আরাক্কল রাজা দ্বীপগুলির মালিক ছিলেন। দ্বীপমালায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। রাজাবাহাদুর সাহায্যে অক্ষম। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন ভারতে আনাগোনা শুরু করেছে। রাজার অনুরোধে তারা দ্বীপমালার সাহায্যে এলেন। পরে হিসাব করে দেখালেন রাজমহাশয়ের দেনা হয়েছে লক্ষ টাকা। রাজামহাশয় শোধ করতে পারলেন না। দ্বীপমালার মালিকানা বদল হ'ল লক্ষ মুদ্রার দায়ে। ভাই নাম হল তার লক্ষদ্বীপ লাক্ষাদ্বীপ অথবা লাক্কাদিভ।

লাক্ষাদ্বীপ গোষ্ঠীর দ্বীপ সংখ্যা উনিশ। কিন্তু দশটিতে মাত্র বসতি আছে। ২৪১০৮ জন অধিবাসীর ১২১৭৩টি মহিলা। মিনিকয় দ্বীপটি সর্বদক্ষিণে। মিনিকয়ের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার অন্যান্য দ্বীপ থেকে ভিন্ন। এখানে নারীর প্রাধান্য সমাজের সর্বস্তরে। গৃহিণী [illegible] মন, গৃহ তাঁর, তিনি [illegible]। বিবাহের পর স্বামী [illegible] পরিবারের [illegible] হয়ে যান। তখন তাঁর যে পরিবারে [illegible] পরিবারের সব অধিকার ছেড়ে আসতে হয়। সমাজের নিয়মে পুরুষ [illegible] বোধ করেন না। [illegible] মর্যাদা এতই ব্যাপকভাবে [illegible] হয়েছে যে, নারীশাসিত [illegible] হতে পুরুষের আপত্তির প্রশ্নই ওঠে না। শুধু কি তাই? পুরুষ নয়নে অঞ্জন দিয়ে ঘরের বাইরে আসেন না। ছোট বড়, যুবা বৃদ্ধ সকলেই নয়নরঞ্জনী প্রধাধনপারিপাট্যের প্রথম পর্ব মনে করেন। অস্নাত থাকবেন, অভুক্ত থাকবেন কিন্তু নয়নের কাজল না হলে—ছি ছি। মেয়েরা কি ভাববেন! তাঁরা [illegible] অরঞ্জিত আঁখিপল্লব পছন্দ করেন না। আর মেয়েরা? তাঁদের ভ্রূক্ষেপই নেই। [illegible] মর্যাদা তাঁদের রানীর মত। বসনে, [illegible] বাহার নাই বা হল। আশ্চর্য।

তা বলে নারী সেখানে ভূষণবিহীনা কি? মোটেই না। কুন্তলে তারা [illegible] থাকেন, যেমন সাজে রাণী নিজের [illegible]। লাল রঙ ও'দের বড় পছন্দ। কাপড় জামা বর্ণাঢ্য। রঙ্গীন লুঙ্গি, লাল [illegible] কালো মাথার কাপড়ে মিনিকয়ের [illegible] অন্যান্য দ্বীপবাসিনীদের থেকে আলাদা মনে হয়।

সমাজের [illegible] গ্রহণ করেন। সমাজের দায়িত্ব প্রত্যেক [illegible] বাসীর কাছে। ৬ মাইল লম্বা এই দ্বীপের [illegible] সেখানে সবচেয়ে [illegible] সেখানেও ই মাইলের [illegible] লোকসংখ্যা ৪,০০০-এর সামান্য [illegible]। এই ৪,০০০ লোক ১টি গ্রামে বাস করেন। বসতি এলাকা অর্ধ বর্গ মাইল। প্রত্যেক গ্রামে পুরুষ যেমন দলপতি মনোনীত করেন, মেয়েরাও তাঁদের নেত্রী বরণ করেন। মনোনয়ন হয়ে গেলে নেতা ও নেত্রীকে যথেষ্ট সম্মান করা হয় এবং বিনা দ্বিধায় প্রত্যেক নারী ও পুরুষ তাঁদের আজ্ঞাবহন করেন। মাছ ধরবার জাল বা নৌকো সমস্ত গ্রামের সম্পত্তি। যে মাছ দৈনিক পাওয়া যাবে তাতে প্রত্যেক গ্রামবাসীর অংশ আছে আর সবার আগে অংশ দেওয়া হয় বৃদ্ধ, অক্ষম বা অসুস্থ গ্রামবাসীদের।

এককালে নাকি মিনিকয় দ্বীপের মেয়ে পুরুষ রাত ভোর করে দিতেন নেচে গেয়ে। এই সব নাইট ক্লাব পশ্চিমের নাইট ক্লাবের চেয়েও বেপরোয়া, সংগীত মুখর উদ্দাম ছিল। এখন আইন করে বন্ধ করা হয়েছে। মিনিকয়ও ইসলাম ধর্মাবলম্বী, কিন্তু মেয়েরা পর্দা পরেন না। ঐ মাথার ঢাকাটুকুই সব। মিনিকয়ের মেয়ের স্বাধীনতায় সামান্য শরম চিহ্ন।

শ্রীমতী

আলোচনা

কবি-সম্মেলন

গত এপ্রিল মাসের ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই তিনদিন ধরে কলকাতার সর্বভারতীয় কবি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অধিবেশনের আগে তার সংবাদ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'দেশ' সাপ্তাহিকে একাধিকবার প্রকাশিত হয় এবং সম্মেলনের 'প্রেস কনফারেন্স' ও অধিবেশনগুলিতে বিভিন্ন কাগজের পক্ষ থেকে সর্বশ্রী সন্তোষকুমার ঘোষ, গৌরকিশোর ঘোষ, অরুণ চৌধুরী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মতি নন্দী প্রমুখেরা যোগ দেন।

আনন্দবাজার পত্রিকায় একাধিকবার এই সম্মেলনের পক্ষপাতহীন সংবাদ প্রকাশিত হয়, তার শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ মহাশয়ও 'আনন্দবাজার' পত্রিকার 'রবিবাসরীয়' পাতায় এ বিষয়ে সমর্থনসূচক একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন।

কিন্তু 'দেশ' পত্রিকায় 'সনাতন পাঠক' সাহিত্য সংবাদ বিভাগে সম্মেলনের বর্ণনা দেবার সময় সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীসতীকান্ত গুহ সম্বন্ধে 'কে এক সতীকান্ত' বলে মন্তব্য করে সমস্ত আলোচনা এমন এক স্তরে নিয়ে গেলেন যাকে কোনোমতেই সৌজন্যমূলক বলা চলে না। তবু আমরা যাঁরা এ সম্মেলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম, তাঁরা এ হেন অশালীন মন্তব্যে বিস্মিত ব্যথিত হলেও এটাকে নিছক লেখনীচাপল্য মনে করে নীরব থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলাম। কিন্তু গত সপ্তাহে আবার ওই একই বিষয়ে জনৈক বিমল রায়চৌধুরীর একটি অত্যন্ত ইতর-রুচির অসম্মানজনক ব্যঙ্গবিদ্রূপ-প্রয়াসী চিঠি দেখে মনে হচ্ছে, আপনার পত্রিকার এই বিভাগটির সুযোগ নিয়ে কেউ কেউ তাদের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ চরিতার্থ করবার চেষ্টা করছেন।

সর্বভারতীয় কবি-সম্মেলনের ত্রুটি নিশ্চয় অনেক কিছু ছিল, কোন সম্মেলনেই বা না থাকে! কিন্তু এমন একটি সম্মেলন, যাতে ভারতের সমস্ত ভাষার অগ্রণী সাহিত্যিক-কবিদের সমবেত করবার চেষ্টা হয়েছে, বাংলা দেশের পক্ষে গৌরবের কথা বলেই মনে হয়।

এ সম্মেলনের উদ্যোগ-আয়োজনে শ্রীসতীকান্ত গুহ বিশিষ্ট একটি ভূমিকা নিয়েছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টা ও সংগঠন-শক্তি ছাড়া এ সম্মেলন সম্ভব হ'ত না।

কোনো সাহিত্য-সম্মেলনের আয়োজন শুধু অসামান্য সাহিত্য-রথীদেরই করতে হবে, রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর মত কাউকে দিয়ে ছাড়া কোনো সমাবেশের উদ্যোগ নিষিদ্ধ, এরকম বিধান নিশ্চয়ই হাস্যকর। সর্বত্র সত্যকার সাহিত্যানুরাগী উৎসাহী কর্মবীরেরাই এসব কাজের ভার বহন করে থাকেন। সতীকান্তবাবুও তাই করেছেন।

তিনি অজ্ঞাতকুলশীল 'কে একজন'ও নন। 'দেশ' পত্রিকাতেই তাঁর লেখা কবিতা নানা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর ইংরাজী কবিতা বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সতীকান্তবাবুর কবি ও সাহিত্যিক হিসাবে একটা পরিচয় আছে। তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা হ'ল এই যে, তিনি সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যিকদের আপনার মানুষ।

আপনার সম্পাদিত মহৎ ঐতিহ্যবাহী পত্রিকায় এভাবে মানী লোকের সম্মান হননের চেষ্টা দেখে সত্যিই ব্যথিত হয়েছি। আপনার জ্ঞাতসারে এ কাজ হয়েছে এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। সেই কারণেই অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা আপনার গোচরে আনবার চেষ্টা না করে পারলাম না। ইতি

প্রেমেন্দ্র মিত্র
কলকাতা-৭

লেখকের বক্তব্য

শ্রদ্ধেয় প্রেমেন্দ্র মিত্র আমাকে যে তিরস্কার করেছেন, তা শিরোধার্য করি। তিনি গুরুজন, তাঁর কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন করার কোন প্রয়োজন নেই। তবে, তাঁর চিঠি যখন ছাপা হচ্ছে, তখন পাঠকদের কাছে আমি আমার বক্তব্য পুনর্বার জানাতে চাই।

আজকাল সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রেই নানা-রকম কম্প্রোমাইজ হয়। শুধু কবিতাই তার নিজস্ব সম্মান বাঁচিয়ে আছে। কবিতার জন্য সিনেমার প্রলোভন নেই, বৃহৎ সংস্করণের প্রলোভন নেই। কবিতা লেখার জন্যই কবিতা লেখা। সুতরাং কবিতার জগতে, কবিদের সমাবেশে রাজনীতি কিংবা দলাদলি কিংবা স্থূলে সরকারী হাত বা বিষয়বুদ্ধির আনয়ন নিশ্চিত অভিপ্রেত নয়। সর্বভারতীয় কবি-সম্মেলনে এ সবের বহু উপাদান উপস্থিত দেখেই ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম। এত বড় একটা কবি-সম্মেলনে বাংলা দেশের বহু বিশিষ্ট কবি এবং কাব্য-সমালোচকদের কোনো আমন্ত্রণই জানানো হয়নি, অথচ বহু অকবি এবং অনধিকারীদের (তাঁরা যত বড় পদাধিকারীই হোন না কেন) আনার জন্য হুড়োহুড়ি নিশ্চিত অরুচিকর।

এই সম্মেলনের সার্থকতা আমাদের সকলেরই কাম্য ছিল। কিন্তু এর বিশৃঙ্খলা এবং ঔচিত্যবোধের অভাব অনেককেই পীড়া দিয়েছে। সন্তোষকুমার ঘোষের যে প্রবন্ধের কথা প্রেমেন্দ্র মিত্র উল্লেখ করেছেন, তাতে কিন্তু সন্তোষকুমার ঘোষ এই ধরনের সম্মেলনের আদৌ কোনো সার্থকতা আছে কিনা—এই মূল প্রশ্ন তুলেছেন!

সতীকান্ত গুহ মহাশয় ছিলেন এই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা। প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঠিকই বলেছেন, এ ধরনের বিশাল অনুষ্ঠানের সংগঠন যে কোনো অসামান্য সাহিত্যরথীকেই করতে হবে, তার কোনো মানে নেই। তাঁরা এ কাজ ভালো পারেনও না। উৎসাহী, উদ্যোগী, কর্মক্ষম, অর্থবান বা অর্থ সংগ্রহে পারঙ্গম ব্যক্তিরাই এ কাজের পক্ষে উপযুক্ত। এবং তাঁরা অবশ্যই আমাদের ধন্যবাদার্হ। কিন্তু এই প্রকার পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করলেই কারুকে রাতারাতি বড় কবির সম্মান দেওয়া যায় না। সতীকান্ত গুহ মহাশয়ের নাম আমি নিমন্ত্রণপত্রে এবং প্রচার-পুস্তিকায় আগে অবশ্যই দেখেছি, কিন্তু যে সম্মেলনের প্রথম দিনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে একজন বাঙালী কবিকেও ভাষণ দিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি, সেই অনুষ্ঠানে সতীকান্ত গুহ মহাশয়ের পৌনে এক ঘণ্টাব্যাপী ইংরেজী বক্তৃতা শুনে যদি হতভম্ব হয়ে যাই, সে দোষ আমার? মনে প্রশ্ন জাগবে না, ইনি কে? এতই কি আমরা জড়?

সনাতন পাঠক

কবি সম্মেলন

সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনের সভাপতি সম্পর্কে সাহিত্য সংবাদে সনাতন পাঠকের উক্তি ('কে এক.....' ইত্যাদি) আমারও ক্ষোভের কারণ, এইটুকু জ্ঞাপনের জন্যই অত্র পত্র। বোঝা যাচ্ছে বাঙলা শিশুসাহিত্য সম্পর্কে আপনারা কোনো খবর রাখেন না। নচেৎ জানতে পারতেন, দক্ষিণ কলকাতার এক বৃহৎ বিদ্যালয়ের প্রায় সকল শ্রেণীতেই উক্ত মহৎ সাহিত্যিকের গল্প-কবিতা-ছড়া ইত্যাদি গ্রন্থ একমাত্র পাঠ্য। কোনো কোনো শ্রেণীতে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং সতীকান্ত গুহ এই তিন লেখক ব্যতীত অন্য পাঠ্য নেই। এমনকি, গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেই সেগুলি পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়, স্কুল চলার মাস ছয়েক পরে বই প্রকাশিত হয়। রচনার পূর্বেই সেগুলির মহত্ত্বের কথা ধ্যানযোগে অবগত হয়ে সেগুলি তালিকাভুক্ত হয়।

অধ্যাপক অরুণ বসু
কলকাতা-২৯

'প্রভাত-রবি'

'দেশ' পত্রিকার বর্তমান বর্ষের 'সাহিত্য' সংখ্যায় প্রকাশিত ও শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত, 'প্রভাত-রবি'-শীর্ষক 'প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী' সম্পর্কীয় রচনাটি পড়িয়া প্রীত হইলাম। আমি প্রথম যৌবনে প্রভাতকুমারের কয়েকখানি উপন্যাস ও কয়েকটি ছোট গল্প পড়িয়াছিলাম। তাহার পর কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ল কলেজে আইন পড়িবার সময় তাঁহার নিকট ফৌজদারী আইন বিষয়টি পড়িবার আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল। কারণ, তিনি ব্যারিস্টার ছিলেন ও সেই হিসাবে উক্ত ল কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। আইন পাঠ সমাপ্তির কয়েক বৎসর পরে জ্যৈষ্ঠ মাসে কোনো আত্মীয় প্রতিবেশীর কলিকাতায় বিবাহে বরযাত্রিরূপে সারিয়া ফিরিবার সময় শিয়ালদহ স্টেশনে দার্জিলিং মেলের যাত্রী হিসাবে প্লাটফর্মে দিয়া তাঁহাকে যাইতে দেখিয়াছিলাম এবং সেই ঘটনার দুই দিন পরে ঐ প্রতিবেশী গৃহে পাকস্পর্শ উপলক্ষ্যে প্রীতিভোজে নিমন্ত্রিত, তাঁহার পুত্র শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়কে দেখিয়াছিলাম। তাহার দুই এক বৎসর পরে প্রভাতকুমারের মৃত্যু হইলে, ঐ ল কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর সতীশচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত গুণগ্রাহিতাপূর্ণ একটি ইংরাজী প্রবন্ধ কলিকাতার তদানীন্তন ইংরাজী দৈনিকপত্র Forward-এ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় অংশটি ছিল:—

The keynote of Prabhat Kumar's literary output is neo-realism. The great Rabindranath had possibly no influence upon him. Prabhat Kumar's literature is permeated through and through with simplicity and lucidity. This simplicity and lucidity will be Prabhat Kumar's passport to posterity.

(অর্থাৎ, প্রভাতকুমারের সাহিত্যসৃষ্টির অন্তর্নিহিত ভাবটি হইতেছে 'বাস্তববাদ'। মহান রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রভাব বোধ হয় তাঁহার উপর ছিল না। প্রভাতকুমারের সাহিত্য সরলতা ও প্রাঞ্জলতায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই সরলতা ও প্রাঞ্জলতাই ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের নিকট তাঁহার ছাড়পত্রস্বরূপ হইবে।)

কিন্তু 'প্রভাত-রবি'তে প্রকাশিত প্রভাতকুমারের পত্রাবলী পাঠে জানা যাইতেছে যে, তাঁহার উপর রবীন্দ্রনাথের অসীম প্রভাব ছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম 'একশিষ্য' ছিলেন। অতএব, বাগচী মহাশয়ের উপরে উদ্ধৃত মন্তব্যটি আদৌ সত্য নহে।

এইবার ব্যারিস্টার-অধ্যাপক প্রভাতকুমারের নিকট আমার অধ্যয়নকালের দুই একটি অভিজ্ঞতার কথা জানাইতেছি।

ভারতীয় ফৌজদারী আইন Indian Penal Code ও Criminal Procedure Code লইয়া গঠিত। এই Penal Code-এর ১২৪ক ধারায় sedition অর্থাৎ রাজদ্রোহ অপরাধ বর্ণিত হইয়াছে। ইংরাজ আমলে ভারতবর্ষে প্রথম রাজদ্রোহের মামলা বোম্বাই হাইকোর্টে বালগঙ্গাধর তিলকের বিরুদ্ধে মামলা। কিন্তু কলিকাতা হাইকোর্টে ঐ জাতীয় প্রথম মামলা হইতেছে 'বঙ্গবাসী' নামক সাপ্তাহিকপত্রের বিরুদ্ধে মামলা। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক হিন্দু ধর্মে হস্তক্ষেপকারী কোনো বিশেষ আইন প্রবর্তনের ফলে কলিকাতার 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা ব্রিটিশ সরকারকে আক্রমণ করিয়া ধারাবাহিকভাবে লিখিতে থাকে। ইহার ফলে ঐ পত্রিকার সম্পাদক প্রভৃতি রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হন। বঙ্গভাষায় লিখিত আপত্তিকর মন্তব্যের সরকারি অনুবাদকের দ্বারা ইংরাজীতে অনূদিত অংশের উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া সরকার কর্তৃক মামলা রুজু হইয়াছিল। মূল বাঙলা মন্তব্যের এক স্থানে ছিল:—

আমরা কি শাস্ত্রজ্ঞানে জলাঞ্জলি দিয়া খৃষ্টান হইয়া যাইব?' কিন্তু সরকারী অনুবাদক 'জলাঞ্জলি দিয়া' শব্দদ্বয়ের আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া বাক্যটি এইভাবে ইংরাজী করিয়াছিলেনঃ— 'Shall we throw a handful of water to our belief in the Shastras and become Christians?' আসামী পক্ষের ব্যারিস্টার নর্টন সাহেব এই ভুল অনুবাদটির দিকে বিচারকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন যে, এইরূপ বহু ভুল সমগ্র ইংরাজী অনুবাদটিতে থাকিতে পারে। তাঁহার মতে, যেহেতু বাঙলা মন্তব্যগুলিতেই রাজদ্রোহের অপরাধ করা হইয়াছে একথা সরকার পক্ষ বলিতেছেন, অতএব সেইগুলির ভুল ইংরাজী অনুবাদের উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া আসামীদিগকে উক্ত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা চলে না। ইহার ফলে, আসামীরা মুক্তিলাভ করেন। অধ্যাপক প্রভাতকুমারের মুখ হইতে উক্ত ঘটনাগুলি আমরা শুনিয়াছি।

[illegible] আমরা যে প্রায়ই নিন্দাচ্ছলে Idiot শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা আদৌ সঙ্গত নহে, ইহা 'Idiot-like' হইবে। চিকিৎসক ও আইনজ্ঞ ব্যতীত সাধারণ লোক Idiot শব্দটির অর্থ জানেন না। ইহার অর্থ 'জড়' এবং যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিতে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত ব্যক্তি-দের তালিকার মধ্যে ইহার উল্লেখ আছে। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির দ্বাদশ শতাব্দীর পশ্চিম ভারতীয় প্রসিদ্ধ টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার 'মিতাক্ষরা' নামক টীকায় ইহার সংস্কৃত অর্থ করিয়াছেন, **'জড়ো নষ্টান্তঃকরণো** হিতাহিতাবধারণাক্ষম ইতি'। পরে কোলব্রুক সাহেব 'মিতাক্ষরা' টীকাটিকে অনুবাদ করিতে গিয়া ১৮১০ সালে তাঁহার 'Two treatises on the Hindu Law of Inheritance' গ্রন্থে টীকাকারের উক্ত সংস্কৃত বাক্যটির নিম্নলিখিত ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন— An **idiot** is a person, **devoid** of the **internal faculty** not able to distinguish between right and wrong.

প্রাচীন ও বর্তমান ভারতীয় ফৌজদারী আইনেও কোনো অপরাধীর Idiocy (অর্থাৎ জড়ত্ব) নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইলে তাহার দণ্ড হয় না। ব্যারিস্টারী পড়িবার জন্য ইংলণ্ডে থাকার কালে অধ্যাপক প্রভাতকুমারের একটি Idiot-এর খুনের দায় হইতে নিষ্কৃতির নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঘটিয়াছিল এবং তিনি ফৌজদারী আইন অধ্যাপনাকালে ল কলেজে ইহা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন:

বিলাতে messকে **chummery** বলে। সেখানে একটি **chummeryতে** কতক-গুলি অফিসে কাজ করা লোক ও তাহাদের আশ্রয়ে একটি idiot থাকিত। একদিন সেইগুলির মধ্যে একজন অসুস্থ হইয়াছিল। তাই দুপুরবেলা সে ও idiotটি মাত্র chummeryতে ছিল। অন্য সকলে অফিসে গিয়াছিল। অফিস হইতে প্রথম প্রত্যাগত লোকটি দেখিতে পাইল যে তাহাদের অসুস্থ শয্যাশায়ী বন্ধুটির গলা কাটা। ইহাতে বিস্মিত হইয়া সে idiotকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, idiot 'তাহাকে চুপ করিতে বলিল, কারণ সে তখন ঘুমাইতেছে এবং যখন সে জাগিয়া উঠিয়া মাথার খোঁজ করিবে, তখন ভারি মজা হইবে'। তাহার পর সে সেই কর্তিত রক্তাপ্লুত মুণ্ডটি আনিতে গেল। আদালতে idiotটি খুনের দায় হইতে idiocy'র জন্য নিষ্কৃতি পাইল।

এইবার আমার কর্মজীবনে অনুভূত প্রভাতকুমার সম্পর্কীয় দুই একটি কথা বলিয়া এই দীর্ঘ পত্রের উপসংহার করিব। আমি B L পাশ করার পর সংস্কৃতে M A পাশ করি। তাহার পরে নানা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বহুবর্ষব্যাপী শিক্ষকতা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার বাঙলার পরীক্ষকতা করি। বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে বাঙলা পড়াইতে গিয়া বাঙলা পাঠের অন্তর্ভুক্ত, প্রভাতকুমার রচিত 'মাস্টার মহাশয়' গল্পটি পড়াইতে হইয়াছিল। ইহাতে দামোদর নদের পার্শ্বে অবস্থিত, বর্ধমান জেলার গোসাইগঞ্জ ও নন্দীপুর নামক যে প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি গ্রামের উল্লেখ আছে, লেখক গল্পের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন যে দামোদরের বন্যা তাহাদের ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। পাছে কোনো পাঠক ঐ জেলায় দামোদরের ধারে গ্রাম দুইটির খোঁজ করিতে যান, তাই লেখক সাবধান হইয়া গল্পারম্ভেই দামোদরের বন্যায় তাহাদের ভাসিয়া যাওয়ার কথার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাই হইল ডক্টর বাগচীকথিত neo-realism (অর্থাৎ বাস্তবাভাস)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, প্রভাতকুমারের পৈতৃক বাসগ্রাম ও সম্ভবত জন্মস্থান বর্ধমান জেলারই কালনার সন্নিহিত 'ধাত্রীগ্রাম'। আবার, ল কলেজে প্রভাতকুমারের নিকট ফৌজদারী আইন অধ্যয়নকালে leading-case (অর্থাৎ প্রামাণিক মোকদ্দমা) হিসাবে Emperor Vs Barindra Kumar শীর্ষক মামলার বিবরণ ও সিদ্ধান্ত ও আমাদের পড়িতে হইয়াছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাঙলার সহকর্মী পরীক্ষক হিসাবে ঐ বারীন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়ের সহিত আমার অনেকবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। যাহা হউক, 'প্রভাত রবি'তে ১৩৮ পৃষ্ঠায় সঙ্কলয়িতা সেন মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, 'প্রভাত-কুমারের জীবনীর উপকরণ রূপে এগুলির (অর্থাৎ তাঁহার এ সময়কার রবীন্দ্রনাথকে লিখিত চিঠিগুলির) একটি বিশেষ মূল্য (আছে)'।

শ্রীভবতোষ ভট্টাচার্য

গান্ধীবাদ কি অচল?

শ্রীঅম্লান দত্তের গান্ধীবাদের মূল্যায়ণ ও তৎসম্পর্কিত কতকগুলি সুচিন্তিত সমালোচনা আগ্রহ সহকারে পড়লাম। কিন্তু সমস্ত আলোচনায় যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হল তা এই যে শ্রীদত্ত বা সমালোচক-বৃন্দ কেউই একথা স্পষ্ট করে বললেননি গান্ধীবাদ শুধুমাত্র ভারতবর্ষ বা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে সচল বা অচল কি না। শ্রী দত্তের প্রবন্ধ পাঠ করে মনে হয় তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেই উল্লিখিত প্রবন্ধটি রচনা করেছেন আর সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ পৃথিবীর ব্যাপক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বৃহত্তর পরিধির মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে গান্ধীবাদের সমালোচনা করেছেন। যাই হোক, গান্ধী-বাদের অন্যান্য দিক সম্বন্ধে কোন মন্তব্য না করে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলন সম্পর্কে কিছু বক্তব্য পেশ করতে চই।

মনে হয় সমাজের রূপান্তরের জন্য মহাত্মা-গান্ধীর অহিংস আন্দোলন বা হিংসাত্মক বিপ্লব কোন পথই একক ভবে কার্যকরী নয়। আন্দোলনকে অনেকগুলি ধাপ পার হয়ে আসতে হয়। সমাজে শোষক শোষিতের দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্ব ভূমিতে পারস্পরিক শক্তির মাত্রাভেদে আন্দোলনের এক একটি বিশেষ পর্যায়ে ও সমাজের এক একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে উভয় পন্থাই পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করতে পারে।

প্রসঙ্গত বলে রাখি—ব্যবহারিক ক্ষেত্রে হিংসা ও অহিংসার পার্থক্য গুণগত নয়, মাত্রাগত। সশস্ত্র সংঘর্ষে হিংসার প্রকাশ বেশী, আর আন্দোলন যেখানে সশস্ত্র নয় হিংসার প্রকাশ সেখানে কম—অর্থাৎ আপেক্ষিকভাবে তা অহিংস। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনে কার্যত ব্যক্তির মানস বৈশিষ্ট্যের প্রকার ভেদে এই দ্বিতীয় ধরনের হিংসা ও যথার্থ খৃষ্টীয় মনোভাবের মিশ্রণ ঘটেছে। তাছাড়া অবস্থা বিশেষে সাময়িকভাবে উপায় হিসাবে বিশেষ অবস্থায় হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করা আর হিংসাকে পোষণ করা ও হিংসান্ধ হওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। হিংসা এক নিম্নমানের মনোবৃত্তি—আর সে হিংসা যদি দুর্বলের হিংসা হয় তবে তা আরো নিম্নমানের। এই ধরনের হিংসা সমাজে উস্কানি পেতে থাকলে তা রাজনৈতিক সামাজিক সমস্ত ক্ষেত্রকেই পঙ্কিল ও বিষময় করে তোলে ও তা কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হয় না। সুতরাং উপায় হিসাবে হিংসার ব্যবহারে

সংযম ও সচেতনতা অবশ্যই প্রয়োজন। হিংসার আশ্রয় গ্রহণ ব্যাপারে এই সংযমের প্রবণতাই গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের নীতির বাস্তব রূপ।

তা যাই হোক হিংসার সশস্ত্র বিপ্লবের ভেতর দিয়ে সমাজ রূপান্তরের ঐতিহাসিক নজীর যথেষ্ট আছে। কিন্তু সেটা কার্যকরী হয়েছে সেইখানেই যেখানে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে ব্যাপক শক্তিশালী সংগঠন ও সুচতুর নেতৃত্বের সমন্বয়ে শোষিত শ্রেণী শোষক শ্রেণীর তুলনায় বেশী শক্তি অর্জন করেছে। চীন ও রাশিয়ার সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের কথা ধরা যাক। সমাজতন্ত্রের অবক্ষয় ঘটেছে। ধনতন্ত্র শিশু—সমাজে শিকড় গাড়তে পারেনি, দেশ যুদ্ধ ক্লান্ত, অর্থনীতি বিপর্যস্ত। এই যুগসন্ধিক্ষণে শোষিত শ্রেণীর দুর্বলতার সুযোগে নবোদ্ভূত সাম্যবাদী দল সশস্ত্র বিপ্লবের ভেতর দিয়ে সেখানে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে। আর এক্ষেত্রে রক্তপাত রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করার ব্যাপারে যতটা না ঘটেছে, প্রতি বিপ্লবী আন্দোলন দমন করে ক্ষমতা পাকা করতে গিয়ে ঘটেছে তার বেশী।

বর্তমানে ধনতন্ত্রের শক্তি রাশিয়া বা চীনের সে যুগের মত দুর্বল নয়, বরং আজ তা বহু ব্যাপক ও বিচিত্র। বর্তমান অবস্থায় ধনতন্ত্রের পতন ও শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতালাভ সহজ ও দ্রুত হতে পারে না। প্রতিপক্ষ যেখানে সবল সেখানে স্বপক্ষের শক্তি সঞ্চয় করা ও প্রতিপক্ষের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় কোণঠাসা করাই সুবুদ্ধি রণনীতি হওয়া উচিত।

যেখানে শোষিত শ্রেণীর শক্তি বিশেষ সংহতি লাভ করেনি অস্ত্র বল নগণ্য ও বা নেতৃত্ব দুর্বল সেখানে হিংসাত্মক সশস্ত্র আন্দোলনের পরিণাম নৈরাশ্য ব্যঞ্জক সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষে নকশালবাড়ির সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন এবং ইন্দোনেশিয়ার সাম্যবাদী দলের করুণ পরিণতিই এর প্রমাণ।

শোষক শ্রেণীর শক্তি যেখানে বেশী, গণতন্ত্রের সুযোগ সুবিধা যেখানে গ্রহণ করা যেতে পারে, পূর্বব্যাখ্যাত অর্থে অহিংস আন্দোলন সেখানে শোষিত শ্রেণীর শক্তিবৃদ্ধির সবচেয়ে কার্যকরী ও বাস্তব উপায়। এ কথা অনস্বীকার্য বিপ্লবী দলগুলির আদর্শ যাই হোক না কেন কার্যক্ষেত্রে ধর্মঘট আইন অমান্য, প্রতিবাদ ঘেরাও ইত্যাদির মাধ্যমে তারা সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশেই নিজেদের শক্তি সংহতি বাড়িয়ে তুলছে। সুতরাং আন্দোলনের একটি বিশেষ পর্যায়ে গান্ধীর অহিংস নীতি অচল তো নয়ই পুরোপুরি সচল নীতি। যে কোন দেশের আন্দোলনের ক্ষেত্রেই এ নীতি মূল্যবান। সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে ফ্রান্সের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এই ধারাতেই একটি উজ্জ্বল ঐতিহাসিক নজীর সৃষ্টি করতে চলেছে। (এ ক্ষেত্রে হিংসাত্মক কার্যকলাপের আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও গভীরতার তুলনায় নগণ্য।)

যথেষ্ট শক্তি অর্জন করার পর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা ও তা টিকিয়ে রাখার জন্য শোষিত শ্রেণীর হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বন করবে কিনা বা তার প্রয়োজন হবে কিনা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র কয়েকটি অতীত ঐতিহাসিক নজীর দেখিয়ে চূড়ান্তভাবে বলা যায় না। দীর্ঘ সংগ্রামে কোণঠাসা, অন্তর্দ্বন্দ্বে হীনবল শোষক শ্রেণীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করতে অতি সামান্য বলপ্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শনই যথেষ্ট হতে পারে।

এখনও যথেষ্ট ঐতিহাসিক নজীর সৃষ্টি হতে বাকী আছে। তা ছাড়া ইতিহাসে রক্তপাতহীন বিপ্লবের নজীর যে নেই তাও তো নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ বিনা রক্তপাতে কিংবা অতি সামান্য রক্তপাতে সামন্ততন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে এসে পৌঁছেছে। ব্রিটেনের ও জাপানের সামাজিক রূপান্তর এর সপক্ষে দুটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যুগোস্লাভিয়া ও কিউবার সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর মোটামুটি শান্তিপূর্ণই বলা চলে। তা যদি হয় তবে ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথে হিংসাত্মক বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী এটা মনে করার পেছনে কোন যুক্তি আছে কি?

তা ছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শোষক শোষিতের, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে ধনতান্ত্রিক শিবিরের দ্বন্দ্ব এবং সাম্রাজ্য ও ধনতন্ত্রবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত পরিণতি একটা বিধ্বংসী পারমাণবিক মহাযুদ্ধের ভেতর দিয়ে ঘটবে তাও জোর করে বলা চলে না। কারণ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের একটা বড় অংশ বর্তমান পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে ও শান্তিপূর্ণ সমাজরূপান্তরে বিশ্বাসী এবং ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর ভেতরেও যুদ্ধবিরোধী মনোভাব ক্রমশ দানা বাঁধছে।

সবশেষে বলি, পৃথিবীতে শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্ব আছে বটে কিন্তু এটা দুই অন্ধ বৃষের লড়াই নয়—বুদ্ধিমান মানুষের দুই শ্রেণীর মধ্যে লড়াই। বুদ্ধিমান মানুষ সব সময়েই দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তির শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে এসেছে—কখনও হয়েছে সফল, কখনও বা বিফল। আর তারই ফলে আমরা দেখি পৃথিবীর ইতিহাস একটানা হিংসাত্মক দ্বন্দ্বের ইতিহাস নয়। পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সমন্বয় ইতিহাসের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে। কিন্তু আমরা অনেকে যখন দ্বন্দ্বের কথা বলি তখন দ্বন্দ্ববোধের দ্বারা এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে থাকি যে সমন্বয় সমঝোতার ব্যাপারটা [illegible] চোখে পড়ে না। যাঁরা ইতিহাসের [illegible] দেখিয়ে হিংসাত্মক আন্দোলনের পন্থাকেই একমাত্র পথ বলে দাবি করেন তাঁরা অতীত ও বর্তমান ইতিহাসের পরিস্থিতির পার্থক্যটা উপেক্ষা করেন, ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণে মানুষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটাকে আমল দেন না এবং এক ধরনের ঐতিহাসিক নিয়তির কাছে অসংগতভাবে আত্মসমর্পণ করে বসে থাকেন। ইতিহাস যান্ত্রিক ছকে চলে না—অতীত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ইতিহাস নয়, ইতিহাস সৃষ্টিশীল—বাস্তব অবস্থার সঙ্গে বুদ্ধিমান কল্যাণকামী (ন্যূনপক্ষে আত্মকল্যাণকামী) মানুষের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দ্বারাই সে ইতিহাস সৃষ্ট হয়।

অনেকে বলতে পারেন শোষক শ্রেণী লোভান্ধ ও স্বার্থান্ধ। রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ছাড়া তারা সেই লোভ ও স্বার্থ ত্যাগ করবে না। .....প্রতিপক্ষ অন্ধ তথা নির্বোধ—সর্বনাশ সমুৎপন্ন দেখেও জনমতকে উপেক্ষা করে মার না খাওয়া পর্যন্ত অন্তত নিজেদের কল্যাণের খাতিরেও ধনলোভ ত্যাগ করবে না, এটা মনে করে একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করা যেতে পারে বটে—কিন্তু এর দ্বারা বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে কোন যথার্থ ধারণা হতে পারে না। গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের চাপে শোষক শ্রেণী ক্রমাগত ছাড় (concession) দিতে দিতে পশ্চাদপসরণ করছে তা দেখেও কি বলতে হবে হিংসাত্মক বিপ্লবের পথই একমাত্র পথ, বর্তমান যুগধর্মে গান্ধীর অহিংসা আন্দোলনের নীতি একেবারেই অচল? এবং সুদূর সাম্যবাদী সমাজ সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপে মানুষ ক্রমাগত অস্ত্রের ব্যবহার আর রক্তপাত করেই চলবে এই ধারণাটাই চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে? এই মনোভাবের ভেতর দিয়ে সাম্যবাদী সমাজসৃষ্টির কল্যাণকর ইচ্ছা এবং মস্তিষ্কের উত্তাপ কোনটা বেশী প্রকাশ পায়?

অসীমকুমার ভট্টাচার্য
কাঁচরাপাড়া

সাহিত্য সংবাদ

গ্রীষ্মের ঝড়

সমুদ্র তীরে বালির ওপরে পড়ে ছিল একটি যুবতীর দেহ, মৃত এবং সম্পূর্ণ নগ্ন।

উপন্যাসটির শুরু এই দৃশ্য থেকে। কয়েকটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে প্রথম সেই মৃতদেহটি দেখতে পায়। স্পেনের সমুদ্র উপকূলে, কয়েকটি ধনী পরিবারের নিজস্ব এলাকা, বাইরের লোকের প্রবেশ নিষেধ। মেয়েটির মৃতদেহ সমুদ্র দিয়ে ভেসে এসেছে, কিন্তু অবিকৃত।

স্প্যানীশ উপন্যাসটির ইংরেজী অনুবাদের নাম সামার স্টর্ম, লেখক হুয়ান গারথিয়া হরেলোনো। গ্রন্থকারের বয়েস ৪০, নাট্যকার হিসেবেই বেশী পরিচিত, তাঁর প্রথম উপন্যাস সমালোচকদের কাছ থেকে প্রশংসিত হয়েছে। এই উপন্যাসটিকে আধুনিক স্প্যানীশ উপন্যাসের একটি বিশেষ উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা যায়।

উপন্যাসটি যে ধারায় রচিত সেই ধারাটি আজকাল বিরল হয়ে এসেছে। সংবাদপত্রের বহুল বিস্তারের ফলে সাংবাদিক-গদ্যই পাঠকদের কাছে বেশী পরিচিত, এবং গল্প-উপন্যাসে সেই গদ্যই চলছে। এই গদ্য লঘু এবং ক্ষিপ্র, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যেতে একটুও সময়ক্ষেপ করে না। আজকালকার ইংরেজী বাংলা উপন্যাসে এই গদ্যই প্রধান। এই সাংবাদিক গদ্য ভালো কি খারাপ সে কথা জোর দিয়ে বলা যায় না, নিছক খারাপ বলে উড়িয়ে দিলেও অবশ্য ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে যাওয়া হবে।

আলোচ্য উপন্যাসটির ভাষা মৃদু ও মন্থর, কোথাও ব্যস্ততা নেই। ফলে, এতে বর্ণিত অবসন্ন চেতনার কথা বেশ নিবিড়-ভাবে অনুভব করা যায়। একজন লোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের পাড়ে যাচ্ছে একা। যাবার পথে কিছুই ঘটলো না, শুধু সে অলস পায়ে হেঁটে গেল, তবু এই পথটুকুর দুধারের দৃশ্য ও বস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা অনেক লেখকের কাছে অপ্রয়োজনীয়, এই লেখকের কাছে নয়। সমস্ত পাত্রপাত্রীর পোশাকের বর্ণনা, চেয়ারে কে কি রকম ভাবে বসে আছে, কার হাতে কখন ঠিক কোন পানীয়—এসব উল্লেখ করতে লেখক কখনো ভোলেননি। ফলে, মন্থর অর্থহীন জীবনের ছবি খুব চমৎকার ফুটে উঠেছে। সমুদ্রের পাড়ে নগ্ন মৃত যুবতীর দেহ আবিষ্কার দিয়ে যে উপন্যাসের শুরু, সেটাকে ডিটেকটিভ উপন্যাসের মতন হুড়হুড়িয়ে লেখার লোভ অনেকেই সামলাতে পারতেন না।

কয়েকটি অর্থবান অভিজাত পরিবার সমুদ্রতীরে গ্রীষ্মাবাস বানিয়েছে—শহর ছেড়ে নিরালায় গ্রীষ্ম কাটাবার জন্য। সকালে বিকেলে সমুদ্রে সাঁতার, এক এক সন্ধ্যেবেলা এক একজনের বাড়িতে পার্টি, হ্রস্ব বেশবাস পরে বাগানের চেয়ারে বসে রোদ পোহানো—এ ছাড়া আর কিছুই করার নেই। সকলেরই ব্যবহার ভদ্র ও ফর্মাল। এদের পুরুষরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আহত হয়েছিল, তখন লড়াই করেছে নোংরায় কাদায়, মেরেছে ও মরেছে, দেখেছে নরক, ব্যারাকের বেশ্যা পল্লীতে মুখ গুঁজে পড়ে থেকেছে—সে সব ভুলে এখন আবার ফিরে এসেছে ভদ্র, অভিজাত জীবনে—এখন তারা প্রতি পদক্ষেপে কেতা দুরস্ত, ছেলেমেয়েদের শেখাচ্ছে যোগ্য সহবৎ। ওদের স্ত্রীরা চুলের ঔজ্জ্বল্য ও পায়ের আকৃতি ঠিক রাখার জন্য অতি পরিশ্রমী, পরনিন্দার মধ্যেও ঔদার্যের ভান। স্প্যানীশ উপন্যাসের মধ্যে সাধারণত যে দারিদ্র্য, ষাঁড়ের লড়াই, খুনোখুনি কিংবা জিপসী নাচ দেখবো বলে আমরা আশা করি— এ উপন্যাসে তার কিছু নেই। দারিদ্র্য আছে বটে দূরের জেলে পাড়ায়—কিন্তু তা অনেক দূরে। এখানে সমুদ্রের পাড়ে এই ধনী পরিবারগুলির জীবন আপাত নিস্তরঙ্গ, এখানে প্রাচুর্য ও বিলাসিতা ও আলস্যের একঘেয়েমি। কিছুদিন ধরেই আকাশে মেঘ করে গুমোট হয়ে আছে, হঠাৎ কখন গ্রীষ্মের ঝড় উঠবে। এদের কথাবার্তায় অবধারিতভাবে আসবে আবহাওয়া প্রসঙ্গ, কবে ঝড় আসবে, এবারের ঝড়ে নাকি সমস্ত ইওরোপ তছনছ করে দেবে।

এর মাঝখানে ঐ নগ্ন যুবতীটির মৃতদেহ এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। মেয়েটির শরীরে পোশাক নেই, আশেপাশে কোথাও তার পোশাকের চিহ্ন নেই। তিরিশের নিচে বয়েস, সুঠাম স্বাস্থ্য, চামড়ার মসৃণ উজ্জ্বলতা দেখে মনে হয় সে স্প্যানীশ নয়, বিদেশিনী, সম্ভবত ইংরেজ মেয়ে। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা প্রথম তাকে দেখতে পায়।

সাধারণ মধ্যবিত্ত লোক হলে তাদের মধ্যে এ নিয়ে মহা উত্তেজনার সঞ্চার হতো। অবিশ্রান্ত ঔৎসুক্য, গুজব আর গল্প ছড়াতো। কিন্তু অভিজাতরা কোনো ব্যাপারেই সহজে বিচলিত হয় না। একটি মেয়ের মৃতদেহ পাওয়া গেছে— এ নিয়ে পুলিশ মাথা ঘামাবে, তারা মাথা ঘামাবে না। তাদের জীবন পূর্ববৎ চলতে লাগলো, সেই রোদ পোহানো আর সাঁতার, জিন কিংবা হুইস্কির গ্লাস নিয়ে বারান্দায় বসা। পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তায় মেয়েটির প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্তভাবে দু' একবার ওঠে, কেউই বেশী কৌতূহল দেখায় না, প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়।

প্রথম পরিবর্তন দেখা দিল বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের মধ্যে। তারা আগে সাবলীল আনন্দে ছুটোছুটি করে খেলতো, এখন তারা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলে। ফিসফিসানি মানেই অপরাধ বোধ। বাবা-মায়েরা জেরা করে আড়ি পেতে সন্তানদের আলোচনা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়। আট-ন' বছরের ছেলেমেয়ে, তারা ঐ প্রথম একজন সম্পূর্ণ নগ্ন নারী মূর্তি দেখেছে। তারা নারী শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করছে। একজন প্রশ্ন করে, হুয়াভিয়ের কাকা, ন্যাংটো অবস্থায় কেউ মারা গেলে, সে স্বর্গে যায়?

সেই অভিজাতবৃন্দের মধ্যে একমাত্র ডন হুয়াভিয়ের-ই বিচলিত হয়েছেন। তিনিই এ কাহিনীর উত্তর পুরুষ। ডন হুয়াভিয়ের বলশালী চেহারার প্রায়-প্রৌঢ়। সার্থক জীবন, ব্যবসায়ে উন্নতি করেছেন, তিনিই সমুদ্র-উপকূলের এই গ্রীষ্মাবাসের নির্মাণ-কারক। তাঁর স্ত্রী ডোরা প্রথাগত সুন্দরী, দুটি ফুটফুটে সন্তান—আদর্শ পরিবার, অনেকেই ডন হুয়াভিয়ের-এর সুখী দাম্পত্য জীবনকে ঈর্ষা করে। কিন্তু সেই নগ্ন যুবতীর মৃতদেহ ডন হুয়াভিয়ের-এর মধ্যে একটা বিষাদময় অস্বস্তির সৃষ্টি করলো। তিনি বারবার মেয়েটির মুখ দেখতে যান, শুধু মুখ— সেখানে একটা পবিত্র অভিমান লেগে আছে। হুয়াভিয়ের মেয়েটিকে চেনেন না, কখনো দেখেন নি। এক মুখ অন্য মুখের কথা মনে পড়ায়—কিন্তু হুয়াভিয়ের সে-রকম কোনো বাল্য স্মৃতি কিংবা ব্যর্থ প্রণয়ের চিন্তায় ডুবলেন না। তাঁর মধ্যে একটা যুক্তিহীনতা ও ছটফটানি দেখা দিল। বাইরে সেই দায়িত্ববান স্বামী ও পিতা হিসেবে রয়ে গেলেও ভিতরে তাঁর আত্মা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এই ফাঁপা অর্থহীন জীবনের সব অসারতা নিয়ে টের পেয়ে গেলেন। বিনা দ্বিধায় ও বিনা পরিকল্পনায় তিনি বন্ধু পত্নীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। আবার একই সঙ্গে, একই সময়ে

একটু দূরের শহরে এক নষ্ট মেয়েমানুষের সঙ্গে শারীরিক সংসর্গ উপভোগ করতে লাগলেন। বস্তুত এই দুটি সম্পর্কের মূলেই কোনো যৌন আবেগের বাড়াবাড়ি নেই, ডন হুর্নাভিয়ের রাতারাতি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়লেন না, আসলে তিনি নিজের ছটফটানির ব্যাখ্যা খোঁজার জন্য নিজেকে হারাতে ও ভাঙতে চাইলেন। কিন্তু তাও অত সহজ নয়। শেষ পর্যন্ত কিছুই হলো না—জীবন আবার যথানিয়মে চলতে লাগলো।

যাঁরা বিশ্বাস করেন উপন্যাসে একটা উত্তরণ থাকা দরকার, শেষ পর্যন্ত কোথাও একটা লক্ষ্যে পৌঁছোনো উচিত—তাঁদের হয়তো এ উপন্যাস ভালো লাগবে না। কিন্তু এই [illegible] অবিশ্বাস ও অন্বেষিত এবং কয়েকটি আনুষঙ্গিক উপলব্ধি অত্যন্ত সার্থক ভাবে ফুটেছে হুর্নাভিয়ের তাঁর ধারাবাহিক জীবন থেকে বিচ্যুত হননি, সাধারণত কেউ তা হয়ও না কিন্তু ভিতরে ভিতরে নষ্টনীড় হয়ে গেছে আমার উপন্যাসটি ভালো লেগেছে।

সনাতন পাঠক

পুস্তক পরিচয়

জীবনী

আমার জীবন। মধু বসু। বাক্‌সাহিত্য: ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য ১৫·০০।

চলচ্চিত্র জগতে একটি সুখ্যাত নাম মধু বসু। ধরতে গেলে ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্মকাল থেকেই তিনি নানাভাবে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। সম্ভ্রান্ত বংশের শিক্ষিতদের নিয়ে ক্যালকাটা অ্যামেচার প্লেয়ার্স দল গঠন করে মঞ্চজগতে [illegible] একটি ইতিহাস। মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের প্রযোজক পরিচালক এই খ্যাতনামা মানুষটির জীবনের ঘটনাবহুল কাহিনী মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের ইতিহাস রচনায় প্রচুর মালমশলার যোগান দেওয়ার সঙ্গে গত শতাব্দীর সমাজ জীবনের বহু তথ্যও জানবার সুযোগ এনে দিয়েছে। সে-কালের বিখ্যাত যেসব পরিবারের সংস্পর্শে লেখক এসেছেন তাঁদের অনেকের বিষয়ে অনেক তথ্য গ্রন্থখানিকে পুষ্ট করেছে। শুধু তাই নয়, জার্মানী ও ইংল্যাণ্ডেও চলচ্চিত্র বিষয়ে শিক্ষালাভ-সূত্রে লেখকের বিচিত্র অভিজ্ঞতাসমূহ উপন্যাসের মতো রোমাঞ্চকর। নিজের যেখানে যেমন দুর্বলতা ঘটেছে তাও অকপটে তিনি ব্যক্ত করেছেন—দোষত্রুটি চাপা দেবার চেষ্টা করেননি। আর তাই গ্রন্থখানি [illegible] সমৃদ্ধ একটি ব্যক্তিগত জীবনী হয়েও সরলভাবে বর্ণনাগুণে একটি সাহিত্য-কীর্তির মর্যাদা পাবার যোগ্য হয়েছে। [illegible] একটা যুগের বহু খ্যাতনামার ব্যক্তিগত জীবনের বহু ঘটনা পাওয়া যায়, সে কারণে একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে লেখাটি মূল্যবান।

(১২৪/৬৭)

প্রবন্ধ

বীক্ষা ও অন্বীক্ষা। অসিত গুপ্ত। চতুষ্কোণ প্রকাশনী: ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯। চার টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি লেখকের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি জর্নালধর্মী রচনার সংকলন। সাহিত্য, সমাজনীতি, চলচ্চিত্র প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে লেখকের নানা ভাবনার পরিচয় এতে বিধৃত। প্রাঞ্জলতা-হীন বক্তব্য এবং রচনাকারের কোন পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অভাবই প্রধানত রচনাগুলিকে দুর্বল করেছে। শ্রীঅসিত গুপ্ত প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে নবাগত, সুতরাং তাঁর কাছ থেকে এ ধরনের লেখা প্রত্যাশিত নয়। কোন জীবনশিল্পীর দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ও বোধের পরিপ্রেক্ষিতে যে ধরনের স্বগত চিন্তা বা শিল্প জিজ্ঞাসা সম্পর্কে পাঠক সাধারণের কৌতূহল থাকে তা একজন নবাগত লেখক নিশ্চয়ই দাবি করতে পারেন না। অথচ এখানে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা সত্যজিৎ রায়ের ছবি বা 'সমাজতন্ত্র বিবেকানন্দ সনাতন ধর্ম' অথবা 'সার্ত্র-এর তত্ত্ব ও ব্যক্তিত্ব' প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে লেখকের ব্যক্তিগত টুকরো টুকরো অনুভাবনাই প্রধান, গঠন বা বিশ্লেষণের সাহায্যে কোন পরিচ্ছন্ন বক্তব্যের প্রতিষ্ঠা তাঁর কাছে বড় কথা নয়। মধ্যে মধ্যে চমকপ্রদ কিছু পাণ্ডিত্যপূর্ণ

মন্তব্য থাকলেও যৌক্তিকতার অভাবে তা দায়িত্বহীন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কলমে যে মন্তব্য মানিয়ে যায় বা তাঁর কোন সিদ্ধান্ত আপাত দুর্বোধ্যতা সত্ত্বেও পাঠকের কাছে যে ধরনের অভিনিবেশ দাবি করতে পারে, সে কি সুধীন্দ্রনাথের গদ্যের অনুকরণ করলেই পাওয়া যায়? অনুকৃতি হয়ত সর্বাংশে নিন্দনীয় নয় যদি না নিছকই শিক্ষানবিশী হয়, কিন্তু আলোচ্য লেখকের মানসিক সজীবতা ও তাঁর পরিশ্রমের উপযুক্ত ফল পেতে হলে তাঁকে তাঁর নিজের গদ্য খুঁজে বার করতেই হবে।

বইটির অপরিচ্ছন্ন ছাপা, প্রচ্ছদে লেখকের নামের বানান ভুল, বড়ই দৃষ্টিকটু।

বড়গল্প

তিমির বাসর : সন্তু মুখোপাধ্যায়। অভিধা। ৯৩ সিমলা স্ট্রীট, কলকাতা-৬। দুই টাকা।

'তিমির বাসর' একটি প্রেমের গল্প। নায়ক অমিত খেয়ালী শিল্পী, প্রকৃতিটি বাউণ্ডুলে। নায়িকা মন্দিরা অনেক আঘাতে বিপর্যস্ত, অমিতের অকর্মণ্যতায় বিরক্ত হয়ে তাড়িয়ে দিয়েও তার প্রতীক্ষায় কালযাপন করা ছাড়া জীবনে তার দ্বিতীয় অবলম্বন নেই। শেষ পর্যন্ত অমিত ফিরে এলো। মন্দিরার প্রতীক্ষা সার্থক। লেখক অনায়াস-প্রচেষ্টায় কাহিনীটি বলেছেন। ভাষা স্বচ্ছন্দ। কিছু ঘটনার বাহুল্য বর্জন করতে পারলে কাহিনীটি আরও পরিচ্ছন্ন হতো।

৭০।৬৬

বিবিধ

Towards a Better Life.

ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য গভর্নমেন্ট যে-সমস্ত উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছেন, তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ইংরেজী পুস্তকে পাওয়া যাবে। পর পর তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার ফলে দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান কি পরিমাণে নানা দিক থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে সে সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট ধারণাও এই পুস্তক থেকে করা যাবে বলে মনে করি।

প্রাপ্তি স্বীকার

শ্রীমদ্ভাগবতম (১০ খণ্ড)। মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার : ৩ অম্বিকা নিয়োগী লেন, কলিকাতা-৩। মূল্য ৮·৫০।

Problems of Translation : Allen Wendt, Lila Ray, Monomohon Thakur, Premendra Mitra, Jagannath Chakravarty. All India Poets' Conference : 2 Auckland Place, Calcutta-17.

DE ROZIO by Bijoy Bhattacharya. Well Print Publications : 8A 2 W.E.A., New Delhi-5. Price Rs. 2.00.

কার্ল মার্কস। ডঃ পঞ্চানন সাহা। ভারত-গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্র মৈত্রী সমিতি : ১৪৪ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য ০·১৫।

নিঃসঙ্গ আরণ্যক বিভূতিভূষণ। বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত। শরৎ পুস্তকালয় : ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৫·০০।

খেলার মাঠে

কথা হচ্ছিল সিউলের এশিয়ান যুব ফুটবলের আসর থেকে ফিরে আসা ভারতীয় রেফারি শ্রী আর কে দত্তর সঙ্গে।

দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল কলকাতার তুলনায় বেশ ছোট শহর। কিন্তু যুব ফুটবলের জন্য তাদের যে আয়োজন এশিয়ান গেমস-এর জন্যও ভারতের পক্ষে সে আয়োজন করা সম্ভব কি না সন্দেহ। প্রতিযোগিতার নিখুঁত পরিচালনার কথা ছেড়ে দিচ্ছি, অংশগ্রহণকারী দলের খেলোয়াড়দের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর রাখার কথাও ধরছি না। কোন ব্যাপারে কারো কিছু অভিযোগের কারণ ঘটেনি, ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল রেখে সব কাজ এগিয়ে গেছে। প্রতিযোগিতার সঙ্গে কোচিং ক্যাম্পের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সে কোচিং ক্যাম্প শুধু কোরিয়ার ছেলেদের জন্য নয়, সব দেশের জন্য। তা ছাড়া ফিফার সঙ্গে ব্যবস্থাপনায় বিশ্বখ্যাত জার্মান ফুটবল কোচ ডেটমার ক্রেমারকে আনিয়ে এশিয়ার কোচদের জন্যও একটি ক্যাম্প খোলা হয়েছিল। সেখানে ফুটবলের আলোচনা, ফুটবলের শিক্ষা, ফুটবল খেলার ছায়াচিত্র, বক্তৃতা, উপদেশ, প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে রুটিন ধরে চলেছে। ডেটমার ক্রেমার প্রদর্শনীর মাধ্যমে এক একদিন খেলার এক একটি বিষয় বুঝিয়ে দিয়েছেন। বল মারার পদ্ধতি, আউট সাইড ডজ ও ইনসাইড ডজের প্রক্রিয়া, কপাট আঁটা রক্ষণব্যূহ ভেদ করার ট্যাকটিকস, আক্রমণে বাড়তি শক্তি যোগাবার উপায়, শুটিং, হেডিং, ড্রিব্লিং প্রভৃতির কলাকৌশল—সবই এশিয়ান কোচদের হাতেকলমে বুঝিয়ে দিয়েছেন ডেটমার ক্রেমার।

প্রতিযোগিতার সঙ্গে এ ধরণের শিক্ষামূলক ক্যাম্প খোলার এক বিশেষ মূল্য আছে সে কথা বলাই বাহুল্য। ফুটবল সম্পর্কে এশিয়ার ছোট ছোট দেশের ধ্যান ধারণা এমন বলেই খেলাতেও তাদের প্রকৃত উন্নতি। রেফারি আর কে দত্তই বলছিলেন, বরমা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন তাদের যুব দলকে দুমাস মিলিটারী ক্যাম্পে রেখে অনুশীলন করিয়েছে। তার আগে পরিকল্পনা মত দল গড়েছে। ইজরাইলের দল গঠনে এবং ট্রেনিং পদ্ধতিও পরিকল্পনা মত ছকে বাঁধা।

সাধারণত ওরা দেশের গুণী ও সম্ভাবিত তরুণদের নিয়ে তিনটি দল গড়ে। দুটি সিনিয়র, একটি জুনিয়র। প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন সিনিয়র দুটি দল নিজেদের মধ্যে খেলার অনুশীলন রেখে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রস্তুতির কাজ সেরে নেয়। সম্ভাবিত তরুণদের নিয়ে গড়া জুনিয়র দলও সিনিয়রদের সঙ্গে অনুশীলন করে। তার মধ্যে যারা বিশেষ নৈপুণ্য ও দক্ষতার পরিচয় দেয় তারা সিনিয়র দলে প্রোমোশন পায়। প্রতি বছর দুটি-একটি করে খেলোয়াড়কে এইভাবে সিনিয়র দলে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়।

কিন্তু আমাদের দেশে দল গড়ার এমন পরিকল্পনা তো নেই-ই, প্রতি প্রতিযোগিতার একেবারে শেষ সময় দল গড়াই আমাদের রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে।

এশিয়ান যুব ফুটবল উপলক্ষে প্রকাশিত সুভেনিরে দেখলাম অংশগ্রহণকারী সবদেশের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদেরই ছবি আছে শুধু ভারত ছাড়া। কারণ এত দেরীতে ভারতের দল গড়া হয়েছে যে খেলোয়াড়দের ছবি পাঠাবার মত সময় পাওয়া যায়নি। তবে হ্যাঁ, ভারতীয় এক কর্মকর্তার ছবি আছে সুভেনির-এর শুভেচ্ছা বাণীতে।

দক্ষিণ কোরিয়ার ফুটবল সংস্থা খেলার রেফারিদের জন্যই খরচ করেছে আমাদের টাকার অঙ্কে এক লাখেরও বেশী টাকা।

ব্রিটিশ হার্ডকোর্ট চ্যাম্পিয়নশিপে দু'বারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন এবং বর্তমানে প্রোফেশনাল খেলোয়াড় রয় এমারসনকে পরাজিত করে ২৪ বছর বয়সী অ্যামেচার খেলোয়াড় মার্ক ককস্ সাম্প্রতিক টেনিসে বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন। ছবিতে ককস্‌কে খেলতে দেখা যাচ্ছে

বিভিন্ন দেশ থেকে আগত রেফারি ও কর্মকর্তাদের আরাম উপকরণের যে ব্যবস্থা ছিল তাও বলবার মত। তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল একখানি করে বড় আকারের মোটরগাড়ি। তাতে অংশগ্রহণকারী ১২টি দেশের পতাকা সজ্জিত। ট্রাফিক পুলিশের উপর সরকারী নির্দেশ ছিল, রাস্তায় যত ভিড়ই থাক আর রাস্তা যত 'জ্যাম'ই হক পতাকাসজ্জিত এই গাড়িকে আগে ছেড়ে দিতে হবে। রেফারি ও কর্মকর্তাদের থাকবার হোটেলে ছিল রেডিও টেলিভিশন, টেলিফোন, গরম ও ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থা, ঘর-গরম রাখার হিটার প্রভৃতি আরাম উপকরণ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের চরম ব্যবস্থা। আনুপাতিক মতই খাদ্যসামগ্রী। আতিথেয়তার এই পরিচয়ের সঙ্গে তাদের আন্তরিকতারও পরিচয় মিলেছে। শুধু খেলার ব্যাপারেই নয়, সব কিছুতে। তাদের খেলাতেও এই আন্তরিকতা থাকায় খেলার মানও বাড়ছে।

✻

উনিশশো আটষট্টির উইম্বলডন আরম্ভ হবে ২৪ জুন। শেষ হবে ৬ জুলাই। সকলেরই ধারণা এবারের অনুষ্ঠান হবে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক। কারণ, শৌখিন সম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রতিযোগিতা এই উইম্বলডনে এবার পেশাদাররাও যোগ দিচ্ছেন। এবারের মোট পুরস্কার মূল্য ২৬০০০ স্টার্লিং।

অনেকে ভেবেছিলেন টেনিসের এই 'মুক্তাঙ্গনে' পেশাদারীরা শৌখিনদের কাছে হেরে মান খোয়ানোর ভয়ে এগিয়ে আসতে দ্বিধা করবেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে সে ভয় ঠিক নয়। ওরা সবাই যোগ দিচ্ছেন। পেশাদার নামীদের মধ্যে যারা উইম্বলডনে খেলতে আসছেন তাঁরা হলেন রড লেভার, কেন রোজওয়েল, পাঞ্চো গঞ্জালেস, জন নিউকোম্ব, আর্ল বুকোলজ, লুই হোড, লুই আয়লা—পেশাদার টেনিসের সব দিকপাল।

যদিও পেশাদারদের যোগদানে টুর্নামেন্টের চেহারায় নতুনত্ব আসছে তবু উইম্বলডনের নিয়মকানুন সবই আগের মত বজায় রাখা হয়েছে। পেশাদার ও অপেশাদার সকলেরই সমান ইজ্জত। প্রসঙ্গত বলা দরকার, পেশাদার টেনিসের অন্যতম ধনাঢ্য পরিচালক আমেরিকার এচ লামার হান্টের ছেলেদের পেশাদারী রঙিন পোশাক ছেড়ে উইম্বলডনের গতানুগতিক সাদা জামা গায়ে দিয়ে মাঠ নামতে হবে। কোন হেরফের চলবে না।

পেশাদার - অপেশাদারদের বাছাই তালিকায় ইতর বিশেষ আনার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সে প্রস্তাবও ধোপে টেঁকেনি। সব ব্যাপারে কানুন বজায় রাখবেন বলে অল ইংল্যান্ড ক্লাবের সম্পাদক এ ডি মিলস জানিয়েছেন।

ভবিষ্যত রাজার তালিকায় পুরুষদের বিভাগে 'রড লেভার'কে তুঙ্গে রাখা হয়েছে, আর 'রাণীর' গৌরবের দাবিদার হিসাবে সকলেরই আঙুল 'বিলি জিন কিং'য়ের দিকে। অবশ্য কারো কারো আশঙ্কা, বিলি জিন কিংয়ের সাম্প্রতিক খেলার নমুনায় ওই আশা ফলবতী হবে না।

পুরুষদের বিভাগে অঘটন ঘটলে হয়তো কারোরই বিস্মিত হবার কারণ থাকবে না যদি ইংল্যান্ডের মার্ক ককস তাঁর হাল্কা ফিল র‍্যাকেট দাপটের সমস্তটাই উইম্বলডনের সেন্টার-কোর্টে হাজির করতে পারেন। ওঁর উপর এত জোর দেওয়ার কারণ, কিছুদিন আগে উনি ব্রিটিশ হার্ড কোর্ট টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে পাঞ্চো গঞ্জালেস ও রয় এমার্সনের মত জাঁদরেলদের হারিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন।

সকলেরই সঙ্গত ধারণা, প্রখ্যাত পেশাদারগোষ্ঠিদ্বয় হান্ট ও ম্যাককলের ছেলেরা জোর দ্বন্দ্বে উইম্বলডন মাতিয়ে তুলবে।

তবে পেশাদারদের মধ্যে অভাবনীয় তালিকায় রয়েছেন 'বর্ষীয়ান' পাঞ্চো গঞ্জালেস। তাঁর নড়াচড়ায় যদি যুবকা ফিরে আসে তবে যে কেউ বেগ পাবেন।

পেশাদার ছাড়া শৌখিনদের মধ্যে যাদের সম্ভাবনা বেশি তারা হলেন, পিলিচ (যুগোশ্লাভিয়া), রোচ (অস্ট্রেলিয়া) ড্রিসডেল (দঃ আফ্রিকা), বার্থেস (ফ্রান্স) র‍্যালস্টন (আমেরিকা), টেলর (ব্রিটেন) আমাদের ঘরের ছেলেদের মধ্যে কৃষ্ণ জয়দীপ মুখার্জী, প্রেমজিত লাল ও শ্যা মিনোত্রা যোগ দেবেন।

টেনিস প্রমীলাদের মধ্যে বিলি জিন কিংয়ের কাছাকাছি অপর দাবীদার হলে রোজ মারি ক্যাসলস (আমেরিকা) ফ্রান্সোয়েস ডার (ফ্রান্স) এবং অ্যান জোন (ব্রিটেন)। এঁরা ছাড়াও 'হতচকিত' ফলাফল করার মত আর একজন টেনিস পটিয়সী হলেন অস্ট্রেলিয়ার মার্গারেট স্মিথ কিছুদিন আগে টেনিস থেকে অবসর নিলেও উনি (২৬) পূর্ণ সম্ভাবনা নিয়ে ফিরে আসছেন। এবার বিবাহিত জীবনে 'মিসেস কোর্ট' নামের আড়ালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। উনি পেশাদারী প্রলোভন ৫০ হাজার স্টার্লিংয়ের' মোহ ত্যাগ করে ৩০ হাজার স্টার্লিংয়ের শৌখিন পুরস্কারের দিকেই ঝুঁকে পড়েছেন।

ডাবলসের দিকে চোখ ফেরালে কোন জুটি বাজি মাত করবে এখনই বলা কঠিন। কারণ প্রতিযোগীদের চূড়ান্ত জুটি তালিকা এখনও ঠিক হয়নি। তবু আশ্চর্য সংবাদ ফ্র্যাঙ্ক সেজম্যান ও ডোরিস হার্ট প্রমুখ বর্ষীয়ান ও বর্ষীয়সীদের ডাবলস জুটি হিসাবে খেলতে দেখা যাবে।

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যামেচার টেনিস প্রতিযোগিতা উইম্বলডন আজ মিশ্র প্রতিযোগিতায় পরিণত। তার জন্য অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে অল ইংলণ্ড ক্লাবের পরিচালকদের। এখন তাঁদের মুখে সাফল্যের হাসি।

অল ইংলণ্ড ক্লাবের কর্মকর্তারা এখন পৃথিবীর প্রথম মিশ্র প্রতিযোগিতার মহা আয়োজনে কর্মব্যস্ত। সর্বত্রই সাজ সাজ রব। বহু দেশ থেকে এখানে দর্শক আসেন জুন-জুলাইয়ের সন্ধিকালে। উইম্বলডনের হালচাল, উইম্বলডনের ফ্যাশন অভিজাত-মহলেরও অনুকরণীয়। অ্যামেচারদের খেলাতেই প্রতি বছর টিকিটের জন্য উইম্বলডনে হাহাকার ওঠে। এবার অ্যামেচার-প্রোফেশনালের মিশ্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার টিকিটের চাহিদা আরও বেশি। বলা বাহুল্য, যাঁরা টিকিট পেয়ে খেলা দেখবেন তাঁদের চেয়ে টিকিট না পাওয়া হতাশ দর্শকের সংখ্যা দাঁড়াবে দশগুণ।

একলব্য

ক্রীড়া কাল

টেবল টেনিস খেলোয়াড় সমীর চ্যাটার্জী

উনিশ শ' আটচল্লিশে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ—টেবল টেনিসে বাংলার এক নম্বর খেলোয়াড়। উনিশ শ' আটষট্টিতে সদ্য-সমাপ্ত রজত উৎসব টেবল টেনিসে বিজয়ীর সম্মান। মাঝের কুড়ি বছরে অবশ্যই সাফল্য ও ব্যর্থতার অনেক নজির আছে। আছে খেলা ছেড়ে দিয়ে অধিগত বিদ্যা বালক-বালিকার মধ্যে বিলিয়ে দেবার প্রেরণা। গুরু হিসাবে টেবিলের পাশে গুরুগম্ভীর ভূমিকা। আবার ছাত্র হিসাবে টেবল টেনিসের টেকনিক ট্যাকটিস, মারের প্রক্রিয়া, খেলার সৌন্দর্য আরও ভালভাবে রপ্ত করার প্রচেষ্টা। টেবল টেনিসের ব্যাট প্রথম হাতে উঠেছিল উনিশ শ' আটত্রিশে। ব্যাট নয়, প্লাই একখণ্ড কাঠ। খেলাও খেলার টেবিলে নয়, ডাইনিং টেবিলে। প্রথম স্পর্শেই রোমাঞ্চ! পরে ব্যাট-বল-জাল-টেবিলের সঙ্গে নিবিড় প্রেমে অভিভূত। দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে সমীর চ্যাটার্জির বিদ্যা-ধর্ম-জ্ঞান-কর্ম—সবই টেবল টেনিস। আজ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেও ধ্যান ধারণায় ওই খেলারই শাশ্বত ছবি।

খুব বড় খেলোয়াড়ও সমীর চ্যাটার্জিকে তাঁর নিশ্চয়ই বলেন না। তার চেয়ে অনেক বড় খেলোয়াড় বাংলার টেবল টেনিসকে সমৃদ্ধ করে। অভিন্ন হৃদয় যে বন্ধু প্রথম জীবনে তাঁর খেলার দোসর ছিলেন সেই রণেন ঘোষ সমীরের চেয়ে অনেক প্রতিষ্ঠিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত খেলোয়াড়। কল্যাণ জয়ন্ত, রণবীর ভাণ্ডারী এবং আরও অনেকে অনেক কীর্তির অধিকারী, কিন্তু সমীরের হাতে ফোরহ্যান্ডের যে একটি মার দেখেছি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বহু খেলোয়াড়ের হাতেও সে মার দেখিনি। বার্নার ব্যাকহ্যান্ড ফ্লিকে যেমন সূক্ষ্মতা, কুমার ঘোষের ওই মারে যেমন বিদ্যুৎ সঞ্চালিত শক্তি—সমীর চ্যাটার্জির ফোরহ্যান্ডের মারেও তেমন বজ্রের শক্তি ও রকেটের গতি।

ওই মারের দাপটেই সমীর চ্যাটার্জি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বহুমিল ভানাকে নাজেহাল করেছিলেন, চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন রিচার্ড বার্গম্যানকে একটি খেলায় চারবার ভূপাতিত করেছিলেন।

সমীর তখন উঠতি তরুণ। কল্পনার রঙে রঙীন মন। সেলুলয়েডের ছোট্ট ফাঁপা বলের মধ্যে বারুদ ঢুকিয়ে দেবার বাসনা। তারপর ব্যাটে কামান দেগে টেবিলের উপর আগুন ছোটাবার আগ্রহ। ভানা বা বার্গম্যান, কাকেও সমীর হারাতে পারেননি। উনিশ শ' সাতচল্লিশে কলকাতার প্রদর্শনী খেলায় ভানার সঙ্গে ১৯—১৯ পয়েন্টে সমতা রেখে শেষ পর্যন্ত ১৯—২১ পয়েন্টে হেরে গিয়েছিলেন। উনিশ শ' উনপঞ্চাশে বাটানগরে প্রদর্শনী খেলায় বার্গম্যানের বিরুদ্ধে ১৭—১৩ পয়েন্টে লীড নিয়ে শেষ পর্যন্ত হেরে গিয়েছিলেন ১৮—২১ পয়েন্টে। সে খেলায় সমীরের সেলুলয়েডের গোলা আটকাতে গিয়ে চারবার বার্গম্যান মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন। খেলার শেষে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন, খেলোয়াড় জীবনে এমন মার তিনি খুব কমই খেয়েছেন।

ওই বছরের ফর্ম অনুযায়ী বুদাপেস্টের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দলে সমীরের জায়গা হবে—সবাই ধরেই রেখেছিলেন। কিন্তু দল গড়ায় মুখ-চাওয়া মন-রাখা এবং অন্তরালের নোংরামিতে সমীর বাদ পড়লেন। ফলে খেলার প্রতি আস্থা বীতশ্রদ্ধা। দু বছর খেলা থেকে একটু দূরেই সরে থাকেন। পঞ্চান্ন থেকে আবার ফিরে আসেন খেলার রাজ্যে। তবে সিরিয়াস খেলোয়াড় হিসাবে নয়। গঠনমূলক কাজে, কোচিং অ্যাসাইনমেন্টে।

ছেলেমেয়ে অনেকেই টেবল টেনিসের তালিম নিয়েছে সমীরের কাছ থেকে। ইন্দ্রার লীলা, গ্লোরিয়া গ্রীন, শীলা ওয়ারেন, শকুন্তলা দত্ত, ডেইজি ও কমল কাপাদিয়া, জয়ন্ত দে, অমিত মিত্র অনেকেই খেলোয়াড় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। আবার সিরিয়াস খেলা ছেড়ে দেবার পর সমীর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যাঁদের পরাজিত করেছেন, তাঁদের প্রতিষ্ঠাও কম নয়। কেউ বা বাংলার এক নম্বর, কেউ বা দু নম্বর, তিন নম্বর খেলোয়াড়।

আম্পায়ারিং এবং খেলার টেকনিকের সংগে সাহিত্য মিশিয়ে প্রবন্ধ রচনায়ও সমীরের সুনাম কম নয়। উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে যে তরুণ খেলোয়াড়টির উপরে আম্পায়ারিং-এর দায়িত্ব পড়েছিল সেই খেলোয়াড়টির নামই সমীর চ্যাটার্জি। সেই আম্পায়ারিং দেখে স্পোর্টস ক্রিটিক তলোয়ার খাঁ ইলাস্ট্রেটেড উইকলিতে লিখেছিলেন—দি আম্পায়ারিং অব কুমার ঘোষেজ ফাইনাল সমীর চ্যাটার্জি অব বেঙ্গল ডিজার্ভড দি হাইয়েস্ট প্রেজ। আই বেট হিম দি বেস্ট আম্পায়ার বোম্বে হ্যাজ সিন সো ফার ইত্যাদি।

আর একবার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের একটি খেলায় আমেরিকার জাতীয় চ্যাম্পিয়নের দুর্ব্যবহারে যখন কোন আম্পায়ার খেলা পরিচালনা করতে চান না, তখন সমীর এগিয়ে যান এবং কড়া হাতে রাশ ধরে তিন ঘণ্টা ধরে আম্পায়ারিং করেন।

আমাদের সাংবাদিকদের কাছে সমীর চ্যাটার্জি টেবল টেনিসের মুভিং এনসাইক্লোপিডিয়া। বার্না, বেলাক, জ্যাবাডোজ, সিডো, ককাইয়ান, ভানা, আন্দ্রিয়াদিজ, জনি লীচ, বার্গম্যান প্রভৃতি কোন্ কোন্ বছর ভারতে খেলতে এসেছেন, খেলার ফলাফল কি, সবই সমীরের নখদর্পণে! আবার টেবল টেনিসের বোদ্ধা হিসাবেও সমীর চ্যাটার্জির জুড়ি কম। তাঁর মতে, পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বহুমিল ভানা, বার্নার উপরেও তাঁর স্থান। আর ভারতীয় টেবল টেনিসের মান পড়ে যাবার আংশিক কারণ স্যান্ডউইচড ব্যাট। শেকহ্যান্ড গ্রিপে স্যান্ডউইচড র‍্যাকেটে বল কণ্ট্রোল করা এবং খেলার সৌন্দর্য বজায় রাখা খুব শক্ত! পেন হ্যান্ডে অনেক সুবিধা বলে আজ চীন ও জাপানের খেলোয়াড়দের বিজয়-বৈজয়ন্তী।

মুকুল

বক্তব্য কী। সংঘের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারিত হবে তারপর।

ই-আই-এম-পি-এ'এর বক্তব্য

ই-আই-এম-পি-এ'র কর্মসচিব শ্রীপ্রামাণিক এইদিন জানান, উক্ত শিল্পীদের "বয়কট" করবার ব্যাপারের সংগে তাঁদের সংস্থার কোনও যোগ নেই। ওই সিদ্ধান্ত কয়েকজন প্রদর্শক করে থাকলে তা নিজেদের দায়িত্বেই করেছেন। তিনি বলেন ওই প্রদর্শকরা সংস্থার সভ্য হলেও এ-ব্যাপারে সংস্থাগত ভিত্তিতে যখন কোনও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি, তখন তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করাও ই-আই-এম-পি-এ'র এক্তিয়ারের বাইরে।

এই বিষয়ে এবং সিনেমা ধর্মঘট প্রসংগে আলোচনার জন্য সংঘের তরফ থেকে সোমবার (৩ জুন) য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এক সাধারণ সভা ডাকা হয়।

"রক্তরেখা"-র মুক্তি আসন্ন

সরস্বতী চিত্রম্-এর 'রক্তরেখা' আসন্ন মুক্তি প্রতীক্ষায়। উমাপ্রসাদ মৈত্র পরিচালিত ছবিটিতে সুরারোপ করেছেন নচিকেতা ঘোষ।

বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিজয়া চৌধুরী (বম্বে) শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ললিতা চট্টোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভব্রত দত্ত, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, নিরঞ্জন রায়, দ্বিজু ভাওয়াল, রাজলক্ষ্মী, রজনী প্রভৃতি।

আলোকচিত্র গ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে দীনেন গুপ্ত ও রমেশ যোশী।

"ঝুক গয়া আসমান"

কলকাতার চিত্র প্রযোজক শ্রী জে বি বনসালের রঙিন হিন্দীচিত্র "ঝুক গয়া আসমান" বোম্বাইয়ে গত সপ্তাহে মুক্তি পেয়েছে। ছবির মুক্তি উপলক্ষে বোম্বাই যাত্রার আগে শ্রীবনসাল এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, হিন্দী চিত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেও বাংলা ছবি তিনি আগের মতই তৈরি করবেন। প্রসংগত, শ্রীবনসাল তাঁর প্রযোজিত কয়েকটি বাংলা ছবির (সত্যজিৎ রায়ের "চারুলতা" ও "মহানগর" সমেত) কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, শিল্পসমৃদ্ধ বাংলা চিত্রনির্মাণের কাজে আমি আগেও আগ্রহী ছিলাম এবং এখনও আছি। বাংলা ছবি আমি ভালবাসি।

"ঝুক গয়া আসমান" পরিচালনা করেছেন লেখ টাণ্ডন। রাজেন্দ্রকুমার ও সায়রা বানু নায়ক-নায়িকা।

পান্না-হীরে-চুণী

দীনেশ চিত্রম্-এর প্রথম প্রয়াস 'পান্না-হীরে-চুনী' ছবির চিত্রগ্রহণ অমল দত্তের পরিচালনায় দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। গত সপ্তাহে সংগীত পরিচালক অজয় দাসের পরিচালনায় সাতখানি গান টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে গৃহীত হয়েছে। গানগুলি গেয়েছেন—শ্যামল মিত্র, আরতি মুখোপাধ্যায়, পিণ্টু ভট্টাচার্য ও চন্দনা মুখোপাধ্যায়।

বিভিন্ন চরিত্রে আছেন—অনিল চট্টোপাধ্যায়, জোৎস্না বিশ্বাস অনুপকুমার নিরঞ্জন রায়, নৃপতি গঙ্গোপাধ্যায়, সুখেন দাস, অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী মন্মথ মুখোপাধ্যায়, এবং একটি বিশিষ্ট চরিত্রে একজন নবাগতাকে দেখা যাবে।

সুখেন দাস রচিত কাহিনীটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত।

ই-আই-এম-পি-এ অফিসের সামনে শিল্পীদের বিক্ষোভ; বক্তৃতারত শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

ফটো-দেশ

"পরিণীতা" শেষ পর্যায়ে

অজয় কর পরিচালিত "পরিণীতা"র শুটিং প্রায় শেষ। জুনেই ছবিটির সম্পাদনা আরম্ভ হবে। শরৎচন্দ্রের কাহিনীর ভিত্তিতে তৈরি "পরিণীতা"-য় মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, ছায়া দেবী, বঙ্কিম ঘোষ, শমিত ভঞ্জ, ছায়া দেবী, অনুভা গুপ্ত, রোমি চৌধুরী, গীতা দে প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। সংগীত পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

মুক্তির প্রতীক্ষায় "আপন জন"

তপন সিংহ পরিচালিত "আপনজন" (কে এল কাপুর প্রোডাকশন্স) মুক্তির প্রতীক্ষায় রয়েছে। ইন্দ্র মিত্রর কাহিনী অবলম্বনে পরিচালক-চিত্রনাট্যকার—সংগীত পরিচালক শ্রীসিংহ এই ছবিতে আজকের শৃংখলাহীন সমাজের একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। ছবির বিভিন্ন প্রধান ভূমিকায় স্বরূপ দত্ত, পার্থ মুখোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, শমিত ভঞ্জ, ছায়া দেবী সুমিতা সান্যাল, নির্মলকুমার, রোমি চৌধুরী, বাপী বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ প্রভৃতি রয়েছেন।

ফাইন ছবি "রক্তরেখা"-তে (পরিচালনা : উমাপ্রসাদ মৈত্র) ললিতা চ্যাটার্জি।

ফটো—দেশ

ধ্রুপদী মইনুদ্দীন ডাগর স্মরণে

মৈনুদ্দিন ডাগর

২৯শে মে বিড়লা আকাডেমীর সুরম্য প্রেক্ষাগৃহে পরলোকগত মইনুদ্দীন ডাগরের স্মৃতিসভা সুন্দর অনাড়ম্বর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর যুগে, একদিকে যেমন ক্লাসিক্যাল সংগীতের আদর বেড়েছে, তেমনি উত্তর ভারতীয় সংগীতে ধ্রুপদী প্রভাব খানিকটা কমে গেছে। দুঃখের কথা, সন্দেহ নেই। খেয়াল, ঠুংরীর চটকদারিতা থাকতে পারে, কিন্তু ধ্রুপদে রাগ-তালের বিশুদ্ধতা ও শ্রুতির যে নিখুঁত ব্যবহার পাওয়া যায়, তা খেয়ালের তানকর্তবে অনেক সময়েই হারিয়ে যায়।

আরো দুঃখের কথা যে, ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের মৃত্যুর পরে ধ্রুপদ-ভাঙ্গা খেয়ালে আলাপ করার পদ্ধতিও আজকাল বিশেষ কেউ গ্রহণ করেন না। অবশ্য স্বর্গত ওঙ্কারনাথের বাঁটের কাজ ছিল নিশ্চয়ই ধ্রুপদী-অঙ্গের, তেমনি আমীর খাঁর কায়দাবিস্তারে রাগের বিশুদ্ধ মূর্তি ধীরে ধীরে শ্রোতার কাছে প্রতিভাত হয়।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে, বিশেষ করে পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে ধ্রুপদ প্রচারের কাজে ডাগর ভ্রাতৃদ্বয়ের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বড়ো ভাই নাসির মইনুদ্দীন ডাগরের অকাল মৃত্যুতে যে ক্ষতি হলো, তা বোধ হয় শীঘ্র পূরণ করা সম্ভব হবে না। স্বর্গত মইনুদ্দীনের চার ভায়ের মধ্যে আমিনুদ্দীন ডাগর তাঁর বাবার কাছে সামান্য এবং বড়ো ভায়ের কাছে কিছু তালিম পেয়েছিলেন। জাহিরউদ্দীন ও ফায়াজউদ্দীন এখনও তরুণ ও অপরিণত। অথচ ধ্রুপদী এই বংশটির ঐতিহ্য দু'শ বছরেরও বেশী। জাকরুদ্দীন বা আলাবন্দে খাঁ, তাঁদের পুত্র নাসিরুদ্দীনের (ডাগর ভ্রাতৃদ্বয়ের স্বর্গত পিতা) গান শুনেছেন এমন অনেকে আজো শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন যে, আমাদের রাগসংগীতে শ্রুতির ব্যবহার জানতে ও বুঝতে হলে ওঁদের গান শুনতে হয়।

স্বর্গত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সংগীত-স্মৃতিকথাতেও (এখনও ছাপা হয়নি) এঁদের কথা বার বার স্মরণ করা হয়েছে।

সেদিনকার আসরে আমিনুদ্দীন ডাগর সুরদাসী মল্লার পরিবেশন করলেন প্রায় এক ঘণ্টার কিছু বেশী। রাগটি ছোটো। রাগকে অক্ষুণ্ণ রেখে বিস্তার করা বেশ শক্ত। তাছাড়া গানের প্রারম্ভে তিনি বলে নিলেন, তাঁদের ঘরে সুরদাসী মল্লারে কোমল গান্ধার লাগানো হয়ে থাকে। কোমল গান্ধারের ব্যবহারটি নিশ্চয়ই চিত্তাকর্ষক এক্সপেরিমেণ্ট, তবে আমাদের মতে রাগ-মূর্তির মূল অবয়বে এর ব্যবহার করা না করার উপর বেশি কিছু হেরফের হয় না (অবশ্যই আনাড়ীর হাতে নয়)।

আমিনুদ্দীন ডাগরের পূর্বে ও'দেরই খুল্লতাত জিয় মহীউদ্দীনের বীণে চন্দ্রকোশ আমাদের ভালো লেগেছে। চন্দ্রকোশও যে স্বাধিকারে একটা বড়ো রাগ, তার নিজস্ব রূপ, যেটি কেবলমাত্র মালকোশের অপভ্রংশ মোটেই নয়, এটি আজকাল অনেক সময়েই আমরা ভুলে যেতে বসেছি। আজকালকার আসরে দেখি, তবলা লহরার জন্য সারেঙ্গী-সংগতেই যেন চন্দ্রকোশ বাজানো হবে (নিশ্চয়ই কেবলমাত্র স্থায়ীর গৎটিও সেক্ষেত্রে বাজানো যেতে পারে) এইরকমই একটা চালু ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাখোয়াজে সংগত করেছিলেন, বিঠলদাস গুজরাটি। একেবারে শেষে স্বর্গত মইনুদ্দীন ডাগরের ইউনেসকোতে টেপ রেকর্ড করা ভৈরবী বাজিয়ে শোনানো হয়। ধ্রুপদের বহুল প্রচার, গানে ও যন্ত্রে হোক এ আমরা সব সময়েই কামনা করি।

শ্রীলোচন পণ্ডিত

রবীন্দ্রনাথের কাহিনী অবলম্বনে নির্মীয়মাণ "শাস্তি" ছবিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও দিলীপ রায়।

ফটো—দেশ

নাট্যোন্নয়নে সহযোগিতা

নাট্যচর্চা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রটি ক্রমশই সংকীর্ণ হয়ে আসছে। নাট্যদলের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু সেই অনুপাতে মঞ্চের অভাব। বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ "নাট্যোন্নয়নে সহযোগিতা" এই পরিকল্পনার মাধ্যমে বিশ্বরূপা মঞ্চে প্রতি শনিবার দুপুরে বিভিন্ন সংস্থাকে নামমাত্র দক্ষিণায় অভিনয়ের সুযোগ দিয়েছিলেন। পরিষদ এ বছরেও এই পরিকল্পনা কার্যকর করতে চান।

চলচ্চিত্রে "সংশয়"

নবগঠিত দেবকুমার প্রোডাকশনস-এর প্রথম ছবি হবে "সংশয়"। নরেন্দ্রনাথ মিত্রর কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক শ্রীদেবকীকুমার বসুর পুত্র দেবকুমার বসু। ইতিপূর্বে শ্রীবসু তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন। কাহিনীচিত্র তাঁর এই প্রথম।

গুরু বাগচী পরিচালিত চিত্রভারতীর "তীরভূমি" ছবিতে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও রুমা গুহঠাকুরতা

'এডুকেশান কর্নারে'র ব্যালে

সম্প্রতি মহাজাতি সদনে 'এডুকেশন কর্নার' এর শিশু শিল্পীরা পৃথিবী বিখ্যাত কয়েকটি ব্যালের অংশ বিশেষ সার্থকতার সঙ্গে মঞ্চস্থ করে। এই অনুষ্ঠানে শোপাঁর সুর-সহযোগে ড্রীম, সান-সাঅনস্ এর সুরে 'ডাইং সোয়ান', স্ট্রভীনস্কীর 'ফায়ার বার্ড' এবং চায়কোস্কীর 'শ্লীপিং কিউটি ব্যালেগুলে উপস্থাপিত হয়। শিশু-শিল্পীদের নিয়ে ব্যালের রূপায়ণ এ দেশে প্রথম, সেদি থেকে কোরিওগ্রাফার শ্রীমতী বাণী মুখো পাধ্যায়ের প্রচেষ্টা অভিনন্দনীয়। শিশু ব্যালের দুরূহ ভঙ্গিমাগুলির রূপে দি সেদিন দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। বিশে করে ডাইং সোয়ান'এ শর্মিষ্ঠা নাগে

অভিব্যক্তির কয়েকটি মুহূর্ত স্মরণীয়। 'ড্রীম'এ অনুশ্রী দাস ও ফায়ার বার্ড-এ কল্পনা দত্ত দক্ষতা দেখিয়েছে। শ্লিপিং বিউটি'তে সঞ্চয়িতা রায়ের 'রাজকন্যা' ভোলবার নয়। মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে তাপস বসুর শিল্পচিন্তা প্রশংসার দাবী রাখে। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক।

অরুন্ধতী দেবীর "মেঘ ও রৌদ্র" ছবির নায়ক-নায়িকা : স্বরূপ দত্ত ও হাসু বন্দ্যোপাধ্যায়।
ফটো—দেশ

বোম্বাই বিচিত্রা

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। আই এস জোহর তখন বম্বের ফিল্মিস্তান স্টুডিওতে একটি ছবি পরিচালনা করছিলেন। শ্রীশশধর মুখার্জি তখনও ফিল্মিস্তানের প্রোডাকশন্স-গুলির দেখা শোনা করতেন। বম্বের চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে নানা কারণে জড়িত কোন এক ভদ্রলোক বহুদিন যাবত ফিল্মিস্তানে শ্রীমুখার্জির কাছে ঘনঘন যাতায়াত করতেন। তাঁর বাসনা ছিল একটি ছবি পরিচালনা করা! ফিল্মিস্তানে যাতায়াত করতে করতেই ভদ্রলোক অনেকের সংগে পরিচিত হয়ে পড়েন। আই এস জোহরও তার মধ্যে একজন। দেখা হলেই তিনি জোহরকে বলতেন, "এই আসছে মাস থেকেই আমার শুটিং আরম্ভ হবে।" কিন্তু ওই 'আসছে মাস' যেন কিছুতেই আসছে না। শেষ অবধি ভদ্রলোক 'আসছে মাসের প্রসংগটাই ত্যাগ করলেন। তখন জোহর একদিন ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলেন, "কী স্যার, আপনার ছবি ডাইরেকট করার কী হল?" উত্তরে ভদ্রলোক প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, "দেখুন না কপালটাই খারাপ, সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ কে যেন কী সিনেমাস্কোপ না কি ছবির প্রোপোজাল নিয়ে এসেছেন। মিঃ মুখার্জি এখন সেই প্রোপোজাল নিয়েই ব্যস্ত। আমার সাধারণ ড্রামাটিক গল্প, তাতে সিনেমাস্কোপ-টোপ কিছু নেই। সুতরাং বুঝতেই পারছেন।" জোহর গম্ভীর হয়ে ভদ্রলোকের কথাগুলো শুনলেন। তারপর বললেন, "সিনেমাস্কোপের চেয়েও "ইনটারেস্টিং" স্কোপ আছে একটা। আপনার ছবিটা সেই স্কোপে করার প্রোপোজাল দিন মিঃ মুখার্জিকে তাহলেই আর কেউ ঠেকাতে পারবে না আপনাকে।" জোহরের কথা শুনে ভদ্রলোক আহ্লাদে আটখানা। বললেন, "এই জন্যেই ত আপনার পরামর্শ নেওয়া। তা এই নতুন স্কোপটার নামটা একবার বলে দিন ত আমাকে। এখুনি গিয়ে মিঃ মুখার্জির মাথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে আসি।" আই এস জোহর কোনরকম দ্বিধা না করে গম্ভীরভাবে বললেন, "হরো-স্কোপ।" শোনা যায় ভদ্রলোকও নাকি মিঃ মুখার্জিকে এই হরোস্কোপের প্রপোজাল দিয়েছিলেন। তারপরের ইতিহাস কারো জানা নেই। নাম বলেন না কিন্তু জোহর বলেন সেই ভদ্রলোকই নাকি বর্তমানে বেশ নামকরা প্রয়োজক পরিচালক।

রাজ কাপুরের ছবি "মেরা নাম জোকার"-এর চেয়ে বেশী ব্যয় বহুল ছবি আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে হয়নি। রাশিয়া থেকে সার্কাসের দল আসি আসি করছে। এলেই নতুন কাজ শুরু হবে। ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের "শ্রেষ্ঠ শো ম্যানের" আতিথেয়তায় রাশিয়ান সার্কাসদল নিশ্চয়ই নতুন উত্তেজনার সন্ধান পাবেন। 'মেরা নাম জোকার' নিয়ে রাজের ব্যস্ততা খুব। তা তো হবেই। তেমনি চিন্তা তাঁর আগামী ছবি 'কাল আজ আওর কাল' নিয়ে। লেখক বীরেন্দ্র শর্মার লেখা এই গল্পটি রাজ কিনেছেন প্রায় বছর খানেক হল। তিন পুরুষের জীবনের দ্বন্দ্ব নিয়ে লেখা এ গল্পে দাদু বাবা এবং ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করবেন পৃথ্বীরাজ কাপুর (দাদু), রাজ কাপুর (বাবা) এবং রণবীর কাপুর অর্থাৎ 'ডাব্বু' (ছেলে)। রাজ যা করেন তাই হবে। পুণায় কয়েক একরের এক বিরাট জমি নিয়ে রাজ কাপুর ফার্মিং শুরু করেছেন। রাজের সব ব্যাপারেই

অগ্রদূত পরিচালিত "কখনো মেঘ" : উত্তম

"তিন ভুবনের পারে" তনুজা ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। ফটো—দেশ

রাজকীয়। এটাও তাই। কিছুদিনের মধ্যেই রাজের এই ফার্ম দর্শনীয় হয়ে উঠবে। অনেকে মনে করেন রাজের ফার্ম পুণায় আর একটি ট্যুরিস্ট এ্যাট্রাকশন হিসেবে গণ্য হবে।

শহর বম্বের বেশ কয়েক মাইল দূরে 'দহিশর' বলে একজায়গায় মহারাষ্ট্র সরকার বম্বের চিত্রজগতকে প্রতিষ্ঠিত করার যে পরিকল্পনা করেছিলেন সেই পরিকল্পনার সমালোচনা করে রাজকাপুর বলেছেন যে, বম্বের চিত্র জগৎ দহিশরের বদলে পুনায় এলে ভাল হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে পুনাই বম্বে চলচ্চিত্রের পীঠস্থান। এইখানেই এককালে বিখ্যাত 'প্রভাত টকিজের' জন্ম হয়েছিল। পুনায় একদিন চলচ্চিত্রের যে ঐতিহ্য লালিত হয়েছিল বম্বের ব্যবসালাঞ্ছিত চলচ্চিত্র যদি আবার সেই ঐতিহ্যমুখী হয় তাহলে নাকি সোনায় সোহাগা হবে। রাজ কাপুর বলেছেন বর্তমান বম্বে চলচ্চিত্র অত্যন্ত "কমার্শিয়ালাইজড" এবং একেবারে "আরটিফিসিয়াল!" এই "কমারশিয়লাইজেশন" এবং "আর্টিফিশিয়্যালিটি" থেকে কি করে মুক্তি আসবে সে প্রসঙ্গে শ্রীরাজ কাপুর কিন্তু কিছু বলেন নি।

সরল শর্মা

রবীন্দ্র-অঙ্গনের রবীন্দ্র জন্মোৎসব

রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্র অঙ্গনের শিল্পিবৃন্দ গত ৪ মে সন্ধ্যায় উত্তর কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়িতে, 'সারাদিনের গান', গত ১২ মে সকালে দক্ষিণ কলকাতার হিন্দুস্থান রোডস্থ রবীন্দ্র-অঙ্গন শিক্ষাকেন্দ্রে 'বৈশাখী' এবং গত ১৯ মে সন্ধ্যায় হাওড়ার বাটরা লাইব্রেরী হলে, 'রবীন্দ্র সংগীতে বেহাগ', সংগীতালেখ্য আলোচনা ও সংগীত সহযোগে পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠানগুলিতে বক্তৃতা দেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীরজকান্ত গুহ, শ্রীশৈবাল গুপ্ত এবং শ্রীশান্তিদেব ঘোষ।

রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেছিলেন শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, শ্রীপ্রসাদকুমার সেন, শ্রীশৈলেন দাস, শ্রীসুনীল ঘোষ, শ্রীবিমলেন্দু রায়, শ্রীমতী চিত্রলেখা চৌধুরী এবং শ্রীমতী নীলিমা সেন।

কবিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের শিল্পীরা কবিপক্ষে "বাল্মীকি-প্রতিভা" মঞ্চস্থ করেন, কোলকাতা আর দুর্গাপুরে।

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশন আগামী ৮ জুন থেকে ২২ জুন পর্যন্ত মারকাস স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত হবে। এ বছরও মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে। মেলা প্রাঙ্গণে যাত্রা, পুতুলনাচ, তরজা, ব্যায়াম প্রদর্শনী এবং সিনেমা প্রদর্শনের আয়োজন থাকবে। এবারকার অনুষ্ঠানসূচিতে বাইরে থেকে যাঁরা যোগ দিচ্ছেন তাঁদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের সাঁওতাল সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে নাটক, যাত্রা, পুতুল নাচ, কবিগান, শিশু অনুষ্ঠান, রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল, মুকুন্দ দাসের গানের আসর, উচ্চাঙ্গ সংগীত, আধুনিক বাংলা গান প্রভৃতির আয়োজন রয়েছে। অন্যান্য বছরের মত এ বছরও আলোচনা সভার ব্যবস্থা থাকবে। আলোচনার বিষয়সূচি হল সাহিত্যে সমাজের প্রভাব ও বাংলা চলচ্চিত্রের সংকট ও পরিত্রাণের উপায়।

সুধীর মুখার্জি প্রযোজিত ও পরিচালিত 'আঁধার সূর্য'-র নায়ক-নায়িকা মৃণাল মুখোপাধ্যায় ও রিনা ঘোষ ফটো—দেশ

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

লাইফ-বেল্ট ছাড়াই গিয়েছে! বোকার দল!

সমুদ্রে হঠাৎ ঝড়-তুফান ....

আর লাইফবোট নেই!

ওটা আমাদের দাও!

ভেলায় উঠে এসো!

চেষ্টা করছি ....

!

সাপ্তাহিক সংবাদ

ফরাসী প্রেসিডেণ্ট দ্য গলের সহসা প্যারিস পরিত্যাগ আলোচ্য সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গত ২৯ মে ভবিষ্যৎ নিয়ে ক্রমবর্ধমান জল্পনা কল্পনার মধ্যে জেনারেল দ্য গল আজ সহসা প্যারিস ত্যাগ করে তাঁর পল্লী ভবনে চলে গিয়েছেন। অপর এক সংবাদে বলা হয়েছে, তিনি পল্লী ভবনে যাননি, অজ্ঞাত কোন স্থানে গিয়েছেন। এই সঙ্গে ফ্রানসের নয়জন সদস্য-বিশিষ্ট সংবিধানিক পরিষদকে প্রয়োজন হলে জরুরী অধিবেশনের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। এর ফলে এই গুজবই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে যে, ৭৭ বৎসর বয়স্ক প্রেসিডেণ্ট হয়ত অবসর গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। প্রকাশ ঃ প্রেসিডেণ্ট দ্য গল পদত্যাগ করছেন না। তবে, এক ঘোষণায় তিনি জাতীয় পরিষদ বাতিল করে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী জরজ পাঁপিদু প্রেসিডেণ্ট দ্য গলের অধীনে তাঁর পঞ্চম মন্ত্রিসভা গঠন করেন। দ্য গলের সমর্থক নন এমন কাউকেই মন্ত্রিসভায় নেওয়া হয়নি।

দেশী সংবাদ

২৭ মে—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী অসট্রেলিয়া থেকে ফিরে আসার পর হয়ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদবদল হবে। তবে ফিরে এসে প্রথমেই তিনি আসাম পুনর্গঠনের প্রশ্নটিতে হাত দেবেন। এই জরুরী বিষয়টির নিষ্পত্তির পর সম্ভবত মন্ত্রিসভায় রদবদল হবে। পুনর্গঠিত মন্ত্রিসভায় মহীশূরের মুখমন্ত্রী পদপ্রার্থী শ্রী বি ডি জাত্তি হয়ত স্থান পাবেন।

১৯৬৪ সালের পর পশ্চিমবঙ্গে যে নতুন উদ্বাস্তু এসেছেন তাঁদের একাংশকে শিল্পে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ছোট ও মাঝারী শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব সম্বলিত ৫৬টি পরিকল্পনা পাঠিয়েছেন।

২৮ মে—আজ সন্ধ্যার পর পশ্চিমবঙ্গের উপর যে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যায় তার ফলে বিভিন্ন স্থানে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে অধিক রাত্রে কলকাতায় সংবাদ পাওয়া যায়। এই ঝড়ের সময় বজ্রপাতে এবং বাড়ি ধসে শহরতলী ইছাপুরের কাছে নবাবগঞ্জে তিনজন, বর্ধমানে একজন মারা গিয়েছেন। আরও ৭ জন বজ্রাহত হয়ে আশংকাজনক অবস্থায় কলকাতা ও বর্ধমান হাসপাতালে ভরতি হন। কলকাতায় একটি ট্রামের উপর বাজ পড়ায় দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাটি পুড়ে যায়।

গতকাল রাত্র প্রায় ৩টা ৪৫ মিনিটের সময় দক্ষিণ রেলপথের রেনিগুনেটা স্টেশনে এক ট্রেন দুর্ঘটনার ফলে ২০ জন নিহত ও প্রায় ৮০ জন আহত হয়েছেন। একটি মালগাড়ির সঙ্গে ওই স্টেশনে দাঁড়ানো বেনিগুনেটা-মাদরাজ প্যাসেনজার ট্রেনের সংঘর্ষের ফলে দুর্ঘটনা ঘটে।

২৯ মে—গতবারের আঠারো দফার পরিবর্তে এবার যুক্তফ্রনটের কর্মসূচী হচ্ছে পঁয়ত্রিশ দফা এবং খাদ্য সমস্যা সমাধান থেকে আরম্ভ করে আগসট বিপ্লবের শহীদদের স্মরণে যথাযোগ্য স্মৃতিসৌধ নির্মাণ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে ফ্রনট এই কর্মসূচীর মাধ্যমে জনসাধারণকে নানা স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে চান।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার চলচ্চিত্র শিল্পে, মূলত অর্থ লগনির জন্য অবিলম্বে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা (করপোরেশন) গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এছাড়া সরকার আপাতত কলকাতায় দুটি হল লিজ নিয়ে বাংলা ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করতে চান। এর একটি হবে উত্তর কলকাতায়। অপরটি দক্ষিণাঞ্চলে।

৩০ মে—ভূমি সংস্কার আইন বলে সারা পশ্চিমবঙ্গে যে পাঁচ লক্ষ একর জমি সরকারে বর্তেছে তা এই বাংলা সনেই স্থায়ী রায়তী-স্বত্ব দিয়ে বিলি করার জন্য রাজ্য সরকার জেলা-কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। ১৩৬৯ সাল থেকে ভূমিহীন চাষীরা লাইসেনস নিয়ে এই জমি চাষ করে আসছেন।

৩১ মে—নির্ভরযোগ্য মহলের খবরে প্রকাশ ঃ চীনারা বৈরী নাগাদের বলেছে যে, অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক শিক্ষাদান সহ সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য দিতে তারা রাজি আছে। তবে যুদ্ধ যখন বাধবে তখন কিন্তু তাদের নিজেদেরই লড়াই করতে হবে।

এ বছর গত চার মাসে পশ্চিমবঙ্গে ১২৭টি প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট, লকআউট ও কাজ বন্ধ হয়েছে। ফলে ৩৯ হাজার লোকের কার্যত চাকরি নেই। যে কারখানা উঠে গিয়েছে, সেখানে ত ভবিষ্যতেও চাকরির আশা নেই।

১ জুন—কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম আজ বলেন, দেশে, বিশেষ করে পানজাব ও হরিয়ানায় যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে তাতে খাদ্যশস্যের ওপর থেকে বিধি নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া সম্ভবপর হতে পারে।

টালা-পলতা জলের মেন পাইপের সংস্কার, পানীয় জল সরবরাহের উন্নতি, শহরের নিকাশী ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পৌর সংস্থাকে তিন কোটি টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেছেন।

২ জুন—কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির উদ্বোধনী অধিবেশনে বলেন, দেশের রাজনৈতিক প্রবাহ কংগ্রেসের অনুকূলে মোড় নিয়েছে। ওই সঙ্গে তিনি কংগ্রেসসেবীদিগকে আত্মতুষ্টির মনোভাব বর্জন করতেও অনুরোধ জানান। আজকের বৈঠকে দলের গঠনতন্ত্রের সংশোধন করে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটিকে কমবেশী পরি... একটি স্থায়ী সংস্থারূপে গঠনের প্র... অনুমোদন করা হয়।

আসাম পুনর্গঠনের প্রশ্নে কেন্দ্রের ... জন্য পূর্ব প্রান্তের এই রাজ্যের সর্বত্র রাজনৈ... অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। আশঙ্কা ... এই অনিশ্চয়তা গুরুতর হাঙ্গামার ... নিতে পারে। কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত যাই হোক কেন, সমতল ও পার্বত্য অঞ্চল ... সন্তুষ্ট করতে পারবে না। কেন্দ্রীয় সিদ্... মুলতুবি রাখা সেটাও বোধ হয় সঙ্গত নয়, কম বিপজ্জনকও নয়। হাঙ্গামা যে ... পারে এ ব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক ... বিশেষ কোন সন্দেহ নেই। আপোস মীমা... আশা অতি বড় আশাবাদীরাও আর করছেন।

বেতন পর্ষদের যে সব সুপারিশ সর... চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করবেন মালিক ও ... যাতে সেগুলি মানা করেন সেজন্য এ ... করা উচিত। এ সুপারিশ করেছেন ... পর্ষদের কাজকর্ম পর্যালোচনা সম্পর্কি... জাতীয় কমিশনের একটি সমীক্ষা ... সমীক্ষা দলের সুপারিশ হচ্ছে, ভবিষ্যতে ... পর্ষদগুলি যৌথ দর কষাকষির ... কাজ করবে এবং এ ব্যাপারে তারা ... চেষ্টা করবে।

বিদেশী সংবাদ

২৭ মে—ট্রেডইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ... মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনার ... পর আজ সারা ফ্রানসে কারখানার ... ধর্মঘটীরা ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার ... অভিমত প্রকাশ করেন।

২৮ মে—ভিয়েৎকংরা উত্তর সায়গনে ... রকেটের সাহায্যে বাড়ি বাড়ি ... চালিয়েছে। আজ উত্তর সায়গনের ... বাড়িতেই দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সেনাবাহিনী ... সঙ্গে ভিয়েৎকংদের সামনাসামনি লড়াই ...

৩১ মে—রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ ... রাতে দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ... স্মিথ সরকারের বিরুদ্ধে প্রায় সর্বাত্ম... অর্থনৈতিক বয়কট জারি করেছেন।

৩১ মে—ভিয়েৎনামে যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাসের জন্য প্রেসিডেণ্ট জনসন যে প্রস্তা... দিয়েছিলেন, উত্তর ভিয়েৎনাম আজ ... প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রাথমিক শান্তি আলোচনায় হ্যানয়ের প্রতিনিধি দলের নে... জুয়ান থুই পুনরায় অবিলম্বে এবং বিনাশর্তে উত্তর ভিয়েৎনামে মারকিন বোমাবর্ষণ ব... করার দাবি জানান।

১ জুন—আজ হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রনেতা ড্যানিয়েল কোহন-বেনডিট ও আরও কয়েকজন নেতাকে সামনে রেখে বিক্ষোভ মিছিল বে... করেন। কোহন-বেনডিট সফরের জন্য ফ্রানসের বাইরে গিয়েছিলেন এবং গতকাল তি... ফিরেছেন।

২ জুন—অন্ধত্ব ও বধিরত্বকে জয় করে একদা যিনি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সেই হেলেন কেলার গতকাল ওয়েস্টপোরটে মারা গিয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল সাতাশি বছর।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীঅশোককুমার দাস

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৫ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৩৩
শনিবার ১ আষাঢ় ১৩৭৫

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০ . ২৩-৮৫৫১

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	...	২৫.০০
ষান্মাসিক	...	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	...	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষান্মাসিক "	...	১৫.০০
ত্রৈমাসিক "	...	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষান্মাসিক "	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক "	...	৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	...	৫২.০০
ষান্মাসিক "	...	২৬.০০
ত্রৈমাসিক "	...	১৩.০৫

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	৩১.০০
ষান্মাসিক	...	[illegible]
ত্রৈমাসিক	...	[illegible]

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাশুল (অতিরিক্ত) ৫ পয়সা

DESH

Saturday 15 June 1968

বঙ্কিমচন্দ্র সেন

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের এক দুর্লভ সমন্বয় যাঁর জীবনকে একটি আশ্চর্য তাৎপর্য দিয়েছিল, সেই মানুষটি অকস্মাৎ বিদায় নিলেন। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেনের তিরোধান বস্তুত সমন্বয়ী সাধনার ক্ষেত্রে একটি বিরাট ব্যক্তিত্বের তিরোধান। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ—সকল পন্থার সমস্ত মানুষই তাঁকে হারিয়ে আজ তাঁর বেদনা অনুভব করছেন। আমাদের বেদনা আরও বেশী। তার কারণ, তিনি ছিলেন আমাদের ঘরের মানুষ, আপনজন, সুখে-দুঃখে-আনন্দ-যন্ত্রণায় জীবনের অনেকগুলি বৎসর তাঁর সঙ্গে আমরা কাটিয়েছি, তাঁর স্নেহ-ভালবাসার তপ্ত স্পর্শ আমাদের জীবনে প্রতিনিয়ত এক অসামান্য ভরসার বাণী বহন করে আনত, তাঁর উপদেশ ও পরামর্শ আমাদের জীবনকে বেষ্টন করে সুনীতির একটি সুন্দর রক্ষা-বলয় রচনা করেছিল। আমাদের এই পত্রিকা-পরিবারে তিনি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ জীবিত পুরুষ। তাঁকে হারিয়ে একদিকে আমরা বেদনা বোধ করছি, অন্যদিকে অসহায়তা।

সাংবাদিকের জীবন কোনওকালেই বিপন্মুক্ত নয়, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন যখন সাংবাদিকের জীবন বরণ করেন, বিপদ তখন আজকের তুলনায় অনেক বেশী। দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার তখন জন্মলগ্ন। সহায়-সম্বল যৎসামান্য, দারিদ্র্য সুকঠিন,—সঙ্কল্পে কঠোর যে কয়েকজন দুঃসাহসী কর্মী তখন বিদেশী শাসকের রক্তচক্ষুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার এই দুর্গকে দিবারাত্রি রক্ষা করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদেরই একজন। তাঁর দেশপ্রেম ছিল জ্বলন্ত, এবং লেখনী ছিল অকুতোভয়। লেখার মধ্যে আগুন ঝরিয়ে মুক্তিসংগ্রামকে তিনি তখন প্রেরণা দিয়েছেন, দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনকেই তিনি তাঁর ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, ব্রিটিশ সরকারের ভ্রূকুটি সেই ব্রত থেকে তিলেকের জন্যও তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদনাভার তিনি যখন গ্রহণ করেন, বহ্নি-উদ্গিরণের ক্ষেত্র তখন আরও বিস্তৃত হল। যেমন সাংবাদিকতা, তেমনি সাহিত্যেরও পরম লক্ষ্য স্বাধীনতা। যেমন দেশ, তেমনি চিত্তের স্বাধীনতাকেও তিনি তাঁর অভিলক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। 'দেশ'-এর মাধ্যমেও তাকেই তিনি সন্ধান করে ফিরেছেন।

এই তাঁর জীবনের একটি দিক। সংগ্রামী দিক। অন্যদিকে তিনি ধর্মনিষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ, সুপণ্ডিত একজন মনস্বী ব্যক্তি। মনস্বী এবং মমতাময়। পরমবৈষ্ণব প্রেমময় এই মানুষটি সর্বজনকে আপন জ্ঞান করতেন, গভীর ভালবাসায় সবাইকে কাছে টেনে নিতেন, বিপদে পরামর্শ দিতেন, সমস্যায় পথের নির্দেশ। তাঁর মুখে যাঁরা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনেছেন, তাঁরাই জানেন, গূঢ় এবং জটিল নানা তত্ত্বকে কত সহজে তিনি বুঝিয়ে বলতে পারতেন। ঈশ্বরের কারুণিকতায় তাঁর আস্থা ছিল অবিচল, বিপদকে তিনি পরীক্ষা বলে জ্ঞান করতেন; সেই পরীক্ষা, ভক্তকে যা উত্তীর্ণ হয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যেতে হয়। ফলত, কোনও সংকটেই তিনি কখনও টলেননি; ট্রাম-দুর্ঘটনায় অঙ্গহানির ফলে যখন তাঁর প্রাণ-সংশয় দেখা দিয়েছিল, তখনও তাঁর ওষ্ঠে তাই আমরা আশ্চর্য একটি হাসি লেগে থাকতে দেখেছি। কথা বলবারও দরকার হত না, মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারা যেত যে, তাঁর বুকের মধ্যে একটি দীপশিখা জ্বলছে। বিশ্বাস ও ভালবাসার সেই দীপশিখাকে তিনি আমৃত্যু জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, মুহূর্তের জন্যও নির্বাপিত হতে দেননি।

জ্ঞানী, ভক্ত, কর্মী, প্রেমিক সেই অসামান্য মানুষটির উদ্দেশে আমরা আমাদের নিবিড় ভালবাসা ও গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। প্রার্থনা করি, তাঁর আত্মা শান্তি-লাভ করুক।

দেশ দর্পণ

পশ্চিম বাংলার অ-কংগ্রেসী সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি আর একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত শ্রীঅজয় মুখার্জির গত দুই বছরের রাজনৈতিক জীবনের আর একটা নূতন পদক্ষেপ। শ্রীঅজয় মুখার্জি বহু দিন কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন, বহু বছর কংগ্রেস শাসনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এবং প্রথম তিনটি সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হিসাবে কম্যুনিস্ট প্রার্থীকে পরাজিত করে পশ্চিম বাংলা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক জীবনটা ঘুরে গিয়েছিল প্রায় আকস্মিকভাবে যেদিন তিনি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে এলেন কংগ্রেস আদর্শকে সামনে রেখে, কংগ্রেস সংগঠনের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ আনুগত্য দেখিয়ে। কিন্তু আজ পিছনের দিকে তাকালে দেখা যাবে, সেদিনই তিনি আন্তরিকভাবে কংগ্রেস থেকে বাইরে চলে এসেছিলেন। তারপর অবশ্য তিনি পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে কাজ করেছেন, কিন্তু সংগঠনের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। হয়ত পারেন নি বলেই এত সহজে তিনি বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন কংগ্রেস সংগঠন থেকে চতুর্থ নির্বাচনের কিছু আগে।

সেই বেরিয়ে আসার পিছনে হয়ত কিছু ইতিহাস আছে; কিন্তু ইতিকথা আলোচনার জন্য বর্তমান প্রসঙ্গ টেনে আনা হয় নি। হয়ত সে-ইতিহাসের মধ্যে শ্রীঅজয় মুখার্জির বর্তমান রাজনৈতিক জীবনের ভূমিকা খুঁজে পাওয়া যাবে; কিন্তু অত্যন্ত বাস্তবভাবে তিনি সেদিনই কংগ্রেস-বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করে দিয়েছিলেন। তারপর আর ফেরা হয় নি। যেমন সম্ভব হয় নি গত বছর ২ অক্টোবর। ফেরা সম্ভব ছিল না বলেই তিনি সেদিন সত্যিই ফিরে যান নি কংগ্রেসে। তার রাজনৈতিক জীবনটাকে ধরে রাখতে হয়েছিল সেই বাংলা কংগ্রেসে যে সংস্থার জন্ম হয়েছিল শ্রীঅজয় মুখার্জির কংগ্রেস-বিরোধী নীতিবাদের ভিত্তিতে। তবু বাংলা কংগ্রেসের কোন কংগ্রেস-বিরোধী নীতি বা আদর্শ ছিল। যে কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে বাংলা কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল, সেটা যথার্থই ছিল কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সে-প্রতিবাদ প্রধানত ছিল পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের মূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে, তাই ২ অক্টোবর তাঁর প্রস্তাবিত পদত্যাগের প্রধান শর্ত ছিল সেই মূল নেতৃত্বের অপসারণ। আর সেই প্রধান শর্তের মূল কথা ছিল তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্ব, কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেসের যৌথ প্রচেষ্টার প্রতিষ্ঠিত।

তবু সে সিদ্ধান্ত তিনি নেন নি। শেষ মুহূর্তে তিনি এই সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন যে, তিনি কংগ্রেস-বিরোধী শিবিরেই থাকবেন এবং কম্যুনিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়েই তিনি তাঁর বাংলা কংগ্রেসের কংগ্রেস-বিরোধী ভূমিকাকে আরও স্পষ্ট করে তুলবেন। অন্য রূপে এবং ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাটিই তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন ভারতীয় ক্রান্তি দলের সভাপতি শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ এবং ক্রান্তি দলের জাতীয় কার্যকরী সমিতিকে দিল্লিতে গত সপ্তাহে। মূল প্রশ্নটা ছিল তিনি এবং পশ্চিম বাংলার সহকর্মীরা কম্যুনিস্টদের সঙ্গে থাকবেন কিনা। এ কথাটা উঠেছিল এই কারণে যে, কিছু দিন আগে ভারতীয় ক্রান্তি দলের জাতীয় নেতৃত্ব কার্যকরী সমিতিতে এই সিদ্ধান্ত নেন, তাঁরা এমন কোন মোর্চার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন না যার মধ্যে "জাতীয়তাবিরোধী, গণতান্ত্রিকতা-বিরোধী এবং ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী" কোন শক্তি বা দল থাকবে। কার্যকরী সমিতি এই সিদ্ধান্ত যখন নেয় তখন শ্রীঅজয় মুখার্জিও সদস্য হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এমনকি, শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহের মতে, এই সিদ্ধান্ত কোন্ কোন্ দলের প্রতি প্রযোজ্য তাও স্পষ্টভাবে শ্রীঅজয় মুখার্জির জানা ছিল। এই সব দলের মধ্যে যাদের প্রধানত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাদের মধ্যে আছে কম্যুনিস্টরা এবং বিশেষ করে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি। শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহের মতে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি ভারতের বাইরের শক্তির উপর নির্ভরশীল এবং সে কারণে এই পার্টির প্রকৃত রূপ "জাতীয়তা-বিরোধী" ভারতীয় ক্রান্তি দল মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে কোন মতেই হাত মিলিয়ে কাজ করতে পারে না।

প্রশ্ন উঠতে পারে এটা ভারতীয় ক্রান্তি দলের কোন নূতন নীতিগত সিদ্ধান্ত কিনা। যদি এটা নূতন সিদ্ধান্ত হয়, তা হলে এ

প্রশ্নও উঠতে পারে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রয়োজন দেখা দিল কেন? এ দুটো প্রশ্নই ওঠা স্বাভাবিক; কারণ, ভারতীয় ক্রান্তি দলের গত কয়েক মাসের ইতিহাসে কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে নীতিগতভাবে জাতীয়তাবোধের কোন প্রশ্ন তোলা হয় নি। তা ছাড়া এ দাবিও আগে কখনও ভারতীয় ক্রান্তি দলের পক্ষ থেকে করা হয়নি যে, ক্রান্তি দলই জাতীয়তাবোধের একমাত্র প্রহরী। তা ছাড়া আরও একটা কথা ওঠে এ সম্পর্কে, এবং সেটা নীতিবোধের কথা। সে কথা আলোচনা করতে গেলে ভারতীয় ক্রান্তি দলের সংগঠনের গোড়ার কথায় ফিরে যেতে হয়। সেদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে এই নীতিবাদের কথাটা আগে কখনও তোলা হয় নি ক্রান্তি দলের জাতীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে।

গোড়ার কথা আলোচনা করলে দেখা যাবে ক্রান্তি দল সংগঠনের কথাটা তখনই উঠেছিল যখন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে চতুর্থ নির্বাচনে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হয়ে গেল। এটা অনস্বীকার্য যে, নির্বাচনের আগে কংগ্রেস সংগঠনে যে ভাঙ্গন দেখা দেয় এবং যে ভাঙ্গনের ফলে বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে কংগ্রেস বিরোধী সংস্থা গড়ে ওঠে তার ফলেই কংগ্রেসকে চতুর্থ নির্বাচনে বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়াতে হয়। বাংলা কংগ্রেসের নেতা শ্রীঅজয় মুখার্জি পশ্চিম বাংলায় যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে রাজ্যের শাসনভার হাতে নিলেন: বিহারে জনক্রান্তি দলের নেতা শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ সংযুক্ত বিধায়ক দলের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হলেন; এবং উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস গঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শ্রীচরণ সিং রাজ্যের শাসনভার হাতে নিলেন সংযুক্ত বিধায়ক দলের সমর্থনে। এই ঘটনাগুলো ক্রান্তি দলের সূচনার ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাই চতুর্থ নির্বাচনের কিছু পরেই কথাটা ওঠে যে, বিভিন্ন রাজ্যে সংগঠিত কংগ্রেস কর্মীদের কংগ্রেস বিরোধী সংগঠনগুলো এক করে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে তোলা উচিত। এই সব সংগঠনের নেতাদের এটাই ছিল মূল ধারণা যে, কংগ্রেস বিরোধী ভূমিকাকে সামনে রেখে কংগ্রেসের ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে বিকল্প সর্বভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব সংগঠিত করা সম্ভব।

এই বিকল্প নেতৃত্ব সম্বন্ধে কোন অস্পষ্টতা ছিল না। এটা একদিকে যেমন ছিল কংগ্রেস বিরোধী অন্য দিকে তেমনি ছিল কম্যুনিস্ট শক্তির পরিপন্থী। তবু কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা সন্দেহ সে সময় তোলা হয় নি; কারণ, পশ্চিম বাংলায় শ্রীঅজয় মুখার্জির মুখ্যমন্ত্রিত্ব সম্ভব হয়েছিল কম্যুনিস্টদের, এবং বিশেষ করে যুক্ত ফ্রন্টের বৃহত্তম পার্টি মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির, সমর্থন ছিল বলে। তেমনি সম্ভব হয়েছিল শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া কম্যুনিস্টদের সঙ্গে জনসংঘ ও সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির সমর্থন নিয়ে। সে কারণে, ক্রান্তি দলের সংগঠনের মুখে কম্যুনিস্টদের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তোলা হয়নি। অবশ্য, ক্রান্তি দলের ইন্দোর সম্মেলনে গৃহীত গঠনসূচীর প্রারম্ভে এটাই বলা হয়েছিল যে, প্রকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী দল হিসাবেই ক্রান্তি দল সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কাজ করবে।

ইন্দোরে অনুষ্ঠিত ক্রান্তি দলের জাতীয় সম্মেলন বসে গত বছর নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। এই সময়টা উল্লেখযোগ্য; কারণ, এই সময় পশ্চিম বাংলায়, বিহারে যুক্ত ফ্রন্ট বা সংযুক্ত বিধায়ক দলের সরকার সম্বন্ধে প্রকৃত উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। এই সময় পশ্চিম বাংলায় বিশেষ করে শ্রীঅজয় মুখার্জির সঙ্গে শ্রীহুমায়ুন কবিরের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করেছে। অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকবির তখন শ্রীঅজয় মুখার্জিকে মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে অপসারিত করার জন্য বদ্ধপরিকর। সে কারণে, ইন্দোরের জাতীয় সম্মেলনের পরেই শ্রীকবিরকে শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ ক্রান্তি দল থেকে অপসারিত করেন। শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহর দৃষ্টিভঙ্গীতে শ্রীকবির তখন যুক্ত ফ্রন্ট-বিরোধী এবং সেই অনুসারে ক্রান্তি দলের নীতি-বিরোধী। অর্থাৎ শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ ক্রান্তি দলের সভাপতি হিসাবে যুক্ত ফ্রন্ট-বিরোধিতা বা কম্যুনিস্টদের নিয়ে গঠিত মোর্চার বিরোধিতাকে দলগত নীতি বা শৃঙ্খলা বিরোধী বলেই তখন মনে করতেন। শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ অবশ্য তখনও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী এবং সংযুক্ত বিধায়ক দলের নেতা।

এমনকি তার পরবর্তী কালে যখন বিহারে সংযুক্ত বিধায়ক দলের মন্ত্রিসভার পতন ঘটে দলের ভাঙনের ফলে, তখনও শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ কম্যুনিস্টদের বা ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী কোন দলের সঙ্গে সংগঠিত মোর্চা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তোলেন নি, বা সমালোচনা করেন নি। তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্ব তখন ছিল না; তবু তিনি সংযুক্ত বিধায়ক দলের নেতা হিসাবে পাটনায় অনুষ্ঠিত ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসের উদ্বোধনী সভায় এই কথাটাই ঘোষণা করেছিলেন যে, সংযুক্ত বিধায়ক দলের সংগঠিত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন দিয়ে এবং যে যুবকরা তাঁর "হৃদয়ের টুকরো" তাদের সংঘবদ্ধ করে বিহারে আবার জনতার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবেন। তাঁর ভাষণের পর বহুক্ষণ ধরে কম্যুনিস্ট প্রতিনিধিরা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিল, ইনক্লাবের ধ্বনি শুনিয়েছিল। শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ সেদিন প্রশান্ত মনেই কম্যুনিস্টদের অষ্টম কংগ্রেস থেকে ফিরে এসেছিলেন।

কিন্তু এই প্রশান্তি বেশী দিন টেকেনি। কারণ, কিছু দিনের মধ্যেই সংযুক্ত বিধায়ক দল আবার মন্ত্রিত্বে ফিরে আসে বিহারে; কিন্তু ফিরে এলেন না মুখ্যমন্ত্রীর পদে শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ। হয়ত ফিরে এলেন না বলেই পরিবর্তিত হয়ে গেল শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহর মতামতটা কম্যুনিস্টদের সম্বন্ধে, বিশেষ করে এবং যুক্ত ফ্রন্ট বা সংযুক্ত বিধায়ক দল সম্বন্ধে। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর আক্রোশটা প্রধানত সংযুক্ত মোর্চার বিরুদ্ধে; কারণ, কলকাতায় তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, এই যুক্ত ফ্রন্টের খেলাটা সারা ভারতবর্ষে খতম করে দিতে চাই। তাঁর ভাষায় বিদ্বেষ নিশ্চয়ই ছিল। স্পষ্টভাবেই তিনি বলেছিলেন, বিহারে সংযুক্ত বিধায়ক দল প্রকৃতপক্ষে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করেছে। তাঁর পক্ষে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে শ্রীভোলা পাসোয়ানের নেতৃত্ব স্বীকার করা সম্ভব নয়। কাজেই শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহকে এমন এক পথ নিতে হল, যার সঙ্গে ব্যক্তিগত ক্ষোভ বড় হয়ে উঠবে না; অথচ যুক্ত ফ্রন্ট বা সংযুক্ত বিধায়ক দল থেকে বেরিয়ে আসাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়।

তা ছাড়া আরও একটা প্রসঙ্গ ইতিমধ্যে ভারতীয় ক্রান্তি দলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। সে প্রসঙ্গ উঠেছে বিভিন্ন রাজ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচন উপলক্ষ করে। এই মধ্যবর্তী নির্বাচন প্রসঙ্গে একটা প্রচ্ছন্ন কম্যুনিস্ট বিরোধী রাজনীতি ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করছিল কংগ্রেসের বাইরে। এটা লক্ষ করেই প্রথমে শ্রীহুমায়ুন কবির চেষ্টা করেন তৃতীয় শক্তি সংগঠনের; কিন্তু সফল হননি। অথচ কয়েকটি অ-কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে কম্যুনিস্ট বিরোধী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার উদ্দেশ্যে যুক্ত ফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে আসার একটা ঝোঁকও দেখা যায়। এই অবস্থাটা সামনে রেখেই শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহর নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রান্তি দল একটি অ-কম্যুনিস্ট মোর্চা গঠনের সুযোগ খুঁজতে থাকে। স্বতন্ত্র পার্টি এবং প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে এ সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তাও হয়; এবং এই আলোচনার সূত্র অনুসারেই ভারতীয় ক্রান্তি দলকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় যুক্ত ফ্রন্ট মোর্চার বিরুদ্ধে। বিহারের অভিজ্ঞতায় শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহর পক্ষে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব কঠিন ছিল না। তাই সরাসরি প্রস্তাবটা চলে এল ক্রান্তি দলের জাতীয় কার্যকরী কমিটির সামনে। এ সিদ্ধান্ত ছিল ক্রান্তি দলের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এটাই ছিল সংযুক্ত মোর্চাকে ভেঙে দেবার এবং বিকল্প অ-কম্যুনিস্ট মোর্চা গঠনের হাতিয়ার।

কিন্তু শ্রীঅজয় মুখার্জির পক্ষে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং কার্যকরী করা খুব সহজসাধ্য ছিল না। তাঁর একটা উদ্দেশ্য যেমন তাঁর দলকে কংগ্রেস বিরোধী দল হিসাবে পশ্চিম বাংলায় প্রতিষ্ঠিত করা, তেমনি অন্য উদ্দেশ্য ছিল মধ্যবর্তী নির্বাচনে সংযুক্ত মোর্চার সম্পূর্ণ সুযোগ নেওয়া। পশ্চিম বাংলায় এমন কোন অ-কম্যুনিস্ট দল তাঁর সামনে ছিল না, যার সঙ্গে তাঁর দল হাত মিলিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনের মারফত পশ্চিম বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তা ছাড়া শ্রীঅজয় মুখার্জির কাছে নিছক কংগ্রেস বিরোধিতাই একমাত্র রাজনীতি হয়ত নয়। তাঁর কাছে কংগ্রেস বিরোধী বিকল্প সরকার গঠনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এ কথাটাই কলকাতায় সাংবাদিকদের বলেছেন যে, সকল প্রগতিশীল শক্তি সংঘবদ্ধ না হলে কংগ্রেসের পরাজয় সুনিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া এটাও তিনি জানেন পশ্চিম বাংলায় তাঁর নিজস্ব দলের প্রতিষ্ঠা ক্রান্তি দলের সিদ্ধান্তর চাইতে অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। তাঁর দলের প্রতিষ্ঠা যুক্ত ফ্রন্টের বাইরে এসে সম্ভব নয়, অন্তত বর্তমান অবস্থায়। তা ছাড়া তিনি নিজেও এটা অস্বীকার করেন না, তাঁর মূল আদর্শ (শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা) কম্যুনিস্ট আদর্শের পরিপন্থী নয়। তাই তাঁর পক্ষে ক্রান্তি দলকে আর গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তাই তাঁকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে হয়েছে তাঁর নিজের সংগঠন বাংলা কংগ্রেসকে।

শ্রীঅজয় মুখার্জি এটা স্পষ্টভাবেই জানেন, তাঁর রাজনৈতিক শক্তি পিছনে না থাকলে পশ্চিম বাংলায় ক্রান্তি দল বাঁচবে না। বাংলা কংগ্রেস ফিরে আসায় ক্রান্তি দলের যেটুকু থাকবে, সেটা পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে কোন রেখাপাত করবে না। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যুক্ত ফ্রন্টকে আরও সংযুক্ত করবেন বলে। অন্তত একবার শ্রীমুখার্জি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন; কারণ, অন্য কোন সিদ্ধান্ত তাঁর পক্ষে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

রবার্ট কেনেডি

মৃত্যু যে কীভাবে একটি পরিবার, দেশ, জাতি, রাজ্য ও রাষ্ট্রের সীমানা ছাড়িয়ে সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বেদনার্ত করে তার পরিচয় পাওয়া গেল আর একবার। এ-বেদনা, শোক, বিলাপ, অনুতাপ সবই হয়তো ক্ষণিক ক্ষীণায়ু। গান্ধীজি নিহত হওয়ার পরে যে-শোক, বেদনা, অনুশোচনা আমাদের দেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল তার কতটুকুই বা কতদিন টিকেছিল? গান্ধীজির পরেও এদেশে বহু নিরপরাধ লোক আক্রান্ত বা নিহত হয়েছে, হচ্ছে রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক কারণে। লস এঞ্জেলস শহরে রবার্ট কেনেডি নিহত হওয়ার ছ মাস আগে মেমফিস শহরে নিহত হন ডঃ মার্টিন লুথার কিং। তখনও শোকের বন্যা বয়েছিল। সাড়ে চার বছর আগে ডালাস শহরে প্রেসিডেন্ট কেনেডি নিহত হওয়ার ঘটনাটি তো আরও শোকাবহ। কেনেডি একটি নাম যা তখন থেকে আব্রাহাম লিঙ্কনের নামটির মতই আমেরিকার জনচিত্তে নাকি পরম শ্রদ্ধার সামগ্রী। সে-শ্রদ্ধা রবার্ট কেনেডির জীবনকে ঘিরে রাখতে পারেনি, ঘাতকের নির্ভুল লক্ষ্যস্থল তিনিও হয়েছেন। কে সেই ঘাতক, রবার্ট কেনেডিকে হত্যায় তার স্বার্থ বা উদ্দেশ্য কী, এ-সব প্রশ্নের সুনিশ্চিত উত্তর পাওয়া যায়নি, হয়তো কোনদিনই পাওয়া যাবে না। প্রেসিডেন্ট কেনেডির মৃত্যু-রহস্যও অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেছে, অনেকের তাই বিশ্বাস। কেনেডি নামটির প্রতি আক্রোশ থেকে প্রেসিডেন্ট কেনেডির ভাই রবার্ট কেনেডির ওপর প্রাণঘাতী আক্রমণ হয়েছে একথা বিশ্বাস করতে পারা সহজ নয়।

অনেকের ধারণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধপ্রবণতা, খুনোখুনির ঝোঁক খুব বেশি। সে-কথা একেবারে মিথ্যা নয়। প্রতি বছর প্রায় ছ হাজার মানুষ খুন স্বাভাবিক মনে করা যায় না। অনেকে এর জন্য দায়ী করছেন অবাধে বন্দুক ইত্যাদি কেনাবেচার। যতই কড়াকড়ি করা হোক না কেন, গুন্ডা, খুনী, ডাকাত এবং অপ্রকৃতিস্থচিত্ত যারা তারা যে কোন উপায়ে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে পারে এবং করেও। খুন জখমের বাড়াবাড়ির কারণ সম্ভবত আরও গভীর। প্রেসিডেন্ট জনসন চটপট একটা তদন্ত কমিশন নিয়োগ করে ফেলেছেন। পর পর কয়েকটি বড় রকমের হত্যাকাণ্ডে সারা পৃথিবীতে আমেরিকার মর্যাদাহানি ঘটছে খুবই। কেনেডি, মার্টিন লুথার কিং-এর মত নামী লোকদের নিহত হওয়ায় আলোড়ন ঘটেছে বেশি। এ-সবই ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদী অথবা উন্মাদের কাণ্ড নয়।

কোন কোন মার্কিন নেতা ও মার্কিন খবর-কাগজ কিন্তু ওই রকম ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। মার্কিন রাষ্ট্রসচিব ডীন রাস্ক বলছেন, দু চারটি উন্মত্ত হত্যাকাণ্ড দেখে কেউ যেন মনে না করেন আমেরিকার অরাজক অবস্থা। রবার্ট কেনেডি কিন্তু লস এঞ্জেলসে আক্রান্ত হওয়ার কয়েক মিনিট আগে তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, হিংসা, খুনোখুনি মার্কিন জীবনধারার অভ্যস্ত পথ (অ্যামেরিকান ওয়ে অব লাইফ) হয়ে উঠেছে। খুনজখমের পরিসংখ্যা দেখে ওইরকমই মনে হয়। মার্কিন সেনেটের বহু কমিটি একাধিকবার তদন্ত করে দেখিয়েছেন, রাহাজানি, খুন ইত্যাদি আমেরিকার সবচেয়ে বড় সংগঠিত ব্যবসায়। আরও একটু পিছিয়ে দেখলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পত্তন থেকে খুনোখুনি, জবরদখল, লুটতরাজের ঐতিহ্য। সোনা, তেল ও জমির লোভে বহু ভাগ্যসন্ধানী আমেরিকার পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমে এগিয়েছে, বসতি পত্তন করেছে যে-কালে, তখন আইন-শৃঙ্খলা, ন্যায়নীতির কিছুমাত্র বালাই ছিল না। সেই "জোর-যার-মুলুক-তার" ধরনের সীমান্ত-বিস্তারী উদ্দাম শিকারী মনোবৃত্তির ছাপ মার্কিন মানসে ও চরিত্রে। গত শতাব্দীতে মার্কিন ধনপতিরা যখন রেল রাস্তা পাতেন, তেলের খনি দখল করেন তখন তাঁরা আইনের তোয়াক্কা রাখেননি, নিজেরাই পুষেছেন নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বড় বড় ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী। মার্কিন সভ্যতার এই জন্মসূত্র অনন্যভাবে মার্কিনী।

তার জের এখনও চলেছে, মিলেছে তার সঙ্গে বিপুল বিত্তশালী যন্ত্র সভ্যতার নানারকম বিরোধ, বিকার, অসুস্থ উত্তেজনা আর কালো এবং শাদা বঞ্চিত দুর্গতদের চিত্তক্ষোভ। সুসভ্য সচ্ছল দেশ, বেশির ভাগ লোক শহরবাসী, শিক্ষার সুযোগ তো প্রায় সকলেরই; তবু সে দেশে কেন এমন অবস্থা যে, বহু শহরের বহু রাস্তায় চলাফেরা করাই বিপজ্জনক, মেয়েরা একলা লিফটে চড়তে সাহস পায় না কারণ ধর্ষিত হওয়ার আশঙ্কা। মার্কিন সমাজ ও সভ্যতার রীতিপ্রকৃতির সুস্থতা সম্পর্কে কোন কোন মার্কিন নেতা সংশয় প্রকাশ করেছেন, প্রশ্ন করেছেন, মার্কিন সমাজ কি অসুস্থ, 'সিক সোসাইটি'? কোন কোন সাংবাদিক-ভাষ্যকার-এর চটপট জবাব দিয়েছেন, ওটা নিতান্ত বাজে কথা; রবার্ট কেনেডিকে খুন করেছে খুব সম্ভবত একজন উন্মাদ; তার কাজটার জন্য আমেরিকাকে "সিক সোসাইটি" বলা একেবারে অর্থহীন। হয়তো অর্থহীন, কিম্বা হিংসার উন্মত্ততার অর্থ যেটুকু সে কেবল আমেরিকার কেন, পৃথিবীর আরও অনেক দেশের জীবনধারা সম্পর্কে প্রযোজ্য। ব্যক্তিগত সন্ত্রাস কিম্বা দলবদ্ধ খুনোখুনি, সম্পূর্ণ নিরপরাধ নির্বিরোধ ব্যক্তিদের প্রাণনাশ—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে পৃথিবীর বহু অঞ্চলে বিস্তৃত।

মার্কিন সংবাদ ভাষ্যকার বলছেন, অধিকাংশ আমেরিকান খুনোখুনিতে লিপ্ত নেই। সে-কথা পৃথিবীর সব দেশের মানুষ সম্পর্কেই খাটে। তবু প্রশ্ন রয়ে যায়। রাষ্ট্রের স্বার্থ কিম্বা প্রয়োজনের যুক্তি দেখিয়ে অন্য কোন রাষ্ট্র, জাতি, গোষ্ঠী অথবা সম্প্রদায়কে ধ্বংসের চেষ্টা কি উন্মত্ততা নয়? এ-অভিযোগ বহু রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কদের বিরুদ্ধেই তোলা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমানে সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ আমেরিকা ও মার্কিন রাষ্ট্রকর্তাদের বিরুদ্ধে। পৃথিবীর সর্বত্র স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের খবরদারির দায়িত্ব আমেরিকা স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে, ধরা যাক এটা রূপকথা নয়। কিন্তু সে-দায়িত্ব পালনে আমেরিকা যে-সব নৃশংস কলাকৌশল নির্বিচারে খাটাচ্ছে সেগুলি কি মার্কিন মানসের আভ্যন্তরী অসুস্থতার লক্ষণ নয়? কঙ্গোর লুমুম্বা-হত্যা থেকে লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে বর্বরতম মিলিটারী গুণ্ডারাজ পোষার আমেরিকার যে-রেকর্ড তার সঙ্গে খাস মার্কিন মুলুকে খুনজখম রাহাজানির উন্মত্ত লীলার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ থাকা খুবই সম্ভব। বিখ্যাত মার্কিন পত্রিকা ওয়াল স্ট্রীট জর্নাল লিখছে, আমেরিকায় এমন কী আর ঘটেছে, পৃথিবীর যে-দিকেই নজর দাও, দেখবে হিংসা, হতবুদ্ধিকর যুক্তিহীনতা আর অরাজকতার আভাস; এক কথায়, কোন বিশেষ সমাজ বা দেশ নয়, মানুষই অসুস্থ। মার্কিন বিজ্ঞদের এই সর্ব-ভূতে বিকারতত্ত্ব মেনে নিলে ধরতে হয় দু চারটে কেনেডি, মার্কিন লুথার কিং নন, কেবল ভিয়েতনামও নয়, আরও বহু প্রাণ ও বহু দেশের ওপরে মৃত্যুর পরোয়ানা ঝুলেছে। রবার্ট কেনেডি সেটা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন, সাহস করে সবটা বলতে পারেননি।

দেরাজে, রাজকীয় সনদ

গোবিন্দ চক্রবর্তী

এই যে,
দেরাজে তোমার অপার্থিব চিঠি।
বোধ হয়,
যে জাহাজ ছাড়বে এখন
তারই বিদায়প্রার্থী বাঁশী বাজছে বন্দরে।
এই রাতের টেবিলে একাকী
নিদ্রারহিত স্ফিংকস
আমি—আবার, আবার তোমাকে
স্বর্গীয় বোধ করছি।

এই, এই ত' আমার আমন্ত্রণ।
আমাকে বিশুদ্ধ আসার কথা,
বাঁচে নতুন তোমার বাসার কথা,
সেই ভাল লাগা, ভালবাসার
নরম জলদ বাজনা...

মেঘ,
আলস্য, ইন্দ্রধনু, মন্থরতা,
কত কথা:
পর্দা সবাতেই
রোদ্রে ছড়ে-দেওয়া বসন্তের মাঠ

কথার ফুলঝুরি
রঙ-দেশলাইয়ের কাঠি ফস করে জ্বলছে।
ফুটন্ত দুধ, ঢেউয়ের মত দুলছে।
আবার যুঁইফুলী বৃষ্টি,
সেই তুষারপাত—
বাড়ি, গাড়ি, ফুটপাত সব
অতীন্দ্রিয় ভিজে যায়।

তোমার চিঠি,
দেরাজে তোমার রাজকীয় সনদ,
চন্দনকাঠের কৌটোয় কস্তুরী
খুব যত্নে রেখেছি।
আবার,
একটু একটু ক'রে আবার
নির্জনতার এই অন্তরঙ্গ সেমিনারে,
অসম্মানিত না হয়,
যেন উর্বশীর অলৌকিক শাড়ির ভাঁজ—
একটু একটু ক'রে আবার
খুলে খুলে দেখছি।

ঐ, ঐ ত' খুলছ পাখা,
হীরের-আংটি আঙুল
কি ভেবে তুলছ ঠোঁটে,
ভুল ক'রে নশ্বর নীল বাল্‌ব জ্বালছ;
আমার জন্য কফি ঢালতে ঢালতে—

মরিচ-তেজপাতার গন্ধে রান্নাঘরে ছুটছ।
লাটিমের মত পাক খেয়ে
আবার এসে ছড়িয়ে পড়ছ চেয়ারে
ফুরফুরে ফোয়ারা;
থামছ, মুখ মুছছ, চামচ নাড়ছ।

অক্ষরের ফাঁকে ফাঁকে
স্রোতময় চলচ্চিত্রমালা
একটি একটি ক'রে এত, এক মুঠো;
দূর গ্রহলোকের ফটোগ্রাফ যেন
টেলিসকোপে তুলছি।

তুমি,
এখন একটি হলুদ কমলালেবুর মত,
আমার হাতে।
তোমার লেখা আর পড়ছি কই?
তোমাকে বই,
হস্তসংবিত তোমাকেই আয়তনে দেখছি।
গুরুস্পর্শে
এই অব্যক্ত চিঠি
একদৃষ্টে আমাকে দেখছে
পাখির মত:
পাখি যেমন কোনো উত্তম উপহার
ঠোঁটে তুলে নিয়ে
সবিশেষ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে।

আমার আত্মা
সঙ্গে সঙ্গে
খসখস উত্তর লিখে যাচ্ছে
বাইরে, দূরে, নিকটে, কাছে

যেখানে অভিসারক্লান্ত এক ঝাঁক নক্ষত্র,
গ্রামের উঁচু থামের মাথায়,
অস্ত যাচ্ছে;
লিখছে
ওর হৃদয়ের মতই প্রকাণ্ড
সবুজ শৌখিন পাতাগুলোয়।

সুনন্দর জার্নাল

স্বদেশ

তো মাকে কিন্তু এবার আসতেই হবে আমাদের প্রীতি-সম্মেলনে।'

বললুম, 'গিয়ে কী করব?'

বুড়ো ভদ্রলোক আশ্চর্য হলেন একটু।

'কেন, দেশের সব লোকজন আসবে, দেখা হবে তাদের সঙ্গে।'

'তাঁদের অনেকের সঙ্গেই তো মধ্যে মধ্যে দেখা হয়। সম্মেলনের কী দরকার?'

ভদ্রলোকের সরল চোখ দুটোতে বেদনার ছায়া পড়ল।

'কেন, দেশের কথা নিয়ে একটু আলাপ-আলোচনা হবে—সে কি তোমার ভালো লাগবে না?'

না, লাগবে না। যে দেশকে পর করে দিয়েছি, যার পদ্মা-মেঘনা-মধুমতী-আড়িয়াল খাঁ—ইছামতী-কালাবদর এখন স্বপ্নের নদী, যার মাইলের পর মাইল সুপুরিবনের মাথার ওপর বর্ষার মেঘ নুয়ে পড়েছে, সে এখন রূপকথা। কী হবে সেই স্মৃতিচর্চায়—যা শুধু দুঃখই দেবে?

তবু বললুম, 'আচ্ছা, যেতে চেষ্টা করব।'

'করো।'—একটু বিরক্ত হয়েই ভদ্রলোক চলে গেলেন।

আমার আর একজনকে মনে পড়ল। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'মশাই—একেই বলে অদৃষ্টের রসিকতা!'

'কিরকম?'

'পাসপোর্ট নিয়ে গেছি ইস্টবেঙ্গলে। স্টিমারের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দেখছি—সেই ধানের ক্ষেত, সেই গাছপালার সবুজ, সেই ছোট ছোট গ্রাম। হঠাৎ পাশ থেকে এক পাঞ্জাবী মুসলিম ভদ্রলোক আমায় কী জিজ্ঞেস করলেন, জানেন? বললেন, হাউ ডু ইয়ু লাইক মাই কান্ট্রি? বুঝুন একবার। আমি এই দেশের ছেলে মশাই, আর একজন পাঞ্জাবী আমাকে—'

বলতে বলতে গলাটা তাঁর ধরে এসেছিল।

আমাদের এখনো ব্যথা বাজে—তা ঠিক। হয়তো মৃত্যুর আগেও ভাবব, এখানকার কোনো শ্মশানে ছাই হয়ে মিলিয়ে না গিয়ে—দেশের ভিটে বাড়ির সেই পুকুরের পাড়ে যেখানে পূর্বপুরুষদের চিতার ওপর সারি সারি মাঠ, সেখানে যদি কেউ আমার শেষ স্মৃতিটুকু রেখে দিত। কিন্তু এ তো

—গুজরাটের গির অরণ্যে দূর অতীতে আফ্রিকা থেকে আগত কাফ্রীরা বাস করে। বন্য জীবনের আস্বাদ, হিংস্র সিংহের সান্নিধ্য এমন কি কাফ্রী ভাষাও এখানে অক্ষুণ্ণ আছে

সেন্টিমেণ্ট। আমাদেরই শুধু এক একটা দিন-রাত্রি বেদনায় ম্লান হয়ে যায়, আমাদের ছেলেমেয়েদের কাছে তো পূর্ব বাংলার সঙ্গে নাইজেরিয়া কিংবা আলাস্কার ভূগোলে কোনো তফাত নেই। পূর্ব পাকিস্তানকে তারা পোলিটিক্যালী জানে, ইমোশন্যালী আর অনুভব করে না—করবার কোনো কারণই নেই।

কারণ নেই—তা ঠিক। তবু আমাদের এই চেতনার স্পন্দন কি আমরা নিঃশব্দে রেখে যাই না উত্তরাধিকারীর রক্তে? প্রাগৈতিহাসিক কোন্ দুর্লক্ষ্য ধূসরতায় যাযাবরী-বৃত্তির ওপরে আমাদের বিরাম-যতি পড়েছিল; তারপর থেকে কিছু মাটি, কিছু জল, কিছু পাহাড়, কিছু অরণ্য—তাই দিয়ে গড়ে উঠল আমাদের স্বদেশ-বস্তু। সেই দেশের ভৌগোলিক রূপ সঞ্চারিত হল আমাদের ধ্যানে, কল্পনায়, জন্মগত অধিকারের প্রত্যয়ে। আদিম বৃত্তির মতো সেই স্বদেশ-সংস্কারকে আমরা কি আর রক্ত-তরঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি—

দেশকে না কখনো দেখেও কি তার স্পন্দনকে ভুলতে পারে আমাদের উত্তরাধিকারীরা?

তা যদি না হয়, তা হলে তিন শ' বছর আগে যারা চলে গিয়েছিল আমেরিকায়, তাদের উত্তর পুরুষের চেতনা কেন মৌমাছির মতো গুঞ্জন করে সেই সমারসেটশায়ারের 'ঈস্ট ককার' গ্রামের স্মৃতিতে—কেন চার শ' বছর আগেকার স্যার টমাস এলিয়টের প্রত্যাশা-সম্ভূত প্রত্যয়ের জন্যে একালের টি এস এলিয়টের নিশ্বাস পড়ে? ঈস্ট ককারের দার্শনিক পূর্বপুরুষ মিথ্যা বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানুষের ভবিষ্যৎকে দেখেছিলেন—এলিয়ট তা জানেন। কিন্তু আজকের তিক্ত জ্ঞান বৃক্ষের ফলের চাইতে অনেক মধুর ছিল ঈস্ট ককারের সেই ভ্রান্তি—বুদ্ধিবাদী কবি সেই নস্টালজিয়াকে তো অস্বীকার করতে পারেননি।

দেখছি, এই রক্ততরঙ্গের দোলাতে মার্কিন লেখকও পুরো আমেরিকান হতে পারছেন না। গল্প লিখছেন ওয়াইডম্যান—কিন্তু চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে নিউ ইয়র্ক, স্কাই-স্ক্রেপারের ম্যানহাটান—দেখা দিচ্ছে পিতৃপুরুষের সুদূর অস্ট্রিয়া, তার প্রকৃতি, তার পরিবেশ। শুধু 'ওয়ান্ডারিং জু' নয়—সমস্ত ইহুদী জাতিই তো অভিশপ্ত হয়ে ঘুরে বেড়াল পৃথিবীময়, তবু কি ভুলতে পারল তার প্যালেস্টাইনকে, তার পিতৃভূমিকে? স্বয়ং আইনস্টাইন পর্যন্ত যে ভুলতে পারেননি, তার পরিচয় তো তাঁর আত্মজীবনীতেই রয়েছে।

না—সেই আদিম আহ্বানকে ভোলা যায় না। তাই মার্কিনী কালো মানুষেরাও অপমানিত মানবতার সব গ্লানির ভেতরে থেকে থেকে চকিত হয়, তার কানে আসে অপার অরণ্য থেকে ঢাকের শব্দ, তার বন্য পিতৃপুরুষের শিকারের কলরোল, শুনতে পায় তৃণভূমিতে আকাশফাটা সিংহের গর্জন—সেই গর্জনের সঙ্গে মিশে যায় ম্যাম্বোসি-প্রপাতের বজ্রধ্বনি, তার মাথার ভেতরে হিসহিস করে ব্ল্যাক-মাম্বা। তখন আমেরিকার আকাশেও আফ্রিকার কালো মেঘে বিদ্যুৎ চমকায়।

তাই প্রেসিডেন্ট কেনেডিও যখন ইংল্যান্ডে এলেন, তখন—

কেনেডী! আর একটা বজ্রধ্বনি এই মুহূর্তে বেজে উঠল বেতারে। মারাত্মক আহত রবার্ট কেনেডী শেষ নিশ্বাস ফেলেছেন।

মার্টিন লুথার কিং-এর পর আর এক নরবলি। আবার সেই অন্ধ হিংসার নগ্ন-নৃত্য। প্রতিটি সত্যাশ্রয়ী মানুষের বিরুদ্ধে উন্মত্ত বর্বরতা।

রবার্ট কেনেডীও তাঁর স্বদেশকে ভালোবেসেছিলেন। কিছু গ্লানি, কিছু পাপ মোচন করতে চেয়েছিলেন তার। তাই তাঁকে চলে যেতে হল।

সৎ, সহৃদয় মানুষের স্বদেশ কি কোথাও নেই?

ছেলেবেলায় শ-র 'সেন্ট জোয়ান' নাটকটি পড়েছিলুম। তার কাহিনী-বস্তু এখন ঝাপসা। তবু জোয়ানের মরণোত্তর জিজ্ঞাসা আজও শুনতে পাই: 'তোমার পৃথিবী মহামানবদের বরণ করবার জন্যে প্রস্তুত হবে কবে, হে ঈশ্বর, কতদিনে?'

রবার্ট কেনেডী সেন্ট ছিলেন না। আমি আজ আমার পিতৃভূমির জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলছি, কিন্তু একটি সহৃদয় সৎ মানুষের জন্যেও পৃথিবী কেন—মাতৃভূমিই কি তৈরী হয়েছে এখনো?

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু গৃহের অঙ্গনে সেই সুপারিগাছ.

সংসার

শংকর চট্টোপাধ্যায়

অফিস ছুটির অনেকটা আগে আগেই সুলতা বেরিয়ে পড়েছিল। আজ অফিসের হলঘরটায় মিটিঙ, শোকসভা হবে। এস্টাবলিশমেন্টের অক্ষয়বাবু গত বৃহস্পতিবার অফিসের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। সে বড় মর্মান্তিক মৃত্যু। গত কয়েকদিন ধরে কেমন পাগল পাগল চেহারা হয়েছিল অক্ষয়বাবুর। কারো সঙ্গে কোনো কথা বলতেন না, একা একা চুপচাপ কী যেন ভাবতেন। শেষ পর্যন্ত ঐ চরম পাগলামিটা করে বসলেন বৃহস্পতিবার টিফিনের সময়। অথচ তাঁর মৃত্যুর কোনো সঠিক কারণ বের করা যায়নি এখনও। অফিস থেকে লোকজনেরা অক্ষয়বাবুর বাড়িতে গিয়েছিল। মোটামুটি সুখী সচ্ছল পরিবার। তেমন কোনো দুঃখ কষ্টের কারণ ছিল না। তবু অক্ষয়বাবু আত্মহত্যা করলেন।

অফিস থেকে বেরুনোর আগে হলঘরটার পাশ দিয়ে আসবার সময় সুলতা দেখে এসেছে শোকসভার আয়োজন চলেছে। [illegible], অনিল, সান্ত্বনা আর কে কে সব [illegible] হলঘরের ফরাসটা সাজাচ্ছে। টেবিলের [illegible] টেবিলের ওপর ধবধবে সাদা [illegible] অক্ষয়বাবুর বাঁধানো একটা [illegible]। কে বুঝি [illegible] জ্বালিয়ে দিয়েছিল দেওয়ালে দেওয়ালে, ঐ [illegible] অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন গম্ভীর অফিসের বাতাস ধূপের গন্ধ নিয়ে শোকের আবহাওয়া রচনা করছিল।

সুলতার মাথাটা আরও ধরে আসছিল। কেন, সুলতা জানে না। অথচ আজই তার ক্যাজুয়াল লিভের স্যাংকশানটা এসেছে। বড়ো শিবতোষবাবু ছুটির চিঠিটা তাকে দেবার সময় কেমন এক ধরনের হাসছিলেন। সুলতার তখন লজ্জা করছিল ভীষণ।

সুধাদি সেটা টের পেয়ে সকলের সামনেই গলা উঁচিয়ে ঠাট্টা করে বললো,—তোর মত সবাই যদি রাতারাতি করিতকর্মা হয়ে ওঠে তাহলে তার দেখতে হবে না আমাদের। অফিসটাই উঠে যাবে একদিন।

সুধাদির কথার মধ্যে একটা জ্বালা ছিল, সুলতা সেটা টের পেয়েছিল। সুধাদির এখন চল্লিশ চলছে, আর বোধ হয় বিয়েটিয়ে হবে না কোনোদিন। রাস্তায় নেমে সুধাদির জন্য এক ধরনের মায়া হচ্ছিল সুলতার।

গত কয়েকদিন ধরেই মনের ভেতর-একটা অশান্তি চলছে তার। আর আজ দুপুর থেকেই সেই কারণে হয়ত বা মাথাটা ধরে গিয়েছে সুলতার। আজ বোসসাহেবের কামরায় ভুল ফাইলটা পাঠিয়ে দিয়েছিল, বিরক্ত হয়ে শিবতোষবাবুকে ফোন করে-

ছিলেন বোসসাহেব। শিবতোষবাবু যদিও সুলতাকে কিছু বলেন নি। তাহলে লজ্জায় পড়তে হত তাকে।

টিফিনের শেষে মিটিঙের সার্কুলারটা পাবার পর সুলতা একজন দুজন করে অফিসের অনেককেই লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে যেতে দেখল। সুলতারও আর ইচ্ছে করছিল না অফিসে থাকতে। শোকের বক্তৃতা শোনবার কোনো উৎসাহ বা আগ্রহ তার ছিল না। অক্ষয়বাবু মানুষটা এতই অপরিচিত ছিলেন তার কাছে যে তাঁর মৃত্যুর জন্য তেমন শোকের ভাব টের পাচ্ছিল না সে। বরং আরো বেশী করে সুলতার তখন গগনের কথা মনে হচ্ছিল। কাল বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে গগন। সেই কথাটাই বার বার ঘুরে ফিরে মনে আসছিল সুলতার।

তারপর সান্ত্বনাদিকে একটু আড়ালে ডেকে সুলতা বলল, আমার খুব মাথা ধরেছে দিদি, আমি বরং বাড়ি চলে যাই। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় হেলিয়ে সায় দিলে সান্ত্বনাদি।

—চলে যা তুই। আজ থেকেই তো তোর ছুটি হয়ে গেল, না? এই সময়টা একটু সাবধানে থাকিস। আমি পারলে এর মধ্যে একবার যাবো তোর বাড়িতে। বলতে বলতে কাজের তাড়ায় অন্যদিকে চলে গিয়েছিলেন তিনি।

এরপর তাকে কেউ লক্ষ করছে না দেখে সামান্য সময় অপেক্ষা করে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল সুলতা।

অফিস পাড়ার পথটুকু একটু দ্রুত হেঁটে পেরিয়ে এল। বলা যায় না, কে দেখছে, কার মুখোমুখি পড়ে যাবে। বড় ঘড়ির দোকানটার মোড় ঘুরে আর দ্রুত হাঁটতে হল না, এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত, কেউ তাকে দেখছে না। সুলতা দ্রুত হাঁটার জন্য ভেতরে ভেতরে একটু ক্লান্ত বোধ করল। এই মাস পাঁচেকের মধ্যেই এমন অবস্থা, আরো কিছুদিন গেলে হয়ত নড়াচড়া করতে পারবে না আর।

এর মধ্যেই বিকেল পড়ে আসছে। চৈত্র মাসের অস্থির হাওয়া দিচ্ছে। একটু বুঝি মেঘলা ধরে আছে আকাশের কোনায়, তাই দিনের আলোটাও কেমন মিয়োনো গোছের দেখাচ্ছে।

রাস্তার ধার ঘেঁষে ভিড় বাঁচিয়ে মন্থর হাঁটছিল সুলতা। আজকাল ভিড়ের ভেতর যেতে বড় ভয় করে তার। বলা যায় না কখন কোথায় ধাক্কা লেগে যাবে পেটে। বিয়ের প্রায় দশ বছর পর এ অবস্থা হয়েছে সুলতার। অন্য কেউ না জানলেও সে তো ভালো করে জানে সামনের মাসে, তার পঁয়ত্রিশ শেষ হবে। বেশী বয়স হয়ে গেলে আর কী তেমন ছেলেপিলে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে? শেষ সময়ের এই ফসলটার জন্য সুলতাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে।

হাঁটতে হাঁটতে মানসিক অশান্তি ও মাথা ধরার ভারটাকে একটু ভুলে থাকতে চাইছিল সুলতা। সম্পূর্ণ ভুলতে পারছিল না। জোর করে এলোমেলো ভাবনায় মন ভরাতে চাইলেও কোথায় কোন কোনার দিকে একটু মেঘ জমে থাকার মত গগনের চিন্তাটা জেগে থাকছিল। সুলতা অনুভব করতে পারছিল গত কয়েকদিন ধরে তার মনে গগনের কথা ছাড়া আর কিছুই জেগে থাকছে না। সব ভাবনা চিন্তাই যেমন আসছে তেমনি ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে। শুধু থেকে যাচ্ছে গগন।

ট্রাম রাস্তার মুখে এসে সুলতা একটু দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখল লাইনটা ফাঁকা। তার গা ঘেঁষে সেই সময় একটা বাস চলে গেল। এত অন্যমনস্ক ছিল সুলতা, একটু এদিক-ওদিক হলে বাসটা হয়ত তার গায়ের উপর এসেই পড়ত। ড্রাইভার কি একটা কথা বলল। হয়ত সুলতাকে হয়ত সুলতাকে নয়। সে অপ্রস্তুতের মতন বড় রাস্তাটা ছেড়ে ট্রামের স্টপের লোহার শেডটার তলায় গিয়ে দাঁড়াল। গগনকে জড়িয়ে নিজের মানসিক অশান্তির জন্য ভীষণ বিচ্ছিরি লাগল তার। অবনী যখন বলেছে তখন তো চলেই যেতে হবে গগনকে। আর সত্যিই তো গগন ছেড়ে না দিলে ঐ একখানা ঘরের মধ্যে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে থাকতে ভীষণ মুশকিলেই পড়তে হবে সুলতাকে। দুখানা ঘর হলে বরং একটু হাত-পা ছড়িয়ে থাকা যাবে। বাচ্চাটাও একটু হাত-পা খেলাতে পারবে। এসব কথা ভাববার পরও আশ্চর্য গগনের জন্যই মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল সুলতার। গগন চলে যাবে। গগন আর থাকবে না তার সংসারে। কথাটা যেন কিছুতেই ভাবতে পারে না সে। বুকের ভেতর একটা অদ্ভুত ধরনের কষ্ট আবার শুরু হয়ে যায় সুলতার। অথচ গগনের সঙ্গে কী বা সম্পর্ক তার! অবনীর বহু দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছাড়া তো গগন তাদের কেউ নয়।

ভাবনার সময় ছটফট করে চারপাশে তাকালে সুলতা দেখল, একজন মাঝবয়সী কোটপ্যান্ট পরা ভদ্রলোক তার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছেন। ভদ্রলোকের তাকানোটা বিশ্রী লাগল। সুলতা আঁচল দিয়ে তলপেটের দিকটা আরো ঢেকে দিয়ে একটু সরে দাঁড়াল।

তারপর ট্রামটা আসতেই সুলতা তাড়াতাড়ি দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল। ভিড় নেই তেমন। দু'একজন কে নামল সুলতা লক্ষ করল না; ফুটবোর্ডটা খালি হতেই উঠে পড়ল। মেয়েদের একটা সিট খালি ছিল। সুলতা বসে পড়তেই পেছন থেকে কে যেন ডাকল তাকে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল মেয়েদের সিটের পেছনের দিককার ছোট সিটটায় ভূপতি বসে।

—আরে আপনি?

—তাই তো, চেনাচেনা মনে হল, ডেকে ফেললাম।

—অচেনা কাউকে ডাকলে কিন্তু মুশকিলে পড়তে হত আপনাকে।

—তা আর বলতে, ট্রামের বীরপুরুষেরা পিটিয়ে একেবারে ছাতু করে দিত।

কথার ফাঁকে ফাঁকে ভীষণ হাসছিল ভূপতি।

—অফিস থেকে নাকি?

—সেখানে ছাড়া এ পাড়ায় আর কোথায় যাবো বলুন?

কষ্ট করেও একটু বেশী বেশী কথা বলছিল সুলতা ভূপতির সঙ্গে। তার স্বামীর বন্ধু। আর মাঝে মধ্যে অবনীকে যথেষ্ট সাহায্য করে ব্যবসায়। উটকো টাকা পাইয়ে দেয়। অবনী একদিন বলেছিল সুলতাকে। কিন্তু ভূপতিকে তেমন পছন্দ হয় না সুলতার। কেমন বদ ধরনের চোখের দৃষ্টি, পান খাওয়া ঠোঁট আর গিলে করা পাঞ্জাবিতে এক বিশেষ ধরনের ছাপ আছে মানুষটার চেহারায়। কেমন নোংরা ধরনের মনে হয়। তবু অবনীর কথা ভেবেই সুলতাকে এখন একটু আদুরে আদুরে ভাব ফোটাতে হচ্ছিল চোখে মুখে। যে মানুষ যা চায়। অথচ ভেতরে ভেতরে ঘৃণার ভাবটাও ছিল। সুলতা এবার গলা টেনে প্রয়োজন ছাড়াই বলল—আজ অফিস পালিয়েছে, জানেন!

—তাই নাকি? তাহলে তো বউদি বেশ সাবালিকা হয়ে উঠেছেন।

পানের পিক ছিটিয়ে চোখ কুঁচকে ভূপতি বলছিল তরল গলায়। উত্তরে সুলতা মুখ নামিয়ে চাপা গলায় বলল।

—সাবালিকা না হলে আপনাদের সঙ্গে কি পেরে ওঠা যাবে ঠাকুরপো?

—না বউদি, এটা কিন্তু ঠিক নয়; অবনী তো আজকাল বেশ কাজে মন দিয়েছে। টাকা পয়সা তো রোজগার করছে দু-হাতে।

সুলতার কথার গূঢ় অর্থটা ধরেই এবার কথা বলল ভূপতি। একটু অপরাধী অপরাধী ভাব ফুটল তার চোখে মুখে, সুলতা সেটা লক্ষ করছিল। এই ভূপতিই অবনীকে নানান খারাপ পথে নিয়ে যায়। বেসামাল অবস্থায় কতদিন সুলতার কাছে গল্প করেছে অবনী। ভূপতির চরিত্রের বিষয়েও নানান কথা বলেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় সে সব গল্পে কানে হাত চাপা দেয় সুলতা। এখন কিন্তু সেই সূত্র ধরেই ভূপতিকে একটু খোঁচা দিল সে।

—আপনার বন্ধুকে কিছু বিশ্বাস নেই। কবে আবার সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বাড়িতে এসে বসে থাকবে।

—না, না এবার আর সে সব বিষয়ে ভয় পাবেন না আপনি। আমি তো আছি, ওকে চোখে চোখে রাখছি।

—আপনার ভরসায় তো খানিকটা বল পাচ্ছি বুকে।

এরপর আর বেশী কথা হয় না তাদের মধ্যে। লোকজনের ভিড় বাড়ছে। অফিস ছুটি হতে আর বেশী দেরী নেই। সুলতা জানলা দিয়ে দেখল গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে ট্রামটা যাচ্ছে। পুকুরের পাড়ে অ্যাংলো মেয়েরা হাফপ্যান্ট পরে বাস্কেটবল খেলছে। কেল্লার মাথার আকাশটাকে আলো করে সূর্য ডুবছে। কন্ডাক্টার আসতে ভূপতি আগ বাড়িয়ে সুলতার টিকিট কাটল। তারপর নিজের টিকিটটা ঘড়ির ব্যান্ডের ভেতর গুঁজে তার টিকিটটা বাড়িয়ে দিলে ভূপতির আঙুল সুলতার হাতটাকে ছুঁয়ে গেল। ঘৃণায় সিরসির করে উঠল সুলতার শরীর। সে বুঝতে পারছিল ভূপতি ইচ্ছে করেই তার হাতটা স্পর্শ করল। কিন্তু নিজের হাতটা সরাতে পারছিল না সুলতা।

ভূপতি বলল—আচ্ছা বউদি, আপনাদের বাড়ি থেকে কার যেন উঠে যাবার কথা ছিল, অবনী বলছিল সেদিন।

—গগন ঠাকুরপোর কথা বলছেন? তিনি তো গত সপ্তাহেই চলে গেছেন।

ইচ্ছে করেই মিথ্যে কথাটা বলল সুলতা। আর কথাটা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গে বুক ভরে একটা ব্যথা জেগে উঠল তার। কেমন এক ধরনের শূন্যতা, ঠিক বলা যায় না, অনুভব করা যায় মাত্র। গগনকে নিয়ে কিছুতেই ভূপতির মত মানুষের সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে ছিল না সুলতার। তাই শুরুতেই কথাটাকে শেষ করে দিল। অবনীর কাছ থেকে সত্য কথাটা জানতে পারলে ভূপতি নিশ্চয়ই সুলতাকে খারাপ ভাববে। তা ভাবুক। সুলতার তাতে কিছু এসে যায় না। তবু সে কিছুতেই ভূপতির সঙ্গে গগনের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারবে না। এর পর মোড়ের মাথায় ট্রাম দাঁড়াতে ভূপতি সিট ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। মুখ বাড়িয়ে বলল—চলি, আবার দেখা হবে।

—আজকাল তো আর আমাদের বাড়ি আসেইনি না, তা হলে দেখা হবে কি করে? এবারে চলে আসুন না একটা ছুটির দিন দেখে। কথার ফাঁকে ফাঁকে হাসি ছিটোচ্ছিল সুলতা।

—নেমন্তন্ন করলেন যখন তখন তো নিশ্চয়ই আসব।

ট্রাম থেকে নেমে ভূপতিকে রাস্তা পার হয়ে ওপাশের ফুটপাতে উঠে যেতে দেখল সুলতা। তারপর ট্রামটা আবার চলতে শুরু করলে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। মানুষজনের ভিড়ে রাস্তাঘাট উপচে পড়ছে এখন। বিকেল শেষ হয়ে এল। প্রসূতি সদনের পাশ দিয়ে যাবার সময় ট্রামটা অযথা শব্দ করছিল। সুলতা বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। প্রসূতি সদনের লম্বা টানা বারান্দায় গর্ভিণী মেয়েদের জটলা হচ্ছে। গেট দিয়ে একটা রিকশা বেরুচ্ছে। একজন অল্প বয়সী বউ কাঁথায় মুড়ে বাচ্চা নিয়ে বাড়ি ফিরছে। পাশে জোয়ান চেহারার পুরুষ একজন। ওপাশের লনে খাটিয়ায় কাপড় ঢাকা এক সধবার লাশ কাঁধে তুলছে শ্মশানযাত্রীরা। সুলতা সেদিকে থেকে তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল। আর মাস কয়েক পরে তাকেও এখানে আসতে হবে। গগনের কে এক চেনা ডাক্তার বন্ধু আছে এই প্রসূতিসদনে। কথায় কথায় একদিন বলেছিল গগন। মনে পড়ল সুলতার। আর আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করল সে, প্রত্যেকটি ভাবনাচিন্তার শেষে কী করে যেন ঠিক মনের ভেতর উঠে আসছে গগন। কিছুতেই মন থেকে সরানো যাচ্ছে না তাকে। সুলতা গভীর করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। গলির ভেতরে বাড়ি। মোড়ের পানের দোকানটার সামনে পাড়ার ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে ফুটবল খেলা নিয়ে আলোচনা করছে। খুব ক্লান্ত লাগছিল সুলতার। নিজেকে তার বড় দুঃখী ও দীন মনে হচ্ছিল। সুলতা অস্পষ্টভাবে অনুভব করল তার হৃদয় সহসা শিশুর মতন অভিমানী আর কাতর হয়ে কিছু পেতে চাইছে। নিজের চাওয়াটাকে স্পষ্ট করে বুঝতে পারছিল সুলতা। আগের মতই তার সংসারে থেকে যাক মানুষটা। যেমন ছিল তেমনি করে থাকুক গগন।

বাড়ি ফিরে নিজের ঘরের দিকে যাবার সময় দেখতে পেল রান্নাঘরে আলো জ্বলছে। পারুলবালা কলতলায় উবু হয়ে বসে বাসন মাজছে। সুলতার পায়ের শব্দে পারুল মুখ ফিরিয়ে দেখল। সুলতা তাকে গলা তুলে বলল—একটু চা কর তো।

তারপর নিজের ঘরের দিকে যাবার সময় আড়চোখে দেখল গগনের ঘরের দরজায় তালা দেওয়া। নিজের ঘরে এসে দরজার তালা খুলে আলো জেলে কাপড় জামা ছাড়ল। মেঝেতে সকালের খবরের কাগজটা এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। জানলাটা খুলে দিতে সেটা ফর ফর করে শব্দ করল। সুলতা কাগজটাকে ভাঁজ করে রাখতে যাচ্ছিল, পারুলবালা এল।

—চায়ের সঙ্গে লুচি করে দেবো বউদি?

—না আর কিছু লাগবে না।

কথা শেষ করে দেওয়ালের ঝোলানো আয়নায় মুখ বাড়িয়ে দেখল কেমন ক্লান্ত উস্কোখুস্কো দেখাচ্ছে মুখটা। মরা চামড়ার মত খসখসে, ধুলোপড়া চেহারা। পারুল তখনও দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল। সুলতা মুখ ফিরিয়ে বলল—কিছু বলবে?

—জিজ্ঞেস করছিলাম গগন দাদাবাবুর জন্য রান্না হবে কী আজ?

—কেন ঠাকুরপো কী কিছু বলে গেছে তোমাকে?

—না, তা নয়...।

কী যেন বলতে গিয়েও চেপে গেল পারুল সুলতা বুঝতে পারল না। তারপর সে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

সেবারের সেই ভীষণ পেটখারাপের পর থেকেই গগনের জন্য ঝালমসলা কম দিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করেছিল সুলতা। অবনীর আবার ঝালটাল দিয়ে গরগরে রান্না না হলে মুখে রোচে না। তাই গগনের জন্য আলাদা করে প্রত্যেকদিন রান্নার ব্যবস্থা করতে হয়। প্রথম প্রথম পারুলবালা রাগারাগি করত, মাইনের উপর বাড়তি টাকা পাঁচেকের মত কবুল করায় এখন আর কিছু বলে না।

সুলতার মনে পড়ছিল গগনের অসুখের সময়ের কথা। সারাদিন ঘরের জানলাগুলো বন্ধ করে ঘরের ভেতরটাকে আবছা করে রাখত। আগের দিন রাত্রেও শরীর খারাপের ব্যাপারটা টের পায়নি সুলতা, ভোরে চা দিতে গিয়ে জানল। গগন বেশ গলা ছেড়েই বলেছিল—জানো, কত দিন পর আমার জ্বর হয়েছে?

বলেই ছেলেমানুষের মত গগন তারপর কর গুনে গুনে হিসেব করতে লেগেছিল।

—বেশী জ্বর নাকি?

—কপালে হাত দিলেই টের পাবে জ্বর বেশী কি কম।

সুলতা গগনের কপালে হাত দেয়নি। শুধু গলা নামিয়ে বলেছিল—তা হলে চা আর খেতে হবে না, একটু দুধ খান।

তাতেই গগন ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল।

—সকাল থেকেই সারা বাড়িতে বিচ্ছিরি একটা গন্ধ পাচ্ছি, লুচি ভাজছ নাকি?

—হ্যাঁ।

—তাহলে তো আর কথা নেই নিয়ে এসো খানকতক তোমার ঐ পচা ঘিয়ে ভাজা লুচি, গরম গরম।

—সে কি জ্বরের মধ্যে লুচি খায় নাকি কেউ?

—অন্য কে খায় কিনা জানি না, কিন্তু যার কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখবার কোনো লোক নেই সে খায়।

বলেই ঘর কাঁপিয়ে হেসেছিল গগন। তারপর হাসি থামলে বলেছিল,—কেমন, ডায়লগটা বাংলা সিনেমার নায়কদের মত হলো না?

সুলতা এখন চায়ে চুমুক দিতে দিতে সে সব কথা ভাবছিল। এক এক সময় এমন হয় সব ভুলে যাওয়া ঘটনা একসঙ্গে আচমকা মনে পড়ে যায়। সুলতারও গগনকে কেন্দ্র করে ঘটা অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। আর মনটা ততই বিষণ্ণ

হয়ে যাচ্ছিল বেশী করে। গগনকে কোনোদিন ভালো করে বুঝে উঠতে পারেনি সুলতা। কিন্তু এটা ঠিক গগনের সাহায্য ছাড়া সুলতা কিছুতেই অবনীর এই সংসারে নিজেকে খাপ-খাইয়ে নিতে পারত না। এই সংসারের উপর মন বসানো তার পক্ষে খুব কষ্টসাধ্য হতো। নিজেকে সে তো খুব ভালো করেই চেনে, যা একগুঁয়ে স্বভাব তার! হয়ত অবনীকে ছেড়ে দিয়েই চলে যেত সে একদিন। কিন্তু গগন সে সময় বড় সাহায্য করেছিল সুলতাকে। সান্ত্বনা আর সহানুভূতি দিয়ে তাকে ভরিয়ে রেখেছিল। হাসি ঠাট্টা করে সুলতার মনের বিষণ্ণতাটা দূরে করবার চেষ্টা করত গগন। এই সংসারে ঐ গগনের কাছ থেকেই সুলতা যা কিছু সহৃদয় সাহচর্য পেয়ে এসেছে। কারণ, চিরদিনই সুলতার আত্মীয়স্বজনের একান্ত অভাব। মা মারা গিয়েছিল সেই ছোটোবেলায়। তারপর থেকেই মেয়েদের স্কুল-কলেজের হোস্টেলে মানুষ। বাবা ছিলেন একটু সন্ন্যেসী ধরনের। সংসারে থেকেও তিনি ছিলেন বাইরের মানুষ। মা-মরা মেয়ের দিকে তেমন লক্ষ্য ছিল না ভদ্রলোকের। বাবা মারা গেলেন। সুলতা সেবার বি-এ পাস করল। কাকারা তারপর কোনোরকমে ধরে বেঁধে অবনীর সঙ্গে সুলতার বিয়ে দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালন করলেন। সেই থেকে সুলতা এ সংসারে। অবনীরও তেমন আত্মীয়স্বজন কেউ ছিল না। ওর মা থাকতেন কাশীতে তাঁর গুরুদেবের আশ্রমে। বিয়ের সময় অবনী মোটামুটি একটা চাকরি করত। কিন্তু তার নেশা বা মেজাজের কোনো ঠিক-ঠিকানা ছিল না। সময় অসময়ের জ্ঞান তার ততো প্রখর নয়। বিয়ের প্রথম বছরই চাকরি গেল অবনীর। গগন এলো তখন এ সংসারে। কলকাতার কাছের এক ফ্যাক্টরীতে চাকরি নিয়ে চলে এসেছিল সে।

পুরানো দিনের কথা ভাবতে গিয়ে মনের অশান্তি এবং ভারটা অনেকখানি বুঝি কেটে যাচ্ছিল সুলতার। জীবনের বিচিত্র সব উদাস চিন্তার ভেতর দিয়ে তার মনে একধরনের নিঃসঙ্গতার বোধও জাগছিল। গগন কাল চলে যাবে। আর সে এখানে থাকবে না। সুলতার নিজেকে বড় একাকী লাগছিল। এই সময় পারুল-বালা বাড়ি ফেরবার তাড়ায় সুলতাকে খাবার জন্য ডাকতে এল।

তারপর আরও রাত হলে সুলতা ঘরের আলো নিবিয়ে বিছানায় শুতে গেল। গগনের খাবার বারান্দায় ঢাকা দিয়ে রেখে গেছে পারুলবালা। অবনীর খাবারটা সুলতা নিজের ঘরে এনে রেখেছে। কত রাত্রে ফিরবে অবনী, ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া করবে কিনা তারও কোনো স্থিরতা নেই।

অবনীর চাকরি যাওয়ার পর গগনের টাকায় এই সংসারটা চলেছিল কিছুদিন। তারপর সুলতা অফিসে চাকরি নিল। অবনী টুকিটাকি ব্যবসায় তখনও কিছু সুবিধা করতে পারেনি। মাঝে মধ্যে দু' দশ টাকা হাতে এলে নেশা বা বদ খেয়ালে উড়িয়ে দিত। সুলতা কিছু বলত না অবনীকে। তার প্রতি প্রথম থেকেই এক ধরনের নিস্পৃহতার ভাব ছিল সুলতার মনে, পরে সেটা আরও বাড়ল। এক সঙ্গে থাকতে গেলে অভ্যাস বশে রক্তে এক ধরনের মায়া বা টান জন্মায় অবনীর জন্য ততটুকুই টান বোধ করে সুলতা। তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু তাই বলে সুলতা কখনও অন্যায় কিছু করেনি। অবনী যে গগন নয় আর গগনও যে কোনদিন অবনী হতে পারবে না এই সূক্ষ্ম বিভেদটা সে বরাবরই বজায় রেখে এসেছে। গগনও তেমনি, সুলতার কাছ থেকে কখনও কোনোদিন সে কিছু দাবী করে বসেনি। বরং যতটা সম্ভব সূক্ষ্ম একটা দূরত্ব বজায় রেখে এসেছে।

শুয়ে শুয়ে সুলতা ছেঁড়া খোঁড়া বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে নানান কথা ভাবছিল। ইদানীং এই বছরখানেক অবনী বেশ কিছু রোজগার করছে। সুলতার সংসারটা বেশ খানিকটা সচ্ছল হয়ে উঠেছে। তারপর বেশী বয়সে সুলতার এই মাতৃত্বটা এল, আর গগনের ফ্যাক্টরিতে লক্-আউট চলার দরুন মাসতিনেক সে সুলতাকে ঠিক মত সংসার খরচটা দিতে পারছে না। এতকাল সংসারের দিকে তেমন চোখ ছিল না অবনীর। পকেটে পয়সা আসাতে সে যেন একটু হিসেবী হয়ে উঠল। পাওনাগণ্ডাটা শক্ত হাতে হিসেব করতে শিখল। আর তখনই চোখ গেল তার গগনের উপর। অবনী গগনকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলল শেষ পর্যন্ত। গগনও রাজী হয়ে গেল।

একের পর এক ঘটনাগুলো সুলতার মনে কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। সে নিজের মনটাকে সেখান থেকে বের করে আনতে চেয়ে বার বার হাঁপিয়ে উঠছিল। সুলতার বুকের ভেতরটা অকারণেই কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। শরীরের ভেতর কোথায় যেন একটা কষ্ট হচ্ছিল তার ঠিক মত আন্দাজ করতে পারছিল না। তখন হঠাৎ সদর দরজার কড়াটা নড়ে উঠলে সুলতা দরজা খুলে একটু সরে দাঁড়াল পাশে। গলি রাস্তায় ট্যাক্সিটা আলো জ্বালিয়ে চলে গেল। অবনী ঢুকল টলতে টলতে। বারান্দার আলোটা ঘর থেকে বেরুনোর আগে জেলে দিয়ে এসেছিল সুলতা। দরজার খিল তুলতে তুলতে দেখল অবনী সোজা কলতলার দিকে যাচ্ছে। সুলতা তাকে কিছু বলল না। ঘরে ফিরে খাবারের ঢাকাটা তুলে অপেক্ষা করতে লাগল। কোনো কিছুই যেন আর স্পর্শ করছিল না তাকে। কলতলা থেকে অবনীর গলায় আঙুল দিয়ে বমি করার আওয়াজ পাচ্ছিল সে তারপর জল ঢালার শব্দ হল। নিজের গায়ের পাঞ্জাবিটা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে অবনী ঘরে এল।

—খাবে না?

—না, খিদে নেই।

বলতে বলতে হাতের পাঞ্জাবিটা ঘরের কোনার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে অবনী গড়িয়ে পড়ল বিছানায়। সুলতা আলোর সুইচে হাত রেখে দীর্ঘ করে নিশ্বাস ফেলল। সুলতা আর কিছু ভাবছিল না। শুধু মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সেই পুরোনো কথাটাই বেজে যাচ্ছিল, গগন চলে যাবে কাল। সুলতাকে সেই ভাবনাটা আরো বেশী করে অসুস্থ, উদাস আর অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিল।

একজন আসছে বলেই কী আর একজনকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে? এটাই কী জীবনের নিয়ম? সুলতা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না এই সংসার তবে

কীসের জন্য? মানুষজনকে ধরে রাখবার জন্যই তো! এর পর সংসারের বিষয়টা ক্রমশ তুচ্ছ হয়ে আসছিল সুলতার মনে। এক ধরনের রাগ হচ্ছিল তার। সুলতা বড় বেশী করে গগনকে চেয়েছিল বলেই কী তাকে এমনভাবে চলে যেতে হচ্ছে? ভাবতে ভাবতে তন্দ্রার ভাব এসে গেল, ঘুমিয়ে পড়ল সুলতা।

অনেক রাত্তিরে পাশের ঘরে খুটখুট একটা শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল তার। ঘুম ও জাগরণের মধ্যে শব্দটাকে ঠিক চিনতে পারছিল না সুলতা। কিছু সময় সে সজ্ঞানে চেয়ে থাকল অন্ধকারের দিকে। তারপর এক সময় ধীরে ধীরে বিছানার ওপর উঠে বসল। অবনী মড়ার মত ঘুমুচ্ছে। পাশের ঘরের ঐ খুটখুট শব্দটা ছাড়া চারপাশ নিস্তব্ধ। অবনীর প্রবল নিশ্বাসের শব্দটাও কিন্তু শুনতে পাচ্ছিল ও।

এর পর অনেকক্ষণ বিমূঢ় অসংবৃত হয়ে সুলতা বসে থাকল এবং স্বামীর গভীর নিশ্বাসের শব্দ শুনল। এই সময় সুলতা তার প্রতি রোমকূপে নিজের ব্যর্থতার স্বাদ অনুভব করতে পারছিল। জীবন এত শূন্য অর্থহীন সুলতা আগে কখনও বোধ করেনি। মা-বাবার মৃত্যুর পরও নয়। বেদনা সুলতাকে ক্রমশ পরিত্যক্ত শিশুর মতন অসহায় করে তুলছিল।

সে তারপর এক সময় উঠে দরজা খুলে বারান্দায় এল। পাতলা ছানার জলের মত জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে বারান্দায়। সুলতা গগনের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দেখল বাইরে থেকে আলোটা দেখা যাচ্ছে। হাত দিতে ভেজানো দরজাটা খুলে গেল। গগন মেঝেতে উবু হয়ে বসে কী যেন বাঁধাছাঁদা করছিল, দরজায় শব্দ হতে মুখ ফিরিয়ে হাসল।

—কি, বিদায় জানাতে এলে নাকি?

সুলতা সে কথার কোনো জবাব দিল না। ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতর তাকাল। ছেঁড়াখোঁড়া কাগজের টুকরো উড়ছে ঘরময়, বাতিল জিনিসপত্র। চৌকির উপর দড়ি দিয়ে বাঁধা বিছানা, জিনিস বোঝাই তোরঙ্গটা একদিকে হাঁ করে আছে। সুলতার গগনের ঘরটার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল যেন এই প্রথম সে এখানে পা দিল। এই ঘরটা সম্বন্ধে আগে তার যেন কোনো সঠিক ধারণা ছিল না। নিজেদের ঘরটার অনুপাতে গগনের এই ঘরটাকে বেশ বড়সড়ই লাগছিল সুলতার। উত্তরের জানলাটা খুলে দিলে বেশ হাওয়া আসবে ঘরে। ওঘরটা একটেরে বলে তেমন আলো-বাতাসের সুবিধা নেই। দেওয়ালে কয়েকটা তাকেরও বন্দোবস্ত আছে। টুকিটাকি জিনিসপত্র রাখবার খুব সুবিধা হবে। গগনের ঘরটাকে শোবার ঘর করলে বেশ ভালো হয়। ওপাশের ঘরটায় না হয় কেউ এলেটেলে বসতে দেওয়া যাবে। কয়েকটা বেতের চেয়ার কিনতে হবে সুলতাকে ওমাসে। সুলতা গগনের ঘরটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করছিল।

—কি আমার উপর তোমার কোনো রাগটাগ নেই তো?

গগন হাসি মুখেই কথা বলছিল। সুলতা কিছু বলল না।

—দেখো, অযথা আবার মনে কিছু পুষে রেখো না যেন। যাই বলো মানুষটা আমি কিন্তু খারাপ নই।

হঠাৎ সুলতার মনে হল তার বুকের মধ্যে থেকে কোনো যন্ত্রণা উঠে আসতে চাইছে, গলার কাছটায় কান্নার মত লাগছে, ব্যথা করছে। একটা শূন্যতার বোধ যেন ভারী হয়ে বুকের ওপর চেপে বসতে চাইছে। মুখ হাঁ করে শ্বাস ফেলল সুলতা গোপনে, মাথার দুপাশে কপালের কাছে দুপুরের ব্যথাটা যেন আবার ফিরে এসেছে। চোখে যেন কিছু স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছে না সে।

গগন বলল—তোমার কাছে একটা ব্যাপারে কিন্তু আমি অপরাধী হয়ে আছি।

বলতে বলতে সে হাঁ করা তোরঙ্গটার কাছে গিয়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে কী যেন হাতড়াতে লাগল। সুলতা ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে পারছিল না। গগন একটা কাগজের মোড়ক হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল সুলতারর মুখোমুখি—তোমার কাছে একটা মিথ্যে কথা বলেছিলাম আমি।

গগনের ঠোঁটের হাসিটাকে কেমন ভেজাভেজা দেখাচ্ছিল। সুলতা এবার গলার স্বর নামিয়ে বলল—কী মিথ্যে?

—এইটে নাও, দেখলেই বুঝবে।—আরে মানুষ তো, দু'একটা ভুল ত্রুটি তো থাকবেই। নিজেকে সান্ত্বনা দেবার মত করে মাথা ঝাঁকাল গগন। তারপর ফিসফিস করে বলল—ব্যাপারটার জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি আমি।

সুলতা হাতের মোড়কটা খুলতে এত ব্যস্ত ছিল যে গগনের মুখ-চোখের ভাবটা লক্ষ করল না। মোড়কটা খুলতে গিয়ে আঙুলগুলো কাঁপছিল সুলতার, সময় লাগছিল। তারপর শেষ কাগজটা খুলে যেতেই ভেতরের জিনিসটার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল সে। একজোড়া কানের ফুল। পুরোনো আমলের জিনিস। মায় গয়নার বাক্সে ছিল। মনে পড়ল বেশ কিছুদিন আগে একবার ভীষণ টাকার টানাটানির সময় সে গগনকে জিনিসটা বিক্রি করে টাকা আনতে দিয়েছিল। গগন টাকাটা এনে দিয়েছিল সুলতাকে। কত টাকা আজ আর ভালো করে মনে পড়ছিল না তার। তবে এটা ঠিক ন্যায্য মূল্যের চেয়ে একটু বেশী টাকাই এনে দিয়েছিল গগন তাকে।

দুই চোখের মাঝখানে ভুরুর কাছে কোথাও এটা শিরা যেন কাঁপছে। সুলতা সেই ব্যথা অনুভব করতে পারছিল। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা দ্রুত এবং শব্দবহুল হয়ে উঠছে। সুলতা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছিল এতদিন এই সংসারের চার দেওয়ালের মধ্যেও তার একটা খোলা দরজা ছিল, যেখান দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সে দুদণ্ড অন্তত বাইরের পরিচ্ছন্ন খোলা আলো-বাতাস গায়ে লাগিয়ে আসতে পারত, আজ তার সেই দরজাটাই চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল।

সুলতার বুকের কোনো নিভৃত শূন্যতার বোধ এখন গলিত হয়ে তার অনুভবকে কান্নায় রূপান্তরিত করছিল। গলার শিরা টাটিয়ে ফুলে উঠছিল, তালুর গহ্বরে শ্বাস বন্ধ হবার মতন অসহ্য যন্ত্রণা-বোধ করছিল সে। সুলতা তার ঝাপসা চোখ দুটো তুলে যেন শেষ বারের মত সংসারের সেই খোলা দরজাটার দিকে তাকাল।

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

সাতাত্তর

তথাপি অবধূত থামতে রাজী না। করোটি পাত্রে আর এক দফা কারণ বারি পান করে নেয়। অনুষ্ঠান আগের মতই। বিড়বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ। উপবীত স্পর্শের কল্পনা। কপালে করোটি ঠেকিয়ে যোগোমতীর দিকে ফিরে বলে, 'খাই গ মা।'

এক চুমুকে করোটি শূন্য করে সে আমার দিকে তাকায়। পলকহীন রক্তাভ চোখের দিকে চোখ রাখতে পারি না। ব্রহ্মানন্দ অবধূত আবার আমার দিকে এমন করে তাকায় কেন। অস্বস্তিতে চোখ ফিরিয়ে নেবার আগেই, অবধূত অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ে। আবার মিটিমিটি হাসে।

এবার কী রহস্য, কে জানে। আমার দিকে চোখ রেখেই যেন রহস্যোদ্ঘাটনের সুরে ডাক দেয়, 'মা।'

এই যেন যোগোমতীর নাম। সে স্বাভাবিক স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'বল।'

'ইয়ার মধ্যে একটো কী রকম ভাব আছে, দেখ্যাছিস্?'

শোন এবার নতুন কথা। কার মধ্যে আবার কী ভাব আবিষ্কার করে অবধূত! দেখি, যোগো দৃষ্টি চালাচালি করে গোপীদাসের সঙ্গে। ঠোঁটের কোণে হেসে, আমার দিকে চেয়ে জবাব দেয়, 'বাবার নজর এতক্ষণে পইল্ল? আমি ত পেথম থেক্যাই নজর কইরছি।'

অবধূত ঘন ঘন ঘাড় দুলিয়ে বলে, 'করবি বই কি মা, তোর চখে ত ফাঁকি যাবার নয়।'

কী বাজ দেখ দেখি। তিনজনেরই দৃষ্টি একজনের দিকে। অবধূত আবার বলে, 'নজর দেখ্যাছিস, যেন ধ্যানে রইয়েছে। ভিতর জোর আছে পোব। ক্ষেইপলে গুণ জ্ঞান থাইকবে না, সিরকম ভাব।'

গোপীদাস বলে ওঠে, 'অই, অই জন্যেই ত চিতে বাবাজী নাম দিইচি গ।'

অবধূত ধমকে ওঠে, 'আ রে ধ্যুর শালো তোর চিতে বাবাজী। এ মাল ভিন্ন গোত্তরের। দেইখছিস না, কোনদিকে লজর নাই, এক বগ্‌গা ছুইটছে। কোথাক কী এলা গেলা, এ নিটের কিচকলাটো।'

গোপীদাস অমনি ঘাড় দুলিয়ে, দাড়ি নাড়িয়ে আওয়াজ দেয়, 'লদীর মতন, বলা যানে গ বেহ্মালন্দ দাদা। উ ত আমি আগেই বইলছি। বাবাজী আপন মনে বইছে।'

অবধূতের আবার ধমক, 'তোর বাবার বাবাজী। খালি বাবাজী বাবাজী কইরছে শালোর বাউল।'

সে তো আর গোপীদাস চোখে চোখে হাসে। আর আমি ভাবি, এ কি বিব্রত করার ধরন। বিরক্তিকরও বটে। শুনতে ইচ্ছা করে না। এদের মুখের ভাব দেখতে ইচ্ছা করে না। এরা থাকে থাকে, বেশ থাকে। হঠাৎ কোথায় গোলমাল লাগে, এদের কাছে থাকা দায়। তখন এদের সামনে, নিজেকে নিয়ে নিজের গোল লাগে। এদের কাছে, নিজের কথা শুনতে ইচ্ছা করে না। কারণ, এদের দেখা, এদের ভাব, এদের কথা, সবই আলাদা। আমি বলি, 'সে কথা এখন থাক।'

তোমার কথা কানে গেলে তো। যারা

নিজের ভাবে বিভোর, তারা নিজের কথাই বলে। গোপীদাস বলে অবধূতকে 'তা হলো, তুমিই বল।'

'বইলব, বইলব বই কি। উয়ার ভক্তির জো টো দেখ্যাছিস্। দ্যাখ্ তোরা ভাল করো, বিটা পদে পদে মার খায়, অপমান হয়, তবু টলাতে লাইরছে।'

কে মারে আমাকে। কে অপমান করে। আমার কথা আমি জানি না। আমার মুখের দিকে চেয়ে বলে শ্মশানবাসী অবধূত। আমার ভক্তিই বা কীসে, তার আবার জোরই বা কী। এ সবই যেন এক আত্মসম্মোহিতের কথা। আমার কথা কিছু না। তবু কথা বলতে পারি না, চুপ করে থাকি। কেন বলে, কোথা থেকেই বা আসে এসব কথা, কে জানে। হাসতে পারলে, খুশি হই। হাসতেও পারি না। অথচ, কৌতূহলও বোধ করি না। বিব্রত অস্বস্তিতেই চুপ করে থাকি। কেবল যোগো আমার চোখের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসে। গোপীদাসও তা-ই।

অবধূত আমার ঘাড়ে হাত রাখে। এই সে আমাকে প্রথম স্পর্শ করে। গরম মস্ত বড় হাতের পাঞ্জাখানি ভারীও তেমনি। একটু ঝাঁকানি দিয়ে বলে, 'ভাল, ভাল।'

বলে, হঠাৎ হাসতে হাসতে যোগোর দিকে ফিরে বলে, 'ই কি ভেবেছে জানিস মা। ই ভেবেছে, আমি বুঝি উয়ার ঈশ্বর ভক্তির কথা বইলছি।'

আমার দিকে ফিরে বলে, 'তা লয় হে বাবা, ভক্তির ভাব আলাদা জিনিস। উটো হলো চষা জমির মতন। তাপর তুমি উতে যা খুশি বীজ ছড়াও কেনে। ফইলবার ধন ফইলবে, বুইঝলে? সিটি তোমার আছে।'

ভক্তি রূপের এমন ব্যাখ্যা আর শুনি নি। আমার তা আছে কি না আছে, জানি না। কথাটা মন্দ লাগে না শুনতে। গোপীদাস বলে ওঠে, 'জয়গুরু, খাঁটি বইলেছ গ অবধূতদাদা।'

অবধূতের সে খেয়াল নেই। আবার করোটি পাত্র পূর্ণ, যথানিয়মে পান। পানের পর, আবার আমাকেই বলে, 'ভাল লাইগল বাবা তোকে। মরবি বিটা, তোর শান্তি নাই। আর, তোর সঙ্গে কথা কই দুটো। শব না হলো শব সাধন হয় না, জানিস ত বাবা। তুই না হলো মনের কথা হবেক নাই।'

গোপীদাস আওয়াজ করে, 'জয়গুরু।' যোগোমতী নিষ্পলক চেয়ে থাকে আমার দিকে। সে যেন আমাকে সম্মোহন করতে থাকে।

অবধূত বলে, 'কারণ খাস নাই, নাই খাস। তবে বাবা, ভক্তি করো, নারীর পুজো কইরবি। পাটার মতন পাটী পুজো না। বিটা যেমন মা পুজো, মানুষ যেমন দেবী পুজো, তেমনি। তবে হাঁ, খাঁটি নরে যেমন নারী পুজো, সিটিও জাইনবি দেবী পুজোর অঙ্গ।'

না জিজ্ঞেস করে পারি না, 'এ কথা আমাকে বলছেন কেন। আমি সাধক নই, তন্ত্র মন্ত্রও আমার নেই।'

না, থাইকল। কিন্তু তোর মন আছে, ধ্যান আছে, তা-ই তোকে বলি। তোর এই একটা ভাব আছে, নারী ছাড়া তোর দিন যাবে নাই। যিখানে যাবি, সিখানেই, উয়ারা তোর কাছকে আইসবে। দ্যাখ্ বাবা, আমার কিছু হয় নাই। আমি ফোঁপড়া ঢেঁকি, এখন শ্মশানের কুত্তা হয়্যেছি।'...

হঠাৎ যেন অবধূতের গলায় কথা আটকে যায়। বুকে কোথায় চোট লাগে। তা-ই নিজের বুকে একটা হাত চেপে ধরে। আর যোগোমতী যেন নিচু আর্তস্বরে ডেকে ওঠে, 'অই গ বাবা।'

গোপীদাসের গলায় বাজে, 'জয়গুরু।'

অবধূত বুকের থেকে হাত সরিয়ে, আবার করোটি কারণে পূর্ণ করে, সেইভাবেই পান করে। মুহূর্তেই যেন পরিবেশ বদলে যায়। অবধূতের চোখ কেবল রক্তবর্ণ না। যেন রক্ত ফেটে পড়তে গিয়েই, তার চোখ দুটি চিকচিক করে।

গোপীদাসের কথা আমার মনে পড়ে যায়। সে নিজেকে পতিত বাউল বলে, নিশ্বাস ফেলে চোখের জলে গলেছিল। এখন অবধূত বলছে, সে ফোঁপড়া ঢেঁকি। শ্মশানের কুকুর হয়েছে। এ সময়ে, তার মুখের দিকে চেয়ে, আমারও যেন কোথায় একটা চমক লেগে যায়। একে অন্য মানুষ মনে হয়।

অবধূত চোখ আধ বোজা করে, মোটা স্বরে বাজে, 'দেখ্যা বাবা দেখ, ই যা দেইখছ কুকুর দুটো, ইয়াদের গায়ে ধরে পিটাও, হবেক নাই। ইখানকার মড়া না খেলো, ইয়াদের পেট ভরে না, খোঁতাও জমে না। সিরকম আমারও বটে, আমার আর উপায় নাই।'

যোগোমতী বলে ওঠে, 'ইসব কথা ক্যানে বাবা, থাক না।'

অবধূত বলে, 'না মা, ইয়াকে তাই বলি, তবু দেইখলে চিনতে পারি। বাবাকে দেখ্যে চিনতে পারি। তা বলো, তোকে কি আর তন্ত্রমতে পুজো কইরতে বইলছি? তা না, হেলা ফেলা করিস না, যে বিটি যে ভাবেতেই আসুক, তাকে তুষ্ট কইরবি। তার মান রাইখবি, মন রাইখবি, তোর ভাল হবে। শক্তি বাইড়বে।'

এ সব কথার সত্য জানি না, মিথ্যা জানি না। তবু, আমার জীবনকালের পেরিয়ে আসা নানান পটে, নানা রঙ ভাসে। যে কথার অর্থ কিছুই বুঝি না, সে কথাই কেমন যেন রাঙ্গনাময় মনে হয়। চুপ করে তার কথা শুনি।

অবধূত তার নিজের বেগে ভাসে, আপন স্রোতেই কলকলায়, 'কলিকালে ত বাবা বেদের সাধন নাই, তন্ত্রসাধনই বিধি। তা সি শক্তি সাধনা হলো কই। যার হলো, তার হল্য, আমার কিছু হল্য না। ধ্যান না থাইকলে হয় না শাস্ত্রে বইলছে, সুরা হলো শক্তি, মাংস হল্য শিব। শিব শক্তির ভক্ত হলো ভৈরব। তিনে যদি মিলো, তবে মোক্ষের কারণ। কিন্তু মদে মাংসে বদ হজম কইরলাম, পচা ঢেকুর মরা্য গেইছি বাবা।'

অবধূতের চোখের কোণে, রক্তের ফোঁটাই যেন বিন্দুর মত চিকচিকিয়ে ওঠে। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করে যোগোমতীর আলতা পরা পা। যোগো সেই হাতখানি দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে। ভৈরবীর চোখে যে এর আগে জল দেখি নি, মুখের বিমর্ষতা দেখি নি, তা না। কিন্তু এখন এ মুখ একেবারে আলাদা। এখন এ মুখে যেন গাঢ় অন্ধকার, গভীর শোকের ছায়া। এখন দেখি যেন, এক আর্ত মানবী, এক অসহায় পুরুষের হাত ধরে। বলে, 'এমন করো্য বইলছ ক্যানে গ। আমার পাপ লাগে না?'

অবধূত বারে বারে মাথা নাড়ে। বলে, 'না গ, না। তুমি যোগমায়া, মহামায়া। তোমার পাপ লাইগবে না। কিন্তু তুমি থাইকতে আমি পুজো কইরতে লাইরলাম। কুললক্ষ্মী পেলোম, তবু আমার শক্তি পুজো হলো না। কেবল অনাচার করো্য বেড়ালোম।'...

দূরে হেপানদের বুকে টানা বাতাসে যেমন, সুরহীন হা হা রব ওঠে, অবধূতের স্বর যেন তেমনি বাজে। কান্নার স্বর এক রকম। এ স্বর তার এক রকম, কান্নার থেকে গভীর, আরো বেশি কিছু। বুঝতে পারি না, এ কি কেবল নিষ্ফল সাধনের হাহাকার। নাকি, যোগোমতী ভৈরবীর কাছে, আপন কৃতকর্মের অনুতাপ। একেশ্বরের ঘরে থেকে, যোগোকে দুঃখ দেওয়ার পাপ কি তার আপন জ্বালায় বাড়ছে।

যোগো বলে, 'ক্যানে মিছা বইলছ গ। আমি কি তোমার সি শক্তি?'

অবধূত ব্যগ্র ব্যাকুল স্বরে বলে 'অই গ, এমন করো্য বলিস নাই। তোর মধ্যে যা আছে, তা আর কারুর নাই।'

যোগো নিজের দু হাতে ধরা অবধূতের হাতখানি নিজের কপালে ছুঁইয়া বলে, 'তোমার পুজো যেন চিরকাল করো্য যেতে পারি গ। যদি আমার কিছু থাকে, তা-ই যেন পারি।'

দেখে মনে হয়, তন্ত্র মন্ত্র সাধন আচরণ দূরে, দুই নরনারী হৃদ-সায়রের তরঙ্গে ভাসে। যদি সেইখানেতে দুয়ের মিলে একাকার হওয়া যায়, তবে সফল সাধন ঘটে। দুইয়ে যদি পরস্পরকে পুজতে পারে, তবেই সকল পুজার ফললাভ। এখন দেখ, কথা যাকে নিয়ে উঠেছিল, সে ভেসে গিয়েছে। গোপীদাসের চোখে আবেশ, বিভোর হয়ে দুজনকে দেখছে। দুজনায় আপনাতে মগন।

একটু পরে, অবধূত আবার করোটি পূর্ণ করে পান করে। তারপরে কুললক্ষ্মীর ব্যাখ্যা করে। ব্রাহ্মণী, শূদ্র কন্যা, রজকী, গোপবালা, কাপালী, নট বধূ, বেশ্যা, নরসুন্দরী, মালাকার-কন্যা এই নয় প্রকার কুললক্ষ্মী। শুনে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, এদের মধ্যে

তন্তুবায় বধূর হিসাব তো নেই। কিন্তু তার জবাব দেয় অবধূত নিজেই, "তবে হাঁ, সব থেক্যা সেরা কুলস্ত্রী জাইনবে সি-ই, যে "বিশেষবৈদগ্ধযুতা সর্বাএব কুলাঙ্গনা।" পরপুরুষগামিনী বিদগ্ধা হল্যে, সি-ই কুলস্ত্রী হব্যে। তা বল্যে, পুরুষ ধর্যে ধর্যে শোয়ার বিষয় লয়। কুলাচারী, সি যি পুরুষই হক, তার নামই পরপুরুষ। আর পুজোকালে সি পুরুষকে, "পুজোকালে চ দেবেটি বেশ্যেব পরিতোষয়েত্।" বেশ্যার মতন তাকে তুষ্ট কইরবে। কিন্তু পুজোকাল ছাড়া, তোমার চিন্তায় তার পুরুষ থাইকবে না, তবে হলা কুলস্ত্রী।'

কুলাচারীর মতে, আগামোক্ত পতি শিব স্বরূপ, তিনিই গুরু। বিবাহিত পতি, পতি না। কুল পুজোয়, স্বামী ত্যাগ করলেও, নারীর দোষ নেই। এই কুলনারী সাক্ষাৎ কালী স্বরূপা।

এই কথা শেষ করেই, সহসা অবধূত ডাক দেয়, 'মহামায়া।'

যোগোমতী উত্তর দেয়, 'বল।'

'ষটচক্র বিষয়ে কথা বইলব তোমার সাথে।'

'বল।'

মুহূর্তেই যেন আবার পরিবেশ বদলায়। দু জনেই, দুজনের মুখোমুখি, সোজা হয়ে বসে। যোগোর কোলের ওপর দুই হাত জড়ো করা। ব্রহ্মানন্দের দুই হাঁটুর ওপরে দুই হাত। সে জিজ্ঞেস করে। 'মা, মেরুদণ্ডের দুই পাশে কী আছে?'

'ইড়া পিঙ্গলা নাড়ি।'

'তার ডাইনে বাঁয়ে?'

'সুসুম্না মগজ পর্যন্ত।'

'সুসুম্নার মধ্যে আর কোনু নাড়ি আছে?'

'বজ্রাখ্যা।'

'বজ্রাখ্যার মধ্যে?'

'চিত্রিণী।'

'সুসুম্না নাড়িতে আর কী আছে মা?'

'সাত পদ্ম বাবা।'

'কী কী?'

'আধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, সহস্রদল।

অবাক হয়ে শুনতে থাকি। যেন এক ঘোর লাগা চোখে, দুজনের দিকে চেয়ে থাকি। বুঝি না কিছুই। ষটচক্র কী, দেহের মধ্যে এত বিচিত্র জটিল যন্ত্রই বা কী, কিছুই জানি না। তবু, আমার সামনে এক আশ্চর্য দৃশ্য। বিচিত্র সংলাপ শুনি অবোধ কৌতূহলে। সর্বোপরি, পরমবিস্ময় লাগে বাঙলা দেশের কোন এক পাড়া গাঁয়ের, একটি তাঁতী বউয়ের মুখে এসব কথা শুনে। এ যোগোমতীকে এখন যেন আর চিনতে পারি না। তার গলার স্বর ভিন্ন। সে যেন অন্য জগত থেকে কথা বলে। দৃষ্টি স্থির, ধ্যানমগ্না, এক ধরনের সমাধিস্থ ভাব যেন। সিন্দুরের রক্ত টিপসহ, এখন সে যেন ত্রিনয়নী দেবী প্রতিমা। আমাদের কারুর প্রতিই তাদের লক্ষ নেই।

ব্রহ্মানন্দ আবার জিজ্ঞেস করে, 'আধার পদ্মে কয়টি দল আছে।'

যোগোমতী বলে, 'চাইরটে। চাইর দল, চাইর বর্ণ, বং শং ষং সং। ই পদ্মে চৌকোনা ধরাচক্র আছে, উয়ার আট দিকে আট শূল। মধ্যখানেতে জগতবীজ লং রইয়েছে, আর কর্ণিকার মধ্যে ত্রিকোণ যন্ত্র। ই পদ্মের মধ্যে মহাদেব রইয়েছেন লিঙ্গ্যের রূপ ধর্যে। উ'য়ার অমৃত গইলবার জায়গায় সাপিনী রূপে কুণ্ডলিনী শক্তি রইয়েছেন।'

'জয় মা ধূমাবতী। স্বাধিষ্ঠান পদ্মের কথা শুনাও মা।'

'স্বাধিষ্ঠান থাকোন লিঙ্গ্যের মূলে। উয়ার ছয় দল, বং ভং মং যং রং লং ছয় বর্ণ। ই পদ্মের মাঝখানটাতে গোল বরুণ মণ্ডল, তার মধ্যে যে্য অর্ধচন্দর রইয়েছে, তাতে বং বর্ণ আছে। ই পদ্মে বারুণী শক্তি থাকোন।'

যোগোমতীর গলায় যেন একটা আচ্ছন্নতা নেমে আসতে থাকে, সেই সঙ্গেই উচ্চারণের মধ্যে স্পষ্টতা লক্ষ্যনীয়। ব্রহ্মানন্দ যত শোনে, ততই যেন সে কী এক আবেগে আপ্লুত হতে থাকে। গোপীদাসও ইতিমধ্যে একেবারে ধ্যানস্থ হয়ে পড়েছে। সে হাত জোর করে, যেন পুজোয় বসেছে।

অবধূত বলে ওঠে, 'জয় মহামায়া। মণিপুরের কথা বল।'

'মণিপুর নাইকুণ্ডলের মূলে। উয়ার দশ দল, দশ বর্ণ, ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং। ই পদ্মের মাঝখানটাতে ত্রিকোণা অগ্নি মণ্ডল উয়ার তিন দিক্যে তিনটো স্বস্তিকার ভূপুর। তার মধ্যে বং বর্ণ রইয়েছে। ই পদ্মে লাকিনী শক্তি বাস করেন।'

'আর অনাহত?'

'হিদে ইয়ার থান। বার দল, বার বর্ণ, কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং এবং টং ঠং। ই পদ্মের ছয় কোণা বায়ুমণ্ডল, উয়ার ভিতর যং বীজ রইয়েছে। ই পদ্মে শিব আর কাকিনী শক্তি থাকেন।'

'জয় যোগমায়া! বিশুদ্ধ পদ্মের কথা বল গ।'

ই পদ্ম গলায় থাকো। ষোল দল, ষোল বর্ণ, অং আং ইং ঈং ঋং ঋৃং ৯ং ৯ৃং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ! ইয়ার মাঝখানটোতে গোল চাঁদের মণ্ডল, ভিতরে নভমণ্ডল আর হং বীজ রইয়েছে। ই পদ্মে শাকিনী শক্তি রইয়েছেন।'

ব্রহ্মানন্দর শরীর যেন উল্লাসে কাঁপে। হাঁকে, 'জয় মা জগত্তারিণী। আজ্ঞা কোথাক মা?'

যোগোমতী তেমনি স্থির চোখে তাকিয়ে বলে, 'ক্যানে বাবা, আজ্ঞা দ্বিদল নামে থাকে। ভুরুর মাঝখানো। উয়ার দুই দল, দুই বর্ণ, হং ক্ষং। মধ্যখানে, ত্রিকোণ শক্তি, শক্তির মধ্যে শিব। ই পদ্মে হাকিনী শক্তি রইয়েছেন। ইয়ার উপরেতেই পরমাত্মা থাকেন। তার উপরে চন্দ্রবিন্দু, চন্দ্রবিন্দুর ওপরে শঙ্খিনী নাড়ি। সহস্র দল উয়ার উপরে।'

'সিখানে কী আছে গ?'

'গোল চাঁদের মণ্ডল, ত্রিকোণ যন্ত্র, মধ্যখানে পরম শিব।'

বলতে বলতে, যোগোমতীর শরীরেও যেন তরঙ্গের দোলা লাগে। তার চোখে মুখে ভাবের আবেশ। সে মাটিতে নত হয়ে, ব্রহ্মানন্দর পায়ে হাত দেয়। ব্রহ্মানন্দও নত হয়ে যোগোমতীর দু হাত, নিজের হাতে নেয়। যেন সুখোল্লাসে ডেকে ওঠে, 'জয় যোগমায়া, জয় মহামায়া।'

সে উঠে দাঁড়ায়। যোগোমতীকে টেনে তোলে। বলে, 'চল ভৈরবী, একটুক ধ্যানে বসি গেইয়ে।'

'চল।'

হাত ধরাধরি করে, পাশাপাশি, দুজনেই প্রোথিত ত্রিশূলের সামনে যায়। ত্রিশূলের

দিকে মুখ করে, দুজনেই জোড়াসনে স্থির হয়ে বসে। তাদের মুখ আর দেখতে পাই না। আমাদের দিকে পিছন ফিরে বসেছে তারা। যোগোমতীর পিঠে ছড়ানো চুল। জামাহীন পিঠের একাংশ দেখা যায়। সামান্য আলোয়, দুজনকেই অস্পষ্ট দেখি। মনে হয়, ঘরের মধ্যে থেকেও, তারা যেন আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে। বেড়ার গায়ে তাকের ওপরে, কপালে সিঁদুর মাখানো নরমুণ্ডের কংকালটি যেন, অল্প আলোতেই তার সাদা বর্ণে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চোখের শূন্য কোটরে যেন স্থির দৃষ্টি রয়েছে। কালো কুকুর দুটি দুজনের কাছাকাছি গিয়ে, এলিয়ে বসে। যা শুনেছি, তা এই মুহূর্তে আর স্মরণ করতে পারি না। কিন্তু সব মিলিয়ে, আমি আমার কথা ভুলে যাই। আমার বর্তমান, দেশকাল, জীবনযাপন চিন্তাভাবনা। যেন কোন এক কালান্তরের ওপারে, বিস্ময়াবিষ্ট রহস্যের দ্বারে, আচ্ছন্ন হয়ে থাকি।

সত্য মিথ্যার বিচার জানি না। মোক্ষ মুক্তির মূল্য বুঝি না। কিন্তু আমার এই সামান্য জীবন কালের স্রোতে, আমারই অপরিচয়ের দূর কাল এসে মেশে। সংসারে কত মানুষ, কত ধ্যান ধারণা, কত তার বিচিত্র স্রোত নানা দিকে বহে। তার মাঝখানে আমি, আমার চলার পথের বাঁকে বাঁকে, কেবল জোড় হাতে দাঁড়িয়ে থাকি।

গোপীদাসের ধ্যান ভাঙে। সে ওঠে, ঘরের এক পাশ থেকে আরো কাঠ এনে, দীর্ঘস্থায়ী আগুন তৈরী করে। তারপরে আমার কাঁধে হাত দিয়ে, নিচু গলায় বলে, 'রাত অনেক হলো বাবাজী, ইবারে শুয়ো পড় এইস।'

আচ্ছন্নের মতই, ছেঁড়া চাটাইয়ের ওপর গা এলিয়ে দিই। চোখ বুজি। আর আমার চোখের সামনে যেন আগুনের শিখা নাচতে থাকে। ধ্যানের আগুন, নাকি চিতার, কিছুই বুঝতে পারি না। একটুও শীত লাগে না। শরীর ভিতরে, সবখানে নিঝুম স্তব্ধতা। কোথাও কোন শব্দ নেই।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙে, তখন সোনালী রোদে চারদিক ভরা। পাখির ডাক শোনা যায়। গোপীদাস ব্রহ্মানন্দ, দুজনের কেউই ঘরে নেই। আমার ঘুম ভাঙতেই প্রথমে দেখি যোগোমতীকে। বাগানের দিকে দরজা দিয়ে সে ঘরে ঢোকে। এখন আবার তার মুখ আলাদা। গতকাল রাত্রের সে ভাব নেই। দেখলেই বোঝা যায়, সে স্নান করেছে। হেসে জিজ্ঞেস করে, 'ঘুম ভাইঙল বাবাজীর?'

দু হাত দিয়ে মুখ মুছে তাড়াতাড়ি উঠে বসি। বলি, 'হ্যাঁ। এরা সব কোথায়?'

সব বেইরে বাইরে রোদে বসেছে।'

আমার ভিতরে ভিতরে তাড়া। এবারে আমাকে ফিরতে হবে। বাইরে গিয়ে গোপীদাসকে ডাকি। সেও বেরোবার জন্যে প্রস্তুত। যোগোমতী ঘটিতে কুণ্ডের জল রেখেছিল। জল যেন তখনো গরম। তাড়াতাড়ি হাতে মুখে একটু জল দিয়ে নিই। ঝোলাটা কাঁধে নিতেই, যোগোমতী প্রায় ধমকে ওঠে, 'দেখ্য হে, ছুট লাগাল্‌ছে যে। বস্য ক্যানে, একটুক চা মুড়ি খাও।'

চা মুড়ি! চমৎকার! এই শীতের সকালে, এমন প্রাপ্তি তো আশাই করতে পারিনি এখানে। যোগো একটা কলাইয়ের বাটিতে মুড়ি দেয়। একটু পরে বাইরের দাওয়া থেকে এসে, এলুমিনিয়ামের গেলাসে গরম চা এগিয়ে দেয়। বলে, 'সবাইয়ের খাওয়া হয়ে যেইছে, তোমারটাই ছিল।'

জিজ্ঞেস করি, 'আপনারা উঠলেন কখন?'

'আবার?'

যোগোমতী চোখ পাকিয়ে ধমক দেয়। এবার আর স্মরণ করাবার দরকার হয় না। নিজেই তাড়াতাড়ি বলি, 'তোমরা উঠলে কখন।'

যোগোমতী খুশি হয়ে চোখের কোণে হাসে। ঘাড় নেড়ে খুশিটুকু জানিয়ে বলে, 'উঠাউঠির কী আছে? আমি আর কত্তা ত শুই নাই। অন্ধকার থাইকতে পাপহরতে যেইয়ে নেয়ে এসেছি দুজনে।'

গতকাল রাত্রের যোগোমতীকে আমার মনে পড়ে যায়। সেই স্থির দৃষ্টি, আবেশভরা মুখ, দুর্বোধ্য ষটচক্রের সেই বিচিত্র বর্ণনা। তখন যেন সে ছিল, কুললক্ষ্মী সাধিকা ভৈরবী। এখন যেন পরিহাসরসিকা ঘরের গৃহিণী, কাছে বসিয়ে খাওয়ায়।

হঠাৎ দপদপে রক্তিম চোখ পাকিয়ে বলে, 'কী দেখছ হে?'

বলি, 'তোমাকে। কাল রাতের সঙ্গে এখন আর মেলাতে পারি না।'

'ক্যানে?'

'কী জানি!'

হাত বাড়িয়ে প্রায় থাপ্পড় তুলে বলে, 'তোমার চোখদুটো গেলে দেব আমি। তোমার নজর খুব খারাপ।'

বলেই হেসে কাঁপে। আবার বলে, 'গোপীদাদাই তোমার ঠিক নাম রেখেছে, চিতে বাবাজী, চিতে বাঘ।'

সে কথায় কান না দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলি, 'তোমার সেই রূপ আমি ভুলব না। আমি কিছুই বুঝি না। কিন্তু তুমি যে এত জান—।'

যোগোমতী উঠে দাঁড়িয়ে আমার মুখে হাত চাপা দেয়। বলে, 'ছাই জানি। উসব কথা থাক। আবার কবে আইসবে বল।'

বলে সে আমার হাত ধরে। বলি, 'সময় সুযোগ পেলেই আবার আসব।'

আমি দরজার দিকে যাই। সে আমার

হাত ছাড়ে না। হাত ধরেই বাইরে আসে। সেখানে গোপীদাস আর ব্রহ্মানন্দ বসে কথা বলছে। আমাকে দেখে গোপীদাস উঠে দাঁড়ায়। চোখ ঘুরিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করে, 'কী গ যোগোদিদি, বাবাজীকে ছাইড়তে মন নাই ক্যানে?'

যোগোমতী ঘাড় নেড়ে বলে, 'না।'

সহজ কথা, সহজেই বলে। আমার দিকে চেয়ে হাসে। আমিও তার দিকে চেয়ে হাসি। শ্মশানবাসিনী ভৈরবীটিকে অনেক দিনের চেনা বলে মনে হয়। তারপর তো, আরো বিস্ময়ের অবধি থাকে না, যখন মনে পড়ে, কার্তিক ঘোষালের সঙ্গে সে এক পলাতকা তাঁতী বউ।

গোপীদাস চোখ বড় করে বলে, 'সব্বনাশ, শুইনছ গ বেহ্মালন্দদাদা।'

ব্রহ্মানন্দ উঠে এসে আমার আর একটা হাত ধরে। বলে, 'বিটাটোকে আমারই কি ছাইড়তো মন কইরছে হে।'

গায়ের কাছে জড়িয়ে নিয়ে বলে, 'আবার এস্য বাবা। বেঁচো থাইকলে দেখা হবে।' অবধূতের মোটা গলায় কেমন একটা করুণ সুর বাজে। গতকাল রাত্রের কথা মনে পড়ে যায়। এখন সামান্য এক ফালি কাপড় কোমরে জড়ানো। চুলের জটা মাথায় আঁট করে জড়ো করা। খালি গা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে রক্ত চন্দনের ফোঁটা।

বলি, 'আসব। চলি।'

গোপীদাসের সঙ্গে অবধূতে আশ্রম ছেড়ে বেরিয়ে যাই। ছড়ানো শিব মন্দিরের আড়ালে পড়ে যায় অবধূতাশ্রম, সেই সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ যোগোমতীও। চন্দ্রশায়রের পাশ দিয়ে পাকা রাস্তায় এসে পড়ি আমরা। সেখান থেকে দেখতে পাই, বক্রেশ্বর মহাশ্মশানে নতুন চিতা জ্বলছে। সত্যিই, এখানকার চিতা নেভে না!

গোপীদাসের ইচ্ছা, সে আমার সঙ্গে দুবরাজপুর পর্যন্ত যাবে। সঙ্গদান ছাড়া সেটা আর কিছু না। কিন্তু গোপীদাসের কষ্ট। এখান থেকে দুবরাজপুরে গিয়ে আবার তাকে রেলগাড়িতে উজান শিউড়ি ফিরতে হবে। তার চেয়ে সে বাসে চেপে, শিউড়িই ফিরে যাক। তার ফিরে যাবার ভাড়া হাতে দিয়ে, সেই কথাই বলি।

বক্রেশ্বর গ্রামের পাশে, আমার মোটর বাস আগে আসে। ওঠবার আগে মনে হয়, গোপীদাসের বড়া চোখ দুটি চিকচিক করে। বলে ওঠে, 'জয়দেবে যেন দেখা হয় বাবাজী।'

আমি ঘাড় নেড়ে গাড়িতে উঠি। এবার আমার যাত্রা আবার সাঁওতাল পরগণার নির্জন বাসে। সেখান থেকে শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায় গিয়েছিলাম। পৌষ সংক্রান্তির অপেক্ষা, তারপরে কেঁদুলি হয়ে দক্ষিণে ফেরা। (ক্রমশ)

চব্বিশ পরগণার মন্দির
রাজারামপুর-পাইকপাড়া

অসীম মুখোপাধ্যায়

আজও গণ্ডগ্রামে দরিদ্র কৃষকের জীর্ণ গৃহকোণে, আগাছার জঙ্গলে বাংলা দেশের চির অপরিচিত লোকশিল্পীদের প্রতিভার স্বাক্ষর জ্বলজ্বল করছে। সেদিন রাজারামপুর গ্রামে (বজবজ থানা, আলিপুর মহকুমা) ভগ্ন মন্দিরের গায়ে এমন এক অখ্যাত লোকশিল্পীর প্রতিভার স্বাক্ষর দেখে এলাম।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজারামপুরের রামলোচন হাজারী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির-গাত্রে কোন লিপি আজ আর নেই, খসে পড়ে গেছে। তাহলেও হাজারীদের বর্তমান বংশধরের কাছ থেকে জানা যায় যে, মন্দির প্রতিষ্ঠাতা রামলোচনের তিনি অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ এবং রামলোচন পর্যন্ত প্রত্যেক পুরুষের নাম তিনি বলতে পারেন। ত্রিশ বৎসরে এক পুরুষ হিসাবে ছয় পুরুষে হয় একশত আশী বৎসর। তাহলে আজ থেকে একশত আশী বৎসর আগে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে রামলোচন বর্তমান ছিলেন জানা যাচ্ছে এবং এই মন্দির যখন তাঁরই কীর্তি, তখন এটি নিশ্চয় ঐ সময়েই নির্মিত হয়েছিল। তা ছাড়া মন্দিরের গায়ে ঐ সময়ের পোড়ামাটি-অলংকরণের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির প্রায় সব কটিই উপস্থিত আছে।

আটচালা শৈলীর মন্দির, বিগ্রহ শিব, মন্দিরের গায়ে বিরাট আকারের কয়েকটি ফাটল দেখা দিয়েছে, আর সেই ফাটল বেয়ে বেড়ে উঠেছে নিম, বট ইত্যাদি গাছ। এই-ভাবে আর কয়েক বৎসর রাখলে মন্দিরের দক্ষিণ দিকে যে বারান্দাটি আছে, তা একেবারে ধসে যাবে এবং সেই সঙ্গে মন্দিরের গুরুত্বও যাবে নষ্ট হয়ে। কেননা, এই বারান্দার বাইরের দেওয়ালেই আছে পোড়ামাটির সুদৃশ্য অলংকরণ। মন্দিরের ভিতের মাপ—দৈর্ঘ্য চব্বিশ ফিট ছয় ইঞ্চি, প্রস্থ চব্বিশ ফিট, উচ্চতা দুই ফিট চার ইঞ্চি, ভিত সহ মন্দিরের উচ্চতা পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ ফিট। প্রবেশ পথ দক্ষিণ দিকে। প্রবেশপথের মাপ—উচ্চতা ছয় ফিট চার ইঞ্চি, প্রস্থ দুই ফিট সাত ইঞ্চি। দক্ষিণ দিকে মূল মন্দিরের গাত্রসংলগ্ন একটি বারান্দা আছে। এই বারান্দায় চারটি স্তম্ভের উপর তিনটি পত্রাকৃতি খিলান রয়েছে। কোন এক সময়ে যে বারান্দাটি মেরামত করা হয়েছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় খিলানের ভারবহনকারী স্তম্ভ দুটির দিকে তাকিয়ে। তবে মন্দিরের সৌন্দর্যরক্ষা সম্বন্ধে মালিক ও মিস্ত্রী উভয়েই সচেতন ছিলেন; কেননা, অলংকৃত টালিগুলি আজও অবিকৃতই আছে। গ্রামের অনেকেই আমাকে বলেছেন যে, মাত্র কয়েক বৎসর আগেও বারান্দার বাইরের দেওয়ালটি আরও বেশী অলংকৃত ছিল। আমি নিজেও দেখেছি দেওয়ালের দুই প্রান্তে ভিতের ঠিক উপরে অনেক খসে যাওয়া টালির দাগ আছে। চারটি স্তম্ভই যে অলংকৃত ছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। একেবারে বাঁ দিকে যে স্তম্ভটি আছে তার গায়ে এখনও পাশা-পাশি দুটি অলংকৃত টালি রয়েছে। মনে হয় প্রথমাবস্থায় বারান্দার বাইরের দেওয়ালটি আগাগোড়াই সুসজ্জিত ছিল। বর্তমানে খিলানগুলির শীর্ষ ও পার্শ্বদেশ ছাড়া আর কোথাও বিশেষ অলংকরণ নেই। কার্নিসের ঠিক নীচে যে সারিটি থাকে, তা উধাও হয়েছে। দ্বিতীয় সারির প্যানেলগুলিতে চার পাপড়ির ফুল সমন্বিত নক্‌শা উৎকীর্ণ। তৃতীয় সারির প্যানেল-গুলিতে পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছিল। তবে বিশদভাবে বোঝা কঠিন; কেননা, নোনা ধরে প্যানেলে আবদ্ধ টালিগুলি নষ্ট হয়ে গেছে।

কেন্দ্রীয় খিলানের শীর্ষে রামরাবণের যুদ্ধের বিস্তৃত দৃশ্য স্থান পেয়েছে। এক দিকে একটি রথে রাম, লক্ষ্মণ ও বিভীষণ, আর একটি রথে রাজা রাবণ ও জনৈক পার্শ্বচর। উভয় পক্ষই যুদ্ধরত। রাবণের দশ মাথার বদলে সাত মাথা দেখা যাচ্ছে, প্যানেলে স্থানাভাব হওয়ায় শিল্পীকে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। উভয় রথের চূড়ায় পাখি বসে আছে। চূড়া দুটির মাঝখানে স্বল্প-পরিসর স্থানে একটি ছোট টালি দেখা যাচ্ছে, তার গায়ে উৎকীর্ণ হয়েছে যুদ্ধরত কয়েকটি রাক্ষস ও বানর। খিলানের দুই পাশেও রাক্ষস ও বানর বিভিন্ন ভঙ্গীতে দেখা যাচ্ছে। একটি মিথুন দৃশ্যও রয়েছে। একেবারে নীচে স্থান পেয়েছে কতগুলি শিবমন্দিরের মোটিফ। মন্দিরের গর্ভগৃহে লিঙ্গ-বিগ্রহ এবং মস্তকভাগে পতাকা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। খিলানের দুই পাশে দুটি প্রস্ফুটিত পদ্ম রয়েছে, তবে এই ফুল দুটির মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য কম।

ডানদিকের খিলানগাত্রেও অনুরূপ-ভাবে রাম-রাবণের যুদ্ধ স্থান পেয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে বানর-ভক্ষণরত কুম্ভকর্ণ, ধাবমান রাক্ষস ও রাক্ষসী ইত্যাদি দৃশ্য

পাইকপাড়ার শিবমন্দিরের সম্মুখভাগ

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একটি পক্ষিরাজ ঘোড়াও রয়েছে। নীচের দিকে একপাশে একটি টালিতে তিনটি নারীমূর্তি উৎকীর্ণ, সম্ভবত এরা প্রসাধনরত রমণী।

বাঁদিকের খিলানগাত্রেও যুদ্ধরত বানর ও রাক্ষস রয়েছে। একটি দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে যে, দুইজন রাক্ষস একটি বানরকে গাছের ডালে বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে। অপর একটি দৃশ্যে বানর ও রাক্ষস মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছে। এ ছাড়া একটি কৃষ্ণলীলা মোটিফও রয়েছে একপাশে, পুতনা আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেছে এবং শিশুকৃষ্ণ তাকে বধ করতে যাচ্ছেন। খিলানের বাঁ পাশে নীচের দিকে একটি দৃশ্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। পাগড়ি মাথায় দুটি লোক বসে আছে এবং তাদের মাঝখানে রয়েছে একটি ক্ষুদ্র ত্রিভুজাকৃতি স্তূপ। দৃশ্যটির দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে। প্রথমটি, কেনাবেচার। দুটি লোকের একজন ক্রেতা ও অপরজন বিক্রেতা মাঝখানের স্তূপটি চাল বা ঐ জাতীয় খাদ্যশস্যকেই বোঝাচ্ছে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি মন্দির নির্মাণের কোন একটি পর্যায় সংক্রান্ত। মন্দিরগাত্র অলংকৃত করার জন্য যে পোড়ামাটির টালিগুলি ব্যবহার করা হত সেগুলি তৈরি করতে বিশেষ সতর্কতা ও যত্নের প্রয়োজন ছিল। প্রথমে সংগৃহীত মাটি গুঁড়ো করে ও চেলে নেওয়া হত, যাতে কোন কাঁকর বা শক্ত কিছু ঐ মাটিতে না থাকে। আমার মনে হয়, টালিটিতে এই মাটি চালার দৃশ্যই স্থান পেয়েছে। অবশ্য আমার অনুমান ঠিক নাও হতে পারে। তবে সম্ভবত মেদিনীপুর জেলার কোন একটি মন্দিরে এই রকম একটি দৃশ্য স্থান পেয়েছে বলে জানা গেছে। বাঁদিকের এই খিলানটির শীর্ষে এমন একটি দৃশ্য আছে যা বিষয়বস্তু হিসাবে নিঃসন্দেহে অভিনবত্বের দাবি রাখে, প্রসবরতা একটি নারীকে সাহায্য করছে তার ধাত্রী।

বয়স্কা গ্রামবাসী কয়েকজন আমাকে বলেছিলেন যে, দেওয়ালের বামপ্রান্তে কিছুদিন আগেও অনেক মিথুন দৃশ্য উৎকীর্ণ ছিল। এখন সে জায়গায় কেবল গাঁথনির ইঁট ছাড়া আর কিছুই নেই। গ্রামের সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ যিনি, তাঁর বয়স বর্তমানে এক শত বৎসরেরও বেশী। তিনিও এই মন্দিরগাত্রে নানা ধরনের মিথুন দৃশ্য ছিল বলে আমাকে জানিয়েছেন।

রাজারামপুরের মন্দিরের টালিগুলিতে সমকালীন অলংকরণ রীতির বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে একথা আগেই বলেছিলাম। যদিও দেওয়ালের অন্যান্য জায়গার টালি খসে পড়েছে, তাহলেও খিলানগুলি এখনও যথেষ্ট অলংকৃত রয়েছে। এবং এই খিলান-গুলির অলংকরণের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিল্পীর কাজের সমালোচনা করা যেতে পারে। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মন্দির-শিল্পের মান উন্নতই ছিল। এর পর যতই দিন যেতে লাগল ততই এই অবনতির লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো মন্দিরের গড়নে, অঙ্গসজ্জায় এক কথায় সব কিছুতেই রাজারামপুরের মন্দিরে এই অবনতির লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অধিকাংশ মূর্তিই গড়নে বেবড়ানো বা গোল, গায়ে নরুন চালানোর দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, অর্থাৎ কাজ সুসম্পন্ন হয়নি। অধিকাংশ দৃশ্যেই নরনারী, পশু, পাখির মুখ ভাবলেশহীন, তাদের চলাফেরায় কোন গতি নেই। সব কটি দৃশ্যেই যেন ছন্দ রুদ্ধ হয়েছে। রাম রাবণ তীর ছুঁড়ছেন, রাক্ষসরাক্ষসীরা ছুটে আসছে, বানরেরা গাছ পাথর নিক্ষেপ করছে—এই ধরনের দৃশ্য-গুলির মধ্যে কেমন একটা আড়ষ্টতা জড়িয়ে আছে। বাঁদিকের খিলান শীর্ষে একটি টালিতে একটি নারীর সন্তান প্রসবের দৃশ্য উৎকীর্ণ আছে একথা আগেই বলেছি। এহেন দৃশ্যের মধ্যে যা আশা করা উচিত এ ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। প্রসবরতা রমণী বা তার ধাত্রী কারো মুখেই ভয়, বেদনা, সতর্কতা, কোন ভাবই ফুটে ওঠেনি। বিষয়বস্তু হিসেবে দৃশ্যটির মধ্যে অভিনবত্ব থাকলেও সৌন্দর্য বলে কিছু নেই।

প্রধান খিলানের দু' পাশ থেকে দুটি সারি লম্বালম্বিভাবে ওপর দিকে উঠে গেছে এবং এর ফলে প্রধান খিলানের দৃশ্যগুলি অপর দুটি খিলানের দৃশ্যগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই সারি দুটি যদি না থাকত তাহলে দেওয়ালের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত রামরাবণের যুদ্ধের একটা একটানা বিরাট দৃশ্য আমরা দেখতে পেতাম।

নানা ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও যে কারণে এ মন্দিরের অঙ্গসজ্জা ভাল লাগবে তা হচ্ছে শিল্পীর বাস্তবমুখিনতা। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে তিনি রূপ দিতে চেয়েছেন পোড়ামাটিতে। যেমন —(১) হাস্যালাপরত দুই বৃদ্ধ, মাঝখানে আগুন জ্বলছে। বোঝা যাচ্ছে শীতকালীন

একটি দৃশ্যের অবতারণা করেছেন শিল্পী। কেন্দ্রীয় খিলানের ডানপাশে এই দৃশ্য রয়েছে। (২) প্রসাধনরতা রমণী (৩) ক্রেতা ও বিক্রেতা বা দুই মন্দির-শিল্পী (৪) প্রসাধনরতা রমণীবৃন্দ, ইত্যাদি।

রাজারামপুর থেকে কয়েক মাইল দূরে পাইকপাড়া নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামের চারটি শিব মন্দিরের মধ্যে যেটি সব চাইতে পুরোনো ও আকারে বড় তার গায়ে এক কালে পোড়ামাটির অতি সুন্দর অলংকরণ ছিল, রাজারামপুরের মন্দিরের মত এই মন্দিরটিও আটচালা, বিগ্রহ শিব, প্রবেশ পথ দক্ষিণ দিকে এবং এই দিকে, মন্দিরের বারান্দার বাইরের দেওয়ালটি যে এক সময়ে ভিতের ওপর থেকে শুরু করে কার্নিশের তল পর্যন্ত আগাগোড়া অলংকৃত তা বুঝতে কোন অসুবিধাই হয় না। খসে যাওয়া টালির অজস্র দাগ দেওয়ালের গায়ে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। কার্নিশের ঠিক নীচেই স্ক্রোল ওয়ার্কের সুন্দর নিদর্শন এখনও পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া ফুল এবং লতার যে নক্সাগুলি আছে সেগুলিও বিশেষ যত্ন ও দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মন্দিরগাত্রে লিপিটি আজও আছে এবং তা পাঠযোগ্য, নীচে তুলে দিলুম।

"শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৭৬ তারিখ ২৯শে
অগ্রহায়ণ
কীর্ত্তি শ্রীকেদার দাস শিল্পীবর
শ্রীবুলচন্দ্র পাল"

অর্থাৎ ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যদি টিকে থাকত তা হোলে এই মন্দিরটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগানার অন্যতম দ্রষ্টব্য মন্দির বলে পরিচিত হোত।

আর একটি কথা, হালিশহরে বৈদ্যপাড়ায় গঙ্গার ধারে যে দুটি পঞ্চরত্ন মন্দির আছে (এখন অবশ্য কোনটিরই মূল শিখর ছাড়া পার্শ্ববর্তী শিখরগুলি নেই এবং একটি মন্দির বটগাছের নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে একেবারেই জরাজীর্ণ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে) তাদের ও পাইকপাড়ার এই মন্দিরটির অলংকরণের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। হালিশহরের ঐ দুটি মন্দিরের কার্নিশের ঠিক নীচের তিনটি সারিতে যে নকশাগুলি দেখেছি এই মন্দিরেও ঠিক সেই নকশাগুলি অনুরূপভাবে তিনটি পৃথক সারিতে সাজানো আছে। এ ছাড়া উভয় স্থানের মন্দির গাত্রে একই ধরনের "স্ক্রোল ওয়ার্ক" দেখা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, প্রধান টালিগুলির অলংকরণেও যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। হালিশহরের মন্দিরগুলি ১৭৪৫ সালের কিছু আগে বা পরে তৈরী হয়েছিল। আর পাইকপাড়ার শিবমন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭৫৪ সালে, মাত্র দশ বৎসর পরে। সুতরাং এই মন্দিরগুলি একই গিল্ডের তৈরী কি না তা নিয়ে ভাবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। হালিশহরের মন্দিরগুলি আকারে পঞ্চরত্ন আর এই মন্দিরটি আটচালা আকৃতিগত এই বৈসাদৃশ্য দেখে কেউ হয়ত বলতে পারেন যে একই গিল্ডের তৈরী মন্দিরের আকৃতি ভিন্ন হবে কেন? তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে মন্দিরের আকৃতি কেমন হবে না হবে তা প্রতিষ্ঠাতার রুচি ও ইচ্ছার ওপর অনেকটা নির্ভর করত তবে আরও বেশী প্রমাণ পাওয়া না গেলে এ কথা জোর দিয়ে বলা উচিত হবে না যে এই মন্দিরগুলি একই গিল্ডের তৈরী। কিন্তু এমন হতে পারে যে, পাইকপাড়ার মন্দির শিল্পী বুলচন্দ্র পাল হালিশহরের মন্দিরের অলংকরণ রীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

রাজারামপুরের মন্দিরের খিলান-শীর্ষে রামরাবণের যুদ্ধ

শেয়ালদা স্টেশন থেকে ট্রেনে চেপে বজবজে নামতে হবে। বজবজ থেকে পূর্ব দিকে বাস-রাস্তার পাশে পাইকপাড়া গ্রাম। বজবজ থেকে পশ্চিমে আছিপুরের পথে বাস-রাস্তার পাশে রাজারামপুর গ্রাম।

ট্রামে বাসে

রবার্ট কেনেডি আততায়ীর গুলিতে নিহত হইয়াছেন। বিশুখুড়ো সখেদে মন্তব্য করিলেন — "গণ-চক্কানিনাদিত তান্ত্রিক'-পুজোয় আর একটি নরবলি।"

একটি সংবাদ-শিরোনামা : পঃ বঙ্গে ক্রান্তি দল বাতিল, অজয়বাবুর মতে ফ্রন্ট ত্যাগ অসম্ভব। শ্যামলাল আমাদিগকে বহু দিন বিস্মৃত একটি যাত্রা গানের চরণ সুরে করিয়াই শুনাইল—"ধরেছি যখন বেঁধেছি তখন আর কি ছাড়িতে পারি/ আমার মনটি করিলে চুরি, আমার প্রাণটি করিলে চুরি!!"

যুক্ত ফ্রন্টে আসন লইয়া বিরোধ অনেক কমিয়া আসিয়াছে—অন্য এক সংবাদ। —"কে কাকে আসন ছাড়লেন এবং কে শুধু রড ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন এ প্রশ্ন ট্রামে-বাসের যাত্রীদের পক্ষে করা স্বাভাবিক"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহু দলের আবির্ভাব প্রসঙ্গে আমাদের অন্য এক সহযাত্রী পৌরাণিক গল্প শুনাইলেন : দল সম্পর্কে শলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি বামদেবকে বিনাশ করিতে এক বিষাক্ত বাণ ক্ষেপণ করিলে তাঁহার পাশে ঐ বাণে তাঁহার পুত্র শোনজিৎ নষ্ট হয়। গল্প শেষ করিয়া সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"পৌরাণিক যুগের গল্পের দল-এর সঙ্গে আমাদের বর্তমান যুগের দলাদলির অনেকটা আদল আছে দেখে আমরা শুধু বলতে পারি সাধু, সাবধান!!"

বাংলা কংগ্রেসের আবার নব জনম লাভ। —"অবশ্য এর জন্য সিজারিয়ান অপারেশনের প্রয়োজন হয়নি!!"—মন্তব্য শ্যামলালের।

জীবনবীমা কর্পোরেশন প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সম্পাদক মন্তব্য করিয়াছেন—জীবনবীমা কর্পোরেশন হইয়া উঠিয়াছে রাজনৈতিক সঙ্গতের বাঁয়া।— "সম্পাদক মশাই হয়ত বলতে চেয়েছিলেন ঢাকের বাঁয়া"—বলেন খুড়ো।

"**নদী**" সম্পর্কিত প্রবন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য : ভারতের এবং বাংলার পক্ষে বাহিরের কাহারও রাজনৈতিক মতলবের দাবি প্রসন্ন করিবার জন্য গঙ্গাকে ক্ষীণতোয়া করিবার প্রস্তাবে সম্মত হওয়া সম্ভব নহে। —"অন্য প্রদেশের কথা জানিনে, বাংলার পক্ষে ত নয়-ই; গাঙ্গেয় ইলিশের তিরোভাব সেকথা বাঙ্গালীকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেবে"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সাম্প্রতিক অস্ট্রেলিয়া সফরে যে-সব কেনাকাটা করিয়াছেন তার মধ্যে শুনিলাম আছে একজোড়া কেঙ্গারুর চামড়ার জুতো। শ্যামলাল বলিল—"অস্ট্রেলিয়া ভারত থেকে গণ্ডারের চামড়ার কোন সামগ্রী ক্রয়ে উৎসুক কিনা তা অবশ্য এখনো জানা যায় নি।"

একটি সংবাদে শুনিলাম, সারা দেশে মাদক বর্জনের নিমিত্ত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ১০৬জন সদস্য কমিটির এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের জন্য ওয়ার্কিং কমিটিকে অনুরোধ করিয়াছেন। জনৈক সহযাত্রী সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন—"থেকে থেকে হেঁকে ওঠে হিং টিং ছট॥"

জনসঙ্ঘের সভাপতি শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী নাকি বলিয়াছেন যে, মন্ত্রীর দরকার নাই, তাহার বদলে কম্পিউটার বসাইয়া দিলেই কাজ চলিবে। শ্যামলাল বলিল—"সারা দেশব্যাপী আর একটি 'চলবে না' 'চলবে না' শোভাযাত্রা সমাসন্ন হয়ে এল।"

একটি সংবাদ : ভারতের বন্দরে সোভিয়েত জাহাজকে ভারত নোঙর করিতে দিয়াছে যাহাতে সে তার জাহাজ-গুলির মেরামতি কাজ শেষ করিতে পারে। এই লইয়া চীনের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। পিকিং বেতার হইতে বলা হইয়াছে, ভারত ও সোভিয়েতের মধ্যে এই যে সহযোগিতা গড়িয়া উঠিয়াছে ইহার আসল লক্ষ্য চীনকে কাবু করা। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কিন্তু ভয় কি? শুনেছি মস্তিষ্ক বিকৃতিতে মাও-মাদুলি অব্যর্থ মহৌষধ।"

পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি ভবঘুরে শিবিরে এবং আসরক্ষাবাদের পূর্বতন উদ্বাস্তু শিবিরে যে-সব উদ্বাস্তু পরিবার আছে তাহাদের পুনর্বাসনের জন্য ভারত সরকার চল্লিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার টাকা ঋণ এবং সাতাশি হাজার টাকা অনুদান হিসাবে মঞ্জুর করিয়াছেন। এই ঋণ এবং অনুদানের পরিমাণকে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মূষিকাঞ্জলি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সহযাত্রী বলিলেন : "আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে যেখানে জল গলে না সেখানে এ-ই যথেষ্ট। তবে মূষিকাঞ্জলিতে মার্জার ভোগের বরাদ্দ না থাকলে উদ্বাস্তুরা দু' হাত তুলে আশীর্বাদ করবে!!"

জঞ্জাল অপসারণের ভাড়া-লরি লইয়া কলিকাতা কর্পোরেশনে যে-সব অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে তাহাতে নাজেহাল হইতেছেন বেচারা নাগরিকরাই।—"কিন্তু পৌর সভাকে ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল বলার মর্জি (না) কারো নেই" বলেন সহযাত্রী।

এই মরসুম হইতে কলিকাতার মাঠে নূতন আইনে লীগ খেলা হইবে। —"অবশ্য বড় বড় খেলায় টিকিট সংগ্রহের ব্যাপারে পুরনো আইন-ই বলবৎ থাকবে"—বলেন বিশুখুড়ো।

কবির সঙ্গে ইয়োরোপে ১৯২৬

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

॥ ১৭ ॥

স্টকহলম খুব ভাল লেগেছে। শহরটা যে কী সুন্দর দেখতে কী বলব! লোকেদের কাছে শুনলাম, স্টকহলমকে নাকি নর্দার্ন ভেনিস বলে য়ুরোপে। ভেনিস দেখিনি, কাজেই তার সৌন্দর্যের কথা জানিনে। তবে স্টকহলম যে সত্যিই সুন্দর সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। চারিদিকে হ্রদ, তার উপর দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। সন্ধ্যাবেলা সেই রাস্তার দুধারের আলো এবং বাড়ি-গুলোর আলোর ছায়া জলের উপরে পড়ে যখন ঝলমল করতে থাকে, মনে হয় যেন কোনো মায়ালোকে এসেছি। প্রতিদিনই যেন সেখানে কোনো উৎসব চলেছে।

আমাদের হোটেলটার নাম ছিল Grand Hotel & Grand Hotel Royal! সামনে বরাবর একটা লেক। তার উপরে সাঁকো দিয়ে ওপারের রাস্তার সঙ্গে জোড়া। আর সাঁকোর ওপিঠেই রাজার প্রকাণ্ড প্রাসাদ আলোতে রঙেতে একেবারে ঝলমল করছে। হাউস অব লর্ডস, বড় বড় সব মিউজিয়াম, টাউন হল, পার্লামেন্ট বিল্ডিং প্রভৃতি যা কিছু জরুরী বাড়িটাড়ি, সবই ওই কাছাকাছি। শহরের আশেপাশের স্বাভাবিক দৃশ্যও খুব চমৎকার। সমস্ত লেকগুলোর মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপের মধ্যে সুন্দর সুন্দর বাড়ি ঘর। সব জড়িয়ে যেন একটা ছবি।

শহরের অনেক গুণীমানী লোকের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় হল। যেদিন পৌঁছলাম, সেইদিনই দুপুরে কবির বন্ধু ডঃ সোয়েন হেডিন-এর বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল। এঁর নাম তো জানেনই। য়ুরোপের একজন বিখ্যাত লোক, সারা পৃথিবীর মধ্যে নাম করা এক্সপ্লোরার। তিনবার ভারতবর্ষে গিয়েছেন ডাঙা পথে সাইবেরিয়ার ভিতর দিয়ে। তিব্বতে অনেকদিন ছিলেন। মানস সরোবর, কৈলাস সব দেখে এসেছেন। এশিয়াটা সমস্তই ঘুরেছেন—মরু প্রান্তর পাহাড় পর্বত, কোনো কিছুরই বাধা গ্রাহ্য না করে। জীবন তুচ্ছ করে এই ঘোরা। তা না হলে এত বড় এক্সপ্লোরার হবেন কী করে? সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, সুইডিশ অ্যাকাডেমির সভ্য এবং অনেক বই-এর রচয়িতা এই সোয়েন হেডিন।

আমার বাবার আলমারী থেকে নিয়ে এঁর বেড়ানোর কাহিনী যখন মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম, তখন কি একবারও স্বপ্নেও ভেবেছি যে, এই অসাধারণ মানুষটিকে কোনো দিন চোখে দেখতে পাব? ভদ্রলোকের বয়স এখন ৬১ বছর হলেও একেবারে যুবা-পুরুষের মত দেখতে। সেই রকমই আঁটসাঁট সুঠাম শরীর, খুব হাসিখুশি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির চেহারা। মুখ দেখেই বোঝা যায় একজন অনন্য সাধারণ মানুষ। অমায়িক ব্যবহারেও সেই রকম মনেরই পরিচয় দেয়।

সোয়েন হেডিন বিয়ে করেননি। পাঁচটি বোনের মধ্যে মাত্র একটি বোনের বিয়ে হয়েছে। বাকী সবাই অবিবাহিত। এই চারটি বোনকে নিয়ে ভাই একই বাড়িতে থাকেন। প্রত্যেকেই যে যার কাজকর্ম নিয়ে মগ্ন হয়ে রয়েছেন। শুনলাম, ভাইবোনদের অসম্ভব টান পরস্পরের প্রতি। স্টকহলম-এ গেলে সোয়েন হেডিনের সঙ্গে দেখা না করে প্রায় কেউ আসে না।

তিনি তাঁর বাড়িতে কবিকে সাক্ষাৎ করবার জন্য ওখনকার কয়েকজন বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গেও নেমন্তন্ন করেছিলেন। এঁরা সকলেই সুইডিশ অ্যাকাডেমির সভ্য। পের হ্যাল স্ট্রম (Per Halle Strom), যাঁর কথা কালিদাস নাগ শ্রাবণের প্রবাসীতে "এলেন কেই"-র প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখ করেছেন, তিনিও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গেও আলাপ হল। এঁরই অফিসিয়াল রিপোর্ট-এর উপর নির্ভর করে কবিকে নোবেল প্রাইজ দেবার সিদ্ধান্ত স্থির হয়েছিল।

আর যিনি ইংরিজী গীতাঞ্জলিকে সুইডিশ ভাষায় তর্জমা করেছিলেন, সেই মাদাম ব্যাটেনশন, তাঁর সঙ্গেও এবারে [illegible] খুব আলাপ হয়েছে। ইনি একজন নামকরা বিদুষী। এদেশের সাহিত্যিক মহলে সকলের কাছেই তাঁর খুব প্রতিষ্ঠা, কারণ ইনি যে আবার কবিও বটে। কালিদাস বাবু তাঁর প্রবন্ধে এঁর কথাও উল্লেখ করেছেন। মাদাম ব্যাটেনশনও আমাদের একদিন নেমন্তন্ন করেছিলেন ও অনেক দিন নানা জায়গায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছেন। বারে বারেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। অসমার

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির সুইডিশ তর্জমা-কারী ম্যাডাম ব্যাটেনশন, সুইডিশ মহিলা ও খ্যাতনামা কবি

দিন স্টেশনেও এসেছিলেন কবিকে বিদায় দিতে এবং পথে খাবার জন্য এক বাক্স চকোলেট আমাকে দিয়ে গেলেন। কবির চিরকালের স্বভাব বিদেশীদের স্বদেশী নামকরণ করা; যেমন স্টেন কোনোর নামকরণ করেছিলেন শৈল কন্ঠ; তেমনি মাদাম ব্যাটেনশনকে রূপান্তরিত করলেন শ্রীমতী ভূতনাশিনী নামে। আমরা তো হেসে বাঁচি না। তিনি অবশ্য নামের কথাটা জানতে পারেন নি। এই দেখুন আমার মজা স্টকহলম-এর গল্প করতে করতে আবার অসলোতে গিয়ে পড়লাম, যাক্ গে, এই বার যা বলছিলাম তাই বলি।

সেদিন লাঞ্চের পরে মোটরে ক'রে ডঃ সোয়েন হেডিন রাজার সামার প্যালেস এবং শহরটা আমাদের সব দেখিয়ে নিয়ে বেড়ালেন, খুব উপভোগ করেছিলাম।

এর পরের দিন আবার কবির সুইডিশ পারিশারের বাড়ি লাঞ্চ। প্রকাণ্ড ভোজের আয়োজন। খুব ঘটা করেই কবির সংবর্ধনা উৎসব তিনি করলেন। এই দিনে বহুলোকের সমাগম হয়। তার মধ্যে এখানকার রাজার সবচেয়ে ছোট ছেলে প্রিন্স উইলহেলম-ও উপস্থিত ছিলেন। শুনলাম, ইনি নিজে নাকি এখানকার একজন খুব ভাল কবি। টেবিলে আমার পাশেই জায়গা পড়েছিল, কাজেই অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল। ভারতবর্ষে একবার গিয়েছিলেন, খুব ঔৎসুক্য আছে সব বিষয়ে, ভারী মজার মানুষটি। দেখতে অত্যন্ত পচা ও অসম্ভব লম্বা, হয়ত সাত ফুটের কাছাকাছি হবে।

আর একজন ছিলেন Sweedish Minister for Egypt—ইনি আমার আর এক পাশে বসেছিলেন। ভারতবর্ষের অনেক কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন, বিশ্বভারতী সম্বন্ধেও অনেক খোঁজ খবর নিলেন। বেশ ভাল মানুষ গোছের লোক। যাবার সময় আপনার ছেলেকে নিজের কার্ডে ঠিকানা লিখে দিয়ে বললেন : যদি দেশে ফেরবার পথে ইজিপ্ট হয়ে যাও তবে আমাকে একটু খবর দিও। যদি তোমাদের কোনো সাহায্য করতে পারি তা হলে খুশী হব।

তৃতীয় দিন অর্থাৎ আমরা যে রাত্রে চলে এলাম সেইদিন সকালে আমাকে আর ও'কে ডঃ সোয়েন হেডিন-এর একমাত্র ভাগনী,—এই বোনই খালি বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁরই একমাত্র সন্তান এই মেয়েটি—মিসেস ভেটারলিশু তাঁর বাড়িতে লাঞ্চে নেমন্তন্ন করেছিলেন। ডঃ হেডিন-এর এক বোন এসে মোটরে ক'রে আমাদের নিয়ে গেলেন। তাঁরা থাকেন শহরের বাইরে একটু দূরে। আমাদের অত্যন্ত আদর যত্ন করে খাইয়েছেন, অতদূরে যেতে পাছে কবি শ্রান্ত হয়ে পড়েন সেইজন্য তাঁকে আর ডাকেন নি। বললেন : আসল সুইডিশ পরিবার ও তাদের বাড়িঘর দোর কী রকম হয় দেখবার জন্য তোমাদের ডেকেছি। শহরের মধ্যে হোটেলে থেকে দেশটার সত্যিকারের চেহারা দেখা যায় না।

খুব চমৎকার লাগল তাঁদের বাড়ি গিয়ে। ছোট্ট আড়াই বছরের একটি মেয়ে ডল পুতুলের মত, সারাক্ষণ পট পট ক'রে কথা বলে, দেখে আপনার নাতির কথা মনে হচ্ছিল। মেয়েটির বুদ্ধি অসম্ভব আর তেমনি শয়তানি। বাবা মা আমাদের সোনালী রাংতা দিয়ে মোড়া মোহর চকোলেট খেতে দিয়েছেন, মেয়েটিও পেয়েছে। বেশী খেলে অসুখ করবে বলে তাকে মোটে একটা দেওয়া হয়েছে। তার মিষ্টিটা যখন ফুরিয়েছে তখনও আমরা খাচ্ছি, কাজেই বেজায় ইচ্ছে আর একটা খায়, কিন্তু মার তাতে মোটে উৎসাহ নেই। বেচারার লোভে চোখ দুটো চকচক করছে দেখে আপনার ছেলে হাতে একটা মিষ্টি মোহর নিয়ে যেই তার সামনে মেলে ধরেছেন, বাবা মা বারণ করবার আগেই একেবারে চিলের মত ছোঁ মেরে চকোলেটটা তুলে নিয়েই তাড়াতাড়ি "টাক" (সুইডিশ ভাষায় ধন্যবাদ) বলেই মুখে পুরে দিয়ে মার দিকে তাকিয়ে সে যে কী দুষ্টু হাসি, সে কী বলব! যেন যুদ্ধ জয় করেছে এমনি গর্বিত ভাব মুখের। তার রকম দেখে আমরা সবাই হো হো ক'রে হেসে উঠলাম। মায়ের আর রাগ করবার উপায় রইল না। "আনমারী" মেয়েটির নাম,—ওকে বোধ হয় আমরা কখনও ভুলব না।

আমাদের খাওয়ার পর মিস্টার ও মিসেস ভেটারলিশ্‌ তাঁদের মোটরে করে আবার শহরে ফিরিয়ে এনে আর্ট গ্যালারী, মিউজিয়াম ইত্যাদি সব দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো দেখিয়ে নিয়ে বেড়ালেন। ডঃ সোয়েন হেডিন বিকেলে তাঁর এক বোন ও এঁদের আমাদের হোটেলে চা খেতে বলেছিলেন। সবাই মিলে সে সময়টা বেশ জমেছিল। রাত্রে সোয়েন হেডিন স্টেশনে এসে গাড়িতে তুলে দিয়ে তারপরে নিশ্চিন্ত।

স্টেশনে আবার এক কাণ্ড। আমাদের ঘড়ি বোধ হয় একটু ভুল ছিল। পৌঁছে দেখা গেল গাড়ি ছাড়বার প্রায় সময় হয়ে গিয়েছে। এদিকে অনেকখানি প্ল্যাটফরম হেঁটে পার হয়ে তারপরে ওদিকে যেতে হবে। কবি তো এমনিতেই গাড়ি ধরবার সময়, পাছে দেরী হয়ে যায় বলে, ধড়ফড় করেন। সেদিন তো কথাই নেই। জোরে জোরে অতটা হাঁটতে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়লেন। আমার হাতে এক বোঝা চকোলেটের বাক্স আর প্রকাণ্ড এক ফলের বাস্কেট। যেখান থেকেই যাই, এই বোঝাগুলো ঘাড়ে চাপে।

সোয়েন হেডিন এক হাতে আমাকে ধরেছেন, অন্যহাতে কবিকে। আর হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলছেন : ব্যস্ত হয়ো না, তোমাদের না নিয়ে গাড়ি ছাড়বে না।

কবি কি সে কথা শোনেন? হাঁপাচ্ছেন আর জোরে জোরে চলেছেন। আমাদের রিজার্ভ গাড়ির কাছাকাছি আসবার আগেই দেখি আপনার ছেলে হন হন করে সামনে এগিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ব্যাপার কি না বুঝে আমিও দৌড়লাম সেই দিকে ওঁকে ডাকতে। উনি ইতিমধ্যে সামনের ট্রেনখানার ভিতরে চড়ে করিডর দিয়ে হেঁটে আমাদের ট্রেনের কাছে ফিরে এসেছেন, কাজেই আমি আর ওঁকে খুঁজে পাই না। এদিকে কবি আমার নাম ধরে পিছন থেকে চেঁচিয়ে 'রানী, রানী' ডাকছেন। শুনে পিছনে ফিরে দেখি আমাদের যুবা বৃদ্ধটি দৌড়তে দৌড়তে আমার দিকে আসছেন আর হাত নেড়ে আমাকে ডাকছেন। সেই প্রকাণ্ড ফলের বাস্কেট হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়নো কি সোজা? যাই হোক ফিরলাম গাড়ির কাছে কোনোমতে। সোয়েন হেডিন প্রায় আমাকে কোলে করেই চড়িয়ে দিলেন কামরার ভিতর।

কণ্ডাক্টর এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল: এবারে গাড়ি ছাড়তে পারি?

তিনি হ্যাঁ বলতেই গাড়িতে হুইসিল দিল। সোয়েন হেডিন কবিকে চেঁচিয়ে বললেন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া আর কারো জন্যে স্টকহলম স্টেশন থেকে ট্রান্স-কন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেস বারো মিনিট দেরিতে ছাড়ত না। আজ যা হল, একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার।

সুইডেন থেকে কোপেন হেগেন স্টেশনে উপনীত ১৯২৬

যতক্ষণ পাবা যায় গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে এলেন। তারপর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আর দেখতে পেলাম না। গুছিয়ে যখন বসেছি সকলে তখন কবির যেমনি হাসি, তেমনি হাসতে হাসতে বকুনি, ছুটে এগিয়ে গিয়েছিলাম বলে : স্বামীকে চলে যেতে দেখে বিরহিণী প্ল্যাটফরমের বাইরে যেদিকে দু চোখ যায় চলে যাবেন বলে, নিরুদ্দেশ যাত্রা করলেন। আমি বলি কীরকমনাকে বুঝি এদেশে ফেলেই যেতে হবে। সোয়েন হেডিন সারা পৃথিবী ঘুরে এসেছেন, কিন্তু এমন কাণ্ড আগে আর দেখেন নি। ট্রান্স-কন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেস দাঁড় করিয়ে রেখেছে আমাদের জন্যে, বঙ্গললনার সেদিকে খেয়াল নেই। "উনি কোথায় গেলেন" বলে তিনিও সেইদিকে দৌড়লেন। প্রশান্ত, তোমার এই ঘরের লোকটিকে নিয়ে আর পারলুম না। ভাগ্যি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামটুকু সম্বল ছিল: তা না হলে ওঁকে এই সুইডেনেই বিসর্জন দিয়ে যেতে হত। যে রকম উন্মাদিনীর মত দৌড়ে গেলেন, তাতে রেলের নীচেই কাটা পড়তেন কি কী হত কে জানে।

আমি যদিও তখন খুবই হাসছি, কিন্তু বুকের মধ্যে তখনও ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করছে উত্তেজনার চোটে। ওঁকে রাগ ক'রে বললাম : তুমি কেন ও রকম হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলে?

বললেন : মিঃ লাল আমাদের আগে জিনিসপত্র নিয়ে স্টেশনে এসে ভুল করে অন্য গাড়িতে আমাদের মাল চড়িয়েছিলেন। শেষ মুহূর্তে সেটা আবিষ্কার করলাম। কাজেই তখন দৌড়ে গিয়ে জিনিসগুলো উদ্ধার না করলে কী হত? তুমি তাই বলে আমার পিছন পিছন দৌড়লে কেন?

যাক, এটা একটা মনে রাখবার মত ঘটনা হয়ে রইল। এখন ছুটির সময়। তাই শহরে বেশী লোকজন নেই। কবি এ সময় ওখানে বক্তৃতা দেবেন না ঠিক করেই গিয়েছিলেন। তাই মোটে দুদিনের থাকারই ব্যবস্থা হয়েছিল। কেবলমাত্র সোয়েন হেডিন-এর সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্যই কবির যাওয়া, তাছাড়া আমাদের স্টকহলমটা দেখা হবে, মনের মধ্যে সে ইচ্ছেটাও ছিল তাঁর।

ওখানকার লোকেরা খুব দুঃখিত হয়েছে, বক্তৃতা কিংবা পড়া কিছুই হল না বলে।

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৬

কাল আর চিঠি শেষ করতে পারিনি। আজও বেশী লেখা হবে না। কারণ, এখনই এক জায়গায় ডিনারের নেমন্তন্ন। সেখান থেকে কবি রাত সাড়ে আটটায় বক্তৃতা দিতে যাবেন। তারপর ফিরতে অনেক রাত হবে।

চিঠি তো যথেষ্টই বড় হয়েছে, কাজেই এবারে বোধ হয় শেষ করতে পারি। যদিও এখনও ইচ্ছে করলে আরো কিছু যে লিখতে পারি না তা নয়। তবে, তা হলে আর চিঠি শেষ হবে না। শুধু একটা গল্প না বলে পারছি না।

কবি এবারে অসলোতে সেদিন কনভোকেশনে যাবার আগে জোর করে আমাকে তাঁর একটা ব্রাউন রঙের টুপী পরিয়ে নিয়ে গেলেন। শাড়ির সঙ্গে টুপী পরতে আপত্তি করেছিলাম বলে কী ধমক: তোমরা এমন কনভেনশনাল যে কিছুতেই বুঝতে পার না, কোনটাতে ভাল দেখায়, না দেখায়। সেই জন্যেই আলিপুরে প্রশান্ত যখন আমার মত জোব্বা করাতে চেয়েছিল, তুমি আপত্তি করেছিলে। অথচ আমি জানতুম, ও লম্বা মানুষ, ওকে ও-পোশাকে খুব ভালই মানাবে। ও বৈজ্ঞানিক, কাজেই ওর মনে সাহস আছে নতুন জিনিস পরীক্ষা করবার। তোমাকে আমি বলছি, টুপী পরলে অনেকখানি লম্বা দেখাবে, কাজেই দেখতে ঢের ভাল হবে। এদেশের লোকরা তো কেউ জানে না যে, আমাদের শাড়ির সঙ্গে মেয়েরা মাথায় কিছু পরে কি না। তা ছাড়া জানলেই বা কী? নিজের স্টাইল নিজে তৈরি করতে হয়।

আপনার ছেলেরও এতে খুব উৎসাহ। কাজেই দুজনের চাপে পড়ে সেদিন সঙ্ সেজে টুপী মাথায় দিতে হয়েছিল। কবি আবার আমার গলার সোনার নেকলেসটা তাতে আটকে দিয়েছিলেন। লোকেরা ভাবল, আমরা সত্যিই বুঝি ওরকম একটা জিনিস মাথায় পরি শাড়ির সঙ্গে। আমাদের গৃহকর্ত্রী সেদিন ছবি তুলেছিলেন। তাতেই দেখতে পাবেন কী রকম মজার দেখাচ্ছে আমাকে। কবির মতে, টুপী পরে আমার চেহারার অনেক উন্নতি হয়েছিল। আমার মতে কিন্তু ঠিক তার উলটো। কিন্তু ও'র অনুরোধ ঠেলতে পারিনি বলে গেলাম সেই অপরূপ মূর্তিতে কনভোকেশনে। কবির যুক্তি: প্রশান্ত আর আমি দুজনেই লম্বা; তার মাঝে তোমাকে আরো বেঁটে দেখায়। টুপীতে বরং তোমাকে আরো ছ' ইঞ্চি লম্বা করে দেবে। তাতে আমাদের পাশে চললে নিতান্ত বেখাপ দেখাবে না।

এর কী উত্তর আছে? অতএব হঠাৎ আমাকে মাথায় ছ' ইঞ্চি বেড়ে যেতে হল।

কাল রাত্রে এখান থেকে জার্মানী যাত্রা করে পরশু সকালে হামবুর্গে পৌঁছনোর কথা। আমাদের দুজনের ইচ্ছে ছিল এ্যারোপ্লেনে যাবার। কিন্তু কবি সঙ্গে রয়েছেন বলে আর তা হল না। তিনি যদিও পীড়াপীড়ি করছিলেন তাঁকেও উড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য কিন্তু আমরা আর সে রিস্ক নিতে চাইলাম না। এবারে ও'কে রথীবাবুর কাছে জার্মানীতে পৌঁছে দিয়ে তারপর আমরা দুজনে কোনো একটা পথ উড়ে যাব ঠিক করেছি।

উড়ো জাহাজে গেলে দু ঘণ্টায় এখান থেকে হামবুর্গে পৌঁছানো যেত; সে আর কত্তে নেই। হামবুর্গের পরে বার্লিনে যাবার প্রোগ্রাম। সেইখানে রথীবাবুরা আমাদের meet করবেন।

স্টকহলম-এর খবরের কাগজের ছবিগুলো পাঠালাম। ট্রেন থেকে নামবার পরই ওগুলো তুলেছিল। এখানেও বিস্তর তুলেছে। কাগজগুলো হাতে পেলে সেগুলোও পাঠাব।

ক্রমশ

কিশোর বিজ্ঞান

গ্রহাণু বলয়

জুন মাসে পৃথিবীর সঙ্গে আইকারাস গ্রহাণুর সংঘর্ষ হবে কি?

॥ ২ ॥

পৃথিবীর কাছাকাছি আসে এমন যে সব গ্রহাণু আছে সেগুলির মধ্যে অ্যালবার্ট আবিষ্কৃত হয় ১৯১১ সালে, যে বছর আমাদের মোহনবাগান প্রথম আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী হয় বিলাতী সৈন্যদের দল ইস্ট ইয়র্কস-এর বিরুদ্ধে। মাত্র ৪ কিলোমিটার ব্যাসের এই গ্রহাণু পৃথিবীর ২ কোটি ৮০ লক্ষ কিলোমিটারের মধ্যে আসে। ১৯৩২ সালে আরো দুটির খোঁজ পাওয়া যায় যার একটির নাম আমোর, ব্যাস ৩ কিলোমিটার। ঐ সময় সেটি পৃথিবী থেকে মাত্র দেড় কোটি কিলোমিটার দূরে এসেছিল। সেটিকে আবার দেখা যায় ১৯৪০ সালে। অন্যটির নাম অ্যাপোলো এবং সেটি এসেছিল আরো কাছে অর্থাৎ ১ কোটি ১০ লক্ষ কিলোমিটারের মধ্যে। ২ কিলোমিটার ব্যাসের এই ক্ষুদ্র গ্রহাণুটি আর দেখা যায়নি। অ্যাপোলো কিন্তু শুক্রের আরো অনেক নিকটে যায় যখন শুক্র থেকে তার দূরত্ব দাঁড়ায় মোটে ২ লক্ষ কিলোমিটার যা হচ্ছে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের অর্ধেক মাত্র। সুতরাং এই নৈকট্যকে একটা রেকর্ড বলা যেতে পারে। ১৯৩৬ সালে আবিষ্কৃত অ্যাডোনিসের ব্যাস মাত্র ১ কিলোমিটার। সেটিও পৃথিবীর থেকে মাত্র দেড় কোটি কিলোমিটার দূর দিয়ে চলে যায়। কিন্তু ১৯৩৭ সালে পৃথিবী থেকে মাত্র ৭ লক্ষ ৮০ হাজার কিলোমিটার দূরে দেড় কিলোমিটার ব্যাস এবং ৩০০ কোটি টন ভর সম্পন্ন হার্মেস নামে গ্রহটি যখন আবিষ্কৃত হয় তখন পৃথিবীর নৈকট্যের দিক থেকে সেটিও একটি রেকর্ড স্থাপনা করে বললে অন্যায় হবে না, কারণ সেই দূরত্ব পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের মাত্র দ্বিগুণ। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, ভবিষ্যতে সেটি আমাদের আরো কাছে আসতে পারে অর্থাৎ মোটে ৫ লক্ষ কিলোমিটার দূরে। কিন্তু মহাজাগতিক মানদণ্ডে এই সব গ্রহাণু এত ছোট যে একটি বালুকণার সঙ্গে উপমেয়। সেই অত্যধিক ক্ষুদ্রতার জন্য বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ ও সূর্যের প্রভাবে তাদের কক্ষ এমনভাবে আলোড়িত ও মর্দিত হয় যে বিজ্ঞানীদের পক্ষে তাদের কক্ষপথ সঠিকভাবে গণনা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে এবং সেইজন্য আবিষ্কৃত হবার পর হঠাৎ তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না, তারা যায় হারিয়ে। ভবিষ্যতে সেগুলি পুনরাবিষ্কৃত হতে পারে, নাও পারে।

যে আইকারাস নামক গ্রহাণুর সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষের সম্ভাবনার কথা ভেবে কেউ কেউ উদ্বিগ্ন বোধ করছেন তার চেয়েও অনেক বেশি কাছে আসে এমন কতকগুলি গ্রহাণুর নাম করলাম। কিন্তু কই আইকারাসের চেয়েও এত কাছে আসা সত্ত্বেও পৃথিবীর সঙ্গে কোনদিনই সেগুলির সংঘর্ষ তো হয়নি? সুতরাং আশংকিত হবার কোন যুক্তিসংগত কারণ আছে বলে মনে হয় না। অবশ্য ১৯৪৯ সালের জুন মাসে আবিষ্কৃত আইকারাসের গ্রহাণু হিসাবে নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানীদের পক্ষে কৌতূহলের জিনিস। কারণ পুরাকথিত ডিডেলাস পুত্র আইকারাসের মত এই গ্রহাণুটি সূর্যের "খুব নিকট" দিয়ে ভেসে যায়। তার অতি দীর্ঘায়িত কক্ষপথে সে যখন সূর্য থেকে দূরতম বিন্দুতে পৌঁছায় তখনও দূরত্বের মধ্যে দূরত্ব দাঁড়ায় ৩ কোটি কিলোমিটার মাত্র অর্থাৎ তখন সে সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধের কক্ষপথের মধ্যে এসে পড়ে। একটি অনুমিতি অনুসারে সেই সময় সৌররশ্মির তাপ তাকে এতখানি উত্তপ্ত করে যে সে নিজেই জ্যোতিষ্মান হয়ে ওঠে।

১৯৫০ সালে আরো একটি গ্রহাণুর সন্ধান মিলেছে যাকে "পৃথিবী-ছোঁওয়া" বলা যেতে পারে। সেটি তখন পৃথিবী থেকে ৯০ কিলোমিটার দূর দিয়ে যাচ্ছিল এবং ঐরকম 'পৃথিবী ছোঁওয়া' আরো বহু গ্রহাণুর সন্ধান পাবার আশা রাখেন বৈজ্ঞানিকেরা। কিন্তু একমাত্র আইকারাস ছাড়া অন্য কোন গ্রহাণুর এমন কি তার চেয়েও অনেক নিকটতর গ্রহাণুর ক্ষেত্রে পৃথিবীর সঙ্গে ধাক্কা লাগার আশংকার কথা শোনা যায়নি। বরঞ্চ পৃথিবীর "কাছাকাছি" যে গ্রহাণুগুলি আসে গ্রহান্তরে যাত্রার পথে যথাসময়ে সেগুলির কোন একটির নৈকট্যের সুযোগ নিয়ে সেটিকে মহাজাগতিক স্টেশন হিসাবে ব্যবহার করার সুযোগ হয়ত পাওয়া যাবে। মহাকাশচারী অন্যান্য দুনিয়ার তুলনায় গ্রহাণুতে উড়ে যাওয়ার ইন্ধন খরচ অনেক কম, এমন কি যদি গ্রহাণুটি পৃথিবী থেকে চাঁদের চেয়েও বহু গুণ দূরেও থাকে। তার কারণ এই যে, এই সব ছোট ছোট গ্রহাণুর কাছে আকর্ষণ ক্ষেত্র প্রায় নেই বললেই চলে। খুব বেগবান নয় এমন একটিকে বেছে নিলেই হোল।

বিজ্ঞানীদের অভিমতে যে এক লক্ষের মত গ্রহাণু মহাকাশ পরিক্রমা করে যাচ্ছে সেগুলির মোট ভর কিন্তু পৃথিবীর ভরের এক সহস্রাংশমাত্র। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিশাল সেরেস (পরিধি ২৫০০ কিলোমিটার এবং আয়তন প্রায় ২০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ ইউরোপের ১/৬ ভাগ) ও পালাসের কথা আগেই বলেছি। আয়তনের দিক থেকে এই দুটির পরেই হচ্ছে ভেস্তা এবং জুনো। গ্রহাণুপুঞ্জ জগতে এই চারটি আয়তনে দৈত্যের সামিল। পালাসের ব্যাস ৫০০ কিলোমিটার, ভেস্তার ৪০০ এবং জুনোর ২০০। এই চারটির মধ্যে একমাত্র ভেস্তাকেই মাঝে মাঝে বিনা দূরবীণেও দেখা যায়। অন্যগুলিকে দেখতে হলে শক্তিশালী দূরবীণ চাই এবং দূরবীণে সেগুলি নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল বিন্দুর চেহারায় দেখা যায় বলেই সেগুলিকে

'অ্যাস্টেরয়েড' বলে। যাঁরা শখের জ্যোতির্বেত্তা হতে চান তাঁরা যদি রোজ রাত্রে চোখে একটা দূরবীণ লাগিয়ে আকাশে কোন একই অংশের দিকে তাকিয়ে থাকেন এবং সেই অংশে পরিদৃশ্যমান তারাগুলির অবস্থানের বিন্দুগুলি একটি কাগজে নক্‌শার আকারে এঁকে রাখেন তাহলে রাতের পর রাত ঐভাবে একই নির্দিষ্ট সময়ে আকাশের সেই জায়গার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন দেখবেন যে তাঁদের আঁকা নক্‌শার একটি তারা তার নিজের জায়গা থেকে একটু সরে গিয়েছে। অর্থাৎ সেটি স্থান পরিবর্তন করেছে। তখনই বুঝতে হবে যে এতদিন ধরে এই যে জ্যোতিষ্কটিকে তিনি নক্ষত্র বলে ধারণা করে আসছিলেন সেটি আসলে নক্ষত্র নয়, গ্রহাণু। এইভাবে বহু শখের জ্যোতির্বিৎ অনেকগুলি গ্রহাণু আবিষ্কার করেছেন যেগুলি বিজ্ঞানীদের কাছে অপরিজ্ঞাত ছিল। ঠিক এইভাবেই একজন শখের জ্যোতির্বিৎ আস্ট্রিয়া নামে পঞ্চম গ্রহাণুটি আবিষ্কার করেছিলেন ১৮৪৫ সালে।

গ্রহাণুগুলির আবিষ্কার আকস্মিক ব্যাপার, কারণ আগে থাকতে এটা বোঝবার

ব আন্দাজ করার কোন উপায় নেই যে, আকাশের কোনখানে কবে একটি গ্রহাণুর আবির্ভাব হবে। যাই হোক গ্রীক ও রোম্যান সভ্যতার আমলেই সেগুলির সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এমন একটা অঙ্কে গিয়ে পৌঁছাল যখন নামকরণের জন্য আর কোন নতুন দেবতার নাম ভেবে পাওয়া গেল না। তখন কি আর করা যায়, নাম ধার করতে হোল ফিনিশীয়, জার্মান ও নরওয়েজিয়ান দেবদেবীর নামের ঝুলি থেকে, যেমন হার্মিস, অ্যাডোনিস, ইরস ইত্যাদি। সেই সব ঝুলিও যখন শূন্য হয়ে গেল তখন পৃথিবী থেকেই মেয়েদের নামের আশ্রয় নিতে হোল যেমন ফর্চুনা, আমহার্স্টিয়া প্রভৃতি। আজকাল বিজ্ঞানের সর্বময় কর্তৃত্বের যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে দৃষ্ট নতুন গ্রহাণুগুলির নামকরণ হচ্ছে সেই সব দেশের প্রখ্যাত নেতা বা নগরের নাম দিয়ে যেমন (ভ্লাদিমীর ইলিচ লেনিনের নামে) ভ্লাদিলেনা, (শরীরবিজ্ঞানী পাভলভের নামে) পাভলোভিয়া (লোমনোসভের নামে) লোমনোসোভা, (মস্কোর নামে) মস্কভা ইত্যাদি।

তাহলে আমরা দেখছি গ্রহাণুর রাজ্যে সেরেস ও পালাসের মত এমন বৃহৎ দুনিয়া রয়েছে যার মধ্যে ফ্রান্স, ইতালী, জার্মানী, ব্রিটেন এবং সুইজারল্যাণ্ডের মত ছোট আরো গুটিকয়েক দেশ ঢুকে যাবে। তারপর রয়েছে মাঝারি আয়তনের গ্রহাণু যেগুলির ব্যাস ১০০ থেকে ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত এবং সবশেষে রয়েছে সেই সব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গ্রহাণু (পকেট অ্যাস্টেরয়েড)—যেমন সিগারের মত দেখতে ইরস (৩৫ কিলোমিটার লম্বা, প্রস্থচ্ছেদে ৭×১৬ কিলোমিটার এবং পৃষ্ঠায়তনে ৩০০ হেক্টার) এবং আরো আরো অনেক ছোট গ্রহাণু যেগুলি এখনো অনাবিষ্কৃত। শেষোক্তগুলির ব্যাস হয়ত কয়েক ডজন এমন কি ২/৪ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। অর্থাৎ সেগুলি বড় বড় পাথরের চাংড়ার আয়তনের। অতীতের কোন গ্রহের বিস্ফোরণের ফলে এই গ্রহাণুপুঞ্জের সৃষ্টি হয়ে থাকলে সেই গ্রহটিও নিশ্চয় আয়তনে খুবই ছোট ছিল—হয়ত পৃথিবীর হাজার ভাগের একভাগ।

গ্রহাণুগুলির বিভিন্নতা লক্ষ করার মত অন্য বৈশিষ্ট্য আছে। তাদের কারো কোন আবহমণ্ডল নেই, অভিকর্ষ যা আছে তা নগণ্য বলা চলে। তাদের চেহারার মধ্যেও বিভিন্নতা আছে ইরসের সিগারের মত চেহারার কথা বলেছি। তা ছাড়া বহু ছোট্ট গ্রহাণু উল্কাপিণ্ডের মত বা আগ্নেয়-বিস্ফোরণে উদ্গীর্ণ শিলাখণ্ডের মত দেখতে। অনেক গ্রহাণুর এবং আমহার্স্টিয়ার লোহিতাভ রঙের কথাও উল্লেখযোগ্য। আয়তনের ক্ষেত্রেও পার্থক্য সেই রকম।

হার্মিসের আয়তন নিউইয়র্কের সেণ্ট্রাল পার্কের সমান মাত্র। বহু গ্রহাণু কোনো এক অজানা শক্তির ধাক্কায় মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্তী গ্রহাণুবলয় থেকে ছিটকে বাইরে গিয়ে পড়ে মহাকাশ পরিক্রমা শুরু করে আলাদা পথে যেমন হিডাল্গো চলে যায় শনির কাছাকাছি, আবার হার্মিস এসে পড়ে পৃথিবীর ৭ লক্ষ ৮০ হাজার কিলোমিটারের মধ্যে। ছোট একটি শহরের আয়তনের আইকারাস—যাকে সহজাত আলোকসম্পন্ন একমাত্র গ্রহাণু বলে অনেকে মনে করেন—চলে যায় বুধের তুলনায় সূর্যের দ্বিগুণ নিকটে এবং সৌর অগ্নিসাগরের ঊর্মিমালা তার কিনারায় এসে আছড়ে পড়ে। কিন্তু পুরাকথিত আইকারাসের মত সে সূর্যের অগ্নিগর্ভে পতিত না হয়ে মহাজাগতিক মহাকর্ষের নিয়ম মেনে ভেসে চলে যায় অপেক্ষাকৃত শীতল অঞ্চলের দিকে।

কিন্তু পৃথিবীর কাছে সে আবার আসতে যাচ্ছে আগামী ১৫ই জুন ১৯ বছর আগে মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানাচার্য এস হেরিকের দ্বারা আবিষ্কৃত হবার পর। সেবার আইকারাস এসেছিল পৃথিবীর ৬০ লক্ষ কিলোমিটারের মধ্যে অর্থাৎ সর্বাধিক সম্ভব নিকটে সূর্যের ঠিক বিপরীত দিকে যাকে বলা হয় "ইন অপোজিশন।" কিন্তু এত কাছে এসেও (অন্য কয়েকটি গ্রহাণু আরো কাছে এসেছে) সেবার গ্রহাণুটি যখন পৃথিবীকে 'যুদ্ধং দেহি' বলে 'চ্যালেঞ্জ' করেনি তখন আসছে বারের জন্য আশংকার কী কারণ থাকতে পারে? আগামী ১৫ই জুন সে কতটা কাছে আসবে তা নিয়ে মতবিরোধ আছে স্বীকার করি। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে এ বছর সে পৃথিবী থেকে ১ কোটি ২০ লক্ষ কিলোমিটার দূর দিয়ে চলে যাবে অর্থাৎ ১৯ বছর আগেকার তুলনায় ডবল দূর দিয়ে। কিন্তু লেনিনগ্রাদে অবস্থিত আন্তরীক্ষ বস্তুগুলির সন্নিবেশ গণনার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র থেকে হালে প্রকাশিত হবার পর দেশ দেশান্তরের জ্যোতির্বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলিতে প্রেরিত ক্ষুদ্র গ্রহগুলির ১৯৬৮ সালের স্থিতিপঞ্জিকা অনুসারে এবার আইকারাসের আগের বারের মতই ৬০ লক্ষ কিলোমিটার দূর দিয়ে যাবার কথা। পৃথিবীর দিকে আসার পথে বুধের আকর্ষণের যে প্রভাব তার উপর পড়বে সেটি হিসাব করেই এই দূরত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। ঐ গণনা অনুসারে ৯ই এপ্রিল থেকে ২৭শে অগাস্ট পর্যন্ত আইকারাসের গতি পৃথিবীর উভয় গোলার্ধের গ্রহ পর্যবেক্ষণাগারগুলি থেকে অনুসরণ করা যাবে, যার ফলে আরো নির্ভুলভাবে বিচার করা যাবে তার ভবিষ্যৎ আচরণ।

কিন্তু তার কি কোন প্রয়োজন আছে? আছে বই কি। ১৯৩৭ সালের ২৮শে অক্টোবর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বেত্তারা যখন একটি অতি ছোট্ট গ্রহের মত বস্তুকে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসতে এবং উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে প্রথম দেখেন তার ২ দিন পরে সেটি পৃথিবী থেকে মোটে ৫ লক্ষ কিলোমিটার দূরে এসে পড়ে। তখন সবাই খুবেই ঘাবড়ে যান এবং একটা দারুণ বিপদ ঘটার আশংকা করেন। কিন্তু সেই রহস্যময় আগন্তুক শেষ পর্যন্ত আর এদিকে এগোল না এবং ধীরে ধীরে মহাশূন্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল। লোকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বস্তুটি ছিল গ্রহাণু হার্মিস। কবে আবার সে ফিরবে কেউ বলতে পারে না।

জিওগ্রাফার নামে হালে আবিষ্কৃত গ্রহাণুটি ১৯৬৯ সালে পৃথিবীর খুব কাছে আসবে বলে জানা গিয়েছে। বিজ্ঞানীরা তার গতিপথ গণনায় নিবিষ্ট রয়েছেন।

এইরকম কত সহস্র সহস্র গ্রহাণু মহাকাশচারণা করছে। কিন্তু কোন একটির পক্ষে পৃথিবীর ঘাড়ে এসে পড়া কি কোনদিন সম্ভব হলেও হতে পারে? এই প্রশ্নের জবাব হচ্ছে যে, তত্ত্বগতভাবে সেইরকম ঘটনা সম্ভব হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে না ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। তা ছাড়া পরমাণু শক্তি ও আধুনিক রকেটের সাহায্য নিয়ে সেইরকম দুর্ঘটনা (যদি ঘটতে যায়ই) আগে থেকেই নিবারণ করা যাবে বলে বৈজ্ঞানিকদের দৃঢ়বিশ্বাস।

প্রাকৃতিক গ্রহাণুর প্রসঙ্গ আলোচনার পর এই বলে আমরা পূর্ণচ্ছেদ টানি যে, লুনা-১ মহাকাশযান ১৯৫৯ সালের ২রা জানুয়ারী মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়ে গ্রহাণু পরিবারের সদস্যতা লাভ করে ৪৫০ দিনে একবার করে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আসছে এবং করে চলবে।

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

তেইশ

এক একটি ভয়াবহ রাত্রির স্মৃতি মানুষ সহজে ভুলতে পারে না যেমন ভুলতে পারেনি কবিতা মিতার বাসার সেই কাল-রাত্রির কথা যেদিন বন্ধ দরজার বাইরে উন্মত্ত জন্তুর মত গর্জন করছিল হলধরবাবু, আর ঘরের মধ্যে খাটের ওপর বেহেড মাতাল হয়ে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিল মিতা আর প্রাণপণে দরজাটাকে ঠেলে রেখে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাচ্ছিল অসহায় কবিতা। সে রাত্রি কাটতে অনেক সময় লেগেছে। জন্তুটা এক একবার দরজা থেকে সরে যায় কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে আবার ফিরে আসে। আরও জোরে ধাক্কা মারে। এভাবে কতক্ষণ চলেছে কবিতার খেয়াল নেই। এক সময় শাসানি শোনা গেল, ঠিক আছে, আজ তোকে ছেড়ে দিলাম কিন্তু হলধরকে যখন ক্ষেপিয়েছিস ঠিক তোকে ঝুঁটি ধরে নিয়ে আসব, চাঁদির জুতো মেরে তোর বন্ধুর মতই এই ঘরে পুষব। তখন দেখব তোর সতীপনা।

জুতোর শব্দ শোনা গেল হলধরবাবুর, সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছে, পরে রাস্তা দিয়ে চলে গেল। তবু কবিতা প্রথমটা নিশ্চিন্ত হতে পারেনি, অনেকক্ষণ অবধি দরজায় পিঠ দিয়ে বসে ছিল। ক্রমে ভরসা এল, মনে হল লোকটা সত্যিই গেছে। ফিরে তাকাল মিতার দিকে। সে তখনও বেহুঁশই বলতে গেলে। এলোমেলো শাড়ি, জামার বোতাম খোলা, মাথার চুল খোঁপা বাঁধাই রয়েছে, এলিয়ে পড়েছে দেহটা।

একবার কবিতার মনে হল আজ সন্ধ্যায় মিতার সঙ্গে না বেরলেই তার ভাল হত, বিকেলে এখান থেকে বেরিয়ে রানাঘাটে ফিরে যেতে পারত, নিশ্চয় বাড়ির লোকেরা তার জন্যে ভাবছে, আর এদিকে ঐ মাতাল পুরুষমানুষটা মিতার উন্মত্ত দেহটাকে নিয়ে নিশ্চয় মহানন্দে রাত কাটাত। শুধু তারই জন্যে সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল।

কবিতা অপেক্ষা করতে লাগল কতক্ষণে ভোর হয়। মিতার সঙ্গে কথা বলার আর তার ইচ্ছে ছিল না। কিই বা বলবার আছে। মিতার সোহাগের বাবু যে তারই ঘরে কবিতাকে নিয়ে শুতে চেয়েছিল তা শুনলে মিতা নিশ্চয় খুশী হবে না, হয়ত ভুল বুঝবে, ভাববে কবিতা তার বাবুর সোহাগে ভাগ বসাবার চেষ্টা করছে।

সেইজন্যেই ভোর হতেই মিতার বাসা ছেড়ে আস্তে আস্তে নেমে দপ্তরীপাড়ার অলিগলি পেরিয়ে কবিতা এসে হাজির হল অশোক প্রেসে। তখনও দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কিছুক্ষণ ধাক্কাধাক্কি করতে মেশিনম্যান নিরঞ্জন ভেতর থেকে দরজা খুলে দিল। তখনও চোখ থেকে তার ঘুম যায়নি, হাই তুলে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার, তুমি এত সকালে?

কবিতা উত্তর দিল, কাল রানাঘাটে ফিরতে পারিনি।

—সে তো চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি।

—আমার বন্ধুটার খুব অসুখ।

—তাই নাকি, কি হয়েছে?

—এই জ্বরজারি, গায়ে ব্যথা, দেখবার কেউ নেই। তাই রাত্রিবেলাটা ওর কাছে থাকতে হল।

নিরঞ্জন টিপ্পনি কাটল, তবু ভাল।

—তার মানে?

—মেয়েরা রাতে বাড়ি না ফিরলেই ভয় লাগে, এই আর কি।

কবিতা ঝাঁঝিয়ে ওঠে, আমি সে রকম মেয়ে নই নিরঞ্জনদা, ওসব ছেঁদো কথা অন্য মেয়েদের বোলো। কত কষ্ট করে আমাকে যে থাকতে হয় তা যদি জানতে—

—হ্যাঁ, কষ্ট তো শুধু তোমরাই কর, আমাদের তো সুখের জীবন।

কবিতার মন্তব্য, তোমরা পুরুষ মানুষ।

নিরঞ্জন পরিবেশটা হালকা করার চেষ্টা করে হেসে বলে, মাঝে মাঝে সেই কথাটাই ভুলে যাই। যাক গে, ভোরবেলা এসেই যখন পড়েছ, চায়ের জল চাপাও, আমি যাই গরম কচুরি সিঙ্গাড়া কিনে আনি।

—আমি খাব না, তুমি আমাকে দেখলেই কি রকম খোঁচা দিয়ে কথা বল।

—আর বলব না, লক্ষ্মীটি, ভাল করে চা বানাও দেখি। তোমাকে খুশী করার জন্যে আজ না হয় জিলিপিও নিয়ে আসব।

কবিতা হেসে ফেলে, কি করে জানলে জিলিপির কথা, ছোটবেলায় আমার বাবা প্রায় আনত, আমি জিলিপি খেতে ভালবাসি। ঠিক আছে, তুমি যাও, আমি হাত মুখ ধুয়ে চায়ের বন্দোবস্ত করছি।

কবিতা শুধু হাত মুখই ধুল না, কলের জলে গাও ধুয়ে নিল। কেমন নিজেকে যেন ওর অপবিত্র মনে হচ্ছিল। প্রেসের দপ্তরী ঘরের এক কোণে ও সব সময় একটা ধোপ শাড়ি রেখে দিত, যদি হঠাৎ কোথাও বেরতে হয় তার জন্যে। আজ স্নান সেরে ঐ শাড়িখানা পরেই সে স্টোভ জ্বালিয়ে চায়ের জল বসালো। চারদিকে তাকিয়ে দেখল অনেক কাজ বাকি আছে। একটা নতুন বই-এর ফর্মা তাড়াতাড়ি চলছে, তা ছাড়া এক হাজার পাতা বাঁধতে হবে, পাঁচখানা বাঁধাই বাকি। তবু আজ রানাঘাটে না ফিরলেই নয়। সকলের নিকট কাজ করা যাবে না যদি পারে তো বিকেলে ফিরে আসবে। খবরটা বলে যেতে হবে নিরঞ্জনকে, যদিও জানে

অশোক জানা শুনলেই বিরক্ত হবে। কিন্তু সে নিরুপায়। খাবার নিয়ে ফিরে এসে নিরঞ্জন সেগুলো টেবিলের ওপর রেখে এসে একটা সিগারেট ধরালো। কবিতার দিকে চেয়ে তারিফ করে বলল, বাঃ, আজ তোমার বেশ পরিষ্কার দেখাচ্ছে।

—সে বোধ হয় এই ধোপ শাড়িটার জন্যে।

—না তা নয়। চোখে মুখে বিরক্তির ভাব নেই, কত সহজ।

কবিতা হাসল, সে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে হচ্ছে না বলে।

নিরঞ্জনও হাসল, আমি তোমায় খুব বিরক্ত করি, না কবিতা? কেন করি জানো? তোমাকে আমার ভাল লাগে বলে।

—থাক আর ঢঙ করে কথা বলতে হবে না। হঠাৎ এত প্রশংসা কেন? চায়ে একটু বেশী চিনি দিতে হবে নাকি?

—তোমার কোন রসকষ নেই।

—তাও তো আমি কবিতা লিখি, গান বাঁধি—,

—কই, অনেকদিন তো নতুন কিছু শোনাও নি!

কবিতা অন্যমনস্ক স্বরে বলে, তা সত্যি,

অনেকদিন কিছু লেখা হয়নি।

চা খেতে খেতে কবিতা জানিয়ে দিল ঐদিন সে কাজে আসতে পারবে না। নিরঞ্জন যেন বাবুকে খবরটা দিয়ে দেয়।

নিরঞ্জন অবশ্য অনুরোধ করেছিল, কি দরকার বাবা, হাতের কাজগুলো শেষ করে তাড়াতাড়ি চলে যাও না।

—উঁহু, বাড়িতে ভাববে, তা ছাড়া সারা রাত আমি কাল ঘুমইনি।

—বেশ তো, এখন ঘুমিয়ে নাও। দুপুরে-বেলা হোটেলে মাংস-ভাত খাওয়াব।

কবিতা হাসল, খুব পয়সা হয়েছে বুঝি?

—ওভার টাইমের টাকা পেয়েছি।

—তুমি একলা বসে খেও, আমি চললাম। সত্যি কথা বলতে কি কাজ করতে আজ ইচ্ছে করছে না।

—কেন কি হয়েছে?

কবিতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কি জানি।

কবিতা মিথ্যে বলেনি, সত্যিই তার কাজ করতে ভাল লাগছিল না। কেন, এ কথার সে উত্তর দেবে কি করে? জবাব দিতে গেলে বলতে হয়, 'কি জানি'। কারণ কবিতা জানে না সে কি চায়। অভাব অনটনের মধ্যে মানুষ হয়েও সে ভেবেছিল একবার বড় হয়ে বাড়ির বাইরে পা বাড়াতে পারলে নিশ্চয় সে জীবনটাকে নিজের পছন্দমত চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, স্বপ্ন দেখেছিল একটা সুখী নিশ্চিন্ত সংসারের। সে মিতার মত স্বার্থপর কোন দিনই নয়। তার স্বপ্ন-রাজ্য থেকে বাবা মাকে সে বাদ দেয় নি, বাদ দেয় নি ছোট ভাইবোনদের। কিন্তু কতটুকু সে করতে পেরেছে সারা দিন খেটে। শুধু রেশনের টাকাটারই যোগান দিতে পারে সংসারে, তার বেশী আর কিছুই নয়। ছোট-বেলায় যখন কবিতা লিখত, বন্ধুরা বলত বড় হলে তার কত নাম হবে, তার লেখা ছেপে বেরবে। কিন্তু হল কই? লেখাপড়া-টুকুও তো ভাল করে শেখবার সুযোগ পেল না। জ্ঞানের পরিধি সীমায়িত, মাত্র গুটি কয়েক শব্দ নিয়ে নাড়াচাড়া করা। যা ভাবে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না। এই অক্ষমতাই তাকে সবচেয়ে বেশী কষ্ট দেয়, আপনা থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। শুধু হতাশা, আর ব্যর্থতা।

মিতার জীবনধারণের রীতি নিজের চোখে দেখে কবিতা মনে মনে আরও শঙ্কিত হয়েছে। ও মেয়েটার ভবিষ্যৎ কি? ভেবেছিল নিজের পায়ে দাঁড়াবে, সবাই-এর চোখ ধাঁধিয়ে দেবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত না পাঁকের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে। পুরুষ মানুষের চোখে নেশা ধরাতে গিয়ে মিতা আজ নিজেই নেশাড়ে। মদ তাকে জড়িয়ে রেখেছে কড়া আচারের মত, এর থেকে মুক্তি নেই। আজ হলধরবাবু, কাল হয়ত অন্য কোন বাবু জুটবে, ধাপে ধাপে নামতে হবে নর্দমায়, তারপর কি আছে মেয়েটার কপালে কে জানে।

কবিতার ইচ্ছে ছিল না রানাঘাটে পৌঁছে মিতার মার সঙ্গে দেখা করে। কি প্রয়োজন এই দুঃসংবাদ তাকে দেবার। কিন্তু বাসায় পৌঁছে প্রথমেই মিতার মার সঙ্গে দেখা হল। একটা হাড়ের কাঠামোর ওপর শাড়ি জড়ানো, বলল, মিতার খবর নিতে এসে শুনলাম, তুইও নাকি রাত্রে ফিরিস নি?

—না, বড্ড কাজের চাপ ছিল।

—হ্যাঁরে মিতার সঙ্গে দেখা হয়েছে? কিছু বলল?

কবিতা মিথ্যে বলতে বাধ্য হয়, ওদের কারখানায় গিয়েছিলাম, দেখা হয়নি।

—কেন? কাজে যাচ্ছে না?

—যাচ্ছে মানে তখন ছিল না। আমি আজ বড্ড ক্লান্ত মাসীমা, যদি কোন ওর খবর পাই জানিয়ে আসব।

মিতার মারও দীর্ঘশ্বাস পড়ে, কি মেয়েই পেটে ধরেছিলাম! সারা জীবন জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারল। যাক গে যাক, যা হবার হবে। আজ তো শুনলাম তোকে দেখতে আসছে। ভালয় ভালয় পছন্দ হয়ে গেলেই বাঁচি।

এ খবর কবিতার জানা ছিল না, বললে, কে বললে?

—কেন তোর মা।

কবিতা সোজা গিয়ে হাজির হল রান্নাঘরে মায়ের কাছে, আবার কি তামাশা হবে শুনছি? আজ নাকি আমাকে কে দেখতে আসছে?

কবিতার মা মেয়েকে দেখে নিশ্চিন্ত হন, যাক, তুই ফিরে এসেছিস। আমি ভয় পাচ্ছিলাম যদি কালকের মত আজকেও কলকাতায় আটকে যাস তাহলে সন্ধেবেলা ছেলের বাড়ির লোকদের কি বলব?

কবিতা কঠিন স্বরে বলে, তুমি তো জান সঙ্‌ সাজতে আমার ভাল লাগে না, তবে কেন বার বার এইভাবে মেয়ে দেখাবার নাম

করে আমার কষ্ট দাও! আমি তো তোমাদের গলগ্রহ হয়ে নেই, আমি তো রোজগার করছি।

—শুধু আমাদের কর্তব্য।

—দুনিয়া সুদ্ধ লোক শুধু কর্তব্য করে যাচ্ছে, তবু কিছুই তো হয় না দেখি। কর্তব্য না করে চোখ বুজে পড়ে থাক না, তা হলেও দেখবে সংসার চলছে, পৃথিবী ঘুরছে।

একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, এ সম্বন্ধ কে আনল?

—রতন ঠাকুরপো।

কবিতা দাঁতে দাঁত চেপে বলে, সেই দালালটা?

—আঃ, কি বলছিস! তোদের কত ভাল-বাসে, তোদের কাকা।

—বলিহারি কাকা, আজকে এই ক্যাম্পের যতকিছু দুর্দশা ঐ শয়তান রতনকাকার জন্যে। গ্রামের লোক, এক সংগে পাকিস্তান থেকে তোমরা এসেছিলে। মানুষটাকে সবাই অকপটে বিশ্বাস করেছিলে, তারই সুযোগ নিয়ে ঐ মানুষটা প্রত্যেকের নাম করে 'গ্রাণ্টে'র টাকা চুরি করেছে। সরকারী অফিসারদের সংগে সড় করে তোমাদের মত বোকাদের ঠকিয়েছে। পোড়ারমুখো দালাল।

মা থামাবার চেষ্টা করেন, চুপ কর কবিতা। আজকাল যা তোদের মুখ হয়েছে! রতন ঠাকুরপো গন্যি মান্যি লোক, তাছাড়া বিপদের সময় সাহায্যও তো করেছে—

—সেই বিশ্বাসেই থাকো। ঐ রতন কাকা-দের জন্যেই উদ্বাস্তুদের এই হাল, ইতিহাসে এদের নাম লেখা থাকবে, মীরজাফরের শ--, এরা আমাদের ডুবিয়েছে। যদি দেশে সত্যি-কারের শাসন থাকত তাহলে ঐ মানুষ-গুলোকে শূলে চড়াত।

কবিতার মা কথা না বাড়িয়ে চুপ করে গেলেন। কবিতাও কিছুক্ষণ গজগজ করে মাটিতে বিছানাটা পেতে নিয়ে শুয়ে পড়ল। রতন কাকার ওপর রাগের অবশ্য কবিতার বিশেষ কারণ ছিল। সে ছোটবেলা থেকে জানত ঐ মানুষটা শঠ, জোচ্চোর, ধাপ্পাবাজ। বুঝত, ওর বাবার মত ভাল মানুষদের মাথায় হাত বুলিয়ে তাদের নাম করে সরকারী দৌলত ফাঁক করাই তার নেশা। কিন্তু ভাবতে পারেনি, ঐ প্রৌঢ় লোকটা এই ক্যাম্পের এবং অন্য উদ্বাস্তু কলোনীর মেয়েদের দালালি করে। কথাটা রতনকাকা তার কাছে সরাসরি পেড়েছিল, আজকে কলকাতায় তুই নাই বা গেলি কবিতা।

—কেন কাকা?

—না মানে আমার এক বন্ধু খুব বড় অফিসার, বিশেষ কাজে এখানে আসছে, ভাবছিলাম তোর সংগে আলাপ করিয়ে দেব।

কবিতা বিস্মিত হয়, আমার সংগে? কেন?

—আহা আলাপ করতে ক্ষতি কি? বলা যায় না তোর বাবার যে দরখাস্তটা অনেকদিন থেকে পড়ে আছে হয়ত পাশ হয়ে যাবে।

আপনি কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না রতন কাকা।

এইবার রতনকাকার মুখোশ খসে পড়ে, কচি খুকীটি তো নও, কলকাতায় যাচ্ছ, রোজগার করছ, শহরের চাল চলন সবই তো শিখেছ। প্রেসে কাজ করার নাম করে কত জায়গায় ঘুরে বেড়াও তা কি আমার জানতে বাকি আছে! মাঝে মাঝে না-হয় আমার কথা শুনলে, তাতে দু' পয়সা রোজগারও হবে, নিজের আখেরটাও গুছিয়ে নিতে পারবে।

স্তম্ভিত কবিতা শুধু বলে, ছি ছি! আপনি এই?

—কি?

—মেয়েমানুষের দালাল?

রতন কাকা চটে যায়, চুপ কর। চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলতে হবে না। না যাবি তো বয়ে গেল। এটুকু জানবি, এ ক্যাম্পের যত কটা মেয়ে শাড়ি পরতে শুরু করেছে, সবাই আমার কথামত চলেছে—সে মিতা, সন্ধ্যা, আরতি, যেই হোক না কেন। তুমি ব্যতিক্রম হিসেবে থাকতে চাও, থাক। তবে আমার কাছ থেকে আর কোন দিন সাহায্য চেয়ো না। বরং ক্যাম্প থেকে তল্পিতল্পা গুটোও।

সেই রতন কাকা আজ বিয়ের সম্বন্ধ এনেছে, তারাই মেয়ে দেখতে আসবে আজ সন্ধ্যার সময়। এর আগেও অনেকবার কবিতাকে দেখতে এসেছে কিন্তু কোন পক্ষরই তাকে পছন্দ হয়নি। রঙ ময়লা, চেহারাও খুব সুশ্রী না, লেখাপড়ায়

কমজোর, তার ওপর বাপের পয়সা নেই। কে আর তোকে যেচে বউ সাজিয়ে ঘরে নিয়ে যাবে। তাই মনে মনে আজ সে প্রস্তুত হয়েই ছিল পাত্র পক্ষের লোকেরা যদি বেয়াড়া কিছু বলে সে তার উচিত জবাব দেবে। আর বাপ মায়ের ইজ্জতের কথা ভেবে মুখ বুজে থাকবে না।

আজও তার মা নিজে হাতে মেয়ের চুল বেঁধে দিলেন। পাশের বাড়ির বউয়ের কাছ থেকে চেয়ে এনে পরালেন ফিকে কমলা রঙের একটা শাড়ি। মুখে লাগালেন পাউডারের প্রলেপ, কপালে কুমকুমের টিপ, হাতে দুগাছি চুড়ি, কানে ফুল।

যারা মেয়ে দেখতে এল তারা চারজনেই যুবক। বয়োজ্যেষ্ঠরা কেউ সঙ্গে আসেন নি, এমন কি যিনি সম্বন্ধ এনেছেন সেই রতন কাকাও নয়। মেয়ের পক্ষ থেকে আপ্যায়নের ত্রুটি হল না, ঘরের মধ্যে শতরঞ্চি পেতে তাদের বসানো হল। মিষ্টির প্লেট চায়ের কাপ দেওয়া হল সকলের সামনে। কবিতার ছোট বোনেরা হাতে তালপাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগল অতিথিদের। কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধে হল না, অন্যান্যবারের মতই ধারালো মন্তব্য—'গায়ের রঙ বড্ড কালো', 'তাই তো একেবারে একটাও পাস না করলে আজ কালকার দিনে কি চলে', 'সে কি মেয়ে কলকাতায় যায় চাকরি করতে! এসব কথা তো জানতাম না', 'ধরুন, যেখানেই বিয়ে হোক, কিছু তো আপনাদের দিতে হবে। অন্তত একটা খাট, নমঃ নমঃ করে এক সেট গয়না, বরের আংটি বোতাম, দু'চারখানা জামা কাপড়', 'মিছি মিছি সময় নষ্ট হল রতনবাবু জেনে-শুনে কেন যে এখানে পাঠালেন!'

এর কোন মন্তব্যটিই কবিতার কাছে নতুন নয়। এসব সে বহুবার শুনেছে, কিন্তু আজ এদের কথার ধরনে কেমন যেন চিমটি কাটার ভাব ছিল। কেন জানা নেই কবিতার মনে হল রতনকাকা ইচ্ছে করে তাদের অপদস্থ করার জন্যে এই লোকগুলোকে পাঠিয়েছে। এ ধারণা তার দৃঢ় হয়েছিল আরও এইজন্যে যে, বাবা মা বুঝতে না পারলেও কবিতা ধরতে পেরেছিল ঐ চারটি ছেলেই নেশার ঘোরে রয়েছে, তাদের মুখে মদের গন্ধ। চাপা দেবার জন্যে একমুখ পান খেয়েছে আর জামায় লাগিয়েছে আতর।

কবিতা হঠাৎ বাবা মাকে অনুরোধ করল তোমরা একটু অন্য ঘরে যাও, আমি এ'দের সঙ্গে কথা বলব।

এ প্রস্তাবে ছেলের পক্ষের লোকেরা উৎসাহ দেখাল, ভাল কথা, যদি মেয়ের কিছু জিজ্ঞেস করবার থাকে—

কবিতার সরাসরি প্রশ্ন, পাত্র কি আপনাদের মধ্যেই আছেন?

তারা রসিকতা করে, যদি থাকে?

—তার সঙ্গেই আমি কথা বলতে চাই।

কানামাছি খেলার মত পরস্পর পরস্পরকে ঠেলে দেয়, তুই তো পাত্র, যা না কথা বল মেয়ের সঙ্গে।

সকলেই সকলকে দেখায় কিন্তু কে পাত্র ঠিক বোঝা যায় না।

কবিতার কণ্ঠে তীব্র শ্লেষ, আপনারা এখানে এসেছেন কেন? আপনাদের যাওয়া উচিত ছিল কোন বেশ্যাপাড়ায়।

চারজনই একসঙ্গে চমকে ওঠে, কি বলছেন?

—চার ইয়ারে মিলে মদ খেয়ে মাইফেলের আসর বসাতে চান, তবে সেইরকম জায়গাতেই যাওয়া উচিত ছিল। আপনাদের কোন পাত্র নেই, মেয়ে দেখতে আসাটা বাহানা মাত্র।

চারজনেই রাগবার চেষ্টা করে, বাড়িতে ডেকে পাঠিয়ে আমাদের এইভাবে অপমান করা? ঠিক আছে রতনবাবুকে বলে—

—কি আর করবেন, তার দালালির পয়সাটা না-হয় নাই দেবেন। মুখে আপনাদের শুধু বড় বড় বুলি, শিক্ষার বড়াই, স্ত্রী স্বাধীনতার কথা আগেও যেমন সমাজটা ছিল পুরুষ জানোয়ারের রাজত্ব আজও তাই আছে—আপনারা জানোয়ার।

লোকগুলো অসম্ভব রেগে হাত পা ছুঁড়ে কবিতার চোদ্দ পুরুষ তুলে গালাগাল দিতে দিতে বেরিয়ে চলে গেল।

ভয়ে ভয়ে কবিতার অসুস্থ বাবা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন কি হল রে?

কবিতা নিষ্ঠুর হল, বলল, দরে পোষাল না, তাই অন্য মেয়ে খুঁজতে গেছে।

—কি বলছিস?

কবিতার আকুতি, আর এভাবে আমাকে অপমান ক'রো না। আমি কালো, আমি বিশ্রী, আমি মুখ্যু, সব জানি। কিন্তু বার বার আমাকে এভাবে খোঁচা দিয়ে মনে করিয়ে দিয়ে কি লাভ? দোহাই তোমাদের, আমার বিয়ের কথা ভুলে যাও। চাকরি করে রোজগার করে তোমাদের খাওয়াব, যতটুকু পারি করব। ব্যস্ আর কিছু আশা ক'রো না, আমাকে নিজের মত থাকতে দাও, মিছি মিছি বিরক্ত ক'রো না।

কাঁদতে কাঁদতে কবিতা গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল। মা এসে বসলেন মাথার কাছে। আস্তে আস্তে মেয়ের কপালে হাত দিলেন, দু' চোখ বেয়ে তাঁর জলের ধারা নামছে, নিজেকেও তিনি সংযত রাখতে পারলেন না। কারুর জন্যেই তো কিছু করতে পারেন নি। বড় সাধ ছিল কবিতার একটা বিয়ে হয়, জামাই আসে। এ সাধও অপূর্ণ থেকে যাবে। এই অক্ষমতার অশ্রু টপটপ করে চোখ দিয়ে পড়তে লাগল। উনি তো মোছবার চেষ্টা করলেন না, ধরা গলায় একবার জিজ্ঞেস করলেন, আজ রায়বাবুদের বাড়ি কীর্তনের বড় আসর বসছে, শুনতে যাবি?

কবিতা কোন উত্তর দিল না।

—তুই গেলে আমি যেতাম।

—তুমি যাও না, ঘুরে এস।

—না। গেলে তোকে নিয়ে যাব।

কবিতা মায়ের চোখের দিকে তাকাল। সে কি অপরিসীম বেদনার ভাষা, একটা অব্যক্ত অনুভূতি। কবিতা মায়ের হাতটা ধরে সমবেদনাভরা গলায় বলল, বেশ যাব।

বহুদিন বাদে এক হতভাগিনী মা তার অভিমানী মেয়েকে কোলের ওপর টেনে নিলেন। (ক্রমশ)

প্যারিসের রাস্তায় আগুনে-পোড়া মোটর গাড়ি

প্যারিসের চিঠি

প্যারিস, ২৪ মে, ১৯৬৮

বহুদিন আপনাদের কাছে চিঠিপত্র লিখিনি, প্যারিসের খবরও দেওয়া হয়নি বছর দুই। তার কারণ সে সময় আমি প্যারিসে ছিলাম না। এই মাসের গোড়ার দিকে ফরাসী সরকার ও ফরাসী বিদ্যুৎ-শিল্প ফেডারেশনের আমন্ত্রণে আবার প্যারিসে এসেছি এখানে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক বিদ্যুৎশিল্প প্রদর্শনীতে উপস্থিত হতে। পৃথিবীর অন্যান্য আট-দশটি দেশের প্রতিনিধিরাও এসেছেন।

প্যারিসের ও ফরাসী জীবনের অনেক পরিবর্তন হয়েছে লক্ষ করেছি। দু বছর খুব বেশী দিন নয় একটা গতিশীল জাতির পক্ষে, কিন্তু এই অল্প সময়েও যে পরিবর্তন হয়েছে সেটা বিশেষ অনুধাবনের যোগ্য। সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য হয়েছি যুবসাধারণের আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন লক্ষ করে। হয়ত সারা ইউরোপব্যাপী যুব-সমাজের ভেতরে যে একটা আলোড়ন চলেছে ফরাসী যুবসমাজের মধ্যে তারই ঢেউ এসে লেগেছে। হয়ত সমস্যার গুরুত্ব এখানে তার চাইতেও বেশী। প্রশ্ন হচ্ছে—যুবমনের এই আলোড়ন, আশা আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ বিশেষ সতর্কভাবে ও সহানুভূতিশীল মন নিয়ে বিচার করা হচ্ছে কিনা। লক্ষ করা হয়েছে—ইউরোপের প্রতিটি দেশেই যেখানে সম্প্রতি যুবসাধারণের "বিদ্রোহ" হয়েছে সেখানে যুবক সমাজ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন দাবী করেছেন। যুবক সমাজের নিজেদের অবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের দাবী তো রয়েছেই। তবে আরো লক্ষ করার বিষয় ছাত্র ও যুবক সমাজের দাবীগুলির মধ্যে সব সময় উদ্দেশ্য পরিষ্কার নয়। ঠিক যে তারা কি চাচ্ছেন সে সম্পর্কে তাঁদের ধারণা পরিষ্কার নয়। প্যারিসের ছাত্র-বিদ্রোহের কয়েকটি নেতাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করে ঠিক স্পষ্ট জবাব পাইনি। বর্তমান সামাজিক কাঠামো ও সমাজ ব্যবস্থা আজকের দিনের উপযুক্ত নয়—তাকে ভেঙে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়তে হবে—এই হোল তাদের দাবী। মুশকিল হয়েছে দেশের সরকারও সব সময় সহানুভূতিশীল হয়ে ছাত্রদের প্রশ্নগুলি বিচার করেননি, ফলে অবস্থার অবনতিই হয়েছে। প্রাগে হাঙ্গামা হয়েছে, বার্লিনে ছাত্র-পুলিশে মারামারি হয়েছে, প্যারিসে 'ব্যারিকেড' হয়েছে।

ফরাসী দেশের সমস্যাটি একটু স্বতন্ত্র ধরনের। এখানে ছাত্র বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাও দেখা দিয়েছে। আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না, আমার "প্যারিসের চিঠি"তে অনেক দিন আগে ফরাসী দেশের ছাত্র সমস্যা সম্বন্ধে জানিয়েছিলাম আপনাদের পাঠক-পাঠিকাকে। সেদিনই যে সমস্যার বাস্তব রূপ লক্ষ করেছিলাম আজ তাই গুরুতর আকার ধারণ করে বিদ্রোহে ফেটে পড়েছে। "কার্তিয়ে লাত্যাঁ"র বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম সাংঘাতিক সেই বিদ্রোহের রূপ। রাস্তার বিভিন্ন অংশ সম্পূর্ণ তুলে সেখানে আগুনে পোড়া মোটর গাড়ী, রাস্তার ফুটপাথ থেকে কেটে আনা বড় বড় গাছ, ল্যাম্পপোস্ট দিয়ে সুদৃঢ় ব্যারিকেড রচনা করে তার পিছনে দাঁড়িয়ে সারা রাত পুলিসের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ করেছে ছেলেরা। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় "সরবন" ও তার সমস্ত কলেজ ও ইনস্টিটিউটগুলো দখল করে ফরাসী সরকারের শিক্ষা-নীতির সমালোচনা করেছে ছেলেরা। প্রত্যেকের মুখেই এক কথা ১৭৮৯ সালের বিপ্লবের পর আবার ফরাসী বিপ্লব শুরু হোল। আরো একটা বিষয় লক্ষ করতে হবে। ছাত্রদের এই বিদ্রোহের যে শান্তি-পূর্ণ ভাব ভেঙে চুরমার হয়েছে প্রচণ্ড তাণ্ডবে তার পেছনে রয়েছে কিছু এ্যানার্কিস্ট, কিছু রাজনৈতিক মতলববাজের কার্যকলাপ, কিছুটা পুলিশের হঠকারিতা। শিক্ষা ব্যবস্থা, পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন হবে কিনা অথবা কিভাবে হবে সেটা আলোচনার বিষয়। 'সরবন' বিশ্ববিদ্যালয়ে আর তিল-ধারণের জায়গাও নেই সেটা সত্যি, কিন্তু তাই বলে সমস্ত সমাজ ব্যবস্থাই ভেঙে দিতে হবে অথবা ছাত্রদের বাড়ি পাঠিয়ে দেবার জন্যে পুলিশ গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ি দখল করে বসবে এটাও অনস্বীকার্য। তাই বোধ হয় ছাত্র বিদ্রোহ প্রকাশ্য রূপ নিল এবং ছাত্রদের নিগৃহীত হতে দেখেছেন তাদের শিক্ষকরা। তখন তাঁরাও ছাত্রদের সঙ্গে একসঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বিশ্বাস করুন, এরকম পঞ্চাশ হাজার ছাত্রছাত্রীর সরব প্রতিবাদ আগে দেখিনি। ছাত্র মিছিলের প্রথম সারিতে ছিলেন প্যারিসের বিখ্যাত নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত অধ্যাপক আলফ্রেড কাসলার, মোনো প্রভৃতি। জাঁ পল সার্ত্রও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সারা রাত হাঙ্গামার পর যখন আহত ছাত্রদের অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল রাত প্রায় চারটার সময় তখনও অধ্যাপক মোনো রাস্তায় দাঁড়িয়ে, বলছেন: আমার জায়গা তো ছেলেদের

পাশে। আমি কি করে ওদের ফেলে যাই।

ফ্রান্স, তথা প্যারিস শহর গত তিন সপ্তাহ থেকে বিশেষভাবে আলোড়িত হয়েছে। আজও তার শেষ হয়নি। বরং অবস্থা এত গুরুতর আকার ধারণ করেছে যে, যে কোন সময় রক্তাক্ত বিপ্লব বা গৃহযুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে।

ছাত্র বিদ্রোহের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সারা ফ্রান্সের শ্রমিক সাধারণ মজুরী বৃদ্ধি, কাজের সময় কমানোর দাবীতে ধর্মঘট করে বসে আছেন প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে। তিন সপ্তাহব্যাপী এমন অভূতপূর্ব ধর্মঘট আমি তো কোনদিন দেখিনি, আপনারা দেখেছেন কিনা জানিনা। সমস্ত ফরাসী জীবন নিস্তব্ধ হয়ে আছে। এবং সেটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ট্রেন, মেট্রো, ব্যাঙ্ক, সমস্ত কারখানা, সব কিছুই বন্ধ। ফলে লোকের হাতে টাকা নেই, দোকানে খাবার কমে এসেছে, গাড়িতে পেট্রোল নেই, সব কিছু বন্ধ ও একটা সর্বনাশের সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। অমন সুন্দর প্যারিস শহরে বিভিন্ন জায়গায় জঞ্জাল জমে পাহাড় হয়েছে, রাস্তায় রাস্তায় হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ গাড়ি পড়ে আছে। যারা পারছে হেঁটে অফিস আসছে। কিন্তু সবার মনেই একটা আতঙ্ক—এর শেষ কোথায়! বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কারখানার কর্মীরা ধর্মঘট করে প্রতিষ্ঠান দখল করে বসে আছেন, কোথাও কোথাও ডিরেক্টর ও ম্যানেজারদের "ঘেরাও" করে বন্দী করে রেখেছেন। বাংলা দেশের "ঘেরাও" এখানেও এসে পৌঁছেছে। শ্রমিক সাধারণও সমস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন চায়, দেশ শাসনের ব্যাপারে আরো অধিকার চায়, তাদেরও মতামত নিতে হবে সরকারকে।

আশ্চর্যের বিষয় ফরাসী সরকার এতদিন অবস্থা অনুধাবন করছিলেন, কোন রকম বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেননি। কিন্তু একটু একটু করে সমস্ত কিছুই স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পর অবস্থা যখন প্রায় আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে তখন প্রেসিডেন্ট দ্য গল স্বহস্তে ক্ষমতা নিয়েছেন, জাতীয় পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়ে নির্বাচনের আদেশ দিয়েছেন ও সামরিক বাহিনীকে সতর্ক থাকতে বলেছেন। প্যারিসের দিকে সেনাবাহিনী, ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে এগিয়ে এসে ঘিরে রেখেছে। প্রেসিডেন্ট দ্য গল গত সপ্তাহে ফরাসী জাতিকে বলেছিলেন জুন মাসে রেফারেন্ডাম হবে, তখন ফরাসী জাতি তাদের মতামত প্রকাশ করবেন তাঁরা দ্য গলের শাসন চান কিনা। কিন্তু অবস্থা এর মধ্যে এমন গুরুতর রূপ ধরেছে যে এর পর অপেক্ষা করা সমীচীন হবে না ভেবেই দ্য গল স্বহস্তে ক্ষমতা ধারণ করেছেন।

যাঁরা ফরাসী দেশের সঙ্গে পরিচিত ও ফরাসী জাতির সমস্যার অনুধাবন করে এসেছেন গত দশ বছর ধরে, তাঁরাই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে যুদ্ধের পর ফরাসী দেশের শোচনীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার হাত থেকে বাঁচিয়ে প্রেসিডেন্ট দ্য গল ফরাসী দেশকে একটা বিশেষ সম্মানের আসনে বসিয়েছিলেন। রাজনৈতিক মতামতের কথা ছেড়ে দিন, অর্থনৈতিক ও পররাষ্ট্রের ব্যাপারে ফরাসী জাতি একটা স্বাধীন সত্তা পেয়ে তার মতামত প্রকাশ করেছে ও স্বীকৃত হয়েছে বিশ্বের দরবারে। সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তনের প্রয়োজন হলেও যে এভাবে সমস্ত কিছু ভেঙ্গে দাঁড়িয়ে সেই পরিবর্তন আনতে হবে তার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু আজ ফ্রান্সের যে অবস্থা হয়েছে তাতে হয়ত সবকিছুই, এই গত দশ বছরের একটা জাতির সমস্ত প্রচেষ্টা, সমস্ত কীর্তি নষ্ট হয়ে যাবে রাজনৈতিক দলাদলির সামনে।

গত দশ বছর ধরে অর্থনৈতিক ও ও শিল্পপ্রচেষ্টায় ফ্রান্স যেভাবে এগিয়ে গিয়ে ইউরোপ ও বিশ্বের অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যে একটি শীর্ষ স্থান অধিকার করে একটি স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি মেনে চলেছিল হয়ত তার সবকিছুরই শেষ হয়ে যাবে এই গত তিন সপ্তাহের শ্রমিক ও ছাত্র বিদ্রোহের ফলে। ফরাসী দেশের যাঁরা বন্ধু তাঁরা সবাই দুঃখিত হবেন সেরকম অবস্থায়।

আজকে এখানেই শেষ করি, পরে আরো কয়েকটা চিঠিতে সমস্ত অবস্থাটার পর্যালোচনা করার ইচ্ছে রইল।

প্যারিস থেকে সমস্ত বিমান ও অন্যান্য যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায় আমি প্যারিস থেকে ব্রাসেলস হয়ে লণ্ডন পৌঁছই, সেখান থেকে বার্লিনে এসে এই চিঠি শেষ করে পোস্ট করছি।

অজিতকুমার দাস

লক্ষ্মীর কৃপালাভঃ বাঙালীর সাধনা

কাচশিল্প—দ্বিতীয় পর্ব ঃ হলো-ওয়্যার কাচের কারখানা ।

গ [illegible]

[illegible] নিবন্ধ [illegible] সঙ্গে সঙ্গে [illegible] আমার নিবন্ধ সংশোধ কিছু কিছু জুড়ে দিলাম।

(১) অভিভাষণের গোড়াতেই সভাপতি মশায় ভারতে কাচশিল্পের ক্রমবিকাশের বিবরণ দিয়েছেন। ১৯৫০ সালে আমাদের উৎপাদিত কাচ পণ্যের ওজন ছিল ৫০ হাজার টন। ১৯৬৬-তে তা এসে দাঁড়িয়েছে ৩ লক্ষ টনে।

(ভারতে কাচের উৎপাদন এখন কেবল যে চাহিদা-বরাবর তাই-ই নয়, কয়েকটি কাচপণ্যের উৎপাদন প্রয়োজনের অতিরিক্তও হচ্ছে। রামায়ণের কাল থেকে আজ পর্যন্ত রমণীকুলের আদরের পদ্ধতি তৈরি থেকে শুরু করে শিশিবোতল, গেলাস-বাটি হ্যারিকেন লণ্ঠনের চিম্নির মতো হলো-ওয়্যার কাচ, কাচের পাত ও আয়নার মতো শীট বা ফ্ল্যাট কাচ, বীক্ষণ ও চশমার কাচ এবং নিউট্রাল ও উচ্চতাপসহ কাচ—সবই এখন ভারতে প্রস্তুত হচ্ছে। কাচ-শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্প। অধিকাংশ কাচের কারখানাই বাংলা, মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত। ১৯৬৬ সালে ১২৩টি ভারতীয় গ্লাস ফ্যাক্টরীতে মোট ২২ কোটি টাকা লগ্নি ছিল আর উৎপাদিত কাচের দাম দাঁড়িয়েছিল ১৮ কোটি টাকায়। এই হিসেবের মধ্যে আবার কলকাতার [illegible] দুটি এবং মহাত্মা গান্ধী [illegible] দুটি অঞ্চলের হোমিওপ্যাথিক ওষুধের কিংবা আতরের শিশি তৈরীর কুটিরশিল্পের পরিসংখ্যান অন্তর্ভুক্ত নয়। উত্তরপ্রদেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের পাঁচ [illegible] কুটিরশিল্পের হিসেবও ধরা হয়নি।)

(২) সভাপতি মহাশয় বলছেন যে বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে মাত্র বছর বিশেকের মধ্যে ভারতীয় কাচশিল্পের বিরাট সম্প্রসারণ হলো বটে, কিন্তু তা হতে না হতেই এল মন্দা ও শিল্পসংকট।

(সম্প্রসারণের মধ্যে আবার প্রধান একটি গলদ রয়ে গেল। স্থাপনার সময়ে বর্তমান কাচশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই ছিল আয়তনে ক্ষুদ্র, যন্ত্রপাতিতে সেকেলে, অথচ সংখ্যায় অনেক। কাজেই অল্পকালের মধ্যেই ঊর্ধ্বগতি পড়তার সঙ্গে তাল রাখা এইসব ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। সংকট আরও ঘনীভূত হলো ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধে, যার পরিণামে ভারত থেকে পাকিস্তানে রপ্তানি গেল বন্ধ হয়ে। উদাহরণ ঃ শুধু কৃষ্ণ গ্লাসেরই হলো-ওয়্যার কাচের পাকিস্তানে রপ্তানি বছরে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা কমে গেল। সায়ান্টিফিক কাচ অথবা শীট-গ্লাসের মতো দামী জিনিসের রপ্তানি ৯ লক্ষ টাকা কম হলে তেমন কিছু হতো না, কিন্তু শিশিবোতলের বেলায় এই হ্রাস দারুণ ক্ষতির ব্যাপার হলো। কৃষ্ণ গ্লাস শ্রেণীর আধুনিক যন্ত্র সংবলিত প্রতিষ্ঠানগুলির কম পড়তার জন্যে এই চোট সামলে নিল, কিন্তু ছোটদের প্রায় স্বাস্রোতের উপক্রম হলো।)

(৩) সাগরপারে রপ্তানির অন্তরায় সম্বন্ধে সভাপতি বিভূতি সরকার মশায় বিশেষ যে কারণের উল্লেখ করেছেন তা হলো আন্তর্জাতিক জাহাজ-ভাড়া বৃদ্ধি। মাসুল, বীমা খরচ ইত্যাদি খুব বেশী বেড়ে গেছে। তাই ডিভ্যালুয়েশনের পরেও ভারতীয় কাচের দাম এত বেশি হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আমাদের বড়ো বড়ো গ্লাস ফ্যাক্টরীর পক্ষেও অসম্ভব।

(লোহার রপ্তানিতে যেমন সরকারী সাহায্য আছে, কাচেও তেমনি আছে, কিন্তু বিশ্বের বাজারে এই বড়ো প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে [illegible] হলে কাচ-শিল্পের সাহায্য [illegible] বাড়াতে হবে। সুবিধা দরে ভারতীয় কাচ পেলে [illegible] দেশেরা ইওরোপীয় কাচ না কিনে নিশ্চয়ই তাই-ই কিনবে। বিশেষ করে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য-চুক্তিগুলির জন্যেই এতে [illegible]

আগ্রহ; কিন্তু অন্যায্য দরে তো তারা কিনবে না।)

(৪) বিভূতিবাবু তাঁর ভাষণে আরও বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক বিভাগের (এক্সাইজের) নাকি একমাত্র কাজ হলো যে, গ্লাস ফ্যাক্টরীগুলি যতদিন ধুঁকে ধুঁকে টিকে থাকে ততদিন জিজিয়া-করের মতো করে ছোট বড়ো সকলের কাছ থেকে ১৫ পারসেণ্ট শুল্ক আদায় করে যাওয়া। শুল্কনীতির নিয়মকানুনের পরিবর্তন খুবই জরুরী। অন্যান্য শিল্পে যেমন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের শুল্কের হারে কম বেশি আছে কাচশিল্পে সে-সব নেই। ফেডারেশন এই অন্যায়ের প্রতিকারের চেষ্টা করছেন।

(কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম যখন কাচের ওপর এক্সাইজ ডিউটি বসান, তখন হিসেব করেছিলেন যে, এই খাতে বড়ো জোর বিশ-ত্রিশ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে; এখন কিন্তু আড়াই কোটি টাকারও বেশি পেয়েও সরকার বাহাদুর কিছুটা ছেড়ে দেওয়ার কথায় কর্ণপাত করতে নারাজ।)

(৫) ইমপোর্টেড কেমিক্যালের ব্যাপারে সভাপতি মশায় একটি উদাহরণ দিয়েছেন।

কাচশিল্পে অত্যাবশ্যক সোডিয়াম নাইট্রেট-এর আমদানি ও বিতরণের একচেটিয়া অধিকার হলো S. T. C. অর্থাৎ 'স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন' নামক আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের। আমদানিতে S. T. C.-র যা পড়তা দাঁড়ায়, ভারতের গ্লাস ফ্যাক্টরীগুলি খোলা বাজার থেকে তার বেশ কয়েক গুণ বেশী দামে সেই কেমিক্যাল কিনতে বাধ্য হয়। কেন্দ্রীয় সরকার কাচশিল্পকে এতকাল সরাসরি সোডিয়াম নাইট্রেট আমদানি করার লাইসেন্স দেননি। ফেডারেশন আশা করছেন যে, এবারে তাঁরা কিছু কিছু 'অ্যাকচুয়াল ইউজার্স লাইসেন্স' পাবেন। এই সোডিয়াম নাইট্রেট-এর বদলে দেশে উৎপন্ন পোটাসিয়াম নাইট্রেট ব্যবহার করা যেতে পারতো, কিন্তু তার বাজার দরও যে কেন খুব উঁচু সে কথা বিভূতিবাবুরা বুঝতে পারেন না।

(বোঝা খুব শক্ত নয় বোধ হয়: এটা হলো সরকার উৎসাহিত কালোবাজারী কারবার।)

উপসংহারে সভাপতি মশায় 'কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণাগার' অর্থাৎ C. G. C. R. I.-এর কর্মসূচীর সাধুবাদ করে বলেছেন যে, এর কর্তৃপক্ষ কাচ, চীনেমাটি ও এনামেলের পণ্য উৎপাদন বিষয়ে নীরবে যে কাজ করে এসেছেন ও করছেন তা অতুলনীয়। পড়তা কমের দিকে রেখে উৎপাদনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাত্ত্বিক ও প্রয়োগগত বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সি. জি. সি. আর. আই. ভারতীয় কাচ-শিল্পকে সর্বদাই সাহায্য করেন।

সি. জি. সি. আর. আই.-এর উৎপত্তি হয়েছিল ১৯৫০ সালের অগাস্ট মাসে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মশায় তখন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী ছিলেন। প্রথমে এই গবেষণাগারটিকে বোম্বাইয়ে স্থাপনার জন্যে পশ্চিম ভারত থেকে ভীষণ চাপ দেওয়া হয়েছিল। অনেক টানাপোড়েন সত্ত্বেও শ্যামাপ্রসাদ খুব শক্ত হয়ে থেকেছিলেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ডক্টর মেঘনাদ সাহা ও ডাক্তার বিধান রায়। তার ফলে গবেষণাগারটি কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হলো। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁদের জমি থেকে এই সংস্থাকে কয়েক বিঘা জমি দেবার পর সেখানে এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হলো। এটিকে গড়ে তোলার কাজে এর প্রথম ডিরেক্টর ('কাউন্সিল অব সায়ান্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ'-এর বর্তমান ডিরেক্টর-জেনারেল) ডঃ আত্মারামের অবদান উল্লেখযোগ্য। শ্রী কে ডি শর্মা এখন এর ডিরেক্টর। এই গবেষণাগারের বর্তমান কার্যকলাপ সম্বন্ধে গত সপ্তাহেও আপনাদের কিছু বলেছি এবং ভবিষ্যতেও বলার সম্ভাবনা আছে।

এই সব সুপরিচালিত গবেষণাগারের কথা শুনলে মনে হয় যে, সরকার বাহাদুর এটুকু করেই ক্ষান্ত হন না কেন—শিল্প-বাণিজ্যে হাত পাকাতে গিয়ে দেশের এত ক্ষতি করেন কেন! গবেষণাগার সুপরিচালিত হবার কারণ হলো যে, স্বধর্মে অধিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিকরা এখানে কাজ করেন; আই-সি-এস কিংবা আই-এ-এস হয়ে ইস্পাতের কারখানা বা শিল্প-প্রকল্প চালানো—মানে, আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর রাখার চেষ্টা বৈজ্ঞানিকরা সাধারণত করেন না। অবশ্য সরকারী সংস্থার পরিচালকের স্থলাভিষিক্ত সব সিভিলিয়ানকেই অকর্মা বললে অন্যায় হবে; দু'চারজন অপূর্ব কর্মক্ষম ব্যক্তিকেও আমরা সেই গোষ্ঠীতে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মতো হঠাৎ হঠাৎ পেয়ে যাই।

এক বিদ্যায় পাণ্ডিত্য লাভ করে অন্য ক্ষেত্রে উদ্যম ও অধ্যবসায় দ্বারা সফল হওয়ার গুণ সচরাচর দেখা যায় না। এইরকম গুণী লোকের সংখ্যা খুব কম।

কৃষ্ণা গ্লাস-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার সেই কচিৎ দৃষ্ট ব্যক্তিদের একজন।

বিভূতিভূষণ চট্টগ্রামের লোক—অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম যেখানে এককালে বাঙালী হিন্দু হয়ে জন্মানো যেমন পরম গৌরব ছিল তেমনি ছিল বিভীষিকা। স্কুলের উঁচু ক্লাসে উঠতে না উঠতেই ব্রিটিশ পুলিসের গোয়েন্দারা প্রতিটি ছেলে ও মেয়ের ওপর শ্যেন দৃষ্টি রাখতো। তা সত্ত্বেও অবশ্য সূর্য সেন আর প্রীতি ওদেদার-রা ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বাক্ষর রেখে গিয়েছিলেন।

স্কুলে পড়ার সময় থেকেই ছাত্রনেতা হিসেবে বিভূতিভূষণ পুলিসের নির্যাতন ভোগ করতে আরম্ভ করেন। 'অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের' সময়ে তাঁর বয়স ছিল মাত্র দশ কি এগারো। আর একটু বড়ো হলে বিভূতিভূষণ কি করতেন তা আন্দাজ করা যায়। তার তিন বছর পরে ১৯৩৩ সালে কৈশোরে উপনীত হওয়ামাত্রই তিনি গ্রেপ্তার হলেন। তেত্রিশ থেকে ছত্রিশ সাল পর্যন্ত তিনি বর্মার আকিয়াব শহরের ধারাওয়াড়ি সেন্ট্রাল জেলে আটক রইলেন অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পলাতক আসামী হরিপদ মহাজনের সঙ্গে ব্রহ্মদেশে যোগাযোগ রাখার অপরাধে। জেলের মধ্যেও বিভূতিভূষণ এক আন্দোলন চালালেন। কারাগারের মধ্যেই তাঁকে পড়াশোনা করতে দিতে হবে। সেই অধিকার আদায়ের জন্যে তিনি অনশনও করেছিলেন।

১৯৩৬-এ জেল থেকে বেরোবার দু' মাস পরেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে বিভূতিভূষণ ভালোভাবেই পাস করলেন। মেধাবী

ছাত্র ছিলেন; তাই পর পর আই এস-সি-তে দ্বিতীয়, বি এস-সি-তে প্রথম ও এম এস-সি-তে দ্বিতীয় হলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ হবার পর তিনি আই-সি-এস ও ফাইনান্স পরীক্ষা দেবার অনুমতি প্রথমটায় পেয়েছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক অপরাধী ছিলেন বলে পরীক্ষার অব্যবহিত আগে ব্রহ্ম সরকারের বিরুদ্ধে রিপোর্ট পৌঁছবার জন্যে সেই অনুমতি নাকচ হয়ে গেল। রাজদ্রোহীর হাতে রাজকার্যের ভার দিতে কোন্ সম্রাট চাইবে? ব্রিটিশ সরকারকে দোষ দেওয়া চলে না।

কিন্তু যার প্রতিভা আছে ভাগ্য তার অনুকূল হলে কে তার উন্নতি রুখতে পারে?

চট্টগ্রামের বাঙাল বিভূতিভূষণ খাস কলকাতার বাসিন্দা এক বিশিষ্ট চিকিৎসক স্বর্গীয় ডাক্তার কুমুদনাথ ঘোষের নজরে পড়ে গেলেন। বিভূতিবাবু কুমুদনাথের ছেলেমেয়েদের গৃহশিক্ষকতা করতেন। সুদর্শন বিদ্বান্ ছেলেটিকে কুমুদবাবু এবং তাঁর পরিবারের সকলে ভালোবেসে ফেললেন। বিদ্যা বুদ্ধি ও দীপ্তিমান চেহারা ছাড়া বিভূতিবাবুর আর কোনো সম্বল তখন ছিল না।

কুমুদবাবু তাঁকে চাকরির মায়া ত্যাগ করে কাচশিল্পে উৎসাহ দিলেন। কুমুদবাবুর একাধিক চেম্বারের মধ্যে ক্যানিং স্ট্রীট অঞ্চলে একটি চেম্বার ছিল। তার আশেপাশে অসংখ্য কাচের ব্যাপারীদের দোকানপাট ছিল আর রোগীদের মধ্যেও অনেকে কাচের ব্যবসা করতো। তাঁদের কাছ থেকেই কুমুদনাথ কাচের বাজার সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছিলেন এবং এই শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যেই কুমুদবাবু বিভূতিবাবুকে উৎসাহ দিলেন। কেবল বাচনিক অনুপ্রেরণাই নয় কুমুদনাথ বিভূতিবাবুকে নগদ ছ' হাজার টাকা ধার দিলেন এবং যাদবপুরে তাঁর নিজের জমিতে একটা গ্লাস ফ্যাক্টরী স্থাপনার পরামর্শ দিলেন। ১৯৪৩ সালে বিভূতিভূষণ কৃষ্ণা গ্লাস কোম্পানীর গোড়াপত্তন করলেন জনা বিশেক কর্মী নিয়ে।

'কৃষ্ণা' নামটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। বিভূতিবাবুর স্ত্রী, কুমুদনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা কৃষ্ণা দেবীই এই নামের উৎস। অবশ্য গ্লাস কোম্পানীটির উৎপত্তি বিভূতিবাবুর সঙ্গে কৃষ্ণা দেবীর বিবাহের আগে; অতএব নামকরণটি পূর্বরাগরঞ্জিত না অনুরাগসিঞ্চিত তা আমার জানা নেই, কারণ বর্তমান প্রবন্ধ রচনাকালে বিভূতিবাবু এবং কৃষ্ণা দেবী, উভয়েই কলকাতায় অনুপস্থিত। তবে ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ শুনে মনে হয় আগেরটাই ঠিক।

অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সে এম এস-সি আর কাচশিল্পে একেবারে আনাড়ী বিভূতি সরকার সামান্য ৬০০০ টাকা ঋণ এবং অসামান্য প্রেরণা সম্বল করে কাজে নেমে পড়লেন। প্রেরণার উৎস ছিলেন কুমুদনাথ, যিনি নিজে ব্যবসায়ী না হয়েও বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে বিভূতিভূষণকে সর্বদাই উৎসাহ দিতেন।

বিভূতিভূষণের পিতা স্বর্গত ডাঃ ব্রজমোহন সরকার বর্মায় ডাক্তারি প্র্যাকটিস করতেন। তাঁর ওপরে বৃহৎ পরিবারের বোঝা ছিল বলে বিভূতিবাবু আর্থিক ব্যাপারে তাঁকে বিব্রত করতেন না।

এই সময়ে দুজন পরিশ্রমী বুদ্ধিমান যুবক বিভূতিবাবুর সহকারী হলেন। রামকমল ঘোষ (বর্তমানে কৃষ্ণা গ্লাস-এর বোম্বাই শাখার ম্যানেজার) এলেন উৎপাদনের তত্ত্বাবধানে, আর শ্যামাপদ বল (বর্তমানে কোম্পানীর সেলস্ ম্যানেজার) যোগ দিলেন বিক্রির সাহায্য করতে।

, দুপুরবেলায় কোম্পানীর ঠেলাগাড়িতে মাল চড়িয়ে বিভূতিভূষণ আর শ্যামাপদ যেতেন মুর্গিহাটায় মাল বেচতে। ফেরবার সময়ে কাঁচামাল সওদা করে সেই ঠেলাগাড়িতেই চাপিয়ে দেওয়া হতো। রাত্রে বিভূতিভূষণ যাদবপুরেই থাকতেন। কাচ তৈরির সেই ছোট চুল্লি অনির্বাণ জ্বলতো, তাই কখনই কাজের বিরাম থাকতো না।

এঁরা কঠোর পরিশ্রম করে দিনে দিনে কৃষ্ণা গ্লাসকে বাড়াতে লাগলেন। অবশেষে প্রতিষ্ঠানের কিছুটা শ্রীবৃদ্ধি হবার পর ১৯৪৬ সালে কৃষ্ণা গ্লাস লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত হলো; নাম হলো কৃষ্ণা সিলিকেট অ্যান্ড গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড।

এর পরে আর এক ব্যক্তি ডিরেক্টর হিসেবে যোগ দিলেন। তাঁর নাম শ্রীবিভূতিভূষণ মৌলিক। কাচের বাণিজ্যিক দিকটায় এঁর অভিজ্ঞতার জন্যেই বিভূতি সরকার এঁকে ডেকে নিলেন। আর এলেন বর্তমান চেয়ারম্যান শ্রীশান্তিময় সরকার, যিনি কৃষ্ণা গ্লাসের গোড়া থেকেই প্রধান কাঁচা মাল ভাঙা কাচের সরবরাহে নানাভাবে সাহায্য করতেন। ১৯৪৮ নাগাদ কোম্পানীর বর্তমান সেক্রেটারি শ্রীহিমাংশুবিমল সেন যোগ দিলেন। আরও পরে যোগ দিলেন বর্তমান ডিরেক্টর বোর্ডের অন্যতম সভ্য শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ। শ্রীমতী সরকারও ডিরেক্টর বোর্ডে আছেন।

কোম্পানীর প্রথম যুগের বিশ্বস্ত পরিশ্রমী কর্মীদের কর্তৃপক্ষ ভোলেননি। তাঁদের মধ্যে অন্তত একশ' জন আছেন যাঁরা এখন কোম্পানীর অংশীদার। কোম্পানী থেকে তাঁদের বিনামূল্যে শেয়ার উপহার দেওয়া হয়েছে তাঁদের অতীত শ্রমের পুরস্কার হিসেবে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ বিভূতি সরকার মশায় প্রথম থেকেই করেছিলেন। তিনি একটা নীতি স্থির করে নিয়েছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তু আর যাদবপুরের স্থানীয় বাঙালী যুবকদের কাজে ভর্তি করে কাচ তৈরি শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে।

কাচের শ্রমিক বলতে প্রাধান্য ছিল বিহারী ও উত্তরপ্রদেশের লোকের। এঁরা পুরুষানুক্রমে মুখ দিয়ে ফুঁকে অর্থাৎ

glass blowing করে হলো-ওয়্যার করতে অভ্যস্ত। উত্তরপ্রদেশে যে এখন থেকে আড়াই হাজার বছর আগেও কাচ তৈরি হতো সে বিষয়ে পরে বলছি। তখন যাঁরা কাচ-শ্রমিক ছিলেন এ'রা হয়তো তাঁদেরই উত্তরপুরুষ।

এখন অবশ্য কৃষ্ণা গ্লাসের তিন কারখানার অটোম্যাটিক ও সেমি-অটোম্যাটিক মেশিনের কাজে শ্রমিকদের সেই প্রাগৈতিহাসিক ফোঁকার কাজ আর করতে হয় না। সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত কাট্ গ্লাস ইত্যাদি কাচ বা সায়েন্টিফিক কাচের নানা প্রিসিশন কাজ এই বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের যুগেও নাকি ফুঁকে তৈরি করা ছাড়া উপায় নেই।

যাদবপুরের সেই ছোট্ট ফুঁকো শিশি-বোতলের কারখানাটি আজ প্রকাণ্ড রূপ নিয়ে ১৩০০ শ্রমিকের অন্ন-সংস্থানের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয় ইউনিট বোম্বাই শাখা ১৯৬০ সালে চালু হয়েছিল; সেখানে কৃষ্ণা গ্লাসের ফ্যাক্টরী ৬৫ বিঘা জমির ওপর অবস্থিত। বারুইপুরের অটোম্যাটিক ইউনিটটি ১৯৬৪ সাল থেকে চালু হয়েছে। সেখানেও জমি আছে প্রায় ৩০ বিঘা। তিন ইউনিটের কর্মিসংখ্যা এখন ২০০০ এরও বেশি আর তার মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা শতকরা ৭০।

সেদিন কৃষ্ণা গ্লাসের বারুইপুর শাখার বিরাট কারখানায় ১৩।১৪০০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড-এর গরম চুল্লির পাশে দাঁড়িয়ে কাচমণির জন্মপ্রস্তুতি দেখছিলাম—যেন জরায়ুর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট তপ্তবীর্য ভ্রূণের প্রাণসঞ্চারে ব্যাপৃত।

কাচমণি—'ভারতকোষ' বলছেন সংস্কৃত শাস্ত্রানুসারে কাচকে মণি বিশেষ বলিয়া গণনা করা হয়। কাচ ও স্ফটিক একই দ্রব্য (?)। স্ফটিকমণি সম্বন্ধে সংস্কৃত গ্রন্থে আছে: হিমালয়ে সিংহলে চ বিন্ধ্যাটবীতটে তথা স্ফটিকং জায়তে চৈব নানারূপং সমপ্রভম্। (লেখকের মন্তব্য: স্ফটিক আর কাচ এক নয়। প্রথমটি quartz, দ্বিতীয়টি silica-জাত।)

অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়ের 'হিস্ট্রী অব কেমিস্ট্রি ইন এনশেণ্ট অ্যান্ড মিডিয়েভাল ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের ৭৩/৭৪ পৃষ্ঠায় আছে: "কৌটিল্যের উক্তিতে কাচের পদ্ধতির উল্লেখ আছে। সুশ্রুত কাচ ও স্ফটিকের প্রভেদের উল্লেখ করেছিলেন। প্রাকৃতিক ইতিহাসের প্রণেতা রোম শহরের জ্যেষ্ঠ প্লিনি (প্লিনি দি এলডার) খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মাঝামাঝি লিখেছিলেন যে, ভারতবর্ষে তৈরী সাদা ও রঙীন কাচ সকল কাচের সেরা। মহাভারতে কাচের উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে স্থাপিত একটি কাচের কারখানা আবিষ্কৃত হয়েছে উত্তর-প্রদেশের কোপিয়া নামক স্থানে। উজ্জ্বল রঙীন ছোট ছোট কাচের পুঁতি এবং ১৮×১১×১২ ইঞ্চি মাপের একখণ্ড কাচও নাকি কোপিয়ার সেই কাচের কারখানায় পাওয়া গেছে" ইত্যাদি।

রামায়ণের কালেও কি কাচ ছিল? আমার এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধু সেদিন আমাকে সুন্দর একটি মারাঠী গান গেয়ে শোনালেন: তার কয়েক লাইন বাংলায় বলি:—এক বছরের খোকা শ্রীরামচন্দ্র পূর্ণিমার চাঁদ দেখে আব্দার ধরলেন যে সেটি এনে তাঁর হাতে দেওয়া চাই। কিছুতেই কান্না থামে না, প্রাসাদে মহা অশান্তি। খবর পেয়ে রাজা দশরথের অষ্ট অমাত্যের মধ্যে চতুরতম অর্থসচিব সুমন্ত্র ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে রামের সামনে একটি আয়না ধরে চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখানো হলো। হাতে চাঁদ পেয়ে খোকা রাম খুশিতে হেসে উঠলেন; সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যা নগরীতেও উঠল আনন্দের রোল।

তাহলে তো শ্রীরামচন্দ্রের কালেও কাচের আয়না তৈরি হতো।

একটি বিদেশী কিংবদন্তী:—আধুনিক সিরিয়ার সংলগ্ন পাহাড়ে জায়গার অতীতে নাম ছিল ফিনিশিয়া। সেখানকার বাসিন্দারা ছিল জাত-বণিক। তারা বাণিজ্যতরী নিয়ে ভূমধ্যসাগরের বন্দরে বন্দরে বাণিজ্য করে বেড়াতো খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকেও। একবার ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে নৌকো ভিড়িয়ে তাদের একদল সাগরবেলার বালির ওপরে দুটি চুণা পাথরের ঢিবি কুড়িয়ে এনে রান্না চড়িয়েছিল। রন্ধনপর্বের পরে লোকগুলি দেখে যে চুল্লির উত্তপ্ত পায়া দুটির সঙ্গে গলিত বালুকণা মিশে কী যেন এক স্বচ্ছ বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে। সেটিই নাকি প্রথম কাচ। ফিনিশীয়রা সেই কাচের প্রচলন করে দিল মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ ইওরোপ ও উত্তর আফ্রিকাতে।

এ ছাড়াও প্রাচীন অ্যাসিরিয়া ও মিশরে কাচের বহুল প্রচলন ছিল বলে ঐতিহাসিকরা বলেন।

ইতিহাস বাদেও কিংবদন্তীরও সবটাই সত্যি হতে পারে; কারণ, সাধারণ কাচ তৈরি করা খুব কঠিন কাজ নয়। বালি অর্থাৎ সিলিকাই হলো কাচের প্রধান উপাদান। সঙ্গে লাগে চুণাপাথর ও সোডা। এমন কি, শুধু বালিকেও যদি প্রচণ্ড ২০০০ সেণ্টিগ্রেড তাপে গালানো যায় তো তার থেকে একরকম অনচ্ছ কাচ তৈরি হয়ে যায়। অতটা তাপসঞ্চার করা কঠিন বলে উপযুক্ত অন্য উপাদান, সোহাগা (বোর‍্যাক্স) ইত্যাদি মেশানো হয়। তাতে তাপ কম লাগে।

রঙীন কাচ করার জন্য ব্যবহৃত হয় নানা রঙের অক্সাইড।

ভারতে সওয়া-শ' আর বাংলা দেশে গোটা কুড়িক কাচের কারখানার মধ্যে এই মুহূর্তে পুরোপুরি বাঙালীর মালিকানায় আছে মাত্র ৬টি। সিগকল এবং নিউ ইণ্ডিয়ান গ্লাস ওয়ার্কসের কথা গতবারে লিখেছি আর কৃষ্ণার বিষয়ে তো বলছি-ই। এগুলি বাদে আরও যে তিনটি বাঙালী প্রতিষ্ঠান আছে তার নাম ও বাৎসরিক উৎপাদনের একটি ছোট হিসেব নীচে দিচ্ছি:—

নাম	বার্ষিক উৎপাদনের আনুমানিক দাম
ক্যালকাটা গ্লাস অ্যান্ড সিলিকেট ওয়ার্কস (১৯৩৬) প্রাঃ লিঃ	৩০ লক্ষ টাকা
গীতা গ্লাস ওয়ার্কস লিঃ	১২ লক্ষ টাকা
মেট্রো গ্লাস ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ	১৮ লক্ষ টাকা

এদের মধ্যে প্রথম দুটি প্রতিষ্ঠান সাধারণ শিশি-বোতল প্রভৃতি হলো-ওয়্যার-এর কারখানা। মেট্রো গ্লাসে নিউট্রাল অর্থাৎ অম্ল ও ক্ষারের প্রভাবমুক্ত কাচ তৈরী হয়। নিউট্রাল কাচে ইনজেকশনের অ্যামপিউল, ব্লাড ব্যাংকের রক্তের বোতল প্রভৃতি তৈরী হয়।

প্রাচীনতম বাঙালী প্রতিষ্ঠান ধীরেন্দ্রনাথ ও ফণীন্দ্রনাথ সেন মহাশয়দের নিউ ইণ্ডিয়ান গ্লাস-এর বার্ষিক উৎপাদন আনুমানিক ১৯ লক্ষ টাকার।

বেঙ্গল ল্যাম্পও এক হিসেবে কাচের কারখানা। বিজলী বাতির খোল তৈরি করেন বলে আংশিকভাবে এ'দেরও গ্লাস ফ্যাক্টরী বলতে হয়।

কৃষ্ণা গ্লাস-এর ক্রমবিকাশের রূপ নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি থেকেই প্রতীয়মান:—

সর্বভারতীয় ১৮ কোটি টাকার কাচ বিক্রির মধ্যে এক কৃষ্ণা গ্লাস-এরই হচ্ছে ১২ কোটি টাকা; আর ৩ লক্ষ টনের মধ্যে কৃষ্ণার বার্ষিক উৎপাদন হচ্ছে প্রায় ১৮০০০ টন।

কৃষ্ণা গ্লাস সম্বন্ধে তথ্যগুলি পেলাম এ'দের তরুণ প্রচার সচিব শ্রীশিশির গুহর কাছ থেকে।

অটোম্যাটিক মেশিনে কাচ উৎপাদন দেখার লোভে সেদিন কৃষ্ণা গ্লাসের বারুইপুর ফ্যাক্টরী পরিদর্শনে গেলাম। সুপরিকল্পিত এই অতি আধুনিক কারখানার পরিচালনায় আছেন সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীসত্যরঞ্জন ঘোষ। ইনি জার্মেনি ও বেলজিয়ামে গ্লাস টেকনোলজি শিখে এসেছেন। বয়সে ইনিও তরুণ। এ'র সহকারী হিসেবে আছেন দক্ষিণ ভারতীয় গ্লাস-টেকনোলজিস্ট শ্রী এস আর সীতারাম আর আছেন চীফ এঞ্জিনীয়ার শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

সাল	বিক্রি	
১৯৪৬-৪৭	৩,৯০,০০০ টাকা	(কেবল যাদবপুরের উৎপাদন)
১৯৫৮-৫৯	২৪,১৭,০০০ টাকা	(কেবল যাদবপুরের উৎপাদন)
১৯৬৩-৬৪	১,৩৫,৪২,০০০ টাকা	(তিন কারখানার উৎপাদন)
১৯৬৬-৬৭	১,৪৬,৫০,০০০ টাকা	(তিন কারখানার উৎপাদন)

অতিকায় স্বয়ংক্রিয় মেশিনগুলির বৃহত্তমটি আমেরিকান যন্ত্র। এই মেশিনে মিনিটে ৩/৪ ডজন করে শিশিবোতল তৈরি হয়। পাশের ছোট মেশিনগুলির কিছু কিছু পার্টস ছাড়া বাকী সবই নাকি এ'দের নিজস্ব মেশিনশপ-এ তৈরি। অনেকগুলি লেদ ও অন্যান্য মেশিনে ভরা এই বিভাগটিও দেখতে সুন্দর। সঙ্গে আবার একটি ঢালাই বিভাগও আছে।

নানা রঙের নানা মাপের শিশিবোতলগুলি তৈরি হয়ে বেরোতে না বেরোতেই তার মধ্য থেকে কয়েকটা তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগে। খারাপ জিনিস যেন খরিদ্দারের ঘরে না পৌঁছয় তার জন্যেই এই সতর্কতা।

কিন্তু সত্যরঞ্জনকে এইসব মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা বিষয়ে বিশেষ প্রশ্ন করাতে তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। সংক্ষেপে বললেন, "গত বছর থেকে এখানে গো-স্লো, স্ট্রাইক, ঘেরাও—সবই শুরু হয়েছে। একশ'-টার জায়গায় এখন মাল তৈরি হচ্ছে পঞ্চাশটা।"

কৃষ্ণা গ্লাস-এর একুশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন শান্তি চুরমার করে দিয়েছে সাতষট্টির শ্রমিক আন্দোলন আর ঘেরাও। বহুদিন ধরে যাদবপুর ও বারুইপুরের দুটি

ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলাতে কৃষ্ণা গ্লাস উন্নতি করতে পেরেছিল। সেখানে আজ গজিয়েছে আরও তিনটি ইউনিয়ন—সবাই উগ্র বামপন্থী। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্টরা দুই কারখানায় নতুন দুই ইউনিয়ন গড়েছেন আর সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার বারুইপুরে অতিরিক্ত একটি ইউনিয়ন চালু করেছেন। পাঁচ সংঘের পঞ্চতিক্ত রসায়ন শুধু যে কর্তৃপক্ষকে জেরবার করছে তাই নয়, শ্রমিকগোষ্ঠীকেও করে তুলেছে আর এক যদুবংশ।

গত বছর সত্যরঞ্জন একদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত ১৭ ঘণ্টা ঘেরাও হয়েছিলেন। হেড অফিস থেকে আদালতে দরখাস্ত করে পুলিশের সাহায্যে তাঁকে উদ্ধার করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তদানীন্তন শ্রমমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেউই এই অত্যাচার দমনের কোনো চেষ্টাই করেননি।

সেই থেকে কৃষ্ণা গ্লাস-এ নিরানন্দ বিরাজ করছে। সাহিত্য ও নাট্যপ্রিয় বিভূতি সরকার মশায় এবং তাঁর সহধর্মিণী কৃষ্ণা দেবীর উৎসাহে কৃষ্ণার নাট্যকে দল 'অগ্রমুখ' এঁদের যাদবপুর কারখানায় বিশেষভাবে নির্মিত প্রকাণ্ড অডিটোরিয়ামের পার্মানেন্ট স্টেজ-এ মহা আড়ম্বরে বছর বছর যে নাটক মঞ্চস্থ করেন তাতে কৃষ্ণা দেবী, বিভূতিবাবু এবং তাঁদের পরিবার ও সহকর্মীরা সকলেই অংশ নেন। সেখানে শ্রমিক মালিকের কোনো প্রভেদ থাকে না। কৃষ্ণা গ্লাস এর মুখপত্র ওরা কাজ করে একবার দেখলেও মুগ্ধ হলাম। কারখানার শ্রমিক এবং ওই অঞ্চলের দুঃস্থের সেবায় নিযুক্ত 'কৃষ্ণানন্দ' সেবাকেন্দ্রে বছরে ৩৭/৪৫০০০ রোগীর নিয়মিত চিকিৎসা হয়। এই সেবাকেন্দ্রের নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্সও দেখলাম। কো-অপারেটিভ স্টোর্স আছে, রিক্রিয়েশন ক্লাব আছে। সবই গড়ে উঠেছিল শ্রমিক ও মালিকের মিলিত চেষ্টায়।

কিন্তু সাতষট্টির ওইসব নোংরা ঘটনার পরে (অবশ্য তার জন্যে কারখানা সুটি মাত্র ৯/১০ দিনের জন্যেই বন্ধ ছিল) কৃষ্ণা গ্লাসের উৎপাদন থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক কাজ, সব কিছুতেই যেন ভাটা পড়ে গেছে। গত বছরে দুর্গোৎসব নমো নমো করে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর নাট্যোৎসব হয়ইনি। উৎপাদনের অবনতির কথা তো আগেই বলেছি। যে-সব শ্রমিক নেতারা এই সুখের সংসারে ঘৃণা ও অশান্তির বীজ বপন করেছেন, একটা বড়ো বাঙালী প্রতিষ্ঠানের সর্বনাশ ডেকে আনছেন, আমাদের অতীত দিনের স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবুর মতে তাঁরা বা তাঁদের দল উপদলগুলি নাকি অ্যান্টি-ন্যাশানাল নয়।

জাতীয়তাবাদের এক জ্বলন্ত উদাহরণ দেখে এলাম! শোনা কথা নয়, নিজের চোখে কারখানায় এক অত্যাশ্চর্য ন্যাশানালিজমের প্রমাণ দেখে এলাম। বছরের গোড়ায় শ্রমিকদের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করে কর্তৃপক্ষ সারা বছরের কারখানা ছুটির তালিকা প্রস্তুত করেন। এবারে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি চালিত ইউনিয়ন বারুইপুরে যে লিস্ট দাখিল করেছেন তাতে ২৩ জানুয়ারী (নেতাজীর জন্মদিন), ২৬ জানুয়ারী ও ১৫ অগাস্টের উল্লেখ নেই। কর্তৃপক্ষ বিস্মিত হয়েছিলেন; ভেবেছিলেন ভুল হয়েছে। কিন্তু মার্ক্সিস্ট ইউনিয়ন বললেন, না—ঠিকই আছে। ২৬ জানুয়ারী আর ১৫ অগাস্ট নাকি জাতীয় দিবস নয়; আর নেতা তো অনেক ছিলেন ও আছেন; কাকে বাদ দিয়ে কার জন্মদিনে উৎসব পালন করবে লোকে?

কয়েকদিন আগে কলকাতা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সভায় আমাদের থৈই-হারা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি মশায় বলেছিলেন যে তিনি যুক্তফ্রন্টের কোনো দলকেই 'অ্যান্টি-ন্যাশনাল' মনে করেন না। তবে কি 'বেঙ্গল গ্লাস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন'-এর বারুইপুর ইউনিট মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত নয়? সেটা কি একটা জাল ইউনিয়ন, না ভুঁইফোঁড়?

এত সত্ত্বেও আশাবাদী বিভূতি সরকার আর কৃষ্ণা গ্লাস-এর আদিকালের কর্মীরা সোদ্যমে কাজ করে চলেছেন—'ওরা' কাজ করুক বা নাই করুক।

বিভূতিভূষণ 'ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল'-এর কাচ-শাখার চেয়ারম্যানরূপে দলনেতা হয়ে ১৯৬২-তে আমেরিকায় বাণিজ্যিক সফর করে এসেছিলেন। ১৯৬৮ সালের গোড়াতেও ভারতীয় কাচের রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়নের জন্য বিভূতিবাবু ও আর কয়েকজন শিল্পপতি মধ্যপ্রাচ্য ও সিংহলে যোগাযোগ করে এলেন। এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা নাকি যথেষ্ট।

অল ইন্ডিয়া গ্লাস ম্যানুফ্যাকচারার্স ফেডারেশনের সভাপতিত্ব করা ছাড়াও বিভূতি সরকার মশায় 'বেঙ্গল গ্লাস ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রাক্তন সভাপতি। এই সংঘের বিষয়েও দু'চার কথা লেখবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু কী হবে লিখে- রাজনৈতিক ও শ্রমিক নেতারা যা করে চলেছেন তাতে বাঙালীর ও বাংলার কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠানই বাঁচবে না। তার আবার তাদের সঙ্ঘ আর তার কার্যবিবরণ!

বিশ্বকর্মা

খাদ্যশস্যের বিনিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে কি?

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী একটি আশার বাণী শুনিয়েছেন। শ্রীজগজীবন রাম বলেছেন, দেশে, বিশেষ করে পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে তাতে খাদ্যশস্যের ওপর থেকে বিধি-নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া সম্ভব হতে পারে। এ কথা ঠিক, ১৯৬৭—৬৮ সালে ভারতে প্রায় ৯২ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে এবং এটা সর্বকালীন রেকর্ড। আশা করা যায়, এ বছরেও, অর্থাৎ ১৯৬৮—৬৯ সালেও খাদ্যশস্যের উৎপাদন ক্রমবর্ধমান থাকবে। কিন্তু যে পরিমাণ খাদ্যশস্য দেশে উৎপন্ন হয়েছে সে পরিমাণে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না। অবশ্য পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কথা স্বতন্ত্র—এই দুই রাজ্যের খাদ্য সংগ্রহের অবস্থা খুবই সন্তোষজনক। খাদ্যদপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী যেখানে দৈনিক ৩০ থেকে ৩২ হাজার টন খাদ্যশস্য সংগৃহীত হচ্ছে, সেখানে দৈনিক বিক্রী হচ্ছে ১৩ থেকে ১৪ হাজার টন। উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য গুদামজাত করাই এখন বড় সমস্যা। পাঞ্জাবে ইতিমধ্যে তিন লক্ষ টন খাদ্যশস্য গুদামজাত করা হয়েছে।

খাদ্য সংকট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অন্ধ্র, পাঞ্জাব ও হরিয়ানাকে প্রকৃতই খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত রাজ্য হিসাবে বিবেচনা করা যায়। মাদ্রাজেও সমস্যার সমাধান হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে; কারণ মাদ্রাজ রাজ্যের পক্ষে এক টাকায় প্রতি কিলো চাল বিক্রী করা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু কেরালা ও পশ্চিম-বঙ্গের অবস্থা এখনও সংকটজনক। বিহার এবং আসামও পুরোপুরি সংকট কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এ অবস্থায় খাদ্যশস্যের বিনিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কি? উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্য এ বছর খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে খুব বেশী সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে না, এ কথা সত্য। কিন্তু পর পর দু বছর যদি খাদ্যশস্যের ভাল উৎপাদন হয় এবং যদি খাদ্যশস্যের দামে স্থিতিশীলতা আসে, তবেই বিনিয়ন্ত্রণের কথা ভেবে দেখা যেতে পারে।

যে রাজ্যে অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য গুদামজাত করার অসুবিধা সেই রাজ্যের উদ্বৃত্ত খাদ্য অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদন হয়েছে এ রকম রাজ্যে পাঠানো যেতে পারে। উৎপাদন এ বছর বাড়তির দিকে; কিন্তু, সমগ্র দেশে খাদ্যশস্যের সুষ্ঠু বণ্টন করা সম্ভব হচ্ছে না। তার ফলে খাদ্য নিয়ে চোরাকারবারীও অপ্রতিহত থেকে যাচ্ছে।

আর্থিক ভারত

পশ্চিমবঙ্গে এখনও খাদ্যশস্যের দাম উর্ধ্বমুখী; কিলো প্রতি চালের দাম এখনও তিন টাকা। খাদ্যশস্য বিনিয়ন্ত্রণ করার অবস্থা তখনই অনুকূলে হবে যখন সরকার রেশনে চালের দাম কিছুটা কমিয়ে চালের পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে দিতে পারবেন, যদি রেশনে চালের পরিমাণ এমন হয় যে আমাদের আর বাইরের খোলা বাজার থেকে চাল কেনার দরকার হয় না,—তবেই খোলা বাজারে চালের দাম কমে আসবে। তখন যদি খোলা বাজারে চালের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় এবং দামের স্থিতিশীলতা রাখার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা সক্রিয় থাকে, তবেই খাদ্যশস্যের বিনিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। মোদ্দা কথা হচ্ছে, খাদ্যশস্যের যোগান সম্পর্কে সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তার বিনিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না এবং সে অবস্থা এখনও দেশে আসেনি। সরকার অবশ্য সর্বত্রই 'সুদিনের পদধ্বনি' শুনতে পাচ্ছেন এবং সেজন্যই শ্রীজগজীবন রাম এখনই খাদ্যশস্যের বিনিয়ন্ত্রণ করার স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার, শ্রীজগজীবন রাম চিনির বিনিয়ন্ত্রণ করার পরেই তার দামও হু হু করে বেড়ে গেছে। চিনির বিনিয়ন্ত্রণ করার সময় যে সুবিবেচিত হয়নি, তা এখন বোঝা যাচ্ছে। আমাদের আশংকা খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রেও হয়ত এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হতে পারে যদি এখন থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করা না হয়'

সরকারের গতিশীল রপ্তানি নীতি

বাণিজ্য পরিষদের পূর্ব ঘোষিত ১১ দফা রপ্তানি নীতি সাধারণভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এ কথা স্বীকৃত হয়েছে যে আমাদের রপ্তানি বহুমুখী হওয়া উচিত যাতে একটি বিশেষ জিনিসের রপ্তানির উপরেই নির্ভর না করে থাকতে হয়। সেজন্য রপ্তানিযোগ্য নূতন নূতন পণ্য উৎপাদন করতে হবে; কী ধরনের পণ্য এ উদ্দেশ্যে উৎপন্ন করা যেতে পারে তার জন্য সমীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। নূতন পণ্য তৈরী করা ছাড়াও আরও দুটি জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন; (১) নূতন বাজার খুঁজে বের করা যেখানে ভারতীয় পণ্যের জন্য চাহিদার সৃষ্টি করা যায়; এবং (২) রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন খরচ যতটা সম্ভব কমিয়ে দেওয়া যাতে আমাদের দেশের রপ্তানি মালের দাম অন্যান্য দেশের মালের তুলনায় বেশি না হয়।

বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং সমাজতন্ত্রী দেশগুলির সাথে ভারতের ক্রম-সম্প্রসারণশীল বাণিজ্যিক সম্পর্কের উল্লেখ করে বলেছেন যে ভারতীয় বাণিজ্যের বহুমুখী সম্প্রসারণের এটা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখন দেখতে হবে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কীভাবে ভারত দ্রুত স্ব-নির্ভরশীল হতে পারে। শ্রীসিং-এর মতে বর্তমান বছরে রপ্তানির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় অর্থনৈতিক মন্দা কিছুটা প্রশমিত হয়েছে। কিন্তু কৃষির উপর নির্ভরশীল কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের (যেমন বস্ত্র শিল্প ও পাট শিল্প), কয়েকটি সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে না। উদাহরণ হিসেবে এই শিল্পগুলির আধুনিকীকরণের সমস্যার উল্লেখ করা যেতে পারে। তাছাড়া আমাদের পাটশিল্প ও চা-শিল্পকে বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। জিনিসপত্রের মান উন্নত না করলে অথবা গুণগত উৎকর্ষ না বাড়াতে পারলে বিদেশে নূতন চাহিদার সৃষ্টি করাও কঠিন হবে। সুখের বিষয়, সরকারের রপ্তানি নীতিতে এই মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। তবে এই নীতি কতটা গতিশীল হবে তা নির্ভর করে প্রশাসনিক দক্ষতার উপর। সরকারকে সেক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে।

সুব্রত গুপ্ত

চিত্র প্রদর্শনী

শিল্পী শ্রীমতী মেরী মোদি সম্প্রতি অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস্ গ্যালারীতে তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। দিল্লীতে থাকাকালে শ্রীমতী মোদি ত্রিবেণী কলা সঙ্গম-এ অঙ্কনবিদ্যা শিক্ষা করেন। কলকাতায় এসে তিনি আকাডেমি স্টুডিওতে নিয়মিতভাবে শিক্ষালাভ করেন। এটি তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী—এখানে [illegible] আঁকা তাঁর ২০টি নিদর্শন দেখা যায়।

দি নিউ ব্যাঙ্গল্স্। —মেরী মোদি

রচনা দেখে মনে হয়, শিল্পী প্রাথমিক অঙ্কন প্রণালীর দিকে অধিক মনোযোগ না দিয়ে রঙ ব্যবহারে যত্নশীল হয়েছেন। রঙের পাত্রের উপর নির্ভর করে তিনি মনের আনন্দে নানা রঙ ব্যবহার করে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। রঙ মনোনয়ন ও লেপনের পদ্ধতি দেখে মনে হয় তাঁর রচনায় পাশ্চাত্য প্রভাব পড়েছে বেশী। তা হলেও শিল্পীর অঙ্কনরীতি মিশ্র এবং বিষয়বস্তুও নানা শ্রেণীর। প্রদর্শনীতে স্টিল লাইফ থেকে শুরু করে জীবজন্তু ও কয়েকটি নারীর অঙ্কন পাওয়া যায়। শিল্পীর কয়েকটি রচনায় একটি সহজাত সরলতা ও [illegible] কোমল দরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, দি ফ্লাওয়ার [illegible] স্বাভাবিক [illegible] এক [illegible] অতি সহজ ও [illegible]ভাবে [illegible] চেষ্টা করেছেন। [illegible] আঁকা ছবিটির মধ্যে এক সরল গ্রাম্য নারীর সহজাত রুচির সন্ধান পাই।

তবে শিল্পীর কয়েকটি রচনা দুর্বল ও কষ্টকল্পিত। এই পর্যায়ে নিটিং-এর নাম করা যায়। অঙ্কনপদ্ধতি দোষে ছবির লালিত্য নষ্ট হয়েছে। অন্যান্য রচনা দেখে বোঝা যায় যে, শিল্পী নানা রীতি মাধ্যমে অনেক পরীক্ষাও করেছেন। এই প্রসঙ্গে স্টর্ম-এর উল্লেখ করা যায়। বলিষ্ঠ কয়েকটি তুলির টানের মধ্য দিয়ে শিল্পী ছবির মধ্যে দুর্দম গতিশীলতা প্রকাশ করতে চেয়েছেন। শিল্পীর একটি ছবি ভাল লাগে—দি লং হেয়ার। প্রসাধনরত নারীর সম্পূর্ণ ভারতীয় রূপ ও গ্রাম্য সরলতা অনেককেই মুগ্ধ করে। এই শ্রেণীর আর একটি রচনা দি নিউ ব্যাঙ্গল্স্। সুন্দর ও পরিপুষ্ট গোল হাতে নিত্য নতুন প্যাটার্নের চুড়ি-পরা নারীমাত্রেরই এক চিরন্তন ও স্বাভাবিক দুর্বলতা। বসার বিশিষ্ট ভঙ্গীমা ও নতুন চুড়ি পরার আনন্দ ও লজ্জা শিল্পী মাত্র কয়েকটি রঙের আঁচড়ের মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। স্টিল লাইফের মধ্যে স্পাইডার লিলিজ সার্থক রচনা। অপরাপর ছবির মধ্যে ফরেস্ট হর্সেস ও দি ব্ল্যাক ক্যাট উল্লেখযোগ্য।

*

বিড়লা আকাডেমিতে পাঁচজন শিল্পী একটি যুক্ত প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন শিল্পী শ্রীমতী সন্তোষ রোহাতগি, চিত্রা দে (দত্ত), শ্যামল বসু, মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী ও বেণু লাহিড়ী। এঁরা সকলেই কলকাতার সরকারী আর্ট কলেজে শিক্ষালাভ করেন ও ইতিপূর্বে একক ও যুক্ত প্রদর্শনীতেও এঁদের সকলের রচনা নিদর্শন দেখা গেছে। এই প্রদর্শনীতে প্রত্যেক শিল্পীর ছয়টি নিদর্শন দেখা যায়। প্রদর্শনীভুক্ত রচনাগুলির মান সাধারণ। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কোনও রচনাই দেখিনি। শুধু তাই নয়, কয়েকজনের রচনায়

মাদার অ্যাণ্ড ডটার। —মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী

লেমন লাইট। —শ্যামল বসু

হার প্লেইট। —বেণু লাহিড়ী

এখনও ছাত্রসুলভ শিক্ষানবিশীর ছাপ চোখে পড়ে। সকলেরই বিষয়বস্তু প্রায় এক জাতীয় প্রতিকৃতি, স্টিল লাইফ, প্রাকৃতিক ও গৃহের আভ্যন্তরীন দৃশ্য ও কয়েকটি স্টাডি। রচনারীতিতে নতুনত্বের সন্ধান পাইনি—অধিকাংশই রিয়ালিস্টিক। তবে ওরই মধ্যে প্রথমেই শ্যামল বসু ও মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর রচনা চোখে পড়ে। শ্যামল বসুর ছবিতে কোমল কাব্য ছন্দের সন্ধান পাওয়া যায়। লঘু রঙ মাধ্যমে কয়েক ক্ষেত্রে তিনি স্বাভাবিক আলোকচ্ছটা নানাভাবে প্রকাশ করে ভিন্ন ভিন্ন ভাব (মুড) সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ভেরিয়েশন ইন গ্রীন উল্লেখযোগ্য। প্রধানত একটি মাত্র রঙেরই স্তরভেদ সৃষ্টি করে তিনি রচনাটির মধ্যে প্রকৃতিগত স্বাভাবিক রূপটুকু প্রকাশ করেছেন। এই সঙ্গে ডাস্ক ও গ্রে মর্নিং-এরও নাম করা চলে। লেমন লাইট-এ নৌকা রচনার ওপর প্রাধান্য না দিলে হয়ত ছবিখানি আরও সার্থক হয়ে উঠত।

মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর অধিকাংশ কাজেই মিশরীয় প্রভাব দেখা যায়। রচনাগুলি প্রোফাইল জাতীয় ও রেখাসর্বস্ব অর্থাৎ সরল প্রাচীর চিত্রে ব্যবহৃত রেখা মাধ্যমে আঁকা মূর্তিগুলিকে তিনি কয়েকটি নির্বাচিত রঙে ভরে দিয়েছেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই রিলিফের বৈশিষ্ট্য এসে পড়েছে। উদাহরণ হিসাবে মাদার অ্যান্ড ডটার ও হুকার-এর নাম করা যায়। তবে কম্পোজিশন-এ শিল্পী সফলতা লাভ করতে পারেন নি। রচনার মূর্তিগুলি কণ্টকিপিত ও বিচ্ছিন্ন, ফলে ছবিতে সমষ্টিগতভাবে কোনও রূপই ফুটে ওঠেনি। শিল্পীর দুটি রচনা চোখে পড়ে—টেম্পেস্ট ও স্টাডি ৫। নারিকেল গাছ ও তারই নিম্নস্থ পত্রকুঞ্জকে কেন্দ্র করে দুটি গ্রাম্য তরুণীর রূপ শিল্পী সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন, যদিও রচনাটিতে গগ্যার প্রভাব দেখা যায়। জলসম্পাতের নানা [illegible] রেখার মধ্যে একটি নারী মূর্তিকে স্থাপন করে শিল্পী স্টাডি ৫-এ সম্ভবত মাতিসের [illegible] প্রাধান্য দিয়েছেন।

শ্রীমতী সন্তোষ বোস [illegible] শিল্পী। প্রদর্শনীতে তাঁর [illegible] রচনার [illegible] অধিক [illegible]। অঙ্কনরীতি ও রঙ ব্যবহারে [illegible] একটি [illegible] রচনা চোখে পড়ে। [illegible] অভ্রটি ও বিলচারী। আর একখানি ছবিও অনেকের ভাল লাগে [illegible]। [illegible] কৃষ্ণবর্ণ দুটি তরুণীর মূর্তিকে কেন্দ্র করে শিল্পী অতি পরিচিত একটি বিষয়বস্তু স্বাভাবিকভাবে বর্ণনা করেছেন।

বেণু লাহিড়ীর রচনা সাধারণ পর্যায়ের। কয়েকক্ষেত্রে দুর্বল অঙ্কনপদ্ধতির জন্য বিষয়বস্তু সঠিকভাবে প্রকাশিত হয়—যেমন দি লেবারস শিল্পীর একটি রচনার নাম করা চলে—হার প্লেইট। চিত্রাদের অধিকাংশ নিসর্গদৃশ্য প্রতিকৃতি, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও স্টাডি জাতীয়। শিল্পীর রচনা [illegible] ও রঙ ব্যবহার পদ্ধতি উভয়ই দুর্বল, ফলে উল্লেখযোগ্য কোনও রচনাই আমার চোখে পড়েনি। তবে, মূল্য ও পেনসিল মুড চলনসই। এই যুক্ত প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাগণ যে নিষ্ঠাবান সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে আশা করি ভবিষ্যতে প্রদর্শনী আয়োজনকালে ছবি নির্বাচন ব্যাপারে তাঁরা অধিক সচেতন হবেন।

চিত্রপ্রিয়

গানের আসর

আকাশবাণীর অনুষ্ঠানসূচীতে 'রাগপ্রধান' বলে একটি পর্যায় আছে। এটির ওপর গুরুত্ব খুব কমই আরোপ করা হয়। যেসব গায়ক গায়িকা খেয়াল, ঠুংরী গাইতে পারেন অথচ সে সুযোগ পান না, বোধ করি, তাঁরাই রাগপ্রধান গেয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটান।

রাগপ্রধানের কোনও বিশেষ স্পেসিফিকেশন নেই। বেতারের নিয়মাবলিতে হয়তো আছে কিন্তু যা শুনি তাতে তো এর একটা বিশেষ স্বকীয়তার পরিচয় পাই না। শুনেছিলাম আকাশবাণীর পরিকল্পনা ছিল রাগভঙ্গীম বাংলা গানের বিশেষ প্যাটার্ন গড়ে তোলা। উদ্দেশ্যটি খুবই-ভাল, কিন্তু অনুষ্ঠানগুলিতে শিল্পীদের দিক থেকে কোনও বিশেষ চিন্তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। আমার মনে হয় রাগপ্রধান পর্যায়ে বহু নূতনত্ব সৃষ্টি করা যায় এবং এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

এখন আমরা রাগপ্রধান বলতে যা শুনি তা অনেক ক্ষেত্রে হিন্দী খেয়ালের হুবহু অনুকরণ, গাইবার ঢং কায়দা কানুন সবই হিন্দী ঘেঁষা। অনুকরণ করে কোনও মহৎ সৃষ্টি করা যায় না,—অতএব এমন একটা আর্ট সৃষ্টি করা দরকার যাতে আমাদের মানসকে রাগসংগীতের মধ্যে প্রতিফলিত করা যাবে—যা একটা ওরিজিনাল সৃষ্টি বলে স্বীকৃতি পাবে। একদা এই চেষ্টা হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে যাঁরা হিন্দী গানের চর্চা করেছিলেন তাঁরা কেবলমাত্র হিন্দী গানেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, বাংলা গানে যাতে সে সব গানের রস আনা যায় সে চেষ্টা তাঁদের বরাবর ছিল। চিন্তা এবং প্রতিভা দিয়েই তাঁরা বাংলায় একটা নতুন ধরনের রাগসংগীত গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এই চেষ্টা অব্যাহত থাকেনি। প্রতিভাবান রচয়িতার সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছিল। তার ফলে বাংলাগান গতানুগতিক নিয়মে চলতে আরম্ভ করেছিল। এছাড়া রুচির বিকৃতি ঘটায় অনেক বাংলাগান ইতর পর্যায়ে পড়তেও আরম্ভ করেছিল। এমন সময় কলকাতায় এলেন নবাব ওয়াজিদ আলী শা। তাঁর দরবারে বহু ওস্তাদের আনাগোনা। ওস্তাদ সম্বন্ধে কলকাতায় এই সময় একটা বিশেষ সম্ভ্রম দেখা গেল। ক্রমে বাঙালী গায়কদের ওস্তাদ হবার প্রবল বাসনা হল, তাঁরা উঠে পড়ে হিন্দী গানের চর্চা আরম্ভ করলেন। হিন্দী গান যে বাংলা গানের চেয়ে ভাষার দিক দিয়ে বা রুচির দিক দিয়ে উন্নততর ছিল এমন নয়, কিন্তু রাগসংগীতের একটা নূতনত্ব তার মধ্যে ছিল। এইখানে কিন্তু বাঙালী গায়কদের একটা মস্ত ভুল হল। ওস্তাদ হতে আপত্তি ছিল না কিন্তু বাংলা গানকে অবহেলা করাটা খুবই পরিতাপজনক ব্যাপার হয়েছিল। বাংলা গান যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে রইল আর বাঙালীরা ছুটলেন হিন্দী গানের পিছনে ওস্তাদ হবার লোভে, আগেকার মত তাঁরা যদি বাংলা গানের চর্চাটা রেখে যেতেন এবং বাংলা গানের পুনর্বিন্যাসে যত্নবান হতেন তাহলে রাগসংগীতের দিক থেকে বাংলা গানে আমরা আর একটা নতুন সৃষ্টি দেখতে পেতাম। কিন্তু সেটা হল না। বাংলা গান সম্বন্ধে একটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স এই সময় থেকেই খুঁটি গেড়ে বসল আর রাগসংগীতের দিকে বাংলা গানের অগ্রগতি এই সময় থেকেই রুদ্ধ হয়ে গেল। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু চেষ্টা যে হয়নি তা নয় কিন্তু তাকে একটা আন্দোলন বা সুচিন্তিত প্রগতি বলা যায় না।

অবস্থার এখনও বিশেষ উন্নতি হয়নি, সেই হীনমন্যতা আজও বিরাজমান। ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গীতজগতে প্রতিষ্ঠা বেড়েছে। বর্তমানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে বাঙালীর দখল কম নয় অথচ রাগসংগীতে নতুন কোনও সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায় না। বাংলা খেয়াল নামক একটা আন্দোলন মাঝে মাঝে মাথাচাড়া দেয় বটে কিন্তু তার যা পরিচয় পেয়েছি তাতে যথার্থ কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। অধিকাংশ তথাকথিত বাংলা খেয়াল হিন্দী খেয়ালের ছকে তৈরি, ভাষা অপটু, আকৃতি এবং প্রকৃতিতে "মংগ্রেল"-এর পরিচয় বহন করছে। পুরাতন বাংলা রাগসংগীতের পাশে এই পরাশ্রিত বাংলা খেয়াল অপাংক্তেয়। এই অনুকরণের ধারায় বাংলা গানের সম্মান বৃদ্ধি পাবে এমন ধারণা করাই ভুল। রাগসংগীতে আমাদের এমন একটা অভিযানে অগ্রসর হতে হবে যাতে এটা যে বাংলারই জিনিস তাতে কোনও সন্দেহ না থাকে।

রাগপ্রধান পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রচুর সুযোগ আছে এবং প্রতিভাবান শিল্পীরা এই সব গানে চমকপ্রদ সৃষ্টির ইঙ্গিত দিতে পারেন। এক সময়ে যেমন হিন্দী গানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গানের নবরূপায়ণের চেষ্টা চলেছিল আজ আবার আমাদের মধ্যে সেই চিন্তাটা জাগ্রত হওয়া দরকার। বাংলা গানকে যে হিন্দুস্থানী খেয়ালের ছকে ফেলতে হবে এর কোনও অর্থ নেই। চলুক না আমাদের গান আমাদের নিয়মে, ঘটুক না এর একটা নতুন বিকাশ রাগসংগীতের মাধ্যমে। এই প্রচেষ্টায় যে সৃষ্টি হবে সেটাই হবে বাংলার নিজস্ব সৃষ্টি।

"বর্তমানে রাগসংগীত সম্পর্কে আমাদের কতকগুলি বাঁধা ধরা সংস্কার আছে। রাগপ্রধানে সেইগুলিরই প্রতিফলন দেখতে পাই। বিস্তারের যে কায়দাগুলি বড় খেয়ালে মানায় বা যে তানকর্তবগুলি ছোট খেয়ালের উপযোগী সেগুলি রাগপ্রধান গানে সেই নিয়মে বসিয়ে দিলে আমাদের স্বকীয়তা রইল কই? গানের কাঠামোটাও যদি হিন্দীগানের অনুযায়ী রচনা করা যায় তাহলেও তো আমাদের বৈশিষ্ট্য তাতে থাকল না। কেউ কেউ রাগপ্রধান গানে সরগম প্রয়োগ করবার পক্ষপাতী এবং সেটাও ঐ একই নিয়মে তাঁরা আরোপ করে থাকেন। এক কথায় রাগপ্রধানকে সর্বতোভাবে হিন্দী খেয়ালের 'প্যারালাল' করে তোলবার চেষ্টা করা হয়। এই নিয়মে চললে অনুকৃতি হিসাবে বাংলা গান সার্থক হতে পারে, কিন্তু স্বকীয়তার দিক থেকে তার কোনও স্বীকৃতির আশা নেই।

রাগপ্রধান গান সম্বন্ধে বেতার বা শিল্পীদের কোনরকম বিধিনিষেধ আরোপ করবার পরামর্শ আমরা দিই না। আমরা শুধু তাঁদের আত্মবিশ্লেষণ করতে বলি। প্রোগ্রামগুলি তাঁরা ভাল করে বিচার করে দেখুন কোথায় তাঁরা সার্থক হলেন, কোথায় একটা নতুন পথের সন্ধান দিতে পারলেন। যদি মনে করেন তাঁদের অনুষ্ঠান নিছক অনুকৃতির পর্যায়ে পড়ে যাচ্ছে তাহলে তার মোড় ঘুরিয়ে দিন। এইভাবে পদে পদে বিচার বিশ্লেষণ করতে থাকলে বাংলার রাগসংগীতে বহুত্বের রূপায়ণ দেখা দেবে যা আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। আপনারা হয়ত প্রশ্ন করবেন—"নিজস্ব বৈশিষ্ট্য" যে বলছেন সেটা কি? আমরা সেটা বোঝাবার ভার শিল্পীদের ওপরেই তুলে দিতে চাই। তাঁরাই রচনা করে বুঝিয়ে দিন কোথায় তাঁদের বৈশিষ্ট্য।

শ্রোতাদের আমরা রাগপ্রধান গান সম্বন্ধে আর একটু আগ্রহ রাখতে বলব। বেতার কর্তৃপক্ষ "রাগপ্রধান" অনুষ্ঠানটির জন্য অনেক তাঁদের সমালোচনা সহ্য করেছেন। অনেকে এ সম্পর্কে তাঁদের ওপর অনেক উদ্দেশ্যও আরোপ করেছেন কিন্তু বাস্তবভাবে আমার মনে হয় "রাগপ্রধান" অনুষ্ঠানটি দুর্ভাগ্যের শিকার। রাগসংগীতে বাংলা গানের হাতে একটি নতুন সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, শিল্পীর হাতে নিজের ভাবে নতুন উদ্ভাবনের সুযোগ পাবে—নিঃসন্দেহে এটাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। এই প্রচেষ্টা সার্থক হলে বাংলার সংগীতে অন্তত যে স্বীকৃতি অর্জন করবে তার মূল্য কম নয়।

আলোচনা

[illegible] "পুতুল, [illegible], [illegible]" (৪ খণ্ড) [illegible] [illegible]। [illegible]

অদ্যাবধি অমীমাংসিত। শার্ঙ্গদেবের সিদ্ধান্তগুলো যদিও বড়ো বেশী নিশ্চিন্ত। সম্ভবত সেই কারণেই তিনি কোন যুক্তিকে পুনর্বার ভাববার প্রয়োজন বোধ করেননি। ছন্দ এবং তাল এই দুটিকে এক পর্যায়ে ফেলা যায় না—এই অভিমত প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রধান যুক্তি—

১। ছন্দ হচ্ছে অক্ষর বা বর্ণ সমাবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

২। কেবলমাত্র বর্ণ সমাবেশের উপরেই তাল নির্ভর করে না। তালের নিয়ামক হচ্ছে কাল। এখানে কাল অনুসারেই মাত্রা নির্ণয় করা হয়।

ছন্দ প্রসঙ্গে প্রাথমিক অনুসন্ধানই এই যুক্তিতে সন্দেহ আনে। কারণ ছন্দের প্রকৃতিও কেবলমাত্র বর্ণ সমাবেশের উপর নির্ভর করে না। তারও একটি অনিবার্য মানক কাল তা উচ্চারণকাল। mora—এই উচ্চারণকালের একক। বর্ণসমাবেশকে অতিক্রম করার ক্ষমতা ছন্দের আছে। তাই ছন্দ বিচারে প্রয়োজন হয়েছে "প্রসারিত" এবং "অপ্রসারিত" এই দুই উচ্চরণ রীতির। শ্রদ্ধেয় প্রবোধচন্দ্র সেন অপ্রসারিত দলে ১ মাত্রা এবং প্রসারিত দলে ২ মাত্রার হিসেব তাঁর কলামাত্রিক ছন্দের ব্যাখ্যায় জানিয়েছেন। তবে সেখানেও একটি প্রশ্ন আসে। প্রসারিত বলতে কতটা প্রসারণ? প্রসারিত কলায় ২ মাত্রা কেন? ৪ মাত্রায় বাধা কোথায়? ছন্দ চর্চা যদি বিজ্ঞান হয় ধারণাটি আরও স্পষ্ট হবার অপেক্ষা রাখে, এবং মাত্রা (unit of measure) এবং কলা বা Morar (এটিও unit of measure) চাইতে একটি ব্যাপকতর unit of measure-এর অভিজ্ঞতা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

বর্ণসমাবেশ বলতে বুঝি উচ্চারণ সমাবেশ। এই উচ্চারণের স্বাভাবিক বিভাগ যাকে প্রবোধচন্দ্র সেন "মুক্তদল" এবং "রুদ্ধ-দল" বলে চিহ্নিত করেছেন সেটি দ্বিতীয় মানক ছন্দ নিরূপণের। এই মুক্ত ও রুদ্ধ দল হলো ধ্বনির সৌষ্ঠব, যা কবিতার ছন্দে এবং গানের তালে বৈচিত্র্য আনে। শ্রুতির সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য বোধকে তৃপ্ত করে। যে কোন তালের বোলে এই দুই 'দল' বিশিষ্টভাবে উপস্থিত (যথা 'তা ধিন না' অর্থাৎ মুক্ত+রুদ্ধ+মুক্ত)।

শার্ঙ্গদেব বলছেন—তালেও মাত্রা আছে কিন্তু অক্ষর এখানে আবশ্যিক নয়। এই বিন্যাসকে আড়ি দিয়ে অনেক কমপ্লেক্স করে গাওয়া যায় কিন্তু ঠিক জায়গাতেই সোম এসে পড়বে।

কিন্তু ছন্দের ক্ষেত্রেও কি তাই নয়। উল্লিখিত প্রসারিত দলের মাত্রা কি অক্ষরকে অতিক্রম করে না। অনেক জটিল পর্ব, অর্ধ-পর্বের বৈচিত্র্য পার হয়ে ঠিক জায়গাতেই তো যতি এসে পড়ে। সুতরাং ছন্দ আর তালে তফাৎ কোথায় থাকে আর।

সম্ভবত ছন্দ আর তাল একই ধারণার প্রায় নামান্তর। দুই পৃথক বিজ্ঞান চর্চায় এমন এক একটি সাধারণ বিষয়ের দুই পৃথক পরিভাষা সৃষ্টির নজির আরও আছে। তবে যদি আপাত বিচারে ছন্দ এবং তালের কোন পার্থক্য খুঁজে নিতেই হয় তবে "ছন্দ পরিক্রমা"র মতবাদ সঠিক এবং সম্পূর্ণ। আমাদের নিত্যকথিত বা পঠিত ভাষার উচ্চারণ ও শ্রুতিই 'পদ্যছন্দের' মূল আশ্রয়। বাক্যবিন্যাস তথা ভাববিন্যাসের ভঙ্গিকে যথাসম্ভব রক্ষা করে চলাই পদ্য ছন্দের নীতি। 'গীতছন্দ' সর্বদা বাক্যের গতিভঙ্গি তথা ভাবের অনুবর্তী না হতেও পারে,—প্রবোধচন্দ্র সেনের এই বিচারের কথা মনে রেখে শার্ঙ্গদেবের অনেক উক্তি যখন পুনর্বার বিবেচনা করেছি, দেখেছি তিনিও পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন ছন্দ কোথাও কোথাও তালের নামান্তর। যথা (১) ছন্দেই তালের কাজটা পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় তালের প্রয়োজনকে আবশ্যিক বিবেচনা করা হয়নি। (২) ছন্দবদ্ধ পদ সঙ্গীত পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে এলো। (৩) কেননা এই গানটি ছন্দেই প্রকৃষ্টরূপে আবদ্ধ হয়েছে। ইত্যাদি।

এখানে দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে সঙ্গীতজ্ঞ শার্ঙ্গদেব 'গান' শব্দটিকে নির্বিচারে দুটি অর্থে ব্যবহার করেছেন। একটি 'গান' ছন্দবদ্ধ পদ যেখানে গায়কের স্বাধীনতা কখনই নেই, গায়ক স্রষ্টা নন। অপর 'গান' এর যিনি গায়ক তিনি। শিল্পী, অর্থাৎ সৃষ্টির স্বাধীনতায় তার অধিকার।

এই দ্বিতীয় অর্থে যে গান সেটি সাধারণত ভাষাশ্রিত-ভাব নিরপেক্ষ, অতএব সেখানে বর্ণ সমাবেশ অনুপস্থিত। সে কারণে এই গানে ছন্দের এবং তালের তুলনার অবকাশ নেই। তথবা গানের বন্দেশ কখন কখন যেটুকু আক্ষরিক উচ্চারণ উপস্থিত থাকে সেটুকু ছন্দকে প্রকাশ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়, শুধু সঙ্গীতের রূপের বিকাশের অবলম্বন মাত্র।

প্রথম অর্থে যে 'গান' তার পদরচনার শুদ্ধ ছন্দের অভাব প্রায়ই থাকে। সেখানে সুরকার বাধ্য হয়ে থাকেন গানের বর্ণ সমাবেশে কখন সঙ্কোচনে, কখন সম্প্রসারণে পরিবর্তন আসতে। অথবা, তাঁর প্রযুক্ত সুরের সামঞ্জস্য রক্ষায় কখন কোন নতুন ছন্দের প্রয়োজন হয়। শার্ঙ্গদেব সম্ভবত এই রকম ক্ষেত্রেই বলতে চেয়েছেন—গান যেমন নিজের ঐশ্বর্যে বড়, তেমনি ছন্দের বেলাতেও সে নিজের গতির অনুকূলে ছন্দকে প্রস্তুত করে নিতে পারে।

শার্ঙ্গদেবের মতে, তাল শব্দ ছন্দের থেকে আরও ব্যাপক। যদি ছন্দ এবং তাল এই দুই ধারণার একটি অপরটির থেকে ব্যাপক হয় তবে হয়তো সেটি ছন্দ। যেহেতু ভিন্ন তালে ভিন্ন ছন্দ। বিলম্বিত আলাপে যেখানে তাল অনুমেয় নয় সেখানেও ছন্দের বিশিষ্ট ভূমিকা। জীবনে যা কিছু ঘটছে তার, উদ্দেশ্য কে বলবে। কিন্তু তারুণ্য তথা মৃত্যুর বিশেষ ছন্দের অন্বেষণও তো শিল্পীর সাধনা।

শ্রীঅশোকনাথ মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-৩৬

লেখকের বক্তব্য

সিদ্ধান্তগুলি লেখকের মনগড়া নয়। ছন্দশাস্ত্র এবং সঙ্গীতশাস্ত্র মিলিয়ে বিচার করলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় সেইটাই বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে। এ পত্র পড়েও কোনও যুক্তিকেই পুনর্বার ভাববার প্রয়োজন বোধ করছি না।

কেবলমাত্র ছন্দের নিয়মে গানের রীতি বহুকালের। ইতিহাসে লিখিতভাবে এর বিকাশ দেখা যায় "ধ্রুবা" গানে—যা ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু তার সঙ্গে চচ্চৎপুট, চাচপুট প্রভৃতি তালের আলোচনাও হয়েছে। অর্থাৎ ছন্দ এবং তাল দুটিকে আলাদা করেই বিচার করা হয়েছে। ছন্দ শব্দে যদি তাল-এর ব্যাপ্তি বোঝানো যেত তা হলে তাল শব্দের উৎপত্তি হত না। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, মূলত তাল এবং ছন্দের ক্রিয়ার দিক থেকে সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ কিন্তু এটাও অবশ্য স্বীকার্য যে, ছন্দের প্রয়োগ সীমিত হওয়াতেই তাল-এর পরিকল্পনা হয়েছে। "ছন্দ আর তাল একই ধারণার প্রায় নামান্তর"—একথা যথার্থ নয়। কবিতার ছন্দ সঙ্গীতের চাহিদা মেটাতে পারেনি বলেই তাল-এর পরিকল্পনা হয়েছে।

ছন্দ কেবলমাত্র বর্ণসমাবেশের উপর নির্ভর করে না—এমন উক্তির তাৎপর্য বোঝা গেল না। উচ্চারণের সমাবেশ বা বিভাগ যাই হোক না কেন, কবিতার পদ শেষ হলে সঙ্গীতের মত শুধু ধ্বনি সহযোগে তাকে বাড়ানো যায় না। কথা ফুরিয়ে গেলে কাব্যের ছন্দও নটেগাছটির মত মুড়িয়ে যায়। গানের সম-এর সঙ্গেও কবিতার যতির তুলনা করা চলে না। কারণ দুটির রীতি ভিন্ন। যতি যেভাবেই পড়ুক না কেন, তা একান্ত-ভাবে বাক্যনির্ভর—সঙ্গীতের মত এক্ষেত্রে চলার স্বাধীনতা নেই।

পরিশেষে বলা আবশ্যক মনে করি যে, গান শব্দটিকে কোনও অর্থেই নির্বিচারে ব্যবহার করা হয় নি। ছন্দ প্রয়োগে এবং তাল প্রয়োগে একই গানের প্রকারভেদ কিভাবে হতে পারে সেটি নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। পত্রলেখক সমস্ত বিষয়টি সাহিত্যিক দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং প্রচলিত ছন্দ-গ্রন্থাদিতেও সঙ্গীতশাস্ত্রের বিরাট ছন্দনীতির প্রয়োগ অনালোচিত থেকে গেছে। প্রকৃতপক্ষে ছন্দ এবং তাল নিয়ে এইভাবে তর্ক ওঠানো নিরর্থক কারণ দুটির প্রয়োজনীয়তা দুদিকে সেটি মেনে না নিয়ে উপায় নেই।

—শার্ঙ্গদেব

দ্বিতীয় দর্পন

প্রতিভা বসু

৩৯

সমীরের আজ কমিশনারের বাড়িতে ডিনার পার্টি। ইদানীং সেখানে ঘন ঘন ডাক পড়ছে তার। কখনো ডিনারে কখনো লাঞ্চে। কখনো চায়ে, কখনো ককটেইলে। রাত দশটায় সাপারও হয় মাঝে মাঝে। মাঝে মাঝে বনভোজন, গঙ্গায় নৌকো ভ্রমণ ইত্যাদিও হয়। এবং কেন হয় সেটা হঠাৎ বুঝতে পেরেছে সমীর; বুঝতে পেরে মন্দ লাগছে না ব্যাপারটা।

ওঁদের মেয়ে এসেছে দার্জিলিং থেকে। সেখানে সে একটা মিশনারি কলেজে পড়ায়, আপাতত শীত সহ্য হচ্ছে না, চিলরেনে ভুগছে, মা-বাবা কাজ ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছেন জোর করে। মেয়েটির বয়েস তিরিশ-বত্রিশ, এখনো অবিবাহিত। হয়তো প্রথম জীবনে কোনো প্রেমঘটিত ব্যাপারে ব্যর্থ হয়ে এই জীবন গ্রহণ করেছিল, এখন বিবাহেচ্ছু। মা-বাবাও সে ইচ্ছাকে সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং হাতের কাছে তাকে পেয়ে ভেবেছেন এ বুঝি প্রজাপতিরই নির্বন্ধ।

নিমন্ত্রণ সাড়ে আটটায়। এখনো আটটা বাজেনি। বাইরের ঘরে বসে সমীর বইয়ের পাতা উল্টোচ্ছিল। কিন্তু তাকে উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল না, অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ট এবং উদ্‌ভ্রান্ত মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এই মুহূর্তে সে যতোটা অসুখী তার চেয়ে বেশী সুখের অভাব তার সচরাচর ঘটেনি।

খানিক আগেই সুরেন বেয়ারা বিকেলের ডাকে আসা তার মায়ের চিঠিখানা এনে দিয়েছে তার হাতে। মোটা পুরু খাম। এই চিঠির জন্যই সে আজ ক'দিন উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল।

চিঠিখানা নিশ্চয়ই অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু অবাঞ্ছিত। মার কাছ থেকে সে এর চেয়ে আর একটু ভদ্র চিঠি আশা করেছিল। সে ভেবেছিল, মা-ও যেমন তার কাছে শ্রদ্ধেয় প্রায় চল্লিশ ধরো ধরো পুত্রও মার কাছে কিছুটা সম্মান আশা করতে পারে। মাতা পুত্র হলেও একটা বয়েসের পরে দুজন সাবালক মানুষের দুজনের প্রতিই সশ্রদ্ধ হওয়া উচিত। তিনি লিখেছেন, 'শোনো শমী, ভেবো না হাকিমি করছো বলে তোমাকে আমি এতটুকুও রেয়াত করে কথা বলবো। আমি বলবো, তোমার শুধু বয়েসই বেড়েছে, বুদ্ধি বাড়েনি। তুমি এখনো অত্যন্ত মূর্খের মতো ব্যবহার করছো, অর্বাচীনের মতো চিঠি লিখছো, বাতুলের মতো কথা বলছো। মনে হচ্ছে আশৈশব তোমাকে আমি আপ্রাণ যত্নে লালন করেও এতটুকু মনুষ্যপদবাচ্য করে তুলতে পারিনি। তুমি অত্যন্ত স্বার্থপর, অত্যন্ত দাম্ভিক, অত্যন্ত নীচমনা! তোমার কথার কোনো মূল্য নেই, তুমি একবার সম্মতি জানিয়ে আবার ইতরের মতো সে কথা তুলে নিতে চাইছো। অধিক কি, গোবিন্দ ঘোষের কাছে ওরকম একটা চিঠি লেখায় আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করছে। এর পরে তোমাকে একটা ছোটোলোক ছাড়া আর কী বলা যায়? কিছুদিন থেকেই তোমার বেশ পরিবর্তন লক্ষ করছি আমি, তুমি যেন হঠাৎ মস্ত লায়েক হয়ে উঠেছ। তোমার চিঠির মধ্যে একটা উদ্ধত সুর। জানি না কার পরামর্শে, কার জোরে, কার সাহসে তুমি এমন পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছো। কী কারণে নিজের মাকে, যে তোমাকে জগতে প্রথম আলো দেখিয়েছিল, তাঁকে অকারণে এমন অপমান করছো, কিন্তু আমি তোমার ভালো ছাড়া কখনোই কোনো মন্দ করিনি। মনে রেখো, এই যে শাসকের দণ্ড হাতে নিয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করছো, সেই দণ্ডটিও আমিই তোমার হাতে গুঁজে দিয়েছিলাম। আমি চাই, এই ঔদ্ধত্য তুমি অবিলম্বে পরিত্যাগ করো।'

এই হচ্ছে চিঠির আরম্ভ। তারপরে দুঃখে, ক্ষোভে, রাগে, অপমানে, হতাশায় ফেটে গিয়ে যে কী লিখেছেন আর লেখেননি তার ঠিক নেই। সেখানে চোখের জল, রাগের আগুন, আদেশ নির্দেশ উপদেশের শিলাবৃষ্টি সব আছে। অনেক দিনের অনেক কথা তুলে তিনি খোঁটা দিয়েছেন, অনেক বেদনার জায়গায় ঘা দিয়েছেন। বাবার কথা তুলেছেন, এমন কি সুমনাকেও বাদ দেননি। সেই কবেকার স্বপ্নে দেখা হারিয়ে যাওয়া সুমনা। যাকে ভাবলে এখনো বুকের রক্ত ছলকে ওঠে।

প্রকৃতপক্ষে মার আসল রাগ এখনো সেখানেই। তাঁর ধারণা তাঁর পুত্র এখনো বুঝি সেই নামই জপছে বসে বসে। তাই থেকে থেকে জ্বলে উঠছে ঈর্ষার স্ফুলিঙ্গ। মা তাকে এই ঈর্ষা থেকেই সুমনার সঙ্গে বিয়ে দেননি। হয়তো বা সেই ঈর্ষার রেশই বহুকাল বহন করেছেন বলে এতদিনেও ছেলের বিয়ে দেবার কথা মনে আনেননি। হঠাৎ কে যে তাকে এই ক্রোড়পতি গোবিন্দ ঘোষের সন্ধান দিয়ে লুব্ধ করল জানে না সমীর।

সমীর হাতের ঘড়ি দেখল। হঠাৎ মনে পড়লো এই ঘড়িটি তাকে আই-এ-এস হবার পরে হেরম্বমামা উপহার দিয়েছিলেন। কোন্ বিলেত প্রত্যাগত বন্ধুকে দিয়ে আনিয়ে-ছিলেন ইংল্যান্ড থেকে প্রথম শ্রেণীর ওমেগা। আসলে আনিয়েছিলেন নিজের জন্য, যখন এসে পৌঁছুল ঠিক সেই রকম সময়েই রেজাল্ট বেরুল তার। কলকাতা এসেছিলেন, যেইমাত্র জানলেন পরীক্ষায় সে পয়লা নম্বর হয়েছে, তৎক্ষণাৎ হাত থেকে খুলে পরিয়ে দিলেন তার হাতে।

না, তখনো সুমনার সঙ্গে বিয়ের কথা ভাবেননি তিনি। কোনো স্বার্থ ছিল না।

কিন্তু ড্রাইভার আসছে না কেন? আসা উচিত। পাঠিয়েছেন কয়েকখানা বই কিনতে। রবীন্দ্রনাথের গীতবিতান। শর্বরীর জন্য। আজকের ভোজ শর্বরীর জন্মদিন উপলক্ষে। শর্বরী কিন্তু কমিশনার এইচ কে খাস্তগীরের নিজের মেয়ে নয়। পালিতা মেয়ে। সামান্য আত্মীয়তা আছে অবশ্য। শর্বরীর বাবা বোধ হয় মিসেস খাস্তগীরের সম্পর্কিত মামাতো ভাই ছিলেন। মা-বাবা দুজনেই ওকে বালিকা রেখে মারা যান, খবর পেয়ে বুকে করে নিয়ে এলেন মিসেস খাস্তগীর। তাঁর নিঃসন্তান মাতৃত্ব শতধারে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল ওর উপর। এখন এই মেয়ে ওঁদের চোখের মণি।

মাত্র তো তিনখণ্ড বই, কতক্ষণ লাগছে আনতে? এই তো বইয়ের দোকান, গাড়ি নিয়ে গেছে, নির্দিষ্ট নাম লিখে দিয়েছে সমীর। কমিশনার সাহেব আবার সময় মানেন খুব। তাঁর সব কাঁটায় কাঁটায়। ঠিক সময়ে যাওয়া দরকার। পুরোনো দিনের আই-সি-এস, মেজাজটি বেশ বিদেশী। থাকেনও সম্পূর্ণ সেই কায়দায়। কিন্তু মানুষটি চমৎকার। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অত্যন্ত শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত।

আর কন্যাটি? হ্যাঁ, শর্বরীও তাঁর মা-বাবার যোগ্য সন্তান। শান্ত, ভদ্র, নম্র। একটু দুর্বলতা হয়েছে সমীরের উপর, বোঝা যায় সেটা। সমীরেরও মন্দ লাগে না। যদি এই বয়সে সত্যিই বিয়ে করতে হয় এই মেয়েটিই ছিলো সব দিক থেকে উপযুক্ত।

কিন্তু মাকে নিয়ে সমীর কী করে? যাই লিখুন, যাই করুন, তারই তো মা। এই বয়সে তাঁকে নতুন করে আহত করা কি তার উচিত হবে? আর কেনই বা আহত করবে? কী দোষ করেছেন তিনি? ছেলের বিয়ে দিতে চাওয়া কি দোষ? সে তো সব মা-ই চায়। নিজের পছন্দমতো চাইছেন? তাই বা কেন চাইবেন না? ছেলে তো তাঁরই! তাঁর পছন্দেরও মূল্য আছে বইকি।

প্রথমে যাই লিখুন, শেষের দিকে কিন্তু কেঁদেছেন। সেই চোখের জলই সমীরের সব আপত্তি বিরক্তি ধুয়ে দিয়েছে। মার উপর যেমন রাগ হয়েছে, কষ্টও হয়েছে। সত্যিই তো এতখানি অগ্রসর হয়ে এখন পিছিয়ে যাওয়া মানেই মাকে অপমান করা। তা কি সমীর পারে?

তবু মনে হয়, সব দিক থেকে শর্বরীই পাত্রী হিসেবে তার মনের কাছাকাছি মানুষ। গোবিন্দ ঘোষের মেয়ে সুধাকে সে চেনে না। যদিও মা বলেন, 'এমন সাধ্যস্ত মেয়ে আজকাল বিরল' দিদি লিখেছেন, 'রং কালো হলে কী হবে, বেশ লাবণ্য আছে' কিন্তু এসব আবেদন তার হৃদয়ে সাড়া তোলে না। বিবাহ করবে বলেই বিবাহ করার দিন এখন গত, এখন যাকে দরকার, তার জায়গা শুধু রাত্রিরের বিছানাতে সীমাবদ্ধ থাকলেই সে তৃপ্ত হতে পারবে না; সে হবে সঙ্গী, বন্ধু, স্বজন, সমকক্ষ। ভেসে যাওয়া শরীর সুখের অতিক্রান্ত বয়স এখন যুক্তিবুদ্ধির অধীন হয়েছে। তাই নানা দিক বিবেচনা করলে শর্বরীকে বিয়ে করাই তার সবচেয়ে সুবুদ্ধির কাজ হবে। শর্বরীর ধরন-ধারন চলন-বলন শিক্ষা-দীক্ষা সব তার নখদর্পণে, শর্বরীকে সে তিন মাসে উল্টেপাল্টে বিশ্লেষণ করে খুব ভালোভাবে চিনে নেবার অবকাশ পেয়েছে।

এখানে জজসাহেবেরও একটি অনূঢ়া কন্যা আছে। ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়। পাত্র নির্বাচনে এতো বাড়াবাড়ি করছেন যে, মেয়েটির যৌবন প্রায় যাই যাই করছে। এখন জজগিন্নীরও নজর পড়েছে তার উপরে। মেয়েটিকে ওরা সুইটি বলে ডাকেন। কী বিশ্রী নাম! নাম শুনেই তো বোঝা যায়, এতটুকুও বৈশিষ্ট্য নেই পরিবারটার মধ্যে। নইলে একজন বাঙালী মেয়ের নাম কেউ সুইটি রাখে? মেয়েটির সাজগোজও তার নামের মতোই। ছেলেবেলাটা কনভেন্টে কাটিয়ে এক অক্ষর বাংলা শেখেনি, পরের ভাষাও আপন করে পায়নি। বুকনিতে দক্ষ হয়েছে খুব, কিন্তু শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারেনি। কী দুঃখ! অথচ এমনিতে বেশ সরল, সহজ, হয়তো ভালোভাবে শিক্ষা দিলে এমন ময়ূরপুচ্ছ লাগিয়ে মেকী জীবনে অভ্যস্ত হতো না। আসলে জজসাহেব আর জজগিন্নী দুজনেই বড়ো বেশী মধ্যবিত্ত ঘর থেকে চাপাচাপিতে মানুষ! অনেক স্ত্রী-আচার, লোকাচার, আর সংস্কারের ডিপো। মাঝখান থেকে সাহেব হবার দুর্দান্ত বাসনা। নিজেরাও যথাসম্ভব সেভাবেই মুখোশ এঁটে থাকেন, ছেলে-মেয়েদেরও শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবে।

সুইটি খুব গা ঘেঁষা মেয়ে। মা-বাবার ইঙ্গিতেই অবশ্য। শর্বরীর চেয়ে দেখতে সে অনেক বেশী সুন্দর। তার রং প্রায় সোনার মতো। নাক মুখ চোখ গড়ন, তা-ও ভালো তবু সমীরের শর্বরীকেই পছন্দ। প্রথম পছন্দ ওর নাম। নামের অর্থ। তারপর ওর সংস্কৃত বাঙালীয়ানা। ওর উচ্চারণ স্পষ্ট ও সাহিত্য ভালোবাসে, ওর মনের মধ্যে কোনো কাঙালপনা নেই। নিজেকে জাহির করার কোনো সচেতনতা নেই। যা সুইটির ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা বিদ্যমান।

তবুও তা সত্ত্বেও শর্বরীকে যথেষ্ট পছন্দ করা সত্ত্বেও ঠিক যেন প্রেম আসছে না মনের মধ্যে। সমীর চাইছে তা আসুক। কেন না এই বয়সে এইরকম সবদিক থেকে পছন্দসই মেয়ে পাওয়া সহজ নয়।

কেন প্রেম আসছে না, কেন এতো মেলামেশার পরেও অদর্শনে কাতর হয়ে উঠছে না, তার কারণও সে বুঝতে পেরেছে। সে বুঝেছে তার মা যে গোবিন্দ ঘোষ নামের এক ভদ্রলোকের কন্যাকে প্রহরী হিসেবে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন তার জীবনে, যার সঙ্গে আর কয়েক সপ্তাহ বাদেই সে বিবাহিত হতে যাচ্ছে, তার জন্যই তার হৃদয়ের দরজা এঁটে আছে এখনো। নিজের ইচ্ছের গন্ধমাদন চাপিয়ে তার মা-ই তার পুত্রের ইচ্ছেকে একটা ভারবাহী গর্দভে পরিণত করেছেন।

সমীর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, মনের তলায় কেউ যদি এরকম একটা অসহ্য চাপ সৃষ্টি করে রাখে সর্বদা, তা হলে সহজ-ভাবে কিছুই এগিয়ে আসতে চায় না। সমীর দেখেছে, এই মেয়েটিকে অর্থাৎ

শর্বরীকে বিবাহ করার কথা যদি তার মনে একবার আসে, সহস্রবার এই ভাবনা তাকে ছোঁক ধরে যে, বিবাহ যদি করেই তা হলে মার পছন্দসই মেয়েটিকে কেন নয়? মা সেখানে কথা দিয়েছেন, সে নিজেও তেমন জোর দিয়ে আপত্তি জানিয়ে আসেনি, সেই ক্ষেত্রে মাকে সে এরকম অপ্রস্তুত করবে কী অজুহাতে। মাকে তা হলে মিথ্যাবাদী হতে হয়, অপ্রস্তুত হতে হয়। এবং সে জন্যই সে চায় শর্বরীর সঙ্গে তার একটা প্রেমের প্লাবন আসুক, যে প্লাবনে সব কিছু এক পলকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। ভালোবাসা হলে সে কি এক বিন্দু পরোয়া করতো আর কারো কোনো কথার জন্য? না, করতো না। মাকে সে স্পষ্টভাবে জানাতে পারতো আমি যা চাই, যেমন চাই, আবার তা খুঁজে পেয়েছি। আর আমি হারাতে রাজী নই।

তাকে আর শর্বরীকে শর্বরীর মা-বাবা অনেক অবকাশ দেন একা হবার। তারা বাগানে বসে, গঙ্গার ধারে যায়, মোটরে বেড়িয়ে আসে, কতো বিষয়ে কতো কথা বলে, কতো লেখক নিয়ে কতো তর্ক করে, কতো সময় অতিবাহিত হয়ে যায় ঘড়ির দিকে না তাকিয়ে কিন্তু কোনো সময় এমন হয় না, শুধু চুপচাপ মুখোমুখি বসে থেকেও হৃদয় পরিপূর্ণতার ভারে আনত হয়ে যায়। সমীর আজ পর্যন্ত শর্বরীকে ছোঁয়নি। মনেই আসেনি। কে জানে শর্বরী হয়তো অবাক হয়েছে, অপমানিত হয়েছে, ব্যথিত হয়েছে।

কিন্তু শর্বরীকে সে কী করে বোঝাবে, তার জন্য সমীরের মায়ামমতা বন্ধুতা ভালোবাসা—সবই আছে, নাই শুধু প্রেম।

অতএব? অতএব মিছিমিছিই মাকে দোষ দেয়। আসলে তার নিজের মধ্যেই একটা কিছুর অভাব ঘটেছে। কিন্তু কেন ঘটলো? কে ঘটালো? তা সমীর জানে না। তবে কি অন্তরতম প্রদেশে সেই মানুষটাই সক্রিয় হয়ে কাজ করে যাচ্ছে? অচেতনে থেকেও আচ্ছন্ন করে রেখেছে চেতনা?

না, মা, ওসব কিছু না। কিছুই কিছু না। শর্বরীও না, সুমনাও না। আমি তোমাকেই ভালোবাসি, তোমাকেই একমাত্র বলে জানি। আমি তোমাকে দুঃখ দেবো না। যদি আর কখনো দিয়ে না থাকি, তা হলে এই বয়সে কেন দেব? যে বয়সে আর আমার কিছু সাধ করবার নেই, আকাঙ্ক্ষা করবার নেই, ফিরে পাবার নেই।

হ্যাঁ ঠিক আছে। তাই হোক। গোবিন্দ ঘোষের কন্যার সঙ্গেই হোক। তুমি চেয়েছ এর উপরে আর কথা কী? তুমি তো সত্যিই আমার ভালো চাও। সত্যিই তো তুমিই আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়েছ।

কিন্তু আমি কি এ জীবন চেয়েছিলাম?

আরে, এ যে আটটা বেজে গেল। এখনও আসছে না ড্রাইভার?

কিন্তু একটা কথা ভাবলে বড়ো অবাক লাগে, মা কেমন চিরকাল নিজের ইচ্ছেটাকেই আরোপ করে গেলেন সমীরের উপর, সমীরের ইচ্ছের কিন্তু কোনো মূল্য দিলেন না কখনো। ঈশ্বরের রাজত্বে কিছুই নিরবচ্ছিন্ন নয়, এই একটি জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে ব্যতিক্রম। মার ইচ্ছেই ইচ্ছে, আর সে শুধু তাঁর ইচ্ছের পুতুল হয়েই জীবনপাত করলো।

শর্বরী, তুমি কী বলো? প্রেম না হয় নাই হলো, পাত্রী হিসেবে তুমি যখন এতো পছন্দের, তখন একটা লঙ্ঘিত নিয়মকে আবার নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করবো নাকি? একবারের মতো অন্তত মাকে জানিয়ে দেবো নাকি আমার নিজেরও একটা অস্তিত্ব আছে, ইচ্ছে আছে। নিজের ব্যক্তিসত্তাকে অন্তত একবারের মতো তুলে ধরবো নাকি? কিন্তু কী জানো? বড়ো শক্ত শিকলে আমার মা আমাকে বেঁধে বড়ো করেছেন। আয়াসী কুকুরের মতো আমি বড়ো বেশী গৃহপালিত হয়ে গেছি। যতোই ঘেউ ঘেউ করি, সব আমার ভাসা ভাসা, দৌড়ে গিয়ে যে চোরের ঠ্যাং কামড়ে ধরবো সেই বিষ দাঁত আমার ভেঙে দিয়েছেন মা। আমার নিজের কোনো উচ্ছ্বাস বা ইচ্ছে জীবন্ত নয়, বোধহয় সবই আমি আমার মাকেই উৎসর্গ করে দিয়েছি। হয়তো বা প্রেমও।

আচ্ছা শর্বরী, ধরা যাক, আমি আজই তোমার কাছে প্রস্তাব করলাম, তুমি অনুমতি দিলে, তোমার মা বাবাকেও বললাম, তারপর আমাদের বিয়ে হলো। তারপর তুমি একদিন টের পেলে আমার হৃদয় মন আমি আমার প্রথম যৌবনে প্রায় চিরকালের মতোই এক-জনের কাছে গচ্ছিত রেখে সর্বস্বান্ত অবস্থায় বিয়ে করেছি তোমাকে, যার জন্য আমি তোমাকে সব দিতে পেরেও আবেগের জায়গাটাতে এসেই কেমন ফিরে যাচ্ছি পাথরে ধাক্কা খাওয়া প্রবল ঢেউয়ের মতো তখন? তখন তুমি কী বলবে? কী করবে? হঠাৎ আমার একদিন মন খারাপ হয়ে গেলে, তাকে মনে পড়ে গেলে—

'সাব'

'কে মকবুল? এসেছ? এতো দেরি করলে কেন?'

মকবুল নামের সুশ্রী যুবক চালকটি বিনীত হয়ে বইয়ের প্যাকেটটা এগিয়ে দিতে দিতে বললো, 'আপনি একেবারে ফিতে দিয়ে বেঁধে আনতে বলেছিলেন, কিন্তু যে লোকটা বাঁধে তার জন্য বসে থাকতে হলো একটু, কাগজ কিনতেও একটু সময় লাগলো।'

'বা, সুন্দর প্যাক করেছে। কাগজটা কি তুমি পছন্দ করে কিনলে নাকি? চমৎকার রংটা।'

মকবুল সলজ্জ ভঙ্গিতে মুখ নামালো।

সমীর হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো বইয়ের প্যাকেটটা, গন্ধ শুঁকলো বার কয়েক, তারপর রেখে দিল টেবিলের উপর।

এইবার একটা আলাদা কাগজে লিখে দিতে হবে 'জন্মদিনের জন্য।' তারপর গুঁজে দিতে হবে সবুজ ফিতের বাঁধনের মধ্যে।

সবুজ কেন? 'মকবুল, তুমি তো জান আমাদের উৎসবের রং লাল। লাল ফিতে পেলে না? আজ যে কমিশনার সাহেবের মেয়ের জন্মদিন।'

'লাল? ও। তা হলে আমি সামনের দোকান থেকে একটা লাল ফিতে নিয়ে আসবো? যাবো আর আসবো।'

'দেরি হবে না তো?'

'একটুও না।'

মকবুল চলে গেল। সমীর হঠাৎ মনস্থির করে ফেললো। হ্যাঁ, আজই, আজই আমি বিবাহের প্রস্তাব জানাবো। আমি কক্ষণো মার পছন্দসই ক্রোড়পতি গোবিন্দ ঘোষের কন্যার পাণিগ্রহণ করবো না। কেন করবো? তাকে আমি চিনি না। মা চেনেন তো আমার কী? আর মা তো চেনেন টাকা। টাকার জন্যই তো মা এখানে এতো আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

লাল ফিতেই দরকার। লাল শুভ। লাল বিয়ের রং। লাল সিঁদুর। লাল শাঁখা।

৪০

ভিতর থেকে পর্দা সরিয়ে উঁকি মারলো কালীচরণ। দমকা হাওয়ার মতো লক্ষ্মী বেগে ঢুকে এলো ঘরের মধ্যে। অন্যমনস্ক সমীরকে চমকে দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো কোলের কাছে। খুশিতে সে সংকোচ ভুলে গিয়েছিলো, উত্তেজনায় ছটফট করছিলো, বস্তির অন্ধকারে ঢুকেও আলো ঝলসিত এই ঘরে, এই মানুষের কাছে আবার ফিরে আসতে পেরে তার আর সুখের সীমা ছিলো না। একগাল হেসে বললো, 'আমি আবার এসেছি।'

'আবার এসেছ?' তাকিয়ে সমীরের মুখও প্রসন্ন হয়ে উঠলো। ছোট্ট বন্ধুটিকে সে সহাস্যে হাত বাড়িয়ে আদর করলো।

কালীচরণ হাত কচলাতে কচলাতে বললো, 'হুজুর একটা কথা—'

'বলো।'

'বইলছিলাম যে—'

'ছুটি চাইছো? নিশ্চয়ই। আর আমার

কোনো কাজ নেই আজ। গিয়েছিলে যদি আবার না এলেও পারতে।'

'সে কথা নয়।'

'তবে?'

'আমি একা আসিনি হ্জুর।'

'তাতো দেখতেই পাচ্ছি।'

'না, ওর কথা বলছি না। ওর মা এসেছেন।'

'ওর মা?'

'বড়ো বিপদে পইড়ে এসেছেন। কী বলবো হ্জুর, রাজরানী যখন পথের ভিখারিণী হয়, এমনিই দশা হয় তাঁর। কাজ করতেন, ঐ শচীরাণী বালিকা বিদ্যা-লয়ে, এখন এমন অবস্থা কইরে তুলেছেন। তাঁরা—'

'কোথায় তিনি?'

খাবার ঘরের তলায় দেঁইড়ে রয়েছেন।'

'খাবার ঘরের তলায়? কেন? ওখানে কেন?'

'ভাইবলাম সামনে নিয়ে এলে যদি অস্ুবিধে হয় আপনার।'

'আমার আবার কিসের অস্ুবিধে? ছি, ছি, ওখানে কাউকে অপেক্ষা করতে হয়?'

'নিয়ে আইসবো?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু আমাকে যে এখুনি বেরুতে হবে।'

'বেশী দেরি হবে না কর্তা—'

'ঠিক আছে, নিয়ে এসো তুমি। আচ্ছা চলো আমিই যাচ্ছি ওঘরে।' সমীর হাতের ঘড়ি দেখলো। ভদ্রমহিলা বিষয়ে একটু কৌতূহল ছিলো তার. সে বুঝেছিলো কিছু একটা রহস্য আছে এই মা মেয়ের মধ্যে। তিনি কেন এসেছেন. কী বলবেন. কতো তাড়াতাড়ি বিদায় দেয়া যায় এসব ভাবতে ভাবতে এ ঘরে এলো।

সিঁড়ি বেয়ে লক্ষ্মীর মাও এলেন। আলোটা নেবানো ছিলো, সমীর রাগ করলো তাই নিয়ে। কালীচরণকে বকলো. 'কী বুদ্ধি তোমার! আলোটাও জ্বালিয়ে দাওনি?' নিজেই এগিয়ে এসে টিপে দিল স্যুইচ, উজ্জ্বল উদ্ভাসে মুহূর্তে ভেসে গেল ঘর।

'আসুন' ফিরে দাঁড়িয়ে সম্ভাষণের জন্য যুক্তকর হয়ে নমস্কার শব্দটি উচ্চারণ করতে করতে তাকালো মুখের দিকে তারপরেই ভীষণভাবে চমকে উঠে একটা বজ্রাহত গাছের মতো স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

সিঁড়ির নীচে অপেক্ষমান যে আহত অপমানিত মানুষটি এতক্ষণ ধরে আকাশের কোটি কোটি তারার মধ্যে একটি তারাকে খুঁজে খুঁজে বার করছিলেন সেই লক্ষ্মীর মা এখনও আরও বিষণ্ণ বিধুর দৃষ্টিও এই পৃথিবীর এই সবচেয়ে মানুষটির মুখ ছুঁয়ে স্থান হলো। একটা ঢেউ কাটলো বুকে। কিন্তু উপচিয়ে ভিড়ে ছত্রখান হয়ে গেল।

সবই মুহূর্ত কয়েক. তারপরে দুজনেই নামিয়ে নিল চোখ। সমীর বললো 'বসুন।'

লক্ষ্মীর মা বললেন, 'বরং আজ যাই, আপনার বোধহয় সময় নেই।'

'না না, আমার কিছুমাত্র ব্যস্ততা নেই।'

'আমার কথাটাও খুব জরুরী নয়। আর একদিন—'

'উপলক্ষ্য যাই হোক, এলেন যখন দয়া করে নিশ্চয়ই একটু বসবেন।'

কালীচরণ লক্ষ্মীকে নিয়ে চলে গেল বৃন্দাবনের ঘরে। লক্ষ্মীর মা ঢোক গিলে বসলেন। চারদিকে তাকিয়ে আলাপের ভাষা খুঁজলেন।

সমীর সহাস্য হলো, 'আপনার মেয়ে কিন্তু আমাকে খুব পছন্দ করে।'

'জানি, অনেক উৎপাত আপনাকে সহ্য করতে হয়।'

'আপনার নামে তার অনেক নালিশ জমা আছে।'

'তাই নাকি?'

'আপনি সেদিন ওকে মেরেছিলেন, ওর সব জিনিসপত্র ফেলে দিয়েছিলেন, এখানে আসতে বারন করেছিলেন—'

'তবু তো আসছে।'

'চমৎকার খাবার পাঠিয়েছিলেন। খুব তৃপ্তি করে খেয়েছি। ক' বছরের জন্মদিন হলো?'

'চার।'

'ওর বাবা—মানে—'

'মৃত।'

'আপনার বিয়ে, অর্থাৎ—'

'আমি যে জন্য এসেছি তার সঙ্গে এই সব প্রশ্নের যোগ নেই কোন।'

'তা নিশ্চয়ই নেই। আসলে দেখছেন তো কী রকম শূন্যো বাড়িঘর। নিজে তো বিয়ে করিনি, অন্যের বিষয়ে তাই অযথা কৌতূহল।'

লক্ষ্মীর মা চুপ করে রইলেন।

'একটু চা করি' ইলেকট্রিক কেটলির প্লাগটা দেয়ালে গুঁজে দিল সমীর।

লক্ষ্মীর মা ব্যস্ত হলেন, 'না, না আমি চা খাবো না। আমি অত্যন্ত বিপন্ন হয়েই এমন অসময়ে খবর বার্তা না দিয়ে ছুটে এসেছিলাম।'

'হ্যাঁ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'না, দারিদ্র্যের জন্য নয়' শাড়ি দিয়ে ছেঁড়া জুতো ঢাকলেন। 'আমি অর্থসাহায্যের জন্য আসিনি।'

'আমিও তা ভাবিনি।'

'কারো নামধাম বংশপরিচয়ও আমি জানতাম না।'

'তা-ও বুঝেছি।'

'এসেছি আমি এই শহরের প্রভু, কালেকটার সাহেবের কাছে। আমার একটা সুবিচারের প্রার্থনা ছিলো।'

'আশা করি এখন আর কোনো সুবিচারের আশা পোষণ করছেন না মনের মধ্যে।'

'কেন করবো না। শহরের শত শত অধিবাসীর মতো আমিও একজন এবং আপনি আমাদের অধিকর্তা।'

'শুধুই কি তাই?'

'কিন্তু এখন আমি যাবো।'

'ঠিক আছে। আমিই আপনাকে পেঁৗছে দেব।'

'আমি বস্তির মধ্যে ঘরভাড়া নিয়ে থাকি। গলির মুখে গাড়ি দাঁড়ালে আপনার অসম্মান হবে।'

'আমার সম্মানের জন্য উতলা হবেন না।'

'আমার সম্মানও তাতে থাকছে না বলেই আমি উতলা।'

'আমি পেঁৗছে দিলে আপনার সম্মানের হানি হবে?'

'অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হবে অনেকের কাছে।'

'কৈফিয়ৎ! কিসের কৈফিয়ৎ?'

'আপনি পদস্থ ব্যক্তি, লোকে আপনাকে সম্ভ্রম করে, আমার মতো একজন সামান্য মানুষকে গাড়ি চড়িয়ে বাড়ি পেঁৗছে দিলে তার অর্থটা ওদের পক্ষে সুবোধ্য হবে না।'

'কলঙ্ক রটাবে?'

স্বাভাবিক।'

'মন্দ কী?'

'আপনার কলঙ্ক আপনি ধুলোর মতো ঝেড়ে ফেলতে পারলেও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'সমীর গম্ভীর হলো একটু। তারপরেই সহজ হলো আবার।

'যাকগে, জল ফুটেছে, চা করি।'

'দয়া করে আমার জন্য করবেন না।'

'কেন, আমার তো ধারণা চা আপনার প্রিয় পানীয় এবং তা যদি অসময়ে হয় তাহলে আরো খুশি।'

লক্ষ্মীর মার মুখে বিদ্যুৎ প্রবাহ হলো। চুপ করে থেকে বললেন, 'তা হলে এবার উঠি?'

প্লাগটা খুলে সমীর কেটলিতে জল ঢাললো, ধীরে ধীরে হোয়াট নট থেকে কাপ প্লেট সাজাতে সাজাতে বললো, 'জানি, তেমন আতিথেয়তা করতে আমি পটু নই, কিন্তু আর দু'চার সপ্তাহ বাদে যদি আসেন কথা দিতে পারি আমার স্ত্রী আপনাকে সব পূরণ করে দিতে পারবেন। মানে, শীগ্গিরই বিয়ে করছি কিনা?'

'ও।'

'আজকে আমার সেই ভাবী স্ত্রীরই জন্মদিনে যাচ্ছিলাম—'

'আমি সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত।'

'আসলে কি জানেন, মনোস্থির করতে পারছিলাম না। এখন ভেবে দেখলুম বোকার মতো সারাটা জীবন অপেক্ষা করে ভুলের মাশুলই গুনেছি। নিন্ দেখুন কি রকম হয়েছে খেতে।'

চায়ের কাপটা সযত্নে এগিয়ে দিল সে, টিন থেকে বিসকুট বার করে সাজিয়ে দিয়ে বললো, আপনার পুষ্যি কালীচরণ এতো উৎকৃষ্ট রান্না করে যে মাঝে মাঝেই বিসকুট চিবিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয়। এখন দেখছি তা সার্থক হচ্ছে।'

'আপনার ভদ্রতা অনুকরণযোগ্য, কিন্তু তা ভোগ করার মতো মনের অবস্থা আমার নয়, ক্ষমা করবেন।'

'মন? মনের কথা বাদ দিন। তার ইচ্ছে মতো চললে আমার তো কবেই মরে যাওয়া উচিত ছিল। আসলে মন হচ্ছে গিয়ে পোষা কুকুরের মতো কয়েক ঘা চাবুক মারলেই ঠিট হয়ে যাবে। আমার কথাই ধরুন না, এক সময়ে এমন তলিয়ে গিয়েছিলুম যে কখনো ভাবিনি আবার মাথা তুলে আলোর মুখ দেখবো। দিন নেই, রাত নেই, খিদে নেই তৃষ্ণা নেই, যতোদূরে তাকাই শুধু অন্ধকার, অন্ধকার আর অন্ধকার। আকণ্ঠ অন্ধকারে তলিয়ে আছি তো আছি। কেন? না, সে চলে গেছে। কে? না, যে ছিলো আমার —মানে কবিতার ভাষায় স্বপনচারিণী। আমি তাকে ভেবেছিলাম রক্তমাংসের মানুষ। আসলে সে তা ছিলো না। তার হৃদয় মন বলে কোনো পদার্থ ছিল না। অথচ আমার হৃদয় মন নিয়ে আমি পাগল। বুঝলেন, মানুষ আমি দুর্বল চরিত্রের ছিলুম বটে, তা বলে আমার মধ্যে কোনো ফাঁকি ছিল না। মিথ্যা ছিল না। কিন্তু সে কথা কেউ বোঝেনি।'

কোণের টেবিলে ফোন বেজে উঠলো। কথা থামিয়ে সমীর এগিয়ে গেল সেখানে।

'হ্যালো।' 'শর্বরী?' 'হ্যাঁ' 'হ্যাঁ' 'কিছু মনে করো না, একটু দেরি হচ্ছে।' 'এ্যাঁ' 'হ্যাঁ।' 'হ্যাঁ।' 'একটা জরুরী কাজে আটকে গেছি।' 'কী বললে?' 'না, না' 'হ্যাঁ' 'আসবো।' 'ঠিক আছে।' 'চাঁদনী রাতে নৌকো? তা বেশ তো।' 'হ্যাঁ' 'হ্যাঁ' 'ছেড়ে দিচ্ছি' 'না, না' 'হ্যাঁ' 'হ্যাঁ' 'শোনো।'

সমীর যতোক্ষণ পিছন ফিরে কথা বললো, লক্ষ্মীর মা ততক্ষণে নিঃশব্দে উঠে বাইরে এলেন, বৃন্দাবনের বারান্দা থেকে কালীচরণ আর প্রায়-ঘুমিয়ে-পড়া লক্ষ্মীকে নিয়ে কুঠির কম্পাউন্ড পার হলেন।

পথে এসে কালীচরণ বললো, 'হুজুর কী কইলেন মা?'

অন্যমনস্ক লক্ষ্মীর মা বললেন, 'কিছু না।'

'কিছু না? তোমার নালিশ শুইনে উনি কিছুটি বইললেন না?

'উনি খুব ব্যস্ত ছিলেন, বিয়ে কিনা?'

'বিয়ে! কার বিয়ে?'

'তোমার মনিবের।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, কালীচরণ। উনি আজ সেখানেই নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছিলেন। দেরি দেখে ও'রা ব্যস্ত হয়ে ফোন করছিলেন। এরকম অবস্থায় আমি এসে ভালো করিনি।'

'মনিবের বিয়ে?' কালীচরণ মুহূর্তে উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'আজ তো কমিশনার সাহেবের কুঠিতে নিমন্ত্রণ। তা হলে বোধ হয় তাঁর মেয়েকেই বিয়ে করবেন।

'তাঁর মেয়ের নাম কী কালীচরণ?'

শর্বরী। আমি তো তেনাদের চিনি। একদিন চিঠি নিয়ে গেলাম।'

'ও। তিনিই ফোন করছিলেন।'

'খুব বিদ্বান মেয়েছেলে। ইশকুলের মাস্টার না গো মা, পুরুষের কান কেইটে কলেজে পড়ান। বাবা, এ কি সোজা লেখাপড়ার দরকার?'

একটু হাসলেন লক্ষ্মীর মা, 'ঐ জন্যই আমার কথা শুনলেন না তোমার মনিব। ভাবলেন সামান্য একটা ইশকুল পড়ানো মানুষ, তার আবার নালিশ, তার জন্য আবার সময় নষ্ট।'

'না না তা নয়। বাবু আমার তেমন নয়। ছোটো বড়ো সকলের দিকে তার সমান নজর।'

'ছোটো বড়ো?' বুকটা মোচড় খেয়ে উঠলো, 'আচ্ছা কালীচরণ—'

'মা'

'চলো না আমরা কলকাতা চলে যাই?'

'কলকাতা?'

'গিয়েছ কখনো?'

'না মা—'

'কলকাতা গেলেই সবদিক থেকে ভালো হবে। আমি নিশ্চয়ই একটা কাজ পাবো গিয়ে, এসব গোলমালও থাকবে না।'

'তা মন্দ কী?'

'আজই চলো না?'

'আজ? আজ কখন?'

'এখনি সব গুছিয়ে নিতে পারি। মেইল ট্রেন রাত বারোটায়।'

'তা কি হয়?'

'কেন হয় না?'

'এই রাত করে আমরা কোথায় গিয়ে উঠবো?'

'স্টেশনেই থাকতে পারবো। তারপর সকাল হলে—'

'না মা তা হয় না। মনিবকে না বলে, আর একটা লোক না দিয়ে—'

'তাতে কী?'

'কে রেঁধে দেবে? কী খাবেন?'

'তবে এক কাজ করলে হয় না?'

'কী?'

'আমি বরং আজ ওপারের সেই আমার পুরোনো কাজের জায়গায় চলে যাই।'

'পুরোনো কাজের জায়গা?'

'একটা হাসপাতালে কাজ করতুম।'

'ওমা, সেখানে এতদিন পরে গেলে কে চিনবে তোমাকে? কোথা থাইকবে?'

'তার জন্যে কিছু হবে না। হাসপাতালে সব সময় কোনো না কোনো কাজ খালি থাকে। গেলে ঠিক পেয়ে যাবো।'

'সে তো তুমি কাল গিয়েও খোঁজ আনতে পাইরবে। তার জইন্যে আজ কেন? আমি ছুটি নিয়ে যেইতে পারবো তোমার সঙ্গে। তুমি এতো ভয় পাচ্ছ কেন মা? তোমার ছেলে কি বেইচে নেই?'

'কালীচরণ—'

'মা—'

'এই শহরে আমার আর একবিন্দু মন টিকছে না।'

'কী করে টিইকবে মা? এই শহর তোমাকে কী দিল?'

'শুধু যা ভুলেছিলাম মনে করিয়ে দিল সে সব। আমি আর এক মুহূর্ত থাকতে পারছি না এখানে।'

'তোমার কোনো ভয় নেই, কোনো ভয় নেই। আমি কাল নিজে মনিবের কাছে সব খুইলে বইলবো। উনি বিচার করেন ভালো, না করেন তো বিচারশালা আমি নিজে বসাবো। আবার আমি কালী ডাকাত হইয়ে খড়্গ ধইরবো বাহুতে। না, আমি

ছাইড়বো না, আমি ছাইড়বো না, যদি মা বলে ডেইকে থাকি এর পিরতিশোধ আমি নিব নিব নিব। তোমাকে আমি পেইলে যেতে দেবো না, পালাবে ওরা, ঐ শেয়াল কুকুর গুলোন।'

লক্ষ্মীর মা নীরবে হাটতে লাগলেন। তাঁর পা চলছিল না, তিনি পড়ে যাচ্ছিলেন।

৪১

ফোন শেষ করে সমীর এদিকে ফিরল। শূন্য চেয়ারটার দিকে তাকালো, ভরা পেয়ালা চা'য়ের দিকে তাকালো, অস্পৃশ্য বিস্কুট-গুলোর দিকে তাকালো। সব আছে। শুধু মানুষটাই উঠে গেছে কখন।

কিন্তু আদৌ সে এসেছিল কিনা এটাই ঠিক ভেবে উঠতে পারলো না। চিৎকার করে কালীচরণকে ডাকলো সে। বৃন্দাবন ছুটে এলো ঘর থেকে, মকবুলও এলো। সে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। মনে করিয়ে দিয়ে বললো, 'ন'টা বেজে গেছে।'

সমীর বললো, 'বাজুক। আমি যাবো না।'

বৃন্দাবন বললো, 'তা হলে খাবার বন্দোবস্ত—'

'আমি খাবো না।'

'কালীচরণকে কি ডেকে আনবো ফিরে?'

'কোনো দরকার নেই।'

প্রভুর মেজাজ দেখে একটু থমকে গেল সুজনেই। ভারি ভারি পা ফেলে শোবার ঘরের দিকে যেতে যেতে সমীর বললো, আলো নেবাও, দরজা বন্ধ করো, গাড়ি গ্যারাজে তোলো।'

মুহূর্তে কী থেকে কী ঘটলো বুঝতে পারলো না ওরা। মুখচাওয়াচাওয়ি করে হুকুম পালনে প্রবৃত্ত হলো।

শোবার ঘরে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো সমীর। যেন ভুলে গেল কী করবে। অনেক পরে বেরুবার পোশাক খুলে ঘুমের পোশাক পরে নিয়ে বিছানার কাছে এলো। তারপরে আবার ভাবতে লাগলো এবার তার করণীয় কী।

ভিতরে ভিতরে অদ্ভুত এক অসহায় উত্তেজিত রাগে সে ক্ষিপ্ত বোধ করছিল। মনে মনে বাচ্চাদের মতো রুষে ফুঁষে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলছিল 'খুব হয়েছে, ভালো হয়েছে, আক্কেল হয়েছে। এর নামই যেমন কর্ম তেমনি ফল। এখন? এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে? আমি না হয় একটা অপদার্থ অক্ষম ব্যক্তিত্বহীন মানুষ ছিলাম, স্বামী হিসেবে আমাকে না হয় তোমার একটা পায়ের যোগ্য মানুষ বলেও মনে হয়নি। কিন্তু যাকে তুমি বড়ো সাধ করে বরমাল্য পরালে (এখানে সমীরের চোয়াল ব্যথা করলো) সে এখন গেল কোথায়? এই

বস্তির ঘরে বসিয়ে, আমারি ভৃত্যের অভিভাবকত্বে ফেলে রেখে সেই উপযুক্ত লোকটা কোথায় পালালো? মৃত্যু! না হয় মৃত্যুই তাকে নিয়ে গেছে তাই বলে সেই বীরপুরুষ বিয়ে করতে পারলেন তো স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্য[...]

এক পা বিছ[...] জঙ্গলে জঙ্গলে খাঁচার জন্তুর মতো হাঁটতে লাগলো। ত[...]

একাকী চেয়ারে, চুপচাপ তাকিয়ে রইলো গঙ্গার দিকে। ঠাণ্ডা শান্ত গঙ্গা। কিন্তু সেই বুকেও আজ শান্তি নেই। অনেক রাত্রে টের পেল তার চোখে একবিন্দু ঘুম নেই, তার চোখ বারে বারে ভরে যাচ্ছে জলে। তার রাগ আক্রোশ হিংসা প্রতিদ্বন্দ্বিতা—সব মিশে গেছে বেদনার সাগরে, যেখান থেকে একটিমাত্র জিজ্ঞাসা হাহাকারের মতো পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে বুকের মধ্যে, 'কে! সে কে! কে তাকে এমন করে ছিঁড়ে নিয়ে গেল আমার হৃদয় থেকে।

দুঃখের রাত, বিরহের রাত, বিচ্ছেদের রাত, কতো অসহ্য রাতের স্বাদই তো এক সময়ে জেনেছিল সমীর। কিন্তু এই রাতের যেন কোনো তুলনা খুঁজে পেলো না। এই রাতেই শুধু সে জেনেছে ঐ মানুষটার জীবনে আর কোথাও তার জন্য এক ফোঁটা জায়গা অবশিষ্ট নেই, একবিন্দু আশা নেই। যে ছিলো হেরম্ব দত্তের একমাত্র সন্তান, একটা আস্তো সুখের পুতুল, তার দ্বিতীয় রহিত ঈশ্বরী, সে আজ অন্যের, অন্যের, অন্যের। সে আজ বস্তিতে বসেও অন্যের, প্রাসাদে থাকলেও অন্যের। সে আজ লক্ষ্মীর মা, যে লক্ষ্মীর জন্মদাতা আর একজন মানুষ, যে মানুষকে সমীর দেখেনি, চেনে না, জানে না, যে মানুষ মৃত এবং যে মানুষ তার হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিয়েছে।

সুমনা। সুমনা। মনি, সত্যি কি তুমি আজ এসেছিলে? সত্যি তোমার জীবন এখন এখানে এসে একটা বস্তির মধ্যে অবসিত হচ্ছে। আমাকে শেষে তাই দেখতে হলো? এই অবস্থায় দেখতে হলো? এর চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কী হতে পারে? এর চেয়ে অবিশ্বাস্য আর আমি কী ভাবতে পারি? এর চেয়ে আশ্চর্য ঘটনা আর কী ঘটে মানুষের জীবনে। সুমনা, আমার সুমনা, আমার মনি—

প্রায়-চল্লিশের প্রায়-প্রৌঢ় সমীর চৌধুরী তার নিঃসঙ্গ বারান্দার নিঃসঙ্গ রাতে দু' হাতে মুখ ঢেকে নিঃশব্দ কান্নায় উত্তাল হয়ে উঠলো।

রাত খুব দীর্ঘ ছিলো সেদিন, মনে হচ্ছিলো না ফুরোবে, মনে হচ্ছিলো না আবার পূর্বদিক আলো ক'রে সূর্য উঠবে গঙ্গার ওপারে, মনে হচ্ছিলো না চোখ মেলে আর কখনো দেখতে পাবে জগৎসংসারের আলোকিত চেহারা।

কিন্তু রাত কাটলো। ঘুম ভেঙে মনে হলো রোজের মতোই ঘুমিয়েছিলো, বারান্দায় নয়, রোজের মতো বিছানাতেই, রোজের মতো টোকা শুনে দরজাও খুলে দিল। রোজের মতোই চা পেলো শিয়রে। শুধু এইটুকু তফাৎ সে চা কালীচরণ দিয়ে যায়নি, সুরেন বেয়ারা দিয়েছে।

কেন কালীচরণ দেয়নি? সে আজ আসেনি। কেন আসে নি? সে এ শহরে নেই। নেই? না। তবে কোথায় গেল হঠাৎ? সে কথা জানে না কেউ। জানে না মানে? জানে না মানে সে কথা সে কাউকে বলেনি। কী বলেছে তবে? ভোর পাঁচটায় এসে ব'লে গেছে ক'দিন আসবে না। কার কাছে বলেছে? বৃন্দাবনের বউর কাছে।

চা খাওয়া মাথায় উঠলো। মুখ ধোওয়া হলো না, দাঁত রাশ করা হলো না, পোশাক বদলানো হলো না, প্রায় লাফিয়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে, টপকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো উঠোনে। 'বৃন্দাবন, বৃন্দাবন।' প্রভুর এমন উঁচু গলার ডাকে বৃন্দাবনের সকালের ঘুমের অলস আমেজ ভেঙে খান খান হয়ে গেল। সে মরি কি পড়ি করে চোখ মুছতে মুছতে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো।

'বউ কোথায়? তোমার বউ?'

'আজ্ঞে, আমি দেখছি।' দৌড়ে গিয়ে কোথা থেকে ডেকে নিয়ে এলো তাকে।

'শোনো, কালীচরণ কখন এসেছিলো?'

ঘোমটার তলা থেকে বৃন্দাবনের বউর মিষ্টি গলায় জবাব এলো, 'অনেক সকালে।'

'কী বললো?'

'মার সাথে সে কোথায় যাচ্ছে—'

'মার সাথে? মা কে?'

'ঐ বাচ্চাটার মা, লক্ষ্মী দিদির মা,—

'উনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'আজ্ঞে, আমি তো তা জানি না।'

'কেন জানো না?'

বৃন্দাবনের বউ চোর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

'কখন গেছে জান?'

'বললো, সাতটার ট্রেনে যাবে।'

'সাতটার ট্রেনে? ঠিক জান?'

'তাই তো বললো।'

'তা হলে আমাকে এতোক্ষণ বলোনি কেন?'

'আজ্ঞে আপনি তখন ঘুমোচ্ছিলেন।'

'ঘুমোচ্ছিলাম তো ডাকনি কেন।' সমীর যেমন হন্তদন্ত হয়ে এসেছিলো তেমনি হন্তদন্ত হয়েই ফিরে গেলো। বড়ো ঘড়িতে সাতটা বেজে পাঁচ।

এখন আমি কী করি, কী করি। শোবার ঘরে গিয়ে সে হতাশভাবে বসে পড়লো চেয়ারে। তারপর কী ভেবে উঠলো, কাপড় চোপড় ছেড়ে বেরিয়ে এলো রাস্তায়।

শেষ চেষ্টা হিসেবে তার কাছে মাত্র দুটো পথ খোলা আছে মনে হলো। একটা হচ্ছে, গাড়ি নিয়ে স্টেশনে যাওয়া সেখানে গিয়ে খোঁজা, অবিশ্যি ট্রেন যদি দৈবাৎ লেট হয় তবেই সে খোঁজার মানে হবে, আর নয়তো সোজা বস্তিতে যাওয়া। গিয়ে সংবাদ সংগ্রহ। কেউ না কেউ নিশ্চয়ই বলতে পারবে ভদ্রমহিলা কোথায় গেছেন।

ভাবতে ভাবতে একটা সাইকেল রিক্শা দেখে সেটা ডেকেই সে চেপে বসলো। যেন নিজের অজান্তেই চলে এলো বস্তিতে।

গলির মুখে নেমে ভাড়া দিয়ে ঢুকে এলো ভিতরে।

বস্তির ঘুম ভেঙেছে সবে। আস্তে আস্তে ভিড় জমছে কলে।

রিকশ চড়ে আসা, সামান্য ধুতি সার্ট পরা মানুষটিকে কেউ তেমন গ্রাহ্য করছিলো না, তবু সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছিলো। সমীর জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে কি লক্ষ্মীর মা বলে একজন ভদ্রমহিলা থাকেন?'

দু'টি ছেলে লুঙ্গি কষতে কষতে এগিয়ে এলো তাড়াতাড়ি, 'লক্ষ্মীর মা? সেই যে সুন্দর মেয়েছেলেটি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।

অমন সুন্দর একজন ভদ্র চেহারার মানুষের মুখে 'আপনি আজ্ঞে' শুনে ছেলে দু'টি খুশি হলো। বললো, হ্যাঁ থাকেন বই কি। ঐ তো ছ' নম্বর ঘর। কালীচরণ বলেও একটা লোক থাকে। আমাদের কলেক্টার সাহেবের কুঠিতে কাজ করে।'

ছ' নম্বর ঘর?'

বিরস চেহারার একটি আধ বুড়ো লোক দাঁতন করতে করতে বললো, 'তাঁরা তো নেই।'

'কোথায় গেছেন?'

'সেই মেয়েছেলেটির চাকরী হয়েছে কোথায়, সেখানেই চলে গেছে সব।'

ঘর খালি?'

'আমি মশায় সব জানি। কালীচরণ সেই সক্কালবেলা আমার কাছেই ক'টা টাকার জন্য ছুটে এসেছিলো। বলছিলো, আমার মার চাকরী হয়েছে, আমরা চলে যাচ্ছি। দশটা টাকা হাওলাত দাও, আমি দু' হপ্তার মধ্যে শুধে দেব। আমি ও তেমনি চালাক, খপ করে চেপে ধরলুম, চলে তো যাচ্ছ, দেবেটা কে? বলে যদি মনিঅডার করে না পাঠাই বাপের ব্যাটা নই। আমি যখন তাতেও টললুম না, তখন বলে আমার মনিবের কাছে গিয়ে চেয়ো, ঠিক পেয়ে যাবে। আজ মাসের তিরিশ তারিখ, কালই মাইনে পাবার দিন আমার। তুমি চাইলেই তা থেকে কেটে দিয়ে দেবেন।

লোকটির বেশী কথা বলার অভ্যেস। অস্থির সমীর দাঁড়াতে পারছিলো না। ফিরে আসতে আসতেও একবার ছ' নম্বর ঘরটা দেখে যাবার সাধ হলো। যে ঘরটায় সুমনা থাকতো, সে ঘরটা কেমন তা কি স্বচক্ষে না দেখে পারে? প্রতিবেশীরা যে কেমন তাতো দেখছে। তার বুক থেকে ঠেলে ঠেলে একটা যন্ত্রণা দলা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে আসছিলো গলার কাছে। সে সকলের কৌতূহল উপেক্ষা করে ছ' নম্বর ঘরের দিকেই পা বাড়ালো।

খুঁজে নিতে দেরি হলো না, উঠোনে দাঁড়িয়েই দেখতে পেলো সব।

'সুমনা।'

বারান্দায় পিছন ফিরে বসে উনুনে আঁচ দিতে দিতে লক্ষ্মীর মা চমকে ফিরে তাকালেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। সমীর এগিয়ে এলো, রুদ্ধশ্বাসে বললো, 'তা হলে তুমি আছ?'

'ওরা বলছিলো চলে গেছ। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম।'

'পাগল হয়ে যাচ্ছিলেন!' লক্ষ্মীর মার গলা যেন প্রতিধ্বনি হয়ে ভেসে এলো দূর থেকে।

'কোথায় যাচ্ছিলে? কেন যাচ্ছিলে? কেন পালিয়ে যাচ্ছিলে আবার। সুমনা, আমি ক্লান্ত, আমি সারারাত ঘুমহীন, তুমি আমার কথা একটু ভাবো।'

'আপনার কথা!'

'আমি ভুলিনি, ভুলিনি, ভুলতে পারিনি, আমাকে আর তুমি কষ্ট দিয়ো না।'

'কষ্ট!'

'আমি জানি আমি আর কেউ নই তোমার জীবনে। কিন্তু স্মৃতি! স্মৃতিও কি নেই কিছু?'

'স্মৃতি! স্মৃতি!' এবার চোখের পাতা কাঁপলো সুমনার।

সকালবেলা সত্যিই সে চলে যাচ্ছিলো। কাল ওখান থেকে ফিরে আসতে আসতেই মনোস্থির করেছিলো যেখানে হোক যাবে, যেমন ক'রে হোক থাকবে কিন্তু এখানে আর নয়। আর বাড়ি ফিরেই অপ্রত্যাশিতভাবে বারান্দার উপর একখানা পোস্টকার্ড পড়ে থাকতে দেখলো। কোনো এক পাণ্ডব বর্জিত গ্রামে কোনো এক ইস্কুল মাস্টারির আহ্বান। অলক্ষ্য দেবতার পায়ে সে হাজারো বার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলো। যোগ দিতে হবে পয়লা তারিখে, আজ তিরিশ তারিখ। কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করেও দশটা টাকা সংগ্রহ করতে পারেনি কারো কাছে। যাওয়া স্থগিত হয়েছে। কালীচরণ কাজে গেছে, লক্ষ্মী কান্নাকাটি করে সঙ্গে গেছে। কথা আছে কালীচরণ মাইনের টাকা নিয়ে এলে তবে যেতে পারবে। ট্রেন আবার বিকেল পাঁচটায়। আর তার মধ্যেই এই। তার এতোদিনের অর্জিত ধৈর্যের বাঁধ যেন ভেঙে যেতে চাইলো।

সমীর বারান্দার থামে ঠেসান দিল, 'কিছু বলো, কিছু বলো, আমি বিশ্রাম করতে চাই, আমাকে বসতে বলো।'

'এখানে আপনি কোথায় বসবেন!' প্রায় কেঁদে উঠলো সুমনা।

'তোমার ঘরে, যেখানে তুমি বসো, তুমি ঘুমোও, তুমি থাক, তোমার মেয়ে খেলা করে।'

'সে ঘর, সে জায়গা কিছুই আপনার যোগ্য নয়।'

সে ঘর আমারও ঘর, সে জায়গা আমারো জায়গা, আমাকে তুমি ফিরিয়ে দিও না।'

'কিন্তু—কিন্তু—'

'আমি কোনো কিন্তু নিয়ে আসিনি সুমনা।'

'আপনার স্ত্রী?'

'আমার মুখের দিকে তাকাও, আমার চোখের মধ্যে তাকাও, দেখ কী লেখা আছে সেখানে।

'আমার লক্ষ্মী?'

'সে আমারও লক্ষ্মী।'

'সমীর!'

'মনি!'

'আমার সুমনা—'

'সমীর, সমীর—' দু'হাতে মুখ ঢাকলো সুমনা।

কলকাতার সকাল। এই মাত্র চা খাওয়া শেষ হ'লো। সমীরের দিদি বাচ্চাদের পড়াতে বসালেন, সমীরের জামাইবাবু স্নান করতে গেলেন, সমীরের মা জামায়ের অপিসের রান্নার তদারকে এলেন। ঠিকে ঝি মানদা পিয়নের হাত থেকে চিঠি নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

'কার চিঠি?'

'দিদিমার।'

'আমার?'

সমীরের মা প্রায় ছুটে এলেন। ছেলের চিঠি। খুললেন দ্রুত হাতে, পড়লেন তার চেয়েও দ্রুতগতিতে।

মা,

কোনোদিন তোমার অবাধ্য হইনি সুতরাং এখনো হতে পারলাম না। তুমি আমাকে বিবাহিত দেখতে চেয়েছ, আমি তোমার সে ইচ্ছে পূরণ করলাম। কাল সকালে আমাদের রেজিস্ট্রেশন হলো। আমি যে শুধু স্ত্রী-ই পেয়েছি তাই না, তার একটি চার বছরের কন্যার পিতাও হয়েছি। সে কন্যা আমাকে আগে থাকতেই বাবু ডাকতো, এখন প্রকৃত বাবা পেয়ে তার খুশির দাপাদাপিতে বাড়িতে টেঁকা দায়। আশাকরি তুমিও এই নাতনীটিকে দেখে মুখ ফেরাতে পারবে না।

পাত্রীটি তোমার আত্মীয় ভ্রাতা হেরম্ব দত্তেরই কন্যা, খুব আশ্চর্যভাবে এতোকাল পরে তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হলো। তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো। তোমার চিঠি পেলেই আমরা দুজনে গিয়ে তোমাকে প্রণাম করে আসবো।

দিদি জামাইবাবুকে আলাদা লিখলাম না, তুমি বলে দিও। তাদেরও আমাদের প্রণাম জানালাম।

সমীর

সমাপ্ত

ঘরে বাইরে

তীর্থ দর্শন

প্রায় বছর চোদ্দ আগের কথা। তীর্থ দর্শনের সাধ হলো হারান জ্যাঠামশায়ের। জরুভেদে হারান জ্যাঠামশায় ছিলেন অসুস্থ মানুষ। পান ছেঁচা, খলনুড়িতে অনুপান আর বাঁড় মাড়া এসব আমরা আনন্দের সঙ্গেই করে দিতাম। কিন্তু লম্বা তীর্থ দর্শনের প্রোগ্রাম তৈরী করেই বিপদে ফেললেন। এতদিন ঘর সংসার ছেড়ে কে যায় সঙ্গে?

পাক্কাপিসী হিসেবী মানুষ। হারানদার সুখ সুবিধার জন্য হামেশা প্রস্তুত। হারান জ্যাঠার পয়সাকড়ির অভাব ছিল না, তাই আত্মীয় বন্ধু সবাই হাঁ হাঁ করে এসে উপস্থিত হবার আগেই পিসি আমাকে পাঠালেন। 'মা না, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন দেখতে দেখতে কুতুবমিনার আর তাজমহলও দেখে নিবি।' অকাট্য সব যুক্তি। কিন্তু পিসির কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। সেবারে হারান জ্যাঠা কি দেখেছিলেন জানি না। আমি দেখেছিলাম মহাতীর্থ। সে অনুভূতি ভুলবার নয়, হয়তো অন্যকে বোঝাবারও নয়।

এদিক ওদিক ঘুরে দিল্লিতে এসে কালীবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি। হারান জ্যাঠামশায় পথশ্রমে ক্লান্ত। একটা দিন জিরিয়ে নিতে চান। কালিবাড়িতেই পাশের ঘরের এক ভদ্রলোক খবর দিলেন তিনি নাকি নতুন দিল্লির পালাম হাওয়াই ঘাঁটিতে যাচ্ছেন হেলেন কেলারকে দেখতে। হেলেন কেলার ভারতবর্ষে আসছেন সেই প্রথম। আমি ইচ্ছা করলে যেতে পারি তাঁর সঙ্গে। হারান জ্যাঠা সহজেই রাজী হলেন। দিনটা ছিল রবিবার। শহরে তাঁর দু একটি আত্মীয় ছিলেন, এসে গল্পগুজব জমিয়েছেন।

পালামে পৌঁছে দেখি, সন্ধ্যা হয়েছে। চারদিকে ঝিকমিক আলোতে লোকের আনাগোনা আর দারুণ ব্যস্ততা। নারী পুরুষ, শিশু এসেছেন দলে দলে। হাতে তাদের স্তবকে স্তবকে সেরা ফুলের গুচ্ছ। কারও কারও হাতে ফুলের হার। এক দিকে কিছু মূকবধির ও অন্ধ ছেলেমেয়ে এসেছে। অধীর আগ্রহে উজ্জ্বল তাদের মুখ। অপেক্ষা যে আর সহ্য হয় না প্রতি মুহূর্তে যেন অধীর প্রতীক্ষা বড়ই এক প্রিয়জনের জন্য।

কে এই প্রিয়জন? চাপা কথায় গুনগুন চলছে চারদিকে। হেলেন কেলার আসবেন। এখনই? হ্যাঁ এখনই। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁর প্লেন ভূমি স্পর্শ করবে। মহীয়সী মহিলা। মূক, দৃষ্টিহীনা হেলেন কেলার জগতের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বিজয়িনী। কঠিন তাঁর তপস্যার সাধন সার্থক করেছে এক দুর্ভাগা দুনিয়ার নরনারীকে। তিনি নিজে যে আঁধার জয় করেছেন মাত্র তা নয়। আঁধারের মানুষগুলি সবাই আলোর সন্ধান পেয়েছে। মৌন মানুষগুলি পেয়েছে ভাষা! ধ্বংসলীলায় তাঁর বীরত্বের ব্যঞ্জনা নয়, তিনি

হেলেন কেলার (১৮৮০-১৯৬৮)

গড়ে তোলার বীরাঙ্গনা। নেপোলিয়নের চেয়ে বড়। আলেকজান্ডারের চেয়ে বড়।

অল্পক্ষণের মধ্যে বিমানখানা পৌঁছে গেল। বাংলাদেশের নগণ্য সাধারণ মেয়ে আমি। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি আর পাঁচ জনের সঙ্গে অসহিষ্ণু, অস্থির অপেক্ষায়। যেন কোন আরাধ্য আমায় দর্শন দেবেন। নাটকীয় সম্ভাবনাময় সময়টুকু। আস্তে আস্তে প্লেন থেকে নামলেন পলি টমসন, শ্রীমতী কেলারের সঙ্গিনী ও সেক্রেটারী। পাশে শ্রীমতী হেলেন কেলার। ৭৪ বছর বয়সে যে একটি মহিলা এমন মনোহারিণী হতে পারেন, ভাবতে পারিনি। দীর্ঘ, ঋজু, দেহী, সুবেশা সৌম্যদর্শনা উদ্ভাসিত সেই সুশ্রী নারী মূর্তি আজও আমার মনে গভীর স্মৃতি রেখায় আঁকা আছেন। মনে হলো যেন কি দেখছেন, কি শুনছেন, পারিপার্শ্বিকের সবটুকু সমানে গ্রহণ করে যাচ্ছেন মালার পর মালা তাঁর গলায় আসছে ফুলের পর ফুল। রূপ রস স্পর্শ গন্ধ অজানা মন্ত্রশক্তি দিয়ে তাঁর উদ্ভাসিত মুখে ছায়াপাত করে যাচ্ছে। এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না। এমন এক দর্শন আমার জীবনে আর ঘটেনি। দৃষ্টিহীনার নয়নে কি প্রশান্ত জ্যোতি, মূক সে ওষ্ঠাধরে কি অভিব্যক্তি! আগন্তুকদের একজন কতগুলি ভায়োলেট ফুল দিয়েছিলেন। শ্রীমতী কেলার আনন্দে অধীর। ভায়োলেট চিনতে তাঁর কষ্ট হয়নি। বড্ড সুন্দর ফুল যে ভায়োলেট!

শ্রীমতী কেলার আগে আর একবার ভারতবর্ষে আসবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল ভারতবর্ষ। ১৯৪৮ সালে জাপান পর্যন্ত এসে পলি টমসন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দেশে ফিরে যেতে হলো। এ যেন এক বজ্রাঘাত! শ্রীমতী কেলার বলেছিলেন "স্বপ্ন আমার ভেঙে গেল!" সেই স্বপ্ন এতদিনে পূর্ণ হলো।

১৮৮০ সালে আলাবামার টাসকাম্বিয়াতে হেলেন কেলার সুস্থ, সবল ও নীরোগ শিশু হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯ মাস বয়সে দুরন্ত স্কার্লেট ফিভার রোগে আক্রান্ত হয়ে দৃষ্টিশক্তি ও বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেন। ছোট্ট দুরন্ত হেলেন দুর্নিবার হয়ে উঠতে লাগলেন। বাপ মায়ের চিন্তার শেষ নেই। এমন সময় হেলেনের জন্য একটি অসামান্য শিক্ষয়িত্রী পেলেন। অ্যান সালিভান। তিনি হেলেনের ভাঙা জীবন জুড়ে আনলেন নতুন আশা। তাঁদের পরিচয় হলো নতুন নিয়মে, কথা বলতে শিখলেন নতুন ধরণে। প্রথম কথা বলে উঠলেন, "আমি তো মূক নই!"

১৮ বছর বয়সে হেলেন কেলার অ্যালজেব্রা, জিওমেট্রি, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা সব শিখে ফেললেন। জার্মান বলতে পারতেন, ফরাসীতে চিঠিপত্র লিখতেন, ল্যাটিন পড়তে পারতেন। র‍্যাডক্লিফ কলেজ থেকে ইংরেজী সাহিত্যে সম্মানের সঙ্গে স্নাতক হলেন। শেষ দিন পর্যন্ত অক্লান্ত ছিল তাঁর জীবনের প্রতি ক্ষণ। ভারী ভারী ব্রেইল-এ লেখা মোটা বই পায়ের উপর রেখে রাতের পর রাত পড়ে যেতেন কবিতা, উপন্যাস আর গল্প।

কেলারের হাত দুখানা ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় সম্পদ। স্পর্শ দিয়ে [illegible] চিনতেন, মানুষের অন্তর [illegible]। স্পর্শ করে নাকি বলেছিলেন [illegible]

প্রসাদ শাস্ত্রী আর দয়াল, ডঃ রাধাকৃষ্ণন মহা পণ্ডিত ও ভদ্র আর নেহেরু চিন্তাশীল ও কোমল। হাজার হাজার দৃষ্টিহীন ও মূক বধিরের কাছে হেলেন কেলারের জীবন আশার যাদুস্পর্শ। সে যাদু কোনও দেশে বা কালে সীমাবদ্ধ নয়। সেদিন পাল্লামের লোকগুলিকেও বলেছিলেন, আমি সুখী, আমার বন্ধু আছে, কাজ আছে। জীবনে যা পাইনি তার কথা কমই চিন্তা করি। দুঃখও বিশেষ করিনা। যদি বলি, কখনও কি কোন আকাঙ্ক্ষা হয় না, তবে তা ঠিক হবে না। কিন্তু সে ইচ্ছা ঠিক ফুলের বনে মৃদু বাতাসের মত। হঠাৎ সামান্য হিল্লোল বা অশান্তি আসে। আবার শান্ত হয়ে যায়।

হেলেন কেলারের আধ্যাত্মিকতা, তাঁকে তিক্ততা বা অবসাদ থেকে রক্ষা করেছে। সম্ভবত সেই আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশই সেদিন পাল্লামকে আমার চোখে তীর্থে পরিণত করেছিল। তাই দীর্ঘ এতকাল পরে হেলেন কেলারের মৃত্যু সংবাদে আবার সেই শক্তিকে প্রণাম করছি। এইতো ঈশ্বর! এই তো তাঁর প্রকাশ! হারান জ্যাঠামশায় আর পদ্মপিসির সঙ্গে যোগ কমে গেছে। কিন্তু তাঁরাই তো আমাকে মহাতীর্থ দর্শন করিয়েছিলেন! পুণ্যের অংশ তাঁদেরও প্রাপ্য নিশ্চয়ই!

প্রতিমা প্রয়াণে

গত ২০ জ্যৈষ্ঠ সোমবার লেডি প্রতিমা মিত্রের দেহাবসান হয়েছে। সৌভাগ্য সাগর মন্থন করে তাঁর জীবন পরিপূর্ণ সার্থকতায় ধন্য ছিল। ভগবানের অজস্র করুণাধারার কোথাও এতটুকু কম ছিল না। আর সেই অকাতর দানের প্রতি কণা তিনি বাংলা দেশের মহিলা সমাজকে ফিরিয়ে দিয়ে যেতে পেরেছেন। সৌভাগ্য তাই তাঁর সকলের মঙ্গলে হয়েছিল শতগুণে। যারা তাঁর স্নেহ পাবার সুযোগ পেয়েছে, তাদেরই একজন হিসাবে আমি আজ তাঁকে প্রণাম জানাই।

লেডি প্রতিমা মিত্র বাংলাদেশের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, শিক্ষা, গৌরব, সৌজন্য—সবের সর্বোচ্চ সীমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিলেন। যদি বলি হবেই বা না কেন? বংশগৌরবের কি কোনও প্রভাব নেই? থাকতে পারে তবে সবার ক্ষেত্রে আধার কি এমন হয়? বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ প্রথমনাথ বসুর তৃতীয়া কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রতিমা মিত্র। মাতামহ ছিলেন স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্ত। বিবাহ হয়েছিল স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে। কিন্তু কোনও গৌরব তাঁর হাতে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। কোনও মর্যাদার হয়নি অপলাপ। বরং অদ্ভুত এক সুষমায় তিনি ভরে দিয়েছিলেন উত্তরাধিকারে পাওয়া অনেক গুণকে।

প্রতিমা মিত্র বাংলা দেশ, তথা ভারতবর্ষের মহিলা প্রগতির ইতিহাসের এক অধ্যায়। মৌসুমী ফুলের মত সেদিন জাতীয় জীবনের বহুদিকে প্রতিভাময়ী মেয়েদের আবির্ভাব হয়েছিল। তাতে কবি ছিলেন, লেখিকা ছিলেন, শিল্পী ছিলেন, রাজনীতিতে ক্ষুরধারবুদ্ধি মহিলার অভাব ছিল না কিন্তু প্রতিমা মিত্র ছিলেন কেমন একটা মিলিত প্রতিভার গড়া কল্যাণী। প্রথম তাঁকে কবে দেখেছিলাম ভাল করে মনে পড়ে না। দূরে থেকে দেখতাম, শ্রদ্ধা নিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। একেবারে কাছে পেয়ে তাকিয়ে নিতে সুযোগ পেলাম আমাদের স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ উৎসবে। দার্জিলিং মহারানী বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ করতে এসেছেন লেডি মিত্র। সেটা অন্য যুগ। অভিজাত বলুন, পদমর্যাদায় পদস্থ বলুন, তাদের জন্য সাধারণের মনে বেশ একটা ভক্তি ছিল। আমার যে ছিল না তাই বা বলি কি করে। হাত থেকে জরির ফিতেয় বাঁধা বই-এর গোছা নেবার সময় দেখলাম, কি সুন্দর হাত! পালিশ লাগানো নয়, রং করা নয় কিন্তু পদ্মফুলের মত কোমল। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি এত রূপসী কমই চোখে পড়েছে। ভগবানের এই শ্রেষ্ঠ দান কিন্তু তাঁকে এতটুকুও অহংভাব দেয়নি। সেটা জানলাম পরে। কতবার কত ভাবে প্রতিমাদির সঙ্গে কাজ করেছি। কত রকমের মহিলা সমাবেশে তিনি পরিচালনা করেছেন কার্যক্রম কিন্তু কারও সঙ্গে এক দিন বা একবারও এতটুকু সৌজন্য অথবা সদ্ভাবের অভাব দেখিনি। সমাজসেবা করে যেসব মহিলা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তাঁদের সবার সম্বন্ধে কিন্তু একথা বলা যায় না। তা ছাড়া সমাজ সেবার ধারা বদলেছে, ধরনধারন বদলেছে, কর্মীদের পর্যায়ে পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু প্রতিমা মিত্রে আভিজাত্য অভিজাতশাসিত সমাজেও যতটা কার্যকরী ছিল, সাম্যের মাঝেও ঠিক ততটাই। স্বাধীন ভারতবর্ষের আগেও তিনি কর্মী ছিলেন, পরেও। সেই যে কিড্ স্ট্রীটের শেষ দিকে স্যার ডেভিড এজরার মস্ত বাড়ি আর ছায়া ছায়া ঠান্ডা ঘর, বাড়ি ভরা পাখি আর কুকুর তাতে বসতো ন্যাশনাল কাউন্সিল অব উইমেন-এর বৈঠক। বোধ হয় লেডি এজরা অসুস্থ ছিলেন বলে এই ব্যবস্থা হয়েছিল। লেডি মিত্র ছিলেন প্রেসিডেন্ট। লেডি সিংহ আসতেন, আরও কারা সব মনেও নেই। ছোট ছোট গ্লাসে লাল নীল সবুজ শরবত আর নানারকম বিলিতী টুকিটাকি খাবার দিতেন লেডি এজরা। সে দরবারে রানীর মত আসতেন প্রতিমাদি। কাজের কথা গুছিয়ে বুঝিয়ে সবাইকে পথ ধরিয়ে দিতেন অনায়াসে যেন খেলার আসর জমেছে। আবার তারপর এল খাদ্য সংকটের দিন। মেয়েদের ফুড কাউন্সিল হলো। সেখানেও প্রতিমা মিত্র কর্ণধার। অন্নপূর্ণার স্থাপনা হলো। সস্তা অথচ খাঁটি খাবার পরিবেশন করতে হবে। দিনের পর দিন প্রতিমাদি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। চোখে চোখে দেখেছেন স্বল্পবিত্ত মানুষগুলিকে কি দেওয়া হবে। সবার সঙ্গে পাতে বসে গেছেন। রান্নাঘরের কর্মীদের উৎসাহ দিয়েছেন। কোথাও এতটুকু ফাঁক থাকেনি। কাজ করার চাইতেও কাজ করার নির্দেশের দাম কম নয়। সবাই নির্দেশ দিতে জানে না। তাও প্রতিমা মিত্রকে দেখে বুঝেছিলাম। ঝাউতলার নারী সেবা সঙ্ঘেও তাঁকে দেখেছি। গৃহহীন ছিন্নমূল মেয়েদের জন্য কি দারুণ ভালবাসা তাঁর! শত কাজ ফেলে ছুটে আসতেন। '৪২ সালের দুর্ভিক্ষের পর প্রতিমা মিত্রের সুযোগ্যা কন্যা সীতা চৌধুরীর চেষ্টায় নারী সেবা সঙ্ঘের পত্তন হয়। এখন নারী সেবা সঙ্ঘ বিরাট প্রতিষ্ঠান। সেখানে প্রতিমাদির স্নেহ পায়নি এমন একটি সামান্যতমও ছিল না।

লেডি প্রতিমা মিত্রের কর্মবহুল জীবনের একটি বড় কীর্তি কমলা গার্লস স্কুল। কমলা ছিল তাঁর মায়ের নাম। এই বিদ্যালয়টি প্রতিমা মিত্র কেবলমাত্র গড়ে তুলেছিলেন তা নয়, শেষদিন পর্যন্ত বিদ্যালয়ের জন্য প্রাণপাত করেছেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের দিয়ে 'তাসের দেশ' অভিনয় করানো হলো একবার। কি উৎসাহে প্রতিমাদি প্রত্যেক পদে আপনাকে ঢেলে দিয়েছিলেন বোঝানো যায় না। সেবারই প্রথম শুনেছিলাম কবিগুরুর 'মায়ার খেলা'র প্রথম অভিনয়ে প্রধান ভূমিকায় নেমেছিলেন কিশোরী প্রতিমা মিত্র ১৯০৫ সালে। তার পরই ১৯০৮ সালে তাঁর বিবাহ হয়। অপূর্ব গান গাইতেন তিনি। সঙ্গীতানুরাগের চিহ্ন রেখে গেছেন শঙ্কর মিত্র কীর্তন শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করে। অসুস্থ শরীরে শেষ বয়সে যখন নিজে কাজ করতে কষ্ট বোধ করতে আরম্ভ করলেন তখনও অন্যকে উৎসাহ দিতে পারতেন যথেষ্ট। W V S এর দপ্তর খুঁজে যখন কর্মীরা উপযুক্ত স্থান পাচ্ছেন না, তখন প্রতিমা মিত্রের ঘরে বসলো দপ্তর ১৯৬৫ সালের হাঙ্গামার সময়।

প্রতিমা মিত্রের জীবনের আর একটি দিক না বলতে পারলে আমার বলা নেহাত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি আদর্শ গৃহিণী ছিলেন। সব কথায় সব সময় আমাদের বলতেন পুরুষ মানুষ অসহিষ্ণু, ধৈর্যহীন। মাতৃত্ব দিয়ে নারীকে ভগবান সহনশীলতায় গড়েছেন। তাই তাদেরই হাতে আছে মঙ্গলকরার কলকাঠি। সেখানে সে হেরে গেলে কোনও জিতই কিছু নয়।

সংসার সবার আগে তবে আর সব কাজ। ... এই জীবনের অবসান ... বাংলার মহিলা সমাজকে যেন ... দেয় এই প্রার্থনা করি। এ অবসান যেন আমাদের অবসন্ন না করে, উৎসাহ যেন ... দিনের প্রত্যেক কাজের মাঝে।

বৌদ্ধ যুগের নারী

বৈদিক যুগের গার্গী, মৈত্রেয়ী ইত্যাদির পর মহিলা সমাজের মর্যাদা কিছু কমেছিল সত্য কিন্তু বৌদ্ধ প্রভাব আবার সে গ্লানি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম জাতি ভেদ যেমন অস্বীকার করেছিল, তেমন অস্বীকার করেছিল নারী পুরুষে ভেদ। বিবাহ বিচ্ছেদ সেদিন সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছিল। সংঘের দ্বার মেয়েদের কাছে অবারিত ছিল। থেরীগাথা বৌদ্ধ শাস্ত্রের অতুলনীয় সম্পদ। মহাপ্রজাপতি গোতমী যে পথ বেছে নিয়েছিলেন, উত্তরকালে সে পথের সম্পদ বাড়াতে ত্রুটি হয়নি। গৌতম বুদ্ধের বিমাতা গোতমী স্বামী শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর মনস্তাপে কাল কাটাচ্ছিলেন। তারপর শাক্যদের প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে বিবাদে যখন শত শত মেয়ে পতিহীনা হলেন, তখন গোতমী পাঁচ শত স্বামী-বিয়োগ-বিধুরা নারী সঙ্গে নিয়ে বৈশালীতে উপস্থিত হলেন। পাছে ভগবান বুদ্ধ আপত্তি করেন এই ভয় আগেই তাঁরা গেরুয়াবাস অঙ্গে ধারণ করেছিলেন আর স্বহস্তে কেটে ফেলেছিলেন রাশি রাশি কুঞ্চিত কেশদাম। বুদ্ধদেব আপত্তি করেন নি। গোতমী ও পাঁচ শত পরিব্রাজিকা হলেন সংঘের ভিক্ষুণী। নির্বাণ আর মুক্তির পথে নারী পুরুষে ভেদ সেদিন শেষ হয়ে গেল।

থেরীগাথায় ৭৩টি ভিক্ষুণীর রচনা আছে। কোনও কোনও রচনায় ভিক্ষুণীদের জীবনের কিছু কিছু খবরও মেলে। থেরীরা কেউ এসেছিলেন রাজপ্রাসাদ থেকে, কেউবা গণিকালয় থেকে আবার কেউ ছিলেন অস্পৃশ্য সমাজের কুটিরবাসিনী দরিদ্র কন্যা। ধনী শ্রেষ্ঠী সমাজের বহু মেয়ে বিবাহিত জীবনে সুখী না হয়ে সংঘে প্রবেশ করেছিলেন।

থেরীগাথার দীর্ঘতম রচনা রাজকুমারী সুমেধার। তিনি ছিলেন ক্রৌঞ্চ রাজ কন্যা। কৈশোরেই সুমেধা সংসারের চেয়ে নির্বাণের পথ ভালবেসেছিলেন। সুমেধার বিবাহের বয়স হলে বর্ণাবতীর রাজা তাঁর পাণি-প্রার্থনা করলেন কিন্তু কন্যার মন এখন সংঘের সুরে বাঁধা হয়ে গেছে। পিতামাতাকে রাজী করিয়ে তাই সুমেধা ভিক্ষুণীর ব্রত গ্রহণ করলেন। বাধা কেউ দিতে পারেনি।

থেরী ঈশিদাসী কিন্তু বহু কষ্টে পিতা-মাতার অনুমতি পেয়েছিলেন। তিন বার তাঁর বিবাহ হয় কিন্তু বিচ্ছেদ তাঁর কপালের লিখন ছিল, কোনও বিবাহই সুখের হয়নি। তিনি সুন্দরী ছিলেন, শিক্ষিতা ছিলেন। গৃহকর্মে নিপুণ ছিলেন। পরম যত্নে পতির পরিচর্যা করতেন। শ্বশুরকুলে সবার মন পেয়েছিলেন, না পেলেন স্বামীর। তাই ফিরে এলেন পিতৃ গৃহে। বিবাহ বিচ্ছেদের পর দ্বিতীয় বিবাহ হলো ধনী শ্রেষ্ঠীর পুত্রের সঙ্গে। এ বিবাহও সুখ দিতে পারেনি। পর পর আঘাতে কন্যা এবার পরিব্রাজকের গলায় মালা দিলেন। তৃতীয় বিবাহও টিকলো না। পথে ঘুরে ফেরা যার অভ্যাস ঘর তাকে ধরতে পারলো না। পরিব্রাজক পক্ষকাল পরে পত্নীকে রেখে আবার পথে নামলেন। ঈশিদাসী আর সহ্য করতে পারলেন না। এবার সংঘের শরণে সকল জ্বালা জুড়িয়ে নিতে সাজলেন ভিক্ষুণী।

ভগবান বুদ্ধের আশ্রয়ে কত ভ্রান্ত পতিত মেয়ে এসেছে তার বহু কথা আমরা সর্বদা শুনি। এমনি একটি পদস্খলনের কাহিনী পটাচারের জীবন। সে ছিল শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠীর মেয়ে। ধনী ঘরে আদরে লালিতা তনয়া। বিবাহের আয়োজন হয়েছে। চার দিকে আসন্ন উৎসবের সূচনায় ভয় পেলেন শ্রেষ্ঠীনন্দিনী, কারণ তিনি তখন অন্তঃসত্ত্বা। ধনী পিতার কর্মচারীর সঙ্গে চলেছে অবৈধ প্রণয়। দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে শ্রেষ্ঠী কন্যা প্রণয়ীর সঙ্গে পালিয়ে গেলেন গ্রামের গাঁয়ে। পর পর দুটি সন্তানের জন্মের পর, সন্তানদের পিতা সর্পাঘাতে মারা গেলেন। নিরুপায় হয়ে শ্রেষ্ঠীকন্যা আবার পিতার ঘরে ফিরবেন স্থির করলেন। একটি শিশু কোলে নিয়ে আর অন্য শিশুর হাত ধরে দুস্তর তরঙ্গময় নদী পার হতে গিয়ে দুটি সন্তানকে হারালেন। পাগলের মত পিতৃগৃহে প্রবেশ করতে গিয়ে দেখলেন গৃহ নেই। ভগ্নাবশেষের নীচে পিতামাতা ও ভ্রাতার প্রাণহীন দেহ মাত্র আছে। এবার আর সহ্য করা অসম্ভব। প্রজ্বলিত চিতায় প্রাণ দেবেন সংকল্প করলেন। তখন ভগবান বুদ্ধের বাণীতে পেলেন সান্ত্বনা। ভিক্ষুণী হয়ে এলেন সংঘে। 'ধর্ম' দিল আশ্রয় আর শান্তি। অল্পকাল পরে ভিক্ষুণী হলেন পটাচারা। ৩০টি ভিক্ষুণী তাঁর কাছে শিক্ষা-লাভ করেছিল এত হয়েছিল তাঁর প্রভাব।

দুঃখেই যে কেবল মেয়েরা আসতেন তাও নয়। রাজ-অন্তঃপুরচারিণী আসতেন, ধনীর নন্দিনী আসতেন প্রাণের টানে, বিশ্বাসের জোরে। সম্পদকে পিছনে রেখে আসার সমস্ত উদাহরণ তো সঙ্ঘমিত্রা। সম্রাট অশোকের কন্যা। তিনিই তো প্রথম ভারতীয় সঙ্ঘ-সংবাদ, বুদ্ধের বাণী বহন করে নিয়ে যান সিংহলে। সেখানে সঙ্ঘ স্থাপনা করেন আর দেহরক্ষা করেন আজীবন ভিক্ষুণী থেকে।

রবার্ট রুয়ার্কের বই 'Women'-এ নারী

ঔপন্যাসিক রবার্ট রুয়ার্ক-এর বিখ্যাত উপন্যাসগুলির চেয়েও তাঁর "Women" নামক বইখানা মহিলা সমাজকে অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য মহিলা সমাজকে বেশী উত্তেজিত করেছে। ২২,০০০ মহিলার লেখনী মুখর হয়েছিল তাঁর প্রতিবাদে। অবশ্য তাতেই রবার্ট রুয়ার্ক হয়েছেন অমর। মহিলা সমাজ মন্তব্য পেশ করেছিলেন, রুয়ার্ক নারী-বিদ্বেষী। সত্যই কি তাই? নারীকে ভাল-বেসেছিলেন বলেই নারীর মধ্যে যা তাঁর আপত্তিজনক মনে হয়েছিল তাই তাদের জানাতে চেয়েছিলেন। কখনও বা মন্তব্যের দুঃসহ প্রখরতায় তাঁর কথার সুরে বড্ড বেশী ঝাঁজ নেমে এসেছে, তবে অনেকটাই তাঁর নারীকে নূতনত্বের নেশায় বেখাপ্পা থেকে ফিরিয়ে আনবার প্রচেষ্টা।

মার্কিন দেশের নর্থ ক্যারোলিনাবাসী লেখক রুয়ার্ক বলেছেন তাঁর জন্মসূচনা থেকে নারী তাঁকে অশান্তি দিয়েছে। শেষ দিন পর্যন্ত দেবে। শেষদিনও এসেছে তিন বছর আগে যখন ১৯৬৫ সালে লণ্ডনে রুয়ার্ক মারা গেলেন। মৃত্যুর পরে নারী সম্বন্ধে তীব্রবিদ্বেষ আর তিক্ততা, বিকৃত উক্তি, অথচ কখনও কখনও স্নেহময় বা কৌতুক করা লেখাগুলি একত্র করে প্রকাশিত হয় সংগ্রহ হিসাবে। তারই নাম

"Women"। ভাগ্যে তাঁর জীবদ্দশায় হয়নি! অন্তত অভিমানে মেয়েরা কি করে বসতো কে জানে।

রুয়ার্ক-এর মতে, রহস্যময়ী নারীর রহস্য এক গ্লাস জলের যতটা রহস্য ঠিক ততটা। কুহকিনীর কুহক উদ্ঘাটন করলে পাবেন প্রসাধনের পুরু প্রলেপ, ভিমির হাড়, মিশরীয় নয়নরঞ্জনী নানারকম কেশের কলপ, গজের পর গজ ইলাস্টিক, ক্রীম, পালিশ, পাউডার আর দুর্গন্ধ নাশক। মাত্র কি এই? দেহবল্লরীকে কোথাও ধরে বেঁধে সংযত করা হয়েছে আবার কোথাও বা বেমালুম নকল অতিরঞ্জনে ফোলানো ফাঁপানো ব্যবস্থা। কোথাও বা বক্ষবন্ধন, কোথাও বা ফোম রবারের নেশা। যেন খামখেয়ালীপনা, ইঞ্জিনিয়ারিং আর রূপটান ব্যবসায়ীর অদ্ভুত মিশ্রণ!

মেয়েরা ছুটি যোবারের জন্য চায় ছোট্ট একটি ক্ষেত্র। ক্ষেত্র মানে তাঁদের পোষমানা দু'একটি মানুষ। তা না হলে তাঁরা কেঁদে কেটে আকুল হন। মেয়েদের ঘৃণা করলে তাঁরা যত না ভীষণ মূর্তি ধারণ করেন, তাঁদের হাসি তামাশার পাত্র মনে করলে তাঁরা ভয়ানক হয়ে ওঠেন। তখন তাঁরা বুঝতে পারেন তাঁদের ভয়ে আর কেউ ভীত নয়।

চোখের জল মেয়েদের সবচেয়ে সেরা অস্ত্র। কিন্তু রুয়ার্ক তার ওষুধ জানতেন। সাজঘরের দরজা বন্ধ করা অথবা বাপের বাড়ি যাবার ভয় দেখানোকে অবজ্ঞা করতে হবে।

নারীর চোখে নারী

নারীই নারীর মান রাখেন না। এ সত্য সবার জানা কিন্তু তাকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এক মনস্তাত্ত্বিক। তিনি ১৪০টি কলেজে-পড়া মেয়েকে নিয়ে গবেষণা করে জানিয়েছেন মেয়েরাই মেয়েদের ছোট মনে করেন পুরুষের চেয়ে বেশী। এমনকি পড়াশুনোর ব্যাপারেও মেয়েরা ছেলেদের লেখা বইকে মূল্য দেন অনেক। একই বিষয় নিয়ে একই রকম লেখা বই, মেয়ে লিখলে তাঁরা তত মন দিয়ে পড়েন না। যে সব বাড়িতে ছেলেমেয়ে সমানে এগিয়ে এসেছেন, মেয়েরা সে ক্ষেত্রেও ভরসা পান ছেলেদের কাছে। মেয়ে ডাক্তারের চেয়ে ছেলে হলে যেন তাঁরা সাহস পান মনে হয়।

না হলে নিজেদেরই সেই চোখের জল হবে অবলম্বন। তাই তিনি বলছেন, "আমি এই চোখ অনেকটা সময় কাটিয়েছি। আমাকে আর কেউ কাবু করতে পারেন না। মেয়েদের হতবুদ্ধি করে দেবার মত কেঁদে, চেঁচিয়ে হাট বাধাতে আমি তাঁদেরই একজনের মত।"

যুদ্ধের পর দেশে ফিরে রুয়ার্ক দেখলেন, মেয়েরা তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবভাবন যেন হঠাৎ পাল্টে ফেলেছেন। তার পর থেকেই তিনি লিখতে আরম্ভ করলেন নারীর কোন রূপ, কেমন সাজ পুরুষের ভাল লাগে। তাঁর যুদ্ধোত্তর রচনায় নারীর বর্ণনা আছে—"অদ্ভুত দর্শন জীব, যারা নিজেদেরই অন্তর্ঘাত করেছে। এমন কোনও সজ্জার প্রথা জানা নেই যাতে সব মেয়েকে সমান সুন্দরী দেখাবে। কিন্তু এ কি অদ্ভুত সাজ, যেন মুরগীর ছানাদের টিনে বন্ধ করা হয়েছে আর কি। এই পোশাক গর্ভাবস্থায় মানাতে পারে কিন্তু এতে তো পুরুষে নারীতে যে প্রভেদ তাই সযত্নে আবরিত করেছে। প্যাণ্ট পরা মেয়ে তো একেবারে হাস্যকর জিনিস। মেয়েরা কেন আঁটো প্যাণ্ট পরে বেড়ায় সে এক বিস্ময়। কোনও খুঁতই তাতে ঢাকা পড়ে না। যে মহিলা অন্তত মাঝে মাঝে স্নান করেন তাঁরও বোঝা উচিত তাঁর নিজের দেহের ভূগোলে কোথায় কি ত্রুটি।"

প্রসাধনী নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটা রুয়ার্কের খুব খারাপ লেগেছিল। মেয়েদের মাথার বুদ্ধি সব ধুয়ে মুছে বিশ্বাস করানো হয়েছে বাজারের সব প্রসাধনী একত্র করতে পারলেই রূপসী হওয়া যায়। প্রাচীন মিশরীয় নীলাঞ্জনে নয়নপল্লব রঞ্জিত না করলে যেন পুরুষের মন পাওয়া যায় না। দুর্গন্ধ নাশক না ঢালতে পারলে তাঁর দেহের দুর্গন্ধ পাওয়া যাবে। অথচ হয়তো বিবেচক ব্যবহারে ভুল চুক হয় আর পুরুষে তার ত্রিসীমানা এড়িয়ে চলে। এরকম বিষোদ্গার করেই তিনি নিরস্ত হননি। সবচেয়ে আপত্তি করেছেন মেয়েদের পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতাকে। অথচ মেয়ে হবার সুযোগটুকুও তাঁরা ছাড়বেন না। পিঠে খাবেন কিন্তু হাতের পিঠে আস্তই থাকবে। মেয়েরা যদি দেবীর আসনে বসে থাকতেন তবে তাঁদের সেই দিব্য স্থানে সসম্মানে রাখতেই রাখা হতো। তা তো নয়! পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জিততে হবে, অন্তত পাশাপাশি ছুটতে হবে। কিন্তু ওদিকে শিশিরভেজা নরম নারীত্বকে বর্জন করতেও রাজী নন! সবই চাই। চুরুট খাবেন, প্যাণ্ট পরবেন, প্রেসিডেণ্ট হবেন, আবার কান্নাকাটি করবেন, চেঁচামিচির অধিকার ছাড়বেন না, সময় বা সুযোগ পেলে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়েও পড়বেন।

রুয়ার্ক মনে করেন যতদিন না গ্রহান্তরে মহাকাশচারণায় এক নারীকে পাঠানো হবে ততদিন শান্তি নেই। (এ কথা ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভার আকাশ অভিযানের আগে লেখা নিশ্চয়ই)। চাঁদের বুকে একটি নারীকে নিক্ষেপ করার বিরুদ্ধেও কোনও যুক্তি নেই। দরকার হলে পাকাপাকিভাবে বসতি করতেও পাঠানো যায়। মহাকাশে তাঁরা ঘুরে বেড়ান, মহাশূন্যে ঝুলে থাকুন। তাতে মহাসুসংবাদ, মধ্যাহ্নভোজন আর সুখাদ্য, সুপেয় কাটা যাবে। কিছুদিন পরে অভিনবত্বের আমেজ কাটলে আবার তাঁরা রান্নাঘরে ফিরবেন।

এত সব কথা বলা সত্ত্বেও রুয়ার্ক নারীকে ভালবাসতেন, অন্তত তাই বলতেন। নারীর মধ্যে রূপসী আছে কত শত। কিন্তু হায় তাঁরা নাকি কেউ রুয়ার্ককে ভালবাসার মত বুদ্ধি রাখেন না। পুরুষের একমাত্র আশা নারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা—মুষ্টিযুদ্ধ নয়, বাক্‌যুদ্ধ। রেস্টোরাণ্টে, পথে-ঘাটে, সমুদ্রসৈকতে, গৃহে, সংবাদপত্রে, এমন কি প্রসাধনাগারেও চালাতে হবে তুমুল প্রতিবাদ। ঢিলে দিলে চলবে না। ঘাট মানা ভুল। তাঁরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে এ ধারণা ভাঙাতে হবে। সত্যই তো আর তাঁরা দেবী নন।

শ্রীমতী

ভারতীয় সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা

শ্রীতিমিরবরণ

স্বাধীনতা লাভের পর জনসাধারণের মধ্যে সঙ্গীত চর্চা বহু গুণ বেড়ে গেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুখের বিষয় আমাদের গভর্নমেন্ট সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ আরও বেড়েছে। ভারতীয় ক্লাসিকাল সঙ্গীত বলতে আমরা মার্গ বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বুঝি। এ ছাড়াও আরও বহু প্রকার সঙ্গীতও আছে। লোকসঙ্গীত, বাউল, কীর্তন, ভজন এবং আরও অনেক। ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে ক্লাসিকাল সঙ্গীত যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ফিল্‌ম ও আধুনিক সঙ্গীতের দাপট আজকাল বড়ই প্রবল হয়ে উঠেছে। তবে ক্লাসিকাল সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীর কোন সঙ্গীতই ম্লান করতে পারবে না।

আমাদের সরকার ভারতীয় সমস্ত প্রকার সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সিম্ফনি বা অর্কেস্ট্রায় কেন যে তাঁদের নেক-নজর পড়ল না সেটা বোঝা দুষ্কর। এর কারণ অবশ্য অনুমান করা যায়। সেটা হচ্ছে জনসাধারণ অর্কেস্ট্রার রস এখনও উপলব্ধি করতে পারেননি। ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত—সকলেই সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক। পাশ্চাত্ত্য দেশ ভ্রমণ আজকাল আর এমন কিছুই কঠিন নয়। অর্থবল থাকলেই যথেষ্ট। পাশ্চাত্ত্য দেশের সিম্ফনি বা অর্কেস্ট্রা আমাদের দেশের বহু লোকেই শুনে এসেছেন। অনেকেই নাকি ওদেশের ক্লাসিকাল সঙ্গীত বোঝেন। পাশ্চাত্ত্য দেশের ক্লাসিকাল সঙ্গীত অর্কেস্ট্রার মাধ্যমেই বেশীর ভাগ লোকে শুনে থাকেন। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্ত্য দেশে অর্কেস্ট্রা তাদের সামাজিক জীবনে সংস্কৃতির এক প্রধান অঙ্গ। সঙ্গীত জগতে অর্কেস্ট্রাই ওদেশে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়ে থাকে। ওদের দেশে প্রায় প্রত্যেকেই তাঁদের নিজ নিজ পছন্দমত অর্কেস্ট্রার পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে। ওদেশে অর্কেস্ট্রায় অনেক ক্ষেত্রে আমার নিজ চোখে দেখা ২০০-রও বেশী শিল্পী অংশ গ্রহণ করে থাকেন। রেডিও এবং টেলিভিসন ছাড়াও অনেক বড় বড় হোটেলে তাদের নিজস্ব অর্কেস্ট্রা আছে। তা ছাড়া প্রতিটি দেশে স্টেট অর্কেস্ট্রা আছে।

স্বাধীনতা লাভের বহু পূর্বে বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের সঙ্গে আমি সারা ইউরোপ (রাশিয়া বাদে), আমেরিকা, কানাডা ও লাতিন আমেরিকা ভ্রমণ করেছি। প্রায় প্রত্যেক দেশের অর্কেস্ট্রা শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বহু সঙ্গীত শিল্পী, কণ্ডাক্টর ও কম্পোজারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাঁদের পরিচালিত

অর্কেস্ট্রা পরিচালনারত তিমিরবরণ

অর্কেস্ট্রাও শুনেছি। অর্কেস্ট্রা শেষ হবার পর পরিচালকের উদ্দেশে যে সোচ্চার প্রশংসা ও হাততালি পড়তে থাকে যাঁরা না দেখেছেন তাঁদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে। বহু স্থানে জনতা তিরিশ মিনিট পর্যন্ত সোচ্চার করতালি দিয়ে থাকেন নিজ চোখে দেখেছি। তখনকার দিনে মাত্র আটজন শিল্পী নিয়েই আমি অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করেছি, তার বেশী শিল্পী নেবার ক্ষমতা আমার ছিল না। অবশ্য সকলেই ছিলেন ভারতীয় এবং বাদ্যযন্ত্রগুলিও সম্পূর্ণ ভারতীয় ছিল। কিন্তু তবুও যে সম্মান ও করতালির দ্বারা আমি যে সম্বর্ধনা পেয়েছিলাম তার স্মৃতি আজও একটুও ম্লান হয়নি।

এটা একটা গভীর মনস্তাপের বিষয় যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির এত বৎসর পরেও আমাদের সরকার অর্কেস্ট্রা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। এ বিষয়ে গভর্নমেন্টের সাহায্য না পেলে একক প্রচেষ্টায় অর্কেস্ট্রার উন্নতি সম্ভব নয়। স্বাধীনতার পরে অনেকবার পাশ্চাত্য দেশ থেকে তাদের জাতীয় অর্কেস্ট্রা এদেশে এসেছিল এবং আমরা তাদের বিরাট সম্মান দিয়েছি। কিন্তু আমাদের দেশ থেকে আমাদের জাতীয় অর্কেস্ট্রা ওদেশে পাঠাবার ব্যবস্থার কথা গভর্নমেন্টের মনেও স্থান পায়নি। যদিও আমাদের জাতীয় অর্কেস্ট্রা বলতে যা বোঝায় সেটা এখনও গড়ে ওঠে নি।

সিম্ফনি বা অর্কেস্ট্রা সম্বন্ধে আমাদের দেশে জনসাধারণের মনে ভুল ধারণা আছে, আমি এই কথাই মনে করি। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে যে সমস্ত বড় বড় রাজা-মহারাজা ছিলেন তাঁরা তাঁদের স্টেটে ব্যাণ্ড পার্টি গড়ে তুলেছিলেন। গোয়ালিয়র, রামপুর, বিকানীর, আলোয়ার, মাইহার এবং আরও অনেক দেশীয় রাজ্যে স্টেট ব্যাণ্ড পার্টি ছিল। স্বাধীনতার পর ঐ সব রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ পায় এবং ব্যাণ্ড পার্টিও সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু মাইহার ব্যাণ্ড আজও বর্তমান। কারণ উক্ত ব্যাণ্ড পার্টির জন্মদাতা আমার গুরু পদ্মভূষণ আলাউদ্দিন খাঁ আজও জীবিত। যাই হোক, ঐসব ব্যাণ্ড পার্টিকে সিম্ফনি বা অর্কেস্ট্রা বলা ঠিক নয়। এ বিষয় নিয়ে আলোচনা এখন নিরর্থক। তবে কলকাতার ব্যাণ্ড পার্টি নিয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। এখানে এই প্রচেষ্টা যে একেবারেই হয় নি তা নয়। স্বর্গীয় দক্ষিণারঞ্জন (কিম্বা চরণ) মুখোপাধ্যায় 'রু রিবন' নামে একটা দল গড়েছিলেন। কিন্তু সেটা সফল হয় নি। তার কারণ, তিনি ভারতীয় সঙ্গীতে বিদেশী সাজ-পোশাক পরাতে চেষ্টা করেছিলেন। এ তথ্য আমার শোনা, সুতরাং এ নিয়ে আলোচনা আমার করা উচিত নয়। তবে ঐকতানবাদন বলতে যা বোঝায়, এই শহরে সেটা ছিল। এ ধরনের ব্যাণ্ড পার্টি নির্বাক চলচ্চিত্রযুগে ছিল; তখন এগুলিকে কনসার্ট বলা হত। সিনেমা হল ও থিয়েটারগুলিতে কনসার্ট বাজানো হত। আরম্ভ এবং বিশ্রামের সময়ও কনসার্ট বাজানো হত। এগুলিতে বিলাতী বাদ্যযন্ত্রই বেশী ব্যবহার করা হত। কিন্তু দেশী গত বাজানো হত। বাঁয়া তবলার বদলে ঢোল ও স্টীলের করতাল ব্যবহার হত। একটা গত সমস্ত বাদ্যযন্ত্রে একসঙ্গে বাজানো হত। কোনরকম হার্মনি বা পলিফনির ব্যবহার ছিল না। প্রতি বৎসর জৈনদের যে পরেশনাথের জলুস বের হয় তাতেও এইরকম কনসার্ট পার্টির চলন ছিল। ইদানীং এই ধরনের কনসার্ট পরেশনাথের সঙ্গে থাকে কিনা ঠিক জানা নেই। কারণ, আমি বহু বৎসর যাবৎ উক্ত জলুস দেখি নি। এই কনসার্ট পার্টিরা যেসব গত বাজাতেন, আজও আমার সেগুলো মনে আছে। সেই সব দিনে আমি তখনও স্বরোদ যন্ত্রে হস্তক্ষেপ করিনি। আমি তখন ক্লারিওনেট বাজাতুম। শিক্ষা করতাম স্বর্গীয় শ্রীরাজেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। সেই সময় আর একজন বাজিয়ে ছিলেন স্বর্গীয় শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার। যদিও তাঁর কাছে শিক্ষা করিনি। কিন্তু তাঁর গ্রামোফোন রেকর্ডগুলি আমি সম্পূর্ণ নকল করেছিলাম।

আমি পাঁচ বৎসর মাইহারে গুরু আলাউদ্দীন খাঁর নিকট স্বরোদ শিক্ষা করেছিলাম। মাইহার ব্যাণ্ড শুনেই আমি অর্কেস্ট্রা গঠন করবার প্রেরণা পাই। বৎসরান্তে একবার করে যখন কলকাতায় আসতাম তখন বাড়ির ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে একটা ফ্যামিলি অর্কেস্ট্রা গড়ে তুলেছিলাম। অবশ্য বাইরে থেকে কিছু ছেলেমেয়েও আমার অর্কেস্ট্রায় যোগ দিয়েছিল। অনেকে হয়তো শুনে আশ্চর্য হবেন যে, বর্তমান আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকারও আমার অর্কেস্ট্রাতে সেতার বাজাতেন। আমার ঐ ফ্যামিলি অর্কেস্ট্রা শুনেই শ্রীউদয়শঙ্কর আমাকে তাঁর দলে টেনে নিয়েছিলেন ১৯৩০ সনে। সেই সময় তিনি প্যারিস থেকে এখানে এসেছিলেন নৃত্য ও সঙ্গীতের একটা দল গঠন করে ইউরোপে নিয়ে যাবার জন্য। তিনি সারা ভারত ঘুরে বাদ্যযন্ত্র, পোশাক এবং অন্যান্য শিল্পী সংগ্রহ করেছিলেন একমাত্র অর্কেস্ট্রা পরিচালক ছাড়া। সেই সময় একদিন তাঁকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। তিনি অর্কেস্ট্রা শুনেই আমার সম্বন্ধে মনস্থির করে ফেললেন। সেই সময় তিনি নিউ এম্পায়ারে একক কয়েকটা নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন এবং আমি আমার ফ্যামিলি অর্কেস্ট্রার দ্বারা তাঁর নৃত্যের সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলাম।

১৯৩০ থেকে '৩৪ সাল এই চার বৎসর ইউরোপের সমস্ত দেশ (রাশিয়া বাদে), আমেরিকা, কানাডা ও দক্ষিণ আমেরিকার ছোট বড় প্রায় সমস্ত শহরে ভ্রমণ করেছি—এ কথা পূর্বেই বলেছি। তখন থেকেই আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে, ভারতীয় সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা গড়ে তুলতে পারলে পৃথিবীর সঙ্গীতজগতে শ্রেষ্ঠ সিম্ফনি বলে পরিচয় দিতে পারবে। বিত্তবান সঙ্গীত রসিকেরা ভারতীয় সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হিসাব করে দেখতে গেলে সেটা সামান্যই। কিন্তু দুঃখের বিষয় অর্কেস্ট্রার জন্য কিছুই কেউ করেন নি। লোকে আমাকে বলে ভারতীয় অর্কেস্ট্রার জনক। কিন্তু আমার একক প্রচেষ্টায় খুব সামান্যই কিছু করতে পেরেছি। পশ্চিমে সব দেশেই অর্কেস্ট্রাকে তাদের সংস্কৃতি এবং সভ্যতার অঙ্গ বলে মনে করে। প্রত্যেক দেশেই গভর্নমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় অর্কেস্ট্রা আছে। গভর্নমেন্টের পৃষ্ঠ-পোষকতা ছাড়াও আরও বহু অর্কেস্ট্রার দল আছে বহু বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালকদের দ্বারা গঠিত। ওখানকার জনসাধারণের প্রায় প্রত্যেকেই ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে নিজেদের পছন্দ মত অর্কেস্ট্রা শুনতে যাবেনই। তার কারণ সিম্ফনি বা অর্কেস্ট্রার ভিতর সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রায় সর্বপ্রকার রস সৃষ্টি হতে পারে, যা অন্য কোন একক যন্ত্র বা কণ্ঠসঙ্গীত দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব। সামান্য দু-একটা উপমা দিলে বোঝান যায়। যেমন—প্রবল ঝড়বৃষ্টি ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে হয়তো গাছপালা বাড়িঘর পড়ে যাচ্ছে ইত্যাদি। অথবা এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হচ্ছে। আগুনের লেলিহান জিহ্বায় সব ধ্বংস হচ্ছে, মানুষের আর্ত চিৎকারে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই-সমস্ত ঘটনা একক যন্ত্র দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব। এ ধরনের পরিবেশ একমাত্র বহু এবং বহু-প্রকার বাদ্যযন্ত্রের দ্বারা গঠিত অর্কেস্ট্রার মাধ্যমেই প্রকাশ করা সম্ভব।

আজ পর্যন্ত আমি কি কি বিষয় নিয়ে সিম্ফনি রচনা করেছি সে বিষয়ে কিছু বলতে চাই। এর দ্বারা জনসাধারণ সিম্ফনি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করতে পারবেন। অবশ্য বিদেশী বহু পুস্তক আছে যাতে সিম্ফনির আসল রূপ ব্যাখ্যা করা আছে। আমি সিম্পনি অর্কেস্ট্রা শুরু করেছি ১৯৩০ সাল থেকেই। সিম্ফনি সঙ্গীত রচনা আমি বহু করেছি তবে বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মতন যেগুলি আছে তার

বিবরণ এখানে ব্যাখ্যা করা অবান্তর হবে না।

অহিংসা মন্ত্রের জনক মহাত্মা গান্ধীর শোচনীয় হত্যার পরে আমার উপর একটা বিশেষ সিম্ফনি রচনার দায়িত্ব পড়ে। ইং ১৯৪৯ সালে তদানীন্তং অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ডাইরেক্টর জেনারেল শ্রীদিবাকর দিল্লী থেকে কলকাতায় এসে আমাকে ডেকে পাঠান। আমাকে তিনি একটা বিশেষ অতি কঠিন সিম্ফনি রচনা করবার দায়িত্ব অর্পণ করেন। সেটার নামকরণও তিনি করেছিলেন Violence to Non--violence অর্থাৎ হিংসা থেকে অহিংসা। কিন্তু তিনি যা চেয়েছিলেন তার ব্যাখ্যা করলেন এইভাবে। ভগবান বহু সৃষ্টির মধ্যে এক সময় পৃথিবী নামে একটা গ্রহের সৃষ্টি করলেন। ক্রমে ক্রমে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছোট বড় অতিকায় সব জীবের সৃষ্টি হল। পরে এক সময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক শ্রেষ্ঠ জীবের আবির্ভাব হল যার নাম মানুষ। প্রথমেই কিন্তু এই জাতীয় জীবের মধ্যে সভ্যতার কোন লক্ষণ ছিল না। বর্বর, ক্রুর, নিষ্ঠুর অন্যান্য জীবের মতই একটা জীব। বন্যপ্রাণীর মতন নিজেদের মধ্যে কলহ ও মারপিট করত। একে অপরকে খুন করলেও তার বিচার ছিল না। উপরন্তু অন্যেরা তাকে প্রশংসা ও সমীহ করে চলত। কারণ সে একজন মস্ত বীর বলে গণ্য হত। এইভাবে কতকাল যে কেটেছে তার নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের মনে সভ্যতার আলোক প্রবেশ করতে লাগল। তারা ক্রমে দল বেঁধে বাস করার সুবিধা বুঝতে শিখল। তার দ্বারা কিন্তু অহিংসার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। দুই দলের সংঘর্ষ লেগেই থাকল। দলের একজন প্রধান থাকতো। এইভাবে ক্রমে ক্রমে রাজা মহারাজা সম্রাট এই সব পদের সৃষ্টি হল। কিন্তু মনুষ্য জাতির মধ্যে লড়াই করার স্পৃহা কিছুমাত্র কমল না। সৈন্যসামন্তর সৃষ্টি হল। একে অপর রাজ্য দখল করবার জন্য যুদ্ধবিগ্রহ বেড়েই চলল। মানুষ মারবার জন্য নানারকম অস্ত্র আবিষ্কার হল। এইভাবে বহু বহু যুগ চলতে লাগল। ক্রমে মানুষের মধ্যে শান্তির আকাঙ্ক্ষা দেখা দিতে লাগল। কিন্তু শান্তির প্রকৃত উপায় আবিষ্কার হল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানুষজাতিকে ধ্বংস করবার জন্য বহুপ্রকার বৈজ্ঞানিক অস্ত্র আবিষ্কার হতে লাগল এবং জাতিতে জাতিতে ঐ জন্য প্রতিযোগিতা আরও প্রবল হয়ে উঠল। এইভাবে বহু যুগ শেষ হবার পর বিংশ শতাব্দীতে ভারতে একজন মহাত্মার আবির্ভাব হল। তিনি আমাদের অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। শুধু তাই নয় এই পরাধীন ভারতকে প্রবল প্রতাপান্বিত আধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত রাজশক্তিকে অহিংসার দ্বারা পরাস্ত করলেন। ভারত স্বাধীন হল। ভারতে শান্তি এলেও পরিণামে সেই মহাত্মাকে এক মারাত্মক আগ্নেয় অস্ত্রের দ্বারা নিহত হতে হল। এরই সিম্ফনি কেবলমাত্র বাদ্যযন্ত্রের দ্বারাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শ্রীদিবাকর এটা রেডিওর মাধ্যমে প্রচার করবার জন্যই আমার উপর ভার দিয়েছিলেন এবং সেইরূপ করাই হয়েছিল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ১ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। এখনও উক্ত সিম্ফনির রেকর্ড আকাশবাণীতে মজুত আছে।

১৯৪৩ সালে নিউ এম্পায়ারে আমার সিম্ফনির একটা বিশেষ অনুষ্ঠান হয়েছিল।

সেদিন সেখানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বর্গীয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। এখানে আমি যে কয়টা সিম্ফনি উপহার দিয়েছিলাম তার মধ্যে প্রধান ছিল কবিগুরুর ক্ষুধিত পাষাণ। স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হলুম যে, ঐ সময় সর্বপ্রথম ক্ষুধিত পাষাণ দর্শকদের নিকট উপস্থাপিত করা হয়েছিল। এছাড়া আরও যে কয়েকটা সিম্ফনি উপস্থাপন হয়েছিল সেগুলি হল আবাহন, ললিতা-গৌরী, অপরিচিতা এবং আরও কয়েকটা।

এরপর আকাশবাণী থেকে কয়েকবার আমার সিম্ফনির প্রচার হয়েছিল। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেঘমল্লার। এই রচনার স্থিতিকাল ছিল ৪৫ মিঃ। আর একটা উল্লেখযোগ্য সিম্ফনি একটা ভুতুড়ে বাড়ির ঘটনা নিয়ে। এর বিষয়ও কল্পনা সম্পূর্ণ আমার ছিল।

আমার শ্রেষ্ঠ সিম্ফনি রচনা করে জনসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করেছিলাম ১৯৬৫ সালে। প্রথমে ফাইন আর্ট অ্যাকাডেমিতে এবং পরে নিউ এম্পায়ারে। এটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের The child বা শিশুতীর্থ। এটা কবিগুরুর শ্রেষ্ঠ কবিতাবলির অন্যতম। ১৯৩১ সনে জার্মানীতে থাকাকালীন যীশু খৃষ্টের জন্মদিনে তিনি এই কবিতা রচনা করেন। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, প্রথমে এই অপূর্ব কবিতা তিনি ইংরেজীতেই রচনা করেন। পরে তিনি এটা বাংলায় তর্জমা করেন। এই কবিতার দুটি ভাষার মধ্যে কোনটা শ্রেষ্ঠ বিচার করা অসম্ভব।

শিশুতীর্থ সম্বন্ধে একটা শোকাত্মক ঘটনা আছে যেটা এখানে প্রকাশ না করে থাকতে পারছি না। এই শিশুতীর্থের সিম্ফনি রূপ-পরিকল্পনার প্রায় দু' বছর পূর্ব থেকেই পঃ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিধানচন্দ্র রায়ের সংগে একটা জাতীয় অর্কেস্ট্রা গঠনের প্রয়োজনীয়তার বিষয় আলোচনা করতে থাকি। তিনি এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। এবং কিছু চিঠিপত্রও লেখালেখি হয়েছিল। এই ধরনের সিম্ফনির জাতীয় গুরুত্বও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি রবীন্দ্র ভারতীর উপাচার্য শ্রীহিরন্ময় ব্যানার্জীকে একটা পত্রে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন এবং এ বিষয়ে কি করা যেতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করতে বলেন। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তাঁর বাড়িতে আমি এ বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা করি। তিনিই আমাকে এই শিশুতীর্থের সিম্ফনি রচনা করতে বলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর আকস্মিক তিরোধানে তাঁর অঙ্গীকৃত সাহায্য হতে আমাকে বঞ্চিত হতে হল।

পরিশেষে আমার এই কথাই বলবার আছে যে, আমার একার চেষ্টায় একটা জাতীয় অর্কেস্ট্রা গড়ে তোলা দুঃসাধ্য। অথচ সর্ববিষয়ে গভর্নমেন্টের মুখাপেক্ষী হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু জাতীয় অর্কেস্ট্রার জন্য সরকারের নিশ্চয়ই দায়িত্ব আছে। তাঁরা হয়তো ভাবছেন অর্কেস্ট্রা হচ্ছে ঐকতান বাদন, এর আর সাহায্যের কি প্রয়োজন! যন্ত্রীদের একত্র করে একটা গত বাজলেই চুকে যায় ল্যাঠা। আমি রসিকতা করছি না। আমি বহুদিন যাবৎ গভর্নমেন্টের কাছে এ বিষয়ে সাহায্যের জন্য চেষ্টা চালিয়ে আসছি। মন্ত্রীদের মধ্যে কয়েকজনের অর্কেস্ট্রা মানে ঐকতান বাদন—এই ধারণাই আছে। এছাড়াও আজকাল অনেক বিত্তবান ব্যক্তিও সঙ্গীত-শিল্পের জন্য অনেক কিছু করছেন, কিন্তু অর্কেস্ট্রার দিকে তাঁরা উদাসীন। তাঁরা কেন হাত গুটিয়ে বসে আছেন বোঝা কঠিন। শুধু তাই নয় প্রতি বছর কলকাতায় যে সঙ্গীত কনফারেন্স হয় তাতে সিম্ফনি বা অর্কেস্ট্রার কোন স্থান নেই কেন? একজন বিখ্যাত শিল্পীকে যে টাকা দিয়ে থাকেন অর্কেস্ট্রার জন্য ৫০ জন যন্ত্রীকে ঐ পারিশ্রমিক দিয়ে অর্কেস্ট্রা উপস্থাপন করা যায়। নিউ এম্পায়ারে একবার বিশেষ আসরে শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুকে আমন্ত্রণ করে আমি অর্কেস্ট্রা শুনিয়েছিলাম। তিনি প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন কিছু করবেন। কিন্তু পরে নীরবতাই পালন করেছিলেন।

আমাদের ভারতীয় ক্লাসিকাল সঙ্গীতে অর্কেস্ট্রার যে বিরাট উপাদান আছে পৃথিবীর অন্য কোন সঙ্গীতে আছে কিনা সন্দেহ। এক একটা রাগে সিম্ফনির প্রচুর উপকরণ আছে, সেগুলি সঠিকভাবে কাজে লাগালে জাতীয় সম্পদ হয়ে থাকবে। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও রচনাগুলির মধ্যেও প্রচুর উপকরণ আছে। তদুপরি বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক আছেন যাঁদের রচনার ভেতর সিম্ফনির উপকরণ আছে। শুধু তাই নয় তাঁরা চেষ্টা করলে সিম্ফনির জন্য নতুন অনেক উপকরণ যোগাতে পারেন—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

আমি সিম্ফনির যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি অর্থাভাবে সেটা স্তব্ধ হয়ে আছে। সারাজীবন সঙ্গীত সাধনা করে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি আমার মৃত্যুর পর সেটারও যদি মৃত্যু হয় তো পরলোকেও আমাকে অশান্তিতে কাটাতে হবে। সুতরাং সিম্ফনি বা অর্কেস্ট্রায় যাঁরা অনুরাগী আমি তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করি আর দেরি না করে এগিয়ে আসুন। অর্কেস্ট্রার বিরাট ভবিষ্যৎকে তাঁরা এই ঘুমন্ত শিশু অবস্থা থেকে জাগিয়ে তুলুন। এর যৌবন এলে পরে সারা পৃথিবীতে সাড়া পড়ে যাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী আমি দ্বিধাহীনভাবেই করতে পারি।

এই প্রবন্ধ শেষ করবার পূর্বে আমার বক্তব্য এই যে, আমি একজন যন্ত্রী। স্বরোদ যন্ত্রই আমি প্রায় সারাজীবন সাধনা করেছি। পূর্বে ক্লারিওনেটও বহু বৎসর বাজিয়েছি, তাছাড়াও অন্যান্য যন্ত্রও কিছু কিছু বাজিয়েছি। অর্কেস্ট্রার ওপর ঝোঁক আসে পশ্চিম দেশগুলি ভ্রমণ করবার বহু পূর্ব থেকেই। সুখের কথা আরও কয়েকজন অর্কেস্ট্রার চর্চা আরম্ভ করেছেন। তবে কথা হচ্ছে অর্কেস্ট্রা গঠন বা রচনা খুব সোজা নয়। অর্কেস্ট্রার রচনা কৌশল সম্পূর্ণ আলাদা। গান কিংবা যন্ত্রে যে গত বাজানো হয় সেগুলির দ্বারা অর্কেস্ট্রা হয় না। অর্কেস্ট্রার সুর ও ছন্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্ত্য দেশের হার্মনি ভারতীয় সঙ্গীতে ঠিক খাপখাওয়ানো যায় না। ঐকতান বাদনকেও অর্কেস্ট্রা বলা যায় না। অথচ অর্কেস্ট্রার জন্য ব্যাক গ্রাউন্ড বা পটভূমিকার বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের অর্কেস্ট্রার পটভূমিকার প্রয়োজন হচ্ছে পলিফনি। সুদূর প্রাচ্যে বিশেষ করে জাভা, বালি, কম্বোজ এইসব দেশে বহুকাল যাবৎ অর্কেস্ট্রার প্রচলন আছে। হার্মনির বদলে তারা যা ব্যবহার করে আমাদের ভারতীয় অর্কেস্ট্রার জন্য সেই ধরণের পটভূমিকা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আসল কথা একটা ছবি আঁকতে যেমন তার ব্যাকগ্রাউন্ড বা পটভূমিকার প্রয়োজন হয় তেমনি সিম্ফনি বা অর্কেস্ট্রারও সেইরূপ ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রয়োজন। কিন্তু সেটা যেন ভারতীয় হয়। ভারতীয় সুর ও তার বিদেশী পটভূমিকা কিরকম শোনায় এ অভিজ্ঞতা বোধ হয় অনেকেরই আছে। কিন্তু এর সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হচ্ছে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। সত্য মিথ্যা জানি না, তবে শুনেছি, আমাদের এই মহান জাতীয় সঙ্গীত বিলাত থেকে প্রচুর অর্থব্যয়ে হার্মোনাইজ করানো হয়েছে। সিনেমা শেষ হবার পর জনসাধারণ যে তাড়াহুড়ি পলায়ন করে, এটাও একটি কারণ হতে পারে।

আলোয় কালোয়

ত্রিশঙ্কু

কিছুদিন আগে কাগজে একটা খবর পড়েছিলাম, কলকাতা শহরের নিষিদ্ধ এলাকা দেখিয়ে আনবে বলে একজন জোচ্চোর জনৈক বিদেশী পর্যটকের কী সর্বনাশটাই না করেছিল। শুধু পাসপোর্ট মাত্র সম্বল করে ভদ্রলোক প্রথমে থানা—তারপর নিজের দেশের দূতাবাসে গিয়ে সব কথা খুলে বলাতে কিছু সুরাহা হয়েছিল হয়ত। পালিয়ে বেঁচেছেন তিনি, জীবনে আর কখনো কলকাতা-মুখো হবেন বলে মনে হয় না। আবার এমন খবরও জানি, কোনো বিদেশী ভ্রাম্যমাণ কাটমাণ্ডু যাবার পথে কলকাতায় দুদিন থেকে যাবার বায়না নিয়ে এসেছিলেন, তারপর এক বছর আর ফিরতে পারেননি। কলকাতার চরিত্রই এইরকম—হয় ধরে রাখবে, নয়তো তাড়িয়ে দেবে। বিদেশের অন্য কোনো প্রকাণ্ড শহরের মতো নির্বিকার ভাব আমাদের কলকাতা টাউনের নেই।

জয়ন্ত বললো, অন্তত দু-একটা ছোট শহর বিদেশেও আছে যেখানে গোপন আত্মীয় ও উৎপাত একসঙ্গে বসবাস করে। এই প্রসঙ্গে বিদেশ ভ্রমণের গল্প ফাঁদছি কৌশলে—যদি না মনে করো, তবে একটা মজার ঘটনার কথা বলি।

আমরা সমস্বরে জানালাম—প্রেম আর পার্টির গাঁজা বাদ দিয়ে আর সব শুনতে প্রস্তুত। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে—কী আর করা যায়।

ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটা ছোট শহরে। নামটা বোধ হয় কারকাসন। প্রায় দশদিন হিচ্-হাইক করে পৌঁছেছি বিকেল চারটে নাগাদ। এক পাদরিসাহেব আমায় নামিয়ে দিয়ে গেলেন। ইচ্ছে ছিল, সন্ধ্যা ছটার মধ্যে ফ্রান্স ছেড়ে বার্সিলোন পৌঁছে যাবো, তার কোনো আশা দেখলাম না। প্রায় পাঁচ-সাত মাইল শুধুই হাঁটলাম বড় রাস্তা ধরে, কারণ হিচ্-হাইকারদের সব সময় চলমান থাকা দরকার। তা ছাড়া, আমার কাঁধের ঝোলায় বড় বড় অক্ষরে INDE—এই চারটি অক্ষর লেখা ছিল, ভারতীয় ভেবে মমতাবশত কেউ যদি অনুগ্রহ করে। সব বৃথা গেল। নাড়তে-নাড়তে বুড়ো আঙুল ব্যথা হয়ে গেল—একটাও গাড়ি থামলো না।

এক এক সময় ভবঘুরেদের এইরকম অবস্থায় পড়তে হয়। অন্ধকার হয়ে আসছে, টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে হয়তো। হাঁটতে-হাঁটতে যেখানে এসেছি, সেখানে দুপাশে বিস্তৃত আঙুরের ক্ষেত ছাড়া আর কিছু নেই। ম্যাপ দেখে জেনে গেছি, পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কোনো য়ুথ হোস্টেল নেই যেখানে আশ্রয় নেওয়া যায়। অর্থাৎ মরণ।

এই মুহূর্তে মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। ঝোলা নামিয়ে একটু বিশ্রাম। ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে একটু কফি খেয়ে, তারপর একটা সিগারেট টানতে টানতে চিন্তা। ভুরভুর করে বুদ্ধি বেরোবে দুকান দিয়ে—বলবে, এগোও, কাছাকাছি কোনো রেল স্টেশনে গিয়ে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করে নাও ওয়েটিংরুমে—যখন হোটেলে থাকার পয়সা তোমার নেই। ইচ্ছে হলে পরদিন সকালে না-হয় ট্রেন ধরতে চেষ্টা ক'রো বার্সিলোন যাবার।

স্পেন ও ফ্রান্সের সীমান্তে একটি ছোট স্টেশনে শেষপর্যন্ত পৌঁছনো গেল। নামটা এখন মনে পড়ছে না। চমৎকার মুসাফিরখানা, ভেতরটা গরম, চারটি বেঞ্চি পাতা চারপাশের দেয়াল ঘেঁষে। একটি বেছে নিয়ে আরাম করে শুয়ে পড়লাম হাত-পা ছড়িয়ে। প্রত্যেকটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন বেতের চেয়ারের মতো খচমচ করে উঠলো। আমার ক্যামেরা, ঘড়ি ও মানিব্যাগ যত্ন করে ঢুকিয়ে রাখলাম ঝোলার মধ্যে, তারপর সেটিকে মাথার বালিশ করে শয়ন। একটু উঁচু হয়ে গেল বটে, । নিরাপদ।

কোনো নিষিদ্ধ অঞ্চল আমি দেখতে চাইনি নিদ্রালয় ছাড়া। এত ক্লান্ত ছিলাম, খানিক পরেই ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ এক সময় ঘুম ভেঙে গেল শব্দে। দেখি ঘরে আর একটি লোক। মজুর গোছের। প্রচণ্ড টলছে নেশায়। হাত থেকে একটি বোতল ফেলেছে এইমাত্র। একটি সরু ধারা হয়ে রক্তের মতো এঁকেবেঁকে গড়াচ্ছে তরল

তোমার কী এমন ঘুম হে—যে ভাঙবে না

পদার্থ। লোকটি বিষম অপ্রস্তুত—আমার ঘুম ভেঙে গেছে।

মধ্যরাত্রে একটি অপরিচিত মাতালকে সঙ্গী পেয়ে খুব উৎফুল্ল হলাম না, বলা বাহুল্য। বরং একটু ভয়ই পেয়েছি। এ-দেশে আবার ছোরা-ছুরির চেয়ে রিভলভার বেশি প্রচলিত। অর্থাৎ, মরণ, নির্ঘাৎ। লোকটি টলতে টলতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে দেখলাম চোখ পিটপিট করে। ঘুমিয়ে আছি দেখে যদি ও চলে যায়।

সে তো যাবার জন্যে আসেনি। ঠেলে আমায় তুললো, "এই মসিঁয়ো, আমায় ক্ষমা করো, শব্দ করেছি বলে তোমার ঘুম ভেঙে গেছে তো? নিশ্চয় ভেঙেছে, আলবাৎ ভেঙেছে। আমার গোটা বোতলটা পড়ে ভেঙে গেল, আর তোমার কী এমন ঘুম হে—যে ভাঙবে না?"

—"ঠিক আছে, ঠিক আছে, ক্ষমা করেছি", বলে যত ওকে বিদেয় করার চেষ্টা করি, ততই ও জেঁকে বসতে শুরু করলো। এক সময় হঠাৎ ও আমার মুখের দিকে চেয়ে বুঝলো আমি বিদেশী, আমি কালো মানুষ।

আর যায় কোথায়! কোন্ দেশের লোক তুমি? আফ্রিকা? পাকিস্তান? ভারতবর্ষ? নেহরু? তোমরা মন্দিরে জন্তু-জানোয়ারের পুজো করো? তোমরা কি কম্যুনিস্ট?—এই সব। হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল বোধ হয়, ভারতবর্ষের লোক পেট-ভরে খেতে পায় না—আমায় জিজ্ঞেস করলো, "তোমার খাওয়া হয়েছে? উঁহু, মিথ্যে কথা, তুমি খাওনি। মুখ দেখে বুঝতে পারছি, তুমি খাওনি। কতদিন খাওনি? না খেয়ে কী করে বাঁচো তোমরা?"—তারপর আবার টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ভয়ে সিঁটিয়ে ছিলাম এতক্ষণ, বাঁচলাম।

একটা দশ ফ্রাঁ দামের নোট

দুর্যোগের দিন, এত সহজে তো মুক্তি পাবার কথা নয়। মিনিট কয়েক পরেই আবার তার আবির্ভাব। এক হাতে প্রকাণ্ড লম্বা একটি রুটি, অন্য হাতে এক বোতল মদ। "তোমার খিদে পেয়েছে, আমি জানি, এ দুটো তোমায় খেতেই হবে"। আমি বুঝলাম, সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে, নিষ্কৃতির কোনো পথ নেই। আজ রাত্রে আমার সর্বস্ব হাত ছাড়া হয়ে যাবে। শুধু প্রাণে বেঁচে থাকা দরকার এই ভেবে একবার গায়ত্রীমন্ত্র জপ করে নিলাম। তারপর আস্তে-আস্তে উঠে বসে সম্পূর্ণ রুটিটা ও পুরো বোতল পানীয় খেয়ে ফেললাম। লোকটি একদৃষ্টে চেয়ে-চেয়ে আমার খাওয়া দেখছিল। শিকারীর মতো মিটিমিটি হাসছিল।

তারপর কী ঘটেছিল, আমার মনে নেই। কতক্ষণ লোকটি ওই ঘরে ছিল, কখন ও গেছে, জানি না। যখন ঘুম ভাঙলো, বোধ সকাল হয়ে গেছে। তড়াক করে উঠে নিজের নাড়ি দেখলাম আগে। বেঁচে আছি। তারপর জোব্বার পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমার ঘড়ি, কলম ও মনিব্যাগ। সব ঠিকঠাক। ভাগ্য ভাল। চটপট মুখ-হাত ধুয়ে, এক কাপ কফি খেয়ে আবার পথে। আবার হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে বুড়ো আঙুল দেখানো। গাড়ী থামলে তাতে চড়ে যত দূর পর্যন্ত সম্ভব এগিয়ে যাওয়া। হিচ হাইকার সব সময় চলমান।

দিন দুয়েক পর মার্সাই শহরে পায়চারি করতে আমার ওভারকোটটার বুক পকেটে হাত দিয়ে কী যেন ঠেকলো। বার করে দেখি, একটা দশ ফ্রাঁ দামের নোট। সেই নোংরা চেহারার মাতালটা আমাকে ঘুম পাড়িয়ে যাবার সময় পকেটে ঢুকিয়ে রেখে গেছে। এত কাণ্ড হল হঠাৎ, সঙ্গে সঙ্গে ভাবলাম টিকিট কিনবো। এই পয়সায় ষাঁড়ের লড়াই দেখতে হবে। 'তোরো' না দেখে স্পেন ভ্রমণের মানেই হয় না।

কলকাতা শহরে একজন গরিব বিদেশী এমনি হঠাৎ কিছু টাকা পেয়ে গেলে কী করতো? নিষিদ্ধ এলাকায় চলে যেতো নাকি?

দিল্লির ডায়েরি

কোনো স্থানের একটা বিরাট বটগাছ। তাকে ছোট বড় সবাই জানে, সবাই চেনে, তার বড় বড় মেলানো ডাল আর পাতার ছায়া আর তার জড়-নামা প্রাচীনতা—সবাইকার চেনা, অচেতনভাবে সকলের আপনার। এমনি বৃক্ষটি যখন আর থাকে না, কোনো কারণে অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, তখন যেন সবারই বেশী করে মনে পড়েঃ "গাছ! তুমি ছিলে। ও বৃক্ষ, তুমি তো এইখানটায় ছিলে তোমার পাতা আর ছায়া নিয়ে, মানুষের সেবায়, আর্তের প্রয়োজনে, আমাদের আপনার হয়ে ছিলে। তাই জায়গাটা এতো ফাঁকা ফাঁকা আজ।"

এমনি একটি মহীরুহ ছিলেন, অন্তত রাজধানীর বাঙালী সমাজে, সর্বজন-পরিচিত আদ্যবাবু, রাসবিহারী সেন, যিনি দেহত্যাগ করেছেন এই সেদিন (৩০শে মে), আনসারি রোডে (দরিয়াগঞ্জ) নিজের বাড়িতে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস ছিল আটাত্তর।

আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে, যদি একজন রাজনীতিক মারা যেতেন, যিনি কালোবাজারে পয়সা করেছেন, ডান হাতে দু' পয়সা দান করে বাঁ হাতে কানমলা দিয়ে তুলে নিয়েছেন চার পয়সা, এবং সংসদ অথবা কোনো রাজ্যের বিধানসভার মাধ্যমে উঠে গেছেন ঐ পর্যায়ে, হয়তো কয়েক শ' মন্ত্রীদের মধ্যে একজন তা হলে সেই বক্তৃতাবাজ ভারতীয় সন্তানটির জন্যে খবরের কাগজে কাগজে অ্যাদ্দিন বেরুতো নানা শোকবাণী, ফটো, মৃতের গৃহে কে কে ফুল নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের নাম, শোকসভার নোটিস, চাই কি, একটা মেমোরিয়াল ফান্ডের আবেদন, মানে আমার আপনার পকেট মেরে একটা নাম করার জন্যে কিছু।

না, আদ্যবাবুর বেলায় তা কিছু হয় নি। অবাঙালীদের কথা ছেড়ে দিলাম। স্থানীয় বাঙালী সমাজেও খুব একটা আলোড়ন হয়েছে বলে আমার জানা নেই। অথচ উনি প্রাচীনতম একটি বাঙালী পরিবারের ছিলেন ধ্বজাবাহক, ছিলেন পরোপকারী, পরদুঃখ-কাতর এবং সেবাধর্মে দীক্ষিত। আজকের রাজনীতিকদের মতো স্বয়ংসেবী ছিলেন না। নিজের কাছে নিজের লজ্জা পেতে ইচ্ছে হয়ঃ বাঙালীদের মধ্যে অতো নাম-করা একটি মানুষের জন্যে সমস্ত বাঙালীদের একটা শোকসভা অন্তত কোথাও হল? কেন হয় নি?

আমি তাঁকে মাত্র একবার দেখেছি, মাত্র ঐ একটিবার তাঁর সংগে কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছিল। যাকেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, দেখুন পুরোনো কালে দিল্লিতে দুর্গাপুজো কেমন হত, কী করে জানতে পারি আমার লেখার প্রয়োজনে? সকলের উত্তর এক ঃ আদ্যবাবুর কাছে যান।

গিয়েছিলাম। তাঁর সম্বন্ধে কিছু না জেনেও টেলিফোনে দিনক্ষণ ঠিক করে গিয়েছিলাম। আলাপে জানলাম, তাঁর মন খুব উঁচু, সৎ ও সরল এবং বাঙালীর ঐতিহ্য-পূজারী। জেনেছিলাম, দিল্লির প্রাচীন কথা তাঁর নখদর্পণে। অনেক কথা বলেছিলেন, পুরোনো দিনের কথা। সেই কালের কথা, যখন একজন বাঙালী ছিল রাজধানীতে সম্মানে সকলের উপরে, শ্রদ্ধার উপর তলায়।

আজকের দিনের কথা স্মরণ করে অনেক দুঃখ করেছিলেন। তাঁর সংগে আমারও হয়েছিল দুঃখ। বাস্তব জীবনের অনেক গ্লানি দেখে শুনে বেশ উষ্মার সংগে নালিশ করেছিলেন (আমি মাথা পেতে নিয়েছিলাম)ঃ এই তো আপনারা খবরের কাগজের লোক, আনন্দবাজারের লোক। বলুন তো, সত্যি কথা সব সময় লিখতে পারেন? ("না, পারি না")। এইসব মন্ত্রীদের, রাজনীতি-ওয়ালাদের আপনারা দেবতা বানান নি? ("আজ্ঞে হ্যাঁ, বানিয়েছি, তার ফলও ভুগছি")। দেশের মানুষদের কথা ভাবে, বলুন? ("না, ভাবে না, মন্ত্রীরাও না")।

আদ্যবাবুর জন্ম দিল্লিতে ১৮৯০ সনে। তাঁর পিতা ডক্টর হেমচন্দ্র সেন রেলের ডাক্তার হয়ে এসেছিলেন এখানে ১৮৭৯, কিন্তু এক বছর পরেই চাকুরি ছেড়ে নিজে প্র্যাকটিস করতে আরম্ভ করেন এবং প্রচুর নাম করেন। (সেই স্বীকৃতিতে দিল্লি করপোরেশন একটি রাস্তার নাম দিয়েছে ডক্টর সেনের স্মৃতিতে)। এবং বহু সাম্রাজ্যের মসনদ-শ্মশান দিল্লি শহরে বাঙালীদের দল বেঁধে আসা শুরু হল ১৯০১ সন থেকে, যখন কলকাতা থেকে এখানে স্থানান্তরিত হল তদানীন্তন ডেপুটি কনট্রোলার (পোস্ট অফিস) মহাশয়ের দপ্তর, ২৫০ বাঙালী পরিবার নিয়ে। (ইংরাজরা হয়তো তখন থেকেই রাজধানী সরানোর কাজে লেগে গিয়েছিল ধীরে ধীরে, পুরোপুরি বদলানো হল ১৯১১ সনে)।

স্থানীয় লোকদের কাছে শুনেছি যে, আদ্যবাবুদের বাড়ি থেকে লোকেরা রেল স্টেশনে গিয়ে যাত্রীদের মধ্যে বাঙালী দেখলে তাকে নিয়ে আসতো নিজেদের গৃহে। খাইয়ে-দাইয়ে চাকুরি দিয়ে তাকে করতো দিল্লিবাসী। (হয়তো আপনারা অনেকে জানেন, এর ঠিক উল্টো ছিল কয়েকজন কেন্দ্রীয় বাঙালী মন্ত্রী, যাদের দু-একজনকে আমিও চিনি। তাদের কাছে—ইচ্ছে করে "ত"-এর উপর চন্দ্রবিন্দু দিলাম না—তাদের কাছে কোনো বাঙালী চাকুরি-প্রার্থী গেলেই,—যদি সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য হয়—তাদের মুখ কালো। "ও, তা হলে তুমি বাঙালী। সেই তো মুশকিল। অমনি নালিশ হবে বাঙালী মন্ত্রী বাঙালীকে কাজ দিচ্ছে। তাই তো, কী করি। বড়ই মুশকিল, মানে বুঝলে কিনা দেখি কী করতে পারি।—কিংবা বলতো, "না, না, চাকুরি কোথায়? এখানে কিছু হবে না। যাও!!")

একই সংগে মনে পড়ে একটি ব্যতিক্রমের কথাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কথা। তাঁর সংগে যেন এমনি আদ্যবাবুদের মতো বাঙালী পরিবারের কোথায় যেন আছে মিল।

আদ্যবাবুদের মস্ত বড়ো ওষুধের দোকান চাঁদনি চকে। গরীবদের চিকিৎসায় (বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়, যখন ওষুধ বেচতো শুধু কালোবাজারে) এঁরা অনেককে ওষুধ দিয়েছেন বিনা পয়সায়, প্রাণ বাঁচিয়েছেন অনেক নামনা-জানা সাধারণ মানুষের।

বহু লোককে টাকা পয়সা দিয়ে উনি সাহায্য করেছেন। এমন কি, ঠকেছেনও। কিন্তু তিনি জানতেন যে, দুটো একটা লোক হয়তো ঠকিয়ে টাকা নিয়েছে কিন্তু উপকৃত হয়েছে অনেকে। তাই যথেষ্ট। ঋণ দিয়েছেন অনেককে। কিন্তু টাকা ফেরত চাইতেন না। এমন কি, তাদের কেউ কেউ দ্বিতীয়বার ঋণের জন্যে এলেও ফিরিয়ে দিতেন না।

কাশ্মীরী গেটের স্কুল স্থাপন, তিস্-হাজারির কালী বাড়ি স্থাপন, অলিম্পিক কমিটি, খেলাধুলো—সমস্ত কাজে ছিলেন আদ্যবাবু। ছিলেন মানে উনি ট্যাঁকের পয়সা খরচ করে এ-সবে উৎসাহ দান করেছেন। (এটা পুরোনো কালীবাড়ি। একদা পুরুত মশায়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল রোশনপুরায়। আদ্যবাবুর চেষ্টায় কালী মাতা হলেন সকলের ১৯১৭ সন থেকে। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী এতে জড়িত ছিলেন আদ্যবাবুর সংগে)।

বাঙালী ও অবাঙালী বহু জনের হিতে দিন যাপন করেছেন আদ্যবাবু। প্রতিদানে কিছু চান নি। রাজনীতিতে থেকেও প্রতিদান চান নি, কী আশ্চর্য! (আর আজকাল? অন্তত কয়েকটা পারমিট ও লাইসেন্স প্রতিদানে)! রাজনীতিতে আসেন অ্যানি বেসান্টের চেলা হয়ে। পুরোনো কংগ্রেসেও ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় আদ্যবাবু অমৃতসরে (১৯২৩) কংগ্রেসে বেংগল ক্যাম্পের তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, লালা লাজপত রায়—এঁদের সংগেও আদ্যবাবুর সংযোগ ছিল। কিন্তু ১৯২৫ থেকে রাজনীতি ছেড়ে দিলেন। তখন থেকে প্রবাসী বংগ সাহিত্য সম্মেলন (অধুনা নিখিল ভারত বংগ সাহিত্য সম্মেলন) ও অন্যান্য ধরনের সাহিত্যের চর্চায় আদ্যবাবু সক্রিয় ছিলেন অনেক বৎসর। (সম্মেলন যখন হল "সাহিত্যের কুণ্ডু স্পেশ্যাল", তখন থেকে আদ্যবাবু সৌভাগ্য-বশত ওতে আর সক্রিয় ছিলেন না)।

তাঁর সমস্ত কথা লিখে ওঠা মুশকিল। হ্যাঁ, আমাদের জানা উচিত যে, এ'র চেষ্টাতেই হয়েছে মূক-বধিরদের বিদ্যালয় লেডি নয়েস্ স্কুল)।

আদ্‌বাবু বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন এবং স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের পশ্চাতে রয়েছে তাঁর অবদান। তাঁর পিতাও ছিলেন বিবেকানন্দের ভক্ত। স্বামীজী যখন দিল্লি আসেন ১৮৯১ সনে, হেমচন্দ্র সেন তখন তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। এ'দের বাণী আদ্‌বাবুকে সেবাধর্মে প্রেরণা দিয়েছে।

আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সেদিন ও'র কাছ থেকে জানতে পারলাম যে উনি রান্না-বান্না করার ওস্তাদ—দেশী, বিদেশী, বাঙালী, ভারতীয়, সব। শিখেছেন একেবারে বৈজ্ঞানিকভাবে। প্রশ্ন করলেন: "শুক্তো মানে জানেন?" "না জানি না, কিন্তু খেতে ভাল লাগে।" "লাগে, তাই না? শুক্তো মানে যা হল সু তিক্ত. তিক্ত কিন্তু ভাল তেতো। ঐ যে আপনি বললেন খেতে ভাল লাগে।"

আমি বিস্ময়ে চেয়ে ছিলাম তাঁর অভিজ্ঞতা-পূর্ণ চোখের দিকে আদ্‌বাবুর প্রাচীন চোখের দিকে।

খগেন দে সরকার

আলোচনা

কবি সম্মেলন

৩১ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকার শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসুর চিঠিটি পাঠ করলাম। বুদ্ধদেব বসু বাংলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা অপরিসীম। তবে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিটিতে এমন কিছু কথা আছে, যা প্রতিবাদযোগ্য মনে করি। আশা করি আপনি আমাকে এ সুযোগ দিয়ে বাধিত করবেন।

শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসু মহাশয় Bengali Literature পত্রিকা সম্বন্ধে এমন কতকগুলি কথা বলেছেন, যার অনেকটাই অর্ধসত্য। শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসুর একটি কবিতা To a dog আমাদের সংকলনের ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হবার পর শ্রীযুক্ত বসুর কাছ থেকে একটি উকিলের চিঠি পাই। আমি তার উত্তরে তাঁকে যা লিখেছিলাম, তা প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করছি। তাতে ঘটনার অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমার উত্তরটি ছিল—

"On our request Sm. Lila Ray sent to us some poems translated by her, to be published in 'Bengali Literature' and among them there was a poem named "TO A DOG" written by you. Although she did not categorically mention that the same was translated by her ownself, we presumed to be so. We did not know that the particular piece had been published before elsewhere and so the question of infringement of copyright did not arise.......We fail to understand, therefore, how your reputation could be damaged by our act. We assure you, however, that we shall be more cautious in this respect in future."

উপরের চিঠির উত্তর থেকেই লক্ষ্য করা যাবে, কোনও একটা ভুল বোঝাবুঝির জন্য এটা হয়েছে, এবং এর পেছনে আমাদের কোনও উদ্দেশ্য কাজ করেনি। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলাম। (বুদ্ধদেব বসুর কাছে ক্ষমা চাইতেও আমার লজ্জার কোনও কারণ নেই, বরং আমার পক্ষে সেটা গৌরবের।) তিনি খুব স্নেহের সঙ্গে আমাকে সেদিন গ্রহণ করেছিলেন। আজ দেখছি, সেটা নিতান্তই ভুল।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের রচনাটি আমাদের দিয়েছিলেন বিষ্ণু দে। পত্রিকার ভুলত্রুটি সম্বন্ধে তিনি আরও অনেক কথাই বলেছেন। এ বিষয়ে আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। তবে ইংলণ্ড, আমেরিকা বা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই পত্রিকার যে সমালোচনা বেরিয়েছে, তা অন্য কথাই বলে।

এবার 'সর্ব ভারতীয় কবি সম্মেলন' সম্বন্ধে বলি। তিনি এই কবি সম্মেলনে অনুপস্থিত থাকার কথা বলেছেন। অথচ আমার যতদূর জানা আছে, আমাদের সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে বেতার কর্তৃপক্ষ যে বিশেষ সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছিলেন, তাতে তিনি উপস্থিত ছিলেন। সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনে আগত শ্রদ্ধেয় উমাশঙ্কর যোশি, বা. না. সুব্রহ্মণ্যম এবং প্রভাকর মাচওয়ের সঙ্গে তিনি কিভাবে আলোচনায় যোগ দিলেন, তা আমি বুঝতে পারছি না। বুদ্ধদেববাবু বলেছেন, তাঁকে আমন্ত্রণ ঠিক মত জানান হয়নি, এটাও বোধ হয়, কিছুটা সত্যের অপলাপ। আমি এবং শান্তি লাহিড়ি যাই বুদ্ধদেববাবুকে আমন্ত্রণ জানাতে। আমরা অবাঙালী কবিদের প্রধান অতিথি হিসেবে এবং বাঙালী কবিদের সভাপতি হিসেবে আমন্ত্রণ জানাই। কিন্তু বুদ্ধদেব বাবু নিজেই আমাদের বললেন—সভাপতি হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। এর পর তিনি সম্মেলনের 'স্মারক পুস্তিকাতে' লেখাও দিয়েছেন। অথচ এখন বলছেন—এ লেখা তিনি দিয়েছেন চক্ষুলজ্জার খাতিরে। তিনি আরও বলেছেন 'নিতান্তই দায়ে পড়ে, ঘোর অনিচ্ছা কাটিয়ে' তিনি স্মারক গ্রন্থে লেখাটি দিয়েছেন। পাঠকবৃন্দও ভেবে দেখবেন, এর যৌক্তিকতা কতদূর?

পরিশেষে আর একটি নিবেদন জানাই। বুদ্ধদেব বসুর মত যোগ্যতা আমার নেই। তাই বলে কিছু করতে যাওয়াটাও কি অপরাধ? যোগ্যতা নিয়ে ঘরে বসে থেকে কি লাভ?

আশিস সান্যাল
সম্পাদক
সর্বভারতীয় কবি সম্মেলন

পত্রলেখকের বক্তব্য

॥ ২ ॥

শ্রীআশিস সান্যালের চিঠিতেই প্রমাণ হচ্ছে যে আমার পূর্বপত্রের বক্তব্য—অর্ধেক বা সিকি-পরিমাণ বা তিন-চতুর্থাংশ নয়, নিটোল ও অবিকলভাবে সত্য। আমার উল্লিখিত একটি তথ্যও তিনি খণ্ডন করেননি, করা সম্ভবও ছিলো না। পক্ষান্তরে, তিনি এমন দুটি উক্তি করেছেন যা অলীক: (১) আমি তাঁকে 'উকিলের চিঠি' পাঠাইনি, আমার পত্রে আমার নিজেরই স্বাক্ষর ছিলো; আর (২) তাঁর আয়োজিত কবিসম্মেলনের সভাপতি বা প্রধান অতিথি বা বক্তা বা কবিতা-পাঠক হ'তে কোনো সময়েই আমি স্বীকৃত হইনি; আমার বিনা-অনুমতিতে ও অজ্ঞাতসারে অনুষ্ঠানসূচিতে আমার নাম ছাপা হয়েছিলো। আমার পূর্বপরিচিত কয়েকজন অবাঙালি সাহিত্যিকের সঙ্গে আমি আকাশবাণীর একটি আলোচনা-সভায় যোগ দিয়েছিলাম, তাতে ঐ অনুষ্ঠানের প্রতি আমার আনুকূল্য প্রমাণ হয় না।

শ্রী সান্যাল আমাকে লেখা তাঁর চিঠিখানা থেকে উদ্ধৃতি ছাপিয়ে, নিজেই নিজেকে আশাহীনভাবে অভিযুক্ত করেছেন। 'We did not know that the particular piece had been published before elsewhere *and so the question of infringement of copyright does not arise.*

(ইটালিক অক্ষর আমার।) এ-রকম একটি হাস্যকর কথা বাংলাদেশেও বেশি শোনা যায়নি। কোনো রচনা, যাতে লেখকের বা তাঁর উত্তরাধিকারীর কপিরাইটের মেয়াদ ফুরোয়নি, তা যে-ভাবেই হাতে এসে থাক, তা যথাস্থান থেকে লিখিত অনুমতি ব্যতীত প্রকাশ বা পুনঃপ্রকাশ করা যে একটি অন্যায় ও অবৈধ কর্ম, এবং আইনের চোখে অপরাধ, এবং 'আইন জানতুমনা' বা 'অমুক তথ্য জানতুম না' বললেই যে মহামান্য হাইকোর্টের চোখে কোনো অপরাধ মার্জনা পায় না, এই মৌলিক বিধিবিধান বিষয়ে যে-ব্যক্তি নিজের জবানিতেই অজ্ঞ, তাঁকে নির্বোধ ভেবে করুণা করা যেতে পারে, কিন্তু তিনি স্পষ্টত কোনো পত্রিকা বা কবিসম্মেলনের সম্পাদক হবার পক্ষে সীমাহীনরূপে অযোগ্য। কোনো রচনার লেখক বা অনুবাদক কে, তা 'presume' করার অধিকার কোনো সম্পাদকের নেই, এ-বিষয়ে সঠিক তথ্য অবগত হওয়া তাঁর কর্তব্য। তাছাড়া, এ-কথাও বিশ্বাসযোগ্য নয় যে শ্রীআশিস সান্যাল 'কবিতা'র শততম সংখ্যাটি দ্যাখেননি, কেননা, পূর্বেই বলেছি, 'বেঙ্গলি লিটারেচার'-এর আলোচ্য সংখ্যায় লেখক-পরিচিতি বিভাগে অনেকগুলো বাক্য সরাসরি 'কবিতা'র সেই সংখ্যা থেকেই অপহৃত হয়েছে। কোনো 'ভুল বোঝাবুঝি'র স্থান নেই এখানে; ব্যাপারটা খুবই সরল: আমার রচনা অবৈধভাবে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, আমার মতে (এবং আইনের মতে) এর জন্য ক্ষতিপূরণ ও প্রকাশ্য ক্ষমাপ্রার্থনা আমার প্রাপ্য, কিন্তু, আমি যতদূর জানি, ছাপার অক্ষরে কোনো ক্ষমাপ্রার্থনা আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। লক্ষণীয়, শ্রী সান্যালের উদ্ধৃত ইংরেজি পত্রাংশেও সাধারণ সৌজন্যসূচক দুঃখপ্রকাশ পর্যন্ত নেই। এবং এও আমার স্মরণে আসে না যে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ

করতে এসে শ্রী সান্যাল মৌখিকভাবেও স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে তাঁর কৃত অন্যায় কর্মের জন্য তিনি আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'যাকে আমরা হৃদয় দিতে পারি না তাকেও আমাদের কিছু দেবার আছে।' এই নীতিটি পালন করে চলার আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকি। যাকে বলে সাধারণ সৌজন্য সেই বস্তুটিকে শ্রী সান্যাল যে 'স্নেহ' বলে ভুল করেছিলেন সেজন্য তাঁরই আত্মপ্রতারণার ক্ষমতাকে দায়ী করতে হবে।

বুদ্ধদেব বসু
কলকাতা-৪৭

॥ ৩ ॥

আপনাদের আলোচনা বিভাগে সর্ব-ভারতীয় কবি সম্মেলন সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসুর পত্রটি পড়ে মনে হল যে সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনের উদ্যোক্তারা ঠিক কবি সম্মেলন করার উপযুক্ত লোক একেবারেই নন। এই ধরনের কোনও বৃহৎ জাতীয় ব্যাপারের আয়োজন যাঁরা করবেন তাঁদের হৃদয়ের মাপটাও বড় হওয়া চাই, তত বড়, যাতে অন্যের মান সম্মান ও শিল্পবৃত্তির প্রতি তাঁদের কিছুটা বিবেচনা থাকে। যিনি পুরোপুরি লেখক, লেখাই যাঁর একমাত্র কাজ এবং যাঁরা শিল্পকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন এই সম্মেলনের উদ্যোক্তারা বোধকরি শিল্পীর এই সামান্য অধিকারটুকুকে পর্যাপ্ত সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেননি। সেই কারণেই বিনা অনুমতিতে তাঁরা বুদ্ধদেব বাবুর নাম স্মারক গ্রন্থে ছেপেছেন; (আরও বহু জ্ঞানী ব্যক্তির নামও তাঁরা বিনা অনুমতিতে ছেপেছেন শুনেতে পাই) এবং আমার মত একজন সামান্য শিল্পীর নামও বিনা অনুমতিতে তাঁদের একটি অনুষ্ঠানসূচীতে ব্যবহার করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এখানে বলা আবশ্যক মনে করি।

এই সম্মেলন আরম্ভ হবার বেশ কিছু-দিন আগে আমি একটি টেলিফোন কল পাই। অপর প্রান্তের বক্তা জানান যে তিনি কবি সম্মেলনের অফিস থেকে কথা বলছেন। সম্পাদক নাকি আমার সঙ্গে কথা বলবেন। সম্পাদকের নাম শুনলাম কে এক আশিস সান্যাল। এই ভদ্রলোক নাকি তখন দারুণ ব্যস্ত ছিলেন, তাই আমার সঙ্গে কথা বললেন সম্ভবত তাঁর চেয়ে কিছু কম ব্যস্ত তাঁর প্রতিনিধি। তিনি আমার একদিন সম্মেলনে সংগীত পরিবেশনের অনুরোধ জানালেন। এই ক্ষেত্রে স্বভাবত যা বলা উচিত আমি তাই বললাম। টেলিফোনের মাধ্যমে এ ধরনের যোগাযোগ যে হয়না সেকথা জানিয়ে এঁদের প্রতিনিধি কাউকে আমার বাড়িতে এসে কথাবার্তা বলার জন্য অনুরোধ জানালাম। এঁদের কেউই একটু সময় করে আমার সঙ্গে এবিষয়ে যোগাযোগ করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। বেশ কিছুদিন পরে আবার একটি টেলিফোন কল পেলাম। এবারও সম্পাদক নন, তিনি বোধহয় তখন আরও ব্যতিব্যস্ত তাই তাঁরই এক প্রতিনিধি আমাকে দয়া করে আমার অনুষ্ঠানের সময় ও তারিখ জানিয়ে আমাকে বাধিত করলেন। আমি ত হতবাক। আমার সম্মতি ছাড়াই আমার অনুষ্ঠানের দিন ক্ষণ তারিখ কিভাবে যে ঠিক করা যেতে পারে এ বিষয় কোনও ধারণাই আমার নেই। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একটু আধটু সংগীত পরিবেশন করার সৌভাগ্য ইতিপূর্বেও আমার ঘটেছে। কিন্তু কখনও আমার কোনও নিকটতম বন্ধুদের মধ্যেও কেউ আমার বিনানুমতিতে অনুষ্ঠান সূচীতে আমার নাম ছাপিয়ে আমাকে বিপদগ্রস্ত করেননি। বিপদগ্রস্ত শব্দটি এইজন্য ব্যবহার করতে হল যে আমার অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ আগে থেকেই নির্ধারিত থাকে।

এই অভাবনীয় অসৌজন্যের প্রতিবাদ হওয়ার একটা আবশ্যকতা আছে মনে হওয়ায় আমি আমার আইন পরামর্শদাতার পরামর্শ গ্রহণ করি। তিনি সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীআশিস সান্যালকে কারণ দর্শাবার অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি দেন। এই চিঠি দেবার পর আবার সেই শশব্যস্ত সম্পাদকের এক প্রতিনিধি এসে আমাকে অনুরোধ জানান যে তাঁরা বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন এবং অনেকের মান সম্মান এর সঙ্গে জড়িত; আইনগতভাবে আমি যেন আর অগ্রসর না হই, তা হলে এঁদের সম্মেলনের সমূহ ক্ষতি ঘটবে।

এই প্রতিনিধির অনুরোধের পর আমি বাংলাদেশের বাইরে থেকে আমন্ত্রিত সম্মানিত ব্যক্তিদের কথা ভেবে এবং স্বভাবতই এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটির সুষ্ঠু পরিচালনার কথা চিন্তা করে আইন-গত পথে আর অগ্রসর হইনি। কিন্তু এখন দেখছি এঁদের কাছ থেকে এহেন দাম্ভিক ব্যবহার একমাত্র আমিই পাইনি; আরও অনেকেই পেয়েছেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা আমার সেই পত্রটিরও উত্তর এখন পর্যন্ত মেলেনি।

সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির নামে একটি সর্বভারতীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন যাঁরা করেন; অথচ সংস্কৃতির প্রতি ভিতরে ভিতরে এতখানি যাঁদের অশ্রদ্ধা, আমার মনে হয় সারা বাংলাদেশের সামনে তাঁদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত না হলে বাংলায় শিল্পী, কবি, সাহিত্যিকরাই ভবিষ্যতে সবচেয়ে বেশি অবমানিত, অপদস্থ ও প্রতারিত হবেন।

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা-৩৩

॥ ৪ ॥

শ্রীসতীকান্ত গুহ সত্যই খ্যাতনামা হোন বা না হোন, সনাতন পাঠক তাঁর নামের পূর্বে 'কে এক' শব্দ দুটি সংযোজন করে তাঁকে বিখ্যাত করে দিয়েছেন, আমরা যারা বাংলার বাইরে থাকি তাদের পক্ষে আধুনিক কবিতার দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করবার সুযোগ খুব কম হওয়ায় আমাদের অনেকেরই তাঁর কবি প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়নি, তবুও তাঁর কবিতা পাঠ করেই তাঁর প্রতিভার বিচার করব—তাঁর অন্যতম ভক্ত বিমল রায়চৌধুরীর মত (দেশ ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫) সর্বভারতীয় কবি-সম্মেলনের সুভ্যেনিরে প্রকাশিত তাঁর—কবিতার পৃষ্ঠা সংখ্যা বা "পরিচিতি"র পংক্তি গণনা করে নয়, "দেশের" এই একই সংখ্যাতে কবিসম্মেলনের সম্পাদক আশিস সান্যাল সতীকান্ত গুহ সম্বন্ধে একটি অমূল্য তথ্য পরিবেশন করেছেন—গুহ মহাশয় সর্ব-ভারতীয় কবি সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। তাঁরই আমন্ত্রণপত্র হাতে নিয়ে সনাতন পাঠক সম্মেলনে প্রবেশ করেছেন। "এ ছাড়াও সমস্ত অনুষ্ঠানটিই হয়েছে শ্রীসতীকান্ত গুহের তত্ত্বাবধানে"। সুতরাং সুভ্যেনিরে কবিতার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছয় না হয়ে ষাট বা "পরিচিতির" (আত্মজীবনী?) পংক্তি পাঁচের বদলে পঞ্চাশ হ'তে বাধা কোথায়? কিন্তু এগুলি কবি প্রতিভার মানদণ্ড হিসাবে মেনে নিতে আপত্তি আছে বৈকি।

অশোকা দাশগুপ্ত
নিউ দিল্লী-১২

প্রভাত রবি

'দেশ'-এর ৮ জুন-এর সংখ্যায় ভবতোষ ভট্টাচার্য আলোচনা শীর্ষক অংশে 'প্রভাত রবি' প্রসঙ্গে এক স্থানে লিখেছেন:—

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, প্রভাতকুমারের পৈতৃক বাসগ্রাম ও সম্ভবত জন্মস্থান বর্ধমান জেলারই কালনার সন্নিহিত ধাত্রীগ্রামে।

লেখকের ও কৌতূহলী পাঠকের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, প্রভাতকুমারের জন্মস্থান বর্ধমানের ধাত্রীগ্রাম—(কালনা ও নবদ্বীপের মধ্যে অবস্থিত) প্রকৃতপক্ষে তাঁর মাতুলালয়। প্রভাতকুমারদের পৈতৃক বাসগ্রাম হুগলী জেলার গুরুপ নামক স্থানে। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারী বাংলা ২২শে মাঘ ১২৭৯ তাঁর ধাত্রীগ্রামে জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম জয়গোপাল মুখোপাধ্যায়।

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য
কলিকাতা-১২

সাহিত্য সংবাদ

মণীশ ঘটকের কবিতা

মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত "এষণা" পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যাটি "কবি মণীশ ঘটক সংখ্যা" হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। এতে মণীশ ঘটকের সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁকে লেখা বিখ্যাত ব্যক্তিদের কয়েকটি চিঠি ও তাঁর সম্পর্কে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুশীল রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অতীন্দ্র মজুমদার, নবীন রায়চৌধুরীর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া আছে মণীষ ঘটককে নিবেদিত এক গুচ্ছ কবিতা ও তাঁর নিজের স্বনির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ। সংখ্যাটি নানা কারণে আকর্ষণীয়। এই সঙ্গে এ পত্রিকার কর্তৃপক্ষ মণীশ ঘটকের একটি পৃথক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, 'যদিও সংধ্যা'—এবং তাঁর কয়েকটি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ।

মণীশ ঘটক বাংলা সাহিত্যে একজন রহস্যময় লেখক। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, 'এমন মানুষ পাওয়া শক্ত/লেখার রাজ্য চুঁড়ে/এই নিচ্ছেন কলম এবং/এই ফেলছেন ছুঁড়ে'...খুবই সত্যি এই বর্ণনা। মণীশ ঘটক, ছদ্মনামে যিনি 'যুবনাশ্ব' তিনি বাংলা সাহিত্য জগতে ঘূর্ণি হাওয়ার মতন বারবার এসে আবার দূরে চলে গিয়ে চুপ করে থেকেছেন দীর্ঘকাল। তাঁর রচনা পড়লেই মনে হয়, তিনি থেমে থেমে, অনেক চিন্তা করে লেখার পক্ষপাতী নন, তাঁর রচনাস্রোত অনিবার, স্বতোৎসারিত এবং তেজী—কিন্তু এমনভাবে যিনি লেখেন—তিনি মাঝে মাঝেই কেন দীর্ঘকালের জন্য চুপ করে ছিলেন, তা বোঝা যায় না। এই কারণেই বোধ হয়, তিনি পাঠকদের চেয়ে বাংলার লেখকদের মনের মধ্যেই বড় আসন পেয়েছেন।

মণীশ ঘটকের বয়েস এখন সম্ভবত পাঁচাত্তরের কাছাকাছি। দু' একটি সভা-সমিতিতে দূর থেকে তাঁকে দেখেছি—দীর্ঘ ঋজু চেহারা, মুখে চাপদাড়ি, শৌখিন পরিচ্ছদ—অনেকটা মোগল বাদশাহদের মতন দেখতে। শোনা যায়, যৌবনকালে যখন তিনি যুবনাশ্ব ছদ্মনামে কল্লোল পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন, তখন যুবনাশ্ব-এর পৌরাণিক অর্থের বদলে 'জোয়ান ঘোড়া' বললেই তাকে বেশী মানাতো। "কল্লোলযুগ" গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর সেই ছবি চমৎকারভাবে ফুটিয়েছেন।

যুবনাশ্ব ছদ্মনামে তিনি প্রথম গল্প লেখা শুরু করেন। তাঁর 'পটলডাঙার পাঁচালি' বাংলা ভাষার একটি দিগ্‌দর্শক বই। কালনেমি, গোষ্পদ, মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি গল্পে যে-সব চরিত্রগুলিকে দেখা গেল—বাংলা সাহিত্যে তারা এতকাল অনুপস্থিত ছিল। রাস্তার ভিখিরি—সমাজ-পরিত্যক্ত নারী-পুরুষ—ছিনতাইবাজ, পকেটমার আর ফুটপাথের বেশ্যা—এদের সম্পর্কে কোনো আপ্তবাক্য উচ্চারণ না করে—এদের জীবনকেই শুধু ফোটাবার আন্তরিক চেষ্টা করেছিলেন তিনি। বস্তুত কল্লোলযুগের লেখকরা যে রোমান্টিক বাস্তবতা নিয়ে মত্ত হয়েছিলেন, মণীশ ঘটকই তার পথিকৃৎ এবং অনেকখানি রোমান্টিকতা বর্জিত। অনেক কিছুরই প্রথম সূচনার কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য। যতদূর জানি, খাঁটি পূর্ববঙ্গের ভাষায় সম্পূর্ণ কাহিনী তিনিই প্রথম লিখেছেন। 'কনখল' নামে তার একটি উপন্যাস পড়েছি, উপন্যাসটি অনন্য, বয়ঃসন্ধিকালের অস্বস্তির অকপট কাহিনী ঠিক এভাবে বাংলায় আর কেউ লেখেন নি।

কল্লোল বন্ধ হয়ে যাবার পর কিছুদিন তিনি চুপ করে ছিলেন। কয়েক বছর পর শুরু করলেন আবার কবিতা লেখা। ১৯৪০-এ প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শিলালিপি'-দীর্ঘকাল বাদে বেরুলো তাঁর এই দ্বিতীয় কবিতার বই 'যদিও সন্ধ্যা'। ব্যক্তিগতভাবে আমি মণীশ ঘটকের কবিতার চেয়ে গদ্যেরই বেশী অনুরাগী। চরিত্রগত অস্থিরতার জনাই তাঁর রচনার ক্রম পরিণতি নির্ধারণ করা শক্ত। সার্থক কবিতা তিনি অনেক লিখেছেন, কিন্তু সেগুলি বিচ্ছিন্নভাবে সার্থক কবিতা, বরং গদ্য রচনায় লেখক হিসেবে তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ অনেক স্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ পৃথক জাতীয়। কিন্তু গদ্য রচনাতেও তিনি ধারাবাহিকভাবে মনঃসংযোগ করেননি। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন, সেই অনুকরণে মণীশ ঘটক সম্পর্কেও বলা যায়, তাঁর প্রতিভা যতখানি ধনী, ততখানি গৃহিণী নয়।

"যদিও সন্ধ্যা" কাব্যগ্রন্থে ৩১টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। এই কবিতাগুলি ৪৫ বছরের এলাকায় রচিত—সুতরাং এগুলির মধ্যে সুর ও ভাষার সঙ্গতি নেই। এই দীর্ঘকালে বাংলা কবিতা অনেক বদলে গেছে। লক্ষ করার বিষয় এই, যে-সব কবিতায় কবির রাগ, বিরক্তি, হতাশা ও ব্যঙ্গের প্রকাশ—সেগুলিই বেশী সার্থক। কিন্তু বাংলা দেশের মুশকিল এই, যে কবির চরিত্র যে রকমই হোক, শেষ পর্যন্ত কিছু মিষ্টি রোমান্টিক কবিতা না লিখলে লেখক-পাঠকের যেন অতৃপ্তি থেকেই যায়। কবিতাকে যেন খানিকটা কবিতা-কবিতা হতেই হবে। এই বই-এর 'আরে কে ও, যুবনাশ্ব না?'—কবিতাটি যে রীতিতে লেখা—সেটাই মণীশ ঘটকের সবচেয়ে সার্থক স্টাইল—মুখের ভাষার প্রকরণ, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব ও তির্যক উক্তি তাঁকে বেশী মানায়। কিন্তু তাঁর বিভিন্ন কবিতায় বিভিন্ন রীতি। এ ছাড়া কিছু প্রতিবাদ ও রাজনীতির কবিতাও আছে—সেগুলির অন্য উপযোগিতা থাকতে পারে—কিন্তু কবিতা হিসেবে তেমন ভালো না।

মণীশ ঘটক বলেছেন, তাঁর কাছে কবিতার চেয়ে জীবন বড়ো. মনে হয়, আজকাল সব কবিই একথা মানেন। তবে, জীবনে অনেক বিশৃঙ্খলা মানায়—কিন্তু বিশৃঙ্খল সাহিত্য মহৎ হলেও নানা দুর্বিপাকে কদাচিৎ যোগ্য সমাদর পায়।

বিদেশী কবিতা

তরুণ কবি সামসুল হক কিছু বিদেশী কবিতার অনুবাদ করে একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন। যে-সমস্ত কবিদের রচনা অনূদিত হয়েছে, তাঁরা অনেকেই এ দেশে খুব পরিচিত নন্। (অতিশয় লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করি, রেমণ্ড সাউনটার কিংবা বার্নার্ড বি ড্যাডি—এই সমস্ত কবিদের নামও আমি আগে শুনিনি।) ইংলণ্ড আমেরিকার দু'চারজন ছাড়া, বাকি কবিরা আফ্রিকা, ক্যানাডা অস্ট্রেলিয়া এবং ফিলিপিন্-এর, এবং বয়েসে তরুণ। এই সমস্ত কবিদের সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্য আমাদের ধন্যবাদ অনুবাদকের প্রাপ্য। কে জানে মূল কবিতাগুলো কেমন, কিন্তু বাংলা অনুবাদে পড়তে কয়েকটি কবিতা বেশ ভালোই লাগলো, যেমন আর্ল বিরনি'র একটি কবিতার কয়েক লাইনঃ

পদ্মফুল তার সাঁতার কাটছে অপরূপ
লীলাময়
রোহিত মাছের মতো
চোখ দুটো তার গাছের মতোই, যার
ডালে ঝুঁকে দেখে
বালকেরা প্রধানত।

সনাতন পাঠক

রবীন্দ্রনাথ ঃ আধুনিকতার প্রেক্ষণে

সত্যটা প্রথম কে ধরিয়েছিলেন ঠিক জানি না। সেই স্বল্পায়ু স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দার্শনিক সোরেন কির্কগার্ড? "আমি সমগ্রের অংশ নই, সমগ্রের সঙ্গে সম্মিলিত নই, সমগ্রের মধ্যে গৃহীত নই—" এই কি আধুনিক বিচ্ছিন্নতাবোধের আরম্ভ? এবং তারপরে কি শার্ল বোদল্যারের 'ল্য স্প্লিন দ্য পারী'র প্রথম রচনা 'লেত্রাঁজে'-তে—যেখানে মা-বাপ-ভাই-বোন-দেশ বলে কিছু নেই—যেখানে শেষ কথা শুধু মেঘ হতে পারা, শুধু মেঘ হয়ে ভেসে-যাওয়া?

'নগ্ন এবং একাকী—আমরা এসেছি বন্দিত্বের ভেতর।'—টমাস উল্‌ফের আর্তনাদ। সেই বন্দিত্বের যন্ত্রণা ফ্রানৎস কাফ্‌কার 'প্রাসাদে।' জীবনের প্রতি ঐকান্তিক অনীহা থেকেই বিচ্ছিন্নতার উপলব্ধি—তারপরে এই "unspeakable and incommunicable prison of the earth"—এর ভেতরে ক্রোধ-ঘৃণা-বিরক্তি-বিষাদ—সেই চেতনার রক্তকুসুমপুঞ্জে হচ্ছে 'অমঙ্গলের পুষ্প-সম্ভার'—লে ফ্লার দ্যু মাল।

স্বপ্ন-সংহারী বিজ্ঞান, ধনবাদী সভ্যতার সংকট, অতীন্দ্রিয়তা আর ঐশ্বরিকতার বিলীয়মান মরীচিকা—কবিশিল্পীকে দুঃখ-পন্থী এবং বিচ্ছিন্ন করবার পক্ষে এরাই যথেষ্ট। হেনরি জেমস এই নিয়েই দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। এই সঙ্গে যদি শিল্পীর ব্যক্তিগত ব্যর্থতা, পরাভব কিংবা কোনো মনোব্যাধি এসে মিশে যায়—তখন তার প্রতিক্রিয়া আরো প্রচণ্ড। শক্তিমান শিল্পী তখন নিজস্ব ফ্রাস্ট্রেসন'কে একটা সর্বজনীন দর্শনে রূপায়িত করে ফেলতে পারেন: তখন তা নীট্‌শের হাতে 'দাস স্পেক জরথুস্ত্র', বোদ্‌ল্যারের হাতে 'ফ্লার দ্যু মাল।'

আপত্তি সেখানে নয়। প্রশ্ন তখনই দেখা দেয়—যখন বিচ্ছিন্নতা, ঘৃণা আর বিষাদ বাদকেই আধুনিকতার একতম লক্ষণ বলে নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা হয়। যখন বিকৃত এবং খণ্ডিত সত্তাকে—ব্যক্তিবিশেষের আধিক্যে যুগধর্ম বলে বিশ্বাস করা হয়; রোমান্টিজমের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানো হয় নৈরাজ্য কুশ্রীতাকে। গঁকুর জর্ণালে দেখি, শিষ্য এমিল জোলার ন্যাচারালিজমের বাড়াবাড়িতে স্বয়ং ফ্লোব্যার পর্যন্ত খেপে গিয়েছিলেন। রিয়্যালিজমের গুরু সরোষে বলেছিলেন : 'চুলোয় যাক ইজ্‌ম। সাহিত্য হচ্ছে জীবন—এইটেই সার কথা।' কারণ, জীবনের নির্মোহ প্রদর্শক রিয়্যালিস্টও কশাইখানার শূকরের মতো একটা অন্ধ পরিণামবাদকে মেনে নিতে পারেন নি।

ইজ্‌মই হোক আর খণ্ডিত বোধিই হোক, এই চশমাটিতে দৃষ্টি যখন আচ্ছন্ন—তখন দুর্বিপাক দেখা দেবেই। ইজ্‌ম যেখানে মায়া-কাজলের কাজ করে—শিল্পী-সাহিত্যিককে পথ দেখায়, সেখানে তার ভূমিকা আলাদা। কিন্তু যখন তা জনডিস্‌—তখন তা সাহিত্যের পরম দুর্ভাগ্য। ফ্লোব্যারেরও তখন ধৈর্যচ্যুতি স্বাভাবিক।

'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথে' এই দুর্ভাগ্যের দিকেই আঙুল বাড়িয়েছেন অধ্যাপক আবু সয়ীদ আইয়ুব। তাঁর অসীম দুঃসাহস—একথা বলতেই হবে। বিতর্কের তুফান উঠবে জেনেই এই বই লেখা। বিস্বাদ-বিকৃতি আর আত্মিক নৈঃসঙ্গ্যই আধুনিকতার স্বরূপ—এ কালের এই 'মিথ'-এর ওপরে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শোভন ও অনুশীলিত ভাষায় প্রবল আঘাত হেনেছেন তিনি। আর এই প্রেক্ষিতেই রবীন্দ্রনাথের কবি সত্তারও স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন এই বইতে। 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' সাম্প্রতিক কালের একটি স্মরণীয় সাহিত্য-বিচার।

বইটির 'পূর্বভাষে'ই অধ্যাপক আইয়ুব তাঁর আলোচনার রেখাটি স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করে দিয়েছেন। তাঁর প্রতিবাদের প্রথম বিষয় : 'কাব্যদেহের প্রতি একাগ্র মনো-নিবেশ, যার পরিণাম কাব্যরচনায় ও সমালোচনায় দেহাত্মবাদ, ভাষাকে আধার বা প্রতীক জ্ঞান না করে আপনারই দুর্ভেদ্য মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা জ্ঞান করা।' তাঁর দ্বিতীয় প্রতিবাদ সেখানে—যেখানে "জাগতিক অমঙ্গল বিষয়ে চেতনার আত্যাধিক্য...জগৎ ও জীবন বিষয়ে আনন্দ, আগ্রহ, শ্রদ্ধা, বিস্ময়, এমন কি কৌতূহল পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে তার জায়গা জুড়েছে বোর্‌ডম, বিরক্তি, বিতৃষ্ণা, বিবমিষা।'

যাঁরা প্রত্যাখ্যানবাদী—অথবা 'ডেকাডেন্ট', তাঁদের সাহিত্যিক-শক্তিকে অধ্যাপক আইয়ুব অস্বীকার করেন নি, কোনো সুস্থ সাহিত্য-পাঠক তা করেনও না। পরাভব এবং পরাজয়-বাদী সাহিত্যেরও শিল্পগত ছাড়া অসীম ঐতিহাসিক মূল্য যে আছে—কিছু দিন আগে একটা চমৎকার আলোচনায় তা সার্ত্র দেখিয়েছিলেন। কিন্তু শক্তিকে সম্রান্তভাবে স্বীকার করলেই কি তার সিদ্ধান্তকে অমোঘ বলে মেনে নিতে হবে? আইয়ুব তা মানেন নি। 'অভিশপ্ত পুষ্পস্তবকের' বৈপরীত্যে তিনি তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথকে—যিনি জীবন এবং জগৎকে আনন্দময় স্বীকৃতি দিয়েই মহতোহপি মহীয়ান—যেখানে ভিক্তর উ্যগোর মতো তিনি মহান মানবতার সহযাত্রী।

কাব্যের পরম সিদ্ধির সুর বোধ করি প্রথম ধরিয়েছিলেন ফরাসী সাহিত্যের মধুরতম কবিতার স্রষ্টা পোল ভ্যার্ল্যান—বেদমন্ত্রের মতো উচ্চারিত হতে লাগল তাঁর বাণী : 'সব বস্তুর আগে সঙ্গীত।' বোদ্‌ল্যারের সাংকেতিকতা, ভ্যার্ল্যানের সঙ্গীত, তারপর মালার্মে'র "বিশুদ্ধতর অর্থবাহী এক নবভাষা চাই কবিগোষ্ঠীর জন্য (Donner un sens plus pur aux mots de la tribu)—এই দাবি, সব মিলে যে আন্দোলন তৈরি হল, তা চূড়ান্ত রূপ ধরল প্রতীকে, তত্ত্বে, উপনিষদ-আবেস্তা-তালমুদ-ক্রিশ্চিয়ানিটি-অ্যান্‌থ্রপলজীর চক্রপাকে—যার উদাহরণ এলীয়টীয় 'পোড়ো জমি' আর পাউণ্ডের কবিতা।

শেষ পর্যন্ত সব গিয়ে ঠেকে বোধ হয় মালার্মেতেই—কবিতা আর কিছু নয়, শব্দ—শব্দ। কবির শব্দ—বিশুদ্ধ শব্দ—নব অর্থবাহী শব্দ। কালের শিখরে দাঁড়িয়ে পোল ভালেরি। পাঠকের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন-প্রায় কমিউনিকেশন এবারে লুপ্ত হওয়ার পালা। আর এই শব্দের আধারে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের জ্যোতির্ব্যাপ্তি—আধুনিক কবিতার এই কি পরম তীর্থ? কিন্তু তখনো মৌল জিজ্ঞাসা থেকে যায়: কবিতা কখনো গান হতে পারে? হতে পারে নিরবয়ব সুরের সংকেত-সম্ভার মাত্র? তা হলে কবিতার অস্তিত্ব কোথায় থাকবে—সে কি গানের মহত্তম বিস্তারে বিলীন হয়ে যাবে না?

তীক্ষ্ণ যুক্তি এবং অক্লান্ত অধীতির মাধ্যমে আধুনিক কাব্যধারার এই দ্বৈত প্রবণতা নির্ণয় করে অধ্যাপক আইয়ুব রবীন্দ্র-কবিচেতনায় নিরীক্ষা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'দুর্মর রোম্যান্টিক' এবং জগতে অনবচ্ছিন্ন আনন্দ এবং কল্যাণছাড়া কিছুই তিনি দেখতে পান না—এই প্রচলিত স্থূল অভিযোগের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্র-মানসের ক্রমিক-বিবর্তন বিচার করেছেন তিনি। দেখিয়েছেন, 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে'র বিষণ্ণ তমশ্ছায়া কী করে উদ্ভাসিত হল অরুণা-লোকে, এল বিশ্বাস, এল মানব-প্রেম, এল ভক্তি। অথচ এই বিশ্বাস ভালোবাসা ভক্তি কোনো দিন আত্মতৃপ্ত মগ্নতায় নিবিষ্ট হয়ে গেল না—শুধু এই কথাটিই বারে বারে শোনালো না : 'জগতে আনন্দ-যজ্ঞে আমার

আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ : আবু সয়ীদ আইয়ুব। প্রকাশক : ভারবি, ২৬ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম আট টাকা।

'নিসম্পূর্ণ।' দুঃখ বোধকে তিনি কোনো দিন অস্বীকার করেননি না, কারণ রবীন্দ্রনাথ জানেন : 'দুঃখ আমার ঘরের জিনিস, খাঁটি রতন তুই তো চিনিস।' তিনি নিশ্চিতভাবেই জেনেছিলেন : 'তুমি যাহা দাও সে যে দুঃখের দান, শ্রাবণধারার বেদনার রসে সার্থক করে প্রাণ।' এই দুঃখ তাঁকে কোনো হতাশা-বিচ্ছিন্নতায় প্রত্যাখ্যানবাদী করে তোলেনি —তাঁর পূর্ণতর জীবন-যজ্ঞে আহুতি দিয়েছে। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের মহিমা —এইখানেই তিনি চিরায়ত।

অধ্যাপক আইয়ুব সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলোর ওপর। এইগুলি সম্পর্কেও বাংলা সমালোচনায় একটা সাধারণ সংস্কারের উপস্থিতি—ভাষণের অতি স্পষ্টতায় এবং বক্তব্যের চাপে এদের কবিত্ব নাকি নামমাত্র, এরা গদ্যধর্মী। কিন্তু কবিতা চিন্তাগর্ভ হলে কি হৃদয়ধর্মী হতে বাধা আছে কোথাও? আইয়ুবের এই জিজ্ঞাসা অসংকুচিত। শুধু শব্দের সাধনা এবং চিত্রকল্পের চতুর বিন্যাসই কবিতার শরীর-সংস্থান? আইয়ুব পরিচ্ছন্ন স্পষ্টভাষায় বলেছেন : "মহৎ কবিতা আমরা তখনই পাই যখন কোনো গভীর চিন্তাগর্ভ কথা তৎসম্ভূত ও তদনুরক্ত হৃদয়ানুভূতির বিস্তৃত পরিমণ্ডলসমেত ব্যক্ত হয়। অনুভূতি না থাকলে কবিতা হয় না, কিন্তু অনুভূতিমাত্র কবিতার সম্বল নয়, শুধু চিত্রকল্প অর্থাৎ অপ্রতীকী চিত্রকল্পও নয়। কাব্যের উপাদানগুলি কবিতার মধ্যে অর্থবান হয়ে না উঠলে কবিতা হয় না। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কবিতা এই মানদণ্ডে বিচার্য।" (পৃঃ—১৫০)

এই মানদণ্ডেই সমালোচক বিচার করেছেন এবং অনুভব করেছেন—উত্তরপর্বের কবিতায় শুধু অবসিত প্রতিভার ক্রমাবনমিত অস্তরাগ নয়, রবীন্দ্রমানসের অশ্রান্ত অন্বেষা যেমন পর্বে পর্বে নব নব দিগ্বিজয়ের দিকে প্রাগ্রসর, তেমনি পরিশেষ-পুনশ্চ থেকে আরোগ্য-শেষ লেখা পর্যন্ত কবি আর এক আকাশ—আর এক সমুদ্রের সম্মুখীন। সমাপ্তির কোনো বিরাম-যতি রবীন্দ্রনাথে কখনো পড়েনি : 'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে।'

এই নতুন আকাশ—নবীন সমুদ্রতটে যে রবীন্দ্রনাথকে দেখি, বহু পথের ক্লান্তি, বহু সংগ্রামের ক্ষত, বহু স্বপ্নের সমাধি, প্রভৃতি প্রত্যয়রাজির ধ্বংসস্তূপ পেরিয়ে তিনি এক চির-নিরুত্তরের দুস্তরতার মুখোমুখি—'চিরপ্রশ্নের বেদীমূলে' যেখানে 'বিরাট নিরুত্তর।' প্রথম মহাযুদ্ধের কালে তাঁর প্রত্যাশী প্রশ্ন ছিল : 'রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?' কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন 'চলেছে দারুণ ভ্রাতৃহত্যা শতঘ্নী বাণ হেনে'—তখনো কি সেই বিশ্বাসে অটল ছিলেন তিনি? মানুষের মহিমাকে কোনো দিন রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করতে পারেন না —কিন্তু বিদায়ের আগে সংগ্রামীদের আহ্বান জানিয়েও কি পরম বিষণ্ণ ক্লান্তির ভেতরে এক নিরুত্তর অন্ধকারের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন নি তিনি, 'কিন্তু কেন?'

কিন্তু উত্তর নাই বা পাওয়া গেল। 'দিনের প্রথম আবির্ভাবে' আদি প্রশ্নেরই জবাব মেলেনি—শেষ প্রশ্নেও কারও মিলবে না। তাই দুস্তর জীবনের বোধগুলিতে অপূর্ণতা অনুভব এক দুর্বোধ মহাশক্তির রবীন্দ্রনাথ প্রশান্ত সর্বকিমত্ত। সেদিন "আপনা থেকে বিভক্ত হয়ে সমগ্রের মধ্যে খণ্ডকে স্থাপন করা মাত্র নিজের অস্তিত্বের ভার লাঘব হয়ে গেল" রবীন্দ্রনাথের। সমালোচক বলেছেন, "শেষ পর্বের রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক সাধনা ছিল সেই 'নির্মম' দেবতাকে নিজের অন্তরে উপলব্ধি করার—যিনি পরম দ্রষ্টা, পরম সাক্ষী, অবিচলিত আনন্দপূর্ণ ধ্যানদৃষ্টি দিয়ে দেখছেন নক্ষত্ররাজির ভাঙাগড়া, মানব-জাতির উত্থান-পতন—যেন সারা বিশ্ব জুড়ে অনাদ্যনন্ত কাল ধরে এক সংঘাতমুখর তীব্র সুখ-দুঃখময় মহানাটকের অভিনয় চলেছে তাঁরই সম্ভোগের জন্যে।" (পৃঃ ১৭১)

বিশ্বমহানাট্যের ঐক-দর্শকের এই নিষ্কাম সম্রাট রবীন্দ্রনাথের উত্তর-কাব্যে উদ্ভাসিত হয়েছে সমালোচকের সামনে। যেন অনন্ত আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলে অচঞ্চল হিমালয় ধ্যানমৌন।

লেখকের সব সিদ্ধান্ত—সব বিচারের সঙ্গে মতের ঐক্য ঘটবে, এমন প্রত্যাশিত নয়। দু-একটি কবিতার ব্যাখ্যা সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা রয়ে গেল। তবু সমগ্রভাবে 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' আমাকে প্রবল-ভাবে অভিভূত এবং আলোড়িত করেছে। তর্কের ঝড় যদি ওঠে—উঠুক। কিন্তু আধুনিক মননের প্রেক্ষাপটে যাঁরা রবীন্দ্র-নাথকে বুঝতে চান—এই মনীষাদীপ্ত অনন্য আলোচনাটি তাঁদের নির্দেশকের কাজ করবে।

রবীন্দ্রনাথের ভক্তি-গীতির যুক্তিসিদ্ধ অসংশয় ব্যাখ্যার জন্যেও অধ্যাপক আইয়ুবকে একান্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পুস্তক পরিচয়

শরৎ সাহিত্যের আলোচনা

শরৎ চেতনা। শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যো-পাধ্যায়। এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ১২। ১৬·০০ টাকা।

শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ। শিল্পী সংস্থা প্রকাশনী বিভাগ, ১৬৩ আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা ৫। ১৩·০০ টাকা।

শরৎচন্দ্র নামের 'চন্দ্র' শব্দে আপত্তি তুলেছিলেন শ্রদ্ধেয় সমালোচক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : 'কারণ চন্দ্রের আলো ধার করা, কিন্তু শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্যে বিলক্ষণ মৌলিকতা আছে। তিনি স্বপ্রকাশ।' জনচিত্তজয় যদি সাহিত্যমূল্য নির্ধারণের সামান্যতম মাপ-কাঠিও হয় তাহলে শরৎচন্দ্রের একচ্ছত্র আধিপত্য বাংলা সাহিত্যে। অতি সম্প্রতি শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে নতুন করে কিছু কথা অবশ্য উঠেছে। কিন্তু সে-বিতর্ক সমস্ত যুগে সমস্ত লেখককেই কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও 'ষোড়শী' প্রসঙ্গে এই অভিযোগ তুলেছিলেন যে : 'তুমি উপস্থিত কালকে খুশী করতে চেয়েছ এবং তার দামও পেয়েছ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেছ। যে-ষোড়শীকে এঁকেছ সে এখনকার কালের ফরমাসের মনগড়া জিনিস, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়। ...... সৃষ্টিকর্তারূপে তোমার কর্তব্য ছিল এই ভৈরবীকে একান্ত সত্য করা। লোকরঞ্জনকর আধুনিক কালের চলতি সেন্টিমেণ্ট মিশ্রিত কাহিনী রচনা করা নয়।' আজ, শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর তিন দশক পরে, সেই অভিযোগের যাথার্থ্য নতুন করে ভাববার মত। 'ফরমাসের মনগড়া জিনিস।' সাহিত্য-কীর্তিরূপে তার দাবি কতকাল টিকিয়ে রাখতে পারে তাও বিবেচ্য। সুখের কথা, শরৎচন্দ্রের মানস, সাহিত্য ও জীবন নিয়ে বিশদভাবে আলোচনাকারী এই গ্রন্থ দুটিতে এই জাতীয় বহু প্রশ্নের আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা উপন্যাসের বিবর্তনের সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের রচনারীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা অনিবার্য। সেদিক থেকেও গ্রন্থ দুটি বিশেষ সহায়ক হবে আশা করা যায়।

অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচটি নির্বাচিত অধ্যায়ে শরৎচন্দ্রের মানস-পরিচয় বিধৃত করেছেন। শরৎচন্দ্রের সমাজ-চেতনা, অর্থনৈতিক চেতনা, ধর্মচেতনা, রাজনৈতিক চেতনা ও শিল্পচেতনা। সমাজ-চেতনার আলোচনাক্রমে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন রচনায় প্রকীর্ণ মনো-ভঙ্গির বিশ্লেষণ করে শেষ পর্যন্ত এই

আপত্তি উত্থাপন করেছেন যে : 'শরৎচন্দ্র সমস্যার ছবি আঁকিয়াই প্রায়ক্ষেত্রে থামিয়া গিয়াছেন, সমস্যার সমাধান করিতে বড় একটা চেষ্টা করেন নাই।......তিনি হয়তো ধরিয়া লইয়াছেন যে, সমস্যা সমাধানের তাত্ত্বিক প্রয়াস তাঁহার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।' লেখকের এই আপত্তির সমর্থন হয়তো অনেকেই করবেন না। বস্তুত, কোনো সাহিত্যিকেরই কাজ নয় সমস্যার স্পষ্ট কোনো সমাধান নির্দেশ করা। এবং 'সমস্যাগুলি প্রায়ই শেষ পর্যন্ত সমস্যা থাকিয়া গিয়া পাঠককে আতঙ্কিত করিয়া রাখে'—লেখকের এই ধারণাও সম্ভবত নির্ভুল নয়। লেখকের কাছে শিল্পের অনুশাসন সামাজিক অনুশাসনের থেকেও বড় সমস্যা। শরৎচন্দ্র এর ব্যতিক্রম ছিলেন না, না থাকাই স্বাভাবিক।

'অর্থনৈতিক চেতনা' প্রসঙ্গেও লেখক শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র সম্পর্কে সমধর্মী অনুযোগ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্প দুটির উল্লেখ করে বলতে চেয়েছেন, অসহায়তার আর্তি গল্প দুটির মূল সুর, সামাজিক সমস্যার মূলে ডুব দিয়ে অবিচার অত্যাচারের কারণ সন্ধান বা মুক্তিলাভের পথ নির্দেশ করেননি। লেখকের বক্তব্য অনুসরণ করে প্রশ্ন থেকে যায় যে, ছোটগল্পের শর্ত তাতে লঙ্ঘিত হত কি না! উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই যুক্তি কিছুটা শিথিল করে প্রয়োগ করা হয়তো সম্ভব। পল্লীসমাজের সমালোচনার উত্তরে শরৎচন্দ্রের উক্তিও এ-প্রসঙ্গে মনে পড়বে: "Social reform বা Construction আমার কাজ নয়। আমার ব্যবসা লেখা।" (পৃঃ ১৫৫)

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনে ও রচনায় ধর্ম-মনোভাব 'ধর্মচেতনা' অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা যেতে পারে : 'শরৎচন্দ্রের ধর্মচেতনা প্রধানত আনুষ্ঠানিক ধর্মের উপর ভিত্তি না করিয়া মানবতামূলক কল্যাণবোধের উপর ভিত্তি করিয়া রূপ পাইয়াছে। অধ্যাত্ম-বোধে অধিক প্রসূত না হইয়া নৈতিক ভাবাশ্রিত হইয়াছে।'

সামাজিক সমস্যার তুলনায়, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে শরৎচন্দ্রের উদারতর মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে—শরৎচন্দ্রের রচনাবলী বিশ্লেষণ করে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। 'রাজনৈতিক চেতনা' শীর্ষক অধ্যায়ে পথের দাবী বাজেয়াপ্ত হবার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের মূল্যবান পত্রবিনিময় প্রসঙ্গটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

শরৎচন্দ্রের 'শিল্পচেতনা' সম্পর্কিত আলোচনাটি প্রকৃতপক্ষে সমগ্র শরৎসাহিত্যের মূল্যায়ন। এই অধ্যায়ে লেখক শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ নিরপেক্ষতা ও রসগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছেন। শরৎসাহিত্যের জিজ্ঞাসু পাঠক এই আলোচনাটি পাঠ করে নতুন আলোকে শরৎসাহিত্য বিচারের চাবিকাঠিটি লাভ করবেন। শরৎচন্দ্রের ভাষা ও গদ্যরীতির বিশ্লেষণও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। অ্যাকাডেমিক হওয়া সত্ত্বেও লেখকের রচনাগুণে এই বিষয়টি নীরস তত্ত্বসর্বস্ব হয়ে ওঠেনি।

ডঃ অজিতকুমার ঘোষের 'শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার' সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত। শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন নানা কৌতূহলকর ঘটনাপরম্পরায় গঠিত। শরৎচন্দ্রের জীবনীগ্রন্থ ইতিপূর্বেও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ডঃ ঘোষ প্রচলিত পন্থায় পা বাড়াননি। শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যধারা সমান্তরালভাবে উপস্থাপিত করেছেন তিনি। সাহিত্যধারার আলোচনা শুধু গ্রন্থের নামোল্লেখেই সীমাবদ্ধ রাখেননি তিনি। তাঁর প্রতিটি গ্রন্থ সম্পর্কে চিঠিপত্রে ও সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় বিধৃত তথ্য ও সমালোচনার উল্লেখ করে নিজস্ব সমালোচনা যুক্ত করেছেন। পরিশিষ্টে, একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে, শরৎসাহিত্যের মূল্যবিচার সংযোজিত করেছেন ডঃ ঘোষ।

আলোচনার সুবিধার্থে শরৎচন্দ্রের জীবনপ্রবাহ কয়েকটি পর্বে বিন্যস্ত করেছেন অজিতকুমার। 'শরৎচন্দ্রের সমকালীন জীবন-অভিজ্ঞতা ও মানবচেতনার সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া প্রতিটি পর্বের সাহিত্য সাধনার স্বরূপ নির্ণয়' এবং 'শরৎ প্রতিভার ক্রমবিবর্তন ধারাটি বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন পর্বের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে' তা উন্মোচিত করাই লেখকের মূল উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর এই উদ্দেশ্য তিনি সার্থকভাবে পালন করেছেন একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য।

শরৎচন্দ্রের জীবনী রচনার কাজটিও ডঃ ঘোষ সফলরূপে সমাধা করেছেন। বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থের পরস্পরবিরোধী বা অর্ধসত্য তথ্যগুলি পাশাপাশি রেখে নিজস্ব বিচার প্রয়োগ করে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তিনি। উদাহরণস্বরূপ শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় বিবাহের ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের স্মৃতিকথাও যে সর্বক্ষেত্রে অভ্রান্ত নয়, স্মৃতিচারণায় ঘটনাপরম্পরায় বিকৃতি ঘটে যায়—সে দিকেও সতর্ক লক্ষ্য রেখেছেন লেখক। ফলে, শরৎচন্দ্রের প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থরূপেও বর্তমান গ্রন্থটি আদৃত হবে।

তবে জীবনী রচনার ক্ষেত্রে ডঃ ঘোষ মূলত মালাকার, শরৎসাহিত্য বিচারে কিন্তু তাঁর ভূমিকাটি সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক সমালোচকের। ডঃ ঘোষের আলোচনাভঙ্গির বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি শরৎসাহিত্যের ভোক্তা হওয়া সত্ত্বেও বিচারের কালে কোনো পূর্বধারণার দ্বারা আচ্ছন্ন হননি। শরৎসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর দ্বিধা ও প্রশ্নগুলি নির্বিচারে প্রয়োগ না করে, নম্র ও প্রসন্ন ভঙ্গিতে শরৎসাহিত্যের সীমাবদ্ধতার কারণ অনুসন্ধান করেছেন। শরৎচন্দ্রের প্রতিটি উপন্যাস ও গল্প নিয়ে যতদূর সম্ভব ব্যাপক আলোচনা করে তিনি ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি সবিনয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শ্রদ্ধার ভাব ক্ষুণ্ণ না করেও যে পক্ষপাতশূন্য সমালোচনা সম্ভব ডঃ অজিতকুমার ঘোষের বর্তমান গ্রন্থটি তার উজ্জ্বল নিদর্শন।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে সমকালীন সাহিত্যজগতের শোকোচ্ছ্বাস ও শ্রদ্ধার্ঘ্য-এর পরিচয় গ্রন্থটির বিশেষ আকর্ষণ। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত রচনার (যার কয়েকটি সমাপ্ত করেছিলেন অন্যান্য লেখকবৃন্দ) আলোচনাটিও সুলিখিত। ৪।১২।৬৭, ৩।১।৬৮

প্রাপ্তি স্বীকার

কাব্য মশাল। গাজী বিশ্বজিৎ ইসলাম। ইউরেকা বুক এজেন্সী : ৫৬ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১·০০।

গল্প বিথুরা। সুপ্রিয় রাহা। সিটিজেন্স বুক ক্লাব : ২৯ শিবপুর রোড, হাওড়া। মূল্য ৪·০০।

আর কোনোখানে। লীলা মজুমদার। মিত্র ও ঘোষ। ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২। মূল্য ৫·০০।

খেলার মাঠে

প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগ অনিশ্চয়তার জালে জড়িয়ে পড়েছিল। সিঙ্গল লীগ, লীগ-কাম-নকআউট, সিঙ্গল লীগের পর শীর্ষস্থান অধিকারী প্রথম ৪টি দলের মধ্যে ডাবল লীগ এবং প্রথম ৪টি দলের মধ্যে সিঙ্গল লীগে চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ধারণের প্রশ্ন নিয়ে অনেক জল ঘোলা হবার পর অবশেষে বি এন আর-এর শেষোক্ত প্রস্তাব আই এফ এ পরিচালকমণ্ডলীর ৬ই জুনের জরুরী সভায় গৃহীত হয়েছে।

সরদার খাঁ

গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, এবারে প্রথম ডিভিসনের ১৫টি দল প্রত্যেকে একটি করে ম্যাচ খেলবে। এই খেলার পর শীর্ষস্থানের অধিকারী প্রথম ৮টি দল চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের জন্য আবার লীগ প্রথায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। চূড়ান্তভাবে যে দল প্রথম স্থান লাভ করবে তারাই হবে চ্যাম্পিয়ন। অবশ্য নিয়মটি শুধু এই বছরের জন্য।

সিঙ্গল লীগে প্রথম ৮টি দল নির্ধারণের পথে যদি একাধিক দল সমান সংখ্যক পয়েন্ট অর্জন করে তা হলে স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে গোলের ব্যবধান বিচার করে দলের স্থান নির্দিষ্ট হবে। এই পদ্ধতিতেও যদি সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে একই সংখ্যক পয়েন্ট সংগ্রহকারী দলগুলি তখন অতিরিক্ত একটি খেলায় নিজেদের শক্তি যাচাই-এর জন্য মিলিত হবে। অতিরিক্ত চিকিৎসাতেও যদি ফল না পাওয়া যায় তখন শেষ পথ হিসাবে টস করে দলের স্থান নির্ধারণ করা হবে।

৮ জুন খেলা শুরু হওয়াতে ফুটবল উৎসাহী মাত্রেই খুশী হয়েছেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবও সংশোধিত এই প্রস্তাব গ্রহণ করায় বহু প্রতীক্ষিত প্রথম ডিভিসন লীগ ৮ জুন থেকে শুরু হয়েছে।

সাবেকী পোশাকে লীগ চালু না হলেও নবকলেবরে লীগের আত্মপ্রকাশে ফুটবল সমর্থকদের উৎসাহ উদ্দীপনায় ভাটা পড়েনি। প্রথম ডিভিসন লীগ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই ময়দানে জেগেছে বাড়তি চাঞ্চল্য। আর্য, অনার্য, হিন্দু, মুসলমান এক সাথে চলছে গঙ্গার কূলে। উচ্ছ্বাস, আবেগ, উৎকণ্ঠায় কাঁপছে গঙ্গার তীরভূমি। ফোর্ট উইলিয়ামের শক্ত পাঁচিলে ধাক্কা খাচ্ছে 'গোল'-এর কলজে কাঁপানো চীৎকার।

প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগ চালু হবার মুখে লীগে অংশ গ্রহণকারী ১৫টি দলের মধ্যে ৫টি দলের শক্তির সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা হল। বাকি দলগুলি সম্পর্কে আগামী সপ্তাহে লেখবার ইচ্ছা রইল।

*

গতবারের অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ন মহমেডান স্পোর্টিং এবারে আরও বেশী শক্তিশালী। রক্ষণ এবং আক্রমণ উভয় বিভাগেই তারা কয়েকজন কুশলী খেলোয়াড় লাভ করেছে। ব্যাকে সুকুমার সেন ও রফিক চলে যাওয়ায় দলের ডিপ ডিফেন্সে যে সমস্যা দাঁড়িয়েছিল মহীশূরের দেবরাজ, কৃষ্ণাপ্পা ও ভেংকটস্বামী যোগদান করায় সে সমস্যার সমাধান হয়েছে। বিশেষ করে দেবরাজের দুদিন যে খেলা দেখেছি তাতে তার সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করার যথেষ্ট কারণ আছে। টমাস ও বিমান মজুমদারের সহযোগী হিসাবে ইস্টবেঙ্গলের উচিল, [illegible] ইত্তাহার এবং মহীশূরের রহমতুল্লা প্রয়োজন অনুযায়ী শক্তি যোগাতে সক্ষম হবেন।

মহমেডান স্পোর্টিং এ বছর পুরোভাগের কোন খেলোয়াড় হারায়নি। কিন্তু গতবারের ভাল লেফট আউট না থাকায় দলের অনেক আক্রমণই বিপক্ষ রক্ষণভাগের মধ্যে ঢুকে পথ হারিয়ে ফেলে। মহীশূরের কুশলী লেফট আউট এবং ভারতীয় যুব ফুটবল দলের সরদার খাঁ দলে যোগদান করায় মহমেডানের লেফট আউটের সমস্যা আর নেই। পরিমার্জিত সাদাতুল্লা, পরিশ্রমী এন্টনি এমবরোজ, সুযোগসন্ধানী পাপ্পানা ছাড়া লাওনেল এবং রামানার সঙ্গে সরদার খাঁর যোগাযোগে মহমেডানের পুরোভাগের শক্তি যে কোন রক্ষণভাগকে উদ্বিগ্ন করবে।

সদ্য অনুষ্ঠিত ত্রিদলীয় লীগে মহমেডান সংহতির অভাবে আশানুরূপ ফলাফল দেখাতে পারেনি। বহিরাগত খেলোয়াড়দের সঙ্গে দলের নিয়মিত খেলোয়াড়দের বোঝাপড়ার সৃষ্টি হলে মহমেডান এ বছরেও চ্যাম্পিয়নশিপের প্রধান দাবিদার থাকবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

*

গতবারের লীগ রানার্স ইস্টবেঙ্গল থেকে নায়িম এবং হাবিবের মত দুজন সর্বভারতীয় খেলোয়াড় চলে যাওয়ায় স্বভাবতই দলটি দুর্বল হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। এ ছাড়া সঞ্জীব বসু, উচিল, পি সরকার, দুলাল মণ্ডল প্রভৃতির নামও আছে দলত্যাগীদের তালিকায়।

রহমতুল্লা

কিন্তু তবুও ইস্টবেঙ্গল যে গতবারের তুলনায় দুর্বল হয়েছে এ কথা বলতে পারছি না। পারছি না আরও এই কারণেই যে দলের শক্তির উৎসস্থল যিনি, সেই সাধারণ সম্পাদক জে সি গুহের দৃঢ় ধারণা তাঁর দল এ বছরে আরও বেশী শক্তিশালী। অভিজ্ঞ শক্তির শূন্যস্থান তরুণ খেলোয়াড় দিয়ে পূরণ করে দক্ষিণ ভারতের দুটি প্রধান ফুটবল প্রতিযোগিতা 'সাইৎ নাগজী ট্রফি' এবং 'কেরালা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন শীল্ড' কলকাতায় এনে শ্রীগুহ তাঁর ধারণার সত্যতা প্রমাণ করেছেন।

ভারতশ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক থঙ্গরাজ, পরিমার্জিত শান্ত মিত্র ও সুনীল ভট্টাচার্যের মাঝে বালী প্রতিভার তথা ভারতীয় যুব ফুটবল দলের স্টপার অশোক ব্যানার্জি ডিপ ডিফেন্স লাইনে নায়িমের অভাব বুঝতে দেবেন না। পি সিংহ ও কালন গুহের সঙ্গে এরিয়ানের ডি পাল এবং মোহনবাগানের মণ্টু কর্মকারের যোগে ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগ অটুট।

পুরোভাগে সেন্টার ফরোয়ার্ডের সমস্যা নিয়ে ইস্টবেঙ্গল হয়তো উদ্বিগ্ন। অসীম মৌলিক আজ পূর্বের প্রতিভায় নেই। তবে বি এন আর-এর এন্টনি হয়তো এ সমস্যার কিছুটা সুরাহা করতে পারবেন। ইস্টার্ন

রেলের নারায়ণ গাঙ্গুলী, বি এন আর-এর প্রিয়লাল মজুমদার, সার্ভিসেসের বেণীকুমার ও টিকারাম এবং অভিজ্ঞ সমাজপতির সাফল্যের উপর পুরোভাগের সমস্যা সমাধান কিছুটা নির্ভর করছে। দলের কুশলী ফরোয়ার্ড পরিমল দে এবার দলনায়ক। সুতরাং দলনায়কের দক্ষতা এবং শর্মা ও আরমাদের নৈপুণ্য চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মানের পথে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সদ্য সমাপ্ত ত্রিদলীয় ফুটবলে ইস্ট বেঙ্গল ফাস্ট ফরোয়ার্ড লাইনের বিরুদ্ধে নিজেদের গলদ দেখতে পেয়েছে। ভুলভ্রান্তি সংশোধন করলে ইস্টবেঙ্গলের সাফল্যের দাবির মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সম্ভাবনাই বেশী।

*

খেলোয়াড় তালিকা দেখে যে কোন ফুটবল উৎসাহী বলবেন যে, মোহনবাগান এবারে সব থেকে শক্তিশালী। বাঙ্গলা তথা ভারতের বহু কুশলী খেলোয়াড় নিয়ে মোহনবাগানের ফুটবলের সাজি সাজানো।

দেবরাজ

গত বছরটি মোহনবাগানের পক্ষে শুভ ছিল না। লীগে তৃতীয় স্থান। ভারতের কোন প্রধান প্রতিযোগিতার পুরস্কারেও তারা নাম খোদাই করতে পারেনি। তাই মোহনবাগান গত বছরের অতৃপ্ত আশাকে রূপায়িত করতে বদ্ধপরিকর। দলের হাল ধরেছেন অতীত দিনের দিক্‌পাল খেলোয়াড় করুণা ভট্টাচার্য। গত বছরেও মোহনবাগানে কুশলী খেলোয়াড়ের সংখ্যা কম ছিল না। কিন্তু সংগ্রামের সঙ্গে সমতা না রাখতে পারার জন্য যে ব্যর্থতা এসেছিল সে ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্য শ্রীভট্টাচার্য অতন্দ্র প্রহরীর মত কাজ করছেন।

মরসুমে প্রথম প্রতিযোগিতা হিসাবে

কৃষ্ণাপ্পা

সদ্য-সমাপ্ত ত্রিদলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ মোহনবাগানের 'অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু' বলা যায়। এই প্রতিযোগিতায় মহমেডানের বিরুদ্ধে দুই গোলে পিছিয়ে থেকেও গোল পরিশোধ এবং শক্তিশালী ইস্টবেঙ্গলকে শেষ সময়ে ২—০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভে মোহনবাগানের মনোবল ও দলগত সংহতির পরিচয় মিলেছে।

রক্ষণভাগে সি প্রসাদ, আলতাফ ও লিঙ্কম্যান হিসাবে লতিফ এবং পুরোভাগে কানন তিনটি খেলাতেই নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। নায়িম এবং হাবিব দলীয় খেলায় একাত্ম হতে পারলে মোহন-বাগানের উভয় বিভাগই আরও বেশী শক্তি-শালী হয়ে উঠবে। ফলে মোহনবাগান এবারের লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মানলাভে নিজেদের দাবি সকলের উপরে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে বলে আশা রাখে।

*

মহমেডান, ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান এই তিনটি দলের পরেই লীগে উন্নত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে দুই রেল দল অর্থাৎ বি এন আর ও ইস্টার্ন রেল। গতবারের লীগ তালিকার চতুর্থ স্থানের অধিকারী বি এন আর এ্যান্টনি ও পি মজুমদারের মত দুজন কুশলী খেলোয়াড় হারালেও বি এন আর-এর লাভের পাল্লাই ভারী। দিল্লির গোলরক্ষক বি ঘোষ, মহমেডানের সুকুমার সেন এবং ভারতীয় যুব ফুটবল দলের অমিত চক্রবর্তী রক্ষণ-ভাগের শক্তিকে যেমন উন্নত করবেন, তেমনি এরিয়ানের মোহন সিং, উড়িষ্যার বিজয় দাস এবং ভারতীয় যুব ফুটবল দলের পি বসুর উপর বি এন আর অনেক আশা রাখে। অভিজ্ঞ এবং তরুণ খেলোয়াড় সমন্বয়ে বি এন আর-এর শক্তি গত বছর থেকে কোন অংশেই দুর্বল নয়।

খেলোয়াড়দের দল পরিবর্তনে ইস্টার্ন রেলের লাভের অংশই বেশী। একমাত্র নারায়ণ গাঙ্গুলীকে হারিয়ে তারা লাভ করেছে অনেক তরুণ উঠতি খেলোয়াড়কে। এ ছাড়া সার্ভিসেস এবং ভারতীয় দলের গোলরক্ষক শ্যামল বসু সহ ভারতীয় যুব ফুটবল দলের আর কে গাঙ্গুলী দলের বাড়তি শক্তির উৎস। ইস্টার্ন রেল রক্ষণ এবং আক্রমণ উভয় বিভাগের মধ্যে সুন্দর যোগাযোগ রেখে যে উন্নত ক্রীড়াধারার সাক্ষ্য রাখে এবারেও সে সুনাম তারা বজায় রাখতে পারবে বলে সমর্থকেরা মনে করেন।

*

গতবারের লীগ টেবল

প্রথম ডিভিসন

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
মহঃ স্পোর্টিং	২৮	২১	৭	০	৪৭	৬	৪৯
ইস্ট বেঙ্গল	২৮	২১	৫	২	৪২	৯	৪৭
মোহনবাগান	২৮	২১	২	৫	৫৯	১৫	৪৪
বি এন আর	২৮	১৫	৮	৫	৪৫	২০	৩৮
এরিয়ান	২৮	১৩	৬	৯	২৭	২৪	৩২
বালী প্রতিজ্ঞা	২৮	১২	৬	৯	২৭	২৪	৩০
ইস্টার্ন রেল	২৮	১১	৭	১০	২৬	২০	২৯
কালীঘাট	২৮	৭	১০	১১	২৪	৩৩	২৪
উয়াড়ি	২৮	১০	৪	১৪	২১	৩১	২৪
স্পোর্টিং ইউঃ	২৮	৭	৬	১৫	১৯	৩৬	২০
বাটা	২৮	৭	৫	১৬	২২	২৯	১৯
খিদিরপুর	২৮	৬	৬	১৬	২০	৪১	১৮
রাজস্থান	২৮	৫	৭	১৬	১১	১৭	১৭
জর্জ টেলিগ্রাফ	২৮	৪	৭	১৭	২১	৫৯	১৫
হাওড়া ইউঃ	২৮	৪	৬	১৮	২০	৫২	১৪

দ্বিতীয় ডিভিসন

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ক্যালকাটা জিমখানা	১৬	১৪	০	২	২৭	৯	২৮
পোর্ট কমিশনার্স	১৬	১৩	১	২	৪৫	৯	২৭
পুলিস	১৬	১২	২	২	৩১	১৭	২৬
টালীগঞ্জ অগ্রগামী	১৬	১১	২	৩	২০	১৩	২৪
ইয়ং বেঙ্গল	১৬	৭	৬	৩	২৭	১৮	২০
বেনেটোলা	১৬	৭	৫	৪	২৮	১৮	১৯
গ্রীয়ার	১৬	৬	৬	৪	১৬	১৬	১৮
অরোরা	১৬	৫	৬	৫	২০	১৯	১৬
ডব্লিউ বি পুলিস	১৬	৫	৫	৬	২০	১৬	১৫
ইন্টারন্যাশনাল	১৬	৭	১	৮	২০	২৬	১৫
সুবারবন	১৬	৩	৬	৭	১৮	২৪	১২
সালকিয়া	১৬	৩	৬	৭	১৮	২৪	১২
বৌবাজার ওয়াই এম ইউ	১৬	৫	২	৯	১১	২০	১২
রেনজার্স	১৬	৩	৩	১০	১৩	৩১	৯
কুমারটুলি	১৬	২	৪	১০	১৪	৩৭	৮
সি এ সি	১৬	২	১	১৩	৯	২২	৫
রবার্ট হাডসন	১৬	০	৩	১৩	৮	২৯	৩

একলব্য

ক্রীড়া কণা

বিপদ বিজয়ী ভ্যাদিমির কুক

দূর পাল্লার দৌড়ে রীতিমত যুঝতে হলে দরকার ঘাম ঝরানো খাটুনি, অসাধারণ সহ্য-শক্তি ও একঘেয়ে একাগ্রতা। গত দশকের শুরুতে ওইসব গুণপনা রপ্ত করে 'ইঞ্জিন-মানব' জাটোপেক লম্বা দৌড়ের রেকর্ডগুলি ক্রমশ ছোট করে আনছিলেন। ও'র দেখাদেখি সময় কমানোর চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগে যান রোজার ব্যানিস্টার, গর্ডন পিরি ও ক্রীস চ্যাটাওয়ে প্রমুখেরা। ও'রা যখন প্রবাদের মত লোকের ঠোঁটস্থ হয়ে উঠেছেন, তখন (১৯৬৫) মেলবোর্ন অলিম্পিক অনুষ্ঠানে রাশিয়ান যুবক ভ্যাদিমির কুক সকলকে চমকে দিয়ে দশ হাজার মিটার দৌড়ের বিশ্ব রেকর্ডটি আরও খানিকটা কমিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, পাঁচ হাজার মিটারের দৌড়, শেষেও ওঁর গলায় সোনার মেডেল ওঠে। দৌড়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কুকের এগিয়ে থাকার অস্বাভাবিক বাহাদুরি দেখে প্রত্যক্ষদর্শীরা প্রশংসায় গদগদ। সকলের মধ্যে কুক ও পিরির দৌড় দ্বন্দ্বটিকে কিংবদন্তীর কুলুঙ্গিতে সাজানোর তাগিদে ছটফটানি শুরু হল।

ছোট থেকেই কুকের মাতব্বরি করার ঝোঁক। ওর সর্দারির খবরদারিতে সঙ্গীরা তটস্থ থাকত। খেলার পোকা তাই বই খাতায় আঠা ছিল খুবই কম। এমনি খেলা পাগল ছেলে স্কী খেলার পোশাক পরেই একদিন ক্লাসে ঢুকে পড়েছিল, পরে অম্লানবদনে ক্লাস করে বাড়ি ফেরে। বাড়িতে 'ডানপিটেমি'র জন্যে মার কাছে প্রায়ই ঘা-কতক জুটতো। এতে ওর প্রকৃতি মজবুত হয়ে ওঠে।

এই জলবৎ জীবন কুকের কপালে বেশী দিন টিঁকল না। সেটা ছিল দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের বছর। তখন ওর বয়স মাত্র চৌদ্দ, জার্মান সৈনারা ওদের ইউক্রেনস্থ গ্রামটিকে ঘিরে নির্যাতন চালাতে থাকে; ফলে, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এমনকি ছেলেদের লেখাপড়াও বন্ধ হয়ে যায়। জার্মান বাহিনীর অত্যাচারে অ্যালেকসিনোবাসীরা গরু-ছাগলের হেনস্থাকর রোজনামচায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাই অত্যাচারিতের জন্যে কোন উপকার করতে স্বভাবতই ভ্যাদমিরের মন সায় দিত না, কখনো পালিয়ে বাঁচতে ধরা পড়ে পঁচিশ ঘা বেতের জলপানিও পিঠে পড়ত।

১৯৪৩ সালে সোভিয়েট সৈনারা ওই গ্রামটি কিছু দিনের জন্যে ফিরে পায়। এই ফাঁকে কুক সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় এবং কয়েকটি লড়াইয়ে জেতে। ফিরে এসে কুক সবুজ অ্যালেকসিনোকে কিন্তু ফিরে পেল না। চারিদিকে ইতস্তত ধ্বংসাবশেষ। নির্জন খাঁ খাঁ করছে। জানতে পারে, সবাই প্রাণে বাঁচতে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। আশ্চর্য। এত ঘা খেয়েও ওর মানবতায় চিড় ধরেনি। ভগবানের উদ্দেশ্যে ব্যাকুলভাবে বলেছিল—ঈশ্বর। ১৯৪৩-এর জুন-জুলাই-এ যে বিভীষিকা দেখেছি তা আমার অতি বড় শত্রুকেও যেন দেখতে না হয়।

আবার সেনানীর জীবন। মাঝে শরীর চর্চার ব্যস্ততা, নির্দেশ এল নৌ-বাহিনীতে বদলী হওয়ার। কারণ, ওখানে তখন শক্ত সমর্থ জোয়ানের বড় প্রয়োজন। কুকেরও বড় সাধ—এই সুযোগে কি করে অ্যাথলীট হিসাবে নিজেকে ফোটানো যায়।

ছুটির জীবনে কুকের প্রথম বরাত খোলে একাদশে, ৩০০০ মিটার ক্রস কান্ট্রি দৌড়ের এক প্রতিযোগিতায়। প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ২৪জন। সে সময় এমিল জাটোপেকের তিনটি সোনার মেডেল পাওয়ার ঘটনাও ('৫২র হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে) কুকের কানে আসে, কিন্তু কুক তাকে বাহবা দিতে রাজি ছিল না। এ প্রসঙ্গে জোর গলায় দাবি রাখে—"জানি, সময়ের তফাতে আমি এমিলের পিছনে রয়েছি ঠিকই, তবুও অমন কৃতিত্ব পাওয়া আমার পক্ষে সাধ্যাতীত নয়।"

পরের বছর বুখারেস্টের মাঠে ৫০০০ মিটারে জাটোপেকের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে কুক হাজির হয়। প্রথমেই খ্যাতিক গ্রন্থ বুড়ো মাঝির মত সকলকে পিছনে ফেলে সাড়ে বারো চক্করের দৌড় শুরু করে: দুর্ভাগ্য! বারো চক্কর পর্যন্ত পুরো ভাগে থেকেও শেষের আধ চক্করে জাটোপেকের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি। লোকসান তো নয়ই, বরং ওর লাভ হল—বুঝল, জাটোপেককে দাবানো খুব কঠিন নয়। পরের বছর ফল হাতেনাতে। ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপসে কুকের কাছে জাটোপেক হার মানল।

আবার হতাশা, পয়লা থেকে এগিয়ে থাকার মতলব বজায় রেখে দৌড়তে গিয়ে প্রথমে হোয়াইট সিটিতে ক্রীস চ্যাটাওয়ে ও বার্জেনে পিরির কাছে হার স্বীকার করতে হয়। উপর্যুপরি হার হলেও কুক হাল ছাড়েনি। দ্বিগুণ উৎসাহে অনুশীলন চলল। কুকের নিজের ভাষায়: ট্রেনিং-এর ক্লান্তিকে জয় করার চেষ্টায় নিজেকে সদাই ব্যস্ত রাখতাম। যত পরিশ্রম করেছি তত আনন্দ পেয়েছি। প্রায়ই পুরানো পেটের যন্ত্রণাটা কষ্ট দিত—আশা মিটিয়ে প্র্যাকটিস করতে অক্ষম হলে ক্ষুব্ধ হতাম।

অমানুষিক অনুশীলন শেষে কুক সদলে মেলবোর্ন পৌঁছল জীবনের সেরা দৌড়টির জন্যে। অলিম্পিক গ্রামে পা দিয়েই শুনল অ্যাথলীট গণৎকারের মত: দশ হাজার মিটার দৌড়ের সোনার মেডেলটি ব্রিটেনের ছেলে পিরির গলায় ঝুলবেই। কুকের মন খারাপ, এতে অস্ট্রেলিয়ান বন্ধু ডেভ স্টিভেন্স ওকে ভরসা দিল। প্র্যাকটিস চলল ঘোড় দৌড়ের মাঠে। ঘড়ির সময়ও খুব আশা দিচ্ছে না। বিপদও কুকের পিছনে ঘুর ঘুর করছে। প্র্যাকটিসে যাবার পথে মোটর চালাতে গিয়ে রাস্তার ধারে পোস্টে ধাক্কা খেয়ে বুকে ও হাঁটুতে চোট পেল। অভিজ্ঞ সাংবাদিককুল রটালেন—'কুক দৌড়ে অংশ নেবেন না', অথচ সকলকে অবাক করে ভ্যাদমির সময়মত হাজিরা দিল মেলবোর্ন অলিম্পিকের দশ হাজার মিটার দৌড়ের 'স্টার্টিং পয়েন্টে'। দৌড়ের ইঙ্গিতে পিস্তল গর্জে উঠতেই—কুক পূর্ব পন্থায় সকলকে পিছনে রেখে দৌড় আরম্ভ করলেন। পিরি ছায়ার মত নাছোড়বান্দা, কুকের ছোটার কায়দায় নতুনত্ব, কখনো ক্ষিপ্র (৬৮·৬ সেঃ) কখনো ধীর (মাত্র ৭০·৪ সেঃ)। প্রতিটি চক্কর পাক দিতে লাগলেন। ওর এই চকিত বাড়া-কমা দৌড়ের সঙ্গে তাল রাখতে টালমাটাল হয়ে পিরি ফুরিয়ে গেল। পিরির সমর্থকরা চুপ। কুক ২৮ মিঃ ৪৫·৬ সেকেন্ডে সীমানা পেরিয়ে বিশ্ব রেকর্ড করলেন। পিরি অষ্টম। দৌড়ের শেষে পিরি খোলা মেজাজে স্বীকার করলেন—"আমার পক্ষে এত জোরে দৌড়নো কখনই সম্ভব নয়।"

কয়েক দিন বাদে কুকের পরবর্তী অভিযান পাঁচ হাজার মিটারেও সাফল্য এল। শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সকলকে পিছনে ফেলে ছুটতে হয়েছিল। বাধা দিল ডেরেক ইবটসন, ট্যাবোরি, ক্রীস চ্যাটাওয়ে ও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পিরি। এই দূরত্ব পেরোতে কুকের সময় লেগেছিল ১৩ মিঃ ৩৯·৬ সেঃ—বিশ্ব রেকর্ড।

সিনেমা ধর্মঘট প্রসঙ্গ

দ্বিপাক্ষিক কিংবা ত্রিপাক্ষিক কোন আলোচনাতেই বিশেষ কোন ফল হয়নি। গত সপ্তাহটা এই আলোচনার মধ্য দিয়েই কেটে গেল। সিনেমা ধর্মঘটের অবসান ঘটেনি। তবে অনতিবিলম্বে প্রেক্ষাগৃহের দরজা খুলতে পারে এই আশার বাণী শোনা যাচ্ছে।

গত শুক্রবার স্বরাষ্ট্রসচিব জানান, "অ্যাড হক পেমেণ্ট"সহ অন্যান্য কয়েকটি ন্যূনতম দাবি মেনে নেওয়ার জন্য তিনি মালিকপক্ষকে অনুরোধ জানাবেন। অ্যাড হক পেমেণ্ট-এর প্রস্তাব তিনি কর্মচারী ইউনিয়নের কাছেও পেশ করেছেন। ওইদিন ত্রিপাক্ষিক আলোচনায় কোন ফল হয়নি। সিনেমার মালিকপক্ষ ও কর্মচারী ইউনিয়নের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এই বৈঠকও সফল হয়নি। দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পর ই-আই-এম-পি-এ'এর প্রতিনিধি বলেছেন, মালিকপক্ষ শেষ পর্যন্ত

নায়িকা প্রোডাকশনস-এর "দিবারাত্রির কাব্য" (পরিচালনা : নারায়ণ চক্রবর্তী ও বিমল ভৌমিক) ছবিতে অঞ্জনা ভৌমিক

বোনাসের বিষয়টি আইনের মাধ্যমে মীমাংসার প্রস্তাব করে "অন্তর্বর্তী-কালীন" বোনাস দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কর্মচারী ইউনিয়ন তাতে রাজি হননি। ইউনিয়নের তরফ থেকে বলা হয়, আমরা মালিকদের ধর্মঘটকালীন বেতন ও অন্যান্য ন্যূনতম দাবির কথা জানিয়েছি। কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়নি

পীযূষ বসু পরিচালিত "স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে" ছবিতে দিলীপ রায় ও কৃষ্ণা প্রধান

স্বরাষ্ট্রসচিব ওইদিন সাংবাদিকদের কাছে এই আশা প্রকাশ করেন যে, সোমবার (১০ জুন) ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে ধর্মঘটের অবসান হবে

এদিকে একটির পর একটি সিনেমা হল খুলেছে। গত সপ্তাহে শহরতলির পাঁচটি এবং বাইরের তিনটি সিনেমা হলে শো আরম্ভ হয়েছে

ফিল্ম তদন্ত কমিটির রিপোর্ট

চলচ্চিত্রশিল্পের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য ১৯৬২ সনে রাজ্য সরকার শ্রী কে সি সেনের সভাপতিত্বে একটি চলচ্চিত্র তদন্ত কমিটি গঠন করেছিলেন। কমিটি ১৯৬৩ সনে জুলাই মাসে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন। চার বছর পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত সপ্তাহে এই রিপোর্ট প্রকাশ করেন। ১৯৬৬ সনের আগস্ট মাসে আর একটি অ্যাড হক কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিও তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করেন। এই কমিটিতে সরকারী প্রতিনিধি ছাড়া ছিলেন শ্রীঅজিত বসু, শ্রীসত্যজিৎ রায় এবং শ্রীঅসিত চৌধুরী।

গত চার বছরে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের সমস্যার রূপ বদলেছে। নতুন দুরবস্থাও দেখা দিয়েছে। তবু এই রিপোর্টে এমন কয়েকটি সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে যেগুলির সমাধান আজও হয়নি। এই সংকট যেন বরাবরের।

বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের রক্ষাকবচ বাংলা ছবির 'চেন'। অর্থাৎ বাংলা তথা বাংলা দেশের ছবি দেখাবার সুযোগ যত বাড়বে সংকট ততই কমে আসবে। দেশবিভাগের ফলে বাংলা ছবির ব্যবসাক্ষেত্র সংকুচিত। তার উপর হিন্দী ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতা তো আছেই। কমিটি সুপারিশ করেছেন, পশ্চিমবাংলার ক্ষয়িষ্ণু চলচ্চিত্র-শিল্পকে বাঁচাবার জন্য এখন আরও বেশী সিনেমা হল দরকার। কমিটি মনে করেন, এই রাজ্যে সিনেমা হল কম। ফলে বাংলা চিত্র প্রদর্শনীর সময়ও কম। কলকাতার ৭৫টি সিনেমা হাউসের মধ্যে মাত্র ১২টি হাউসে (এখন আরও কমেছে) এককভাবে বাংলা ছবি দেখানো হয়। কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ, জনসংখ্যা অনুসারে কলকাতায় ১১৭টি সিনেমা থাকা উচিত। সে জায়গায় এই শহরে মাত্র ৭৫টি সিনেমা। বিভিন্ন সাক্ষ্য থেকে কমিটি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে সিনেমা হলের সংখ্যাল্পতার ফলে এই শিল্পে প্রদর্শকরাই প্রাধান্য বিস্তার করেছেন। ছবির প্রযোজনার গতি শ্লথ হয়েছে; ছবি মুক্তি পেতে বিলম্ব ঘটছে, স্টুডিও ল্যাবরেটরির কাজ কমে গিয়েছে কলাকুশলী, শিল্পী ও পরিচালকদের মধ্যে বেকারত্ব দেখা দিয়েছে। এছাড়া প্রদর্শকরা হাউস প্রোটেকশন বাবদ টাকা জমা রাখার সুযোগ পেয়েছেন এবং টিকিট ঘরের টাকার অংক বেশী পরিমাণে নিতে পারছেন।

দেশাত্মবোধক ছবি "অগ্নিযুগের কাহিনী"-তে (পরিচালনা : ভূপেন রায়) বিকাশ রায় ও স্বপনকুমার

কমিটি আরও বলেন, বর্তমানে নতুন সিনেমা হাউস স্থাপনের লাইসেনস দানের নিয়ম-পদ্ধতি এত কঠোর যে, নতুন হাউস তৈরি করা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমিটি আরও ভ্রাম্যমান সিনেমা স্থাপন ও "কমিউনিটি থিয়েটার" গঠনের উপর জোর দেন। এই কমিউনিটি থিয়েটারগুলিতে নাটক ও প্রদর্শনীর সঙ্গে সঙ্গে সিনেমাও দেখানো হবে। কমিটি মনে করেন, স্বল্প মূল্যের টিকিটের ছোট ছোট সিনেমা হল আরও হওয়া উচিত। যে কোন শহরেই দিনে একটির বেশি শো হওয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত। কমিটি অবশ্য সতর্ক করে দেন যে চলচ্চিত্র প্রযোজনার সঙ্গে সঙ্গে নতুন সিনেমা হল তৈরির সমানুপাতিক হার যেন বজায় থাকে।

তদন্ত কমিটি ১৪৭ পৃষ্ঠাব্যাপী রিপোর্টে চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতিকল্পে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। এই সুপারিশগুলির মধ্যে রয়েছে—(১) চলচ্চিত্র উন্নয়ন বোর্ড গঠন (২) চলচ্চিত্র-শিল্পে অর্থলগ্নীর জন্য রাজ্য চলচ্চিত্র অর্থলগ্নী করপোরেশন গঠন (৩) প্রমোদ-করের বর্তমান হার সংশোধন (৪) চলচ্চিত্র-শিল্পে উপযুক্ত ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা (৫) হোল্ড-ওভার ও হাউস প্রোটেকশান-এর অবসান (৬) প্রচার ও প্রিণ্টের খরচ প্রযোজক ও পরিবেশকের মধ্যে সমান ভাগাভাগি হওয়া।

কালো টাকা

চলচ্চিত্রশিল্পে কালো টাকা বন্ধের জন্য কমিটি বিশেষভাবে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেন। কমিটি মনে করেন, কালো টাকা আদান-প্রদান বন্ধের জন্য ই-আই-এম-পি-এ'র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কিছু বিধি-নিষেধ তৈরি করা উচিত। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যাতে কালো টাকা লেন-দেন না হয় সে বিষয়ে ই-আই-এম-পি-এ'র সদস্যরা যেন সংকল্প গ্রহণ করেন। একজন শিল্পীকে কত বেশী পারিশ্রমিক দেওয়া যেতে পারে তাও ই-আই-এম-পি-এ বিবেচনা করে দেখতে পারেন। কমিটি আরও সুপারিশ করেন যে, একজন শিল্পী এক-সঙ্গে কত ছবিতে অভিনয় করবেন তাও যেন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

প্রমোদ-কর

কমিটি মনে করেন, প্রমোদকরের বর্তমান হারের পরিবর্তন করা উচিত। এক লক্ষ জনসংখ্যা যে শহরে ওই শহরের সিনেমাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর সিনেমা ও ভ্রাম্যমান ও অস্থায়ী সিনেমাকে তৃতীয় শ্রেণীর সিনেমা বলে গণ্য করা উচিত। প্রথম শ্রেণীর সিনেমার প্রমোদকর হওয়া উচিত মোট টিকিট বিক্রয়ের টাকার শতকরা ২৫ থেকে ৫৫ ভাগ। দ্বিতীয় শ্রেণীর সিনেমার প্রমোদকর ২২০ মোট টিকিট বিক্রয়ের শতকরা ২০ থেকে ৪৫ ও তৃতীয় শ্রেণীর সিনেমার এক হারে শতকরা ২০ ভাগ।

কমিটির উল্লেখযোগ্য সুপারিশের মধ্যে সিনেমা শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের অবস্থা বিশেষভাবে পর্যালোচনার জন্য একটি তদন্ত কমিটির কথা উল্লেখ আছে। কমিটি মনে করেন, মূলধনের অভাব এবং চড়া সুদের জন্য পশ্চিমবাংলায় চলচ্চিত্র প্রযোজনা হ্রাস পাচ্ছে।

অ্যাড হক কমিটির মতে সুপারিশগুলির মধ্যে রয়েছে—(১) সিনেমা হলের লাইসেনস দেওয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি হ্রাস এবং (২) সিনেমা হলগুলির উপর চলচ্চিত্র উন্নয়ন সেস ধার্য করা।

গত সপ্তাহে চলচ্চিত্র তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেশ করে রাজ্যসরকারের প্রচার উপদেষ্টা শ্রী পি এস মাথুর বলেন, কমিটির রিপোর্ট জনসাধারণের কাছে বিক্রয় করা হবে এবং এ সম্পর্কে জনসাধারণের মতামত আহ্বান করা হবে।

"কমললতা" শেষ পর্যায়ে

শরৎ কাহিনীর চিত্ররূপ "কমললতা"র শুটিং নিয়মিত চলছে। অল্পকালের মধ্যেই প্রযোজক অসিত চৌধুরীর এই ছবির চিত্র-নিবেদন। অনেক দৃশ্য গৃহীত। সম্প্রতি টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে কয়বছরের বাবাজীর আখড়ার সেটে ছবির নাম-ভূমিকায় শিল্পী সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমারকে (শ্রীকান্ত) নিয়ে কয়েকটি দৃশ্য তোলা হয়। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী, ঘাটু বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্রা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। হরিসাধন দাশগুপ্ত ছবিটি পরিচালনা করছেন। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব রবীন চট্টোপাধ্যায়ের।

গৌরী মা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে নিউ ফেজ ফিল্মসের ভক্তিমূলক কাহিনী "গৌরীমা"র চিত্র গ্রহণ আবার ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে সুরু হয়েছে। ছবিখানি পরিচালনা করছেন রবি বসু। সংগীত পরিচালনায় আছেন অপরেশ লাহিড়ী। ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন অসিতবরণ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, পদ্মা দেবী, মলিনা দেবী, তপতী ঘোষ, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতাজ অহামেদ, গীতা দে, স্বপনকুমার, এন বিশ্বনাথন, দীপক চট্টোপাধ্যায়, মিত্রা মুখোপাধ্যায় ও দীপ্তি রায় প্রভৃতি। আগামী সপ্তাহে ভুবনেশ্বর ও পুরীতে ছবির কয়েকটি বহির্দৃশ্যের কাজ হবে।

আলি আকবরের সরোদ

গত ৪ঠা জুন রবীন্দ্র সদনে আলি অকাবর খাঁ সাহেবের পুনরায় বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর একক বাজনার প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করেছিলেন খাঁ সাহেবের কয়েকজন গুণগ্রাহী বন্ধু। সংগতে ছিলেন তবলাতে শ্রীশংকর ঘোষ। ইনিও খাঁ সাহেবের সঙ্গে এই মাসে আমেরিকা যাচ্ছেন, সেখানে খাঁ সাহেবের সংগীত বিদ্যালয় পরিচালনাতে সাহায্য করতে।

প্রথমে আলাপ-জোড়-ঝালাতে দরবারী কানাড়া, পরে গৎ-এ কিরওয়ানী, বিরতির পরে দেশ এবং মেঘ বাজিয়ে শোনালেন আলি আকবর খাঁ সাহেব।

ভারতীয় রাগ-সংগীতে দরবারী কানাড়ার স্থান বহু উচ্চে—প্রমাণ করা শক্ত, তবে জনশ্রুতি রাগটি মিয়া তানসেনের সৃষ্ট; সম্রাট আকবরের রাজদরবারের সুগম্ভীর দরবারী মেজাজের সঙ্গে মেশানো হয়েছে কিছুটা ভক্তিমূলক, তথা করুণ রস। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে, দরবারী কানাড়া আসলে যেন মালকোশ ও মেঘ রাগের সমন্বয়ে গড়ে তোলা হয়েছে। নিখুঁত শ্রুতির প্রয়োগ ছাড়া এ রাগের সুষ্ঠু রূপায়ণ অসম্ভব।

সেদিক থেকে দরবারী কানাড়াতে খাঁ সাহেবের বাঁ হাতে স্বরের যে নিটোল পূর্ণ রূপ আমরা দেখেছি (চলতি কথায় যাকে টিপ বলে) তা হয়তো নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না, তবু না উল্লেখ করলে তাঁর সেদিনকার বাজনার কোনো মূল্যায়ন করাই সম্ভব নয়।

আর এর সঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ঝালার তথা ঠোক ঝালার। যতদূর লক্ষ করা সম্ভব হয়েছে, তাতে কমপক্ষে অন্তত ১২ রকমের বিভিন্ন ধরনের ঝালাতে রাগের যে ভাবঘন রূপটি আমরা পেলাম, সেটি যেন খাঁ সাহেবেরই নিজস্ব সৃষ্টি। বাঁ হাত ও ডান হাতের কাজ আমরা উল্লেখ করতে চাই এবং জোর করেই বলতে পারি যে, সেদিন ঐ আসরে বসে বাজাতে বাজাতে বাঁধা নিয়মের বাইরে যে রসসৃষ্টি খাঁ সাহেব করলেন, সেটা হয়তো আর একদিন অন্য পরিবেশে সম্ভব নাও হতে পারে। পিকাসো বা বড়ো চিত্রশিল্পীর তুলিতে সব ছবিই যেমন সমান পর্যায়ে উন্নীত হয় না, (লেখকের লেখনী সম্পর্কেও তাই), তেমনি আমাদের ক্ল্যাসিকাল সংগীতে সুরের যে চিত্রকল্প রাগের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, সেটির রূপও যে প্রত্যেকবার একটি বাঁধা নিয়মে হবে না, খাঁ সাহেবের মতো সৃজনশীল শিল্পীর (creative artist)-এর কাছে সেটা আমরা বুঝতে পারি।

বিরতির পরে খাঁ সাহেব বেছে নিয়েছিলেন দেশ ও মেঘ, দুই-ই বর্ষার রাগ। দেশে গান্ধারের বক্র প্রয়োগ, রে, (কোমল) নি ধ, (কোমল) নি-র ব্যবহারটি লক্ষ করার মতো। তাল ছিল সাড়ে পাঁচ মাত্রার, আলি আকবর খাঁ সাহেবের নিজস্ব সৃষ্টি।

রূপক তাল হচ্ছে সাত মাত্রার ১২৩।৪৫। ৬৭; খাঁ সাহেব রূপকের শেষ তিন মাত্রাকে ডবল লয়ে বাজিয়ে দেড় করেছেন। তাহলে এই নতুন তালের (নাম দিয়েছেন লক্ষ্মণ) মাত্রা ভাগ হোলো ১২৩।৪।৫৬৭ (ডবল) —অতএব সাড়ে পাঁচ।

ঠিক ঐ একই পদ্ধতিতে দশ মাত্রার ঝাঁপ-তালের (১২।৩৪৫।৬৭।৮৯১০) শেষ তিন মাত্রাকে ডবল লয়ে বাজালে ৮½ মাত্রার তাল দাঁড়াবে।

দেশের পরে মেঘ রাগে খাঁ সাহেব চলে গেলেন দ্রুত লয়ে, তিনতালে, একটুও না থেমে। চারদিকে আঁধার করে যেন ঘন-ঘোর বর্ষা নেমে এলো। দ্রুত লয়ের ওপর ভারী গমকের প্রাচুর্যে যখন আমরা বিদ্যুতের ঝলকানি ও মেঘডম্বরুর শব্দ হলের মধ্যে নিস্তব্ধ বিস্ময়ে শুনতে মগ্ন, তখন বাইরেও যে ঘনঘোর বর্ষা নেমেছে, সেটা বুঝলুম বাজনা শেষ হবার পরে। অবশ্যই এই দুই ঘটনার মধ্যে কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে, এরকম আমরা দাবী করছি না—তবে পরিবেশটি মধুর।

শ্রীলোচন পণ্ডিত

বর্ণালীর অভিনয়

গত দোসরা জুন একাডেমী অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে "বর্ণালী নাট্য দল" প্রাক্তন সৈনিক সংঘের সাহায্যার্থে, রসরাজ অমৃতলালের "কৃপণের ধন" নাটকটি অভিনয় করেন।

কৃপণের চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করে তোলেন কুমার দাস। ঘুড়োর ভূমিকায় প্রবীণ শিল্পী সুধীর সরকার দর্শকদের মনে রেখাপাত করেন। হাবা ও পুরোহিতের ভূমিকায় হারাধন সাহা ও সরলবিহারী আঢ্য প্রচুর আনন্দ জোগান। স্ত্রী চরিত্রগুলিতে দীপালি চক্রবর্তী, দীপালি ঘোষ, অঞ্জলী চক্রবর্তীর অভিনয় সুন্দর হয়। নাটকটি পরিচালনা করেন সাধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুধীরলাল স্মৃতি বাসর

সুধীরলাল স্মৃতিবাসরের সপ্তদশ বার্ষিকী অনুষ্ঠান কলিকাতা তথ্য কেন্দ্রে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ বৎসর স্মৃতি-বাসরে দুটি মনোজ্ঞ সংগীত অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। প্রথম দিন লঘু (সুধীর-গীতি) ও দ্বিতীয় দিন উচ্চাঙ্গ আসরের শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন তারাপদ চক্রবর্তী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, ভি জি যোগ, সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারী অনিন্দিতা ও অজন্তা রায়চৌধুরী (দ্বৈত কথক নৃত্য), হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, নিখিলচন্দ্র সেন, শ্যামল মিত্র, অনিলবন্ধু ঘোষ, সুধীর মুখোপাধ্যায়, অমরেশ রায়চৌধুরী, গদাধর ভট্টাচার্য, সলিল মিত্র, হিমাংশু মুখোপাধ্যায়, মৃণাল গাঙ্গুলী, দেবব্রত দত্ত, শ্রীমতী সুপ্রভা সরকার, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র,

বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা সেন, দেবী মিত্র, স্বাগতা ঘোষরায়, ভবানী চট্টোপাধ্যায়। তবলা-সংগতে সর্বশ্রী কানাই দত্ত রাধাকান্ত নন্দী, সুনীত বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ চট্টোপাধ্যায়, কুমুদ ঘোষ, মণীন্দ্র চক্রবর্তী, খগেশ মুখোপাধ্যায়, মদনলাল মিশ্র, গোবিন্দ বসু প্রভৃতি।

"তিন অধ্যায়" (পরিচালনা : মঙ্গল চক্রবর্তী) ছবিতে সন্ধ্যা রায় ও অজয় গাঙ্গুলী

বেঙ্গল মিউজিক কলেজের সমাবর্তন উৎসব

গত ২০শে মে, সোমবার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম হলে বেঙ্গল মিউজিক কলেজের ঊনবিংশ ও বিংশতিতম সমাবর্তন উৎসব সম্পন্ন হয়। প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত বাংলা দেশের একমাত্র সংগীত বিদ্যালয় ও লক্ষ্ণৌ ভাতখণ্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠের সঙ্গে সর্বপ্রথম সংযুক্ত বাংলার এই প্রতিষ্ঠানটি। প্রায় সাত শত ছাত্রী এই কলেজে সঙ্গীতে, নৃত্যে, বাদ্যে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা কোর্সে শিক্ষা গ্রহণ করছেন। প্রথম দিন ভাতখণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালের কৃতী স্নাতকদের প্রায় ২০০ জনকে পুরস্কার ও অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ করেন ডঃ রমা চৌধুরী। এর পর প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের পরিচালনায় ও বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রীদের অংশ গ্রহণে কতগুলি চিত্তাকর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করা হয়। মিঁয়া-কি-মল্লার রাগাশ্রয়ী সমবেত কণ্ঠে ধ্রুপদ এক সম্মোহক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রীরা দ্বিজেন্দ্রগীতি, বাদ্যে ঐকতান, ভজনমণ্ডলী, পল্লীগীতি সুচারুরূপে পরিবেশন করেন। ছোট ছোট শিশুদের রেলগাড়ি, লজেন্স, প্রজাপতি, ঝর্ণা, লোকনৃত্য, সরস্বতী বন্দনা—প্রতিটি নৃত্যানুষ্ঠান মনোজ্ঞ হয়েছিল। সবশেষে সম্মিলিত ... নৃত্যানুষ্ঠানও উপভোগ্য হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬৪—৬৭ সাল পর্যন্ত সঙ্গীতে কৃতী স্নাতকদের এবং ১৯৬৬ এবং ৬৭ সালের ভাতখণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী স্নাতক প্রায় ২৯০ জনকে পুরস্কার ও অভিজ্ঞানপত্র প্রদান করেন শ্রীমতী সেন। দীক্ষান্ত ভাষণের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। এদিনের অনুষ্ঠানসূচীতে স্বদেশী গান, ঝুমুর গান, সারী নৃত্য, ভজনমণ্ডলী, দক্ষিণ ভারতীয় ভরতনাট্যম নৃত্যানুষ্ঠান, পল্লীগীতি মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাগপ্রধান গান, শিশু শিল্পী জয়শ্রী রায়ের একক রবীন্দ্রসঙ্গীত, সমবেত লোকনৃত্য, সুমিতা গুইয়ের কথক নৃত্য একের পর এক অনুষ্ঠান দর্শকবৃন্দকে আনন্দ দেয়। দু দিনের অনুষ্ঠানের শুভসূচনা হয় মাঙ্গলিকী বেদগান ও রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে। যোগ দেন রবিপ্রভা বিভাগের ছাত্রীবৃন্দ। কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অতুল গোঁসাই

রূপম সম্প্রদায় রঙমহলে ১৮ জুন শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্ত"র চতুর্থ পর্বে শ্রীকান্ত ও কমললতার কাহিনী অবলম্বনে "অতুল গোঁসাই" নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন।

"প্রথম বসন্ত" (পরিচালনায় নির্মল মিত্র) ছবিতে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়

ফটো—দেশ

বোম্বাই বিচিত্রা

বম্বের বিখ্যাত প্রেক্ষাগৃহ 'অপ্সরা' 'অপেরা' হাউস এবং আরো প্রায় ডজনখানেক শহর এবং শহরতলির প্রেক্ষাগৃহে 'আর, ডি, বনসালে'র 'ঝুক গায়া আসমান' রিলিজ হয়েছে। 'ঝুক গায়া আসমান' বহাল তবিয়তে চলছে। শ্রীবনশালের সঙ্গে দেখা হতেই বুঝলাম আশঙ্কা শেষ হয়েছে এবং আশা উঁকি দিচ্ছে ও'র চোখে মুখে। ও'র আশা যদি মাঝপথে আহত না হয় তা হলে কিছু দিনের মধ্যেই আর, ডি, বনশাল প্রোডাকশন্সের আগামী হিন্দী ছবি ঘোষিত হবে।

নিউ থিয়েটার্সের সময় বাংলা দেশে প্রযোজিত হিন্দী ছবির সারা ভারতে আদর ছিল। সেটা অতীতের কথা। পরবর্তীকালে বাংলা দেশ থেকে অনেক কলাকুশলী এবং অভিনেতা অভিনেত্রী বম্বেতে এসেছেন এবং এখানে ছবি বানিয়েছেন। বাংলা দেশে হিন্দী ছবি তৈরি হওয়া বহু বছর ধরে বন্ধ ছিল। সেই অবস্থার শেষ হয় অসিত চৌধুরী প্রযোজিত "মমতা" দিয়ে। কিন্তু "মমতা"র সাফল্যের পর শ্রী চৌধুরী এখনো অবধি কোন হিন্দী ছবি করেন নি। অথচ "মমতা"র পরিচালক বম্বে চলে এসে অনেকগুলি হিন্দী ছবি করছেন। "মমতা"র সার্থকতার পর বাংলা দেশের বিখ্যাত প্রযোজক পরিবেশক আর, ডি, বনশাল হিন্দী ছবি করা মনস্থ করেন। 'ঝুক গায়া আসমানে'র পুরো আউটডোর বাংলা দেশের দার্জিলিং-এ হলেও এ ছবি বাংলা দেশে স্থানীয় কলাকুশলীদের দ্বারা বাংলার পরিবেশে নির্মিত নয়। বর্তমানে শ্রীবনশাল যে হিন্দী ছবি তৈরির কথা ভাবছেন তা হয়ত বাংলা দেশেই তৈরি হবে। আর একটি ছবি তরুণ মজুমদার এবং হেমন্ত মুখার্জি প্রযোজিত 'রাহগীর' যা আংশিকভাবে বম্বেতে গৃহীত এবং বেশীর ভাগই কলকাতায় তৈরি, অর্থাৎ যে ছবিকে আবার বাংলা দেশে তৈরি হিন্দী ছবি বলা যাবে অনায়াসে। সেই "রাহগীর" সম্পর্কেও বম্বের চিত্র জগতে যথেষ্ট কৌতূহল আছে।

*

গত ৪ঠা জুন বম্বেতে সাড়ম্বরে ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাংলা দেশের কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি বম্বেতে এসেছেন। এই অনুষ্ঠানে বছরের শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবির প্রযোজক হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন বাংলা দেশের তরুণ প্রযোজক শ্রীঅসীম দত্ত। অসীমবাবু এখন বম্বেতে ও'র আগামী ছবি 'আনন্দ সংবাদে'র নায়ক এবং পরিচালক (রাজ কাপুর এবং হৃষীকেশ মুখার্জি) দুজনেই বম্বের অধিবাসী। সুতরাং এই অনুষ্ঠানে এসে যে শ্রীদত্ত কয়েক দিন বম্বেতে থেকে যাবেন তাতে আর আশ্চর্যের কী। এই অনুষ্ঠানের শোভাবর্ধন করতে বাংলা দেশের অভিনেত্রী শ্রীমতী অঞ্জনা ভৌমিকও বম্বেতে এসেছেন। উনিও বোধ হয় কয়েক দিন ছুটি কাটিয়ে যাবেন এখানে।

এবার বাঙালীদের ছেড়ে এ্যাওয়ার্ড ফাংশন সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। বম্বে তথা ভারতের সবচেয়ে বড় অডিটোরিয়াম ষন্মুখানন্দ হলে বম্বের চিত্রজগতের উজ্জ্বল তারকারা এবং ততোধিক উজ্জ্বল বম্বের থেকেও মানে [illegible] থেকেও [illegible] নামকরা চিত্রতারকা এসেছিলেন (তাঁদের নামগুলো এমন খটমটে যে, লিখে নিইনি বলে লিখতে পারছি না)। অনুষ্ঠানের বাকি বিবরণ দেবার তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি না। তবে একটি বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার মনে হয়। পুরস্কার বিতরণী এই অনুষ্ঠানে যাঁরা পুরস্কৃত হলেন তাঁরা সবাই বসেছিলেন মঞ্চে। আর ছিলেন অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ

অগ্রদূত পরিচালিত "চিরদিনের" ছবিতে উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী ফটো—[illegible]

চিত্রযুগ-এর "পিতা-পুত্র" (পরিচালনা : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়) ছবিতে জহর গাঙ্গুলী ও গীতা দে
ফটো—দেশ

আমাদের তথ্য এবং বেতার মন্ত্রী শ্রী কে কে শাহ। আর যাঁদের হাত দিয়ে পুরস্কার বিতরিত হল সেই তারকারা বসেছিলেন হলের মধ্যে জনতার সঙ্গে। এক এক জনকে এক একজন তারকার হাত দিয়ে পুরস্কার দেওয়া হয়। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম যখন পুরস্কৃতদের নাম ঘোষণা করা হচ্ছিল তখন যত না হাততালি পড়ছিল তার থেকে বেশী করতালি শোনা যাচ্ছিল, যার হাত দিয়ে পুরস্কার দেওয়া হবে সেই তারকার নাম যখন করা হচ্ছিল। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কয়েকজন পুরস্কৃতকে "রিঅ্যাক্ট" করতে দেখলাম। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা এটা লক্ষ করেছেন কিনা বুঝতে পারলাম না। এ্যাওয়ার্ড ফাংশানে পপুলার এ্যাক্টর মনোজকুমার এক রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। তিনি একাই এবার চারটি পুরস্কার পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার, শ্রেষ্ঠ সংলাপ লেখক এবং শ্রেষ্ঠ প্রযোজক হিসেবে। শ্রেষ্ঠ প্রযোজক হিসেবে মনোজ পুরস্কার নেন শ্রী কে কে শাহর হাত থেকে আর শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার নেন রাজকাপুরের হাত থেকে। দিলীপকুমার শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার নেন তাঁর স্ত্রী সায়রা বানুর হাত থেকে। অনুষ্ঠান পরিচালক ডেভিড (ব্যাচিলার এখনও) মন্তব্য করেন "ইউসুফ ইউ হ্যাভ মিস্ড এ চান্স। ইউ কুড গিভ সায়রা এ পাবলিক কিস্"। চিরতরুণ ডেভিডের মন্তব্য শুনে দিলীপকুমার হাসার চেষ্টা করেন কিন্তু জনতা উল্লসিত হয়ে হেসে ওঠেন।

এবার আসা যাক অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আকর্ষক দুটি বক্তৃতার কথায়। প্রথমটি রাজকাপুরকৃত। দ্বিতীয়টি শ্রী কে কে শাহর। একটিতে প্রশ্ন, অপরটিতে উত্তর। রাজকাপুর নিজস্ব ঢঙে জনতার উদ্দেশ্যে শ্রী কে কে শাহকে শুনিয়ে বলেন যে, মন্ত্রীমহাশয়ের কথা চিত্রজগত চিরকাল শুনে আসছে, এখন যদি মন্ত্রী মহোদয় একটু চিত্রজগতের কথা শোনেন। রাজকাপুরের মতে এই শো বিজনেসে কিছু গল্‌ত্ কিসিমের শোম্যান এবং কিছু গল্‌ত্ কিসিমের বিজনেসম্যানের অযোগ্যতা এবং হঠকারিতার ফলেই বর্তমান চিত্রজগতের যত সমস্যা। রাজ বলেন, মন্ত্রীমহাশয় ওরফে সরকার যদি একটু সহানুভূতিশীল হন তা হলেই চলচ্চিত্রের সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে। শ্রী শাহ তাঁর বক্তৃতায় রাজের বক্তৃতার উল্লেখ করে বলেন যে, চিত্রজগতের সমস্যা চিত্রজগতের সুতরাং সে সমস্যা তাঁদের নিজেদেরকেই মেটাতে হবে। দরকার হলে সরকার প্রয়োজন মত সাহায্য করবে। তারপর শ্রী শাহ স্বভাব-সুলভভাবে কয়েকটি কাব্য পংক্তি ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন, "যদিও আমি লিখিত ভাষণ পছন্দ করি না তবু অনিবার্য কারণে আজ লিখিত ভাষণ পাঠ করতে বাধ্য হচ্ছি।" এই লিখিত ভাষণে এ্যাওয়ার্ড প্রসঙ্গ ছাড়া শ্রী শাহ যা যা বলেছেন, তা আমরা অনেকবার শুনেছি ওঁর কাছ থেকে সুতরাং সে প্রসঙ্গে আর কাজ নাই। পরিশেষে শুধু এইটুকু বলেই শেষ করব যে, বম্বের চিত্রজগতে যে সংকট চলছে অনুষ্ঠানে বম্বের চিত্রজগতের প্রায় অধিকাংশকে দেখে তার কোন হদিশ পেলাম না।

সরল শর্মা

হিন্দোলীর অনুষ্ঠান

সম্প্রতি উত্তরপাড়ার তরুণ শিল্পীদের সংগীত সংস্থা "হিন্দোলী"র দ্বিতীয় বার্ষিক উচ্চাঙ্গ সংগীতানুষ্ঠান উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীগোকুল নাগ মহাশয়। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ওস্তাদ মহঃ দবীর খাঁ।

ওস্তাদ দবীর খাঁর ইমন কল্যাণ রাগে ধ্রুপদ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। আসরের অন্যান্য কণ্ঠসংগীত শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মুকুন্দরঞ্জন ঘোষ, অঞ্জলি সুর, অন্নপূর্ণা গোস্বামী ও রঞ্জনা মুখোপাধ্যায়। যন্ত্র-সংগীত শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সেতারে সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পিটার এল রো, বাঁশীতে নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী। তবলা-লহরা পরিবেশনে স্বরাজ ভট্টাচার্য। সঙ্গতে ছিলেন অমলকুমার চট্টোপাধ্যায়, শিবগোপাল চক্রবর্তী, শান্তনু ভৌমিক, বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কানু গাঙ্গুলী প্রভৃতি। সারেঙ্গীতে সহযোগিতা করেন বাচ্চেলাল মিশ্র।

"বাঘিনী" (পরিচালনা : বিজয় বসু) ছবিতে [illegible]

অরণ্যদেব ✶ লী ফক

প্রমোদ-জাহাজ ডুবছে! রাউডি আর গোলডি তীর লক্ষ্য করে এগোচ্ছে....

—অন্য সবাই সমুদ্রে ভাসছে...

জাহাজ ডুবছে... সাহায্য পাঠাও

রাউডি আর গোলডি তীরে গিয়ে পৌঁছেছে...

এ-যাত্রা বেঁচে গেছি।

আঃ...!

চলো, ওই কুটিরে আশ্রয় নেওয়া যাক।

জাহাজ থেকে ওই কুটিরটাই দেখেছিলাম। কিন্তু ভিজে বালি যে কাদার মত প্রায় আটকে যাচ্ছে!

ডুবন্ত জাহাজের বেতার-বার্তা শুনে অন্য একটি জাহাজ সাহায্য করতে ছুটে আসছে।

ওই তো সেই জাহাজ! লাইফবোট নামাও!

আমাদের বাঁচাতে এসেছে!

12/31

বাঁচাও!

সবাইকেই বাঁচাব!

বাঁচাও!

ওদিকে কেচ-পাথরের বাড়িতে---

কে জানে আর বাড়ি!

রাউডি, দ্যাখো দ্যাখো আর একটা জাহাজ!

রাউডি আর তার স্ত্রী ছাড়া বাকী সবাইকেই পাওয়া গেছে।

রাউডিটা অতি পাজি। ওর ভেলায় আমাকে উঠতে দেয়নি!

বাঁচাও! আমরাও যেতে চাই!--- নাঃ, ওরা শুনতে পাচ্ছে না!

বালি একেবারে কাদার মতো! পায়ে আটকে যাচ্ছে!

কাদার মতো, না গুঁড়ো সোনার মতো?

৫

প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক দেশ পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন গত ৯ই জুন সকালে তাঁর কলকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬।

টাঙ্গাইল মহকুমায় ঘারিন্দা গ্রামে ১৮৯২ সালে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেনের জন্ম। সুরেন ব্যানার্জির 'বেঙ্গলী' কাগজে তাঁর সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। 'সারভেণ্ট' ও 'হিন্দুস্থান' পত্রিকার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। শ্রীসেন আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দেন ১৯২৬ সালে। এবং শীঘ্রই সাংবাদিক হিসাবে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অসামান্য দখল ছিল। তাঁর লেখনীতে পরাধীনতার বন্ধনবেদনা অপূর্বভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ও মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিনি নিরলসভাবে সংগ্রাম করে গিয়েছেন। নির্ভীক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁর স্থান ছিল প্রথম সারিতে। সাংবাদিকতার জন্য তাঁকে কারাবরণও করতে হয়েছিল।

বৈষ্ণব দর্শন ও শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল যেমন গভীর তেমনই সুপ্রসারিত। তিনি দিব্য বিশ্বাসে বলিষ্ঠ এক জীবনের অধিকার লাভ করেছিলেন। তাঁর সান্নিধ্য, সাহচর্য এবং উপদেশ বহুজনের চিত্তে ভক্তি-ভাবনা সঞ্চারিত করেছে। বহু পণ্ডিত তাঁকে আচার্যরূপে, বহু শিক্ষার্থী তাঁকে গুরুরূপে এবং বহু বিপন্ন-হৃদয় মানুষ তাঁকে সদুপদেশের বন্ধুরূপে পেয়েছিলেন। ভাগবত বিশ্বাসে স্থিতিলাভ করে তিনি মানুষের জীবনকে আরও ভালবাসার শক্তি পেয়েছিলেন

দেশী সংবাদ

৩ জুন—গত ১৬ মে-র ধর্মঘট সম্পর্কে পুলিসের অভিযোগের ভিত্তিতে রাজ্য সরকারের যে সব কর্মীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল সোমবার রাজ্যপাল সে সব আদেশ প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রায় ৪০ জন নন-গেজেটেড কর্মীর উপর ওই আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

সারা সীমান্ত এলাকায় এখন জাল নোটের ছড়াছড়ি। পুলিস এই ব্যাপারে প্রচুর জাল নোট-সহ কয়েকজন জাল নোটের কারবারীকে পাকড়াও করেছে। পুলিস মহলের সন্দেহ : সীমান্তের ওপারে পাকিস্তান এলাকা থেকে একদল আন্তঃ-রাষ্ট্রচক্রী জাল নোট ছাপিয়ে এপারে কারবার চালাচ্ছে।

৪ জুন—জাতীয় কর্মকর্তাদের নির্দেশ লঙ্ঘন করে যুক্ত ফ্রন্টে থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ভারতীয় ক্রান্তিদলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কার্য-নির্বাহক সমিতি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। আজ দলের জাতীয় কর্মকর্তাদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অব্যবহিত পরেই রাজ্য শাখার সভাপতি শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি, শ্রীসুশীল ধাড়াকে সঙ্গে নিয়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন এবং দিল্লিতে তাঁদের কর্মসূচী বাতিল করে দিয়ে দ্রুত কলিকাতা রওনা হন।

আজ রাত্রি একটা পর্যন্ত কলকাতায় শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি, শ্রীসুশীল ধাড়া ও আরও কয়েকজন নেতার সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, পশ্চিম-বঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের পুনর্জীবন লাভ করতে খুব বেশী দেরী নেই।

৫ জুন—চলচ্চিত্র তদন্ত কমিটি সুপারিশ করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের অর্থকরী চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচাবার জন্য এই রাজ্যে আরও সিনেমা হল খোলা দরকার। কমিটি মনে করেন মূলধনের অভাব ও চড়া সুদের জন্য এই রাজ্যে চলচ্চিত্রের উৎপাদনও হ্রাস পাচ্ছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্যরাও যাতে পুরাতন সদস্যদের মতন ভাতা পান সেজন্য রাজ্য সরকার বঙ্গীয় আইনসভা সদস্যদের 'ভাতা আইন'-এর ৩নং ধারা সংশোধন করে রাষ্ট্রপতির আইন চালু করার পক্ষপাতী।

৬ জুন—কংগ্রেস সংসদীয় দলের কর্মসমিতির অধিকাংশ সদস্যই নাকি আইন ও শৃঙ্খলা সহ ব্যাপক ক্ষমতা দিয়ে আসামে পৃথক একটি স্বশাসিত পার্বত্য রাজ্য গঠনের কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছেন।

৭ জুন—ব্যাপক "গণ-আন্দোলনের জোয়ারে" পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে আবার নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসার জন্য বাম-পন্থীরা প্রস্তুতি হচ্ছেন। জুনের মাঝামাঝি শুরু করে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে এই আন্দোলনকে একাধিক "বাংলা বন্ধ-এর" মাধ্যমে তাঁরা আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দিতে চান।

আসামের শিল্প দফতরের মন্ত্রী শ্রীবিশ্বদেব শর্মা আজ গৌহাটিতে বলেন, আসামে আর একটি তৈল শোধনাগার স্থাপন না করার জন্য কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম দফতরের মন্ত্রী যে কৈফিয়ত দিয়েছেন তাতে আসাম সরকার সন্তুষ্ট হতে পারেন নি।

৮ জুন—পুষ্পচন্দ্রবাজিতে সাহায্য করার অভিযোগে শনিবার গোয়েন্দা পুলিশ রাজ্য স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) দফতরের একজন গেজেটেড অফিসার, কলকাতা পুলিশের একজন বরখাস্ত সাব-ইনসপেকটার ও দুইজন চীনাকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের সন্দেহ, শুধু এঁরা নন, রাইটারস বিলডিংসের আরও কিছু কর্মচারীর সঙ্গে কিছু চীনা ও পাকিস্তানীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে।

চীন-ফেরত বৈরী নাগাদের একটি দলের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে নিরাপত্তাবাহিনী উল্লেখ্য সাফল্য অর্জন করেছেন। কয়েকজন বৈরী মারা গিয়েছে। বন্দী হয়েছে চব্বিশজন। তার চেয়েও বড় কথা, পাওয়া গিয়েছে প্রচুর চীনা ও পাকিস্তানী অস্ত্রশস্ত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র।

বিদেশী সংবাদ

৩ জুন—শান্তি বৈঠকে হ্যানয়ের প্রতিনিধি দলে যোগ দেওয়ার জন্য আজ আর একজন উত্তর ভিয়েতনামী প্রবীণ অফিসার এখানে আসছেন। এই কারণেই শান্তি আলোচনার চতুর্থ সপ্তাহে হ্যানয়ের মনোভাবের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে বলে কূটনৈতিক মহল মনে করছেন।

৪ জুন—প্রায় দুশ বৈরী মিজো গত ৩১ মে ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের দুটি শহর লিংডম ও কালাম আক্রমণ করে। কয়েকটি সরকারী কোষাগার ও মালপত্রের গুদাম লুণ্ঠিত হয়। পরে কয়েকটি সরকারী ভবনেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

৫ জুন—আততায়ীর গুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সদস্য রবার্ট কেনেডির মৃত্যু আলোচ্য সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট জন কেনেডির ভাই এবং বর্তমান নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদ-প্রার্থী রবার্ট কেনেডি ৫ জুন ক্যালিফর্নিয়া নির্বাচনে বিজয়ের পর লস এনজেলেসে আততায়ীর অতর্কিত আক্রমণে গুরুতর আহত হন এবং সংকটাপন্ন অবস্থায় তাঁকে গুড সামারিটান হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁর দেহের কয়েক স্থানে অস্ত্রোপচার করে গুলির টুকরা বের করা হয়। চিকিৎসকদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে ৬ জুন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। আততায়ী সিরহানকে রবার্ট কেনেডির দেহ-রক্ষীর গুলির আঘাতে আহত অবস্থায় গ্রেফতার করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডে আমেরিকা আতংকিত এবং সমগ্র বিশ্ব বিস্মিত।

৬ জুন—সেনেটর রবার্ট এফ কেনেডিকে হত্যার পটভূমিকায় প্রেসিডেন্ট জনসন মার্কিন জনজীবনে হিংসার কারণ অনুসন্ধানের জন্য গত রাত্রিতে জনস হপকিংস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট শ্রীমিলটন আইসেন-হাওয়ারের নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিশন নিযুক্ত করেছেন।

৭ জুন—সেনেটর রবার্ট কেনেডির হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট জনসনকে হত্যা করা হবে, আটজন কুইবেক বিপ্লবী এই মর্মে ভীতিপ্রদর্শন করে। এই সতর্কবাণী শোনার পর গত রাত্রিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কানাডা সীমান্তের সমিলিত প্রহরীদের সজাগ করে দেওয়া হয়।

৮ জুন—গতকাল জাপানের ৫৭টি স্থানে প্রায় ২৪,০০০ ছাত্র মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। অন্তত ১৫০ জন আহত হন। ২৪০ জন ছাত্র ধৃত হন। আহতদের মধ্যে ৭৫ জন পুলিশ।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীযুধাজিৎ সেনগুপ্ত

ডাবর

আমলা কেশতৈল পুরস্কার প্রতিযোগিতায় যোগ দিন

২৫,০০০৲ টাকা

নগদ পুরস্কার জিতুন

প্রথম পুরস্কার ১০,০০০৲ টাকা

দ্বিতীয় পুরস্কার ৬,০০০৲ টাকা

তৃতীয় পুরস্কার ৪,০০০৲ টাকা

এবং প্রতিটি ৫০৲ টাকা হিসেবে ১০০টি অতিরিক্ত পুরস্কার

১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ডাবর (ডাঃ এস, কে, বর্মণ) প্রাইভেট লিমিটেড নানা রকম কেশতৈল, আয়ুর্বেদীয় ও পেটেন্ট ঔষধ এবং প্রসাধন সামগ্রী তৈরীর সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান। ডাবর কেশতৈলের বহু গুণ আর এইজন্যই এইগুলি সকলের কাছে প্রিয়। ডাবর আমলা কেশতৈলের ১০টি অনন্যসাধারণ গুণ আমরা বাছাই করেছি। নীচে যে প্রবেশ পত্র দেওয়া হয়েছে তাতে এই গুণগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনাকে শুধু ডানদিকের খালি জায়গায় আপনার পছন্দমত ক্রমানুযায়ী নম্বর দিয়ে এগুলি সাজিয়ে দিতে হবে। মনে করুন, 'ডাবর আমলা কেশতৈল মাথা ঠাণ্ডা রাখে' এই গুণটিই যদি আপনি সবচেয়ে ভালো বলে মানেন তাহলে উত্তরের কলমে এই গুণটিকে ১নং দিন এবং এভাবে পর পর গুণগুলি সাজিয়ে দিন। প্রতিযোগিতা যতদিন চালু থাকবে ততদিন ডাবর কেশতৈল সমূহের প্রত্যেকটি ৪০০ মি.লি. ও ২০০ মি.লি. শিশির সঙ্গে একটি ক'রে কুপন থাকবে। আপনার প্রবেশপত্র পূরণ ক'রে এই কুপনটি তাতে আঠা দিয়ে এঁটে যত তাড়াতাড়ি পারেন আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন, যাতে

আপনি হয়তো একটি পুরস্কার জিততে পারেন।

নিয়ম :— ১। প্রত্যেকটি প্রবেশপত্রের সঙ্গে একটি ক'রে প্রতিযোগিতার কুপন এঁটে পাঠাতে হবে। আমাদের যে কোনো কেশ তৈলের ৪০০ মি.লি বা ২০০ মি.লি. শিশির সঙ্গে এই কুপন পাওয়া যাবে। ২। প্রবেশপত্র আমাদের ডীলারদের কাছে কিংবা খবরের কাগজে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে পাবেন। ৩। প্রবেশপত্র স্পষ্টাক্ষরে লিখে পূরণ না করলে কিংবা কাটাকুটি বা অদল-বদল থাকলে গ্রাহ্য হবে না। ৪। বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং বাধ্যতামূলক। ৫। এই পুরস্কার প্রতিযোগিতার ব্যাপারে কোনরূপ পত্রালাপ করা হবে না। ৬। একাধিক ব্যক্তি একই পুরস্কার পেলে পুরস্কারের টাকা সমানভাবে ভাগ ক'রে দেওয়া হবে। ৭। ডাবর (ডাঃ এস, কে, বর্মণ) প্রাইভেট লিঃ এর কর্মী ও কর্মীদের আত্মীয়স্বজন, তাঁদের পরিবেশক, স্টকিস্ট, ডীলার এবং প্রচার প্রতিষ্ঠান এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার অধিকারী নন। ৮। ফলাফল খবরের কাগজে ঘোষণা করা হবে আর বিজয়ীদের ডাকযোগে জানান হবে।

---------- নীচের অংশটা কেটে নিন এবং পূরণ ক'রে ও কুপনটি এঁটে দিয়ে পাঠান। ----------

১	ডাবর আমলা কেশতৈল সুগন্ধে সেরা।	
২	ডাবর আমলা কেশতৈল মাথা ঠাণ্ডা রাখে।	
৩	ডাবর আমলা কেশতৈল চুল ওঠা বন্ধ করে।	
৪	ডাবর আমলা কেশতৈল চুল অকালে পাকতে দেয় না।	
৫	ডাবর আমলা কেশতৈল খরচ কমায়।	
৬	ডাবর আমলা কেশতৈল খাঁটি ও টাটকা উপাদানে তৈরী।	
৭	ডাবর আমলা কেশতৈল সুন্দর প্যাকিংয়ের জন্য সকলের প্রিয়।	
৮	ডাবর আমলা কেশতৈল চুল ঘন করে ও গোড়া শক্ত রাখে।	
৯	ডাবর আমলা কেশতৈল চুল দীর্ঘ করে ও কালো রাখে।	
১০	ডাবর আমলা কেশতৈল চুল রেশমের মত কোমল ও চকচকে রাখে।	

আপনি নিয়মিত যে কেশতৈল ব্যবহার করেন তার নাম এখানে লিখুন ....

যোগদানের শেষ তারিখ ৩০শে জুন ১৯৬৮

পুরো নাম..............................
(বড় অক্ষরে)..............................
পিতার/স্বামীর নাম..............................
ঠিকানা..............................
গ্রাম.................. পোষ্ট..................
জিলা.................. রাজ্য..................
যে দোকান থেকে কুপন সমেত আমাদের কেশতৈল কিনেছেন
তার নাম ও ঠিকানা..............................

প্রতিযোগিতার কুপন
আঠা দিয়ে এখানে
এঁটে দিন

প্রবেশপত্র এই ঠিকানায় পাঠান :

'ডাবর আমলা কেশতৈল পুরস্কার প্রতিযোগিতা'

ডাবর (ডাঃ এস. কে. বর্মণ) প্রাইভেট লিঃ, ১৪২ রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা-২৯

Western/D. 68

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

*

দেশ

৩৫ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৩৪
শনিবার ৮ আষাঢ়, ১৩৭৫

*

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৪৫৪১

*

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক ... ২৫.০০
ষাণ্মাসিক ... ১২.৫০
ত্রৈমাসিক ... ৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক ... ৩০.০০
ষাণ্মাসিক „ ... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক „ ... ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক ... ৩০.০০
ষাণ্মাসিক „ ... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক „ ... ৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক ... ৫২.০০
ষাণ্মাসিক „ ... ২৬.০০
ত্রৈমাসিক „ ... ১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক ... ৩১.০০
ষাণ্মাসিক ... ১৯.৫০
ত্রৈমাসিক ... ১০.০০

*

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাসুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday, 22 June, 1968

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে সংকট

পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক অসন্তোষ বা বিক্ষোভ একটা গুরুতর ব্যাধির আকার নিয়েছে। ভারতের আর কোথাও ঠিক এতটা অসন্তোষ আছে কিনা সন্দেহ, অথবা অসন্তোষ থাকলেও তার বাহ্য প্রকাশ এমন তীব্র হয়ত নয়। পশ্চিমবঙ্গে কলকারখানা কিছু কম নয়, কিন্তু যাকে শিল্পোন্নত রাজ্য বলে বাহবা দেওয়া যায়, এই রাজ্যের সেই বাহবা পাবার যোগ্যতাও আর নেই। দেশময় ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা আসার পর থেকে এই রাজ্যের শিল্পেও যথেষ্ট মন্দা দেখা দিয়েছিল। গত বছর যুক্তফ্রন্টের আমলে সেই অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে পড়ে। এক দিকে মন্দার চাপ, অন্য দিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা, এবং সেই সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের কিছু হঠকারিতা, যার ফলে '৬৭ সালের পশ্চিমবঙ্গে কলকারখানার নাড়ি ক্রমশই মন্থর হয়ে আসে। নিত্য 'ঘেরাও', বিক্ষোভ, আন্দোলন। দেখতে দেখতে কলকারখানার দরজা বন্ধ হয়ে আসতে লাগল, লক-আউট, ছাঁটাই, বেকারী—কি আর বাকি থাকল! যুক্তফ্রণ্ট অবশ্য শেষ সময়ে রাজ্যের এই চরম ক্ষতিটা বুঝতে পেরেছিলেন, শিল্পকে আবার বাঁচিয়ে তোলার কথাও কয়েকজন নেতার মুখে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু ততদিনে পট পরিবর্তন হয়ে গেছে। রাষ্ট্রপতির শাসনেও যে এই সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে এমন কথা বলি না, কিন্তু সকলেই স্বীকার করবেন, আমাদের বন্ধ কলকারখানার দরজা খোলার চেষ্টা শুরু হয়েছে, কিছু কিছু কলকারখানা আবার খুলেছে, বহুৎ দু'-একটি শিল্পসংস্থা পুনরায় চালু হয়েছে। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার যে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সংকটের একটা সুরাহা করতে উদ্যোগী হতে চাইছেন, এটা অন্তত স্বীকার করা যায়।

আমাদের বর্তমান অবস্থা কি? সরকারী একটা হিসেব-মত এক শো' আঠারোটি শিল্পসংস্থা এখনও বন্ধ, এবং তিরিশ হাজার কর্মী বেকার। আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, ওই এক শো' আঠারোটি কলকারখানার তিরিশ হাজার কর্মীর চাকরি নেই। এর সঙ্গে যদি আমরা নতুন, সক্ষম বা ভাবী কর্মীর একটা অঙ্ক যোগ করতে চাই তবে বেকার শ্রমিকের সংখ্যা আরও বাড়ে। এই অবস্থায় দেখা যাচ্ছে, জটিলতা আরও বাড়ছে, নতুন করে ধর্মঘটের একটা ঢেউ এসে পড়েছে মাথার ওপর। এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ধর্মঘট বস্ত্র ও পাট শিল্পে ধর্মঘট ইত্যাদি। এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ধর্মঘটের পরিণাম কি হবে বলা যায় না। এখন পর্যন্ত এমন কোনো ভরসা নেই যে ধর্মঘট হবে না। শেষ সময়ে কিছু দিনের মতন আশঙ্কাটা ধামাচাপা পড়ে থাকল এই মাত্র। আগামী পয়লা জুলাই থেকে বস্ত্রশিল্পে অবিরাম ধর্মঘটের প্রস্তাব রয়েছে। এ রাজ্যের কাপড়কলের সাতটি আগে থেকেই বন্ধ, বাকি ক'টি বন্ধ হয়ে গেলে সোনায় সোহাগা হবে, আরও হাজার পঞ্চাশ শ্রমিক বেকার হবেন। অতঃপর, আরও বিভিন্ন শিল্পে ধর্মঘট এবং আরও বেকার বৃদ্ধি।

আমরা শ্রমিক-স্বার্থের প্রতি সর্বদাই সহানুভূতিশীল, কিন্তু আজকের অবস্থায় এই ধর্মঘটের হিড়িকের অর্থ স্পষ্ট বুঝি না। সন্দেহ হয়, বর্তমানে শিল্পের যে অবস্থা তাতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘটের ডাক দিলেই মালিকপক্ষ ধর্মঘটিদের দাবি-দাওয়া মেনে নেবেন। বোধ করি, আর্থিক অবস্থার খানিকটা উন্নতি এবং শিল্পের এই অস্বচ্ছন্দ ভাব খানিকটা না কেটে গেলে মালিকপক্ষ সব দাবি মেনে নেবেন না। চোখের সামনেই এমন উদাহরণ রয়েছে, যেখানে বড় একটি-দুটি এঞ্জিনিয়ারিং সংস্থাকে দরজা খোলাতে রীতিমত বেগ পেতে হয়েছে, তা ছাড়া কর্মী-গ্রহণের ব্যাপারেও শ্রমিক পক্ষের চাপ বিশেষ কাজে দেয় নি।

বলা বাহুল্য, আর্থিক এই দুর্গতির এবং অনিশ্চয়তার সময় একটির পর একটি ব্যাপক ধর্মঘট আমাদের যথেষ্ট বিব্রত করবে। যাঁদের স্বার্থের জন্য এই ধর্মঘট, জানি না, তাঁরা কত দূর লাভবান হবেন। তবে, অনেকেরই ধারণা, আগামী নির্বাচনের আগে রাজ্যের আবহাওয়া উত্তপ্ত করে দেবার বাসনাতেই রাজনৈতিক দলের এই অপচেষ্টা। অভিযোগটি আমাদের পক্ষে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, কেননা আগামী নির্বাচনের আগে সব দলই নিজের তরফে উজান পাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন এটাই স্বাভাবিক। তবে শ্রমিক-সমস্যা অথবা শিল্প-সমস্যা কি তাতে মিটবে?

ছেলেবেলায় শ্রীঅতুল্য ঘোষের একমাত্র প্রিয় খেলা ছিল ঘুড়ি ওড়ান। ছাদের উপর দাঁড়িয়ে ঘুড়ি ওড়াতেন, আর তখন যাঁরা রাজনীতির আসরে ছিলেন দিকপাল তাঁদের দূর থেকে লক্ষ করতেন। ছেলেবেলার খেলাটা তিনি বোধহয় আজও ভুলতে পারেন না, তাই দেখা যায় প্রায়ই বর্তমান রাজনীতির আলসেয় দাঁড়িয়ে ঘুড়ির সুতোর কাটার খেলায় মেতে ওঠেন। অপরের ঘুড়ি কাটতে হলে নাকি অনেক সুতো ছাড়তে হয়, অনেক ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। শ্রীঅতুল্য ঘোষ জানেন রাজনীতির আসরটাও তাই ঘুড়ি কাটার মত অনেক ধৈর্য, অনেক প্রতীক্ষা, বহু আলোচনা দাবি করে। তিনি জানেন সে দাবি কিভাবে মেটাতে হয়।

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে দেখেই এ কথাটা বোঝা যায়। তিনি আবার কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন। আড়ম্বরে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি-পত্রে সই করেছেন। তিনি একা আসেন নি, তাঁর সঙ্গে এসেছেন আরও ১২।১৩জন। তাঁরা সবাই ছিলেন লোক দলের সদস্য। যে লোক দলের সভাপতি ছিলেন ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং প্রধান নেতা ছিলেন শ্রীহুমায়ুন কবীর। শ্রীকবীর শেষ পর্যন্ত বাধা দিয়েছেন, বিরোধিতা করেছেন ডাঃ ঘোষের প্রস্তাবের। কিন্তু শ্রীকবীর তবু লোক দলের কার্য-নির্বাহক সমিতিতে ডাঃ ঘোষের প্রস্তাবকে বাধা দিয়ে নাকচ করিয়ে দিতে পারেন নি। প্রস্তাব ছিল লোকদলের রাজনৈতিক অস্তিত্ব মুছে দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যাওয়া। এই মিশে যাওয়ার মধ্যে প্রত্যক্ষ কোন শর্ত ছিল না, কোন রাজনৈতিক চাপও ছিল না। ছিল না বলেই শ্রীকবীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় বিপুল ভোটাধিক্যে।

লোক দলের কাছে, এবং বিশেষভাবে শ্রীহুমায়ুন কবীরের কাছে এটাই ছিল উল্লেখযোগ্য বাস্তবতা। এ কথা ঠিক যে, ডাঃ ঘোষের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার ফলেই শ্রীকবীরের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল লোক দলকে নূতন রাজনৈতিক দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। তবু বাস্তবকে মেনে নিলে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, শ্রীকবীরের নেতৃত্ব লোক দলের সদস্যদের কাছে অপরিহার্য ছিল। ডাঃ ঘোষের রাজনৈতিক 'ইমেজ' যাই থাক না কেন, শ্রীকবীরের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ফিরে এসেছিল এই লোক দলকে কেন্দ্র করেই। তাই অনেকেরই ধারণা ছিল যে, লোক দলের কার্যকরী সমিতির সভায় অধিকাংশ সদস্যই শ্রীকবীরের বিরোধিতাকে সমর্থন জানাবে। ফলে, এমন আশংকাও ছিল যে, ডাঃ ঘোষকে হয়ত পরাজয়ের গ্লানি স্বীকার করেই লোক দল থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। তাই অনেকের ধারণা ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ দল হিসাবে ডাঃ ঘোষ এবং তাঁর অনুগামীদের চলে যেতে হবে কংগ্রেসের দরজায়। তার ফলে হয়ত, বড় একটা অংশ শ্রীকবীরের সঙ্গে থেকে যাবে লোক দলের কাছে। কিন্তু থাকল না। কার্যকরী সমিতির বেশীর ভাগ সদস্যই দল ছেড়ে চলে গিয়েছেন কংগ্রেসে। এক অস্বস্তিকর সংখ্যালঘিষ্ঠতা নিয়ে থেকে গেলেন শ্রীহুমায়ুন কবীর।

বিজ্ঞপ্তি

'কবির সঙ্গে ইওরোপে'র লেখিকা বর্তমানে ভারতের বাইরে থাকায় নিরুপায় হয়েই তাঁর লেখা আপাতত কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখতে হল। —সম্পাদক

শ্রীকবীর এটাকে রাজনীতির খেলায় পরাজয় হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। সেই স্বীকারোক্তিটাই বেরিয়ে এসেছে তাঁর প্রতিবাদের ভাষায়। তিনি দলগতভাবে সাংগঠনিক বৈধতার প্রশ্ন তুলেছিলেন। অবশ্য লোক দলের সাংগঠনিক কোন বিধি বিধান আছে বলে শোনা যায় নি। কারণ, সে প্রচেষ্টার সুযোগ এ পর্যন্ত হয় নি। তবু শ্রীকবীর দাবি করেছিলেন যে, কার্যকরী সমিতির ভোটে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার সদস্যদের নেই। তিনি মনে করেন, লোক দলের সাধারণ অধিবেশনেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রশ্নটা উঠেছিল যে, কার্যকরী সমিতির বাইরে লোক দলের কোন সংগঠন আছে কিনা। নেই। সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠা এখনও হয় নি। ফলে, প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী সমিতিই লোক দলের মুখ্য সংগঠন। এর বাইরে সিদ্ধান্ত নেবার মত উপযুক্ত কোন সংগঠন আছে বলে এ পর্যন্ত শোনা যায় নি।

নেই বলেই শ্রীকবীরকে এখন ডাকতে হয়েছে লোক দলের কনভেনশন। সাধারণ সভা নয়। এই কনভেশনের সিদ্ধান্ত যা-ই হোক না কেন, সে সিদ্ধান্ত কার্যকরী সমিতির পক্ষেও গ্রহণযোগ্য হবে কিনা সে প্রশ্ন নিশ্চয়ই থেকে যাবে। কার্যকরী সমিতির যেটুকু টুকরো শ্রীকবীরের কাছে পড়ে আছে সেটা পুনর্গঠিত নিশ্চয় করা হবে; কিন্তু সেটা প্রকৃতপক্ষে হবে লোক দলের নূতন সংগঠন। প্রকৃতপক্ষে, লোক দলের রাজনৈতিক অস্তিত্বর অনেকাংশ মুছে গিয়েছে, আর সেই সঙ্গে শ্রীকবীর জড়িয়ে পড়েছেন রাজনৈতিক নিঃসঙ্গতার মধ্যে। এই নিঃসঙ্গতার জন্যই তাঁর নিজস্ব লোক বলে যাঁরা ছিলেন লোক দলের মধ্যে তাঁদেরও ধরে রাখতে পারেন নি। তাঁরা শেষ মুহূর্তে চলে গিয়েছেন ডাঃ ঘোষের সঙ্গে কংগ্রেসে। কারণ, তাঁদের কাছে এটাই মূল বাস্তব যে, মধ্যবর্তী নির্বাচনে তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। গত নির্বাচনে যে কংগ্রেস-বিরোধী হাওয়া স্পষ্টভাবে তাঁদের নির্বাচনকে সার্থক করে দিয়েছিল, সে হাওয়া আর বইবে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিয়েছে বলেই তাঁদের পক্ষে আর অ-সংগঠিত এলাকায় থাকা সম্ভব নয়। শ্রীকবীরের নিজস্ব নেতৃত্ব থাকতে পারে, কিন্তু লোক দলের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা নেই। সেটা লোক দলের বেশীর ভাগ সদস্য বোঝেন বলেই তাঁরা আর শ্রীকবীরের সঙ্গে থাকতে রাজী হন নি। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষও এ কথাটা বোঝেন যে, কংগ্রেস সংগঠন এবং শ্রীঅতুল্য ঘোষের নেতৃত্ব তাঁর কাছে আজ আর উপেক্ষণীয় নয়। একান্তভাবেই গ্রহণযোগ্য।

এটা না বুঝলে ডাঃ ঘোষ কংগ্রেসে ফিরে

যেতেন কিনা সন্দেহ। কারণ, অতীতের পাতা খুঁজলে দেখা যাবে, ডাঃ ঘোষ তাঁর নিজস্ব এবং ব্যক্তিগত কারণে তাঁর রাজনৈতিক চেহারাটা বহুবার বদল করে নিয়েছেন। কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গেও তাঁর নূতন পরিচয় নয়। শুধু তাই নয়, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি বহু বছর। এবং কংগ্রেসের নেতা হিসাবেই তিনি স্বাধীন পশ্চিম বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী রূপে রাজ্যের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু সে দায়িত্ব পালন করার অধিকার তাঁর হাতে বেশী দিন ছিল না। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস সংগঠন এবং নেতৃত্বে যে পরিবর্তন আসে সেটা দেখা দিয়েছিল ডাঃ ঘোষের মুখ্যমন্ত্রীত্বের সময়। তিনি তখন কংগ্রেসের অবিসম্বাদী নেতা এবং মুখ্যমন্ত্রী। সেই হিসাবেই তিনি গিয়েছিলেন মেমারীতে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস কর্মী সম্মেলন উদ্বোধন করতে। সেই সম্মেলন যাঁরা আহ্বান এবং সংগঠন করেছিলেন তাঁরাই আজ পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের মূল নেতৃত্ব।

এই মেমারী সম্মেলনে ডাঃ ঘোষের উদ্বোধনী ভাষণের পরই একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং তাঁর সমর্থক কংগ্রেস কর্মীরা। এই প্রস্তাবের কথাটা শোনার পরই ডাঃ ঘোষ প্রবল দুর্যোগ উপেক্ষা করে রাতেই ফিরে এসেছিলেন কলকাতায়। কাজেই শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের প্রস্তাবটা যখন গৃহীত হয় তখন ডাঃ ঘোষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। এই প্রস্তাবের মূল কথা ছিল যে, বাংলা দেশ ভাগ করে যখন পশ্চিম বাংলা সৃষ্টি হয়েছে তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও পশ্চিম বাংলার জন্য পুনর্গঠিত করা হোক। প্রস্তাবটা নীতিগতভাবে সাংগঠনিক, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তখনকার বাংলা দেশের কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ ছাড়া এ প্রস্তাবের অন্য কোন ভাষ্য তখন শোনা যায় নি।

অন্য কোন ভাষ্য ছিল না বলেই মেমারী সম্মেলনের কিছু পরেই বাংলা কংগ্রেস, তথা পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধটা তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এ বিরোধের গণ্ডী এড়িয়ে যেতে পারেন নি ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস পরিষদীয় দলের মধ্যে ডাঃ ঘোষের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং এই পরিষদীয় দল ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে দলের নেতা হিসাবে নির্বাচিত করে। এটা নিঃসন্দেহে ছিল ডাঃ ঘোষের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অনাস্থাজ্ঞাপক এবং তিনি সেটা মেনে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। এই পদত্যাগের পর থেকেই ডাঃ ঘোষ নিজেকে ক্রমশ কংগ্রেসের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ছেড়ে চলে যান। তখনকার এই ইতিহাসের পিছনে যাঁরা ছিলেন তাঁরাই আজ পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের সমগ্র সংগঠন ও রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করেন।

তারপর থেকে ডাঃ ঘোষ কোন দিন রাজনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে। সেই প্রতিবাদকে সংগঠিত করেই সৃষ্টি হয়েছিল কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি। এই নূতন পার্টি সংগঠনের অনেকটা অংশেই জড়িয়ে ছিলেন ডাঃ ঘোষ। তবু এ পার্টি টেকেনি। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে নানা পরিবর্তনের মধ্যে এই সংগঠন এগোবার চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত সোশ্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে এক হয়ে প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টি বা বর্তমানের পি-এস-পি সংগঠিত হয়েছে। ডাঃ ঘোষ এই পি-এস-পির সঙ্গেও নেতা হিসাবে সংযুক্ত ছিলেন বেশ কিছু দিন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকতে পারেন নি। পার্টির নেতৃত্ব হাত বদল হবার সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ ঘোষও সরে দাঁড়িয়েছিলেন প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টি থেকে। অবশেষে [illegible] নির্বাচনে পরাজিত হয়ে নিজেকে সরিয়ে নিলেন রাজনীতি থেকে।

এখান থেকেই ডাঃ ঘোষ হয়ে গেলেন নির্দলীয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে হলেন নিঃসঙ্গী। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গতা কোনরকমেই প্রতিষ্ঠা দিতে পারে না। ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলনের সময় নিরপেক্ষ হিসাবে একবার চেষ্টা করেছিলেন নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে। পারেন নি। তখনই বুঝেছিলেন নিরপেক্ষতার পরিবর্তে নেতৃত্ব

দাবি করা যায় না। এটা আরও বেশী বুঝেছিলেন গত সাধারণ নির্বাচনের পর। চতুর্থ নির্বাচনে ডাঃ ঘোষ ছিলেন নিতান্তই নির্দলীয় প্রার্থী। নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে জয়লাভ করেও তাঁর স্বস্তি ছিল না। কারণ, তিনি চাইছিলেন প্রতিষ্ঠা। তাই কংগ্রেস যখন একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারল না; তখন তিনি যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠেছিলেন কংগ্রেস-বিরোধী ক্যাম্পে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। নির্বাচনের আগে এবং পরে অনেকগুলো কংগ্রেস বিরোধী বক্তৃতা দিয়ে আসর জমাবার চেষ্টা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, পশ্চিম বাংলায় প্রথম কংগ্রেস বিরোধী সরকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা যখন সুনিশ্চিত হয়ে উঠেছে তখন কংগ্রেস বিরোধী দলগুলোকে ঐক্যবন্ধ করার প্রচেষ্টার মধ্যে তিনি নিজেকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়েও ফেলেছিলেন। তবু তিনি যুক্ত ফ্রন্টের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হতে পারেন নি। হয়েছিলেন শ্রীঅজয় মুখার্জি; কারণ, তিনি ছিলেন নিতান্তই নির্দলীয় সদস্য।

আশা ভরসা যদি কোথাও হয়ে থাকে, ডাঃ ঘোষ অবশ্য তা কখনও প্রকাশ করেন নি। বরং যুক্ত ফ্রন্টের মন্ত্রী হিসাবে তিনি যেদিন রাজভবন থেকে বেরিয়ে এলেন, তার আগের দিন ময়দানের সভায় দাঁড়িয়ে এ কথাটাই জনসাধারণকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, কংগ্রেসের দুর্বিসহ বোঝা জনসাধারণের ঘাড় থেকে নেমে গিয়েছে। সে জন্য তিনি আন্তরিকভাবে আনন্দিত। এ কথাও বলেছিলেন যে, কংগ্রেস বিরোধী সরকারের এবং যুক্ত ফ্রন্টের এটাই লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কংগ্রেস আর কখনও ক্ষমতায় ফিরে আসতে না পারে। তিনি প্রথম অ-কংগ্রেসী সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন নি; কিন্তু খাদ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন কংগ্রেস শাসনের মুখ্যমন্ত্রী এবং খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের চ্যালেঞ্জ হিসাবে।

তখন অবশ্য ডাঃ ঘোষ জানতেন না যে, যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা হবার কিছু দিনের মধ্যেই কংগ্রেসের কাছ থেকে এমন কোন আশ্বাস পাওয়া যাবে যাতে তাঁর প্রতিষ্ঠা আরও সুনিশ্চিত হতে পারে। সে আশ্বাস খুব শীঘ্রই এসেছিল কংগ্রেসের এমন এক অংশ থেকে যে অংশ সক্রিয়ভাবে শ্রীঅতুল্য ঘোষের নেতৃত্ব খর্ব করার জন্য ব্যগ্র। সে আশ্বাস ডাঃ ঘোষের কাছে অ-গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি; কারণ, পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস সংগঠন তখন অনৈক্যের সংশয়ে দুলছে। শ্রীঅতুল্য ঘোষ তখন কংগ্রেসের দিল্লীর নেতৃত্বের চাপে পড়ে অনিশ্চয়তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে ব্যস্ত। তাই কংগ্রেসকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ করতে যতটুকু করা প্রয়োজন সেটুকু করতে ডাঃ ঘোষের মনে তখন কোন দ্বিধা ছিল না। শ্রীঅতুল্য ঘোষ তখন ডাঃ ঘোষের কাছে রাজনৈতিক বিচারে বিশেষ কোন নেতৃত্ব হিসাবে দেখা দেন নি। তাই ২৬ জুলাই ১৯৬৭ সালে ডাঃ ঘোষ একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জির কাছে। এটা ছিল তাঁর পদত্যাগ পত্র। কারণ, তাঁর ধারণা ছিল, তিনি একা বেরিয়ে যাবেন না সেদিন যুক্ত ফ্রন্টের মন্ত্রিসভা থেকে।

কিন্তু সে পদত্যাগপত্র তিনি ফিরিয়ে নিলেন; কারণ, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জির সঙ্গে তখন তাঁর আলোচনা শেষ হয়ে গিয়েছে। তখন তিনি জেনে গিয়েছিলেন যে, বেরিয়ে যেতে হলে সেদিন তাঁকে একাই চলে যেতে হবে। এবং হয়ত নির্দলীয় হিসাবে। তিনি ফিরে এলেন। তারপর এল ২ অক্টোবরের ঘটনা। যে ঘটনা শ্রীঅজয় মুখার্জির বর্তমান রাজনৈতিক জীবনে একটা বিশিষ্ট উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভিন্ন কারণে ২ অক্টোবরের ঘটনা ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের কাছেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ২ অক্টোবরের ঘটনার পর কংগ্রেস মহলের একাংশে যে দারুণ নৈরাশ্য এবং ক্ষোভ দেখা দিয়েছিল সেটা ডাঃ ঘোষের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। শুধু তাই নয়, শ্রীঅজয় মুখার্জি যে তখন কংগ্রেস মহল থেকে মুছে গিয়েছে এটা তাঁর জানতে বেশী দেরি হয় নি। এটাও তাঁর কানে এসেছিল যে, কংগ্রেস মহল থেকে আরও একটা নাম প্রচ্ছন্নভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। সে নাম ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

সেদিন থেকেই ডাঃ ঘোষ প্রচ্ছন্নভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন যুক্ত ফ্রন্টের মধ্যে তাঁর নিজস্ব ফ্রন্ট তৈরী করার জন্য। নির্দলীয় ফ্রন্ট নয়। এমন একটা ফ্রন্ট, যেটা কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে দ্বিধা করবে না এবং তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেবে। তিনি বাংলা কংগ্রেস বা প্রস্তাবিত ক্রান্তি দলের কেউ ছিলেন না। তবু তিনি হাত মেলালেন শ্রীহুমায়ুন কবীরের সঙ্গে; কারণ, শ্রীকবীর তখন শ্রীঅজয় মুখার্জিকে মুখ্যমন্ত্রীত্ব এবং নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেবার জন্য কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন। ডাঃ ঘোষ নিশ্চয়ই জানতেন যে, শ্রীকবীর শ্রীঅতুল্য ঘোষের সঙ্গে খুব বেশী ঘনিষ্ঠ নন। তা ছাড়া শ্রীকবীরের প্রত্যক্ষ সমর্থন না থাকলে যুক্ত ফ্রন্টের মধ্যে নিজস্ব ফ্রন্ট সংগঠনও সম্ভব ছিল না। এই ফ্রন্টেরই আত্মপ্রকাশ ঘটল তাঁর পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এবং যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের মুহূর্তে। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হলেন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পরম নির্ভরশীল আশ্বাস এসেছিল তাঁর কাছে শ্রীঅতুল্য ঘোষের কাছ থেকে। সে আশ্বাসের প্রতিধ্বনি তুলে ডাঃ ঘোষ একান্তভাবে স্বীকার করে নিলেন কংগ্রেসকে, যে কংগ্রেস থেকে তিনি একদিন বেরিয়ে গিয়েছিলেন, এবং সেইসঙ্গে শ্রীঅতুল্য ঘোষের নেতৃত্বকে। সেই দিনই ডাঃ ঘোষের কংগ্রেসে ফিরে আসা সুনিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, তবু তিনি আসেন নি। কারণ, শ্রীঅতুল্য ঘোষ জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর প্রতি কংগ্রেসের সমর্থনের মধ্যে কোন শর্ত নেই। তবু ডাঃ ঘোষ ইচ্ছে করলে সেই দিনই কংগ্রেসে ফিরে আসতে পারতেন "সসম্মানে"; কিন্তু তাঁর সঙ্গে আরও অনেকের ফিরে আসাটা তখনও সুনিশ্চিত হয় নি। তা ছাড়া মধ্যবর্তী নির্বাচন যখন সামনে তখন লোক দলকে কংগ্রেসের বাইরে রাখা কংগ্রেসের পক্ষে সুবুদ্ধি বলে মনে হয় নি। তাই প্রতীক্ষায় থাকতে হয়েছে, অনেক আলোচনাও করতে হয়েছে।

তাই অপেক্ষা করতে হয়েছে ঘুড়ির সুতোটা কেটে দেবার জন্য। যেটুকু সুতো শ্রীকবীরের হাতে থেকে গেছে তাতে ঘুড়ি উড়বে কিনা বলা কঠিন; তবে এটাও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, ডাঃ ঘোষের হাতেও আর সুতো নেই। তাঁর ঘুড়ির সুতোটা এখন অন্য হাতে।

বিদেশিকী

ছাত্র-বিদ্রোহের রোমাঞ্চ

বার্কলি থেকে বার্লিন, প্রাগ থেকে প্যারিস, ছাত্ররা চঞ্চল, বিক্ষোভে, বিদ্রোহে টলমল। রোম, ম্যাড্রিড, টোকিও পিছিয়ে নেই; ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে জন বুলের পোষমানা বাচ্চারাও, কী আশ্চর্য, বিদ্রোহের বাণী শোনাচ্ছে। মার্ক্সের মন্ত্র ছিল, দুনিয়ার মজদুর এক হও; এখন নিও-মার্ক্স, অধ্যাপক মার্কুস যাঁর নাম। একলা মার্কুস নন, আছেন আরও অনেকে। "দুনিয়ার মজদুর এক হো" আওয়াজ কবেই মিইয়ে গেছে; নিও-মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিকরা আওয়াজ তুলেছেন, মধ্যবিত্ত ছাত্র যুবশক্তিই বিপ্লবী শক্তি। নজরুল ইসলামের গানের কলি, "আমরা শক্তি, আমরা বল, আমরা ছাত্রদল" বুঝি সারা দুনিয়ায় ছাত্র-শক্তির ঐকতান এখন। চমক যতটা লাগায় শক্তি কি সত্যিই ততখানি! প্যারিসে, ফ্রান্সের আরও নানা শহরে ছাত্রবিদ্রোহের জোয়ারে ভাটার টান। রাস্তার লড়াই, বিশ্ব-বিদ্যালয় দখল, এমনতর আরও নানারকম নাটকীয় অতিনাটকীয় সংগ্রামকৌশল বিপ্লবকে কতটুকু এগিয়ে নিতে পারল, কতটুকুই বা এগিয়ে নিতে পারে?

দুনিয়ার ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে বিক্ষোভ বিদ্রোহের প্রচণ্ড আলোড়ন এই প্রথম ঘটছে না। যাঁরা ছাত্রশক্তির বৈপ্লবিক সামর্থ্যে বিশ্বাসী তাঁরা কতকগুলি নজীরও হয়তো দেখাতে পারেন। সাম্প্রতিক কালের নজীর—১৯৬৪ সনে বলিভিয়া, দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও সুদানে গভর্নমেণ্টকে গদিচ্যুত করায় ওই সব দেশের ছাত্র-বিক্ষোভ-কারীদের ভূমিকা ছিল অনেকখানি। ১৯৬০ সনে দক্ষিণ কোরিয়ায় সীংম্যান রী-র রাজত্ব খতম হয় ছাত্র-বিক্ষোভের ফলে। জাপানে মার্কিনবিরোধী ছাত্র-বিক্ষোভ তো বছর বছর লেগে আছে: বৈপ্লবিক সাফল্য খুব বেশি নয়, জাপানের বামপন্থী ছাত্ররা মার্কিন-জাপান নিরাপত্তা চুক্তি রদ করতে পারেনি, তবে তাদের বিক্ষোভের ফলে ১৯৬০ সনে প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাউয়ারের জাপান-সফর বাতিল হয়েছিল। পোলাণ্ড, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়ায় ছাত্র-বিক্ষোভ কম্যুনিস্ট শাসনব্যবস্থার কঠোরতা অনেকটা নমনীয় করতে পেরেছে মনে হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে এখন পর্যন্ত পারেনি, বরঞ্চ ব্রেজনেভের নেতৃত্বে ইয়ং কম্যুনিস্ট লীগের খবরদারী ব্যবস্থা আরও আঁটসাঁট করা হচ্ছে। যুগোশ্লাভিয়ায় প্রেসিডেণ্ট টিটো ছাত্রদের দাবি মৌখিকভাবে অন্তত স্বীকার করেছেন। কম্যুনিস্ট একদলীয় শাসনের মৌল পরিবর্তন ঘটানো অবশ্য সহজ নয়, সহজ নয় পশ্চিমী ধনগণতন্ত্রী সমাজের রূপান্তর ঘটানো।

ছাত্র-বিদ্রোহ সংহিতাকারদের তবু বিশ্বাস, বার বার আঘাত হেনে, সংকট সৃষ্টি করে ছাত্ররাই সনাতন সমাজকে ভাঙতে পারবে, বিপ্লব ঘটাবে। আদর্শবাদী তারুণ্যের আশা দুর্মর, আত্মবিশ্বাস প্রচণ্ড, সে-বিষয়ে সন্দেহ কী! বলশেভিক বিপ্লবের আগের কালে সব স্বৈরাচারী রাষ্ট্রে ছাত্ররাই ছিল বৈপ্লবিক আন্দোলনের একমাত্র শক্তি-প্রায়। পরাধীন ভারতবর্ষেও তাই দেখা গেছে। চীনে মাঞ্চু রাজবংশের পতন, সান ইয়াত সেনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাফল্য, এ-সবের পিছনেও ছিল ছাত্রশক্তির দুর্জয় সংকল্প। জারের আমলের রাশিয়ায় ১৯০৫ সনের বিপ্লব প্রচেষ্টায় পর্যন্ত মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই ছিল সংগ্রামের পুরোভাগে। রাজপথে বিক্ষোভের কায়দা রুশ মজুররা নাকি আয়ত্ত করে রুশ ছাত্রদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। ছাত্রশক্তির সংগ্রামসামর্থ্য সম্পর্কে এই শতাব্দীর ইতিহাসে নির্ভরযোগ্য নজীর প্রচুর। ছাত্র-বিপ্লবের কোন কোন তাত্ত্বিক তাই বনেদী মার্ক্সীয় সূত্র অগ্রাহ্য করে বলছেন, মজুর শ্রেণী নয়, ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীরাই বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানোর উপযুক্ত শক্তি। ছাত্রশক্তি অতখানি জোরাল কি না সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। আপাত-বিচারে এইটুকু দেখা যায় যে, মার্ক্স যে-সর্বহারা শ্রেণীকে বিপ্লবের উৎসর্গীকৃত শক্তি মনে করেছিলেন সে-রকম সর্বহারা শ্রেণী মজুররা এখন অনেক দেশেই নয়।

সমাজব্যবস্থায় ভাঙন ধরানো, উলট-পালট ঘটানোর গরজ ফ্রান্স, ইতালির মজুরদের মধ্যে দেখা যায় না, যদিও তারা বেশির ভাগ কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত। ব্রিটেন, আমেরিকার মজুররা তো বহুকালাবধি সনাতন ট্রেড ইউনিয়নপন্থী। কম্যুনিস্ট দেশগুলিতেই বা কী? পোলাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়ার মজুর সংগঠনগুলি বিদ্রোহী ছাত্রদের বিরোধিতা করেছে। ধন-গণতন্ত্রী পশ্চিম জার্মেনীতে মজুর শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ প্রচুরই, তবু তারা ছাত্রদের বেপরোয়া বিদ্রোহের ডাকে সাড়া দেয়নি। প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ছাত্রদের আন্দোলন একেবারে ভিত্তিহীন, বেয়াড়া উচ্ছৃঙ্খলপ্রবণতা, একথা বলা অবশ্য অন্যায় হবে। অ-কম্যুনিস্ট এবং কম্যুনিস্ট সব রকম রাষ্ট্রেই ছাত্রশক্তি পরি-বর্তনের দাবিতে মুখর, অস্থির দেখা যাচ্ছে। প্রচলিত, ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র, কম্যুনিস্টতন্ত্র, কোনটাই যেন আদর্শবাদী তারুণ্যকে আশ্বাস দিতে পারছে না, বর্তমানকে সহনীয়, ভবিষ্যতকে সম্ভাবনাপূর্ণ দেখাতে পারছে না। ছাত্রশক্তির এই বিদ্রোহপ্রবণতাকে তাই বিশেষ কোন তত্ত্ব, দল বা মতের ছকে ফেলতে পারা কঠিন।

ম্যাক্স বেবার বলেছিলেন, তারুণ্যের ধর্মই হল বিশুদ্ধ চূড়ান্ত আদর্শনীতি অনুসরণ। বয়স্করা যেখানে বুদ্ধিমন্ত, বিজ্ঞ, বাস্তববাদী, কথায় কথায় দায়িত্বশীল আচরণের দোহাই দেন, তরুণরা সেখানে আদর্শনিষ্ঠায় চূড়ান্ত নীতি অনুসরণে আগ্রহী, আপস তাদের ধাতস্থ হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে, সামাজিক নীতিনিয়ম পালনে বয়স্করা গতানুগতিকপন্থী, তরুণরা চায় সব কিছু বিশুদ্ধ আদর্শের নিকষে যাচাই করতে; অকম্যুনিস্ট, কম্যুনিস্ট যে রকম রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থাই হোক না কেন, বিদ্রোহী ছাত্রশক্তি চায় নতুনভাবে তার মূল্যায়ন। এই মূল্যায়নের চেষ্টা থেকে অবশ্য নানারকম পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত তৈরী হচ্ছে। তবে সব সিদ্ধান্তের মূলে রয়েছে যন্ত্রশিল্প সভ্যতার একটানা একরঙা আধিপত্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। ইউরোপ আমেরিকার বিদ্রোহী ছাত্রদের বিশ্বাস পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের প্রকৃত আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত, প্রযোজিত হয় না, হতে পারে না; দক্ষিণপন্থী, বাম-পন্থী সব রাজনৈতিক দলই কতকগুলি বাঁধা নিয়মে চলে, মজুরশ্রেণীও এই সমস্ত দলের প্রভাবে বাঁধা লাইনে চরকি-পাক দেয়, আর ছাত্ররাই নাকি এখনকার কালে সবচেয়ে বেশী শোষিত, কাজেই বিপ্লবের অগ্রণী ভূমিকাও তাদেরই। তত্ত্ব যাই বলুক, বিদ্রোহী ছাত্রদের নাটকীয় ভূমিকা এখানে সেখানে যতই চমক লাগাক, এটা পরিষ্কার যে ছাত্র-শক্তি এককভাবে কোথাও এখনকার কালে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাতে পারে না। ফ্রান্সে ড্যানিয়েল দি রেড, পশ্চিম জার্মেনীতে রুডী ডুশকের সংগ্রামী ভঙ্গির অভিনয়-নিপুণতা রোমাঞ্চকর বটে, কিন্তু বিপ্লব কোন কালেই এক-নায়কী নাটক নয়।

১৭।৬।৬৮

জন্মাদনে

রাধারানী দেবী

আমার অস্তিত্বে করে সচঞ্চল খেলা
উদ্বিগ্ন-অপেক্ষা নিয়ে কাটে তার বেলা
যে-আমি, সতত ক্ষিপ্র, বিরাম বিহীন,
কোন্ তিথি বর্ষে পাবে নিজ-জন্মদিন'

ক্ষিতি অপ্ তেজে গড়া দেহপাত্র তলে
যে-আমির পরিপুষ্টি ভাব-সমুচ্চয়ে,
পিণ্ডাকারে আবদ্ধ সে অন্তর-মহলে
আলোয় আসিতে চায় সদ্যোজাত হয়ে।

জঠর মুক্তির তরে চলে যুদ্ধ ঘোর,
পরিপুষ্ট তনু চায় পৃথিবীর হাওয়া,—
সূর্যালোক-তৃষ্ণা প্রতি রোমকূপে মোর,
মৃত্তিকার স্পর্শ আজও হয়নিকো পাওয়া।

জন্মের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কেটে যায় দিন,
জেনেছি, জন্মের আগে হব মৃত্যুলীন।
১০ই মে, ১৯৬৮

গান লেখা হলো না

তারাপদ রায়

রোদে হাওয়ার একটি গোলাপ,
একটিই শেষ গোলাপ, সখি,
ফুটলো যদি
আমার সবুজ বাগান জুড়ে,

পাখির মত উড়লো সখি,
সেই তো পাখি, সেই গোলাপ,
উড়ে বেড়ায়,
আমার সবুজ বাগান ঘুরে।

কোথায় সেই গোলাপ গেলো,
কোথায় সেই গোলাপী পাখি?
তোমার হাতে এলোমেলো
আমার কিছু
সময়, সখি, রইলো পড়ে,

ইচ্ছে হলে তুলে রেখো
শক্ত একটা বাক্সে ভরে,
ইচ্ছে হলে খুলে দেখো
মধ্যে মধ্যে,
হঠাৎ যদি মনেই পড়ে।

চাবি হারিয়ে গেলে

মঞ্জু মিত্র

হৃদয় সে তো বিকল ঘড়ি
দমের চাবি হারিয়ে গেলে
কোন দেরাজে হদিশ মেলে?
মুঠোর মধ্যে শক্ত দড়ি

বাগিয়ে ধরো। ওপরতলায়
যাঁরা আছেন তাঁরাই সব
আমরা শুধুই জ্যান্ত শব
শক্ত দড়ি নধর গলায়।

ঈশ্বরের হাতের কাছেই কলিও বেল
পাত্র উপুড়, বলুন এবার
হেড-কি-টেল? বাগিয়ে নেবার
এই তো সময়, শক্ত দড়ি
নধর গলায়: পাস-কি-ফেল?

হায়রে চাতক বৃথাই আকাশ
নকল মেঘে সাজানো বাজার
ঠুকরে খাবার কিচ্ছুটি নেই,
দমের চাবি হারিয়ে গেলে
দোষ দিবি তুই কোন রাজার?

সুনন্দর জার্নাল

গোবরে বেশী ঘাস গজায়

ইন্দ্রলুপ্ত

বেশিদিন নয়, বছর তিনেক পরে তাঁর সঙ্গে দেখা। গোল মুখ আর এক জোড়া চশমার মধ্য দিয়ে এমন করে আমার দিকে ড্যাব-ড্যাব করে চেয়ে থাকলেন যে ভদ্রলোককে হঠাৎ চিড়িয়াখানার ফেরারী জীব বলে সন্দেহ হল। আমি খুব রূপবান এমন সন্দেহ আমার শত্রুও করেন না, কিন্তু উল্টো দিক থেকে যে এত দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছি—এ তথ্যটাও ঠিক জানতুম না।

Chandi

ছেলেরা মাথায় 'উইগ' পরতে পারে

পরশুরামের 'স্বয়ম্বরা' গল্পের কেদার চাটুজ্জের মতো আমিও 'ব্লাশ' করলুম। তাঁরই মতো বলতে ইচ্ছে করল, 'আই সুনন্দ রায়—নো জু গার্ডেন।' কিন্তু তার বদলে নায়কোচিত লজ্জিত ভঙ্গিতে আমি বললুম, 'কী দেখছেন?'

'আপনার টাক।'

পিত্তি চটে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মানুষের একটি নিদারুণ ব্যথার জায়গা এটি। এই টাক ছাড়া আমার চেহারায় কি আর কিছুই দেখতে পেলেন না ভদ্রলোক?

তবু আমি স্পোর্টসম্যানের মতো হাসতে চেষ্টা করলুম।

'টাক পড়েছে, কী আর হয়েছে তাতে?'

'বলেন কি! অমন মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল আপনার—'

আচ্ছা স্যাডিস্টিক লোক তো! কিন্তু সহানুভূতির রসিকতাটুকু ওঁকে আমি করতে দিচ্ছি না। অতএব আরো 'কেয়ার-ফ্রী' মেজাজে বললুম, 'ভালো চুল থাকলেই তো ভালো টাক পড়ে মশাই—নইলে খুলবে কেন? টুথ-ব্রাশের বিসলস-এর মতো যাদের চুল, তাদের মাথায় টাক পড়া কি আপনি পছন্দ করেন? কোনো কনট্রাস্ট হবে তাতে? আমার এক মাথা ঝাঁকড়া চুল ছিল বলেই টাকটা আপনাকে অ্যাট্রাক্ট করছে—যে-কোনো বাজে চুলে একটা আন-ইমপ্রেসিভ টাক থাকলে আপনি চেয়েও দেখতেন না।'

চশমার পেছনে ভদ্রলোকের চোখ দুটো পিটপিট করতে লাগল: 'আপনি ঠাট্টা করছেন। সত্যি, আপনার চুলের জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু আমি বেশ সুখে আছি।'

'তাই নাকি? ও আচ্ছা, নমস্কার—'

খুব ব্যাজার হয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

ব্যাজার হলেন কি আমার মাথার এই সুবিশাল ইন্দ্রলুপ্তটির জন্যে? না—আদৌ নয়, ও-রকম পরদুঃখকাতরতা নাইনটিনথ সেঞ্চুরীর পরেই পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে গেছে। ভদ্রলোক দুঃখ পেলেন আমাকে দুঃখিত করবার অভিসন্ধিটি কাজে লাগল না বলে। সব সাধু চেষ্টাই সর্বদা সফল হয় না।

কিন্তু বিশ্ব-সংসারে এত লোক থাকতে আমার প্রতি ও'র এই ম্যাগনেটিক আকর্ষণ কেন? কারণটা অত্যন্ত সোজা। আমার তো তবু কানের আশেপাশে, ঘাড়ের কাছাকাছি কোনো বিধ্বস্ত সেনাবাহিনীর আহত ক'জন সৈনিকের মতো কয়েকগাছা চুল এখনো দাঁড়িয়ে—অর্থাৎ কোনো সেলুন-ওলাকে এখনো আমি মিনিট দশেকের অকুপেশন দিতে পারি। কিন্তু ও'র ক্ষেত্রে 'ওথেলোজ অকুপেশনজ গন'—অমন নির্মল নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র বিনিন্দিত টাক এর আগে আর কখনো দেখেছি কিনা সন্দেহ!

বছর কুড়ি থেকেই এই সৌন্দর্য আমি প্রত্যক্ষ করছি—আমার ধারণা ওই গৌরবটিকে শিরোভূষণ করেই উনি পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন—জন্মাবধি চুলের জন্যে এক পয়সাও তেল-ক্রীম-শ্যাম্পু-লোশন-চিরুনি-হেয়ার ব্রাশ ওঁকে খরচ করতে হয়নি—

হিপিরা চৈতন্য ছাঁট গ্রহণ করলে টেকোরা জাতে ওঠে

কোনো হেয়ার-কাটার একটা নয়া-পয়সাও আদায় করতে পারেনি ও'র কাছ থেকে।

আজ খুশি হচ্ছেন আমাকে দলে ভিড়তে দেখে। আশা করছেন, দু-এক বছরের ভেতরে আমার মাথাতেও কিছু আর অবশিষ্ট থাকবে না। সেই ল্যাজকাটা শেয়ালের জ্ঞানগর্ভ উপাখ্যান।

বাঙালী

আমি জানি, পৃথিবীতে টাকপড়া লোকের মতো পরশ্রীকাতর জীব আর নেই—পরকেশকাতর বলাই সঙ্গত। পথে যেতে যেতে যখনই সে দেখে রোদে কিংবা ইলেকট্রিকের আলোয় আর একজনের চাঁদিটি চকচক করে উঠল, তখনই তার মনে হয়—আছে, আছে, আমার মতো আরো অনেকে আছে। যদি নজরে পড়ল, কারো চুল পাতলা হয়ে আসছে, তখনই খুশিতে সে গদগদ করে উঠল : আসছে, তোমারও দিন আসছে। আর নিবিড় কেশধারী ভাগ্যবানদের দিকে তাকালে—নাঃ, সে কথা না বলাই ভালো।

খোঁড়াকে দেখলে আর এক খোঁড়ার সহানুভূতি, দুই বাতের রোগী গভীর সহমর্মিতা অনুভব করেন, দুই ডাইবেটিক মুখোমুখি হলেই হৃদয় ঢেলে দিয়ে ডায়েট-ইনস্যুলিন-ব্লাড-সুগারের পার্সেণ্টেজ—এইসব নিয়ে অতি সহৃদয় আলাপ করতে থাকেন। কিন্তু একজন সটাক অপর টাকবানকে সহ্য করতে পারেন না—পরস্পরের দিকে তাকিয়ে যেন একটা নিদারুণ জিঘাংসা চরিতার্থ হতে থাকে তাঁদের।

অকালে টাকপড়া মানেই যৌবনের প্রতিযোগিতায় বারো আনা বাতিল। হালের কোড-ভাঙা ফিল্মের কথা ঠিক বলতে পারছি না—কিন্তু দেশী-বিদেশী এমন কোনো ভালো ছবির কথা ভাবতে পারেন—যার নায়ক মাথাজোড়া টাক নিয়ে শেষ পর্যন্ত নায়িকাকে লাভ করতে পারল? টাক থাকলে নায়িকার কাকা হওয়া যায়—পরকীয়া-কাহিনীতে নায়িকার ব্যুরোক্র্যাট প্রায়-ভিলেন স্বামী হওয়াও চলতে পারে, কিন্তু নায়কত্ব? নৈব নৈব চ!

অকালে কেন, যথাকালেই বা কে টাক চায়? বয়েসটাকে আড়াল করবার জন্যে পাকা চুলে কলপ দেওয়া যায়, মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়লে বিউটি-ট্রীটমেণ্টও করা যায় বোধ হয়, ভালো খেয়ে দেয়ে টেনিস-ফেনিস খেলে অর্থবানেরা এভার-গ্রীনও থাকতে পারেন বহুকাল—কিন্তু টাক? কলপ চলে না। উইগ পরে থিয়েটারে নামা যায়, কিন্তু রাস্তায় বেরুলে পুলিসে ধরবার সম্ভাবনা। টাকার টাক ঢাকে না—টেনিস কিংবা গলফ খেলেও চুল গজায় না। এ যুগের দুর্ধর্ষ বিজ্ঞানও দুটি ক্ষেত্রে এখনো ইডিয়টের মতো তাকিয়ে আছে : একটি থ্রম্বোসিস, আর একটি টাক!

লিখতে লিখতে একটি দূর-সম্পর্কের ভাই এসে ঢুকল ঘরে। দু-চারটে কুশল আলাপের পর বললে, 'সুনন্দদা, মাথার চুল ভারী পাতলা হয়ে যাচ্ছে—কী করি বলো তো?'

মনের মধ্যে চকিতে আনন্দের বাণ ডেকে গেল। পরমোৎসাহে একটা তেলের নাম করে বললুম, 'ওইটে ইউজ কর্—খুব কাজ দেবে। আমি জানি।'

জানি বইকি। ওই অব্যর্থ টাকনাশক তেলটাই তো দেড় মাসের মধ্যে এই মনোরম টাকটি আমায় উপহার দিয়েছে!

কালসন্ধ্যা

বুদ্ধদেব বসু

পাত্রপাত্রী

দুই যাদব বৃদ্ধ
সত্যভামা
সুভদ্রা
কৃষ্ণ
অর্জুন
ব্যাসদেব

কয়েকটি সুরানিমগ্ন অভিজাতবংশীয় পুরুষ ও রমণী দ্বারকার বিবিধ জনতা (স্ত্রী ও পুরুষ), দুই প্রহরী, দস্যুদল, কয়েকটি নারী, অর্জুনের অনুচরবৃন্দ।

পূর্বরঙ্গ

[যবনিকা এখনো ওঠেনি। দুই যাদব বৃদ্ধ দু-দিক থেকে প্রবেশ করে মঞ্চের অগ্রভাগে দাঁড়ালেন।]

প্রথম বৃদ্ধ

এই তো সেদিনমাত্র কুরুক্ষেত্রে রক্তপাত শেষ।
তবু আমাদের এই লোল চর্ম, পাণ্ডুবর্ণ কেশ
নির্ভুল জানায় বার্তা কেটে গেছে ছত্রিশ বৎসর,
আর এই বিশ্বধামে কিছু নেই, যা নয় নশ্বর।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

ধর্মরাজ্য, সামনীতি কৃষ্ণ করেছিলেন স্থাপন।
সাত্যকি ও কৃতবর্মা যুক্ত হয়েছিলেন সদ্ভাবে—
একজন পাণ্ডবপক্ষীয় বীর, পাণ্ডবের শত্রু অন্যজন।
আমরা ভেবেছিলাম এই শান্ত শৃঙ্খলায় দিন কেটে যাবে।

প্রথম বৃদ্ধ

এই তো সেদিনমাত্র প্রত্যাবৃত বৃষ্ণিবীরগণ
জায়া, পুত্র, সুহৃদের সাহচর্যে সানন্দনিশ্বাস,
ফিরিয়ে এনেছিলেন জনতার সরল আশ্বাস।
—তবু আজ কেন শঙ্কা? দ্বারকায় কেন দুর্লক্ষণ?

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

ইতিমধ্যে এই দেশে কত হ'লো নূতন যোজনা:
পথ, যান, অট্টালিকা, পুষ্করিণী, কানন, মন্দির,
চতুর্বর্ণ নিজ গৃহে নিরাপদ, স্বকর্মে সুস্থির।
—আমরা ভেবেছিলাম, এই রীতি ব্যাহত হবে না।

প্রথম বৃদ্ধ

ভেবেছি অনেকবার, ব্যক্তিগত আমরা যদিও
বিদায়নিমগ্ন, তবু বীজ থেকে বৃক্ষের উত্থান
ছায়াস্নিগ্ধ আঙিনায় প্রপৌত্রকে জানাবে সম্মান;
এরই নাম প্রকৃতি, যা সনাতন, অনাক্রমণীয়।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

আমরা সমাপ্ত, বন্ধু। আমাদের চাওয়ার কী আছে?
কেবল এটুকু: যেন পরম্পর ঋতুর উৎসাহ
বিসংবাদী পঞ্চভূতে অবিচ্ছেদ ঘটায় বিবাহ।
কেবল এটুকু: যাতে মানুষের সন্তানেরা বাঁচে।

প্রথম বৃদ্ধ

কিন্তু, বলো, সেটুকুও অদৃষ্টের নয় কি সম্মত
পশ্চিম-সাগরকূলে ঋদ্ধিময়ী এই দ্বারকায়?
সে কোন অজানা ভয় আমাদেরও পাঁজর কাঁপায়—
আমরা, মুহূর্ত পরে হবো যারা ভস্মে পরিণত।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

আমরা জেনেছি, বিশ্বে ক্ষয়, বৃদ্ধি পরিবর্তমান,
মৃত্যু আনে নবজন্ম, বার্ধক্যের প্রচ্ছদ শৈশব;
কিন্তু আজ মনে হয় কখনো বা বাতাস সন্তপ্ত,
কখনো বা চিতার নির্বাণ থেকে জ্বলে ওঠে আরেক শ্মশান।

প্রথম বৃদ্ধ

আমরা ভেবেছিলাম কুরুক্ষেত্রে শোণিতক্ষরণ
এঁকে দেবে দুঃখের অক্ষরে এক মহত্তর শান্তির ইঙ্গিত,
উদ্ভাসিত ভবিষ্যতে অর্থ পাবে বীভৎস অতীত।
—কিন্তু আজ কেন শঙ্কা, দ্বারকায় কেন দুর্লক্ষণ?

[দুই বৃদ্ধ দু-দিক দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।]

প্রথম অঙ্ক : ১

[বৃদ্ধদের সংলাপ শেষ হবার আগেই বিবিধ অশুভসূচক শব্দ শোনা যাচ্ছিলো, এবারে তা আরো স্পষ্ট হ'লো। কয়েক মুহূর্ত এই সব শব্দ, তারপর ধীরে যবনিকা উঠলো। দ্বারকা-পুরীর প্রাসাদের একটি কক্ষ। বাতায়নে সুভদ্রা, সত্যভামা অদূরে দাঁড়িয়ে। বাতায়নের বাইরে রাজপথ।]

সত্যভামা

শুনছো? ... শুনছো? ... সুভদ্রা, শুনছো?

* এই নাটকের একটি হ্রস্বতর ভিন্ন লেখন আকাশবাণীর নিখিলভারতীয় অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত হয়েছিলো। অভিনয়ের স্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত।

সুভদ্রা

সত্যভামা, এসো দেখে যাও,
বাতায়নে মেলে দাও দৃষ্টি—
ভাবোনি যা কোনোদিন দেখবে,
দুঃস্বপ্নেও কেউ দ্যাখেনি।

সত্যভামা

গুরুগুরু শব্দ, যেন ভূমিকম্প,
জায়মান ঝঞ্ঝার অগ্রিম গর্জন,
বন্যার আয়োজন, জনতার চীৎকার

সুভদ্রা

অবিশ্বাস্য এই দৃশ্য!
নভোমণ্ডলে বিশাল ধূম্রপুচ্ছ,
মধ্যদিনেই নামে সন্ধ্যা।
—না!
নয় সন্ধ্যা, নয় রৌদ্র, নয় রাত্রি,
নেই অস্ত-কনক, নেই স্নিগ্ধ ছায়া
নম্র-কিরণশালী চন্দ্র কোথাও নেই,
কম্প্র-অংশুমালী নেই নক্ষত্র।

সত্যভামা

গুরুগুরু মন্দ্র, যেন ভূমিকম্পে
বিদীর্ণ মন্দির, নাগরিক হর্ম্য,
দানবের ধর্ষণে বিহ্বল দিঙনাগ,
উন্মূল যেন অশ্বত্থ।

সুভদ্রা

নেই!
জ্যোতি বা তমিস্রা,
নিদ্রা বা জাগরণ,
আহ্নিক অভ্যাস কিছু নেই।
আকাশে জ্বলছে এক ধিকিধিকি পিঙ্গল পিণ্ড,
করালদংষ্ট্রা কোন অসুরের মুণ্ড;
জ্বলে নেভে রক্তিম চক্ষু
মলময় তির্যক অনলে,
উদ্দাম জটা থেকে ছুটে যায় অস্থির উল্কা,
জিহ্বা বিলোল, যেন হিংস্র তরঙ্গ।

[নেপথ্যে স্ত্রী ও পুরুষের কণ্ঠে দূরাগত অস্পষ্ট কলহাস্য।]

সত্যভামা

শুনেছো? ... সুভদ্রা, শুনেছো?
অট্টহাসি, ঐ অট্টহাসি
পুরুষের, রমণীর কণ্ঠে!
সত্যি কি ওরা সব আমাদেরই আত্মীয়
অভিজাত যদুরাজবংশ?
কুৎসিত উল্লাসে উন্মাদ হ'লো আজ
তোমার আমার জ্ঞাতিগোষ্ঠী—
সত্যি, এ কি সত্যি?

সুভদ্রা

সত্যভামা, আমি জানি না,
মনে হয় কিছু নেই শাশ্বত।
নেই মিত্র-বরুণ দিকচক্রবালে,
অন্তরিক্ষে নেই দ্বাদশ আদিত্য।
রুদ্র হলেন আজ বামে উন্মার্গ,
কাঁপছেন বিষ্ণু ও ব্রহ্মা।

[নেপথ্যে সুরাবিহ্বল কণ্ঠে সুরতালভ্রষ্ট গানের শব্দ।]

সত্যভামা

শুনেছো? ... গান শুনেছো?
নেই তাল, নেই মান, মদিরায় উদ্দাম
পুরুষের, রমণীর কণ্ঠ!
আমরা যাঁদের মাতা, অথবা ভ্রাতৃবধূ,
আদরিণী ভগ্নী বা তনয়া,
তাঁদেরই কণ্ঠে আজ নেই তাল, নেই মান,
আচরণে নেই কৌলীন্য।

[নেপথ্যে বিলোল সংগীত:]

একদল পুরুষের কণ্ঠ

ডাকছি,
তোদের ডাকছি,—
ওলো, যাদব-কুলস্ত্রী!

সুভদ্রা

ছী-ছী-ছী!
ওরা বলছে কী!

[নেপথ্যে বিলোল সংগীত:]

একদল রমণীর কণ্ঠ

আয় না—
চ'লে আয় না!
দেখি কেমন মুরতি!

সুভদ্রা ও সত্যভামা

(সমস্বরে)

ছী-ছী-ছি!
ওরা বলছে কী!

[রাজপথে কয়েকটি সুরাবিহ্বল অভিজাত পুরুষের প্রবেশ।]

পুরুষেরা

(বিলোল কণ্ঠে গান গেয়ে)

আয়—আয়—আয়!
আর রঙ্গ করিসনে।

[অন্য দিক থেকে কয়েকটি সুরাবিহ্বল অভিজাত রমণীর প্রবেশ।]

রমণীরা

যাই—যাই যাই।
বোন আগল খুলে দে।

সুভদ্রা ও সত্যভামা

(সমস্বরে)

হায়—হায়—হায়!
এ কী জঘন্য গান গায়!

পুরুষেরা

(বিলোল কণ্ঠে)

হোক বুড়ি, হোক ছুঁড়ি,
হোক উগ্রসেনের খুড়ি,
চন্দ্রমুখী বিম্বাধরা
কিংবা হতশ্রী!
শোন ডাকছি!

রমণীরা

(বিলোল কণ্ঠে)

চল ভাঙি ওদের দর্প,
হোক বাঁদর বা কন্দর্প!
আয় সবাই মিলে দামালগুলোর
ভূত ভাগিয়ে দিই।
এই আসছি!

[পুরুষ ও রমণীদের মিশ্রণ ও কলহাস্য। তারা টলমল পদক্ষেপে সরে গেলো। কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।]

সত্যভামা

সুভদ্রা,
এ কি সম্ভব? এ কি সম্ভব?
কল্যাণী যাঁরা গৃহলক্ষ্মী,
রক্ষয়িত্রী মনুবংশের,
যুগে-যুগে জননী ও ধাত্রী,
সনাতন ধর্মের আশ্রয়—
সত্যি কি তাঁরা আজ বীভৎস যজ্ঞের হোত্রী
বিখ্যাত যাদবের পুরীতে?

সুভদ্রা

সম্ভব—
সবই সম্ভব।
এসো এই বাতায়নে দেখে যাও,
জনগণ ছোটে উদ্‌ভ্রান্ত,
আর্তি ও আক্রোশে ফুঁশে ওঠে গর্জন,
বাত্যাচালিত যেন বহ্নি অশান্ত।

[জনতার কলরোল আরো স্পষ্ট ও উচ্চ হ'লো।]

সত্যভামা

শুনছো? ... সুভদ্রা, শুনছো?
হুংকারে আক্ষেপে উগ্র পদক্ষেপে
আমাদেরই পরিজনবর্গ—
কৃষক, তন্তুবায়, ধীবর, সূত্রধর,
বণিক, নাবিক, কারুশিল্পী—
ভূগর্ভ থেকে যারা টেনে তোলে দুজ্ঞেয় স্বর্ণ
সপ্তসিন্ধু ঘুরে এনে দেয় লবঙ্গ মৌরি,
যাদের যত্নে পশু, পতঙ্গ, উদ্ভিদ
দান করে অন্ন ও আবরণ,
জোগায় দুগ্ধ, মধু, উজ্জ্বল অংশুক, শঙ্খ—
সেই যারা যুগে-যুগে জীবনের নির্ভর,
তারা আজ কী বলছে, শুনছো?

[নেপথ্যে জনতার উগ্র কণ্ঠস্বর :]

নিপাত যাক, নিপাত যাক,
পাপিষ্ঠেরা নিপাত যাক!

(ক্রমশ)

দস্যিদের গল্প

আশা দেবী

মাঠটার মাঝখানে খেলা হচ্ছিল, আর তারই কোণায় বড় রাস্তার ওপর একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে কতগুলো ছেলেমেয়ে জটলা করছিল। তাদের মধ্যে একটি মেয়ে বয়েসে কিছু বড়—; তবে তাকেই দলের নেত্রী বলে মনে হয়। মাথায় কালো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল; রংটা শ্যাম, পরনে ডুরে শাড়ি—গাছকোমরে বাঁধা।

খানিকটা কি যেন জিনিস ভাগ হলো সবার হাতে হাতে; তারপর গলির মুখে মুখে দলে দলে দাঁড়িয়ে গেল তারা। তারও পরে বাঁ হাতের তেলোয় একটু নুনের ভেতর একটু করো আদা ডুবিয়ে তারা সবাই সমবেতভাবে শুরু করলো: "ব্যাসবাক্য সহ সমাস করো—যশো+আদা=যশোদা।" বার দুই সুরের তরঙ্গে যখন আকাশ আকুল হয়ে উঠলো, তখন যেন মনে হলো শব্দ-ভেদী বাণ লক্ষ্যভেদ করেছে। একটি কালো স্বাস্থ্যবান ছেলে এক লাফে তাদের পেছনে ধাওয়া করলো। মুহূর্তে দলটি উধাও এবং দলনেত্রী বিনি গলির আর এক প্রান্তে বিজেতার মহিমায় যশোদার প্রতি দীর্ঘ জিভ বের করে, খুব ভালো করে ভেংচি কেটে বিলীন হয়ে গেল।

মাঠের প্রান্তে কদম গাছটার গায়ে ঠেস দিয়ে অন্ধ রাগে ফুলতে লাগলো যশোদা-নন্দন বটব্যাল। ও পাড়ার ওই কালো পিঁপড়ের মতো মেয়েটা,—ওই-ই যত নষ্টের গোড়া। সবাইকে নিয়ে দল পাকিয়েছে। আর ওই-ই অমনি করে আদানুন খাওয়া শিখিয়েছে সবাইকে। বুড়ো ধাড়ী মেয়ে—ছোট ছেলেদের দলে ভিড়েছে এসে, লজ্জাও নেই! যদি একবার ধরতে পারি, দাঁত ক'টা খুলে দেব ওর। অন্ধ রাগে নিজের দাঁতই কিড়মিড় করতে লাগলো যশোদানন্দন।

মাঝখানে একটা ছোট মাঠ আর তার পাশেই এলোপাথাড়ি একটা শিরীষ-বাবলার বন—তাতে বুক সমান বিশল্যকরণীর জঙ্গল। তার ওপারে বিনিদের বাড়ি। তার বাপ জোতদার—ওই একটিই মেয়ে, অনেক মরে-হেজে গিয়ে। তাই মা তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে পরের ঘরে দিতে চাননি। পনেরো-ষোল হলো, এখনও এমন দুষ্টুমি করে বেড়ানো ওর সাজে না। তবু অতিমাত্রায় আদর দিয়ে মা ওকে মাথায় তুলেছেন; এখন আর ঠেকাতে পারেন না। বাবার কাছে নালিশ আসে। চটে গিয়ে সে ভদ্রলোক যখন গজগজ করতে থাকেন, তখন প্রশ্রয়ের হাসিতে মায় মুখ ভরে ওঠে: বিয়ে হলেই তো সব মিটে যাবে আর কি দুষ্টুমি করে বেড়াতে পারবে তখন। যে কটা দিন পায়ে বেড়ি না পড়ে, থাকুক না একটু হেসে-খেলে। এত রাগ কেন গো সব তাতে?

: রাগবো না? তোমাকে তো আর ঝক্কি পোয়াতে হয় না? হাটে বাজারে বেরুলে লোকে আমায় যা-তা বলে।

: বলুক গে। আমার মেয়ে দুষ্টু তাতে ওদের কী?—বিনির মা গরম হয়ে ওঠেন: নিজেদের হাঁড়িতেই কাঠি দিক না ওরা।

মাঠ পেরিয়ে, জঙ্গলটা পাশে রেখে, যশোদাকে স্কুলে যেতে হয়। এবার তার ক্লাস ইলেভেন। বয়েসের তুলনায় একটু নীচেই পড়ে। খুব ছোট বেলায় অসুখ করে বছর দুয়েক তার নষ্ট হয়েছে। আর ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়ে সরস্বতীর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে বিনি। এবার মা তার বিয়ে দিয়ে দেবেন। স্বামীর সঙ্গে যতই ঝগড়া করুন, মেয়েটা সত্যিই ভারি দুষ্টু হচ্ছে—এবারে জব্দ করে দেওয়া দরকার।

যশোদানন্দন হাঁটছিল বেশ গম্ভীর মেজাজে। হঠাৎ বনের মধ্যে থেকে আওয়াজ উঠলো: নালিশ করে ক'টা বালিশ পেলি, —ও যশো আদা?

বিনির উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে কাল রাগের চোটে সত্যিই যশোদা ওর বাবার কাছে নালিশ করতে গিয়েছিল। তখন মায় ভাঁড়ার ঘর থেকে লুকিয়ে আচার চুরি করে খাচ্ছিল বিনি বাগানে বসে। সবই দেখেছে সে। বাবার খোঁজে যশোদানন্দন এলো; কিন্তু বাবা বাড়ি নেই—দেখা হলো না। রাগে গজ গজ করতে করতে সে ফিরে গেল। একটা জয়ধ্বনি বিনি নিশ্চয়ই করতে পারতো

এবং করতোও, কিন্তু হাতে চুরি করা আচার এবং মুখ-ভর্তি কুলের বিচি—তাই সে যাত্রা যশোদানন্দন আর একটা নিদারুণ অপমান থেকে বেঁচে গেছে। কিন্তু এবার আর বিনির হাত থেকে মুক্তি নেই। সেই কণ্ঠস্বর আবার আকাশ বিদীর্ণ করে বাঁশির গলার মত যশোদানন্দনের কানে এসে বিঁধ হলো।

: তবে রে—তোকে দেখাচ্ছি মজা।—গাম্ভীর্য ভুলে যশোদানন্দন ছুটলো। কিন্তু বিনির জঙ্গল চেনা, সে চট করে লুকিয়ে গেল বুক সমান বিশল্যকরণীর বনের তলায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও যশোদানন্দন ওকে ধরতে না পেরে অভিশাপ দিলে: মর জঙ্গলে ঢুকে, তোকে ঠিক সাপে খাবে।

কিন্তু ব্রাহ্মণবাক্য বৃথা হলো, বিনিকে সাপে কামড়ালো না। মাথা তুলে ঝোপের আড়াল থেকে সে দেখলো যশোদানন্দন চলে গেল স্কুলের পথে। একটা মহৎ কাজ শেষ করে বিনি এগিয়ে চললো, ডাহুকদের সচকিত করে এসে দাঁড়ালো পুকুরটার ধারে। জলপিপিগুলো শালুকের পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে পোকা আর কুচো চিংড়ি খুঁজছিল, বিনি তাদের ঢিল মারলো। খানিকক্ষণ জলের ভেতর পা ডুবিয়ে বসে থাকলো, ক'টা কলমীর ফুল তুলল। তারপর বনের পথে, মাঠের ওপর দিয়ে বাড়ি ফিরে এলো। বড় রাস্তায় হাঁটতে সাহস হলো না—যদি যশোদানন্দন কোথাও ওত পেতে বসে থাকে! বলেছে, এবার ধরতে পারলে দাঁত তুলে নেবে।

বর্ষা এলো আকাশ ছেয়ে। মেঘ ধেয়ে চলেছে উত্তর মুখে। গাছের ডালে ডালে নতুন কুঁড়ি আর সবুজ পাতায় ছেয়ে গেছে—মাঠের ধারের সুপুরিতলায় থকথক করছে থানকুনি আর গিমে শাক। আরো একটু দূরে—বনের ধারে, কদমে গাছ ছেয়ে গেছে, তেঁতুল গাছগুলো কী সবুজ—কী সবুজ! দূরের দুটো তাল গাছে ছোট ছোট দোলনার মতো দুলছে বাবুইয়ের বাসা।

ওপর থেকে বিনির চোখ নামলো মাটির দিকে। লালচে—মরা ঘাসগুলো কী তাজা হয়ে উঠেছে এখন—ছোট ছোট কত অসংখ্য ফুল ফুটেছে তাদের ভেতর। বিনি বসে বসে এক মনে এই সব দেখলো। এখন সে আর স্কুলে যায় না। দুপুর আর কাটতে চায় না ওর। তাই এই মাঠে মাঠে ঘুরতেই ভালো লাগে ওর।

জোলো হাওয়া দিলো হঠাৎ—ওদের. বাড়ির চাঁদ-কপালী কালো গাইটার মতো এক কোণায় একটুখানি রোদ মেখে গভীর আর কালো মেঘ ঘনিয়ে এলো একখানা। কোথায় যেন গুরুগুরু করে উঠলো। বৃষ্টি আসছে। কাল ভিজেছে, আজো শাড়ি ভিজিয়ে ফিরলে মা আস্ত রাখবে না। বিনি গুটি গুটি বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

ফিরে দেখলো কারা যেন বারান্দায় বসে মার সঙ্গে কথা বলছে।

: এসো মা, এসো।—মার গলায় আদর উথলে উঠলো: এই আমার মেয়ে বিনি, ভারি লক্ষ্মী মেয়ে।

হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিত সমাদরে বিনি ঘাবড়ে গেল—এটা নতুন ঠেকছে। কাজেই দু হাতের বুড়ো আঙুল তুলে কলা দেখাতে গিয়েই সে থমকে গেল। আরে, এ যে যশোদানন্দনের পিসী! সর্বনাশ, নিশ্চয়ই নালিশ করতে এসেছে। কাল বিকেলেও তো সে আদা আর লবণ দিয়ে অভ্যর্থনা করেছে তাকে। নিষ্ফল জেনে যশোদা

অবশ্য তাকে আর তাড়া করেনি—শুধু দূরে থেকে চেঁচিয়ে বলেছে—

: তোর দাঁতগুলো যদি তুলে না দিই তো—

তবে কি যশোদার পিসী তার দাঁত তুলতে এলো? এক দৌড়ে ঘরে ছুটে পালালো বিনি। একেবারে খিল এঁটে দিলে। কিন্তু দাঁত তার কেউ তুলল না। খানিক পরে বোঝা গেল, পান-টান খেয়ে খুব খুশী হয়ে চলে গেল যশোদার পিসী। আর শোনা গেল, সদর দরজায় দাঁড়িয়ে সে বলছে—

: তা হলে কথা তো পাকাই হলো দিদি।

বিনি ব্যাপারটা বুঝলো খানিক পরেই। যশোদানন্দনের সঙ্গে তার বিয়ের কথা চলছে।

কেঁদে আছড়ে পড়লো বিনি।

: না—ওকে আমি বিয়ে করবো না। ভারি গুণ্ডা ওটা, আমাকে মেরে ফেলবে।

: তোকে মেরে ফেলাই উচিত—চিরদিনের স্নেহময়ী মা হঠাৎ যেন শত্রুপক্ষ হয়ে উঠলেন: যা লক্ষ্মী ছাড়া মেয়ে তুই! সবাই বলে যশোদা সোনার টুকরো ছেলে—আর তোর কাছে হয়ে গেল গুণ্ডা! দূর হয়ে যা সামনে থেকে।

বাবা অতটা চড়া কথা বললেন না। শুধু আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

: ভালোই হবে মা; খুব ভালো হবে। যশোদা বেশ ছেলে।

বেশ ছেলে? ওই জিমনাস্টিক করা জোয়ানটা? কিল মেরে নারকেল ভাঙে, লোহার পাত বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে ভেঙে ফেলে? বিনিকে একবার হাতে পেলে আস্ত রাখবে? দাঁত তোলা তো সামান্য কথা—এক কিলে যদি মাথা ভেঙে না দেয় তো—

কিন্তু না। কোথাও আশ্রয় পাওয়া গেল না। কোথাও না।

ভয়ে ভাবনায় অস্থির হয়ে বিনি আবার মাঠে মাঠে মনের আশ্রয় খুঁজে বেড়াতে লাগলো।

তিন চার দিন ধরে বিনি কেঁদে কেঁদে একা একা ফিরলো। কিছুই হলো না। বিয়ে ঠিক হয়েই গেছে। যশোদানন্দনের মা ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে কলকাতায় চলে যাবেন। ছেলে ওখানেই পড়বে।

দুপুর বেলা। চার দিকে খাঁ খাঁ করছে রোদ। বিষ্টির পর রোদ্দুর ঝকঝক করছে হীরের কুচির মতো। জলে ধোয়া গাছের পাতাগুলো চকচক করছে। চিলেরা নেড়া ডালে বসে ডানা শুকোচ্ছে। ছুটোছুটি করছে চড়ুইয়ের দল। বাতাসে কেয়ার গন্ধ। কদম গাছগুলো ফুলের ভারে নুয়ে গেছে। বিনি নিজের ভাবনায় তলিয়ে বসেছিল। হঠাৎ শব্দ এলো: তবে রে—এবার পেয়েছি। তীরের মত ছুটলো বিনি।

কিন্তু এবারে পালাতে গিয়ে অঘটন ঘটে গেল একটা। বাড়ির কাছাকাছি এসে তার হরিণের মতো দৌড় থমকে গেল আচমকা। খচ করে আধখানা ভাঙা বোতল বিঁধে গেল তার পায়ে।

'মা' বলে একেবারে বসে পড়লো বিনি। মিষ্টি মুখখানা যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেল। চোখে ফুটে উঠলো জল। কিন্তু অদূরেই যশোদানন্দন হটব্যালের বিভীষিকা। প্রাণপণে সে পা থেকে কাচটাকে টেনে বের করে ফেলল; দর দর করে নেমে এল রক্ত আর কালচে ভিজে মাটি, সবুজ ঘাস আর পাঁচরঙা ঘাসফুলের ওপর চুনির বিন্দুর মতো রক্তের ফোঁটা ঝরিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হলো সে।

ঘটনার পরিণতি দেখে যশোদানন্দন থ।

শত্রু যে এমনভাবে আহত হবে যশোদা-নন্দন তা ভাবতেও পারেনি। এবার তাকে যেন একটু অন্যমনস্কই দেখাতে লাগলো। তারপর খানিকক্ষণ ওই রক্তের ফোঁটার দিকে তাকিয়ে থেকে নিজে নিজেই বললে: ঈস্, কেটেছে খুব—! আবার খানিকক্ষণ সে চারদিকে তাকালো। মাঠ, বন, গাছ পালা সবই যেন একবার তাকিয়ে দেখলো অসহায়ের মতো। মনে হলো—তার কিছু একটা করা উচিত, কিন্তু কী যে করা যেতে পারে—সেটা বোঝা গেল না। অগত্যা পরাভূত সৈনিকের মতো সে-ও উদাসচিত্তে বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

দুপুরের তামাটে রোদে ওর ছায়াটা পড়েছে সমান সমান হয়ে। ওকে যেন এখন আরো কালো আর দুর্বল বোধ হচ্ছে। মাঠে বসে থাকা কাকের দলের ভেতর দিয়ে, কাঠ-বেড়ালীকে চকিত করে, পাতাপচা আর কাদা, কখনও ঘাসের ওপর থিতোনো জলকে পা দিয়ে ছিটিয়ে ছিটিয়ে বাড়ির দিকে চললো যশোদানন্দন। মেয়েটার যন্ত্রণাভরা মুখটার কথা ভাবতে ভাবতে ইঁটে একটা ঠোকর খেলো—বেশ লাগলো বাঁ পায়ের তিনটে আঙুলে। পরের মেয়েকে

কষ্ট দেবার শাস্তিই কিনা কে জানে!

বাড়িতে ঢুকেই আর এক আবিষ্কার! পিসীমা আর মা ওর ঘরের সামনে বসে কথা কইছিলেন নিজেদের মধ্যে।

: পাকা কথা আজ দিয়ে দিলাম। সামনের সপ্তাহে আশীর্বাদ হবে।—মা বলছিলেন।

: মেয়েটা বড্ড ছোট। আর ভারী দুরন্ত বলেও শুনেছি।

: আমার খুব ভালো লেগেছে ওকে। ছোট না হলে যশোদার সঙ্গে মানাবে কেন ঠাকুরঝি? আর ছেলেবেলায় আমিও অমনি দুরন্ত ছিলাম। তোমাদের ঘরে পা দিয়েই তো সব ঠিক হয়ে গেল।

: পুরো ঠিক হওনি—পিসীমা হাসলেন। মা-র দিকে আড়চোখে চেয়ে আবার বললেন, মা-বাবা ঘুমোলে তুমি আর আমি বকের ছানা দেখবার জন্যে গাবগাছে উঠতাম মনে পড়ে?

দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠলেন।

যশোদানন্দন পুনর্বার স্তম্ভিত। এসব কী কুটিল চক্রান্ত! এরকম একটা সম্ভাবনার কথা তো ইতিপূর্বে কখনই অনুমান করা যায়নি।

পিসীমা আবার বললেন: সত্যি বউদি, তুমিও নেহাত কম ছিলে না। বউ-মানুষ চাটুজ্জেদের বাড়ির বোলতার চাকে ঢিল মেরে পালানো—

মা বললেন: এখন যে খুব ভালোমানুষ সাজছ। বুদ্ধিটা কে দিয়েছিল, শুনি? তা আমি যখন মানিয়ে গিয়েছি, তখন শশধর চক্রবর্তীর মেয়ে বিনিও এ বাড়িতে বে-মানান হবে না। শাশুড়ী-পিস-শাশুড়ীর নজির তো রয়েছেই।

আবার হাসি উঠলো। আর দরজার পাশে সজনে গাছতলায় যশোদানন্দন একেবারে কাঠের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এ কী নিদারুণ ব্যাপার—কী ঘোরালো পরিস্থিতি!

শেষকালে ওই বিনির সঙ্গে তার বিয়ে পাকা!

পিসীমা আবার বললেন: রঙ একটু ময়লা হলেও মুখ চোখ—

এক কিলে ডাব ভাঙলে কী হয়, বীর জিমন্যাস্ট যশোদানন্দন হঠাৎ ভয়ানকরকমের দুর্বল বোধ করতে লাগলো। আর দাঁড়ানো গেল না।

—মা-পিসীমার চোখ এড়িয়ে সোজা ঢুকে গেল বাড়ির ভেতরে তারপর পড়বার ঘরে। কোণায় রাখা ডাম্বেল-বারবেলগুলোর দিকে একবার তাকিয়েই ভাবুকের মতো বসে পড়ল টিনের চেয়ারটায়। তারপরে সামনে টাঙানো মা-সরস্বতীর ছবির দিকে চোখ মেলে সে ধ্যানে বসে গেল।

খুবই পাপের কথা—ধ্যানটা সরস্বতীর জন্যে না হয়ে সেই কালো পিঁপড়ের মতো মেয়েটার দিকেই ছুটল। সরস্বতী তাতে রাগ করলেন না—সাদা পদ্মটায় বসে, বীণায় হাত আর হাঁসের পিঠে পা রেখে হাসি-মুখে যশোদার দিকে চেয়ে রইলেন।

ঈস্—খুব কেটে গিয়েছিল পা-টা! যন্ত্রণায় কান্না এসেছিল মেয়েটার। কত রক্ত পড়েছিল পা থেকে। অমন করে ভয় না দেখালে চলতো। সে একটা জোয়ান মানুষ—ওই পুঁচকে মেয়েটাকে—ভীষণ অনুতাপ হতে লাগলো যশোদানন্দনের।

বৃষ্টি শুরু হলো। ঘরের চালের ওপর টুপ-টুপ করে বিষ্টি পড়ছে। সামনের মাঠে থিতনো জলের ওপর পড়ে কেমন ফুটে উঠছে। হাওয়ায় পাতারা এসে সাঁতার দিচ্ছে সেই জলে। পা-কাটা মেয়েটার কথা ভেবে ভারি অশান্তি বোধ হতে লাগলো যশোদানন্দনের। একেবারে পাগল! হঠাৎ যশোদানন্দনের মনে হলো বিয়ের পর ওর পায়ে মল পরিয়ে দিয়ে ওকে জব্দ করলে কেমন হয়। পালিয়ে কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারবে না—যেখানে থাকবে, মলের ঝমঝম শব্দে ঠিক ধরা পড়ে যাবে।

আর ঠিক সেই সময়েই—বাইরের এত মেঘ বৃষ্টি সব ভুলে গিয়ে হৃৎকম্প হচ্ছিল বিনির। বিয়ে না হতেই পা কেটে দিচ্ছে, দাঁত তুলে দেবে বলে শাসাচ্ছে! বিয়ের পরে তো আর পালাতে পারবে না; তখন ওরা সবাই মিলে ওর এত দিনের সব দুষ্টুমির শোধ নেবে। দাঁত তোলা তো তুচ্ছ ব্যাপার, তার মাথাটা যদি ডাবের মতো ভেঙে ফেলে, তবুও কিছু বলবার থাকবে না।

সে ছুটে মার কাছে এলো: মা, ওই যশোদা—যশোদাকে আমি বিয়ে করবো না কিছুতেই। ও আমার দাঁত তুলে নেবে বলেছে।—গাছকোমর বাঁধা বিনি বাঁ হাতটা মাজায় দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

শুনেই মা হাসিতে লুটিয়ে পড়লেন: পাগল মেয়ে! তাই নাকি হয়! ও সব কথার কথা।

ঃ তুমি জানো না, কথার কথা নয়। ওটা একটা গোঁয়ার, গুন্ডা।

ঃ আবার ওই কথা! বলতে নেই, ছিঃ। কাল তোর আশীর্বাদ। একটা দিন একটু লক্ষ্মী হয়ে থাক দিকি।

মা-র সই বকুল মাসীমাকে বলতে গিয়েও সেই এক ফল। তিনিও খিলখিলিয়ে হেসে উঠলেন: দেবেই তো দাঁত ভেঙে। যে দস্যি মেয়ে, নইলে শায়েস্তা হবি কেন?

কেউ তার কথা বোঝে না। ছোট বলে সে যা বলে সবাই ঠাট্টা করে তাই নিয়ে। আর উপায় নেই, বিয়ের দিন এসে গেল। যশোদানন্দনের ভয়ে বিনির রাতে ঘুম নেই, দিনে খাওয়া নেই। এতদিন আদানুনে খাওয়া আর ভেংচি কাটা এবার ওই গোঁয়ারটা তার শোধ তুলবে।

দুপুরে বেলা বাবা খেতে বসেছেন। বিনি নীল শাড়ির আঁচল হাতের নখে জড়াতে জড়াতে বাবার কাছে বসলো।

—মা-মণির কি খবর? বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ পায়ে পড়ি বাবা, আমার বিয়ে দিয়ো না।

ঃ কেন —মুখ থেকে মাছের কাঁটা বের করতে করতে বাবা আবার জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ ও আমার দাঁত ভেঙে দেবে বলেছে।

ঃ আমি আবার বাঁধিয়ে দেব, ভাবনা কী?

একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বাবার দিকে আর একবার মার দিকে ফেলে বিনি বেরিয়ে গেল।

ঃ বেরুস নি, বিয়ের কনেকে বেরুতে নেই। —মা ডেকে বললেন।

দুমদুম করে শব্দ তুলে বিনি বেরিয়ে গেল, শুনেও শুনলো না।

মাঠে কদম গাছটার পাতা দেখা যায় না, ফুলে ফুলে একাকার। দুটো শালিক পরস্পরের গা খুঁটে দিচ্ছে। একটা হলদে প্রজাপতি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে সোনালী রোদে। পায়ের ঘা-টা এখনও ভালো করে সারেনি। তার ওপর আবার সেই যশোআদা —সে যদি রাগে পায়—

হঠাৎ পেছন থেকে বিনির হাতটা কে সজোরে চেপে ধরলো। পালে বাধা, পালানোও গেল না। আর কে? যশোদানন্দন—রক্ত সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা।

ঃ তোর সঙ্গে তো আমার বিয়ে। এবার?

তাবৎ ভয়াৎ ভেতবাং যাবন্ডয়মনাগতম্। করাল বিভীষিকার সামনে পড়ে বিনি মরিয়া হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। ঠিক আধ হাত জিভ বের করে ভেংচি কাটল যশোদানন্দনকে: বিয়ে না কাঁচকলা।

কিছুক্ষণ কট কট করে বিনির মুখের দিকে চেয়ে রইলো যশোদানন্দন: তুই কাঁচ-কলা বললে কী হয়—বিয়ে তো হবে। তখন? তখন তো আর দৌড়ে পালাতে পারবি না।

ঃ বিয়ে হবেই না।—বিদ্রোহী ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকালো বিনি: তার আগেই আমি পালিয়ে যাব।

যশোদানন্দন একটু চুপ করে রইলো। মাথার ওপরে হাওয়ায় নিমের পাতা ঝির ঝির করছে। ঘুঘু ডাকছে মিষ্টি গলায়। টেলিগ্রাফের তারে বসে একটা কাক আর একটার গা খুঁটে দিচ্ছে। আকাশের নীল চোখের ওপর দিয়ে জলের ছায়ার মতো ভেসে যাচ্ছে মেঘ। আকাশটা হঠাৎ বিনির চোখের মতো মনে হলো যশোদানন্দনের —ভারী কষ্ট হলো তার।

ঃ তোকে কোথাও পালাতে হবে না— তোর কোনো ভাবনা নেই। বিয়ের দিনে বরং আমিই কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকবো।

হঠাৎ কি রকম চমকে গেল বিনি। এমন কথা তো ছিল না। যেন আত্মসম্মানে ঘা লাগল তার।

ঃ তুমি পালাতে যাবে কেন? আমাকে বুঝি পছন্দ হয় না?

যশোদানন্দন উদাসভাবে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললো: আগে মোটেই হত না। কিন্তু যেদিন তোর পা কেটে গেল—তারপর খালি তোর কথাই ভাবছি, আর যত ভাবছি, ততই পছন্দ হয়ে যাচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কী, এর পর যদি যশোআদা বলে এক সের আদাও তুই খেয়ে ফেলিস, আমার বোধ হয় একটুও রাগ হবে না।

ঃ একটুও রাগ হবে না?

ঃ একটুও না। কিন্তু কিছু ভাবিসনি —বিয়ের দিন ঠিক আমি নদী পার হয়ে পালিয়ে যাব—কেউ আমার খোঁজ পাবে না। তুই বেঁচে যাবি, আমাকে তো দু' চক্ষে দেখতে পারিস নে।

সাদা সাদা মেঘগুলো আকাশের নীলকে ছেয়ে ফেললো, আরো কোমল হয়ে এল নিমগাছের ছায়া। বিনির চোখের দিকে কেমন করে একবার তাকালো যশোদানন্দন। তারপর উঠে পড়তে চাইলো।

খপ করে বিনি হাতটা ধরে ফেলল তার। বললে: দেখতে পারি না, বলেছে তোমাকে! থাক—কোথাও তোমায় পালিয়ে যেতে হবে না।

জিমন্যাস্টিক করা জোয়ানটা ভীষণ দুর্বল বোধ করলো আবার। আধখানা উঠেছিল, বসে পড়লো। তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বিনি বললে: কক্ষনো আর যশোআদা বলবো না, বিয়ের পর কি কেউ বরের নাম ধরে? পাপ হয় না?

অগত্যা, নিমগাছের ওপর ঘুঘু দুটো এ ওর কাছে আরো বেশী ঘন হয়ে এলো।

আলোচনা

কবি সম্মেলন

পর পর কয়েকটি সেম-সাইড গোল খেলে গোলকিপার যেরকম বিভ্রান্ত এবং হতবুদ্ধি হয়, শ্রদ্ধেয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের পত্রটি পড়ে আমার অবস্থা প্রায় তদনুরূপ। বাস্তবিক, প্রথমে ত আমি বুঝতেই পারছিলাম না তিনি আমার বিরুদ্ধে, না স্বপক্ষে।

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের পত্রে আমার সম্বন্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে তার সারাংশ হল: আমি 'জনৈক' বিমল রায় চৌধুরী 'ব্যক্তিগত বিদ্বেষ চরিতার্থ' করবার জন্য 'দেশ'এর আলোচনা বিভাগটির সুযোগ নিয়ে একটি 'ইতর রুচি'র অসম্মানজনক 'ব্যঙ্গবিদ্রূপ প্রয়াসী' চিঠি লিখে 'সাহিত্যরসিক', 'সাহিত্যকদের আপনার মানুষ', 'কবি' এবং 'কর্মবীর' শ্রীসতীকান্ত গুহ মহাশয়ের মত একজন মানী লোকের সম্মানহানির চেষ্টা করেছি।

যুক্তির বিচারে, আমার আগের চিঠিটা দু দল পাঠক নেবেন দু'ভাবে। যাঁরা সতীকান্ত গুহের কবিত্বে অবিচলিত আস্থাবান (এই দলে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রও পড়েন) তাঁরা আমার পত্রটিকে যুক্তিসম্মত-ভাবেই 'ব্যঙ্গবিদ্রূপ প্রয়াসী' কিছুতেই ভাবতে পারেন না। কারণ, এই চিঠিতে সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনের স্যুভেনীর থেকে প্রমাণ তুলে তুলে শ্রীসতীকান্ত গুহকে আমি কবি প্রমাণ করারই চেষ্টা করেছি। এবং সনাতন পাঠককে 'কে এক সতীকান্ত গুহ' লেখার অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে 'অমনোযোগী', 'দৃষ্টিশক্তিহীন' প্রভৃতি কঠিন শব্দাবলীও প্রয়োগ করেছি। সুতরাং প্রেমেন্দ্র মিত্র, যিনি সতীকান্তবাবুর কবিত্বে অবিচল বিশ্বাসী তাঁর সংগে আমার বিরোধটা কোথায়? তিনিও যখন লিখছেন, 'সতীকান্ত বাবুর ইংরেজী কবিতা বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে'—অর্থাৎ তিনি শুধু দেশের কবিই নন, জগতেরও কবি, তখন অন্তত শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র আমার চিঠিতে ব্যঙ্গের আভাস পান কোন্ যুক্তিতে? আমার পত্রের উদ্দেশ্যের সংগে তাঁর পত্রের উদ্দেশ্য ও মতামতের অভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন পত্রাঘাতে আমার বিরুদ্ধাচরণ করলেন?

এবার একদল পাঠকের কথা বলি, যাঁরা সতীকান্তবাবুকে কবির সম্মান দিতে চান না। তাঁরা যুক্তিসঙ্গতভাবেই সতীকান্তবাবুকে আমার কবি প্রতিপন্ন করার আপ্রাণ চেষ্টায় ব্যঙ্গের আভাস পেয়েছেন। সে ক্ষেত্রে আমার পত্রকে তাঁরাই একমাত্র "ব্যঙ্গবিদ্রূপ প্রয়াসী" বলে অভিযোগ তুলতে পারেন।

এখন প্রশ্ন, এই ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ 'ইতর রুচি'র কি না? এবং হলে তার জন্য দায়ী কে? এ ব্যাপারে আমার বিনীত বক্তব্য, আমার পত্রে আমি কোথাও আমার নিজের মতামত বা অপরের মন্তব্যের সাহায্যে শ্রীসতীকান্ত বাবুকে কবি হিসেবে খাড়া করবার চেষ্টা করিনি। কবি সম্মেলন উপলক্ষ্যে তাঁদের প্রকাশিত যে স্যুভেনীর তার থেকেই মুদ্রিত তথ্য প্রমাণ উপস্থিত করেছি মাত্র। আমার পত্রে ব্যবহৃত তথ্যের একটি লাইনও যে বানানো ও ফাঁপানো নয় তা স্যুভেনীরটি পাঠ করলেই নিঃসন্দেহে জানা যাবে। সুতরাং এতে কোনো 'মানী' লোকের সম্মানহানি, হলে, বা 'ইতর রুচি' বা 'ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রয়াস' থাকলে তার জন্য দায়ী কে? যিনি ঘটনাগুলি উদ্ধৃত করেছেন তিনি, না যাঁরা উদ্ধৃত ঘটনার জন্য দায়ী তাঁরা?

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র দু'টি কূটনীতিপ্রসূত লাইনে জানাচ্ছেন: "আপনার সম্পাদিত মহৎ ঐতিহ্যবাহী পত্রিকায় এভাবে মানী লোকের সম্মানহননের চেষ্টা দেখে সত্যিই ব্যথিত হয়েছি। আপনার জ্ঞাতসারে এ কাজ হয়েছে এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।" এই লাইনটি পড়ে স্বভাবতই মনে হতে পারে যে, দেশ-সম্পাদক মহাশয়ের চোখে ধুলো দিয়ে আমি মুদ্রণ বিভাগের সংগে গভীর ষড়যন্ত্র করে আমার এই পত্রটি ছাপিয়ে ফেলেছি। এই প্রসংগে আমার জিজ্ঞাস্য, সম্পাদকের অজ্ঞাতসারে শুধু-মাত্র কয়েকটি লাইনের একটি পত্র ছাপিয়েই ক্ষান্ত থাকব কেন? একটি সম্পূর্ণ উপন্যাসই ত চোরাপথে ছাপিয়ে ফেলা আমার পক্ষে অধিক লাভজনক ছিল।

পরিশেষে একটি ব্যক্তিগত নিবেদন, শ্রীসতীকান্ত গুহ মহাশয়ের মত একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক (কবি কি কবি নন সে তর্কে আর যাব না) যে বার বার একটি বহুল প্রচারিত পত্রিকায় বিতর্কের কারণ হচ্ছেন এটা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক ঘটনা। প্রেমেন্দ্র মিত্র মশাই যদিও লিখেছেন ব্যক্তি-গত বিদ্বেষ চরিতার্থ করার জন্য আমি এঁর সম্মানহননে প্রয়াসী হয়েছি, এর মূলে কিছুমাত্র সত্য থাকতে পারে কিনা একথা

সতীকান্ত গুহ মহাশয় নিজেই ভালো বলতে পারবেন। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই, কার্যক্ষেত্রও এক নয়, এবং শুনেছি তিনি বয়সেও প্রবীণ। এবং আমি ব্যক্তিগত-ভাবে বিশ্বাস করি যে সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষণা করে তিনি উদার একটি কাব্যরসিক মনেরই পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বার বার তাঁকে যে ভগবানের মত ভূতগ্রস্ত হতে হচ্ছে তার জন্য দায়ী, বিশ্বাস করুন, দেশ পত্রিকার কোনো পত্রলেখক, বিভাগীয় লেখক বা এমন কি তিনি নিজেও নন। —দায়ী তাঁর পরিমণ্ডলের দশচক্র—যারা মোহন-আড়ালে থেকে এই কলকাতা শহরের পথে পথে নিত্য নিয়ত ভগবানের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় এবং একবার তাঁকে আয়ত্তে পেলে নিজেদের স্তরে নামিয়ে এনে তাঁকে একে-বারে নিজেদের মতই ঝুলকালি মাখিয়ে ভূত বানিয়ে ছাড়ে। এবং ঈদৃশ ভগবানরা অতিরিক্ত ভক্তবৎসল হওয়ার ফলে ক্ষতিটা তৎক্ষণাৎ ধরতে পারেন না, যখন পারেন, তখন কাছেপিঠে দশচক্রটি থাকে না বটে তবে তাঁর ভৌতিক অবস্থাটা থেকেই যায়।

'জনৈক' বিমল রায় চৌধুরী
কলকাতা-২৫

২

কবি-সম্মেলন সম্পর্কে নয়, সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সম্পর্কে যে সমস্ত অশালীন, অভদ্রোচিত, অমার্জিত এবং বিদ্বেষপ্রসূত উক্তি আপনারা নির্বিচারে প্রকাশ করছেন, তাতে দেশ পত্রিকার একজন সাধারণ পাঠক হিসাবে নির্বিকার থাকা সম্ভবপর নয় বলেই এই পত্র-লেখার প্রয়োজন। সনাতন পাঠক কিংবা বিমল রায়চৌধুরী অথবা অধ্যাপক অরুণ বসু—প্রত্যেকের বক্তব্যের ভিতর ব্যক্তিগত আক্রোশ ও বিদ্বেষ অপ্রকাশ থাকে নি। কোনো লোককে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য ছলচাতুরীর এবং শিক্ষিত হয়েও অশিক্ষিত মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে দ্বিধা কারুর কারুর না-ও থাকতে পারে—কিন্তু দেশ পত্রিকা তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে দেখে দুঃখিত। প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতিবাদপত্রটি সময়োচিত ও অপরিহার্য ছিল। কারণ, আমাদের মনে এরূপ ধারণা হওয়া হয়ত সম্ভব হত যে, দেশ পত্রিকা ব্যক্তিগত বিদ্বেষপরায়ণার বাহনস্বরূপ। আর অধ্যাপক বসু 'অগ্র পত্র' লেখবার পূর্বে কি ভাবেন নি যে, তার সম্পাদিত গ্রন্থসমূহও কিভাবে তার কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রি হবার জন্য প্রচারিত হচ্ছে। মানসিকতা উভয় ক্ষেত্রেই এক এবং অভিন্ন। কিন্তু 'কবি-সম্মেলনে'র আলোচনায় এসব প্রসঙ্গ অবান্তর। সতীকান্ত গুহ মহাশয়ের শিক্ষা, রুচি, অভিজ্ঞতা, ঐতিহ্য, সাহিত্যপ্রীতি, কর্মদক্ষতা ও রচনাশক্তি অনেকেরই যে হিংসার বিষয়, তা প্রকাশ করতে দেশ পত্রিকা কেন আগ্রহী—সেটাই আমার প্রশ্ন।

মানিক গুহ
কলকাতা-২৬

৩

শ্রীসতীকান্ত গুহ মহাশয় সম্পর্কে সনাতন পাঠকের মন্তব্যে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। কিন্তু তিনি কেন গুহমহাশয়কে সাহিত্যিক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, বোঝা গেল না। যে কোন বৃহৎ সম্মেলনের সাফল্যের জন্য একজন 'কর্ম-বীর' নিশ্চিত প্রয়োজন। তবে এই সুবাদে কেউ সাহিত্যব্রতী বলে স্বীকৃত হয়ে যাবে, এ বড়ই উদ্বেগের বিষয়। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো শ্রদ্ধেয় প্রবীণ সাহিত্যিকের তকমা যিনি পেলেন, সনাতন পাঠকের মন্তব্য পড়ার পর নিছক কৌতূহলবশত দক্ষিণ কলকাতার সেই স্কুলের জনৈক ছাত্রর কাছ থেকে সংগ্রহ করে তাঁর কিছু কিছু রচনা পড়ে মনে হয়েছিল কেবলই অপরচনা—গ্রামে গ্রামান্তরে কবিযশঃপ্রার্থীরা কিছুকাল এই জাতীয় সাহিত্য প্রয়াসে ব্যস্ত থাকেন। তাঁর ইংরেজী কবিতা বিদেশী ভাষায় অনুবাদ হয়েছে জেনে উল্লাসবোধ করি, কিন্তু এই ঘটনার কোনই তাৎপর্য নেই, কিছুই প্রমাণিত হয় না। কোনো সুযোগসন্ধানী অসাহিত্যিকধর্মী 'কর্মবীর' কবিতাকে লোকচক্ষুতে হেয় করে দিতে পারে। কেবলমাত্র এই কারণে বরাবরের জন্য এ জাতীয় সম্মেলন নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া ভালো। কবিতা আত্মভুক, মৃত্যুর অধিক অহংকারী, তাকে নিয়ে কোন ডামাডোল বরদাস্ত করা হবে না। সনাতন পাঠক এই অপপ্রয়াসকে যথোচিত ভৎর্সনা করেছেন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

সুব্রত চক্রবর্তী
আনন্দপল্লী, বর্ধমান

৪

রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কবি সম্মেলন নিয়ে সম্প্রতি একটি ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মনোভাব দেখা গিয়েছে। সর্ব-ভারতীয় কবি সম্মেলন করার যৌক্তিকতা এবং সার্থকতা নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এখনো তীব্র ভাষায় আলোচনা ও চিঠি লেখা হচ্ছে।

বাংলা দেশে এত দিন ধরে যে কাব্য আন্দোলন চলে আসছিল তাতে একটি মহৎ প্রেরণাই সমস্ত শক্তির উৎস ছিল, অন্য কোন উদ্দেশ্য সেখানে প্রতিফলিত হয় নি। এই মহৎ প্রেরণার বশবর্তী হয়েই শত শত কবিতাপত্রিকা ক্ষণিকের জন্যে জন্মলাভ করছিল। এ ছাড়া শহর-গ্রামে এমন কী বহির্বাংলাতেও বাঙালীরা অকিঞ্চিৎকর উৎসাহ আর উদ্দীপনায় ছোট করে কবিতা-বাসরের আয়োজন করতেন। সর্বভারতীয় কবি সম্মেলন সম্পর্কে আমাদের একটি আশা ছিল যে এতকাল যা ছোট্ট আয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল অন্তত সেইটুকু বৃহৎ আকারে ভালভাবে পরিচালিত হবে। কিন্তু

এই কবি-সম্মেলন দেখার পর হতাশ হয়েছি। এতকাল কবিতার ব্যাপারে 'দালাল' শ্রেণীর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, এবার তাদের জন্যেও কবিতা রাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হলো। নইলে বাংলা দেশের যোগ্য কবিদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কী করে এবং কোন উদ্দেশ্যে একাধিক অক্ষম এবং তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কবিদের হাতেই এই সম্মেলনের সমস্ত পরিচালনা ব্যবস্থা কায়েম হয়? উদ্যোক্তারা হয়তো বলবেন অনেক কবিই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নি অথবা সভায় উপস্থিত থাকেন নি। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে বাংলাদেশের কবিরা কতটা সহানুভূতির সঙ্গে এই সম্মেলনকে গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত সকল কবিকেই কি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল? আমি জানি অনেক কবি আমন্ত্রিত হন নি। কিন্তু কেন?

সনাতন পাঠক কৃত এই সম্মেলনের বর্ণনার পর সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীআশিস সান্যাল এই বিভাগে একটি পত্র দিয়েছিলেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বুদ্ধদেব বসুর একটি উদ্ধৃতিও ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু স্বয়ং শ্রীবুদ্ধদেব বসু তাঁর পত্রে যে ভাবে শ্রী সান্যালের ত্রুটি উদ্ঘাটন করেছেন তাতে আশিস সান্যালকে স্রেফ ভেজাল ব্যবসায়ী ছাড়া আর কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছে না। আরো পরিতাপের বিষয় যে এমন ব্যক্তিরাই বাংলাদেশের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন।

এই সপ্তাহে (৮ই জুন) শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের পত্রটিও উল্লেখযোগ্য। শ্রীসতীকান্ত গুহ কেমন সাহিত্যিক এবং আদৌ কিছু লেখেন কি না তা আমরা অনেকেই জানি না। এ ত্রুটি হয়তো আমাদের। তবে মনে হয় শ্রীসতীকান্ত গুহ অপেক্ষাও বাংলাদেশে সক্ষম-জীবিত কবির সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। তাঁদের যে কেউ একজন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌনে এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিতে পারতেন অথবা সুভেনিরে প্রশংসা পাওয়ার যোগ্যতাও অনেক কবির ছিল।

শ্রদ্ধেয় প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর অভিযোগ প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, এই বিভাগটির সুযোগ নিয়ে কেউ কেউ ব্যক্তিগত বিদ্বেষ চরিতার্থ করছে—শ্রীমিত্র কী ব্যতিক্রম হিসেবে শ্রীসতীকান্ত গুহর সঙ্গে তাঁর প্রীতি বন্ধনের নজীর রাখতে চাইছেন। এই সংখ্যায় অধ্যাপক অরুণ বসু সম্ভবত শ্রীমিত্রের প্রীতিভাজন এই সাহিত্যরসিক মানুষটি প্রসঙ্গে কটাক্ষপাত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসার যোগ্য এমন একজন সাহিত্যিককে আমরা আজো চিনি না বলে লজ্জিত।

সৌম্যজিৎ রায়
জামসেদপুর-১

৫

অধ্যাপক অরুণ বসুর সহিত আর একটু যোগ করিয়া জানাইতেছি যে, ঐ বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভায় কৃতী ছাত্রছাত্রীগণকে শ্রীসতীকান্ত গুহ মহাশয়ের অধিকাংশ পুস্তক দিয়াই কৃতার্থ করা হয়। ঐ পুস্তকগুলির কোনও সাহিত্য মূল্য আছে, কি নিতান্তই অপাঠ্য, দয়া করিয়া প্রেমেন্দ্র মিত্র মহাশয় একটু নিজে অনুধাবন করিয়া জানাইলে আমরা বাধিত হইব।

একজন হতভাগ্য অভিভাবক

৬

আপনাদের আলোচনা বিভাগে গত এপ্রিল মাস থেকে 'সর্বভারতীয় কবি সম্মেলন' সম্পর্কে বহু বিতর্কমূলক পত্র প্রকাশিত হয়েছে এবং এই বিতর্কের বিষয়গুলি 'কবি সম্মেলন'কে ছেড়ে এখন ব্যক্তিগত কলহের সূত্রপাত করেছে। আপনাদের পত্রিকায় আপনারা যা খুশী তাই প্রকাশ করতে পারেন, কিন্তু যেহেতু আমি ঐ নামী পত্রিকাটির নিয়মিত পাঠক সেই কারণে আমারও কিছু বলার নিশ্চয় অধিকার আছে মনে করি। আমি বলব যে, সর্বভারতীয় কবি সম্মেলন সম্বন্ধে অনেক বিতর্ক হয়েছে এবং ব্যক্তিগত ঘরোয়া কলহের উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে 'দেশ' পত্রিকার এই বিভাগটি আর ব্যবহৃত না হলেই আনন্দিত হতাম।

রাণা চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা-২৬

প্রতিমা মিত্র

ঐ সপ্তাহের 'দেশ' পত্রিকায় (শনিবার ১লা আষাঢ়, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ) ৮০৪ পৃষ্ঠায় 'ঘরে-বাইরে'তে প্রতিমা-প্রয়াণে শ্রীমতী লিখেছেন যে, "লেডী প্রতিমা মিত্রের কর্মবহুল জীবনের একটি বড় কীর্তি কমলা গার্লস স্কুল। কমলা ছিল তাঁর মায়ের নাম। এই বিদ্যালয়টি প্রতিমা মিত্র গড়ে তুলেছিলেন তা নয়; শেষ দিন পর্যন্ত বিদ্যালয়ের জন্যে প্রাণপাত করে ছিলেন।"

কিন্তু শ্রীমধু বসু 'আমার জীবন' স্মৃতিকথায় আছে "নারী শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর (কমলা দেবীর) এই বিরাট আগ্রহের কথা মনে রেখেই আমার ছোটকাকা অমিয়নাথ বসু ১৯৩২ সালে কলকাতায় এক স্কুল স্থাপন করে মার নামে স্কুলটির নাম দিলেন—'কমলা গার্লস স্কুল।' ছোট কাকা, আমরা তাঁকে অমিয়কাকা বলে ডাকতাম—মাত্র ৩০০০ টাকা সম্বল করে এই স্কুল স্থাপন করেন।" লেডী প্রতিমা মিত্র (মধু বসুর সেজদি) ১৯৫০ সাল থেকে ওই স্কুলে

জড়িত থেকে স্কুল ভবনের জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন।

আমার মনে হয় 'কমলা গার্লস স্কুলের' প্রতিষ্ঠায় প্রধান উদ্যোগী অমিয়নাথ বসু। স্কুলটির পরে উন্নতি করেন লেডী প্রতিমা মিত্র।

পিনাকী সরকার
ব্যারাকপুর

প্রভাত-রবি

'দেশ' পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পত্রাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্য সবিশেষ ধন্যবাদ। পত্রগুলির মধ্যে পত্র লেখকের আন্তরিকতা, অকপট অন্তরঙ্গতা ও প্রাণবন্ততা আমাদের মুগ্ধ না করে পারে নি। প্রতিটি পত্রের মধ্যে তিনি এতই জীবন্ত যে, তাঁর সান্নিধ্যও যেন আমরা নতুন করে উপলব্ধি করতে পারলাম।

কিন্তু কয়েকটি প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে যা আপনার কাছে নিবেদন করা প্রয়োজন মনে করলাম।

১ নং পত্রের রচনাকাল ১৩০১ সাল। ঐ সময়েই রবীন্দ্রনাথের সংগে তাঁর পরিচয়, এক হিসাবে তাঁর প্রথম পত্র বলা যেতে পারে, কিন্তু তিনি লিখছেন—"ভাই রবি বলিতে সাহস হইল না"। "ভাই রবি" লিখবার চিন্তাটাই কি আশ্চর্য নয়? এই সময় প্রভাতবাবুর বয়স ২২ (তারও কয়েক দিন কম, দ্বিতীয় পত্র থেকে জানা গেল), আর রবীন্দ্রনাথের ৩৪। তবে কি সেসময় তা সম্ভব ছিল, না রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসার জোরেই তা সম্ভব হয়েছিল, যা এ যুগে সম্পূর্ণ অসম্ভব? কিন্তু এই ভালবাসা বা প্রীতির সম্পর্ক বয়সের এই ব্যবধান সত্ত্বেও যথেষ্ট গভীর হবার সুযোগ পেল কখন?

"প্রিয় টেগোর মহাশয়" (৪নং পত্র), "প্রিয় সোনারতরীবাবু" (৫নং পত্র), "সময়-হীনেষু" (৬নং পত্র)—সম্বোধনগুলিই বা এইভাবে হালকাসুরে অল্প পরিচয়েই সম্ভব হল কি করে?

প্রভাতবাবু লিখছেন তাঁর দ্বাবিংশতম জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিঠি তিনি পেলেন। "ইহা আমার পক্ষে বড় সুখের accident। এইদিন আমার জীবনে একটি পরম স্মরণীয় দিন হইয়া রহিল। আমার জীবনে আর দুইটি স্মরণীয় দিন আছে।" এই কথা লিখে তিনি যেদিন তাঁর পত্নীকে প্রথম জেনেছিলেন এবং যেদিন তাঁকে বিবাহ করেছিলেন সেই দুটি দিনের কথা উল্লেখ করেছেন। আশ্চর্য বোধ হয় একেবারে নতুন অসমবয়সী এক কৃতধী ব্যক্তির কাছে তাঁর মনের এই অতি গোপন অনুভূতির কথা তিনি ব্যক্ত করতে পারলেন কি করে এই ভেবে। সে যুগ ছিল আন্তরিকতার যুগ, আন্তরিকভাবেই তিনি এই দুটি দিনের সুখস্মৃতি নিজের মনে লালন করতেন বলেই হয়ত সে কথা রবীন্দ্রনাথকে জানাতে পেরেছিলেন। অথবা সে যুগে হয়ত অন্তরঙ্গ হতে সময় লাগত না। আমাদের মধ্যে কেউ এ যুগে ওকথাটা স্বল্প পরিচয়ের সূত্র ধরেই লিখে জানাচ্ছেন ভাবতেই পারি না, এবং যাঁকে লিখবেন তিনিও নিশ্চয় হাসাগোপন করতে পারবেন না।

এক পত্রে তিনি স্ত্রীর গল্প রচনার প্রয়াস নিয়ে কৌতুক করতেও ছাড়েন নি, তারপর ১৩০২ সালে লেখা ১৪নং পত্রে তিনি লিখছেন স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রথম দর্শনের কথা উল্লেখ করে—"আমি Works of Goldsmith পাইয়াছিলাম, তিনি চন্দ্রনাথ বসুর 'গার্হস্থ্য পাঠ' পাইয়াছিলেন। একথা বোধ হয় একবার আপনাকে বলিয়াছি, আরও কতবার বলিব (যদি বাঁচিয়া থাকি)—তাহার ঠিকানা নাই।" আমরা এখানে একটা জিনিস লক্ষ করলাম, তা হল এই যে—অসচেতন মনের ভাবাবেগই এইভাবে বারংবার স্ত্রীর উল্লেখের কারণ নয়। সচেতনতা ও সংযমবোধ তাঁর ছিল। বারংবার স্ত্রীর উল্লেখের পর ৩৯নং পত্রে স্ত্রীর মৃত্যুর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আমরা, আজ যারা পাঠকের ভূমিকা নিয়েছি, তাদের মন স্পর্শ না করে পারে নি। ট্রাজেডির রস তিনি এইভাবে সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন সার্থক ঔপন্যাসিক হিসাবে আত্মপ্রকাশের বহু আগেই।

এইভাবে যিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন, পত্রের প্রতি ছত্রে যাঁর আন্তরিকতার স্পর্শ কম্পমান তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পরিপূর্ণ মনস্কতার দাবি নিশ্চয় করতে পারেন। কিন্তু সে মনস্কতা তিনি পান নি বলেই মনে হয়। তা কেন?

প্রভাতবাবু এক পত্রে রবীন্দ্রনাথের 'ভুলো

মনের কথা উল্লেখ করে অনুযোগ জানিয়েছেন কয়েকটি প্রশ্নের জবাব না পেয়ে। এই পত্রে লিখছেন "আপনার এবারকার পত্রখানা যেন কেমন কেমন হইয়াছে। যা হোক পত্র লিখিয়াছেন, যাহার জন্য এই পত্র তাহার জন্য একটা সর্বনামও ব্যবহার করেন নাই। এ যেন সংবাদপত্রের স্তম্ভের জন্য সম্পাদকীয় মন্তব্য।" আর এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রভাতবাবুকে কোথাও আপনি এবং কোথাও তুমি বলে সম্বোধন করেছেন, যে জন্য প্রভাতবাবু লিখছেন (১৭নং পত্র)—"এবার হঠাৎ আমি 'আপনি' হইয়া গেলাম কেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।" এই অনবধানতা কেন? যেখানে প্রীতি এবং স্নেহ আন্তরিক সেখানে মনস্কতার অভাব সম্ভব নয় বলেই ত মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ কি তা হলে সকল সময়ই প্রভাতবাবুর কাছে দূরের মানুষ হয়েই ছিলেন?

রবীন্দনাথ সেন
কলিকাতা-২৯

বিলাতী পোশাকে বাংলা সাহিত্য

বুদ্ধদেব বসু মহাশয়ের পত্র পড়িয়া বেঙ্গলী লিটারেচার নামক একটি পত্রিকা সম্বন্ধে কয়েক ছত্র লিখিতে সাহসী হইলাম। উক্ত পত্রিকার দু একটি সংখ্যা আমার দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে ইংরেজি ভাষার অনুবাদ মাধ্যমে পৌঁছাইয়া দেওয়ার যে উদ্যোগ বেঙ্গলী লিটারেচারগোষ্ঠী করিয়াছেন, তাহা অভিনন্দনযোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু অনুবাদ কর্মটি বিশেষ সহজ নহে। এমন কি শুদ্ধ ভাষাতে অনূদিত হওয়া সত্ত্বেও যে মূল রচনার রস অনেকাংশে ক্ষুণ্ন হয়, তাহার বিস্তর প্রমাণ ইতস্তত লভ্য। অনুবাদ অশুদ্ধ ভাষায় হইলে ত কথাই নাই। বেঙ্গলী লিটারেচার সম্বন্ধে আমার অভিযোগ এই পত্রিকার কর্ণধারগণ ব্যাকরণসম্মত ইংরেজীতে ভাষান্তরের কাজটি করেন না। ভূরি ভূরি বানান ভুল, ব্যাকরণ বিস্মৃতি এবং অ-ইংরেজীয় ভাষা প্রয়োগের দ্বারা বাংলা সাহিত্যকে সাহেবগণের সমীপে উপস্থিত করিলেই যে বাংলা সাহিত্যের ইহকাল পরকাল ধন্য হইবে, এরূপ আশা করা বাতুলতা। উপদেষ্টা মণ্ডলীতে ডক্টরেট উপাধিধারী সুধীবৃন্দের নাম থাকা সত্ত্বেও যে স্থলে ভাষাগত প্রমাদ এড়ানো যাইতেছে না উক্ত পত্রিকার, ইহা অতিশয় দুর্ভাগ্যজনক। সত্য বলিতে গেলে বেঙ্গলি লিটারেচার পড়িয়া মনে হয় উক্ত পত্রিকার প্রকাশিত কেবলমাত্র বিভিন্ন কোম্পানীর বিজ্ঞাপনগুলিই ইংরেজী ভাষায় রচিত। বাকিগুলি অর্ধ প্রাকৃত কোন ভাষায়। পরিশেষে নিবেদন, বাংলা সাহিত্য আজিকে নানা শাখায় অতীব সমৃদ্ধ। সাহেবগণের নিকট হইতে শিরোপা প্রভৃতি পাইবার ব্যগ্রতায় তাহাকে কিম্ভূত বিলাতী পোশাকে সজ্জিত করিবার উৎকট শখ কোনো সৎ [illegible] না রাখাই মঙ্গল।

ই[illegible] কর
[illegible]গড়

(চাণক্য)

কি বিচিত্র এই শহর কলকাতা!

এখানে পায়রার খোপের মত ছোট্ট ছোট্ট খুপরীতে কখন যে কি ঘটে, অতি নিকট প্রতিবেশীরও তা জানবার উপায় নেই। অবশ্য তেমন কৌতূহলী প্রতিবেশী হলে হয়ত বাড়ীর খবর বার করতে সক্ষম হয়, সরস হয় দৈনন্দিন জীবন পাশের বাড়ির কেচ্ছা কাহিনীতে। কিন্তু এই নিষ্করুণ শহরে যেখানে জীবন সংগ্রাম চলে ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সেখানে পাশের বাড়ির কে কি ভাবে বেঁচে আছে তা জানার উৎসাহ খুব কম লোকেরই থাকে। আর, এ শহরে সবাই চায় নিজের গণ্ডীটুকুকে লক্ষ্মণের বেড়াজালে ঘিরে রাখতে।

আগেকার দিনে বৈকালিক মহিলা মজলিসে অনেক কিছু ফাঁস হয়ে পড়ত পাড়া বেড়ানো দু'একজন অত্যুৎসাহী বক্তার আগমনে। অপরের আনন্দ ওদের ঈর্ষার বস্তু ছিল, অন্যের দুঃখ ওদের রসনায় রস যোগাত, সামান্য একটি সংবাদ থেকে মুখে মুখে তৈরী হয়ে যেত সংবাদ-বিচিত্রা।

সেকালের সেইসব পাড়া বেড়ানো ঠানদিদিদের আজকাল দেখা পাওয়া যায় ক্বচিৎ, ক্বচিৎ খবর পাওয়া যায় এদের-ওদের-তাদের বাড়ির কিস্যা-কাহিনী। ঠানদিরা সেকালে ছিলেন হিন্দু সমাজের উত্থান পতনের ব্যারোমিটার, বর্তমানে সংবাদ পত্রের নানান ধরনের ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন চিন্তাশীল পাঠককে সামাজিক আর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করে। হারানো প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যেরকম পাওয়া যায় বিচিত্র ঘটনার কৌতূহলোদ্দীপক পশ্চাৎপট, তেমনি পাওয়া যায় মধ্যবিত্ত সমাজের রূঢ় নিষ্করুণ বাস্তব।

হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ।

হারাইয়াছে :—গত সোমবার বড়বাজার হইতে ম্যাডান স্ট্রীট যাইবার পথে কালো রং-এর ট্রাঙ্ক বোঝাই আমাদের কোম্পানীর গত তিন বছরের হিসাব পত্রের খাতা হারাইয়াছে। যে কেউ ফিরত দিলে নগদ এক হাজার টাকা পুরস্কার পাইবেন। নেবোরাম দেওনা দাস অ্যান্ড কোম্পানী, সোনাপট্টি।

পাওয়া গিয়েছে :—পরশু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে নিউটন কোম্পানীর অতি সুদৃশ্য নির্ভরশীল, নিখুঁত ১৫০ টাকা মূল্যের লেডিস রিস্ট-ওয়াচ পাওয়া গিয়াছে। ঘড়ীর মালিকানা প্রমাণ সহ দোকানে সাক্ষাৎ করুন।

এই ধরনের বিজ্ঞাপন কতই না প্রকাশিত হয় খবরের কাগজে, কিন্তু এর পিছনে যে ব্যবসা বুদ্ধি লুকিয়ে নেই কে বলতে পারে? ইনকাম ট্যাক্স অফিসকে বিভ্রান্ত করার জন্যে তিন বছরের হিসাবের খাতা কল্পনায় জলাঞ্জলি দেওয়া ছাড়া হয়ত গতি ছিল না নেবোরাম দেওনা দাস কোম্পানীর। আর, এমনও তো হতে পারে, দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনটি স্রেফ নিউটন কোম্পানীর ঘড়ীর বিজ্ঞাপন। আদৌ কোন লেডীজ রিস্ট-ওয়াচ কুড়িয়ে পাওয়া যায় নি ভিক্টোরিয়ার সামনে।

নিরুদ্দেশ :—বাবা ভ্যাবলা, আর কেউ কি পরীক্ষায় ফেল করে না? তাই বলে কি মায়ের গহনা নিয়ে পালিয়ে যেতে হয়? শীঘ্র ফিরে এস, তোমার মা আজ সাত দিন অন্নজল ত্যাগ করেছেন। তোমাকে ক্ষমা করলাম, টাকার প্রয়োজন হলেই লিখবে, মনিঅর্ডার যাবে, ইতি বাবা।

কিংবা, নিরুদ্দেশ :—কুমারী রমলা দত্ত, উচ্চতা চার ফুট ছ' ইঞ্চি। বয়স উনিশ বছর ছ' মাস, হাতে চার গাছা করে সোনার চুড়ী, পরনে লাল রঙের খয়েরী পাড় শাড়ি, বাম কনুই-এর নীচে লাল তিল। সংবাদ দিবেন, বক্স নং—।

প্রথম বিজ্ঞাপনে বাবা ভ্যাবলার পিতা পুত্রকে ক্ষমা করে ঠিকানা জানবার টোপ ফেলেছেন কাগজে। অপহৃত গহনার শোক হয়ত তাঁর জিঘাংসার কারণ। তাই চটপট ঠিকানা জেনেই অকুস্থলে গিয়ে হাতে-নাতে ভ্যাবলাকে পাকড়াও করার পর বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত বাৎসল্য রস শুকোতে বিন্দুমাত্র দেরী হবে না। যে মা ক্ষিদে সইতে পারেন না বলে ষষ্ঠিটুকুও করেন না, তাঁর পক্ষে পুত্রের বিচ্ছেদে সাত সাতটা দিন উপবাসে থাকা যে একরকম অসম্ভব তা ভ্যাবলাও ভাল ভাবে জানে।

আর ঐ কুমারী রমলা দত্ত? উনিশ বছর ছ' মাস বয়েসের মেয়েকে খোঁজার জন্যে পথে ঘাটে পরোপকারী পথচারী হয়ত বা পাওয়া গেল, কিন্তু সেই ব্যক্তির পক্ষে ফিতে নিয়ে চার ফুট ছ' ইঞ্চি উচ্চতা মাপার মত সৎসাহস নাও থাকতে পারে। আরও বেশি সাহস চাই তার সেই অপরিচিত মহিলাকে বাম কনুই-এর নীচে লাল তিল আছে কিনা দেখাতে বলার।

হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ বিজ্ঞাপনগুলির সবই যে এ ধরনের হবে এমন কোন কথা নেই। অধিকাংশই বহন করছে বর্তমান সমাজের অবক্ষয়, আকাঙ্ক্ষা আর আশা-নিরাশার পরিচয়। আজকাল পাশের বাড়িটা নিলামে উঠলে প্রতিবেশীরা জানতে পারে কোর্টের নিলাম ইস্তাহার বিজ্ঞাপনে।

বহুবার সাক্ষাত ঘটলেও ফলস্ প্রেস্টিজ জানান দিতে চায় না নিজের দুর্দশার কথা।

ঠিক এই কারণেই নিকট প্রতিবেশী হয়েও অনাদিপ্রসাদরা জানতে পারেন নি পাশের বাড়ির সাধনবাবুর মানসিক অশান্তির কথা। খবরটা পেলেন খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন মারফত।

"মা মীনা, যা হবার হয়ে গেছে, বাড়ি ফিরে এসো। আমার সামাজিক মর্যাদার কথা ভাববে, এ ছাড়া আর কিছু বলার নেই। ইতি বাবা।"

চারদিকেই জীবন সংগ্রামের একি নব নব প্রকাশ। জীবন নাটকের অন্যতম শ্রোতা অনাদিপ্রসাদও আজ বিস্মিত। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা লাভের সেই গৌরব দীপ্ত দিনগুলি আর সোনার খাঁচায় আবদ্ধ থাকতে চাইছে না। জীবনসায়াহ্নে একি বিচিত্র জীবন দর্শন ঘটছে বার বার, নিত্য নূতন চরিত্র লক্ষ্য করে? দীর্ঘ পঁচিশ বছর আগে বিয়ের পর রমলাকে নিয়ে যে রোমান্স সৃষ্টি হয়েছিল, সাহিত্যে তা অনাঘ্রাণিত [illegible], পাঠক ডুবেছে রস-সাগরে। আজ [illegible] দৈনন্দিন জীবন যন্ত্রণায় সে রস সাগর [illegible] নিয়েছে লবণ সমুদ্রের চোখের জলের লবণাক্ত। তাই এখন দৃষ্ট চরিত্রগুলিও যেন এক-একটি নুনের পুতুল। [illegible] বিলাস-ব্যসনের ফাঁসে বিদ্ধ অবক্ষয়ের প্রতীক।

অনাদিপ্রসাদ দেখেছেন [illegible] কলকাতাকে—কোন [illegible] [illegible] ছিল, [illegible] এক [illegible] এক জগতে [illegible] দেখেছেন সাধনবাবুকে, [illegible] হয়ে কন্যার প্রতি [illegible] মীনার আজকের এই নিরুদ্দেশ [illegible] ঘটনা। দেখা পেয়েছেন [illegible], [illegible] সুন্দর এই মেয়েটি, যার এক [illegible] মায়া জাল, অন্য চোখে [illegible] রজনীর [illegible]। [illegible] দেখা পেয়েছেন [illegible] দিনের হারিয়ে যাওয়া বন্ধু অশোক [illegible] —যে এক হাতে [illegible] অন্য হাতে [illegible] নিয়ে [illegible] খেলা দেখাচ্ছে। [illegible] এরা তো সে তুলনায় নির্বিষ ঢোঁড়া সাপ। অনাদিপ্রসাদ জেনেছেন ওপর মহলের জীবনকে—বর্ণ, মিঃ কুশারী আর [illegible]—বাইরে থেকে যাকে মনে হয় উচ্চ শিক্ষিত ধনী, সেই মিঃ কুশারীর কি অস্বস্তিকর জীবনের ট্রাজেডী। পথ চলতে হঠাৎ দেখা সেই কবিতা মেয়েটি কি তাঁর প্রয়োজন কম ঘুচিয়েছে? পদে পদে ইজ্জৎ বাঁচাবার চেষ্টায় যারা সুদূর রাণাঘাট থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রুজি রোজগার করতে আসে—তাদের মধ্যেও একি ব্যতিক্রম। সবাই এক নয় তার প্রমাণ মিতা।

অনাদিপ্রসাদের চোখের সামনে আজ নব

চরিত্রগুলোই ভীড় করে রয়েছে—দৃশ্য আর জনতার মিছিল চলছে, একের পর এক, কেউ চলছে ছক বাঁধা জীবনের নিশ্চিন্ততায়, কেউ চলছে বল্গাহীন অশ্বের দুর্গম আবেগে বিদ্রোহের নিশান তুলে। আজকের এই মীনার নিরুদ্দেশ যাত্রা কি সেই বিদ্রোহের সূচনা?

অনাদিপ্রসাদ অন্যমনস্কভাবে পায়চারী করতে করতে হাজির হলেন পাশের ছোট খোলা বারান্দায়। লক্ষ করলেন সাধনবাবুর বাড়ির জানালা দরজা সব বন্ধ। নীচের গেটখানাও খোলা নেই। তবে ভদ্রলোকের গাড়িটা রয়েছে। ড্রাইভার গাড়ির সিটে বসে ঘুমোচ্ছে।

এমন সময় রমলা বউদি পাশে এসে দাঁড়ায়, নিজের থেকেই বলে, সাধনবাবুরা বোধ হয় কলকাতার বাইরে কোথাও গেছেন।

কোথায়?

—তা জানি না, হয়তো চেঞ্জে কোথাও। কিংবা কোন আত্মীয়স্বজনের বিয়ে উপলক্ষে—

অনাদিপ্রসাদের হিসেব ঠিক মেলে না, তাই জিজ্ঞেস করেন, বাড়িতে কেউই নেই?

রমলা বউদি জানায়, মাঝে মাঝে দেখি সাধনবাবুকে গাড়ি করে বেরোতে। অন্যরা বোধ হয় কেউ নেই।

—তা হবে, অনাদিপ্রসাদ চুপ করে যান। কাগজের বিজ্ঞাপনের কথা স্ত্রীর কাছেও প্রকাশ করেন না। যদি ঐ বিজ্ঞাপন অন্য কোন মীনার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়ে থাকে, মর্যাদাবোধসম্পন্ন বাবা সাধনবাবু ছাড়া আর কেউও তো হতে পারে।

সন্দেহের নিরসন ঘটল কয়েক দিনের মধ্যে। একটি চিঠি এল ডাকে, মাত্র কয়েকটি ছত্র। লেখা—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

একদিন ভরসা দিয়েছিলেন বিপদে পড়লে আপনাকে পাশে দেখতে পাব। সেই আশায় এ চিঠি লিখছি। ইচ্ছে করে বাসার ঠিকানা গোপন রাখছি। যদি একটি বিপন্ন যুবককে সাহায্য করার বাসনা এখনও থাকে তবে এই শনি, রবি, সোম, যে-কোন দিন সকালে দশটার সময় গড়িয়াহাটের মোড়ে আসুন। অনেক আশা নিয়ে প্রতীক্ষা করব।

ইতি

আপনার গুণমুগ্ধ

সমীর

চিঠি পৌঁছল শনিবার সকালেই। অনাদিপ্রসাদ কালবিলম্ব করলেন না, একটা ট্যাক্সি নিয়ে চিঠির নির্দেশমত হাজির হলেন গড়িয়াহাটের মোড়ে। তখনও দশটা বাজে নি, আশেপাশে সমীরকে কোথাও দেখতে পেলেন না, এক কোণায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন আর ভাবছেন এই জায়গাটার কথা। কয়েক বছর আগেও কলকাতার এ অঞ্চলটা এত বেশী উন্নত ছিল না। কত সুন্দর সুন্দর বাড়ি উঠেছে, কত রকমারি দোকান, বাজার। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তা, মেয়েরা স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়, নিজেরা বাজার হাট করে। উত্তর কলকাতা যেমন বনেদী বাঙালী পাড়া, এ অঞ্চলে তেমনি উচ্চ মধ্যবিত্ত বিলিতী কায়দায় ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকতে অভ্যস্ত ছোট ছোট বাঙালী পরিবার। মাঝখানের কলকাতাটা বাঙালীদের বেহাত হয়ে গেছে। বড়বাজারে রাজস্থানী, চৌরঙ্গী অঞ্চলে ঈঙ্গ বঙ্গ, ভবানীপুরে গুজরাটি, পাঞ্জাবী আর মাদ্রাজী। সেই কারণে উত্তর আর দক্ষিণ কলকাতার বাঙালীদের মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান। সে শুধু দূরত্বের জন্যেই নয়, আচারে ব্যবহারে জীবনধারণের রীতিতে অনেক তফাত। উত্তরে এখনও যৌথ পরিবার আছে, দক্ষিণের লোকেরা আদৌ তাতে বিশ্বাস করে না। উত্তরে এখনও সাহেবীআনা ততটা ঢুকতে পারেনি যতটা ঢুকেছে দক্ষিণে। এখনও উত্তরের রান্নাঘরে শুক্তুনি, ছ্যাঁচড়া, ডাঁটা চচ্চড়ি রান্না হয়, কিন্তু দক্ষিণে গ্যাসের উনুনের থেকে বার হয় মাংসর রোস্ট, পুডিং কিংবা প্রেস্টিজ কুকারে রাঁধা মুরগীর কারি। উত্তরের মেয়েদের প্রসাধনে এখনও পুরোন বাঙালীআনার রেশটুকু বেঁচে আছে, কিন্তু দক্ষিণের মেয়েদের কেশ চর্চার বৈচিত্র্যে তাদের অনেক সময় বাঙালী বলে চেনা যায় না। উত্তরের বাজারে মোহনবাগান জিতলে আজও বোধ হয় চিংড়ি মাছের দাম বাড়ে কিন্তু দক্ষিণের বাজারে খেলার ফলাফলের কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। উত্তর কলকাতার বনেদীআনার নজির পেশাদার মঞ্চ। ভিড় করে সেখানে নাটক দেখতে যাওয়া আর দক্ষিণ কলকাতার বাঙালীদের চিত্তবিনোদনের স্থান সিনেমা, সে বাংলা, হিন্দী, ইংরিজী যে ভাষারই হোক না কেন। তা ছাড়া পিকনিক। উত্তর কলকাতার লোকদের ফাঁকা মাঠে বেড়োবার অভ্যেস নেই। দক্ষিণবাসীদের দেখা যায় লেকে, ময়দানে, গঙ্গার ধারে।

অনাদিপ্রসাদের চিন্তায় বাধা পড়ল, লক্ষ করেন নি কখন সমীর এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর পাশে। ছেলেটার মুখ ফ্যাকাশে, চোখের তলায় কালি পড়েছে। হাসবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না।

অনাদিপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ?

সমীরের ছোট্ট উত্তর, ভাল নয়।

—কি হয়েছে?

—সে অনেক কথা, চলুন একটু ফাঁকায় গিয়ে কোথাও বসি।

—চল।

দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে মোড় নিয়ে তারা ঢুকল সাদার্ন অ্যাভেন্যুতে। লেক পর্যন্ত যেতে হল না, গাছের তলায় ছায়া দেখে অনাদিপ্রসাদ বললেন, এইখানেই বসা যাক।

—মাটিতে?

—ঘাসের ওপর, খুব অপরিষ্কার নয়।

তারা দুজনে পাশাপাশি বসে। পরিস্থিতিটা একটু সহজ করে নেবার জন্যে অনাদিপ্রসাদ স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করলেন, এখন কোথায় আছ তোমরা?

—গড়িয়াতে।

—বিয়ে হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ।

—কত দিন হল?

সমীর যা বলল তা গুছিয়ে নিলে এই দাঁড়ায়, দিন পনের আগে ওরা বিয়ে করবে বলে ঠিক করে। সমীরের এক বন্ধুর বাড়ি থেকে বিয়ে হয়, রেজিস্ট্রার সেখানেই আসে। বিয়ের রাত্রে জন পাঁচ ছয় লোক ছিল, তারা সকলেই সমীরের বন্ধু। মীনা কলেজ থেকে সোজা সেখানে চলে আসে। সে রাত্রিটা তারা বন্ধুর বাড়িতে কাটায়। পর দিন চলে যায় গড়িয়ায়, সেখানে সমীর আগে থেকেই বাসা

ঠিক করে রেখেছিল, সমীর যেভাবে প্ল্যান করেছিল তার এতটুকুও নড়চড় হয়নি। নির্বিঘ্নে বিয়ে হয়ে গেছে, সাধনবাবুরা কোন খবর পান নি। গোলমাল করার সুযোগ তাদের ছিল না।

এত দূর শুনে অনাদিপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে দুর্ভাবনার কি হল? টাকা পয়সার অভাব?

—না তা নয়।

—তবে?

—গোলমাল হয়েছে মীনাকে নিয়ে। প্রথমটা সে খুব খুশী হয়েছিল, কেমন করে নিজের সংসার পাতবে তারই জল্পনা কল্পনা করছিল। কিন্তু তার পর কেমন যেন মনমরা হয়ে গেল। যত দিন যাচ্ছে বুঝতে পারছি মীনার ভাল লাগছে না, কথা বলছে, কাজ করছে, হাসছে, কিন্তু কোনটায় মধ্যে প্রাণ নেই। আমি অনেক বুঝিয়েছি, কোন ফল হয়নি। আমার বন্ধুরাও বোঝাচ্ছে ও সেসব কথা শোনেই না।

—মীনা কি চাইছে?

—পরিষ্কার বুঝতে পারছি না। নিজে কোন কূলকিনারা করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত আপনাকে চিঠি দিলাম। লুকিয়ে বিয়ে করেছি বলে আমার বাড়ির লোকদের সংগেও কোন সম্পর্ক নেই। এই দুঃসময় কার সংগে যে পরামর্শ করব, কে যে ঠিক উপদেশ দেবে, তাই—

অনাদিপ্রসাদ এই বিষণ্ণ যুবকটির কাঁধে হাত রাখলেন, তুমি নিজে অনুতপ্ত নয় তো?

সমীর দৃপ্ত কণ্ঠে বলে, মোটেও না। আমি তো কোন অন্যায় করি নি, মীনাকে ভালবেসে বিয়ে করেছি, তাকে সুখী করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু কেন যে পারছি না!

—ঠিক আছে, চল তোমাদের বাসায় যাওয়া যাক।

—সে যে অনেক দূরে।

—তা হোক, ট্যাক্সি নিয়ে যাব। মীনার সংগে আমার কথা বলা দরকার।

শহর ছাড়িয়ে গড়িয়া স্টেশনের কাছে নির্জন মাঠের উপর দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে সমীরদের নতুন সংসার। ঘর দুটি মাঝারি সাইজের, একখানা তক্তাপোষ পাতা, তার ওপরে বিছানা গোটানো রয়েছে। ওপরে দড়ি দিয়ে মশারী টাঙানো। ঘরে আসবাব-পত্র আর বিশেষ কিছু নেই। একখানা মাঝারি ট্রাংক, ছোট স্যুটকেশ। দেওয়ালে পেরেক দিয়ে মারা কাঠের আলনা, তাতে খান কয়েক পাঞ্জাবি শাড়ি ব্লাউজ ঝুলছে।

অনাদিপ্রসাদের চোখ নতুন বউটিকে খুঁজছিল, সমীর জানাল, বোধ হয় কলে গেছে, এখুনি আসবে।

একটু পরেই মীনা এসে দাঁড়াল ঘরে, তখনও শাড়িটা ভাল করে পরেনি, ভিজে চুল দিয়ে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। অনাদিপ্রসাদকে দেখে ভয়ে কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। মুখ দিয়ে শুধু বেরল, কাকাবাবু, আপনি?

অনাদিপ্রসাদ সস্নেহে হাসলেন, তোমাদের নতুন সংসার দেখতে এলাম।

মীনা কথাটা সহজভাবে নিতে পারল না, আপনি আমাদের ঠিকানা পেলেন কোথায়? বাবা আপনাকে পাঠান নি তো? চুপ করে কেন, বলুন না কি হয়েছে?

—কেন, আমি এসেছি বলে তুমি খুশী হও নি মীনা?

মীনা বিড় বিড় করে বলে, খুশী হয়েছি! কিন্তু কে আপনাকে খবর দিল?

সমীর এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, বলল, আমি ওঁকে চিঠি লিখেছিলাম।

—কেন? আমাকে তো বলনি।

—তোমার মনটা ভাল নেই তাই।

—আমার মন খুব ভাল আছে, আমার নিজের সংসার, আমার ঘর, আমার স্বামী, সব মেয়েই তো এই চায়, তাই না কাকাবাবু? আপনি কত বই লেখেন, আপনি তো জানেন, মেয়েরা আর অন্য কিছু চায় না। আমি টাকা চাই না গয়না চাই না, বাপের বাড়ি—

বলতে গিয়ে মীনা কি রকম থেমে গেল, একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবতে শুরু করে। সমীর সেদিকে অনাদিপ্রসাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অনাদিপ্রসাদ কথার খেই ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন, বাপের বাড়ির কথা কি বলছিলে মীনা?

মীনা ফিরে তাকায়, ব্যথিত চোখের দৃষ্টি, মা কেমন আছে? খুব কান্নাকাটি করছেন বোধ হয়, না? বাবার ভয়ে হয়তো কাঁদিতেও পারছেন না, এর মধ্যে মার সংগে আপনার দেখা হয়নি?

অনাদিপ্রসাদ কি উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না, কি করে জানাবেন ওদের বাড়ির দরজা জানালা সব বন্ধ, কাউকেই দেখা যাচ্ছে না।

মীনা বলে যায়, আপনি কিন্তু ওদের কাছে আমাদের ঠিকানা দেবেন না, বাবা জানতে পারলেই পুলিশ পাঠাবে, ওকে জেলে দেবে।

অনাদিপ্রসাদ ভরসা দেন, কি সব আবোল তাবোল ভাবছ, তোমরা এখন স্বামী-স্ত্রী, বাবার কথায় পুলিশ তোমাদের বিরক্ত করবে কেন?

—কি জানি, বাবার কত টাকা, কত লোকজন, তা ছাড়াও ওর ওপর খুব রেগে আছেন তো, কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না, আমি তো বাবাকে জানি।

সমীর জোর দিয়ে বলে, সে ভাবনা আমার, এসব কথা চিন্তা করে তুমি মন খারাপ করছ কেন?

মীনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আমার জন্যে এর জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল কাকাবাবু, যত সেই কথা ভাবি মনে হয় বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই।

অনাদিপ্রসাদ চিন্তিত হন, বলেন, ছিঃ, মীনা, সমস্ত তোমার নিয়ে হয়েছে, এখন মনের জোর কর, দুদিনের সংসার করে তবে তো সমীর সুখী হবে। তুমিও যে রকম বাড়ি ছেড়ে এসেছ সেও তো তোমারই জন্যে তার বাবা মা সবাইকে ছেড়ে চলে এসেছে। এখন তুমি যদি অমন করে কর ওর কি অবস্থা হবে বল তো।

মীনা অসুখের মত বলে, সেই তো বলছি কাকাবাবু যত অশান্তি আমাকে নিয়ে, আমি মরে গেলে আমার বাড়ির লোকেরা আর ওর পেছনে লাগবে না। তখন ও ইচ্ছে করলে নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে পারবে। আমার আর সত্যি বাঁচতে ইচ্ছে করছে না।

অনাদিপ্রসাদ আর কথা বাড়ালেন না, আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, চাপা গলায় বললেন, সমীর, আমার মনে হচ্ছে মীনাকে ডাক্তার দেখানো দরকার।

সমীরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, কেন, কি হয়েছে?

—মীনার কল্পনার নৌকো বাস্তবের পাহাড়ে ধাক্কা লেগে ফুটো হয়ে গেছে, জল ঢুকছে, ক্রমশ ও তলিয়ে যাবে যদি না এখুনি বাঁচাবার ব্যবস্থা করা যায়।

অসহায় সমীর মীনার দিকে তাকিয়ে দেখে বিভ্রান্ত নাবিকের মত।

(ক্রমশ)

বিশ্ব বিজ্ঞান

আন্তর্জাতিক জীবশাস্ত্রীয় কর্মসূচী

বছরকতক হলো বাংলা দেশের ঋতুচক্রে কয়েকটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমরা দেখছি শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুর কোনটিই আজকাল আর আগেকার নিয়মমত পালা বদল করে না। শরৎ ও হেমন্ত কাল টের পেতে না পেতেই উধাও হয়ে যায়। নভেম্বর মাসেও আজকাল পাখার দরকার হয় এবং মার্চ মাসে অনেক সময় রাত্রে বিছানায় শুতে হয় গায়ে চাদর চাপা দিয়ে। কালবৈশাখী আজকাল বসেই কাল কাটায়। শীতকালে সত্যিকার ঠাণ্ডা থাকে বড় জোর দিন দশ পনেরো। সোজা কথায় বছরের ১০ মাস গরম আর ২ মাস কমবেশি ঠাণ্ডা থাকে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কমে যাচ্ছে এবং যথাসময়ে বর্ষা পড়ে না। তারপর একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে ঋতুগুলির সমাগম কাল আগেকার তুলনায় পেছিয়ে গিয়েছে শুধু নয়, সেগুলির চরিত্রেও কিছুটা অদল-বদল ঘটেছে। দিনের বেলা লু-এর মত পশ্চিমী হাওয়া আর ১০৭-১০৮ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রা আগেকার দিনে ছিল না। আজকাল প্রতি বছরই এই দুটি ব্যাপার ঘটছে। শীতের দিনেও আজকালকার মত তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রীর নিচে নামত না। আর বসন্ত বলে যে একটা ঋতু আছে সেটা এই কলকাতায় তো অনুভবই করা যায় না।

ঋতুগুলির এইসব পরিবর্তনের মূলে কিছুটা সৌরক্রিয়ার হাত থাকতে পারে। কিন্তু সেটাই সব নয়। মনে হয় সৌরক্রিয়ার চেয়ে মানুষই এগুলির জন্য বেশি করে দায়ী। দুর্গাপুর অঞ্চলে আগে যে বন-জঙ্গল ছিল, সব কেটে সাফ করে ফেলে কলকারখানা তৈরি হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ ও আসামে যুদ্ধের সময়েই বহু বন জঙ্গল নিশ্চিহ্ন করা হয় এবং "বনমহোৎসবের" যুগে বিভিন্ন অঞ্চলে চলেছে বন-ধ্বংসোৎসব। এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে, কলকারখানা তৈরি করা বন্ধ করা উচিত। শিল্প প্রসার তো করতেই হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে নতুন অরণ্য বলয় রোপণ করতে বাধা কোথায়, কোথায় বাধা কলকাতার রাস্তার দু' ধারে বট, অশ্বত্থ, কদম, দেবদারু প্রভৃতি গাছ লাগাবার? কারখানা তৈরি করতে গিয়ে আমরা আঞ্চলিক প্রকৃতির উপর যে হস্তক্ষেপ করছি তার কুফল নিবারণের আবশ্যিক প্রয়োজনের কথাটা আমরা খেয়ালই করছি না। ফলে বাংলা দেশের এবং তার মর্মকেন্দ্র কলকাতার আবহাওয়া অধিবাসীদের পক্ষে দুঃসহ হয়ে পড়ছে। অথচ মানুষকে মানুষের এবং প্রকৃতির সহযোগী হয়ে বসবাস করতে হবে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে গেলে প্রকৃতি মানুষকে ক্ষমা করবে না। প্রকৃতির সহযোগী হতে শেখার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বহু দেশের বিজ্ঞানীরা ১৯৬৪ সাল থেকে তিন বছর প্রস্তুতির পরে গত বছরের জুলাই মাস থেকে কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায় নিয়ে কাজে নেমেছেন যার নাম দেওয়া হয়েছে **আন্তর্জাতিক জীবশাস্ত্রীয় কর্মসূচী**। এই কর্মসূচী পাঁচ বছর চালু থাকবে। আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ বৈজ্ঞানিক বৎসরের (১৯৫৭-৫৮) মতই এটিরও কর্মক্ষেত্র ভূমণ্ডলব্যাপী বৈজ্ঞানিক অভিযান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এই দুটিরই জন্মদাতা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সংযোগসাধনের আন্তর্জাতিক পরিষদ (ইণ্টারন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব সায়েণ্টিফিক ইউনিয়নস)। কিন্তু এই দুটির সাদৃশ্য বলতে এইটুকুই এবং সেটা বাহ্যিক বা আঙ্গিক সাদৃশ্য মাত্র। উপকরণ বা উপাদানের ক্ষেত্রে দুটির মধ্যে অনেক প্রভেদ। আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ বৈজ্ঞানিক বৎসরের কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ছিল ভূত্বক, আবহমণ্ডল এবং তারও উর্ধ্বে পদার্থ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা অর্থাৎ এমন সব ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করা যা এমনি চোখেই দেখা যায় বলে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে যুগপৎ পর্যবেক্ষণ চালানো। সেই জন্য এক বছরের মধ্যে সেই কর্মসূচীর কাজ সমাধা করা সম্ভব হয়েছিল যার ফলে ভূমণ্ডলের ও

লিবীয়ার এই দিগ্বলয়বিস্তৃত মরুভূমি কিংবা সাহারাকে কি করে মরূদ্যানে রূপান্তরিত করা যায়, আন্তর্জাতিক জীবশাস্ত্রীয় কর্মসূচী অনুসারে বৈজ্ঞানিকরা তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। ভিতরে বসানো ছোট্ট ছবিটিতে সাহারা মরুভূমির দক্ষিণাংশে ২ জন উটযাত্রী বেদুইনকে দেখা যাচ্ছে। এই ছবিটিতে একটি গাছের ঝোপও দেখা যাচ্ছে যেটা প্রমাণ করে যে, মরুভূমি বৃক্ষসমৃদ্ধ করা সম্ভব।

আফ্রিকার রুডল্ফ্ হ্রদের কাছের একটি উঁইঢিবি। এগুলিই উঁইপোকা, জমির জৈববস্তু খেয়ে ফেলে উর্বরতা নষ্ট করে এবং ভূত্বকের ঠিক নিচেকার মাটির স্তর বাইরে বার করে আনে...

আফ্রিকার বর্ষণসমৃদ্ধ ট্রেংগানু অঞ্চলের গহন অরণ্যে যত জীব ও গাছপালা আছে তত অন্য কোথাও নেই। এটির জলশক্তি বিপুল।

তার প্রতিবেশের গঠন ও চরিত্র সম্পর্কে বহু সত্য ও তথ্য সংগ্রহ করা গিয়েছিল। তারপরে আন্তর্জাতিক প্রশান্ত সূর্যের বছরগুলিতেও অনেক কিছু নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। ভূপদার্থ বৈজ্ঞানিক বৎসরেই উত্তর সাগরের তলদেশে বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়।

কিন্তু জীব জগতের ও তার পারিপার্শ্বিকের ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণের দিক থেকে অন্য রকমের। সেই জগৎ সদা-পরিবর্তনশীল ও গতিশীল। সেই জন্য বহু জায়গায় যুগপৎ একই ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করা অসম্ভব। তা ছাড়া আন্তর্জাতিক জীবশাস্ত্রীয় কর্মসূচীর উদ্দেশ্য শুধু মৌলিক গবেষণ নয়, সেই সঙ্গে মানুষের কল্যাণ সাধনও বটে। তাই সেটির কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হচ্ছে "উৎপাদিকা শক্তি ও মানব কল্যাণের জীবশাস্ত্রীয় ভিত্তি" সম্পর্কে এক বিশ্বব্যাপী পরিকল্পনা অনুসারে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে যাওয়া। ১৯৬৪ সালের জুলাই থেকে ১৯৬৭ সালের জুলাই পর্যন্ত বহু আলোচনা, পর্যালোচনা, সমালোচনার মাধ্যমে পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলি সংশোধিত, পরিবর্ধিত ও সবিস্তারে সম্পাদিত করা হয়। কর্মসূচীটিকে সংক্ষেপে বলা হয় আই-বি-পি অর্থাৎ ইণ্টারন্যাশন্যাল বায়োলজিক্যাল প্রোগ্রাম।

পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে যে হারে পৃথিবীতে লোকসংখ্যা বাড়বে তার সঙ্গে মানিয়ে তাদের সকলের বৈষয়িক প্রয়োজন মেটানোর বন্দোবস্ত করা, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। সেই সমস্যার মীমাংসা নির্ভর করবে প্রধানত গাছপালা ও জীবজন্তুর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির উপর। লোকবৃদ্ধির এবং ঐ উৎপাদিকা শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হলে বিজ্ঞানের সাহায্য হবে অপরিহার্য, বিশেষ করে জীব-বিজ্ঞানের কতকগুলি ক্ষেত্রের। সেই সঙ্গে আরো চাই পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা। কিন্তু এই দুটি ব্যাপারেই কর্মসূচীর বৈজ্ঞানিক পরিচালক ডঃ ই বি ওয়র্দিংটনের মতে, বিজ্ঞানীদের জ্ঞান এখনো অত্যন্ত কম যে তাকে শোচনীয় বললে অত্যুক্তি হবে না।

প্রথমত এইসব সমস্যা বিচার বিবেচনা করতে হবে ভূমণ্ডলের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া অনুসারে অর্থাৎ হিমমণ্ডল, নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল ও উষ্ণ মণ্ডল অনুসারে। তারপর সেগুলি নিয়ে কাজ করতে হবে জৈব ভৌগোলিক অঞ্চল নিয়ে যেমন উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে আফ্রিকা, ইউরেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায়। কারণ, সেগুলির প্রত্যেকটিতে এমন সব গাছপালা ও জীবজন্তু আছে যেগুলি অন্য কোনটিতে নেই। সেগুলির আবাস ও বসবাসের জায়গাগুলির অনন্য বৈশিষ্ট্যও পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

সুতরাং আই-বি-পিকে কয়েকটি শাখা দলে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কয়েকটি দলের কাজ হল বিভিন্ন জাতীয় গাছপালা ও জীবজন্তুর প্রধান আবাসস্থল বেছে নিয়ে (জমিতে, পুকুরে ও সাগরে, সেখানে গিয়ে সবুজ গাছের মাধ্যমে প্রথম স্তরের উৎপাদিকা শক্তি এবং সবুজ উদ্ভিদভোজী জীবজন্তুর দ্বিতীয় স্তরের উৎপাদিকা শক্তি ও এই দুই স্তরের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা। আর একটি দলের কাজ হচ্ছে উৎপাদন প্রক্রিয়াগুলি অনুশীলন করা—যেমন, আলোক সংশ্লেষ ও বাষ্পমোচনের স্বার্থে গাছগুলির দ্বারা সৌরশক্তি ব্যবহার এবং নাইট্রোজেন চক্রের ক্রিয়াকলাপ পরীক্ষা। সেই রকম আর একটি দল দায়িত্ব নিয়েছেন বিভিন্ন জাতির গাছপালা ও জীবজন্তু যাতে স্বাভাবিক আস্তানায় থাকতে পারে তার জন্য উপযুক্ত এলাকা ও জাতিগুলির সংরক্ষণ। আর একটি দল মানুষের অভিযোজন ক্ষমতা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন অর্থাৎ সুপ্রজনতত্ত্ব, বর্ধন, স্বাস্থ্য, শীত, গরম ও উচ্চতা সহ্য করার ক্ষমতা, কাজ কর্ম করবার সামর্থ্য ইত্যাদির দিকগুলি নিয়ে গবেষণা করছেন। আরো একটি দল গাছপালা ও জীবজন্তুর 'জীন' (gene) সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং মানুষের ব্যবহারের জন্য নতুন জীবশাস্ত্রীয় উৎস গড়ে তুলছেন। বিভিন্ন দেশে এইসব গবেষণা চালাবার জন্য সেই সব দেশের কিছু বিজ্ঞানী মাঝে মাঝে সমবেত হয়ে ঠিক করেন কর্মসূচীর অংশ-বিশেষ ঐ সব দেশের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে

কিভাবে বাস্তবে রূপায়িত করা যাবে। কোন একটি বিষয় নিয়ে সারা পৃথিবীতে একই পদ্ধতিতে কাজ করা যাবে কিনা সেটা বিচার বিবেচনার জন্যও মাঝে মাঝে তাঁরা মিলিত হন। এইসব যৌথ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে এবং আগামী ২ বছরের মধ্যে ২০টিরও বেশি বই (হ্যাণ্ড বুক) ছাপার কথা।

ধরুন বিজ্ঞানীদের একটি করে দল, প্রেরি, স্টেপ বনভূমি এবং ইকুয়েডরের বিশাল সব তেপান্তরের মাঠে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন সেখানকার ঘাসবনচারী পশুপাল থেকে কত মাংস পাওয়া যেতে পারে কিম্বা কতকগুলি অঞ্চলের বাসিন্দারা কতখানি পর্যন্ত উচ্চতায় উঠলে তাদের কাজকর্ম করার ক্ষমতার কোন ক্ষতি হয় না। তারপর তাঁরা সবাই একসঙ্গে জমা হয়ে প্রাপ্ত তথ্য ও ফলাফলগুলি তুলনা করে দেখেন। এই ধরনের তুলনামূলক আলোচনা থেকেই বুঝতে পারা যায় যে আই-বি-পির কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়িত করায় কোন দেশের অবদান কি পরিমাণ হবে এবং সেটা হবে কোন কোন বিষয়ে। আই-বি-পির পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তব রূপায়ণের জন্য টাকা পয়সা লাগবে অজস্র যেমন লেগেছিল আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ বৈজ্ঞানিক বৎসরকে সাফল্যে উত্তীর্ণ করাতে। কিন্তু মোট কত টাকা খরচ হবে তা আগে থাকতে বলা অসম্ভব। কারণ কোন দেশ শেষ পর্যন্ত কত টাকা বরাদ্দ করতে পারবে সে সম্পর্কে এখন থেকে আন্দাজ করা শক্ত। তা ছাড়া মাঝে মাঝে কর্মসূচীর কিছু কিছু সংশোধনের প্রয়োজন হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, ব্রিটেনে ঐ কর্মসূচী অনুসারে যে ১৪০টি প্রকল্প নিয়ে কাজ হচ্ছে সেগুলির মধ্যে কতকগুলি একেবারে নতুন বলে সেগুলির জন্য আলাদা টাকা মঞ্জুর করতে হয়েছে। তারপর ধরুন এমন সব বিষয়ও আছে যেগুলি নিয়ে এমনিতেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা পরিষদ ও সরকারী বিভাগে আগে থেকেই স্বতন্ত্রভাবে কিছু কিছু কাজ হচ্ছিল যেগুলির আই-বি-পির কর্মসূচীর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে বলে সেগুলিকে আই-বি-পির সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। এইসব কারণে অর্থব্যয়ের সঠিক হিসাব আগে থেকে দেওয়া মুশকিল।

পৃথিবীতে এমন বহু ছোট ছোট দেশ আছে যেগুলিতে বহু বড় বড় জীবশাস্ত্রীয় প্রশ্ন ও সমস্যার অস্তিত্ব রয়েছে কিন্তু সেগুলি নিয়ে গবেষণা করার মত অর্থবল বা বৈজ্ঞানিক নেই। সেই জন্য আই-বি-পিতে সেইসব দেশে গবেষণা চালানোর জন্য অন্য দেশের সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেইসব ক্ষেত্রে ছোট দেশটি সমস্যাগুলির উল্লেখ করে সেগুলি নিয়ে গবেষণার সুযোগ-সুবিধা করে দেবে এবং তার সহযোগী দেশটি জোগান দেবে গবেষক দল ও অর্থবল।

উগাণ্ডার এই জলাশয়ে প্রচুর মাছের চাষ করা যেতে পারে যার ফলে সমুদ্র থেকে বহুদূরের বাসিন্দাদের প্রোটিন জোগানো যাবে। জলাশয়টির নাম কিজেনাবো লোলা হ্রদ।

উদাহরণ হিসাবে আমরা মালয়েশিয়ার কথা উল্লেখ করতে পারি যেখানকার নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলীয় আরণ্য অঞ্চলগুলি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের খুবই কৌতূহল আছে। সেই সব বনজঙ্গল নিয়ে ব্রিটেন ও মালয়েশিয়া একযোগে কাজ করছে। তেমনি ব্রিটেন ও অস্ট্রেলিয়া একযোগে গবেষণায় নেমেছে, নিউ গিনিতে সেখানকার আদিবাসীরা কিভাবে জংলী পরিবেশে বসবাস করতে অভ্যস্ত হয় বা সেই অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেয় তা পরীক্ষা করে দেখতে। ইউগাণ্ডা দেশেও ব্রিটেনের দুটি বৈজ্ঞানিক দল গিয়েছেন। একটি দল দায়িত্ব নিয়েছেন সেখানকার নদ নদী ও জলাশয়ের জল নিয়ে কাজ করার, অন্যটি সাভানা অঞ্চল নিয়ে গবেষণা করার। প্রথম দলটি ১০০ বর্গ মাইল আয়তনের সেণ্ট জর্জ হ্রদের বিপুল মৎস্য সম্পদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। অদূর ভবিষ্যতে নিকটস্থ ম্যাকেরেয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে কিছু আফ্রিকান গবেষক তাঁদের সঙ্গে যোগ দেবেন। সাভানা নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্র হচ্ছে ইউগাণ্ডার সংরক্ষিত জঙ্গলগুলি (ন্যাশনাল পার্ক) যেখানে বসবাস করে বহু বড় বড় জীবজন্তু। তারা স্বাভাবিক অবস্থায় কিভাবে খায়দায় ও বসবাস করে তা খুঁটিয়ে জানতে পারলে পশু প্রজনন ও পালনের ব্যাপারে অনেকখানি সাহায্য পাওয়া যাবে।

আই বি-পি নিয়ে কাজ করার সুযোগ-সুবিধা সংখ্যাতীত। পরিকল্পনার স্তরে ও প্রাপ্ত তথ্যাবলীর বিচার-বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন জায়গার গবেষণাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারলে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের উপকার হবে এবং সেই সঙ্গে আই-বি-পি প্রত্যেকটি দেশের কাছ থেকে কিছু না কিছু অবদান লাভ করবে। বর্তমানে যে ৪০টিরও বেশি দেশ আই-বি-পির শরিক হয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সবগুলি দেশ, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার

অধিকাংশ দেশ এবং অস্ট্রেলেশিয়া। তবে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বহু দেশের পক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে এখনো আই-বি-পিতে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও নাইজিরিয়া এবং ব্রেজিল যোগ দিয়েছে।

আই-বি-পি নিয়ে এ পর্যন্ত যা কাজ হয়েছে তা থেকে বিজ্ঞানীরা ক্রমশই এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হচ্ছেন যে জীবশাস্ত্রীয় সম্পদের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই জন্য সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের ইউনেস্কো, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রভৃতি সংগঠনগুলি আই-বি-পির বিভিন্ন প্রকল্পের কাজে সহযোগিতা করছে। এখনো পর্যন্ত আই-বি-পি হচ্ছে এক বেসরকারী ব্যাপার। কিন্তু ভবিষ্যতে সরকারী স্তরেও এক বিশ্ব কর্মসূচী রচনার কথা চিন্তা করা হচ্ছে বলে উপরে উল্লেখিত সংস্থাগুলির কার্য পরিকল্পনা নিয়ে বিভিন্ন দেশের সরকারগুলির এক বৈঠক ডাকা হবে বলে ঠিক করা হয়েছে।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

অর্থভাবনা

গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ

জুন মাসের ৮ তারিখে নয়াদিল্লীতে ব্যাংকারদের যে সম্মেলন হয়ে গেল তাতে অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-আমানত বাড়াবার প্রয়োজনীয়তার প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গত বছর কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বেশি হওয়ায় জাতীয় আয় প্রায় শতকরা দশভাগ বেড়ে গেছে বলে অনুমিত। গ্রামাঞ্চলে বড় বড় জোতদার এবং কৃষকদের আয় বেড়ে যাওয়ায় ব্যাংকগুলির পক্ষেও অধিক আমানত সংগ্রহ করার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে বলে অর্থমন্ত্রী মনে করেন। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বেশি করে আমানত সংগ্রহ করা কতটা সম্ভব হবে তা নির্ভর করে গ্রামবাসীদের মনে ব্যাংকগুলি কর্তৃক বিশ্বাস ও উৎসাহ সৃষ্টি করার ক্ষমতার উপরে। আমাদের দেশে ব্যাংক ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত। এই অনুন্নত ব্যাংক ব্যবস্থার কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একটি সুসংগঠিত বিল-বাজারের (Bill Market) অভাব, বিলের মাধ্যমে লেনদেন করার ক্ষেত্রে অভ্যাসের অভাব, গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার কার্যকারিতার অভাব এবং ব্যাংকবহির্ভূত বিরাট গ্রামাঞ্চলের অস্তিত্ব। যদি গ্রামবাসীদের মনে ব্যাংক-ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি আস্থা ও বিশ্বাসের ভাব জাগ্রত করতে হয়, তবে সুদূর গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করতে হবে, গ্রামবাসীদের ব্যাংক-ব্যবস্থার উপকারিতা বোঝাতে হবে এবং গ্রামাঞ্চলে যাতে আরও বেশি করে ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন চালু করা হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

বর্তমানে আমাদের দেশে একমাত্র স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া-ই সুদূর গ্রামাঞ্চলে শাখা স্থাপন করছে এবং তা-ও সম্ভব হত না যদি এই ব্যাংকটি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে না আসত। অন্যান্য ব্যাংকগুলিও অবশ্য বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে শাখা স্থাপন করছে, কিন্তু তা সংখ্যায় খুবই নগণ্য। সমবায় ব্যাংকগুলি অবশ্য গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু জনসাধারণের মনে ব্যাংকে টাকা জমা রাখার আগ্রহের সৃষ্টি করা এখনও সম্ভব হয়নি। আমাদের জাতীয় আয়ের প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগ আসে কৃষিক্ষেত্র থেকে। কিন্তু ব্যাংকের মোট আমানতের অধিকাংশই আসে শহরাঞ্চল থেকে। দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশের একটি বিরাট অংশের আয় এখনও সংগৃহীত হচ্ছে না। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থানে আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের উপর প্রায়ই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না গ্রামাঞ্চল থেকে আরও বেশি করে আমানত সংগ্রহ করা যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না।

ব্যাংকের সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ব্যাংকারদের সহযোগিতা

ব্যাংকারদের সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ অর্থমন্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছেন যে তাঁরা ব্যাংকের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সব বিধি-নিষেধ কার্যকর করতে প্রস্তুত। এটা সুখের কথা; কিন্তু সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সফল করতে হলে দুটো জিনিস বিশেষভাবে বিচার করতে হবে। একটি হচ্ছে ব্যাংক-ব্যবস্থা পরিচালনার উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, এবং অপরটি হচ্ছে ব্যাংক বিনিয়োগের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। ব্যাংক-ব্যবস্থা পরিচালনার উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ইতিমধ্যেই প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু এজন্য ব্যাংকের অফিসারদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা দরকার। ব্যাংকগুলিকেও এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। তাহলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা কার্যকর করার পক্ষে তাদের সহযোগিতা সঠিক পথে চালিত হবে। ব্যাংক-বিনিয়োগের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করার জন্য জাতীয় ঋণ পরিষদ (National Credit Council) গঠিত হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য, কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনানুযায়ী ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা করার জন্য এবং রপ্তানি সামগ্রী উৎপাদনকারী সংস্থাসমূহকে আরও বেশি করে ঋণ দেওয়ার জন্য ব্যাংকগুলির ঋণদান নীতিকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে আনা উচিত, এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। এতদিন ব্যাংকগুলি যে এ দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পালন করতে পারেনি সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করার মধ্য দিয়েই তা প্রমাণিত। এখন যদি ব্যাংকগুলি সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে সরকারের সহিত সহযোগিতা করে তবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকগুলির ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হবে। কিন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রণ যত কঠোর হতে থাকবে তত ব্যাংকগুলির সহযোগিতা থাকবে কিনা এ বিষয়ে এখন থেকেই কিছু বলা যাচ্ছে না। যেখানে বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলিকে জাতীয়করণ করার দাবি সোচ্চার হয়েছিল সেখানে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ চালু করা হয়েছে। অর্থাৎ, মালিকানাবিহীন সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হয়েছে। আমানতকারীদের স্বার্থ এবং দেশের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্বার্থেই এই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হয়েছে। আশা করি ব্যাংকগুলি এখন থেকে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করেই নিজেদের ক্রিয়াকলাপ এবং ঋণদান নীতি পরিচালিত করবে।

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় বেকার সমস্যা

আশঙ্কা করা হয়েছে যে, চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে ২ কোটি ৮০ লক্ষ লোক বেকার থাকবে। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা শুরু হওয়ার সময়েই বেকার লোকের সংখ্যা হবে ৯৫ লক্ষ; চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় নূতন কর্মপ্রার্থী লোকের সংখ্যা হবে ২ কোটি ৭৩ লক্ষ। অর্থাৎ, চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে ৩ কোটি ৬৮ লক্ষ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না বলে পরিকল্পনা কমিশন আশঙ্কা করছেন।

জিনিসপত্রের দাম গত বছর কতটা বেড়েছে?

সরকারী সূত্রে জানা যায়, ১৯৬৭-৬৮ সালে পাইকারী মূল্যসূচী হয়েছে ২১২·৪ (১৯৬১-৬২=১০০ ধরে নিয়ে); ১৯৬৬-৬৭ সালে মূল্যসূচী ছিল ১৯১·৩; অর্থাৎ, এক বছরে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে শতকরা ২১·২ ভাগ। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দাম বেড়েছে খাদ্যশস্যের। চিনি এবং গুড়ের দাম বেড়েছে শতকরা ৮৬·৬ ভাগ। চাল ও গমের দামও বেড়েছে। দুধ ও ঘি-এর দাম বেড়েছে শতকরা ১৮·৮ ভাগ এবং ফল ও সব্জির দাম বেড়েছে শতকরা ৭·৭ ভাগ। মাছ-মাংস ও ডিমের দাম বেড়েছে শতকরা ৪·৪ ভাগ। এই বর্ধিত মূল্যসূচীর কারণ প্রধানত দুটি—একটি হচ্ছে চাহিদার বৃদ্ধি এবং অপরটি উৎপাদন-খরচের বৃদ্ধি। চাহিদা বেড়ে যাবার অন্তরালে রয়েছে কালো টাকার দাপট।

—সুব্রত গুপ্ত

লক্ষ্মীর কৃপালাভঃ বাঙালীর সাধনা

পর্সিলেন বা মৃৎশিল্পে বাঙালী

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী'** পত্রিকার ১ ভাদ্র, ১৩১০ সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিশেষ খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল — "সত্যসুন্দর দেব দীক্ষার্থী হইয়া জাপান গমনের পূর্বে মহর্ষির (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের) সমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া এইভাবে উপদেশ দেন : তুমি ধর্মের বংশীয়। যিনি ধর্মের সেতু ও ধর্মের হেতু, সর্বতোভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হও......তুমি ধর্মপরায়ণ হইয়া বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে ও দেশের কল্যাণ-সাধনে রত হইবে। আশীর্বাদ করিতেছি, তোমার বিঘ্নবিপত্তি দূর হউক এবং তুমি সদুদ্যমে কৃতকার্য হও।" (আংশিক উদ্ধৃতি।)

আজকের অষ্টাশি বছর বয়স্ক মহাস্থবির শ্রীসত্যসুন্দর দেব মহাশয়ের জীবনী লেখা আর ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের 'পার্সিলেন' বা মৃৎশিল্পের ইতিহাস রচনা প্রায় একই কথা। বর্তমানে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলা দেশে যে ক'টি উল্লেখযোগ্য পটারি (Pottery) আছে, তার অনেকগুলিই ভারতীয় মৃৎশিল্পের এই নায়ক সত্যসুন্দরের স্পর্শধন্য। ভারতের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম 'বেঙ্গল পটারিজ্ লিমিটেড'-ও তারই হাতে গড়া। ১৯০৩ সাল থেকে শুরু করে সত্যসুন্দরের ৬০ বছর বিস্তৃত কর্মজীবনের সংক্ষিপ্তসার নীচে লিপিবদ্ধ করছি।

১৯০৩—১৯০৫...জাপানের টোকিও শিল্প-বিদ্যালয় ও কিয়োটো সেরামিক গবেষণাগারে শিক্ষালাভ। জাপানে অন্যতম প্রথম ভারতীয় ছাত্র।

১৯০৬...মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের উদ্যোগে স্থাপিত ভারতের প্রথম পটারি 'ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস'-এর বিশেষজ্ঞ ও জেনারেল ম্যানেজার পদে নিয়োগ। (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আত্মজীবনীতে সত্যসুন্দরের কাজকর্মের সুদীর্ঘ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী দৈনিক 'বেঙ্গলী' কাগজের ১৬ আগস্ট, ১৯০৬ সংখ্যায় ক্যালকাটা পটারি এবং সত্যসুন্দরের বিষয়ে বিশেষভাবে লিখিত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল।)

১৯০৯—১৯১০...চীন ও জাপানের মৃৎশিল্পে অধিকতর অভিজ্ঞতা লাভের জন্য দ্বিতীয়বার বিদেশ যাত্রা।

১৯১১—১২...ব্রহ্মদেশের ইনসিনে অবস্থিত বার্মা পটারি ওয়ার্কস-এ বিশেষজ্ঞের পদে নিয়োগ।

১৯১৩—১৪...ইয়োরোপ যাত্রা। জার্মেনী ও ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ গবেষণাগার ও মৃৎশিল্প প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ও চাকরি।

১৯১৬—১৭...মহীশূর ও বরোদা-রাজের আমন্ত্রণে স্থানীয় পটারি স্থাপনা এবং চায়না-ক্লের খনি বিষয়ে উপদেষ্টার পদে নিয়োগ।

১৯১৯...কলকাতায় সদ্যপ্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল পটারিজ্ লিমিটেড'-এর ডিরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজার পদে নিয়োগ।

১৯২৭...বিহার প্রদেশে 'বিহার পটারিজ্ লিমিটেড'-এর স্থাপনা।

১৯২৮...'ইন্ডিয়ান সেরামিক সোসাইটি'র প্রথম সভাপতি পদে নির্বাচিত।

১৯২৯...ত্রিবাংকুর ও কোচিন-রাজের আমন্ত্রণে উপদেষ্টারূপে ত্রিবাংকুরের কুন্দারা নামক স্থানে চায়না-ক্লে খনি বিষয়ে এবং কোচিনের চালাকুড়িতে সরকারী 'পটারি' স্থাপনা বিষয়ে পরামর্শদান।

১৯৩০—৩১...মহীশূরের মল্লেশ্বরমে সরকারী পর্সিলেন ইনসুলেটার কারখানা স্থাপনার তত্ত্বাবধায়ক পদে নিয়োগ।

১৯৩৭—৩৮...বাংলা সরকারের অনুরোধে বেলঘরিয়াতে 'আর্ট অ্যান্ড ইউনাইটেড পটারিজ্'-এর স্থাপনা ও পরিচালনা।

১৯৩৯...বেলঘরিয়াতেই 'বেঙ্গল পর্সিলেন কোং লিমিটেড'-এর স্থাপনা ও পরিচালনা।

১৯৫২—৫৪...বোম্বাই-এর 'নবভারত

** তত্ত্বকৌমুদী বোধ হয় অন্যতম বাংলা সাময়িক পত্রিকা, যা ধর্মসম্প্রদায়বিশেষের মুখপত্ররূপে একাদিক্রমে ৯০ বছর নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশের গৌরব করতে পারে। ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ২ জ্যৈষ্ঠ অর্থাৎ ১৫ মে, ১৮৭৮-এ প্রথম প্রকাশের পর বহু দশক ধরে এর চেহারা ছিল একইরকম; বিশেষ আকর্ষণীয় প্রকাশনা ছিল না। কয়েক বছর আগে খ্যাতনামা সংকলয়িতা ও সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন-এর সুদক্ষ পরিচালনায় পত্রিকাটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

পটারিজ্‌'-এর স্থাপনার সহায়তা এবং পরিচালনা।

১৯৫৮—৬০ ... রাঁচী শহরের নিকটস্থ রাই নামক স্থানে 'রাই রিফ্র্যাক্টরিজ লিমিটেড'-এর স্থাপনা ও পরিচালনা।

ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারের নিবাস চব্বিশ পরগনার ন্যাতড়ার কাছে কর্ণপুর গ্রামটি হল সত্যসুন্দরের দেশ। তাঁর বাবা ত্রৈলোক্যনাথ দেব মশায় ছিলেন ভারতবর্ষের কাঠ-খোদাই ব্লকের এক প্রাচীনতম শিল্পী। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় ভারতবর্ষে আধুনিক ব্লক-মেকিং প্রবর্তন করার আগে পর্যন্ত গ্রন্থচিত্রণের একমাত্র উপায় ছিল এই wood-engraving। আজ থেকে ১১০/১৫ বছর আগে ত্রৈলোক্যনাথ এই উড-এনগ্রেভিং-এর কাজ করতেন এবং উপেন্দ্রকিশোর মঞ্চে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বাংলা দেশের উল্লেখযোগ্য পাঠ্যপুস্তক ও পত্রপত্রিকার প্রায় সব ছবিই ছিল ত্রৈলোক্যনাথের শিল্পকর্ম।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পৌরোহিত্যে হিন্দুমতে বিবাহের কিছু কাল পরে ত্রৈলোক্যনাথ ও তাঁর পত্নী বিরাজমোহিনী দেবী উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ প্রচারকদের অনুপ্রেরণায় ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন আচার্য শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (উত্তরকালের বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু) এবং সপরিবার ত্রৈলোক্যবাবু কলকাতার ঝামাপুকুর অঞ্চলের একটি বাড়িতে একই সঙ্গে বসবাস করতেন। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথ দত্ত অর্থাৎ পরবর্তীকালের স্বামী বিবেকানন্দ মাঝে মাঝে বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে ঝামাপুকুরের সেই বাড়িতে পদধূলি দিতেন। এ হল বিজয়কৃষ্ণের ধর্মান্তর ও নরেন্দ্রনাথের রামকৃষ্ণ-শিষ্যত্ব গ্রহণের আগের কথা। ব্রাহ্মভাবাপন্ন নরেন্দ্রনাথ নাকি নিয়মিত সমাজের উপাসনায় যোগ দিতেন।

সত্যসুন্দর নামটি আচার্য বিজয়কৃষ্ণের দেওয়া। সত্যসুন্দর বড় হয়ে তাঁর মায়ের কাছে এ-ও শুনেছিলেন যে, রামকৃষ্ণদেব তাঁদের ঝামাপুকুরের বাড়িতে এলেই শিশু সত্যসুন্দরকে কোলে নিয়ে বসতেন। আর নরেন্দ্রনাথ এলেই বিরাজমোহিনী তাঁকে গানের ফরমাশ করতেন এবং নরেন্দ্রনাথ তাঁর উদাত্ত সুরেলা গলায় গানের পর গান গেয়ে শোনাতেন।

এ এক অশ্রুতপূর্ব সমন্বয় ও পরিবেশ। সত্যসুন্দর আমাকে অতি প্রাচীন একটি বাঁধানো খাতা দেখতে দিলেন। মা বিরাজমোহিনীর নিজের হাতের লেখায় সত্তর আশি বছরের আগেকার একটি ডায়েরী। বিরাজমোহিনী ভালো বাংলা জানতেন এবং চলনসই ইংরেজীও শিখেছিলেন। আর কী সুন্দর হাতের লেখা! কালি চোপসানো একটি পাতায় মুক্তাক্ষরে লেখা আছে: "শিশু সন্তানদের সরল প্রাণে যে সাধুতার বীজ পড়েছিল, কালে তাতে মধুময় ফল লাভ করিয়াছি।"

এমনি এক সুন্দর ছেলেবেলার পরে সত্যসুন্দর বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে।

এক্সপার্ট হিসেবে শ্রীসত্যসুন্দর দেব হলেন ভারতীয় পোর্সিলেন শিল্পের অবিসংবাদিত পথিকৃৎ। অবশ্য সত্যসুন্দর যোগ দেবার আগেই ভারতের প্রথম পোর্সিলেন ফ্যাক্টরী 'ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'Life And Experiences Of A Bengali Chemist (চক্রবর্তী-চ্যাটার্জি, ১৯৩২) বইটিতে দেখতে পাচ্ছি যে, কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ সেন (অধুনা কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সেনের পিতামহ) এবং তাঁর কনিষ্ঠ স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ সেন (নিউ ইণ্ডিয়ান গ্লাস ওয়ার্কসের শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেনের পিতা)—এই তিনজনের মিলিত চেষ্টায় ১৯০১ সালে 'ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস'-এর স্থাপনা হয়েছিল। কিন্তু প্রথমটার এক অপটু ব্যক্তির পরিচালনায় সেই অতি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাতেই প্রচুর লোকসান হয়ে যায়। ১৯০৬ সালে জাপান থেকে ফিরে সত্যসুন্দর এই প্রতিষ্ঠানের কার্যাধ্যক্ষ পদে যোগ দেন।

বাঙালীর প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র মহাশয়ের জনকল্যাণমূলক কীর্তি সকলেরই মোটামুটি জানা আছে!

বাংলার শিল্পোন্নতির জন্যেও তিনি নানা প্রচেষ্টাতে অর্থ বিনিয়োগ করে নিজে একাই যেন একটি ফিনান্সিয়াল করপোরেশন হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। উক্তিটি আমার নয়। এটি C. G. C. R. I. অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কাচ ও সেরামিক গবেষণাগারের 'গ্লাস অ্যান্ড সেরামিক বুলেটিন'-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের মূল বক্তব্য (১৯৬৫-র দ্বাদশ খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। ক্যালকাটা পটারি স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজা স্যার মণীন্দ্র এবং তাঁর তিনজন অংশীদার মিলে একটি চায়না-ক্লে'র খনি নিয়ে 'রাজমহল কোয়ার্টজ-স্যান্ড অ্যান্ড কাওলিন কোং' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা করেন। তারপর ১৯১৯ সালে বিহার সরকারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নিয়ে সিংভূম অঞ্চলে যে প্রতিষ্ঠান গঠিত করেন বর্তমানে তার নাম 'মহারাজা কাশিমবাজার চায়না-ক্লে মাইনস'। বিদেশী বিশেষজ্ঞের সাহায্যে বহু অর্থব্যয় ও দুস্তর বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে মণীন্দ্র নন্দী মহাশয় এই কোম্পানীটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। এই বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে তিনি কয়েকটি বাঙালী যুবককে বৃত্তি দিয়ে বিদেশেও পাঠিয়েছিলেন। আজ এই বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের চীনেমাটি পটারি (নিম্নমানের), কাপড়ের কল, রবার শিল্প, রঙ তৈরি, ওষুধ তৈরি প্রভৃতি বিবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়। স্যার মণীন্দ্রের স্বনামধন্য সাহিত্যিক পৌত্র মহারাজকুমার সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী এখন এর কর্তা।

ওপরে C. G. C. R. I.-এর নামের উল্লেখ করতে গিয়ে একটা কথা মনে পড়ে গেল। 'দিগকল্প' ও 'কৃষ্ণ গ্লাস' বিষয়ক প্রবন্ধে উল্লেখিত C. G. C. R. I.-এর কাচ ও সেরামিক শিল্পের উন্নয়ন প্রয়াসের প্রশংসা করার সময়ে দুটি তথ্যে ভুল থেকে গিয়েছিল। এই গবেষণাগারের উৎপাদিত বীক্ষণ কাচের (optic glals-এর) ওজন লিখেছিলাম ৪।৫ টন। আসলে এর বার্ষিক উৎপাদন হলো আনুমানিক ৯ টন। আর বলেছিলাম যে, ভারতবর্ষে এখনো 'গ্লাস-উল' 'ফাইবার-গ্লাস' ইত্যাদির উৎপাদন আরম্ভ হয়নি; কিন্তু পরে খবর পেলাম যে, বোম্বাইয়ের এক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি গ্লাস-উল প্রভৃতি তৈরির একটি কারখানা চালু করেছেন।

সম্প্রসারণের জন্য মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সালে 'ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস'-কে লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করা হলো। নামটিও বদলে এর নতুন নামকরণ হলো 'বেংগল পটারিজ লিমিটিড'। ঠিকানা একই রইলো—৪৫নং ট্যাংরা রোড। (বর্তমান বিরাট ফ্যাক্টরীটি এখনও সেখানেই অবস্থিত।) পরিচালনারও পরিবর্তন হলো। পি এন দত্ত এবং এস এন দত্ত নামে দুই ভাই এর ভার নিলেন। সেই ম্যানেজিং এজেন্সী কোম্পানীর নাম ছিল 'পি এন দত্ত অ্যান্ড কোং'।

কিন্তু এত করেও শেষ পর্যন্ত বেঙ্গল পটারিজ বাঙালীর হাত থেকে বেরিয়ে গেল ১৯৩২।৩৩ সালে। সত্যসুন্দর দেবের হাতে গড়া বেঙ্গল পটারিজ আজ বছরে প্রায় ৩½ কোটি টাকার মাল বিক্রি করে। আমাদের ঘরে ঘরে আজ এই প্রতিষ্ঠানের বাসন শোভা পাচ্ছে। এখন এ'রা উন্নত ধরনের Bone Chinaর (হাড়ের গুঁড়ো মিশ্রিত) বাসনও তৈরি করেন।

প্রায় ২৫০০ বছর আগে বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট'-এর একটি বাক্য: Then I went down to the Potter's house and behold he was making a work on the wheels. জেরেমিয়া-র অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ থেকে উদ্ধৃত।

কিন্তু বাইবেলের যুগ হলো মৃৎশিল্পের যৌবনকাল। মৃৎশিল্প বা পটারি-র আনুমানিক জন্ম সময় হলো প্রস্তর যুগের শেষ ভাগ, অর্থাৎ এখন থেকে ৬।৭ হাজার বছর আগে। চীন দেশেই এর উৎপত্তি—যে চীন আমাদের কাগজ দিয়েছে, আর দিয়েছে আমাদের গৈরিক-সুধা, যাকে আপনারা বলেন 'চা'। (চীন আবার আমাদের এখন দিয়েছে নকশাল-তন্ত্র।)

চৈনিক মৃৎশিল্পী বোধ হয় প্রথমে করেছিল Stoneware অর্থাৎ কালো fireclay জাতীয় মাটির তৈরি বাসন। এখনো আমরা সস্তা কাফে রেস্তোরাঁ-তে যেসব মোটা পেয়ালা পিরিচ ব্যবহার করি, কখনো যদি তার ভাঙা টুকরোর ভিতরটা পরীক্ষা করেন তো দেখবেন তা সরন্ধ্র এবং অসমান কালচে পোড়ামাটি—এ হলো stoneware-এরই জাত। আর করেছিল লাল মাটি পোড়ানো earthenware এবং majolica। তাদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো সম্পূর্ণ চায়না-ক্লে'-র তৈরি দুগ্ধফেনানিভ দামী chinaware।

ভারতবর্ষ-ও যে বেশী পিছিয়ে থাকে নি তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি হাজার পাঁচেক বছর আগেকার মত জনপদ মহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পায় আবিষ্কৃত উচ্চ-মানের মৃৎপাত্রের নমুনা দেখে। মিশরেও তাই।

পারস্যের উজ্জ্বল নীল ও সবুজ রঙের মৃৎপাত্রের জন্মকাল হলো খৃষ্টীয় সপ্তম শতক নাগাদ। একাদশ শতাব্দীর নৈশা-পুরে জ্যোতির্বিদ কবি ওমর খৈয়াম যে পেয়ালা হাতে ছন্দ গেঁথে দিন কাটাতেন আর সাকী যে পাত্র থেকে সেই পেয়ালায় সুরা ঢেলে দিত, মনে হয় তার দুটোই ছিল সেই ইরানী পার্সিলেন।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমেও নাকি পর্সিলেনের প্রচলন ছিল। ক্রমশ সারা ইয়োরোপে এবং ব্রিটেনেও তা ছড়িয়ে পড়লো।

ইয়োরোপের পার্সিলেন এখন বোধ হয়

সবচেয়ে ভালো। তার কারণ হলো যে, সেখানে পৃথিবীর সেরা চায়না-ক্লে খনির চীনেমাটি দিয়ে উন্নত গবেষণাজাত উন্নত প্রণালীতে পর্সিলেন নির্মিত হয়। চেকোস্লাভাকিয়ার কার্লোভি-ভেরি অঞ্চলের zettlitscher জায়গাটিতে নাকি পৃথিবীর সর্বোত্তম চীনেমাটি পাওয়া যায়। তারপরেই হচ্ছে ফ্রান্সের Limoges-এর নিকটস্থ St. Yriex-এর খনি আর ইংল্যাণ্ডের Cornwall-এর খনির মাটি। সত্যসুন্দরবাবুর মতে আমাদের কেরল ও রাজমহলের চীনেমাটির গুণ নাকি এর ধারে-কাছেও নয়।

কিন্তু ইয়োরোপীয় পর্সিলেন এখন যত ভালোই হোক না কেন, আসল হার্ড-পেস্ট (hard-paste) অর্থাৎ খাঁটি (true) পর্সিলেন আবিষ্কারের কৃতিত্ব হল সপ্তম থেকে নবম খৃষ্টীয় শতকের চৈনিক মৃৎশিল্পীর। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চৈনিকদের মন্ত্রগুপ্ত এর নির্মাণকৌশল চীনেই সীমাবদ্ধ রেখেছিল। সেই বছরে Johan Bottger নামে এক জার্মান মৃৎশিল্পী তাঁর ড্রেসডেন শহরের কারখানাতে এর গুপ্ত কৌশলটি বের করে

ফেললেন। তাঁর কারখানার কর্মীরাই পরে সারা ইউরোপে এর প্রচলন করে দেন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ Dresden China-র কথা আমরা অনেকেই জানি।

সত্যসুন্দরের কাজের নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রতিষ্ঠান গড়ে যাওয়া—একের পর এক, তারপর আর এক। আরম্ভেই দেখিয়েছি যে, ভারতের মৃৎশিল্পকুলের এই পিতামহ 'ক্যালকাটা' ও 'বেঙ্গল' ছাড়া বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দীর্ঘ সম্বন্ধ রাখেন নি। তা রাখলে তাঁর ব্যক্তিগত উপার্জন ও সঞ্চয় হয়ত অনেক হতো, কিন্তু তাতে ভারত-বিস্তৃত পর্সিলেন শিল্পের প্রবর্তন ও সমৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটতো—সত্যসুন্দরের সাধনা ব্যতিরেকে অন্য দশজনের লক্ষ্মীলাভ হতো না। সায়ান্টিস্ট ও টেকনিশিয়ান আবিষ্কার করেন, অর্থনীতিবিদ্ উপার্জন ও সঞ্চয়ের পথনির্দেশ দেন, আর তার সুযোগ নিয়ে অন্যে হয় ধনপতি—এই-ই হলো সাধারণ নিয়ম।

এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো বাঙালীর, তথা সত্যসুন্দর দেব মহাশয়ের সাধনা—পর্সিলেন শিল্পে কিন্তু মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র বা আর কারওই, যাকে বলে লক্ষ্মীর কৃপালাভ তা হয়ে ওঠে নি। অনেক বাঙালী পটারি-মালিকই লাভ করতে না পেরে সরে এসেছেন, আর যাঁরা আছেন তাঁদের প্রতিষ্ঠানও বিরাটত্বের মহিমা অর্জন করতে পারে নি।

এই প্রসঙ্গে সত্যসুন্দরের সমসাময়িক স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কথাও উল্লেখ্য। দেবমহাশয়ের জাপান যাবার কয়েক বছর পরে দীনেশবাবুও সে দেশ থেকে পর্সিলেন শিল্পে পারদর্শিতা লাভ করে এসেছিলেন। তিনি বেশী কাজ করেছেন সাদা ও রঙীন earthenware পটারির ওপরে। গোয়ালিয়র-রাজ প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত 'গোয়ালিয়র পটারিজ্' দীনেশচন্দ্রেরই অবদান।

বাঙালীর মধ্যে এঁদের পরেই উল্লেখযোগ্য হলো সত্যসুন্দরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীসরল দেব-এর নাম। তিনি পিতার ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। পঁয়ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সরল দেব-ও ভারতীয় মৃৎশিল্পের এক মহোপাধ্যায়। প্রায় চব্বিশ বছর বাঙালী প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল পর্সিলেন প্রাইভেট লিমিটেডে জড়িত থাকার পর (কালে ইনি এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টরও হন) সরলবাবু এখন কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'অ্যাসোসিয়েটেড পর্সিলেন প্রাঃ লিঃ' নামে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি পটারির ডিরেক্টর হিসেবে পরিচালনা করছেন। কিন্তু ক্রোড়পতি পটারি-মালিকের চেয়ে কোনো অংশে এই পর্সিলেন-পণ্ডিত সরল দেবের সম্মান এই শিল্পের জগতে কম নয়।

কেবল বাণিজ্যেই নয়, সরল দেব কিছু দিন আগে পর্যন্ত প্রাচ্যের কয়েকটি দেশের রোটারি ক্লাবের সর্বোচ্চ আসন 'ডিস্ট্রিক্ট গবর্নর'-এর পদ অলংকৃত করেছিলেন। কুশলী ক্রিকেটার হিসেবে যৌবনে তিনি ও তাঁর বিখ্যাত কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমিয় (কানি) দেব মোহনবাগান ক্লাব-এর নামী খেলোয়াড় ছিলেন। অবশ্য ফুটবলার হিসেবে অমিয়ের খ্যাতি বেশী ছিল। (সরলবাবুর আর দুই ভাই, শিশির ও সুশান্ত দেবও কৃতী ক্রীড়াবিদ্ ছিলেন এবং এখন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জয়ন্ত হকি ও ক্রিকেটে খ্যাতি অর্জন করেছেন। খেলাতেও যে এই পরিবারের মহান ঐতিহ্য আছে, সে কথাটি না জানিয়ে পারলাম না।)

ত্রিশ দশকের বাংলার ব্রিটিশ রাজ্যপাল স্যার জন অ্যান্ডারসন মুক্ত রাজবন্দীদের ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনীতি থেকে সরিয়ে এনে পুনর্বাসন করার উদ্দেশ্যে বাংলার তদানীন্তন ডিরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রিজ সতীশ মিত্র মশায়ের পরামর্শে সরকারী সাহায্যে 'আর্ট অ্যান্ড ইউনাইটেড পটারিজ্' নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়ে দেন, শ্রীসরল দেব ছিলেন তার 'টেকনিক্যাল এক্সপার্ট'। কতিপয় মুক্ত রাজবন্দী ছিলেন এর যৌথ মালিক।

সম্পূর্ণভাবে বাঙালীর মালিকানায় এখন যে-সমস্ত পটারি চালু আছে, শ্রীসরল দেব মহাশয়ের সাহায্যে তার একটি তালিকা সংকলন করেছি।

কিন্তু সৌন্দর্যের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে যাঁরা আমাদের নিত্যপ্রয়োজনের জিনিসকে নয়ন-ভুলানো রূপ দেন, সেইসব কারুশিল্প প্রতিষ্ঠানের পথিকৃৎ ছিলেন স্বর্গীয় রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। তাঁর প্রচেষ্টায় বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনে চীনেমাটির বদলে লালমাটি পুড়িয়ে সুন্দর চিত্রিত সব earthenwere তৈরি শুরু হয়েছিল, যত দূর মনে পড়ে, ত্রিশ দশক থেকেই।

এখন সারা ভারতে এই আর্ট পটারির প্রচলন হয়েছে। কলকাতার বর্তমান আর্ট-পটারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'কলেজ অব সেরামিক টেকনোলজি'র অধ্যাপক শ্রীআশিস জানা ও তাঁর ফরাসিনী সহধর্মিণীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 'Vallauris Caramique d' Art' প্রতিষ্ঠানটির নাম। এঁরা এবং আরও দু'-চারটি প্রতিষ্ঠান নাকি শ্রীনিকেতনের চাইতে উন্নততর আধুনিক পদ্ধতিতে চায়ের সরঞ্জাম, ফুলদানি, ছাইদানি, পুতুল ও আরও নানা রকম সুন্দর সুন্দর জিনিস করছেন।

পশ্চিমবঙ্গ কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প অধিকারের সেরামিক বিভাগের কর্তা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর শ্রীজ্যোতির্ময় সান্যালের কাছ থেকে আমি যে ক'টি জ্ঞাতব্য তথ্য পেলাম, আংশিকভাবে তাও আমি এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

কলকাতার পূর্বাঞ্চলে পাগলাডাঙাতে অবস্থিত পুরনো সরকারী গবেষণাগার 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ল্যাবরেটরি'র সেরামিক বিভাগটির (সরল দেব মহাশয়ও এককালে এর ছাত্র ছিলেন) নাম বদলে

প্রতিষ্ঠানের নাম		বর্তমান কর্মকর্তা বা স্বত্বাধিকারী
বেঙ্গল পর্সিলেন প্রাঃ লিঃ	—	শ্রীইন্দুভূষণ মিত্র
ইন্ডিয়া পটারিজ্ লিমিটেড	—	শ্রীসুধীর ঘোষ
অ্যালায়েড সেরামিক্স প্রাঃ লিঃ	—	শ্রীসুবোধ ঘোষ
হিন্দুস্থান পটারিজ্	—	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাঁ
বি. ডি. সেরামিক্স	—	শ্রীপ্রাণগোপাল দত্ত
নাগ পটারিজ্	—	শ্রীসুধীর নাগ
আরকো সেরামিক্স	—	শ্রীসুশীল রায়
আর্ট পটারিজ্ প্রাঃ লিঃ	—	শ্রীসেনগুপ্ত ও শ্রীসাহা

এঁরা Tableware, মানে বাসনপত্র, Sanitaryware অর্থাৎ ওয়াশ-বেসিন, প্যান, কমোড ইত্যাদি, এবং বিদ্যুৎ সরবরাহে জরুরী ইনসুলেটর, ফিউজ, ক্লিট, রীল প্রভৃতি নানা শ্রেণীর পর্সিলেন তৈরি করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা ও সংকট সত্ত্বেও এঁদের মালের চাহিদা আছে প্রচুর। কিন্তু একদা বাঙালীর সম্পত্তি বেঙ্গল পটারিজের বার্ষিক ৩২ কোটি টাকার বিক্রির সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হয় না।

ওপরে যাঁদের নাম করলাম, তাঁরা তৈরি করেন যাকে বলে আটপৌরে কাজের জিনিস। ১৯৪১ সালে 'বেঙ্গল সেরামিক ইনস্টিটিউট' গঠিত হয়। ১৯৬২-তে পুনর্বিন্যাসের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এই শিক্ষায়তনটির নাম হয়েছে 'কলেজ অব সেরামিক টেকনোলজি'। এখন প্রায় ৫০ জন ছাত্র এই কলেজে বি-এস্সি টেক (সেরামিক্স)-চার বছরের কোর্সে শিক্ষালাভ করছেন। শ্রীশশধর রায় এই কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ।

জ্যোতির্ময়বাবু বললেন যে, তাঁদের ডায়রেকটোরেট কলকাতা ও শহরতলির প্রায় ৮০টি উটজ মৃৎশিল্প প্রতিষ্ঠানকে সস্তা পেয়ালা-পিরিচ থেকে বৈদ্যুতিক ইনসুলেটর

পর্যন্ত বিভিন্ন পণ্য নির্মাণে বান্ত্রিক সহায়তা করেন। তা ছাড়াও নাকি এই শ্রেণীর কতক কতক কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারী পটারিগুলির কাছ থেকেও অনুরূপ সাহায্য নেন। সরল দেবও বললেন যে, এইসব ছোট ছোট ১০।১২ জন কর্মীর চালিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেশ কয়েক হাজার পুরুষ ও মহিলার (বিশেষ করে বাস্তুহারার) অন্নসংস্থান হয়।

বিশ্ববিখ্যাত 'বাঁকুড়ার ঘোড়া'র উৎপত্তির স্থান সোনামুখীর (বাঁকুড়া) ২০০।৩০০ পরিবারের এবং মাটির পুতুল ও প্রতিমা তৈরির আদি জায়গা কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি অঞ্চলের শ' তিনেক মৃৎশিল্পী পরিবারের কথা জ্যোতির্ময়বাবু বিশেষ করে উল্লেখ করলেন। কলকাতার কুমারটুলি অঞ্চলের প্রসিদ্ধ মৃৎশিল্পীদের বিষয়ে ডাইরেক্টোরেট থেকে সঠিক কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া গেল না।

বছর খানেক আগে শ্রীসরল দেব C. G. C. R. I-এর বিশেষ একটি অনুষ্ঠানে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার সারাংশ অনুধাবন করলেই ভারতবর্ষের সেরামিক শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়।

প্রথমেই বলা দরকার যে, এ দেশের বৃহৎ ও ক্ষুদ্র মৃৎশিল্পে খুব কম করেও ১ লক্ষ শ্রমিক ও কর্মীর অন্নসংস্থান হয়। সরলবাবুর বক্তৃতার অন্তর্ভুক্ত পরিসংখ্যানে অবশ্য বৃহৎ শিল্পের মোট কর্মিসংখ্যার যে হিসেব দেওয়া আছে তাতে সংখ্যা হলো প্রায় ৭৫০০০। তার মধ্যে কুড়ি হাজারেরও বেশী লোক খাটছে Glazed Tiles (চীনেমাটির টালি। সাধারণ রানীগঞ্জ বা কোটরাং-এর লালমাটির টালি নির্মাণে। উপরন্তু Firebricks ইত্যাদি ফার্নেসের মালমসলা তৈরিতে খাটছে প্রায় ৩০০০০ লোক। বৃহৎ শিল্পের শ্রমিক ও কর্মীরা প্রায় ২½ কোটি টাকা মাইনে পায় সারা বছরে। বার্ষিক জাতীয় উপার্জনের মধ্যে কেবল মৃৎশিল্পের আয় (ফায়ার-ব্রিক্স ও টালি-সহ) হলো ১৪ কোটি টাকা আন্দাজ। গত বছর দশেকের মধ্যে উৎপাদন কি-ভাবে বেড়ে গেছে তার একটা ছোট হিসেব পাচ্ছি Sanitary were-এর বেলায়। ১৯৫৬ সালে ভারতে এই বস্তুটি উৎপাদিত হয়েছিল ২৮০০ টন আন্দাজ, আর আজ হচ্ছে ১২০০০ টন বা তারও বেশী। চীনেমাটির টালি তৈরি হচ্ছে আন্দাজ ৭০০০ টন। পেয়ালা-পিরিচের উৎপাদন বৃদ্ধির হিসেব আর নাই দিলাম। সরলবাবু বলেছেন যে, রফতানি কিছুটা বাড়াতে পারলে শীঘ্রই এমন অবস্থা হবে যে, বেঙ্গল পটারির মতো ১৫টি বৃহৎ পটারি বাজারে মাল যুগিয়েও কুলিয়ে উঠতে পারবে না। ভারতীয় টেবল-ওয়্যার বা crockery ২৩টি দেশে রফতানি হয়েছে এবং স্যানিটারি-ওয়্যার নাকি হয়েছে ৭টি দেশে। বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হিসেবে অনতিবিলম্বে ভারতেই প্রায় ৪০ কোটি পেয়ালা-পিরিচের চাহিদা হবে বলে সরলবাবু মনে করেন; এখন সেখানে নাকি মাত্র ৫½ কোটি আন্দাজ তৈরি হচ্ছে।

সমস্যার মধ্যে সর্বপ্রথম হলো চীনেমাটির সহজ ও যথেষ্ট সরবরাহ। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুসারে আমাদের ১০ লক্ষ টন চায়না-ক্লের প্রয়োজন। তার ব্যবস্থা আমাদের নেই—ভালো কোয়ালিটির তো প্রায় নেই-ই। দেশী চীনেমাটির দামও বেড়ে যাচ্ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। ১৯৬৫-তে যে 'রাজমহল'-এর দাম ছিল ১৬৫ টাকা টন, এখন তা এসে দাঁড়িয়েছে ২৩০।২৫০ টাকা টনে। তা বাদেও আমাদের প্রচুর ভালো কোয়ালিটির চায়না-ক্লে ইমপোর্ট করতে হয়। মজার কথা যে, তার দাম নাকি পড়ে নিকৃষ্টতর দেশী ক্লের চাইতে কম। চীনেমাটি ছাড়াও পার্সিলেন শিল্পে লাগে কোয়ার্টসজ্ (স্ফটিক), ফেল্‌স্পার, প্লাস্টিক-ক্লে, ফায়ার-ক্লে প্রভৃতি, আর লাগে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের জন্য ইনসুলেটর ইত্যাদি; আবশ্যিক তামা, পেতল, দস্তা, সীসা প্রভৃতি ধাতু। আমাদের আবার এই ধাতুগুলির বিশেষ অভাব। কিন্তু সেই অভাব মেটাবার সাধ্য আমাদের সরকারের আছে কোথায়?

আর বেশী পরিসংখ্যান নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। মূল তত্ত্বটি আমরা এখন ভালো করেই বুঝতে পেরেছি; অবিলম্বে আমাদের মৃৎশিল্পের বিরাট সম্প্রসারণের প্রয়োজন।

কিন্তু মহামান্য সরকার বাহাদুর কি এ বিষয়ে অবহিত? না বোধ হয়—সরকারের অত সময় কোথায়? কি দক্ষিণ, কি বামপন্থী, আমাদের নেত্রী ও নেতাদের সকলের পেয়ালায় ভরা আছে শুধু রাজনীতির আরক। সেই সুরাসারের তীব্র নেশায় চুর হয়ে যমুনা-গঙ্গার তীরে বসে নেতারা আমাদের ছন্দহীন 'রুবাই'-এর গুচ্ছ উপহার দিচ্ছেন বক্তৃতা আর পত্রিকার মাধ্যমে।

বলিহারি সত্যসুন্দরের ভাগ্য! তিনি ঊনবিংশ শতকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোলে বসেছিলেন; আবার এই বিংশ শতকে দেখে যাচ্ছেন আজকের মহাভারতে নিবাতকবচ যুদ্ধের পুনর্জন্ম।

বিশ্বকর্মা

ঢেউ

কণা বসু

সার্কিট হাউসের পাশ দিয়ে ও রোজ ছুটত জাহাজঘাটে। গোত্রহীন বুনো-ফুলের মেলা দেখত ছোট টিলার গায়ে। লুব্ধ মৌমাছির গুঞ্জন, আর কতরকমেরই না গাছ গাছালি! পুরনো অশ্বত্থ গাছের কোটরে বাসা বেঁধেছিল কোন এক তক্ষক। ওকে ওর বড় ভয় করত, যখন ওর ডাক শুনত, টক্ টক্ টক্। কাটা কাটা একটানা সুর। সে তো শুনেছিল, কুদ্দুস মিঞার কাছে, ও নাকি বলে, আমি তক্ষক, আমি তক্ষক। ওরা নাকি অনেক কাল বাঁচে।

রুনিয়ার চোখ দুটো জ্বল জ্বল করত কৌতূহলে। কতদিন থেমে পড়েছে সে ওই পথ দিয়ে যেতে। ওর মনে হত, তক্ষকটা ডাকে না, কাঁদে। এ যেন ওর বুক নিংড়োনো কান্না। ও কি বলতে চায়, কে জানে। অশ্বত্থ গাছের ডালপাতায় শব্দ হত, সর সর সর। গায়ের কাঁটা খাড়া হয়ে উঠত রুনিয়ার। ওই সরীসৃপটাকে দেখবার দুরন্ত লোভ এবং উত্তেজনায় পাথর ছুঁড়ত গাছের ঝোপে। ডাক থেমে যেত যখন, তখন অনেক দূরে সরে গিয়ে অপেক্ষা করত রুনিয়া। মিনিটের পর মিনিট, ওর চোখের পলক আর পড়ে না; তবু কোন মতে সরীসৃপকে দেখা যেত না ছিটকে পড়তে অন্ধকার ঝোপ থেকে।

ইন্দ্রক্ল্যাটের খালাসী তখন নমাজ পড়ছে পশ্চিম দিকে মুখ করে চাদর পেতে। একবার হাঁটু গেড়ে বসত, মাথা নীচু করে কিসব বিড় বিড় করত, আবার উঠে বসত হাঁটুর পরে ভর করে। অবাক রুনিয়া বলত,

তুমি কি কর কুদ্দুস মিঞা?

নমাজ পড়ি, নমাজ। তুমি যেমন ঠাকুররে ডাক না? আমি তেমন আল্লারে ডাকি।

একমুখ দাড়ি গোঁফ নিয়ে হাসত মিঞা।

রুনিয়া বলত, আমায় শিখিয়ে দেবে নমাজ?

কুদ্দুস মিঞা হো হো করে হাসত।

না গো খোকাবাবু, তুমি যে হিন্দুর ঘরের মেয়ে। এসব মোছলমানরা করে।

ওর কথার অর্থ খুব পরিষ্কার লাগত না রুনিয়ার।

হিন্দু মানে কি, মুসলমান মানে কি?

রাত্তিরে বাবার গলা জড়িয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করত রুনিয়া।

বাবা বিরক্ত হতেন না এতটুকু। উত্তর দিতেন প্রতিটি প্রশ্নের।

কুন্দুস মিঞার হাত, পা আছে, চোখ আছে, মুখ আছে, আমারও তো আছে, তবু কেন আমরা আলাদা বাবা? আমি হিন্দু আর ও মুসলমান?

ওটা তো ওর গ্রহণ করা একটা ধর্ম মা। ওটা ইচ্ছে করলেই মানুষে বদলাতে পারে, কারো গায়ে কিছু লেখা থাকে না। আসল পরিচয় আমাদের একই, আমরা সবাই মানুষ।

তবু খুশী হতে পারত না রুনিয়া। মনটা বিষণ্ণ লাগত; বড্ড একা একা বোধ হত। কুন্দুস যেন অনেক দূরে সরে যেত, তার নাগালের অনেক বাইরে, ও হাজার চাইলেও কিছুতেই পারবে না সেখানে পৌঁছুতে। নিষ্ঠুর যেন সে দূরত্ব, তার কোন মাপ নেই, সে যে কত বড়।

মাঝ নদীতে পড়ে ঢেউয়ের বুকে যখন দুলত ওদের ডিঙি, তখন ওর বুক কাঁপত, জলের নীচে যেন শুধু অন্ধকার বিভীষিকা। যদি তলিয়ে যায় নৌকোটা: সেই অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে সে কি খুঁজে পাবে মিঞাকে? তারপর? ওর হাত, পা ঠান্ডা বরফ। কি আছে জলের তলায়? ওর গলা শুকিয়ে কাঠ, অদ্ভুত একটা ভয়ের যন্ত্রণা অথচ কান্ডারীর এতটুকু ভয় নেই। চোখ গোল গোল করে বলছে তখন,

যদি কারেণ্টের মধ্যি পড়ে যাই খোকাবাবু?

কারেণ্ট কি?

জলের ঘূর্ণি গো, তার মধ্যি পড়লি আর রক্ষে নেই।

রুনিয়ার চীৎকারে চমকে উঠত কুন্দুস: বলিষ্ঠ হাতে ওকে স্পর্শ করে বলত, ছিঃ ভয় ক্যানে? কামিজ পিনছ তুমি না! আশ্চর্য! মনের জোর কি যে বেড়ে যেত। কোত্থেকে যেন ফিরে আসত সাহস, তখন ঝড়, জল, কারেণ্ট সব তুচ্ছ মনে হত। মনে হত ঐ বলিষ্ঠ হাতের কব্জি তাকে যে কোন বিপদ থেকে মুক্ত করতে পারবে। মিঞার চোখ নাচে, বড় আশ্বাস সে চোখে। ওর মন রহস্যের সমুদ্রে ডুব দেয়। রুনিয়া যেন ডুবুরীর মত ডুবে যেত জলের তলায়, দেখতে পেত কি আছে সেখানে। মণিমাণিক্যের বিশাল পুরী। কিন্তু পাহারাদার তার হিংস্র কালনাগিনী। ফণা তুলে নাচছে সে। মাথায় জ্বলছে লক্ষ মানিক। কত রাজার প্রাণ গেল, কত লোক পালিয়ে গেল, কেড়ে নিতে পারল না কেউ। রুনিয়া দেখত, জলের তলায় কেউ অন্ধকার পুরী দখল করল তারা। সাপের মাথার মণি কেটে পরল মুকুটে। সে রাজত্বে আর কেউ রইল না। শুধু একজন রাজা, একজন প্রজা, সে আর তার কুন্দুস মিঞা।

কুন্দুস মিঞা ওকে খোকাবাবু বলত, খুকি বললে ভয়ানক রেগে যেত কিনা। একবার বাবরি চুল নেড়ে বলল, আমায় খোকাবাবু বলবে মিঞা, দেখতে পাচ্ছো না আমি প্যান্ট পরেছি?

খল খল করে হেসে উঠত মিঞা, তালি খুকির মত ভয় পাবা না?

নদীর চরে যে নেপালী বস্তি আছে, সেখানে কাশগাছের আবডালে কারা পালায় ধাবে কেনো?—রহস্যময় ইঙ্গিত রেখে চুপ করত সে। চোখ বুজে আল্লার নাম জপ করত বার কয়েক।

রুনিয়ার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করত। তবু তার অদম্য প্রলোভন, বল বল চুপ করলে কেন কুন্দুস দাদা?

ওরা বসত ফ্ল্যাটের ছাদে। দৃষ্টির অনেক দূরে পর্যন্ত শুধু জল আর জল। বহু দূরে নদীর চর, ঝাউগাছের সবুজ রেখা, তারও পরে নীলের পাহাড়। পূব দিক থেকে শুরু হয়ে মিশে গেছে উত্তর কাছাড়ে। কোনটা যে পাহাড় আর কোনটা যে মেঘ রুনিয়া গালে হাত রেখে ভাবত বসে বসে। নেপালী বস্তির ঘরে ঘরে আলো জ্বলত। অন্ধকারের বুকে তারা যেন মিটিমিটি জোনাকির আলো হয়ে রুনিয়ার চোখ ধাঁধিয়ে দিত।

কুন্দুস মিঞা বলত, ঐখানে যারা থাকে না, তাগেরে নাম করতি নেই ভর সন্ধ্যেকালে। তারা নাকি মাছ চাইতে আসে জেলেনীর কাছে। বলে, এই বোয়ারি! মাছ নিদিলে তোক পাঁতি পেলাম।

কুন্দুস মিঞার কাছেও আসে, অনেক রাত্তিরে। নদীতে যখন ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ওঠে

ঢেউয়ের, তখন তারা আসে। কালো কালো লাগির মত সেই ছায়ারা। কিন্তু কিছুই করতে না পেরে ফিরে যায় রেগে।

মিঞা যে তুকতাক জানে।

আমায় শিখিয়ে দেবে তোমার তুকতাক?

না গো, সে কি হয়? সে আমি জানি, আর জানে আমার বিবি, আর কেউ জানে না ত্রিভুবনে।

দমে যায় রুনিয়া। কিন্তু প্রচণ্ড ঈর্ষা হয় বিবির ওপরে। মিঞাকে ও ছিনিয়ে নিতে চায় কেন? তখন ওর বুকে ফেটে কান্না পায়. বিবিকে অসহ্য লাগে। কুন্দুস মিঞা অত বিবি বিবি করে কেন? সে কি তার পর? নইলে সব মন্তর, যা সে জানে সব শেখায় বিবিকে. তাকে নয়।

কুন্দুস বলে, আমার বিবির দেখতি কেমন জানো? ফকফকে ফরসা, এই চোখ, এই নাক, কাঁচামিঠে আম চেনো? আমার বিবি তাই।

তোমার বিবিকে একদিন দেখাবে আমায়?

না গো তারে আমি লুকোয় থুইছি, বস্তির অন্ধকার ঘরে। কেউ তারে দেখতি পায় না শুধু আমি ছাড়া। সে আমার সাথে যখন কথা কয় না? কুন্দুসের চোখ নাচে. বলে, আমার সঙ্গে কথা কতি কতি নাকের নথ দুলোয়ে হাসে, ফিক ফিক করে হাসে বিবি. বড় পীড়িত করে।

পীড়িত মানে কি?

জানো না? ভালবাসা গো, ভালবাসা।

জ্বলে ওঠে রুনির, আঃ চুপ কর, এত বক বক করো না তো।

ক্যান হিংসে হয় বুঝি? হা হা করে হাসে কুন্দুস মিঞা।

তখন চোখে জল আসে রুনিয়ার।

রাত্তিরে ঘুম আসত না। এ পাশ ও পাশ করত। তন্দ্রার ঘোরে শুনতে পেত, প্রেতিনীর কান্না, অশরীরী আত্মার হাসি। ওরা হয়ত চোরাবালিতে পুঁতে রাখবে মিঞাকে। আহা! বুড়ো মিঞা! ওর নথ দোলানো রাঙা বউটার কি দশা হবে? নদীর পাড়ে গিয়ে সে যখন চেঁচাবে খসম খসম করে, তখন যে কেউ সাড়া দেবে না তাকে।

জানলার পাশে বাঁশগাছে শব্দ হচ্ছে কিসের? ফিস ফিস করে কথা বলছে যেন কারা? কুন্দুস মিঞা বলে, ভূত নাকি বাঁশ নরায়? শন শন করে বাতাস উঠত বাঁশ বনে। গির্জার ঘড়িতে ঘন্টা বাজত থেকে থেকে একটা, দুটো, তিনটে। ঘেমে নেয়ে উঠত রুনিয়া, কখন সকাল হবে? তারপর ভোরের ফিকে আলোর আভাস পেলেই চোঁ চোঁ দৌড়।

কুন্দুস মিঞা তখন হয়ত অঘোরে ঘুমুচ্ছে, ইন্দ্রর্যাটের পাটাতনে চাটাই পেতে।

ভয় পেতেন মা। বাবার সঙ্গে এই নিয়ে ঝগড়া হত প্রায়ই। ওগো মেয়েকে সামলাও, মিঞাদের বিশ্বাস কি? ঠিক দেখো চালান করে দেবে পাকিস্তানে।

কিন্তু বাবার কাকস্য পরিবেদনা। কানেই তুলতেন না, বাজে বকো না, কুন্দুস লোক ভাল, ওকে কত স্নেহ করে দেখেছো?

তাই বলে আস্কারা দিতে হবে নাকি? মেয়ে বলেই বলি আর কি, ছেলে হলে কি বলতাম?

বল কেন? ও না হয় একটু ডানপিটেই হল।

রুনিয়ার মজাই লাগত। এসব কথা শুনত আর হাসত। ছেলে মেয়ে—কিসব প্রশ্ন তুলে যে মা তর্ক করেন। ও তার সব মানেই বুঝতে পারত না। কুন্দুস মিঞার কাছে ওর যেতে বাধা কেন? মেয়ে বলে? মেয়েরা বুঝি যেতে পারে না সেখানে? ভগবান ওকে মেয়ে করে দিলে সে কি করবে? কুন্দুসের কাছে বলত সে কথা, আর হেসে হেসে খুন হত রুনিয়া। দাড়িতে হাত বুলিয়ে কুন্দুস বলত,

আমারে ভয় লাগে না ক্যানে খোকাবাবু?

বারে, তুমি তো আমার বন্ধু।

আমি যদি তুমারে নিয়ে পলায় যাই?

যাবে মিঞা? ওর চোখ দপ করে জ্বলে উঠত উৎসাহে, চল অনেক দূরে পালিয়ে যাই, মা তবে আর মারতে আসবে না স্কেল নিয়ে।

কুন্দুস হেসে উঠত, হা হা করে। ওর হাসির শব্দ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ত জলের মধ্যে, ঢেউয়ের মধ্যে দিয়ে ধেনুকণা পাহাড়ের ওপার পেরিয়ে।

বিরক্ত রুনিয়া বলত, বোকার মত হাসছ যে?

তুমার বাবা আমারে খুন করে ফেলাব।

চুপ কর, বলে ওর মুখ চেপে ধরত রুনিয়া।

মা শাসান, ঘরে তালা বন্ধ করে রাখবেন।

আমি ঠিক বেরিয়ে যাব, তালা ভেঙে, রুনিয়া ভাবে। ও কিছুতেই বুঝতে পারে না, মা অমনি করেন কেন? কুন্দুসের কাছে শোবার কথা শুনলে, ওর সঙ্গে খাবার কথা শুনলে, মা রেগে যান কেন? ভয়ই বা পান কেন? বাবা যে বলেছে, আমরা সবাই মানুষ।

কুন্দুসের কাছে গেলে লোকে নিন্দে করবে, তুমি মেয়ে আর ও পুরুষ।—এ কথা মা যখন বলতেন, তখন ও ফ্যাল ফ্যাল করে চাইত আর সেই নিষেধই ওকে উত্তেজিত করে ছুটিয়ে নিয়ে যেত আবার সেখানে। কুন্দুস মিঞার গলা জড়িয়ে যখন তাকে আদর করত রুনিয়া, কানে কানে কথা বলত যখন, তখন ওর ভুলেও মনে হত না, একজন পুরুষ এবং অন্যজন মেয়ে। কুন্দুসের দাড়ির স্পর্শ ওকে সুড়সুড়ি দিত। রুনিয়া হেসে উঠত সরল কৌতুকে। স্থূল ইন্দ্রিয়সুখ নয়; মেয়ে পুরুষের লুব্ধ কামনা, আকর্ষণ এসব সে টেরও পেত না। কুন্দুস মিঞার চোখের চাউনিটা যেন কেমন। কখনও বাবার মত মনে হয়, কখনও বল খেলার মাঠের সতুর মত, কখনও মায়ের মত, যখন সে মাথায় হাত বুলিয়ে ভাটিয়ালি গান গাইত।

কয়েক বছর পরে যখন সে বড় হতে লাগল, তখন ফিকে হয়ে এল নদীর টান। যখন তখন আর মনে পড়ে না মিঞাকে। মায়ের কথাগুলো যেন বড় বেশি বুকে বাজত তখন, বাড়ন্তশরীর, আর বেরিও না ওভাবে, তুমি তো আর ছেলেমানুষ নও।

এসব কথা শুনতে ওর ভাল লাগত না।

ছুটে পালাত ওখান থেকে। বড় বেয়াড়া যৌবন, যাকে কিছুতেই ঢেকে রাখা যায় না ছেলের পোশাকে। সেকি বুঝতে পারে না, জাহাজের খালাসীরা ডাকাত, লোভী নেকড়ের মত মনে হত সে চাউনি, বড় অসহ্য লাগত রুনিয়ার। কুন্দসেকে যদিও নয়, কিন্তু তবু অতগুলো চোখের সামনে ঐ খালাসীটার সঙ্গে নিবিড় হয়ে বসা! বাবারও তো একটা সম্মান আছে।

সতু, মনুদের দলেও যেন ভিড়তে পারত না আর আগের মত। একটা স্পষ্ট পার্থক্য কাঁটার মত ওকে খোঁচা দিত অহরহ। ওরা ওকে আর তুই বলে না আগের মত। বলত, তুমি। বাধ্য হয়ে ওকেও তাই বলতে হত তুমি। রুনিয়ার খুব অসোয়াস্তি হত এতে। তারা সহজ করে চাইতেও যেন লজ্জা পায়। কিন্তু কেন? রুনিয়া ভাবত, কই সে তো বদলায় নি। ছেলেমেয়ের সম্পর্কটা যেন কেন জটিল, দুর্বোধ্য।

ভাল লাগত না মেয়েদেরও। প্রতি পদে পদে মতের সঙ্গে অমিল। কিছুতেই পারত না ওদের হাব ভাব নকল করতে। ফলে অবস্থাটা ময়ূরপুচ্ছধারী কাকের মত। না ছেলেদের দলে, না মেয়েদের দলে। থিয়েটারের সঙ সাজা অভিনেতার মত মনে হত নিজেকে। বুকে জ্বলে যেত ব্যর্থতায়। কারো কাছে যেতে ইচ্ছে করত না, কাউকে ভাল লাগত না, চার দিকে যেন একটা কঠিন দেওয়াল তৈরী করে নিজেকে আড়াল করত রুনিয়া। মা বলতেন, এ কি স্বভাব? বাবা বলতেন, সব ঠিক হয়ে যাবে, যখন একজনের বউ হয়ে চলে যাবে শ্বশুরবাড়ি।

আমি কোনদিন বউ হব না বাবা! তীব্র প্রতিবাদ জানাত রুনিয়া।

পার্থকে ওর ভাল লাগত, কলেজে যখন ব্যাডমিন্টনের সঙ্গী হিসেবে পেত তাকে। তাজা প্রাণ, অফুরন্ত শক্তি, পরিশ্রান্ত হয় না কিছুতেই। ওর সঙ্গে খেলতে গিয়ে বার বার হেরে যেত রুনিয়া। এ জন্যে প্রথমে ঈর্ষাবোধ এবং ধীরে ধীরে এলো তা থেকে শ্রদ্ধা, আকর্ষণ। ওর সেই কঠিন দেওয়ালে টোকা পড়ল, ও এড়িয়ে যেতে পারল না পার্থকে। যখন চুপচাপ বসে থাকত একা, তখন, ও এসে বলত, চল না বেড়িয়ে আসি কোথাও?

এ প্রস্তাব ওর মন্দ লাগত না।

ব্যাডমিন্টন খেলতে সারা দুপুর ফুরিয়ে ফেলেছে কতদিন। তবু ক্লান্তি আসে না রুনিয়ার। ওর সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক? মাঝে মাঝে ভাবত রুনিয়া। যাকে ভাই বলা যায় না, বন্ধু বলা যায় না, পরিচিত কোনো সম্পর্কের গণ্ডীর মধ্যেই ফেলা যায় না তাকে, অথচ বড় আপন, বড় কাছের।

তোমার কাল রাতে ঘুম হয় নি?

কি করে বুঝলে?

চোখের নীচে কালির প্রলেপ।

কি আশ্চর্য! পার্থ সব বুঝতে পারে। কিছু বলে দিতে হয় না তাকে, শুধু চোখের দিকে তাকালেই সব বুঝে নেয়।

কথা খুব কমই হত। মাঝে মাঝে শুধু হাসির বিনিময়। একটু চোখাচোখি। যখন খেলার চালে ভুল হত, বলত, কি হল?

কই কিছু না তো।

কি যে হত তা কি জানত রুনিয়া? দুপুরের মাঠ বড় নির্জন, বড় ফাঁকা, পড়ে যাওয়া ফেন্দারটা পার্থের হাতে তুলে দিতে গেলে কেন যেন কেঁপে উঠত হাত। একটা ঠাণ্ডা স্রোতের স্পর্শ ওর সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নাড়া দিয়ে যেত। মুখ লাল, চোখ তুলে তাকাতে পারত না অনেকক্ষণ।

তুমি কাল আসোনি কেন?

কাজ ছিল।

এমন কি কাজ? কোন কৈফিয়ত মানতে চাইত না রুনিয়া। লাগামহীন ঘোড়ার মত ছুটতে চাইত শুধু দিনরাত। পার্থের আকর্ষণ অত প্রবল কেন? ওর কাছে আসা, ওর ছোঁওয়া মাতালের মত অবশ করে ফেলে যেন। কি আশ্চর্য অনুভূতি! এ যেন বিষ আর অমৃত। এর নামই কি প্রেম? রুনিয়া অনুভব করত, সে একটি মেয়ে। একজন পুরুষ তাকে ভালবাসে।

ওর ভাবলে অবাক লাগত, এই তো মাত্র কিছু দিন আগেও, সতু, মনুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত সে। মাঠে বল নিয়ে ছুটত ওদের পেছন পেছন। মেয়েদের দেখলে বক দেখাত। ওদের খেলাঘরের কনে বউ, বরের সাজান আসর ভেঙে ফেলত বল ছুঁড়ে ছুঁড়ে।

আজকাল আয়নার সামনে ঘোমটা টেনে দাঁড়াতে বেশ লাগে। আমি বউ হব না বাবা, এ কথা মনে পড়লে হাসি পায়। ইন্দ্রফ্ল্যাটে যাবার কথা ভাবতেও পারে না। কুদ্দুস মিঞা তো রূপকথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কচিৎ কোনদিন বিকেলে বেড়াতে গেলে, কি মিঞা কেমন আছো?—এই পর্যন্তই।

পাহাড়িয়া শহরের এই সন্ধ্যেগুলো ভারি মিষ্টি। তখন কি আর ভাল লাগে মিঞাকে? সেই একঘেয়ে ভূত প্রেতের গল্প, যত সব অবাস্তব, ভাবলেই হাসি পায়। ছিঃ ছিঃ পার্থ জানলে মনে করবে কি? নাইবা বলল তাকে খালাসীর কথা। রুনিয়া শিউরে উঠত, যদি অবিশ্বাস করে তাকে?

পার্থের যে কতরকমের ইচ্ছে! ওর সব ইচ্ছেগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে পারে না রুনিয়া। মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠে যখন।

রুমাল দেবে আমায়? তোমার হাতের কাজ করা রুমাল?

ও যে কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। অপ্রস্তুত রুনিয়া ভাবে এ শখটা কি ওর না হলেই চলত না? সে কি বাজার থেকে কিনে দেবে কোন কাজ করা রুমাল? বলবে আমি করেছি? না থাক্। ওকে যে ঠকাতে পারবে না রুনিয়া। তবুও ঠোঁট কেঁপে ওঠে, আমি সেলাই জানি না পার্থ—এ-কথা বলতে গিয়ে থেমে যায় রুনিয়া। চোখে জল আসে, বুকের মধ্যেটা খাঁ খাঁ করে কিসের যেন অভাব বেদনায়। কোন মেয়ের সঙ্গে ছেলের প্রেম হলে সে যে তার হাতের কাজ করা রুমাল চাইতে পারে, এ কথা কি জানত রুনিয়া?

শুধু কি তাই, পার্থের যেন বায়নার শেষ নেই। বলে, এসো না একদিন পিকনিক করি আমরা দুজনে, এই মেনকেণা পাহাড়ে।

আর ফার্স্ট-ক্লাস! তুমি রাঁধবে ভাত, আমি নদী থেকে বয়ে আনব জল, আর তোমায় পাহারা দেব, আর কারো প্রবেশের অধিকার নেই সেখানে।

চুপ করে থাকে রুনিয়া। কেমন করে জানাবে তার অক্ষমতা। ফাঁকা জমির মত ধুধু করে বুক। ও যেন অনেক দূরে সরে যায়, পার্থের কাছে থেকে বহু দূরে। ওর সেই নির্জন পৃথিবীতে যেখানে ও একা।

বুঝেছি। হাসে পার্থ, রান্না শেখোনি বুঝি? তোমায় অনেক বদলাতে হবে রুনি। নইলে অফিসে যাবার সময় ভদ্রলোক দেখবেন কলম নেই পকেটে, কলম গেছে ধোপার বাড়ি। ভাত রান্না হয় নি। কেন? না, চাকরের জ্বর। ঠাট্টা করে বলল পার্থ। এই তো?

কিন্তু তার এ ঠাট্টা আর একজনের মনে যে কিভাবে গিয়ে বিঁধল, তা সে জানতেও পারল না।

ফ্যাকাশে হয়ে আসছিল দিনের রঙ। আকাশে অনেক পাখির চেঁচামেচি। নীড়ে ফিরছিল তারা। ক্ষেত থেকে বস্তির মানুষগুলো খোলে ঢুকে বসেছিল আগুনের পাশে। শীতের শুরুতে। স্বামী ঘন করে কাছে টেনে নিল স্ত্রীকে।

ভোর মাইরি বড় জাড়। তোক মরম করু।

স্ত্রী বলল, ধ্যাৎ, তবু লাজ নে লাগে?

অন্যমনস্কের মত কখন ওরা নেমে পড়েছিল দুজনে। পার্থর চোখ হাসছিল। আড়চোখে চেয়ে বলল, শুনলে কি বলল ওরা?

কিছু বলল না রুনিয়া। চলতে লাগল নিঃশব্দে।

পার্থের ঠোঁট কাঁপছিল। ওরা চোখ থেমে গেল রুনিয়ার চোখে। চোখ সরিয়ে নিল রুনিয়া। ও কেন পারছে না সাড়া দিতে? ওর মন তখন পালিয়ে গেছে দূরের ঐ মিকির পাহাড়ে। বড় নিষ্ঠুর এ নবমীর চাঁদ, ভিজে বাতাস, এই কুয়াশা।

স্তব্ধতা ভেঙে পার্থ বলল, আমাদের একটা ঘর চাই, তাই না রুনি? খুব আস্তে বলল পার্থ।

কিন্তু আর একজন তা শুনেও শুনল না। ও যে কি চায়, ও কি চেয়েছিল বুঝতে পারল না, সমস্তই অর্থহীন কুহেলিকার মত মনে হল।

রুনিয়া শুনল, জাহাজের বাঁশী। বর্ষায় পাড় ভাঙা ক্ষেপানদীর ডাক। সাপের মত গর্জায় ব্রহ্মপুত্র, এ কূল ও কূল নেই যার। সেই মাতাল নদীর ঢেউয়ের ওপর আছড়ে পড়ছে ইন্দ্রফ্ল্যাট। পাটাতনের ওপরে নমাজ পড়ছে কুদ্দুস মিঞা, ফ্ল্যাটের ডেকে বসে শোনাচ্ছে তাকে রোমাঞ্চকর কাহিনী।

আমি জাহাজের খালাসী হব, বাবা!......

শতচ্ছিন্ন জামা গায়ে নেংটি পরা খালাসী হেসে উঠল, হা হা করে। সরল বেপরোয়া হাসি।...সমুদ্দুরে যাবা না? ভয় ক্যানে?

মস্কোর চিঠি

অনিবার্য কিছু কারণে মস্কোর চিঠির নিয়মিতিতে ছেদ পড়েছিল। স্বভাবতই এর মধ্যে যত প্রসঙ্গ জমেছে তা এক চিঠিতে উজাড় করা সম্ভব নয়। অথচ গুরুত্বের দিক দিয়ে তাদের অনেক কটিই উত্থাপনের মতো। যেমন লিখতে গেলে অবশ্যই প্রথমে লিখতে হয় এখানকার কেন্দ্রীয় কমিটির বিগত প্লেনামের কথা, যাতে খুব স্পষ্ট করেই জোর দেওয়া হয়েছে মতাদর্শের সংগ্রামে, পার্টির সতর্কতা ও ভূমিকা বৃদ্ধিতে। নিশ্চয় লেখা উচিত গোর্কির শতবার্ষিকী নিয়ে, মহা সমারোহে যার অনুষ্ঠান হয়ে গেল ক্রেমলিন কংগ্রেস প্রাসাদে। মার্ক্সের ১৫০তম জন্মোৎসব উপলক্ষে সম্প্রতি এখানে যে বৈজ্ঞানিক আলোচনার আসর বসেছিল তার কিছু খবরও, সম্ভবত, কারো কারো কাছে চিত্তাকর্ষক হওয়া সম্ভব। তবে এর অনেক ব্যাপারই 'দেশে'র পাঠকদের কাছে ইতিমধ্যে সুবিদিত ও পুরনো ঠেকতে পারে, এই আশঙ্কায় শুরু করা যাক এমন একটা জন্মোৎসব নিয়ে যা আরো অনেক পুরনো হলেও হয়ত তত সুবিদিত নয়।

যাঁর কথা বলছি তিনি উজবেকিস্তানের নিজাম-উদ্দিন আলিশের, সাহিত্যিক নাম নাভোয়ি (আক্ষরিক অর্থে সুরেলা), গত ফেব্রুয়ারিতে সাড়ম্বরে তাঁর জন্মের ৫২৫ বছর পূর্তির উৎসব হয়ে গেল। ব্যক্তিগত-ভাবে তাতে আমি উপস্থিত না থাকলেও কিছু দিন আগে উজবেকিস্তান ঘুরে দেখে-ছিলাম বলে জানি, গোটা দেশটা আজও পর্যন্ত কীভাবে তাঁর স্মৃতিকে মাথায় করে রেখেছে। তাসখন্দের সবচেয়ে বড়ো রাস্তাটা, সবচেয়ে সুদৃশ্য ব্যালে ও অপেরা ভবনটা থেকে শুরু করে মরুভূমির মধ্যে সদ্যোজাত সবচেয়ে আধুনিক শিল্প নগরটা পর্যন্ত তাঁর নামে নামাঙ্কিত। আঙুর লতার ছায়ায় বসে সবুজ চায়ের পেয়ালা টেনে বিনা তাড়ায় যদি কোনো আলাপ চলে কিছুটা লম্বা সুতোয়, তাহলে সে আলাপ যাই হোক, একবার না একবার নাভোয়ির নজির উঠবে, একবার না একবার উদ্ধৃত হবে তাঁর কবিতার কোনো পঙক্তি। কথায় কথায় উজবেকিস্তানে যদি কেউ বলে ওঠে, 'বেইমানের লজ্জা নেই, নির্লজ্জের ইমান নেই' অথবা, 'বিন্দু বিন্দু জলে সাগর, বিন্দু বিন্দু জ্ঞানে জ্ঞান' কিংবা 'হৃদ্‌ভাণ্ডারের তালা ভাষা, শব্দ তার চাবিকাঠি', তাহলে নিঃসন্দেহে অনুমান করতে পারেন, প্রবচন হয়ে যাওয়া এ উক্তি-গুলি আর কারো নয়, নাভোয়ির।

উজবেকিস্তানে, এবং শুধু উজবেকি-স্তানেই নয়, নাভোয়ির এতটা প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। ভারত সমেত গোটা মধ্য এশিয়ায় তখন ফারসি সাহিত্যের একাধিপত্য। নিজামি থেকে শুরু করে নাভোয়ির সমসাময়িক জামি পর্যন্ত সকলেই জাতিতে যাই হোন কবিতা লিখেছেন ফারসিতে। নাভোয়িই প্রথম তখনকার উজবেক বা তুর্কি ভাষায় সাহিত্য রচনা করে দেখান যে, ভাবপ্রকাশে, সাহিত্যসম্ভাবনায় তাঁর স্বদেশী ভাষা ফার্সি'র চেয়ে এতটুকু হীন নয়। এবং এক লহমায় সে সাহিত্য এতই উৎকৃষ্ট হয় যে, জামি পর্যন্ত লেখেন :

এবার কী হবে নিজামির? কী হবে খসরুর?

অন্য ভাষায় সুস্ফুর জব ফুটিয়েছে সে (নাভোয়ি)

কিন্তু কে বড়ো? এ বিচার বুদ্ধির অসাধ্য।

অথচ পেশায় নাভোয়ি ছিলেন প্রথমে হেরাতের সুলতান হোসেনের মোহর-দার, এবং পরে উজির। রাজ্য পরিচালনার সমস্ত ভার তাঁর ওপর চাপিয়ে সুলতান হোসেন নিশ্চিন্তে সুরা ও সাকীতে গা ভাসান। শোনা যায়, মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ এবং জ্ঞানীগুণীর পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও নাভোয়ি নাকি প্রজাদের নানাবিধ মঙ্গল বিধানের চেষ্টা করেন। যে লোকটা তৈমুরবংশীয় নয়, দরবারে তার এতটা প্রতিপত্তি অন্যান্য আমিরদের পছন্দ হয় না। একবার নির্বাসিত হন তিনি, একবার বিষ দেবার চেষ্টা হয়। নিজেই কাজে ইস্তফা দেন, রাজদ্রোহের অভিযোগে গর্দান যায় তাঁর ছোটো ভাইয়ের এবং অবিরাম এই সব প্রাণান্তকর টানা-পোড়েনের মধ্যেই নাভোয়ি ইতিহাস লিখেছেন ও লিখিয়েছেন, পাণ্ডুলিপিতে ছবি এঁকেছেন, শিল্পীদের দিয়ে খাড়া বানিয়েছেন, লিখেছেন ছন্দশাস্ত্র এবং দুই ভাষার টানাটানি নামে উজবেক ভাষার প্রথম ব্যাকরণ, সাধ্য ভাষায় হেঁয়ালী কবিতা, চার দিওয়ান গজল, এবং তাঁর বিখ্যাত 'খামসা'—কাব্যে প্রত্যুত্তর।

কাব্যে কাউকে জানতে হলে এই প্রত্যুত্তর দেওয়াই ছিল তখনকার রীতি। মূল কাহিনীগুলো একই, শিরিন-ফারহাদ, লায়লী মজনু, সপ্ত গ্রহ, সিকন্দরের দেয়াল প্রভৃতি পাঁচটি কিংবদন্তী। এই কিংবদন্তী আশ্রয় করেই কাব্য লিখেছেন যেমন ১২শ শতকে খোরাসানের নিজামি, তেমনি ১৩শ শতকে দিল্লির আমির খসরু, নাভোয়িকেও

মে-দিবসের আনন্দোৎসবে অংশগ্রহণকারী শ্রমজীবী জনতার নৃত্যরত একটি অংশ

ঠিক ওই একই কিংবদন্তী নিয়েই লিখে দেখাতে হল তাঁর মৌলিকত্ব ও উৎকর্ষ।

বিশেষ করে প্রথম দুটি কাহিনী আমাদের দেশেও খুবই পরিচিত। লায়লী মজনু দুই বিবদমান উপজাতির মেয়ে এবং ছেলে, পরস্পর ভালোবাসে, কিন্তু নানা দুর্যোগের পর মিলন হয় কেবল মরণে। রাজকন্যা শিরিণের জন্যে পাথর কেটে নদীর খাত ফেরায় ফারহাদ, কিন্তু এখানেও মৃত্যুতে বিফল প্রেমের শেষ। আজীবন অবিবাহিত নাভোয়ির এই দুই কাব্য শুধু প্রেমের শুচিতা ও কোমলতায় স্নিগ্ধ তাই নয়, মানবগর্ব ও শ্রমের জয়গানেও ঝংকৃত। কিন্তু রুশ অনুবাদে আমি যতটুকু পড়েছি তার ভিত্তিতে যেহেতু নাভোয়ির কোনো একটা সাহিত্যিক সমীক্ষা দিতে যাওয়া আমার পক্ষে স্পর্ধা হবে, তাই তাঁর জীবনের শেষ ঘটনাটা দিয়েই এ প্রসঙ্গ শেষ করি, যা তাঁর কাব্য দুটির মতোই করুণ:

ভাইয়ের গর্দান যাবার পর হজে যাবার ছুতো করে নাভোয় পালাবার চেষ্টায় আছেন এমন সময় বিদ্রোহ করে বসল সুলতান হোসেনের ছেলে। রণযাত্রা করলেন হোসেন, রাজধানীর ভার দিয়ে গেলেন ফের নাভোয়ির ওপর। বিদ্রোহ দমনের পর হোসেন ফিরছেন, দরবারের সমস্ত আমির-ওমরারা এগিয়ে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করবে। ঘোড়া থেকে নামলেন নাভোয়ি, আভূমি কুর্নিশ করলেন, কিন্তু মাটি থেকে আর মাথা তুলতে পারলেন না বৃদ্ধ। মারা গেলেন ছদিন পরে।

❊

কিন্তু ফেরা যাক বর্তমানে, আর মে মাসে মস্কো থেকে যে চিঠি লেখা হবে তাতে মে-দিবসের কথাই যদি না থাকে, তবে তো সে হবে রাম ছাড়া রামায়ণ! তদুপরি এবারের মে-দিনটা ছিল আশ্চর্য বাসন্তী। পাতার কুঁড়ি যতটুকু ফুটেছে তাতে শহরের সমাদরের বন গাছগুলোর ন্যাড়া ভাবটা তেমন না কাটলেও স্বচ্ছ আকাশ আর কাঁচা রোদে বেশ একটা খুশি লেগেছিল। সেই-সঙ্গে ছিল এক নাগাড়ে চারদিন ছুটির অসাধারণ একটা যোগাযোগ, যা ইওরোপে ঘটে কম। অবশ্য এজন্য লোকে পরের রবিবারটা কাজের দিন হিসেবে খাটবে, কিন্তু তার বদলে এ কয়দিন খেয়ে-দেয়ে-নেচে, পথে-ঘাটে ঘুরে, আলোয় ভাসন্ত শহরটার নানান পার্কের কার্নিভালে, নানান চকের উন্মুক্ত মঞ্চের সামনে লোকে যে ঠিক সেই জিনিসটি পাবে, যা আমাদের দুর্গা-পূজোর মতো প্রতি বছর অনেকটা একরকম হলেও যেন আবার একরকম নয়, এবং ঠিক সেই কারণেই যাকে আমরা বলি বাৎসরিক উৎসব। বলাই বাহুল্য, এ উৎসবকে সবচেয়ে উপভোগ করেছে সেই খোকাখুকিরা, যারা সেদিন বাপের কাঁধে চেপে হাসি হাসি মুখে ছোটো ছোটো হাত নেড়ে তাদের খুশী জানিয়ে গেছে লাল ময়দানের ফুল, ফেস্টুন ও বেলুন-ভরা দীর্ঘ মিছিলে। বিদেশের সংবাদপত্রে অবশ্য বেশী আগ্রহ থাকে উৎসবের এই দিকটার চেয়ে তার প্রথম দিকটায়, যা শুরু হয় প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বক্তৃতা ও সামরিক কুচকাওয়াজে। এটাও প্রতিবারের মতো অনেকটা একই রকম ঠেকলেও যেন ঠিক এক নয়। লাল ময়দানের পাথর-বাঁধানো বুকের ওপর রেশমের মতো মিহি একটু ধুলো তুলে জ্যামিতিক অমোঘতায় এগিয়ে আসা রুপোলী, সবুজ ও ধূম বর্ণের যে যন্ত্রগুলোকে দেখা মাত্র শশব্যস্তে চারি দিকে ফোটো ক্যামেরার ক্লিক আর সিনে ক্যামেরার গর্জন শুরু হয়ে যায়, তাদের বাইরের চেহারার ঈষৎ বদল সন্দেহ করলেও আমার মতো আদার ব্যাপারী কেবল বোকার মতোই তাকিয়ে থাকতে পারি এবং, তাদের জঠরাগ্নির খবরে কেউ উৎসুক থাকলে, তুলে দিতে পারি কেবল মিতভাষী প্রাভদার খানিকটা রিপোর্ট:

সোভিয়েত স্ট্র্যাটেজিক রকেট, "কেবল যে বিপুল ক্ষমতার চার্জ বহন করতে পারে তাই নয়, প্রতিপক্ষের রকেট-বিরোধী প্রতি-

রক্ষাকেও পরাভূত করতে পারে। তার বোর্ডে ক্ষেপণের যে ব্যবস্থা আছে, তাতে অসাধারণ যাথার্থ্যতায় লক্ষ্যভেদ নিশ্চিত। আমাদের গ্লোবাল রকেটগুলির অগ্নিবর্ষণ দূরত্ব সীমাহীন। এমন পরাক্রান্ত রকেট বিশ্বের কোনো ফৌজেই নেই।"

এ উৎসবের কিছু আগে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের ভাগ্যেও শিকে ছিঁড়েছিল। বেতন ছাড়াও দিন কতক বাদে পেয়ে গেলাম আর একটি প্যাকেটে বোনাস। শিল্প পরিচালনার নতুন যে পদ্ধতি এ দেশে চালু হচ্ছে, এটি তার একটি ফল এবং হাতল। এই বৈষয়িক প্রেরণাদানের ফলে কোনো সূক্ষ্ম আকারে পুঁজিবাদ বুঝি বা ফিরে আসছে, সমবেত উল্লাসের মধ্যে এমন আশংকা নিম্নবেতনভোগী কর্মচারী থেকে নৈষ্ঠিক প্রবীণ কারও মুখেই কিন্তু ফুটতে দেখলাম না। আপানরের উৎসব-টেবিলে আরও কিছু ভোজ্য আসার এই যে ব্যাপারটাকে আমাদের দেশে কোথাও কোথাও 'গুলাশ কমিউনিজম' বলে একটু যাঁরা টিটকারি দিয়েছেন, তাঁরা কিন্তু এটুকুও জানেন না যে, গুলাশ রাশিয়ার প্রধান খাদ্য বা শ্রেষ্ঠ খাদ্য নয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণের সেই দুরূহ কালে এদের বর্ণপরিচয় শুরু হত এই ছড়ায়ঃ শিন্ দা কাশা, পিশ্যা নাশা; অর্থাৎ অনেকটা এইরকমঃ শিং (বাঁধাকপির সুপ) বিশেষ। আর অন্ন, খাদের জন্য। বর্তমানে সাধারণ রুশ সংসারে হাঙ্গেরীর জাতীয় খাদ্য গুলাশ যদি বা দেখা যায়, তারচেয়ে অনেক বেশী দেখা যাবে সাইবেরিয়ার পেলমেনি, ইউক্রেনের বর্শ, পশ্চিমের কাটলেট, স্টেক, সসেজ, ককেশাসের শিক কাবাব, লেল্যা কাবাব, কী নয়। মুরগির রোস্টের জন্য যেসব রেস্তোরাঁর কাফের সামান্য নাম আছে, সেখানে তো লোকে বরফের মধ্যেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত অকাতর।

স্বীকার করছি, এটাকে আমি ভাবতাম দারুণ ব্যাপার। আমাদের দেশে দামী জিনিস পড়ে থাকে, লোকে লাইন দেয় সবচেয়ে সস্তা মোটা কাপড়, সবচেয়ে সস্তা মোটা চাল এবং তেল, চিনি, এমন কি কলের জলের জন্য। আর হরদমই এখানে লম্বা লাইন হচ্ছে একটা টেরেলিন শার্ট, দামী সোয়েটার, শীতাশনদুরস্ত ওভারকোট, রেস্তোরাঁ প্রভৃতি এমন জিনিসের জন্য, যাকে বলি বিলাস-দ্রব্য। জীবনযাত্রার সাধারণ দাবি মেটাবার পর কত লোকের পকেটে কত পয়সা থাকলে এত খরিদ্দার হতে পারে দোকানগুলোর। কিন্তু বিকাশের একটা পর্যায়ের পর এ লাইন যে সমাজের সমৃদ্ধির লক্ষণ নয়, মূর্খতার লক্ষণ, এমন সন্দেহ কদাচ হত না, যদি না চোখে পড়ত লিতারেতুর্নায়া গাজেতায় বিশ্ববিতর্কিত প্রফেসর লিবের-মানের হালকা চালের গুরুত্বের একটি লেখা।

তাসখন্দে উজবেক কবি নাভায়ির স্মৃতিস্তম্ভ

বলেছেন, সমাজতন্ত্রে সরবরাহের চেয়ে চাহিদা থাকবে এগিয়ে, স্তালিনের এ নীতি শেষ পর্যন্ত বর্জিত হয়েছে সুখের কথা, কিন্তু এখনও থেকে গেছে তথাকথিত ওভার-লোডের তত্ত্ব। প্রতিটি ট্রেন, প্রতিটি সিনেমা, প্রতিটি রেস্তোরাঁর সব সীট যদি ভরতি না হয়, তা হলে বুঝি বা আয় কমবে এই ভয়। তার ফলেই কোনো একটি সার্ভিসের জন্য লাইন পড়ে উঠলেই ব্যবস্থাপকেরা নিশ্চিন্ত থাকেন। তাতে একটি প্রতিষ্ঠানের আয় বাড়লেও খরিদ্দারদের কত ঘণ্টা লোকসান গিয়ে সমাজের মোট কর্মদিনে কত ক্ষতি হয় সেই হিসেব করে তিনি বলেছেন, আসলে দরকার একটা অপটিমাল আন্ডার-লোড। ধরা যাক ট্রেনে, রেস্তোরাঁয় খদ্দেরের ভিড়ের চেয়ে শতকরা দশটি সীট থাকুক খালি। তাতে কি প্রতিষ্ঠানের লোকসান যাবে? সোভিয়েত ঘড়ি-শিল্পের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন, আজকাল বিনা লাইনে যে কোনো দোকানে যথেষ্ট ভালো ঘড়ি সর্বদাই কেনা যাচ্ছে, তাতে সোভিয়েত ঘড়ি-শিল্পের আয় ও বিদেশে মর্যাদা কমে নি বরং বেড়েছে। কিন্তু দৃষ্টান্তস্বরূপ, রেস্তোরাঁয় এই ধরনের অপটিমাল আন্ডার-লোডে লাভ হবে অনেক। প্রতিটি রেস্তোরাঁই আয় বাড়াবার জন্যে বেশী পরিমাণে ভোদকা বিক্রি (যাতে সহজে আয় বাড়ে) বা বেশী পরিমাণে দামী খাবার গছাবার (খদ্দেরের যখন অভাব নেই, তখন বললেই হল অল্প দামের খাবার নেই) চেষ্টা না করে সবরকম খদ্দের টানার জন্য সত্যি করেই পুষ্টিকর অথচ কম-দামী সবজির খাবার থেকে শুরু করে সমস্ত রকম খাদ্যের আয়োজন ও উৎকর্ষের দিকে মন দেবে। এটা হবে সমাজতান্ত্রিক প্রতি-যোগিতা, যার পরিণাম দেউলিয়াপনা ও একচেটিয়া নয়, উৎপন্ন ও সার্ভিসের ক্রমাগত অগ্রগতি।

অবশ্যই এটা একটা প্রস্তাব এবং প্রফেসর লিবেরমানের অনেক প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক এদেশে এখনও চলছে এবং চলবে। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা কথা বোধ হয় পরিষ্কার। গত দুই বছর ধরে এখানে যেসব শিল্পে নতুন অর্থনৈতিক সংস্কার চালু হয়েছে, তাতে আমাদের মতো অকিঞ্চনেরা মাঝে-মধ্যে বোনাস পাচ্ছে তাই নয়; উৎপাদন, উৎপাদন বিক্রয়, লাভ এবং শ্রমের উৎপাদন-শীলতা এই সব কটি দিক থেকেই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য সব সমস্যা এখনও মেটে নি। সংস্কার চালু করতে গিয়ে দেখা দিচ্ছে নতুন সমস্যা। বিতর্ক চলছে পত্রিকায়। কিন্তু সমস্যা ও বিতর্ক ছাড়া সত্য আছে কি?

নদী ভৌমিক

চিত্র প্রদর্শনী

শহরে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীগুলির আলোচনা করার পূর্বে আজ প্রথমেই কয়েকটি কথা বলে নিই। শিল্পী মাত্রেই যে-কোনও স্থানে বা গ্যালারীতে যে তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করতে পারেন, সে কথা সকলেই স্বীকার করবেন। সে অধিকার ও স্বাধীনতা তাঁর আছে, যেহেতু তিনিই গ্যালারীর ভাড়া দেন বা ক্যাটালগ-নিমন্ত্রণপত্রাদি ছাপানোর ব্যয় বহন করেন। এ বিষয়ে বলার কিছু নেই। তবে অনেকেই

ফর্ম—১ —মানিক তালুকদার

লক্ষ করে থাকবেন যে, সম্প্রতি দুই শ্রেণীর প্রদর্শনীর সংখ্যা বেশ বেড়ে গেছে। একটি হল বালক-বালিকা শিল্পীর একক তথা যুক্ত প্রদর্শনী, অপরটি শখের শিল্পীর প্রদর্শনী।

চিত্রকলা শিক্ষা ব্যাপারে যে এ যুগের ছেলেমেয়েরা নানা সুবিধা পায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সে দিক দিয়ে বিচার করলে তাদের চিত্র প্রদর্শনীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। তবে এ কথাও সত্য যে,

পার্ক —স্বপ্নেশ চৌধুরী

সংখ্যা অপেক্ষা প্রদর্শনীর উচ্চ মানই সকলের কাম্য। দেখা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে ও মাতা-পিতা তথা অভিভাবকের অহেতুক প্রচার-লালসার জন্য এ-জাতীয় প্রদর্শনীর মান হয়ে গেছে সাধারণ নিম্নস্তরের। শখের ও আত্মশিক্ষিত শিল্পী আবার অন্য জাতের। শিল্পের তাগিদে নিষ্ঠা সহকারে যাঁরা শেখেন বা কাজ করেন, তাঁদের সংখ্যা অল্প। এ পর্যায়ের অধিকাংশ শিল্পীই আসেন ধনী সম্প্রদায় থেকে, তাঁরা সাধারণত উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত, ছবি আঁকা তাঁদের নিছক শখ। অনেকের কাজের মধ্যে কোনও ধারা বা রীতির সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক ছেলেমেয়ের প্রদর্শনীর ও শখের শিল্পীর প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হলেই যে তার আলোচনা করা সম্ভব বা প্রয়োজন তা নয়। অবশ্য ব্যতি-ক্রমের কথা আলাদা। অতএব উল্লেখযোগ্য না হলে ভবিষ্যতে এ-জাতীয় প্রদর্শনীর কোনও আলোচনা এ স্তম্ভে প্রকাশিত হবে না।

*

ক্যানভাস শিল্পী সংস্থার তরুণ সভ্য-গণ সম্প্রতি বিড়লা অ্যাকাডেমিতে তাঁদের দ্বিতীয় প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। প্রদর্শনীতে নয়জন শিল্পী ও দুজন ভাস্করের মোট ২৬টি নিদর্শন দেখা যায়। নিদর্শনগুলি দেখেই বোঝা যায় যে, সংস্থার প্রত্যেক সভ্যই নিয়মিতভাবে কাজ করেন এবং প্রত্যেকেই আপন আপন চিন্তা ও রচনাধারা অনুসরণ করে নিজ মাধ্যমে মনোভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য দুই একটি ব্যতিক্রমও আছে। শিল্পীদের মধ্যে স্বপ্নেশ চৌধুরীর রচনা প্রথমেই চোখে পড়ে। তাঁর দুটি নিদর্শন—দুটিই বিভিন্নধর্মী। প্রায়বিমূর্ত 'পার্ক' রচনাটিতে শিল্পী দ্রষ্টব্য বস্তুগুলি ভেঙে

কম্পোজিশন —ত্রিদিব চন্দ্র

নানা প্রতীক ও আকারের মধ্য দিয়ে একটি সমগ্র রূপ ফোটাবার চেষ্টা করেছেন। স্থানে স্থানে আলঙ্কারিক রূপও চোখে পড়ে। দ্বিতীয়টি (গার্ল অ্যান্ড দি মুন) কাব্যধর্মী। আধুনিক রীতি অবলম্বনে রচিত এই ছোট ছবিখানির মধ্যে শিল্পীর কবিসুলভ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এর পরেই আলোক ভট্টাচার্য ও বরেন বসুর রচনার দিকে নজর পড়ে। আলোক ভট্টাচার্যের বিন্দুপ্রধান রচনাটি সুপরিকল্পিত হলেও পরীক্ষামূলক বলে মনে হয়। তবে তাঁর দ্বিতীয় নিদর্শন (মাইনারস কামিং আউট অব দি কেভ) সুরচিত—বিশেষ করে আলোকবিন্যাসের গুণে রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য হয়েছে। বরেন বসু পরিচিত মূর্তি ও আকার খণ্ড খণ্ড করে ভেঙে ফেলেছেন ও সেইগুলিই রেখা,

বৃত্ত ও অর্ধবৃত্তের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন (গণেশ ও ফর্ম)। অর্থাৎ স্বপ্নেশ চৌধুরী যেখানে প্রতীক ও অলঙ্কারের ওপর জোর দিয়েছেন, এই শিল্পী সেখানে বলিষ্ঠ রেখা ব্যবহার করেছেন, তার ওপর প্রধানত এক রঙের প্রাধান্যগুণে ছবি দুটির বিশেষ রূপ ফুটে উঠেছে। ত্রিদিব চন্দ্রের একটি রচনা ভাল লাগে—কম্পোজিশন-২। কেবলমাত্র রেখা ও নীল রঙের স্তরভেদে রচিত ছবিটির মধ্যে তিনি রঙীন কাচের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। বলাই কর্মকারের কীর্তনিয়া অপেক্ষা দি কাউ অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৃত্তপ্রধান আধুনিক রীতি অবলম্বনে রচিত এই ছবির মধ্যে শিল্পীর বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ করে শারীরিক গতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তেলরঙে রচিত হলেও মূলত লাল, কালো ও নীল রঙ ব্যবহার-কৌশলের জন্য নারায়ণ চক্রবর্তীর প্রোসেসন-এ কোলাজ-চাতুর্য ফুটে উঠেছে। অশোক বিশ্বাসের কাছে শালবনওয়ালা অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর রচনা আশা করেছিলাম। তুলনামূলকভাবে বিচার করলে প্রদর্শনীতে পরিমল দত্তরায় ও প্রফুল্ল পালের রচনা দুর্বল, যদিও বিশিষ্ট কোনও শিল্পীর প্রভাব লক্ষিত হলেও প্রথম শিল্পীর অ্যাসপিরেশন-এর নাম করা যায়।

সুখের বিষয়, প্রদর্শনীতে দুজন তরুণ ভাস্করের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—মানিক তালুকদার ও সুধীর ধর। মানিক তালুকদারের ভাস্কর্যে সমসাময়িক রীতির প্রভাব স্পষ্ট। বিশেষ করে নেগেটিভ ফর্মের মধ্য দিয়ে যে ভাস্কর্যের একটি আকর্ষণীয় রূপ প্রকাশিত হয়, মানিক তালুকদার সেটি ফর্ম (প্লাস্টার)-এর মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে ফর্ম-২ ও ব্রঞ্জের ম্যাকোয়েট উল্লেখযোগ্য। সুধীর ধর মাটি, প্লাস্টার ও সিমেণ্ট মাধ্যমে কাজ করেন ও তাঁর ভাস্কর্যেও বিশিষ্ট গঠন-রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—কম্পোজিশন নং ৩। উপবিষ্ট নরনারীর নিম্নদিকের আয়তনিক ভারসাম্যতার বিষয়ে ভাস্কর অধিকতর সচেতন হলে এটি আরও উপভোগ্য হত। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে কম্পোজিশন নং ২-এর নাম করা চলে।

*

শিল্পী অমর নন্দন বিড়লা অ্যাকাডেমিতে তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। চাকুরিজীবী হলেও চিত্রকলার দিকে শিল্পীর ঝোঁক আছে ও সেজন্য তিনি সন্ধ্যায় ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে শিক্ষালাভ করেন, সুতরাং একেবারে শখের শিল্পী বললে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। তাঁর এই প্রথম একক প্রদর্শনীতে

গ্রাম্য বালিকা। —অমর নন্দন

জল, তেলরঙ ও প্যাস্টেলে আঁকা ২৬টি নিদর্শন দেখা যায়—সেই সঙ্গে কয়েকটি স্কেচও ছিল।

কয়েকটি, বিশেষ করে, মিনিয়েচার জাতীয় রচনা লক্ষ করলে এখনও কিন্তু শিল্পীর শিক্ষার্থীরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে যেখানে তিনি আধুনিক রীতিতে রঙ ব্যবহার করেছেন সেখানে তাঁর শিল্পীরূপ ফুটে উঠেছে—যেমন, দি রেন অ্যাট নাইট। প্যাস্টেল নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি চোখে পড়ে—ফ্যাক্টরী অ্যাট নাইট। তবে তেলরঙ মাধ্যমে শিল্পী অধিক যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। এ ভিলেজ গার্ল প্রথমেই চোখে পড়ে। চিন্তাধারার দিক থেকে দি রুইন্স উল্লেখযোগ্য হলেও দুর্বল অংকনরীতির জন্য রসোত্তীর্ণ হয়নি। অপরাপর রচনার মধ্যে দে আর টু-র নাম করা যায়। শিল্পীর কয়েকটি ছোট স্কেচ ভাল লাগে।

চিত্রপ্রিয়

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

আটাত্তর

কিন্তু চিন্তায় আর কাজে মেলাতে পেরেছি কবে। সাঁওতাল পরগণার নিরালায়, একদিন হঠাৎ অট্টহাসের হাসি যেন নতুন কৌতূহলে বেজে ওঠে। বেজে উঠতেই আর চুপ করে থাকতে পারি না। অট্টহাসে নাকি দেবীর ওষ্ঠ পড়েছিল। বাহান্ন পীঠের সেও এক পীঠ! ওষ্ঠ পড়েছিল, নাম তাই অট্টহাস।

এমন নাম কি আর কোথাও হয়। কেন যেতে ইচ্ছা করে জানি না। কিসের বা সন্ধানে তাও বুঝি না। কী যেন এক অপার রহস্যের কৌতূহল আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। থাকতে পারি না, তাই বেরিয়ে পড়ি।

বর্ধমান থেকে কাটোয়া। কাটোয়া থেকে আহমেদপুর ছোট লাইনে, পাচন্দি-তে গিয়ে নামি। পাচন্দির হাটের পাশ দিয়ে মাঠে নামি, আলের সঙ্গী সাথী মেলে না। নিতান্ত গাঁয়ের পথচলা হাটুরে বাটুরে মানুষের সঙ্গে পথে দেখা। দু'-একটি কথা। পথ বাতলে দেওয়া।

কিন্তু অট্টহাস গ্রামের সঙ্গে অট্টহাস ক্ষেত্রের ব্যবধান অনেক। বেলাশেষে, গ্রামের প্রান্তে এসে দেখি, এক তীব্র স্রোতস্বিনী। সুদীর্ঘ বাঁকে কলকলিয়ে যায়। ওপারে ধান কাটা বিশাল মাঠ। তার মাঝখানে ঘন ঝোপের বিশাল মহীরুহের বিস্তৃত অরণ্যের এক দ্বীপ ভেসে আছে যেন। ওই অট্টহাসক্ষেত্র। বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না।

দেখি, খুঁটিতে বাঁধা নৌকা রয়েছে এপারে। মাঝি নেই। একখানি বৈঠা নৌকার ওপরে। এদিকে ওদিকে চাই। লোক দেখতে পাই না। নিজেকেই মাঝি হতে হবে নাকি। এদিকে সময় চলে যায়।

এই সাত পাঁচ ভাবনার মধ্যে একটি লোক এসে দাঁড়ায়। বেঁটে খাটো মানুষ। ছোট ছোট চুল, মাথায় টিকি, কপালে সিঁদুরের হালকা ছাপ। হাঁটুর ওপরে কাপড়, গায়ে সুতির চাদর। ছোট ছোট চোখে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা। যেন তলপেট থেকে জিজ্ঞাসা আসে, 'কোথায় যাবেন মশায় ?'

'ওপারে, অট্টহাসের মন্দিরে।'

লোকটার দৃষ্টিতে কৌতূহল আর ঔৎসুক্য ফোটে। বলে, 'মন্দিরে ? কি করবেন ?'

'এমনি দেখতে যাব।'

'একলা ?'

'হ্যাঁ।'

'ওখানে কেউ নেই, একটা জনপ্রাণীও না।'

'সে কি, মন্দিরে পুজো হয় না ? দেখাশোনা করবার লোক নেই ?'

'দেখাশোনার আর কী আছে ? অই একবারই পুজো হয়। তখনই বাতি জেলে দিয়ে আসি। সকাল থেকে দুপুর অবদি থাকি, তারপরে চলে আসি।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে বলি, 'আপনিই পুজো করেন ?'

'হ্যাঁ। দেখলাম, অচেনা লোক গাঁয়ের পথ দিয়ে ইদিকে এলেন, ভাবলাম যাই দেখি যেয়ে।'

চমৎকার! স্বয়ং অট্টহাসের পুজোরী পুরোহিতই উপস্থিত। মনে একটু আশা পাই, বল হয়। জিজ্ঞেস করি, 'ওখানে কি ঘরদোর নেই ?'

'আছে তবে থাকা যায় না। সব ছেড়ে, একলা কি ওখেনে থাকা যায় ? এখন আর কী দেখবেন, দেখবার কীই বা আছে। তবে যান তো চলেন। অন্ধকার হলে আর যাওয়া যাবে না।'

'নৌকার মাঝি ?'

'আসেন না কেন, ওঠেন।'

পুরোহিত মশায়ের পিছু পিছু নৌকায় গিয়ে উঠি, উনি নিজেই দড়ি খুলে নৌকা চালান। প্রবল স্রোত, অনেকখানি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু পুরোহিত শক্তিমান। ঠেলে ওপারের ঘাটে ওঠেন। সেখানেও একটা খুঁটি। সেই খুঁটিতে নৌকা বেঁধে বলেন, 'মাঝি বলে কিছু নেই। যখন যে আসে, সে পার হয়ে নৌকা বেঁধে রাখে। এপারে নৌকা থাকলে, ওপারের লোক হা পিত্যেশ করে থাকে, কখন একজন এসে পার হবে, তবে ওপারে নৌকা পেঁছাবে।'

নিয়ম মন্দ না। কাজ চলে যায়। তবে সময়ের কথা ভাবলে হবে না। তাড়া থাকলে, সাঁতরে পার হয়ে যাও। কারণ উলটো পারের খেয়া দিয়ে কে যে কখন আসবে, তা তোমার ভাগ্যে লিখন।

পুরোহিতের সঙ্গে মাঠ পেরিয়ে সেই নিবিড় অরণ্যের দ্বীপের সীমায় যাই। সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হয়। ভিতরে ঢোকবার রাস্তা কোথায়। এ বনের কি কোন পথ নেই।

পথ আছে। পুরোহিতকে অনুসরণ করেই সে পথ মেলে। এক প্রকাণ্ড ঝাড়ালো অশ্বত্থের পাশ দিয়ে বুনো ঝোপের ভিতর দিয়ে, সরু সর্পিল পথ। মাথা নিচু করে চলতে হয়। তবু মুখের ওপর ঝাপটা খেয়ে পড়ে ঝোপঝাড়ের ডালপালা। চোখ ঢেকে দেয় লতাগুল্মের নিবিড়তা। তাই হাত দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে চলতে হয়।

ঢুকেই মনে হয় এলাম নতুন রাজ্যে। পৃথিবী ছাড়িয়ে আর এক গ্রহে। মুহূর্তেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। পায়ের তলায় শুকনো পাতা ছড়ানো, মাটি ভেজা ভেজা নরম। মাকড়সার জাল মুখে লাগে। ঝোপ লতাপাতার তীব্র গন্ধ। এখানে কোন কালে আলো উঁকি দেয় নি, রোদ কিরণ ছড়ায় নি। শীতও তাই বেশী অনুভূত হয়। চারদিক স্তব্ধ, কবল ঝিঁঝিঁ'র ডাক শোনা যায়। কেন, এ বনে কি পাখি পাখালি নেই। এও নিঝুম কেন।

পুরোহিত আমার আগে আগে চলেন। তার মধ্যেই নাম ধাম পরিচয়ের জিজ্ঞাসাবাদ। কখনো বা এমন আনকা জায়গায় দেবীর মন্দিরে লোকজন বিশেষ না আসার আক্ষেপের কথা। হঠাৎ দেখি, পথের বাঁ দিকে এক জায়গায় ছোট পুকুর। কিন্তু তাতে জল দেখা যায় না। যদিও জল আছে বেশ। পাতায় আর পানায় একেবারে ঢাকা। আর তখনই শুনতে পাই, সরু মেয়েলি গলায় নাকি সুরে কে যেন কেঁদে কেঁদে ওঠে। চমকে অবাক হয়ে আশেপাশে তাকাই। পুরোহিতের দিকে চাই।

পুরোহিত কানে কালা কী না জানি না। কিন্তু নির্বিকার ভাবেই চলে। কিছু শুনতে পান বলে মনে হয় না। কাছ ঘেঁষে জিজ্ঞেস করি, 'কিসের একটা শব্দ হচ্ছে বলুন তো?'

পুরোহিত মশাই উৎকর্ণ হয়ে আমার দিকে ফিরে তাকান। পালটা জিজ্ঞেস করেন, 'কই, কিসের শব্দ?'

আশ্চর্য, শব্দটা তো আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গলাটা যেন চেরা চেরা লাগে। শব্দ যেন অমানুষিক, গা ছমছমানো।

তারপরেই পুরোহিত ওপর দিকে মুখ করে হেসে ওঠেন। বলেন, 'অ, আপনি গৃধিনীর ডাকের কথা বলছেন? ওই ত, গাছের উপরে বসে ডাকছে।'

তাঁর কথায় চোখ তুলে ওপর দিকে চেয়ে থমকে যাই। সহসা যেন কেমন একটা ভয় ভয় শিহরণ লাগে, অস্বস্তির আড়ষ্টতা বোধ করি। প্রকাণ্ড গাছটার অনেক উঁচুতে দৈত্যের কালো কিম্ভূতাকৃতি হাতের মত, পাতাহীন ডালপালা। তাতে, সাপের মত ফণা তোলা ভঙ্গিতে কতগুলো শকুন বসে আছে। কারুর দৃষ্টি নিচে আমাদের দিকে। কারুর বহু দূরে, দূরান্তে। যেন তীক্ষ্ণ চোখে স্থির অনুসন্ধিৎসায় কিছু দেখছে। তাদের মাঝখানে গলায় লাল ঝুলি, লাল করোটি গৃধিনী পাখা ছড়িয়ে বসে আছে। সে-ই ডাকছে। মাথাটা অদ্ভুতভাবে দোলাচ্ছে।

'এই দিকে আসেন।'

ডাক শুনেই ডান দিকে ফিরি। রাস্তা একটু প্রশস্ত। তারপরেই প্রশস্ততর মন্দির প্রাঙ্গণ, সেখানে একটা হাঁড়িকাঠ। ঝাঁটপাট দিয়ে প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখা যায় নি। কিছু শুকনো পাতা ছড়ানো। এখানে-ওখানে শকুনের বিষ্ঠা। ঝোপ ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে কোথা দিয়ে খানিকটা লাল আলো এসে পড়েছে। ডুবু ডুবু সূর্যের রক্তিম আলো। তাতে প্রাঙ্গণের খানিকটা যেন রক্তে লেপা দেখায়। হাঁড়িকাঠের গায়েও রক্তাভা।

পুরোহিতের নাভিস্থল থেকে উঠে আসা গলাটা যেন এখন বদলে গিয়েছে। নদীর ওপারে থাকতে তাঁর চোখের দিকে ভাল করে লক্ষ করি নি। এখন আমার দিকে ফিরে তাকাতেই মনে হয় ছোট ছোট [illegible] চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। অথচ যেন কী একটা ঘোরে মগ্ন। আমার দিকে একবার তাকিয়ে গহ্বরের ভিতর থেকে আওয়াজ করে ডাকেন, 'এদিকে।'

তাঁর পিছনে পিছনে গিয়ে মন্দিরের সামনে দাঁড়াই। সাধারণ মন্দির। সামনের দাওয়াটা লাল সিমেন্টে বাঁধানো। দরজা বন্ধ। সামান্য একটা পাকা ঘরের মত দেখায়।

পুরোহিতের বুকের কাছ থেকে ময়লা চাদরটা খসে পড়ে। পাথরে খোদাই মত শক্ত কালো। [illegible] ছোট ছোট হাত পায়ের চেহারা। [illegible] সেই রকমই, কিন্তু লাল। গলায় পৈতে [illegible] বুকের ওপর। তিনি একদিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমিও সেদিকে তাকাই। জায়গাটা সেখানে ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে। [illegible] ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে দেখি, [illegible] ঝিকমিক করছে। নদীটি [illegible] এসে পড়েছে [illegible] পারি না। পুরোহিত [illegible] বলেন, 'নদী।'

[illegible]

অনেক মুহূর্ত পরেই [illegible] সে আমার চলে [illegible] ফিরে দুএকবার তাকাই। [illegible] সেই আলো সামনে থেকে থেকে [illegible] থাকে। পুরোহিতের [illegible] ডাক শুনে তাঁকে আমার কাপালিকের মত মনে হয়। আর কোথাও একটি জনপ্রাণী নেই। আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া নিবিড়তা সর্বত্র। চারদিকে গভীর বন। বড় বড় গাছের গায়ে গায়ে নিবিড় জঙ্গল। তার এক পাশ দিয়ে চোখে পড়ে একদিকের মাঠ। যার কোন শেষ নেই। সেই দূরে আকাশে গিয়ে ঠেকেছে।

আমার ঘাড়ের কাছে শিরাটা কেমন শিরশিরিয়ে ওঠে। গায়ে ছমছম করে যেন কাঁটা দেয়। সত্যিই মনে হয় এমন করে একলা অসময়ে এই মানুষটির সঙ্গে অট্টহাস দেবীর থানে না এলেই হত। আমার সমস্ত ভিতর জুড়ে যেন কিসের একটা ভয় বিপাকের ছায়া ঘনায়।

পুরোহিত আবার আমার দিকে ফিরে তাকান। বলেন, 'এ বেলা থেকে সারা রাত এরাই মন্দির পাহারা দেয়।'

বলে, মন্দিরের দাওয়ায় উঠে কোমরের কাছ থেকে চাবি বের করে মন্দিরের তালা খোলেন। এই বনের নির্জনে তালা কোন কাজে লাগে, কে জানে। যদি কেউ কিছু চুরি করতে চায়, এ তালা সে অনায়াসে নির্বিঘ্নে ভেঙে ঢুকতে পারে। বাধা দেবার কেউ থাকবে না। এক পাশে দুটি চালা। শূন্য চালা রয়েছে। তার দরজা খোলা। লোকজন নেই, বোঝাই যায়।

মন্দিরের দরজা খোলেন। ভিতরে গভীর অন্ধকার, কিছুই দেখতে পাই না। উনি সেই স্বরেই ডাকেন, 'আসেন।'

কোথায়? মন্দিরের মধ্যে? সাহস পাই না যেন। তবু পায়ে পায়ে দাওয়ায় উঠে দাঁড়াই। সেখান থেকেই প্রথমে চোখে পড়ে, এক পাশে ঝোলানো খাঁড়ার ধারালো ঝলক। বলির খড়্গ। পুরোহিত ভিতরের অন্ধকারে কোথায় গেলেন দেখতে পাই না। বিগ্রহের স্থানে একটা স্তূপের মত কিছু দেখতে পাই। দেবীর ওষ্ঠের কী রূপে আছে সেখানে চোখে পড়ে না। নাম অট্টহাস। যেন কোন করাল মুখ ব্যাদান করে আছে সেখানে, হঠাৎ হাসি বেজে উঠবে হাহা করে।

পিছনে আচমকা পাতার সামান্য শব্দে ফিরে তাকাই। চোখের ওপর দিয়ে চকিতে যেন সেই পাংশুবর্ণ শিবা একটা ঝোপের মধ্যে মিলিয়ে যায়। তার সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হয়ে যায়। আর তখনই চোখে পড়ে, দরজার খাঁড়ির গায়ে পাথরে সিঁদুর মাখানো। পুটকিয় মাটির ঘোড়ার পুতুল। গৃধিনী ডাকছে, আঁ আঁ আঁ—উউউ!

'ভেতরে আসেন।'

সেই গলায় ডাক শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি মন্দিরের দিকে ফিরি। পুরোহিতকে দেখি না। কিন্তু ঘরে যেন ক্ষীণ আলো দেখা যায়। প্রদীপ যদি জ্বলে থাকে, শিখার তার তেজ নেই। এখন একটি দেবী মূর্তি চোখে পড়ে স্তূপের পাশে। চতুর্ভুজা কালো মূর্তি। কালী মূর্তিই কী না, বুঝতে পারি না। কারণ প্রসারিত জিহ্বা চোখে পড়ে না।

পুরোহিত দরজায় আবির্ভূত হন। আমার দিকে চেয়ে ডাকেন, 'আসেন, দর্শন করে নেন।'

খালি পায়ে ভিতরে ঢুকি। প্রদীপ জ্বলছে ঠিকই, শিখা মরো মরো। যেন তেল নেই, শুকনো পলতে। বাইরে থেকে যা দেখেছি ভিতরেও তাই। বেশীর মধ্যে মন্দিরের কিছু জিনিসপত্র। নতুনের মধ্যে একটি শিবলিঙ্গ।

পুরোহিত ছোট একটা কুঁষিতে করে চরণামৃত এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'নিন।'

নিয়ে ঠোঁটে ছুঁইয়ে মাথায় ঢেলে দিই। তারপরে প্রাপ্তি, দুটি ছোট ছোট নকুলদানা। দেবীর প্রসাদ। প্রথানুযায়ী কপালে ঠেকিয়ে খেয়ে নিই।

পুরোহিত বলেন, 'একেবারেই যে লোকজন আসে না তা না। সকালবেলার দিকে আসে। পালাপার্বণে বা চোতমাসে লোকজন বেশ আসে। আর মাঝে মধ্যে সাধক সাধুরা কেউ কেউ এসে থাকেন এখানে।'

না জিজ্ঞেস করে পারি না, 'রাত্রেও থাকেন?'

'হ্যাঁ থাকেন। অই যে বাইরে দুটো চালা রয়েছে সেখানে থাকেন। চলেন, বাইরে যাই।'

অনুমতি পেয়েই তাড়াতাড়ি বাইরে আসি। পুরোহিত হাতের ঝাপটায় প্রদীপ নিবিয়ে বাইরে আসেন। ঘরের তালাটা লাগাতে দেখে একটু যেন স্বস্তি পাই। বলেন, 'ঢাক ঢোল বাজিয়ে পুজো করবার জায়গা তো নয়। সাধকরা নিরিবিলিতে এখানে পুজো করতেন। তান্ত্রিক কুলাচারের চক্র সাধনার ভাল জায়গা। এক সময়ে নাকি নরবলিও হয়েছে এখানে।'

খুবই স্বাভাবিক। নরবলির এমন প্রশস্ত জায়গা আর হয় না। জিজ্ঞেস করি, 'এখানে কি শ্মশানও আছে নাকি?'

'না, এখানে শ্মশান নাই। আমাদের এদিক থেকে সবাই উদ্ধারণপুরের ঘাটেই যায়। সেখানে গঙ্গা আছে, বড় শ্মশান। বিশ পচিশ মাইলের সব লোক সেখানেই যায়।'

আকাশে যত না অন্ধকার ঘনায় তার চেয়ে

নিবিড় কালো এখানে। মনে হয় অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। বিশেষ কিছুই আর চোখে পড়ে না। মন্দিরের দাওয়া থেকে নেমে পুরোহিত জিজ্ঞেস করেন, 'কারণ পান চলে আপনার?'

এখানেও সেই কারণ! এখন আর হকচাকিয়ে চমকাই না। রাতের এইসব অঞ্চল তান্ত্রিকদেরই প্রাধান্য। জবাব দিই, 'না।'

পুরোহিত বলেন, 'তা হলে এখানেই বসা যেত। রাত্রটা চালাতে থাকতে পারতেন।'

রক্ষে করুন! বক্রেশ্বরের মহাশ্মশানে তবু জানতাম আশেপাশে অনেক লোকজন রয়েছে। এখানে এই বনের মধ্যে হাঁড়িকাঠ মাঝখানে রেখে, সারা রাত্রি গৃধিনীর কান্না শুনে, শিবার সঙ্গে চোখাচোখি করে, পুরোহিতের সঙ্গে রাত্রি বাসে মন সাড়া দেয় না। তা ছাড়া, কারণবারি যখন আমার চলবে না। বলি, 'না, থাক। অন্য সময় এসে থাকা যাবে।'

এখন বুঝতে পারি, মহাশয়ের চোখ কেন লাল। গলার স্বরই বা এমন কেন। কাপালিকের কিছু অংশ আছে ঠিকই। তবে এখন আর তাঁকে ভয় লাগে না। বরং অন্ধকারে তাঁর কাছ ঘেঁষেই থাকবার চেষ্টা করি। তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। পকেট

থেকে দুটি টাকা বের করে তাঁর হাতে দিয়ে বলি, 'এটা রাখুন।'

টাকা দুটি নিয়ে বলেন, 'জয়স্তু বাবা, বেঁচে থাকেন। মায়ের কৃপা হোক।'

কিন্তু সে জন্যে আমার ব্যয় না। উনি অসময়ে এলেন, দেবী দর্শন করালেন, চরণামৃত প্রসাদ দিলেন। তার একটা প্রাপ্তি তো চাই। বলেন, 'তা হলে চলুন যাওয়া যাক। আমার হাত ধরুন।'

তাঁর হাত ধরে নিবিড় অরণ্যের অন্ধকার পথ চলি। গৃধিনীর ডাক পিছনে পড়ে থাকে। শকুনের পাখা ঝাপটা বেজে ওঠে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হয় শিবারা যেন আমাদের আশেপাশেই চলাফেরা করে। শুকনো পাতায় প্রায়ই খস খস শব্দ ওঠে। একটা হাত সামনে রেখে চলি মুখ বাঁচাবার জন্যে। তবু মাকড়সার জাল মুখে লেগে যায়। পুরোহিত আশেপাশের গ্রামের আর পথ ঘাটের বৃত্তান্ত বকবকিয়ে চলেন।

সে সব কথা বিশেষ আমার কানে যায় না। বাহান্ন পীঠের এই নির্জন নিবিড় বন ক্ষেত্রের কথা ভাবি। বাহান্ন পীঠের পুরাণ কথা জানি। দেবীর ওষ্ঠ রহস্য বুঝি না। তবু সব মিলিয়ে এক গভীর কল্পনা মনোজগতে তরঙ্গ তোলে। পৃথিবীতে কত বিস্ময় আছে। তবু বাঙলার এমন বৈচিত্র্য আর কোথায় আছে জানি না। আকাশের নিচে, দিগন্তবিসারী মাঠের মাঝে এক অরণ্যদ্বীপ। তার মধ্যে কোন মানুষেরা খুঁজে পেল দেবীর ওষ্ঠ। নাম দিয়েছে তার অট্টহাস। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে সঁপেছে নিজেকে।

হয়তো এ সবের মধ্যে যে ভাবনা নিহিত, তার মধ্যে নিজেকে সঠিক খুঁজে পাই না। কিন্তু আমার সমস্ত কিছুর মধ্যে এই অট্টহাসও যেন কোন এক স্তরে চাপা পড়ে আছে। এই প্রকৃতি, পরিবেশ, এই হাত ধরে নিয়ে চলা, প্রায় বাক্যালংকৃত রক্তচক্ষু পুরোহিত, সব কিছুর মধ্যে আমি যেন কোথায় ছায়া ফেলে রয়েছি। সব কিছুতেই এক অচিন অনুভূতির দোলায় আমার মন দোলে। কোন্ এক রহস্য পারে যেন নির্বাক স্তব্ধ হয়ে থাকি।

সৌভাগ্য এপারের আর যাত্রী ছিল না, তাই নৌকা ওপারে যেতে পারে নি। ওপারে গিয়ে পাচনদি যাবার চিন্তা ছাড়ি। কারণ, কাটোয়া যাবার গাড়ি রাত্রে আর নেই। পাচনদির মতই সমান দূরে নিরোল গ্রাম। সেখানে আমার পরিচিত মুখোপাধ্যায় বংশ। এক পরম শান্ত পরিবার আছেন। নাম বলতেই পুরোহিত চিনতে পারেন। অট্টহাস থেকে তিনি একটি গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করে দেন। নিরোলে পেঁছোতে সময় যায় তিন ঘণ্টা। আমার মনে হয়, এ রাত্রির আর শেষ নেই। আমার চলা যেন, এমনি করে চিররাত্রির সঙ্গে বাঁধা থাকবে।

বক্রেশ্বরে যে চাঁদকে ক্ষীণ দেখেছিলাম, এখন তার একটু বৃদ্ধি হয়েছে। তবু পাতলা কুয়াশার ঝাপসাতে এই দশমী বা একাদশীর জ্যোৎস্নাকেও কুহেলিময় লাগে। সমস্ত প্রকৃতি যেন জাগ্রত, অথচ আচ্ছন্ন। গাড়ির চালকের নাম নসীরাম। সে জানায়, সে দুলে। তার বউ ছেলেমেয়ে পরিবার পরিজনের কথা বলে। ভূমিহীন এক কৃষক। আজ রাত্রে আর সে নিরোল থেকে ফিরবে না, কাল ভোর রাত্রে বেরিয়ে পড়বে। পথের কোন এক জায়গা নাকি খারাপ। না, ঠ্যাঙাড়ে ডাকাত না, সেখানে একটু অপদেবতাদের বাড়াবাড়ি। রাতবেরাতে একলা চলাফেরায় দু'-একজনের প্রাণ গিয়েছে। কী দরকার, নসীরাম কাল ভোরেই ফিরবে। এই পর্যন্ত বলে, অট্টহাসের দুলে পুরুষ বলদকে বলে, 'চখের মাথা খেয়েছে হারামজাদা, খাঁলি ডাইনে যাবে।' তারপরে সেই দূরে আকাশ পর্যন্ত গলার স্বর তুলে মাঠ কাঁপিয়ে গেয়ে ওঠে, 'আমি অই ভয়েতে মুদি না আঁখি।'...

রীতিমত টপ্পা ধাঁচের সুরে। ভাবতেও পারি নি, আচমকা সে এরকম গান ধরে দেবে।

তার চেয়েও বিস্ময়কর, মুখোপাধ্যায় গৃহের বাহির দুয়ারে যখন গাড়ি দাঁড়ায়, তখনও ভাঙা ভাঙা বুড়ো গলায় সেই গানই শুনতে পাই, 'নয়ন মুদিলে পাছে তারা হারা হয়ে থাকি।/অই ভয়ে মুদি না আঁখি।'... গলার স্বরেই চিনতে পারি, স্বয়ং গৃহকর্তার গলা। পূজামণ্ডপের অন্ধকারে বসে আছেন।

সাঁওতাল পরগণা ছাড়িয়ে এসে দুর্গাপুরে নামি। যাত্রা কেঁদুলি। কেন্দুবিল্ব। বাউলের পাঁচ পরম রসিকের এক রসিক, জগতজনের কবি জয়দেবের লীলাক্ষেত্রে।

বাউল বলে, 'জয়দেবে যাব।' তার মানেই কেঁদুলি যাওয়া। আজই সেই পৌষ সংক্রান্তির দিন। আজ জয়দেবের স্মারকোৎসব।

নিরোল থেকে সাঁওতাল পরগণায় ফিরেছিলাম। সেখান থেকে এখানে। কিন্তু গতিক সুবিধার বুঝি না। নতুন লৌহনগরীতে ইতিমধ্যেই মানুষ আর যানবাহনের বেজায় ভিড়। শুনেছিলাম এখান থেকেই মোটর বাস পাওয়া যাবে। ভিড়ের চেহারা চরিত্র যা দেখি, সেই ছাতিমতলার কথা মনে করিয়ে দেয়। নগর লোকের ভিড় বেশ।

তবে কেঁদুলির বাস যখন খুঁজে পাই সেখানে নগর নাগরিক ছাপছোপ যাত্রী একটু কম। আলাদা মোটরগাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। তার দরকার নেই। সকলের সঙ্গে যাওয়াই স্থির। জানা গেল, কেঁদুলির মোটর বাস নিয়মিত না। মেলা উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন।

গাড়িতে বসবার জায়গা যে পাওয়া যায় সেটাই আশ্চর্য। আমার আশেপাশে অধিকাংশই গ্রামীণ নরনারী। শহুরেরাও আছেন ছড়ানো ছিটানো। শোনা গেল তাঁদের ভিড় বেশী হবে, যখন কলকাতার গাড়ি আসবে। এখন কলকাতা থেকে দুর্গাপুর দিয়েই কেঁদুলির সহজ রাস্তা। অনাথায় অণ্ডাল থেকে দুবরজপুর, সেখান থেকে মোটর বাসে জয়দেব। বহুত ঘুর পথ।

ভিড় হলেও শেষ পর্যন্ত প্রকৃতি তার কষ্টটা ভুলিয়ে দেয়। মাইলের পর মাইল শালবন। মাঝখান দিয়ে লালমাটির শক্ত সড়ক। সবখানেই লালে লাল। শালবনের ডালে ডালে পাতায় পাতায় লাল ধুলোর মাখামাখি। আলখাল্লা জড়ানো বিবাগী হয়েছে মহীরুহ। পথের ধারে ধারে ঝোপ-ঝাড়ের গায়েও লালধুলোর ছড়াছড়ি। যাত্রীরাই বা বাকি থাকবে কেন। লাল ধুলোতে আমরাও মাখামাখি হয়ে যাই। তবু ভাল লাগে।

যাত্রী নামার থেকে, ওঠাই বেশী। কিন্তু বেকায়দা করলে এক কৃষ্ণা যুবতী। মাঝপথে কোথা থেকে উঠে কোলের কচি অজাটিকে এনে ফেলে দেয় একেবারে আমার কোলে। নিজে ঢলে পড়ে আর একজনের কোলে। তারপরেই বিব্রত লজ্জায় কী হাসি! অই মা, দ্যাখ দিকি নি ছাই!

তার আগেই গুটি কয় সাঁওতাল মেয়ে পুরুষ গাড়ির মেঝেতেই বসে গিয়েছে। কনডাকটারের ধমকে তাদের কিছুই যায় আসে নি। তাতে পা নীচে রাখাই যাচ্ছিল না। তার ওপরে এই নধর পুষ্ট ছোটখাটো একটি পাঁঠা কোলের ওপর!

কৃষ্ণা যুবতী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। চোট লেগেছে কী না, লজ্জা চকিত মুখ দেখে তাও বোঝা যায় না। কিন্তু এমনি দাঁড়িয়ে থাকতে তো পারে না। অতএব জায়গা থাক বা না থাক, নীচেই কোনরকমে বসে পড়ে। তারপর হাত বাড়িয়ে দেয় জীবটির জন্য। সেটিকে নিয়ে প্রায় বুকে চেপেই বসে। সে বেচারী ভয়ে ভয়ে তাকায়, এক আধবার ডেকে ওঠে। নানান কলরবের মধ্যে একজন গ্রামীণ যাত্রীর সঙ্গে যুবতীর কথায় জানতে পারি সে যাবে বিল্বমঙ্গলে! নতুন কথা শুনি যে। যাচ্ছি সবাই জয়দেবে। এ বলে বিল্বমঙ্গলে। এ'র সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কী। বাউলের গানে চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলের কথা শুনেছি বটে। কেননা, সহজিয়াদের পাঁচ রসিকের এক রসিক বিল্বমঙ্গল। বিল্বমঙ্গল চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি কবি রায় শেখর আর জয়দেব। যাচ্ছিও সেই অজয়ের কূলেই। তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনীতে, যখন ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরি খন্তিয়া, যখন অজয় নদে বান লেগেছে ঝড়ে উত্তাল তরঙ্গ, তখন বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির কাছে যাবার ব্যাকুলতায় ঝাঁপ খেয়ে পড়েছিল জলে। কাঠ ভেবে মড়া ধরে ভেসেছিল। চিন্তামণির ঘরের সামনে লতা ভেবে সাপ বেয়ে উঠেছিল। বাহ্যিক জগতে যা-ই ঘটুক, যা-ই থাকুক, বিল্বমঙ্গলের

এক মন, এক প্রাণ, এক মুখ, এক রূপ, এক দর্শন, এক আসঙ্গ, নাম তার চিন্তামণি।

কৃষ্ণা যুবতীর কথায় আরো ভিন্ গলাতেও আওয়াজ ওঠে, 'আমরাও তো বিল্ব-মঙ্গলেই যেইছি গ।'

সবাই তা হলে জয়দেবে না। অন্য রসিকের খোঁজেও। এমন কথা জানা ছিল না। তবে, বিল্বমঙ্গল কোথায়। আজ সেখানে কিসের উৎসব।

তার কোন সঠিক জবাব মেলে না। কিন্তু কৃষ্ণা যুবতীর বুকে আঁকড়ানো জীবটি যা বলে আওয়াজ দিয়ে হঠাৎ ধড়ফড়িয়ে এক লাফ। কী দুর্গতি! সবাই হইহই করে ওঠে। যুবতী হেসে তাকে ধরতে গিয়ে কনুয়ের একখানি মোক্ষম খোঁচা মারেন আমার উরুতে।

কী লজ্জা বল দিকিনি ছাই! তাই একটু সলজ্জ হাসি। তারপরে কটাক্ষের কোণে একদিকে চেয়ে ঝংকার দেয়, 'তুমি ধর না।'

যাকে বলে, তার দুরবস্থা আরো। হাত দিয়ে কিছু ধরবার নেই বেচারীর। কাঁধে ঝোলানো পুঁটলি। গোঁফজোড়া ভিড়ের চাপে ধসে গিয়েছে বলা যায়। ওপর ঠোঁট ঢেকে দিয়েছে। সামনে পিছনে ভিড়ের চাপেই খাড়া আছে। অসহায় চোখে চেয়ে এগিয়ে আসবারই চেষ্টা করে। পাশের লোকে ধমক দেয়, 'ধুত্তোরিকা।'

যুবতী আবার পাল্টা ঝামটা দেয়, 'যাক, দরকার নাই।'

বলে নিজেই গুছিয়ে গাছিয়ে পশুটিকে বুকে জড়িয়ে বসে। এবার কৌতূহল প্রকাশ না করে পারি না, 'বিল্বমঙ্গলে পাঁটা কী হবে।'

যুবতী বলে, 'বলি হবে।'

বলি! সহজিয়া রসিকের থানে বলি! এ যে নতুন কথা শুনি। যুবতীর পাশে যে পুরুষটি তার কাছে নিবিড় হয়ে বসে আছে, সে বলে 'ওখেনে এক দেবীও আছে ত, সেখেনেই হবে।'

যুবতী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'বিল্ব-মঙ্গলের মানত।'

পুরুষটি জবাব দেয়, 'অই হল। অধরার মানত।'

যুবতী ঘাড় কাত করে সম্মতি জানায়। বোঝ, এবার কী বুঝবে। লোকের মুখে শুনলে না হয় প্রত্যয় না হত। এ যে চোখে দেখি, কানে শুনি!

তবে অবাক হবারই বা কী আছে। অথৈ-এর থৈ পাবার কী আছে। এই যে নানা মতের নানা ছন্দের তরঙ্গ, এ বহু দিকের বহু স্রোতের মিলজুলের মোহনা। তুমি ভাসো সংগমে, যেখানে সব একাকার। আলাদা করে বাছবিচার করতে যাও, খেই হারিয়ে যাবে। বৌদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্য লুইপাদ। সহজ ধর্মের অন্যতম প্রবর্তক। তাঁর নাম শুনবে রাঢ়ের ধর্মঠাকুরের পুজায় মেলায়। সেখানে শত শত বলি, মন্ত্র নিয়ে হোলি, মদমত্ত নরনারীর উল্লাস উৎসব। জয় বাবা লুই ঠাকুরের জয়! আবার লুইপাদের চর্যাপদের ইঙ্গিত পাবে, রসিকের গানে কথায়। বাউলের দুর্বোধ্য গানে। তবে, সমাজে যাদের বলে নিচু ঘর, ধর্ম-ঠাকুরের মস্ত বলিদান উৎসবে তাদের পাবে বেশী। এই কৃষ্ণা যুবতী বা যারা বিল্বমঙ্গলের যাত্রী, তাদের অনেককেই দেখে মনে হয়, হিন্দু সমাজের সেই 'নিচু ঘরের' মানুষ।

অতএব, কোথায় কিসের যোগাযোগ, সে বিচারে নেই আমি। আমি দেখি রঙ্গের বিচিত্র রঙ্গ। বিচিত্র এই মানুষের মিছিল। তার মধ্যে নানা বিশ্বাস, নানা চিন্তা, নানা ভাবের খেলা। সেই স্রোতে ভাসি আমি। আমার ভিতরে ছলছলিয়ে কলকলিয়ে ওঠে।

এদিকে গাড়ি যত অগ্রসর হয়, পথের ভিড় বাড়ে। কেবল পায়ে চলা মানুষের না। যানবাহনেরও বটে। তার মধ্যে গরুর গাড়ি বেশী। শহরে নতুন আসা বলদের ভারী ধন্দ। মোটর বাসের শব্দ শুনেই রাস্তা থেকে নেমে গাড়ি নিয়ে দৌড় দিতে চায় মাঠে। কেবল যে মানুষবাহী গো-শকট, তা না। মালবাহীও প্রচুর। তরিতরকারি ফল-ফলারি নানান বস্তুর বোঝা। তার মধ্যেই হঠাৎ হঠাৎ দু' একখানা ছোটখাটো সুন্দর মোটর গাড়ি দেখা যায়। জীপ গাড়িও চলেছে। যাত্রীদের দেখলেই মনে হয়, এ পথে মেলায় ছাড়া ভিন্ যাত্রী নেই।

তারপরে অজয়ের কাছাকাছি এসে বিল্বমঙ্গলের যাত্রীরা নামে আগে। জয়-দেবের যাত্রীরা একেবারে অজয়ের উঁচু বাঁধের কাছে এসে নামে। বর্ধমান বীরভূমের সীমানা। এপারে বর্ধমান, ওপারে বীরভূম। মাঝখানে অজয়। বিল্বমঙ্গল যাবার ইচ্ছাটা মনে মনে রেখে গাড়ি থেকে নামি।

এবার দেখ লোক। মেলার কাছে এসেছি, দেখলেই বোঝা যাবে। মোটর বাস দাঁড়িয়ে যায় বটে বাঁধের সীমানায়। গরুর গাড়ি বাঁধ ডিঙিয়ে চলে যায়, কাঁকর আর বালি মাটির চরার বুক দিয়ে। জীপ গাড়ি-গুলোও তাই।

অনেকখানি চরা পেরিয়ে তারপরে নদী। বর্ষাকালে না জানি এ নদীর কী ভয়ংকর প্রমত্ত রূপ হয়! এখনো নদীখানি ছোট না। লাল বালি আর কাঁকর মাটির রক্তাভ চরা পেরিয়ে ওপারের দূরত্ব অনেক-খানি। কিন্তু পারাপারের ব্যবস্থা কী?

ব্যবস্থা একটাই, হেঁটে পারাপার। গরুর গাড়িরও তাই। তবে চেনা পারের চিহ্ন ধরে চল। যারা অনায়াসে যায়, তাদের পিছন ধর। নইলে অগাধ জলে, একেবারে টুপ্‌সে! ওদিকে দেখ, দুর্গাপুরের সরকারি জীপ গাড়িতে বাবু বিবিরাও এসেছেন। কিন্তু কাল করেছে অজয়। সাহেবের পাতলুন গুটিয়ে তোলা যায় না। মেম-সাহেবের অবস্থা আরো খারাপ। কাপড় কতখানি তোলা যায়! অজয়ের একি খেলা! নারীর লজ্জা হরণ করতে চায়।

কিন্তু লজ্জা আছে তবু নারীরা পার হয়, তাও দেখি। কেন না তাদের কথা হল, জলে নামব, কাপড় ভেজাব না, তা হয় না। তারপরে আর কী লজ্জা হরণ করবে কর।

এপারে থাকতেই চোঙার ফোঁকা, যে রকম কলের গানের হুংকার শুনি, তাতে তো জয়দেবের বাউল সমাবেশের কল্পনাই মাটি হয়ে যেতে চায়। সার্কাসের তাঁবু। বাজীকরের তাঁবু, এপার থেকেই চোখে পড়ে। সব মিলিয়ে একটা প্রচণ্ড গর্জনের মত কানে এসে বাজে। মানুষের ভিড় তো অথৈ।

পার হয়ে, পাড়ে উঠে ভিড়ের মধ্যে মিশি। যার নাম মেলা, এ তা-ই। খাজা গজা মণ্ডা মেঠাইয়ের দোকান সারি সারি। তার পাশে ভাত ডাল মাছ মাংসে পরিবেশন-কারী নামা নামের হোটেল। ইতো যদি না হয়, তব্যে চপ কাটলেট চা খেয়ো যান কানে গ! কর্তার পাশে ঘোমটা ঢাকা দিয়ে বউ বসে গিয়েছে। ঘোমটার তলে খ্যামটা নাচে বলো না। ঘোমটার মধ্যে হাত, হাত ভরে খাবার। মেলায় এলে একটু না খেলে মন মানে নাকি।

মনোহারি, বাঁশী, পুতুল, কতকিছুর পসার। কিন্তু এসব এখন দেখতে চাই না। অনেক সময় পাব। জয়দেবের আসল যাত্রীরা কোথায়। তাদের দেখা আগে চাই। জন-স্রোতে একদিকে ভাসতে ভাসতে চলি। তবে, অজয়ের কূল বরাবর পথ রাখি। সামনে এক মন্দির পড়ে। তার চারি ভিতে দাওয়ায় মানুষের ভিড়। শুনি শ্রীরামের মন্দির। তারপরে মনে হয়, গ্রামের পাড়ায় ঢুকে পড়েছি। ঘরের দাওয়ায় দাওয়ায় দোকান। দোকানে নানান পসরা। কোথায় যে সেই শ্রীচরণচারণ চক্রবর্তী কবির ভিটা, তার খোঁজ পাই না। যার মুখের দিকেই চাই, সবাই আপনভাবে বিভোর। ভারী ব্যস্ত ত্রস্ত দ্রুতগামী।

এমন সময়ে এক বিবাগী বাবাজী, গেরুয়াধারীকে দেখি, একতারাটা বগলদাবিয়ে আপন মনে চলে যায়। তাকেই জিজ্ঞাসা করি, 'আচ্ছা, বাউলরা এখানে কোথায় বসেন।'

ঘাড় কাত করে একবার দেখে, বাবাজী বলে, 'আসেন। সব বেদনাশা বটের তলায় আছে।'

বেদনাশা বটতলা! কথাটা শোনা ছিল। স্বরূপে রূপ মাখাচোখা। বেদবিধিতে নাই। বাউল বেদবিরুদ্ধ পথের মানুষ।

খানিকটা যেতেই দেখি, প্রকৃতি ভিন্ন, পরিবেশ ভিন্ন। অজয়ের ধার ঘেঁষে, মস্ত জমির পরিসরে, অনেক গাছ। গাছতলাতে গেরুয়া রঙের ছেঁড়া কাঁথার, ঝুলি আল-

খাল্লার ছড়াছড়ি। তারা ডুপকি প্রেমজুরি, একতারা বাঁয়া গোপীযন্তরী, খোল করতাল খঞ্জনী, কী নেই। হেথায় হোথায় গুচ্ছ গুচ্ছ, আসরে আসরে জমজমাট। লালপাড় গেরুয়া ছোপানো শাড়িধারিণী যেমন পাবে, পাড়হীন গেরুয়া থান পরা বৈষ্ণবীর রসকলিও দেখবে। চুলদাড়িতে ঝাপটা যত, কামানো সাফানো চিকন মুখে কালার হাসিও তেমনি ঝলক দেয়।

কেউ গায়, 'গৌরচাঁদে দেখবি যদি, চল্ গ নদীয়ায়।' পায়ের ঘুংগুরে বোল্ তুলে, কোমর দুলিয়ে, কেউ বলে, 'জানুগে, মানুষের করণ কিসে হয়।'...

একতারাওলা বাবাজীটি কোথায় হারিয়ে যায় দেখতে পাই না। আমি দেখতে দেখতে যাই। সবাই যে কেবল এমনি বসেছে, তা নয়। এর মধ্যে আবার অস্থায়ী আখড়াও হয়েছে। বাঁশের বেড়ায় খড়ের চালে, কোনরকমে একটা ডেরা। বড় ব্যবস্থাও আছে। চারদিকে বেড়া দিয়ে, মাঝখানে মস্ত তাঁবুর আস্তানা। সেখানে নামকরা ক্ষ্যাপা কিংবা বাবাজীদের সমাবেশ। তাদের শিষ্যসাবুদ-দের চেহারাও আলাদা। কোট পাতলুনে সাহেব। ঝকমকানো ধুতি পাঞ্জাবীতে বাবু। সেই সঙ্গেই সঙ্গিনীরা মেমসাহেব আর বিবি। সব মিলিয়ে, তবু ভাল লাগে। নানা রূপের ছন্দে, এক অপরূপের সুর বাজে। রূপে রূপে লহর তোলে।

এই সমাবেশ আর আখড়াগুলোর সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে দেখি, নদীর কিনার একটু নিরালা। এই শেষ বেলাতেও সেখানে কেউ কেউ অজয়ের হিম জলে ডুব দেয়। নদীর ধারে, ধান কাটা মাঠের ফাঁকে ফাঁকে রবিশস্যের সবুজ আঁচল পাতা।

এদিক থেকে ফিরে যাই। কোন একটা আখড়ায় ঢুকে পড়লেই হবে। তার আগে, গোপীদাসদের সঙ্গে একটু দেখা করা দরকার। জয়দেবে তারা নিশ্চয়ই এসেছে। যত ভিড়ই হোক, খুঁজে নিশ্চয়ই পাব। একটা মুখ তো না। অনেকগুলো মুখই চিনি।

অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে, দিকে দিকে বাতি জ্বলে। বড় আখড়ায় হ্যাজাক জ্বলে। ছোট আখড়ায় হ্যারিকেন, গাছতলার খোলা সমাবেশে, তাও প্রায় নেই। বড় বড় কাঠের গুঁড়িতে আগুন জ্বালিয়ে আলো হয়েছে। আলো তাপ, এক সঙ্গেই। মকর সংক্রান্তি বলে কথা। গংগাসাগরের যাত্রায় যত না শীত পাবে, এখানে রাঢ়ের সীমায় তার বেশী।

গাছতলাতে এক জায়গায় এক বাউলকে দেখে মনে হয়, রূপে ভুবনমোহন। বয়স কাঁচা। কালো রঙ, ডাগর চোখ। এখনো ভাল করে দাড়ি ওঠেনি। পায়ে তার ঘুংগুরের গোছা। গায়ে কাঁথার জোড়ায় আলখাল্লা। কোমরে শক্ত করে বাঁধা এক ফালি গেরুয়া। সব থেকে পাগল করে তার গলা। যেমন মিঠে, তেমনি উঁচু। ভঙ্গিতে হরিণের নাচ। সে নিজে মাতাল গানে। তার গানে মাতাল বাকীরা। সকলেরই শরীরে দোলা লেগে গিয়েছে। তার সঙ্গের নরনারীরা ঘিরে রয়েছে। মাঝখানে আগুনের শিখা।

দেখে শুনে চলতে ভুলে যাই। সেখানেই বসে পড়ি। নিজেরাই সরে বসে জায়গা করে দেয়, 'বসেন, বসেন দাদা।' হাতে হাতে প্রেমের গাঁজার কলকেখানি ফেরে। ফিরতে ফিরতে হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা, 'চইলবে নাকি দাদা।' না থাক। সেধেছে, তাই যথেষ্ট। পাগলটার গানেই মজে থাকি।

এর মধ্যেই দেখি খিচ্ খিচ্ করে বিদ্যুচ্চকিতে ঝিলিক হেনে যায়। বুঝতে পারি, নগরবাসীদের ক্যামেরার ঝিলিক। ফটো তোলা হচ্ছে। কেউ কেউ খাতা কলম নিয়ে ঘোরেন। বাউলের গান লিখে নিয়ে যান।

তারপরে হঠাৎ একেবারে আমার পাশ থেকে, মুখের সামনে একটি মুখ। চেনা মুখ যেন। ছোটখাটো মুখখানি, নাকে আবার নাকচাবি। আয়ত চোখ দুটিতে অনুসন্ধিৎসু আর রাজ্যের বিস্ময়। হঠাৎ আমার পিঠে একটা আলতো চড় মারে আমার। বলে ওঠে, 'হ্ গ, তুমি! তাই ভাইবছি, ই ত সিই বাবাজী। ইখানে বসো আছ তুমি?'

আমার বিস্ময় ততোধিক! গোকুলের বোন কুসুম যে! এ কী করে আমাকে দেখতে পেল। এই অন্ধকারে ভিড়ের মধ্যে। চিনতেই পারে কী করে। জিজ্ঞেস করি, 'কুসুম তো!'

তার জবাব পরে। হাত ধরে টেনে বলে, 'এসো, এসো শীগ্গির!'

আশেপাশের কৌতূহলিত অনুসন্ধিৎসায় না উঠেই বা উপায় কী। কুসুম যেন আমাকে নিয়ে প্রায় ছুট দেয়। জিজ্ঞেস করি, 'সবাই এসেছে? গোপীদাস বাবাজী তোমার দাদা, এরা সব কোথায়?'

'তুমি এসো ক্যানে।'

কোনদিকে যে সে নিয়ে যায় ঠাহর করতেও পারি না। লোকের গায়ে ধাক্কা লাগে। পড়ি না মরি, একি ছোটা! সে আসে একটা ভাঙাচোরা পাকা বাড়ির ভিটের মাঝখানে। সেখানে কয়েকটা হ্যারিকেনের আলো। বাঁশ ঘিরে বেড়া করে মাথায় খড়ের চাল দিয়েছে। কে যেন গান করে। ভিড়ও মন্দ হয়নি।

কিন্তু সে পর্যন্ত যাবার আগেই কুসুম থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে একটা গাছতলার কাছে। বলে, 'দ্যাখ ক্যানে।'

লেপামোছা গাছতলায় যে কয়জন বসেছিল তাদের একজনের দিকে চোখ পড়তে অবাক হয়ে যাই। সে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ায়। চমকিত বিস্ময়ে যেন এক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু সে হাসে না। তার ঠোঁট কেঁপে যায়। অস্পষ্ট উচ্চারণ শোনা যায়, 'তুমি!'

আমি অবাক হলেও হেসে জিজ্ঞেস করি, 'কবে এলে?'

ঝিনি কোনরকমে বলে, 'গতকাল।'

এখনো যেন ওর চোখে অবিশ্বাস, বিস্ময়, আর সেই সঙ্গেই একটা রুদ্ধ আবেগের থর থর ভাব। জানতাম না, ঝিনি—শ্রীমতী অলকা চক্রবর্তী এখানে উপস্থিত। বেশবাস এত রুক্ষ কেন কে জানে। আবাঁধা চুলে মুখে যেন ধুলো। শাড়ির অবস্থাও তথৈবচ। সারা শরীরের কোথাও এক কণা অলংকারের চিহ্ন নেই। হাতে একটা বড় ব্যাগ। কিন্তু ওর চোখ ছলছলিয়ে ওঠে দেখে আমি বিব্রত হই। আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে বলে উঠি, 'বস।'

ও থমকে যায়। আমার কানে আসে, 'আপনিও বসুন।'

শ্রীমতী লিলিও এসেছে! ও বসে আছে গাছতলাতেই। চোখাচোখি হতে হাসে। ঘাড় নাড়িয়ে ডাকে।

কুসুম আমার গায়ে একটা খোঁচা দিয়ে বলে, 'বস্য বাবাজী, বউদিকে সম্বাদ দিয়ে আসি।'

কুসুম চলে যায়। ঝিনি বসবার আগেই আমি বসি। তারপরে ও বসে। গায়কের দিকে ফিরে দেখি, স্বয়ং গোপীদাস। গান করে, 'অ রাই, কিছু দিন মনে মনে,/রতন করো শ্যামের পীরিত রাখ গোপনে।'

বুড়া দাড়ি নাড়িয়ে চোখ ঘুরিয়ে হাসে। আমার সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়। সে হাত তোলে আসর থেকে। আমিও তুলি। তারপরে সে ভাঙা ভাঙা গলা চড়িয়ে গায়,

'ইশারায় কইবি কথা,
দেখিস যেন কেউ না শোনে।
কিছুদিন মনে মনে—
ও রাই, রাই লো!'...

ক্রমশ

ঘরে বাইরে

পশ্চিমবঙ্গের মহিলা জে পি

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে দশজন মহিলা J P আছেন। তার মধ্যে আটজনই ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে নিযুক্ত হয়েছেন। কাজেই মহিলা সমাজের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় সন্দেহ নেই। অন্য দুটি মহিলা হলেন শ্রীমতী সুশীলা সিংগ। তাঁর ঠিকানা ১৬২।২৬।১ লেক গার্ডেনস, কলকাতা-৪৫ এবং ডাঃ লক্ষ্মী ঘোষ, পি৭৪, ডাঃ সুন্দরীমোহন অ্যাভেনিউ। ঠিকানাগুলি বিশেষ করে দিচ্ছি তার কারণ, সাধারণত অঞ্চল হিসাব করে জে পি নিযুক্ত হন ও যে

ডাঃ শ্রীমতী লক্ষ্মী ঘোষ

অঞ্চলের জন্য যিনি জে পি হন তাঁর সে অঞ্চলের বাসিন্দা হতে হয়। সম্প্রতি যাঁরা নিযুক্ত হয়েছেন তাঁদের নাম ও ঠিকানা নীচে দিলাম।

১। শ্রীমতী পদ্মাসনা বসু,
১৭বি নলিনী সরকার স্ট্রীট,
২। কুমারী কুলসুম টি জারিফ,
২৬, পোলক স্ট্রীট,
৩। শ্রীমতী মঞ্জু রায়
৭এ, আসগর মিস্ত্রী লেন,
৪। শ্রীমতী মনিকা ঘোষ
৩, রবিনসন স্ট্রীট,
৫। শ্রীমতী মনোরমা গুপ্ত
৭৮৪, পি ব্লক, নিউ আলিপুর,
৬। শ্রীমতী নিভা দাশগুপ্ত
৬৬।১ জৈনুদ্দিন মিস্ত্রী লেন,
৭। শ্রীমতী উদয়কুমারী দুধোরিয়া
৫৪।৩ হাজরা রোড,
৮। শ্রীমতী নিভা রায়,
১১সি, বৈষ্ণবঘাটা রোড।

১৮৯৮ সালের ক্রিমিনাল প্রোসিডিওর কোডের ২২ ধারা অনুযায়ী যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতায় প্রাদেশিক সরকার জে পি নিযুক্ত করতে পারেন। এই আইন ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ অ্যামেন্ডমেণ্ট আইন XXX দ্বারা সংশোধিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সরকারের জুডিসিয়াল বা বিচার সংক্রান্ত দপ্তরের ৩০ জুলাই, ১৯৫৬ সালের বিজ্ঞপ্তি হিসাবে জাস্টিস অফ্ দি পিস নিয়োগের নিয়মাবলী হচ্ছে :

(১) অঞ্চলবিশেষের জন্য জে পি নিযুক্ত হবেন এবং আঞ্চলিক হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তি সাধারণত সেই অঞ্চলের অধিবাসী হবেন।

(২) নিয়োগের পূর্বে তাঁর বয়স ২৫এর নীচে অথবা ৬০-এর বেশী হবে না।

(৩) তাঁর শিক্ষিত হওয়া দরকার।

(৪) নিজের অঞ্চলে তাঁর কিছু প্রতিষ্ঠা থাকা দরকার এবং তাঁর সততা সর্বজনস্বীকৃত হওয়া উচিত।

(৫) দেউলিয়া অথবা যিনি কোন বিশেষ অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয়েছেন এরকম ব্যক্তিকে জে পি নিযুক্ত করা হবে না।

প্রাদেশিক সরকারের তরফ থেকে প্রত্যেক জে পি-কে একটি পঞ্জা, নামমুদ্রা বা সীল দেওয়া হয়। তাতে জাস্টিস্ অফ্ দি পিস এই কথাটি লেখা থাকে এবং তিনি যে অঞ্চলের জাস্টিস্ অফ্ দি পিস সে অঞ্চলের নাম থাকে। কার্যকাল শেষ হয়ে গেলে পঞ্জা ফেরৎ দিতে হয়। সরকারের নিয়োগপত্রও সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ যায়। জে পি সম্পূর্ণ অবৈতনিক নিয়োগ। যদিও এক বছরের জন্য প্রথম নিযুক্ত হন কিন্তু সরকার বিবেচনা করে নিয়োগকাল বাড়িয়ে দিতে পারেন।

যে অঞ্চলের জেপি সে অঞ্চল থেকে সরকারের বিনা অনুমতিতে ছয়মাসের অধিককাল অনুপস্থিত থাকলে, সরকার কোনও কারণে তাঁকে অনুপযুক্ত মনে করলে, দেউলিয়া হ'লে অথবা অপরাধী প্রতিপন্ন হলে সরকার নিয়োগ নাকচ করে দিতে পারেন।

জে পি-র ক্ষমতাও বেশ যথেষ্ট। নিজের অঞ্চলের কোনও ব্যক্তিকে তিনি পরিচয়পত্র দিতে পারেন। Attestation অথবা তস্দিক করার ক্ষমতা তাঁর থাকে। অঞ্চলে শান্তিভঙ্গ হলে খবর পাওয়ামাত্র জে পি-র সেখানে উপস্থিত হবার কথা। প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানবন্দী নিতে পারেন। প্রমাণাদিসহ নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট এবং থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে লিখিত বিবরণ পেশ করা তাঁর কর্তব্য। অবশ্য পুলিশ যেখানে তদন্ত শুরু করেছে সেখানে তাঁর প্রয়োজন নেই। পুলিশ যেখানে তদন্তে তাঁর সাহায্য দরকার মনে করেন সেখানে তিনি সাহায্য করবেন। জে পি dying declaration অথবা মরণোন্মুখ ব্যক্তির জবানবন্দী নিতে পারেন। যতদূর সম্ভব সেই ব্যক্তির ভাষায় জবানবন্দী লিখে নিজের মোহর এবং সই দিতে হবে।

মহিলাদের মধ্যে যাঁরা জে পি হয়েছেন তাঁরা সকলেই বিশিষ্ট কর্মী। সরকারের মনোনয়ন সার্থক হয়েছে। শ্রীমতী সুশীলা

শ্রীমতী পদ্মাসনা বসু

সিংগ এবং শ্রীমতী মনিকা ঘোষের কথা আগেই আমরা অন্য প্রসঙ্গে একাধিক বার উল্লেখ করেছি। সকলের পরিচয় একবারে সম্ভব নয়। এবার তাই ডাঃ লক্ষ্মী

ঘোষ এবং শ্রীমতী পদ্মাসনা বসুর কথাই মাত্র বলতে চাই। ডাঃ লক্ষ্মী ঘোষ মহিলা ডাক্তারদের মধ্যে নিজের নার্সিং হোম ও তার তত্ত্বাবধানে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন। জন্ম তাঁর বিহারে কিন্তু কর্মক্ষেত্র কলকাতায় হয়েছে। বেলতলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি এল এম এফ ও পরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম বি বি এস পাশ করেন। নদীয়া জেলা নিবাসী ডাঃ সুকুমার ঘোষের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ডাক্তারী তাঁর পেশা কিন্তু সমাজ কল্যাণের বহু বিষয় তাঁর নেশা। শ্বশুরবাড়ির গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, Calcutta Police Ambulance-এর সঙ্গে আজ ১৮ বছর যুক্ত আছেন, ১৯৬৫ সাল থেকে এনটালির তিনি অ্যাডিসনাল ডিভিসনাল ওয়ার্ডেন। RWAC-র তিনি সভ্য বহুদিন থেকে। রেড ক্রশ সোসাইটি, উইমেন্স কোঅর্ডিনেটিং কাউন্সিল, বেঙ্গল টিউবারকুলোসিস অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত। যেখানে যখন সমাজহিতে ডাক এসেছে ডাঃ ঘোষ প্রাণপণ শক্তিতে আত্মনিয়োগ করেছেন। নিজের অঞ্চলে দরিদ্র রোগীকে বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করেন। কোথাও দুঃখ দুর্দশা শুনলে ছুটে যেতে দ্বিধা করেন না। ডাঃ ঘোষ জে পি হিসাবেও স্বীয় অঞ্চলের উন্নতির পথে সাহায্য করবেন সন্দেহ নেই।

শ্রীমতী পদ্মাসনা বসু অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্সের কলকাতা শাখার সভাপতি। তাঁর ছাত্রীজীবন ছিল প্রতিভা-দীপ্ত। ১৯২৩ সালে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি-লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে কর্নেল সর্বাধিকারী স্বর্ণপদক প্রদান করেছিলেন। ইণ্টারমিডিয়েট বেথুন কলেজ থেকে পাশ করেন এবং তাতেও বৃত্তি পান। ১৯২৭ সালে একই কলেজ থেকে মেনটাল অ্যাণ্ড মরাল ফিলসফিতে বি এ পাশ করে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গঙ্গামণি দেবী স্বর্ণপদক পান। ১৯৩৩ সালে বাংলা কবিতার জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁকে নলিনীসুন্দরী স্বর্ণপদক দেন। পরবর্তী পাঁচ ছয় বছর শিক্ষাব্রতীর কাজে লিপ্ত ছিলেন ও কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষার আসন অলংকৃত করে-ছিলেন। ১৯৫০ সাল থেকে সক্রিয়ভাবে সমাজকল্যাণ কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স ভিন্ন নারী শিক্ষা সমিতি, রেড ক্রশ, সরোজনলিনী দত্ত অ্যাসোসিয়েশন, লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতাল, বিদ্যাসাগর শিক্ষা সংসদ ইত্যাদি বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শ্রীমতী বসু ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

১৯৩০ সালে শ্রীমতী পদ্মাসনার বিবাহ হয়। দীর্ঘ বিবাহিত জীবন, সংসারের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে তিনি এত কাজ করেছেন। ঘরের বাইরে সমাজ-সেবা করে ঘরকে অবহেলা কখনও করেন নি। আজ তাঁর পরিপূর্ণ পারিবারিক সুখে তিনটি সুপ্রতিষ্ঠিত সন্তান। তাঁর কন্যা ডাক্তার, দুই পুত্র ইঞ্জিনিয়ার ও আইনজীবী। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্থক এই মহিলার যোগ্য স্বীকৃতি দিয়েছেন সরকার।

টুকিটাকি

স্যালাডের সবজী বা অঙ্গ হিসাবে লেটুসের ব্যবহার বাঙ্গালীর ভোজ্য তালিকায় এখনও ব্যাপক নয়। অথচ লেটুস পাতা একটি স্বল্পমূল্য ও সহজপ্রাপ্য জিনিস যা অনায়াসে নিত্যব্যবহার্য হয়ে উঠতে পারে। লেটুস সামান্য জমিতে, বিনা খরচায়, নেহাৎ অল্প পরিশ্রমে হয়। যেখানে জমি নেই সেখানে মাটির টবে, কাঠের বাক্সে, পুরোনো টিনের বড়মুখ কৌটোতে মাটি দিয়ে লেটুস করা কিছুই কষ্টকর নয়।

লেটুস অনেকরকম হয়। তবে সাধারণত আমরা বাঁধাকপির ধরণের দেখতে লেটুস পাই। লেটুসের পুরো গাছটি না তুলে একটি দুটি পাতা তুলে ব্যবহার করলে অনেকদিন পর্যন্ত কাজ চলে। লেটুসের খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন অসাধারণ। ভিটামিন 'এ' আর 'সি'তে লেটুস এর সমকক্ষ জিনিস বেশী নেই। বেশ ভাল, তাজা লেটুস পাতায় শতকরা ১৫ পর্যন্ত 'এ' ও 'সি' ভিটামিন পাওয়া যায়। ভিটামিন বি১ ও বি২ যথেষ্ট আছে। তাছাড়া ভিটামিন 'ই' যা প্রজননের জন্য উপকারী বলে জানা যায় তাও লেটুসে আছে। বায়োটিন অথবা পুষ্টিশাস্ত্রের নবতম খাদ্যপ্রাণ 'জি' এবং 'এইচ' পর্যন্ত নাকি লেটুসে পাওয়ার সন্ধান মিলেছে। ক্যালরি মূল্যে লেটুস পাতার বেশী নেই সত্য, কিন্তু স্নায়ু আর পেশীর জন্য নাকি লেটুস বিশেষ ফলপ্রদ ওষুধের মত। পাতায় তার ক্লোরোফিল পর্যাপ্ত। পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যাল-সিয়াম, লোহা, গন্ধক বেশ যথেষ্ট আছে আর সামান্য ক্লোরিন আইয়োডিন ও সোডিয়াম আছে। লেটুস্ পাতার ডাঁটার রস ভাল ঘুমের ওষুধ।

বাজারের লেটুস্ খাবার আগে খুব ভাল করে ধুয়ে নেওয়া দরকার। অসুখ বিসুখের বেশী ভয় থাকলে সামান্য পারম্যাঙ্গানেট অফ্ পটাশ জলে দিয়ে তাকে পরিষ্কার করে তারপর ভাল জলে বেশ করে ধুয়ে নেবেন। কিন্তু বেশী কচলে নিতে গেলে পাতা সব ভেঙ্গে যাবে। কাজেই তারের ঝুড়ি জাতীয় জিনিসে রেখে অথবা জল থেকে তুলে পাতলা কাপড়ে রেখে জল ঝরিয়ে নিলে ভাল হয়। লবণাক্ত জলে ধুলেও ভাল হয়। তারপর মুখবন্ধ পাত্র অথবা ডেকচিতে রেখে ঠাণ্ডা মেঝেতে রেখে দেবেন। অনেক সময় রেফ্রিজারেটরের চেয়েও এভাবে রাখলে লেটুস তাজা থাকে।

লেটুস না রান্না করে খেলেই সবচেয়ে উপকার পাওয়া যায়। তবে মুখ বদলানো হিসাবে রান্না করা মাঝে মধ্যে চলে। লেটুসের কাঁচ পাতা বেসমে ভাজা খেতে পারেন, অন্যান্য শাকসবজীর সঙ্গে কয়েকটা পাতা সংযোগ করলেও বেশ একটা নূতনত্ব হয় বৈকি।

শ্রীমতী

আলোয় কালোয়

ত্রিশঙ্কু

শ্রীযুক্ত পাঠক, শ্রীমতী পাঠিকা, একটা ব্যাপারে আমি আপনাদের প্রশংসা করি। আপনাদের সহ্যশক্তি অপরিসীম। গত ছ' সাত মাস ধরে চেষ্টা করছি বিরক্ত করতে, আপনাদের মোষের চামড়ায় তার আঁচ লাগছে না! আলোয় কালোয় পড়ে যাচ্ছেন নির্বিকার। মাঝে মাঝে দু-একটা ঢিল এসে পড়ে অবশ্য, তবে সেগুলো আমায় শাট-আপ করার মতো তীব্র নয়। ফলে আমি লিখে

'জগতে আনন্দ যজ্ঞে'

যাচ্ছি যা খুশি গলগল করে, আপনারা আমার টুঁটি চেপে না ধরলে আমি থামবো না।

গত শনিবার কয়েকজন হিন্দী ও পাঞ্জাবী সাহিত্যিকের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেরিয়ে মনে হলো, এখনই রবীন্দ্র সংগীত গাইবার সময়। আমার স্বভাবসিদ্ধ ভাঙা গলায় 'জগতে আনন্দযজ্ঞে' নামক প্রিয় গানটি ধরলুম লক্ষ্মীর বাজারে—ওরা সবাই আপত্তি করার বদলে আমার চারপাশে ভাংড়া নাচতে শুরু করলো। একজন পানওলা ঝুড়িসুদ্ধ পান নিয়ে সকৌতুক হাজির হয়েছিল, তবে ঝুড়ির ওপর এক পা রেখে জুতো পালিশ করতে গেলায় মৃদু গোলমাল হয়েছিল বটে, কিন্তু খুব একটা গন্ডগোল মারামারি বাধে নি। তার কারণ, আমার বন্ধুরা ছিল সবল এবং পানওলাও হয়ত ভেবেছিল, প্রাণহীন রাজধানীতে এই জনাব তো মৌজে আছে—একে ক্ষমা করা উচিত।

সবাই যে সব সময় ক্ষমা করে এমন নয়। এক এক সময় তো একা থাকি। উদ্ভট ঘটনা বা দৃশ্য দেখলে, উদ্ভট বাক্য শুনলে কেউ কেউ মারমুখী হয়ে তেড়ে আসে, আবার কেউ মজা পেয়ে মিটমিটি হাসে। ছোটবেলা থেকে ভদ্রতা, সামাজিকতা ও সাংস্কৃতিক শোভনতা বিষয়ে এত ব্রহ্মজ্ঞান গিলিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সেই মিষ্টি মিষ্টি ওষুধ-খাওয়া-মুখে যখন ভয়ংকর বা দুর্বোধ্য কোনো স্বাদ ঢুকে যায়, তখন থুথু করে ফেলে দিলেও সেই স্বাদের নতুনত্ব ও জংলী শুদ্ধতা জিভে লেগে থাকার কথা। থাকবে, আমার বিশ্বাস। সেই কারণেই সজ্জন ও নিরপরাধ ব্যক্তিদের শান্তি নষ্ট করতে আমার এত ভালো লাগে। কোনো লক্ষ্মীমন্ত গৃহস্বামিনীর মনে চুপিচুপি ব্যভিচারের মন্ত্র পড়ে বা হঠাৎ কোনো নবোদ্ভিন্ন কিশোরীর অপক্ব ঠোঁটে চুমো খেয়ে ওদের নিটোল স্বাস্থ্যে চিড় ধরিয়ে দেওয়ার তো একটা আনন্দ আছে!

ইনেসেন্স আঘাত করা একটা আসুরিক আনন্দ—আপনারা বলবেন হয়তো। নায়ক এবং ভিলেন-এর চেহারা আপনাদের মনের মধ্যে এমন স্পষ্টভাবে গেঁথে দেওয়া হয়েছে যে, ভুলেও ভাবতে পারেন না—যাকে ভিলেন ভাবছেন সেই হয়ত নায়ক হতে পারতো, কিংবা ভাইসি-ভার্সা। একটাই শরীরের মধ্যে দুজনও বিদ্যমান থাকতে পারে সগর্বে। আমাদের জীবনটা যে বোম্বাই ছবির মতো নির্ভেজাল ভালো-মন্দে বিভক্ত নয়, আধুনিক বাংলা গানের মতো পাখি ও ফুলে মাখামাখি নয়—কে বোঝাবে বলুন।

প্রত্যেকে আমরা যে কাঁচের বাক্সে বাস করি, তার সর্বত্র ফেটে ঝুরঝুর করছে। এখন সময় হয়েছে টোকা দিয়ে বাক্সটা ভেঙে ফেলার। তা হলেই আর একটা নতুন বাক্স সাজানো সম্ভব; না ভাঙলে ওই ফাটা কাঁচের মধ্যেই টিমটিম করে জ্বলতে হবে। সেই ভয়াবহ কাজটা—অপ্রিয় কাজটা আপনাদের হয়ে যদি কেউ করে দেয়, তাতে আপত্তি কিসের? তাই তো আমার সেই সব লোকের সঙ্গে মিশতে ভালো লাগে, যারা নির্দ্বিধায় ঠিক-ঠাক করে সাজানো খেলনাগুলো ভাঙতে উদ্যত। সব ঠিকঠাক থাকলে যাদের মন ওঠে না। ইচ্ছে করে, এমন লেখা লিখতে যা আপনাদের চরম বিরক্তি উৎপাদন করবে—প্রতিবাদে শিরশির করে তুলবে স্নায়ু—না, না, এ মানায় না, অন্য কিছু চাই। কী সেই অন্য কিছু, তা আমিও জানি না, আপনিও জানেন না। বন্দি হয়ে বসে থাকলে কেউ

ত্রিশঙ্কুর ছোটখাটো উপদ্রব সহ্য করুন আরো কিছু দিন

কোনোদিন তা জানতে পারবে না। বরং ব্যাপারটা একটু এলোমেলো করে দেওয়া ভালো। বেমানান দু-একটা ভাবনা বা অভিজ্ঞতা আপনাদের সামনে মেলে ধরে দেখি না, আপনারা সাঁত্রা সাঁত্রা চাঁচের মধ্যে প্রাণহারা সন্দেশ হয়ে বসে আছেন, না ছটফট করছেন।

অনেক কিছুই তো মানায় না। জজ সাহেবের মাথায় উকুন থাকলে মানায়? কানা, খোঁড়া জরদগবদের হাতে দেশ শাসন? কিংবা বিশ্বময় খ্যাতির প্রত্যাশী প্রবীণ সাহিত্যিকের পক্ষে গোপনে পুরস্কারের আবেদনপত্র পাঠানো? মানায় না। আমাদের রুচিতে বাধে হয়তো, কিন্তু হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই হচ্ছে। হচ্ছে যখন, তখন তাকে আর গোপন রাখার দরকার কী। সত্য অপ্রিয় হলেই সাহিত্যের বাইরে বসে থাকবে কেন? আমরা দেখি, ভালো করে নেড়েচেড়ে দেখি এই দুনিয়ার দুনিয়াদারি। কোনো ক্ষতি হবে না। জীবনের মানে জায়গায় যদি শিকড় লেগে থাকে, হেঁটেখাটো ভ্রম নষ্ট হলে কী

আসে যায়? নিয়মিত সন্তান প্রসব করাচ্ছে যে-ডাক্তার, সে কি প্রেমে পড়ে না?

আসল কথা, দিনকাল একটু বদলেছে। কৃত্রিমতা দিয়ে কাব্যরচনা, কারসাজি দিয়ে শিল্প সৃষ্টি, বাকচাতুরি দিয়ে আদর্শপ্রচার —এসব পুরোনো প্রথা এবার ভুলে যাওয়াই বোধ হয় ভালো। সর্বস্ব উন্মোচন করে আমাদের অস্তিত্ব বা অস্তিত্বের অভাব উপলব্ধি করার সময় এসেছে। শ্রীযুক্ত পাঠক, শ্রীমতী পাঠিকা, আপনারা প্রস্তুত আছেন তো?

না থাকলে কিন্তু বিরক্ত করবো। সব্জীর বাজারে দাঁড়িয়ে গান গাইবো। পানওলার ঝুড়ির ওপর এক পা রেখে বলবো—জুতো পালিশ করে দাও। মাথার ভেতরে যে-সব পোকামাকড় থইথই হয়ে উঠেছে, তাদের ছেড়ে দেবো আরশোলার মতো আপনাদের রান্নাঘরে।

না, আমার নিজের কোনো ভয় নেই। আমার বন্ধুভাগ্য ভালো চিরকালই। আপনারা মারমুখী হয়ে উঠলে বন্ধুরা এগিয়ে আসবে। আরো বিরক্তিকর কিছু এগিয়ে দেবে আপনাদের সামনে। আরশোলার বদলে টিকটিকি। তার চেয়ে বরং ত্রিশংকুর ছোটখাটো উপদ্রব সহ্য করুন আরো কিছু দিন। বড়ো বড়ো উপদ্রব আসতে তো খুব দেরি নেই।

সোনামুখীর শ্রীধর মন্দির

পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

বাঁকুড়া জেলার উষর উপত্যকা, শৈল-ভূমি ও বিস্তৃত অরণ্যগুলি যেন সৃষ্টি করেছে অতীতের এক কাব্যময় মোহ। এখানকার নিসর্গ-বৈচিত্র্য ও ইতিহাসবিজড়িত স্থানগুলির সৌন্দর্য পরিবেশ অনুযায়ী কখনও রোমাঞ্চময় এবং কখনও বা নয়নাভিরাম। এক কথায়, এই জেলায় বিস্তৃত প্রাচীন মল্লভূমের শৈল অথবা শ্যামল প্রান্তর নিজ সৌন্দর্যে উজ্জ্বল এবং অতীতের ধূসর অবগুণ্ঠনে রহস্যময়ী। বাঁকুড়া জেলার প্রাগৈতিহাসিক দিগন্ত যেমন এক দিকে একান্ত আকর্ষণীয় তেমন এখানকার প্রাচীন দেব-দেউল এবং অন্যান্য পুরাকীর্তিগুলির গুরুত্ব অসামান্য। এক সুদূর অতীতে প্রস্তাশ্মর কালে এখানকার প্রথম সংস্কৃতি নির্ঝরের মত উৎসারিত হয়ে কাল-ক্রমে প্রবাহিত হয়েছে এক সুবিস্তৃত জলধারার মত তার দু' কূল প্লাবিত করে। সভ্যতার এই বিভিন্ন অধ্যায়গুলি বাঁকুড়াকে মহনীয় করে তুলেছে ভারত-ইতিহাসে।

বাঁকুড়ায় অবস্থিত বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজবংশের ইতিহাস স্পষ্টতর হয়েছে মধ্য-যুগে, যখন পূর্ব ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তুর্কো-আফগানদের সামরিক সংগঠন ও প্রশাসন। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, মুঘল-পাঠানদের সংগ্রাম ও রাজ-নৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ নিয়েই বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজারা প্রতিষ্ঠা করেন তাঁদের ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য, যার প্রত্যন্ত-রেখা একদা অতিক্রম করেছিল বিভিন্ন নদী ও শৈল-উপত্যকাকে। একটি স্থানীয় গণ্ডী থেকে নিষ্ক্রমণ করে এক সর্ব-ভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই রাজ্যের গৌরব ও গুরুত্বের আসন নির্দিষ্ট হয় খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর সমাপ্তিকালে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন মল্লরাজ বীর হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্যের ভক্তি-প্রভা ও মহিমায় বৈষ্ণবধর্মের প্রতি হয়ে ওঠেন গভীর অনুরাগী। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিবাদ ও মাহাত্ম্য তাঁকে আকর্ষণ করে এক মহিমময় অনন্ত সাধনার প্রতি। স্বভা-বতই প্রথমে দুর্দান্ত কিন্তু পরে বৈষ্ণব ভক্তিদর্শনে দীক্ষিত বীর হাম্বীরকে তুলনা

পঞ্চবিংশতি রত্নযুক্ত শ্রীধর মন্দির। সোনামুখী

করা যায় কতকটা মগধরাজ অজাতশত্রুর সঙ্গে, যিনি পরবর্তী জীবনে আশ্রয়ভিক্ষা করেন পরম কারুণিক তথাগতের বেদী-মূলে। বীর হাম্বীর ও তাঁর পরবর্তী বংশধরগণ মন্দির-নির্মাণে যে নূতন উদ্দীপনা প্রকাশ করেন তার ফলে ভাগবত, রামায়ণ ও অপরাপর পৌরাণিক বিষয়-বস্তুর প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ অনুভূত হলেও বাঁকুড়ার দেব-সৌধে দেখা যায় বাঙলার নিজস্ব গাথা ও কাব্যের অনুপম প্রতিফলন। আজ থেকে শতাধিক বৎসর পূর্বেও যে বাঙলা দেশে পদাবলি-কাব্য, শিবায়ন ও মঙ্গল-কাব্যের প্রভাব ছিল অপরিমিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাঙলার পোড়ামাটির স্থাপত্যে ও মৃন্ময় ভাস্কর্য-চিত্রে যে অন্তরঙ্গতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা প্রতিফলিত করে শিল্পী ও ভক্তের চিরন্তন প্রেরণা ও সৌন্দর্যবোধ। বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত সোনামুখীর শ্রীধর মন্দিরটি এই শ্রেণীর দেব-সৌধেরই এক আশ্চর্য নিদর্শন। মল্লভূম বর্ধমান-রাজের নিয়ন্ত্রণাধীনে

—শ্রীধর মন্দির পোড়ামাটির ভাস্কর্য

আসবার পর নির্মিত এই দেউলের প্রাচার-গাত্রে শোভিত পোড়ামাটির ফলকগুলিতে অভিব্যক্ত সুসমঞ্জস সৌন্দর্য ও লাবণ্যধারা তাদের নিজস্ব প্রেরণায় একান্ত রমণীয় ও তুলনাহীন।

বাঁকুড়া শহর থেকে প্রায় ২০ কিলো-মিটার উত্তর-পূর্বে দামোদর নদের অদূরে অবস্থিত সোনামুখী গ্রাম। ইংরাজ আমলের আদি যুগে এক দিকে যেমন ভক্ত বৈষ্ণবদের নিকট খ্যাত ছিল সোনামুখী, অপর দিকে তেমন রেশম-শিল্প ও তসর-বস্ত্র বোনার জন্য খ্যাত ছিল এই অঞ্চল। অতীত জেলা-বিবরণী থেকে জানা যায় যে, এখানে প্রস্তুত তসরের শাড়ি, ধুতি ও চাদরের একদা বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল পূর্ববঙ্গেও, যেখানে সেগুলি নিয়মিত বিক্রয় হ'ত।

সোনামুখী গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত শ্রীধর মন্দিরটি পঞ্চবিংশতি রত্নের এবং এর আরাধ্য দেবতা শালগ্রাম শিলা, যার "অব্যক্ত" রূপ ভক্তজনকে গোচরীভূত করে পৌরাণিক দেবলোকের অপরিমেয় রহস্য এবং ধ্যানীর সাধনালব্ধ চৈতন্যের গভীরতাকে। এখানে স্মরণ করা চলে যে ঈশোপনিষদে যা কিছু দৃশ্যমান তাকেই "নশ্বর এবং ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদনীয় বা ব্যাপ্য" বলা হয়েছে ("ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্ যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।" প্রবোধচন্দ্র চৌধুরী : "উপনিষদ-কথা", পৃঃ ৮৬—৮৭)।

শ্রীধর মন্দিরের পঁচিশটি "রত্ন" অথবা চূড়া যেমন এক দিকে সাক্ষ্য দেয় স্থাপত্যশিল্পে বাঙলার নিজস্ব প্রেরণা ও বৈশিষ্ট্যের, অপর দিকে তেমন এগুলি প্রতিবিম্বিত করে দেব-লোকের বিভিন্ন স্তর-জ্ঞাপক অদৃশ্য-শিখরের প্রতীককে। দেব-লোকের এই অপার রহস্যেই হয়ত বা নিহিত আছে মোক্ষাভিলাষির উপলব্ধি ও

কারুকার্যমণ্ডিত পোড়ামাটির স্তম্ভ

উত্তরণের মর্ম ও সংকেত। খৃষ্টীয় ১৮৪৫ সালে নির্মিত শ্রীধর মন্দিরের মৃন্ময় কারুকার্য ও ফলকগুলির সৌন্দর্য একান্ত রমণীয় (শ্রী ও সি গাঙ্গুলী রচিত "ইণ্ডিয়ান টেরাকোটা আর্ট", এবং শ্রীঅমিয়-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "বাঁকুড়ার মন্দির" গ্রন্থদ্বয় দ্রষ্টব্য)। মন্দিরের চারপাশে সাজান পোড়ামাটির আলেখ্যগুলি এবং খিলান ও স্তম্ভগুলির সূক্ষ্ম কারু-কার্য নিঃসংশয়ে সাক্ষ্য দেয় এক বিশিষ্ট উৎকর্ষ ও অনুভূতির। শ্রীধর মন্দিরের পশ্চিম দিকের ফলকসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিব-বিবাহের চিত্রটি। আলেখ্যটির অসাধারণ মর্যাদাবোধ প্রকৃতই অবিস্মরণীয়। বিবাহে আগত দেবতাদের কমনীয় কান্তি যেন অপার্থিব মহনীয়তার প্রতীক। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং দেবর্ষির উপস্থিতি যেন সমগ্র চিত্রটিকে এক পৌরাণিক গাথায় রূপান্তরিত করেছে, যেখানে ভক্তের মানস-লোকে দেব-লোকের দূরত্ব অন্তর্হিত। শিব-বিবাহ অথবা 'কল্যাণসুন্দরম'-এর এমন স্বচ্ছন্দ ও মনোরম রূপায়ণ প্রকৃতই ভারতের সমসাময়িক শিল্পে দুর্লভ। আখ্যান-বর্ণনার সুষমা ও বলিষ্ঠতায় শ্রীধর মন্দিরের এই ফলক-সমষ্টি স্মরণ করিয়ে দেয় প্রাচীন ভারতের বাকাটক অথবা গুর্জর-প্রতিহার ভাস্কর্য-শিল্পে রূপায়িত কল্যাণসুন্দরমের পাষাণ-আলেখ্য। এ ছাড়া, এই বিবাহ-দৃশ্যে স্পষ্টই দেখা যায় শিব-ঠাকুর সম্বন্ধীয় প্রাচীন বাঙলা গানের প্রভাব। বাঙলা দেশে বিগত কয়েক শতাব্দীতে রচিত "শিবের গানে" (ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনঃ "বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়" ১ম খণ্ড) বরবেশী শিবকে কেন্দ্র করে যে প্রতীকধর্মী কৌতুক ও মাহাত্ম্য সৃষ্টি হয়েছে তারই প্রতিফলন দেখা যায় এই পোড়ামাটির ফলকে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে দ্বিজ কালিদাস রচিত শিবের গানে বরবেশী মহাদেব প্রসঙ্গে বিভিন্ন কৌতুকের অবতারণা করা হয়েছে। যথা,

"কহে রামাগণ এই কি বর।
এটা যে ভাঙ্গার ভুতুড়ে হর॥
আহা মরি উমা রূপের চূড়া।
সে কপালে হ'ল ত্রিকাল বুড়া॥"

অথবা,

"দেখি এ বরের ঠাম যত রামাগণ।
অবাক হইল সবে না সরে বচন॥
বরের ভঙ্গিমা দেখি রাণী দুঃখমনা।
রাগ।বরে নারদেরে কর এ ভর্ৎসনা॥

বর্ণিত আছে, প্রথম দর্শনে শিবের প্রতি গিরিরাজপত্নী মেনকার বিরাগভাব উপস্থিত হয়েছিল। এর প্রধান কারণঃ

"উমার কুন্তল মেঘের মালা।
এ বুড়ার জটা তামার শলা॥
সিন্দুরের বিন্দু উমার ভালে।
বুড়ার কপালে অনল জ্বলে॥

বিষ্ণু অনন্তশায়ী। মৃন্ময় ফলক

চন্দনে চর্চিত উমার কায়।
আই আই ছাই বুড়ার গায়॥
উমার বসনে বিচিত্র কাজ।
দিগম্বর বর একি গো লাজ॥"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রাচীন বরিশালের একটি গানে বিবাহ-আসরে নৃত্যের ফলে শিবের পরিধেয় মৃগ-চর্ম খুলে যাওয়া এবং তার ফলে মেনকার বিশেষ লজ্জিত হবার বর্ণনা আছে।

বিবাহ-আসরে অবশ্য শিব বেশীক্ষণ কৌতুক সৃষ্টি করেন নি। কারণ, উপস্থিত সকলকে নিশ্চিন্ত করবার জন্য শীঘ্রই তাঁকে রাজরাজেশ্বর মূর্তি ধারণ করতে হয়:

"এইরূপ রঙ্গভঙ্গ দেখি গঙ্গাধর।
উমার ইঙ্গিতে হৈলো রাজরাজেশ্বর॥
রজত শিখর জিনি রূপের বরণ।
ভবানীর ভাবে ভব হইলা মোহন॥
মণিময় অলঙ্কার শোভিত শিরেতে।
মনোহর মুকুট শোভয়ে মস্তকেতে॥
অগুরু চন্দন চুয়া অঙ্গময় মাখা।
জিনি পদ্ম মুখপদ্ম তাহে গোপরেখা॥
ছাদনাতলাতে ছিল যত রামাগণ।
অপরূপ রূপ দেখি মোহ সর্বজন॥
মেনকা দেখিল আর পূর্বরূপ নাই।
মনোহর বর এবে হইলা জামাই॥"

শ্রীধর মন্দিরের মৃন্ময় আলেখ্যটিতে রূপায়িত মুকুট-পরিহিত শিবকে দেখা যায় 'রাজরাজেশ্বর' মূর্তি পরিগ্রহ করতে। সুন্দরী গিরি-পত্নী মেনকার বিস্ময় ও লজ্জার ভাবটি এখানে স্নেহ-সুধার লাবণ্যে অনুপ্রাণিত। অপর পক্ষে, বিবাহের পিঁড়িতে তোলা উমার আত্মনিবেদিত মুখভাবে প্রকাশিত হয়েছে জগজ্জননীর অপার প্রেম-ভাবনার নিগূঢ় তত্ত্ব। রাজরাজেশ্বর শিবের মহনীয় আত্মপ্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষীণ-কটি মেনকা-কন্যা যেন সদ্য-প্রস্ফুটিত পদ্মের মত কাব্যময়ী ও পেলব-দেহা। শ্রীধর দেবসৌধের এই চিত্রটি প্রকৃতই অতুলনীয়।

পশ্চিম দিকে নির্দিষ্ট মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে স্থাপিত স্তম্ভ ও খিলান-গুলির উপরে সজ্জিত অপরাপর ফলক-গুলির সৌন্দর্যও একান্ত আকর্ষণীয়। নিম্নের একটি সারিতে রূপায়িত একজন দেব-কন্যা বাঙলার পোড়ামাটি শিল্পের এক অনন্য কীর্তি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। সমগ্র ভারতেও এই ভাস্কর্যটি প্রায় তুলনাহীন। এই তরুণী সুর-সুন্দরী অথবা দেব-বালার সুঠাম ভঙ্গী যেন তার চিকন বসনের ভাঁজগুলির দ্বারা ছন্দায়িত। রূপসীর শাড়ি যেমন স্মরণ করিয়ে দেবে স্থানীয় তসর-শিল্পকে, তেমন তার বিন্যাস-ভঙ্গিতে প্রতিভাত হয় ক্ষণিক আত্ম-প্রস্তুতির সলজ্জ অভিব্যক্তি। সুনয়নী রূপসীর আত্ম-সচেতনতায় প্রকাশিত হয়েছে শিল্পীর গভীর উপলব্ধি ও দক্ষতা, যার সমকক্ষ মেলে একমাত্র পার্বত্য পাঞ্জাবে অবস্থিত কাংড়ার রঞ্জিত চিত্রে। অপর পক্ষে, দেবীর মৃদু হাসিতে কিছুটা প্রতিবিম্বিত হয়েছে ইটালীয় চিত্রকর লিয়োনার্দো অঙ্কিত 'মোনালিসা' কিংবা 'লা জিয়োকোণ্ডা'র অপরিমেয় রহস্য।

সোনামুখীর এই পঞ্চবিংশতি রত্ন-মন্দিরটির ফলক-সমারোহ তুলে ধরেছে পুরাণ, ভাগবত, লোক-গাথা, চৈতন্য-লীলা এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক জীবনের নানা প্রতিচ্ছবি। ক্ষুদ্রায়তন পোড়ামাটির কাজে যেমন দেখা যায় মণিকারের সূক্ষ্ম শিল্পবোধ, বৃহত্তর রূপায়ণে তেমন অনুভূত হয় শিল্পীর গভীর প্রত্যয় ও সৌন্দর্যপ্রীতি। মৃন্ময় শিল্প-কর্মে দক্ষতা বাঙালী শিল্পীর প্রাচীনতম উত্তরাধিকার, যার বিস্মৃত দিগন্তের সন্ধান পাওয়া যায় পাণ্ডুরাজার ঢিবির তাম্রাশ্মীয় স্তরে এবং মহাস্থানগড়, বাণগড়, পোখরণা, তাম্রলিপ্ত ও চন্দ্রকেতু-গড়ের মৌর্য অথবা শুঙ্গ-কুষাণ কৌলাল কিংবা মৃন্ময় পুত্তলিকায়।

শ্রীধর মন্দিরের অন্যান্য ফলকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য শেষনাগের উপর শায়িত বিষ্ণুর চিত্রটি। অনন্ত নাগের উপর সুপ্ত বিষ্ণুর

শিববিবাহ। মৃন্ময় আলেখ্য

বেহালা-বাদিকা ও নর্তকী(?)। পোড়ামাটির ভাস্কর্য

নাভি-কমলে ব্রহ্মা উপবিষ্ট এবং লক্ষ্মী পদ-সেবায় ব্যাপৃতা, পাশে স্মিত হাস্যাননা দেবী, যাঁর তনুরেখায় মূর্ত হয়েছে সুরলোক-বাসিনীর সুঠাম রূপ ও লাবণ্য। এই আলেখ্যটিতে বাঙলার নিজস্ব বৈচিত্র্যে প্রতিফলিত হয়েছে উত্তর ভারতে অবস্থিত দেওগড়ে (ঝাঁসী) গুপ্তযুগে নির্মিত সুবিখ্যাত দশাবতার মন্দিরের প্রাচীরে রূপায়িত অনন্তশায়ী বিষ্ণুর অপার রহস্য ও মর্যাদা।

মন্দিরের পূর্বদিকে শোভিত পোড়ামাটির আলেখ্য রূপায়ণে ভিন্ন হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে অপরাপর দৃশ্যের মধ্যে তিনটি বিষয়বস্তুকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যথা, রাম-রাবণের যুদ্ধ, কমলে-কামিনী এবং কৃষ্ণ কর্তৃক গিরিগোবর্ধন ধারণ। রামায়ণের যুদ্ধ বর্ণনায় শিল্পীর বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। যার ফলে সমগ্র ফলকটিতে প্রকাশিত হয়েছে এক আশ্চর্য গতিশীলতা। রণস্থলে কোদণ্ডধারী শ্রীরামচন্দ্র ও দশাননের এই যুদ্ধচিত্রটি নিঃসংশয়ে এক "ক্লাসিক" পর্যায়ে পড়ে। এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণকারী বানর সৈন্যদের নির্ভীকতা একান্ত আকর্ষণীয়। রামায়ণের বিষয়বস্তু রূপায়ণে উল্লেখ্য লঙ্কেশ্বরের রাজ-পরিচ্ছদ যা সুস্পষ্টভাবে মুঘল আভিজাত্যের পরিচায়ক। এখানে অবশ্য স্মরণ করা যেতে পারে যে, সমসাময়িক কালের বাঙলার চিত্র-কর্মেও রাজপুত-মুঘল রীতির প্রেরণা অনুভূত হয়। উল্লিখিত যুদ্ধচিত্রটির উপর দেখা যায় দেবলোকের এক আংশিক রূপায়ণ। এখানে শিল্পী ও ভক্তের প্রয়াসে সৃজিত হয়েছে রামায়ণ কাহিনীর প্রতি এক গভীর অন্তরঙ্গতা ও প্রত্যয় যা প্রাণবন্ত রেখায় ও সমাবেশে সৌন্দর্যস্নাত। এই ফলকগুলির উপরিভাগে দেখা যায় এক দেবী মূর্তিকে, যার উপবেশনভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে নারীসুলভ কমনীয়তা ও মনোরম ঋজুতা। তনুদেহের তরঙ্গায়িত রেখা যেন দেবীর আত্মনিমগ্নতাকে মোহনীয় করে তুলেছে। স্বভাবতই, অনন্তযৌবনার রূপ দেব-লোকের অপার রহস্যে একাঙ্গভূত। লাস্যভাব অচিন্ত্য সাধনায় বিলীন।

শ্রীধর মন্দিরের পূর্ব দিকের প্রাচীরে প্রদর্শিত অন্যান্য আলেখ্যাবলির মধ্যে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য, ধনপতি কিংবা শ্রীমন্ত সদাগর কর্তৃক "কমলে-কামিনী" দর্শন এবং কৃষ্ণ কর্তৃক গিরিগোবর্ধন ধারণ দৃশ্য দুইটির রূপায়ণ। কমলে-কামিনীর চিত্র রচনায় শিল্পীর নিরতিশয় দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ফলকের ঊর্ধ্বতম সারিতে দেখা যায় কমলে-কামিনীকে। একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর ললিতাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় তিনি একটি হস্তী-শিশুকে সস্নেহে আদর করছেন। পাশেই কয়েকজন সম্ভ্রান্ত নৌযাত্রী। চণ্ডীমঙ্গলের এই প্রাচীন কাহিনীটি থেকে জানা যায় যে, উজানি নগরের বণিক ধনপতি সিংহলের পথে মধুকর ডিঙায় কালিদহ অতিক্রম করবার সময় প্রথম কমলে-কামিনীকে দর্শন করে অতিমাত্রায় আশ্চর্যান্বিত হন (ডঃ তমোনাশ-চন্দ্র দাশগুপ্ত : "প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস", দ্রষ্টব্য)। * প্রকৃতপক্ষে, এখানে প্রকাশিত হয়েছে চণ্ডীমাতার অপত্যস্নেহ। তিনি সমুদ্রের মধ্যে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর আসীনা হয়ে শিশু গণেশের প্রতি স্নেহ প্রদর্শনে ব্যাপৃতা ছিলেন, যা ধনপতির পক্ষে প্রথমেই উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি। তিনি ও পরবর্তী কালে তাঁর আদরিণী স্ত্রী খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত অবলোকন করেন একই দেবীলীলা :

কালিদহে সুজে মাতা কমলের বন।
তদুপরি মাহেশ্বরী কুমারীবরণ॥
অবহেলে গজ গিলে হেলিয়া অবলা।
ক্ষেণে ক্ষেণে ক্ষেণে খেলে অতিশয় চপলা॥
(মুক্তারাম সেনের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য)

ধনপতির এই বৃত্তান্ত অবশ্য সিংহলরাজ শালিবাহন বিশ্বাস করতে পারেন নি। কারণ, ধনপতির সঙ্গে যখন তিনি এই অভূতপূর্ব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবার জন্য কালিদহে যান তখন আর তা দেখা যায় নি। ফলে ধনপতি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন শালিবাহনের আদেশে। ধনপতি ও খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত পিতার অন্বেষণে সিংহল যাবার পথে পুনর্বার দর্শন করেন কমলে-কামিনী। কিন্তু, পিতার ন্যায় তিনিও রাজা শালিবাহনকে

* এই প্রসঙ্গে অপরাপর গ্রন্থগুলিও উল্লেখনীয়।

প্রথমে এই দৃশ্য দেখাতে সক্ষম হননি বলে সিংহলরাজের দ্বারা নির্যাতিত হন এবং অবশেষে চণ্ডীর কৃপায় পিতা-পুত্র উদ্ধার-প্রাপ্ত হন ও রাজ-সৈন্য ডাকিনী-যোগিনী কর্তৃক পরাভূত হয়। শ্রীমন্তের ভক্তিবলে এইবার সিংহলরাজ "কমলে-কামিনী" দর্শন করতে সক্ষম হন এবং এই তরুণ সদাগরের সঙ্গে নিজ কন্যা সুশীলার বিবাহ দেন। শ্রীধর মন্দিরের উল্লিখিত ফলকগুলির দ্বিতীয় সারিতে দেখা যায় মালাহস্তে রাজ-কন্যা সুশীলা এবং পাশে শ্রীমন্ত সদাগর। শ্রীমন্তের পাশে আবেগময় ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান রাজমূর্তিটি স্বভাবতই রাজা শালিবাহন। এই সারির নীচে কারুকার্য-মণ্ডিত খিলানের দু' পাশে রূপায়িত হয়েছে যুগল সিংহ এবং খড়্গধারিণী দুই নারীমূর্তি, সম্ভবত যুদ্ধরতা ডাকিনী ও যোগিনী।

সোনামুখীর পঞ্চবিংশতি মন্দিরের গায়ে শোভিত আছে আরও বিভিন্ন ফলক, যে-গুলির সৌন্দর্য ও সুসমঞ্জসতা সৃষ্টি করেছে এক দৃশ্যমান কাব্য। এ ছাড়া, মন্দিরের কারুকর্মে প্রতিফলিত হয়েছে স্বর্ণকারের নিপুণতা। সূক্ষ্ম রেখার সুচারু বিন্যাসে স্তম্ভগুলিকে যেন রত্নখচিত হিরণ্যকর্মের সমকক্ষ বলে অনুভূত হয়।

কমলেকামিনীর উপাখ্যান

মন্দিরের ধারে ধারে উপর থেকে নীচে সাজান ফলকগুলি এক বিশিষ্ট শিল্পবোধের পরিচয় দেয়। এ ছাড়া, রাজপুত-মুঘল যুদ্ধ সাজে সজ্জিত ঢাল-তরোয়াল হাতে সম্ভ্রান্ত সৈনিকদের সারিগুলি যেন প্রতিবিম্বিত করে সে যুগের সেনানীদের সুশৃঙ্খল কুচ-কাওয়াজ অথবা রণভঙ্গি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মন্দিরটি নির্মিত হবার কালে মল্লরাজদের পরাক্রমের কাহিনীগুলি হয়ত জনচিত্তে অতীত বিভবের সৌন্দর্য ও

বর্ণাঢ্যতায় বিলীন হয়েছিল। অবশ্য, শ্রীধর দেউলের শ্রেণীবদ্ধ সৈনিকরা এখানে মূলত পৌরাণিক জগতের প্রহরী, যুযুধান দেব-সেনাদের চিরন্তন প্রতিমূর্তি। কারুমণ্ডিত স্তম্ভগুলিতে যেন রূপায়িত হয়েছে পার্থিব জগত ও দেব-লোকের স্তরবিন্যাস, যার শীর্ষে প্রসারিত খিলান ও চূড়ায় রচিত হয়েছে পৌরাণিক বৈচিত্র্য ও লোকধর্মের সমন্বয় যার পরিশিষ্ট পরমেশ্বরের অচিন্ত্য সৌন্দর্য ও রহস্য।

শ্রীধর মন্দিরের দক্ষিণ দিকে রূপায়িত মৃন্ময় আলেখ্যগুলি পূর্ব ও পশ্চিম দিকের কারুকর্ম থেকে কিছুটা স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দেয়। পশ্চিম দিকের আলেখ্যাবলির প্রতিকৃতি-মূলক ভাবগত সৌন্দর্য এবং পূর্ব প্রাচীরের নমনীয় বিশ্লেষণের পরিবর্তে এখানে মূর্ত হয়েছে সুকোমল স্_ ন, অনুভূতি এবং এমন এক সুনির্দিষ্ট রীতি যার দ্বারা রচিত হয়েছে কৃষ্ণ-লীলা, রামাবতার এবং চণ্ডী-মাহাত্ম্যের বর্ণাঢ্যতা ও ভক্তের আনন্দলোক। উপরের সারিতে রূপায়িত বংশীবাদনরত কৃষ্ণ ও রাধার চিত্রটি যেমন বারবার মূর্ত হয়েছে একই ফলকে তেমন বৃন্দাবনলীলার অপর দুই দৃশ্যে কৃষ্ণ ও চতুর্ভুজ বিষ্ণু যেন একাঙ্গীভূত। নিম্নসারিতে প্রদর্শিত শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক, দুর্গা-মহিষাসুর-মর্দিনী এবং কৃষ্ণ-কালীর আলেখ্যত্রয় প্রকৃতই অবিস্মরণীয়। এইগুলির মধ্যে রাধা ও বেণুগোপালের রূপায়ণে প্রতিফলিত হয়েছে কমনীয় দেহ-সৌষ্ঠব ও মনোরম সুসমঞ্জসতা। তিনবার প্রদর্শিত কৃষ্ণের সুঠাম ত্রিভঙ্গরূপে এবং শ্রীরাধার নিশ্চিন্ত ভাবনা ও অপার সৌন্দর্য যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে পোড়ামাটির এই চিত্রার্ধ (Relief) ভাস্কর্যে।

শ্রীধর মন্দিরের উত্তর দিকের ফলক-সজ্জায়ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে রূপায়িত ফলকগুলিতে কৃষ্ণ-লীলা, শ্রীচৈতন্যলীলা, পৌরাণিক দেব-দেবী ও নৃত্যরতা অপ্সরাদের চিত্রগুলি কাল-প্রবাহে জীর্ণ হলেও তাদের সৌন্দর্য এখনও অম্লান। অক্রুরচালিত রথে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মথুরা যাত্রার কালে শোকাভূতা শ্রীরাধা ও গোপীবৃন্দের মূর্তিতে যে গভীর অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় সেখানে মুখরিত পদাবলী-কাব্যের অশ্রুত সুর-লহরী অনুভূত হবে বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত হেতমপুরের দেওয়ানজী মন্দিরের নয়নাভি-রাম ফলক-রচনায়। গোপিনীদের মর্মবেদনা ও শ্রীরাধার ক্রন্দন এখানে চিরন্তন বিরহ-দুঃখে উচ্চারিত, যার ফলে প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের উদ্বেলিত অঙ্গরূপ, কমনীয় তরুণী-হৃদয়।

সোনামুখীর শ্রীধর মন্দিরটি এক কথায় যে কেবলমাত্র বাঙলার অতীত স্থাপত্যের একটি উল্লেখনীয় নিদর্শন তা নয়, এই দেউলের মৃন্ময় ফলকগুলি সমকালীন ভারতীয় ভাস্কর্যের ঐশ্বর্যস্বরূপ। এক দিগন্তপ্রসারী প্রান্তরের প্রত্যন্ত-সীমায় এক উপনগরীর শান্ত পরিবেশে এই দেউলের সুদৃশ্য চূড়াগুলি ও আলেখ্যাবলিতে মূর্ত হয়েছে ভক্তের ধ্যান ও তপস্যা। এ যেন প্রবহমান কাল-স্রোতের ওপারে ব্যাপ্ত এক অনন্ত মুহূর্তের প্রতিফলন। মল্লভূমের পার্থিব বৈভব, পরাক্রম ও মোহের ইতিবৃত্ত এখানকার প্রসারিত প্রান্তর, উপত্যকা ও অরণ্যের বিষণ্ণ মায়ায় লীন হলেও শিল্পীর মধুর আকুতি ও অভীপ্সা দেবলোকের অন্তরঙ্গ ভাবনায় স্বাক্ষরিত ও প্রোজ্জ্বল।*

* আলোকচিত্রসমূহ পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের কর্মী শ্রীরঞ্জিতকুমার সেন কর্তৃক গৃহীত।

ট্রামে বাসে

একটি সংবাদে শুনিলাম বামপন্থীরা নাকি আবার 'বাংলা বন্ধ'-এর তোড়জোড় করিতেছেন। বিশুখুড়ো নাটকীয় ভঙ্গীতে বলিলেন—"বাংলা জানিল না কিবা অপরাধ তার, বিচার হইয়া গেল।"

যুক্তফ্রন্টে ৩৫টি আসন লইয়া বিরোধের কথা শুনিলাম। অনেকের প্রশ্ন: কিন্তু ৩৫টি কেন? শ্যামলালের জবাব: "৩৫ দফা কর্মসূচী, আসন ৩৫টি, কিউ. ই. ডি।" সকলের সমবেত মন্তব্য—"পরিষ্কার, অতি পরিষ্কার।"

এক অভিযোগে প্রকাশ, কলিকাতা পৌরসভার বাতি বিভাগে যত অয়্যারম্যান আছেন তাঁহাদের কাহারই নাকি কোন লাইসেন্স নাই। সহযাত্রী বলিলেন—"তা হলেও বিনা লাইসেন্সে অয়্যারম্যান-এর কাজ করার লাইসেন্স তাঁদের নিশ্চয়ই আছে এবং তা পেতে কাঠখড়ও হয়ত কম পোড়াতে হয়নি।!"

সংবাদে শুনিলাম, ব্যারাকপুরের কৃষি গবেষণা পরিষদ এক নূতন ধরনের পাট উৎপাদন করিয়াছেন। ইহার ফলন নাকি হইবে প্রচুর। —"খুব ভালো কথা। ফলন দেখার আগেই এই পাটের নামকরণ করলাম—'পাটরানী', গবেষণা পরিষদ নামটা গ্রহণ করতে পারেন, অবশ্য ট্রামেবাসের সহযাত্রীর সৌজন্যে কথাটা উল্লেখ সাপেক্ষ।

বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসগুলিতে কর্মীর বহর, বিদেশী মুদ্রার অপচয় এবং কর্মের 'লবডঙ্কা' সম্পর্কে অনেকেই সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"এটাকেও উপদেশের অপচয় বলেই বলব। অতি সাধারণ কথাটা মনে রাখলেই আর কোন গোল থাকবে না, কথাটা হল: কেউ মদ বেচে দুধ খায় আর কেউ দুধ বেচে মদ খায়।"

সিনেমা ধর্মঘট মিটাইবার জন্য কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের সংবাদ পাঠ করিলাম। সহযাত্রী সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন—"এই বারে তা হলে আঠারো ঘা!!"

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন তাঁর বিদেশ সফরে এক সাম্প্রতিক ভাষণে মন্তব্য করিয়াছেন—শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন চাই। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"পরীক্ষা কেন্দ্রে নিত্য নূতন হাঙ্গামা, পরীক্ষা ভণ্ডুল, শিক্ষায়তন লণ্ডভণ্ড, পরীক্ষক/শিক্ষক ঘেরাও ইত্যাদি বিপ্লবের কথা আমরা ইতিমধ্যেই জেনে গেছি; ডঃ জাকির হোসেন ভাষিত বিপ্লবের ধারার কথা জানতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত, আমরা ঘরপোড়া গরু কিনা, সিঁদুরে মেঘ দেখলেই পিলে চমকে ওঠে!!"

সিনেমা সংক্রান্ত অন্য এক সংবাদে শুনিলাম কতিপয় সিনেমা শিল্পীদের সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। —"এখন বাকী আছে শুধু হলঘরগুলি সম্পর্কে চিচিংফাঁক-এর আজ্ঞা"—বলেন জনেক সহযাত্রী।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর এবার নিউ মার্কেটকে ঢালিয়া সাজাইবার জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন। শ্যামলাল বলিল—"সেই ভালো। স্টেডিয়াম, স্টেট বাস, চক্ররেল প্রভৃতিতে অনেক ঝামেলা। নিউ মার্কেটের সামান্য একটু সুব্যবস্থাতে আমরা পেটভরে চানাচুর খেতে পারব এই আমাদের কাছে অষ্টরম্ভার চেয়ে কাম্য।"

আট হাজার ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে চার কোটি টাকা চাহিয়া এক জরুরী চিঠি দিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"বলতেই হবে খুব ভালো কথা। কিন্তু কেন্দ্রের কাছে কি কি চেয়ে কি কি পেয়েছেন তার যে-পরিসংখ্যান জানা গেল না তা-ও বলতে হবে এবং 'তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলাম শুধু লজ্জা' কবিতাটি যে রাজ্য সরকার পড়েন নি তা-ও বলতে হবে বইকি।"

ভি, আই পি রোডে সম্প্রতি একটি কেউটে সাপ দেখা গিয়েছিল। তাকে স্থানীয় কয়েকজন মিলিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে।—"আমরা বলি, ভি আই পি রোড-এর মতো রোডে কেউটের মত ভি আই পি-র জন্য প্রটোকলের দিক থেকে কোন সংবর্ধনার তোড়জোড় না দেখে আমাদের মতো ভি আই পিরা অর্থাৎ ভেরি ইনসিগনিফিকেন্ট পার্সনরা স্বভাবতই শঙ্কিত হয়ে পড়ছি"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

বাড়িওলা হিসাবে সরকারের নানা অব্যবস্থার কথা শুনিয়া আমাদের অন্য এক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"বাড়িওলা সরকারকে একটু ক্ষমাঘেন্না করে নিতে হবে বই কি, অনভ্যেসের ফোঁটা ত, কপাল একটু চড়চড় করবেই।"

একটি বৈদেশিক সংবাদে শুনিলাম জনৈক ব্যক্তি ৪০ মিনিটে ১০ লিটার বিয়ার খাইয়া নাকি নূতন রেকর্ড করিয়াছেন। —"প্রতিযোগিতায় মূল্য ফেরত দিতে না হলে কিংবা কোন রকম খেসারত দিতে না হলে আমরাও প্রতিযোগিতা করতে রাজি আছি. বিশ্বাস না হয় বিয়ার অফার করে দেখুন, সঙ্গে সঙ্গে চীয়ার্স বলে — — — কিন্তু তা কি আর হবার পা. আমরা যে রাতারাতি বিয়ার ত্যাগ করে রেকর্ড সৃষ্টির জন্য তৈরি হয়ে আছি"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ তাঁর লোকদল-এর অনেক সদস্য লইয়া আবার কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"আমে দুধে মিশে গেল বলা যায় কি, না বলতে হবে—যৌবন আমার, ফিরে ফিরে তব সাথে দেখা মোর হবে বারবার।"

কলকাতায় মনসুন আসিয়া গিয়াছে। —"আসেনি এবং কোনদিন আসবে না যা তা হল সোনামুগের ডাল, বাসমতি চাল, গঙ্গার ইলিশ। আর তা যদি না এল তবে এমন দিনে তারে বলবই বা কী আর শুনবই বা কোন ছাই"—বাহিরে অঝোর বৃষ্টিপাতের দিকে তাকিয়ে বলেন সহযাত্রী, আমরাও অবশ্য মনে মনে বলি।

মৌত সে বাঁচো

সরোজেন্দ্রনাথ রায়

যাঁরা দিল্লী গিয়েছেন তাঁরা পুরোন দিল্লীর দেয়ালে নানারকমের আঁকা-বাঁকা উর্দুতে লেখা প্রাচীরপত্র নিশ্চয়ই দেখেছেন। বেশীর ভাগই হকীমি ওষুধের বিজ্ঞাপন। একটা বিজ্ঞাপনের মাথায় দেখতাম মোটা মোটা হরফে লেখা "মৌত সে বচো" অর্থাৎ মৃত্যু হতে বাঁচো। প্রভিডেন্ট ফান্ডের চাকরী, ইনফ্লেশনের বাজার। বেশীদিন বাঁচলে খাব কি? এই ভয়ে ওসব হালুয়া সরবৎ কোনদিন খাইনি —এমন কি হকীমি রূহ্ আফজাও নয়। কিন্তু বিধির লিপি খন্ডাবে কে? মৃত্যুঞ্জয়ী হবার উপায় অন্যভাবে আবিষ্কার করলাম। সেই কথাটাই খুলে বলছি।

স্টেশন এলাহাবাদ। , দিল্লী-হাওড়া একসপ্রেসের একটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে বসে আছি। এলাহাবাদে গাড়িটা প্রায় আধঘন্টা দাঁড়ায়। একজন ভদ্রলোক এসে উল্টো সীটে বসলেন। ব্যাগের উপর লেখা আছে ডাঃ বি মিত্র। বুঝলাম যে ভদ্রলোক বাঙ্গালী। খুব খুশী হলাম। গাড়ি ছাড়তে আর মিনিট দশেক বাকী। ভদ্রলোক ধড়ফড় করে উঠে আমায় উর্দুতে বললেন : দয়া করে আমার ব্যাগটার উপর একটু নজর রাখবেন? আমি এক্ষুণি আসচি। ভদ্রলোকের লখনৌবী-উর্দুর বিশুদ্ধ বাচনভঙ্গী শুনে মুগ্ধ হলাম। আমি বললাম : 'জরুর, আপনি হয়ে আসুন।'

ট্রেন ছাড়ার প্রথম ঘণ্টা পড়ে গেল। ভদ্রলোকের কোন পাত্তা নেই। দ্বিতীয় ঘণ্টাও হয়ে গেল। আমি একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। দরজায় মুখ বাড়িয়ে প্ল্যাট-ফর্মের চারপাশ দেখতে লাগলাম। ভদ্রলোকের কোন চিহ্ন নাই। ভারি চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলাম। এখন কি করা যায় ভাবছি। তৃতীয় ঘণ্টাও ঘটাং ঘটাং করে বেজে উঠল। গাড়ির হুইসিলও পড়ল। গাড়ি ছাড়ে আর কি! যাত্রীরা সব যে যার জায়গায় বসে গেছে। স্টেশনের কোলাহল থেমে গেছে। এমন সময় ভদ্রলোককে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে দেখা গেল। মাথায় চুল আলুথালু উঠছে আর নামছে। টাই-এর ডগাটা মাথার পেছনে ফং ফং করে উড়ছে। ট্রেনে মোশন দিয়েছে...এমন সময় ভদ্রলোক কোন রকমে গাড়ির দরজায় পা দিলেন। আমি হাতটা ধরে ভেতরের দিকে টান মারলাম। 'থ্যাঙ্কস্' বলে ভেতরে এসে বসে পড়লেন। সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত, হাঁফাচ্ছেন। তখন আর আমি কিছু বললাম না। একটু জিরোবার পর ভদ্রলোক যখন আবার কথা বলতে আরম্ভ করলেন তখন আমি বললাম : 'লেবল্ দেখে মনে হচ্ছে আপনি বাঙ্গালী। আমিও বাঙ্গালী।' ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন : 'তাই নাকি? বেশ ভালই হল।'

একটা স্টেশন পার হয়ে গেল। তিনি খানিকটা ধাতস্থ হয়ে এলেন। নিজেই কথাটা পাড়লেন। 'জানেন, আমি খুব মুশকিলে পড়েছিলাম। সকালে কতকগুলো জাম কিনেছিলাম। কিন্তু তাড়াতাড়িতে ওগুলো কি করে খেতে হবে সে কথাটা স্ত্রীকে বলে আসতে ভুলে গিয়েছিলাম। তাই স্টেশন থেকে বাড়িতে ফোন করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোন কনেকশন না পেয়ে শহরে আমার চেম্বারে যেতে হল। বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, জামগুলো খাবার আগে যেন পারমাঙ্গানেট অব পটাশে ডুবিয়ে ভাল করে ডিসইনফেকট করে নেয়। অবশ্য আমার স্ত্রী ওসব ভাল করেই জানেন, তবু ছেলেমেয়েগুলো এত অসাবধান যে সতর্ক না করে পারলাম না। তাতেই দেরী হয়ে গেল।'

আমি একটু বিস্মিত হয়ে বললাম : 'আমরা তো মশাই চিরকালই জাম খেয়ে আসচি, এসব তো কোনদিন করিনি।' তিনি বললেন : 'ভুল করেন। জানেন, চাষীরা গাছ থেকে আম জাম পেড়ে ঘরে খাটিয়ার নীচে রেখে দেয়। তারপর ভাল করে পাকলে বাজারে আনে। ওদের ঘরে ঘরে টীবি, বসন্ত, কলেরা আরও কত কি লেগেই আছে। আমাদের দেশে অর্ধেক ব্যারাম তো ঐভাবেই আসে।' আমি বললাম : 'তবে কি আপনার ছেলেমেয়েদের কোন অসুখ-বিসুখ হয় না?' তিনি—'হবে না কেন? আমার কথা শোনে না বলেই হয়। স্কুলে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে যা তা খায়। বিশেষ করে আমার ছেলেটা। কি করা যাবে? আমার যতখানি সাধ্য করে থাকি। এই ধরুন না, আমার ছেলেটা তিলের খাজা

খেতে ভালবাসে। জানেন এই সব খাজা কোথায় তৈরী হয়?'

তিনি তাঁর ডাক্তারী অভিজ্ঞতা থেকে যা বর্ণনা করলেন তারপর আর তিলের খাজা, গজা, রেউড়ি প্রভৃতি খাদ্য যা দেখলে জিভে জল আসে তা খাওয়া একবারে বন্ধ হয়ে গেল। আমি চিন্তিত হয়ে বললাম : ছেলেপিলেরা তো খাজা গজা দেখলে ক্ষেপে ওঠে। তা বন্ধ করা তো একবারে অসম্ভব। এখন কি করা যায় বলুন তো?' ডাক্তার বললেন : 'আমি যা করে থাকি তা যদি করেন তো গজাটজা সবই খেতে পারবেন।' আমি উপায়ের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম। ডাক্তার : 'খাজা গজার উপর একটু মেথিলেটেড স্পিরিট ঢেলে জ্বালিয়ে দেবেন। দোষ কেটে যাবে স্বাদও ভাল হবে। আমি তাই করে থাকি। তবে ওগুলো না খাওয়াই ভাল। ব্যাক্টিরিয়া মারবার জন্য আমরা যত চেষ্টা করছি, ওরা বাঁচবার জন্য ততোধিক চেষ্টা করছে। একদিন আসবে যখন সব স্টেরিলাইজার বেকার হয়ে পড়বে।'

ট্রেন চলতে লাগল। ভদ্রলোকের সংগে আলাপ জমে উঠল। উনি কলকাতায় একটা মেডিক্যাল কনফারেন্সে যাচ্ছেন। স্বাস্থ্যতত্ত্ব থেকে রাজনীতি, রাজনীতি থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ, উত্তরপ্রদেশে বাঙ্গালীদের অবস্থা প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনাতে সময় কেটে গেল। আমার আবার ট্রেনে চড়লেই ক্ষিদে পায়। বিন্ধ্যাচল পৌঁছতে না পৌঁছতে পেটের মধ্যে বেশ চড়চড়ানি শুরু হল এবং বিন্ধ্যাচলে ট্রেন থামতে না থামতেই আমি মেঠাইঅলার জন্য ডাকহাঁক পাড়তে লাগলাম। ডাঃ মিত্র বললেন : 'আরে মশাই, আপনি করছেন কি? এখানে কলেরা এপিডেমিক চলছে। আর আপনি এখানকার খাবার খাচ্ছেন? তার চাইতে এক কাজ করা যাক। আমার কাছে এক টিফিনকেরিয়ার বোঝাই খাবার আছে। ওটার সদ্ব্যবহার করা যাক। আমারও একটু ক্ষিদে ক্ষিদে ভাব হয়েছে।'

ট্রেন ছাড়ার পর ডাঃ মিত্র বাথরুমে গিয়ে কনুই পর্যন্ত সাবানে ধুয়ে এলেন। আমাকেও ধুয়ে আসতে বললেন। একটা নেলব্রাশ দিয়ে বললেন যে, নখগুলোর ভেতর কত রকমের জার্ম আছে তার ইয়ত্তা নেই। নখগুলো ভাগ করে ঘসে আসবেন। বাথরুম থেকে ফিরে আসার পর ভিজে হাতে টিফিন কেরিয়ার খুললেন। দামী বিলেতী হটবকস্‌। প্রত্যেক খোপের মধ্যে চক্‌চকে চামচ বা কাঁটা। আমাকে একটা প্লেট দিলেন। স্টেরিলাইজ করা গজ দিয়ে সেটা মুছে আলগোছে কয়েক খণ্ড স্যান্ড-উইচ, একটা কলা ও একটা আ্যাপেল্‌ দিলেন। বললেন : 'খান, কোন চিন্তা করবেন না। সব সাবধানে তৈরী। কোনটা হাত দিয়ে

আমি তাই করে থাকি

ছোঁয়া হয়নি।' ডাক্তার অতি সন্তর্পণে খাবার শেষ করে ফ্লাস্ক থেকে প্ল্যাস্টিকের গ্লাসে জল ঢেলে দিলেন—সেও মাপা। আহার ও পানীয় শেষ করে বোঝা গেল যে আমার পেটের তলায় ও গলার নলীতে একটা জ্বালার ভাব আরও বেড়ে গেল। ক্ষিদেও গেল না, তেষ্টাও মিটল না। আমি ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলাম।

দুটো স্টেশন পার হয়ে গেল। আমার কপালে পড়ে ডাক্তারবাবুর বোধহয় একটু প্রেজুডিস হয়ে গিয়েছিল। তিনি শুয়ে পড়েছেন। ট্রেন থামতেই আমি নেমে পড়লাম। তিনি নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বললেন : 'কোথায় চলছেন?' আমি বললাম : 'একটু বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া লাগিয়ে আসি।' ডাক্তার : 'আবার ওসব অভ্যাসও আছে নাকি? সাবধান, সাবধান, শেষটা মারা পড়বেন।'

মারা পড়ি তো পড়ব। আজ তো বাঁচি। ছুটে গিয়ে যথাসম্ভব কম্পার্টমেন্ট থেকে দূরে কতকগুলো পচাতেলে ভাজা গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করে দু খুরি চা খেলাম। তারপর ভাল করে মুখ মুছে একটা সিগারেট ধরিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। গাড়ি ছাড়ল। চোখ না চেয়েই ডাক্তারবাবু বললেন : 'জানেন তো যত ক্যানসার হয় তার অর্ধেকের বেশী হয় সিগারেটের ধোঁয়া থেকে। ঐ কুঅভ্যাসটা ছেড়ে দিন। শেষকালে আমাদের পয়সা দিয়ে জেরবার হবেন, মারাও পড়বেন। ক্যানসার থেকে কোন অব্যাহতি নাই। যদি থাকত তবে অ্যামেরিকায় ডালেস মরত না।'

ডাক্তারকে বললাম : 'বেশী বেঁচে আর কি হবে? আমি তো আর গভর্ণমেন্টের চাকরি করি না যে, পেনসন পাব?' ডাক্তার বললেন—'অল্পদিনই তো বাঁচবেন না। তা আর বেশীদিনের কথা কি? ছেলেপুলেকে অকূল সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে যাবেন। আপনার আমার মত লোক যার একমাত্র ভরসা এই হাত দুখানা তাদের খুব সাবধান থাকা দরকার।' এই বলে হাত দুখানা দেখালেন। অনেক ঘসাঘসির ফলে হাত দুখানা বার্নিশ করা আমার মত ঝকঝক করছিল।

আমি কলকাতায় মেয়ের বাড়ি যাচ্ছিলাম। রাস্তায় ডাঃ মিত্রের সংগে বেশ ভাব জমে গেল। কিন্তু একরকম অনাহারেই সফর শেষ করতে হল। দিনের বেলায় ডাঃ মিত্র আমার উপর কড়া নজর রাখলেন। চুরি করে খাওয়ার কোন সুযোগই রইল না। তার টিফিনকেরিয়ারের রেশন করা খাবার খেয়ে পেটের জ্বালা আরও বেড়ে গেল। কিন্তু ভদ্রলোক খুব সদালাপী ও সজ্জন ব্যক্তি। কয়েক ঘণ্টা ট্রেনযাত্রার ফলে যেন একটা আত্মীয়তার ভাব জমে গেল। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম : 'তারপর ডাঃ মিত্র, কলকাতায় কোথায় উঠবেন?' তিনি বললেন : 'কলকাতায় আমার কোন আত্মীয় নেই। ভাবছি হোটেলে একটা ঘর নিয়ে থাকব। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নিজেই করব। একদিনের মামলা বই ত নয়।'

জামাই বাবাজী বড় চাকরী করেন। উড স্ট্রীটে মস্ত বড় ফ্ল্যাট। মেয়ে-জামাই-এর অনুমতি না নিয়েই বলে ফেললাম : 'কষ্ট করতে যাবেন কেন? আমার মেয়ের বাড়িতে উঠবেন। ওরা পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে খুব সাবধান।' ডাক্তার মিত্র খুশী হলেন। মেয়ের বাড়ি এসে মেয়েকে সব কথা বললাম। জামাই ও মেয়ে আদরের সংগে ডাক্তার মিত্রকে গ্রহণ করলেন। আমার কন্যাদের একটু পরিচ্ছন্নতার বাতিক ছিল। বেশী কিছু বলতে হল না। [illegible] 'পাগল' একটি কামরাতে [illegible] ডাক্তারকে নিয়ে গেল, তখন তাঁর খুশী আর ধরে না। সবই তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে, স্নানের ঘর, খাবার টেবিল, কাঁটাচামচ ও প্লেটগ্লাস সব ধব্‌ধব্‌ করছিল। ডাক্তারও তাঁদের সংগে আহার করলেন। শুধু রাত্রিবেলা একটু গোলমাল হল দুধ নিয়ে। কলকাতার প্যাস্টুরাইজড দুধে তাঁর ভরসা নাই। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে তাকে বয়েলিং পয়েন্টে বিশ মিনিট সেদ্ধ করে নিলেন। তবেই দুধ খাওয়া চলল। জল ফুটোনই ছিল তবুও একটা শিশি থেকে সাদা একটা বড়ি বের করে গ্লাসে ফেলে দিলেন।

আহারান্তে আমরা বসবার ঘরে গেলাম। খানসামা কফি দিয়ে গেল। ডাক্তার চিনি ও দুধ ছাড়া ছোট্ট পেয়ালায় একটু কফি সিপ্‌ করতে করতে তাঁর চিকিৎসক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগলেন। বললেন : 'লোক না খেয়ে মরে না। বেশী খেয়েই মরে। একটা লোকের বাঁচতে হলে আড়াই হাজার

ক্যালোরি যথেষ্ট।' তিনি সারাদিনে একটু বেশীই খেয়ে ফেলেছেন। তার উপর কফিতে দুধ চিনি খেলে তাঁকে ব্যালান্স রক্ষা করার জন্য পরের দিন ব্রেকফাস্ট কাট করতে হত।

আস্তে আস্তে আলোচনাটা একটু গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করল। প্রকৃতি কেমন করে দুর্বলকে, অসমর্থকে নিকেশ করছে, জীবনসংগ্রামে মানুষ বাঁচবার জন্য প্রকৃতির শত্রুতাকে কিভাবে পরাস্ত করছে—কি করে সমাজ ও সভ্যতার সৃষ্টি হল—প্রকৃতির দ্বন্দ্বকে পরাস্ত করে মানবসভ্যতা কি করে এগিয়ে চলেছে—চিকিৎসাশাস্ত্র প্রকৃতির হিংসাবৃত্তিকে কেমন করে দিনের পর দিন দমন করছে—এই সব গূঢ় তত্ত্বের আলোচনা করতে করতে ডাক্তার সময়ের কথা ভুলে গেলেন। তাঁর আবার ঠিক দশটার সময় ঘুমোন অভ্যাস। হঠাৎ সামনের ঘড়িতে সোয়া দশটা বেজে গেছে দেখে আঁতকে উঠলেন। শুধু একটা 'গুড নাইট' বলে ধড়ফড় করে শোবার ঘরে ঢুকে পড়লেন।

যা হোক ভদ্রলোকের মধ্যে একটা সহৃদয়তা, বিশেষত সহজ শালীনতা দেখে আমরা মুগ্ধ হলাম। দুদিন মাত্র ছিলেন। শুধু যে একটা আত্মীয়তা জমে গেল তাই নয়, অনেক কিছু শেখা গেল। তিনি এলাহাবাদ ফিরে যাবার সময় আমাকে বিশেষ করে বলে গেলেন যেন দিল্লী ফিরবার সময় আমি তাঁর বাড়ি হয়ে যাই।

নিছক পরিচ্ছন্নতা আমার স্বভাবসিদ্ধ নয়। নিমন্ত্রণে একটু ভীত হয়ে পড়লাম বটে, কিন্তু ফেলতে পারলাম না। মনে মনে তাঁর বাড়ির চালচলন দেখবার জন্য একটু ঔৎসুক্যও ছিল। যা হোক, দিন পনেরো পরে দিল্লী ফেরার পথে এলাহাবাদে নেমে গেলাম। তাঁর বাড়ি বের করতে বিশেষ অসুবিধা হল না। দেখলাম শহরে তিনি খুব পরিচিত। লাল রঙের সুন্দর বাংলো বাড়িটি। চারপাশে টিকোনিয়ার বেড়া—বেশ নিখুঁতভাবে ছাঁটা। গেটের উপর বোগেনভিলিয়া ফুল স্তবকে স্তবকে ধরেছে। লম্বা লম্বা ইউকেলিপটাসের গাছ। সারা বাগান একটা অম্ল মধুর গন্ধে পূর্ণ। সামনে সরু কাটা একটা চৌকস লন। গেট থেকে গাড়িবারান্দা পর্যন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের মত দুটো লাল সুরকীর পথ। গাড়িবারান্দার দুই ধারে যুঁই ফুলের লতা ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে। দু' পাশে ফুলের কেয়ারি। বড় বড় গোলাপ, বিচিত্র রঙের ডালিয়া, অ্যান্টি-রাইনাম, পপি ও ফ্লক্সের বেড। মনটা মুগ্ধ হয়ে গেল। নতুন দিল্লীর বড় বড় অফিসারদের বাড়িতেও এত সুন্দর রুচির পরিচয় পাওয়া যায় না।

আমিও বেকুব—টাঙ্গা করে গাড়িবারান্দা পর্যন্ত হাজির। টাঙ্গা বিদায় হবার পরই ঝাড়ু দিয়ে ডি ডি টি স্প্রে করে গেল। বড়ই লজ্জায় পড়লাম। সকলের অসাক্ষাতে পকেট থেকে রুমাল বের করে জুতো জোড়া ঝেড়ে নিলাম। ঘরের সর্বত্র একটা তীব্র কেমিক্যাল গন্ধ ফুলের সুগন্ধকে ছাপিয়ে উঠেছে।

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে সকলেই খুব আলাপী ও মধুরভাষী। বেশ ভাল লাগল। ভয় সংকোচ কেটে গেল। আপনার বাড়ির মতই মনে হতে লাগল। দেড়টায় লাঞ্চ। ডাক্তার চেম্বার থেকে ফিরেছেন। খাওয়ার যখন ডাক পড়ল দেখলাম সবাই কনুই পর্যন্ত সাবান দিয়ে ধুয়ে অপারেশন টেবিলের ডাক্তার নার্সদের মত দাঁড়িয়ে আছেন। আমি হাত ধুইনি দেখে সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন। আমার জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে সামনেই হাতে লেখা একটা মেনু দেখলাম, সব পদের উল্টোদিকে ক্যালোরির সংখ্যা লেখা আছে। ডাক্তার গৃহিণী বললেন, 'আপনি আড়াই হাজার ক্যালোরি বেছে নিন।' খাওয়া চলতে লাগল। সব খাবার টেবিলের উপর সাজানো। যার যা খুশী তুলে নিতে হবে। বেয়ারা মাঝে মাঝে সাহায্য করছে। শেষ পদ আইসক্রীম বেয়ারাই সার্ভ করতে লাগল। ডাক্তার নিলেন না। ডাক্তার গিন্নিও তাই। তাঁর দু হাজার ক্যালোরি থেকে সামান্য কিছু বাকী ছিল বলে দু-এক টুকরো আলুর চিপস তুলে নিলেন। মিনি দুয়েক খণ্ড আখরোট। মন্টু হাত বাড়াতেই মিনি নাটকীয়ভাবে বলে উঠল : 'হোলড, হোলড, ডোণ্ট বি সো গ্রীডি—তুমি অত লোভী হবে না।' তারপর আমার পালা। আমার পেটে খিদে ছিল। ভেবেছিলাম আইসক্রীমের বড় একটা চাংক তুলে নিয়ে খিদে মেটাব। কিন্তু ডাক্তার বললেন : 'আপনি তো অলরেডি আড়াই হাজার ক্যালোরি খেয়ে ফেলেছেন, নরেনবাবু। আর খাওয়া কি ঠিক হবে? এরপর যা খাবেন তা পয়জন হবে।' এখন গৃহকর্তা স্বয়ং যদি একথা বলেন তো খাওয়া কি করে চলে? পেটের খিদে পেটেই রেখে উঠলাম। তারপর বসার ঘরে একটু গল্প-সল্প হবার পর আমি বললাম : 'শীতের বেলা। দিনে আর ঘুমোয় না। যাই একটু সঙ্গমটা দেখে আসি।'

সঙ্গম দেখার ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু তার চাইতে খিদের পীড়ন বেশী। শুনে-ছিলাম এলাহাবাদে ভাল কলাকন্দ পাওয়া যায়। সঙ্গমযাত্রার পূর্বে তার চার পাঁচটা উদরস্থ করে ত্রিবেণীর দিকে অগ্রসর হলাম। রাত্রিতে আহারযজ্ঞের পূর্ববৎ ব্যবস্থা হ'ল। শুধু জানা গেল যে, ফ্রীজের মধ্যে যে আইসক্রীম রাখা ছিল তা কে যেন অলক্ষিতে খেয়ে ফেলেছে। সকলের ধিক্কার দৃষ্টি পুত্র মন্টুর দিকে ধাবিত হওয়ায় অপরাধী কে তা আর জানতে বাকী রইল না। আমি মনে মনে ভাবলাম বেশ করেছে।

আর একদিন এলাহাবাদ ছিলাম। পরিবারের সদাচারে ও হৃদ্যতায় সময় বেশ কেটে গেল। ক্যালোরির জন্য ভয় ছিল না। বাক্সের মধ্যে এক প্যাকেট বিস্কিট লুকিয়ে রেখেছিলাম। দিল্লী ফেরার আগে ডাক্তার মিত্র ও তাঁর পরিবারের সকলকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেলাম। ডাক্তার একবার এলেন। একবেলা ছিলেন, কিন্তু আমার বাড়ির জলও স্পর্শ করলেন না। টিফিন কেরিয়ারে খাবার এনেছিলেন। ফ্লাস্কে জল ছিল। অনেক কষ্টে আমরা দুয়েকটা ফল খাওয়াতে পেরেছিলাম—তাও আবার গরম জলে ডুবিয়ে।

আমার স্ত্রী শ্যামমোহিনী সেকেলে স্ত্রীলোক। পানখেকো, চাবি ঝুলোনো, কস্তাপাড়-শাড়িপরা মহিলা। সে একদিনের পরিচয়ে ডাক্তারকে ঠাকুরপো বানিয়ে খাওয়া নিয়ে অনেক রসিকতা করলে। কিন্তু ডাক্তার তাঁর নীতি থেকে একটুও বিচলিত হলেন না। আরও একবার ডাক্তার হঠাৎ এলেন। আমার বাড়ি ওঠেননি। দশ মিনিটের জন্য দেখা করতে এসেছিলেন। শ্যামমোহিনী এবার আপনি থেকে তুমিতে উপনীত হ'ল। কিছু না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বে না। অনেক কষ্টে ডাক্তার একটা কমলালেবু খেতে রাজী হলেন। তাড়াতাড়িতে গরম জল করা সম্ভব হল না। ডাক্তার পকেট থেকে একটা ছুরি বের করে আলগোছে সেটা ফাঁক করলেন ও ঠোঁট দিয়ে কোয়াগুলো বের করে খেয়ে ফেললেন। বুঝিয়ে দিলেন যে, এটা নেহাৎ বৌদির প্রতি কনসেশন। মোট কথা শ্যামমোহিনী তার সরল ও অকৃত্রিম স্নেহমমতা দিয়ে ডাক্তারকে প্রভাবিত করে ফেললে। এবার শ্যামমোহিনী আবদার করে বসল যে ডাক্তার আবার যখন আসবেন তখন যেন মীরা (ডাক্তারের স্ত্রী), মিনি ও মণ্টুকে নিয়ে আসেন। ২৩শে জানুয়ারীর আগের দিন সত্যি সত্যিই ডাক্তার সপরিবারে এলেন। রিপাব্লিক-ডের তামাসা দেখবার জন্য। আমরা যথাসম্ভব বাড়ি ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে রেখেছিলাম। খাওয়ার টেবিলের প্লাস্টিকের চাদর রেখে সাদা ধবধবে টেবিল ক্লথ পাড়া হ'ল। চাঁদনী থেকে মোরাদাবাদী কাটা চামচ আনা হল। ন্যাপিন ওয়ের কেনার পয়সা নাই। নতুন নিমকদানী ও পরিবেশনের জন্য ডিশ প্লেটও চাঁদনী থেকে এল। গাড়বাজী চাকরটাকে যথাসম্ভব সাজিয়ে গুজিয়ে খানসামা করে তুললাম। শ্যামমোহিনী বললে—সে অতশত বোঝে না। আপনার লোকের সঙ্গে অত আদব কায়দার দরকার কি বাপু! যাই হোক সঙ্গতি রক্ষার জন্য সেও তার আধভাঙ্গা পানরাঙ্গা দাঁতগুলো নীমকাঠি দিয়ে যথাসম্ভব সাফ-সুতের করে তুলল ও ধোপভাঙ্গা ধনেখালি পরে তৈরী হ'ল।

আমাদের কোথায় বসিয়ে গেলে?

সন্ধ্যার সময় তুফান এক্সপ্রেসে সপরিবারে ডাক্তার এসে উপস্থিত হলেন। চা তাঁরা খেয়েই এসেছিলেন। খেলেন না। তারপর মীরাদেবী তাঁদের শোবার ঘরে ঢুকে লাইজল ছড়িয়ে ঘর শুদ্ধ করে নিলেন। রাত্রিতে তাঁরা শুধু লুচি তরকারী খেলেন। খাবার ঘরে আংগাঠি এনে একটা একটা লুচি ভেজে উনুনে সেঁকা চিমটে দিয়ে তাই আলগোছে প্লেটে তুলে ঐ পবিত্রভাবে তৈরী ফুলকপি ভাজা দিয়ে আহার সমাধা হল। ডাক্তার জানিয়ে দিলেন যে হট ফ্রম দি ওভেন অর্থাৎ উনুন থেকে গরম গরম জিনিসে স্বাস্থ্যের কোন অপকার হয় না। এও বৌদির প্রতি কনসেশন। বলা বাহুল্য খাওয়ার টেবিলের সমস্ত সরঞ্জাম ত্রিশ মিনিট ফুটিয়ে নেয়া হয়েছিল।

রিপাব্লিক ডের বিকেল বেলায় চায়ের টেবিলে দিল্লীর বিখ্যাত মেঠাইওয়ালা ঘণ্টে-বালার (১৭৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত) দোকান থেকে রাজেন্দ্র মার্কা বরফী, রাধাকৃষ্ণন মার্কা বালুসাই ও জবাহর মার্কা কলাকন্দ আনা হল। শ্যামমোহিনী আজ তার পুরো ফর্মে। বায়না ধরলে—আজ এই খুশীর দিন মেঠাই খেতেই হবে ঠাকুরপো। মীরা দেবী কিছু পরিমাণে সন্ত্রস্ত, মিনি বিরক্ত ও ডাক্তার বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। শুধু মণ্টুর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ভদ্রলোক বোধ হয় বৌদির আদরে-বঞ্চিত। যাই হোক শ্যামমোহিনীর বৌদিপনায় ডাক্তারবাবুর স্বাস্থ্যনীতিতে বোধ হয় একটু সাময়িক বিচ্যুতি ঘটল। শ্যামমোহিনী যখন একটা প্লেটে এক-জোড়া ধবধবে কলাকন্দ এনে ধরল ও ঠাকুরপো খেতেই হবে বলে আবদার আরম্ভ করল তখন ডাক্তারের বোধ হয় মতিভ্রম হল। তিনি একটা বরফী তুলে নিয়ে কামড় মারলেন। যেই কামড় মারা অমনি মিনি লাফ দিয়ে এসে ডাক্তারের গলা চেপে ধরে বলে উঠল : 'কি করলে ড্যাডি, কি করলে? আমাদের কোথায় বসিয়ে গেলে?' হাউ হাউ করে মিনি কেঁদে উঠল। বললে : 'বমি কর ড্যাডি বমি কর।' মীরা দেবীও হাহাকার করে উঠলেন : 'কি সর্বনাশ করলে গো—কি সর্বনাশ করলে?'

শ্যামমোহিনী বড় অপ্রস্তুত হ'ল। তার চোখ মুখে যেন কালবৈশাখীর ঝড় নেমে এল। আমি প্রমাদ গুনলাম। মীরা দেবীর হাহাকারে সে আর ধৈর্যরক্ষা করতে পারল না। বজ্রগর্ভ মেঘ যেন ফেটে পড়ল : 'ঘণ্টেবালার মেঠাই খেয়ে তোমার সোয়ামী মরছে? হাজার হাজার লোক এই মেঠাই খাচ্ছে। বিলেতের সাহেব মেমেরা খাচ্ছে—রাধাকেষ্টন খাচ্ছে, ইন্দিরে খাচ্ছে, কিছু হচ্ছে না, আর তোমরাই মরছ গো! যত সব ন্যাকামী!'

সেইদিনই সন্ধ্যার গাড়িতে ডাক্তারেরা এলাহাবাদ ফিরলেন।

সাহিত্য সংবাদ

কবিতার দোকান

কবিতার বই-এর কথা শুনলেই যখন সমস্ত প্রকাশকদের ভুরু কুঁচকে যায়—সেই সময়ে শুধু কবিতার বই প্রকাশ করার দৃঢ় বাসনা নিয়ে কোনো নতুন প্রকাশকের আবির্ভাবের খবর নিশ্চয় বিস্ময়কর। শুধু আবির্ভাব নয়, তার চেয়েও বিস্ময়কর এই প্রকাশের সার্থকতা।

দু' বছর ধরে লণ্ডনে এইরকম একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান চলছে। এর পরিচালকের নাম ব্যারি ক্রুক। ব্যারির বয়েস মাত্র ৩২ বছর, জীবন শুরু করেছিলেন চিত্রকর হিসেবে, ঐ উদ্দেশ্যে আমেরিকাতেও গিয়েছিলেন। ফিরে এসে ঠিক করলেন, নিজে নিজে একা ছবি আঁকা এবং পরে সেগুলো অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ব্যাপারের বদলে একটা নতুন কিছু করা দরকার। তখন এই প্রকাশনীর পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসে। এক ধনী আমেরিকানের কাছে ৩০০ পাউণ্ডে একটি ছবি বিক্রী করেছিলেন, সেটা হলো মূলধন। কাগজে দেখলেন পুরোনো ভিক্টোরিয়া আমলের একটি প্রিন্টিং মেশিন বিক্রী হচ্ছে—১০০ পাউণ্ড দিয়ে কিনে ফেললেন সেটা। একটা অব্যবহার্য আস্তাবল ভাড়া নেওয়া হলো সপ্তাহে ২০ শিলিং ভাড়ায়। প্রকাশনীর নাম হলো গোলিয়ার্ড'।

কিন্তু প্রকাশনীই যখন, তখন কবিতার মতো এমন লোকসানের দ্রব্য কেন? ব্যারির উত্তর খুব সাদাসিধে। ছোট প্রকাশকরা ছোট বই-ই প্রথম ছাপাতে শুরু করে। এবং ছোট বইয়ের মধ্যে কবিতার বই-ই সুবিধাজনক। তাছাড়া আমেরিকায় সানফ্রান্সিসকোতে তিনি অনেক বীট কবির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের কবিতার বই ইংলণ্ডে ছাপতে আগ্রহী হয়েছিলেন। প্রথম দিকে এক একটি সংস্করণ ৭৫০ কপি করে ছাপা হতে লাগলো—কবিরা প্রতি কপিতে নাম সই করে দিলেন—সুতরাং সংগ্রাহকরা লুফে নিল। বিশেষত আমেরিকায় এরকম সংগ্রাহকের অভাব নেই। ব্যারি নিজের হাতে বই ছাপতে লাগলেন, লে-আউট, মলাটের ডিজাইন সবই তাঁর নিজের। নতুনত্বের ছাপ প্রতিটি প্রোডাকশানে স্পষ্ট।

ক্রমে ব্যারির প্রচেষ্টার দুঃসাহসে আরও কয়েকজন পুস্তক বিক্রেতা ও পরিবেশক সংস্থা এসে যোগ দিল তার সঙ্গে। দু' তিনজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সহযোগিতায় পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের ভারও ব্যারির নিজের। সম্পূর্ণ নতুন কবিকে সুযোগ দিতেও তাঁর দ্বিধা নেই। ডাকে আসা প্রতিটি পাণ্ডুলিপি পড়ে দেখেন, তা ছাড়া যাবতীয় ছোটখাটো সাহিত্য পত্রিকা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেন—কোথাও কোনো নতুন প্রতিভাবান কবির সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। প্রায়ই পাওয়া যায়, ব্যারির ধারণা।

এই দু' বছরে ব্যারির প্রতিষ্ঠান বেশ জমজমাট। গোড়ার দিকে নিজের মূলধন ফুরিয়ে যাওয়ায়—জোনাথান কেপ নামে আরেকজন এসে ৫০ ভাগের অংশীদার হন—প্রতিষ্ঠানটির পরিবর্তিত নাম হয় কেপ গোলিয়ার্ড। কিন্তু নির্বাচন ও মুদ্রণ পরিকল্পনার সব দায়িত্ব ব্যারিরই রইলো। এখন তাঁর প্রতিটি কবিতার বই-ই গড়ে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কপি বিক্রী হয় (ইংরেজি ভাষায় হলেও একে বেশ ভালো বিক্রীই বলতে হবে), এবং বছরে তিনি আঠারোখানা কবিতার বই ছাপছেন। শুধু ইংরেজি কবিতা নয়, পাবলো নেরুদা, অক্টাভিও পাজ (মেক্সিকোর বিখ্যাত কবি, বর্তমানে ভারতে রাষ্ট্রদূত) এবং ইজরাইলের কবি অ্যামিচাই—এঁদের অনুবাদও ছাপছেন। ব্যারির আগামী পরিকল্পনার মধ্যে আছে একটি কিউবান কবিতার সংকলন এবং একটি গেরিলা যোদ্ধাদের কবিতার সংকলন (এর মধ্যে আছে চেগুয়েভারার কবিতা। বলাই বাহুল্য, যেসব দেশ এখন ছাত্র আন্দোলনে মত্ত—সেসব দেশে এই বইটির দারুণ জনপ্রিয়তার সম্ভাবনা।)

ব্যারির কৃতিত্ব এই যে, শুধুমাত্র কবিতার বই-এর প্রকাশের এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে ওঠার সম্ভাবনায় বড় বড় প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকদের টনক নড়েছে। তাঁরাও এখন বেশী কবিতার বই ছাপার কথা ভাবছেন। কবিতার বই ছাপার খরচ কম—তবু প্রকাশকরা বছরে দু' তিনখানার বেশী ও-দ্রব্য ছাপেন না। এখন এর লাভজনক সম্ভাবনাটি তাঁরাও উপলব্ধি করছেন।

ব্যারির কবিতার দোকানটি কবিদেরও আড্ডাখানা। ছোট্ট অফিস ঘর, নড়বড়ে চেয়ার টেবিল, মাত্র একজন সহকর্মী নিয়ে ব্যারি সেখানে কাজ করেন। কবিরা এসে নিজের বই ছাপার সময় শেষ মুহূর্তেও প্রুফের কাটাকুটি করতে পারেন। কোনো কোনো সময় একদল কবি আসে আড্ডা দিয়ে কাজ নষ্ট করতে। তখন ব্যারিও কাগজপত্র সরিয়ে টেবিলে পা তুলে দিয়ে গালগল্পে মেতে যান।

আমাদের বাংলাদেশেও কবিতা নিয়ে মাতামাতি কম হচ্ছে না। এখানে কি কোনো ব্যারি'র দেখা পাওয়া যাবে না?

টেলপীস

নতুন পরিচালনায় 'এনকাউণ্টার' পত্রিকার লেখক পরিচিতির নমুনা! জারমানির নতুন সম্ভোগবাদীদের সম্পর্কে 'দি এরস সেণ্টার' নামে একটি রচনার লেখিকার পরিচিতি: "কুমারী ডুটিকে একজন তরুণী লেখিকা (সোনালি চুল, রূপসী এবং ২২)—জারমানিতে তাঁর দুটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। এই রচনাটির তথ্য আহরণের সময় তাঁকে নানারূপ লোভনীয় প্রস্তাব দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁরই বক্তব্য অনুযায়ী ভবিষ্যতেও সাহিত্য রচনাতেই ব্যাপৃত থাকবেন।"

দ্বিতীয় টেলপীস

"আমি সংস্কৃতের বহু বাংলা অনুবাদ পড়িয়া এবং কিছু করিবার চেষ্টা করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, সংস্কৃত কবিতার উপযুক্ত অনুবাদ বাংলায় করা সম্ভব নয়, ইহার চেয়ে অনেক সহজে ইংরেজিতে হয়।' ইহার কারণ এখানে দেখাইতে পারিব না, শুধু পাঠককে আমার কথাটা মানিয়া লইতে অনুরোধ করিব।"

(নীরদচন্দ্র চৌধুরীর 'বাঙালী জীবনে রমণী" গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।)

সনাতন পাঠক

পুস্তক পরিচয়

অনুবাদ ঃ দুষ্প্রাপ্য উপন্যাস

গোবিন্দ সামন্ত। লালবিহারী দে। **মনীষা গ্রন্থালয়** (প্রা) লিমিটেড। ৪/৩বি **বঙ্কিম চ্যাটার্জী** স্ট্রীট। কলি-১২, ছয় টাকা।

'Folk Tales of Bengal'-এর স্রষ্টা রেভারেণ্ড লালবিহারী দের নাম এ দেশের পাঠকের স্মৃতিতে আজও অমর হয়ে আছে। বস্তুত তাঁর খ্যাতি সাধারণ পাঠক-শ্রেণীর মধ্যে এই বইটিকে কেন্দ্র করেই বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু সাহিত্যের ছাত্র, গবেষক বা উৎসাহী পাঠক-মহলে লাল-বিহারী দের নাম তাঁর বিখ্যাত 'Bengal Peasant life' বা 'Govinda Samanta' নামক গ্রন্থের সঙ্গেই বিশেষ-ভাবে যুক্ত হয়। কারণ,' আমাদের কথা-সাহিত্যের আদিপর্বে যে ধরনের রচনা-গুলিকে সমালোচক বস্তুনিষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস বলে চিহ্নিত করেন, লালবিহারী দের আলোচ্য গ্রন্থটি ইংরেজীতে লেখা হলেও এই ধরনের লেখার একটি উল্লেখ-যোগ্য দৃষ্টান্ত। বাংলা উপন্যাসের গঠন-পর্বে মূলত স্কট এবং ডিকেন্সের প্রভাব যদি স্বীকার করে নেওয়া যায়, তা হলে নিঃসন্দেহে প্যারীচাঁদ, লালবিহারী বা তারকনাথকে ডিকেন্সপন্থী বাঙালী ঔপন্যাসিক বলে চিনে নিতে বাধা থাকে না। এবং এমনকি স্কটের আদর্শে অনুপ্রাণিত রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসেও ডিকেন্স-পন্থী লালবিহারীর পদক্ষেপ চিনে নিতে ভুল হয় না।

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে এই যুগান্তকারী রচনাপ্রসঙ্গে স্বভাবতই বাংলা নাট্যসাহিত্যে অনুরূপ একটি তাৎপর্যপূর্ণ রচনা রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল সর্বস্ব'-এর নামও মনে পড়ে যায়। কারণ, এখানেও দেখতে পাই, মূল রচনার প্রেরণা আসে একটি প্রতিযোগিতার আহ্বান থেকে। ১৮৭১ সালে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গ্রাম-বাংলার চাষীদের জীবন নিয়ে লেখা একটি শ্রেষ্ঠ ইংরেজী রচনাকে পাঁচ শো' টাকা পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেন। এই আহ্বানেই লালবিহারী তাঁর বিখ্যাত 'Bengal Peasant life' (১৮৭২) রচনা করেন। গ্রন্থটি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করার পর লালবিহারী পরবর্তীকালে এটিকে পরি-বর্ধিত করে দু' খণ্ডে প্রকাশিত করেন এবং এর নামকরণ করেন 'Govinda Samanta' (১৮৭৪)। সেকালে এই বইটির প্রথম খণ্ডের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন ভূকৈলাশের সত্যবাদী ঘোষাল। দ্বিতীয় খণ্ড অনুবাদের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। সেদিক থেকে বিচার করলে মনীষা প্রকাশিত আলোচ্য সংস্করণটি 'Govinda Samanta' গ্রন্থের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ।

অনুল্লিখিত একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় ছাড়াও উপন্যাসটি আরও বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হবে। সতর্ক পাঠক লক্ষ করবেন, বাংলা দেশের দরিদ্র কৃষিজীবী পরিবারের এমন একটি অকৃত্রিম ও বিশ্বস্ত ছবি ইতিপূর্বে বাংলা উপন্যাসে আর কোথাও পাওয়া যায় না। গ্রামের পাঠশালা, বিয়ের ঘটকালি, বাসরঘর, ভূতের ওঝা, বালবিধবাদের দুঃখ, মেয়েলি বৈঠক কিছুই লালবিহারীর বাস্তব দৃষ্টিকে এড়িয়ে যায় নি। এতে এক দিকে যেমন দৈন্যপ্রপীড়িত অত্যাচারিত চাষী-সমাজের প্রতি লাল-বিহারীর নিবিড় মমতার পরিচয় পাওয়া যায়, অন্য দিকে তেমনি অত্যাচারী জমিদার, ঘুষখোর দারোগা বা নীলকর সাহেবের প্রতি তাঁর প্রতিবাদের স্বরও গোপন থাকে নি। সমালোচক ঠিকই দাবি করেছেন, "ইংরেজী ভাষায় লেখা হলেও 'Govinda Samanta' বাংলা কথাসাহিত্যে প্রথম গণ-আখ্যান।"

বইটির একটি সুন্দর ভূমিকা লিখে দিয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য। 'গ্রন্থ ও গ্রন্থকার' পর্যায়ে তাঁর সুলিখিত রচনাটি লালবিহারী সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ। লালবিহারীর অপর একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান', যেটি অধ্যাপক ভট্টাচার্য সম্প্রতি পুনরাবিষ্কার করে লাল-বিহারী দের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীসহ প্রকাশোদ্যোগী হয়েছেন, সেটি সম্পর্কেও কয়েকটি বিশেষ মূল্যবান তথ্য এই গ্রন্থের ভূমিকায় পাওয়া যায়।

প্রকাশক এমন একটি বই প্রকাশ করে বাংলা উপন্যাসের ঐতিহাসিক ও অনুরাগী পাঠকদের আরও অনেক উপকার করতে পারতেন, যদি ছাপা ও মুদ্রণ-বিষয়ে আরও একটু সতর্কতার পরিচয় থাকত। সূচনাতেই লালবিহারী দের জন্মসাল ভুলক্রমে ১৯২৪ ছাপা হওয়া এরূপে একটি অমার্জনীয় অমনোযোগিতার উদাহরণ। বইটির অনুবাদ বেশ ভালো হওয়া সত্ত্বেও অনুবাদকের নাম নেই, অথচ এ ধরনের অনুবাদকের নাম ঐতিহাসিক কারণে প্রয়োজনীয়। এটি কি প্রকাশকের অবহেলাপ্রসূত, নাকি স্বয়ং অনুবাদকের অভিপ্রায় অনুযায়ী ঘটিত?

৪২/৬৮

পত্রিকা

Coffee House. Editor: Amitava Bose. 133-2a Acharya Prafulla Chandra Rd., Calcutta-6. Price 00.50 Paise.

আঠারো থেকে আশী বছর বয়স পর্যন্ত সাহিত্য সৃজনেচ্ছুদের জন্য এই পত্রিকা-খানির আবির্ভাব বলে আলোচ্য প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে ঘোষণা করা হয়েছে। বুদ্ধ দেব, রাজেন্দ্র দেশমুখো, দেবব্রত মুখো-পাধ্যায়, কার্তিকেশ্বর সেনগুপ্ত প্রভৃতি এ সংখ্যার লেখকদের হঠাৎ ইংরাজীতে সাহিত্যচর্চার শখ কেন হল বোঝা যায় না। দক্ষিণারঞ্জন বসু এবং জীবনানন্দ দাশেরও ইংরেজী কবিতা আছে—সেগুলি অনুবাদ, না মৌলিক রচনা তার কোন উল্লেখ নেই। ইংরেজী ভাষায় সাহিত্যচর্চায় উৎসাহীদের ওপর এই পত্রিকার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

কালি ও কলম। সম্পাদক: বিমল মিত্র। ১৫ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১.২৫।

বেশ একটি মর্যাদাপূর্ণ সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে 'কালি কলম' ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পেরেছে। সুরুচিত গল্প ও কবিতা ছাড়া এর ও তত্ত্বসমৃদ্ধ প্রবন্ধাবলী প্রতিটি সংখ্যায় পাঠকদের মনোরঞ্জন করার মতো। আলোচ্য সংখ্যায় (বৈশাখ—১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা) বিমল মিত্র ও তারাশঙ্করের দুটি ধারাবাহিক উপন্যাসের সঙ্গে আছে সুকোমল বসু, নীরদ চক্রবর্তী, নির্মলেন্দু গৌতম, চণ্ডী মণ্ডল, অশোককুমার সেনগুপ্ত ও গণেশ দাশগুপ্তের গল্প। 'সামাজিক সংঘাতের সূচনা' এবং 'কলকাতার নাগরিক সমাজের রূপায়ণ সম্পর্কে' যথাক্রমে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ও বিনয় ঘোষের প্রবন্ধ দুটি কালোপযোগী। অন্যান্য প্রবন্ধকারের মধ্যে আছেন সুভাষচন্দ্র সরকার, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, ডঃ দিলীপ মালাকার, পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখো-পাধ্যায়, সুভাষ মজুমদার, দেবনারায়ণ গুপ্ত। শ্রীপুলিনবিহারী সেন সংকলিত 'রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী' পত্রিকাখানির একটি মূল্যবান উপাদান।

মুক্তি মনতাজ। সম্পাদক ঃ শুভঙ্কর দাশগুপ্ত। ২৬ চৌরঙ্গী রোড, কলি-কাতা-১৩। মূল্য ১.২৫।

ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউটের মুখপত্র আলোচ্য ত্রৈমাসিকখানি চলচ্চিত্র বিষয়ে জ্ঞানলাভেচ্ছুদের একটি অবশ্য সংগ্রহীতব্য

পত্রিকা। দেশের এবং বিদেশের সমসাময়িক চলচ্চিত্র চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় রাখার ব্যাপারে পত্রিকাখানি বিশেষভাবেই সহায়ক। আলোচ্য চতুর্থ সংখ্যাখানির লেখকদের মধ্যে আছেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, সোমেন ঘোষ, প্রলয় সুর। এ ছাড়া 'দি সেভেনথ সীল' সম্পর্কে বার্গম্যান নাইগারের বক্তব্যের অনুবাদ, ল্যান্ড ডিউইয়ি লিখিত ১১তম লণ্ডন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের চিত্রবিবরণী এবং মাইলো ফোরম্যানের 'লাভস অব এ ব্লণ্ড'-এর চিত্রনাট্যের অংশ সংখ্যাখানির বিশেষ আকর্ষণ।

আসর। সম্পাদক : সত্যচরণ ঘোষ। ২/১/এ নারায়ণ সুর স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ১·০০।

চটকদার কোন উপাদান পরিহার করে নিছক সাহিত্য-সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত পত্রিকাখানিতে একটা নিষ্ঠার

পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য নববর্ষ সংখ্যাখানিতে খ্যাতনামা বলতে বেশী নাম চোখে পড়ে না; প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্পের অধিকাংশেরই রচয়িতা নতুন হলেও একটা মান রক্ষা করার চেষ্টা হয়েছে। পূর্ব-বঙ্গের কয়েকজন কবির কবিতা এই সংখ্যা-খানির বিশেষ আকর্ষণ।

অনুষ্টুপ। সম্পাদক : অনিল ভট্টাচার্য। ৫১ বদন রায় লেন, কলিকাতা-১০। মূল্য ১·০০।

এই ত্রৈমাসিক পত্রিকার আলোচ্য সংখ্যা-খানি গোর্কির স্মরণে বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত। গোর্কির কবিতা ও গল্প এবং এ ছাড়া তলস্তয় স্মরণে গোর্কির রচনা, তাঁর ডায়েরির অংশ, তলস্তয়কে ও চেখভকে লেখা চিঠির অনুবাদগুলি সংখ্যাখানির বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছে। গোর্কির নাটক ও ছোটগল্প সম্পর্কে আলোচনাও এতে আছে। সংখ্যাখানি সাহিত্যরসিকদের পক্ষে সংগ্রহ করে রাখার যোগ্য।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি। সম্পাদক : সঞ্জীব-কুমার বসু। ১০ হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১। মূল্য ১·৫০।

বাঙলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধাদির প্রকাশ এই ত্রৈমাসিকখানির বৈশিষ্ট্য। সে-দিক থেকে এর একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও আছে। আলোচ্য সংখ্যায় (বৈশাখ-আষাঢ়) প্রবন্ধাবলীর মধ্যে আছে সভ্যতা ও সাহিত্য বিষয়ে পৃথ্বীশ-চন্দ্র ভট্টাচার্য, উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের লেখা রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যরূপ চিন্তা', কবি নজরুল সম্পর্কে ভূপেন্দ্রনাথ সরকার, রবীন্দ্র-যুগের কবি সুখরঞ্জন রায় সম্পর্কে অজয়-কুমার ঘোষের রচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের উপ-ন্যাসের ভাষা, বুদ্ধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রাচীন তাম্রলিপ্তের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে লেখা যথাক্রমে রমা বসু, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক ও বাদলচন্দ্র মুখো-পাধ্যায়ের প্রবন্ধ তিনটিও উল্লেখযোগ্য।

বিশ্ববীণা। সম্পাদক : শ্রীঅরুণ দাস, শ্রীভাস্কর বসু, শ্রীঅমিতাভ ঘোষ। ১৩।১ রিচি রোড, কলিকাতা-১৯। মূল্য ১·২৫

সঙ্গীত বিষয়ে আদি পত্রিকা 'সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা' বন্ধ হবার পর সঙ্গীত এবং সঙ্গীতজ্ঞদের বিষয়ে জানবার মতো ভালো পত্রিকার একটা অভাব অনুভূত হয়ে আসছে। সে-অভাবের খানিকটা আলোচ্য ত্রৈমাসিকখানি দ্বারা যে পূরণ হতে পারবে তার আশ্বাস এই সংখ্যাটিতে (এপ্রিল-জুন '৬৮) পাওয়া যায়। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুচিত্রা মিত্র, প্রসাদকুমার সেন, ভাস্কর বসু প্রমুখ গুণীজনের রচনা সংখ্যাখানিকে সমৃদ্ধই করেনি, সঙ্গীত রসিকদের একটা অভাব মেটাতেও সক্ষম হয়েছে। পত্রিকার প্রকাশক রবীন্দ্রসঙ্গীত ভারতীর এই প্রচেষ্টাটি প্রশংসনীয়।

মানব মন। (নববর্ষ সংখ্যা) এপ্রিল ১৯৬৮। ১৩২।১এ বিধান সরণি, কলকাতা ৪। দাম : প্রতি সংখ্যা ১·২৫।

মানব মনের এই সংখ্যাটি বিশেষ চিত্তা-কর্ষক হয়েছে। মনোবিদরচিত "রবীন্দ্র মানস বিশ্লেষণের—ভূমিকা" প্রবন্ধটি এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্র-মানসের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের যে চেষ্টা হয়েছে তা এ পর্যন্ত রবীন্দ্র মানসের অনুদ্ঘাটিত দিক সম্পর্কে পাঠকদের মনো-যোগ আকর্ষণে সমর্থ হবে। এই সংখ্যার আর একটি বিশেষ আকর্ষণ শ্রীকুইক্সট বিরচিত "কল্মাস্পাদ" নাটক। নাটকটির উপস্থাপনা ও বক্তব্য একেবারে নতুন ধরনের। তাছাড়া ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "সম্মোহন প্রসঙ্গে", সুনন্দা ঘোষের "কার্ল রজারের আমিবাদ", কালিময় ভট্টাচার্যের "প্রজননে নতুন তথ্য", পরিতোষ গুপ্তের "পৃথিবীর প্রথম প্রমিথিউস্" এবং বিভু-রঞ্জন গুহের "আধুনিক বাংলা কবিতার সমীক্ষা" এই সংখ্যার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা। রম্যরচনা, গল্প, কবিতা, উপন্যাস বাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর নির্ভর-শীল মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, এবং জীববিজ্ঞানের আধুনিক ধারা পরিচায়ক এই পত্রিকাটি বাংলাদেশের সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। আমরা এই পত্রিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

একসাথে। সম্পাদিকা : কনক মুখো-পাধ্যায়। ২ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলি-কাতা-১২। প্রতি সংখ্যা ০০·৬০ পয়সা।

'শ্রেণীসমাজের বৈষম্যের শিকার, বঞ্চিত মেয়েদের' মধ্যে 'বলিষ্ঠ সমাজচেতনা ও সংস্কৃতির আলো পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি' নিয়ে এই পত্রিকাখানির প্রকাশ। পত্রিকা-খানির বৈশিষ্ট্য এতে প্রকাশিত বিবিধ বিষয়ের প্রবন্ধ, আলোচনা, কবিতা ও গল্প সবই কেবল মাত্র মহিলাদের দ্বারাই রচিত। রচনাবলীর মধ্যে যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলার চেষ্টার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাপ্তি স্বীকার

অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম (১ম খণ্ড)। অনন্ত সিংহ। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড : ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ১১·০০।

সরল যোগ ব্যায়াম। ডাঃ ললিতকৃষ্ণ। মডেল পাবলিশিং হাউস : ২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২·২০।

বেগম বৌ। তৃপ্তি বসু। ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ : ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য ৩·০০।

বেহাগ। শ্রীনিমাইচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ত্রি এম লাইব্রেরী : ৪২ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩·০০।

বাঘে মানুষে। বিশ্বনাথ বসু। অরুণা প্রকাশনী : ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য ৫·০০।

আমার শিকার স্মৃতি। বিজয়কান্ত সেন। মৌরিট পাবলিশার্স : ৫১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ৫·০০।

আটি টাকা। কমলচন্দ্র সরকার। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস : ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য ৪·০০।

এপার ওপার। সমরেশ বসু। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : ৫ চিন্তা-মণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ৫·০০।

ঝরাপাতার ঝাঁপি। সাগরময় ঘোষ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ৪·০০।

হাতে রইলো তিন। বিমল মিত্র। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ৬·০০।

সরমা। কবিতা সিংহ। চতুষ্পর্ণী প্রকাশনী : ৫/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ৫·০০।

সুখ-অসুখ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। অরুণা প্রকাশনী : ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য ৬·০০।

খা ক সা র আন্দোলনের ইতিহাস। অমলেন্দু দে। জ্ঞানান্বেষণ : ২/৫৬ আজাদ-গড়, কলিকাতা-৪০। মূল্য ৪·০০।

গোলাপ কেন কালো। বুদ্ধদেব বসু। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ৫·০০।

জঙ্গল মহাল ও মেদিনীপুরের গণ-বিক্ষোভ। ডঃ বিনোদশঙ্কর দাশ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ : বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দির, মেদিনীপুর। মূল্য ৩·০০।

শ্রীমা দর্শন (৫ম ভাগ)। স্বামী নিত্যানন্দ। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড : ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-কাতা-১৩। মূল্য ৫·০০।

লোকারণ্য। প্রফুল্লকুমার সরকার। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : ৫ চিন্তা-মণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ৪·০০।

হারেজ। শ্রীপান্থ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ৫·০০।

'ওল্ড ট্রাফোর্ডে' দ্বিতীয় দিনের টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার নীল হক ইংলন্ডের এডরিচের বিরুদ্ধে এল বি ডব্লিউ-এর মার্ক আবেদন জানাচ্ছেন

খেলার মাঠে

ম্যানচেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ইংলন্ড ও অস্ট্রেলিয়ার এই সিরিজের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার ১৫৯ রানে জয় ইংলন্ডের সমর্থকদের কাছে স্বর্গ থেকে বিদায়ের মতই শোকাবহ। কারণ, গত শীতের মরসুমে ইংলন্ডের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ক্রিকেটের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে ইংলণ্ড পরাজিত করবার পর সবারই ধারণা ছিল অন্তত প্রথম টেস্টে কলিন কাউড্রের ইংলন্ড দল সহজেই জয়ী হবে এবং 'অ্যাশেস' পুনরুদ্ধারের পথও প্রশস্ত করে রাখবে। ধারণার আরও কারণ ছিল—তরুণ ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড় নিয়ে গড়া অস্ট্রেলিয়া দল ইংলণ্ডে আসার পর খুব ভাল খেলতে পারছিল না। ইংলন্ডের ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সঙ্গে তারা নিজেদের খাপ খাইয়েও নিতে পারেনি। তার চেয়েও বড় কথা, যাঁদের উপর অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বিল লরির বেশী ভরসা ছিল সেই সব খেলোয়াড় টেস্টের আগে নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী আদৌ খেলতে পারেন নি। স্পিন-কুটিল জন গ্লীসন, যিনি লেগ ব্রেক-এর মত বল দেখিয়ে গেলব কব্জির মোচড়ে মারাত্মক অফ ব্রেক বলে বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানদের ঘায়েল করেন টেস্টের আগে ইংলন্ডের মাঝারি ধরনের ব্যাটসম্যানরাও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে তাঁর বল খেলেছেন। ফাস্ট বোলার নীল হক এবং গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জিও ব্যাটসম্যানদের বিশেষ বেগ দিতে পারেন নি। দুই উদীয়মান ব্যাটসম্যান পল শীহান এবং ডগ ওয়াল্টার্সও তাঁদের ফর্ম পান নি। অপরদিকে ইংলন্ড ছিল আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। তাই ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা একটু জোর দিয়েই টেস্টের আগে মন্তব্য করেছিলেন—'ইফ দেয়ার ইজ এ উইনার, ইট মাস্ট সিরিয়াসলি বী ইংলন্ড।'

কিন্তু ক্রিকেটের চরিত্র 'দেবাঃ ন জানন্তি'। খেলার সময় দেখা গেল প্রায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া দলেরই পর্যাপ্ত প্রাধান্য। ইংলন্ড যেন পরাজয় ভীতির মধ্যে একটি ভাঙ্গাছেঁড়া দল। কি ব্যাটিং, কি বোলিং, কি ফিল্ডিং—সব বিভাগে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের সাফল্যের চিহ্ন। ফল প্রথম টেস্টে সহজ জয়।

খেলাটির পর্যালোচনা করলে দেখতে পাব অস্ট্রেলিয়া টসে জিতে ব্যাট করতে আরম্ভ করে মাত্র ২৯ রানের মধ্যে ওপেনিং ব্যাটস-ম্যান ইয়ান রেডপাথ এবং ও বব্ কাউপারের উইকেট হারায়। কিন্তু অপর ওপেনিং ব্যাটসম্যান এবং অধিনায়ক বিল লরি ও ডগ ওয়াল্টার্স দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাট করতে থাকেন। অচিরেই দুজন ইংলন্ড বোলারদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন এবং অনায়াস ভঙ্গিতে রান তুলতে থাকেন। এক সময় ১৫৬ মিনিটে দুজনে সংগ্রহ করেন ১৪৪ রান। এর মধ্যে প্যাট পোককের বলে লরির দুটি ওভার বাউন্ডারি দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দেয়। যে ওয়াল্টার্স মোটেই ভাল খেলতে পারছিলেন না তিনিও কেন হিগসের বল বারবার বাউণ্ডারীর বাইরে পাঠাতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত অধিনায়ক কাউড্রে বব্ বারবারকে বোলিং করতে ডাকেন। এখানে বলা দরকার টেস্টের আগে কাউন্টি ক্রিকেটে এ বছর বারবার পেয়েছেন মাত্র ৩টি উইকেট। তা ছাড়া কেন ব্যারিংটন পিঠের ব্যথায় অসুস্থ থাকায় অনেক দ্বিধার পর শেষ মুহূর্তে বারবারকে দলভুক্ত করা হয়। কিন্তু বারবার বল করতে এসে ওয়াল্টার্স ও লরি দুজনেরই উইকেট দখল করেন।

মোহনবাগান ও জর্জ টেলিগ্রাফ দলের প্রথম ডিভিসন লীগের খেলায় মোহন-বাগানের পি গাংগুলীকে ট্যাকল করছেন জর্জ টেলিগ্রাফের একজন খেলোয়াড়

দু' বছর আগে এম সি সির অস্ট্রেলিয়া সফরে ডগ ওয়াল্টার্স প্রথম দুটি টেস্টে সেঞ্চুরি করেছিলেন। ইংলন্ডের মাটিতে ওল্ড ট্রাফোর্ডের প্রথম টেস্টেও তিনি সেঞ্চুরির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ৮১ রানের মাথায় বারবারের টপস্পিন বল বুঝতে না পেরে এল বি ডবলিউ আউট হয়ে যান। পরের ওভারে বারবারের রঙ্গ-আনকে লেগ ব্রেক বলে ভুল করে বিল লরিও ৮১ রানের মাথায় বয়কটের হাতে ক্যাচ দেন। যাই হোক, লরি ও ওয়াল্টার্স জুটি আউট হবার পর দুই তরুণ পল শীহান ও ইয়ান চ্যাপেল পঞ্চম উইকেটে সমান প্রশংসায় ব্যাট করতে থাকেন। প্রথম দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া ৪ উইকেটে ৩১৯ রান তোলে। শীহান ৭৩ ও চ্যাপেল ৬৮ রানে নট আউট থাকেন।

৪ উইকেটে যারা ৩১৯ রান সংগ্রহ করেছিল দ্বিতীয় দিন বাকি ৬টি উইকেটে তারা মাত্র ৩৮ রান যোগ করে ৩৫৭ রানে ইনিংস শেষ করবে এটা অভাবনার ভাবনা। দ্বিতীয় দিনের খেলার আরম্ভের পর মাত্র ১০ মিনিট অতিবাহিত হতে না হতে ইয়ান চ্যাপেলের রান আউটের ফলে এই বিপর্যয়। ভুল বোঝাবুঝির ফলে চ্যাপেলের রান আউটের প্রতিক্রিয়ায় পল শীহানও স্বাভাবিকভাবে খেলতে পারেন না। তাঁর মনঃসংযোগ নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তী খেলোয়াড়রাও প্রায় পত্রপাঠ প্যাভিলিয়নে ফিরে আসেন।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি এবং অল্প আলোর জন্য ৪৫ মিনিট খেলা বন্ধ থাকে। ইংলন্ডের দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান এডরিচ ও বয়কট অতি সতর্কতার সঙ্গে ইনিংস আরম্ভ করেন। অস্ট্রেলিয়ার বোলিংয়ে খুব ধার না থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কোন ঝুঁকি নেন না। দ্বিতীয় দিনের শেষে ইংলন্ড কোন উইকেট না হারিয়ে ৬০ রান তোলে। এডরিচ ৩২ ও বয়কট ২৬ রান করে নট আউট থাকেন।

এই ৬০ রানকে ফাউ হিসাবে ধরে নিয়ে ইংলন্ড সমর্থকরা আশা করেছিল অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৩৫৭ রান সংগ্রহ করা ইংলন্ডের পক্ষে খুবই সহজসাধ্য হবে। কিন্তু তৃতীয় দিনের খেলায় ইংলন্ডের অভিজ্ঞ খেলোয়াড়রা যে ব্যর্থতার পরিচয় দেন সাম্প্রতিক ক্রিকেটে তার নজির কম। কোন উইকেট না হারিয়ে যে ইংলন্ড ৮৬ রান সংগ্রহ করেছিল মাত্র ১৬৫ রানে তাদের ইনিংস শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ ৭৯ রানের মধ্যে ইংলন্ড হারায় ১০টি উইকেট। গ্রেভনি, কাউড্রে, ডলিভেরা, নট কেউই বেশীক্ষণ ব্যাট হাতে উইকেটে টিকে থাকতে পারেন না। চ্যাপেলের রান আউটের ফলে যেমন ক্যাঙ্গারুর মোটা লেজ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়ে, তেমন এডরিচের রান আউটের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ সিংহও কাহিল হতে থাকে।

অস্ট্রেলিয়ার কাউপার ও ম্যাকেঞ্জি ভাল বল করেন বটে, কিন্তু ইংলন্ডের এই ব্যর্থতার কোন কৈফিয়ত নেই। প্রথম দিকে তারা রান তোলে অতি মন্থর গতিতে। এক একটি করে উইকেট পড়তে আরম্ভ করলে রান ওঠার গতি আরও মন্থর হয়ে পড়ে। তারপর অতি সকর্তার ফলে খেলাও হয়ে পড়ে আকর্ষণহীন। এক সময় তাদের ফলো-অনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু শেষ দিকে জন স্নোর কিছুটা বে-পরোয়া ব্যাটিংয়ের ফলে ফলো-অনের হাত থেকে রক্ষা পায়।

প্রথম ইনিংসের খেলায় ১৯২ রানে এগিয়ে থেকে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিং আরম্ভ করলেও তাদের সূচনা ভাল হয় না। তৃতীয় দিনের শেষে ৬০ রান তুলতেই তারা হারায় দুটি উইকেট।

একদিন বিরতির পর চতুর্থ দিনের খেলায় ২২০ রানে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হবার পর ইংলন্ড মোট ৪১২ রানের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা করে। দিনের শেষে তাদের ওঠে ৫ উইকেটে ১৫২ রান।

অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের হীরোও ডগ ওয়াল্টার্স যিনি প্রথম ইনিংসে ৮১ রান করেছিলেন। ক্রিকেট দেবতা ব্র্যাডম্যানের ভঙ্গিতে খেলে ওয়াল্টার্স দ্বিতীয় ইনিংসে করেন ৮৬ রান। অফ-স্পিনার পোকারের বল এই দিন খুবই কার্যকরী হয়। তিনি ৭৯ রানে ৬টি উইকেট দখল করেন।

চতুর্থ দিনের শেষে পরাজয় এড়াবার জন্য ইংলন্ডের প্রয়োজন ছিল ২৬০ রানের, জয়ের জন্য ২৬১। হাতে মাত্র ৫টি উইকেট। অবস্থানুযায়ী পরাজয় এড়ানো অসাধ্য ব্যাপার।

সুতরাং শেষ দিন ম্যাচ বাঁচাবার জন্য ডলিভেরার অনমনীয় দৃঢ়তা সত্ত্বেও মাত্র ২ ঘণ্টার মধ্যে খেলা শেষ হয়ে যায়। ২৫৩ রানে ইংলন্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হওয়ায় অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্ট জেতে ১৫৯ রানে। ইংলন্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ডলিভেরার নট আউট ৮৭ রান উল্লেখ করবার মত।

২৪ জুন থেকে লর্ডস মাঠে দুই দেশের এই সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট—অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট যুদ্ধের দ্বিশততম টেস্টও বটে। নীচে প্রথম টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড দেওয়া হল।

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস ৩৫৭ (পল শীহান ৮৮, বিল লরি ৮১, ডগ ওয়াল্টার্স,

৮১, ইয়ান চ্যাপেল ৭৩; জন স্নো ৯৭ রানে ৪ উইকেট, বব্ বারবার ৫৬ রানে ২ উইকেট, কেন হিগস ৮০ রানে ২ উইকেট)।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস ১৬৫ (জন এড্রিচ ৪৯, জিওফ বয়কট ৩৫, বব্ বারবার ২০; বব্ কাউপার ৪৮ রানে ৪ উইকেট, গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি ৩৩ রানে ৩ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস ২২০ (ডগ ওয়াল্টার্স ৮৬, ব্যারী জারম্যান ৪১, বব্ কাউপার ৩৭; প্যাট পোকক ৭৯ রানে ৬ উইকেট, ডালিভেরা ৭ রানে ১ উইকেট)।

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস ২৫৩ (ডালিভেরা নট আউট ৮৭, বব্ বারবার ৪৬, জন এড্রিচ ৩৮, টম গ্রেভনি ৩৩; জন গ্লীসন ৮২ রানে ৩ উইকেট, অ্যালান কনোলী ৩৫ রানে ২ উইকেট, বব্ কাউপার ৪৪ রানে ২ উইকেট, গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি ৫২ রানে ২ উইকেট)।

✻

প্রথমে একক লীগ ও পরে লীগ টেবলের শীর্ষস্থানীয় চারটি দলকে নিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ মীমাংসার জন্য সুপার লীগ খেলার ভিত্তিতে প্রথম ডিভিসনের খেলা আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা ময়দান পুনঃ জমজমাট। সব দলই আসরে নেমেছে, বিভিন্ন দলের শক্তি সম্বন্ধেও একটা আন্দাজ পাওয়া গিয়েছে। তবু খেলোয়াড়দের নৈপুণ্যগত উৎকর্ষ অনুযায়ী দলগত খেলার মধ্যে ফারাক অনেকখানি। তুলনামূলক বিচারে প্রতিষ্ঠিত দলের চেয়ে মাঝারি শক্তির দলগুলিই ভাল খেলছে। তাদের খেলায় যেমন দৃঢ়তা তেমন আন্তরিকতা। অবশ্যই শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। এই তো গত সপ্তাহে প্রধান কয়েকটি দলের শক্তি নিয়ে দেশ-এর পাতায় কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এ সপ্তাহে বাকি দলগুলি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করছি।

এরিয়ান, রাজস্থান এবং বাটা দলও এ বছর গতবার থেকে ভাল ফলাফল দেখাবে বলে মনে হয়। শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে শক্ত বাধা সৃষ্টিতে এরিয়ানের সুনাম আছে। দল পরিবর্তনে এরিয়ান প্রতিবারেই লোকসানের সম্মুখীন হয়। বলাই দে, দিলীপ পাল, মোহন সিং, কর্পূর ব্যানার্জি, টি নাগরায় ও এস ঘোষ চৌধুরী প্রমুখ খেলোয়াড়েরা দল ছেড়ে যাওয়ায় এরিয়ান চিন্তাকুল। তবে গোলরক্ষক কানাই সরকার ও ইনসাইড বিমান লাহিড়ী দলে ফিরে আসায় এরিয়ান অনেকটা ক্ষতি পূরিয়ে নেবে। তা ছাড়া বালীর ব্যাক এস কর্মকার, খিদিরপুরের দুলাল ঘোষ উয়াড়ীর পি বাশ্যাল এবং কালীঘাটের এস রক্ষক দলকে দুর্বল হতে দেবেন না বলে আশা করা যায়।

বাটা গতবারের তুলনায় এ বছর অনেক বেশী শক্তিশালী। রক্ষণভাগে ইস্টবেঙ্গলের সুধীর দাস, ও প্রণব সরকার, মোহনবাগানের নির্মল চক্রবর্তী, বি এন আর-এর পরিমল দাস, উয়াড়ির এস রাও এবং পুরোভাগে ইস্ট বেঙ্গলের দুলাল মণ্ডল ও সন্তোষ চ্যাটার্জি, বালীর নীলেশ সরকার এবং ইস্টার্ন রেলের এস খাঁ যোগদান করায় দলের উভয় বিভাগের শক্তি বহুলাংশে উন্নত হয়েছে।

রাজস্থান দল সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। এবারে বেশ কিছু তরুণ উঠতি খেলোয়াড় আসায় রাজস্থানের শক্তি যে কোন দলের বিরুদ্ধে উন্নত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি করবে। রক্ষণভাগে অরুণ ব্যানার্জি, টি নাগরাজ এবং পুরোভাগে এস ঘোষদস্তিদার ছাড়া জুনিয়র বাংলা দলের এস ভৌমিক এবং এন দে সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের অনেক আশা।

ইস্টবেঙ্গল ও কালীঘাট ক্লাবের ফুটবল লীগের খেলায় কালীঘাট গোলের মুখের এক দৃশ্য

✻

বালীপ্রতিভা গতবারের ৩০ পয়েন্ট পেয়ে ষষ্ঠ স্থান দখল করেছিল। এবারে দলের রক্ষণভাগের কয়েকজন কুশলী খেলোয়াড় চলে যাওয়ায় কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। বিশেষ করে উঠতি স্টপার অশোক ব্যানার্জির দলত্যাগ বালীকে ভাবিয়ে তুলেছে।

কালীঘাট তরুণ ও অল্পখ্যাত খেলোয়াড়দের উপরেই বেশী ভরসা রাখে। গতবারে লীগ তালিকায় মাঝামাঝি স্থান পেলেও এবারে জুনিয়র বাংলা দলের ফ্রি গুহঠাকুরতা, এ সিংহ, রণজিৎ দে, বাবু মিত্র, স্বরাজ দত্ত ও এন গাঙ্গুলী যোগদান

করায় কালীঘাট গতবার থেকেও ভাল ফলাফল দেখানোর আশা রাখে।

উয়াড়ি, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, খিদিরপুর, জর্জটেলিগ্রাফ এবং হাওড়া ইউনিয়ন সকলেই দলের কয়েকজন করে কুশলী খেলোয়াড় হারিয়েছে। নবাগত খেলোয়াড়দের সাফল্যের উপর এই দলগুলির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

"ইয়োরোপ কাপ ফাইনালের বিবরণ"

আশী হাজার দর্শককে মন মাতানো ফুটবলের কলাকৌশলে অভিভূত করে ইটালীর মিলানো এ সি দলের ইউরোপ কাপ লাভ"—হল্যাণ্ডের প্রখ্যাত দৈনিক "ডাগেসব্লাং" মন্তব্য করেছে। ঐ দিন শুধু রোটারড্যামের আশী হাজার দর্শককেই অভিভূত করেনি মিলানো, ইউরোপের লক্ষ লক্ষ টি ভি দর্শক নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছে মিলানো আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুটবল দল।

ইটালীর ফুটবলে প্রতিষ্ঠা লাভের পেছনে রয়েছে মিলানোর অসামান্য অবদান। ইটালীর জাতীয় দলের অর্ধেক মিলানো এ সি। "এক কথায় মিলানোই ইটালী, ইটালীই মিলানো" —বলেছেন ইউরোপের প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ্ পুসকাস। এবার ইউরোপ কাপের ফাইনালে মিলানোর কাছে পশ্চিম জার্মানীর প্রখ্যাত "হ্যামবুর্গ দলকে" ২—০ গোলে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। এ নিয়ে দু' বার মিলানো এ সম্মানের অধিকারী হলেন। ইতিপূর্বে ১৯৬২ সনে ইংল্যাণ্ডের "ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড" দলকে এদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। এবার সেমিফাইনালে বিগত বছরের ইউরোপ কাপ বিজয়ী পঃ জার্মানীর "ব্যাভেরিয়া মিউনিক" দলকে পরাজিত করে মিলানো ফাইনাল খেলবার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। অপর পক্ষে হ্যামবুর্গ দলকে ইংল্যাণ্ডের "কার্ডিফ সিটি" দলকে পরাজিত করে মিলানোর সম্মুখীন হতে হয়েছিল, বিগত দু' বছর ইউরোপ কাপের অধিকারী ছিল পঃ জার্মানীর ব্যাভেরিয়া মিউনিক ও ডুটমণ্ড দল। হ্যামবুর্গ দলের ফাইনাল খেলার যোগ্যতালাভের সাথে সাথে ইউরোপের বিভিন্ন কোনে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছিল এবারেও ইউরোপ কাপ জার্মানীর দখলে থাকবে কিনা? তাই এবারকার ইউরোপ কাপের খেলায় উত্তেজনা ও গুরুত্ব দুই-ই ছিল। কিন্তু মিলানো জার্মানদের সে আশায় বাদ সেধেছে। যদিও এবার জার্মানীর লীগের কোঠায় হ্যামবুর্গ দলের স্থান মাঝামাঝি তা হলেও একাধিক জাতীয় দলের খেলোয়াড়ের সমন্বয়ে গঠিত হ্যামবুর্গ ইউরোপের প্রথম সারির দলগুলির অন্যতম। এদের রক্ষণ ভাগের সুনাম ইউরোপের ক্রীড়ামহলে যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু তবুও পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পায় নি হ্যামবুর্গ দল। দলের বিপর্যয়ের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে শিক্ষক ক্রেফেল নির্দ্বিধায় বলেছেন—"মিলানো ভীতিই এ পরাজয়ের অন্যতম কারণ। তা ছাড়া উৎকর্ষে ও যোগ্যতায় মিলানো আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দল।"

ইটালীর প্রখ্যাত ধনী ব্যবসায়ীদের দল মিলানো এ সি। এবার ইটালীর লীগ বিজয়ী। ইতিপূর্বেও নয়বার এ সম্মানের অধিকারী। সাধারণত ইটালী ও ইউরোপের প্রখ্যাত পেশাদার খেলোয়াড়ের সমন্বয়ে গঠিত হলেও এবার পঃ জার্মানীর প্রাক্তন এফ সি কোলন দলের স্নেলিংগার ও সুইডেনের গোটেবুর্গ দলের হাম্রিন ছাড়া সবাই ইটালীর খেলোয়াড়। যাদের মধ্যে রয়েছে ইউরোপের প্রথম সারির মর্যাদা প্রাপ্ত আংগোয়েলিটি, লোডেটি, রিভেরা, প্রাটী ও সোরমানীর মত প্রখ্যাত খেলোয়াড়বৃন্দ। রিভেরা আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেফট-ইন। চব্বিশ বছরের রিভেরা শুধু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ই নয়, পৃথিবীর সবচেয়ে দামী খেলোয়াড়ও। মিলানো দলে রিভেরার দাম প্রায় ছয় শত হাজার পাউণ্ডের মত।

মিলানো দলের জয়লাভের পেছনে রয়েছে রক্ষণ ও আক্রমণ দু' তরফেরই অবদান। তা হলেও রক্ষণভাগে স্নেলিংগার ও আংগোয়েলিটি এবং আক্রমণভাগে রিভেরা প্রাটী ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে সমালোচকদের বিচারে। রক্ষণ ভাগে স্নেলিংগারকে অতিক্রম করা হ্যামবুর্গ দলের পক্ষে কোন সময়ই সম্ভব হয় নি। অপর সহযোগী খেলোয়াড় আংগোয়েলিটি শুরুতেই হ্যামবুর্গ দলের আক্রমণ ভাগের পুরোধা ওয়ে সিলারকে সতর্ক প্রহরীর মত আগলে রাখায় হ্যামবুর্গের সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা মাঝ মাঠেই মারা পড়েছে। অপর দিকে মিলানো দলের পুরোভাগে লোডেটি, হাম্রিন, সোরমানী ও রিভেরার সংঘবদ্ধ আক্রমণের দাপটে হ্যামবুর্গ দলের রক্ষণভাগ তচনচ হয়ে যায়। খেলার শুরুতেই দু দলের মধ্যেই প্রচণ্ড তীব্রতা পরিলক্ষিত হয়। তা হলেও মিলানো দলের ঝড়ের গতির কাছে হ্যামবুর্গকে মাথা নোয়াতে হয়েছে। রিভেরা অনলস কর্মীর মত সারা মাঠ ঘুরে সহযোগী খেলোয়াড়দেরকে আক্রমণ রচনায় সাহায্য করেছে। রিভেরা সম্পর্কে পঃ জার্মানীর জাতীয় দলের শিক্ষক হেলমুথ সেইন বলেছেন—"এক আশ্চর্য খেলোয়াড় রিভেরা। নিজের উপর রয়েছে অসামান্য আত্মপ্রত্যয়। যে কোনও খেলোয়াড়ের আদর্শ-স্থানীয় হওয়ার যোগ্য।"

মিলানোর পক্ষে জয়সূচক গোল দুটি করেছে দলের বর্ষীয়ান খেলোয়াড় সুইডেনের হাম্রিন। বয়স তেত্রিশের কোঠায়। কিন্তু খেলাতে জলুস এতটুকুও কমেনি। এখনও সুইডেনের জাতীয় দলে স্থান অটুট। প্রথম শ্রেণীর খেলা থেকে অবসর গ্রহণের কথা ভাবেন না হাম্রিন। হেসে বলেন—"স্যার স্টানলী ম্যাথুজের রেকর্ড ভাঙতে এখনও বেশ কিছু বছর হাতে রয়েছে"। মিলানো দলের অপর খেলোয়াড় সোরমানী ক্রীড়া সমালোচকদের বিচারে এ বছরের শ্রেষ্ঠ উদীয়মান প্রতিভা। উনিশ বছরের সোরমানী আজ ইটালীর অসংখ্য প্রখ্যাত ফুটবল দলের মধ্যে আলোড়ন ও প্রতিযোগিতা দুই-ই এনে দিয়েছে।

হ্যামবুর্গ দল পরাজিত হয়েও নিজেদের ক্রীড়া প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে দর্শকদের সামনে। খেলার শেষে দর্শকদের স্বতস্ফূর্ত অভিনন্দনেই তার প্রমাণ রয়েছে। গোল পরিশোধের জন্য হ্যামবুর্গ দল আপ্রাণ চেষ্টা করেছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। সব চেয়ে বড় কথা হল, খেলার গতি এতটুকুও ক্ষুণ্ন হতে দেয়নি হ্যামবুর্গ। বরঞ্চ বিভিন্ন সময়ে আক্রমণ রচনা করে খেলা প্রাণবন্ত করে তুলেছে। তবে হ্যামবুর্গ দলের পরাজয়ের জন্য রক্ষণভাগের অন্যতম হিন্নি সুলজকে সর্বাংশে দায়ী করা যেতে পারে। কারণ হাম্রিন ও সোরমানীকে সুলজ কখনও আটকাতে পারেন নি। তাই প্রাটি ও রিভেরার যোগ্য প্রচেষ্টায় হাম্রিনের পক্ষে গোল করা সহজসাধ্য হয়েছিল। হ্যামবুর্গ দলের পুরোভাগে ছোনিগ্ ও ডার্ফেলের খেলা উচ্চাঙ্গের হয়েছে। বিশেষ করে ডর্ফেল দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছে।

গোলরক্ষক ওসিয়ানের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলায় হ্যামবুর্গ অধিক গোলে পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। আক্রমণভাগে জার্মানীর জাতীয় দলের অধিনায়ক ওয়ে সিলার নিজের সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেন নি। কারণ, শুরুতেই মিলানো দল সিলারের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল। বত্রিশ বছরের সিলার বিগত সপ্তাহে প্রথম শ্রেণীর খেলা থেকে অবসর গ্রহণের কথা ঘোষণা করে সমর্থকদের চমৎকৃত করে দিয়েছেন। দীর্ঘ চৌদ্দ বছরের ক্রীড়া জীবনে সিলার জার্মানীর জাতীয় দলে উনষাটবার খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। বিগত বিশ্ব কাপে সিলারের অধিনায়কত্বে জার্মানী রানার্স-আপ-এর গৌরব লাভ করেছিল।

মিলানো দলের শিক্ষক রকো সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন—"হ্যামবুর্গ দলের বিরুদ্ধে ২—০ গোলে জয়লাভ আমাদের ক্রীড়া প্রতিভার এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর। আমরা শুধু ইউরোপ কাপ নিয়েই দেশে ফিরছি না, সেই সংগে নিয়ে যাচ্ছি হ্যামবুর্গ দলের আত্ম-প্রত্যয়, দৃঢ়তা ও সহনশীলতার শিক্ষা, যা আমাদের খেলোয়াড়দের আরও সাফল্য এনে দেবে। এর চেয়ে বড় লাভ খেলোয়াড় জীবনে আর কি হতে পারে?"

দিব্যেন্দুবিকাশ চৌধুরি
স্টুটগার্ট—পঃ জার্মানি

ক্রীড়া কাল

অর্জুন খেতাবপ্রাপ্ত বাংলার তিনজন

ক্রীড়াকীর্তির স্বীকৃতিস্বরূপ ভারত সরকারের কাছ থেকে ১৯৬৭ সালে বাংলার যে তিনজন ক্রীড়াবিদ অর্জুন পুরস্কার পেয়েছেন জগৎজননী ক্লাবের তরফ থেকে তাঁদের সম্বর্ধনার এক আয়োজন করা হয়। নীচে তিনজন ক্রীড়াবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

প্রেমজিতলাল—১৯৪০ সালের ২০শে অক্টোবর কলকাতায় প্রেমজিতলালের জন্ম। ১৪ বছর বয়সে টেনিসে হাতেখড়ি। কোচ ভারতের প্রথম এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন দিলীপ বসু। দুবার জাতীয় জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপ এবং তিনবার অল ইণ্ডিয়া হার্ডকোর্ট চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের পর ১৯৫৮ সালে প্রেমজিতলালের জুনিয়র উইম্বলডন জয়। পরের বছর থেকে ডেভিস কাপে ভারতের নিয়মিত খেলোয়াড়। বিদেশে এবং ভারতের মাটিতে প্রেমজিতলালের অনেক কীর্তি। জয়দীপ মুখার্জির সঙ্গে ডাবলসের জুটি হিসাবে ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালে পর পর দুবার কৃষ্ণন ও কুমারকে হারিয়ে জাতীয় ডাবলসে বিজয়ী হয়েছেন। তা ছাড়া ড্রুবনী ও প্যালাফক্স, বুকোলজ ও গ্রাণ্ট এবং যুবোনোভিক ও পিলিক-এর মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড়দেরও জয়দীপ-প্রেমজিতের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে।

দীর্ঘদেহী এবং মারমুখী খেলোয়াড় প্রেমজিতলাল টেনিসের এক সুনিপুণ শিল্পী। ভারতের খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রেমজিতের সার্ভিস সবচেয়ে জোরালো। ফোর হ্যাণ্ডের মারে পৃথিবীর প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়দের প্রায় সমকক্ষ। ব্যাক হ্যাণ্ডে স্লাইসড শটের প্রবণতা বেশি। বিদেশ সফরে এবং উইম্বলডন ও ফরেস্ট হিলে বহু বিশ্বখ্যাত টেনিস খেলোয়াড়দের প্রেমজিতের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে। এদের মধ্যে ব্যারী ম্যাকে, স্নিড, লুই আয়েলা, উলরিচ, বুংগার্ট, নিউকোম্ব প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

থঙ্গরাজ—বহুদিন থেকে ভারতীয় ফুটবলের এক নম্বর গোলরক্ষক থঙ্গরাজ প্রথম জীবনে ছিলেন সেণ্টার ফরোয়ার্ডের খেলোয়াড়। খেলতেন মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টার সামরিক দলে। একদিন খেলার সময় দলের গোলরক্ষক আহত হয়ে মাঠ ত্যাগ করলেন। থঙ্গরাজের উপর গোলরক্ষার ভার পড়ল। গোলে এত ভাল খেললেন যে তার পর থেকে ঐ স্থানই তাঁর পাকা হয়ে গেল।

১৯৫৫ সাল থেকে থঙ্গরাজ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন। অলিম্পিক, এশিয়ান গেম, মারডেকা ফুটবল সব প্রতিযোগিতার ভারতীয় দলে ওর প্রথম নাম। সামরিক বিভাগের চাকরী ছেড়ে ১৯৬১ সালে থঙ্গরাজ কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে যোগ দেন। পরে ১৯৬৩-৬৪ দুই বছর খেলেন মোহন বাগানে। ১৯৬৫ থেকে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবে খেলছেন।

থঙ্গরাজ ভারতের সব চেয়ে দীর্ঘদেহী ফুটবল খেলোয়াড় তো বটেই, ওর মত অবয়ব বিদেশী দলের খেলোয়াড়দের মধ্যেও কম দেখা যায়। গোলরক্ষক হিসাবে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্যও বটে।

অরুণ সাহা—১০০ মিটার বাটারফ্লাই স্ট্রোকে ভারতীয় রেকর্ডের অধিকারী অরুণ সাহার কথা এর আগে ক্রীড়াকীর্তি স্তম্ভে লেখা হয়েছে।

১৯৫৮ সালে দিল্লিতে জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় অরুণ ১ মিনিট ১২.৪ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার বাটারফ্লাইতে জাতীয় রেকর্ড করেন। তার পর আরও দু'বার এই রেকর্ডের উন্নতি করেছেন। ১৯৬৫ সালে এই বিষয়ে তার সময় হয় ১ মিনিট ৯.৯ সেকেণ্ড। শেষ পর্যন্ত কলোম্বোতে ভারত-সিংহল সাঁতার প্রতিযোগিতায় রেকর্ড-সময়কে আরও কমিয়ে এনে ১ মিনিট ৯.১ সেকেণ্ডে দাঁড় করান।

মানিকতলার বিখ্যাত সাহা পরিবারের ছেলে অরুণ। নিজেদের বাড়ির পুকুরে অরুণের সাঁতারের সূচনা এবং একটি বাড়ি নিয়ে জগৎজননী ক্লাব। অরুণের ধ্যান-জ্ঞান, সবই সাঁতার। সাঁতার নিয়েই জীবনের সাধনা। সংবর্ধনার উত্তরে বলেছেন, 'সকলের শুভেচ্ছাই আমার সাফল্যের সোপান তবে সাফল্যের পথে আমার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মধ্যে কোন খাদ ছিল না। আগামী দিনের তরুণেরা যদি আমার চেয়ে বেশী আন্তরিকতার পরিচয় দিয়ে সাঁতারক্ষেত্রে আমার রেকর্ড ম্লান করে দেন, তবে আমিই হব সবচেয়ে সুখী।'

মুকুল

অরণ্যদেব ★ লী ফক

উদ্ধারকারী জাহাজে.....

ওই আমাদের জাহাজটা ডুবে গেল!

ভাগ্যিস এই বড় জাহাজটা এসে পড়েছিল!

রাউডি, আমাদের জাহাজটা ডুবে যাচ্ছে!

সবাই গিয়ে বড়-জাহাজে আশ্রয় নিয়েছে, শুধু আমরাই পড়ে রইলাম!

বাঁচাও... বাঁচাও!

যতই চেঁচাও, গলা অতদূর পৌঁছবে না!

কীলা-উয়ির সোনা-বেলায় রাউডি আর তার সঙ্গিনী.....

হয়ত এই নিশানা ওদের চোখে পড়তে পারে!

কিছু দেখতে পাচ্ছ?

!

রাউডি আমাদেরও একটু জায়গা দাও!

দূর হ, জায়গা দিতে পারব না!

!

ব্যাটা তখন আমাদের জায়গা দেয়নি।

নাঃ, কিছু দেখছি না!

1/7

রাউডি, আমাদের ফেলে রেখেই ওরা চলে যাচ্ছে!

ব্যাটারা আমাদের দেখেছিল, তবু নিল না!

উঃ, কী বিচ্ছিরি বালি। কাদার মত শরীরে আটকে যাচ্ছে। সব যে হলুদ হয়ে গেল!

বালির সঙ্গে কিছু মিশে আছে, মনে হয়।

খাঁটি সোনা মিশে আছে.....

সারা শরীরে হলুদ কাদা.....

জুতোর মধ্যেও কাদা ঢুকে গেছে.....

অরণ্যের লোকেরা আড়াল থেকে দেখছে.....

বিদেশী মানুষ...

অরণ্যদেবকে খবর দিতে হবে!

৬

এ-ভি-এম-এর "দো কলিয়াঁ" ছবিতে বিশ্বজিৎ ও মেহমুদ

বোম্বাই বিচিত্রা

চলচ্চিত্রের চালচিত্রে এখন নিত্য নতুন নকশা সংযোজন হচ্ছে। চলচ্চিত্র ব্যবসায় লক্ষ্মী বর্তমানে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত। এ পঙ্কে দু/একটি পদ্মফুল ফুটলেও তার দ্বারা পঙ্কোদ্ধার হচ্ছে না। সুতরাং চলচ্চিত্র জগৎ এখন হাপিত্যেশ করছে আর প্রতীক্ষা করছে কোন অবতারের—যিনি এসে চলচ্চিত্র রাজ্যকে রামরাজ্যে পরিণত করবেন! একজন বললে, সে গুড়ে বালি, এটা 'ব্ল্যাক মার্কেটের' যুগ। এখন দেশে মানে 'ক্রুক রেকর্ড' বা 'জাতের মাল মিন্ট' লোকের ঘরে ঘরে প্রবেশ করেছে আর 'রামরাজ্য' রচিত হচ্ছে টেকনি-কালারে। এ বক্তাকে সমর্থন করে অন্যজন বললেন, 'এ যুগে লুথার কিং বা রবার্ট কেনেডি আততায়ীর হাতে নিহত হবেন—নিহত হবার পর বড় বড় সভা হবে, সারা বিশ্ব কয়েকদিন শোকে মুহ্যমান থাকবে, পৃথিবীর সমস্ত সংবাদপত্র চোখের জলে ভেজা সম্পাদকীয় ছাপবে, তারপর আবার যেমন চলছিল তেমনি চলবে।' তৃতীয় বক্তা বললেন, 'তার মানে সব কিছুই নিয়তির হাতে ছেড়ে দিয়ে আততায়ীর হাত থেকে আত্মাকে সযত্নে রক্ষা করে নির্বিকার বসে থাকো, সমস্যার সূচগুলো অমনিই ভোঁতা হয়ে যাবে বা সূচীবিদ্ধ হতে হতে একদিন শরশয্যাও সয়ে যাবে। গণতন্ত্রের যুগে সহনশীলতাই সবচেয়ে বড় গুণ, সহনশীলতার গুণেই সহ অবস্থান সম্ভব হবে এবং সহঅবস্থানে অভ্যস্ত হয়ে গেলেই গায়ের চামড়াও মোটা হয়ে যাবে। তখন আর কোন সমস্যাই থাকবে না।'

তৃতীয় বক্তার জ্ঞানগর্ভ বাণী শোনার পর সকলেই চুপ করে গেল। খানিকক্ষণের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে হঠাৎ অট্টহাসে ফেটে পড়লেন এক প্রবীণ চরিত্র অভিনেতা। তিনি বললেন: 'এসব ছেঁদো কথার কোন মানে নেই। দাম নেই অর্থে মূল্য নেই। এই যে আমার সাদা চুলগুলো দেখছো, হলপ করে বলতে পারি এর একটিও রোদ্দুরে পাকে নি। আর এত বছর যদি কোনরকমে কাটিয়ে দিতে পারি তাহলে সাড়ম্বরে আমার ফিল্ম কেরিয়ারের গোল্ডেন জুবিলী পালিত হবে, ততদিনে যদি তোমাদের চেষ্টায় আমার ফিল্ম কেরিয়ার 'ট্রিফল-কেরিয়ারে' পরিণত না হয় তাহলে তোমাদের সবাইকে ডিনারে ডাকব সেটাও এখন থেকেই অ্যানাউন্স করে রাখছি।' প্রবীণ চরিত্র অভিনেতার এক অর্বাচীন ভক্ত টিপ্পনী কাটলো, 'একচল্লিশ বছর যাবৎ অন্যের লেখা ডায়লগ বলে বলে আপনার এমন অবস্থা হয়েছে যে, নিজে কিছু বলতে গেলেই সেটা বাজে কথা ছাড়া আর কিছুই হয় না, হালকা ভণিতার গাঢ় চাপে আপনার গম্ভীর বক্তব্যকে খুঁজে পাওয়া দায় হবে একটু পরেই, সুতরাং চটপট কাজের কথায় আসুন।' প্রবীণ চরিত্র অভিনেতার সহনশীলতার জবাব নেই। মৃদু হেসে তিনি বললেন, সব কাজের কথা অভিনীত চরিত্রগুলোর মুখ দিয়ে দেশ-বাসীকে শোনানো হয়ে গেছে। আজ দীর্ঘদিন যাবৎ যেসব চরিত্রে অভিনয় করেছি তার এক ভগ্নাংশও যদি তোমাদের প্রভাবিত করত তাহলে তো কোন ভাবনাই থাকতো না। আজকাল তোমরা, আমরা কি বলছি তা না শুনে আমরা কি করছি তাই দেখতে চাইছ। সব গণ্ডগোল সেইখানে। আমরা চিত্রজগতের চুনোপুটি থেকে শুরু করে রুই কাতলা সবাই আমাদের বায়স্কোপের মাধ্যমে যেসব হিতকথা লোককে শুনিয়ে থাকি সেদিকে আজকাল কেউ কর্ণপাতই করছে না। আজ পর্যন্ত একটা ছবির নাম করতে পার যে ছবিতে আমরা অসৎচরিত্রকে শাস্তি দিইনি। এমন ছবি কখনো তৈরী হতে দেখেছো এই পবিত্র গঙ্গামায়ের দেশে যেখানে মাতালকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে বা কালো টাকার গুণ গাওয়া হয়েছে। আমাদের ছবির নায়িকারা যতই বগলকাটা জামা পরুক, আর যৌন উত্তেজক অঙ্গভঙ্গী করুক তাদের মত চরিত্রবতী (চলচ্চিত্রে) কোথায় খুঁজে পাবে আজকের এই ভারতে। আমাদের ফিল্মের প্রতিটি ফ্রেম যেন আগুনে আঁকা। আমাদের ছবির গান, "সজন রে ঝুট মাত বোলো খুদাকে পাস জানা হ্যায়"। তবু আমাদের কথা কেউ বিশ্বাস করে না। না সরকার না পাবলিক। আরে বাবা আমরা অবতার নই, সমাজ সংস্কারক নই, ধর্মপ্রবর্তক নই, এমন কি স্কুল মাস্টারও নই। আমরা ছিলাম ভাঁড়। লোককে হাসিয়ে কাঁদিয়ে, ছলে বলে কৌশলে [illegible] আমাদের দল চালাচ্ছিলাম। কোথা থেকে কিছু লোক এসে সব গুলিয়ে দিল। বলে কিনা প্রযোজকদের ভেতরে সমাজ সেবার অসাধারণ ক্ষেত্র আছে। এরা ছাড়া আর একদল লোক আমাদের ফিল্ম ইনডাস্ট্রির অসাধারণ ক্ষতি করেছে। এরা হচ্ছে এই ফিল্ম জার্নালিস্ট-এর দল, আমরা কখন হাঁচি, কখন যাক সে কথা, কী খাই, কোন বাড়িতে কটা কোন মডেলের গাড়ি আছে, অন্দরমহলে কেমন সাজপোশাক করি সব কিছু লিখে ছবি ছাপিয়ে একেবারে সর্বনাশ করে দিয়েছে। বহুদিন যাবৎ আমরা অন্য-জগতের মানুষ ছিলাম। যতদিন সাধারণ লোক আমাদের দূরে সরিয়ে রাখত ততদিন বেশ ছিলাম। এখন জনসাধারণের ভালবাসা সম্মান এসব পেতে গিয়েই আমাদের ছাতুর হাঁড়ি হাটে ভেঙে গেছে। এখন ঠ্যালা সামলাও। পপুলারিটির পাপ বৃক্ষে যেসব ফল ফলেছে তা এখন আমাদের খেতেই হবে। হজম করতে পারি আর নাই পারি।' প্রবীণ চরিত্র অভিনেতার অর্বাচীন ভক্ত আবার টিপ্পনী কাটলো, 'এতক্ষণ আপনার কথা শুনলাম তবু আপনার বক্তব্য স্পষ্ট হল না।' এবার চরিত্র অভিনেতা একটু ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'কেন আমি কি এতক্ষণ ধরে কোন আধুনিক

[illegible] পাঠ করলাম, যে আমার বক্তব্য বোঝা [illegible] না। আসলে তোমাদের মাথায় [illegible]-এর কুয়াশা ভর্তি। কিছুই স্পষ্ট [illegible] না তোমরা। এবার আসল কথা [illegible]। [illegible]তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান আছে? [illegible] কখন পৃথিবীতে অবতারের [illegible] হয়? যখন পাপের পাল্লা ভারী [illegible] মাত্রায় ভারী হবে তখনই [illegible] অনিবার্য হবে। আমাদের [illegible] সমস্যা সৃষ্টি করার। সমাধানের ভার ভগবানের ওপর। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা [illegible] আমরা ভগবৎ-প্রতিভর আবির্ভাবকে আরো বিলম্বিত করছি। ভগবান অন্তরীক্ষে [illegible] দেখছেন। তিনি ভাবছেন মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা হবার চেষ্টা [illegible] টিটকিরি শুনতে শুনতেই [illegible], এখন যদি ভগবানের [illegible] তো আর [illegible] এসে নিজে পাপ [illegible] আরো পোক্ত [illegible] স্মরণ করে [illegible] ইচ্ছে [illegible] কিছু করি [illegible] শুনেছে হায় [illegible] হায় [illegible] সুতরাং [illegible] ঠিক ঠিক বললাম না। কিন্তু [illegible] পাচ্ছেব [illegible] ইচ্ছায়, তাহলে আমি পাপ করলে আমাকে পাপী বলা হয় কেন?" [illegible] সুতরাং এ প্রশ্ন আমাদের। [illegible] তিনি যদি চুপ [illegible] বসে থাকেন তার দায়িত্ব আমাদের [illegible]।"

তপন সিংহ পরিচালিত "আপনজন" ছবিতে চিন্ময় রায়, রোমি চৌধুরী ও দিলীপ রায়
ফটো—দেশ

প্রবীণ চরিত্র অভিনেতা যখন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন, তখন সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার। দূর থেকে একটা পুরোনো গানের আওয়াজ ভেসে আসছে: "চাহে কৈ মুঝে জংলী কহে। কহনে দো জী কহতা রহে!"

সরল শর্মা

বঙ্কিমচন্দ্র সেনের মৃত্যুতে শোকসভা

দেশ পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক, দেশসেবক ও ভক্ত-বৈষ্ণব বঙ্কিমচন্দ্র সেনের মৃত্যুতে খিদিরপুরে অবস্থিত সঙ্গীত সংস্থা "সুরবিতান" এক অনাড়ম্বর ঘরোয়া শোকসভায় গত ১০ই জুন সকালে তাঁর পবিত্র আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শ্রীরবীন্দ্র বস্, সভার কার্য পরিচালনা করেন এবং বলেন, "স্বর্গত বঙ্কিমবাবু ছিলেন একদিকে নিষ্ঠাবান সমাজ সেবক, পরমবৈষ্ণব এবং অন্যদিকে ছিলেন নির্ভীক সাংবাদিক, বলিষ্ঠ দেশসেবক এবং অতি উচ্চস্তরের সাহিত্যিক। আদর্শ গুণসম্পন্ন চরিত্র মাধ্যমে তিনি অনেকের অন্তর জয় করেছেন এবং কর্মজীবনে বহু প্রতিষ্ঠানে স্বাক্ষর রেখে গেছেন।"

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত "দুরন্ত চড়াই" ছবিতে সবিতা চ্যাটার্জি ও দিলীপ রায়

বাংলা ছবির আবশ্যিক প্রদর্শনী

রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র গত সপ্তাহে সাংবাদিকদের বলেন, রাজ্যের প্রত্যেক চিত্রগৃহে বাংলা ছবি আবশ্যিক প্রদর্শনের ন্যূনতম সময় নির্দিষ্ট করার প্রস্তাবটি অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য সরকার এক আদেশ জারি করতে চান। কীভাবে তা করা সম্ভব, তার খুঁটিনাটি বিচার করে দেখা হচ্ছে। মহারাষ্ট্র সরকারের সংশ্লিষ্ট আদেশটি এই সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। বর্তমানে 'সিনেমা নিয়ন্ত্রণ আইন'-এর একটি ধারা অনুযায়ী এরূপ আদেশ জারি করা সম্ভব বলে মনে হয়।

তিনি বলেন, রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর এই আইন তাড়াতাড়ি চালু করার ব্যাপারে আগ্রহী।

মেলবোর্নে বাংলা ছবি চলবে

মেলবোর্নের ইউনিভার্সিটি-পাড়া কার্লটনে এক প্রৌঢ় গ্রীক দম্পতি একটা তরকারির দোকান চালান। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে প্রায়ই সন্ধ্যায় তাঁর দোকানের সামনে একবার গাড়িটা থামাই, কারণ এই দোকানটাতে বড় বড় বেগুন, শালগম, পালং শাক, পুঁই শাক, কাগজি লেবু এবং কপালে ভালো থাকলে মাঝে মাঝে দুর্দান্ত ঝাল কাঁচা লংকা পাওয়া যায়।

সেদিন একলা ছিলুম। দোকানের সামনে গাড়ি থামাতেই নজরে পড়ল একটা বিরাট সচিত্র পোস্টার—গ্রীক ভাষায় লেখা, কিন্তু যার ছবি সেই পোস্টারে আঁকা, সেই মুখটি যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। ও হরি! এতো দেখি আমাদের শাম্মি কাপুর। একটু একটু গ্রীক ভাষা যা জানি, তার সাহায্যে পোস্টারটির পাঠোদ্ধার করলুম। পোস্টারটি একটা সিনেমার বিজ্ঞাপন, গ্রীকদের সিনেমা হল রিচমণ্ড এলাকার ব্রীজ রোডের ন্যাশনাল সিনেমায় একটা হিন্দি সিনেমা দেখানো হবে—নাম "প্রোফেসর", নাম ভূমিকায় শাম্মি; টিকিট বিক্রি হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। দোকানদার বললে, আগে থেকে সিট বুক না করলে জায়গা পাবো কিনা বলা যায় না। এত নাকি ভীড় হয়।

মেলবোর্নে ভারতীয় ছবি দেখানো হয় না তা নয়। সত্যজিৎ রায়ের ছবি এখানে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মাঝে মাঝে দেখানো হয়। তিনিই শুনেছিলাম, একমাত্র ভারতীয় চিত্রপরিচালক, যাঁর ছবি অস্ট্রেলিয়াতে ব্যবসায়ীরা দেখিয়ে দু' পয়সা পান। হিন্দি ছবিও যে এখানে নিয়মিত দেখানো হয়, তা জানতুম না।

এখানে শহরতলীর সিনেমা হলগুলিতে সন্ধ্যায় মাত্র একবার সিনেমা দেখানো হয়, ছুটির দিনে ম্যাটিনি থাকে। সব সিনেমা হলেই একটা করে রেস্তোরাঁ থাকে, সবাই সেখানে রাতের খাওয়া সেরে সিনেমায় ঢোকে। রেস্তোরাঁ খোলে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়, সিনেমা শুরু হয় সাড়ে সাতটায়। তবে মূল ছবির সঙ্গে অন্য ছবিও দেখানো হয়—সব মিলিয়ে রাত এগারোটায় আসর শেষ। চার ঘণ্টায় দুটো বা তিনটে ছবি দেখানো হলেও টিকিটের দাম কিন্তু একই থাকে। টেলিভিশনের সঙ্গে প্রতি-যোগিতায় টিকে থাকতে হলে, তা করতেই হবে।

সিনেমায় ঢুকে দেখি, একটা সিটও খালি নেই। খালি গ্রীক নয়, ইতালিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান, পোলিশ, পাকিস্তানী, ইন্দোনেশিয়ান, মালয়েশিয়ান—সব দেশের লোকই সেখানে দিব্যি আসর জমিয়ে বসেছে। হলের ম্যানেজার বললেন, হিন্দি ছবি এলেই এই রকম সাংঘাতিক ভিড় হয়; আপনি এই প্রথম এলেন তাই অবাক লাগছে।

ছবি শুরু হল। তিন ভাষায় সাব-টাইটেল—গ্রীক, আরবি আর ইংরিজি। পর পর তিন লাইনে তিন ভাষায় খুদে খুদে অক্ষরে সাব-টাইটেল পড়তে চোখ ব্যথা হয়ে যায়। তারপর অনেক সময়, বেশির ভাগ জায়গাতেই ছবির সংলাপের সঙ্গে সাব-টাইটেলের মিল নেই, দেখলেই বোঝা যায়, খুবই তাড়াহুড়ো করে, অত্যন্ত অযত্নের সঙ্গে কাজ সারা হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হল সাব-টাইটেল পড়ার কষ্ট স্বীকার কেউই করছে না, সকলেই ভাষা না বুঝলেও দিব্যি গল্প বুঝতে পারছে। আর যেই না নাচ-গানের ঘটা, তখন কি তাল দেওয়ার ধুম! হল একেবারে ফেটে যাবার যোগাড়। আমার মাঝে মাঝে সিটি মেরে কলকাতার খিদিরপুরের আবহাওয়া সৃষ্টি করার দারুণ ইচ্ছা হচ্ছিল, কেবল আমার স্ত্রীর তাড়নায় সেটি করা হল না।

"বন কি চিঁড়িয়া" থেকে শুরু করে বোল রাধা বোল-মার্কা সব রকম হিন্দি ছবির সঙ্গে ছোটো বয়স থেকে শুরু করে এই প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত মোকাবিলা হয়ে গেছে, হিন্দি ভাষার বিরোধী হলেও অনেকে হিন্দি ছবি দেখতে কেন ভিড় করে—তাও আমার অজানা নয়। কিন্তু মেলবোর্নে বিদেশী-দের হিন্দি ছবির প্রতি এত আগ্রহ কেন, সত্যি প্রথমটায় বুঝতে পারিনি। বুঝলাম কিছুদিন পরে যখন নিয়মিতভাবে কিছুদিন গ্রীক ছবি দেখা অভ্যাস হয়ে গেল।

গ্রীসেও আমাদের বোম্বাইয়ের মত প্রচুর অতি সাধারণ কিন্তু খুবই 'এনটারটেনিং' ছবি তৈরি হয়। তার কাহিনী হিন্দি ছবির মতই অতি সহজ সরল, নাচ-গান, মারামারি, খুনোখুনি, মান-অভিমান, বিরহ-মিলন—সব আমাদের হিন্দি ছবির ঢঙে সাজানো। ছবি আরম্ভ হবার তিন মিনিটের মধ্যেই বোঝা যায়, ছবির গতি শেষ পর্যন্ত কি হবে। নায়িকা হিন্দি ছবির

নায়িকার মতই প্রথমেই নায়কের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দেয়, শেষে সব বাদ-প্রতিবাদ, ঝগড়া-ঝাটি, ভুল বোঝাবুঝি মিটে গিয়ে যুগল মিলন দেখিয়ে ছবি শেষ। হিন্দি ছবির নায়িকার মতই তারা কথায় কথায় জলতরঙ্গ অর্কেস্ট্রার সঙ্গে যেখানে সেখানে গান জুড়ে দেয়, একটুতেই তাদের চোখে জল চলে আসে, খলনায়ক ছবির শেষে হঠাৎ দারুণ ভালো হয়ে গিয়ে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে, নায়িকা শেষে তার অবস্থা এবং বয়স অনুযায়ী খলনায়কের বোন, না মেয়ে, বা মা হয়ে যায়। বেশির ভাগ ছবির নাট্য-মুহূর্ত গড়ে ওঠে নায়ক-নায়িকার বিয়ে বা মেলামেশা নিয়ে। বাবা-মা কিংবা খলনায়কের আপত্তি নিয়ে অথবা [illegible] নিয়ে গ্রামের সরল [illegible] নায়কের (বা খলনায়কের) [illegible] শেষে কিভাবে নিজের 'সব কিছু হারিয়ে' নিজের বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ [illegible] এই হচ্ছে অধিকাংশ গ্রীক [illegible] ছবির বিষয়বস্তু। কিছু ছবি [illegible] ওয়েস্টার্ন ছবির নকল, কিছু [illegible], কিছু আবার ওয়েস্ট-[illegible] ঢঙে পরিকল্পিত। [illegible] ঘোড়সওয়ার নায়কের [illegible] মোটর নিয়ে [illegible] কোনরকম [illegible] মারধাকি, [illegible] অনুসরণ— [illegible] প্রেম-সংঘর্ষ-মৃত্যু-মিলন—এই [illegible] কাহিনী বিন্যস্ত।

আমাদের সাধারণ হিন্দি ছবি সেইজন্য [illegible] গ্রীক ইটালিয়ানদের এত প্রিয়। [illegible] হিন্দি ছবির চাষী যেমন [illegible] শার্ট-প্যান্ট পরে স্ল্যাকস্ পরা [illegible] সঙ্গে বিচিত্র রকমের হিন্দি ভাষায় আলাপ করে, এদের নায়কও কাউবয়দের মত প্যান্টপরা চাষী সেজে মিশরের মেয়েদের মত পোশাক পরা নায়িকার সঙ্গে ঝোপ জঙ্গলে বসে দিব্যি গলা ছেড়ে একটা পুরো অর্কেস্ট্রার সঙ্গে জমিয়ে গান জুড়ে দেয়। আর কি আশ্চর্য, না শুনলে বিশ্বাস করবেন না—সেই গানের সুরও আমাদের হিন্দি গানের সুরের মত। নায়ক বা নায়িকা বিপদে পড়লে সবাই এক সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, খলনায়ককে দেখলেই 'মার শালাকে' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। বাড়তির মধ্যে এরা পায় ভারতীয় নায়িকাদের কোমল ললিত দেহভঙ্গী, আর তাদের সংখ্যাহীন সঙ্গিনীদের সমবেত নাচ-গান। গ্রীক ছবির নায়িকারা, আমি লক্ষ করে দেখেছি, প্রায়ই নিঃসঙ্গ: আমাদের নায়িকাদের মত সব সময় অনসূয়া প্রিয়ংবদা নিয়ে ঘোরে না। হাসি তামাশা ভাঁড়ামি—সবই আমাদের ছবির মত, কেবল তফাত এই, এদের ভাঁড়রা কথায় কথায় 'চেয়ার কে বাচ্চে', কিংবা 'হেলিকোপ্টার কে বাচ্চে' বলে বাপ তুলে হাস্যরস সৃষ্টি করে না। এরা বোধ হয় জানে না, ভারতীয় দর্শনে গাছ, মাটি, পাহাড় সব কিছু সজীব প্রাণবন্ত, সেইজন্যই মানুষের বাপ চেয়ার বা হেলিকোপটার হতে বাধা নেই। এই একটা দিকেই দেখলাম বেচারারা পুরোপুরি হিন্দি হতে পারেনি।

"সাবরমতী" (পরিচালনাঃ হীরেন নাগ) চিত্রে উত্তমকুমার, পাহাড়ী সান্যাল ও পদ্মা দেবী। ফটো—দেশ

তা সে যাই হোক, ন্যাশনাল সিনেমা হলে তার পরেও অনেক হিন্দি ছবি দেখতে দেখতে পাশাপাশি আর একটা দৃশ্য মনে ভেসে উঠলো। সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখানো হচ্ছে মেলবোর্নের নামকরা সিনেমা হলে—বিগ সিটি (মহানগর), দি ওয়ার্ল্ড অব অপু (অপুর সংসার), দি গডেস (দেবী), চারুলতা, দি হিরো (নায়ক) ইত্যাদি। কারা সেইসব ছবি দেখে? বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ছাত্র, অস্ট্রেলিয়া-ইন্ডিয়া সোসাইটির সভ্য-সভ্যা, মেলবোর্নের একাধিক ফিল্ম সোসাইটির সদস্য, ভারত-প্রেমিক বিদেশী। সেই ছবি নিয়ে আলোচনা হয়, 'দি এজ' কাগজে কলিন বেনেট তা নিয়ে বিরাট প্রবন্ধ ফাঁদেন, তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। সবটাই বুদ্ধিজীবী সমাজের ব্যাপার। অবাঙালী ভারতীয়রা সেইসব ছবি দেখতে আসেন না—বলেন রায়ের ছবি আমাদের ভালো লাগে না। তাঁদের ভালো লাগবার কথাও নয়। কিন্তু সাধারণ অস্ট্রেলিয়ান কি খুব বেশি এসব ছবি দেখে? বোধ হয় না।

সত্যজিৎ রায়ের ছবি সকলের ভালো লাগবে না, হিন্দি ছবি ওয়ালারা সে কথা জানে। তাই তাঁরা তাঁদের ছবিগুলিকে কোনোরকমে একটু সাব-টাইটেল জুড়ে দিয়ে বিদেশের বাজারে—মধ্য-প্রাচ্য এশিয়ায়, গ্রীসে, কুয়ালালামপুরে পূর্ব আফ্রিকায়, ফিজিতে, মরিশাসে পাঠায়। এবং সেগুলি বেশ ভালো পয়সা পায়। অনেক ছবিই সাদা-কালোতে, কিছু ছবি রঙীন। কোনো-রকম প্রিটেনশন নাই—এমন অনেক বাংলা ছবিও তো আমাদের দেশে তৈরি হয়, যেমন ধরুন, "পাশের বাড়ি", "মণিহার", "অজানা শপথ" ইত্যাদি ধরনের ছবি। সোজা সরল গল্প, একটু নাচ-গান, একটু চোখের জল, শেষকালে যুগল মিলন—এরকম ছবি কি বাংলাদেশে হয় না জানতে চান? একা সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার, ঋত্বিক ঘটকই সব বাংলা ছবি করেন না। কোন বাঙালী ব্যবসায়ী যদি এই সব খুব সাধারণ অথচ প্রচুর নাট্যাবেগসমন্বিত বাংলা ছবি ইংরেজি ভাষায় মোটামুটিভাবে সাব-টাইটেল দিয়ে বিদেশে পাঠান, আমার মনে হয়, তা বেশ ভালো পয়সা পাবে। ইদানীং মাদ্রাজের প্রযোজকরা তাই করছেন, এবং বেশ ভালো পয়সা পাচ্ছেন। ভারতবর্ষে বাংলা ছবির বাজার ছোট। বিদেশে সেসব কোনো সমস্যাই নাই, মোটামুটি চলনসই ছবি হলেই লোকে নেবে। তবে বাংলা ছবির প্রযোজক-পরিচালকরা হিন্দি ছবির স্তরে নিজেদের নামাতে পারবেন কিনা, সেইটাই হচ্ছে আসল প্রশ্ন।

অতীন্দ্র মজুমদার
মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়

সাপ্তাহিক সংবাদ

দমদমে বিমান দুর্ঘটনা আলোচ্য সপ্তাহের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঝড়জলের মধ্যে গত ১২ জুন বুধবার শেষরাত্রি ১-২৭ মিনিটে দমদম বিমানবন্দরের দক্ষিণ প্রান্তে রাজারহাট থানার সলুয়া দশদ্রোণ গ্রামে ব্যাংকক থেকে আগত প্যান আমেরিকান এয়ার ওয়েজের বোয়িং ৭০৭ ক্লিপার ওয়ান বিমান দমদমে নামার ঠিক আগে দুটো নারকেল-গাছের মাথা উড়িয়ে বাতাবি নেবু, আম, লিচু, পেয়ারা গাছ ভেঙে হাজার কলাগাছের বাগান প্রায় সাফ করে বিমানটি মাঠে হুড়মুড় করে পড়ে যায়। বিমানে দশজন কর্মী সহ ৬৩জন আরোহী ছিলেন, এ ছাড়া আরও একটি কোলের শিশু ছিল। শিশুটিসহ তাদের ৫৮জনই উদ্ধার পান। একজন এয়ার হোস্টেস, দুজন মহিলা, দু-তিন বছরের একটি মেয়ে এবং একজন পুরুষ মিলে ছয় জনের দেহ আগুনে পুড়ে তালগোল পাকিয়ে যায়। সুস্থ পাঁচজন যাত্রী স্বদেশযাত্রা করেছেন।

দেশী সংবাদ

১০ জুন—ফিজো ও চীন-বিরোধী বৈরী নাগা নেতা 'জেনারেল' কাইটো বৈরীদের 'প্রধান সেনাপতি' জুহেতো এবং আরও দুজন 'উচ্চপদস্থ' ব্যক্তিকে বন্দী করেছেন। এরপর সারা নাগাভূমি জুড়ে বৈরীদের নিজেদের মধ্যে সংঘাত বাধতে পারে।

ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সহ লোকদলের ১৪ জন নেতা আজ কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যের আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র স্বয়ং এখানি গ্রহণ করে কংগ্রেস ভবনে জমা দেন।

১১ জুন—মঙ্গলবারের বৈঠকে যুক্তফ্রন্টের আসনের বিরোধ কমা ত দূরের কথা বেশ বেড়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত বিরোধ ছিল মাত্র ১০টি আসন নিয়ে; বৈঠকের শেষে দেখা গেল, বিরোধ এখনও ৩৫টি আসন নিয়ে।

কংগ্রেস সংসদীয় কমিটির সহকারী মুখ্য সচেতক শ্রীদ্বৈপায়ন সেন আজ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী এস পি সেনবর্মা সমীপে, পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্বর্তী নির্বাচন পিছিয়ে দেবার জন্য নতুন করে বক্তব্য পেশ করেন।

১২ জুন—আট হাজার ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন সরকারের কাছে এই আর্থিক বছরের মধ্যে ৪ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা চেয়ে এক জরুরী চিঠি দিয়েছেন।

পৌর কর্তৃপক্ষ বলে আসছেন গাড়ির অভাবেই কলকাতা শহরের জঞ্জাল-ময়লা সাফ হচ্ছে না। অথচ পৌর ওয়ারকশপে নাকি লরিট্রেলার সব সারাই হয়ে পড়ে আছে, কাজে লাগানো হচ্ছে না।

১৩ জুন—ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সেনবর্মা বৃহস্পতিবার কলকাতায় এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল যদি অন্তর্বর্তী নির্বাচনের দিন পরিবর্তনের জন্যে সরকারীভাবে তাঁর কাছে আবেদন করেন তাহলে সময়মত তা অবশ্যই বিবেচনা করে দেখা হবে।

১৪ জুন—গত শুক্রবার কোহিমার কাছে গুরুতর সংঘর্ষের সময় বৈরী নাগাদের কাছ থেকে যে সমস্ত কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়েছে তাতে জানা গিয়েছে যে, কম্যুনিস্ট চীনের সহায়তায় নাগাভূমির আইনসম্মত সরকারকে গদিচ্যুত করার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে।

১৯৬৪ সালের জানুয়ারীর পর যেসব উদ্বাস্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসেছেন, তাঁদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রের কাছে ২ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা মূলধন খাতে ব্যয়ের জন্য দাবি করেছেন।

১৫ জুন—আজ প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ১৯৬৮ সালের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফল খুবই শোচনীয়। এবার মোট ৯৩,৩৮২ জন ছাত্রছাত্রী এই পরীক্ষায় বসেন তাঁদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন মোট ২০,৮০০ জন। (পাশের হার মোটের উপর শতকরা ২২·২৮ জন।)

স্টেট-ট্রেডিং করপোরেশন নানা ধরনের ভারতীয় জিনিসপত্র বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং ও ছোটখাট শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করে বিশ্বের বাজারে সেগুলিকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে।

ক্ষমতাসীন হওয়ার আড়াই মাসের মধ্যেই বিহারের শাস্ত্রী মন্ত্রী সভা গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন। এই সংকট হয়ত পরিশেষে মন্ত্রিসভার পতন ডেকে আনবে। রাজ্যের তিনজন মন্ত্রী পদত্যাগ করায় এই সংকট দেখা দিয়েছে।

ক্যানিং-এ তৈলকূপ থেকে ব্যাপকভাবে তেল আহরণের কাজ আগামী জুলাই মাসের মাঝামাঝি শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে।

১৬ জুন—প্রায় একটানা প্রবল বর্ষণে আজ কলকাতা ও শহরতলির জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ মরশুমে এদিনই সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ৬৪·৬ মিলিমিটার। ঘন ঘন বজ্রপাতের ফলে একজন নিহত এবং নয়জন আহত হন।

মারকসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুন্দরাইয়া আজ বলেন, দলবিরোধী কাজ ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য অন্ধ্র প্রদেশ পরিষদীয় দলের নেতা উগ্রপন্থী শ্রীনাগিরেড্ডি সহ সব কয়জন উগ্রপন্থীকে দল থেকে সরাসরি বহিষ্কার করা হবে।

ভারতীয় জনসংঘের ওয়ার্কিং কমিটি আজ সমগ্র পূর্বাঞ্চল পুনর্গঠনের প্রশ্ন সম্পর্কে বিবেচনার জন্য অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞগণ সহ একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন নিয়োগের আহ্বান জানান এবং এই কমিশনের মতামত প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত আসাম পুনর্গঠনের বিষয়টি স্থগিত রাখতে বলেন।

নাগাভূমি শান্তি পর্যবেক্ষক দল বলেছেন যে, শেষ পর্যন্ত একটা হেস্তনেস্ত করার প্রস্তুতি হিসাবে বৈরী নাগারা সামরিক শক্তি অর্জনের জন্য যদি নাগাভূমিতে শান্তির সুযোগ গ্রহণ করে তাহলে শান্তির আর কোন অর্থ থাকে না।

বিদেশী সংবাদ

১০ জুন—চীন শত্রু রাষ্ট্রে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ার আতঙ্কে ভুগছে। বড় বড় ঘটনা সম্পর্কে সরকারী চীনা ভাষ্যে চীনের এই উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। পৃথিবীর অন্যসব রাষ্ট্র থেকে চীনের ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার এই উদ্বেগ সরকারী ভাষ্যগুলির মূল কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১১ জুন—রাষ্ট্রপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটিতে আজ পরমাণু অস্ত্র প্রসার রোধ চুক্তি অনুমোদিত হয়। কমিটি ৯২—৪ ভোটে চুক্তিটি অনুমোদন করেন। ফ্রান্স সহ ২২টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে।

১২ জুন—ফরাসী সরকার আজ সারা ফ্রান্সে সবরকম বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করে দেন। প্যারিস ও আরও আধডজন শহরে গতকাল থেকে দাঙ্গা আর ধ্বংসের ঝড় বয়ে যাওয়ার পরেই আজ মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে তথ্যমন্ত্রী ইভন গুয়েনা এই নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেন।

১৩ জুন—নিজেদের প্রশাসন ও সোভিয়েট সরকারের প্রশংসা করার জন্য প্রেসিডেন্ট জনসনের গতকাল রাষ্ট্রপুঞ্জে নাটকীয় আবির্ভাব ঘটে। যে কাজের জন্য এই প্রশংসা তাকে তিনি "জাতিসমূহের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ঘটনা" বলে অভিহিত করেন।

১৪ জুন—প্রধানমন্ত্রী উইলসনের শ্রমিক সরকার কমন্স সভার নির্বাচনে উত্তর ইংল্যান্ডের ওল্ডহাম ওয়েস্ট কেন্দ্রে বিরোধী রক্ষণশীল দলের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে।

১৫ জুন—সায়গন থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, রাজধানীতে নতুন কমিউনিস্ট আক্রমণের আশংকার মধ্যেও মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান সায়গনের উপকণ্ঠে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করে।

১৬ জুন—জাপানে গতকাল দেশব্যাপী পুলিস ও বামপন্থী ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে অন্তত ২৫০ জন লোক আহত হয়। বামপন্থী ছাত্ররা ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদে এবং জাপান থেকে মার্কিন ঘাটিগুলি তুলে নেবার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে পুলিসের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়।

পুলিসী সূত্রে জানা যায়, প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী সেনেটর ইউজিন ম্যাকার্থিকে হত্যার জন্য ভয় দেখানো হয়েছে। আজ রাত্রে তাঁর মেক্সিকোতে যাওয়ার কথা আছে।

সরকার পরিচালিত ফরাসী বেতার থেকে আজ ঘোষণা করা হয়েছে, সোরবোন বিশ্ব-বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। অবস্থা স্বাভাবিক হলে পরে আবার এই বিশ্ব-বিদ্যালয় খোলা হবে।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

*

দেশ

৩৫ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৩৫
শনিবার ১৫ আষাঢ়, ১৩৭৫

*

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮০ ২৩-৮৫৪১

*

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	... ২৫.০০
ষান্মাসিক	... ১২.৫০
ত্রৈমাসিক	... ৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	... ৩০.০০
ষান্মাসিক "	... ১৫.০০
ত্রৈমাসিক "	... ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	... ৩০.০০
ষান্মাসিক "	... ১৫.০০
ত্রৈমাসিক "	... ৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	... ৫২.০০
ষান্মাসিক "	... ২৬.০০
ত্রৈমাসিক "	... ১৩.০০

অন্যান্য অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	... ৬১.০০
ষান্মাসিক	... ১১.৫০
ত্রৈমাসিক	... ১০.০০

*

মূল্য ৫০ পয়সা
আসামে বিমান মাশুল (অতিরিক্ত) ৫ পয়সা

*

DESH

Saturday 29 June, 1968

খাদ্য অপচয়

পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় এবার গমের ফলন আশাতীত ভাল হয়েছে, ফলে শুধু-মাত্র উদ্বৃত্ত নয়, শোনা যাচ্ছে, ফলনের পরিমাণ এত বেশী যে পাঞ্জাবে তা রাখার মতন জায়গা নেই। আমরা অহরহ খাদ্যাভাবের কথাই শুনি; সে জায়গায় প্রচুর উদ্বৃত্ত হবার কথা শুনলে কি রকম বিমূঢ় হয়ে পড়ি, বিশ্বাস করতে বাধে। তবে অল্পস্বল্প খোঁজ-খবর রাখলে পাঞ্জাবের গম সম্পর্কে এতটা বিস্ময়ের কিছু নেই। পাঞ্জাব ও হরিয়ানার গমের খ্যাতি আছে, ফলনও সেখানে ভাল হয়। গত বছরেও পাঞ্জাবে বজরা, ভুট্টা ও ধানের অতিরিক্ত ফলন হয়েছিল, এবারে হয়েছে গমের।

উদ্বৃত্ত বেশি হওয়ায় পাঞ্জাব সরকারের দুশ্চিন্তা, এত গম রাখেন কোথায়, সরকারী ও বেসরকারী ভাঁড়ারে গম গুদামজাত করেও স্থানাভাববশে গম রাখা যাচ্ছে না। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্য এই উদ্বৃত্ত গম আনতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, মাল বোঝাই ও খালাসের অব্যবস্থা ছাড়াও অন্যান্য অসুবিধা প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে যেটা আপত্তিকর, তা হল, খোলা মালগাড়িতে গম পাঠানোর ব্যবস্থা। পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা থেকে খোলা মালগাড়িতে শুধু কলকাতাতেই প্রত্যহ দেড় শো'টি করে গাড়ি আসছে। তা ছাড়া অনুমান করা যাচ্ছে প্রায় পাঁচ শো'টি মালগাড়ি লাখখানেক টন গম নিয়ে আসার পথে রাস্তায় রয়েছে।

খোলা মালগাড়িতে গম পাঠানোর ব্যাপারে এখানকার ফুড কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ বিচলিত। এঁদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, গত মে মাস থেকে বার বার পাঞ্জাব ও হরিয়ানার সহকর্মীদের তাঁরা অনুরোধ জানিয়েছেন যেন খোলা মালগাড়িতে গম না পাঠানো হয়, কিন্তু সে অনুরোধে কর্ণপাত করা হয় নি। রেল কর্তৃপক্ষের ঘাড়ে দোষের ভার চাপিয়ে ওঁরা হাত ধুয়ে বসে আছেন, আর যথারীতি খোলা মালগাড়িতে গম আসছে, বৃষ্টিতে ভিজে তা নষ্ট হচ্ছে। সম্প্রতি এইভাবে কলকাতার কয়েকটি রেল-শেডে খোলা ওয়াগনের ছ' হাজার টন গম বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের ফুড কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষের মতে, পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্য মজুত করা কোনো সমস্যা নয়। এখানে যেরকম ব্যবস্থা আছে তাতে ছ' লক্ষ টনেরও বেশি খাদ্যশস্য তাঁরা মজুত করতে পারেন। সে জায়গায় এখন অর্ধেক পরিমাণ খাদ্যশস্য মাত্র মজুত হয়ে আছে, কাজেই বাকি তিন লক্ষ টন খাদ্যশস্য মজুত কোনো সমস্যা নয়। কিন্তু আগে থেকে না জানিয়ে হঠাৎ গমের চালান বাড়িয়ে দেওয়ায় এখানকার ব্যবস্থাদির ওপর আচমকা ভীষণ চাপ পড়েছে, যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা যাচ্ছে না। আগে কলকাতা এলাকায় যেখানে পঁচাত্তরটি করে গমের ওয়াগন আসছিল এখন সেখানে দ্বিগুণ আসছে, উপরন্তু খোলা মালগাড়ি থেকে মাল খালাসে অনেক সময় লাগে।

যাই হোক, পাঞ্জাব ও হরিয়ানার উদ্বৃত্ত গম রীতিমত একটি সমস্যা সৃষ্টি করেছে। প্রেরক স্থানাভাববশে যত দ্রুত পারছেন এবং যা হাতের সামনে পাচ্ছেন তাতে করেই মাল পাঠিয়ে খালাস হতে চাইছেন, আর গ্রাহক পড়েছেন নানা অসুবিধায়, ভেজা গম তুলবেন কোথায়, মাল খালাস করবেন কি করে ইত্যাদি ইত্যাদি। শোনা যাচ্ছে, এ যাবৎ জলে ভিজে যে গম নষ্ট হয়েছে তা শুকোবার একটা যান্ত্রিক ব্যবস্থা নাকি করা হয়েছে। কিন্তু, হরিয়ানার রেল স্টেশনের প্লাটফর্মে, মোকামায় ও অন্যত্র যেসব গমের বস্তা জলে ভিজে ভিজে পচে নষ্ট হচ্ছে তার উপায় কি হবে। এই গম পশ্চিমবঙ্গেই আসুক আর অন্যত্রই যাক, পচা নষ্ট-হওয়া গম কি মানুষকে খাওয়ানো হবে? যদি তা করা হয় তবে দায়িত্বহীনতার চূড়ান্ত হবে। আর যদি এই সব গম নষ্ট করে ফেলা হয় তবে তাও অপচয় হবে। দেখা যাচ্ছে, আমাদের এই বিচিত্র দেশে খাদ্য না থাকলেও হাহাকার, খাদ্য দৈবাৎ জুটে গেলেও তার অপচয় বন্ধ করার উপায় নেই। যে দেশে এত খাদ্যাভাব সে দেশে যে কি করে খাদ্য অপচয় করার বিলাস আসে আমরা তা বুঝে উঠতে পারি না। রেল কোম্পানির দূরদর্শিতার অভাব, অবহেলা ও উদাসীনতার খেসারত কে গুনবে?

রাজনীতিতে প্রদর্শনপ্রবণতা বা দেখানেপনার স্থান নেই এ-কথা বলা চলে না। বরং প্রদর্শনপ্রবণতাকে বিভিন্ন দেশে আধুনিক রাজনীতির একটা অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছে। দলগতভাবে এই দেখানেপনার প্রয়োজনও হয়ত অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু এই প্রবণতা ব্যক্তিগতভাবেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নেতাদেরও প্রভাবিত করেছে। উইনস্টন চার্চিল, স্টেটসম্যান হিসাবে বিশ্ব-বিখ্যাত। নেতা হিসাবে তাঁর স্থান বহু ঊর্ধ্বে নিঃসন্দেহে; তবু চার্চিলের রাজনীতির সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে তাঁর মুখের চুরুট বা সিগার। চুরুট ছাড়া চার্চিলকে কল্পনা করা প্রায় অসম্ভব এবং বিভিন্ন দেশে পত্রপত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে যত কার্টুন প্রকাশিত হয়েছে তার প্রধান উপাদান জুগিয়েছে তাঁর চুরুট। এ-দেশে নেহরুকে চিনতে হত তাঁর বিশিষ্টভঙ্গীর গান্ধী টুপি এবং রক্তাভ গোলাপ। তেমনি পশ্চিমবাংলার দুই নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ এবং শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তকে চিনতে হয় তাঁদের হাতের ফাঁকে প্রজ্জ্বলিত চুরুট, অবশ্য বর্মা চুরুট, হাভানা হয়ত নয়। তেমনি একটা প্রবণতা দেখা যাবে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীযশোবন্তরাও বলবন্তরাও চ্যবনের মধ্যে। তাঁরও একটা প্রবণতা আছে গান্ধী-টুপি এবং চুড়িদার পাজামার প্রতি। হয়ত অনুকরণের ছাপ কোথাও আছে। তবু এটাই তাঁর একান্তভাবে নিজস্ব।

হয়ত সে-কারণেই তাঁর মুখের আদল খুব বেশী পরিচিত নয়, যেমন পরিচিত তাঁর গান্ধীটুপি ও চুড়িদার পাজামা। তাই কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসের জনসভায় বক্তৃতা দেবার সময় তাঁর যে-ছবিটা সামনে দেখা গিয়েছিল সেটা তাঁর গান্ধীটুপির। হয়ত গান্ধীটুপি ছাড়াও শ্রীচ্যবনকে চেনা যেত সেই জনসভায়; কারণ, সেদিনের জনসভা ছিল একান্তভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভা। তিনি কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলেন লোকসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য আনুষ্ঠানিকভাবে এবং সমারোহ সহকারে প্রচার করতে। প্রচারের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে; কারণ রাজনীতির আসরে দলগত এবং ব্যক্তিগত প্রচার মূলগতভাবে অপরিহার্য। কিন্তু প্রচার যেখান রাজনীতির আসর জমাবার প্রধান অঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, সেখানে প্রদর্শনপ্রবণতা মুখ্য হয়ে ওঠে। রাজনীতির স্থানটা সে-ক্ষেত্রে গৌণ হয়ে যায়।

ফলে, কৃষ্ণনগরে শ্রীচ্যবন যে-কথাটা বলার চেষ্টা করেছেন কংগ্রেস সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে সেটা অনুষ্ঠানের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। প্রধান যে-কয়টি প্রশ্ন তাঁর বক্তৃতায় স্থান পেয়েছিল সে-গুলো কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়, বিশেষ ক'রে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে। যেমন তিনি বলেছেন আঞ্চলিকতা সম্বন্ধে। তাঁর মতে আজ গোটা দেশের আবহাওয়া উগ্র আঞ্চলিকতার স্পর্শে বিষিয়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছে। তিনি মনে করেন, সাম্প্রদায়িকতার মত উগ্র আঞ্চলিকতাও দেশের অখণ্ডতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে একথা বলার অধিকার তাঁর নিশ্চয় আছে। কিন্তু নিছক আসর মাত করার হাতিয়ার হিসাবেই যদি তিনি আঞ্চলিকতা সম্বন্ধে তাঁর শঙ্কা প্রকাশ ক'রে থাকেন তাহলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য সাধারণ মানুষের উপর কোন রেখাপাত করতে পারবে কিনা সে-সম্বন্ধে সন্দেহ নিশ্চয় থাকবে।

কথাটা উঠছে কেন? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী [illegible] করলে [illegible] হবে। প্রত্যক্ষভাবে বিচার করলে, [illegible] শিব সেনাকে এ-ব্যাপারে পথপ্রদর্শক বলেই মনে হবে। কারণ, শিব সেনা নিঃসন্দেহে আঞ্চলিকতার বিষফল। এই বিষের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই দেখা গিয়েছে নানা প্রদেশে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে উগ্রপন্থার প্রতি প্রচ্ছন্ন অনুরাগ। উগ্রপন্থায় বিশ্বাসী সংগঠন দেশে আগেও ছিল; যেমন ছিল সাম্প্রদায়িক সংস্থাগুলি। হয়ত এরই ফলে বিভিন্ন সময়ে নানাস্থানে সাম্প্রদায়িকতা প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে; তবু তার আকর্ষণী শক্তি এত ব্যাপক ছিল না, যেমন দেখা দিয়েছে শিব সেনার মত আঞ্চলিক দলগুলোর মধ্যে। সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে যেমন উন্মত্ততা দেখা গিয়েছে, স্থৈর্য ও বিরোধিতাও তেমনি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আঞ্চলিকতা ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মনে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। তাই আজ শিব সেনার মত বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠছে লাচিত সেনা, গোছাল সেনা, বিজয় সেনা ইত্যাদি।

এই আঞ্চলিক প্রবণতার বিষক্রিয়া যে-কোন ভাবে, যে-কোন প্রসঙ্গে দেশের স্থিতিকে অস্থির করে দিতে পারে, সমগ্রভাবে জাতির স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে, বাইরের শত্রুকে ডেকে আনতে পারে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচ্যবন এটা বোঝেন বলেই তিনি কলকাতায় বলেছিলেন, 'এই সেনা নিয়ে আমি সত্যিই খুব চিন্তিত, কারণ আমার নিজের অঞ্চলে যে শিবসেনা আছে তা' নিয়েও তিনি বিব্রত।' কিন্তু বিব্রতবোধ এবং অস্বস্তিবোধ—এ দুটো দিয়ে আঞ্চলিকতার স্পর্শ থেকে বাঁচা যায় না, এ কথাটা শ্রীচ্যবন নিশ্চয় উপলব্ধি করেন। সে-অস্বস্তিবোধ আছে বলেই তিনি কৃষ্ণনগরের জনসভায় এ-নিয়ে তীব্রভাবায় বক্তৃতা করেছেন। কিন্তু তাঁর এই বক্তৃতার মধ্যে কোন কর্তব্যবোধের পরিচয় ছিল কিনা সেটা বোঝা যায়নি।

প্রথমতঃ, যে-অঞ্চলে তিনি আঞ্চলিকতা সম্বন্ধে তাঁর আশংকা প্রকাশ করেছেন, সে-অঞ্চলে আর যাই থাক আঞ্চলিকতা খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। এ-কথা শোনা যায়নি যে, কৃষ্ণনগর আঞ্চলিকতার স্পর্শে কাতর। দ্বিতীয়তঃ, কৃষ্ণনগরের জনসভাকে উপলক্ষ করে যদি তিনি তাঁর বক্তব্য সকল দেশবাসীর সামনে রেখে থাকেন, তাহলে এ কথাটাও তাঁর বলা প্রয়োজন ছিল কিভাবে এই সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। সে-কথা তিনি বলেননি। তিনি এটাও বলেননি যে প্রধানত কি কি কারণে

কলকাতায় তিনি যখন এসেছিলেন তখন তাঁর সামনে আঞ্চলিকতা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। পশ্চিমবাংলার কথাই ধরা যাক। পশ্চিমবাংলায় রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থা চালু হবার পর সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে সংসদ সদস্যদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক বসেছিল কলকাতায়, এবং এই কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবেই শ্রীচাবন কলকাতায় এসেছিলেন। এই বৈঠকে এবং তাঁর উপস্থিতিতে পশ্চিমবাংলার যে-কটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়েছিল তার মধ্যে প্রধানত ছিল খাদ্য, আইন ও শৃংখলা এবং শিল্পাঞ্চলের অবস্থা ও চাকুরীসংস্থানের সুযোগ। তিনটি বিষয়ের মধ্যে খাদ্যের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল সবচাইতে বেশী; কারণ, পশ্চিমবাংলা খাদ্যশস্যে ঘাটতিপ্রধান অঞ্চল। প্রতি বছর এই রাজ্যকে শুধু ঘাটতির কথাই চিন্তা করতে হয় তা নয়, বর্ষার সময়টা রীতিমত উদ্বেগে কাটাতে হয়। প্রতি বছর পশ্চিমবাংলা সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তদ্বির করতে হয় কেন্দ্র থেকে খাদ্যশস্য পাবার জন্য, ঘাটতি পূরণের জন্য।

এই তদ্বির প্রথাটা খুব বাঞ্ছনীয় নয়। তবু করতে হয়, এবং প্রতি বছর এ-নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্য সরকারের একটা বিরোধ থেকেই যায়। শেষ পর্যন্ত যা পাওয়া যায়, তা নিয়ে এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হয়, যাতে মনে হতে পারে যে, কেন্দ্রের কাছ থেকে পশ্চিমবাংলা যা পায় তা দাক্ষিণ্যের দান হিসাবেই দেওয়া হয়। কিন্তু একথাটা কেন্দ্রীয় সরকার বুঝতে চান না যে, সারা দেশের স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই পশ্চিম বাংলায় খাদ্যশস্য উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দেয়। পশ্চিমবাংলা থেকে যে পাট ও চা রপ্তানী হয়, তা থেকেই আসে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার একটা মোটা অংশ। আর এই বৈদেশিক মুদ্রা থেকেই আসে কেন্দ্রীয় সরকারের দাক্ষিণ্য বিভিন্ন রাজ্যের প্রতি, গোটা দেশের উন্নতির জন্য। কিন্তু এ কথাটা কেন্দ্রীয় সরকার বা শ্রীচাবন বুঝতে রাজী নন। এটাও তাঁরা বুঝতে চান না যে, পশ্চিমবাংলার প্রয়োজনকে মেটান কেন্দ্রের বিশেষ দায়িত্ব এবং সে-দায়িত্ব পালন করা তখনই সম্ভব যখন খাদ্যশস্যে উদ্বৃত্ত রাজ্য থেকে বাড়তি শস্য আবশ্যিকভাবে সংগ্রহ করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এ-দায়িত্ব কখনও পালন করেননি; কারণ, বিভিন্ন রাজ্য থেকে আবশ্যিকভাবে সংগ্রহ করা আঞ্চলিকতার [illegible] এবং কেন্দ্রের দুর্বলতাকে প্রকাশ করে দিতে হয়। ফলে, আঞ্চলিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। রাজনীতির মধ্যেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে আঞ্চলিকতার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। যেমন করতে হয়েছিল কংগ্রেসের হায়দ্রাবাদ অধিবেশনের সময়। কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচনের সময় আঞ্চলিক স্বার্থ নেতৃত্বের স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল বলেই মুখ্যমন্ত্রীদের নির্বাচনপ্রার্থী হিসাবে গ্রহণ করতে হয়েছিল যাতে অন্য কোন স্বার্থ না জড়িয়ে পড়তে পারে। অথচ কংগ্রেসী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা রীতি হিসাবে কার্যকরী সমিতির সভায় আমন্ত্রিত হয়ে থাকেন। শুধু তাই নয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে আঞ্চলিক স্বার্থকে জীইয়ে রাখা হয় নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য। আঞ্চলিকতার উৎসাহ আসে কেন্দ্র থেকে, নেতৃত্বের কাছ থেকে, যে নেতৃত্বের মধ্যে আছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাবন। তবু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাবনকে কৃষ্ণনগরের জনসভায় বলতে হয়েছে উগ্র আঞ্চলিকতার বিরুদ্ধে। কারণ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে শ্রীচাবন বেশ ভালভাবেই জানেন পশ্চিমবাংলায় আঞ্চলিকতার ব্যাপক প্রকাশ বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় সম্ভব নয়। তিনি জানেন কৃষ্ণনগরের জনসাধারণের কাছে আঞ্চলিকতার অর্থটা খুব স্পষ্ট নয়। তিনি জানেন উপদেষ্টা কমিটির কলকাতা অধিবেশনে পশ্চিমবাংলার কাছ থেকে যে-খাদ্যশস্যের দাবী এসেছিল তা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই বলতে হয়েছে উগ্র আঞ্চলিকতার কথা কৃষ্ণনগরের জনসভায়।

তিনি এটাও জানতেন যে, রাজনীতির খেলায় উপদেষ্টা কমিটির সামনে তিনি তাঁর নেতৃত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেননি। আইন ও শৃংখলা এবং শিল্পক্ষেত্রে শান্তি ও অশান্তি নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল উপদেষ্টা কমিটির অধিবেশনে, তা সর্বাংশে ছিল দলগত রাজনীতিভিত্তিক। কংগ্রেস পক্ষীয় সংসদ সদস্যরা যেমন ছিলেন শ্রীচাবনের পক্ষে, তেমনি তাঁর বিরোধীপক্ষে ছিলেন অ-কংগ্রেসী এবং বিশেষ করে কম্যুনিস্ট সদস্যরা। পশ্চিমবাংলায় আইন ও শৃংখলা সম্বন্ধে, অথবা শিল্পক্ষেত্রে শ্রীচাবনের বক্তব্য একটাই ছিল। যুক্তফ্রন্ট শাসনকালে আইন ও শৃংখলার যে দুর্গতি দেখেছিলেন অথবা শিল্পক্ষেত্রে ঘেরাও নিয়ে যে অশান্তি বোধ করেছিলেন তা এখন [illegible] যদি তার যুক্তফ্রন্টের [illegible] কলকাতার বৈঠকে যে আলোচনা হয়। যুক্তফ্রন্টের শাসন ব্যবস্থার সমালোচনাকেই প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করা হবে। প্রধানত সেটা রোধ করার উদ্দেশ্যেই শুধু গণডেপুটেশনেরই আয়োজন করা হয়নি, শ্রীচাবনের কাছে দাবী পেশ করা হয়েছিল যে যুক্তফ্রন্ট নেতাদের, অর্থাৎ শ্রীঅজয় মুখার্জি ও শ্রীজ্যোতি বসুকে কমিটির অধিবেশনে তাঁদের বক্তব্য রাখতে দেবার সুযোগ দেওয়া হোক। যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে যে স্মারকলিপি শ্রীচাবনের কাছে পেশ করেছিলেন শ্রীঅজয় মুখার্জি ও শ্রীজ্যোতি বসু তাতে খাদ্য সম্বন্ধে দাবী নিশ্চয়ই ছিল; কিন্তু তার থেকেও বড় কথা ছিল, রাজ্যপালের শাসনব্যবস্থাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা। সে-কারণেই দাবী করা হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট শাসনের পরবর্তীকালে পুলিশের অত্যাচারের নিরপেক্ষ বিচার এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি।

এ দুটি বক্তব্যকে সামনে রেখেই কমিটির অধিবেশনে শ্রীভুপেশ গুপ্ত এবং শ্রীচাবনের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হয়। একদিকে শ্রীগুপ্ত যেমন দাবী করেন যে, যুক্তফ্রন্টের নেতাদের উপদেষ্টা কমিটির সামনে আসতে দেওয়া হোক, অপরদিকে তেমনি শ্রীচাবন জানান যে, এ-দাবী গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তাতে অবাঞ্ছিত নজীর সৃষ্টি করা হবে। মূল প্রশ্নের বা যুক্তফ্রন্টের দাবীর মীমাংসা কিছু হয়নি সত্য; কিন্তু যে রাজনৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছিল বিরোধী-পক্ষ থেকে সেটা উল্লেখযোগ্য। এই প্রভাব সৃষ্টির মূলে হাতিয়ার ছিল যুক্তফ্রন্ট নেতাদের গণডেপুটেশন। কলকাতা বৈঠকের গুরুত্বকে যুক্তফ্রন্ট অস্বীকার করেনি। এটা সঠিক জানা ছিল যে, যুক্তফ্রন্ট শাসনব্যবস্থাকে সামনে রেখেই কংগ্রেসপক্ষ থেকে আক্রমণ চালান হবে বিরোধীদের বিরুদ্ধে। সে-আক্রমণকে বানচাল করে দেবার জনাই দেখানপনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল গণডেপুটেশন সংগঠন করে। খাদ্য নিয়ে গণডেপুটেশনের রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রয়োজন হয়ত আছে; কিন্তু তার চাইতেও বড় প্রভাব সৃষ্টির প্রচেষ্টা হয়েছিল উপদেষ্টা কমিটির সামনে যুক্তফ্রন্ট নেতাদের উপস্থিত করার দাবী তুলে। এ-দাবীর পিছনে যৌক্তিকতা ছিল কিনা সেটা বড় প্রশ্ন নয়, কারণ, মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ

আক্রমণকে প্রতিহত করা। সেটা যুক্তি দিয়ে সম্ভব হয়েছিল কিনা জানা নেই। হয়ত হয়নি, কারণ, এরই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীভূপেশ গুপ্তকে তাঁর সংসদ সদস্য থেকে পদত্যাগের হুমকি দিতে হয়েছিল। এ-হুমকির জবাব আসেনি কংগ্রেসপক্ষ থেকে বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবনের কাছ থেকে।

প্রকৃতপক্ষে বিরোধীপক্ষের প্রদর্শন-প্রবণতার সামনে শ্রীচ্যবনকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। কারণ, বিচার করলে দেখা যাবে উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে কংগ্রেস পক্ষ যেমন অনুকূল রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারেনি, তেমনি কমিটির পক্ষে এমন কোন সুপারিশ বা সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি যা থেকে পশ্চিমবংলার কোন সমস্যার সমাধানের কোন হদিশ পাওয়া যেতে পারে। হয়ত সে-কারণেই, শ্রীভূপেশ গুপ্ত অধিবেশনের পর সাংবাদিক-দের বলেছেন, কলকাতার অধিবেশনে তাঁরা যা চেয়েছিলেন, তা পেয়েছেন। হয়ত সে-কারণেই শ্রীচাবনকে জোর গলায় বলতে হয়েছিল উগ্র আঞ্চলিকতা সম্বন্ধে কৃষ্ণ-নগরের জনসভায়। দুটোর মধ্যেই ছিল প্রদর্শনপ্রবণতা।

বৈদেশিকী

পরমাণু-বোমার কুলীনতন্ত্র

আমেরিকার ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট শ্রীগ্লাসেন ঘোষণা করেছেন, মার্কিন নাগরিকের বন্দুক রাখবার স্বচ্ছন্দ অধিকার কেড়ে নেওয়া মানে ব্যক্তি স্বাধীনতার সর্বনাশ; বন্দুকের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা যদি খতম হয় তাহলে তো গণতন্ত্রের দফা রফা, রাষ্ট্রের জুলুমের জয়জয়কার। মার্কিন নাগরিকের বন্দুক রাখবার অধিকার অবশ্য কেড়ে নেওয়া হয়নি, অনেক সাধ্যসাধনার পর মার্কিন কংগ্রেস কেবল পিস্তল কেনা সম্পর্কে কিছু কড়াকড়ি ব্যবস্থা করেছেন। মার্কিন নাগরিকের বন্দুক নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে আমাদের মাথাব্যথা সামান্যই। পরমাণু বোমা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মার্কিন-রুশ-ব্রিটিশ রাষ্ট্রকর্তারা যে ছকখানি তৈরী করেছেন সেটাই বা কেমন? স্বদেশে প্রেসিডেণ্ট জনসন অনেন বন্দুক-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা চালু করতে পারছেন না, অথচ সারা পৃথিবীতে পরমাণু বোমার বিস্তার বন্ধের জন্য কড়াকড়ি ব্যবস্থায় প্রেসিডেণ্ট জনসনের উৎসাহ অপরিসীম। এ ব্যবস্থাতেও বৈষম্য প্রচুর; শাদা-কালোয়, ধনী-দরিদ্রে তফাৎ যেমন অবধারিত অনিবার্য, পরমাণু বোমার ব্যাপারেও আমেরিকা, রাশিয়া ও ব্রিটেন তেমনই ধরে নিয়েছে, পরমাণু বোমা তৈরীর অধিকার সব দেশের জন্য নয়। সুরাপান যদি ক্ষতিকর হয় তবে সেটা সকলের পক্ষেই ক্ষতিকর, সুরাপান নিরোধ সম্ভব হোক না হোক, সুরাপানের অধিকার অন্ততঃ কেবল ভাগ্যবন্তদের জন্য বেঁধে দেওয়া হয় না। পরমাণু বোমার বেলায় কিন্তু অন্যরকম বিচার; এ বোমার ভাণ্ডারী যারা বোমা তাদের দখলে থাকুক, তাতে দোষ নেই, কেবল অন্যেরা পরমাণু বোমা তৈরী করতে চাইলেই দোষ!

অতএব মার্কিন-রুশ-ব্রিটিশ উদ্যোগে পরমাণুবোমার ব্রহ্মচর্য বিধান—যে বিধান আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং কম্যুনিস্ট চীন কাউকেই মানতে হবে না, মান্য করার দায় নাকি কেবল অন্য সব দেশের যারা এখনও পরমাণু-অস্ত্রহীন। পরমাণু বোমার ব্রাহ্মণত্বে প্রতিষ্ঠিত অতএব পঞ্চশক্তি, বাকী সব দেশ পাকাপাকিভাবে অব্রাহ্মণ, অবশ্য যদি তারা সকলেই মার্কিন-রুশ-ব্রিটিশ পাঁতি অনুযায়ী পরমাণুবোমার ব্রহ্মচর্যবিধান মেনে নেয়। এ বিধানের নাম পরমাণুবোমা বিস্তার-নিরোধ চুক্তি। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে চুক্তির খসড়া পাস হয়েছে; ৯৫ ভোট চুক্তির পক্ষে, বিপক্ষে মাত্র ৪ ভোট; ভোট দেয়নি ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকার কতকগুলি দেশ মিলে ২১ জন। সাধারণ পরিষদে যারা চুক্তির সপক্ষে ভোট দিয়েছে তারা সকলেই চুক্তিতে বিধিবদ্ধ সই নাও দিতে পারে। যেমন পাকিস্তান চুক্তির পক্ষে ভোট দিলেও ভারতের আপত্তির ধুয়া তুলে এখন দর কষাকষি চালাচ্ছে। আমেরিকা, রাশিয়া এবং ব্রিটেন সমেত মোট ৪৩টি রাষ্ট্র চুক্তিতে সই দিলেই চুক্তি বলবৎ হবে। ভারতের আপত্তিতে চুক্তি আটকাবে না, বেশির ভাগ রাষ্ট্র যদি চুক্তিতে সই দেয় এবং দেবে বলেই মনে হয়, তবে ভারতের পক্ষে এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র ভূমিকা বজায় রাখা কঠিন হতে পারে।

নীতির দিক দিয়ে এ চুক্তির ভণ্ডামি স্পষ্ট। পরমাণু অস্ত্রধরদের ভাবখানা এই যে তাদের হাতে পরমাণু বোমা থাকায় পৃথিবীর কোন বিপদের ভয় নেই, অন্য সব দেশ পরমাণু অস্ত্র তৈরী করলেই মহাবিপত্তি! একথা হয়তো সত্যি যে আপাতত আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা নেই। মার্কিন-রুশ মহাশক্তিধরদের মধ্যে সমঝোতা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কম্যুনিস্ট চীন কিম্বা ফ্রান্সও পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারে সাহস করবে না। তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মার্কিন-রুশ সমঝোতা কিম্বা রুশ-চীন বিরোধ কোনটাই চিরস্থায়ী মনে করা যায় না। আমেরিকা এবং রাশিয়ার মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখনও চলছে। বিরোধ যদি কখনও চরম সংকট সৃষ্টি করে তখন পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারে কোন পক্ষের অরুচি ঘটবে মনে হয় না। আমেরিকা ও রাশিয়া যদি তাদের নিজেদের পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার নষ্ট করে ফেলতে রাজী হত তাহলে তারা সঙ্গতভাবেই অন্যদের বলতে পারত, এস, এখন থেকে সকলেই হই পারমাণবিক অস্ত্র সংহরণে ব্রতচারী। মার্কিন-রুশ-ব্রিটিশ প্রস্তাব বলছে অন্য কথা; বলছে, আমরা ভোগী, তোমরা হবে ত্যাগী; আমরা তোমাদের বিপত্তারণ, তোমরা আমাদের আশ্বাসে হও সমর্পিত প্রাণ। নীতির দিক দিয়ে এটা ভণ্ডামি, বাস্তবক্ষেত্রেও এ আশ্বাসের কোন দাম নেই।

মার্কিন-রুশ-ব্রিটিশ প্রস্তাবের পিছনে তবু কোন যৌক্তিকতা আছে কি না সেটা দেখা উচিত। কম্যুনিস্ট চীনের পারমাণবিক অস্ত্রশক্তির ভয়েই আমেরিকা ও রাশিয়া এই পরমাণু অস্ত্র বিস্তার-নিরোধ চুক্তি রচনা করেছে মনে করা যায় না। কারণ এ চুক্তি পরমাণু অস্ত্রধরদের অধিকার মোটেই ক্ষুণ্ণ করছে না। চুক্তিতে সব দেশও যদি সই দেয় তবু তাতে পরমাণু-অস্ত্রধর পঞ্চশক্তির একচেটিয়া অধিকার একটুও স্পর্শ করবে না। একমাত্র ভয় কম্যুনিস্ট চীন যদি তার পছন্দমত কোন দেশকে পরমাণুবোমা দেয় কিম্বা বোমা তৈরীতে সাহায্য করে। সেটাও এই চুক্তিবলে রোধ করা যাবে না, চীন যতদিন রাষ্ট্রপুঞ্জের বাইরে এবং মার্কিন-রুশ সমঝোতার প্রচণ্ড প্রতিবাদী। তাহলে এ অবস্থায় পরমাণু অস্ত্র-বিস্তার নিরোধ চুক্তিতে সই আদায়ের জন্য আমেরিকা, রাশিয়া ও ব্রিটেনের এত গরজ কেন? গরজ কেন না আগামী দশ বছরের মধ্যে বহু মাঝারি এবং ছোট ছোট রাষ্ট্রও পরমাণুবোমা অনায়াসে তৈরীর সামর্থ্য অর্জন করবে। এ সব ছোট ও মাঝারি রাষ্ট্রগুলি অনেকে পরস্পর প্রতিবেশী, এদের নিজেদের মধ্যে নানারকম বিবাদ-বিরোধও আছে। নিজেদের মধ্যে বিরোধ-সংঘর্ষে এরা পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে। [illegible] অবস্থায় ঈজিপ্ট এবং ইজরেল, গ্রীস ও তুর্কী, পূর্ব জার্মেনী এবং পশ্চিম জার্মেনী তাদের নিজেদের তৈরী পারমাণবিক অস্ত্র পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহারে উদ্যোগী, তখন আমেরিকা রাশিয়া, ব্রিটেন ইত্যাদি বৃহৎ শক্তি জোটের নায়কদের ভূমিকা হবে কী?

মার্কিন-রুশ-ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতির দুর্ভাবনা বর্তমানে বড় রকমের পারমাণবিক যুদ্ধ সম্পর্কে নয়; বড়রা অর্থাৎ পারমাণবিক মহাশক্তিধররা কখন কী করবে, "হট লাইনে" আলাপ করে নিজেদের মধ্যে পারমাণবিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা ঠেকাবে কি না, এ সব তাদের নিজেদের ব্যাপার। মাঝারি ও ছোট ছোট রাষ্ট্র নিজেদের সামর্থ্যে পারমাণবিক লড়াই যাতে না বাধায় আপাতত সেই ভাবনাই যেন আমেরিকা ও রাশিয়াকে এক সঙ্গে মিলিয়েছে। ছোট ও মাঝারি রাষ্ট্রগুলি তাতে অবশ্য আশ্বস্ত বোধ করতে পারছে না; আত্মরক্ষার প্রয়োজনে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরীর অধিকার তারা একেবারে লিখিত-পঠিতভাবে ছেড়ে দেবে কেন? মার্কিন-রুশ-ব্রিটিশ পক্ষ এর জবাবে আশ্বাস দিচ্ছে, পারমাণবিক অস্ত্র তৈরীর অধিকার ছেড়ে দিলে ক্ষতি নেই, কারণ পারমাণবিক আক্রমণ ঘটলে বা ঘটবার আশঙ্কা দেখা দিলে, আমরা আছি, আমরা বিপদ-ভঞ্জনে প্রস্তুত কথা দিচ্ছি। সে কথা নিতান্ত কথাই। আন্তর্জাতিক বিপদে কে কাকে কখন রক্ষা করবে সেটা পূর্ব-প্রতিশ্রুতিমত সুনিশ্চিত ধরে নেওয়া যায় না।

২৪।৬।৬৮

ব্যোম

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

এক-একদিন আমার বুকের মধ্যে একজন সন্ন্যাসী
হেঁকে ওঠে—ব্যোম;
অমনি সব এলোমেলো হয়ে যায়
ধসে যায় পালংকের গদি
ঘুরন-কেদারা পড়ে মুখ থুবড়ে, সযত্নে টাঙানো
ক্যালেন্ডার, ছবি, ঘর, বারান্দায় টব, টবে ফুলের সংসার
শঙ্কিত বিহ্বল চোখে চমকে দেখে—ক্রমে
কেমন নিঃশব্দে হচ্ছে শৌখীন লোকটার বিবর্তন।

মাথার চারদিকে হালকা কুয়াশার মতো প্রতিধ্বনি
ব্যোম...হোম...ওম...
আর অমনি কাঁধের উপর থেকে চারকোণা মাপের কোট
গৌরবের মতো গলে পড়ে
পা বেয়ে পাৎলুন,
গন্ধতেল-মাখা চুল ঝুরি হয়ে নামে ইতস্তত—
সহসা নিম্নাঙ্গে যেন বহুকাল পরে হাওয়া লাগে
যেন সব অবরোধ মুহূর্তে বিচূর্ণ—আমি
নিষ্কাম স্বাধীন।
হাড়ের সুড়ঙ্গে ট্রেন ছুটোছুটি করে, বাঁশি বাজে
ব্যোম ব্যোম...একজন সন্ন্যাসী
কৌপিন-সম্বল, ডাকে—চলে আয়, আর আমরা
বিশ্ব ঘুরে আসি।

দেশ, আমার গৌরী

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

খ্রীষ্টাব্দ—হিসাব নয়; নীলিমার প্রতিনিধি হাঁস
বুদ্ধের উপর দিয়ে বহুবার উড়ে গেছে অচঞ্চল শব্দভাষ্যে ভারী
মনীষার দিকে। অবিশ্বাস
আলিঙ্গনের উত্তাপ শিখে হয়ে গেছে নারী
[illegible] শরীরেও ভারতবর্ষের মানচিত্র। যেন ইচ্ছে হলো নদী, উৎসে
গিরিতুষার; অথবা ঐ সূর্যসচ্ছল প্রত্যঙ্গের
দর্শন এড়িয়ে যন্ত্রবাহনের নিযুত কিলোমিটার দৌড়
সব আত্মায় অগ্রাহ্য করে আজো তপোবনে ওঁ শান্তি ওঁ, অর্থাৎ
মন্ত্রের
টায়টায় ঈশ্বর জাগিয়ে রাখা, দেশ আমার স্বদেশ, গৌড়
থেকে দ্রাবিড়ভূমির নারিকেলবীথির উচ্চতা
আদ্যোপান্ত ঘুরে এসে তবু জনসাধারণ ভাবে তোমাকে হলো
না চেনা!

শুনেছি ক্ষুধায় মানুষকে বড় পবিত্র দেখায়, আনে ভঙ্গীর সমতা
আমি এই শতকের এক অন্নাদ মানুষ
ক্ষুধা নিয়ে গিয়েছি যখনি, তুমি ধারণের দেনা
শুধেছো সপ্রাণ শস্যে, শুধু তার বাৎসরিক ক্রম
জানাওনি, জানতে দাওনি; মা আমি না সন্তান! মা আমি আবাদ
পারি না
তাই সূর্য ডুবে গেলে প্রতি রাত্রে একা কলমের হাত ধরে অক্ষরের
সাদা পাতা পরিশ্রম
সাক্ষী রাখি, খুঁড়ে চলি নিজের হৃদয়; অথচ জানি না
কখনো রক্তের সঙ্গে স্বাধীনতার টাটকা ইতিহাস
অশ্রুর উদাম নিয়ে উঠে আসবে কিনা!

দেশ আমার স্বদেশ, শব্দকে শেখাও আজ তেমন উদ্ভাস।

সুন্দরের জানালা

'সেই বাড়ীটি'

কলকাতায় আর একটি পুরোনো বাড়ি ধ্বসে পড়ল—কাগজের খবর। নতুন কিছু নয়—জব-চার্নকের শহরে প্রতি বর্ষাতেই এমনি দু-দশটি ওল্ড্ গার্ড জীর্ণতার ভারে ভেঙে পড়ছে, মধ্যে মধ্যে মানুষের প্রাণও যাচ্ছে সেই সঙ্গে। আমরা বিষণ্ণ হই—কর্পোরেশনের অচলায়তন আর আইনের দুর্বোধ্য কুটিলতার উদ্দেশে নিষ্ফল ধিক্কার দিই, লোভী বাড়িওয়ালা আর

রামের সার্ট শ্যামের লুঙ্গি, ঝিয়ের টাকায় বাবুয়ানী করায় বাবু

অবিবেচক ভাড়াটেদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠি। কিন্তু একই নিয়মে চলতে থাকে, প্রতিটি সঘন বর্ষণ নতুন নতুন অপঘাতের খবর আনে; একদিকে মাল্টি-স্টোরিড্ আধুনিক বাড়ির প্ল্যাসটিক বিউটিতে কলকাতার পূবে দক্ষিণে যৌবন ঝলমল করে, অন্যদিকে মধ্যে উত্তরে পশ্চিমে জরতীর জীর্ণ কঙ্কাল টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়ে। এ হল প্রকৃতির বিধান—এই নিয়মেই চিরকাল পৃথিবী তার ভারসাম্য বজায় রেখে আসছে।

গরমে পদ্মনাভ

কলকাতায় পুরোনো বাড়িরা ভেঙে পড়ছে—ভেঙে পড়বে। এ নিয়ে আমার তত্ত্বচিন্তা করবার কোনো দরকার হত না—যদি না সংপ্রতি-বিধ্বস্ত একটি বাড়ির সংগে আমার কিছু স্মৃতি-সংযোগ থাকত। দুই যুগেরও বেশী আগে, প্রথম যৌবনে, আমাকে অন্তত বছরতিনেক সেই বাড়িটিতে কাটাতে হয়েছিল। তখনই তার সর্বাঙ্গে কালের ছায়া—তখনই জানতুম, কর্পোরেশনের হিসেবের খাতায় তার বেঁচে থাকবার অধিকার শেষ হয়ে গেছে, যে-কোনো সময় তাকে ডেমোলিশ করা যেতে পারে। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেল, শ্রান্ত রেসের ঘোড়ার মতো গুলি খেয়ে মরবার গৌরব সে পেলো না—আজ এতদিন পরে নিজের জীর্ণতার ভারেই তাকে ভেঙে পড়তে হল।

গোর্কীর জীবনে কাজানের সেই ক্রিস্টাল প্যালেসের একটা অনিবার্য ভূমিকা আছে। এই বাড়িটি আমাকে সেই ক্রিস্ট্যাল্ প্যালেসের কথা মনে করিয়ে দিত। মাঝখানে একটি চওড়া উঠোন, তাকে ঘিরে থার্ড ব্র্যাকেটের মতো তেতলা বিশাল বাড়ি। একতলার বাইরের দিকে রাস্তার ওপর কিছু দোকান—ভেতর দিকে উৎকলীয় উপনিবেশ আর পাইস্ হোটেল। তেতলায় দু-তিনটি গৃহস্থ পরিবার থাকতেন। সবচেয়ে ইণ্টারেস্টিং ছিল দোতলাটি—থার্ড ব্র্যাকেটের ত্রিভুজে সারি সারি ঘরে নিম্নবিত্ত আর নিম্ন মধ্যবিত্তের এক অনন্য অ্যাসর্টমেন্ট্।

মেস? না। প্রত্যেক ঘরের মেজেতে সারি সারি জাপানী মাদুর আর সতরঞ্চের বিছানা—মাথার কাছে দুটি একটি ট্রাঙ্ক-স্যুট্কেস হাত-আয়না-কাচের গ্লাসের ঐশ্বর্য, তার ওপরে এক-এক টুকরো দড়িতে কাপড়-জামা ঝোলাবার ব্যবস্থা। অর্থাৎ মোটের ওপর পাঁচ যাই দুই হাতের মতো প্রত্যেকের দখলী-স্বত্ব। সীট্ রেণ্ট্ এক টাকা থেকে পাঁচ সিকে, গোটা ঘরের ভাড়া মিলিয়ে যেমন দাঁড়ায়। একটি সর্বজনীন ইলেক্ট্রিক ল্যাম্প, তার জন্যে পার হেড আনা চারেক। রাস্তার দিকের বারান্দায় সকলের জুতো রাখবার

ব্যবস্থা, সেই সঙ্গে স্নানের বালতি, মগ অথবা পেতলের ঘটি—যার যেমন সম্পদ।

খাওয়ার জন্যে তো নীচের পাইস-হোটেল আছেই। সেই 'পাঁচ পয়সার কমে খাওয়া নাই'—এর যুগেও সেখানে চার পয়সায় ভাত-ডাল-ছ্যাঁচড়া মিলত। চার পাঁচ আনার আভি-জাত্যে যাঁরা উঠতে চাইতেন, অর্থাৎ চিংড়ির মালাইকারী আর ডিমের লবঙ্গলতিকা কিংবা মাংসের দো-পেঁয়াজীর বিলাসিতা করবার শখ যদি কারো জাগত, তা হলে বাইরে তো চেয়ার-টেবিলের আরো ভালো পাইস হোটেল ছিলই।

আর মানুষেরা। ওরই মধ্যে কেউ ছাত্র—সতরঞ্চির বিছানায় তার সারস্বত-সাধনা। কেউ বেকার—কখনো বিড়ি ধরিয়ে উদাস হয়ে পড়ে-থাকা, কখনো চাকরির সন্ধানে বেরুনো। কেউ ক্যান্‌ভাসার—ভোর ছটায় প্রস্থান রাত এগারোটায় প্রত্যাবর্তন। কেউ গেঞ্জীর কলের ফিটার, কেউ প্রেসের

এই জুতো যে করিবে চুরি
বাবা তার ঘোড়া, মাতা...

কম্পোজিটার, কেউ ট্রাম-কণ্ডাকটার, কেউ দালাল, কেউ-কেউ বা নিতান্তই হরিপদ কেরাণী।

ভোরবেলা উঠেই কেউ কেউ গলা চড়িয়ে রামপ্রসাদী গাইতে থাকেন—কোনো ঘরে দল বেঁধে শুরু হয়ে যায় নরোত্তম দাসের প্রার্থনা। একজন সেই ফাঁকে এক মুঠো ছোলা চিবিয়ে ঘরের মধ্যেই ডন-বৈঠক দিতে থাকেন, তার মধ্যেই কারো পাঠধ্বনি ওঠে :

'সুলো-সুলো-সুয়া রেন্‌ড্‌ উইথ্‌ ব্লড অ্যাণ্ড আয়র্ন!' কোনো বিপন্ন ভদ্র সন্তান দরজা খুলেই সূর্য দেখবার আগে কাবুলীওলার মেহেদী রঙা দাড়ি দেখতে পান, লাঠি ঠুকে ঠুকে সে জানতে চায় : 'রুপেয়া-রুপেয়া কাঁহা এ হর্‌ড়িচড়ুণ?' নীচের পাইস হোটেলের মালিক আর ভাইপোর মধ্যে হঠাৎ মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়—পরস্পরের উদ্দেশে সম্বন্ধ বিরোধী বিবিধ-সম্ভাষণ চলে—দু-তিনজন মুখ টিপে হেসে কানাকানি করেন : 'সুন্দ-উপসুন্দের ব্যাপার মশাই—হোটেলের ঝি-টা'—গোড়ীর সংগ্রাম শেষ হতে না হতে উৎকলীয় মহাসমর শুরু হয়ে যায় : 'টঙ্কা-টঙ্কা-গুটে টঙ্কা!' একটি ছাত্র একমনে রোম-সাম্রাজ্যের পতন মুখস্থ করে, তিনজন খবরের কাগজ নিয়ে রাজনীতির তর্ক চালায়। আর নির্বিকার মুখে বিড়ি ধরিয়ে একটি 'বাথরুমে'র সামনে গামছাপরা ছজন শান্ত ধৈর্যে লাইন দেয়।

বর্ণহীন দুপুর নির্জনতায় কাটে। বিকেল পাঁচটা থেকে আবার জীবন-কাব্য। ফিরে এসে কেউ আড্ডা দেয়, কেউ একটু ফর্সা জামা-কাপড়ে সিনেমায় যায়—কেউ কেউ অন্য আর একটি 'সুখে'র সন্ধানে বেরোয়। মধ্য রাতে সেই সৌখিনদের একজন হয়তো যন্ত্রণায় গুণ গুণ করে কাঁদে—পাশ থেকে বিরক্ত বন্ধুটি বলে, 'কান্‌ যে যাও ওইসব জায়গায়—বিয়া করতে পারো না?' চাপা কান্নার মধ্যে জবাব আসে : 'খাওয়াব কী?' ভোর হওয়ার আগে কার সন্ধানে পুলিস আসে রাজনীতির ব্যাপারে, তাকে ঘরে পাওয়া যায় না।

বন্ধুত্বে-বিদ্বেষে, ভালোয়-মন্দে, নীচতায়-নিঃস্বার্থতায়, স্থূল রসিকতায়-সহজ আনন্দে, প্রত্যাশায়-পরাভবে—বাড়িটা জীবনের মহাকাব্য রচনা করে। সেই মহা-কাব্যের স্বাদ আমি পেয়েছিলুম। আমার পাশের বিছানায় থাকতেন এক বন্ধু, আজ তিনি দিক্‌পাল ঔপন্যাসিক। অনেক বই-ই তিনি লিখেছেন—কিন্তু এই বাড়িটার কথা কখনো লেখেন নি।

কেন লেখেন নি? মহাকাব্যের যুগ শেষ হয়ে গেছে বলে। এখনকার ফ্ল্যাটে—নতুন বাড়িতে গল্প-কবিতা-মাঝারি উপন্যাস লেখা হয়, তার বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্রতায় এপিকের সমুদ্র-মন্দ্রিত ঐকতান ওঠে না। তাই মহা-কাব্যের উপকরণ বুকে নিয়ে আর একটি বাড়িও ইতিহাসের ওপারেই চলে গেল।

ভাষা ও সাহিত্য

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

আমাদের দেশ মূর্তি পূজোর দেশ। মূর্তি সম্পর্কে আমরা অতিমাত্রায় সচেতন। আমাদের অগণিত দেবদেবীর মধ্যে একটিকেও আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিনি কিন্তু প্রত্যেকেরই একটি মূর্তি আমরা কল্পনা করে রেখেছি—কেউ চতুরানন, কেউ ত্রিনয়ন, কেউ চতুর্ভুজ, কেউবা দশভুজা—এমন আরো কত। কিন্তু আমাদের স্বভাব বড় বিচিত্র—এই আমরাই আবার কোন কোন ব্যাপারে মূর্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। যার বিশেষ একটি মূর্তি আছে তারও মূর্তি আমরা ভুলে যাই; যার আকার আছে তাকে ঠিক নিরাকার না করলেও কিম্ভূত কিমাকার করে তুলি। অ-দৃষ্ট এবং অনির্দিষ্ট কোন জিনিসের মূর্তি আমরা কল্পনা করে নিতে পারি। কিন্তু যে জিনিস নিত্য দেখছি, শুনছি, হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছি তার রূপ এবং স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। কাব্য সাহিত্য হচ্ছে সেই জাতীয় জিনিস। সাহিত্য নিয়ে আমরা নিত্য ঘাঁটাঘাঁটি করি কিন্তু তার রূপ এবং স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের সুনির্দিষ্ট কোন ধারণা নেই।

সেদিন আলোচনা প্রসঙ্গে আমি যখন বলেছিলাম যে সাহিত্য জিনিসটা সাকার, সেটা নিরাকার নয় তখন শ্রোতারা বেশ একটু চমকে উঠেছিলেন। সাহিত্য তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা বাঙলা ভাষায় খুব বেশি হয়নি; সেটুকু হয়েছে তাও অনেকটা নিরাকার ব্রহ্মের আলোচনার মতো। অবশ্য কাব্যরস যে কি বস্তু সেটা স্পষ্ট করে প্রকাশ করা যে আদৌ সহজসাধ্য ব্যাপার নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। বসওয়েল ডক্টর জনসনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন what is poetry? জনসন উত্তরে বলেছিলেন, ও বস্তুটা কি নয় সেটা বরং বলা সহজ (Sir, it is easier to say what it is not)। বাস্তবিক পক্ষে আরিস্টটল থেকে শুরু করে দিশী বিদেশী নানা মুনির নানা মতামত পাঠ করে সাহিত্য কি বস্তু আমি আজও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি, কি নয়, সেটা বরং খানিকটা বুঝেছি। সাহিত্য-তত্ত্বজ্ঞানীরা যা বলেছেন তার বেশির ভাগ কথাই খুব স্পষ্ট নয়। তার কারণ রস-সৃষ্টির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই বলেই শিল্প সাহিত্যের খেয়ালী চরিত্রটি পুরোপুরি তাঁদের কাছে ধরা দেয়নি। অবশ্য পণ্ডিত সমালোচকরা কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে কখনো কখনো খুব সংগত প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন কিন্তু সে সব প্রশ্নের তাঁরা যে জবাব দিয়েছেন রসিক সমাজে সব সময়ে তা গ্রাহ্য হয়নি। অপর পক্ষে কবি সাহিত্যিকরা যখন কাব্য সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন তখন সব কথা স্পষ্ট না হলেও কথা প্রসঙ্গে হঠাৎ এমন কিছু বলেছেন যার ফলে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো সংশয়ের অন্ধকার বিদীর্ণ করে বিষয়টি সম্পর্কে অনেকখানি আলোক বিকীর্ণ করেছেন।

সাহিত্যের মূল্য বিচার রূপ ও রসের পরীক্ষায়। রস জিনিসটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়—চক্ষু কর্ণ স্পর্শের গোচর নয়, অনুভূতি-সাপেক্ষ অর্থাৎ একে ঠিক সাকার বলা চলে না। তবে জলের যেমন আকার নেই কিন্তু যে আধারে রাখা হয় সেই আধারের আকার গ্রহণ করে, রসও খানিকটা সেই রকম। কাব্যে সাহিত্যে রসের আধার হল ভাষা। চিত্র-শিল্পের ভাষা যেমন রেখা এবং রং, সংগীত শিল্পের ভাষা যেমন সুর তাল মান, কাব্য শিল্পের ভাষা তেমনি শব্দ এবং ছন্দ। শব্দের সম্পদে, গঠনের সৌষ্ঠবে, ছন্দের গুঞ্জনে কাব্যের রূপ ফুটে ওঠে। এটিই তার মূর্তি। যা গোড়ায় ছিল নিরাকার সে তখন সাকার হয়ে ওঠে। মনের ভাবকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করবার ক্ষমতাকেই বলে শিল্প সৃষ্টির ক্ষমতা। আবার মনের ভাব তখনই যথাযথভাবে ব্যক্ত হয় যখন সেই ভাবটি একটি মূর্তি পরিগ্রহ করে এবং সম্পূর্ণরূপে না হলেও কতক পরিমাণে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। অতএব কাব্যস্রষ্টার অন্যতম প্রধান কর্তব্য হবে নিরাকার রসকে আকার দান করা। লক্ষ্য করবার বিষয় যে দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুর্দশপদী ইত্যাদি নাম-করণ আকারের প্রতি লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। রসকে যখন আমরা নিরাকার বলি তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা রসের অনির্বচনীয়-তার কথাই উল্লেখ করি। অনির্বাচনীয়কে বচন দান করার মধ্যেই কবির কৃতিত্ব। যা ছিল অনির্বচনীয় সে যখন বচন লাভ করল তখনই সে মূর্তিও লাভ করল। স্বরূপ তখন রূপ পেল। যে অনুভূতি ছিল অনুমানের ব্যাপার সে অনুভূতি প্রত্যক্ষ হল। রবীন্দ্র-নাথ এই কথাটি অতি সুন্দর করে বলেছেন, "রসের অবতারণা সাহিত্যের একমাত্র অব-লম্বন নয়। তার আর একটা দিক আছে যেটা রূপের সৃষ্টি। যেটাতে আনে প্রত্যক্ষ অনুভূতি, কেবলমাত্র অনুমান নয়, আভাস নয়, ধ্বনির ঝংকার নয়।"

বাল্যকালে একদিন আমার কোনো বই-এর নাম দিয়েছিলাম 'ছবি ও গান'। ভেবে দেখলে দেখা যাবে এই দুটি নামের দ্বারাই সমস্ত সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করা যায়। ছবি জিনিসটা অতিমাত্রায় গূঢ় নয়—তা স্পষ্ট দৃশ্যমান। তার সঙ্গে রস মিশ্রিত থাকলেও তার রেখা ও বর্ণবিন্যাস সেই রসের প্রলেপে ঝাপসা হয়ে যায় না। এইজন্য তার প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর (সাহিত্যের স্বরূপ, 'সাহিত্যের মূল্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। আমাদের মনে যে ভাবের আকৃতি তাকে ভাষার বেষ্টনে বাঁধতে হয়। এই কারণে সাহিত্য সৃষ্টিতে ভাব এবং ভাষার সমান মূল্য। ভাবকে যদি বলি কাব্যের আত্মা তবে ভাষা তার দেহ। বাস্তবিকপক্ষে আমাদের অলংকার শাস্ত্রে ভাষাকে বলা হয়েছে 'কাব্য শরীর'। আমরা সাধারণত আত্মাকে দেহের চাইতে উচ্চ-স্থান দিই। সেটা খুব যুক্তিযুক্ত কথা নয় কারণ দেহ থেকে আত্মাকে পৃথক করা চলে না। মানুষের বেলায় যাই হোক, যে কবিতার দেহের সৌন্দর্য নেই তার আত্মার সৌন্দর্য আছে এমন কথা কোন সাহিত্য-রসিক স্বীকার করবেন না। আধ্যাত্মিক

বিচারে কোন্‌টা বড় কোন্‌টা ছোট বলতে পারিনে কিন্তু সাহিত্যিক বিচারে দুই-এর মূল্য সমান তো বটেই বরং দেহের মূল্য খানিকটা বেশী। কারণ অনেক উঁচু দরের কথা, ভালো ভালো কথা আমি পর পর সাজিয়ে যেতে পারি কিন্তু যতক্ষণ না তাকে ভাষার কারুকলায় সৌষ্ঠব বা সুষমা দিতে পারছি ততক্ষণ তা সাহিত্য পদবাচ্য হবে না। অবশ্য কেবলমাত্র ভাষা গৌরবেই সাহিত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় এমন কথা কখনো বলব না। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, বক্তব্য যৎসামান্য হলেও প্রকাশভঙ্গির চমৎকারিত্বেই কোন কোন জিনিস সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করতে পারে। এমন অনেক গীতি কবিতা আছে যার অর্থগৌরব অর্থাৎ আত্মিক মাহাত্ম্য বিশেষ কিছুই নেই কিন্তু তার কাঁচা অঙ্গের লাবণি যখন ভাষার রং-এ ছবির মতো উজ্জ্বল রেখায় ফুটে ওঠে তখন মন নিঃসন্দেহে মুগ্ধ হয় এবং তাকে খাঁটি কাব্য বলে গ্রহণ করতে কেউ আপত্তি করে না। বোধ করি এই কারণেই কোলরিজ কাব্যকে বলেছেন—

—the best words in the best order. সাহিত্যিকমাত্রেই ভাষার কারিগর। একটি মনোমত শব্দ খুঁজে বের করবার জন্যে কবি মাথা খুঁড়ে মরেন। কীটস্‌ বলেছিলেন, I am a lover of beautiful phrases. প্রকৃতপক্ষে প্রেমিকের স্বভাব আর কবি সাহিত্যিকের স্বভাবে মিল আছে, তেমনি আবার নারী দেহে এবং কাব্যদেহেও মিল আছে। দুটিই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। প্রেমিক যেমন প্রেমাস্পদের রক্তমাংসের দেহটিকে আদর করেন কবি তেমনি শব্দালঙ্কারে কাব্য-দেহটিকে মনের মতো করে সাজান।

কাব্য সাহিত্যকে আমরা যখন শিল্প বলে উল্লেখ করি তখন মনে রাখতে হবে যে, ঐ শিল্পকলা অনেকাংশে প্রকাশভঙ্গির মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় অর্থাৎ সাহিত্যের আর্ট প্রধানত ভাষাগত। আমাদের সাহিত্যে গোড়ার দিকে ভাষার কারুকলার প্রতি তেমন নজর দেওয়া হয় নি। কৃত্তিবাস এবং কাশীরাম দাস সরল ভাষায় সহজ ছন্দে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী রচনা করেছিলেন। কাব্যকাহিনী শোনানোর চাইতে ধর্মকাহিনী শোনানোর প্রতিই তাঁদের অধিকতর আগ্রহ ছিল। ভাষাগত কারুকার্যের প্রতি তাঁরা তেমন মনোযোগ দেন নি। বৈষ্ণব কবিরা এ বিষয়ে অধিকতর যত্ন নিয়েছেন। পরবর্তীকালে ভাষার ব্যবহারে সর্বাধিক সচেতনতা দেখিয়েছেন ভারতচন্দ্র। বলতে গেলে তিনিই বাংলা কাব্যে প্রথম আর্টিস্ট। বাকচাতুর্যের সংস্কৃত চর্চা তাঁর কাব্যেই প্রথম আমরা লক্ষ্য করেছি। এলিয়ট যে অর্থে কবিকে craftsman বলেছেন সে অর্থে ভারতচন্দ্রকে বলা যায় ভাষার কুশলী কারিগর।

অবশ্য এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে কেবলমাত্র ভাষার কারুকার্য দিয়েই সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। ভাবের সঙ্গে ভাষার সাযুজ্যকেই বলে সাহিত্যের আর্ট। দুএ মিলে রসসৃষ্টি। কোন একটিকে প্রাধান্য দিলে শিল্পকলা বিকলাঙ্গ হতে বাধ্য। সকল শিল্পের গোড়ার কথা মাত্রাবোধ। প্রাচীনকালের সাহিত্যাচার্যরা এ বিষয়ে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। বিশেষ করে ক্লাসিকেল সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ মাত্রাবোধ। রেনেসাঁস যুগে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত হল। সীমাহীন জগতের বিস্ময়, বসুন্ধরার অন্তহীন বৈচিত্র্য, আপন শক্তির নবলব্ধ চেতনা, এক কথায় Brave new World আবিষ্কারের উল্লাস মানুষকে অসম্বৃত করে তুলেছিল। (এখানে বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডের কথাই বলছি।) ভাবের উন্মাদনায় কাব্যে সাহিত্যে স্বভাবতঃই অতিশয়তা দেখা দিল। দু' শতাব্দী পূর্বে চসার যে কাব্যরীতির প্রবর্তন করেছিলেন তার উচ্ছেদ হল। বহু ভ্রমণে, বহু দর্শনে, বহু শ্রুতিতে চসারের মন ছিল সমৃদ্ধ। কাব্যের যে অঙ্গসজ্জার প্রয়োজন আছে সেটি যেমন তাঁর জানা ছিল, তেমনি অলঙ্করণ বাহুল্য যে অনাবশ্যক তাও তাঁর অজানা ছিল না। এই কারণে চসারকে বিশেষ এক কাব্যাদর্শের স্রষ্টা বলা যেতে পারে। কিন্তু সে আদর্শ স্থিতি-লাভ করবার পূর্বেই রেনেসাঁসের প্রবল বন্যা এসে তার ভিত ধসিয়ে দিল।

রেনেসাঁস মানুষের মনে যে উন্মাদনা এনে দিয়েছিল তার ফলে মানুষের ভাষায়ও যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। সেটা স্বাভাবিক, সদাজাগ্রত মন যখন পক্ষ বিস্তার করে তখন তার দাবি মেটাবার জন্যে ভাষাকে সারাক্ষণ শশব্যস্ত থাকতে হয়। অব্যবহারে মরচে-পড়া শব্দ নতুন ব্যবহারে চকচকে হয়ে ওঠে, অনেক অপোগণ্ড শব্দ সাবালকত্ব লাভ করে—নতুন অর্থগৌরবে গৌরবান্বিত হয়। অনেক নতুন শব্দের জন্ম হয়। রেনেসাঁস যুগে ইংরেজী ভাষার সম্পদ সমৃদ্ধি অনেক বেড়েছে। কিন্তু সে সম্পদের ব্যবহারটা হয়েছে একটু বেহিসেবী, বেপরোয়া রকমে। রোমান্টিক সাহিত্যের অনেক গুণ, দোষের মধ্যে ও অযথা বাক্যবাগীশ। সব সময়ে একটু বাড়িয়ে বলে, এক কথার জায়গায় দশ কথা বলে। ক্লাসিকেল সাহিত্য কামিয়ে বলে এমন নয়। সে স্বভাবত স্বল্পভাষী, যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই বলে, অতিরিক্ত কিছু বলে না। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে কাব্যকে একেবারে চাঁচা-ছোলা হতে হবে, তার কোন প্রকার সাজগোজের প্রয়োজন নেই। মেয়েরা এক আধটু সেজেগুজে থাকলে আমাদের চোখে ভালই লাগে, কাব্যের বেলায়ও তাই। ওকে আটপৌরে পোশাকে দেখতে আমাদের ভালো লাগে না। কীটস্‌ যাকে বলেছেন 'fine excess' কাব্যের পক্ষে তা অত্যাবশ্যক। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে কাব্যের পক্ষে যা অত্যাবশ্যক গদ্যের পক্ষে তা অত্যাবশ্যক নয়। কাব্যে অল্পবিস্তর অতিশয়তার জন্য সকলেই প্রস্তুত থাকেন কিন্তু গদ্যে অনেকেই সেটা বরদাস্ত করতে পারেন না।

আশ্চর্যের বিষয় যে রোমান্টিক অতিশয্যের ডামাডোলের মধ্যেও বেকন অত্যাশ্চর্য গদ্য রীতির প্রবর্তন করেছিলেন। বাক্যের এমন মেদক্লেশহীন আঁটসাঁট গড়নের কথা সে যুগে ভাবাই যেত না। ক্লাসিকেল রচনারীতির প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ফলেই এটি সম্ভব হয়েছিল। ক্ষুরধার বুদ্ধির রচনা কখনো শিথিল-রসনা, বিস্রস্ত-বসনা, স্খলচরণা হয় না। সে ক্ষিপ্রগতি অথচ সংযত-মতি; ঘনাপিনদ্ধ তার কায়া। গদ্যের এটাই স্বাভাবিক মূর্তি। বেকনকে বাদ দিলে সে যুগের অন্যান্য গদ্য রচনা না গদ্য না পদ্য। চসারের কাব্যরীতি যেমন রেনেসাঁস যুগে ঠাঁই পায় নি, বেকনের গদ্য রীতিও সে যুগে কেউ অনুসরণ করে নি।

কল্পনাপ্রবণ রোমান্টিক মনোভাব খানিকটা ইংরেজের স্বাভাবগত। ও দেশের ঘন কুয়াশা বেশির ভাগ জিনিসকে চোখের আড়াল করে রাখে। সামান্যই দেখে, বাকীটুকু অনুমান করে নেয়। অন্যান্য অনেক কারণের মধ্যে ইংরেজী রোমান্টিকতার বোধ করি এটাও একটা কারণ। অবশ্য আমরা বাংলাদেশীরাও অতিমাত্রায় রোমান্টিক যদিও এ দেশে সূর্যালোকের অভাব নেই। আমাদের বোধ অন্যরকম, আমরা দেখেও দেখি না। থাক্‌ আমাদের কথা পরে হবে। ইংলণ্ডের তুলনায় ফ্রান্সকে সূর্যকরোজ্জ্বল দেশ বলা যেতে পারে। ও দেশে রোমান্টিসিজম এবং তাদের ভাব স্থিতি লাভ করে নি। ও দেশে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা যতখানি হয়েছে কল্পনা-বৃত্তির ততখানি নয়। কল্পনাপ্রবণ অভিনিবিষ্ট মন ইংরেজী কাব্যে যে গভীরতা দিয়েছে, অতিমাত্রায় Sophisticated ফরাসী কাব্যে সে গভীরতার অভাব আছে। অপর পক্ষে ফরাসী মনের যুক্তিবাদী বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি ফরাসী গদ্য ভাষাকে যে ঔজ্জ্বল্য এবং তীক্ষ্ণতা দিয়েছে ইংরেজী গদ্যে তা নেই। ফরাসী গদ্যের প্রসাদগুণ যে কোন সাহিত্যের ঈর্ষার বস্তু। বাঙালী লেখকরা সকলেই ইংরেজী পাঠশালার ছাত্র। ফলে আমাদের কাব্য, সাহিত্য অনেকটা ইংরেজীর আদলে গড়ে উঠেছে। তাতে ক্ষতি হয়েছে এমন কথা কেউ বলবে না। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে ফরাসী সাহিত্যের চর্চা আমরা করিনি বলে সাহিত্য রচনার বিশেষ করে গদ্য রচনার কারুকলা এখনো আমরা পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারিনি। অথচ বাঙলা ভাষার মধ্যে একটি স্বভাবজাত প্রসাদগুণ আছে, আর বাঙালী মনের মধ্যেও একটি সূক্ষ্ম রুচিবোধ রয়েছে। কাজেই

০ আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি উপন্যাস ০

বিমল মিত্রের
হাতে রইলো তিন
সদ্য প্রকাশিত ॥ দাম ৬·০০

সমরেশ বসুর
এপার ওপার
সদ্য প্রকাশিত ॥ দাম ৫·০০

গৌরকিশোর ঘোষের
লোকটা
দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৩·০০

সুবোধ ঘোষের
বন উপবন
তৃতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৪·০০

প্রবোধকুমার সান্যালের
জনম জনম হম
চতুর্থ মুদ্রণ ॥ দাম ৪·০০

বিমল মিত্রের
রং বদলায়
চতুর্থ মুদ্রণ ॥ দাম ৩·৫০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
মনের মানুষ
দাম ৩·০০

বিমল মিত্রের
বেগম মেরী বিশ্বাস
তৃতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ২৫·০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
প্রেমের চেয়ে বড়
সম্প্রতি প্রকাশিত ॥ দাম ১২·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
অমাবস্যার গান
দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৩·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
সেতুবন্ধন
দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৫·০০

আশাপূর্ণা দেবীর
দোলনা
তৃতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৫·০০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
সারারাত
দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৫·০০

সুবোধ ঘোষের
শতকিয়া
তৃতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৮·০০

রমাপদ চৌধুরীর
বনপলাশির পদাবলী
তৃতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৮·৫০

আশাপূর্ণা দেবীর
রাতের পাখি
দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৪·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
সূর্যসাক্ষী
দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ১৪·০০

মনোজ বসুর
স্বর্ণসজ্জা
দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৪·০০

প্রতিভা বসুর
রাঙা ভাঙা চাঁদ
তৃতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৪·০০

মনোজ বসুর
রূপবতী
তৃতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৩·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
রূপসী রাত্রি
তৃতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৬·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলকাতা ৯ ॥ ফোন ৩৪-১৪৮৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলকাতা ৯ ॥ ফোন ৩৪-৮২৬৪

ভাষাগত Craftsmanship-এর প্রতি যদি আমাদের যথেষ্ট নজর থাকত তা হলে আমাদের গদ্যরীতির অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি সাধন সম্ভব হত।

প্রধানত আমাদের গদ্য সাহিত্যের কথা মনে রেখেই এই প্রবন্ধ লিখতে বসেছিলাম। ভূমিষ্ঠ হতে না হতেই বঙ্কিমচন্দ্র তাকে যে বলিষ্ঠতা দিয়েছিলেন খুব কম সাহিত্যের ভাগ্যেই সেটি ঘটেছে। বাঙলা গদ্যের জন্ম উনিশ শতকের গোড়ায়। কিঞ্চিদধিক দেড় শ' বৎসরে সে গদ্যের যে উন্নতি হয়েছে তা নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। আধুনিক যুগের গতি স্বভাবতই দ্রুত। যুগের গতিবেগের দরুণই ভাষার উন্নতি ত্বরান্বিত হয়েছে। বাঙলা গদ্য বাঙলা সাহিত্যের পরিণত বয়সের সন্তান। বলতে গেলে জন্ম মুহূর্তেই ও দেহে মনে সংগঠিত, আচারে ব্যবহারে সাবালক। শৈশব পরিচর্যা হয়েছে রামমোহন বিদ্যাসাগরের হাতে, তাতেই ওর হাড় মজবুত হয়েছে। আর কৈশোরে পদার্পণ করতে না করতেই বঙ্কিম তার দেহে লাবণ্য এবং মনে বুদ্ধির প্রাচুর্য এনে দিয়েছিলেন, এক কথায় দেহে মনে যৌবনের উদ্গম হয়েছিল।

আমাদের গদ্য সাহিত্য যে জন্মাবধি সাবালক তার কারণ তাকে প্রথমাবধিই কষ্টসাধ্য কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর দুজনকেই সে যুগের নানা ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রশ্ন নিয়ে বাদানুবাদে নিযুক্ত হতে হয়েছে। আমাদের সদ্যোজাত বাঙলা গদ্যের সাহায্যেই প্রচলিত ধ্যান ধারণার অযৌক্তিকতা প্রমাণিত করে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। সেখানেই বাংলা গদ্য ভাষার অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ভাষাকে যুক্তিতর্কের উপযোগী বাহন করতে বহু সময় লেগে যায়। বাঙলা ভাষাকে ওই জন্যে খুব বেশি কালক্ষেপ করতে হয়নি। রামমোহন বিদ্যাসাগরের ন্যায় যুক্তিবাদী মানুষের পরিচর্যার ফলেই ওই দুঃসাধ্য সাধনায় সে সিদ্ধি লাভ করেছে। সাহিত্যের বাহন হতে হলে ভাষাকে একদিকে যেমন যুক্তি তর্কের টান সামলাতে হয় অপর দিকে তেমনি মনের নিগূঢ়তম আনন্দ বেদনা প্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। কমনীয়তা এবং বলিষ্ঠতা—একযোগে এই দু'-এরই চর্চা প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা এই উভয় গুণের অধিকারী। মানব হৃদয়ের স্নেহ প্রেম ভক্তি প্রকাশের জন্য ভাষায় যেটুকু আর্দ্রতার প্রয়োজন সেটুকু অবশ্যই ছিল, কিন্তু অনাবশ্যক ভাবোন্মাদনায় সে ভাষাকে কোথাও তিনি জলো জলো করেন নি। তাঁর ভাষায় জলীয় অংশ নেই বললেই চলে। আমি অন্যত্র ওই ভাষাকে dehydrated ভাষা বলে বর্ণনা করেছিলাম।

প্রত্যেক জাতির কতগুলো মূলগত বৈশিষ্ট্য (ethnical characteristics) থাকে। তার ছাপ সে দেশের মানুষের মুখাবয়বে এবং দেহাবয়বে প্রকাশ পায়। ভাষার বেলায়ও তাই। তারও কতগুলো মূলগত বৈশিষ্ট্য আছে। রামমোহন বিদ্যাসাগর উভয়েই মহামনীষী ব্যক্তি। তাঁরা বাঙলা ভাষার স্বভাবধর্মের প্রতি বিশেষ লক্ষ রেখে বাঙলা গদ্যের ভিত তৈরি করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভিতের উপরে সৌধ রচনা করেছেন। যতটুকু মজবুত হলে সমস্ত রকম জ্ঞানচর্চা এবং জিজ্ঞাসাপূরণ সম্ভব বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের ভাষাকে সেই স্তরে তুলে দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের হাতে বাঙলা গদ্য যে অভাবনীয় সমৃদ্ধি লাভ করেছে তারও মূলে প্রধানত বঙ্কিম প্রতিভা নিহিত। এমন কি বাঙলা গদ্যে আজ যে কথ্য ভাষার প্রচলন হয়েছে তারও বীজ উপ্ত হয়েছিল বঙ্কিমের বহু নিন্দিত গুরুচণ্ডালী দোষ দুষ্ট ভাষার মধ্যে। সাধু ভাষার চরিত্র কেবলমাত্র ক্রিয়াপদের উপর নির্ভরশীল নয়। সাধু ভাষার সাধুত্ব অবিমিশ্র। প্রাকৃত শব্দের ব্যবহার সেখানে নিষিদ্ধ। আজ সকলেই স্বীকার করবেন যে ভাষার শক্তিবৃদ্ধির জন্যে আবশ্যিক পরিমাণে গুরুচণ্ডালী দোষ গুণে বলাই বাঞ্ছনীয়। অত্যাবশ্যকও। এখানে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাধু ভাষায় এবং চলতি ভাষায় বিরোধ থাকলেও, চলতি ভাষাকে অসাধু ভাবা হলে চলবে না। অসাধু ভাষা কখনো সাহিত্যের বাহন হতে পারে না। ভাষাকে সব সময় সাহিত্যের সম্ভ্রম রক্ষা করে চলতে হয়। হুতোম প্যাঁচার নকশা এবং আলালের ঘরের দুলাল ভাষার অগ্রগতিতে যতখানি সহায়তা করেছে সাহিত্যের অগ্রগতিতে ততখানি নয়। চলতি ভাষায় প্রথম খাঁটি সাহিত্য গ্রন্থ বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র। সতেরো আঠারো বৎসরের বালকের পক্ষে এ এক অত্যাশ্চর্য কীর্তি। রবীন্দ্র জিজ্ঞাসুরা একটি কথা লক্ষ করে দেখবেন যে উক্ত গ্রন্থে তিনি গদ্য রচনায় যে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন ওই বয়সের কাব্য রচনায় ততখানি শক্তির পরিচয় নেই। কলম ধরেই এ জাতীয় গদ্য রচনা অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। এই ভাষারই

পূর্ণ প্রতিভায় উদ্ভাসিত জনকজন্দে ঝলমলে রূপে পরে ছিন্নপত্রের পাতায় প্রকাশ পেয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র না হলে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সম্ভব হত না, এ কথা বাহুল্য মাত্র। তা হলেও একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের কীর্তিকে explain করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরাট প্রতিভা-সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের যখন আগমন তখন বাঙলা ভাষার শক্তি সামর্থ্য এতখানি হয়নি যা স্বাভাবিক নিয়মে রবীন্দ্র সাহিত্যের সৃষ্টি করতে পারে। গদ্যের চাইতে পদ্যের পুঁজি অবশ্যই কিছু বেশি ছিল কিন্তু তার দৌলতে রবীন্দ্র কাব্যের উদ্ভবকে স্বাভাবিক বলা চলে না।

ইতিপূর্বে মধুসূদন মহাকাব্য রচনা করেছেন; হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রও মহাকাব্যের মহড়া দিয়েছেন। কিন্তু তার ফলে বাঙলা কাব্যের শক্তি সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়নি। লক্ষ্য করবার বিষয় যে সব সাহিত্যেই মহাকাব্যের জন্ম হয়েছে আগে, গীতিকাব্য বহু পরে। মহাকাব্যের অবমাননা না করেও বলা চলে যে জিনিসটা আকারে বৃহৎ এবং বৃহৎ বলেই ব্যবস্থাপনায় একটু স্থূল। বেশির ভাগ জিনিসেরই আরম্ভ স্থূলাকারে। ওই একই কারণে উপন্যাস আগে, ছোট গল্প পরে। শুধু শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার দেখা গিয়েছে। সেই আদি যুগে মানুষ বাসস্থানের জন্যে বড় বড় পাথর জড় করে গুহা ঘর তৈরি করেছে কিংবা বড় বড় গাছের গুঁড়ি সাজিয়ে মাথা গুঁজবার স্থান রচনা করেছে কিন্তু গাছের পাতা কিম্বা খড়ের ছাউনি দিয়ে ছোট্ট একটি কুঁড়ে ঘরের কল্পনা করতে বহু যুগ লেগে গিয়েছে। সূক্ষ্ম জিনিসের কল্পনা সহজে আসে না। অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের কত যুগ পরে এসেছে একটি চতুর্দশপদী কবিতা। বাদ-বিবক্ষিত মেঘনাদবধ কাব্যের চাইতেও বাঙলা সাহিত্যে মধুসূদনের বড় দান চতুর্দশপদী কবিতাবলী।

যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদি বৃহৎ ব্যাপার কিম্বা গুরুগম্ভীর তত্ত্বকথা বাদ দিয়েও নিত্য দিনের সামান্য কথা নিয়েই যে গদ্যে পদ্যে অসামান্য রসের সৃষ্টি করা যায়, রবীন্দ্রনাথই বাঙলা ভাষায় সর্বপ্রথম সে দুঃসাধ্যসাধন করেছেন। সাহিত্যের, বিশেষ করে ভাষার আসল পরীক্ষা এখানেই। ভাষার দেহটিকে অতিশয় নমনীয় কমনীয় এবং চিক্কণ—ইংরেজীতে যাকে বলে supple করতে পারলে তবেই ভাষাকে দিয়ে সব কাজ করানো যায়, তাকে ইচ্ছামত যেদিকে খুশি হেলানো দোলানো যায়। লেখার ভাষাকে যতটা সম্ভব মুখের ভাষার কাছাকাছি আনা প্রয়োজন। এই সেদিনও আমাদের ভাষা ছিল লেখায় এক কথায় আর। মানুষ ঘরে বাইরে যখন দুই ভিন্ন

মূর্তিতে দেখা দেয় তখন দুটোই খানিকটা অস্বাভাবিক ঠেকে। বাইরে চোগা চাপকান শামলা আঁটা সুসজ্জিত মূর্তি, ঘরে আদুড় গায়ে হাঁটু-ধুতি পরা আটপৌরে চেহারা। আমাদের ভাষার মূর্তিও ছিল এমনি অস্বাভাবিক। লিখতে গেলে এক, বলতে গেলে আর। ঘরোয়া কথাকে যখন শৌখিন রূপ দেওয়া যায় তখনই ভাষা সাহিত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। কারণ সাহিত্য মূলত শখের জিনিস।

রবীন্দ্রনাথ যে ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন তাঁর পূর্বকালীন কিম্বা সমকালীন কাব্যের সঙ্গে তার মিল যৎসামান্য। আমাদের পূর্বার্জিত সুকৃতির জোরে রবীন্দ্রকাব্যের মতো বর লাভ করবার সংগত অধিকার আমরা দাবি করতে পারি না। পূর্বকৃতির তুলনায় রবীন্দ্রকৃতি এত বিস্তীর্ণ, এত বিচিত্র, এত বর্ণাঢ্য যে একে একেবারেই বেহিসাবী বলে মনে হয়। প্রতিভা জিনিসটাই বেহিসাবী এবং বেপরোয়া। ওর নিজেরই একটা তাগিদ আছে, সেই তাগিদের চাপেই তাকে পথ করে নিতে হয়। অপরের মুখ চেয়ে থাকলে তার চলে না। রবীন্দ্রকাব্যের ভাষা রবীন্দ্রনাথকে নিজে তৈরি করে নিতে হয়েছে। পূর্বগামী-দের কাছ থেকে গদ্যে যাও বা পেয়েছেন কাব্যে তা পান নি। কাব্যের অত্যাবশ্যক কর্তব্য সূক্ষ্মতম অনুভূতিকে তদুপযোগী সূক্ষ্ম সুচারু সপ্রতিভ শব্দের জালে আবদ্ধ করা। ভাব আর ভাষায় সারাক্ষণ একটি লুকোচুরি খেলা চলছে। যে ভাষা অপরিণত সে তেমন ঠাস বুনানি নয়, তার গায়ে বড় বড় ফাঁক থেকে যায়—মনের অনেক কথা সেই ভাষার জালে ধরা পড়ে না। ভাষা যেখানে ঘন-বুনোট সেখানে চুনো পুঁটিটিও পালাতে পারে না। হেন কথা নেই যা সেই ভাষায় প্রকাশ করা চলে না। আবার প্রকাশ করাটাই একমাত্র কর্তব্য নয়, সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারলে তবেই তা সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারে। ভাব বা অর্থগৌরবে সাহিত্য হয় না, ভাষার সৌষ্ঠবেই সাহিত্য। গান যেমন সুরের, ছবি যেমন রেখায়, সাহিত্য তেমনি ভাষার শিল্প। অথচ অনেক শক্তি-শালী লেখকও ভাষা সম্বন্ধে উদাসীন। তাঁরা ভাবেন ভাব বা অর্থগৌরবেই সাহিত্যের গৌরব। এ যুগের কবিই বলেছেন, Poetry is written with words not with ideas, গদ্য পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। যৎসামান্য বিষয়ও প্রকাশভঙ্গির গুণে সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করতে পারে।

ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যতখানি সচেতন তাঁর পূর্ববর্তী লেখকরা ততখানি ছিলেন না। তাঁর নিজের প্রয়োজনেই ভাষার শক্তিবৃদ্ধির কথা তাঁকে সারাক্ষণ ভাবতে হয়েছে। এত বিভিন্ন এবং এত বিচিত্র বিষয়ে তাঁকে লিখতে হয়েছে যে বিষয়ভেদে ভাষার বৈলক্ষণ্য এবং শব্দের ধ্বনিগত তাৎপর্য সম্পর্কে তাঁকে সর্বদা সজাগ থাকতে হয়েছে। আমাদের শাস্ত্র শব্দকে বলেছে ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অরূপ কিন্তু তাঁর নিজের সৃষ্টির মধ্যেই তিনি রূপ লাভ করেছেন। শব্দও অরূপ কিন্তু কবি সাহিত্যিক যখন যেভাবে শব্দকে ব্যবহার করেন শব্দ সেইভাবে রূপ গ্রহণ করে। আমি এই অর্থেই গোড়াতে সাহিত্যকে সাকার আখ্যা দিয়েছি। মানবিক প্রেম এবং ভগবৎ প্রেম, ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, পার্থিব সৌন্দর্য এবং অপার্থিব সৌন্দর্য, পার্থিক লাভক্ষতি এবং পারমার্থিক লাভক্ষতি অভিন্ন বস্তু নয়। দুই এর ভেদ শব্দ দ্বারাই প্রকাশ করতে হয়। সেই শব্দভেদী বাণ একমাত্র কবিরাই নিক্ষেপ করতে পারেন।

সুসমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষার অপত্য হিসাবে বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্য নিতান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় যাত্রা শুরু করে নি। রামমোহন বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই সে মূলধন অল্পাধিক পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। জমানো টাকার সুদটাই সব চাইতে বড় সহায়। মূলধন ভাঙিয়ে খেতে গেলে অল্প দিনেই ফুরিয়ে যায়। সাধু শব্দ থেকে উৎপন্ন যে অপভ্রংশ সেটাই সাধু ভাষার সুদ। ভাষার অপভ্রষ্ট রূপ বা অপভাষা যে পরিমাণে লিখিত ভাষার ব্যবহারে আসবে সেই পরিমাণে ভাষার সাবলীলতা বাড়বে। প্রাকৃত ভাষাই প্রকৃত ভাষা, এই কথাটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন। মধুসূদন অতিমাত্রায় সংস্কৃতাশ্রয়ী ছিলেন বলে তাঁর ব্যবহৃত ভাষা অনতিকাল মধ্যে বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যের নিরবচ্ছিন্ন গতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এই কারণে অসামান্য কবি প্রতিভা সত্ত্বেও মধুসূদন বাঙলা কাব্যে একটি বিচ্ছিন্ন episode, অগ্রজদের সঙ্গে যেমন কোনই মিল নেই, অনুজদের সঙ্গেও খুব একটা নেই।

অনেকের ধারণা সংস্কৃত সাহিত্যের সম্পদ যতখানি exploit করা উচিত ছিল বাঙালী লেখকরা তা করেন নি। প্রত্যেক ভাষার

বিশেষ একটা ধাত আছে, সেই ধাত অনুযায়ী সে গড়ে ওঠে। বাইরাগত জিনিস যেটুকু স্বাভাবিক নিয়মে অঙ্গীভূত হয়ে যায়, নিজস্ব ধাতের সঙ্গে মিশে যায় সেটুকুই স্থিতি লাভ করে। জোর করে মেশাতে গেলে সত্যিকারের পুষ্টিসাধন হয় না। ইদানীং কালে কবি সুধীন দত্ত সংস্কৃতের দোরে ধর্ণা দিয়েছিলেন। রত্নরাজি খুব যে একটা উদ্ধার করতে পেরেছেন এমন মনে হয় না। আধুনিক বাঙলার তুলনায় সংস্কৃত ভাষাটা ওজনে অনেক বেশি ভারি। এখন এই দুটিতে মিশ খাওয়ানো কঠিন। সুধীন্দ্রনাথ বাঙলা ভাষাকে যে 'সাংস্কৃতিক' মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেছিলেন আধুনিক বাঙলার পক্ষে সেটা খুব পুষ্টিসাধক হয়েছে এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে না। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন, উঁ সাহিত্যে তাঁর প্রবেশ ছিল গভীর। অপর পক্ষে তাঁর মন ছিল বৈজ্ঞানিক। ভাষার ব্যাকরণ প্রকরণ বানান সম্পর্কে প্রবল কৌতূহল ছিল। বাঙলা ভাষার নিজস্ব ধাত, চালচলন, ঢং সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। এ জন্য যখন কাব্য রচনায় হাত দিলেন তখন সংস্কৃত-রত্নাগারের দ্বার তাঁর কাছে উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি তার যথেচ্ছ ব্যবহার করেন নি। সাহিত্য শিল্পী নিজ প্রয়োজনে যেখানে যা পাবেন তাই হাত বাড়িয়ে নেবেন, এটাই স্বাভাবিক। দ্বিজেন্দ্রনাথ যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই নিয়েছেন, তার বেশি নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথেরও অনুরাগ এবং অধিকার দুই-ই যথেষ্ট ছিল। সংস্কৃতের ভাণ্ডার হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও তিনি সেখান থেকে নেন নি এমন কথা কেউ বলবেন না। অবশ্যই নিয়েছেন তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু নেন নি। আত্মপ্রকাশের তাগিদে এবং নিজস্ব কাব্যরীতির প্রয়োজনে ভাষার যে flexibility আবশ্যক সেটি আয়ত্ত করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে ভাষার কসরৎ যথেষ্ট করতে হয়েছে। তবে এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে এই কার্যে পূর্ব-পুরুষের সঞ্চিত ধন যতখানি সহায়তা করে তার চাইতে ঢের বেশী করে সমকালীন সাহিত্য এবং তারও চাইতে বেশী করে লোকের মুখের নিত্যদিনের প্রচলিত ভাষা।

সকল দেশেই দেখা গিয়েছে গোড়ার দিকে পদ্যের এবং গদ্যের ভাষা ছিল আলাদা। এটা অস্বাভাবিক। পদ্যেই হোক গদ্যেই হোক সাহিত্যের মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ গতি থাকা প্রয়োজন। প্রথম দিকের গদ্যে পদ্যে কোথাও সেই স্বচ্ছন্দ গতি ছিল না। রণপায়ে চলবার মতো সেটা একটা অস্বাভাবিক গতি। সাহিত্য মানুষের দিবারাত্রির কাব্য, ওর মধ্যে একটা ঘরোয়া ভাব থাকা স্বাভাবিক। ঘরোয়া ভাবকে ঘরোয়া ভাষায় প্রকাশ করতে হয়, সেটা নিত্য দিনের চলতি ভাষার সাহায্যেই সম্ভব।

সাধারণ মানুষের যে বাক্‌ভঙ্গি তাই থেকেই ভাষার ইডিয়াম তৈরি হয়। সেই ইডিয়াম যদ্দিন না সাহিত্যের গাঁথুনিতে ব্যবহার হচ্ছে ততদিন তার ভিত পাকা হবে না। চলতি ইডিয়ামের ব্যবহারে ভাষা strengthened হয়, vulgarized হয় না। লক্ষ্য করে দেখেছি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর গদ্য পদ্য উভয় ক্ষেত্রে খাঁটি বাঙলা ইডিয়াম ব্যবহারে অতিশয় তৎপর ছিলেন।

ভাষাকে বাগ মানানো খুব সহজ ব্যাপার নয়। বুনো ঘোড়ার মতো ভাষার মধ্যে একটা একগুঁয়ে একরোখা ভাব থাকে, সেই অবাধ্যতাকে ভেঙে দিয়ে তাকে বশ মানাতে হয়। লেখক যত বেশি শক্তিশালী হবেন ভাষা তত বেশি তাঁর আজ্ঞাবহ হবে। রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে ভাষাকে পোষ মানিয়ে ছিলেন যে তাকে দিয়ে ইচ্ছামত যা খুশি করিয়েছেন, যেমন খুশি বলিয়েছেন। সমকালীন ভাষার উপরে যেমন অধিকার বিস্তার করেছিলেন, প্রয়োজন বোধে সংস্কৃতের ভাণ্ডারেও তেমনি হস্তক্ষেপ করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর লালিত্যকেও পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করেছেন। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ গদ্যে পদ্যে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা শিক্ষিত মার্জিত সমাজের ভাষা। অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের ভাষাকে তিনি

সম্ভব এড়িয়ে চলেছেন। কিন্তু ভাষার ঐশ্বর্য বহুলাংশে ওই অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের ভাষার মধ্যেই নিহিত থাকে। আইরিশ নাট্যকার synge এক বন্ধুগৃহে ঝি চাকরদের বিশ্রম্ভালাপ শুনতে পেয়েছিলেন। শুনে তিনি চমৎকৃত। মনে হয়েছিল, তাঁর আপন সমাজে এবং ইস্কুলে কলেজে তিনি যে ভাষা শিখেছেন সে ভাষা এর তুলনায় কিছুই নয়। এদের ভাষা অনেক বেশি তুখোর, অনেক বেশি ভাবব্যঞ্জক। ভাষা শিখতে হলে এদের কাছেই শেখা প্রয়োজন। কার্যত তিনি তাই করেছিলেন। সাধারণ মানুষদের মুখের ভাষায় নাটক লিখে Synge, O'Casey প্রভৃতি লেখকরা আইরিশ নাট্যসাহিত্যে যুগান্তর এনেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ভাষার সেই সম্ভাবনাকে explore করেন নি। তাঁর পক্ষে করা সম্ভবও ছিল না। আমাদের সাধারণ মানুষদের কথা রবীন্দ্রনাথ যতখানি ভেবেছেন এমন খুব কম লোকেই ভেবেছেন, তথাপি রবীন্দ্রনাথকে ঠিক জনগণের মানুষ বলা চলে না। শিক্ষায় রুচিতে জীবন চর্চায় তিনি অনেক দূরের মানুষ ছিলেন। তিনি এদের মনটাকে জানতেন, এদের ভাষা জানতেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকারের বাইরে কখনো যান নি। তবে ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতাকে তিনিই ঠিক পথে চালিত করে দিয়ে গিয়েছেন—কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের বাহন হিসাবে ব্যবহার করেছেন। অবশ্য তাঁর ব্যবহৃত কথ্য ভাষা, শিক্ষিত ভদ্রসমাজের প্রচলিত ভাষা। অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মানুষের নিত্য ব্যবহৃত ভাষায় যে ইডিয়মের প্রচলন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তা তেমন মর্যাদা পায় নি। প্রমথ চৌধুরী চলতি ইডিয়মের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রেখেছেন। তবে তাঁরও ভাষা শিক্ষিত বিদগ্ধজনের বৈঠকখানায় ব্যবহৃত মজলিসী ভাষা। সাধারণের ভাষা তাঁরও নাগালের বাইরে ছিল। তা হলেও স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর হাতে ভাষার flexibility খানিকটা বেড়েছে। ভাষার দেহলাবণ্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যতখানি নজর প্রমথবাবুর ততখানি নয়। তিনি ভাষায় দেহভঙ্গি—অর্থাৎ তার তৎপরতা, চতুরতা, চটুলতার উপর অধিকতর জোর দিয়েছেন। এ ছাড়া ফরাসী ভাষায় প্রমথবাবুর যথেষ্ট অধিকার ছিল। ভাষার কারিগরিতে ফরাসী লেখকরা সর্বাগ্রগণ্য। ফরাসী সাহিত্যের গুণগ্রাহী হিসাবে প্রমথবাবু আমাদের ভাষার প্রখরতা এবং উজ্জ্বলতা অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রযুগের অন্যতম প্রধান লেখক শরৎচন্দ্র বোধকরি সব চাইতে জনপ্রিয় লেখক। ভাষা সম্পর্কে তিনি মোটামুটি রবীন্দ্রানুসারী হলেও প্রচুর পরিমাণে লবনাম্বু মিশিয়ে ভাষাকে বেশ খানিকটা জলো জলো করে দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের অসাধারণ জনপ্রিয়তার দরুণ সেদিনকার অনেক লেখক ভাবে ভাষায় তাঁর অনুকরণ করেছেন। এর ফল খুব ভালো হয়নি। কোন জিনিসের মধ্যেই অত্যধিক পরিমাণে জলীয় পদার্থ বাঞ্ছনীয় নয়। সহজে পচন ধরবার আশংকা থাকে। ভাষার বেলায়ও তাই। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় (এখানে বিশেষ করে গদ্যের কথাই বলছি) জলীয় পদার্থ নেই বললেই চলে। এ জিনিসকে preserve করা সহজ। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার সঙ্গে আজকের ভাষার মিল নেই, তথাপি ওই ভাষার এমন আঁটসাঁট বাঁধুনি যে আজকের পাঠকও বিস্মিত বোধ করেন। অপর পক্ষে আশংকা হয় অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষিত, পরিণতবুদ্ধি পাঠকের কাছে শরৎচন্দ্রের ভাষা ক্লান্তিকর ঠেকবে।

চিন্তার শিথিলতা ভাষায় নানাপ্রকার শিথিলতার সৃষ্টি করে। আজকে যাঁরা বাঙলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাবান লেখক, সুখের বিষয় তাঁদের ভাষায় ওই জলীয় অংশটা কম। তবে এঁদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত নবীন তাঁদের ভাষায় একটা অনাবশ্যক উগ্রতা দেখা দিয়েছে। যে কথা একটু নিচু গলায় বললে ভালো শোনায় সে কথাও অনর্থক চেঁচিয়ে বলবার দিকে বিশেষ একটা ঝোঁক দেখা দিয়েছে। এঁদের ব্যবহৃত শব্দ অনেক সময় অতিমাত্রায় সশব্দ। দু চার পাতা পড়লেই হাঁপিয়ে উঠতে হয়, মনে হয় কানের কাছে কে যেন তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। অল্পবয়স্ক পাঠক পাঠিকার কাছে এ ভাষা বোধকরি কিছু খারাপ লাগে না কিন্তু নিবিষ্টমন শ্রোতার কাছে অনাবশ্যক চিৎকার যেমন বিরক্তিকর মনে হয়, এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে এ জাতীয় লিখিত ভাষাও তেমনি ক্লান্তিকর মনে হবে। মুখরতা ভাষার স্বভাবগত কিন্তু একটু মুখচোরা ভাব থাকলে তারও আকর্ষণ বাড়ে। যাঁদের কথা বলছি তাঁরা অনেকেই শক্তিশালী লেখক, এঁদের ভবিষ্যৎ আছে বলেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁদের অধিকতর সবহিত থাকা প্রয়োজন। ভাবে ভাষায় ভঙ্গিতে সর্বপ্রকারে মডার্ন হবার জন্যে এঁরা এমন আপ্রাণ চেষ্টা করছেন যে দেখলে কষ্ট হয়। মডার্ন মন অত্যন্ত সুকুমার ভাষাতেও প্রকাশ পেতে পারে। *

আমরা যাকে আধুনিকতা বলি সে জিনিসটা প্রধানত ভাবগত। অবশ্য তার একটা বাহ্যিক রূপও আছে, সেটিকে প্রকাশ করবার জন্যে আমাদের লেখকরা ভাষাটাকে মুচড়ে দুমড়ে, নানা আক্ষেপে বিক্ষেপে একটি উত্তেজিত-স্নায়ু, বিপর্যস্ত-কেশ, বিভ্রান্ত মূর্তিতে উপস্থাপিত করছেন। এর ফলে বাঙলা ভাষা তার বহুকালের আচার ব্যবহার এবং অভ্যস্ত রুচি থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব genius বা স্বভাবধর্ম আছে, এ কথা আগেও বলেছি। জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে এটি যুক্ত। কাজেই একে সহজে অস্বীকার করা চলে না, এর উপরে জবরদস্তিও চলে না। এই সূত্রে এলিয়টের আরেকটি কথাও মনে পড়ছে—'Any language, so long as it remains the same language, imposes its own laws and restrictions and permits its own licence, dictates its speech-rhythms and sound patterns.'

অন্যত্র বলেছেন, eccentricity for its own sake is suspect—and must be curbed for the sake of order'. লক্ষ্য করে দেখেছি, আমাদের নবীনদের মধ্যে যাঁরা কবিখ্যাতি লাভ করেছেন তাঁরা গদ্য ভাষা সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন এবং সংযত। ইংরেজ কবি বলেছেন, Poetry should be as well-written as prose. আমাদের বেলায় ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে উল্টো—Our prose should be as well-written as our poetry.

ভাষার মধ্যে দুটি বিপরীত জিনিসের সংঘাত নিরন্তর চলতে থাকে। একটি সুনির্দিষ্ট প্রচলিত ধারা, অপরটি যুগধর্মের উৎক্ষেপে উত্থিত নিত্যপরিবর্তনশীল জীবনের এক নতুন ইডিয়ম। এই দুই-এর সংঘর্ষে মধ্যপথগামী যে ভাষার সৃষ্টি হয় সেটিই যুগোপযোগী ভাষা। ভাষা এইভাবেই অগ্রসর হতে থাকে। ভাষার একদিকে fixity, অপরদিকে flux. ভাষা সম্বন্ধীয় আলোচনায় এলিয়ট এই দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। Fixity এবং Flux-এর মধ্যে সমন্বয় হয়ে যে ভাষা তৈরি হয়, সেটিই প্রত্যেক যুগের আদর্শ ভাষা। এর একটিকে শুধু আঁকড়ে ধরে থাকলে ভাষার অবনতি অবশ্যম্ভাবী। আজকের লেখকদের মধ্যে অনেকে flux-এর ঘূর্ণাবর্তে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন অর্থাৎ নিজেদেরই বিপন্ন করছেন। অতি-মাত্রায় সমকালীন হতে গেলে ভবিষ্যৎ কালের আশা ছাড়তে হয়। স্বকালের মোহে পরকাল নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বিশেষ করে যাঁরা যথার্থই শক্তিশালী লেখক।

---

* দৃষ্টান্ত স্বয়ং টি এস এলিয়ট। গদ্যে পদ্যে উভয়ত্র তাঁর ভাষা অনবদ্য। ভাষা ব্যবহারে অর্থাৎ শব্দপ্রয়োগে তিনি যতখানি যত্ন নিয়েছেন এ যুগের আর কোন কবি ততখানি নয়। ভাষা সম্পর্কে গদ্যে পদ্যে বহু কথা তিনি বলেছেন। ভাষাকে বলেছেন—a difficult tool to handle. একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করছি—

So here I am, in the middle of the way,
having had twenty years....
Twenty years largely wasted
Trying to learn to use words.
(East Coker, V)

সেকালের রথযাত্রা

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

রথযাত্রার কথা উঠলে সেই দৃশ্যটির কথা নিশ্চয়ই চোখের ওপর ভেসে ওঠে। সেই অজস্র লোকের সমাবেশ। সেই বাদুলে দিন। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ধারায় দেশ ভেসে যাবার মতন অবস্থা। হাজার লোকের কোলাহলের উপর সেই ছোট্ট মেয়েটির তালপাতার বাঁশি বেজে চলেছে সহর্ষে। আর এক পয়সার একটি বাজনা কাঠি না-কিনতে পারার জন্য একটি ছেলের করুণ মুখচ্ছবি। বর্ষাসজল এই মেলার দৃশ্য সহজেই আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কেননা, এ বাঙলা দেশের নিজস্ব ছবি।

সারা বাঙলা দেশ জুড়েই এ রথের মেলা। আর পিছনের দিকে ফিরে গেলে ত কথাই নেই। যেখানে রাধাকৃষ্ণের মন্দির এবং সেখানেই একটু আর্থিক সচ্ছলতা, সেখানেই রথযাত্রা। বাঙলা দেশে মাহেশের রথ নাম করা। এক ডাকে সবাই চেনে। সুতরাং তার কথা না তোলাই ভালো। গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবন ঠাকুরের রথ সেকালে খুবই জমকালো ছিল। ঢাকা জেলার ধামরাই গ্রাম এবং ময়মনসিংহ জেলার কালিগঞ্জের খ্যাতি রথের জন্যই। লালগোলার রাজবাড়িতে আজো মেলা বসে। দশ পনের দিন নয়। পাক্কা একটি মাস। মহিষাদলের রাজারও এ খ্যাতিতে কম যায় না।

এ প্রসঙ্গে কাঁঠালপাড়ার রথের মেলাকেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের রথ। বহুকাল আগে থেকেই এ রথযাত্রা চলে আসছিল। আগে ছিল কাঠের। বঙ্কিমচন্দ্রের আমলেই সেটি পিতলের রথে রূপান্তরিত হয়। তমলুকের কারিগরেরা এসে ঐ নতুন সজ্জায় সাজিয়ে গেল। সেবার আঠারোশ' বাষট্টি সাল। আজ থেকে একশ বছর আগেকার কথা।

সেই পুরনো দিনে রথ উপলক্ষে যে জাঁকজমক হত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তা সুন্দরভাবে ধরে রেখে গিয়েছেন। এবং তাঁর এই বর্ণনার ভেতর দিয়ে সেকালের রথযাত্রার চিত্রটি জীবন্তভাবে ফুটে ওঠে। শাস্ত্রী মহাশয়ের দেওয়া বর্ণনাটি এই রকম : 'রাধাবল্লভের বারমাসে তের পার্বন হয়। কিন্তু রথে খুব জাঁক হয়। রথখানি পিতলের, বেশ বড়। বারমাস রথখানি গোলপাতার ছাউনিতে ঢাকা থাকে। রথের সময় উহা বাহির করিয়া ঘষে মেজে চকচকে করিয়া লওয়া হয়। রথের সময় বঙ্কিমবাবুদের বাড়ীর দক্ষিণে একটা খোলা জায়গায় বেশ একটা মেলা হয়। প্রচুর পাকা কাঁঠাল ও পাকা আনারস বিক্রি হয়, তেলেভাজা পাঁপোর ও ফুলুরির গন্ধ লাগিয়া যায়, আট দশখানা বড় বড় ময়রার দোকান বসে, গজা, জিলিপি, লুচি, কচুরি,

সেকালের রথ

মিঠাই, মিহিদানা, মুড়িমুড়কি, মটর ভাজা, চিঁড়ে, চিঁড়ে ভাজা যথেষ্ট থাকে।'

শুধু তেলেভাজার দোকান নয়, মণিহারী দোকানেরও মনোহারী বর্ণনা এখানে পাওয়া যায়। একালের মত সেকালে অবশ্য প্লাস্টিক জাতীয় খেলনা ছিল না। তবে খেলনার ধরন প্রায় একই। নানারকম বাঁশি, কাগজের পুতুল, কাঠির ওপর লাফ দেওয়া হনুমান, কটকটে ব্যাঙ প্রচুর পাওয়া যেত। ছেলেদের জন্য ছিল এই খেলনা, আর বড়োদের জন্য ছিল নানারকম গাছের চারা এবং কলম। গোলাপজাম, পিচ, সবেদা, ফলসার চারা গাছের সঙ্গে আমলিচুর কলম অথবা লকেট ফলের গাছ হামেশাই মিলত।. শৌখিন ক্রেতাদের জন্য গোলাপ, জুঁই, জাতি, বেল, নবমল্লিকা, কামিনী মুচুকুন্দ, বক, কুরচি, কাঞ্চন টগর শিউলি প্রভৃতি নানা জাতীয় ফুলের চারা ও কলম থাকত সাজানো। আটদিন ধরে মেলা চলত।

মেলার সঙ্গে সঙ্গে চলত পুতুল নাচ। পুতুলের নাটক। প্রকাণ্ড একটি দোচালার ভেতর চল্লিশ পঞ্চাশ রকমের পুতুল নাচ চারদিকে লোক জমিয়ে ফেলত। সীতার বিয়ে, লবকুশের লড়াই এবং কালীয়দমন ছিল ভক্ত শ্রোতাদের জন্য। তরুণ রসিক সমাজ যুগোপযোগী পালা দেখতেই ভাল বাসতেন। মোকদ্দমার সং সব থেকে জমত। জজ সাহেব এসে বসলেন। পেশকার এসে কাগজ পেশ করল। কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল আসামী। সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষীর জবানবন্দী হল। উকিলের বক্তৃতায় গরম হয়ে উঠল আসর। গম্ভীর মুখে জজ সাহেব সব শুনলেন, ততোধিক গম্ভীর হয়ে তিনি রায় দিলেন। রায়ে আসামীর ফাঁসীর আদেশ হল। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় এসে গেল ফাঁসীর মঞ্চ। আসামীকে ঝুলিয়ে দেওয়ার পর নাটক সমাপ্ত।

এ কেবল কাঁঠালপাড়ার রথযাত্রায় নয়, সারা বাঙলা দেশেই রথের নাটক এভাবেই অভিনীত হত।

শহর কলকাতাতেও রথযাত্রা বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হত। তবে তার ঐতিহ্য যে কতদিনের তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। শহর কলকাতার আদি বাসিন্দা ছিল বসাক ও শেঠেরা। শোনা যায়, তাঁরা নাকি পূর্বে বাস করতেন সপ্তগ্রামে। সেখানে যখন ব্যবসার অবস্থা মন্দা হয়ে এলো, তখন সুতানুটি-গোবিন্দপুরে এসে নতুন হাট বসালেন। এদিকে সাবর্ণ চৌধুরীদেরও বাড়-বাড়ন্ত হল। শেঠেদের গৃহদেবতা গোবিন্দজীর খুব নাম ডাক ছিল। ঘটা করে পুজো হত। চৌধুরীদেরও ছিল শ্যাম রায়। দোলের সময় শ্যাম রায়ের পুজোয় এত আবির খেলা হত যে পুকুরের জল পর্যন্ত লাল হয়ে উঠত। লাল হয়ে উঠত পথ। লালদীঘি বা লালবাজারের নামকরণের পিছনে সে ইতিহাস নাকি লুকিয়ে আছে।

যাই হোক, এহেন গোবিন্দজী বা শ্যামরায়ের রথযাত্রা ছিল না, তাও কি কখনো সম্ভব? শ্যামরায়ের কথা বলতে পারি না, তবে গোবিন্দজীর রথ ছিল। বৈঠকখানা বাজারে এসে জব চার্নক কোন্ গাছের তলায় বসে হুঁকো খেয়েছিলেন, ঐতিহাসিকরা হয়ত সে বিষয়ে আলোকপাত করতে পারবেন। তবে আজ যেখানে শিয়ালদা স্টেশন ওখানে নাকি বিরাট একটি বট গাছ

ছিল। ঐতিহাসিক বৃক্ষ। ১৬৯০ সালের চব্বিশে আগস্ট চার্নক সাহেব যখন এখানে এসেছিলেন, তখন রথযাত্রা শেষ হয়ে গেছে। সেই বটতলাতেই সম্ভবত শেঠেদের গৃহদেবতা গোবিন্দজীর রথ বাঁধা ছিল। বিরাট রথ। সাততলা সমান উঁচু। লালদীঘি থেকে বৈঠকখানা পর্যন্ত সোজা রাস্তায় এ রথ টানা হত। আর তদুপলক্ষে রাস্তার দুধারে যে বিরাট মেলা বসত, এ অনুমান আমরা নিশ্চয় করতে পারি। সে বছর নয়, পরের বছর চার্নকও সে দৃশ্য দেখে থাকতে পারেন।

পরের যুগের কলকাতায় আরো অনেক রথের ঠিকানা মেলে। পোস্তায় যে জগন্নাথদেব প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁর তিন তিনখানি রথ ছিল। গরাণহাটার গোলাবাড়ি বাড়ির উঠোনে সারা বছর সে রথগুলি রেখে দেওয়া হত। রানী রাসমণির শ্বশুর ছিলেন প্রীতিরাম মাড়। কাঠ নয় পেতল নয়—এই মাড়দের ছিল রূপোর রথ। সেই রূপোর রথের শোভাযাত্রা দেখার জন্য সেকালে পথে কম ভিড় হত না। জন-কোম্পানির বাঙালী কর্মচারী নন্দরাম সেন পুরনো কলকাতার এক বিখ্যাত মানুষ। 'নন্দরামের ঘটি' আজো প্রবাদের মত প্রচলিত। সেই নন্দরাম একদা নাকি সুতানুটির গঙ্গাতীরে একটি ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন; সেই ঘাট পরবর্তীকালে রথ-তলার ঘাট বলে পরিচিত হয়ে ওঠে। সম্ভবত রথের মেলাই এহেন নামকরণের পিছনে বর্তমান। এইভাবে সামান্য একটু অন্বেষণ করলেই দেখা যাবে শহর কলকাতার রথের ঐতিহ্যও কম নয়।

যেখান দিয়ে সেদিন রথ যেত, সেই পথের দুধারে লোক জমে যেত কাতারে কাতারে। ছোট ছোট ছেলেরা এ উৎসব উপলক্ষে পরত সেপাইপেড়ে ঢাকাই ধুতি। গায়ে পরিপাটি করা চকচকে জামা। হয়ত বিলিতি সিঁথি কেটে চুল আঁচড়াত। কোমরে বাঁধত রুমাল। তারপর চাকরাণীদের হাত ধরে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াত। রাস্তার ধারে দোকানীরা বসে থাকত পসরা সাজিয়ে। কেনাবেচাও মন্দ হত না। ফলের ভেতর কাঁঠাল এবং খেলনার ভেতর মাটির জগন্নাথ, তালপাতার ভেঁপু এবং সোলার পাখি বিক্রি হত বেধড়ক। তালপাতার পাখাও বিক্রি হত কম নয়। ভেঁপুর শব্দে মুখর হয়ে উঠত মেলাতলা। বয়স্ক লোকেরা পর্যন্ত ঐ ভেঁপু কেনার লোভ সংবরণ করতে পারতেন না। ফলত হুতোমের ভাষায় বলা চলে—'ছেলেদের দেখাদেখি বুড়ো বুড়ো মিনসেরাও তালপাতার ভেঁপু বাজাচ্ছেন।'

এইভাবে যখন মেলাতলা সরগরম, এমন সময় দূরে থেকে ভেসে আসত ঘণ্টাধ্বনি। হরিবোল এবং খোলকত্তালের সঙ্গে জনতার

18 CLUES

(1) It is not easy to break through the natural conservatism of the **Banker Farmer.**

(2) **Democracy Equality** can never be true in a society where greed grows uncontrolled, and people are drugged with adulation for power politics.

(3) In this land of a thousand and one gods, why is there such devilry and such **Despair Misery ?**

(4) Democracy is in essence a way of life, a way of life where the **Dignity Liberty** of the individual is not smothered.

(5) With the growth of national consciousness and civilized ways of life **Education Religion** becomes ethical and reflective.

(6) To be weighty and effective, criticism must be just, **Emphatic Sympathetic** and constructive.

(7) Wise judges are fully conscious of their **Fallibility Responsibility.**

(8) **Forgiveness Happiness** is not possible without the capacity to forget.

(9) The fire and zeal for a cause have now gone. Amongst the people at large there is stagnation, apathy and a pathetic **Helplessness Listlessness.**

(10) The dominant note of Indian philosophy is **Idealistic Realistic.**

(11) Is it possible to **Live Love** without jealousy ?

(12) Nothing in this Universe **Lives Moves** without a purpose.

(13) The administration of any country should be guided by **National Spiritual** considerations.

(14) Far too often in our country bad economics is being trotted out as good **Policy Politics !**

(15) Education still carries with it a great deal of social **Prejudice Prestige.**

(16) Teaching like agriculture is an occupation where personal interest plays a large part in increasing **Productivity Progress.**

(17) Religion is **Reason Revolutionary** or it is nothing.

(18) True **Security Tranquillity** comes to man only when he gives up all thought of security.

দ্রষ্টব্য:—উপরের ধাঁধাগুলি বিভিন্ন ভারতীয় লেখকদের লেখা থেকে নেওয়া কয়েকটি প্রশ্ন। এগুলি সব সম্পূর্ণ বাক্য ও নিজস্ব সম্পূর্ণ অর্থ বহন করে। লেখক/প্রবন্ধকারের নাম ও তাঁহাদের রচনার নাম সরকারীভাবে সমাধানের সঙ্গে লিট-কুইজ উইকলিতে প্রকাশ করা হবে।

১। **মহাজন/চাষীর** স্বাভাবিক **সংরক্ষণ-শীলতা** ভেদ করা সহজ কথা নয়।

২। যে সমাজে লোভ অবাধে বেড়ে চলেছে, মানুষ যেখানে শক্তির কূটকৌশলকে প্রশংসা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন সেখানে **গণতন্ত্র/সাম্য** কখনো সত্য হতে পারে না।

৩। যে দেশে হাজারের উপর দেবতা, কেন সেখানে এমন শয়তানি, আর এমন **হতাশা/দুর্দশা ?**

৪। গণতন্ত্র, মূলত জীবনের এক ধরন, যে ধরনের জীবনে মানুষের **মর্যাদার/স্বাধীনতার** কণ্ঠরোধ করা হয় না।

৫। জাতীয় চেতনা আর সভ্যজীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে **শিক্ষা/ধর্ম** হয়ে ওঠে নীতিপূর্ণ আর চিন্তাশীল।

৬। সমালোচনাকে কার্যকরী ও প্রভাবশালী করতে হলে, তা হওয়া উচিৎ ন্যায়সঙ্গত, **জোরালো/দরদী**, আর গঠনমূলক।

৭। বুদ্ধিমান বিচারকেরা তাঁদের **ভ্রম-শীলতা/দায়িত্ব** সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন।

৮। ভুলতে পারার শক্তি না থাকলে **ক্ষমা-শীলতা/সুখ** আসা সম্ভব নয়।

৯। কোনো আদর্শের জন্য যে উৎসাহ উদ্দীপনা, তা আর নেই। বেশীর ভাগ লোকের মধ্যেই এসেছে জড়তা, অনীহা আর এক করুণ **অসহায়তা/উৎসাহহীনতা।**

১০। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের মূল ধারা **আদর্শবাদী/বাস্তববাদী।**

১১। ঈর্ষা ছাড়া কি **বেঁচে থাকা/ভালবাসা** সম্ভব ?

১২। উদ্দেশ্য ছাড়া এ জগতে কেউই **বেঁচে থাকে/চলে** না।

১৩। যে কোন দেশের শাসন পরিচালিত হওয়া উচিৎ **জাতীয়/আধ্যাত্মিক** বিবেচনা অনুসারে।

১৪। আমাদের দেশে অনেক সময় ভুল অর্থনীতিকে ভালো **নীতি/রাজনীতি** বলে চালিয়ে দেয়া হয়।

১৫। শিক্ষার সঙ্গে এখনো সমাজের যথেষ্ট **প্রতিকূলভাব/সম্মান** জড়িয়ে রয়েছে।

১৬। কৃষির মত অধ্যাপনাও এক পেশা, যাতে **সৃজনশীলতা/প্রগতি** বৃদ্ধির ব্যাপারে নিজের আগ্রহের রয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

১৭। ধর্ম **জ্ঞানের স্বরূপ/বিপ্লবের সাধক,** নয়তো তা কিছুই নয়।

১৮। সত্যিকারের **নিরাপত্তা/প্রশান্তি** তখনই সম্ভব, যখন মানুষ নিরাপত্তার সব চিন্তা ছেড়ে দেয়।

কালসন্ধ্যা

বুদ্ধদেব বসু

প্রথম অঙ্ক : ২

[রাজপথে বিস্রস্ত ও উত্তেজিত চলমান জনতার প্রবেশ।]

দলপতি

ধিক! ধিক! ধিক!

অন্যেরা

কৃষ্ণকে ধিক!
অকর্মা অক্ষম কৃষ্ণকে ধিক!

দলপতি

ধ্বংস হোক! ধ্বংস হোক!

অন্যেরা

পাপিষ্ঠ সব রাজন্যেরা,
ধ্বংস হোক।

দলপতি

মন্ত্র শোন! মন্ত্র শোন! মন্ত্র শোন!

অন্যেরা

আমরা আজ শক্তিমান, দুঃশাসন!

[পুরুষের দল বেরিয়ে গেলো। রাজপথে একদল স্ত্রীলোকের প্রবেশ।]

প্রথম স্ত্রীলোক

ভয় পেয়েছি গো, ভয় পেয়েছি আমরা।
গাভী বিয়োলো ছাগল, পায়রাগুলো হুক্কাহুয়া চ্যাঁচায়:

দ্বিতীয় স্ত্রীলোক

আমাদের ঘরের মধ্যে রাত্রি ভ'রে ইঁদুর
খুঁটে খায় চুল, নখ, গায়ের চামড়া।

তৃতীয় স্ত্রীলোক

স্বপ্নে দেখি, আমাদের বুকের দুধ শুষে নিচ্ছে
বিকট জোঁক, রক্তমুখী বাদুড়,
আর দেখি লক্ষ কৃমিকীট আমাদের অন্নে।

চতুর্থ স্ত্রীলোক

আমরা জানি না কিসের জন্যে এই দারুণ!
দুর্দৈব, কিন্তু চলেছি
পুজো দিতে, হত্যে দিতে কোনো বাবার চরণে।

স্ত্রীলোকেরা

(সমস্বরে)

রাজামশাই, পুরুৎঠাকুর, হে নারায়ণ,
যে যেখানে দেবতা আছেন, দয়া করুন।

[স্ত্রীলোকদের কথা শেষ হবার আগেই পুরুষের দল আবার প্রবেশ করেছে। এবারে তাদের সংখ্যা আরো বেশি। মেয়েদের ভাষণ শেষ হওয়ামাত্র তাদের কথা আরম্ভ হবে।]

দলপতি

হাঃ হাঃ হাঃ!
তোরা কান্না থামা না,
ওরে মূর্খ মেয়েমানুষ!
আর নেই রাজা, নেই পুরুৎঠাকুর
তাও কি জানিস না?

দ্বিতীয় পুরুষ

বিষ্ণু মহেশ ভূত হয়েছেন
তাও কি জানিস না?

তৃতীয় পুরুষ

আজ তিন ভুবনে কোথাও নেই
বাবা কিংবা মা!

চতুর্থ পুরুষ

আজ ঠগ বাছতে গাঁ-উজোড় হবে গাঁ!

পঞ্চম পুরুষ

কোন বানের জলে যাচ্ছে ডুবে
বৃষ্ণিকুলের ছা—
তাও কি জানিস না,
ওরে মূর্খ মেয়েমানুষ।

[রাজপথে দুই প্রহরীর প্রবেশ। তাদের হাতে মদের ভাঁড়। স্ত্রীলোকেরা চকিত হ'য়ে সরে দাঁড়ালো। দূরে থেকে ভেসে এলো অভিজাত-বংশীয় নরনারীদের প্রমোদের শব্দ]

প্রথম প্রহরী

(ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে, আঙুল তুলে দূরের দিকে দেখিয়ে)

দেখে নে, দেখে নে, দেখে নে
ক্ষাত্রধর্ম কেন ধন্য।
কুরুক্ষেত্রে যাঁরা মহান কীর্তিমান
শাম্ব, সারণ, প্রদ্যুম্ন,
সাত্যকি আর কৃতবর্মা,
ইত্যাদি আত্মীয়বৃন্দ—
তারা কেলিকর্দমে রাজপথে উত্তাল,
বানরের মতো নির্লজ্জ।
এ-ও কি সহ্য হবে বাসুদেব কৃষ্ণের
না কি তাঁর নেই অস্তিত্ব?

পুরুষেরা
(সমস্বরে)

নেই! নেই! নেই!

দ্বিতীয় প্রহরী

(ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে, আঙুল তুলে দূরের দিকে দেখিয়ে)

শিখে নে, শিখে নে, শিখে নে
সার্থক কেন নরজন্ম।
চেষ্টা, পরিশ্রম, অর্জনে উদ্যম,
এ তো শুধু দুঃখেরই উৎস।
আনন্দ আছে শুধু অজ্ঞান জন্তুর,
জীবজন্মের সার মাধুরী ও শিশ্ন
অতএব, বল দেখি, কী বা তায় এসে যায়,
আছেন বা নেই তোর কৃষ্ণ?

পুরুষেরা
(সমস্বরে)

নেই! নেই! নেই!
কৃষ্ণ নেই! ধর্ম নেই! সত্য নেই!

দলপতি

বাঃ! বাঃ! বাঃ!
আর রইলো না চিন্তা।
আজ জোয়ারে গাঙে বান ডেকেছে
পাতাল খোলে হাঁ!

দ্বিতীয় পুরুষ

তাহ'লে চল ভাই, চল চল,
আমরাও গা ভাসাই এই বন্যায়।

তৃতীয় পুরুষ

কী আনন্দ, আজ ন্যায়-অন্যায় নির্ভেদ,
উচ্চ যায় তলিয়ে, ঊর্ধ্বে ওঠে নিম্ন।

চতুর্থ পুরুষ

ছন্দ ভাঙে, খসে শৃঙ্খল, শৃঙ্খলা,
নেই শ্রম, নিয়ম হ'লো ছিন্ন।

পঞ্চম পুরুষ

আয় মাতি ওদেরই মতো রঙ্গে,
ইন্দ্রের মতো চিহ্ন আঁকি সর্বাঙ্গে।

চতুর্থ পুরুষ

ঢাল কণ্ঠে ধান্যেশ্বরী, টান অঙ্কে কামেশ্বরীকে,
নে নিংড়ে দেহ থেকে ননী, নে ছিনিয়ে গলার মুক্তো।

দ্বিতীয় পুরুষ

আমাদের বৌগুলো সব জাউ পান্তা, ধ'রে আন
ওদের কয়েকটা গনগনে জোয়ান ছুকরিকে—

দলপতি

চল আগুয়ান, আর ভয় নেই, আমরা মুক্ত।

পুরুষেরা
(যেতে যেতে সমস্বরে চীৎকারে)

আমরা চাই ধ্বংস, আমরা চাই সম্ভোগ।
আমরা আজ ঈশ্বর, আমরা আজ ইন্দ্র।

(কলরোল করতে-করতে পুরুষেরা চ'লে গেলো।)

স্ত্রীলোকেরা

(সমস্বরে)

মা-ষষ্ঠী, বাঁচাও! মা-লক্ষ্মী, বাঁচাও! মা-দুর্গা, বাঁচাও!

[স্ত্রীলোকদের প্রস্থান। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধতা।]

(ক্রমশ)

মনের পুতুল সাগরে

(পঁচিশ)

এতদিন পরে হঠাৎ এরকম অপ্রত্যাশিত-ভাবে শশধর বোস এম এল এর কাছ থেকে টেলিফোন আসবে অশোক জানা ভাবতেও পারেনি। প্রেসের ছোট ঘরে বসে অন্যদিনের মত আজও সে প্রুফ সংশোধন করছিল, এমন সময় জন-প্রতিনিধির টেলিফোন এল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর, আরে মশাই কোন খোঁজ খবর নেই, কেমন আছেন? প্রেস কেমন চলছে, বাড়ির সব খবর ভাল তো?

অশোক জানার কিন্তু ব্যবহারিক প্রশ্ন, এতদিন পরে কি মনে করে?

—অনেকদিন দেখা হয়নি, আজকে আসুন না জমিয়ে গল্প করা যাক।

—কোথায় যাব?

—আমি এখানে আছি পান্থ নিবাসে, বালীগঞ্জের একটা হোটেলে।

—গেলে কোন লাভ হবে?

শশধর বোস আরও উদার, অনেক ছাপার কাজ দেব, তাছাড়া একটু পরামর্শ করবারও আছে। এক সময় আপনি তো আমাকে কম সাহায্য করেননি।

অশোক জানা ঠিকানাটা টুকে নিয়ে বলে, ঠিক আছে, হাতের কাজ সেরে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

—খুব খুশী হলাম, ধন্যবাদ।

এই সেই শশধর বোস। অশোক জানা যার নাম দিয়েছিল ক্যাবলাকান্ত। মুখ ফুটে একটা ভাল করে কথা বলতে পারত না, তার হয়ে বক্তৃতার ভাষণ লিখে দিতে দিতে কত সময় অশোক জানা বিরক্ত হয়ে উঠেছে। সেই লোকটার কথা বলার ধরন আজ বদলেছে, কেমন যেন একটা পিঠ চাপড়ানি ভাব। আগে কলকাতায় এলে রোজই অশোক জানার সঙ্গে দেখা করত, যেত তার বাসায়, আসত প্রেসে অথচ সেই বাস্তু ঘুঘুর সঙ্গে ঠান্ডা নীল রেস্তরাঁর জল খেয়ে মাতাল হবার পর থেকে আর এদিকে আসেনি। হঠাৎ তার কি দরকার পড়ল এ কথা জানবার কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক, সেই জন্যেই অশোক জানা কথা দিয়েছিল শশধর বোসের সঙ্গে দেখা করতে যাবে বলে।

পান্থ নিবাস।

বালীগঞ্জের কোন এক সম্ভ্রান্ত অঞ্চলের এটি একটি রহস্যময় গৃহ। বেশ লম্বা চওড়া, অনেক ঘর, বহু ফ্ল্যাট, বিচিত্র বাসিন্দা। কেউ বলে এটা হোটেল তবে লাইসেন্সবিহীন। যারা সন্ধান জানে তারা এখানে থাকে খায়, হিসাব মত পয়সা দিলেই চলে। তবে অনেকের মতে ওখানে ফ্ল্যাট ভাড়া পাওয়া যায় বড়লোক হাফ গেরস্তদের জন্যে। নিজের বিবাহিত স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও যেসব পুরুষ মানুষ অন্য মেয়ে মানুষ নিয়ে ঘর করতে চায় গোপনে, অথচ বিপদে পড়তে চায় না, তাদের কাছে এসব ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে বাড়িওয়ালা প্রচুর টাকা রোজগার করে। পান্থ নিবাস-এর সঙ্গে লাগোয়া একটা বিরাট গ্যারেজ আছে, টিনের শেড দেওয়া। এ অঞ্চলের অনেক গাড়িই রাত্রিবেলা এখানে আশ্রয় নেয়। গাড়ির মেরামতি এ গ্যারেজে খুব হয় বলে দেখা যায় না, তবে এদের নিজস্ব গাড়ি অনেক-গুলি, প্রাইভেটে সব ভাড়া খাটে। দুটি সংস্থার মালিক একই ব্যক্তি।—যার পরিচয় অবশ্য বিশেষ কেউ জানে না।

পান্থ নিবাসের নীচে একজন নেপালী দরোয়ান বসেছিল, শশধর বোসের নাম বলায় সে অশোক জানাকে খাতির করে ওপরে নিয়ে গেল। সাধারণ একটা ঘর আধুনিক রুচিতে সাজানো, কয়েকটি সোফা, নীচু টেবিল, এক কোণায় একটি সিঙ্গল বেড, ছোট আলনা।

শশধর বোস উঠে এসে আপ্যায়ন করল, আসুন, এই হচ্ছে আমার কলকাতার আস্তানা। সঙ্গে একটা ছোট বাথরুম আছে, তাছাড়া টেলিফোন। এখানে থাকতে কোন অসুবিধে হয় না।

অশোক জানা সোফায় বসতে বসতে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি প্রায়ই কলকাতায় আসেন?

—মাসে অন্তত পনের দিন।

—আশ্চর্য, আমাদের দিকে একবারও যান না!

—সত্যি বলছি অশোকবাবু, একেবারে সময় পাই না। কত কাজ করতে হয়, জনগণ যখন আমাকে ভোট দিয়েছে, তাদের সুবিধে অসুবিধে আমাকে দেখতে হবে।

অশোক জানার মনে হল ময়না পাখী

'রাধে কেস্ট' বুলি শিখেছে। চেহারাটাও পাল্টে ফেলেছে শশধর বোস, গে'ও ভাব আর নেই, শহরের জলুস চোখে মুখে চমকাচ্ছে। কায়দা করে চুল ছাঁটা, ঘাড়ে গলায় সাদা পাউডার, ফিনফিনে গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী, কোঁচা লুটোন ধুতি, টেবিলের উপরে একটা সিগারেটের টিন।

অশোক জানা মন্তব্য করল, শরীর তো ভালই আছে মনে হচ্ছে।

শশধর বোস অমায়িক হেসে, বলল, রাখতে হচ্ছে, শরীর তো এখন আর আমার নয়, দেশের দশের। অতএব ভাল না থাকলে চলবে কেন?

সেদিনের ক্যাবলাকান্তর মুখ থেকে এই ধরনের বাণী শোনা অসহ্য, তাই অশোক জানা সরাসরি কথা পাড়ে, কেন ডেকেছেন বলুন।

—এ কিন্তু খুব গোপন কথা, কারুর সঙ্গে আলোচনা করবেন না।

—সেটুকু বিশ্বাস আমাকে করতে পারেন।

—আমরা একটা নতুন দল তৈরী করছি, সব এম এল এ'রা মিলে। হঠাৎ রাতারাতি গভর্নমেন্ট উল্টে দেব।

—কাজটা যত সোজা মনে করছেন তত নয়।

শশধর বোস জোর দিয়ে বলে, তবু আমাদের করতে হবে, এত খরচা করে যে এম এল এ হলুম কি তাতে লাভ হল? কটা পয়সা আমরা রোজগার করতে পেরেছি!

—শুধু পয়সা ভাবছেন কেন, কত সম্মান, খাতির।

শশধরের অভিমান, সেসব ঐ মন্ত্রীরা পায়, আজকাল সভা সমিতি, বৃক্ষ রোপন, এসব বড় বড় অনুষ্ঠান ছেড়ে দিন, কলেজের সোশ্যাল, টিউবওয়েল উদ্বোধন এসবের জন্যেও মন্ত্রী পাওয়া যায়। সারাদিন কাজ-কর্ম তো নেই, কাঁহাতক আর ঘরের মধ্যে বসে থাকবে। তাই যে কোন একটা নিমন্ত্রণ পেলেই ছোটে। আমাদের আর কে ডাকছে বলুন?

অশোক জানা তখনও বোঝাবার চেষ্টা করে, শুধু দল বাঁধলেই তো হবে না, একজন নেতা চাই।

—আপনি একেবারে ছেলেমানুষ, একজন কি বলছেন, কটা নেতা চান? বাংলা দেশে যত না পার্টি তার চেয়ে বেশি নেতা। এবং আদর্শ সুবিধাবাদ। নেতা আমাদের যোগাড় হয়ে গেছে, একজন ফসকালে দুজন রিজার্ভে আছে।

—তাহলে আর বলবার কিছু নেই।

শশধর বোস এবার ব্যবসায়ীক গলায় বলে, এ পর্যন্ত সব ঠিক আছে, আপনাকে এবার আমার হয়ে একটু পাব্লিসিটি করতে হবে।

—কিরকম?

—দু'চারটে কাগজে লেখা, দু'চার জায়গায় আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা করানো, মানে বুঝতে পারছেন তো, এখন একটু লাইম লাইটে আসা দরকার। তাহলে নতুন সরকার গড়বার সময় আমাকে মন্ত্রী করতেই হবে, এ ছাড়া এদের উপায় থাকবে না। আপনার ইন্টারেস্ট আমি দেখব, এত ছাপার অডার আমি এনে দেব যে আপনি কাজ শেষ করে উঠতে পারবেন না।

অশোক জানার ছোট্ট উত্তর, ভেবে দেখি।

—ভেবে দেখলে চলবে না, এ আপনাকে করতেই হবে। শশধর বোসের শেষের কথাটা যেন আদেশের মত শোনাল।

আশ্চর্য, ক'মাস আগে এই লোকটাই খুন হবার ভয়ে অশোক জানার সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। আজ সেই লোকটাই দল পাকিয়ে বলীয়ান হয়ে অশোক জানাকে ধমকাচ্ছে, মন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছে।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে ডাইনে মোড় নিতেই অশোক জানার সঙ্গে লম্বুর মুখো-মুখি দেখা হয়ে গেল। লম্বুই অবাক হল বেশি।

—দাদা আপনি এখানে?

—একজনের সঙ্গে দেখা করতে এসে-ছিলাম।

—কে, শশধরদা? আপনার ওখানে দেখেছিলাম বটে, আজকাল বেশ চালু হয়েছে ভদ্রলোক।

—কি রকম?

—বলব একদিন, আসব আপনার প্রেসে।

অশোক জানা জিজ্ঞেস করল, তুই এখানে কি করছিস

—প্রাইভেট গাড়ির দরকার পড়লে এখান থেকে ভাড়া নিই।

—কিসের জন্যে?

—স্টুডিওর কাজে লাগে, কখনও বা বিয়ে বাড়িতে, তাছাড়া—'

—কি?

লম্বু চোখ মারল, বুঝিয়ে দিল বাকী পদটুকু পূরণ না করলেও চলে।

অশোক জানা চলে যাবার পর লম্বু কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওপরেই গেল এবং ঢুকল শশধর বোসের ঘরেই।

জননায়ক মন্ত্রিত্বের স্বপ্ন ছেড়ে নেমে এলেন কঠিন বাস্তবে, তুই কোন কাজের নোস লম্বু। এতদিনে কিছুই করতে পারলি না।

লম্বু হি হি করে হাসল, সব ঠিক করে ফেলেছি, সেই কথা বলতেই এসেছিলাম, অশোকদা ঘরে ছিলেন বলে আর ঢুকিনি।

—চুপ চুপ, ওরা না জানতে পারে, তাহলেই—।

—পাগল হয়েছেন, কাকপক্ষীতেও টের পাবে না। তবে যাকে ঠিক করেছি একেবারে আনকোরা কলেজের মেয়ে, এখান থেকে গাড়ি নিয়ে যেতে, মেয়েটিকে তুলে নেব কলেজের সামনে থেকে, তার বাড়ির লোকও বুঝতে পারবে না। যখন বিকেলে ফিরবে তারা ভাববে কলেজ থেকে পড়ে এল।

শশধর বোসের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে, সিগারেটের টিনটা লম্বুর দিকে এগিয়ে দেয়। লম্বু সিগারেট ধরিয়ে মুরুব্বি চালে বলে, দরটা একটু বেশি পড়বে, একেবারে আনকোরা কিনা। মাঝখানে একটা দালাল রাখতে হয়েছে, মেয়েটার কাকা, সে কিছু টাকা খাবে। দেড়শ' পড়বে।

—দেড়শ? তার ওপর গাড়ি ভাড়া!

—সেখানে কম করে দেব, পঁচাত্তর, আমি নিজে চালাব। আপনার কোন রিস্ক থাকবে না। ছোট [illegible] গাড়ি, আপনারা পেছনে উঠবেন, জানালায় পর্দার ব্যবস্থা আছে, এ সব গাড়ি একেবারে [illegible] ছাড়ে না।

শশধর বোস মনে মনে কি যেন হিসেব করল, দেখ যদি আর একটু কম করাতে পার।

লম্বুর [illegible] হবে না। এখন একশ'টি টাকা [illegible] ছাড়ুন, আমাকেও তো [illegible] রাখতে হবে।

অশোক [illegible] এক'শ' টাকা বার করে [illegible] জানেন এ কার টাকা। [illegible] জন্যে কেন অর্থনীতির [illegible] হাতে ভুল করে টাকাটা [illegible]। লম্বু মারফৎ [illegible] অস্তিত্বে ব্যায়িত হবে কে [illegible]?

[illegible] অশোক জানা সারাক্ষণ [illegible] বোসের কথাই ভেবেছে। কি [illegible] ব্যাপার? ক্রীড়াঙ্গনে যে [illegible] সে জীবন দিয়েছিল সেই [illegible] মানুষটা এখন নিজেই হাত পা [illegible] করেছে। বুদ্ধিহীন একটা [illegible] কোন নিকৃষ্ট চিন্তার বশবর্তী হয়ে [illegible] সর্বনাশ করবে, ভাবতেই অশোক জানা মনে মনে শিউরে ওঠে। রাজনীতির সার্কাসে ঐ নির্লজ্জ ক্লাউন শশধর বোস মুখে চুন মেখে লোক হাসাবে। যত হাততালি আর বাহবা পাবে ততই ঐ ভাঁড়টা ডিগবাজী খাবে। অথচ বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঐ মানুষটাকে ফিরিয়ে আনার কোন উপায় নেই। সে এখন জনগণের প্রতিনিধি, মনে তার জনপ্রিয় হবার সাধ, সেই সঙ্গে মন্ত্রিত্বের গদীতে বসার স্বপ্ন। অতএব ঐ আহাম্মকটাকে যে কোন রাজনৈতিক রিং

মাস্টার বাঁদর নাচ করাবে, গলায় ঘণ্টি লাগিয়ে ডুগডুগি বাজিয়ে গান করবে, চলরে বুড়া বুড়ীর বাড়ি চল, চলরে বুড়া চল, শ্বশুরাল চল।

প্রেসে পেঁছে কবিতার সঙ্গে দেখা। মেয়েটা অন্যমনস্কভাবে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। অশোক জানা জিজ্ঞেস করল, কি, হাতে কোন কাজ নেই বুঝি? এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

কবিতা বলল, আমার ক'দিন ছুটির দরকার ছিল, তাই আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

অশোক জানা বিরক্ত হয়, ছুটি, ছুটি, এ ছাড়া যেন আর কোন কথা নেই। মাসে ক'দিন কাজ কর বলতে পার? তাহলে আর মাস মাইনে নিও না, এবার থেকে দিন মজুরি করো।

—আমি তো কখনও ছুটি চাই না।

বাজে বকিও না, কাজ করতে হয় কর, আর ইচ্ছে না করে তো বাড়ি যাও। অশোক জানা পাঞ্জাবীটা খুলে রেখে নিজের টেবিলে গিয়ে বসল, প্রুফ সংশোধন করতে। একটু পরেই কবিতা এক কাপ গরম চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। সত্যিই অশোক জানার চা তেষ্টা পাচ্ছিল, অথচ একটু আগে কবিতাকে বকেছে বলে চা তৈরী করে আনার জন্যে বলতে পারছিল না।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতেই কবিতা জিজ্ঞেস করল, বিস্কুট আনতে দেব।

—না থাক।

তখনও কবিতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অশোক জানা প্রশ্ন করে, ক'দিন ছুটি চাই?

—এক সপ্তাহ।

—কেন, কি হয়েছে?

—মাকে নিয়ে নবদ্বীপ যেতে হবে।

—হঠাৎ?

কবিতা হাসল, সে কথা পরে জানাব।

—এদিকের কাজ সামলাবে কে?

—আমি একটা মেয়ে দিয়ে যাব, ঐ সাতদিনের টাকা আমার মাইনে থেকে কেটে দেব, আপনার কাজের কোন অসুবিধে হবে না।

অশোক জানা এতক্ষণে খুশী হয়, নিতান্তই যেতে যদি হয়, বেশ যেও তাহলে, তবে তাড়াতাড়ি ফিরে এস।

সম্মতি পেয়ে খুশীর ঢেউ তুলে কবিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই তার গলা শোনা যায়, কি, বলেছিলাম না বাবু আমায় ছুটি দেবে।

সঙ্গে সঙ্গে নিরঞ্জনের জবাব, ছুটি না হয় পেলে, দেখা যাক ঠাকুরদের অন্দিন নবদ্বীপে থাকতে পারেন কিনা।

—কেন পারব না?

—এ হলো ক'লকাতার মায়া, একবার যে ফাঁদে পড়েছে সে আর কিছুতেই বেরতে পারে না।

—বেশ দেখা যাবে।

কান পাতলে অশোক জানা হয়ত ওদের কথা আরও শুনতে পেত, ঠিক এই সময় মিঃ দত্ত এসে হাজির। লোকটা ভাল মক্কেল, প্রেসের অনেক কাজ এনে দেয়। অশোক জানা তাকে খাতির করে বসাল। ভদ্রলোকের হাতে একটা অ্যালুমিনিয়ামের ডিবে, অশোক জানার টেবিলের ওপর এগিয়ে দিয়ে বলল, আমার স্ত্রী বাড়িতে সন্দেশ তৈরী করেছে, তাই একটু পাঠিয়ে দিয়েছে আপনার জন্যে।

—সন্দেশ, হঠাৎ?

—আপনার কথা আমার কাছে শোনে তো, যেই বলেছি এখানে আসছি, অমনি ডিবেটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছে।

—শ্রীমতীকে ধন্যবাদ জানাবেন।

—আগে খেয়ে দেখুন মুখে দেবার মত হয়েছে কিনা।

অশোক জানাও ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে আমিও কিছু খাবার আনাই, রাজাবাজারের বিখ্যাত কষা মাংস।

—না, না, এতো আপনি লৌকিকতা করতে শুরু করলেন।

অশোক জানা নাছোড়বান্দা, বলে, তাই কখনও হয়, আপনি আমাদের খদ্দের—লক্ষ্মী, আপনি আমাদের খাওয়াবেন আর [illegible] চুপ করে বসে থাকব।

প্রেসের লোককে ডেকে অশোক জানা তখনি অর্ডার দেয় কষা মাংস আর পরোটা নিয়ে আসার জন্যে।

অফিসের পরিবেশে পারিবারিক গল্প বড় একটা জমে না, কিন্তু আজ এই প্রেসের ছোট ঘরে খেতে খেতে কথা বলতে বলতে ঘরোয়া গল্প কেমন করে যেন জমে উঠল। অশোক জানা স্বভাব সুলভ চাপল্যের সঙ্গে বলল, মিঃ দত্ত আপনাকে দেখলেই বুঝতে পারি খুব সুখী মানুষ এবং তার মূলে রয়েছে একটি সুখী পরিবারের অবদান।

মিঃ দত্ত ম্লান হাসে, কি করে বুঝলেন?

—মানুষ দেখলেই আমি বুঝতে পারি। জানেন অনাদিপ্রসাদের মত আমিও লেখক হতে পারতাম, পা হড়কে গিয়ে প্রেসের মালিক হয়ে বসেছি, আপনাদের মত নিশ্চিন্ত জীবন হলে দেখতেন আমিও কতো কি করতাম।

—এইখানে কিন্তু ভুল করলেন অশোকদা, জীবনে আমার অনেক সমস্যা, সহজে কাউকে জানতে দিই না, হাসিমুখে ঘুরে বেড়াই।

একটু থেমে ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরায়, চোখ দুটো ছোট করে বলে, আমার বিধবা মা, বয়স প্রায় ষাট, পাঁচ বছর আগে কলঘরে পড়ে গিয়ে কোমরের হাড় ভেঙ্গে যায়; দুবার অপারেশান করিয়েছি, যতরকম চিকিৎসা সম্ভব, কিন্তু কিছু হল না, মা আমার চলৎ শক্তিহীন, বিছানায় শুয়ে থাকেন, সব কিছু করিয়ে দিতে হয়। রোগে ভুগে ভুগে মেজাজটাও রুক্ষ হয়ে উঠেছে, একটুতেই বিরক্ত হন।

অশোক জানা সমবেদনা প্রকাশ করে, আহা, এ জীবন বড় দুঃখের।

—আমার স্ত্রী সুন্দরী, মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, শিক্ষিতা, কিন্তু বিয়ের আগে ছোট-বেলায় ওর চোখে ছুঁচ ফুটে গিয়েছিল, তার ফল ফলছে এখন। ক্রমশ চোখের পাওয়ার বাড়ছে, ঘন ঘন চশমা বদলেও ভাল দেখতে পাচ্ছে না। ওর মনে ভয় ঢুকেছে যদি পরে অন্ধ হয়ে যায়।

অশোক জানা শুনতে শুনতে অস্বস্তি বোধ করে, এসব কি বলছেন? এত বড় দুঃখের কথা, অথচ আপনাকে দেখে—,

মিঃ দত্তর দীর্ঘশ্বাস পড়ে, বুঝতেই পারছেন, অসুস্থা মা এবং স্ত্রীর এই অসুখের জন্য বাড়িতে ঝি, চাকর সবই রাখতে হয়। দুটি বাচ্চা আছে, তাদেরও দেখাশোনা করা দরকার। সব কিছুই করছিলাম, ভালো চাকরি ছিল, প্রায় সাতশো মাইনে, কিন্তু—

—কি বলুন।

—প্রায় পাঁচ মাস হল চাকরিটা গেছে, ঠিক নিজের দোষেও নয়। বিলিতী কোম্পানী, লাল মুখো সাহেব, আমাদের ডিপার্টমেণ্টের অনেকের ওপরেই চটে যায়, তাইতেই চাকরি গেল। অথচ একথা বাড়িতে আমি বলতে পারিনি, তাতে মা বউ আরও ভাববে। অফিসের সময় বেরিয়ে পড়ি, সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরে যথারীতি বাড়িতে ফিরি সন্ধ্যার সময়। হাতে যা টাকা ছিল এক'মাস সমানভাবে সংসার টেনে গেছি, কিন্তু আর বোধ হয় পারব না।

অশোক জানা এই পর্যন্ত শুনে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে, আরে মশাই এত ঠিক নাটকের মত মনে হচ্ছে, কিন্তু তারপর আর কোথাও চাকরি পেলেন না?

—সেটা আরও নাটকীয়, আমি টেকনিকাল লাইনের লোক। আমার সার্টিফিকেটটা ছিল সাহেবের কাছে, তিনি আমাকে শুধু জবাব দিলেন তাই নয় ঐ সার্টিফিকেটটা লাল কালি দিয়ে কেটে আমার বিরুদ্ধে মতামত লিখে সই করে দিয়েছে, যার ফলে সে সার্টিফিকেট অন্য কোথাও দেখাতেও পারছি না আর সার্টিফিকেট ছাড়া আমাদের লাইনে কাজ যোগাড় করা একরকম অসম্ভব।

কথা বলতে বলতে লাল কালি লাঞ্ছিত সার্টিফিকেটখানা মিঃ দত্ত অশোক জানার সামনে মেলে ধরে। অশোক জানা সজোরে

বলে, এ তো ঘোর অন্যায়, সার্টিফিকেট নষ্ট করার অধিকার কারুর নাই।

—বলতে গিয়েছিলাম, শুনলাম সেই সাহেব বিলেতে চলে গেছেন আমার সর্বনাশ করে। ফলে আজও আমি বেকার।

—তাহলে?

মরুভূমিতে জল দেখতে পাওয়া চোখে মিঃ দত্ত তৃষ্ণার্ত স্বরে বলে, অশোকদা এই সার্টিফিকেটের একটা কপি ছাপিয়ে দেবেন? আমার যথাসাধ্য আমি দেব, দুশো, তিনশো টাকা যা চাইবেন। শুধু একটা কপি।

অশোক জানা এ প্রস্তাবের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, ব্যস্ত হয়ে বলে, কি বলছেন, জাল সার্টিফিকেট ছাপাব?

মিঃ দত্তর অনুনয়, এটুকু সাহায্য করলে আবার আমি চাকরি পাব, একটা পরিবার বেঁচে যাবে, প্লীজ অশোকদা।

অশোক জানা উঠে দাঁড়ায়, ঘন ঘন মাথা নাড়ে, না, না, এ অসম্ভব, এ অন্যায়, এ পাপ!

মিঃ দত্তর আকুতি, একটি বৃদ্ধা, একটি হায় অন্ধ স্ত্রী, দুটি অসহায় শিশু।

(ক্রমশ)

বিশ্ব বিজ্ঞান

সোভিয়েট বিজ্ঞানের অর্ধশতাব্দী

সেকালে মিশরে এই প্রবাদ প্রচলিত ছিল, "যে দেবতা বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছিলেন তিনি মানুষের প্রশান্তির শত্রু।" এক দিক থেকে কথাটা ঠিক, কারণ বিজ্ঞান ও মানুষের প্রশান্তি হাতে হাত মিলিয়ে চলতে পারে না। বিজ্ঞানের যতই অগ্রগতি হয় ততই উন্নতি লাভ করে সামাজিক উৎপাদনের যন্ত্রকৌশল এবং সেই অনুপাতে বেড়ে চলে মানুষের অভাব অভিযোগ ও চাহিদা। এতদিনকার পুরানো ধরনের জীবনযাত্রা নিয়ে সে আর সন্তুষ্ট থাকতে চায় না, এমন কি চাঁদ ও গ্রহ-গ্রহান্তরে গিয়ে উপনিবেশ রচনা করবার স্বপ্ন দেখে। সেই সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে প্রখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী সিয়লকভস্কি বলেছিলেন :—"আমি মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে বিশ্বাসী। আমি মনে করি মানুষ শুধু পৃথিবী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে না এবং একদিন সে গ্রহের দুনিয়াকে পর্যন্ত রূপান্তরিত করবে। আমাদের এই সৌরমণ্ডল থেকে মানুষ ছড়িয়ে পড়বে মহাবিশ্বে। এই বিষয়ে আমার মনে কোন সংশয় নেই। এই হচ্ছে পার্থিব মানুষের ভাগ্য। বহু গ্রহমণ্ডলকে সে রূপান্তরিত করবে।"

সিয়লকভস্কির সেই বিশ্বাস যে ভ্রান্ত ছিল না তা দুনিয়ার প্রথম স্পুৎনিক থেকে এই দশ বছরে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। সোভিয়েতের মানুষ প্রাচীন মিশরের ঐ প্রবাদ বাক্য প্রত্যাখ্যান করে রুসোর ভাষায় বলেছে :—"যে কূপের গভীরে পরম সত্য নিহিত রয়েছে তার চাতালের কানায় পৌঁছে মরবার জন্যই কি আমরা সৃষ্ট হয়েছি?" সেই কূপ থেকে সত্যের সোনার তাল উত্তোলন করবে, এই বজ্রসংকল্পের উপর অটুট বিশ্বাস রেখে মাত্র ৫০ বছরে বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি সাধন করেছে তা বিস্ময়কর। মাত্র ৫০ বছর এই জন্য বলছি যে, য়ুরি গাগারিনের ভাষায় বলতে গেলে "'মহাশূন্য' ও 'অক্টোবর' এই দুটি শব্দকে রুশেরা এক-সঙ্গে দেখে ও উচ্চারণ করে শুধু এই জন্য নয় যে, প্রথম স্পুৎনিক দুনিয়ার ইতিহাসে অক্টোবর মাসেই মহাশূন্য অভিযানের ইতিহাস সূচনা করে তার সংকেত পৃথিবীতে পাঠিয়ে, যা অক্টোবরেই রুশ মহাকাশযান চাঁদের অদৃশ্য দিকের ছবি তোলে, কিম্বা বহু যাত্রীবাহী ভসখদ মহাকাশযানও উৎক্ষেপ করা হয় এই অক্টোবর মাসে। এদিকটা হচ্ছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে কয়েকটি স্মরণীয় দিন মাত্র। কিন্তু মানব সভ্যতার ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে এই সব অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক কীর্তির মূল নিহিত রয়েছে ১৯১৭ সালের সেই দিনটিতে যে রণতরী 'অরোরার' কামান ধ্বনি এক নতুন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার জন্মবার্তা প্রচার করে সারা দুনিয়ায়। রুশ বিজ্ঞানের সোভিয়েত বিজ্ঞান হিসাবে পুনর্জন্মলাভও হয় সেই সময় যে বিজ্ঞান উন্নতির দ্রুততায় অপ্রতি-দ্বন্দ্বী। অরোরার সেই কামান থেকে

গবেষণারত বিজ্ঞানাচার্য ইভান পাভলভ
(বিপ্লবের ঠিক পরেকার ছবি)

সোভিয়েট বিজ্ঞান আজ মহাজাগতিকযানের যুগ উত্তীর্ণ হয়েছে মাত্র ৫০ বছরের মধ্যে, আগেকার ব্যক্তি-কেন্দ্রিক বিজ্ঞানকে রূপান্তরিত করেছে সমষ্টিকেন্দ্রিক বিজ্ঞানে, কাঠের লাঙলের স্তর থেকে দেশকে উন্নীত করেছে মহাকাশযানের স্তরে।

কিন্তু সোভিয়েত বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর অগ্রগতিপথ কি কুসুমাস্তীর্ণ ছিল? না, সে পথ ছিল অত্যন্ত দুর্গম। সোভিয়েত যুগের নতুন বিজ্ঞানের জন্ম কালে ১৪টি বৈদেশিক রাষ্ট্রের সৈনাবাহিনী ও দেশীয় হোয়াইট গার্ডদের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধের শেষ অঙ্ক সবে শেষ হতে চলেছে। সেই দারুণ দুর্দিনের মধ্যেই লেনিনের পরামর্শে নতুন সরকার 'জ্ঞানতরণী' (নৌকা মানে বিজ্ঞান) নামে একটি বিভাগ খুলে তার অধ্যক্ষপদে নিয়োগ করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ফিওদোর পেত্রফকে। সেই সব দিনের কথা চিন্তা করে দেখুন, যখন সেই বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর ও দালান-গুলিতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলত লোকের আনাগোনা, এসে পৌঁছাত তাড়া তাড়া চিঠিপত্র। প্রায় সকলেই আসত নানা অনুযোগ অভিযোগ নিয়ে—যেমন বৃদ্ধ প্রিন্স ক্রপোটকিন লেনিনের কাছে অভিযোগ করলেন যে, বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়েও তাঁর মতো বুড়ো মানুষের একটু দুধ জুটছে না কেন? লেনিনের নির্দেশে সেই দিন থেকেই তাঁর জন্য দুধের ব্যবস্থা করা হল। জ্ঞানতরণীর অফিসে এসে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক লেবরেটরীর সাজসরঞ্জাম খরিদ করার জন্য অর্থ মঞ্জুরের দাবি করলেন। তেমনি উদ্ভাবকরা সেখানে হাজির হয়ে নিজেদের রচিত প্রকল্পগুলি পরীক্ষা করে দেখতে কেন সরকারের এত দেরি হচ্ছে, এই অভিযোগ তুললেন। বিভিন্ন সংগ্রহালয়ের (মিউজিয়াম) অধ্যক্ষরা দাবি করতে লাগলেন যে, স্থাপত্যের কীর্তিস্তম্ভগুলির সংরক্ষার ভার সরকারকেই নিতে হবে। কবিরা নালিশ করলেন তাঁদের কবিতার বই ছাপার জন্য কাগজ কেন পাওয়া যাচ্ছে না? প্রখ্যাত উদ্ভিদের যাদুকর ইভান মিচুরিন একদিন তাঁর কলম-করা গাছে কিছু নতুন জাতের ফল নিয়ে হাজির। কনস্তান্তিন সিয়লকভস্কি সেই অফিসে গিয়ে মহাকাশ বিজয় সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। বায়ুর চেয়ে ভারি অত্যুচ্চ বেগবান বিমানের এক নকশা হাতে ধরে বিখ্যাত বিমান বিজ্ঞানী নিকোলাই জুকভস্কি জ্ঞানতরণীর দপ্তরে গিয়ে উপস্থিত। লেনিনের নির্দেশে বিভাগের অধ্যক্ষ ও আরো কয়েকজন কর্মী যখন বিশ্ববিখ্যাত শরীরতত্ত্ববিৎ ইভান পাভলভের বাড়ি গেলেন তাঁকে এই খবর দিতে যে, লেনিন তাঁর গবেষণার সর্বপ্রকারে সাহায্য ও সমর্থন দানের জন্য এক হুকুম নামায় দস্তখত করেছেন, বৈজ্ঞানিক তখন ঘরের ভিতরেও প্রচণ্ড ঠাণ্ডার জন্য লোমের জামা আর টুপি পরে বসেছিলেন। বার্তাবাহকরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার চলছে কেমন? পাভলভ জবাব দিলেন একটু কাঁধ কুঁচকে,

"কেমন আর চলবে বলুন যখন আমাদের পরীক্ষার জন্য কোন জীবজন্তু পাচ্ছি না, যা আছে তাদের খাওয়াবার সংস্থান নেই, খাদ্য নেই, এমন কি ফায়ারপ্লেসে জ্বালাবার কাঠ অবধি বাড়ন্ত? প্লাভনোকার কর্মীরা কি এ বিষয়ে কোন খবর রাখেন?" এই রকম কত শত দাবি দাওয়া নিয়ে যে লোকে সেই দপ্তরে যেত, যেগুলির কোনটি তুচ্ছ, কোনটি গুরুত্বপূর্ণ, কোনটি হয়ত আজগুবি যার সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন সম্পর্কই নেই। এটা ছিল অনিবার্য কারণ, 'প্লাভনোকার' পুরো নাম দাঁড়ায় রুশ ফেডারেশনের জনশিক্ষা মন্ত্রিবিভাগের বিজ্ঞান, চারুকলা, সংগ্রহশালা নাট্য ও সাহিত্যের কেন্দ্রীয় প্রশাসন সংস্থা। সুতরাং হরেক রকমের দাবি-দাওয়া নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রের লোকের সেখানে যাতায়াত তো হবেই। রুশিয়ার তখনকার অবস্থা ছিল ব্রিটিশ শাসিত ভারতের চেয়েও খারাপ। ভারত যে বিজ্ঞান চর্চার একটা মোটামুটি তৈরি কাঠাম নিয়েই স্বাধীনতা লাভ করে, জারশাসিত রুশিয়ার তা ছিল না বলে রুশিয়ার পক্ষে বিজ্ঞানে উন্নতি করার পথ ছিল অনেক বেশি কঠোর।

কিন্তু সেজন্য রুশ বিজ্ঞানী ও প্রশাসকরা

ঘোর মানেন নি। সেই হিমশীতল কঠোর দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনের সময়ে ম্যাক্সিম গর্কী বৈজ্ঞানিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য অগাধ ও প্রকৃষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন এবং সেইজন্য তিনি একটি কমিশন গঠন করে বিজ্ঞানীদের জন্য নিয়মিত বাড়তি রেশন ও জ্বালানি কাঠ সরবরাহের বন্দোবস্ত করেন। বাড়তি রেশন মানে একটা পাউরুটির সিকি টুকরা! সে সময়েও দেশে কিছু চরমপন্থী অতিনব্য লোক ছিল যারা পুরাতন ও প্রবীণ বৈজ্ঞানিকদের রক্ষণশীলতার বদনাম দিয়ে একেবারে নাকচ করে দিয়ে নতুন করে বিজ্ঞান চর্চা শুরু করতে চেয়েছিল। কিন্তু লেনিন ও অন্যান্য নেতারা তাদের এই অতিবামপন্থা গ্রহণ করেন নি, কারণ সমাজতান্ত্রিক হোক বা পুঁজিবাদী হোক যে কোন সমাজই বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত। পুঁজিবাদী বিজ্ঞান সমাজতান্ত্রিক বিজ্ঞান, এসব কথার কোন মানে হয় না, কারণ বিজ্ঞান বিজ্ঞানই। কেবল তার গবেষণা ও প্রয়োগ পদ্ধতি বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকমের হতে পারে।

পেত্রোগ্রাদে (লেনিনগ্রাদ) ১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টিবিজ্ঞান ভবনটি হচ্ছে সোভিয়েত আমলের সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক সংস্থা। সংস্থার প্রথম বার্ষিকোৎসবে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ রজদেস্তভেন্‌স্কি বলেন যে, "দেশব্যাপী খাদ্যাভাব, প্রচণ্ড শীত ও অন্যান্য দুরবস্থা ও অসুবিধা এবং গৃহ-যুদ্ধের দরুন সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমরা বর্ণচ্ছত্র বিশ্লেষণের সাহায্যে পরমাণুর গঠন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছি।"

ঐ ১৯১৮ সালেই মস্কোতে প্রতিষ্ঠিত হয় সেন্ট্রাল এরোহাইড্রোডাইনামিকস ইন্সটিটিউট। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি বলেছিলেন, "চালকচক্রই (প্রোপেলার) একদিন আমাদের আকাশে উড়ে যেতে সাহায্য করবে।" ঐ ইন্সটিটিউটে নিকোলাই জুকভস্কি চালকচক্র সম্পর্কে যে চূড়ান্ত তত্ত্ব রচনা করেন তা আজ বিশ্ব স্বীকৃতি লাভ করেছে ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী আছে। ইতিমধ্যে ভল্গানদী তীরে অবস্থিত ঐতিহাসিক নিঝনি নভগরোদ শহরে আচার্য বঞ্চ-ব্রুয়েভিচ এক লেবরেটরী ফেঁদে সেখানে এক মৌলিক নমুনার বিয়োগ রশ্মি বা ক্যাথোডরে টিউব উৎপাদন শুরু করেছেন এবং আর একটি রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানায় আরম্ভ হয় টেলিভিশন নিয়ে পরীক্ষা। ওদিকে পেত্রোগ্রাদের পদার্থবিদ্যা ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউটে বিজ্ঞানাচার্য য়োফি প্রথম সেমিকণ্ডাক্টার গঠন করার পর অত্যন্ত বেগসম্পন্ন ইলেকট্রন ও এক্সরশ্মির দ্বারা পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের উপর আঘাত হানার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করতে (বিজ্ঞানাচার্য কয়েক বছর আগে মারা

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানাচার্য ল্যান্দাউ—রুশ বিপ্লবের ঠিক পরে বিজ্ঞানাচার্য য়োফির অধীনে গবেষণাকালীন ছবি

গিয়েছেন) থাকেন। এঁরা সবাই প্রাগবিপ্লব যুগের বিজ্ঞানী, যাদের অত্যুৎসাহী আধুনিকরা বর্জন করতে চেয়ে হঠকারিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু লেনিন প্রমুখ নেতারা তাঁদের বর্জন করা তো দূরের কথা, উল্টে সেই ঘোর দুর্দিনেও তাঁদের বিজ্ঞান গবেষণার জন্য যে সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করেন তা বিপ্লবের আগেকার দিনে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। সেই সময়েই বিজ্ঞানচর্চার আসরে নামেন যুবা বয়সে, আজকের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানাচার্য লেভ ল্যান্দাউ, নিকোলাই সেমিওনফ ও পিওতর কাপিৎজা এবং তাঁরা বিজ্ঞানাচার্য য়োফির নেতৃত্বে কাজ শুরু করেন। বিপ্লবের ঠিক পরেই আরো যাঁরা গবেষণায় প্রখ্যাতি লাভ করেন তাঁদের মধ্যে কুর্চাতফ, আলেকজান্দ্রফ, ফ্রিডম্যান ভাভিলফ ও লজারেফের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের উত্তরসাধন করেছেন আচার্য ফ্রিডম্যান, প্রজননতত্ত্বে বিরাট অবদান করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন ভাভিলফ যিনি পরে সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাডেমির প্রেসিডেণ্ট হন। কুর্স্ক অঞ্চলের ভূগর্ভে বিরাট চৌম্বক ধাতু কেন্দ্রের আবিষ্কর্তা ছিলেন আচার্য লাজারেফ। সুতরাং অক্টোবর বিপ্লবের ফলে "চাষা-ভূষোদের রাজত্বে" রুশ সংস্কৃতির "রাত ঘনিয়ে আসছে" পশ্চিমী জগতে রটানো এই অপবাদের যে কোন ভিত্তিই ছিল না তা বুঝতে কোন অসুবিধা নেই। এই সব প্রবীণ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যাঁরা আজও বেঁচে আছেন, নবীন বিজ্ঞানীদের সঙ্গে একযোগে কাজ করে তাঁরা স্বদেশকে বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

জারের রাজত্বের আমলে যে ১৮টি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান ছিল তাই নিয়ে কাজে হাত দিয়ে সোভিয়েত শিক্ষাদপ্তর ৫ বছরের মধ্যে ঐ রকম প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড় করান ৫৭টি। গোড়া থেকেই লেনিনের নেতৃত্বে দেশের গঠন ও উন্নতির কাজ পরিকল্পনার ভিত্তিতে শুরু হয়। সুতরাং উৎপাদনের যন্ত্রকৌশলে উন্নতি যখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তখন বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেও পরিকল্পিত পথে অগ্রসর না হলে চলে না। সেই উদ্দেশ্যে 'নার্কমনোকার' পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞান কংগ্রেস ডাকা হয়, যা নিয়ে অনেকে সেদিন এই বলে বিদ্রূপ করেছিলেন যে, বলশেভিকরা অর্থাৎ কুলি-মজুর চাষা-ভূষোদের তো শিক্ষাদীক্ষার বালাই নেই! তাদের মগজে এটুকু বোঝবারও ক্ষমতা নেই যে বিজ্ঞানের সাফল্য ব্যক্তিবিশেষের প্রতিভার উপর নির্ভর করে এবং তাদের কাজে নাক গলাবার অধিকার কারো নেই। কিন্তু যে যাই বলুক বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট কার্পিন্‌স্কি, ভাইস প্রেসিডেণ্ট স্টেকলফ, ওল্ডেনবুর্গ, কোমারফ, ফেসম্যান, ভার্নাডস্কি, সেমিওনফ প্রমুখ প্রবীণ ও নবীন বিজ্ঞানীরা পরিকল্পনার ভিত্তিতে বিজ্ঞান-চর্চার সমর্থনে দাঁড়ান। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, প্রকৃতির নিয়মাবলী উদ্ঘাটন করতে না পারলে দেশের বৈষয়িক সম্পদের কোন উন্নতি করা

যাবে না। আর সেই জন্যই শত শত বৎসর যাবৎ মানুষ বিজ্ঞান ও উৎপাদনকে একসূত্রে গ্রথিত করে দেখেছে এবং বুঝেছে যে, জনশিক্ষাই হচ্ছে সেই যোগসূত্র। তবুও বিপ্লবের আগে জারতন্ত্রের হর্তাকর্তারা প্রকৃতি বিজ্ঞান, যন্ত্রকৌশল ও অর্থশাস্ত্রকে উন্নতির এই তিনটি প্রধান ক্ষেত্রকে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন। বিপ্লবের পরে যাঁরা সামাজিক উন্নতির এই তিন ক্ষেত্রকে শিক্ষার মাধ্যমে একসঙ্গে জুড়ে দেবার প্রয়োজন প্রথম উপলব্ধি করেন, তাঁদের মধ্যে কাপিৎজা, লান্দ্রেস্তিয়েফ ও সেমিওনফের নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য এবং মস্কোর প্রথম পদার্থবিদ্যা ও যন্ত্রকৌশলবিদ্যার ইন্সটিটিউট সেই উপলব্ধিরই ফল। সেই প্রতিষ্ঠানের প্রথম শুরু হয় পদার্থবিদ্যা গণিতশাস্ত্রের সঙ্গে বিজ্ঞান গবেষণা ও ডিজাইনিংকে একসঙ্গে গ্রথিত করার চেষ্টা। নোভোসিবির্স্ক আজ অতীতের ইতিহাসের অংশ হিসাবে বিলুপ্ত হলেও বিজ্ঞানীদের পরিকল্পিত পথে সৃজনাত্মক গবেষণা চালিয়ে যাবার অধিকার আজ খর্ব হওয়া তো দূরের কথা, বরং আগের চেয়েও অনেক বেশী সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেটাই যে বিজ্ঞানচর্চার একমাত্র যুক্তিসংগত পথ, সোভিয়েত বিজ্ঞানের বর্তমান অগ্রগতিই তার সাক্ষ্য। বিপ্লবোত্তর বিজ্ঞানীরা প্রাক্‌বিপ্লব যুগের বিজ্ঞানের ব্যক্তীকরণের পদ্ধতি বর্জন করে সকলের যৌথ বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাকে ইতিহাসের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে আধুনিক কালের সোভিয়েত বিজ্ঞানের জন্য খনিত্রচালনা করে উপযুক্ত জমি তৈরি করেছিলেন। সোভিয়েত সমাজের উন্নতিকামীরা বিজ্ঞানকে যতখানি মূল্য দেন ততখানি মূল্য অন্য কোথাও দেওয়া হয় কিনা সন্দেহ কারণ, সমাজতন্ত্রের ভিত্তি বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কিছুর দ্বারা গঠিত হতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচেষ্টা খাপ খায় না। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজকে আগেকার অসমাজতান্ত্রিক সমাজের ব্যক্তিবিশেষের বৈজ্ঞানিক সাফল্যগুলিকে বর্জনের বদলে গ্রহণ করে সেগুলির উত্তরসাধন করতে হবে, উন্নতি করতে হবে, সেগুলিকে আরো শক্তিশালী নবরূপ দান করতে হবে বিজ্ঞানের নতুন শাখা প্রশাখা আবিষ্কার করে। প্রাক্‌বিপ্লব আমলেও রুশিয়ায় প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকের অভাব ছিল না। যাঁরা এমন অনেক কিছু আবিষ্কার করে গিয়েছেন যার জন্য তাঁরা বিশ্ববিজ্ঞানের পুরোভাগে স্থান পাবার যোগ্য। সভ্যতার ইতিহাস যতই ঘটনাবহুল হোক বা যতই সাফল্যসমৃদ্ধ হোক, যতই দীর্ঘ ... হোক, বরাবরই প্রত্যেকটি ব্যাপারের একটা আরম্ভ ছিল, ছিল সর্বপ্রথম ঘটনা। যেমন ইতিহাসে প্রথম ভূপ্রদক্ষিণ, প্রথম এরোপ্লেনের আকাশযাত্রা, প্রথম রকেটের উৎক্ষেপ, ইত্যাদি। এবং সেই ইতিহাসে প্রথম হবার সম্মান যাঁরা লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রুশিয়ার লোমনোসফ (যিনি প্রথম শুক্রের আবহমণ্ডল আবিষ্কার করেন), রসায়নবিজ্ঞানী মেণ্ডেলিয়েফ, প্রথম এরোপ্লেনের ডানার আবিষ্কর্তা মোজাইস্কি, প্রথম এরোহাইড্রোডাইনামিকস্ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা জুকভস্কি, বেতারের অন্যতম আবিষ্কর্তা পপফ, বাষ্পীয়যানের অন্যতম আবিষ্কর্তা পলজুনফ্, স্নায়বিক সাপেক্ষ প্রতিবর্তীর আবিষ্কর্তা পাভলফ, রকেটের প্রথম নকশাকার কিবালচিচ্ ও তার রূপদাতা সিয়লকভস্কি, কৃষিবিজ্ঞানের উন্নতির পথপ্রদর্শক মিচুরিন, তিমিরিয়াজেফ প্রভৃতি। তাঁদেরই ঐতিহ্য সাদরে গ্রহণ করে তাকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলছেন এ যুগের সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা যার দ্বারা দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান, তাদের সংস্কৃতি ও শিক্ষাদীক্ষা এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। বিপ্লবের পরবর্তী যুগের এই পঞ্চাশ বছরে দেশে বিজ্ঞান গবেষক, অধ্যাপক ও শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের (উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে) মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ লক্ষের মত এবং ডক্টরেট-প্রাপকদের মোট সংখ্যা বিপ্লবের আগেকার সমস্ত গবেষক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ডক্টরেট প্রাপকদের তুলনায় দাঁড়িয়েছে দেড় গুণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যদি না হোত তাহলে এঁদের সংখ্যা হোত আরো অনেক বেশী। তাঁরা সবাই মিলে অবতীর্ণ হয়েছেন প্রকৃতির রহস্যাবৃত নিয়মাবলী উদ্ঘাটন করে সেগুলি সমাজকল্যাণের স্বার্থে কাজে লাগাতে এবং মহাবিশ্বের অভিযানে অগ্রসর হতে। নোভোসিবির্স্কের জায়গায় আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাডেমী তার বহু আঞ্চলিক শাখাপ্রশাখা নিয়ে, রূপ নিয়েছে বিজ্ঞান গবেষণা ও যন্ত্রকৌশলবিদ্যার পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধনের জন্য একটি সরকারী কমিটি। অবশ্য এটা ঠিক যে, মৌলিক গবেষণা সম্পর্কে আগে থেকে পরিকল্পনা বা পথনির্দেশ করা একরকম অসম্ভব বলা যেতে পারে কারণ, কোন্ শাখায় কখন হঠাৎ কি নতুন ব্যাপারের সন্ধান পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন না। তাই সরকারী কমিটি পরিকল্পনার সময় সেই সব গবেষণাকে প্রাধান্য দেন যেগুলি থেকে সবচেয়ে বেশী সুফলের আশা করা যেতে পারে। প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান ও যন্ত্রকৌশলের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা করা অনেক সহজ।

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

লেসার ও মেসার যন্ত্রের অন্যতম আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানাচার্য প্রোহরফের যুবা বয়সের ছবি

সুইডেনের চিত্র

সুইডেনে প্রজাতন্ত্র অত্যাধুনিক হলেও তার ভিত্তি পুরাকালেই পাওয়া যায়। যদিও সুইডিশ প্রজাতন্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আধুনিকতা রক্ষা করেই চলে, তবু ঐতিহাসিক সূত্রেই তার ক্রমবিকাশ হয়েছে। সুইডিশ সামাজিক প্রথায় পুরাকালের ঐতিহ্যের চিহ্ন আজও লক্ষ্য করা যায়। এ দেশের সমাজে বিদেশী প্রথার বিশেষ প্রভাব পাওয়া যায় না, কারণ, বিমানযুগ চালু হওয়া পর্যন্ত সুইডেন বিদেশীদের সংস্পর্শে বিশেষ আসে নি। বিশ্ববাসীর চিরপরিচিত এলাকাগুলির মধ্যে সুইডেনের স্থান ছিল না।

এখন অবশ্য সুইডেন আর সকল দেশের দৃষ্টিই আকর্ষণ করেছে। ইউরোপে আর সকল দেশকেই নানা উন্নতির মাধ্যমে সুইডেন এখন ছাড়িয়ে গেছে। সুইডিশরা বিশ্বের অন্যান্য সব দেশের মানুষের তুলনায় অতি স্বচ্ছন্দেই জীবনযাপন করছে। এই স্বচ্ছন্দের ভিত্তির মূল কারণ, তাদের জীবনে সামাজিক নিরাপত্তা, যা তারা জন্মের থেকে শুরু করে সারা জীবন ভোগ করে। এই সামাজিক নিরাপত্তাই নানা দেশের মনোযোগ সুইডেনের দিকে আকর্ষিত করেছে। যে সব সমাজবিদ সমাজনীতি নিয়ে অধ্যয়ন করে থাকেন, তাঁরা সকলেই ব্রিটেন, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, এমনকি আমেরিকার তুলনায়ও সুইডেনের প্রচুর প্রশংসা করেছেন। সুইডেনকে সমাজনীতি পরীক্ষার আদর্শ দেশও বলা হয়েছে।

এই সব তুলনামূলক প্রশংসা মেনে নেবার আগে কিন্তু অনেক কথাই মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমত সুইডেন আর সকল দেশের তুলনায় বহুকাল যুদ্ধের সংগে জড়িত হয় নি, কাজেই শান্তির আবহাওয়ার মধ্যে উন্নতি করাটা সুবিধাজনক। এ ছাড়া সুইডেনের জনসংখ্যাও তো নেহাতই নগণ্য। অন্যান্য দেশের তুলনায় ক'টা মানুষই বা সুইডেনে বাস করে? এই জনসংখ্যাও আবার জাতিতে এক, সমধর্মসম্পন্ন, সমভাবী, সমভুক, এবং সমপ্রথা পালন করে সকলে, সমস্বত্ব তাদের। এমন অবস্থায় এ দেশের উন্নতি হওয়াটায় আশ্চর্য কি? বরং উন্নতি না করলেই তো বেশী আশ্চর্যজনক হয়ে দাঁড়াত। সুইডিশদের স্বভাবও সুইডেনের সাফল্যের পথে খুবই সাহায্য করেছে। চিরকালই এরা সরকারের উপর সম্পূর্ণ ভরসা রেখে জীবনযাপন করেছে। সরকারের কাজেকর্মে, নীতিতে এই একান্ত ভরসা ও বিশ্বাস সাধারণতই যে কোন বিদেশীকে সমানভাবে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে।

অবশ্য সরকারও কখনও জনসাধারণের এই বিশ্বাসকে অবহেলা করে নি, যা হয়ত করতে পারে নি। সকলেই সুশিক্ষিত ও বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ায় সরকারকেও জনসাধারণের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির দিকে নজর রেখেই অগ্রসর হতে হয়েছে। এই সব কারণে প্রায় ২০০ বছর আগের থেকেই সামাজিক কল্যাণের দিকে সুইডিশ সরকার নজর দিয়েছে। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই প্রতিটি ধর্মযাজকের কর্তব্য ছিল যে, তিনি যে গ্রামের বাসিন্দা, সেই গ্রামের বৃদ্ধ, অসুস্থ, অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র ব্যক্তিদের যত্নের ভার নেওয়া। এদের কল্যাণে যা ব্যয় হত তা স্থানীয় করের মাধ্যমে মেটানো হত। ঐ সময় থেকেই প্রায় সব হাসপাতালগুলি সাধারণ তহবিলের দ্বারা চালিত হয়ে আসছে। জনসাধারণের স্বাস্থ্যের সেবা একটি মূলনীতির দ্বারা চালিত হয়। সকল মানুষের অসুস্থতার সময়, চিকিৎসা ও ওষুধ ইত্যাদি পাবার যে সমান অধিকার আছে সেটাই এই Health Service-এর প্রধান কারণ। যাতে অর্থাভাবে কোনও মানুষের চিকিৎসায় ত্রুটি না হয়, যা অসুস্থতার কারণে অর্থকষ্ট না হয়, সেটাই বিশেষভাবে বিবেচ্য।

বর্তমান শতাব্দীতে এই সব দিক দিয়ে সুইডেন প্রচুর উন্নতি করেছে। পুরাকালে যে সেবা ও যত্ন কেবল অভাবগ্রস্তদের পাবার অধিকার ছিল, এখন সেই সেবা প্রতি নাগরিকের কল্যাণে বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাভাবের হাত থেকে মানুষকে রেহাই দেওয়াই এর প্রধান উদ্দেশ্য। ১৯৫৫ সাল থেকে এই রাষ্ট্রীয় Health insurance (স্বাস্থ্য বীমা)কে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই আইনটি প্রতি রাজনৈতিক দলের কাছে সমান স্বীকৃতি পায়, এবং তখন থেকে আজ সুষ্ঠুভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। জনসাধারণের সকলেই এই ক্ষেত্রে আর্থিক নিরাপত্তা পেয়েছে। ডাক্তারের পারিশ্রমিকের প্রায় অর্ধেক এখন সরকার দেয়, রোগীর হাসপাতালে যাতায়াত ও সেখানে থাকার খরচ, ওষুধের খানিকটা দাম ও হাসপাতালে চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয় সরকারই বহন করে। সাধারণ অসুস্থতায়, অর্থাৎ যখন কিছু দিনের জন্যে কাজে অনুপস্থিত থাকতে মানুষ বাধ্য হয়, তখন দৈনিক আয়ের ক্ষতিপূরণ হিসেবে অবিবাহিত ব্যক্তিরা আয়ের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ও বিবাহিতরা আরও কিছু বেশীই পেয়ে থাকে। সাধারণ কর ও কর্মস্থান থেকে কিছু ভাগ অর্থ এই উদ্দেশ্যে পাওয়া যায়। সন্তানসম্ভবা মায়েদের যত্ন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষাও হয় বিনা খরচে। তাদের হাসপাতালে থাকার খরচও সম্পূর্ণ সরকারই বহন করে থাকে। যে মেয়েরা চাকরি করে অথবা শ্রমিক, তারা শিশুর জন্মের পরে তিন মাস পর্যন্ত কাজে অনুপস্থিত থেকে Health insurance থেকে উপরোক্ত অর্থসাহায্য এবং সাধারণ অসুস্থতায় প্রাপ্য অর্থ গ্রহণ করে থাকে। কারখানা বা খনি ইত্যাদিতে যারা বিপজ্জনক কাজ করে থাকে, তাদের কাজের দরুন স্বাস্থ্যহানি হলে সে ক্ষতিপূরণও অবশ্য সরকার থেকেই করা হয়।

৬৭ বছর বয়স পর্যন্ত এখানে সকলেই নানা কাজে জীবন কাটিয়ে থাকে। অর্থাৎ ঐ বয়সের পর থেকে সকলে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে সাধারণ পেনসান

কিন্ডারগার্টেনের ছেলেমেয়েরা মডেল খেলনা তৈরি করায় ব্যস্ত

পেনসানপ্রাপ্ত মহিলারা অবসর সময়ে সেলাই বোনার কাজে কাটাচ্ছে

ভোগ করে। পেনসানের আগে যার যে কাজই থাক না কেন বা যে রকমই হোক না কেন সকলে এক বাঁধা রেটে পেনসান পেয়ে থাকে। প্রতিটি অবিবাহিত মানুষ বছরে প্রায় ৪০০০ ক্রাউন ও বিবাহিতরা ৬০০০ ক্রাউনের মত সাধারণ পেনসান পায়। যারা অবশ্য নিজেদের মাইনের থেকে প্রতি মাসে কিছু প্রিমিয়াম দিয়ে থাকে, সেই হেতু তাদের পেনসানের চেয়ে কিছু বেশীই পেয়ে থাকে। ৬৭ বছর বয়সের আগেই যারা কোনও কারণে কর্মক্ষমতা হারায়, তারা তাদের আয়ের অনুসারে পেনসান পায়। পেনসানপ্রাপ্ত বয়স্ক মানুষদের জন্যে নানা জায়গায় বিশেষ ব্যবস্থাসম্পন্ন বাড়িও তৈরি হয়েছে, যাতে তারা নির্ঝঞ্ঝাটে নিজেদের কাজ সামলাতে পারে। সাহায্য করার মত লোক এখানে বিরল। নেহাত দরকার হলে, কদিনের জন্যে এরা লোক পায়। সেও মাত্র সকালের কয়েক ঘণ্টা কাজ সামলিয়ে চলে যায়।

যারা কোনও কারণে চাকরি পেতে অক্ষম বা কিছু দিনের জন্যে চাকরি হারায়, তারাও তাদের ইনসিওরেন্সের মাধ্যমে জীবন যাপনের মত কিছুটা অর্থ পায়। সম্প্রতি এই রকম বেকারদের সংখ্যা সুইডেনে বেশ বেড়ে গেছে এবং প্রতি বছরই বেড়ে চলেছে। সারা ইউরোপেই এই অবস্থা এখন দেখা দিয়েছে এবং সুইডেনও এর হাত থেকে রক্ষা পায় নি। এ বছর নাকি বেকারদের হার যে রকম বেড়ে গেছে, সে রকম অবস্থা বহু দিনই এখানে দেখা যায় নি। তাই এই 'বেকার বীমা'র কল্যাণে অনেকেই দারিদ্র্যের সম্মুখীন হতে বাধ্য হয় নি।

শিশু কল্যাণের ওপর খুবেই বেশী জোর দেওয়া হয় এখানে। যাতে ছেলেমেয়ে মানুষ করতে অভিভাবকদের অর্থাভাব না দেখা দেয় বা অর্থাভাবে ছেলেমেয়েদের যত্ন না হয়, সেই দিকে নজর রেখেই প্রতিটি শিশু ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত সরকারের কাছ থেকে বছরে প্রায় ১০০০ ক্রাউন করে অর্থ দেয় পায়। অবশ্য এতে তাদের মানুষ হওয়ার সব খরচ মেটে না, তবে সাহায্য হয় বইকি। স্কুলে পড়াশোনা, খাওয়াদাওয়া, বই খাতাপত্র এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা সব সরকারের খরচেই হয়। ঘরে ছেলেমেয়ের সংখ্যা বেশী হলে, থাকার জন্যে যদি তাদের সাধ্যমত সুবিধাজনক বাড়ি বা ফ্ল্যাট পেতে অভিভাবকদের কষ্ট হয় তা হলে তাদের খানিকটা সস্তায় ভাল বাড়ি ভাড়ার ব্যবস্থাও হয়ে থাকে। অবশ্য শিশু কল্যাণে যতটা কাজ এগিয়েছে বা বহু দিন ধরে চলে আসছে, তার মূলে ছিল অন্য কারণ। ১৯৩০-৪০ সালে সুইডেনের জনসংখ্যার হার এমন কমে গিয়েছিল যে, তাতে সুইডেনের জীবনে একরকম সংকটকালই দেখা দিয়েছিল। তখন অনেকের মনেই এই ধরনের ভীতি স্থান পেয়েছিল যে, সুইডেনের জনসংখ্যা হয়ত কোন দিনও আর বাড়বে না। কাজেই সরকার থেকে যথাসাধ্য সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করা হয় পরিবার-গুলিকে, যাতে শিশুদের মানুষ করতে তাদের কোন রকম কষ্ট না হয় ও শিশুরাও যেন মা বাবার অর্থাভাবের দরুন তাদের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা ও প্রতিভা বর্ধন করতে অক্ষম না হয়। এই কারণে, আজ সুইডেনের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। শিশুদের মানুষ করাটা এখন আর কেবল মা-বাবারই কর্তব্য নয়, দেশের কর্তব্য বলেই গণ্য।

চাকরিরত মানুষ কর্মজীবনে সপ্তাহে কত ঘণ্টা কাজ করবে তাও এখন সীমাবদ্ধ হয়েছে। বহু জায়গায় ইতিমধ্যে সপ্তাহে মাত্র পাঁচ দিন কাজ করারই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে—অর্থাৎ শনিবার এবং রবিবার সাধারণত অধিকাংশ অফিস ও ব্যাংকই বন্ধ। গ্রীষ্মকালে এখন প্রায় সকলেই বেতন-সহ চার সপ্তাহ ছুটি ভোগ করে থাকে, যদিও এখনও কিছু কিছু জায়গায় একসংগে ২।৩ সপ্তাহের বেশী ছুটি পাওয়াটা নিয়ম হয়ে দাঁড়ায় নি। বাকি ছুটি শীতকালে দেওয়াই বহু মালিকের ইচ্ছা।

বলা বাহুল্য সুইডিশ নাগরিকদের এই সুখ সমৃদ্ধি ভোগ করার পিছনে রয়েছে তাদের নিজেদেরই অর্থ। আয়করের হার এখানে খুবই বেশী। একজনের বেতনের শতকরা প্রায় ২৫।৩০ ভাগ যায় সরকারী তহবিলে। কাজেই যে হয়ত মাসে ২০০০ ক্রাউনের মত উপায় করে, তার মধ্যে ১৪০০।১৫০০ ক্রাউনের বেশী কোন দিন হাতে পায় না। কাজেই সে টাকা সামাজিক কল্যাণের মাধ্যমে আদায় করার অধিকার সুইডিশদের আছে। এই সামাজিক কল্যাণনীতির পরিণাম স্বরূপ আজ সুইডেনে জীবনযাপনের হার সাধারণ ভাবে এবং গড়পড়তা অনুসারে বেশ উঁচু। ধনী বা দরিদ্র, কর্মরত, বেকার অথবা পেনসানপ্রাপ্ত শিশুবহুল পরিবারে বা একাকীদের সংসারে, অথবা শহর ও গ্রাম-বাসীদের মধ্যে প্রভেদ এতদূর কমিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সাধারণের পক্ষে কোন পার্থক্য চোখে পড়া একান্তই অসম্ভব।

মোটের ওপর প্রাণখুলে টাকা পয়সা খরচ করার পথে এদের কোনই বাধা নেই। সুইডেনের প্রতিটি দোকানে, প্রতি দিন এবং মাসের যে কোন দিন সমান ভিড় লেগে থাকে। তারা শুধু দোকানের জৌলুস সাজসজ্জাই দেখে বেড়ায় না, সর্বদাই কিছু না কিছু কেনে। পৃথিবীর সব দেশের জিনিসই সুইডেনে অনায়াসে পাওয়া যায়, বরং সুইডিশ জিনিসেরই দাম তার তুলনায় বেশী। খাদ্যদ্রব্য এখানে সবই বিদেশী। সেদিক থেকে আলু ছাড়া সুইডেনে আর কোনও জিনিসই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় না। চা, কফিও অন্যান্য দেশ থেকে আসে। সুতির কাপড়, সিল্ক, নাইলন, টেরিলিন বা গরম উলের জিনিস সবই বাইরে থেকে আমদানি হয়। কয়লা ও পেট্রোল, যে ২টি জিনিসের ওপর সুইডেনের সম্পূর্ণ অর্থনীতি প্রায় নির্ভর করে, তাও আসে বিদেশ থেকে। ব্যবসা-বাণিজ্য সুইডেনের সব দেশের সংগেই আছে। নানা জিনিস আমদানি করার অবাধ স্বাধীনতা থাকায় বিদেশী জিনিস সব খুবই সস্তায় পাওয়া যায়। সুইডেনে আমদানি শুল্ক অপেক্ষাকৃত-ভাবে অনেক দেশের চেয়ে খুব কম। এ জন্যে পৃথিবীর সব দেশ থেকে অনায়াসে আমদানি চলে। এখানে জাপান, জার্মানী, রাশিয়া, পোল্যান্ড, সুইটজারল্যান্ড, আমেরিকা, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিসগুলিই আসে। এদেশের জনসাধারণ জিনিসের মান ও গুণের ওপর খুব বেশী জোর দিয়ে থাকে, এবং কড়া নজরেই পরখ করে। কাজেই এখানে জিনিস বিক্রি করতে গেলে খুব ভাল জিনিস ছাড়া উপায় নেই।

কয়েক বছর যাবৎ ভারতীয় জিনিসপত্রও কিছু কিছু বাজারে দেখা যাচ্ছে। ঘর সাজানর জন্যে তৈরি পেতলের নানা রকম জিনিস, কাঠের তৈরি কাশ্মীর বাক্স, ট্রে ইত্যাদি বেশ বিক্রি হয়। এ ছাড়া কাশ্মীরি নামদাও দেখা যাচ্ছে এখানে, যেগুলি এখানের দামের তুলনায় প্রায় জলের দামেই বিক্রি হচ্ছে। ভারতীয় সিল্কও বহু দিন ধরেই খুব চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। তবে এসব জিনিস মাত্র কিছু দিন আগে, সুইডিশ বাজারে চালু হয়েছে, তাও বড় বড় শহরগুলিতে এবং বিশেষ করে স্টকহলমে। এখানকার মানুষ এমনিতে যতই উদার হোক, তাদের পছন্দমত জিনিসপত্র বাছার দিক থেকে বিশেষ রক্ষণশীল বলা যেতে পারে। যে সব জিনিস চিরকাল দেখে এসেছে বা ব্যবহার করে অভ্যস্ত, তা ছাড়া আর যে কোন জিনিস কিনতেই চার বার ভাবে। অবশ্য বিদেশী জিনিস চিরকালই দেখে এসেছে এবং অনেক বিদেশী জিনিস সারা পৃথিবীতেই সুপরিচিত, যেমন জাপানী ক্যামেরা, রেডিও বা সুইস্ ঘড়ী। সেগুলি অবশ্যই নির্ভাবনার কেনে। তবে ভারতীয় জিনিসের সঙ্গে এদের পরিচয় মাত্র কিছু দিনের। ভারতে যে কেনার মত কোন জিনিস তৈরি হয়, সেটাই অনেকের কাছে বিস্ময়কর। ভারতের বিষয়ে জ্ঞান এদের খুবই সীমাবদ্ধ। সেখানকার জনসংখ্যা, দারিদ্র্য, রাস্তায় ঘাটে স্বেচ্ছায় গরু বিচরণ করা এবং ম্যালেরিয়ার প্রকোপ—এই হল মোটামুটি ভারতের বিষয়ে এদের জ্ঞান। এর বেশী কেউ কিছু জানেও না এবং জানার ইচ্ছাও তারা বিশেষ রাখে কিনা সন্দেহ হয়। ভারতীয়রা ভারতের বিষয়ে সব সময়ই খানিকটা যে বাড়িয়ে বলে থাকে, সে বিষয়ে এদের কোন সন্দেহ নেই। কাজেই সে সব বিবরণ এদের কাছে বিশ্বাসযোগ্যও নয়। ইউরোপে আসার আগে যে কোন ভারতীয় কখনও পেট ভরে খেতে পেয়েছে কিনা, চালাঘর ছাড়া পাকা বাড়ি জীবনে দেখেছে কিনা, সেটাও অনেকের কাছে সাধারণত আলোচ্য বস্তু!!

কাজেই বলা যায় যে এখানে ভারতীয় জিনিসপত্র বাজারে চালু করা খুব সহজ কাজ নয়। দোকানে দেখতে পেলেও, সকলেই যে সে জিনিস কিনবে, তার কোনই স্থিরতা নেই। এদের একটু উৎসাহ দিলেই অবশ্য জিনিসগুলি অনায়াসে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অর্থাভাবে নয়, উৎসাহের অভাবে ভারতের মত সুদূর ও অচেনা দেশের জিনিস কিনতে এরা একটু দ্বিধা বোধ করে।

এই মনোভাব দূর করার জন্যেই সম্প্রতি স্টকহলমের একটি নামকরা 'ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে',—"এয়ার অফ ইণ্ডিয়া", বলে একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। উক্ত দোকানে 'এয়ার ইণ্ডিয়ার' উদ্যোগেই প্রদর্শনীটি সম্পন্ন হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, এই সুপরিচিত দোকানটির মাধ্যমে ভারতীয় দ্রব্য সব সুইডিশ ফ্যাশানের অনুযায়ী গড়ে, সুইডিশ বাজারে চালু করা। এই দোকানটি স্টকহলমের একটি প্রধান ফ্যাশান হাউস বলেই পরিচিত। কাজেই এরা যদি ফ্যাশানে কোন নতুন ধারা চালু করে, তাতে জনসাধারণ মুগ্ধ হতে বাধ্য। বেশভূষায় সেই অত্যাধুনিক ধারানুযায়ী সকলেই চলতে চায়, তার জন্যে যতই ব্যয় হোক না কেন।

২ সপ্তাহ ধরে এই প্রদর্শনী চলেছিল এবং ভারতীয় জিনিসে সারাটি দোকান ছেয়ে গিয়েছিল। সারা দোকানের দেয়ালে ভারতীয় আল্পনার সুস্পষ্ট ছাপ ছিল। রং বেরঙের সিল্কের কাপড়ে হয়েছিল দোকানটির সজ্জা। দোকানের চার তলা মিলিয়ে হয়েছিল প্রদর্শনীর আয়োজন। প্রতি ডিপার্টমেন্টেই কিছু না কিছু ভারতীয় জিনিস ছিল। ঘরসজ্জার জন্য পেতলের খোদাই করা ফুলদানি, ট্রে, আর মোমবাতীর আধার, চন্দন ও সাধারণ কাঠের নানা রকমের সাজসরঞ্জাম, বেতের তৈরি ছোটখাট সাজি থেকে শুরু করে মোড়া পর্যন্ত সবই ছিল। নানা রকমের সিল্কের ছড়াছড়ি ত ছিলই এবং এবার শুধু থান থেকে কেটেই বিক্রি হয় নি, মেয়েদের রেডিমেড ব্লাউজ, স্কার্ট, ফ্রক ও কোট সবই পাওয়া যাচ্ছিল। কাপড় কিনে করাতে গেলে এখানে অসম্ভব খরচ পড়ে, ঘরে করার মত সময়ও খুব কম লোকেরই থাকে। তাই এই তৈরি পোশাকগুলি খুবই বিক্রি হয়েছে, অবশ্য অত্যন্ত চড়া দামে। মহিলাদের একটি করে সিল্কের ব্লাউজের সর্বনিম্ন দামই প্রায় ৫০ ক্রাউনের মত ধার্য ছিল। এ ছাড়া মহিলাদের মনোহরণের বস্তু ছিল ব্রোকেডের স্টোল ও ব্রোকেডের বা সিল্কের ছোট ছোট হ্যাণ্ড ব্যাগগুলি। ভারতীয় ডিজাইনে তৈরি সব নকল গয়নাগুলিও সকলকে খুবই মুগ্ধ করেছিল।

শুধু মহিলারাই মনের আনন্দে ভারতীয় জিনিস কেনার সুযোগ পায় নি। পুরুষেরা পছন্দমত ইণ্ডিয়ান সিল্কের রেডিমেড স্যুট, ড্রেসিংগাউন বা টাই রুমাল সবই বেছে নিতে পেরেছে। শিশুদের জন্যে সুতির জিনিসই বেশী ছিল। সুতির জামার হাতে গলায় কাশ্মীরি কারুকার্য করা, ছোট ছোট পোশাকগুলি খুব সুন্দর হয়েছিল, অনেকগুলির গলায় ভারতীয় প্রথানুরূপে রুপোর বোতাম পর্যন্ত যোগান ছিল। এ ছাড়া ভারতীয় কাজুবাদাম ও চা সকলে মনের সুখে চাখতে পেরেছে প্রতি দিন, বিক্রিও হয়েছে অনেক। প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভারতের নানা জায়গার রঙগীন ফিল্ম দেখান হয়েছে। এবং একজন ভারতীয় নর্তকী দু' দিন ভারতীয় নৃত্যকলার প্রদর্শনও করেছেন। দোকানটি মৃদু সেতারের সুরে ও ধূপের গন্ধে সর্বদাই ভারতীয় আমেজে ভরপুর ছিল। বলতে গেলে সুইডিশ মনোরঞ্জনের কোন রকম ত্রুটিই হয় নি। বাজারে ভারতীয় দ্রব্যাদি চালু করায় দোকানটির প্রচেষ্টা বিফল হয় নি। রক্ষণশীল সুইডিশরা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার বৃহত্তম ও বিখ্যাত দোকানটির কাছে উৎসাহ পেয়ে নির্ভাবনায় অসংখ্য ক্রাউনই ঢেলেছে ভারতের ভাণ্ডারে। সুইডেনে বসন্তের আগমনের আগেই ভারতের বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে বহু স্টকহলমবাসীর মনে।

কৃষ্ণা দত্ত

আর্থিক ভারত

রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে স্টেট ট্রেডিং করপোরেশনের সফল প্রয়াস

বারো বছর আগে স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন গঠিত হয়েছিল। এই বারো বছরের হিসাব-নিকাশ করে দেখা যায়, করপোরেশন শুধু রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ১২৭ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। এই রপ্তানির দুই-তৃতীয়াংশ হয়েছে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে; তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী বাণিজ্য হয়েছে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সংগে। মোট রপ্তানির শতকরা ৪০ থেকে ৪৫ ভাগই হয়েছে রাশিয়ায়। করপোরেশন নানা ধরনের ভারতীয় জিনিসপত্র, বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং ও ছোটখাট শিল্পজাত জিনিস, রপ্তানি করে বিশ্বের বাজারে সেগুলিকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। ১৯৬৭-৬৮ সালে করপোরেশনের মোট ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ হয়েছে ১৬০ কোটি টাকা। এর আগেকার বছরের তুলনায় বাণিজ্যের পরিমাণ বেড়েছে ৫৮·৫ কোটি টাকা। ১৯৬৭-৬৮ সালে মোট রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। করপোরেশন চলতি বছরে রপ্তানির পরিমাণ ৫৫ কোটি টাকা পর্যন্ত বাড়াবার চেষ্টা করছে। আশা করা যায়, মোট বাণিজ্যের পরিমাণও চলতি বছরে বাড়বে। ১৯৬৭-৬৮ সালে করপোরেশন ১০৮ প্রকার সামগ্রী মোট ৪১টি দেশে রপ্তানি করেছে। ওয়াগন সরবরাহ এবং মেসিন টুল রপ্তানির ক্ষেত্রে করপোরেশন বেশী সাফল্য দেখিয়েছে। মাত্র কয়েক দিন আগে প্রায় ২ কোটি টাকা মূল্যের ৫ হাজার ওয়াগন সরবরাহের জন্য পোল্যাণ্ডের সংগে স্টেট ট্রেডিং করপোরেশনের একটি চুক্তি হয়েছে। তা ছাড়া চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, পূর্ব জার্মানী এবং বুলগেরিয়ায় আরও বেশী করে মেসিনটুল সরবরাহ করার জন্য করপোরেশনের প্রয়াস সফল হয়েছে।

রপ্তানির বৃদ্ধি ও পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের চিন্তাধারা

গত বছরের অনুপাতে এ বছর ভারতের রপ্তানি-আয় শতকরা তিন ভাগ বেড়েছে। এই বাড়তি রপ্তানি-আয়ের জন্য আমাদের বাণিজ্য ব্যালান্সে ঘাটতির পরিমাণও কিছু কমেছে। ১৯৬৬ সালে মুদ্রামূল্য হ্রাস করার পর প্রথম নয় মাস আমাদের রপ্তানি-আয় প্রায় শতকরা ১১ ভাগ কমে গিয়েছিল। কিন্তু গত আর্থিক বছরে যে রপ্তানি-আয় শতকরা তিন ভাগ বেড়েছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে কৃষির ভাল ফলন। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রণেতাগণ হঠাৎ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র থেকে পরিকল্পনার প্রেরণা পাবার তাগিদ অনুভব করেছেন। নিজের দেশের আর্থিক সমস্যাবলীর সমাধানের সূত্র খুঁজে যাঁরা বের করতে পারেন না, পরিকল্পনার স্ট্র্যাটেজি ঠিক করার জন্য যাঁদের বিদেশে ছুটতে হয়, তাঁরা যে কতটা দেশের আর্থিক অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছেন জানি না। তবে এ কথা পরিষ্কার যে, আমরা যতদিন পর্যন্ত কৃষি-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত না করতে পারছি ততদিন পর্যন্ত বৈদেশিক বাণিজ্যের স্থায়ী উন্নতি আশা করতে পারছি না। অধ্যাপক গ্যাডগিল চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার রপ্তানি-আয়ের লক্ষ্য বাৎসরিক শতকরা সাত ভাগ ধার্য করতে চেয়েছেন। যদি শতকরা সাত ভাগ রপ্তানি-আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব না-ও হয়, তবুও অন্তত শতকরা পাঁচ ভাগ রপ্তানি-আয় বাড়াতে পারলেই আমাদের অনেক সমস্যার সুরাহা হবে। প্রথমত, বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে আমাদের আয় যত বাড়বে, তত বৈদেশিক মূলধনের উপরেও আমাদের নির্ভরতা কমবে। দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ উন্নতির পথে নিয়ে যাবার এটাই প্রথম পদক্ষেপ। দ্বিতীয়ত, অধিকতর বিদেশী মুদ্রার সাহায্যে আমরা এমন জিনিস আমদানি করতে পারব যেগুলি আমাদের আমদানির বিকল্প জিনিস উৎপাদনের পক্ষে সহায়ক। তৃতীয়ত, যে বৈদেশিক দেনার দায়ে ভারত ডুবে আছে তার জন্য বাৎসরিক সুদ প্রদান করা এবং ক্রমে ক্রমে সেই দেনা শোধ করার জন্যও রপ্তানি-বাণিজ্য সম্প্রসারণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো দরকার। চতুর্থত, বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে আয় বাড়াতে পারলে দেশের উন্নয়ন-প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করা সম্ভব হবে।

রপ্তানি-আয় বাড়িয়ে উপর্যুক্ত সুবিধাগুলি পাওয়া তখনই সম্ভব হবে যখন রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীগুলির সরবরাহ বাড়বে। এজন্য চতুর্থ পরিকল্পনাটিকে কৃষি-ভিত্তিক করা দরকার। আশা করি, বিলম্বে হলেও পরিকল্পনা কমিশন তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যপরিস্থিতির সর্বশেষ অবস্থা

পশ্চিমবঙ্গের জন্য যে পার্লামেণ্টারী পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হয়েছে তার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গত বছরের চেয়েও এ বছর পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য-ঘাটতির পরিমাণ বেশী। গত বছর ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২·৩২ মিলিয়ন টন; এ বছর ঘাটতি হয়েছে ২·৩৬ মিলিয়ন টন। গত ২১ মে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে চাল সংগ্রহ হয়েছে মাত্র ২ লক্ষ ৫৭ হাজার টন। অথচ যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের আমলে খাদ্য সংগ্রহের লক্ষ্য ছিল ১০ লক্ষ টন, এবং পি ডি এফ-কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকারের আমলে খাদ্য সংগ্রহের লক্ষ্য ছিল ৭ লক্ষ টন। রাজ্য সরকার রাজ্যের ঘাটতি মেটাবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ১·৬৫ মিলিয়ন টন খাদ্য-সামগ্রী চেয়েছিলেন; কেন্দ্রীয় সরকার ১·৪৯ মিলিয়ন টন দিতে রাজী হয়েছেন, এবং তার মধ্যে মে মাস পর্যন্ত ৬ লক্ষ টন পাওয়া গেছে। অথচ শোনা যাচ্ছে, পাঞ্জাবে খাদ্যশস্যের এত বেশী ফলন হয়েছে যে, সেখানে চাহিদা থেকেও যোগানের পরিমাণ বেশী। পাঞ্জাবের বাড়তি গম পশ্চিমবঙ্গে সরবরাহ করলে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়। পশ্চিমবঙ্গের জন্য গঠিত পার্লামেণ্টারী পরামর্শদাতা কমিটি এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-ঘাটতি মেটাবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

সুব্রত গুপ্ত

লক্ষ্মীর কৃপালাভঃ

বাঙালীর সাধনা

রাবার ও টায়ার শিল্পে বাঙালীর অবদান

হৈমবতীর বাগ্র আহ্বানে কিশোরী সখীর দল ছুটে এসে ছাদের আলসের ওপর ঝুঁকে পড়লো। পথ দিয়ে অতি সুন্দরকান্তি এক যুবাপুরুষ চারিদিক নিরীক্ষণ করতে করতে ধীর পদে হেঁটে চলেছেন। গৌরবর্ণ উন্নতনাসা মুখমণ্ডলে অনুসন্ধিৎসা। মনে হয় বিদেশী অভ্যাগত। প্রাংশু সুঠাম দেহ: সম্মুখের পেশী পদক্ষেপের তালে তালে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হচ্ছে। স্কন্ধে আলম্বিত উত্তরীয়ের আড়ালে উপবীত দেখা যাচ্ছে।

হৈমবতী ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপরেই বিম্বাধরে কৌতুকের হাসি ফুটিয়ে সখীদের বললেন, "বাবা তো দেশময় পাত্র খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন; এদিকে যে 'আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমার আঙিনা দিয়া'!"

সখীরা এ-ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ে খিল-খিল করে হেসে উঠলো। (অবশ্য যুবক বহু পূর্বেই দৃষ্টির বাইরে চলে গেছেন।) মনোরমা হাততালি দিয়ে বলে উঠলো, "চল্ দামিনি, রাণীমাকে খবর দিই গিয়ে—হৈম আমাদের স্বয়ংবরা হতে চায়।"

দামিনী বললো রাণীমাকে, আর রাণীমা বললেন কর্তামশায়কে। খবর আনলেন পূজারি ঠাকুর, যুবকের নাম মাণিকলাল মুখোপাধ্যায়, দেশ বর্ধমান, পালটি ঘর, জীবিকান্বেষণে বেরিয়েছেন। সবই ভালো, কিন্তু তিনি বিবাহিত এবং এক স্ত্রী বর্তমান।

তবুও বাকুলিয়ার জমিদার বাড়িতে মাণিকলালের ডাক পড়লো। সৎপাত্রের সন্ধান করতে করতে রূপসী কন্যা হৈমর আজ চৌদ্দ বছর বয়স হলো। কুলীন কুল হলেও আর তো অপেক্ষা করা যায় না। তাছাড়া দুলালীর নিজের মনে যখন ধরেছে—প্রস্তাব শুনে মাণিকলাল অসম্মতি জানালেন। তিনি বহু বিবাহের বিরোধী। দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার মহাশয় এবারে মাণিকলালের হাত দুটি ধরে মিনতি করলেন। বললেন, মাণিকলাল সম্মত হলে বিষয় আশয়ও দেবেন। মাণিকলাল আসন থেকে উঠে বললেন, "বেশ তাই হোক, কিন্তু এক শর্তে—বছরের ছ'মাস আমি এখানে থাকবো আর বাকি ছ'মাস থাকবো বর্ধমানে নিজ গ্রামে, প্রথমা পত্নীর কাছে।"

শঙ্খ বেজে উঠলো, পুরনারীরা হুলু-ধ্বনি দিলেন। হুগলি জেলার বাকুলিয়া গ্রামের প্রখ্যাত মুখোপাধ্যায় বংশের উৎপত্তি হলো।

মূল কাহিনীটি সত্য ঘটনার সংক্ষেপ; তবে অঙ্গকে সম্পূর্ণতা আনার জন্য আমার দ্বারা কিঞ্চিত অতিরঞ্জিত। মনোরমা ও দামিনীর সংলাপ আমার কল্পনাপ্রসূত। হৈমবতীর উক্তিটিও।

অতি বৃদ্ধ পিতামহ-পিতামহীর এই দুষ্মন্ত-শকুন্তলা পর্বটি সরসভাবে বললেন, বাকুলিয়ার মুখোপাধ্যায় বংশা-বতংস এবং বাঙালীর আদি প্রতিষ্ঠান জি-ডি-ব্যানার্জি অ্যাণ্ড কোং লিমিটেড-এর বর্তমান কর্তা শ্রীমোহনকুমার মুখোপাধ্যায় এবং তস্য পিতৃব্যপুত্র প্রিয়ভাষী শ্রীনীরদ-গোপাল। নীরদবাবু হলেন বাঙালীর আর এক গর্বের বস্তু ন্যাশনাল রাবার ম্যানুফ্যাকচারার্স লিমিটেডের অন্যতম ডিরেক্টর।

হৈমবতী ও মাণিকলালের মিলনের বেশ কয়েক দশক (এমন কি, শতক-ও হতে পারে) কেটে যাবার পর ১৮২১ খৃষ্টাব্দে মুখার্জি পরিবারে এক কৃতীপুরুষের জন্ম হলো। তাঁর নাম বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়। সেকালের প্রথা অনুসারে মাত্র পনেরো বছর বয়সে বিশ্বেশ্বর শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক কলকাতার এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর কন্যাকে বিবাহ করেন। ধনী শ্বশুরের বাসনা ছিল যে, জামাতা তাঁর ব্যবসাতেই যোগ দেন, কিন্তু বাকুলিয়ার জমিদার বংশের ছেলের পক্ষে তা হতো আত্মসম্মানের হানি। বিশেষ কোনো কারণে বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়াতে তেজস্বী বিশ্বেশ্বর বাকুলিয়ার জমিদারী পরি-চালনাতেও অংশ নিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি চাকরি নিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফোর্ট উইলিয়মে।

ওদিকে গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় নামে শিবচন্দ্রের এক দূর সম্পর্কীয় ভাগনে মামার সেরেস্তায় নাকি হিসাবরক্ষকের কাজ করতেন। মামার মৃত্যুর পর মামাতো ভাইয়েরা তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করাতে গঙ্গাধর কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন। বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। গঙ্গাধর তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে নতুন একটা ব্যবসা আরম্ভ করার প্রস্তাব করলেন, কারণ একক ব্যবসা করার মূলধন গঙ্গাধরের ছিল না। প্রস্তাবটি কার্যে পরিণত হয়ে নতুন ফার্মটির নাম হলো 'গঙ্গাধর ব্যানার্জি অ্যাণ্ড কোম্পানী'। মূলধন যদিও বিশ্বেশ্বরেরই ছিল, কিন্তু কয়েকটি কারণে তাঁর নামটা প্রচ্ছন্ন রইলো। প্রথম কারণ হলো বিশ্বেশ্বরের আত্মপ্রচারে আপত্তি; দ্বিতীয়, সেকালের ব্রাহ্মণ জমিদার-নন্দনের ব্যবসাতে লিপ্ত হওয়াটাকে সমাজে হেয় বৃত্তি বলে ধরা হতো; তৃতীয়ত, বিশ্বেশ্বর ঠিক সেই সময়টিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরিতে বহাল ছিলেন।

মোহনকুমার ও নীরদগোপাল আমাকে এইসব তথ্যও যোগালেন।

এরপরেই শুরু হলো জি-ডি-ব্যানার্জি কোম্পানীর বিরাট সমৃদ্ধি। ইতিহাসের পাতায় এই প্রতিষ্ঠানের নামের স্বাক্ষর অঙ্কিত হলো।

"It was part of a contract for petty stores to be supplied to the arsenal at Fort William for two years from the 15th August, 1856 entered into by Gungadhar Banerjee & Co." . . . (Kaye—in his

History of Sepoy War, Vol. C, page 519, Footnote).

এইসব মিলিটারি সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করে অল্পকালের মধ্যেই গঙ্গাধর ও বিশ্বেশ্বর অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হলেন। বিশ্বেশ্বর কলকাতা শহর ও তার আশে-পাশে বিপুল ভূসম্পত্তিও করে ফেললেন। আর প্রকাণ্ড বসত বাড়িটি করলেন কেল্লার অদূরে খিদিরপুরে। নিজের জন্মস্থানের নামে তিনি এই বাড়ির নাম রাখলেন 'বাকুলিয়া হাউস'। যে রাস্তাটিতে এই বাড়িটি আছে তার এখন নাম বিশুবাবু লেন—বিশ্বেশ্বরের স্মারক।

এ যুগের আত্মকেন্দ্রিকতার ব্যতিক্রম করে বিশ্বেশ্বরের দুই জীবিত পৌত্র ধন-গোপাল ও প্রাণগোপাল এবং প্রপৌত্রবর্গ, অর্থাৎ ন্যাশনাল রাবার, ইনচেক টায়ার ও আর জি ডি ব্যানার্জি কোম্পানীর বর্তমান কর্মকর্তা কেদারনাথ, মোহনকুমার, নীরদ-গোপাল, মিলনকুমার ও বীরেশ্বর প্রমুখ ভ্রাতারা বাকুলিয়া হাউসে আজকের দিনেও একান্নবর্তী জীবন যাপন করছেন।

বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী বিশ্বেশ্বর গৃহদেবতা নারায়ণ শিলার সঙ্গে বাণেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠাও করে গিয়েছিলেন। সে যুগের ধর্মপ্রবণ ধনী ব্যক্তিদের মতো বিশ্বেশ্বরও নিয়মিত অন্নকূট, এমন কি অন্নমেরু অনুষ্ঠানও করতেন। একালে আমরা আর সেইসব মহোৎসব দেখতেই পাই না। আমাদের অন্নের যা অবস্থা তাতে অন্নমেরু তো দূরের কথা অন্নচিন্তা করার কথাও আমরা ভাবতে পারি না। ধর্মাচরণের মাধ্যমে সেইসব অনুষ্ঠান সামাজিক সংহতি বিধানেও অপূর্ব সহায়তা করতো। তার মধ্যে কেবল একটি বড়ো দোষ ছিল—জাতি বিচার।

মাত্র ৪৯ বছর বয়সে পুরুষসিংহ বিশ্বেশ্বর দেহত্যাগ করলেন। শেষের কটা দিন কাশীবাস করবার পর সেই মহাতীর্থেই তিনি দেহ রাখলেন। সেটা ছিল বোধ হয় ১৮৭০ সাল।

একটা কথা বলা হয়নি—মোহনবাবু বলেছিলেন যে, বিশ্বেশ্বরের মৃত্যুর কিছুকাল আগে গঙ্গাধর স্ব-ইচ্ছায় জি-ডি ব্যানার্জিতে তাঁর অংশ বিশ্বেশ্বরকে বিক্রি করে দিয়ে গিয়েছিলেন।

এখন ব্যবসার সম্পূর্ণ স্বত্ব ও ভার এসে পড়লো বিশ্বেশ্বরের বড়ো ছেলে রায় বাহাদুর অখিলচন্দ্রের ওপর। অখিলচন্দ্রের দুই বিবাহ। দ্বিতীয়ার নাম ছিল অন্নপূর্ণা দেবী। অখিলচন্দ্রও (১৮৫০-৯১) যখন তাঁর বাবার মতো মাত্র ৪১ বছর বয়সে মারা গেলেন তখন এক পুত্রের বিমাতা ও সাত পুত্রের জননী অন্নপূর্ণার নিজের বড়ো ছেলেটির বয়স ১৭।১৮ আর ছোটোটির বয়স মাত্র ১৪।১৫ দিন।

এই অন্নপূর্ণা দেবী, যাঁর রাশ নাম ছিল দুর্গা—তিনি কুইন ভিক্টোরিয়া না হয়েও একটি মাতৃশাসিত 'ডায়নাস্টি'-র উৎস--স্বরূপা হলেন। অকাল বৈধব্য ও এতগুলি অপোগণ্ডের ভারে এই সাহসিকা ভেঙে তো পড়লেনই না, চোখের জল মুছে আরও যেন শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। ঈশ্বরপ্রেমের সঙ্গে তাঁর মনের বলের প্রাচুর্য ছিল। পাখি যেমন ভয়ের কারণ ঘটলে তার শাবকদের নিজের ডানার আশ্রয়ে টেনে নেয়, অন্নপূর্ণাও তেমনি নাবালক ছেলেদের কলকাতা শহরের ধনিকসুলভ পাপ ও প্রলোভন থেকে আড়াল করে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে রাখলেন। তা না হলে পরিবারের কারও কারও ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল তাই হতে পারতো; বিপুল বৈভবের জোয়ারে এরাও ভেসে যেতে পারতো। আর তাহলে আজ হয়তো বাঙালীর গৌরবের একটি অধ্যায় অকথিত থেকে যেত।

মাণিকলাল থেকে অখিলচন্দ্র পর্যন্ত মুখোপাধ্যায় পরিবারের সকল গৃহকর্তারই অবদান নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আমার মতে এই মহীয়সী নারীর মহিমা ব্যতীত বাকুলিয়ার মুখার্জিদের ঐতিহ্য বজায় রাখা বোধ হয় সম্ভব হতো না। ভরা-সংসার সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে ১৯৩৭ সালে আটাত্তর বছর বয়সে অন্নপূর্ণা মহা-প্রয়াণ করলেন।

রায় বাহাদুর অখিলচন্দ্রের সাত ছেলের মধ্যে সকলের কথা আমি এই প্রবন্ধে লিখছি না। তাঁদের মধ্যে যাঁরা NRM অর্থাৎ ন্যাশনাল রাবার ম্যানুফ্যাকচারার্স লিমিটেড-এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন বা আছেন আমি কেবল তাঁদেরই উল্লেখ করছি।

তাঁরা হলেন কেদারনাথের বাবা ক্ষীরোদ-গোপাল, মোহনকুমার ও মিলনকুমারের বাবা রায় বাহাদুর বিনোদগোপাল, নীরদগোপালের বাবা রামগোপাল, ও বীরেশ্বরের বাবা ধনগোপাল। শ্রীধন-গোপাল ও কনিষ্ঠ শ্রীপ্রাণগোপাল ছাড়া অখিলচন্দ্রের আর সব ছেলেরাই এখন গত হয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে কেদারনাথও অল্পবয়সেই জি-ডি-ব্যানার্জি প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তারপরে যোগ দিলেন বর্তমান কর্তা মোহনকুমার ও নীরদগোপাল। সর্বশেষে এলেন মিলনকুমার ও ডাক্তার বীরেশ্বর মুখার্জি। মিলনকুমার কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম এসসি এবং বীরেশ্বর ডক্টরেট পেয়েছেন প্রাণিবিদ্যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শ্রীমোহন মুখার্জি মশায় কয়েক বছর আগে কলকাতার শেরিফ ছিলেন এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে ভারত চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি ছিলেন। বাঙালীর অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান 'বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ'-এরও ইনি এখন চেয়ারম্যান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কলকাতায় এ আর পি (এয়ার রেইড প্রিকশান) বিভাগের আবশ্যকীয় সরঞ্জাম, মানে বোমা-বর্ষণ হলে আগুন নেভাবার জলের জন্য রাবারের হোজ পাইপ, স্টীল হেলমেট-এর ভেতরে লাগানোর জন্যে রাবারের টুকিটাকি ইত্যাদি নির্মানের এক বাঙালী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। তার নাম ছিল এ-কে-সরকার রাবার ওয়ার্কস। স্বর্গীয় এ-কে-সরকার এবং তাঁর জামাতা শ্রীশচীন্দ্র-নাথ ঘোষ এর কর্তা ছিলেন। এঁদের আরও কয়েকটি শিল্পোদ্যোগ ছিল। এইসব তথ্য আমাকে যোগালেন ডাঃ বীরেশ্বর মুখার্জি। তাঁর মুখেই শুনলাম যে, ১৯৪৬ সালে এ-কে-সরকার মশায় চিৎড়িহাটায় অবস্থিত তাঁর রাবারের কারখানাটি বিক্রি করা ঠিক করলেন। খবরটি বাকুলিয়া ভবনে পৌঁছতে কেদার-নাথের উৎসাহে তাঁর পিতৃস্থানীয়রা সেটি কিনে নেওয়া স্থির করলেন। কেদারনাথের বেশি উৎসাহ ছিল শিল্পে; নিছক বাণিজ্য ব্যাপারে তাঁর ততোটা স্পৃহা ছিল না বোধ হয়। তাই রাবার ওয়ার্কসটি পরিচালনার ভার তাঁর ওপরেই ন্যস্ত হলো।

রাবারের পণ্য উৎপাদন কাজটি কিন্তু অসাধারণ; যাকে বলে 'হাইলি টেকনি-ক্যাল'। সেই কাজে সুনিপুণ ও বিশেষজ্ঞ এক ব্যক্তি এ-কে-সরকারের আমল থেকেই ওই কারখানাতে কাজ করতেন। তাঁর নাম ডাক্তার দাশরথি ব্যানার্জি। রাবার সায়ান্সে বিলিতী ডক্টরেট-প্রাপ্ত এই তরুণটির সহায়তা পাবেন বলেই কেদার-নাথের এমন একটি কঠিন শিল্পোদ্যোগের ভার নেবার সাহস বেড়ে গেল।

আধুনিক ভারতীয় রাবারশিল্প বিশারদ-দের চূড়ামণি এই ডাক্তার ব্যানার্জি শুধু যে NRM-এর 'টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার' তাই নয়, এখন তিনি এর ডিরেক্টর বোর্ডেও আছেন। ছাত্রাবস্থায় নাকি ডাঃ ব্যানার্জির অর্থসাচ্ছল্য ছিল না—ছিল জ্ঞানের পিপাসা। কৃতিত্বের সঙ্গে কলকাতার এম এসসি ডিগ্রি পাবার পর বৃত্তি পেয়ে উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেত গেলেন। মেধা ও অধ্যবসায় দিয়ে রাবার সায়ান্সে তিনি লণ্ডনের ডক্টরেট পেলেন; তারপর একে একে F. R. I. C., F. I. R. I. প্রভৃতি উপাধি পেলেন। ১৯৬৫ সালে ডাঃ ব্যানার্জি রাবার বিশেষজ্ঞের উচ্চতম সম্মান ইংল্যাণ্ডের 'ইনস্টিটিউশন অব রাবার ইণ্ডাস্ট্রি'র 'হ্যানকক্' পদকেও বিভূষিত হয়ে এলেন। গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়ে ভারতীয় মানকসংস্থা গত বছরে এঁকে 'ফেলো' হিসেবে নির্বাচন করেছেন। তা

ছাড়াও ইনি সরকারী দুর্গাপুর কেমিক্যালস ও বেসরকারী ইন্ডিয়ান আলকালিজ লিমিটেডের ডিরেক্টর।

কেদারনাথ ও দাশরথি ব্যানার্জির মতো উদযোগী যুবকদের প্রচেষ্টার ফলে চিংড়িহাটার সেই ছোট্ট প্রতিষ্ঠানটি আজ এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ১৯৪৬ থেকে ৫৬ পর্যন্ত দশ বছরে উৎপাদনের প্রচুর বৃদ্ধি হওয়ার পরে পরের বছর ১৯৫৭তে ন্যাশনাল রাবারকে পাবলিক লিমিটেড করা হলো। উন্নয়ন, সম্প্রসারণের জন্য মূলধন সংগ্রহ। বর্তমানে ৫২ লক্ষ টাকার শেয়ার ছাড়া হবে বলে প্রচারিত হতেই কয়েক জনসাধারণ দরখাস্ত করে বসলো ২ কোটি টাকার। এক 'ইন্ডিয়ান আয়রনের' শেয়ার ছাড়া আর কারও বেলাতেই সাধারণের এত আগ্রহ দেখা যায় না। এ হলো মুখার্জি পরিবার ও ডাঃ ব্যানার্জির নেতৃত্বে এই প্রতিষ্ঠানের ছোটবড়ো সকল কর্মীর কৃতিত্ব।

এইসব কৃতী ডিরেক্টর, ম্যানেজার ও কর্মীদের মধ্যে কয়েকজনের কথা এবারে বলছি।

ডিরেক্টরদের মধ্যে মহীনবাবু ও মিলন-বাবু এখন আছেন হেড অফিস 'লেসলি হাউস'-এ বড়দাদা কেদারবাবু ও দাশরথি-বাবুর সঙ্গে আর ৬০বি চৌরঙ্গী রোডের সেলস অফিসের ভার নিয়ে আছেন এঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ ডাঃ ধীরেশ্বর মুখার্জি, সেলস ডিরেক্টর।

আর এইসব স্বত্বাধিকারীদের পাশে অন্যান্য যেসব বলিষ্ঠ অবলম্বন আছেন তাঁরা হচ্ছেন এ-কে-সরকার কোম্পানীর আমলের শ্রীঅমূল্য দত্ত এবং পরবর্তীকালের ডাক্তার মাখনলাল ভৌমিক (রাবার সায়ান্সে ডক্টরেট) এবং ডাক্তার অমিয় গুপ্ত (অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রিতে ডক্টরেট)। এঁরা হলেন যথাক্রমে NRM-এর প্ল্যান্ট ম্যানেজার, প্রোডাকশন ম্যানেজার ও টেকনিক্যাল ম্যানেজার পদাধিষ্ঠিত। অমূল্যবাবু আবার ইনচেক টায়ার্সেরও প্ল্যান্ট ম্যানেজার।

রাবার শিল্পের প্রতিটি পর্যায়ে রসায়নের প্রয়োগ। এই বিষয়টিতে আমি আবার এত বেরসিক যে, তাই নিয়ে আলোচনা পরিহার করে, আমার পক্ষে যেটি সহজ কাজ সেইটি করি। অর্থাৎ রাবারের ইতিহাসটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করি।

আমার প্রবন্ধমালার প্রায় সব বিষয়বস্তুরই তথ্য ও ইতিহাস সংগ্রহের ব্যাপারে আমি সাধারণত জাতীয় গ্রন্থাগারের উপ-গ্রন্থাগারিক শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর অধস্তন কর্মীদের শরণ নিয়ে থাকি; কিন্তু NRM এবং ইনচেক-এর সুযোগ্য প্রচার সচিব শ্রীদিলীপ চৌধুরী তাবৎ তথ্য সরবরাহ করে এ যাত্রা আমার ও চিত্তবাবুর পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিলেন।

পঞ্চদশ শতকের প্রায় শেষে কলাম্বাস জলপথে ভারতবর্ষ আবিষ্কার করতে বেরিয়ে তাঁর তিনটি জাহাজ নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছলেন। হেইটি দ্বীপে দেখলেন যে, সেখানকার 'রেড-ইন্ডিয়ান' ছেলেরা সব গোলাকার কী একটা খেলনা নিয়ে ছোড়াছুঁড়ি করছে। সেই খেলনাটা মাটিতে পড়ে নিজের থেকেই লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। খবর নিয়ে জানলেন যে, ওদেশের ভাষায় কাঁদনে গাছ, মানে weeping tree থেকে উৎপন্ন আঠা জমিয়েই নাকি বস্তুটি তৈরী হয়েছে। দ্বীপের আদিম অধিবাসীরা নাকি এই আঠা তরল অবস্থায় ওষুধে মিশিয়েও খায়।

কলাম্বাস এবং তাঁর উত্তর সাধক অভিযাত্রীরা আরও জানলেন যে, রেড ইন্ডিয়ানরা এই আঠাকে বলে Cahuchu, দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর লোক বলে Jebi, আর ব্রেজিলের বাসিন্দারা বলে Borracha। ১৬১৫ সালে বিজিত দেশ থেকে আমদানি করে স্পেনের লোকরা ক্যানভাসের অঙ্গাবরণে এই আঠালো জিনিসটির আস্তরণ দিয়ে সেকালের ওয়াটারপ্রুফ তৈরি করলেন। আর এক ফরাসী পর্যটক আট বছর ধরে দক্ষিণ আমেরিকায় অ্যামাজন অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়ে ১৭৪৪-এ দেশে ফেরার সময়ে এই স্থিতি-স্থাপক বস্তুটির নমুনা নিয়ে ফিরলেন। স্পেনীয়দের আবিষ্কারের প্রায় ২০০ বছর পরে রাবারের দিকে নানা দেশের লোকের দৃষ্টি পড়েছিল।

'রাবার' নামটি নাকি রেখেছিলেন ইংল্যান্ডের এক রসায়নশাস্ত্রী ডাঃ জোসেফ প্রিস্টলি (১৭৩৩—১৮০৪)। সালটা বোধ হয় ছিল ১৭৭৪। একমাত্র পেন্সিলের লেখা মোছবার অর্থাৎ rub করে উঠিয়ে ফেলবার কাজেই এর ব্যবহার হতো বলে নেহাত খেয়ালের বশেই ডাঃ প্রিস্টলি এর নাম রেখেছিলেন রাবার। আর এর 'ইন্ডিয়া রাবার' আখ্যা এই জন্যে হলো যে, এর আবিষ্কারের সময়ে ইয়োরোপীয়রা ওয়েস্ট ইন্ডিজ-কে ভারতবর্ষের উপকূলে অবস্থিত দ্বীপ বলে ধরে নিয়েছিল। রাবারের ব্যবহারের বিবর্তনের কোনো এক সময়ে তরল দুধের মতো সাদা, রাবারের আখ্যা হলো Latex।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে স্যামুয়েল পেল নামে এক ইংরেজ সর্বপ্রথম রাবার বস্তুটিকে শিল্পোৎপাদনের কাজে লাগালেন। তিনি রাবারের সঙ্গে তার্পিন তেল মিশিয়ে মোটা কাপড়ের ওপর লেপে ত্রিপলের মতো এক জিনিস তৈরি করলেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেন যে, কাঁচা জমানো রাবারকে

যদি কোনো যন্ত্র দিয়ে 'চিবিয়ে' অর্থাৎ মাড়াই করিয়ে নেওয়া যায় তাহলেই এর থেকে অনেক কাজের জিনিস তৈরী হতে পারে। এইভাবেই বোধ হয় রাবার তৈরির গোড়ার পর্ব 'masticator' মেশিনের উদ্ভব হয়। কিন্তু দেখা গেল যে, রাবার আচ্ছাদিত বারিনিরোধক বস্ত্রখণ্ড থেকে দুর্গন্ধ বেরিয়ে বমি আসে। আরও দেখা গেল যে, এই ওয়াটারপ্রুফ কাপড় খুবে চটচটে হয়। কিন্তু ১৮২৩ সালে স্কটল্যাণ্ডের চার্লস ম্যাকিনটশ ন্যাপথেলিন মিশিয়ে এই সমস্যার সমাধান করে সর্বপ্রথম গায়ে দেবার ওয়াটারপ্রুফ কোট-এর সৃষ্টি করলেন। সেই জন্যে ইংল্যাণ্ডে রাবারের তৈরী বর্ষাতির চলতি নাম হয়ে গিয়েছিল ম্যাকিনটশ। এখনও সে দেশে বর্ষাতিকে লোকে 'রেইনকোট' বা 'ম্যাকিনটশ' বলে থাকে।"

ভারতবর্ষে রাবারের চাষের প্রবর্তন হলো ১৯০২ সালে। অতীতের ত্রিবাংকুর অর্থাৎ বর্তমান কেরল রাজ্যের 'পেরিয়ার' রাবার বাগিচাতেই ভারতীয় রাবার-চাষের শুরু। সেই বছরেই মালাবারের 'পুনুর' বাগিচাতেও গুটিকয়েক রাবার গাছের চারা রোপণ করা হয়েছিল। ১৯৬৫ সালে

কেরল, মাদ্রাজ ও মহীশূরের রাবার বাগিচাগুলির মোট আয়তন ছিল আন্দাজ ৪ লক্ষ একর এবং উৎপন্ন রাবারের ওজন ছিল প্রায় ৫০০০০ টন। সেই বছরে আমরা প্রায় ১৮০০০ টন গাছের-রাবার ও ৩৩০০ টন 'সিনথেটিক' রাবার আমদানি করেছিলাম ঘাটতি পূরণের জন্য। আর ১৯৬৭ সালে ইমপোর্ট হয়েছিল ২২০০০ টন স্বাভাবিক রাবার ও ২৫০০ টন সিনথেটিক।

NRM-এর ডাঃ ব্যানার্জি ও ডাক্তার ভৌমিকের একটি যুক্ত প্রতিবেদনে পেলাম যে, ১৯৭০-৭১ সালে ভারতীয় বাগিচার রাবারের উৎপাদন বেড়ে ৮০০০০ টন পর্যন্ত পৌঁছবে। তখন আবার আমাদের চাহিদাও বেড়ে যাবে; কৃত্রিম ও স্বাভাবিক রাবার দরকার হবে ১ লক্ষ টনের ওপর। কিন্তু ইতিমধ্যে বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ শিল্প-প্রতিষ্ঠান কিলাচাঁদ গোষ্ঠী ও আমেরিকান ফায়ারস্টোন কোম্পানীর যুক্ত-উদ্যোগ 'সিনথেটিক অ্যান্ড কেমিক্যাল' কোম্পানী তাঁদের বেরিলি-র কারখানাতে কৃত্রিম রাবার উৎপাদন আরম্ভ করে দিয়েছেন। তাঁদের ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের জোরে সম্ভবত ঘাটতির সবটাই পূরণ হতে পারে।

স্বাভাবিক রাবারের উৎপাদনে দক্ষিণ ভারতের রাবার বাগিচা মালয়েশিয়ার বাগিচার তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। আমাদের প্রতি একরের উৎপাদন ক্ষমতা মাত্র ১৬০ কেজি, আর তার জায়গায় মালয়ে উৎপন্ন হয় তার ছ' গুণ বেশী—একর পিছু ১০০০ কেজি। ব্রিটিশ রাজত্বকালে ইংরেজ প্ল্যান্টাররা মালয়ের উর্বর মাটিতে বৃক্ষ-রোপণ করে এক বিশাল রাবার-সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। মালয়ের সরল দরিদ্র জন-সাধারণের ওপর নাকি খুবই অত্যাচার অনাচার করতেন, কিন্তু ইংরেজ প্ল্যান্টারদের নিজেদের কষ্টসহিষ্ণুতা-ও কম ছিল না। আত্মীয় স্বজন থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরের শ্বেতাঙ্গসমাজ থেকেও বিচ্ছিন্ন-প্রায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে তাঁরা এই 'সোনার খনি' রাবার বাগিচাসমূহের সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁদের বিচিত্র জীবনযাত্রা কাহিনীর আঙ্গিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে স্বনামধন্য ইংরেজ ঔপন্যাসিক পরলোকগত সমারসেট মম-এর অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প আছে। দক্ষিণ ভারত এবং সিংহলের রাবার বাগিচাগুলিও প্রধানত ইংরেজের অবদান।

ভারতীয় রাবার গাছের উৎপাদন বৃদ্ধির খুব চেষ্টা চলছে। এই উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ শহরের অদূরে তিরুভোত্তিয়ুর-এ সম্প্রতি একটি রাবার গবেষণাগারের স্থাপনা হয়েছে বলেও শুনলাম।

দক্ষিণ ভারতের রাবার বাগিচায় শ্রমিক সংখ্যা আনুমানিক ১½ লক্ষ এবং নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১১০/১১৫ কোটি টাকা।

ভারতের রাবার শিল্পের অপূর্ব কৃতিত্ব এই যে, ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ভারতে উৎপন্ন রাবার রপ্তানি হতো দেশে রাবার শিল্পোদ্যোগের অভাবে, আর তার বদলে আজ এই শিল্পের প্রসার এতটা হয়েছে যে, স্বদেশের উৎপন্ন রাবারেও কুলোয় না—আমদানি করতে হয় ২০/২২০০০ টন করে।

সর্বভারতীয় শিল্পোৎপাদনের ক্রমিক বর্ধনের হার যেখানে মাত্র বার্ষিক ২½ পারসেন্ট আন্দাজ, একা রাবার শিল্পের বর্ধনের হার সেখানে ১০ পারসেন্ট। আমাদের রপ্তানির বাজারও ধীরে ধীরে বাড়ছে; ১৯৬১-৬২-তে রাবার পণ্যের রপ্তানি হয়েছিল প্রায় ৮৬ লক্ষ টাকার, আর ১৯৬৬-৬৭-তে হয়েছে ৫½ কোটির।

একেই বলে শিল্পযোজনা। মাত্র বছর পঁচিশেকের মধ্যে এই যুগান্তকারী ঘটনাটা ঘটে গেল, আর তাতে এক বৃহৎ অংশ নিল কেদার মুখার্জি মশায়দের ন্যাশান্যাল রাবার ও ইনচেক টায়ার্স।

তথ্যের বোঝা এখন পর্যন্ত যতটা চাপালাম তাতেই আপনাদের অবস্থা প্রায় নাবিক সিন্ধবাদ-এর মতো করে তুলেছি। পরে-প্রকাশ্য আরও অনেক রয়েছে। কিন্তু বিশেষ একটি তথ্য ঠিক করে কেউ সরবরাহ করতে পারলেন না; মানে, পরিবার পরি-কল্পনার গুহ্য সমস্যার সমাধানে রাবারের যে সমস্ত বস্তু আবশ্যক তার উৎপাদনের পরিসংখ্যান NRM-এর কেউই দিতে পারলেন না। বললেন, বোম্বাইয়ে একটু বেশী এবং কলকাতা প্রভৃতি শহরে কিছু কিছু 'হাইজিনিক রাবার গুডস' তৈরী হচ্ছে বটে ছোট ছোট কারখানায়, কিন্তু তার সঠিক সংখ্যা বা ওজন বেঙ্গল ন্যাশান্যাল চেম্বারও নাকি জানেন না। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক নাকি চেষ্টা করেও এখন পর্যন্ত কোনো বড়ো প্রতিষ্ঠানকে পাতলা রাবারের ওই বিশেষ জিনিসের উৎপাদনে রাজী করাতে পারেন নি। এ বড়ো পরিতাপের বিষয়।

NRM-এর বিরাট উৎপাদনের মধ্যে সাইকেলের টায়ার টিউব এবং কনভেয়ার বেল্টিং-এর কথাই প্রথমে উল্লেখযোগ্য। এখন দিনে ২০০০০টি (কুড়ি হাজার) করে টায়ার এবং টিউব তৈরী হয়। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রাবার, মানে নানাবিধ শিল্পের পক্ষে জরুরী রাবারের পণ্যের মধ্যে এঁদের বেল্টিং-এর উৎপাদনে ভারতজোড়া সুনাম। বিদেশেও কিছু কিছু রপ্তানি হচ্ছে।

এঁদের কনভেয়ার বেল্টিং-এর যতটা উৎপাদন হয় তার অধিকাংশই কিনে নেন ভারতে অবস্থিত অ্যামেরিকান প্রতিষ্ঠান 'গুডইয়ার ইণ্ডিয়া লিমিটেড'। সেই অংশটি গুডইয়ারের মার্কাতে বাজারে বিক্রি হয়। আর যেটুকু বাকি থাকে সেটুকু NRM বেচেন নিজের ছাপে। গুডইয়ারের মোটর টায়ার-টিউব তৈরী হয় তাঁদের বল্লভগড়ের (হরিয়ানা), নিজস্ব ফ্যাক্টরীতে; কিন্তু ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রাবারের কোনো কোনো জিনিস, যেমন বেল্টিং, তাঁরা নিজেরা না করে NRM-কে দিয়ে তৈরি করিয়ে নেবার চুক্তি করেছিলেন ১৯৫৪ সালে। সেই চুক্তি আজও বলবৎ রয়েছে।

ন্যাশান্যাল রাবারের ক্রমিক উন্নতির চমক-প্রদ হিসেবটি আমি নীচে লিপিবদ্ধ করছি:—

সাল	কর্মিসংখ্যা	বিক্রীত মালের দাম
১৯৪৭	২৫০ আন্দাজ	২৪ লক্ষ টাকা
১৯৫৫		১০১ লক্ষ টাকা
১৯৬৪		৫৪৪ লক্ষ টাকা
১৯৬৭	৩৫৭০ ,,	৮৩২ লক্ষ টাকা

১৯৬৮ সালে বিক্রির টারগেট (লক্ষ্য) হলো ৯½ কোটি আন্দাজ।

বর্তমানে ভারতের প্রধান প্রধান শহরে NRM-এর ১৬টি বিক্রয় কেন্দ্র আছে। এঁদের প্রচার পদ্ধতিও প্রশংসনীয়। নিজেদের সচিত্র হাউস-বুলেটিন NRM NEWS প্রকাশনা সৌষ্ঠবে অনবদ্য।

এই প্রতিষ্ঠানের পেড-আপ ক্যাপিট্যাল এখন ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। সাতষট্টি সালে আয়কর সাপেক্ষ নীট লাভ হয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা। কর্মীরা বেতন পেয়েছেন ১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। এঁদের সম্প্রসারণ সূচীর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে কল্যাণীতে ১০০ বিঘা জমির ওপরে বৃহৎ কারখানা বসিয়ে পুরনো রাবার থেকে ব্যবহারযোগ্য ভালো রাবার উদ্ধার করার পরিকল্পনা।

চিংড়িহাটা অঞ্চলে ৬০ বিঘা জমির ওপর অবস্থিত এই বিশাল ফ্যাক্টরীর সর্বত্রই কর্মতৎপরতা। সাইকেল টায়ার তৈরির শেষ পর্ব বিল্ডিং মেশিনে যাঁরা মাল চড়ানোর প্রস্তুতি করছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনের ক্ষিপ্রতায় আমি মুগ্ধ হলাম। বাঙালী ছেলে, নাম সতীশ দাস

[illegible]নি নিজেই যেন একটি মেশিন। বাহবা [illegible] দিয়ে পারলাম না।

দোতলা ল্যাবোরেটরীর বাড়িটিতে দামী দামী টেস্টিং মেশিনের যান্ত্রিক পরিবেশে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল পুরনো দিনের বিখ্যাত এক গায়কের সঙ্গে—একাধারে রাবার কেমিস্ট ও রবীন্দ্র সংগীত বিশারদ শ্রীসুনীল রায়। অনেক গানের মধ্যে একটি গান উনি বড়ো ভালো গাইতেন—'আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে/ সে যে বাসা বাঁধে নীরব মনের কুলায়ে'। বেদনামধুর সেই অনুভূতিটিকে ইংরেজীতে যেন কী বলে—'নস্ট্যালজিয়া'? পুরনো কথা মনে পড়ে আমার যেন তাই হলো।

সুনীলবাবু NRM-এ আছেন এ-কে-সরকার আমল থেকে; আর আছেন অরুণ সেনচৌধুরী, মনোহর ব্যানার্জি, দেবকুমার সরকার এবং আরও কতজন তরুণ রাসায়নিক ও যান্ত্রিক; কেমন সুন্দর উজ্জ্বল সব ছেলেরা!

কাঁকিনাড়ার ইনচেক টায়ার্স-এর কারখানাতেও সেদিন ভারী ভালো লাগলো। হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন শ্রীনির্মল বসু—শুধু সুপুরুষ নয়, বুদ্ধি ও তারুণ্যে সমুজ্জ্বল এক যুবক। ইংরেজী ভাষায় কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম-এ নির্মল বসু ইনচেক-এর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজার।

ভেতরে গিয়ে দেখলাম, এখানেও সেই অভিজ্ঞ অমূল্য দত্ত, ক'দিন আগে যাঁর সঙ্গে NRM-এ পরিচয় হলো। অমূল্যবাবু ইনচেক-এরও প্ল্যান্ট ম্যানেজান। অমূল্যবাবু ও নির্মলবাবু, দুজনেই আবার 'ইনস্টিটিউট অব ওয়ার্কস ম্যানেজমেন্টের' অ্যাসোসিয়েট মেম্বার। অর্থাৎ ফ্যাক্টরী পরিচালনা শাস্ত্রে পণ্ডিত। কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ার শ্রীপরেশ নন্দী মশায়ের সঙ্গে শুধু মুখ দেখাদেখি হলো। কী একটা জরুরী কাজে তিনি কলকাতা চলে গেলেন যেন।

আর আলাপ হলো টেকনিক্যাল রিসার্চের (গবেষণাগারের) কর্তা সুরথলাল মুখার্জি মশায়ের সঙ্গে। এঁর সৌজন্যে ও ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ [illegible] [illegible] কিন্তু ইনচেক-এর মতো আধুনিক[illegible] [illegible] সম্ভবও নয়, কারণ [illegible] ইনচেক অর্বাচীন।

ডানলপ, ফায়ারস্টোন, চিয়াট (Ceat) ও গুডইয়ার-এর মতো অর্বুদ মুদ্রা মূলধনের ভারতে অবস্থিত ইংরেজ, অ্যামেরিকান ও ইটালিয়ান প্রতিষ্ঠানের পরেই হলো বাঙালী ও চেকোস্লভাকীয় সহযোগিতায় স্থাপিত এই ইনচেক টায়ার্স লিমিটেড। এঁরা বাদেও ভারতে আরও দুটি টায়ার কোম্পানী আছে—ম্যাড্রাস রাবার কোং অর্থাৎ 'ম্যান্সফিল্ড' টায়ার নির্মাতা এবং 'প্রিমিয়ার'।

ইনচেক-এর স্থপতি হলেন শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায়। অবশ্য ভাইয়েরা, ডাঃ দাশরথি ব্যানার্জি আর অমূল্য দত্তরা সঙ্গে না থাকলে একা তাঁর পক্ষে এই বিশাল শিল্পসৌধটি গড়ে তোলা সম্ভব হতো না। আর কায়িক পরিশ্রমে এঁদের যাঁরা শক্তি ও সফলতা যোগাচ্ছেন ইনচেক-এর সেই ১১০০ শ্রমিক ও কর্মীর কথাও একই সঙ্গে উল্লেখ্য।

১৯৬০ সালে যখন চেকোস্লভাকিয়ার রাষ্ট্রীয় সংস্থা টেকনোএক্সপোর্টের সঙ্গে কেদারনাথ সহযোগিতার চুক্তি সই করে কোম্পানী রেজিস্ট্রি করালেন ইনচেক-এর তখন নামকরণ হয়েছিল 'জেনারেল টায়ার্স লিমিটেড'। কিন্তু আগে প্রতিষ্ঠিত একটি বিদেশী কোম্পানীর নামের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকাতে কেদারবাবু কোম্পানীর নামান্তর করতে বাধ্য হলেন। ১৯৬৪ সালের মাঝা-মাঝি এর নতুন নাম হলো 'ইনচেক টায়ার্স লিমিটেড'। সূচনায় ৩½ কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধনের মধ্যে ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকার শেয়ার বাজারে ছাড়া হলো। এখন এর পেড-আপ ক্যাপিট্যাল ২ কোটি টাকার সামান্য কম।

বর্তমানে ইনচেক-এ দিনে ৪৫০ বড়ো (অর্থাৎ লরি ও মোটরবাসের উপযোগী) [illegible] বর্তমান [illegible] ১০০০ [illegible] উৎপাদন [illegible] গতবারের ব্যালেন্স-শীটে [illegible] দেখানো হয়েছিল ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার; চলতি বছরে সেটা ৭ কোটি টাকায় পৌঁছবে। অমূল্যবাবু বললেন যে, NRM ও ইনচেক-এর মোট বিক্রি ১৯৬৮-৬৯ সালের মধ্যে বাৎসরিক ২২ কোটি টাকা না হওয়ার কোনো কারণ নেই।

তাহলে এখন যে দুই কারখানা আর অনেকগুলি অফিস নিয়ে ৫৬০০ কর্মী কাজ করছেন, তাঁদের সংখ্যাও দ্বিগুণের কাছাকাছি হওয়া উচিত। আরও কত বাঙালীর অন্নসংস্থানের পথ প্রশস্ত হবে।

কর্মসংস্থানের ব্যাপারে ভারতের টায়ার-শিল্পের মহৎ কীর্তির ছবিটি দেখিয়ে আজকের প্রবন্ধের উপসংহারে আসি। ১৯৫৭ সালে ভারতবর্ষে অটোমোবাইল টায়ার-টিউবের উৎপাদন ছিল সংখ্যায় ৯½ লক্ষ আন্দাজ এখন সেটা এসে পৌঁছেছে ২৫ লক্ষের ঘরে; আর সাইকেলের টায়ার-টিউবের উৎপাদন এই ১০ বছরে ৭১ লক্ষ থেকে ২ কোটি ১৫ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। এর থেকেই কর্মসংস্থানের ক্রমিক বৃদ্ধিটি বোঝা যাবে।

ন্যাশানাল রাবার এবং ইনচেক টায়ার্সের মাধ্যমে বাকুলিয়ার মুখোপাধ্যায় বংশ এই অপূর্ব শিল্পোন্নয়নে এক বৃহৎ অংশ নিয়ে বাঙালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

তাঁদের নেতা কেদারনাথ নানাভাবে তাঁর সার্থক নেতৃত্বের জন্য অভিনন্দিত হয়েছেন। তিনি দুর্গাপুর প্রকল্প, কল্যাণী স্পিনিং, পশ্চিমবঙ্গ ফিনানসিয়াল করপোরেশন প্রভৃতি বহু সরকারী সংস্থার চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টর পদে বৃত হয়েছেন; আর বেসরকারী সংঘ বা প্রতিষ্ঠানেও তাঁর সমধিক সম্মান। কেদারনাথ বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অব কমার্সেরও প্রাক্তন সভাপতি।

কেদারনাথ ও তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ নিজেরাই কেবল লক্ষ্মীর বরপুত্র হননি, তাঁদের মেধা, কর্মক্ষমতা ও সংগঠনশক্তি হাজার হাজার বাঙালীর ঘরে স্বস্তি ও শান্তি এনে দিয়েছে।

হৈমবতী-মানিকলাল যে বংশের সৃষ্টি করেছিলেন, বিশ্বেশ্বরের প্রতিভা যে বংশে সমৃদ্ধি এনেছিল, আর অন্নপূর্ণার প্রজ্ঞা যাকে ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করেছিল, সেই বংশ যেন অক্ষয়বটের মতো বাঙালীকে ছায়া দিতে থাকে, এই আমরা প্রার্থনা করি।

বিশ্বকর্মা

...জানেন। মুখ দেখেই ...নি মুখে

লিলি বলে, 'যাই বা আজকাল। না হয় আজ সকালেই আসতেন।'

...কথারও কোন জবাব ... পারে ...ফিরিয়ে আমায় ...হয়

কোন ক্যাম্পেই হোক, জয়দেবের মেলায় আসবে ... কেন? এ তো আমার অনেক দিনের ... আসবে ... আসতাম। ... ভাবে কেন? এত অবিশ্বাস কেন।

ওর মুখের দিকে ... মুহূর্ত চেয়ে ... বদলে যায়। ... পাই।

হায় হায় ধ্বনি ওঠে আসরে। আর গোপীদাসের বারে বারে এদিক চেয়ে ইশারা করা দেখে আসরের সবাই গাছতলার দিকে ফিরে ফিরে চায়। বড় গোলমেলে বুড়া। অকারণ মানুষের সামনে লজ্জা দিতে চায়। আবার হেঁকে জিজ্ঞেস করে, 'হাঁ চিতে বাবাজী, ঠিক বইলছি ত?'

হেসে ঘাড় নাড়ি। তবু একটা আড়ষ্টতা ঘোচে না। যতবার চোখ তুলি, ঝিনির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। লিলি হঠাৎ পাশ থেকে বেজে ওঠে, 'আপনি আর ঘাড় নাড়বেন না মশাই।'

উলজাদি

আমার ডাইনে লিলি বাঁয়ে ঝিনি। গাছতলাতে এদিক ওদিক, আরো দু চারজনা। দেখলে চেনা যায়, তারা শহুরে কেতার মানুষ না। গ্রামীণ মানুষ, বসে বসে গান শোনে। তবে শহুরে মেয়েদের দিকে নজরে কিঞ্চিত কৌতূহল। হয়তো গোকুলদাসদের সঙ্গে শিউড়ি থেকেই এসেছে। কিংবা গোপীদাসের চেরুক থেকে। নতুবা নিতান্ত জয়দেবের যাত্রী আসর দিয়ে বসে গিয়েছে।

গোপীদাসের গানের আসরেও লোকজন কম না। রাধা দাসী পাশে আছে তার। সুজন গোকুলও রয়েছে। সুজন তার দোতারা বাজায় হেলে দুলে। বিন্দু কোথায় কে জানে। কুসুম তাকে কোথায় তাকতে বসে গেল জানি না। কিন্তু মজা লাগিয়েছে বটে গোপীদাস। গান গাও তুমি আসরে বসে। তোমার যত ভুরু কাঁপানো, চোখের ইশারা, হেসে হেসে হাত তুলে এদিকে দেখানো কেন। কেবল কি তাই। গানের কথাও তেমনি। সেই যে বলে, 'কথা পড়ে সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে' সেই রকমের ব্যাপার। গোপীদাস গায় সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে। সে যেন বিঁধছে বুড়োর মত চোখের নজর আর গানের কথা, গাছতলাতে ছুঁড়ে মারে,

'আগে না জেনে প্রেম—ফল
খেয়েছিলেম প্রেমের গাছে উঠ্যে।'

গানের সঙ্গে হা করে হাত দিয়ে খাওয়ার ভঙ্গি করে। তারপরে বুক চেপে ধরে, মুখ বিকৃত করে গায়,

'অই গ জাইনলে খেতোম না,
গাছে উইঠতেম না
এখন বিষের জ্বালায় বেড়াই ছুটো।...
কি প্রেম সরল নয় হে গরল মাখা
জন্মাবধি স্বভাব বাঁকা।
এখন উগরাইতে নারি
উহু মরি মরি
বিষের জ্বালায় আমার পরান ফাটে।'...

'কেন'? বলে তার দিকে ফিরে তাকাতেই ঘাড় অবধি রুক্ষ চুলের গোছায় ঝাপটা দেয় নাগরিকা। সখীর দিকে তাকায়। ঝিনি চোখ নামিয়ে নেয়। ওর গায়ে ফুল তোলা মেয়েলী পশমী সাল, আঁচলের মত করে গায়ে ছড়ানো। লিলির গায়ে মেমসাহেবের পশমী কোট। সামনের দিকে বোতাম-

গনুলো সব খোলা। তার ফাঁকে রাঙা শাড়ি, রাঙা জামা শোভে। ওর তুলনায় ঝিনিকে বৈরাগিনীই মনে হয়। গেরুয়া রঙের খয়েরী পাড় শাড়িতে খয়েরী রঙের নানা ছাঁদের ছাপ। হঠাৎ দেখলে মনে হয় নামাবলী বুঝি।

লিলি প্রায় চোখ পাকিয়ে বলে, 'কাল আসতে পারেননি?'

অবাক হয়ে বলি, 'কাল আসবার তো কোন কথা ছিল না।'

'কথা না থাকলে বুঝি আসতে নেই?'

এরকম পাল্টা প্রশ্নের জবাব হয় না। তাই বলি, 'না, শুধু শুধু আসব—মানে—।'

লিলি সে কথায় কানই দেয় না। আবার বলে ওঠে, 'আর কথা থাকলেই যেন আপনি আসতেন?'

বলে ঝিনির চোখাচোখি হতেই ঝিনি হেসে বেজে ওঠে। যেন এতক্ষণে মনের মত একটা কথা শুনেছে। বলে, 'তাই না বটে!'

সঙ্গে সঙ্গে লিলির পাল্টা কথা, উল্টো রূপ। তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে ঝিনিকে বলে, 'থাক ভাই, তুমি আর কথা বলো না।'

অমনি ঝিনির অবাক চোখ দুটি বড় হয়ে ওঠে। মুখে একটু রঙ লেগে যায়। প্রায় যেন অভিমান করে বলে, 'কী মেয়ে বাবা!'

এবার আমার অবাক হবার পালা। আমি মধ্যখানে বসে দুই সখীকে দেখি। লিলির কথা শুনে মনে হয় না এ মেয়ে একেবারে নিটুট নাগরিকা। ঘাড় নেড়ে বলে, 'এখন কী মেয়ে বাবা! কই কাল থেকে তো এরকম হাসতে দেখিনি!'

বলেই আমার দিকে চায়। আবার বলে, 'কাল থেকে এ মেয়ে নিয়ে মশাই একেবারে ভাজা ভাজা হয়ে গেলাম।'

ব্যাপার বুঝতে পারি না। লিলির কথার ঢঙে হাসি পায়। তবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কী ব্যাপার?'

লিলি ঝিনির দিকে দেখিয়ে বলে, 'জিজ্ঞেস করুন কী ব্যাপার। আমার কোন ব্যাপার নেই।'

বলে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আমি তাকাই ঝিনির দিকে। ঝিনি যেন বিব্রত বিস্ময়ে সখীর দিকে চেয়ে থাকে। তবু ভুরুতে একটু বাঁক। চোখের তারায় যেন কী কথা। মুখে কিছু বলে না।

লিলি আবার আমার দিকে ফেরে। জিজ্ঞেস করে, 'কেঁদুলিতে কবে আসবেন নানুরে ওকে বলেছিলেন?'

মনে করতে পারি না ঠিক। কিন্তু দুই সখীর কথার বিষয় এবার অনেকটা আঁচ করতে পারি। বলি, 'ঠিক মনে নেই। এখানে আসব বলেছিলাম।'

লিলি বলে, 'আর কাল থেকে এসে অবধি কী খোঁজাখুঁজি। কাল তো তবু একরকম গেছে। আজ সকাল থেকে তো নাড়ি ছেড়ে যাবার যোগাড়।'

ঝিনি আর একবার অস্বস্তিতে লজ্জায় বলে ওঠে, 'আহ্, কী হচ্ছে লিলি।'

এখন আর লিলিকে থামানো যাবে না। সারা দিনের একটা শোধ তো আছে। মনে মনে আমিও বলি, থাক না এ প্রসঙ্গ।

লিলি বলে, 'এত বড় মেলায় এত মানুষের মুখ দেখে দেখে বেড়ানো যায়! বলুন তো মশাই।'

ওর 'মশাই' বলা শুনলেই আমার হাসি পায়। বলি, 'খুব অসুবিধে।'

ঝিনি এবার আমার দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে ভুরু বাঁকিয়ে তাকায়। বলে ওঠে, 'মোটেই তা করি নি।'

'করিস নি?'

লিলির কাজল লাগানো চোখের পাতায় কুঞ্চন। ঝাপসা রঙ ঠোঁটে কৌতুকের স্ফুরণ। বলে, 'আমি একলা সাক্ষী, না? কুসুম বিন্দুরা সাক্ষী নেই? তারপরে কী যেন সেই ছেলেটির নাম—কাশীনাথ, সে পর্যন্ত খুঁজেছে।'

এবার আমিই বলে উঠি, 'তা এত খোঁজাখুঁজির কী ছিল।'

লিলি হাত উল্টে বলে, 'সেটা আপনি

জানেন আর ইনি জানেন। মুখ দেখেই বুঝতে পারছেন, দুপুরে বেলা ইনি মুখে অন্ন তুলতে পারেননি। এবার যান, খাইয়ে নিয়ে আসুন।'

আমাকেও জড়িয়ে দিয়ে লিলি বড় বেশী লজ্জায় ফেলে দেয়। কিন্তু ঝিনির এতটা উতলা হবার কী ছিল। হবেই বা কেন। আমি ঝিনির দিকে ফিরে তাকাবার আগেই ওর গলার প্রায় একটা আর্ত আক্ষেপের ধ্বনি বাজে, 'আহ্ লিলি, কিছু রাখলি নে।'

বলেই মুখটা নিচু করে দু হাতে ঢাকে। লিলি তখনো আপন স্রোতে বহতা, 'আপনি আসবার একটু আগেও গোটা মেলার ধুলো মেখে ফিরেছি। সন্ধ্যাবেলা তো মেয়ে—।'

কথা শেষ হবার আগেই লিলি চকিত হয়ে ঝিনির দিকে ফিরে তাকায়। ঝটিতি উঠে গিয়ে একেবারে ঝিনির গা ঘেঁষে বসে। উদ্বেগে ভেসে বলে 'এই ঝিনি, ও কি রাগ করলি আমার ওপর?'

ইহার নাম মানসী লীলা। একটু ভেঙে বললে, হৃদয়লীলা। এর কী বুঝবে বল। ঝিনিকে দেখেই বোঝা যায়, ও মুখ ঢেকে কাঁদছে। রোধ করতে চেয়েও পারছে না। লিলির কথায় কোনরকমে ঘাড় নেড়ে জানায়, রাগ করেনি।

লিলি চকিতে একবার আমার দিকে চায়। এখন সখীকে বিঁধিয়ে কাটায়, নিজে বেঁধে অনুশোচনায়। বলে, 'তবে কেন কাঁদছিস? আমি কি ওর তার সামনে কিছু বলেছি? ওঁর সামনেই তো বলেছি।'

ঢাকা মুখ থেকেই ভেজা রুদ্ধ গলা শোনা যায়, 'কাঁদিনি।'

লিলি আবার আমার দিকে চায়। ওর আঁকা ভুরু কাঁপে, চোখের তারায় কী যেন ইশারা করে। ইশারা ধরতে পারি না। তাই জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থাকি। আর বুড়ো বাউলটা কী লাগিয়েছে দেখ। সেই চোখ ঘুরিয়ে ঘাড় নাড়িয়ে গেয়েই চলেছে,

'অই অই, কে বলে সই পীরিত ভাল
পীরিত কর‍্যে ই লাভ হলা
সোনার বরন কালি কইল্যা
পীরিত কনুনোজ্জ্বারে পিরবেশিয়ে
চুইকল বেইচ্যে হিদ্‌মাঝারে
শোষে ধরে আপন জোর
আমারে কর‍্যে চোর
অকলঙ্ক্যে কলঙ্ক রট্যো।'

লিলির চোখের তারায় তখনো কী এক নিঃশব্দ ইশারা। যদি বুঝেও থাকি তার ইশারা, সেই মত কাজ করা দায়। আমার পক্ষে ঝিনিকে সান্ত্বনা দেবার কিছু নেই। বরং অন্য কথা বলি, 'আপনারা যে আসবেন, সে কথা আমার জানা ছিল না।'

লিলি বলে, 'যাই বা থাকল। না হয় আজ সকালেই আসতেন।'

এ কথারও কোন জবাব থাকতে পারে না। হঠাৎ ঝিনি ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে চেয়ে বলে, 'জানা থাকলে বোধ হয় আসতে না, না?'

এখনো চোখ শুকোয়নি। ভেজা আরক্ত চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি হানে ঝিনি। অবাক হয়ে হেসে বলি, 'আসব না কেন? বলেছিলাম তো আসব।'

'কিন্তু জানতে না যে, আমরা আসব।'

'তা জানতাম না বটে।'

'জানলে কি আসতে?'

কী উত্তর দেওয়া যায় এ কথার। যে কোন কারণেই হোক, জয়দেবের মেলায় আসব না কেন? এ তো আমার অনেক দিনের ইচ্ছা। ঝিনি আসবে জানলেও আসতাম। ও এত ভুল ভাবে কেন? এত অবিশ্বাস কেন।

ওর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে হঠাৎ আমার দেখাটা বদলে যায়। ওর চোখ দিয়ে যেন ওকে দেখতে পাই। আর তখন হাসির মধ্যেও একটা কষ্ট কেমন খচখচিয়ে ওঠে। ও এসেছে অনেক দ্বন্দ্বের মধ্যে দ্বন্দ্বের দোলায় দুলতে দুলতে। অনেক সংশয়ে হাতড়ে ফিরে, প্রতি মুহূর্তে অতৃপ্তি কাটিয়ে কাটিয়ে চোখের আলোয় আশা ফুটিয়ে।

ওর সঙ্গে আমার তুলনা হয় না। ও এসেছে যোগিনী হয়ে। ওর সব কিছুতেই সেই ছায়া, সেই রূপ। ও যে আসে ভরে ভরে। কিছু ভুল, অবিশ্বাস, থাকলেই তো।

এই মুহূর্তে, ওর মুখ থেকে চোখ সরাতে ভুলে যাই। মন যেখানেই ঘাড় ফিরিয়ে থাক, ও যে কী সুন্দর, তাই ভেবে মুগ্ধ হয়ে থাকি।

ঝিনি হঠাৎ ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করে, 'কী দেখছ?'

'তোমাকেই।'

ঝিনি যেন ভয়ে চমকে কেঁপে ওঠে। যেন উৎকণ্ঠায় স্ফুরিত হয়, 'মিথ্যুক।'

'সত্যি।'

'মিথ্যুক মিথ্যুক মিথ্যুক।'

তিনবার করে বললেই যেন সত্যি হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গেই আবার জিজ্ঞেস করে, 'একবারও কি ভেবেছিলে, আসতে পারি?'

সত্যি কথাই বলি, 'সেটা ভাবি নি বটে।'

'জানলে কি আসতে?'

ঘুরে আবার সেই কথা। নির্দ্বিধায় জবাব দিই, 'আসতাম।'

ওর সন্দিগ্ধ চোখে গভীর বিষণ্ণতা ফোটে। মাথা নেড়ে বলে, 'বিশ্বাস হয় না।' কেন বিশ্বাস হয় না?'

ওর দৃষ্টিতে অন্যমনস্কতা ফোটে। গলার স্বরেও জাগে। বলে, 'কী জানি কেন বিশ্বাস হয় না। কেবলই মনে হয়, আমি যেখানে থাকব, তার অনেক দূরে দিয়ে তুমি চলে যেতে চাও।'

ঝিনির এই অসহায় রূপটা আমি চিনি। জানি আমাকে উপলক্ষ করে যে কথাটা বলে, সে কথা ওর জীবনের গভীরে মিশে আছে। এমনিতে যে ভয়ংকর কিছু জটিলতায় জড়িয়ে আছে, তা না। ওর দাদার মৃত্যু, দাদার বন্ধু হেনরির কারাবাস, ওর প্রায় কৈশোরেই সেই রাগী বিষণ্ণ দুঃখী বন্ধু, স্বামীই বলা চলে, যার সঙ্গে ওর আইনত বিয়ে হয়েছিল, মারা গিয়েছে অথচ বাবা মা জানেন না, সব মিলিয়ে কিছু মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা আছে। তার পরেও আর দশটি মেয়ের মত নিটোল সংসার পেতে জীবন কাটানো এমন কিছু আশ্চর্যের ছিল না।

কিন্তু সংসারে যারা নিটোল জীবনে অনায়াস হতে পারে না, ওর ভিতরে আছে সেই বিড়ম্বিত মন। আয়াসের মধ্যেই ওর আশা ফেরে। অনায়াস কিছু দেখলে ধন্দ লাগে। যে কারণে ও ছুটে বেড়ায়। না পাওয়ার মধ্যে ডুব দিতে চায়। সম্ভবত এমন মনেরই বিশেষত্ব চোখের জলেই হাসির কিরণ দেখবে বলে চেয়ে থাকে। ঈশ্বরে ওর বিশ্বাস আছে কি না জানি না, কিন্তু জীবনের সব কিছুই যে বড় দূরে, দূর দিয়ে চলে যায়, ওর এই আত্মস্বরে কোন ফাঁকি নেই।

ওর কথা শুনে লিলির সামনে আমার একটু লজ্জা করে। লিলি সখীর মুখের দিকেই চেয়ে রয়েছে। আমি একটু হেসে হাল্কা করেই বলি, 'এটা তুমি ভুল কর। দূর দিয়ে চলে যাব কেন। আমি তোমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলব কেন। নিজের তাগিদেই বাঁচে, নিজের তাগিদেই চলে।'

ঝিনি দ্রুত মাথা নেড়ে বলে, 'ঠিক তাই, ঠিক তাই। তুমি চলে যাও নিজের মনে, আমি তোমাকে ধরতে পারি না। সেটাকেই বলি, দূর দিয়ে চলে যেতে চাও।'

ঝিনি যদি এমনি করে বলে, তবে তার জবাব দিতে পারি না। তারপরে হঠাৎ হেসে, দু চোখে ঝিলিক দিয়ে বলে ওঠে, 'আচ্ছা, যদি এমন হত তুমি খালি আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে চাও, তা হলে কী ভীষণ ভাল হত?'

ধন্দের চমকে জিজ্ঞেস করি, 'কেন?'

ও বলে, 'ভাল হত না? আমি এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে চাওয়া মানেই তো কিছুতেই আমাকে ভুলতে পারবে না। সব সময়ে মনে রাখতে হত।'

সহসা ওর কথায় কোন জবাব দিতে পারি না। আর ও সারা শরীরে তরঙ্গ তুলে নিঃশব্দে হাসে। আবার যেন লজ্জা পেয়েই ফুলে তোলা শাল দিয়ে ঘোমটা টেনে একটু মুখ চাপা দেবার চেষ্টা করে।

লিলিও যেন অবাক হয়ে আসে। বলে 'তুই তো সাংঘাতিক মেয়ে ঝিনি।'

ঝিনি কোন জবাব দেয় না। লিলিই আবার বলে, 'অমনি করে মনের মধ্যে থাকতে হবে?'

ঝিনির যে গলার কাছে স্বর আটকে গিয়েছে, চোখ ভেসেছে, তা ওর কথায় বুঝতে পারি।

বলে, 'উপায় না থাকলে এমনি করেই থাকতে হয়। কী করব।'

লিলি আমার দিকে তাকায়। ওর দৃষ্টিতে একটা করুণ অভিযোগ ফোটে। আমি ডাক দিই, 'ঝিনি।'

'বল।'

বলতে পারি না কিছু। কী বলতে হবে, তা জানি না। শুধু বলি, 'বলছি, এমন করে বলো না।'

ঝিনি তাড়াতাড়ি চোখ মুছে পরিষ্কার গলায় বলে, 'তোমাকে ভারী জ্বালাতন করছি। রাগ করো না যেন। সারাটা দিন এত কষ্ট পেয়েছি, আর ভয় পেয়েছি, আমার মাথার ঠিক নেই। চল আমরা মেলায় ঘুরে আসি।'

লিলি সঙ্গে সঙ্গে চোখ কপালে তুলে বলে ওঠে, 'এ কি রে ঝিনি, আবার ঘোরাতে পারি কী? সারা দিন ঘুরে ঘুরে আমার যে কোমরে ব্যথা ধরে গেছে।'

'সত্যি, তাও তো বটে।'

লিলি বলে, 'তুমি যাও তো যাও, তোমার এখন নতুন বল এসেছে। আমি পারব না ভাই।'

বলে আমার দিকে চেয়ে ঝিলিক হানে। ঝিনি বলে ওঠে, 'কী বিচ্ছিরি মেয়ে!'

দুই সখীতে আবার লাগে। লিলি বলে, 'হ্যাঁ, আমি বিচ্ছিরি, তুমি খুব সুচ্ছিরি।'

বলেই আমার দিকে ফিরে বলে, 'কীভাবে এসেছি জানেন? কাউকে কিছু বলা নেই, কওয়া নেই, শুনি শ্রীমতী একলাই কেন্দুলিতে চলে আসছেন। শুনে বাড়ির লোকদের দুশ্চিন্তা। ওর মা আমাকে বললেন, তোরা কেউ সঙ্গে যা। একলা একলা কোথায় যাবে।'

আমি হেসে বলে উঠি, 'খুব ভাল ব্যবস্থা বটে। এক যুবতীকে রক্ষা করতে আর এক যুবতী।'

লিলি বলে ওঠে, 'আরে মশাই যুবতী কাকে বলছেন। সেসব চিন্তা মাথায় থাকলে তো। আমার বন্ধু তো যাকে বলে পাগলিনী। আর আমি তার পাহারাদার। ও সব যুবতী চিন্তা টিন্তা কিছু নেই।'

ইতিমধ্যে আমার সামাজিক প্রশ্নগুলো মনে পড়ে। ঝিনিকে জিজ্ঞেস করি, 'তোমার বাবা মা কেমন আছেন?'

ঝিনির জবাব একটু তেরছা হবেই। বলে, 'তবু যা হোক, মানুষ দুটোকে লিলি মনে পড়িয়ে দিল। ভালই আছেন। তোমার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে দেখা হয়েছে শুনে বাবা বললেন, জানলে যেতাম। মায়েরও খুব ইচ্ছে হয় তোমাকে দেখতে।'

অগ্রহায়ণের দক্ষিণের দরিয়ায় বাংলার হাল ধরে দুটি মানুষের মুখ মনে পড়ে যায়। যাদের সামনে দেখলে মনে হয়, প্রৌঢ়ত্বের সীমায় দুটি নিবিড় প্রাণের যোগে সহজ। অথচ শোকের ছায়া গভীর হয়ে পড়ে আছে দুজনের মধ্যে। বলি, 'সময় করতে পারলেই একবার দেখা করে আসব।'

ঝিনি এখন অন্য মানুষ। আমার অনেকখানি কাছে, ঘাড় বাঁকিয়ে মুখ এনে চুপি চুপি স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'সত্যি? কবে সময় করতে পারবে বলে মনে হয়?'

ওর ঠাট্টা বা বিদ্রূপ, যাই হোক, এমনই তীব্র, আমাকে অবাক হয়ে হেসে বাঁচতে হয়। বলি, 'কেন, বিশ্বাস হয় না?'

'অবিশ্বাস করিনে। কিন্তু এটুকু বুঝেছি, তোমার চলার পথে না পড়লে কারুর সঙ্গেই দেখা হয় না।'

'কেন, আমার কি সমাজ সামাজিকতা নেই?'

'আছে, সকলের মত নয়। ওই যে তখন বললে, মানুষ নিজের তাগিদেই চলে বাঁচে। এড়িয়ে তো তুমি যাও না।'

বলে ঘাড় কাত করে আমার চোখের দিকে কটাক্ষ করে। আমার মুখে কোন কথা যোগায় না। এমন সময় বিন্দু এসে দাঁড়ায়। সেই লাল পাড় গেরুয়া শাড়ি। এই মাত্র যেন কপালে সিঁথেয় সিঁদুর দিয়ে এসেছে। গায়ে একটি খয়েরী রঙের সুতীর চাদর। এসেই সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলে, 'জয় গুরু, চিতে বাবাজী, জয় গুরু।'

আমিও নড়েচড়ে বসে বলি, 'জয় গুরু।'

বিন্দু আড়চোখে চায় ঝিনির দিকে। ঘাড় দুলিয়ে চোখ বড় বড় করে বলে, 'সি হিসাবে লয় গ বাবাজী, ও' শান্তি ও' শান্তি ও' শান্তি বইলছি। না কি বল গ লিলিদিদি?'

লিলি বলে, 'তুমিই বল। আমি বলতে গিয়ে তো দোষী।'

বিন্দু ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, 'তাই নিকি? ক্যানে হাসো না কান্দে?'

বলে ঝিনির দিকেই আড়চোখে চায়। লিলি বলে, 'দুই ঠ।'

বিন্দু বলে ওঠে, 'অই অই, বুইঝলে গ লিলি দিদি, উ রাগ তোমার জন্যে লয়, কাঁদাও তোমার জন্যে লয়। সবই কারণে কারণ আছে, বুইঝলে ত?'

এতক্ষণে ঝিনি বলে, 'বাবারে বাবা, বিন্দুদি এবার চুপ কর। আমার অপরাধ হয়েছে।'

বিন্দু সেদিকে চায় না। বলে 'এখন আর অপরাধ বা কী, অন্যায় বা কী। আর ত আমাদিগে দরকার নাই, ক্যানে গ লিলিদিদি।'

লিলি বলে, 'ঠিক বলেছ।'

ঝিনি লজ্জায় হাসে। বিন্দু আমাকেও বিব্রত লজ্জিত করে। জিজ্ঞেস করি, 'ভাল আছ তো বিন্দু?'

বিন্দু কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে। বলে, 'ভাল বাবাজী। তবে সাথক আমার বাবার নজর, যে তোমার নাম দিইছে চিতেবাঘ। ই কী ঝিলিক্যেকো গ।'

বলে সে নিজে খিলখিলিয়ে বেজে ওঠে। সেই সঙ্গে তার এই বিচিত্র বিশেষণে লিলি ঝিনিও বেজে ওঠে। আর আমি বিন্দুর ঠাট্টায় একেবারে এতটুকু হয়ে যাই। জয়দেবে এসে এমন কথাও শুনতে হল। এই কি আমার নামের বিশ্লেষণ!

(ক্রমশ)

গানের আসর

—শার্ঙ্গদেব

ঘনঘোর বর্ষা নেমেছে। আমার এক গায়ক বন্ধু নানা সুরে বর্ষার গান গাইছেন—কখনো হিন্দী, কখনো বাংলা। এক সময় তিনি বললেন—"দেখ, আমাদের রাগসঙ্গীতেও বর্ষার একটা বিশেষ প্রাধান্য আছে। ভাল ভাল কত রাগে যে কতরকম বর্ষার গান আছে তার হিসেব নেই। এছাড়া কতরকম দেশী, দেহাতী, ঠুংরী, দাদরা—এই বর্ষা নিয়ে রচিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই"। কথাটা সত্যি, বর্ষা এবং বসন্ত এই দুটি ঋতু মনের ওপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে। এই দুই ঋতুতেই শিল্পীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গান গাইবার প্রেরণা পান। বসন্তের চেয়ে বর্ষার আবেদন বোধ হয় আরও ব্যাপক এবং বিচিত্র। বর্ষাকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন বহু গম্ভীর এবং করুণ রাগ রচিত হয়েছে তেমনি পুলক এবং উচ্ছলতাও কম প্রকাশ পায়নি। তথাপি বর্ষার যে একটা বেদনাতুর নিবিড় অনুভূতি আছে আমার মনে হয় সেটাই যেন আমাদের মনকে সবচেয়ে বেশী করে অভিভূত করে। মিয়া মল্লার তানসেন রচনা করেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু এই রাগের গম্ভীর মন্থর মীড়গুলি এমন একটা আবেশ আনে যা কেবল অবিশ্রান্ত বর্ষার রিমিঝিমির মধ্যেই অনুভব করা যায়। তানসেনের মত বিরাট প্রতিভাই বোধ হয় এইরকম একটি সৃষ্টির উপযুক্ত ব্যক্তি। অন্ধগায়ক সুরদাস ছিলেন তানসেনেরই সমসাময়িক। শোনা যায় সুরদাসী মল্লার তাঁরই সৃষ্টি। এই রাগে বেশী গান শুনিনি। কিন্তু এটি যে একটি অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাগ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। খাদ থেকে তার সপ্তকে আরোহণ এবং "নিপা" এই মীড় কখনো কখনো "নিপামরেসা" এই স্বরগুলির সংযোজনা—এক একটা বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করে। সারঙ্গ আর মল্লারের মিশ্রণে এই রাগ যেন একটা ভারি সমৃদ্ধ সৃষ্টি। নায়ক চার্জুও বোধ হয় এই সময়কারই ওস্তাদ। এঁর তৈরি চার্জুকী মল্লারও বড় মধুর রাগ। এতে কাফীর ভাবটা আছে। এতে কোমলগান্ধারের স্পর্শটি বড় মধুর এবং রসসঞ্চারী। মেঘমল্লার যা ক্বচিৎ কদাচিৎ শুনি তার রূপটা কিন্তু খুব কোমল নয়, কেমন যেন একটা উত্তেজনার ভাব রয়েছে এই রাগে। বোধ করি সারঙ্গ-এর প্রভাব কিছু বেশী এবং গমকপ্রধান বলেই এর এই রকম একটা উত্তেজিত গতি। নটমল্লার এবং গৌড়-মল্লারের মধ্যে আবার বর্ষার সেই নিবিড় উপভোগ্য রসটি গভীরভাবে মিশে রয়েছে। বিশেষ করে গৌড় মল্লার—কত জনপ্রিয় গানই না এতে রয়েছে। "রুম্ ঝুম্ বাদরওয়া বরষে" যতবারই শুনি ততবারই যেন কেমন একটা মোহে আচ্ছন্ন হয়ে যাই। প্রাচীন বাংলাগানে ভাল ভাল গৌড়মল্লার রয়েছে। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ—তিনিও কী মধুর রসসৃষ্টিই না করেছেন এই রাগে। কাফীতেও তো কম বর্ষার গান নেই। "রুমঝুমে বরষে আজু বাদরওয়া"—এই বিখ্যাত সুরফাক্তা তালের ধ্রুপদটি অন্ততঃ বাংলায় অনেকদিন থেকে গেয়ে আসা হচ্ছে।

খাম্বাজ ঠাটে রয়েছে কয়েকটি বড় বড় রাগ যাতে বর্ষার গানও প্রচুর রয়েছে। এর মধ্যে জয়জয়ন্তী যেন বর্ষাকে উপলক্ষ করেই রচিত হয়েছে। এই করুণ মধুর রাগ এত পরিচিত যে এর কথা বেশী না বললেও চলে। এর পরেই "দেশ" যার গভীরতার তুলনা নেই। এর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আরও কত রাগ করুণ মধুর হয়ে উঠেছে। বাংলা গানেও দেশ-এর প্রাধান্য কম নয়। সুরট-মল্লার নামক একটি রাগ এক সময় বাংলায় বিশেষ প্রসারের জন্য এবং এই রাগেও কিছু বর্ষার গান শোনা গেছে। তিলককামোদ রাগটিও বর্ষার অনুকূল। এই রাগেও বিচিত্র বর্ষার গান রচনা করা সম্ভব। বাগেশ্রীতেও বর্ষার গান আছে। রবীন্দ্রনাথ বর্ষার গানে এই রাগ বিচিত্রভাবে যোজনা করেছেন।

বেহাগে বর্ষার মাধুর্য কোনও কোনও গানে অতুলনীয়ভাবে ফুটে উঠেছে। বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অতুলপ্রসাদের "নিদ নাহি আঁখিপাতে" সকলকারই পরিচিত। বাংলার বেহাগে এক সময় কোমল নিখাদ লাগানো হত এবং খাদে "পানিসারেগাসা" এইটি সংযোজিত হত। এতে বেহাগের মাধুর্য আরও ঘনীভূত হত এবং একটি বিচিত্র আবেদন প্রকাশ পেত। নজরুলও বেহাগে কয়েকটি সুন্দর বর্ষার গান রচনা করেছিলেন।

কল্যাণ ঠাটে ইমন, ভূপালী, কেদারা, কামোদ এবং ছায়ানট সবগুলিই বর্ষার গানের জন্য প্রশস্ত। বিশেষ করে কেদারা, কামোদ এবং ছায়ানট। বাংলায় এই তিনটি রাগে কত মনোহর গান রচিত হয়েছে এবং তার মধ্যে বর্ষার গান বড় অল্প নেই। ছায়ানটকে আশ্রয় করে রবীন্দ্রনাথ শেষ

ফিক ফিক করে হাসছিল ভুবন। জবাবটা তখন মাথায় খেলেনি। এখন খেলতে শুরু করেছে। পুকুরঘাটের ওদিক হয়ে এলে বলে আসব—একটা পাখি আছে। বড় চালাক আর যেন খাখাওয়া সেই পাখি। সে যদি জালে পড়ে, রাজ্যের পাখি পড়ার দিন আর গুনেব না।

ভুবনের এতক্ষণে মন কেমন করছিল। সে বড় অবিশ্বাসী আসলে। শিবপুজোর মেলায় ফাঁক পেলেই যেমন জুয়োর ছকে পয়সা ফেলে, কখনও উঠে আসে ডবল কখনও বা শূন্য, তেমনি করে আলোপরীর মুখের উপর দান ধরতে পারল না। ভুবন জানে, গত সারাটি রাত হলুদ-হলুদ অজস্র পাখির স্বপনের সঙ্গে আলোপরীও কতবার তার সামনে এসেছে। আলোপরীর রোদে-পোড়া মলিন শরীরের যে সব অংশ এ যাবৎ সে দেখতে পায়নি, সেই সব অংশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল ভুবন। মারাত্মক হলুদ আর উজ্জ্বল আলোপরীর স্তন। ও নাভিটা ছিল কল্কেফুলের ছেঁড়া বোঁটার দিকটার মত খাজখাটা আর গোলাকার মাঝে মাঝে সেই উজ্জ্বল হলুদ আলোপরীর মাঠে জঙ্গলে জলায় ফেরা পরিশ্রমী

আর খসখসে গাছের গুঁড়ির মত পা থেকে নতুন পাতাগজানোর মত ক্ষত ফুটছিল স্বপ্নে ভুবনের বড় কষ্ট। জালের গাবদেওয়া রুক্ষ সুতোর দাগ পায়ে নিয়ে মেয়েটি তবু অকৃপণ হাসে।......

ভুবনের কষ্ট হচ্ছিল। আলোপরী যা মেয়ে, রতনের আঁকাস দেওয়া হাত সরিয়ে ঠিকই এসে দাঁড়িয়ে আছে ঘাটে। কিন্তু অসম্ভব ভুবনের লোভ আর কষ্টকে, তার বিশ্বাস-অবিশ্বাস আর জুয়োখেলার সাধকে মাথা চাড়তে দিল না। অসম্ভব তার তলপেটের উপরদিকটা হঠাৎ খামচে ধরছিল। ভুবনের মনে পড়ছিল, গত রাতে সরকারবাবুর মেজজামাইকে স্টেশন থেকে লণ্ঠন দেখিয়ে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দেওয়ার বদলে খানচারেক রুটি আর একটু তরকারি মিলেছিল। ঘরে এসে বুড়ো বাপকে সুদ্ধ তার ভাগ দেবে বলে ওখানেই পাতে বসেনি। ...কী অবাক, এই বুড়ো লোকটি কত সব অসম্ভব গল্প করে; বুক দেখিয়ে বলে—এই বুকে বেউলা নদীর বানবন্যা রুখেছি। হিজলের মাঠে রুখেছি রাক্ষুসে শীত। তখন আমার ফসলের ক্ষেত ছিল রে ভুবন। সারা শীতের রাত খরপী হাতে চারা গমের ক্ষেতে খেটেছি। গলার শ্লেষ্মা সরিয়ে বুড়ো বলে—তাই দেখে শেষ রাতে হাটে যাবার পথে হাটুরেরা বলেছিল, এত শীতে মরে যাওনি হে, তা ভুবন, আমি বলেছিলাম, মরিনি। অনেক শীত আমি দেখেছি হে। অনেক ঠাণ্ডায় যখন বিষেল সাপ আর পোকামাকড় মাটির নীচে পালিয়ে যায়, চাঁদখানা শেষ রাতে মনে হয় বাবলার ডালে ঝোলানো ভিজে ন্যাকড়া, উত্তুরে হাওয়া শিঙে খুঁচিয়ে গায়ের চামড়া ফাটায় ...হ্যাঁ রে ভুবন, অনেক শীত আমি দেখেছি। সেই সকল খোয়ারে গড়া এই গতরটা। এবং ভুবনের সেই গতরওলা বাপ চারখানা রুটিই গপগপ করে গিলে ফেলেছিল। ভুবন ঘাট থেকে হাত-পা ধুয়ে এসে শূন্য শালপাতাটা একবার আড়চোখে দেখেই এক গ্লাস জল খেয়ে শুয়েছিল। সারারাতভর নানারকম স্বপ্ন দেখেছিল খালি পেটে।

অনেক আশা নিয়ে ভুবন তখন তার ঝিদেকে মাড়িয়ে হাঁটতে থাকল। তার পা-দুটো তার সামনের লম্বা অস্ফুট ছায়াকে ঠেলতে-ঠেলতে বাবলা গাছটার দিকে তাকে নিয়ে গেল। একটি বছরের ব্যবধানে এ মাঠের পাখিগুলো ভুবনকে ভুলেছে বলেই মনে হয়। অন্তত আজ তারা গা করবে না তাকে দেখে। অন্তত ভুবন তাই লক্ষ্য করছিল। এত বড় মাঠের মধ্যে গাছের সংখ্যা খুব কম। আরও দূরে নীচের দিকে চালু অংশে গেলে জলার ওপাশে নদী, তার পারে যা গাছপালা আছে। তাই পাখির ঝাঁক বাবলাগাছটা চেনে রেখেছে একেবারে। ভুবন দেখেছিল, মাংস খাবার মত পাখির সংখ্যাও কম নয় সেখানে। অর্থাৎ দু-একটা টিয়া পেয়ে গেলে বড়বাবু-ছোটবাবুদের ছেলেগুলোকে গছিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু টিয়ার মত মারাত্মক পাখি আটকানোর ক্ষমতা ওর জালের নেই; মাঝখান থেকে জালটার সর্বনাশ হয়ে যাবে। ভুবন ঠিক করল, বরং আঠাকাঠি পেতে দেবে ধারে কাছে। লাল লঙ্কা আনবার কথা মাথায় ছিল না। সে ঝুলি হাতড়ে এক টুকরো লাল ন্যাকড়া বের করল। এতেই কাজ হবে।

ভুবন আলের মাথায় বসল ধুপ করে। ছেঁড়া শার্টের বুকপকেট থেকে আধখানা সিগ্রেট বের করল। গত রাতে সরকারবাড়ির জামাইবাবুর দান। ইতিমধ্যে দুবার খাওয়া হয়ে গেছে। এখনও বার দুই চালানো যাবে। রাংতা কাগজে মোড়া দামী-দড়ি মুখপোড়া সিগ্রেটটা দেখে বেশ গর্বিতই হল ভুবন। আলোপরী দেখল না সে সিগ্রেট খাচ্ছে। আলোপরী কি আজ মাঠের দিকে আসবে? এলেও রতন হয়ত সঙ্গে থাকবে। আলোপরী ফাঁক পেলে দুঃখ করে, লোকটা যেন আঠার মত লেপ্টে গেছে জনমসঙ্গী! ওর সিঁদুর তখন কী নিষ্প্রভ আর করুণ দেখায়!... ভুবন বেশ আরাম করে চকমকি ঠুকতে থাকল। শোলার টুকরোটা নিস্তেজ হয়ে আছে। আজ যদি জলার ওদিকে যেতে হয়, কিছু শোলা সংগ্রহ করা দরকার। অনেকবার ঠুকে শোলাটা ধরাতে পারল ভুবন। সযত্নে সিগ্রেট ধরিয়ে খুব আস্তে করে টানল সে। পিছনে গ্রামের দিকে একবার তাকাল। গ্রামের উপর দিকটায় দগদগে লাল আভা। চাপচাপ কুয়াশা ভাঙচুর করে সূর্য উঠছে। নরম আলোর উপর সিগ্রেটের নীল ধোঁয়ার সঙ্গে মুখের ভিতর থেকে কুয়াশার মত ভাপও বেরোচ্ছে। ধোঁয়া শেষ হবার পর বেশ কিছুক্ষণ হাঁ করে দমকে দমকে শ্বাস ছাড়ল ভুবন। ভাপগুলো দেখতে লাগল। কোথায় জমে থাকে এগুলো? শূন্য নাড়ির মধ্যে যেন জমে থাকে। দূরে জলাশয়ের উপর রোদ পড়েছে। সেখানেও এমনি ভাপ দেখতে পাচ্ছিল ভুবন। আরশির মত নিষ্কম্প জলের ওদিকে হটিটির ডাক শোনা যাচ্ছিল। টি...টি...টি। ভুবন জানে, জোড়া মরে গেলে বা খড়ের জঙ্গলে তাজা ডিম ভেঙে গেলে ওরা অমন করে ডাকে। টি...টি...টি। বড় বিষণ্ণতা আনে ওই ডাক। পাড়াগেঁয়ে মেয়েদের বিলাপের মত মনকে বারেবারে মৃত্যুর কথা ভাবায়। কিন্তু মৃত্যুর কথা চাপা দিচ্ছিল সে। আলোপরীর কথাই ফের মনে পড়ছিল ভুবনের। ওই আলোপরী যেদিন এগ্রামে নতুন বউ হয়ে এসেছিল, সেদিনই ভুবনের সঙ্গে পরিচয়। এমনি শীতের শেষ দিকে। মাঠের পথে রোদে শিশির শুকিয়ে গেলে গরুমোষদের পায়ে ধুলো ওড়ে। ঘূর্ণী তুলে প্রেতাত্মারা খড়কুটো উড়িয়ে নিয়ে যায়। শিমুলের গাছগুলো লাল ফুলে ভরে ওঠে। রতন তার বউ আনছিল মাঠের পথে। আর ভুবনের কাঁধে পাখিধরা জাল। পথের মাঝেই পরিচয়—নিঃসঙ্কোচে তবু নতুন বউ স্বামীর দিকে তাকিয়ে কথা বলে ভুবনকে। বলে—পাখির শাপে মাথার চুল উঠে যায়, বলো তোমার বন্ধুকে। পাখি ধরা ভালো কাজ নয়। শেষে ওই কথার পৃষ্ঠে ফিক করে হাসি: তা পাখির মাংস খুব মিষ্টি। ফলের মত কোয়া-কোয়া, তেমনি রসাল। পাখি আকাশচরা জীব কি না, তাই তার মাংস এমন। রতন বলে—শুনছ হে ভুবন? ভুবন বলে, শুনলাম হে। ওকে শুধোও দিকি, বাপের গাঁয়ে এমন পাখমারা আছে নাকি? শুনে নতুন বউ হাসতে

হাসতে বলে—আছে। এক শিকারী 'ছোটবাবু' আছে। তার আছে বন্দুক। গাঁয়ের নীচে বিল আছে। বিলে ছোটবাবু পাখি মারে। দু-একটা এদিক-ওদিক দামে আটকালে আমরা কুড়িয়েছি। তা দেখ গো, কুসুমপুরে বুঝি ইনিই ছোটবাবু?

ভুবন তার গর্ববোধটুকু এখনও মনের ভিতর কোথাও টিকে থাকা দেখছিল। কুসুমপুরের ছোটবাবু সে; তার দুঃখ থাকা উচিত নয়।

অনেকটা সময় স্থিরচিত্তে ভুবন বসে থাকল। রোদের তাপ বেড়ে তার শীত-ভাবটুকু ফুরিয়ে যাচ্ছিল একটু করে। এবার সে জামাটা খুলে ঝোলায় রাখল এবং সাবধানে জাল আঠাকাঠি কৌটো একে একে বের করে নিল। প্রথমে দু-হাতে সবগুলো জড়িয়ে একবার কপালে ঠেকাল ভুবন। তারপর পাশে মাটিতে রাখল। বগাড়ীর ঝাঁক ইতিমধ্যে ঘুরে ঘুরে এখানে-ওখানে উড়তে শুরু করেছে। অল্প অল্প বাতাসে মিয়ানো নীরস ঘাস কাঁপছে। চারপাশে একটা ফিসফিসানি শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘাসফড়িং তাদের পাখনার শিশির শুকিয়ে ওড়াউড়ি করছে। তাদের কণ্ঠে চিড়্চিড় করে অদ্ভুত শব্দ ফুটছে। আর বাবলা-গাছ থেকে টিয়াপাখিরা ডাকছিল। শালিখ ডাকছিল। বনচড়ুই উড়ে-উড়ে ঘুরছিল সামনে জমির ওপর। ফর্‌ফর্‌...থর্‌থর্‌ ...শন্‌শন্‌। আঠার কৌটো খুলতে গিয়ে হঠাৎ আনমনা হয়ে গেল ভুবন।

শান্ত, কাচের মত ঝকঝকে সকালের আকাশে, তার চারপাশ ঘিরে এক অকৃপণ সুখ রয়েছে এই পৃথিবীর। সব কিছু বড় নির্ভয়ে নিরাপদে দিনের প্রথম যাত্রা শুরু করেছে। অকৃপণ রোদ। অকৃপণ পাখির মিঠে ডাক। আর অজস্র শস্যকণা এ মাঠের বুকের খাঁজে খাঁজে সঞ্চিত। অথচ সে এল কৃপণ এক জায়গা থেকে। রিক্ত দুটো হাত বাড়িয়ে দাঁড়াল এসে। ভিখিরী, আমি শালা একটা ভিখিরী হে! নিজেকে গাল দিল ভুবন। মনে মনে বলল—আমি এক বেজম্মা শত্তুর। ঘরভাঙা হাত ভুবনের। ভুবন ভয়ানক শত্তুর। অথচ নাইকুন্ডলের পাশে মুখ ঘষে ক্ষিদের কুত্তা কাঁইকুঁই করে। কুত্তাকে মনে মনে প্রবোধ দিয়ে শত্তুর হাতের সাহায্যে কাঠিতে আঠা মাখাতে থাকল সে। কপাল ফললে স্টেশনবাজারে যাবে খাঁচা ভরতি চড়ুই বা বগাড়ী নিয়ে। সাধ যায়, আজ পেটপুরে রসগোল্লাই খাবে। পান খাবে একথিলি। কিনবে একটা সিগ্রেট: রাঙা ঠোঁটে সিগ্রেট টানতে টানতে সোজা চলে যাবে রতনের বাড়ি। বলবে—বঁধু কেমন আছ, দেখতে এলাম হে। তখন, তখন আলোপরী কি হাসবে আড়চোখে চেয়ে? আহা, বড় অকৃপণ হাসে আলোপরী। বিধাতা তার হৃদয়খানিতে যত কিছু দিয়েছেন, সকলই বিলিয়ে দিতে পারে যেন নতুন বউ আলোপরী।

এখানে-ওখানে দূরে ও কাছে আঠা-কাঠিগুলো গুনিগোনতা ছড়িয়ে রেখে এল ভুবন। তারপর বাঁধন খুলে জালখানা কাঁধে ফেলে বেশ কিছুটা দূরে, অনেক জমি খুঁজে, জমির মাটিতে ধানের পরিমাণ বুঝে, জাল পেতে দিল। ছোট ছোট খুঁটিগুলি পুঁতে দিল নরম মাটিতে। গুচ্ছগুচ্ছ কাটা ধানের গোড়ার রঙের সঙ্গে জালের রঙ মিশে যায় কিনা, কিছুক্ষণ পরখ করল সে। দূরে থেকে দূরে এসে পরখ করল। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বাবলাগাছের নীচে এসে দাঁড়াল। হাততালি দিল অনেকক্ষণ ধরে। ঢিল ছুঁড়ল। চিৎকার করে বলল ভুবন—যাঃ, যাঃ, যাচ্চলে যা! তার মনে হল, এই মাঠের মাটির হৃদয় যেমন পাখিদের ক্ষুধা দূর করে, পাখিরাও তার ক্ষুধা দূর করবে।

গাছের সবগুলো পাখি উড়ে গেছে। এমন কি নির্ভীক ফিঙেটাও চলে গেছে গাছ থেকে। সে শূন্য গাছের নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। আর তখনই দেখল, একটা আঠাকাঠি বুকে নিয়ে একটা টিয়ে পাখি জোরে চেঁচাতে চেঁচাতে গ্রামের দিকে উড়ে চলেছে। লাল ন্যাকড়ায় টুকরো বেঁধে লক্ষ্য করেছিল ওকে। ভুবন ছুটতে গিয়ে থামল। অনুসরণ করা নিষ্ফল হবে, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সে দেখল, অনেক দূরে হাইওয়ের ধারে সবচেয়ে উঁচু অর্জুন গাছটায় গিয়ে টিয়ে পাখিটা মিশে গেল। ওর পিছনে দলসুদ্ধই গেছে। যাক!...

আর একবার গ্রামের দিকে আলোপরী আসছে কি না দেখে নিয়ে ভুবন শুকনো ঘাসের উপর চিত হয়ে শুলো। চোখ বুজল। ফের চোখ খুলল। উঃ, কী ভয়ানক হে, আর তো কিছু দেখি না জগতে! ঠাণ্ডাঠাণ্ডা নীল ফাঁকা আকাশ। যদি চলে যায়, চলেই যাবে! তারপর কী? চলে যাবে, চলেই যাবে! উঃ, বড় সর্বনেশে হে! ভুবন তাই চোখ বোজে ফের। রাতের স্বপ্নের অসম্ভব হলদে-হলদে পাখি দেখতে থাকে। গাছের গুঁড়ির মত খসখসে পা থেকে পাতার অঙ্কুর গজানোর মত ঘা। ভুবনের কষ্ট হয়।

রাতে ভালো ঘুম হয়নি। তায় এই মিঠে রোদ। ভুবনের ঘুম পেয়েছিল কখন। হঠাৎ ভর ভর,...ফর ফর,...শন শন ...এবং চিক্...চিক্...চিক্...চিক্...এইসব শব্দে ঘুমের ঝাঁপি খুলে গেলে, পলকে উত্তেজিত গোখরোর মত ফনা উঁচু করে ভুবন উঠল। লাল চোখে তাকাল। দেখল, সামনে তার জালখানা আকাশে ভেসে চলেছে। চিৎকার করে সে ছুটতে থাকল। মাটি খুব নরম ছিল। ওখানে খুঁটি পোতা ঠিক হয়নি তার। ভুবন রাগে আক্রোশে ক্ষিপ্ত হয়ে দৌড়চ্ছিল। আছাড় খেয়ে পড়ছিল বারবার। জালটা চলেছে জলার দিকে। মাঠ ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমেছে এবার। কোন কোন উৎসাহী চাষা কোথাও কোথাও ইতিমধ্যে চাষ দিয়ে ফেলেছে জমিতে। সেই চষা ক্ষেতের চাঙড়ে হোঁচট খাচ্ছিল ভুবন। মা মাসী তুলে উড়ন্ত জাল আর চাষাদের গাল দিচ্ছিল। তার পাখিধরা হাত কুঁকড়ে ঢিল কুড়িয়ে ছুঁড়ছিল জাল লক্ষ্য করে। তারপর সে দেখল, আস্তে আস্তে তাকে পিছনে ফেলে জালটা জলার আকাশ পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। ক্ষুধার্ত ক্লান্ত ভুবন এবার পাখিধরা হাত দিয়ে বড় বড় চুল খামচে ধরল। মুখটা ঝুঁকিয়ে দিল একটুখানি। আস্তে আস্তে মাটিতে থাকল ভুবন।

যখন মুখ তুলল, ভুবন দেখল, তার অজান্ত পা তাকে জলার কিনারা ঘুরিয়ে নদীর ধারে এনে ফেলেছে। ছোট এই নদী। বর্ষায় একবার করে বুক ভরে যায়। তারপর শরতের শেষ থেকে সারা হেমন্তকাল ধরে আস্তে আস্তে শূন্য হয়ে যায়। খালি বুকে তিরতির করে এক-ফালি স্রোত চলে। দু পাশে সোনালী বালি জমে থাকে। তার উপর পাখির পালক পায়ের দাগ আর কিছু খড়কুটো মাড়িয়ে লোকে ওপারের জঙ্গলে যায়। খাড়া পাড় গড়িয়ে নামল ভুবন। ক্লান্ত ছড়ে যাওয়া পায়ের পাতা ভিজিয়ে জলে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। ঠাণ্ডা জলের স্নেহ দিয়ে মায়ের মত এই নদী যেন তাকে আদর করছিল।

—হেই ছোটবাবু!

ভুবন দ্রুত মুখ তুলল। সামনে ওপারে ঢালু পাড়ে খড়ের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে আলোপরী। বাতাসে তার রুক্ষ চুল উড়ছে পাঁজরের কাছে। একটা আনন্দ উদোম হয়ে যাচ্ছে আলোপরীর। বাতাস বড় লম্পট এই বনজঙ্গলের নিরিবিলিতে। ঢাকবার চেষ্টা করে সে হাসছিল। শুকনো মুখ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল তার। পলকে ভুবনের মন ভরে গেল। মনে হল কী তাকে দিল আলোপরী, কী যেন দিল নদীটার মত প্রচুর সান্ত্বনা, কত সব আশা আর ওই হাসির মত সহজ বিশ্বাস। হুড়বড় করে লাফিয়ে-লাফিয়ে নামল ছেলের

মত উঠতে থাকল ভুবন।—চোখ এড়িয়ে চলে এসেছে। সে বলল কাছে গিয়ে। বঁধুর খবর? এসেছে নাকি সঙ্গে?

আলোপরী যেন গল্প করার জায়গা খুঁজতে এগোচ্ছিল হিজল গাছগুলোর দিকে। সে বলছিল—তোমার বঁধুও এসেছে। ছায়া কি সঙ্গ ছাড়ে? ছাড়ে না। গেছে কুলের জঙ্গলে। কুল পেকেছে। কুল তুলবে। শুকনো কাঠ ভাঙবে।

ভুবন বলে—দুঃখের সময় চেনামুখ দেখে আনন্দ লাগে। লাগে না?

—লাগে। আলোপরী বলে। তারপর একটা কাশঝোপের সামনে হঠাৎ বসে পড়ে। ...এখানেই বসি রোদে। আমিও বড় কেলান্ত ছোটবাবু।

ভুবন বসে। বলে—ছোটবাবু! আমি কি তাই হতে পারি আলোবউ, ছোট-বাবুর বন্দুকে থাকে। পাখি পালাতে পারে না। আর আমার বরাতখানা শোন। আমার শত্তুর হাতখানা দ্যাখো।...

সব শোনে আর দুলে দুলে হাসে আলোপরী। মুঠোমুঠো হাসিতে ভুবনকে ভরিয়ে তোলে সে। তারপর বলে—বরাত গুনতে জানো বঁধু? আর আলোপরীর মিঠে গলায় বঁধুডাক ভুবনকে ফের সেই স্বপ্নের ঘরে নিয়ে যায়। সে চোখ বোজে। এবং মাথা নাড়ে। আলোপরী বলে—মানুষের হাতেই সব লেখা থাকে। তোমার হাতে ওই লেখা আছে। আর বলো দিকি, কী লেখন লেখা আছে আমার হাতে?

নিঃসংকোচে হাত তুলে নেয় ভুবন। আলাপরীর অকৃপণ হাসির মতই তার হাত। বুনোহাঁসের পেটের রোমশ পালকের মত একটা কোমলতা। কত পাখি ধরেছে ভুবন! তার কর্কশ হাতের তেলোয় নরম পালকের মিঠে ছোঁওয়া—কী আনন্দ! আর আবিষ্টা সাপিনীর মত নিষ্পলক তাকায় আলোপরী। লাল কাচের চুড়ি চুপিচুপি কী কথা বলে যেন। সে ঠোঁট টিপে হেসে বলে—কী দেখলে গুনিন, বলো। কী ছিল, কীই বা হবে আমার?

ভুবন বলে—তোমার হাত খুব সুন্দর আলো, তোমার খুব সুখ।

শুনে সে জিব কাটে।—সুখ আছে বলতে নেই, পাপ হয়।

—পাপ কী আলো? আমি পাখি ধরি। আমি পাখির মাংস নিজে খাই না। আমার কি পাপ? আমার সুখ আছে বলি না। তবু......

—তোমার কথা বুঝিনে বাপু। হাত ছাড়ো। তোমার বঁধু এসে পড়বে।

ভুবন হাত ছাড়ে না। কারণ সে-হাত ছেড়ে দিলেও উঠবে না যেন, এমন ঘুমন্ত লাগে। সে প্রশ্ন করে—তোমার এত সুখ কিসের আলো? আর আলোপরী চকিতে মুখ ফিরিয়ে নিজের মুখের কিছু ঢাকে।

আলোপরী আস্তে আস্তে তার হাত ছাড়িয়ে নেয়। হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। তারপর তিতিরের মত ঘাসের জঙ্গলে ছুটতে থাকে।

ভুবনের কাঁধে চিতাবাঘ রঙের শূন্য ঝোলাটাও যেন রাগে গরগর করে উঠছিল। শরীরের কোষে বোলতার চাকের মত কী ক্ষতের জ্বালা বাড়ছিল। সে দেখল, সামনে বানে-ওপড়ানো হিজল গাছের একটা ডালে ঠোক্কর লেগে আলোপরী আছাড় খেয়েছে। যেন উড়ন্ত জালের পিছনে ধাবমান ভুবন অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠল—অই, অই, পক্ষী আমার বাঁধা পড়েছে!

ভুবন লম্বা পা ফেলে তার কাছে গেল। আলোপরী ওঠবার চেষ্টা করছিল। অথচ বিশৃঙ্খল কাপড় সরে যাওয়ায় তার দুটো জানুই নগ্ন হয়েছে। ভুবন কাটা গাছের মত উন্মূল শরীরে আছড়ে পড়ল তার কাছে। সে হাঁকায়—আলো, আমার আলো, আমার বুকখানা আজ দ্যাখো। আগুনে জ্বলে গেল হে!

—না, না! তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠেছে আলোপরী। সে দুপাশে মাথা ঘষে। তার খোঁপাখোলা, চুল ছায়াঢাকা শুকনো ফ্যাকাসে ঘাসে লোটে। লাল-পোকা পিঁপড়ে আর ঘাসফড়িঙের পাশে শুয়ে সে ধরাপড়া পাখির মত চেঁচিয়ে বলে—না, না! তার পরিশ্রমী আর গাছের গুঁড়ির মত খসখসে পায়ে পাতার অঙ্কুর গজানোর মত ঘা জ্বলজ্বল করে। সে ফাঁদে ছটফটায়।

ভুবন ফিসফিস করে—আর কিছু করার নাই আমার। আলো, আগুনে জ্বলে গেল হে!

আলোপরী ককায়। শুকনো গাল ভিজিয়ে চোখের জল চোঁয়ায়। সে বলে—আমার শরীল আমার লয়। আমার ছেলে হবে। অকৃপণা আলোপরী তার বুকে হাঁটুর চাপ দিতে দিতে বলে আবার—তোমার ঘরভাঙা হাত, পাখিধরা হাত ছোট-বাবু। অনেক আঁচড় খেয়ে পালিয়েছি। দোহাই তোমার, এই শেষ ঘরখানা ভেঙো না।

ভুবন তাকে ছেড়ে দেয়।—ক্ষ্যামা দিও, বলে সে ওঠে। আর আলোপরী মাতৃ-জঠরের অসম্বৃত কাপড় ঠিকঠাক গুছিয়ে নিয়ে করুণ চোখে হাসে। তার হাসি বলে: দুঃখু করো না। আমি আর উড়তে পারি না। ডানা দুটো ছেঁড়া আর পায়ে পড়েছে বেড়ী। ভুবন আলোর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আকাশে রাখে। আকাশ যেন নীলবর্ণ অন্ধকারে ভরা। উড়ন্ত জালখানা কোন পথে গেল কে বলবে হে! খালি খাঁচা নিয়ে কোন মুখে এখন ঘরে ফিরি! ঘরে আমার বুড়ো বাপ পথ তাকিয়ে বসে আছে। পাখির শাপে মাথার যে চুলগুলো একদিন উড়ে যাবে, সেই চুল ফের খামচে ধরে নদীর দিকে নেমে যায় সে।

উদ্দেশহীন হাঁটছিল ভুবন। চিতারঙা নিস্তেজ ঝোলা নিষ্ফলতার মত পড়ে থাকল হিজলতলায়। মাঠের সেই বাবলা গাছের নীচে পড়ে রইল অপেক্ষমান শূন্য খাঁচা। নাইকুন্ডলে কুন্ডাটাও খুব নিস্তেজ। যেন পিছনে ফেলে সব স্বপ্ন: হলদে পাখি—যাদের অমসৃণ পায়ে অজস্র জলের ক্ষতচিহ্ন অঙ্কুরিত পাতার মত, পিছনে মাড়িয়ে সকল সুন্দর ইচ্ছা, চিবুক গলার খাঁজে বিঁধিয়ে ভুবন হাঁটছিল।...

তারপর শেষ বেলায় রোদের রঙ যখন ঘাসফড়িঙের গায়ের মত খসখসে আর বিমর্ষ হয়ে এল, সামনে পথ দেখল সে। পীচের পথের দুপাশে প্রাচীন পুরুষদের মত লম্বা উঁচু গাছের সারি। এখন তাদের পাতা-ঝরার মরসুম। গাছগুলোর পাতা ঝরে-ঝরে পরস্পর একলা হয়ে যাচ্ছে তারা। মাথার উপর কিছু কুয়াশা কিছু লালচে আভা—তালিমারা টুপি পরে দাঁড়িয়েছে যেন যষ্ঠিখণ্ড হাতে সব বিবাগী ফকির: বলছে—আয়, বেরিয়ে পড়ি একলা যাবার দেশে। ভুবন হন হন করে হাঁটে আর মনে মনে বলে—আমি একলা যাওয়া দেশে যাবো হে!...

এবং আসন্ন সন্ধ্যার প্রবল শীতে কারা পথের পাশে শুকনো পাতা জড়ো করে আগুন জ্বেলেছে। আগুনের আঁচে তাদের মুখগুলো দেখাচ্ছে নরকস্থ পাপীদের মত ঝলসানো। ভুবনের গতরে পাপের শীত। ভুবন শীতে কষ্ট পায়। যাবার মত অনেক শীত সে দেখেনি। সুতরাং কাঁপতে কাঁপতে নরকবাসীদের দলে ভিড়ে ভুবন তার খালি হাত দুখানা সামনে ছড়িয়ে ঝলসে যাওয়ার সুখে কিংবা দুঃখে শুধু বলে—আঃ আঃ!...

আলোয় কালোয়

ত্রিশঙ্কু

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর একটা প্রচলিত দুর্নাম আছে—শোষণের। ব্যবসায় অতিরিক্ত মুনাফার লোভে ওরা প্রত্যেক নিযুক্ত কর্মীর কাছ থেকে শেষ বিন্দু পর্যন্ত কাজ আদায় করে নেয়, বিশ্রাম দেয় না, রক্তমাংসের মানুষকে যন্ত্রের মতো ব্যবহার করে। তবু আমি বলবো, সেখানে প্রাণের স্পন্দন থাকে। আপনি কোনো একটা বেসরকারী ব্যাঙ্কে বা বীমা-অফিসে বা কারখানায় ঢুকলে আর কিছু না হোক, অন্তত সেখানে যে পুরোদস্তুর কাজ চলছে, তা প্রথমেই টের পাবেন।

অথচ একটা সরকারী দপ্তরে ঢুকে দেখুন এক দিন। সাধারণভাবে নোংরা, ঠাসাঠাসি, স্তূপাকার কাগজে ভর্তি ও এলোমেলো। ভেতরের মানুষগুলোর মধ্যে এক ধরনের বেপরোয়া ভঙ্গি ও কে-কার-প্রত্যাশ-করে ভাব। তাঁরা সব সময় ব্যস্ত কিন্তু তেমন মনোযোগ দিয়ে কাজ করছেন না। কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে জেনে নিয়েই আমি এই মন্তব্য করলাম।

কিছুদিন আগে এক সরকারী অফিসের খোদ কর্তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

পা নাচাতে বিষম ব্যস্ত

আগে থেকে সময় নেওয়া ছিল। পৌঁছে খবর পাঠাতে না পাঠাতে তিনি ডেকে পাঠালেন, করমর্দন করলেন। তারপর সমস্ত কথা শুনলেন মন দিয়ে। একজন সহকারীকে ডেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ দিলেন কীভাবে আমার সমস্যা সমাধানে তাঁরা সাহায্য করতে পারেন। তারপর অতি বিনীত সৌজন্য সহকারে বললেন, আপনি এবার এঁর সঙ্গে ভেতরে যান, ইনি ব্যবস্থা করে দেবেন বাকি সব।

ব্যবস্থা মানে আমাকে একটা ছাপানো বই দেওয়া এবং আমার নামে একটি ছাপানো চিঠি ইস্যু করা। সময় লাগলো দু' ঘণ্টার কিছু বেশী। তার কারণ, এই কাজগুলি করার জন্যে পাঁচজন কেরাণী নিযুক্ত আছেন—তাঁরা প্রত্যেকেই গল্প-সল্প করতে, চা-জল-সিগারেট খেতে এবং তারই ফাঁকে পা নাচাতে বিষম ব্যস্ত। যখন বেরিয়ে এলাম, তখন আমার রক্তের চাপ নিশ্চিত দশ মাত্রা উঁচুতে উঠেছে।

সমাজ-সংস্কারক নই, আমি সমালোচকও নই। শুধু সশব্দে ভাববার চেষ্টা করছি—কেন এমন হয়। দু-এক জায়গায় নয়, সর্বত্র। কলকাতায় এবং কলকাতার বাইরে, এবং বাংলাদেশেরও বাইরে। সরকারী বা আধা-সরকারী কর্মচারীদের এবং কিছু কিছু বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের অধস্তন মহলে কাজের স্পৃহা নেই। যতটুকু কাজ না করলে টিঁকে থাকা অসম্ভব, তার বেশী কাজ কেউ করতে চান না। তার ফলে দেরী করে এলে ক্ষতি হয় না, আগেভাগে চলে গেলে অসুবিধা নেই, অফিসে বসেও ঢের সময় পাওয়া যায় কাজ ছাড়া সময় কাটাবার। ব্যক্তিগতভাবে এঁরা কেউ অপদার্থ নন, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, দক্ষ ও হিসেবি। শুধু জীবিকা অর্জনের কাজে বীতস্পৃহ।

সমস্যাটা অনেকখানি সামাজিক। একটা প্রশ্ন তোলা যাক : কেন আমরা কাজ করতে চাই? অর্থাৎ চাকরি করতে। সোজা উত্তর আছে—কারণ, না করে উপায় নেই; জীবন নির্বাহের জন্যে আমাদের নানান-রকম ভোগ্যবস্তুর দরকার, সেগুলি সংগ্রহ করা যায় একমাত্র অর্থ দিয়ে এবং অর্থ-প্রাপ্তির একমাত্র সত্য ও নিরাপদ পথ, পরিশ্রম অর্থাৎ অর্থকরী পরিশ্রম। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ উত্তর হল না। সাঁতার না কাটলে তো জলে ভেসে থাকা যায় না—বললে যেমন ওস্তাদ সাঁতারুদের জল-ক্রীড়ার আনন্দ বোঝানো যায় না।

অর্থ উপার্জনের জন্যে আমরা কাজ করি, চাকরি করি, পরিশ্রম করি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু, বস্তু আমরা চাই পরিশ্রমের বিনিময়ে—যেমন একটা কিছু

গড়ে তোলার, একটা নতুন জিনিস রচনা করে উপহার দেবার আনন্দ। সারাদিন গলদঘর্ম হবার পর কুম্ভকার তার চারদিকে রাশি রাশি মৃৎপাত্র সাজানো দেখলে যেমন খুশী হয়। আমরা প্রতিদিন যে কাজ করতে বাধ্য হই, তাতে সৃষ্টির আনন্দ নেই।

তা ছাড়া সব পরিশ্রমের বা যোগ্যতার উপযুক্ত অর্থমূল্যও নেই—বিশেষত, আমাদের দেশে। শিক্ষার কতকগুলি বিভাগে আর্থিক প্রত্যাশা অন্যান্য বিভাগের তুলনায় ঢের বেশী বা কম। তার ফলে শিক্ষককে কারিগর হতে হয়, গাণিতিককে কেরানী। তাঁদের কাছ থেকে এই অ-কাজের জন্য কতখানি মনোযোগ দাবী করা যেতে পারে? আর্থিক সচ্ছলতা চেয়ে আমরা অনর্থক পরিশ্রমের হাড়িকাঠে গলা বাড়িয়ে দিয়েছি বাধ্য হয়ে, কিন্তু তাও পেয়েছি কি? শতকরা কতজন আমরা শুধু পরিবারের ভরণপোষণের অর্থটুকু উপার্জন করতে পারি দৈনিক আটঘণ্টা পরিশ্রম করে? এইখানে সরকারী চাকরির প্রসঙ্গ আবার এসে পড়েছে।

অনিলদা বলে—বাইশ বছর বয়সে এম এ পাশ করে চাকরিতে যোগ দিলাম। দুশো টাকা মাইনে। পরিবারের হঠাৎ দুশো টাকা আয় বেড়ে গেল, ভারি মজা। প্রচণ্ড উৎসাহ আমার। আপিসে খুব সুনাম। তারপর ক্রমশ বুঝতে পারলাম, দু-তিন বছর বেকার মতো খেটেছি। আমার ভবিষ্যৎ ও সবচেয়ে অকর্মণ্য লোকটির ভবিষ্যৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ছকে বাঁধা মাইনে—কাজ করলেও যতটা

কেন খামোকা গাধার মত খাটি...

বাড়বে, না-করলেও ততটা। কেন খামোকা গাধার মতো খাটি, যতটুকু কাজ না করলে চলে না, ততটুকুই করা উচিত, তখন বুঝলাম। পদোন্নতির জন্যে একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হোল সিনিয়রিটি, অর্থাৎ বার্ধক্য, কারণ অভিজ্ঞতা যা হবার তা তো দু-তিন বছরেই হয়ে যায়, তারপর থেকে চর্বিত-চর্বণ। সুতরাং কলম হাতে চুপ-চাপ বসে থাকা বার্ধক্যের অপেক্ষায়। সারা দিনে একদিন কালি কলম তোলেনই বুঝেছি।

সরকার এদেশে অনেক মালিক নন। অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে অল্পমূল্যে নিযুক্ত রাখতে সমর্থ। যোগ্যতা ও উৎকর্ষের বিচার করে আর্থিক উৎসাহ দিতে অক্ষম। উপরন্তু চরম দুর্বিষহ সরকারী চাকরিতে সক্ষমকে অকেজো করে, অকেজোকে সম্পূর্ণ স্থবির। কেতাবি শৃঙ্খলায় বাঁধা অথচ সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরে হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ অর্ধভুক্ত কর্মচারীতে ভর্তি সরকারী আপিসগুলি তাই সারা দেশময় গমগম করছে। একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপের মতো মাঝে মাঝে একটু নড়ে ওঠে, অন্য সময় শুধু তাদের নিশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। যে কয়েকটি প্রত্যঙ্গে ঈষৎ চাঞ্চল্য ও রক্ত-প্রবাহ আমরা দেখতে পাই, অনুমান করতে পারি, সেখানে বদরক্ত বেশী, সেখানে গোপনে ছুঁইবিল-তহরূপ চলে।

অনিলদা বলে—এক-এক সময় ভালো লাগে না, জানো। মনে হয় এই আধপেটা চাকরির চেয়ে বেকার থাকা অনেক ভালো। বিবেক-দংশন হয়—মানুষ হিসেবে আমি সৎ নই, আমি পঞ্চাশ টাকার কাজ না করে মাসিক তিনশো টাকা বেতন নিচ্ছি। নিজের ছেলেকে যখন পড়াতে বসি মহাপুরুষদের জীবনী ও বাণী, আমি নিজে উচ্চারণ করতে পারি না। এ-তঞ্চকতা আমার ভালো লাগে না।

গরীব দেশ আমাদের। জনসংখ্যার চাপ প্রচণ্ড। শিল্প-বাণিজ্যে যে কোনো পাশ্চাত্য দেশের কাছাকাছি ঘেঁষে দাঁড়াবার ক্ষমতা কোনদিনই আমাদের হবে জানি না। ফলে নিচু হতে হতে চুল পর্যন্ত। মাথার উপরে কোনো বিকল্প আদর্শপুরুষ নেতৃত্ব নেই। স্বাধীনতার পর জন্মেছে এমনি লাখ লাখ নতুন মুখ, আরও হবে। প্রস্তুত হয়ে রয়েছে কিছু একটা করার জন্যে—কাজ, যা করে আনন্দ, যে কাজে সম্মান, যে কাজ করলে সামাজিক সচ্ছলতা। ঠিক এমনি সময়ে দেশজোড়া ইনার্শিয়ার কবল থেকে কেউ রক্ষা করবে না?

ঘরে বাইরে

পাহাড়ের নেশা

১৯৬৬ সালের গঙ্গোত্রী-১ অভিযানের নেত্রী নন্দিনী প্যাটেলের সঙ্গে এবার হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। জাপানী মেয়ের দলের সঙ্গে মিলে যে ভারতীয় মেয়ের দল সম্প্রতি কৈলাস প্রমুখ চারটি পর্বতশৃঙ্গ জয় করে ফিরেছেন নন্দিনী প্যাটেল তাঁদেরও দলনায়িকা ছিলেন। নন্দিনী চটপটে, সদাহাস্যময়ী, সরল, মিশুকে মেয়ে। মাউণ্ট আবুতে যে পর্বতারোহণ শিক্ষালয় আছে নন্দিনী সেখানে শিক্ষয়িত্রী। তিনিই আমাকে আলাপ করিয়ে দিলেন ডলি শাহের-এর সঙ্গে। ডলিও এই রাজস্থানের মাউণ্ট আবুর শিক্ষাকেন্দ্রে পর্বতারোহণ শেখান। নন্দিনী গুজরাতী আর ডলি পার্শী। দুজনেরই মাতৃভাষা গুজরাতী। আমি যখন ওদের সঙ্গে আড্ডা দিতে বসেছি তখন সবেমাত্র ভোর হয়েছে। ভোরের ঘুম ভাঙালো চায়ের পেয়ালা আর খবরের কাগজ সামনে খোলা; নন্দিনী আর ডলি নিজেদের ভাষায় উত্তেজিতভাবে কি যেন বলছেন। হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়তেই লজ্জিত হয়ে গেলেন। আসল কথা কাগজে ওঁরা সদ্য দেখেছেন রবার্ট কেনেডির নৃশংস হত্যার খবর। আশ্চর্য, আশ্চর্য! তথাকথিত সভ্য মানুষ কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে। অথচ প্রকৃতিকে যারা প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যেতে চায় তারা ভাবতেও পারেন না এমন সব কথা। দার্জিলিং-এর পর্বতারোহণ প্রতিষ্ঠানের শ্রীযুক্ত জয়ালের কথা কয়েকটি বলতে বলতে নন্দিনীর চোখ চকচক করে উঠলো, আর আমি ভাবলাম, সাবাস আগামী দিনের ভারতনন্দিনী! জয়াল বলেছিলেন—"The Himalays will forge men who, when they come back to every day life, will do so with a changed perspective ignoring all the petty, trivial and unimportant things that normally take so much of their energy and time and concentration on problems that realy matter. হিমালয় মানুষকে এগিয়ে দেবে। তারা যখন দৈনন্দিন জীবনে ফিরে আসবে তখন তাদের দৃষ্টিভঙ্গী যাতে বদলে ক্ষুদ্র, হীন, তুচ্ছ সব কিছু, যা নিয়ে মানুষে সময় ও শক্তি নষ্ট করে—যে শক্তি তারা প্রয়োজনীয় কাজে দিতে পারে—সেইসব গৌণ নগণ্যতাকে উপেক্ষা করতে পারবে।") আশা করি একথার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত থাকবে চিরকাল।

আস্তে আস্তে অন্যেরা আসর সরগরম করে সবাই এসে বসলেন। জ্যার্ফিন খিয়াংকেকে দেখে তো আমি ভেবেছিলাম জাপানী মেয়ে বুঝি বা। জ্যার্ফিন কিন্তু খাসিয়া পাহাড়ের মেয়ে। অনেক দেশে তিনি ঘুরেই গেছেন। মা বাবা থাকেন শিলং-এ। পড়াশুনো করেন শিলং-এ করেছেন। বর্তমানে মিলিটারী নার্সিং সারভিস বা M. N. Sএ কাজ করেন। এই অভিযানে যোগ দেবার জন্য কর্তৃপক্ষ বেতন সমেত ছুটি দিয়েছেন বলে জ্যার্ফিন ভারী খুশী। পাহাড়পাগল পাহাড়ী মেয়ের দুঃসাহসিক অভিযানে সরকারের সহানুভূতি আছে বলে তিনি কৃতজ্ঞ। পরনে "পরেন" প্রায় পায়ের গোড়ালির কাছাকাছি। ওঁরা নাকি ঘরে বসে ছোট ছোট তাঁতে বোনেন "পরেন"। মোটা কাপড়ের কটিবেষ্টনী স্কার্ট-এর মত। পয়োম দেখে মনে হলো দুটি টুকরো জুড়ে তবে প্রস্থ বাড়ানো হয়েছে। জ্যার্ফিন খিয়াংয়ে

কৈলাস বিজয়িনীদের সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধী

প্রায় কৈলাসের কাছে (ইণ্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউণ্ডেশনের সৌজন্যে)

ভারতবর্ষ ও জাপানের পতাকা কৈলাস শিখরে (ইণ্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউণ্ডেশনের সৌজন্যে)

বললেন, 'এ আমাদের সেকেলে ধরণ। সেই পাহাড়ের আনাচে কানাচেও মিনির প্রভাব পৌঁচেছে। আজ তাই ছোট ছোট পয়মান পরে "ফ্যাশনেবল" পর্বতনন্দিনীরা! উপরের ব্লাউজের নাম "কর"। সেটা প্রায় মিনি, মিডির প্রভাব এড়িয়ে চলেছে, দলের মধ্যে ক্যাপ্টেন শশিকান্তা এসেছেন N. C. C. থেকে। তিনি চণ্ডীগড়ে N. C. C. দপ্তরে সহকারী অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর। সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট কুমারী কোকিলা মেহ্তাও N. C. C থেকেই এসেছেন। এঁদের সঙ্গে আলাপ হবার আগেই N. C. C.-র মহিলা তরফের ভার-প্রাপ্ত অফিসার শ্রীমতী দাশগুপ্তের মুখে শুনেছিলাম এ অভিযানে N. C. C.-র মেয়েদের অংশ গ্রহণের কথা। শ্রীমতী দাশগুপ্ত দুঃখ করে বলেছিলেন, বাংলার মেয়েরা N. C. C.তে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন বলে মনে হয় অথচ N. C. C.-র শিক্ষা সত্যই জীবনে অনেক কাজে লাগে, অনেক সুযোগও এনে দেয়। এই কৈলাস শিখর অভিযান হ'য়েছে জাপানের আলপাইন ক্লাব ও ভারতের ইণ্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউণ্ডেশনের যুগ্ম সাহায্যে। তাতে ৬টি ভারতীয় মেয়ে এবং ৪টি জাপানী মেয়ে ছিলেন। ৬টির মধ্যে দুটি N. C.C. থেকে নেওয়া N. C. C.-র গৌরবেরই কথা।

জাপানী মেয়েদের নেত্রী ছিলেন ইকোমিয়া। জাপানীদের মধ্যে বলতে গেলে কেউই ইংরাজী ভাল জানতেন না। আসরে তাই তাঁরা মিষ্টি হাসি বিতরণ করে যাচ্ছিলেন। মীনা আগরওয়াল এবং ওদের দু একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে বললেন। জাপানী মেয়েরা ১৩,০০০ ফিট-এর উপরে গিয়ে কিছু অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। নিঃশ্বাসের কষ্ট পেয়েছিলেন। হিমালয়ের মত পাহাড় তো আর তাঁদের দেশে নেই। কাজেই এত উচ্চতায় ওঠা অভ্যাস ছিল না। কিন্তু সামান্য যা কিছু অসুবিধা সব কেটে গেছে পাহাড়ের নেশায়। এ এক অদ্ভুত নেশা। তার উপর সহযাত্রী সব আপন জনের মত এক লক্ষ্য নিয়ে যখন এগিয়ে চলে তার প্রভাব কি কম?

মেয়েরা বলছিলেন, চম্বাবাসীরা সবাই তাঁদের কৈলাস শিখরে যেতে মানা করেছিল। হিমাচল প্রদেশের চম্বা জেলার সরল মানুষগুলি যে শৃঙ্গকে কৈলাস বলে তা মানস সরোবর ও কৈলাস যদিও নয় কিন্তু তাদের কাছে এ কৈলাসও দেবাদি-দেবের স্থান। মানুষের যদি দুঃসাহস হয় তবে সে কৈলাস যাবার কথা ভাবে কিন্তু শৃঙ্গে পৌঁছোবার আগেই তারা কেউ হ'য়ে যায় পাথর অথবা আর কিছু। পাঠান-কোট হ'য়ে এগিয়ে [illegible] হয় চম্বার পথে। যেখানে তাঁরা জীপ রেখে পদযাত্রা শুরু করলেন সেখানে গ্রামবাসীরা দলে দলে এসে করজোড়ে প্রার্থনা করেছিল 'যেওনা যেও না। দেবাদিদেব মহাদেবের কোপ তোমাদের নবীন জীবনকে অভিশপ্ত করে দেবে।" ফিরবার পথে সেই গ্রামবাসীরাই এসে হেসে তাদের অভিনন্দন জানিয়েছিল "মহাদেব তোমাদের আশীর্বাদ করেছেন, তাই পেরেছ কৈলাসে পৌঁছোতে।"

নন্দিনী প্যাটেল আক্ষেপ করছিলেন একটি শেরপার মৃত্যুতে। একই রক্তে ছিল সে আর একটি মেয়ে। পূর্ব নেপালের সোলো আর খুম্বু জেলার অধিবাসী হ'চ্ছে এই শেরপারা। শেরপা দেশের প্রধান শহর নামচে বাজার। গৌরীশঙ্কর বা এভারেস্টের ছায়ায় এদের জীবন কাটে। কোনও হিমালয় অভিযান শেরপা না হলে হয় না। দুর্গম গিরি পথের প্রত্যেক মুহূর্তের বন্ধু শেরপারা। এরা বৌদ্ধ কিন্তু গৌরীশঙ্কর এদের কাছে পবিত্রতার পরম প্রতীক। দেশে অনেকেই চাষবাস করেন, কেউ বা ব্যবসায় করেন অল্পবিস্তর। আবার কিছু শেরপা দার্জিলিংএ এসে

বসবাস করছে। এভারেস্ট বিজয়ী শেরপা তেনজিং আমাদেরই দার্জিলিং-এর একজন।

১৯৫৩ সালে তেনজিং-এর বিজয় আমাদের পর্বত অভিযান সম্বন্ধে সচেতন করে দেয়। বিদেশী অভিযাত্রী এসে হিমালয়ের মহান গিরিশৃঙ্গে অভিযান চালিয়েছেন আর শেরপা দল তাঁদের রসদ বহন করেছেন—এই তো ছিল ইতিহাস। ছোটখাটো অভিযানে নেহাত উৎসাহী অভিযাত্রী একটু আধটু করেছেন কিন্তু ব্যাপকভাবে সাহায্যের অভাবে তা ছিল সামান্য। তেনজিং-এর জয় এরপর পণ্ডিত নেহের, ও ডাঃ বিধান রায়ের আগ্রহে দার্জিলিং-এর হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের পত্তন হয় ১৯৫৪ সালে। H M I-এর খরচার অর্ধেক বহন করেন প্রাদেশিক সরকার আর অর্ধেক বহন করেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তর এবং শিক্ষা দপ্তর। প্রতিরক্ষা দেন বাকি অর্ধেকের দুই তৃতীয়াংশ আর শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেন এক তৃতীয়াংশ। গত ১৪ বছরে HMI মাত্র ভারতবর্ষে নয় সারা দুনিয়ায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। HMI ভিন্ন উত্তর কাশীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়েছে। উত্তর প্রদেশ সরকারকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সাহায্য করেন। রাজস্থানের মাউন্ট আবুতে যে কেন্দ্র আছে তা পুরোপুরি প্রাদেশিক সরকারের। এই কেন্দ্রেরই দুটি শিক্ষার্থী নন্দিনী প্যাটেল আর ডলি শাহের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। হিমাচল প্রদেশের মানালিতে অবস্থিত ইনস্টিটিউটটিও প্রাদেশিক সরকারের।

আমার সঙ্গে যেদিন দেখা হলো তারপরদিনই আবার নন্দিনী আর ডলি রওনা হবেন ত্রিশূলে অভিযানে। ২৩,৩৬০ ফুট ত্রিশূলে অভিযান মিলিত অভিযান, পুরুষ আছেন মেয়েও আছেন। কৈলাস ভেল ১৮,৫৫৫ ফুট। ত্রিশূলের দিকও অনা। যোশী মঠ হয়ে যেতে হবে। কি আনন্দে মুখে ক্রীম ঘষছিলেন নন্দিনী বলে বোঝাতে পারবো না। ও'রা বীরাঙ্গনা। রঙ্গ লিপস্টিক, পাউডারের ধার ধারেন না। কেবলমাত্র রোদে ঝলসে যাবার ভয়ে মাখেন ক্রীম বা পেট্রোলিয়াম জেলি সাজসজ্জার অবকাশ নেই। বরং সেই সময়টুকুতে টেনে বের করে দেখাচ্ছিলেন পাহাড়ে উঠবার জুতো যা বাটা কোম্পানী বিশেষ করে বানিয়ে দিয়েছেন, পাখীর পালক দেওয়া মোটা থলের মত বিছানা, এইসব। এবার নাকি জওয়ানদের জন্য উচ্চতায় যে খাবার দেওয়া হয় তা ও গোটাকতক প্যাকেট ও'রা পেয়েছিলেন। পরোটা, তরকারী, চাটনি এমন কি ছোট্ট একটি স্টোভ দেওয়া সেই বন্ধ প্যাকেট। পাঁচজনের খাবার ধরে।

শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যেন রূপ-কথার কাহিনী। আমাদের বাঙ্গালী মেয়েরাও তো পর্বত অভিযাত্রী হিসাবে কম নন। রনটি বিজয়িনী দীপালী সিংহ, সুজয়া গুহ ইত্যাদি আজও আমাদের মনে বিজয়িনীর ভূমিকাতেই আছেন। তবে কেন জানি না ভয় হয়। মাঝে মাঝে অন্য প্রদেশবাসীরা কানাঘুষো করেন: অভিযাত্রী হিসাবে পাকা হলেও বাংলার অভিযানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁদের সন্দেহ হয় নানা রকম। আমার কেবল এই আশা যে তাঁদের সন্দেহ যেন ভুল হয়। বাঙ্গালীরা নাকি এক হ'তে পারেন না বলে আর পাঁচটা ব্যাপারে মত পর্বত অভিযানেও সমবেত প্রচেষ্টা হয় না। মেয়েরাও যদি তা করেন তবে কিন্তু দুঃখের বিষয়। দুঃসাহসের দরজা মেয়েদের কাছে নতুন খোলা হয়েছে। সে পথ প্রশস্ত হ'ক তাই প্রার্থনা করি।

শ্রীমতী

স্বাধীনতার সন্ধানে জননী : দেশে ও বিদেশে

স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের মেয়েরা তাদের স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়েছে। তার জন্য তাকে আন্দোলন, শোভাযাত্রা বা কোন বিক্ষোভ প্রকাশ করতে হয় নি। ভাষা হিন্দী হবে, না ইংরেজী হবে: যুক্ত ফ্রন্ট সরকার চাই, না কংগ্রেস সরকার চাই—এ নিয়ে যে দেশে রক্ত-গঙ্গা বয়ে যায়, সে দেশে মেয়েরা পর্দা ছেড়ে বেরিয়ে দলে দলে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছে ইউপার্টমেন্টের পরোয়া না করে, সেটা আশ্চর্যের কথা নয় কি? বাধা নিশ্চয়ই ছিল, এখনও আছে। তবে সেটা বেশীর ভাগ পারিবারিক। পাড়াগ্রামে সামাজিক বাধা আছে, তার ক্লেশও আছে। কিন্তু সে বাধা রাজনৈতিক আন্দোলনের মত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে নি। পঞ্চাশ বছর আগে যে পরিবারের মেয়ে মহাকালী পাঠশালার গণ্ডি পেরোয় নি, তাকে বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে এসে কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে রাজনীতির তুলনামূলক আলোচনা করতে দেখেছি। অবাক হবার কিছু নেই, এমনি অনায়াসে সচ্ছন্দ গতিতে আমরা এগিয়েছি।

উপার্জনক্ষম মেয়েরা রোজগার করতে নামবে কিনা সে প্রশ্নের উত্তরের আশায় কেউ বসে নেই। বড় বড় শহরে যে মহিলাদের স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালতে দেখা যায় তাদের অনেকেই বিবাহিতা এবং একাধিক সন্তানের জননী। ত্রিশ বছর আগেও বেশীর ভাগ শিক্ষিতা মহিলা খাওয়া পরার চিন্তার হাত থেকে অব্যাহতি পেলে নিশ্চিন্ত আরামের জীবন বেছে নিতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে জীবনের কোন স্তরে সচ্ছলতা বা নিশ্চিন্ততা খুঁজে পাওয়া কঠিন। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম আকাশচুম্বী, আমাদের চাহিদা তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। এই চাওয়া পাওয়াকে মেলাতে গিয়ে ঘরের গৃহিণীর নিদ্রানিদ্রা ঘুচে গেছে। তাকে সকাল নটায় নাকে মুখে গুঁজে ডালহৌসি স্কোয়ারে গিয়ে কলম ধরতে হয়। ঘরের যিনি গৃহিণী, সন্তানের জননী তাকে যখন পথে বেরোতে হয়, স্বভাবতই ঘর সামলাবার দায়িত্বের প্রশ্ন ওঠে।

আমেরিকার এক তৃতীয়াংশ শিশু সন্তানের জননী ঘরের বাইরে নানা কাজে নিযুক্ত। বাড়ির দাসী থেকে আরম্ভ করে বড় অফিসের কর্তৃত্ব সব রকম কাজ এরা করে থাকে। অনেকে চাকুরি করে সংসারের বাড়তি খরচ মেটায়। এ দেশের জীবনধারণের মান অতি উঁচু এবং সে ঠাট বজায় রাখতে হলে মেয়েদের কাজ না নিয়ে উপায় নেই। মায়েরা উপার্জন করে অনেক ক্ষেত্রে ছেলের কলেজের পড়ার খরচ যোগায়, বিদেশে ভ্রমণ করে এবং অনেকে পড়াশুনো করে নিজেদের জ্ঞান ও কর্মক্ষমতা বাড়ায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আমেরিকান মহিলা বেশীর ভাগ সুশিক্ষিতা, বাইরের জগতে রোজগারের পথ করে নিতে তাদের বেগ পেতে হয় না। মেয়েদের বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় পুরুষের সমান, ঘরের কোণে মন বসানো তাদের কঠিন। এর ফলে ঘরের সমস্যা কঠিনতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যে সমাজ ও দেশে বৃদ্ধের স্থান অন্তরালে, শিশু ও তরুণ যাদের অতি আদরের ধন ভবিষ্যতের আশা, সে সমাজে বিকলাঙ্গ শিশু, অবিবাহিত মায়ের স্নেহ বঞ্চিত শিশুর সংখ্যা দেখলে অবাক হতে হয়। আমাদের দেশের মত একান্নবর্তী পরিবার প্রথা এখানে নেই; দাসদাসী স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা কেবল মাত্র কোটিপতির পক্ষে সম্ভব। বেশীর ভাগ মা শিশু সন্তানকে কোন বান্ধবীর দায়িত্বে তার বাড়িতে কিংবা কোন নিরক্ষর, অজ্ঞ নিগ্রো নারীর কাছে রেখে কাজে যায়। আমাদের দেশে ঝি বা আয়া আর আমেরিকান নিগ্রো 'বেবী সিটার' এক শ্রেণীভুক্ত নয়। এ দেশে নিগ্রো ঝিরা ঘন্টা হিসাবে কাজ করে, অসুরের মত খাটে। কিন্তু মনিব বা তার সন্তানের জন্য মমতা বোধ করে না। শ্রমকে এরা পণ্য হিসাবে বিক্রি করে এবং আকাঙ্ক্ষিত মূল্য পাই পয়সা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেয়। বেশীর ভাগ শিশুকে এরা নানারকম ড্রাগ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। কোন কোন শিশুর অযত্ন এবং অবহেলার ফলে মানসিক বিকৃতি দেখা দেয়

এবং অবোধ শিশুর জন্য বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

আমেরিকানরা 'স্ট্যাটিস্টিকস' কষে প্রমাণ করেছে এ দেশে শতকরা পঞ্চাশজন তরুণী বিবাহের পূর্বে যৌনজীবন আরম্ভ করে এবং বিবাহবিচ্ছেদ ও বিবাহ-বহির্গত শিশুর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ছেলেমেয়েদের জন্য সুন্দর সাজানো বাড়ি রয়েছে, কিন্তু সে বাড়ির দরজা খোলবার জন্য স্নেহময়ী জননী, এমন কি কোপন-স্বভাবা দাসী পর্যন্ত নেই। আছে একটি চাবি।

মার্কিন দেশের রাজধানী ওয়াশিংটনের যে পাড়ায় আমি থাকি সেই পাড়াটি উচ্চ মধ্যবিত্তের। মহিলারা উচ্চশিক্ষিত, বেশীর ভাগ দিনের বেলাটা কর্মস্থানে কাটান। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী সরকারের পদস্থ কর্মচারী, স্ত্রী নাম-করা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী। সকাল আটটায় দুজনে দুটো গাড়ি নিয়ে কাজে বেরোন, ফেরেন সন্ধ্যায়। ষোড়শী কন্যা তৃতীয় গাড়ি চালিয়ে স্কুলে যায়। স্কুল শেষে তাকে শূন্য পুরীতে ফিরতে হয়, সঙ্গে একটি বন্ধু আসে, বলা বাহুল্য পুরুষ বন্ধু, তার 'স্টেডী ডেট'। আট বছরের একটি সুন্দরী বালিকা তার সোনালী চুল ঝাঁপিয়ে পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়, তার চাকুরে মা পাঁচটার আগে ফিরতে পারে না। একলা শিশুর পক্ষে বাড়িতে থাকা নিরাপদ নয়, স্কুলের পরে দু ঘণ্টা সে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। অন্যদিকের প্রতিবেশী স্কুলে পড়ান, তাঁদের আর্থিক সঙ্গতি যথেষ্ট। কিন্তু বাড়ি বসে সময় নষ্ট না করে শিক্ষকের কাজ নিয়েছেন। পনেরো বছরের ছেলে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ি আসে না, অসৎ ছেলেদের সঙ্গে পথে ঘোরে। মা দুঃখ করে বলেন যে তিনি বাড়ি বসে থাকলেও ছেলে ঘরে আসত না, তার মন আরো বিক্ষিপ্ত হত। এরা সকলেই ছেলে-মেয়ের স্কুল শুরু হবার পর কর্মক্ষেত্রে নেমেছেন, তবু সমস্যার হাত এড়াতে পারেননি। সমাজতত্ত্ববিদ তার গবেষণার পরিধি বাড়িয়ে চলেছেন। মনস্তত্ত্ববিদ ঘরে ঘরে সমীক্ষা চালাচ্ছেন; কিন্তু কিশোর-কিশোরীর বিবাহ, বছর না ঘুরতে তাদের বিচ্ছেদ, অনাকাঙ্ক্ষিত, অনাদৃত শিশুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

সম্প্রতি কিশোর-কিশোরীরা 'হিপি' দলে যোগ দিয়ে বাবা মার শান্তি ভঙ্গ করছে।

আমাদের অভাবগ্রস্ত দেশের সঙ্গে প্রাচুর্যধন্য আমেরিকার জীবনযাত্রার তুলনা করা যদিও বাতুলতা, তবু মনে হয় কোন দেশেই সমাজের প্রতি স্তরে মাতৃস্নেহ, গৃহলক্ষ্মীর দুখানি কল্যাণহস্তের সেবার প্রয়োজন এখনও ফুরিয়ে যায়নি। এ দেশের ফ্রিজ-ভরা খাবার, সকালে বাড়ির কর্তা ও ছেলেমেয়েরা খাবার বার করে বা তৈরী করে চলে গেল যে যার কাজে। গৃহিণী নিজে কাজে যাবার জন্য তৈরী হলেন। সান্ধ্য ভোজন ছাড়া পরিবারের কেউ কারো সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পায় না। দেশের কথা মনে পড়ে: আমাদের মায়েরা (অতি আধুনিক ও অতি ধনীদের বাদ দিয়ে) সামান্য ডাল ভাতের থালা পুত্র-কন্যার সামনে দিয়ে বসে খাবার তদারক করেন এবং যাবার পথে টিফিন বাক্সটি কিংবা কয়েকটি পয়সা হাতে ধরে দেন। এ দেশের হিসেবে তিনি অযথা সময় নষ্ট করেন। পাশ্চাত্ত্যের গৃহিণী যদি এ সময়টা অপচয় করত তবে বোধ হয় তার ছেলে 'হিপি' জগতে কিংবা ষোড়শী মেয়ে তার সমবয়সী ছেলের গলায় মালা দিয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে বেরোত না।

কর্মক্ষম মহিলাদের অনেক ক্ষেত্রে উপার্জন না করে উপায় নেই। বাড়ির কর্তার সঙ্গে যখন ঘরের গৃহিণী নটায় বাস ধরেন আর ক্লান্ত পদক্ষেপে সন্ধ্যায় ঘরে ঢোকেন, তার ঘর সামলাবার দায় বইবে কে? এদেশের অনুকরণে 'বেবী সিটার' রেখে কিংবা পাড়ার শিশুনিকেতনে ছেলে পাঠিয়ে এ সমস্যার আংশিক সমাধান সম্ভব; তবে মধ্যবিত্ত সংসারের আর্থিক প্রয়োজনে যে মা ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন তাঁর পক্ষে এ বাড়তি খরচ চালানো কঠিন।

আমাদের যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে, তবে এখনও আমাদের বৃদ্ধা শ্বাশুড়ী বা বিধবা মা বৃদ্ধ সেবাশ্রমে নির্বাসিত হননি। দুস্থ আত্মীয় এখনও অনেক সংসারে আশ্রয় পান। দু পক্ষই যদি নিজেদের প্রয়োজন বুঝে পরস্পরকে সাহায্য করে তবে সন্তানের জননীর পক্ষে কাজ করা অসম্ভব নয়। দারিদ্র্য, অনাহার, রোগ, চিকিৎসার অব্যবস্থা প্রভৃতি সমস্যায় মধ্যবিত্তসমাজ জর্জরিত। আয়ের উপার্জনে এ সমস্যার কিঞ্চিৎ সমাধান হলেও মাকে সে চেষ্টা না করে উপায় নেই। কিন্তু শিক্ষিতা ও স্বল্প-শিক্ষিতা জননীর নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ হওয়া প্রয়োজন।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ন্যায় নারী-স্বাধীনতারও প্রস্তুতি প্রয়োজন। হঠাৎ বাঁধ ভেঙে বন্যার জলের মত সমাজের শাসন সংস্কার ভাসিয়ে দিলে তার দাম দিতে হবে। যেমন পশ্চিমের সমাজ আজ দিচ্ছে।

প্রভা ঘোষাল

চব্বিশ পরগণার মন্দির

জয়নগর

অসীম মুখোপাধ্যায়

আদি গঙ্গার তীরে জয়নগর, আজ আদি-গঙ্গা মজে গিয়েছে, বড় বড় দিঘী, খাল ও জলা ছাড়া তার আর কোনও চিহ্ন নেই, কিন্তু জয়নগর আজও দাঁড়িয়ে আছে দক্ষিণবঙ্গের লোক সংস্কৃতির এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হিসাবে।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে রচিত কৃষ্ণরামের "রায়মঙ্গল" কাব্যে জয়নগরের নাম প্রথম পাওয়া যায়। সওদাগর পুষ্প দত্ত আদিগঙ্গার বুকে বাণিজ্যতরী ভাসিয়ে ফিরে চলেছেন দেশে। তার স্বদেশে প্রত্যাগমনের এক সুন্দর বিবরণ দিচ্ছেন কৃষ্ণরাম—

"সেজ্যা না বাহিয়া চলে
কর্ণধার কুতুহলে
বামাই বেতাই কইল পাছে।
সারিগাছি জুড়ি জুড়ি
কাকদ্বীপ গজমুড়ি
ছাড়াইল বণিকের রাজে॥

অম্বুলিঙ্গ মহাস্নান
নাহি যার উপমান
তথায় বন্দিল বিশ্বনাথ,
বাদ্য বাজে সুমধুরে
বাহিয়া রাজা বিষ্ণুপুরে
জয়নগর করিল পশ্চাৎ॥

জয়নগর নামের উৎপত্তিকে কেন্দ্র করে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। কিংবদন্তিটি এইরকম—প্রায় তিন শ' বছর আগে স্থানীয় মিত্রলাল বংশের পূর্বপুরুষ গুনানন্দ এখানে দেবী জয়চণ্ডীর আদেশে এক মন্দির নির্মাণ করান এবং সেই মন্দিরে দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। দেবীর নামানুসারে গ্রামের নাম হয় জয়নগর। এই কিংবদন্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলেই মনে হয়। কেননা গুনানন্দ জয়চণ্ডীর মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন "প্রায় তিন শ' বছর আগে" অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। অথচ যে "রায়মঙ্গল" কাব্যে (কৃষ্ণরাম রচিত) জয়নগরের নাম প্রথম পাওয়া যায় তার রচনাকাল খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ। তা হলে বোঝা যাচ্ছে যে, জয়চণ্ডীর মন্দির নির্মিত হবার বেশ কিছু আগে থেকেই এই গ্রাম গড়ে উঠেছিল এবং এর জয়নগর নামকরণ হয়েছিল অন্য কোন কারণে। তা না হলে কৃষ্ণরাম এই গ্রামের নাম জানলেন কি করে? মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী "দেশাবলী বিবৃতি" নামে একটি সংস্কৃত পুঁথি পেয়েছিলেন। এই পুঁথিটিতে জয়নগর নামের উৎপত্তির একটি কাহিনী আছে,

জয়নগরের মন্দির প্রবেশ পথের উপরভাগে কারুকার্য

"নবদ্বীপ দ্বিজাঃ রাজন পণ্ডিতেষবব
চোত্তমাঃ।
নাভিজ্জৈতুমশকাশ্চানানাদেশীয় পণ্ডিতৈঃ॥
কেন জয়নগরস্থেন পণ্ডিতেন মহাত্মনা,
জিতা নবদ্বীপা দ্বিজা ন্যায়শাস্ত্র বিচারতঃ।
ততো জয়নগরো লব্ধং রাজ্ঞ সকাশতঃ॥"

অর্থ, "হে রাজা, পণ্ডিতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণরা। বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতরা তাঁদের কাছে পরাজয় স্বীকার

জয়নগরের মন্দির—মিত্রগঙ্গার তীরে দ্বাদশ শিবের মন্দির

করেছেন, কিন্তু জয়নগর নিবাসী এক মহাজ্ঞানী ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের পর্যন্ত পরাজিত করেছিলেন, তাই তাঁর দেশের নাম হয় জয়নগর।" জয়নগর নামকরণের এই দ্বিতীয় কাহিনীর কিছু গুরুত্ব আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই এই অঞ্চল সংস্কৃত চর্চার এক অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করতে থাকে। পাণ্ডিত্যে জয়নগরের ব্রাহ্মণরা নবদ্বীপের পণ্ডিতদের সমকক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

এই জয়নগরে, কুলপী রোডের অনতিদূরে, আদিগঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে আছে "মিত্র" জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি মন্দির। অধিকাংশ মন্দিরই পূর্বমুখী এবং তাদের গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ আটচালা শৈলীর গড়ন। কেবল মাঝখানের একটি মন্দির পঞ্চরত্ন। কিন্তু এই পঞ্চরত্ন মন্দিরটির গড়নে এমন কোন আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নেই যা তাকে দু' পাশের আটচালা মন্দিরগুলি থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করতে পারে। মনে হয় যে, অন্যান্য মন্দিরগুলির সঙ্গে সমতা রক্ষা করার জন্যই শিল্পীরা এই পঞ্চরত্ন মন্দিরটি বড় করে নির্মাণ করেন নি।

জয়নগরের এই শিবমন্দিরগুলি স্থাপত্যের দিক থেকে কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দাবি করতে পারে। প্রথমত, অধিকাংশ মন্দিরের প্রবেশ পথের দু' পাশের দেওয়াল "বাট্রেস" বা "আলম্বের"র ভঙ্গীতে নির্মিত। হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন মন্দিরের সম্মুখভাগ এই প্রবেশপথের দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন মন্দিরের সম্মুখভাগকে খাড়াভাবে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্যই এই ধরনের প্রবেশপথের প্রয়োজনীয়তা শিল্পীরা উপলব্ধি করেছিলেন। প্রবেশ পথের দু' পাশের এই দেওয়ালগুলির ঘনত্ব মন্দিরের মূল দেওয়াল অপেক্ষা চোদ্দ ইঞ্চি বেশী।

দ্বিতীয়ত যে শিল্পীরা জয়নগরের এই মন্দিরগুলি নির্মাণ করেছিলেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে তদানীন্তন ইউরোপীয় স্থাপত্য-রীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। "পলাশীর" যুদ্ধজয় প্রকৃতিপক্ষে ভারতে ইংরেজদের "গৃহপ্রবেশ"। এই যুদ্ধের পর থেকেই বাংলা দেশে ইংরেজাধিকার দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে। দেশের অর্থনীতি পুরোপুরি এই বিদেশী বণিকগোষ্ঠীর হাতে এসে পড়ে। দাঁড়িপাল্লা আর লাঠি, দুই-ই তাদের হাতে থাকায় দেশের মানুষ মাথা নত করতে বাধ্য হয়। ফলে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে একটা বড় রকমের দোলা লাগে। আমাদের সনাতন ঐতিহ্য, আচার, ব্যবহারের ভিত টলে ওঠে, পালটে যায় অনেক কিছু, এমন কি আমাদের শিল্পরুচিও। বিশেষ করে, ইংরেজসৃষ্ট, ইংরেজ সাহায্যপুষ্ট ধনী বাঙালী পরিবারগুলির শিল্পরুচি হয়ে দাঁড়ায় বহুলাংশে ইংরেজঘেঁষা। তাদের স্থাপত্যকীর্তি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে।

পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় গিয়েছি। দেড় শ' থেকে দু' শ' বছরের পুরনো বসত-বাড়ি, কাছারী, নাটমন্দির প্রায়ই চোখে পড়েছে। দেখেছি ইউরোপীয় স্থাপত্য-রীতির প্রভাবে ক্লাসিক্যাল, গ্রীক ডোরিক, রোমান ডোরিক, করিনথিয়ান, আয়নিক ইত্যাদি, নানা ধরনের স্তম্ভের ব্যবহার হয়েছে অট্টালিকা, নাটমন্দির, কাছারীর ছাদের ভার বহনের জন্য। "পদ্মাকৃতি", "চিত্রিত", "সচল মুখ-বিশেষ" খিলানের স্থান নিয়েছে "ডেকরেটেড গথিক", "টিউডর গথিক" ইত্যাদি বিদেশী প্রথায় নির্মিত খিলান। শুধু তাই নয়, আলো-বাতাস প্রবেশ করানোর জন্য "প্যালাডিয়ান উইণ্ডো" বসান হয়েছে। উদ্যানসজ্জার প্রধান উপকরণ হিসাবে স্থান পেয়েছে ইউরোপীয় ঢঙে নির্মিত অর্ধনগ্ন পুরুষ ও নারীমূর্তি।

জয়নগরেও আমি দেশীয় ভূস্বামী ও শিল্পীদের ওপর ইউরোপীয় প্রভাব বিস্তারের যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। "মিত্র"দের প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ মন্দির এ কথা প্রমাণ করছে। সব কটি মন্দির একই সময়ে তৈরি হয় নি। সবচেয়ে পুরনো মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল ১৬৮৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে, রামদেব মিত্র এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সবশেষে যে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার বয়স মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর, অর্থাৎ ১৩২৯ বঙ্গাব্দের বা ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। পুরনো মন্দিরগুলিতে ইউরোপীয় স্থাপত্যের প্রভাব তেমন দেখা যাচ্ছে না যেমন দেখা যাচ্ছে পরবর্তীকালের মন্দিরগুলিতে। পুরনো মন্দিরগুলিতে "পদ্মাকৃতি" খিলান ও ভারতীয় আদর্শে নির্মিত স্তম্ভ দেখা যাচ্ছে, আর নতুন মন্দিরগুলিতে স্থান পেয়েছে অর্ধচন্দ্রাকৃতি "করবেলড" খিলান আর ক্লাসিক্যাল কলাম। খিলানের শীর্ষদেশে "ভেনেসিয়ান উইণ্ডো"র মোটিফ উৎকীর্ণ।

জয়নগরের মন্দির : আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ

জয়নগরের ভগ্ন মন্দির

দেড়বোড়িয়ার মন্দির : গভীর জংগলে পরিত্যক্ত

ইউরোপীয় স্থাপত্যের প্রভাব সুন্দর করে ফুটে উঠেছে বড় দোল মঞ্চটির গায়ে। আলোচ্য মন্দিরগুলির একেবারে কাছেই দাঁড়িয়ে আছে এই দোলমঞ্চটি। একটি বৃহৎ বেদীর ওপর মঞ্চটি স্থাপিত। বেদীটি যেন ইউরোপীয় প্রথায় নির্মিত একটি অতি ছোট দোতলা বাড়ি। এক তলায় এক সারি দরজা আর দোতলায় এক সারি জানালা। অবশ্য এই দরজা, জানালাগুলি সবই নিরেট, চুন-সুরকি দিয়ে নির্মিত এবং এদের আকৃতি ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতির কথা মনে করিয়ে দেবে।

মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা "বাংলা মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ" আর আমিই এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। জয়নগরে গিয়ে এই কথাটি আমার বার বার মনে হয়েছে। পোড়া-মাটির সুদৃশ্য অলংকরণের জন্য এই মন্দির-গুলি আজ বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু তা আর হল না। মন্দির-গুলির বর্তমান মালিকদের রুচিবোধকে আমি কখনই প্রশংসা করতে পারব না। পোড়ামাটির সূক্ষ্ম কাজের ওপর বার বার "চুনকাম" করার ফলে মন্দিরগুলির সৌন্দর্য একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে, মন্দির সংরক্ষণের যে অদ্ভুত উপায় তারা আবিষ্কার করেছেন, তার ফলে মন্দিরের ভাস্কর্য মূল্য আর রইল না। অবশ্য এ ধরনের ব্যাপার পশ্চিম বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও যথেষ্ট দেখেছি। দ্বিতীয়ত, অনেক সুন্দর নকশাকে কোন শক্ত ও ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে তুলে ফেলা হয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীরা কেউ কেউ আমাকে জানিয়েছেন যে, এক ধরনের দুষ্কৃতকারী মন্দিরের নকশা তুলে নিয়ে বিদেশীদের কাছে বিক্রি করে

ভিত
৩'-৫"
সিঁড়ি
বেদী
১২'-১০" × ১২'-১০"
দোলমঞ্চ
৩'-০"
৩'-১"
২'-১০"
২৪'-০"
২০'-৭"
৩'-৮"
২৫'-১"
২'-০"
৩০'-০"

জয়নগরের মন্দির—দোলমঞ্চের নক্‌শা

অংকন—প্রদীপ ভট্টাচার্য

দিয়েছে।

যেসব মোটিফ পোড়ামাটির অলংকরণ হিসাবে এই মন্দিরগুলির গায়ে স্থান পেয়েছিল তাদের মধ্যে নানা ধরনের মিথুনেই প্রধান। হান্টারের স্ট্যাটিসটিকাল একাউন্ট অব বেংগল (ভল্যুম-ওয়ান) বইতে জয়নগরের এই মন্দিরগুলির মিথুন ভাস্কর্যের উল্লেখ আছে।

"The old bed of the river has **dammed across, and at Jaynagar** it forms a continuous line of tanks at one of which are some old temples decorated with indecent sculptures".

বর্তমানে মাত্র দুটি মন্দিরের গায়ে মিথুন মোটিফ সম্বলিত তিনটি টালি আছে। বাকীগুলি স্থানীয় রক্ষণশীল লোকেরা নষ্ট করেছেন। সামাজিক সুচিতা রক্ষার কি চমৎকার উপায়! মন্দিরগাত্রে মিথুনের এই ব্যবহার বিভিন্ন জেলার বহু মন্দিরেই দেখা যাবে, কোথাও কম, কোথাও বেশী। মিথুনের ব্যবহার খুবই পুরান প্রথা এবং তার নানা ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদ পর্যন্ত মন্দিরের গায়ে যে মিথুনের ব্যবহার, তা তখনকার দিনের উচ্চবিত্তদের যৌনবিকৃতি তথা রুচিবিকৃতির পরিচায়ক। এমন সব মিথুন কয়েকটি মন্দিরে দেখেছি যে কোনও রকম বর্ণনা দেওয়া ভদ্রতার আদর্শ বিরোধী। অবাক হয়ে কেবল ভেবেছি যে তখনকার বঙ্গসমাজে উচ্চ কোটির নরনারীর একটি অংশ ব্যভিচার আর বিলাসব্যসনে কেমন করে গা ঢেলে দিয়েছিল! যারা ঊনিশ শতকের বঙ্গসমাজের পূর্ণচিত্রটি পেতে চান তাঁদের আমি মন্দিরগাত্রের এই মিথুন মোটিফগুলি খুঁটিয়ে দেখতে বলছি।

জয়নগরের অনতিদূরে দেড়বেড়িয়া গ্রামে ভীষণ জঙ্গলে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি আটচালা মন্দির দেখতে পেলুম। আলোকচিত্রটি দেখলেই বুঝতে পারা যাবে জঙ্গলের আসল চেহারাটা। "পঙ্ক" ও "পোড়ামাটি"র, উভয় প্রকার অলংকরণই রয়েছে এই মন্দিরটির গায়ে। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাফলকে উৎকীর্ণ লিপিটি এই রকম—

"মুনিপক্ষর্ষিপৃথিবীমিতে শাকে
অচ্যুতালয়ঃ শ্রীরাজচন্দ্রদেবেনকৃতঃ।"

অর্থাৎ ১৭২৭ শকাব্দে বা ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়, প্রতিষ্ঠাতা রাজচন্দ্রদেব।

জয়নগর ছেড়ে আসার আগে, আমি শ্রদ্ধেয় কালিদাস দত্ত মহাশয়ের সাথে দেখা করতে যাই। এই নিরভিমান, নিরহংকার, জ্ঞানতাপসের কথা বাঙালীর কাছে অজানা থেকে গেল। কেননা তিনি প্রচার চান নি, প্রতিষ্ঠা চান নি। পশ্চিমবঙ্গে, আঞ্চলিক ইতিহাসের অন্যতম পথিকৃৎদের মধ্যে তাঁর স্থান নিঃসন্দেহে সবার আগে থাকবে। চব্বিশ পরগণা জেলার প্রাচীন কালের ইতিহাস সংকলনের কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। নিজ ব্যয়ে, বহু সার সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে, আপদ-বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান পরিচালনা করেছেন তিনি। গত ১৯৫৫ সালে আশুতোষ মিউজিয়ামের খনন কার্য পরিচালন বিভাগের অধিকর্তা কে জি গোস্বামী কালিদাস দত্ত সম্পর্কে বলেন যে "জয়নগর-মজিলপুর নিবাসী কালিদাস দত্তের কাছ থেকে তিনি ও অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ বেড়াচাপার প্রাচীনত্বের কথা জানতে পারেন। ডঃ স্টেলা ক্রেমরিশ, ডঃ ভোগল, ডঃ টমাস প্রভৃতি বিদেশী পন্ডিতেরাও কালিদাস দত্তের গবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ করেন। বাংলার লৌকিক দেবদেবী নিয়েও দত্ত মহাশয় বহু মৌলিক গবেষণা করেন। তাঁর মিউজিয়ামটি ঘুরে দেখলে বোঝা যায়, সারাজীবন কি প্রচণ্ড ধৈর্য, জ্ঞান আর নিষ্ঠা নিয়ে তিনি ইতিহাস চর্চা চালিয়ে গেছেন।

মাত্র কিছু দিন হল কালিদাস দত্ত ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর জয়নগরের বাড়িতেই মারা গেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎকারের কথা আজ বার বার মনে পড়ছে, যেন দেখতে পাচ্ছি আমার মুখোমুখি তিনি বসে আছেন ক্লান্ত, পাণ্ডুর মুখে ঝকঝকে দুটি চোখ, যেন প্রতিজ্ঞায় বৈদুর্যমণি, ধীর কণ্ঠে আমাকে বলছেন "সেরে উঠলে আবার সুন্দর বনে যাব, ফেলে রাখা কাজ শেষ করতেই হবে।"

আলোকচিত্রগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত।

আলোচনা

উন্নতির শর্ত

৪ জুন ১৯৬৮ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত অধ্যাপক অম্লান দত্তের 'উন্নতির শর্ত' নামক প্রবন্ধটি, নিঃসন্দেহে, মূল্যবান এবং সময়োপযোগী। মূল্যবান, কেন না আর্থিক উন্নতির প্রধান শর্তগুলো এ প্রবন্ধে অত্যন্ত সুবোধ্যভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ; সময়োপযোগী, কেন না আজকের ভারতবর্ষের মতো দরিদ্র দেশে এই ধরনের সামাজিক জিজ্ঞাসা যথার্থই প্রয়োজনীয়। কৃষি ও শিল্পে বিজ্ঞানের সুচারু প্রয়োগ, শ্রমের প্রতি নিষ্ঠা, মূলধন-গঠন ইত্যাদি আর্থিক উন্নতির শর্তগুলোর অপরিহার্যতা সম্পর্কে আশা করি কেউ বিতর্কের অবতারণা করবেন না। কিন্তু অধ্যাপক দত্তের কয়েকটি মন্তব্যের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বোধ হয় সংশয় সৃষ্টি করতে পারে। সম্ভবত স্থানাভাবের জন্যই তিনি তাঁর এ প্রবন্ধে এই আনুষঙ্গিক মন্তব্যগুলোর পরিষ্কার আলোচনা করতে পারেন নি। আমি নিচে এরকম কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করলাম। নিজের অজ্ঞতাই এ প্রশ্ন উত্থাপনের কারণ। 'দেশ' পত্রিকার মতো বহুল প্রচারিত প্ল্যাটফর্মে এ প্রশ্নগুলোর প্রক্ষোভ-বর্জিত যুক্তি-আশ্রয়ী আলোচনা হলে ভালো হয়।

এক ॥ শ্রমের প্রতি সমীহা আর্থ উন্নতির একটি প্রধান শর্ত, অধ্যাপক দত্ত বলেছেন। অনস্বীকার্য। এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রমোদ্যোগের সহায়ক হিসাবে ইওরোপে আধুনিক যুগের প্রারম্ভে পিউরিটান এথিক্ এবং জাপানে কিছুকাল আগের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দৃষ্টান্ত স্বরূপে ব্যবহার করেছেন। এই উদাহরণগুলো যথাযথ সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো একটি বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রমের উদ্যোগ বা তার অভাব সম্ভবত কতগুলো তন্ত্রাপ্ত শর্ত দ্বারাই নির্ধারিত হয়। অন্তত সাধারণ অর্থে। যেমন, মার্ক্স-বর্ণিত 'এশিয়াটিক্' উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমোদ্যোগের অভাব এবং অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় ও অংগজ্ঞ জীবনযাত্রার ব্যাখ্যা খাড়া করা হয়েছে অসংখ্য বিচ্ছিন্ন স্থানিক সম্প্রদায়গুলোর হস্তশিল্প ও চাষবাসের একটি উদ্বাহ-বন্ধনের মধ্য দিয়ে, যা সম্পূর্ণ স্বয়ং-পোষক এবং যা নিজের মধ্যে উদ্বৃত্ত উৎপাদন এবং সঞ্চয়নের সকল বীজ ধারণ করতে সক্ষম।(১) অধ্যাপক দত্তের প্রবন্ধটি পড়ে এ কথাই মনে হয়েছে, তিনি ইতিহাসে তন্ত্রাপ্ত পরিবেশের প্রভাব এবং ভূমিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন : "পুঁজিপতির ব্যক্তিগত ইচ্ছা দিয়েও শ্রমিকশ্রেণীর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় না" (পৃঃ ৬৪৮); "অসাধ্যসাধনে মত্ত হলে অকারণে দুর্দশা বাড়ে" (পৃঃ ৬৪৯); "মূলধন গঠনে সহায়তা করাই পুঁজিপতিশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা" (পৃঃ ৬৪৯) প্রভৃতি মন্তব্যগুলো তো স্ব-প্রকাশক। সুতরাং কোনো একটি সমাজ-সংগঠনে শ্রমের প্রতি সমীহা বা অনীহা সেই সমাজ-অন্তর্নিহিত তন্ত্রাপ্ত উপাদান দিয়েই ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত বলে নিশ্চয়ই মনে করেন অধ্যাপক দত্ত। তাই শুধুমাত্র ক্যাল্ভিনিজম্ বা জাপানী দেশপ্রেম দিয়ে যথাক্রমে আধুনিক যুগের প্রারম্ভকালীন ইওরোপীয় সমাজে এবং আধুনিক জাপানী সমাজে শ্রমোদ্যোগের বর্তমানতা ব্যাখ্যা করা কী অনায়াসসাধ্য বলে মনে হয় না? জাপানের এই দেশাত্মবোধ বা ইওরোপের এই পিউরিটান্ এথিক্ গড়ে উঠল কী-কী সামাজিক শর্ত অবলম্বন করে, এটাই বোধহয় আসল প্রশ্ন।

দুই ॥ উপনিবেশ থেকে সংগৃহীত সম্পদে প্রতীচ্যের পুঁজিবাদী দেশগুলোর প্রাচুর্য গঠিত হয়েছে কী বা কতখানি হয়েছে, এই ধরনের প্রশ্ন অনেকের মনেই উঠে থাকবে। কেউ কেউ অবশ্য ভারতবর্ষ থেকে 'লুণ্ঠিত' সম্পদ এবং ব্রিটেনে শিল্প-বিপ্লবের জন্য আবশ্যিক মূলধনের একটা সংযোগ লক্ষ্য করে থাকেন। তবে অধ্যাপক দত্ত যেমন বলেছেন (পৃঃ ৬৪৫), ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা কোনো দেশেরই আর্থিক উন্নতির 'অপরিহার্য' শর্ত নয়। কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী শোষণ নির্ভর করেই ইউরোপীয় শিল্প-বৈভব গড়ে উঠেছে, এই ধরনের মতবাদের উৎস সম্ভবত (ক) ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আফ্রিকা বা এশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত জাতীয়তাবাদের উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ, এবং (খ) উনিশ শতকের শেষার্ধে এবং বর্তমান শতকের প্রথম দশকগুলোতে পুঁজিবাদ-অনুপ্রাণিত যন্ত্রশিল্প ভিত্তিক ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে হবসন লেনিন প্রমুখদের বক্তব্য অনুসরণে পরবর্তীকালের বিবিধ আলোচনার চাপল্য। কিন্তু আর্থিক উন্নতির 'অপরিহার্য' শর্ত যে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা

(১) কার্ল মার্ক্স : 'পুঁজিবাদ-পূর্ব অর্থনৈতিক সংগঠন' (লণ্ডন, ১৯৬৪), পৃঃ ৭০ এবং অন্যান্য।

নয়. অধ্যাপক দত্তের এই বক্তব্যে বোধ হয় কেউই আপত্তি তুলবেন না। কিন্তু তাঁর এই বক্তব্য সম্পর্কে দুটি প্রশ্ন রয়েছে।

প্রথমত, উপনিবেশ গঠন (অন্তত রাজনৈতিক অর্থে) আধুনিক পুঁজিবাদের 'অপরিহার্য' অঙ্গ নয় বটে, কিন্তু যা অনেকটা অপরিহার্য তা হল দেশের সীমান্ত ছাড়িয়ে পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত বহির্বিস্তারণ প্রবণতা। লাভের হারের ক্রমক্ষীয়মাণতা এবং আণ্ডার-কন্‌সাম্পশ্যান, এই দুই কারণে বোধ হয় সামাজিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি হিসাবে পুঁজিবাদে কখনো খুব একটা সুস্থিতি লক্ষ্য করা যায় নি। এই পদ্ধতির ভেতরকার এই সব গোলমাল এড়াবার জন্য তাই এককালে বাইরের কাঁচামাল ও বাজার এবং পুঁজি রপ্তানির সুযোগ অন্বেষণ লক্ষণীয়। বিভিন্ন দেশে যন্ত্রশিল্পের প্রসারের পর (ব্রিটেনের একচেটিয়া প্রাধান্যের পরিবর্তে বেশ কয়েকটি শিল্পোন্নত দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে) উনিশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশ থেকে পুঁজিবাদের বহির্বিস্তারণ প্রবণতা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। ফলে, অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার ভাঙন এবং পুঁজিবাদের এই নতুন আবহাওয়ায় উপনিবেশের সন্ধানে প্রমত্ত অন্বেষণ। বস্তুত, অন্তর্জাত পরিবর্তনের ফলে পুঁজিবাদের গঠনগত চরিত্রই পালটে যেতে আরম্ভ করে : শিল্প উৎপাদনের সঙ্গে ব্যাংক ব্যবস্থার সংযোগ, বিনিয়োগী পুঁজির হাতে শিল্প ক্ষমতার সমাবেশ, এবং পরিশেষে অধিকতর লাভের সন্ধানে 'অনুন্নত' এলাকায় উদ্বৃত্ত পুঁজির বিদেশযাত্রা (অর্থাৎ মূলধন রপ্তানি)। রাজনৈতিক অধিকার অর্থাৎ প্রত্যক্ষ উপনিবেশ দখল এ ক্ষেত্রে স্বভাবতই সুবিধাজনক : দখল করতে পারলে ভালো না-হলে কিছু এসে যায় না যদি প্রয়োজন মতো পুঁজি রপ্তানি করা যায়। অন্য কথায়, অধিকতর লাভের আশায় বিদেশে 'উদ্বৃত্ত' পুঁজির বিনিয়োগ—এই কী আসল কথা নয়?

আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরিবর্তিত আবহাওয়ায় হয়তো (রাজনৈতিক অর্থে) উপনিবেশ সংরক্ষণ সম্ভব নয়, এবং পুঁজিবাদের প্রত্যক্ষ ধরণও পালটে গেছে। আজকের 'উন্নত' পুঁজিবাদের রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক চেহারায়ও এক ধরনের আপাত সুস্থিতি গড়ে উঠেছে বলা যেতে পারে। হয়তো পুঁজিবাদের আত্ম-সংশোধন : পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সাহায্য ও সহায়তা, বিশেষ ধরনের দ্বি-পাক্ষিক বা আঞ্চলিক বাণিজ্য (ও অন্যান্য) ব্যবস্থা, নিরন্তর সমন্বয়োজনের মধ্য দিয়ে এক নতুন কৌশলের 'অর্থনৈতিক' প্রযুক্তি, ইত্যাদি। এবং এ ব্যাপারে মার্কিন দেশের প্রাধান্য ও বহুবর্ণীয় ভূমিকা কেউই অস্বীকার করবেন না। এই পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক দত্তের মন্তব্য (পৃঃ ৬৫০)—"ভিয়েতনাম হাত ছাড়া হলেও মার্কিন অর্থনীতি ভেঙে পড়বে না"—অবান্তর নয় কী? ভিয়েতনাম থেকে সরে এলে মার্কিন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিশ্চয়ই চোখে অন্ধকার দেখবে না, কিন্তু সারা পৃথিবী থেকে অর্থ-বিনিয়োগ গুটিয়ে নিলে এবং সমরবর্তমান সমরায়োজন পুরোপুরি বন্ধ করে দিলে কি মার্কিন পুঁজিবাদ ব্যবস্থার একটুও মুশকিল হবে না?

দ্বিতীয়ত, উপনিবেশ কখনো কখনো সাম্রাজ্যবাদী দেশের উন্নতির বাধা হয়ে দাঁড়ায়, অধ্যাপক দত্তের এই মন্তব্য (পৃঃ ৬৫৫) সাধারণ অর্থে ঐতিহাসিক বিচারের আশ্রয়ে প্রতিপালিত কী? উপনিবেশ যে একটি 'অপ্রীতিকর বোঝা', এ মতবাদ অবশ্য নতুন নয় : গ্রোভার ক্লার্কের 'এ প্লেস ইন দা সান' (১৯৩৬) থেকে শুরু করে অধ্যাপক দত্ত উল্লিখিত জন স্ট্রেচির 'দি এণ্ড অব এম্পায়ার' মোটামুটি একই সুরে বাঁধা। এ প্রসঙ্গে তিনটি প্রশ্ন উত্থাপন করা প্রয়োজন :

(ক) পুঁজিবাদী ব্যবস্থার 'বাণিজ্য' ভিত্তিক পর্যায় ও 'যন্ত্রশিল্প' ভিত্তিক পর্যায়ের মধ্যে প্রতি তুলনায় এই শেষোক্ত পর্যায়ের উপরোল্লিখিত বহির্বিস্তারণ প্রবণতার সঙ্গে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী ক্রিয়াকলাপের নিকটতর সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় কী? অনস্বীকার্য, ইতিহাসের কোনো কোনো অল্পকালব্যাপী পর্যায়ে প্রত্যক্ষ উপনিবেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ব্যয়বহুল মনে হতে পারে। বস্তুত, ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লবের পূর্ব মুহূর্তের ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিতর্কের ইতিহাস 'সাম্রাজ্যের ভারে' যথেষ্ট ক্লিষ্ট। কিন্তু তবু অন্যান্য কারণে, শিল্প বিপ্লবের পর, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নেতাদের এ কথা সবিশেষ মনে হয় নি।

(খ) সাম্রাজ্যবাদী দেশের পক্ষে পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক দিক থেকে 'ক্ষতিকর' হয়েছে, এ ধারণা ইতিহাসের পরিসাংখ্যিক তথ্য দিয়ে (জন স্ট্রেচি যাই বলুন না কেন) সপ্রমাণ করা বোধ হয় সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য, সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক কারণে একটি উপনিবেশ অন্যটির তুলনায় কম লাভজনক হতেই পারে—যেমন ভারতবর্ষের তুলনায় সাহারা মরুভূমি। কিন্তু সাধারণ অর্থে, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদী দেশগুলোকে অনেক কিছুই জুগিয়েছে : যেমন, কাঁচামাল২, শিল্পজাত বস্তুসামগ্রীর বাজার৩, পুঁজি রপ্তানির সুযোগ-সুবিধা৪, ইত্যাদি।

(গ) উপনিবেশ থেকে আহরিত সম্পদ সাম্রাজ্যবাদী দেশের সর্বজনভোগ্য বৈভবে সব সময় পর্যবসিত হয় না। এই প্রসঙ্গে নর্মান অ্যাঞ্জেল পরিবেশিত একটি গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হীরক জয়ন্তী (১৮৯৭) উপলক্ষে লণ্ডনের রাস্তায় এক বিরাট আড়ম্বরপূর্ণ মিছিল দেখে একজন ভিক্ষুকের খেদোক্তি : যে সাম্রাজ্যে সূর্য কখনো অস্ত যায় না, সেই সাম্রাজ্যের অংশীদার হয়েও সে জানে না রাত্তিরে তার খাবার জুটবে কি না।৫ হায়,

---

(২) যদিও বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের—যখন প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ক্রম-পশ্চাদপসরণ প্রায় সম্পূর্ণ—কোনো পরিসংখ্যান যথাযথ চিত্র অংকন করতে পারে না, তবু ১৯৪৮ সালে উপনিবেশগুলো পৃথিবীর ৫১% বক্সাইট, ৪৫% আকরিক টিন, ৪০% ফস্‌ফেট পাথর, ২২% ম্যাংগানিজ, ১৮% তামা ও ১৫% ক্রোমাইট ও অ্যাসবেস্টাস সরবরাহ করেছে [উড্রুই এস ওয়টিনস্কি ও ই এস ওয়টিনস্কি : 'ওয়ার্লড কমার্স অ্যাণ্ড গভর্নমেণ্টস (নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৫), সারণি ২০৬ ২০৮, পৃঃ ৬৬৭-৮]।

(৩) ১৯৫১ সালে পৃথিবীর ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলো অন্যান্য দেশের থেকে প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলারের জিনিসপত্র আমদানি করেছে আর বদলে রপ্তানি করেছে মাত্র ৭½ বিলিয়ন ডলারের জিনিস।

(৪) তা ছাড়া, সস্তা শ্রমিক, সামরিক ঘাঁটি (যথা সুয়েজ, সিংগাপুর প্রভৃতি) তো আছেই।

(৫) দ্রষ্টব্য, স্যর নর্মান অ্যাঞ্জেল : 'হু ওনস দ্য ব্রিটিশ এমপ্যায়ার' (লণ্ডন ১৯৩৯)।

এই ইংরেজ ভিক্ষুকটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে আহরিত সম্পদের কণামাত্র ভোগ করল না: বস্তুত উপনিবেশ-নিষ্কাশিত সম্পদ সাম্রাজ্যবাদী দেশের শ্রেণীবিশেষেরই করায়ত্ত, সর্বজনের নয়।৬ সুতরাং সাধারণ অর্থে, সেই 'দেশটির' আথেরে লাভ হল কী হল-না, তা যাচাই করা হবে কী করে?

তিন॥ অধ্যাপক অম্লান দত্ত তাঁর প্রবন্ধের দ্বিতীয় ও তৃতীয়াংশে (ক) মূলধন গঠনে পুঁজিবাদী প্রথা ও সমাজতন্ত্রী বা সাম্যবাদী রাষ্ট্রের একটি প্রত্যক্ষ তুলনা এবং (খ) সাধারণ অর্থে ইতিহাসে এই দুই ব্যবস্থার কৃতকর্মের একটি প্রতিতুলনা খাড়া করেছেন। (খ) সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়, চারশত বৎসরব্যাপী সক্রিয় একটি অর্থনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে মাত্র অর্ধ শত বৎসর হল গড়ে উঠেছে যে ব্যবস্থা তার আর্থিক কৃতির তুলনা সঙ্গত কি না। আর যদিও আর্থিক উন্নতির ক্রমবৃদ্ধির গড়পড়তা হার নিয়ে কোনো তুলনা হয়তো সমীচীন হবে না, তবু এ দিক থেকে তুলনা করলে কোন ব্যবস্থায় এই উন্নতির হার অধিক? (ক) সম্পর্কে অধ্যাপক দত্ত ঠিকই বলেছেন যে বিজ্ঞান নির্ভর শিল্প ভিত্তিক সমাজ গঠন উভয় পদ্ধতিরই মূল উদ্দেশ্য। তবু এ ব্যাপারে অন্তত তিনটি প্রশ্নের সমাধান হওয়া প্রয়োজন।

প্রথমত, এই দুই পদ্ধতির একটি শ্রেণী-বৈষম্য ভিত্তিক সমাজ, আরেকটি নয়। দ্বিতীয়ত, নৈতিক মূল্যায়ন বাদ দিলেও, অর্থনৈতিক 'অপচয়' কোন ব্যবস্থায় বেশী? অধ্যাপক দত্ত শুধুমাত্র বলেছেন (পৃঃ ৬৯৮), অপচয় দুই ব্যবস্থাতেই বর্তমান। অনস্বীকার্য, বৃহদাকার শিল্প ভিত্তিক উৎপাদনে কিছুটা অপচয় হবেই। কিন্তু এই অপচয়ের চরিত্র এবং বহর কী দুই ব্যবস্থায় একই ধরনের? ঝুঁকি না নিয়েই হয়তো বলা যায়, পুঁজিবাদ উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্গত অপচয়ের অতি-প্রাচুর্যকে প্রায় সচেতনভাবেই আজ একটি 'পদ্ধতিতে' পরিণত করা হয়েছে। বিপণনাকৃতি প্রচার ব্যবস্থার প্রকাণ্ড খরচ তো রয়েছেই, তা ছাড়া রয়েছে (অন্যান্য মধ্যে) কৃত্রিম উপায়ে চাহিদা সৃষ্টির বিরাট ব্যয়: সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য বস্তুসামগ্রী সামাজিক মর্যাদা সংরক্ষণে 'পুরোনো' হয়ে যাচ্ছে (status obsolescence) বলে নতুন মডেল তৈরীর খরচ। শোনা যায়, ডেট্রয়েটের মোটরগাড়ির নতুন মডেল তৈরীর ব্যয় "সারা ভারতবর্ষের বেশ কয়েক বৎসরের উৎপাদন পরিকল্পনার সম্পূর্ণ অর্থ বিনিয়োগের" চেয়ে বেশী।৭ তৃতীয়ত,

অধ্যাপক দত্ত বলেছেন (পৃঃ ৬৪৮), শ্রমিকের সৃষ্ট ধনের একটা অংশ পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী উভয় ব্যবস্থাতেই শ্রমিকের হাতের বাইরে যথাক্রমে পুঁজিপতি ও রাষ্ট্রের হাতে চলে যায়, এবং পরিশেষে তা মূলধন বৃদ্ধিতে লাগানো হয়। মন্ময় (subjective) দিক থেকে অধ্যাপক দত্ত অবশ্য এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্যের কথা নিজেই স্বীকার করেছেন: সাম্যবাদী রাষ্ট্রে শ্রমের উদ্বৃত্ত আহরণের উদ্দেশ্য 'শোষণ' নয়। কিন্তু এমনিতে মূলধন বৃদ্ধির ব্যাপারে এই দুই ব্যবস্থাকে একই ব্র্যাকেটে সংযুক্ত করা সমীচীন হবে কী? আকারিক পরিমাণের দিক থেকেও কী এই উদ্বৃত্তের পুনঃপ্রয়োগ পুঁজিবাদী ও

(৬) অবশ্য কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ বলবেন, মুষ্টিমেয়ের বৈভব তার সংবহনের মধ্য দিয়েই সর্বজনীন সমৃদ্ধি গড়ে তোলে।

সাম্যবাদী ব্যবস্থায় সমানভাবে হতে পারে? পুঁজিপতির নিজের টাঁক তো একটি বিরাট গহ্বর!

চার ॥ "ধনতন্ত্রের বহু গলদ আছে", অধ্যাপক দত্তের এই মন্তব্য (পৃঃ ৬৪৯) যথার্থই আশ্বাসসূচক। কিন্তু তাঁর উক্তি—"পুঁজিপতিশ্রেণীর অস্তিত্বে সমাজে অসাম্য বৃদ্ধি পায় বটে; কিন্তু মনে রাখা ভালো যে, আর্থিক উন্নতির প্রথম যুগে বিনা কষ্টে মূলধন গঠন কোনো ব্যবস্থাতেই সম্ভব নয়। মূলধন গঠনে সহায়তা করাই পুঁজিপতি-শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা" (পৃঃ ৬৪৮-৯) —কী এই ইঙ্গিত বহন করছে যে আজ ভারতবর্ষে মূলধন গঠনের জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে 'খারাপ হলেও অপরিহার্য' বলে গ্রহণ করতে হবে? 'বিনা কষ্টে' তো কিছুই হয় না; তবু অধ্যাপক দত্তের সুপারিশ স্পষ্টত কী তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। উপরোল্লিখ মন্তব্যটির অব্যবহিত পরেই অধ্যাপক দত্ত লিখেছেন : "এই শ্রেণীর (পুঁজিপতি শ্রেণীর) উচ্ছেদের পর মূলধন গঠনের কাজ গিয়ে পড়ে রাষ্ট্রের হাতে অর্থাৎ রাজনীতিক দলবিশেষ ও আমলা-তন্ত্রের হাতে।...হিংসাত্মক বিপ্লবের পর এই কাজের ভার গিয়ে যখন পড়ে ভ্রাতৃহন্তা এক সমাজে পারস্পরিক সন্দেহে কলুষিত একদল মানুষের হাতে তখন সেই শাসক দলের অধঃপতন রোধ করা যায় না" (পৃঃ ৬৪৯)। অধ্যাপক দত্ত কী মনে করেন যে, পুঁজিবাদ-উত্তর সমাজ ব্যবস্থার 'অবশ্যম্ভাবী' পরিণতি ঠিক এই রকম হতে বাধ্য? তা ছাড়া তাঁর এই বিবৃতিটি সম্পর্কে অন্তত দুটো কথা বলবার রয়েছে।

প্রথমত, পুঁজিপতি শ্রেণীর 'উচ্ছেদ' কী একমাত্র হিংসাত্মক উপায়েই সম্ভব? দ্বিতীয়ত, বিপ্লবোত্তর সমাজ = 'ভ্রাতৃহন্তা এক সমাজ'? (ক) যে কোনো বিপ্লবেই মারামারির কিছুটা আধিক্য তজ্জনিত কারণে স্বাভাবিক। উন্নতির পথ হিসাবে অশান্ত পন্থার প্রয়োগ গ্রহণযোগ্য কি না, এটা হল অন্য প্রশ্ন। (খ) ব্যক্তিবিশেষের কথা আলাদা, কিন্তু পুঁজিপতি শ্রেণী কী ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কখনো সাধারণ লোকের সঙ্গে 'ভ্রাতৃ-বৎ আচরণ করেছে? (গ) পুঁজিবাদী সমাজ কী 'পারস্পরিক সন্দেহে কলুষিত' একেবারেই নয়?...বলা নিষ্প্রয়োজন, পুঁজিবাদ ব্যবস্থার যৌবনের ইতিহাস মানবেতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায় : তখনকার সেই উচ্ছল তারুণ্য শান্তি-প্রগতি-সমৃদ্ধির এক দ্বিধাহীন আশ্বাস এনে দিয়েছিল। কিন্তু আজকের পুঁজিবাদে মানুষের আত্মানুভূতিতে, সেই বলিষ্ঠতা কোথায়?

দীপ্তেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ইতিহাস বিভাগ : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

(৭) টমাস বালোগ : 'নিউ স্টেট্সম্যান', ১২ ডিসেম্বর ১৯৫৯।

লক্ষ্মীর কৃপালাভ

দেশ পত্রিকার ৩১ সংখ্যাতে "লক্ষ্মীর কৃপালাভ : বাঙ্গালীর সাধনা" শীর্ষক প্রবন্ধে 'ভারত ব্যাটারি' ও শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ সাহার বিষয়ে বিশ্বকর্মা প্রদত্ত তথ্য ও ইতিহাসে আমি আনন্দিত কিন্তু নিম্ন লিখিত কয়েকটি বিশেষ ভুল আছে।

১। "শক্তি" মার্কা ব্যাটারির উৎপাদন কোন দিনই বন্ধ হয় নাই। কালীঘাট ট্রাম ডিপোর ঠিক সম্মুখে ১২৬এ নং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড ভবনে ইহার জাজ্বল্যমান সাইনবোর্ড শোভা পাইতেছে। আমার ব্যবসা সাহা মহাশয়ের ব্যবসার মত বিস্তৃত না হইলেও একেবারে মন্দও নয়।

ইহা বুঝিতেছি যে, 'বিশ্বকর্মা' সংগৃহীত তথ্যের মূল পরিবেশক শচীন্দ্রবাবু। আন্দাজ করিতেছি যে, শক্তি ব্যাটারির পুরাতন ইতিহাস তিনি আংশিক বিবৃত করিয়াছেন। অথবা তিনি বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, কোম্পানীটির রূপান্তর ঘটতে পুরাতন মালিকানার পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু "শক্তি" মার্কা ব্যাটারি যে এখনও বাজারের চালু জনপ্রিয় ব্যাটারির অন্যতম একথা তাঁহার মত ব্যাটারি শিল্পের দিকপালের বিস্মৃত হওয়া উচিত হয় নাই।

২। পুরাতন ব্যাটারির জালি সংস্কার করিয়া নূতন প্লেট করা সম্ভব এই অভিনব তথ্যটি 'বিশ্বকর্মা'কে কে দিলেন? ইহা কখনই সম্ভব নহে।

৩। ক্ষুদ্র ব্যাটারির শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর সরকারী শুল্ক প্রত্যাহৃত হয় আমার চেষ্টায় এই তথ্যটিও শচীন্দ্রবাবুর সরবরাহ করা উচিত ছিল।

অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী
কলকাতা-২৬

রবীন্দ্রনাথ : আধুনিকতার প্রেক্ষণে

শ্রদ্ধেয় আবু সয়ীদ আইয়ুবের 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ'-এর উপর সুপণ্ডিত সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার প্রেক্ষণে' নামক মনোজ্ঞ আলোচনাটি পড়ে সত্যই যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। এটিকে মল্লীনাথের টীকা বলবো না নীলকণ্ঠের কারিকা, না মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধির প্রয়াস না 'দুমর্র রোমান্টিকতার ব্যাখ্যা, না 'উপনিষদ-আবেস্তা-তালমুদ-ক্রিশ্চিয়ানিটি অ্যানথ্রপলজীর চক্রপাক'। যাই হোক এই ষড়দর্শন ভেদ করেও মূল বইটিকে ও নারায়ণবাবুর লেখাটিকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে কিছু মাত্র আলস্য বোধ হয় না। বইটি আমাকেও অভিভূত করেছে। কিন্তু আমার একটি প্রশ্ন এই দুই সুধীর কাছে উত্থাপিত করছি—রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমানসের, কবিমানসের, সামাজিক ও সার্বভৌম চেতনার পরিমাপে ও পরিপ্রেক্ষিতে 'আধুনিকতা' বলতে আমরা কি বুঝি, তার সংজ্ঞা কি, তার নিরীখ, তার প্রকাশ কতটুকু—অর্থাৎ তার শুধু concept নয়, context এবং content-ও নয়, তার contour-ও। কবি বেঁচে থাকতেই এই প্রশ্ন উঠেছিল, তিনি স্পষ্ট জবাবও দিয়ে গেছেন।

আমার কবিতা আমি জানি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সর্বত্রগামী

এটা কি frustration এর সুর, রবির অস্তগমনের সূচনা। সুধীন দত্তকে আকাশ-প্রদীপ ' উৎসর্গ করে তিনি লিখলেন—"তোমাদের কালের সঙ্গে আমার যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে এমনতরো অস্বীকৃতির সংশয় বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনি নি।" কিন্তু কেন এ সংশয়?—এ কী অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা। নবীন বিচারপতির কাছে কেন এ বলা যে আমি কমার পাত্র আমি সময় হারা।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রথম দিকের ও শেষের দিকের কবিতার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ইয়েটসের মধ্যেও দেখেছি অদ্ভুত দ্বন্দ্ব between self and soul, শেষের র‍্যাবোর মধ্যেও অস্তগমনের সূচনা—পল গঁগ্যা—the noble savage-এরও সেই দশা। তাঁরা কি আধুনিকতার দিক থেকে পেছিয়ে পড়েছিলেন। ম্যালার্মের শেষের দিকের কবিতা তো acrobatics with words, thought about thought. রিল্কের প্রতীক কাব্যগুলি আধুনিক না অনাধুনিক? না যে ভাবটা ছিল সরু, সেটা হল মোটা?

তাই আধুনিকতাটা বোধহয় মেজাজের, মর্জির কথা দৃষ্টির কথা, শুধু দেশ বা কালের কথা নয়, শুধু justify the ways of jod to men নয়, justify ways of men to God-ও বটে। ঋতু পরিবর্তন সব কবির মাঝেই আছে। এক কালে প্রশ্ন করা হতো—রবীন্দ্রনাথ কতটা ইউরোপীয় আর কতটা ভারতীয়—কতটা sentimental langours of the celtic twilight বা misty vagueness of Materlinkian symbolism তাঁকে প্রভাবিত করেছিল এবং মূলে তাঁর সাফল্যের কারণ যে তিনি মনেপ্রাণে ইউরোপীয় যুক্তিবাদীই ছিলেন এবং উপনিষদের ছদ্মবেশে, বৈষ্ণব কবির ঝোলা নিয়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিক দক্ষিণাচারী হয়ে দেশের

সামনে কড়ামিঠে পাক দেওয়া Made Inland বলে Made in England-এর জিনিসগুলিকে ঝকঝকে রাংতায় মুড়ে ভারতবর্ষে পরিবেশন করেছিলেন—গীতাঞ্জলি দৃষ্টি আকর্ষণ করলো কেন, না সেগুলি psalms of David-এর মত! এ ধরনের কথাও আমরা শুনেছি। রবীন্দ্র নাথের মনন ধারায় মিশেছে বহু সাধকের সাধনার স্রোত। বিশুদ্ধ উপনিষদ চেতনা বলতে নানা মুনির নানা মত আছে কিন্তু শ্রদ্ধেয় নলিনীকান্ত গুপ্ত যে কথা বলেছেন তার মধ্যে সারবত্তা আছে—'যাঁরা লোকোত্তর পুরুষ তাঁদের চেতনা বহুতর পুরুষের চেতনা-সমষ্টি। বিভিন্ন এমন কি বিরোধী ধারা মিলে কি অপরূপ অভিনব ঐকতান সৃষ্টি করতে পারে তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা। তাই রবীন্দ্রনাথ শুধু আধুনিক নন, traditionist বা revivalistও বটে, কিন্তু সেগুলি হচ্ছে পুনর্নবীকরণ—যেমন বৃষভবাহন পাতাল ভোলানাথ শিব তাঁর কাছে শুধু পৌরাণিক দেবতা নন, মধ্যযুগের কবির নেশাখোর কুচুনীপাড়া যাওয়া ভিখারী নন, কল্যাণের প্রতীকও। আবার বাণী-বিলাসীর কণ্ঠে ব্যক্ত হয়েছে ভর্ৎসনা, রূঢ় পৌরুষের ছন্দে জেগেছে হুঙ্কার, মহাকাল সিংহাসনে সমাসীন বিচারকের কাছে তিনি চেয়েছেন 'শক্তি দাও, শক্তি দাও, কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী"। এ কী শুধু আধুনিকতার প্রকাশ না romantic extrvaganza? রবীন্দ্রনাথ প্রাচীনপন্থী হয়েও আধুনিক, আধুনিক হয়েও প্রাচীনপন্থী। লোকে বলে রবীন্দ্রচেতনায় 'awareness আছে "acceptanee" নেই, vague synthetic Unity of appreciation আছে, জীবন রসে জারিত জীবন জিজ্ঞাসা নেই, অর্থাৎ তিনি আধুনিকতার মানদণ্ডে ফার্স্টক্লাস নন, সবে থার্ড ক্লাস। তাঁর মধ্যে বিচার বিশ্লেষণের দুঃসহমুক্তি নেই, বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতা নেই, তামসপ্রবেগের খরধারা নেই, Walpurgis' night নেই। কবি যতই মানব-ধর্ম সম্বন্ধে গালভরা বক্তৃতা দিয়ে আধুনিক হতে চান তাঁর হিউম্যানিজম্ মানবকেন্দ্রিক চিন্তা নয়—Man end in itself নয়, এখানে একটা ভাসা ভাসা 'ডিভিনিটি অফ হিউম্যানিটি, হিউম্যানিটি অফ ডিভিনিটি'র খেয়াতরীতে খণ্ডয়া একটা অস্পষ্ট জীবন-দেবতা বাদ পাওয়া যায়, যেখানে সমাজ চেতনা, ব্যক্তি চেতনার value ও norm, গুণ ও আদর্শ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নেই, কাব্যকুহেলিকায়, ভাষার চমৎকারিত্তায় সব গুলিয়ে গেছে। বৎসর বৎসর চলে যায়, উত্তর মেলে না।

আসলে কথা হচ্ছে আধুনিকতা দেশ-কাল পাত্রের গণ্ডির ঊর্ধ্বে মন মেজাজ ও মর্জির উপর নির্ভর করে। সে মন দেশাশ্রয়ী বা কালাশ্রয়ী নয়, দৃষ্টিভঙ্গী আশ্রয়ী। এই মন শুধু জিজ্ঞাসা করে চলে—প্রশ্ন করে চলে—প্রশ্ন করে, উত্তর পায়, উত্তর বদলায়, কিন্তু এর মধ্যেও Paradox আছে, পশ্চিমের এক চিন্তাশীল মনীষীর কথা উদ্ধৃত করছি—

Take science....Its triumphant advance in the understanding and control of nature has weakened man's belief in his own importance in the cosmic scheme or even in the reality of spiritual values.... Is man a mere mechanism whose behaviour is blindly determined... Altogether science, the most powerful instrument of human reason has broken the faith in reason that has been the main spring of western civilization.

বিজ্ঞানই আঘাত দিচ্ছে যুক্তিবাদের উপর। অথচ রেনেসাঁসের যুগ থেকে যুক্তি-তর্ক বিচার-বিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতেই আমরা 'আধুনিকতার' পরিমাপ করছি।

যে দুইজন মননশীল ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা সম্বন্ধে বিচার করেছেন তাঁদের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েই এই প্রশ্ন রাখছি—জিজ্ঞাসু হিসাবে। জানি এই সম্বন্ধে অনেক কিছু বলবার আছে, অনেক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী আছে শ্রীঅইয়ুবের পুস্তকটি তাঁর মনীষার একটি বিশিষ্ট প্রকাশ এবং নারায়ণবাবুর সঙ্গে আমি একমত যে তাঁর বিচার প্রণালীর একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা আমার মতামতের বিরোধী হলেও আকৃষ্ট করে। আমি সেই দলের লোক যারা বলে

শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা
শোনো নি কি জননীর অন্তরের ব্যথা?

কাব্য বিচারে এই অনুভবই প্রধান কি? আজকের যুগে মনস্তাত্ত্বিকরাও তো ইতিহাসকে এইভাবে পর্যবেক্ষণ করতে আরম্ভ করেছেন। টয়েনবীর বক্তব্যও অনেকটা তাই। সাহিত্য রসবিচারেও তা গ্রাহ্য হবে না কেন?

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-২৯

ভারতীয় অর্কেস্ট্রা

শ্রীতিমিরবরণের ভারতীয় অর্কেস্ট্রা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনাটি (৩৩ সংখ্যা) খুবই সময়োচিত এবং জ্ঞানগর্ভ হয়েছে। অর্কেস্ট্রা সম্বন্ধে আমারও কিছু বক্তব্য আছে। যদিও আমি নাম করা সংগীত রচয়িতা নই তবুও আমার পূর্বসূরীদের পথ ধরে নানা বাধা বিপত্তির মধ্যেও এগিয়ে চলার চেষ্টা করছি।

এ বিষয়ে শ্রীতিমিরবরণের সঙ্গে আমিও একমত যে ভারতীয় রাগ সংগীতে অর্কেস্ট্রার প্রচুর উপাদান আছে। আজকাল সাধারণত অর্কেস্ট্রা রূপে যা শোনা যায় তার বেশীর ভাগই কতকগুলো গান একসঙ্গে বাজে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং বিভিন্ন সাহিত্যিকদের রচনাতেও বহু উপাদান আছে। এ কথা সত্যি অর্কেস্ট্রা নিয়ে গবেষণা করতে প্রচুর অর্থের দরকার। সত্যিই দুঃখ হয় রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো স্থানেও অর্কেস্ট্রার জন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থা নাই। আমার আর একটা প্রস্তাব যে সমস্ত সংগীত প্রতিষ্ঠান (নামকরা) আছে তাঁরা চেষ্টা করলে একটি করে অর্কেস্ট্রা সংস্থা তাঁদের প্রতিষ্ঠানে করতে পারেন এবং তাতে হয়তো তাঁদের খুব বেশী খরচ হবে না। আমার মতো আরও অনেকে আছেন যাঁরা অর্কেস্ট্রার বিকাশ সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন কিন্তু তৈরী করলেও শোনাবার সুযোগ এবং অর্থের জন্য পিছিয়ে আছেন। এ জন্য সত্যিই সকলের এগিয়ে আসা উচিত যথাসাধ্য চেষ্টা এবং সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে। যে আলো শ্রীতিমিরবরণ জ্বালিয়েছেন তা যেন সকলের চেষ্টায় অনির্বাণ থাকে এই আমার একমাত্র কামনা।

রঞ্জন মজুমদার
অধ্যক্ষ : ছায়া হিল্লোল
কলকাতা-৪৭

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিতে বিরামচিহ্ন ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

১

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মুদ্রিত সংস্করণে বহু জায়গায় পুঁথির বিরামচিহ্ন পরিবর্তন করে নূতন চিহ্ন বসান হয়েছে। পুঁথিতে যেখানে দু-দাঁড়ি, মুদ্রিত সংস্করণে সেখানে এক-দাঁড়ি; পুঁথিতে যেখানে চিহ্ন নেই, মুদ্রিত সংস্করণে সেখানে এক-দাঁড়ি বসেছে। যেখানে পরিবর্তন করা হয়েছে সেখানেও মূলে কি চিহ্ন ছিল তার উল্লেখ নেই। সুতরাং মুদ্রিত সংস্করণে বিরামচিহ্ন ব্যবহারের যে রীতি তা সম্পাদকের রীতি, পুঁথির রীতি নয়। পুঁথিতে কি রীতি ছিল—আদৌ কোনো রীতি ছিল কিনা—মুদ্রিত সংস্করণ থেকে তা জানবার উপায় নেই। সম্ভবত সম্পাদক পুঁথির বিরামচিহ্ন ব্যবহারে কোনো সংগতি খুঁজে পান নি। তাই সংগতিহীন ও গুরুত্বহীন বোধ হওয়ায় পুঁথির চিহ্ন পরিবর্তন করে তিনি নিজের বিবেচনা অনুযায়ী চিহ্ন বসিয়েছেন।

পুঁথিতে বিরামচিহ্ন ব্যবহারে নূতনত্ব থাকলেও অসংগতি নেই। শতকরা নব্বইটি গানে যে রীতি সতর্কতার সংগে অনুসরণ করা হয়েছে তা যতই অস্বাভাবিক হোক, সংগতিহীন অবশ্যই নয়। শতকরা মাত্র দশটি গানে নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। এই ব্যতিক্রম লিপিকরের অনবধানবশতই হোক বা লিপিকরের পরিবর্তনের ফলেই হোক তা ব্যতিক্রম-ই। এবং এরকম ব্যতিক্রম সংখ্যায় এত কম যে, তা উপেক্ষণীয়। কিন্তু সম্পাদকের হস্তক্ষেপের ফলে মুদ্রিত সংস্করণে একাধিক অসংগতি দেখা দিয়েছে। প্রথম, 'ধ্রুবপদ'এ অসংগতি। মুদ্রিত সংস্করণে কোনো গানে 'ধ্রুবপদ' আছে, কোনো গানে নেই। কেন নেই? 'ধ্রু' কথাটি কি লিপিকরের খেয়ালখুশিমত কোনো গানে লেখা হয়েছে, কোনো গানে লেখা হয় নি? এর উত্তর পুঁথির বিরামচিহ্নের মধ্যে আছে, মুদ্রিত সংস্করণে নেই। পুঁথিতে বিরামচিহ্ন ব্যবহারের রীতিটি আবিষ্কার করতে পারলে জানা যায় যে, 'ধ্রু' লিপিকরের খেয়ালখুশিমত লেখা হয় নি। কোন্ গানে 'ধ্রু' থাকবে এবং কোন্ গানে থাকবে না তার একটা বাঁধা নিয়ম ছিল। লিপিকর সে নিয়ম রক্ষা করেছেন। দ্বিতীয় প্রত্যেক গানের কোনো কোনো ছত্রের শেষে ॥১॥, ॥২॥, ॥৩॥ ইত্যাদি সংখ্যা লেখা আছে। কোনো গানে সংখ্যাগুলি দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম ইত্যাদি ছত্রের শেষে, আবার কোনো গানে চতুর্থ, অষ্টম, দ্বাদশ ইত্যাদি ছত্রের শেষে বসেছে। দুটি উদাহরণ নেওয়া যাক—

নারদের মুখে শুণী কংস মাহাবীর।
একে একে মাইল ছয় গর্ব্ভ দৈবকীর ॥১॥

এখানে দেখছি ১ সংখ্যাটি দ্বিতীয় ছত্রের শেষে বসেছে; সুতরাং অনুমান করতে পারি সংখ্যাটি পদ-সংখ্যার দ্যোতক। এবং 'পদ' বলতে লিপিকর বুঝেছিলেন গানের অন্ত্যমিলযুক্ত দুটি ছত্র। অন্যত্র অবশ্য দেখছি ভিন্ন রীতি—

কোণ সুখে কংশ তোর মুখে উঠে হাস।
নাহিং জাণ এবেং তো আপনার নাশ॥
যে হৈবেক দৈবকীর গর্ব্ভ অষ্টম।
আতি মহাবল সেসি তোহ্মার যম॥১॥

প্রথম উদ্ধৃতির নিয়ম অনুসারে দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে দ্বিতীয় ছত্রের শেষে ॥১॥ সংখ্যাটি লেখা হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু লেখা হয়েছে চতুর্থ ছত্রের শেষে। ছাপার রকমফের করে ছত্র দুটি অন্যভাবে সাজালেও গোলমালের নিষ্পত্তি হবে না। কারণ, প্রথম উদ্ধৃতিতে দেখা গেছে এক-দাঁড়ির পর দু-দাঁড়ি বসে এবং দু-দাঁড়ির পর সংখ্যাশব্দ বসে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতেও তাই প্রতি দুই দাঁড়ির শেষে—অর্থাৎ দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছত্রের শেষে—সংখ্যাশব্দ লেখা হবে এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু কার্যত দেখছি তা হয় নি।

বলা বাহুল্য, মুদ্রিত সংস্করণের এই অসংগতি পুঁথিতে নেই। পুঁথির বিরামচিহ্নগুলি সতর্কতার সংগে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, বিরামচিহ্ন ব্যবহারের রীতি অনুসারে পুঁথির গানগুলি দুই শ্রেণীতে পড়ে। মুদ্রিত সংস্করণে সম্পাদকের হস্তক্ষেপে দুটি শ্রেণী একটি শ্রেণীতে পরিণত হওয়ায় অসংগতির সৃষ্টি হয়েছে। উপরে যে উদাহরণ দুটি দেওয়া হয়েছে তার প্রথমটির পুঁথিতে প্রদত্ত বিরামচিহ্ন এইরূপ—

নারদের মুখে শুণী কংস মাহাবীর॥
একে একে মাইল ছয় গর্ব্ভ দৈবকীর॥১॥

এর সংগে তুলনীয়—

কোণ সুখে কংশ তোর মুখে উঠে হাস।
নাহিং জাণ এবেং তো আপনার নাশ॥
যে হৈবেক দৈবকীর গর্ব্ভ অষ্টম।
আতি মহাবল সেসি তোহ্মার যম॥১॥

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে পুঁথিতে দ্বিতীয় দু-দাঁড়ির পরে সংখ্যাশব্দ বসে। প্রথম উদাহরণে প্রতি ছত্রের শেষে দু-দাঁড়ি তাই স্বভাবতই দ্বিতীয় ছত্রের শেষে দ্বিতীয় দু-দাঁড়ি পড়েছে এবং সংখ্যাশব্দ বসেছে। দ্বিতীয় উদাহরণে চতুর্থ ছত্রের শেষে দ্বিতীয় দু-দাঁড়ি পড়েছে এবং সংখ্যাশব্দ বসেছে। এই রীতি পুঁথির শতকরা নব্বইটি গানে অনুসরণ করা হয়েছে। সুতরাং স্বীকার না করে উপায় নেই যে, দাঁড়ি-চিহ্ন ব্যবহারের একটা নির্দিষ্ট রীতি পুঁথিতে ছিল। এই রীতিটি বুঝে নিতে হবে

২

পুঁথিতে কোনো কোনো গানে বিন্দু-চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, যত মনোরথ ছিল ∘ তাহাক সফল কৈল ∘ নানাবিধ দিআঁ আলিঙ্গনে॥ কিন্তু বিন্দু-চিহ্ন ব্যবহারে লিপিকর কোনোরকম সংগতি রক্ষা করেন নি। সেই কারণে বিন্দু-চিহ্ন এ আলোচনা থেকে বাদ দিচ্ছি। বিন্দু-চিহ্নের কথা বাদ দিলে এক-দাঁড়ি এবং দু-দাঁড়ি-ই পুঁথির বিরামচিহ্ন। আগেই বলেছি, দাঁড়ি-চিহ্ন অনুসারে পুঁথির গানগুলি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক, কেবলমাত্র দু-দাঁড়ি ব্যবহৃত গান; দুই, এক-দাঁড়ি ও দু-দাঁড়ি ব্যবহৃত গান। এই দুই শ্রেণীর গানে দাঁড়ি-চিহ্ন ব্যবহারের রীতি নীচের ছক দুটির মধ্যে দেখান হয়েছে।

প্রথম শ্রেণী :	.... ॥
	.... ॥১॥
	.... ॥
	.... ॥২
দ্বিতীয় শ্রেণী :	.... ।
	.... ॥
	.... ।
	.... ॥১॥
	.... ॥
	.... ॥ধ্রু॥
	.... ।
	.... ॥
	.... ।
	.... ॥২॥

দু' শ্রেণীতেই এমন কিছুসংখ্যক গান আছে যেগুলি ভেঙে ত্রিপদীর মত করে ছাপালে পাঠকের সুবিধা হয়। ভেঙে বা অখণ্ডরূপে যেভাবেই ছাপানো হোক, তাতে

কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। এবার ছক অনুসারে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।

প্রথম শ্রেণী :

হাথে খড়ী করি বোলোঁ মো কাহ্ন॥
আইস ল রাধা লেখা করি দান॥১॥

অহঠে হাথ কলেবর তোর॥
দুই কোমি দান তাহাত মোর॥২॥

দ্বিতীয় শ্রেণী :

এত কালে বড়ী তোর কেহ্নে হেন মন।
ভাল বুলিবে তোরে শুণী কোণজন॥
আদি আন্ত এখো বোল না বোলসি ভাল।
মারিবোঁ পরাণে তোকে
জগাআঁ গোআল॥১॥

দারুণ বড়ী তোর বাপেত নাহিঁ লাজ॥
তে কারণে মোক বোলসি হেন কাজ॥ধ্রু॥

বার বার না বুলিহ হেনক উত্তর।
সামী দুরবার মোর নহোঁ সতন্তর॥
মো যবেঁ জাণোঁ তোর হেন দুষ্ট মতী।
তবেঁ কেহ্নে আসিবোঁ মো
তোহ্মার সংহতী॥২॥

এবার এই দুই শ্রেণীর গানে দাঁড়ি-চিহ্ন ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা প্রয়োজন। প্রথম শ্রেণীর গানের বৈশিষ্ট্য—

১। প্রতি ছত্রের শেষে দু-দাঁড়ি।
২। 'ধ্রুবপদ'-এর উল্লেখ নেই।
৩। পদ অর্থে ক অন্ত্যমিলযুক্ত দু'টি ছত্র।
খ
৪। প্রতি গানে পদের সংখ্যা চারের অধিক। ঊর্ধ্বসংখ্যা একুশ, নিম্ন-সংখ্যা পাঁচ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর গানের বৈশিষ্ট্য—

১। এক-দাঁড়ি ও দু'-দাঁড়ির ব্যবহার।
২। পদ অর্থে ক অন্ত্যমিলযুক্ত চারটি ছত্র।
ক
খ
খ
ক মিলের শেষে প্রথম দু'-দাঁড়ি খ
ক খ
মিলের শেষে দ্বিতীয় দু'-দাঁড়ি।
৩। গানে পদের সংখ্যা চারের বেশী নয়।
৪। 'ধ্রুবপদ'-এর উল্লেখ।
৫। 'ধ্রুবপদ'-এর স্থান প্রথম ও দ্বিতীয় পদের মধ্যে।
৬। গানের অন্যান্য পদে এক-দাঁড়ি ও দু'-দাঁড়ি। 'ধ্রুবপদ'-এর দু'টি ছত্রের শেষেই দু'-দাঁড়ি।
৭। গানের অন্যান্য পদে চারটি করে ছত্র। 'ধ্রুবপদ' দু'টি ছত্রের।

এই তথ্যগুলি থেকে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় কিনা সে বিচার বিশেষজ্ঞেরা করবেন। আমার বক্তব্য এই, যে-নিয়ম এগারটি সূত্রের দ্বারা শাসিত এবং যে নিয়ম পুঁথির শতকরা নব্বইটি গানে মেনে চলা হয়েছে, সে নিয়ম লিপিকরের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে উদ্ভূত মনে করা অসমীচীন। সুতরাং স্বীকার করা কর্তব্য, দাঁড়ি-চিহ্ন ব্যবহারের এই রীতি পুঁথির বৈশিষ্ট্য এবং এ বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত সংস্করণ থেকে মুছে ফেলা অনুচিত।

গ

উপরের তথ্যগুলি থেকে জানা গেল, বিশেষ এক শ্রেণীর গানে 'ধ্রু'-র উল্লেখ করা হয় নি। কেন করা হয় নি, তা অবশ্যই অনুমানসাপেক্ষ। 'ধ্রু'-র অনুল্লেখ সম্বন্ধে আমার অনুমানের কথা এখানে বলে রাখতে পারি। যে গানগুলিতে 'ধ্রু'-র উল্লেখ নেই, সেগুলিতে সম্ভবত সব পদ-ই 'ধ্রুবপদ'। যে পদগুলিকে 'ধ্রুবপদ' বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেগুলি দুই ছত্রবিশিষ্ট পদ এবং প্রতি ছত্রের শেষে দুই দাঁড়ি। যে গানগুলিতে 'ধ্রু'-র উল্লেখ করা হয় নি, সেগুলির প্রত্যেকটি পদও দু'-ছত্রবিশিষ্ট এবং প্রতি ছত্রের শেষে দুই দাঁড়ি। অর্থাৎ 'ধ্রুবপদ'-এর লক্ষণাক্রান্ত। সেই কারণে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, যেহেতু গানের প্রত্যেকটি পদ 'ধ্রুবপদ', সেই হেতু লিপিকর বাহুল্যবোধে প্রত্যেকটি পদের শেষে 'ধ্রু' লেখেন নি। কিন্তু যে গানগুলির সব পদ 'ধ্রুবপদ' নয়, সেখানে বিশেষ করে 'ধ্রুবপদ'-টিকে চিনিয়ে দেওয়া প্রয়োজন হয়েছে (যদিও 'ধ্রু' লেখা না থাকলেও 'ধ্রুবপদ'-কে সনাক্ত করবার অন্য একাধিক উপায় আছে)। এই প্রসঙ্গে আর একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করতে বলি, যাকে আকস্মিক মনে করতে বাধে। সেটি হল গানের দৈর্ঘ্য। 'ধ্রুবপদ'-এর উল্লেখ না থাকলেই গানটিতে চারটির বেশী পদ থাকবে। সম্ভবত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যে কালে রচিত হয়েছিল, সে কালে গান রচনার দু'টি বিশিষ্ট রীতি ছিল। এক রীতিতে গানের বক্তব্য চারটি পদের মধ্যে শেষ হতে হবে। আর এক রীতিতে হয়ত 'ধ্রুবপদ'-এর মালা গাঁথা হত। মালার দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে কোনো নিষেধ ছিল না।

যদিও এই ক্ষীণ সূত্র ধরে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া অনুচিত তথাপি এই প্রসঙ্গে চর্যাগীতির কথা স্মরণ করতে পারি। চর্যার পুঁথিতে মূল গানে প্রতি পদ-ই 'ধ্রুবপদ' এবং প্রতি দ্বিতীয় ছত্রের শেষে লিপিকর 'ধ্রু'-র উল্লেখ করেছেন। টীকায় মুনিদত্ত অবশ্য প্রায় সর্বত্রই প্রথম ও দ্বিতীয় পদের মধ্যবর্তী পদটিকে 'ধ্রুবপদ' বলে নির্দেশ করেছেন (দ্রঃ সুকুমার সেন, চর্যাগীতি-পদাবলী, ১৯৬৬, পৃঃ ৪)। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'ধ্রু'-হীন গানগুলির সব পদই 'ধ্রুবপদ' এই অনুমান যদি ঠিক হয় তা হলে চর্যার রীতির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এক শ্রেণীর গানের সাদৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে। আবার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অপর শ্রেণীর গানের সাদৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে মুনিদত্ত অবলম্বিত রীতির সঙ্গে। প্রথম ও দ্বিতীয় পদের মাঝে 'ধ্রুবপদ'-এর স্থান জয়দেবের কাল থেকে স্থির হয়ে আছে। বৈষ্ণব পদাবলীর যে গানগুলিতে লিপিকরেরা পদের ক্রমভঙ্গ করেন নি, সেগুলিতেও 'ধ্রু' প্রথম ও দ্বিতীয় পদের মধ্যবর্তী। সুতরাং এইটিই বহুপ্রচলিত রীতি। এটি ছাড়া অন্য রীতিও যে ছিল, চর্যাগীতির মূলে এবং সম্ভবত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রথম শ্রেণীর গানগুলি তার উদাহরণ।

ঘ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোনো কোনো গানে 'ধ্রু'-র অনুল্লেখ সম্বন্ধে যে কারণের কথা উপরে বলা হয়েছে তার পক্ষে অন্য যুক্তিও আছে।

আগে বলা হয়েছে যে, পুঁথিতে সর্বদাই দ্বিতীয় দুই দাঁড়ির পর সংখ্যাশব্দ লেখা হয় এবং এক শ্রেণীর গানে 'পদ' দু'-ছত্রের, আর এক শ্রেণীর গানে 'পদ' চার ছত্রের। অর্থাৎ গানের পদগুলি দাঁড়ি-চিহ্ন দিয়ে বিভক্ত এবং সংখ্যাশব্দ দিয়ে চিহ্নিত। এ তথ্যগুলি সত্য বটে, কিন্তু চোখে দেখা সত্য। গানগুলি কাগজের উপর কালির অক্ষরে দেখবার পর এ তথ্যগুলি আবিষ্কার করতে পারা গেছে। সুতরাং পদ-বিভাগের এই রীতি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গানের লিখিত রূপ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু গানগুলি যখন গীত হত, তখন কোথায় এক-দাঁড়ি, কোথায় দু-দাঁড়ি, কোথায় দ্বিতীয় দু-দাঁড়ি, কোথায় সংখ্যাশব্দ তা বলে দেওয়া হত না। গানগুলি থেকে যদি দাঁড়ি-চিহ্ন এবং পদসংখ্যা মুছে ফেলি, তা হলে বুঝবার উপায় নেই একটি পদ কোথায় সম্পূর্ণ হল, কোথায় শুরু হল। সুতরাং বুঝতে হবে, দাঁড়ি-চিহ্ন এবং পদসংখ্যা এই ইঙ্গিতগুলি পাঠকের জন্য। এই চোখে দেখা ইঙ্গিতগুলি ছাড়াও পদ-বিভাগের স্বতন্ত্র কোনো ইঙ্গিত ছিল, যা কানে শোনা যায়। সে ইঙ্গিতটি কি? সেটি গাইবার রীতি।

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন বলেছেন, 'মূলে চর্যার সব পদই ধ্রুবপদ। অর্থাৎ প্রত্যেক পূর্বপদ পরবর্তী পদ গাহিবার পর ধুয়ার মত পুনরাবৃত্তি হইত।' (দ্রঃ চর্যাগীতি-পদাবলী, পৃঃ ৪)। এই যদি গাইবার রীতি হয় তা হলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রথম শ্রেণীর 'ধ্রু' উল্লেখহীন যে গানটিতে পাঁচটি পদ আছে সে গানটির পদগুলি এইভাবে পুনরাবৃত্ত হত।

১—২—১—৩—২—৪—৩—৫—৪—৫

এইভাবে দ্বিতীয় পদের পর প্রথম পদ এবং তৃতীয় পদের পর দ্বিতীয় পদ পুনরাবৃত্ত হলে শ্রোতারা পদের ইউনিট ধরতে পারত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দ্বিতীয় শ্রেণীর গানগুলিতে—অর্থাৎ যে গানগুলিতে 'ধ্রু'র উল্লেখ আছে, সেগুলিতে—পদের ইউনিট ধরা আরও সহজ। কারণ, সে

গানগুলিতে প্রতি পদের পর 'ধ্রুবপদ'-টি পুনরাবৃত্ত হত। অর্থাৎ প্রথম পদ / ধ্রু. দ্বিতীয় পদ / ধ্রু. তৃতীয় পদ / ধ্রু. চতুর্থ পদ / ধ্রু। এই শ্রেণীর গানে 'ধ্রুবপদ' হল সাধারণ পদ। গানের প্রত্যেকটি পদের মধ্যে যেটি Common element, সেটি 'ধ্রুবপদ'। কাজ সংক্ষেপ করবার জন্য লিপিকরেরা 'ধ্রুবপদ'-টিকে প্রথম পদের পর একবার মাত্র লিখে রাখেন; কিন্তু প্রতি পদের শেষে 'ধ্রুবপদ' পুনর্লিখিত হলে অন্যায় হত না, যদিও অবান্তর হত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গানগুলিকে দাঁড়ি-চিহ্ন অনুসারে যে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, সে শ্রেণীবিভাগ সাংগীতিক রীতি দ্বারাও সমর্থিত হচ্ছে। প্রথম শ্রেণীর গানে পূর্বপদ পরবর্তী পদের পর পুনরাবৃত্ত হত। দ্বিতীয় শ্রেণীর গানে পূর্বপদ পুনরাবৃত্ত হত না, 'ধ্রু' চিহ্নিত পদটিই শুধু পুনরাবৃত্ত হত। সাংগীতিক রীতির এই পার্থক্যটি বোধ হয় লিপিকর বিরামচিহ্নের পার্থক্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এবং এ কথা বললে আশা করি ভুল হবে না যে, সাংগীতিক রীতির পার্থক্য প্রকট করবার জন্যই লিপিকর কোনো গানে 'ধ্রু' লিখেছেন, কোনো গানে লেখেন নি। যে গানে লেখেন নি, তার সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি—সে গানের প্রত্যেকটি পদই 'ধ্রুবপদ'। 'ধ্রুবপদ' হোক বা না হোক, অন্তত এটুকু বলতে পারি যে সে গানগুলি গাইবার রীতি 'ধ্রু' যুক্ত গানগুলি থেকে পৃথক।

৫

'ধ্রুবপদ'-এর প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চারটি গানে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। গান চারটি এই—

১। আরে ভৈরব পড়িলে গাতা
গড়াইল দিআঁ।
(চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ৩০-৩১)

২। মনত হরিষ কর ঈষত হাসিআঁ।
(পৃঃ ৬০-৬১)

৩। রাধাক মারিআঁ পুণী
জিআইল কাহ্নে।
(পৃঃ ১১৪-১৫)

৪। বোল শত রাধার সখিগণী। আল।
(পৃঃ ১২৮-২৯)

গান চারটিতে যথাক্রমে ৪টি, ৫টি, ৬টি এবং ৪টি করে পদ আছে। ভণিতায় বাসলী এবং চণ্ডীদাস আছে একটিতে, বাসলী এবং বড়ু চণ্ডীদাস আছে দুটিতে, বড়ু চণ্ডীদাস আছে একটিতে। গান চারটির বৈশিষ্ট্য হল এই যে, প্রতি পদের জন্য আলাদা আলাদা 'ধ্রুবপদ' আছে। অর্থাৎ প্রথম গানে চারটি 'ধ্রুবপদ', দ্বিতীয় গানে পাঁচটি 'ধ্রুবপদ', তৃতীয় গানে ছটি 'ধ্রুবপদ', চতুর্থ গানে চারটি 'ধ্রুবপদ'। 'ধ্রুবপদ'গুলি পদের পরে। পদগুলি চার ছত্রের, 'ধ্রুবপদ'গুলি দু' ছত্রের। পদগুলিতে এক-দাঁড়ি ও দু'-দাঁড়ি, 'ধ্রুবপদ'গুলিতে কেবল দু'-দাঁড়ি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যাবতীয় গানের সমাপ্তিতে ভণিতা। যেমন,

নাগরালি তেজ কাহ্নাঞি নেবারহ মন॥
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ॥১০॥

কিন্তু এই চারটি গানে প্রতি পদের জন্য আলাদা আলাদা ভণিতা থাকায় 'ধ্রুবপদ' দিয়ে গান শেষ হয়েছে। যেমন,

আহ্মার বচন রাধা সুন পরমান॥
বিনি রতি পাইলেঁ হোক
মা এড়িব কাহ্ন॥
এজা কলী দৈল বধা আহ্মার পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী
গাইল চণ্ডীদাসে॥২॥

আহ্মার পাশক রাধা আইস সত্বরে॥
নাহত বান্ধিআঁ থুইবো
দানের আন্তরে॥ধ্রু॥

গানে 'ধ্রু'-র উল্লেখ থাকলে সাধারণত চারটির বেশী পদ থাকে না। এ নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে। ধরা গেল, এই চারটি গানের দুটিতে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। কিন্তু যদি প্রতি পদের শেষে পুনরাবৃত্ত হওয়াই 'ধ্রুবপদ'-এর লক্ষণ হয়, তা হলে একটি গানে একটি 'ধ্রুবপদ'-ই থাকতে পারে। এই গানগুলিতে একাধিক 'ধ্রুবপদ' কেন? একটি-দুটি গানে এরকম ঘটলে অনুমান করা যেতে পারত লিপিকরের অসাবধানতায় এরকম ঘটেছে। কিন্তু চারটি গানে এরকম অসাবধানতা কি সম্ভব? সুতরাং যে কারণেই ঘটুক, লিপিকরের অসাবধানতার জন্য একাধিক 'ধ্রুবপদ' সৃষ্ট হয় নি। অতিরিক্ত 'ধ্রুবপদ' কটি যদি অন্য কেউ যোজনা করে দিয়ে থাকেন, তা হলে তিনি শুধু 'ধ্রুবপদ' যোজনা করতে যাবেন কেন? নূতন পদ যোজনা করে দিতে তাঁর কি বাধা ছিল? আর তিনি কি এমনই মূর্খ যে, বুঝতে পারবেন না একটি গানে একাধিক 'ধ্রুবপদ' থাকে না? গান কটির রচয়িতা যিনিই হন, তিনি সজ্ঞানে জেনে-শুনেই গান কটি লিখেছেন। তা হলে গান কটি কি ভিন্ন রীতির? একাধিক 'ধ্রুবপদ'-যুক্ত আর কোনো বাংলা গানের সন্ধান কারও জানা থাকলে তিনি এ সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

সাহিত্য সংবাদ

বঙ্কিম পুনর্দর্শন

আলমারিতে অন্য একটা অর্বাচীন বই খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ বঙ্কিম রচনাবলীর একটি খণ্ডের দিকে চোখ পড়লো। কালো চামড়ার মলাটে বাঁধানো, অতিশয় গম্ভীর রাশভারী চেহারা। আশেপাশের রোগা দুর্বল বইগুলির অবস্থিতি সম্পর্কে যেন বেশ বিরক্ত।

বহুদিন বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা পড়ে দেখা হয়নি, অন্যমনস্কভাবে রচনাবলীর খণ্ডটি টেনে এনে পাতা ওল্টাতে লাগলুম। এই খণ্ডে রয়েছে আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী, কৃষ্ণচরিত্র, লোক রহস্য এবং বিবিধ প্রবন্ধ। "কৃষ্ণচরিত্র" ছাড়া অন্য সবগুলিই কৈশোরের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার সময় একাধিকবার পড়া হয়েছিল, লম্বা লম্বা সংস্কৃত শ্লোক দেখে কৃষ্ণচরিত্রটি আর ভয়ে পড়া হয়ে ওঠেনি। কৌতূহলবশত পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে নানা জায়গায় চোখ আটকে যেতে লাগলো, দণ্ডায়মান অবস্থা থেকে ক্রমে চেয়ারে এসে বসলুম, তারপর চেয়ার ছেড়ে খাটে চিৎ—বুকের পর সেই ভারী বই—অন্যান্য কাজকর্ম বিস্মৃত হয়ে দিনের মনে দিন কেটে গেল।

দেখলাম, ভয়ের কিছু নেই তেমন। নিছক শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে পুজো করে দূরে সরিয়ে রাখার কোনো দরকার নেই। তাঁর রচনাগুলির পাঠযোগ্যতা একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নি, অনায়াসে পড়া যায়, দুঃখ, প্রেম মহত্ত্ব, আত্মত্যাগের পর্বগুলি এখনো শিহরণ জাগায়। সবচেয়ে বড় কথা, বঙ্কিমচন্দ্রের নানান দোষ ত্রুটিও চোখে পড়ে—সুতরাং বেশ কাজের মানুষ বলে মনে হয়। তাঁর পাগড়ি পরিহিত গম্ভীর ছবি— এমনিতেই সভয় সম্ভ্রম জাগায়, তার ওপর, তাঁর নামের পূর্বে ঋষি পদবীটি কে দিয়েছেন জানি না—একজন উপন্যাস লেখককে ঋষি বানিয়ে পাঠকদের থেকে বহু দূরে সরিয়ে দিলে সেই লেখকেরই ক্ষতি হয় বেশী। তাঁর রচনাগুলি এখন পড়লে বোঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র রীতিমত একজন জেদী, একগুঁয়ে মানুষ ছিলেন, এ দেশের মানুষকে সহোদর-সহোদরার মতন ভালোবাসতেন—সাহেবী ধরনের ভদ্রলোক ছিলেন—তাঁর জীবিতাবস্থায় কেউ তাঁকে ঋষি বলে ডাকলে তিনি নিশ্চিত অত্যন্ত চটে যেতেন। ইংরেজদের বিষয়ে এবং ধর্ম বিষয়ে তিনি অনেকবার মত পরিবর্তন করেছেন—এবং সে-কথা স্বীকার করতেও লজ্জা পান নি। আনন্দমঠ উপন্যাসের শেষে তিনি অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ভাবে ইংরেজদের হয়ে ওকালতি করেছেন, ইংরেজ শাসন যে এ দেশের পক্ষে শুভ সে কথাও বলেছেন। পরবর্তীকালে এই বঙ্কিমই ইংরেজদের চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করেছেন। কৃষ্ণ চরিত্রের ভূমিকায় তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, তিনি নিজে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করলেও—পাঠকদের তাঁর মতাবলম্বী করতে চান না। শ্রীকৃষ্ণের মানবচরিত্র সমালোচনা করাই তাঁর উদ্দেশ্য। এই ধরনের স্পষ্ট নীতি আজকাল দুর্লভ।

রাগী ধরনের লোক হলেও বঙ্কিমের রসিকতাবোধ ছিল অসাধারণ। তাঁর গদ্য অত্যন্ত স্বাদু। আজকালকার গল্প-উপন্যাসে এক ধরনের কেজো গদ্য ব্যবহৃত হয়—যেখানে নতুনত্বের চেষ্টা সেখানে কৃত্রিমতাই বেশী। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য বেশ সরল ও সুন্দর—সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য সত্ত্বেও সরল—এবং প্রতিটি লাইন রসাত্মকভাবে বলার ভঙ্গি এখনও যথেষ্ট উপভোগ্য। রসিকতা কোথাও কোথাও যে প্রায় চ্যাংড়ামির পর্যায়ে গেছে—সেটা আরও ভালো লাগে (উদাহরণঃ "তাহার মতে পাণিনি তো 'কালকের ছেলে'—"; "পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে পুরাণকার ঋষি কি গাঁজা খাইয়া লিখিয়াছেন?"; পুরাতত্ত্ববিদ লাসেন সাহেব বলেছেন, আমাদের কাব্য পুরাণে রূপকের আধিক্য, অনেক কিছুই তিনি রূপক হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চান—অনেক সংস্কৃত নামের ধাতুরূপ থেকে তিনি এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁকে ব্যঙ্গ করে বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন, "আমরা ইচ্ছা করিলে 'লস' ধাতু খোদ লাসেন সাহেবের নামের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করিয়া তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণা ক্রীড়া কৌতুক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি।")

ছেলেবেলায় "কৃষ্ণচরিত্র"কে ভয় পেয়ে ভুল করেছিলুম। "কৃষ্ণচরিত্র" মোটেই খটমটো রচনা নয়—অত্যন্ত উপভোগ্য লেখা—উপন্যাসের মতন কৌতূহল জাগ্রত রাখে। কৃষ্ণচরিত্রের বক্তব্যের সঙ্গে কে কে একমত হবেন জানি না—বস্তুত, এ প্রবন্ধে বঙ্কিম অনেক কুযুক্তির অবতারণা করেছেন—তথ্যগুলোকে যে নিজের সুবিধে মতন দলে টানছেন—এবং অসুবিধে হলেই প্রক্ষিপ্ত বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন—তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু আশা করি, এমন পাঠক এখনও অনেক আছেন, যাঁরা কোনো একটি রচনার বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারুন বা না-পারুন, তবু সেই রচনার যদি শিল্প সৌকর্য ও প্রসাদ গুণ থাকে—তবে তা নিশ্চয়ই উপভোগ করতে পারেন। "কৃষ্ণ চরিত্র" সেই কারণে একটি অবশ্য পাঠ্য রচনা—এখানে দেখা যায় তাঁর ভাষার জোর, বক্তোক্তির তীব্রতা এবং নিজের বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার এক অমানুষিক দৃঢ়তা। কিন্তু এই "কৃষ্ণচরিত্রে" বঙ্কিম একটি অনুচিত কাজ করেছেন। অন্যান্য সংস্কৃত শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ দিয়ে তিনি আমাদের সাহায্য করলেও বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গে একটি লম্বা শ্লোকের তিনি অনুবাদ দেন নি—কারণ, "তাহা আমরা স্ত্রীলোক, বালক প্রভৃতির বোধগম্য বাংলা ভাষায় কোনোমতেই প্রকাশ করিতে পারি না।" যে-বঙ্কিমচন্দ্র স্ত্রীলোক এবং বালকদের পাঠ্য বাংলা ভাষাকে সম্মানের আসনে বসাবার জন্য কলম ধরেছিলেন—তাঁর এরকম উক্তি শোভা পায় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি এখন পড়তে কেমন লাগে? উপন্যাসগুলির ঐতিহাসিক মূল্য, বাংলা সাহিত্যে তাদের স্থান, পথিকৃতের সম্মান—এ প্রশ্ন তুলছি না—গবেষক, প্রবন্ধলেখক ও অধ্যাপকরা তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন—নিছক একজন সাধারণ পাঠক পূর্বসংস্কার বাদ দিয়ে বঙ্কিমের কোনো উপন্যাস নতুনভাবে পড়ে দেখলে তার কি মনে হবে? আমি আমার অনুভূতি জানাচ্ছি। তাঁর চারখানি উপন্যাস আবার পড়ে আমি কোনো মহৎ আস্বাদ পাইনি। একটা বিশালত্ব ও কল্পনার প্রসারতা হৃদয় স্পর্শ করে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা অতৃপ্তি থেকে যায়। কালানুক্রমের অতৃপ্তির কথা বাদ দিচ্ছি—রামায়ণ, বৈষ্ণব পদাবলী কিংবা মনসামঙ্গল পাঠে সে অতৃপ্তি আসে না—বঙ্কিমের উপন্যাসে সেই অতৃপ্তি। প্রতিটি উপন্যাসে লেখক বড় বেশী উপস্থিত—প্রবন্ধ লেখকের মতন তাঁর মতামত জোর করে চাপিয়ে দিতে চান। দাম্পত্য সম্পর্কের পবিত্রতা নিয়ে এমন বাড়াবাড়ি করার কোনো কারণ খুঁজে পাই না। তাঁর সময়ে কি বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি টলে উঠেছিল? মনে তো হয় না! বিধবা বিবাহ সম্পর্কে তাঁর আপত্তির কারণ বুঝি—কিন্তু কথায় কথায় সতীত্বের এই জয়গান কেন? কপালকুণ্ডলার আরম্ভ অতি চমৎকার—বর্ণনা, ভাষা ও চরিত্র সৃষ্টি আধুনিক বিচারেও অসাধারণ মনে হয়—কিন্তু মাঝপথে উপন্যাসটিকে তিনি নষ্ট করতে শুরু করলেন। কপালকুণ্ডলার চরিত্রে যখন নবকুমার সন্দেহ করতে শুরু করল—তখন নবকুমারকে একটি গবেট ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। আমরা পাঠকরা জানি কপালকুণ্ডলা দুশ্চরিত্রা নয়—তবু লেখক জোর করে এখানে একটা নাটকীয় ঘটনা আনবার চেষ্টা করছেন।

উপন্যাসগুলির কাহিনী ও চরিত্র সৃষ্টির ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন এখন মনে জাগে—কিন্তু ভাষার প্রসাদগুণের জন্য তাঁকে এখনো শ্রেষ্ঠ সম্মান দিতে ইচ্ছে হয়।

সনাতন পাঠক

পুস্তক পরিচয়

উপন্যাস

ত্রিবর্ণ। বনফুল। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭। দশটাকা।

প্রচ্ছন্ন মহিমা। বনফুল। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ। চারটাকা।

ডাক্তার সুঠাম মুখোপাধ্যায় তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন : "তিন সংখ্যাটি মানব সভ্যতাকে বহু দিন থেকেই প্রভাবিত করেছে। আমাদের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তো আছেনই, খ্রীস্টানদের ট্রিনিটি আছে, বৌদ্ধদের আছে বুদ্ধ, ধর্ম আর সংঘ। আমরা স্বর্গের নাম দিয়েছি ত্রিদিব, আর সমস্ত লোককে অভিহিত করেছি ত্রিলোক নামে। এরকম অনেক 'ত্রি' বিভিন্ন দেশের পুরাণে আছে। উদ্বাস্তু সমস্যাকে কেন্দ্র করেও যে তিনটে বিভিন্ন রস ফুটে উঠেছে এ ভেবে ভারি ভালো লাগছে। আমার এ-ও মনে হচ্ছে, পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যাকে কেন্দ্র করেই বোধ হয় মোটামুটি এই তিন ধরনের মনোভাব ফুটে ওঠে। একদল থাকেন উদার সমন্বয়-পন্থী, একদল নবীন সংশোধন-পন্থী আর তৃতীয় দল বে-পরোয়া উগ্রপন্থী, যে-কোনও উপায়ে স্বকার্যসাধন করাই এঁদের উদ্দেশ্য।"—উপন্যাসের 'ত্রিবর্ণ' নামকরণের ব্যাখ্যা মোটামুটিভাবে এর মধ্যে নিহিত। বনফুল তাঁর প্রতিটি উপন্যাসেই অনন্য দু-একটি চরিত্র উপহার দেন। সুঠাম মুখোপাধ্যায়ের চরিত্র তাঁর অ্যালবামের এবং বাংলা সাহিত্যের পাতায় স্মরণীয় একটি নতুন মুখ। পেশায় ডাক্তার, অথচ অধিকাংশ সময় কাটান নির্জনে, প্রকৃতির কোলে, বহু জটিল বিষয়ে তাঁর নিজস্ব সুশৃঙ্খল চিন্তা ব্যক্ত হয় ডায়েরির পাতায়, দূর নক্ষত্রমণ্ডলী থেকে গোলাপবাগান পর্যন্ত তাঁর কবিত্বপূর্ণ মনের অবাধ আনাগোনা, পশুপাখির প্রতি অকৃত্রিম বাৎসল্য তাঁর, মঙ্গলা গাইয়ের সন্তান প্রসবের সম্ভাবনায় যিনি এই মুহূর্তে উৎকণ্ঠিত, পর মুহূর্তে তদ্‌গত চিত্তে তিনি সুখ ও দুঃখের প্রকৃতি নির্ণয়ে মগ্ন হয়ে পড়েন, সহানুভূতিতে মমতায় মনুষ্যত্বে সুঠাম মুখোপাধ্যায় পরিপূর্ণ একজন মানুষ। তবু সুঠাম মুখোপাধ্যায়কে 'ত্রিবর্ণ' উপন্যাসের নায়ক ভাবলে ভুল করা হবে। তাঁর ডায়েরিতে উল্লিখিত 'নবীন সংশোধন-পন্থী', অর্থাৎ দ্বিতীয় বর্ণের গণেশ হালদার বরং এই উপন্যাসের কেন্দ্র-চরিত্র। গণেশ হালদার পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তান। যৌবন কেটেছে বিলেতে। দেশে ফিরে মা আর বোনের কোনো সন্ধান পান নি। বিলেতী ডিগ্রীর ছাপ নিয়েও তিনি শেষ পর্যন্ত সুঠাম মুখোপাধ্যায়েরই শহরের স্কুলের মাস্টার হয়ে এসে পড়েছিলেন। যোগা-যোগটা অবশ্য পুরোপুরি আকস্মিক নয়। গণেশ হালদারের হারানো বোন বুলি—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বলি, পরে সুঠাম মুখোপাধ্যায়ের করুণায় তাঁর স্ত্রী—তাঁর এই নির্বাচনের নেপথ্যে ছিল। গণেশ হালদারের দিক থেকেই উপন্যাসটি রচিত। সুঠাম মুখোপাধ্যায়ের ডায়েরি কপি করতেন গণেশ হালদার। ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রটি বহুদিক থেকে উদ্ঘাটিত হয়েছে এই ডায়েরির সাহায্যে। অন্যদিকে গণেশ হালদার পরোক্ষভাবে পরিচিত হয়েছিলেন শহরের এক গোপন-চক্রের সভ্যদের সঙ্গে। এই দলে ছিল ডাঃ ঘোষাল, মিঃ সেন ও তাঁর মেয়ে তনিমা, সুবেদার খাঁ, মিঃ পাণ্ডা—প্রভৃতি শহরের নামী-অনামী কিছু ব্যক্তি। এঁদের প্রধান ব্যবসা ছিল চোরাই-মাল বিক্রি। এই দলের মধ্যমণি ঝিনুক বনফুলের সৃষ্ট আরেকটি আশ্চর্য চরিত্র। ঝিনুক ও শামুক দুই বোন। পূর্ববঙ্গ ছেড়ে এসে ভাগ্যের নিষ্ঠুর বিধানে দুই বোনই বাধ্য হয়েছিল অসৎ জীবনযাপনের পথ বেছে নিতে। শামুক শেষ পর্যন্ত পালিয়ে বাঁচল, পালিয়ে বাঁচল তনিমাও। কিন্তু ঝিনুকের মুক্তি ছিল না। যা প্রেমেই ছিল তার মুক্তি, তা সে-প্রেমের রূপ যত বিচিত্র বিষম তিক্ত-মোহন হোক না কেন। অথচ ঝিনুক ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্রী (ইকনমিকসে ফার্স্ট ক্লাস), বিপথগামী, তবু নিষ্কলুষ পরার্থপর আদর্শে উজ্জীবিত, অসম সাহসী, প্রখর বুদ্ধিমতী, কোমলপ্রাণ, সমস্ত দিক থেকে আদর্শ এক নারী। ডাঃ ঘোষালের সঙ্গে তার সম্পর্কটি আপাত-দৃষ্টিতে বিসদৃশ ঠেকলেও শেষ পর্যন্ত ঝিনুকের প্রেমিকা সত্তা তার সব কিছু ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। ডাঃ ঘোষালের জীবনবেদনাও মর্মান্তিক। বাইরে থেকে স্খলিত, ভ্রষ্ট, ইন্দ্রিয়পরায়ণ এই মানুষটির নিঃসঙ্গ অসহায়তা পরিসমাপ্তিতে সুন্দর-ভাবে চিত্রিত করেছেন বনফুল। 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবার সময়েই 'ত্রিবর্ণ' পাঠকসমাজে সাড়া জাগিয়ে-ছিল। উপন্যাসাকারে প্রকাশিত হয়ে এটি বাংলাসাহিত্যে একটি স্থায়ী সংযোজন হয়ে রইল।

'প্রচ্ছন্ন মহিমা' সুখপাঠ্য উপন্যাস।

কলকাতা শহরের পটভূমিকায় রচিত হলেও এর আখ্যানবস্তু মূলত 'সভ্যজগতের মুখোশপরা সমাজ-জীবনের বিরুদ্ধে'। এর নায়ক একদা তথাকথিত সভ্যসমাজের 'নামী' লোক ছিলো, কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তাকে বেছে নিতে হয় অজ্ঞাতবাসের জীবন। সেই নির্বাসিত জীবন সে কাটায় সমাজের এক নিচুতলার জগতে, যেখানকার লোকজন অবশ্য সকলেই 'নিচু' নয়। এদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন মহিমার বিকাশ কিভাবে ঘটল বনফুলের এই স্বল্পপরিসর উপন্যাসে তা চিত্রিত হয়েছে। উপন্যাসটির একটি ত্রুটি মাঝে-মাঝে বক্তব্য এত বেশী স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে উঠেছে যে, উপন্যাসের গতি শ্লথ ও ব্যাহত হয়ে পড়েছে। এ-ছাড়া অতি নাটকীয় কিছু ঘটনাও রয়েছে। তবু সব মিলিয়ে বনফুলের গল্প লেখার আকর্ষণীয় মেজাজে ও কৌতূহলকর ঘটনাবিন্যাসে উপন্যাসটি শেষ পর্যন্ত পাঠে আনন্দ পাওয়া যায়। 'ত্রিবর্ণ' ও 'প্রচ্ছন্ন মহিমা' দুটি উপন্যাসেই উদ্বাস্তু-সমস্যার ও রাজনীতি-সমাজনীতির আলোচনা বেশ কিছু অংশ অধিকার করে আছে। সমস্ত ক্ষেত্রে এই আলোচনা বোধ হয় অপরিহার্য ছিল না।

১৭৭।৬৮

ভস্মরেখা। সুদর্শন। পরিবেশক : এডভান্সড বুক হাউস, এ-১২-এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২। পনের টাকা।

'ভস্মরেখা' এক বৃহদায়তন উপন্যাস। উপন্যাসের পটভূমি স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ। বিভিন্ন ঘটনাযোগে নবলব্ধ রাজনৈতিক বন্ধন মুক্তির স্বরূপ ও প্রতিক্রিয়া আলোচ্য উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। নায়ক সুমন্ত্র আদর্শবাদী যুবক সমকালিক জাগ্রত গণ-মানসের প্রতিনিধি। পিতা নকুলেশ্বরবাবু ন্যায়নীতিবিবর্জিত প্রতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী। প্রথম দুই সন্তান অনুপম ও সুরেপম পিতার যথার্থ উত্তর-সাধক, তবে তুলনামূলক বিচারে অনেক অযোগ্য। এ-হেন পরিবেশে সুমন্ত্র বিপরীত মেরুর মানুষ। সে আপন পারিপার্শ্বিকতায় সদাই বিতৃষ্ণ। মেকী আত্মাদরপ্রবণ নীতি-হীন সমাজের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। লেখক অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সঙ্গে সুমন্ত্র চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তবে সুমন্ত্রর বিক্ষোভ উপন্যাসের কোথাও কোন সদর্থক সক্রিয়তা লাভ করেনি। বরং উপন্যাসের শেষে সুমন্ত্র-কণিকার মিলনে যে সরল-সমাপ্তি আভাসিত হয়েছে তা এক ধরনের তরল রোমান্টিকতাকেই প্রশ্রয় দেয়। বাংলা সাহিত্যে সুদর্শন সম্ভবত নবাগত। ফলে ছোটখাটো ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও তিনি কিছু ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন—এটাই আশার কথা। বহু শাখাশ্রয়ী ঘটনাপুঞ্জকে সংহত করে বক্তব্য বিষয়কে সুষ্ঠুরূপদান লেখকের সামঞ্জস্যবোধের পরিচায়ক। পরীক্ষামূলক রচনা হিসাবে 'ভস্মরেখা' উপন্যাসের একটা বিশেষ মূল্য রয়েছে।

১১৪।৬৭

ধর্ম

আমার দৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন, (৭-৮ অধ্যায়),—শ্রীশম্ভুনাথ ভদ্র। চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স, ১-১-১ এ-বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। মূল্য দু টাকা।

ভাগবত চেতনার সাথে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় একত্রিত হলে ভাগবত চেতনা পাওয়া যায়। নিজে ভাগবত চেতনা পেয়েই পাওয়ার পথটি শ্রীঅরবিন্দ সহজ সরল করে আমাদের জন্য তাঁর দি লাইফ ডিভাইন পুস্তকে এঁকে দিয়েছেন। অনুবাদক মূলের রস কোথাও ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি।

৪৪৪।৬৭

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় শ্রীমতী রাধারানী দেবীর কবিতা 'জন্মদিনে' মুদ্রাকর প্রমাদবশত একটি ভুল থেকে গেছে। কবিতাটির প্রথম স্তবক এই রকম হবে:

আমার অস্তিত্বে করে সচঞ্চল খেলা
যে-আমি সতত ক্ষিপ্র, বিরাম বিহীন,
উদ্বিগ্ন-অপেক্ষা নিয়ে কাটে তার বেলা
কোন্ তিথি বর্ষে পাবে নিজ জন্মদিন।

খেলার মাঠে

ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির নানা পরিকল্পনায় এবং নানা প্রস্তাবে নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের আগামী সাধারণ সভার কর্মসূচী বিশেষভাবে ভারাক্রান্ত। এর মধ্যে একটি প্রস্তাব এবং একটি পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু বলার আছে।

প্রস্তাবে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এবং ইউরোপীয়ান কাপ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথায় আর একটি বড় ফুটবল প্রতিযোগিতা পরিচালনার কথা বলা হয়েছে। ইউরোপের চ্যাম্পিয়ন ক্লাব দলগুলি নিয়ে ইউরোপীয়ান কাপ চ্যাম্পিয়নশিপ। আর প্রতি রাজ্যের লীগ চ্যাম্পিয়নদের নিয়ে 'ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ অব ইণ্ডিয়া'র ব্যবস্থা করার জন্য বর্তমান ভারতীয় প্রস্তাব। অর্থাৎ প্রতি রাজ্যের লীগ প্রতিযোগিতায় যারা চ্যাম্পিয়ন হবে, কেবল তারাই ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ অব ইণ্ডিয়ার অংশ গ্রহণের অধিকারী। প্রস্তাবটি গৃহীত হলে নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন স্বয়ং প্রতিযোগিতা পরিচালনার ভার গ্রহণ করবেন।

আপাতদৃষ্টিতে প্রস্তাবটি ভাল বলেই মনে হচ্ছে এবং ফুটবলের উন্নতির জন্য উঁচু দরের প্রতিযোগিতামূলক খেলার প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। কিন্তু ভারতে তো উঁচু জাতীয় প্রতিযোগিতার অভাব নেই। আর এই বিরাট দেশে মাঝারি ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন তো ভূরি ভূরি। প্রতি রাজ্যে রাজ্যে লীগ খেলা আছে, নানা-রকমের নক আউট আছে। স্কুল কলেজের ছেলে এবং অফিসের কর্মীদের জন্য আছে পৃথক লীগ ও নক-আউট। তারপর পি অ্যাণ্ড টি প্রতিযোগিতা, আন্তঃ রেল, আন্তঃ পুলিস, আন্ত কলেজ, আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতাও আছে। সর্বভারতীয় উঁচু দরের প্রতিযোগিতার মধ্যে আছে আই এফ এ শীল্ড, ডি সি এম, রোভার্স, ডুরাণ্ড প্রভৃতি প্রতিযোগিতা। এর উপর জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ অর্থাৎ সন্তোষ ট্রফির খেলা। তা ছাড়া মারডেকা ফুটবল, এশিয়ান ফুটবল প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার বহরও কম নয়। মাঝে মাঝে বিদেশ সফরের কথা ছেড়েই দিচ্ছি। এত সব প্রতিযোগিতার মধ্যে খেলোয়াড়দের বিশ্রামের ফুরসত খুবই কম। নক আউটে বেশী খেলা ড্র হলে একটি দলের উপর্যুপরি দুই তিন দিন প্রতিযোগিতা করার ঘটনাও কম নয়। সময়ের অভাবে অনেক প্রতিযোগিতা আরম্ভ দেরি যদি, শেষ হয়ও অনেক দেরিতে কিংবা শেষ পর্যন্ত শেষই হয় না। সারা বছরই প্রায় ফুটবলের আয়োজন লেগে থাকে।

এই অবস্থার মধ্যে আর একটি উঁচু দরের প্রতিযোগিতা পরিচালনা করা কিভাবে সম্ভব, ভেবে পাচ্ছি না। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের অভিমত, বেশী অনুশীলন, এমন কি বছরের ৩৬৫ দিনই ফুটবলের অনুশীলন খেলার উন্নতির সহায়ক হতে পারে। কিন্তু বেশী খেলায়, বিশেষ করে প্রতিযোগিতামূলক বেশী খেলায় অংশ গ্রহণ ফুটবলের উন্নতির পরিপন্থী। সব মিলিয়ে আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের অনেক বেশী প্রতিযোগিতামূলক খেলায় অংশ নিতে হয়। তারপরও আরও খেলার ব্যবস্থা হলে ফল কি ভাল হবে?

এই প্রশ্নের সঙ্গে আর একটি কথাও ভেবে দেখা দরকার। কার্যকারণে আমাদের ফুটবলের মধ্যে পেশাদারি প্রথা ঢুকে পড়লেও এখনো আমাদের দেশে পেশাদারি ফুটবলের প্রচলন হয়নি। ঘোমটার আড়ালে খেমটা নাচার মত অ্যামেচারের আড়ালে যে কতিপয় খেলোয়াড় প্রোফেশনাল খেলোয়াড়ের বৃত্তি গ্রহণ করেছেন তাদের বাদ দিলে বেশীর ভাগ খেলোয়াড়ই হয় অফিসের কর্মী, না হয় কলেজের পড়ুয়া। অফিস ও কলেজ কামাই করে বছরে এদের পক্ষে কত দিন ফুটবল খেলা সম্ভব?

লীগের খেলায় রাজস্থানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় গোল করায় ইস্টবেঙ্গলের বেনুকুমারের ব্যর্থতা। বেনুকুমার অবশ্য এই ব্যর্থতার আগে ও পরে একটি করে গোল করেন এবং ইস্টবেঙ্গল খেলায় ৩—০ গোলে বিজয়ী হয়

'ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ অব ইণ্ডিয়া'র প্রস্তাব আর একদিক দিয়েও অবাস্তব। কারণ, প্রতি রাজ্যে এক সময়ে লীগ খেলা আরম্ভ হয় না। কোনোটির শুরুর সঙ্গে কোনোটির শেষ, কোনোটি শেষ হতে কোনোটি আরম্ভ। অবশ্য শীতকালে ক্রিকেট মরসুমের মাঝে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু তাতেও কি কোন একটি কেন্দ্রে এই প্রতিযোগিতার সমস্যার সমাধান হবে? কিংবা খেলোয়াড়রা বেশী খেলায় অংশ গ্রহণের হাত থেকে পাবে নিষ্কৃতি?

আশা করি বারাণসীর ফুটবল সম্মেলনে ভারতীয় ফুটবলের পরিচালকরা সব দিক আলোচনা করে 'ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ অব ইণ্ডিয়া' সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

*

ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির জন্য একটি পরিকল্পনায় পশ্চিম জার্মানীর বিখ্যাত ফুটবল কোচ ডেটমার ক্রামারকে ভারতে এনে কোচিং ক্যাম্প পরিচালনার কথা বলা হয়েছে। পরিকল্পনাটি ফুটবল ফেডারেশনের সম্পাদক স্বয়ং শ্রীজিয়াউদ্দিনের। সাধু পরিকল্পনা সন্দেহ নেই। সুতরাং পরি-

মহমেডান স্পোর্টিং ও বাটার লীগের খেলায় বাটা গোলকিপার এম দত্ত মহমেডান সেণ্টার-ফরোয়ার্ড পান্নানার পাশ দিয়ে একটি কর্ণার কিক ধরতে যাচ্ছেন

কল্পনাকে স্বাগত জানাতেও দ্বিধা নেই। তবু একটু কিন্তু রেখে।

ফুটবল সম্পর্কে ডেটমার ক্র্যামারের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কথা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। বিগত বিশ্ব ফুটবলে পশ্চিম জার্মানী দলের রানার্স-আপ হবার ব্যাপারে তাঁর অবদান কম নয়। কিন্তু ক্র্যামারের ক্যালিবারের কোচকে তো ভারতে আগেও আনা হয়েছে। ক্র্যামার নিজেও এ দেশে স্বল্পকালের অবস্থানে ফুটবল সম্পর্কে উপদেশ নির্দেশ দিয়েছেন।

শুধু ফুটবলের কথাই বা বলি কেন, স্বাধীনতা লাভের পর রাজকুমারী অমৃত কুমারীর ক্রীড়া শিক্ষা পরিকল্পনার সূচনা থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত ভারতে যেমন অনেক ক্রিকেট কোচ এসেছেন তেমন এসেছেন অনেক ফুটবল কোচও। কিন্তু আমরা যেখানে ছিলাম প্রায় সেখানেই কি থেমে নেই? কেউ কেউ তো বলছেন, আমরা আরও পিছিয়ে পড়েছি। তাঁদের অভিমতের সঙ্গে অবশ্য আমি একমত নই; তবে এ কথা অস্বীকার করতে পারছি না যে, কোচিং ক্যাম্প পরিচালনা করে বা বিদেশ থেকে কোচ আনিয়ে আমরা খেলাধুলোয় উন্নতির যে আশা করেছিলাম তা পূরণ করতে পারিনি। হয় আমাদের পরিকল্পনায় গলদ আছে, না হয় আছে শিক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থায় ত্রুটি, কিংবা শিক্ষার্থীদের আন্তরিকতার ফাঁক।

স্বল্পকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা যে সামগ্রিক উন্নতির সহায়ক নয় অভিজ্ঞতা থেকেই এ কথা আমাদের বোঝা উচিত। অথচ ক্র্যামারকে দিয়ে সেই স্বল্পকালীন কোচিং ক্যাম্প পরিচালনারই পরিকল্পনা করা হয়েছে। পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, ভারতে তিন মাস অবস্থানকালে ক্র্যামার পাঁচটি শিক্ষা কেন্দ্রে তিন থেকে চার সপ্তাহ অবস্থান করবেন এবং শেষে ভারতীয় কোচদের একটি কেন্দ্রীয় সমাবেশ কেন্দ্রে কিছুদিন থেকে কোচদের উপদেশ নির্দেশ দেবেন।

এতেও কিছু কাজ হবে না এমন কথা বলব না। তবে অবশ্যই বলব, এ পরিকল্পনাও আগের মত ত্রুটিপূর্ণ। ভারতের মত বিরাট দেশের জন্য একজন কোচ নয়, অনেক কোচের দরকার। এবং স্বল্পকালীন ক্যাম্প নয়, সারা বছরব্যাপী কোচিং ক্যাম্পের প্রয়োজন। ভারতের গুণী কোচদের দ্বারা আংশিক অভাব পূরণ হতে পারে। বাকির জন্য দরকার আন্তর্জাতিক ফুটবলের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একাধিক কোচের এবং সারা বছরের জন্য।

ডেট-ক্র্যামারকে আনা সম্পর্কে এখনো অনেক বাধা আছে। বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন আছে, ভারত সরকারের অনুমতির প্রয়োজন আছে। তবে ক্র্যামার ভারতে আসতে যখন আগ্রহী তখন আশা করব এসব অসুবিধা দূর হয়ে যাবে এবং ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির জন্য যাঁরা মাথা ঘামাচ্ছেন তাঁরা ক্র্যামারকে দীর্ঘকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে আরও কোচ আনার ব্যবস্থা করবেন।

*

ফুটবল লীগে সবচেয়ে বেশী গোলদাতা দলের জন্য দেওয়া ডি বি সেন ট্রফিটি আই এফ এ-র যুগ্ম সম্পাদক শ্রীবীরকুমার মুখার্জির হাতে তুলে দিচ্ছেন মেয়র শ্রীগোবিন্দ দে

আগের সপ্তাহেই লিখেছি, তুলনামূলক বিচারে কলকাতার ফুটবল লীগে নাম ডাকের বড় বড় ক্লাবের খেলোয়াড়দের চেয়ে মাঝারি বা ছোট ক্লাবের খেলোয়াড়দের খেলারই বাহাদুরি বেশী। এক সপ্তাহ পরেও আমার সে ধারণার বদল হয়নি।

যদিও মোহনবাগান প্রথম খেলায় জর্জ টেলিগ্রাফকে ৬—২ গোলে এবং দ্বিতীয় খেলায় হাওড়া ইউনিয়নকে ৫—১ গোলে সহজেই পরাজিত করেছে, মোহনবাগানের নাইম হাওড়ার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিকও করেছেন তবু দুটি খেলায় মোহনবাগানের তিনটি গোল রক্ষণভাগের ভুল খেলা বা দুর্বলতারই পরিচয়। সত্যি কথা বলতে কি, পর্যাপ্ত প্রাধান্য সত্ত্বেও দুটি খেলায় মোহনবাগানের সত্যিকার শক্তির পরিচয় মেলেনি। এবং তৃতীয় খেলায় ইস্টার্ন রেলের সংগেও তারা ভাল খেলতে পারেনি। অস্পষ্ট আলোর জন্য ১১ মিনিট আগে খেলাটি বন্ধ হয়ে না গেলে ইস্টার্ন রেলের কাছ থেকে মোহনবাগান পুরো পয়েন্ট পেত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

ইস্টবেংগল সম্পর্কেও এক কথা। চারটি জয়ের মধ্যে উয়াড়ি ও রাজস্থানের বিরুদ্ধে তিনটি করে গোল করলেও ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখে সমর্থকদের মন ভরেনি। কালীঘাট ও এরিয়ানের বিরুদ্ধে ইস্টবেংগলের জয় তো রীতিমত কষ্টার্জিত। ইস্টবেংগলের খেলায় যোগাযোগের অভাব আছে। আক্রমণ রচনায় ত্রুটি আছে। সবচেয়ে যেটা বেশী আছে তা হচ্ছে আত্মবিশ্বাসের অভাব। এখনো সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি দলে পরিণত হয়ে উঠতে পারেনি।

সালাতুল্লার হ্যাটট্রিক সমেত গতবারের অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ন মহমেডান স্পোর্টিং প্রথম খেলায় জর্জ টেলিগ্রাফকে ৪—১ গোলে ও দ্বিতীয় খেলায় বাটা দলকে ২—০ গোলে হারিয়ে তৃতীয় খেলায় হাওড়া ইউনিয়নের কাছে প্রথম একটি গোল খেয়ে বসে। পরে অবশ্য গোল শোধ করে ২—১ গোলে এগিয়ে যায় কিন্তু মেঘাবৃত আকাশের অস্পষ্ট আলোর জন্য এ খেলাটাও ৫ মিনিট আগে বন্ধ হয়ে যায়। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়দের তুলনায় মহমেডানের খেলোয়াড়রা বেশী আত্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী। খেলার মধ্যে সামঞ্জস্যও কিছু আছে। সম্ভবত তার প্রধান কারণ—গতবারের দলের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। তা ছাড়া সরদার খাঁর মত একজন সুকুশলী খেলোয়াড় দলে এসেছেন। তবু আমার ধারণা, শক্ত প্রতিযোগীর কাছে মহমেডানকেও যথেষ্ট বেগ পেতে হবে।

শক্তিশালী দল হিসাবে পরিগণিত বি এন আর-এর সূচনা ছিল খুবই ভাল। প্রথম খেলাতেই জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে ৬ গোল। কিন্তু দ্বিতীয় খেলাতেই খিদিরপুরের বিরুদ্ধে কোনক্রমে ১—০ গোলে জয়। কালীঘাটের বিরুদ্ধে ২—০ গোলের ক্ষেত্রেও কিছুটা ভাগ্যের সহায়তা। তার পরের খেলাতেই উয়াড়ির কাছে ২—৩ গোলে পরাজয়। সুতরাং বি এন রেল দলের খেলাতেও উন্নত এবং যোগাযোগপূর্ণ ফুটবলের পরিচয় নেই।

প্রাথমিক একক লীগের পর শীর্ষস্থানীয় চারটি দলকে নিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণয়ের সুপার লীগে ফুটবল ক্রীড়ামোদীরা মোহনবাগান, ইস্টবেংগল, মহমেডান স্পোর্টিং এবং বি এন আরকেই সম্ভাবিত প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ধরে রেখেছে। অথচ এই চারটি দলের কোন দলই তাদের খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারছে না।

অবশ্য এ কথা স্বীকার্য মাঝারি শক্তির বা অল্প শক্তির প্রতি দলই বড় বড় ক্লাবের সংগে খেলবার সময় জানপ্রাণ দিয়ে লড়ে থাকে। ফলে তাদের খেলাও ভাল হয়। অন্য খেলায় তাদের খেলার মধ্যে এই আন্তরিকতার পরিচয় মেলে না। যাই হোক, কলকাতার ফুটবল মরসুম জমে উঠলেও এখন পর্যন্ত এমন একটি খেলাও অনুষ্ঠিত হয়নি, যা দেখে দর্শকরা সত্যিকারের আনন্দ এবং আক্রমণ প্রতি-আক্রমণের ছন্দোসুখ উপভোগ করেছেন।

*

কলকাতার ফুটবল ও ক্রিকেটের বিজয়ীদের নানা পুরস্কারের তালিকায় আরও দুটি পুরস্কার যোগ হয়েছে। একটি প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগে সবচেয়ে বেশী গোলদাতা দলের জন্য আর একটি ক্রিকেটের জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের জন্য। দুটি ট্রফিই দান করা হয়েছে পরলোকগত ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া উৎসাহী শ্রী ডি বি সেন-এর স্মৃতির জন্য। দান করেছেন শ্রীডি বি সেনের পুত্র শ্রীঅমল সেন।

আই এফ এ এবং মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন সহ-সভাপতি শ্রীডি বি সেন ময়দানপাড়ায় যিনি 'দাঁতিদা' নামে সবার প্রিয় ছিলেন তিনি ছিলেন উত্তর কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ বসু-মিত্র-সেন পরিবারের ক্রীড়া-আদর্শ ও ক্রীড়া-ঐতিহ্যের উত্তরসাধক। কারোই অজানা নেই, এই বসু-মিত্র-সেনদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় মোহনবাগান ক্লাবের সূচনা এবং পরবর্তী কালে প্রতিষ্ঠা। দাঁতিদাও জীবনভর মোহনবাগান ক্লাবের প্রতিষ্ঠা ও আদর্শ বজায় রাখার জন্য সংগ্রাম করে গিয়েছেন। সমাজ সেবার সংগে ক্রীড়া চর্চা এবং খেলাধুলার সংগে জীবন সংগ্রামকে এক করে জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার মহৎ চেষ্টায় গ্রহণ করেছেন বড় ভূমিকা।

আই এফ এ এবং সি এ বি-র হাতে দুটি ট্রফি অর্পণ অনুষ্ঠানের সভাপতি ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীঅমলকুমার সরকার আগামী দিনের খেলোয়াড়দের কাছে পরলোকগত ডি বি সেনের আদর্শকে তুলে ধরার আবেদন জানিয়েছেন। কলকাতার মেয়র শ্রীগোবিন্দ দে-ও বলেছেন, 'ট্রফি জয় নয়, যার নামে এই দুটি ট্রফি তাঁর আদর্শ বজায় রাখার চেষ্টা হলে সেটাই হবে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এবং মেয়রের এই মন্তব্যের কথা স্মরণ রেখে আমরাও আশা করব, উচ্ছৃঙ্খলতা ও আদর্শচ্যুতির যে কালো ছায়া ধীরে ধীরে ক্রীড়াঙ্গনকে গ্রাস করতে চাইছে অতীত দিনের আদর্শের পূজারীদের পূণ্য স্মৃতিতে তা যেন লুপ্ত হয়ে যায়। খেলার মাঠ যেন আদর্শ ও আনন্দের রমাভূমি হয়ে ওঠে।

একলব্য

পল শিহান

বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার কম বয়সী ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে বর্ণময় খেলোয়াড় পল শিহান। বয়স মাত্র একুশ। ইতিমধ্যেই বিশ্বের নামী ক্রিকেটারদের সঙ্গে তুলনার পাত্র।

দীর্ঘদেহী লাবণ্যময় ক্রিকেটার পল শিহানের খেলার মধ্যে পরলোকগত ফ্রাঙ্ক ওরেলের খেলার মতই ব্যাট বলের মধুস্পর্শ, ওরেলের মতই খেলার সৌন্দর্য—বলেছেন অতীত দিনের বিখ্যাত চৌকস খেলোয়াড় এবং বর্তমানের ক্রিকেট লেখক কীথ মিলার।

আবার মিলার এ কথাও বলেছেন, খেলার এত সৌন্দর্য সত্ত্বেও শিহান এখন পর্যন্ত একটু অপরিণত। কারণ ওল্ড ট্রাফোর্ডে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্টে ভুল বোঝাবুঝির ফলে সহ খেলোয়াড় ইয়ান চ্যাপেল রান আউট হতেই শিহান-এর সেঞ্চুরি করার সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়। শিহান এত অধীর হয়ে ওঠে যে, ১১ নম্বর ব্যাটসম্যানের মত খেলতে থাকে। ফলে ৮৮ রানের মাথায় তাকে আউট হতে হয়।

অন্যান্য ক্রিকেট লিখিয়েরাও শিহানের চিত্তচাঞ্চল্যকে ক্ষমা করতে পারেননি। আবার অনেকে তার অপরিণত সুন্দর ইনিংসকে দেখেছেন ক্ষমা-সুন্দর চোখে। বলেছেন, কার না এমন হয়? ইংলণ্ডের মাটিতে সর্বপ্রথম এবং অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট খেলার প্রথম সুযোগে সেঞ্চুরির মুখে এসে যদি ভুল বোঝাবুঝির ফলে দলের ক্ষতি হয় তবে চিত্তচাঞ্চল্য স্বাভাবিক, মনঃসংযোগ নষ্ট হতে বাধ্য। বিশেষ করে একজন উঠতি তরুণের পক্ষে। পরিমার্জনের সঙ্গে পরিমিতি বোধের সামঞ্জস্য থাকলে তো এই একুশ বছরেই শিহান ওরেল হয়ে যেতে পারতেন। ওরেলও কি এইভাবে উইকেট ছুঁড়ে ফেলে দেন নি?

কথাটা মিথ্যে নয়। বহু সংগ্রামের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে ওরেল পাকা সোনায় পরিণত হয়েছিলেন। শিহান সবে যাচাই হতে শুরু করেছেন। ইংলণ্ডে তাঁর এই প্রথম সফর।

ইংলণ্ডে আসার আগে খেলেছেন চারটি টেস্ট। সবই ভারতের সঙ্গে। চারটি টেস্টের ৭ ইনিংসে ৩১৮ রান, অ্যাভারেজ ৪৫·৪০। তার পর ওল্ড ট্রাফোর্ডে ইংলণ্ডের সঙ্গে প্রথম টেস্ট। রান ৮৮ ও ৮। বলবার কথা, এই পর্যন্ত যে পাঁচটি টেস্টে সিহান অস্ট্রেলিয়া দলে খেলেছেন সে পাঁচটি টেস্টেই অস্ট্রেলিয়া বিজয়ী হয়েছে সর্ব বিভাগে পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয়ে। তাই পল শুধু গুণী খেলোয়াড় নয়, লাকি খেলোয়াড়ও বটে।

সিহানের ধমনীতেই বইছে ক্রিকেটের রক্ত। বাবা অস্ট্রেলিয়ার ক্লাব ক্রিকেটে বেশ নামকরা খেলোয়াড়। তিন ভাইয়ের মধ্যে বড় দুই ভাইয়েরও ক্রিকেটে ভাল হাত। সব চেয়ে ছোট পল। মেলবোর্নের মাইল কুড়ি দূরে ওয়ারিবিতে বাড়ির পেছনেই বাগানের মাঠেই ওদের 'ব্যাট-খাড়া'। বাবাই ছিলেন বড় উৎসাহদাতা। ছেলেদের সেখানেই খেলা শেখাতেন। বলা বাহুল্য, স্টাইল ও টেকনিকের বিশেষ ভঙ্গিমা দেখে বাবা পলের উপরই একটু বেশী নজর দিয়েছিলেন। পলের বয়স তখন সবে পাঁচ বছর। ঘাসের উপর দিয়ে বল মারতেই বাবা বেশী উৎসাহ দিতেন এবং বলতেন যদি তোমার বল বেড়ার উপর দিয়ে ডিঙ্গিয়ে যায় আমি তোমার খেলার সঙ্গী হব না। সেই থেকে যাকে বলে কার্পেট ড্রাইভ সেই মারের প্রতি পলের প্রবণতা বেশী।

পলের বয়স যখন মাত্র ১০ বছর তখন প্রিপেটরী স্কুল মাঠের মন্দ পিচে ওর ড্রাইভ-এর ভঙ্গি ও নিখুঁত মারের কৌশল সমালোচক মহলে ওয়াল্টার হ্যামণ্ডের খেলার স্মৃতি জাগিয়ে তোলে।

পল সিহান এখন ভিক্টোরিয়া দলের খেলোয়াড়। কিন্তু ভিক্টোরিয়ার পক্ষে না খেলতেই অনেকে তাকে অস্ট্রেলিয়ার ভবিষ্যৎ টেস্ট খেলোয়াড় এবং নর্মান ও'নীলের যোগ্য পরিপূরক হিসাবে কল্পনা করে নেন।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে পলের আগমন মাত্র তিন বছর। ১৯৬৬-৬৭ সালে 'ক্রিকেটার অফ দি ইয়ার'-এর সম্মান। '৬৭-তে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় দলের হয়ে নিউজিল্যাণ্ড সফর এবং ক্রাইস্ট চার্চে তৃতীয় বে-সরকারী টেস্টে ১৩৫ রান। ১৩৫ রানের ওই ইনিংসটি ছিল ক্রিকেটের ললিত লাবণ্যে ভরা একটি আনন্দের ইনিংস।

অস্ট্রেলিয়ার শেফিল্ড শীল্ডে তিন বছরে ভিক্টোরিয়ার পক্ষে ১২টি ম্যাচ খেলে একটি ডাবল সেঞ্চুরী ও চারটি সেঞ্চুরী সমেত সিহান ১০৪৯ রান করেছেন। গত অস্ট্রেলিয়ান মরসুমে করেছেন ৫৭৩ রান।

১৯৬৫-৬৬ সালে ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা অস্ট্রেলিয়ায় প্রাইম মিনিস্টারের একাদশের সঙ্গে খেলার সময় এই বালক-প্রতিভার সামান্য পরিচয় পেয়েছিলেন। সে খেলায় ইংলণ্ডের বোলারদের তোয়াক্কা না করে সিহান করেছিলেন ৭৯ রান।

ক্রিকেটারের ধৈর্য, ক্রিকেটারের মনঃসংযোগ, ক্রিকেটারের আভিজাত্যপূর্ণ আচরণ এবং ক্রিকেটারের অবয়ব—সবই আছে পল সিহানের। স্টাইল ও টেকনিক তো আছেই। তবু স্টাইল ও টেকনিকের এই তরুণ মাস্টার এখনো ক্রিকেটের শিক্ষার্থী। 'হুক' করায় দুর্বলতা আছে। গত মরসুমে লেগ স্টাম্পের লাইনে পড়া সর্টপিচ বল মারার বারবার ব্যর্থতায় বাবাকে বলেছিলেন—'বাবা, বাড়ির পেছনের সেই মাঠে কি আবার খেলার ব্যবস্থা করা যায় না?

মুকুল

গ্লোবে "আওয়ার ম্যান ফ্লিন্ট" ছবিতে জেমস কোবার্ন ও গিলা গোলান

মার্চেন্ট-আইভরি প্রোডাকশন্স-এর 'দি গুরু' ছবিতে রিটা টুশিংহাম

সিনেমা খুলছে

সিনেমা ধর্মঘট চলছে। আবার একটির পর একটি সিনেমাও খুলেছে। ইতিমধ্যে শহর ও শহরতলির অনেকগুলি প্রেক্ষাগৃহে আলো জ্বলেছে। ই আই এম পি'এর হিসাব মত (গত রবিবার পর্যন্ত) কলকাতায় ও বাইরে মোট ১০২টি সিনেমা খুলেছে। সংস্থা জানান যে, মোট ২০২টি সিনেমা ধর্মঘটের আওতায় ছিল।

সিনেমা ধর্মঘটের শততম দিবস পূর্ণ হয়েছে গত সপ্তাহে। এত দীর্ঘ দিন ধরে আর কোথাও সিনেমা ধর্মঘট চলেনি। ১৯৬৬ সনে ধর্মঘট চলেছিল মাত্র ছাব্বিশ দিন।

১২ মার্চ পশ্চিমবঙ্গে পর্যায়ক্রমে ধর্মঘট শুরু হবার পর বিরোধ মীমাংসার অনেক চেষ্টা হয়েছে। প্রথমে রাজ্য সরকার কর্মীদের দাবির দু'টি মূল বিষয় মীমাংসার জন্য ট্রাইব্যুনালে পাঠান। কর্মী সংস্থার আবেদনে হাইকোর্ট থেকে এপ্রিল মাসের শেষে ট্রাইব্যুন্যালের ক্ষমতার উপর ইন-জাংশন দাবি করা হয়।

তারপর রাজ্যপাল এবং রাজ্য স্বরাষ্ট্র সচিব কর্মীদের কাছ থেকে তাঁদের দাবি-দাওয়ার কথা শোনেন। এই সময়ে মালিকরা অভিযোগ করেন, সরকার কর্মী-প্রতিনিধি-দের সঙ্গেই বারবার বৈঠক করছেন। মালিক পক্ষের কথা সরকার শুনছেন না। অবস্থা এমনিভাবে ক্রমশ ঘোরালো হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে ই-আই-এম-পি-এ'র প্রতিনিধি জানান, সিনেমা টিকিটের দশ পয়সা হার বৃদ্ধি (প্রমোদকরমুক্ত) এবং শো-ট্যাক্স প্রত্যাহার করা হলে মালিক পক্ষ কর্মীদের দাবি-দাওয়া বিবেচনা করতে পারেন। 'শো-ট্যাক্স' তুলে নেওয়া হবে না, এ কথা রাজ্য সরকার স্পষ্টই জানিয়ে দেন। এবং ৪২ দিন ধর্মঘট চলার পর রাজ্য সরকার ঘোষণা করেন, সিনেমা বন্ধ থাকলে লাইসেন্স রিনিউ করা হবে না। বলা বাহুল্য, এই ঘোষণার পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়ে।

অপর দিকে রাজ্য সরকার ধর্মঘটী কর্মীদের জন্য অস্থায়ী সিনেমার লাইসেন্স মঞ্জুর, কয়েকটি সরকারী সিনেমা হাউস চালু, বাংলা ছবির জন্য উন্নয়ন কমিটি গঠন প্রভৃতি পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেন। কর্মীরাও নিজেদের চেষ্টায় এবং সরকারী সহায়তায় কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে এবং মুক্ত-অঙ্গনে ছায়াছবি প্রদর্শনী শুরু করেন। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান বিশেষ হয়নি। আসল বিরোধের মীমাংসা সুদূর-পরাহত হয়েই রইল। শেষ পর্যন্ত রাজ্য

"চেনা-অচেনা" : বিকাশ রায় ও সুস্মিতা সান্যাল

সরকার টিকিটের দাম শতকরা ১৫ ভাগ বাড়াতে রাজী হলেন। গত ১১ জুন রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতর মীমাংসার সালিসী প্রস্তাব নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডেকেছিলেন। তা ব্যর্থ হয়।

তারপরের ঘটনা নিষ্ফল আলোচনার ইতিহাস। এ পর্যন্ত মালিক ও কর্মী-প্রতিনিধিদের আলাদা আলাদাভাবে আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয়েছে ২৯টি। দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হয়েছে বহুবার। তা ছাড়া, ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে ৭টি। কোন ফল হয়নি। আলাপ-আলোচনার পথ রুদ্ধ হয়েছে এ-কথা অবশ্য বলা যায় না।

বিনয়-বাদল-দীনেশ

একোবি ফিল্মের "মহাবিপ্লবী অরবিন্দ" ছবি প্রায় শেষ হয়ে এল। এর পর পরিচালক দীপক গুপ্ত "বিনয়-বাদল-দীনেশ" ছবি তৈরির কাজে হাত দেবেন। বাংলার অগ্নিযুগের এই তিন বিপ্লবীর জীবন-কাহিনী নিয়ে ছবিটি তৈরি হবে। শ্রীগুপ্ত বর্তমানে চিত্রনাট্য রচনা করছেন। চিত্রনাট্যে শুধু বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্তর জীবনের ঘটনাই থাকবে না, সেই সঙ্গে বাংলার বিপ্লব-যুগের চিত্রটিও ফুটিয়ে তোলা হবে।

"তীরভূমি" সমাপ্ত

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে চিত্র ভারতীয় প্রথম ছবি "তীরভূমি" সেন্সারের ছাড়পত্র পেয়েছে। ছবিটি মুক্তির প্রতীক্ষায়। এই ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিকাশ রায়। গুরু বাগচী পরিচালিত ছবির ভূমিকালিপিতে আছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, রুমা গুহঠাকুরতা, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, জীবেন বোস, সীতা দেবী, মাঃ শংকর ও রবি ঘোষ। বিজন পালের সুরে ছবির গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র ও রুমা গুহঠাকুরতা।

"সুবহ কাঁহি শাম কাঁহি"

সম্প্রতি কলকাতায় "সুবাহ কাঁহি শাম কাঁহি" নামের একটি হিন্দী ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। ছায়াদূত প্রাঃ লিঃ প্রযোজিত ছবিটির কাহিনী, সংলাপ ও গীতরচনা করেছেন আর এস প্রীতম। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক দিলীপ বসু। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন হিমাংশু বিশ্বাস। একটানা চার দিনের শুটিংয়ে যে শিল্পীরা যোগ দিয়েছেন তাঁরা হলেন মৃণাল মুখোপাধ্যায় ("ছুটি" খ্যাত), কালীপদ চক্রবর্তী, জ্ঞানেশ মুখার্জী, ত্রিলোচন ঝা, চার্লি, মানিক, কৃষ্ণা দেবী, নবাগতা অর্চনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নন্দা।

আনন্দবাজার পত্রিকা রিক্রিয়েশন ক্লাবের অনুষ্ঠান

আনন্দবাজার পত্রিকা রিক্রিয়েশন ক্লাবের দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান গত মঙ্গলবার (১৮ জুন) বিশ্বরূপা মঞ্চে সম্পন্ন হল। এবার ক্লাবের সভ্যরা শচীন সেনগুপ্তর "গৈরিক পতাকা" মঞ্চস্থ করেন। পুরুষ-চরিত্রে ক্লাবের সভ্যরাই অভিনয় করেন। শৌখিন শিল্পী এঁরা সকলেই। শৌখিন মঞ্চে যাঁরা নিয়মিত অভিনয় করেন কিংবা যাঁরা পেশাদারী অভিনেতা, তাঁদের দক্ষতা আনন্দবাজার রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যদের কাছে আশা করা খুব স্বাভাবিক নয়। তবু এঁদের মধ্যে দু'-একজন শিল্পী আছেন, যাঁদের অভিনয়-নৈপুণ্য বিশেষভাবে লক্ষ করার মত। এঁদের মধ্যে অমরেশ ভট্টাচার্য (ঔরংগজেব), সুধাংশু চট্টোপাধ্যায় (যে-ু-পুরে), পাঁচুগোপাল বসু (তানাজী) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শিবাজী চরিত্রে শংকরনাথ নন্দীর অভিব্যক্তি যত সুন্দর, বাচনভঙ্গি তত ব্যক্তিত্বপূর্ণ নয়। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য, তারাশংকর রায়, বিনয়কৃষ্ণ ভৌমিক, কৃষ্ণকুমার ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ সেন, রাখালচন্দ্র মাইতি, সুরেন্দ্রনাথ দাস-কর্মকার, সত্যজিৎ রায়, অধীরচন্দ্র মাইতি, শম্ভুলাল বসু, ব্যোমকেশ জানা, অমরনাথ ঘোষ, দীপক গাঙ্গুলী, মুকুল চক্রবর্তী, শ্রীকান্ত মহাপাত্র প্রভৃতি চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন।

মহিলা চরিত্র সব কয়টিই সুঅভিনীত। প্রতিমা দাশগুপ্ত, লতিকা দাশগুপ্ত প্রতিমা পাল, পুতুল চক্রবর্তী, মন্দিরা দাস প্রভৃতি তাঁদের অভিনীত চরিত্রে প্রাণসঞ্চার করেছেন। চরিত্রচিত্রণের বিশেষ ক্ষমতা দেখিয়েছেন প্রতিমা দাশগুপ্ত, লতিকা দাশগুপ্ত ও প্রতিমা পাল। জয়শ্রী সরকারের নৃত্য মোটামুটি উপভোগ্য।

শশাঙ্ক ভট্টাচার্য পরিচালিত এই নাটকটি সামগ্রিকভাবে উপভোগ্য হয়। পাত্র-পাত্রীদের বেশভূষা ঐতিহাসিক নাটকের উপযোগী। বিলিবাবু ও সম্প্রদায়ের আবহ-সংগীত চিত্তাকর্ষক।

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীসুবোধ ঘোষ। তিনি তাঁর সময়োচিত ভাষণে আধুনিক জীবনে নাটকাভিনয়ের স্থান বিশ্লেষণ করেন। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীসুধাংশুকুমার বসু। তিনি বাংলা নাটকের অতীত ও বর্তমান যুগ নিয়ে আলোচনা করেন। সংস্থার সহ-সভাপতি শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সেন সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এর আগে সংস্থার যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীতারাপদ মণ্ডল সম্পাদকের বক্তব্য পাঠ করেন। প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যুগ্ম-সংগঠন সচিব শ্রীনেপাল চক্রবর্তী।

শ্রীঅনুপ ঘোষাল ও শ্রীমতী সবিতা ঘোষাল উদ্বোধন সংগীত গেয়ে সকলকে আনন্দ দেন।

॥ নাটক ॥

চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড

নক্ষত্র-গোষ্ঠীর নাট্যপ্রয়োজনা "চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড" (রচনা : মোহিত চট্টোপাধ্যায়) 'সায়েন্স ফিকশান' বা বৈজ্ঞানিক রূপকথা নয়। যদিও নামে চন্দ্রলোকের উল্লেখ, সমস্যা বা বক্তব্য আসলে এই গ্রহের, এই পৃথিবীর। সহজ একথা বলা যেতে পারে। বিশেষ করে নায়িকা শান্তার চিন্তাধারা এবং স্কুলের ছাত্রীকে (শান্তা শিক্ষিকা) শিক্ষাদানের ধরন (শিক্ষণীয় বিষয়ও বটে) দেখে। এ যুগের তার সব লক্ষণ বিদ্যমান সত্ত্বেও শান্তার শিক্ষাপদ্ধতির কথা বলা হল এই কারণে যে, তার দেওয়া শিক্ষা—কী ছাত্রীকে কী নাটকের প্রেত-নায়ককে — যেন আধুনিক কালের বিচারে অনেক বেশী এগিয়ে আছে, "আহেড অব আওয়ার টাইমস"। স্কুল বা ... যে ইংরেজী সংজ্ঞা বলেছে শান্তার ছাত্রী, ওই বয়সের মেয়ের পক্ষে তা বলা সম্ভব নয়, সেকালের কথাও নয়। শান্তার ছাত্রীর পক্ষে হয়ত সেটাই স্বাভাবিক। শান্তা সাধারণ মেয়ে নয়। তার প্রেমাস্পদ প্রেত। শান্তার হাতে জীবনের চাবিকাঠি। প্রেমের শক্তিতে সে প্রেতাত্মার মধ্যে জীবনের স্পন্দ ও উত্তাপ, চাঞ্চল্য ও আবেগ এবং কামনা ও বাসনা ফিরিয়ে আনতে চায়। নায়ক আসলে প্রেত নয়, অবসাদগ্রস্ত, নৈরাশ্যক্লিষ্ট, পলাতক এক মানুষ। তবুও ... হয়, শান্তার এক্সপেরিমেন্ট ব্যর্থ। ... যে কথা শান্তা তার প্রেত-প্রেমিককে ... ও যে শিক্ষা সে তাকে দেয়, তাও যেন আগামীকালের। চিন্তা ও ভাবনায় শান্তা যেন একালের মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিতা মেয়েদের অনেক পিছনে ফেলে এসেছে। শান্তা চন্দ্রলোকের বলে কি? অন্তত এই গ্রহের মেয়েদের সঙ্গে তার অমিল।

অবশ্য বক্তব্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থে এই বাস্তব-অতিক্রমণ বা চিন্তার অতিচার গমন তেমন দোষের নয়। বক্তব্য কী? প্রেতপ্রায় মানুষের 'বিসাবেকশন'? জীবন্মৃতের পুনরুজ্জীবন? শান্তার প্রেম ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বলা হয়েছে। নাট্যকারের বলবার বিষয় আরও আছে। নাটকে দেখানো হয়েছে, প্রেতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও অভিযান। প্রেত-দমনের পুরোভাগে এক ইনসপেক্টার (পুলিস?)। তার প্রকৃতি অতিমাত্রায় "স্যাডিস্টিক", অন্যকে পীড়ন করতে পারলেই যেন তার সুখ। এরা কি আধুনিক নির্মম পরিবেশের প্রতীক? যে পরিবেশ সুন্দর ও সুস্থ জীবনকে পদে পদে পিষে মারে? যে পরিবেশ উন্নত চিন্তা ও প্রগতির পথে অপ্রতিরোধ্য প্রতিবন্ধক? "অগ্নিকাণ্ড" কথাটিও সম্ভবত প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত। অগ্নিকাণ্ড বলতে নাটকে যা রয়েছে তা হল বন্দুকের গুলিবর্ষণ—যাতে প্রেত নিহত। শেষে নাট্যকার জানিয়ে দিয়েছেন—যা চরিত্রের মুখে সোচ্চার, স্লোগানের ঢঙে উচ্চারিত—যে মৃত্যুর গর্জন বন্দুকের গর্জনের চেয়েও ভয়ংকর। ষড়যন্ত্র ও হত্যাকাণ্ড বিফল করে মৃত্যু নিঃশব্দে অমোঘ গতিতে কাজ করে চলে। ক্লাইম্যাক্সে দেখি, মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া। ইনসপেক্টার পরাজয়ের গ্লানিতে বিমূঢ়, যন্ত্রণায় দগ্ধ। অন্যরা বিবেকের দংশনে আহত।

নাটকের বক্তব্য নৈরাশ্য-অভিক্রান্ত। অভিযোগের সুরও আছে। নালিশ কাদের বিরুদ্ধে তা যেমন বঞ্চিত বা অবসাদগ্রস্ত মানুষ নিজেই অনেক সময় জানে না এই নাটকেও তেমনি প্রতিপক্ষের আভাস অস্পষ্ট।

সমালোচনার বস্তু যাই থাকুক, নতুন আঙ্গিকের এই নাটক দেখার কালে সুখ-উত্তেজনা অনুভব করা যায়। নাটক দর্শকের মনোযোগ কেড়ে নেয় আরও বেশী করে অভিনয়ের গুণে। এবং কৌতুকের উপকরণও পর্যাপ্ত।

মমতা চট্টোপাধ্যায় (শান্তা), অমল চক্রবর্তী (ইনসপেকটার) এবং মানব সেনের (চেয়ারম্যান) অভিনয় উঁচুদরের। তিনু বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাক্তার) এবং শ্যামলবরন ঘোষের অভিনয়ও মনোজ্ঞ। অসিত দে, অশোক সোম ও শান্তি চক্রবর্তীর কৌতুকাভিনয়ে দর্শকরা উৎফুল্ল। প্রেত-নায়ক শ্যামল ঘোষের চরিত্রচিত্রণ বুদ্ধিদীপ্ত, তাঁর অভিনয়ে জীবনযন্ত্রণার আভাস স্পষ্ট। শ্যামল ঘোষ নাটকটি পরিচালনা করেছেন। নাটকের গতি স্বচ্ছন্দ মঞ্চসজ্জা ও (তাপস বসু-কৃত) বিশিষ্ট।

লোকরঞ্জন শাখার "শ্যামা"

গান অথবা নাচ, সুর কিংবা মুদ্রা যেরকমই হোক, রবীন্দ্রনাথের "শ্যামা" নৃত্যনাট্যের আকর্ষণ অনিবার্য। গানের কথা যতক্ষণ অটুট, "শ্যামা"-র আবেদনও ততক্ষণ অক্ষত। তবে গান সুগীত হলে এবং অভিনয় ও নৃত্যকলা যথাযথ ও পরিমিত থাকলে "শ্যামা" দর্শকের মনকে সহজেই আবিষ্ট ও আচ্ছন্ন করতে পারে। রবীন্দ্র-সদনে গত সপ্তাহে রাজ্য সরকারের লোক-রঞ্জন শাখা অভিনীত "শ্যামা" দর্শককে যদি তেমন অভিভূত না করে থাকে তবে তার কারণ দুর্বল সংগীতাংশ এবং অপরিমিত নৃত্য ও অভিনয়। কী শ্যামা, কী বজ্রসেনের মনের কথা দর্শকের অন্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য অতিঅভিনয় বা মেলোড্রামা সৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। "শ্যামা" রবীন্দ্রনাথের। তাই "শ্যামা"র আদি, মধ্য ও অন্তে অতিরিক্ত নৃত্য, অবান্তর বেশভূষা কিংবা নাট্যরসের অতিরিক্ত 'ডাইমেনশন' যা-ই নতুন সংযোজিত হবে সেটাই রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের মর্যাদা ও সূক্ষ্ম ভাবনাকে ক্ষুণ্ণ করবে। লোকরঞ্জনের "শ্যামা"য় রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের ভাবপরিবেশ এবং সংযত ও সম্মোহনী আকর্ষণ যেন বারে বারে ব্যাহত। যদিও শিল্পীদের আন্তরিকতার অভাব ছিল না। গানের সঙ্গে "লিপ মুভমেণ্ট" রসহানি ঘটিয়েছে। ছোটখাটো এমন অনেক ত্রুটি—

"অগ্নিযুগের কাহিনী"-তে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও বিকাশ রায়   ফটো—দেশ

গড় নাসিমপুর : অনুপকুমার, দেব মুখার্জি, দিলীপ রায় ও উত্তমকুমার ফটো—দেশ

যেমন আবহসংগীতে অ-রাবীন্দ্রিক সুর—সম্বন্ধে বোধহয় লোকরঞ্জনের শিল্পীরা সচেতন ছিলেন না।

তবে নৃত্যের পারদর্শিতা শিল্পীরা দেখিয়েছেন। এঁদের মধ্যে উৎপলা ভট্টাচার্য (শ্যামা) এবং গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের (বজ্রসেন) নাম আগে করতে হয়। অন্য শিল্পী-

[illegible]

ভেনিস উৎসবে "আপনজন"

তপন সিংহ পরিচালিত কে এল কাপুর প্রোডাকশনস এর "আপনজন" ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্বাচিত। আগামী আগস্ট মাসে ভেনিস উৎসব শুরু হচ্ছে।

সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবিতে রবি ঘোষ, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় ও তপেন চট্টোপাধ্যায়

ফটো—দেশ

বোম্বাই বিচিত্রা

শাস্তারাম দুহিতা এবং গৌতম চ্যাপমানের ভার্যা রাজশ্রী হঠাৎ একদিন স্বামী সহযোগে দেশত্যাগ করেছেন। রাজশ্রী এবং গৌতম ঠিক কতদিনের জন্য আমেরিকা যাত্রা করেছেন, তার কোন সঠিক খবর নেই। রাজশ্রী নায়িকা (অথচ ছবিগুলি এখনো শেষ হয়নি) এমন ছবির সংখ্যা নেহাত কম নয়। অনেকে আন্দাজ করছেন যে, রাজশ্রীর এই হঠাৎ চলে যাওয়ার ফলে অনেক প্রযোজককেই অসুবিধায় পড়তে হবে। শোনা যায়, গত কয়েক মাস যাবৎই বিশেষ করে এক মোটর দুর্ঘটনার পর রাজশ্রীর স্বামী গৌতমের আর এ দেশে মন টিকছিল না। সুতরাং রাজশ্রী তাঁর প্রত্যেক প্রযোজককেই তাড়াতাড়ি ছবি শেষ করার তাগিদ দিয়েছেন গত কয়েক মাস ধরে। কিন্তু বম্বের শতকরা পঁচানব্বই জন প্রযোজকই যে নিজের ইচ্ছেমত সুটিং করতে পারেন না, সেটা হয়ত রাজশ্রীর জানা ছিল না। আর্টিস্টদের ডেট ছাড়াও সুটিং-এর জন্য অনেক বেশী প্রয়োজন ডিসট্রিবিউটার বা ফাইনানসিয়রদের ইনসটলমেণ্ট-এর। আজকাল এই ইনসটলমেণ্ট প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে আর যাও আসছে তাও আসছে খোঁড়াতে খোঁড়াতে। সুতরাং রাজশ্রীর দেওয়া কয়েক মাসের নোটিশে বেশির ভাগ প্রযোজকই কোন সাড়া দিতে পারেননি। যে কয়েকজনের ছবি সমাপ্ত-প্রায় ছিল, তাঁরা রাতকে দিন করে যদিওবা কিছু জোগাড় করতে পেরেছিলেন, তবুও তাঁদের অন্য ঠেলা সামলাতে হয়েছে। কারণ, রাজশ্রী ডেট দিতে কার্পণ্য না করলেও অন্য তারকাদের ডেট মাটিতে মুড়ি মুড়কির মত ছড়ানো নেই। খুব ধরাধরি করায় কোন সহঅভিনেতা নাকি বলেছেন, 'রাজশ্রী বিয়ে করেছে, সে শ্বশুরবাড়ি যাবে, তার জন্য আমরা কী করতে পারি? রাজশ্রী যখন তার আমেরিকান স্বামীর ঘর করতে আমেরিকা যাচ্ছে, তখন যারা ক্ষতিগ্রস্ত, তাঁরা আমেরিকান এইড নিতে ওয়াশিংটন যাত্রা করুন, দেশী লোকের কাছে হাত পেতে কোন লাভ নেই।' রাজশ্রী আমেরিকা পেঁছে চ্যাপমান পরিবারের মুখে নিশ্চয়ই হাসি ফুটিয়ে থাকবেন, কিন্তু গৌতম চ্যাপমানের শাশুড়ি রাজশ্রীর মা, বিগত দিনের নায়িকা শ্রীমতী জয়শ্রী দেবীর অবস্থা নাকি কাহিল। তিনি নাকি রাজশ্রীর প্ল্যানের কথা কিছুই জানতেন না, এবং এখনো জানেন না রাজশ্রী কবে দেশে ফিরবেন। কিন্তু প্রযোজকরা সে কথা বিশ্বাস করতে নারাজ। প্রযোজক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের টেলিফোন এবং তাগাদার ফলে জয়শ্রী দেবীর প্রাণান্ত।

*

বৈজয়ন্তীও বেশ কয়েক মাসের জন্য বিদেশ ভ্রমণে যাচ্ছেন। সঙ্গে যাচ্ছে ভারতীয় নৃত্য (বিশেষ করে ভরতনাট্যম) অর্থাৎ বৈজয়ন্তী পরিচালিত নৃত্য শিক্ষায়তনের আরো তিনটি মেয়ে এবং স্বামী ডক্টর বালি। এযাত্রার পেছনে ব্যবসা এবং প্রমোদ দুই-এরই মণিকাঞ্চন যোগ। বিয়ের পর এই প্রথম বৈজয়ন্তী তাঁর নৃত্যপটুতা এবং স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে বিদেশ সফরে যাচ্ছেন। বৈজয়ন্তীর এই দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতি নাকি বম্বে বা মাদ্রাজের চিত্র-জগতের কোন ক্ষতি করবে না। এ-সফরে যদি বৈজয়ন্তী নির্ধারিত সময়ের কিছু বেশীও লাগিয়ে দেন তা হলেও দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই—কারণ, বৈজয়ন্তীর শ্বশুরবাড়ি বম্বেতেই। তা-ছাড়া, ভগবান না করুন যদি কোন কারণে শরীর-টরীর খারাপ হয়, তা হলেও নাকি কুছপরোয়া নেই, ডাক্তার স্বামী সঙ্গে আছেন।' বম্বের এক বিখ্যাত হোটেলে এক রাজকীয় সাংবাদিক বৈঠকে বৈজয়ন্তী তাঁর এই বিদেশ সফরের কথা ঘোষণা করেন। তাঁর এ-সফর যে অভাবনীয়ভাবে সার্থক হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই? মন্তব্য করলেন এক বন্ধু-সাংবাদিক ডক্টর বালির চোখের কোনের বৈজয়ন্তী হাসি দেখে।

*

পাঠক সাধারণের বোধ হয় অজানা নেই যে, রাজকাপুরের 'মেরা নাম জোকার' একটি সিরিয়াস ছবি। প্রায় বছর দুয়েক আগে রাজ আমাকে বলেছিল (এবং সেই অনুযায়ী স্ক্রীপ্টও হয়েছিল) যে ছবিটিতে চারটি অধ্যায় থাকবে এবং এই চারটি অধ্যায় দুটি ছবিতে বিভক্ত হবে। প্রথমপর্ব আপাতত শেষ হয়েছে। কেবল রাশিয়ান সার্কাস দলের কাজ ছাড়া। দ্বিতীয় পর্বেরও সুটিং আরম্ভ করেছেন রাজ; কারণ, অক্টোবর নভেম্বরের আগে রাশিয়ান সার্কাস ভারত-মুখো হতে পারবে না। 'তিসরি কসম' যখন মস্কো ফেস্টিভ্যালে গিয়েছিল তখন সেই সঙ্গে রাজও গিয়েছিলেন মস্কো এবং সেখানে বাদরচুককৃত টলস্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পীস' চারটি স্বয়ংসম্পূর্ণ চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে দেখে যৎপরোনাস্তি অনুপ্রাণিত হয়ে রাশিয়াতেই ঘোষণা করে-ছিলেন যে, মেরা নাম জোকারকেও ঐ রকম চারটি চিত্রে ভাগ করে দেবেন। কিন্তু দেশে ফিরে এত [illegible] সেই ঘোষণা [illegible] আপাতত সে বাসনা ত্যাগ করেছেন। [illegible] এক বছর [illegible] দ্বিতীয় পর্ব দেখার আগে আর একবার প্রথম পর্ব ঝালিয়ে নিতে পারে। এ ধরনের আশা অন্য কারো পক্ষে করা এবং প্রকাশ্যে তা নিয়ে আলোচনা করার ক্ষমতা বর্তমান বম্বে চিত্রজগতে রাজ ছাড়া আর কারো আছে

"দাদু" ছবিতে অনুভা গুপ্তা, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায় ফটো—দেশ

বলে আমার জানা নেই। আই. এস. জোহর মুচকি হেসে একটি ছবি করে ফেলেছেন তার নাম 'মেরা নাম জোহর' এবং জোহর বলছে, রাজের মেরা নাম জোকার এক বছর চলবে কি না তা আমি জানি না, কিন্তু আমার, 'মেরা নাম জোহর' যদি এক সপ্তাহ না চলে তা হলে—' একটি সবিশেষ বিশেষণ থাকায় জোহরের পুরো বক্তব্য লেখা গেল না। দোষটা আমার নয়, দোষটা সংস্কারের।

সরল শর্মা

হলিউডে অশ্লীলতার প্রতিযোগিতা

মারকিন চলচ্চিত্র নির্মাতারা যৌনজীবন, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ে আরও এক ধাপ এগোবার জন্য তৈরী হয়েছেন। যেসব বিষয় চলচ্চিত্রে এক সময় নিষিদ্ধ ছিল, সেগুলি এখন তাঁরা আরও খোলাখুলি প্রকাশ করবেন বলে স্থির করেছেন।

চলচ্চিত্র প্রযোজনায় যেসব রক্ষণশীল বিধিনিষেধ আছে সেগুলি মেনে চললে দর্শকদের আর আকর্ষণ করা যাবে না, এ কথা বোঝবার সঙ্গে সঙ্গে হলিউডের এই যৌনাভিযান শুরু হয়েছে। শ্রী জ্যাক ভ্যালেনটি প্রযোজক সমিতির নতুন সভাপতি হয়েই তাঁর প্রাথমিক কর্তব্য হিসাবে প্রযোজনা সংক্রান্ত কঠোর বিধিনিষেধ-গুলিকে সংশোধন করে এ সম্বন্ধে ঔদার্য দেখিয়েছেন।

১৯৬৬ সনের সংশোধনের পর চলচ্চিত্রে যৌনতা, নরনারীর নগ্ন দেহ প্রদর্শন এবং ভাষা ব্যবহারের অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। "হুজ অ্যাফরেড অব ভারজিনিয়া উলফ" চিত্রে যৌন-সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুবই খোলাখুলিভাবে কথাবার্তা বলা হয়েছে। 'পন-ব্রোকার', 'হাওয়াই' এবং অন্যান্য কয়েকটি চিত্রে নারীবক্ষকে নিরাবরণ করা হয়। 'প্লানেট অব দি এপস'-এ চারলটন হেসটন, 'দি বাইবেলে' মাইকেল পারকস, 'ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড-এ টেরেন্স স্ট্যাম্প এবং 'কুল হ্যানড লিউকে' পল নিউম্যানের নগ্নদেহ পিছন থেকে দেখা যায়।

'ব্লো আপ' চিত্রে ডেভিড হেমিংসের সঙ্গে দুটি অল্পবয়সীকে উলঙ্গ দেহে হই-হুল্লোড় করতে দেখা গিয়েছে। শোবার ঘরের দৃশ্য-গুলি ক্রমেই বেশি অনাবৃত হচ্ছে। এই চিত্রগুলির সবই গৃহীত হচ্ছে তা নয়, কিন্তু না-মঞ্জুর চিত্রের সংখ্যা খুবই কম। এই সব চিত্রের অধিকাংশকেই 'পরিণত বয়সীদের জন্য' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। শ্রী ভালেনটি এই নতুন শ্রেণী বিভাগ করেছেন।

নিষেধের বেড়া ভেঙে মারকিন চলচ্চিত্র কতদূর অগ্রসর হতে পারে, আগামী চিত্র-গুলির দিকে একবার চোখ বোলালেই তা বোঝা যাবে।

লনডন ও নিউ ইয়রকের দুজন সমকামী ব্যক্তির উপাখ্যানের ভিত্তিতে রচিত 'স্টেয়ার-কেস' চলচ্চিত্রের প্রধান দুটি ভূমিকায় রেকস হ্যারিসন ও রিচারড বারটন অভিনয় করছেন। ডেভিড উলফার 'কাপল্‌স'-এর চিত্রস্বত্ব কিনেছেন। এতে ব্যাভিচারের প্রায় পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে।

প্যারামাউনট হেনরি মিলারের 'ট্রপিক অব ক্যানসার'-এর চিত্ররূপ দেবেন বলে জানিয়েছেন। বইখানি অশ্লীলতার জন্য দীর্ঘকাল নিষিদ্ধ ছিল।

অশ্লীল ব্যঙ্গ রচনা বলে চিহ্নিত 'ক্যাণ্ডি' সম্প্রতি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। বিশিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এতে অভিনয় করেছেন। কুরুচিপূর্ণ হিসেবে খ্যাত অন্তত দুখানি নতুন চলচ্চিত্র পরীক্ষামূলকভাবে দেখানো হবে।

ব্রিটিশ চিত্র 'আই উইল নেভার ফরগেট হোয়াট ইজ হিজ নেম' সম্প্রতি ন্যাশনাল ক্যাথলিক অফিস ফর মোশন পিকচারস কর্তৃক নিন্দিত হয়েছে। কারণ, এই চিত্রে অস্বাভাবিক যৌন দৃশ্য আছে।

"নতুন গোঁসাই" অভিনয়

শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব অবলম্বনে রচিত "নতুন গোঁসাই" নাটক সম্প্রতি রঙমহলে অভিনীত হয়। মুরারিপুরের বৈষ্ণবী কমললতা শ্রীকান্তকে নতুন গোঁসাইরূপে পেয়েছে ভালবাসা আর দুঃখের মধ্য দিয়ে। সেই ভাব প্রকাশ পেয়েছে ছন্দাদেবীর স্বচ্ছন্দ অভিনয়ে, শ্রীকান্তরূপী মিহির ভট্টাচার্য যথাযথ অভিনয় করেছেন। রাজলক্ষ্মীরূপে বাসন্তী চ্যাটার্জি সংগীতে সুন্দর। গহরের ভূমিকায় শচীন মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় প্রশংসনীয়। তা ছাড়া, দেবকুমার রায়, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী, মণি দত্ত ও সানু চট্টোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন। সংগীতে নিশীথ সাধু ও নাট্যনির্দেশে সানু চট্টোপাধ্যায়ের কাজ ভাল। নাটকটি রচনা করেন শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

তিন ভুবনের পারে : সৌমিক চট্টোপাধ্যায় ও তনুজা ফটো—দেশ

অরণ্যদেব ✯ লী ফক

সারা গায়ে হলুদ বালি এরা যে কারা যায়।

একটু ধৈর্য ধরো, সব ঠিক হয়ে যাবে।

সোনা-বেলায় বিদেশী মানুষ!

অরণ্যদেবকে জানানো দরকার!

সোনাবেলায় বিদেশী মানুষ...

ঢাকের সাংকেতিক বার্তা ছড়িয়ে যাচ্ছে...

রাউডি, ও কিসের শব্দ?

ঢাকের। কাছাকাছি মানুষ আছে!

গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে যাচ্ছে ঢাকের সাংকেতিক বার্তা.....

সোনাবেলায় বিদেশী মানুষ

সাংকেতিক বার্তা শেষপর্যন্ত গভীর অরণ্যে অরণ্যদেবের গোপন গুহায় গিয়ে পৌঁছুল...

সোনাবেলায় আবার কারা এল?

দেখা যাক।

সোনাবেলায় বিদেশী মানুষ—

1/14

আমি আর টমটম তোমার সঙ্গে যাব?

না রে রাজা! আমি একাই চললুম।

বাইরের জগতের লোভী মানুষরা যদি একবার বুঝতে পারে যে, সোনাবেলার বালির অর্ধেকটাই সোনা, তাহলে শুরু হবে হানাহানি।

বিদেশীরা কোথায়?

জেড-পাথরের বাড়ির কাছে।

যাক্, দুটিমাত্র প্রাণী!

কেন এসেছে কে জানে!

অরণ্যদেবের আশঙ্কা মিথ্যে নয়।

৭

সাপ্তাহিক সংবাদ

কলকাতা শহরের জল-জঞ্জাল **অপসারণের** দাবিতে পৌরভবনে **হানা** প্রভৃতি এই সপ্তাহের **উল্লেখযোগ্য** ঘটনা। দিকে **দিকে পুঞ্জীভূত জঞ্জাল**, পাড়ায় পাড়ায় **নরনারী জলবন্দী**, পথে ঘাটে গর্তের পর গর্ত—**কলকাতার** এই বিভীষিকাময় অবস্থার দুর্বিষহ নাগরিক জীবনের বিক্ষোভ ১৯ **জুন চরমে উঠে** কেন্দ্রীয় পৌরভবনে ফেটে পড়ে। **একদল নরনারী** এসে পৌর অধিবেশন ভেঙে দেন, **একদল** পৌর **শ্রমিক লরি লরি জঞ্জাল** এনে পৌর ভবনকেই **জঞ্জাল** ভবনে পরিণত **করেন**। মেয়র, ডেপুটি মেয়র, **কমিশনার** প্রমুখ **দীর্ঘ** রাত্রি পর্যন্ত ঘেরাও **হয়ে থাকেন**। **পৌরভবন** তোলপাড়, বহু পদস্থ **ব্যক্তির উপর বদলি এবং কৈফিয়ত** তলবের **কড়া নোটিশ পড়ে। জল-জঞ্জালের** ভার গ্রহণের জন্য বিশেষ **ক্ষমতা** দিয়ে দুজন স্পেশাল **ডেপুটি কমিশনার** নিয়োগের সিদ্ধান্ত **গ্রহণ করেন** রাজ্য সরকার। বেলা তিনটা নাগাদ জঞ্জাল **বোঝাই লরিগুলি** করপোরেশন ভবনের প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে যায়। এ ছাড়া ২১ জুন পৌর **অধিবেশনে** জল-জঞ্জাল নিয়ে আলোচনা শুরু হলেও এক শ্রেণীর কাউন্সিলার রাজ্যপালের **প্রতি** আস্থা-অনাস্থার **প্রসঙ্গ তুলে তুমুল হৈ হট্টগোলের** মধ্যে পৌর অধিবেশন পণ্ড করে দেন।

দেশী সংবাদ

১৭ জুন—নকশালপন্থী বাম কমিউনিসট-দের **ক্রিয়াকলাপ বন্ধ** করার **জন্য** ভারত সরকার **প্রস্তুত** হচ্ছেন বলে **জানা** গেল। ঠিক কিভাবে **তাদের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন এখনও** তা **পাকা** হয়নি; **তবে ইতিমধ্যেই স্বরাষ্ট্র দফতরের কর্মচারীরা এ** সম্পর্কে **বিস্তারিত এক পরিকল্পনা রচনা করছেন**।

গত কয়েক মাস ধরে ঘন ঘন সাম্প্রদায়িক **হাঙ্গামা** ঘটছে। দেশের ভিতরকার বিভেদাত্মক **শক্তি** ষড়যন্ত্র করে এই সব দাঙ্গা বাধাচ্ছে এবং তাদের পিছনে রয়েছে 'একটি বিদেশী হাত।' এই **অবস্থা লক্ষ্য** করে ভারতীয় **জনসঙ্ঘ** 'গভীর উদ্বেগ' প্রকাশ করেছে।

১৮ জুন—কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আজ তীব্র মতবিরোধের দরুণ জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত থাকে। সারা দেশে শিক্ষা উন্নয়ন ও প্রসারের একই নীতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষানীতির ওই খসড়াটি **রচনা** করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক।

প্রবল বর্ষণে অজয় নদ বিপদ সীমা অতি-**ক্রম** করেছে। বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের **কাছে** বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। সংবাদ পেয়ে বর্ধমান সদরের **মহকুমা** শাসক একদল ইনজিনিয়ার নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন। দামোদরও ক্ষিপ্ত। **সদরঘাটের** কাঁচা সেতু ভেঙে পড়েছে।

১৯ জুন—নাগাভূমিতে নাশকতামূলক **কাজে** লিপ্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য ভারত সরকার আজ চীনা সরকারের আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং পিকিংকে এই **বলে** সতর্ক করে দিয়েছেন যে, 'ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের পরিণামের **জন্য** চীন সরকারকে সম্পূর্ণ দায়ী হতে হবে।'

১৯৫২ সালের **স্থাবর সম্পত্তি দখল** আইন **সংশোধন** করে এক অর্ডিন্যানস জারি করা **হয়েছে**। ওই অর্ডিন্যানস অনুসারে ১৯৬২ **সালের** ভারতরক্ষা আইনে **দখলীকৃত সম্পত্তি** ও ওই আইন অনুযায়ী রচিত বিধি ১৯৫২ সালের **সম্পত্তি দখল** আইন অনুযায়ী করা হয়েছে বলে মনে করা হবে।

২০ জুন—আজ হাওড়া স্টেশনের অদূরে 'কার শেডের' **কাছে** ডাউন মেন লাইনে **একটি যাত্রী ট্রেন অপর একটি** যাত্রী ট্রেনের সঙ্গে দুর্ঘটনায় পতিত হয়। দুর্ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা ৪৫। **ঘটনাস্থল** থেকে দুটি মৃতদেহ **উদ্ধার করা হয়েছে**। আশংকা, আরও তিনটি **মৃতদেহ** ভাঙাচোরা কোচটির মধ্যে পড়ে রয়েছে।

লখিমপুর জেলার উত্তর লখিমপুর মহকুমার ১৬ বর্গমাইল এলাকা আজ বন্যার জলে ডুবে যায়। ফলে শত শত লোক আটক হয়ে পড়ে। তাঁদের চার পাশে জল থৈ থৈ করছে। জলমগ্ন ওই এলাকাটি চা বাগানের।

২১ জুন—একনাগাড়ে নব্বুই ঘণ্টা ধরে বৃষ্টির ফলে আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, বিশেষ করে সারা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা জুড়ে, বন্যার তাণ্ডবলীলা চলেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন দশ লক্ষের বেশি মানুষ। ব্রহ্মপুত্র আর তার অনেকগুলি শাখা নদীতে বান ডেকেছে।

কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রী জে এল হাথি আজ সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, এ বছর ইনজি-নিয়ারিং পাশ করে বেরুবেন অন্তত ৪৩ হাজার জন। আর আগে থেকেই পাশ করে বেকার বসে আছেন ৪০ হাজার জন। কাজেই এ বছরের শেষে বেকার ইনজিনীয়ারের সংখ্যা দাঁড়াবে মোট ৮৩ হাজার।

২২ জুন—মর্মান্তিক রেল দুর্ঘটনাগুলির জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ব্যক্তিগণ যাতে বর্তমান আইনের মারপ্যাঁচে কঠোর শাস্তির হাত থেকে রেহাই না পান, সে ব্যাপারে সংসদের আগামী অধিবেশনে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধন করা সম্পর্কে বিবেচনা করা হতে পারে।

আজ বেলা এগারোটার পর ইনটালি বাজার থেকে জোড়া গির্জার কাছে করপোরেশনের সেনট্রাল গ্যারেজ পর্যন্ত ময়লা বোঝাই ৬০-৭০টি করপোরেশন লরি লোয়ার সারকুলার রোডে দাঁড় করিয়ে রাখার দরুণ ওই **এলাকায়** এক নারকীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। পথচারীরা নাকে মুখে কাপড় দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করেন।

২৩ জুন—রাজ্য সরকার **এবং কলকাতা** করপোরেশন কর্তৃপক্ষ 'যুদ্ধকালীন **জরুরী** অবস্থা' হিসাবে ধরে নিয়ে ২৪ জুন, সোমবার থেকে **কলকাতার জঞ্জাল** অপসারণের কাজ শুরু করবেন।

আজ সকালে কাশীপুর চিড়িয়া মোড়ে দুটি দোতলা বাস ও একটি লরির মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ২৬ **জন** আহত **হন**। এদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক শিশু ও মহিলা। আহতদের আর জি কর হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

বিদেশী সংবাদ

১৭ জুন—ভাইস প্রেসিডেন্ট নুয়েন কাও কী-র নামে একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ভিয়েতকংরা সায়গন আক্রমণের এক পরিকল্পনা করেছিল বলে সামরিক সূত্র থেকে আজ জানা গেল। দক্ষিণ ভিয়েতনামের গোয়েন্দা বিভাগ এর হদিস পেয়েছেন।

পুলিস সরবোন বিশ্ববিদ্যালয় ভবন ঘিরে রাখায় **জনসাধারণ** তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার **জন্য জড়** হলে পুলিস তাদের **ছত্রভঙ্গ** করার জন্য কাঁদানে গ্যাস ও পটকা ছোড়ে। এই সময় ছাত্ররা সরবোন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যায়। ফরাসী কর্তৃপক্ষ গতকাল রাত্রে সরবোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপর আবার তাদের **কর্তৃত্ব** স্থাপন করেছে।

১৮ জুন—শহরের উপকণ্ঠে আজ দক্ষিণ ভিয়েতনামী নৌসেনাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ১১৬ জন ভিয়েতকং ও উত্তর ভিয়েতনামী সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। একসঙ্গে অপর পক্ষের এত বেশী সংখ্যক সৈন্য এর আগে আর আত্ম-সমর্পণ করেনি।

১৯ জুন—শান্তি আলোচনার নবম বৈঠকে আজ মার্কিন সরকারের অনিচ্ছা সত্ত্বেও উত্তর ভিয়েতনামের একটি দাবি স্বীকৃত হয়; এখন থেকে সপ্তাহে একবার মাত্র বৈঠক বসবে। প্রতি বুধবার, সকাল সাড়ে দশটায়।

২০ জুন—পারমাণবিক শক্তিবিহীন দেশগুলি পারমাণবিক আক্রমণের সম্মুখীন হলে তৎক্ষণাৎ সাহায্য দেওয়ার অঙ্গীকার করে রাষ্ট্রপুঞ্জ নিরাপত্তা পরিষদে গতকাল একটি প্রস্তাব অনু-মোদিত হয়েছে। প্রস্তাবটির উত্থাপক হল তিনটি বড় পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন দেশ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া ও বৃটেন।

সম্প্রতি তিব্বতের রাজধানী লাসায় মাও-সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে একাধিক সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে। ফলে লাসায় এখন সামরিক আইন জারি হয়েছে। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র প্রাভদায় এই খবর প্রকাশিত হয়।

২১ জুন—হোয়াইট হাউসের সামনে দরিদ্রেরা তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে পুলিস কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে। এই ঘটনায় দরিদ্র জনসাধারণের বিক্ষোভ আন্দোলনের নতুন পর্যায় আরম্ভ হয়।

প্রেসিডেনট জনসন কাল রাত্রে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক ব্যবস্থা সম্বলিত বিলটিতে সই দিয়েছেন। কিন্তু খুব সন্তুষ্টচিত্তে নয়। কারণ, তিনি এই বিলে যা চেয়েছিলেন, কংগ্রেস তার চেয়ে অনেক কম দিয়েছেন।

২২ জুন—আগামীকাল **ফ্রান্সে** সাধারণ নির্বাচন শুরু হচ্ছে। **ফরাসী রাজনৈতিক** নেতারা সকলেই তাঁদের নির্বাচনী **প্রচার অভিযান** শেষ করেছেন। কিন্তু কোন **দলই** ভোটার **মহলে** তেমন কোন সাড়া জাগাতে পারেননি।

২৩ জুন—নেপালের ছোট শহর জনকপুরে গত বুধবার হঠাৎ তীব্র আলোর ঝলকানিতে সবাই চকিত হয়ে ওঠে। দেখা যায় আকাশে কয়েকটি জোরালো আলো দারুণ বেগে ছুটে চলেছে। পনেরো সেকেন্ড পর আলো মিলিয়ে যায়।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীরজত সেনগুপ্ত

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৫ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৩৬
শনিবার ২২ আষাঢ় ১৩৭৫

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	... ২৫·০০
ষাণ্মাসিক	... ১২·৫০
ত্রৈমাসিক	... ৬·২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	... ৩০·০০
ষাণ্মাসিক "	... ১৫·৫০
ত্রৈমাসিক "	... ৮·০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	... ৩০·০০
ষাণ্মাসিক "	... ১৫·৫০
ত্রৈমাসিক "	... ৮·০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	... ৫২·০০
ষাণ্মাসিক "	... ২৬·০০
ত্রৈমাসিক "	... ১৩·০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	... ৩৯·০০
ষাণ্মাসিক	... ১৯·৫০
ত্রৈমাসিক	... ১০·০০

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাসুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

DESH

Saturday 6 July 1968

নববর্ষা ও কলকাতা

যার জন্যে ডাকাডাকির অন্ত থাকে না, যার কৃষ্ণ-কটাক্ষ দেখার জন্যে আকাশ-পানে বারে বারে চোখ তুলে তাকাতে হয় সেই নববর্ষা এবারে কিছুটা আগেভাগেই এসে গেছে। সারা গ্রীষ্মে বর্ষা সমাগমের বিশেষ কোনো লক্ষণ এবারে ছিল না, বরং তাপিত মৃত্তিকা মুমূর্ষু অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল, আচমকা আষাঢ়ের মুখে মুখেই বর্ষার আবির্ভাব। বোধ করি, আমাদের এত নিন্দা-গঞ্জনা আর তার সইছিল না, বা এইটুকু রহস্য-প্রিয়তা বুঝি প্রকৃতির স্বভাব। আষাঢ়ের প্রথম দিনটির জন্যে অপেক্ষা করার প্রয়োজনও সে অনুভব করেনি, 'আষাঢ় আসিয়াছে—চল নামি' করেও হাঁকডাক করেনি, একেবারে 'সহস্রে সহস্রে লক্ষে লক্ষে অর্বুদে অর্বুদে'ই নেমে এসেছে। আবহাওয়া অফিস, প্রায় নিত্যই যার মান খোওয়া যায়, এবার অন্তত তার আসন্ন বর্ষার ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়েছে।

কিন্তু, কপাল আর কাকে বলে, যখন আসে না তখন আসে না, আর এলে দেখি প্রবলভাবে আসে। এবারে বর্ষার সূচনাতেই অবস্থা মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবহাওয়া অফিসের খবরে দেখি, গত জুন মাসে যে রকম বৃষ্টি হয়েছে কলকতা ও শহরতলিতে, এত বৃষ্টি নাকি গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এমন সময় হয়নি। সারা পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই, তবে বৃষ্টির আধিক্য যে বহু জায়গায় ঘটেছে তার সংবাদ শুনি। নদীর জলস্ফীতি, প্লাবনে মাঠঘাট ভেসে যাওয়ার খবরও কানে এসেছে। সেই সঙ্গে একদিকে যেমন কৃষককুলের মুখে হাসি এসেছে, তেমনই পাট চাষীদের নাকি এই বৃষ্টি দুর্ভাবনার কারণ হয়েছে। মুশকিল এই যে, আকাশটা আমাদের হাতে গড়া বাঁধ নয়, প্রয়োজন মতন জল ছেড়ে বইয়ে দেব, আবার প্রয়োজন মতন তার প্রবাহ পথ বন্ধ করে দেব। ভবিষ্যতের বিজ্ঞানে এ রকম একটা ব্যবস্থা থাকলে নিশ্চয় তা লাভজনক হবে তবে আপাতত যখন তার কোনো ব্যবস্থা নেই তখন ভালমন্দ দুই-ই মেনে নিতে হবে।

কলকাতা শহরে বর্ষা একটা উপদ্রব। গরমে প্রাণ আইঢাই করে যখন, গায়ের ঘামে সর্বাঙ্গ সিক্ত হয়ে ওঠে তখন আমরা বর্ষার জন্যে ব্যাকুল হই, অথচ যেই দু-এক পশলা জোর বৃষ্টি হয় অমনি আকাশের দিকে করজোড় করে মনে মনে বলিঃ বাঁচাও, আর এখন নয়। এবারের বর্ষার মরসুম শুরু হতে না হতেই কলকাতা অচল। কলকাতার আকাশ থেকে যত জল বর্ষায় নামল তত জল পথঘাট ডুবিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কোথাও কোথাও দিনের পর দিন বসে থাকল। অর্থাৎ কলকাতায় বর্ষা নামলেই যে খেলাটা জমে ওঠে তা হল কলকাতার আকাশ বনাম কর্পোরেশান। বলা বাহুল্য, বেচারী কর্পোরেশান এরকম একটা খেলার যোগ্য প্রতিপক্ষ নয়, বরং এত দুর্বল ও অযোগ্য পক্ষ যে এক ঘণ্টা জোর খেলা চললে তার পক্ষে দু-তিন দিন সময় লাগে নিজেকে সামলাতে।

এই যে কিছুদিন ধরে বর্ষার ঢল নেমেছে তাতে কলকাতা একটা নরক হয়ে উঠেছে। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে জায়গায় জায়গায় জল না জমেছে হাঁটু পর্যন্ত, এমন কোনো বড় সড়ক নেই যেখানে গাড়িঘোড়া আটকে না পড়েছে। এ এক শোচনীয় অবস্থা, বৃষ্টি পড়ল কি কলকাতা অচল হল, ন চলে ট্রাম, না পাওয়া যায় বাস, ট্যাক্সিও সব জায়গায় যেতে চায় না। লক্ষ লক্ষ মানুষের আসা যাওয়া, অফিস কাছারী করা এক বিষম বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়ায়। বছরে বছরে, দফায় দফায়, এই অভিযোগ ঃ তবু কর্পোরেশন নীরব। তার নাকি কোনো ব্যবস্থাই পুরো মাত্রায় সচল নেই, পাম্পিং স্টেশন চলে কি চলে না, নালার আবর্জনা পরিষ্কার হয় কি হয় না, রাস্তা মেরামতিও নিতান্ত লোক দেখানো। এই বর্ষার সঙ্গে জুটেছে স্তূপীকৃত আবর্জনা। এক পক্ষে এটা ভালই হয়েছে, যে আবর্জনা রাস্তার পাশে স্তূপীকৃত ছিল, বৃষ্টির জলে তা পথে ঘাটে ছড়িয়ে পড়ে স্তূপের উচ্চতা খানিকটা হ্রাস করেছে। অবশ্য এই আবর্জনা পরিষ্কার নিয়ে এখন খুব একটা উত্তেজনা চলছে, কলকাতাকে আবর্জনা মুক্ত করার জন্যে জরুরী সব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সন্দেহ হয়, এই উৎসাহ কতদিন টিঁকবে। এর আগেও জঞ্জাল সাফ করার জন্যে মাঝে মাঝে তৎপরতা দেখা গেছে, কিন্তু তা সাময়িক। যাই হোক, বর্ষার জল আর জঞ্জালের স্তূপ নিয়ে, মশামাছি রোগব্যাধি সমেত আমরা শহর কলকাতায় দিব্যি আছি।

দেশ-দর্পণ

খুব চটে গিয়েছেন মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী শ্রী পি সুন্দরাইয়া। চটে যাবার অবশ্য কারণ যথেষ্ট আছে। সহজভাবে বলতে গেলে শ্রীসুন্দরাইয়ার রাগের কারণ ভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলনে তাঁদের নেতৃত্বকে টিঁকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলন তেনালী সম্মেলনে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাবার পর মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব মোটামুটিভাবে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। তাঁদের কাছে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি সংশোধনবাদের প্রতিনিধি ছাড়া আর কিছু মনে হয় নি: এবং অনেকটা সে-কারণে হয়ত এ ধারণাও ছিল যে, ভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বের একচেটিয়া অধিকার তাঁদের হাতেই ছিল। দেখা যাচ্ছে ছিল না।

দেখা যাচ্ছে ভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলনটা কোন নেতৃগোষ্ঠীর হাতের মুঠোয় নেই! যে সংশোধনবাদের স্পর্শ এড়িয়ে যাবার জন্য তেনালীতে দ্বিতীয় পার্টি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, দেখা যাচ্ছে সেই সংশোধনবাদের নূতন ছায়াটা আবার মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকে ক্রমাগত অনুসরণ করে চলেছে। বর্ধমানে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির যে সর্বভারতীয় প্লেনাম বসেছিল এবং যে প্লেনামে মাদুরাই দলিল গৃহীত হয়েছিল, তা দিয়ে সংশোধনবাদের ছায়াটাকে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বরং বর্ধমান প্লেনামে যে ধাক্কাটা পার্টির নেতৃত্বকে সহ্য করতে হয়েছিল সেটা আজ রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসাবে পার্টির নেতৃত্বের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই বর্ধমান প্লেনামেই পার্টির অন্ধ্র প্রদেশ থেকে আগত প্রতিনিধি দলের নেতাদের কাছ থেকে কেন্দ্রীয় কমিটিকে অনেক ধিক্কার ও সমালোচনা শুনতে হয়েছে। মাদুরাই দলিল তাঁরা বাধা দিয়েছিলেন প্রতি পদে: অবশ্য তাঁদের প্রতিরোধ সফল হয় নি। মাদুরাই দলিলের এমন কোন বড় রকমের সংশোধন করা হয় নি যাতে অন্ধ্র নেতাদের সমালোচনা অবাস্তব মনে হতে পারে। মন-ভোলানো সংশোধন যদি কিছু হয়ে থাকে তাতে আর যাই হোক অন্ধ্র প্রদেশের সমালোচকদের মন ভোলে নি, মাদুরাই দলিল সম্বন্ধে মতও পরিবর্তিত হয় নি।

পরিবর্তিত হবার অবকাশও হয়ত ছিল না। কারণ, মাদুরাই দলিল আদর্শগত প্রশ্নের মূল দলিল হলেও এই দলিলে আদর্শগত কোন সঠিক ইংগিত ছিল কিনা সন্দেহ। এই দলিলে, শ্রীসুন্দরাইয়ার ভাষায়, ভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে একটা নিরপেক্ষ নীতি নেবার প্রয়াস হয়ত ছিল: কিন্তু এই প্রচেষ্টার ফলে পার্টির নেতৃত্বকে আন্তর্জাতিক আন্দোলন সম্বন্ধে অনেকটা উহ্য থাকতে হয়েছে। দলিলের মধ্যে এ কথাটাই বলার চেষ্টা হয়েছিল যে, ভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলন আভ্যন্তরীণ ঘটনা ও অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভরশীল হতে বাধ্য। আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয় বলেই, দলিলে আন্তর্জাতিক আন্দোলনের দুই নেতৃত্ব সম্বন্ধে অনেক বলার পরও অনেক মূল কথাই অনুল্লেখ রাখতে হয়েছে। পরোক্ষভাবে, আন্তর্জাতিক আন্দোলন যে দুই নেতৃত্বের ক্যাম্পে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে এটা বজায় রেখেই চীন ও সোভিয়েত নেতৃত্বের সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই দলিলের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া হিসাবেই মার্ক্সিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সামনে নূতন প্রশ্ন ও জটিলতা অবশ্যম্ভাবীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই প্রতিক্রিয়ার ফলেই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টিকে আজ ভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের পটভূমিতে এক অনিবার্য নিঃসঙ্গতার মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে হয়েছে।

এখন আর এই নিঃসঙ্গতাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলেই পার্টির নেতৃত্বকে আজ রাজনৈতিক লড়াইয়ের সামনে এসে দাঁড়াতে হয়েছে। এই লড়াই প্রত্যক্ষভাবে উগ্রপন্থীদের সঙ্গে। এই লড়াই প্রত্যক্ষভাবে উগ্রপন্থীদের তৃতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি গঠনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে। বর্ধমান প্লেনাম শেষ হবার পর পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী হিসাবে শ্রীসুন্দরাইয়া এই আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, মাদুরাই দলিলের সমালোচকরা যথার্থভাবেই দলগত নিষ্ঠা বজায় রেখে নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য দেখাবে। নিয়মানুবর্তিতা এবং আনুগত্যের প্রশ্ন তুলেছিলেন সমালোচকদের সম্বন্ধে। তবু মুখ্য সমালোচকরা, অর্থাৎ শ্রীনাগি রেড্ডী এবং শ্রীহুল্লা রেড্ডী শ্রীসুন্দরাইয়ার মন্তব্যের কোন জবাব দেন নি। তাঁরা দলত্যাগও করেন নি, যদিও এ রকম একটা সম্ভাবনা অপ্রত্যাশিত ছিল না। বরং পার্টির উঁচু মহলে এ কথাটাই সোচ্চারিত হতে শোনা গিয়েছে যে, এরা দল থেকে বেরিয়ে গেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তবু তাঁরা দল ছেড়ে যান নি এবং এ কারণে তাঁদের অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হয় ঘরে বাইরে। একদিক থেকে যেমন আনুগত্যের চাপ এসেছে এঁদের উপর, অপর দিকে তেমনি উগ্রপন্থী কম্যুনিস্টদের কাছ থেকে এসেছে অভিযোগ যে, তাঁরা দলের নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

দেখা গেল আত্মসমর্পণ করেন নি। অথবা পার্টির নেতৃত্বের আনুগত্যও দেখাবার চেষ্টা করেন নি। বরং পার্টির পলিটব্যুরো অন্ধ্র কর্মীদের এবং বিশেষ করে উগ্রপন্থীদের কাছে যে খোলা চিঠি পাঠিয়েছিল, তাতে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, অন্ধ্রের উগ্রপন্থী নেতারা পার্টির নেতৃত্ব বিরোধিতা করার কাজেই বেশী উৎসাহ দেখিয়েছিলেন মাদুরাই দলিল গৃহীত হবার পর। এই চিঠি থেকে এটাই পরিষ্কার হয়ে যায়, অন্ধ্র প্রদেশে পার্টির নেতৃত্বকে প্রকাশ্যভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে। প্রকাশ্য জনসভায় পার্টির কোন নেতার পক্ষে বক্তৃতা করাও প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। নেতৃত্বর সমালোচকদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, রাজ্য কমিটির সেক্রেটারীর (পার্টি নেতৃত্বর অনুগত পক্ষ) অনুমতি ছাড়া তাঁরা কোন জনসভায় ভাষণ দিতে পারবেন না। এ নির্দেশ উপেক্ষা করে উগ্রপন্থীরা জনসভা করেছে এবং পার্টি নেতৃত্বের সমালোচনাও করেছে। শেষ পর্যন্ত অন্ধ্র কমিটিতে এমন অবস্থা দেখা দিল যে, উগ্রপন্থীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেল। এই অবস্থা শুধরে নেবার জন্য পার্টি নেতৃত্ব অন্ধ্র কমিটি এবং সেক্রেটারিয়েটের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করল উগ্রপন্থীদের সংখ্যালঘিষ্ঠ করার জন্য। এরই প্রতিবাদে শ্রীনাগি রেড্ডী এবং আরও তিনজন উগ্রপন্থী সদস্য পদত্যাগ করলেন। পরে তাঁদের পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করা হল।

এরই জের টেনে শ্রীসুন্দরাইয়া প্রশ্ন তুললেন উগ্রপন্থীদের সামনে, তোমাদের বিপ্লবের বুলি কোথায় ছিল যখন চীনের সমর্থন ছিল মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের প্রতি। তিনি বললেন, মজার কথা পিকিং রেডিওর মন্তব্য যেদিন শোনা গেল পার্টির নেতৃত্ব সম্বন্ধে সেদিন থেকেই উগ্রপন্থীদের সুরটাও বদলে গেল। স্পষ্টভাবেই শ্রীসুন্দরাইয়া বলতে চেয়েছেন যে, চীনের নির্দেশ মতই উগ্রপন্থীদের রাজনৈতিক মতবাদটা প্রচারিত হচ্ছে। এটা যদি অভিযোগ হয়, তা হলে শ্রীসুন্দরাইয়ার মনে রাখা উচিত ছিল এমনি একটা অভিযোগ তাঁকে এবং পার্টি নেতৃত্বর অন্যান্য সদস্যদের আগেও শুনতে হয়েছে। তখন অবশ্য তাঁদের যুক্তি ছিল অন্যরকম। সে যুক্তির জের হিসাবে এমন কথাও শ্রীসুন্দরাইয়ার কাছ থেকে শোনা গিয়েছে যে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় যুদ্ধ-

ভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলন ভাগ হয়ে গেলেও ১৯৫৩ সালের মাদুরাই নীতিকে আমূল পরিবর্তিত করা হয় নি। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে যাবার পরও এ নীতি মূলগতভাবে বজায় রাখা হয়েছে, যদিও যুক্ত ফ্রণ্ট নীতিকে বদলে নেওয়া হয়েছে রাজনৈতিক কারণে। পরবর্তী কালের সাধারণ নির্বাচনে কম্যুনিস্ট পার্টির সাফল্য ক্রমশ দুটি পার্টিকেই সংসদীয় নীতির মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছে যে নীতির স্পষ্ট বিরোধিতা জানান হয়েছিল "সংগ্রামের দলিলে।" প্রকৃতপক্ষে কম্যুনিস্ট পার্টি দু' ভাগ হয়ে যাবার পর প্রথম সাধারণ নির্বাচন এসেছে ১৯৬৭ সালে। এই সাধারণ নির্বাচনেও দুটি কম্যুনিস্ট পার্টির সামনেই যুক্ত ফ্রণ্ট মোর্চার কথাটা ছিল; কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে দুটি পার্টি একই মোর্চায় সংযুক্ত হতে পারে নি পশ্চিম বাংলায়। তবু ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস যখন একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারল না, তখন সংসদীয় কাজের জন্য যুক্ত ফ্রণ্টে যোগ দেবার জন্য দুটি পার্টির পক্ষে আর কোন বাধাই থাকল না। যুক্ত ফ্রণ্টকে পাকা-পাকির সংসদীয় কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠিত করে দুটি কম্যুনিস্ট পার্টিকে নূতন অবস্থাকে স্বীকার করে নিতে হল।

এরই ফলে, দেখা গেল ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির পাটনা কংগ্রেসে এই নীতিটাই স্বীকৃত হল যে, শান্তিপূর্ণ-ভাবে এবং উপায়ে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সামনেও এই প্রশ্ন দেখা দিল এবং মাদুরাই দলিলে এই নীতিকেই স্বীকৃতি দেওয়া হল। এই স্বীকৃতির ফলেই স্লোগান উঠল: সংসদীয় গণতন্ত্রকে কংগ্রেসী চক্রান্তের হাত থেকে রক্ষা কর। মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বলা হল গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট বা জনগণের মোর্চা প্রতিষ্ঠিত কর আর ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির স্লোগান উঠল 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট সংগঠিত কর।' দুটো স্লোগানের মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে এবং সে পার্থক্য হয়ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আকৃতি হিসাবে দুটো মোর্চারই কাঠামোটা একই সূত্রে বাঁধা, সেটা সংসদীয় কাঠামো।

এই কাঠামোতে দুটো স্লোগানই আজ একান্তভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে এবং ভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলনে আজ নতুন স্লোগান শোনা যাচ্ছে। সে স্লোগান: নির্বাচন বয়কট করো। পশ্চিম বাংলা বা অন্যান্য রাজ্যে যে মধ্যবর্তী নির্বাচন হবার কথা হয়েছে সে নির্বাচনকে উদ্দেশ্য করেই এই স্লোগান দেওয়া হয়েছে উগ্রপন্থীদের পক্ষ থেকে। পশ্চিম বাংলায় উগ্রপন্থীদের পক্ষ থেকে এই প্রশ্নই রাখা হয়েছে মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সামনে: বিপ্লব সমাপ্ত করার প্রশ্নটিকে কি আশু কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করা যায়? উগ্রপন্থীদের দাবি প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাদের বক্তব্য: লেনিনের ব্যাখ্যা অনুসারী সমস্ত ক্লাসিক্যাল লক্ষণ-যুক্ত একটি চমৎকার বিপ্লবী পরিস্থিতি সারা দেশে বিদ্যমান। এবং বিপ্লবী পরিস্থিতি আছে বলেই, এঁদের মতে বর্তমান অবস্থায় নির্বাচন বয়কটের স্লোগানই একমাত্র "মার্ক্সবাদ লেনিনবাদসম্মত নির্ভুল রণকৌশল।" এঁদের বক্তব্য, দ্বিতীয় [illegible] হঠাৎ নকশালবাড়ি আন্দোলন শুরু হবার পর সারা ভারতে দারুণ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে এবং এঁদের প্রচেষ্টায় সেই উদ্দীপনাকে চাপা দিয়ে সংসদীয় পথে আবদ্ধ করে দিতে চাইছে মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব।

নকশালবাড়ি আন্দোলন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে কিনা, কিম্বা বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে কিনা এটা হয়ত তর্কের বিষয়বস্তু হতে পারে; কিন্তু এখন যেটা দেখা যাচ্ছে এই অবস্থাকে সামনে রেখে আজ পশ্চিম বাংলা, কেরল, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, দিল্লী, বিহার, উড়িষ্যা এবং মহারাষ্ট্রে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে উগ্রপন্থীরা সক্রিয় হয়ে উঠছে। শুধু তাই নয়, কেরল প্রভৃতি রাজ্যে পার্টির নেতৃত্বকে প্রত্যক্ষভাবে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তৃতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি সংগঠনের সম্ভাবনাকে বাস্তব করে তুলেছে। এটা প্রত্যক্ষভাবে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে চ্যালেঞ্জ এবং সংকট।

এই চ্যালেঞ্জ এবং সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সামনে একটা রাস্তাই খোলা আছে যুক্ত ফ্রণ্ট মোর্চার সংসদীয় কর্মপন্থাকে আরও বেশী সক্রিয় করা এবং প্রতিষ্ঠিত করা। সেটাই আজ দুটি কম্যুনিস্ট পার্টির কাছেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে বলে যুক্ত ফ্রণ্টের মোর্চা আরও সংগঠিত হবার সুযোগ পেয়েছে। আর সেই সঙ্গে এসে গিয়েছে ভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলনে তৃতীয় শক্তির আবির্ভাবের সম্ভাবনা। সে সম্ভাবনা কি রূপ নেবে বলা সম্ভব নয়; কিন্তু একটা অংশ যে নূতন অবস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে সেটাই পরিস্ফুট হয়ে গিয়েছে অন্ধ্র ইউনিটের সংকটে এবং শ্রীসুন্দরাইয়ার উগ্রপন্থীদের প্রতি প্রত্যক্ষ আক্রমণে।

বিদেশিকী

ফরাসী নির্বাচন

দ্যগলের পরে কে ও কী, সে-কথা এখনই কারো জানা সম্ভব নয়, তবে আপাতত ফ্রান্সে দ্যগল ছাড়া গতি নেই, নেই গতিও। অকাল নির্বাচনে তাই দেখি দ্যগলের জয়জয়কার, দ্যগলপন্থীদের পোয়াবারো। এর আগের বারের সাধারণ নির্বাচনেও দ্যগলের দলবল এতটা সুবিধে করতে পারেনি। আর এবার ভোটযুদ্ধের প্রথম কিস্তিতেই দ্যগলপন্থীদের দখলে সবচেয়ে বেশি আসন। তারপর গত রবিবার ভোটাভুটির দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত কিস্তিতে দ্যগলের দলবল ফরাসী পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেয়েছে, আগের বারের নির্বাচনেও যা তারা পায়নি। রাজনীতিতে ভোজবাজি যে একেবারে চলে না তা নয়, তবে ফরাসী নির্বাচনের এই ফলাফল এবং দ্যগলপন্থীদের চূড়ান্ত সাফল্য ভোজবাজির ব্যাপার মোটেই নয়। দ্যগলের নেতৃত্বের আকর্ষণ ক্ষমতা অনেকখানি সন্দেহ নেই কিন্তু সে আকর্ষণ স্বাভাবিক নিয়মে কিছুকাল বড় কমেছিল, আগে এই রকমই শোনা গেছে। গত মে মাসে ফ্রান্স যখন বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল তখন অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন এবার প্রেসিডেন্ট দ্যগলের বিদায়ের পালা। তাঁর মতের শেষ পালো দিলে যা ঘটল তা কিন্তু একেবারে উল্টো। [illegible] বাম ও বামপন্থীদের বিক্ষোভ উচ্ছৃঙ্খলতার ভয়ে পার্লামেন্টে দ্যগলের আসন তো টলেইনি, বরং ফরাসী রাষ্ট্রনায়কের হাত আরও শক্ত করেছে ফরাসী জনসাধারণের বড় একটা অংশের নিঃশর্ত সমর্থন।

হয়তো এটাও ফরাসী রাজনীতির স্বাভাবিক লক্ষণ নয়। তবে কিনা ফরাসী মেজাজও অস্থির, কখন কোনদিকে যে ঝুঁকবে বলা যায় না। বিলেতে অনেক সময় ভোটের পাল্লা লেবার থেকে টোরী কিম্বা টোরী থেকে লেবারের দিকে ঝোঁকে: ভোটারদের মধ্যে শতকরা হারে সামান্য কিছু অংশ একদিক থেকে অন্যদিকে ঝুঁকলেই রাজনীতির পালা বদল ও ক্ষমতার হাত বদল হয়ে যায়। ফ্রান্সে পালা বদল অত সহজ নয়, তার কারণ ভোটপ্রার্থী দল মাত্র ২।৩টি নয়, প্রায় ডজনখানেক, তারপর ফরাসী ভোটের হারজিত হিসাব নিকাশের নিয়মকানুনও একেবারে আলাদা ধরনের, অন্য কোন গণতন্ত্রী দেশে যার তুলনা মেলে না।

ফরাসী নির্বাচন পদ্ধতিটা একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় কম্যুনিস্টদের কিম্বা কোন বামপন্থী জোটের পক্ষে ভোটের জোরে পার্লামেন্টে সবচেয়ে বেশি আসন দখল করতে পারা অসম্ভবপ্রায়। ফ্রান্সের এই নির্বাচনপদ্ধতি প্রথম চালু হয় বছর দশেক আগে প্রেসিডেন্ট দ্যগলের আমলে। তার আগে ভোট এবং ভোটে হারজিতের নিয়ম ছিল অন্যান্য গণতন্ত্রী দেশের মতই। ভোটযুদ্ধের সাবেকী নিয়ম এক একটি নির্বাচনী এলাকায় ভোট একবারই, প্রার্থী যতজনই দাঁড়াক, যে প্রার্থীর ভোট সবচেয়ে বেশি তারই জিত। একে বলা হয় সাধারণ গরিষ্ঠতার নিয়ম। দ্যগলের আমলে ফ্রান্সে এ নিয়ম বাতিল। তার কারণ একাধিক। ফ্রান্সে বহু দল, তারপর নির্দলীয় প্রার্থীও কম নয়। দ্যগল-রাজত্বের আগে ফ্রান্সে কোন মন্ত্রিসভাই ছমাসের বেশি টিকত না; নানা দলের জোট মিলিয়ে গড়তে হত মন্ত্রিসভা। কোন একটি দলই নির্বাচনে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারত না। পার্লামেন্টের আসনগুলি এমনভাবে ভাগাভাগি হয়ে থাকত যে কেবল নিজের সামর্থ্যে কোন দল মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারত না। আরেক মুশকিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে ফ্রান্সে প্রত্যেকটি সাধারণ নির্বাচনেই সাবেকী ভোটের নিয়মে কম্যুনিস্টরা হত পার্লামেন্টে এককভাবে সবচেয়ে বড় দল। কম্যুনিস্টদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গড়তে প্রায় সব দলই নারাজ, আবার সবচেয়ে বড় দলকে বাদ দিয়ে কোন মন্ত্রিসভার পক্ষে পার্লামেন্টে ভোটের গরিষ্ঠতা বজায় রাখাও কঠিন।

প্রেসিডেন্ট দ্যগলের নতুন সংবিধান সেদিক দিয়ে মুশকিল-আসান। সাবেকী নিয়মে কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের জোরে নির্বাচনে জিতবার সুযোগ নানা কৌশলে খাটো করা হল নতুন ফরাসী সংবিধানে। এরপর থেকে সাধারণ নির্বাচনে দুই কিস্তি ভোটাভুটি। প্রথম কিস্তিতে যে প্রার্থী অন্য সব প্রার্থীর মোট ভোটের চাইতে বেশি ভোট পাবে তার জিত অর্থাৎ জয়ী হতে হলে অন্যদের প্রত্যেকের চাইতে বেশি ভোট পেলে চলবে না, অন্যদের পাওয়া সব ভোটের যোগফলের চাইতে বেশি ভোট পাওয়া চাই, তবেই প্রথম কিস্তিতে জিত। এই নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠ ভোটের জোরে এবার প্রথম কিস্তিতে দ্যগলপন্থীরা সবচেয়ে বেশি, প্রায় দেড়শো আসন জিতেছে, কম্যুনিস্ট ও অন্য বামপন্থীরা নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠ ভোটে জিতেছে মাত্র বারোটি আসন। মজুর ও নিম্নমধ্যবিত্ত ভোটার যেসব নির্বাচনী এলাকার সর্বাধিক নয়, সেসব এলাকায় কম্যুনিস্ট এবং অন্যান্য বামপন্থীদের নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠ ভোট পাওয়া অসম্ভব।

নির্বাচনে দ্বিতীয় কিস্তির ভোটাভুটির কৌশলও চমৎকার। ধরা যাক কোন নির্বাচনী এলাকায় প্রথম কিস্তির ভোটাভুটিতে ছিল নানাদলের পাঁচ ছয়জন প্রার্থী, কেউই নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠ ভোট পায়নি। এদের মধ্যে যার ভোট পড়েছে মোট ভোটের শতকরা ১০ ভাগের কম দ্বিতীয় কিস্তিতে প্রথমেই তার নাম খারিজ। বাকী চার-পাঁচজন নানা দলের প্রার্থী তখন দ্বিতীয় কিস্তির ভোটাভুটির আগে নিজেদের মধ্যে রফা-বন্দোবস্তের চেষ্টা করবে। কারণ এই দ্বিতীয় কিস্তিতে ভোটের হারজিত সাবেকী নিয়মে, যার সবচেয়ে বেশি ভোট তারই জিত। অতএব এখন রফা বন্দোবস্ত বোঝাপড়া রাজনৈতিক ঝোঁক কিম্বা মিল অনুযায়ী। কম্যুনিস্ট প্রার্থী যদি দেখে সে সরে দাঁড়ালে তার পক্ষের ভোটে অন্য বামপন্থী প্রার্থীর জয় এবং দ্যগলপন্থী প্রার্থীর হার হওয়ার সম্ভাবনা তাহলে কম্যুনিস্ট এবং বামপন্থীদের মধ্যে সেইমত বোঝাপড়া হবে। আবার অন্য বামপন্থীরাও সেইরকম হিসাব করে কম্যুনিস্ট প্রার্থীর জয়ের সুযোগ করে দিতে পারে। দ্যগলপন্থী, দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে ওইরকম বোঝাপড়া হতে পারে, যাতে ভোট ভাগাভাগির ফলে কম্যুনিস্ট কিম্বা বামপন্থী প্রার্থী জিতে না যায়। এবার দ্যগলপন্থীদের পড়তা ছিল এত ভালো যে তারা অন্য কোন দলের সঙ্গে রফা বন্দোবস্ত বড় একটা করেনি।

ফরাসী নির্বাচনের ভোট কৌশলে স্পষ্টই শেষ পর্যন্ত বাম এবং দক্ষিণ দুই রাজনৈতিক মেরু-ভিত্তিক। দ্যগলের নির্বাচনী আবেদনও ছিল সেই অনুযায়ী। ফরাসী জনসাধারণ কম্যুনিস্ট এবং কম্যুনিস্ট-জোটের শরিক বামপন্থীদের "রাজত্ব" চায়, না দ্যগলপন্থীদের নিরাপদ, শান্তির শাসন চায়? ভোটের রায় নিঃসন্দেহে দ্যগলের সপক্ষে। তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে ফরাসী জনসাধারণ নির্বিবাদ, সর্বাংশে দ্যগলের অনুগামী এবং সর্বাবস্থায় তাই থাকবে। অতি বামপন্থীদের উচ্ছৃঙ্খলতা হঠকারিতার বিরুদ্ধে ফরাসী জনসাধারণের মনোভাব অবশ্যই দ্যগলপন্থীদের বিপুল জয়ে সাহায্য করেছে। ফরাসী "নকশালপন্থী"রা নির্বাচন মানেই "বিশ্বাসঘাতকতা" বলে আওয়াজ তোলায় ফরাসী জনসাধারণ সব রকম বামপন্থীদের প্রতি আরও বেশি বিরূপ হয়েছে মনে হয়।

৯।৭।৬৮

ছেড়ে এলাম

বনফুল

ছেড়ে এলাম পুরাতন বাসা :
আসতে হ'ল ছেড়ে।
ভালো-মন্দ দিয়ে গড়া মায়ার খাঁচাখানা
দুয়োর খুলে মৃদু হেসে নোটিশ দিলে আমাকে এক দিন,
'এবার যেতে হবে'।
যেতে হ'ল:
ছেড়ে এলাম পুরাতন বাসা।
সঙ্গে করে' নিয়ে এলাম যতটা পারি,
চেয়ার টেবিল খাট আয়না,
আলনা দেরাজ বাক্স এবং বই
আটবছরে বোঝাই হ'ল মস্ত দুটো 'লরি'
নূতনের মাঝে
পুরাতনকে পাওয়ার ইচ্ছা মোটেই মরে না যে!
কিন্তু দেখছি ওদের সঙ্গে এসে গেছে এমন একটা জিনিস
'লরি'তে যা চাপাই নি কো আমি।
অবর্ণনীয় সমস্যার মতো
আশেপাশে ঘুরছে সেটা
কালো একটা অন্ধকারের স্তূপ
সর্বাঙ্গে তার
সংখ্যাতীত ছিন্ন মুখ শিরা
ঝরছে রক্ত প্রতি শিরা থেকে।
বোবা বেদনাকে
কোথায় রাখি
কি যে করি
পাচ্ছি না তো ভেবে।

নাজির আছে

বনফুল

অনেক দিনের অনেক ক্লান্তি জমেছে চোখে,
তবু ঘুম নেই, ঠায় জেগে আছি,
দুয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে ও কে?
বলবে কিছু কি? বল না বল,
তোমার চোখের চাহনির মাঝে যে জিজ্ঞাসা
যে ছল-ছল
প্রত্যাশা ভরে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাখনা মেলে
আমার চোখের ক্লান্তির ভারি পরদা ঠেলে,
আসবে সে কি? আসে তো আসুক,
বিনা কারণেই শাড়ির আঁচলে আঙুল জড়িয়ে
হাসে তো হাসুক।
পড়ুক না এসে মিষ্টি মিষ্টি
রোদ বা বৃষ্টি
ঘুমনো পাথরের জমাট বুকে
জীবন্মৃতের ঠোঁটে ও মুখে
দুচার বিন্দু
অমৃত বিন্দু
পড়লই যদি — ক্ষতি কি তার?
একা একা বসে' খোলা জানালায়
দেখছি রোজই — হাতের কাছে
নাজির আছে।
বুড়ো গাছটার শুষ্ক কাণ্ড ত্বক বিলীন
ডালপালাগুলো কঙ্কাল যেন
রিক্ত-পুষ্প পত্রহীন
তবু তার পরে ভুবন মোহিনী জ্যোৎস্না তো রোজ নামছে হেসে
উষার আলোও থামছে এসে
বসছে পাখীরা, গাইছে গান
চাইছে না ওরা কোন প্রমাণ
বুড়ো গাছটার বয়স কত
আমরাই কেন মগ্ন থাকব হিসাবে অত?

লরীর বদলে ওভারহেড ট্রলির সাহায্যে ময়লা অপসারণ করা হোক

সুনন্দর জার্নাল

'কলকাতা—আরেক আট'

কলকাতার মিউনিসিপ্যালিটিই যে ভারতবর্ষে সবচাইতে বীভৎস নয়, বহু দিনের বহু চেষ্টায় গড়ে তোলা তার এই মহিমা যে কাশী এবং গৌহাটির কাছে ম্লান হয়ে গেছে, খুব সম্ভব এই সমীক্ষায় অনেকেই পুলকিত হয়েছেন। কিন্তু আমি এতে খুশি হতে পারছি না। বাঙালী ধীরে ধীরে তার সমস্ত গৌরবই হারাচ্ছে—তবু পৃথিবীর সবচাইতে নোংরা শহরে কলকাতাকে পরিণত করবার যে অক্লান্ত সাধনা সে করে যাচ্ছিল এবং হাওড়ার ল্যাবরেটারিতে যেভাবে বছরের পর বছর সে সিদ্ধিলাভ করছিল, তাতে মনে হয়েছিল, অন্তত এখানে সে অদ্বিতীয়।

কিন্তু অহো ('হায়' বললে ঠিক জোরটা আসছে না)—তাও গেল। যাবেই—কারণ, বাঙালীর এখন ঘোরতর দুর্দিন। রামমোহন-বিদ্যাসাগর থেকে সুভাষচন্দ্র-শ্যামাপ্রসাদ পর্যন্ত কে-ই বা রইলেন? সত্যেন দত্ত এক সময় সগর্বে কলকাতা সম্বন্ধে লিখেছেন, এই মহানগরী নাকি ভারতবর্ষের "সাতাশ তারার নয়নতারা।" এখন আর ভারতবর্ষে মাত্র সাতাশটি বড় শহর নেই—এক শ' সাতাশটিই কিনা কে জানে! আর 'নয়ন-তারা?' শতাক্ষ ভারতের একটি কানা চোখই তো সম্প্রতি কলকাতা নামে অভিহিত।

আমরা আক্ষেপ করে থাক, আজ সর্ব-ভারতীয় নেতৃত্বের কাছে আমরা 'হরিজন।' মহাত্মাজী তো আর নেই—কে আর অস্পৃশ্যদের ত্রাণ করে! আমাদের প্রতি সর্বদাই 'বিমাতৃ-সুলভ' ব্যবহার চলছে এখন। সন্দেহ হচ্ছে, এই বিমাতা-মনোভাবই কাশী এবং গৌহাটিকে শিরোপা পরিয়ে দিলে—প্রাপ্য গৌরব থেকে অত্যন্ত নিদারুণভাবে আমাদের বঞ্চিত করা হল।

এর পরে যদি আমরা বাঙালীরা রোষে-ক্ষোভে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো গর্জন করে উঠি, কেউ কি তাকে অন্যায় বলবেন?

গর্জন করবার একটা ইচ্ছে আমারও ছিল, কিন্তু একটি দাঁতের কন্‌কনানির জন্যে সে ইচ্ছে আমাকে আপাতত প্রদমিত করতে হল। অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে আমি জানলার সামনে এসে দাঁড়ালুম। জ্যৈষ্ঠের শেষ থেকেই এবার যেভাবে আকাশ কালো করে প্রায় অবিচ্ছেদ বৃষ্টি নেমেছে, তাতে 'মেঘদূতে' অরুচি ধরে গেল, এমনকি রেডিয়োতে রবীন্দ্রনাথের বর্ষা-গীতি শুনলেও অন্তরাত্মা চমকে উঠছে। ভিজে-জুতো পরে থাকার মতো অস্বস্তিতে মন-প্রাণ ছেয়ে আছে, আর তার ভেতরে সামনের রাস্তায়—

সকালের দুরন্ত বর্ষণ-হর্ষণে হাঁটুভোর জল জমেছিল, এখন পঙ্কের একটি মনোরম আবরণ। তাকে আরও আলোকিত করে দাঁড়িয়ে আছে আবর্জনার সেই বিশাল স্তূপটি—গত দু' দিন ধরে যেটির সদ্‌গতি হয় নি—বর্ষার কল্যাণে যার আধা-আধি এখন সারা রাস্তায় পরিব্যাপ্ত—যা থেকে দিন তিনেক আগে স্বর্গীয় গোটা দুই ইঁদুরের পরিস্ফীত নশ্বরদেহ কুম্ভীপাক নরকের সৌরভ ছড়াচ্ছে!

সরে আসতে হল। বিন্দুতেই সিন্ধুর স্বাদ—গোটা কলকাতার অবস্থা না ভাবলেও চলে। আজকাল যাঁরা বুক ঠুকে আমহার্স্ট স্ট্রীটে রামমোহন রায়ের বাড়ির (যে বাড়ি নিয়ে একদা জার্নালে বিস্তর বিলাপ করেছিলুম) পাশ দিয়ে হাঁটতে পারেন, লেডী

রণপা নির্মাণের ফ্যাক্টরী বসানো হোক

ডাফারিন হাসপাতালে রোগিণীকে নিয়ে যেতে পারেন, কিংবা—কিংবা কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের মাছের বাজারের পাশ দিয়ে মার্কাস স্কোয়ারের (যেখানে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন হয়!) দিকে এগোতে পারেন—সেই বীরর্ষভেরা রৌরব-কুম্ভীপাক-ইনফার্নো-হেডিস্-লিম্বোকেও বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে পারেন।

তবু গৌহাটি এবং বেনারস! ইম্-পসিবল্! ভূপাল-সুরাট? শিশু-শিশু! ট্র্যাডিশনাল হাওড়া পর্যন্ত কলকাতার দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

অদূরে ইঁদুর দুটোকে এক জোড়া শূয়োরের মতো দেখাচ্ছিল, যদিও তাদের সুগন্ধ হ্যাম অ্যান্ড এগের অনুষঙ্গ আনছিল না। অগত্যা জানালাটা বন্ধ করে আমি সরে এলুম, তারপর খুব বিমর্ষভাবে একটা তাকিয়া টেনে খাটের ওপর শবাসনে লম্বিত হলুম।

এই সব যৌগিক প্রক্রিয়ার একটা সুবিধে আছে, উঁচু দরের ভালো ভালো ভাবনা মস্তিষ্কে অঙ্কুরিত হতে থাকে। শবাসনের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে চোখ বুজে এল, আমি আর-এক সত্যকে দেখতে পেলুম।

'ইউ নো—ক্যালকাটা ইজ্ ডিফারেন্ট!'—একাধিক বিদেশীর মুখে শুনেছি—এই আবর্জনা—এই বিকটতম কর্পোরেশন—এসব সত্ত্বেও কলকাতার নাকি আর একটা নিজস্ব সত্তা আছে। সে ওরিজিন্যাল — সে প্রোগ্রেসিভ! তাই যদি হয়—

চোখ খুলে গেল। আমি লাফিয়ে উঠলুম। শবাসন ছেড়ে বসলুম জোড়াসনে। আর একটা দিক দেখতে পাচ্ছি এখন।

চলতি অর্থে সুন্দর শহর কাকে বলে? ঝকঝকে পথ, তকতকে বাজার, চোখ-জুড়োনো পার্ক, আইন-মানা ট্র্যাফিক, প্রশান্ত সিভিক সেন্স। কিন্তু রাস্তার পানের পিক না ফেলে, কলার খোসা না ছড়িয়ে আমরা এক দিনও বাঁচতে পারব? যদি গোড়ালি পর্যন্ত সব্জির পচা পাতায় ডুবে না গেল এবং ফতুয়ায় মাছের রক্তের ছিটে না লাগল, তবে বাজার করে কিসের সুখ? পার্কের বেঞ্চে যদি হাতল-পায়া অখণ্ড থাকে, যদি তার মাঝখানে ফুটবল-পেটানো ইত্যাদির ফলে বেশ কাদা না জমে, চীনেবাদামের খোলায় এবং আরও অনেক কিছুতে চার দিকে একাকার না হয়ে যায়, তা হলে সেখানে বসে আমাদের ভালো লাগবে? (কলকাতার পক্ষে যা ন্যাচারাল নয়, তা করতে গেলে কেমন দাঁড়ায় তার প্রমাণ বোধ হয় রাসবিহারী অ্যাভেন্যুর ফুটপাথকে 'কুসুমোদ্যান' করবার সেই দুঃখজনক এক্সপেরিমেন্ট!) ট্যাক্সিতে চেপে, কিংবা স্টেটবাসে ঝুলতে ঝুলতে তাদের অতুলন গতিতে যদি প্রতিমুহূর্তে হৃৎকম্পই না হল—তা হলে কোথায় গাড়ি-চড়ার রোমাঞ্চ?

এই তো কলকাতা — অদ্বিতীয়, ওরিজিন্যাল।

এই কলকাতার সৌন্দর্য দেখতে হবে উলটো দিক থেকে—যেমন কোনো কোনো হালের নন্দন-তত্ত্ব বলে থাকে। প্রচলিত সুন্দরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলেই—কলকাতা আর ট্র্যাডিশনাল ফুলের চাষ করছে না—আবর্জনার গিরি-গোবর্ধন গড়ে তুলছে। আর্টের ভৈরবমূর্তি একেই বলে!

দিব্যদৃষ্টি লাভ হল যেন। সামনের জানলাটা তা হলে খুলেই দিই!

সুভেনির ফ্রম ক্যালকাটা

ঠাকুরদাসকে লেখা বিদ্যাসাগরের একখানা পত্রের একাংশের প্রতিলিপি

বিদ্যাসাগরের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

[বর্তমানে মিহিজামের অধিবাসী ডাক্তার পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের ষষ্ঠ সহোদর ঈশানচন্দ্রের পুত্র। তাঁর পারিবারিক ভাণ্ডারে বিদ্যাসাগরের অর্ধশতাধিক অপ্রকাশিত পত্র সযত্নে রক্ষিত আছে। ডাক্তার পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রদের (শ্রীপ্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়) সৌজন্যে উক্ত পত্রাবলীর প্রতিলিপি সংগ্রহের সৌভাগ্য লাভ করেছি। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বিদ্যাসাগরের এই অপ্রকাশিত পত্রাবলীর নিঃসন্দেহে একটি অপরিসীম ঐতিহাসিক মূল্য আছে। বস্তুত এই পত্রাবলীর মধ্য থেকে বিদ্যাসাগর-চরিত্রের এমন একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় যা অন্যত্র দুর্লভ। *

অধিকাংশ পত্রই বিদ্যাসাগর তৎকালে কাশীবাসী পিতা ঠাকুরদাসকে লিখেছিলেন। অধিকাংশ পত্রই তারিখ শূন্য।

একমাত্র পুত্র নারায়ণকে লেখা বিদ্যাসাগরের একখানা পত্রও এই সংগ্রহের মধ্যে আছে। পুত্রকে লেখা বিদ্যাসাগরের অন্য কোনো পত্র এ-যাবৎ আমার চোখে পড়েনি।

ওই সংগ্রহের মধ্যে দুখানা পত্র বিদ্যাসাগর কাদের লিখেছিলেন, সে-সত্য নিশ্চিত উদ্ধার করতে পারিনি। অনুমান করি, ওই দু-খানা পত্রের একখানা পুত্র নারায়ণকে এবং আরেকখানা তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখা।

যা হোক, একের পর আরেক বিদ্যাসাগরের অপ্রকাশিত পত্রাবলী উদ্ধার করি। ইন্দ্রমিত্র]

ঠাকুরদাসকে লেখা:

শ্রীশ্রী হরি :—

শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদনম্

আপনকার শ্রীচরণারবিন্দের আশীর্ব্বাদ প্রভাবে আমি কায়িক ভাল আছি। ৩৮৲ আটত্রিশ টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি আপনকার শ্রাবণ মাসের খরচ ৩০ ত্রিশ টাকা ও মদনের মাতার ৮ আট টাকা। এই পত্রের পঁহুছ সংবাদ ও আপনকার কায়িক কুশল সংবাদ দ্বারা নিরুদ্বেগ করিতে আজ্ঞা হয় ইতি ৮ শ্রাবণ

ভৃত্য শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা:

শ্রীশ্রী হরি :—

শরণম্—

পূজ্যপাদ শ্রীমত্ পিতৃদেব শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদনম্

কাশীবাসী শ্রীযুত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য অদ্য আমার নিকট ছয় টাকা জমা

---

* বিদ্যাসাগরের কিছু অপ্রকাশিত চিঠিপত্র এখনো কারো-কারো পারিবারিক ভাণ্ডারে সযত্নে রক্ষিত থাকা সম্ভব। যাঁদের পারিবারিক ভাণ্ডারে বিদ্যাসাগরের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র সযত্নে রক্ষিত আছে, তাঁদের কাছ থেকে সেই সংবাদ পেলে আমি কৃতার্থ হই, তাঁদের কাছে আমি এই অনুগ্রহ ভিক্ষা করি—ইন্দ্রমিত্র।

করিয়া দিলেন আমি চার পাঁচ দিন পরে যখন মাঘ মাসের টাকা পাঠাইব ঐ সঙ্গে ঐ ছয় টাকাও প্রেরিত হইবেক বেণীমাধব বাবুর অভিলাষ ও অনুরোধ এই আপনি ইতিমধ্যে তাঁহার পিতৃদেবকে এই ছয় টাকা দেন অনেকদিন টাকা না যাওয়াতে তাঁহার পিতৃদেবের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে এই ছয় টাকা দিবেন আগামী শুক্র অথবা শনিবার সমুদয় টাকা পাঠাইব ইতি ৩০ মাঘ

ভৃত্য
শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখাঃ

শ্রীশ্রী হরিঃ—
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্—

আপনকার ১ আশ্বিনের পত্র অদ্য ২১ আশ্বিন পাইলাম কারণ এই যে আমি ভাদ্রমাসের শেষে স্থানান্তরে গিয়াছিলাম অদ্য প্রাতে এখানে পহুঁছিয়াছি আমি যাইবার দিন হুণ্ডী সমেত পত্র পাঠাইয়াছিলাম বোধ করি তাহা পহুঁছিয়াছে কার্যবশত অদ্যই স্থানান্তরে যাইতে হইল পিতামহদেবের একোদ্দিষ্ট দিন ৩০ আশ্বিন হইবেক পূজার পূর্ব্বে আপনকার পত্র হস্তগত হইলে একোদ্দিষ্টের খরচ পাঠাইতে পারিতাম এক্ষণে ছাপাখানা প্রভৃতি সমুদয় বন্ধ আছে সুতরাং টাকা পাঠাইবার সুবিধা নাই আপাততঃ হাওলাত করিয়া কার্য্য শেষ করিবেন আমি কলিকাতায় আসিয়া ১০০্ একশত টাকা ও আশ্বিন মাসের খরচের টাকা এক হুণ্ডীতে পাঠাইয়া দিব। এসময়ে পাঠাইতে পারিলাম না এই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। গত তিনবৎসরকাল যে সকল রোগ ভোগ করিতেছিলাম এক্ষণে প্রায় নাই বলিলেই হয় কিন্তু এককালে নিঃশেষ হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। যাহা হউক অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও সচ্ছন্দ হইয়াছি তাহার সন্দেহ নাই। বাস্ততাপ্রযুক্ত অদ্য আর কিছু লিখিতে পারিলাম না আসিয়া অন্যান্য বিষয়ে সংবাদ লিখিব ইতি ২১ আশ্বিন

ভৃত্য শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখাঃ

শ্রীশ্রী হরিঃ—
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্—

বারাণসীনিবাসী শ্রীযুত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ইতিপূর্ব্বে ৬্ ছয় টাকা দিতে লিখিয়াছিলাম এক্ষণে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে আর ৫্ পাঁচ টাকা দিবেন এই ১১্ এগার টাকা সত্বর প্রেরিত হইবেক ইতি ১২ চৈত্র

ভৃত্য
শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখাঃ—

শ্রী হরিঃ—
শরণম—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনমিদম্—

বারাণসীনিবাসী শ্রীযুত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ৫্ পাঁচ টাকা অনুগ্রহপূর্ব্বক দিবেন এই পাঁচ টাকা আগামী টাকা পাঠাইবার সময় পাঠাইব কিমধিকমিতি ২৬ চৈত্র

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা বিদ্যাসাগরের একখানা পত্রের প্রতিলিপি

ঠাকুরদাসকে লেখাঃ—

শ্রীশ্রী হরিঃ—
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

৮৩ তিরাশী টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি নিম্নলিখিত বিনিয়োগ করিবেন

নিজ খরচ পৌষ — ৪৫্
সারদা দেবী ঐ — ৭্
মদনের মাতা ঐ — ৮্
কালিদাস ভট্টাচার্য্য — ৪্
নিস্তারিণী পিসী — ১২ গোপালের প্রেরিত

আপনকার শ্রীচরণারবিন্দের আশীর্ব্বাদ প্রভাবে এখনকার এক প্রকার সমস্ত মঙ্গল। আমি সেখান হইতে আসিয়া অবধি অনেক ভাল আছি। বাসা পরিবর্ত্তের বিষয়ে পূর্ব্বে পত্রে যে নিবেদন করিয়াছি যদি তাহা আপনকার নিতান্ত অনভিমত হয় তবে কেবল আমার প্রার্থনা অনুরোধে তাহাতে সম্মত হইবার আবশ্যকতা নাই। আপনিও শম্ভুচন্দ্র এক্ষণে কায়িক কিরূপ

আছেন সবিশেষ লিখিয়া পরিতুষ্ট করিতে আজ্ঞা হয় ইতি ২৫ পৌষ ১২৮০

ভৃত্য
শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা :—

শ্রীশ্রী হরি :—
শরণম্—

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনমূ—

গত রবিবার বাটী হইতে আসিয়াছি সেখানে সকলে কায়িক ভাল আছেন আমি এক্ষণে আপনকার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদ প্রভাবে অনেক সুস্থ হইয়াছি জানিবেন। সোম প্রকাশের বরাতী ১৩, তের টাকা জমা দিলাম তাঁহারা রীতিমত রসিদ পাঠাইয়া দিলেন। ২৫, পঁচিশ টাকার হুণ্ডী পাঠাইয়াছি পাওয়া সংবাদ লিখিয়া উদ্বেগ দূর করিবেন। কঠোর ব্রত প্রবৃত্ত হইয়া শারীরিক কিরূপ আছেন জানিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হইয়া আছে সবিশেষ লিখিয়া নিরুৎকণ্ঠ করিতে আজ্ঞা হয় কিমধিকমিতি ১৫ ফাল্গুন

ভৃত্য শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রী হরি :—
শরণম্—

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনমিদম্

একশত বিংশতি টাকার হুণ্ডী পাঠাইয়াছি তন্মধ্যে আপনকার দুই মাসের খরচ ১২০, দীনের মাহিনা দুই মাসের ২০, ও শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দরুণ ১৩,। আপনকার শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদ প্রভাবে এখানকার সমস্ত মঙ্গল জানিবেন। আপনি গোপাল ও দেবী সকলে কেমন আছেন সবিশেষ সংবাদ দ্বারা চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হয় কিমধিকমিতি ১৭ মাঘ বুধবার

ভৃত্য শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

কমলাপুরের হরকোনার মাতা ঠাকুরাণীর মৃত্যু হইয়াছে আর সংবাদ শুক্রবার অশৌচান্ত জানকারণ নিবেদন করিলাম

শ্রী ঈ

জানিয়ুনে গঙ্গামণি দেবীর টাকা হুণ্ডীর মধ্যে দেওয়া হয় নাই তাঁহাকে আপনি দুই মাসের ১৪, টাকা অনুগ্রহপূর্ব্বক দিবেন এই মাসের শেষেই অথবা তৎপূর্ব্বেই সুযোগক্রমে ঐ টাকা পাঠাইব

শ্রী ঈ

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরি:—
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনমিদম্—

কয়েক দিবস হইল আমি রেজিষ্টরী ডাকযোগে এক পত্র লিখিয়াছি তাহা এতদিনে নিঃসন্দেহ আপনকার হস্তগত হইয়াছে। আমি ১ শ্রাবণে আপনকার এক পত্র পাইয়াছিলাম তৎপরেই রেজেষ্টরী পত্র পাঠাইয়াছি দেবীকে একখান পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা সে আমাকে দেখাইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন এখানে আর কাহাকে পত্র লিখিয়াছেন কিনা তাহা আমি জানি না এবং কি কারণে তাঁহারা উত্তর লিখেন নাই তাহাও বলিতে পারি না। আপনি ৬ আষাঢ়ে যে পত্র লিখিয়াছিলেন অসুস্থতা ও

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—

শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু,

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

কলিকাতা হইতে এক পত্র হুণ্ডীসমেত পাঠাইয়াছি ঐ পত্রের উত্তর কর্ম্মাটাড়ে লিখিবেন এই প্রার্থনা করিয়াছিলাম অদ্য তিন দিন হইল এখানে আসিয়াছি মনে করিয়াছিলাম এখানে আসিয়াই আপনকার পত্র পাইব কিন্তু এ পর্য্যন্ত পত্র না আসাতে অতিশয় উদ্বেগ হইতেছে অথবা এ পর্য্যন্ত আমার পত্র আপনকার হস্তগত হয় নাই যাহা হউক আপনি এক্ষণে কারিক কিরূপ আছেন অনুগ্রহ করিয়া তাহার সবিশেষ সংবাদ লিখিতে আজ্ঞা হয়। ইতি ১০ আশ্বিন

ভৃত্য

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

আমার ঠিকানা

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রেলওয়ে ষ্টেশন

কর্ম্মাটাড়

কর্ড লাইন

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীচরণারবিন্দেষু,

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

১০৯ একশত নয় টাকার হুণ্ডী পাঠাইলাম [illegible] বিনিয়োগ করিতে আজ্ঞা হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের

আপনকার	—	৫০,
[illegible]	—	৮,
গঙ্গানারায়ণ দেবী	—	৮,
সারদা দেবী	—	৭,
নিস্তারিণী দেবী	—	৩,
		৭৬,

কাশী থাকার সময় অন্নপূর্ণা তহবিলে আমার যে দেনা হইয়াছিল তাহা এই—

সন্দ্র খরিদ	—	৬।৶৫
মিষ্টান্ন	—	৪৶৫
গঙ্গাসাগর	—	৩।৶৫
মিছরী	—	২,
অতিরিক্ত বাসা		
খরচের দরুণ	—	৭,
কালিদাস চট্টোপাধ্যায়	—	৫,
		৩০৸৶১৫

অবশিষ্ট ২/০ দুই টাকা পাঁচ পাই মিছরী ও সন্দেশ হিসাবে [illegible] খরিদ হইবে [illegible] টাকা দিতে বলিয়াছেন অবশিষ্ট [illegible] হিসাবে জমা করিয়া দিতে বলিয়াছেন।

শেষে শ্রীযুক্ত কালিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে যে ১০ দশ টাকা দিতে লিখিয়াছিলাম ঐ দশ টাকা [illegible] হুণ্ডীর সঙ্গে দেওয়া হয় নাই আগামী মাসে পাঠাইব। আপনকার শ্রীচরণ-[illegible] আশীর্ব্বাদে এখানকার সমস্ত মঙ্গল। আপনা-[illegible] মঙ্গল সংবাদ লেখা [illegible] করিতে আজ্ঞা হয় ইতি ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৬১ সাল

ভৃত্য

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা ঃ

শ্রীশ্রী হরিঃ—

শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

আমি মধ্যে অতিশয় অসুস্থ হইয়াছিলাম এবং অধিকাংশ সময় কলিকাতায় উপস্থিত ছিলাম না। এজন্য এতদিন আপনাকে পত্র লিখিতে অথবা টাকা পাঠাইতে পারি নাই এক্ষণে আপনকার আশীর্ব্বাদ প্রভাবে অপেক্ষাকৃত অনেক সুস্থ হইয়াছি। একশত সাতাত্তর টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি

পিতামহদেবের একোদ্দিষ্টের খরচ	—	১০০,
আপনকার আশ্বিন মাসের খরচ	—	৬০,
মদনের মাতার আশ্বিন মাসের খরচ	—	১০,
গঙ্গামণি দেবীর আশ্বিন মাসের খরচ	—	৭,

আপনি এক্ষণে কায়িক কিরূপ আছেন তাহার সবিশেষ সংবাদ দ্বারা চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হয় এখনকার সমস্ত মঙ্গল ইতি ২১ কার্ত্তিক

ভৃত্য
শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা ঃ

শ্রীশ্রী হরিঃ—

শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

আপনকার পত্র পাইয়া সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলাম। আপনি এক্ষণে কায়িক ভাল আছেন এই সংবাদে পরম আহ্লাদিত হইলাম। পিতামহীদেবীর শ্রাদ্ধে মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণেরা বেদ পাঠ করিয়াছেন এবং ৪০ জন মহারাষ্ট্রীয় ও ৪৫ জন হিন্দুস্তানী ব্রাহ্মণ জল পান করিয়াছেন ইহাতে আমার যারপর নাই আহ্লাদিত জন্মিল। এরূপ ব্রাহ্মণ ভোজন ও এরূপ ক্ষেত্রে বৈভবাদি নাই যথার্থ কর্ম্ম।

আমার উদরাময়ের সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্তি হইয়াছে কিন্তু অদ্যাপি সচ্ছন্দরূপে আহার করিতে পারিতেছি না। পাছে পুনরায় রোগের আবির্ভাব হয় এই ভয়ে সাবধানে আহারাদি করিতে হইতেছে। সচ্ছন্দরূপে আহার চলিতেছে না এজন্য অদ্যাপি অতিশয় দুর্ব্বল আছি। বোধ করি আর কিছু দিনেই সম্পূর্ণরূপে সচ্ছন্দ হইব। এখনকার আর সমস্ত মঙ্গল জানিবেন ইতি ৬ পৌষ

ভৃত্য
শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

অনুপরে শম্ভুচন্দ্র ভায়া আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে তোমার মাসিক বরাদ্দের মধ্য হইতে ১৫, পনর টাকা পাঠাইতে লিখিয়াছ কিন্তু তাহা না করিয়া আমি এই ১৫, পনর টাকা স্বতন্ত্র পাঠাইব অর্থাৎ তোমার বাটীতে যেরূপে টাকা পাঠাই সেইরূপে পাঠাইব এই পনর টাকা আমি স্বতন্ত্র দিব। পৌষ মাসের টাকার সঙ্গে এই ১৫, টাকা প্রেরিত হইবেক তুমি আপাততঃ হাওলাত করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। তোমার পত্র পাইবার পূর্ব্বেই চন্দ্রশেখরের কাশী যাওয়া রহিত করিয়া তাহাকে বাটী পাঠাইয়াছি ইতি—

ঠাকুরদাসকে লেখা ঃ

শ্রীশ্রী হরিঃ—

শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনমিদম্

আপনকার আজ্ঞাপত্র পাইয়া সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলাম। আমি উৎকট উদরাময় পীড়ায় প্রায় দেড় মাস কাল বড় কষ্ট পাইয়াছি অবশেষে অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ি। কলিকাতায় কোনমতে পীড়াশান্তি না হওয়াতে কর্ম্মটাড়ে আসিয়াছি। এখানকার জলবায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর ৬ দিন মাত্র এখানে আসিয়াছি। ইহার মধ্যেই বিলক্ষণ উপকার বোধ হইয়াছে বোধ করি ২০।২৫ দিন এখানে থাকিলেই সুস্থ হইব। আপনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইবেন এই কারণে পূর্ব্বে পীড়ার সংবাদ আপনাকে লিখি নাই এক্ষণে উদ্বেগের কোন কারণ নাই এজন্য লিখিলাম। আমি এত অসুস্থ না হইলে যজ্ঞেশ্বরকে না পাঠাইয়া স্বয়ং আপনার নিকটে যাইতাম কেবল দুর্ব্বলতাবশতঃ যাইতে পারি নাই। গেলে আমা-দ্বারা আপনকার কোন উপকার হইত না অথচ আমার পীড়াদ্বারা আপনাকে বিব্রত করিতাম। আপনি এ অবস্থায় স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিতেছেন এই সংবাদ পাইয়া আমি ম্রিয়মাণ হইয়া আছি; কেবল নিতান্ত নিরুপায় বলিয়া চুপ করিয়া রহিয়াছি। আমি অসুস্থ অবস্থাতেও যাইতে উদ্যত হইয়াছিলাম কেবল সকলে প্রতিবন্ধক হইয়া যাইতে দিল না। শম্ভু ত্রয়োদশীর দিন বাটী হইতে নির্গত হইবেন লিখিয়াছেন ত্রয়োদশীর আর বিলম্ব নাই যদি কোনগতিকে তাঁর আসিবার বিলম্ব হয় আমি যাইব কল্য কলিকাতার পত্র পাইয়াছি সেখানে সকলে ভাল আছে। প্রায় একমাস হইল আমার মধ্যমা কন্যা কুমুদিনীর এক কন্যা হইয়াছে ইতি ১৩ আশ্বিন

ভৃত্য
শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা ঃ

শ্রীশ্রী হরিঃ—

শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনমিদম্

৭৬ টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি আপনকার মদনের মাতার ও সারদাদেবীর শ্রাবণ মাসের খরচ হিসাবে লইবেন আমি কয়েক দিবসের পর অদ্য অন্ন আহার করিয়াছি অতিশয় দুর্ব্বল আছি এজন্য আপনকার শেষ পত্রের লিখিত অন্যান্য বিষয়ে কিছু লিখিতে কিঞ্চিৎ সবল হইয়া লিখিব। শম্ভুকে কহিবেন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র এখানে আসিয়াছেন এবং কাশীপুরের বাসাতে আছেন এখানে কিছুদিন থাকিলে সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারিবেন ইতি ২৬ শ্রাবণ

ভৃত্য
শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা ঃ

শ্রীশ্রী হরিঃ—

শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

অদ্য শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাত হইল তিনি কহিলেন আপনকার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল আপনি কায়িক ভাল আছেন এবং *...একোদ্দিষ্ট ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে তাঁহার মুখে যেরূপ উদ্যোগের কথা শুনিলাম তাহাতে আমি যে টাকা পাঠাইয়াছিলাম তদ্দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে অতএব আমার প্রার্থনা এই যে অধিক ব্যয় হইয়াছে জানিতে পারিলে পাঠাইয়া দি কারণ ঐ ব্যয় আপনকার নিয়মিত টাকা হইতে নির্ব্বাহ করিতে হইলে কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। আমি সেইরূপই আছি অদ্যাপি সম্যক সুস্থ হইতে পারি নাই আপনি এক্ষণে কায়িক কিরূপ আছেন লিখিতে আজ্ঞা হয়। আমি ৭।৮ দিন হইল বাটী হইতে আসিয়াছি বোধ করি আর ৭।৮ দিন পরে পুনরায় বাটী যাইব ২২ অগ্রহায়ণ বিস্মৃত হইব না তথাপি অনুগ্রহ

ঠাকুরদাসকে লেখা বিদ্যাসাগরের একখানা পত্রের প্রতিলিপি

পূর্ব্বক ঐ মাসের ১০।১২ তারিখে ঐ দিবস উল্লেখ সম্বাদ লিখিলে ভাল হয় ইতি ৩ কার্ত্তিক

ভৃত্য
শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদনম্

আপনকার শ্রীচরণারবিন্দের আশীর্ব্বাদে আমি এক্ষণে কিছু ভাল আছি জানিবেন। শম্ভু প্রভৃতি সকলে নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় পহুছিয়াছেন সোমবার বেলা ২॥ প্রহরেয় তাঁহারা কলিকাতায় পহুছেন আমি সেদিন কলিকাতায় ছিলাম তাঁহাদের মঙ্গলবার বাটী যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমি সোমবার সন্ধ্যাকালেই বর্দ্ধমানে আসিয়াছি। শম্ভুচন্দ্র ১২৮, একশত আঠাইশ টাকার দেশর ফর্দ্দ দিয়াছিলেন ঐ টাকা ও আপনকার ও তর্কলঙ্কারের মাতার ভাদ্রমাসের টাকা সমুদয়ে ১৬৬, একশত ছষট্টি টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি পহুছ সংবাদ লিখিয়া নিবেদন করিতে আজ্ঞা হয়। আপনি কায়িক সচ্ছন্দ আছেন শুনিয়া পরম সুখী হইলাম। পহুছ সংবাদ বর্দ্ধমান ঠিকানায় লিখিবেন ইতি ভাদ্র

ভৃত্য
শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

আপনকার আজ্ঞাপত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম আমি তিন চারদিন পরে কলিকাতায় যাইব এবং গিরিশবাবুর ভ্রাতাকে ১০০, একশত টাকা দিব। সেখানে ৪।৫ দিন থাকিয়া পুনরায় বর্দ্ধমানে আসিব। আপনি যখন পত্র লিখিবেন বর্দ্ধমান ঠিকানা দিবেন কারণ এক্ষণে প্রায় বর্দ্ধমানেই থাকি মধ্যে মধ্যে ২।৪ দিনের জন্য কেবল কলিকাতায় যাই। আমি এখন অনেক ভাল আছি জানিবেন ইতি তাং ২৩ পৌষ

ভৃত্য
শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

৭১ একাত্তর টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি নিম্নলিখিত বিনিয়োগ করিতে আজ্ঞা হয়।

নিজ খরচ আশ্বিন		—	৫০,
মদনের মাতা	ঐ	—	৮,
নিস্তারিণী দেবী	ঐ	—	৩,
গঙ্গামণি দেবী	ঐ	—	৮,
			৬৯,

অবশিষ্ট ২, টাকা ও পূর্ব্বে তারাশঙ্কর তর্করত্নের পিসি বলিয়া যে ৩, টাকা প্রেরিত হইয়াছিল এই পাঁচ টাকা আপনকার নিকট জমা রাখিবেন। আমি তথায় গিয়া এই টাকার বিলি করিব। প্রায় একমাস আটদিন হইল আমার বাঁ পায়ে ও কোমরের নীচে এই দুই স্থানে দুটী ব্রণ হইয়াছিল, অদ্য ২২ দিন হইল অস্ত্র করা হইয়াছে, কোমরের নীচের ব্রণটি আর ৪।৫ দিনে ও বাঁ পায়ের ব্রণটি আর ১০।১২ দিনে সম্পূর্ণ শুষ্ক হইবে, উদ্বেগের কোন বিষয় নাই জানিবেন। শম্ভুচন্দ্রের পত্রে অবগত হইলাম আপনি এক্ষণে অপেক্ষাকৃত কিছু ভাল আছেন, দুই জানুতে যে বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইয়াছে। হস্তের ঘা সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইয়াছে কিনা অনুগ্রহ করিয়া তাহার সবিশেষ লিখিতে আজ্ঞা হয়। এখনকার আর সমস্ত মঙ্গল জানিবেন ইতি ৫ই আশ্বিন

ভৃত্য
শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে যে দশ টাকা দিতে লিখিয়াছিলাম ঐ দশ টাকা শম্ভুচন্দ্রের হস্তে দিয়াছি। ইতি—

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

খড়্গ

সমীর রক্ষিত

নৌকার গলুইয়ের ওপর তুবড়িটাতে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠিটা ছোঁয়াতেই মুহূর্তে সেটা জ্বলে উঠল, প্রথমে কয়েকটা ফুলকি এদিক-ওদিক ছিটিয়ে পড়ল তারপর মুহূর্তে আগুনের একটা ফোয়ারা ফুঁসতে ফুঁসতে ঊর্ধ্বমুখে উঠে ছড়িয়ে পড়তে লাগল; একটা কম্পমান লালচে আলোয় নৌকার সকলের মুখ জ্বলজ্বল করে উঠতেই উত্তেজনায় হাত মুঠো করে জম্বুদা হেঁকে উঠল—'দেখালো কারা?' সমবেত কণ্ঠে ছেলেরা চেঁচাল, 'বালক সঙ্ঘ', সে আওয়াজে আশেপাশের আরো দু-তিনটে নৌকা পর্যন্ত দুলে উঠল। সিটি পড়তে লাগল চুঁই চুঁই শব্দে, ঢাকের গর্জন চড়ে গেল দ্বিগুণে, ঢাকীরা সামনে পিছনে মাথা ঝাঁকিয়ে বাজাতে লাগল। প্রতিমার সামনে দুলালের নাচের ঘটাও গেল বেড়ে, দু-হাতে দুটো ধুনুচি নিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে চোখ পাকিয়ে পাছা দুলিয়ে নাচতে লাগল সে—ড্রেনপাইপটা পায়ের গুলি পর্যন্ত গুটনো, মাথার সিঙ্গাড়া মার্কা চুল ভেঙে পড়েছে কপালে। ওর আশেপাশে পনর থেকে বিশ বছরের আরো দু-তিনজন ছেলে মুখোশ পরে পরস্পর অসুরের লড়াই জমিয়েছে। প্রতিমা নৌকার প্রায় মাঝামাঝি বসানো হয়েছে—সামনে পাড়ার মেয়েবউবাচ্চারা, পেছনে ফরাস পেতে পাড়ার মাতব্বরেরা; একপাশে বিশু-পল্লব-স্বপন মাইক নিয়ে ব্যস্ত—তারা মেয়েদের ওপরও নজর রাখছে। তাদের চেয়ে কিছু বড় পাড়ার মস্তান জম্বুদা সমস্ত নৌকাটা তদারকি করে বেড়াচ্ছে আর মাঝে মধ্যে বাইসেপ ফুলিয়ে হেঁকে উঠছে—'দেখাল কারা? যাচ্ছে কারা?' প্রতিমা নিয়ে সব নৌকাই উত্তরে বাজারের গোলা থেকে দক্ষিণে দোলনা ব্রিজ পর্যন্ত টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। করলা নদীর দুপারে হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে—মেলা জমজমাট, মুন্সিপ্যালিটি থেকে বাড়তি আলো দিয়েছে, মৃদুগতি নদীর জলের আলো দুলছে—ছায়া শূন্যে বাড়ি পড়ছে, বহু কণ্ঠের মিলিত শব্দ গুমেগুম করে ফিরছে বাতাসে; আজই শেষ মজা, শেষ আরতি, আজ দশমী। মাইকে 'পাগল মুখে কর দিয়া—প্রতিমার সামনে কুণ্ডলী

প্যাঁকিয়ে ধোঁয়া উঠছে—ঘাড় বেঁকিয়ে চোখ প্যাঁকিয়ে পাছা দুলিয়ে দুলাল নাচছে—

'এই, তুই এসব কী দেখিস!' স্বপন বীরুর কানের কাছে ফিসফিসিয়ে উঠতেই অন্যমনস্ক বীরু যেন চমকে উঠল, এতক্ষণ সে যেন এখানেই ছিল না। দাঁত বের করে শিবাই বলল, 'অত কী ভাবছিস রে বীরু, একটা রাত মাঠে মারা গেল, পড়াশুনো হল না?' কাঁচা ঘুম থেকে উঠলে যেমন হয় বীরুর চোখ-মুখ সেইরকম—অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল এতক্ষণ, আলোয় মুখ ফেরাতে পারছে না অথবা তার সারা মুখটাই, সমস্ত শরীরটাই একটা অস্থির যন্ত্রণার অন্ধকার; বস্তুত প্রতিমা, ধোঁয়া, নাচ এসব কিছুই দেখছিল না সে, মাঝে মাঝে ঢাকের শব্দে চমকে উঠছিল মাত্র। তার দু' চোখে সারাক্ষণ মায়ের রুক্ষ মুখ রাগী চোখ, কানে তার কর্কশ আওয়াজ দাপাদাপি করছিল। নিজের পড়াশুনো, পরীক্ষার কথা ভেবে ভেতরে ভেতরে এতটুকু হয়ে যাচ্ছিল সে: কী একটা বলতে গিয়ে তার ঠোঁট কাঁপছিল—বিশু তাকে চেপে দিয়ে বলল, 'আরে তোকে মারে কোন্ ব্যাটা, টেস্ট্ মে ভি তুম্ জরুর ফাস্ট হো জায়গা, বেটা!'—যেন হাত তুলে অভয় দিল। 'সে ত হবেই' —পল্লব কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'একটা রাত প্রাণ ভরে মাল দেখেছো ইয়ার!' বীরু হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু হাসিটা তার মুখের যন্ত্রণার কালচে দাগে মিশে গিয়ে আরো বীভৎস হল, তার চোখজোড়াও কেমন যেন রুক্ষ হয়ে উঠছে—সেটা লক্ষ্য করে শিবাই বলল, 'কেন ওকে ওসব ফুসমন্তর দিচ্ছিস পল্লব, না বাবা, তুমি এসব দেখো না, খারাপ হয়ে যাবে আমাদের মত।' 'আমাদের' ওপর জোর দিল শিবাই। 'আমি কী আলাদা?' বীরুর চাপা গলা ডুবে গেল। 'ন্যাকা, জানো না হেডু পর্যন্ত বলে ব্রি-লিয়ান্ট'—স্বপন হেডুর ভঙ্গি করল। সকলে হো হো করে হেসে উঠল। স্বপনের মুখটা দু' হাতে চেপে ধরে মুচড়ে দুমড়ে গলুইয়ের ওপর থেঁতলে দিতে ইচ্ছা করে বীরুর, একটা রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে দিতে মন চায়—কে তাদের দিব্যি দিয়েছে তার পড়াশুনোর কথা ভাবতে। সবাইকে তার জানা আছে। তার জন্য চিন্তায় কারো ঘুম নেই যেন—হাত মুঠো হয়ে যায়, মুখে কিছু বলতে পারে না বীরু পাছে ভেতরের আগুন তার গলায় বেরিয়ে পড়ে, মুখ ফেরাতে পারে না, পাছে মুখের বীভৎস অন্ধকার ধরা পড়ে যায়। ক্ষোভে অভিমানে বুকটা ফুলে ওঠে শুধু চোখ জ্বালা করে। মায়ের কর্কশ চীৎকার যেন ঢাকের আওয়াজ, লোকজনের গমগমে শব্দ, মাইকের আওয়াজ সব চাপা দিয়ে দেয়; মায়ের মুখটা—প্রতিমা, দুলাল, নৌকোভর্তি লোকের মুখ আড়াল করে দেয়। তার বুকের ভেতরের চাপা যন্ত্রণা যেন ফুঁসে ফুঁসে ওঠে তারপর তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে করে নিয়ে চলে যায়, কোনো দেয় সোজা মায়ের রুক্ষ দু' হাতের খপ্পরে, এলোপাথাড়ি কিল চড় ঘুষি, চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকানি, কানের পর্দা ফাটানো আওয়াজ, 'হারামজাদা ছেলে, তোমার পড়াশুনোই বেশী হল আর সংসার ভেসে যাক না?' টুঁ শব্দটি করে না বীরু, বাঁশের খুঁটিটা চেপে ধরে শরীর শক্ত করে মার খায়। 'কি হচ্ছে মা?' দিদি ছুটে এসেছিল, মা তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে—'তুই যা এখান থেকে'। বারান্দা থেকে বাবার রুগ্ন আওয়াজটা ভেসে আসে, 'আহ্ কি করছ—ওকে বুঝিয়ে বল, ও কি আমাদের কথা ভাবে না?'—'ছাই ভাবে!' মায়ের গলার ঝাঁঝটা বেড়ে যায়, 'ভাবলে মুখের ওপরে একথা বলতে পারে ধাড়ি ছেলে?' মায়ের গলা বুজে আসে, তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যায় ঘরে। 'বীরু তুমি আমার বড় ছেলে, তুমি আমার ভরসা'—বাবার কাতর গলা মায়ের কাঁপা কাঁপা ফোঁপানোর শব্দে ডুবে যায়, 'নিজের মুরোদে হল না, এখন ছেলের দোহাই!' মায়ের গলায় উথলানো কান্না।

'এই ছেলে, তুই এসব কী দেখিস!' কার ফিসফিস কানের ভিতরে। ঢাকের আওয়াজ তীক্ষ্ণ—ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার চারিদিক, দুলালকে প্রায় বোঝা যায় না। হ্যাজাকের লালচে আলোয় প্রতিমাও অস্পষ্ট। কিন্তু দুর্গার উঁচু সোনালী মুকুট ঝলমল করছে, কাচপুঁতি ঝলকাচ্ছে, কপালের মধ্যে চোখের দৃষ্টিটা কোনদিকে কে জানে, বাকী দু-চোখ নত, কিন্তু বিস্ফারিত—দশ হাত দশ দিকে ছড়ানো, হাতে বালাকঙ্কণ, বাজু মণিবন্ধ সব

অলংকার। নানান অস্ত্র ঝলসে উঠছে. ত্রিশূল বর্শা শঙ্খচক্রগদাপদ্ম, এক হাতে সাপ। মায়ের আগেকার হাতের মত সুডৌল চকচকে বলিষ্ঠ। এখন তো হাড্ডিসার, হাড়ের ওপর চামড়ার পাতলা একটা আবরণমাত্র. দিনদিন সে চামড়াও শুকিয়ে শুকিয়ে আরো পাতলা হয়ে যাচ্ছে। হাতের চুড়িবালা সব গেছে নোয়াটা ছাড়া। তার চুল ধরে ঝাঁকানোর সময় অন্য কোন শব্দ পায় নি বীরু মায়ের তপ্ত নিশ্বাসের ছাড়া। আগে মা দূরে দিয়ে গেলেও বোঝা যেত চুড়ির আওয়াজে। ধোঁয়ার ধোঁয়াকার, দুলালের সমস্ত শরীরে ঘামে দরদর. গায়ের জামা খুলে ফেলেছে, পাকানো শরীরে মস্ত গাঁদা ফুলের মালা ঝুলছে একটা। ধুপদানি দাঁতে কামড়ে কিম্বা কখনো শরীরের তলা দিয়ে বেঁকিয়ে নানা কসরতে নেচে যাচ্ছে। চোখ আধবোজা, যেন একটা ঘোর লেগেছে —'এই দুলোল'—জম্বুদা ডাকতে একবার দাঁড়িয়ে ফিরে তাকাল তারপর ঘোরের মধ্যে আগের মতই নাচতে লাগল—'সাবাস্' জম্বুদা এদিকে চলে এল। বেশীক্ষণই তাকে প্রতিমার পেছনে মাতব্বরদের ওখানে থাকতে হচ্ছে, বীরুকে দেখে হেসে বলল, 'এই যে তুমিও এসেছ দেখছি'।—বিশুদা বলল, 'ও এসব নাচও শেখাচ্ছে জম্বুদা'। জম্বুদা গম্ভীর হয়ে গেল, 'শেখবে না, নিশ্চয়ই শেখবে। লেখাপড়াও করবে এন্‌জেকও করবে।' তারপর বীরুর কাঁধটা জোরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, 'কিন্তু যাই কর স্কলারশিপটা মেরে দেওয়া চাই বুঝলে—পাড়ার ইজ্জৎ!'—বলেই দুজনের মাঝে গিয়ে ফস্ করে সিগ্রেট ধরালো. তারপর ধোঁয়া ছেড়ে গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমাদের দ্বারা তো কিছুই হল না'—যেন একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল জম্বুদা। বলিষ্ঠ কাঁধ, চওড়া বুক, শক্ত মাইসেল, মোটা কব্জি সব মিলিয়ে জম্বুদার জবরদস্ত চেহারার ভিতরে কোথায় যেন একটা নরম ক্ষত আছে, বীরু বুঝতে পারে, একটা বেদনা। তার কিছু একটা বলতে ইচ্ছা করে; তার সব কথা জম্বুদাকে খুলে বলতে ইচ্ছা করে কিন্তু বলতে পারে না। কেবল মায়ের রুক্ষ মুখটা মনে পড়ে যায়। তার কর্কশ আওয়াজ আর সব শব্দ চাপা দিয়ে দেয়। সহসা যেন চারিদিক ভীষণ নীরব স্থির হয়ে যায়। ঢাকের আওয়াজ যেন বন্ধ হয়ে গেছে. মেলার হাজার হাজার লোক একটিও কথা বলছে না. নড়ছে না চড়ছে না, দুলাল নাচছে না, নৌকা চলছে না; নৌকা স্থির, প্রতিমা স্থির নদীর জলও সহসা স্থির। কোথাও এক বিন্দু আলো নেই. বাতি জ্বলছে না, চরকি ঘুরছে না, বাজি ফাটছে না। বীরুর দু' চোখ স্থির শান্ত। জম্বুদার মুখে স্কলারশিপের কথাটা তাকে বোবা বধির করে দিয়েছে। কেবল ভিতরের যন্ত্রণাটা কেটে কেটে সমস্ত শরীরে বসে যাচ্ছে আর তাকে টেনে হিঁচড়ে করে পেছনের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পুজোর ছুটির আগে উপেনবাবু তাকে ডেকে ছুটির মধ্যে ট্রানশ্লেসন দেখিয়ে নিতে বললেন। আরো বললেন, 'তোমাকে দিয়ে আমরা খুবই আশা করছি চেষ্টা করলে হয়তো স্কলারশিপ একটা পেতে পারো।—উপেনবাবু খুব বেশী কথা বলেন না, টিউশনিও করেন না, ইচ্ছা হলে কাউকে এমনি পড়ান। বাড়ী ফিরেই মাকে বলেছিল বীরু। আগে মা এসব কথায় কত খুশী হত। এখন কেমন ফ্যাকাশে চোখে তাকিয়ে আস্তে করে শুধু বলল, 'আমার ভাগ্যে কী আর ওসব হবে।' আগে হলে পাশের বাড়ীর রমা বউদিকে ডেকে

বামুপাটির মত বাবাও প্রতিমার পিছনে মণি শিকদারকে ঘিরে থাকত। সিগারেটের টিনটা এগিয়ে দিত, আগুন ধরিয়ে দিত আর সব কথায় মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিত। রাগী মাস্টারের সামনে তারা যেমন বসে থাকে তেমনি সব ভাল ছেলে। তা নইলে উপায় আছে? মণি শিকদারের মেজাজ তার জানা। মা কতদিন তাকে পাঠিয়েছে। এক মাস বাবা হাসপাতালে, একটা পয়সা পায়নি। মণি শিকদার চেঁচিয়ে উঠেছে, 'আমি কী দানসত্র খুলেছি? আমি টাকা ছাপাই না, কাজ করলে টাকা আসে বুঝেছ—মাগনা আসে না।' ফিরে এলেই মায়ের গর্জন, 'তুই চুপ কর— তোমরা সব গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াও, আমি যে কী দিয়ে কী করি সে খবর রাখো!'— মায়ের চোখে জল। মা, তোমার কষ্টের খবর আমি জানি না! শাড়িটা ছিঁড়ে ফালা ফালা, সেলাইয়ের ওপর সেলাই—কত তালি দেবে! গায়ে না সোঁমজ—মাথায় না তেল। হাড়গুলো খোঁচিয়ে উঠেছে ওপরে— চামড়া দিন দিন কী রকম পাতলা হয়ে যাচ্ছে! আমি সব জানি। বাবাকে বারণ করে দেব, বাবা, তুমি ও কথা বলো না, 'আমি বাঁচবো তো?' মা আড়ালে চোখ মোছে, কখনো বলো না, 'আমি বাঁচবো তো?'

'আমি বাঁচবো তো', 'আমি বাঁচবো তো'— যেন উথাল পাতাল শব্দ ঢাকের কাঠিতে: মায়ের গর্জন, মণি শিকদারের হুমকি সব তীক্ষ্ন শব্দগুলো যেন ঠোকাঠুকি করতে করতে বিস্ফোরিত হয়ে যায়, কানের পর্দা ফাটে। ঢাকীর পায়ের দাপটে পাটাতন কাঁপছে, সমস্ত শরীর শিরশির করে ওঠে, রক্ত টগবগায় ভিতরে। হুশ্ করে হাউই উঠে যাচ্ছে ওপরে, আকাশময় আগুন ছড়িয়ে মুহূর্তে মিশে যাচ্ছে বোমা ফাটছে কোথায়, তুবড়ী জ্বলেছে, চরকি ঘুরছে: বারুদের গন্ধ বাতাসে, নাক জ্বলে যাচ্ছে। লোকজন সকলের গায়ে, পায়ে সকল মানুষের গায়ে বারুদের গন্ধ, নদীর জলে থেকে, নিজের শরীরের ভেতর থেকে বারুদের গন্ধ উঠে আসে। হ্যাজাকের আলোয় অসুরের শরীরটা চকচক করছে, ঝাঁকড়া চুল পিছন পানে ওল্টানো, বিস্ফারিত হিংস্র দৃষ্টি, হাতে উদ্যত খড়্গ ওপরের পাটির দাঁত নীচের ঠোঁটে বসে গেছে, পেশল একটা হাত সিংহের হাঁ-মুখের ভিতরে, আর পায়ের নীচে রক্তাক্ত মহিষ—জিভ বেরিয়ে পড়েছে, সেই রক্তাক্ত মহিষের গর্দানের মধ্যে একটি পা প্রোথিত, মহিষের—ঘাড় ফুঁড়ে হঠাৎ আক্রমণের উদ্যত অসুরের সমস্ত শরীরটা যেন ক্রমাগত ফুঁসছে, উদ্ধত ভয়ংকর হয়ে যাচ্ছে। দুর্গার মুখের এক পাশটা অন্ধকার, হ্যাজাকের আলো দপদপ করছে, দশ হাতের ভারে দুর্গা যেন ঝুঁকে পড়েছে, কপালের চোখটা কালো গর্তের মত। সরস্বতীর মুখটা দপদপে আলোয় চমকাচ্ছে, কে যেন হ্যাজাকে পাম্প করছে। অন্ধকার। গভীর অন্ধকারেও মায়ের গলা চেনা যায়—ফোঁপানোর আওয়াজ, 'এবার তুমি একটা কিছু কর, আমি আর পারি না।' ঘুমে পালিয়ে যায়। বাবার সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, 'কত করে তো বললাম মণিদাকে মাইনে হিসাবে না হোক অন্তত ধার হিসাবে দিন কিছু টাকা, তা কী কানে তোলে শালা রক্তচোষা!' ফোঁপানোর শব্দ, তারপর ফিসফিস। খাঁদু উৎকর্ণ, ঝিঁঝের মত— মায়ের ফিসফিস শব্দ, অন্ধকার কাঁপে, 'তাহলে মণিদাকে খাঁদুর কথা বলো'— দপ্ করে হ্যাজাক জ্বলে ওঠে।

'এই ছেলে, তুই এসব কী শোনস!' চাপা গর্জন যেন কানের পিঠে, তপ্ত নিশ্বাসের ঝাপটা। কে যেন দু হাতে পেছন থেকে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরতেই এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় খাঁদু। অশ্লীল হেসে পাড়ার তপ্ত নিশ্বাস ছাড়ে, 'ও আমার ভালো ছেলে রে!' ঘুঙুর বাজছে—গীতা নাচছে এখন, ঢাকের তালে তালে যেমন নাচছে তেমনি তার মুখটা লাল, বুকটা আরো তীক্ষ্ন হয়ে উঠেছে, ঝাঁকড়া করা চুল উড়ছে হাওয়ায়, সুডৌল পায়ের ডিম, বলিষ্ঠ উদরে কিছুটা দেখা যাচ্ছে। একটা কালো গেঞ্জী গায়ে জম্বুদা নিজেই এখন ঢাক বাজাচ্ছে, তার হাতের পেশী রগ ফুলে উঠেছে, চোখ দুটো ওঠানামা করছে নাচের তালে। বাজাতে বাজাতেই পল্লব বিশুদের কানে কানে জম্বুদা বলল, 'যে করেই হোক জলসা করতেই হবে।'

প্রতিমার পেছন থেকে উঁকি মেরে মণি শিকদার, রোল্ড গোল্ডের চশমা বাঁ হাতে নাকে আঁটতে আঁটতে বিজ্ঞের মত বলে, 'বেশ নাচে কী বলেন অনাদিবাবু।' 'বেশ নাচে'— অনাদিবাবুর আগেই অনু বামুপাটি বলে দেয়। অনাদিবাবুও বলেন, 'যা বলেছেন'। 'তা তো নাচবেই—আসল কথা হচ্ছে কী জানেন এই সব ছেলেমেয়েদের দেখলেই মনে মনে বেশ একটা ভরসা পাই আশা হয়।—'আশা হয়'

কার আগে কে বল যে! চুঁই চুঁই সিটি পড়ে একঝাঁক। বাইসেপ ফুলিয়ে জম্বুদা হাঁকে, 'দেখাল কারা?' ছেলেরা সকলে চেঁচায়—'বালক সঙ্ঘ।' 'যাচ্ছে কারা'—'দেখাল কারা'—বালক সঙ্ঘ'। মুহূর্তে সমস্ত নৌকা উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে থাকে। নৌকার গলুইয়ে তুবড়ির মুখে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি—মুহূর্তে আগুনের ফোয়ারা ঊর্ধ্বে উঠে যায়। একটা কম্পমান লালচে আভায় সকলের মুখ জ্বলে জ্বলে করে উঠতেই বাইসেপ ফুলিয়ে জম্বুদা হাঁকে, 'এবার বালক সঙ্ঘ কি চায়?' সকলের চীৎকার 'জলসা'। প্রতিমার পিছনে দাঁড়িয়ে মণি শিকদার কী একটা বলতে গিয়ে থতমত খেয়ে যায়। বড়দের সঙ্গে তাঁর কী শলাপরামর্শ হয়।

'এই ছেলে, তুই এমন কী দেখছিস!' কানের পিঠে উত্তপ্ত নিশ্বাস। ঘুঙুর বাজছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার, নীতা নাচছে ঘুরে ঘুরে। পাটাতন কাঁপছে ঢাকীর পায়ের দাপটে, নৌকা কাঁপছে, জল। জলের ওপর চরকি পাক খাচ্ছে। দুম করে কোথায় বোমা ফাটল একটা, বাজি পড়ছে আকাশে, কারা যেন একটা ফানুস উড়িয়েছে—হাওয়ার টানে একটা অগ্নিপিণ্ড যেন গাঢ় অন্ধকারে কাঁপতে কাঁপতে ওপরে ওঠে যাচ্ছে। নীচে হাজার হাজার লোক—তাদের মাথাগুলো কিলবিল করছে—স্পষ্ট করে তাদের শরীর বোঝা যাচ্ছে না, অনেক রকম আওয়াজ হচ্ছে। কোন শব্দ আলাদা করা যাচ্ছে না—সব শব্দ মিলেমিশে একটা করুণ আর্তনাদের মত, রুগ্ন লোকের কাতরানির মত। 'দেখো মেয়ে দিল মচলে গেয়া।' বুকের ভিতরে যন্ত্রণার ফোয়ারা ফুঁসতে থাকে, হিস হিস শব্দ, মায়ের গলা, কিসের ঝড়, 'তাহলে মণিদাকে বীরুর কথাই বল।' তারপর সব অস্পষ্ট, অন্ধকার। দিনের বেলায়ও কারো দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারেনি বীরু যেন এই মুহূর্তে একটা দুঃসংবাদ সে পেয়ে যাবে। দিদিকে একবার জিজ্ঞেস করবে কিনা ভেবেছিল, দিদি কী বলবে। বেচারী জোরে শব্দ করে একটু হাসতে পারে না, অমনি মায়ের গলা, 'এই যে গলার কাঁটা আমার, এ যে কবে নামবে।' দিদিও নির্বাক। কাউকেই জিজ্ঞেস করতে হয়নি বরং তাকেই ডেকে বলে দিয়েছে সবাই, সব পরিষ্কার হয়ে গেছে বিকালে।

বিকালে বাবা বসেছিল বারান্দায় জল-চৌকির ওপর, চাটাইয়ের বেড়ার গায়ে হেলানো মাথা, মুখ ভর্তি কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফ, ফ্যাকাশে চোখ, ক্ষীণকণ্ঠ, 'দেখ বীরু তুই আমার বড় ছেলে, তোকে একটা কথা বলব' যেন বেশী করে বুকে হাওয়ায় টানতে চেষ্টা করে বাবা, 'গরীব ঘরের ছেলে, মানুষ হতে গেলে কত কী করতে হয় জীবনে।' রাত্রের ফিস্ ফিস শব্দগুলো যেন স্পষ্ট হতে থাকে। বুকটা কেঁপে ওঠে, মা গালে হাত দিয়ে বাবার পাশে। 'মণিদাকে কত করে বললাম আমাকে কিছুদিনের ছুটি দিন, তা বলে কী, কাজ তো আর বন্ধ রাখতে পারি না'—জোরে শ্বাস টানে বাবা। বুক কাঁপে বীরুর—উপেনবাবুর মুখটা দাপায় ভেতরে। 'কী বলবে বল না'—বীরু যেন অস্থির হয়ে ওঠে।

'বলছি—কাজ তেমন কঠিন না—এই কিছু হিসাবপত্র রাখা আর কুলিদের ওপর নজর রাখা'—বাবার গলা ভীষণ দূরে। 'তা আমি কী করব?' গলা চেপে আসে বীরুর। 'তোকে আমার বদলে কিছুদিন ময়নাগুড়ি থাকতে হবে'। বাবার কথায় চীৎকার করে উঠবে কিনা ভাবল বীরু, চীৎকার করতে পারল না, দম আটকে আসে তার, উপেনবাবুর ক্ষতবিক্ষত মুখ বুকের ভিতরে, পিচকারির মুখে সারা শরীর রক্ত ছড়ায়; 'তাই কী রাজী হয় মণিদা, বলে ঐ টুকু ছেলে ওকি পারবে? আমি হাত পায়ে ধরে রাজি করিয়েছি।'—

'খুব করেছ ভাল করেছ'—কান্নায় ভেঙে পড়ে বীরু, 'আমার পরীক্ষা নেই? আমি

পারব না।' 'তোমার পড়াশুনোই বেশী হল—সংসার ভেসে যাক না?' মা উঠে দাঁড়ায়। রুক্ষ চোখমুখ। 'আরে আমি সেরে উঠলেই তো তুই চলে আসবি।' 'আর সেরেছ তুমি' —কে যেন ভেতর থেকে বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের সেই ভয়ঙ্কর গর্জন, 'কী বললি হারামজাদা ছেলে', কানের পর্দা ফেটে যায়, মাথার সব চুল ছিঁড়ে যাবে, এলোপাথাড়ি কিল চড় ঘুষি। বাঁশের খুঁটি ধরে শরীর শক্ত করে মার খেয়ে যায় বীরু। মায়ের দশ আঙুলে বাঘ নখ তীক্ষ্ম হয়ে ওঠে—

'থ্রি চীয়ার্স' কর মণিদা'—'হিপ্ হিপ্ হুররে' 'মণিদার নামে একটা' সকলে চেঁচিয়ে ওঠে—'হু'—উ'—তিন লাফে জম্বুদা প্রতিমার পেছন থেকে লাফিয়ে পড়ে পাটাতনের ওপর, 'জলসা হবে—কলকাতা থেকে আর্টিস্ট আসবে'—'দেখাল কারা?' 'বাজ্জে কারা?' 'বালক সঙ্ঘ'। চালচিত্র সুদ্ধ প্রতিমা টাল খায়, নৌকা দোলে, পাটাতন কাঁপছে পায়ের দাপটে। ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার চারিদিক। বাজি পড়ছে—আকাশময় আগুন ছড়িয়ে দপ করে নিবে যাচ্ছে। বোমা ফাটার শব্দ—বাতাসে বারুদের গন্ধ, নৌকার লোকের গা থেকে, পাড়ের মানুষের গা থেকে, নিজের শরীরের ভিতর থেকে বারুদের গন্ধ উঠছে। ঝাঁঝে নাক জ্বলে যায়। চালা সুদ্ধ প্রতিমা টাল খায়—দুর্গার দশ হাত দশদিক ছড়ানো—দুর্গা দশ হাতের ভারে ঝুঁকে পড়ে। মা তাকে ছেড়ে দিয়ে ঘরে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। মায়ের ফোঁপানোর আওয়াজে চমক লাগে। মায়ের শীর্ণ হাত, অলঙ্কারহীন রুক্ষ শরীরে, পাতলা চামড়ার তলায় কোথায় কান্না ছিল। গায়ে একতিল মাংস নেই, গলায় এতটুকু কোমলতা নেই, মনে হয় এতটুকু স্নেহ নেই। সব উড়ে পুড়ে গেছে। মায়ের আবার মুখটা ভাঙাচোরা কাচের মত, কিছুতে সঠিক সাজানো যায় না, ভীষণ অস্পষ্ট সে ছবি। কোনদিন গায়ে হাত তোলেনি মা—সেই কোন্ ছোট বেলায় একবার মায়ের কাচের বোয়েমটা ভেঙেছিল বলে একদিন মেরেছিল তাকে। রাগ করে শুয়ে পড়েছিল বীরু খায়নি দায়নি। কত রাত সে জানে না, ঘুম থেকে জেগে দেখেছিল মায়ের কোলে বসে সে খাচ্ছে। আধবোজা চোখে যেন স্বপ্নের মধ্যে মায়ের করুণ মুখটা সে দেখেছিল,—চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে—যন্ত্রণায় সমস্ত মুখটা অপরাধীর মত, অনুতাপে মলিন সমস্ত মুখ। তার প্রায় ঘুমন্ত কপালে মাথা রেখে গালে গাল চেপে ধরেছিল মা, চুল ছড়িয়ে পড়েছে, উষ্ণ জলের ধারায় ভেসে গিয়েছে তার কপাল, গাল, সমস্ত বুক। এখনো মাঝে মাঝে রাত্রে পড়তে পড়তে বইয়ের ওপর ঘুমিয়ে পড়লে, গায়ে পিঠে মা হাত বুলিয়ে দেয়, বলে, 'এখন শুয়ে পড়—সকালে উঠে পড়বি'। তখন স্বপ্নের মধ্যে কোন কোনদিন মায়ের আগের সেই মুখ দেখা যায়—তার গালে গাল লাগিয়ে অনুতপ্ত ক্রন্দরত করুণ মায়ের সেই মুখ। অন্ধকার উজ্জ্বল হতে আর একটা অসহ্য যন্ত্রণায় বুক পিঠ সমস্ত শরীর গলে গলে নদীর জলের মত বয়ে যায়—বীরুর।

'এই ছেলে, তুই এসব কী দেখিস!'—কানের কাছে অস্পষ্ট শব্দ। 'থ্রি চিয়ার্স ফর'—'দেখাল কারা?' 'বাজ্জে কারা?'—'বালক সঙ্ঘ'। দুন্দুভির আওয়াজ, ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার। চারিদিক অস্পষ্ট। কোথায় বোমা ফাটল ভীষণ শব্দে। জলের ওপরে চরকি পাক খাচ্ছে। পায়ের দাপটে পাটাতন কাঁপছে—নৌকা টলছে—নদী দুলছে। চাল সুদ্ধ প্রতিমা টাল খায়। দশ হাত দশ দিকে, দশ হাতের ভারে দুর্গা ঝুঁকে পড়েছে। বাজি পুড়ছে, হাওয়াই জ্বলছে, আকাশময় আগুন। কারা ফানুস উড়িয়েছে। একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড হাওয়ার টানে কেঁপে কেঁপে ওপরে চলে যাচ্ছে। হাওয়ায় বারুদের গন্ধ, মানুষের গায়ে বারুদের গন্ধ, নিজের শরীরের ভিতর থেকে বারুদের গন্ধ উঠে আসে। রক্ত টগবগায়। হৃৎপিণ্ড থেকে পিচকারির মুখে সমস্ত শরীরে রক্ত। হাত পা নিসপিস করে বীরুর। রক্তাক্ত মহিষের গর্দানের মধ্যে প্রোথিত-পা অসুরের শরীর ক্রমশ ফুঁসছে। ফুলে ফেঁপে বিশাল হচ্ছে। অসুরের হিংস্র চোখ, উদ্যত খড়্গ, পেশল শরীরের সামনে ঢাক বাজছে। শরীর দুলে দুলে উঠছে, বীরুর রক্ত টগবগ করছে সমস্ত শরীরে। সহসা সকলে নিশ্চুপ, সকলে অবাক। সিটি বন্ধ, বোমা ফাটছে না, নৌকা স্থির, নদী স্তব্ধ, আকাশ ঝুঁকে পড়েছে, কোথাও কোলাহল নেই শব্দ নেই; প্রতিমার সামনে বীরু নাচতে শুরু করেছে। পল্লব বিশু শিবাই —জম্বুদা অবাক, পাড়ার বউঝিরা অবাক। মুহূর্তে সকলে ঘিরে দাঁড়ায়—'এই বীরু—' 'এই শালা!'— 'ব্যাটার মেজাজ এসে গেছে এ্যা!' হঠাৎ প্রতিমার পিছন থেকে মুখ বাড়িয়ে মণি শিকদার বলে ওঠে, 'কে ও, শীতলের ছেলেটা না? ওকে নাচতে বারণ কর, কাল সকালে ও আমার সাইটে যাবে।' মুহূর্তে জম্বুদার মুখটা কঠিন হয়ে যায়, শিবাই পল্লব বিশু মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, সকলে স্তব্ধ, তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে। ততক্ষণে অসুরের হাত থেকে উদ্যত খড়্গ কেড়ে নিয়ে বীরু উদ্দাম ঢাকের তালে নাচতে লেগেছে।

কালসন্ধ্যা

বুদ্ধদেব বসু

প্রথম অঙ্ক : ৩

সুভদ্রা

রক্ষা নেই, সত্যভামা, রক্ষা নেই আর।

সত্যভামা

শুনেছি, হস্তিনাপুরে দেখা দিয়েছিলো
এইমতো প্রাকৃতিক বিশৃঙ্খলা,
জীবে জড়ে বিপর্যয়
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রাক্কালে?

সুভদ্রা

আমিও শুনেছি তা-ই, স্বচক্ষে দেখিনি।
যুদ্ধ—সে তো ক্ষাত্রধর্ম। ভ্রাতৃহত্যা তবু ভালো নয়।
তাই দেবগণ
হয়তো করেছিলেন ইঙ্গিতে ভর্ৎসনা।
কিন্তু আজ দ্বারকায় যুদ্ধ, মারী, অনাবৃষ্টি, কিছু নেই।
তবু যদি ব্যাধি ও বিকার ব্যাপ্ত, কোথায় উদ্ধার?

সত্যভামা

সুভদ্রা, আমার মন অন্য কথা বলে।
অকস্মাৎ দেখি যেন রশ্মিরেখা, যা এখনো দিগন্তে লুকোনো।
জানো তো, যখন রাত্রি সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ অমায় মগ্ন,
তখনই নূতন ঊষা আসন্ন, প্রস্তুত।

সুভদ্রা

আমি দেখি দ্বারকায় সর্বনাশ উঁড়িয়েছে পদপা,
উন্মাদ রাজন্যকুল, আশঙ্কায় বিহ্বল জনতা;
পঞ্চভূত উত্তরোল, চরাচরে ওঠে প্রতিবাদ।

সত্যভামা

ভেবো না, আছেন কৃষ্ণ।
এরা আজ মোহাচ্ছন্ন, তাই ভুলে গেছে
কিছু নেই, যা অসাধ্য তাঁর,
অনায়াস অপ্রয়াসে তাঁর দান সব সমাধান,
স্থানে, কালে, অন্তরালে তিনি উপস্থিত।

সুভদ্রা

আর যিনি গোবিন্দের অভিন্নহৃদয় বন্ধু,
অজেয় গাণ্ডীবধন্বা সব্যসাচী,
পরন্তপ, পাপহন্তা, অনিদ্র অর্জুন—
এরা কি তাকেও ভুলে গেছে?

সত্যভামা

বিস্মৃতি সহজ, আর মানুষ চৈতন্যক্লিষ্ট
এবং মরত্বে বন্দী, স্বভাবত মুক্তি কাম্য তার।
কিন্তু দৈবদোষে কখনো বা
চায় মূর্ছা, অপস্মার, আত্মলোপে খোঁজে স্বর্গসুখ—
কী দীন জনতা, কী-বা শূরবৃন্দ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
তবু ভাবি, যেহেতু কুরুক্ষেত্রে
ভ্রাতৃবধ, গুরুহত্যা, বহু মিথ্যাচার—
তাও ছিলো ধর্মরাজ-প্রতিষ্ঠার পূর্বরঙ্গ,
তাই আজ যাদবের নির্বোধ ভ্রান্তিও
কিছু নয়—তুচ্ছ অপলাপ।

সুভদ্রা

কিন্তু, সত্যভামা—
তোমার কি মনে নেই?
মনে নেই গান্ধারীর অভিশাপ?

সত্যভামা

কৃষ্ণ, যিনি বহুরূপী, বিশ্বরূপী,
সব আরম্ভের মন্ত্রী, যন্ত্রী সব দূর সমাপনের,
যুদ্ধের নেপথ্যনেতা, শান্তির স্থপতি,
সাম্রাজ্যের অলক্ষ্য যোজক,
মহাজ্ঞানী ভীষ্ম যাঁকে মৃত্যুকালে অর্ঘ্য দিয়েছেন
দেবশ্রেষ্ঠ ব'লে—
সেই তিনি অভিশপ্ত?

[মৃদু হেসে]

—বাতুলতা!

সুভদ্রা

তবে কেন প্রচ্ছন্ন এখনো
পার্থসারথি ও পার্থ, যাঁদের দর্শনমাত্রে
শান্ত হবে বিক্ষুব্ধ জনতা, আর বৃষ্ণিবীরগণ
দাঁড়াবেন পুনর্জিত মৌলিক গৌরবে
স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষমাপ্রার্থনায়?

[নেপথ্যে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা।]

অস্ত্রের সংঘাত কেন? যাদবেরা স্বস্থ নেই জেনে
এলো কি লুণ্ঠনকারী বর্বর দস্যুরা?

সত্যভামা

[সহাস্যে]

দ্বারকায় আক্রমণ? কোন দস্যু এত দুঃসাহসী?
হোন মদিরায় মত্ত, তবু কৃতবর্মা ও সাত্যকি
সহস্র দস্যুর চেয়ে পরাক্রান্ত।

[নেপথ্যে আবার অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা।]

সুভদ্রা

ঐ শোনো—আবার।

সত্যভামা

[কান পেতে]

কিসের শব্দ?

[ক্ষণকাল পরে]

না, সুভদ্রা, অস্ত্র নয়, নর্তকীর নূপুরনিক্কণ,
কঙ্কণে ও কাঞ্চীদামে চঞ্চল ঝংকার।

সুভদ্রা

কনকের ধ্বনি আরো নম্র ব'লে আমার ধারণা।

সত্যভামা

হয়তো বা স্বভাবযোদ্ধারা
প্রমোদের অবসানে অবসাদ কাটাতে, সম্প্রতি
খেলাচ্ছলে করছেন অস্ত্রাভ্যাস।

সুভদ্রা

[ক্ষণকাল পরে]

এসো, অন্য কথা বলি, সত্যভামা,
পুরোনো দিনের কথা, অতীতের—
আমাদের যখন যৌবন ছিলো—সেই সব দিন।
বলো প্রেম, বলো সুখ—যুদ্ধ নয়, জয় নয়, রাজনীতি নয়—
পুরুষ ও নারীর প্রণয়,
আলিঙ্গনে প্রাণবিনিময়,
অঙ্গে-অঙ্গে সংযুক্ত হৃদয়।
তারপর চিন্ময় সফলতা :
স্তনমুখে শ্যামল মণ্ডল,
উদরের গুরুত্বে মন্থর তনু,
অন্তরালে অন্য এক প্রাণ—
আনন্দে ও যন্ত্রণায় জন্ম নেয় মাতার সন্তান।

[হঠাৎ থেমে, রুদ্ধস্বরে]

—অভিমন্যু! হায়, অভিমন্যু!

সত্যভামা

দেহ লঘু, জীবন নির্ভার,
ক্ষীণাঙ্গী তরুণী আমি, পিতা ভালোবাসতেন আমাকে।
'সত্যভামা,' পিতা বলতেন,
'সত্যভামা, আমি তো জানি না,
তোর যোগ্য পতি কে হ'তে পারেন—একজন বিনা।'
গণক বলেছিলেন বৃষ্ণিকুলে আমার নির্বন্ধ;—আমি
মনে-মনে কৃষ্ণকে চেয়েছিলাম,
পিতার ইচ্ছাও তা-ই।
কিন্তু অন্য পাণিপ্রার্থী ছিলো—
শতধন্বা, অক্রূর ও কৃতবর্মা।
সদ্যপরিণীতা আমি—নববধূ, গরবিনী, বিজয়িনী কৃষ্ণপ্রিয়া;
অকস্মাৎ বার্তা এলো, ব্যর্থ কামে ক্ষুব্ধ যুবকেরা
পিতাকে করেছে হত্যা, যখন নিদ্রায় তিনি চেষ্টাহীন।
হন্তা শতধন্বা, আর কৃতবর্মা সংঘটক, ষড়যন্ত্রী।
কৃষ্ণ শতধন্বাকে নিধন ক'রে
করুণায়, সান্ত্বনায় থামালেন আমার উত্তাল কান্না।
কিন্তু সেই কৃতবর্মা আজও বেঁচে আছে।

সুভদ্রা

থাক।
কৃতবর্মা, জয়দ্রথ লক্ষবার যদি হত হয়,
অভিমন্যু ফিরে আসবে না,
পাণ্ডবের কোনো পুত্র ফিরে আসবে না।

সত্যভামা

পিতা, ক্ষমা করো!
পতিপ্রেমে মগ্ন হ'য়ে কেমন সহজে
আমি ভুলেছিলাম তোমার
জটিল, হিংসুক মৃত্যু—যা আমারই দাম্পত্যের প্রতিফল।
জীবন নিষ্ঠুর।

সুভদ্রা

সত্যভামা, ভেবে দ্যাখো :
পিতৃগণ অগ্রগামী জন্মে ও মরণে,
তাঁদের অপসরণ কষ্টকর, তবু স্বাভাবিক।
কিন্তু পুত্র—জননীর অনন্য সন্তান—তার মৃত্যু
আমি তাও—তাও সহ্য করেছি, নিয়েছি মেনে,
এমনকি—এতদিনে—ভুলে গেছি—প্রায়।
জীবন নিষ্ঠুর।

সত্যভামা

বলেছিলে, 'এসো, অন্য কথা বলি। প্রেম, সুখ, সুন্দর যৌবন।'

সুভদ্রা

আমাদের সব সুখ—অন্তরালে ব'য়ে যায় অশ্রুর প্লাবন।

সত্যভামা

জ্বলে প্রেম আত্মভুক : লালসায়, বিচ্ছেদের তীব্র তাপে,
ঈর্ষার জ্বালায়।

সুভদ্রা

কখনো বোঝে না কেউ কোন গুপ্ত ছিদ্রপথে যৌবন পালায়।

সত্যভামা

মনে হয় আমাদের বন্ধু যারা—তার মধ্যে মৃতেরাই
সংখ্যায় বিরাট;

সুভদ্রা

আর যেন অপেক্ষায় আছে তারা, দৈবে যদি খুলে যায়
দুর্গের কবাট।

সত্যভামা

তাহ'লে কি মৃত্যু আর স্মৃতি ছাড়া কীর্তনের যোগ্য
কিছু নেই?

সুভদ্রা

তবু এ-জীবন ভালো—ক্ষয়, শোক, পরিতাপ সত্ত্বেও

সত্যভামা

কেননা ভুক্তাবশিষ্ট কিছু থাকে—

সুভদ্রা

যেমন পাণ্ডবপৌত্র পরীক্ষিৎ
যার কাছে নিতান্তই জনশ্রুতি হস্তিনার রক্তাক্ত অতীত।

সত্যভামা

যেমন আবর্তময় ইতিহাসে কৃষ্ণের উত্থান,
এবং দ্বারকাধামে ঋদ্ধিশালী এই বর্তমান।

সুভদ্রা

[চকিত স্বরে]

কিন্তু—ঐ শোনো!

[সহসা অস্পষ্ট কলরোল। ক্রন্দন
[illegible]]

স্তব্ধ কেন! অকস্মাৎ স্তব্ধ কেন?
এতক্ষণ আন্দোলন, চীৎকার, ঝঙ্কার—
অনেক প্রাণের চিহ্ন—কে গুটিয়ে নিলো অকস্মাৎ?
কোন স্তব্ধ অপেক্ষায় বিশ্বে কেন পড়ে না নিশ্বাস?
কী... কী? সত্যভামা, কী হ'লো?

সত্যভামা

কিছু না।

[একটু থেমে]

হয়তো বা ভালো নয় মৃতের বিদায়ে এত কথা বলা।
কে জানে, তারাও
মাঝে-মাঝে শান্তি ফিরে পায় কিনা,
পার্থিবের স্মরণে ও সম্ভাষণে উৎকণ্ঠ হয়ে পড়ে।

[ক্ষণকাল পরে]

মৃতগণ, প্রিয় বা অপ্রিয়, বলো,
তোমরা কি তৃপ্ত নও?
তর্পণে ও পিণ্ডদানে এখনো কি তৃপ্ত নও?
তোমরা কি এখনো করোনি পান নূতন মাতার স্তন্য,
কিংবা কোনো ব্রহ্মলোকে হওনি বিলীন?
কেন, কেন ক্ষুদ্রবল জীবিতেরে পাঠাও সংকেত?

[ক্ষণকাল পরে, যেন আত্মস্থ হ'য়ে]

সুভদ্রা, আকাশে রোদ! চেয়ে দ্যাখো, অমল আশ্বাস নিয়ে
সূর্যদেব এইমাত্র আবির্ভূত। শান্ত হও।

সুভদ্রা

[বাতায়নে ঝুঁকে বাইরে তাকিয়ে]

সূর্য—ও কি সূর্য—আকাশের ধূম্রজাল ঠেলে
দেখা দেয়, যেন মধ্যদিনে
স্থির?
স্থির—যেন এই দিন অনন্তকালেও
ফুরাবে না,
সাজাবে না সন্ধ্যাকে হিরণবর্ণে, মিলাবে না মধুর তন্দ্রায়।

[ক্ষণকাল পরে]

কিন্তু না—এ নয় রোদ। প্রতিভাস, দৃষ্টিভ্রান্তি,
[illegible], নিষ্প্রাণ, নিস্তাপ।
—এত রোদ, তবু কেন শীত?
কেন শীত, কেন স্থির, কেন বিশ্বে পড়ে না নিশ্বাস?

সত্যভামা

যিনি গতি, যিনি জ্যোতি, যিনি প্রাণ, প্রাণের স্পন্দন,
মনে হয় এ-প্রতীক্ষা তাঁরই জন্য।

সুভদ্রা

কে জানে অপেক্ষায় কেটে গেলো যুগ-যুগান্তর।
কবে সন্ধ্যা হবে, কখন শান্তি পাবো—
কখন সন্ধ্যা হবে সত্যভামা—কখন? কখন?

[ক্ষণকাল স্তব্ধতা]

সত্যভামা

সুভদ্রা, ওঠো।
ঐ তিনি আসছেন।
সুশ্রী উদ্বেগহীন,
ধীর, শান্ত পদক্ষেপ—
সুন্দর চিরকিশোর, নির্বেদ, শ্যামল,
নবোদিত হরিৎ ভূর্জের মতো কান্তিমান—
তুমি যাঁর ভগ্নী, আর আমি যাঁর মানিনী বনিতা।

(ক্রমশ)

লাহিড়ীর সৃষ্টি হবে। তাকে দিয়ে আমার কাজ চলবে না।

—ভারি তো কাজ করি আমি।

—এই তো কাজ, এতক্ষণ যে বসে বসে তোমার সঙ্গে গল্প করছি, তার দাম নেই? তুমি হঠাৎ আমার সঙ্গে গল্প করবে কেন? চাকরি করছ বলে তোমায় গল্প করতে হচ্ছে।

মনুয়া আপত্তি করে, মোটেও না, আমার বেশ ভাল লাগে আপনাদের কথা শুনতে। সবকিছু হয়ত বুঝতে পারি না, তবে এটুকু বুঝি ব্যবসার জগৎটাই আলাদা। আমাদের বাড়িতে এ ধরনের কথাই হয় না। দাদা খুব বড় চাকরি করেন।

—কোথায়?

—ফিনলে কোম্পানীতে।

—কি নাম?

বলা ঠিক হবে কিনা মনুয়া একবার ভেবে নেয়, শেষ পর্যন্ত বলে ফেলে, স্বরূপ লাহিড়ী।

—নামটা শোনা-শোনা মনে হচ্ছে, হয়ত কোথাও দেখাও হয়েছে।

—সেই জন্যে আমাদের বাড়িতে বেশীর ভাগই সাহেবদের কথা শুনতাম, অন্যান্য অফিসাররা আসত, চাকরির গল্প, প্রমোশনের চেষ্টা, কিন্তু ব্যবসার কথা হত না।

মোহনচাঁদ জিজ্ঞেস করে, আর তোমার মামা?

মনুয়া পাতানো মামার কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিল, অন্যমনস্কভাবে পাল্টা প্রশ্ন করে, কোন্ মামা?

—যিনি তোমার লোকাল গার্জেন।

এতক্ষণে মনুয়ার খেয়াল হয় অনাদিপ্রসাদের কথা, বলে, উনি লেখক, বই লেখেন।

প্রথম মাসে একদিনও মনুয়াকে বিকেলের দিকে আটকে থাকতে হয় নি মোহনচাঁদের কাজে। লাঞ্চের পরই মোহনচাঁদ বলে দিত, মিস লাহিড়ী আমার আর কোন দরকার নেই, তুমি চলে যেতে পার।

মনুয়া অবশ্য চলে যেত না, অন্য টেবিলে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করত, দু-একটা ব্যবসার কথা বলে সবাইকে চমকে দিত। তারা জিজ্ঞেস করত, হঠাৎ ক' দিন থেকে তোমার মাথায় ব্যবসা বুদ্ধি খেলছে কি করে?

মনুয়ার জবাব, ব্যবসা ছাড়া কোন জাত বড় হয় না, কারুর টাকা হয় না।

—তা বুঝলাম, কিন্তু তুমি কি করবে?

—ব্যবসা করব। তারই চেষ্টায় আছি। কিছু না-হোক একটা এজেন্সী নেব।

—মনুয়া, তোমার মুখে এ-সব কথা শুনতে কিন্তু আশ্চর্য লাগছে। নাচ, গান, বাজনা ছেড়ে ব্যবসা?

মনুয়া হাত দুটো ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে খুশীভরা গলায় বলে, নাচতে নাচতে ব্যবসা করব। গাইতে গাইতে টাকা রোজগার করব।

অন্যদের সরস প্রশ্ন, আর বাজাতে বাজাতে?

মনুয়া খিল খিল করে হাসে, বাজাতে বাজাতে পার্টি দেব, সমস্ত মে-ফ্লাওয়ারটা বুক করে বোতলের পর বোতল খুলব—শ্যাম্পেন।

সকলের উচ্ছ্বাস, থ্রি চীয়ার্স ফর মনুয়া লাহিড়ী, দি বিজনেস কুইন!

মাসের শেষে মাইনের টাকা হাতে পেল মনুয়া, এমন কিছু বেশী নয়, পাঁচ শ' টাকা। স্বরূপ লাহিড়ীর মেয়ে ছোটবেলা থেকে অনেক টাকা দেখেছে, তবু নিজের রোজগারের প্রথম টাকার প্রতি কেমন যেন একটা মমতা জন্মায়। নিজের মনে হিসেব করে কি করবে এই টাকাগুলো দিয়ে। ব্যাঙ্কে জমিয়ে রাখবে, খরচ করবে, বন্ধু-বান্ধবদের খাওয়াবে, কিছুই ভেবে পায় না। এক-এক সময় মনে হয়, রবিটা থাকলে ভাল হত। অন্তত কয়েকটা দিনের জন্যে সে রবিকে নিজের কাছে ধরে রাখত, রত্না কুমারী কিংবা কে তি ব শালীর কাছে যেতে দিত না। নিজের রোজগারের টাকায় সে রবিকে মদ খাওয়াত, অনেক রাত পর্যন্ত বসে গল্প করত। ছেলেটা বড় সুন্দর, আরও সুন্দর ওর চোখ দুটো। কিন্তু ক্রমশ কেমন যেন উল্টো স্রোতে ভেসে যাচ্ছে।

যদি ঠিকমত সাঁতার কাটতে না পারে কি হবে বলা শক্ত। বাবির জন্যে মনে মনে শঙ্কিত হয় মনুয়া।

মাইনের টাকা ব্যাগে নিয়ে মে-ফ্লাওয়ার থেকে বেরিয়ে মনুয়া গেল মার্কেটে। কত দোকান, কতকরকম জিনিসপত্র, ঘুরে বেড়াতে বেশ ভাল লাগে। এটা-ওটা দেখতে দেখতেই সময় কেটে যায়। যারা জিনিস কিনছে, তাদেরও দেখতে ভাল লাগে! কত-রকম দর কষাকষি, রাগারাগি, শেষ পর্যন্ত খদ্দের ভাবে সে জিতল, দোকানীও মনে মনে হাসে। যতই দাম কমাক কোন দিনই তার দুধে হাত পড়ে না।

একটা নতুন ডিজাইনের সিল্ক প্রিন্টের শাড়ি। চমৎকার দেখতে, এখনও কলকাতার বাজারে ততটা চালু হয়নি, দামও খুব বেশী নয়। মনুয়ার লোভ হল শাড়িটা দেখে, না কিনে পারল না। বাড়ির জন্যে কিছু কেক, প্যাটি কিনে নিল, ইচ্ছে করে ট্যাক্সী নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরল বাড়িতে।

স্বরূপ লাহিড়ী তখনও অফিস থেকে ফেরেনি। মা সেজেগুজে তৈরী হয়ে বারান্দায় বসে, স্বামী ফিরলে দুজনে একসঙ্গে চা খায়। মনুয়া কোন দিনই এ সময় ফেরে না, তাই মার স্বরে বিস্ময়, কি ব্যাপার, এত সকাল সকাল ফিরে এলে?

মনুয়ার ছোট্ট উত্তর, এমনি। আজ তোমাদের সঙ্গে চা খাব।

—মুখ হাত-পা ধুয়ে এস, উনি এখুনি এসে পড়বেন।

মনুয়া নিজের ঘরে চলে গেল। হাতের জিনিসপত্রগুলো খাটের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে বসল। আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখে, চোখ, মুখ আগের চেয়ে আরও উজ্জ্বল হয়েছে। কপালের চুলগুলো বেড়েছে, যেমন করে সেলুনে বেঁকিয়ে দিয়েছিল ঠিক তেমনি-ভাবেই বেড়ে উঠেছে। সারাদিনের ক্লান্তির কোন ছাপই নেই মুখের ওপর। ঠোঁট দুটো এত গোলাপী হল কি করে, সে তো লাঞ্চ খাওয়ার পর আর লিপস্টিক ব্যবহার করেনি।

হঠাৎ নজরে পড়ল খোলা দরজা দিয়ে মাকে দেখা যাচ্ছে, তারও আবছা প্রতিবিম্ব পড়েছে আয়নায়। কে বলবে এ সেই মা, মনুয়ার চেয়ে উনি একদিন অনেক সুন্দরী ছিলেন। যাকে ঘিরে স্তাবকদের কত গুঞ্জন, যার জন্যে বাবা-মার অবিরাম ঝগড়া। নিত্য নূতন কত স্টাইল, কত শাড়ি, গয়না। সেই ভদ্রমহিলা চুপটি করে চেয়ারে বসে আছে স্বামীর প্রতীক্ষায়। নেই সেই আগের জলুস, আগের সেই প্রাণ। আজকাল বড় একলা পড়ে গেছে। মনুয়া সকালে বেরিয়ে যায়, রাত্রে ফেরে, স্বরূপ লাহিড়ীরও ফিরতে সন্ধ্যে হয়। সকাল, দুপুর, বিকেল মিসেস লাহিড়ী চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকে, বই পড়ার অভ্যাস নেই। কখনও উল বোনে, কখনও রান্না করে। কাজে আনন্দ নেই, কোনরকমে সময় কাটানো।

মনুয়া ঘরে বসল। আয়নার মধ্যে দিয়ে নয়, এবার সামনাসামনি দেখল তার মাকে। আহা, বেচারি! মায়ের কথা ভাবতে তার কষ্ট হল। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ডাকল, মা শোন।

মিসেস লাহিড়ী সাড়া দেয়, কি রে?

—এ ঘরে এস।

মা এসে দাঁড়াতে মনুয়া ঝুপ করে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। মেয়ের এ ব্যবহারে মায়ের বিস্ময়, হঠাৎ, কি ব্যাপার? প্রণাম করছিস?

মনুয়া শাড়ির বাক্সটা মার হাতে ধরিয়ে দেয়, তোমার জন্যে এটা কিনে এনেছি। আনন্দ বিহ্বল মিসেস লাহিড়ী। আমার জন্যে শাড়ি কিনেছিস, কি চমৎকার! এ পরলে কি এখন আমায় মানাবে?

—খুব মানাবে। আমার মায়ের মত সুন্দর ক'জন?

মা আরও অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকায়। অগত্যা মনুয়া বলে, আজ প্রথম মাইনের টাকা পেয়েছি, তাই তোমার জন্যে শাড়ি নিয়ে এলাম।

—মাইনে? তুই কি চাকরি করিস?

—হ্যাঁ।

—কোথায়?

—সে মস্ত একটা কোম্পানীতে,

—কি কাজ? কে যোগাড় করে দিল?

মনুয়া একটু যেন বিরক্ত হয়, সেই জন্যে তো তোমাদের কিছু বলতে চাই না, অত কথা জানবার দরকার কি? আমি তো অন্যায় কিছু করছি না।

—তা নয়, তোমার বাবাকে তো জান, ক'দিন ধরে আমাকে খালি বলছেন তোমাকে ঠিক মত দেখছি না, বেশী প্রশ্রয় দিচ্ছি। মাঝে মাঝে রাত করে ছুটির বাড়ি ফের। তোমার বয়সী মেয়ের পক্ষে সেটা ভাল নয়।

মনুয়া চটে গিয়ে বলে, প্লীজ, আর পায়রার মত বকম বকম কোর না। নীতি-কথা অনেক শুনেছি, তোমাদের সুখের জীবন নিজে চোখে দেখেছি, আর আমাকে জ্বালিও না।

মিসেস লাহিড়ী নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলে, এই তো আমার অবস্থা, সারাক্ষণই তোমার বাবার কাছে বকুনি খাচ্ছি, আবার সেই সব কথা তোমাকে বলতে গেলে বিরক্ত হও, চুরির দায়ে যেন ধরা পড়েছি। আর কিছু ভাল লাগে না।

মনুয়া আর কথা না বাড়িয়ে কলঘরে ঢুকে যায়। কিছুক্ষণ বাদে শাড়ি পাল্টে বেরিয়ে এসে মার কাছে গিয়ে সহজ হবার চেষ্টা করে বলে, মামী, আমার ওপর রাগ কোর না। এবার থেকে আমি তোমায় দেখব, এখন থেকে নিজে রোজগার করছি তো?

মিসেস লাহিড়ী ম্লান হাসে।

—কিন্তু একটা কথা, বাবাকে এখন জানিও না আমি চাকরি করছি। কি জানি, হয়ত রেগে যাবে। আরও দু'এক মাস যাক, তারপরে বললেই হবে।

—আমার ওপর রেগে যাবে না তো?

—সে আর নতুন কথা কি? তখন বলে দিও তুমিও জানতে না। তাহলে তো আর তোমায় দোষ দিতে পারবে না।

নিজের অজান্তে মিসেস লাহিড়ী দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কি জানি।

স্বরূপ লাহিড়ী বাড়ি ফিরে মা-মেয়েকে একসঙ্গে বসে থাকতে দেখে প্রথমটা ভুরু কোঁচকাল, সন্দিগ্ধ চোখে এদিক-ওদিক দেখল, শেষ পর্যন্ত টাই-এর নট্ খুলতে খুলতে খুশী হয়ে বলল, দিস্ ইজ্ এ

স্পেজেন্ট সারপ্রাইজ। অফিস থেকে ফিরে মেয়েকে আমি কোনদিন দেখিনি। শরীর-টরির খারাপ হয়নি তো?

মনুয়াও হাসল, আজ ঠিক করলাম, বাবা-মার সংগে সন্ধ্যেটা কাটাব।

—ভাল কথা, কোন প্রোগ্রাম আছে নাকি? নয়ত চল চা খেয়ে কোথাও বেড়াতে যাওয়া যাক, নয়ত যদি চাও রাত্রে আমরা বাইরে খেতে পারি।

—তার চেয়ে বাড়িতে বসে গল্প করা ভাল। রাত্রে এক বাড়িতে আমরা শুই বটে, এ ছাড়া আর কোন্ সময় এক সংগে থাকা হয় বল?

তিনজনে গল্প করতে কবতে তারা চা খেল। মিসেস লাহিড়ী বাড়িতে কাবাব তৈরি করেছিল, সেই সংগে মনুয়ার কিনে আনা কেক, প্যাটি, তারচেয়েও বড় কথা সরব ঘরোয়া আলোচনা।

স্বরূপ লাহিড়ী না বলে পারে না, অন্যদিন বাড়ি ফিরি, চুপচাপ বসে চা খাই।

তোমার মা আজকাল দরকার না পড়লে কথা বলেন না।

মিসেস লাহিড়ীর উত্তর, কি করব, আমি কিছু বললেই তো তুমি বিরক্ত হও।

—যাতে বিরক্ত না হই এমন কথাও তো বলতে পার।

—সেরকম কোন কথা আছে কিনা আমি তো জানি না। এত বছর বিয়ে হয়েছে কই আজও তো খুঁজে পাইনি।

মনুয়া থামিয়ে দেয়, তর্কাতর্কি থাক, আজকের সন্ধ্যেটা এস আমরা গল্প করে কাটাই। ভাবছিলাম অনেকদিন তো আমরা কোন চেঞ্জে যাইনি, বাপি যদি ছুটি পায় দিন সাতেকের জন্যে কোথাও ঘুরে আসা যায়। দার্জিলিং, কিম্বা পুরী, গোপাল-পুর।

স্বরূপ লাহিড়ী উৎসাহিত হয়, ছুটি আমি যখন খুশি পেতে পারি, তোমরা আগে ঠিক কর কবে যাবে, কোথায় যাবে।

এতক্ষণে মনুয়ার মা এ প্রসংগে যোগ দেয়, বলে যদি যাওয়াই হয় দার্জিলিং চল, অনেকদিন ওখানে যাইনি, কি সুন্দর জায়গা। অল্পদিনের মধ্যে মনটা ভুলিয়ে দেয়, সত্যিকারের চেঞ্জ হয়।

—মনে পড়ে, মনুয়া যখন এক বছরের বাচ্চা আমরা জলা পাহাড়ের একটা বাড়িতে ছিলাম।

—তোমাদের কোম্পানীর এক সাহেবের বাড়ি, কিন্তু তারপর মনুয়া যখন চার বছরের, ম্যালের ওপরে একটা হোটেলে উঠেছিলাম, তোর মনে পড়ে?

মনুয়া বলল, না, তবে যেবার আমরা মাউণ্ট এভারেস্টে উঠি, বাপি ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াত, কয়েকজন তিব্বতী মেয়ের সংগে আমার ভাব হয়েছিল, আমরা বার্চ হিলে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম, সে সব কথা মনে আছে।

—তখন তো তোর দশ বছর বয়েস।

—আর একবার গিয়েছিলাম শুধু তুমি আর আমি, বাপি তখন ইউরোপে। তোমার অসুখ করল, আমরা ফিরে এলাম।

তিনজনে পুরোন দিনের স্মৃতি রোমন্থন করে। ফেলে আসা দিনের কথা ভাবতেও আনন্দ। তিক্ততা থাকে না, শুধু সুখ স্মৃতি।

টেলিফোন বেজে উঠল।

স্বরূপ লাহিড়ী অভ্যাস মত উঠে পড়ে, যন্ত্রণা। বসতে দেবে না এখনি হয়ত খবর দেবে ডকের কাজে গোলমাল হয়েছে। হ্যালো, কাকে চাই? মিস লাহিড়ীকে?

আপনি কে কথা বলছেন? আচ্ছা ধরুন আমি দিচ্ছি।

রিসিভার টেবিলের উপর রেখে মনুয়াকে বলে, কোন এক অবাঙালী ভদ্রলোক তোমাকে খুঁজছে, নাম বলল মোহনচাঁদ।

মনুয়া তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরে, আমি মনুয়া কথা বলছি।

অন্যদিক থেকে মোহনচাঁদের গলা শোনা যায়, মিস্ লাহিড়ী, আমার দুজন বিশিষ্ট অতিথি আসছেন, ডিনারে যেতে হবে। কতক্ষণের মধ্যে তুমি আসতে পারবে?

মনুয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, ডিনারে, কোথায়?

—বড় হোটেলে, টেবিল আমার রিজার্ভ করা আছে। ওরা স্বামী-স্ত্রী, সেই জন্যে আমি চাই তুমি আমার সংগে থাক।

—কখন যেতে হবে?

—তুমি তৈরী হয়ে নাও আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—ঠিক আছে।

—রাত্রে আমার গাড়ি তোমায় বাড়ি পেঁ‍ৗছে দেবে।

মোহনচাঁদ টেলিফোন কেটে দেয়।

মনুয়া ভয়ে ভয়ে মা-বাবার দিকে ফিরে তাকায়, অপরাধীর মত বলে, আমাকে একটু বেরুতে হবে।

স্বরূপ লাহিড়ীর গম্ভীর কণ্ঠস্বর, তাতো বুঝতেই পারলাম, মোহনচাঁদ লোকটা কে?

মনুয়া কি জবাব দেবে প্রথমটা ভেবে পায় না, শেষ পর্যন্ত মিথ্যে বলে, আমার বন্ধু।

—তুমি বললেই পারতে আজকে বেরবে না। বাড়িতে থাকবে।

মনুয়া ঢোক গেলে, পারতাম।

—তাহলে বললে না কেন?

মেয়েকে চুপ করে থাকতে দেখে স্বরূপ লাহিড়ীর আদেশ, আবার টেলিফোন করে জানিয়ে দাও তুমি যাবে না।

—আমি যে কথা দিয়েছি।

—তুমি লাইন দাও আমি বলে দিচ্ছি তুমি যেতে পারবে না।

মনুয়া প্রমাদ গোনে, মিথ্যে বলে, আমি তো ওর কোন নম্বর জানি না।

স্বরূপ লাহিড়ীর মেজাজ আরও চড়ে যায়, ঠিক আছে গাড়ি আসুক আমি ফেরত পাঠিয়ে দেব।

মনুয়া এবার জোর দিয়ে বলে, উপায় নেই আমাকে যেতেই হবে।

—কেন?

—সে আমি তোমায় পরে বলব।

আর তর্কাতর্কির মধ্যে না গিয়ে মনুয়া ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। বহুদিন বাদে যে সহজ সুন্দর একটি পারিবারিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল স্বরূপ লাহিড়ীর এই লক্ষ্মীছাড়া বাড়িতে এক নিমেষের মধ্যে তা অন্তর্হিত হল। কোথায় দার্জিলিং-এর পাহাড়, কোথায় স্মৃতির রোমন্থন, আবার সেই অবধারিত সমুদ্রে তিনটি নির্জন দ্বীপ। স্বরূপ লাহিড়ী—মনুয়া আর তার মা।

(ক্রমশঃ)

চন্দ্রপুরা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

দামোদর উপত্যকার রূপান্তর

দামোদর উপত্যকা ঘুরে এলে ভ্রমণের নেশা চরিতার্থ হয়, প্রাণটা ভরে ওঠে আনন্দে। আগে ভালো ক'রে এই অঞ্চলটা না দেখে থাকলে হয়তো বা রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি ক'রে বলতে ইচ্ছা করবে :

> "বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
> বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
> দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
> দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
> দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
> ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
> একটি ধানের শিষের উপরে
> একটি শিশিরবিন্দু॥"

দামোদরের বন্যা তো প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। কলেজে পড়ার সময়ে এ বিষয়ে রচনা লিখতে হয়েছে। গত একশো বছরে কম ক'রে ধরলেও কুড়িবার দামোদরের জলস্ফীতি বাংলা দেশকে বিপন্ন করেছে। একজন বিদেশী লেখক দামোদর উপত্যকা পর্যটন ক'রে লিখেছেন : "যুগ যুগ ধ'রে দামোদর পরিচিত ছিল অশ্রু-নদ ব'লে। ভারতীয় চিন্তাধারায় ভয়াল দামোদর হ'ল নদ আর কল্যাণদায়িনী গঙ্গা হ'ল নদী। সেই দামোদরের জলে যখন বর্ষায় ঢল নামত তখন দামোদর আর তার সঙ্গে বরাকর আর কোনার নদের জল মিশে বিহারের উচ্চ ভূমি ছাপিয়ে বাংলার নিম্নভূমিকে ডুবিয়ে বিহার থেকে ২৬০ মাইল পথ উজিয়ে আসত কলকাতা শহরের দরজা পর্যন্ত। ১৯৪৩ সালে মহাযুদ্ধের এক সংকটজনক অবস্থায় দামোদরের জলে এল বন্যা। তখন এই হিংস্র নদ যেন শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মেলাল। সেই বন্যায় ডুবে গেল দামোদর উপত্যকায় রক্ষিত সৈন্যদের সমরোপকরণ: কলকাতা থেকে যাতায়াত করার রেলপথ আর রাস্তা।"

> **প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আগামী ৭ জুলাই ডি ভি সি-র চন্দ্রপুরা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের তৃতীয় ইউনিটটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, একই তারিখেই দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের ২০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হবে।**

এর পর বাংলা সরকার বিশেষভাবে তৎপর হ'য়ে ওঠেন দামোদরের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে। বর্ধমানের মহারাজা, ডক্টর মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বিশিষ্ট দশজন ব্যক্তিকে নিয়ে এক কমিটি গঠন করা হ'ল। আমেরিকার টেনেসী ভ্যালী অথরিটির মতো এক সর্বার্থসাধক প্রকল্পের পরিকল্পনা রচনা করার জন্যে ডাকা হ'ল ওখানকার এঞ্জিনিয়র ডব্লিউ. এল. ভুর্দুইন-কে। তারপর ১৯৪৮ সালের ৭ই জুলাই, অর্থাৎ ঠিক বিশ বছর আগে, দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের উদ্ভব হয়।

বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে দামোদর অববাহিকার সার্বিক উন্নতির জন্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জল সেচ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন হ'ল এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্যান্য কাজের মধ্যে ভূমি সংরক্ষণ, মাছের চাষ, জনস্বাস্থ্য ও নৌবহন উল্লেখযোগ্য।

কলকাতা থেকে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে ১১৪ মাইল গেলেই দুর্গাপুর। দামোদর প্রকল্পের সাফল্যের ফলে শ্বাপদ-সংকুল এই উপনগর এখন বিরাট শিল্প-নগরে পরিণত হয়েছে। এখানে গড়ে উঠেছে লৌহ-ইস্পাত কারখানা, কোক চুল্লী, কয়লা ধৌতাগার, সার, বয়লার, ভারী যন্ত্রশিল্প, কাচ ও অ্যালুমিনিয়মের কারখানা, এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সেণ্ট্রাল মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট। দামোদর প্রকল্প যোগাচ্ছে বিদ্যুৎ ও জল।

রাজরাপ্পায় দামোদর নদের উৎস

এখানে দামোদরের ওপর দুর্গাপুর ব্যারেজ। জলের বেগ নিয়ন্ত্রণ করা এবং দু' পাশের খাল দিয়ে প্রায় দেড় হাজার মাইল দীর্ঘ ছোট বড় অনেক প্রণালীর সাহায্যে কৃষির জন্যে জল সরবরাহ করাই হ'ল এই ব্যারেজের কাজ। পঁচাশি মাইল দীর্ঘ খালটি বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলী জেলা এবং পঞ্চান্ন মাইল দীর্ঘ খাল বাঁকুড়া জেলায় সেচের জল যোগায়। গত বছর খারিফ শস্যের জন্যে প্রায় সাত লক্ষ একর এবং রবি শস্যের জন্যে প্রায় চল্লিশ হাজার একর জমিতে দুর্গাপুর ব্যারেজের মাধ্যমে জল দেওয়া হয়েছে।

বিহারে কুশী পরিকল্পনার চাষীদের ক্ষেতে যেভাবে জল সরবরাহ করা হয়, সেই পদ্ধতি অনুসরণ করলে পশ্চিম বাংলার কৃষকরা আরও উপকৃত হ'তে পারেন। তাতে খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণও যথেষ্ট বাড়তে পারে।

দামোদরের জল বর্ধমান 'প্যাকেজ প্রোগ্রামের' যে সব গ্রামে পৌঁছয় না সেখানকার কৃষিকর্মও ব্যাহত হচ্ছে। এই দায়িত্ব এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। কারণ ১৯৬৪ সালে দুর্গাপুর ব্যারেজ, খালগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও সেচ-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ভার দামোদর প্রকল্পের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তাঁরাই নিয়েছেন।

দুর্গাপুরে দুটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। দামোদর প্রকল্পের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ওয়ারিয়া রেল স্টেশনের পাশে। এটিই পুরনো। এখানকার জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীনিখিলেশচন্দ্র বসু ও অপারেশন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীমিহির মিত্র অভিজ্ঞ এঞ্জিনিয়ার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তাঁরা দুজনেই বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাঁদের অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি। এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের।

এই প্রসঙ্গে দামোদর প্রকল্পের বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথাটা আলোচনা করি। বর্তমানে আমাদের দেশের শতকরা এগারো ভাগ বিদ্যুৎ দামোদর প্রকল্পের তিনটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও তিনটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপন্ন হয়। এত বড়ো বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা ভারতে আর নেই।

বোকারো, দুর্গাপুর ও চন্দ্রপুরার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং তিলাইয়া, মাইথন ও পাঞ্চেতের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে আমরা পাই প্রায় এক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। চন্দ্রপুরা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ভারতে বৃহত্তম। এখান থেকে চারশো কুড়ি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই বিদ্যুৎ-কেন্দ্র নির্মাণের জন্যে মার্কিন সরকার প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা ঋণ দিয়ে সাহায্য করেছেন।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক'রে দামোদর প্রকল্প প্রতি বছর অনেক টাকা আয় করে। গত বছরে এই আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল সাড়ে একুশ কোটি টাকা।

চন্দ্রপুরা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজকর্ম কিভাবে চলে তা অতি সহজ ক'রে বুঝিয়ে বলতে পারেন জেনারেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীমানিকলাল সেন। এখানকার অপারেশন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীসমীরকুমার সোমও একজন দক্ষ এঞ্জিনিয়র। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আধুনিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত অনেক কাজকর্ম দেখে এসেছেন।

চন্দ্রপুরা ধানবাদ থেকে ত্রিশ মাইল। গাড়িতে যেতে এক ঘণ্টার একটু বেশী সময় লাগে। দামোদর নদের তীরে এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এর অপর পারে বোকারো ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠছে।

দামোদর প্রকল্প সরাসরি যে সব সংস্থাকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে তাদের মধ্যে আছে: চিত্তরঞ্জন এঞ্জিন কারখানা; জামসেদপুর, বার্নপুর ও কুলটির ইস্পাত কারখানা; ঘাটশীলার তামার খনি; ঝরিয়া ও রানীগঞ্জের কয়লার খনিগুলি; কলকাতা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন; পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্যের ইলেকট্রিসিটি বোর্ড; ইস্টার্ন ও সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে; ঝিরয়া (ঝরিয়া) ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি; দিশেরগড় ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি প্রভৃতি।

দুর্গাপুর ব্যারেজের খাল থেকে বর্ধমান জেলায় সেচের জল সরবরাহ করা হচ্ছে

দামোদরের বন্যা নিয়ন্ত্রণ করাই হচ্ছে এই প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কথা ছিল, মোট আটটি বাঁধ হবে। কিন্তু প্রথম পর্যায় চারটি বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। হাজারীবাগ জেলায় বরাকর নদের ওপর তিলাইয়া বাঁধ; এই জেলায় কোনার নদের উপর কোনার বাঁধ; ধানবাদ জেলায় বরাকর নদের ওপর মাইথন বাঁধ; এবং এই জেলার দামোদর নদের ওপর পাঞ্চেৎ বাঁধ। তিলাইয়া, মাইথন ও পাঞ্চেতে একটি করে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রও আছে।

মাইথন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পাহাড়ের নিচে পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে। এটি এই ধরনের সর্বপ্রথম বিদ্যুৎকেন্দ্র। আশি ফিট গভীর গহ্বরের মধ্যে এর কাজ চলছে। এখান থেকে কল্যাণেশ্বরী মায়ের মন্দির খুব কাছে। মায়ের স্থান বলেই নাকি এই জায়গার নাম হয়েছে 'মাইথন'। একথা আমায় প্রথম বলেন দামোদর প্রকল্পের প্রথম চীফ এঞ্জিনিয়ার অ্যানড্রু কোমোরা। তিনিও টেনেসী ভ্যালী অথরিটির এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। প্রধানত চারটি বাঁধ তৈরির কাজে তাঁকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হয়। তাঁর নেতৃত্বে দামোদর প্রকল্পে একদল তরুণ দক্ষ ভারতীয় এঞ্জিনিয়ারের গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এখন অন্যান্য বড় বড় প্রকল্পের চীফ এঞ্জিনিয়ারের পদে কাজ করছেন।

চারটি বাঁধের দ্বারা খুব বড় বন্যা রোধ করা যাবে না, এ কথা মিঃ কোমোরা আমায় জানিয়েছিলেন। ১৯৫০ সাল থেকে তিনি প্রায় নয় বছর দামোদর প্রকল্পে কাজ করে গেছেন। আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, তাঁকে খুব পছন্দ করতেন।

বাঁধগুলি তৈরি হবার পর দামোদরে দুবার এমন বন্যা এসেছে যা তুলনায় ১৯৪৩ সালের বানের চেয়ে কম নয়। পাঁচবার বন্যার কথা তো কেউ জানতেই পারেনি। কেবল ১৯৫৯ সালের বন্যায় পশ্চিমবাংলার কোনও কোনও অঞ্চল প্লাবিত হয়েছিল। এই বন্যাকে রোধ করার শক্তি চারটি বাঁধের ছিল না। কিন্তু এই চারটি বাঁধ না থাকলে কি হত? প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক বিপন্ন হতেন। ১৯৪৩ সালে যে বন্যা হয়েছিল তার ক্ষতির পরিমাণ ১৯৫০ সালে ধার্য হয়েছিল প্রায় আট কোটি টাকা। এই হিসাবে ধরলে ছয়টি বন্যার ক্ষতির পরিমাণ দামোদর প্রকল্পের চারটি বাঁধের ব্যয়ভারের চেয়ে অনেক বেশী হ'ত না কি?

মাইথনে এঞ্জিনিয়ারদের ভিড়। চীফ ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার ছাড়া প্রায় সব প্রধান এঞ্জিনিয়ারদের দপ্তর এখানে। এখানে যাঁরা বাইরে থেকে আসেন তাঁদের মাইথন ও পাঞ্চেতের বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটি দেখান অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক রিলেশন অফিসার শ্রীমতী সুকীতি বন্দ্যোপাধ্যায়। পলিটিক্যাল সায়েন্সে এম-এ। অবাঙালী মেয়ে, অথচ সুন্দর বাংলা বলতে পারেন।

এখানকার তিনজন এঞ্জিনিয়ার শ্রীআনন্দমোহন রায় (সম্প্রতি বোকারোতে বদলি হয়েছেন), শ্রীশান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত ও শ্রীরজত বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন সদালাপী

তিলাইয়া জলাধারের তীরে কৃষি কাজ

তেমনি মিষ্টভাষী। এ'রা তিনজনই বিদেশ থেকে মূল্যবান অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছেন।

দামোদর প্রকল্পের ভূমি সংরক্ষণ বিভাগের কাজ অনেক বিদেশী বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছে। প্রায় সাত হাজার বর্গমাইলব্যাপী দামোদরের সমগ্র উচ্চ অববাহিকায় ভূমির অবক্ষয় রোধ করা এবং জলাধারগুলিতে পলিমাটি পড়ার পরিমাণ কমিয়ে তাদের আয়ুবৃদ্ধি করাই হচ্ছে এই বিভাগের প্রধান কাজ।

এই বিভাগের ডিরেক্টর ডক্টর এম পি সিং তেওতিয়া এবং ডেপুটি ডিরেক্টর শ্রীরাজিত মুখোপাধ্যায় অক্লান্ত কর্মী। হাজারীবাগে তাঁদের দপ্তর। এই অঞ্চলে প্রায় সহস্রাধিক অবক্ষয় নিরোধক বাঁধ নির্মিত হয়েছে। বনসংরক্ষণের কাজও সম্পন্ন হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মতভাবে। চারটি জলাধারের তীরবর্তী ভূমিতে খারিফ ও রবিশস্য উৎপন্ন হচ্ছে। হাজারীবাগের অনতিদূরে দেওবন্দায় এক গবেষণা কেন্দ্রে ভূমি ও জলসংরক্ষণ এবং জমির উৎপাদনী শক্তির বৃদ্ধি সম্বন্ধে নানা পরীক্ষার কাজ চলেছে। যে সব প্রয়োগ-পদ্ধতি সফল হচ্ছে তা স্থানীয় কৃষকদের শিখিয়ে দিচ্ছেন এই বিভাগের বিশেষজ্ঞরা। সেচের জলের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে বর্ধমান জেলার পানাগড়ে গবেষণা হচ্ছে।

দামোদর প্রকল্পের বাঁধ, জলাধার ও বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করতে যাঁদের জমি নেওয়া হয়েছে ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাঁদের দেওয়া হয়েছে নগদ টাকা, জমি বা নতুন বাড়ী। এইভাবে প্রায় কুড়ি হাজার পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিলাইয়ার কাছে তাঁদের জন্যে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে পাঁচটি আদর্শ গ্রাম।

এই প্রকল্পের চিকিৎসা বিভাগের কর্মতৎপরতায় দামোদর উপত্যকার নতুন জনপদ ও জলাধার-সংলগ্ন গ্রামগুলি ম্যালেরিয়ার কবল থেকে মুক্ত হয়েছে।

এই উপত্যকায় যাঁরা বেড়াতে যাবেন তাঁরা দুর্গাপুর, মাইথন, পাঞ্চেত, চন্দ্রপুরা, তিলাইয়া ও হাজারীবাগে দামোদর প্রকল্পের অতিথিশালায় থাকতে পারেন। অবশ্য এ জন্যে চীফ ইনফরমেশন অফিসারের কাছে চিঠি লিখতে হয়।

প্রথম চীফ ইনফরমেশন অফিসার ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ কবি ও প্রাবন্ধিক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর পর এই পদে ছিলেন শ্রীঅমল হোম। বর্তমানে আছেন শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়। এ'রা প্রত্যেকেই সুলেখক।

দামোদর প্রকল্পের অতিথি গৃহগুলি সুন্দর ও আধুনিক। তিলাইয়ার অতিথি-গৃহটি একটি পাহাড়ের চূড়ায়। মাইথনের অতিথিশালার সামনে যে বাগানটি আছে তা নয়নাভিরাম। খাদ্যের দিক থেকে সব চেয়ে প্রশংসা পাবার অধিকারী হাজারী-বাগের অতিথিভবন। কামরুদ্দীনের পাক-নিপুণতা অবিস্মরণীয়।

শ্রীঅমৃত শর্মা

বিশ্ব বিজ্ঞান

সোবিয়েত বিজ্ঞানের অর্ধ-শতাব্দী

২

ভাবী শতাব্দীগুলিতে যেসব ইতিহাস লেখা হবে সেগুলিতে কোন্ মত প্রতিফলিত হবে জানি না তবে আজকালকার সোভিয়েত দেশের দিকে তাকালে মনে হয় যে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সোভিয়েত সমাজের অগ্রগতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গিয়েছে বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে। সেই কারণেই বোধ হয় ওই দেশে বৈজ্ঞানিকদের কদর ও উপার্জন অন্য সকলের চেয়ে বেশী। আলোচ্য কালে সোভিয়েতে যন্ত্র কৌশল বিদ্যার গতি ও চরিত্র সেই অবস্থান্তর জ্ঞাপক রেখা অতিক্রম করে গিয়েছে যার পরে বিজ্ঞানের সমস্ত শাখা প্রশাখার মধ্যবর্তী ব্যবধান ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এখন সেখানে ব্যক্তি বিশেষের শখ ও খুশি মত বিজ্ঞান নিয়ে নাড়াচাড়া করার দিন চলে গিয়েছে। আসল বিজ্ঞানের বিপুল ও সমবেত পরিচালিকা শক্তিই একমাত্র সেখানে বিজ্ঞান ও যন্ত্র কৌশলের অগ্রগতির বর্তমান হার বজায় রাখতে এবং তাকে আরো পরিবর্ধিত করতে পারে, আরো শক্ত করে গাটছড়া বাঁধতে পারে বিজ্ঞান ও যন্ত্র কৌশল বিদ্যা বা কারুবিদ্যার মধ্যে। এই ধরনে কারুবিদ্যা (ইঞ্জিনীয়ারিং) সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর নিখুঁত যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম না যোগালে জীবশাস্ত্রের অগ্রগতির রাস্তা আরো প্রশস্ত হোত কি করে? এইরকম বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেমন আর একটি হচ্ছে জীবদেহের অনুকরণে যন্ত্রপাতি নির্মাণ যাকে বলা হয় বায়ো-মেকানিক্স্ বা আরো ছোট কথায় বায়োনিক্স। ইঞ্জিনীয়ারিং প্রসূত যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া মাস কয়েক আগে অধ্যাপক ফিওদর তুর্চিন কি করে এতদিনকার ধারণা ভেঙে দিয়ে প্রমাণ করতে পারতেন যে, প্রায় সব গাছই বায়ু থেকে নাইট্রোজেন আত্মীকরণ করতে সক্ষম। শত শত বছর ধরে মানুষ শুনে আসছে একমাত্র সুঁটিওয়ালা গাছ ছাড়া অন্য কোন গাছ বায়ুর নাইট্রোজেন ব্যবহার করতে পারে না। আচার্য তুর্চিনের এই আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষক ছিল মানুষের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাব বা বুভুক্ষা। কিভাবে জমি, জল ও হাওয়ার যোগাযোগে আমাদের দৈনিক খাদ্য উৎপন্ন হয় সে সম্পর্কে এতকালের ধারণা ভেঙে দিয়ে সেই আবিষ্কার সম্ভবত কৃষি কৌশলে এমন এক বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে যখন জমিতে আর খনিজ সার দেবার কোন দরকারই হবে না। ইঞ্জি-নীয়ারিং-এর সাহায্য না পেলে এই আবিষ্কার কি তিনি করতে পারতেন? বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনীয়ারিং-এর আরো একটি মিলন বিন্দুর কথা এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। অভ্র আমরা সবাই দেখেছি যা হচ্ছে খনিজ পদার্থ এবং সেটি অন্যান্য বিষয় ছাড়াও বিদ্যুৎশিল্পে অন্তরক (ইন্সুলেটার) হিসাবে ব্যবহার হয়। কিন্তু ভূগর্ভে প্রাকৃতিক অভ্র খুব বেশি নেই এবং যা আছে তাও আজকের দিনের গুণগত ও মানগত চাহিদা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ইঞ্জিনীয়ারিং ও রসায়নের দৌলতে সোভিয়েত দেশের লেবরেটরীতে এমন এক নতুন অজৈব পলিমার তৈরি করা হয়েছে যাকে আমরা কৃত্রিম অভ্র বলতে পারি শুধু নয়, বস্তুটি ব্যবহার্য গুণের দিক থেকেও স্বাভাবিক অভ্রের চেয়ে সরেস। সেটি হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড

পৃথিবীর বৃহত্তম সিনক্রোসাইক্লোট্রন যার মোট দৈর্ঘ্য ১½ কিলোমিটার। এই প্রোটন অ্যাক্সিলেটার থেকে ৭৬ হাজার মেগা (মিলিয়ন) ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি উৎপন্ন হয়

যেগুলিতে অবস্থা বিশেষে পরস্পরাণুসারী রূপান্তর ঘটতে পারে। আমরা জানি আপেক্ষিকতা ও কোয়াণ্টাম মেক্যানিক্সের মত যুগান্তকারী আবিষ্কারও আনুবীক্ষণিক জগতের বিভিন্ন কাণ্ডকারখানার কোন তত্ত্বগত ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা আশা করেন যে, সেইসব ব্যাপারেরও স্বরূপ উদ্ঘাটিত হবে এবং সেজন্য তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। সেই পরিশ্রমের ফলে নিত্য নতুন আইসোটোপ আত্মপ্রকাশ করছে, উদ্ঘাটিত হচ্ছে বহু মূল পদার্থের রূপান্তর সাধনের দ্বারা শিল্পের জন্য যত বেশি সম্ভব বিদ্যুৎশক্তির উৎস স্থাপনা করার কলকৌশল। তাছাড়া আইসোটোপের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রকৌশল ও উৎপাদন কৌশল নিয়ন্ত্রণের ফলে সরকারের প্রতি বছর ৪০০—৫০০ কোটি মুদ্রা সাশ্রয় হবে এবং উৎপন্ন দ্রব্যগুলিতে কোন খুঁত থাকবে না, থাকলে ওই আইসোটোপই সেই খুঁত ধরিয়ে দেবে।

লেসার ও মেসার যন্ত্রের অন্যতম আবিষ্কর্তা আচার্য বাসভ ও আচার্য প্রোখরভ ওই দুটি যন্ত্রের সাহায্যে শিল্পের ও চিকিৎসা জগতের বৈপ্লবিক ভবিষ্যতের সূচনা করে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

একদা বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে মহাবিশ্বে আলোক রশ্মির চেয়ে বেগবান আর কিছু নেই। আজ আর সেই ধারণা নেই, কারণ ইলেকট্রনের মধ্যে সোভিয়েত পদার্থবিজ্ঞানীরা যে তড়িচ্চৌম্বিক বিকিরণ আবিষ্কার করেন সেই বিশ্বখ্যাত "ভাভিলভ-চেরেনকফ্ এফেক্ট"-এর বেগ আলোকের চেয়েও বেশি। তাঁদের আরো একটি আবিষ্কার হচ্ছে হিলিয়াম গ্যাসের অতিদ্রবণতা যে অবস্থায় গ্যাসটি পৌঁছায় যখন তার তাপমাত্রা দাঁড়ায় পরম (অ্যাবসলিউট) শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের ২৭৩ ডিগ্রী নিচে) শূন্যের কাছাকাছি। এটিকে একরকমের কোয়াণ্টাম প্রক্রিয়া বলতে পারি আনুবীক্ষণিক মানদণ্ডে। চুম্বকের ধ্রুবের দ্বারা আকর্ষণ যোগ্য অনুনাদ ক্রিয়া (প্যারাম্যাগ্নেটিক রেজোন্যান্স) কঠিন ও তরল পদার্থের গঠন পরীক্ষা করার এক প্রধান উপায় হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এইরকম আরো কয়েকটি মূল তত্ত্বের মধ্যে একটি হচ্ছে শাখায়িত শৃংখলিত বিক্রিয়া (র‍্যামিফায়েড চেন্ রিয়্যাকশন) যার মধ্যে জারণ ও দহন বিক্রিয়া, পলিমারিজেশন ইত্যাদি কতকগুলি ব্যাপারে নির্ভুল ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়েছে। অত্যুচ্চ শক্তি সংক্রান্ত পদার্থবিদ্যায় একটি প্রধান ধারার নাম "অটোফেজিং", যা হচ্ছে সমস্ত আধুনিক বিদ্যুৎ সঞ্চারিত অ্যাক্সিলেটারের কাজকর্মের ভিত্তি। সে সম্পর্কেও সোভিয়েত বিজ্ঞানের অবদান উপেক্ষনীয় নয়।

সংশ্লেষণ ও নতুন ইউরেনিয়াম ধরনের বস্তুর ধর্মাবলী পরীক্ষা সোভিয়েতে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা দাবি করেন যে তাঁরা এক নতুন বস্তু পরমাণু সংশ্লেষিত করে পরীক্ষা করেছেন যার নাম দেওয়া হয়েছে কুর্চাতোভিয়াম (বিজ্ঞানাচার্য কুর্চাতফের নামে)। মেণ্ডেলিয়েফের মূলবস্তু তালিকায় এটির স্থান হবে ১০৪-তম এবং এখনো পর্যন্ত এর চেয়ে ভারি কোন মূল পদার্থ পাওয়া যায়নি যদিও মার্কিন বিজ্ঞানীদের মতে তাঁরা মেণ্ডেলেভিয়াম নামে যে নতুন মূল পদার্থ সংশ্লেষিত করেছেন সেটিই সবচেয়ে ভারি। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মূলবস্তু সম্পর্কিত গবেষণায় এত গুরুত্ব দিচ্ছেন এই আশায় যে তাঁদের এই গবেষণা থেকেই মূল পদার্থ সম্পর্কিত বর্তমান তত্ত্বের ক্ষেত্রে এমন পরিবর্তন আসবে যার দ্বারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মাবলী তাঁদের সামনে আত্মপ্রকাশ করবে। এই গবেষণার জন্য যে প্রোটন সিনক্রোটন তৈরির কাজ শেষ হয়ে এল তার অ্যাক্সিলারেটরের উৎপাদিকা শক্তি হবে ৭০ নিখর্ব (১০০০০০০০ কোটি) ইলেকট্রন ভোল্ট। এর আগে থেকে ইয়েরেভান শহরে ওই ধরনের যে যন্ত্রটি কাজ করে যাচ্ছে তার শক্তি ৬ নিখর্ব। এই ধরনের এক একটি যন্ত্র কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ, এটা হচ্ছে একটি প্রধান অসুবিধা। সেই জন্য পারমাণবিক ত্বরণের এমন নতুন কৌশল আবিষ্কারের চেষ্টা হচ্ছে যা ক্ষমতায় অন্যগুলির চেয়ে কোন অংশে কম না হলেও আয়তনে হবে অনেক ক্ষুদ্র। আয়তন কমিয়ে শক্তি আরো বাড়াবার জন্য গবেষণা চলেছে। মানুষ বস্তুর গভীর অন্তস্তলের রহস্য যত বেশি জানতে পারবে ততই তার সামনে উন্মুক্ত হবে নব জ্ঞান। নিউট্রিনো বলে যে নতুন পারমাণবিক বস্তুকণা কিছুদিন আগে আবিষ্কৃত হয় তার সাহায্যে বিজ্ঞানীরা সূর্য ও নক্ষত্রের মর্মস্থল পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন, পরীক্ষা করতে পারবেন বিভিন্ন ছায়াপথ ও নীহারিকার মর্মকেন্দ্র। এইসব ব্যাপারের সঙ্গে চলেছে তাপ পারমাণবিক অর্থাৎ হাইড্রোজেন বোমার শক্তিকে সমাজ কল্যাণের স্বার্থে নিয়োগ করা যায় কিনা তাই নিয়ে গবেষণা। প্রোটন ও প্রতিপ্রোটনের সংঘর্ষে যে শক্তি উৎপন্ন হবে তার মান আবার তাপ পারমাণবিক বিক্রিয়ার চেয়েও অনেক গুণ বেশি। সেই দুঃসাধ্য ব্যাপার নিয়েও কাজকর্ম হচ্ছে। নবজাত নক্ষত্রের (সুপারনোভা) ও নক্ষত্রপুঞ্জের মর্মস্থল বিস্ফোরণের ফলে যে কৌশলে বিপুল তড়িচ্চৌম্বিক বিকিরণ ও অতি শক্তিসম্পন্ন বস্তুকণা নিঃসৃত ও

বারাউনি তৈল পরিশোধনাগারে প্রোটিন উৎপাদন করা যাবে

ম্যারাউনির তৈল পরিশোধনাগারে উৎপন্ন দ্রব্যাদি রেলগাড়ীতে চড়াবার র‍্যাক্

সম্প্রসারিত হয়ে সেই কৌশলের স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা চলেছে বিরাট অভিনব রেডিও-দূরবীণ এবং রকেট ও স্যাটেলাইটে সন্নিবিষ্ট যন্ত্রপাতির সাহায্যে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে মহাবিশ্বে আজও নতুন নতুন নক্ষত্র রূপ নিচ্ছে। এই সব কাজের যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা নির্মাণের তাগিদে সেমিকণ্ডাক্টার, সুপার কণ্ডাক্টার, প্রভৃতি নিত্য নতুন তথ্য বার হচ্ছে ও সেগুলি কাজে লাগান হচ্ছে। ইলেকট্রো-টেকনিক, রেডিও টেকনিক, অ্যাক্সিলারেটার, ম্যাগ্নেটোহাইড্রো-ডাইনামিক্স প্রভৃতির ক্ষেত্রে এবং তাপশক্তিকে সরাসরি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে। এইসব মৌলিক গবেষণায় সাফল্য লাভের জন্য নোভোসিবিস্ক বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর এবং দুব্নার সম্মিলিত পারমাণবিক গবেষণা ভবনের একাধিক বৈজ্ঞানিক ১৯৬৭ সালের লেনিন পুরস্কার লাভ করেছেন পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে। আরো পেয়েছেন ধাতু সম্পর্কিত ইলেকট্রনিক্সের ক্ষেত্রে আচার্য লিফ্‌শিৎস।

পদার্থবিদ্যাই বিজ্ঞানের মেরুদণ্ড বলে তাই নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা হলো। সুতরাং বিজ্ঞানের অন্য প্রধান শাখা-গুলির বিষয়ে অতি সংক্ষেপে ২।৪ কথা বলা ছাড়া উপায় নেই।

গণিতশাস্ত্রে অ্যালজেব্রিক জিয়োমেট্রি ও সংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা করে ৩০ বছর বয়স্ক যুবা বিজ্ঞানী যুরি মানিন লেনিন পুরস্কার লাভ করেছেন। ভূসংস্থান-সম্পর্কিত গণিতের লেনিন পুরস্কার পেয়েছেন সার্গেই নভিকফ।

পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের সংযোগে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা অভিনব সব বস্তু সৃষ্টি করছেন, যেমন অঙ্গার-ইস্পাতের চেয়ে দশগুণ শক্ত ইস্পাত, নিয়োবিয়াম ও জির্কো-নিয়ামের যোগাযোগে তৈরি এমন জিনিস যার বিদ্যুৎ পরিবাহক শক্তি অবস্থা বিশেষে দাঁড়ায় শূন্যে। এই জিনিসের দ্বারা অতিদীর্ঘ বিদ্যুৎ পরিবাহক তার পথ নির্মাণের পথ প্রশস্ত হবে। নতুন গুণসম্পন্ন বস্তু সৃষ্টি করা এবং কৃষির জন্য সার ও কীটনাশক ওষুধ তৈরি করা সোভিয়েত রসায়ন শাস্ত্রের কর্তব্যগুলির মধ্যে অন্যতম। এ ছাড়া চিকিৎসার জন্য নতুন ওষুধ বার করা তো আছেই। তাঁরা সিলিকনমিশ্রিত এমন সব জৈব পলিমার, কৃত্রিম রবার প্রভৃতি সৃষ্টি করছেন যেগুলির উত্তাপ, আর্দ্রতা, অন্তরণ প্রভৃতি গুণ স্বভাব জিনিসের চেয়ে বেশি। রসায়ন শাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য দুইদল বিজ্ঞানী গত বছরের লেনিন পুরস্কার পেয়েছেন নতুন ধরনের সংশোধিত রবার সৃষ্টি করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সোভিয়েতে মোটরের টায়ার নির্মাণে কৃত্রিম রবারের প্রাধান্য, যে রবার বিভিন্ন গুণের দিক থেকে স্বভাবজাত রবারের চেয়ে সেরা।

চারজন বৈজ্ঞানিক একযোগে জীবাশ্ম-বিদ্যার মূলতত্ত্ব সম্পর্কে এক গ্রন্থ রচনা করে লেনিন পুরস্কার লাভ করেছেন ভূতত্ত্বে।

যন্ত্রকৌশল বা কারুবিদ্যায় ইঞ্জিনীয়ারদের পাঁচটি দলকে লেনিন পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন নতুন ধরনের কৃষিযন্ত্র ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রের যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করার জন্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, যে ক্ষেত্রে ক্ষেত থেকে এক টন তুলো হাতে করে চয়ন করতে একজনকে ৭৫০ বার হাত খাটাতে হয়। কিন্তু নবনির্মিত মেশিনের দৌলতে তুলো চাষের ক্ষেতে ফসল তোলার মরসুমে ৭ লক্ষ কৃষকের কাজ মেশিনগুলি করেছে। তেমনি বাছাই করে ভাল চায়ের পাতা চয়নের জন্য এক নতুন মেশিন উদ্ভাবিত হয়েছে। এই রকম মেশিন তৈরি করা সহজ কথা নয় যা চা বাগানের ১ বর্গ মিটার ক্ষেত্রের ৪০০০ ডাঁটার মধ্যে ভাল ও সরেশ পাতাওয়ালা ৩/৪ শত ডাঁটা বেছে নিয়ে পাতা চয়ন করে। এই ধরনের মেশিনের কল্যাণে বছরে ৪০০ মানুষ-দিবস বেঁচে যায় এবং হাতে করে পাতা তোলার চেয়ে একই সময়ে ৪০ গুণ বেশি পাতা তোলা যায় এবং তার প্রত্যেকটি পাতা ভাল।

জীবশাস্ত্রের ক্ষেত্রে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেছেন জীবনে উৎপত্তি ও সারবস্তু আবিষ্কার করা ও উদ্ঘাটিত তথ্যাবলীর সাহায্যে মানুষের জন্য খাদ্য প্রাচুর্য ও রোগমুক্ত সুস্থ জীবন সুনিশ্চিত করা তাঁদের লক্ষ্য। জীবনের প্রাথমিক পরিপ্রকাশের সন্ধানে জৈব রসায়ন বিজ্ঞানী আলেক্জান্ডার ওপারিন এবং আরো অনেকে অন্যান্য জ্যোতিষ্কের দিকে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। অঙ্গারক বস্তুর সঙ্গে অন্য কতকগুলি মূল পদার্থে অবস্থা বিশেষে মিশ্রণের ফলে সেই যৌগিক বস্তুটিতে (যাকে আমরা বলি পঞ্চভুত) প্রাণের সঞ্চার হয়। যে সব গ্রহের পরিবেশ এখনো ভূমণ্ডলের গোড়ার দিকের পরিবেশের সমতুল্য, সেগুলিতে অঙ্গারের রূপান্তর-ক্রিয়ার রহস্য জানতে পারলে পার্থিব প্রাণের উদ্ভবের রহস্যও জানা যাবে। জীবশাস্ত্রীরা সূর্যপৃষ্ঠের বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করে দেখেছেন যে অত বেশি তাপের মধ্যেও কিছু কিছু অঙ্গারক বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে। তাছাড়া মহাকাশ থেকে ঠিকরে আসা উল্কাগুলিতেও শুধু অঙ্গার ও অন্যান্য ধাতু কেন, সেই সঙ্গে হাইড্রোজেনের অস্তিত্বেরও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। আচার্য ওপারিনের নেতৃত্বেই চলেছে এইসব গবেষণা।

ঠিক সেইরকম বৈপ্লবিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলেছে চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে যা থেকে জন্মলাভ করেছে আণবিক জীবশাস্ত্র। এই সব গবেষণার লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি, হৃদ্‌ রোগ ও কর্কট রোগের প্রতিষেধ ও প্রতিকার করা।

মহাজাগতিক অভিযানের ক্ষেত্রে সোভিয়েতের সাফল্যের বিষয়ে পত্রিকায় একাধিক প্রবন্ধ বার হয়েছে। এখানে খালি হাল আমলের কয়েকটি কীর্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যেমন ভেনাস-৪ মহা-কাশযানের শুক্রে অবতরণ, প্রোটন-৩ নামে বিরাট মহাকাশ স্টেশনের উৎক্ষেপ, চন্দ্র প্রদক্ষিণকারী লুনা-১১-এর সাফল্য (এবং ১২), নতুন বহু যাত্রীবাহী মহাকাশযান সোয়ুজ-১ নির্মাণ, কজমস-১৮৬ ও কজমস-১৮৮ মহাকাশ লেবরেটরী ২টির মহাশূন্যে স্বয়ংচালিত মিলন এবং তারপর স্বয়ংচালিত বিয়োজন ইত্যাদি। প্রতিটি ঘটনাই এক একটি বিশ্ব রেকর্ড।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

" It may get me crucified. I may even die. But I want it said even if I die in the struggle that 'He died to make man free'.

নিহত মার্টিন লুথার কিং-এর বিখ্যাত উক্তি। বিংশ শতাব্দীর এই পৃথিবীর বিদ্বেষ তাঁকে বাঁচতে দেয়নি। তাঁর দিকে লক্ষ্য করে একটি গুলিই ছোঁড়া হয়েছিল। আততায়ীর অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ।...শুধু একটি মাত্র গুলি। কিন্তু সেই গুলি এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্যের প্রতিটি প্রান্ত থেকে আর সেই ফায়ারিং স্কোয়াডে অংশ নিয়েছিল শুধু একজন নয়—আরও কয়েক কোটি লোক। কুখ্যাত কু-ক্লাক্স-ক্ল্যানের শিবির থেকে আরম্ভ করে শিকাগোর সেই সব বিবর্ণ শ্বেতাঙ্গিনীরা যারা কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেমেয়েদের স্কুলের বাসে ডিম ছুঁড়ে মারে, তারাও আছে ওই ফায়ারিং স্কোয়াডে। বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণাঞ্চল এবং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের আরও কয়েক কোটি নির্বোধ, বর্ণবৈষম্য প্রসঙ্গে যাদের বলতে বাধে না "Keep America clean"—তারাও আছে ওই ফায়ারিং স্কোয়াডে! F B I খুঁজছে সেই একজন আততায়ীকে—বন্দুকের ট্রিগারে যার হাতের চাপ পড়েছিল। সে হয়তো ধরা পড়বে। শাস্তিও তাকে পেতে হবে। কিন্তু সেই ফায়ারিং স্কোয়াডের আরও কয়েক কোটি লোক—তারা?

মার্টিন লুথার কিং-এর স্বপ্ন ছিল—একদিন যাদের পূর্বপুরুষকে প্রকৃতির কোল থেকে ছিনিয়ে এনে পায়ে লোহার শেকল বেঁধে দাস করে রাখা হয়েছিল—আদেশ অমান্য করলে হাতে পায়ে পেরেক ঠুকে জ্যান্ত আগুনে পুড়িয়ে যাদের মারা হতো—তারা শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সকল ঐশ্বর্যের সমান অধিকার পাক। তাই সেই ফায়ারিং স্কোয়াড তাঁকে গুলি করে হত্যা করল—ঠিক যেভাবে তারা হত্যা করেছিল আব্রাহাম লিনকনকে, জন ফিটজেরাল্ড কেনেডিকে, সম্প্রতি তার ভাই রবার্ট কেনেডিকে। যুক্তরাষ্ট্রই বোধ হয় পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র দেশ যেখানে এ যুগেও এতজন মানবদরদীকে হত্যা করা হয়েছে।

আজ যুক্তরাষ্ট্রের তামসগহনবিমগ্ন সমাজে বিচারের বাণীর নীরব নিভৃত ক্রন্দনের মাঝে মার্টিন লুথার কিং-এর আশ্বাস বাণী আর শুনতে পাওয়া যাবে না—In the spirit of the darkness of this hour, we must not despair, we must not become bitter— । সেই করুণাঘন উদার উদাত্ত কণ্ঠস্বর আজ স্তব্ধ।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে, যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম প্রতিবেশী ক্যানাডাতে বর্ণবৈষম্য আছে কিনা। এই প্রশ্ন ওঠা নিতান্ত

ক্যানাডার চিঠি

অস্বাভাবিক নয়। কারণ, ক্যানাডার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অনেক বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। আর বর্ণবৈষম্যের এই প্রশ্নের উত্তরে এক কথায় হয়তো বলা চলে

মার্টিন লুথার কিং

এই ক্যানাডাতে আইনত বর্ণবৈষম্যের স্থান নেই।

কিং-এর মৃত্যুর পর কিছুদিন ধরে ক্যানাডার প্রধান সংবাদপত্রগুলির বেশ কিছু অংশ জুড়ে কিং-এর জীবনী ও তাঁর চিন্তাধারা নিয়ে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। বেতারে তাঁর বক্তৃতামালা প্রচার করা হয়েছে। টরন্টোর নাথান ফিলিপস স্কোয়ারে প্রায় ১০০০০ লোকের সমাবেশে (যার শতকরা ৭০ ভাগই ছিলো শ্বেতাঙ্গ) তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়েছে। বিভিন্ন গির্জায় তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনা করা হয়েছে। এক কথায় কিং-এর মৃত্যুতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এদের আন্তরিকতাটুকু প্রশংসনীয়।

সত্যিই এখানে দোকানে-বাজারে স্কুল-কলেজে কোথাও বর্ণবৈষম্য নেই। ভালো লাগে যখন দেখি শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে হাত ধরাধরি করে বাড়ি ফিরছে, পার্কে এক সঙ্গে খেলছে। সরকারী কাজের দরখাস্তের কাগজে ক্যানাডার অধিবাসীদের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবিক অধিকারের কথা লেখা রয়েছে। কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের অনেকেই এখানে বাড়ি তৈরি করে সম্মানজনকভাবে বাস করছেন।

ধর্ম ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে এখানে Ontario Human Rights Commission প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেক দিন হল এবং ১৯৬২ সালে তার মানবিক অধিকার আইন অনেক সংশোধিত হয়েছে। যখন এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন অনেকেই এর বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করে। কারণ, তাদের মতবাদ ছিল যে, শুধু আইন করে কোন দিনও বর্ণবৈষম্যের প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। তার জন্যে চাই সময় এবং শিক্ষা। কথাটা সত্যি হলেও অনেক সময় যে আইনেরও প্রয়োজন হয়, তার একটি সুন্দর উদাহরণ দিই। যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠান কয়েকদিন আগে টরন্টো থেকে ৬ জন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিকে বর্ণবৈষম্যের জন্যে কাজে নিয়োগ করতে অস্বীকার করে। এখানকার Human Rights Commis-

sion প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়ে তার তদন্ত করে এবং তার ফলাফল স্বরূপ প্রতিষ্ঠানটিকে ওই ৬ জন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিকে প্রায় ২৯০০০ ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। যখন যুক্তরাষ্ট্র এবং পৃথিবীর আরও কয়েকটি দেশে বর্ণবৈষম্যের উগ্র রূপ দেখা দিয়েছে, তখন তার পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনাটির ফলাফল এই ক্যানাডার মতো দেশে সত্যই সুদূরপ্রসারী।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছে যে সব বাড়ির মালিক ছাত্র-ছাত্রীদের ঘর ভাড়া দেওয়ার জন্য আবেদন জানায় তার যদি বর্ণবৈষম্যের প্রশ্ন তোলে তা হলে কর্তৃপক্ষ সেই আবেদনে সাড়া দেয় না। তা ছাড়া বর্ণবৈষম্যের উপর তৈরি Guess who's coming to dinner চলচ্চিত্রটি বিভিন্ন পত্রিকা এবং সাধারণ দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে।

এই সব দেখে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ক্যানাডা বর্ণবৈষম্যের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত। কিন্তু আরও একটু গভীরভাবে সমস্ত বিষয়টিকে চিন্তা করলে এখানকার কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মৈত্রীর সুরটা কেমন যেন একটু বেসুরো মনে হয়। বলতে দ্বিধা নেই, এই প্রচ্ছন্ন বেসুরো ভাবটা ক্যানাডার অনেক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে। তাই যখন কয়েকদিন আগে মার্টিন লুথার কিং অর্থ ভান্ডারের সভাপতি Stanley Grizzle এখানে একটি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, এই ক্যানাডাতে প্রচ্ছন্ন বর্ণবৈষম্য রয়েছে, তখন খুব একটা অবাক হইনি। পৃথিবীর যেখানেই কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গরা এক সাথে বসবাস করছে—তাঁর মতে—"They do so in Tension, Pretension and Uneasinss." সত্যি কথা বলতে, ওই কথাটার মধ্যে এতটুকু অতিরঞ্জন নেই। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গরা যখন প্রাণ খুলে মিশতে চায় তখন অলিখিত এক নিয়ম অনেক সময় প্রাচীরের বাধার মতো তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় এবং সেই বাধা অতিক্রম করার মতো ইচ্ছার আন্তরিকতা অনেক সময় কোন পক্ষেরই থাকে না। তাই নিতান্ত আশাবাদী না হলে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ এই দুই সম্প্রদায়কে নিয়ে এক জাতি এক প্রাণ কল্পনা করা সত্যিই শক্ত।

ক্যানাডাতে কি ধরনের বর্ণবৈষম্য চোখে পড়ে তার উদাহরণ দিই। বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপন দেখে কোন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি যদি বাড়িটি দেখতে যায় তখন অনেক সময় বাড়ির শ্বেতাঙ্গ মালিক মধুর হাসি ও বিনয়ের সঙ্গে জানিয়ে দেয় যে একটু আগেই বাড়িটি ভাড়া হয়ে গেছে অথবা অনেক ক্ষেত্রে নিজে থেকেই বাড়িটির হাজারটা খুঁত

দেখিয়ে দেয় যাতে সে আর ভাড়া নিতে না চায়।

কর্মক্ষেত্রেও অনেক সময় এই বর্ণ-বৈষম্যের আভাস চোখে পড়ে। সংবাদপত্রে প্রায়ই কর্মপ্রার্থীর বিজ্ঞাপনে দেখি "Negro-youngman seeks job." আমার পরিচিত যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত একজন কৃষ্ণাঙ্গ ভদ্রলোককে এ বিষয়ে প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, আগে থেকে 'নিগ্রো' কথাটা বলে দেওয়া ভালো যাতে কর্তৃপক্ষ জেনে নিতে পারে যে, কর্ম-প্রার্থী একজন কৃষ্ণাঙ্গ। কারণ, অনেক সময় চাকরির জন্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে যখন দেখা যায় সে কৃষ্ণাঙ্গ তখন কথাবার্তার পর বলা হয় যে আগামী কাল টেলিফোন-এ এর ফলাফল জানানো হবে এবং যথারীতি সেই 'আগামী কাল' আজকের রাত্রিশেষের দরজায় টোকা দেয় না।

এমন কি ক্রীড়াক্ষেত্রেও এই ধরনের বর্ণ-বৈষম্য রয়েছে। কিছুদিন আগে এখানকার একটি পত্রিকাতে এই বিষয়ে একটি চিন্তা-শীল প্রবন্ধ পড়েছিলাম। কানাডার অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলা হলো রাগবী। সমস্ত কানাডাতে [illegible] প্রথম শ্রেণীর দলে প্রায় ২৬০ জন খেলোয়াড় রয়েছেন। তার মধ্যে ৪০ জন কৃষ্ণাঙ্গ [illegible]

[illegible] এই প্রসঙ্গে অনেক কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড় মন্তব্য করেছিলেন, "কানাডাতে [illegible] আমার ভালো লেগেছে। কিন্তু [illegible] আমি এখানে [illegible] দেওয়া হয়নি। [illegible] অন্যরকম [illegible]।" আর একজন খেলোয়াড় মন্তব্য করেছেন, "কানাডাতে বর্ণবৈষম্য নেই এই কথা ভেবে যারা চোখ কান বন্ধ করে রেখেছে আমি তাদের বলতে চাই যে, আমি কৃষ্ণাঙ্গ বলে অনেক সময় আমাকে বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়নি।"

কিছুদিন আগে জনৈক চিন্তাশীল ব্যক্তি মন্তব্য করেছিলেন, "Today's Negro is a very sensitive person—one to be handled with care." কথাটা মিথ্যা নয়। কারণ, মানুষের অধিকার থেকে যাদের এতদিন বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল—বসানো হয়েছিল সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসনে, তারা যদি আজ অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে তবে অবাক হবার কিছু নেই।

✻

কুসুমে কুসুমে চরণ চিহ্ন দিয়ে ঋতুরাজ বসন্ত এসেছে ক্যানাডার প্রাঙ্গণে। পথে ঘাটে এখন উদ্ধত উজ্জ্বল হলুদ ড্যাফো-ডিলের গুচ্ছ। অনেক দিন পর রাস্তায় ছেলেমেয়েরা গরম ওভারকোটের কোটর থেকে নিজেদের উদ্ধার করতে পেরে মহা-খুশী। সত্যি দীর্ঘ শীতের পর বরফের চাদর সরিয়ে ফেলে ধীরে ধীরে দেশটা যখন লাইলাক ফুলের আলপনা বিছানো সবুজ ওড়না গায়ে এক ঝলক হেসে ওঠে, আর তারই মাঝে যখন এখানে সেখানে দু-একটা টুকটুকে টিউলিপ আদরিনীর মতো মাথা দুলিয়ে বসন্তকে জানিয়ে দেয় "না চিনিতেই ভালোবেসেছি" তখন সে রসের সুধায় হৃদয় ভরিয়ে অকারণের সাথে আমাদের মনও খুশিতে ঝলমলে হয়ে ওঠে। এই যান্ত্রিক যুগে যে দেশে ভালোবাসার দোসরও কম্পিউটারের মাধ্যমে মনোনীত করা হয়, সত্যি কথা বলতে সেই এগারো হাজার মাইল দূরের দেশটিতে আমরা অনেকেই কেতকী-করবী-কেয়াতে ভরা বাঙলা দেশের সজল নিয়মে আজও গোধূলি লগ্নে আকাশের গায়ে গিনি সোনার রঙ দেখে মনে করি না মেঘপুঞ্জটির নাম অল্টোকিউমুলাস। আমাদের মনের এই রোমান্টিক ভাবটা অবান্তর একটা অ্যাপেনডিসাইটিসের মতো, সেটা না থাকলে হয়তো কোন ক্ষতি ছিল না—আবার 'ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে'।

কিছুদিন আগে নায়গ্রা ফলসে গিয়ে দেখি চারিদিকে শুধু ভারতীয়ের ভিড়। প্রাত্যহিক জীবনের গণ্ডি থেকে ছুটি নিয়ে সবাই এসেছেন বসন্তের আবির্ভাবে নায়গ্রা জলপ্রপাতের উচ্ছ্বাস দেখতে। তারই মাঝে হঠাৎ শুনি একজন গেয়ে উঠলেন, "আমি বনফুল গো—ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে"। পরে জানা গেল, তিনি যে সময় দেশ ছেড়েছেন তখন ওই গানটিই ছিল "লেটেস্ট হিট"। যারা ক্যানাডায় এসেছি, সংবাদপত্রের ভাষায় আমরা সবাই Young Canadian। কিন্তু বিপদ হচ্ছে এই যে, বৃষ্টির দিনে এই Young Canadianদের অনেকেরই গরম চা আর মুড়ির নামে ভাবাবেশ হয়।

বসন্তের মরসুমে এখানকার ভারতীয় সমাজ নানা ধরনের গঠনমূলক কাজে মেতে উঠেছে। সত্যি কথা বলতে, এখানে যত ভারতীয় সেই অনুপাতে তেমন কোন বিশেষ সংস্থা নেই যার মাধ্যমে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার কিছুটা এদেশের সবার সামনে উপস্থাপিত করা যায়। যদিও এখানে India Canada Association, Friends of India ইত্যাদি দু' তিনটি সংস্থা রয়েছে এবং ইদানীং এদের মাধ্যমে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে, তবুও একটি দেশের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্বের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। টরন্টোতে জার্মানী গ্রীক, ইটালিয়ান প্রভৃতি প্রতিটি জাতের কিছু না কিছু গঠনমূলক সৃষ্টিধর্মী সংস্থা রয়েছে। তা ছাড়া তাদের নিজস্ব লাইব্রেরীও রয়েছে। কয়েকদিন আগে একজন গ্রীক ভদ্রলোকের আমন্ত্রণে তাঁদের সংস্থায় গিয়ে গ্রীক লেখক নিকস্ কাজানৎবাকিস্-এর উপর মনোজ্ঞ আলোচনা শুনলাম। সেই সঙ্গে লক্ষ করে দেখলাম যে, ওই আলোচনা সভায় এমন অনেক গ্রীক রয়েছেন, যাঁরা কোনদিন গ্রীস দেখেন নি। এই ক্যানাডাতেই তাঁদের জন্ম। সুতরাং এই সংস্থাটির জন্যে একজন গ্রীকের পক্ষে যতটা দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ রাখা সম্ভব ততটা একজন ভারতীয়র পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অন্য দেশে অন্য পরিবেশে নিজের শোভনীয় স্বতন্ত্রকে রক্ষা করতে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

এখানে সম্প্রতি Tagore Society of Canada প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে এই সংস্থার উদ্বোধন অনুষ্ঠানের ভার নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক প্রবাসী নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার এবং স্থানীয় শিল্পী শ্রীমতী দীপিত সরকার। এখানকার শিক্ষাজগৎ এবং সাংস্কৃতিক চেতনাসম্পন্ন মহল থেকে উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া গিয়েছে। এ দেশে রবীন্দ্রনাথের তথা ভারতীয় সাহিত্যের বিভিন্ন দিক প্রচারের জন্যে এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা। সত্যি কথা বলতে, দক্ষিণ ভারতীয় কবি ভাল্লাথোলের সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে যেমন সাধারণ বাঙালীদের খুব একটা পরিচয় নেই তেমনই অনেক দক্ষিণ ভারতীয়র বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান খুবই সীমায়িত। সুতরাং এই সংস্থা প্রতিষ্ঠার ফলে শুধু ক্যানাডিয়ানরা নয়, এখানকার ভারতীয়রাও যথেষ্ট উপকৃত হবেন।

ইউরোপ এবং আমেরিকা মহাদেশের শিক্ষিত মহলে রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ পরিচিত নাম। ভারতবর্ষের বাইরে যত দেশে গিয়েছি এমন কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে যাঁরা কবিগুরুর কথা শুনতে আগ্রহী। কিছুদিন আগে একজন বৃদ্ধ ক্যানাডিয়ান ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় হয়েছিল এখানকার পাবলিক লাইব্রেরীতে। তিনি সশ্রদ্ধ চিত্তে কবিগুরুর 'আহ্বান' কবিতাটির ইংরাজী অনুবাদটি আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। কবিতাটি কবিগুরু ক্যানাডার উদ্দেশে লিখেছিলেন এবং ১৯২৯ সালের ২৯ মে ক্যানাডার রাজধানী অটোয়ার বেতার কেন্দ্র থেকে কবিতাটির ইংরাজী অনুবাদ প্রচার করা হয়েছিল। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি যখন দরদ দিয়ে আবৃত্তি করছিলেন—

> Come, young Nation
> Build bridges with your
> life across
> the gaping earth blasted
> by hatred
> and......
> March forward......

তখন মনে হয়েছিল, ক্যানাডার মতো [illegible] দেশে ভারতবর্ষের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি কিছুটা দায়িত্ববোধ নিয়ে আমাদের [illegible] অনেক কিছুই করবার আছে। যা করেছি এবং করছি তাই তুলনায় [illegible]।

আকাশে [illegible] দেখছো কি [illegible] বলার মতো আমাদের [illegible] বাচ্চারা পৃথিবীর সব [illegible] মধ্যেই আছে। ভাগ্যের প্রসন্ন দাক্ষিণ্যের সন্ধানে আমরা দেশ থেকে পৃথিবীর আর এক প্রান্তে উপনিবেশ গড়ে তুলেছি সে কথা তাই মাঝে মাঝে ভুলে যাই! কিন্তু দেশের মাটিতে আমাদের সঞ্চয়গুলো সময়ের পথপ্রান্তে ফেলে না দিয়ে সবাই মিলে যদি চেষ্টা করি তবে বিদেশে থাকার একটি সুন্দর অর্থ আমরা খুঁজে পাবো আর অনুভব করতে পারবো জন্মভূমির অফুরান ভাণ্ডার থেকে কয়েকটি আনন্দঘন মুহূর্ত। অনেক দূরে ফেলে আসা নয়ন-জুড়ানো অপরূপ সেই দেশটির প্রাণময় কলরবের কিছু সাড়া সত্যিই এই প্রবাসী জীবনে যদি পেতে পারি তবে "শেফালী বনের মনের কামনায়" কি সুর লাগে তা হয়তো কোন দিনও এ দেশে শুনতে পাবো না; কিন্তু "একটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশির বিন্দুর" আন্তরিক স্পর্শটুকু পাবো নিশ্চয়ই!

নীলাদ্রি চাকী

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় গঠিত হয়েছিল তার অন্যতম উদ্যোক্তা রূপে ও ক্যাপ্টেন (অবৈতনিক) দ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এক মহৎ কাজ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি এই C. U. T. C.-র সর্বাধিনায়ক হন এবং এবং অবসর গ্রহণের সময় তিনি লেঃ কর্নেল পদাভিষিক্ত ছিলেন বলে তিনি এখনো সাধারণ্যে 'কর্নেল ভট্টাচার্য' নামে পরিচিত।

শিশিরকুমারও সেই সময়ে বিদ্যাসাগর কলেজেই ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। এর অল্পকাল পরেই তিনি মঞ্চে যোগ দেন।

কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন হল ৳ লক্ষ টাকা। সেই শেয়ার বিক্রির জন্যে সেদিনের রেওয়াজ মত বিজ্ঞাপন দিয়ে এজেন্ট রাখা হল। সেই এজেন্টরা দ্বারে দ্বারে ঘুরে শেয়ার বিক্রি করতে লাগলেন। আচার্য রায়ের নামে সকলেই ৫/১০টি করে শেয়ার কিনলেন।

কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্-এর নাম রাখা হয়েছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ট্রেডিং কোং। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ এই ম্যানেজিং এজেন্সির মালিক হলেন।

কিন্তু গোড়াতেই মহা বিভ্রাট ঘটে গেল।

এনামেল-শিল্পে বিশেষজ্ঞ যে ভদ্রলোকের উপর ভরসা করে কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল, তাঁর সঙ্গে কর্তৃপক্ষের মতবিরোধ হওয়াতে তিনি সকলকে পথে বসিয়ে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন।

সেই সংকটের সময়ে সাহিত্যের অধ্যাপক নির্ভীক দ্বিজেন্দ্রনাথ রসায়নে হাত লাগালেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুজ দেবেন্দ্রনাথ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের এক প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তাঁর অধীত বিষয় ছিল কেমিস্ট্রি। দেবেন্দ্রনাথ সায়েন্স কলেজ থেকে এম এস সি পাস করে বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেছিলেন। আচার্য রায়ের প্রেরণায় বাঙালীর নবজাগরিত শিল্পোৎসাহে সক্রিয় অংশ নেবার জন্যে তিনি অধ্যাপনা ছেড়ে এনামেল-শিল্পে শিক্ষার্থে জাপান চলে গেলেন।

স্বদেশে দাদা আর জাপানে ছোট ভাই—যে কাজ এঁরা হাতে নিয়েছিলেন এর সফলতার জন্য কী কৃচ্ছ্রসাধনই না তাঁরা শুরু করলেন! এঁরা সব ছিলেন নীরব দেশপ্রেমিক। সংগঠনই ছিল এঁদের ব্রত, আন্দোলন নয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথের সারা দিনের রুটিন ছিল সকালে নারকেলডাঙ্গার কারখানাতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বেলা বাড়লে বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনা, আর বিকেলে নবদ্বীপ অথবা কোর্ট উইলিয়মে গিয়ে C. I. T. C.-র অধিনায়কত্ব করা। দিনমান এই খাটুনির পর মানুষ বিশ্রাম চায়, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ তখন আবার এনামেল শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং ছোট কারখানার ছোট ফার্নেস-এ হাতে হাতে পরীক্ষা নিয়ে বসতেন। ফলাফল দেখবার অপেক্ষায় অনেক রাত ভোর হয়ে যেত, হুঁশ থাকত না।

ওদিকে জাপানে দেবেন্দ্রনাথ জাপানের এনামেল শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকরা নাকি কড়া মন্ত্রগুপ্তি পালন করতেন। তাঁদের কাছে টেকনিক্যাল ট্রেনিং-এর দরজা বন্ধ দেখে ফরিদপুরের এই ব্রাহ্মণসন্তান, ধনী ব্যবহারজীবীর পুত্র এবং ভূতপূর্ব অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সামান্য ঝাড়ুদারের কাজ নিয়ে এক কারখানায় ছদ্মবেশে ভর্তি হলেন। সেখানে ঝাড়ুপোঁছের মাঝে মাঝে তিনি গিয়ে কারিগর ও কেমিস্টদের পাশে দাঁড়িয়ে এনামেলিং-এর গূঢ় তত্ত্ব আয়ত্ত করতে লাগলেন। যে বাসায় থাকতেন সেখানে তিনি একটি ছোট ল্যাবোরেটারির মত বসিয়েছিলেন। সারা দিন চোখের দেখায় যা কিছু হৃদয়ঙ্গম করে এলেন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেই সে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ফলাফল টুকে রাখতেন। সপ্তাহান্তে তাঁর সংগৃহীত ও পরীক্ষিত তথ্য দাদাকে চিঠি লিখে জানাতেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আত্মচরিতে আছে যে, এর পরে দেবেন ভট্টাচার্য মশায় জাপান থেকে বেঙ্গল এনামেল-এর জন্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি কিনে আনেন। ১৯২৩ সালে কলকাতা শহরের জল সরবরাহের উৎস পলতার রেল স্টেশনের পাশে প্রশস্ত এক খণ্ড জমি কিনে "আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে" নতুন কারখানা স্থাপিত হয়েছিল।

দুই ভাইয়ের অক্লান্ত কর্মোৎসাহে কাজ বাড়তে লাগলো। আগে যেখানে একটি ছোট চুল্লি নারকেলডাঙ্গার কারখানায় ছিল, সেখানে পলতার ফ্যাক্টরীতে চারটি বড়ো মাফল ফার্নেস (Muffle Furnace) বসলো। এনামেলের রং করার জন্যেও অনেকগুলি স্মেলটিং-এর চুল্লি তৈরী হলো।

দামী ইম্পোর্টেড কাঁচামালের জায়গায় দেশজ মাল দিয়ে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে 'বেঙ্গল এনামেল' থেকে চমৎকার glaze-এর জেল্লাদার এনামেল বেরোলো। বিলিতী মালের তুলনায় নাকি সেই এনামেল-এর বাসনের মান কোনো অংশে কম ছিল না।

কিন্তু কারিগর হিসেবে সেকালের বাঙালী যুবকেরা ফেল হয়ে গেল। ফার্নেস-এর প্রচণ্ড তাপে মধ্যবিত্ত বাঙালী ছেলেরা পরাস্ত হয়েছিল। শেষে কষ্টসহিষ্ণু নোয়াখালির মুসলমান ও পূর্ববঙ্গের হিন্দু যুবকদের নিয়ে বাঙালী শ্রমিকের অভাব মেটাতে হলো সত্য। অবশ্য সামান্য কজন সেকালের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবক কাজে লেগে রইলো। কিন্তু আচার্য রায় বলেছেন যে, সেই স্থানীয় ছেলেরা অশিক্ষিত ছিল বলেই থেকে গিয়েছিল, কলেজে পড়া ছেলেরা দু চার দিন কাজ করেই পালিয়ে যেত। কায়িক শ্রমে তারা পরাঙ্মুখ ছিল।

প্রফুল্লচন্দ্রের এই 'আত্মচরিত'টি সম্পাদনা ও সংক্ষেপণ করে আমাদের মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-এর উচ্চতর শ্রেণীর ছেলেদের অবশ্য পাঠ্য পুস্তক তালিকাভুক্ত করা উচিত। তাতে হয়তো 'বাবু ছোকরা'-র গোষ্ঠী বৃদ্ধি না পেয়ে স্বাবলম্বী কাজের ছেলের দল গড়ে উঠতে পারে। দ্বিজেন্দ্রনাথ বা দেবেন্দ্রনাথ তো আর সকলেই হতে পারবে না; অধিকাংশই তাঁদের মতো সুযোগই পাবে না। কিন্তু লক্ষের মধ্যে দশটিও যদি তাঁদের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়, তবে বাংলা দেশ উপকৃত হবে। না হলে, কাজের ছেলেদের মধ্যে যাদের অবস্থা ভালো তারাও কেবল 'এক্সিকিউটিভ' আর 'কভেনান্টেড অফিসার' হয়ে পরের দাসত্ব করেই কাটাবে চিরকাল।

কর্নেল ডি এন ভট্টাচার্যের একমাত্র সন্তান শান্তি দেবী কিন্তু পলতা স্টেশন থেকে ট্রেনের থার্ড ক্লাসেই ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করতেন। ততদিনে তাঁর বাবার একটা ভাঙাচোরা ফোর্ড গাড়ি হয়েছে বটে, কিন্তু সেটা বাবার কাজেই খাটে।

তাই শেয়ালদা লোরেটো স্কুলের মেয়ে শান্তি ট্রেনে চড়েই কলকাতা যায়। স্কুলে পড়া ছাড়াও এই সপ্রতিভ কিশোরীটির

নানান কাজ। কারখানার কাজ দেখে শিখে সে এনামেল তৈরির এক খুদে এক্সপার্ট হয়ে উঠেছে। উপরন্তু, যেটা শুনলে অদ্ভুত লাগবে, মেয়েটি শেয়ালদায় নেমে স্কুলে যাবার পথে ও-পাড়ার খদ্দেরদের নতুন মালের নমুনাও পৌঁছে দেয়। স্কুলের ছুটি হলে সে বাবার জন্যে অপেক্ষা করে। বাবা কলেজ সেরে এসে কোনো কোনো দিন মেয়েকে সঙ্গে করে চীনেবাজারের কাচ আর এনামেলের বাসনপট্টিতে পাইকারদের কাছে যান, 'বাঘ' মার্কা এনামেলের গুণাগুণ বর্ণনা করে বিক্রি বাড়াবার চেষ্টায়। এসব হলো ত্রিশ দশকের কথা।

সেই পিতৃভক্ত পিতৃসহচরী কন্যা আজকের সবল ব্যক্তিত্বসম্পন্না শ্রীযুক্তা শান্তি গঙ্গোপাধ্যায় বেঙ্গল এনামেল-এর ডিরেক্টর বোর্ডের অন্যতমা। স্বামী ডাক্তার উমাপতি গঙ্গোপাধ্যায় বেঙ্গল এনামেল-এর 'প্রেসিডেণ্ট' অর্থাৎ কর্ণধার। স্বামীর ঘরে, তাঁর বাঁ পাশের চেয়ারে বসে স্বামীকে এবং যোগ্য পুত্র আমেরিকার কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এস্‌সি (ম্যানেজমেণ্ট এঞ্জিনীয়ারিং) তারাশংকরকে এবং অফিসের সবাইকে শান্তি দেবী সর্ব কাজে সহায়তা করেন। 'এনামেল' শিল্প ও বাণিজ্য তাঁর নখদর্পণে, তাই তাঁর বুদ্ধিপরামর্শও অমূল্য।

এঁদের দুই ছেলের মধ্যে তারাশংকর জ্যেষ্ঠ। শুনলাম তিনি এখন কোম্পানীর শিল্প-উপদেষ্টা হয়ে এই অল্প বয়সেই অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন। কনিষ্ঠ ভবানীশংকর এখন অ্যামেরিকাতে কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করছেন।

কর্নেল ভট্টাচার্য এখনো কোম্পানীর চেয়ারম্যান আছেন, যদিও তা নামেই; তিনি ব্যবসা বাণিজ্যে কোনো সক্রিয় অংশ নেওয়া ছেড়েছেন প্রায় কুড়ি বছর আগে।

১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষের সময়ে যখন অগণিত প্রপীড়িত নারীপুরুষ ও শিশুর দল কলকাতা শহর ছেয়ে ফেলেছিল খাদ্যের অন্বেষণে, তখন থেকেই দ্বিজেন্দ্রনাথ দুঃখে ও ক্ষোভে অভিভূত হয়ে মনঃস্থির করেছিলেন যে, উপযুক্ত লোকের হাতে ব্যবসার ভার তুলে দিয়ে তিনি দুর্গত জনের সেবার ভার নেবেন। উমাপতি সেই ভার নেবার পরেই দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রায় সংসার ত্যাগ করে গৃহী সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন।

জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে তিনি নদীয়া জেলার সিমুরালিতে গঙ্গার ধারে তাঁর অনাথাশ্রম 'ভাগীরথী শিল্পাশ্রমের' প্রতিষ্ঠা করলেন। সেখানে কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেমেয়েরা আশ্রয় পায়; আর দ্বিজেন্দ্রনাথ এত বছর ধরে এক এক করে তাদের সমাজে স্থান পাওয়ার যোগ্য মানুষ করে গড়ে তুলছেন। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া, চাষবাস আর কুটিরশিল্পে শিক্ষা পায়। আমি দেখি নি, কিন্তু নানা লোকের মুখে শুনেছি যে, সে নাকি এক পবিত্র স্থান।

অবসর-প্রাপ্ত ধনী শিল্পপতিদের মতো ধর্মশালা আর মন্দির গড়ে দিয়ে মানুষের ভালো করার চেষ্টা না করে দ্বিজেন্দ্রনাথ মানুষকে ভালো করার কাজে আত্মনিবেদন করেছেন।

দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মশায় কিন্তু এখনো শিল্পোদ্যোগেই আছেন। ত্রিশ দশক থেকে তিনি বেঙ্গল এনামেলে আর সক্রিয় অংশ নেন না। তখন তিনি দমদমে নিজস্ব ছোট একটি রাবার ফ্যাক্টরী করেছিলেন এবং এখন দুর্গাপুরেও নাকি আর একটি রাবার ফ্যাক্টরীর স্থাপনা করে সেখানেই বসবাস করছেন বলে এঁরা বললেন।

বিদেশী মাল, বিশেষ করে সস্তা

জাপানী এনামেলের সঙ্গে বেঙ্গল এনামেলের কঠিন প্রতিযোগিতা চললো ১৯৩৯/৪০ পর্যন্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগার সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে আমদানী বন্ধ হয়েই দেশের চাহিদা বেড়ে গেল তাই নয়, উপরন্তু জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধার পর থেকে ব্রিটিশ ও অ্যামেরিকান পল্টনের প্রয়োজনে 'বেঙ্গল এনামেল'-এর মালের দারুণ কাটতি হয়ে দাঁড়ালো। কাটতি এতটা হয়েছিল এ'দের মালের ভালো কোয়ালিটির জন্যেই।

গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে সামাজিক আচার ব্যবহারেও আমাদের দেশে অনেক পরিবর্তন ঘটলো। তখন থেকে গোঁড়া হিন্দুরাও এনামেলের বাসনকে তেমনটা অস্পৃশ্য বলে ধরেন না। সেইজন্যে ঘরে ঘরে কলাই-করা থালা-বাটির প্রচলনও বেড়ে গেল। আরও একটা বিশেষ কাজে ইতিমধ্যেই এনামেলের চাহিদা বাড়ছিল; সেটা হলো, দীর্ঘস্থায়ী ও আকর্ষণীয় করার জন্যে নানারকম সাইনবোর্ড লোহা ও কাঠের বদলে এনামেলে তৈরি করানো। এখন আমরা পথে ঘাটে রাস্তার নামের প্লেট, পেট্রল পাম্পে তেল-কোম্পানীর নাম প্রভৃতি যেসব সাইন-বোর্ড দেখি, তার কথাই বলছি।

ইতিমধ্যে সেই বিশ দশকেই কলকাতার বিখ্যাত ধনকুবের সুর পরিবারের স্বনামধন্য শ্রীমৃগাঙ্কমোহন ও শ্রীরামচন্দ্র সুর মহাশয়রা এন্টালি অঞ্চলে আর একটি এনামেল কারখানা খুলেছিলেন। সেই সুর এনামেল অ্যান্ড স্ট্যাম্পিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড প্রতিষ্ঠানটিও আজ মস্ত বড়ো হয়ে উঠেছে। বর্তমান কর্মকর্তা শ্রীশিশির সুর বললেন যে, এখন এর বার্ষিক বিক্রি ৫০ লক্ষ টাকারও বেশি। বেঙ্গল এনামেল যে সমস্ত এনামেলের জিনিস তৈরি করেন, এ'রাও মোটামুটি সেই সবই করেন।

ঠিক করে কেউ বলতে পারে না, কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকের অনুমান মিশরের ফ্যারাওদের সমাধিসমূহে আজ থেকে হাজার তিনেক বছর আগে তৈরী ফুলকাটা-মিনের যে সমস্ত অলংকার পাওয়া গিয়েছে, তাই হলো এনামেলিং-এর প্রথমতম নিদর্শন।

ভাষাতত্ত্ববিদরা মনে করেন যে গ্রীক মহাকবি হোমার তাঁর 'ইলিয়াড' কাব্যে 'ইলেকট্রন' নামে যে বস্তুটির উল্লেখ করেছেন তা সম্ভবত সে যুগের 'এনামেল'। যদি তাই হয় তবে সুন্দরী হেলেনকে অপহরণ করার জন্যে খৃষ্টজন্মের হাজার বারো শ' বছর আগে যে ট্রয়ের মহাযুদ্ধ 'ট্রোজান ওয়ার' বেধেছিল, তার আগে থেকেই মধ্য এশিয়া (ট্রয় নগরী যেখানে ছিল) অঞ্চলে মিনে-করা গহনার প্রচলন ছিল। এটা যদিও ঠিক ইতিহাস নয়, কিংবদন্তী।

ইতিহাসের শুরু হয়েছিল খৃষ্টজন্মের কয়েক শ' বছর পর থেকে সেই মধ্য এশিয়া

ও ইওরোপের সংযোগস্থল বর্তমান তুরস্কের ইস্তাম্বুল অঞ্চলে। তখন সে দেশের নাম ছিল 'বাইজেন্টিয়াম'। রোমানরা তখন সেখানে রাজত্ব করতেন। সেখানকার স্বর্ণকারদের কারুশিল্পের সঙ্গে ফুঁকো (blown) কাচের নির্মাতাদের কারিগরীর সংমিশ্রণে এই মিনে-করা অলংকারের উৎপত্তি হয়েছিল। বাইজেন্টাইন-এনামেল-শিল্পীরা কারুশিল্প রূপেই একে পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে দেন। ষষ্ঠ শতকে ইটালির কোনো এক রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় অ্যান্টোনিওকে বিবাহ করে বাইজেন্টিয়ামের রাজকুমারী থিওপ্যানি ইটালিতে এই শিল্পের প্রচলন করেছিলেন আর একাদশ শতাব্দী থেকে একদল বাইজেন্টাইন এনামেল-শিল্পী ইটালিতে স্থায়ীভাবে বাস করে সেখানে এই শিল্পের উৎকর্ষ ঘটিয়েছিলেন। আন্দাজ এক শতক পরে জার্মানির কলোন ও ফ্রান্সের লিমোজ অঞ্চলে এনামেল শিল্পের বিস্তার হলো। পূর্বদিকে এর প্রসার হলো আনুমানিক ত্রয়োদশ শতকের মোঙ্গোলদের চীন আক্রমণের সময়ে; আর ষোড়শ শতাব্দীতে গেল চীন থেকে জাপানে।

কোনো এক সময়ে এই শিল্প পারস্যে পৌঁছে ফারসী ভাষায় আখ্যা পেয়েছিল 'মিনা-কারি'। সেই থেকেই এসেছে আজকের বাংলা আভিধানিক শব্দ 'মিনে'।

এনামেলিং কারুশিল্প থেকে শিল্পোদ্যোগে উন্নীত হলো ষোড়শ শতকের কাছাকাছি কোনো সময়ে। আর ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংল্যাণ্ডে ও ইওরোপে শিল্পবিপ্লবের পর থেকে ঢালাই লোহার ওপর এনামেলিং-এর প্রবর্তন হলো। তারও কয়েক দশক পরে অস্ট্রিয়া ও জার্মানিতে লোহা ও ইস্পাতের পাতের ওপর এনামেলিং পদ্ধতি প্রযুক্ত হলো। এই প্রণালীর আখ্যা হলো 'ভিট্রিয়াস-এনামেলিং', সহজ অর্থে গলানো কাচ, লোহা প্রভৃতি ধাতুর ওপর প্রলেপন পদ্ধতি। এনামেল বস্তুটির ক্রমবিকাশের জন্যে যে-সমস্ত উপাদান সহায়তা করেছে তার ফিরিস্তি দিয়েই প্রবন্ধ শুরু করেছি, অতএব পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এখন Wet এবং Dry এই দুই পদ্ধতিতে এনামেল তৈরী হয়, কিন্তু তার ব্যাখ্যা করেও আপনাদের ওপর উৎপাত করতে চাই না। কেবল একটা কথা বলি আপনার গাড়ি বা স্টীল ফার্নিচারে যে স্প্রে-পেইন্টিং হয় তা-ও এক ধরণের এনামেলিং—স্টোভ্‌-এনামেলিং। ছুরি দিয়ে ঘষলে তাতে দাগ পড়বে, কিন্তু ভিট্রিয়াস-এনামেলিং-এ সেটা হবে না।

এনামেল-শিল্প উৎকর্ষের শিখরে উঠলো বিংশ শতাব্দীর উত্তর আমেরিকা ও কানাডাতে। এখন সেখানে অসংখ্য এনামেল ফ্যাক্টরী স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য লাগে যে, 'বেঙ্গল এনামেল' এখন ইউ এস এ-তেও অনেক রপ্তানি করছে। সে কথায় পরে আসছি।

পালা করে দুজনের কাছে 'বেঙ্গল এনামেল' ও এনামেল শিল্পের ইতিহাস শুনেছিলাম। আদি ইতিহাসের অনেকটা শোনালেন আদি ডিরেক্টর স্বর্গীয় রসিকলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের পুত্র বর্তমান ডিরেক্টর শ্রীনিত্যগোপাল চক্রবর্তী। বাকিটা শুনলাম, এই প্রতিষ্ঠানের একাধারে আইনমন্ত্রী ও 'পাবলিসিটি অফিসার' শ্রীঅমিতাভ ব্যানার্জির কাছে। ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ, আইনে এল-এল-বি এবং জার্নালিজমে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট এই যুবক কিছুদিন সাংবাদিকতার পর হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন। কিন্তু তা করা হলো না অমিতাভবাবুর। বেঙ্গল এনামেল-এর বর্তমান কর্ণধার গণেশ ভট্টাচার্যের জামাতা ডক্টর উমাপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নজরে পড়ে গেলেন এবং তিনি অমিতাভবাবুকে এই প্রতিষ্ঠানে টেনে আনলেন। উমাপতি সহস্রভুজ না হ'ন, তবে চতুর্ভুজ তো নিশ্চয়ই। অমিতাভ হলেন তাঁর অন্যতম দক্ষিণহস্ত। শুধু তাই নয়, ফরাসী সরকারের আমন্ত্রণে রপ্তানি বাণিজ্য বিষয়েও ইনি প্রায় বছর খানেক ফ্রান্সে ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন।

রপ্তানির বিষয়ে আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য মিঃ ব্যানার্জি দু'একজন কাকে কাকে যেন ইণ্টারকম্‌ ফোনে আহ্বান করলেন। একটু পরেই বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল, সুশ্রী এক তরুণী কামরায় ঢুকলেন। আমি ভেবেছিলাম তরুণী বোধ হয় অমিতাভ বাবুর পি-এ হবেন। পরিচয় পেয়ে অবাক হলাম—পরনে ঢাকাই শাড়ি, সিঁথিতে সিঁদুর বাঙালী মেয়ে শ্রীমতী মঞ্জুলা সরকার এই প্রতিষ্ঠানের দু' কোটি টাকা বার্ষিক বিক্রির এক মোটা অংশ যোগান বেঙ্গল এনামেল-এর মার্কেটিং ডিভিশনের ইন-চার্জ হিসেবে। 'শেষের

লোকসান হলে আমাদের খুব কষ্ট হয় বলেই দুঃখের বশে কতকগুলি কথা লিখে ফেলি। তাতে যদি আমার কোনো অপরাধ হয় তো হোক।

গত সপ্তাহে বেঙ্গল এনামেল-এর বিশাল ফ্যাক্টরী দেখার সময়ে ম্যানেজার শ্রীবিজয়কুমার চৌধুরীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কাজ দেখার সময়ে সেইসব কথাই ভাবছিলাম।

শতাধিক মহিলা কর্মীর অন্যতমা পরিচালিকা শ্রীমতী কমলা গিরির সঙ্গে কথা হলো; আর একজন, শ্রীমতী পরিমলপ্রভা ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়নি। কমলা গিরির বাংলা শুনে প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে, তিনি মেদিনীপুরের মেয়ে। শুনলাম যে, তিনি নেপালের মেয়ে। তাঁর জীবন, তাঁর ছোট্ট সংসার সবই তিনি এই বেঙ্গল এনামেলকে ঘিরে গড়ে এখন বাঙালী হয়ে গেছেন।

কমলা গিরির 'সেক্শন' বিভাগের গীতা চক্রবর্তী, আভা পাল, খুকু রায়, এ'রা সবাই আমাদের গরিব ঘরের মেয়ে। দরিদ্র পিতা, ভাই বা স্বামীর সংসারে যা কিছু পারছেন সাহায্য করছেন নিজেদের কায়িক পরিশ্রমের উপার্জনে। দিনে এ'রাও পুরুষ কর্মীদের মতো আট ঘণ্টা করে কাজ করেন কারখানা

প্রাক্তন সভাপতি (একদালে কর্নেল ভট্টাচার্য'ও এর সভাপতি হয়েছিলেন); FICCI এবং ভারত ও ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্সের সভা; অল-ইন্ডিয়া ভিট্রিয়াস এনামেলার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর বর্তমান সভাপতি; এবং সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে, তিনি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার-এর অন্যতম প্রাণপুরুষ।

প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত শিল্প ও বাণিজ্যিক সঙ্ঘের মধ্যে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স দ্বিতীয়। ১৮৮৭ সালে এটি সংগঠিত হয়েছিল এবং এর সংবিধানের খসড়া করেছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা প্রাতঃস্মরণীয় ডব্লিউ সি বনার্জি এবং এ-ও-হিউম। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রথম ভারতীয় সঙ্ঘ ছিল ১৮৮৫ সালে, অর্থাৎ জাতীয় কংগ্রেসের জন্মবর্ষে, প্রতিষ্ঠিত নেটিভ মার্চেণ্টস্ চেম্বার অব কোকনদ' (এখনো 'গোদাবরী চেম্বার অব কমার্স')।

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার-এর চিরাচরিত প্রথা ভেঙে উমাপতিবাবুরই উৎসাহে গত বছরের সভাপতি ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কর্মকর্তা শ্রী[illegible] চেম্বারের কার্যকরী সমিতি এবারেও সভাপতি নির্বাচিত করেছেন। [illegible] শ্রী[illegible]কুমার সরকার এবং বেঙ্গল কেমিক্যালের [illegible] গ্রহণ করে এই সঙ্ঘের সিনিয়র ও জুনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। কর্মীদের, এবং উমাপতিবাবুর আশা যে, [illegible] মহাশয়ের নেতৃত্বকে আরও এক বছর সামনে রেখে বাংলার, বিশেষ করে অনগ্রসর [illegible] শিল্পোদ্যোগে সুযোগের [illegible] আরও [illegible] সঙ্ঘের [illegible]।

[illegible] শিল্পোদ্যোগ সফল ও সফল হোক, এই আমরা কামনা করি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের আরও এক কর্তব্য পালন করা উচিত। বাঙালীর শিল্পবাণিজ্যে পথপ্রদর্শকদের মধ্যে যাঁরা এখনো আমাদের মধ্যে আছেন তাঁদের সম্মানার্থে চেম্বার এবং বাংলা সরকারের তরফে এমন কিছু করা উচিত যাতে তাঁদের মহৎ কীর্তির কথা দেশের লোক ভালো করে জানতে পারে। তাঁদের ত্যাগ কষ্টসহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের ফলে আজ শত শত বাঙালী পরিবারের অন্নসংস্থান হচ্ছে—এই সত্যটা প্রচারিত হোক।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ—এঁরাই আসল ভারতরত্ন।

বিশ্বকর্মা

চিত্র প্রদর্শনী

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারীতে সম্প্রতি শিল্পী ধীরাজ চৌধুরী তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। তরুণ শিল্পী-দের মধ্যে ধীরাজ চৌধুরী সুপরিচিত। কয়েক বছর কলিকাতা সরকারী আর্ট কলেজে শিল্পবিদ্যা অধ্যয়ন করে তিনি দিল্লী চলে যান ও শেষে দিল্লী আর্ট কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। পরে তিনি ভারতের নানাস্থানে একক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করে শিল্পী হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। প্রদর্শনীতে তিনি তিনটি প্রাচীর চিত্র (mural) ও ১৬টি রচনা পেশ করেন। মাধ্যম তেলরঙ।

শিল্পীর রচনাগুলি বিমূর্ত শ্রেণীর। বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে কোনওটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয় না। তবে একত্রে সবগুলি দেখলে শিল্পীর রচনারীতির তাৎপর্য বোঝা যায়। রঙ, রেখা জ্যামিতিক নানা ক্ষেত্র মাধ্যমে তিনি কোনও প্যাটার্ন বা আকার সৃষ্টি করেন নি অথবা শূন্য স্থানের বিশ্লেষণ করে বিশিষ্ট কোনও ইমেজ তৈরি করেন নি। উজ্জ্বল ও সোচ্চার রঙও তিনি পরিমিতভাবে ব্যবহার করেছেন, ফলে এগুলি সাধারণত ম্লান বলে মনে হয়। শিল্পী প্রকৃতি ও বহির্জগতের বিভিন্ন বস্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন এবং বহির্জগতের বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন আকার তিনি আপন অনুভূতির মধ্য দিয়ে নতুনভাবে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছেন। ফলে প্রত্যেকটি রচনার মধ্য দিয়ে নানা বিচিত্র আকার ও রূপ ফুটে উঠেছে, যেগুলি হয়ত সকলের চোখে প্রথমে ধরা পড়ে না। কিন্তু যাঁরা এ জাতীয় রচনা দেখতে অভ্যস্ত তাঁদের মধ্যে অনেকেই এগুলির বক্তব্য বুঝতে পারবেন। বলা বাহুল্য, সকলেই জানেন পিকাশো ও হেনরী মুর বহির্জগতের নানা পরিচিত বস্তু আপন আপন মাধ্যম ও চিন্তা-ধারার মধ্য দিয়ে নতুন আকারে রূপান্তরিত করেছেন। শিল্পীর রচনায়ও সেই পদ্ধতি দেখা যায়। তা হলেও আমার মনে হয়, এ জাতীয় সব কটি রচনাতেই শিল্পী কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। যদিও তিনি স্বীয় বিবৃতিতে স্বীকার করেছেন যে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ ও ব্যঞ্জনা তিনি রেখা, রঙ ও আকারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন, বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু অনেক স্থলে সেগুলি একই শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়েছে। তবে ব্যতিক্রমও আছে—যেমন ১৬নং রচনা। প্রধানতঃ নীলরঙ মাধ্যমে রচিত এই ছোট্ট ছবিখানির বক্তব্য অনেকেই বুঝতে পারেন। এই প্রসঙ্গে ১১ নং রচনারও উল্লেখ করা চলে। ইঙ্গিত প্রধান এই ছবিটির মধ্যে কোথাও যেন একটি প্রচ্ছন্ন গতিবেগ লুক্কায়িত আছে। তবে আমার বিশ্বাস ধীরাজ চৌধুরী মুখ্যত প্রাচীরচিত্র শিল্পী। পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, অংকনরীতি ও রঙ ব্যবহারের দিক থেকে বিচার করলে তাঁর প্রাচীর চিত্র তিনটি সত্যিই সকলের চোখে পড়ে। ১নং নিদর্শনে শিল্পী গণপতির শোভাযাত্রা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রধানত লাল ও হলদে রঙ মাধ্যমে সমবিমূর্ত রীতিতে আঁকা শোভা-যাত্রার মূর্তিগুলিকে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্পষ্ট রেখেও শিল্পী এটির মধ্যে এক সুসম্বদ্ধ রূপ প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রাচীর চিত্রের বিষয়বস্তু কনসার্ট। এটিও একই রীতিতে রচিত, তবে স্নিগ্ধ ও মৃদু সবুজ রঙের মাধ্যমে রচনাটির মধ্য দিয়ে যেন সত্যিই সংগীতের মূর্চ্ছনা শত ধারায় ছড়িয়ে পড়েছে। তৃতীয় প্রাচীর চিত্রটি কিন্তু বিমূর্ত শ্রেণীর। উজ্জ্বল লাল রঙকে কেন্দ্র করে এটির মধ্যে শিল্পী একটি সুন্দর প্যাটার্ন সৃষ্টি করেছেন। নানা মাধ্যম ও রীতিতে পরীক্ষা করার স্বাধীনতা অবশ্য শিল্পীর আছে, তবে আমার মনে হয় প্রাচীর চিত্রেই ধীরাজ চৌধুরীর প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত গ্রাফিক আর্ট শিক্ষণ-শিবিরে শিল্পী রামকিঙ্করের সঙ্গে আছেন শিল্পী সুব্রহ্মণ্যম ও শিল্পী রামচন্দ্রণ

✻

অ্যাকাডেমিরই আর এক গ্যালারীতে শিল্পী অমিতাভ দত্ত তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। শিল্পী তরুণ, ইন্ডিয়া ফয়েলস (India Foils)-এ ডিজাইন বিভাগে কাজ করেন। ছেলেবেলায় ছবির দিকে স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল, তার ওপর এখানে কাজ করতে করতে অ্যালুমিনিয়ম ফয়েলের ওপর শিল্পসৃষ্টি করার বাসনা তাঁর মনে জাগে। সাধারণত কার্ড বোর্ডের ওপর অ্যালু-মিনিয়ম ফয়েল এঁটে তার ওপর রেজিন

একটি ম্যুরাল

ধীরাজ চৌধুরী

সলভেণ্ট সহযোগে তিনি নানা পরীক্ষা শুরু করে দেন এবং সেই পরীক্ষালব্ধ ফলের নিদর্শন এই প্রদর্শনী। এখানে ২৪টি নমুনা দেখা যায়।

শিল্পী অপরিচিত, ইতিপূর্বে তাঁর কোনও প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানও হয়নি। বলতে দ্বিধা নেই, সন্দেহ ও অবিশ্বাস নিয়েই প্রদর্শনীতে পদার্পণ করেছিলাম। প্রদর্শনীটি দেখে অবশ্য মনোভাব বাদলাতে হল। প্রদর্শনীটি উল্লেখযোগ্য কারণ, যতদূর জানি এই মাধ্যমে শিল্প সম্ভাবনার পরিচয় দিয়ে এই শিল্পী একটি নতুন পথের সন্ধান দিলেন। রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে অ্যালুমিনিয়ম ফয়েলের ওপর আঁকা বলে এগুলি স্বচ্ছ দেখায় ও সামান্য আলোকপাতে রঙীন কাচের মত চকচক করে। অনেক সময়ে মনে হয় বুঝি বা ঘসলেই রঙটুকু মুছে যাবে। কিন্তু এ আশঙ্কা অমূলক—তেল রঙের মতই এ রঙ স্থায়ী।

বলা বাহুল্য অধিকাংশ রচনার মধ্য দিয়েই নানা প্যাটার্ন বা আকার ফুটে উঠেছে। দেখে মনে হয় শিল্পী হয়ত ঠিক ইচ্ছাকৃতভাবে সেগুলি সৃষ্টি করেন নি। কোনও স্থলে তিনি তরল রঙ ছড়িয়ে দিয়েছেন, কখনও বা প্রয়োজন বোধে জমিয়ে ফেলেছেন, আবার কোনও ক্ষেত্রে হয়ত রঙকে রেখা মাধ্যমে আয়ত্তে এনেছেন। ফলে সব ক্ষেত্রেই রচনাগুলি হয় বিমূর্ত নয় সুররিয়ালিজম শ্রেণীভুক্ত হয়ে উঠেছে। রচনাগুলি দেখে মার্ক টোবি, অ্যালান ডেভি ও ফিলিপ গাসটনের রচনা মনে পড়ে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই হারবার-এর নাম করা চলে। প্রতীক-প্রধান রচনাটি যেন রেখা মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করেছে। এর পরেই কনস্টেলেশন উল্লেখযোগ্য। মূলত একটি রঙকে কেন্দ্র করে শিল্পী কয়েকটি সুন্দর প্যাটার্ন সৃষ্টি করেছেন, যেমন ব্লু ফরেষ্ট, গার্ডেন কলার্স ও পার্পল মুন। বলা বাহুল্য, রঙ ব্যবহার কৌশল দ্বারা রচনাক্ষেত্রের কারুকার্য ও বিভিন্ন প্যাটার্ন সৃষ্টি করাই এ জাতীয় রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং বিশেষ সচেতন না হলে সমগ্র রচনাবলীই এক জাতীয় বলে ভুল হয় এবং এখানেও কয়েকটির মধ্যে পুনরুক্তেখের আভাস পাওয়া যায়। তবে নতুন মাধ্যমে শিল্প সৃষ্টির প্রচেষ্টার পরিচয় দিয়ে শিল্পী সকলের প্রশংসাভাজন হয়েছেন।

*

এ বছরে গ্রীষ্মাবকাশে শান্তিনিকেতন কলাভবনে অনুষ্ঠিত গ্রাফিক অনুশীলন শিবির শিল্পক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। শিবিরটি আয়োজিত হয় বেসরকারীভাবে, সুতরাং বিধি নিয়মের কোনও বাধা ছিল না, ফলে এক হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সকলে কাজ করেন। শিবির পরিচালনা করেন অধ্যাপক সোমনাথ হোড় ও তাতে যোগদান করেন অধ্যাপক বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, রামকিঙ্কর, কে জি সুব্রহ্মণ্যম, রামচন্দ্রন ও অধ্যক্ষ দিনকর কৌশিক। এ ছাড়া ছিলেন বিশ্বরূপ বসু, সুখময় মিত্র ও শর্বেন্দু ঘোষ। গ্রাফিক প্রিণ্ট নেওয়া পদ্ধতি বিষয়ে শিবিরে সকলকে নানা সুযোগ দেওয়া হয় এবং ত্রিশেরও অধিক মৌলিক এচিং ও লিথোগ্রাফির নিদর্শন বিষয়ে বিচার ও আলোচনা হয়। এই জাতীয় শিবিরের অনুষ্ঠানের ফলে শিল্পবিদ্যালয়ের সাধারণ ও বাঁধাধরা জীবনে যে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হয় সে কথা বলাই বাহুল্য। অধ্যক্ষ দিনকর কৌশিক আশা করেন যে ভবিষ্যতে ভাস্কর্য, লাইফ স্টাডি ও ডিজাইন বিভাগেও এই জাতীয় বহু অনুশীলন শিবিরের আয়োজন করা হবে, ফলে সৃষ্টি কুশলতার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সন্ধান পাওয়া যাবে।

চিত্রপ্রিয়

কলকাতা বন্দর এবং ফরাক্কা

কলকাতা বন্দর এককালে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু বর্তমানে কলকাতা বন্দরের চেয়েও বোম্বাই বন্দর বেশী প্রাণ-চঞ্চল। অথচ কলকাতা বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি এখনও বোম্বাইয়ের চেয়ে বেশী। দেশ-বিভাগ কলকাতা বন্দরের জৌলুস অনেকটা কেড়ে নিয়েছে।

কিন্তু এজন্য কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব মোটেই কমেনি। কলকাতা বন্দরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ফরাক্কা বাঁধের গুরুত্ব আজ অপরিসীম। ভাগীরথী নদীর অবস্থা আজ এমন হয়েছে যে, বর্ষাকালেও তার বুকে পলি জমে চড়া পড়ে।

ফরাক্কা বাঁধ সম্পূর্ণ হলে ভাগীরথী নদীর অবস্থা অনেক উন্নত হবে, জাহাজ চলাচল আরও সহজ হবে এবং কলকাতা বন্দরও বাঁচবে। কিন্তু ফরাক্কা বাঁধ নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এর কারণ, ভারত কর্তৃক পাকিস্তানের অন্যায় আব্দারকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে তা খণ্ডন করার প্রচেষ্টা। পাকিস্তানের অভিযোগ, ফরাক্কা বাঁধ সম্পূর্ণ হলে মার্চ মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত বছরে তিন মাস পূর্ব পাকিস্তানে গঙ্গার ভাটিতে একটুও জল পাওয়া যাবে না; সুতরাং প্রশ্নটি এখন রাজনৈতিক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে এবং পাকিস্তানের মতে ভারতের উচিত বিশ্ব ব্যাংকের মত কোন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের হাতে এ বিষয়ে পূর্ণ তদন্ত করার ভার অর্পণ করা।

ভারত প্রথমেই পাকিস্তানের আব্দার সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে পারত। কিন্তু তা না করে ভারতের প্রথানুযায়ী পাকিস্তানী ইঞ্জিনীয়ারদের ফরাক্কার কাজ পরিদর্শন করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং বছরে তিন মাস পাকিস্তান কী পরিমাণ জলের অভাব ভোগ করবে তার তথ্য সরবরাহ করার জন্য ভারতের দিক থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। আমাদের মনে হয়, অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ করে গোড়া থেকেই এ ব্যাপারে ভারতের আরও দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করা উচিত ছিল। পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের নেতা শ্রী বি এ আব্বাস সোজাসুজি বলেছেন যে, পাকিস্তান এ ব্যাপারে রাজনৈতিক আলোচনা চায়। যে প্রকল্পের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত, যে প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে পাকিস্তানের কোনও ক্ষতি না করেও কলকাতা বন্দর এবং পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি রক্ষা পাবে, তার মধ্যে রাজনৈতিক যুক্তি-তর্কের অনুপ্রবেশ হয়েছে। এটা যেন খাল কেটে কুমির ডাকা।

অর্থনৈতিক ভারত

পাকিস্তান সরকার রাজসাহীর একটি অংশের জন্য জল সরবরাহের নিশ্চয়তা চেয়েছেন। কিন্তু রাজসাহীর যে অংশের জন্য পাকিস্তান সরকার জল চেয়েছেন, সে অংশে কোন কারণেই নিয়ন্ত্রিত সেচ ব্যবস্থার দরকার নেই। ভারতের মতে ওই এলাকায় নদীনালা এত বেশী যে, সেখানে নিয়ন্ত্রিত সেচের দরকার হয় না। কিন্তু পাকিস্তানী প্রতিনিধিবৃন্দ এই যুক্তিতে সন্তুষ্ট হননি। শুধু তাই নয়, জনৈক পাকিস্তানী প্রতিনিধি জানতে চেয়েছিলেন ফরাক্কার সঙ্গে কোন জলাধার নির্মাণ করা হবে কিনা। এই প্রশ্নের উত্তরে ভারতীয় প্রতিনিধি জানান যে "ইঞ্জিনিয়ারদের জানা উচিত পৃথিবীর কোন ব্যারাজেই জলাধার রাখা হয় না। অতএব ফরাক্কার ক্ষেত্রেও সে প্রশ্ন অবান্তর।" দেখা যাচ্ছে, ফরাক্কা প্রকল্পের রাজনৈতিক গুরুত্ব এত বেড়ে গেছে যে, তার অর্থনৈতিক দিকটির প্রতি পাকিস্তান সরকার পরিকল্পিত উপেক্ষা দেখিয়ে যাচ্ছেন।

তবে সুখের কথা ফরাক্কার সব কাজই যে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার এবং বিশেষজ্ঞগণ করছেন এবং সে কাজ যে সব দিক থেকেই ভাল হচ্ছে পাকিস্তানের প্রতিনিধিবৃন্দ তা স্বীকার করেছেন এবং ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশংসা করেছেন।

ফরাক্কা বাঁধ নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে মতভেদ হয়েছে তার সমাধানকল্পে পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের নেতা শ্রীআব্বাস একটি নূতন প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রস্তাবটি হলঃ পাঞ্জাবে সিন্ধু নদের জলের ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৫০ সালে যে ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, গঙ্গার জলের ক্ষেত্রেও সে ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হোক। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ভারতের দিক থেকে এ ধরনের প্রস্তাব মেনে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে নিঃশর্তে ভারতের সম্পদ পাকিস্তানকে সমর্পণ করা। ভারত সরকার যে এ প্রস্তাব গ্রহণ করেননি তাও পাকিস্তানের প্রতিনিধিবৃন্দকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন ভারতের উচিত, রাজনীতির আবর্তে ফরাক্কা সংক্রান্ত ব্যাপারে আর জল ঘোলা না করে যত দ্রুত সম্ভব ফরাক্কার কাজ শেষ করা। তা হলে কলকাতাকে বাঁচানো যাবে, আর কলকাতাকে বাঁচানোর অর্থ সমগ্র পূর্ব ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করা।

যদি একদিকে হলদিয়া বন্দরের কাজ দ্রুত সম্পন্ন হয় এবং অপরদিকে ফরাক্কা বাঁধের কাজও তাড়াতাড়ি শেষ হয়, তবে কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে মাল চলাচল দ্বিগুণ হয়ে যাবে আশা করা যায়। কলকাতা বন্দরের উন্নয়নের জন্য ফরাক্কা প্রকল্পের সমস্যা সম্পূর্ণ প্রয়োগ বিদ্যা ও অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; তাতে রাজনীতির অনুপ্রবেশ গোড়ায় বন্ধ করে দেওয়াই ভারত

সরকারের উচিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রস্তুতির জন্য উপদেষ্টা সম্মেলন

সংবাদে প্রকাশ, চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষিনীতি কিভাবে নিরূপিত হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য পরিকল্পনা কমিশন জুলাই মাসে নয়াদিল্লিতে কয়েকজন অর্থনীতিবিদকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সংবাদটি শুভ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেন না, পূর্বে কখনই পরিকল্পনা কমিশন শুধু কৃষিনীতি নির্ধারণের জন্য অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ গ্রহণ করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। শুধু দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার সময়ে অর্থনীতিবিদদের একটি প্যানেল তৈরী করা হয়েছিল এবং প্যানেলের অন্তর্ভুক্ত কয়েকজন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন প্রবন্ধে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছিলেন। অবশ্য তাঁদের সব মতামতই তখন গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমানে যে সম্মেলন ডাকা হচ্ছে তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ সম্মেলন ডাকা থেকেই বোঝা যাচ্ছে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনাটি কৃষি-ভিত্তিক হওয়াই স্বাভাবিক। গত আর্থিক বছরে ভারতের কৃষি-উৎপাদন ভাল হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে চলতি বছরেও কৃষির ফলন ভাল হবে। যদি কৃষি-উৎপাদনের বর্তমান ধারাকে সুদৃঢ় করা যায় তবে ভারত ক্রমেই খাদ্যে স্বয়ম্ভরতার পথে এগিয়ে যাবে। আশা রাখছি, সম্মেলনে আমন্ত্রিত অর্থনীতিবিদগণ কিভাবে ভারতের কৃষি-ব্যবস্থাকে স্থায়ীভাবে উন্নত রাখা যায় সে পথের নির্দেশ দেবেন। পরিকল্পনা কমিশনের কাছেও আবেদন, অর্থনীতিবিদদের সুপারিশগুলি যেন শুধু ছাপার অক্ষরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে: নীতি নির্ধারণে সেগুলিকে যেন কাজে লাগানো হয়। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনাও যদি ব্যর্থ হয়, তবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উপযোগিতা ও কার্যকারিতায় সাধারণ মানুষের বিশ্বাস টিঁকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। এক দিকে মুদ্রাস্ফীতি এবং অপর দিকে বেকার সমস্যা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে অসহনীয় করে তুলেছে এবং তার জন্য দায়ী আগেকার পরিকল্পনাগুলির ভারসাম্যের অভাব। দেশের সুষম উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার কী নীতি নির্ধারিত হওয়া উচিত সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের সুচিন্তিত অভিমত যদি বাস্তবে রূপায়িত হয় তবে পরিকল্পনা কমিশন প্রকৃতই জনসাধারণের সহযোগিতা পাবেন এবং জনগণের মন থেকে পরিকল্পনা সম্পর্কে হতাশা ও নৈরাশ্যের ভাব দূর করতে পারবেন।

সুব্রত গুপ্ত

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

আশি

আমার অবাক লাগে অন্য কারণে। লিলি বৌদির মতন এমন বিদুষী নাগরিকদের সঙ্গে বিন্দু নামে বাউল প্রকৃতির এত আপনাই কেমন করে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উঠোন পেরিয়ে আসা নগরের একেবারে হালের দলকে দামিনী এমনি মেয়েদের কাছে, কোন বাউল প্রকৃতিকে এত নিকট হতে দেখি নি। কেনই বা তাই কেন, এমন দুই দলকে পাশাপাশি কে দেখেছে। তাদের জগৎ আলাদা, বরেও দুস্তর ফারাক। তবে দেখ, উভয়েরই বেদনাশা বটের তলায় তিন সখীতে এক ভাবের ভাবিনী।

সবখানে সবই আছে; সমাজ শিক্ষা ভেদ। কিন্তু তার ওপরে আরো কিছু আছে, সেখানে কোন কিছুতেই ফাঁক ফারাক থাকে না। সে তুমি বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই এস কিংবা পাড়াগাঁয়ের পাকশালা থেকে। সেই যে এক চিরন্তনের খেলা আছে, কালো ধলো রাঙা হরিৎ সকল নদী সাগরে গিয়ে মেশে সেই রকম। সেই এক চির মেয়ে, এক অগাধে যেয়ে মেশে। তখন আর আলাদা করে চেনা যায় না। এখানে এই বেদনাশা বটের তলায় সেই চির প্রকৃতির খেলা।

এর মধ্যেও একটা সুর বেজে যায়। যে যা-ই বলুক, হাসুক কাঁদুক রাগুক, সব মিলিয়ে একটা সুর বেজে ওঠে। বেসুরের আঘাত লাগে না। যে অচিনের খোঁজেই ফিরি, ফেরার তালে, যতই দ্বিধা সংশয় ভয় বিরক্তির দোলা লাগুক জানি যাব 'আপন দেশ্-এ।' ফকির যেমন তার মুরশেদের দেশ্-এ যায়, তেমনি আমার নিজের দেশ্-এ। কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যাব এই সুরটুকুও। কোথাও একটু থেমে ঝুলি ঝাড়া দিলেই এই সুরটুকু বাজবে মনের কোণে। সেইটুকু আমার প্রাপ্য। তবু ওরা তিন সখীতে যখন হাসে তখন নিচু স্বরে বিন্দুকে না বলে পারি না, 'তা বলে এমন একটা নাম দিলে?'

বিন্দু অমনি আমার কাছে এসে কানের কাছে মুখ এনে বলে, 'রাগ কইরলে বাবাজী?'

বলি, 'না, লজ্জা পেলাম।'

বিন্দু আমার ঘাড়ের কাছে আলতো করে একটি চাঁটি মারে। ফিসফিস করে বলে, 'দূরে ছাই, তোমাকে কিছু বইলছি নাকি? যাকে বলার, তাকেই বইলছি, তোমার নাম দিয়ে বইলছি। তোমার লজ্জার কী আছে।'

বিন্দুর সঙ্গে আমার চোখে চোখ মেলে। দৃষ্টিতে তার অনুসন্ধিৎসা একটু বা কটাক্ষে কোপ, কিন্তু কৌতুকে নিবিড়। গলার স্বরে সান্ত্বনার আভাস। এ সময়ে সেই কথাটা মনে হয়, স্ত্রিয়শ্চরিত্রম্'। বিন্দুকে যেন একটু ছলনাময়ীই মনে হয়। ভোলাতে চায় নাকি আমাকে।

তারপর আবার চুপিচুপি বলে, 'তবে বাবাজী, কিন্তু দিদিও একেবারে মইজেছে গ, উয়ার আর কিছু নাই।'

আমি হাত জোড় করি না বটে। অসহায় করুণ চোখে বিন্দুর দিকে চাই। বিন্দু তাড়াতাড়ি বলে, 'আচ্ছা, বইলব না বাবাজী, বইলব না।'

বিন্দু হাসে। নিশ্বাসও পড়ে সেই সঙ্গে। নিশ্বাসের বাষ্প জমে আমারও। তবু যেন কৃতজ্ঞতা বোধ করি বিন্দুর কাছে।

ইতিমধ্যে গোপীদাস আসর থেকে উঠে আসে গাছতলায়। এসেই দু হাত বাড়িয়ে দেয়, হাঁটু পেতে বসে। আমি তার হাত ধরতে যাবার আগেই মোটা কাঁথার

আলখাল্লা সহ বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে। তার দাড়ি আমার মুখে লেগে যায়। দাড়িতে মুখে স্পষ্ট গাঁজার গন্ধ। তা হোক, তার এই ব্যগ্র আলিঙ্গনে মনটা টলটলিয়ে ওঠে। হঠাৎ মনে হয়, গোপীদাসের পায়ে হাত দেওয়া উচিত ছিল আমার। কিন্তু লজ্জা করে। আমি যে আমাকে ছাড়াতে পারি না। নিজেকে ভুলতে পারি না। তাই নানা লজ্জা, নানা সঙ্কোচ।

সে বলে, 'জয় গুরু, জয় গুরু, ভাল ত বাবাজী।'

বলি, 'ভাল।'

'তখন থেক্যে দেইখছি আর ভাইবছি, কখন বাবাজীর কাছে যাব। আনন্দে ছিলে ত বাবাজী? আনন্দে থেক্য, খালি আনন্দ।'

তার ঘড়ঘড়ে গলায় আবেগ। তার আনন্দের স্বরূপ কী, জানি না। তাকে যেরকম সদানন্দ মনে হয় তেমন কি আমি হতে পারি? আমার সে মন নেই। কিন্তু তার কথার মধ্যেই যেন একটা আনন্দের সুর বাজে, অনুভবে বাজে। বলি, 'আপনি ভাল আছেন তো?'

'ভাল, ভাল বাবাজী। কিন্তুন "আপনি আজ্ঞে" ক্যানে গ, উটি কর্যো না।'

ঝিনি এমন করে আমাদের কুশল জিজ্ঞাসার ছবি দেখে যেন মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ। যেন ওর চোখেও একটা আকাঙ্ক্ষা।

গোপীদাস আলিঙ্গন ছেড়ে আমার হাত ধরে বলে, 'তব্যে বাবাজী, দিদিমণিদের সাথে আমার কথা নাই। ওঁয়ারা আমাদিগের আখড়ায় আসেন নাই। ক্যানেই বা আইসবেন। আমাদিগের হল্য গরীবের আখড়া। ই ভাঙা পোড়োতে কোন রকমে একটুক জোড়াতালি দিয়ে লিয়েছি। ইথানে দিদিমণিদের আসা চলে না।'

ঝিনি কয়েকবারই গোপীদাসের কথার মাঝখানে কথা বলবার চেষ্টা করে। বাউল বুড়োও তেমনি। এক দমে বলে যায়। ঝিনি বলে ওঠে, 'এটা ঠিক বললেন না গোপীদাস বাবাজী। আপনাকে তো এসেই বলেছি, আমার উপায় ছিল না।'

ব্যাপারটা এখনো আমার বোধগম্য না। লিলি ঝিনি বিশেষ কোন জায়গায় এসে উঠেছে নাকি? প্রথম থেকে আমার ধারণা, আমার মতই মেলায় চলে এসেছে। তারপরে যেমন সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, সেইরকম একত্র হওয়া। আমি ঝিনি লিলির দিকে তাকাই।

গোপীদাস বলে, 'সি ত আমার কপালের দোষ গ ঝিনুদিদি। নইলে মদনের আখড়ার খোঁজ মেলে কলকেতায় বস্যে, ই বুড়ার কথা মনে থাক্যে না।'

আমি জিজ্ঞাসু চোখে ঝিনির দিকে তাকাই। ও একটু লজ্জা পেয়ে বলে, 'আমাদের ইস্কুলের এক মাস্টারমশাই মদন বাউলের আখড়ার খবর দিয়েছিলেন। চিঠিপত্র লিখে আগে থেকেই যোগাযোগ করেছিলেন, সেই সূত্রেই অন্য আখড়ায় উঠেছি। কোন ঠিক ছিল না তো, হঠাৎ—'

আর বলতে দেয় না গোপীদাস। বলে, 'বুইঝলে বাবাজী, সি খোব বড় আখড়া বড় মানুষের আখড়া। বাঁকুড়ার মদন বাউলের যে মেলাই নামডাক। কত বড় বড় লোক ওঁয়ার শিষ্য সাবুদ, জজ ম্যাজিস্টর উকিল বেস্তর। উই পশ্চিমে গেল্যেই দেইখতে পাবে অজয়ের পাড়ে পেকাণ্ড তাঁবু খাটিয়েছে। কত লোকজন বাতি, অষ্টপ্রহর চুলা জ্বইলছে, রান্না হইলছে। তাই সি কী বল্যে গ, আহ্ হুঁ হুঁ, মায়িক্ মায়িক্। সব সোমায় মায়িক বাইজছে...।'

এবার কথার মাঝে বিন্দু বলে ওঠে, 'কিন্তুন গোঁসাই মদন মস্ত বড় সাধক বাবা।'

গোপীদাস তাড়াতাড়ি কান মুলে জিভ কাটে। বলে, 'অই, সি কথা কি বইলতে

গোপীদাস সস্নেহে হেসে বলে, 'সে ত হবেই গ দিদিমণি। কত লোক এসেছে হাজার হাজার।'

তারপরে বিন্দুকে বলে, 'যা মা, সব্বাইকে নিয়ে যা। বাবাজী আর দিদিদেরও নিয়ে যা।'

আমি ঝিনি আর লিলির দিকে ফিরে চাই। ঝিনি আমার দিকে চেয়ে ছিল। চোখাচোখি হতে চোখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় লিলির দিকে। লিলি জবাবে বলে, 'হাতে-মুখে একটু জল দিতে ইচ্ছে করছে। তোয়ালে সাবান, সব তো সেখানে রয়েছে। তোর ইচ্ছে করছে না চোখে-মুখে জল দিতে?'

ঝিনি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। বিন্দু বলে, 'আবাং তবলে দিতে পাইরব ভাই। তবে জল দিতে পাইরব আমাদিগের আখড়ায়।'

লিলি বলে, 'তার জন্যে নয়। সারা-দিনের এই জামাকাপড়গুলো ছাড়তে ইচ্ছে করছে। সেই তো কোন সকালে নদীতে স্নান করে পরেছি। এর পরেও তো সারা রাত আছে।'

লিলির কথা শেষ হবার আগেই আমার

কানের কাছে ঝিনির নিচু স্বর বাজে, 'খুব ক্লান্ত নাকি? অনেকক্ষণ বিশ্রাম নেবে?'

বলি, 'না। আমারও একটু চোখে-মুখে জল দেবারই ব্যাপার।'

ঝিনি বলে ওঠে, 'আমাদের থেকে তো ক্লান্ত নন মশাই। যান হাত-মুখ ধুয়ে নিন গে, তারপরে আমাদের ওখানে আসুন।'

'আপনাদের আখড়ায়?'

'ওই যাই বলুন। কেন নিষিদ্ধ জায়গা নাকি?'

'তা নয়, জানাশোনা নেই—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই ঝিনি বলে ওঠে, 'আমরাই আসব, তুমি থেকো।'

তার কী প্রয়োজন জানি না। ঝিনি বলে ওঠে, 'তুই আর মেয়েদের ইজ্জত কিছু রাখলি নে ঝিনি। উনি আসতে পারবেন না?'

বিন্দু বলে, 'পারবে কোনদিকে আমি দিতি দেইখতে হবে ত। তোমাদিগেরই আইসতে হবে। আমাদিগের আখড়ার মান নাই ক্যানে? এস বাবাজী।'

বিন্দু ওদের দিকে নিঃশব্দ হাসি ছড়িয়ে দিয়ে প্রায় আমাকে ঠেলে নিয়ে যায়। ওরা হেসে চলে যায়। গোপীদাস ইতিমধ্যে আবার আসরে গিয়ে বসেছে। যেদিকে গানের আসর তার পিছনদিকেই ভাঙা পোড়োর ঘর। তার দেওয়াল আছে তো ছাদ নেই। ঘরের মেঝে বলে কিছু নেই। তাতেই বেড়া বেঁধে খড়ের আচ্ছাদন করে সাময়িক আশ্রয় তৈরী করে নেওয়া গিয়েছে। দরজার কোন পাল্লা নেই। এখানে তার দরকারও নেই। পিছনের উঠোনে ত্রিপলের ঢাকনা দিয়ে রান্নার ব্যবস্থা। সেখানেই দেখা যায় নিতাইকে। নিতাই ছাড়াও দু-তিনজন রয়েছে। তার মধ্যে একজন স্ত্রীলোক। সেখানে হ্যারিকেন ছাড়াও মোটা শাঁইয়ের লম্ফ জ্বলছে। ঘরের মধ্যে হ্যারিকেন। খড় বিছিয়ে তার ওপরে শতরঞ্চি পাতা। এই শীতের মধ্যে ব্যবস্থা মন্দ না।

পাশে আর একটি ঘর আছে। সেখানেও টিমটিমে আলো। বিন্দু আমার ঝোলা নিয়ে পাশের ঘরেই যায়। বলে, 'ঝোলাটো ই ঘরেই রইল। আশ্রমের জিনিসপত্তর সব ই ঘরেই রইয়েছে।'

তারপর সে এদিক-ওদিক ফিরে, কুসুমকে ডাকাডাকি করে। তার কোন সাড়া পাওয়া যায় না। আমি বলি, 'তাকে যে গাছতলাতেই দেখেছিলাম।'

বিন্দু হতাশায় ঘাড় নেড়ে বলে, 'উয়ার কথা আর বল্য না বাবাজী, আমার হাড়-মাস কালি করো খেলো সি বিটি। কখন কোথা যেইছে না যেইছে বুইঝতে লাইরছি। উ এসেই ত আমাকে বইললে, তোমাকে নাকি কোথা থেকো ধরো লিয়ে আইসছে।'

'হ্যাঁ, কুসুমের সঙ্গেই আমার প্রথম দেখা হয়েছে। কাশীনাথ আসে নি?'

'আস্যে নাই আবার! সিই ত জ্বালা বাবাজী। দুটোতে কাক চিল বইসতে দিচ্ছে না, ঝগড়া ঝগড়া ঝগড়া।'

আমি হেসে ফেলি বিন্দুর কথা শুনে। বিন্দু বলে, 'হাইসছ কী বাবাজী, আমি যে আর পারি না। কুসিরও বলিহারি! আজ দুপুরে কী মারটা মেরেছে কাশী কুসিকে! তবু কি লজ্জা আছে ছুঁড়ীর? দ্যাখ যেইয়ে, দুটোতে কোথাও বেড়াল্ছে, নয় ত কাশী লুকিয়ে কোন আসরে যেইয়ে গাঁজা টাইনছে, কুসি খুঁজ্যে মইরছে।'

তবুও আমার হাসি দমে না। সামনের প্রাঙ্গণে আসরে গোকুলের গলায় গান শুনতে পাচ্ছি। চারদিকেই গানের সুর। নানান যন্ত্রে, নানা স্বরে, বটতলার বিশাল প্রাঙ্গণ মুখরিত। তার মাঝখানে কাশী আর কুসুম এক বিচিত্র খেলা খেলে চলেছে। ওদের নাম গান নেই, ভজনসাধন নেই। চারদিকে আখড়ায় আশ্রমে সকলের কত কাজ। সে দায়দায়িত্ব নেই ওদের। চারদিকের এই ডামাডোলে ওরা আপনাতে আপনি মত্ত। সেও যেন এক সাধন, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এতে যে কোন্ রসিকের ভজন হচ্ছে কে জানে। মনে হয় কোন্ এক অদৃশ্যে বসে কে যেন মিটিমিটি

হাসে চোখ চিকচিক করে। অলক্ষ্যে তার দৃষ্টি ফেরে কাশী কুসুমের সঙ্গে।

বিন্দু বিরক্তিতে হেসে বাজে। আবার বলে, 'সত্যি, দুটোকে নিয়ে আর পারি না।'

আমি বলি, 'ওরা আপন মনে আছে।'

'হাই, তা থাইকলে ত বাঁচা যেত। জ্যাথ ক্যানে, হাঁকডাক পেড়ো এল্য বল্যে। হ্যাপা যত আমার। আসুক, কাশী কুসি, একজনও নালিশ কইরতে আসুক দুটোকেই আমি ইবারে দুচ্চার ঘা লাগাব।'

বলে, ঘাড়ে একটা দোলা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। রোষের মুখেও একটু হাসি তবু লেগে থাকে। তাতে বোঝা যায়, দুচ্চার ঘা দেবার মত হাতের বা মনের জোর তার নেই।

তারপরে বিন্দু আমাকে পিছনের উঠোনের এক পাশে নিয়ে যায়। সেখানে জল ছিল। হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে আসতেই নিতাই এসে 'জয় গুরু' দেয়। আসল কাজের লোক সে-ই। মাটির ভাঁড়ে করে গরম চা খাওয়ায় সে। গুড়ের চা, একটু হলুদের গন্ধও আছে। তা হোক। গরম পানীয় তো। এই শীতের রাত্রে তা-ই বা কে দেয়। নিতাইয়ের হাতের চা একটু হলুদের গন্ধই বা না হবে কেন। হলুদ রঙের হাত দেখেই বোঝা যায়, বাটনা তাকেই বাটতে হয়েছে।

ইতিমধ্যে বিন্দু রান্নার দিকে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার মধ্যেই ডেকে বলে, বাবাজী, একটুকু বস, ইদিকে দেখ্যে যাই।'

এ যেন অনেকটা যজ্ঞিবাড়ির গিন্নীর ব্যস্ততা। তার ওপরে অনেক দায়িত্ব। হয়তো খিচুড়ি, একটা পাঁচ মিশেলি তরকারি, একটু বা ভাজাভুজির আয়োজন। তবু খাবে হয়তো অনেক লোকে। প্রকাণ্ড মাটির উনুনে আর হাঁড়ির আকৃতি দেখে তা-ই মনে হয়। বিন্দুর ব্যস্ত না হয়ে উপায় কী। তবু সে নিতাইকে আমার কাছ থেকে ডেকে নিয়ে যায় না। আমিই বলি, 'আপনি যান, কাজ করুন গে, আমি বেশ আছি।'

'বিন্দুঠাকরুন রাগ কইরবে।'

'রাগ করবে না। বলবেন, আমি বলেছি। আমি একটু একলা থাকি ততক্ষণ।'

নিতাই উঠতে উঠতে হঠাৎ কেমন কাচুমাচু মুখ করে শরীর বাঁকিয়ে হাসে। হাত বাড়িয়ে বলে, 'তবে আপনার ঐ বস্তু একটো দেন খাই।'

কী বস্তু? অবাক হয়ে তার দিকে তাকাতেই সে আর একটু সলজ্জ হেসে গলে। ঠোঁটের ওপর দু' আঙুল রেখে ধূমপানের ভঙ্গি করে বলে, 'অই বস্তু।'

অর্থাৎ সিগারেট। আমি তখন সিগারেট ধরিয়েছি। আমারই ভুল, আমারই সাধা উচিত ছিল। তবু এই মুহূর্তে ইছামতীর বুকে অধর মাঝির নৌকায় মামুদগাজীর কথা আমার মনে পড়ে যায়। সিগারেট আর দেশলাই এগিয়ে দিই। তখুনি নিতাইয়ের চলে যাবার লক্ষণ না দেখে জিজ্ঞেস করি, 'আপনিও বাউল তো নিশ্চয়?'

নিতাই জিভ কেটে তাড়াতাড়ি বলে, 'আমি কিছু না বাবাজী। আমাকে আপনি আজ্ঞা কইরবেন না। আখড়ায় থাকি, কাজ কম্মো করি। আর কিছু না।'

বলে নিতাই মাথা নিচু করে হুস্ হুস্ সিগারেট টানে। কী যেন ভাবে, কী যেন বলি বলি করে বলতে পারে না। তারপরে হঠাৎ বলে ওঠে, 'আমি আজ্ঞে আসলে—কী বইলব বলেন, দাগী চোর ছিলাম।'

দাগী চোর? বলে কী লোকটা! অবাক অবিশ্বাসে নিতাইয়ের দিকে দেখি। তার

মুখ তেমনি নিচু, কিন্তু মুখের চামড়া কাঁপে। যেন অনেক কথার তরঙ্গ। কিন্তু গোকুলদাসের আখড়ায় দাগী চোর, ব্যাপার বুঝতে পারি না।

নিতাই নিজেই বলে, 'আপনাকে বইলতে ত বারণ নাই, আপনি হলোন গোকুলদাস বিন্দুঠাকরুনের নিজের লোক। আমি জেলখাটা দাগী চোর ছিলাম। সিঁদেল চোর।'

এলিয়ে বসেছিলাম। সোজা হতে হয়। জিজ্ঞেস করি, 'জেল খাটাও হয়েছে?'

'আজ্ঞে হ্', তা দু' দফায় তিন বছর। তারপরে ই দুনার পাল্লায় পড়্যে দশ বছর আর উ কাজ করি নাই।'

'কেন?'

'তা কী জানি বাবাজী। আমিও ত শিউড়ির মানুষ, ইয়াদের কাছে একটুক-আধটুক আসা-যাওয়া ছিল। যিখানেই যেত্যেম, সব্বাই দূর দূর কইরত। তা কইরবে বটে, চোরকে আবার বইসতে দিবে কে! কিন্তুন গোকুল বিন্দু কোনদিন তাড়ায় নাই। উ ত দূরের কথা, বিন্দু আবার বইসতে দিত। ক্যানে, ইয়াদের কি ভয় নাই? ভাইবতাম, মনে মনে ভাইবতাম। জিগেসাও কইরছি, "চোর বল্যে মনে কর না নাকি, খাতির কর্যে বইসতে দাও যে?" বলে, "তা যিখানে চোর আছ, সিখানে চোর আছ, আমাদিগের কী।" "ক্যানে, তোমাদিগের ঘরে চোর করতে পারি ত।" "পার, কইরবা। আমাদিগের কী চুরি কইরবা নিতাই, কী আছে। পিতল-কাঁসার কিছু বাসনপত্তর, মরাইয়ের দু-চার মন ধান। আর কী লিবে? তা সি ও তুমি এখনই লিতে পার, পিতল-কাঁসা ছাড়াও লোকের চলে! ঘরে ভাত না থাইকলে ভিক্ষে কইরতে যাব।" কথাটা যে মিথ্যা বইলত তা লয়। আমাকে বসিয়ে রেখ্যে দুজনায় নিজের নিজের কাজে যেত্য। ইচ্ছা কইরলে চুরি কইরতে পাইরতাম। তা ইচ্ছাই হত্য না।'

প্রায় নিবে আসা সিগারেটে পর পর কয়েকটা টান দেয় নিতাই। মুখ এখনো তার নিচু। আর আমি এক অদ্ভুত কথা শুনি। 'সে আবার বলে, 'তা কেউ যদি আমার হাতে ধন তুল্যে দিয়ে বলে, লাও হে চুরি কর, তা কি হ-য় বাবাজী! গোকুল-বিন্দুকে লোকে সাবধান কইরত, নিতাই চোরে একদিন উয়াদের পথে বসিয়ে যাব্যে। তাতেও ভয় ছিল না। উলটে কী হল্য জানেন বাবাজী, দেখি গোকুল বিন্দু আখড়া ছেড়্যে, শিউড়ি ছেড়্যে, কোথা কোথা চল্যে যায়, আর আমিই আখড়া দেখাশুনা করি। তখন গোয়াল গরু দেখি, না আখড়ার ঘর দোর সামলাই, না গাছপালা, মাচা মরাই দেখি। তার উপরে অই কুসি বিটি, সিটি ত একটুক। উয়াকেই বা কে দেখে। শুধু কি তা-ই, কেউ এল্যে তার সেবাযত্ন করা, বসানো খাওয়ানো। আও ঠাস্যা, কখন সিঁদ কাইটতে যাব বলেন!'

সে হাসতে হাসতে এবার আমার দিকে চোখ তোলে। দেখি, তার চোখ দুটো কেমন আরক্ত। একেবারে শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটের অঙ্গার, সে অনায়াসে দু' আঙুলে টিপে নিবিয়ে ফেলে। যেন ওটা আগুনই না। আমার কথা কখন বন্ধ হয়ে যায়। আমি যেন এক অবিশ্বাস্য আশ্চর্য কাহিনী কেবল শুনি।

নিতাই হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'একদিন বিন্দু বল্যেছিল, "দ্যাখ নিতাই চুরি যদিন কইরতে হয় ত একটা জিনিস কইরবে, তার কোন মার নাই।" কী জিনিস? না, বইললে, "মন!"'

বলে নিতাই আবার নিঃশব্দে তার শক্ত পেশীবহুল শরীরটা কাঁপিয়ে হাসে। হাসিতেই তার চোখ দুটো প্রায় ঢেকে যায়। বলে, 'বাবা রে, সি কি আমার কম্যো, বলেন ত বাবাজী। বসেন, উদিকে একটুক দেখ্যে আসি।'

সে চলে যায়। আর নিতাইয়ের মুখের ওপরেই গোকুল বিন্দুর মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এই যুগল রূপকে আমার ভাল লেগেছিল। সেই ভাল লাগাটা নিতান্ত চোখ ভরানো। নানুর থেকে শিউড়িতে ফিরে আসা সেই রাত্রেও তা-ই। কিন্তু এমন মুগ্ধ বিস্ময়ে মন ভরে যাওয়া না। এখন জানি, এ যেমন তেমন যুগল না। আপন অন্বেষণে আছে।

আর নিতাই। চোরের রাণী বিন্দু যে সিঁদকাটি তার হাতে তুলে দিয়েছিল তার কী গতি। সে কি কেবল সিঁদ কেটেই চলেছে? না কি মনের ঘরের খোঁজ খবর কিছু পেয়েছে? কে জানে।

এত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ সামান্য শব্দে চমকে উঠে দেখি দরজায় দুই সখী দাঁড়িয়ে। লিলি আর ঝিনি। বেশবাসে এমন কিছু অদল-বদল নেই। পশমী শাল এবং কোট, দুই-ই আছে। তবু যেন নতুন দ্যুতিতে ছটা লাগানো। রঙ ঝলকানো।

আমার সঙ্গে ওদের চোখাচোখি হতেই ওরা পরস্পরের দিকে তাকায়। তারপরে

লিলি আমাকে খুব নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যাপার মশাই কিসের স্বপ্ন দেখছেন?'

অবাক হয়ে হেসে বলি, 'না, স্বপ্ন দেখি নি তো।'

লিলি আমার চেয়ে বেশী অবাক হয়ে বলে, 'তা-ই নাকি? আমরা তো ভাবলাম আপনার বাহ্যজ্ঞান নেই। কখন থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছি আপনার কোন চৈতন্যই নেই।'

বলি, 'তা নয়, একটা কথা ভাবছিলাম। এইমাত্র শোনা একটা কথা।'

লিলি ঝিনি চোখাচোখি করে। ঝিনি জিজ্ঞেস করে, 'কী কথা?'

'এদের আখড়ার নিতাইয়ের কথা।'

লিলি তাড়া দিয়ে বলে, 'আচ্ছা, সে কথা শুনব, এখন উঠুন তো, চলুন।'

'কোথায়?'

'যেখানে খুশি। যেখানে আমরা যাব সেখানেই। আজ সারা রাত্রি আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন।'

'আঁ?'

'হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ। আসুন।'

ক্রমশঃ

আলোয় কালোয়

ত্রিশঙ্কু

—"যিশু, তোমাকে যাহারা ভালোবাসে না, তাহাদের হইয়া আমরা তোমাকে ভালবাসি"—একটি গাছের নিচে জড়ো হয়ে প্রার্থনা করছে তিন-চারটি ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে। তিন থেকে পনেরো বছর বয়সের মধ্যে সবাই। সিস্টার মার্গারেট মেরী বললেন, প্রত্যেকে এরা [illegible] নয়। [illegible]—এই ভাষা সবাই বলছে। তিন বছর বয়সের নিচে আরো চল্লিশটি শিশু আমাদের শিশুভবনে এই মুহূর্তে আছে।

এদের চোখ-নাক-মুখ, হাত-পা, স্বাস্থ্য-উচ্চতা সবই আমাদের ছেলেমেয়েদের মতো স্বাভাবিক। শুধু ভালোবাসাটা হয়ত অন্যদের চেয়ে একটু বেশী। তা না হলে [illegible] প্রেম-মমত্বহীন মানুষের হৃদয় থেকে ওরা কেমন সাহসে যিশুকে ভালোবাসা জানায়। কিংবা হয়তো প্রচণ্ড অভিমান চাপা আছে ওদের মনে—সেই সব পুরুষ ও রমণীদের বিরুদ্ধে অভিমান, যারা ওদের জন্ম দিয়েও সব কিছু থেকে বঞ্চিত করেছে। বড় হয়ে ওরা বুঝবে, দুজন স্ত্রী-পুরুষের [illegible] থেকে জন্মালেই মানুষের অধিকার পাওয়া যায় না। সমাজের অনুশাসন [illegible] শাসনের সুরে চিৎকার করে, বিবাহিত হওয়া চাই, নইলে জন্মদানের অধিকার নেই।

এত খবর ওদের জানার কথা নয়। যখন জানবে, তখন স্বীকার করবে কিনা তা-ও জোর করে বলা যায় না। শুধু সত্য এইটুকু, পৃথিবীতে হাজির হয়ে ওরা খুব ঠকে গেছে।

এদের দেখলে সেই সব পরিচয়-গোপনকারী বাপ-মায়েদের প্রতি ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক। সেই সব দুর্বল ভীতু মানুষদের চুলের মুঠি ধরে টেনে আনতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু সিস্টার মেরী মার্গারেট রাগ করেন না। এক-এক বয়সে, বিশেষ বিশেষ পরিবেশে মানুষ ভুল করে। ভুল বুঝতে পারলে অনুশোচনা হয়। অনুতপ্ত মানুষদের ঈশ্বর ক্ষমা করেন। আর যারা নির্দোষ নিষ্পাপ, তাদের জীবন থেকে গ্লানি মুছে দেবার দায়িত্ব সকলের।

—কী করে পালন করেন আপনারা শিশুদের?

—শিশুদের পালন করার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে আমাদের, অনেক জায়গায়। ডাক্তার আছে, সেবিকা আছে, আর আমরা মিশনের কর্মীরা আছি। পরিত্যক্ত শিশুটির পারিপার্শ্বিক অবস্থা জানার উপায় থাকলে আমাদের সুবিধে হয়। ওর ভাষা ও ধর্ম স্থির করে ফেলি। তারপর আমরা আদালতে একটা জন্ম-তারিখ ও পদবী দিয়ে দিই। শিশুটি সামাজিক পরিচয় পায়। অবশ্য এগুলো করতে লাগে আর একটু পরে—যখন স্কুলে ভর্তি করার সময় হয়। তার আগে, তিন বছর বয়সের মধ্যে এরা অনেকেই নানান পরিবারে জায়গা পেয়ে যায়।

একটু আশ্চর্য হই। এদের গ্রহণ করার মতো লোকও আছে!

—অসংখ্য। সিস্টার মেরী হাসলেন। ঈশ্বর ওদের এনেছেন, ঈশ্বর ওদের ব্যবস্থা করেন ঠিকই। আমার কাছেই তেইশটি শিশুর জন্য ওয়েটিং-লিস্ট-এ নাম আছে। নিঃসন্তান পরিবার পোষ্য নিতে ইচ্ছুক, আমাদের কাছে দরখাস্ত করেন। দরখাস্ত যা পাই, তার অর্ধেক বিদেশ থেকে। এবং বিদেশীরা কোনোরকম বাছবিচার করেন না। ভারতীয়রা মেয়ের চেয়ে ছেলে বেশী চান।

'যিশু, তোমাকে যাহারা ভালোবাসে না, তাহাদের হইয়া আমরা তোমাকে ভালবাসি"

ঘরে বাইরে

শ্রীমতী উদয়কুমারী দুধোরিয়া

সপ্তাহ দুয়েক আগে আমরা মহিলা জে পিদের কথা আলোচনা করেছিলাম। লেখা পাঠাবার পর আরও দুটি কর্মী জে পির পরিচয় পেলাম। সকলের সম্বন্ধে বলা হয়তো সম্ভব হবে না কিন্তু এ'দের কথা একটু না বলে পারছি না। প্রথমে শ্রীমতী উদয়কুমারী দুধোরিয়া আমাকে তাঁর

উদয়কুমারী দুধোরিয়া

বৈশিষ্ট্যে প্রভাবিত করেছেন। তিনি ব্যবসার জগতের মেয়ে। ব্যবসায় অর্থাৎ পারিবারিক বা স্বামীর ব্যবসায়ের আরাম ও প্রাচুর্যের অংশীদার মাত্র নন, তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 'সুমন মেশিন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী' একটি মেশিনটুল ফ্যাক্টরী। নিজের ব্যবসার বেশ দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন। আজ তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়স, অভিজ্ঞতা অনেক কিন্তু এই ফ্যাক্টরী উদয়কুমারী বেশ কয়েক বছর আগেই আরম্ভ করেছেন। ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণের সময় বছর দুই সমানে তাঁর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ লভ্যাংশ ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা সাহায্য তহবিলে দান করেছেন।

শ্রীমতী উদয়কুমারী বারানসীর সম্ভ্রান্ত জৈন পরিবারের কন্যা। কিন্তু এখন বাংলাদেশই তাঁর ঘর। স্বামী কমল সিং দুধোরিয়া কলকাতাবাসী কিন্তু আদি নিবাস মুর্শিদাবাদে। বাংলাদেশের নবাবী আমলে উত্তর ভারতের যে সব পরিবার বাংলাকে একেবারে আপন করে নিয়েছিলেন এবং কর্মসূত্রে বা ব্যবসায়সূত্রে কয়েক পুরুষ এখানেই কাটিয়েছেন দুধোরিয়ারা তাঁদের একজন। শ্রীমতী দুধোরিয়া ব্যবসার ভিন্ন কিছু সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। জৈন মহিলা সমিতি, মঞ্জুশ্রী, অল ইন্ডিয়া মারওয়াড়ী ফেডারেশন-এর মহিলা বিভাগের প্রেসিডেন্ট।

শ্রীমতী মনোরমা গুপ্ত

নিউ আলিপুরস্থ জে পি শ্রীমতী মনোরমা গুপ্ত বলেছেন তিনি জাস্টিস অফ দি পিস হবার খবর পেয়ে নাকি দারুণ আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। "একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে খবর পেলাম...আমি অতি সাধারণ মানুষ..." ইত্যাদি তাঁর বিনীত মনের ভাব। তবে আমরা জানি তিনি কর্মী মহিলা। সরকার কিছু ভুল করেন নি। সরকার ভুল করেন না এমন নয়। পিনাল কোড যেমন আইনসৃষ্টির গোড়া থেকেই গোলমেলে, রামের অপরাধে শ্যামের মাথা ভাঙে, সরকারের প্রসাদের ভিতও তেমনি জটিল, বিতরণের ব্যাপারে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। যাই হক শ্রীমতী গুপ্ত কাজের মানুষ বলেই সরকারের স্বীকৃতি এসেছে। আর যদি তিনি বলেন তিনি সাধারণ ও সামান্য কর্মী, তবে আমরা আরও বেশী করে অভিনন্দন জানাবো। অসামান্যদের যুগ এখন ইতিহাস। সামান্য মেয়েরাই গড়ছে আজকের সংসার। হেলেন কেলার বলেছেন :

"The world is moved along not only by the mighty shoves of its heroes but also by the aggregate of the tiny pushes of each worker.

জগৎ এগিয়ে চলে। কেবল মাত্র বীরের বড় বড় ধাক্কায় নয়, প্রত্যেক কর্মীর ছোট ছোট ঠেলায়ও। আমরা আরও একটু বেশী মূল্য দেবো সাধারণ কর্মীদের। তারাই সত্য কর্মী, অসাধারণ হবার সাধে তাদের ঘূরপাক খেতে হয় না।

শ্রীমতী গুপ্ত ছেলেবেলায় ভালভাবে লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছিলেন বাপ-মায়ের উৎসাহে ও সাহায্যে। মা ছিলেন গুণী মহিলা। সেকালের যে সব গুণী মা'রা সাজানো সংসার গড়তে জানতেন, তাঁদের

মনোরমা গুপ্ত, J, P,

একজন। ১৯৩৪ সালে বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে সসম্মানে বি-এ পাস করার পর তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহোত্তর জীবনে স্বামীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন সমাজ-কল্যাণ কাজে উৎসাহ। ১৯৩৪ সালেই তাঁর কর্মস্থান আসানসোলে শ্রীমতী গুপ্ত মহিলা সমিতির সম্পাদিকা হন ও একটি অবৈতনিক শিশু-বিদ্যালয় স্থাপনা করেন। পরবর্তী জীবনে

A I W C-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে শ্রীমতী গুপ্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন।

শ্রীমতী মনোরমা মনে করেন, দেশের অনেক দুঃখ আপনা থেকেই কেটে যাবে যদি শিক্ষাবিস্তার সহজ হয়। কর্মী মেয়ে ও পুরুষ সামান্য পরিশ্রম করলেই সমাজ-কল্যাণের এই দিকে অনেক বড় বড় কাজ করতে পারেন। আন্তরিকতা, দরদ ও আলস্য বর্জন সবার আগে প্রয়োজন। আশা তাঁর দরদী মানুষের সংখ্যা বাড়বে এবং সমাজের সকল দিকেই এগিয়ে চলায় তাঁদের সাহায্য আসবে। শ্রীমতী গুপ্ত সুপ্রতিষ্ঠিত স্বামীর ঘরণী, কৃতী পুত্রের জননী। ভাগ্যবতী সন্দেহ নেই। তবু তিনি বলেন, মধ্যবিত্ত জীবন তাঁদের। বিলাস বা আড়ম্বর নেই। আড়ম্বরকে বাদ দিয়ে কর্মী হবার প্রেরণা যদি তিনি আর পাঁচজনকে দিতে পারেন তবে সরকারের দেওয়া J. P. হবার চেয়েও বড় কথা হবে। জাঁক করে জাঁমিয়ে বসার প্রস্তাবের চেয়ে বিনীত, নম্র, সহানুভূতির দাম অনেক বেশী। সে কথা বুঝতে পারলে সমাজসেবাও তার অর্থে-সামর্থ্যে সেরা মহলে সীমাবদ্ধ থাকবে না।

একটি নতুন উপজীবিকা

সেই যে বিকেল চারটে বাজতে না বাজতে ছোট্ট একটি পেতে হাতে নাপিত-বউ এসে দাঁড়াতো, আমাদের পাঠিকাদের ক'জনের মনে থাকা সম্ভব জানি না। কিন্তু সেটি ছিল বড় সুন্দর প্রথা। পেতেয় থাকতো আলতার পাতা, ঝামা, নরুন, ছোট্ট একটি বাটি। আলতা গুলতে জল লাগবে তো। আপনি দিতেন পা ধোবার জলের ঘটি, গামছা, সাবানের টুকরো বা তেলটুকু এগিয়ে। বড় সংসার হলে মেয়েরা এসে বসে যেতো নাপিত-বউকে ঘিরে। একের পর এক আলতা পরা, ঝামা দিয়ে ঘষে-মেজে সাফ করা, শীতের দিনে ফাটলে তেল বুলিয়ে শেষ করা প্রায় আধুনিক ক্লাব-ঘরের রামি বা ক্যানাস্টা খেলার মত দরবারী চালে চলতো। নাপিত-বউ পানের রসে রাঙা-রসালো ঠোঁট মুচকে, কুচকুচে কালো চুলের চাপা খোঁপা হাত দিয়ে সামলাতে সামলাতে সারা দুনিয়ার কাহিনী বলে যেতো। পাশের বাড়ির বড় মেয়ে কেন শ্বশুরঘর করে না, জামদারবাবুর বর্তমানে কাকে মনে ধরেছে, সাকিনা বেগম কেন হঠাৎ হাওয়া হয়ে গেল, সব খবর তার নখদর্পণে। পেতেয় ভালরকম দু'-চার পয়সা দিলে তো কথাই নেই। চাইকি ঘটকীর কাজ-এর দায়িত্ব নিয়ে সে আপনার ঘরে আনাগোনা করবে। এ-যে শুধু বাংলা দেশেই এমন ছিল তা নয়, উত্তর ভারতেও "নায়িন" বা নাপতিনীরা হতো অঘটন-ঘটনপটিয়সী। "রিশ্‌তা" বা কুটুম্বিতার গুরুভার সামলিয়ে তারা কামাতো ভালরকম কিন্তু ঘরে ঢুকতো তারা গরবিনীদের খাস তদ্বিরে। পা ধুয়ে, নখ কেটে, মালিশ করে রূপসীদের মন কেড়ে নিত। নায়িন কেন ব্রাহ্মণ কন্যা পর্যন্ত মেহেন্দী লাগাতে। উৎসবের সম্ভাবনায় দলে দলে মেয়ে বসতো তার কাছে। পয়সা খরচ করে মেহেদীর বাহার। অল্প পয়সায় সাদা-মাটা, মনভরা দান হলে দু'টি হাত, দু'টি পায়ে দিন কেটে যেতে পারতো।

এতো গেল এক দিকের প্রসাধন-পর্ব। বাংলা দেশে সাঁঝের প্রদীপ জ্বালাবার আগে মেয়ে-বউ বসে যেতো চুল বাঁধতে। বাহার করে চুল বাঁধার খ্যাতি কারও থাকলে তার পদমর্যাদা হতো যথেষ্ট। কনে দেখাতে তার ডাক, বউ সাজাতে তার ডাক। মাথায় ফুল-কাঁটা চিরুনি, বেলফুলের হার, এমনকি রেশমী ফিতে দিয়ে বাহার তোলা হতো। মুখখানা মুছে, কপালে কাঁচপোকা বা সিঁদুরের টিপ দিয়ে মেয়েরা মুখের প্রসাধন শেষ করতেন। বড় ঘরে স্নানের সময় আর শখ থাকলে তেল-হলুদ মাখা আর সব ময়দা, বেসম বাদাম উপটান হিসাবে চলতো অবসর বুঝে। তাও কিন্তু বাইরে থেকে ডেকে আনা বিশেষজ্ঞ নয়, ঘরেরই কেউ হাত লাগাতেন সৌন্দর্য বর্ধনের কাজে।

সেই সেদিনের প্রসাধন-পর্ব আজ কেমন ভুলে-যাওয়া অধ্যায় হয়ে উঠেছে। ক্ষিপ্রগতি সভ্যতার তালে তাল মিলিয়ে গড়ে উঠছে কত রকমারি নতুন আয়োজন। নিত্যনতুন সংযোজনের প্রতিযোগিতায় একে অন্যকে টেক্কা দিতে ব্যস্ত। ম্যানিকিওর, পেডি-কিওর, facial ইত্যাদি প্রায় বৈজ্ঞানিক প্রতিশব্দের মত সচ্ছল সুন্দরীদের শব্দ-সংগ্রহে স্থান পাচ্ছে। পশ্চিমী প্রভাব সন্দেহ নেই। কিন্তু এমনভাবে আমাদের তথাকথিত সমৃদ্ধ ও শৌখিন সমাজকে করায়ত্ত করতে এ প্রভাবটি প্রায় কায়েম হয়ে এসেছে বলে স্বীকার করে নিতে হবে। "বিউটি পারলার"

বা রূপসাধনার বৈঠকখানা ডজনে ডজনে গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষের সব বড় শহরে। তাঁরা বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত শিল্পীর হাতে ছেড়ে দেন রূপপ্রার্থিনীদের। এ তো ঠিক চিত্রাঙ্গদার বরলাভ নয়। কাজেই সময় লাগে অনেক, পয়সা দিতে হয় প্রচুর। আমাদের আজকের চর্চা বিউটি পারলারের উপযোগিতা নিয়ে নয়। ঝিঙে-পটলের পয়সা বাঁচিয়ে, ছেলেদের স্কুলের টিফিন কেটে মায়েরা ভ্রূ ছাঁটিতে অথবা চুলে চটচটে আঠা ছিটিয়ে অজন্তার নকলে কায়দা করবেন কিনা সেটা সম্পূর্ণ অন্য বিষয়। ধরে নেওয়া যাক, যাঁরা পারলারপ্রবণ, তাঁরা পয়সার তোয়াক্কা করেন না এবং তাঁদের পয়সার যে নতুন ব্যবসায় গড়ে উঠছে, তাতে উপজীবিকা হিসাবে বহু মেয়ের নতুন "কেরিয়ার" হতে পারে। এ পর্যন্ত রূপদক্ষতা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এবং চীনে মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এখন ভারতীয় মেয়েরা ক্রমশ এগিয়ে আসছেন। বেশ ভাল উপার্জন, সম্মানজনক উপজীবিকা, কাজের দায়িত্ব বা শিক্ষাকাল এমন ভাবনাজনকও নয়।

মণিমালা শর্মা এমনি একটি রূপশিল্পী। মস্ত বড় হোটেল-সংলগ্ন এক পারলারের সম্পূর্ণ ভার তার। এখানে আরও একটা কথা বলে নি। পারলারগুলির মালিকানাও অনেক সময় মহিলাদের। মণিমালার মালিকও মহিলা। তবে তিনি মণিমালাকে প্রায় সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে নিজে কখনও আসেন খোঁজখবর নিতে। মণিমালা খুব সম্ভ্রান্ত রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের শিক্ষিতা ও সুন্দরী মেয়ে। গত বছর সে স্নাতক হয়েছে। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চমৎকার লাগছিল। সেই কথাবার্তার সামান্য একটু আপনাদের জানাচ্ছি।

প্রঃ। তোমার কবে থেকে beautician বা রূপদক্ষ হবার সাধ?

উঃ। প্রায় তেরো বছর বয়স থেকে। মেয়েরা সাধারণত নিজেরা সাজতে ভাল বাসেন, অপরকে সাজাতে আপত্তি থাকতে পারে না। অন্যকে পরিচর্যা করে সুন্দর করাও যে শিল্প, আমার ভাবতে ভাল লাগতো।

প্রঃ। এই উপজীবিকায় আয় কিরকম?

উঃ। খুব ভাল। বড় বড় প্রতিষ্ঠিত রূপসাধনাগারে মাসে পাঁচ-সাত শ' টাকা পর্যন্ত কর্মীরা পান। অন্যান্য সুবিধা অনেক, অবসর সময় নিজেদের উপরও চর্চা চালাই। অনেকক্ষণ কাজে আটকে থাকতে হয় বলে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও থাকে।

প্রঃ। শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তোমার কি মত?

উঃ। সবচেয়ে ভাল শিক্ষা হচ্ছে হাতে-কলমে কাজ করা। আজকাল নানা জায়গায় নানারকম শিক্ষার কথা শোনা যায়। বিদেশে তো বহুদিন থেকেই শিক্ষা চালু আছে। তবে সামান্য একটু নির্দেশনা মাত্র হলেই কাজের জন্য চাই নিষ্ঠা ও চেষ্টা।

মণিমালা শর্মা

প্রঃ। আচ্ছা, বিদেশিনীরা নিশ্চয়ই এখনও অনেক বেশীসংখ্যায় রূপচর্চায় আসেন?

উঃ। হ্যাঁ। আমার আন্দাজ হচ্ছে, ১০টি মক্কেলের সাতটি বিদেশী তো তিনটি ভারতীয়। তবে ভারতীয়রা যে সবাই ধনী সংসার থেকে আসেন এমন নয়। তাঁদের মধ্যে working girls বা অফিসে কাজ করা মেয়ে বেশী। অফিসের মেয়েরা নিজেদের বেশ দুরস্ত বা পরিপাটি রাখতে চান। বিদেশিনীদের মধ্যেও আসেন অফিস সেক্রেটারী, স্টেনোগ্রাফার ইত্যাদি।

প্রঃ। এসব প্রসাধনাগারের দক্ষিণা কি রকম?

উঃ। কি ও কতটা পরিচর্যা চান তার উপর নির্ভর করে এবং পারলারের মর্যাদা এ দাম দিতে হয়। নখ কেটে হাতের নখে রঞ্জনী লাগাতে দু' টাকাও লাগে আবার সাত টাকাও লাগে। তবে অন্যান্য কথা না ভাবলেও, সস্তার আকর্ষণে খেলো ব্যবস্থায় যাবার আশংকা থাকে। যদিও পয়সাই মানের শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি নয়।

প্রঃ। আচ্ছা, তুমি তো সচ্ছল সংসারের সুন্দরী, লেখাপড়া জানা মেয়ে। ধরে নিতে পারি তুমি অবিবাহিতা থাকবে না। এ উপজীবিকা কি বিবাহোত্তর জীবনে চালিয়ে যাবে?

উঃ। তাই তো ইচ্ছা আছে। কোন বিশেষ বাধা না এলেই হয়। এমনকি যদি কোন বড় শহরে, চালু একটি পারলারে কাজের সুযোগ না পাই, তবে নিজের বাড়িতে পারলার করতে পারি। কিছুই তো এমন দরকার হয় না। ছোট্ট একখানা ঘর নিজস্ব পেলেই অল্প-বিস্তর উপকরণ দিয়ে আরম্ভ করতে পারি। সময়টাও ইচ্ছামত ঠিক করে নিতে পারি। ঘরের অনেক দায়িত্ব সামলে কাজ করার অসুবিধা কম।

এখানে আমার পরিচিত এক বিদেশিনীর কথা মনে হলো। সুপ্রতিষ্ঠিত, ধনী পরিবারের মহিলা। কলকাতায় স্বামীর কর্মোপলক্ষে থাকতেন। হঠাৎ স্বামী অসুস্থ হওয়ায়, পারিবারিক আয় ব্যাহত হয়ে গেল। ছোট ছোট শিশুসন্তানের জননী তখন বিদেশে মাস তিনেক শিক্ষা গ্রহণ করে বিউটি পারলার খুললেন বাড়িতেই। ঘরের দেখাশুনো, স্বামী-তত্ত্বাবধান ও মক্কেলের কাজ-কর্ম একা হাতে করে যথেষ্ট উপার্জন করতেন। যদি অন্য কোন বাধা না থাকে, তবে এভাবে আমাদের মেয়েরা কেউ কেউ তো ঘরে বসে উপার্জন করতে পারেন। অবশ্য, যে পরিবারে বা যে পরিবেশে সম্ভব তাঁদের কথাই বলছি।

শ্রীমতী

চুল উঠে যাওয়ার জন্য বিব্রত?

আজ থেকে সিলভিক্রিন ব্যবহার করে চুলের পুনর্জীবন ফিরিয়ে আনুন

বিপদের এই সব সঙ্কেত অবহেলা করবেন না

চুল উঠে যাওয়া। মাথার তালুতে চুলকানি। নির্জীব শুকনো চুল। এই সব লক্ষণ থেকেই বুঝা যায় যে আপনার চুল বেড়ে ওঠার জন্য যে জীবনদায়ী খাদ্যের প্রয়োজন তার অভাব হচ্ছে। এর ফলে অকালে আপনার মাথায় টাক পড়তে পারে। তাই এই সব লক্ষণ দেখা দিলেই বুঝতে হবে আপনার চাই—সিলভিক্রিন—যেটি চুলের জীবনদায়ী স্বাভাবিক খাদ্য।

সিলভিক্রিন কি ভাবে কাজ করে?

চুলের গঠনের জন্য যে ১৮টি অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার হয়, প্রকৃতি তা জোগায়। একমাত্র সিলভিক্রিনেই রয়েছে সেইসব অ্যামিনো অ্যাসিডের মূলতত্বের নির্যাস। এটি চুলের গোড়ায় গিয়ে তাকে খাদ্য জোগায় ও শক্তিশালী করে তোলে ও সুস্থ চুল বেড়ে ওঠায় সাহায্য করে।

ব্যবহার-বিধি

প্রত্যহ দুমিনিট করে মাথার তালুতে পিওর সিলভিক্রিন মালিশ করুন। চুলের অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত পিওর সিলভিক্রিন ব্যবহার করে চলুন। একবার চুলের স্বাস্থ্য ফিরে এলে তাকে অটুট রাখবার জন্য নিয়মিতভাবে সিলভিক্রিন হেয়ারড্রেসিং মাখুন—এটি পিওর সিলভিক্রিন মেশানো একটি অয়েল বেস্।

বিনামূল্যে 'অল অ্যাবাউট কেয়ার' শীর্ষক পুস্তিকার জন্য এই ঠিকানায় লিখুন—ডিপার্টমেন্ট D-7, পোস্টবক্স ৭২১, বোম্বাই-১।

Pure Silvikrin

Silvikrin

সিলভিক্রিন উৎপাদন পুরুষ ও মহিলা সকলেরই ব্যবহার উপযোগী।

সিলভিক্রিন

চুলের জীবনদায়ী স্বাভাবিক খাদ্য

দিল্লীর ডায়েরি

বিমানবাহিনীর সঙ্গে আট দিন

অর্কিডের মৃত্যু। যার-তার মৃত্যু নয়, মাটির ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, প্রায়-অপার্থিব অর্কিড ফুলের মৃত্যু, যার সাক্ষী ছিলাম সেদিন আমি যার শব বয়ে এনেছিলাম আমি নিজে, এক হাজার দুশো মাইল দূরে থেকে সুসবুজ নদী-মেঘ-বৃষ্টি-সমৃদ্ধ আসাম থেকে।

সেই অর্কিড শিশুর মতো পবিত্রতায় চলে গেল মৃত্যুর পথে আমার নিজের হাতে, আমার নিজের কোলে, একান্ত আমার কাছে। তার শব কোলে নিয়ে এলাম ভারতের মরু-গ্রীষ্ম বালুকা-ব্যাত্যা-তাড়িত রাজধানী দিল্লীতে, এই সেদিন রাত্রে।

আমি তার শুধু হন্তা নয়; তার শব-বাহক এবং লোক-বন্ধুও বটে। এমন মৃত্যুর সাক্ষী আর কোনো দিন হই নি, যেন আর হই না, কারণ, অর্কিড হলো এমন ফুল যার সৌন্দর্যের সঙ্গে মাটির কোনো সংস্রব নেই, যার পুষ্পায়ন যেন স্বর্গাগত অপরাজিতার।

নেফার পাহাড়ে দুটো ড্যাকোটা বিমান

কিন্তু এতো আমার শেষের কথা, আমার ভ্রমণ-শেষ কাহিনী, যার কথা ভুলতে পারি না বলেই তাকে নিয়ে শুরু করি আমার আট দিনের নামচা, আসামের উত্তরাঞ্চলের নামচা, আকাশ-পথের, হিমালয়ের পর্বতাঞ্চলের মানুষের আদিমতার সাক্ষ্যবহনকারী ভারতের উত্তর পূর্ব অঞ্চলের নামচা। অর্কিড ছিল পথে পাওয়া। যেমনি একদা কেউ পেয়েছিল পথের ধারের সরাইখানায় মদিরাক্ষী সাকিকে।

আমাদের প্রধান উদ্দেশ্যের সঙ্গে তার কোনো সংস্রব নেই, কোনো সম্বন্ধ নেই, এমন কি তার ধারেকাছে আসারও কথা ছিল না। কিন্তু আমি তার ক্যাপ্টেন্ মাথুরে তাকে এড়াতে পারি নি, দুজনে ভাগ করে নিয়েছিলাম আসাম থেকে তুলে আনা এক গোছা অর্কিড এবং অবশেষে তার মৃতদেহ।

সে তো শেষের কথা, মরে যাওয়ার মতো শেষের কথা। তার কাছে ফিরে আসব শেষ বেলায়, যখন পৃথিবীতে থাকে না সূর্য, যখন পাপিষ্ঠ গ্রীষ্মের চাবুক-খাওয়া দিল্লি শহর ব্যথা-বেদনা ও অপমানে ঢলে পড়ে পুরোনো দিনের ক্রীতদাসের মতো। সে কথা এখন নয়। শেষের কথা শেষে।

।তা হলে অতো ভনিতা কেন, বাবা? সোজাসুজি এলেই পারতে শুরুতে? কে দিয়েছে মাথার দিব্বি? অতো বাচালতা কেন? সাহিত্য হচ্ছে, তাই না? যা বলেছেন; তা-ছাড়া তো আধুনিক হওয়া যায় না,

আসামের নদী উপত্যকা, আকাশ থেকে

যেমনি যায় না আট-হাতি খদ্দর আর বানিয়ান গায় দিয়ে, যেমনি যায় না লাল ল্যাংগট্ আর ভাঙের সরবত-খাওয়া কুস্তি-পালোয়ানের মেদবদ্দুল বপু নিয়ে। দোষ আমার নয় দোষ সকলের, দোষ আধুনিকতার দিনকালের ও সময়ের, দোষ ঐ অর্কিডের অপার্থিব রূপের ও রূপ-মুচ্ছাহত দুটো মানুষের—আমি ও ক্যাপ্টেন মথুরে।।

জুন মাসের প্রথম দিকের কথা। ভারতীয় আরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এল নেমন্তন্ন। কনুই অবধি ডুবিয়ে দই-পায়েস খাওয়ার জন্যে নয়। তেনারা বললেন, "বাপু হে! তোমরা নাকি ভারতীয় বিমান বাহিনী আসামের নেফা অঞ্চলে কী করছে, তা স্বচক্ষে দেখার জন্যে উন্মাদ। এবার তাহলে আস, খোদ্ এয়ার চিফ্ মার্শেল অর্জুন সিং মহাশয়ের হুকুম। আও ভাই জেনো আরাম হবে না। অনেকে তক্‌লিফ্ ও মুসিব্বত্, লেকিন্ চল তো, ফের দেখা যাবে, একবার যাবে তো বলবে ফের যায়েংগে লেকিন।" এটা হোল আরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিমান-বাহিনীর পি-আর-ও মহাশয়ের বন্ধুত্বপূর্ণ শাসানো, হুকুম এবং অনুরোধ।

চলো নেফায়। একুনে দশজন সাংবাদিক, যারা দেশের আরক্ষা নিয়ে কিছু মাথা ঘামায় এবং যাদের রক্তে আছে খানিকটা পাগলামি (যা ছাড়া সক্রিয় মাঠে-নামা সাংবাদিক হওয়া যায় না)। প্রত্যেকের নামে চিঠি এল এবং কিরে কেটে তারা জানালেন সঙ্গে যেন নিই : অন্ততে একটি মশারী, একটি বাতাসভরা বালিশ, ভালো জুতো কি বুট্। দুটো চাদর একটা পাতলা বর্ষাতি ইত্যাদি। রীতিমত নোটিস দেওয়া হলো যে খাওয়া-দাওয়ায় আরাম হবে না, বায়ু বাহিনীর সকলে যেমন থাকে তেমনি থাকতে হবে। তাই সই।

এবং সই মানে সহি। এল একখানা কাগজ। সই করে ফিরিয়ে দাও বিমান-বাহিনীর দপ্তরে। এবং ঐ সমস্ত সই করার সঙ্গে সঙ্গে মনে এল এক চমৎকার (অকথ্য?) অনির্বচনীয় ভাব, পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যস্থানীয় ত্রিশংকুর মতো। আমরা

দশজন কাগজে সই করে দিলাম যে যদি আমরা পথে মৃত্যুকে আলিংগন করি (তা বিমান দুর্ঘটনাই হোক, কি রক্তামাশাই হোক), যদি আমি আট দিনের মধ্যে একটিবারের জন্যেও পটল উৎপাটন করি, তাহলে (শৃন্বন্তু জনগণঃ!) ভারত সরকারে বিমানবাহিনী তার জন্যে মোটেই দায়ী থাকবে না এবং কোনো প্রকারের কম্‌পেনসেশন দেবে না। মানে, তুমি যদি মর, তোমাকে ভারত সরকার একটি পয়সাও দেবে না।

(বাবা ভারত সরকার!! বেঁচে থাকতেও কিছু দাও নি। খালি নিয়েছ, ট্যাক্স আর এটাওটা। মাইনের প্রায় আদ্দেক নিয়েছ এবং বদলে কিছু দাওনি একটি পয়সার ওজনেরও কিছু নয়। আমার কথা নয়, সমস্ত মধ্যবিত্তেরই এই কথা। সুতরাং আমি ইহলীলা পরিত্যাগ করলে যদি তুমি (বাবা ভারত সরকার!!) আমার কল্যাণে একটি কপর্দকও না দাও, তাহলে ভূত হয়ে তোমার ঘাড় মটকাতেও আমার খেয়া করবে। কোনো দেশের জনকল্যাণ রাষ্ট্রের সরকার দলিলদস্তাবেজে নিজের অপদার্থতা এমনভাবে ঘোষণা করে, আমার জানা ছিল না। আমরা দশজন সাংবাদিক তার সাক্ষী, একেবারে সই-করা সাক্ষী।)

একটা কারণ এই আমরা বাদে অন্যান্য যাত্রীদের সংগে সবাই হলেন আরক্ষা বাহিনীর লোক, স্থল বাহিনী ও বিমান বাহিনীর অফিসার। কর্তব্য পালন সময়ে তারা যদি মারা যায়, তাহলে তারা পাবে আইনমত কম্পেনসেশন্। কিন্তু হংস মধ্যে বক যথা দশজন সিভিলিয়ান? তাদের কী হবে? মরে গেলে (ধরুন বিমানটা ধপাস্ করে আছড়ে পড়ল মুখ থুবড়ে) তখন তো আর মুখশ্রী দেখে চেনবার জো থাকবে না, কে ছিল সাংবাদিক কে ছিল মেজর-জেনারেল অথবা এয়ার মার্শেল? কে ছিল ক্যাপটেন্ মাথুর কে ছিলাম আমি? তাই এক গাদা সই করো, এমন কি মরে যাওয়ার পরে কাকে প্রথম দেওয়া হবে খবরটি, তার নাম ঠিকানা অবধি।

হুকুম। পালাম বিমানবন্দরের অমুক জায়গায় জড়ো হবে সকাল সাড়ে পাঁচটায়। জো হুজুর বিমানবাহিনী এবং তার পি-আর-ও স্কোয়াড্রন লিডার নীল বাত্রা এবং সৈন্য বাহিনীর জনসংযোগকারী অফিসার ক্যাপটেন মাথুর। জো হুজুর, মানে জী হুজুর! মনে আছে সেদিন রাত্রি দুটো অবধি এই "দেশ" নামক সাপ্তাহিকের প্রধান সহ-সম্পাদক সাগরময় ঘোষ মহাশয়ের এবং আমার নিজের কথা রক্ষার জন্যে ওই রাত অবধি লিখে গেলাম। তারপর শুয়েছি কি না অমনি এল টেলিফোন্, অর্ধশিক্ষিত হিন্দী ভাষায় তিনি জানালেন যে, কথা মত সাড়ে চারটেয় উনি আমাকে জাগিয়ে দিচ্ছেন, তার দোষ নেই কারণ, ঘড়িতে তখন বাজছে ওই ঘুম ভাঙা গান।

অমনি আরম্ভ হলো সভ্যতার রুটিনঃ মুখ ধোও, দাঁত মাজো, দু পেয়ালা চা খাও, বিগ্ ওন্ দাড়ি কামাও (হায়! ভগবান!) সাওয়ার, প্যাণ্ট, বুশসার্ট, জুতো—বাস রেডি।

পনেরো মিনিটে এলাম পালামে। সব ফাঁকা। কেউ নেই। ধীরে ধীরে উদয় হল মনুষ্য মস্তক যাদের কেউ কেউ বেরুলো জানাশোনা। শেষটায় লোকে গিজ্‌গিজ। সবাই অফিসার আমরা দশজন ছাড়া। কিন্তু প্লেন্ কোথায়? উনি এলেন শেষটায় পুনা থেকে উড়ে, একটি অতিকায় সুপার কন্‌সটেলেশন্। আর সেদিন সকালে কী বিষ্টি পালামে। সে আর থামে না।

আবার সই করো। সেই একই ধরনের মনোজ্ঞ কাগজ, আমার সম্ভাব্য মৃত্যুতে ভারত সরকার মোটেই দায়ি থাকবেন না। এবং অন্যান্য এয়ার লাইন্‌সের মতো মালপত্র মাপা হোল, বোর্ডিং কার্ড দেওয়া হোল, মাপের কুপন্ অবধি। এবং সাতটার জায়গায় আমরা রওনা হলাম সকাল ন'টার পরে। "কেন বাবা? পরে আসতে বললেই পারতে? আমরা সিভিলিয়ান্ বলে কী দোষ করেছি বাওয়া বাত্‌রা?"

"আরে ভাই! আমিও তো তোমাদের মতই। তাহলে দোষ দিচ্ছ কাকে? তোমাদের মতো আমার পেটও চোঁ চোঁ করছে, নো ব্রেকফাস্ট নো নাথিং, সমঝে ক্যা নাহি?"—বাত্‌রা।

"শুরুতেই এই। না জানি এবার কপালে কী লেখা আছে, কতো ভোগান্তি", বলেন হিন্দুস্থান টাইমস-এর পৃথ্বীশ চক্রবর্তী। সায় দিলেন অনেকে যথাঃ পেট্রিয়ট প্রতিনিধি গোপীনাথ ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের দুয়া, স্টেটসম্যানের কোত্রু, এবং ন্যাশন্যাল হেরাল্ডের গোপালকৃষ্ণ। রইলেন আর চারজন এক বংশ প্রতিনিধি,—চারটি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, দুটি ইংরাজি ভাষার এবং দুটি হিন্দী ভাষার,—একেবারে সংবিধানের আইনমতো। পি টি আই—শ্রীদেশাই, ইউ এন আই, শ্রীকৃষ্ণকুমার, সমাচার ভারতী শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার এবং হিন্দুস্থান সমাচার শ্রীআগরওয়াল।

ক্রমশ

খগেন দে সরকার

ট্রামে বাসে

সংবাদে প্রকাশ, গমের প্রচুর ফলনকে চিরস্মরণীয় করার নিমিত্ত একটি স্মারক ডাকটিকিট ইস্যু করার জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নির্দেশ দিয়াছেন; এই নির্দেশও দেওয়া হইয়াছে, ডাকটিকিটে "গম বিপ্লব" কথাটি যেন লেখা থাকে। খুড়ো বলিলেন—"বিপ্লবের নামে আমরা ভড়কে যাই সুতরাং গম-বিপ্লব কথা থাক বা না-থাক, খোলা ওয়াগনে এবং প্ল্যাটফর্মে

5P

গম বিপ্লব

বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে যেসব গমের চারা গজিয়েছে সেই চারা ডাকটিকিটে থাকলে বিপ্লবের সচিত্র রূপে সর্বসাধারণকে চমৎকৃত করবে। ডাকটিকিটের রূপায়ণকারী শিল্পীরা এবং শ্রীমতী ইন্দিরাও কথাটা মনে রাখবেন।।"

[illegible] জন্য লক্ষাধিক টন খাদ্য মজুতের ব্যবস্থার নিমিত্ত একটি জাতীয় অন্তর্বর্তীকালীন খাদ্যভাণ্ডার গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। "ভাণ্ডার গঠন হয়ত ঠিকই হবে, শুধু খাদ্য মজুতের প্রশ্নটাই বাকী থাকে কিনা সেই কথাই ভাবছি: দোয়াত আছে কালি নাই যে আমাদের ছোটবেলার শিক্ষা"—বলে শ্যামলাল।

সংবাদে শুনিলাম, গঙ্গা হইতে নাকি পলতার পুকুরে লাল জল আসিতেছে। শ্যামলাল বলিল—"আমরা আশা করব জলটা সত্যি গঙ্গা থেকে, হোয়াংহো থেকে নয়!!"

জঞ্জাল দিয়া শুরু: শেষে রাজ্যপালের প্রতি আস্থা-অনাস্থার প্রশ্নে পৌর অধিবেশন পণ্ড'—একটি সংবাদ শিরোনামা। —"অর্থাৎ এখান থেকে ছুঁড়লাম তীর / পড়ল গিয়ে কলাগাছে / হাঁটু বেয়ে রক্ত পড়ে / চোখ গেলরে বাবা"—বলেন সহযাত্রী।

পোলান্ডে লম্বা লোকদের নাকি একটি ক্লাব স্থাপন করা হইয়াছে—"এতদ্দেশে অনুরূপ একটি ক্লাব হলে আর কিছু না হোক, অন্তত 'ঢেঙ্গা যত আহাম্মক তত' কথাটার একটা অফিসিয়্যাল প্রতিবাদ হতে পারে" বলেন সহযাত্রী।

ফরাক্কা দর্শনে আগত পাক-প্রতিনিধি-দলের নেতা শ্রীআব্বাস নাকি জেনারেল ম্যানেজার শ্রীদেবেশ মুখার্জির সতীর্থ। শ্রীআব্বাস শ্রীমুখার্জির অফিসে গিয়া বলিয়াছেন—'দেবেশ, তুমি অগস্ত্যের মতো গঙ্গার জল শুষে নিয়েছ'—।—"আমরা শ্রীআব্বাসের রসিকতার তারিফ করি, যদিও জানি শ্রীমুখার্জি জল শুষে নেন নি এবং এ কথাও বলি, অগস্ত্য কেন সাগর শুষে ছিলেন সে উপাখ্যান হয়ত শ্রীআব্বাস জানেন না"—বলে শ্যামলাল।

হিমঘর সম্পর্কে দুইদিনব্যাপী সেমিনারে কৃষিজাত দ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্নটি যথেষ্ট গুরুত্বলাভ করিয়াছে।—"আমরা বলি, হিমঘরে থাকা সত্ত্বেও যে দ্রব্য বাজারে এসেই আগুন হয়ে যায়, তার কারণ সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়েছে কি? হিমঘর যে আমাদের চাঁদের সমতুল, নামে হিমাংশু, আসলে অগ্নিগর্ভ এবং সে খবরটা পাই চাঁদের হাটে"—বলেন সহযাত্রী।

সংবাদে প্রকাশ, হিটলার এখনও নাকি বাঁচিয়া আছেন, যদিও তাঁর সেই গোঁফ জোড়াটি আর নেই এবং নেই সেই চুলের ধাঁজ।—"গলিত নখদন্তের অনুকরণে যদি বলা যায়, স্খলিত গুম্ফ জোড়া তবে তার সম্পর্কে আর ভয় কী। তবে গোঁফ না থাকলেও কণ্ঠস্বর আর ফিস্ট আস্ফালনে অনেক খুদে হিটলার সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে আছে, যদিও ইভা ব্রাউন সবার ভাগ্যে জোটে না"—বলেন সহযাত্রী।

'আনন্দবাজার পত্রিকা' সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন—ইলিশ এল। সংবাদে বলা হইয়াছে, দশটি মাত্র ইলিশ ডায়মণ্ড হারবারে ধরা পড়িয়াছে। সহযাত্রী বলিলেন—"আমরা বারবার বলে আসছি, ডায়মণ্ড হারবারের নাম পালটে প্লেটিনাম হারবার রাখা হোক।"

অন্য এক সংবাদে প্রকাশ, মাও-সে তুং-এর রচনাসংগ্রহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্বর্তীর প্রশ্ন নাকি বিবেচনা করা হইতেছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"লেখাপড়াটা আমাদের বড়-একটা আসে না, তাই এ সম্পর্কে মন্তব্য আমাদের আস্পর্ধারই সামিল হবে। তবু এটা জানি, শিক্ষার বনেদটা ছোটবেলা থেকেই গড়তে হয় সুতরাং মনে হয়, সেই সংগ্রহের কিছু অংশ "কিশলয়ে" থাকা ভালো!!"

রথযাত্রা প্রসঙ্গে সহযাত্রী বলিলেন—"এবারে রথযাত্রা সর্বত্রই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে, শুধু দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির টানা সাপেক্ষে মাসীর বাড়ি দূরে অস্ত!"

সংবাদে শুনিলাম, সরকার নাকি দুঃস্থ-দিগকে বিনামূল্যে খাদ্যদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"তা শতং জীবতু। কিন্তু দুঃস্থের লেবেল-আঁটা শিল্পীদের তেমনি না পোহাবার প্রার্থনাও এই সঙ্গে জানিয়ে রাখি।"

প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় এবং প্রখ্যাত ক্রিকেট সমালোচক কিথ মিলার বলিয়াছেন—দ্বিতীয় টেস্টে বরুণদেব অস্ট্রেলিয়াকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।—"আমরা বৃষ্টির জন্যে বেলপাতায় ১০৮টি "পুর" গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতাম, বৃষ্টি হত, মোহনবাগান ভিজে মাঠে প্রতিপক্ষকে কুপোকাত করত। বাকী টেস্টের জন্য বিল লরি এই টেকনিকটি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যে "পুর"-যুক্ত গাঁয়ের নাম সরবরাহ করতে পারি"—বলেন বিশু খুড়ো।

গল্পোকে চরিত্রের স্টাডি হিসেবে গণ্য করা কি অবাস্তব উদ্ভট কল্পনা নয়? কিংবা 'রাত্রির শেষ পর্যন্ত যাত্রা' (সিলিন)—কি কোনো চরিত্রের বর্ণনা করছে? লোকে কি-ভাবে এই তিনখানি বই নেহাত আকস্মিক-ভাবেই উত্তমপুরুষে লেখা? বেকেট তাঁর নায়কের নাম ও বর্ণনা—একই গল্পের মাঝখানে বদলে দেন। ফকনার ইচ্ছে করেই এক গল্পে দুজন লোকের একই নাম রাখেন। কাফকা 'দুর্গ' বইটিতে নায়কের নাম K, শুধু এই একটি অক্ষরই যথেষ্ট মনে করেছেন তিনি, তার কোনো উত্তরাধিকার নেই, কোনো পরিবার নেই, মুখও নেই।

উদাহরণ আরও বাড়ানো যায়। আরও আগে, উলফ্‌এভান্সের নোটস্ ফ্রম দি আণ্ডার গ্রাউণ্ড-এর মধ্যে চরিত্রের নাম বা চেহারা স্মৃতির পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। বস্তুত, আজ-কাল অধিকাংশ আধুনিক উপন্যাসই উত্তম-পুরুষে 'আমি' দিয়ে লেখা হয়—মূল চরিত্রের আকৃতি বা বংশপরিচয় অনাবশ্যক। নামের ঝামেলা এড়াবার জন্য লেখকের নিজের নামটিই সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার করা সুবিধাজনক। আমাদের বাংলায়, 'বিবর' একটি আলোড়নকারী বই—কিন্তু তার নায়কের নাম-ধামের চেয়ে বাসনা ও ব্যবহারই প্রধান। গৌরকিশোর ঘোষ শুধু বলেছেন 'লোকটা'।

যে সমস্ত উপন্যাস প্রথাগতভাবে 'চরিত্র' ফোটায়, তারা চমৎকারভাবে পুরোনো উপন্যাসের ধারাতেই খাপ খায়। গত শতাব্দী পর্যন্ত যে যুগ—তা ছিল ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠারই যুগ। প্রগতি বলা যাক বা না যাক, এ কথা মানতেই হবে, এ যুগ শ্রেণী-বদ্ধ সংস্কারই যুগ। কয়েকটি ব্যক্তি বা কয়েকটি পরিবারের উত্থান-পতনের সঙ্গে পৃথিবীর ভাগ্য জড়িয়ে নেই। পারিবারিক পরিচিতি কিংবা ব্যক্তিগতভাবে অসাধারণ গুণসম্পন্ন হওয়া সেই যুগেই দরকার ছিল—সে যুগে প্রতিষ্ঠার জন্য এগুলোই ছিল প্রধানতম ওরবারী। আমাদের দেশে, ভাল্লুগার অর্থে প্রতিষ্ঠার জন্য এসবের কিছু কিছু প্রয়োজন এখন থাকলেও—সাধারণভাবে বলা যায়, এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের প্রত্যক্ষ তফাত খুব বেশী নেই। একজন মানুষই সর্বশক্তিমান হবে—এ ধারণা এখন আর কেউ করে না—একাকী ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়—হাতাহাতি যুদ্ধের পর বীরত্বের সম্মানের মতনই তা এখন লুপ্ত, এবং লুপ্ত বলেই ভিতরে ভিতরে ক্ষোভময় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এত বেড়েছে। এ শতাব্দীর গোড়া থেকেই উপন্যাস তার প্রধান অবলম্বন 'হীরো'কে হারিয়েছে, সেজন্য দুঃখ করে বা পুরোনো পথে ফিরে গিয়ে নকল হীরো তৈরী করার চেষ্টা অর্থহীন। উপন্যাস এখন শুধু গলনলোকের আবিষ্কারের বর্ণনা।

নতুন পত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মীদের একটি মুখপত্র বেরিয়েছে 'গ্রন্থাগার কর্মী'। এ-জাতীয় পত্রিকা এই প্রথম। বর্তমান সময়ে গ্রন্থাগারের উপযোগিতার কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সংখ্যা ও অবস্থা দুই-ই শোচনীয়। শিক্ষিত ব্যক্তিদের চেতনার অভাব ও সরকারের উদাসীনতা এজন্য দায়ী। গ্রন্থাগার কর্মীদের অভাব-অভিযোগ অনেক এবং সেগুলির প্রতি অবিলম্বে দৃষ্টি না দিলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিস্তার ঘটবে না। সেই আন্দোলন-সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ এই পত্রিকাটিতে পাওয়া যায়।

ধানসিঁড়ি একটি অভিনব মাসিক সাহিত্য-পত্র। রচনাগুলি অন্যান্য পত্র-পত্রিকার মতনই, কিছু চেনা-অচেনা নাম, কিন্তু এদের পরি-বেশন-পদ্ধতি মনোযোগ দাবি করে। একটি ধপধপে লম্বা সীট নানা ভাঁজে মুড়ে এই পত্রিকা, চোখে দেখলেই পড়ার আকর্ষণ জাগায়।

সনাতন পাঠক

পুস্তক পরিচয়

রবি প্রদক্ষিণ পথ

কবির ভণিতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা। আড়াই টাকা।

'যাহা অশরীরভাবরূপে নিরাশ্রয় হইয়া ফিরে তাহাই যদি কবির কাব্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণতালাভ করিয়া থাকে—তবেই কাব্য সফল হইয়াছে এবং সেই সফল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী'—স্বরচিত কবিতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই উচ্চারণ আজও অর্থহীন নয়। তা হলে আবার কবি নিজেই কেন অতিরিক্ত ভূমিকা লিখতে বসেছিলেন? শুধু এক-একটি কবিতা বা রচনার মর্মার্থ পর্যালোচনার জন্য নয় নিশ্চয়ই। 'কোন্ গীতিকাব্যরচয়িতার কোন্ কবিতা ভালো, কোন্‌টা মাঝারি, তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখানো সমালোচকের কাজ নহে। তাহার সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া বিশ্ব কোন্ বাণীরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তাহাই বুঝিবার যোগ্য।' 'জন্ম-রোমাণ্টিক' কবির এই বক্তব্যের সঙ্গে তুলনীয় Defence of Poetry সন্দর্ভে শেলির নির্ঘোষ: 'কবিরা বিশ্বের অ-স্বীকৃত সূত্রধার'। প্রাচীন ও মধ্যযুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবিতার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে থাকতো রচয়িতার বিনীত বক্তব্য। কিন্তু রোমাণ্টিক তথা আধুনিক যুগ থেকে কবিতার পাশাপাশি কবির আত্মপরিচিতি যে অন্তত সমমূল্য হয়ে উঠলো রবীন্দ্রনাথের আপাতনম্র এবং শেলির স্পর্ধাসুন্দর দুটি উক্তি তার প্রমাণ।

বিশ্বভারতী প্রকাশনের উদ্যোগে রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশপর্বে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গ্রন্থের 'সূচনা' হিসেবে যে-সমস্ত প্রাক্-কথন জুড়ে দিয়েছিলেন, নানা খণ্ডে (১—৫, ৭ ॥ আশ্বিন ১৩৪৬—আষাঢ় ১৩৪৮) বিকীর্ণ সেই রচনাগুলি পাঠকের সুবিধের দিকে লক্ষ্য রেখে এই বইতে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'প্রভাতসংগীত' সম্পর্কে মন্তব্যকালে কবি নিজেই 'কবির ভণিতা' শীর্ষক যে শিরোনামটি ব্যবহার করেছেন সেটি এই পুস্তিকার নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

অর্চজিত রচনার আঁকাবাঁকা পথহীনতা থেকে যখন কবির সামনে একটা পথরেখা ফুটে উঠল 'সন্ধ্যাসংগীত' সেই মুহূর্তের কাব্য। বস্তুত তখন থেকে শুরু করে প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, কড়ি ও কোমল, মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি পর্যন্ত কবি-অভীপ্সার যে অভিসার, ভাব ও রূপের যে দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের আগ্রহ, এই গ্রন্থে তার বিস্তৃততম পরিচয় গ্রথিত আছে। সংযোজিত আকর্ষণ কথা, কাহিনী বিষয়ক মূল্যাংকন।

বাল্মীকি প্রতিভা, মায়ার খেলা থেকে প্রকৃতির প্রতিশোধ, রাজা ও রাণী, চিত্রাঙ্গদা, মালিনী রবীন্দ্রনাট্যবিবর্তনের উন্মেষ-উন্মোচনের রহস্যকে রূপবন্ত করেছে। গীতিনাট্যের খেয়ালী শিল্পায়ন থেকে আরম্ভ করে শেক্সপীয়রীয় (এবং হেলেনিক?) নাট্য-সমীক্ষার মধ্য দিয়ে কী করে প্রতীকপ্রবণতার চর জেগে উঠল, এখানে তার নির্মোহ ইতিহাস এবং সমালোচনা আছে।

আর আছে বঙ্কিম-অংকিত সরণী অতিক্রম করে অজেয় আধুনিক ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের উত্থানমহিমার সপ্রতিভ বৃত্তান্ত। আছে বউ-ঠাকুরানীর হাট, রাজর্ষির আইডিয়া-বিহার ছেড়ে চোখের বালিতে সাহিত্যের নব পর্যায়ের পদ্ধতি: 'ঘটনা-

পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। এবং নৌকাডুবির ট্র্যাজিডি প্রসঙ্গে কবির বিপন্ন স্বীকৃতি : 'একালে গল্পের কৌতূহলটা হয়ে উঠেছে মনোবিকলনমূলক। ঘটনাগ্রন্থন হয়ে পড়েছে গৌণ।'

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সমালোচকদের সমবেত বিভ্রান্তির এই মুহূর্তে আবার নতুন করে প্রমাণ মিলল রবীন্দ্রনাথ আত্মপ্রসঙ্গে কী-রকম যথাযথ হতে চেয়েছেন, কীভাবে বারংবার নিজেকে একটি অমোঘ ধ্রুবপদের অভিমুখী করে এগিয়ে গিয়েছেন। ফলত তাঁর সাহিত্য-সমালোচনার এই নিদর্শনগুচ্ছে ছদ্ম-পণ্ডিতের তত্ত্বসর্বস্বতা অথবা তথা-কথিত শিল্পপ্রেমিকের প্রাকরণিকতা, কোনোটিই নেই। আমাদের আত্মবিস্মৃতি অথবা আত্মকেন্দ্রিকতার প্রহরে এই বই একটি বিবেকী নির্দেশ। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগকে ধন্যবাদ তাঁরা এরকম একটি চিরায়ত অথচ সময়োচিত সংকলন অত্যন্ত শোভন, সম্ভ্রান্ত সৌন্দর্যের সঙ্গে আমাদের

ক্রিকেটের 'মক্কা' লর্ডসে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার দ্বিশততম টেস্ট খেলা আরম্ভের আগে প্রিন্স ফিলিপের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রিন্স ফিলিপ ইয়ান রেডপাথের সঙ্গে করমর্দন করছেন

খেলার মাঠে

আগে অস্ট্রেলিয়ান [illegible] ইংল্যান্ড মাঠের প্রথম টেস্ট [illegible] ১৯৬ রানে [illegible] [illegible] অস্ট্রেলিয়া ১-০ [illegible] [illegible] এখন [illegible] [illegible] টেস্ট [illegible]।

লর্ডস টেস্ট [illegible] ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্টে অস্ট্রেলিয়া [illegible] [illegible] প্রাধান্যের পরিচয় দিয়েছিল, লর্ডসে ইংল্যান্ড তেমনি [illegible] প্রাধান্যের পরিচয়। বলা যেতে পারে, বরুণদেবের জন্যই অস্ট্রেলিয়া হারতে হারতে বেঁচে গিয়েছে। বৃষ্টি না হলে এ খেলায় হয়তো অস্ট্রেলিয়া পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পেত না। পাঁচ দিনের খেলাটিকে বরুণদেব প্রায় আড়াই দিনে দাঁড় করিয়েছেন। অর্থাৎ পাঁচ দিনে যে সময় খেলা হওয়ার কথা ছিল তার অর্ধেকেরও কম সময় খেলা হয়েছে। প্রথম দিনের খেলা হয়েছে মধ্যাহ্ন ভোজের সময় পর্যন্ত অর্থাৎ সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়েছে। দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্ন বিরতির পর নষ্ট হয়েছে আধ ঘণ্টার মত সময়। তৃতীয় দিন খেলা হয়েছে মাত্র ৫৮ মিনিট, চতুর্থ দিন ৩৩০ মিনিটের জায়গায় ২৩০ মিনিট। পঞ্চম ও শেষ দিন মধ্যাহ্নভোজের সময় পর্যন্ত খেলা আরম্ভই হতে পারে নি। চা পানের এক ঘণ্টা আগে খেলা আরম্ভ হলেও শেষ দিকে আবার বৃষ্টি ব্যাঘাত সৃষ্টি করে খেলাটির উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থাকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে।

ক্রিকেটের ঐতিহাসিক ক্রীড়াঙ্গন কিংবা ক্রিকেটের মক্কা লর্ডসে এই খেলাটিতে রেকর্ড অর্থ সংগৃহীত হয়েছে। যে অর্থ আজ পর্যন্ত কোন টেস্টেই সংগৃহীত হয় নি। লর্ডসের হিসাবে দর্শকও ছিল রেকর্ড সংখ্যক। কিন্তু বৃষ্টি বিঘ্নিত এই টেস্টের পাঁচ দিনই যেন মেঘে-মানুষে লুকোচুরির খেলায় চিহ্নিত হয়ে আছে। বার বার বৃষ্টির আনাগোনায় খেলোয়াড়দের মাঠ ছেড়ে মাথা বাঁচাতে ছাউনির আশ্রয় নিতে হয়েছে। সেই সঙ্গে ছাউনিবিহীন দর্শকরাও হাল্কা মেঘের আবরণের নীচে কখনো উপভোগ করেছেন ঝিরঝিরে বৃষ্টি, কখনো প্রবল বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছেন। প্রথম দিনের শিলাবৃষ্টিও সবুজ মাঠকে সাময়িকভাবে সাদা করে দিয়েছে।

বলা বাহুল্য, এমন পরিবেশে এবং এমন বৃষ্টির মধ্যে ক্রিকেট খেলতে অস্ট্রেলিয়া মোটেই অভ্যস্ত নয়। যাঁরা এর আগে ইংলন্ড সফর করেছেন তাঁদের বাদে বাকি তরুণ খেলোয়াড়দের কাছে এমন ভিজে আবহাওয়া একেবারেই অনাকোরা। এ বছর সফর শুরুর পরও কোন কাউন্টি ম্যাচে এমন আবহাওয়ার মধ্যে তাঁদের খেলতে হয় নি, পিচের অবস্থাও এমন দুর্জ্ঞেয় হয়ে ওঠে নি। তাই ইংলন্ডের প্রথম ইনিংসের বিরুদ্ধে তাঁদের শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় মিলেছে। ফলো অন করতে হয়েছে। তবে ফলো অনের পরে তাঁরা যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন অবশ্যই তা প্রশংসা-যোগ্য। আগে বলেছি, বরুণদেব অস্ট্রেলিয়াকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। সেই সঙ্গে এখন বলছি, পরাজয় এড়াবার ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা দৃঢ়তাও কম দেখান নি।

ওল্ড ট্রাফোর্ডে ইংলন্ডের পক্ষে যাঁরা খেলেছিলেন তাঁদের মধ্য থেকে ডেনিস এমিস, কেন হিগস ও বব্ বারবারকে বাদ দিয়ে

এবং কলিন মিলবার্ন, কেন ব্যারিংটন ও টেড ডেক্সটারকে দর্শক করে ইংলণ্ডের নির্বাচকরা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন, বলা যেতে পারে। কারণ, বৃষ্টি-ভেজা উইকেটেও তাঁরা ৭ উইকেটে ৩৫১ রান করে ইনিংস ডিক্লেয়ার করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ করেছেন মাত্র ৭৮ রানে। ফলো অন করিয়ে ১২৭ রানের মধ্যে দখল করেছেন দ্বিতীয় ইনিংসের চারটি উইকেট।

প্রথম দিন মধ্যাহ্নভোজের সময় পর্যন্ত খেলায় ইংলণ্ড ১ উইকেট হারিয়ে ৫৩ রান তোলে। তার পরই প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হয়। আর খেলা হয় না। ইংলণ্ডের ১০ রানের মাথায় ওপেনিং ব্যাটসম্যান জন এডরিচ আউট হয়ে গেলেও অপর ওপেনিং ব্যাটসম্যান জিওফ বয়কটের সঙ্গে কলিন মিলবার্ন (ক্রীড়াকীর্তি দ্রষ্টব্য) দৃঢ়তার সঙ্গে খেলার ফলেই ইংলণ্ডের বড় রানের ভিত্তি তৈরী হয়। দ্বিতীয় দিন ইংলণ্ডের দ্বিতীয় উইকেট পড়ে ১৪২ রানের মাথায়। কিন্তু বিপুলকায় ক্রিকেটার কলিন মিলবার্ন তখনো অধিনায়ক কলিন কাউড্রের জুটি। দুই কলিনের চিত্তাকর্ষক ও প্রাণবন্ত খেলার পর কেন ব্যারিংটনের বিক্রম। ফলে, দ্বিতীয় দিনের শেষে ইংলণ্ডের ৫ উইকেটে ৩১৪ রান। তৃতীয় দিন মাত্র ৫৮ মিনিটের খেলায় আর দুটি উইকেট হারিয়ে ৩৭ রান যোগ। ফলে, তৃতীয় দিনের শেষে ইংলণ্ডের ৭ উইকেটে ৩৫১।

পরের দিন খেলার বিরতি। তখনো জানা যায় নি ইংলণ্ড ইনিংস ডিক্লেয়ার করবে কিনা। বিরতির পর চতুর্থ দিনে ইংলণ্ড আর ব্যাটিং করে না। এই ৩৫১ রানেই দান ছেড়ে দেয়। শুরু হয় অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং বিপর্যয়। অধিনায়ক লরির শূন্য রানে বিদায়, কাউপার ৮ রানে আউট, ইয়ান রেডপাথ ৪ রানে প্যাভিলিয়নে ফেরত, পল শিহান ৬ রানে আউট, এক রান বেশী করে চাপেলের শিহানের পদাঙ্ক অনুসরণ, নীল হকের নামের পাশে ২, ৫ রানে ম্যাকেঞ্জি বোল্ড। ব্যারী জারম্যানের হাতের আঙুলে আঘাত, শূন্য রানে অবসর গ্রহণ, কনোলী রান না করে নট আউট। শুধু ডগ ওয়াল্টার্সের ও জন গ্লীসনের নামের পাশে দুই অঙ্কের রান। প্রথমজনের ২৬, দ্বিতীয়জনের ১৪।

মধ্যাহ্ন ভোজের অল্প পরেই মাত্র ৭৮ রানে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ। তখনো খেলার বাকি প্রায় তিন ঘণ্টা। সুতরাং ওই দিন আবার যে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? কিন্তু ফলো অনের পর অস্ট্রেলিয়া অত্যন্ত সতর্কতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাট করতে থাকে। এক ঝাঁক বৃষ্টির ফলে মাঠের পিচের আঠালো ভাবও অনেক কেটে যায়। চা পানের সময় কোন উইকেট না হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে ২৬ রান। লরি ও রেডপাথের 'শক্ত ডগা' ব্যাটিং শেষ পর্যন্ত দুজনই নট আউট। লরির ২৫ ও রেডপাথের ২৪ রান। অস্ট্রেলিয়ার বিনা উইকেটে ৫০।

আমি বলব, চতুর্থ দিনের বিপর্যয়ের পর লরি ও রেডপাথের এই দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিংই অস্ট্রেলিয়ার পরাজয় এড়ানোর প্রধান কারণ। ডেভিড ব্রাউন ও ব্যারী নাইট পিচ থেকে সাহায্য পেয়ে যে মারাত্মক বল করেন তার ফলেই অস্ট্রেলিয়ার বিপর্যয় শুরু হয়। দ্বিতীয় ইনিংসেও তাঁদের বলে সমান ধার ছিল। কিন্তু সে ধারকে ব্যাটের বিক্রমে ভোঁতা করেছিলেন লরি ও রেডপাথ।

শনি বারে শেষ দিন বৃষ্টির জন্য আরো কিছু বেশী সময় নষ্ট না হলে ইংলণ্ডের জেতার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এ কথাও সত্য, লরি এবং রেডপাথই তাঁদের অনমনীয় দৃঢ়তায় অস্ট্রেলিয়ার বাকি খেলোয়াড়দের মধ্যে সংগ্রামের মনোভাব জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাই শেষ দিনে ইংলণ্ডের জয়ের প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। অস্ট্রেলিয়া ৪ উইকেটে ১২৭ রান সংগ্রহের পর খেলার উপর যবনিকা পড়েছে। দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার বব কাউপারও ৩২ রান করে কম দৃঢ়তা দেখাননি।

এই খেলার শেষে ইংলণ্ডের অধিনায়ক কলিন কাউড্রে ক্যাচ ধরার কৃতিত্বে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন। টেস্ট খেলায় ক্যাচ ধরায় বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন পরলোকগত ওয়ালী হ্যামণ্ড। তাঁর ক্যাচের সংখ্যা ছিল ১১০। কাউড্রে সে সংখ্যা পার হয়েছেনই, জীবনে আর কত ক্যাচ ধরবেন কে জানে।

লর্ডসে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার এই সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টটি ছিল দুই দেশের দ্বিশততম ক্রিকেট টেস্ট। তাই খেলাটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্যার রবার্ট মেঞ্জিস একটি স্বর্ণ-মুদ্রা দান করেছিলেন টসে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। স্বর্ণমুদ্রায় ১৮৮০ সালের ছাপ, সে বছর থেকে ইংলণ্ডে টেস্ট খেলা শুরু হয়। মুদ্রাটি এই টেস্টে টসের জন্য যে ব্যবহার করা হয়েছে, পরবর্তী তিনটি টেস্টেও ব্যবহার করা হবে এবং ওটি দর্শনীয় দ্রব্য হিসাবে থাকবে লর্ডসের নব যাদুঘর সংগ্রহ-শালায়।

দুই দেশের ২০০টি টেস্টের মধ্যে এখন জয়-পরাজয়ের হিসাবে অস্ট্রেলিয়া ১৫টি জয়ে এগিয়ে। তাদের জয়ের সংখ্যা ৮০, ইংলণ্ডের ৬৫। ৫৫টি টেস্টের ফলাফল অমীমাংসিত।

দ্বিশততম টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস ৭ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড—৩৫১ (কলিন মিলবার্ন ৮৩, কেন ব্যারিংটন ৭৫, জিওফ বয়কট ৪৯, কলিন কাউড্রে ৪৫, অ্যালান নট ৩৩, ব্যারী নাইট নট আউট ২৭; গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি ১১১ রানে ৩ উইকেটে, অ্যালান কনোলী ৫৫ রানে ২ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস ৭৮ (ডগ ওয়াল্টার্স ২৬, জন গ্লীসন ১৪; ডেভিড ব্রাউন ৪২ রানে ৫ উইকেট, ব্যারী নাইট ১৬ রানে ৩ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস ৪ উইকেটে ১২৭ (ইয়ান রেডপাথ ৫৩, বিল লরি ২৮, বব কাউপার ৩২; ডেরেক আণ্ডারউড ৮ রানে ২ উইকেট)।

[খেলা অমীমাংসিত]

একলব্য

আঠার স্টোনী ক্রিকেটার

উনিশ শো' উনষাট সালের মাঝ-সেপ্টেম্বরের একটি দিন। সান্ডারল্যান্ডে সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের শেষ খেলা ডারহাম-এর সঙ্গে। অতীত দিনের খ্যাতনামা খেলোয়াড় এবং ক্রিকেটের প্রথা-প্রকরণের জ্ঞানী বিচারক জর্জ ডাকওয়ার্থ (এখন পরলোকগত) ঈগল চোখের দৃষ্টি নিয়ে খেলা দেখছেন ১৭ স্টোন ওজনের একটি ১৭ বছর বয়সী ছেলের। ছেলেটি প্রায় ঝড়ের গতিতে ১০১ রান করল, অখ্যাত ডারহাম-এর কোন খেলোয়াড়ের পক্ষে যা কদাচিৎ ঘটনা। ডাকওয়ার্থ তখনই কল্পনায় ছেলেটির গায়ে ভবিষ্যৎ টেস্ট খেলোয়াড়ের ছাপ মেরে রাখলেন।

ক্রিকেট-বাইবেল 'উইসডেন'-এর পরবর্তী সংখ্যায় ছেলেটি সম্পর্কে সম্পাদকের মন্তব্য: "এ ওয়েল বিল্ট ল্যাড—এ ফাইন অ্যাটাকিং ব্যাটসম্যান"। অর্থাৎ ছেলেটি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং একজন সুন্দর আক্রমণমুখী ব্যাটসম্যান। বলা বাহুল্য, এই ছেলেটিই ইংলন্ডের আজকের আশা-জাগানো টেস্ট খেলোয়াড় কলিন মিলবার্ন, যিনি সদ্য-সমাপ্ত লর্ডস টেস্টে ব্যাটসম্যানের অসহায়ক বৃষ্টি-ভেজা উইকেটে ১২টি বাউনডারি ও ২টি ওভার-বাউনডারি সমেত ৮৩ রান করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার দুই ফাস্ট বোলার গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি ও নীল হকের মারমুখী বলের বিরুদ্ধে মিলবার্ন-এর মারমুখী ব্যাটিং-এর ফলেই ইংলন্ড ইনিংসের বড় রানের ভিত্তি এবং খেলায় তাদের আধিপত্য।

এই মারমুখী ব্যাটিং-এর জন্যই মিলবার্ন সর্বকালের চিত্তাকর্ষক খেলোয়াড় হিসাবে স্মরণীয় অ্যালেটসন, ম্যাকার্টনি, জেসফ, গ্রেগরীর সঙ্গে আজ তুলনীয়।

উনিশ শো' ছেষট্টিতে মিলবার্ন দু'বার সেঞ্চুরি করেছেন মধ্যাহ্নভোজের আগে। পরের মরসুমে অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থানকালে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া দলের হয়ে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেছেন মাত্র ৭৭ মিনিটে। এডিলেড মাঠে মিলবার্নের এই সেঞ্চুরি এক স্মরণীয় ঘটনা। কারণ, ৩৯ বছর আগে এই মাঠে পি কে লী-র ৭০ মিনিটে ১০০ রান করার পরে আর কেউ মিলবার্নের মত এত কম সময়ে সেঞ্চুরি করতে পারেন নি।

ঝড়ের গতিতে রান তোলায় এবং একক কৃতিত্বে দলের ইনিংসকে বড়সড় রানের কোঠায় টেনে নিয়ে যাওয়ায় কলিন মিলবার্নের অনেক কীর্তি। ডারহাম-এ খেলার সময়ই ক্রিকেটের বালক-বীর, ভারতীয়দের মতে ক্ষুদে ভীম, যার ব্যাটের গদায় বোলিং ধূলিসাৎ। পরের বছর নর্দাম্পটনশায়ারের দ্বিতীয় দলে বেশী খেলার সুযোগ না পেয়েও ১১৫৩ রান। ১৯৬১-তেও মিলবার্ন নর্দাম্পটনের দ্বিতীয় দলের খেলোয়াড়। দ্বিতীয় খেলাতে মিডলসেক্সের দ্বিতীয় দলের বিরুদ্ধে ইনিংসের সূচনা করে নট-আউট ২০১ রান। বলা দরকার, ইনিংসের মোট রান ২৫৬-র মধ্যে মিলবার্নের একারই ২০১। একক কৃতিত্বের উজ্জ্বল উদাহরণ। পরের খেলাগুলিতে কেন্ট, সামারসেট এবং সারের বিরুদ্ধেও সেঞ্চুরি। ফলে পরের বছর নর্দাম্পটনের বড় দলের আশা-জাগানো ব্যাটসম্যান কলিন মিলবার্ন। এই মরসুমের একটি খেলাকে মিলবার্ন এখনও তাঁর জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় খেলা বলে মনে করেন। ডার্বিশায়ারের সঙ্গে এই খেলায় মিলবার্ন করেছিলেন দলের ১৮২ রানের মধ্যে একাই ১০২। বাকি ১০ জনের মধ্যে মিক নরম্যানের নামের 'পাশে' ছিল ৫৮, অন্যানারা ৫, ০, ১, ৪, ০, ০, ৩, ০ নট-আউট ও ০। অতিরিক্ত রানের ঘরে ৯। ১০২ রানের জন্য নয়—ডার্বিশায়ারের মারাত্মক বোলিং এবং বাক্সটন মাঠের বিশ্রী পিচে খেলার জন্যই মিলবার্ন এই ইনিংসকে স্মরণীয় ইনিংস, শ্রেষ্ঠ ইনিংস হিসাবে মনে করেন।

বলতে গেলে, প্রতি বছরের শেষে মিলবার্ন-এর দেহের ওজন যেমন এক স্টোন করে বেড়েছে তেমন প্রতি বছরে একটু একটু করে বেড়েছে ক্রিকেট খেলার সুনাম। ১০ বছর বয়সে তাঁর দেহের ওজন ছিল ১০ স্টোন, ১১ বছরে ১১ স্টোন, ১২ বছরে ১২ স্টোন, এইভাবে ১৮ বছরে ১৮ স্টোন। এক সময়ে মনে হয়েছিল তার দেহের ওজন শেষ পর্যন্ত ২০ স্টোনে গিয়ে দাঁড়াবে। তাই ১৯৬২-৬৩'র ক্রিকেট মরসুমে মিলবার্ন খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করে এবং কঠিন ব্যায়ামচর্চার মাধ্যমে দেহের ওজন কমিয়ে আনলেন। ওজন দাঁড়ালো ১৬ স্টোন ৫ পাউন্ড। ফলও হাতেনাতে, মরসুমের দ্বিতীয় খেলাতেই ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে ৫৮ ও ১২০ (৭টি ছয় ও ১৪টি চার) এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১০০ ও ৮৮। প্রথম পাঁচটি কাউন্টি ম্যাচে রানের সংখ্যা ৪৪৪, যার মধ্যে ৩২২ রানই করা হয়েছে বাউন্ডারি ও ওভার-বাউন্ডারি সহযোগে। লেস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে নট-আউট ১৫২ রানের মধ্যে ছিল ৬টি 'ছ-এর' ও ১৫টি 'চার'-এর মার। পরে মাইক স্মিথের এম সি সি দলের সঙ্গে পূর্ব আফ্রিকা সফরে গিয়ে লেগব্রেক বোলার নোরেল স্যাটলওয়ার্থের এক ওভারের পর পর পাঁচটি বলে ওভার-বাউন্ডারি মেরেছিলেন, ষষ্ঠ বলেও ওভার-বাউন্ডারি মারতে গিয়ে বাউন্ডারির লাইনে ক্যাচ-আউট হয়েছিলেন। এই হচ্ছেন ২৭ বছর বয়সী ১৮ স্টোনী খেলোয়াড় কলিন মিলবার্ন—আজকের মাঝারিয়ানার ক্রিকেটের মধ্যে যিনি মারমুখী খেলায় মহারথী।

উনিশ শো' ছেষট্টিতে সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে মিলবার্নের প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ। অশুভ সূচনা। প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসের সূচনা করতে গিয়ে ০ রানে রান-আউট। দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৪ রান। তার পরের ৬টি ইনিংসে ৬, ১২৬ নট-আউট, ৭, ১২, ২৯ নট-আউট ও ৪২। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এক ইনিংসে ৮৩। সুতরাং ৯টি টেস্ট ইনিংসে মিলবার্নের বর্তমান রান ৩০৯, যার অ্যাভারেজ ৫৭·০০।

মুকুল

স্মরণ করছে। দিল্লি থেকে বরযাত্রী এসে কোথায় উঠবে তা নিয়ে কিছুদিন দুশ্চিন্তার পর রাজ বম্বের একবিখ্যাত এয়ারকনডিশন্ড হোটেল বুক করেছে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে সেই হোটেল নতুন ভাবে সাজতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। রাজের ঘনিষ্ঠ মহলে পাল্লা চলছে, কে কত বেশী চটকদার আয়োজন সাজেস্ট করতে পারে। 'মানি মারকিট' নাই এ কথা যাঁদের ঠোঁটাগ্রে বর্তমানে তাঁরা চেম্বুর মুখো হচ্ছেন না বলে জোর গুজব।

*

'কারুর পৌষ মাস কারুর সর্বনাশ' কথাটা যে কত সত্যি, তা বর্তমান বম্বের চিত্রজগতের দিকে তাকালে বোঝা যাবে। এক দিকে শতকরা নব্বইজন প্রযোজক সুটিং-এর কোন ব্যবস্থা করতে না পেরে মাথার চুল ছিঁড়ছেন, অন্য দিকে কয়েকজন প্রযোজক একনাগাড়ে কেউ তিরিশ দিন, কেউ পঁচিশ আবার কেউ চল্লিশ দিন সুটিং করছেন বা সেই রকম সুটিং করার প্ল্যান করছেন। মাত্র কয়েকজন ছাড়া, যাকেই জিগ্যেস করি, 'কবে সুটিং করছ? ছবি কদ্দুর হল', সকলের মুখ থেকেই এক উত্তর, 'আরে ভাই, কোত্থেকে সুটিং করব ইনসটলমেণ্ট না দিলে আর্টিস্টরা ডেট দেবার নাম করে না, আর ডিসট্রিবিউটরদের কাছে ইনসটলমেণ্ট চেয়ে চেয়ে হন্যে হয়ে গেছি। তাদের মুখে সেই এক কথা 'ক্যা করুঁ সাহাব, 'মানি মারকিট' ইতনা শাই হ্যায়, প্যায়সা তো আজকাল হারেম কা বেগম হে', শিফ' নবাব সাহাব ছোড়কে কই উনকি মুহ্ নহী দিখ সকতা'। 'কেন এত আন্দোলন হল, এত চেঁচামেচি তারপরও এ অবস্থা কেন?' উত্তর এলো, 'চেঁচামেচি করলাম নিজেরাই, শুনলামও নিজেরাই, আন্দোলন করলাম, ছবি ছাপল, নিজেই তা দেখে খুস্ হলাম, এখন দুর্ভোগও ভুগছি নিজেরাই। বম্বের ফিলম মোগলদের স্বরে সুর মিলিয়ে চেঁচালাম আমরা। ফাইনানসিয়ার ডিসট্রিবিউটার, সিনেমাওনাররা ফিলম মোগলদের কথাগুলো শুনতেই পায়নি মনে হচ্ছে, শুনেছে শুধু আমাদের মত চুনোপুঁটিদের চেঁচামেচি, সুতরাং তাদের দরজা আজকাল আমাদের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। ফাইনান্সের হারেমে আজকাল শুধু ফিলম মোগলদের গতায়াত, সে-রাজ্যে আমরা আজকাল হরিজন—সমঝা গায়ে রাদার ইসলিয়ে আজকাল শিফ' মথ্খিয়াঁ মার রহা হুঁ, আওর পাত্তা খেল রহা হুঁ আও আগর জেল মে কুছ হ্যায় তো শুরু হো জায়ে"। বন্ধুবর পকেট থেকে একজোড়া তাস বার করল। আমারও আজকাল সব জায়গা থেকে ইনসটলমেণ্ট বন্ধ, আমার গিন্নিকেও 'মানি মারকিট' ভীষণ শাই সুতরাং সলজ্জ হাসি হেসে আমি বিদায় নিলাম।

সরল শর্মা

অরণ্যদেব ✯ লী ফক

ওই বিদেশীরা এখানে এল কীভাবে?
ঝড়ে জাহাজডুবি হয়েছিল। ওরা ভেলায় করে ভেসে এসেছে।

অন্য একটা জাহাজ এসে বাকি সবাইকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে।
এরা আর ফিরে যেতে পারেনি।

কিন্তু এখানে থাকা তো নিষেধ।
তা ওরা জানে না। ওরা বিদেশী, ওদের দোষ নেই। ওরা যাতে শহরে যেতে পারে, তার ব্যবস্থা করে দাও।
তাই হবে অরণ্যদেব।

ইস্, কী বিচ্ছিরি বালি; চটচটে বালির মতো।
আমার জুতোয় লেপটে আছে।

রাউডি, এদের মতলব কী? আমার ভয় করছে।
সঙ্গে একটা বন্দুক থাকলে ব্যাটাদের মজা দেখিয়ে দিতুম।
কী চাও তোমরা?
আমাদের সঙ্গে এসো।

এরা আমাদের শহরে নিয়ে যাচ্ছে।
হোটেলে ঢুকেই স্নান করে পরিষ্কার হয়ে নেব। সারা গায়ে কাদা লেপটে আছে।

তোমরা আমাদের বড়ই উপকার করেছ হে। এর প্রতিদান আমি দেব।
CITY LIMITS

আঃ, এতক্ষণে বাঁচলুম।
ড্যালটকে উপরে পাঠিয়ে দাও। জামা জুতো সব পরিষ্কার করতে হবে।

ভাল করে ঘষে এই বালিমাটি তুলে দাও।
বালি কোথায়, এ যে সোনার গুঁড়ো!

সাপ্তাহিক সংবাদ

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভোলা পাশোয়ান শাস্ত্রী ২৫ জুন মঙ্গলবার তাঁর মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র রাজ্যপাল শ্রীনিত্যানন্দ কাননগোর কাছে পেশ করেন। রাজ্যপাল পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন। তবে বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত শ্রী শাস্ত্রীকে কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করেছেন। রাজ্য বিধানসভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রাখা হয়েছে। রাজ্যপালের কাছে পেশ করা পদত্যাগপত্রে শ্রী শাস্ত্রী বলেছেন, সংযুক্ত বিধায়ক দলের অন্যতম শরিক পূর্তমন্ত্রী রামনগরের রাজা শ্রীকামাখ্যানারায়ণ সিংহ তাঁর কাছে এমন কয়েকটি শর্ত আরোপ করেছেন যা রাজ্যের স্বার্থে গ্রহণযোগ্য নয় এবং এর ফলেই তাঁর সরকারের স্থায়িত্ব নড়বড়ে হয়ে উঠেছে. তাই তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর প্রস্তাব ঃ বিধানসভা ভেঙে দিয়ে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হোক। তিনি রাজ্যপালকে আরও বলেছেন, বিহার বিধানসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল না থাকায় সরকার পরিচালনা কঠিন বলে তিনি মনে করেন। ২৯ জুন শনিবার থেকে বিহারে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়েছে। সেই সঙ্গে রাজ্য বিধানসভাও বাতিল করা হয়েছে। নির্দিষ্ট কোন তারিখ স্থির হয়নি, তবে ফেব্রুয়ারিতে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সম্ভাবনা আছে। ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, রাজ্যে যে রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তাতে রাজ্য সরকারের পক্ষে সংবিধান মেনে নিয়ে সুষ্ঠুভাবে সরকারী কার্য পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না বলেই রাষ্ট্রপতি নিজের হাতেই রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করলেন।

দেশী সংবাদ

২৪ জুন—আজ কলকাতার সঙ্গে বাইরের টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও টেলিপ্রিণ্টার যোগাযোগ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বারহিতে (গয়ার কাছে) কোয়াকসিয়াল লাইন কেটে যাওয়ার ফলেই এই বিপর্যয় দেখা দেয়। সকাল সোয়া আটটা থেকে প্রায় ষোল ঘণ্টা টেলি-যোগাযোগ বন্ধ থাকে।

ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী আর এন সিংদেও আজ রাজ্য বিধানসভায় বলেন যে, আইনভঙ্গের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে গিয়ে যদি বলপ্রয়োগ ঘটে, তা হলে সে বিষয়ে বিচার-বিভাগীয় তদন্ত করতে যাওয়া অনুচিত।

২৫ জুন—পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে দুস্থ জনসাধারণের মধ্যে যাদের আদৌ কোন ক্রয়ক্ষমতা নেই তাদের বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করার জন্য রাজ্যপালের আদেশজ্ঞাপক একটি জরুরী বেতারবার্তা আজ বিভিন্ন জেলা-শাসকের নিকট পাঠানো হয়েছে।

আজ মাও মহকুমার খোদাইতে বিক্ষুব্ধ আত্মগোপনকারী নাগা নেতা জেনারেল কাইটোর অনুগামী এবং বিরোধী নাগা সৈন্যদের মধ্যে এক গুরুতর সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে কয়েকজন নাগা নিহত হয়েছে। ওই অঞ্চলের পরিস্থিতি থমথমে বলে প্রকাশ।

২৬ জুন—মালদহ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জ ও ইসলামপুর, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও ২৪ পরগণা জেলায় অনটনের এলাকায় দুস্থদের মধ্যে বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করতে রাজ্য সরকারের প্রায় ১১ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে জানা যায়।

কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন আপাতত জাতীয়করণ করা হবে না। টাকার অভাবে রাজ্য সরকার এখন কোম্পানীটির ভার নিতে পারছেন না। রাজ্য সরকার আদৌ কোম্পানীটি কিনবেন কিনা তা ১৯৮০ সালের ১ জানুয়ারী জানা যাবে।

২৭ জুন—মধ্যপ্রদেশে এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। গদীনসীন সংযুক্ত বিধায়ক দল, বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দনারায়ণ সিংহ ও জনসঙ্ঘের নেতাদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ উপস্থিত হয়েছে। আজ জনসঙ্ঘের কেন্দ্রীয় দফতর থেকে বলা হয়েছে ঃ জনসঙ্ঘের মন্ত্রীদের ৯ জুলাই মন্ত্রিসভায় আবার যোগ দেবার কথা সত্য নয়।

আজ সকালে ওড়িশা বিধানসভায় রাজ্যের স্বতন্ত্র-জনকংগ্রেস কোয়ালিশন সরকারের বিরুদ্ধে আনীত তিনটি অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। তিনটি অনাস্থা প্রস্তাবই ৭৪-৫৬ ভোটে বাতিল হয়ে যায়।

২৮ জুন—অবিলম্বে তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রশ্নে উগ্রপন্থীদের মধ্যে জোর মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। অন্ধ্রের শ্রীনাগি রেড্ডি, কেরলের শ্রীকোশলরাম দাস এবং পশ্চিমবঙ্গের শ্রীচারু মজুমদার অবিলম্বে তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গড়তে চান; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের আর একজন নেতা শ্রীসুশীতল রায়চৌধুরী এই প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধিতা করেছেন।

আজ বিকালে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়। সাতটি গ্রুপ মিলিয়ে মোট পাসের হার ৫৭। বিভিন্ন গ্রুপে পৃথকভাবে শতকরা হার ঃ বিজ্ঞানে ৬৬·৪। কলা-শাখায় ৪৯·৪। বাণিজ্য-শাখায় ৫৯·৩। কৃষিতে ২৯। টেকনিক্যালে ৪৬·২। ফাইন আর্টসে ৫৯·৫ এবং হোম সায়েন্সে ৬৭·১।

২৯ জুন—স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিধির স্থলে আজ স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্ডিন্যান্স ১৯৬৮ বলবৎ করা হয়েছে। অর্ডিন্যান্সের একটি বিধান হচ্ছে এই যে, লাইসেন্সপ্রাপ্ত যে সব ব্যবসায়ী স্বর্ণালঙ্কার তৈরি করবেন, তাঁদের অলঙ্কারের উপর স্বর্ণের বিশুদ্ধতাজ্ঞাপক ছাপ মারতে হবে।

আজ সকালে প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজের একটি বোয়িং ৭০৭ জেট বিমান দমদম বিমানবন্দরের বদলে একরকম হুমড়ি খেয়ে বারাকপুর বিমানঘাটিতে নেমে পড়ে। তাতে ১০৬ জন যাত্রী ছিলেন। যাত্রী এবং দশজন বিমান-কর্মীর মধ্যে কারও আঘাত লাগে নি।

বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুধ সরবরাহ দফতরের একজন গেজেটেড অফিসারকে সাসপেণ্ড করেছেন। গত বৃহস্পতিবার তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্তের নির্দেশ দেওয়া হয়।

৩০ জুন—আসানসোলের রানীগঞ্জে একটি কয়লাখনির ছাদ ধসে গতকাল দু'জন মারা গিয়েছেন। চারজনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহতদের মধ্যে এখনও একজনের মৃতদেহ ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে আছে।

পেশোয়ারে মার্কিন গুপ্তচর ঘাটির ভবিষ্যৎ নিয়ে ওয়াশিংটন ও রাওয়ালপিণ্ডির মধ্যে নাকি গোপনে ফয়সালা হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তান নাকি এই উদ্দেশ্যে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের বিরাট অংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে রাজি হয়েছে।

বিদেশী সংবাদ

২৪ জুন — প্যারিসে শান্তি-আলোচনাকে এগিয়ে নিতে সাহায্যের জন্য মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট হুবার্ট হামফ্রে ভিয়েতনামে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করেছিলেন। শান্তি-বৈঠকে হ্যানয়ের মুখ্য প্রতিনিধি জুয়ান লুইকে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি সরাসরি জবাব এড়িয়ে যান।

২৫ জুন—নিগ্রো নেতাদের গ্রেফতার এবং তাঁদের 'রেজারেকসন সিটি' শিবির বন্ধ করে দেওয়ায় ওয়াশিংটনে ইতস্তত হাঙ্গামা শুরু হয়। মেয়র শহরে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সন্ধ্যা-সকাল কারফু জারি করেন।

২৬ জুন — সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান তাস জানিয়েছেন, রাশিয়া আজ 'কসমস ২২৯' নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশ অভিমুখে উৎক্ষেপণ করেছেন। এ-পি'র সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিমী বিশেষজ্ঞমহল বলেছেন যে, গোয়েন্দাগিরির জন্য সোভিয়েট এই উপগ্রহটি ছেড়েছেন।

২৭ জুন—মার্কিন কমাণ্ড আজ ঘোষণা করেন ঃ উত্তর সীমান্তের যে সান ঘাটি থেকে মার্কিন নৌ-সেনাদের সরিয়ে আনা হচ্ছে। কমিউনিস্ট চাপ এর অন্যতম কারণ।

কারফু উপেক্ষা করে আজ ভোর পর্যন্ত রিচমণ্ড-এ (ক্যালিফোর্নিয়া) অগ্নিসংযোগ ও চোরা গুলিবর্ষণ চলতে থাকে। নিগ্রো বস্তি-এলাকায় দাঙ্গা শুরু হলে গতকাল রাত্রি ১০টায় ৮ ঘণ্টা কারফু জারি করা হয়। মধ্যরাত্রির পরই শহরের প্রধান প্রধান রাস্তায় নিগ্রো যুবকরা দাঙ্গা চালাতে থাকে।

২৮ জুন—নির্বাচনী বিশেষজ্ঞদের ধারণা, গদিনসীন শ্রমিক দলের অনুকূলে চমকপ্রদ কিছু না ঘটলে উইলসন সরকারের দিন ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে। এরকম মনে হওয়ার কারণ, আরও একটি উপ-নির্বাচনে শ্রমিকদের হার।

আজ একটি পাকিস্তানী সামরিক প্রতিনিধিদল মস্কো গিয়েছেন। করাচীর খবরে প্রকাশ, পাক-প্রতিনিধিদল সোভিয়েট অস্ত্র চাইতে গিয়েছেন। পাকিস্তান আগেও সোভিয়েট অস্ত্র পাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ক্রেমলিন সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন নি।

২৯ জুন — পরলোকগত দার্শনিক স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নপ্তা ডঃ অনিল শীল যেমন ঐতিহাসিক হিসাবে সুপরিচিত, তেমন শিক্ষক হিসাবেও। এ পরিচয়েই তিনি ব্রিটিশ রাজকুমার চার্লসের শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন।

৩০ জুন—বিশ্ব শান্তির পক্ষে বিঘ্নসৃষ্টিকারী বিভিন্ন বিষয় আলোচনার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন বৈঠকে বসতে রাজি। সোভিয়েট ইউনিয়ন সেই সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কমিউনিস্ট-শাসিত পূর্ব ইউরোপে নাক গলাতেও নিষেধ করেছেন।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীনন্দদুলাল কুণ্ডু

প্রকাশিত হল

দাম ৪·০০

ছেলে-ছোকরাদের বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মেস-বাড়ি নয়, কলকাতার দক্ষিণে নগর-প্রবীণদের এক সরোবর-সভা—ঘনাদা যেখানে শ্রীঘনশ্যাম দাস, আর তাঁর তস্য তস্য পূর্বপুরুষদের নবপুরাণ-কথায় বিজ্ঞানের বিস্ময়ের বদলে ইতিহাসের রহস্যের ভেলকিবাজি। ইতিহাস জীবন্ত প্রামাণ্য নিখুঁত, তার ওপর ফোড়ন গাল-গল্পের শাহানশাহ-এর বাদশাহী চাল!

ঘনাদার তস্য তস্য পূর্বপুরুষেরা বুঝি তাঁর ওপরেও এক কাঠি! তাঁদের দাস পদবীর আদি বৃত্তান্ত জানতে ভারত থেকে আটলান্টিক পেরিয়ে মেক্সিকোতে

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

নতুন ঘনাদা-কাহিনী

আগ্রা যখন টলমল

চলুন কর্টেজ-এর বিজয়-অভিযানে; ইতিহাসের এক অতল অন্তর্ধান-রহস্যের হদিস পেতে আওরঙ্গজেবের আগ্রায় ঘনাদার তস্য তস্য পিতৃপুরুষ মীর-ঈ-ইমারৎ বচন-রামের শরণ নিন।

ইতিহাসের রঙ, রস, রোমাঞ্চ, উত্তেজনার সঙ্গে শ্রীঘনশ্যাম দাসের তুলনাহীন কৌতুক-কল্পনার কারসাজি মেশানো উপন্যাসের আনকোরা নতুন পাক "আগ্রা যখন টলমল" প্রচ্ছদে, অলংকরণে অতুলন অভিনব।

॥ প্রেমেন্দ্র মিত্রের আর দুটি উপন্যাস ॥

প্রতিধ্বনি ফেরে ৪·০০ **পঞ্চশর ৩·০০**

বুদ্ধদেব বসুর

গোলাপ কেন কালো

সদ্য আকাদেমি পুরস্কারে বিভূষিত খ্যাতনামা প্রবীণ কবি ও কথা-সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর সদ্য প্রকাশিত বই "গোলাপ কেন কালো" এক নতুন ধরনের উপন্যাস ॥ দাম ৫·০০ ॥

বিমল করের

যদুবংশ

নিঃসঙ্গ ও মানসিক মূল্যবোধের শেষ আশ্রয়টুকুও যাদের পায়ের তলা থেকে সরে গিয়েছে, সেই ভ্রষ্ট, উন্মার্গ, আত্মঘাতী সমকালিক যুবসমাজের জীবন্ত-সজীব প্রতিচ্ছবি "যদুবংশ" ॥ দাম ৭·০০ ॥

বুদ্ধদেব গুহর

হলুদ বসন্ত

"হলুদ বসন্ত" এক উচ্ছ্বাসময় প্রেমের উপন্যাস। একটি তরুণ যুবমনের তীব্র আবেগ-কামনাময় প্রচণ্ড ভালোবাসার এক অনন্য বাণীরূপ এ উপন্যাসে বিধৃত ॥ দাম ৪·০০ ॥

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

আত্মপ্রকাশ

তরুণ লেখক অদ্ভুত নৈপুণ্য এবং অনুপম আন্তরিকতার সমকালের অস্থির, বিভ্রান্ত, বিপথগামী যুবমানসের অসহিষ্ণুতা, নৈরাশ্য, আর্তি প্রতিচিত্রিত করেছেন এ উপন্যাসে ॥ দাম ৬·০০ ॥

প্রবোধকুমার সান্যালের

পিয়ামুখচন্দা

এই উপন্যাসের কাহিনীটি প্রেমের। এর নায়ক একজন ছন্নছাড়া আধুনিক কবি, আর নায়িকা জন্মপরিচয়হীনা সর্বপ্রকার মোহ-মায়ামুক্তা এক ধনী বিজ্ঞানসাধিকা ॥ দাম ৬·০০ ॥

শিবরাম চক্রবর্তীর

ঘরণীর বিকল্প

"ঘরণীর বিকল্প" হাসির গল্পের এক অমূল্য সংকলন। নির্মল নিরাবিল প্রাণখোলা হাসির এক অবাধ স্রোত যেন মুক্তধারার মত প্রবাহিত প্রত্যেকটি গল্পের ছত্রে ছত্রে ॥ দাম ৩·৫০ ॥

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলকাতা ৯ ॥ ফোন ৩৪-১৪৮৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা ৯ ॥ ফোন ৩৪-৮২৬৩

এই আনৈক্যের পরিপ্রেক্ষিতে, যুক্তফ্রন্ট ... কংগ্রেসের সাম্প্রতিক ... হয়েছিল, শ্রীমোরারজী দেশাই দুর্গাপুরে থেকে ফেরার পথে কলকাতায় এসে কংগ্রেস ভবনে গিয়েছিলেন কংগ্রেসকর্মীদের কাছে ... এই বিক্ষোভ রাজনীতির ...

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৫ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৩৭
শনিবার ২৯ আষাঢ় ১৩৭৫

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীদীপ্তিপ্রকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
৩৩-২২৮০ ৩৩-৮৩৫১

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	... ২৫.০০
ষান্মাসিক	... ১২.৫০
ত্রৈমাসিক	... ৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	... ৩০.০০
ষান্মাসিক „	... ১৫.০০
ত্রৈমাসিক „	... ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	... ৩০.০০
ষান্মাসিক „	... ১৫.০০
ত্রৈমাসিক „	... ৮.০০

ভারতের বাইরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	... ৪২.০০
ষান্মাসিক „	... ২১.০০
ত্রৈমাসিক „	... ১০.৫০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	... ৬২.০০
ষান্মাসিক	... ৩১.০০
ত্রৈমাসিক	... ১৫.৫০

দাম ৫০ পয়সা
আসামে বিমান মাশুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

DESH
Saturday, 13 July, 1968

অপরাধ-প্রবণতা

সম্প্রতি কলকাতার দিনের আলোয় সদর রাস্তার ওপর বড় ... হয়ে গেল। খবরের কাগজে এই ডাকাতির বিবরণ পড়ে ও ছবি দেখে অনেকেই হয়ত শিহরন অনুভব করেছেন। কলকাতা শহরে ব্যাংক লুঠ, দোকান লুঠ, টাকার গাড়ি লুঠ একেবারে নতুন ঘটনা নয়, এমন কি যেসব পদ্ধতি হালে দেখা যাচ্ছে, ইতিপূর্বের কয়েকটি লুঠ-রাহাজানির সময় তার বিশেষ কোনো ইতর-ভেদ ঘটে নি, সেই একই—বন্দুক, রাইফেল, বোমা, মোটরগাড়ি ইত্যাদির ব্যবহার দেখা গেছে। কলকাতার এই সদ্য চাঞ্চল্যকর ডাকাতি সম্পর্কে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই, পুলিস ঘটনাটির তদন্ত করছে, তাদের দক্ষতা ও কর্তব্যের ওপর বাকিটুকু নির্ভর করছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ছে, বিচ্ছিন্ন একটি ডাকাতির কথা নয়, সমগ্রভাবে এদেশের হিংস্র আবহাওয়ার কথা। আশ্চর্যের বিষয় এই, কলকাতার এই সাম্প্রতিক বড় রকমের ডাকাতির পাশে পাশে আরও কিছু ডাকাতি, রাহাজানি, ছুরি ও বোমা মারামারির ঘটনা ঘটে গেছে, বড় ব্যাপারে চোখ থাকায় হয়ত অনেকেরই দৃষ্টি ছোট ঘটনায় তেমন করে পড়ে নি। লক্ষ করলে এটা দেখা যেত, ইদানীং শুধু কলকাতাতেই নয়, কলকাতার বাইরে, এমন কি বাংলা দেশের বাইরেও লুঠপাটের আধিক্য ঘটছে, ছুরি-বন্দুকের ব্যবহার খুব সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব থেকে একটা জিনিস বোঝা যায়, আমাদের সমাজে অপরাধ-প্রবণতা বাড়ছে, হিংস্রতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, এবং সামাজিক শাসন-অনুশাসনে আর কোনো ভীতি [illegible] নেই।

কলকাতা, শহরতলি ও আমাদের শিল্পাঞ্চলের কথাই ধরা যাক। নিতান্ত অন্ধ না হলে সকলেরই চোখে পড়বে একদল উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া, দুর্বিনীতের [illegible] তৈরি করে আছি। পাড়ায় পাড়ায় রাস্তায়, চায়ের দোকানে [illegible] ছেলে-ছোকরাদের নিয়ে দেখছি [illegible] ঘোড়া-প্যান্ট আর [illegible] করতে শিখেছে। এদের কাছে [illegible] ও ছুরি [illegible] নিরীহ [illegible]। এদের যারা অভিভাবকস্থানীয়, তাদের [illegible] এমন নয়। [illegible] এদের বিশেষ কোনো ভয়ডর নেই। [illegible]

[illegible] এই [illegible] সমাজে [illegible] হয় নি [illegible] এমন বোধ হয় [illegible] হয় নি। এখন দিনে দিনে এটা বাড়ছে [illegible] নির্বিবেক [illegible]।

প্রশ্ন হবে, কেন এমন হল? একদল লোক, আমাদের দুঃখ, দারিদ্র্য, সামাজিক অব্যবস্থা—ইত্যাদির দিকে আঙুল দেখাবেন; অন্য দল সান্ত্বনা দিয়ে বলবেন, কালের হাওয়া। এই দুটি কৈফিয়তের বা অন্য কোনো চলতি কৈফিয়তের মধ্যে কিছু সত্য থাকতে পারে, সবটা নেই। এই কলকাতা শহরে, হাটে-মাঠে-বাজারে, রাস্তায় আমরা শত শত দীন-দরিদ্র দেখেছি যারা পেটের অন্নের জন্যে সওদা ফেরি করছে; দেখেছি তাদের যারা সংসারের জন্যে রোদঝড় সয়ে মাথায় বয়ে সবজি এনে বেচছে, রাত-শেষে ছুটছে মাছের আড়তে যৎসামান্য মাছ কিনতে, কলকারখানায় দিন-মজুরি করছে, এবং আরও কত কি। পেটের অন্ন আর সংসারের দায় বইতে যাদের এত সামর্থ্য নষ্ট হচ্ছে তারা নিশ্চয় ছুরি-বোমা নিয়ে মানুষের ওপর হামলা করতে ছোটে না, সে মন সে অবসর তাদের নেই। বরং এই অবসর ও মনোবৃত্তি তাদেরই, যারা পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব মানে না, স্বাভাবিক জীবন যাপন ও সৎ পরিশ্রমে অনাগ্রহী যারা ক্রমশই অনাচার ও নির্মমতার প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। এটা মনের বিকৃতি, অনাচারী হবার আত্মতৃপ্তি। সমাজে দু'-দশজনের বিকৃতি গায়ে লাগে না, কিন্তু এই যে বিরাট একটি অংশ অনাচারী, নির্মম ও বিকৃত-স্বভাব হয়ে যাচ্ছে এর জন্যে মাথা ব্যথা হবে কার? পুলিসের? সম্ভবত নয়। তবে কি রাজনৈতিক নেতাদের? তাও বোধ হয় নয়। সমাজ-কর্মীদের? তারা কি জীবিত আছেন? তবে কার?

নেতাদের সঙ্গে। তাঁর এই আলোচনার পরেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে নির্বাচন সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন মন্তব্য আসেনি। স্পষ্ট যেটা জানা গিয়েছে সেটা পশ্চিমবাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের স্থির বক্তব্য যে, নভেম্বরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পথে অনেক বাধা এবং এই সব বাধা (যেমন যাতায়াতের অসুবিধা) থাকার জন্য নভেম্বরের নির্বাচনে বহু ভোটদাতা অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

অপরদিকে যুক্তফ্রন্টের বক্তব্যঃ নভেম্বরে ধান পাকার সময়। তখনকার অবস্থা দেখে আগামী ফসলের একটা আনুমানিক হিসাব পাওয়া যায়, যার উপর ভিত্তি করে আগামী বছরের খাদ্যনীতি নির্ধারণ করা সম্ভব। খাদ্যনীতি প্রধানত সরকারী প্রথায় ধান সংগ্রহের সাফল্যের উপর নির্ভরশীল। ধান সংগ্রহের প্রোগ্রামটা ফসল কাটার আগে ঠিক করে না ফেললে খাদ্যনীতিকে ঠিক রাখা সম্ভব হয় না, যেমন হয়নি গত চতুর্থ নির্বাচনের পর। যুক্তফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হন, তখন খাদ্যের অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক। খাদ্য সংগ্রহের অবস্থাও তাই। কারণ, কংগ্রেস সরকার নির্বাচনের সামনে দাঁড়িয়ে কোন সক্রিয় সংগ্রহ নীতি গ্রহণ করেনি। এরই ফলে, পরে খাদ্যের চাহিদা মেটান সম্ভব হয়নি, দাম ঠিক রাখাও অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এই কারণেই যুক্তফ্রন্টের দাবী যে, এমন সময় নির্বাচন হওয়া উচিত যখন নূতন সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সক্রিয় ও সফল খাদ্য সংগ্রহ নীতি গ্রহণ করতে পারে। ফসল কাটা হয়ে গেলে কোন নীতি সফল করা সম্ভব হয় না। সেজন্য যুক্তফ্রন্ট চায় যে, নির্বাচন নভেম্বর মাসেই হোক এবং কোনমতেই তেটা পিছিয়ে দেওয়া উচিত হবে না।

যুক্তফ্রন্টের এই যুক্তি থেকে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ফ্রন্টের নেতাদের মনে আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। নেতাদের এবং বিশেষ করে মার্কসিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি, যাদের প্রার্থী সংখ্যা সবচাইতে বেশী, তাদের ধারণা যে, বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় কংগ্রেসের পক্ষে কোন-ক্রমেই ক্ষমতায় ফিরে আসা সম্ভব নয়। ফ্রন্টের কোন কোন সরিকের অনুমান, কংগ্রেস আসনসংখ্যা এবার আরও কমে যাবে এবং যুক্তফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসবে। এই অনুমানের ভিত্তি হিসাবে বলা হয়েছে যে, পশ্চিম বাংলার জনগণ কংগ্রেস সম্বন্ধে মোহাবিষ্ট নয়। তাছাড়া পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস সংগঠন নানা কারণে বিপর্যস্ত ও অন্তর্দ্বন্দ্বে বিপন্ন। সংগঠনের মধ্যে যদি অনৈক্য থাকে, তাহলে নির্বাচনে সাফল্য লাভ করা কষ্টসাধ্য।

এই অনৈক্যের পরিপ্রেক্ষিতে, যুক্তফ্রন্ট মহল পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের সাম্প্রতিক দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা অনুমোদন নিয়ে। বেশ কিছুদিন ধরে এই প্রার্থী তালিকা রচনার ব্যাপারে নানা আলাপ আলোচনা হয়েছে কংগ্রেস মহলে। শ্রীঅতুল্য ঘোষ বিশেষভাবে বিভিন্ন জেলা সংস্থাগুলোর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে সাংগঠনিক অনৈক্য দূর করার চেষ্টাও অনেক করেছেন। এই প্রচেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসের পক্ষে যে ভোট আগামী নির্বাচনে পড়তে পারে তা যেন কোনক্রমেই ভাগ হয়ে না যায়। অ-কংগ্রেসী দলের বিরোধী কোন প্রার্থী থাকলেই কংগ্রেসের ভোট কমে যেতে পারে। এটা আশংকা করেই শ্রীঅতুল্য ঘোষ চেষ্টা করেছিলেন শ্রীহুমায়ুন কবীর এবং তাঁর লোকদলের সদস্যদের কংগ্রেসের মধ্যে টেনে আনার জন্য। যে কোন কারণেই হোক সে-প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সফল হয়নি। ফলে একটা অংশ শ্রীকবীরের সঙ্গে থেকে গিয়েছে, যাদের পক্ষে কংগ্রেসের ভোট ভেঙে আনা সহজ। তা যদি হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, কংগ্রেসের ভোট বিভক্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা দূর করা যায়নি।

এ-ছাড়া অন্য দুর্বলতাও প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে। সে-দুর্বলতা বড় আকারে দেখা দিয়েছে শ্রীবিজয় সিং নাহারের সাম্প্রতিক বিদ্রোহ ঘোষণার মিথ্যাকে। প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জেলা প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে নির্বাচনের জন্য প্রার্থী তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছিল। সে প্রার্থী তালিকা যখন দিল্লীতে পাঠান হয় কংগ্রেসের নবগঠিত কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির অনুমোদনের জন্য তখনই বিরোধের সূত্রপাত। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি প্রার্থী তালিকা থেকে তিনটি নাম অনুমোদন করতে রাজী হয়নি। কোন কারণ অবশ্য প্রকাশ্যভাবে দেখান হয়নি। কিন্তু শ্রীবিজয় সিং নাহারের ধারণা যে, কমিটির নির্বাচিত সদস্য শ্রীঅতুল্য ঘোষের ইচ্ছানুসারেই তিনটি নাম বাদ পড়েছে। ফলে, শ্রীনাহারের বক্তব্য যে, এতে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসে শ্রীঅতুল্য ঘোষের দলগত স্বার্থকেই কায়েম করা হয়েছে। তাই তিনি সক্ষোভে কংগ্রেসের মনোনয়ন প্রত্যাখ্যান করবার বাসনা পশ্চিম বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রকে জানিয়েছেন। সে-পত্র পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে এটাও ঘোষণা করা হয় যে, শ্রীমোরারজী দেশাই কংগ্রেস ভবনে এলে তাঁর কাছে অভিযোগ উত্থাপন করার জন্য এক শ্রীঅতুল্য ঘোষ-বিরোধী বিক্ষোভ আয়োজন করা হবে।

যথারীতি এই বিক্ষোভ জানান হয়েছিল, শ্রীমোরারজী দেশাই দুর্গাপুর থেকে ফেরার পথে কলকাতায় এসে কংগ্রেস ভবনে গিয়েছিলেন কংগ্রেসকর্মীদের কাছে ভাষণ দেবার জন্য। এই বিক্ষোভ রাজনীতির দিক থেকে কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্বের দুর্বলতাই শুধু নয়, অসাফল্যও ঘোষণা করে। এটা উপলব্ধি করেই শ্রীমোরারজী দেশাই কংগ্রেস কর্মীদের আগামী ছয় মাসের জন্য কোনরকম দলাদলিতে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। অভ্যন্তরীণ অনৈক্য যে প্রতিপক্ষকে শক্তিশালী করবে এটা অনুমান করে তিনি এ কথাটা বলেছেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য অংশ এটাই যে, তিনি ছয় মাসের জন্য দলাদলি মুলতুবী রাখতে অনুরোধ জানিয়েছেন। এটা যদি আগামী নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতেই বলা হয়ে থাকে, তাহলে ছয় মাসের সময়কাল নির্বাচনকে নভেম্বর/ডিসেম্বরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দেয়। শ্রীমোরারজী দেশাইর নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোন অভিমত আছে কিনা সেটা স্পষ্ট জানা নেই; কিন্তু তাঁর ছয় মাসের সীমানা থেকে এটাই মনে হবে যে, শ্রীদেশাইর হিসাব অনুসারে নভেম্বরের কাছাকাছি খবরই সঠিক। এটা থেকে বোঝা যায় যে, নির্বাচন পিছিয়ে দেবার রাজনৈতিক ঝুঁকি সম্বন্ধে তিনি সচেতন।

তাঁর এই মন্তব্য নির্বাচন পিছিয়ে দেবার প্রশ্ন সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন শেষ কথা নয়; কিন্তু এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এই প্রশ্নে কংগ্রেস মহলেও দ্বিধা আছে। সেই দ্বিধা আরও প্রকট হবার সুযোগ পেয়েছে যুক্তফ্রন্টের প্রধান সরিক মার্কসিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির মন্তব্যে। মার্কসিস্ট কম্যু-নিস্ট পার্টির মতে কংগ্রেস সাময়িক দুর্বলতা ভুগছেন এবং সে-কারণে, এই সুযোগে যুক্তফ্রন্টের ঐক্য ও সংহতি আরো শক্তিশালী করে তুলতে হবে। কিন্তু এটাও বড় কথা নয়। নভেম্বরের নির্বাচনের সঙ্গে

আরও কয়েকটি বড় প্রশ্ন জড়িত আছে। প্রধান প্রশ্ন, পশ্চিম বাংলায় নভেম্বরের নির্বাচনের ফলাফল বিহার এবং উত্তর প্রদেশের ফেব্রুয়ারী নির্বাচনকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করবে। এই প্রশ্ন নিয়ে কংগ্রেস এবং অ-কংগ্রেস দুই মহলেই দ্বিধা এবং সংকোচ আছে। দুই মহলেরই ধারণা যে, পশ্চিম বাংলার নির্বাচনে জয় পরাজয় অনেকাংশে বিহার ও উত্তর প্রদেশের নির্বাচনে জয় পরাজয় প্রভাবান্বিত করবে।

পশ্চিম বাংলায় নভেম্বর নির্বাচন সম্বন্ধে ইতিমধ্যে যুক্তফ্রণ্ট সরিক সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। কারণ এস-এস-পির রাজনৈতিক ক্ষেত্র বিহার ও উত্তর প্রদেশে আরও বেশী প্রসারিত। অন্যান্য দলের মধ্যেও এই সন্দেহ আছে। ফলে, নভেম্বরে নির্বাচন হবে কি, হবে না—এ প্রশ্নের সহজ কোন সূত্র বা উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। নির্বাচন পিছিয়ে দিলে, কংগ্রেসের রাজনৈতিক শক্তি কিছুটা ক্ষুন্ন হতে পারে; কিন্তু নভেম্বরে নির্বাচন হলে যুক্তফ্রণ্টের অনেক সরিকেরই অসন্দিগ্ধ থেকে যাবে। তাই মীমাংসা সহজে হবে কিনা সন্দেহ।

বিদেশিকী

মিশর-মস্কো-ইজরায়েল

আরব-ইজরায়েলী যুদ্ধের পর পুরো একটা বছর কেটে গেল; এখন না-যুদ্ধ, না-শান্তি। ছোটখাট সংঘর্ষ সমানে চলেছে। আবার একদফা রীতিমত সম্মুখ সমর এগিয়ে আসছে কিনা কে বলতে পারে? ইজরায়েলের ওপরে আরবদের আক্রোশ একটুও কমেনি, সামনা-সামনি লড়াইএর উৎসাহ ঝিমিয়ে এসেছে। আসাই স্বাভাবিক, গত বছর মাত্র ছ'দিনের লড়াইএ ইজরায়েলের কাছে মিশর, জর্ডন, সিরিয়ার প্রচণ্ড পরাজয়ের ধাক্কা আরবরা কাটিয়ে উঠতে পারেনি, কোনকালে পারবে মনে হয় না। প্রেসিডেণ্ট নাসের জানেন ঘরে বাইরে কোথাও তাঁর আর আগের মত প্রতিপত্তি নেই। একমাত্র ভরসা সোভিয়েট রাশিয়া। পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিন-ব্রিটিশ প্রভাব খর্ব করায় সোভিয়েটের স্বার্থ আছে, কিন্তু আরব দেশগুলির লড়াইএর সামর্থ্যের ওপর রাশিয়ার এখন নিশ্চয়ই আস্থা নেই। আরব-ইজরায়েলী যুদ্ধে প্রেসিডেণ্ট নাসেরের সামরিক বাহিনীর অপদার্থতা রাশিয়াকেও অপদস্থ করেছে। বহু কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র সামরিক সরঞ্জাম প্রেসিডেণ্ট নাসের পেয়েছিলেন রাশিয়ার কাছ থেকে, সে-সবই ঝোড়ো হাওয়ায় ঝরাপাতার মত গত বছর ছ'দিনের যুদ্ধে ইজরায়েলীরা উড়িয়ে দিয়েছে। রাশিয়া তারপর আবারও প্রেসিডেণ্ট নাসেরকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছে; সোভিয়েট কূটনৈতিক প্রচারও আগের মতই ইজরায়েলের বিরুদ্ধে, কিন্তু আরবদের পক্ষ নিয়ে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়াইএর দায় রাশিয়া তার নিজের কাঁধে তুলে নিতে কখনও রাজী হবে মনে হয় না।

প্রেসিডেণ্ট নাসের মস্কো গেছেন সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য। মস্কোয় কথাবার্তা কোন্‌দিকে মোড় নিচ্ছে অনুমান করা শক্ত। প্রেসিডেণ্ট নাসের বলছেন, ইজরায়েলের দখলীকৃত আরব এলাকাগুলি পুনরুদ্ধারে সোভিয়েট রাশিয়া মিশরকে সাহায্য করবে। তার মানে নিশ্চয়ই এ নয় যে, রাশিয়া মিশরের পক্ষ নিয়ে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াইএ রাজী; কিম্বা প্রেসিডেণ্ট নাসের আবার লড়াই বাধালে রাশিয়া সে লড়াইএ যোগ দেবে। নিরাপত্তা পরিষদের গত নভেম্বর মাসের সিদ্ধান্ত রাশিয়াও মোটামুটি মেনে নিয়েছে; মিশর এবং জর্ডনও নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করতে পারেনি। অগ্রাহ্য যদি করত তাহলে ইজরায়েলী বাহিনী অনায়াসে কায়রো পর্যন্ত দখল করত, জর্ডনের বাকী আধখানাও কোনমতে টিঁকে থাকতে পারত না।

প্রেসিডেণ্ট নাসেরের এখন উভয়সংকট। ইজরায়েলকে খতম করার জিগীর তুলে তিনি আরব মুল্লুকের মহান নেতা হতে পেরেছিলেন। এখন সে-জিগীর কায়েত অচল, কিন্তু ইজরায়েলের সঙ্গে কোনরকম রফানিষ্পত্তির কথা প্রেসিডেণ্ট নাসের কিম্বা রাজা হুসেন মুখে তুলতে সাহস পান না। প্যালেস্টাইনের ওপর আরবদের ঐতিহাসিক দাবি একেবারে ধর্মগ্রন্থের বচনের মত প্রত্যেক আরব রাষ্ট্রনেতাকেই অক্ষরে অক্ষরে মেনে নিতে হয়; মনে মনে না হোক, মুখে অবশ্যই। এদিকে সর্বনাশ, মিশর, জর্ডন এবং সিরিয়ার কতকগুলি অংশ এখন ইজরায়েলের দখলে। বিজ্ঞ-জনের মত অর্ধেক ত্যাগ করে ইজরায়েলের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব মিশর ও জর্ডন মেনে নিলে পর পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি হয়তো স্বাভাবিক হয়। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট নাসের কী অতদূর নামতে পারেন? নামলে তাঁকে গদীও হারাতে হতে পারে।

প্রেসিডেণ্ট নাসের অন্তত এটুকু বুঝেছেন যে, প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ইজরায়েলকে হটিয়ে দিতে পারা আরবদের সাধ্যাতীত। আরব ইজরায়েলের সঙ্গে বোঝাপড়া করলে বিষম প্রতিপত্তি নাশ এবং আরও নানা অনর্থের সম্ভাবনা। প্রেসিডেণ্ট নাসেরের কথাবার্তায় তাই নরম ও গরম দুরকম সুর। নিরাপত্তা পরিষদের গত নভেম্বর মাসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পশ্চিম এশিয়ার সমস্যার নিষ্পত্তি সম্ভব, একথা প্রেসিডেণ্ট নাসের বলেছেন। না বলে উপায় নেই, কারণ রাশিয়ার মতও তাই। তবে আরবদেরও খুশী রাখা চাই; প্রেসিডেণ্ট নাসের অতএব ভয় দেখিয়েছেন ইজরায়েলের ওপর আবারও আক্রমণ চালানো দরকার হতে পারে। নকল বীরত্বের দৌড় যে কতদূর সে তো গত বছরেই দেখা গেছে।

আরব-ইজরায়েলী বিরোধের নিষ্পত্তি সহজ নয়, কোন সময়েই সহজ ছিল না, এখন আরও কঠিন। কারণ গত বছর যুদ্ধের পর ইজরায়েল তার সীমান্ত এগিয়ে নিয়েছে মিশর, সিরিয়া এবং জর্ডনের কিছু কিছু এলাকায়। জর্ডন নদীর পশ্চিম তীর, জেরুজেলাম শহরের উপর দখল ইজরায়েল কখনও ছাড়তে রাজী হবে কিনা সন্দেহ। মিশরের গাজা এবং সিনাই অঞ্চল সম্পর্কেও প্রায় সেই কথা। নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশ অবশ্য যে, গত বছর যুদ্ধে অধিকৃত এলাকাগুলি থেকে ইজরায়েলের সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নিতে হবে। ইজরায়েলের তাতে প্রবল আপত্তি। ইজরায়েলের ওপর অন্যায় আক্রমণ চালিয়েছিল আরবরাই; আরবরা ইজরায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকার তো করেই না, উপরন্তু ইজরায়েলকে পশ্চিম এশিয়া থেকে মুছে ফেলতে চায়। এ অবস্থায় ইজরায়েল তার নিরাপত্তার প্রয়োজন মত শত্রুদের এলাকা দখলে রাখতে চাওয়া অসংগত নয়।

তবে আরব-ইজরায়েলী বিরোধ চিরস্থায়ী হোক, এটাও স্বাভাবিক নয়। ইজরায়েল বারবার প্রস্তাব করেছে ইজরায়েলের সংগে আরব রাষ্ট্রগুলি সরাসরি কথাবার্তা মারফত নিষ্পত্তির চেষ্টা হোক। কোন আরব রাষ্ট্রই তাতে রাজী নয়। এখন সামান্য সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে দু একটি। মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্প্রতি বলেছেন ইজরায়েলের বাস্তব অস্তিত্ব মিশর স্বীকার করে। সে আর এমন কথা কী? ইজরায়েলের বাস্তব অস্তিত্ব মিশর, জর্ডন, সিরিয়া হাড়ে হাড়ে বুঝতে বাধ্য হয়েছে গত বছর। ইজরায়েল তাই বলেছে, মিশরের তরফ থেকে এই স্বীকৃতির তাৎপর্য নামমাত্র; আরবরা স্বীকার করুক, না-করুক, ইজরায়েল-রাষ্ট্র আছেই, থাকবেও। বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আরবরা কতদূর কী করতে প্রস্তুত সেটাই আসল কথা।

আসল কথা অর্থাৎ পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এখনও কোন স্পষ্ট রূপ নেয়নি। মস্কোয় প্রেসিডেণ্ট নাসেরের দরবার হয়তো খুব সুবিধা করতে পারবে না। রাশিয়া জানে আবারও লড়াই-এর পথ ধরলে আরবদের বিপর্যয় অনিবার্য। গত বছর যুদ্ধের পর আমেরিকা এই প্রথম আবার ইজরায়েলকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ শুরু করেছে। পশ্চিম এশিয়ায় এ-পক্ষে ও পক্ষে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের প্রতিযোগিতায় রাশিয়া এবং আমেরিকা কেউই কম নয়; তফাৎ এই যে আরবদের অস্ত্রশস্ত্র দিলেও তাদের যুদ্ধসামর্থ্যের ওপর রাশিয়ার ভরসা নেই। প্রেসিডেণ্ট নাসের এবং আরবদের সামনে দুটি মাত্র পথ খোলা, হয় ইজরায়েলের সংগে নিষ্পত্তি, নয় পরাজয়ের অপমান ও ক্ষয়ক্ষতি মেনে নেওয়া।

৮-৭-৬৮

ছাতা

হরপ্রসাদ মিত্র

আমি মাঠ নদী গ্রাম শহর পেরিয়ে
    চলেছি তো চলেইছি।
উপলক্ষ আছে বিবিধ;
কোন্ পরিভাষার বাহনে
    আমার সত্য যে সর্বজনীন হবে, জানি না।

প্রকৃতির পুরো আয়োজনটাই ছলনা
    —বলতে দ্বিধা হয়,
কারণ, সজনের ফুলেল বেড়া,
    শিমুলের লালে-লাল প্রহরী ভঙ্গি,
দুপুরের দাঁড়কাক,
    অথবা, ঠান্ডা সব নদীর গতি—
আমার নিজের মধ্যেই আমি অনুভব করি।

যেন ভালবাসার স্বভাবই এই দৃশ্য রুচি—
যেন ছুঁয়ে দূরে হারিয়ে যাওয়ার নাম, হাওয়া,
যেন ওতপ্রোত অদৃশ্যতার নাম, আকাশ,
আর, সত্যই সেই উত্তরের পাহাড়—
যার পরপারে কে আছে কারা হাঁটছে,
                    কিছুই জানি না।

বোধ হয় নির্বোধ বলেই
সেদিন সরল একটা কুকুর ছানা পড়লো
                    বাসের চাকায়,—

সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে ড্রাইভার বললে 'শালা'।
অনেক কিছু দেখে চলা এখানে অবান্তর;
সহিষ্ণুতার যোগ্য আধার নয়
                    এই পরমায়ু।

হাটের আওয়াজ, মাঝির গান,
    খিস্তি-খেউড়, লোহারাম, শিবরাম—
সকলের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে
    কখনো পৌঁছে যাই
    আমার বিশেষ সেই নিসর্গবোধে—
যেখানে যুদ্ধও কালগ্রস্ত, শান্তিও মহাস্তব্ধ।
    তাকেও লোকালয় বলে না।

লোক বিবেচনা সহিষ্ণুতা নয়।
লুকিয়ে শেকল ছিঁড়তে পারলে
                    কেউ কিছু বলবে না।
সবাই জানে, চালাকিই সভ্যতার ফসল।
কিছু কিছু না-দেখারই নাম, ভব্যতা।

কিন্তু কবন্ধেরা প্রাকৃতিক।
বটগাছের শক্ত গুঁড়িতেই প্রকৃতি সঞ্চারিত হতে দেয়
                    ছায়ার [illegible]।
আমাদের ছাতা তেতে ওঠে
                    অল্প রোদেই।

বাঁধ-নির্মাণ

শান্তিকুমার ঘোষ

একেবারে উত্তর কোণের বাঁধ তৈরি শেষ
দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে দুটি অংশে
পাড়ের উপর হতে এবং নদীগর্ভে
একটানা নয়
টুকরো-টুকরোভাবে গড়ে ওঠে বিশাল ব্যারাজ

উত্তর দিকের স্রোত থেকে রক্ষা করবে সুদৃঢ় ওই ড্যাম
অনেক শতাব্দী ধরে রোধ করবে বন্যার আক্রমণ
পূর্ব ও পশ্চিমের শ্রমিকবাহিনী তাই
এই বসতিবিরল পাহাড়ে অঞ্চলে
গৃহ থেকে যোজন-যোজন দূরে
পাহাড় কাঁপিয়ে কেটে তুলে আনে বাঁধের পাথর
ন কেটে আনে বাঁধের ঠেকনো
াঁধ সম্পূর্ণ হবার জন্য প্রার্থনা-সঙ্গীত ওঠে গ্রামের মন্দিরে

প্রথম প্রস্তর স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে রাজমিস্ত্রী দল
ব্যারাজের অঙ্গ বলে অনুভব করে নিজেদের
জড়ো হয় সমস্ত যুগের স্থাপত্য জ্ঞান
সৌভ্রাত্র ছড়িয়ে পড়ে দিগন্ত অবধি

পাড়ের উপর থেকে এবং নদীগর্ভে
শীতে আর বর্ষাকালে
আংশিক এগিয়ে চলে কাজ
কয়েক পুরুষ ধরে।
একটা ঢেউয়ে ফিরে আসে হারানো কৈশোর
অন্য ঢেউ ছুঁড়ে দেয় প্রেমিকার কণ্ঠস্বর
বাঁধের বন্ধন কোথাও আলগা
কোনোখানে মজবুত
অবিচ্ছিন্নতার নয়
একটু-একটু করে রূপ পায় স্বপ্নের ব্যারাজ

FREEDOM OF THE PRESS

যাহা খুসি ছাপিবার অবাধ স্বাধীনতা চাই

সুনন্দর জার্নাল

'গোপালচন্দ্র অ্যান্ড কোং'

বাড়িতে এক খণ্ড পুরোনো 'কপালকুণ্ডলা' রয়েছে। সেটি যে কতকাল আগেকার—কার সংগ্রহ, তা জানি না। দ্বিতীয় বা তৃতীয় মুদ্রণ মনে হয়। বইখানা নাড়াচাড়া করতে করতে টাইটেল-পেজের একেবারে নীচের দিকে ছোট্ট একটি সই চোখে পড়ল: বি সি চাটুজ্জে।

অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের স্বাক্ষর। [illegible] প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের [illegible] তাঁর সই দেখতুম। তা হালি বঙ্কিমচন্দ্রের [illegible] প্রথা ছিল, [illegible] কোনো বই মানতে না পারেন, তাই প্রচলন।

এ যুগে আর এসব দরকার হয় না—এখন লেখক আর প্রকাশক বিশ্বাস এবং ভালোবাসার স্বর্ণসূত্রে যুক্ত হয়ে বাঁধা। কিন্তু হালে তার একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। একই নামে আসরে নামছেন একাধিক লেখক। মুশকিল হয়েছে আদি ব্যক্তির—দ্বিতীয় জনের খ্যাতি এবং অখ্যাতি তাঁকে অকারণ পুলকে আত্মসাৎ করতে হচ্ছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি যদি আর একটু সৌজন্যসম্পন্ন হন, তা হলে তিনি হয়তো নিজের নামের সঙ্গে লিখে দেবেন—"শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'চাঁদমুখ' প্রণেতা।" অর্থাৎ 'শ্রীকান্ত' প্রণেতার সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। কিংবা পৈতৃক সূত্রে একই নামের অধিকারী দু'জনের একজন শ্রীমান আর একজন শ্রীহীন হয়ে বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবেন। কিন্তু তা যদি না হয়—অবিকল একই নামের দুই সূর্য, চন্দ্র, ধূমকেতু কিংবা রকেট [illegible] আকাশে এক সঙ্গে যদি উদিত হতে থাকেন, তা হলে প্রথমটিকেই 'ত্রাহি ত্রাহি' বলে আর্তনাদ করতে হয়। এবং এমন যদি হয়—যে দ্বিতীয় জনের বইতে খুব রোমাঞ্চকর প্রচ্ছদপট থাকে আর তার প্রকাশক যদি পঞ্চাশ পার্সেন্ট কমিশনে সে বই বেচতে থাকেন—তা হলে আদি লেখক কিংবা লেখিকার বাণপ্রস্থ ছাড়া গতি থাকে না।

শোষিত জনতার মুক্তির পথ বটতলা

জীবন

শরৎ সাহিত্য ২৫ পয়সা

টাকায় দু' কিলো ক্লাসিক সাহিত্য

কী করা যেতে পারে? নিজের বইয়ে একটি করে ফোটোগ্রাফ ছেপে দেওয়া? সে তো বীভৎস। নইলে মতি রায়ের যাত্রার বইয়ের মতো 'আসল নাম ও ছাপ দেখিয়া লইবেন'? সে তো আরো ভয়ংকর—সাহিত্য-চর্চা নিশ্চয় তিল তেল অথবা ছাত্রতারণ নোট বইয়ের ব্যবসা নয়।

এদিকে বাংলা বইয়ের বাজারে এক নাগাড়ে দ্বিতীয় লেখকেরা প্রবলবেগে আবির্ভূত হচ্ছেন। মনে করুন, কমল দত্ত 'রক্ত মন্ত্রী-উজীর' লিখে দিগ্বিজয় করলেন, সঙ্গে সঙ্গে আর এক কমল দত্ত বটতলাজাতীয় কোনো প্রকাশনা থেকে '[illegible]' নিয়ে [illegible]—' বলে তাঁকে তাড়া করলেন। হয়তো হরেন চট্টোপাধ্যায়ের বাজারে কিছু চলে, বই আছে—একদিন কোত্থেকে আর এক হরেন চট্টোপাধ্যায়ের ফুলপাতা আঁকা 'বুকে রেখো' নামে এক উপন্যাস এসে পড়ল। হরেনের বুকের ওপর বোমার মতো ফেটে পড়ল।

দ্বিতীয় কমল দত্ত, হরেন চাটুজ্জে অথবা অনুতোষ ঘোষেরা হয়তো পৈতৃক অধিকারেই স্বনামধন্য। কিন্তু প্রথমেরা কী করবেন? এদের জন্যে জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে পড়বেন? নাকি, দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে পোষণ করতে থাকবেন একটি অসম্ভব আশা: পাঠক-পাঠিকারা অন্তত ভুল করবেন না—আসল-নকল তাঁরা ঠিক চিনে নেবেন?

এক বন্ধু এসে বললেন, 'গোপালচন্দ্রকে চেনো?'

'না। কে সে?'

'প্রাতঃস্মরণীয় লোক। মনে করো তার ভালো নাম রণকুমার খাণ্ডা। সে ফাটকা-বাজারে ব্যবসা করতে পারত, কেপমারী গ্যাং-এ থাকলেও বেমানান হত না। কিন্তু লোকটা দারুণ সাহিত্য-প্রেমিক—তাই এই লাইনেই তার ট্যালেণ্টকে চ্যানেলাইজ করে দিয়েছে।'

'আর একটু খুলে বলো।'

'মনে করো—সে একটা প্রকাশন সংস্থা খুলেল—নাম দিলে "প্রলয়ংকর প্রকাশিকা।" নতুন লেখকদের বই ছেপে দেবে বলে তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা আদায় করে নিলে, তারপর যথাকালে প্রলয়ংকরের ঝাঁপ বন্ধ করে সে উধাও হল। সেখান থেকে গিয়ে হাজির হল এক বাঘা প্রকাশকের কাছে—দশ-পনেরো-কুড়ি-পঁচিশ যা পায়, তাতেই একটা করে দু-তিন ফর্মার শিহরণ-জাগানো বই লিখতে লাগল। সেসব বইয়ে গাছের পাতায় পটাশিয়াম সায়নাইড মাখানো থাকে আর লক্ষপতি ধনপতিবাবু গাছতলায় হাওয়া খেতে গিয়ে সেই সঙ্গে সায়নাইড গিলে পঞ্চত্ব পান। এই সমস্ত লিখে বেশ শাইন করে সে দেখল, বাজারে "প্রেম ও কামনা" বলে যৌনতত্ত্বের পত্রিকাটির দারুণ চাহিদা। অতএব গোপনচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে "প্রেম আর কামনা" বলে আরো রসালো আর একটা

সাহিত্যের একচেটিয়া কারবারীরা ধ্বংস হোক
শোষনহীন সমাজ চাই

প্রতি গ্রন্থের সহিত লেখকের স্ত্রী ও বান্ধবীদের স্বাক্ষরিত ছবি বিনামূল্যে

কাগজ বের করে ফেলল। আর কচু গাছ কাটতে কাটতেই শাল্মলী তরু সংহারের মৌলিক অধিকার জন্মায়—গোপনচন্দ্র দেখল, ডুপ্লিকেট কমল দত্ত, হরেন চাটুজ্জে কিংবা বিভাবতী দেবী চৌধুরানী হতে পারলে আরো বেশি পয়সা পাওয়া যায়, অতএব—'

'তুমি বলতে চাও, এই লোকটিই এসবের চীফ-আর্কিটেক্ট্?'

'আমি বলবার কে হে? বাজারে কান পাতলেই শুনতে পাবে।'

'তবে তো একে জেলে—'

'থামো। প্রমাণ করবে কী করে? বাংলা দেশে এসব তো কমন-নাম, তখন ক'জন কমল দত্ত, হরেন চাটুজ্জে কিংবা বিভাবতী চৌধুরানী কোর্টে এসে এফিডেভিট করলে দাঁড়াবে কোথায়? নামের ওপর কোনো কপি-রাইট আছে? ওরিজিন্যাল মসিয়ো ড্যাগু কিছু করতে পেরেছিলেন চার্লি চ্যাপলিনের? অতএব—'

'অতএব?'

'ধর্ম-টর্ম মানো? তা হলে কালীঘাটে মানত করো, মৌলালীতে শিরনি চড়াও, ব্যাণ্ডেল চার্চে প্রার্থনা করো: "গোপনচন্দ্রের সুমতি হোক।" নইলে চাঁদা করে তারে বিদেশে চালান করে দাও—মহাবিশ্বের ট্রাফেরেই তারা চরে খাক।'

দ্বিতীয় পন্থাই ভালো। বিপন্ন সাহিত্যিকেরা চাঁদাই তুলুন।

সুমন্তর মা-ও আত্মহত্যা করেছিল। তার প্রথম দুবারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু তৃতীয়বারে আর ব্যর্থ হয় নি।

মায়ের আত্মহত্যা সম্পর্কে কারো মনে সন্দেহ উঠেছিল কিনা, সুমন্ত জানে না। কিন্তু সে জানে, আত্মহত্যা করা ছাড়া মায়ের কোন উপায় ছিল না। কিন্তু সত্যি কি তার মা আত্মহত্যা করেছিল? সে প্রশ্নের জবাব সুমন্ত আজো খুঁজে পায় নি।

ভূমিকা দেখে মনে হতে পারে, এটা একটা গোয়েন্দা-গল্প কিংবা রহস্য কাহিনী। কিন্তু আসলে তা নয়। এ গল্পে গোয়েন্দা কোথাও আসে নি, এমনকি রহস্য কোথাও জট পাকাতে পারে নি। আজকাল যা আকছার ঘটছে, যা হামেশাই চারদিকে দেখে থাকি, তেমনি একটি সত্যি ঘটনা।

সুমন্তর মা আত্মহত্যা করেছিল।

মায়ের সেই কচিকচি মুখ, পানের রস-চোবানো ঠোঁট—আজও সুমন্তর মনে পড়ে। এবং মায়ের আত্মহত্যার জন্যে সে কোন দিন বাবাকে ক্ষমা করতে পারে না। অথচ সে জানে, তার বাবা চিরকালই গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। মা সেই তুলনায় একটু চটপটে। তার কারণও ছিল। বাবা গাঁয়ের ছেলে, মা ছিল শহরের মেয়ে—খাস দক্ষিণেশ্বরে তার জন্ম। গম্ভীর হলেও বাবা কোনকালে অলস-প্রকৃতির ছিলেন না। অলস হলে তিনি কখনই তিন-তিনটে রাইস মিলের মালিক হতে পারতেন না। পৈতৃক একটিমাত্র রাইস মিল থেকে তাঁর নিরলস ও কিছুটা বেপরোয়া স্বভাবের জন্যে আজ তিন তিনটে রাইস মিল হতে পেরেছে। এ নিয়ে তাঁর গর্বের অন্ত ছিল না। কিন্তু কথায়-বার্তায় তিনি ছিলেন শান্ত ও সদালাপী। পাশের গাঁয়ের বারোয়ারী পুজো থেকে আরম্ভ করে গরীব ছাত্রকে অর্থসাহায্য দান—সবখানেই তিনি ছিলেন মুক্ত হস্ত। ও অঞ্চলের সবাই তাঁকে খুব মানতো; শুধু মানতো না, শ্রদ্ধাও করতো।

কিন্তু সুমন্ত কোন দিন তার বাবাকে শ্রদ্ধা করতে পারে নি। কমলাক্ষবাবুও তাঁর ছেলেকে দূরে দূরে রাখতেন। কিংবা বলা ভালো, তিনি সুমন্তর কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতেন। ছোটবেলা থেকেই সুমন্তর দিনগুলো তাই বোর্ডিং আর হোস্টেলের চার দেয়ালের মধ্যে কেটেছে।

আজও সুমন্ত পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট হোস্টেলের চারতলার একটা ঘরে বন্দী। বন্দী বই কি! সিক্-রুমও তো এক ধরনের জেলখানা।

তার জীবনের বারোটা বছর ঠিক এমনি-ভাবেই কেটে গেল। তার বাইশ বছর জীবনে বারোটি বছর নিতান্ত কম সময় নয়। বারো বছর জেল হলে তার ঠিক এইভাবেই কাটতো। কিন্তু সে তো কোন অপরাধ করে নি, তার জেল হবে কেন? কোন অপরাধ ছাড়াই তাকে বারো বছর ধরে কারাদণ্ড ভোগ করতে হচ্ছে।—নিজের মনে সুমন্ত একটু হাসলো।

প্রতি মাসে বাড়ি থেকে মনিঅর্ডার আসে। হোস্টেলের পাওনা, য়ুনিভার্সিটির বেতন, পকেট খরচ ইত্যাদি—সবই ওই টাকায় হয়ে যায়। তবে বাবার কোন চিঠি আসে না। বাবার হাতের লেখা কেমন ছিল, সে প্রায় ভুলেই গেছে। বাবা তাকে চিঠি দেয় না, সেও বাবাকে কোন চিঠি লেখে না।

চারতলার সিক্-রুমের জানালা দিয়ে কলকাতা শহরের অনেকখানি দেখা যায়। সে জানালা দিয়ে একমনে অনেক সময় কলকাতা শহরের দিকে চেয়ে থাকে। খালি ফাঁকা ছাত —সারা দিন রোদ্দুরে ধুধু করে। তখন নিজেকে কেমন যেন তার অচেনা মনে হয়। কিছুই তখন আর ভালো লাগে না।

কিন্তু বারো বছর আগে সুমন্ত এমন ছিল না। তখন বাবাকে সে শ্রদ্ধা করতো না

শিখলেও ঘৃণা করতো না, মাকেও সে ভালোবাসতো। তখন আকাশ জুড়ে আলো ছিল, দিগন্ত জুড়ে বাতাস ছিল, শিলাবতীর জলে গানও ছিল। মনে পড়ে, তার বয়েস যখন নয় কি দশ, তখন শিলাবতীর তীরে বেড়াতে যেতে তার খুব ভালো লাগতো। শিলাবতীর তীরে বেড়াতে যাওয়া তার যেন একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাবার সঙ্গে সে প্রায় রোজই শিলাবতীর তীরে বেড়াতে যেত। জলের স্রোতে কেমন একটা দুর্বোধ্য সুর সব সময় বেজে চলতো, সুমন্ত তার কোন অর্থই খুঁজে পেত না। অথচ তার সেই জলের সুর শুনতে বড়ো ভালো লাগতো।

তখনও সে তার বাবাকে ঘৃণা করতে শেখে নি। তখনও তার চোখে বাবা ছিলেন অনেক বড়ো, প্রায় ঈশ্বরের মতো। এক দিন সুমন্ত শিলাবতীর তীরে একটা শাল গাছের ডালে গলায় দড়ি-বাঁধা অবস্থায় একটা বিড়ালকে ঝুলতে দেখেছিল। বিড়ালটি বোধ হয় কোন অপরাধ করেছিল। নিষ্ঠুর গৃহস্থ তাকে আর ক্ষমা করতে পারে নি। গলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে তাকে শিলাবতীর তীরের শালগাছটার ডালে ঝুলিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। কী ভীষণ আর কী করুণ লাগছিল বিড়ালটাকে। ওটা দেখে সুমন্তর নিজেকে কেমন যেন বড়ো অসহায় মনে হচ্ছিল। বাবার হাত ধরেই হাঁটছিল সে। সে বাবার হাতটা আরো জোরে চেপে ধরে। তবু তার ভয় যায় না, অসহায়তার ভাবটাও কাটলো না। ভয়ে ভয়ে সে বলেছিল, বাবা, ওদিকে আর যাবো না।

কেন রে?

বাবা এবার চোখ তুলে সামনের দিকে তাকালেন। বিড়ালটাকে ওই অবস্থায় দেখে হেসে উঠলেন। বললেন, ওই জন্যেই যাবি না? তুই একটা আস্ত বোকা। ওই অবস্থায় বিড়াল কি মানুষের কোন অনিষ্ট করতে পারে?

না, কোন অনিষ্টই করতে পারে না। কিন্তু ওদিকে তাকাতে সুমন্তর খুব ভয় করছিল। না, সে ওদিকে তাকাবে না। কিন্তু তবু সে বাবার আড়াল থেকে চুরি করে একবার ওদিকে তাকায়। কী ভয়ানক! কিন্তু আশ্চর্য, শালগাছের ডালগুলো তখন ফুলে ফুলে ভরে গেছে।

সুমন্তর কেন জানিনা মনে হয়, সেদিন শুধু বিড়ালটারই মৃত্যু হয় নি, তার সঙ্গে আরো কিছুর যেন সেদিন মৃত্যু হয়েছিল। তার মনের সমস্ত আলো-বাতাস সেদিন মরে গিয়েছিল। কিন্তু তার ওপর আবার শাল-গাছটার পাশ দিয়ে যাবার সময় বাবা যখন হাতের লাঠি দিয়ে ওই মরা বিড়ালটার গায়ে একটা ঘা মেরে হেসে উঠলেন, তখন সুমন্তর সমস্ত শরীর কেমন এক তীক্ষ্ণ অনুভূতিতে আতঙ্কে উঠেছিল। লাঠিটা যেন বিড়ালটার গায়ে না লেগে তার গায়েই লেগেছিল। বাবা কিন্তু সমানে হাসছিলেন। ভারী বীভৎস লাগছিল বাবাকে দেখতে। সে আর বাবার দিকে তাকাতে পারে নি।

ওটাকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়ে যায় নি রে, ঝুলিয়ে দিয়ে যাবার পর ওটা মরেছে, বুঝলি?

সুমন্তর ওসব বোঝার প্রয়োজন ছিল না, শোনারও ইচ্ছে ছিল না। সেদিন থেকে সে যেন তার চারদিকের সবাইকে কেমন একটা সন্দেহের চোখে দেখতে শিখলো। বিড়ালটাকে কে ওভাবে মারলো? ওটাকে কেউ মেরে ঝুলিয়ে দিয়ে যায় নি, ঝুলিয়ে দিয়ে যাবার পর ওটা মরেছে। কিন্তু কে মারলো ওটাকে? তার বাবাও তো মারতে পারে। বাবা যেভাবে ওটাকে লাঠি দিয়ে মেরে হেসে উঠলেন, তাতে সুমন্তর কেন জানিনা, ওই কথাটাই বেশি করে মনে হতে লাগলো। নাঃ, বাবা কি কখনো এ কাজ করতে পারে?

কিন্তু সেদিন থেকে তার চোখে শিলাবতীরও মৃত্যু হলো। শিলাবতীর তীরে আর সে কোন দিন যায় নি। আর সে শিলাবতীর গান শোনে নি।

পোস্ট-গ্রাজুয়েট হোস্টেলের চারতলার ঘরটাতে বসে সুমন্ত সেদিনের কথা ভাবে। সেদিনের কথা মনে পড়লেই সুমন্ত কেমন যেন হয়ে যায়। সে ভোলবার চেষ্টা করে। কিন্তু চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা শাল গাছ, ফুলে ফুলে তার ডালগুলো ভরে গেছে আর তার একটা ডাল থেকে একটা মরা বিড়াল ঝুলে রয়েছে বীভৎসভাবে।

সীলিং থেকে ঝোলানো দড়িটার দিকে সে তাকায়। কী ঠাণ্ডা মনে হয় ওই ঝুলন্ত দড়িটাকে। শিশির-ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে গেলে যেমন হয়, তেমনি একটা হঠাৎ অনুভবে তার বুকের ভেতরটা সিরসির করে উঠতে থাকে। ভাঙা ধারালো কাচের টুকরো কিংবা মরা সাপ দেখলেও কেন জানিনা, এমনি একটা অনুভূতি তার সারা মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

আবার ঘুরে ফিরে দড়িটার ওপরই তার চোখ পড়ে। দড়িটা কী [illegible] এর [illegible],

আকর্ষণে তাকে টানে। কলেজের হোস্টেলে থাকার সময় থেকেই ওটা তার সঙ্গে রয়েছে। সেই সময় ওটা সে অতি কষ্টে সংগ্রহ করেছিল। তারপর থেকে সে আর ওটা কাছ-ছাড়া করেনি।

চার দিকে সে তাকায়। না, কেউ এ-ঘরে নেই। জানালাগুলো বন্ধ। দরজার খিলটাও ঠিক দেওয়া আছে। আজ রাতে আর কেউ এ-ঘরে আসবে না। ঠাকুর রাতের খাবার টেবিলের ওপর রেখে গেছে। ওগুলো পড়ে পড়ে ঠাণ্ডা হচ্ছে। ঠাণ্ডা হোক্ গে। খাওয়ার কথা সে আজ ভাবতেই পারে না।

সুমন্ত বিছানায় শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে ভাবে।

বন্দীজীবনের সাতটা দিন এ-ঘরেই তার কাটলো। আরও ক'দিন কাটবে, কে জানে? অসুখ সারলে তবে সে এঘর থেকে মুক্তি পাবে। শরীরটা ক'দিন থেকেই ভালো যাচ্ছিল না। সেদিন ডাক্তার দেখেই বলে দিলেন, আর ভাবতে হবে না। চিকেন পক্স্। ওপরের সিকরুমে চলে যাও।

তারপরই সে সিকরুমে চলে আসে। এ সময়ে বাবাকে হয়তো তার একখানা চিঠি লেখা উচিত ছিল। কিন্তু কি দরকার? কি হবে চিঠি দিয়ে, অযথা ঝামেলা বাড়ানো ছাড়া?

চিঠি লিখতে কোন দিনই তার ভালো লাগে না। তাই বাসনাকেও সে এতদিন একখানা চিঠি দিতে পারলো না। সেজন্যে বাসনার কাছ থেকে তাকে কি কম অভিযোগ শুনতে হয়েছে? বাসনাকে সুমন্ত একবার বলেছিল, সে চিঠি দেবে। কিন্তু সে কথা রাখতে পারে নি। সে প্রায় বছরখানেক আগের কথা। তারপরে বাসনার সঙ্গে তার বহুবার দেখা হয়েছে, বাসনার চোখা চোখা কথা তাকে অনেক হজম করতে হয়েছে। কিন্তু চিঠি লেখার কথা তার একবারও মনে আসে না।

সুমন্ত আবার বাসনাকে চিঠি লিখবে কি? সুমন্ত জানে, বাসনা তারই আছে, তারই থাকবে। কফি হাউস থেকে যেদিন সবাইকে অবাক করে দিয়ে সে আর বাসনা উঠে চলে এসেছিল, সেদিনই ব্যাপারটা সকলের কাছে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। সেদিনই বাসনা সর্বপ্রথম সুমন্তর মনটাকে জানলো। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনুের ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে সুমন্ত বাসনাকে বলেছিল, আচ্ছা বাসনা, বলতে পারো, এক-এক সময় আমার কিছুই ভালো লাগে না কেন?

বাসনা হেসে জিজ্ঞেস করেছিল, কিছুই ভালো লাগে না? সত্যি কি তাই? তা হলে আমাকেও তোমার ভালো লাগে না?

তোমার কথা ভিন্ন।

ভিন্ন কেন?

তোমার কথা সত্যি ভেবে দেখি নি।

তাই বুঝি?

সুমন্ত একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। তারপর বলেছিল, মনে হয়, তুমি থাকলে সব কিছু এত খারাপ লাগতো না।

বুঝেছি।

সংক্ষিপ্ত জবাবটুকু দিয়ে বাসনা নিজের মনে হেসে উঠেছিল। সুমন্ত কিন্তু হাসতে পারে নি। সে চেয়ে চেয়ে বাসনার নাক চোখ ঠোঁট মুখ দেখছিল। হাসলে বাসনার নাকটা কতখানি কুঁচকে যায়, চোখ দুটো কত ছোটো হয়ে যায়, ঠোঁট দুটো কতখানি প্রসারিত হয়, দাঁতগুলো কতখানি দেখা যায়—এই সব সে দেখে। সুমন্তর চোখ দুটো তখন কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে ওঠে। বাসনার তখন কেমন যেন ভয় ভয় করে।

বাসনা একবার তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি এমন করে কি দ্যাখো, বল তো?

না, কিছু নয়। বলে সুমন্ত নিজের মনে হেসে উঠেছিল।

কিন্তু বিছানায় শুয়ে অন্য সময় সুমন্তর মনে হয়েছে শিলাবতীর তীরে শালগাছের ডালে ঝুলে-থাকা সেই বিড়ালটার কথা। ভেবেছে, বিড়ালটা না হয়ে তার জায়গায়

যদি বাসনা মরে থাকতো, তা হলে কেমন হতো? শালগাছের ডালে ডালে ফুল ফুটে থাকবে, তারই মাঝখানে বাসনার মুখটা ভারি সুন্দর দেখাবে। সমস্ত শরীরটা তার অসাড় হয়ে থাকবে, এক আশ্চর্য রকমের ঠান্ডা—ঠিক তার মায়ের শরীরের মতো।

নানা চিন্তার মধ্যে ঘুরে ফিরে তার মায়ের কথাটাই বেশি করে মনে পড়ে। মা আত্মহত্যা করেছিল। কিন্তু কেন? সুমন্ত মনে মনে মায়ের আত্মহত্যার কারণ খুঁজে বের করবার চেষ্টা করে। কতকগুলি বিক্ষিপ্ত ঘটনায় সে ছিল প্রত্যক্ষদর্শী। সেই ঘটনাগুলিকে একসূত্রে বেঁধে সে একটা কাহিনী দাঁড় করায়।

মা-বাবার বিয়ের ছ' মাসের মধ্যেই সুমন্তর জন্ম হয়েছিল। বিয়ের তারিখে তোলা বাবা-মার একখানা ছবি বাবার ঘরে ছিল। ছবিটার কোণে যে তারিখ লেখা ছিল, তার সঙ্গে

সুমন্তর জন্ম-তারিখের তফাত দু' মাসও নয়। শুনেছেই তার মা-বাবার বিয়ে এবং তার জন্মের ব্যাপারে যে একটা রহস্য থেকে গিয়েছিল, তা সুমন্ত ভালোভাবেই জানে।

বাবার ছিল ছোটোবেলা থেকেই যাত্রা-থিয়েটারের শখ। এ অঞ্চলে যখনই কোন যাত্রা-থিয়েটার হতো, বাবা থাকতেন তার উদ্যোক্তাদের প্রধান। মাঝে মাঝে তিনি থিয়েটার দেখবার জন্যে কলকাতায়ও আসতেন। কলকাতায় এলেই তিনি উঠতেন দক্ষিণেশ্বরের রায়বাড়িতে। রায়বাবুদের মেজো ছেলে বাবার কলেজের সহপাঠী, বন্ধু ছিলেন কিনা। সে যাই হোক, রায়বাড়িতে বাবা ঘরের ছেলের মতো আদর পেতেন। বাবার ওখানে ওঠার সম্ভবত আরো একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল—সে রায়বাবুদের সেজো মেয়ে। কচি কচি মুখ—অত্যন্ত সরল। যেন কেষ্টনগরের একটি মাটির পুতুল। তার সঙ্গে ইতিমধ্যেই বাবার একটা গোপন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সে কথা কেউ জানতো না। সময় সেই সম্পর্ককে বেশি দিন গোপন রাখতে দেয় নি।

সুমন্তর জন্ম যতই আসন্ন হতে লাগলো, রায়বাড়িতে বাবার যাওয়া ততই কমতে লাগলো। বাবা শেষে একেবারেই ডুব দিলেন। রায়বাড়ির সেজো মেয়েটি চিঠির পর চিঠি দেয়। বাবার আর কোন খবরই নেই। শেষে একদিন সেজো মেয়েটা পুলিসের হাতে ধরা পড়লো। সে নাকি দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে আত্মহত্যা করবার জন্যে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল। আত্মহত্যা করলে সে হয়তো বেঁচে যেত। সেই সঙ্গে সুমন্তও হয়তো বেঁচে যেত। কিন্তু আত্মহত্যা সে করতে পারলো না। হাসপাতালে সুস্থ হয়ে তাকে পুলিসের কাছে সবই স্বীকার করতে হলো। তার স্বীকারোক্তিতে সুমন্তর বাবার নামের উল্লেখ ছিল। সুমন্তর জন্ম-সংবাদ পৃথিবীর খাতায় সেই প্রথম নথিভুক্ত হয়েছিল।

গংগার ঢেউ তারপর শিলাবতীর তীরে গিয়ে পৌঁছুলো। সুমন্তর বাবা গ্রেপ্তার হলেন। কিন্তু কেলেংকারিটা আর বেশি দূর গড়াতে পারে নি। সুমন্তর দাদামশাই বাবাকে খালাস করিয়ে এনে দক্ষিণেশ্বরের রায়বাড়ির সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক পাতিয়ে ফেললেন। কিন্তু সেই বিয়েতে বাবা বিশেষ খুশী হন নি। কারণ, অজ্ঞাত। অবশ্য স্বকৃত অপরাধের জন্যে বাবাকে দাদামশাইর কাছ থেকে যে তিরস্কার শুনতে হয়েছিল, তা সহজেই অনুমেয়। সেই জন্যে কিংবা অন্য কোন কারণে, সুমন্ত জানে না, মা-বাবার মধ্যে প্রায়ই খিটিমিটি লেগে থাকতো।

কিন্তু মা বা বাবার আদর সুমন্তর কোন দিনই অভাব হয় নি। যাই হোক, মা আর বাবার স্নেহে তার জীবনের প্রথম দশটি বছর ভালোভাবেই কেটেছিল। বাবার সঙ্গে সুমন্ত মামার [illegible]

কিন্তু মামার বাড়ি তার কোন দিনই ভালো লাগতো না। এইখানেই তো মা আত্মহত্যার প্রথম চেষ্টা করেছিল। কেমন যেন বড় বেশি ঠাণ্ডা মনে হতো দক্ষিণেশ্বরের বাতাস। তা ছাড়া বাবা দক্ষিণেশ্বরে মামার বাড়িতে তাকে একা রেখে যখন ছোটো মাসিকে নিয়ে কলকাতায় থিয়েটার দেখতে যেতেন, তখন তার আরো খারাপ লাগতো। মনে মনে ভাবতো, বাবা এমন কেন? তাকে সঙ্গে না নিয়ে ছোটো মাসিকে সঙ্গে নিয়ে বাবা কেন থিয়েটারে যান?

বাড়ি ফিরে সুমন্ত মাকে কিছুতেই ব্যাপারটা বলতে পারতো না। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগলো, বাবা আর মায়ের মধ্যে তিক্ততা যেন ক্রমাগত বেড়েই চললো। তারই মধ্যে মা এক দিন কি একটা ওষুধ খেয়ে বসলো। ফলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে কলকাতার একটা নার্সিং হোমে সরিয়ে ফেলতে হলো। সুমন্ত থাকলো মামার বাড়িতে। মায়ের অবস্থা তখনও সংকটপূর্ণ। বাবা কিন্তু পরের দিনই বাড়ি ফিরে গেলেন।

সুমন্তর দক্ষিণেশ্বরে একা-একা আর ভালো লাগে না। ওরা কেউ তাকে মায়ের কাছে নিয়ে যায় না। মায়ের কাছে যেতে চাইলেই সবাই তাকে বারণ করে। শেষে এক দিন শুনতে পেল, মা ভালো হয়ে উঠছে। তারই মধ্যে এক দিন সন্ধ্যায় বাবা এলেন। সুমন্ত শুনেছে, বাবা এসেছেন। মনটাও একটু খুশী হয়ে উঠলো। এবার সে বাবাকে বলবে, তাকে নার্সিংহোমে মায়ের কাছে একটিবার নিয়ে যাবার জন্যে। সন্ধ্যা আর ছিল না, কখন রাত হয়ে গেছে। বাবাকে সে এ-ঘর ও-ঘর অনেক খুঁজলো। শেষে ছোটো মাসির ঘরে পা দিয়েই সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে এলো। বেরিয়ে এসে অন্ধকার বারান্দায় সে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর বাবার পায়ের শব্দ শুনে সে অন্ধকারে ছুটে নিচে নেমে এলো। ওপরের অন্ধকার বারান্দা থেকে বাবার ডাক শোনা গেল : খোকা, খোকা—

সুমন্ত ততক্ষণ দিদিমার কোল ঘেঁষে বসে কেঁদে ফেলেছিল। দিদিমা জিজ্ঞেস করে, কি হলো রে? অত হাঁপাচ্ছিস কেন? কাঁদছিসই বা কেন?

আমার বড় ভয় করছে দিদিমা—

সুমন্ত আর কিছু বলতে পারে নি।

পরের দিনই নার্সিংহোম থেকে মায়ের ছুটি হলো। মা দক্ষিণেশ্বরে এলো। সুমন্ত কিন্তু মায়ের কাছে যেতে পারলো না। মা তাকে অনেক করে কাছে ডাকলো। কিন্তু কিছুতেই সুমন্ত কাছে গেল না। মা হয়তো ভাবলো, তার আত্মহত্যার সেই চেষ্টার জন্যে সুমন্ত তাকে ভয় করতে শুরু করেছে।

কয়েকদিন পরেই সুমন্ত মায়ের সঙ্গে বাড়ি ফিরলো। বাবা আগেই ফিরে গিয়েছিলেন। মা রাস্তায় তাকে কিছু বলে নি।

কেঁদে ফেললো। আশ্চর্য, সুমন্ত সেদিন কাঁদতে পারলো না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

সারাক্ষণ সুমন্তর এখন বড় ভয়ে ভয়ে কাটে। ভয়ানক কিছু যেন একটা ঘটতে যাচ্ছে, সময়ে-অসময়ে তার বুকটা তাই ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। সারাটা দিন তার কেমন একটা ভয়-থমথম অনুভবের ভেতর দিয়ে কেটে যায়। কিন্তু রাত আর কাটতে চায় না। চোখ বন্ধ করে সে বিছানায় পড়ে থাকে। এর পর মোরগ ডাকবে, রাত ভোর হবে, একটা রুক্ষ সকাল এসে তার সামনে দাঁড়াবে। তারপর সারাটা দিন একটা ভয় তার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে সিরসির করে হাঁটবে।

তবু সকাল হয়। পাণ্ডুরোগীর ফ্যাকাশে মুখের মতো দিনের আলো ফোটে। বাবা সকালেই 'মিলে' চলে যান। তারপর সুমন্ত বিছানা ছেড়ে উঠে বসে। যাই হোক, দক্ষিণেশ্বরের ঘটনার পর সে আর বাবার মুখোমুখি হয় নি। আর সে বাবার মুখ দেখে নি। সে ভাবে, বাবার মুখ দেখলেই সে বুঝি মরে যাবে। বাবার চোখে চোখ পড়লেই সে হয়তো জন্মের মতো অন্ধ হয়ে যাবে।

বারে বারে দক্ষিণেশ্বরের কথাই তার মনে পড়ে। কেন সে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিল? কেন সে এমন ঘটনার নির্জন সাক্ষী হয়ে রইলো? সুমন্তর কেন জানি না, নিজেকে আর ভালো লাগে না। ও সব ভাবতে গেলে কেমন যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসে।

মায়ের পায়ের শব্দ শুনে সে বিছানা থেকে নামতে যায়। ততক্ষণে মা এসে পড়ে। কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে : তোর কি হয়েছে, বল তো?

সুমন্ত কিছু না বলে চলে যাচ্ছিল। মা তাকে টেনে এনে বুকে চেপে ধরে।

কি হয়েছে রে তোর? কারো সাথে কথা বলিস না, মুখে হাসি নেই, দিন দিন কেমন শুকিয়ে যাচ্ছিস—কি হয়েছে, বলবি তো?

সুমন্তর দু' চোখ জলে ভরে এলো। সে একটাও কথা বলতে পারলো না।

মা জিজ্ঞেস করলো, কোন অসুখ করে নি তো?

সুমন্ত আর চুপ করে থাকতে পারলো না। দু' চোখ ছাপিয়ে কান্না নেমে এলো তার। মা তার চোখের জল মুছিয়ে দিল।

কাঁদছিস কেন? কি হয়েছে তোর?

কিছুই হয় নি।

সুমন্ত আর কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মা কি ভাবলো, সুমন্ত জানে না। সেদিন থেকে মা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। মা মরতে গিয়েছিল, সুমন্ত তা জানতে পেরেছে—মা তাতেই যেন মরে গিয়েছিল।

দু' দিন পরেই সুমন্ত বোর্ডিং-এ চলে গেল। সে ভেবেছিল, বোর্ডিং-এ গিয়ে শান্তিতে থাকতে পারবে। কিন্তু তা সে পারলো না। সারাক্ষণ তার মনটা এক অজানা ভয়ে কুঁকড়ে থাকে।

পুজোর ছুটিতে বোর্ডিং বন্ধ থাকে। সুমন্তকে তাই বাড়ি চলে আসতে হলো। আসতে তার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তা ছাড়া তার অন্য উপায়ও ছিল না।

এক দিন রাতে কি একটা ভীষণ শব্দে সুমন্তর ঘুম ভেঙে গেল। বাবার ঘরে কাঁচের কিছু যেন মেঝের ওপর পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তারপর চাপা গলায় মায়ের কান্নাও শুনতে পেল সে। সুমন্তর কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগলো। সে নিজেকে বিছানার মধ্যে আরও গুটিয়ে নিল। অল্পক্ষণ পরেই বাবার শাসানি শুনতে পেল সে।

এর চেয়ে তার বোর্ডিং ভালো। সেখানে অন্তত এই সব ঘটনা নেই। সেখানে মাঝ-রাতে অজানা ভয়ে ঘুম ভেঙে যায় না। মা-বাবার ঝগড়াও শুনতে হয় না।

মিনিটখানেক পরেই বাবার ঘরের দরজা খোলার শব্দ হলো। সিঁড়িতে কার মৃদু পায়ের শব্দ শোনা গেল। মনে হলো, কে যেন ব্যস্তভাবে ছাতে উঠে গেল। মায়ের পায়ের শব্দ চিনতে সুমন্তর এতটুকু ভুল হয় নি। কিন্তু এত রাতে মায়ের ছাতে যাবার প্রয়োজন হলো কেন? পর মুহূর্তেই তার মনে হলো, মা ছাতে গিয়ে ভালোই করেছে। বাবার কাছ থেকে মায়ের দূরে থাকাই ভালো।

অল্পক্ষণ পরেই সুমন্তর বুকটা ঢিপ ঢিপ করে উঠলো। সিঁড়িতে বাবার পায়ের শব্দ শুনতে পেল সে। কিন্তু বাবা আবার ছাতে গেলেন কেন? শিরদাঁড়ার ভেতরে একটা পুরোনো ভয় সিরসির করে হাঁটে। সুমন্ত কান পেতে রইলো। মা ছাতে গিয়ে আবার কাঁদছে কেন? কিন্তু সে অল্প কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ ছুরির ফলার মতো একটা আর্তনাদ, আর নিচে ভারি একটা কিছুর মাটিতে পড়ার শব্দ।

ভয়ে সুমন্ত বিছানার একটা কোণে গুটিয়ে জড়ো হয়ে পড়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরে বাবা নেমে এলেন, মনে হলো। কিন্তু মা আর নামে নি। ভয়ের মধ্যে সুমন্ত কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, সে জানে না। সকালে যখন ঘুম ভাঙলো, তখন বাড়িসুদ্ধ হুলস্থুল পড়ে গেছে।

মা আত্মহত্যা করেছে।

এবার আর কেউ মাকে ঠেকাতে পারে নি। দুবার ব্যর্থ হয়ে তৃতীয় বারে মা সফল হলো। মায়ের জন্যে সুমন্ত আর কাঁদে নি। তার মনে হলো, মা মরে ভালোই করেছে। মরে বেঁচে গেছে। কিন্তু সেদিন সারা রাত চাপ চাপ একরাশ রক্তের মধ্যে তার মা শুয়েছিল, এ-কথা ভাবতে সুমন্তর আজো কষ্ট হয়।

হোস্টেলের চারতলার সিকরুমে শুয়ে সুমন্ত মনে করবার চেষ্টা করে, মাটির স্পর্শ কতো নিচে? ভাবতেও মাথাটা তার টন টন করে ওঠে।

এ কাহিনী সে এ পৃথিবীর আর কাউকে শোনাতে পারবে না, বলতে পারবে না—কেন তার মা আত্মহত্যা করেছিল। মাত্র কয়েক দিন আগে সে এই ঘটনাটি তার বন্ধু সরলকে বলেছিল। সরল ঠিক বিশ্বাস করেছিল কিনা, সে জানে না। হয়তো গল্প বলে মনে হয়েছে তার। সব শুনে সেদিন সরল বলেছিল, বেশ জমাটি গল্প তো? তারপর শুভ দিন দেখে তোর বাবা ছোটো মাসিকে ঘরে নিয়ে এলো—এই তো? তারপরই গল্পের শেষ। তাই না?

সুমন্ত আর সরলের কথার উত্তর দেয় নি। তবে সে জানে, সেই গল্পের এখনো শেষ হয় নি। আরো কিছু যেন ঘটতে বাকি আছে। সে সেই বাকিটুকুর কথা ভাবে। বাকিটা তা হলে কেমন হবে?

সরল বলেছিল, তুই একটা আস্ত—। তা নইলে এই ঘটনার কথা ভেবে মন খারাপ করে বসে থাকিস? আমার যেবার বাবা মারা গেল—

সরল তার গল্প শুরু করে।

আমার যেদিন বাবা মারা গেল, সেদিন সিনেমার ইভনিং শো-এর টিকিট কাটা হয়ে গেছে।

সুমন্ত প্রশ্ন করে, সিনেমার টিকিট?

সরল বলেছিল, হ্যাঁ। কাটা হবে না কেন? বাবা তো আর আগে থেকে নোটিশ দিয়ে রাখে নি—

সুমন্ত চেয়ে থাকে।

সরল বলে চলে, সকালে 'ডেড বডি' নিয়ে শ্মশানে যাচ্ছি। যেতে হবে বাসনার বাড়ির সামনে দিয়ে। বাসনা তখন ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে। আমাকে খালি পায়ে সবার পেছনে যেতে দেখে ওর তো মুখ শুকিয়ে কাঠ। আমি ইশারায় জানিয়ে দিলাম—ঘাবড়িয়ো না। সময় মতো আমি চলে যাবো। তোমার যাওয়া চাই। সেদিন বিকেলে বাড়ি ফিরে এক বন্ধুর হোস্টেলে গিয়ে তার জামাপ্যাণ্ট ধার নিয়ে ঠিক সময়ে বাসনার সঙ্গে সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরে এলাম।

সুমন্ত প্রশ্ন করেছিল, বাসনা কিছু বললো না?

কি আবার বলবে? তবে সে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল।

সরল একটু থেমে বলেছিল, কোনদিন শ্মশানে গিয়েছিস?

হুঁ। মায়ের বেলায়—

চিতায় ছাই জমে উঠলে আগুনটা একটু উসকিয়ে দিতে হয়। দেখেছিস তো? বাপ-মা হলো ঠিক তাই। ওরা আগুনটা উসকিয়ে দিয়ে চলে গেলেই তাদের কাজ শেষ।

সুমন্ত অবাক হয়ে কথাটা শুনেছিল। সরল বললো, আসল কথা কি জানিস? দুনিয়াটা জ্বালিয়ে রাখতে হবে।

সুমন্ত তার সিকবেড থেকে উঠে বসলো। সরলের কথাটা মনে পড়ায় সে নিজের মনে হেসে উঠলো। সরলটা বলে বেশ। একেবারে খাঁটি কথা। বাসনাকে সে নিশ্চয়ই এসব কথা শুনিয়েছে। তাই তো বাসনা টেবিলে সবার সঙ্গে বসলেও সে আজকাল বেশি সময় সরলের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সেই বাসনা সুমন্তর সঙ্গেও অনেকবার বেড়াতে গেছে। বাসনা তার সঙ্গে থাকলে মন্দ লাগে না। নিজেকে বেশ বয়স্ক মনে হয় তার। অনেকটা বাবার মতন। বাসনা যেন একটি নিটোল যৌবন। কিন্তু শিলাবতীর তীরের সেই স্মরণীয় বিড়ালটার মতো বাসনা যদি একটা শালগাছের ডালে কিংবা কড়িকাঠে ঝুলে থাকে, তা হলে তাকে কেমন দেখায়?

সত্যি কি সে বাসনাকে ভালোবাসে?

ভালোবাসা?

সুমন্ত হেসে ওঠে। ভালো লাগা বা ভালোবাসা—সবই তো সেই শ্মশান চিতার আগুন উস্কিয়ে দেবার ব্যাপার! সত্যি কি বাসনাকে তার ভালো লাগে না? তবে যে সেদিন সে বাসনাকে বলেছিল, তুমি থাকলে সব কিছু এত খারাপ লাগতো না। মিথ্যে কথা। এ পৃথিবীর কাউকে তার ভালো লাগে না। নিজেকেও কি ভালো লাগে না? তাই তো? নিজেকে তো সে কোনদিন এ প্রশ্ন করে দেখে নি।

ঘরের ভেতর চার দিকে সে তাকায়। ঘরে একটাও আয়না নেই। এখন একবার তার নিজের মুখটা দেখতে ইচ্ছে করছে। অনেক দিন সে নিজের মুখ দেখে নি। নিজের মুখের আদলটা সে মনে করবার চেষ্টা করে। না, কিছুতেই মনে পড়ছে না। বাসনার মুখ? সরলের মুখ? বাবার মুখ? শিলাবতীর তীরে সেই বিড়ালটা? তা পারে বই কি।।

আজই তো দুপুরে সরল দেখা করতে এসেছিল। বেশিক্ষণ সে ঘরে বসতে পারে নি। বাসনা নাকি নিচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। কোথায় যাবে নাকি দুজনে। যাবার সময় সরল বলে গেছে, খুব শিগ্গির বাসনাকে সে বিয়ে করছে।

সুমন্ত জিজ্ঞেস করেছিল, সত্যি?

এতে তুই অবাক হয়ে যাচ্ছিস কেন?

সুমন্ত হেসে উঠেছিল। তারপর সরল বলেছিল, পৃথিবীতে এসে একটু আগুন উস্কিয়ে দিয়ে যাবো না?

সরল চলে যাবার পর সুমন্ত নিজের মনে বলেছিল, কে তোমার মাথার দিব্যি দিয়ে তা করতে বলেছে?

বিছানা থেকে নেমে সুমন্ত মেঝের ওপর পা রাখলো। মেঝেটা বেশ ঠাণ্ডা, মৃত্যুর মতো ঠাণ্ডা। হঠাৎ তার শরীরটা কেমন সিরসির করে উঠলো। মনে হলো, তার শিরার রক্তের মধ্যে কারা যেন হাঁটছে। কারা হাঁটছে? আদিম পৃথিবীর রক্ত? নাকি এক পুরোনো ধুনির আগুন?

এ আগুন সে নেভাবেই। আগুন আর সে উস্কিয়ে দেবে না। কি হবে মিছিমিছি আগুন উস্কিয়ে?

মনে পড়ে, তার মা-ও আত্মহত্যা করেছিল।

চারদিকে তাকালো সে। না, এ-ঘরের কোন কিছুই তার নয়। সেও এ-ঘরের কেউ নয়। টেবিলের ওপর খাবার চাপা পড়ে আছে। চাপা পড়ে থাক। খাবার ছুঁতে আর তার ইচ্ছে নেই।

সে এ পৃথিবীর আর কেউ নয়। পৃথিবীর কিছুই আর তার নয়। কিছু নয় কেউ নয়......

টেবিলের ওপর চেয়ারে উঠলো সে। শক্ত করে দাঁড়ালো। মনে পড়লো শিলাবতীর মৃত্যু...শিলাবতীর তীরে শালগাছের ডাল ...ঝুলন্ত বাসনা...চাপ চাপ রক্তের মধ্যে শুয়ে থাকা মায়ের মুখ...

দড়িটা গলায় শক্ত করে বেঁধে চেয়ারটাকে লাথি মেরে সরাতে গিয়ে তার মনে পড়লো, সে পুলিসকে কোন চিঠি লেখে নি।

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

একাশি

লিলি ঝিনিকে দেখতে পেয়ে বিন্দু ঘরে আসে। দুজনের দিকে চেয়ে চোখ ঘুরিয়ে হাসে। ভেজা হাত লালপাড় গেরুয়ার আঁচলে মুছতে মুছতে বলে, 'বাবা গ, তোমাদিগের মতলব কী গ! আজ কি জয়দেবের সব বাউলবাবাজীদিগের মাথা ঘুরিয়ে দেবে, না কি মেলার মানুষদিগের?'

দুই সখীর সাজ দেখেই বিন্দু এমন বচনে বাজে। আড় চোখে একবার আমাকেও দেখে নেয়। বিন্দুর কথা একেবারে মিথ্যে না। বেশবাসে যদিও তেমন অদল-বদল হয় নি, ঝিনির কুসুমে রঙের, আর লিলির গাঢ় পাইমেটেলি রঙের রেশমী শাড়িতেই চোখে ঝলক লেগে যায়। তার ওপরে ঝিনি যদিবা প্রসাধনের দিকে ততটা যায় নি, একটু যা মুখের ওপর হালকা প্রলেপ, ঠোঁটে সামান্য একটু রঙ বুলোনো, লিলি একেবারে পুরো-পুরি। মুখে, চোখে ঠোঁটে সবখানেই তার গাঢ় রঙের প্রলেপ। সেই সঙ্গেই ফাঁপানো চুলের আবাধা তরঙ্গে সে যেন নিজেই দোলে। ঝিনি ওর গায়ের চাদরটা কেমন করে যেন ঘাড়ের ওপর দিয়ে জড়িয়েছে, পিছনের চুলের গোছা ঢাকা পড়ে গিয়েছে। দুই সখীর হাতে দুটি নাগরিকা-ঝোলা। এর নাম জেনানা কি ফ্রেটার্নি কি থলিয়া, কী না কে জানে। জয়দেবের এই বাউল সমাবেশের মেলায় একটু যেন কেমন খেই হারানো।

জবাবে লিলি ঘাড়ে একটা ঝটকা দিয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে, 'সেরকম লোক পেলে তো। মাথা ঘোরাবার মানুষ কোথায় এখানে।'

ঝিনি হেসে ওঠে, একটু যেন লজ্জা পেয়েই বলে, 'কী সব বলছিস।'

লিলি তাড়াতাড়ি চোখ বড় করে বলে, 'তাও তো বটে! তোমাকে কিছু বলি নি ভাই, আমি আমার কথাই বলেছি শুধু।'

বিন্দু হেসে বলে, 'তবে? সাবধানে মুখ খুলো গ লিলিদিদি। তোমাকে বলো রাখি, মাথা ঘোরাবার মানুষ কোথা কে ওত্ পেতো রইয়েছে, জাইনবে কেমন করো। নিজের মাথা না ঘুইরলে কি জানা যায়?'

লিলি বলে, 'দেখা যাবে। কই মশাই, আসুন।'

তা ছাড়া উপায় আছে নাকি। যেতে তো হবেই, দেখতে হবে, এ স্রোতের টান কত দূরে, কোথায় নিয়ে যায়। বেরুবার আগে বিন্দু স্মরণ করায়, 'যিখানেই যাওয়া হক, ইখানে এসো খাবে, মনে রেখো বাবাজী। দিদিদের যদি লিয়ে আসতে পার, আরও ভাল। স্রোতের টানে যদি আস্যে।'

বলে বিন্দু লিলি ঝিনির দিকে তাকায়। আর বিন্দুর দিকে দেখে নিতাইয়ের কথা আর একবার আমার মনে পড়ে যায়। বলি, 'চেষ্টা করব।'

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুও খানিকটা আসে। আবার বলে, 'মেলার পুব দিকে বেশী যাবার দরকার নাই, সাবধানে ঘুরো-ফিরা করো।'

কোন দিকে তার নজর ফাঁকি যায় না। ফাঁকি গেলে সিঁদেল চোরকে মন-চুরির মতলব দিত না। এক মুহূর্ত তার দিকে আমার অবাক দৃষ্টি থমকে যায়। বিন্দুর নজরও সজাগ। হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'কী বইলছ বাবাজী, কিছু বইলবে?'

তাড়াতাড়ি বলি, 'না। একটা কথা মনে পড়ল, তা-ই।'

'কী কথা?'

'পরে বলব।'

তৎক্ষণাৎ বিন্দু ছেলেমানুষের মত ঘাড়ে

দোলা দেয়। বলে, 'না, ইবেলাতেই বইলতে লাইগবে।'

আমি হেসে বলি, 'নিতাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল।'

বিন্দু ভুরু কুঁচকে এক পলক অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। বলে, 'কী বল গ?'

বলি, 'সিঁদকাটি ছেড়ে সে এখন মন-চুরির খোঁজে আছে।'

অমনি একেবারে বিন্দুর চোখ বড় হয়ে ওঠে। মাথায় হাত দিয়ে বলে, 'অই মা গ, ইস্! নিতাই আবার কী বলেছে তোমাকে?'

আমি হাসতে হাসতে এগিয়ে যাই। বিন্দু পিছনেই দাঁড়িয়ে থাকে। মুখ ফিরিয়ে বলি, 'মন্দ কিছু বলে নি, ভালই বলেছে।'

বিন্দুর দুই চোখে তখনও অবাক হাসির ঝিকিমিকি। ঝিনি জিজ্ঞেস করে 'কী ব্যাপার?'

ভিড় কাটিয়ে প্রায় দুই সখীর মাঝখানে চলতে চলতে দু'-এক কথায় নিতাইয়ের বৃত্তান্ত বলি। শুনে আমার মতই ওদের মনের অবস্থা। ঝিনি বলে, 'সত্যি, না মিশলে জানতে পারতুম না, বিন্দু কী আশ্চর্য মেয়ে!'

লিলিও অন্যমনস্ক স্বরে বেজে ওঠে, 'বিন্দুর কাছে নিজেকে তো আমার তুচ্ছ মনে হয়। সত্যি, কিছুই জানি না, কিছুই দেখি নি।'

বলে কী এরা, এইসব গরবিনী নাগরিকারা। নিশ্চয়ই এসব কেবল নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞানের বিলাস নয়? বিন্দুকে এরা এতখানি মূল্য দিয়ে বোঝে? দু'জনের মুখের দিকেই তাকাই। ঝিনি বলে, 'নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস হত না, বিন্দু পরিষ্কার জয়দেবের কবিতা বলতে পারে।'

এবার আমার অবাক হবার পালা। জিজ্ঞেস করি, 'পারে মানে, সংস্কৃত উচ্চারণ?'

'হ্যাঁ। হয় তো শুধুই মুখস্থ। সবটা না হলেও, অনেকখানি। যেভাবেই হোক, মানেও সবই প্রায় বোঝে।'

এ কথা আমারও অজানা। বিন্দুর মুখে গীতগোবিন্দের বচন শোনা আমার ভাগ্যে ঘটে নি। রাঢ়ের এক সামান্য বাউল প্রকৃতি, যে হেথা-হোথা আলখাল্লাধারী পুরুষের সঙ্গে গান গেয়ে বেড়ায়, মাত্র এক জোড়া প্রেমজুরীর যার বাদ্য, গলায় কিছু গানের ডালি, সে যদি গীতগোবিন্দ ভাবে, তবে অবাক লাগে বই কি! আমার আপন সীমার পরিবেশে চোখ ফিরিয়ে মনে হয়, অনেক ঝলকের মধ্যে বড় গরীব হয়ে আছি।

এ বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই এক আলো-ঝলকানো আসরের মাঝখানে এসে পড়ি। এখানে চেহারাই আলাদা। এখানে মাইকের—গোপীদাসের ভাষায় মাইকের গলায় গান। অনেকখানি অংশ ঘিরে শক্ত বাঁশের বেড়া। গানের আসরের সামনে, মস্ত বড় গদিতে সাদা ঝকঝকে চাদর। গুটিকয় তাকিয়া। সামনে একজন আসীন। মধ্য-বয়স্ক গৌরাঙ্গ পুরুষ, সুপুরুষ। ধূসর গোঁফদাড়ি, মাথার ধূসর চুল চূড়ো করে বাঁধা। গায়ে গেরুয়া রঙের রেশমী আল-খাল্লায় ঝিলিক দিচ্ছে। আশেপাশে আরও দু'-এক বাবাজী। তার চেয়ে বেশী শহুরে মানুষের ভিড়। সামনে দাঁড়িয়ে, যন্ত্রের কাছে মুখ রেখে গান করে এক বাউল। কোট-পাতলুন পরা এক লোক, চোখে চশমা এঁটে, হাতের কাছে যন্ত্র নিয়ে বসেছেন। বোঝা যায়, যন্ত্রের ফিতেয় গান তুলে নিচ্ছেন। গৌরাঙ্গ পুরুষ, তদ্‌গতভাবে, আধ-বোজা চোখে, শরীরের দোলায় গান শোনেন। শ্রোতার ভিড়ও কম নয়।

আসরের থেকে আমরা দূরে। বেড়া-ঘেরা বিরাট জায়গা জুড়ে অস্থায়ী ঘর তৈরী হয়েছে। যেমন-তেমন ঘর না, তার আবার সাজ-পোশাক আছে। নীল কাপড়ে বেড়া জড়ানো, লাল ঝালরে সাজানো। দরজার কোন পাল্লা নেই, কিন্তু ভারী কাপড়ের পরদা আছে। পরদা একটু সরানো, তার ফাঁকেই দেখতে পাই সেখানে নানা বয়সের, নানা রূপের মহিলাদের ভিড়। সাজানো-গোছানো বাক্স-প্যাটরা বিছানা। মাঝখানে বড় বড় গদি পাতা। কেউ শুয়ে, কেউ বসে। কেউ বা পান সাজে, তরকারি কোটে। এলাহি ব্যাপার। তা ছাড়াও, ছোট ছোট তাঁবুর ঘর। সেখানেও যাদের ভিড়, সেই সব নারী-পুরুষকে দেখে মনে হয়, নগরের সম্পন্ন মানুষ।

অন্য দিকে রান্নার আয়োজন। গুটি ছয়েক বিশাল উনুন জ্বলে। কাঠ লাকড়ির ব্যাপার না, কয়লার আগুন। সেখানে ব্যস্ত কম করে জনা পনেরো-ষোল। কে যে কার দিকে দেখছে বুঝতে পারি না। তবে, আলো-ঝলমলে গানের আসরের তুলনায় অন্য দিকে ভিড় কম, হই-হট্টগোল নেই। বেদনাশা বটের তলায়, দেখেই তোমার ঠেক লাগবে, ই আখড়ার ছাঁদ-ছন্দ ধরন-ধারন একটুকে আলাদা।

লিলি ডেকে বলে, 'কী হল, আসুন। আমরা কোথায় উঠেছি, একটু দেখিয়ে দিই।'

সেটা আমারও অনুমান, এটিই গোপী-দাসের কথিত মদন বাউলের আখড়া। ঝিনিদের আশ্রয়। আমাকে ডাক দিয়ে ওরা গানের আসরের উলটো দিকে নিয়ে যায়। যেদিকে থাকবার ঘর আর তাঁবু। রান্নার জায়গাটা একেবারে নদীর উঁচু পাড় ঘেঁষে হয়েছে। সেখানেও মাথার ওপরে টিনের চাল।

আমার আর দেখার কী আছে। সব থেকে বড় ঘরের পরদা সরিয়ে ওরা দু'জনেই ভিতরে যায়। তখন টের পাই, বড় ঘরের

সংলগ্ন, আর এক দিকে পরদা ঢাকা অন্য ঘরও রয়েছে। বাইরের থেকে তার কিছুই দেখা যায় না। বড় ঘর পেরিয়ে ওরা অন্য দিকের পরদার আড়ালে চলে যায়। আমার আর ভিতরে যাওয়া হয় না। নানা আবরণে আভরণে সাজা মহিলাদের নানা ব্যস্ততা, নানা রকমের আলস্য বিশ্রাম। দু'-এক পুরুষও তার মধ্যে আলাপে মগ্ন।

আমি দরজার কাছেই থমকে দাঁড়াই। ওদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে একটু ধূমপানের ইচ্ছা জাগে। সিগারেট ধরিয়ে আশেপাশে চোখ ফিরিয়ে দেখি। কয়েক মুহূর্ত যায় কী না সন্দেহ। খপ্ করে কে যেন আমার সিগারেট সুদ্ধ হাত চেপে ধরে, আর সঙ্গে সঙ্গে, প্রায় বীণানিন্দিত তীব্র অথচ মন্থর গলায় বেজে ওঠে, 'কে তুই, আমার আশ্রমে দাঁড়িয়ে ফুরুক ফুরুক সিগ্রেট ফুঁকছিস?'

হস্তধারণ এবং কণ্ঠস্বরেই আমার বুক ধড়াসে যায়! তার ওপরে আত্মসম্মানের ভয় বিব্রত লজ্জা। নানা কিছুতে হকচকিয়ে যাবার সঙ্গে কথাও বন্ধ অবাক মনে। যিনি আমাকে ধরেন, এবং কণ্ঠস্বরের অধীশ্বরী এক মহিলা। বয়স অনুমানের সাধ্য নেই যুবতী কি না, বলতে পারি না, লক্ষণ সকল আছে। হয়তো বেলা যায়, কিন্তু মধ্য ভাদ্রের মত, এ শরীর থেকে যৌবন যেতে গড়িমসি করে। তা করুক, শেষ রশ্মিও যেমন জলে পড়লে বড় বেশী ঝলকায়, এ গৈরিক বসনা রমণী তেমনি।

চোখ তাঁর ডাগর, দৃষ্টির ভাবেতে যেন লাস্যের জড়িমা। নাগরিকা ছাঁদের সুন্দর চশমা থাকলেও এ চোখ সুন্দর, তাহে অঞ্জন বিলাসিনী কৃষ্ণনয়না। রেশমী গেরুয়ায় পাড় নেই, পরনের চালে নাগরিকা। পাতলা রেশমী গেরুয়ার কাঁধইস্তক জামা, অন্তর্বাসের ইশারা জাগানো। মুখের ছাঁচখানি মিঠে তাম্বুলরঞ্জিনী রক্তবিম্বোষ্ঠা। রুক্ষ কেশপাশে আলগা বাঁধনের খোঁপা।

রুদ্ধ কটাক্ষের বদলে তাঁর অনুসন্ধিৎসু আয়ত চোখে ঢুলুঢুলু ভাব বেশী। তবু এই অপলক দৃষ্টিপাতের সামনে চোখ তুলে রাখতে পারি না যেন। অপরাধের চিন্তায় জড়ীভূত হবার আগে কোনরকমে করতে পারি, 'আমি—মানে—।'

মহিলা মুখ থেকে একরাশ জর্দার মোহিনী গন্ধ ছড়িয়ে, ঘাড় দুলিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ বাছা, তুমি। তুমি কে, আমার আশ্রমের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট খাচ্ছ। পায়ে আবার লাটবরের মতো জুতোও রয়েছে।'

আত্মসম্মানের ভয় যত, কথাগুলো বুকে বেঁধে তত! দৃষ্টি যুবতীর পিছু পিছু, কাঁচপোকার পিছনে, আরশোলার মত কোথায় এলাম! কার হাতে পড়লাম। কী লাঞ্ছনা কপালে আছে। ইনিই বা কে, তাও জানি না। তবে হাতের কবজিতে যে শক্তি আছে, তা তাঁর উক্ত করধৃতিতেই বুঝতে পারি। এই শীতেও ও'র গায়ে কোন গরম জামা নেই।

আশ্রমের দু'-একজন কৌতূহলিত হয়ে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পড়ে। কিছু বলে না, আমাদের উভয়ের দিকেই দেখে। তাদের মুখভাব তেমন মারাত্মক মনে হয় না যে, আদেশ পেলে এখনি এই অপরিচিত নিষ্ঠাহীনকে উত্তমমধ্যম দান করে। এদিকে হাত ছাড়বারও কোন লক্ষণ দেখি না। অথচ, যে পর্যন্ত জুতো পায়ে এসেছি, সে পর্যন্ত লিলি-ঝিনিও এসেছে। ঘরের দরজার কাছে ওরা ছেড়ে রেখে গিয়েছে। এখন কি এই মহিলার হাতে-পায়ে ধরতে হবে নাকি। তাতেও আমার আপত্তি নেই, অপরাধ যখন করে ফেলেছি। বলি, 'দেখুন, আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি নি।'

আমার কথা শেষ হবার আগেই ঝিনি

এসে একেবারে আমার গায়ের কাছে দাঁড়ায়। বলে ওঠে, 'কী হয়েছে?'

মহিলা বলেন, 'দ্যাখ্ মা, ছেলেটা এখানে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট খাচ্ছে।'

উচ্চারণে 'সিগ্রেট' শব্দটা অদ্ভুত, এক শ্রেণীর লোক সবখানেই কেন যেন সিগারেটকে সিগ্রেট বলে। আমার বিব্রত লজ্জা এখন সবই ঝিনির গলায় বাজে, 'ওহ্, মানে উনি জানেন না তো তা-ই।'

লিলি বলে ওঠে 'মা, উনি আমাদের সেই লোক, যাঁর কথা আপনাকে বলেছিলাম।'

ও আমার নামটাও উচ্চারণ করে। সঙ্গে সঙ্গে মহিলার আচরণ ভিন্ন। স্পর্শকোমল হয়ে ওঠে। হাত ছেড়ে দিয়ে, একেবারে চিবুকে হাত দিয়ে বলে, 'তাই বল, আমি ভাবি এমন ভালমানুষ মুখখানি কার। খুব ভয় ধরিয়ে দিয়েছি তো? আয়, আমার কাছে আয়।'

বলে একেবারে গলা জড়িয়ে ধরে, গায়ের কাছে আকর্ষণ। ইতিমধ্যে ঝটিতি পরিস্থিতি বদল হলেও একটু একটু নিশ্বাস বইতে আরম্ভ করে। আগেই জ্বলন্ত সিগারেট ফেলবার উদ্যোগ করি। তিনি হাত ধরে বারণ করে বলেন, 'থাক, মুখের জিনিসটা খা। ফেলিস না। আমাকে আবার সব লক্ষ্য রাখতে হয় তো।'

বলে নিশ্বাসে এক রাশ মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে হেসে ঢুলঢুলু চোখে তাকান। আঙুলে দিয়ে আমার গালে টোকা মারেন। বলেন, 'তাই ভাবি, এমন মিঠে ভাবের ঠাকুরালি মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেন।'

ঝিনি তখন আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মহিলার দিকে দেখছে। লিলি বলে, 'আমরা আবার ভেতরে আপনাকেই খুঁজতে গেছলাম। ওঁকে ডেকে নিয়ে এলাম। বলেছিলেন, যেন আলাপ করিয়ে দিই।'

'না দিলে রাগ করতাম। চল্ ভেতরে একটু বসবি। এই, এই মনু, একটা মাটির ভাঁড় দে তো রে, জলখাবার ভাঁড়। সিগ্রেটের ছাই ফেলবে।'

যাকে ডেকে বলে, সে তাড়াতাড়ি দৌড়ে একটা খুঁড়ি এনে দেয়। আমিই হাত বাড়িয়ে নিই। বাহুপাশের আলিঙ্গন থেকে তখনও মুক্ত নই। মহিলা বলেন, 'কাল থেকে যা চলে তোমার জন্যেই যা পিত্তেশ?'

বলে ঝিনির দিকে একবার তাকান। তাম্বুল-লাল ঠোঁটে হাসি। দৃষ্টি তেমনি ঢুলঢুলু। এমন সময় একটু দূরে থেকে হাসি আর গলা খাঁকারির শব্দ হয়। মুখ তুলে দেখি, সীমানা বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে জনা তিন-চারেক লোক, আমাদের দিকে দেখছে। মহিলা ডাকেন, 'এস, ভেতরে এস।'

এমন একজন মহিলার অঙ্গাঙ্গী থাকতে অস্বস্তি হয়, তথাপি তাঁর নির্বিকার উদাসীনতার বাধা দিতে পারি না। পায়ের জুতো বাইরে রেখে ভিতরে ঢুকি। ঝিনি লিলি সঙ্গে। মহিলা আমাকে তেমনি ধরে নিয়েই চলেন। চলতে চলতেই বলেন, 'গিরিবালা, আমাকে দুটো পান দিও গো।'

গায়ে এক গা গহনা, প্রায়-প্রৌঢ়া এক মহিলা পান সাজতে সাজতেই বলেন, 'দিচ্ছি মা।'

আমি যেতে যেতেই ঝিনি-লিলির দিকে তাকাই। দুজনেই ঠোঁট টিপে, চোখের তারা কাঁপিয়ে কী যেন ইশারা করে। কী আর ইশারা করবে, যা হচ্ছে, তা-ই হতে দিতে বলে নিশ্চয়ই। তখন তো মনে মনে বলেছিলাম, দেখি, এই দুই সখীর স্রোত কোথায় টেনে নিয়ে যায়। তবু, ঘটনা-জালের জটায় কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি।

ঘর ছাড়িয়ে, পরদা সরিয়ে আর এক নতুন পরিবেশ। এখানে সম্পূর্ণ আলাদা তাঁবুর ঘর। মাটির সবখানেই মোটা করে খড় বিছানো। এক পাশে তার ওপরে মোটা করে গদি পাতা। গদির ওপরে ধোপদুরস্ত বিছানা। মহিলা আমাকে সেই বিছানায় বসিয়ে দেন। বলেন 'বস। বস গো তোমরা।'

আমার পাশে বসে ঘাড় কাত করে চেয়ে হেসে বলেন, 'খুব ভয় পেয়েছিলে তো।'

সঙ্গে সঙ্গে স্বীকারোক্তি, 'তা পেয়েছিলাম।'

স্বীকারোক্তির ভঙ্গিতেই বোধ হয় তিনজনেই হেসে ওঠে। আবার তৎক্ষণাৎ মহিলা ভুরুতে যেন শর জুড়ে তাকান। ঝামটা দিয়ে বলেন, 'তা মুখপোড়া ছেলে বলবে তো, তুমি ওদের সঙ্গে এসেছ। তখন তো মনে হচ্ছিল, ভাজার মাছটি উলটে খেতে জান না। দেখে তো বুঝতে পারছি, তা মোটেই নও।'

লিলি তাতে ফোড়ন দেয়, 'একেবারেই নয়।'

মহিলা আবার বলেন, 'মেয়েগুলোকে সেই থেকে ঘুরিয়ে মারছ।'

সেই একই অভিযোগ। লিলি বলে ওঠে, 'গুলো নয় মা, আমি ওর মধ্যে নেই।'

মহিলা বলেন, 'আহা, বলিস কেন। বললে মনে হয়, আছিস। ঠাকুর ঘরে কে রে, আমি কলা খাই না।'

এবার লিলির রঙ-করা গালেও লালের ছোপ ধরে যায়। ঝিনির দিকে একবার দেখে প্রায় আর্তস্বরে অস্ফুট শব্দ করে, 'মা কী বলছেন!'

মা প্রায় সখীর মতই লিলির গায়ে চাটি মেরে বলেন, 'তুই যেমন বললি, আমিও সেইরকম বললাম। আমি তো অন্য কিছু বলি নি, বলেছি, মেয়েগুলোকে ঘুরিয়ে মারছ।'

লিলির অবস্থা ঝিনি উপভোগ করে হাসে। লিলি তাকায় আমার দিকে। মহিলা আরও বলেন, 'দু'জনেই যদি ঘুরে মরিস, তাতেই বা ক্ষতি কী। কী বল ছেলে, ক্ষতি আছে কিছু?'

আবার আমাকে কেন। আমি তো

এমনিতেই বাকাহারা হয়ে গিয়েছি। তবুও, কোন গরুত্ব আর জটিলতা আরোপ না করেই বলি, 'না, ক্ষতি আর কী।'

এবার ঝিনি লিলি, দুই সখীতে চোখাচোখি করে হঠাৎ এক সঙ্গেই হেসে ওঠে। তখন গিরিবালা নাম্নী পান নিয়ে আসেন। মহিলা পান হাতে নিয়ে আমার দিকে ফিরে বলেন, 'খাবে?'

ঘাড় নেড়ে জানাই, 'না।'

'কেন, দাঁত নষ্ট হবে?'

'সেজন্য নয়, খাই না তো।'

'এই মেয়েগুলোকেও খাওয়াতে পারলাম না। কলকাতায় এত পানের দোকান চলে কী করে?'

তা বটে। নিজেকে কলকাতার লোক বলে আমার দাবি নেই। বাকী দুজন কলকাতারই। দুজনে পান না খেলে দোকানগুলো চলে কেমন করে।

উনি ঝিনিকে বলেন একটা ছোট বাক্স দেখিয়ে, 'ওটার থেকে আমার জর্দার কৌটোটা দাও তো।'

ঝিনি বাক্স থেকে জর্দার কৌটো বের করে দেয়। মহিলা আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা খালি হাত কেন, ঝোলাঝুলি কিছু নেই?'

'আমি অন্য জায়গায় উঠেছি।'

'কোথায়?'

'গোপীদাস বাউলের আখড়ায়।'

সঙ্গে সঙ্গে মহিলা বলেন, 'ও, কেঁদুলের গোপীদাস? বড় ভাল মানুষ। তবে তো সেখানে বিন্দু, গোকুলও আছে?'

আমি অবাক হয়ে বলি, 'আপনি চেনেন?'

চোখ ঢুলুঢুলু করে তাকিয়ে বলেন, 'চিনব না? এক সম্প্রদায়ের লোক আমরা, এক সাধনভজন। বীরভুম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, সব জায়গার সবাইকে চিনি।'

আমি ঝিনি লিলির দিকে একটু অবাক জিজ্ঞাসায় তাকাই। কেন, ওরা কি এ মহিলাকে কিছু বলে নি। ঝিনির সঙ্গে আমার চোখাচোখি হতেই মহিলার দিকে ফিরে বলে ওঠে, 'আপনার সঙ্গে যে ও'দের চেনা-পরিচয় আছে, তা তো জানি না। বিন্দুদের সঙ্গে আমাদের শান্তিনিকেতনে পরিচয় হয়েছে।'

মহিলা বলেন, 'ওমা, বলবে তো সে কথা।'

আমার দিকে ফিরে বলেন, 'আমার কথা বলো। কালই খবর পাঠাব, আমার এখানে এসে ওদের সবাইকে একবার গেয়ে যেতে হবে। গোপীদাসের গান শুনতে উনি খুব ভালবাসেন।'

'উনি' সম্ভবত মদন বাউলের কথাই বলেন। কিন্তু পান দুটো সেই হাতেই। জর্দার কৌটো আর খোলা হয় না। আমাকে আবার বলেন, 'তা তুমিও এখানে এসে উঠলেই পারতে।'

বলি, 'ওদের সঙ্গে আগেই কথা ছিল।'

মহিলা লিলি ঝিনির দিকে ফিরে তাকান। বলেন, 'এ বছরে, আশ্রমে এ দুটিকেও আমি ভাল পেয়েছি। মনগুলো বড় ভাল। ভাগ্যে না থাকলে মেলে না।'

ওরা দুজনেই লজ্জা পেয়ে যায়। একটা খুশীর রঙও লাগে। মহিলা আমার দিকে ফিরে ঠোঁট টিপে একটু হাসেন। বলেন, 'তোমার জন্যেই পেয়েছি বটে।'

লজ্জিত বিস্ময়ে বলি, 'না না, আমার জন্য কেন। ও'রা নিজেরাই এসেছেন।'

'তা জানি হে। কাল থেকে এ পর্যন্ত, তোমার কথা অনেক হয়েছে। দেখলাম বটে, শুনলামও বটে, তাতেই বুঝেছি, তোমার আসার কথা না থাকলে ওরা আসত না।'

চুপ করে থাকি। ঝিনি সবখানে, সকলের কাছে, এক রূপে এক স্রোতে বহতা। তব

বলে ওঠে, 'কে'দর্‌লির মেলা দেখার ইচ্ছেটা অনেক দিনের।'

মহিলা হাত তুলে ধমক দেন, 'থাম্ দিকি নি বাপু, খালি আগ্ বাড়িয়ে কথা। আমি কিছু বলেছি নাকি। ও এসেছে বলে না হয় এ বছরে ইচ্ছে পূরণ হয়েছে, এই তো?'

লিলি বলে, 'তা-ই।'

'আর তুমি কীজন্য এসেছ বাছা।'

প্রশ্নটা আমাকে। বাছা বাবা যা-ই বলুন, ও'র মুখে যেন এ সম্বোধন মানায় না। সর্বাঙ্গে, ভাবে ভঙ্গিতে যেন অন্য এক নারী। রমণী, রঙ্গিণী। বলি, 'দেখতে শুনতে।'

যেন গোপন কথা জিজ্ঞেস করেন, এমনি-ভাবে। কানের কাছে মুখ এনে বলেন, 'কী?'

বলি, 'মেলা, বাউল, বাউলের গান।'

'কেন।'

'ভাল লাগে।'

'শুধু ভাল লাগে?' শুনলাম, এখানে সেখানে নানা জায়গায়, মেলায় খেলায় ঘুরে বেড়াও।'

'তা বেড়াই।'

'কেন, লেখবার জন্য?'

প্রশ্নটা অনেকের মতই যুক্তি তর্কহীন। অর্থহীন তো বটেই। বলি, 'না। ঘুরে বেড়োবার সঙ্গে লেখার কিছু নেই। ঘুরে বেড়াই বলেই মাঝে মাঝে লিখতে ইচ্ছে করে।'

'আর ঘোরার তাগিদটা?'

'ঘোরার তাগিদেই।'

হঠাৎ আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে, বুকের জামা মুঠি করে ধরে জোরে টান দেন। আমার চোখের দিকে তাকান। একটু একটু নাড়েন। আর যেন প্রায় রুদ্ধ গলায় বলেন, 'দাগা খাওয়া তুই!'

কিসের দাগা খাব? অবাক হয়ে তাকাই তাঁর দিকে। তিনি হাসতে হাসতে কাঁপেন, আর মুহূর্তেই দেখি, চোখের কাজল ভাসিয়ে জল গলে। আমি চেয়ে থাকি, কিছু বলতে পারি না। কারণ আমি বুঝতে পারি, হাস্যে লাস্যে তরঙ্গিণী রমণী ভিতর থেকে একটা কষ্টপাক খেয়ে চোখের জলে ভাসেন। গলার কাছে তাঁর স্বর রুদ্ধ। যা উপচে আসতে চায় তা আর কিছু।

এই ভাব ও আবেগের সহসা লক্ষণের কিছুই বুঝি না আমি। কিন্তু আমার কোথায় যেন একটা বিকল ভাব লাগে। আমি যেন নিজের মধ্যেই হাতড়ে ফিরি। ঝিনি আমার দিকে গভীর অনুসন্ধিৎসায় দু চোখ মেলে চেয়ে থাকে। লিলি নিজেও জানে না, কেন অকারণ ওর চোখ ছলছলিয়ে ওঠে।

একটু পরে মহিলা নিচু স্বরে বলেন, 'দাগা খাওয়া মানে জান তো? কোন মেয়েকে সমাজ যদি কুলটা বলে, সেটা একটা দাগা। কিন্তু সে মেয়ে যদি আপন ধর্মে চলে, তবে প্রাণে দাগা খেয়েও তার স্বর্গ। রাধা যেমন বুঝলে তো? কিসের সমাজ, কিসের সংসার, কিসের বন্ধন। সব তো সেই "এক"-এর জন্য। সেটাই আসল দাগা। তুমি সেই রকমে দাগা খাওয়া ঠিক বলেছি?'

ওঁর চোখের জল শুকোয় না, তার ওপরে গলে। আমি বলি, 'জানি না।'

'তা জানবে না। জান খালি ঘোরার তাগিদেই ঘোর। জান। তাই জানগে। তবে দাগা খাওয়ারাই কিন্তু দাগাবাজ বেশী হয় তা জান তো?'

বলতে বলতে ভেজা চোখেই দেখি, ঢলঢলে দৃষ্টি বক্র হয়। আমি কোন জবাব দিই না। উনি বলেন, 'যখন দাগা খায়, তখন "দেহি পদপল্লব মুদারম্।" কেন? না, "জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো হরতু তদুপাহিতবিকারম্।" আর দাগাবাজ হল শঠ ধূর্ত, কেবল কাঁদায়।'

এ কথারও জবাব দিতে পারি না। কিন্তু কেউ কারুর দিকে ফিরে তাকাতে পারি না। ঝিনি একেবারে অধোবদন। লিলি মুখ ফিরিয়ে বোধ হয় ঠোঁট টিপে টিপে হাসে। তবু মনে মনে এ মহিলার বাণী-বিন্যাস ও ভাবকে ভাল লাগে।

আমাকে একটু ঠেলা দিয়ে বলেন, 'কী সত্যি কী না।'

বলি, 'বলতে পারছি না।'

'দাগাবাজ!'

বলেই উঠে দাঁড়ান। বলেন, 'দেখি একবার ওঁকে ডাকি। উনি তোমাকে দেখতে চেয়েছিলেন।'

ক্রমশ

বিদ্যাসাগরের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—

শরণম্—

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

প্রায় দুই মাসের অধিক হইল আমি শিরোরোগে ও উদর-পীড়ায় অতিশয় কষ্টভোগ করিতেছি বিশেষতঃ রাত্রিতে নিদ্রা হয় না এই সমস্ত কারণে আমার বুদ্ধির স্থিরতা নাই মনের অত্যন্ত চাঞ্চল্য জন্মিয়াছে কি করিয়াছি তাহার স্মরণ হয় না এবং কি করিতে হইবেক তাহা স্থির করিতে পারি না। আপনাকে যে দুই মাস পত্র লিখি নাই আপনার আজ্ঞাপত্র পাইবার পূর্ব্বে তাহা বোধ ছিল না। যাহা হউক এতদিন পত্র না লেখাতে আমার যে অপরাধ হইয়াছে তাহা মার্জ্জনা করিতে আজ্ঞা হয়। ১৫৭ টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি আপনার চৈত্র-বৈশাখ দুই মাসের ১৪০ মদনের মাতার ২০, গঙ্গামণি দেবীর বৈশাখের ৭, আর যদুনাথ চট্টোর হাওলাতের দরুণ ১০,। আমার এক্ষণে আয়ের অনেক খর্ব্বতা হইয়াছে এজন্য ব্যয়ের সঙ্কোচ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে তজ্জন্য সকল বিষয়েরই সংক্ষেপ করিতে হইবেক এক্ষণে আপনকার নিকট নিবেদন এই জ্যৈষ্ঠ মাস অবধি আপনাকে মাস মাস ৪০ চল্লিশ টাকা দিলে আপনকার চলিতে পারে কিনা—অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিতে আজ্ঞা হয় আপনি যেরূপ লিখিবেন তদনুসারে কার্য্য করিব। এখনকার একপ্রকার সমস্ত মঙ্গল জানিবেন ইতি ১৮ জ্যৈষ্ঠ

ভৃত্য

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—

শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

একশত ছিয়াত্তর টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি তন্মধ্যে ছিয়াত্তর টাকা মাসিক বরাদ্দের হিসাবে অবশিষ্ট একশত শ্রাদ্ধের ব্যয়ের হিসাবে প্রেরিত হইল। আমি এক্ষণে কিছু ভাল আছি জানিবেন। হুণ্ডীর পঁহুছসংবাদ ও আপনাদের কুশলসংবাদ লিখিয়া নিরুদ্বেগ করিতে আজ্ঞা হয়। এখানকার আর আর সমস্ত মঙ্গল জানিবেন ইতি ২৮ আশ্বিন

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—

শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

৭৬ টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি নিম্নলিখিত বিনিয়োগ করিতে আজ্ঞা হয়।

নিজ খরচ চৈত্র	—	৫০,
মদনের মাতা	—	৮,
গঙ্গামণি দেবী	—	৮,
সারদা দেবী	—	৭,
নিস্তারিণী দেবী	—	৩,
		৭৬,

আপনকার শ্রীচরণারশীর্ব্বাদপ্রভাবে এক্ষণে কিছু ভাল আছি জানিবেন ইতি ৫ চৈত্র ১২৮১ সাল

ভৃত্য

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—

শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

৮৭ সাতাশী টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি নিম্নলিখিত

বিনিয়োগ করিবেন

আপনকার	জ্যৈষ্ঠ	—	৬০,
মদনের মাতা	ঐ	—	১০,
গঙ্গামণি দেবী	ঐ	—	৭,
কালিদাস ভট্টাচার্য্য	ঐ	—	১০,
			৮৭,

আমি এক্ষণে কয়দিন অবধি কিছু ভাল আছি জানিবেন এখানকার আর আর সমস্ত মঙ্গল জানিবেন আপনি কায়িক কেমন আছেন লিখিয়া নিরুদ্বেগ করিবেন ইতি ১২ আষাঢ়

ভৃত্য
শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ৫, পাঁচ টাকা দিবেন ইতি ২৫ মাঘ ১২৮০ সাল

ভৃত্য
শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ৬, ছয় টাকা দিবেন আগামী টাকা পাঠাইবার সময় ঐ টাকা পাঠাইব ইতি ২৬ মাঘ

ভৃত্য
শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

৮৯।০ উননব্বই টাকা চারি আনার হুণ্ডী পাঠাইতেছি নিম্ন-লিখিতমত নিয়োগ করিতে আজ্ঞা হয়।

নিজ	—	৫০,
মদনের মাতা	—	৮,
গঙ্গামণি দেবী	—	৮,
সারদা দেবী	—	৭,
নিস্তারিণী দেবী	—	৩,
কালিদাস ভট্টাচার্য্য	—	৯,
আমার হাওলাত	—	৪।০
		৮৯।০

আপনি এক্ষণে কায়িক সচ্ছন্দ আছেন ইহা শম্ভুচন্দ্রের মুখে অবগত হইয়া নিরুদ্বেগ হইলাম আপনকার শ্রীচরণারবিন্দের আশীর্ব্বাদ প্রভাবে আমি অনেক ভাল আছি জানিবেন ইতি ১৪ ফাল্গুন ১২৮১ সাল

ভৃত্য
শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা বিদ্যাসাগরের পত্রের প্রতিলিপি

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—
শরণম্—

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

১৭৭, একশত সাতাত্তর টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি পিতা-মহী দেবীর শ্রাদ্ধের খরচ ১০০, আপনকার কার্ত্তিক মাসের খরচ ৬০, মদনের মাতার ১০, শ্রীমতী গঙ্গামণি দেবীর ৭,। শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দিবার জন্য যে ৫, পাঁচ টাকার বরাত লিখিয়া দিয়াছি অনবধানবশতঃ ঐ ৫, টাকা হুণ্ডীর মধ্যে দিতে বিস্মৃত হইয়াছি অগ্রহায়ণের টাকার সঙ্গে পাঠাইতে ভুলিব না। আমি ইতিপূর্ব্বে দুইবার পত্র লিখিয়াছি বোধ করি তাহা পান নাই। যাহা হউক এক্ষণে আমি অনেক ভাল আছি জানিবেন এখানকার আর সমস্ত মঙ্গল জানিবেন ইতি ৬ই পৌষ

ভৃত্য
শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ৬, ছয় টাকা দিবেন

আগামী টাকা পাঠাইবার সময় ঐ টাকা প্রেরিত হইবেক ইতি ২২ শ্রাবণ ১২৮০

ভৃত্য
শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

শম্ভুচন্দ্রের ২০ কার্ত্তিকের পত্রে আপনকার সুস্থতার সংবাদ পাইয়া কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম বলিতে পারি না। আমি আপনকার কষ্টের কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম। আপনকার শ্রীচরণারবিন্দের আশীর্ব্বাদ প্রভাবে আমি ক্রমে সুস্থ হইতেছি যদি আর কোন ব্যতিক্রম না ঘটে আর ১০।১৫ দিনে সুস্থ ও সবল হইব এবং আপনকার শ্রীচরণদর্শন করিতে পারিব। এখানকার আর আর সমস্ত মঙ্গল জানিবেন ইতি ২৩ কার্ত্তিক

ভৃত্য
শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

আপনকার কার্ত্তিকের খরচ	— ৪৫৲
মদনের মাতা	— ৮৲
সারদা দেবী	— ৭৲
কালিদাস ভট্টাচার্য্যের দঃ	— ১০৲
গঙ্গামণি দেবী	— ৭৲
	৭৭৲

হুণ্ডীর টাকা আনাইয়া উপরিলিখিতমত বিনিয়োগ করিতে আজ্ঞা হয়

অতঃপরে শম্ভুচন্দ্র আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে পিতৃদেব যখন যে-রূপ থাকেন প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার তাহার সংবাদ লিখিবে। অদ্য তোমার বাটীতে আশ্বিন মাসের টাকা পাঠাইলাম এবং যাহাতে মাস মাস তোমার পুত্রেরা টাকা পায় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। ...পত্রে সকল সমাচার অবগত হইবে ইতি

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—
সহায়—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

শম্ভুচন্দ্র ও নারায়ণ নির্ব্বিঘ্নে পঁহুছিয়াছেন ও আপনি কায়িক ভাল আছেন ইহাতে কি পর্য্যন্ত সুখী ও আহ্লাদিত হইলাম বলিতে পারি না পরম্পরায় আপনকার অসুস্থতা ও দৌর্ব্বল্যের সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বেগ ও দুর্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছিল যাহা হউক এমতাবস্থায় আর আপনকার একাকী থাকা উচিত হয় না আমার ইচ্ছা নারায়ণ আপনকার শ্রীচরণসমীপে থাকে এবং কাশীর কলেজে অধ্যয়ন করে আপনকার অনুমতি পাইলে আমি ২।৪ দিনের জন্য সেখানে গিয়া বন্দোবস্ত করিয়া আসি। আমি এক্ষণে কিছু ভাল আছি জানিবেন। চকদিঘীতে আর ২।৩ দিন থাকিয়া কলিকাতা যাইব এবং সেখান হইতে পুনরায় সংবাদ লিখিব ইতি ১২ ভাদ্র

ভৃত্য
শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—

শরণম্—

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনমিদম্

আপনকার আজ্ঞাপত্র পাইয়া সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলাম আমি...উত্তরোত্তর দুর্ব্বল হইতেছি মন অত্যন্ত অসুস্থ তাহাতেই এরূপ দুর্ব্বল হইতেছি। আপনারা কায়িক ভাল আছেন ইহাতে পরম সুখী হইলাম। ৭৬, টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি ভাদ্রমাসের হিসাবে দিবেন ও লইবেন। এখানকার আর আর সমস্ত মঙ্গল জানিবেন। ...ইতি ২৩ ভাদ্র

ভৃত্য

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—

সহায়—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনমিদম্

একশত উনিশ টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি নিম্নলিখিত বিনিয়োগ করিতে আজ্ঞা হয়—

নিজ খরচ মাঘ	—	৪৫,
মদনের মাতা	—	৮,
সারদা দেবী	—	৭,
গঙ্গামণি দেবী	—	২,
মদনের মাতা ...	—	৫০,
		১১২,

আপনকার আজ্ঞাপত্র পাইয়া শম্ভুচন্দ্রকে অবিলম্বে কলিকাতায় আসিতে লিখিয়াছি আসিলেই পাঠাইয়া দিব এবং আমিও ঐ সঙ্গে অথবা দুই এক দিন পরে শ্রীচরণ সমীপে উপস্থিত হইতেছি। শ্রীমতী ছোট বধূমাতার যাইবার বিষয়ে বক্তব্য এই যে শীতকালে দুগ্ধপোষ্য বালিকা লইয়া দূরদেশে যাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। যাহা হউক শ্রীচরণসমীপস্থ হইয়া পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্যস্থির করিব। আমি এক্ষণে অনেক ভাল আছি এখানকার আর সমস্ত মঙ্গল জানিবেন ইতি ২১ মাঘ

ভৃত্য

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

মদনের মাতার ১৫০, টাকার হিসাব পাঠাইতেছি তাঁহাকে দেখাইবেন এবং কহিবেন আমার নিকট তাঁহার যে ১৫০, টাকা জমা ছিল তাহা তিন দফায় তিনি সমুদয় লইবেন। ইতি

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—

শরণম্

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

আপনকার শ্রীচরণারবিন্দের আশীর্ব্বাদ প্রভাবে এখানকার সমস্ত মঙ্গল জানিবেন। দুইশত সাইত্রিশ টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি নিম্নলিখিত মত বিনিয়োগ করিবেন

আপনকার নিজ খরচ—ভাদ্র ও আশ্বিন	—	৯০,
পিতামহদেবের একোদ্দিষ্ট খরচ	—	১০০,
মদনের মাতা—ভাদ্র ও আশ্বিন	—	১৬,
সারদার মাতা—আশ্বিন	—	৭,
গঙ্গামণি দেবী—ভাদ্র আশ্বিন	—	১৪,
কালিদাস ভট্টাচার্য্যের দ	—	১০,
		২৩৭,

শম্ভুচন্দ্রের পত্রে অবগত হইলাম তিনি পূজার পর ত্রয়োদশীর দিন যাত্রা করিবেন তিনি আপনাকেও এই সংবাদ লিখিয়াছেন তাঁহার পত্রে অবগত হইলাম অতএব যজ্ঞেশ্বরকে বলিবেন শম্ভুর যাওয়া পর্য্যন্ত তিনি তথায় থাকেন। আমার উদরাময় হইয়াছিল তজ্জন্য অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছি। আমি কল্য অথবা পরশ্বঃ কর্ম্মটাড় নামক স্থানে যাইতেছি তথায় কিছুদিন থাকিলে সচ্ছন্দ ও সবল হইতে পারিব। এই পত্রের পঁহুছ সংবাদ ঐ ঠিকানায় লিখিবেন। আমার নাম লিখিয়া ঠিকানার স্থলে

"কর্ম্মটাড় ষ্টেশন"

এইমত লিখিলেই আমি পত্র পাইব।

আপনি এক্ষণে কায়িক কেমন আছেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার সবিশেষ লিখিতে আজ্ঞা হয়। ইতি ৩ আশ্বিন ১২৮০ সাল

ভৃত্য শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—

শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

অদ্য ১৩ দিন হইল আমি কর্ম্মটাড়ে আসিয়াছি। এখানে আসিয়া অবধি ভাল আছি। ২২ পৌষ পুনরায় কলিকাতায় যাইব এবং তথায় ১০।১২ দিন থাকিয়া এখানে আসিয়া শ্রীচরণ দর্শনে যাইব। আপনি এবং ঈশান ও ছোট বৌ সকলে কেমন আছেন সবিশেষ লিখিয়া চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হয় ইতি ৮ পৌষ ১২৮২

ভৃত্য

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—

শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ৬, ছয় টাকা দিবেন ইতি ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ সাল

ভৃত্য

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—

শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ৬, ছয় টাকা দিবেন ইতি ২ চৈত্র

ভৃত্য

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—

শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ১০, দশ টাকা দিবেন ইতি ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ সাল

ভৃত্য

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—

শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রীযুত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ১০, দশ টাকা দিবেন ইতি ২০ ভাদ্র

ভৃত্য

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—

শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রীযুত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ১০, দশ টাকা দিবেন ইতি ৬ আশ্বিন ১২৮০

ভৃত্য

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—

শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

১৩২ একশত বত্রিশ টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি তন্মধ্যে আপনকার আষাঢ় শ্রাবণ দুই মাসের ৯০ মদনের মাতা ১৬, গঙ্গামণি দেবী ১৪, কালিদাস ভট্টাচার্য্যের ৮—১২,। আপনি যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন তদনুসারে আপনকার ১৫, পনর টাকা কম প্রেরিত হইল আর মদনের মাতাকে বলিবেন তাঁহাকেও দুই টাকা কম দিলাম।

শম্ভুচন্দ্রের মুখে শুনিলাম যজ্ঞেশ্বর পাক করিলে আপনি খাইবেন না সুতরাং আপনাকে নিজে পাক করিতে হইবেক ইহাতে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলাম। এ অবস্থায় স্বয়ং পাক করিয়া আহার করা সহজ নহে। যাহার কেহ কোথায়ও না থাকে তাহারই এইরূপ ঘটে আপনকার সকল থাকিয়াও না থাকার তুল্য হইয়াছে।

এখানকার একপ্রকার সমস্ত মঙ্গল জানিবেন ইতি ১২ ভাদ্র

ভৃত্য

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—

শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

বেণীমাধব নির্বিঘ্নে এখানে পঁহুছিয়াছেন। ৯৭, সাতানব্বই টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি নিম্নলিখিতমত বিলি করিবেন।

নিজ খরচ মাঘ	— ৬০,
মদনের মাতা	— ১০,
গঙ্গামণি দেবী	— ২১,
কালিদাস ভট্টাচার্য্য	— ৬,
	৯৭,

শ্রীমতী গঙ্গামণি দেবীকে আপনি দুই মাসের টাকা দিয়াছেন ঐ টাকা আপনি লইবেন অবশিষ্ট ৭, টাকা তাঁহাকে দিবেন। বেণীর মুখে শুনিলাম আপনকার এক পা ফুলিয়াছে এক্ষণে বোধকরি তাহা আরাম হইয়াছে তদ্ভিন্ন আপনি শারীরিক কিরূপ আছেন তাহার সবিশেষ লিখিতে আজ্ঞা হয়। এখানে সকলে কিরূপ আছেন তাহা আপনি অনায়াসে অনুমান করিতে পারিতেছেন সে বিষয়ে কিছু লিখিবার প্রয়োজন নাই ইতি ১০ ফাল্গুন

ভৃত্য

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

পুনশ্চ নিবেদনং

আপনি অনুগ্রহ করিয়া গঙ্গামণি দেবীকে এই কথা বলিবেন যে নীলমাধববাবুর হিসাবে তাঁহার চৈত্র মাস পর্য্যন্ত শোধ হইয়া গেল ইতি

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—

শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

আপনকার শ্রীচরণারবিন্দের আশীর্ব্বাদ প্রভাবে এক্ষণে অপেক্ষাকৃত অনেক সুস্থ হইয়াছি বোধ হয় আর কিছু দিনে সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারিব। পিতামহদেবের একোদ্দিষ্ট উপলক্ষে যেরূপ ব্রাহ্মণ ভোজনাদি নির্ব্বাহ হইয়াছে তাহাতে পরম আহ্লাদিত হইলাম। লিখিয়াছেন কতকগুলি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হইয়াছে আমার এইরূপ সংস্কার ছিল হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণেরা শ্রাদ্ধে ভোজন ও দান গ্রহণ করেন না এক্ষণে সেই সংস্কার অমূলক বোধ হইতেছে। আপনকার আশীর্ব্বাদে এখনকার আর আর সমস্ত মঙ্গল জানিবেন ইতি ৫ কার্ত্তিক

ভৃত্য

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—

শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

প্রাতঃকালে গাড়িতে চড়িয়া রাত্রি দুই প্রহর দুইটার সময় বর্দ্ধমান পঁহুছাই পরদিন অর্থাৎ পরশ্বঃ আহারান্তে ৪টার সময় গাড়ীতে চড়িয়া রাত্রি ৯টার সময় কলিকাতায় পঁহুছিয়াছি কল্য অতিশয় দুর্ব্বল ছিলাম অদ্য আর কোন অসুখ নাই। এখানে সকলে ভাল আছেন। আপনারা নূতন বাটীতে উঠিয়া গিয়াছেন ও আপনারা কাহার কিরূপ আছেন লিখিতে আজ্ঞা হয় ইতি ১৫ ফাল্গুন রবিবার

ভৃত্য শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

দীনবন্ধুকে কহিবেন গোপালের মাতুলের বাসার ঠিকানা লিখিয়া পাঠান আসিবার সময় আনিতে বিস্মৃত হইয়াছি ইতি

শ্রী ঈ—

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—

শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্

শম্ভুচন্দ্র পরশ্বঃ সন্ধ্যাকালে কাশী যাত্রা করিয়াছেন। তাহার প্রমুখাত এখানকার সকল সংবাদ অবগত হইয়াছেন। ৮৪, টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি শ্রাবণ মাস হিঃ আপনকার ৬০ ষাটি মদনের মাতার ১০, সারদা দেবীর ৭, বাকী ৭, সাত টাকা শ্রীমতী গঙ্গামণি দেবী নামে একজন কাশীতে বাস করিয়া আছেন তাঁহাকে দিতে হইবেক ইনি শ্রীযুত নীলমাধব মুখোর ভগিনী

সম্মুখে সকল কহিয়া দিয়াছি তিনি এই টাকার বিলি করিবেন
ইতি ২৯ শ্রাবণ ১২৭৯ সাল

ভৃত্য
শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রী হরিঃ—
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্
একশত আশী টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি তন্মধ্যে—

পিতামহী দেবীর একোদ্দিষ্টের খরচ	—	১০০,
আপনকার বাসা খরচ	—	৬০,
মদনের মাতা	—	১০,
সারদা দেবীর হিসাব শোধ	—	১০,
		১৮০.

৪।৫ দিনের মধ্যে এখান হইতে কাহাকেও পাঠাইতেছি তিনি পঁহুছিলে শম্ভুচন্দ্র বাটী আসিবেন। এখনকার একপ্রকার সমস্ত মঙ্গল জানিবেন। আপনি এক্ষণে কিরূপ আছেন লিখিয়া নিরুদ্বেগ করিবেন ইতি ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৭৮ সাল

ভৃত্য
শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ—
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদনম্—

আমি মধ্যে অতিশয় অসুস্থ হইয়াছিলাম এজন্য এতদিন কোন সংবাদ লিখিতে পারি নাই। এক্ষণে আপনকার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে অনেক সুস্থ হইয়াছি। সত্বর টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি। পৌষ মাসের খরচের হিসাব লইবেন ও মদনের মাতাকে দিবেন। মাঘ মাসের টাকা সত্বর পাঠাইতেছি। শম্ভুচন্দ্র কল্য রাত্রিতে কাশীযাত্রা করিয়াছেন। এখনকার আর সমস্ত মঙ্গল জানিবেন ইতি ২০ মাঘ

ভৃত্য
শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ—
শরণম্—

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্—

৭০ সত্তর টাকার হুণ্ডী পাঠাই আপনকার ও মদনের মাতার চৈত্র মাসের খরচ লইবেন। এখানকার সমস্ত মঙ্গল জানিবেন আপনকারদিগের কুশল সংবাদ দ্বারা নিরুদ্বেগ করিতে আজ্ঞা হয় [illegible] ২৫ চৈত্র

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ—
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদনম্—

একশত ছাব্বিশ টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি নিম্নলিখিত বিনিয়োগ করিবেন। আপনি এক্ষণে কায়িক কিরূপ আছেন এবং শম্ভুচন্দ্র পীড়িত হইয়াছিলেন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন কিনা লিখিতে আজ্ঞা হয়। আমি কায়িক অনেক ভাল আছি জানিবেন। অত্যন্ত [illegible] অদ্য আর কোনও কথা লিখিতে পারিলাম না ইতি ৫ মাঘ

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

শম্ভুচন্দ্র লিখিয়াছিলেন এবার শ্রাদ্ধে ২০ কুড়ি টাকা অধিক খরচ হইয়াছে তাহা প্রেরিত হইল।

নিজ খরচ মাঘ	৫০,
মদনের মাতা	৮,
নিস্তারিণী দেবী	৭,
গঙ্গামণি দেবী	৮,
আমার হাওলাত	৪০,
শ্রাদ্ধের অতিরিক্ত খরচ	২০,
	১২৬,

পুত্র নারায়ণকে লেখা :—

শ্রীশ্রীহরিঃ—
শরণম্—

শুভাশিষঃ সন্তু—

তোমার পত্র পাইয়াছি লিখিয়াছ পথে যাইতে অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল কিন্তু যাইবার যেরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহাতে তাদৃশ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না যাহা হউক কিরূপ কষ্ট তাহার বিশেষ কিছু লিখ নাই সুতরাং বুঝিতে পারিলাম না। অদ্য আমি কলিকাতায় চলিলাম। তুমি কেমন থাক তদ্বিষয়ে বিশেষ সংবাদ সেখানে লিখিবে। আমি কলিকাতায় চলিলাম এই সংবাদ পিতৃদেবকে জানাইবে। তিনি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছেন চলিতে পারেন না চলিতে গেলে পায়ে পায়ে জড়াইয়া যায় ইহা অবগত হইয়া অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলাম কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেই আমি তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনে যাইব মানস করিয়াছি। তুমি প্রতি সপ্তাহে তোমার ও পিতৃদেবের সবিশেষ সমস্ত সংবাদ লিখিবে ইতি ২১ আশ্বিন

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

পিতৃদেবের শ্রীচরণারবিন্দে প্রণাম নিবেদন করিয়া কহিবে তাঁহার পত্র পাইয়াছি ইতি

পুত্র নারায়ণকে (?) লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ—
শরণম্—

শুভাশিষঃ সন্তু—

কর্ত্তামহাশয় এক্ষণে কেমন আছেন সবিশেষ লিখিবে শম্ভু অদ্যাপি না আসাতে বোধ হইতেছে তিনি অদ্যাপি সুস্থ হইতে পারেন নাই অতঃপর তুমি প্রতি সপ্তাহে তথাকার সংবাদ লিখিবে কোনমতে অন্যথা করিবে না। একশত টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি দেনা শোধ ও বাসা খরচ করিবে ও বাসা খরচ চালাইবে। চৈত্র মাস অবধি বাসা খরচ হিঃ কত পাঠাইব আন্দাজী লিখিবে। আমি অদ্য কৃষ্ণনগর যাইতেছি সোমবার ফিরিয়া আসিব। [illegible] ও এখানকার সমস্ত মঙ্গল জানিবে ইতি ২০ ফাল্গুন

শুভার্থিনঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে (?) লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ—
শরণম্—

শুভাশিষঃ সন্তু—

পিতৃদেব সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন ও মাতৃদেবী সুস্থ মনে ও সচ্ছন্দ শরীরে আছেন এই সংবাদে পরম আহ্লাদিত হইলাম। অতঃপর পিতৃদেবকে কোন প্রকার উৎকট পরিশ্রম করিতে দিবে না যেমন অবস্থা তদনুরূপে করাও উচিত। তোমাদের চৈত্র মাসের ৬০, ও মদনের মাতার ফাল্গুন চৈত্র ২০, ও [illegible] দেবীর ৬, সমুদায় ৮৬ টাকার হুণ্ডী পাঠাই পঁহুছ সংবাদ লিখিবে। তুমি ও মাতৃদেবী বৈশাখের কোন নাগাএদ আসিতে চাও লিখিবে তদনুসারে বন্দোবস্ত করিব। এখনকার সমস্ত মঙ্গল জানিবে। তোমার বাটীর হিসাবে মাঘের টাকার সঙ্গে অতিরিক্ত ৫০, পঞ্চাশ টাকা প্রেরিত হইয়াছে ফাল্গুনের টাকার সঙ্গে বাকী পঞ্চাশ টাকা পাঠাইব। লোকনাথ বাবুর নিকট যে পঞ্চাশ টাকা লইয়াছিলাম তাহা দেওয়া হইয়াছে জানিবে। [illegible] বাবুর [illegible] আছি নিশ্চিন্ত নাই ইতি ১১ চৈত্র

শুভার্থিনঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

কিশোর বিজ্ঞান

জীবনের ছন্দ

গোধূলির পর রাতের অন্ধকার যখন পৃথিবীর উপর নেমে আসে তখনই মানুষের চোখ বুজে আসে—সে চট বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তো। ক্রমে সেটাই তার অভ্যাসে গিয়ে দাঁড়াল। ভোরের আলোয় আকাশ রাঙিয়ে উঠলেই সে আবার জেগে ওঠে। ঠিক তেমনি গাছের পাতাও ২৪ ঘণ্টা একভাবে একদিকে থাকে না। দিনে রাতে গাছের পাতারও দিক পরিবর্তন হয়। ফুলের কুঁড়ির পাপড়িগুলি কিরকম অদ্ভুত নির্ভুলভাবে খুলে যায় এবং আবার বন্ধ হয়ে যায় তাও আমরা দেখেছি। এ-সবের পিছনেই একটা নিয়ম আছে, আছে একটা শৃঙ্খলা। সেই নিয়মের বাঁধুনি ছিঁড়ে যথেচ্ছ আচরণ করবার ক্ষমতা প্রকৃতি কাউকেই দেয় নি। সেই নিয়মানুবর্তিতাবশেই মানুষ রাতে ঘুমায় আর দিনে জাগে। গাছপালার ক্ষেত্রেও ঠিক সেইরকম আহ্নিক নিয়মানুবর্তিতা চালু আছে, যাকে আমরা পুনরাবর্তনশীলতা বলতে পারি। বহু জৈব ক্রিয়ার মধ্যে মানুষ এই পুনরাবর্তনশীলতা লক্ষ্য করে আসছে আজ দীর্ঘকাল, কিন্তু সেটা কি করে, কোন্ প্রক্রিয়ায় কেন ঘটে তার জবাব এখনো পর্যন্ত ঠিকমত পাওয়া যায় নি।

গাছপালা বা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এইসব আহ্নিক পরিবর্তনের যোগাযোগ থাকতে পারে আলোক ও উত্তাপের সঙ্গে। তার মানে সেই যোগাযোগটা রয়েছে গাছের বাহ্যিক পরিবেশের সঙ্গে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, গাছপালা ও জীবজন্তুর দেহের ভিতরে নিশ্চয়ই এমন কোন কলকৌশল আছে যাকে আমরা "জীবতাত্ত্বিক ঘড়ি" (Biological clock) বলতে পারি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অদল-বদলের প্রভাবে সেই ঘড়ি চলে। এইরকম কিছু একটা কৌশল না থাকলে সূর্যমুখী ফুল আকাশে সূর্যের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার মুখখানি সর্বদা সূর্যের দিকে ঘুরিয়ে রাখে কি করে এবং কি করেই বা সে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পাপড়িগুলি বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ে?

আজ থেকে দু' শ' বছরেরও বেশী আগে দ্য মাইরা নামে এক ফরাসী জ্যোতির্বেত্তা এক পরীক্ষা করেন। কয়েকটি গাছকে তিনি একটি একেবারে অন্ধকার ঘরে রাখেন এবং ঘরের তাপমাত্রা সব সময় সমান রাখেন। তার ফলাফল যা হল তাতে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন যে, সেই অন্ধকারেও গাছের পাতাগুলির দিক-পরিবর্তন বন্ধ হচ্ছে না, ঠিক দিনের বেলার মতই সেগুলি নড়াচড়া করছে। তখন তাঁর ধারণা হল যে, আলো বা তাপের মত কোন বাহ্যিক ব্যাপারের দ্বারা গাছের গতি প্রভাবিত হয় না। অর্থাৎ গাছের নিজের সময় হিসাব করবার কোন একটা উপায় আছে এবং তার জীবতাত্ত্বিক ঘড়িটি স্বয়ংক্রিয়। অবশ্য তারপর একনাগাড়ে বেশ কিছু দিন গাছগুলিকে ঐ অন্ধকারে রাখার পর তাদের আহ্নিক পুনরাবর্তনশীলতা বন্ধ হয়ে গেল বটে, কিন্তু এক পলকের জন্য তাদের উপর এক ঝলক আলো ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আহ্নিক নিয়মে কাজ করা আবার শুরু হয়ে গেল। পরে তিনি আরো দেখলেন যে, কোন কোন গাছপালার ক্ষেত্রে এই আহ্নিক নিয়মানুবর্তিতা এত স্থায়ী যে, দীর্ঘকাল পরিবেশ পরিবর্তন করলেও আহ্নিক ক্রিয়ার কোন অদল-বদল হয় না। তিনি কতকগুলি ড্রসোফিলা মাছিকে ১৫ পুরুষ ধরে এমন অবস্থার মধ্যে রাখেন যেখানে দিন বা রাত্রির কোন প্রভাব পড়বে না। কিন্তু ষোড়শ পুরুষেও বাচ্চাদের মধ্যে আহ্নিক নিয়মানুবর্তিতার কোনরকম অদল-বদল দেখা গেল না। এই যে নিয়মের ছন্দ, কোন কোন ক্ষেত্রে তা ২৪ ঘণ্টা অনুসারে হয় না। সেসব ক্ষেত্রে কম বা বেশী ঘণ্টা লাগতে পারে। সুতরাং জীবতাত্ত্বিক ঘড়ির স্বশাসনের এটাও একটা প্রমাণ বলা যেতে পারে।

এ দুব্রফ নামে এক তরুণ বৈজ্ঞানিক জীবনের এই আহ্নিক ছন্দ নিয়ে গবেষণা করছেন, যা জীবতাত্ত্বিক ঘড়ির কলকৌশল সম্পর্কে আমাদের ধারণা বদলে দিতে পারে।

কতকগুলি গাছের আহ্নিক কর্মছন্দ পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি দেখেন যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেগুলির শিকড় থেকে কতকগুলি জৈব পদার্থের ক্ষরণে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে।

আমরা জানি যে, শিকড়ের মাধ্যমে গাছেরা বিভিন্ন জৈব পদার্থ জমিতে নিঃসৃত করে। সেই নিঃসরণের পরিমাণ সারা দিন সমান থাকে না। সারা দিন গাছের মধ্যে বিপাক ক্রিয়ার যেমন পরিবর্তন হয় সেই অনুপাতে পরিবর্তন হয় শিকড়ের ক্ষরণের। এইখানেই হচ্ছে গাছের আহ্নিক কর্মছন্দের একটি পরিপ্রকাশ। সেইজন্য গাছের দৈনিক ক্রিয়ার পুনরাবর্তনশীলতা (ছন্দ) বিচারের মানদণ্ড

ফুলগাছের মধ্যে জীবনের ছন্দ পরীক্ষা করা হচ্ছে

হিসাবে দ্রুব্রফ বেছে নিলেন শিকড়ের ক্ষরণকে।

কিছু গাছকে তিনি এমন এক প্লাস্টিকের দ্রবের মধ্যে রাখলেন, যাতে কিছু খনিজ লবণ ছাড়া আর কিছু নেই। তারপর শিকড়ের ক্ষরণ মাপবার সময় হতেই তিনি অন্য একটি পাত্রে গাছগুলি নিয়ে বসালেন তাজা দ্রবের মধ্যে, যে দ্রবের উপাদান আগেকার দ্রবটিরই মত। নতুন দ্রবের মধ্যে গাছগুলিকে ১০ মিনিট রাখা হল। দেখা গেল, যে ক্ষেত্রে অধিকাংশ জৈব পদার্থ অতিবেগুনী রশ্মি শোষণ করে সে ক্ষেত্রে এই দ্রবের মধ্যে অতিবেগুনী রশ্মির কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। তার মানে কি? তার মানে একমাত্র এই হতে পারে যে, গাছগুলির শিকড় থেকে ঐ নতুন দ্রবের মধ্যে কোন জৈব পদার্থ ক্ষরিত হয় নি। ফোটো মিটারের সাহায্যে এই অতিবেগুনী রশ্মি পরীক্ষা করা হয়।

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি লেবরেটরী আছে, যার ভিতরে কৃত্রিম আবহ চালু আছে। সেখানকার তাপ, আলো ও আর্দ্রতার মাত্রা সব সময় সমান রাখা হয়। সেই চেম্বারের মধ্যে দ্রুব্রফ ছোলা, যব, ভুট্টা, মটর ও পেঁয়াজ নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। পরীক্ষা চালাতে গিয়ে তিনি দেখেন যে, দিনের মধ্যে কোন কোন ঘণ্টায় শিকড় থেকে খুব বেশি পরিমাণে জৈব পদার্থ নিঃসৃত হয়, আবার অন্য সময়ে সেগুলি একেবারেই ক্ষরিত হয় না। তারপর ক্রমে ক্রমে আরো দেখা গেল যে, কোন কোন দিন প্লাস্টিকের দ্রবের মধ্যে গাছগুলি সচরাচর যে পরিমাণ জৈব পদার্থ

এই প্রবালের জীবাশ্মের চক্রগুলির মধ্যে কি জীবনের ছন্দ প্রকাশ পাচ্ছে না?

ত্যাগ করে তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষরণ হচ্ছে এবং এই ব্যাপারটাও একটা নিয়ম বা ছন্দ অনুসারে চলে বা পুনরাবর্তিত হয়। দ্রুব্রফ দেখলেন যে, প্রতি মাসে ঐরকম অত্যধিক ক্ষরণ ঘটে ৪ থেকে ৭ বার পর্যন্ত এবং অত্যধিক মানে সাধারণ ক্ষরণের দশ গুণের মত এবং সেটা চলতে থাকে ১ থেকে ১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই সেই ক্ষরণের উপাদানে কোন পার্থক্য ঘটে না, পার্থক্য ঘটে শুধু পরিমাণে। যব, ছোলা ও ভুট্টার ক্ষেত্রেই এই ধরনের ক্ষরণটা হয় সবচেয়ে বেশী।

এখন প্রশ্নটা হল—অত্যধিক ক্ষরণের এই নিয়মিত পুনরাবর্তনশীলতা ঘটে কি কারণে। তাদের পরিবেশ একই থাকে; তাপ, আলো ও আর্দ্রতারও কোন পরিবর্তন করা হয় না। তবু ক্ষরণের পরিমাণ হঠাৎ এভাবে বাড়ে কি করে?

এবারে দ্রুব্রফ গাছগুলিকে নিয়ে মাটির নিচে ৩০ মিটার গভীরে স্টার্নবার্গ জ্যোতির্বিদ্যা ইন্সটিটিউটের স্ট্যান্ডার্ড ঘড়ির পাশে রাখলেন। তারপর গাছগুলিকে সীসার তৈরী একটি ঘরে নিয়ে প্রথমে অতিবেগুনী রশ্মির দ্বারা প্রদীপ্ত করে একটি ৬ মিটার চওড়া দোলকের (পেন্ডুলাম) উপর রাখা হল। তারপর ছোট একটি চুম্বককে গাছের পাতার উপর রাখতেই দেখা গেল যে, শিকড়ের ক্ষরণ কমে যাচ্ছে, এমন কি পুনরাবর্তনের নিয়ম পর্যন্ত বদলে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানীদের মতে, মহাজগতে যে রকম বিরাট কাণ্ডকারখানা ঘটার ফলে পৃথিবীতে মহাজাগতিক রশ্মির যদি আধিক্য হয় তাতে গাছের শিকড়ের ক্ষরণ বাড়ে। সেইজন্যই সম্ভবত সীসার ঘরে থাকার সময় শিকড়ের ক্ষরণ আর কমে গিয়েছিল; কারণ, ঐ রশ্মি সীসা ভেদ করে যেতে পারে না। অবশ্য ওরই মধ্যে সবচেয়ে বেশী ও সবচেয়ে কম ক্ষরণের নিয়মগুলি ঠিকই ছিল। অতিবেগুনী রশ্মির দ্বারা প্রদীপ্ত করার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

আর যে গাছগুলি পেন্ডুলামের উপর রাখা হয়েছিল? তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেল ক্ষরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পুনরাবর্তনের নিয়মেও পরিবর্তন ঘটেছে।

সেই সঙ্গে বিজ্ঞানীরা আরো একটি নতুন ব্যাপার দেখলেন। পৃথিবীর অভিকর্ষশক্তির দৈনিক তারতম্যের একটি নকশার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেল যেদিন অভিকর্ষ কম থাকে শিকড়ের ক্ষরণ সেদিন বাড়ে। বহুবার পরীক্ষা করে দ্রুব্রফ এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, অভিকর্ষশক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে গাছের শিকড়ের ক্ষরণের নিশ্চয়ই একটা সম্পর্ক আছে এটা ঠিক, কিন্তু তাই বলে সেটাই ক্ষরণের একমাত্র কারণ নয়।

দ্রুব্রফ এবং তাঁর অন্যান্য সহকর্মীরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন; কারণ, গাছে নিয়মানুবর্তিতার ছন্দের চরিত্র এবং জীবতাত্ত্বিক ঘড়ি সম্পর্কে সংশয়াতীতভাবে শেষ কথা বলবার সময় এখনও আসে নি। তবে এটা ঠিক যে, গাছের দেহের ভিতরের কতকগুলি কারণ এবং পারিপার্শ্বিক অন্য কতকগুলি কারণ যেখানে একসঙ্গে মিশেছে, জীবতাত্ত্বিক ঘড়ির রহস্য লুকিয়ে আছে সেইখানে।

কালসন্ধ্যা

বুদ্ধদেব বসু

প্রথম অঙ্ক : ৪

[কৃষ্ণ প্রবেশ করলেন। তাঁর চলার ছাঁদ ক্লান্ত, মুখ আবেগলেশহীন, তাঁর দৃষ্টি যেন কোনো অনির্ণেয় দূরে নিবদ্ধ। তাঁর বাচনভঙ্গি উদাস ও অনাসক্ত, কণ্ঠস্বর আবেগহীন।]

সুভদ্রা

প্রণাম, অর্জুনসখা।

সত্যভামা

বার্ষ্ণেয়, প্রণাম। দেব, তুমি
কোথায় লুকিয়ে ছিলে?

কৃষ্ণ

আমি
কিছুক্ষণ নেপথ্যে ছিলাম, যাতে উপস্থিত নট ও নটীরা
পা ফ্যালে নির্দিষ্ট তালে, অসংশয়ে, অনিবার্যভাবে।
যাতে অকস্মাৎ
অন্য কেউ যবনিকা টেনে নিয়ে নষ্ট ক'রে না দেয় নাটক।

সত্যভামা

তুমি কি অন্যত্র ছিলে? এইমাত্র এলে দ্বারকায়?

কৃষ্ণ

এইমাত্র?...না কি
বহু পূর্বে, কোনো পূর্বজন্মে, স্মরণের দিগন্তরেখায়
আমি যদুবংশের সন্তান হ'য়ে কাটিয়েছিলাম
দ্বারকায় কয়েকটি দণ্ড, পল?

সত্যভামা

পরিহাসপ্রিয় তুমি, জনার্দন।

সুভদ্রা

আর যিনি হাস্যে-পরিহাসে
কৃষ্ণের আদৃত সঙ্গী—

কৃষ্ণ

তিনি আসছেন।
তাঁর কাছে দূত গেছে বার্তা নিয়ে : 'সময়ের উচ্ছিষ্ট যা ছিলো,
ধবল ও কৃষ্ণবর্ণ মূষিকেরা তাও আর রাখলো না বাকি।'
ইতিমধ্যে

সত্যভামা

তুমি শেষ করেছো তোমার কর্ম?
বলো তবে, বলো, কৃষ্ণ, তোমার দর্শনমাত্রে জনগণ
কেমন আস্থা ও প্রীতি ফিরে পেলো, আর
শৃঙ্খলিত যাদববৃন্দ
প্রত্যাবৃত্ত হলেন স্বভাবে?

কৃষ্ণ

প্রত্যাবৃত্ত — অথবা আবর্তমান।
অন্তত অধীন, অন্তত আপৎমুক্ত, পার্থিবের অনাক্রমণীয়।
উপরন্তু মুক্তঋণ।

সত্যভামা

ছাড়ো ব্যাসকূট, বলো সরল ভাষায়।

কৃষ্ণ

শোনো : কৃতবর্মা ও সাত্যকি
মদিরার উত্তুঙ্গ চূড়ায়
কালদষ্ট, হৃতদৃষ্টি, বিলুপ্তসংবিৎ
পরস্পরে হত্যা করেছেন।

সত্যভামা ও সুভদ্রা

[সমস্বরে, আর্তস্বরে]

হত্যা! হায়, হায়!

কৃষ্ণ

এ নয় নূতন কিন্তু, নয় আকস্মিক।
শৃঙ্খলিত ঘটনাপর্যায়ে
বিধিবদ্ধ, নিশ্চিত অন্তিম মাত্র।
সত্যভামা,
তোমার পিতার হত্যা মনে নেই?
মনে নেই সাত্যকির নৃশংসতা
সে যখন ছিন্নবাহু তপোনিষ্ঠ ভূরিশ্রবার
শিরচ্ছেদ করেছিলো, একবার পলক না-ফেলে?
সুভদ্রা কি ভুলে গেছো, কৃতবর্মা কত কীর্তিমান?
ভুলে গেছো সপ্তরথী, চক্রব্যূহ?
ভুলে গেছো পাঞ্চালীর পঞ্চপুত্রে

সুভদ্রা

ক্ষান্ত হও, বাসুদেব! ক্ষান্ত করো অর্থহীন বীভৎস কীর্তন!

সত্যভামা

আর নয় যন্ত্রণার পুনর্জন্ম—বিস্মরণ, চাই বিস্মরণ!

সুভদ্রা

কে আছে এমন দুঃখী, যে নয় অন্তরতলে জীবনভিক্ষুক?

সত্যভামা

অশ্রুময় মর্ত্যলোক, তবু জীব নিরন্তর আশায় উৎসুক।

সুভদ্রা

যুদ্ধ নয়, হিংসা নয়—আনো প্রীতিসম্মেলন, গার্হস্থ্য কল্যাণ।

সত্যভামা

বলো, ধন্য সেই বীর, যিনি পরিণামে তাঁর পত্নীর শয্যায়
ফিরে যান।

সুভদ্রা

যেহেতু আমরা নারী, জীবনের অন্তঃপুরে, জন্মের দুয়ার—

সত্যভামা

তাই করি নিবেদন : জীবিতেরা সুখী হোক, শান্তি হোক
মৃতের আত্মার।

সুভদ্রা

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ শেষ হ'লে
বিধবার আর্তনাদ, মাতার ক্রন্দন,
ভীষ্মের অনুশাসন, মৈত্রীর স্বাক্ষর :
তারপর অশ্বমেধ, মহাপ্রস্থানে গেলেন বৃদ্ধেরা
কেটে গেলো ছত্রিশ বৎসর।
তবুও কি স্থিতি নেই—ক্ষমা নেই?
তবু—প্রতিহিংসা?

কৃষ্ণ

প্রতিহিংসা নয়—প্রতিদান।
যুদ্ধ শেষ, যুদ্ধ অসমাপ্ত।
দু-একটি প্রশ্ন ছিলো শূন্যে ঝুলে,
সর্বদাই থাকে।
আজ কুরুক্ষেত্রের উত্তর এলো—
অনুবৃত্তি, উপসংহার।
সাত্যকি ও কৃতবর্মা
সকলের সব প্রাপ্য শোধ ক'রে নির্ভার হলেন।

সত্যভামা

না! আমি বুঝি না! বুঝি না!
হত্যা থেকে প্রতিহত্যা যদি
অবিরাম উৎসারিত হ'য়ে ওঠে,
যদি হিংসা না থামে কোথাও,
যদি কারো হৃদয়ে না জাগে দয়া, কোনো হন্তা না পায় মার্জনা,
যদি যুগ-যুগান্তর ধ'রে
[illegible] চলে ভ্রাতৃবধ বংশে-বংশে গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে
তবে শেষ পর্যন্ত কি মনুবংশ
সেইমতো অবক্ষয়ে বিলুপ্ত হবে না
যেমন মণ্ডলাকার মহাসর্প, যে নিজেকে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খায়?

কৃষ্ণ

সত্যভামা,
আমি সৃষ্টি করিনি এ-বিশ্বলোক, তুমিও করোনি।
আমি শুধু দু-একটি কথা জানি, যা তুমি জানো না।
প্রথমত, দ্বন্দ্ব বিনা জীবনের স্রোত অসম্ভব :
যাকে বলো গতি, জ্যোতি, প্রাণের স্পন্দন—
সব দ্বন্দ্ব :
পিতা-পুত্রে, গুরু-শিষ্যে, বংশে-বংশে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে।
এবং ফলত—
ভ্রাতৃবধ, পিতৃবধ, পুত্রবধ, সবই স্বাভাবিক।

সত্যভামা

[আর্তস্বরে]

সবই স্বাভাবিক!

সুভদ্রা

[ব্যঙ্গের সুরে]

এ নয় সময়োচিত, বাসুদেব,
এই জ্ঞান, কাপট্য, কৌতুক
যখন তোমার দুই জ্ঞাতিজন
পরস্পরের হাতে এইমাত্র পঞ্চত্বে বিলীন।

সত্যভামা

[কৃষ্ণের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে]

কৃষ্ণ, আমি জেনেছি তুমিই বিষ্ণু,
নিয়ামক বিধায়ক অক্ষর, ঈশ্বর।
তা-ই যদি, তবে কেন যুদ্ধ হ'তে দিয়েছিলে?
কেন থামালে না
কৌরব-পাণ্ডবের আত্মবিনাশে?
কেন শুধু নিশ্চেষ্ট দর্শক ছিলে
যাদবের আত্মীয়নিধনে?

সুভদ্রা

সত্য বলো! সত্য বলো!

কৃষ্ণ

নিশ্চেষ্ট? না তো।

সব কথা এখনো শোনোনি।
যে-মুহূর্তে সাত্যকি হঠাৎ রোষে বুদ্ধিভ্রষ্ট
অস্ত্র হাতে উঠে দাঁড়ালেন,
সেই ক্ষণ থেকে এক অনল বিস্তীর্ণ হ'লো
সর্বভুক উৎসাহে রক্তিম,
জন থেকে জনান্তরে, তৃণ থেকে তৃণান্তরে যেন।
বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধকেরা আরম্ভ ক'রে দিলেন
নির্বিচারে পরস্পরে অস্ত্রাঘাত।
প্রদ্যুম্ন, রুক্মিণীপুত্র, অচিরাৎ ধুলোয় লুটালো।
[illegible] শাম্ব, চারুদেষ্ণ, অনিরুদ্ধ
ইত্যাদি জ্ঞাতিরা দ্রুত পরস্পর কিংবা যুগপৎ—
[illegible]

অথবা ঝঞ্ঝার বেগে উৎপাটিত অগণন দ্রুম।
পিতা করে পুত্রের মস্তক চূর্ণ, পুত্র মাখে পিতার শোণিত
অঙ্গে,
কেউ হানে নিজের কণ্ঠেই খড়্গ।
আমি সেই দৃশ্য দেখে
মাটি থেকে এক মুষ্টি এরকা নিলাম তুলে;
স্পর্শমাত্রে প্রতি তৃণ পরিণত হ'লো
বজ্রতুল্য কঠিন মুষলে;
হ'লো তারা ধাবমান অবিরাম আপন আবেগে।
তুলি তৃণ—যাদবেরা প'ড়ে যায়
কৃষকের উৎকলিত ধানের গুচ্ছের মতো,
অথবা ব্যাধের
শরবিদ্ধ যেন হংসশ্রেণী।
এমনি নিশ্চিহ্ন পরিশ্রমে
শেষ ক'রে দিলাম আমার
অবশিষ্ট যা দায়িত্ব ছিলো।

সত্যভামা

[কান্নার স্বরে]

কী বললে?
তুমি নাথ অন্তর্যামী—তুমিও কি আজ
নিজ হাতে হানিলে বজ্র, নরকপালক?

সুভদ্রা

না! না! সত্য নয়—বলো, সত্য নয়!

কৃষ্ণ

ভীষ্ম, কর্ণ, ভীম ও অর্জুন,
এমনকি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির
যাঁরা যা করেছিলেন কুরুক্ষেত্রে, দীর্ঘ দিন ধ'রে,
আমি একই মুহূর্তে করেছি সমাপন।

সুভদ্রা

কেউ নেই অবশিষ্ট?

কৃষ্ণ

কেউ নেই।
যাদব বংশ আজ নিজ হাতে আপনারা উৎসন্ন, নিঃশেষ।
পিতা বৃদ্ধ বসুদেব শোকে মৃতপ্রায়।
সত্য হ'লো গান্ধারীর অভিশাপ।

সত্যভামা ও সুভদ্রা

[রোদন স্বরে]

হায় হায়! হায় হায়! হায় হায়!

কৃষ্ণ

মহিলারা, বিলাপ কোরো না।
এও নিয়মের অংশ, আদিষ্ট, অলঙ্ঘনীয়,
আঘাতের প্রত্যাঘাত, ধ্বনিজাত প্রতিধ্বনি,
লোষ্ট্রাহত জলের কম্পন শুধু।
জেনো, যাঁরা ছিলেন বিশ্রুত বীর, তাঁরা অনাবশ্যক এখন,
তাই প্রত্যাহৃত।
জেনো, এই ধ্বংস—এও ভালো। এরই সংযোজনে
ফিরে এলো বস্তুবিন্দু, পূর্ণ হ'লো কালের ঘূর্ণন।
—সত্যভামা, সুভদ্রা, বিদায়।

সত্যভামা

প্রভু, তুমি কোথায় চলেছো?

কৃষ্ণ

চলেছি যে-পথে ধায় সর্বজন।
—আপাতত পার্থের সন্ধানে। তিনি তাঁর
সাধ্যমতো তোমাদের আশ্রয় দেবেন।

[কৃষ্ণ অলক্ষ্যে নিষ্ক্রান্ত।]

সুভদ্রা

কৃষ্ণ কি চ'লে গেলেন?
মর্মান্তিক সংবাদ শুনিয়ে
কৃষ্ণ কি চ'লে গেলেন?
পার্থ, এসো — এসো — আর বিলম্ব কোরো না।

সত্যভামা

কৃষ্ণ, তুমি কোথায়, কোথায়
হা-য়! হা-য়! হা-য়!

যবনিকা

(ক্রমশ)

সবসময়েই শ্রেষ্ঠতম

1st

★ মিষ্টি গন্ধ
★ মচমচে তাজা
★ অপূর্ব্ব সুস্বাদু
★ অতুলনীয় পুষ্টিকর, সবসময়েই শ্রেষ্ঠতম-

পার্লে গ্লুকো

বিস্কুট

PARLE BISCUITS Gluco

PARLE Gluco BISCUITS

তাই, পার্লে গ্লুকো বিস্কুটের
বিক্রী ভারতে সবচেয়ে বেশী!

গ্রহের আসরে

(সাওয়ান)

শহর কলকাতার বাসিন্দা অথচ জ্যোতিষীর কাছে ভবিষ্যতের কথা জানতে যায় নি এমন লোক কেউ আছে বলে মনে হয় না। সে ধনী নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, বাঙালী অবাঙালী, বৃদ্ধ যুবক, বিশ্বাসী অবিশ্বাসী যেই হোক না কেন, এক দিন না এক দিন সতর্ক বা অসতর্ক মুহূর্তে নিশ্চয় গিয়ে হাজির হয়েছে জ্যোতিষীর কাছে। সে জ্যোতিষী রাজ-জ্যোতিষী বা ফুটপাথ-জ্যোতিষী যাই হোক না কেন। কাগজে বড় বড় বিজ্ঞাপন, রাজা মহারাজা, কবি বিজ্ঞানীদের সার্টিফিকেট সহ দিগ্বিজয়ী জ্যোতিষীদের সমস্ত আড়ম্বর, তাদের সুসজ্জিত বাড়ি, ঝকঝকে চেম্বার, নিজস্ব গাড়ি, ছোট্ট অফিস সেই সঙ্গে গ্রহ-রত্নের ব্যবসা। এঁদের দরজায় বড়লোকদের ভীড়—শান্তিহীন জীবনে আরটি মাদুলির প্রেসক্রিপশান সংগ্রহ করতে যায়।

ফুটপাথের জ্যোতিষীদেরও প্রসার কম নয়, যে কোন পার্কের পাশে এরা বসে যায়, কারুর মাথায় জটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কারুর কপালে শ্বেত চন্দন, পাশের রেলিঙে ঝোলান হস্তরেখার ছবি। কারুর সামনে চোখ বাঁধা টিয়া পাখি, খানকয়েক কাগজের খাম। রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ কোন মক্কেল উদয় হয়ে এদের সামনে বসে পড়ে, ফিস ফিস করে দু' চারটে কথার আদান-প্রদান—অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা—কয়েক আনা দক্ষিণা।

এ ধরনের পেশাদার জ্যোতিষী ছাড়াও অপেশাদারদের সংখ্যাও কম নয়। ট্রামে বাসে অফিসে খেলার মাঠে সিনেমার লাইনে যত্রতত্র এদের বিচরণ। পাশের লোকের হাতটা টেনে নিয়ে বিজ্ঞের মত মৃদু মৃদু হাসি আর দু' চারটে অস্ফুট ভবিষ্যৎবাণী। অতি সহজে এরা অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এঁদের এক একজন পেশাদার গুরু থাকে, যখন নিজে হালে পানি পায় না তখন ছোটে সেই গুরুর কাছে। এই সব চ্যালাদের জন্য গুরুদেবরও পসার বাড়ে।

'কত যে জন দূরে রয়েছে চন্দ্র সূর্য, তবু তাদেরই আবর্তনে কত নীচের পৃথিবীর জলে জোয়ার ভাটা হয়, হয় অমাবস্যার অন্ধকার, পূর্ণিমায় চন্দ্র করোজ্জ্বল রাত্রি। তবে কেন জ্যোতিষ্কগুলি মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে না? এতে অবিশ্বাসের কি আছে?'

বলেছিলেন এক জ্যোতিষী তাঁর অবিশ্বাসী মক্কেলকে।

মক্কেলটির আক্কেল নিশ্চয় হয়েছিল তা না হলে অবিশ্বাসী মন নিয়ে জ্যোতিষীর দোর-গোড়ায় দিনের পর দিন ধরনা দেয় কেন? অদ্ভুত মানুষের মন, একাধারে বিশ্বাস অন্য দিকে অবিশ্বাসী মনকে চোখ ঠেরে সান্ত্বনা দেয়, বলুক না, পাগলে কিনা বলে।

জ্যোতিষীও কিনা বলে?

বলে দেয় প্রসূতির জঠরাভ্যন্তরে ভাবী জাতকের আবির্ভাবের দিন-ক্ষণ-লগ্ন, বলে দেয় ভাবী দম্পতির রাজযোটক মিলের খবর।—খবর—সারাজীবন সদ্য বিবাহিত জোড়াটি হৃদয়ে হৃদয়ে জুড়ে থাকতে পারবে কিনা; বলে দেয় আধি-ব্যাধির হেতু, সেই সঙ্গে তার প্রতিকার। সেয়ানা জ্যোতিষী হদিশ দেন গ্রহ রত্নের; প্রেসক্রিপশান এবং দাওয়াই—একই জায়গায় মিলবার ব্যবস্থা। রত্নের ওজন ও উৎকর্ষতার হেরফেরে দামেরও পার্থক্য। যে যুবক বেকার, হাতে একটাও পয়সা নেই, সেও জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী শুনে উৎফুল্ল হৃদয়ে বাড়ি ফেরে—টাকা ধার করে পাঁচ ছ' খানা লটারীর টিকিট কিনে ফেলে, কিংবা মাঝারি ধরনের একটা পাথর ধারণ করে আঙুলে।

'ধন্য আশা কুহকিনী!' আশা, শুধু মাত্র আশার মোহে ঠকেও মানুষ পুনরায় ছোটে জ্যোতিষীর কাছে—যেহেতু ভবিষ্যৎ এমনই জিনিস, যা জীবনে আসা মাত্র বর্তমানে পরিণত, কিছু বিলম্বে যার পরিচয় অতীত বলে। এবং সর্বোপরি—যাকে জানা যায় না, যার কথা বলা যায় না আগে থেকে।

'ফাঁদ আপনার ভাগ্য বলিয়া দিবে', কিংবা 'সম্মোহনী রুমাল', যা অবাধ্য বড়বাবুর সামনে অত্যাশ্চর্য সুগন্ধী যোগে নাড়লে

মড়বাবু আপনাকে পেয়ার করতে থাকবেন। পরীক্ষা পাস, মামলা মকদ্দমা জয়ের জন্য রয়েছে একশ্রী, স্প্রিং ত্রিমোহিনী কবচ, প্রিয় নর বা নারী যত দূরেই অবস্থান করুক না কেন, 'আজব আয়নায়' তার মুখ প্রতিফলিত হবেই। পাঁজিতে বিজ্ঞাপন দেখে প্রলুব্ধ হয় মানুষ—জলন্ধরি পোস্ট বক্সের ঠিকানায় ভি পি পি-র অর্ডার যায়, প্যাকেট ছাড়াবার পর নাড়ি ছাড়বার উপক্রম। বিজ্ঞাপনে যে 'দ্যামী' রিস্টওয়াচকে ছাপার ভুল হয়েছে বলে 'দামী' রিস্টওয়াচ ভেবেছিলেন, ভি পিতে পিচ্‌বোর্ডের খ্যালনা ঘড়ি পাবার পর —এ তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা লজ্জায় কাউকে বলতে পারেন না আপনি। পাঞ্জাবে বসে অন্য প্রদেশের লোকের এ হেন পকেট কাটা দেখে সরকারও চুপ করে থাকেন, যেহেতু বিজনেস ইজ বিজনেস।

কিন্তু কালীপ্রসাদবাবুর হস্তরেখা বিচার আদৌ বিজনেস নয়। প্রথম জীবনে স্কুল মাস্টারি করতে করতে হদিশ পেয়েছিলেন এক সাধুর—তার পেছনে ঘুরেছেন বছর কয়েক। তারপর ফিরে এলেন কলকাতায়—শুরু করলেন অপেশাদারী কর-গণনা। এখন তাঁর নাম সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। এক দিনের শখের নেশা আজ পেশায় পরিণত হয়েছে।

—আজ অবধি দেড় লক্ষ লোকের হাত দেখেছি, গর্বের সঙ্গে প্রায়ই ঘোষণা করেন কালীপ্রসাদবাবু।

আরও বলেন, ধাপ্পা আমি দিতে পারি না, ইনটুইশান-এর সাহায্যে আমি ভবিষ্যতের কথা বলি। শুধু হাতের রেখা দেখে এ বিচার করা যায় না। আমাদের চক্ষুলজ্জা থাকলে চলে না। সেদিন তো এক ভদ্রমহিলাকে বলেই ফেললাম তার কুমারী জীবনের প্রেমের কথা, তারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে একটি অনাথ আশ্রমের শিশু।

যারা কালীপ্রসাদবাবুকে চেনে তারা তাঁর চেম্বার ফাঁকা থাকলে আসে।—ভয় পায় কার সামনে কি বেফাঁস বলে ফেলেন।

তবে যাদের চক্ষুলজ্জা নেই যেমন হলধর বা ফিল্ম ডিরেক্টার সৌরভ সেন তারা নির্লজ্জের মত নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কালীপ্রসাদকে প্রশ্ন করে, আবার উত্তর শুনে কান এঁটো করে হাসে। সেদিন অবশ্য হলধর মিতাকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, জিজ্ঞেস করল, কালীবাবু ভাল করে হাতটা দেখুন তো আমাদের তিনজনের, এ মেয়েটির ইচ্ছে ফিল্ম প্রোডিউসার হবে, টাকাটা আমার, আর ইনি ডিরেক্টার। সেই জন্যে তিনটে হাতই দেখা দরকার।

কালীপ্রসাদ মিতার দিকে তাকান, ইনি কে?

—আমার ইয়ে।

—হঠাৎ ছবির শখ কেন?

হলধর অম্লান হাসে, জানেনই তো আমার ঘোড়া রোগ আছে, ঘোড়ার পয়সা এদ্দিন মেয়েমানুষের পেছনে ঢেলেছি, এবার ভাবছি ছবির পেছনে ঢালব। কায়া থেকে ছায়া।

কালীপ্রসাদ হলধরের হাতটা ভাল করে দেখে নিয়ে বলেন, নতুন ব্যবসার পক্ষে সময়টা ভাল নয়, আরও কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে।

সৌরভ সেন না বলে পারে না, আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই, কোনরকমে লোকটাকে নিমরাজী করিয়েছিলাম, আপনি স্রেফ জল ঢেলে দিলেন।

কালীপ্রসাদের আহ্বান, দেখি আপনার হাত।

সৌরভ সেন ডান হাতের তালুটা প্যান্টে মুছে নিয়ে গণৎকারের সামনে এগিয়ে দেয়। একটু পরে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, এতক্ষণ ধরে কি দেখছেন স্যার?

কালীপ্রসাদের মুখে মৃদু হাসি, দেখছি আপনার অতীতটাকে, আপনি যা ছিলেন। এন্তার টাকা রোজগার করেছেন, গ্রাহ্য করেন নি। দু' হাতে উড়িয়েছেন, নবাবী করেও সাধ মেটে নি। বহু নারী সঙ্গ, শরীরের ওপর অত্যাচার, অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে লিভারটা নষ্ট হতে বসেছে। মনটা আপনার ভাল, সেই কারণে বহু লোকে ঠকিয়েছেও।

—এসব কথা শুনে আর লাভ কি? নিজে কি ছিলাম তাতো জানিই, এখন বর্তমানটা কিরকম দেখছেন।

—ভাল নয়।

—কবে ভাল হবে?

—সেটা নির্ভর করছে আপনার ভবিষ্যতের ওপর।

সৌরভ সেন বিরক্ত হয়, আহা সেই ভবিষ্যৎটাই তো জানতে এসেছি।

—জীবনে আর একটা সুযোগ আপনি পাবেন, তবে একেবারে শেষ বেলায়। খুব নাম হবে, তবে টাকা হবে কিনা বলতে পারছি না।

সৌরভ সেন আশার আলো দেখে, কবে সেটা?

—দেরী আছে।

—দূর মশাই, আরও দেরী? এত মনে হচ্ছে দেবদাস শেষ অবস্থায় পার্বতীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত দোর গোড়ায় গিয়ে মুখ থুবড়ে মরবে আর মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করবে, 'ধর্মদা আর কত দেরি?' আমার ধর্মদা অবশ্য আপনি।

কালীপ্রসাদ হাসেন, আপনি বেশ বাকপটু।

—পরিষ্কার করে বলুন না বাকসর্বস্ব, আগে কাজ করতাম এখন শুধু কথা বলি। নয়ত চব্বিশ ঘণ্টা কাটবে কি করে? যাক্ গে, যোদ্দা কথা বলুন তো হলধরবাবুকে নিয়ে ছবি করা যাবে কিনা।

—আমি করবার উপদেশ দেব না, খারাপ সময়টা কেটে যাক, সেও প্রায় দেড় বছর তারপর দেখা যাবে।

এ কথায় হলধর কিন্তু অখুশী হল না, বলল, এখন বুঝতে পারছেন তো সৌরভ-বাবু কেন আমি ইতস্তত করছিলাম, কালীদা যখন বলছেন এখন বরং ছবির ব্যাপারটা থাক। তার চেয়ে ক'দিন আপনি আমার সঙ্গে রেসের মাঠে চলুন। কপালে থাকলে বেশ দু' পয়সা রোজগার হবে।

সৌরভ সেনের সায় দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না, বলে, তথাস্তু।

এইবার কালীপ্রসাদ মিতাকে লক্ষ্য করে বলেন, দেখি মা তোমার হাত দুটো।

মিতার জবাব, আমি কিন্তু একলা আপনাকে দেখাব। এখানে আর কেউ থাকলে চলবে না।

হলধর উঠে পড়ে, ঠিক আছে, তুমি কালীদার সঙ্গে কথা বল, আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি।

কালীপ্রসাদকে একলা পেয়ে মিতা প্রথম কথাই বলল, আমাকে কিন্তু মিথ্যে কথা বলবেন না আমার মন রাখবার জন্যে।

কালীপ্রসাদের গম্ভীর উত্তর, আমি সেরকম কখনও বলি না।

—ঐ হলধরবাবুটি কিরকম লোক?

কালীপ্রসাদ হাতের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে মিতার মুখখানা দেখেন, বুঝতে পারেন সে চঞ্চলা সফরী নয়, গভীর জলের মাছ। তাই পাল্টা প্রশ্ন করেন, আপনার কিরকম মনে হয়?

—ঘোড়েল।

—এক কথায় তা বলা চলে।

—ক'দিন টিঁকবে?

লক্ষ্মীর কৃপালাভঃ বাঙালীর সাধন।

পণ্যসমীক্ষা ঃ বহির্বাণিজ্যে তরুণ বাঙালীর অবদান

একটি প্রকাণ্ড ও একটি বড় বাঙালী প্রতিষ্ঠান এবং তাঁদের তারকাখচিত দুশোদিনের পরিচিতি গত দুই সংখ্যায় আপনাদের কাছে পেশ করেছি; আর আমার অধিকাংশ প্রবন্ধেই বাঙালীর ঐতিহ্যবিশিষ্ট শিল্পপ্রচেষ্টার কাহিনী রচনা করে কৃপাপ্রসাদ লাভ করেছি। ভেবেছিলাম বাঙালীর বাণিজ্যপ্রয়াস বিষয়টি পরে হাতে নেব। কিন্তু সেদিন হঠাৎ দুটি যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে এবং তাঁদের কার্যকলাপের বিবৃতি শুনে মনে হল যে, ঐতিহ্যবাদের কিয়ৎকাল সাইডিং-এ দাঁড় করিয়ে এই ঐতিহ্যবিহীন অথচ কৃতী তরুণ বণিক গোষ্ঠীটির কথা আপনাদের জানাই।

গত সংখ্যায় আমি বলেছিলাম যে, এক দল অবস্থাপন্ন বাঙালীর সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয় যাঁরা স্বজাতি-বিদ্বেষী। বাঙালী অলস, বাঙালী কোনো কর্মের নয় এই মিথ্যা অপবাদটি তাঁরা বাঙালী হয়েও যেন উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করে আনন্দ পান। সেই নিন্দা প্রচারের দ্বারা তাঁরা ঠিক কী প্রতিপন্ন করতে চান, বুঝি না। আমার অভিজ্ঞতা কিন্তু ভিন্ন।

বাঙালী ছেলেরা একেবারেই অকর্মণ্য নয়; প্রত্যুত, আজ যাঁদের কথা বলছি, বিনা মূলধনে, নিছক পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও কর্তব্যনিষ্ঠার ফলে তাঁদের লক্ষ্মীলাভের বিবরণ শুনে এইটাই প্রমাণিত হয় যে, বাঙালী তরুণরা অনেক কিছু করতে পারেন। [illegible] আমাদের হতাশ্বাস বাঙালী ছেলেরা অনেকেই প্রেরণা পাবেন।

সাকল্যে এঁরা পাঁচজন—সুধীর চাটার্জি, কাজল সেন, প্রদীপ বসু, শেখর গুহ ও সলিল কর। এই পাঁচ শরিকের নামের আদ্যক্ষর জুড়ে 'এস্‌ক্যাপস' (ESKAPS) নামে যে চমৎকার একটি পণ্য সমীক্ষক (Cargo Surveyor) প্রতিষ্ঠান মাত্র বছর চারেকের মধ্যে শূন্য থেকে গড়ে উঠেছে তার বর্তমান আয় বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে। প্রথমে মনে হবে এমন আর কী। কিন্তু টাকাটা এখানে বড় কথা নয়।

অল্প সময়ের মধ্যে অন্য উপায়েও ধনী হওয়া সম্ভব। শেয়ার-মার্কেট কিংবা পাটের ফাটকায় বেচাকেনা করে অনেককে খুব অল্প কালের মধ্যে নিঃস্ব অবস্থা থেকে বিরাট ধনী হতে দেখেছি ও শুনেছি (অবশ্য তার ঠিক উলটোটাই বেশী দেখেছি)। তাঁদের মধ্যে বাঙালী প্রবীণ ও তরুণ ব্যক্তিও কিছু কিছু আছেন। গণ্যমান্য বাঙালীর মধ্যে আমাদের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল স্বর্গীয় দানবীর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বেশ কয়েক দশক আগে যখন অধ্যাপক ছিলেন, তখন থেকে শুরু করে বহুকাল নাকি তাঁর সঞ্চিত অর্থ—প্রথমে সে সঞ্চয় অতি সামান্যই ছিল বলে শুনেছি—ভালো ভালো শেয়ারে লাগিয়ে, এবং ডিভিডেন্ড থেকেই শুধু নয় অধিকাংশ শেয়ারই বেচাকেনা করে, লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছিলেন এবং সেই উপার্জনের সঙ্গে সঙ্গেই মোটা মোটা টাকা [illegible] করে [illegible]। [illegible] পঁয়তাল্লিশ আগে তিনি তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রথম যে দান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে করেছিলেন, তার অঙ্ক যত দূর মনে পড়ে ৮ লক্ষ টাকা ছিল। আজকের সস্তা টাকা নয়, সেদিনের সেই মহামূল্য আট লক্ষ টাকাই নাকি শেয়ার মার্কেটে তাঁর বিচক্ষণ লগ্নীর লাভের টাকা ছিল। আর স্বর্গীয় প্রেসিডেন্ট জন কেনেডির বাবা জোসেফ কেনেডিও (তিনি এখনও জীবিত) নাকি একই উপায়ে সারা জীবনে সঞ্চিত ১৭৫০ লক্ষ ডলারের মোটা অংশ লাভ করেছিলেন। হরেন মুখার্জি মশায় এবং জোসেফ কেনেডি খুব কম সময়ের মধ্যেই এইরকম মোটা মোটা লাভ করতেন বটে, কিন্তু তা ছিল স্পেকুলেশন বা ফাটকা, কিংবা আর একটু মার্জিত আখ্যা 'গুড ইনভেস্টমেন্ট'-এর ফল।

প্রদীপ বসু প্রমুখ 'এস্‌ক্যাপস'-এর মালিকরা কিন্তু ফাটকা করে কপর্দকহীন অবস্থা থেকে আজকের সমৃদ্ধিতে উপনীত হন নি; তাঁরা প্রচণ্ড কায়িক পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দিয়েই সেটা পেরেছেন।

মাত্র বছর পাঁচেক আগে এই পাঁচজন যুবক বেকার হয়ে পড়েছিলেন। বেকার মানে একেবারে নিঃস্ব। কারও কারও পারিবারিক অবস্থা যদিও চলনসই ছিল, কিন্তু বাড়ির ২৮/৩০ বছরের ছেলে কোথায় বুড়ো বাপ খুড়োকে সাহায্য করবে রোজগার করে, তা নয়, উলটে এক বোঝা হয়ে দাঁড়ালো! এ কোন্ সুস্থশরীর যুবকের পক্ষে সম্মানজনক! সেই গ্লানি থেকে মুক্ত হওয়ার প্রাণপণ চেষ্টায় এই পঞ্চপাণ্ডব উত্তর কলকাতার এক পার্কে মন্ত্রণার স্থান বেছে নিলেন। মন্ত্রণাসভার আসন হলো ৯ ফুট চওড়া, ১২ ফুট লম্বা জুট কার্পেট তৈরি করার এক টুকরো 'ব্যাকিং-ক্লথ' (Backing cloth)।

প্রদীপ বসু-সলিল কর-দের পূর্ব-জীবনের কথা এইখানটায় বলে নেওয়া দরকার। এঁরা সকলেই শ্রীরামপুরের বেঙ্গল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, অধুনা কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজির ছাত্র ছিলেন। ছাত্রাবস্থার শেষে চাকুরে পরিবারের ছেলেরা চাকরিতেই ঢুকেছিলেন; কেউ কটন মিলে, কেউ জুট মিলে। কয়েক বছর এ-কারখানা সে-কারখানায় কাজ করার পর আবার তাঁরা একত্র হলেন বৃহৎ এক কার্গো-সার্ভেয়ারের প্রতিষ্ঠানে।

কার্গো-সার্ভেয়িং, বিকল্পে সুপারিন- [illegible]

যাবের দেওয়া যুগ্ম-শব্দের আখ্যা 'পণ্য-সমীক্ষা' ব্যবহার করছি।

আমাদের রঘুনাথ দত্ত অ্যান্ড সন্স-এর মানিকলাল দত্ত মশায়দের, অর্থাৎ স্বর্গীয় ভোলানাথ দত্তের পূর্বপুরুষ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগর তাঁদের বাহিত্র, তাঁদের সপ্তডিঙাতে বাণিজ্যসম্ভার চাপিয়ে নিজেরাই সাগর পাড়ি দিতেন। তাঁদের জ্ঞাতি 'মনসামঙ্গল'-এর চাঁদ-সদাগরও সপ্তডিঙা 'মধুকর' নিয়ে বাণিজ্য-যাত্রা করতেন। ইওরোপে, আদি ফিনিশীয় বণিক থেকে শুরু করে মধ্যযুগের স্প্যানিশ, ইংরেজ ও ডাচ বণিকরাও তাঁদের পণ্য বোঝাই করা জাহাজে করে নিজেরাও দেশ-বিদেশে ঘুরতেন। চৈনিকরাও নিশ্চয়ই তাই করতেন।

কিন্তু বিশ্ববাণিজ্যের সর্বাধিক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো ব্যবস্থা অচল হয়ে দাঁড়ালো। তখন বণিককুল বাধ্য হয়ে দূর বিদেশে নিজেদের অনুপস্থিতিতে স্বার্থ বজায় রাখা ও পণ্যের নিরাপত্তার জন্যে বিশ্বস্ত কর্মচারী নিয়োগ আরম্ভ করলেন। এই প্রতিনিধিদের আখ্যা দেওয়া হলো 'সুপারকার্গো' (Supercargo)। কিন্তু

তাহলেও সহজ নানা অসুবিধা দেখা দিল তখন তাঁরা স্বাধীন প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে বসলেন, যাঁরা বণিকের মাইনে করা লোক না হলেও সাধুতা ও নিপুণতার সঙ্গে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। সেই প্রতিনিধিত্বকে নাম দেওয়া হলো 'সুপারিনটেণ্ডেন্স' বা 'কার্গো-সার্ভেয়িং'।

পণ্য সমীক্ষকের বিরাট দায়িত্বের মূলে যে যে গুণ থাকা আবশ্যিক তা হলো রপ্তানি ও আমদানির পণ্য বিশেষে সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান এবং বলাই বাহুল্য, সাধুতা। কেবল এ দুটি থাকলেও চলে না, সাজ-সরঞ্জামও চাই। পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ভালো যন্ত্রপাতি সংবলিত নিজস্ব একটি ল্যাবরেটরিও থাকতেই হবে। কাজেই, পণ্য-সমীক্ষক হলো একাধারে 'ক্রেডিট ইন্স-টিটিউশন' ও মানক-সংস্থা। হাজার হাজার মাইল দূরের বিদেশী খরিদ্দার লক্ষ লক্ষ টাকা দামের জিনিস কিনেছেন, সাপ্লায়ার যাতে সেই অর্ডারের বাবদ বাজে কোয়ালিটির বা কম ওজনের জিনিস আংশিকভাবেও চালিয়ে না দেন সেইজন্যে ক্রেতা নির্ভরযোগ্য কার্গো-সার্ভেয়ারকে ভার দিলেন। সেই সার্ভেয়ারের ছাড়পত্র না পাওয়া পর্যন্ত সে মাল জাহাজে বোঝাই হতে পারবে না, এই হলো সাধারণ নিয়ম। যদি অর্ডারে নির্দিষ্ট গুণ এবং ওজনের পরিবর্তে নিম্নমানের অথবা ওজনে কম মাল কোনোরকমে চালান হয়ে যায়, তবে পণ্য-সমীক্ষকের সর্বনাশ হয়—তা সে মালের ঘাটতি অসৎ উপায়েই হোক বা গাফিলতির জন্যেই হোক। এক চুল এদিক-ওদিক হবার যো নেই; খুব ঠুনকো কাঠামোর ওপর পণ্য-সমীক্ষকের সুনাম এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে বলে বিদেশী ক্রেতার মাল জাহাজে না ওঠা পর্যন্ত তাঁকে প্রতি মুহূর্তে সজাগ থাকতে হয়; কারণ প্রলোভন থেকেও পণ্য-সমীক্ষকের নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। শেষের কথাটি আবার আমাদের ভারতবর্ষে বিশেষ প্রযোজ্য; কারণ, এ দেশের এক জাতীয় শিল্পপতি ও বণিকের ধর্মই হলো, স্বদেশী ক্রেতাকে তো বটেই, বিদেশী খরিদ্দারকেও ঠকানো। তাঁরা 'কার্গো-সার্ভেয়ার' বা তাঁর কর্মচারীকে মোটা মোটা ঘুষ দিয়ে ওঁচা মাল পাস করাবার জন্যে সর্বদাই উদ্যত।

এই প্রবঞ্চনার ফলে এ যাবৎ ভারতবর্ষের রপ্তানি বাণিজ্যে, বিশেষ করে পাট ও চা-এর রপ্তানিতে কত যে কেলেংকারি হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই।

১৯৫৩-৫৪ সালে কলকাতায় নিযুক্ত মিশরের বাণিজ্যদূত ডক্টর জাকির কাছে আমি বিশেষ এক কাজে গিয়েছিলাম। কথা-প্রসঙ্গে তিনি তাঁর টেবিলে স্তূপীকৃত ফাইল দেখিয়ে বললেন যে, ভারতবর্ষে ব্যবসায়ীরা ওজন ও কোয়ালিটি, দুই বিষয়েই কীভাবে যে মিশরকে কোটি কোটি টাকা ঠকিয়েছে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ ওই ফাইলে জমা রয়েছে। ভারতীয় বিক্রেতার নাম কাগজে চাপা দিয়ে দু-একটা চিঠির অংশ ডক্টর জাকি আমাকে পড়তে দিলেন; পড়ে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল। আমাদের কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্যের অর্থাৎ চট, বস্তা, সুতলি প্রভৃতি জিনিসের এই বদনামে আমরা অনেক দেশের পৃষ্ঠ-পোষকতা হারিয়েছিলাম।

সেজন্য অসাধু ব্যবসায়ী ছাড়াও নিশ্চয়ই সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠান বা তাঁদের কর্মচারীরাও দায়ী ছিলেন। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, পণ্য-সমীক্ষায় অসাধুতা বা গাফিলতি দেশ-দ্রোহিতার শামিল।

একে আমরা ফরেন এক্সচেঞ্জের অভাবে মৃতপ্রায়, তার ওপরে এই কাণ্ড!

ঘরে-বাইরে সর্বত্রই আমাদের একই হাল। অকর্মা সরকার ও অসাধু ব্যবসায়ীর কল্যাণে আমরা ভেজালের রাজত্বে বাস করছি। সে কেলেংকারি ঘরের সীমানাতেই আবদ্ধ রেখে অন্তত বাইরের সুনামটুকুর পুনরুদ্ধার করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার জন্যে আমাদের চাই সৎ ও সুদক্ষ পণ্য-সমীক্ষক। নবীন প্রতিষ্ঠান 'এস্‌ক্যাপস' সেই গুণে গুণান্বিত। অর্থোপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সেদিক দিয়ে দেশের সেবাও করছেন বলা চলে। এখন আবার তাঁদের কথায় ফিরে যাই।

আগেই বলেছি যে, নানা জুট মিল ও কটন মিলে কিছু কাল কাজ করার পর কাজল সেন, শেখর গুহ, প্রতীপ বসু, সুধীর চ্যাটার্জি আর সলিল কর, এঁরা পাঁচজনেই বড় একটি কার্গো সার্ভেয়ার ফার্মে এক সঙ্গে এসে জুটলেন। কাপড় ও পাট বিষয়ে অধীত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জন্যে তাঁরা সেখানে চাকরি পেয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ প্রতীপ বসু কেবল বয়সে নয়, অভিজ্ঞতাতেও বড় ছিলেন। পণ্য-সমীক্ষার কাজে এখন পর্যন্ত তাঁর দশ-বারো বছরের অভিজ্ঞতা।

কিন্তু এমন এক সময় এলো, যখন দাসত্বে বীতস্পৃহ হয়ে একই দিনে পাঁচ বন্ধু চাকরিতে ইস্তফা দিলেন, স্বাধীনভাবে পণ্য-সমীক্ষকের কাজ করবেন বলে। এঁরা কেউই এমন কিছু মাইনে পেতেন না যে সঞ্চয় করতে পারবেন; তাই এই কাজ ছেড়ে দেওয়ার মানে হয়ে দাঁড়ালো চরম দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়া। অভিজ্ঞতা ছাড়া আর মূলধন বলতে ছিল ওই ৯×১২ ফুট ব্যাকিং ক্লথ।

বেলগাছিয়ার অজিত মিত্র পার্কে এঁদের দপ্তর বসলো একেবারে জনমী বসন্তেরায় ফোনের খরচ, বেয়ারা-পিওন, কিছুই লাগে না; লাগাবার পয়সাও নেই। টিফিন যেদিন জোটে সেদিন তার দৌড় হয় পার্কের কোণের পোর্টেবল তেলেভাজার দোকানের দু-চার পয়সার ফুলুরি-বেগুনির সঙ্গে মুড়ি আর নিত্যনৈমিত্তিক পবিত্র ভাঁড়ের-চা। বৃষ্টি এলে ঠাঁই মেলে পার্কের অদূরে কাজল সেনের ৪×৬ হাত ঘরে, যে ঘরে আলো-হাওয়ার উৎপাত কম।

অনামা ফার্মের নামকরণ হলো 'এস্‌-ক্যাপস'। তখন সেটা আনরেজিস্টার্ড পার্টনারশিপ ফার্ম হয়েছিল। চেষ্টাচরিত্র করে কিছু চিঠির কাগজ ছাপানো হলো; ঠিকানা হলো কাজল সেনের ডেরা। ব্যাকিং ক্লথের ওপর উপুড় হয়ে পাঁচটি মাথা এক সঙ্গে ঠেকিয়ে 'বিজনেস লেটার'-এর মুসাবিদা করা হলো। অনেক অদলবদলের পর সেই চিঠি নিয়ে পঞ্চ-রথী ছুটলেন

বিদেশের ট্রেড-কমিশনার কিংবা কনস্যুলেটের অফিসে। অবশেষে রুশ বাণিজ্য-দূতের আবাসে ডাক পড়লো। চিঠিতে রুশ বাণিজ্যদূতের নির্দেশ ছিল ২৭ মে, ১৯৬৪ তারিখ বিকেলবেলায় দেখা করার। এঁদের পক্ষে সেটা স্মরণীয় দিন হয়ে উঠলো—উৎকণ্ঠিত চিত্তে শেখরবাবুরা শুভক্ষণটির অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু যখন এলো তখন দিনটি সঙ্গে আনলো সারা দেশ ও জাতির এক প্রকাণ্ড বড়ো ক্ষতি—পণ্ডিত নেহরু সেদিন মহাযাত্রা করলেন। শেখরবাবুরা ফোন করে 'অ্যাপয়েন্টমেণ্ট ক্যানসেল করলেন—হোক তাঁদের প্রথম ইণ্টারভিউয়ের দিন, তবু এমন শোকের দিনে কোনো কাজ নয়।

দু-চার দিন পরে আবার একটা দিন ঠিক হলো। রুশ মুখ্য-সচিব যুবকদের প্রতি আকৃষ্ট হলেন; কথা বলে বুঝলেন এঁরা কাজের লোক। তবুও প্রথম যে কাজটি এই ঐতিহ্যবিহীন তরুণ ফার্মকে দিলেন তা ছিল অন্য একটি পুরনো সার্ভেয়ার কোম্পানীর সঙ্গে সামান্য একটু কাজের অংশ। সেই হলো বীজের বপন।

প্রথম পরীক্ষাটিতে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতেই রুশ ভদ্রলোক এঁদের বেশী বেশী করে কাজ দিতে থাকলেন; তরুণ গোষ্ঠীটির যোগ্যতা ও সাধুতায় তাঁর আস্থা এত বেড়ে গেল যে, কেবল তাঁর পৃষ্ঠপোষকতাতেই মাত্র ৮।৯ মাসের মধ্যে 'এস্‌ক্যাপস্‌'-এর পারিশ্রমিক হলো ১ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা, যার মধ্যে এঁদের নীট লাভ হলো ১ লক্ষ ২ হাজার টাকা।

ইতিমধ্যে এক পরিচিত ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের সৌজন্যে এসক্যাপস-এর নতুন অফিস বসেছিল তাঁর অফিসের এক কোণে একটি ছোট টেবিলে। এই ভদ্রলোক ছাড়াও সুধীরবাবুদের ধন্যবাদার্হ আরও এক হিতৈষীর কথা আগেই উল্লেখ করা উচিত ছিল। তিনি হলেন শ্রীকৃষ্ণলাল শর্মা নামে এক মারোয়াড়ী ভদ্রলোক। ইনি এক জুট মিলের কর্মচারী ছিলেন। এঁদের সঙ্গে তাঁর পূর্বপরিচয় ছিল। তিনি নাকি এস্‌ক্যাপস্‌-এর জন্মের আগে প্রায়ই অজিত মিত্র পার্কের বৈঠকে যোগ দিতেন, আর মাঝে মাঝে যখন পঞ্চপাণ্ডবের মন নিরাশায় ভেঙে পড়বার মতো হতো তখন মোহনলাল নাকি শ্রীকৃষ্ণের গীতোপদেশের মতো এঁদের স্বাধীন ব্যবসা করার পবিত্র কল্পনাতে লেগে থাকতেই উৎসাহ দিতেন। এই উদার হৃদয় ভদ্রলোক শুধু মৌখিক উৎসাহই নয়, কাজলবাবুদের সাধ্যমতো সামান্য আর্থিক সহায়তাও দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সাহায্য এঁদের নিতে হয়নি। পার্কের মন্ত্রণাসভার এঁদের এক সতীর্থও মাঝে মাঝে যোগ দিতেন। তাঁর নাম মুকুল ঘোষ। তাঁর কথা পরে বলছি।

প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শে ১৯৬৫ সালে পঞ্চপাণ্ডবের দ্রৌপদী 'এস্‌ক্যাপস্‌' প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত হলো। নতুন নাম হলো ESKAPS (INDIA) PRIVATE LTD; অর্থাৎ এবারে বৃক্ষের রোপণ হলো।

সেই বৃক্ষের কাণ্ড দিন দিন পুষ্ট হয়ে উঠছে। এস্‌ক্যাপস্‌-এর কাজ বেড়ে চলেছে। অজিত মিত্র পার্কের মুক্তাঙ্গন অফিস আজ উঠে এসেছে বনেদী পার্ক স্ট্রীট পাড়ার চৌরঙ্গীর মোড়ে। তেতলার ওপরে সেই বৃহৎ সুসজ্জিত অফিসে বসে ১৯৬৭ সালে এস্‌ক্যাপস্‌-এর কর্তারা ১০ই লক্ষ টাকার কাজ করে প্রায় ৪ই লক্ষ টাকা লাভ করেছেন। এ অফিসে কাজ করেন প্রায় ৫০ জন কর্মী; দুতিনজন ড্রাইভার (এঁদের ৫।৬টি মোটরকার এখন সারা দিন নানা কাজে ছুটে বেড়ায়) আর পিওন ছাড়া বাকী সকলেই শিক্ষিত বাঙালী।

পার্ক লেনে এস্‌ক্যাপস্‌-এর বেশ বড়ো একটি ল্যাবরেটারি স্থাপিত হয়েছে। এঁদের প্রধান পণ্য কাঁচাপাট ও পাটজাত দ্রব্য ছাড়াও চিনি, খনিজ পদার্থ প্রভৃতি অন্যান্য পণ্য এবং খাদ্যদ্রব্যের সমীক্ষাও এখন করা হয়। সেইসব পণ্য এবং রপ্তানির পাটের অগ্নিপরীক্ষা এই ল্যাবরেটারিতেই হয়ে থাকে।

রুশ প্রতিনিধির আস্থা দেখে পূর্ব ইওরোপের অধিকাংশ দেশই এখন 'এস্‌ক্যাপস্‌'-কে দিয়ে তাঁদের ভারতে কেনা পাটের জিনিসের সার্ভে করাতে আরম্ভ করেছেন। তার ফলে ১৯৬৫ সালে 'এস্‌ক্যাপস্‌' যেখানে ১২৯৫১৮ টন কাঁচাপাট ও পাটজ পণ্যের সমীক্ষা করেছিলেন, সেখানে তাঁরা ১৯৬৭ সালে করেছেন ২০৮৮৭৮ টন। এই সমস্ত মালই

টোকিওর চিঠি

বসন্ত-উৎসব; প্রকৃতির রঙ্ জড়ানোর সংগে সংগে ডেকে ওঠে কত না নাম না জানা পাখির দল। তারি সংগে সুর মেলায় 'নাইটিংগেল'।

'নাইটিংগেল তুমি গাইবে না? তাহলে তোমার মৃত্যু আমার হাতে' —ওদা (Oda)

'নাইটিংগেল, তুমি গাইবে না? তোমায় গাইতে বাধ্য করব।' —হিদেওসি

'নাইটিংগেল, তুমি গাইবে না? আমি চেয়ে রইলাম তোমার গানের অপেক্ষায়।'

—ইয়েয়াসু

সেই পুরনো দিনের জাপান। সেদিন অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ আর অশ্বের হ্রেস্বা-রবে দিগ্বলয় চমকিত হতো। রুধিররঞ্জিত তরবারি শত্রুর বক্ষস্থলে আমূলে বিদ্ধ হয়ে আপসে ঝলকে উঠত। প্রতিপক্ষের নিষ্ঠুর হত্যায় বীর স্বীকৃতি পেত সমাজে। এ এক বিরামহীন ইতিহাস পৃথিবীর পাতায়! সেই ফল্গুধারা আজও বয়ে চলেছে নানা রূপে নানা ধারায় পৃথিবীর সব রকম সমাজ ব্যবস্থায়।

জাপানের সেই পুরনো-দিনের তিন মহান যোদ্ধা ওদানিবুনাগা, হিদেইওসি আর ইয়েয়াসু তকুগাওয়া নাইটিংগেল পাখির মিষ্টি সুরের ডাক। তিন বীর তিন প্রথায় তাকে আহ্বান করেছে। ভিন্ন ভিন্ন চারিত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে একের আহ্বানে, ভিন্ন ভিন্ন মানসিক অভিব্যক্তির পরিচয়ে।

সকলের মাঝে আজকের শান্তিকামী চিন্তাশীল মানুষের দল যাঁর অভিব্যক্তিতে সব থেকে বেশী আস্থা স্থাপন করতে পারে সেই মানুষ ইয়েয়াসু তকুগাওয়া।

জাপানের Aichi Prefective. Prefective বলতে ঠিক্ জেলা বা প্রদেশ কোনটাই বিশেষভাবে ধরা যায় না, বোধ হয় এই দুইয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছু। এই Aichi Prefective এর তৎকালীন রাজন্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ওকাজাকি দুর্গে জন্ম-গ্রহণ করেন ইয়েয়াসু তকুগাওয়া। দিনটা ১৫৪২ সালের ২৬ ডিসেম্বর। ১৬০০ খৃঃ-এ জাপানের বিখ্যাত সেকি-গাহারার যুদ্ধে তৎকালীন এদো (Tokyo)র শাসনকর্তাকে পরাজিত করে তিনিই জাপানের সর্বময় কর্তা হয়ে পড়েন। সেই সময় টোকিওকে 'এদো' বলা হতো। ইয়েয়াসু তকুগাওয়ার সেই দিনের বাণী আজও জাপানের চিন্তাশীল সুধী সমাজের মনে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রেখেছে। সেই কবে কোন দিনে তিনি সকলের উদ্দেশ্যে যা বলেছিলেন, সর্বযুগে, সর্ব সমাজে পৃথিবীর সমস্ত সুস্থ মানুষের প্রতি আজও তা প্রযোজ্য। তিনি বলে-ছিলেন,—"মানুষের জীবন যেন এক বিরাট পথ পাড়ি জমাতে বদ্ধপরিকর। তার সৃষ্টির আদিতেই সম্মুখে এক অসীম দিক্‌হারা পথের জিজ্ঞাসা। বিপুল বোঝা অবশ্যই দেহে ক্লান্তি আনে। তবুও তাড়ার আর তাগাদার কোন প্রয়োজন নেই। যা হবার ছিল, যা হওয়া উচিত ছিল, নাইবা হল সেসব কিছু। তার জন্য বিমর্ষ হবার কোন কারণ যেন না ঘটে। আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে সব সময় দুর্ভাবনার কথাটাও ভেবে রাখতে হবে। ধৈর্য এবং স্থিরতা, সেই সংগে অপার শান্তি জীবনকে মহিমা-মণ্ডিত করতে পারে। ক্রোধই তোমার সব-থেকে বড় শত্রু। সে জীবন মূল্যহীন যা জানল শুধু 'জয়'। পরাজয়কেও জানতে হবে। তবেই আসবে জীবনের স্বয়ং-সম্পূর্ণতা। পরের ছিদ্র অনুসন্ধানের আগে নিজের দোষ ত্রুটিকে যাচাই করে নেবে। জীবনে বেশী পাওয়ার চাইতে কিন্তু কম পাওয়া অনেক বেশী সুখকর।"

তকুগাওয়ার অনেক কথা এবং চিন্তাধারা অনেক সময় ভারতীয় সাধকদের বাণীকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

বসন্ত উৎসবের কথা বলতে গিয়ে দেখছি ইতিহাস চলে এল। তাহলে বলি, এই সেদিন গিয়েছিলাম নিক্কো। এই সেদিন কেন, আমি সুযোগ পেলেই নিক্কো ছুটি। বলতে গেলে টোকিওর টুঁটি টেপা পরিবেশ থেকে কিছুক্ষণ পালিয়ে বাঁচি। তবে সাময়িক। খাঁচার পাখি আবার খাঁচাতেই ফিরে আসি।

এদেশের লোকেরা বলে জাপানে নিক্কো না দেখলে 'কেক্কো' (ভাল) হল না। মনে জাপানে যদি নিক্কোই না দেখলে তাহলে তোমার জাপান দেখা অসম্পূর্ণ থেকে গেল।

ধরুন যদি কলকাতার খুব কাছে, এই এক দেড় ঘণ্টার গাড়িতে চেপে বসলেই একটা ছোট মাপের দার্জিলিং পাওয়া যেত। যদি সেখানে থাকত ইতিহাস জড়ান একটা রাজমহল আর একটা চিল্কা হ্রদ। গাড়ি আছে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। লোকের গিজ্‌গিজানিও সীমায়িত। সকালে রওনা হয়ে, বেশ দিব্যি

সৌন্দর্যের মূর্তপ্রতীক। তোশ্‌গু সমাধি-মন্দিরের দ্বার-দেশ

সমাধি-মন্দিরের দ্বারদেশে দ্বারী মূর্তি

লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলে সিংহ। আগে পাশে ছোটর দল বড়দের গা-ঘেঁষে ভয় আনন্দ আর উত্তেজনায় মশগুল

হাওয়া খেয়ে সন্ধ্যায় ঘুরে আসা যেত। এই দেড় ঘণ্টা পার করলেই খুব গরম কাল ছাড়া ঝির ঝির করে বরফ গায়ে মাথায় ঝরে পড়ত—না ভাবা যায় না। ভাবব কি করে? শ্যামবাজার থেকে যদি মনে করলাম লেকের হাওয়া খাব তাহলে? অতএব অত সুখ নাই বা ভাবলাম। কিন্তু গিজগিজে শহর টোকিও এগারো মিলিয়ন লোক বুকে করেও সেই সুখের ভাগী। আমি হিংসুক তাই হিংসা করি।

টোকিও থেকে ট্রেন ছুটেছে নিক্কোর দিকে। ছোট ছোট টিলা পার হয়ে, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, আঁধার করা গুহা পার হয়ে, দু'পাশের সাজান বনবিথীকে পাশে রেখে ছুটেছে সেই ট্রেন। পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে এই ঘণ্টা দেড়েক পার হয়ে যায় কিছুই খেয়াল থাকে না। ট্রেন ছাড়তেই দু-একটা জাপানী মেয়ের গোলগোল নিটোল হাত আপনার আসনের সামনে ট্রের উপর এক একটা ছোট্ট মেনু রেখে চলে যাবে। অলস মেজাজে চোখ বুলিয়ে রাখুন। একটু পরেই সেই মেয়ে এসে আপনার পছন্দমত খাবারের নাম লিখে নিয়ে যাবে। তার পরেই রসনা তৃপ্তির মাল-মশলা হাজির। এছাড়া আপনা থেকে খুলছে বন্ধ হচ্ছে দরজা। চারদিক ঝক্ ঝক্ করছে। সব মিলিয়ে জাপানের বেসরকারী রেল প্রতিষ্ঠান 'টোবু'কে ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যায় না। সব কিছুর মাঝে আপনার যতটা সম্ভব কষ্ট লাঘব করতে সদা সচেষ্ট। এমনকি সময়টা যাতে করে বেশ ভালভাবে কাটে তার জন্য বেছে বেছে যে রাস্তার চার-পাশ বেশ দৃশ্য-বহুল তার মাঝ দিয়েই পাতা হয়েছে রেল লাইন। এছাড়া সরকারী রেলগাড়ি আছে। কিছুটা গেরস্থ-পোশাক—জাপানের তুলনায়। ভাড়া একটু কম।

এই হচ্ছে—নিক্কো। ছোট্ট শহর পাহাড় দিয়ে ঘেরা। টোকিও ছেড়ে দেড় ঘণ্টা এলেই শহুরে ছাপটা হারিয়ে যাবে। টোকিওর যান্ত্রিক জীবন থেকে আমি যে কতবার একা একা এই ছোট্ট শহরটাতে পালিয়ে বেঁচেছি তার ইয়ত্তা নেই। কোন ছুটিছাটায় সময় পেলেই আমি ছুটি নিক্কো। অনেককে সংগী করে নিয়ে গেছি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে ঐতিহাসিক রূপ মেশান এই শহরে।

স্মৃতি-মন্দির তশুগু শ্রাইন (Toshugu Shrine)। একে ঘিরেই বসন্ত উৎসব অতুল সৌন্দর্যের বাস্তব প্রকাশই এই স্মৃতি রূপায়ণের প্রধান উদ্দেশ্য।

ষোল বৎসর দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসন কার্য চালনার পর ১৬১৬ সালের ১৭ এপ্রিল ইয়েয়াসু তকুগাওয়ার মৃত্যু হয়। তার মরদেহের ভস্মাবশেষ সর্বপ্রথম কবরিত হয় Shizuoka Prefective-এর Mt. Kuho-তে। পরবর্তী ১৬১৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তাঁরই ইচ্ছানুসারে সেই ভস্মাবশেষ বিরাট সমারোহে বহন করে আনা হয় নিক্কোতে।

তোশোগু সমাধি-মন্দিরের এই বসন্ত উৎসব বা Senin Gyoretsu (হাজার মানুষের মিছিল)র প্রধান উদ্দেশ্য, জাপানের তিন মহা বীর যোদ্ধা এবং নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। প্রথম জন ইয়েয়াসু তোকুগাওয়া, যিনি তকুগাওয়া বংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। দ্বিতীয় জন হিদেইওশি তোয়োতোমি জাপানের তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ বীর যোদ্ধা, সেনাপতি। তৃতীয় ব্যক্তি Yoritomo Minamoto, কামাকুরা বংশের যিনি প্রথম ধারক।

এই Senin Gyoretsu বা হাজার মানুষের মিছিল প্রতি বৎসর ঠিক একই জমকালো সাজসজ্জায় ভূষিত হয়ে সমাপন হয়, যেমনটি হয়েছিল সেই ১৬১৭ সালে, ইয়েয়াসুর ভস্মাবশেষ যেবার প্রথম বহন করে আনা হয়েছিল।

তোশুগো সমাধিমন্দিরের স্থাপত্য কীর্তির উদ্দেশ্য অনেকটা আমাদের দেশের তাজমহলের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ধারায়। এই দুই সৌন্দর্যের সৃষ্টিও প্রায় সমকালীন। শুধু সময়ই নয়, খরচ-খরচা এবং শিল্পীদের মহিমাময় কীর্তির দিক থেকেও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য প্রায় সমকক্ষ। যদিও তোশুগো সমাধিমন্দির জাপানের বাইরে তাজের মত অমন পৃথিবী-জোড়া খ্যাতি বহন করে না বা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি বলেও স্বীকৃতি লাভ করেনি। তাজের নির্মাণ কার্য শুরু হয় ১৬৩২ সালে এবং শেষ হয় ১৬৫৫ সালে। তোশুগো শুরু হয় ১৬২৩ সালে এবং শেষ হয় ১৬৩৬ সালে।

তোশুগোর সব থেকে বড় আকর্ষণ তার পারিপার্শ্বিক দিকহারা বিস্তার। চারদিক ঘুরতে ঘুরতে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয় প্রকৃতির অতুল সৌন্দর্যের মহিমায়। মনে হয় এই স্থাপত্যকীর্তিকে ছাড়িয়েও কি যেন এক বিপুল বিস্তার ধ্যানে মগ্ন। যে দিকে তাকানো যায় বড় বড় মহীরুহ আপন বিস্তারে ধ্যান-গম্ভীর মূর্তির মাঝে আপন-ভোলা। এই বুঝি স্থাপত্যের প্রাচীন উপদেষ্টা Sir George Sansom এর অত্যধিক জাঁকজমক, কারুকার্যের সূক্ষ্মতা এবং বিভিন্ন রঙের বাহারের প্রশংসা করেও বলেছেন যে, সব কিছু এত বেশী বলেই সৌন্দর্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতার পরিপ্রেক্ষিতে মনকে তেমনভাবে সাড়া দেয় না। শুধু চারদিকের অতুল সৌন্দর্য আর এই আকাশ-ছোঁয়া মহীরুহের অলস সঞ্চালনই এই মন্দিরকে সৌন্দর্যের বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করেছে।

একই কারণে ইয়েয়াসু তকুগাওয়া (১৫৪২-১৬১৬), যিনি তকুগাওয়া বংশের প্রথম স্রষ্টা আর যে তোকুগাওয়া বংশ জাপানকে প্রত্যক্ষভাবে ১৬০০ থেকে ১৮৬৮ পর্যন্ত চালিত করেছিল, মৃত্যুর পূর্বে তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য বেছে নিয়েছিলেন এই নিক্কো। প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে শিল্পী মানুষের স্থাপত্য মিলে যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি তাকে যেন কখনও কেউ এতটুকু ম্লান না করতে পারে।

Senin Gyoretsuকে দেখে আমার মনে পড়ল নবদ্বীপের রাসের কথা। সেই রাস্তার দুপাশে গায়ে-গা মিলিয়ে মানুষের ভিড়। একই মিছিল তারা প্রতি বৎসর নূতন করে দেখছে। মাঝে মাঝে বেশ কিছু বিদেশীর মুখও চোখে পড়ে। কারণ জাপানের এই ধরনের মেলা বা পুরনো সংস্কৃতি এমনভাবে সারা দেশে প্রচার করা হয় যে, বিদেশী পর্যটকরা এ সবের প্রতি

আকর্ষণ [illegible] প্রত্যেক হোটেল এবং রেল-স্টেশনের সর্বত্র এই ধরনের প্রচারপত্র ছড়ান। এতে এ দেশে কিছু বিদেশী মুদ্রাও ঘরে এল, নিজেদের শিল্প-সংস্কৃতিও তুলে ধরা হল। মনে পড়ে মাহেশের রথ, কৃষ্ণনগরের বার-দোল, চন্দননগরের কার্তিক পুজো, নবদ্বীপ-শান্তিপুরে-কুচবিহারের রাস। কোনটাই এই সব পালা-পার্বণের চেয়ে কমতি নয়। এ ছাড়া আমার না জানা কত না মেলা অনুষ্ঠানে বাংলা দেশ ভরপুর। কিন্তু কোথাও এই ধরনের উৎসাহ বা প্রচারপর্ব আছে বলে মনে হয় না। ভবিষ্যতে এদিকটা ভেবে দেখলে লাভবান হওয়া যেতে পারে।

নিক্কোর বাইরে যে যেখানে আছে তারা এই দিনটাতে দেশে এসে জড়ো হয়। মিছিল এলে রাস্তার পাশ থেকে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের গলা শোনা যায়। কেউ ডাকে 'বাবা', কেউ বা দেখায় 'ওই যে দাদা'। সাজগোজ করা নূতন কিমোনো-পরা বউ গভীর কালো চোখে হয়ত ওই চিত্রের মাঝেই সকলের অজান্তে কারোর সংগে দৃষ্টি বিনিময় করে নিল। কেউ সেজেছে যোদ্ধা, কেউ নিয়েছে তীর-ধনুক, কেউ নিয়েছে ঢালতলোয়ার, কারো হাতে বর্শা। সাজেরই না কত ঘটা। তার মাঝে সেনাপতি চলেছে ঘোড়ায় চড়ে, পাশে পাশে ছত্রধারী চলেছে সেই পুরনো কায়দায়। সবশেষে একদল চলেছে সিংহের মুখোশ পরে নাচতে নাচতে। ছোটরা হাসছে হাততালি দিচ্ছে। মুখোশ দেখে অবশ্য বোঝবার উপায় নেই বাঘ কি সিংহ। জাপানে পুরনো দিনের এমন অনেক ছবি দেখা যায় যাতে আঁকা আছে হাতি, বাঘ, সিংহ কিন্তু সবই বিকৃত। কারণ সেই সময়ের চিত্রকরেরা এই সব জীবজন্তু প্রত্যক্ষভাবে কোনদিন দেখেনি। শুধু এই সব প্রাণীদের বর্ণনা কোন বই থেকে পেয়েছে, তারপর বর্ণনা অনুযায়ী নিজেদের চিন্তাশক্তি মিলিয়ে চিত্ররূপে দেবার চেষ্টা করেছিল। সেই কারণেই মুখাবয়ব এবং দেহের এই বিকৃতি।

১৭ মে ঠিক সকাল ১০টায় তোশগো সমাধি মন্দির থেকে বার হয় এই মিছিল। সংগে থাকে তিন বীর তকুগাওয়া, হিদেইওসি, মিনামতোর স্মৃতির ধারক তিন ছোট ছোট Shrine অনেকটা আমাদের মহরম-এর তাজিয়ার মতন। এক একটি শ্রাইনকে বয়ে নিয়ে যায় পঁচাত্তর জন সাদা পোশাকের মানুষ। এরা প্রথম যায় "ফুডারসন" সমাধি-মন্দিরে। সেখানে সকলে সেদিন রাত কাটিয়ে দেয়। তারপর দিন ১৮ মে সকালে আবার সেই হাজার মানুষ ঝলমলে পোশাক পরে চলে "ওটাবিস্" (সারা দিন কাটান যায় এমন বড় ঘর)। সেখানে প্রচুর খাদ্যসম্ভার, শিনটো নাচ আর নানা রকম আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে তারা তাদের সম্মান প্রদর্শন করে সেই পূর্ব-

সাজ আর ঘটা। হাজার মানুষের মিছিল চলেছে এগিয়ে। দু' পাশে হাজার মানুষের চোখে কৌতূহল আর বিস্ময়

পুরুষদের উদ্দেশ্যে। এই সবের শেষে আবার দলবেঁধে ফিরে যায় তোশগো সমাধি-মন্দিরে। সেখানে এনেন-নো-মাই প্রদর্শনী বা নৃত্যের মাধ্যমে বৌদ্ধযাজক তাদের অন্তরের ভক্তি উজাড় করে দেয়।

এর পর সেই পুরনো দিনের লক্ষ্য-ভেদ প্রথা। অশ্বের পিঠে করে ছুটে আসে লক্ষ্যভেদকারী আর লাগাম ছাড়া হাতে তীর দিয়ে দূরের লক্ষ্যকে বিদ্ধ করে আজকের বীর। এমন করে শেষ হয় নিক্কোর বসন্ত-উৎসব।

তোশগো মন্দিরের প্রধান আকর্ষণীয় বস্তু Hidari- Jingoro (বাঁইয়া জিঙ্গোরো)র স্থাপত্য কীর্তি। জিঙ্গোরো পুরনো দিনের পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্য শিল্পীদের একজন। এখানে 'জিঙ্গোরো' সম্বন্ধে অনেক গল্পগাথা প্রচলিত। কোন এক সময় জিঙ্গোরো একটা ঘোড়ার মূর্তি তৈরি করে। সেটা এতই সুন্দর ছিল যে, অনেকেই জীবন্ত মনে করে ভুল করত। প্রবাদ আছে যে, মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ত রাত্রে নাকি ঘোড়াটা প্রাণ পেয়ে দূরে দূরে চরাই করতে যেত। কোন এক সময় কোন এক রাজার অনুরোধে 'জিঙ্গোরো' সেই রাজার মেয়ের একটা মূর্তি তৈরি করে। কোন এক বিপন্ন অবস্থায় শত্রু-পক্ষ সেই রাজার অতি আদরের কন্যার মস্তক—ভেট্ হিসাবে দাবি করে বসে। রাজা পড়লেন মহা বিপদে। তখন 'জিঙ্গোরো' রাতের অন্ধকারে তাঁর সেই তৈরি মূর্তিটির মস্তক-খণ্ডন করে এক ভৃত্যের হাতে ভেট পাঠালেন সেই শত্রুপক্ষের কাছে। তারা তো সেই মূর্তির খণ্ডিত মস্তককে সত্যই ভেবে খুব খুশী। এদিকে যে ভৃত্যটি সেই মস্তকটা বহন করেছিল সেও ভুল বুঝে বসল। সে ভাবল, জিঙ্গোরো বুঝিবা সত্যই তার প্রভুকন্যার মাথাটা কেটে ফেলেছে। সে রাগের মাথায় ফিরে এসে জিঙ্গোরোর ডান হাতটা তলোয়ারের এক কোপে কেটে ফেলল। সেই থেকে জিঙ্গোরো হয়ে গেল বাঁ-হাত সর্বস্ব জিঙ্গোরো।

তোশগো মন্দিরের স্থাপত্যশিল্পের মধ্যে সব থেকে যা বিদেশীদের কাছে আকর্ষণীয় তা হচ্ছে তিন বানরের মূর্তি। যাদের একজন কানে হাত দিয়েছে—কু-শুনবে না, একজন চোখে হাত দিয়েছে—কু-দেখবে না, একজন মুখে হাত দিয়েছে—কু-বলবে না। যদিও এগুলো খুব সাধারণ শিল্পীর দ্বারাই তৈরি। তবে জিঙ্গোরোর তৈরি

"ঘুমন্ত বিড়াল" এখানে খুবই প্রসিদ্ধ। দেখলে মনে হয় সত্যই ঘুমিয়ে আছে। এমন প্রাণবন্ত কাঠের মূর্তি সত্যই বিরল। আপনাকে এইখানে এনে গাইড বেশ একটু রসিকতা করবে—"এই দেখছেন ঘুমন্ত বিড়াল। দিনে ঘুমুচ্ছে। রাত্রে সে কিন্তু পাহারাদার। আর সেই কারণেই এখানে কোন ইঁদুর দেখতে পাবেন না...।" তোশুগো ছাড়াও এর চার পাশে পাবেন নূতন ও পুরনো অনেকগুলো মন্দির। দেখতে দেখতে মনে হবে জাপানের কোন পুরনো দিনে হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে। ঐতিহাসিক তত্ত্বকে একপাশে রেখে এবারে চোখ ফেরান যাক্ সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে যে নিক্কো ডাকছে সকলকে।

সর্বপ্রথম যে দিকে চোখ পড়ে তা হচ্ছে "কেগন জলপ্রপাত"। কোন অন্ধকার গহ্বর থেকে বারিধারা বার হয়ে এসে হঠাৎ লাফিয়ে পড়ছে পাতাল-প্রমাণ অতলে। দার্জিলিং-এর ভিক্টোরিয়া ফলসকে ভেবে যেন না বসেন আবার।

আজকের নূতন জাপানে বিবাহের পর মধুচন্দ্রিমা যাপন এক প্রধান অংগ। আমেরিকাতে যেমন আছে নাইগারা, যেখানে ছুটে চলে লক্ষ লক্ষ নবদম্পতি বিবাহের প্রথম দিনগুলোকে আরও মধুময় করতে, তেমনই জাপানের নবদম্পতির অনেকেই ছুটে আসে এরই চারপাশে।

আজকে যদিও 'কেগন জলধারা দর্শনীয় বস্তু হিসাবেই লোকের কাছে সমাদৃত, তবুও কোন একদিন এরই দিকে ছুটে আসত কত নাম-না-জানা যুবক-যুবতী নিজেকে আহুতি দেবার আশায়। বুকভরা ব্যথা নিয়ে কতজনই না নিজেকে এর কোলে আহুতি দিয়েছে, যাদের হাহাকার আজও এখানকার আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে আছে। প্রেমের ব্যর্থতা সকল-কালে সকল সমাজেই এক। আর তাকে কেন্দ্র করেই এই জীবন আহুতি। এ বিষয়ে সকলের পুরোভাগে রয়েছে ওসিমা দ্বীপের 'মিহারা' জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। আজও কোন কোন পড়ন্ত বেলায় বা আলোফোটা ভোরে এর শীর্ষদেশে দেখা যায় কোন এক হতভাগ্যের ফেলে যাওয়া পাদুকা যুগল। কে জানে কোন না-বলা ব্যথা তাকে টেনে নিয়ে গেল এই মৃত্যু-গহ্বরে, তারপর সে হারিয়ে গেল এই পৃথিবী থেকে। আর এই মিহারা পাহাড়ের পরেই সে বুক ফুলিয়ে নিজের আধিপত্য বা আভিজাত্যের বড়াই করছে সে এই "কেগন জলপ্রপাত". ১৯৩০ সালের আগে পর্যন্তও এই আত্মবলিদান-প্রথা এতই সাধারণ ছিল যে, মৃত্যুর কারণ বা ঘটা খুব একটা জাঁক-জমকপূর্ণ না হলে বড় একটা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত না বা খবরের কাগজেও ছাপা হত না। এই প্রথার জাপানে একটা নিজস্ব নাম আছে—"সিঞ্জু"। এমনও এক সময় গেছে, এই ধরনের যুবক-যুবতী জোড় বেঁধে আত্মাহুতির আগে, বিবাহ বা মধুচন্দ্রিমার মতন ঘটা করে ছাপিয়ে আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব সকলকে জানান দিয়ে যেত। আজকাল পাশ্চাত্যের মতন এখানেও মধুচন্দ্রিমা যাপন বিবাহের এক জাঁকজমক-পূর্ণ আবশ্যিক অঙ্গ; তেমনই সেই সব দিনেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 'সিঞ্জু'রও কম জাঁকজমক ছিল না। দুই শতাব্দী আগে 'গেনরকু' (Genroku)র সময় এই প্রথা লোকসমাজে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে। শুধু তাই নয় সমকালীন বিখ্যাত লেখকদের গল্প বা উপন্যাসেও এই 'সিঞ্জু' প্রথায় জীবন-উৎসর্গকে ব্যর্থ প্রেমের স্বর্গীয় স্বীকৃতি হিসাবেই বিবেচিত হত। এমনকি আজও ছায়াছবি বা নাটকে এই ধরনের সিঞ্জুর মাধ্যমে বিয়োগান্তক-পরিসমাপ্তি এক বিরাট সার্থকতা! অনেকের ধারণা, কেগন-জলধারা উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরণকে ডেকে আনলে, তার সেই মর-দেহও ওই সমস্ত মহান বীর নেতাদের মতই সমাধিমন্দিরের বুকে স্থান পাবে।

আর আছে লেচ্ চুজেঞ্জিতে (Chujenji)। বিশাল এই জলধারা। কোনো এক সময়ের জীবন্ত আগ্নেয়গিরি, যা বিভীষিকার তাণ্ডব লীলারই ধারক ছিল, তারই মুখ-গহ্বরে আজ হয়ত সহস্র সহস্র বৎসর পর নীল সলিল। সমতল থেকে কত না আঁকাবাঁকা পথ পার হয়ে গিয়েছে Chujenji পদতলে। এমন মানুষ নেই যে নিক্কো এসে ছুটেছে না Chujenjiর বিস্তীর্ণ বিশালতায় দু দণ্ড প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে। এত উপরে যে এত বিশাল এক জলাধার থাকতে পারে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এরই চার পাশ ঘিরে চাক বেঁধেছে হোটেল আর সরাইখানা, তারই মাঝে গুঞ্জনরত কত না কপোত-কপোতী।

বিকাশ বিশ্বাস

শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন—।
ভারতের অভিজ্ঞতা

প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা এবং উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই কলেজগুলিতে ভর্তির জন্য ভিড় শুরু হয়েছে। যারা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ তারা ভাগ্যবান কেননা, কলেজে ভর্তি হতে তাদের কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। কিন্তু যে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় পাস করেছে তারা কি কলেজে পড়া থেকে বঞ্চিত হবে? আজ এই প্রশ্নটিই সবার কাছে বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে।

অনুন্নত দেশের উন্নত হবার যে প্রচেষ্টা তার একটি বড় মাপকাঠি শিক্ষার সম্প্রসারণ, কিন্তু শিক্ষানীতি যদি ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয় তবে তাই হয়ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিম আফ্রিকার কয়েকটি দেশ যেমন—নাইজেরিয়া, ঘানা প্রভৃতি স্বাধীনতা লাভের পর শিক্ষা খাতে যথেষ্ট বিনিয়োগ করেছে। নাইজেরিয়ার মোট বিনিয়োগের শতকরা ২৫ ভাগই শিক্ষা খাতে; ঘানায় শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ হচ্ছে মোট বিনিয়োগের শতকরা ১৭ ভাগ। ভারতে মোট বিনিয়োগের প্রায় শতকরা ১১ ভাগ হচ্ছে শিক্ষা খাতে। কিন্তু এই দেশগুলিতে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রচুর হলেও শিক্ষানীতি পরিকল্পিত উপায়ে কার্যকর হয়নি। তার ফলে এই দেশগুলিতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ভারতে যেখানে ইঞ্জিনিয়ারদের ক্ষেত্রেও বেকার সমস্যা তীব্র সেখানেই হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য ভিড় করছে—বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য দেখা যাচ্ছে অভূতপূর্ব আগ্রহ যদিও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শতকরা নব্বইজনই বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা (অন্তত অনার্স পর্যায়ে) পাবার মত নম্বর পরীক্ষায় পায়নি। তবে কি উচ্চশিক্ষার দ্বার জনসাধারণের জন্য বন্ধ থাকবে? উন্নতিকামী দেশ কখনই উচ্চশিক্ষার দ্বার রুদ্ধ রাখতে পারে না। কিন্তু শিক্ষানীতি যাতে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত না হয়, প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যাতে তা নির্ধারিত হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক ও পরিপূরক হতে পারে সে চেষ্টা সরকারের করা উচিত। প্রথমেই দেখা যাক, শিক্ষার সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক কোথায়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপাদানগুলির মধ্যে মূলধন এবং শ্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মূলধন এবং শ্রম ছাড়াও অর্থনৈতিক উন্নয়নের আরও বহু উপাদান আছে।

বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক সলো (Solow) দেখিয়েছেন ১৯০৯ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে তার শতকরা ১২½ ভাগ সম্ভব হয়েছে মূলধন এবং শ্রমের নিয়োজিত পরিমাণের দরুন এবং বাকি ৮৭½ ভাগ সম্ভব হয়েছে না-জানা অর্থাৎ অচিহ্নিত উপাদানের দরুন; এই উপাদানগুলিকে একসঙ্গে কারিগরী উন্নয়ন (Technical Progress) আখ্যা দেওয়া হয়। কারিগরী উন্নয়নের ফলে শ্রমের পরিমাণ পরিবর্তন না করলেও শ্রমিকের উৎপাদনী শক্তি বাড়ে। উৎপাদনী শক্তি বেড়ে যাবার মূল কারণ শিক্ষার সম্প্রসারণ। সে শিক্ষা সাধারণ পর্যায়ের হতে পারে, আবার কারিগরী শিক্ষাও হতে পারে। দেখা যাচ্ছে, উপযুক্ত শিক্ষা শ্রমিকের উৎপাদনী শক্তি বাড়িয়ে দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হয়।

কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে পরিকল্পনাবিহীন শিক্ষার সম্প্রসারণ হলেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম হয় না। যে হারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে অথবা আগামী দশ বছর কিংবা কুড়ি বছর কী হারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতে পারে তার একটি হিসাব করে দেখা উচিত, কী হারে আগামী দশ অথবা কুড়ি বছরের জন্য স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষিত শ্রমিকের প্রয়োজন এবং সেজন্য কোন কোন ক্ষেত্রে কী ধরনের শিক্ষার সম্প্রসারণ হওয়া উচিত ভাবতে হবে। ভারতে সেভাবে শিক্ষা-পরিকল্পনা করা হয়নি; যদি করা হত, তবে যে হারে আমাদের দেশে ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন সে হারের চেয়ে বেশী ইঞ্জিনিয়ার থাকত না, এবং যে হারে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমিক প্রয়োজন সে হারে সেই প্রকার শ্রমিক পাওয়া যেত। আজ আমরা দেখছি পাসকোর্সে উত্তীর্ণ অগণিত বিজ্ঞান-স্নাতক চাকরির আশায় ঘুরছেন, ইঞ্জিনিয়ারগণ কাজের আশায় বসে আছেন। বেকারসমস্যা একটি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। অথচ লেখাপড়া শেখার খরচ বেড়ে গেছে এত বেশী যে গরীব ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে উচ্চশিক্ষা অর্জন করা একটি আকাশ-কুসুম কল্পনা।

[illegible] অবস্থা আমাদের দেশে এখন নেই। অন্তত এখনও আমাদের দেশের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ লোক অশিক্ষিত। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, আমরা যে ধরনের শিক্ষা [illegible] উচ্চশিক্ষা [illegible] শিক্ষা প্রায় সব [illegible] উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পর অন্যান্য পাঠক্রম [illegible] প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষার সম্প্রসারণ করা হয়? অনুন্নত দেশের পক্ষে গোড়াতেই শিক্ষা সম্পর্কে কঠোর নিয়ম অনুসরণ করায় অসুবিধা আছে, তা মানি। কিন্তু সেজন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় প্রণেতাগণ শিক্ষার প্রভাবে ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধার অবস্থা কিরূপ হবে সে সম্পর্কে উদাসীন থাকবেন, সে যুক্তিও গ্রহণ করতে পারি না। যে হারে দেশের উন্নয়ন-হার এবং যে হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে সে হারেই শিক্ষিত শ্রমিকের যোগান থাকা উচিত। এখনও গ্রামাঞ্চলে উপযুক্ত কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমিকের অভাব, এখনও অনেক

গ্রামে উপযুক্ত ডাক্তারের অভাব, হাতে-কলমে কাজ জানা এমন কারিগরের প্রয়োজন এখনও অনেক কলকারখানায় আছে; অথচ এই ধরনের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক সরবরাহের প্রচেষ্টা সরকারের দিক থেকে নেই। দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে এ ধরনের কাজে ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা কখনই তুলে ধরা হয়নি, এবং সরকারের দিক থেকেও এ ধরনের কাজে লাভজনক অনুপ্রেরণা (Profitable incentive) দেওয়ার প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। বহু ছাত্রছাত্রী তো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল! অতঃ কিম্? সবাই কি কলেজে ভর্তি হতে পারবে? যদি সবাই শেষ পর্যন্ত কলেজে ভর্তি হয় তারপর তারাই যখন আবার উচ্চতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তখন কি সরকার তাদের জন্য কাজের সংস্থান করতে পারবেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। সেজন্য আজ শিক্ষানীতি নিয়ে নূতন করে ভেবে দেখার সময় এসেছে। সমস্যার সমাধান নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে যদি সমাধানে খুঁজে বের করার প্রচেষ্টায় দৃঢ়তা থাকে।

সুব্রত গুপ্ত

চিত্র প্রদর্শনী

শিল্পী গোপাল ঘোষ সম্প্রতি বিড়লা অ্যাকাডেমিতে তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। জলরঙ ও চীনা কালিতে আঁকা ৪৪টি নিদর্শন প্রদর্শনীতে দেখা যায়। গোপাল ঘোষ খ্যাতনামা শিল্পী, তাঁর সম্বন্ধে নতুন কিছুই বলার নেই। যাঁরা শিল্পীর রচনাধারা লক্ষ করেছেন তাঁরাই জানেন যে গোপাল ঘোষ মুখ্যত বাঙালী শিল্পী। বাংলা দেশের পল্লী ও পুকুর, নদী ও নদীতীর, গাছপালা ও ছোট ছোট কুঁড়েঘরের প্রতি তাঁর অসীম মমতা এবং এগুলিই রঙ ও তুলির যাদুর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত করে তিনি সুনামের অধিকারী হয়েছেন। তবে তাঁর সাম্প্রতিক রচনায় কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। লাল, নীল ও হলদে, প্রধানত যে তিনটি প্রিয় রঙ মাধ্যমে শিল্পী এত দিন বাংলা দেশের বিচিত্র রূপ ফুটিয়ে এসেছেন এবারের প্রদর্শনীতে সে তিনটি রঙের ব্যবহার কম লক্ষ করেছি। এই প্রদর্শনীর অধিকাংশ ছবিই ঋতুধর্মী, অর্থাৎ বাংলা দেশের চিরপ্রিয় ও চির-পরিচিত বর্ষার রূপই তিনি অধিকাংশ রচনার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। তাই তিনি অনেক ক্ষেত্রেই হালকা রঙের পরিবর্তে গাঢ় রঙ ব্যবহার করে বর্ষণমুখর বাংলা দেশের সজল শ্যামল রূপটুকু অনবদ্যভাবে বর্ণনা করেছেন। ন্যূনতম রেখা ও রঙ মাধ্যমে বিষয়বস্তুটুকু ফুটিয়ে তোলা গোপাল ঘোষের বৈশিষ্ট্য—যেন নব পরিণীতা পল্লী-বধূ—কথা বলে কম, যেটুকুও-বা বলে তা যেন চোখের চাহনি ও ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে। কখনও শুধুই ব্রাশের কয়েকটি রেখা কখনও বা মোটা, চওড়া ব্রাশের গোটা কয়েক আঁচড়, আবার কখনও বা গাঢ় রঙের মোটা প্রলেপের মধ্য দিয়েই তিনি বর্ষা-কালের প্রকৃত রূপটুকু ফুটিয়ে তুলেছেন। শিল্পীর কৃতিত্বের বিষয় এই যে আসন্ন বর্ষা, বর্ষণমুখর ও বর্ষণক্লান্ত বাংলা দেশের বর্ষার তিনটি রূপই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে ৫, ১১, ৩৩ ও ৪২ নং ছবির নাম করা যায়। মুষলধারে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, আকাশের বুকে ভাসমান কালো কালো মেঘস্তরের মধ্য থেকে উঁকি মারছে আলোকের রেখা আর তারই স্পর্শে ক্ষেতের জলভরা অংশগুলি যেন শত শত খোলা তলোয়ারের মত ঝকঝক করছে। বাস্তবিকই, শেষোক্ত ছবিটি যেন মনে গাঁথা হয়ে যায়। এই সঙ্গে ৪নং

গোপাল ঘোষ অঙ্কিত দৃশ্যচিত্র

ছবিরও উল্লেখ করা চলে। কেবলমাত্র চীনা কালির মাধ্যমে ও একটি চওড়া ব্রাশ বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে দোলায়মান নারিকেলপত্ররাজির মধ্য দিয়ে তিনি কাল-বৈশাখীর ঝড়ের রুদ্রলীলা বর্ণনা করেছেন। শিল্পীর পূর্বে প্রধান লাল ও হলদে রঙের প্রাধান্য অবশ্য দুটি রচনায় দেখা যায়—১৪ ও ৩৭ নং-এ। অপরাপর ছবির মধ্যে ৩১, ১৪ ও ৩২ নং উল্লেখ-যোগ্য। আশ্চর্যের বিষয়, ঘন ও লম্বমান কয়েকটি তুলিরেখা মাধ্যমে শিল্পী যে ছবিটি (১৬ নং) এঁকেছেন সেটি দেখে ক্লীর রচনা পদ্ধতির কথা মনে পড়ে, অথচ যাঁরা ছবিখানি লক্ষ করেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে, এ ক্ষেত্রে শিল্পীর অংকনরীতি একেবারেই স্বতঃস্ফূর্ত। প্রদর্শনীতে বহু-কাল পূর্বে ভারতীয় রীতিতে আঁকা তিনটি নিদর্শনও ছিল।

অ্যাফেক্‌সন —সমরেশ চৌধুরী

❋

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস্‌ গ্যালারীতে ভাস্কর সুবল সাহা ও সমরেশ চৌধুরী তাঁদের ভাস্কর্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। সুবল সাহা কলকাতা আর্ট কলেজে শিক্ষা শেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের সাংস্কৃতিক বৃত্তিলাভ করেন। বর্তমানে তিনি আর্ট কলেজে ভাস্কর্য বিভাগে শিক্ষকতা করছেন। ইতিপূর্বে তিনি কয়েকটি প্রদর্শনীতে তাঁর কাজের নমুনা পেশ করেন। এই প্রদর্শনীতে তাঁর ১৩টি নিদর্শন দেখা যায়। সমরেশ চৌধুরী কল-কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও আর্ট কলেজ থেকেও ডিপ্লোমা লাভ করেন। বর্তমানে তিনি কলা শিক্ষক হিসাবে কল-কাতার কোনও বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি অ্যাকাডেমির স্টুডিওটিরও পরিচালনা করেন। প্রদর্শনীতে তাঁর ১১টি ভাস্কর্য নিদর্শন দেখা যায়। বলা বাহুল্য, দুজন ভাস্করই অ্যাকাডেমির স্টুডিওতে আপন আপন কাজ করেন। মাধ্যম হিসাবে দুজনেই প্রধানত প্লাস্টার অব প্যারিস ও কংক্রীট ব্যবহার করেছেন, তবে সুবল সাহা উপরন্তু ব্রঞ্জ, কাঠ ও জাংকও ব্যবহার করেছেন। প্রদর্শনীটি সুবিন্যস্ত হয়েছিল।

অসাধারণ কোনও নিদর্শন চোখে না পড়লেও প্রদর্শনীটি প্রদক্ষিণ করলেই বোঝা যায় যে দুজনেই সমসাময়িক রীতি ও ধারা অনুযায়ী নানা পরীক্ষা করেছেন। তুলনা-মূলকভাবে বিচার করলে পরিকল্পনার দিক থেকে সুবল সাহার নিদর্শন প্রথমে চোখে

শ্রীচৈতন্য—অমূল্যগোপাল সেন শর্মা। জলরঙে রচিত এই ছবিখানি ১৯৪৬ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো (UNESCO) প্রদর্শনীতে স্থান পায়। চীন সরকারকে উপহার হিসাবে দেবার জন্য ভারত সরকার এই ছবিখানি ক্রয় করেন

পড়ে। মাধ্যম ব্যবহারে তিনি প্রতিভা ও বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। উদাহরণ-হিসাবে ষাঁড়-এর উল্লেখ করা চলে। গঠন-রীতি প্রশংসনীয় ও প্লাস্টারে তৈরী হলেও এটির মধ্যে ভাস্কর পুরোনো পাথরের বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। ম্যাকোয়েট জাতীয় ১নং টরসো রিয়ালিস্টিক পদ্ধতিতে গঠিত, যদিও আয়তনের দিক থেকে নিম্নাংশটুকু দুর্বল। ছোট ছোট নিদর্শনের মধ্যে পরি-কল্পনা ও সমতার জন্য মেডিটেশন ইন মিউজিক অনেকের ভাল লাগে। মাদার অ্যান্ড চাইল্ড-এর মধ্যে ভাস্কর সম-সাময়িক চিন্তাধারা ও ভারতীয় শিল্পের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। বাস্তবিক, ডিমের নিম্নাংশের আকারে গঠিত ও যামিনী রায়ের রেখাপ্রধান ছবির মত এই ভাস্কর্য নিদর্শনটির মধ্যে যেন সাবলীল কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। আয়তনিক সমতার দিক থেকে বিচার করলে বোঝা যায় যে ভাস্কর মাধ্যম ব্যবহারে সুপটু। স্টক (কাঠ) আর একটি নিদর্শন, যদিও দীর্ঘতর হলে এটি আরও সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠত। ছোট ছোট প্রতিকৃতিগুলির মধ্যে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের ছাড়া কোনটিই উল্লেখযোগ্য নয়—বিশেষ করে নেহরুর ক্ষেত্রে সাদৃশ্য দেখা যায় না।

শিল্পী অমূল্যগোপাল সেন শর্মা

গঠনরীতির দিক থেকে সমরেশ চৌধুরীর নিদর্শন দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুবল সাহা যেখানে প্রধানত মাধ্যমস্তূপে তথা পজিটিভ ফর্মের ওপর নির্ভর করেছেন, সমরেশ চৌধুরী সেখানে মাধ্যম-স্তূপ কেটে, গর্ত সৃষ্টি করে নেগেটিভ ফর্মে কাজ করেছেন। সে হিসাবে তাঁর ভাস্কর্যে আর্কিপেংকোর প্রভাব দেখা যায়। পরীক্ষামূলক হলেও কয়েকটি নিদর্শন ভাল লাগে—যেমন রিদ্‌ম্। লম্বমান, ইঙ্গিতপ্রধান এই মূর্তিটির মধ্য দিয়ে ভাস্করের সমসাময়িক গঠনপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তিনি প্রাচীন ধারাও একেবারে ভোলেন নি—যেমন, টু ফ্রেন্ডস। পোড়ামাটিতে তৈরী নিদর্শনটির মধ্যে একটি প্রাচীন, সরল অথচ বলিষ্ঠ গঠনচাতুর্যের আভাস পাই। সন্তানের সঙ্গে মাতার যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সেটি নেগেটিভ ফর্মের ওপর প্রাধান্য দিয়ে নাভির প্রতীক মাধ্যমে ভাস্কর অ্যাফেকশান-এ (১৭নং—পোড়া-মাটি) বোঝাতে চেয়েছেন। অপরাপর নিদর্শনের মধ্যে রিক্লাইনিং ফিগার, টরসো ও ফিগার ২ উল্লেখযোগ্য।

পরলোকে শিল্পী অমূল্যগোপাল সেন শর্মা

খ্যাতনামা শিল্পী অমূল্যগোপাল সেন শর্মা গত ১৯শে জুন পরলোকগমন করেন। ভারতীয় শিল্পধারাকে যে কয়জন এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন, শিল্পী অমূল্যগোপাল ছিলেন তাঁদেরই একজন। অমূল্যগোপালের জন্মস্থল চট্টগ্রাম। ছাত্রাবস্থায় সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীর সংস্পর্শে আসার জন্য সরকারের আদেশে তিনি চট্টগ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। হুগলী কলেজ থেকে স্নাতক হবার পর কিছুকাল তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। শিল্পকলা শিক্ষার জন্য তিনি ১৯৩৪ সালে তদানীন্তন সরকারী আর্ট স্কুলে ভর্তি হন ও পাঁচ বছর পরে শিক্ষা সমাপ্ত করে শিল্পরচনায় মনোযোগী হন ও অধ্যক্ষ রমেন চক্রবর্তীর কাজে সাহায্য করেন। আর্ট স্কুল কলেজে রূপান্তরিত হবার সময় থেকে শুরু করে মৃত্যুকাল পর্যন্ত অমূল্য-গোপাল কলেজের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। তিনি ছিলেন অকৃতদার এবং মানুষ হিসাবে ছিলেন নিরহংকার, ও সত্য ও ধর্মের সাধক। তাঁর শিল্পরচনার নিদর্শন হিসাবে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে একটি ও লোকসভায় রক্ষিত দুটি প্রাচীরচিত্র উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তাঁর বহু রচনা ইতিপূর্বে ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা প্রদর্শনীতে উচ্চ প্রশংসিত হয় ও পুরস্কার লাভ করে।

চিত্রপ্রিয়

আলোয় কালোয়

ত্রিশঙ্কু

বুড়োদার সিগারেটের দোকানের পাশে যে এক ফালি নীচু রক আছে, সেখানে বসে মাঝে মাঝে আমরা আড্ডা দিই। জায়গাটা একটু অন্ধকার মতন এবং তেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়। রাত্রি নটার পর বুড়োর দোকানটা বন্ধ হয়ে যায়, কখনও কখনও দোকানের দরজা বন্ধ করে মৃদু আলো জেলে হাতা-পাখা-ছাতি কাটাকুটির কাজ চলে ভেতরে—মানে আমাদের পেছনে। কিন্তু তাতে আড্ডার কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। সামনে প্রকাণ্ড চওড়া ফুটপাথ, পেরিয়ে তার চেয়েও প্রকাণ্ড চওড়া পিচের রাস্তা—বসে বসে আমরা লোকচলাচল দেখি। কিংবা দেখি না, নিজেদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি। পনেরো মিনিট পর পর বুড়োদার সাকরেদ নিতাই আমাদের খোঁজ-খবর করে যায়। দরকার হলে কাবাব-টাবাব ডিমভাজা নিয়ে আসে। আমরা বহাল তবিয়তে গল্প-গুজব করি।

উপর্যুপরি কয়েক দিন বর্ষার পর সেদিন সন্ধ্যে নাগাদ আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। উড়ুউড়ু মন নিয়ে বেরিয়েছি বাড়ি থেকে, এবং বেড়াতে বেড়াতে এক-এক করে তিনজন হাজির হয়েছি এক ফালি নীচু রকটার কাছাকাছি। দু-তিন দিন পর বহু পরিচিত পচা মুখগুলো দেখে বেশ ভালো লাগলো।

খানিক পর দেখলাম, অনেক দূরে থেকে আমাদের দিকে একটা শোভাযাত্রা আসছে। সার সার বৃত্তাকার কারবাইড আলোর মালা কাঁধে একদল লোক, তাদের পেছন পেছন পা মিলিয়ে এগোচ্ছে ব্যাগপাইপ শিঙা ও ভেঁপু বাজিয়েরা ও তাদের সহচর ঢাকী—সম্পূর্ণ ব্যান্ড-পার্টি উজ্জ্বল লাল ও হলুদ পোশাক পরে তাল মিলিয়ে হিন্দী ছবির বিখ্যাত একটা গানের সুর বাজাচ্ছে। শোভাযাত্রার মাঝখানে একটা মোটর গাড়ি—সূত্রাকার সাদা ফুলে হাঁসের মতন সেজে—খুব ধীরে চলছে, গাড়ির ভেতর রাজ পোশাক পরা পাগড়ীমাথায় কচি বর, তার মুখের সামনে ঝুমকোর মতো ফুলের ঝালর ঝুলছে। প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তায় ট্র্যাফিক-জ্যাম করে দিতে পেরেছে বলে বরের অভিব্যক্তিহীন মুখেও যেন একটু আত্ম-প্রসাদের চিহ্ন আমরা লক্ষ করলাম।

শোভাযাত্রা কাছাকাছি আসতেই নিতাই উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। আমাদের বললো, হরিরাম শেঠের বড় ছেলের বিয়ে। লাখ লাখ টাকা খরচ হচ্ছে।

লোকগুলো আর হাঁটতে পারছে না

আমাদের অতীন মশকরা করলো—তা তোমার হরিরাম শেঠ কি ছেলের বরবেশ বানাবার সময় ব্যাণ্ড-পার্টির সব মেথরদেরও নতুন কোট-প্যাণ্ট তৈরী করিয়ে দিয়েছেন?

মণীন্দ্র প্রথমে কোনো মন্তব্য করে নি। একটু পরে বললো, দেখেছিস, বিশাল ভুঁড়ি নিয়ে পেছনের লোকগুলো আর হাঁটতে পারছে না! এই সময় কেউ যদি মাঝখানে একটা বোমা ফাটায় তা হলে ওরাও বাঁচে, সরকারেরও কয়েক কোটি টাকা ডেথ-ডিউটি আদায় হয়।

অরুণ যেন বিরক্ত হল একটু। —তোদের যত অলক্ষুণে কথাবার্তা। বর বেচারা বিয়ে করতে যাচ্ছে কত শখ করে, সেজেগুজে। একটা মাত্র দিন তো। কাল থেকে আবার হয়তো শেয়ার মার্কেটের গরাদ ধরে ঝুলবে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করবে—কেয়া ভাও, কেয়া ভাও। কেন বাগড়া দিচ্ছিস?

শোভাযাত্রা ক্রমশ আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেল। নিতাই ফিরে গেল নিজের কাজে। ঘণ্টাখানেক পর আমরাও এক-এক করে গা তুললাম। বুড়োদার পয়সাকড়ি চুকিয়ে হাঁটা দিলাম শ্যামবাজার অভিমুখে।

খুব দূরে যেতে হল না। বাঁ দিকের ফুটপাথ ঘেঁষেই একটা প্রকাণ্ড বাড়ি। গাড়ি-বারান্দার নিচের স্তম্ভগুলো রঙিন কাপড় ও আলো দিয়ে ঢাকা। সারা বাড়িটা আপাদমস্তক মখমল আর নানা রঙের ইলেকট্রিক বাতি দিয়ে সাজানো। ফুটপাথের ওপর একটা রোগাপানা দেবদারু গাছের বাচ্চা—তাকেও ছাড়েনি।

অতীন বললো—বেচারা গাছটার সারা গায়ে আলো ফুটফুট করছে। হরিরাম শেঠের ছেলের বিয়েতে এর অবস্থা ব্যাণ্ড-পার্টির মেথরগুলোর চেয়েও সংগীন!

মণীন্দ্র বললো—চল না, বিয়েবাড়ির ভেতরে গিয়ে বলে আসি, গাছের আলোগুলো এক্ষুনি নিবিয়ে দাও, নইলে...

—আহা, একটা দিন তো...অরুণ তাদের বাধা দিতে চাইল। বরাবর ও একটু শান্তি-প্রিয়। রোগাপটকা চেহারা বলে খুব একটা ঝামেলায় ভিড়তে চায় না।

শেষ পর্যন্ত আমরা ভেতরে যাওয়াই স্থির করলাম। তখন রাত সাড়ে দশটা বাজে। ভিড় কমে গেছে অনেক। শেঠজীর কর্মচারীরা একটু-আধটু ছুটোছুটি করছে মাত্র। বসার ঘরটায় ফরাশ পাতা, দশ-বারোজন মোটাসোটা লোক গুলতানি করছে। ভেতরের উঠোন থেকে শোনা যাচ্ছে চাপা সানাই।

সানাই শুনলেই অরুণের মন খারাপ হয়ে যায়। বিয়ে বাড়িতে কেন যে লোকে সানাই বাজায় জানি না। এত করুণ বাজনা কোনো উৎসবে মানায় না। অবশ্য লাখ লাখ টাকা যখন খরচ হচ্ছে, তখন শেঠজীর এই সাধটাও বা কেন অপূর্ণ থাকে? কাল থেকেই তো আবার...

অতীন বললো—তা যাই বলো, আমার বিয়েতে কিন্তু সানাই বায়না করবোই।

—আর-এক পক্ষের সম্মতি নেহাতই প্রয়োজন, তাই তো তোর বিয়ে হচ্ছে না অতীন, মণীন্দ্র ঝেঁঝে উঠলো—বরং ধ বাকে বলেকয়ে আর একবার [illegible] নে, তাতে সানাই ব্যাণ্ড-পার্টি খ্যামটা-নাচ সব বায়না করিস! যত সব...এই বলে ও গটগট করে বসার ঘরটায় ঢুকে পড়লো। অন্যেরা পিছু পিছু।

ভেতরে ঢুকে মণীন্দ্র নমস্কার জানালো সবচেয়ে প্রবীণ লোকটিকে।

—নমস্তে। ঘরসুদ্ধ লোক আমাদের

মেরা ভাতিজাকা সাদী হ্যায়

আকস্মিক আবির্ভাবে একটু তটস্থ। ওরা কিছু বলার আগেই মণীন্দ্র আমাদের বসতে বললো। নিজেও বসে পড়লো ফরাশে। তারপর জিজ্ঞেস করলো—আজ কেয়া হ্যায় হিঁয়াপর শেঠজী?

শেঠজী একটু ধাতস্থ হয়েছেন ততক্ষণে। বিনীত হেসে বললেন, মেরা ভাতিজাকা সাদী হ্যায়।

—বাঃ বাঃ, বহুত আচ্ছা।—আমাদের উদ্দেশে, দেখেছিস, ঘরটাতে কেমন আতরের গন্ধ বেরোচ্ছে! জাঁকজমক দেখে সাধ মিটিয়ে নে তোরা। এই অতীন, মাথা ধরেছে বলছিলি, ইচ্ছে হয় তো, ওই তাকিয়াটাতে মাথা দিয়ে একটু গড়িয়ে নে। ঠিক সময়ে তোকে তুলে নেবো।

অতীন একটু ক্লান্তই ছিল, ঝুপ করে শুয়ে পড়লো। মণীন্দ্র শেঠজীকে জানালো, আমরা এই বিরাট জাঁকজমক ওলা বিয়েবাড়ি দেখতে এসেছি। বিনা নিমন্ত্রণে এসে পড়লাম বলে কিছু মনে করেন নি তো? আমরা ব্রাহ্মণ।—যেন ব্রাহ্মণ হলেই সাতখুন মাপ।

ছোকরা মতন একজন বলে উঠলো—বড়ো কেঁও মানেঙ্গে? ইয়ে আপনা কোঠী সমঝ লিজিয়ে। তারপর রুপোর প্লেটে একরাশ পানের খিলি এগিয়ে দিল আমাদের দিকে।

—কোনো অতিথি এলে তাদের জন্যে শরবৎ টরবৎ-এর ব্যবস্থা নেই এখানে? এত বড়ো বিয়েবাড়ি, তা ছাড়া আমাদের বেশ তেষ্টাও পেয়েছে। পান না নিয়ে মণি বলল।

অরুণ ফিসফিস করে বলতে চেষ্টা করলো—বেশী বাড়াবাড়ি করিস না, শেষকালে মেরে তাড়াবে।

তিন-চার গেলাস শরবৎ এল সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জন্যে—পেস্তা ও মালাই দেওয়া। মণীন্দ্রের হুকুমে যন্ত্রচালিতের মতো আমরা এক-একটা গেলাস তুলে নিলাম। শায়িত অতীনকে ডাকলো মণীন্দ্র—এই, একটু ওঠ, শরবতটা খেয়ে ফেল চট করে, তারপর ঘুমোবি। ভদ্রলোকেরা ভালোবেসে দিচ্ছেন, আপত্তি করিস না।

অতীন তবু উঠছে না দেখে শেঠজীর এক ছোট সংস্করণকে বললো, ইয়ে দোস্ত খালি পেটমে তরল পদার্থ নেই খাতা হ্যায়—মানে, নেহি পিতা হ্যায়। কুছ মিঠাই-উঠাই হোনেসে ও জাগেগা।

অমনি প্রবীণ লোকটির ইশারায় একজন ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে। লাল্লু, কাল্লু বলে ডাক দিল উচ্চস্বরে। লাল্লু এলে পর ওকে ওপর থেকে চার প্লেট মিষ্টি আনতে নির্দেশ দিল।

লাল্লুর হাতে মিষ্টির থালা এসে পৌঁছলে পর অতিকষ্টে অতীনকে জাগালাম আমরা। পেস্তার বরফি, কালাকান্দ তবক দেওয়া ক্ষীরের সন্দেশ অনেকগুলো করে খেলাম আমরা। মণীন্দ্র বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলো—পেট ভরেছে তো তোদের? আর কী চাই বল। শেষকালে যেন আবার শেঠজীর বদনাম করিস নি কঞ্জুস বলে! তারপর ওদের দিকে চেয়ে গর্বের সুরে জানায়—ইয়ে দোস্ত এক-সাথ পুরো বারো দর্জন মানে এক গ্রোস রসগুল্লা খা সকতা হ্যায়। দেড় সের রাবড়ি।...রাবড়ি সব খতম হো গিয়া?

আবার লাল্লুর ডাক পড়লো। ছুটোছুটি দৌড়ঝাঁপ করে লাল্লু বেচারা ওপর থেকে এক হাঁড়ি রাবড়ি নিয়ে আসে আবার। মণীন্দ্রের হুকুমে আমরা ভাগাভাগি করে সবটা শেষ করে ফেললাম। অতীন ঘুম থেকে উঠে বসেছে। কিন্তু এত বেশী খেয়ে ফেলেছে যে দাঁড়াতে পারবে বলে মনে হয় না।

অরুণ ফিশফিশ করে বললো, এবার যদি এরা লাল্লুকে ডেকে ধোলাই দিতে শুরু করে, আমরা কেউ পালাতে পারবো না। মণি, এবার চল বাবা, দোহাই।

—দাঁড়া, মিঠে পান কয়েকটা খেয়ে নিই। এমন পান জীবনে খাস নি কখনো।

যখন সবাই উঠে দাঁড়িয়েছি যাবার জন্যে, রাত প্রায় এগারোটা বাজে। মণীন্দ্র সসম্ভ্রমে শেঠজীকে ডেকে অজস্র ধন্যবাদ দিল। আমরা ব্রাহ্মণ, আশীর্বাদ করছি, আপনার ভাইপো সুখী হবে। ব্যবসাতে উন্নতি করবে। কিন্তু...আমরা যে হাঁটতে পারছি না। একটা গাড়ি যদি শ্যামবাজার অবধি পৌঁছে দেয়, কিছু মনে করবেন না।

ভদ্রলোক এবার নিজে বেরিয়ে এলেন। ড্রাইভারকে ঘুম থেকে তুলে আমাদের পৌঁছে দিতে বললেন। গাড়ি যখন স্টার্ট দিল, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন নমস্তে।

শ্যামবাজারে নেমে আমরা একটা করে সোডা খেলাম। নাঃ, অতীন বললো, অনেকদিন পর ভালোমতন খাওয়া গেল মারোয়াড়ীদের কল্যাণে। অরুণ বললো, ভাগ্যিস মারধোর করেনি, আমি তো ভয়ে সিঁটিয়ে ছিলাম। লাল্লু লোকটা কুস্তী করে নিশ্চয়।

—আমাকে ধন্যবাদ দে। মণীন্দ্র ঝেঁঝে বলে—লাখ লাখ টাকা খরচ করছে ব্যাটারা। সে তো আমাদেরই টাকা। খানিকটা উশুল করা গেল। অতীন, তুই আরো কয়েকটা কালাকান্দ খেয়ে আসতে পারতিস।

অতীন ওর স্বভাবসিদ্ধ জিভ কেটে বলে—বাব্বা, মারা যেতাম তা হলে। পেটে যদি একটু জায়গা থাকতো, একটা আরো সোডা খেতাম এখন। এতগুলো ভালো ভালো জিনিস হজম হলে হয়।

আমি বললাম, আসল কাজ কিন্তু করা হোল না। গাছটার সারা গায়ে আলো কুটকুট করবে আজ সারারাত।

ঘরে বাইরে

শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী

শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী কিছু দিন আগে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্র থেকে উপনির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। তিনি কংগ্রেসপ্রার্থী ছিলেন। আমাদের অভিনন্দনের কারণ অবশ্য রাজনৈতিক অথবা দলীয় নয়। আমরা তাঁকে অভিনন্দিত করতে চাই তিনি আমাদের একজন বলে। তিনি মহিলা বলে।

শ্রীমতী পালচৌধুরী যদিও ১৯ বছর বয়সে কংগ্রেসে যোগ দেন, তবু রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে সর্বসাধারণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় ১৯৫৩ সালের উপনির্বাচনে। তখন তিনি নদীয়া থেকে পার্লামেন্টের সভ্য হয়েছিলেন। কর্মী অবশ্য তিনি চিরকাল ছিলেন। শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত সমাজের মেয়ে, অভিজাত ঘরের বধূ হিসাবে আমরা প্রথম তাঁকে দেখেছিলাম। অমিয় পালচৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে ১৯২৮ সালে তাঁর বিবাহ হয়। নদীয়া জেলার পালচৌধুরী বংশ বাংলা দেশের সম্ভ্রান্ত বংশ এবং তাঁদের জনসেবা এবং আতিথেয়তার খ্যাতি ছিল। সেই সংসারের সার্থক গৃহিণী শ্রীমতী পালচৌধুরীর প্রথম ভূমিকা।

শ্রীমতী পালচৌধুরী সুশিক্ষিতা মহিলা। বাংলা, নেপালী, ফরাসী, ইংরাজী ও হিন্দী এই পাঁচটি ভাষা জানেন এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় গল্প ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন যথেষ্ট। শ্রীমতী নীরা চৌধুরী যখন "শ্রীমতী" নামে একটি মহিলা পত্রিকা প্রকাশ করতেন তখন শ্রীমতী পালচৌধুরীর সাহিত্যানুরাগ ও মহিলা-জীবনের নানা বিষয়ে উৎসাহ আগ্রহের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হবার সুযোগ হয়। "শ্রীমতী"র সঙ্গে সে সময় আমারও যোগ ছিল বলে তাঁর এই দিকটি আমাকে প্রভাবিত করে। কর্মী হিসাবে তাঁর আরও অনেক দিকে লক্ষ ছিল। দেশ-বিদেশে ভ্রমণ, নানা কল্যাণব্রতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে ভবিষ্যতের দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য প্রস্তুত করেছিল।

শ্রীমতী পালচৌধুরী মৃদুভাষী মানুষ। নিজের সম্বন্ধে বেশী কিছু বলতে চান না। এবারের নির্বাচনের পর দেখা হওয়াতেও বললেন, "আমি তো সেবা করেই খুশী ছিলাম। কাজও ছিল অনেক। তবু অনেকের আগ্রহে শেষ পর্যন্ত ভয়ে ভয়েই নির্বাচনে নামলাম।" ভয়, কিন্তু একা তিনি নন, অনেকেই মনে করেছিলেন কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসপ্রার্থীর জয় অসম্ভব। তাই বিজয়িনী হয়ে তিনি তাঁদের সবাইকে কিছুটা অবাক আর অনেকটাই আনন্দ দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আমার সেই প্রথম উপনির্বাচনের একটি ঘটনা বার বার মনে আসছে। একটি মহাপ্রাণ শ্রীমতী পালচৌধুরীর রাজনৈতিক জীবনে অনেক প্রেরণা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন

শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী

তাঁর দাদা ডঃ কালিদাস নাগ। প্রথম উপনির্বাচনে তাঁর উৎসাহেই শ্রীমতী পালচৌধুরী এগিয়ে এসেছিলেন মুক্ত অঙ্গনে।

বহু সরকারী, আধা-সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকে শ্রীমতী পালচৌধুরী, তাঁর কর্মবহুল জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে দেশের জনসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে তুলে ধরেছেন এবং তাঁদের অভাব-অভিযোগ পূরণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। সারা পশ্চিম বাংলার মানুষের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেছেন। কখনও জীপে হাজার হাজার মাইল ঘুরেছেন, কখনও সীমান্ত অঞ্চলে, কখনও বা দূর গ্রামাঞ্চলে নৌকোয়, গরুরগাড়িতে, এমনকি পদব্রজেও হাজির হয়েছেন সাধারণ মানুষের কুটিরের দরজায়। তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন, খবরাখবর করেছেন, সুখ-দুঃখের কত ঘরোয়া খুঁটিনাটি জানার চেষ্টা করেছেন। নিত্য ও নিয়মিত সংবাদ আদান-প্রদানসূত্রেও জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যেমন আন্তরিক তেমনি অবিচ্ছিন্ন। শ্রীমতী পালচৌধুরী তাঁদের একান্ত ঘরোয়া মানুষ, তাঁর কাছে তাঁরা সর্বদাই নিজেদের সমস্যা আর অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে অসংকোচে লেখেন। শ্রীমতী পালচৌধুরী বললেন, গড়পড়তা প্রতি মাসে তাঁকে প্রায় ৪০০টি চিঠির উত্তর দিতে হয়। সাধারণত কি ধরনের সমস্যার কথা নিয়ে লোকে তাঁর কাছে আবেদন করেন, এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী পালচৌধুরী জানালেন, সমস্যা বহু রকমের; যেমন ধরুন, চাষ-আবাদ ও জলসেচের নানা সমস্যা, বাড়িঘর জমিজমা সংক্রান্ত সমস্যা, স্কুল-কলেজ ও শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যা, রেলপথ, যানবাহন, যোগাযোগ-ব্যবস্থার সমস্যা, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত নানা সমস্যা। এ ছাড়া ব্যক্তিগত অনেক সমস্যাও আছে; যেমন, চাকরি ও বদলি, উন্নতি ইত্যাদি। শ্রীমতী পালচৌধুরী পূর্বাঞ্চলীয় রেলওয়ে কমিটিগুলিতে সভাপদে বহু বৎসর অধিষ্ঠিত আছেন। ট্রেন, রেলওয়ে স্টেশন, ট্রেনের সময়সূচী নির্ধারণ, ট্রেনে ও স্টেশনে খাদ্য পরিবেশন ইত্যাদি নানা বিষয়ে যাত্রিসাধারণের সুখ-সুবিধার অনেক ব্যবস্থাই এ পর্যন্ত তাঁর চেষ্টায় সম্ভব হয়েছে। বিশেষত, নদীয়া জেলার সুবারবন রেলপথের স্টেশনগুলির কথা এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। জনহিতকর এই সব কাজ করতে শ্রীমতী পালচৌধুরী ভালবাসেন এবং এসব সমস্যার কথা শুনে তার বিহিত করতে পারলে তিনি তৃপ্তি পান। একটি কথায় তাঁর আত্মপ্রত্যয় ফুটে উঠল। তিনি বললেন, "দেখুন, নদীয়া জেলার লোকের এমন কোনো সমস্যা নেই যা আমি জানিনে বা যা আমাকে জানানো হয় নি, আরও বলতে পারি, যা আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থিত করি নি।" জনসাধারণ যদি সত্যিই শ্রীমতী পালচৌধুরীকে তাঁদেরই একজন আপন মানুষ ভেবে তাঁদের সুখ-দুঃখের আর অভাব-অভিযোগের সব কথা মন খুলে জানিয়ে থাকেন, তা হলে শ্রীমতী পালচৌধুরীর পক্ষে সেটা কম গৌরবের কথা নয়। জনকল্যাণব্রতী একজন সমাজসেবিকার পক্ষে এর চেয়ে বড় কৃতিত্ব আর কি হতে পারে?

শ্রীমতী পালচৌধুরী নিজের কথা সহজে বলতে চান না। কিন্তু নানা জিজ্ঞাসাবাদে তাঁকে মুখ খুলতেই হল। তাঁর কাছে জানলাম, নতুন দিল্লির কালকাজীতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত বাস্তুহারা সরকারী ও বেসরকারী কর্মীদের জন্যে যে কলোনিটি

তৈরি হচ্ছে. তাকে রূপ দেবার জন্যেও তিনি অনেক পরিশ্রম করেছেন। তা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তুহারাদের নানা সমস্যা সমাধানের জন্যে শুরু থেকেই তিনি বিশেষ আগ্রহী এবং তার জন্যে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ও দণ্ডকারণ্যে বাস্তুহারাদের সাহায্য পুনর্বাসন-সংক্রান্ত অনেক সমস্যারও তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় সুরাহা হয়েছে। শ্রীমতী চৌধুরী মৃদুভাষিণী কিন্তু জোর দিয়েই বললেন "আমি বলতে পারি, পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের কোনো ব্যাপার আমি অগ্রাহ্য হতে দিই নি। যা সম্ভব হয়েছে তাই করেছি।"

১৯৬২ সালে অতর্কিত চীনা আক্রমণের সময় জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থসংগ্রহের কাজে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসেবে তিনি তাঁর কর্তব্য করেছেন। বললেন, "দেশের প্রতিরক্ষা-প্রচেষ্টায় সোনা ও অলংকার দান করার জন্যে মহিলা সমাজের কাছে আবেদনে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। তাঁদের একান্ত প্রিয় ও মূল্যবান গহনাই নয়, কেউ কেউ স্বামীদের সঞ্চয় ও সম্বলও বিনা দ্বিধায় দেশের প্রতিরক্ষায় দান করেছেন। আমার মায়ের যেসব গহনা এত দিন খুব ভালোবেসে সযত্নে রক্ষা করেছিলাম, এই সব দেখেশুনে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হল। তাই রাজভবনে গিয়ে ভাইফোঁটার দিন মায়ের আর আমার সব গহনা প্রতিরক্ষা তহবিলে দিয়ে এলাম।"

শ্রীমতী পালচৌধুরী বহু জনকল্যাণমূলক সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত আছেন। মহিলা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এঁদের নাম উল্লেখযোগ্য : অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স, কৃষ্ণনগর মহিলা সমিতি, উইমেন্স ফুড কাউন্সিল, নারী শিক্ষা সমিতি, নারী সেবা সঙ্ঘ, নারী শিল্প শিক্ষা সমিতি, সিভিল উইমেন্স চার্চ অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট বোর্ড অফ দি উইমেন্স সেভিংস ক্যাম্পেন ও ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডস। এ ছাড়া আছে ভারত সেবক সমাজ, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার, ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার, ইণ্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি এবং আরও বহু সংস্থা।

দেশের বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি যুক্ত আছেন। শিল্প, কলা, বেতার, চলচ্চিত্র, পর্যটন প্রভৃতি বহু বিভাগে নানা দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি কর্তব্য পালন করেছেন। এই প্রসঙ্গে, কিছু কাল আগে নবদ্বীপে একটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে শ্রীমতী পালচৌধুরী যেভাবে সমর্থন করেছিলেন, সে কথা মনে পড়ছে। নদীয়া বা নবদ্বীপ তাঁর নিজের জায়গা, শুধু এই যুক্তি দিয়ে নয়, এখানে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যুক্তির পিছনে অনেকখানি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কারণ আছে। শ্রীমতী পালচৌধুরীর শিক্ষিত ও কৃষ্টিসম্পন্ন মন তাকেই সমর্থন জানিয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের কাশী বা বিহারের মিথিলার মত, পঞ্চদশ শতকে নবদ্বীপ ছিল সংস্কৃত শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। পণ্ডিতদের মতে, দেড় শো বছর কি তারও আগে নবদ্বীপে সংস্কৃতে উচ্চশিক্ষার জন্যে ত্রিশটির বেশী অধ্যয়ন কেন্দ্র ছিল এবং সেখানে শত শত ছাত্র অধ্যয়ন করতেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত নবদ্বীপে স্মৃতি ও ন্যায়দর্শনের অধ্যাপনা করতেন বাসুদেব সার্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন স্মার্ত ভট্টাচার্যের মত বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন। বিদেশী শাসনে ভারতে সংস্কৃতচর্চা হ্রাস পাওয়ার কারণ যাই হোক না কেন, নবদ্বীপের মত বিদ্যাপীঠগুলিতে এই সব প্রাচীন পণ্ডিতেরা আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য আর শিক্ষার ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। নবদ্বীপে এখনও যেসব পুঁথি আছে তা যে-কোনো গ্রন্থাগারের গৌরবের বস্তু। শ্রীমতী পালচৌধুরী তাই এ ব্যাপারে নবদ্বীপের দাবিকে সমর্থন করে আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যকেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

অপরাহ্ণের স্তিমিত অথচ অদ্ভুত একটা উজ্জ্বল আলোয় শ্রীমতী পালচৌধুরীর শান্ত চোখে আর সৌম্য মুখে একটা অপূর্ব আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ দেখেছিলাম। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে কেন জানি না আমার মনে হয়েছিল, দেশের আর্ত আর বিপন্ন মানুষ ভরসা খুঁজে পাবে।

শ্রীমতী

ট্রামে বাসে

ভারতে লক্ষতম ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে যোগাযোগ ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ রামসুভগ সিং বলেন : ১৮৫০ সালে যখন প্রথম ডাকঘরের পত্তন হয় তখন তার সংখ্যা ছিল মাত্র ৬৬২। এখন প্রতি ছয়টি গ্রামে একটি করিয়া ডাকঘরের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। খুড়ো বলিলেন—"খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু দেখবেন, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে একটি পোস্ট কার্ড পৌঁছুতে যেন ছ' মাস না লাগে।"

আবর্জনা অপসারণের কাজ দেখিতে গিয়া রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর বিরক্ত হন। রাস্তার দুই পাশে বিপুল পরিমাণ পাঁক দেখিয়া পৌর কমিশনার শ্রীদুলাল মুখার্জি নাকি বিস্মিত হইয়া বলেন—এটা ভূতের কাণ্ড, কাল যেখানে পাঁক ছিল না, আজ সেখানে তা কী করে এল।—"অতঃপর রাজ্যপাল সরষের ব্যবস্থার অর্ডার দিলেন কি না সংবাদে তা বলা হয় নি—"বলে আমাদের শ্যামলাল।

একটি সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি কলিকাতার কতিপয় ছাত্র ডেপুটি মেয়র শ্রীখান্নার কামরায় প্রবেশ করিয়া একটি 'নকল' পৌরসভার অনুষ্ঠান শুরু করে, তাহাতে প্রস্তাব, প্রতিবাদ, হট্টগোল মায় হাতাহাতি পর্যন্ত চলে। এই নাটকের যবনিকাপাতের পর ছাত্ররা জঞ্জাল অপসারণের দাবিতে একটি স্মারকলিপি অর্পণ করে এবং প্রস্থান করেন। সহযাত্রী বলিলেন—"আমরা এই পৌর নাটক রূপায়ণের সংবাদে আনন্দ লাভ করিলাম। সর্বসাধারণের সুবিধের জন্য এই নাটকের দ্বিতীয় রজনী যদি খোলা মাঠে করা হয় তবে আরও ভালো হয়। "আসল" নাটকের কুশীলবদের এই "নকল" নাটকের বিচারক নির্বাচন করে এর উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচারের ভার দেবেন' চেল্লামেল্লি আর হাতাহাতিতে যাঁর অভিনয় উতরে যাবে তিনি হয়ত বিনা ভোটেই একদিন নকল থেকে আসল নাটকের কুশীলব হতে পারবেন!!"

তিরপল ছাড়া খোলা ওয়াগনে গম পাঠাইয়া এবং প্লাটফরমে ফেলিয়া রাখিয়া বৃষ্টির জলে পচাইবার অভিযোগে অনেকেই সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠিয়াছেন। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই পচানো নয়, গমকে সহজ পাচ্য করার প্রয়াস মাত্র!!"

অনেকেই প্রশ্ন করিতেছেন : নির্বাচন নবেম্বরে হবে, না ফেবরুয়ারীতে হবে। খুড়ো বলিলেন—"এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তবে যে হারে ভাগাভাগি দলাদলি চলছে তা দেখে মনে হয়, ফেবরুয়ারী কেন, আরও দু'-চার মাস দেরি হলে খেলা ভাঙার খেলা দেখার সুযোগ হয় এবং কোন্ মামা, কোন্ পুকুর পাড়ে থাকেন এবং কোন্ মামীর হাতে তখন দুধে সর পড়ে তা-ও দেখা যায়!!"

এই বৎসর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার হিউমেনেটীজ স্ট্রীমে প্রথম দশটি স্থানই মেয়েরা অধিকার করে।—"অতঃপর চিত্তাচরিত শিক্ষিতা, গৃহকর্মনিপুণা প্রভৃতি সম্বলিত ছেলের পক্ষের বিজ্ঞাপনের বদলে মেয়ের পক্ষ থেকে মার্কশীট চেয়ে বিজ্ঞাপন চালু হলে ভালো হয় এবং আরও ভালো হয়, যদি বরযাত্রীর বদলে কন্যাযাত্রিণীরা বরের বাড়ি গিয়ে বিয়ে সুসম্পন্ন করেন"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

একটি পর্বতশৃঙ্গের নামকরণ হইয়াছে "বিধান পর্বত"।—"স্বর্গত ডাঃ বি সি রায় এটাকে কনসোলেশন প্রাইজ বলে হয়ত গ্রহণ করবেন এবং মনে মনে খুশী হবেন যে, অন্তত বিধান ফুটবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয় নি"—বলে অন্য এক সহযাত্রী।

আলিপুর চিড়িয়াখানায় মেঘ দর্শনে নৃত্যরত একটি ময়ূরের ছবি (হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড) দেখিলাম।—"কিন্তু আমরা হুঁশিয়ারি করে দিচ্ছি, কর্তৃপক্ষ যেন ময়ূরটির নিরাপত্তার সর্ববিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, ময়ূরপুচ্ছের চাহিদা সর্বত্র কিনা তাই কথাটা বলে রাখলাম"—বলে শ্যামলাল।

সিগারেটের উৎপাদন নাকি বহু বহু লক্ষ কোটিরও বেশীতে গিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং দেখা যাইতেছে, সমস্ত পৃথিবী বুঝি ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ছাইয়া যাওয়ার দাখিল হইয়াছে।—"তাতে প্রতিক্রিয়া কি হবে-না-হবে তা বিচারের আগে আমাদের প্রশ্ন : বিড়ি আর গাঁজার ধোঁয়া কি এই ধূম্রজালের পরিসংখ্যানে স্থান পেয়েছে"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

রাজ্য সরকার একটি চলচ্চিত্র উৎপাদন বোর্ড সংগঠনের কথা বিবেচনা করিতেছেন। খুড়ো বলিলেন—"ভালো কথা। কিন্তু চলচ্চিত্রে ধর্মঘট বোর্ড সংগঠনের চেষ্টা কোথাও হচ্ছে কিনা সে খবর পাই নি!!"

সংবাদে শুনিলাম, সোভিয়েট রাশিয়া নাকি মার্কিনী প্রমুখ শক্তিগুলিকে পূর্ব ইউরোপে নাক গলাতে মানা করিয়াছেন।—"কিন্তু নাকের বদলে নরুন যাদের কাম্য তারা এই নিষেধ মানবে কেন"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

অন্য এক সংবাদে প্রকাশ, পিকিং-এ এই প্রথম পিয়ানো বাজাইয়া একটি চীনা গীতিনাট্যের অনুষ্ঠান হয়।—"আমাদের কাজে কাজেই মনে পড়ল—ডু নট শুট দি পিয়ানিস্ট"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

কাশ্মীর সমস্যার সমাধান উদ্দেশে শেখ আবদুল্লা একটি নতুন পরামর্শ দান করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন, কয়েক বৎসর কাশ্মীরকে রাষ্ট্রপুঞ্জের শাসনাধীনে রাখা। শ্যামলাল বলিল—"তাঁর বিনয়ে মুগ্ধ হয়েছি; তিনি কাশ্মীরে শের-রুল প্রবর্তনের কথা বলেন নি!!"

রিজার্ভ ব্যাংকের কাজকর্ম ব্যাহত হওয়ায় সোমবার কয়েকটি সরকারী অফিসে কর্মীদের বেতন দেওয়া সম্ভব হয় নাই, প্রতিবাদে কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান।—"কাজে কাজেই। কর্তারা হয়ত 'আজকে মাসের পয়লা' গানটি শোনেন নি এবং 'দুয়ারে দাঁড়ানো গয়লার রূপও দেখেন নি!!"

গানের আসর

—শার্ঙ্গদেব

দেশীয় সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা সম্বন্ধে সম্প্রতি তিমিরবরণ যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। ভারতীয় সংগীতের মান বর্তমানে যেরকম উন্নত এবং বিচিত্র প্রয়োগে চিন্তার যেরকম বলিষ্ঠতা দেখা যাচ্ছে, তাতে আমাদের সংগীতবেত্তারা যে উত্তম সংধ্বনি সংগীত বা বৃন্দবাদন রচনা করতে সক্ষম হবেন তাতে সন্দেহের কারণ দেখি না। সাম্প্রতিক কালে এই ধরনের যেসব রেকর্ড বেরুচ্ছে সেগুলির সার্থকতায় এই ধারণা দৃঢ়তর হয় যে, সুযোগ পেলে আমাদের সমবেত যন্ত্রসংগীত বিশ্বসংগীতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সক্ষম হবে। বাস্তবিকই আমাদের মনে হয়, ভারতীয় বৃন্দবাদনকে সমৃদ্ধ রূপ দেবার এইটিই প্রকৃষ্ট সময়। এ কথাও ঠিক যে, যন্ত্রসংগীতের সমারোহ কিছু ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। সরকারী সাহায্য যদি পাওয়া যেত তা হলে প্রচুর সুবিধা হত। কিন্তু পরিচালকগণ যেভাবে সাহায্য চান তা কি তাঁরা সরকারের কাছ থেকে পাবেন? বহু দফতরে বহু রেফারেন্সের পর যে সামান্য অর্থ মঞ্জুর হবে, তার বহু শর্ত, বহু নির্দেশ এবং বহু অনভিজ্ঞ হস্তক্ষেপ প্রতি পদেই হয়ত স্রষ্টাকে নিরাশ করে তুলবে। এ বিষয়ে অনেকেরই তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। অতএব যদি দিতেই হয়, সরকারকে অকৃপণ হাতে দিতেই আমরা অনুরোধ করব এবং যোগ্যপাত্রে তাঁরা আস্থা রাখতে পারবেন এটাই আমরা আশা করব। কিন্তু ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত প্রচেষ্টাই বোধ হয় এই উন্নতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা সহায়ক হবে। আকাশবাণীর সহায়তা বোধ করি এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী কাম্য হত। সংধ্বনি সংগীতের যে বিরাট পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন, তার প্রচুর সুবিধা আকাশবাণী করে দিতে পারেন। তাঁদের প্রোগ্রামে এ বিষয়ে গভীরতর মনোযোগ দিতেও আমরা অনুরোধ করব।

সিম্ফনি বা অর্কেস্ট্রার সঙ্গে এক না হলেও ঐকতান আমাদের দেশের প্রাচীন বস্তু। এ বিষয়ে কিছু সার্থকতা যে আমরা অর্জন করি নি তা নয়, কিন্তু তেমন একটা উচ্চতর আর্ট যে আজ পর্যন্ত সৃষ্ট হয়েছে এ কথা বলা চলে না। এর একটা কারণ সংগীত-জগতে যেসব ব্যক্তি বিরাজিত ছিলেন তাঁদের আদর্শটা অ্যাকাডেমিক ছিল না। অতএব বিপুল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও কেবলমাত্র আমোদলিপ্সু মহলের ওপরে এর আবেদন পৌঁছোয় নি। একদা প্রতিষ্ঠিত কনসার্ট নামক এক প্রকার বৃন্দবাদনের কথা অনেকেই জানেন এবং তার অধঃপতনের

কনসার্ট পার্টির ক্রমিক অধোগতিতে সমাজের হিতৈষীরা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। এই সুপ্রাচীন কনসার্টেরই একটা ধারা বর্তমানে কলাবাগান অঞ্চলের ব্যান্ড পার্টিগুলির মধ্যে অস্তিত্ব রক্ষা করে আছে। এ ছাড়াও ঐকতান আমাদের পুরাতন থিয়েটার, সিনেমায় বাজিয়ে আসা হয়েছে—নানা ক্রিয়াকর্মেও এই বাদকগোষ্ঠীদের আমন্ত্রণ ছিল। এদের প্রকৃতি কিরকম ছিল, তিমিরবরণ সে কথা জানিয়েছেন।

কাব্য, সাহিত্য, আর্ট, সংগীত—প্রত্যেকটি বিষয়েই পর্যায়ক্রমে নব নব অভ্যুদয় হতে থাকে। আমাদের দেশেও হয়েছে, গোড়ার দিকে দৃষ্টি ছিল সব যন্ত্রগুলি একসুরে মিলছে কিনা সেদিকে। মেলডিটাই ছিল প্রধান। বিশুদ্ধ রাগ অবলম্বন করে অনেক গৎ তৈরি হয়েছিল যা খুবই চিত্তাকর্ষক। বহু জনপ্রিয় ছন্দমধুর গান নিয়েও কনসার্ট তৈরি হয়েছে। আমাদের ছেলেবেলাতেও সে সব গৎ-এর প্রচলন ছিল। যারা গান শিখত, তারাও এই সব গৎ মুখস্থ করত, যাতে সুর এবং তালে দখল পাকা হয়। এ রীতি অনেক দিন ধরেই প্রচলিত ছিল। ক্রমে নৃত্য এবং অভিনয়ের সঙ্গে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ আবেদন আনবার চেষ্টা চলতে লাগল। বিচিত্র যন্ত্রের বিচিত্র ধ্বনির মধ্যে যে এক-একটা বিশেষ ইঙ্গিত ফুটে ওঠে, সেটা উপলব্ধি করে সমবেত যন্ত্রসংগীতকে নতুনভাবে রচনা করবার প্রচেষ্টা শুরু হল। এরই মধ্যে পাশ্চাত্ত্য দেশের সঙ্গে আমাদের আর্টের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে সংযোগ সাধিত হয়েছে। আমরা চিন্তা করতে আরম্ভ করেছি, সিম্ফনি বা অর্কেস্ট্রার দিকে কিভাবে সার্থকতার সঙ্গে অগ্রসর হওয়া যায়। এই অভিযান ধীর গতিতে আরম্ভ হয়েছে কিন্তু আজও আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই চলেছি—কোনও একটা বিশিষ্ট রীতি উদ্ভাবন করতে পেরেছি এমন দাবি করতে পারি না। এ-যুগের শিল্পী এবং সংগীতরচয়িতারা অনেক বেশী মননশীল। প্রাচ্য-সংগীতের মর্ম তাঁরা যেমন বোঝেন, তেমনি পাশ্চাত্ত্য-সংগীতের ধারা সম্বন্ধেও তাঁদের একটা বোধ আছে। একটা আর একটার নকল হবে সেটা তাঁরা চান না এবং একটা বেমানান ভূমিকার অংশ গ্রহণ করতেও তাঁরা নারাজ। তাই পদে পদে তাঁদের আত্মসমীক্ষণ করে চলতে হচ্ছে। এটা খুবই সুলক্ষণ এবং এই বিচারটি থাকলেই যন্ত্রসংগীতের ক্ষেত্রে আমরা একটা সার্থক রূপায়ণে সমর্থ হব, কেননা প্রতিটি পরীক্ষাই মূল্যায়ন দ্বারা উত্তীর্ণ হবে।

তিমিরবরণের একটি উক্তি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। সেটি হচ্ছে এই যে, এক-একটি রাগে সিম্ফনির প্রচুর উপকরণ আছে এবং সেগুলি যদি সিম্ফনি বা সোনাটা জাতীয় সৃষ্টিতে লাগানো যায়, তা হলে সংগীত-জগতে মহৎ সৃষ্টি বলেই পরিগণিত হবে। তাঁর আর একটি উক্তিও বিশেষ সুচিন্তিত যে, সিম্ফনি বা অর্কেস্ট্রার ভিতর সংগীতের মাধ্যমে প্রায় সর্বপ্রকার রস সৃষ্টি হতে পারে যা অন্য কোনও একক যন্ত্র বা কণ্ঠসংগীতে প্রকাশ করা অসাধ্য। ব্যাপকভাবে যন্ত্রসংগীতের সাহায্যে কোনও বিষয়বস্তুর বর্ণনা আমাদের সংগীতে নেই। কোনও “থীম” বা আখ্যায়িকাকে অবলম্বন করেও শুধু ধ্বনির সাহায্যে সংগীত সৃষ্টির প্রচলনও আমাদের দেশে ছিল না। কিন্তু রাগসংগীতের মধ্যে যে প্রচুর নাটকীয় উপাদান রয়েছে এটা বিশেষভাবেই সত্য; কারণ, রাগসংগীতের ক্রমোন্নতিই হয়েছে নাটকের মাধ্যমে। একদা আমাদের সংগীত নাটকের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল। নাটকের বিভিন্ন রসে বিভিন্ন কালে রাগসংগীতের বিশিষ্ট প্রয়োগ ঘটেছে। সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষায় প্রচলিত নাটক একসময় নানা কারণে লোপ পেল, কিন্তু রাগসংগীত আপন মহিমায় এককভাবে বিকশিত হয়ে উঠল। আজও সেই বিভিন্ন সেন্টিমেন্টের

সংগে যুক্ত হয়ে রাগসংগীত স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিচিত্রভাবে সংযুক্ত করা কিছু মাত্র আয়াসসাধ্য ব্যাপার নয়। উপযুক্ত প্রতিভার হাতে পড়লে সিম্ফনির ক্ষেত্রে রাগসংগীত আশ্চর্য বৈচিত্র্য সম্পাদন করতে সক্ষম হবে।

আমরা যে সংগীত একটি বা দু'টি যন্ত্রের মাধ্যমে উপভোগ করি তার রস এবং রূপ আলাদা, কিন্তু সংধ্বনি সংগীতের পরিধি বিপুল, তার আয়োজনও বিস্তৃত। বিভিন্ন বিচিত্র যন্ত্রের সমন্বয়ে যে ধ্বনিগাম্ভীর্যের সৃষ্টি হল তার এমন একটা আবেদন আছে, যা একক বাদনে আনা যায় না। তারপর সেটা মিলিয়ে আসবার সংগে সংগে একটি বা দু'টি যন্ত্র সেই সুরের রেশটিকে বহন করে ধীরে ধীরে নিজের মহিমায় ব্যক্ত হয়ে উঠল। আবার তারা লীন হয়ে এল, ফুটে উঠল অন্য যন্ত্রে বিচিত্রতর স্বরলহরী। এইভাবে পটের পর পটের পরিবর্তন, ধ্বনির পর ধ্বনির লীলা—আর তার সংগে যে বিষয়টির বর্ণনা হচ্ছে তার স্বপ্নময় অনুভূতি। সংগীতের এই যে বিচিত্রলোক, এর থেকে আমরা বঞ্চিত থাকব কেন? আমাদের যথেষ্ট উপকরণ আছে, প্রতিভারও অভাব নেই মনে হয়, জনগণের সচেতনতা এবং প্রেরণা থাকলে সংগীতের ক্ষেত্রে আমরা একটা বিরাট আনন্দযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে পারি।

তিমিরবরণ অত্যন্ত সময়োচিত প্রস্তাব করেছেন এবং প্রাজ্ঞ-সমাজ এতে উৎসাহ প্রদান করে একটি নতুন যাত্রায় অভিনন্দন জানাবেন এই আশাই আমরা পোষণ করি।

আলোচনা

মহাশয়,

দেশ (৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫) পত্রিকায় শার্ঙ্গদেবের 'ছন্দ, তাল, লয়' সম্বন্ধে আলোচনা ও তার ওপর শ্রীঅশোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য (১ আষাঢ়, ১৩৭৫) এবং লেখকের বক্তব্য পড়লাম।

এই প্রসংগে একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে আমার এখনও কিছু সংশয় রয়ে গেছে। আশা করি, শার্ঙ্গদেব এ বিষয়ে আর একটু আলোকপাত করবেন।

শার্ঙ্গদেব মূল আলোচনায় এবং শ্রীঅশোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যের জবাবেও বলেছেন, 'উচ্চারণের সমাবেশ বা বিভাগ যাই হোক না কেন, কবিতার পদ শেষ হলে সংগীতের মতো শুধু ধ্বনি সহযোগে তাকে বাড়ানো যায় না। কথা ফুরিয়ে গেলে কাব্যের ছন্দ নষ্ট পাছটির মতো মুড়িয়ে যায়।' কিন্তু ভারতীয় সংগীত-শাস্ত্রে অন্যতম পণ্ডিত প্রজ্ঞানানন্দজী তাঁর Historical Development of Indian Music (১৯৬০) গ্রন্থে লিখেছেন—

The old Sanskrit verses of musical pieces were of two kinds Varna-Vritta and Matra-Vritta, i.e., one is determined by the syllable unit, and other by time unit."

(পৃ: ৩৩৭)। অতএব স্পষ্টত কাব্যে এই মাত্রাবৃত্ত যে Time unit অর্থাৎ "ক্ষণ-ভেদ" দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং শুধু বর্ণের দ্বারা নয়, এ কথা সংগীত-শাস্ত্রেও স্বীকৃত হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রজ্ঞানানন্দজীর বক্তব্য আমি যেভাবে বুঝেছি, তা যদি সঠিক হয়, তবে প্রশ্ন থেকে যায় যে, গানের তাল এবং কবিতার ছন্দ এ দু'টি ধারণার পার্থক্যসূচক লক্ষণ কি?

প্রসঙ্গত বলতে চাই যে, শার্ঙ্গদেব মনে করেন—'ছন্দ এবং তাল নিয়ে তর্ক ওঠানো নিরর্থক: কারণ, দু'টির প্রয়োজনীয়তা দু'দিকে।' কিন্তু আমার মনে হয়, যদি এ আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করি তবে 'প্রচলিত ছন্দগ্রন্থাদিতেও সংগীত-শাস্ত্রের বিরাট ছন্দনীতির প্রয়োগ অনালোচিত'ই থেকে যাবে।

অরুণকুমার ঘোষ
কলকাতা-৩১

লেখকের বক্তব্য।

অলংকার এবং সংগীত-সম্বন্ধীয় প্রাচীনতম এবং প্রধানতম তত্ত্বগ্রন্থ নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, পদবন্ধগুলি বৃত্তদ্বারা নিবদ্ধ হতে পারে অথবা চূর্ণ অবস্থায় থাকতে পারে। চূর্ণ বা গদ্যপদকে অনিবদ্ধ বলা হয়, কেননা এর অক্ষরগুলি অনিয়ত। বৃত্ত বা ছন্দে গ্রথিত পদগুলি হচ্ছে নিবদ্ধপদ; কারণ, এর অক্ষরগুলি নিয়ত এবং এতে নিয়মিত ছেদ আছে। এই যে নানা অর্থসংযুক্ত চারটি পদযুক্ত বৃত্ত, একেই বলে ছন্দ। পাঠ্যছন্দ উপলক্ষে উপদেশ দেবার সময়ই আচার্য ভরত বলেছেন যে, সম, বিষম প্রভৃতি ছন্দ নাটক এবং কাব্যে যোজনা করা কর্তব্য। বহু ছন্দ আছে, যা তেমন শোভা উৎপাদন করে না; সেগুলির প্রয়োগ না হওয়াই ভাল। আবার অন্য কতকগুলি ছন্দ আছে, যা গানে সংযোজিত হয় এবং ছন্দযোজিত গানগুলিই ধ্রুবা। আচার্য ভরত নাট্যশাস্ত্রের একটি বৃহৎ অধ্যায়ে (৩২ অধ্যায়) এই ছন্দযুক্ত ধ্রুবগানগুলি উদাহরণ সহযোগে বর্ণনা করেছেন। এই গানগুলিই হচ্ছে প্রাচীনতম ছন্দনিবদ্ধপদে আচরিত গান। অতএব এই আলোচনায় এটি স্পষ্ট যে, ছন্দ মুখ্যত পাঠ্যবস্তু, কেবলমাত্র ছন্দবদ্ধ পদের একটা লিরিক গুণ বা গীতিধর্মিতা আছে বলেই তাকে গানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। বৃত্ত (সম, অর্ধসম, বিষম) অথবা জাতি বা মাত্রাবৃত্ত—যে প্রকারেরই ছন্দ হোক না কেন, তা তো শব্দনির্দিষ্ট পদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেখানে ভাষা বা পদ নেই সেখানে কি কোনও ছন্দ নির্দেশ করা যায়? মাত্রাবৃত্ত কি অক্ষরদ্বারা সীমিত নয়? বিভিন্ন প্রকারের স্বরা, পঙ্‌ক্তিকা, (সংগীতে পাদধ্রুবী) প্রভৃতি ছন্দগুলি সবই তো কাব্যবদ্ধ। সুতরাং বলতে যে "টাইম ইউনিট" বোঝায় তা পাঠ বা আবৃত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সংগীতের যে ধ্বনিবিস্তার তা এত ব্যাপক যে, কাল অনুসারে মাত্রা নির্ণয় ব্যতীত তাকে তালের বৃত্তে আনা যায় না। বিলম্বিত একতাল আটচল্লিশটি মাত্রায় এসে যদি তার বৃত্ত শেষ করে, তা হলে কাল অনুসারে তার মাত্রা নির্ণয় করাই কি সংগত নয়? এই যে ধ্বনিগত বিস্তার, এ তো কোনও পদ বা অক্ষরকে সহায় করে চলছে না, এ চলছে শিল্পীর আন্দাজমত মাত্রাকে অবলম্বন করে। তবলীয়া শিল্পীর গানের গতি অনুসারে তাঁর ঠেকায় সময় অনুমান করে নেন, যদি সেটা শিল্পীর মনোনীত না হয়, তবে তিনি তাকে তাঁর অভিপ্রেত মাত্রার যে গতি তার নির্দেশ দিয়ে দেন। এইরকম বিবিধ কারণেই পাঠ্যছন্দকে সংগীতে আরোপ করা যায় না, আর এই

আলোচনা

উন্নতির শর্ত

শ্রীদীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ('দেশ' ১৫ই আষাঢ় ১৩৭৫) লিখেছেন : "প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়, চারশত বৎসরব্যাপী সক্রিয় একটি অর্থনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে মাত্র অর্ধশত বৎসর হল গড়ে উঠেছে যে ব্যবস্থা তার আর্থিক কৃতির তুলনা সংগত কি না। আর যদিও আর্থিক উন্নতির ক্রম বৃদ্ধির গড়পড়তা হার নিয়ে কোনো তুলনা হয়তো সমীচীন হবে না, তবু এদিক থেকে তুলনা করলে কোন ব্যবস্থায় এই উন্নতির হার অধিক?" একটি প্রচলিত ভ্রান্তিকে দীপেন্দ্রবাবু এখানে অত্যন্ত সাবধানে জ্ঞাপন করেছেন। সোজা ভাষায় কথাটা এই : ইংল্যাণ্ডের তুলনায় সোভিয়েত দেশে শিল্পোন্নয়ন দ্রুতগতিতে হয়েছে, অতএব সোভিয়েত আর্থিক ব্যবস্থাই তুলনায় শ্রেষ্ঠ। এই ভ্রান্ত যুক্তিটি বহু প্রচলিত বলেই এ বিষয়ে ছোট একটি মন্তব্য আবশ্যক।

শিল্পবিপ্লবের আগমন ঘটে সর্বপ্রথমে ইংল্যাণ্ডে। জার্মানি, জাপান ও রুশদেশে শিল্পবিপ্লব শুরু হয় অপেক্ষাকৃত বিলম্বে। কিন্তু আধুনিককালে এসব দেশেই শিল্পোন্নয়নের গতি হয়েছে অপেক্ষাকৃত দ্রুত। এর নানা কারণ আছে। একটি কারণ যেমন সরল তেমনই মৌল। আর্থিক উন্নতির মূল শর্ত হল ধনোৎপাদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগ। কিন্তু পরীক্ষানিরীক্ষার ভিতর দিয়ে বিজ্ঞান ও উৎপাদন পদ্ধতিকে উন্নততর স্তরে তোলা যতটা সময়সাপেক্ষ একবার কোনো একটি দেশে এই উন্নতি ঘটবার পর অন্য দেশে অনুরূপ উন্নতির প্রবর্তন ততটা সময়সাপেক্ষ নয়। সোভিয়েত দেশের শিল্পোন্নতি উনিশ শতকের ইংল্যাণ্ডের তুলনায় দ্রুত সন্দেহ নেই। জাপান ও জার্মানি সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। এই দেশগুলির ভিতর উন্নতির হার সম্ভবত জাপানেই সর্বাধিক।

ইংল্যাণ্ডের আর্থিক উন্নতিতে উপনিবেশের স্থান নিয়ে মতের পার্থক্য সম্ভব। দু' শ বৎসরের পরাধীনতার ইতিহাসের পর এ বিষয়টা স্থির ভাবে বিচার করা আমাদের পক্ষে সহজ নয়, ইংরেজের পক্ষেও নয়। আমাদের ছাড়াও ওদের চলতো একথা স্বীকার করতে আমাদের স্বাদেশিক অহমিকায় বাধে। তবু কয়েকটি মূল তথ্য অস্বীকার করা যায় না। শিল্পবিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে ইংল্যাণ্ডের অন্যতম প্রধান শিল্প ছিল বস্ত্রশিল্প। ইংল্যাণ্ডকে তুলোর জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। সাধারণভাবে জনসংখ্যা ও শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডকে খাদ্যশস্যের জন্যও ক্রমশ ভিন্ন দেশের উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছে। উনিশ শতকে ইংল্যাণ্ডের দ্রুত শিল্পোন্নতির জন্য ভারতের চা ও পাট অপরিহার্য ছিল না, কিন্তু মার্কিন দেশের গম ও তুলো ছিল অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ, ইংল্যাণ্ডের শিল্পোন্নয়নের পক্ষে পরাধীন ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের চেয়েও স্বাধীন মার্কিন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের মূল্য ছিল বেশী। মূলধন বিনিয়োগের ব্যাপারেও দুয়েকটি তথ্য মনে রাখা আবশ্যক। উনিশ শতকে যে-পরিমাণ মূলধন ইংল্যাণ্ড ভারতে এমন কি সারা এশিয়ায় নিয়োগ করেছে তার চেয়ে অনেক বেশী করেছে মার্কিন দেশে। বাণিজ্য—এমন কি কাঁচামাল ও খাদ্যশস্যের পরিবর্তে শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়—এবং মূলধন নিয়োগ বললেই শোষণ বোঝায় না। ইংল্যাণ্ডের মূলধন ও বাণিজ্য উনিশ শতকে মার্কিন দেশের উন্নতির সহায়ক হয়েছিল।

এ কথা স্বীকার্য যে ব্রিটিশ বাণিজ্যনীতি অনেক সময়ে ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী হয়েছে। আজও কোনো কোনো উন্নত দেশ এমন বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করে থাকেন অনুন্নত দেশের যাতে আপত্তি করবার কারণ আছে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। মার্কিন দেশে এখনও বিদেশী বস্ত্রের অবাধ প্রবেশাধিকার নেই। এই নীতি আমি নিন্দনীয় মনে করি। এর পরিবর্তন হলে মার্কিন দেশের আর্থিক ব্যবস্থা বিপন্ন হবে এমন নয়, তবে ওদের বস্ত্রশিল্প খানিকটা অসুবিধায় পড়বে। ওদেশের বস্ত্রশিল্পের পক্ষ থেকে তাই পুঁজিপতি ও শ্রমিক সংগঠন কেউই এই নীতির পরিবর্তন চান না। আইনসভায় কোনো "লবি" কলরবে সবাইকে ছাড়িয়ে গেলেই কিন্তু সারা দেশের এমন কি সমগ্র শাসকশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গেও তার অভিন্নতা প্রমাণিত হয় না। একটা দেশের বাণিজ্যনীতি অনেক সময়েই দেশের সামগ্রিক স্বার্থ দ্বারা নির্ধারিত না হয়ে বরং গোষ্ঠী বিশেষের চাপের কাছেই আত্মসমর্পণ করে থাকে। ঔপনিবেশিক অথবা সাম্রাজ্যবাদী নীতিকেও তেমনই কোনো দেশের শিল্পোন্নয়নের বৃহৎ প্রচেষ্টার সাফল্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক বলা যায় না; বরং গোষ্ঠীবিশেষের স্বার্থ ও উগ্র জাতীয়তাবাদী ক্ষমতালিপ্সার উপরই তার প্রতিষ্ঠা।

সাম্রাজ্যও যে বোঝা হয়ে উঠতে পারে এ নিয়ে আজ সন্দেহ প্রকাশ করা ভুল। সাম্রাজ্যের আশ্রয় ত্যাগ করে ফ্রান্স, হল্যাণ্ড জার্মানি, জাপান প্রভৃতি দেশ এখন পূর্বের চেয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। যুদ্ধ সম্বন্ধেও একই কথা প্রকারান্তরে প্রযোজ্য। হিটলারী আমলে সমালোচকেরা বলতেন যে, সামরিক খাতে বহু টাকা ক্ষয় করেই পুঁজিবাদী আর্থিক সংকট কোনো রকমে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। অবশ্য সুইডেনে সেদিনও শান্তির পথেই উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটছিল। কিন্তু সুইডেন অপেক্ষাকৃত ছোট দেশ; জার্মানি ও জাপানের জঙ্গী ঝোঁকটাই সেদিন সকলের চোখে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। আজকের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন, প্রায় বিপরীত। জাপান ও জার্মানির গত বিশ বৎসরের দ্রুত উন্নতির ব্যাখ্যা হিসাবে অনেকে এখন বলছেন যে, সামরিক খাতে ওদের আজ অর্থক্ষয় করতে হয় না এটাই ওদের সাম্প্রতিক আর্থিক সাফল্যের একটা বড় কারণ।

প্রতিরক্ষা বাবদ ব্যয়টা আসলে ধনতান্ত্রিক দেশের আর্থিক প্রসারের জন্য অপরিহার্য নয়। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জন গলব্রেথ মার্কিন ধনতন্ত্রের একজন বিশিষ্ট সমালোচক; কাজেই তাঁর মত উদ্ধৃত করলে আশা করি পাঠক ভুল বুঝবেন না। তিনি বলেছেন:

"The management of aggregate demand can be served by different types of public spending, a possibility which he (Marx) did not foresee. And it has now been amply shown that, by such management, the size of the market can be increased as employment and other considerations require. Arms expenditure have no unique value for increasing aggregate demand."

বর্তমান যুগে ধনতান্ত্রিক দেশেও সরকার স্কুল, হাসপাতাল, পথঘাট ও বাসস্থান নির্মাণে এবং অন্যান্য জনহিতকর কাজে অর্থ ব্যয় করে থাকেন। ভিয়েতনামের যুদ্ধ হঠাৎ বন্ধ হলে মার্কিন অর্থনীতি সাময়িকভাবে কিছুটা অসুবিধায় পড়তে পারে; কিন্তু আশা করা যায় যে, জনহিতকর নানা কাজে ব্যয় বৃদ্ধি করে সরকার অবস্থা শীঘ্রই আয়ত্তে আনতে পারবেন। শেষ অবধি এতে মার্কিন দেশেরও আর্থিক সচ্ছলতাই বাড়বে।

মূল কথাতে ফিরে আসা যাক। যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদ ইতিহাসের অঙ্গ বটে; মানুষ ও সমাজের প্রকৃতি বোঝবার জন্য এদের প্রতি মনোযোগও দিতে হয়। কিন্তু আর্থিক উন্নতির শর্ত ভিন্ন। বিজ্ঞান ও শ্রমের সার্থক ব্যবহারের চেয়ে আর্থিক উন্নতির মৌল শর্ত আর নেই। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন; কিন্তু কোনো বিশেষ সমাজ ব্যবস্থা অবশ্যপ্রয়োজন নয়। উন্নতির মূল শর্তগুলি পূর্ণ হলেই হল। বহু পথে সমাজের বিকাশ সম্ভব। কোনো একটি

পথকে একমাত্র পথ জ্ঞান না করে প্রগতির স্থলে উপাদানগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে আমরা অন্ধ গোঁড়ামির বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাব।

শ্রমের প্রতি সমীহা বা অনীহা এবং ব্যবহারমুখী বিজ্ঞানচর্চা ঐতিহাসিক পরিপার্শ্বের ফলমাত্র নয়, বরং আর্থিক উন্নতির একই কালে কার্য ও কারণ। বাণিজ্যের প্রসার ইয়োরোপের আধুনিক যুগের একটি প্রধান ঘটনা। ষোড়শ শতকে পর্তুগাল বাণিজ্যের এই প্রসারে একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল; দক্ষিণ আমেরিকায় উপনিবেশের প্রসারেও স্পেনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আইবেরীয় উপদ্বীপে সমাজ সংগঠন ও ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে গেল পশ্চাৎপন্থী, শ্রমের প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সেখানে ব্যাপ্ত হল না। স্পেন ও পর্তুগাল আর্থিক উন্নতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিছিয়ে গেল। ঐতিহাসিক কার্যকারণ বিশ্লেষণে কোনো একটি উপাদানকে প্রাথমিক কারণ হিসাবে নির্ণয় করা নিষ্ফল।

ধনতান্ত্রিক সমাজের বহু গলদের কথা আমার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি। শ্রমিকের প্রতি ধনিকের "ভ্রাতৃভাব" বর্তমান একথা নিশ্চয়ই বলা যায় না। এরও নানা কারণ আছে। জাতিভেদ ও আভিজাত্যের প্রাচীন সংস্কা সাম্যভাবের পরিপন্থী। নতুন শিল্পসংগঠনেও অসাম্যের ভিত্তি নতুন করে গড়ে ওঠে। এই ঘটনাটা আজ সমাজতান্ত্রিক দেশেও প্রকট। কি করে এটা হয় সে কথা অন্যত্র আলোচনা করেছি। শ্রমিকের সঙ্গে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিচ্ছেদবোধ বেদনাদায়ক; এ দুয়ের সফল সংযোগ কাম্য। কিন্তু কাজটা সহজ নয়। শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়াবার জন্য যে-সব অভ্যাস আয়ত্ত করা প্রয়োজন শিল্পায়নের গোড়ার যুগে সেগুলো অনায়াসে সিদ্ধ হয় না। স্বাধীনতা ও নিয়মনিষ্ঠার ভিতর সমন্বয় সাধনের কোনো সহজ পথ নেই। সোভিয়েট শিল্পপ্রতিষ্ঠানেও নিয়ম বলবৎ করবার জন্য পরিচালক গোষ্ঠীকে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আবার এই ক্ষমতার অপব্যবহারের বিপদও আছে। কোনো যাদুবলে বা রক্তপাতের ভিতর দিয়ে সমাজে হঠাৎ স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তবু স্বাধীনতা ও সাম্যই আদর্শ হিসাবে স্বীকার্য। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিতরও আমরা বিভ্রান্ত ও দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়ে পড়ি যদি-না এই আদর্শ আমাদের মনে স্পষ্ট থাকে।

সাম্যবাদী দেশেও মূলধনের অপচয় সামান্য নয়, বরং সর্বব্যাপী। এই অপচয় রোধ করবার জন্য পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি যে-ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চলেছেন তারই ফলে তাঁরা উগ্র মার্ক্সপন্থীদের কাছে "সংশোধনবাদী" চাই না। বরং আরও মৌলিক একটি বিষয়ই এখানে উল্লেখ করব। মনে রাখা আবশ্যক যে, আদর্শ কখনও সম্পূর্ণ বাস্তব হয়ে ওঠে না। প্রতিষ্ঠিত কোনো সাম্যবাদী সমাজের ভিত্তি নির্দোষ এমন ধারণা হাস্যাস্পদ। যে-সমাজই একবার ইতিহাসের অংশ হয়েছে তার ভিত্তি ও ওপরের মহল কিছুই নির্দোষ নয়, হতে পারেও না। যা-কিছু ইতিহাসের অংশ তাই পরিবর্তনশীল। এমন কোনো ব্যবস্থা বাস্তবে আকার গ্রহণ করে নি এবং করতে পারে না যার ভিত্তি চিরকালের মতো স্থির হয়ে গেছে, অতএব যা সমালোচনার ঊর্ধ্বে। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র উভয় ব্যবস্থা সম্বন্ধেই একথা সত্য। এ কথাটা কিন্তু আজও সাম্যবাদী দেশগুলিতে বলা সহজ নয়। আত্মসমালোচনাকেও ওঁরা আগে পিছে বাঁধেন আত্মস্তুতির মন্ত্রে, সমালোচনার সীমা নির্ধারণ করে দেন মন্ত্রগুরুরা। এটাই ওঁদের বড় বন্ধন। সমালোচনাকে বন্ধনমুক্ত করাও উন্নতির একটি শর্ত।

আদর্শ কখনও সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় না জেনেও এদেশে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও শ্রমে অনুরাগ, শিক্ষা ও শ্রমিক সংগঠন, নিয়মনিষ্ঠা ও সমালোচনার প্রতি সহিষ্ণুতার ঐতিহ্য আমাদের গড়ে তুলতে হবে। ক্ষমতা নিয়ে দলীয় কাড়াকাড়ির চেয়ে আজ এটাই বড় কাজ।

পরিশেষে দীপেন্দ্রবাবুকে ধন্যবাদ জানাই। সব প্রশ্নের বিশদ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবু তাঁর সমালোচনার জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

অম্লান দত্ত
কলকাতা ৫০

জীবনানন্দ সম্বন্ধে

১৩৭৫ সালের দেশ পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায় শ্রীবুদ্ধদেব বসু লিখিত চরম চিকিৎসা নামক একটি একাঙ্ক নাটিকার দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই আলোচনার মধ্যে তিনি কবি জীবনানন্দ সম্বন্ধে লিখেছেন যে, অশ্লীল কবিতা রচনার অপরাধে কোন কলেজ থেকে তাঁর চাকরি যায়। জীবনানন্দবাবুর প্রথম চাকরি কলকাতায় সিটি কলেজে, দ্বিতীয় বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে। দেশ বিভাগ পর্যন্ত তিনি বরিশালেই ছিলেন। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, বুদ্ধদেব বসু তাঁর সিটি কলেজের চাকরি যাওয়া সম্বন্ধেই ইঙ্গিত করেছেন। জীবনানন্দবাবু বছর দুয়েক সিটি কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২৮ কিংবা ১৯২৯-এ সেখান থেকে তাঁর চাকরি যায়। এই সময় সিটি কলেজের [illegible] সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে যার কিছু কিছু তিনি নিজেও জানতেন ও কৌতুক অনুভব করতেন। জীবনানন্দবাবুর চাকরি-যাওয়া ও তাঁর নীতি-পরায়ণতাকে যুক্ত করে একটি কাহিনী রচিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। শুধু বুদ্ধদেব বসু একলা নন, আরও কেউ কেউ করেছেন। আমি এই সময় সিটি কলেজে দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত ছিলাম। তখনকার অনেক বৃত্তান্ত আমার জানা আছে। আসল কথা এই যে, ১৯২৮ সালে সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে কলেজে ভীষণ ছাত্র-বিক্ষোভ হয়। ফলে কলেজের আড়াই হাজার ছাত্রের মধ্যে প্রায় দু' হাজার কলেজ ছেড়ে চলে যায় ও কলেজ নিদারুণ অর্থসংকটের সম্মুখীন হয়। এই কারণে কলেজের প্রত্যেক বিভাগ থেকে কিছু কিছু ছাঁটাই হয়। জীবনানন্দবাবু ইংরেজী বিভাগে সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ ছিলেন। ফলে তাঁর চাকরি যায়। এ ঘটনা খুবই দুঃখ-দায়ক। কিন্তু ব্যাপারটি এইরূপ।

সরোজেন্দ্রনাথ রায়
কলকাতা-১৯

চব্বিশ পরগণার মন্দির

১৫ আষাঢ়ের দেশ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অসীম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চব্বিশ পরগণার মন্দির প্রসঙ্গে জয়নগর প্রবন্ধে জয়নগরের সর্বশেষ মন্দির নির্মাণের যে বঙ্গাব্দ উল্লেখ করেছেন তা ঠিক নয়, তিনি লিখেছেন, "সর্বশেষ যে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার বয়স মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর, অর্থাৎ ১৩২৯ বঙ্গাব্দ বা ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়।"

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ হলে বঙ্গাব্দ ১৩৩২/৩৩ হবে, তা হলে মন্দিরটি বিয়াল্লিশ কিংবা তেতাল্লিশ বছর আগে নির্মিত হয়।

শ্রীঅজীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কলকাতা-৪০

কোথায় পাব তারে

গত ৩৪ সংখ্যা 'দেশে' 'কোথায় পাবো তারে' ক্রমশ-প্রকাশ্য উপন্যাসধর্মী ভ্রমণ-কাহিনীর ৭৮ অধ্যায়ে কালকূট জয়দেব-কেঁদুলির বর্ণনা-প্রসঙ্গে বিল্বমঙ্গলের কথা এনেছেন একজন কৃষ্ণা যুবতীর অবতারণা করে। কিন্তু সেই প্রসঙ্গেই এমন একটি তথ্যগত ভুল দেখলাম, যেদিকে আমি কালকূট মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারছি না। তিনি লিখেছেন—"যখন অজয় নদে বান লেগেছে ঝড়ে উত্তাল তরঙ্গ, তখন [illegible]

বিল্বমঙ্গল সুদূর দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী। চিন্তামণির সঙ্গে তাঁর যে বহুখ্যাত প্রেমলীলা এবং জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর যে সন্ন্যাস গ্রহণ ও আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভ তাও সম্পন্ন হয়েছিল যথাক্রমে দাক্ষিণাত্যে ও বৃন্দাবন-মথুরায়। বাংলা দেশে কখনো তিনি এসেছিলেন এরূপ কোনো তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'সারঙ্গ-রঙ্গদা' টীকায় বিল্বমঙ্গলকে 'কৃষ্ণবেন্বা পশ্চিম তীর-নিবাসী পণ্ডিত কবীন্দ্র'রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। 'ভক্তমাল' গ্রন্থেও তিনি দক্ষিণ দেশের কৃষ্ণবেন্বাতীরবাসী বলেই উল্লেখিত হয়েছেন। কেবল গোপাল ভট্টের (পূর্ব-দেশীয়) 'শ্রবণাহ্লাদিনী' টীকায় তাঁকে কাশীর নিকট 'সুরতরঙ্গিণীতট গ্রামবাসী' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে তিনি দাক্ষিণাত্যেরই অধিবাসী। তা ছাড়া, স্বয়ং চৈতন্যদেব বিল্বমঙ্গলের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতে'র পুঁথিটি কৃষ্ণবেন্বাতীরে এসেই একটি মন্দির থেকে সংগ্রহ করে বাংলা দেশে নিয়ে আসেন। বৈষ্ণবদের কাছে পরম আদরণীয় গ্রন্থ এটি। 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে'র পুঁথিটি দাক্ষিণাত্যে পাওয়া গিয়েছিল বলে এর পূর্বে আর কোথাও পাওয়া যায় নি। ঐ গ্রন্থটির রচয়িতা বিল্বমঙ্গল যে দাক্ষিণাত্যেরই অধিবাসী ছিলেন, তা স্থির-নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করা যায়। বাংলা দেশের সহজিয়া মতাবলম্বীগণ নিজেদের মতবাদ সুপ্রচারিত করার জন্য বাংলা দেশের অজয়তীরবর্তী একটি স্থানকে বিল্বমঙ্গলের নামে চিহ্নিত করে রাখতে পারেন, কিন্তু তাই বলে চিন্তামণির সঙ্গলাভের আশায় ঝটিকা-সংকুল ভয়ংকর রাত্রিতে অজয়ের উত্তাল তরঙ্গে বিল্বমঙ্গল ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন, এই কল্পনা ও বর্ণনা কোনো দিক দিয়েই যুক্তিসহ নয়।

গোপেশচন্দ্র দত্ত
নূতন পল্লী, বর্ধমান

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

১৫ আষাঢ়, ১৩৭৫ তারিখের ৩৫ সংখ্যা দেশে তারাপদ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিতে বিরামচিহ্ন ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে পুঁথির পাঠনির্ণয় সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। তিনি অভিযোগ করেছেন, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মুদ্রিত সংস্করণে বহু জায়গায় পুঁথির বিরামচিহ্ন পরিবর্তন করে নূতন চিহ্ন বসান হয়েছে। পুঁথিতে যেখানে দু-দাঁড়ি, মুদ্রিত সংস্করণে সেখানে এক দাঁড়ি; পুঁথিতে যেখানে চিহ্ন নেই, [illegible] মূলে কি চিহ্ন ছিল তার উল্লেখ নেই।' অভিযোগ সত্য হলে, পুঁথি সম্পাদনার ক্ষেত্রে এটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুতর ত্রুটি স্বীকার করতে হবে। লিপিকারের মূল পুঁথির পাঠ অভ্রান্তভাবে না পেলে রচনাকারের অভিপ্রেত গঠনরীতি সম্পর্কে ভুল বিচারের আশংকা রয়েছে। মনে হয়, এই ত্রুটি সংশোধনের প্রকৃষ্ট পথ হল এ জাতীয় পুঁথির Facsimilie সংস্করণ প্রকাশ করা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ যদি বাংলা সাহিত্য ইতিহাসের পক্ষে পরম মূল্যবান প্রাচীন দুটি গ্রন্থের, অর্থাৎ চর্যাপদ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের Facsimilie সংস্করণ প্রকাশ করেন তবেই বাংলা সাহিত্য গবেষকদের পক্ষে একটি পরম উপকার সাধিত হতে পারে। চর্যাপদের পুঁথির পাণ্ডুলিপি নেপাল থেকে সংগ্রহের আবশ্যকতা রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথি তো বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেই রয়েছে। প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হলে এবং যোগ্য লোক সম্পাদনার দায়িত্ব নিলে, এ গ্রন্থের ফটোমুদ্রণ সংস্করণ তো এখুনি প্রকাশ করা যেতে পারে।

শ্রীমুখোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদগীতি-গুলির ধ্রুবপদ ব্যবহার সম্পর্কে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি সাধারণভাবে প্রযোজ্য হলেও সর্বত্র খাটে না নিজেই স্বীকার করেছেন। তিনি চতুষ্পঙ্‌ক্তিক চার শ্লোকবন্ধ গানে প্রথম শ্লোকের পর দ্বিপঙ্‌ক্তিক ধ্রুবপদের ব্যবহার-বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছেন। তবে দ্বিপংক্তিক চার শ্লোকবন্ধ গানেও এমন প্রথম শ্লোকের পর ধ্রুবপদের ব্যবহার-দৃষ্টান্তও যথেষ্ট মেলে (দ্রঃ পয়ারবন্ধে লেখা 'ঘনে বসী থাকে কাহ্ণাঞি—বংশী ১২, ত্রিপদীবন্ধে লেখা 'মুসর বাঁশীর নাদ শুনিআঁ বড়ায়ি : বংশী ১৫ ইত্যাদি)। সুতরাং বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক সূত্র হিসাবে বলা যেতে পারে, প্রধানত চতুঃশ্লোক (দ্বিপঙ্‌ক্তিক বা চারপঙ্‌ক্তিক উভয়ই) সমন্বিত গানে প্রথম শ্লোকের পর ধ্রুপদ বসানো হয়েছে। যে পদগুলিতে 'ধ্রু' অনুল্লেখিত, সেখানে শ্লোকগুলি সবই দ্বিপঙ্‌ক্তিক এবং গানের মোট শ্লোকসংখ্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আঠারো বা ততোধিক। শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেছেন, ধ্রুবপদে দুটি পঙ্‌ক্তিতেই দু-দাঁড়ির ব্যবহার আছে। তাঁর বক্তব্য সত্য হলে স্বীকার করতে হয়, গ্রন্থ সম্পাদক (সা প সং) সেটি উপেক্ষা করে পাঠকদের প্রতি অবিচার করেছেন। চর্যাগানে ধ্রুবপদে পৃথক ছন্দোবন্ধ রাখার প্রশ্ন ওঠে নি, কারণ সব পদগুলিই ধ্রুবপদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। গীত-গোবিন্দের চব্বিশটি গানেই জয়দেব মূল শ্লোকগুলির ছন্দোবন্ধ থেকে ধ্রুবপদে পৃথক ছন্দোবন্ধ রেখেছেন। বড়ু চণ্ডীদাস পৃথক ছন্দোবন্ধ দিয়েছেন। সেটি জয়দেবের আদর্শে কিনা, বিবেচ্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দ্বিপঙ্‌ক্তিক শ্লোকবন্ধ যে গানগুলিতে ধ্রুবপদ অনুল্লেখিত সেখানে সব শ্লোকগুলিই ধ্রুবশ্লোক কিনা এ বিষয়ে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বা শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র প্রমুখ সংগীত বিশেষজ্ঞগণের সুচিন্তিত মতামত পেলে ভাল হয়।

শ্রীমুখোপাধ্যায় প্রত্যেক শ্লোক শেষে পৃথক ধ্রুবপদের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে 'রাধাক মারিআঁ পুনী জিআইল কাহ্নে' (বাণ ২৭) গানটিকে ছয় শ্লোকের পদ বলেছেন। এটি নয় শ্লোকের সুদীর্ঘ গান। ৩৬টি মূল পংক্তি এবং ১৮টি ধ্রুবপংক্তি রয়েছে এতে। তাতে অবশ্য তাঁর মতামত ও মন্তব্যের কোনও তারতম্য ঘটে না।

আমার এ মন্তব্যগুলি সা প সং শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের সপ্তম সংস্করণ (১৩৬৮) ভিত্তিক। পুঁথি পাণ্ডুলিপি দেখার এখনো সুযোগ ঘটে নি। প্রবন্ধটির জন্য শ্রীমুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই।

নীলরতন সেন
দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়

দিল্লীর ডায়েরী

গত ১৫ই জুনের (৩৩ সংখ্যা) 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীখগেন দে সরকারের লেখা 'দিল্লীর ডায়েরী'র খবরের একটা বিষয় পড়ে খুবই আশ্চর্য হলাম। এই সংখ্যায় তিনি দিল্লীর প্রবীণতম বাসিন্দা স্বর্গীয় শ্রীরাসবিহারী সেন (আদুবাবু) সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, যে এই মহান ব্যক্তির দেহাবসানে বাঙ্গালী দের একটা শোকসভাও হয় নি।

তিনি বোধ হয় জানেন না যে, পুরোনো দিল্লীর বাসিন্দারা আদুবাবুর মৃত্যুতে খুবই শোকাতুর হয়ে পড়েন এবং তাঁদের এই সরল হৃদয়, পরোপকারী, নিষ্ঠাবান, বয়োজ্যেষ্ঠের দেহাবসানে বার বার নীরবে চোখের জল ফেলেছেন। এবং কাশ্মীরী গেট বেঙ্গলী ক্লাব তাঁদের এই প্রিয়জনের মৃত্যুতে এক শোকসভার আয়োজন করেছিলেন, বৃহস্পতিবার, ৬ই জুন, ১৯৬৮। এই সভায় দিল্লীর বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা স্বর্গীয় সেন মহাশয়ের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন এবং তাঁর সঙ্গে (সেন মহাশয়) তাঁদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের সূত্র ধরে বলেন যে, আদুবাবু ছিলেন গুণনিধি। এই সভায় আমিও উপস্থিত ছিলাম, তবে শ্রীসরকারের উপস্থিত দেখি নি। এই শোকসভার খবর নিউদিল্লী কালীবাড়ি বেঙ্গলী ক্লাবকে পাঠানো হয়েছিল কাশ্মীরী গেট বেঙ্গলী ক্লাবের তরফ থেকে। 'দিল্লীর ডায়েরী' লেখার সময় শ্রীসরকার যেন নতুন দিল্লীর কয়েকটি

না লেখেন। কারণ, পুরোনো দিল্লীর বাঙালী সমাজও প্রবাসী বাঙালীর অন্তর্গত। তাই নতুন দিল্লীর খবরের ওপর ভিত্তি করে বাকি সব জায়গার খবর না জেনে তা 'দিল্লীর ডায়েরী' আকারে প্রকাশ করা ঠিক উচিত নয়। তাতে যে শুধু কয়েকটি এলাকাকে বঞ্চিত করা হয় তা নয় —বিভিন্ন পাঠকের কাছে (দিল্লী এবং দিল্লীর বাইরে) এখানকার বাঙালী সমাজের এক বিসদৃশ ভাব প্রকাশ করা হয়—যা আদৌ বর্তমান নেই।

দিব্যেন্দু ঘোষ
নিউদিল্লী-১৬

সর্বভারতীয় কবি সম্মেলন

সতীকান্ত গুহ মশাইকে দেখি নি। তাঁর স্কুল দেখেছি। প্রেমেন্দ্র মিত্র মশাইয়ের লেখা পড়েছি, তাঁকে দেখেছি। তিনি সম্প্রতি কয়েক বছরে নানান বিষয়ে খবরের কাগজের বিবৃতিতে সই দিয়েছেন। আবার অবাক হলাম, যখন দেখলাম সতীকান্ত গুহ সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটি দীর্ঘ চিঠির জন্য কলম ধরেছেন তিনি। সেই চিঠিতে তিনি বিমল রায়চৌধুরী সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'ইতর' কথাটি ব্যবহার করেছেন।

যাঁরা সংসারধর্ম পালন করেন, অল্প বয়স থেকে দীর্ঘ বয়স অবধি লেখালেখি করেন—তাঁরা কি অন্তত প্রেমেন্দ্র মিত্র মশাইয়ের বয়সে অন্যকে ইতর সম্বোধন করেন?

আমি কিছু লেখালিখির চেষ্টা করি। বছর দশেক কি কিছু বেশী এইসব চেষ্টার দরুণ বুঝতে পারি—আমি না পড়লেও, যাঁরা কবি, দাগ রাখার কবি—তাদের নাম আমার কানে আসবেই। কানে আঙুল দিয়ে রাখলেও সে নাম আমি অস্বীকার করতে পারব না। হালখাতার দিন লাউডস্পীকারে কত লোকের রেকর্ড বাজে—কিন্তু আদৎ গাইয়ে ছাড়া আর কারও নাম আমরা জানি? মিত্র মশাই আমাদের জন্মের আগে থেকে লেখালেখি করছেন। তাঁকে কি এসব বলে বোঝানোর দরকার আছে?

মিত্র মশাই সতীকান্ত গুহের তরফে যতখানি পরিশ্রম করছেন তার অর্ধেক পরিশ্রমও কি তিনি তাঁর পরবর্তী সমধর্মীদের জন্য করেছেন?

তখন স্বভাবতই প্রশ্ন আসে যে, এই সতীকান্ত গুহ এবং কেনই বা মিত্র মশাইয়ের এতখানি পরিশ্রম?

তিনি শ্রীযুক্ত গুহকে তাঁর এই রচনায় অমর করে দিলেন। গুহ মশাইকে নিয়ে আমরা বিশেষ চিন্তিত না। তা হলে বহু ব্যক্তি সম্পর্কেই চিন্তা ভাবনা করতে হয়। অভিভাবকদের লেখা চিঠিতে অভিভাবকের খেদ আছে, কবির চিঠিতে যুব-কবি সম্পর্কে বক্তব্য আছে—কিন্তু মিত্র মশাই আমার মত সামান্য একজন গদ্য ব্যবসায়ীর জন্যও তো কিছু লিখতে পারতেন। আমরা জানতাম, আমরা তাঁর স্নেহভাজন। সমবয়সী কিংবা আমার চেয়ে বড়কে আমি শাণিত তীর ছুঁড়তে পারি। কিন্তু বয়োঃকনিষ্ঠকে তীর-ছুঁড়তে দ্বিধা করে থাকি। এই হলো মনুষ্যধর্ম।

আর একটা জিনিস, তিনি বিমল রায়চৌধুরীকে লক্ষ্য করে অবাধে লিখলেন। কিন্তু সনাতন পাঠককে বিভাগীয় লেখক বলে রেয়াৎ করলেন কেন? এসব সতর্কতা তাঁর ছবিকে মলিন করে না কি?

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা-১

২

প্রখ্যাত ছোটগল্প লেখক, ঔপন্যাসিক, শিশুসাহিত্যিক, চিত্রপরিচালক, চিত্রনাট্যকার, গীতিকার ও কবি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র লিখিত কবি, ঔপন্যাসিক, শিশুসাহিত্যিক সম্পাদক ও স্কুল-মালিক শ্রীসতীকান্ত গুহ মহাশয় সম্পর্কে লিখিত প্রশংসাপত্রটি অনেক কৌতুকের আকর। আমার একার পক্ষে পত্রের সব কৌতুক আবিষ্কার করা হয়ত সম্ভবপর হলো না, যে কয়টি হলো তা পর পর লিপিবদ্ধ করি।

কৌতুক নং এক

মিত্র মশাইয়ের পত্রপাঠে জানা গেল সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনে শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতি নন্দী, শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী ও শ্রীগৌরকিশোর ঘোষের মতন লেখক ও কবিরা আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন শুধু আনন্দবাজারের পদাধিকার বলে। আনন্দবাজারের 'পক্ষ থেকে' এঁরা নাকি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণও যে সাংবাদিকতার সূত্রে, কবি হিসেবে নয়, 'কবি সম্মেলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট' মিত্র মশাইয়ের এই স্বীকৃতির ফলে অনেকেই সকৌতুকেই প্রশ্ন করতে পারেন যে, গত ১১, ১২ ও ১৩ এপ্রিল যে 'মোচ্ছব'টি হয়ে গেল তা 'কবি সম্মেলন' না 'সাংবাদিক সম্মেলন'?

কৌতুক নং দুই

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের চিঠিতে সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সম্বন্ধে তাঁর অদ্ভুত এক ভয় ও দুর্বলতা আমার মতো আশা করি অনেকেই লক্ষ করেছেন। মিত্র মশাই তাঁর পত্রে মোট আটটি নামের উল্লেখ করেছেন। এই আটটি নামের অধিকারীদের সাতজনই প্রভাবশালী সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত। মিত্র মশাই এই সাতজনকেই 'শ্রী'-যুক্ত রেখেছেন। তাঁর পত্রে উল্লিখিত একমাত্র বি-শ্রী' নাম 'জনৈক' বিমল রায়চৌধুরীর। চৌধুরী মশাইয়ের দুর্ভাগ্য তিনি কোনো সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত নন, থাকলে 'শ্রী' ভাগ্য থেকে হয়ত বঞ্চিত হতেন না। বিখ্যাত 'কে-এক সতীকান্ত গুহ' কথাটার জনক শ্রীসনাতন পাঠকের উক্তিতে 'বিস্মিত ও ব্যথিত' হয়েও মিত্র মশাই তা নেহাত 'লেখনী চাপল্য' হিসেবে মেনে নিয়েছেন। সম্ভবত সাপ্তাহিক পত্রের কোনো বিভাগীয় লেখককে যে চটানো আখেরের পক্ষে লাভজনক নয়, প্রেমেনবাবুর চিঠির এই বৈষয়িক ভূয়োদর্শনটি নিঃসন্দেহে কৌতুকজনক।

কৌতুক নং তিন

মিত্র মশাইয়ের অকৃপণ প্রশংসাপত্র বিতরণের অভ্যাসটিও কম কৌতুককর নয়। মনে পড়ছে, বঙ্গ-বিহার মার্জারকেও মিত্র মশাই প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন একদা। মিত্র মশাইয়ের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত বঙ্গ-বিহার মার্জারের প্রস্তাবটি বাঙালীদের কাছে কিভাবে নিন্দিত হয়েছিল সেটা নিশ্চয়ই আজও কেউ ভোলেন নি। সেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রশংসাপত্র এবার পেলেন সতীকান্তবাবু।

কৌতুক নং চার

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের পত্রের আর একটি কৌতুক, রাজসাক্ষী হিসেবে শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ। তাঁকে কাঠগড়ায় তোলা। মিত্র মশাইর দাবী, সন্তোষবাবু নাকি সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনের 'সমর্থনসূচক' একটি নিবন্ধ আনন্দবাজারে লিখেছেন। ভাগ্যি আমি কোনো ব্যাখ্যার মধ্যে না গিয়ে এই 'সমর্থনমূলক নিবন্ধ' থেকে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করছি। ভালমন্দ পাঠকরা বিচার করুন:

"সুতরাং বড় মাপের যে মোচ্ছব হয়ে গেল, তা আমাদের মতো কয়েকজনের অভিমানের কানেই সুড়সুড়ি দিল।"

কৌতুক নং পাঁচ

শ্রদ্ধেয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের যখন সকলকে আশীর্বাদ করার বয়স তখন এই চিঠিটি লিখলেন, এটাই এই চিঠির সবচেয়ে বড় কৌতুক।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
কলি-২

৩

৮ জুন তারিখের দেশ পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের চিঠি পড়লাম। তাঁর পত্রে আমার নামোল্লেখ দেখছি, এটা আমার পক্ষে শ্লাঘার বিষয়, কিন্তু যে সূত্রে এই উল্লেখ, তাতে কিছুটা ভুল বুঝবার অবকাশ আছে। আমি অবশ্যই আনন্দবাজার পত্রিকার কর্মী, এই পত্রিকার পক্ষ থেকে কখনও কোথাও [illegible] কবি

সম্মেলন'-এর প্রেস কনফারেন্সে আমি আদৌ উপস্থিত ছিলাম না, এবং অধিবেশনেও —সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে নয়—নিতান্ত একজন কবি হিসাবেই উপস্থিত ছিলাম।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
কলকাতা ৫৫

৪

সর্বভারতীয় কবি সম্মেলন সম্বন্ধে বিভিন্ন বাদানুবাদ পড়ে ওই সম্মেলনের এক দিনের একটি ঘটনার কথা জানাবার ইচ্ছা হচ্ছে। প্রথমে ভেবেছিলাম যে, এই ধরনের অনুষ্ঠানে এইরকমই বোধ হয় হয়ে থাকে। (কারণ, এই ধরনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সুযোগ আমার কখনও হয় নি।) তবে এও মনে হয়েছিল যে, উপরোক্ত "এইরকমই" যদি স্বাভাবিক এবং প্রচলিত প্রথাও হয়, তা হলেও এর প্রতিবাদ এবং পরিবর্তন প্রয়োজন।

ঘটনাটা এইরকম:—কবি সম্মেলনে যেদিন কবি মণীশ ঘটক সভাপতি ছিলেন, সেদিন আমি ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রিত না হয়েও উপস্থিত থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে কবির মুখ থেকে কিছু শোনবার আশা করেছিলাম। কিন্তু শুনতে পেলাম না। বোধ হয় সময়াভাবের জন্য! অথচ এমন কোন কোন লোককে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে দেখলাম, যাঁদের নাম ওই দিনের ছাপানো অনুষ্ঠানসূচীতে ছিল না। জানি না, সভাপতির অনুমতি নিয়ে এই অংশ-গ্রহণ হয়েছিল কিনা।—সন্দেহ হয়: বিনানুমতিতে। কাজের সংখ্যা যা দেখছি। আরও সন্দেহ হয় যে, কবিকে কিছু বলবার সুযোগই দেওয়া হয় নি। অন্ততঃ মাইকের মাধ্যমে ঘোষিকাকে অনুরোধ করতে শুনি নি।

সন্দেহ এবং অনুমান ছেড়ে নিশ্চয়তার কথায় আসা যাক। অনুষ্ঠান-শেষে দেখলাম উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে যানবাহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বিশিষ্ট অতিথিদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্যে। আশ্চর্য, উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে কেউই অনুরোধ অবধি করলেন না এই প্রৌঢ় মাননীয় কবিকে রাত সাড়ে এগারোটার পর বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য! যদিও অনেক তথাকথিত 'স্বেচ্ছাসেবী'কে ওই যানবাহনের সুযোগ নিতে দেখলাম। উদ্যোক্তারা হয়ত অনুষ্ঠানের সভাপতিকেও বিশিষ্ট অতিথি বলে গণ্য করেন না। অবশেষে আমার পরিচিত এক দম্পতি, যাঁরা উদ্যোক্তামণ্ডলীর কেউ ছিলেন না, কবিকে বাড়ি পৌঁছে দেন ট্যাক্সি করে। ওই ট্যাক্সিতে আমিও বাড়ি পৌঁছে দেওয়া অবধি ছিলাম বলেই এই বক্তব্য রাখার জোর পাচ্ছি।

প্রসঙ্গতঃ কিছু দিন আগে কলেজ স্ট্রীট উপস্থিত থেকে এবং সেখানে কবিতা সম্বন্ধে শ্রোতৃমণ্ডলীর স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ দেখে খুব ভাল লেগেছিল। এবং মনে হয়েছিল যে, উদ্যোক্তারা আরও একটু বড় জায়গার ব্যবস্থা করলে ভাল করতেন। কারণ, অনেক আগ্রহী শ্রোতাকেই স্থানাভাবের জন্যে ফিরে যেতে দেখেছিলাম। অথচ সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনের ওই দিনে কবিতাপাঠের সময় রবীন্দ্র সদনের শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত বিরাট হলে ব্যাজপরা সুন্দরী মেয়েদের (উদ্যোক্তা-মণ্ডলীকে আন্তরিক ধন্যবাদ) ধরেও 'দর্শক'-সংখ্যা (এঁদের মধ্যে অনেকেই শ্রোতা ছিলেন না বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস) এতই কম ছিল যে, অবাক লেগেছিল; মনে হয়েছিল যে, কলকাতার মত জায়গায়, যেখানে শুনি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী কবিতা-সম্বন্ধীয় পত্রিকা প্রকাশ করা হয়, কবিতা-সম্বন্ধে উৎসাহী লোক এত কম কি করে সম্ভব! বিশেষ করে যেখানে বিভিন্ন ভাষার কবি এবং কবিতার সাথে পরিচয়ের সুযোগ রয়েছে।

এখন মনে হয় যে, প্রথম দিনের অনুষ্ঠানেই হয়ত এইরকম কোন অব্যবস্থা দেখে অনেক উৎসাহী শ্রোতাই (এবং হয়ত উদ্যোক্তাদের মধ্যেও কেউ কেউ!) বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাঁদের অনুপস্থিতির দ্বারা এই ধরনের অসৌজন্যমূলক অকৃতজ্ঞতার নীরব প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

পরিশেষে সনাতন পাঠককে সবিশেষ ধন্যবাদ এই কারণে যে, তাঁর লেখার জন্যেই (ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত, যাই হোক) প্রকাশ্য প্রতিবাদের সূচনা হয়েছে। —অনেকের মনে হতে পারে এটা একটা লজ্জাকর পরিস্থিতি। কিন্তু এতে লজ্জাকর কিছুই নেই। কারণ, এর দ্বারা অসৎ ব্যবসায়ের মূলধন হিসাবে সংস্কৃতিকে ব্যবহার করে এরকম বহু লোকের স্বরূপ প্রকাশ পাবে। আর সংস্কৃতির সুস্থ অগ্রগতির জন্য সেটাই কি প্রধান কাম্য নয়?

সরল শ্রীমানী
কাঁকুড়তলা কয়লাখনি

৫

১৯৬৭ সালে দক্ষিণ কলিকাতার কোনো বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় 'লালকমল-নীলকমল' নামে একটি বই-এর নাম দেখলাম; পাশে গ্রন্থকারের নাম নেই দেখে অবাক লাগল। স্কুল থেকে সরবরাহ করা অন্যান্য বই-এর মতই তার দাম দিয়ে দিতে হলো গোড়াতেই। ছ' মাস বাদে বই ছাপা হয়ে যখন ছাত্রছাত্রীদের হাতে এল দেখলাম গ্রন্থকার স্কুলের রেক্টর শ্রীসতীকান্ত গুহ। ১৯৬৮ সালে তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যতালিকায় একটি নয়, দুটি বই যুক্ত হল— "লালকমল-নীলকমল" (২য় ভাগ) আর "খেয়ার মাঝি ... গ্রন্থকারের রচিত কী কী বই পাঠ্য আছে আমার জানা নেই। এই সব রচনার সাহিত্যিক মূল্য সুধীজনকে বিচার করে দেখতে অনুরোধ করি।

একজন অভিভাবক হিসেবে এর প্রতিবাদ করার দুর্বার ইচ্ছা সত্ত্বেও যে এত দিন করি নি তার কারণ, বর্তমান বাঙালীর সর্বব্যাপী নিষ্ক্রিয়তা। এই হতভাগ্য দেশে যখন জন্মেছি এবং স্কুলেও যখন ছেলে-মেয়েদের পড়াতে হবে তখন অন্যান্য বহুবিধ অন্যায়ের সংগে এ-ও মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই—এই ধরনের দার্শনিকতায় নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছি। কিন্তু যত বিলম্বিতই হোক সব অন্যায়েরই প্রতিবাদ আছে; তা চোখে পড়ল দেশে প্রকাশিত অধ্যাপক অরুণ বসুর এবং তারপর সুব্রত চক্রবর্তী ও সৌমিত্রজিৎ রায়ের পত্রে। কোনো এক মানিক গুহ অধ্যাপক বসুকে প্রতি-আক্রমণ করেছেন এই বলে যে, অধ্যাপক বসুর সম্পাদিত গ্রন্থও তাঁর কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিক্রি হবার জন্যে প্রচারিত হচ্ছে। প্রচার করা আর কোনো অধিষ্ঠানে নিজের সর্বময় কর্তৃত্বের সুযোগ নিয়ে স্বীয় অপাঠ্য রচনাবলী ছাত্রছাত্রীদের পড়তে এবং মুখস্থ করতে বাধ্য করা কি এক কথা? মানসিকতার প্রশ্ন এখানে অবান্তর। প্রশ্ন উঠতে পারে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে কি বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের রচনাই পাঠ্য হত না? অথচ তা নিয়ে কোনো দিন কোনো অভিভাবক তো ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানান নি! কেন তা বাঙালী পাঠক সাধারণ বিচার করুন।

অর্থ মূল্য বা গোষ্ঠীর সমর্থনে সাহিত্যিক খ্যাতি ক্রয়ের এইরকম দৃষ্টান্ত এ পোড়া দেশেও এখন পর্যন্ত বিরল। এবং সাহিত্যরসিক বাঙালী যে এই জাতীয় অপপ্রয়াস নির্বিচারে বরদাস্ত করেন না সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কবি-সম্মেলনকে উপলক্ষ করে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত এই পত্রাবলীই তার প্রমাণ। কিন্তু সাহিত্য জগতে মান্য শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র এই বিতণ্ডায় অংশ গ্রহণ না করলেই বোধ হয় ভাল ছিল।

জনৈক অভিভাবিকা
কলকাতা-২৯

দিল্লীর ডায়েরি

আমাদের আকাশ যাত্রা শুরু এবং গোটা সাতদিনে প্রায় ২০ ঘণ্টা উড়ে গগন-বিহারী সাংবাদিকদের অবস্থা অনুকম্পা-যোগ্য হয়ে উঠল।

ঐ মেঘভারাক্রান্ত আকাশ, অশেষ মেঘের স্তর, তার উপরে আরো আকাশ আরো মেঘ আরো আকাশ, আর পায়ের নিচে অফুরন্ত সবুজের পৃথিবী, আসাম আর নেফার মাটি, অসংখ্য নদনদীর ধাবমান শিরাউপশিরা, আর পাহাড়-পর্বত ও বনের তরঙ্গমালা যার সৌন্দর্যের তুলনা নেই।

গোটা একটি সুপার-কনস্টেলেশন ভরা যাত্রী, ঠাস ভরা, যেখানে (আগেই বলেছি) সামরিক কর্মচারীদের মধ্যে আমরা গুটি-কয়েক প্রাণী। পোশাকে-আশাকে চালচলতিতে কোথাও কোনো মিল নেই। ওদের অনেকে তাকিয়ে তাকিয়ে বুঝবার চেষ্টা করে: কী ব্যাপার! অতোজন অসামরিক ভারতীয়, অসামরিক পোশাক পরে সহযাত্রী? না করে সেলাম, না ঠোকে পায়ের জুতো জেনারেলদের দেখলেও,—কী ব্যাপার।

একত্রে ভ্রমণ করার মজা এই যে, আলাপ না হয়ে যায় না। তাদের অনেকেই জেনে গেলেন বুশসার্ট-পরিহিত এই দশজন কারা এবং কোথায় যাচ্ছে। চার-চারটে সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রতিভূ,—পি টি আই (দেশাই), ইউ এন আই (কৃষণ কুমার), হিন্দুস্থান সমাচার (আগরওয়াল,—দারুণ হিন্দিওয়ালা), ও সমাচার ভারতী (সুরেন্দ্র-কুমার)। হিন্দুস্থান টাইমস (পৃথ্বীশ চক্রবর্তী), পেট্রিয়ট (গোপীনাথ), ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস (দুয়া), স্টেটসম্যান (কোহর), ন্যাশনাল হেরাল্ড (গোপীকৃষ্ণ) এবং আমি।

সংবাদ জগতের দশাবতার চলল আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ভারতীয় বিমান বাহিনীর অতিথি হিসেবে। আমাদের কর্ণধার, পথ-প্রদর্শক, বন্ধু ও উপদেষ্টা দুজন: বিমান বাহিনীর জনসংযোগ কর্মচারী নীল বাতরা (যার নামের সঙ্গে "দেশ" পাঠক-পাঠিকারা অবগত) এবং সেনাবাহিনীর অনুরূপ কর্মচারী ক্যাপটেন মাথুর। এই দুজনের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। একে সাংবাদিক, যাদের চাইতে

আমরা চলেছি পাহাড়ের বুক ঘেঁষে।

বিগ্রহ এবং উপেক্ষাকারী ব্যক্তি পৃথিবীতে হয় না এবং উপরন্তু দশজন,—প্রতিজন নিজ নিজ বিদ্যাবুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের স্বকীয়তায় নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে থাকেন। দশ-জনের দশ রকম পোশাক, দশ কি বারো রকমের রুচি ও অভ্যাস, খাদ্য ও পানীয়তে অনেক বাছ-বিচার (অবিচারও), রাজ-নীতিতে এ-ওর মারমার-কাটকাট,—বাঙালী, কাশ্মীরি, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, কেরলী, গুজরাতি, গারওয়ালী এবং উত্তর প্রাদেশিক (নাকি বিহারী) হানড্রেড পার্সেন্ট হিন্দিওয়ালা। এমনি ব্যক্তি-ভাবাপন্ন দশজনকে একত্রে নিয়ে ঘুরে-বেড়ানোর দায়িত্ব ঐ দুজন সামরিক কর্মচারীর। সোজা কাজ নয়। তাদের অশেষ ধৈর্য।

কেউ বলবে: দ্যাখো বাতরা, সকালে ছটার আগে আমার শয্যা ত্যাগ সম্ভব নয়। এবং আমি চা চাই পাঁচটায়। এক কাপ নয়, এক পট। (আরে বাবা! সাড়ে ছ বাজে নাশতা হো যানা চাহিয়ে, গডসোক, পায়ে পড়ি বাবা, টাইম রাখো")। ক্যাপটেন, আমার বালিশ নেই। স্কোয়াড্রন লীডর বাতরা, গডসোক অমুক লোকটির সঙ্গে আমি একত্র রাত্রিবাস করতে অসম্মত, হি ইজ এ চোর এ্যান্ড ব্যারিশ ইউ নো। ("ঠিক হ্যায় ময় দেখতাহুঁ")। দ্যাখো মাথুর, কী ধরনের কামরা বাবা। ফ্যান টানছে না যে? ("সব ঠিক হো যায়েগা কাল সুবহ্ তক", "তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু হবে!") আরো অনেক স্যাম্পল: হাঁ ভাই, সকালে এক গেলাস লস্যি পাবো তো? জুতো পালিশ চাই। ভাই! হজমের বড়ি আছে তো সঙ্গে? আর যা করো কি না-করো, সন্ধ্যে বেলায় জানো তো আমাদের বড্ডো তেষ্টা পায়,

আসামের আকাশে ওড়া

ঐ যে ইয়েগো, তোমারো তো বাবা ঐ একই তেষ্টা, সুতরাং ডিনারের আগে অন্য কোনো প্রগ্রাম যেন না-থাকে, ওয়ারনিং দিয়ে রাখছি কিন্তু ("হো যায়েগা সব ঠিক হো যায়েগা, নাহি তো হ্যা কিস লিয়ে হু")।

পালাম থেকে প্লেন ছাড়ল অনেক দেরিতে। কেউ সকালের জল খাবার খায়নি। সকাল, মানে রাত্রি সাড়ে চারটেতে কি খাওয়া যায়? ওদিকে প্লেন ছুটেছে গোহাটির দিকে। প্রায় দশটা বাজে। পেট চোঁ-চোঁ করছে। ইণ্ডিয়ান এয়ার-লাইনস নয় যে সেবিকারা হাসিমুখে খাবার নিয়ে আসবে। এ একেবারে পাক্কা মিলিটারী কারবার। খাও না-খাও, বমি করো কি না করো, নিয়ম মেনে চলো, বাস। দুয়েকজন সামরিক কর্মচারীরা কাগজের মোড়ক থেকে খাবার বের করে দিব্যি চিবুতে লাগল। কী আহাম্মুকিই না করেছি, আনলেই পারতাম সঙ্গে।

অভ্যন্তরে একটা ক্রোধের হাঁসফাঁস শুনতে পাচ্ছিলাম। বাপু! আরক্ষা মন্ত্রণালয়! ছাপানো অক্ষরে বলতে পারলে, মশারী নিও সঙ্গে, দুটো চাদর, একটা বালিশ (কোলাপসিবল), পাতলা রেণকোট, ইত্যাদি সঙ্গে আনবে, তোমার মৃত্যুর জন্যে আমরা দায়ি নই ইত্যাদি, আর বলতে পারলে না যে ব্রেকফাস্ট প্যাকেট আনতে হবে সঙ্গে? মৃত্যুর জন্যে যে দায়ি নও বেশ বুঝতে পারছি এই ক্ষুধার্ত সকালে। প্লেন ছাড়লো সকাল আটটায়, আর আমাদের আসতে বলেছো পালামে সেই সাড়ে পাঁচটায়। হোয়াট ইজ দিস?

এই একই মনোভাব দশজনের। দুবার স্রেফ জল খেয়ে যখন পাকস্থলিকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম, তখন দেখি কিনা— কী আশ্চর্য, কী মনোমুগ্ধকর কী অনির্বাচনীয় আস্বাদময়ী বস্তু তোমার হাতে স্কোয়াড্রন লিডার বাত্রা সাহেব। বেশ মোটা মোটা স্যানডুইচ, কাগজের মোড়ক থেকে বের করে হাতে হাতে দিচ্ছে। গপাগপ্ শেষ হয়ে গেল।

আমার পার্শ্বোপবিষ্ট সাংবাদিক পুংগব নিরামিশ খান। ধরে নিল স্যানডুইচ্ নামক হবন খাদ্যটি আমীশ না হয়ে যায় না। "আরে দেখো তো সাঁহ! চিজ হ্যায় অন্দর মে।" কোনো মতে উনি হাতে নিলেন। সন্দেহ যায় না। মধ্যস্থ হলাম আমি। প্রশ্ন করে : ভাই খগেন! বাতাও না এটা কি নিরামিশ স্যানডুইচ্? "দাড়াও বাবা! খুলে দেখে নিই। (মনে মনে বলি, নিজে খাবো না তোমার খাবার পরীক্ষা করব?)" ভেঙে দেখলাম যা, তা ডিমও হতে পারে, চিজও হতে পারে, খুব সম্ভবত ডিম। শুঁকলাম এবং আর সন্দেহ রইলো না। বললাম, "হান্ড্রেড পার্সেন্ট পিওর নিরামিশ, সব দুধের তৈরি, চটপট এবার গলাধঃকরণ করে খাদ্যের প্রতি সুবিচার করো। উনি দিব্যি চিবুতে আরম্ভ করলেন।

বাত্রা সাহেবকে আমরা দু' হাত তুলে সেদিন আশীর্বাদ করেছিলাম : ভগবান তোমাকে অনতিবিলম্বে উইং কমান্ডার করুন, গ্রুপ ক্যাপটেন করুন। যখন সে মস্ত বড় ফ্লাস্ক থেকে গরম কফি দিতে লাগল গেলাসে, আশীর্বাদের হাত আরো উপরে উঠে গেল : হে ভগবান, একে এক ধাক্কায় এয়ার মার্শেল করে দাও, যদি তুমি পার। (জানি, এমন সামান্য কাজও তুমি করতে পারো না)।

জাহাজ চলছে দিব্যি। নিচে শুধু মেঘ, জানলা দিয়ে উঁকি দেওয়ার কোনো মানে নেই, নেহাৎ অভ্যাসে চোখ ওদিকে চলে যায়, মাটিকে আর পৃথিবীর গাছগাছড়া

দেখার গোপনকৃত ইচ্ছায়। তাতে যেন প্রাণে একটু জল আসে। অন্যথায়, ঐ একঘেয়ে গোঁ-গোঁ আর্তনাদ বিমান ইনজিনের এবং তারই প্রতিধ্বনি যাত্রীদের অন্তরে। বিরাট চোরভোম, ফরাসীরা যা বলে "আঙউই", যা জীবটাকে করে দেয় শুকনো, যখন চোখ বুজে ঘুমোনো যায় না, চোখ চেয়ে থাকা যায় না, উঠতে ইচ্ছা করে না, বসে থাকতে ইচ্ছা করে না, কথা বলা অসম্ভব, বই পড়তে বাসনা যায় কিন্তু পড়া হয় না (পেরি মেসন্ যদি না হয়), কী এক ব্যক্তি-বহির্ভূত পরিবেশ, "কেল্ আঙ্উই।"

বিমানযাত্রীদের আজকাল মান অত্যন্ত উঁচু। জেট বিমান না-হলে জাত থাকে না। টারবো-প্রপ্? আরে ছোড়ো বাত্। ডেকোটা? কী সরমের কথা? ওতে চড়ে এখনো বেঁচে আছো? ব্রেকফাস্ট: কী যে বাজে হচ্ছে আজকাল আমাদের এয়ারলাইনসগুলোতে। আর এই সব আগ্লি এয়ার হোসটেস, চোখ তুলে চাওয়া যায় না (মেনে মনে প্রার্থনা করছে, হে যুবতী! একবার আমার চোখে চোখ রেখে অর্থপূর্ণ মৃদু হাসিতে তোমার রক্তিম ওষ্ঠাধর বিস্ফারিত কর)। আর সার্ভিস? এটাকে সার্ভিস বলে? এবার থেকে এয়ার-কনডিসনড্ রেলে আসব। অনেক ভাল। হাওয়াই জাহাজ না তো পাল-তোলা নৌকো।

হবে না, জীবনের মান উঁচু হবে না। অতগুলো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পেরিয়ে এলাম আমরা, আর জীবনের মানদণ্ড উঁচু হবে না? কিন্তু আমরা সাত দিন বিমান বাহিনীর অতিথি হিসেবে অভিজ্ঞতা থেকে বলব: বেঁচে থাকুক তোমার অ-জেট বিমানগুলো, তারা অত্যন্ত কাজের জিনিস, আমাদের কোনো নালিশ নেই, কারণ আমরা বেড়াতে যাই নি, তোমাদের অভিজ্ঞতার একটু অংশ নিতে এসেছিলাম।

আমরা গোহাটিতে নেমে গেলাম। প্লেন বদলাতে হবে। যাবো জোরহাট। হাতে সময় অনেক, কারণ আবহাওয়া খারাপ। বহু সমাদরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল স্থানীয় বিমান বাহিনীর মেস বাড়িতে। বেশ সাজানো-গোছানো বসার ঘর, পাতলা পর্দা উড়ছে জানলায়। অনেক যত্ন করে তারা আমাদের দিলেন পানাহার। ওদিকে অফিসারবা ক্ষণে-ক্ষণে টেলিফোন করছেন কোথায় কে জানে। জানালেন, যাওয়া হয়তো হবে না। রাস্তায় অত্যন্ত মেঘ ইত্যাদি।

কিন্তু তিন ঘণ্টা পরে হঠাৎ এল সুখবর। আবহাওয়া ভাল হয়ে গেছে, জলদি চলো। কোথায় ভেবেছিলাম এবার একটু বিশ্রাম নেবো, হাত-পা ছেড়ে একটু শোবো একটা বই হাতে নিয়ে, তা হবার নয়। ওঠো কেনেডার তৈরি বিমান যার নাম হল "ক্যারিবু" (মানে, মহিষ)। বসার জায়গা ফিতে দিয়ে তৈরি। পেছনে ল্যাজের দিকটা বৈদ্যুতিক শক্তিতে খুলে যায় আর বন্ধ হয় (মালপত্র তোলা-নামার জন্যে), তখন শব্দ ওঠে কোঁ-কোঁ-কোঁ, তীক্ষ্ণ বাঁশীর মতো।

নিচে বিরাট ব্রহ্মপুত্র আর আমরা উড়ে যাচ্ছি এই ব্রহ্মালয় আসামের উপর দিয়ে। সবুজ আর জল, বন, গাছ, পাহাড়, ক্ষেত আর নদী, সবুজ আর জল। ব্রহ্মপুত্রকে সাক্ষী রেখে আমরা উড়ে এলাম জোরহাটে।

আমাদের প্রথম বন্দর জোরহাট। চা খাওয়ার পর, প্রত্যেককে বলা হল কে কোথায় থাকবে, কোন্ কামরায় কোথায়। আমরা তিনজন, পৃথ্বীশ, কৃষ্ণকুমার ও আমি পেলাম যাকে ওখানে বলা হয় ভি-আই-পি ঘর। অন্যরা আপেক্ষিক হরিজন।

খগেন দে সরকার

আমাদের একজন বিমান-চালক, উইং কম্যান্ডার ভান্ডা

সাহিত্য সংবাদ

মারাঠী কবিতা

দিলীপ চিত্রী সম্পাদিত মারাঠী কবিতার একটি ইংরেজী অনুবাদ সংকলন চোখে পড়লেই হাতে নিয়ে ভক্ষ্যানি উল্টে-পাল্টে দেখতে ইচ্ছে করে, প্রধানত তার মুদ্রণ সৌকর্যের কারণে। এমন যত্ন করে ছাপানো বইটি ভারতবর্ষ থেকেই প্রকাশিত—প্রথমে বিশ্বাস হতে চায় না। এই সংকলনটি একটি সাধারণ গ্রন্থমালার অন্যতম—যে গ্রন্থমালার পরিকল্পনা আছে—প্রত্যেকটি ভারতীয় ভাষার কবিতা সংগ্রহ ইংরেজীতে প্রকাশ করা এবং যার মূলে সম্পাদক প্রভাকর পাঠ্যে।

বেশী সংখ্যক কবিতার অনুবাদ দিলীপ চিত্রী নিজেই করেছেন, একটি দীর্ঘ ভূমিকায় তিনি বর্ণনা করেছেন বর্তমান মারাঠী কবিতার আয়তন ও বিস্তার। ১৯৪৫ থেকে ৬৫—এই কুড়ি বছরে রচিত কবিতাই তার নির্বাচনের ভিত্তি।

মারাঠী কবিতায় ইতিহাসের সঙ্গে বাংলা কবিতার ইতিহাসের খুব একটা তফাত নেই। সাত শো বছর আগে শুরু হয়েছে এই ভাষার সাহিত্য, বাংলারই মতন ধর্মাশ্রয়ী রচনাধারা প্রবাহিত হতে হতে গত শতাব্দীতে নানা তরঙ্গসংকুল আবর্ত তৈরী হয়েছে। মধ্যযুগের প্রখ্যাত মারাঠী কবি দানদেব—সম্পাদক তাঁর সঙ্গে তুলনা করেছেন দান্তের, সপ্তদশ শতাব্দীতে ছিলেন সন্ত তুকারাম। তারপর ইংরেজ আমলে যথারীতি শুরু হলো বিলাতী ধরনের রোমান্টিক কাব্য, ইংরেজী সাহিত্যের রোমান্টিকতা বিরোধী আন্দোলনের ঢেউ অনেক দেরিতে এ দেশে পৌঁছোনোর ফলে তার প্রভাবও হলো রোমান্টিক, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাছাকাছি এসে দুটো বিপরীত স্রোতের জন্ম—ইংরেজী মণ্ডুকতা থেকে মুক্তি পেয়ে সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যের নির্যাস এসে পড়লো হৃদয়সমীপে, ওদিকে আর একটা টান এলো ঘরে ফেরার—দেশজ আচার ও কাছাকাছির অরণ্য প্রান্তর নদী মেঘমালার প্রতি নতুন করে আবেগ দেখা দিল—এবং এই সংমিশ্রণ থেকেই উৎপন্ন হলো এক নতুন ভাষা ও সাহিত্য। বাংলা থেকে মারাঠীদের শুধু এইটুকু তফাত যে, তাদের সাহিত্যে তাঁরা কখনো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতন কোনো মহীরূহসদৃশ একক প্রতিভার গ্রাসে পড়েন নি। (বস্তুত, হিন্দী, অসমীয়া, ওড়িয়া প্রভৃতি অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে এক সময়—কিন্তু মারাঠী সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কখনো পড়েছে কিনা তা জানা গেল না, কেন না, দিলীপ চিত্রীর দীর্ঘ ভূমিকায় এলিয়ট, পাউন্ড, রিলকে, বোদলেয়র, র‍্যাঁবো, লাফর্গের উল্লেখ থাকলেও রবীন্দ্রনাথের নামগন্ধ পর্যন্ত নেই। বারংবার উল্লেখে, এজরা পাউন্ড সম্পর্কে দিলীপবাবুর বেশ খানিকটা দুর্বলতা আছেই মনে হলো এবং অবাক হলাম। ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র কিংবা অধ্যাপক ছাড়া অন্য কারুরও যে এখনো পাউন্ডের একঘেয়ে বিরক্তিকর কবিতা সম্পর্কে কোনো আগ্রহ থাকতে পারে—এ ধারণা আমার ছিল না।

অধুনাতন মারাঠী কবিতার প্রতিনিধি-স্বরূপ চারজন বিশিষ্ট কবি সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন দিলীপবাবু। এঁরা হলেন, বাল সীতারাম মারধেকার, পি এস রেজে, মনোমোহন নাটু এবং অরুণ কোলাটকার। মারধেকার-এর আগমন 'কয়েকটি কবিতা' নামের একটি চটি বই নিয়ে। মলাটে একটি দুর্বল, বিকৃত, হাস্যোদ্রেককারী পুরুষের ছবি, কবিতাগুলি তিক্ততম হতাশার। অত্যন্ত হইচই পড়ে গিয়েছিল এই বই নিয়ে, অশ্লীলতার অভিযোগে আদালতে পর্যন্ত গিয়েছিল। তাঁর কবিতা, অসংযত, উদ্দাম, এলোমেলো এবং অনেকাংশে দুর্বোধ্য কিন্তু মারাঠী কবিতায় তাঁর প্রভাব অপ্রতিরোধ্য। রেজে-এর বিপরীত, তাঁর কবিতা শান্ত ও চমকহীন, তাঁর সম্পর্কে সমালোচকদের দ্বিমত নেই। মনোমোহন নাটু-কে বলা হয়েছে যুদ্ধোত্তর কালের সবচেয়ে অরিজিনাল কবি, সমসাময়িকদের মধ্যে তাঁর সুনাম না হলেও তরুণদের মধ্যে এঁর প্রভাব যথেষ্ট। এঁর কবিতা দুর্দান্ত, অশিক্ষিত, কর্কশ ও প্রাণবন্ত। তাঁর একটি বিখ্যাত দীর্ঘ কবিতার নাম 'সময়ের সহযাত্রী'—হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পটভূমিকা নিয়ে লেখা। অরুণ কোলাটকার নিপুণ ও স্নিগ্ধবাক, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব ও যৌন রূপকল্পে তাঁর কবিতার রীতি এক্সপ্রেসানিস্টদের কথা মনে পড়ায়।

এই চারজন ব্যতীত, এই সংকলনে আছে আরও ১৬ জনের কবিতা। দিলীপ চিত্রীর নিজের কবিতাও আছে। বাংলা দেশে পূর্ব পরিচিত, তরুণ মারাঠী কবি অশোক শেহানীর কবিতা এই সংকলনে কেন নেই,

তা জানা গেল না। এই কবিদের মধ্যে অনেকেই গল্প-উপন্যাস লেখক হিসেবেও স্বার্থক, কেউ কেউ ঔপন্যাসিক হিসেবেই বেশী বিখ্যাত। বেশ কয়েকজন কবি ছবি আঁকতে পারেন, কেউ কেউ বিজ্ঞাপনের ছবি [illegible] লে-আউটে দক্ষ, বিজ্ঞাপন অফিসে চাকরি কারুর কারুর জীবিকা। অনেকেই বিদেশ-ফেরত, কেউ কেউ আবার চাকরি ছেড়ে শুধু সাহিত্য-কার্যে ব্যাপৃত হতেও ভরসা পান। যেমন দিলীপবাবু নিজে চাকরি ছেড়ে কবিতা রচনা ও অনুবাদই প্রধান কাজ হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

মারাঠী কবিতার আলোচনা করতে বসে, আমি কবিতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষত কিছু না বলে, এই কবিতা বিষয়ক কিছু খবর বা গল্পই পরিবেশন করলাম। আসলে, অনুবাদ কবিতা, বিশেষত ইংরেজিতে অনূদিত ভারতীয় কবিতা সম্পর্কে আমার বিশেষ ভয়।

The blue sky is Hari
And the lone star Radha—
Tremulous
She is the heart's longing from
age to age.

এই চারটি লাইনকে কোনোক্রমেই কবিতা হিসেবে স্বীকার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই বস্তাপচা ভাবসমন্বিত লাইন চারটিতেও সরল কবিদের সৌকুমার্য থাকা সম্ভব একমাত্র [illegible] ভাষা ব্যবহারে। মূলে হয়তো তা আছে—কিন্তু ইংরেজী শব্দগুলি পড়ে সেন্টিমেন্টাল গ্লাস ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না। শব্দই কবিতার প্রাণ, তাই একনিষ্ঠভাবে সেই মূল শব্দের পরিবারের বন্দনাকারী। যাই হোক, কবিতার রস এসব অনুবাদে যেমন [illegible] থাক বা না থাক, অন্য ভাষার কবিতা ও কবিদের সম্পর্কে খবর বা গল্প জানতে আমার ভালো লাগে। আশা করি, অনেকেরই লাগে।

নতুন পত্রিকা

এবার তারাপদ রায় একটি নতুন পত্রিকা বার করেছেন, নাম, 'কয়েকজন'। সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম নেই, 'আপাতত তিনি দেখাশুনো করছেন।' এই একটি অভিনব এলোমেলো পত্রিকা পাঠকদের কাছে খেলো ভাবে [illegible] এনে দেবে। হলুদ রঙের মলাটের ওপর থেকেই শুরু হয়েছে তারাপদ রায়ের লেখা পত্রিকার উদ্দেশ্য, লেখক পরিচিতি, নানাবিধ টুকিটাকি খবর। 'গত কয়েক বছরে বাংলা সাহিত্যে যে নতুন ঘরানার সৃষ্টি হয়েছে, সেই ঘরানার সকলকে যা ইচ্ছে লেখবার জন্য একটি আন্তরিক চেষ্টা, কয়েকজন।' ●

এই সংখ্যার একটি লেখার নাম : 'সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত খান হলেন না অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে পুনরায় হত্যার চেষ্টা।' বিমল রায়চৌধুরী তাঁর স্ত্রী কবিতা 'সংহত কাব্য-গ্রন্থের সমালোচনা লিখেছেন, 'নৌকোর বই।' শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার নাম, 'অনেক-গুলি শব্দের কাছে আজ আমার দুটি', শান্তিকুমার ঘোষের কবিতা 'শারদীয় ভাষার অকাল বোধন', জ্যোতির্ময় দত্ত লিখেছেন, 'পাখিরা যে-হেতু ভ্রমণ করে না' এবং শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, 'পাশের বাড়ির খবর।' কবি সুরজিৎ দাশগুপ্ত এবং কবি সুরেশ্বর মল্লিক এখানে এই প্রথম গল্প লিখেছেন, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত লিখেছেন, 'আসংলগ্ন', শংকর চট্টোপাধ্যায় ও প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত কবিতায় লিখেছেন গোলোক ধাঁধা ও ফুটপাথের ম্যাজিক। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, কবিতায় তিনি কোনো কথা দিতে পারবেন না। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় রূপ দিয়েছেন বিশুদ্ধ পাগলামির, অপ্রকাশিত তাঁর খাজু গদ্যে সুনীল বসু লিখেছেন 'কি চাই না, কি চাই।' এই পত্রিকার সব লেখা আলাদা স্বাদের।

সনাতন পাঠক

সম্পর্কে সেই স্মরণীয় উক্তি যে তিনি **Reconciled from everything that stood for he**—কি এর দ্বারাই ব্যাখ্যাত?

আলোচ্য খণ্ডের চিঠিগুলি দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গেই কবির পত্র বিনিময়ের সংকলন। এই দুটি বিরাট ব্যক্তিত্বের অনেক ধ্যান-ধারণা, দুটি ভাবুক মনের অনেক কল্পনা ব্যাকুলতা এবং নিবিড় সম্পর্কের পরিচয়ে দশম খণ্ডটি স্মরণীয় হবে। এর মোট আটান্নখানি চিঠির মধ্যে ছেচল্লিশখানি রবীন্দ্রনাথের এবং বাকীগুলি দীনেশচন্দ্রের লেখা। রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিঠিখানির তারিখ জুন ১৮৯৮ এবং শেষ চিঠিখানা লিখছেন ময়মনসিংহ গীতিকা পড়ে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে। কিন্তু ময়মনসিংহ গীতিকা বাংলা পল্লী-হৃদয়ের গভীর স্তর থেকে স্বতঃ উচ্ছ্বসিত উৎস, অকৃত্রিম বেদনার স্বচ্ছধারা।' একটি চিঠিতে কবি লিখেছেনঃ 'তর্ক বিতর্কের আন্দোলনে ক্ষুব্ধ হইবেন না। সাহিত্যক্ষেত্রে নামিয়া কোন প্রকার কুশের কাঁটা পায়ে ফোটে নাই এমন সৌভাগ্যবান কে আছে?' এই উপদেশ কি বিচলিত কবির নিজের উদ্দেশেই আত্মসান্ত্বনা? বিরূপ সমালো-

চনার আঘাতে আপন প্রবণতার বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও যিনি একদিন তাঁর কবিতার মধ্যে পেঁকো নর্দমা, কাঁঠালের ভূতি আর মাছের কানকো জড়ো করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁর মুখে এই উক্তি স্বভাবতই অনুরূপ প্রশ্ন জাগায়।

দীনেশচন্দ্রকে শান্তিনিকেতনে নিমন্ত্রণ করছেন কবি বিভিন্ন চিঠিতে। সেই আমন্ত্রণের আত্মীয়তা ও সৌজন্য আমাদের অভিভূত করে। দীনেশচন্দ্র সম্পর্কে কবির শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল। দীনেশচন্দ্রের একটি চিঠিতে (পত্র সংখ্যা ৫) 'ক্ষণিকা'র সমালোচনা পড়ে আনন্দিত কবি লিখছেন: 'আপনার সমালোচনাটি কবির পক্ষে যে কত উপাদেয় হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না।' বিলেতে দীনেশচন্দ্রের History of Bengali Language and Literature গ্রন্থটির সমাদর দেখে গর্বে উৎফুল্ল কবি Everymans Library Series-এর মধ্যে বইটিকে চালাবার উপদেশ দিচ্ছেন। পথ বাতলে দিয়ে তিনি লিখেছেন: 'Ernest Rhys ওই Series-এর Editor। আমাদের কালীমোহনের সঙ্গে তাঁহার খুব ভাব হইয়াছে।' দীনেশচন্দ্রের সাহিত্যিক কৃতিত্ব সম্পর্কে কবি তখন এতই শ্রদ্ধা পোষণ করছেন যে একটি চিঠিতে তাঁর সঙ্গে 'Collaboration-এ' গল্প লিখবার কথাও ভেবেছেন। অথচ ১৯৩৬ সালে কী আশ্চর্যভাবে রবীন্দ্রনাথের এই সুর বদলে গেছে। বৃহৎ বঙ্গের সমালোচনার জন্যে দীনেশচন্দ্রের প্রায় মিনতিপূর্ণ পত্রের উত্তরে কবি রূঢ় ভাষায় জানাচ্ছেন: 'গ্রন্থ সমালোচনা আমার ব্যবসা নয়, কাজটা অপ্রিয়।' রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এই আঘাত প্রায় অপ্রত্যাশিত। রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবের কারণ অবশ্য খুব দুর্বোধ্য নয় কিন্তু লক্ষণীয় আজীবনের সতর্কতা সত্ত্বেও কবি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্য থেকে এখানে বিচ্যুত হয়েছেন।

দীনেশচন্দ্রের লেখা চিঠিগুলিও ওই একই কারণে অনুধাবন যোগ্য। বিশেষ করে যে চিঠিগুলির উত্তর প্রত্যুত্তর মিলিয়ে পড়া যায় সেগুলিই সবচেয়ে উপাদেয়। এই সংকলনের বিশেষ আকর্ষণ দীনেশচন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত সুন্দর জীবনী।

১৯৪/৬৭

ভ্রমণ

নদী জপমালা। জ্যোতি চৌধুরী। ছাত্র শিক্ষা নিকেতন। ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম ছয় টাকা।

আজকাল কোথাও গেলে সেইসব স্থানের বিবরণ দিয়ে ও কাল্পনিক একটি প্রেম-কাহিনী তার মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে যে কাহিনী ও ভ্রমণের ইতিহাস লেখা হয়, তাকে ভ্রমণ-কাহিনী বলে। এটি প্রায় একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে এবং ভ্রমণ-কাহিনীতে বইয়ের বাজার ছেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বেশির ভাগ ভ্রমণ কাহিনী পাঠযোগ্য নয়, কষ্ট কল্পনায় ভর্তি এবং উচ্ছ্বাসে ভরপুর থাকে; কিন্তু জ্যোতি চৌধুরীর 'নদী জপমালা' এ-জাতীয় বই-এর থেকে একটি সুন্দর ও সুদূর ব্যতিক্রম বলে বোধ হল। লেখক বিদগ্ধ, একটি অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিক মন, দেখবার চোখ এবং লেখবার ভাষা তাঁর আয়ত্তে। গঙ্গাযমুনার উৎস-সন্ধানে এই ভ্রমণ কাহিনীটি প্রায় ছোট ছোট শব্দ ও বর্ণনায় মিনে করা সুগঠিত গহনার মত, জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ অথচ ক্লান্তিকর, উচ্ছ্বাসবহুল, ও আত্মকেন্দ্রিক নয়। কোন তত্ত্বজ্ঞান নয়, মোক্ষলাভের যন্ত্রণা-কঠিন পরীক্ষায় পুণ্য সঞ্চয় নয়, সংসারের কোলাহলে ক্লান্ত দেহমনে বিশ্রামের অবকাশ খোঁজা, হিমালয়ের গভীরে পালিয়ে যাওয়া এবং কিছু শান্তি পাওয়া যে লেখকের উদ্দেশ্য, সেই ভ্রাম্যমাণ লেখকের কাছ থেকে পাঠকও কিছু আনন্দ পারেন নিশ্চয়।

১৯।৬৮

পত্রিকা

একাল (১ম ও ২য় সংখ্যা)। সম্পাদক: শিব ভট্টাচার্য। একাল গোষ্ঠি: গৌহাটি-১১।

শুধুমাত্র কবিতা নিয়ে ইদানীং বহু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে দেখা যাচ্ছে। ছোট গল্পের পত্রিকার সংখ্যা সে তুলনায় নগণ্য। এ কথাটা বিবেচনা করলে আলোচ্য পত্রিকাখানি স্বাগত লাভের যোগ্য। এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যম। বাঙলার বাইরে থেকে প্রকাশিত বলে প্রধানত নতুন ও অখ্যাত স্থানীয় লেখকদের রচনাই এতে পাওয়া যায়। তাহলেও সম্পাদক সংখ্যাদুটিতে রচনাগুলির একটা উঁচু মান রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। পত্রিকাখানির প্রকাশে একাল গোষ্ঠির সাহিত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

খেলার মাঠে

পেশাদার ও অপেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের নিয়ে আয়োজিত প্রথম উইম্বলডনে পেশাদার খেলোয়াড়দেরই জয়জয়ন্তী এবং গুণের নিরিখে যে পুরুষ ও মহিলাকে বাছাই তালিকায় এক নম্বর স্থান দেওয়া হয়েছিল, তাঁদেরই চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ। তবু প্রথম মিশ্র টেনিসের জমকালো আসরের ফলাফল থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয়েছে, কীর্তিখ্যাত পেশাদার খেলোয়াড়রা অপেশাদারদের কাছেও অজেয় নন। অনেক মহারথীকেই হার স্বীকার করতে হয়েছে অ্যামেচারের মাঝারি শক্তির রথীদের কাছে।

অবশ্য সামগ্রিক বিচারে প্রোফেশনালরাই সম্মানের সিংহভাগ ছিনিয়ে নিয়েছেন বিশ্ব টেনিসের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ প্রথম প্রতিযোগিতার আসর থেকে। পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে শুধু মিক্সড ডাবলসের পুরস্কার ছাড়া পুরুষদের সিংগলস ও ডাবলস এবং মহিলাদের সিংগলস ও ডাবলস—চারটি বিষয়ের বিজয়ীর পুরস্কারই আজ পেশাদার খেলোয়াড়দের হাতে।

পুরুষ বিভাগের চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার পেশাদার খেলোয়াড় রড লেভার, যিনি অ্যামেচার জীবনে ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালে পর পর দু' বছর চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছিলেন। আর অ্যামেচার হিসাবে গত দু' বছরের মহিলা চ্যাম্পিয়ন আমেরিকার মিসেস বিলি জিন কিং (ক্রীড়াকীর্তি দ্রষ্টব্য)। এবার উইম্বলডন বিজয়িনী হয়েছেন পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে। সুতরাং রড লেভার মোট তিনবার এবং টেনিস পটীয়সী মিসেস কিং উপর্যুপরি তিনবার উইম্বলডন জয় করলেন। টেনিস-জগতে দুজনেই অনেক কীর্তির অধিকারী। সে কথা পরে। তবে আগে দেখা যাক অ্যামেচার ও প্রোফেশনাল খেলোয়াড়দের এই প্রথম মিশ্র প্রতিযোগিতার কি তাৎপর্য, নামী খেলোয়াড়দের মধ্যে কার কি ভূমিকা, ভারতীয় খেলোয়াড়দেরই বা ভূমিকা কি।

সবাই জানেন, বর্তমানে পেশাদার খেলোয়াড়রা তিন শিবিরে বিভক্ত। একটি জর্জ ম্যাককলের গ্রুপ। আর একটি ডেভ ডিক্সনের গ্রুপ। তৃতীয় শিবিরের খেলোয়াড়রা কোন গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন। অ্যামেচার জীবনে প্রতিষ্ঠার পর কেউ ৩০ হাজার, কেউ ৪০ হাজার, কেউ বা ৬০।৬৫ হাজার ডলারের চুক্তিতে টেনিস খেলাকে জীবনের বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কারো সাথে পেশাদার প্রবর্তকদের চুক্তি এক বছরের, কারো বা দুই কি তিন বছরের। এ ছাড়াও বোনাস অর্থ আছে। প্রসংগত বলা যায়, ১৯৫৭ সালে কেন রোজওয়াল ১৩ মাসে ৬৫ হাজার ডলারে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। ঐ বছরই লুই হোড এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ডলারে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন দু' বছরের জন্য। গতবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান জন নিউকোম্ব গত-বারই ৬৫ হাজার পাউন্ডে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তিন বছরের জন্য। যাই হোক, পেশাদার খেলোয়াড়রা অসাধারণ নৈপুণ্য এবং প্রভূত অর্থের অধিকারী হয়েও অ্যামেচারদের সঙ্গে খেলার সুযোগ পেতেন না। অ্যামেচাররাই ছিলেন ক্রীড়াসমাজে নৈকষ্য কুলীন।

কিন্তু আজ হাওয়া বদলে গিয়েছে। পৃথিবীতে সবচেয়ে রক্ষণশীল বলে যাঁরা পরিচিত সেই ইংরেজ জাতিই তাঁদের গোঁড়ামি ত্যাগ করে পেশাদার ও অপেশাদারদের মধ্যকার বাধার প্রাচীর ভেঙে দিয়েছে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও।

তিনবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন বিশ্বের এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় রড লেভারের ক্রীড়া ভঙ্গি

বিজয়িনীর পুরস্কার স্বর্ণ রেকাবী হাতে উপর্যুপরি তিন বছরের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন আমেরিকার লং বীচের টেনিস পটিয়সী মিসেস বিলি জিন কিং

তাই অভিজাতদের ক্রীড়া-কানন ঐতিহাসিক উইম্বলডনের সবুজ কার্পেটের উপর শেষ পর্যন্ত পেশাদার খেলোয়াড়দের পায়ের ছাপ পড়েছে। উইম্বলডন হয়েছে মহা টেনিসের মুক্ত আসর।

বলা বাহুল্য, দুই চ্যাম্পিয়ন রড লেভার বা বিলি জিন কিং কেউই তৃতীয়বার বিজয়ী হবার সুযোগ পেতেন না, যদি আজ তাঁদের সামনে উইম্বলডনের সিংদরজা খুলে না যেত। আগে উইম্বলডন বিজয়ীকে এক নম্বর খেলোয়াড়ের অলিখিত সম্মান দেওয়া হত। আজ উইম্বলডন বিজয়ী প্রকৃত অর্থেই বিশ্ব টেনিসের এক নম্বর খেলোয়াড়। শুধু শ্রেষ্ঠ সম্মানই নয়, সম্মানের সঙ্গে আজ আর্থিক পুরস্কারও। সে অর্থের পরিমাণও কম নয়। পুরুষ বিভাগের বিজয়ী রড লেভার পেয়েছেন দু' হাজার পাউন্ড, আরও ২৫ হাজার পাউন্ড পাবার সম্ভাবনা। মহিলা চ্যাম্পিয়ন মিসেস কিং পেয়েছেন ৭৫০ পাউন্ড। প্রথম ওপেন উইম্বলডনে পুরস্কার হিসাবে মোট দেওয়া হয়েছে ২৬১৫০ পাউন্ড।

*

পশ্চিম জার্মানীর বিস্ময় সৃষ্টিকারী খেলোয়াড় উইলহেলম বুংগার্ট ও সুইডেনের জান এরিক লান্ডকুইস্ট ছাড়া পৃথিবীর পেশাদার-অপেশাদার সব নামী খেলোয়াড়ই প্রথম ওপেন উইম্বলডনে নাম দিয়েছিলেন। ১৯৫২ সালের চ্যাম্পিয়ন এবং বর্তমানে পেশাদার অস্ট্রেলিয়ার ফ্রাঙ্ক সেজম্যান অবশ্য হাতের আঘাতের জন্য প্রতিযোগিতা আরম্ভের আগে নাম প্রত্যাহার করেছেন।

অংশ গ্রহণকারী নাম-করা পেশাদারদের মধ্যে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ৮জন—রড লেভার, কেন রোজওয়াল, রয় এমার্সন, লুই হোড, ফ্রেড স্টোলে, জন নিউকোম্ব, টনি রোচ ও আওয়েন ডেভিডসন। আমেরিকার ৪জন—পাঞ্চো গঞ্জালেস, ডেনিস রালস্টন, আর্ল বুকোলজ ও অ্যালেক্স অলমেডো (পেরুর অধিবাসী)। যুগোস্লাভিয়ার নিকোলা পিলিক, দক্ষিণ আফ্রিকার ক্লিফ ড্রিসডেল, স্পেনের এন্ড্রেস জিমিনো প্রভৃতি। আর অ্যামেচারদের নাম-করাদের মধ্যে ছিলেন স্পেনের ম্যানুয়েল সান্তানা, আমেরিকার ক্লার্ক গ্রেবনার ও নিগ্রো আর্থার অ্যাস, হল্যান্ডের টম ওকার, অস্ট্রেলিয়ার বিল বাউরি ও কেন ফ্লেচার, ডেনমার্কের উলরিচ, গ্রীসের কালোজিরোপাস, দক্ষিণ আফ্রিকার রে মুর ও বব হিউইট (অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিবাসী), রাশিয়ার এলেক্স মেত্রেভেলি, ভারতের রামনাথন কৃষ্ণন প্রভৃতি।

নাম-করাদের মধ্যে ৯জন ছিলেন উইম্বলডনের প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স। চ্যাম্পিয়ন ৬জন, রানার্স ৩জন। চ্যাম্পিয়নদের মধ্যে রড লেভার (১৯৬১-৬২), রয় এমার্সন (১৯৬৪-৬৫), লুই হোড (১৯৫৬-৫৭), অ্যালেক্স অলমেডো (১৯৫৯), ম্যানুয়েল সান্তানা (১৯৬৬) ও জন নিউকোম্ব এবং রানার্সদের মধ্যে কেন রোজওয়াল (১৯৫৪-৫৬), ফ্রেড স্টোলে (১৯৬৩-৬৪) ও ডেনিস রালস্টন (১৯৬৬)। ম্যানুয়েল সান্তানা বাদে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স সবাই পেশাদার খেলোয়াড়।

যেহেতু বিশ্ব টেনিসে পেশাদাররাই বেশী পটু, সেহেতু বাছাই তালিকায় ১৬ জনের মধ্যে মাত্র ৩জন অ্যামেচার স্থান পেয়েছিলেন। এঁরা হচ্ছেন ম্যানুয়েল সান্তানা, টম ওকার ও আর্থার অ্যাস। কিন্তু বহু প্রতিষ্ঠিত প্রোফেশনালকেই বাছাই-বহির্ভূত অ্যামেচারের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে। যেমন তৃতীয় রাউণ্ডে ৩ নম্বর বাছাই ও প্রতিষ্ঠিত পেশাদার স্পেনের আন্দ্রেস জিমিনো হেরেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার রে মুরের কাছে। ৮ নম্বর বাছাই ও পেশাদার গঞ্জালেস হেরেছেন রাশিয়ার মেত্রেভেলির কাছে। অ্যামেচার

ক্রীড়া কাল

বিলি জিন কিং

দশ বছর বয়সে যে মেয়েটি তাঁর বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিল 'বাবা টেনিস কি?' ত্রয়োদশে সেই মেয়েটির মাথায় উইম্বলডনের ত্রি-মুকুট। চতুর্দশে আজ উপর্যুপরি তিনবার উইম্বলডন জয়ের সম্মানের সঙ্গে ডাবলস বিজয়িনী জুটির পঞ্চম পুরস্কার। কলকাতার একটি বিশিষ্ট ইংরেজী দৈনিকে সংবাদের সুন্দর শিরোনামা—"কিং ইজ কুইন।"

হ্যাঁ, সত্যিই ক্যালিফোর্নিয়ার লংবীচের টেনিস পটিয়সী বিলি জিন কিং-এর আজ টেনিস সম্রাজ্ঞীর সম্মান, সর্বকালের স্মরণীয়াদের মধ্যে সমান আসন।

কারো মন্তব্য, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠই বা নয় কেন? আমেরিকার লুই ব্রাউ ও মৌরীন কনোলী ছাড়া মহিলাদের মধ্যে আর কে পর পর তিনবার উইম্বলডন বিজয়িনী হয়েছে? ত্রি-মুকুটের সঙ্গে একটানা তিনবার জয়ের সম্মানও তো বেশী নেই। সুজানে লেংলেনো বা হেলেন উইলস মুডির অবশ্য উইম্বলডনে এবং বিশ্ব টেনিসে অনেক কীর্তি, অনেক কাহিনী। কিন্তু যুদ্ধোত্তর টেনিসের সঙ্গে প্রাক-যুদ্ধকালীন টেনিসের কি পার্থক্য নেই? তখন কি এত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির খেলা ছিল? না তখন টেনিস বিশ্বময় এমন ছড়িয়ে পড়েছিল? নৈপুণ্যের মান পরিমাপক কোন যন্ত্র নেই। চোখের আয়নায় দেখা নৈপুণ্যের ছবি আয়নার প্রতিবিম্বের মতই ক্ষণস্থায়ী। অতীত দিনের অবিস্মরণীয়রা দিন দিন কিংবদন্তী হয়ে ওঠেন প্রচারের মাধ্যমে। তা ছাড়া অতীতের প্রতি মোহ মানুষের স্বভাব ধর্ম। আসল কথা, খেলাধুলোর প্রতি বিষয়ে দিন দিন যখন উন্নতি ও অগ্রগতি তখন এখনকার টেনিসই বা আগের চেয়ে উন্নত নয় কেন? অ্যাথলেটিকস বা সাঁতারে ক্রমোন্নতির পরিচয় পাই ঘড়ির কাটায়, মিনিট সেকেণ্ডের হিসাবে। কিংবা গজ ফুট ইঞ্চিতে। ফুটবল টেনিস প্রভৃতি খেলার মান যুগধর্মের সঙ্গে উন্নত, বিজ্ঞানের সঙ্গে মিশ্রিত, প্রথা-প্রকরণে পরিমার্জিত। তাই আজকের সর্বশ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়কে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বলতে আপত্তি থাকা উচিত নয়।

ধনীর দেশের মেয়ে হলেও বিলি জিন রূপোর চামচ মুখে করে জন্মগ্রহণ করেন নি। বাবা বিল মফিট আমেরিকার একজন ফায়ারম্যান। তাই ব্যয়বহুল টেনিস খেলা শিখতে বিলি জিনকে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে। অবশ্য মফিটরা শুধু ক্রীড়ামোদি পরিবারই নন, নিজেরা সব রকমের খেলাধুলোও করে থাকেন। বিল মফিট যৌবনে ছিলেন অ্যাথলীট এবং বেসবল ও বাস্কেটবল খেলোয়াড়। জিনের মা সুনিপুণ সাঁতারু। জিন ছোটবেলায় খেলত সফটবল। কিন্তু তাতে ওর মন ভরত না। মা-বাবা বললেন, 'তবে তুমি টেনিস খেলা শেখ।' 'টেনিস কি'? জিন প্রশ্ন করল। বাবা বললেন, 'টেনিস এমন একটি খেলা যাতে তুমি দৌড়তেও পারবে, বলও মারতে পারবে'। জিনের মন নেচে উঠল।

কিন্তু র‍্যাকেট কেনার পয়সা কোথায়? একটি কাঠের র‍্যাকেট? জিন পয়সা জমাতে আরম্ভ করল। বাগান কাটিয়ে পয়সা ... ৮ ডলারের মত জমল তখন জিন টেনিস র‍্যাকেট কিনল। কিন্তু নাইলনের র‍্যাকেট।

লং বীচের পাবলিক পার্কে নিয়মিত বিনা পয়সায় ছেলেমেয়েদের টেনিস খেলা শেখাতেন পেশাদার খেলোয়াড় ক্লাইড ওয়াকার। তাঁর কাছেই বিলি জিনের হাতে খড়ি এবং একটি পার্কে নয়, তার পিছু পিছু ছুটে প্রতি পার্কে অনুশীলন। ফলে অল্প বয়সেই অন্যান্য প্রতিযোগিতার দুই একটি পুরস্কার হাতে এল। ১৯৫৯ সালে ইস্টার্ন গ্রাস কোর্ট চ্যাম্পিয়নশিপে খেলতে নেমে ঐ বছরের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন মেরিয়া বুয়েনোর কাছে হেরে গেল। "তোমার জন্য টেনিসের অনেক সম্মান অপেক্ষা করছে"—খেলা দেখে বললেন কোচ ফ্রাঙ্ক ব্রেনান। ব্রেনান আরও বললেন, 'কিন্তু নাইলনের র‍্যাকেটে খেলা চলবে না'। 'আমার যে 'গাট' ব্যবহার করার মত গ্যাটের জোর নেই', বললো বিলি জিন। ব্রেনান বিলি জিনকে কয়েকখানা র‍্যাকেট দিলেন এবং মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন জিনকে সুপটু করে গড়ে তোলার বাসনায়।

ঊনিশশো ষাট সালে বিলি জিন আমেরিকার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে কারেন হ্যানজের কাছে হার স্বীকার করল। পরের বছর সর্বপ্রথম উইম্বলডনে যোগদান এবং কারেন হ্যানজের সঙ্গে ডাবলসের বিজয়িনীর সম্মান। জিনের বয়স তখন ১৭, কারেনের ১৮—সবচেয়ে অল্পবয়সী জুটি হিসাবে উইম্বলডন জয়ের নজির। পরের বছর আবার উইম্বলডনে। এবার প্রথম রাউণ্ডেই এক নম্বর বাছাই মার্গারেট স্মিথকে হারিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি এবং আবার কারেনের সঙ্গে ডাবলসের চ্যাম্পিয়নশিপ। ১৯৬৩ সালেও বিলি জিন মফিট উইম্বলডনের বাছাই [illegible] খেলোয়াড়। কিন্তু তিনজন বাছাই মেরিয়া বুয়েনো, অ্যান জোনস এবং লেসলী টার্নারকে হারিয়ে আবার বিস্ময় সৃষ্টি। ফাইনালে পরাজয় মার্গারেটের কাছে। ১৯৬৫ সালে আইনের ছাত্র ল্যারী কিং-এর সঙ্গে জীবনের পাকাপাকি ব্যবস্থা। পরের বছর থেকে বিলি জিন মফিট মহিলা বিলি জিন কিং নামে পরিচিত এবং টেনিস বিশ্বে পরিচিত সাফল্যের পর সাফল্য এবং কোর্টের মধ্যে তাঁর পুরুষালী বিক্রমের জন্য।

টেনিসের সুনিপুণ শিল্পী বিলি জিন কিং-এর হাতে সব রকমের মার আছে। নেটের কাছ থেকে ভলী মার সবচেয়ে জোরালো মার। ফোরহ্যাণ্ডের শটের চেয়ে ব্যাক হ্যাণ্ডের শট বেশী কার্যকরী। কারণ সে শটে স্পিন, আণ্ডার স্পিন, এমন কি সাইড স্পিন থাকে। সার্ভিস কখনো স্লাইসড, কখনো টুইস্ট। সে সার্ভিসকে আয়ত্বে রাখা বড় শক্ত কাজ।

টেনিসই বিলি জিনের ধ্যানজ্ঞান এবং জীবন বেদ। সপ্তাহের ৭ দিনই নিয়মিত অনুশীলন। প্রতিদিন একজন পুরুষ প্রতিযোগীর সঙ্গে খেলা চাই। কখনো দুজন প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে একার লড়াই। তাই ১০ বছর বয়সে যে মেয়ে টেনিস কি জানত না সে আজ টেনিসে পৃথিবীর পয়লা নম্বর মেয়ে। যার টেনিস র‍্যাকেট কেনার পয়সা ছিল না টেনিসের দৌলতে সে বিপুল অর্থের অধিকারী।

মুকুল

॥ নাটক ॥

কালচারাল, সেমিনার-এর "জীবনের বালুচরে"

"জীবনের বালুচরে" (রচনা : সমর মুখোপাধ্যায়) নাটকটি দুটি দৃশ্যে বিন্যস্ত। একটি দৃশ্যে নায়ক (জীবন) রোগশয্যায় শায়িত। তার রোগ শরীরের যতটা নয়, ততটা মনের। পাশের বাড়ির মেয়ের সঙ্গে তার প্রেম। তারা মিলিত হতে পারেনি। যেদিন অন্য পাত্রের সঙ্গে নায়িকার বিয়ে, ওই দিনটি নিয়েই নাটক। নায়ক-নায়িকার মেলা-মেশার ঘটনাগুলি দর্শকরা দেখতে পান ফ্ল্যাশব্যাকে, কখনও বা অসুস্থ নায়কের "হ্যালুসিনেশন"-এ।

এই নাটকের নায়ক প্রেমে বঞ্চিত। বিরহী নায়ক যে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, দর্শকরা তা বুঝতে পারেন। নাটকে কখনও রুগ্ন নায়কের ঘরের দৃশ্য, কখনও বিয়েবাড়ি তথা নায়িকার বাড়ির সামনে ভিক্ষুকের দল। ওরা এমনিতে সুস্থ সমর্থ (একজন অবশ্য পঙ্গু), তবু বিয়েবাড়ির এঁটো-খেয়ে ওরা বেঁচে থাকে। ওদের মধ্যে জোনাকি নামে একটি মেয়ে আছে, যে দেহ বিক্রিও করে। একজন মাসীও রয়েছে। ওদের জীবনের হতাশা ও ট্র্যাজেডি, তাদের হালচাল ও জীবনধারণের চিত্রটি বহুলাংশে বাস্তবানুগ। যদিও এই দৃশ্যের পৌনঃপুনিকতা ক্লান্তিকর। এক কথায়, হতাশার নাটক "জীবনের বালুচরে"। ফুটপাথ-বাসীদের ট্র্যাজেডি যদিও বা মেনে নেওয়া যায়, প্রণয়ে বঞ্চিত নায়কের হাহাকার ও শোক কি দেখতে ভাল লাগে? পৌরুষহীন পুরুষকে কে পছন্দ করে?

তা ছাড়া, নাটকের শেষটিও অতিমাত্রায় অবাস্তব ও অতিনাটকীয়। নায়কের "জীবন" নাম নিয়ে প্রচ্ছন্ন বক্তব্য তো আছেই। তার উপর নায়কের মৃত্যুর পর তার মায়ের ছেলেকে খোঁজবার জন্য পথে বেরিয়ে পড়া আরও হাস্যকর।

নাটকটি মনকে তেমন প্রভাবিত করে না। কিন্তু দলগত অভিনয়ের গুণে নাটকটি বিশিষ্ট। ফুটপাথের চরিত্রদের মধ্যে গৌরীশঙ্কর লাল, সলিল পাল, দীপক রায়, সুনীল দত্ত, সঞ্জীব ঘোষ, দিলীপ ভট্টাচার্য, সমর মুখোপাধ্যায়, অলোক মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ দে প্রভৃতি চমৎকার চরিত্রচিত্রণের জন্য প্রশংসা পাবেন। নায়িকা আশার রূপসজ্জায় তৃপ্তি দাস এবং নায়কের বোনের চরিত্রে স্বপ্না রায়চৌধুরী তাঁদের [illegible] চরিত্রকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পেরেছেন। অভিনয়ের নৈপুণ্যের জন্য সর্বাধিক প্রশংসা সম্ভবত জোনাকির চরিত্রে কমলা সুরের প্রাপ্য। টাইপ চরিত্র সৃষ্টির অদ্ভুত ক্ষমতা তিনি দেখিয়েছেন। যদিও বার বার মাথা চুলকানো তিনি বাদ দিতে পারেন। নায়ক চরিত্রে রমেন সরকার এবং তাঁর বন্ধুর ভূমিকায় অজিত সান্যাল মনোগ্রাহী অভিনয় করেছেন। নায়কের জননী সেজেছেন রমা দত্ত। তাঁর স্নেহের ও শোকের অভিব্যক্তি মন্দ নয়।

নাট্যপরিচালনা করেছেন অজিত সান্যাল।

অগ্রদূত পরিচালিত "কখনো মেঘ" ছবিতে বঙ্কিম ঘোষ ও অঞ্জনা ভৌমিক

শ্রীরঙ্গম অভিনীত ॥ আবার ফিরে এলাম

প্রেমিকের কাছে প্রেমিকার এবং স্বামীর কাছে স্ত্রীর অথবা একের কাছে অপরের আবার ফিরে আসার ব্যাপারটা অদূরে কিংবা সুদূর অতীত থেকে নয়, একেবারে পূর্ব জন্ম থেকে। অর্থাৎ এই জন্মে যারা স্বামী-স্ত্রী এবং উভয়ের মাঝখানে যে তৃতীয় পুরুষ, যে বিবাহিত মহিলাটির প্রণয়ী তারা সকলেই আবার ফিরে এসেছে। ভিন্ন নামে, ভিন্ন পরিচয়ে এবং ভিন্ন পরিবেশে। এবং তাদের ক্ষেত্রে একই সম্পর্ক ও ঘটনার পুনরাবৃত্তি। জন্মান্তরবাদের ভিত্তিতে রচিত জে বি প্রিস্টলের "আই হ্যাভ বিন হিয়ার বিফোর" নাটকটির অনুসরণে রচিত "আবার ফিরে এলাম" (রচনা: অশোক সেন)। এই নাটকের ডঃ মুখার্জির এক্সপেরিমেন্ট পুনর্জন্মবাদ নিয়ে। তার এক্সপেরিমেন্ট সফল। শান্তনু, অতসী (ওরা স্বামী-স্ত্রী) এবং রবীন্দ্রের মধ্যে পূর্বজন্মের সম্পর্ক তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন।

পরলোকতত্ত্বে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের কাছে এই নাটকের আবেদন থাকতে পারে হয়ত। যুক্তিবাদী আধুনিক দর্শকরা এই নাটক দেখে কতখানি খুশী হবেন বলা শক্ত। থিয়োসফিক্যাল ব্যাপার তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য তথা অবাস্তব মনে হলেও বিবাহিত জীবনের জটিলতা এবং শান্তনু, অতসী ও রবীন্দ্রকে নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং ত্রিকোণ প্রেমের মধ্যে আধুনিকতা ও 'রিয়ালিটি'-র আভাস আছে। যদিও তা আরও বেশী জীবননিষ্ঠ হতে পারত। অবশ্য আমোদ-পিপাসু দর্শকের জন্য এতে নাট্য-চমকের আয়োজন রয়েছে।

সামগ্রিক অভিনয় আরও উচ্চমানের হলে নাটকটি নিয়ে কোন ক্ষোভ থাকত না। শিল্পপতি শান্তনুর চরিত্রে হারু বন্দ্যোপাধ্যায় যথোচিত ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর অভিনয়ে মানসিক যন্ত্রণার প্রকাশও সুন্দর। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ই শ্রেষ্ঠ। অন্যদের মধ্যে প্রশংসা পাবেন অতসীর রূপসজ্জায় রত্না গোস্বামী এবং ডঃ মুখার্জির চরিত্রে প্রণব বসু। রবীন্দ্রের ভূমিকায় অজিত পাত্রর চরিত্রচিত্রণ আড়ষ্ট। কয়েকটি বিশেষ চরিত্রে রয়েছেন নিখিল সেনগুপ্ত, অশোক ভৌমিক, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অশোক সেনগুপ্ত প্রভৃতি। এঁদের অভিনয় চরিত্রোচিত। গত সপ্তাহে শ্রীরঙ্গম-গোষ্ঠী মুক্ত-অঙ্গনে নাটকটি অভিনয় করেন।

চারণদলের নাট্য-উৎসব

শৌখিন নাট্যজগতের অন্যতম উল্লেখযোগ্য খবর চারণদলের নাট্য-উৎসব। নবগঠিত নাট্যসংস্থা "চারণদল" সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতায় উৎসবের আয়োজন করেন। এতে রঙ্গসভা, রূপকার, বিচিত্রা, মৌসুমী, উত্তরী গ্রুপ প্রভৃতি সংস্থা তাঁদের নাটক মঞ্চস্থ করেন। চারণদল অভিনয় করেন "ইতিহাসের কাঠগড়ায়"। ইন্দ্রজিৎ সেন পরিচালিত এই নাটক সম্মিলিত অভিনয়ের গুণে উপভোগ্য হয়।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সেতার শিল্পীর জন্মোৎসব

গত ২৬ জুন সংগীতবিশারদ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের সভাপতিত্বে ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং সেতার শিল্পী শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ৬৩তম জন্মদিনের উৎসব শিল্পীর জুবিলি পার্কস্থিত বাসভবনে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন। উপস্থিত গুণীজনের মধ্যে ওস্তাদ মহম্মদ দবীর খাঁ সাহেব, শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ডাঃ যামিনী গাঙ্গুলী, শ্রীপ্রশান্ত দাসগুপ্ত, শ্রীচন্দ্রশেখর নিয়োগী ও শ্রীশচীন মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীসুধীশরঞ্জন বিশ্বাস মানপত্র পাঠ করে শোনান।

দবীর খাঁ সাহেবের কণ্ঠে ঠুংরী, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সুরশৃঙ্গার এবং শ্রীসেনগুপ্তের পুরাতন ছাত্রী ও বেতার শিল্পী শ্রীমতী দীপ্তি চন্দের সেতার বাদন উপস্থিত শ্রোতাদের আনন্দবর্ধন করে। এই অনুষ্ঠানে শ্রীসেনগুপ্তের দেড় শতাধিক ছাত্রছাত্রী এবং বহু সঙ্গীতশিল্পী ও বন্ধুবান্ধব উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন বক্তাগণ তাঁহাদের ভাষণে প্রবীণ সেতারসাধকের দানের কথা উল্লেখ করে তাঁর স্বাস্থ্যদীপ্ত শতবর্ষ পরমায়ু কামনা করেন।

শিল্পী শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, (পিছনে ডাইনে) ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন

পিতা-পুত্র

চিত্রযুগের নতুন ছবি "পিতা-পুত্র"র নায়ক-নায়িকা স্বরূপ দত্ত ও তনুজা। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ছবিটি পরিচালনা করছেন। রাজকুমার মৈত্রর কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন প্রণব রায়। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন পবিত্র চট্টোপাধ্যায়।

"চলচ্চিত্র প্রচারজীবী সংঘ"

বাংলা দেশের সিনেমার প্রচারকার্যের সঙ্গে যারা যুক্ত তাঁদের নতুন সংস্থার নাম "চলচ্চিত্র প্রচারজীবী সংঘ"। প্রচারবিদ, বিজ্ঞাপন-শিল্পী, এবং হোর্ডিং ও পোস্টার তৈরি ও লাগানোর কাজে জড়িত প্রচারজীবী এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীদের নিয়ে এই সংগঠন। উদ্দেশ্য—চলচ্চিত্র প্রচারকার্যে যারা যুক্ত তাঁদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং প্রচার-প্রণালীর মান উন্নয়ন।

গত ২৯ জুন প্রায় একশত সভ্যের উপস্থিতিতে সংঘের কার্যনির্বাহকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে। শ্রীফণীন্দ্র পাল সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত। অন্য কর্মকর্তারা হলেন শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী ও শ্রী এম এ হাই (সহ-সভাপতি); শ্রীসুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক); শ্রীঅনুপ কর্মকার ও শ্রী এস এম কমল (সহ-সম্পাদক) এবং শ্রীসুকুমার ঘোষ (কোষাধ্যক্ষ)। কার্যকরী সমিতির সভাবৃন্দ: বি ঝা, কালী কর, জহর কুণ্ডু, বিমল মুখার্জি, রবি বসু, সমর গাঙ্গুলি, অম্বিকা প্রসাদ, আর এন সিংহ, পঞ্চানন দত্ত, গোরাচাঁদ রায়, গোবিন্দ দাস ও বিজন মিত্র।

বোম্বাই বিচিত্রা

আজ প্রায় একযুগ ধরে বম্বেকে দেখছি। কিন্তু এমনটি এর আগে কখনো দেখিনি। ঘটনাটা এমন কিছু অসাধারণ নয়। অত্যন্ত সাধারণ একটি ঘটনা। গত উনত্রিশে জুন স্থানীয় রবীন্দ্র নাট্য মন্দিরে একটি নাটক অভিনীত হ'ল। একটি বাংলা নাটক। বাংলা নাটক না বলে যদি বলি একটি নাটক বাংলায় অভিনীত হ'ল তাহলে বোধহয় ঠিক বলা হবে। নাটকটি বিশ্ব বিখ্যাত পিরানদেল্লোর বিশ্ব বন্দিত নাটক 'সিক্স ক্যারেকটরস ইন সারচ্ অব এ্যান অথার'-এর বাংলা রূপ—'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র'। 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' যাঁরা মঞ্চস্থ করেন তাঁরা সকলেই অন্যকিছুর সন্ধানে এখানে এসেছেন এবং কালক্রমে স্থানীয় হয়ে গেছেন। যাঁদের উদ্যোগে এ নাটক হ'ল তাদের অধিকাংশই বম্বের চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে হয় জড়িত নয় জড়িত হতে চাইছেন। যাঁরা চলচ্চিত্র জগতে এখনো কোন জায়গা করে নিতে পারেননি তাঁদের ত কোন কথাই নেই, কিন্তু যাঁদের চলচ্চিত্রের সংগে কিছু না কিছু যোগাযোগ আছে তাঁরাও সুপরিচিত নাম নয়। তার মানে এই দাঁড়াল যে, এই নাটকটি যাঁরা করেছেন তাঁরা প্রায় সবাই সাধারণ। শুরুতেই এ নাট্য প্রচেষ্টাকে অসাধারণ বলেছি, এবার কেন এই বিশেষণ ব্যবহার করলাম, সেটা বলা দরকার। বম্বেতে এর আগে বহু নাটক হয়েছে। বেশীর ভাগই দুর্গা পূজোর সময়।

আপনারা যারা 'উসকি কহানী' দেখেছেন, তাঁদের ঐ ছবিটির নায়ক তরুণ ঘোষকে ভোলার কথা নয়। সেই তরুণ ঘোষ এবং আরো কয়েকজন, যেমন কানু রায় (উসকি কহানীর সঙ্গীত পরিচালক), অশোক রায়, হারু বোস ইত্যাদি মিলে বম্বের চলচ্চিত্রের মহা দুর্দিনে (অর্থাৎ যখন মন্দা এবং আন্দোলন গলাগলি করছে)। 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' মঞ্চস্থ করার সংকল্প করেন। এ নাটক করার পেছনে কেবল মাত্র ব্যস্ত থাকাই এঁদের উদ্দেশ্য ছিল না, এঁরা কয়েকজন যাঁরা নাটক বা ফিল্ম ছাড়া অন্যকিছু করতে পারেন না বা করতে চান না, তাঁদের দিন গুজরানের একটা ব্যবস্থাও এঁরা করতে চেয়েছিলেন। এবং আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, এঁরা সেটা করতে পেরেছেন।

বম্বের বাঙালী সম্প্রদায় কোন অনিবার্য কার্যকারণের ফলে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। অনেক দল আছে এখানে, যেটা অত্যন্ত বাঙালীসুলভ। মন কষাকষিরও অন্ত নেই, তাই কোন দলই কিছু করে সব লোককে এক জায়গায় জোটাতে পারে না। পারলেও যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা বর্ণনার জায়গা এটা নয়। গত বারো বছরে একমাত্র 'রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর সময় বম্বের সমস্ত বাঙালীকে একত্রিত হতে দেখেছিলাম। তারপর আবার দেখলাম 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' দেখতে গিয়ে। এরা পয়সা দিয়ে নাটক দেখেছেন এবং বর্ষার দিনে জলে না ভিজে বাড়ি ফিরে গেছেন খুশী মনে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে আমাদের। কারণ আমরা নাকি সাধারণ দর্শক নই। আমাদের স্থান সমালোচকের সারিতে। তাই নাটক দেখতে বসে আমরা নাটকে ততটা মন দিতে পারি না, যতটা দোষত্রুটি খোঁজার দিকে দৃষ্টি দিই। আমরা শুধু দর্শক নই, বিদগ্ধ দর্শক। সেই বিদগ্ধ দর্শকের দৃষ্টিতে এ নাটক রসোত্তীর্ণ হয়নি। কিন্তু সাধারণ দর্শকের মন ছুঁয়েছে এ নাটক পরিবেশনার রসে। অভিনয় ভালয় মন্দয় মেশানো, পরিচালনা দোষত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়, নাট্যরূপকার পিরানদেল্লোকে নাট্যকারের ভূমিকা থেকে টেনে এনে এঁরা হয়ত দর্শক-সমালোচকের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছেন, তবু, নাটক পথে বসেনি, নাটকীয়তা পথ হারায়নি। এ নাটকে যা কিছু ঘাটতি তা 'ভুল', অন্যায় নয়। সুতরাং শোধরানোর অবকাশ আছে। কয়েকজনের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' মাত্র একদিনের জন্য এখানে অভিনীত হলেও এক নতুন সংস্থার জন্ম দিয়েছে, সে সংস্থার সন্ধানে স্থানীয় অনেকেই এক নতুন আন্দোলনের ঠিকানা খুঁজছেন। সংস্থার নাম "সঙ্গম"।

*

বেশ কয়েক বছর পর আবার 'জেমিনী'র ছবি দেখছেন হিন্দী দর্শক। 'তিন বহুরানীয়াঁ' বম্বেতে রিলিজ হয়েছে। ফরমুলার চটুল চত্বরের আওতার বাইরে না গিয়েও যে মোটামুটি নির্দোষ আনন্দদায়ক ছবি করা যায় তা আবার প্রমাণ করলেন শ্রীভাসান। হিন্দী ছায়াছবির জগতে মহা আড়ম্বরের ঢাক পিটিয়ে জেমিনীর সাড়ম্বর আবির্ভাব ঘটেছিল বহুদিন আগে। ছবি ছিল তৎকালে সব চেয়ে বেশী পয়সায় বানানো 'চন্দ্রলেখা'। তারপর শ্রীভাসান সর্বভারতীয় দর্শকের প্রিয় হয়ে উঠেছেন 'নিশান', 'সংসার', 'মিস্টার সম্পৎ', 'পয়গাম' প্রভৃতি ছবির মধ্যে দিয়ে। জেমিনীর ছবি 'তিন বহুরানীয়াঁ' অন্তত একটি বিশেষ কারণে প্রশংসার দাবী রাখে। সেটি হচ্ছে—এ ছবিতে তথাকথিত স্টারদের কোন ভীড় নেই। যাঁরা আছেন তাঁরা সবাই চরিত্র অভিনেতা, যেমন পৃথ্বীরাজ কাপুর, শশিকলা আগা, রাজেন্দ্রনাথ ইত্যাদি, আর তিন বহুরানীয়াঁর ভূমিকায় যাঁরা আছেন তাঁরা প্রত্যেকেই সর্বভারতীয় দর্শকের কাছে অপরিচিত। তবু এ ছবি অনায়াসে বক্স অফিসে সফল হবে বলে মনে হচ্ছে। নানা ভাবে নানা জায়গায় আমি একটা কথা বলেছি, আবার সেই কথাটা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। কথাটা হচ্ছে, যে পৃথিবীতে এমন কোন স্টার নেই, কেবলমাত্র যাঁর জন্য ছবি রজত জয়ন্তী বা সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করে। যে ছবি চলে সে ছবি ছবির গুণেই চলে। যদি কোন ছবি পঁচিশ সপ্তাহ চলে তাহলে তার প্রথম দু'তিন সপ্তাহ হয়ত স্টারদের জন্য চলে কিন্তু বাকি কুড়ি-বাইশ সপ্তাহ ছবি চলে নিজের গুণে। ঐ প্রথম কয়েক সপ্তাহের লোভেই এখনো স্টার সিস্টেম চালিত হচ্ছে, আর ঐ কয়েক সপ্তাহের ভয়েই স্টার ছাড়া ছবি প্রায় হচ্ছে না।

ইকন্স ফিল্মস-এর "প্রথম কদম ফুল" (পরিচালনা : ইন্দর সেন) ছবিতে সৌমিত্র ও তনুজা

সরল শর্মা

সাপ্তাহিক সংবাদ

পারক স্ট্রীট ডাকঘরে ডাকাতি বর্তমান সপ্তাহের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১ জুলাই সোমবার ছিল ভারতের লক্ষতম ডাকঘরের প্রতিষ্ঠা দিবস। সেইদিন ঘটে কলকাতার পারক স্ট্রীট ডাকঘরে সাম্প্রতিক কালের বৃহত্তম সশস্ত্র ডাকাতি। ডাকাত-দল ৩ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে উধাও হয়ে যায়। দুটি রাইফেলও তারা নিয়ে গিয়েছে। যাবার আগে তারা ৯৫ রাউনড গুলি চালিয়ে ডাক বিভাগের একজন কর্মী ও ন্যাশনাল ভলানটিয়ার ফোরসের দুজনকে জখম করে রেখে যায়। এরা তিনজনই এখন হাসপাতালে। অবস্থা আশংকাজনক। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে ডাকাতির কাজ শেষ হয়ে গেল। পাছে ডাকঘর থেকে কেউ বেরিয়ে এসে তাদের বাধা দেয়, সেজন্য দুজন যেমন টাকার বাকসটি নিয়ে তাদের গাড়ির দিকে ছুটে গেল, তেমনই আর দুজন ডাকঘরের দরজাটি লক্ষ্য করে মুহুর্মুহু গুলি ছুঁড়ে চলল। এ সম্পর্কে আর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পোসটাল ভ্যানের চালককে আটক করা হয়েছে। ডাকাত দলের কোন সন্ধান এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

দেশী সংবাদ

১ জুলাই—শ্রমিক কর্মী ছাঁটাই সম্পর্কে পর্যালোচনার জন্য প্রস্তাবিত সংস্থা গঠন, কাজ ও কাজের সুযোগ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ত্রিপাক্ষিক কমিটির বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে। এটি নিয়ে দ্বিতীয়বার কমিটির চেষ্টা বিফল হলেও ২২ জুলাই কমিটির সদস্যরা আবার মিলিত হবেন।

রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর আজ তিন ঘণ্টা ধরে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে শহরের জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজ দেখেন। প্রকাশ, কাজের হাল দেখে খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন রাজ্যপাল। তাঁর সংগে রাজ্য সরকারের যে অফিসারগণ ছিলেন তাঁরাও আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

২রা জুলাই—পারক স্ট্রীট ডাকঘরে দুঃসাহসিক ডাকাতির পর ৪০ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও পুলিস এ ব্যাপারের কোন হদিস পায়নি। গোয়েন্দা পুলিসের প্রায় প্রত্যেকটি বিভাগকে তদন্তের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে, স্পেশাল টিম গঠিত হয়েছে, ফরেনসিক বিভাগও তৎপর। কিন্তু লুণ্ঠিত অর্থ, সংশ্লিষ্ট গাড়ি, অপহৃত আগ্নেয়াস্ত্রের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

সাম্প্রদায়িকতা দমনের উদ্দেশ্যে জাতীয় সংহতি পরিষদের সুপারিশ কার্যকরী করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রস্তাবিত আইনানুগ ব্যবস্থাগুলি আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়। প্রস্তাবিত আইন অনুযায়ী ধর্ম, ভাষা, জাতি, শ্রেণী এবং জন্ম বা বাসস্থানের ভিত্তিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণা, অসদিচ্ছা প্রকাশ বা সম্প্রীতিনাশের চেষ্টা দণ্ডনীয় হবে।

৩ জুলাই—একজন বালকের মৃত্যুর ব্যাপারে অভিযুক্ত তিনজন আসামীকে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ সংক্রান্ত একটি রুলের নিষ্পত্তি করে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীঅমরেশ রায় এবং বিচারপতি শ্রীবাগচি ২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিস সুপারিনটেনডেন্টের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তা এবং অপরাধ ধামা চাপা দেওয়ার ব্যাপারে সম্ভাব্য যোগসাজসের অভিযোগ করেছেন।

৪ জুলাই—কলকাতায় বহিরাগতের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি রেশনিং দপ্তরের এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে, গত পাঁচ মাসে কলকাতা শহরে ৭৫ হাজার নতুন রেশন কার্ড দেওয়া হয়েছে। এই ৭৫ হাজারের মধ্যে ৬৫ হাজার লোক পশ্চিম বাঙলার বাইরে থেকে এসেছেন।

রাজন্যবর্গের ভাতা বিলোপ সংক্রান্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রস্তাবটি মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরীণ বিষয়ক কমিটি সাধারণভাবে সমর্থন করেছেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী প্রাক্তন রাজন্যবর্গকে ১০ বছরের বেশী সময়ে ৬৩ কোটি টাকা দেওয়া হবে। এই অর্থ বাবদ কোন কর লাগবে না।

আজ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে কংগ্রেসকর্মীদের এক সভায় ভারতের উপপ্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই অন্তর্বর্তী নির্বাচনের আগে কংগ্রেসীদের একতাবদ্ধ হয়ে কাজে নামার আহ্বান জানিয়ে বক্তৃতা করেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কেরানিকের পদসহ কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত চাকুরীতে লোক নিয়োগের পরীক্ষা সবগুলি ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে গ্রহণের ব্যবস্থা যত শীঘ্র সম্ভব চালু করতে চান।

৬ জুলাই—আজ খড়্গপুর ভিক্টোরিয়া ময়দানে মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস রাজনৈতিক সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভা মঞ্চে উপবিষ্ট রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ইটের ঘায়ে আহত হন। অভিযোগ তাঁকে লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়া হয়েছিল।

৭ জুলাই—কুলটিতে আবার ধস নামছে। কুলটি থানার এলেকাধীন কেন্দুয়াবাজার ও মিঠানি ধৌড়ার অংশবিশেষ গতকাল থেকে ধীরে ধীরে মাটির নিচে বসে যাচ্ছে। ৪০০ গজ দীর্ঘ ও ৩৫০ গজ চওড়া একটি এলাকা জুড়ে এই বিপদ নেমে এসেছে।

মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস রাজনৈতিক সম্মেলনে গৃহীত অর্থনৈতিক প্রস্তাবে সমস্ত প্রকার বিধিনিষেধ তুলে কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র ধান ও চালের খোলা বাজার সৃষ্টি করার দাবি করা হয়। এ ছাড়া আন্তঃরাজ্য বিধিনিষেধ তোলার কথাও প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়।

বিদেশী সংবাদ

১ জুলাই—রুশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীআলেকসি কোসিগিন আজ ঘোষণা করেন যে, সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে সুদূরপ্রসারী প্রস্তাবসমূহ সম্বলিত একটি স্মারকলিপি সমস্ত রাষ্ট্র সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। স্মারকলিপিতে আছে আণব অস্ত্র উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ, মজুত অস্ত্র ভাণ্ডার হ্রাস এবং আণব অস্ত্র প্রয়োগের ব্যবস্থার ওপর নিষেধাজ্ঞা।

ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে দ্য গল-পন্থীরা রেকর্ড গরিষ্ঠতা অর্জন করেছেন : ৪৮৭টির মধ্যে ৩৫৮টি আসন। এই ৩৫৮টি আসনের মধ্যে ৫৬টি পেয়েছেন দ্য গলপন্থী জোটের শরিক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট রিপাবলিকান পার্টি।

২ জুলাই—ব্রিটিশ আদালত আজ ডঃ মার্টিন লুথার কিং-এর হত্যাকারী বলে অনুমিত জেমস আরল রে সম্পর্কে বহিষ্কারের আদেশ দিয়েছেন। মার্কিন কর্তৃপক্ষ এই আদেশ-দানের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন।

৩ জুলাই—ঢাকার এক সংবাদে প্রকাশ : গতকাল রাত্রে পূর্ব পাকিস্তানের রংপুর ও বগুড়া জেলায় আট হাজার লোকের বাড়িঘর বন্যার জলে ভেসে গিয়েছে। প্রবল বর্ষণের ফলে নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় তিন লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বার্লিন এবং পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে সড়ক পরিবহণ সম্পর্কে পূর্ব জার্মান কর্তৃপক্ষ যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন, আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং ফ্রান্স তার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে রাশিয়ার কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছে। সোভিয়েট-নেতা শ্রীব্রেজনেভ এইসব বিধিনিষেধের সমর্থন করেছেন এবং পাশ্চাত্যের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করেছেন।

৪ জুলাই—কায়রো থেকে বিশ্বস্ত কূটনৈতিক মহলের সংবাদে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট নাসের রাশিয়া যাত্রার অল্প কিছুকাল আগে মিসরীয় সামরিক বাহিনীর প্রায় ২০০ জন অফিসারকে বিতাড়িত করেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিস্তৃত ভারত মহাসাগর এলাকায় কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের বিষয়ে নীরবে পরিকল্পনা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। বৃটেনের নৌবহর একদিন ওই এলাকায় আধিপত্য চালিয়েছিল।

৫ জুলাই—সোভিয়েট রাজনৈতিক সাপ্তাহিক 'নিউ টাইমস' পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, চীন স্পষ্টতই বনেদী-জাতীয়তাবাদে ভুগছে এবং তার ফলে পুরোপুরি সম্প্রসারণবাদী হয়ে উঠছে। সেইজন্যই ভুটান, সিকিম, আসাম ও আন্দামানকে চীন তার নিজের অঞ্চল বলে মনে করতে শুরু করেছে।

মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের ক্রেমলিনে রাশিয়ার তিনজন শীর্ষস্থানীয় নেতার সংগে আনুষ্ঠানিক-ভাবে আলোচনা আরম্ভ করেন। আলোচনায় যাঁরা যোগ দিয়েছেন তাঁদের সকলের মধ্যেই পশ্চিম এশিয়ার সংকটের অবসান ঘটাবার জন্য নতুন উদ্যম লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

৬ জুলাই—প্রেসিডেন্ট নাসের আজ সোভিয়েট নেতাদের সংগে তৃতীয় দফা আলোচনা আরম্ভ করেন। তাঁর মস্কো পরিদর্শনের ফলে পশ্চিম এশিয়ায় শান্তির পথ উদ্ভাবিত হতে পারে, এই আশা ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে।

আমেরিকান নৌসেনারা গতকাল চূড়ান্তভাবে খে সান ছেড়ে চলে গিয়েছে। গত আড়াই মাস যাবৎ তারা উত্তর ভিয়েতনামী সৈন্যদের অবরোধের মধ্যে ছিল।

৭ জুলাই—রাশিয়া পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করবেই। ভারত এই ব্যাপারে বারবার আপত্তি জানিয়েছিল। মস্কোস্থ ভারতীয় মিশন নয়াদিল্লিকে নতুন এই পরিস্থিতির কথা জানিয়ে দেন।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৫ বর্ষ ॥ ৩৮ সংখ্যা
শনিবার ৪ শ্রাবণ ১৩৭৫

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়
বার্ষিক ... ২৫.০০
ষাণ্মাসিক ... ১২.৫০
ত্রৈমাসিক ... ৬.২৫

ভারতে
বার্ষিক সডাক ... ৩০.০০
ষাণ্মাসিক „ ... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক „ ... ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)
বার্ষিক সডাক ... ৩০.০০
ষাণ্মাসিক „ ... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক „ ... ৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক সডাক ... ৫২.০০
ষাণ্মাসিক „ ... ২৬.০০
ত্রৈমাসিক „ ... ১৩.০০

[illegible]
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক ... ৬১.০০
ষাণ্মাসিক ... ৩১.৫০
ত্রৈমাসিক ... ১৬.০০

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাশুলে (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

DESH

Saturday 20 July 1968

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : কলঙ্ক-কাহিনী

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে মাঝে মাঝেই একটা দড়ি টানাটানির খেলা হয়। একদিকে কর্তৃপক্ষ, অন্যদিকে বিক্ষুব্ধ ছাত্র, এক তরফে শিক্ষা ও শিক্ষক সমাজ অন্য তরফে শিক্ষার্থী। এই খেলায় দেখছি, এখন আর শালীনতা, শিষ্টতা বলে কিছু থাকছে না। আগের অনেক ঘটনায় দেখা গেছে ছাত্রদল তাদের অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটলে বিশ্ববিদ্যালয়ে হানা দিয়ে চেঁচামেচি করেছে, প্রতিবাদ জানিয়েছে, বিক্ষোভও দেখিয়েছে, কিন্তু তার বেশি বোধ করি এগোয় নি। সম্প্রতি দেখা গেল, ছাত্ররা আরও কিছুটা অগ্রসর হয়েছে, অর্থাৎ তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও শিক্ষকদের মারধোর করতে এবং অশ্রাব্য গালিগালাজ করতেও শিখেছে।

ঘটনাটি নতুন কিছু নয়, সেই একই—পরীক্ষা পিছোনোর দাবি। বলা বাহুল্য, পরীক্ষা পিছোনোর দাবিটি এখন ছাত্রসমাজের অন্যতম নিত্য ও স্বাভাবিক দাবি হয়ে উঠেছে। এই দাবির পিছনে যতটা যুক্তি আছে বলে শুনি, তার চেয়ে নাকি ঢের বেশি আছে ছাত্র রাজনীতির কারুকার্য, তৎপরতা। কথাটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় বটে, তবে একেবারে অস্বীকার করতেও বাধে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষণে ক্ষণে একটা ছাত্র সংগ্রাম বাধিয়ে দিতে পারলে যে উৎসাহীদের রাজনৈতিক প্রভাব বাড়ে সেটা বোধ হয় সত্য। এই কারণ বা উদ্দেশ্যটি মনে রেখে যখন ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলা হয় তখন আমাদের পক্ষে অস্বস্তি বোধ না করে উপায় থাকে না। পরীক্ষা পিছোনোর দাবির ঘটা এখন এত বেড়ে গেছে যে, সত্যিই মনে হয়, এর যথার্থ উদ্দেশ্য কি? তবু স্বীকার করে নিলাম উদ্দেশ্য সৎ; কিন্তু কি করে অস্বীকার করি, এটা অভ্যাস ও রীতিতে দাঁড়াচ্ছে না। সন্দেহ হয়, এই রীতি স্থায়ী হয়ে যাচ্ছে। পূর্বতন উপাচার্য মশাই যতটা পেরেছেন ছাত্রদের সুযোগ দিতে বাধ্য হয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য এই রীতির বিরুদ্ধে। তিনি বোধ করি চান, পরীক্ষার দিন-তারিখ এভাবে পিছিয়ে পিছিয়ে যে সমস্যা জটিল হয়ে উঠেছে এবং যে রীতি চালু হয়ে উঠেছে তা রোধ করতে হবে। যত দূর জানি, সিণ্ডিকেটের অনেকেই এ-বিষয়ে একমত।

সাম্প্রতিক গোলমালটা মেডিকেল ছাত্রদের পরীক্ষা নিয়ে। এম বি বি এস পরীক্ষা পিছোনোর দাবি জানিয়েছেন কিছু ছাত্র। তাঁদের মুখপাত্রের যুক্তি—অন্যান্য বছর পরীক্ষা শেষ ও পরীক্ষা গ্রহণের মধ্যে ছ' মাসের মতন সময়ের ব্যবধান থাকে, এবারে সেখানে ব্যবধান মাত্র আড়াই মাস, অবশ্য যদি উনিশে আগস্ট পরীক্ষার দিন স্থির থাকে। উপরন্তু, নানা কারণে ছাত্রদের পড়ার ক্ষতিও হয়েছে। কথা হল, সব ছাত্রই কি এটা বলছেন — পরীক্ষার দিন না পিছোনোর সমর্থক ছাত্রও তো আছে। কেন?

আমরা ছাত্রদের এই যুক্তি ও আবেদনের অর্থ তবু বুঝতে পারি। বুঝতে পারি না, কি করে মেডিকেল ছাত্ররা, যাঁরা নিশ্চয় অল্পবয়স্ক নন, নির্বোধ নন, তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সিণ্ডিকেটের সদস্য, ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের অশালীন গালিগালাজ করতে পারেন, মারধোরও করেন। জনৈক সদস্যকে পেটে লাথি মারার ঘটনাও এখানে উল্লেখযোগ্য, তাঁর আঘাত এমন মারাত্মক হয়েছিল যে, তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করা তো আছেই। উপাচার্য নিজের খুশিমত পুলিস ডাকেননি, পুলিস ডাকার পরামর্শ সমবেত অন্যান্য অধ্যাপকরা দিয়েছিলেন। যেখানে মেয়েরা ঘর ঘিরে রেখে উলুধ্বনি দেয়, ছেলেরা হরিধ্বনি করে এবং উপাচার্যের মুণ্ড চাই, সি-আই-এর দালালকে খুন করো, ইত্যাদি শ্লোগান ওঠে—সেখানে পুলিস ডাকা ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা এমন কি অপরাধ! যে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে উপাচার্যের মুণ্ডু চায়, খুনের হুমকি দেখায় তারা কোন যুক্তিতে আশা করে যে খুনোখুনির জায়গায় পুলিস আসবে না?

যতই কেননা আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করা হোক, কিছু মেডিকেল ছাত্রের সেদিনকার আচরণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের পক্ষে বিরাট এক কলঙ্ক হয়ে থাকল। আশা করি ছাত্ররা তাঁদের উত্তেজনা দমন করে অন্যভাবে নিজেদের বক্তব্য বিশ্ববিদ্যালয়কে জানাতে পারবেন।

দেশ-দর্পণ

"Acceptance of the CPC (Communist Party of China) Proposal for a General Line of the International Communist Movement as the common basis for the International Communist Movement, should not deter our Party from demarcating ourselves from CPC's mistakes on any specific issue.

"We should firmly reject their interference in the internal affairs of the Party, their unbridled fault-finding. We must refuse to submit to their pressure tactics to browbeat the Party into acceptance of their line on the Indian situation".

একটা চিঠি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। চিঠিটা মোটামুটি এই রকম : চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি প্রস্তাব করেছে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের একটা কর্মসূচী থাকবে যে কর্মসূচীর ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলন এগিয়ে যাবে। এই প্রস্তাব চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির কাছ থেকে আসা সত্ত্বেও আমাদের পার্টি চীনের পার্টি যে-সব প্রশ্নের ক্ষেত্রে ভুল করেছে সেগুলো সামনে রেখে নিজস্ব কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পিছিয়ে যাবে না। আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনে এমন ঘটনা বিরল নয় যখন একটি পার্টির সঙ্গে অপর পার্টির মতভেদ হয়েছে। এই মতভেদ হয়েছে নির্দিষ্ট প্রশ্নের উপর। চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মসূচী গ্রহণ করার পরেও এমন সময় আসতে পারে যখন চীনের সঙ্গে মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে।

"ভারতের অবস্থা সম্পর্কে চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির ধারণা এই রকম একটা প্রশ্ন। আজ চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে আমাদের পার্টির প্রোগ্রাম এবং রাজনৈতিক কলাকৌশলকে আক্রমণ করছে। আমাদের নিজস্ব বক্তব্য থাকবে এবং সে বক্তব্য অত্যন্ত তীব্র ভাষায় রাখা হবে। সে-বক্তব্যে নক্সালবাড়ী কৃষক আন্দোলন সম্বন্ধে চীনের বিবৃতি, অ-কংগ্রেসী সরকারের অংশীদার হওয়া সম্পর্কে চীনের মন্তব্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে পার্টির নিজস্ব নীতি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হবে। এবং আমাদের পার্টির কর্মপন্থার প্রতি নিষ্ঠা জানান হবে।

"আমাদের উচিত হবে বাইরে থেকে আমাদের নিজস্ব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার প্রচেষ্টাকে রোধ করা। আমরা তাদের (চীনের পার্টির) চাপ সৃষ্টি করে চীনের নীতিকে গ্রহণ করবার প্রচেষ্টার সামনে আত্মসমর্পণ করব না।"

চিঠিটা লিখেছিলেন অন্ধ্রের মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীপুল্লা রেড্ডী গত বছর আগস্ট মাসে। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর বক্তব্য এই যে, এই চিঠি কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাঠাবার কিছু দিনের মধ্যেই শ্রীপুল্লা রেড্ডী সম্পূর্ণভাবে ঘুরে গেলেন। এরপর থেকেই শ্রীপুল্লা রেড্ডী এবং তাঁর অন্যান্য সহকর্মীরা মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে কাজ করতে লাগলেন। পলিটব্যুরো থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, পার্টির ভিতরে গণতান্ত্রিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য গোপনে নিজস্ব দল সংগঠন করতে লাগলেন এবং পার্টি বিরোধী কাজ চালাতে লাগিলেন।

পলিটব্যুরোর পক্ষ থেকে সর্বান্তঃকরণে এটাই দেখাবার চেষ্টা হ'য়েছে—শ্রীনাগি রেড্ডী, শ্রীপুল্লা রেড্ডী প্রভৃতি সদস্য পার্টির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করেছেন। চিঠিটা তুলে দেওয়া হয়েছে এই কারণে যে অন্ধ্রের নেতাদের পার্টি-বিরোধী প্রচারকে স্তব্ধ করে দিয়ে বহিষ্কারের পথটা সুগম করে দেবার জন্য। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি উগ্রপন্থী নেতাদের "প্রচারকার্য" সম্বন্ধে যে অত্যন্ত সজাগ সেটা এই চিঠিটা তুলে দেওয়া থেকেই বেশী ফুটে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে, এটাই আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, উগ্রপন্থীদের প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ পার্টির নেতৃত্বের কাছে মোটেই স্বস্তিকর মনে হচ্ছে না। অন্ধ্র প্রদেশে যে-কয়েকজন নেতাকে পার্টি থেকে 'বহিষ্কৃত' করা হয়েছে, তারই প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে সেখানকার পার্টি সদস্যদের মধ্যে। পার্টির মুখপাত্ররা স্বীকার করেন যে, বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য পার্টি ছেড়ে চলে গিয়েছে। এই ঘটনা ঘটছে উত্তর প্রদেশে, বিহারে। পশ্চিম বাংলায় বলা হয়েছে, এমন আশংকা নেই। হয়ত নেই; কারণ, পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীসুন্দরাইয়া বলেছিলেন, পশ্চিম বাংলায় অধিকাংশ উগ্রপন্থী সদস্যই পার্টিতে আবার ফিরে এসেছে। হয়ত তাই; কিন্তু অন্যান্য রাজ্যও আছে, যেখানে উগ্রপন্থীরা বিভিন্ন এলাকায় নিজেদের সংগঠিত করার চেষ্টা করছে।

এটা তাই চ্যালেঞ্জের মত দেখা দিয়েছে। আজ আর এই চ্যালেঞ্জকে উপেক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে পার্টির ভিতরের নিয়মানুবর্তিতাকে প্রতিষ্ঠিত করা। আজ তাই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে পার্টির ঐক্যকে অটুট রাখা। সে-কারণে পলিটব্যুরোর পক্ষ থেকে লেনিনের পার্টি সংগঠন নীতির উল্লেখ করা হয়েছে। নীতিটা মোটামুটিভাবে পার্টির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামতটা সংখ্যালঘুদের পক্ষে গ্রহণ করে মেনে নেওয়া। অবশ্য এই মতামত গৃহীত হবে পার্টির সর্বস্তরে আলোচনা ও সমালোচনার পর। কিন্তু যে-নীতি শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত বা গৃহীত হবে, সেটা সকল সদস্য ও কর্মীকে মেনে চলতে হবে পার্টির নিয়ম-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য। এটাই লেনিনের ডেমক্র্যাটিক সেন্ট্রালিজম। কম্যুনিস্ট পার্টি সংগঠনে এই নীতিকেই সর্বত্র স্বীকৃতি দেওয়া হয়; কারণ, এই নীতি মেনে না চললে পার্টি সংগঠন টিকে থাকতে পারে না, সবল হতে পারে না।

কলকাতায় মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো যে ইস্তাহার প্রচার করেছে, তাতে এই ডেমক্র্যাটিক সেন্ট্রালিজমের উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে, উগ্রপন্থীদের লেনিন মতবাদ-বিরোধী কার্যকলাপকে সামনে তুলে ধরার জন্য। ঠিক যে-উদ্দেশ্যে শ্রীপুল্লা রেড্ডীর চিঠিটি উদ্ধৃত করা হয়েছে ঐ একই ইস্তাহারে। কিন্তু প্রশ্নটা বোধ হয় একতরফা তোলা হয়েছে। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি দু' টুকরো হয়ে যাবার ইতিহাসটা সামনে রাখলে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। এ-প্রশ্ন যে উঠেছে, সেটা বোঝা যায় কলকাতায় ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা শ্রীসোমনাথ লাহিড়ীর এক বক্তব্যে এবং ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীনাগি রেড্ডীর এক বিবৃতিতে। কলকাতায় প্রেস ক্লাবের

মধ্যে উগ্রপন্থী সম্প্রদায়ের কলরবটা বেশ স্পষ্টই শোনা যাচ্ছিল।

সে-কারণে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পার্টি কংগ্রেস নয়, কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে এই আদর্শগত দলিল বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অবশ্য তার আগে দলিলটা পার্টির বিভিন্ন স্তরে আলোচিত হবে এবং সকলের মতামত গ্রহণ করা হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির আরও একটা সিদ্ধান্ত ছিল, পার্টি কংগ্রেস বসবে ১৯৬৮ সালের "শেষার্ধে"। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্ত্বেও প্লেনাম ডাকা হয়েছিল বর্ধমানে এবং ১৯৬৮ সালের "শেষার্ধ" শুরু হবার আগেই। কারণ, শ্রীনাগি রেড্ডী অভিযোগ করেছেন, প্লেনামে "মনোনীত" প্রতিনিধিদের দিয়ে নেতৃত্বের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অটুট রাখা সম্ভব। শ্রী রেড্ডীর অভিযোগ তাঁর ভাষায় অস্বীকার করে পার্টির পলিট-ব্যুরো এ কথাই প্রচার করেছে যে, পার্টির সংবিধান অনুসারে রাজ্য কমিটির ক্ষমতা আছে কেন্দ্রীয় প্লেনামের জন্য প্রতিনিধি বাছাই করা (বা মনোনীত করা)। অবশ্য কেন্দ্রীয় কমিটি রাজ্যের প্রতিনিধি সংখ্যা স্থির করে দেয়। সেই অনুসারে বিভিন্ন রাজ্য কমিটি দলিলটি বিচার করে সমর্থন করে (অন্ধ্র ছাড়া) প্রতিনিধি বাছাই করে। তারাই বর্ধমান প্লেনামে যোগ দিয়ে আদর্শগত দলিলটি গ্রহণ করে।

পলিটব্যুরোর বক্তব্য থেকে অবশ্য এটা বোঝা যায়নি শ্রী রেড্ডীর অভিযোগ সমর্থিত হয়েছে, না খণ্ডিত হয়েছে। বিচার করলে দেখা যাবে শ্রী রেড্ডীর অভিযোগ স্বীকার করেই নেওয়া হয়েছে। প্রথমত, প্রতিনিধি বাছাই করার অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, আদর্শগত দলিল বাছাই-করা-প্রতিনিধিদের দিয়ে গঠিত প্লেনামে গ্রহণ করা নীতিগত কিনা। প্রশ্ন আরও উঠেছিল এই কারণে যে, প্লেনামটা ডাকা হয়েছিল ১৯৬৮ সালের "শেষার্ধ" শুরু হবার ঠিক আগে।

যে দলিল খসড়া হিসাবে তৈরী হবার পরও দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করতে পারে, সে-দলিলকে ১৯৬৮ সালের "শেষার্ধ" শুরু হবার আগেই প্লেনাম ডেকে গ্রহণ করার তাড়া দেখা দিল কেন, এ-প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক মনে না হওয়াই স্বাভাবিক।

তাছাড়া, আদর্শগত দলিল গৃহীত হবার পর পলিটব্যুরোর পক্ষে সম্ভব হয়েছে পার্টি কংগ্রেস ডাকার স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া। পলিটব্যুরোর কলকাতা সভায় স্থির হয়েছে, আগামী ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে পার্টির অষ্টম কংগ্রেস ডাকা হবে। দিনক্ষণ অবশ্য ঠিক হয়নি; কিন্তু সিদ্ধান্তটা পাকা, এটাই জানিয়েছেন জেনারেল সেক্রেটারী শ্রী পি সুন্দরাইয়া। আর যে কথাটা তিনি জানিয়েছেন, সেটাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, পার্টি কংগ্রেসে পার্টির আদর্শগত কোন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা বা সংশোধন করার প্রশ্ন উঠবে না। একটা মুক্ত প্রশ্নই পার্টি কংগ্রেসের সামনে থাকবে, পার্টির ভিতরের অন্তর্বিদ্রোহকে দমন করে সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করা।

এই প্রশ্নটাকে সামনে রেখে পলিটব্যুরো একটা ব্যাপক দলিল তৈরী করার কাজে হাত দিয়েছে। এই দলিলে এটাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করা হবে, কেন এই "বিভেদকারী" মনোভাব পার্টির ভিতরে প্রবল হবার চেষ্টা করছে। যে-সব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার জন্য এই রকম 'বিভেদকারী' মনোভাব দেখা দিতে পারে সেগুলো বিচার করা হবে এবং তারই ভিত্তিতে পার্টি সংগঠনকে বিভেদকামীদের হাত থেকে মুক্ত করার উপায় ও পন্থা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সে-সিদ্ধান্ত এবং সে-বিচার কী ভাবে এবং কী আকারে পার্টি কংগ্রেসের সামনে আসবে তা এখনই অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু এটা অনুমান করতে অসুবিধা নেই যে, পার্টি নেতৃত্বের উদ্দেশ্যটা ছড়িয়ে দেওয়া হবে পার্টি কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের মধ্যে। যাতে পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়।

একটা উপায় অবশ্য পলিটব্যুরোর ইস্তাহারেই রাখা হয়েছে এবং পশ্চিম বাংলা শাখার নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তও সে-কথা বলেছেন। বিভেদকারী ঝোঁকের থেকে পার্টিকে মুক্ত রাখতে হলে পার্টি চিন্তাধারা এবং আদর্শগত বিচার সদস্য ও কর্মীদের মনে গেঁথে দিতে হবে। এটা করা হবে পার্টি কর্মীদের পার্টির আদর্শ ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে উপযুক্তভাবে "শিক্ষিত" করার প্রোগ্রামের মাধ্যমে। এই শিক্ষণ ব্যাপারটা হয়ত শেষ পর্যন্ত মগজ ধোলাইয়ের মত মনে হবে; কিন্তু উগ্রপন্থার ঝোঁক তাকে কমাবে কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ থেকেই যাবে। কারণ, উগ্রপন্থারও একটা রীতি মগজ ধোলাই।

কল্প, কল্পনা

মানস রায়চৌধুরী

উচ্ছ্বাস আনে ঘরে ঘরে মানচিত্র
মানচিত্রের কোনও উচ্ছ্বাস নেই
দ্রাঘিমা তোমার কল্পনা, ভাবো অক্ষাংশের কালো চুল
লুটিয়ে পড়েছে ঋজু পাহাড়ের মুখে
পাহাড় পেরোলে আলো কি অন্ধকার
কল্পনা সব জানে
উচ্ছ্বাস জানি গাঙের পলি কুমোরের সরু আঙুলের
নিপুণ খেলায় পায় বিভা মানচিত্রের
যার কোনোখানে যাওয়াই হল না তার সম্বল ঐ তো
নীল জল আর বাদামী ফাটল
হরিৎ বনের অধিবাস
মাঝে মাঝে দ্বীপ আর অশান্ত কম্পিত জলরেখা
উচ্ছ্বাস আনে মানচিত্রের রেখার জটিল ভাষ্য

যার কোনখানে যাওয়াই হল না
তার ঐটুকু বিশ্ব
পাখা মেলে দিলো ওড়ার নমুনা দেখা যা
পথে হাঁটলেই ভ্রাম্যমাণতা বলি না
হাট থেকে যারা বাড়ি ফিরে যায়
পরদিন যায় হাটে
তাদের কেউ কি বলেছে পর্যটক
কম্পাস আছে মাথার ভিতরে
নাবিকের সব মস্ত স্বভাবও রয়েছে
তবু ভেসে যাওয়া হল না যাদের
তারাই এখন গোপনে
অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা বিচারে প্রাজ্ঞ
মানচিত্রই সার্থক অবলম্ব।

দুঃস্বপ্ন

সুনীল বসু

বাড়িতে আমার প্রবল নরক
লোহা ইঁট কাঠে বন্ধ সড়ক
মৃত্যু আমার পিছনে পিছনে হ্যাংলা কুকুর

আশা-হতাশার দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ
পৃথিবী এখন মাতাল-ক্রুদ্ধ
সেকালের স্নো দৃষ্টির চাঁদ এখন সুদূর

নীতকের সেই সৎ উপদেশ
উপকারী জানি জীবনে আবেশ
যুবতীর কাছে গেলে যেন মিষ্টি শাণিত চাবুক

বিশ্বাস গেছে যমের দুয়োরে
ভালোবাসা খোঁজে দাঁতাল শুয়োরে
সহজে গজায় প্রেমের মজায় ঢ্যাঁড়স ভাবুক

সময় বড়ই অম্লমধুরে
বাজার লুটেছে দালাল অসুরে
চারিদিকে লোকে গোল হয়ে ঘিরে বানায় মোগলা

জীবনে এখন বিঁধেছে কলিশ
নির্বাক দেখে তারকা-পুলিস
কখনো আয়না ভাবি, কে? মানুষ, অথবা বেবুন?

মরা মাছির কয়েকটা লাশ

মঞ্জু মিত্র

দোহাই তোমার
এই পথে আর
কেউ এসো না।

আগলে আছে
ধারালো ছুরির অকুতোভয়
ছয় দারোয়ান।

এই দারোয়ান, শুনছো, ও-ভাই?
দাও-না খুলে এক দরোজা
লাফ দিয়ে যাই
কবরখানা।

দোহাই তোমার
এই পথে আর
কেউ এসো না।

এই কথাটাই মুখস্থ করে
পরীক্ষা পাস।

এই দারোয়ান দরজা খোলো
নইলে দেখ
রাম-দুই-তিন বললেই সুড়ুৎ
হাতের মুঠো
খুললেই পাবে মরা মাছির
কয়েকটা লাশ।

পেটে ব্যথা? দাঁতটা পরীক্ষা করাও।

দাঁতটা ভাল, এবার চোখটা পরীক্ষা করাও

চোখতো খুব ভাল, এবার হার্ট পরীক্ষা করাও।

এতেই হার্ট ফেল করলে! এখনও তো রক্ত, প্রস্রাব, ব্রেন টেস্ট বাকী আছে

chandi

'হাতুড়ে সংক্রান্ত'

কাগজে দেখছি, হাতুড়ে—অর্থাৎ ডিগ্রী-ডিপ্লোমাবিহীন ডাক্তারদের স্বীকৃতি দানের বিরুদ্ধে ডিগ্রীধারীরা প্রতিবাদ মিছিল বের করেছেন—খবরের সঙ্গে তাঁদের ছবিও দেখতে পেলুম। তাঁরা ভাবী ডাক্তারদের মতো গর্জন, উলুধ্বনি এবং 'বলো হরি' (যদিও 'বলো হরি' বলবার পথ তাঁদের সার্টিফিকেট প্রাপ্তিতেই প্রশস্ত হয়ে যাবে) তে বিদীর্ণ হয়ে পড়েন, অভিজ্ঞ গাম্ভীর্যে সমস্ত ব্যাপারটার ওপর একটা ডিগনিটি আরোপ করেছেন।

বিজ্ঞানের দিক থেকে 'হাতুড়ে'রা নিশ্চয়ই বিপজ্জনক। তাঁদের অনেকেই ডাক্তারি-বিদ্যার 'অ-আ' পর্যন্ত শিখেই জীবিকায় নেমে পড়েছেন, কেউ কেউ স্বয়ংসিদ্ধ। আমার এক গ্রাম্য ডাক্তারকে মনে পড়ে গেল। একটি বাচ্চার অসুস্থতার ব্যাপারে তাঁকে ডেকে আনা হয়েছিল। বাড়িতে কেবল

সুনন্দর জার্নাল

মেয়েরাই আছেন মনে করে ডাক্তার গম্ভীর-ভাবে তাঁর জ্ঞানের পরিচয় দিতে লাগলেন: 'ডাইবেটিস্ হতে পারে, ক্যাটারাক্ট হতে পারে, কনকারেশনও করতে পারে!' মেয়েরা চমকিত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার চাইতেও চমকালেন পাশের ঘরে তন্দ্রাচ্ছন্ন একটি শিক্ষিত ভদ্রলোক, যিনি মাত্র সেই-দিনই শহর থেকে এসেছেন এবং যাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে ডাক্তারের কোনো আশঙ্কাই ছিল না। গলাখাঁকারি দিয়ে তিনি বেরিয়ে আসতেই ডাক্তার ব্যাগসুদ্ধ এক লাফে দাওয়া থেকে নেমে পড়লেন এবং 'আমার একটা জরুরী কেস আছে'—বলেই অন্তর্ধান করলেন নক্ষত্রবেগে।

এ হল একটা চূড়ান্ত উদাহরণ। এখনকার গ্রাম্য ডাক্তারেরা বোধ করি আর ও-রকম নির্বুদ্ধিতার স্বর্গলোকে বাস করেন না। তাঁরা বাজার-চলতি মোটামুটি ওষুধগুলোর খবর রাখেন, সালফার-ড্রাগসের মহিমা জানেন, পেনিসিলিন-স্ট্রেপ্টোমাইসিন ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁরা ওয়াকিবহাল। কাজ তাঁরা চালিয়ে দিতে পারেন।

আমরাই কি পারি না? আমার দু-একজন উচ্চশিক্ষিত বন্ধুকে জানি যাঁরা ডাক্তারদের চাইতেও বেশি মনোযোগ দিয়ে ওষুধের সচিত্র বিজ্ঞাপন-পত্রগুলো পড়েন এবং কণ্ঠস্থও করে ফেলেন কখনো কখনো। 'পৃথিবীতে কোন্ জাতের মানুষ সবচেয়ে বেশি'—গোপাল ভাঁড় এই সমস্যার যে ক্ল্যাসিক সমাধান করেছিলেন, তার প্রমাণ পাবার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করবার দরকার হয় না।

'কী বললেন, গা ম্যাজ-ম্যাজ করছে, মাথা ধরেছে? তা হলে এখুনি একটা—'

'ভালো হজম হচ্ছে না? এক কাজ করুন, দু চামচে—'

'শুনুন—রোজ শোওয়ার আগে—'

'ওই টনিকটা একটু ট্রাই করুন না। আমি পার্সোনালী—'

ইত্যাদি ইত্যাদি।

ডিগ্রীধারী ডাক্তারেরা জানেনও না, চলতি পেটেন্ট ওষুধের প্রেসক্রিপশন লিখে তাঁরা কিভাবে নিজেরাই নিজেদের

DOCTOR IS IN

chandi

—শিল্পীর পালাম দাদা, ইনি আটখাট্টি সালের ডাক্তার!

কবর খ'ড়ছেন। আগে কান কনকন করলেই ডাক্তারের কাছে দৌড়োতে হত, এখন পেটি ইকনেস্'-এর জন্য আমরা নিজেরাই ট্যাবলেট কিনে আনি, নইলে যে-কোনো হিতার্থীই উপচিকীর্ষাপরায়ণ হয়ে এগিয়ে আসবেন প্রেসক্রিপশন দিতে—পেশায় তিনি শিক্ষকই হোন কিংবা ইন্সিওরেন্সের এজেন্টই হোন। বিপাকে পড়ে নিতান্তই ধরাশায়ী না হয়ে গেলে আমরা আর ডাক্তারের ছায়া মাড়াতে চাই না। কে আর খামোকা টাকা খরচ করে মশাই? পাড়ার মুখচেনা ছোকরা ডাক্তারকে ডাকলেও তো নিদেনপক্ষে চার টাকা!

গ্রামের মানুষ আমাদের মতো এতটা আলোকপ্রাপ্ত নয় বলেই—কাছাকাছি যে-কোনো ডাক্তারকে পেলে তাঁর কাছে ধর্না

রোগের বদলে রোগীরা প্রায়ই হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ হয়

দিয়ে থাকে। সেই ডাক্তারটির বিদ্যা যদি আমাদের চাইতে বেশি না-হয়, অন্তত আমরা যে-সব পেটেন্ট ওষুধের নাম জানি, সে-সবের নাম তিনিও তো জানেন। আর 'শতমারী' না হলে যদি বৈদ্যত্ব লাভ না ঘটে, তা হলে সেদিক থেকে তাঁরা সকলেই যে আপনার-আমার চাইতে অনেক বেশি এগিয়ে রয়েছেন, এ সত্যও তো আপনি-আমি স্বীকার করতে বাধ্য!

ডাক্তার আসবার সঙ্গে সঙ্গে একটা সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট ঘটে থাকে—এটি তর্কাতীত ব্যাপার। পাড়ার চার টাকার নতুন ডাক্তার এসে যে ওষুধ দিচ্ছিল, চৌষট্টি টাকার দিক্‌পাল এসে যখন সেইটিই প্রেসক্রাইব করেন, তখন দ্রুততর-বেগে আমরা নিরাময় হতে থাকি। যতই ট্যাবলেট কিনে খাই মশাই—ডাক্তারের হাত থেকে সেটি এলে তার আরোগ্য-শক্তি দ্বিগুণ বেড়ে যায়। এই মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতেই হোমিওপ্যাথির বৈপ্লবিক অবদান 'ফাইটাম'—স্রেফ এক পুরিয়া সুগার অভ মিলক! হাতুড়ের হাতে চলতি ট্যাবলেটও গ্রামের মানুষের কাছে ঢের বেশি তেজস্কর হয়ে ওঠে—স্বীকার করুন আর নাই করুন!

হাতুড়ের জায়গায় ডিগ্রীধারী ডাক্তারেরা এসে দেশসেবায় নেমে পড়ুন—অতীব সৎ প্রস্তাব, কিন্তু জানতে ইচ্ছে করে, ডাক্তারের এত প্রাচুর্য সত্ত্বেও গ্রামের অধিকাংশ হেলথ-সেন্টারে ডাক্তার থাকেন না কেন? কম মাইনে? পোষায় না? দূরে পাড়াগাঁয়ে গিয়ে প্র্যাকটিস করতে আপত্তি কেন বিদ্বান-বিচক্ষণদের? পোষায় না—না প্রেসটিজ্ থাকে না?

তাই যদি, তা হলে হাতুড়েদের ওপর রাগ কেন? নেচার অ্যাভরস ভ্যাকুয়াম, যেখানে হাতুড়েও দুর্লভ, সেখানে গো-বদ্যির আবির্ভাব ঘটবে, গো-বদ্যি না জুটলে বুড়ি পিসি শিকড়-বাকড় খাওয়াবেন, আর তা যদি না-হয়, ঝাড়ফুক করতে রোজা কিংবা ওঝা আসবে। অসুখ-বিসুখ তো শহর-গঞ্জ-বন্দরেরই একচেটে নয়!

হাতুড়ে-বিতাড়নের শ্রেষ্ঠ পন্থা ল্যানসেটধারীদের দিকে-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়া। অর্থ খ্যাতি আভিজাত্য ছেড়ে স্রেফ সেবাব্রতে নেমে পড়া। যদি সম্ভব না হয়, হাতুড়েরাই থাকুন—তাঁরাই আমাদের ফোঁড়া কাটুন আর পিল খাওয়াতে থাকুন।

আর তারও কি দরকার হবে? এখন তো দেখছি ক্যানসার-করোনারী আর দুর্ঘটনা ছাড়া মানুষ প্রায় মৃত্যুঞ্জয়। ও তিনটের ব্যাপারে সব ডাক্তারই সমান নিরুপায়। অদূরভবিষ্যতে ডাক্তারেরাই আদৌ থাকবেন, কিনা, সেইটেই বুঝতে পারছি না॥

স্লুইস্

প্রফুল্ল গুপ্ত

গোটা শহরটা 'কারবোন ব্ল্যাকে'র গুঁড়োয় নেরেকার হয়ে গেল। অসংখ্য গুঁড়ো। কালো কালো। বাতাসে ভেসে ঘর দোরে ছেয়ে গেল। এতকাল শহর মোটামুটি ছিমছাম নিরুপদ্রব ছিল। কোথা থেকে এক উড়ো খই এসে সরব হয়ে উঠলো।

পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে একটা বিক্ষোভ। যারা বিজ্ঞ তাদের কথা স্বতন্ত্র। হোঁচট খেয়ে পদ্মনাভ'! উড়ো খইকে গোবিন্দর উদ্দেশে নিবেদন করে অনেকেই স্বস্তি বোধ করলেন শেষ পর্যন্ত।

বারান্দায় কম্বলটা রোদে দিতে দিতে সুচন্দ্রা বকবক করছিল। গোবিন্দর উদ্দেশে কালো খইগুলিকে নিবেদন করতে না পারায় সম্ভবত এই প্রদাহ।

শীতের সকাল। পূব মুখো বারান্দায় রোদ এসে পড়ে; সকালেই। দূরে রেল লাইন। ওপারে উত্তরপূব কোণে যে 'কারবোন ব্ল্যাক' কোম্পানীর শুভাবির্ভাব ঘটেছে, শহরবাসীর কল্যাণের কথা ভেবে এ সম্পর্কে এ তল্লাটে সকলেই উদ্বিগ্ন।

সুচন্দ্রার স্বামী বললেন, "শীত পড়লে বাতাস ঘুরে যাবে, তখন আর তোমার এদিকে কালো গুঁড়ো আসবে না।"

যদি না ঘোরে—বললে সুচন্দ্রা।

উজ্জ্বলকুমার তখনো বললেন, "ভূগোলের বায়ুমণ্ডলের চ্যাপ্টারটা—" বলেই হাসলেন। প্রথম প্রথম এমন কথায় লজ্জা পেত সুচন্দ্রা। এখন রোষ হয়। তাই বললে, "শেষকালে এই গুঁড়োর জ্বালায় মরতে বসেছি, বাড়ি ঘর দোর সব গেল, না কী সব কথা! কেন? দ্বিজেনবাবু যে দরখাস্ত নিয়ে এলেন—"

"কে দ্বিজেনবাবু?"

"সুনীতির বাবা।"

"ওহ্, দ্বিজেন নাগ। ভদ্রলোক নির্বোধ।"

"এহ্ উনিই এলেন কেবল সুবোধ।"

উজ্জ্বলকুমার হাসলেন। হাসলে ভাল লাগে। উজ্জ্বলকুমারের দাঁতগুলি তার উজ্জ্বলতাকে প্রকাশ করে। গত সকালের সংবাদপত্রটি সরিয়ে বললেন, "নবীন অতি সুবোধ বালক। বিদ্যাসাগর মশাই অনেক ভেবেচিন্তে লিখেছিলেন, জানো!"

"সুবোধ বালকে আর কাজ নেই। গুঁড়ো যাতে বন্ধ হয় তার ব্যবস্থা করো।"

উজ্জ্বলকুমার ক্ষণকাল চোখ মেলে

চাইলেন। সংবাদপত্র পরিক্রমায় উপর্যুপরি ছেদ পড়ায় ভদ্রলোক সম্প্রতি যতি টানলেন। বললেন, "মাই গুডনেস। আজ বুঝি শান্তিবাবু আসবেন?"

"ও কি? অসভ্যের মতো কথাবার্তা!"

"ওঁর কোনোখানটাই মেয়েমানুষের মতো নয় কিনা!"

"কেন মেয়েমানুষের মতো হলে কিছু সুবিধে হতো?"

উজ্জ্বলকুমার না হেসে পারলেন না।

সুচন্দ্রা বললে, "বাজার যাও।"

"শান্তিবাবু আসবেন বলে শেষ পর্যন্ত আমাকেই বাজার যেতে হবে?"

এ সব কথার জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বোধ করে সুচন্দ্রা অভ্যেস মতো জবাব দিলে না।

মণিকা আজ আসছে। সুচন্দ্রার বিয়ের পর ওদের আজ এই দ্বিতীয়বার দেখা হবে। কলকাতায় সেবার পুজোর ছুটিতে দেখা হয়েছিল। তারপর আর হয় নি। মণিকা সুচন্দ্রার অন্তরঙ্গ। বন্ধু, আত্মীয়। দূর সম্পর্কের কি যেন বোন টোন হয়। তা হোক, সে বড় কথা নয়।

কথা হল, ওরা এক সঙ্গে স্কুলে পড়েছে, কলেজে পড়েছে। ইউনিভার্সিটির শেষ দরজায় পৌঁছে যাবার আগেই ছাড়াছাড়ি হল। সুচন্দ্রার বিয়ে হয়ে গেল।

মণিকা পাস করেছে। এক বছর চুপ করেছিল। কলকাতারই কাছাকাছি একটা স্কুলে চাকরি-বাকরি করছে। সুচন্দ্রাদের এখানে কোম্পানীর স্কুলে মোমবার ইণ্টারভিউ। মণিকা এর আগে কতবার কথা দিয়েছে। কিন্তু আসেনি শেষ পর্যন্ত। সুচন্দ্রা জানে চাকরি-বাকরির ব্যাপারে মণিকা খুব সিরিয়াস। এবারে সে ফেল করবে না। আসবে নিশ্চয়ই।

পাঠানকোট বেলা তিনটে নাগাদ পৌঁছবে। ফলে স্টেশনে একটু আগেই যেতে হবে। তার মানে আজ দুপুরের ঘুমের ক্লাসে ফাঁকি। দুপুরে সুচন্দ্রা ঘুমোয়। একটা নাতিদীর্ঘ অভ্যেসে। কি বা করার আছে। সুচন্দ্রা মণিকার চিঠিটা আর একবার উলটে দেখলে। টেবিলেই রাখা ছিল।

মণিকা সেবারের চিঠিতে লিখেছিল—"কি রে, ব্যাপারখানা কি? আর কত দিন?" সে চিঠি সুচন্দ্রা উজ্জ্বলকুমারকে দেখিয়েছিল। উজ্জ্বলকুমার সে চিঠি পাঠাতে একটি শব্দ করেছিলেন—'হুঁ'। তারপর চিঠিটা আর একবার নিয়ে শেষের কটা লাইন পড়েছিলেন : গোলমালটা কার দোষী সাব্যস্ত হবে কে? উজ্জ্বলকুমার মন্তব্য করেছিলেন, "সাধারণভাবে মেয়েদেরই সে দুর্নাম আছে। তোমার বন্ধুকে লিখে দিও। আর লিখো এক্ষেত্রে আমিই তার 'বন্ধু' শ্রীমতী চন্দ্রাকে নিষ্কৃতি দেব।"

উজ্জ্বলকুমার সুচন্দ্রার গালে একটা টোকা মেরে একটু নরম করে চেয়ে দেখেছিলেন। সুচন্দ্রার মনে হয়েছিল অন্তরে মানুষটা নরম।

বিয়ের পর মণিকার সঙ্গে উজ্জ্বলকুমারের কয়েকবার দেখা হয়েছিল। তারপর বহুকাল হয়নি। বিয়ের কিছুকাল পরে ওরা কলকাতা এলে মণিকা নেমন্তন্ন করেছিল। খাওয়া দাওয়া সারা হলে মণিকা বলেছিল—'দুপুরে ঘর দিতে পারবো না কিন্তু, মাপ করবেন—।'

উজ্জ্বলকুমার সিগারেটে শেষ টান দিয়ে বলেছিলেন, "ঘরেই তো আছি।"

সুচন্দ্রা মণিকার দিকে রাগত চোখে দেখেছিল আর তর্জনী তুলে তিরস্কার করে বলেছিল—'ভারী ইয়ে—'

এ সব কথা মনে পড়ছে আজ সুচন্দ্রার।

আজ পাঠানকোটে আসবে বলে জানিয়েছে সে নিজে থেকেই। এখানের স্কুলের জন্যে সে ইণ্টারভিউতে আসছে মণিকা সে কথা এখানের চিঠিতেই প্রথম জানতে পারে সুচন্দ্রা। সবটাই গোপনে গোপনে করেছে। এত দূরে এসেছে তবে খবরটা না জানালে নয়, তাই সে জানিয়েছে। ভেতরে ভেতরে বেশ পুলকিত সুচন্দ্রা। যেন এ মুহূর্তে মণিকাকে পেলে হয়।

হাতের কাজ ও যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি সারতে লাগল। উজ্জ্বলকুমার বাজার থেকে একটু বেরিয়েছেন। সুচন্দ্রা ঠিক জানে না কোথায়। শীতের বেলা। এখন আছে, তখন নেই। আজ বিকেলে মণিকাকে নিয়ে একটু বাজারের দিকে বেড়াতে যেতে হবে। অনেকদিন যাওয়া হয়ে ওঠেনি। স্নান করে নিজেকে আর একটু নিতে পারলে বেশ হত।

বসার ঘরে সোফা-সেট। তারই ওপরে ওদের দুজনার ছবি। একটা বুক-কেস। বাংলা ও ইংরাজী বইয়ের অগোছালো সমাবেশ। সুচন্দ্রা মোটামুটি সব গুছিয়ে ফেলেছে।

উজ্জ্বলকুমার আর সুচন্দ্রা খেতে বসলো। ডাইনিং স্পেসটা বেশ বড়ই। মাঝে একটা ছোট খাওয়ার টেবিল। কুকিং রেঞ্জ-এর দুটি চেম্বারে খাদ্যদ্রব্যগুলি গলাধঃকরণের অপেক্ষায়। সুচন্দ্রা খুলতেই একটু শব্দ হল।

কথাটা উজ্জ্বলকুমারই প্রথম পাড়লেন, "তা ভাই তোমার ট্রেনটি কখন পৌঁছবে?" এ ধরনের কথায় অভ্যস্ত সুচন্দ্রা। জানে এর অর্থ শুধু সময় সম্পর্কে সচেতন করা।

সুচন্দ্রা নির্বিকার বললে, "তিনটে—"

"সঙ্গে কেউ যাচ্ছে নাকি!" এর অর্থও সুচন্দ্রার অজ্ঞাত নয়। তিনি নিজে যে যেতে নারাজ এ তারই প্রকাশ মাত্র।

সুচন্দ্রা ভাত বাড়তে বাড়তে বললে—"হ্যাঁ—"।

ধারে একটা কংক্রীটের বেঞ্চ। ওরা বসল। অদূরেই বাঁ দিকের একটি বেঞ্চিতে বসে এক ইহুদী পরিবার। কয়েকখানা মোটর গাড়ি এদিক সেদিক পার্কিং করা। ফুট-ফুটে একটা ছেলে অসম্ভব রকমের দুরন্তপনা করে বেড়াচ্ছে। সম্ভবত ওই ইহুদী পরিবারের। ভারি ভাল লাগছে আজ মণিকার। সব মিলে একটা নতুন কিছু। সে অভিভূত হল। দু একটা কথা তার মনেও এলো। এলো গেলো। সে কথা সুচন্দ্রা জানে। ভেবে কোন লাভ নেই। তবু সে ভাবলো।

বেশ খানিক রাত হল ফিরতে। ফেরার সময় সারা পথটাই হাঁটতে হাঁটতে ফিরছিল ওরা।

"এখানের বাড়িঘরগুলোর বেশ নতুন ধরনের বেশ লাগছে।" মণিকা বললে ফিরতে ফিরতে।

"তুই এখানে চলে আয়। বেশ থাকা যাবে।"

উজ্জ্বলকুমার টিপ্পনি কাটলেন, "না, না। সে কাজটি করবেন না।"

"কেন বলুন তো?"

"তাহলে সব কাজ পণ্ড হয়ে যাবে।"

"তা যা বলেছেন।" বললে মণিকা। তারপর অল্প একটু হাসলো।

ওরা তিনজন যখন বাসায় ফিরল তখন রাত প্রায় দশটা। কারণ কারখানাগুলোর বাঁশি ওরা শুনতে পেলে।

ইন্টারভিউ শেষ হয়ে গেছে আজ সকালে। মণিকা চেয়েছিল আজই বিকেলের দিকে চলে যেতে। সুচন্দ্রা যেতে দেয়নি। খুব স্বাভাবিক কারণে মণিকার পক্ষে সুচন্দ্রার কথা ঠেলে আসতে পারা সম্ভব হয়নি। কোনদিনও সম্ভব হয় না।

আজ আর কোথাও বেড়াতে যাবার কথা নেই। এখনো পর্যন্ত অন্ততঃ তা নেই। কারণ মণিকা কেনাকাটা যাই যাই করেছে। উজ্জ্বলকুমার অফিস গেছেন।

আজ দুপুরের এই শীতের বেলায় ওরা দুজনে। অনেকদিনের পর তাদের যেন একলা ঘরে দুজনকে ঠিক এমনভাবে দেখা গেল। অনেক মুহূর্তে স্মৃতি রোমন্থনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কালের ব্যবধানে আজো তা অক্ষয়। সুচন্দ্রা আর মণিকা তাদের বিগত জীবনের অনেক সুখের আর দুঃখের মুহূর্তগুলোকে আর একবার ঝালিয়ে নিলে।

ওরা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তখনো উজ্জ্বল রোদ। আর কিছুকাল পরে সূর্য দিগন্তে ঝোঁক খাবে।

এই অসময়ে গীর্জার ঢং ঢং শব্দ কানে এলে সুচন্দ্রা সামনের ঘরের খোলা জানলার দিকে তাকালে। ঘরের ভেতর কাউকে দেখা গেল না। শুধু সবুজের পরদাটা স্বল্প হাওয়ায় মাঝে মাঝে প্রসারিত হচ্ছে।

দুপুর গড়িয়ে গেল। সুচন্দ্রা চায়ের আয়োজন শেষ করে বললে, "চা আজ আমরা একটু ঘুরে আসি।"

"কোথায়? কালিমাটিতে?"

"গাড়ির কথা তো বলিনি আজ। ঠিক আছে, কাল যাওয়া যাবে।"

"কাল? বিকেলে তুই কি আমায় ছাড়বি না?"

"ছুটির [illegible]"

মণিকা হাসলো, বললে, "[illegible]"

চা খেয়ে ওরা নীচে নামলো। সূর্যের আলো তখনো মরে যায়নি। দিগন্তে লাল সূর্যটা ক্রমেই দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে। এক ঝাঁক চড়ুই দেবদারু গাছটার দিকে গেলো।

ওরা বেঁকে বাঁ দিকের পথে চললো। কালো রাস্তাটা ঢালু। অদূরে দিকে বাঁক নিয়েছে। মণিকার ভাল লাগছিল। বললে, "সত্যি জায়গাটা অপূর্ব।"

"বাইরে থেকে তাই মনে হয়।"

"কেন?"

"জায়গা ছাড়া আর কি আছে?"

"অনেক কিছুই তো দেখলাম।"

সুচন্দ্রা হাসলে। বললে, "সব ভুয়ো, ফাঁকি।"

ওরা হাঁটছিল। যে পথ ধরে ওদের চলা সে পথে অনেক দিন অনেক প্রহর হেঁটেছে সুচন্দ্রা। বাঁক-এর মোড়ে মিসেস রাঘোবনদের বাংলো। কতদিন সে গেছে। ওরা অবশ্য ভারি ভালো লোক। চমৎকার বাংলো বলে। এরকম দু'একজনদের সঙ্গে সুচন্দ্রার যে হৃদ্যসম্পর্ক গড়ে ওঠেনি তা নয়। মিসেস রাঘোবন, মিসেস মুখোপাধ্যায়,—অনিমেষবাবুরা এঁরা সবাই আছেন। তবু কি জানি সুচন্দ্রার অভিযোগের কারণটা কি ঠিক জানা নেই। আজ শেষবার আগেই সে ঠিক করেছিল কারো বাড়ি সে

এ শহর আপনার কেমন লাগছে বলুন।"

মণিকা অল্প হেসে বললে, "বেশ ভালই—।"

সুচন্দ্রা কথার মাঝেই বলে উঠলো, "রোজই আপনার গীটার শুনি। তাই ভেবেছিলাম একদিন আলাপ করব।"

অজিতেশ হাসল। নিরুত্তর। পরে বললে, "একটু কফি করি?"

সমস্বরে ওরা দু'জনেই বলে উঠলেন, "না, না। এই চা খেয়ে এলুম।"

সবাই থামলে সুচন্দ্রা বললে, "আসুন না একদিন আমাদের ওখানে। মিঃ বোস-এর সংগে আলাপ হবে।"

"বেশ। যাবো একদিন।"

"গীটারটা নিয়ে তো?"

অজিতেশ হাসল। খানিক পর বললে, "আপনিও নিশ্চয় বাজান?"

"না। কিন্তু আমার ভারি শখ ছিল—"

অজিতেশ একথার কোন জবাব দিলে না। অজিতেশ একটা সিগারেট বার করলে। কিন্তু কি ভেবে আর ধরালো না।

সুচন্দ্রা শুধালো, "আপনি এখানে কদ্দিন এসেছেন?"

"এসেছি অনেকদিন। আগে 'বি জোন'-এ ছিলাম।"

"বাড়ির আর সকলে আসেননি না?"

একথার কোন উত্তর না দিয়ে অজিতেশ হাসলো একটু। তারপর মণিকার দিকে চেয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করলে, "আপনি কি কলকাতায় থাকেন?"

মণিকার ঠোঁটে স্বল্প হাসির রেখা ফুটে উঠল। বললে, "হ্যাঁ—।"

সুচন্দ্রা তখনই বললে, "আমরা দু'জনেই এক সাথে [illegible]।"

চোখে হাসি [illegible] অজিতেশ দু'জনকেই দেখলো।

তারপর সুচন্দ্রা বললে, "[illegible] [illegible] না এক দিন [illegible] ঠিক [illegible] কিন্তু।"

সবাই উঠে [illegible]।

সুচন্দ্রা আর মণিকা [illegible] বাড়ির দিকে এগোচ্ছিল। [illegible] অজিতেশ [illegible] তখনও [illegible] বাইরে [illegible] [illegible] অজিতেশ [illegible] বন্ধ করে দিলে।

বাইরে অনুজ্জ্বল আলো। হাওয়ায় ওরা, সুচন্দ্রা আর মণিকা, হাঁটছিল। রাস্তাটা আলোর নিশানায় আরো কালো লাগছে। অনেক রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে। তারপর সেই নদীর পাড়ে ঝুপঝাড় পেরিয়ে পড়েছে।

বাঁকটা ঘুরতেই মণিকা হঠাৎ থামলে। তারপর একটু থেমে বললে, "আচ্ছা চন্দ্রা, এ যাওয়া তোর আর ভাল না, না?"

সুচন্দ্রা মণিকার দিকে মুখ ফেরালো, দেখলো। অনেকক্ষণ চুপচাপ ওরা পথ চললো। সুচন্দ্রা ভাবলো; বললো, "না রে ঠিক তা না। সবই আছে। সব ঠিক আছে, কিন্তু কি জানিস, দু'একটা এ রকম না থাকলে ঠিক ভাল লাগে না রে।"

সরু পথটা আবার অন্যদিকে মোড় নিয়েছে।

ওরা আর এগোল না।

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

বিরাশি

এ যেন এক ভাদুরের ঝাঁপি। ঘরের মধ্যে ঘর, তারপরেও ঘর। পর্দায় পর্দায় সীমানা। এমন মোটা পর্দা যে, পাশের ঘরের দৃশ্য দূরের কথা, কথাও শোনা যায় না। প্রৌঢ় মহিলা অন্যদিকে আর এক পর্দা তোলেন। পাশে আর একটি ঘর। মেঝেয় বিছানো খড়ের ওপরে শতরঞ্চি পাতা। সেই ঘরের খোলা পর্দা দিয়ে চকিতে দেখা গেল, আশ্রমে প্রথম প্রবেশের মুখে আলো ঝলকানো গানের আসর। যেখানে 'উনি' বসে আছেন। ঘরের ভিতর দিয়েই আসরে যাওয়া যায়।

মহিলা অদৃশ্য হতেই আমি লিলি ঝিনির দিকে ফিরে তাকাই। আমার মনে ও চোখে কৌতূহলিত জিজ্ঞাসা। ঝিনির চোখে মুখে তখনো জয়দেবের বাণীর রঙ। কিন্তু আমি দাগাবাজও নই, আর দুরন্ত কামাগ্নির বিকার নষ্ট করার জন্যে কারুর পদপল্লব মাথায় নিতে চাইনি। কিন্তু ভঙ্গির লাস্যে, বচনের চটুল দীপ্তিতে একটু রঙ ছড়ায় বইকি। মহিলা শুধু অভীষ্ট ভাষণে সিদ্ধা নন। এক হিসাবে রসিকা বিদুষী বলে মনে হয়। ভূষণের চাতুর্যেও পাকা স্যাকরার জড়োয়ার কারুমিতি। অথচ তারই মধ্যে এক মহিমায় গলার স্বরও রুদ্ধ হয়ে যায়, চোখ বোজে যায়। ইনি কে।

আমার এই কৌতূহলিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি-পাতের আগেই লিলি ঘাড় বাঁকিয়ে চোখের কোণে হেসে নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করে 'কেমন লাগল!'

বলি, 'অর্থ অনর্থ বাদ দিয়ে, অপূর্ব!'

অমনি লিলির চোখে শঙ্কা। কাজলা চোখ বড় করে একবার সখীর দিকে তাকিয়ে দেখে। তারপরে বলে, 'এত ভাল লেগেছে? দেখবেন মশাই, পাড় ধ্বসে না যেন।'

হেসে বলি, 'সে আশঙ্কা নেই!'

লিলি বলে 'বলা যায় না, পুরুষ মানুষ তো। আর আমাদের মা-টিও যা। বাবারে।'

সেটা একেবারে মিথ্যা না। মহিলার প্রতি আমার কটাক্ষ নেই। কিন্তু অনেক অঘটন অনায়াসেই ঘটিয়ে ছাড়তে পারেন বোধহয়। ঝিনি বলে ওঠে, 'কী যে বলিস। উনি কি তা-ই!'

অর্থাৎ মহিলাটি। লিলি যাঁকে কয়েকবারই মা বলেছে। লিলি তেমনি নিচু স্বরেই বলে, 'উনি যাই হোন ভাই, কী যে না পারেন আর না জানেন, তা জানি না।'

গলার স্বর আরো নামিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে ফিসফিসিয়ে বলে, 'আমি তো ভাবলাম, আপনাকে আর ছাড়বেন না। যেভাবে জড়িয়ে ধরেছিলেন।'

ঝিনি একটু চাপা স্বরে বেজে ওঠে 'আহ লিলি, চুপ কর!'

আমি বলি, 'তা যেন হল, কিন্তু ইনি কে।'

লিলি বলে, 'ইনি মদন বাউলের প্রকৃতি মনোহরা।'

বলে উঠি, 'বাহ্, নামটিও চমৎকার!'

বলতেই ঝিনির সঙ্গে আমার চোখা-চোখি হয়ে যায়। ওর দৃষ্টিতে অনু-সন্ধিৎসা। চোখে চোখ পড়তে হেসে মুখ নামায়। আমি আবার বলি, 'মাতোয়ারা নাম হলেও ওঁকে মানাতো।'

লিলি আলতো করে ধাক্কা দেয় ঝিনির গায়ে। বলে, 'এই ঝিনি, ভদ্রলোক কী বলছেন রে। একেবারে মজে গেছেন মনে হচ্ছে।'

বলি 'তা একরকমভাবে মজেছি বলতে পারেন। সেই খপ করে হাত ধরা থেকে এইটুকু সময়ের মধ্যেই যেরকম দেখলাম, না মজে কে পারে। আপনারা মজেননি?'

দুই সখীতে চোখাচোখি করে ঠোঁট টিপে হাসে। লিলি বলে, 'মজেছি। তবে আমরা মেয়ে তো, সেইটিই ভরসা।'

দুই সখীতে নিচু স্বরে হেসে ওঠে। অর্থাৎ পুরুষকেই ভরসা নেই। ঝিনি হাসি থামিয়ে বলে, 'আমার কিন্তু ওঁকে খুবই ভাল লেগেছে। বাইরের থেকে ওঁকে যা দেখা যায়, ভেতরে তা নয়। এমনিতে সেজেগুজে থাকতে ভালবাসেন, কিন্তু সব সময়েই যেন কিসের একটা ঘোরে আছেন।'

বলতে বলতে ঝিনির মুখের রূপান্তর হয়। ওরও যেন একটা ঘোর লাগে। মদন বাউলের এ প্রকৃতি মনোহরাকে দেখে, আমার মনে হয় যেন কিসের একটা ঘোরে রয়েছেন। এইমাত্র চোখ পাকিয়ে, পুরু-

কুবেরের বিষয়-আশয়

শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নূতন রচনা 'কুবেরের বিষয়-আশয়' আগামী সপ্তাহ থেকে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে।

কুবের সাধুখাঁ ছিল আসলে একটি পাকা ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে মানুষ। প্রকৃতির সন্তান সে মাঝে মাঝে গরুর ভাবলেশ-হীন চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত। আস্তে আস্তে এবং অবশ্যই আন্দাজে সে বিষয়ে আসক্ত হল। ধানজমি, পুকুর, নারকেল-বাগান ইত্যাদিতে মগ্ন হতে হতে সে বুঝলো, বিষয়ে তার শেকড় প্রবিষ্ট হলেও আসলে সে আগের মতই আশ্রয়-হীন—মাথায় কোন শেড নেই তার। অথচ বিষয় মানুষকে বিপদের দিনে ছায়া ছড়িয়ে আশ্রয় দেয়। তাই লোকে একসঙ্গে বলে—বিষয়-আশয়।

এই মানুষটি তাই বৈভবের মধ্যেও আশ্রয় পেল না। তার আশয় হয়ে দাঁড়াল সেই প্রকৃতি—যার দিকে সে একদা আত্মানুসন্ধানের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু তাকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করলেও সে আশ্রয় খুঁজতে চাইল চাঁদের হলুদ নীলাভ বিচ্ছুরণে—ভাটির ফাঁকা-বুক নদীর রহস্যে। কেননা, গোপন পাপের ফলভোগ এবং একটি নির্বাক বিষধর সাপ তার জন্যে ওত পেতে বসেই ছিল।

মুহূর্তেই হাসেন। তৎক্ষণাৎ আবার কাঁদেন। তবু রাধারানীর কথা আমার মনে পড়ে যায়। সে প্রকৃতির সঙ্গে যেন এ প্রকৃতি মেলাতে পারি না। বাউল প্রকৃতি কি এমনটিও হয়। বলি, 'আমি এমন বাউল প্রকৃতি দেখিনি!'

'কেমন বাউল প্রকৃতি হে?'

একেবারে পালটা প্রশ্ন পর্দার পাশ থেকে। দেখি স্বয়ং মনোহরা। পর্দা তুলে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন। আবার সেই বুক ধড়াসে যাওয়া। হঠাৎ কথা যোগায় না মুখে। কিন্তু এত সোজা প্রশ্নের সোজা জবাব না দিলেও চলে না। অথচ তাঁর পাশেই মদন বাউলের গোরা মূর্তি। রেশমী গেরুয়া, ধূসর গোঁফদাড়ি দীর্ঘ পুরুষের চোখ দুটি যেন হাসিতে চিকচিক করে। তাতেই আরো ঠেক খেয়ে যাই। তবু বলে ফেলি, 'আপনার মত।'

মনোহরা ঝটিতি বাউলের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে যেন ছোট মেয়ের মত নালিশ করেন, 'দেখছেন তো গোসাই!'

তারপরেই আমার ওপরে যেন ঝাঁপিয়ে পড়েন। কাছে এসে নিচু হয়ে ঝংকার দিয়ে ওঠেন, 'কেনরে মুখপোড়া, বাউল প্রকৃতি কি মাথায় জটা নিয়ে খেঁকি বোষ্টমী হয়ে থাকবে?'

মদন হেসে ওঠেন হা হা করে। আমি তাড়াতাড়ি বলি, 'তা বলিনি। আমি—মানে—।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ বল না, আমার সাজপোশাক, পান খাওয়া এ সবের মধ্যে ওসব থাকে না, তাই তো? প্রকৃতির তুই কী জানিস?'

বলেই ঝিনির একটা হাত ধরে টান দিয়ে কাছে এনে বলেন, 'এই দ্যাখ দাগাবাজ, এও একটা প্রকৃতি। বাউল প্রকৃতি। চিনতে পারিস, বুঝতে পারিস?'

ভঙ্গিতে যতখানি, গলায় তত রোষ ফোঁস নেই। বরং যেন একটা আবেগের ধারায় কৌতুকের ছটা, তরঙ্গ তোলে স্বরে। ঢুলুঢুলু চোখেও সেই কৌতুক রহস্যের বান। ঝিনি আমার দিকে চেয়ে লজ্জিত হেসে চোখ নামায়। মদন বাউল গাঢ় স্বরে বলে ওঠেন, 'বাহ্ বাহ্ মনোহরা বড় ভাল বইলছ গ।'

আবার সেই রাগের সুরে স্বর বাজে তাঁর গলায়। মনোহরা তখন লিলিকেও আর এক হাত দিয়ে ধরে বলে, 'কে প্রকৃতি নয় বল্ দেখি। যেখানে প্রেমরসের গতি সেখানেই প্রকৃতি। প্রেম কি আর বেশবাসে গন্ধে ধরা পড়ে? প্রকৃতি হয় মনে মনে বুঝেছ হে ছোকরা।'

মদন যেন ফুকারি ওঠেন, 'সোন্দর, মনোহরা সোন্দর বইলছ গ। প্রেম পীরিতি বিনা রসের গতি নাই। রসের গতি প্রকৃতি ভিন্ন হইতে পারে।'

স্পষ্টই দেখতে পাই মদন বাউলের চোখ দুটি ছলছলানো। যখন এলেন তখন থেকেই ভেজা ভেজা, একটু রক্তিম। মনোহরা তাঁর দিকে ফিরে বলেন, 'সেইজন্যেই তো দেহ সাজাবার কথা কেউ বলে না। বলে ।'

মনোহরা সুর করে গেয়ে ওঠেন, 'মন সাজো, প্রকৃতি সাজো।'......

মদন বাউল রুদ্ধ গলায় বলে ওঠেন, 'আহা অই অই, যথার্থ গ, যথার্থ।'

মনোহরা হাত বাড়িয়ে দেন মদনের পায়ে। মদনও নিচু হয়ে মনোহরার পা স্পর্শ করেন। দু'জনেরই যেন কিসের একটা আবেশ। দু'জনেরই চোখ ভিজে ওঠে। ভিতরের ভাব না বুঝতে পারি, দেখতে পাই, এঁরা আপন স্রোতে বহতা। সেই একই বাউল রীতিভঙ্গি। লিলি মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখে। কিন্তু ঝিনি ওর অপলক চোখ দুটি, আমার চোখ থেকে সরায় না। কী ওর মনের ভাব সবটুকু বুঝি না। যেন এক কূলে দাঁড়িয়ে আর এক কূলে নজর করে। মদন মনোহরার কূলে দাঁড়িয়ে আর একজনের দিকে চেয়ে থাকে। সবাই আপন স্রোতে বহতা।

মনোহরা এই ঘোরের মধ্যেই সহজভাবে বলেন, 'গোসাই, আমার মেয়েরা যে ছেলের কথা বলেছিল এ সে-ই।'

মদন অমনি দু' হাত বাড়িয়ে আমাকে বুকের কাছে টেনে নেন। এমন নিবিড় অনাবিল আবেগে টেনে নেন এ মানুষের হৃদয়ের যেন কোন তল খুঁজে পাই না। বলেন, 'এস্য বাবা এস্য। তুমার কথা আগেই শুনেছি।'

যেন কতদিনের চেনা জানা, কত আপন। মেকিপনার দরকারও তো নেই। দেওয়া-নেওয়ার কোন সম্পর্ক নেই আমাদের। যথার্থ দেখ, যেন স্নেহে সোহাগে আলিঙ্গন দেন। এ মন প্রাণের গতিপ্রকৃতি জানি না। তার বিশাল শরীরের স্পর্শে একটি স্নিগ্ধতা। অস্পষ্ট হালকা একটা মিষ্টি গন্ধ। হয় তো চুলদাড়িতে কিংবা রেশমি আলখাল্লার। পান সে খান না, সেটা

বোঝাই যাচ্ছে। তবে অই এক ব্যাজ, মুখের সামনে কথা বললেই হাল্‌কা একটু প্রেমের গন্ধ পাবে। অর্থাৎ গন্ধিকা।

মনোহরা সংবাদ দেন আমার গোপীদাসের আশ্রমে ওঠার কথা। তারপরে বলেন, 'এ আবার কী বলে জানেন তো গোঁসাই?'

'কী গ?'

'বলে, লেখার জন্যে ঘুরি না, ঘুরি বলে লিখি।'

মদন হেসে আমার চিবুক ধরে নাড়া দেন। বলেন, 'ঠিক ঠিক, সাধে বলো জপে, জপে বলো সাধে না। ঠিক কী না বাবা।'

বলি, 'কী সাধি, তাই তো জানি না।'

মদন একেবারে হাঁকাড় দিয়ে হেসে বাজেন, 'জয়গুরু, জয়গুরু। তবে দেখো বেড়াও। তাই বেড়াও বাবা, তাই বেড়াও।'

মনোহরা জিজ্ঞেস করেন, 'কেমন দেখেন গোঁসাই?'

'কিসের বুঝাবুঝি গ? ই [illegible]? [illegible] কানে, সব মনমনা ই [illegible]। [illegible] [illegible]। এখন ইয়ার মইরাছি না মইরার [illegible]। কে জানে [illegible] বাপ।'

বলে, আর একবার নিবিড় করে [illegible]। মনোহরা [illegible] শব্দ করেন, [illegible], [illegible]।'

[illegible] হঠাৎ বিনির দিকে ফিরে [illegible], 'চোখে জল [illegible] মা, [illegible] মরেছি নয় মরতে আছি।'

[illegible] চেয়ে দেখি, বিনির চোখ [illegible] যায়। আমার চোখ [illegible] মুখ নামিয়ে নেয়। মদন [illegible] [illegible] বিনির মাথায় [illegible] [illegible], [illegible] গ মা। [illegible], বা [illegible]?'

বিনির দিকে আমার চোখ পড়ে। ওর [illegible] মুখ, আমার দিকে চেয়ে থাকা [illegible] যেন একটা অভিযোগের ছায়া। কী [illegible] সেই অভিযোগ জানি না। কিন্তু আমার মনের মধ্যে হঠাৎ চলাচিত্র উঠে [illegible] [illegible]। একটা ঘোর লাগে। সব তো মদন বাউলের সব কথা বুঝি না। [illegible] নিজের মনের কথা কারুর মুখে এমনি করে শুনি না। গোপীদাসের মুখে শুনেছিলাম। আবার মদনের কাছে শুনলাম। [illegible] তাঁর কথা শুনেই মনে পড়ে যায়, কী খুঁজি। কিছু কি খুঁজি। আমি কি কখনো এমন গতি পেয়েছি, যেন ফিরে যাবার কথা আমার কানে যায় না। চলি চলি চলি, এমন আর মরি কি না মরি। না হয় মরতেই আছি। এমন গতি কি আমার! না কি, এও সেই গতির কথা বারংবার বন্ধু ডাকাডাকি, তবু যাই সেই তার কোলে, মরণ মরণ মরণ।

বিনি বা কেন কাঁদে। ওর গতিও কি এমনি। স্বরূপের কথা শুনে কি ওর চোখ ভাসে। না কি আর কিছু। ওর চোখ সহসা টলটলিয়ে না উঠলে, আমার নিজের কথাও এমন করে মনে হত না। মদন বাউল কী ভেবে বলেন, জানি না। আমি এক স্রোতে ভেসে যাই। তাঁর চোখও শুকনো নেই।

তারপরে মদন বলেন, 'কিন্তু আমার কাছে এক দিন থাইকতে হবে বাবা।'

মনোহরা বলেন, 'সে কথা বলেছি।'

খুশী হয়ে বলেন, 'বেশ করেছ। জাইনলে গ মনোহরা আজ গোপাল আমাকে ভাসাইচ্ছে। আমি আর থির থাইকতে লাইরছি।'

বলতে বলতেই তাঁর গলার স্বর বন্ধ হয়ে আসে। চোখ ফেটে জল গলে। মনোহরা হাত দিয়ে তাঁর বুকের কাছে চেপে ধরেন। বলেন, 'জানি গোঁসাই। গোপাল ক্ষ্যাপার গান শুনলে আপনি কী করে থির থাকবেন।'

মদন মাথা নাড়েন, আর চোখের জলে গলেন। বলেন, 'আহা হা কানা মানুষ,' আমার হাতখান ধরো ধরো গান কইরছে আমার ভিতরে যেন কী হয়ো যেইছে গ। পেথম গানই ধইরলে, "আয় মজা দেখবি আয়, ভবনদীর মাঝখানে।/এসরাজ উইঠছে

ডুইবছে হাত্রিসছে খেইলাছে, ডাইকছে ভাব্‌ক জনে।" গোপাল আমাকে পাগল কইরবে গ আজ। বড় সুখে রইয়েছি।'

তারপরে হঠাৎ আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'তুমরাও এসো মা-বাবারা, কানা গোপালের গান শুইনবে এসো, আমি যাই।'

বলেই একেবারে উঠে পড়েন। কে কানা গোপাল, যাঁর গান শুনে মদনের জ্বর হয়। এখন বুঝতে পারি কেন প্রথম থেকেই ওঁর চোখ আরও ছলছল। উনি আপন মনে ডুবেছিলেন। আমার কৌতূহল হয় গোপালকে দেখতে তার গান শুনতে। মদন যাবার আগে আবার বলেন, 'অই মনোহরা, উখানে যে সব বাবু ভেয়েরা যন্তরপাতি নিয়ে বসে রইয়েছেন, উয়াঁদের একটু সইরতে বল গা।'

মনোহরা বলেন, 'হ্যাঁ, আপনি চলুন।'

মদন চলে যান। মনোহরা বলেন, 'এই আজকাল একদল মানুষ হয়েছেন গান তুলে নিয়ে যাবার বাতিক। কী, না সিনেমা-থিয়েটারে গিয়ে লাগাবে। মরলে হা ভাত, খালি রঙ্গ।

বলে ঘাড়ে একটা ঝটকা দিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে হাসেন। খুলে যাওয়া এলো

গিয়েছে। হাতে ওর স্যাণ্ডেল, ঘাটের কাছে অন্ধকার। যদিও লোকজন আছে। 'কিন্তু ওপারে কোথায় যাবে ও?' আমি নেমে যাই। ঝিনি জলে পা দেয়। ফিরে ডাকে, 'এস।'

অতএব আমারও পাদুকা হাতে। ওপারের মানুষের পিছন ধরে দুজনেই চলি। জলে ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ বাজে। জিজ্ঞেস করি, 'ওপারে কোথায়?'

অস্পষ্ট ছায়ায় ওর মুখ দেখি। শুধু অবয়ব। ওপারের পশ্চিম দিকে আঙুল তুলে দেখায়। অন্ধকারে নিবিড় গাছপালা ছাড়া কিছুই দেখতে পাই না। গভীর ছায়ার বাইরে অস্পষ্ট নিরালা বালুচর।

জিজ্ঞেস করি, 'কী আছে ওখানে?'

'নিরালা।'

নিরালায় যেতে চায় ঝিনি। ডাক দিয়ে ফেরাতে ইচ্ছা করে। পারি না। তবু জিজ্ঞেস করি, 'কেন?'

ও পালটা জিজ্ঞেস করে, 'ভয় লাগে?'

'ভয় লাগবে কেন?'

ও আমার দিকে ফির চায়। বলতে পারি না, ভয় লাগে না। চলার পথকে বিড়ম্বিত হতে দেখি। উড়াল দিয়ে চলব, ডানায় যেন বাধা ধরিয়ে দিতে চায় ও। আমার স্বরের খুশীকে করুণ সুর ধরিয়ে দিতে চায়, এইটুকু আশংকা।

জলের কল্‌কল্‌ ছপ্‌ছপ্‌ শব্দে ওর গলা শোনা যায় 'আমাকে ভয় করো না।'

যেন এক করুণ আর্তস্বরে বাজে। বলি, 'ভয় করিনি তো।'

আমরা ওপারে পৌঁছুতে পৌঁছুতেই চয়ের বালি যেন চিকচিকিয়ে ওঠে। সব-কিছুই একটু যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি নিজেদের ছায়া পড়েছে বালিতে লম্বা হয়ে। পূর্বদিকে ফিরে দেখি রক্তিম একফালি চাঁদ আকাশের গায়ে।

ঝিনি বলে, 'ওদিকটায় দিনের বেলা দেখেছি, সুন্দর গাছপালা, পরিচ্ছন্ন নিরালা। দুপুরে মনে হয়েছিল, জয়দেব ওদিকে তাকিয়ে লিখতেন।'

ঝিনির কথা শুনতে শুনতে আমার মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে ওঠে, 'দূরালোক : স্তোকস্তবকনবকাশোক-লতিকা বিকাশ : কাসারোপবনপবনোঽপি ব্যথয়তি।/অপি ভ্রামদ্ভৃঙ্গীরণিতরমণীয়া ন মুকুলপ্রসূতিশ্চূতানাং সখি শিখরিণীয়ং সুখয়তি।' সই, এই ছোট ছোট নতুন গুচ্ছে সাজানো অদ্ভুত অশোকলতা আমার দেখতে ইচ্ছে করে না। এই গাছপালার ঠাণ্ডা বাতাসে কষ্ট হচ্ছে। সবই সুন্দর, গায়ে জড়ানো কুঁড়ি মাথা তুলে আছে, ভোমরা গুনগুনিয়ে ফিরছে, কিন্তু আমার প্রাণে একটু সুখ নেই।...কেননা আমার আগের দিনের কথা সবই মনে পড়ছে, যখন মামন্দবীক্ষ্য বিলক্ষিতস্মিত—সুধামুগ্ধাননং কাননে।

ঝিনি যে কানন সরসী নিবিড় বনের দিকে যায়, জয়দেব কি তাই দেখেই কল্পনা করেছিলেন? আমরা যত এগিয়ে যাই ততই নিরালা হয়ে আসে। রক্তিম চাঁদের আলো যেন আর একটু স্পষ্ট হয়। তথাপি কুহেলী প্রচ্ছন্নতা। স্থান নিরাপদ কিনা জানি না। সেই ভাবনার সীমা পেরিয়ে এসেছি। যত এগিয়ে যাই, ওপারের নানা কলরব ছাপিয়ে ঝিঁঝির ডাক শোনা যায়। একটা রাত জাগা পাখির স্বর বেজে বেজে ওঠে।

ঝিনি থমকে দাঁড়ায়। ওপারের মেলার সীমানাও পেরিয়ে এসেছি। ও নদীর দিকে দেখে, আমার দিকে ফিরে তাকায়। জিজ্ঞেস করি, 'কী?'

ও আমার একটা হাত ধরে। বলে, 'বালি শুকনো, ওখানে একটু বসবে?'

'চল।'

আজ তো তাই ভেবেছিলাম সন্ধ্যেয়, দেখি কত দূরে নিয়ে যায়। খানিকটা গিয়ে ঝিনি বলে, 'বস।'

বলে, আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বসে। আমিও বসি। আস্তে আস্তে মনে হয়, লোকজন সবাইকেই দেখতে পাচ্ছি। মেলার আলো যেন আমাদের গায়েও এসে পড়ছে।

ঝিনি চোখ নামায় না দেখে ওর দিকে ফিরি। অস্পষ্টতার মধ্যেও দু পাশের বেয়ে পড়া চুলের মাঝখানে ওর মুখ স্পষ্ট দেখা যায়। অসংকোচ অপলক চোখের দৃষ্টি, তবু ওর ঠোঁট যেন কাঁপে। আবা জিজ্ঞেস করি, 'কী?'

ও আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ে। প্রায় অস্ফুটে বলে, 'শুধু এইটুকুই।'

বলে মুখ নামায়। ওর মুখে, ওর সমস্ত ভঙ্গিতে একটা অসহায় কষ্টের ছাপ ফোটে। ওর বিকেলে আসার কথা আমার মনে পড়ে, মনে পড়ে, ও হাট করতে এসেছে অধরার সন্ধানে। বোধ হয় আপনাকে বিকিয়ে। ওকে কিছু বুঝিয়ে বলব, সে মেয়ে ও না। কিন্তু ওকে কোনরকমে একটু স্নেহের প্রবোধ জানাব, সে সাহস পাই না। তথাপি আমার বুকে বিঁধে যায়।

মুখ নিচু রেখেই ও সহসা বলে, 'জানি, আমার লজ্জা নেই। তুমি দুঃখ পাও, বিরক্ত হও।'

এত তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, বাধা দেবার সময় পাই না। তবু বলি, 'বিরক্ত হইনি।'

'হও হও, আমি বুঝি। কিন্তু—এইটুকু, এইটুকু।'...

ওর গলায় স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। আমি ডাক দিই, 'ঝিনি।'

ও মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে, 'কেন এমন হল, তুমি কি জান?'

জবাব দিতে পারি না। ও বলে ওঠে, 'আমি জানি।'

ওর জলে ভেজা চোখের দিকে তাকাই। ও বলে, 'তোমার জীবনটা আমাকে লোভী করেছে। তুমি যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে চলে যাচ্ছ। কোন কিছুতেই দৃকপাত নেই। যেন কেউ ডাকছে।'

আমি বলি, 'জানি না তো। আমি তো কোন ডাক শুনতে পাই না।'

'কিন্তু তোমাকে যে দেখবে, সেই বলবে একথা। তারপরে মনে হল, তুমি সুখের খোঁজে যাচ্ছ না। প্রাণের খোঁজে চলেছ। তাই আর মন মানাতে পারি না, চোখ ফেরাতে পারি না। কেবল ভাবি, আমিও 'তুমি' হব।'

ও আমার দু হাত নিজের হাতে নেয়। বলি, 'ঝিনি, তোমার সব কথার জবাব আমার জানা নেই। প্রাণের খোঁজে যাই কিনা জানি না, শুধু এইটুকু জানি, আমার সবই বিষের ভরা। এ বিষ আমি সইতে পারি না। এই নিয়ে আমার চলা।'

'হ্যাঁ, তুমি বিষ, বিষাক্ত। সে বিষ তুমি আমাকেও দিয়েছ।'

'দিই নি ঝিনি।'

'তবে নিয়েছি।'

একথায় কোন জবাব দিতে পারি না। শুধু বলি, 'তবু সে তোমারি যন্ত্রণা, মুক্তি সে তোমারি নিজের উপায়ে।'

ঝিনি বলে, 'এইটুকু তোমার বলবার আছে জানি। সে পথ কখনো মিলবে না। একটা কথা বলব?'

'বল।'

'কিছু তো নেবে না, কিছু দাও।'

'কী?'

ঝিনি ঘাড় নাড়তে নাড়তে দু হাতে মুখ ঢাকে। শরীর ফুলে ফুলে ওঠে। ভাঙা ভাঙা স্বরে বলে, 'জানি না, তা জানি না।'

বলতে বলতে থামিয়ে নিচু হয়ে পড়ে। অসহায় কষ্টে ওর দিকে চেয়ে থাকি। যে আলো আমার হাতে নেই, তা আমি জ্বালি কেমন করে। জানি, এই বাজীতে আগুন দিলে সংসারের আকাশ জুড়ে, নানা রঙের আলোর ঝাড়ে ঝলকাবে। কিন্তু সে আগুন আমি হাতে করে নিতে পারি না। দিতে পারি না।

একটু পরে ও শান্ত হয়, মুখ তোলে, উঠে বসে। পশ্চিমের দূরে নদী আর চরের অসীমে, অন্ধকারে মুখ ফিরিয়ে ক্ষণকাল চেয়ে থাকে। তারপরে আমার দিকে তাকায়। বলে, 'আমার লজ্জা ঘৃণা ভয়, কিছু নেই। আমাকে তোমার খুব খারাপ লাগছে, তাই না?'

এই মুহূর্তে আমারও বুকের ভিতরটা দুলে ওঠে। মনে হয় একটা আবেগের ঢেউ ভেঙে পড়তে চায়। বলি, 'আমি অন্যানুষ নই। কী বলব, তোমাকে কেমন লাগে? তোমার মত সর্বাংশে সুন্দর আর—।'

কথা শেষ করতে না দিয়ে ও বলে ওঠে, বিষ বিষ বিষ।' আর দিও না। বুঝেছি কী বলবে, থাক।'

বলতে বলতে ওর চোখ আমার ঝাপসা হয়ে ওঠে। বলে, 'চল যাই।'

দুজনেই উঠি। ঝিনি আবার বলে, 'একটা কথা রাখবে?'

'বল।'

'আজ সারারাত মদন বাউলের আখড়ায় দুজনে গান শুনব।'

'শুনব।'

'সত্যি, তুমি কী বাধ্য।'

বলে, যেন রঙ্গ করে হেসেই ওঠে। পথে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করে, 'এখান থেকে কোথায় যাবে?'

'ঠিক জানি না। তবে হাড়োয়ায় পীর গোরাচাঁদের মেলায় একবার গাজীর সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

'গাজী? কোন গাজী?'

'সেই মামুদ গাজী।'

'ওহ্, সেই মানুষ, যার সঙ্গে তোমাকে প্রথম দেখি।'

'হ্যাঁ।'

ঝিনি কথা বলে না। যেন সেদিনের স্মৃতির মধ্যে ডুবে যায়। একটি কথাও না বলে, নদী পার হয়ে চলে আসে।

ঝিনিকে মদন বাউলের আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে বিন্দুদের আশ্রমে ফিরি। কথা থাকে, খেয়ে এসে ওদের সারা রাত্রি গান শুনব। কিন্তু আমার কেবলই মনে হয়, জয়দেব দেখা আমার শেষ হয়েছে। জয়দেবের রাধা-মাধবের মন্দির দর্শনে লাভ কী। কেবল স্মৃতি। বিগ্রহ বৃন্দাবন থেকেই জয়পুররাজ জয়পুরের ঘাটি নামে জায়গায় প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আশ্রমে ফিরে দেখি গানের আসর তখনো জমজমাট। আমি ঘরে ফিরে যাই। সেখানে দেখি বিন্দু কার সঙ্গে বসে কথা বলছে। নতুন একজন বাউল। গোপীদাসেরই বয়সী হবে। মোটা কাঁথায় আলখাল্লার শরীর জড়ানো। মাথায় পাকা চুল আলুলায়িত। পাকা দাড়ি কুঁকড়ে পাকিয়ে গিয়েছে গলার কাছে।

বিন্দু আমাকে দেখেই কাছে উঠে আসে। বলে, 'এসা বাবাজী, ঘুরাফিরা হল্য?'

সে আমার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়। তারপরে যেন চমকে উঠে বলে, 'কী হয়েছে চিতে বাবাজী?'

অবাক হয়ে বলি, 'কিছু না তো?'

বিন্দু তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসায় তাকিয়ে বলে, 'মুখখানা যে বড় শুকনো দেখি, চখের কোল বসা।'

হেসে বলি, 'কিছু না। বেড়িয়ে ফিরলাম তো।'

বিন্দুর চোখে অতৃপ্ত সংশয় লেগে থাকে। বৃদ্ধ বাউল জিজ্ঞেস করে, 'কে গ বিন্দু।'

বিন্দু ফিরে বলে, 'ই সিই চিতে বাবাজী, যার কথা বইলছিলাম তোমাকে।'

আমার দিকে ফিরে বলে, 'ই বাবাজীর নাম গোপাল গোঁসাই। আমার বাবার আর ওঁয়ার একই গুরু, গুরুতোই গুরুভাই।'

গোপাল গোঁসাই! আমি ভাল করে বাউলের চোখের দিকে তাকাই। বিন্দু বলে, 'কী দেইখছ বাবাজী? ওঁয়ার চখ নাই। মায়ের দয়ায় নজর হারিয়েছে।'

বলি, 'হ্যাঁ, ও'র কথাই শুনেছিলাম মদন বাউলের কাছে। উনি বোধহয় ওখানে গান করছিলেন।'

গোপাল নিজেই বলে ওঠেন, 'হ' হ' বাবা, উখানে গান কইরছি। এস্য বাবাজী, আমার কাছকে এস্য।'

গিয়ে ডান দিকে বসি। গোপাল হাত বাড়িয়ে গায়ে দেন। তারপরে কাঁধের থেকে, গোটা মুখে, চোখে মাথায়। বলেন, 'বাহ্, সোন্দর বাবাজী। মাথা মুখ যেজায় ঠাণ্ডা ক্যানে বাবাজী?'

বলি, 'বাইরে ছিলাম তো।'

'তাই। খুব ঠাণ্ডা।'

বলে আমার হাত টেনে নেন। যেন গরম করে দিতে চান। চোখের ভিতরে কিছুই দেখি না, তবু যেন কী চিকচিক করে।

ও'র সঙ্গে দু' চার কথা হতে হতেই গোপীদাস আসে। রাধা বৃন্দাও আসে। তারপরে নিতাই খাবার জন্য ডাক দেয় সবাইকে। কিন্তু যতবারই বিন্দুর সঙ্গে চোখাচোখি হয়, দেখি তার অনুসন্ধিৎসা ঘোচে না। একটু বা উদ্বেগের ছায়া।

আমার খাওয়া শেষ হতেই ঝিনি আসে। বলে, 'ডাকতে এসেছি।'

বলি, 'আমি তো যাব বলেছিলাম।'

'আকে বলেছেন, তার মন মানলে তো। তারপরে কী করেছেন কে জানে। খেল না কিছুই। আমাকে বললে, ডেকে নিয়ে আয়, নইলে আসবে না হয় তো।'

লিলি কথা বলতে বলতে আমার চোখের দিকে বারেবারেই চায়। চোখাচোখি হলেই, দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। ওর চোখেও অনুসন্ধিৎসা। বিন্দুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গোপীদাসকে বলে মদন গোঁসাইয়ের আখড়ায় যাই।

ঝিনি ঢোকবার মুখে দরজাতেই দাঁড়িয়েছিল। আমরা আসরের একেবারে সামনে গিয়ে বসি। গিয়ে বসতে হয় না। আশ্রমের যাত্রী উদ্যোক্তারাই ডেকে বসান। ইতিমধ্যে গান আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। দেখলেই বোঝা যায় গুচ্ছ গুচ্ছ দল সব বসে আছে। একের পর এক গানের পালা।

ঝিনি আমি লিলি তিনজনেই পাশাপাশি বসি। ওরা দুজনে এক চাদরে পরস্পরকে জড়িয়ে বসে। ঝিনি আমার চাদরটা তার আগেই টেনে একেবারে আমার পা অবধি ঢেকে দেয়। মদন বাউলের সঙ্গে যতবার চোখাচোখি ততবারই হাসাহাসি। চোখে চোখে নিঃশব্দে। তিনি যেন কেবলই ইশারায় ভুরু কাঁপান।

মনোহরা মাঝে মাঝে এসে বসেন, আবার উঠে যান। মাঝ রাত্রে মদন একবার আসর ছেড়ে উঠে যান। লিলি তখন কাত হয়ে শুয়ে পড়ে। ঝিনি আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'ঘুম পেয়েছে?'

বলি, 'না।'

'বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে না?'

আমি ওর দিকে ফিরে তাকাই। বলি, 'না।'

আমার যেন মনে হয়, ঝিনিই ক্লান্ত বেশী। বলি, 'তোমার একটু শোয়া দরকার।'

ও সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'শোব?'

'শোও।'

'তোমার পায়ের ওপর মাথা রাখলে কষ্ট হবে?'

আমি এক মুহূর্ত ওর দিকে চেয়ে থেকে বলি, 'আমার কোলের ওপরেই রাখ।'

মুহূর্তে ওর মুখের পরিবর্তন হয়। অস্ফুটে একবার উচ্চারণ করে, 'বিষ।'

স্পষ্ট করে বলে, 'যাবার আগে ডাক দিও।'

বলে ও আমার পায়ের কাছেই মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। আমার গানের দিকে মনযোগ দিতে গিয়েও যতবার তাকাই, দেখি ঝিনি মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। চাদরের ভিতর দিয়ে ওর একটা হাত আমার পায়ে। ইতিমধ্যে মদন গোঁসাই আবার আসেন। এসে ঝিনি লিলির দিকে ইশারা করে মাথা নাড়েন। তারপরে হাতের ভঙ্গিতে জানান, থাক এমনিই থাক ওরা।

শেষ রাত্রির আগেই ঝিনির চোখ বুজে যায়। এখন আমি ওর মুখের দিকে দেখি। ওর ঘুমন্ত মুখে যেন বিষণ্ণ হাসির আলো-ছায়া মাখা।

আসর অনেক ঝিমিয়ে এসেছে। শেষ রাত্রের দিকে চারদিকেই অনেকে ধরাশায়ী। এমন কি নাসিকা গর্জনও শোনা যায়। আমি আস্তে আস্তে পা থেকে ঝিনির হাত সরাই। সেই মুহূর্তে একবার মদন বাউলের সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হয়। তিনি দাড়ি, দুলিয়ে হেসে ঘাড় নাড়েন। আমি আস্তে আস্তে পা গুটিয়ে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াই। [illegible] হাতটা চাদরের বাইরে পড়ে থাকে। ওর চাদর দিয়ে ঢাকতে গেলে পাছে জেগে যায়। তাই আর ঢেকে দিই না। কিন্তু এলানো হাতটা দেখে কেমন একটা শূন্যতা জেগে ওঠে।

আমি আবার মদন গোঁসাইয়ের দিকে তাকাই, তিনি স্নিগ্ধ হেসে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি হাত তুলে নমস্কার করি। তিনি দু' হাত তুলে ঘাড় নেড়ে আমাকে বিদায় দেন। আমি বেরিয়ে আসি।

এখনো কোথাও কোথাও গান চলছে। কিন্তু অনেকটাই চুপচাপ হয়ে এসেছে। আমি আমার আশ্রয়ে ফিরে আসি। সেখানে একেবারেই নিঝুম। ঘরে ঢুকে দেখি, অচেনা অনেকে শুয়ে আছে। নিতাই আর সঞ্জয় তার মধ্যে চেনা।

হঠাৎ শব্দে পাশ ফিরে দেখি, পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বিন্দু। আমি তাড়াতাড়ি তার কাছে যাই। নিচু স্বরে বলি, 'বিন্দু, আমার ঝোলাটা দাও।'

বিন্দু কিন্তু অবাক হয় না। আমার মুখের দিকে কয়েক পলক চেয়ে থেকে বলে, 'ঝিনিদিদিকে কোথায় রেখে এলো।'

কী আশ্চর্য প্রশ্ন। আমি কেন তাকে রেখে আসব। বলি, 'ও আসরে ঘুমোচ্ছে।'

'আর তুমি পালাইচ্ছ।'

বলে, জবাবের প্রত্যাশা না করে সে আমার ঝোলাটা এনে দেয়। আমি বলি, 'সবাইকে বলো, আমি গেলাম।'

বিন্দু আমার চোখের দিকে চেয়ে থাকে। ওর চোখের কোণ দুটো চিকচিকিয়ে ওঠে। বলে, 'বুঝি চিতে বাবাজী তোমাকে বুঝি, তোমাকে দুষিব না। তবে—'

বিন্দুর গলার স্বর বন্ধ হয়ে যায়। আমি বলি, 'যাই বিন্দু।'

আমার সঙ্গে সঙ্গে সে দরজার কাছে আসে। বলে, আবার এসো বাবাজী, যখন মন কইরবে এস্য। তোমার ত পথ বাঁধা নাই।'

ঘাড় নেড়ে চলে আসি। মনে মনে বলি, কত যে বন্ধন প্রতি পদে পদে, তা যদি বোঝাতে পরাতাম। আমার পথের বন্ধন তো অন্য মানুষ না, আমার মন। সে যদি ঠিক আমিও ঠিক।

জয়দেবকে মনে মনে স্মরণ করি। কে জানে, কেমন দেখতে ছিলেন। শুধু জানি, তিনি এক কবি। তিনি পদ্মাবতীরমণ, চরণ চারণ চক্রবর্তী।

অজয়ের জলে কুয়াশা উঠছে ধোঁয়ার মত। কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেকে স্নানে নেমেছে। চাঁদ চলে গিয়েছে, পশ্চিমের সেই নিরালা কাননের পিছনে। এখন [illegible] আলোর ইশারা। আমি নদী পার হতে যাই।

[illegible]

কালসন্ধ্যা

বুদ্ধদেব বসু

দ্বিতীয় অঙ্ক : ১

[দ্বারকার রাজপথ। পিছনে রাজপুরীর সিংহদ্বারের আভাস। কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে। তাঁকে প্রথম অঙ্কের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধ দেখাচ্ছে। অর্জুন প্রবেশ করলেন। তাঁর কাঁধে গাণ্ডীব, পিঠে তূণ, মুখে পথশ্রম ও প্রৌঢ়ত্বের চিহ্ন। চলার ভঙ্গি চেষ্টাকৃতভাবে বীরোচিত।]

অর্জুন

[কৃষ্ণের সামনে থেমে]

আপনি কি জানেন, কৃষ্ণ এ-মুহূর্তে কোথায় আছেন?

কৃষ্ণ

এই যে, অর্জুন। এসো।

অর্জুন

কী আশ্চর্য, তোমাকে হঠাৎ—

কৃষ্ণ

কী আশ্চর্য, চিনতে পারোনি?

অর্জুন

হঠাৎ তোমাকে মনে হ'লো—

[অর্জুন কাশলেন, কথা শেষ করলেন না।]

কৃষ্ণ

কিছুটা বয়স্ক, বৃদ্ধ? তোমাকেও তা-ই দেখছি।

অর্জুন

কী জানো, আমার চক্ষু তত তীক্ষ্ণ নেই আর।
সেদিন কান্তিক বনে লক্ষ্য করেছিলুম জম্বুক,
পরে দেখি, চিত্রিত হরিণ।

[অর্জুন হাসতে গিয়ে থেমে গেলেন।]

তোমার কি মনে হয় আমি

[নিজের বাহু ও উদরের দিকে তাকিয়ে]

ঈষৎ স্থূলাঙ্গ হ'য়ে পড়েছি সম্প্রতি?

[চুলে আঙুল চালিয়ে]

কেশগুচ্ছ ঘনকৃষ্ণ নেই আর?...বিদায় তাহ'লে, প্রেম!
বিদায়, নূতন দেশে আশাতীত নারীর আহ্বান!
কিন্তু না—এখনো এই বাহুতে বিজয়লিপ্সা,
শোণিতে যৌবনতাপ—

[হঠাৎ থেমে]

হয়েছে কী,
বহুকাল যুদ্ধ নেই, নেই মর্ত্যে বা স্বর্গে ভ্রমণ,
পরিত্রাণ চায় না আমার হাতে কোনো শত্রুবেষ্টিত নগরী,
কিংবা কোনো নির্জিতা রমণীরত্ন।
অশ্বমেধে অশ্বরক্ষা, পুত্র বভ্রুবাহনের হাতে
ক্ষণিক মৃত্যুর পরমুহূর্তেই প্রাণপ্রাপ্তি—
সব ছিলো অত্যন্ত সহজ, চেষ্টাহীন।
ইদানীং সব চলে মৃদু ছন্দে, সূর্য ওঠে, সূর্য ডুবে যায়,
নিশ্চিন্তে কৃষক করে কৃষিকর্ম, বেদমন্ত্র জপেন মুনিরা,
অর্থাৎ দিন ও রাত্রি নিতান্তই অভ্যস্ত, দৈনিক।
অবিরাম নিরাপত্তা ও বিশ্রামে, আমি
কিঞ্চিৎ হয়েছি ক্লান্ত।

[অর্জুন থামলেন, কৃষ্ণ কথা বললেন না।]

তা, তুমি কেমন আছো, বলো।
কেন বার্তা ত্বরিতে পাঠিয়েছিলে? আছেন তো কুশলে ক্ষত্রিয়বর্গ,
বসুদেব, বলরাম, মহিলারা?

[কৃষ্ণ নীরব।]

'সময়ের উচ্ছিষ্ট যা ছিলো,
ধবল ও কৃষ্ণবর্ণ মূষিকেরা তাও আর রাখলো না বাকি।'
—এর অর্থ? আমি, দ্যাখো, সরল মনের যোদ্ধা, উদ্ভট শ্লোকের
নই ভাষ্যকার।

[কৃষ্ণ নীরব।]

কী অদ্ভুত নিঃসাড় দ্বারকাধাম।
রাজপথ জনহীন, সব গৃহে রুদ্ধ বাতায়ন।
যে আজ অতিথি, তার কোনো শ্রদ্ধা প্রাপ্য নেই যেন।
কী ব্যাপার?

[কৃষ্ণ নীরব।]

আমি ভেবেছিলাম, অন্তত
সাত্যকি আসবেন
নগরের বহির্দ্বারে, আমাকে জানাতে অভ্যর্থনা।
তিনি কি ভুলে গেলেন, আমারই অধীনে তাঁর অস্ত্রশিক্ষা?
আশ্চর্য—তোরণ, মাল্য, শঙ্খনাদ কিছু নেই
কুরুক্ষেত্রে বিজয়ী পার্থের জন্য!

[কৃষ্ণ নীরব।]

জানো, আমি দ্বারকার সীমান্তে শুনেছিলাম

[মৃদু হেসে]

মূঢ়, গ্রাম্য লোকেদের মুখে, এক
হাস্যকর, উৎকট রটনা।

[অর্জুনের পরবর্তী উক্তিতে আশঙ্কার সুর লাগলো।]

কৃষ্ণ, কেন কথা নেই? কেন স্তব্ধ? কেন স্তব্ধ এ-মহানগর?

[দূরাগত সমুদ্রের শব্দ অস্পষ্ট শোনা গেলো।]

ঐ শব্দ—কিসের? যেন অসংখ্য দুঃখীর
সম্মিলিত হতাশার দীর্ঘশ্বাস।
তা-ই?
না কি সমুদ্র?
সমুদ্র অদূরে জানি, সন্নিকট নয় কিন্তু।
আগে যতবার
এসেছি দ্বারকাপুরে, এই শব্দ কখনো শুনিনি।
সব আজ মনে হয় অন্যরূপ, অস্বাভাবিক।

কৃষ্ণ

[অতি শান্ত স্বরে]

শোনো, পার্থ:
জনরব সর্বদাই মিথ্যা নয়।
পথে-পথে যে-রটনা শুনে এলে—
সব সত্য।

অর্জুন

[চকিত স্বরে]

—সত্য!

কৃষ্ণ

পরস্পর উন্মাদ হননে
যদুবংশ লুপ্ত আজ:
বসুদেব শোকে, আর বলরাম
যোগাসনে প্রাণত্যাগ করেছেন।
অভ্রান্ত গান্ধারী!

অর্জুন

[চীৎকার করে]

না—অসম্ভব!

কৃষ্ণ

শোক অবলার বৃত্তি। আর তুমি,
অর্জুন, তুমি তো বীর। ধৈর্য ধরো।
তাছাড়া, কেন বা শোক? কার জন্য?
কে কাকে সংহার করে?
জন্ম থেকে সকলেই মৃত, চিরকাল সকলেই মৃত,
জীবিত ও মৃতে কোনো ভেদ নেই।

অর্জুন

জীবিত ও মৃতে কোনো ভেদ নেই?
কী-অদ্ভুত কথা!
তবে কেন নিশ্চিহ্ন যাদবগোষ্ঠী,
আর তুমি, আমি
দৃশ্য, শ্রাব্য, স্পর্শনীয়
এ-মুহূর্তে, এই দ্বারকায়?

কৃষ্ণ

তা সত্যি। তুমি ও আমি
দৃশ্য, শ্রাব্য, স্পর্শনীয়
এ-মুহূর্তে, এই দ্বারকায়?
কিন্তু, দ্যাখো, এ-মুহূর্ত এইমাত্র
অন্য এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেলো,
অন্য এক মুহূর্ত আবার।
সঙ্গে নেয় তোমাকে আমাকে টেনে,
টেনে নেয় দৃষ্টি, শ্রুতি, ঘ্রাণ,
বৃক্ষ, জন্তু, নক্ষত্র, নিখিলবিশ্ব।
ধরো, যদি দ্বারকা সমুদ্রগর্ভে ডুবে যায়,
লুপ্ত হয় আর্যাবর্ত, দাক্ষিণাত্য,
যদি ঘটে প্রলয়, তবুও—
কিছু থাকে — কী থাকে? ভাবো।
যদি ভাবো, যদি ভেবে দ্যাখো,
কিংবা যদি কখনো নিজেরই মধ্যে ডুবে যাও, গভীর, গভীরতর,
হয়তো বা অগত্যা উত্তর পাবে:
যা আছে, তা চিরকাল ধ্বংসের অতীত,
যা নেই, তা কখনো ছিলো না।

[একটু থেমে]

অর্জুন, আমি কি
তোমাকে বলেছিলাম এই কথা, কিংবা এর অনুরূপ কথা,
কখনো — অতীতে?

অর্জুন

[চিন্তান্বিতভাবে]

এই কথা?...অনুরূপ কথা?...আমাকে?

কৃষ্ণ

ভুলে গেছো? আমিও...জানি না ঠিক।
মনে পড়ে, অথচ পড়ে না।
কখনো বা মনে হয়, কোনো-এক অস্পষ্ট অতীতে
কোনো-এক সংশয়ে ব্যাকুল,
তুমি, পার্থ, কিছু প্রশ্ন করেছিলে আমাকে, হঠাৎ
কর্তব্যপরায়ণতা ভুলে গিয়ে, ঘটনার ঘূর্ণন থামিয়ে।
আমি তার উত্তরও দিয়েছিলাম। কিন্তু—
আমি যা বলেছিলাম, তুমি তা বোঝোনি।
আমি যা বলেছিলাম, আমিও বুঝিনি।
তবু—সেই অনুভূতি!—যেন এক সত্তা আছে,
অন্য কিছু নেই, আছে একমাত্র সেই সত্তা—
পায় না বৃদ্ধি বা ক্ষয়; জন্মে না, মরে না;
একবার অস্তিত্ব সম্ভব হ'লে কোনোকালে ঘটে না বিলয়;
যার মুখগহ্বরে অনন্তকাল ধ'রে
যুগপৎ উপস্থিত বর্তমান, অতীত ও ভাবীকাল,
জড়, প্রাণ, জীবিত, মৃতেরা।
আর সেই সত্তা যেন—

[মৃদু হেসে]

আমি!

তুমি সেই মুহূর্তের সাক্ষী ছিলে, দ্রষ্টা ছিলে।
তারপর গাণ্ডীবে টংকার তুলে তুমি পুনর্বার
মুক্ত ক'রে দিলে গতি, আবর্তন, পুনরাবর্তন।
—কিছু মনে পড়ে না, অর্জুন?

অর্জুন

কৃষ্ণ, আমি বুঝি না কেমনে
তুমি পারো ছড়াতে তত্ত্বের ধোঁয়া এ-মুহূর্তে,
যেন এই ভীষণ ঘটনা
কোনো পুরাকালীন কাহিনীমাত্র, পল্লবিত লোকপরম্পর,
কিংবা কোনো অলস কবির স্বপ্ন
কীটদষ্ট ভূর্জপত্রে আঁকা।

কৃষ্ণ

অর্জুন, তুমি ও আমি—
আর যারা আমাদের সঙ্গে ছিলো, শত্রু বা সুহৃদ,
ধৃতরাষ্ট্র, কর্ণ, দ্রোণ, দুর্যোধন,
ভীষ্ম, ভীম, যুধিষ্ঠির, শকুনি, বিদুর,
গান্ধারী, দ্রৌপদী, কুন্তী:
আমরাও ধূসর কাহিনীমাত্র
বিশ্বের বাতাসে ভাসমান,
আর তাই অশেষ, আবহমান।

অর্জুন

কৃষ্ণ, ক্ষমা করো।
যাদবের পরিণাম শুনে
আমি পরিতপ্ত, অস্থির, বেপথুমান।
গাত্র যেন ঘর্মাক্ত, ত্বকে জ্বালা।
অথচ, আশ্চর্য—তুমি নির্বিকার!

কৃষ্ণ

[ক্ষণকাল স্তব্ধতার পরে]

বহুকাল নিরাপত্তা ও বিশ্রামে তুমি
সম্প্রতি হয়েছো ক্লান্ত। নাও তবে
আরো এক দুঃসহ কর্মের ভার। আরো একবার
বীর্যের পরীক্ষা দাও।

অর্জুন

আজ্ঞা করো।

[প্রাসাদের অভ্যন্তর থেকে নারীদের আর্তস্বর ভেসে এলো।]

সমবেত নারীকণ্ঠ

পার্থ, আমরা আর্ত! ত্রাণ করো!
পার্থ, আমরা আর্ত! ত্রাণ করো!

কৃষ্ণ

ঐ আজ্ঞা।
রাজকন্যা, রাজমাতা, রাজবধূ,
সুভদ্রা, রুক্মিণী, সত্যভামা,
ষোড়শ সহস্র নারী,
শিশু, বৃদ্ধ, অসংখ্য সেবক,
আর স্বর্ণমাণিক্যের বিরাট ভাণ্ডার—
সব নিয়ে যাত্রা করো তুমি।
গন্তব্য—হস্তিনাপুর।
যুধিষ্ঠির দেখবেন এঁদের।
দেখবে জগৎবাসী, কেমন অপ্রতিরোধ্য
তোমার গাণ্ডীব, বাহুবল।

অর্জুন

[গাণ্ডীবের গুণে মৃদু শব্দ করে]

বহু বৎসরের সঙ্গী, বলীয়ান, বিশ্বস্ত গাণ্ডীব
হও তবে প্রস্তুত। উদ্যত হও, কিণাঙ্কিত বাহু।

[মঞ্চে আলো ম্লান হ'লো।]

কৃষ্ণ

ত্বরা করো। সন্ধ্যা নামে।

অর্জুন

সন্ধ্যা! এত দ্রুত কেন সন্ধ্যা?

কৃষ্ণ

আসন্ন সময়।

[মঞ্চে আলো আরো ম্লান। সমুদ্রের শব্দ আরো স্পষ্ট।]

অর্জুন

আর এত অসুন্দর—যেন রুগ্ন, শান্তিহীন।
আর যেন সমুদ্র সীমাতিক্রান্ত, ক্ষুধায় উন্মেল।

কৃষ্ণ

যাত্রা করো, অর্জুন। আর বিলম্ব কোরো না।

অর্জুন

[ভিন্ন সুরে]

তুমি আসবে না সঙ্গে?

[কৃষ্ণ নীরব।]

বন্ধু, সখা, সারথি আমার,
তুমি আসবে না?

কৃষ্ণ

মনে হয় কয়েক মুহূর্ত শুধু,
কিংবা বহুকাল,
চিরকাল ধ'রে আমি
ছিলাম তোমার সঙ্গে—লক্ষ্য বা অলক্ষণীয়:
পাঞ্চালীর স্বয়ংবরে, খাণ্ডবদাহনে,
কুরুক্ষেত্রে, স্বর্গে, মর্ত্যে, বনবাসে, সংহারে, বিজয়ে,
এমনকি পানে, স্নানে, ভোজনে, বিশ্রম্ভালাপে,
এমনকি বাসরশয্যায়।
মনে হয় তোমার জন্যই আমি
বলি দিয়েছিলাম কর্ণকে; আর একলব্যের ঘাতক,
তাও আমি—দ্রোণ নন, অন্য কেউ নন।
গান্ধারী আবৃত চক্ষে দেখেছেন
মূল সত্য, আদি বীজ। তাঁকে নমস্কার।
কিন্তু আজ তোমার আমার পথ
ভিন্ন; জনে-জনে মুক্তির সরণি ভিন্ন।
বন্ধু, আজ একা যাও, কর্ম করো; মুক্ত হও কর্মজাল থেকে।

অর্জুন

[আবেগজড়িত স্বরে]

কৃষ্ণ, সখা, হৃষীকেশ, তুমি আসবে না?

কৃষ্ণ

আমি আছি
অন্য এক প্রতিজ্ঞার আবন্ধ। তুমি যাত্রা করো।
এই দেশ বাসযোগ্য নেই আর।

[সমুদ্রের গর্জন আরো স্পষ্ট। মঞ্চের আলো পিঙ্গল।]

অর্জুন

কী-অদ্ভুত স্বিরালোক! অনিশ্চিত, বিকৃত সন্ধ্যার লগ্ন!
আরম্ভ না অবসান? প্রদোষ না প্রত্যূষ—কে জানে।

[চারদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে]

কৃষ্ণ, তুমি অকস্মাৎ কোথায় লুকোলে?

[মুহূর্তের জন্য কৃষ্ণকে দেখালো এক ন্যুব্জপৃষ্ঠ বৃদ্ধের মতো।]

এই বৃদ্ধ—জরাজীর্ণ—লোলচর্ম—
এ কি তুমি?
তুমি কৃষ্ণ?

[কৃষ্ণ অন্তর্হিত। মুহূর্তের জন্য অর্জুনকে
দেখালো এক ন্যুব্জপৃষ্ঠ বৃদ্ধের মতো।]

অর্জুনের কণ্ঠে প্রতিধ্বনি

এই বৃদ্ধ—জরাজীর্ণ—লোলচর্ম
এ কি তুমি?
তুমি পার্থ?

সমবেত নারীকণ্ঠ

[নেপথ্যে]

পার্থ, আমরা আর্ত! ত্রাণ করো!
পার্থ, আমরা আর্ত! ত্রাণ করো!

(ক্রমশ)

বিশ্ব বিজ্ঞান

ভ্রূণ অঙ্গচালনা করে কেন?

যাঁরা জীবের ভ্রূণ নিয়ে গবেষণা করেন তাঁরা প্রথমে একটা জিনিস লক্ষ করে আশ্চর্য হয়ে যান। তাঁরা দেখেন ভ্রূণগুলি পূর্ণাঙ্গ লাভের আগেই নড়াচড়া করতে আরম্ভ করে। মাছ ও ব্যাঙের ভ্রূণগুলি তাঁরা দেখলেন ডিম্বাণুর ঝিল্লীর ভিতরে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে, পাখীর ভ্রূণ ডিমের ভিতরে মোচড় দিচ্ছে, পাক খাচ্ছে, স্তন্যপায়ী জীবের ভ্রূণ ক্রমাগত জরায়ুর মধ্যে জায়গা বদল করছে। পর্যবেক্ষকরা ভেবে কোন কূলকিনারা করতে পারলেন না যে কেন এবং কি করে এই রকম ব্যাপার ঘটে।

বিজ্ঞানীরা কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র নন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন যে, ভূমিষ্ঠ হবার বহু আগে থাকতেই ভ্রূণগুলি এইভাবে অঙ্গচালনা অভ্যাস করে এই নড়ন চড়ন পূর্ণাঙ্গ জীবের আকার নিয়ে জন্মাবার পরে যেভাবে তাদের অঙ্গচালনা করতে হবে তারই মহড়া মাত্র। তাঁরা ভাবলেন যে জৈব জগতে যে নির্মম জীবন সংগ্রাম চলে সেই সংগ্রামের পাকা যোদ্ধা হবার জন্য তারা যোগ্যতা অর্জন করে ডিম্বাণু, ডিম বা জরায়ু থেকে শৈশবের কোঠায় পদক্ষেপ করে।

কিন্তু কিছুদিন বাদেই দেখা গেল যে বিভিন্ন ভ্রূণের ক্ষেত্রে এই অঙ্গচালনার মধ্যেও বিভিন্নতা রয়েছে যাকে সামান্য বলা যায় না। আরো একটা জিনিস গবেষকরা লক্ষ করলেন। সেটা হচ্ছে এই যে, যেসব জীবের ভূমিষ্ঠ হবার পর অঙ্গচালনার দরকারটা খুব বেশী ভ্রূণাবস্থায় তারাই কিন্তু বেশী অলস। বেশী নড়াচড়া তাদের পছন্দ নয়। যেমন ধরুন পাইক নামে এক জাতের প্রকাণ্ড মাছ আছে যাদের শিকার ধরে খেতে হয়। তার মানে তাদের পাকা খেলোয়াড়ের মত ছুটে গিয়ে শিকার ধরতে হয়। শিকার ধরতে পারা না পারার উপর তাদের বাঁচা না-বাঁচা নির্ভর করছে। কিন্তু যে জীবের গতি এত দ্রুত তার ভ্রূণাবস্থায় নড়ন চড়নটা কি রকম? "অবসর সময়ে অঙ্গচালনা শিক্ষা" কি তারা ভ্রূণাবস্থায় অন্যদের চেয়ে বেশী মাত্রায় করে? মোটেই না। ডিমের ঝিল্লীর নিচে তারা খুবই আস্তে আস্তে ঘুরপাক খায় এবং তাও সবসময় নয়। অনেক সময় তারা নড়েও না। কিন্তু পেলেকাস নামে আর এক জাতের প্রাণী আছে যার প্রকৃতি অত্যন্ত শান্তশিষ্ট। অথচ ভ্রূণাবস্থায় তার চপলতা পূর্ণাঙ্গ অবস্থার তুলনায় একেবারে বিপরীত। লেজ বেঁকিয়ে মাথার দিকে মুড়ে সে অনবরত এপাশ ওপাশ করতে থাকে, শরীরটা পাকিয়ে ভিজে কুকুরের মত গা-ঝাড়া দিতে থাকে। ভ্রূণাবস্থার আগাগোড়া সে এক সেকেণ্ড অন্তর এই রকম দুরন্তপনার পরিচয় দেয়।

এর পর বৈজ্ঞানিকরা আরো একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করলেন। কোন কোন মাছের ক্ষেত্রে তাঁরা দেখলেন যে, সদ্যনিষিক্ত ডিম্বাণু মাংসপেশীসম্পন্ন ভ্রূণের রূপ নেওয়ার আগেই নড়ন চড়নের সামর্থ্য লাভ করে। মাছের ডিম্বাণু এমন একটা থলির মত জিনিস যার মধ্যে প্রোটোপ্লাজমের পাতলা একটি আবরণের নীচের সবটুকু জায়গা ডিমের কুসুমে (সাদা অংশ) ভর্তি। প্রোটোপ্লাজমের নিরন্তর সংকোচন ক্রিয়ার ফলে থলির ভিতরকার উপকরণগুলি সদা-সর্বদা আন্দোলিত হতে থাকে। তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে, ডিম্বাণুও "অঙ্গ-চালনা শিক্ষা করছে"? এ কথার কোন অর্থই হয় না। আসলে, কোন জীবই ভ্রূণাবস্থায় অঙ্গচালনায় তালিম দেয় না। ভ্রূণের অঙ্গচালনা সম্পর্কে ধারণাটাই ভুল।

ভ্রূণতত্ত্ববিদরা গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত মনে হয় আসল জবাব তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন বহুকাল মাথা ঘামিয়ে। তার আগে একটি দৃষ্টান্ত দিই যার সঙ্গে আমাদের এই আলোচ্য ব্যাপারের কিছু মিল আছে। একটি প্ল্যাটিনাম ফলকের উপর বৈদ্যুতিক টেনসন প্রয়োগ করে সেটিকে যদি ডুবিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেই জলের মধ্যে যে অক্সিজেন রয়েছে সেগুলি কিছু বাড়তি ইলেকট্রন সংগ্রহ করবে। তখন বিদ্যুৎ-প্রবাহমাপক গ্যালভ্যানোমিটার ব্যবহার করলে দেখা যাবে যে জলের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে। জলে যত বেশী অক্সিজেন মিশবে ততই বাড়বে সেই তড়িৎ প্রবাহের শক্তি। কিছুক্ষণ বাদে অবশ্য দেখা যাবে যে সেই প্রবাহের শক্তি কমে আসছে। কিন্তু সেই সময় ফলকটি যদি জলের মধ্যে আবার একটু নাড়াচাড়া করা যায় তাহলেই বিদ্যুতের প্রবাহচক্রটি আবার জোরদার হয়ে উঠবে। ব্যাপারটায় আশ্চর্য হবার কিছু নেই। স্থির জলে সমব্যাপ্তি নিয়মের রাজত্ব। তার মধ্যকার অক্সিজেন অণুগুলি ধীরে ধীরে প্ল্যাটিনাম ফলকটির দিকে বইতে থাকে। সেইজন্য ফলকে পৌঁছে সেই অক্সিজেনের অণুগুলি বহু ইলেকট্রন আত্মসাৎ করে মিশে যায় বলেই বিদ্যুৎ-চক্রে বিদ্যুৎপ্রবাহ কমে যায়। কিন্তু ফলক নেড়েচেড়ে জল গুলিয়ে দিলেই যে অক্সিজেনের অণুগুলি ফলকের কাছ বরাবর গিয়ে পড়ে সেগুলি ইলেকট্রনওয়ালা অক্সিজেনের অনুগুলির চেয়ে আকারে অনেক বড় হয়ে যায়। তাহলেই বিদ্যুৎ চক্রটি আবার উচ্চগ্রামে গিয়ে ওঠে।

জৈব ভ্রূণগুলির সর্বদা অক্সিজেনের দরকার। ডিম্ব বা ডিম্বাণুর মধ্যে তারা যে তরল পদার্থের মধ্যে ভাসে সেটি নিশ্চল বা স্থির থাকতে পারে কিংবা ভ্রূণ-গুলি নড়াচড়া করলে সেই পদার্থ আন্দোলিত হতে পারে। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে এই যে দুনিয়ার জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার আগে থেকে অঙ্গ-চালনা শিক্ষার জন্য ভ্রূণেরা নড়াচড়া করে না। তারা নড়াচড়া করে (তারা মানে তাদের শরীরের যে অংশের অক্সিজেন চাই) শরীরের চারদিকের তরল পদার্থ কেবলই গুলিয়ে বদলে দেবার জন্য যাতে তারা বেশী করে অক্সিজেন পেতে পারে শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য।

পারিপার্শ্বিক তরল পদার্থ পাল্টে দেওয়া বা সতেজ করার জন্য ভ্রূণ যে শুধু পেশী চালনা, ক্রীড়া-কসরত করে তা নয়। স্টার্জন জাতের মাছের ভ্রূণের সারা অঙ্গ শুঁয়া দিয়ে ঢাকা। সেই শুঁয়াগুলি চালু হলেই ঝিল্লীর নিচেকার তরল পদার্থ ঘাঁটাঘাঁটি হতে থাকে। জরায়ুজ (এইজাতীয় মাছের ডিম হয় না) একরকম মাছ আছে

যার নাম সিমাটোগ্যাস্টেরা। তাদের গর্ভের যেখানে ভ্রূণ গড়ে উঠতে থাকে সেখানে পুরুষ মাছের সঙ্গে মিলিত হবার সময় কিছু উদ্বৃত্ত কীটাণু (জার্ম সেল) থেকে যায়। সেগুলি থাকেও অনেক দিন। তারা লেজ আন্দোলিত করতে করতে সব সময় ভ্রূণের চারিদিকে ঘোরাফেরা করতে থাকে যার ফলে ভ্রূণের চারদিকে অক্সিজেন সঞ্চারিত হয়। ভ্রূণগুলি বড় হয়ে গেলে তখন সেই কীটাণুগুলির আর দরকার থাকে না তখন ভ্রূণগুলি তাদের খেয়ে ফেলে।

এইসব ব্যাপার থেকেই বোঝা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন মাছের ভ্রূণ ভিন্ন ভিন্নভাবে আচরণ করে কেন। এই পার্থক্য নির্ভর করে ভ্রূণবিশেষের চারপাশের তরল পদার্থে কতটা অক্সিজেন আছে তার উপর এবং ডিম্বাণুবিশেষের গঠনের উপর। যেমন ধরুন স্টার্জন মাছের কথা। তার বসবাস করবার ঘরটি এত ছোট যে, আবরক ঝিল্লির সঙ্গে তার গা ঠেকে যায় বললেই চলে। সেইজন্য ঘরে বায়ু প্রবাহিত করার জন্য তাকে বেশী নড়াচড়া করতে হয় না। তার দুই একবার একটু নড়াচড়া করলেই চারপাশের তরল পদার্থ বেশ সচল সতেজ হয়ে ওঠে। স্টার্জন যে জলে বাস করে তাতে অক্সিজেনের অনুপাতও কম। পাইক মাছের ক্ষেত্রে কিন্তু অবস্থাটা অন্যরকম। অক্সিজেন-সমৃদ্ধ জলে তার বসবাস ও খাদ্য শিকার। সেইজন্য পাইকের ভ্রূণের বাঁচবার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বায়ু প্রবাহণের প্রয়োজন। তা না হলে সে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে। সেইজন্য সে অনবরত ঝিল্লীর মধ্যে নড়াচড়া করতে থাকে "ভেণ্টিলেশনের" জন্য। তেমনি আবার পেলেকাসের ভ্রূণ জলের উপরের স্তরে গড়ে ভেসে বেড়ায়, যেখানে অক্সিজেনের প্রাচুর্য। তাদের আবার বসবাসের ঘরটি বেশ বলে সেই ঘর হাওয়া ভর্তি করার জন্য প্রচুর বেশী অক্সিজেনের দরকার।

দেখা গিয়েছে যে, জলের স্তরের অক্সিজেন উপাদান যদি কোন বৈজ্ঞানিক কৌশলে কমিয়ে দেওয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের নড়াচড়াও বেড়ে যায়।

উত্তর মহাসাগরের নোভা জেমলিয়া উপকূলবর্তী পর্বত শ্রেণীর খাড়া চূড়ার উপর এক জাতের পাখীরা দল বেঁধে বসবাস করে ঠিক উপনিবেশের মত। ওই পাখীর নাম মুরে পাখী। সেগুলি ডিম পাড়ার কিছুদিন পরে ডিমগুলি এত বেশী মাটিমাখা হয়ে যায় যে খোলসে এমন কোন ছেঁদা থাকে না যা দিয়ে ডিমের ভিতরে হাওয়া যেতে পারে। অথচ হাওয়া না পেলে তারা বাঁচবে কি করে? তাই ডিমের মধ্যে ভ্রূণ এমন সজোরে নড়াচড়া করে যার ফলে ডিম যায় ফেটে। তখন নিচেকার ঝিল্লী দিয়ে ভিতরে হাওয়া যেতে কোন অসুবিধা থাকে না।

সুতরাং এখন আমরা বলতে পারি যে ভ্রূণেরা আসন্ন জীবন সংগ্রামে পাল্লা দেবার জন্য অঙ্গচালনা করে—এই ধারণা ভুল। তবে হ্যাঁ, তারা নিশ্চয়ই পদার্থবিজ্ঞানের কয়েকটি প্রাথমিক নিয়ম সম্পর্কে "সচেতন"; কারণ তা না হলে অক্সিজেন লাভের জন্য অঙ্গচালনা তারা করতে যাবে কেন?

—অরুণ চট্টোপাধ্যায়

নুনের পুতুল সাগরে

(সাতাশ)

কেওড়াতলা ক্লাবের সদস্যরা আজ নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছে। শুধু নিন্দা নয়, ভর্ৎসনা। আধুনিক ছেলেমেয়েদের শালীনতা-হীন কদর্য ব্যবহার যে ক্রমশ সমাজকে জাহান্নমে নিয়ে যাচ্ছে তারই জন্য অনুশোচনা—সরব আলোচনা—খেদোক্তি।

কেওড়াতলা ক্লাবের পত্তন কবে হয়েছিল জানা নেই। অবস্থান ঢাকুরিয়া লেকের ধারে দুখানা বেঞ্চিকে কেন্দ্র করে যার পেছনে একটা অশ্বত্থগাছ জাপটে ধরে রয়েছে একটা তালগাছকে। কেওড়াতলা ক্লাবের সভ্যরা কেন এ জায়গাটা বেছে নিয়েছিলেন তার ইতিহাস জানতে পারলেও বোঝা যায় সভ্যরা রসিক ছিলেন। গাছের মধ্যে দিয়ে পুরুষ ও প্রকৃতির এই যে চিরন্তন খেলার প্রকাশ, তা তাঁরা উপভোগ করতেন আর হয়ত ছানিপড়া চোখে লক্ষ করতেন সেই সব তরুণ-তরুণী-দের যারা জলের ধারে ঝোপের আড়ালে রাতের অন্ধকারে নিজেদের লুকিয়ে রাখত।

এ ক্লাবের সভ্য হতে হলে বয়স ষাটের ওপর হওয়া প্রয়োজন। কর্মে অবসর প্রাপ্ত, মাথায় পেঁজা তুলোর মত সাদা চুল, চোখে চশমা, হাতে লাঠি, গাল তোবড়ান বৃদ্ধরাই কেওড়াতলা ক্লাবের সভ্য। এঁদের মধ্যে অনেকেই একদিন বড় চাকুরে ছিলেন, কিংবা প্রখ্যাত অধ্যাপক অথবা সরকারী অফিসার। সাধারণত বিপত্নীক, থাকেন ছেলে বা মেয়ের সংসারে, বাড়িতে সময় কাটান নাতি নাতনী-দের সঙ্গে। কিন্তু ছেলের বউ বা জামাইদের সঙ্গে মতে মেলে না বলে বাড়িতে বেশিক্ষণ ভাল লাগে না, আরও ভাল লাগে না ওদের বন্ধু-বান্ধবদের। তাদের উগ্র মতামত বৃদ্ধদের বাধা দেয়। এরা নিজেদের মনে করেন সংসারে অবহেলিত। ঝি-চাকরগুলো প্রশ্রয় পেয়ে বেয়াড়া হয়েছে, অন্যদের কাজ সেরে তবে কর্তার ডাকে সাড়া দেয়, ভাবটা এই বুড়োর আবার তাড়া কিসের। মাঝে মাঝে এঁরা রেগে যান, চেঁচামেচি করেন, কিন্তু তাতেও কেউ কান দেয় না, অভিমান হয়, তাই সময়-অসময় লাঠি হাতে করে হনহন করে বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে, কিন্তু গন্তব্যস্থল একটাই—ওই কেওড়াতলা ক্লাব।

রোদ না পড়তেই এক-একজন করে সভ্য গুটিগুটি পায়ে ক্লাবের বেঞ্চিতে এসে বসেন। প্রতি দিনের অভ্যর্থনা, কি আজও বেঁচে আছেন?

এঁদের দার্শনিক মন সব সময় প্রস্তুত হয়ে আছে, জানে যে কোন সকালে খবর পাবে একজন না একজন সদস্য খসে পড়েছে। নড়বড়ে শরীর নিয়ে আলোচনা রোজই লেগে থাকে।

—আরে আসুন, আসুন ক' দিন দেখিনি যে?

ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর, আর বলবেন না, শরীরটা বড্ড নন-কো-অপরেশান করছে, সেই পিঠের ব্যথাটা—

—বললাম নুনের পুঁটলীর সেঁক দিন।

—কে দেবে? বাড়ির সবাই ব্যস্ত। ছেলের অফিস, বউমা কি সব মাথামুণ্ডু সোশ্যাল ওয়ার্ক করে, বুড়ো শ্বশুরকে দেখবার তার সময় কোথায়? আগে নাতনীটা কথা শুনত, সে এখন একটা ফিরিঙ্গী স্কুলে পড়ে কটর-মটর ইংরিজী বলে, আর নাচের স্কুলে গিয়ে ধেই ধেই করে নাচে।

—আহা চাকরটাকে তো বলতে পারেন।

—সে হারামজাদা আরও শয়তান, একদিন সেঁক দিলে আট আনা বকশিশ চায়। অত পয়সা আমি কোত্থেকে দেব?

এ ধরনের আলোচনা অল্প বিস্তর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রতিদিনের আসরে উঠবেই এবং ওই সুবাদে অন্য সভ্যদেরও কুশল বার্তার আদান-প্রদান হয়। খবরের কাগজ এঁদের কণ্ঠস্থ, যে কোন চাঞ্চল্যকর সংবাদ এঁদের মুখর আলোচনার বিষয়। রাজনীতি নিয়ে মাঝে মাঝে তর্কের ঝড় ওঠে। অর্থ-নীতি, পৌরনীতি, রাষ্ট্রনীতি এসব নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও এক বিষয়ে এঁদের মতের কোন অমিল নেই, তা হোল আধুনিক যুব সমাজের অধঃপতন।

অবশ্য আজকের মুখরোচক আলোচনার বিশেষ কারণ ছিল। কিছুক্ষণ আগে এই বৃদ্ধদের চোখের সামনে একটা খণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেছে। কোনও একটি যুবক বুঝি অন্য দলের একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখে টিটকিরি কেটেছে। সেইটাই সূত্রপাত, তারপর অশ্লীল মন্তব্য, দু' পক্ষের গালাগালি, পরে হাতা-হাতি। ইঁট ছোড়াছুঁড়ি করেও গায়ের জ্বালা মেটে নি, অনেকগুলো সোডার বোতলও ফেটেছে। শাস্ত্র হয়ত আরও গড়াত, অকুস্থলে পুলিস আসার সম্ভবনায় যে যার কেটে পড়েছে। হতভম্ব দর্শক, কেওড়াতলা ক্লাবের সদস্যরা।

এই কারণেই ছিছিক্কার আজ শুরু হয়েছে। ছ্যা, ছ্যা, কে বলবে এগুলো ভদ্রলোকের

জাতির ছেলে, মুখে কিছু আটকায় না, কথায় কথায় মা, বোন তুলে কি অশ্লীল মন্তব্য। আইন করে বাচ্চাদের জিভগুলো কেটে ফেলা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে অন্যের উক্তি, ছুঁড়িগুলোই বা কি কম যায়, এমন করে সাজ পোশাক করবে যাতে ছেলেগুলোকে উস্কে দিতে পারে, বগল কাটা ব্লাউজ তো কিছুই না, পিঠ, বুক সবই তো কাটতে শুরু করেছে, ঢঙ করে জামা না পরলেই হয়, মাথায় চুলে বাবুই পাখির বাসা।

আর একজন ফোড়ন দেয়, মেয়েগুলোও আজকাল কম খিস্তি করে না, ওদেরও ভাষার কোন আঁট নেই, যা ইচ্ছে তাই বলে।

কথাগুলো হয়ত মিথ্যে নয়। কলকাতার শহরের পাড়ায় পাড়ায় প্রতিনিয়ত এই ধরনের ঘটনা ঘটছে, অলিতে-গলিতে 'টেডি টিজার'রা বসে থাকে। চোঙা প্যান্ট, হাওাই সার্ট আর ফাঁপানো চুল মাথায় নিয়ে এনতার সস্তা সিগারেট ফোঁকে, খালি পেটে চা খায় আর মেয়ে দেখলে আদেখলের মত চোখ দিয়ে গেলে আর রসিয়ে রসিয়ে অশ্লীল ফুট্ কাটে। এই পর্যন্তই এদের দৌড়, একটা মেয়েকে নিয়ে পালাবারও মুরোদও নেই।

অন্য দিকে ইতেরা যতদূর সম্ভব দেহটাকে নগ্ন করে মুখে রঙ মেখে খোঁপার ভেল্কি দেখিয়ে. গা'র ঢেউ তুলে ঘুরে বেড়ায়। তাদের দেখে ছেলেরা সিটি না মারলে এরা হতাশ হয়, আবার নোংরা মন্তব্য শুনলে লোক দেখানো বিরক্তি প্রকাশ করে। এ হলো এক ধরনের খেলা।

কিন্তু এর জন্য দায়ী কারা? আধুনিক যুবসমাজকে তো দোষ দিলে চলবে না, তাদের জীবনী শক্তিকে আমরা কাজে লাগাই নি, অবহেলা করেছি। যে ছাত্রসমাজ একদিন ইংরাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, যাদের প্রাণ-শক্তির জোয়ারের ফলে অসহযোগ আন্দোলনের দুর্বার গতি, যাদের ভয়ে বিদেশী সরকার শঙ্কিত হয়ে এদেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল তাদের সেই উচ্ছ্বাস, সেই উদ্দীপনাকে আমরা তো কাজে লাগাতে পারি নি, যদি সেই অবরুদ্ধ শক্তিকে খাল কেটে সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রবাহিত করা হতো তা হলে দেশের এ দুর্দশা হত না। ছাত্রদের আমরা বই মুখস্ত করে পাস করতে বলেছি, কিন্তু চাকরির প্রতিশ্রুতি দিতে পারি নি, এদের খেলবার জন্যে মাঠ দিই নি, সাঁতার কাটার জল দিই নি, দেশ দেখার সুযোগ দিই নি, ঘরের কোণে বন্দী করে রেখে ক্রমশ দমবন্ধ করে শুকিয়ে মেরেছি। এরই জন্যে ছাত্রজীবনে নৈরাশ্য, যুবসমাজ চলচ্ছক্তিহীন। তাই এরা অসভ্য, এরা অশ্লীল, কিন্তু এর জন্য দায়ী আমাদের সমাজ। দায়ী ভুল নেতৃত্ব, ইতিহাস তার রায় দেবে।

এর ব্যতিক্রম সমাজের কোন স্তরেই নেই। যে ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়েছে অভাবের সংসারে কিংবা যারা মধ্যবিত্ত সকলেই রকে বসে আড্ডা মারে, পার্কের রেলিঙে চড়ে চেঁচামেচি করে রুচিহীনতার পরিচয় দেয়, এই ভাবেই তাদের সন্ধ্যেটা কাটে; আর কিছু করার নেই।

তেমনি কিছু করার নেই ববির মত ছেলেদের যাদের অভাবের আঁচ পোয়াতে হয় নি, যারা বিত্তবান না হলেও ধনীদের সংগে মেশবার সুযোগ পেয়েছে, সেই জন্যে রত্না কুমারীকে নিয়ে প্রথমটা ববির মন্দ লাগে নি, প্রাকৃতিক দৃশ্য পরিবর্তনের একটা বাহ্যিক মূল্য আছে, পাহাড়, তুষার, ঠাণ্ডা সব কিছু ববির দমে-পড়া মনটাকে চাঙ্গা করে তুলেছিল। রত্না কুমারীকে নিয়ে সে ঘুরে বেড়াত ওপরের জলাপাহাড়ে, নীচের বোটানিকাল গার্ডেনে, আবার ম্যাল রাউণ্ড পেরিয়ে বার্চহিলের চিড়িয়াখানায়, চেনা-অচেনা লোকের জনতায় বসে থাকত ম্যালের বেঞ্চে, তাদের মধ্যে কিছু লোক ভীড় করত ক্লাবে। ববি কাউকে গ্রাহ্য করত না, গল্প করে, হেসে, নিজের মনে সময়টা কাটিয়ে দিত।

কিন্তু এভাবে বেশী দিন চলে না। আবার এক ঘেয়েমী জমা হতে লাগল। তখন ববির মনে হল পাহাড় বড় শুকনো, তুষার যেন কৃত্রিম আর ঠাণ্ডা গা-সওয়া হয়ে গেছে। মনে হতে লাগল, রত্না কুমারী অসহ্য, কোনরকমে মদ খেয়ে তাকে নিয়ে শোওয়া যায় কিন্তু ঘোরা যায় না। সারাক্ষণ ওই বিগত যৌবনাকে নিয়ে থাকা বড় ক্লান্তিকর। তাই সে আবার মদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল। সকাল, দুপুর, বিকেল, বীয়ার, জিন, হুইস্কি।

রত্না কুমারী ভয় পায়, একি করছ ববি, এত মদ খেলে মরে যাবে।

ববির ছোট্ট জিজ্ঞাসা, ক্ষতি কি?

—তুমি বাঁচতে চাও না?

—কি জানি।

—এখানে ভাল লাগছে না?

—এই তো দিব্যি আছি।

—আমার জন্যে তোমার কষ্ট হচ্ছে!

—তুমি না হলে কে আমাকে এত মদ খাওয়াবে?

—তুমি আজকাল আমায় এড়িয়ে যাচ্ছ, ক্লাবে আসবে বলে আস না, আমি একলা বসে থাকি।

ববি হাসবার চেষ্টা করে, কি হয় জান, যেদিন বেশী মদ খেয়ে ফেলি ঠিক মনে পড়ে না কোথায় যাবার আছে।

—তাই তো বলছি অত মদ খেও না।

ববি শব্দ করে হাসে কিন্তু উত্তর দেয় না। দেয় না কারণ, উত্তর দেবার কিছু নেই. রত্না কুমারীকে এড়িয়ে থাকার জন্যেই তো দিন রাত মদ খাচ্ছে, জীবনটাকে ভুলে থাকতে চাইছে।

রত্না কুমারী এ নিয়ে বেশী কথা বলতে সাহস করে না, পাছে ববি চটে গিয়ে কলকাতায় ফিরে যায়। কিন্তু একদিন সে ভয় পেল, যেদিন ম্যালের বেঞ্চে বসে থাকতে দেখল ব্যারিস্টার কে জির শালী অনুভাকে। ডাইনীটা এখানেও এসেছে, তবে কি ববি আগে থেকে খবর পেয়ে অনুভার কাছে যাতায়াত শুরু করেছে? সেই জন্যেই কি রত্না কুমারীকে ক্লাবে একলা বসে থাকতে হয়?

রত্না কুমারী কথাটা নিজে থেকেই পাড়ল, অনুভাকে দেখলাম, তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

ববি বলল, না।

—সে কি, ক'দিন থেকেই দেখছি ম্যালে বসে থাকে।

—আমি তো সপ্তাহখানেক ম্যালের দিকেই যাই নি।

—তবে কোথায় যাও?

—হয় এই বাড়িতেই বসে থাকি আর নয়ত পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে নীচে নামি, দার্জিলিং-এর কৃত্রিমতা আর ভাল লাগছে না।

—তা হলে চল এখান থেকে আমরা চলে যাই।

ববি ভরসা দেয়, অনুভাকে তোমার ভয় নেই, ওর কাছে আমি সহজে যাচ্ছি না।

—কি জানি, ক্রমশ তুমি দুর্বোধ্য হয়ে উঠছ ববি। কি যে চাও—

কি চায় ববি তা কি নিজেই জানে। হয়ত চায় সহজ, সুস্থ জীবন, কিন্তু তা কি আর পাওয়া সম্ভব। এক দিন খেলার ছলে রত্না কুমারী, অনুভাদের মত মেয়েদের নাচ শেখাতে শুরু করেছিল, আজ তাদের সুরে নিজেকে নাচতে হচ্ছে, কি করবে, এই স্বাচ্ছন্দ্য, এই নিশ্চিন্ততা ত্যাগ করবে কি করে? তার ওপর মদের নেশা তাকে গিলে ফেলেছে, সেখান থেকেই বা কি করে বেরোবে, কে টাকার যোগান দেবে।

সেদিন বাড়িতে রত্না কুমারী ছিল না, ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। ববি একলা ড্রইংরুমে বসে মদ গিলছে। আগে দিনের বেলা হুইস্কি সে খেত না, এখন ওটা না খেলে যেন নেশা জমে না। ভেজাল মেশানো ছেড়ে দিয়েছে, জল নয়, সোডা নয়, নীট্ হুইস্কি, গলা দিয়ে জ্বলতে জ্বলতে নীচে নেমে যায়। এক সময় মনে হলো খালি পেটে পান করা ঠিক হচ্ছে না। বেয়ারার নাম ধরে ডাকল যদি সে এসে কিছু ভেজে দেয়। কিন্তু সাড়া পেল না, বোধ হয় বাজার করতে গেছে। অগত্যা নিজেই গেল রান্নাঘরে যদি খানকয়েক ডিম থাকে সেদ্ধ করে নেবে। রান্নাঘরের সংগে লাগোয়া বাসন মাজার কল, সেখানে দাঁড়িয়ে একটা পাহাড়ী মেয়ে বাসন পরিষ্কার করছিল। রত্না কুমারী রাঁধবার লোক এনেছিল কলকাতা থেকে, এখানে রেখেছে একটা ঠিকে ঝি, সকাল-বিকেল কাজ করে দিয়ে চলে যায়। ববি কোন দিন খেয়াল করে মেয়েটাকে দেখে নি, আজ এই প্রথম পুরুষের চোখে দেখল। ফর্সা রঙ, স্বাস্থ্য ভাল, বয়েস খুব বেশি হলে সতের-আঠার হবে, তাজা চোখ মুখ।

ববি মেয়েটিকে দেখে হাসল।

মেয়েটিও হাসে, অত্যন্ত সহজ হাসি।

—তোমার নাম কি?

—কাঞ্চি।

—বাড়িতে ডিম আছে কিনা জান?

মেয়েটি কোন জবাব দিল না, তবে ঝুড়ির ভেতর থেকে দুটো ডিম বার করে এনে ববির সামনে ধরল। ববিকে তখন নেশা জড়িয়ে ধরেছে, সে কাঞ্চির হাত থেকে শুধু ডিম দুটোই নিল না মেয়েটাকেও কাছে টেনে নিল, চুমু খেল ঠোঁটের ওপর।

আশ্চর্য, মেয়েটা কিন্তু এতটুকু প্রতিবাদ করল না, ববির আকর্ষণী শক্তির কাছে নিজেকে ধরা দিল, তারপর ছাড়া পেয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে রইল সলজ্জে, চোখ নীচু করে।

সেই হল সূচনা। ববি সভ্য সমাজ থেকে মুখ ফেরাল। যখন তখন ঘুরে বেড়াতে লাগল কাঞ্চিকে নিয়ে নীচের পাহাড়ে, ভুটিয়া বস্তীতে, কখনও বা গোম্ভখানায়।

রত্না কুমারীর বুঝতে দেরী হল না। কাঞ্চিকে জবাব দিল। কিন্তু তাতে ফল ভাল হল না, আগে যদিও বা ববি বেশির ভাগ সময় বাড়িতে থাকত এখন সেই মেয়েটার জন্যে ঘুরতে লাগল বাইরে বাইরে।

রত্না কুমারী এক দিন না বলে পারল না, ববি তুমি যদি এইভাবে থাকতে চাও আমি আর প্রশ্রয় দেব না, কলকাতায় ফিরে যাব।

ববির স্বচ্ছন্দ্য উত্তর, বেশ তো যাও না।

—তা হলে তুমি কোথায় থাকবে।

—যেখানে হোক, দরকার হলে বস্তীতে।

—মদ খাবে না?

—দেখেছো তো হুইস্কি, জিন, বীয়ার একরকম প্রায় ছেড়ে দিয়েছি।

—কি খাচ্ছ?

—রক্সি, জাঁড়—এখানকার দিশী মদ।

—ছি ছি আমি ভাবতে পারছি না, তুমি কি করে এত নীচে নেমে গেলে, একটা ঝি এর সঙ্গে—

ববি হাসল, ঝি হলে হবে কি, মেয়ে তো। তাজা মেয়ে। গরম মেয়ে।

রত্না কুশারী যেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

এর পর ক্লাবে দেখা গেল রত্না কুশারী গল্প করছে কে জি-র শালী অনুভার সঙ্গে, বাইরে থেকে ছেলেদের কিছু বোঝা যায় না, ববির এরকম অধঃপতন হবে আমি ভাবতে পারি নি, তুমি যদি পার দেখ না, যদি ছেলেটাকে উদ্ধার করতে পার।

অনুভারও নিজের ওপর খুব আস্থা নেই বোঝা যায়, আমার কথা কি শুনবে, এই পাহাড়ী মেয়েগুলো অসম্ভব পাজী, শুনি ওই মদের সঙ্গে গাছের শেকড়ের রস খাওয়ায়, নানা রকম তুক্‌তাক্‌ করে।

রত্নার ক্ষোভ, এর চেয়ে সেই মনুয়া লাহিড়ী ভাল ছিল, তবু তো আমাদের সমাজের মেয়ে, যদিও ববিটাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাত তবু এরকম একটা স্ক্যান্ডাল হত না। এক এক সময় মনে হয় আমারই দোষ, ছোঁড়াটাকে এতটা প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয় নি।

অনুভা সান্ত্বনা দেয়, তোমার কি দোষ ভাই, তুমি তো ববির ভালর জন্যেই যা করবার তা করেছ, পুরুষ জাতটাই ওইরকম, কৃতজ্ঞতার ছিটে-ফোঁটাও ওদের শরীরে নেই।

রত্না কুশারীর চিন্তা, এখন যে আমি কি করে।

অনুভার প্রস্তাব, কলকাতায় ফিরে চল। আমি তো শনিবার দিন নামছি, প্লেনে সিট রিজার্ভ করা আছে, চল তোমারটাও করিয়ে দিই, একসঙ্গে গল্প করতে করতে চলে যাব।

—আমি তো ফ্ল্যাট নিয়ে ছিলাম, এক গাদা জিনিস পত্র হয়েছে।

—তোমার পুরোন বেয়ারা হুঁশিয়ার লোক, সব কিছু গুছিয়ে ট্রেনে করে নিয়ে যাবে, এখানে থাকলে আরও তোমার মন খারাপ হবে।

শেষ পর্যন্ত তাই হলো। শনিবার একই প্লেনে পাশাপাশি বসে রত্না কুশারী আর অনুভা কলকাতায় ফিরল। দমদমে স্ত্রীকে আনতে গিয়েছিলেন মিস্টার কুশারী ববির বদলে অনুভাকে দেখে মিঃ কুশারীর বিস্ময়ের অবধি থাকে না, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেন, ববি এল না?

—না।

—কেন?

রত্না কুশারীর কঠিন স্বর, ববি মারা গেছে।

বিস্মিত মিঃ কুশারী বোঝেন কোন গণ্ডগোল হয়েছে তাই এ প্রসঙ্গ আর তুলতে চান না।

রত্না কুশারী আর অনুভার কাছে ববি মৃত হলেও আসলে কিন্তু ছেলেটা বেঁচে গেছে। কৃত্রিমতার আওতা থেকে বেরিয়ে বুক ভরে সে নিশ্বাস নিয়েছে প্রকৃতির। যাদুকাঠির স্পর্শ ববিকে নতুন করে জাগিয়ে দিয়েছে, বাঁচতে শিখিয়েছে। সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ, একদল পাহাড়ী ছেলেমেয়ে তাদের হাসি আনন্দ গান, একটা উদার আন্তরিকতা মুগ্ধ করেছে ববিকে, তার ওপর ওই নেপালী মেয়ে কাঞ্চী। কোন প্রত্যাশা নিয়ে সে ববির কাছে আসে নি, বরং হাত ধরে ছেলেটাকে টেনে বার করে এনে একটা পঙ্কিল পরিবেশ থেকে মুক্তি দিয়েছে। ও মেয়েটা একটা উপলক্ষ মাত্র, ববির জীবনে কত দিন টিঁকবে বলা যায় না, হয়ত থাকবে না চলে যাবে, কিন্তু ববির চোখের কালো চশমাটা সে খুলে দিয়েছে—সেইটাই তো পরম লাভ। এখন ববি হয়ত মদ খায়, কিন্তু আগের মত মদ আর ববিকে খেতে পারে না। ববি সাদা চোখে মেঘে ভরা আকাশ দেখে, দেখে কতরকম রঙ, সবুজ পাহাড়, গাছে গাছে ভরা; নানারকম পাখি, তাদের উচ্ছল কলতান। পাহাড়ী ঝরনা লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, নীল নদীর জল, তার উপর ব্যথিত গতি, রকমারি ফুল, লাল নীল হলদে সবুজ।

ববির এখন মনে হয় বেঁচে থাকার অর্থ আছে, প্রয়োজনও আছে। মানুষের তৈরী আড়ষ্ট সমাজের বাইরে যে বিরাট রাজত্ব, তার যে উদার আহ্বান, যে মানুষ শুনতে পেয়েছে, দেখতে পেয়েছে, তার বিমর্ষ হবার তো আর কোন কারণ নেই। কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত মদ আর মেয়েমানুষের চক্কোরে পড়ে এত দিন যে ঘানি ঠেলেছে ববি, আজ এই প্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনে হল সেই জীবনটা বিরাট মিথ্যে, একেবারে ফাঁকা, প্রচণ্ড ধাপ্পা। যদি নতুন করে জীবন শুরু করতে হয়, বেঁচে থাকার জন্যে কাজ করতে হবে, কাজ করে আনন্দ পেতে হবে। ওই যে মানুষগুলো হাজারো অভাব অনটনের মধ্যে থেকেও প্রতি দিন পিঁপড়ের মত কাজ করে, পরিশ্রান্ত হয় না। নাচে, গান, করে, কিন্তু লোক দেখিয়ে করে না, সন্ধ্যার অবসরে রক্সি খায়, কিন্তু মত্ত হয় না, ওদের হাসিকান্না, ঝগড়া মারামারি, সুখ দুঃখ সব কিছু মিলিয়ে যে জীবনযাত্রা তার প্রধান উপজীব্য আনন্দ।

ববি তার দুঃস্বপ্ন ভরা অতীত জীবনটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এই আনন্দ-রস সাগরে ডুব দিল, ডুবুরীর মত হয়ত এক দিন নীচে থেকে অমূল্য মুক্তো তুলে আনবে—কে বলতে পারে। (ক্রমশ)

প্যারিসের চিঠি

বিকেলে বৃষ্টি পড়ছিল আকস্মিক রকম দাপিয়ে, তেমনি হাওয়ার মাতামাতি; থেকে থেকে বাজ ডাকছিল। আমি ভাবছিলাম, দেশে বোধহয় কালবোশেখীর পালা গিয়েছে শুরু হয়ে। আমি ভাবছিলাম, রবিঠাকুর যদি প্যারিসে জন্মাতেন, ফরাসী সাহিত্যের আঙুলে-গোনা বর্ষার কবিতার আসরে কী কাটাকাটিই না বেধে যেত! ('কাটাকাটি' কথাটা আমাদের গুজরাতী বন্ধু অরবিন্দ পটেলের কপিরাইট বাংলা।) ফরাসীরা বর্ষার সময় কবিতার কথা ভাবতে গেলেই শরণ নেয় পল ভ্যার্লেনের সেই বহু-পঠিত বহু কথিত বহু বাঞ্ছিত "ইল প্ল্যর দাঁ ম' ক্যর। কম ইল প্ল্য স্যুর লা ভিল। কেল এ সেৎ লাঁগ্যর। কি পেনেত্র ম' ক্যর?" —পদাবলীর : কবির হৃদয়ে কে যেন কাঁদছে, যেভাবে শহরের ওপর পড়ছে বৃষ্টি; কবি বুঝতে পারছেন না কী এই বেদনা, যা তাঁর হৃদয়ে এসে আছড়ে পড়ছে!—এখানে হৃদয়ের কথা থাকলেও ময়ূরের মতো নাচের উল্লাস কই? এখানে কই মেঘের সঙ্গী হবার মতো মন? এখানে পাই কোথায় 'এত দিনে জানলেন যে কাঁদন কাঁদলেম'-এর উপলব্ধি? যদিও ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য কথাটার মর্ম সত্যেন দত্তের চেয়ে অনেক গভীর থেকে বুঝতেন পল ভ্যার্লেন (দুই কবিই অনুবাদকদের শিরঃপীড়াকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে শব্দ শব্দ ভাষার আকাশে ভাস্বর), তবু জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে' কী আনন্দ যে দিতে পারে, ফরাসী ভাষী কাব্যরসামোদী কাউকেই ভ্যার্লেন তা জানিয়ে যেতে সক্ষম হন নি—সেই ভৈরব হর্ষের সাধনা প্যারিসে বসে রবীন্দ্রনাথেই বোধকরি সম্ভব হত।

আমার ভাবনায় বাধা পড়েছিল টেলিফোনের ডাকে। ক্লদ-কাকীমা বললেন, "পরশু রোববারে কিন্তু মাংস-ভাতের মেনু দুপুরে; তুমি এবং টোগো দুই ভাইই আসছ।" ক্লদ-কাকীমার সঙ্গে কথা বলব, না বাজের গর্জন সামলাব? আবার ও-দুটির শব্দ তরঙ্গকেই বেগুলোর বানচাল করে দিয়ে ফোনে স্পষ্ট ভেসে আসছিল নিকোলা-ভায়ার সওয়া সপ্তম পর্যায় গীত প্রিয় গান, "পাপা এ-ভাঁ ম্যো, কি কে দু গাতো—" (এটি ফরাসী শিশু-সঙ্গীতের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়; ছোট ভাই কোকো বা

"অর্ঘ্য

রত্না বর্মণ (মাইতে দেলতেই)

Nicholas বা নিকোলা-কে ঘুম পাড়ানো হচ্ছে, এই শর্তে 'দোদো' অর্থাৎ ঘুমোও যদি, তোমার 'লোলো' অর্থাৎ 'দুদু' দেওয়া হবে; তদুপরি—বাপি ওপরে বসে পিঠে বানাচ্ছেন, মা নিচে বসে 'শোকোলা' বা দুধ-কোকো বানাতে ব্যস্ত; অতঃপর, ঘুম দাও।)—টের পাচ্ছি, ক্লদ-কাকীমার হাত থেকে রিসিভার কেড়ে নেবার চেষ্টা চলছে; ডাকলাম, "বঁজুর নিকো" সপ্রতিভ জবাব, "বঁজুর পুং!" জানতে চাইলাম, "কি করছ?" গড়গড় করে ভেসে এল শব্দের বন্যা, "আমি? আমি কিছু করিনি। একজন মঁসিয়া কাজ করছেন, খুব শোরগোল হচ্ছে—Un monsieur qui travaille, il fait du bruit—"
"কোথায়?"—স্পষ্ট নির্দেশ "ওই যে!"—ক্লদ-কাকীমা বুঝিয়ে দিলেন : বাজের ডাক জন্মাবধি তো ও শোনেনি (নিকোলার বয়সের গাছ-পাথর খুঁজতে বেশি দূরে যেতে হবে না, কারণ ত্রিশ মাস পাঁচ দিন আগেই তিনি সবে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন) তাই ওর ধারণা যে দূরে কোনও পড়শী ভদ্রলোক কাজ করছেন, তারই আওয়াজ হানা দিচ্ছে ন্যোইয়ী থেকে দাঁফের-রোশরো অবধি।—

স্কুলে যাবার আগে টোগোকে টেলিফোন করে নেমন্তন্নের খবর জানাতে নিচে নেমেছি; দেখি বাত্যাহত বায়সপক্ষীর মতো শপ্‌শপে জামা-কাপড়ে সুহৃদ্বর আঁদ্রে সাসালস দাঁড়িয়ে ডাইরেক্টরীতে একটা নম্বর খুঁজতে ব্যস্ত। আঁদ্রে হচ্ছে ডেমস্থেনিসের দেশোয়ালী ভাই; কিন্তু মেজাজে তখন দেখলাম আলেক্‌সান্ডার দি গ্রেট! ওর নম্বর খোঁজা হতে হতে আমি কাজ সেরে নিয়ে লিফ্‌টের দিকে গুটি গুটি এগুচ্ছি, মুখ না তুলেই আঁদ্রে অনুরোধ করল, "আমি হাত তুলতে পারব না; তুমি যদি নম্বরটা ডায়েল করে দিতে—"

"কেন, হাতে কি হল? আছাড় খেয়েছ?"

"না ভায়া, ডেমক্রেসির চুঃ!" বলেই হেসে ফেলল করুণ চেহারায়, "ডেমক্রেসি তো নয়, রিপাব্লিক?"

"তোমার প্লেটো দাদুর রিপাব্লিক?"

"না হে, নেহাত পদ্যময় গদ্যতো খেয়ে এসেছি, মেজাজ ভাল নেই—"

"মালুম পড়ছে বিলক্ষণ—"

"ঠাট্টা নয়, সত্যি বলছি, এখুনি আমি Le Monde পত্রিকায় ফোন করছি প্রতিবাদ জানিয়ে।"

কিছুদিন ধরে স্পেনে, ইতালীতে, বেলজিয়ামে, জার্মানীতে, পোল্যাণ্ডে যে ছাত্র-বিক্ষোভ চলছিল, তার ঢেউ ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলে এসে চাঞ্চল্য জাগালেও পারীতে এ-যাবৎ মোটামুটি শান্তি অব্যাহত ছিল। পারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণতম 'ফ্যাকাল্টি' নাঁতের হচ্ছে কম্যুনিস্ট পৌরসভার অধীনে, বৃহত্তম পারীর অংশ হলেও খাস পারী তা নয়ঃ সেখানেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত। তার ফলে নাঁতের-এ সমস্ত ক্লাব বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ছ'টি ছাত্রকে বিশ্ব-বিদ্যালয়-পর্ষদের সামনে বিচারার্থে উপস্থিত করা স্থির হয়।

এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে উগ্র বামপন্থী ছাত্রদের শ'চারেক প্রতিনিধি জমায়েত হয়েছিল সেদিন শুক্রবার তেসরা মে—পারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কেন্দ্র সরবোন্-এর উঠোনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে রাজনীতির আলোচনা লিখিতভাবে নিষিদ্ধ—বহু বছর ধরে এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকায়, অচলায়তনের রেক্টর-মশাই স্বভাবতই বিচলিত বোধ করেন। তিনি ছাত্রদের—বিশেষত বামপন্থী যারা মার্কা মারা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ছেড়ে যাবার নির্দেশ দেন, দৈবাৎ অবাঞ্ছিত কিছু ঘটে যেতে পারে, এই ভয়ে।

ধীরে ধীরে যখন ছাত্রদের জটলা বিপুলতর কলেবর ধারণ করে রাস্তা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল, রেক্টর-মশাই পুলিসের শরণ নিতে বাধ্য হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উঠোন ছেড়ে বামপন্থী ছাত্রেরা একচুলও নড়বে না দেখে বেলা ৪-১৫ নাগাদ পুলিসবাহিনী এসে তাদের ঘেরাও করে ফেলে। সেই সঙ্গে রাস্তায় সমবেত ছাত্রদেরও তারা হটাতে শুরু করল। এর পরে শান্তিপূর্ণভাবেই বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় এসে পৌঁছনো-মাত্র তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিসের গাড়িতে তুলে পাচার করা শুরু হল।

এভাবে সঙ্গীদের গ্রেপ্তার হতে দেখে সোচ্চার প্রতিবাদে অবশিষ্ট ছাত্রেরা অগ্রসর হতেই পুলিস তাদের বেটন চার্জ করে ও টিয়ার গ্যাস দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে ল্যুক্-সাঁবুর (Luxembourg) বাগানের দিকে নিয়ে চলল।

এই সময় আমাদের আঁদ্রে সাসাগ্লস ফিরছিলেন ল' কলেজের গ্রন্থাগার থেকে সেদিনের গবেষণালব্ধ ঐশ্বর্য বগলে নিয়ে। আঁদ্রে আইন বিষয়ে ডক্টরেটের থীসিস লিখছে। মুড়ি-মিছরি তখন পুলিসের চোখে পৃথক নয়; অতএব, নির্বিচারে প্রহারের সাহায্যে আঁদ্রের বগলদাবার ধন জয় করে নিয়ে পুলিস তাকে কোণঠাসা করে ফেলে যখন, এক ফাঁকে বেচারা "চাচা, সেভ্ দাইসেলফ্" নীতি অবলম্বন করে কোন মতে ঘরে ফিরে এসেছে। এবং বিনা অপরাধে পুলিসের রণচণ্ডী রূপের মাহাত্ম্য উপভোগ করতে অসমর্থ হয়ে সে জনপ্রিয় পত্রিকা 'ল্য মঁদ'-কে ফোন করে জানাতে উদ্যত নিরীহ বিদেশী [illegible] এই অসহায় লাঞ্ছনার প্রতিবাদ। আঁদ্রে অস্বীকার করে না যে হাজার হলেও তার মধ্যে বুর্জোয়াদের ভূত বেশ খানিকটা এখনো ভর করে আছে; এবং তার সেই গর্বের শিসমহলে এভাবে আঘাত পড়ায় সে রীতিমতো ক্ষুব্ধ দেখলাম।

এবং বন্ধুর ধর্ম অনুযায়ী তাকে হঠকারিতার হাত থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হলাম সেই বর্ষণমুখর বসন্ত-সন্ধ্যায়।

টেলিভিশনে, রেডিওতে, খবরের কাগজের বিবরণে এবং স্বচক্ষে এই ছাত্র আন্দোলনের আকৃতি ব্যাপকতর হতে দেখে নানা কথা মনে জাগছে; আমাদের মহলে এখন ভিয়েৎনাম ও মার্কিন প্রতিনিধিদের বৈঠকের চেয়ে গুরুতর আলোচনার বিষয়-বস্তু হয়ে উঠেছে এই বিক্ষোভ।

সোমবার ৬ই মে আমাদের 'গ্রেট ব্যাচেলার্স' ক্লাবের সদাহাস্যময় সভ্য ব্যার্নার তার পেটমোটা লাতিন অভিধান হাতে যখন ফিরে এল, ওর ভাবাকুল চেহারা আমার নজর এড়াল না। ওদিন সকালে দুর্ভেদ্য পুলিসব্যূহ অতিক্রম করে সরবোন প্রাঙ্গণে ঢোকবার দুর্লভ অধিকার লাভ করেছিল দুরূহ যে আগ্রেগাসিঅঁ পরীক্ষার

দুটি হাসিখুশি খোকন মখমলের পোশাকে আমাদের পথ আড়ালে দাঁড়ালো

ফ্রান্সের মেলার ভারতের প্রজাপতি রক্ষা : বোয়া দ্য ভ্যাসেন উপবনে

প্রার্থীরা—ব্যার্নার তাদের একজন; সারা বছর সকাল-সন্ধ্যে ও বই মুখে করেই কাটায়—আমাদের রাঁদে-ভু (rendez-vous) লাঞ্চ ও ডিনারে উপস্থিত থেকে প্রাণ-সত্তার অক্সিজেন, সংস্কৃতি-তৃষ্ণার বারি এবং বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান প্রবৃত্তির তৃপ্তি সংগ্রহ করে ও ফিরে যায় ওর সাধন-পীঠ ৭১৫ নং কুঠরিতে। নয় ভাই-বোনের মধ্যে ও-ই জ্যেষ্ঠ, এবং পরিবারের প্রতি নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন। তাই পরীক্ষার ফল ভাল হয় যাতে, সারা বছর সে-চেষ্টায় ব্যার্নার বিন্দুমাত্র ত্রুটি রাখেনি। কিন্তু এমন পরিবেশে পরীক্ষা মোটেই জমেনি, কারণ সেই সময়েই সরবোনে চলছিল অভিযুক্ত ছাত্রদের বিচার, আর রাস্তায় তার প্রতিবাদে বিক্ষোভ।

ব্যার্নার খবর নিয়ে এল যে বিকেল সাড়ে ছটায় আমাদের বড় রাস্তার মোড়ে, দাঁফের-রোশরো স্কোয়ারের বীর্যোদ্ধত সিংহ মূর্তিকে Lion de Belfort ঘিরে ছাত্রদের জমায়েৎ হবার নির্দেশ জারি করেছে 'উনেফ' (UNEF : ফ্রান্সের ছাত্রদের জাতীয় সমিতি); ওখান থেকে শোভাযাত্রা ক'রে পর-রোয়াইআল্ (Port-Royal) আভেন্যু বরাবর বুলভার্ সাঁ-মিশেল দিয়ে নিষিদ্ধ এলাকার তোয়াক্কা না রেখে সরবোন অঙ্গনে উপস্থিত হওয়া ওদের উদ্দেশ্য। যেহেতু পুলিস মোতায়েন থাকছে পর-রোয়াইআল্ থেকে সরবোন পর্যন্ত, যেহেতু দাঁফের-রোশরোতে জমায়েৎ হওয়া বেআইনী নয়, যেহেতু দাঁফের-রোশরো স্কোয়ারের প্রথম হোটেলটি সর্বোচ্চ শিখরে বন্ধুদের আলফন্সোর ... রাজি হলাম বন্ধুদের আমন্ত্রণে মিছিলের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে যেতে। এবং সুবিধামতো, পুলিসের দৃষ্টি এড়িয়ে দু-চারটে ফটো তুলতে। পুলিসের চোখে পড়লে, শুনলাম, বেটন-চার্জের সম্ভাবনা কম নেই।

দোমিনিক, ব্যার্নার, মিশেল (পুং), জাঁ-লুই প্রমুখ ফরাসী বন্ধু, দ্রাগিচ যুগোস্লাভ, আঁদ্রে ও কনস্তান্তিন, গ্রীক, জাঁ-গী ক্যানাডিয়ান, মুস্তফা আলজিরিয়ান, আলী ইথিওপীয়—এতগুলি অমাত্য সমভিব্যাহারে রওনা হলাম কৌতূহল চরিতার্থ করতে। আমায় আলফন্সোর হোটেলে পৌঁছে দিয়ে ওরা গেল ভিড়ের মধ্যে মিশে। আমি গোটা-দুয়েক ফটো হোটেলের ওপর থেকে তুলে আরো ভাল ছবির আশায় ফুটপাথে নেমেছি, ক্যামেরা তাগ্ করেছি, সন্ত্রস্ত এক ভদ্রলোক ছুটে এসে ফরাসীতে উপদেশ দিলেন, এখানে ছবি তোলা বিপজ্জনক; আমি গোবেচারার মতো মুখ ক'রে জীবনে এই প্রথম ফরাসী ভাষা শ্রবণগোচর হল ভান করছি দেখে ওঁর সংগী বললেন, "ইংস তু দেজার তু ফোতো তোকিং।" আর তো না বোঝার ভান করা চলে না। হোটেলের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম দু-তিন মিনিট; শুভার্থী দুজন দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেলে আবার বের হয়ে সবে ক্লিক আওয়াজ করেছি—ফুটপাথ ঘেঁষে একটা গাড়ি এসে থামল।

জীবাত্মা আর পলায়নের পথ নেই দেখে শংকিত নেত্রপাতে গাড়িটির দার্শনিক অস্তিত্ব বিশ্লেষণ করতে নিমরাজি হয়ে এবং পুষ্ঠদেশে বেটনস্পর্শ ... আত্ম-প্রস্তুত অবস্থায় ফিরে দাঁড়াতেই ... উদ্ভাসিত ক'রে অপেক্ষমান 'দে এস ২১') (D. S. 21) মার্কা অতি পরিচিত গাড়িটি তাঁর বিস্তর পুলকের কারণ হল। অস্যার্থ, গাড়িটি পুলিসের নয়; আমারই দুর্দিনের বান্ধবী মিশেল পেরুয়াসের সম্পত্তি। হেসে মিশেল দরজা খুলে ইশারা করল চটপট ঢুকে পড়তে। অবাধ্য নই আমি, বিশেষত পুলিসী ভ্যানে ক'রে কারাগার-বাসের মতো অধোগমনের পরিবর্তে এমন-ধারা ব্রহ্মপদের বন্দোবস্ত যখন ইচ্ছাময়ী স্বয়ং করেছেন। গাড়ির সামনের কাচে রেডক্রস চিহ্নর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে মিশেল প্রথম অনুশাসন উদ্ঘাটন করল, "তুমি এখন রেডক্রসের স্বেচ্ছাসেবক; সুতরাং ছবি তোলা সাজবে না।" "সেতাদির (cest-a-dire= অর্থাৎ) ইংস তু দেজার তু ফোতো তোকিং?" ওকে গল্পটি বলতেই ও হেসে উঠল।

মিশেল অল্প কিছুকাল হল নার্সিং পাশ করেছে কৃতিত্বের সঙ্গে এবং এক প্রাইভেট নার্সিং হোমে সে যখন কাজ শিখত, আমার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। নার্সিং-এর বাইরে তার প্রচুর পড়াশুনো আছে, অনর্গল ফরাসী, ইংরেজী, জার্মান ও স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলতে পারে। সর্বোপরি কাব্য-সাহিত্যের অনুরাগী। এই জরুরী পরিস্থিতিতে সে স্বেচ্ছাসেবিকা হয়ে নিজের গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে এবং আমার সঙ্গে দেখা হবে ... এখন ... গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চলল বুলভার ... ধ'রে, ছাত্রদের ... অবলীলাক্রমে ভেদ ক'রে।

আমরা মঁপার্নাস বুলভারে পৌঁছতেই ... পেলাম বুলভার সাঁ-... দিকে

পুলিসের তরফ থেকে বাধা পেয়ে ছাত্রেরা পার্কিং করা কয়েকটা গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, পাকা রাস্তা খুঁড়ে পাথরের চাঁই জড়ো করছে পাল্টা আক্রমণের জন্য, এবং দেড়-দুই মিটার উঁচু উঁচু ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছে পুলিসের ভ্যানের অগ্রগতি রোধ করবে বলে। আমার কাজ ছিল এবং মিশেলের কাজ এইবার। শুরু হবে দেখে আরো কিছু ফটো তুলে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলাম। পরদিন মিশেলের কাছে ফোনে শুনলাম যে রাত একটা অবধি অবিশ্রাম ওরা আহত ছাত্রদের নিয়ে গিয়েছে কাছাকাছি হাসপাতালগুলোয়।

টেলিভিশনে শিক্ষামন্ত্রী মঁসিয়্য আলাঁ পেরফিৎ এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, গত ছয়মাস ধ'রে কর্তৃপক্ষ উপেক্ষা করেছেন ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল মনোভাব। এখন স্বাধীনতার অপব্যবহারে উদ্যত কিছু-সংখ্যক স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির ও গোষ্ঠীর আচরণে কর্তৃপক্ষ এই বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার শরণ নিচ্ছেন। সাময়িকভাবে সমস্ত ক্লাসই এখন বন্ধ থাকবে, এই বিরতির সুযোগে যাতে ক'রে উগ্র হিংসাত্মক পথের সমর্থকেরা নিজেদের আচরণের ন্যায্যতা সম্পর্কে ভেবে দেখতে পারেন। এঁদেরই প্রকোপ থেকে পারী অঞ্চলের দেড় লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর স্বার্থ বাঁচাতে পুলিস তৎপর হয়েছে গত্যন্তর না দেখে। আসন্ন পরীক্ষা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে উতরে যায় বিক্ষোভ-কারীরা যাতে শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে তাঁদের উষ্মার কথা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন অচিরেই যাতে সাধন করা যায়, বর্তমান সরকার তার চেষ্টা করবেন, মঁসিয়্য পেরফিৎ এই প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ছাত্রদের স্বপক্ষে রায় দিয়ে তাদের সঙ্গে ঐকাত্ম্য দেখিয়ে বহু বিখ্যাত অধ্যাপক—কয়েকজন নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তও আছেন তাঁদের মধ্যে—এই বিক্ষোভে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছেন। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে পারী বিশ্ববিদ্যালয়ের faculte de sciences-এর চারজন অধ্যাপক লিখেছেন যে বর্তমান সমাজের দাবি অনুযায়ী উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক-যুবতীর সংখ্যা যেখানে বাড়া উচিত, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে পৌঁছেই ছাত্র-ছাত্রীরা অনুভব করেন যে সমাজ তাঁদের উচ্চশিক্ষার পথে অগ্রসর হতে দিতে নারাজ; এর জন্য শিক্ষা-পদ্ধতি দায়ী, শিক্ষা-পদ্ধতি অসম্পূর্ণ। এবং যেটুকু উচ্চ-শিক্ষাও তাঁরা পেয়ে থাকেন, তার সাহায্যে জীবিকা অর্জনের সম্ভাবনা কমই রয়েছে আজ। যে শিক্ষা তাঁদের দেওয়া হয়ে থাকে, জীবনে তার কোন আবশ্যকতা নেই দেখে সেই শিক্ষার যাথার্থ্য সম্বন্ধে প্রচণ্ড সন্দেহ জেগেছে আজ ছাত্র মহলে।

স্থানীয় সংবাদপত্রের মতে সোমবারের এই বিক্ষোভ গত দশ বছরের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করেছে। এমন কি আলজেরিয়ার যুদ্ধের সময়েও এমন ব্যাপক এবং দীর্ঘস্থায়ী বিক্ষোভ দেখা যায়নি। জার্মানীর 'ফ্রাঙ্কফুর্টের রুণ্ডশাউ' ও 'রাইনিশে পোস্ত', রাশিয়ার 'প্রাভদা' প্রভৃতি পত্রিকাতেও এই ঘটনা নিয়ে কম মন্তব্য প্রকাশিত হয়নি।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে 'কানার আঁশেনে' (বন্দী পাতিহাঁস) পত্রিকার মন্তব্য। রাষ্ট্রপতি দ্য গল ও তাঁর সরকারের প্রতি তীক্ষ্ণ অথচ রসালো টিপ্পনি এই কাগজটির বৈশিষ্ট্য। দ্য গল যেহেতু ফরাসী এবং ফরাসীরা যেহেতু রসবোদ্ধা, এই কাগজটির প্রচার বা প্রকাশ তাই ফ্রান্সের মতো দেশেই সম্ভব। সোমবারের ঘটনার পরে এই পত্রিকার প্রধান শিরোনামা হল, "ল্য গভের্নমাঁ আ প্যার্দু ল্য কঁত্রোল্ দ্য সে ফাকুল্তে" (The Government has lost hold of Faculties)।

এই বিক্ষোভ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে শুক্রবার ১০ই মে রাতে : আড়াইটে থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড যেভাবে কার্তিয়ে লাত্যাঁ-র (কলেজ-পাড়া) সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে, যেভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে পুলিসের লড়াই চলেছে, যেভাবে জনমত ছাত্রদের স্বপক্ষে সোচ্চার হয়ে উঠেছে, তা দেখে চিন্তিত এবং ব্যথিত হয়েছি। শোনা যাচ্ছে এক হাজারের মতো ছাত্র আহত হয়েছে; অসংখ্য ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্তত চল্লিশ হাজার ছাত্র উপস্থিত ছিল এই নৈশ অভিযানে। পারী-র পুলিস কমিশনারের মতে, "পারীর ইতিহাসে এর চেয়ে শোচনীয় রাত আর আসেনি বোধ হয়; গেরিলা-যুদ্ধে পারদর্শী

[illegible], [illegible] ([illegible]) ও পরে [illegible]

ছাত্রপক্ষীয়দের উগ্র আক্রমণের সামনে পুলিস বাহিনী যদি তার স্থৈর্য বজায় না রাখত, রক্তের নদী বয়ে যেত।" "গেরিলা-যুদ্ধে পারদর্শী" কথাটা অত্যুক্তির মতো শোনালেও সত্য; ফ্রান্সের ছাত্ররা বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা লাভ ক'রে থাকে।

সত্যিই পারী-র জীবনে শুক্রবার ১০ই মে রাতটি অবিস্মরণীয়। ওদিকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চতুর্দিকে ছাত্রে ও পুলিসে লড়াই চলছে, সারি সারি মোটর পুড়ছে, আহতের সংখ্যা উভয় পক্ষেই বেড়ে চলছে, ল্যাম্পপোস্ট ও গাছের গুঁড়ি উপড়ে ছাত্রেরা আত্মরক্ষার ও আক্রমণের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করছে, টিয়ার গ্যাস ও হাতবোমা ছুঁড়ছে শান্তিরক্ষীরা, রু গে-ল্যুসাক'-এর বাসিন্দারা জানলা খুলে কাঁড়ি কাঁড়ি স্যান্ডুইচ ছুঁড়ে দিচ্ছেন ক্লান্ত ছাত্রদের উৎসাহ দিয়ে, রেডিওর কর্তৃপক্ষের মতে বিনিদ্র প্রবীণ রাষ্ট্রপতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় খোঁজ নিচ্ছেন ঘটনার ধারা কোনদিকে, প্রধানমন্ত্রী পঁপিদু গিয়েছেন আফগানিস্থান সফরে—তাঁর পরিবর্তে লুই ইয়োক্স অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীর পদে ব'সে রাষ্ট্রীয় দপ্তরের মন্ত্রী ক্রিস্তিয়াঁ ফুশে-র সঙ্গে পরামর্শে মগ্ন, রেক্টর জাঁ-রোশ ইস্তাহার জারি করছেন, "শান্তি ফিরিয়ে আনবার সদিচ্ছা নিয়ে ছাত্র-নেতারা যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন, আমি তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতে প্রস্তুত।" ফলে ছাত্র-নেতা দানিয়েল কোয়েন-বেঁদি যান রেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে।

কোয়েন-বেঁদি অখ্যাতির অন্ধকার থেকে রাতারাতি প্রসিদ্ধ হলেও নাঁতের'-এর উগ্র বামপন্থী (কতক নৈরাজ্যবাদীই) ছাত্রদের মধ্যে তাঁর প্রভাব বেশ গভীরই ছিল। ১৯৩৩ সালে কোয়েন-বেঁদি'র বাবা-মা (উভয়েই জার্মান) নাৎসীদের সংসর্গ থেকে পালিয়ে আসেন। সমাজতত্ত্বের ছাত্র কোয়েন বেঁদি'র বয়স এখন তেইশ বছর। সোমবার ৬ই মে যে ছাত্রদের বিচারার্থে উপস্থিত করা হয়, ইনি তাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সাংবাদিকেরা কোয়েন-বেঁদি'কে সম্প্রতি প্রশ্ন করেন, "আপনার কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ও পন্থা কি?" জবাবে ছাত্রনেতা বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রাজনীতির প্রবর্তন করাই হচ্ছে আমাদের বর্তমান লক্ষ্য।...বিশ্ববিদ্যালয়ে ব'সে খোলা মনে ভাবনা-চিন্তার আদান প্রদান আমরা যেমন সম্ভব করতে চাই, তেমনি আমরা চাই মার্কিনপন্থীদের স্বাধীনতা হরণ করতে। হিটলার লক্ষ লক্ষ ইহুদী হত্যা ক'রে খাসা কাজ করেছিলেন—এ-কথা কেউ যেমন স্বীকার করবেন না, তেমনি ফ্যাসিস্ত-বাদী মার্কিনপন্থীদের সভাই বা লোকে সহ্য করবে কেন"—প্রসঙ্গান্তরে কোয়েন-বেঁদি'কে জিগ্যেস করা হয়, "আপনার কি মনে হয় না যে অধিকাংশ ছাত্রই নিতান্ত আদিম প্রবৃত্তির তাড়নায় এক 'বিপ্লবাত্মক' প্রচেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে, কারণ তাদের সত্যকার অসন্তোষের সত্যকার বিশ্লেষণ আজও হয়নি?..." "আমরা সচেতন যে ব্যবহারিক দিক থেকে আমাদের তত্ত্ব খানিকটা বাসী হয়ে গিয়েছে," কোয়েন-বেঁদি জবাব দেন। "কিন্তু কর্মের ক্ষেত্রে না নামলে তো ছাত্রদের ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে টেনে আনা সম্ভব হত না।...আমি যদি 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' সামান্য আকারেও শুরু করে দিতে পারি, অগণ্য সমর্থক তার টানে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, কারণ রাশি রাশি তাত্ত্বিক কচকচির চাপে তাঁরা হাঁপিয়ে উঠেছেন দীর্ঘকাল।...আমরা কাজে নেমেছি সবে দেড়মাস হল।"—"বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগ কি?" "শ্রেণী-সংগ্রাম ভুলিয়ে দিয়ে শোষণ-নীতি সুষ্ঠু রাখতে সহায় আমাদের বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে, ধরুন, মনস্তাত্ত্বিক-সমাজ তাত্ত্বিক মনোভাব গ'ড়ে তোলা হয় না।... তা ছাড়া শিক্ষায় বিষয়-বস্তুগুলির মধ্যে দেয়াল গেঁথে যেভাবে 'কলুর বলদ' সৃষ্টি করা হয়ে থাকে স্পেশালাইজেশনের সাহায্যে, তা সমাজের ভেদনীতি রক্ষায় সহায়ক হলেও বাঞ্ছনীয় নয়। সত্যি বলতে কি, ক্লাসের ধারা কিভাবে পরিবর্তন করতে হবে, আমাদের জানা নেই; আমরা জানি দল বেঁধে বাধা দিতে—যদি কোন কিছু আমাদের বুদ্ধিকে সন্তুষ্ট না করে।... আমরা চাই ছাত্র-শক্তির জাগরণ—আপাতত সমাজের ক্ষেত্রে নয়, শুধু বিশ্ববিদ্যালয়েই।" —"আপনার ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনার মাথাব্যথা নেই?" "কর্মলিপ্ত মাইনরিটিরা থোড়াই কেয়ার করে নিজেদের ভবিষ্যতের ভাবনায়, যদিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্ধচন্দ্র খেতে কারোই ভাল লাগে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি, অনাথ ব'লে, জার্মান সরকারের বৃত্তিভোগী। আমার ইচ্ছে ছিল ওকালতি করব, যাতে ক'রে রাজনৈতিক মোকদ্দমা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারি। এখন সবই পুলিস কর্তৃপক্ষের কৃপা। তা ছাড়া পরীক্ষার মাত্র তিন সপ্তাহ বাকি, সকলেই স্বভাবতঃ এখন পরীক্ষার ভাবনাতে মশগুল।"

শনিবার ১১ই মে প্রধানমন্ত্রী মঁসিয়ো পঁপিদু রাত আটটার সময় বিদেশ থেকে ফিরেই শর্তহীনভাবে ছাত্রদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনে সক্ষম হন। কিন্তু বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির প্ররোচনায় ছাত্রদের প্রতি সরকারের অবিচারের অছিলায় সমস্ত ফ্রান্সে ১৩ই মে ব্যাপক হরতাল পালনের ব্যবস্থা হয়েছে। ১৩ই মে রাষ্ট্রপতি দ্যগলের ক্ষমতা লাভের দশ বছর পূর্ণ হল।

বিভিন্ন বিক্ষোভের সামনে দাঁড়িয়ে ফরাসী সরকার স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরবোনের আশ-পাশ থেকে প্রহরা তুলে নিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার অবাধে খুলে দিয়েছেন, অভিযুক্ত ছাত্রদেরও সাধ্যমত মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু বিক্ষোভকারীদের মন নরম হয়নি। সোমবার ১৩ই মে নতুন ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের উঠোনে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, বর্তমান সরকারের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মুণ্ডপাত সেখানে কম হয়নি; ব্যাপক মিছিলের আয়োজন হয়েছে বিকেল তিনটে থেকে। ভিয়েৎনাম ও মার্কিন সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে শান্তির আলোচনা চলছে যে-পারীতে, সেই পারীর অভ্যন্তরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে আজ অশান্তির অসংখ্য অভিসন্ধি। দিন-বদলের পালা শুরু হয়ে গিয়েছে, খোলো-হাওয়ার মধ্যে শুনতে পাচ্ছি দমকলের আর অ্যাম্বুলেন্সের করুণ বিলাপ। জানলা দিয়ে দেখছি, বিক্ষোভকারীদের মিছিলের তত্ত্বাবধানে উঠে চলেছে কয়েকটা হেলি-কপটার। অস্ফুট ভেসে আসছে জনতার কোলাহল। দাঁফের-রোশরো'র রাজপথ দূরে নয়; জুলিয়াস সীজারের আমলে প্রধান

রাজপথ—অর্লেয়াঁর পথ—ট্র্যাফিক জ্যাম (!) "দুর্গম" মনে হওয়ায় তারই সমান্তরাল এই রাজপথটি খোলা হয়েছিল এবং Via inferior (গৌণ রাজপথ) নামে পরিচিত ছিল; মধ্যযুগের নানাবিধ কুসংস্কারের মধ্যে inferior কথাটা enfer (নরক) বলে প্রচলিত হয়। এবং ইতিহাসের পরিহাসে ১৮৭০ সালের যুদ্ধে প্রসিদ্ধ এক ফরাসী বীরের নামে বর্তমানে এর নাম হয়েছে দাঁফের-রোশরো—ঐতিহাসিক আজকের মিছিলের সাক্ষীরূপে ভবিষ্যতেও তাকে স্মরণ করবেন ফরাসীরা।

*

'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গে ভরা' যিনি বলেছিলেন, ফরাসী দেশে এলে তিনি কী বলতেন, অনুমান করতে প্রাণ চায়। এই বসন্তে বৃষ্টি হচ্ছে, এই বসন্তে ছোট্ট, ছোট এবং মাঝারি আকারের বিপ্লব ফরাসী জীবনের আনাচেকানাচে আলো-আঁধারির ঝিলিক তুললেও এই বসন্তে ফুটতে দ্বিধা করেনি ভীরু মাধবীর সুবাসে ভরপুর 'ম্যুগে' ফুল, বসন্তোৎসবের অপরিহার্য প্রতীক যা। আরো ফুটেছে হালকা নীল ঝুমকো-লতার মতো 'গ্লিসিন', চাঁপা

আবীরের ছটা নিয়ে 'লীলা' (lilac)-গুচ্ছ, নকশী-কাঁথার মাঠে মাঠে সর্ষেফুলের মতো আদিগন্ত হলুদ 'ল্যুজের্ন' (luzerne). আর বুনো পথে চলতে কত না ঘাসের ফুল; ফলের বাগানে আপেল, বাদাম, খোবানি বা পীচ ফুলের বর্ণসম্ভার। ভ্যাকুম-ক্লীনার দিয়ে মাঝে মাঝে আকাশের উঠোন ঝেঁটিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন যখন অদৃশ্য-লোকের পরিচারিকারা, পঞ্চশরের প্রেরণা প্রবলতর ক'রে তাপস-সেনী এফেক্ট জাগাচ্ছে সোনালী রোদ। কেতকী-কেশর এ-দেশে মেলে না ব'লে এদের পুরনারীরা কেশবাস সুরভিত করতে যান 'কারিতা'-দের সেলুনে; কবরী যেহেতু ফোটে না (কবরীর মাসতুতো-পিসতুতো বোনেরা থাকলেও তাদের ব্যবহার এ'রা জানেন না), এ'রা institut de beaute এবং ডায়েটিং'এর কল্যাণে পাওয়া ক্ষীণ কটিতটে মাইক্রোতম 'মিনি-জ্যুপ' ('খুকু'-ঘাগরা) পরেন; ফুল-শয়নের প্রথা এবং কদম্বের রেণু অজ্ঞাত ব'লে এ'রা ও-দ্য-কোলোঞ এবং আরো হাজার-দশ রকমের গন্ধদ্রব্যে আমোদিত হন; এবং নয়নে অঞ্জন আঁকতে ভোলেন না। অবশ্য নেহাত কানা চোখও তাঁকে নিরঞ্জনা বলে অস্বীকার করতে ইতস্তত করবে। এবং সব কিছুর ওপরে, পিতামহীর ঠুলির মতো জাঁদরেল সাইজের 'নিরীহ' (Powerless) চশমা আঁটা এ বছরের নতুন ফ্যাশনের বিশেষ অংগ; এই চশমা নাকি মেয়েদের বেশ অ্যাঁতেলেক্‌ত্‌-অ্যাঁতেলেক্‌ত্‌ আদল পেতে সহায় হয়।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি প্যারিসে, বন্ধুদের কাউকে স্মরণ করি, আমার মতো সাধুর পরিত্রাণার্থে ষষ্ঠ ম-কার (এ'দের ভাষায় অবশ্য শকট, আর কি 'ভোয়াত্যুর' বা 'ওতোমোবিল') নিয়ে তাঁদের অভ্যুত্থান ঘটে—ঘণ্টায় শ'-বিশ-ত্রিশ-চাল্লশ কিলোমিটার হাঁকিয়ে চলে যাই শহরতলি বা মফস্বলের বনে-বাদাড়ে, পল্লীগ্রামে ঃ ফুসফুসের কেন্দ্রে মেঠো হাওয়া পুরে নিই। এবারেও বসন্ত উৎসব উপলক্ষে একদিন দল বেঁধে গেলাম প্রসিদ্ধ বুলোঞ উপবনে, সরোবরে ময়ূরপঙ্খী (হায় রে!) নাও বেয়ে ঘুরলাম বহুক্ষণ; তারপরে ময়ূরপঙ্খীর দরুন ডিপোজিটের কড়ি গুনে নিয়ে বন-বীথি ধ'রে যাচ্ছি, দুটি হাসিখুশী খোকন ঝিকমিকি মখমলের পোশাকে রাজপুত্তুর-কোটালপুত্তুর সেজে আমাদের পথ আগলে দাঁড়াল, "এক ফ্রাঁ-য় এক থোকা—টাটকা তাজা মুগে ফুল, মঁসিয়্য-দাম।" আর একদিন গেলাম 'শার্ত্র'-এর ক্যাথিড্রাল দেখতে ঃ এই শিল্পকীর্তিটি যতবারই দেখলাম, নয়ন না তিরপিত ভেল। তারপর এলোপাথাড়ি গাড়ি ক'রে আমরা পল্লী-পথে ঘুরছি, এক জায়গায় দেখি গান-বাজনা-হাসি-তামাশায় মুখর হয়ে উঠেছে—ঠিক আমাদের দেশের রথযাত্রার মেলা যেন ঃ ছোট ছোট দোকানে কত রকমারি খেলনা, লাল মাছ, গিনিপিগ, নাগরদোলা, বুড়ীর চুল, তেলেভাজা, বাদাম-বিস্কুট! কুমারী-পুজোর ব্রতের কথা মনে পড়ল খুব খাটো আলতা-রঙ রেশমী স্কার্ট-ব্লাউজ পরা বিচিত্র টোপর-ধরনের টুপি-মাথায় কিশোরী দোকানদারদের দেখে; সুন্দর হয়ে উঠেছে মামুলী, এমন কি অল্প-সুন্দর চেহারাগুলোও উৎসবের আনন্দের আলোয়, স্বর্গীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে ওদের মধ্যেই সত্যকার যারা সুন্দরী। আলাপ করলাম কাৎরিন (ক্যাথারিন) নামে মেয়েটার সঙ্গে; বারবার আমার ক্যামেরার দিকে ওর চোখ পড়ছে দেখে বুঝলাম শিশুর মধ্যে নারীসুলভ সৌন্দর্যসচেতনার অভাব নেই—যে আত্মচেতনা এদের শুরু হয় নেহাত কাঁচা বয়সেই। "তোমার একটা ছবি তুলি?" বলতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল মেয়েটার চোখমুখ। আরও এক রোববারে গিয়েছি বিখ্যাত 'বোয়া দ্য ভ্যাঁসেন' উপবনের 'ফোয়ার দ্য ত্রোন্' বা সিংহাসনের মেলা দেখতে। কলকাতার লোকেদের কাছে অখিল ভারত অমুক প্রদর্শনী বা তমুক মেলা নতুন নয়. যদিও এদেশের এই মেলাটার বৈচিত্র্য বিপুলতর সম্ভবত; একটা এরোপ্লেন-নাগরদোলার পাশে দেখি আমার প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান কিরণ ব্যাসের আদলের একটি পুতুল ব'সে ইলেকট্রিকে চালানো হাত নেড়ে ভাগ্য-বিধান করে চলেছে, প্রেম-বিবাহ-ব্যবসা সংক্রান্ত গণনায় মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে তার কাছে পরামর্শ পেতে পারে, নাম তার—"ব্রহ্মা"; যে রসিক-চূড়ামণি এই পুতুলটির স্রষ্টা তিনি এমার্সনের মনের ঠিকানার হদিস কোথায় পেলেন, নির্ধারণ করতে দশ বাঁও জলে পড়লাম ঃ

> If the red slayer think he slays
> Or if the slain think he is slain,
> They know not well the
> subtle ways
> I keep, and pass, and turn again.
> (Brahma)

গীতার ভাষ্যের সঙ্গে পুরাণের পাঞ্চ, তাতে সাড়ে বত্রিশ ভাজা কিপলিং-এর গুঁড়ো, গড়পড়তা ফরাসী মনের রোমান্টিক রসনার দিকটা এর বাড়া কি চাইবে?

বসন্তের প্যারিসে এখন অন্যান্য আকর্ষণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, এহুদি মেনুইন, ডেভিড অয়েস্ট্রাখ, আর্থ্যর রুবিন-স্টাইন, কার্ল রিশটের, হের্বার্ট ফন কারাইয়ান প্রভৃতির কনসার্ট; পালে দ্য স্পোর (Palais de Sports)-এ হার্লেম গ্লোব-ট্রটারদের বাস্কেট-বল খেলা—অবিস্মরণীয় স্পোর্টস-ক্লাউন লেমন-এর হাত-সাফাই, বাড়তি অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন রিচার্ড বার্গমানের সঙ্গে জাপানী ফুজি-র টেবিল টেনিস ম্যাচ; (এখানেই আমরা দেখেছিলাম 'হলিডে অন আইস্'); ইস্রায়েলি চিত্রশিল্প প্রদর্শনী; জাপানী পুতুল নাচ; জানেৎ ওস্তিয়ে গ্যালারিতে

জাপানের গ্রাম্য-শিল্প প্রদর্শনী; দ্যুরীয়েল গ্যালারিতে Imprssionist and Modern Masters; ব্যার্গ্রুয়েন গ্যালারিতে পিকাসো, পল ক্লে, মাতিস, মিরো, শাগাল প্রভৃতির যৌথ প্রদর্শনী; ম্যুজে গীমে-তে বিলায়েৎ খানের সেতার; নিষ্ঠাবান ভারত-প্রেমিক এবং ভারতীয় ও তিব্বতী অধ্যাত্ম-সাধনার মর্মান্বেষী লেখক-সাংবাদিক-চলচ্চিত্র পরিচালক আর্নো দে জারদ্যা-র 'তিব্বতীদের সর্বশেষ বাণী' নামে ধারাবাহিক চলচ্চিত্র-প্রদর্শনীর সঙ্গে সগ্রন্থ ভাষণ; এবং আঁরি লাংলোয়া'র প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে 'সিনেমাতেক'-এর নবজন্ম।

*

সকালে উঠে অভ্যাসমতো দাড়ি চাঁচতে চাঁচতে রেডিওতে সংক্ষিপ্ত সংবাদ শুনেছিলাম সেদিন। সংবাদের শেষে, কি খেয়াল হল, ফ্রাঁস-মিউজিকের ধ্রুপদী সঙ্গীতানুষ্ঠানের পরিবর্তে 'ফ্রাঁস-ক্যুত্যুর' (France-Culture) অনুষ্ঠানের বোতাম টিপে দিলাম।

ঘোষকের আলাপ চলছিল একজন দীর্ঘকালীন পারী-প্রবাসী জাপানী চিত্রশিল্পীর সঙ্গে। শিল্পীর মোদ্দা বক্তব্য এই দাঁড়ায়

যে ফ্রান্সের কাছে তাঁর জানবার বা শেখবার কিছুই নেই, তিনি জন্মেছেন জাপানী, মরবেন জাপানী, কিন্তু জাপানে উপযুক্ত গবেষণার বা জীবিকার ক্ষেত্র প্রশস্ত নয় ব'লে ফ্রান্সের মাটি আঁকড়ে প'ড়ে আছেন এদেশে। অপ্রিয় সত্য অপ্রিয় ভাষায় বলতে পারা বাহাদুরির কাজ কিনা জানি না, তবে খুব রুচিসম্মত কিনা ছিসেব করছিলাম। এমন সময় ঘোষক বললেন, "এবারে আমরা এশিয়ার অন্য এক দেশের একজন শিল্পীর সঙ্গে আলাপ করব, যে দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের সংযোগ নেহাতই সাম্প্রতিক : ভারতবর্ষের শিল্পী শক্তি বর্মণ উপস্থিত আমাদের স্টুডিওতে।"

প্রশ্ন হল, "জানতে ইচ্ছে হয়, মঁসিয়ে শক্তি বর্মণ, আমাদের দেশে আপনি শিল্পী হিসেবে কাজের যথেষ্ট সুযোগ পান কি?"

শক্তি বর্মণ : "নিঃসন্দেহে। সেইজন্যই এ-দেশে আমার আসা। দেশে থাকলে আমি হয়তো এতদিনে শিল্প-অধ্যাপনায় বেশ মনোনিবিষ্ট হয়ে উঠতাম, কিন্তু শিল্প-সাধনা এমন সর্বাঙ্গীণ রূপে করতে পারতাম না বোধ হয়।"

প্রশ্ন : "আচ্ছা, এ-দেশী শিল্পীদের প্রভাব আপনার উপর কতটা গভীর বলুন তো?"

শক্তি বর্মণ (প্রত্যয়-দৃপ্ত স্পষ্ট ফরাসীতে) : "প্রভাব কথাটার চেয়ে আমি প্রেরণা কথাটাই প্রয়োগ করতে পারি; শিল্প, বিশেষত চিত্রশিল্প যেহেতু বিশ্বজনীন, সেইহেতু কোনও শিল্পীই দেশ-কালের গণ্ডীতে বাঁধা পড়তে পারেন না। আমার মনোভাব সর্বদাই শিক্ষার্থীর মনোভাব; শিখছি আমি জীবনের প্রতিক্ষণেই।"

প্রশ্ন : "আপনার শিল্প-কীর্তিতে আমাদের সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে কি জানি এক অব্যক্ত যাদুর ছাপ, কেমন যেন রহস্যময়তা—"

শক্তি বর্মণ (সবিনয়ে) : "আমার জীবনের অধিকাংশ কেটেছে আমার জন্মভূমি ভারতবর্ষে। সে-দেশের সঙ্গে আমার নাড়ির যোগ। সে-দেশের শিল্পরীতি আমার মজ্জাগত। আমাদের দেশের তন্ত্র-শিল্প, লোক-শিল্প প্রভৃতি আজ হঠাৎ ক'রে এদেশে পরিচিত হলে, আকস্মিক এদেশে আধুনিকতার (avant-garde) প্রতীক হয়ে উঠলেও বহু যুগ ধরে আমরা তারই ছায়ার মানুষ। রহস্যময়তা যদি কিছু পেয়ে থাকেন আমার ছবিতে, তার জন্য আমার শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনেকটা দায়ী।"

প্রশ্ন : "আপনি কি এখানে ব'সে নিজের ঘরের কোণে নিজের মতো দিন কাটান, নাকি প্রচলিত শিল্প-আন্দোলন ও শিল্প-ভাবনার সম্প্রদায়গুলির কোন-একটি বা একাধিক সংস্থার সঙ্গে জড়িত?"

শক্তি বর্মণ : "কোনও গোষ্ঠীর মধ্যে আমি নিজেকে বেঁধে না ফেললেও সবার সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব, হৃদ্যতা, ভাবের আদান-প্রদান চলে। ফরাসী ও বিদেশ থেকে আগত প্রবাসী বহু শিল্পী বন্ধুর সঙ্গে নিয়মিত আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়, আলোচনা চলে।"

প্রশ্ন : "তা হলে এদেশে এসে আপনি অনুশোচনার কারণ পাননি?"

শক্তি বর্মণ : "মোটেই নয়। এদেশের লোকের সঙ্গে মিশে, এদেশের শিল্প-ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে যে দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকার আমি অর্জন করেছি, তার সাহায্যে আমার দেশের শিল্প-বিবর্তন আমার চোখে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুবিধে পেলেই আমি দেশে ফিরে যাই, অনুধাবন করতে চেষ্টা করি আমাদের শিল্পীদের প্রগতির ছন্দ, প্রতিবারেই আবিষ্কার করি নতুন নতুন প্রেরণার উৎস, নতুন ভাবনার খোরাক।"

টেলিফুঁকে দিলাম, "সাবাস শক্তিবাবু!"

বিরক্ত জবাব, "কে? পৃথ্বীনবাবু নাকি? কেমন আছেন।"

"ভীষণ ভাল। ভয়ানক ভাল লাগছে—"

"কেন বলুন তো?"

"বাঃ, রেডিওতে—"

"সেকি? ওটা আজকে ছিল? তাইতো! যাচ্চলে, আমি আবার মাইতে-কে লিখে দিয়েছি ভুল একটা দিন, নিজেও সেই ধারণাই ক'রে আছি!"

মাইতে দেলুতেই "প্রতিভাবতী" শিল্পী এবং শক্তিবাবুর সহধর্মিণী; ক'দিনের জন্য পুত্র নবীনচন্দ্রকে নিয়ে বাপের বাড়ি গিয়েছেন।

"ওঁর কপাল খারাপ, আপনারও।"

"কেন?"

"আপনার এই আলোচনা শুনলে আর-কোনদিন আপনাকে ফরাসী বলা নিয়ে খোঁটা দিতে উনি সাহস পেতেন না।"

কথাটা সত্যি। অন্যান্য শিল্পী যারা রেডিওতে কথা বললেন, তাদের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে এবং স্বতন্ত্রভাবেও চমৎকার বললেন সেদিন শক্তি বর্মণ। এখন উনি জাতকের কিছু কাহিনী অবলম্বন ক'রে একটা সীরিজ আঁকছেন। ইংল্যাণ্ড, কানাডা প্রভৃতি বিদেশী গ্যালারি থেকে ওঁর কিছু ছবি কিনে নেবার জল্পনা-কল্পনা চলছে।

শক্তিবাবুর পরেই সেদিন রেডিওতে ছিল বিখ্যাত চীনে চিত্রশিল্পী জাওকি-র সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বর্ণনা।

—পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পুঃ—এই চিঠি লিখে রেখেছি আজ দিন-দশেক হল। গত সপ্তাহে বার-কয়েক 'অধিকৃত' বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখে এসেছি অরাজকতার হাস্যকর চেহারা : লালঝাণ্ডার ছড়াছড়ি, মাও-ৎসে-তুং, হো-চি-মিন, ট্রটস্কি, চে-গুয়েভারা প্রভৃতির অজস্র ফটোর ভিড়ে কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস লেনিন প্রভৃতির দু-চারটে ছবিও চোখে পড়ছে। ছাত্রদের দাবির পিছনে যে অকৃত্রিম আন্তরিকতা ছিল, তার সঙ্গে বেনোজলের মতো মিশে গিয়েছে বিভিন্ন পার্টির ধেড়ে কমরেডের স্রোত, আর ছেলে-বিষৎ বুড়োর ফ্লক ও কানে দুল-গোঁজা এলোকেশী গুম্ফ-শ্মশ্রুধারী হিপি জনতা। পরিচিত অ্যাম্ফিথিয়েটারগুলোর কোনটার নাম হয়েছে ফ্রয়েড, কোনটা হার্বার্ট মারকিউস, কোনটা কোয়েন-বেন্দি! সারারাত পিয়ানো ও গীটার বাজিয়ে গন্ধর্বলোকের গান-বাজনা চলছে, ছোট ছোট স্টোভ জ্বালিয়ে চা, কফি, আলুভাজা ডিমসেদ্ধ, ওমলেট হাতে-গরম তৈরি হচ্ছে, কমরেডরা পছন্দ-মতো তা সেবন করছেন এবং মর্জি অনুযায়ী বিপ্লবের সাহায্যার্থে নির্দিষ্ট বাক্সে টাকা ফেলে দিচ্ছেন; দামের প্রশ্ন ওঠে না। এ'দেরই একদল, অপেরা এবং অপেরা-কমিকের ওপর চড়াও হয়ে বাড়ি-গুলো দখল করেছেন। অর্থাৎ বস্তি ইওরোপের বুকে যুদ্ধ-বিদ্রোহের নামগন্ধও গত কয়েক-বছরে না থাকায় নওজোয়ানদের জীবন এখানে একঘেয়ে ঠেকত; ভিয়েৎনাম, ইস্রায়েল প্রভৃতির যুদ্ধের আলোচনায় যে উত্তেজনা মিলত তাতে দুধের সাধ এতদিন ঘোলেই মেটাতে হত বাধ্য হয়ে। রাতারাতি এই পরিবর্তন এসে যাওয়ায় এ'দের ধারণা হয়েছে ফরাসী বিপ্লবের অথবা রাশ্যান বিপ্লবের স্বর্ণযুগ এ'রা ফিরিয়ে এনেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে দেয়ালে অবচেতন-নিঃসৃত বিভিন্ন রসের যেসব বাণী ইতিমধ্যে লাল কালির আখরে লেখা হয়েছে, তার

মতো আদিমরাই বক্তা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন: "বন্দুক্তি ঝর অসংকোচে" অথবা "যতই আমি বিপ্লব করছি, ততই প্রবল হচ্ছে আমার প্রেম-প্রবৃত্তি; যতই আমি প্রেম করছি, ততই প্রবল হচ্ছে বিপ্লবের প্রবৃত্তি"" উক্তিগুলোর সামনেই অলিতে গলিতে হোঁচট খেতে হবে ভবিষ্যতের বিপ্লবী নাগরিক সৃষ্টির নান্দী-পর্বে নিমগ্ন আদম-ইভের তপোবনে।

ছাত্র-আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতির অজুহাতে ব্যাপক ধর্মঘট দিয়ে যে শ্রমিক-আন্দোলন সূচিত হল গত ১৩ই মে, তার ঢেউ ক্রমেই নাগরিক জীবনের সর্বত্র আছড়ে পড়ছে বর্ধিষ্ণু আক্রোশে এবং অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে। রানো (রেনল্ট্), সিত্রোয়েন, প্যোজো প্রভৃতি মোটর কারখানাগুলো অবরোধ করবার সময়ে শ্রমিকদের সঙ্গে হাত মেলাতে গিয়েছিল ছাত্রদের মিছিল; সুকৌশলে শ্রমিকেরা ছাত্রদের ফিরে যেতে বাধ্য করালেও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতি পরিবর্তনের দাবী নিয়ে যে আন্দোলনের সূত্রপাত, তার থেকেও বহু গুণে শক্তিশালী শ্রমিক-আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে এই উপলক্ষে। রাষ্ট্রপতি দ্যগল সাহেব বুকারেস্ট থেকে নির্দিষ্ট সময়ের পনেরো ঘণ্টা আগে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন পরশু, শনিবার, ১৮ই মে রাতে। তার আগেই সমস্ত ফ্রান্সে ঢালাও হরতাল শুরু হয়ে গিয়েছে। অর্লি বিমান-বন্দরে রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনার জন্য প্রধানমন্ত্রী জর্জ পঁপিদু, শিক্ষামন্ত্রী আলাাঁ পেরফিৎ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী কুভ দ্য মুর্ভিল, অর্থমন্ত্রী মিশেল দ্যব্রে প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। বিমান-বন্দরেই সংক্ষিপ্ত বৈঠকে কর্তব্য-নির্দেশ দিয়ে এলিসে-প্রাসাদে ফিরে রাষ্ট্রপতি প্রায় একঘণ্টা আলোচনা করেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। ২৪শে মে দ্যগল জাতির উদ্দেশে একটি বিশেষ ঘোষণা প্রচার করবেন বেতার-মারফৎ।

হরতালের চেহারা দেখে যথেষ্ট আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে জনসাধারণ্যে। প্লেন-সার্ভিস, ট্রেন, মেট্রো, বাস, ডাক-তার বিভাগ প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে অনির্দিষ্ট-কালের জন্য বন্ধ; দুইশ'র বেশী প্রধান প্রধান কারখানা 'অবরুদ্ধ'; স্কুল-কলেজ-অফিস, অধিকাংশ দোকান-পাট বন্ধ; যান-বাহন বলতে প্রাইভেট গাড়ি এবং দমকল ও পুলিস-ভ্যান। সারা ফ্রান্সের জন-জীবন ষোল আনাই প্রায় অচল। ব্যাঙ্কগুলো বন্ধ হব-হব। যে যার মতো এপিসিয়ে (বড়-রকম মুদির দোকান) থেকে সপ্তাহখানেকের জন্য রসদ সংগ্রহ ক'রে ঘরে ফিরছেন প্রতি-বেশীরা।

এই দুর্দিনেও দক্ষিণ ফ্রান্সের কান্ (cannes) শহরে আয়োজিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসব। শনিবার ১৯শে মে সকাল এগারোটা নাগাদ নিমন্ত্রিত সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র-শিল্পী-লেখক-প্রযোজক-পরিচালকেরা উপস্থিত হন জেরাল্ডিন চ্যাপলিন অভিনীত স্পেনীয় চিত্র 'পেপারমিণ্ট' দেখতে।—আর ক্লেয়ার হল-এ চলছিল 'একটি পুরুষ, একটি নারী' চিত্রের পরিচালক ক্লদ ল্যলুশ, মেড ইন ইউ-এস-এ'র পরিচালক জাঁ-লুক গোদার, 'পিয়ানিস্টকে গুলিকরো না'-র পরিচালক ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো প্রভৃতির মধ্যে সিনেমাতেক ও লাংলোয়া বিষয়ে আলোচনা। এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উৎসব বন্ধ রাখবার প্রস্তাব সর্বসমক্ষে পেশ করা মাত্র তুমুল বিতণ্ডার শুরু হল। মনিকা ভিত্তি, লুই মাল, রোমাঁ পোলানস্কি এবং টেরেন্স ইয়াং বিচারকমণ্ডলীর সদস্য-পদ ত্যাগ করেন। উৎসব গৃহে আগুন লাগাতে উদ্যত একদল প্রতিনিধির সঙ্গে প্রায় হাতা-হাতির উদ্যোগ। চব্বিশ ঘণ্টা এই অরাজকতা সহ্য ক'রে অবশেষে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে সবাই উৎসব প্রাঙ্গণ ত্যাগ করেন। এক যুগোস্লাভ প্রতিনিধি বলেন, "আমি সাম্য-বাদী সাংবাদিক। আমাদের স্বপ্ন ছিল যে ফ্রান্সের উদাহরণ নিয়ে গ'ড়ে উঠবে আমাদের দেশ। কিন্তু ফ্রান্সের যে চেহারা আজ দেখে গেলাম, তাতে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। অত্যন্ত দুঃখিত মনে আমি ফিরে যাচ্ছি।"

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

[আলোক-চিত্র লেখক ও শ্রীদেবেশো মুখার্জী কর্তৃক গৃহীত]

বিদেশী সাহায্য ও ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন

আধুনিক যুগে বিদেশী সাহায্য ছাড়া অনগ্রসর দেশগুলির পক্ষে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয় একথা সবাই স্বীকার করবে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে বিদেশী সাহায্যের চাহিদা যে কবে শেষ হবে বলা খুবে শক্ত। অধ্যাপক ডি আর গাডগিল চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষে বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ যাতে শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস পায় সে চেষ্টা চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার বিদেশী সাহায্য দরকার। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। যদি পাঁচ হাজার কোটি টাকার বিদেশী সাহায্য পাওয়া যায়, তার মধ্য থেকেই একটি মোটা অংশ বেরিয়ে যাবে আগেকার বিদেশী ঋণ পরিশোধ এবং সেই ঋণের উপর সুদ প্রদান করার জন্য। আবার এখন যদি পাঁচ হাজার কোটি টাকা ধার করা হয়, এই টাকার উপর ভবিষ্যতে সুদ প্রদান এবং এই ঋণ পরিশোধ করার জন্য আরও বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন হবে। এভাবে কত দিন চলতে পারে একথাই আজ সবার মনে একটি বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। বিদেশী সাহায্যের সুবিধার কথা সবারই জানা আছে। কিন্তু ভারত কি বিদেশী সাহায্যের সব সুবিধা অর্জন করতে পেরেছে? বিদেশী সাহায্যে কয়েকটি বড় বড় ইস্পাত তৈরির কারখানা হয়েছে, কিন্তু সতেরো বছর ধরে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করেও ভারতের খাদ্যসমস্যার সমাধান হয়নি। গুরুভার শিল্পগুলির উন্নয়নের যৌক্তিকতা সবাই স্বীকার করবেন, কিন্তু তার সাথে কৃষির উন্নয়নের উপরেও সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল।

রাশিয়া পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করছে। স্বভাবতই ভারতকে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে খরচের পরিমাণ বাড়াতে হবে। যদি প্রতিরক্ষা খাতে খরচের পরিমাণ বেড়ে যায় তবে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে উন্নয়ন প্রকল্পগুলির উপর। বিদেশী সাহায্য থেকে কিছু অংশ হয়ত প্রতিরক্ষা খাতেই ব্যয়িত হবে। অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই ওয়াশিংটন যাচ্ছেন আমেরিকা থেকে কতটা সাহায্য পাওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি আদায় করার জন্য। বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীদিনেশ সিং রাশিয়ায় গেছেন ভারত ও রাশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য। আজ যে প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে,—এত বিদেশী সাহায্য পেয়েও আমরা তার কতটা সদ্ব্যবহার করতে পেরেছি? গত দুই বছর যে জাতীয় আয় বেড়েছে তার প্রধান কৃতিত্ব সরকারের নয়,—তার কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন প্রকৃতি; কেননা, সময়মত বর্ষা হওয়ায় এবং প্রকৃতির অকৃপণ সহযোগিতায় কৃষির ফলন বেশী হয়েছে। অথচ সতেরো বছর ধরে পাওয়া বিদেশী সাহায্যে আমাদের জলসেচ ব্যবস্থা এমন উন্নত স্তরে এখনও যায়নি যাতে একবছর অনাবৃষ্টি হলেও কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকবে। তাই বলছিলাম, বিদেশী সাহায্য যদি আরও পাই সুখের কথা; কিন্তু সেই সাহায্য যেন এমনভাবে কাজে লাগাতে পারি যাতে দেশ প্রকৃতই অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। এখন ভারতের উচিত সর্বাগ্রে কৃষিক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা এবং রপ্তানি শিল্পকে এমনভাবে উন্নত করা যাতে রপ্তানি আয় বাৎসরিক শতকরা ৭ ভাগ বেড়ে যায় এবং বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ ভবিষ্যতে কমানো সম্ভব হয়। বিদেশী সাহায্যের অংশ হিসাবে আমরা পাব কারিগরি সহযোগিতা, আর দেশে তৈরী হবে অধিক পরিমাণ কর্মসংস্থান। কিন্তু উন্নয়নের ক্রমবর্ধমান হার যেন অব্যাহত থাকে। ১৯৬৫-৬৬ সালে ভারতের জাতীয় আয় শতকরা চার ভাগেরও বেশী কমে গিয়েছিল।

১৯৬৬-৬৭ সালে অবস্থার কিছু উন্নতি হয়। কিন্তু ১৯৬৭-৬৮ সালে জাতীয় আয় শতকরা দশ ভাগ বেড়েছে বলে অনুমিত হয়েছে। আশা করা যায়, চলতি বছরেও জাতীয় আয় শতকরা সাতভাগ বাড়বে। লক্ষ করার বিষয়, গত বছর এবং চলতি বছরে ভারত আশানুরূপ বিদেশী সাহায্য পায়নি। তবুও ভারতের জাতীয় আয় বেড়েছে; কারণ, ভারত বুঝতে পেরেছে জাতীয় আয় দ্রুত বাড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে কৃষির উন্নতি এবং সেজন্য ভারত গত বছর থেকেই কৃষির উন্নতির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা গ্রহণ করা তখনই সার্থক হবে যখন এই সাহায্য ভারতকে স্ব-নির্ভরশীল উন্নয়নের (self-sustaining growth) পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

১৯৬৮-৬৯ সালের পরিকল্পনা

পরিকল্পনা কমিশন ১৯৬৮-৬৯ সালের জন্য যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন তার খরচের পরিমাণ ২৩৩৭ কোটি টাকা হবে শোনা যাচ্ছে। এই পরিকল্পনায় জাতীয় আয় এক বছরে ৫ শতাংশ বাড়বে আশা করা যায়, এবং এজন্য দুইটি শর্ত পূরণ হওয়া দরকার। প্রথম শর্তটি, প্রকৃতিদেবীর বিমুখ হওয়া চলবে না। দ্বিতীয় শর্ত, শিল্পোৎপাদন পাঁচ-ছয় শতাংশ বাড়াতে হবে। অবশ্য প্রথম শর্তটি পূরণ হলে দ্বিতীয় শর্তটিও পূরণ হতে বাধ্য। হিসাব করে দেখা গেছে যদি পাঁচ শতাংশ কৃষি-উৎপাদন বাড়ে, তবে শিল্পোৎপাদন বাড়বে ৮ শতাংশ। ১৯৬৮-৬৯ সালের পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন-লক্ষ্য ধরা হয়েছে ১০২ মিলিয়ন টন। খাদ্যশস্যের উৎপাদন যদি অন্তত ১০০ মিলিয়ন টনও বাড়ে, তবুও ভারত উন্নতির পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে। বর্তমান সামর্থ্য আরও ভালভাবে কাজে লাগালে এবং নির্মীয়মাণ প্রকল্পগুলির কাজ শেষ করতে পারলে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হারও অব্যাহত থাকবে।

সুব্রত গুপ্ত

লক্ষ্মীর কৃপালাভ ঃ বাঙালীর সাধনা

প্রসাধনী, আয়ুর্বেদ ও রসায়নে বাঙালী

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বললেন, "কিছু ভেবো না খগেন, দেশ স্বাধীন হলে তোমার হাত সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দেবো।"

স্বদেশী যুগের একেবারে গোড়ার দিকের কথা; সালটা উনিশ শ' চার কি পাঁচ। চৌরঙ্গীর 'হোয়াইট ওয়ে-লেড-ল' কোম্পানী, মানে অধুনা U.S.I.S. অফিসের সামনে, রাজপথে একক পিকেটিং করার সময়ে পুলিসের লাঠির ঘায়ে খগেন্দ্রচন্দ্র দাশ নামে এক যুবকের হাত ভেঙে যায়। তাঁকে উদ্দেশ করেই সুরেন্দ্রনাথ ওই কথাগুলি বলেছিলেন।

মহাপুরুষের আশীর্বাদ বিফল হয় নি।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড অথবা তার উৎপাদিত পণ্যের নাম জানেন না, এমন কোনো শিক্ষিত বাঙালী আজ আছেন বলে আমার মনে হয় না। সেই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্মীলাভও সর্বজনবিদিত। খগেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন তারই তিনজন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠাতার অন্যতম। কিন্তু দেবীর অঢেল কৃপালাভও এই দেশপ্রেমিক কর্মযোগীর নিবেদিত সত্তাকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পথভ্রষ্ট করতে পারে নি। চিরকালের মোটা খদ্দরের ধুতী পাঞ্জাবী পরে আর চটের একটি থলিকে অফিসের ব্যাগ হিসেবে ব্যবহার করেই খগেন্দ্রচন্দ্র কর্মময় জীবনটি কাটিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁর বিষয়ে আরও বলার আছে, কিন্তু তার আগে তাঁর অন্য দুই সহকর্মীর কথা বলে নিই।

যথার্থ উপমার ব্যবহার সাহিত্যিকের কর্ম। আমি তা নই। আমার ভাষায় এঁদের তিনজনকে আমি বলবো ত্রিধারা, যার জলসেচনে ক্ষেত্র আজ উর্বর, সমৃদ্ধ।

অধ্যক্ষ রাজেন্দ্রনাথ সেন বহুকাল আগে, ১৯৩৬ সালে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। খগেন্দ্রচন্দ্র সম্প্রতি (১৯৬৫-তে) পরলোকগত। আছেন কেবল ৮৩ বৎসর বয়স্ক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মৈত্র, যাঁরই জন্যে শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে তিন অধ্যাপক বন্ধুর যোগাযোগ ঘটেছিল।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন-এর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে দীক্ষিত ব্রাহ্ম মধুসূদন সেন মহাশয়ের তৃতীয় সন্তান রাজেন্দ্রনাথ ১৮৯৮ সালে ২০ বছর বয়সে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি-তে এম-এ পরীক্ষায় (তখনও এখানে এম এস-সির প্রবর্তন হয় নি) প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর খ্যাতনামা জ্যেষ্ঠভ্রাতা অধ্যাপক স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের মতো রাজেন্দ্রনাথও অধ্যাপনা ব্রত গ্রহণ করে প্রথম দিকে কিছুকাল উত্তরপাড়া কলেজ ও ঢাকা জগন্নাথ কলেজে শিক্ষকতা করেন। জগন্নাথ কলেজে থাকতে থাকতেই অনুমানিক ১৯০৭ সালে 'ঘোষ স্কলারশিপ' নিয়ে রাজেন্দ্রনাথ বিলেতে যান এবং লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এস-সি পাস করেন। ১৯১০ সালে আই-ই-এস অর্থাৎ ইন্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসে মনোনীত হবার পর দেশে ফিরে শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের 'টিংক্টোবিয়্যাল কেমিস্ট্রি' (রঞ্জক রসায়ন) বিভাগের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

নাটোরের এবং পরবর্তীকালে কলকাতা হাইকোর্টের বর্ষীয়ান ব্যবহারজীবী স্বর্গীয় কাশীকান্ত মৈত্রের পুত্র শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় ক্যালকাটা কেমিক্যালের তিন প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে কনিষ্ঠ। সেন্ট জেভিয়ার্সে এফ-এ এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এস-সি পাসের পর কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নবপ্রবর্তিত এম এস-সি কোর্সের প্রথম ছাত্রদলের অন্যতমরূপে ১৯১০ সালে কেমিস্ট্রিতে এম এস-সি ডিগ্রী পান। পাশ করার কিছুকাল পরেই বীরেন্দ্রনাথও কেমিস্ট্রির লেকচারারের পদে শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে যোগদান করেন।

খগেন্দ্রচন্দ্রের পারিবারিক ঐতিহ্য বিস্ময়কর। তাঁর পিতা তারকচন্দ্র দাশ ছিলেন ঢাকা আদালতের জজ। পিতামহ আনন্দমোহন আবার ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। ওদিকে মা ছিলেন

প্রাতঃস্মরণীয়া মোহিনী দেবী, যিনি রাজ-পুরুষের পত্নী হয়েও মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রাণনায় কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ১৯২১-এর নন-কোঅপারেশনের যুগ থেকেই অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি একাধিকবার কারাবরণ করেছিলেন।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩০-এর বিলিতী বয়কট ও লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলনের সময়কার কারাবাসে মোহিনী দেবীর সংগে স্বগীয় প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের পত্নী (আমাদের 'আনন্দবাজার' ও 'দেশ' সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকারের মাতৃদেবী) স্বর্গতা নির্ঝরিণী দেবী, ঢাকায় প্রকাশিত অধুনালুপ্ত 'ভারত মহিলা' পত্রিকার সম্পাদিকা স্বর্গীয়া সরযূবালা দত্ত ভারতী প্রমুখ দু'-তিনজন বর্ষীয়সী মহিলাও কারাবরণ করেছিলেন। ১৯৩২-এর 'আইন অমান্য' এবং বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময়েও মোহিনী দেবী কংগ্রেসের নেত্রীস্থানীয়া ছিলেন।

মোহিনী দেবীই বোধ হয় প্রথম সম্ভ্রান্ত বাঙালী মহিলা যিনি একা একা সেকালের ট্রামে চলাফেরা করে সারা কলকাতা শহরের রক্ষণশীল সমাজকে চকিত করেছিলেন। আর তাঁর চতুর্থা কন্যা ডক্টর প্রভাবতী দাশগুপ্ত নারীপ্রগতির উৎসাহক পিতা তারকচন্দ্র দাশ মহাশয়ের প্রেরণাতে উচ্চতম শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ডক্টরেট বিভূষিতা ভারতীয়াদের মধ্যে প্রথমতম মহিলা বর্তমানে ৭৫ বৎসর বয়স্কা প্রভাবতী দেবীর শতায়ু কামনা করি।

বংগবাসী কলেজে এফ-এ (ফার্স্ট আর্টস অর্থাৎ আজকের আই-এ) এবং প্রেসিডেন্সীতে বি-এ পড়ার পর স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়ে খগেন্দ্রচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথ ছাড়াও সখারাম গণেশ দেউস্কর ও বালগঙ্গাধর তিলকের মতো বিরাট পুরুষদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেও এসেছিলেন।

১৯০৫ সালে জাস্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের পুত্র স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র ঘোষ, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের অগ্রজ স্বর্গীয় সুবোধচন্দ্র রায় এবং স্বর্গীয় বনোয়ারীলাল চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন দেশপ্রেমিক বাঙালী এ দেশের তরুণদের বিদেশে পাঠিয়ে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পশিক্ষায় ব্যুৎপত্তির জন্য "Society for the Advancement of Scientific and Industrial Education for Indians" নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। সেই সংস্থার ধনভাণ্ডারের সহায়তায় ১৬জন (মতান্তরে ১৯জন) বাঙালী যুবক বিদেশে, বিশেষ করে জাপানে গিয়ে নানা শিল্পে পারদর্শিতা লাভ করে আসেন। এঁরা অবশ্য সকলে একই সঙ্গে যান নি; পর পর কয়েক বছরে এঁদের বৃত্তি দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। সংস্থার উদ্দেশ্যই ছিল যে, এই যুবকরা নানা রকম কাজ শিখে এসে স্বদেশের শিল্পোন্নয়ন করবেন। সেই বৃত্তি যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে পার্সলেন-এর শ্রীসত্যসুন্দর দেব ও গোয়ালিয়র পটারিজ-এর স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়-দের অবদানের বিষয়ে আগের এক প্রবন্ধে লিখেছি। আরও যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, 'বেংগল ওয়াটারপ্রুফের' স্বর্গীয় সুরেন্দ্রমোহন বসু, 'মনোরম' মোমবাতির উদ্ভাবক নগেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়, 'যশোর কোম্ব (চিরুনী) বাটন অ্যান্ড ম্যাট (মাদুর)'-এর স্বর্গীয় মন্মথনাথ ঘোষ, 'রংপুর টোব্যাকো' কোম্পানীর অম্বিকাচরণ রায় মহাশয় এবং চুলের কাটা তৈরীতে স্বর্গীয় অবনীনাথ মিত্র প্রমুখ পথিকৃৎবর্গ। এঁদের মধ্যে অনেকেই আবার ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের শিষ্য। বাঙালীকে শিল্পায়নে পরিচালিত করার জন্য আচার্যদেব তখন উদাত্তস্বরে তাঁর আহ্বান, তাঁর ভর্ৎসনা এবং তাঁর সাবধান-বাণী প্রচার করে চলেছেন।

খগেন্দ্রচন্দ্র এই ষোলো জনের অন্যতম। তিনি ১৯০৬ সালে জাপান যান। উল্লেখ-যোগ্য বিষয় এই যে, এই দলের বাইরের একজন, কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথও নাকি একই জাহাজে খগেন্দ্রচন্দ্রের সহযাত্রী হন।

রথীন্দ্রনাথ যাচ্ছিলেন কৃষিবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের জন্য আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পুত্র স্বর্গীয় সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। এঁরা দু'জনেই ইলিনয়-এর স্নাতক হয়ে দেশে ফিরেছিলেন।

খগেন্দ্রচন্দ্র দাশ জাপান থেকে আমেরিকা যান উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে এবং ১৯১০ সালে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে

থেকে কেমিস্ট্রিতে বি-এস-সি হন। কিছু দিন আমেরিকারই এক বড়ো কারখানাতে রাসায়নিকের কাজ করার পর দেশে ফিরে খগেনবাবু শিবপুর বি-ই কলেজে কেমিস্ট্রির অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

কিন্তু সে কাজ তাঁর বেশী দিন করা হল না। ১৯১৪ সালে ** 'কোমাগাটা মারু'-র ব্যাপারে খগেন্দ্রচন্দ্র ও তাঁর সুহৃৎ 'বেংগল ওয়াটারপ্রুফ' কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় সুরেন্দ্রমোহন বসু গ্রেপ্তার হলেন। কিছু দিন পরে তাঁরা ছাড়া পেলেন বটে, কিন্তু সরকারের চাপে খগেনবাবু সরকারী চাকরি ছাড়তে বাধ্য হলেন।

অধ্যাপক বীরেন মৈত্র বি ই কলেজের কাজ আগেই ছেড়েছিলেন; রাজেন্দ্রনাথও ১৯১৫-তে শিবপুরের কাজ ছেড়ে আলিপুর 'গভর্নমেণ্ট টেস্ট হাউস'-এ কেমিস্ট্রি বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করছিলেন। এটা হলো তাঁর ১৯১৮ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্তির আগের কথা। প্রসংগক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯১৮ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার পর রাজেন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষতা করেন। দু বছর পরে ১৯৩৪ সালে রিটায়ার করে ক্যালকাটা কেমিক্যালের পরিচালনায় সক্রিয় অংশ নেন। দুর্ভাগ্যবশত ১৯৩৬-এ তাঁর মৃত্যু হয়।

তখন ইওরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। বীরেনবাবু কিছু একটা করবেন বলে নানা জায়গায় যাতায়াত করছিলেন। কোনো কাজে এক দিন শেয়ালদায় ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীর ডিপোতে গিয়ে দেখলেন যে, সেখানকার প্রশস্ত প্রাংগণে গ্যাস তৈরীর উপাদানের 'স্পেণ্ট অক্সাইডের' পর্বতপ্রমাণ স্তূপ অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকে। রাসায়নিক বীরেন্দ্রনাথের খেয়াল হলো যে, এই দগ্ধাবশেষ থেকে Yellow Prussiate of Potash নামে যে পদার্থটি উপপণ্যরূপে নির্গত হয় ইস্পাত টেম্পারিং-এর পক্ষে সেটি আবশ্যিক। অথচ গ্যাস কোম্পানী তার সদ্ব্যবহার করে না।

খবরটি নিয়ে বীরেন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু ও ভ্রাতৃপ্রতিম খগেন্দ্রচন্দ্রের সংগে পরামর্শ করলেন। দুজনে মিলে গ্যাস কোম্পানীর সংগে এক চুক্তি করে সেই পাশের গাদা কিনে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 'ইয়েলো প্রুশিয়েট'-এ পরিণত করে ইওরোপে চালান দেওয়া শুরু করলেন। বছর দুয়েকের মধ্যে সেই রপ্তানি দাঁড়ালো কয়েক লক্ষ টাকায়। তাতে অবশ্য লাভ যে বেশী হতো তা নয়, কারণ, নতুন ব্যবসায়ীদের নানারকম অসুবিধে ছিল।

১৯১৬ সালে রাজেন্দ্রনাথও এঁদের দুজনের সংগে যোগ দিলেন, কিন্তু আগেই বলেছি যে, সরকারী চাকুরে বলে সক্রিয় অংশীদার হতে পারলেন না।

প্রতিষ্ঠানের নাম হলো ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং প্রাইভেট লিমিটেড। প্রত্যেকে ৩০০০ টাকা করে দিয়ে মোট ৯০০০ টাকা মূলধনে তিন বন্ধুর সমস্বামিত্বে প্রতিষ্ঠানের জন্ম হলো। কারখানা স্থাপনায় আয়োজন হলো পণ্ডিতিয়া রোডে।

ঝোপঝাড় আর খানাডোবার জন্য বালিগঞ্জের পণ্ডিতিয়া অঞ্চলে তখন সূর্যাস্তের পরেই শেয়াল ডাকতো। মোটা মোটা বিষাক্ত সাপেরও বাস ছিল। মাঝে মাঝে নাকি সুন্দরবনের দক্ষিণ রায়ের চেলা-

---

** গত শতাব্দী থেকেই বেশ কয়েক হাজার কষ্টসহিষ্ণু উদ্যোগী শিখের কর্মক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার কৃষিপ্রধান পশ্চিমাঞ্চল। স্থানীয় লোকের চাইতে এঁরা কম মাইনেতে শ্রমিকের কাজ করতেন বলে শ্বেতকায় শ্রমিকরা পদে পদে এঁদের ওপর অত্যাচার করতেন। এমন কি একটি আইনও পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন যে, বিদেশী শ্রমিকরা স্বদেশ থেকে জাহাজে করে পথে কোনো বন্দরে না নেমে সরাসরি আমেরিকা বা কানাডাতে জাহাজ ভেড়ালে তাঁদের প্রবেশ করতে দেওয়া হবে; অন্যথায় নয়। ভারতীয়দের নিজস্ব কোনো জাহাজ ছিল না বলেই বোধ হয় এই আইন হলো। সেই সময়ে হরদয়াল জী নামে পাঞ্জাবের এক বিপ্লবী সে দেশে গিয়ে উপস্থিত হন এবং তাঁর সম্পাদনায় 'গদর' (বিদ্রোহ) এক পত্রিকার হিন্দী ও উর্দু দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হতে থাকে। প্রায় একই সময়ে বাবা গুরুদিৎ সিং নামে এক শিখ নেতা 'কোমাগাটামারু' নামে পুরো একটি জাপানী জাহাজ ভাড়া করে বিরাট একদল শিখ শ্রমিক নিয়ে হংকং থেকে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলাভিমুখে যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য, স্থানীয় আইন বাঁচিয়ে সে দেশে প্রবেশ করা এবং কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করা। কিন্তু এত করা সত্ত্বেও কানাডা বা আমেরিকার কোনো বন্দরে নামতে দেওয়া হলো না। জাহাজ সকলকে নিয়ে ভারতে ফিরে এলো এবং ১৯১৪ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর কলকাতার বজবজে উপনীত হলো। বাবা গুরুদিৎ সিংয়ের এই দলেরও নাম হয়েছিল 'গদর পার্টি'। পাঞ্জাবের শিখ বিপ্লবীরা বাঙলার বিপ্লবীদের সংগে যাতে যোগাযোগ না করতে পারেন সেই জন্যে ইংরেজ সরকার এই দলের কলকাতায় এসে পৌঁছবার আগেই পুরো একটি ট্রেন মজুত রাখলেন, আর 'কোমাগাটামারু' কলকাতায় পৌঁছুতেই দলনেতাদের বলা হলো যে সেই ট্রেনে করে দলবল নিয়ে তাঁরা সোজা পাঞ্জাব ফিরে যান। এই সব নিয়ে পুলিসের সংগে 'গদর পার্টি'-র মহা হা-গামা হয়ে ১৮জন শিখ এবং কিছু পুলিসের প্রাণহানি হলো। সুরেন্দ্রমোহন, খগেন্দ্রচন্দ্র এবং কলকাতার অন্যান্য বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিকরা 'কোমাগাটামারু'র যাত্রীদের সাহায্য করতে এগিয়ে যাওয়াতেই তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

ছেলেটির যেমনি কথা ফুটল অমনি সে বললে, 'গল্প বলো'। দিদিমা বলতে শুরু করলেন, 'এক রাজপুত্তুর——গুরুমশায় হেঁকে বললেন, 'তিন-চারে বারো'। দিদিমা গুরুমশায়ের গতিক দেখে চুপ। কিন্তু আপদ বিদায় হতে চায়না, এক যায় তো আর আসে। কথক এসে আসন জুড়ে বসলেন। তিনি শুরু করে দিলেন এক রাজপুত্রের বনবাসের কথা। যখন রাক্ষসীর নাক কাটা চলেছে তখন হিতৈষী বললেন, 'ইতিহাসে এর কোনো প্রমাণ নেই; যার প্রমাণ পথে ঘাটে সে হচ্ছে, তিন-চারে বারো।'

ততক্ষণে হনুমান লাফ দিয়েছে আকাশে, অত ঊর্ধ্বে ইতিহাস তার সংগে কিছুতেই পাল্লা দিতে পারে না। পাঠশালা থেকে ইস্কুলে, ইস্কুল থেকে কলেজে ছেলের মনকে পুটপাকে শোধন করা চলতে লাগল। কিন্তু যতই চোলাই করা যাক, ওই কথাটুকু কিছুতেই মরতে চায় না 'গল্প বলো।'

॥ রবীন্দ্রনাথ ॥

আদুর্ভোরা দু চার মাইলের মধ্যে এসে ঘোরাফেরা করে তাদের চতুষ্পদের ধুলো দিয়ে যেতেন। হাজরা রোডই বলতে গেলে কলকাতার দক্ষিণ প্রান্ত ছিল, যদিও কালি-ঘাটের দিকটা আরও একটু ঠেলে এগিয়ে গিয়েছিল।

বীরেন্দ্রনাথের এক পরিচিত ভদ্রলোকের পণ্ডিতিয়াতে পাঁচ বিঘা জমির ওপর এক বাগানবাড়ি ছিল। মাসিক ৫০ টাকা ভাড়ায় পাঁচ বছরের লীজে ৩৫ নং পণ্ডিতিয়া রোডের সেই বাড়িটাই ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর জন্য নেওয়া হলো। শেষ পর্যন্ত কতদূর কি হয়ে ওঠে সেই ভয়ে প্রতিষ্ঠাতারা বেশী দিনের লীজ নিতে সাহস পেলেন না।

বিক্রির দিকটা ধরলে আজকের ক্যালকাটা কেমিক্যাল মুখ্যত সাবান ও প্রসাধন পণ্যের উৎপাদক। ১৯৬৭ সালের ২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার মধ্যে ২ কোটি ৮ লক্ষই হলো সাবান ও প্রসাধনীর বিক্রি। কিন্তু সেই ১৯১৬ সালে সেটা একেবারেই কেমিক্যাল ফ্যাক্টরী ছিল। তার প্রথম যুগের কার্যক্রম পোটাশিয়াম ও সোডিয়াম সাইট্রেট এবং ল্যাকটিক, স্টিয়ারিক, ওলেইক প্রভৃতি অ্যাসিডের উৎপাদনেই সীমিত ছিল।

বাজারে এইসব কেমিক্যালের প্রচুর চাহিদা ছিল এবং তিন কেমিস্ট্রি অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে উৎপন্ন ক্যালকাটা কেমিক্যালের উৎকৃষ্ট অ্যাসিড ও কেমিক্যাল বাজারে পৌঁছতে না পৌঁছতেই বিক্রি হয়ে যেতো। চাহিদার ক্ষুদ্রতম অংশও সরবরাহ করা কঠিন হয়ে উঠলো। এর মধ্যে আবার কয়েকটি কেমিক্যাল নাকি ভারতবর্ষে প্রথম তৈরি হয়েছিল ক্যালকাটা কেমিক্যালেই।

চার বছরে তিন মালিকের যতোটা লাভ হলো তার সামান্য ভাগ নিজেরা রেখে বাকীটা কোম্পানীতে পুনর্নিয়োগ করে ৯০০০ টাকার মূলধন ৫০০০০ টাকায় দাঁড়ালো। কিন্তু যথেষ্ট সম্প্রসারণের পক্ষে সে টাকাও অপ্রতুল হলো। তাই কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন যে মূলধন বৃদ্ধির জন্যে কোম্পানীকে পাবলিক লিমিটেড করে বাজারে আরও শেয়ার বেচবেন।

১৯২০ সালে ক্যালকাটা কেমিক্যাল লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত হলো। ম্যানেজিং এজেন্টস্ হলেন 'সেন দাশ মৈত্র' কোম্পানী। রাজেন্দ্রনাথের স্থানে তাঁর স্ত্রী শ্রীযুক্তা সুজাতা সেন এই ম্যানেজিং এজেন্সির পার্টনার হলেন।

কর্তারা প্রথমেই যে কাজটি করে জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন তা হলো, যথার্থ রাসায়নিক পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা উচ্চ-মানের কেমিক্যাল উৎপাদনের জন্য প্রতিষ্ঠানের সেই ক্ষুদ্রাবস্থাতেই প্রচুর সাজসরঞ্জাম সংবলিত একটি ল্যাবোরেটারির স্থাপনা করা। সেই গবেষণাগারে একের পর আর এক রিসার্চ চললো। চরকসংহিতায় উল্লেখিত আয়ুর্বেদীয় সর্পগন্ধা লতা অর্থাৎ রাজসিক রোগ ব্লাড-প্রেসার বা হাইপার-টেনশনের অমোঘ ঔষধ Rawolfia Serpentina এবং উত্তরকালে K-Salt নিয়ে এঁদের গবেষণার ফল আপনারা অনেকেই আজ পাচ্ছেন।

কিন্তু ক্যালকাটা কেমিক্যালকে যে বস্তুটি বিশ্ববিখ্যাত করেছে তা হলো নিমের তেল থেকে প্রস্তুত 'মার্গো' সোপ ও 'নিম' টুথপেস্ট। খাঁটি নিমের তেলের দুর্গন্ধ প্রায় ন্যাশানাল ট্যানারির ভেজিটেবল্ ট্যানিং বা ছালপাকাইয়ের গন্ধের সমান। সে গন্ধে আপনার আমার বমি আসবে। সে গন্ধের উৎস হলো নিমের ফল ছেঁচা তেলের গন্ধ।

অথচ নিমফুলের গন্ধ কী মধুর।

'শাপমোচনে' রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'কমলিকার অন্ধকার ঘরে এতদিন নিম-ফুলের গন্ধ অনির্বচনীয়ের আমন্ত্রণ নিয়ে এসেছিল।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল উগ্রগন্ধী নিমতেলকে সুপ্রেয় করে তুললেন। এখনকার

কথা জানি না, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো দেশের রাসায়নিকরাই এই কাজে সফল হতে পারেন নি।

এই দারুণ রাসায়নিক ঘটনাটি ঘটলো রাজেন্দ্রনাথ এবং তাঁর শ্যালক কর্নেল করুণাকুমার চ্যাটার্জির গবেষণার ফলে; নিমতেলকে তাঁরা দুর্গন্ধমুক্ত করলেন। পদবী থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, করুণা-কুমার রাজেন্দ্রনাথের মতোই সরকারী কর্মচারী ছিলেন। আত্মীয়তা ও বন্ধুতা-সূত্রে তিনি ক্যালকাটা কেমিক্যালের কর্তৃপক্ষকে এইভাবে সাহায্য করতেন। খগেন্দ্রচন্দ্র ও বীরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন বলেই সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর বছর কয়েক আগে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত করুণাকুমার ক্যালকাটা কেমি-ক্যালের ওষুধ তৈরীর ব্যাপারে উপদেষ্টা-রূপে কাজ করে গেছেন।

ক্যালকাটা কেমিক্যালের পরিচ্ছন্ন এয়ার-কণ্ডিশনড্ ল্যাবোরেটরিটি দেখবার মতো। দামী দামী ইম্‌পোর্টেড যন্ত্রে ওষুধপত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষা ও প্রস্তুতি চলেছে। কেমিক্যাল ল্যাবেরেটরির কার্যক্রম কিছুটা বুঝতে পারলাম; কিন্তু অদ্ভুত লাগলো এঁদের ইলেকট্রনিক যন্ত্রসংবলিত 'ফিজিক্যাল ল্যাবোরেটরিটি' দেখে।

ওষুধ তৈরীতে কেমিক্যাল পরীক্ষা ছাড়াও যে সপ্তাশ্ববাহন সূর্যের সহায়তা প্রয়োজন তা আমার একেবারেই জানা ছিল না। অনেকের মধ্যে একটি যন্ত্র, দাম নাকি তার ৫০০০০ টাকা—সেই যন্ত্রে বেগুনি-পার (Ultra Violet) ও লাল-উজানি (Infra Red) আলোয় ওষুধের উপাদান পরীক্ষা করে তার গুণাগুণ সম্বন্ধে সর্বশেষ রায় দেবার পর সেই ওষুধ বাজারে ছাড়া হয়। 'কোয়ালিটি কণ্ট্রোল'-এর এই উচ্চমার্গের পদ্ধতিটি আমি বুঝলাম না, তবে এটুকু আমার মাথায় ঢুকলো যে, উৎপাদনের আধুনিকতার জন্যেই ক্যালকাটা কেমিক্যাল দিনে দিনে এত এগিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু 'ফাইন কেমিক্যাল' ওষুধ, গ্লিসারিন, অথবা এঁদের বহুবিধ জীবাণু-নাশক দ্রব্যের কথা কম করে বলে আমি ক্যালকাটা কেমিক্যালের প্রসাধনীর কথাই বেশী করে বলবো। কারণ, এই প্রতিষ্ঠানকে আমি ঠিক 'ফার্মাসিউটিক্যাল' শ্রেণীতে ফেলছি না।

তিলজলার ২ নম্বর কারখানা। এর স্থাপনা হয়েছিল ১৯৩৮ সালে। ততোদিনে বোধ হয় হেড অফিস ও ১ নম্বর ফ্যাক্টরীর পণ্ডিতিয়ার জমি ও বাড়িটিও কোম্পানী থেকে কিনে নেওয়া হয়েছে। দু' নম্বর ফ্যাক্টরী বসাবার সময়ে জমি কম ছিল; এখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 'শেড' এবং তিন চারটে নতুন বৃহৎ অট্টালিকা সহ জমির আয়তন হয়েছে ১০ বিঘা। পণ্ডিতিয়া রোডের ফ্যাক্টরীটি বালিগঞ্জের সবাই চেনে। আকাশ-চুম্বী বিরাট সৌধটি গৃহস্থ পাড়ার মধ্যেই অবস্থিত এবং বহুদূরে থেকে তার চিমনির ধোঁয়া দেখা যায়।

সেদিন তিলজলার কারখানাতে মার্গো-সোপ, রেণুকা পাউডার, আর মাথার তেলের মধ্যে ব্রাহ্মী আমলা, কোকোনল, কুন্তলীন প্রভৃতির প্রস্তুতি পর্ব আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন এই প্রতিষ্ঠানের খ্যাতনামা প্রচার সচিব শ্রীশ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় এবং কোম্পানীর প্রাচীনতম কর্মীদের অন্যতম, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীধূর্জটি-প্রসাদ ভট্টাচার্য। প্রকাণ্ড ব্যাপার। দোতলার সমান উঁচু এক একটি দানবীয় কেট্‌লিতে এঁদের সুবিখ্যাত নিম সাবানের শত শত মণ উপাদান একসঙ্গে তৈরী হচ্ছে। বেশ দুর্গন্ধ। পাশেই মহাভৃঙ্গরাজ লতার স্তূপ। তাতেও দুর্গন্ধ। এইসব কড়া গন্ধকে সুরভিত করা কৃতিত্বের কাজ বইকি—মূলত অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ সেনেরই কৃতিত্ব বলে বীরেন মৈত্র মশায় আমাকে বলেছিলেন।

কিছু দূরে নতুন চারতলা বাড়িগুলিতে তৈরী হচ্ছে রমনী মনোরঞ্জন সব প্রসাধন সামগ্রী। পুরুষের ব্যবহার্য জিনিসও অনেক আছে বটে, কিন্তু আবহমান কাল থেকে অঙ্গরাগ হলো নারীরই জন্মগত অধিকার; পুরুষ সেখানে গৌণ (অবশ্য রাজারাজড়া-দের বাদ দিয়ে।)

প্রসাধনের ইতিহাস কে না-জানে! আদিমানব, আমাদের দেশের হরাপ্পা-মহেঞ্জোদারোর অধিবাসী, মিশরের রানী নেফারতিতি ও ক্লিওপ্যাট্রা, চীনের প্রাচীন-তম Hsia রাজবংশ (অবশ্য চীনের নারীদের প্রসাধনে কাঁচা ডিমের স্থান খুব আদরের), রোমক নারীকুল, মুঘল হারেম প্রভৃতির অঙ্গসজ্জার উপাখ্যান থেকে শুরু করে ফরাসী পম্পেসার ও প্রসাধনী-প্রিয় নর-নারীর রূপচর্চার বিষয় নিয়ে আপনার আমার কিশোরী কন্যাও কয়েক পাতার প্রবন্ধ লিখে ফেলতে পারে। (আমার এক কন্যার প্রবন্ধ already ছেপে প্রকাশিত হয়ে গেছে বহু দিন আগে; ক্যালকাটা কেমিক্যালের লিটারেচার নাড়াচাড়া করে নিলে আপনার কন্যা পুরো একটা বই লিখে ফেলতে পারবে।)

তবুও কালিদাসের কালের মল্লালিকা চিত্রলেখা মঞ্জুলিকা মঞ্জরিণীদের অঙ্গরাগের বর্ণনার সেই অপরূপ ছন্দোবন্ধ লিটারেচার-এর লাইন কটি দিয়ে ইতিহাসের পালা শেষ করি—

অলক সাজত কুন্দফুলে, শিরীষ পরত কর্ণমূলে
মেখলাতে দুলিয়ে দিত নবনীপের মালা।
ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে ধূপের ধোঁয়া দিত কেশে,
লোধ্রফুলের শুভ্র রেণু মাখত মুখে বালা।
কালাগুরুর গুরু গন্ধ লেগে থাকত সাজে,
কুরুবকের পরত মালা কালো কেশের মাঝে॥

এর পরে 'কুমারসম্ভবের' পত্রলেখার [illegible] রইত ঢাকা' দিয়ে যে শব্দকটি আছে সেটাও এখানে টেনে আনলে লেখাটা বড়ো হয়ে পড়বে। থাক গিয়ে সেটা।

'ঋতুসংহার' আর 'কুমারসম্ভব' থেকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেকালের সুন্দরীদের অঙ্গরাগের এই ছবিটি এঁকেছেন বলেই শুনেছিলাম। কাব্যে অজ্ঞতার জন্যে আমি ঋতুসংহার ও কুমারসম্ভবের উল্লেখের পারম্পর্যে যদি ভুল করে থাকি তো অনবধানতার জন্যে আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন।

আজ আমি শুধু আফসোস করে মরছি যে, বিশ্বকর্মার কাজটা যদি আমি

যৌবনকালে পেতাম তাহলে শ্রীহরিবাবুর সোজনো আমার কত লাভ হতো! নবোঢ়া কিশোরী বধূকে আনন্দিত করার—তাঁর দন্তরুচির কৌমুদীর ছটায় আমার দৃষ্টি সার্থক করার; আর স্নো-ক্রীম, পাউডার, শ্যাম্পু-ল্যাভেণ্ডার, ও-ডি-কলোন ও পুষ্প-সার দিয়ে তাঁর দেহবল্লরী সুরভিত করার সবকিছুই এক জায়গায় হাত বাড়িয়ে পেয়ে যেতাম। তিনি খুশি মনে থাকলে ক্যান্থারল বা ক্যাস্টরল, আর রুষ্ট হলে ভৃঙ্গরাজ তেল মাখতেন মাথায়। সারা বাড়িটা গন্ধবিধুর হয়ে থাকতো।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল এয়োতীর সিঁথির ও ঠোঁটের সিঁদুর ছাড়া আর সবই তৈরি করেন কিনা!

১৯৫৯ সালে মাদ্রাজের কোডাম্বকম্ অঞ্চলে এই প্রতিষ্ঠানের তিন নম্বর কারখানা স্থাপিত হলো। দক্ষিণ দেশে চুলের তেল, ট্যালকম্ পাউডার, ফিনাইল প্রভৃতি জিনিসের প্রচুর চাহিদার জন্যেই এই সম্প্রসারণ জরুরী হয়ে পড়েছিল।

ভারতবর্ষে এখন ক্যালকাটা কেমি-ক্যালের নিজস্ব শাখা অফিসের সংখ্যা সতেরো। সিঙ্গাপুরেও একজন বাঙালী প্রতিনিধি আছেন। এছাড়াও এজেন্সী দেওয়া আছে নানা জায়গায়।

জলজঙ্গলে ভরা পণ্ডিতিয়া রোডের সেই ছোট্ট প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বিক্রি এখন প্রায় তিন কোটি টাকার। ক্রমোন্নতির একটি পরিসংখ্যান নীচে লিপিবদ্ধ করছি।

সাল	বিক্রি	ডিভিডেণ্ড
১৯২২	১,৪৭,০০০ টাকা	৬ পারসেণ্ট
১৯৩২	২,৮৪,০০০ „	ঐ
১৯৪১	১২,৯২,০০০ „	৯ „
১৯৬৪	২,৩৫,২৩,০০০ „	১৮ „
১৯৬৭	২,৭৯,৩৩,০০০ „	১৮ „

কোম্পানীর বর্তমান পেড-আপ ক্যাপিট্যাল ২০,২১,০০০ টাকা এবং রিজার্ভ ফাণ্ড ৪৬,২৩,০০০ টাকা।

একটি কৌতূহলোদ্দীপক কথা শুনলাম। এত যে মন্দা আর সংকট গেল তা সত্ত্বেও এই প্রতিষ্ঠানের প্রসাধন দ্রব্যের বিক্রি বছরে বছরে বেশ বেড়ে গেছে। দেশময় অভাব আর অভাব, অথচ মানুষের অঙ্গরাগে স্পৃহার অভাব নেই।

সহ-প্রচারসচিব শ্রীরণজিৎ সিংহের টেবিলে বসে তথ্যসংগ্রহ-কালে টিফিনের সময় হলো। জলখাবারের প্লেট আমার জন্যেও এলো—একটি বড়ো সাইজের মর্তমান কলা, বিস্কুট বেশ কয়েকটি, দুটি প্রমাণ সাইজের মিষ্টি ইত্যাদি। ভাবলাম, এসব হচ্ছে আতিথেয়তার নিদর্শন। 'এত কেন' বলাতে রণজিৎবাবু বললেন যে, এই খাবার ক্যালকাটা কেমিক্যালের ছোট বড়ো প্রত্যেক কর্মীর দৈনিক বরাদ্দ; বিকল্পে ডালভাত, মাছতরকারি এবং দুধের ব্যবস্থাও আছে ওপরের খাবার ঘরে। আগে জানতাম যে, বড়ো বড়ো মার্চেণ্ট অফিসের ভাগ্যবান অফিসাররাই কেবল ফ্রী লাঞ্চ আর ফ্রী হুইস্কি, এইসব পেয়ে থাকেন। আহার্যের বিষয়ে ক্যালকাটা কেমিক্যালে মানুষ এবং তার শ্রমেরই মূল্য দেওয়া হয়, পদের নয়। কোম্পানী নাকি বাৎসরিক নীট লাভের ৫০/৫৫ পারসেণ্ট এইভাবে কর্মীদের হিতের জন্য ব্যয় করে আসছেন বহুকাল ধরে।

ছিদ্রান্বেষীরা সম্ভবত বললেন, এ হচ্ছে সরকারকে ট্যাক্স কম দিয়ে খরচ করে ফেলার ব্যবস্থা। তা যদি হয়-ও, সেটা করেন ক'জন শিল্পপতি? পাকেপ্রকারে অনেকেই তো অন্য খাতে ঢুকিয়ে ফেলেন বলেই তো শুনি।

ক্যালকাটা কেমিক্যালের কর্মীদের স্টেট ইনসিওরেন্স'-এ চিকিৎসা এবং ওষুধপত্রের বাধ্যতামূলক সুবিধা দেওয়া ছাড়াও পৃথক-ভাবে 'মেডিক্যাল বেনিফিট'-এর ব্যবস্থা আছে। কর্মীদের সন্তানসন্ততির বিদ্যা-শিক্ষার জন্যেও সাহায্য ভাণ্ডার আছে। আর এক অভিনব ব্যবস্থা আছে। তা হলো, বছরে একবার, পুজোর আগে লটারি করে যাঁরা জেতেন তাঁদের দেশভ্রমণ ও পাথেয় খরচের জন্যে সাহায্য।

ক্যালকাটা কেমিক্যালে এয়ার-কণ্ডিশনিং আছে, কিন্তু সেটা লাগে ওষুধ তৈরির ঘরে আর গবেষণাগারে—কর্তাদের আরামের জন্য নয়।

এখানে চেম্বার আছে, দরজাও আছে; কিন্তু সেই দরজা হাট করে খোলাই থাকে অধিকাংশ সময়ে—কারও পক্ষে কর্তাব্যক্তি-দের সেসব ঘর দুষ্প্রবেশ্য নয়। সকলেই কাজে ব্যস্ত, তাই কাজ ছাড়া কোনো কর্মী

কর্তাদের খোলা দরজার সুযোগ নিয়ে উৎপাত করেন বলে মনে হলো না।

কেবল দেখলাম পিতামহ স্থানীয় বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র মশায়ের আদিকালের পুরনো বার্নিশ ওঠা কাঠের দরজার হাফ-পাল্লা কখনো সখনো বন্ধ থাকে। বৃদ্ধের প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রমের নিদর্শন বলে মনে হলো। সেই ঘরে খোলা জানলার সামনে গায়ে গায়ে ঘেঁসাঘেঁসি করে দু'জোড়া টেবিল চেয়ার পাতা। একটিতে বীরেন্দ্রনাথ বসছিলেন, আর একটি খালি—খগেন্দ্রচন্দ্র এই সেদিনও সেই শূণ্য আসন পূর্ণ করে বসতেন। পঞ্চাশ বছর দু'জনে একসঙ্গে পাশাপাশি বসে কাজ করার পর বীরেনবাবু এত লোকের মধ্যে থেকেও আজ একলা।

খোলা দরওয়াজা হলো এই প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য। এখানকার সহস্র কর্মীর প্রাণ কর্তাদের সঙ্গে যেন একই সূত্রে বাঁধা হয়ে রয়েছে এই খোলামেলার জন্যেই। কর্তারা সহজ মানুষ—বৈষ্ণবী বিনয়ও নেই আর দম্ভও নেই।

এখানে কখনো স্ট্রাইক বা লক-আউট হয় না।

অনেক জায়গায় ঘুরে আমার এই প্রত্যয় হয়েছে যে, বাঙালী প্রতিষ্ঠানে ঠাট-এর আধিক্য কমিয়ে দেওয়া উচিত, যদি-না আমাদের কর্তারা তাঁদের কর্মীদের সকলকেও মোটামুটি একই পর্যায়ে সেই সুযোগ সুবিধা দিতে পারেন। অবশ্য নিজেদের মধ্যে গোপন বাণিজ্যিক আলাপ আলোচনা এবং মান্য বিদেশী অতিথিকে আদর আপ্যায়নের জন্য, ক্রেতাকে খাতির করার জন্যেও, এয়ারকণ্ডিশনিং বা প্লাশ কার্পেটে মোড়া ঘর রাখা এযুগে আবশ্যক; আর আবশ্যক ব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানে, যেখানে মস্তিষ্কের ব্যবহারই বেশী, গোপনীয়তা রক্ষা করা তো আছেই।

এ কথায় অনেকে হয়তো আমাকে আধুনিকতা-বিরোধী মান্ধাতার আমলের লোক বলে মনে করবেন, কিন্ত ক্যালকাটা কেমিক্যাল এবং অন্য দু' চারটে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধের মাধুর্য দেখে আমার খুবই মনে হচ্ছে শ্রমিক সমস্যা সংকুল বাংলাদেশের বাঙালী শিল্পপতি ও বণিকশ্রেষ্ঠদের উচিত অন্তর থেকে কর্মীদের সান্নিধ্যে এগিয়ে আসা। বাহ্যিক আচারের দ্বারাও সেই আন্তরিকতা ফুটিয়ে তোলা বোধহয় খুবই দরকার। বাস্তবের দিকে লক্ষ রেখেই কথাগুলি বললাম, কেউ যেন একে অযাচিত উপদেশ বলে মনে না করেন, এটাই আমার অনুরোধ। আমাদের রোদে-পোড়া আর জলে-ভেজা প্রতিষ্ঠাতা পথিকৃৎ-দের উদাহরণ সব সময়ে আমাদের মনে উজ্জ্বল থাকা উচিত বলেই মনে হয়।

আলুথালু চুল আর আধময়লা খদ্দরের ধুতীপাঞ্জাবী পরা খগেন্দ্রচন্দ্রের অনুজ শ্রীজগদীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ডিরেক্টর এবং 'কমিটি অব ম্যানেজমেণ্ট'-এর চেয়ারম্যান। ১৯২৬-এ সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি এস-সি (অনার্স) পাস করে সাধারণ কর্মচারী হিসেবে ১৯২৭ সালে ক্যালকাটা কেমিক্যালে ঢোকেন। ক্রমিক পদোন্নতির পর এখন বাষট্টি বছর বয়সে তাঁর স্থান বীরেন্দ্রনাথের পরেই। ত্রয়ী প্রতিষ্ঠাতার পরেই জগদীশচন্দ্রের নাম উল্লেখ্য।

বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় এখন ডিরেক্টর বোর্ড থেকে অবসর নিয়ে উপদেষ্টারূপে দিনে ঘণ্টা দুই পুরনো ঘরটিতে এসে বসেন। তিনি বিশ-পঁচিশটি সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং সঙ্ঘের সঙ্গে জড়িত এবং বর্তমানে 'ইনস্টিটিউশন অব কেমিস্টস'-এর সভাপতি।

আর জগদীশচন্দ্রও দেশী ও বিদেশী ১৪/১৫টি সংস্থা ও সঙ্ঘে আছেন। ইনি এখন 'ইণ্ডিয়ান সোপ অ্যাণ্ড টয়লেট্রিজ মেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের'-ও সভাপতি।

তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা আমার প্রথমেই বলা উচিত ছিল। বাঙালীর শিল্প ও বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান সহায়ক, ভূতপূর্ব কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ইউনাইটেড ব্যাংকের ডিরেক্টর, ডক্টর শান্তিভূষণ দত্ত, এম-এ, পি-এইচ-ডি, ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল', মহাশয়ের বিশদ পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। তিনি গত কয়েক বছর থেকে ক্যালকাটা কেমিক্যালের বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের চেয়ারম্যান। বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রাক্তন প্রধানপুরুষ শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন এবং প্রখ্যাত এঞ্জিনীয়ার শ্রীসুরেন্দ্রকুমার গুহ মহাশয়-ও এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর।

খগেন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যু এবং বীরেন্দ্রনাথের অবসর গ্রহণের পর এখন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার বিভিন্ন দায়িত্ব 'কমিটি অব ম্যানেজমেণ্ট'-এর মাধ্যমে যাঁদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে জগদীশচন্দ্র ছাড়াও জনে জনে বাকি পাঁচজনের সঙ্গে দেখা হলো।

সবাই কর্মব্যস্ত; সকলেরই টেবিলে স্তূপীকৃত কাগজপত্র আর সামনের চেয়ারে অভ্যাগতের ভীড়। এঁরা 'কমিটি'-তে ছাড়াও বোর্ড অব ডিরেক্টর্সেও প্রত্যেকেই আছেন। কেউ ক্রয়, কেউ উৎপাদন আর কেউ বিক্রয়ের দায়িত্ব নিয়ে আছেন। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মৈত্র এখানে বহুকাল ধরে আছেন; তিনি উৎপাদন প্রভৃতি বিভিন্ন কাজের তত্ত্বাবধান করেন। শ্রীসমরেন্দ্র দাশগুপ্ত খগেন্দ্রচন্দ্রের একমাত্র পুত্র। তিনি সেলস-এর বিষয়েই প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। রাজেন্দ্রনাথের পুত্র শ্রীসুবোধেন্দ্রনাথ সেন 'পারচেজ'-এর প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। বীরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মৈত্রের প্রধান দায়িত্ব হলো উৎপাদনের উৎকর্ষ সাধন। আর আছেন কোম্পানীর সেক্রেটারি অন্যতম প্রাচীন কর্মী শ্রীসুধীরকুমার বসু। ইনি ক্যালকাটা কেমিক্যালে সাতাশ বছর ধরে কাজ করছেন।

রাজেনবাবু এবং সুধীরবাবুও খদ্দরের ধুতীপাঞ্জাবী পরিহিত, তবে জগদীশবাবুর মতো দিন দশেক আগের পাটভাঙা ময়লা মোটা খদ্দর নয়, একটু মিহি আর ধোপ-দুরস্ত।

আর এই জাতীয় পণ্য, উপপণ্যের বিক্রয়ে যে প্রচারকার্য আবশ্যক তার তত্ত্বাবধানে আছেন শ্রীহরিবাবু। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, বিজ্ঞাপন ও ফটোগ্রাফি জগতে সুপরিচিত এই মার্জিত-রুচি মধ্যবয়সী ভদ্রলোক ১৯৪৭ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানের প্রচার বিভাগে আছেন।

ত্রিধারার মিলিত জলস্রোত আয়তনে বর্ধমান, গতিতে দ্রুত, জলোচ্ছ্বাসে প্রবল, সাগরের মোহনা যেন অদূরে—ব্যক্তির বিষয়ে যেমন যায়, তেমনি কোনো প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিও যদি কল্পনায় আঁকা যেত তবে এইটাই যেন ক্যালকাটা কেমিক্যালের ইমেজ হতো।

বিশ্বকর্মা

আয়োজন নিজেদের [illegible] চাপানো ঠিক হয় নি"

আলোয় কালোয়

ত্রিশঙ্কু

সেদিন মনোজকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। কোন্ পত্রিকায় যেন ওর লেখার বিরূপ সমালোচনা বেরিয়েছে। ওর ধারণা, তথাকথিত বন্ধুদের কেউ আক্রোশ-বশত ছদ্মনামে লিখেছে সেই সমালোচনা। এই রকম ঘটনা হামেশাই ঘটে, কিন্তু সেদিন সন্ধ্যেবেলা যেন ওকে সামলানো যাচ্ছিল না। ও এর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর।

—চলো, কোথাও গিয়ে একটু বসা যাক। আমি বললাম। মন-খারাপের ওষুধ দু পাত্র খেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। এত অল্পে কাতর হলে চলে?

অথচ এমন দুর্ভাগ্য, দুজনের পকেট হাতড়ে গোটা পনেরো টাকার বেশি পাওয়া গেল না। তাতেই যা হয় হবে; মনোজ একটু সৌখিন প্রকৃতির ছেলে—বাজে লোকেদের ভিড়ে না গিয়ে কোনো ঠাণ্ডা জায়গায় বসা স্থির হল।

যে টেবিলে জায়গা পাওয়া গেল, সেখানে একজন অবাঙালী ভদ্রলোক আগে থেকেই বসেছিলেন। একা। বছর চল্লিশেক বয়েস, চোখে পুরু লেন্সের চশমা। দামী টেরিলিনের পোশাক। আমরা মনে মনে একটা ফন্দি আঁটলাম। মনোজ প্রথমেই ভদ্রলোককে একটা সিগারেট এগিয়ে দিল, দেশলাই জেলে দিল, এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করতে লাগলো ক্রমশ। খানিক পর প্রায় বেপরোয়া হয়ে আমরা ওঁর জন্যেও এক রাউণ্ড অর্ডার দিলাম। ভদ্রলোক প্রথমে মৃদু আপত্তি করলেন, তারপর মেনেও নিলেন। মনোজ বললো, টোপ গিলেছে। এবার ওর পালা।

শেষ কপর্দক লগ্নী করে আমরা অপেক্ষা করছি, অবাঙালী ভদ্রলোক নাকে কাঠি দিয়েও হাঁচলেন না। শেষ পর্যন্ত আমাদের চোখের সামনে নিজের জন্যে পানীয় আনালেন দেখে মনোজ বিষম খাপ্পা। বেটা বেইমান।

এমন সময় তিনি বাথরুমে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। অবহেলায় কাগজপত্র, চশমা ও অর্ধশূন্য সিগারেটের প্যাকেটটি রেখে উঠে গেলেন। আমরা একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম দুজনে— চোখে চোখে কথাবার্তা হল। তারপর এক মুহূর্তের

সন্তকো সেবা করো—আনন্দ রহেগো

মধ্যে মনোজ তুলে নিল সিগারেটের প্যাকেটটা। এবং আমি ওঁর চশমা টেবিল থেকে সরিয়ে চেয়ারের গদির নিচে ঢুকিয়ে দিলাম। ফিরে এসে ও খুঁজে পাবে না, পেলেও তার আগে চশমাটা ওর নিজের চাপে ভেঙে যাবে— মনে মনে এইটুকু সান্ত্বনা নিয়ে বেরিয়ে এলাম আমরা। লোকটা কৃপণ, বেইমান, অকৃতজ্ঞ—ওর উচিত শাস্তি হওয়া দরকার।

যথেষ্ট যুক্তি থাকলেও কাজটা যে অন্যায় হয়েছে, পরের দিনই আমার মনে হয়েছিল। বেশি পাওয়ারের চশমা ছিল লোকটার, না পেলে একেবারে অন্ধের মতো অসহায় হয়ে পড়বে। তা ছাড়া ওরই বা দোষ কী! হয়তো আমাদের মতো ওরও ভাঁড়ে মা ভবানী বিরাজ করছিলেন। আমাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়ে ও দোকানে ঢোকে নি তো।

ঝুলিঝোলা কাঁধে নিয়ে হরিদ্বার স্টেশনে নামবার সময় সেই ঘটনা আমার মনে পড়লো অনেককাল পর। বাংকে শুয়েছিলাম রাত্রে, আমার কালো রং-এর চশমাটি ওপরের তাকে রেখে—চুরি গেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে রমেশকে বললাম—এতদিনে শোধবোধ হল। চলো, বিনা চশমাতেই তীর্থদর্শন করবো।

এক অর্থে যে-কোনো গন্তব্যস্থানই তো তীর্থস্থান। তবু হরিদ্বারে প্রবহমাণ গঙ্গা খরস্রোতা চঞ্চল বালিকার মতো। হিমালয়ের গন্ধ ও শীতলতা তার সর্বাঙ্গে, সে শীর্ণা, কলকাতার স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়া ভাগিরথীর সঙ্গে তার মিল নেই। উপরন্তু, আমি শুনেছিলাম, হরিদ্বারের গঙ্গায় বিশাল অভিজাত মাছেরা মানুষের কাছাকাছি এসে নাচের মুদ্রায় পুচ্ছ নাড়ে, বিবাগী গৃহ-বাসীদের জলের গভীরে যাবার লোভ দেখায়। অথচ যখন সত্যি সত্যি গেলাম হর-কি-পৌরির ঘাটে, শুনলাম গ্রীষ্মে নাকি সেই মৎসকুমারীরা অসূর্যম্পশ্যা।

রমেশ বললো, দেখ দেখ, জল থেকে উঠে ওই যে যুবতী দুটি ঘাটের সিঁড়িতে বসে পা দোলাচ্ছে—কুর্তা পাজামা লেপটে আছে শরীরের সঙ্গে ত্বকের মতো—ওদের অনেকটা মাছকন্যাদের মতো দেখাচ্ছে না? পাকা মাছের মতো লালচে বাদামী আভা ওদের শরীর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে—দেখ, দেখ। আমি অদূরে একটা রঙিন চঞ্চলতা দেখতে পেলাম—এইমাত্র। ওদের মাথার ওপর দিয়ে দেখা গেল ছোট্ট পুলটির অর্ধবৃত্ত চাল-চিত্রের মতো। তার পেছনে ধাপসা ধূসর উঁচু পর্বতশ্রেণী। নিশ্চল প্রকৃতি আমার ভালো লাগে না কোনো দিন, আজ চশমা-হীন অসহায় অবস্থায় যেন সেই প্রকৃতি নিঃশব্দে ঘিরে ধরেছে আমাকে।

রমেশ বললো, দেখ দেখ, ওই সিঁড়ির ওপর বসে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কেমন একটি কিশোরীকে স্নান করাচ্ছেন হাত ধরে—ঈশ্বর যেমন করে পাখিদের স্নান করান; দেখ দেখ, মেয়েটি কোন্ দিক সামলাবে ঠিক করতে পারছে না। আমি একটা ছোট্ট উড্ডীন পতাকা দেখতে পেলাম মাত্র। বললাম, চল, এখান থেকে যাই।

কোন্ দিকে যাওয়া যায়? কাছেই এক মন্দিরের নিচে বসেছিলেন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী—আট-দশজন ভক্তগোছের গ্রাম্য লোক ঘিরে রয়েছে হাত জোড় করে। সাধুবাবা সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে শিষ্যদের হুকুম দিচ্ছেন— গৃহী লোগ, ঘর মে বৈঠকে ভজন করো, আনন্দ রহেগো; সন্তকো সেবা করো—আনন্দ রহেগো।

আমরা গুটি গুটি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম—বাবা।

সন্ন্যাসী একটু বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। দাড়িসুদ্ধ মুখখানি আমাদের দিকে উঁচু করে জিজ্ঞেস করলেন—ক্যেয়া চাহিয়ে বেটা?

মহেশ ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে—গাঁজা কাঁহা মিলেগা সাধুবাবা? গুরুজীকো সেবা কে লিয়ে—

প্রশ্নটির পাশ কাটিয়ে সাধুবাবা জবাব দিলেন—মহাআলোগসে মিলোগে তো কনখল চলা যাও, হৃষিকেশ চলা যাও, বেটা।

সূত্র পেয়ে আমরা কনখলের দিকে এগোলাম। তিন-চার মাইল দূরে। টাঙাওলাকে বললাম, বাজারের কাছে নেমে কয়েকটা পুরিয়া কিনে নিতে চাই। মহাদেবের ভোগ লাগাবো। সে এক নতুন খবর শোনালো আমাদের। হরিদ্বার অঞ্চলে শুধু যে আমিষ নিষিদ্ধ তা-ই নয়, গাঁজা-ভাংও বারণ, তবে..। সুতরাং তবে-র দোকান থেকে চারটে ছোট প্যাকেট নেওয়া হল চুপিচুপি। দোকানদার সংলোক,

পরিষ্কার বুঝিয়ে বললো, আপনারা যা খুঁজছেন, তা এখানে মিলবে না। এ হল চরস। ঘাটে বা রাস্তার ধারে বসে খাবেন না, কোনো আশ্রমের মধ্যে ঢুকে সেবন করা বিধেয়।

কলকাতার কথা মনে পড়ে গেল। কান্না পেল আমার। সেখানে সন্ন্যাসীরা কত স্বাধীন, মুক্ত পুরুষ। সারা কনখল জুড়ে সারি সারি ইঁটের বাড়ির মধ্যে আশ্রম। এক-একটি প্রতিষ্ঠান। গৃহত্যাগীরা যেন একজোট হয়ে এখানে নতুন ঘর বেঁধেছেন। টাঙাওলাকে জিজ্ঞেস করলাম, মহাত্মারা এখানে কী সুখে বাস করেন? নির্বিকার-ভাবে ও জানালো, কেন, কালীকম্লীর অন্নসত্র আছে, যে কোনো গেরুয়াধারী গিয়ে দাঁড়ালে দু' বেলা ভরপেট খেতে পান। অন্য সময়ে ভজন-পূজন করেন। সপ্তাহে এক দিন দু' দিনের বেশি ভিক্ষে করার দরকার করে না।

এই সেই বিখ্যাত তীর্থস্থান—যেখানে দক্ষযজ্ঞ হয়েছিল, অনিমন্ত্রিত শিব যেখানে পার্বতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে তাণ্ডবনৃত্য করেছিলেন। শিবের মন্দির স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু দক্ষের শাসন ব্যবস্থার অবসান হয় নি। একটা গাছের নিচে বসে আমরা দু'জন যখন বিরহী শিবের জন্য শোকাচ্ছন্ন, এমন সময় এক সেপাই এসে দাঁড়ালো। চুপিচুপি বললো, আপনারা সিগারেট নিবিয়ে দিন। চারদিকে বড়ো গন্ধ বেরোচ্ছে। ও-জিনিস খাওয়া বে-আইনী।

রমেশ বিরক্ত হয়ে বলে— দূর, কোথাও নিশ্চিন্ত হয়ে ঠাকুর দেবতার নাম করতে দেবে না এরা। চলো, আমরা হৃষিকেশ চলে যাই।

বেলা দুটো নাগাদ নিরামিষ রুটি তরকারি খেয়ে যখন বেরোচ্ছি আমরা, তখনই আমার মনে পড়লো। হৃষিকেশ অবধি যখন এসে পড়েছি, তখন আর কিছু না হোক, মহেশ যোগীর আশ্রমটা দেখে আসা যাক। দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলাম, মহাঋষি মহেশ যোগীর আশ্রমটা কোন্ দিকে হবে ভাই?

বেচারা বুড়ো মতন লোক, মনে করার চেষ্টা করলো, কিন্তু তেই পারলো না। পাশে একটি ছেলে ট্রানজিস্টার বাজাচ্ছিল, তাকে প্রশ্ন করাতে ফল হল। ও চেনে, ও শুনেছে, যেখানে গোরা সাহেবরা এসেছিল। স্থানীয় লোকেরা জায়গাটার নাম দিয়েছে—চুরাশি কুটিয়া।

হৃষিকেশের কেন্দ্রে গীতাভবন নামের প্রকাণ্ড ধর্মশালা। সেখান থেকে বেশ খানিকটা হাঁটলে, পাহাড়ে উঠলে পৌঁছনো যায় আমাদের অভিপ্রেত আশ্রমে। ঢুকতেই সামনে একটা পোস্ট অফিস—শুধু আশ্রমের জন্যেই বসানো [illegible] শংকরাচার্যনগর পোস্টাপিসটি মনে হয়। হারিয়ে গেলে

সারি সারি ছোট ছোট একতলা বাড়ি। পাহাড়ের ওপরে অনেকখানি সমতল জায়গা জুড়ে একটা কলোনি বিশেষ। আমাদের মতন উৎসুক যাত্রী আরো কয়েকজন পাহাড় ভেঙে এসেছেন, ঘুরঘুর করছেন। এক

নজরে দেখলে মনে হয়, এঁরা প্রত্যেকে ইংরেজী কাগজ পড়েন।

হয়ত আমার মনের মধ্যেই ময়লা ছিল, কিংবা চশমা না থাকার ফলে দৃষ্টি ছিল আচ্ছন্ন, কিন্তু আশ্রমটির ব্যাপার-স্যাপার দেখে উঠে-যাওয়া সার্কাস পার্টির কথা আমার মনে হল। সম্পূর্ণ জনশূন্য—কয়েকটা ভাঙা চেয়ার চৌকি ছড়িয়ে আছে এদিক-ওদিক। যে বাড়িটির সামনে রিসেপশন লেখা তার ভেতরে এক বুশশার্ট পরা ভদ্রলোক কফি খেতে খেতে বললেন, এখন আশ্রম কিছুদিনের জন্যে বন্ধ। যোগাভ্যাসের ক্লাশ আবার শুরু হবে কয়েক দিন পরে। সিলেবাস ছাপতে গেছে। ভর্তি হতে হলে কয়েক দিন পর আসবেন।

নিরাশ হয়ে আমরা দু'জন আবার পাহাড় থেকে নেমে এলাম। অত্যন্ত ক্লান্ত। তেষ্টা পেয়েছে ভীষণ। সিঁড়ি বেয়ে আমরা গঙ্গার জলে পা ডুবিয়ে বসলাম খানিকক্ষণ। ঢক-ঢক করে জল খেলাম আঁজলা ভরে। ঠাণ্ডা জল। ঠাণ্ডা বাতাস গঙ্গার ওপরে। চোখে চশমা না থাকলেও অনুমান করতে কষ্ট হল না, বিশাল পাহাড়শ্রেণীর কোণ ঘেঁষে এই খরস্রোতা নদীটি এখনো খাঁটি রয়ে গেছে। তার চার পাশে জমজমাট বাণিজ্য ওকে একটুও মলিন করতে পারে নি।

যোগাভ্যাসের ক্লাশ আবার শুরু হবে কয়েক দিন পরে

চিত্র প্রদর্শনী

কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে সম্প্রতি শিল্পী রথীন মিত্র তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর। বর্তমানে দুন পাবলিক স্কুলের কলাশিক্ষক হিসাবে কাজ করলেও রথীন মিত্র এখানকার শিল্পী-সমাজে সুপরিচিত। ইতিপূর্বে তিনি কলকাতায় ও অন্যান্য স্থানে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেছেন, তা ছাড়া বহু যুক্ত প্রদর্শনীতেও তাঁর রচনা দেখা গেছে। এই প্রদর্শনীতে তিনি কালিকলম ও চারকোলে আঁকা কয়েকটি স্কেচ ও ড্রয়িং পেশ করেন। সবগুলিই বহির্দৃশ্য। বারাণসী, হরিদ্বার, লক্ষ্ণৌ, ডেরাডুন, মুসৌরী ও কাশ্মীর ভ্রমণকালে বিভিন্ন স্থানের যে যে দৃশ্য ও দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ে তিনি সেগুলিই কালিকলমে রূপান্তরিত করেছেন। স্কেচগুলি নতুন বইয়ের মলাটের মত পরিচ্ছন্ন। দেখে বোঝা যায় যে, এ জাতীয় রচনায় শিল্পী সিদ্ধহস্ত। রেখা বলিষ্ঠ ও গতিশীল, অঙ্কনগুণে অনেক স্থলে গ্রাফিক প্রিন্টের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। গঙ্গা ও ঘাটের দৃশ্য থাকলেও শিল্পী শহরের অন্যান্য কয়েকটি বিশিষ্ট স্থান, বিশেষ করে ঘাটের দীর্ঘ সোপানশ্রেণী, সাধু ও ভিখারী দলের স্কেচ করে বারাণসীর নতুন রূপের সন্ধান দিয়েছেন—যেমন ৪নং স্কেচ। হরিদ্বার ও মুসৌরীর ক্ষেত্রে তিনি প্রয়োজনমত কখনও কোনও উঁচু বাড়ি থেকে বা কোনও পাহাড়ের পদতলে বসে বিভিন্ন দৃশ্য স্কেচ করেছেন। এগুলি সুন্দর ও এদের মধ্য দিয়ে তাঁর পরিণত শিল্পীমনের পরিচয় পাই। এগুলি সবই প্রায় বাস্তব-দৃশ্যের অবিকল প্রতিলিপি এবং যাঁরা এই দুই শহরে গেছেন তাঁরাই স্কেচগুলি দেখে পরিচিত স্থানগুলি আবার স্মরণ করবেন। শিল্পীর প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর স্কেচ করার পদ্ধতি। দেখে মনে হয়, সাবলীল রেখা যেন তাঁর কলমের মুখ থেকে কালির মতই বিনা বাধায় বেরিয়ে এসে স্কেচমাধুর্য সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে মুসৌরীর উঁচু-নীচু পথ, বাজার বা পথের দু' ধারে ছোট ছোট দোকানের সারি শিল্পীর কলমের মধ্য দিয়ে অপরূপভাবে ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে ২২, ২০ ও ২৬ নং স্কেচ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে বারাণসী, মুসৌরী ও হরিদ্বারের স্কেচগুলিই বিশেষভাবে সকলের চোখে পড়ে। ডেরাডুনের পথের স্কেচও মন্দ লাগে না। তবে লক্ষ্ণৌ-এর মাত্র দুটি স্কেচ দেখা যায়—সম্ভবত শিল্পী এই শহরের বিভিন্ন দৃশ্য স্কেচ করার মত সময় পান নি। চারকোলে আঁকা কাশ্মীরের স্কেচগুলিতে শিকারার দেখা পাওয়া গেলেও কাশ্মীরের প্রাকৃতিক রূপ বা বৈশিষ্ট্যের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে ড্রয়িং-এর নিদর্শন হিসাবে যে সেগুলি সুন্দর ও অমূল্য সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

গান হিল—মুসৌরী —রথীন মিত্র

*

আর্যা চক্রবর্তীর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয় অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারীতে। শিল্পীর বয়স ১২, অ্যাকাডেমির স্টুডিওতে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করে।

*

খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীসোমনাথ হোড়ের গ্রাফিক চিত্র প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হচ্ছে কেমুলড গ্যালারীতে। আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ে আলোচনা করব।

চিত্রপ্রিয়

ঘরে বাইরে

চা ও কফির প্রতিযোগিতা

সারা দুনিয়ায় চা আর কফিপায়ীদের মধ্যে এক জোর 'রেস' (race) বা রেষারেষি চলেছে। ক্যাশনেবল ধনী সমাজে কফির জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বাড়ছে। কফি-পানের এই প্রতিযোগিতায় নিষ্ঠাবিশ্বেরা এখনো বেশ পিছিয়ে আছেন। চায়ের পার্টির রেওয়াজ এখন আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। তার বদলে কফি পার্টি জনপ্রিয় হচ্ছে। গরম কফি, ঠাণ্ডা কফি, মিল্ক কফি এসপ্রেসো কফি, কোনা কফি, সেবকা কফি, বাজারে কফির কাফি বৈচিত্র্যে হোটেল, রেস্তোরাঁ সরগরম। তা ছাড়া ঘরোয়া টেবিলে কফির আদর বাড়ছে আর একটা কারণে। এখন আর সিদ্ধ করে কফি তৈরির ঝামেলা নেই। বাজার থেকে কৌটোয় ভর্তি একেবারে "প্রস্তুত" গুঁড়ো কফি পাচ্ছেন। টিন খুলে শুধু জলে গুলে দুধ চিনি মেশালেই ঘর আমোদ ভুরভুরে গন্ধে। কফি উত্তেজক, ঘুমের জড়তা আর অবসাদ নাশক। কফির এই ঘুম-নাশক গুণে বা অবগুণকে কেন্দ্র করেই কফি আবিষ্কারের একটি প্রাচীন কাহিনী শোনা যায়। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে আরব দেশ থেকে কিছু সংখ্যক ফকির ধর্মীয় নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে লোহিত সাগর পেরিয়ে আবিসিনিয়ার পার্বত্যাঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে চাষবাস আর পশুপালন করে তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিছুদিন ধরে তাঁরা তাঁদের পালিত ভেড়া ছাগলদের একটা অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করলেন। এই সব জন্তুর চোখে সারা রাত ঘুম নেই। চাঁদের আলোয় এরা দিব্যি নেচে লাফিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ঘুম নেই, অবসাদ নেই—যেন বসন্তের ফুরফুরে সকালটি। প্রথমে ফকিরদের সন্দেহ হল, বোধ হয় জানোয়ার-গুলোকে ভূতে পেয়েছে। অনেক প্রার্থনা, তুকতাক, ঝাড়-ফুঁকেও যখন কোনো ফল হল না, তখন তথ্য-তল্লাশ আর খোঁজখবর শুরু হল। শেষে আসল রহস্য ধরা পড়ল। ওই অঞ্চলে এক ধরনের গুল্ম প্রচুর জন্মাত। কিন্তু কেউ তার নাম বা গোত্র জানত না। ভেড়া ছাগলগুলো এই গুল্মের পাতা আর পাকা ফল চিবিয়ে সারা রাত জেগে লাফা-লাফি করত। এই অজানা গুল্মই ভাবী-কালের কফি। এই কাহিনীর মধ্যে গাল্পিক উপাদান যত পারসেন্টই থাকুক না কেন, একটা তথ্য প্রকৃত। তা হল কফির আদি জন্মস্থান আরব আর আবিসিনিয়া। ১৫ শ শতাব্দীতে মক্কাগামী তীর্থযাত্রীরা কফির বীজ ভেজানো সরবৎ পান করে সারা রাত জেগে প্রার্থনা করতেন। তাঁদের চোখে ঘুমের অবসাদ আসত না। আরব দেশ থেকে কনস্টান্টিনোপল, তারপর ভেনিস এবং সেখান থেকে কফির আগমন হয় ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্সে। তারপরে ছড়িয়ে পড়ে ইয়োরোপের অন্য সব দেশে। কফি খাওয়ার জনপ্রিয়তা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পত্তন হল কফি হাউসের। এই সব কফি হাউসে চাঁইচাঁই রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে সমাজের যত ফ্যাশনেবল নরনারী এসে ভিড় জমালেন। শুধু তাই নয়, এই সব কফি হাউস ছিল প্রসিদ্ধ লেখক আর শিল্পীদের প্রধান আড্ডা। লণ্ডনের প্রথম কফি হাউসের জন্ম ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে। পরবর্তী বিশ বছরে দেশের রাজনৈতিক আর সামাজিক জীবনে এই সব কফি হাউস এমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল যে, দ্বিতীয় চার্লস তা দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে এই সব কফি হাউসকে "Seminaries of Sedition" আখ্যা দিয়েছিলেন এবং এগুলি বন্ধ করে দেবারও চেষ্টা করেছিলেন। প্যারিসেও অনেক কফি হাউস গড়ে ওঠে।

ঘরোয়া চা-এর আসর

জমকালো, কফির আসর

কফি বা কফি হাউসের গুরুত্ব বোঝা যায় একটি কথা থেকে। আজকাল হোটেল রেস্তোরাঁর আর এক সাধারণ নাম কাফে (cafe)। ফরাসী ভাষায় cafe কথার অর্থ কফি বা কফি হাউস।

কিন্তু এত সত্ত্বেও মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-বিত্ত সমাজে চায়ের জনপ্রিয়তা কফির চেয়ে অনেক বেশী। চা-পায়ীর সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ছে এঁদের মধ্যে। গত কয়েক বছরে, জনপ্রতি চায়ের খরচ বেড়েছে বছরে তিন শতাংশেরও বেশী হারে। এই হার, জনপ্রতি আয় বৃদ্ধির হারের চেয়েও বেশী।

দেশের মধ্যে ঘরোয়া চায়ের ব্যবহার এইভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার উদ্বিগ্ন। ঘরোয়া চায়ের খরচ কমিয়ে আরো বেশী পরিমাণে চা বিদেশে রপ্তানি করে আমরা মূল্যবান বিদেশী মুদ্রা অর্জন করতে পারি। গত বছর অবশ্য চা-রপ্তানিকারী দেশগুলির তালিকায় ভারত শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। চা উৎপাদনকারী দেশগুলি (এর মধ্যে উন্নয়নশীল দেশের সংখ্যাই বেশী) প্রচুর চা খরচ করে। সারা পৃথিবীতে যা চা খরচ হয় তার ৫ ভাগের ২ ভাগই খরচ করে এই দেশগুলি। এর মধ্যে কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া এবং চীনকে ধরা হয় নি। মাত্র দশ বছর আগেও উন্নয়নশীল দেশগুলি সারা পৃথিবীর উৎপন্ন চায়ের মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ চা খরচ করত। চা উৎপন্নকারী দেশগুলিতে ঘরোয়া চায়ের চাহিদা এইভাবে বেড়ে যাওয়ায় স্বভাবতই রপ্তানি বৃদ্ধির হার বাড়ছে খুব মন্থর গতিতে মাত্র দুই শতাংশ হারে।

কফির মত চায়েরও জন্মকাহিনী নানা গল্পে উপকথায় ছড়িয়ে আছে। যতদূর জানা যায়, চায়ের জন্ম চীন দেশে, খৃষ্ট জন্মেরও প্রায় ২৭৩৭ বছর আগে। চা-এর

আবিষ্কারের সঙ্গে সম্রাট শেনঙ্গু-এর নাম জড়িত। বহু প্রাচীনকালে চীন দেশে চায়ের ব্যবহার হত ওষুধ হিসেবে। ইংল্যাণ্ডে চা-পান প্রথম প্রচলিত হয় ১৬ শ' শতাব্দীতে। চা তখন বহু মূল্যবান জিনিস—ওজনে এক পাউণ্ড চায়ের দাম তখনকার দিনে তিন পাউণ্ডের মত। চা রাখা হত মূল্যবান বাক্সে তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেনে চায়ের দোকান জনপ্রিয় হতে শুরু করে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ব্রিটিশ ভারতে চায়ের রপ্তানি বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে শুরু হয়। চীন দেশ থেকে আনা বীজ থেকে উৎপন্ন এই চায়ের বিদেশে খুব কদর হয়েছিল। তা ছাড়া ভারতে চায়ের উৎপাদন পদ্ধতিও যথেষ্ট উন্নত ছিল। ভারত তখন থেকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চা উৎপন্নকারী অন্যতম দেশ হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। সিংহল চায়ের ব্যবসায় নামে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে। সিংহল ছাড়া জাভা ও জাপানেও চা উৎপন্ন হয়। চায়ের ফুল দেখতে অনেকটা ছোট বুনো গোলাপের মত। ফুলের পাপড়ির রং কখনও সাদা, কখনও হাল্কা গোলাপী। চায়ের পাতা চামড়ার মত নরম, পাতার কিনারা করাতের মত খাঁজকাটা। চীনে নাকি চায়ের পাতার ওপর জেসমিনের (জুঁই ফুলের) পাতা বিছিয়ে রাখা হয়। চা প্রস্তুত পদ্ধতির এ একটা চীনা বৈশিষ্ট্য। যার ফলে চীনা চায়ের একটা নির্দিষ্ট ধোঁয়াটে গন্ধ। খুব কচি পাতা আর একদম ছোট কুঁড়ি থেকেই সবচেয়ে সেরা আর দামী চা তৈরী হয়। তবে কাঁচা চায়ের পাতায় কোনো সুগন্ধ নেই। বাজারে ছাড়ার আগে বাগানের চাকে বহু পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে পানের উপযোগী করতে হয়। কফির বীজ সেঁকলে তবেই যেমন মিষ্টি গন্ধ বের হয়, চায়েরও তাই। Green Tea এবং Black Tea একই গাছের পাতা থেকে তৈরী হয়। কেবল প্রস্তুত পদ্ধতি আলাদা। গ্রীন টি আসে প্রধানত চীন আর জাপান থেকে। নানা দেশে চা পানের পদ্ধতিও বিভিন্ন। মঙ্গোলিয়া, তিব্বত আর রাশিয়ায় বড়ির আকারে চা পাওয়া যায়। রাশিয়ানরা চায়ে কদাচিত দুধ মিশিয়ে খায়। ওরা চায়ে এক চামচ জ্যাম মিশিয়ে নেয় কিংবা মুখে এক চামচ চিনি রেখে চুমুক দিয়ে চা খায়।

চা ও কফি দুয়ের মধ্যেই আছে সামান্য পরিমাণ ক্যাফেইন (Caffeine) চা ও কফির সুগন্ধ আসে এই ক্যাফেইন থেকে। ক্যাফেইন মস্তিষ্ক আর হৃৎপিণ্ডকে উত্তেজিত করে, রক্ত চলাচল দ্রুত হয় তার ফলে। এই বস্তুটি বেশী পরিমাণে খেলে কিন্তু ফল বিপজ্জনক হতে পারে। চায়ের রং হয় ট্যানিন থেকে। জাপানী বিজ্ঞানীদের মতে, ক্যাফেইন ও ট্যানিন ছাড়া চায়ে ভিটামিন 'সি'ও আছে অল্প মাত্রায়। মাত্রাধিক্য হলে চা ও কফি দুই-ই স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। এই ব্যাপারে বোধহয় কফির বদনামটা একটু বেশী।

চা ও কফির ব্যবহারের সঙ্গে মাথাপিছু আয়ের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা তা নিয়ে আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বিশেষজ্ঞরা গবেষণা করেছেন। তাঁদের মতে, এশিয়া ও আফ্রিকার কোনো কোনো দেশে মাথা পিছু আয় বৃদ্ধির সঙ্গে চায়ের খরচও বাড়ে। কিন্তু কয়েকটি উন্নত দেশে, যেখানে জনপ্রতি আয়ের হার খুব বেশী, সেখানে দেখা গেছে আয় কমা-বাড়ার সঙ্গে চায়ের খরচের কোনো ইতরবিশেষ হয় না। সেখানে চা-পান খানিকটা রেওয়াজ আর অভ্যাসের ওপর নির্ভর করে। সোভিয়েট রাশিয়ায় চা-পায়ীর সংখ্যা বাড়ছে। চীনারা অবশ্য যথারীতি আজও চায়ের সমান ভক্ত। চীন দেশে চা হল এমন একটি সামগ্রী যা কিনা র‍্যাশন কুপন ছাড়াই মেলে। উন্নত ধনী দেশগুলিতে কফি পানের আধিক্যের কারণ, সেই সব দেশে অধিক পরিমাণে কফি উৎপন্ন হয়—এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, উন্নত দেশগুলিকে তাদের প্রয়োজনীয় কফির অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে আমদানি করতে হয়। প্রধান কফি উৎপন্নকারী দেশগুলির মধ্যে আছে—ব্রাজিল, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মধ্য আমেরিকা, মেক্সিকো, আরব ও আফ্রিকার কোনো কোনো অঞ্চল, সুমাত্রা ও জাভা এবং ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চল।

চা ও কফির 'রেস' চলুক। আমরা বলব—চা ও কফি দুই-ই জিন্দাবাদ। পানীয় হিসেবে আমাদের কাছে দুই-ই আদরণীয়। রুচি আর পকেটের অবস্থা বুঝে আমরা চা ও কফির উভয় পাত্রেই চুমুক দেব।

শ্রীমতী

ট্রামে বাসে

সংবাদে শুনিলাম সোভিয়েট শিশুরা ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনকে ফুল উপহার দিয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"ফুল পেয়ে রাষ্ট্রপতি হয়ত মনে মনে বলেছেন, মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রের বদলে পাকিস্তানকে এই পুষ্প উপহার দিলে আমরা স্বস্তি বোধ করতাম।।"

চন্দ্রপুরার তৃতীয় জেনারেটার উদ্বোধন উৎসবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নবভারত গঠনের চেষ্টায় সকলকে ঐক্যবদ্ধ হইবার পরামর্শ দেন। বিশু খুড়ো বলিলেন : "অতীতে ভারতের নবরূপায়নের কথায় আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলাম, কিন্তু শিল্পীদের হাতে শিবের বানররূপে প্রাপ্তির পর আবার আর এক নবভারতের কথায় রীতিমতো আতঙ্কিত হচ্ছি।"

মেডিকেল পরীক্ষা পিছাইয়া দেওয়ার দাবিতে মেডিকেল ছাত্ররা এবং ছাত্রীরাও, উপাচার্য, সিনডিকেট ও সেনেটের ২০ জন সদস্য, চারটি কলেজের অধ্যক্ষবৃন্দকে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে আটক করিয়া রাখে; ধস্তাধস্তি, হাতাহাতি, মারামারি, হৈ হুল্লোড়, চীৎকার সমানে চলিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত পুলিসের সাহায্যে তাঁহাদিগকে আটক-মুক্ত করা হয়। শ্যামলাল বলিল—"রকম সকম দেখে আমাদের মনে হয় ডাক্তারি বিদ্যার বদলে ছাত্ররা বুঝি হাতুড়ে বিদ্যাই সড়গড় করেছে।।"

উক্ত প্রসঙ্গে আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"সেদিন ছাত্রীরা নাকি বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে গিয়ে আটক উপাচার্য প্রমুখদের সামনে উলু দিতে শুরু করে। চারদিকের নানান বিপত্তির মধ্যেও এই খবরে আমরা স্বস্তি বোধ করছি; ছাত্রীরা তাদের শানিত জিবকে উলুর হাতিয়াররূপে ব্যবহার করেছে।"

সাম্প্রতিক প্রবল বৃষ্টিপাত প্রসঙ্গে আমাদের শ্যামলাল বলিল—

ইউনিয়ানি কৌশল অবলম্বন করেছেন, কোন মিছিল ছিল না এবং তাঁর মানতে হবে দাবিও অনুচ্চারিতই ছিল, কিন্তু যানবাহন অচল করে দিয়ে বরুণদেব নাগরিক জীবনকে এই নূতন ঘেরাও অস্ত্রে করুণ করে তুলেছেন। অতঃপর মানুষের দিক থেকে হাইড্রোজেন বোমা সংগ্রহে তৎপরতায় আমরা অবাক হব না।"

স্ত্রীদের প্ররোচনাতেই স্বামীরা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে; কথাটা বলিয়াছেন মালয়েশীয় দুর্নীতি দমন সংস্থার ডিরেক্টর হারুন বিন দাতোর। "ভাগ্যিস ব্যাপারটা মালয়েশীয়; আমাদের এদেশে হলে এই উক্তি প্রত্যাহার করে হারুনকে হার স্বীকার করতেই হত। আমরাও কোন মন্তব্য করব না, কলকাতায় ঝাটা মিছিলের কথা বেশ মনে আছে"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

পাঞ্জাবের অর্থমন্ত্রী ডঃ জগজিৎ সিং নাকি বলিয়াছেন : 'মদ নিষিদ্ধ না করে ভালোভাবে মদ খেতে শেখানো উচিত।'—"আহা, কী সুন্দর কথা, স্বাধীন ভারতে বুঝি এই প্রথম শুনলাম, 'ভালোভাবে' মদ খেতে শেখাও অর্থাৎ পেগ চার পাঁচ-এর পরেও ওয়ান ফর দি রোড, তারপর ওয়ান ফর দি লেন এবং তারও পরে ওয়ান ফর দি বাইলেন, একবারে চূড়ান্ত ভালোভাবে খাওয়া"—বলেন সহযাত্রী, বোধ হয় ওয়ান ফর দি বাইলেনের পর।

সংবাদে শুনিলাম এবার নাকি পরীক্ষায় মার্কশীটেও কারচুপি চলিয়াছে, মূল নম্বর উঠাইয়া দিয়া বেমালুম নিজেদের মনোনীত মার্কস শীটে বসানো হইয়াছে। মেধার জন্য মনোনীত মার্কস-এর উপরেও শুধু চার মার্ক বেশী দেওয়া উচিত, আরিস ক্যাদা সম্ভব না হলেও।।"

পরবর্তী প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে আর দাঁড়াইতে চাহেন না এই কথা বলিতে গিয়া নাকি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জনসনের চোখ অশ্রু সজল হইয়া উঠে।—"নহে নহে প্রিয়, এ নয় আঁখি জল/মলিন হয়েছে ঘুমে চোখের কাজল"—শ্যামলাল নজরুলের গানে মন্তব্য করে।

অন্য এক সংবাদে প্রকাশ, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন সাম্প্রতিক প্রবল বর্ষণের মধ্যে দমদমে পৌঁছেন তখন ভি. আই. পি গাড়ির বদলে তাঁর জন্য একটি স্টেট বাসের ব্যবস্থা করা হয় এবং তিনি উহাতে চড়িয়াই রাজভবনে যান। শুনিলাম এই বাসটির নামকরণ করা হইয়াছে — 'প্রিয়দর্শিনী'। "ব্যবস্থাটা অবশ্যই ভালো হয়েছে কিন্তু আরো ভালো হতো যদি বৃষ্টির দিনের সাধারণ যাত্রী বাসে ইন্দিরাজীকে আনা হত এবং আমরাও বাসটির নামকরণ করতে পারতাম—'বাদুড়-ঝোলানি—' বলেন সহযাত্রী।"

শ্রীমতী ইন্দিরা নজরুল গীতি শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া রাজভবনে সেই ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। "কী গান তাঁকে শোনানো হয়েছে সংবাদে তা বলা হয়নি। আমাদের মনে হয় 'দুর্গম-গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে' গানটি শোনালে ইন্দিরাজীর কিছু চিন্তার খোরাক জুটত"—বলেন সহযাত্রী।

শ্রীমতী ইন্দিরা শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কথা প্রসঙ্গে বাসন্তী দেবী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন 'তোমার বাংলা কথা মনে আছে তো?' ইন্দিরাজী বাংলাতেই জবাব দেন : 'বাংলা বুঝতে পারি, ভালো বলতে পারিনে।' খুড়ো বলিলেন—"অতঃপর বাসন্তী দেবীর প্রশ্ন করতে চেয়েছিলেন বাংলা বুঝতে পার, ভালো কথা, কিন্তু [illegible]

দিল্লির ডায়েরি

জোরহাটে বিমান বাহিনীর অফিসার-গোত্রীয় মেস ব্যারাকে সকাল এবং ওঠে আসেন সোজা চারটেতে। পূব দিকের ভুল কিনা তাই। আর ঐ সকালেই সাক্ষাৎ একেবারে যোগীরাজ কৃষণকুমারের সংগে পাশের ঘরে।

দৌড়ে পালিয়ে এলাম নিজের কামরায় এবং সদ্যোত্থিত পার্শ্ববর্তীবাবুকে ধাক্কা দিয়ে তোলার প্রশ্ন করলেন, "কী ব্যাপার?"

"আগে উঠুন তো শিগ্গির। ও ঘরে একজন দশ গজ কাপড় খাচ্ছে যে," বললাম। বিস্ময়ে তার চোখের ঘুম তক্ষুনি পলাতক। "বলেন কী? কি, কোনো রাক্ষস-টাক্ষস নাকি?"

"সেটেই নয়। আমাদের কৃষণকুমার দশগজ কাপড়, মানে ধরুন ব্যান্ডেজের কাপড়, গিলে খাচ্ছে। কাছে এক বদনা জল। কাপড় মুখবিবরে ঠেসে দিচ্ছে আর বদনার জল খেয়ে ভেতরে ঢোকাচ্ছে। সত্যি বলছি।"

দুজনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, সাক্ষী থাকলাম নতুন ধরনের অপক্ক আহার্যের। হয়তো প্রাতঃরাশ হচ্ছে, কে জানে হয়তো ভিটামিন কিম্বা জোলাপ-মাখানো ব্যান্ডেজের কাপড়। খেয়ে বদনা থেকে আবার বেশ এক ঢোক জল পান করে (ভাবলাম, এবার বোধ হয় আহারান্তে আনন্দ-বিজ্ঞাপক ঢেকুর-ধ্বনি উঠবে), আমাদের কৃষণকুমার অভ্যন্তরে প্রবিষ্টকৃত কাপড়ের শেষাংশটুকু ধরে ধীরে ধীরে আবার বের করে আনল দশগজ কাপড়। পরদিন মেপে জানা গেল, ওটা দশ নয়, মাত্র ন' গজ কাপড়। সে জানাল:

"এটা একটা যৌগিক প্রক্রিয়া, শিখেছি একজন যোগী মহারাজের চরণ তলে। জেনো ভাই উনিই কিন্তু প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরার যোগ-শিক্ষক যোগী মহারাজ। আমিও ওঁর (হাত জোড় করে অদৃশ্য ব্যক্তিকে প্রণাম) শিষ্য। এই যেটা করলাম, এতে আমার সমস্ত অর্কেস্ট্রা ক্লেদ পরিষ্কার। আমি হাঁপানির রুগী ছিলাম। কিন্তু কয়েক মাস এই প্রক্রিয়ায় বেশ ভাল আছি।"

পরস্পরের এখানেই থামেনি। অতঃপর গলাধঃকরণ করতে হবে দুটিন বদনা ঈষদুষ্ণ নুনজল। এবং কিছুক্ষণ পাকস্থলিতে রেখে গলায় আঙুল দিয়ে ঐ জল বের করে দিতে হবে। হয়তো একাধিকবার। তারপর আরো এক বদনা জল। নাকের এক ছিদ্র দিয়ে ঢুকিয়ে অন্য ছিদ্র দিয়ে বের করতে হবে।

"মানে ভাই তুমি এইসব রোজ করো?" প্রশ্ন করি।

"করি বৈকি। তবে এখনো শিখছি। গুরুর দয়া, হে গুরু!" কৃষণকুমার বলে। ইনি উঁচুতে ছয় ফুটের বেশী, পাঞ্জাবী হিন্দু, গোঁফের মাপ বিয়াল্লিশ কি চাল্লিশ। সেদিন থেকে আমরা নাম দিলাম "যোগীরাজ।"

"কী আপনি এখনই তৈরি?" পার্শ্ববর্তী বাবু যেন ডুকরে উঠলেন। "আমার তো কিছুই হয়নি। জানেন এই সকাল বেলাটাই আমার দুর্বলতা। সব কাজ একটু ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে উপভোগ করে না করলে মনটা কেমন যেন বেজার হয়ে যায়। দেখছি তবু।"

"হ্যাঁ, জানেন তো, মিলিটারি ব্যাপার। ঘড়ি ধরে কাজ"।

"আরে রাখুন ঘড়ি আর মিলিটারি।

নেফার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া। চাষের জায়গা ইত্যাদি

বিমান বাহিনীর একজন অভিজ্ঞ চালক, আমাদের প্লেন চালাচ্ছেন

আমরা কি যুদ্ধে যাচ্ছি, নাকি কোর্ট মার্শ্যাল। দে উইল ওয়েট ফর আস. আফটারাল।"

ওয়েট না করে উপায় কি? চারজন মানুষের জন্যে একটি মাত্র স্নানাদির ঘর। এবং কে না জানে যে একটি জিনিস আছে যা খুশিমত জলদি করা যায় না, এমন কি এয়ার চিফ মার্শেলের হুকুম থাকলেও হয় না। অত্যন্ত ট্রিকি ব্যাপার. আমি তো অনেককে শুনেছি এমন কি প্রার্থনা করতেঃ

হে প্রভু! আমার আজকের প্রাতঃক্রিয়াদি যেন...ইত্যাদি।

তারপর? ড্রিল। "নীল বাতাও, আজ ড্রিল ক্যা হায়?" "ব্রেকফাস্ট সিকস থার্টি", রিপোর্ট এয়ারপোর্ট সেভেন থার্টি ফ্লাইট এইট এ-এম।" ড্রিল ছিল ঐ, প্রায় রোজ একই রকমের। প্রথম একত্রিত হও একটি ছোট কামরায়। পাইলট ও অন্যান্যরা জানবে তাদের কাজ. কোথায় যেতে হবে উড়ে এবং রাস্তায় আবহাওয়া হবে কেমন।

তারপর এরোপ্লেন এবং তার আকাশ-যাত্রা। নেফার গোটা অঞ্চল, অর্থাৎ কামেং, সুবর্ণশ্রী, সিয়াং, লোহিত ও তিরাপ এই পাঁচটি ডিভিসন, নাগাল্যান্ড ও মিজো পাহাড়. সমস্ত অঞ্চলের প্রয়োজনীয় জিনিস আকাশ থেকে মাটিতে নামাবে ভারতীয় বিমান বাহিনী। রাস্তাঘাট তৈরি হয়েছে অনেক। বিশেষত গত তিন বৎসরে। যে অবধি রাস্তা আছে, মালপত্র ও রসদ রাস্তা দিয়ে যাবে লরি ও ট্রাকে। তার জন্যে বিমান বাহিনীর কোনো দায়িত্ব নেই।

কিন্তু অধিকাংশ স্থানই হোল রাস্তা-হীন। সামরিক ও অসামরিক লোকেরা তখন নির্ভর করে আকাশযাত্রী বিমান বাহিনীর উপর। আট থেকে তেরো হাজার ফুট উঁচু পর্বত-মালার কোথাও হয়তো রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী অথবা আসাম রাইফেলস-এর পোস্ট। তাদের খাওয়া-দাওয়ার দ্রব্যাদি, অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ, সব যাবে ঐ আকাশপথে। চাল, ডাল, গম, নুন, সব্জি, চিনি, ঔষধপত্রাদি, মাংস, এমন কি জ্যান্ত ছাগল ও ভেড়া-সব যাবে ঐ আকাশ পথে।

পাহাড়ের গায়ে খানিক খোলা জায়গা বেছে নেওয়া হয়। নাম তার "DZ", ড্রপিং জোন। কোনোটা বড়, কোনোটা ছোট আকাশ থেকে রসদ পড়বে ঐ "DZ" স্থানে। লোকেরা তা নিয়ে যাবে বিশেষ বিশেষ জায়গায় বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে। কিছু হোল নেফা অঞ্চলের অসামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের জন্যে, কিছু ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্যে, যারা অতি কঠিন অঞ্চলে দিনরাত্রি পাহাড়ায় মোতায়েন শত্রুর বিরুদ্ধে।

আমাদের বিমান বাহিনীর কাছে এটা শুধু নতুন কিছু নয়। কারণ তারা অনেক আগে থেকে রসদ জুগিয়ে আসছে পর্বত অঞ্চলের সেনাবাহিনীকে। গত বৎসর পহেলা জুলাই-এর আগে একটি অসামরিক বেসরকারী সংস্থা (কলিংগ এয়ারওয়েজ) আকাশ থেকে মালপত্র সরবরাহ করতো নেফা শাসন কর্তৃপক্ষকে এবং আসাম রাইফেলস-কে। এ নিয়ে ভারতের সংসদে ওঠে অনেক কথা : মালপত্র পৌঁছয় না: দেওয়ার কথা হয়তো একশো টন, হাতে পৌঁছয় মাত্র পঞ্চাশ টন, বাদবাকি গায়েব। ভারত সরকারকে কয়েক কোটি অর্থদণ্ড দিতে হয়েছে। তাই গত জুলাই মাস থেকে (১৯৬৭) এই দায়িত্ব [illegible] নিয়েছে

তারা বাহিনীর ২২—২৪ বছরের বিমান চালক ও তাদের সহকর্মীরা, তারা যে প্রশংসার যোগ্য তা আমি দিয়ে উঠতে পারব না। নিষ্ঠুর পর্বতের সঙ্গে দিনের পর দিন লড়ে নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে তারা করে যাচ্ছে নিজেদের কর্তব্য। এবং সেই কর্তব্য সম্পাদনের উপর নির্ভর করছে দেশ ও জাতির নিরাপত্তা।

মুখে বলা কিম্বা কাগজে লেখা খুব সহজ। কিন্তু যদি আমার সঙ্গে আসতেন ঐ আকাশ পথে, তাহলে জানতেন এ কী কঠিন কাজ এবং তাহলে আমার মতো আপনারাও বলতেন : "ভাই, বিমান বাহিনীর আমার ভাইয়েরা, তোমরা শতায়ু হও, তোমরা নাও আমাদের মত দেশবাসীর অকুণ্ঠ আশীর্বাদ ও স্নেহ।

এই সেদিন একজন আমাকে একটি চিঠিতে বলেছেন, একজন সেনাবাহিনীর মেজর (বাঙালী) : আমরা দেশের জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আমরা শুধু চাই আপনারা, সংবাদ জগতের লেখকরা, আমাদের কথা বলুন দেশবাসীকে। দেশবাসীরাও বুঝুন আমাদের কথা, আমরাও বুঝি দেশ ও জাতির কথা।

বন্ধু পত্রের ঐ মেজরটির নাম আমি দিতে পারি না, আরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনেক বিধিনিষেধ। কিন্তু তাকে আমার খুব ভাল লেগেছিল, যেমনি লেগেছিল বিমান বাহিনীর অনেক ছেলেকে, যারা ভারতের ভাল ছেলে, তা আপনারা যে নামেই ডাকুন না কেন : বাঙালী, পাঞ্জাবী, হিন্দি ভাষী, মাদ্রাজী, মালয়ালী, আসামী, রাজস্থানী, গোয়ানীজ, মারাঠা, কে নয়?

সেদিন আকাশে উড়লাম কোনো একটি বিমানে। কোনোটা রাশিয়ার তৈরি, কোনোটা আমেরিকার, কোনোটা কানাডা কি অন্য দেশের। বিমান বন্দর নয়তো যেন ছোটখাটো একটি শহর। জিপে করে যাচ্ছি তো যাচ্ছি। লম্বা লম্বা ঘাস (যা হাতি মশায়রা খেতে ভালবাসেন)। কোথাও সবুজ জঙ্গল, পাখীদের কিচির-মিচির আর প্রপেলারের দানবীয় আর্তনাদ। এখানে কুটি, ওখানে বন্দুকধারী সান্ত্রী; এখানে মাঠ, ওখানে দাঁড়ানো বিমান। কোথায় আরম্ভ কোথায় শেষ, আমি তো বুঝতে পারলাম না।

তাও সকলের সঙ্গে আমিও হাজির একটি বিশেষ বিমানে। সেদিন চালকের স্থানে ছিলেন অতি অমায়িক অ্যাকটিং স্টেশন কমান্ডার চাড্ডা। মাপ করবেন, ওগুলো ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স-এর মুনাফাখোর বিমান নয়; একগাল হাসি এয়ার হোস্টেস থেকে (দেখতে কুশ্রী), নরম-নরম কেদারা (নারীদেহের বিশেষ স্থানের মতো), টফি, লজেন্স, আরো হাসি, ফাসন ইওর সিট বেল্ট, আঃ হোয়াট এ বেবি ইউ আর—মাইকে নারী কণ্ঠ—নো নাথিং।

অতি গদ্যময় পরিবেশ। বস কি দাঁড়িয়ে থাকো, তোমার ভাগ্য। গদি-ফদি কিছু নেই। বসে থাকো। প্রথম দশ মিনিট যেন মাছ ভাজা। দরদর করে ঘাম নামছে গায়ে। কী ঘাম কী ঘাম, নেয়ে-ওঠা ঘাম, কিম্বা মৃত্যু-পূর্ব ঘাম—তারপর বিমান ওঠে আকাশে মেঘের উপরে আরো উপরে—অর্থাৎ আমরা তখন উড্ডীয়মান, উড়ছি, উড়ছি, আর এল শীতল হিম-ঠান্ডা হাওয়া, ঘাম যায় শুকিয়ে, গায়ে আসে হি হি শীত।

এক বন্ধু নাম দিয়েছিলেন থ্রি এফ : ফ্রাইং, ফ্লাইং, ফ্রিজিং। বিলকুল ঠিক। প্রথম দিন হাতে ছিল বর্ষাতি। আমার ও পৃথ্বীশবাবুর। কুড়ি মিনিটের মধ্যে ঐ প্লেনের মধ্যে বসেই আমাদের গায়ে চড়াতে হোল বর্ষাতি, যদিও বর্ষার কোনো জল আমাদের গা' ছোঁয়নি।

ব্যাপারটা অন্য ধরনের। প্রথম দশ মিনিট মাটিতে ঘাম ও ঘাম (প্লেনের ভেতরে); দ্বিতীয় কুড়ি মিনিট উপর দিকে আকাশে ওড়া ও ক্রমশ শীত; এবং তৃতীয় দশ মিনিট বিশ্বাস করুন, একেবারে পূর্ববঙ্গের ম্যালেরিয়া জ্বর। কাঁপুনি।

হোল কি, একটা উড়ো জাহাজ আছে নাম যার ড্যাকোটা। বড় পুরোনো ধরনের বিমান। তার না আছে অ্যারিস্টোক্রেসি, না আছে যান্ত্রিক আধুনিকতা। কিন্তু আছে হাতির মতো একগুঁয়েমি এবং জীবনী শক্তি। আমেরিকার তৈরি, কিন্তু তারাও উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে আজ প্রায় কুড়ি বৎসর। কিন্তু ড্যাকোটা বেশ চালু জাহাজ।

সোয়ার ছিলাম ঐ জাহাজেও। তার দরওয়াজাটা খোলা, মানে দরওয়াজা নেই। ওটার সামনে এবং আমাদের পেরিয়ে রয়েছে বস্তাবন্দী মালপত্র, যা কিনা আকাশ-পথ থেকে ফেলা হবে মাটিতে। তিনজন মাল-ফেলা লোক, যাদের বলা হয় "ইজেকটার"।

তারা তিনজন দাঁড়িয়ে আছে খোলা দরজায়, যা দিয়ে আসছে তুষার শীতল হাওয়া আমাদের গায়ে ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি তুলে। তাদের সামনে উঁচু করে আছে গোটা দশেক বস্তাবন্দী মালপত্র, একের উপর এক। একজন ইজেকটার ডান দিকে দাঁড়িয়ে, একজন বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে, তৃতীয়জন বসে ঠিক মধ্য স্থানে। তাদের পাশে বসে তীক্ষ্ণ চোখে দেখছি।

ম্যাপ থেকে আগেই দেখেছি কোথায় আছে ছোট্ট "DZ", কী করে ড্যাকোটা ফেলবে তাদের এবং কোথায়। পাহাড়ের অনন্ত ব্যূহ পেরিয়ে মেঘের বেড়াজাল অতিক্রম করে অকস্মাৎ আমাদের বিমান এল "DZ"-এর উপরে। একপাশে একটা উগ্র নদী, একপাশে ভয়াবহ পাহাড়ের দেয়াল, একপাশে উপত্যকা, অন্যপাশে শুধু আকাশ। বিমান বোঁ করে নেমে এল অনেক নিচে; ককপিট থেকে বোতাম টিপে বাজল একটা ঘণ্টা, জ্বলে উঠল খোলা দরওয়াজার উপরে একটা ছোট্ট আলো।

অমনি একজন ইজেক্টার পা দিয়ে ঠেলা দিল বস্তাবন্দী মালপত্র, অন্য দুজন হাত দিয়ে ঠেলা দিল শূন্যে গহ্বরের দিকে, গোটা মাল চলে গেল আমাদের দৃষ্টির বাইরে। শূন্য আকাশের রাস্তাহীন পথে। এবং হুমড়ি খেয়ে নামল "DZ"-এতে।

তখন প্লেন অনেক নিচে। হাউল ছেড়ে সে আবার উঠল সোজা উপরের দিকে, পাশের পাহাড় দেয়াল এড়িয়ে সবুজ বনের উপর দিয়ে একটা উপত্যকা ও নদীকে

আমরা কয়েকজন সাংবাদিক পাহাড়িয়া লোকেদের সঙ্গে

অতিক্রম করে এবং আবার একটা মাথা-উঁচু পাহাড়ের সংগে পাল্লা লড়তে লড়তে উঠে গেল উপরে, অনেক উপরে। সহকর্মী দেশাই ততোক্ষণ করছে বমি। এন্তার বমি; কেউ পড়েছে এলিয়ে, কেউ নিচ্ছে নিঃশব্দে ঘাম নাম, কোনো কোনো পাষণ্ডরা দিব্যি করছে হাসি-মস্করা।

আবার প্লেন ডুব দিল নিচের দিকে আকাশে, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে (ভয়াবহ !!), আবার এল "DZ"-এর উপর, আবার উঠে গেল আকাশের স্বাধীন রাজ্যে। এমনি করে চলল পুরো আধ ঘণ্টা। চলল মালপত্র ফেলা শূন্য থেকে মাটিতে। চলল দেশাই-এর বমি এবং, পাষণ্ডদের হাসি-মস্করা। নেফার অন্তহীন পাহাড়ের ঢেউ। সবুজ সবুজ পাহাড়, শাদা শাদা মেঘ, ছোট ছোট গ্রাম আর বড় বড় ভয়।

লোকেরা কেন যে আকাশে ওড়ে জানি না। বহু বহু ঘণ্টা দেশে বিদেশে উড়েছি। কিন্তু যতোক্ষণ মাটিতে পা না দিচ্ছি, ততোক্ষণ ভয়-অস্বস্তি যায় না। নেফাতেও তাই।

ক্রমশ

খগেন দে সরকার

আলোচনা

কবি সম্মেলন

'সর্ব ভারতীয় কবি সম্মেলন'-এর উদ্যোক্তাদের 'দেশ' পত্রিকার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আক্রমণাত্মক হলেও এ সম্মেলনের যে প্রচার এ পত্রিকায় হচ্ছে তার মূল্য অশেষ। এ সম্মেলন নিয়ে একটা বিক্ষোভের ধ্বনি জাগিয়ে রাখার নিশ্চয় একটা নিস্বার্থ গভীর সাধু উদ্দেশ্য আছে, নইলে 'দেশ' পত্রিকা বারবার তার জন্যে এতখানি জায়গা দিতে প্রস্তুত কেন?

আমার একটি চিঠির বিরুদ্ধে বহু আক্রমণই সেখানে দেখলাম, ভবিষ্যতেও দেখব বুঝতে পারছি। আমার চিঠির বিকৃত ভুল অর্থ করে ও যা তাতে নেই তা-ই আরোপ করে ১৩ই জুলাই সংখ্যায় যেসব অভিযোগ করা হয়েছে তার কয়েকটির মাত্র প্রতিবাদ করছি।

প্রথম :—আমার চিঠিতে কোনো ব্যক্তিকে আমি ইতর বলি নি, ইতর বলেছি সম্মানযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়ে সুলভ রসিকতা করবার ধরণকে।

দ্বিতীয় :—সনাতন পাঠককে আমি সেরাৎ করি নি। তবে তাঁর 'কে এক' বিশেষণে ইতর ভঙ্গী ছিল না বলেই মনে করি।

তৃতীয় :—'আনন্দবাজার'-এর পদাধিকারী বলে শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ লেখক ও কবিরা আমন্ত্রণ পেয়েছেন এমন কথা কোথাও লিখি নি। তাঁরা আনন্দবাজার-এর সঙ্গে যুক্ত এই ইঙ্গিতই শুধু চিঠিতে আছে।

চতুর্থ :—স্বয়ং 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদকের কাছ থেকে এখনো লেখবার আমন্ত্রণ পাই। যা পাই তাও সব সময়ে রক্ষা করা সম্ভব হয় না। জীবনে এখনো পর্যন্ত ত সনাতন পাঠকের মত মুরুব্বী ধরে লেখা ছাপাবার উমেদারির দরকার হয় নি, এমন কি কাগজের সুর বুঝে পোঁ ধরে চিঠি ছাপাবারও। সুতরাং বৈষয়িক দূরদর্শনে সনাতন পাঠকের মত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে চটাতে দ্বিধা করার কথা এ ক্ষেত্রে ঠিক খাটে কি?

আর বৈষয়িক বুদ্ধি থাকলে বাংলা দেশের এতগুলি বিচক্ষণ, বিবেকবান, সত্যনিষ্ঠ পত্রবিসকে চটাবার আহাম্মকি কেউ করে?

পঞ্চম :—পরবর্তী সমধর্মীদের জন্যে আমি কিছু করি নি ও করি না, এ কথা শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ই লিখতে পারেন। জনৈক নয়, শ্রীবিমল রায়চৌধুরীরও তাতে সাক্ষ্য দেওয়া উচিত।

তবে খামোখা ধান ভানতে শিবের গীত হিসেবে 'দেশ'-এর একটি প্রতিবাদের চিঠিতে শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের মত শব্দ ব্যবসায়ী' সম্বন্ধে কিছু না লেখা আমার গুরুতর অপরাধ সন্দেহ নেই।

নিষ্ফল জেনেও এই কটি বক্তব্য নিবেদন করে ক্ষান্ত হলাম। ভবিষ্যতে এ প্রতিবাদেরও কি পরিণাম হবে জানি। কিন্তু সাহিত্য-জগতের 'পাবলিক এনিমি নম্বর ওয়ান' বলে অভিযুক্ত হলেও আত্মসমর্থনে আর কলমের কালি অপব্যয় করব না বলেই ঠিক করেছি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র
কলকাতা-২৬

[সর্বভারতীয় কবি সম্মেলন সম্পর্কে এ-যাবৎ অনেকগুলি পত্র 'আলোচনা' বিভাগে প্রকাশ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, উক্ত কবি সম্মেলন সম্পর্কে উৎসাহীদের মতামত নিবেদন করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। অতঃপর এ সম্পর্কে আর কোনো আলোচনা প্রকাশ সম্ভব নয়। সম্পাদক দেশ]

"সেকালের রথযাত্রা"

দেশ পত্রিকায় ১৫ই আষাঢ় ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ তারিখে শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত "সেকালের রথযাত্রা" পাঠ করিলাম। এই বিষয়ে কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ায় তাহা এখানে বলিতেছি। এই প্রবন্ধে ময়মনসিংহ জেলার কালিগঞ্জের রথের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কালিগঞ্জের রথ সম্বন্ধে আমার কিছু জানা নাই। আমার এই অজ্ঞতা মার্জনীয়। মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে কালির বাজারের রথ এর স্থলে কালিগঞ্জের রথ লিখিয়াছেন কিনা বুঝা গেল না। কালিরবাজারের রথ ময়মনসিংহ জিলায় প্রসিদ্ধ।

অর্ধ শতাব্দী আগের কথা। কালির বাজারে রথ দেখিতে যাইয়া নরসুন্দরবংশজাত গোপী শীল নামক জনৈক ব্যক্তির আত্মীয়বর্গ নৌকা ডুবি হইয়া প্রাণ হারান। এই শোকাবহ ঘটনা অবলম্বনে তৎকালে একটি গান রচিত হইয়াছিল। তাহা আমার মনে নাই। ইহার কিছু অংশ এরূপ ছিল "গোপী শীলের গনা গোষ্ঠি জলে ডুইব্যা মরে, চর্‌না পাড়ার চরে।" (চর-নয়া পাড়া) এই গানটি লোকমুখে ব্যাপকভাবে গীত হইত। ফলে কালির বাজারের রথের কথা সবিশেষ প্রচার লাভ করে।

ময়মনসিংহ হইতে ঢাকা যাওয়ার পথে, ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে কালির বাজার রেল স্টেশন অবস্থিত। স্টেশন হইতে অনতিদূরে বাজারে রথের মেলা বসে। বাজার ও মেলার স্থান মুক্তাগাছার জমিদার মহোদয়গণের জমিদারী ভুক্ত ছিল। জমিদার সেরেস্তার কাগজপত্রে কালির বাজার, কালিগঞ্জ নামে লিপিবদ্ধ থাকা বিচিত্র নয়। এই স্থানে. স্থাপিত কালী-প্রতিমার সেবায়েত ছিলেন মুক্তাগাছার বদান্য জমিদারগণ। তাই কালীর নামানুসারে কালির বাজার নাম।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় কষ্ট স্বীকার করিয়া কালিগঞ্জ সম্বন্ধে আলোকপাত

করিলে যথার্থ বিবরণ জ্ঞাত হইয়া সকলের কৌতূহল নিবৃত্ত হইবে।

শ্রীনৃপেন্দ্রকিশোর চৌধুরী
রাঁচী-২

দামোদর পরিকল্পনা

২২শে আষাঢ় শনিবারের দেশ পত্রিকাতে শ্রীঅনন্ত শর্মা লিখিত 'দামোদর উপত্যকার রূপান্তর' প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু জানাতে চাই। ১০৮৬ পৃষ্ঠায় "দুর্গাপুরে দুটি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র। দামোদর প্রকল্পের......তাঁদের অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি। এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের।"

কিন্তু দুর্গাপুরে তিনটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। একটি ডি ভি সির, একটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এবং আর একটি দুর্গাপুর স্টীল ফ্যাক্টরীর মধ্যে। দুর্গাপুরের স্টীলের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষমতা যা আছে, তার দ্বারা তাদের চাহিদা মেটে না, সেজন্য ডি ভি সির কাছ থেকে বাকী চাহিদা মেটায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি দুর্গাপুর স্টেশন থেকে জি টি রোড যাবার রাস্তায় কোক ওভেন ফ্যাক্টরী সংলগ্ন। "এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের" বলে যেটি লেখা হয়েছে সেটা ভুল।

রণজিৎচন্দ্র সাহা
মাইথন

আলি আকবরের সরোদ

গত ১লা আষাঢ়ের দেশএ "আলি আকবরের সরোদ" বিষয়ে লিখেছেন শ্রীলোচন পণ্ডিত॥ খাঁ সাহেবের বাজনার প্রশংসা তিনি যা করেছেন তাতে বিন্দুমাত্র মাত্রাধিক্য নেই। খাঁ সাহেবের বাজনার মধ্যে যে কত প্রকারের বৈচিত্রপূর্ণ সংগীত-ব্যঞ্জনা আছে, তা সংগীত-রসিক কলাবিদ ও শ্রোতার কল্পনার বাহিরে। সুকোতিসূক্ষ্ম তানের জালবুনোতে বুনতে তিনি যেন স্বপ্নের রাজ্যে শ্রোতাকে নিয়ে যান। আবার ফিরে যখন আসেন গতের মুখপাতে, তখনো শ্রোতা যেন স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন। সুরের জাল বোনায় খাঁ সাহেব যেন অদ্বিতীয় শিল্পী। আবার তাঁর তালের বৈচিত্র্য অপূর্ব।

পণ্ডিত রবিশঙ্কর আজ থেকে প্রায় ১৪।১৫ বৎসর পূর্বে খাঁ সাহেব সম্বন্ধে বলেছিলেন—"যন্ত্র হাতে, চোখ বন্ধ করে ভাই আলি আকবর যেন ভিন্ন জগতে চলে যায়। মনে হয় দেবী স্বরস্বতীর আবির্ভাব হয় ওর বাজনার মাধ্যমে"—কথাটা খুবই সত্য। সরোদ হাতে খাঁ সাহেব যেখানে আঙ্গুলে রাখেন সেখানেই যেন সুর, আবার মাথা নাড়লেন যেখানে সেখানেই যেন সম্।

আলোচ্য সংখ্যায় শ্রীলোচন পণ্ডিত একটি মনোরম ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যেমন বাজনার শেষে বৃষ্টির কথা। হয়ত এটা সম্পূর্ণ কাকতালীয় ব্যাপার কিন্তু আমার দেখা এমনি একটি ঘটনার কথা আমি সবাইকে জানাবার কৌতূহল চাপতে পারলাম না। ঘটনাটি আজ থেকে ৩ বৎসর আগেকার। আমার স্কুলের আয়োজিত একটি জলসাতে খাঁ সাহেব বাজাতে আসেন। তারিখ ছিল ২৩শে আগস্ট ১৯৬৫। সে বৎসর এলাহাবাদে অত্যধিক গরম পড়েছিল। এবং বর্ষার সময় হওয়া সত্ত্বেও বৃষ্টির চিহ্নমাত্র ছিল না। আগস্ট মাসের গুমোট গরমে জলসায় বাজাতে বসেন খাঁ সাহেব, তবলায় ছিলেন বারানসীর পণ্ডিত কিসন মহারাজ। এত অস্বস্তিকর পরিবেশে থাকা সত্ত্বেও খাঁ সাহেবের বাজনা শোনার জন্য হলভর্তি লোক। বাজনা আরম্ভ করার আগে আমাকে ডেকে বললেন "আমি প্রথম দিকে আজ শুধু আলাপ বাজাবো। মেঘ মল্লার, দেশ মল্লার, রামদাসী মল্লার ও মিয়া কি মলহার। আর একটা কথা, আলাপের সময় যেন আমার কোন ছবি না তোলা হয়॥" আমি ও আমার অন্যান্য বন্ধুরা বুঝলাম যে ওস্তাদ আলিআকবর খাঁ আজ কিছু অপূর্ব বাজনা শোনাবেন। এই সূত্রে বলে রাখা ভাল যে, এলাহাবাদের শ্রোতৃবর্গের উপর ও এলাহাবাদের উপর কিছু বিশ্ব-খ্যাত শিল্পীর অদ্ভুত ভালবাসা আছে।

মলহারের চার রূপ প্রকাশ করার মধ্যে যে কি অপূর্ব মাধুর্য ছিল, গান্ধারের বক্র প্রয়োগ, ধৈবৎ ও নিষাদের পরিমিত অথচ উপযুক্ত স্বর সমাবেশ, সে সন্ধ্যায় শ্রোতাদের যেন ভিন্ন জগতে নিয়ে যায়। প্রায় ২ ঘণ্টার মত শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ রেখে ওস্তাদ আলাপ শেষ করলেন। হল ভরা লোক যেন ভুলে গেছে কোথায় তারা। আলাপের রেস ছাড়া আর কিছুই যেন হচ্ছে প্রতিফলিত হচ্ছে না। এমন সময় একজন [illegible]

বললেন—"বাইরে বৃষ্টি নেমেছে। হলের গুমোট ভাব আর নেই"। খাঁ সাহেবের কানে শুধু 'বৃষ্টি' কথাটা বোধহয় গেছে। উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে "বৃষ্টি হয়েছে?" আমি জানালাম—'হ্যাঁ বৃষ্টি হয়েছে।' তখন খাঁ সাহেবের মুখ দেখার মত। বালক সুলভ সারল্য নিয়ে আমাকে বললেন—'বিন্দু কোথায় ডাকো তাকে'—(বিন্দু আমার গুরুভাই—বিন্দু মুখার্জি—সরোদ বাজায়) বিন্দু কাছে আসতেই বললেন "বাড়িতে টেলিফোন করে দাও, ও মেজদিকে বলে দাও বাজী আমি জিতে গেছি।"

ব্যাপারটা আমাদের জানালেন অনেক পরে। প্রোগ্রামে আসার আগে বিন্দুর দিদি কথায় কথায় খাঁ সাহেবকে বললেন—"খাঁ সাহেব, কিংবদন্তী শুনি যে আপনাদের সঙ্গীতে বৃষ্টি নামতে পারে। আমরা তো গত ২ সপ্তাহ ধরে গরমে মরে যাচ্ছি। দেখুন না যদি বৃষ্টি আনতে পারেন—" কথাটা দিদি হয়ত কথার ছলে বলেছিলেন। কিন্তু ওস্তাদের অন্তরে কথাটা বেজেছিল। এ ঘটনাটিও হয়ত সম্পূর্ণ কো-ইনসিডেণ্টাল—কিন্তু শ্রীলোচন পণ্ডিতের লেখা-পড়ার পর সবাইকে জানাবার লোভ আমি সংবরণ করতে পারলামনা।

নলিন মজুমদার
এলাহাবাদ—২

ভাষা ও সাহিত্য

দেশ পত্রিকার ১৫ই আষাঢ়, ১৩৭৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভাষা ও সাহিত্য' নামক প্রবন্ধটির জন্য প্রথমেই শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই। তাঁর এই মননশীল প্রবন্ধটিতে শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রবাবু সাম্প্রতিক বাংলা গদ্য সম্পর্কে যে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সাম্প্রতিক বাংলা গদ্য সম্পর্কে তিনি যদি আরো একটু বিস্তারিত-ভাবে এর নানা দিক নিয়ে আলোচনা করতেন, তাহলে আমরা আরো লাভবান হতাম। তাঁর এই মননশীল প্রবন্ধটি পাঠ করার পর সাম্প্রতিক গদ্য সম্পর্কে আমার দু'একটি কথা নিবেদন করতে চাই।

সাম্প্রতিক প্রবন্ধগুলির বাক্যবিন্যাসগত বৈশিষ্ট সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাক্যগঠনে ইংরাজী ব্যাকরণের রীতিকে সার্থকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে; বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদের বৈচিত্র্যময় সংস্থান, ইংরাজী ধরনে বাক্যাংশ (clause) নির্মাণ করে দীর্ঘ বাক্যকে সংহত করে তোলা প্রভৃতি কৌশলের সাহায্যে গদ্যভঙ্গির মধ্যে একটা গতিবেগ ও দ্যোতনা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা দেখা যায়। এই রীতি বাংলা গদ্যে কৃত্রিম তো ঠেকেই না, বরং গদ্য আরো অমোঘ ও মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে। এই রীতির কথা বলতে গেলে প্রথমেই বুদ্ধদেব বসু ও জীবনানন্দ দাশের কথা মনে পড়ে। সুধীন্দ্রনাথও ইংরাজী রীতির সঙ্গে সংস্কৃত শব্দসম্ভার ব্যবহার করে সংহত ও ব্যঞ্জনাময় গদ্য নির্মাণ করেছিলেন। অতি সাম্প্রতিক-কালের অনেক তরুণ কবি-প্রবন্ধকারের প্রবন্ধগুলি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে দেখা যায়, তাঁরা যেন বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ পূর্ব-সূরীদের গদ্যভঙ্গিকে গ্রহণ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তাকে আরো সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এঁদের গদ্যভঙ্গির মধ্যে একটা কাব্যিক মেজাজও লক্ষ্য করা যায়। পত্রের ক্ষুদ্র পরিসরে উদাহরণ দিয়ে দেখাবার অবকাশ নেই। এই সমস্ত লেখকেরা বক্তব্যকে অধিকতর সংহত ও ব্যঞ্জনাময় করে তুলতে প্রয়াসী। বিস্তার ও বাহুল্যকে বর্জন করে গদ্যকে এঁরা একখণ্ড দ্যুতিময় হীরকের সমতুল্য করে তুলতে চান। এই প্রয়াসের ফলেই তাঁদের প্রবন্ধ বিষয়কে অতিক্রম করে একটা শিল্পশ্রীতে মণ্ডিত হয়ে ওঠে ও যথার্থ সাহিত্যপদবাচ্য হয়। প্রবন্ধও যে কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি রসসাহিত্যের মতো সমান উপভোগ্য, তা এঁদের প্রবন্ধ-গুলির দিকে চেয়ে সহজেই মন্তব্য করা যায়।

সুপ্রিয় রায়
ইমামবাজার লেন, হুগলী

সাহিত্য সংবাদ

ওড়িয়া সাহিত্য পত্রিকা

প্রতিষ্ঠান ও ধারাবাহিক ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যুদ্ধ-পরবর্তী সব ভাষার সাহিত্যেরই সামান্য লক্ষণ। অন্যদিকে, প্রতিষ্ঠান ও রক্ষণশীল কেন্দ্রগুলি নবীন সাহিত্যিকদের বিদ্রোহ ও বিস্ফোরণকে সন্দেহের চোখে দেখছেন, এবং এঁদের গ্রহণ বা স্বীকার করার ব্যাপারে তাঁদের মনোভাব শ্লথ। এখনকার নবীন সাহিত্যিকরা নিজেরাই গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে নিজেদের পত্রিকা প্রকাশ করেন।

ওড়িয়া সাহিত্যেও নবীন বিদ্রোহী সাহিত্যিকদের কয়েকটি গোষ্ঠী ও পত্রিকা আছে। বাংলা সাহিত্য যেমন মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক—তার অনেক কুফল আমরা নিশ্চিত ভোগ করছি, সুখের বিষয়—ওড়িয়া সাহিত্য কয়েকটি কেন্দ্রে সারা ওড়িশায় ছড়ানো। কটকের স্থান বেশী গুরুত্বপূর্ণ হলেও, সম্বলপুর এবং বালাসোর-এও শক্তিশালী সাহিত্যিক গোষ্ঠী আছে। ওড়িয়া সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই, শ্রী জি সি দাস লিখিত একটি প্রবন্ধ থেকে ওড়িয়া ভাষার আধুনিকতম সাহিত্য আন্দোলন সম্পর্কে কিছু সংবাদ জানা গেল। তিনটি পত্রিকা এবং তাদের পরিমণ্ডলের গোষ্ঠী এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

কটক থেকে প্রকাশিত হয় 'তিন অক্ষর' (ইংরেজিতে বলা হয়েছে থ্রি অ্যালফাবেটস্), সম্বলপুর থেকে 'অ-কবিতা' এবং বালাসোর থেকে 'কাব্য'। এই সব পত্রিকার লেখকরা ওড়িয়া সাহিত্যে নতুন পরিবর্তনের সূচনা করেছেন, সম্বলপুর ও কটকের কিছু লেখক অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন এবং শারীরিকভাবে প্রহৃত হবার শাসানি পেয়েছেন।

কটকে চারজন কবি, একজন শিল্পী, একজন নাট্যকার ও একজন সঙ্গীত পরিচালক মিলে এক আপোসহীন সাহিত্য শিল্প আন্দোলন শুরু করেন। থ্রি অ্যালফাবেট্স এঁদেরই পত্রিকা—এঁরা ইস্তাহারে ঘোষণা করেন যে তাঁরা ঐতিহ্যগত নীতিবোধ, সংস্কার, ধর্ম, প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য রীতি—সব কিছু থেকে মুক্ত হতে চান। এঁদের অন্যতম মুখপাত্র সত্যনারায়ণ মহাপাত্র বলেন যে, আমাদের জেনারেশন খুব সরল ও সহজ, প্রাচীনের সঙ্গে যে-কোনো আপোসই অর্থহীন এবং তথাকথিত সব রকম নিষ্ঠা সম্পর্কেই প্রশ্ন করা যায়।—তাঁর কথায় মনে হয়, ফরাসী অস্তিত্ববাদীদের মতই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। এই দলের অন্য একজন, বিশিষ্ট গল্প লেখক কৈলাশ লেংকা তথাকথিত শুচিতা, ভদ্রতার অন্তরালে লুক্কায়িত খোলাখুলি দেখাতে চান। এঁদের অনেকের গল্পই আত্মজীবনী ধরনের ও স্বীকারোক্তিমূলক—যা সাধারণভাবে এখন পৃথিবীর সমস্ত আধুনিক সাহিত্যেরই চরিত্র লক্ষণ।

সম্বলপুরের 'অ-কবিতা' গোষ্ঠী সোজাসুজি সাহিত্যে সীমাহীন স্বাধীনতা দাবি করেছেন। এঁরা সব কিছু ভাঙতে ভাঙতে কবিতাকেও ভাঙতে চান। সংস্কার হীনতা, উত্তেজনা ও চমক সৃষ্টিকেও এঁরা সঙ্গতভাবেই শিল্পের অঙ্গ মনে করেন। শ্রীপ্রফুল্ল ত্রিপাঠী তাঁর কবিতায়—তরুণী মেয়েদের ভবিষ্যৎ পুত্রকন্যার প্রকৃত জনক কে হবে—এই চিন্তা ও সংশয়ের কথা তুলে ধরেছেন। শ্রীউমাশংকর পণ্ডা নিজেকে বিশ্বের সমস্ত রমণীর পোষা মেষ শাবক হিসেবে বর্ণনা করতে চান। তিনি বারাঙ্গনা ভবনের সম্মুখবর্তী রাস্তায় সকলকে নগ্ন নৃত্যে সমবেত হবার জন্য আহ্বান জানান।

বালাসোর থেকে প্রকাশিত 'কাব্য' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীব্রজ রথ সাহিত্য সম্পর্কিত সমস্ত ধারনারই পরিবর্তন আনতে চান। মনুষ্য জাতি, তাঁর মতে কস্মিক দিক-স্বরতার অংশ মাত্র, সুতরাং সামাজিক গণ্ডীগুলি নিছক অর্থহীন। তিনি তাঁর শরীরের "কালো সাপের" বিবর্তনের কথা বর্ণনা করেছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। এই গোষ্ঠীর আর একজন কবি শ্রীচন্দ্রকুমার মহান্তির মতে, ভালোবাসা কোনো সুখের সম্পর্ক নয়—এ হচ্ছে বিপর্যস্ত আত্মার শেষ আশ্রয়। এঁরাও ভাষা ও ছন্দের কোনো প্রকার বিধি নিষেধ মানেন না, এবং অশ্লীলতার অভিযোগ, এঁদের মতে বুর্জোয়া সমাজের স্লোগান।

এই প্রকার সাহিত্যগোষ্ঠী নিশ্চয়ই আরও ছড়িয়ে আছে এবং নতুন তৈরী হচ্ছে। আমরা কয়েকটির পরিচয় দিলাম। তরুণ সাহিত্যিকদের এই সমস্ত বল্গাহীন রচনায় নানা বাদ-প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে—এবং ওড়িয়া সাহিত্যের আসর এই নিয়ে সরগরম।

বনফুল সম্বর্ধনা

আগামী ৪ঠা শ্রাবণ প্রবীণ গ্রন্থের লেখক বনফুল-এর ৭০ বছর বয়স পূর্ণ হচ্ছে। গল্প-উপন্যাস-কাব্য-নাটক এর সম্ভারে বনফুল বাংলা সাহিত্যকে ধনী করেছেন। তাঁর ৭০ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখক, শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে তাঁকে একটি সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের আয়োজন করা হচ্ছে। উদ্যোক্তা 'শতরূপা' পত্রিকার পরিচালকবৃন্দ।

বিশ্ব সাহিত্য বিষয়ে সেমিনার

রাইটার্স গিল্ড নামের প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্র ভারতী সমিতি ও ট্রান্স্লেটার্স সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার সহযোগিতায় "বিশ শতকের বিশ্ব সাহিত্য" বিষয়ে একটি সপ্তাহব্যাপী সেমিনারের আয়োজন করছেন সেপটেম্বর মাসে। মনে হচ্ছে, পরিকল্পনাটি বেশ বড় রকমের কিছুর। এখানে হবে পৃথিবীর সাহিত্যের বর্তমান প্রবাহের সম্পর্কে আলোচনা এবং বর্তমান সামাজিক, ধর্মীয় রাজনৈতিক ও অর্থকরী চিন্তার ভিন্নমুখী

আবহে লেখকরা যে-ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন—তার বিশ্লেষণ। সেই সঙ্গে থাকবে পুস্তক প্রদর্শনী, পোস্টার ও চলচ্চিত্র। প্রকাশিত হবে একটি তথ্যসমৃদ্ধ স্মারক গ্রন্থ। আগ্রহীদের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা, সম্পাদক, শেখর সেন, রাইটার্স গিল্ড, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭।

গল্পতন্ত্র

আর একটি নতুন গল্পের পত্রিকা। নতুন পরীক্ষামূলক গল্প ও গল্প সম্পর্কিত আলোচনা প্রকাশ করাই এদের উদ্দেশ্য। সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, লেখকের নাম নয়, লেখার গুণেই মনোনয়নের একমাত্র মানদণ্ড। প্রথম সংখ্যায় সাম্প্রতিক গল্প সম্পর্কে দুটি আলোচনা করেছেন সুবিনয় মুস্তফী ও কৌশিক লাহিড়ী। গল্প লিখেছেন সুভাষ সিংহ, চণ্ডী মণ্ডল, সুবিমল মিশ্র ও শঙ্কর ঘোষ। এবং কমল-কুমার মজুমদারের বিখ্যাত গল্প 'মল্লিকা বাহার' পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

সনাতন পাঠক

পুস্তক পরিচয়

অনুবাদ

The legend of Emperor Asoka : Jean Przyluski.

(মূল ফরাসী হইতে অনূদিত।) অনুবাদক : অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস। প্রকাশক : ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়। মূল্য ১৫·০০।

ভারত তত্ত্ববিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে য়ুরোপ মহাদেশে ফ্রান্স এবং জার্মানী—এই দুইটি দেশেরই সবিশেষ দান আছে। তবে এই দুইটি দেশের মনীষীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে—ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি ও ইতিহাসের দুইটি বিভিন্ন যুগের দিকে। জার্মান পণ্ডিতগণ যেমন ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহন বৈদিক সাহিত্যের গবেষণায় স্বকীয় বিশিষ্ট মনীষায় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ ফরাসী ভারত-তত্ত্ববিদগণের অনুরাগ বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রতিই বেশী করিয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ নিরূপণ করাও বোধ হয় খুব দুরূহ নয়। ফরাসী চিন্তাশীল মনীষিগণ স্বভাবতই উদার ভাবাপন্ন, কোনও একটি সভ্যতার বিশ্বজনীনতার প্রতিই তাঁহাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ হইয়া থাকে; মানব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে সভ্যতার যে সকল তরঙ্গ বিভিন্ন দেশ ও জাতিকে ঐক্যবন্ধনে বাঁধিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল, সে সকল সভ্যতার বিকাশের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী নিজেদের ভৌগোলিক ভাষা,আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি নিবন্ধন ভেদ বুদ্ধি বিস্মৃত হইয়া পরস্পরের নিকটে আসিতে পারিয়াছিল এবং একই মানবতাবোধের ভিত্তিতে পরস্পরের সহিত সুনিবিড় ভ্রাতৃত্ববন্ধনে মিলিত হইবার প্রেরণা লাভ করিয়াছিল—ফরাসী মনীষিগণ সহজাত প্রকৃতিবশেই সেই সকল সভ্যতার অনুশীলনে সুগভীর প্রেরণা লাভ করিয়া থাকেন। স্বর্গত অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি স্পষ্টতই ঘোষণা করিয়াছেন যে, বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে যে সার্বজনীন মানবিকতার বিকাশ ঘটিয়াছে, তাহা পাশ্চাত্ত্যের মানবিকতাবাদেরই পরিপূরক—ইহাকে তিনি Humanisme bouddhique—এই আখ্যা দিয়াছেন। বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও সভ্যতার এই সর্বজনীনতা, বিশ্বপ্রেম ও মানবিকতাই একদিন ইহাকে বহির্ভারতে প্রসার লাভে সাহায্য করিয়াছিল, ইহার ফলেই ভারতবর্ষের প্রত্যন্তভাগের একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে যে ধর্ম একদিন এক মহাপুরুষের অনুশাসনের মধ্য দিয়া জন্মলাভ করিয়াছিল, তাহাই কালক্রমে উত্তর ভারতের সমগ্র পরিধি অতিক্রম করিয়া কাশ্মীর ও গান্ধারের সীমান্ত পার হইয়া সমগ্র এশিয়া মহাদেশে আপন আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ভারতের সে এক মহান গৌরবের যুগ। কিন্তু কিভাবে বৌদ্ধধর্মের এই বিজয় অভিযান সফল হইল, কিভাবে একটি আঞ্চলিক ধর্ম কালক্রমে ভারতবর্ষ ও প্রাচ্যভূখণ্ডের সুবিশাল জনসমাজের চিত্তে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল তাহা জানিতে হইলে প্রাচীন ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ধর্মীয় এবং ভৌগোলিক ইতিহাস জানিতে হইবে; হীনযান ও মহাযান—এই দুই প্রধান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সুবিশাল সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় অর্জন করিতে হইবে; তিব্বতী চীন প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন এশীয় ভাষায় বৌদ্ধ আগম ও সাহিত্যের অনুবাদ হইয়াছিল, তাহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলন করিতে হইবে; প্রাচীন ভারতীয় সার্থবাহগণ যে সকল বাণিজ্য পথ ধরিয়া মগধ হইতে মথুরা, তক্ষশিলা, পাঞ্জাব প্রভৃতি জনপদে পরিভ্রমণ করিত তাহাদের একটি সুস্পষ্ট চিত্র আমাদের মানসপটে অঙ্কিত করিয়া লইতে হইবে। প্রতীচ্য, বিশেষ করিয়া ফরাসী দেশের ভারত তত্ত্ববিদগণ, যাঁহারা বৌদ্ধ সংস্কৃতি লইয়া চর্চায় আপনাদের নিযুক্ত রাখিয়াছেন, তাঁহারা বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিকাশ বুঝিবার জন্য শুধু হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের পালি ও সংস্কৃত ভাষানিবদ্ধ সুবিশাল সাহিত্য অনুশীলন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা তিব্বতী চীনা মঙ্গোলীয় প্রভৃতি ভাষাও অতি যত্নসহকারে আয়ত্ত করিয়াছেন, প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের সাহায্যে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিস্মৃতপ্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়গুলিকে আলোকিত করিবার জন্য তাঁহারা নিরত সচেষ্ট। কেননা, কোনও একটি ধর্মীয় আন্দোলনকে বুঝিতে হইলে যে বাস্তব পরিবেশের মধ্যে তাহার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়াছিল, সেই পরিবেশকেও বুঝিতে হইবে—নতুবা সকল প্রয়াসই বাস্তব সম্পর্কবর্জিত রক্ত-মাংসশূন্য তাত্ত্বিক (theoretical) আলোচনায় পর্যবসিত হইতে বাধ্য। ফরাসী মনীষিগণ এই সত্যটি যেমনভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের পণ্ডিতকুল সেরূপ পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। অধ্যাপক লেভির একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় : **"Use floc religieux est donc bien une unite re ella, solide, integrale, une systeme organique de civilisation".**

অধ্যাপক লেভি নিজে যেমন বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ধর্মের এই বাস্তবরূপের ধ্যানে ও অন্বেষণে আজীবন সাধনারত ছিলেন, সেইরূপ তিনি তাঁহার শিষ্যবর্গকেও সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। লেভির সাক্ষাৎ শিষ্যবর্গের মধ্যে ল্যুই দ্য লা ভালে পুস্যাঁ এবং জাঁ প্রিলুস্কির নাম বৌদ্ধ সংস্কৃতির গবেষণার ক্ষেত্রে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১৯২৩ খ্রীঃ প্রিলুস্কি 'অশোকাবদান' নামক মহাযান বৌদ্ধ সাহিত্যের গ্রন্থখানি অবলম্বন করিয়া **La Legenda de L'Emperor Asoka** নামে যে গবেষণা গ্রন্থ ফরাসী ভাষায় প্রকাশ করেন, তাহা আজও পর্যন্ত বৌদ্ধ সাহিত্যের জিজ্ঞাসু পাঠকবর্গের নিকট একটি মহামূল্যবান আকর গ্রন্থ রূপে সমাদৃত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থটির কোনও প্রামাণিক ইংরাজী অনুবাদ না থাকায় ফরাসী ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট ইহা নামমাত্রেই পরিচিত ছিল। অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস মহাশয় সম্প্রতি মূল ফরাসী হইতে এই গ্রন্থটির ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করিয়া বৌদ্ধ সংস্কৃতির অনুরাগী অধ্যাপক ও

ছাত্রগণের একটি দীর্ঘকালের অভাব দূর করিয়াছেন।

সম্রাট অশোকের নাম বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও ক্রমবিকাশের সহিত যে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত—ইহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অজ্ঞাত নয়। 'অশোকাবদান' গ্রন্থটিতে তাঁহার জীবনের বহু মূল্যবান তথ্য যেমন নিবদ্ধ আছে, সেইরূপ বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিকাশের ধারা অনুধাবন করিবার পক্ষে উপযোগী বহু ইঙ্গিতও ইহার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে। কিন্তু ওই সকল ইঙ্গিতের তাৎপর্য সাধারণের নিকট স্পষ্ট নয়। অধ্যাপক প্রিলুস্কি 'অশোকাবদান' গ্রন্থটির বিভিন্ন পাঠ অবলম্বন করিয়া যে ভাবে সেই সকল তথ্য ও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতগুলিকে ব্যাখ্যা করিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রসারের ও ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসটিকে বিবৃত করিয়াছেন তাহা যেমনই রোমহর্ষক তেমনই প্রশংসনীয়। তাঁহার এই গবেষণা হইতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মগধ হইতে মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের এই প্রসার তিনটি বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া সম্ভব হইয়াছিল। প্রথম স্তরে মগধ ছিল বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্র। দ্বিতীয় স্তরে মথুরা বৌদ্ধ সঙ্ঘের মধ্যে প্রাধান্য অর্জন করে পরবর্তী পর্যায়ে বৌদ্ধ সংস্কৃতির অনুশীলনে ও বৌদ্ধ সঙ্ঘ সমূহের সংগঠনে কাশ্মীরই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। অশোকাবদানের যে বিভিন্ন পাঠান্তরের উপর ভিত্তি করিয়া অধ্যাপক প্রিলুস্কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, মূল অশোকাবদান গ্রন্থখানি মথুরাপর্বেই প্রথম সংকলিত ও সম্পাদিত হইয়া একটি সুসম্বদ্ধ রূপ ধারণ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের এই প্রসার ও ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে মথুরার মুখ্যভূমিকা কি কারণে সম্ভব হইয়াছিল তাহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রিলুস্কি'র মন্তব্য এই স্থলে উদ্ধারযোগ্য—

"This city was situated on one of the great commercial routes of India ; besides, its monk-authors had probably further inherited from the ancient brahmanas the knowledge of Sanskrit as well as the literary and philosophical traditions."

অধ্যাপক প্রিলুস্কি'র বর্তমান নিবন্ধখানি দুইটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে 'অশোকবদান' গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য তথা বৌদ্ধ ও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে অধ্যাপক প্রিলুস্কি বৌদ্ধধর্ম ও প্রিয়দর্শী অশোকের ধর্ম মতামত তথা উত্তর ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম ও সঙ্ঘের প্রসার ও সংগঠন বিষয়ে তাঁহার অবদান স্বপক্ষে বহু অভিনব সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন। প্রথম ভাগের অন্তর্গত অধ্যায়গুলির মধ্যে সংগঠনা (First Council), বৌদ্ধ সঙ্ঘের আদি সংগঠকগণ, বৌদ্ধধর্মের প্রচারকরূপে সম্রাট অশোকের জীবনী সংক্রান্ত বিভিন্ন কিংবদন্তী, অশোকের কারা-নরক ও তাহার অধিপতি চণ্ড গিরিক সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক প্রিলুস্কি চীনা ও তিব্বতী বৌদ্ধ সাহিত্য, বিদেশীয় পর্যটকগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করিয়া যেভাবে আপন সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহা সত্যই চমকপ্রদ।

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে মূল অশোকাবদানের আনুমানিক খ্রীঃ ৩০০ অব্দে চীনা ভাষায় যে অনুবাদ প্রণয়ন হয়, তাহারই ফরাসী ভাষায় অনুবাদ। অধ্যাপক বিশ্বাস সেই ফরাসী অনুবাদেরই ইংরেজী ভাষান্তর করিয়াছেন।

এই জাতীয় গ্রন্থের ফরাসী হইতে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ সত্যই দুঃসাহসিক কার্য সন্দেহ নাই। কিন্তু অধ্যাপক বিশ্বাস প্রশংসনীয় নিষ্ঠার সহিত তাঁহার এই দুরূহ কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে প্রতি অধ্যায়ের অন্তে অধ্যাপক প্রিলুস্কি যে সকল টিপ্পনী (Notes) যোজনা করিয়াছিলেন, সেগুলি নানাবিধ মূল্যবান তথ্যে সমৃদ্ধ। অধ্যাপক বিশ্বাস সেগুলি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিয়াছেন ত বটেই, অধিকন্তু বহু স্থলে আধুনিকতম গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের সাহায্যে মূল গ্রন্থকারের বক্তব্যের সমর্থন, এমন কি কোথাও কোথাও সংশোধনও প্রস্তাব করিয়াছেন। ফলে গবেষকগণের নিকট অনুবাদখানির গৌরব বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই মনে করি। অনুবাদে মূলের স্বাদও বহুলাংশে রক্ষিত হইয়াছে ইহাও অনুবাদের পক্ষে শ্লাঘার কথা। শুধু একটি মাত্র আক্ষেপ মনে রহিয়া গেল—আমাদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এই জাতীয় একখানি মূল্যবান অনুবাদের দ্বারা সমৃদ্ধ হইল না কেন? ২৩০।৬৮

অদ্ভুত গল্প

মামাবাবু ফিরেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র। আলফা-বিটা প্রকাশনী। ৯৭-এ সারপেনটাইন লেন, কলকাতা-১৪। তিন টাকা।

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র আসলে রোমান্টিক; তাঁর রহস্যকথা-চর্চা সেই রোমান্টিকতারই এক আবশ্যিক অংশমাত্র। এ ছাড়া রহস্যে তাঁর প্রবল অনুরক্তি। জীবনের ভাঁজে ভাঁজে কতরকম যে রহস্য আছে সে কথা তিনি সর্বত্র পরখ করে দেখতে সবিশেষ আগ্রহী। এ-ও তাঁর সেই স্বভাব রোমান্টিকতার একরকম লক্ষণ। কল্পনাকে অবাধে বিস্তৃত করা তাঁর আরো একটি অভিপ্রায়। তিনি বোধ হয় চান, ছোট বড় সকলেই যেন কল্পনার দৈন্যে ক্লিষ্ট না হয়; নিছক দৈনন্দিনতার দরুনই আমাদের এত সামাজিক পীড়া কিনা কে জানে! যাই হোক, আমাদের কল্পনাশক্তিকে তিনি বাড়াতে চান বলেই অদ্ভুত সব গল্প লেখেন। কখনো বা ইংরাজীতে যাকে বলে টল স্টোরীজ সেইরকম শোনায় আবার কখনো বে ব্যাডবেরী ধরনের সায়েন্স ফিকশন-এর মতো। অবশ্য বে ব্রাডবেরীর উপমা এখানে না টানাই উচিত। 'মামাবাবু ফিরেছেন' বইটি ছোট বড় নির্বিশেষে সকলেই পড়তে পারেন। গল্পগুলি আলাদা আলাদা বটে তবে চরিত্র-গড়ন এক। অর্থাৎ বিচিত্র রহস্যই এখানে আদত বিষয় এবং সব রহস্যের নায়ক বলা বাহুল্য, সেই বিশ্বকর্মা মামাবাবু। এতেও যথারীতি সব দাঁত-ভাঙা বৈজ্ঞানিক নাম আছে, আছে আশ্চর্য সব দ্বীপের খবর এবং সাগরের তলায় কোকো দ্য মের নামে এক অদ্ভুত গাছের রহস্য। তবু গল্প আশানুরূপ জমে নি, জমে নি তার কারণ, কোথায় কোথায় যেন একটি অযত্ন ও অবহেলার ছাপ থেকেই গেছে। ফলে বড়রা বিস্ময়ে পড়বেন এবং ছোটরা পরিপূর্ণ আমেজ পাবে না। ছাপার কাজ খুব খারাপ —এও এক কারণ। ছাপা শুধু কালি আর হরফ নয়—লেখক ও পাঠকের মাঝখানে একমাত্র প্রকাশ্য সেতু।

খেলার মাঠে

কলকাতার ফুটবল মান সম্পর্কে আগেও যে কথা লিখেছি লীগ আরম্ভের পর মাস দেড়েক অতিবাহিত হবার পরও সেই কথা লিখছি। অর্থাৎ নামে ভারী ও সম্মানে ভারী দলের সঙ্গে অন্যান্য নাম-গোত্রহীন দলের শক্তি সামর্থ্যের পার্থক্য উনিশ বিশ না হলেও আঠারো বিশ। বড় বড় দলের খেলায় বড় বড় ভুল, রক্ষণব্যূহে বড় ফাটল।

দুই ব্যাক প্রথার খেলা ছেড়ে যখন স্টপার সিসটেমের মধ্যে গেলাম, তখন শোনা গেল, রক্ষণব্যূহ এখন অনেক শক্তিশালী। আবার স্টপার সিসটেম থেকে ৪ ব্যাক প্রথায় যাওয়ার পর শুনলাম, রক্ষণব্যূহ একেবারে কপাট আঁটা। গোল হবার কোনই আশঙ্কা নেই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মোহন বাগান শক্তিহীন জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে ৬টি গোল দিয়েও ২টি গোল খেয়েছে। শক্তিহীন হাওড়া ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ৫টি গোল করে খেয়েছে ১টি গোল। সমভাবে হাওড়া ইউনিয়ন ইস্ট বেঙ্গলের কাছে তিনটি গোল খেয়ে ২টি গোল করেছে। মহমেডান স্পোর্টিং, জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে ৪টি গোল করে ১টি গোল খেয়েছে। ইস্ট বেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলায় হয়েছে ৫টি গোল। তা ছাড়া একটু অভিজ্ঞতার অভাব এবং মানসিক চাঞ্চল্যের জন্য ছোট দলের খেলোয়াড়রা বড় দলের বিরুদ্ধে গোল করার সহজ সুযোগ পেয়েও কত যে গোল করতে পারেনি তা লেখাজোখা নেই। গতবারের অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ন এবং লীগ রানার্স ইস্ট বেঙ্গলের খেলায় পাঁচটি গোল হয়েছে, আরও পাঁচটি হতে পারত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বড় বড় দলের রক্ষণ-ভাগের খেলোয়াড়রা যেমন ভুলচুক করে রক্ষণব্যূহে ফাটলের সৃষ্টি করছেন, তেমন পুরোভাগের খেলোয়াড়রা করছেন সহজ সুযোগের অপব্যবহার।

ভারতীয় ফুটবলের এ দৈন্য অবশ্য চিরদিনের। তবু মনে প্রশ্ন জাগে এত শিক্ষা এবং প্রথাপ্রকরণে এত বৈজ্ঞানিক সমন্বয় সত্ত্বেও এ দৈন্য আরও প্রকট কেন? প্রথা প্রকরণেই ভুল? না, তার সঙ্গে পাল্লা টানিয়ে অক্ষমতা? কোচদের কথাটা ভেবে দেখতে বলি।

*

কলকাতা ফুটবলের মান যাই হোক ফুটবল পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। মাঠে ইটপাটকেল পড়া এবং ক্লাব তাঁবুর উপর হামলার ঘটনারও অভাব নেই।

অথচ পরিচালক সংস্থা নির্বিকার না হলেও অবস্থানুযায়ী দৃঢ়তা অবলম্বনে একেবারেই অক্ষম। তাঁদের দৃঢ়তার অভাবই যে অনেক জটিলতা সৃষ্টির কারণ সে কথা কারোই অজানা নেই।

লীগের খেলার সংখ্যা প্রায় অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ এখন সন্দেহ দেখা দিয়েছে, লীগ শেষ হবে কি না। রেফারীর পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে এবং কোন কোন ব্যাপারে আই এফ এ-র আচরণে অসন্তুষ্ট মহমেডান স্পোর্টিং লীগ থেকেই নাম প্রত্যাহারের হুমকী দিয়েছে। ইস্টবেঙ্গল চ্যারিটি খেলতে গররাজি। রাজস্থানও নিরপেক্ষ মাঠে খেলার দাবিতে বড় ক্লাবের সঙ্গে তাদের মাঠে খেলতে অনিচ্ছুক এবং লীগ থেকে সরে যেতেও প্রস্তুত। এসব সমস্যার কোন সমাধানের চেষ্টা না করেই আই এফ এ ১০ আগস্ট থেকে আই এফ এ শীল্ডের খেলা আরম্ভ করতে চাইছেন। অথচ তাদের খেয়াল নেই গত বছরের শীল্ডের ফয়সালা আজও শিকেয় ঝুলে আছে। এবারের লীগও বানচাল হতে চলেছে।

কেন এমন হবে? কলকাতার দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে ফাইনাল খেলার ব্যবস্থা করতে যারা অসমর্থ। এমন কি, শীল্ডের খেলা পরিত্যক্ত, কি দুই দলের যুগ্ম বিজয়ীর সম্মান—সেকথা বলতেও যাদের অক্ষমতা তাঁরা আবার শীল্ডের আয়োজন করেন কোন্ যুক্তিতে?

দুর্বলতা এমন জিনিস একবার কারো প্রতি তা দেখালে অপরেও পেয়ে বসে। নজির দেখিয়ে তারাও সুযোগ আদায় করতে চেষ্টা করে।

শুনতে অনেকের কানে কটু লাগবে, কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই ফুটবল থেকে শ্বেত-শাসন বিদায় নেবার পর এই দুর্বলতাই পেয়ে বসেছে আমাদের ফুটবলের মুরুব্বি-দের মধ্যে। মনে পড়ে সাহেবদের ইস্ট-

মোহনবাগান ও বি এন রেল দলের খেলায় বল কাড়াকাড়ির চেষ্টা করছেন অরুণ ঘোষ (মাথায় ব্যাণ্ডেজ) ও লতিফ

ইস্টবেঙ্গল ও ইস্টার্ন রেলের লীগের খেলায় রেল দলের গোলের মুখে পি সে ও গোলরক্ষক এস বসুর বল কাড়াকাড়ির দৃশ্য

বেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং এবং কালীঘাট ক্লাবের না খেলার হুমকীর কাছেও আই এফ এ নতি স্বীকার করেনি। এবং এই তিনটি ক্লাবকে বাদ দিয়েই লীগের খেলা শেষ করা হয়েছিল।

ওই তিনটি ক্লাবেরও অভিযোগ ছিল রেফারীর পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে। আমার একথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, আমি রেফারীর পক্ষপাতদুষ্ট পরিচালনা সমর্থন করছি। এরং আমি তাঁর ঘোর বিরোধী। যদি সত্যি সত্যিই রেফারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ থাকে তার যথার্থ তদন্ত হওয়া দরকার এবং প্রয়োজনমত ব্যবস্থা অবলম্বনও প্রয়োজন। এতদিন যে সে ব্যবস্থা হয়নি সেটাই বরং দুঃখের।

তাই বলে পরিচালক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত ক্লাব না খেলার হুমকী দেবে? তারা বিচারের আবেদন করতে পারে, প্রতিকার প্রার্থনা করতে পারে, সুবিচার পাবার দাবি করতে পারে। কিন্তু না খেলার হুমকী দিতে পারে না। যতদূর মনে পড়ে একবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এমন হুমকী দেওয়ার ফলে আই এফ এ ইস্টবেঙ্গলকে 'সতর্ক' করে দিয়েছিল। আজ আই এফ এ এমন দুর্বল কেন? কেনই বা মহমেডান স্পোর্টিংয়ের কাছে আবেদন নিবেদন?

রেফারীর পরিচালনায় কম-বেশী অনেক ক্লাবেরই লাভ-লোকসান ঘটে থাকে। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই লাভের পাল্লা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ঝোঁকে বড় বড় ক্লাবেরই অনুকূলে। কই একবারের ব্যতিক্রম ছাড়া আজ পর্যন্ত তো কোনবার কোন বড় ক্লাবের কাছ থেকে শুনলাম না যে, রেফারির পরিচালনায় তাঁরা লাভবান হয়েছেন বলে আরও খেলায় তারা প্রতিপক্ষের সঙ্গে। ... একটি অহেতুক পেনাল্টি ... ফলে ইস্টবেঙ্গলের ... সম্পাদক শ্রী জে সি গুহ ... খেলার ... জন্য আই এফ এ-র কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। সে আবেদন ... করা হয়নি। খেলার ফলাফল ... ছিল।

আমার বক্তব্য, অভিযোগের কারণ থাকলে নিশ্চয়ই তার প্রতিকার করা উচিত। সকলের সমবেতভাবে চেষ্টা করা উচিত যাতে পরিচালনার মান উন্নত হয়, রেফারীরা দুর্বলতা ও মোহের ঊর্ধে থেকে মুক্ত মন নিয়ে খেলা পরিচালনা করতে পারেন। কিন্তু তা না করে রেফারীর ভুলের অভিযোগে না খেলার সিদ্ধান্ত চরম অবাধ্যতা এবং শৃঙ্খলাহীনতা ছাড়া কিছু নয়।

*

মেক্সিকোর বিশ্ব অলিম্পিক আগতপ্রায়। মাঝখানে সময় মাত্র তিন মাস। কিন্তু অলিম্পিকে ভারতের যোগদান নিশ্চিত হলেও দলের কাঠামো এখনো অনিশ্চিত।

আমরা জানি, একমাত্র হকি ছাড়া খেলাধুলোর কোন বিষয়ে আমাদের মান বিশ্ব মানের কাছাকাছিও নয়। কিন্তু অলিম্পিকের আদর্শ অনুযায়ী ওখানে জয়লাভই বড় কথা নয়, অংশগ্রহণ বড় কথা। সততার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা মূলে নীতি। সেই নীতি ও আদর্শের জন্যই প্রধানত ভারতের অনেকগুলি বিষয়ে অংশ গ্রহণ। তার সঙ্গে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ও অন্যতম উদ্দেশ্য। তবে দলের আকার যাই হোক এবং যাদের নিয়েই ভারতের অলিম্পিক দল গড়া হোক, সেটা সময় থাকতে সেরে ফেললে অনেক সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়, মন কষাকষির প্রশ্ন থাকে না এবং প্রতিযোগীরাও অনুভব করেন না স্নায়ুপীড়া বা চিত্তচাঞ্চল্য। কিন্তু আমাদের দেশে সব কিছুই করা হয় অনেক দেরিতে এবং অনেক টালবাহানার পর। তা ছাড়া যেভাবে দল গড়া হয় তাতে আন্তরিকতারও পরিচয় থাকে না। মুখ চেয়ে মন রেখে এবং ভদ্রতা বজায় রাখার প্রয়োজনে অনভিপ্রেতকে দলে ঠাঁই দেবার ঘটনাও অনেক।

যে খেলায় আমাদের স্বর্ণ-সম্ভাবনা সেই হকির কথাই ধরা যাক।

পাতিয়ালায় অনুশীলন শিবিরে খেলোয়াড়দের গুণাগুণের নিরিখে প্রাথমিকভাবে ২৭ জন খেলোয়াড়কে বাছাই করা হয়েছে। এই ২৭ জন এখন ... শিক্ষা শিবিরে। এখানে আর একবার বাছাইয়ের পর নির্বাচিত খেলোয়াড়রা অনুশীলন করবেন ... সেখান থেকে ইউরোপ ...

উপর্যুপরি তিন বছরের উইম্বলডন বিজয়িনী বিলি জিন. কিংকে চুম্বনের মাধ্যমে অভিনন্দন জানাচ্ছেন ফাইনালে পরাজিত ক্রিস ইভার্ট

ইউরোপের কয়েকটি দেশে কয়েকটি খেলার পর মেক্সিকোর অলিম্পিক অঙ্গনে।

এখন দেখা যাক প্রাথমিকভাবে যে ২৭ জনকে নির্বাচিত করা হয়েছে তাদের মধ্যে যোগ্য না হয়েও কেউ নির্বাচিত হয়েছেন কিনা কিংবা যাঁরা নির্বাচিত করেছেন তাঁদের গুণাগুণ যাচাইয়ের পদ্ধতি কি। সব কিছু খুঁটিয়ে বিচার করতে হলে বলতে হয় নির্বাচকদের অব্যবস্থতার আড়ালে দল গঠনের প্রধান বিষয়টি কবরস্থ হয়েছে।

৭ জন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচক সমিতির বেশীর ভাগই পাতিয়ালা ক্যাম্পে হাজির হন নি। দল গঠনের সময়ও বেশীর ভাগকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ ৭ জনের মধ্যে ৪ জনই অনুপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন শুধু সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান জিমি নাগরওয়ালা, সদস্য আর এস ভোলা এবং মেজর জেনারেল কলহা। মেজর জেনারেল কলহাকে মাত্র কিছুদিন আগে সিলেকশন কমিটির সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করা হয়েছে। অনুপস্থিত ছিলেন রূপ সিং, চরঞ্জিত সিং, ভিক্টর সাইমন এবং ইন্দ্র-মোহন মহাজন।

চারজন সদস্যের অনুপস্থিতিতে নির্বাচিত ২৭ জনের মধ্যে বান্দু পাতিল, ধরম সিং ও যোগীন্দার সিং-এর গৌরবের দিন অস্তমিত। তা ছাড়া যোগীন্দার পাতিয়ালা ক্যাম্পে যোগও দেননি। প্রকাশ, স্পেশাল কেস হিসাবে যোগীন্দারকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

সত্যি বটে যোগীন্দার গুণী খেলোয়াড়। তিনি রাইট আউট এবং ইন দু জায়গাতেই খেলতে পারেন। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না এই জায়গায় খেলার জন্য যোগীন্দারের চেয়েও তরুণ এবং দক্ষ খেলোয়াড় দলে আছেন—যেমন, দুই বলবীর এবং পিটার।

নির্বাচকরা যোগীন্দারকে কী লেফট আউটে খেলাবার আশা রাখেন, যেটা বর্তমানে ভারতীয় দলের সমস্যাসংকুল স্থান? সত্যি, ভারতে এখন ভাল লেফট আউটের অভাব। তবু যদি লেফট আউটে খেলার কারো যোগ্যতা থাকে সে যোগ্যতা আছে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস কর্পো-রেশনের সহিদ নুর-এর, নির্বাচিত হয়েও অসুস্থ থাকায় নুর পাতিয়ালার অনুশীলন শিবিরে যোগ দিতে পারেন নি। স্পেশাল কেস-এর ব্যাপারটা নুর-এর উপরই প্রযোজ্য হওয়া উচিত ছিল।

ভারতীয় দলের প্রধান কোচ অতীত দিনের দিকপাল খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদও বলেছেন, নির্বাচিত দলে ভাল গোলকিপার ও লেফট আউটের অভাব আছে। তবু কিন্তু নুরকে দলভুক্ত করা হয়নি। কিংবা পরিবর্তে গোলকিপার হিসাবেও উদীয়মান তরুণদের কোচিং - ক্যাম্পে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না।

এটা কি নির্বাচকদের খামখেয়ালীপনা নয়? যে নির্বাচকদের অনুশীলন শিবিরে খুঁজে পাওয়া যায় না, যাঁরা নির্বাচনের সময় উপস্থিত থাকেন না, তাঁরা কোন প্রয়োজনে সমিতির সদস্যপদ আঁকড়ে ধরে আছেন? সভাশোভন এবং ভোটের প্রয়োজনে গোষ্ঠী ভারী করতে হলে অনেক ক্ষেত্রে সমিতি ভারী করার প্রয়োজন বুঝি। কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না যাদের আন্তরিকতার অভাব তাদের দেশ ক্ষমা করে কিভাবে? বলা নিষ্প্রয়োজন নির্বাচিত সমিতির অনেকেই অতীত দিনের নামকরা খেলোয়াড়। তবু তাঁদের মধ্যে এই আন্তরিকতার অভাব খুবই দুঃখজনক।

✻

উনিশ শ' আটষট্টির বিশ্ব অলিম্পিকের দু' বছর পরে মেক্সিকোতে আর একটি বড় খেলার বিশ্ব অনুষ্ঠান। অর্থাৎ জুলেস

[illegible] কাপ বা বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার মূল আসর।

দেশে দেশে প্রস্তুতি অনেক আগেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের খেলার তালিকা অনুযায়ী খেলা ১৯৬৯ সালের মধ্যে শেষ করতে হবে প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা। তার পর ১৬টি দেশকে নিয়ে মেক্সিকোতে মূল প্রতিযোগিতার আসর।

বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী গতবারের বিজয়ী ইংলন্ড এবং আয়োজনকারী দেশ মেক্সিকো এই ১৬টি দেশের জন্য দুই দেশ। বাকি ১৪টি দেশের জন্যই প্রাথমিক পর্যায়ের খেলার ব্যবস্থা।

প্রাথমিক পর্যায়ে এবার যোগ দিয়েছে ৭১টি দেশ। ইউরোপের ৩০টি দেশের মধ্য থেকে ৮টি (ইংলন্ড বাদে), দক্ষিণ আমেরিকায় ১০টি দেশের মধ্য থেকে ৩টি, মধ্য ও উত্তর আমেরিকার ১২টি দেশের মধ্য থেকে ১টি (মেক্সিকো বাদে), এশিয়া ও ওশিয়ানিয়ার ৮টি দেশের মধ্য থেকে ১টি এবং আফ্রিকায় ১১টি দেশের মধ্য থেকে ১টি দেশ মূল প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পাবে। প্রাথমিক পর্যায়ে খেলার তালিকা অনুযায়ী প্রতি দেশকে নিজেদের দেশে এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর দেশে গিয়ে খেলতে হবে।

এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে যাতে অন্তত একটি করে দেশ মূল প্রতিযোগিতায় খেলায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পায় সেই উদ্দেশ্যে ফিফা খেলার তালিকা রচনায় ইউরোপের দেশগুলির সুযোগ সুবিধা কিছু সঙ্কুচিত করেছেন। ১৯৫৪ সাল থেকে যখন ১৬টি দল নিয়ে মূল প্রতিযোগিতার খেলার ব্যবস্থা হয়, তখন থেকে ফুটবল সমৃদ্ধ ইউরোপের দেশগুলিই মূল প্রতিযোগিতায় দলে ভারী। ১৯৫৪ সালেই ছিল ১২টি দেশ। এবং তখন থেকে গতবারের প্রতিযোগিতা পর্যন্ত যে ১৬টি দেশ সেমিফাইনালে খেলেছে তাদের মধ্যে ১২টি দেশই ইউরোপের। কিন্তু ১৯৭০ সালে ইংলন্ড সমেত ৯টির বেশী ইউরোপীয় দেশ মূল প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পাচ্ছে না। ইউরোপের ফুটবল সমাজ এই ব্যবস্থাকে ইউরোপের প্রতি অবিচার বলে বর্ণনা করেছেন।

যাই হোক, খেলার প্রাথমিক তালিকায় কয়েকটি দেশের উপরও অবিচার করা হয়েছে। যেমন, গতবারের মূল প্রতিযোগিতায় দুই দেশ পর্তুগাল ও সুইজারল্যান্ড গ্রুপ—১-এ পড়েছে। এর অর্থ একটিকে প্রাথমিক খেলা থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে। ১৯৬২ সালের রানার্স চেকোস্লোভেকিয়া এবং গতবারে কোয়ার্টার ফাইনালিস্ট হাঙ্গেরীও পড়েছে গ্রুপ—২-তে। এদেরও একটিকে মূল প্রতিযোগিতার আগে থেকে সরে যেতে হচ্ছে।

মোহনবাগান ও এরিয়ানের লীগের খেলায় মোহনবাগান গোলকিপার বি দে একটি বল ফিস্ট করছেন, পাশে দাঁড়িয়ে নাঈম

এশিয়া ও ওশিয়ানিয়া থেকে ৮টি দেশ নাম দিলেও শেষ পর্যন্ত ক'টি দেশ প্রাথমিক পর্যায় খেলবে বলা শক্ত। গতবার এশিয়ার ১৮টি দেশের মধ্যে মাত্র উত্তর কোরিয়াই শেষ পর্যন্ত খেলেছিল এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয়ের সুবাদে মূল প্রতিযোগিতায় খেলার অধিকার পেয়েছিল।

নীচে ১৯৭০ সালের বিশ্ব কাপের প্রাথমিক পর্যায়ের খেলার তালিকা দেওয়া হল।

ইউরোপ থেকে

(প্রতি গ্রুপের একটি দল মূল প্রতিযোগিতায় খেলার অধিকার পাবে)

গ্রুপ ১—পর্তুগাল, সুইজারল্যান্ড, রুমানিয়া ও গ্রীস;

গ্রুপ ২—হাঙ্গেরী, চেকোস্লোভেকিয়া, আয়ারল্যান্ড ও ডেনমার্ক;

গ্রুপ ৩—ইটালী, পূর্ব-জার্মানী ও ওয়েলস;

গ্রুপ ৪—রাশিয়া, নর্দার্ন-আয়ারল্যান্ড ও তুরস্ক;

গ্রুপ ৫—ফ্রান্স, সুইডেন ও নরওয়ে;

গ্রুপ ৬—স্পেন, যুগোস্লাভিয়া, বেলজিয়াম ও ফিনল্যান্ড;

গ্রুপ ৭—পশ্চিম-জার্মানী, স্কটল্যান্ড, অস্ট্রিয়া ও সাইপ্রাস;

গ্রুপ ৮—বুলগেরিয়া, নেদারল্যান্ড, পোল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গ;

গ্রুপ ৯—ইংলন্ড (গতবারের বিজয়ী)

দক্ষিণ আমেরিকা থেকে

(প্রতি গ্রুপ থেকে একটি দল মূল প্রতিযোগিতায় খেলবে)

গ্রুপ ১০—আর্জেন্টিনা, পেরু ও বলিভিয়া;

গ্রুপ ১১—ব্রাজিল, ভেনেজুয়েলা, কলম্বিয়া ও প্যারাগুয়ে।

গ্রুপ ১২—উরুগুয়ে, চিলি ও ইকোয়েডর;

মধ্য ও উত্তর আমেরিকা থেকে

(গ্রুপ ১৩ থেকে মাত্র একটি দল মূল প্রতিযোগিতায় খেলবে)

গ্রুপ ১৩(এ)—কোস্টারিকা, হণ্ডুরাস ও জামাইকা;

গ্রুপ ১৩(বি)—গুয়েতেমালা, ত্রিনিদাদ ও হাইতি;

গ্রুপ ১৩(সি)—সান স্যালভাডোর, সুরিনাম ও নেদারল্যান্ড-অ্যান্টিলেস;

গ্রুপ ১৩(ডি)—ইউ এস এ, বারমুডা ও কানাডা;

গ্রুপ ১৪—মেক্সিকো (মূল প্রতিযোগিতার আয়োজনকারী দেশ)

এশিয়া ও ওশিয়ানিয়া থেকে

(গ্রুপ ১৫ থেকে মাত্র একটি দল মূলে প্রতিযোগিতায় খেলবে)

গ্রুপ ১৫(এ)—জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, রোডেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া;

গ্রুপ ১৫(বি)—উত্তর কোরিয়া, ইজরাইল ও নিউজিল্যান্ড;

আফ্রিকা থেকে

(গ্রুপ ১৬ থেকে মাত্র একটি দল মূলে প্রতিযোগিতায় খেলবে)

গ্রুপ ১৬(এ)—আলজেরিয়া ও টিউনিসিয়া;

গ্রুপ ১৬(বি)—মরোক্কো ও সেনেগাল;

গ্রুপ ১৬(সি)—ইথিওপিয়া ও লিবিয়া;

গ্রুপ ১৬(ডি)—সুদান ও জাম্বিয়া;

গ্রুপ ১৬(ই)—ক্যামেরুন ও নাইজেরিয়া;

গ্রুপ ১৬(এফ)—ঘানা।

(ক্রমশঃ)

রকহ্যাম্পটন রকেট

কথায় বলে, 'বার বার তিনবার'। রড লেভারের ক্ষেত্রে কথাটা খেটে গিয়েছিল। আবার একই খেলোয়াড় পর পর দু'বার উইম্বলডন জেতে না বলে যে প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছিল, তারও অসারতা প্রমাণ করে-ছিলেন 'রকহ্যাম্পটন রকেট' রড লেভার।

উনিশ শ' উনষাট সালের উইম্বলডন ফাইনালে পেরুর এলেস অলমেডোর কাছে হেরে গিয়েছিলেন লেভার। পরেরবারের ফাইনালে হেরেছিলেন স্বদেশীয় (অস্ট্রেলিয়া) নীল ফ্রেজারের কাছে। উনিশ শ' একষট্টিতে লেভার আবার উইম্বলডন ফাইনালে। বার বার তিনবার। এবার আর পরাজয় নয়। বাছাই তালিকার দুই নম্বরে থেকেও বিশ্ব টেনিসের শ্রেষ্ঠ সম্মান পেয়েছিলেন ফাইনালে আমেরিকার চাক ম্যাকিনলেকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে।

সুতরাং উনিশ শ' বাষট্টির উইম্বলডনে লেভার এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড়। কথা উঠল, লেভার কী এবারও উইম্বলডন জিতে প্রবাদের অসারতা প্রমাণ করতে পারবেন? প্রবাদ অবশ্য ফলাফলের অনিশ্চয়তায়। ১৯২১ সাল পর্যন্ত উইম্বলডনে চ্যালেঞ্জ রাউন্ডের ব্যবস্থা থাকাকালীন একজন খেলোয়াড়ের পক্ষে পর পর ৬ বছর বিজয়ীর সম্মান অর্জন করা সম্ভব হলেও ১৯২২ সালের পর থেকে কচিৎ কদাচিৎ পর পর দু'বার একের কণ্ঠে বিজয়ীর জয়মালা উঠেছে। ব্যতিক্রম শুধু গ্রেট ব্রিটেনের ফ্রেড পেরী, আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ এবং অস্ট্রেলিয়ার লুই হোড।

উনিশ শ' বাষট্টিতে রড লেভারও আর একবার প্রবাদের অসারতা প্রমাণ করে পর পর দু'বার উইম্বলডন জয় করলেন ফাইনালে স্বদেশীয় মার্টিন মুলিগানকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে। সুতরাং ব্যতিক্রমের তালিকায় তাঁরও স্থান হল।

এবার কথা উঠল লেভার কী পারবেন আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ-এর মত টেনিসের প্রধান পাঁচটি প্রতিযোগিতা জয় করে গ্রান্ড স্লাম-এর অধিকারী হতে? লেভারের অধিকারে তখন অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স ও উইম্বলডনের চ্যাম্পিয়নশিপ। বাকি ফরেস্ট হিল (আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপ) ও ইটালীর প্রতিযোগিতা। কিন্তু শুধু পাঁচটি বড় প্রতিযোগিতা নয়—তার সঙ্গে জার্মান চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে পৃথিবীর একমাত্র খেলোয়াড় হিসাবে একই বছরে ৬টি প্রধান প্রতিযোগিতা জয় করলেন।

তবু টেনিস-পণ্ডিতদের সন্দেহ, লেভার পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় কিনা। এবার কথা উঠল, অসাধারণ দক্ষতা-সম্পন্ন খেলোয়াড়রা যখন একে একে অ্যামেচার টেনিসের আসর থেকে সরে যাচ্ছেন তখন তাঁদের ব্যতিরেকে যে প্রতি-যোগিতার আয়োজন তার বিজয়ীকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করি কিভাবে? হলেনই বা তিনি ৬টি বড় প্রতিযোগিতার বিজয়ী।

হয়তো লেভারের অভিমানে আঘাত লাগল। নিজের যোগ্যতা প্রমাণের জন্যই প্রোফেশনালদের দলে যোগ দিলেন। বলা বাহুল্য, সেখানেও তিনি নিজ শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং এবার উইম্বলডনের প্রথম মুক্ত আসরে আবার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে প্রমাণ করেছেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় না হলেও সর্বকালের যাঁরা স্মরণীয় তাঁদের কারো চেয়েই তাঁর দক্ষতা কম নয়।

অ্যামেচার ও প্রোফেশনাল টেনিসে অনেক কীর্তির অধিকারী ২৯ বছর বয়সী রড লেভার কুইন্সল্যান্ডের রকহ্যাম্পটন গ্রামের ছেলে। অস্ট্রেলিয়া টেনিসের দ্রোণাচার্য হ্যারী হপম্যানের শিক্ষায় টেনিসের সুনিপুণ শিল্পী। খেলার মধ্যে রকেটের গতি। তাই টেনিস জগতে 'রকহ্যাম্পটন রকেট' নামে খ্যাতি।

লেভারের দেহের উচ্চতা ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি হলেও তাঁর অবয়ব ঠিক উঁচু দরের অ্যাথলীটের মত নয়। পা কিঞ্চিৎ বাঁকা। খেলেন বাঁ হাতে। অর্থাৎ স্বদেশীয় নর্মান ব্রুকস ও নীল ফ্রেজার এবং মিশরের জারোস্লাভ ড্রবনীর মতই ন্যাটা খেলোয়াড়। কিন্তু গলফ্ খেলেন ডান হাতে। ধরে নেওয়া যেতে পারে, দুই হাতেই তাঁর সমান জোর এবং বর্ন-বল প্লেয়ার। তার কাঁধ, দুই বাহুর গড়ন খুবই মজবুত, যেন স্টিলের তৈরি। আবার প্রয়োজনে তার মধ্যে পেলবতার পর্যাপ্ত পরিচয়।

সার্ভিসের রকেট গতিই লেভারের খেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। সার্ভিসে গতির সঙ্গে থাকে স্পিন। যেদিক খুশি বল ধাবিত করতে পারেন। স্লাইসড রিটার্ন, ফ্লাট রিটার্ন ও টপ স্পিন রিটার্নে সিদ্ধহস্ত। টপ স্পিনে ব্যাকহ্যান্ড বেশী কার্যকরী। হাতে সবরকমের মার, চটুল পদক্ষেপ, কোর্ট ক্র্যাফট, অনমনীয় দৃঢ়তা এবং বিগ গেম টেম্পারামেন্ট—সব মিলিয়ে রডনি লেভার টেনিসে সর্বকালের স্মরণীয়-দের অন্যতম।

মুকুল

গুপী গাইন বাঘা বাইন : নৃপতি চট্টোপাধ্যায়কে নির্দেশ দিচ্ছেন সত্যজিৎ রায় ফটো—দেশ

অভূতপূর্ব প্রাকৃতিক দুর্যোগ গেছে গত সপ্তাহে। মেঘ আর বর্ষণের এমন দাপট নাকি গত তেষট্টি বছরে দেখা যায় নি। চলচ্চিত্রাকাশও ওই একই সময়ে ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হতে থাকে। বাংলা চলচ্চিত্রের জগতেও এমন দুর্যোগ বুঝি এর আগে আর দেখা যায়নি। তারই মধ্যে "কখনও

নতুন সংকট

মেঘ" আসি আসি করেও আসতে পারল না। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় "কখনও মেঘ" উপলক্ষ করেই।

"কখনো মেঘ"-এর পরিবেশক গত সপ্তাহেই ছবিটির মুক্তির ব্যবস্থা করেন। এই সংবাদ পেয়ে পশ্চিমবঙ্গ চিত্রশিল্প সংরক্ষণ সমিতির সভ্যরা দলে দলে গিয়ে ওই পরিবেশকের অফিসের সামনে হাজির হন। তাঁরা সেখানে এই চিত্রমুক্তির বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করেন, চিত্র পরিবেশকের কাছে তাঁদের দাবি সরাসরি পেশ করেন। পরিবেশক ছবির মুক্তি স্থগিত রাখেন।

কলকাতার যে-কয়টি প্রেক্ষাগৃহে নিয়মিত বাংলা ছবি দেখানো হয় (উত্তরা, পূরবী উজ্জ্বলা, রূপবাণী, অরুণা, ভারতী, মিনার, বিজলী, ছবিঘর, শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা, বীণা বসুশ্রী, রাধা, পূর্ণ এবং প্রাচী) ওই সব "চেনে" ছবি রিলিজ-এর ব্যাপারে সংরক্ষণ সমিতির কী সিদ্ধান্ত বা বক্তব্য এবং বাংলা চিত্র প্রদর্শনীর অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমিতির কী অভিযোগ সাংবাদিক বৈঠকে সমিতির মুখপাত্রদের উক্তির ভিত্তিতে তা গত সপ্তাহে আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে সমিতির দুটি প্রধান দাবির পুনরুল্লেখ করি : এক, প্রদর্শকরা তাঁদের পছন্দমত একটি ছবি দেখাবেন, এবং পরের ছবি নির্বাচন করবেন সমিতির রিলিজ কমিটি। অর্থাৎ এইভাবে একটির পর একটি ছবি দেখানো হবে একবার প্রদর্শকের পছন্দ এবং রিলিজ কমিটির নির্বাচন অনুসারে। দুই, প্রদর্শক এবং প্রযোজকের মধ্যে ছবির আয়ের সমান বণ্টনের ব্যবস্থা।

সমিতির সিদ্ধান্ত, এই দাবি পূর্ণ না হলে উক্ত "চেন"গুলিতে ১২ জুলাইয়ের পর কোন

"[illegible]"-এর একটি দৃশ্যে [illegible] ফটো—দেশ

সুবোধ মুখার্জি প্রোডাকশনস-এর "শাগিদ" —সমীর গাঙ্গুলি পরিচালিত এই হিন্দী চিত্রটি অবিলম্বে মুক্তি পাচ্ছে—ছবির একটি দৃশ্যে জয় মুখার্জি ও সায়রা বানু

নতুন বা পুরনো বাংলা ছবি এবং ইংরেজী কিংবা হিন্দীচিত্র দেখানো চলবে না। গত সপ্তাহে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা, রাধা এবং পূর্ণ চিত্রগৃহে যখন পুরনো বাংলা ছবি মুক্তির ব্যবস্থা হয়, তখন সংরক্ষণ সমিতির সভ্যরা ওই সব চিত্রগৃহের সামনে সত্যাগ্রহ করেন এবং দর্শকদের অনুরোধ করেন তাঁরা যেন টিকিট না কাটেন। এবং নিজেদের বক্তব্যও তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা করেন। সত্যাগ্রহীদের মধ্যে বিশিষ্ট প্রযোজক, পরিচালক, পরিবেশক এবং শিল্পীরাও ছিলেন। যে-সব চিত্রগৃহে পূর্বে রিলিজ করা ছবি দেখানো হচ্ছিল ওই সব সিনেমার সামনে অবশ্য সত্যাগ্রহ হয়নি। বীণা ও বসুশ্রীর সামনে সত্যাগ্রহ হয়নি। যেহেতু এই দুটি চিত্রগৃহে বছরের বেশীর ভাগ সময় হিন্দী চিত্র দেখানো হয় তাই সিনেমা দুটিকে সত্যাগ্রহের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। দর্শকের অভাবে পূর্ণ সিনেমায় শো বন্ধ থাকে। অন্য হলগুলিতে দর্শকের সংখ্যা [illegible]।

প্রদর্শকদের বক্তব্য

সংরক্ষণ সমিতির সংগ্রাম যে-কয়টি সিনেমা গৃহের বিরুদ্ধে ওই সব হলের মালিকরা গত বুধবার (১০ জুলাই) এক সাংবাদিক বৈঠকে তাঁদের বক্তব্য উপস্থিত করেন। বীণা ও বসুশ্রীর কর্তৃপক্ষও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। পরে তাঁরা সংবাদপত্রে একটি বিবৃতিও দেন। প্রদর্শকদের পক্ষ থেকে শ্রীদীপচাঁদ কাংকারিয়া, শ্রীনেপাল দত্ত, শ্রীকেন্দু দত্ত, শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী[illegible] প্রভৃতি উক্ত বৈঠকে সংরক্ষণ সমিতির অভিযোগের উত্তর দেন। তাঁরা বলেন বাংলা ছবির সংকট কিংবা ছবির সংখ্যা যে কমে আসছে তার জন্য চিত্র-প্রদর্শকরা দায়ী এ কথা ভুল। চিত্র প্রযোজনার হার যে নিম্নগামী তার কয়েকটি প্রধান কারণ সম্পর্কে চিত্র প্রদর্শকরা বলেন, দেশ বিভাগের পর বাংলা ছবির ব্যবসায় ক্ষেত্র এত সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে যে স্বল্প ব্যয়ে ছবি তৈরি না হলে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের পক্ষে সংকট উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন। কিন্তু এখনও ব্যয়বহুল বাংলা চিত্র নির্মাণের প্রবণতা দেখা যায়। প্রসঙ্গত জনৈক প্রদর্শক সাংবাদিকদের প্রশ্ন করেন, ছয়।সাত লাখ কিংবা ততোধিক টাকায় তৈরি বাংলা ছবির প্রযোজক যদি পয়সা না পান সেজন্য কি চিত্র প্রদর্শক দায়ী? এই বিষয়ে আলোচনাকালে প্রদর্শকরা "অ্যানপ্ল্যানড প্রোডাকশন", (চিত্র প্রযোজনায় সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব), "ফ্রীল্যান্স প্রোডাকশন" (নিয়মিত চিত্র প্রযোজনার বহির্ভূত প্রয়াস), স্টার-সিস্টেম এবং প্রযোজনা ক্ষেত্রের আরও অনিয়ম ও গলদ এবং তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেন। অর্থ বিনিয়োগকারীর সংখ্যা কমে যাওয়ার কথাও তাঁরা উল্লেখ করেছেন। সংরক্ষণ সমিতি 'তারকা'-হীন বা স্বল্প ব্যয়ে নির্মিত ছবি প্রদর্শনের যে দাবি উত্থাপন করেছেন সে-প্রসঙ্গে প্রদর্শকরা বলেন, "তারকাহীন" ছবি আমরা বহুকাল যাবতই দেখিয়ে আসছি। অনেক প্রগতিশীল চিত্র পরিচালকের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক ছবি আমরা আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে দেখিয়েছি। আমরা ওই সব ছবি না দেখালে বাংলাদেশের দর্শকরা নতুন এক্সপেরিমেন্ট এর কথাই বা জানতেন কী করে?

সমিতির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে বিরোধের নিষ্পত্তিতে চিত্র প্রদর্শকদের কী আপত্তি থাকতে পারে এই জিজ্ঞাসার উত্তরে তাঁরা বলেন, প্রথম থেকেই সমিতি আমাদের বাদ দিয়ে চলেছেন। আমরা মানে 'একজিবিটার' ছাড়া প্রদর্শক বাঁচতে পারেন না, প্রদর্শক ছাড়া আমরাও বাঁচতে পারি না। সব সমস্যার সমাধান সহযোগিতার মধ্য দিয়েই হওয়া উচিত। কিন্তু সমিতি অসহযোগিতার মনোভাব নিয়ে চলেছেন। তা-ছাড়া, সমিতিকে চিত্র প্রযোজকদের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা বলা চলে না। বেশ কিছু সংখ্যক প্রযোজক ব পরিবেশক সংরক্ষণ সমিতির হাতে তাঁদে ছবি তুলে দেননি। এবং যে-ভাবে সমিতি বাংলা ছবির রিলিজ নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন তা মেনে নেওয়া যায় না। এই অধিকার তাঁদের হাতে কোন যুক্তিতে তুলে দেব?

সংবাদপত্রে এক বিবৃতি মারফ প্রদর্শকরা জানিয়েছেন, ছবির আয়ের বণ্টন প্রসঙ্গে সংরক্ষণ সমিতি ভুল তথ্য প্রচার করছেন। সমিতি প্রচার করছেন, সিনেমা মালিকের ভাগ ৭০।৭৫ শতাংশ। আসলে গড়ে তা ৫৩ শতাংশ। বিবৃতিতে আরও কয়েকটি ভুল তথ্যের উল্লেখ করা হয়। সংরক্ষণ সমিতির নির্বাচন অনুযায়ী চিত্র মুক্তি প্রসঙ্গে বিবৃতিতে বলা হয় "চিত্র পরিচালক, স্টুডিও এবং শিল্পী নির্বাচনের স্বাধীনতা প্রযোজকদের আছে শিল্পী ও কলাকুশলী নির্বাচনের স্বাধীনতা পরিচালকের আছে; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সংরক্ষণ সমিতি রিলিজ কমিটি মারফৎ প্রদর্শকদের ছবি নির্বাচনের স্বাধীনতা অস্বীকার করছেন।"

কলাকুশলীদের সাহায্যে চিত্র-প্রদর্শকদের দান

কলকাতার চিত্রপ্রদর্শকরা [illegible] চলচ্চিত্র-শিল্পের কলাকুশলীদের [illegible] এক নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ [illegible]। সম্প্রতি এক বিবৃতিতে [illegible] প্রদর্শক-সংঘের [illegible]

দিবারাত্রির কাব্য : মাধবী মুখোপাধ্যায়

মাস থেকে "আই-এন-আর"-এর (রিলিজ) কলকাতার প্রদর্শকরা ১৯৬৮ সনের আগস্ট রিলিজদের ছবির জন্য ভাড়া। ১০ শতাংশ পরিমাণ অর্থ স্বেচ্ছায় রাজ্য সরকার দেবেন। এই টাকায় রাজ্য সরকার বাংলা ঐতিহাসিক তথ্যচিত্র তৈরি করে কলকাতার কলাকুশলী ও স্টুডিও কর্মীদের কাজে নিয়োগ করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এই অর্থদান। উৎকৃষ্ট ও সফল বাংলা চিত্রের সংখ্যা কমে যাওয়ায় বাংলা কলাকুশলীরা যে অনিশ্চয়তার মধ্যে আছেন সে কথা ভেবেই প্রদর্শকরা তাঁদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছেন।

সমিতির জবাব

ই-আই-এম-পি-এ'র চিত্র প্রদর্শক শাখার সভাপতি সম্প্রতি যে বিবৃতি দিয়েছেন তার উত্তরে চিত্রশিল্প সংরক্ষণ সমিতি বলেছেন, প্রদর্শক শাখার সভাপতি বাংলা ছবির গুণগত উৎকর্ষ হ্রাস এবং তার দরুন ছবির ব্যবসায়িক অসাফল্যের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সমিতি তাঁদের বিবৃতিতে বলেন, তিনি (প্রদর্শক শাখার সভাপতি) প্রকৃত দোষীকে খুঁজে বের করতে পারেননি। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে, ছবির টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থের মোটা অংশ প্রদর্শকরাই নিয়ে থাকেন।

কলাকুশলীদের সাহায্যার্থে চিত্র প্রদর্শকরা যে অর্থদানের প্রস্তাব করেছেন সে সম্পর্কে সমিতির মন্তব্য: পরিকল্পনাটি প্রশংসনীয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যাবে, যে টাকা তাঁরা দিতে চেয়েছেন তার পরিমাণ অতি সামান্য। এতে মাত্র দুটি তথ্যচিত্র তৈরি হতে পারে। যে-কোন ব্যক্তির পক্ষে অনুমান করা শক্ত নয় যে, পশ্চিমবঙ্গ চিত্রশিল্প সংরক্ষণ সমিতির মধ্যে ভাঙন ধরানোর জন্যই এই উদ্যম। প্রদর্শকরা দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁদের ধর্মঘটী কর্মচারীদের সঙ্গে সংগ্রাম করছেন। "চ্যারিটি" নিজের ঘরে আরম্ভ হলেই ভাল হয় না কি? বাংলা চিত্রশিল্পের চিত্রপ্রযোজনা শাখা প্রদর্শকদের "চ্যারিটি"র উপর বাঁচতে চান না।

প্রাসঙ্গিক টুকরো খবর

নীল ব্যাজ ধারণ করে সংরক্ষণ সমিতির স্বেচ্ছাসেবকরা যখন বিভিন্ন হলের সামনে প্রথম সত্যাগ্রহ শুরু করেন তখন দর্শকদের অনেকেই ঠিক বুঝতে পারেন নি, কেন এই সংগ্রাম এবং বাংলা ছবির প্রদর্শন বন্ধ করার এই চেষ্টা কেন। তাঁদের আসল ব্যাপারটা বিশেষভাবে বোঝাতে হয়। স্বেচ্ছাসেবকদের অনুরোধে অনেক দর্শকই ফিরে যান। অস্বাভাবিক অবস্থায় অনেকে হলে ঢুকতে সংকোচ বোধ করেন। কেউ কেউ আবার ছবি দেখতে ঢোকেন। হলের সামনে সংরক্ষণ সমিতির তরফ থেকে অনেকেই বক্তৃতা দেন। তাঁদের মধ্যে বিকাশ রায়, ঋত্বিক ঘটক, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, রবীন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সত্যাগ্রহ শান্তিপূর্ণভাবেই চলে। কোন এক বক্তার মন্তব্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনামাত্র সংরক্ষণ সমিতির কাউনসিল অব অ্যাকশন এই নির্দেশ দেন, কোনপ্রকার অশোভনতা, অভদ্রতা ও অসংযম যেন সমিতির স্বেচ্ছাসেবকদের বক্তৃতায়, কর্মে ও ব্যবহারে প্রকাশ না পায়। কিছুসংখ্যক দর্শকের টিকিট কাটার সময় কিংবা ছবি দেখে বেরিয়ে আসার সময় "শেম, শেম" ধ্বনি দেওয়া হয়েছে বলে শোনা যায়।

✽

শিল্পীদের অনেকেই প্রেক্ষাগৃহের সামনে গিয়েছিলেন। এবং সত্যাগ্রহ করেছেন। উত্তমকুমারও বাদ যাননি। তিনি উজ্জ্বলা চিত্রগৃহের সামনে দাঁড়িয়ে দর্শকদের অনুরোধ করেছেন তাঁরা যেন এখন ছবি

"তিন অধ্যায়" : সুপ্রিয়া দেবী ও অজয় গাঙ্গুলী

না দেখেন। উজ্জ্বলায় ছিল উত্তমকুমার অভিনীত "অগ্নিপরীক্ষা" ছবি। জনপ্রিয় নায়ককে সশরীরে দেখতে পেয়ে অনেকেই হৃষ্টমনে টিকিট না কেটে ফিরে যান। উত্তমকুমার তাঁর নিজের অভিনীত ছবি না দেখতে অনুরোধ করছেন এই ঘটনার অভিজ্ঞতাও দর্শকদের কাছে অভূতপূর্ব। সত্যাগ্রহ চলাকালে বিভিন্ন হলের সামনে যে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দেখা যায় তাঁদের মধ্যে অজিত বসু, অসিত চৌধুরী, তপন সিংহ, মঞ্জু দে, হরিদাস ভট্টাচার্য, অজয় কর, মঙ্গল চক্রবর্তী, পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুবোধ মিত্র, বিভূতি লাহা, পিনাকী মুখোপাধ্যায়, সরোজ দে, সত্যনারায়ণ খাঁ, গিরীন্দ্র সিংহ, অনিল চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, মৃণাল সেন, সুধীর মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। একাধিক সাহিত্যিক সত্যাগ্রহে যোগ দিয়েছেন, খবর পাওয়া যায়। সত্যজিৎ রায় হলের সামনে গেছেন এই সংবাদ পাওয়া যায়নি। সত্যাগ্রহের প্রথম কয়েক দিন তিনি "গুপী গাইন"-এর শুটিং নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। অবশ্য সংরক্ষণ সমিতির যে সভায় সংগ্রামের সংকল্প ঘোষিত হয় তাতে সত্যজিৎ রায় উপস্থিত ছিলেন।

*

সত্যাগ্রহ শুরু হবার পর স্টুডিওতে দুটি ছবির শুটিং চলেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। একটি "গুপী গাইন বাঘা বাইন", অপরটি "রাহুগ্রাস"।

চলচ্চিত্র ও নাটক নিয়ে মননশীলতার আন্দোলন

ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনকে ধন্যবাদ, মননশীল বাংলা সিনেমা পত্রিকার সংখ্যা-গুলি আজকাল বেশ নিয়মিতই প্রকাশ পায়। ওই ধরনের সাময়িক পত্র এখন যথেষ্ট। এ ছাড়া নাট্যরসিকদের জন্য আছে দুই-একটি উচ্চাঙ্গের সাময়িক নাট্য-পত্রিকা। কিন্তু একই সঙ্গে চলচ্চিত্র এবং নাট্যকলা দুই-ই যার উপজীব্য এরকম পত্রিকা ইদানীং বাংলায় ছিল বলে মনে হয় না। এমনই একটি দ্বি-মাসিক—নাম "অভিনয় দর্পণ"—সেদিন হাতে এল।

"অভিনয় দর্পণ"-এর (প্রধান সম্পাদক : শ্রীঋত্বিক ঘটক) প্রথম সংখ্যায় দেখা যাচ্ছে নাটককেই কিছু প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। একটি একাঙ্ক (পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং একটি নাটকের (ঋত্বিক ঘটক) অংশ ছাড়া এতে নাট্যবিষয়ক নানা আলোচনামূলক রচনা স্থান পেয়েছে। নাটক ও নাট্যপ্রযোজনা সম্পর্কে ছয়জন নাট্যকারের মতামত-সংবলিত "নাট্যচিন্তা" ফিচারটি এই প্রথম সংখ্যার বিশেষ সম্পদ। সিনেমা বিভাগের দুটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ : "তথ্যচিত্র" (গুরুদাস ভট্টাচার্য) ও "বাংলা চলচ্চিত্রের তথাকথিত সংকট" (ঋত্বিক ঘটক)।

"অভিনয় দর্পণ"-এর প্রথম সংখ্যাটি নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক। শুধু আমাদের একটু খটকা লেগেছে সম্পাদকীয় নিবন্ধটি ("আমাদের কথা") শেষাংশ পড়ে। এখানে [illegible] রয়েছে : "...শিল্পই [illegible] নির্ভর, কিন্তু [illegible] না হইলে তাহা [illegible] হয় না। অতএব [illegible] অনুভূত। কারণ, বর্তমান [illegible] বিচারে, ইহাই হইতেছে একমাত্র পবিত্র কর্তব্য।"

অথবা, বক্তব্যের জাতি, নঞর্থক; সত্য সদর্থক। রাজনীতিতে কী হয় সে কথায় কাজ নেই, কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে কি সদর্থক ভাবের অনুসন্ধান করা যায়? **চিত্রকল্প** (সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা), **চিত্রভাষ** (নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটি) এবং **চিত্রবীক্ষণ** (সিনে সেণ্ট্রাল) —এই তিনটি পত্রিকাতেই কিছু মূল্যবান, একাধিক বিতর্কমূলক এবং উন্নাসিক রচনা রয়েছে।

'চিত্রকল্প' পত্রিকায় শ্রীকিরণময় রাহার "যন্ত্র, মানুষ এবং সিনেমা" সুবিবেচনা-প্রসূত রচনা। সত্যজিৎ রায়ের ছবি এবং বুর্জোয়া-শাসিত সমাজের (তিনির নির্দিষ্ট রচিত) মধ্যে যোগাযোগ নির্ণয় করা কঠিন, তবে লেখক এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। একটি "হতাশার নাম চিড়িয়াখানা" সম্পর্কে সব মন্তব্য পড়ে অনেক পাঠকের হতাশ হবারই কথা। যাই হোক, চিত্রকল্পে আরও কিছু লেখা আছে যা পড়বার মত, যেমন শ্রীঋত্বিক ঘটকের "চিত্রনাট্য"।

"চিত্রভাষ"-এ শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর শিল্পীজীবনের কথা বলেছেন। ফ্যানদের তা ভাল লাগবে। আর কয়েকটি প্রবন্ধ দেখে, গভীরভাবে চিন্তা করার আগ্রহ যত কম, চিন্তাশীলতা দেখাবার ব্যগ্রতা তত বেশী।

বাকি দুটি পত্রিকার মত "চিত্রবীক্ষণ" থেকেও বিদেশের চলচ্চিত্র সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়। আর একটি বিষয় জানা গেল, "হিরোশিমা মনামুর অথবা মনামুর" নিয়ে আলোচনা বুঝি শেষ হবার নয়।

স্বরলিপির শাপমোচন

সম্প্রতি মহাজাতি সদনে স্বরলিপির সদস্য শিল্পী ও ছাত্রছাত্রীরা প্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব ও রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে বিচিত্রানুষ্ঠান ও নৃত্যনাট্য 'শাপমোচন' পরিবেশন করেন। বিচিত্রানুষ্ঠানে যোগ দেন চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, তন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সলিল বসু, আবদুল কাশেম রহিমুদ্দিন প্রভৃতি শিল্পীরা। 'শাপমোচন'-এর গান করেন সাগর সেন, পূরবী মুখার্জি, সুস্মিতা ঘোষ, তাপস গুপ্ত, ও আরও অনেকে এবং নৃত্যের ছন্দ সুষমায় সাধন গুহ, পক্তি গুহ, পিনাকী রায় ইত্যাদি দর্শকদের মুগ্ধ করেন। নেপথ্যে থেকে কাজী সব্যসাচী এবং কাজল চৌধুরী কণ্ঠদান করেন।

বোম্বাই বিচিত্রা

শ্রাবণের আকাশ মেঘলা। মাঝে মাঝেই বৃষ্টি হচ্ছে। এখানকার চলচ্চিত্রাকাশও এখনো মেঘাচ্ছন্ন। অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সময় সময় চলচ্চিত্রশিল্পের নেতারা যে আলোচনায় বসেন না তা নয়। আলোচনা কী ধরনের হতে পারে তা অনেকটা অনুমান করেছি। এতে সত্যের কিছুটা প্রতিফলন থাকতে পারে।

জনৈক : এত ঝামেলার দরকার কী, চারিদিকে শুধু অবিচার, অনাচার আর নৈরাজ্য। চলচ্চিত্র ব্যবসা ন্যাশনালাইজ করা হোক। অন্য জনের কণ্ঠ পঞ্চমে : চলচ্চিত্রের প্রতি যার এতটুকু ভালবাসা আছে, যে চলচ্চিত্রের উন্নতি মনেপ্রাণে কামনা করে সে ভাবতেই পারে না চলচ্চিত্রকে ন্যাশনালাইজ করার কথা। চলচ্চিত্রকে জাতীয়করণ করা মানেই চলচ্চিত্রের কবর খোঁড়া। সরকারী ফাইলের কানুনী চাপে চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ একেবারে চেপটে যাবে। এটা ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, তবু এ কথা বলব যে, চলচ্চিত্রকে জাতীয়করণ করার পক্ষে শুধু তাঁরা রায় দেবেন যাঁরা এ ব্যবসায়ে অসফল। আর একজন বললেন: এসব আলোচনায় কোন ফল হবে না। বর্তমানে চলচ্চিত্র ব্যবসার সবচেয়ে বড় শত্রু হল চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে এক অবাঞ্ছিত সম্প্রদায়। যোগ্য ব্যক্তি, যোগ্য স্থানে থাকলে কোন সমস্যাই সমস্যা নয়। আজ এমন প্রচুর চলচ্চিত্র নির্মাতা আমাদের মধ্যে আছেন, তেল কলের ব্যবসা করলে অনেক বেশী মানাতো তাঁদের। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের প্রবেশ-দ্বারে কিছু প্রহরী বসানোর প্রয়োজন। প্রবেশদ্বারে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তনই চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করতে পারে। নীচু গলায় মন্তব্য: প্রবেশদ্বারের প্রহরীরা যাতে ঘুষ-ঘাস না নেন, পক্ষপাতিত্ব না করেন তা দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হোক। এবং সে কমিটি যাতে কোন রকম অনাচারকে প্রশ্রয় না দেয় সেদিকে আমাদের সকলের দৃষ্টি সজাগ থাক। অপর মন্তব্য : তা হলে চলচ্চিত্রের সমস্ত সমস্যা আকাশে উবে যাবে। কারণ, এত দিকে নজর রাখার পর চলচ্চিত্র বানানোর দিকে নজর দেবার আর কোন সময়ই থাকবে না কারোর।

গম্ভীর গলার ঝঙ্কার : এটা বাচালতা করার জায়গা নয়। এখানে আমরা চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ মানে নিজেদের এবং দেশের সাংস্কৃতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে বসেছি। আগামী কাল আমরা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কে কে শাহর সঙ্গে আলোচনাচক্রে বসব। এভাবে চললে সরকার তো সরকার এমনকি পাবলিকও আমাদের পক্ষে সায় দেবে না। আমার মতে সেল্ফ রেগুলেশনই সবচেয়ে ভাল রেগুলেশন। আমরা নিজেরা ঠিক পথে ঠিক মত চলি না বলেই বাইরের লোক আমাদের উপদেশ দিতে আসে। ভারতের মত দেশে, সর্বভারতীয় স্তরে ছবি তৈরী করা যে কি কঠিন কাজ, সেটা বাইরে থেকে আন্দাজ করার সাধ্য কারুর নেই। যেসব মহান ব্যক্তিরা আমাদের অহরহ উপদেশ দিয়ে থাকেন, তাঁদের উপদেশ শিরধার্য করেও আমি শুধু এইটুকু অনুরোধ করব যে তাঁরা নিজেরা ছবি করে একবার অন্তত বুঝুন গেড়োটা কোথায়। মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়া বা ঘরে অফিসে বসে রেজোলিউসন তৈরী করা এক জিনিস আর ময়দানে এসে কাজকরা আর এক জিনিস। আজ যদি আমার "অ্যাট অল" কিছু বলার থাকে সেটা হচ্ছে সেই একটি মাত্র কথা যে, কথা অনেক হয়েছে এবার আসুন, আমরা সবাই মন দিয়ে কাজ করি।

একটি উন্নাসিক স্বর : কথাটা যা বললেন সেটা লাখ কথার এক কথা। কিন্তু যারাই মন দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছেন বর্তমান চলচ্চিত্র ব্যবসা-ব্যবস্থা তাদের জান নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। অনেক সার্থক, মানে ব্যবসায়িক অর্থে সার্থক চলচ্চিত্র নির্মাতা অনেক ভনিতা করে ঘোষণা করে থাকেন যে, তাঁরা সার্থক, কারণ তাঁরা মন দিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন--আমি জানিনা মন বলতে তাঁরা "অ্যাকচুয়ালী" কি "মীন" করেন। কালো টাকাকে সাদা টাকা [illegible] যে মন এবং মস্তিষ্কের [illegible] এবং মস্তিষ্ক দিয়েই যে ভাল ছবি করা যায় তা আমি বিশ্বাস করি না।

একজন সার্থক চিত্রনির্মাতা : আপনার বিশ্বাস অবিশ্বাসের ওপর ভারতীয় চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে না। আপনি যা পারেন না, তা আরেকজন পারছেন। যে পারে সে আপনার থেকে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, আপনার অন্তরের জ্বালা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এ কথা বলার বোধহয় প্রয়োজন নেই যে, দ্বিতীয় দল বেশী ক্ষমতাশালী তাই তাঁরা বেশী সফল। আপনারা যাঁরা প্রগতির ধ্বজাধারী তাঁরা কালো টাকা, স্টার সিসটেমের মধ্যে ছবি করতে অসমর্থ। কিন্তু যাঁরা কালো টাকা, স্টার সিসটেমকে মেনে নিয়ে ছবি করছেন, তাঁরা কিন্তু প্রগতিবাদী আবহাওয়াতেও ছবি করতে সমর্থ থাকবেন।

সরল শর্মা

"শেষ থেকে শুরু" শেষ

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নাটক অবলম্বনে গৌর সাহা চিত্রপীঠের "শেষ থেকে শুরু" সম্প্রতি সেন্সরের ছাড়পত্র পেয়েছে। "চিত্রসাথী" ছদ্মনামের অন্তরালে অভিজ্ঞ কলাকুশলী-গোষ্ঠী ছবিটি পরিচালনা করেছেন। ছবির কয়েকটি প্রধান চরিত্রের রূপ দিয়েছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর মজুমদার, বিদ্যা রাও, সবিতাব্রত দত্ত, লতিকা দাশগুপ্ত, স্বপনকুমার প্রভৃতি। "ইঙ্গিত" নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরাও ছবিতে রয়েছেন। অনিল বাগচী এবং নচিকেতা ঘোষ যুগ্মভাবে ছবিতে সুরারোপ করেছেন।

অরুন্ধতী দেবীর 'মেঘ ও রৌদ্র' ছবিতে স্বরূপ দত্ত ও হাসু বন্দ্যোপাধ্যায় ফটো—দেশ

... এর করেছে। ... রবীন্দ্রনাথের ... নাট্যরূপে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'। ... রেলওয়ে ... ক্লাব (হাওড়া) রেলওয়ে ... অভিনয় করেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'দোর থেকে দূরে'। সব কটিরই পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন রণজিৎ দত্ত এবং নাট্যরূপকল্পতায় তাঁর পরিচালনার সৌষ্ঠব প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রশংসা লাভ করে।

বর্তমানে তাঁরই নির্দেশনায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা কর্মী রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ জ্ঞান চট্টোপাধ্যায় রচিত 'আজকাল' নাটকটি ৩রা সেপ্টেম্বর স্টারে মঞ্চস্থ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। উত্তর কলকাতার প্রখ্যাত শৌখীন নাট্যসংস্থা শিল্পীতীর্থ তাঁর অতি সাম্প্রতিক নাটক "আহ্বান" শীঘ্রই মঞ্চস্থ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

... তাঁদের দ্বিতীয় বার্ষিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আয়োজন করেছেন। ঐ অনুষ্ঠান রবীন্দ্র সদনে আগামী ১৯, ২০ ও ২১ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে।

এবারকার অনুষ্ঠানে কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতে ভারতের বিভিন্ন ঘরানার যে সমস্ত বিখ্যাত শিল্পীরা যোগ দেবেন তাঁরা হলেনঃ কুমার গন্ধর্ব, সিদ্ধেশ্বরী দেবী, পণ্ডিত জয়সরাজ, আমিজ আমেদ খাঁ, এম আর গৌতম, চিট্টিবাবু, রাধিকামোহন মৈত্র, বলরাম পাঠক, বসন্ত রনদে প্রমুখ শিল্পীরা। কথক নৃত্যের আসরে অংশ নেবেনঃ বিরজু মহারাজ। সঙ্গতে থাকবেন কিষণ মহারাজ। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের পরিচালনায় তবলা ও মৃদঙ্গের দ্বৈত অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন—কিষণ মহারাজ ও পলঘাট মনি।

কার্লো পন্তির "ক্যাসানোভা লেজেণ্ড" ছবিতে মার্চেলো মাস্ত্রোয়ানি ও সেনতা লিন—ছবিটির মুক্তির বিলম্ব নেই

"হাঙ্গর" নাটকের অভিনয়

বিশিষ্ট নাট্যকার ও নির্দেশক শ্রীরণজিৎ দত্তের (চিত্রসাংবাদিক) সামাজিক নাটক 'হাঙ্গর' অভিনয় করলেন হরিনাভির (২৪ পরগণা) সাপ্তাহিক সংস্থা। গুয়ালেশ ইনস্টিটিউটের সভ্যবৃন্দ বিশ্বরূপামঞ্চে অভিনয় করলেন শ্রীদত্ত কর্তৃক নাট্যরূপায়িত

জেমিনির নতুন হিন্দী চিত্র "তিন বহুরানীয়াঁ"

জেমিনির নতুন ছবি "তিন বহুরানীয়াঁ" এ-সপ্তাহে প্যারাডাইস, প্রিয়া, পূর্বশ্রী এবং শহরতলির বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। ছবিটি নতুন আঙ্গিকের পারিবারিক চিত্র বলে ঘোষিত। এস এস ভাসান এবং এস এস বালন ছবিটি পরিচালনা করেছেন। সংগীত পরিচালনা করেছেন কল্যাণজী আনন্দজী।

পাঠকের চোখে

জীবন সংগীত : রিনা ঘোষ ও অনিল চট্টোপাধ্যায়

বাংলা ছবির বাধ্যতামূলক প্রদর্শনী

সবিনয় নিবেদন,

একথা আজ আর কারো অজানা নেই যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর থেকে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প ক্রমশ এক ভয়াবহ ও বিপদজনক পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে চলেছে। সামনের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও সংকটের কথা ভেবে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের শুভানুধ্যায়ীরা সকলেই শংকিত হয়ে উঠবেন। একটি তথ্য থেকে জানা যায়, ১৯৩৯ সালে বাংলাদেশে যেখানে চৌদ্দটি স্টুডিও ছিল আজ সেখানে মাত্র চারটি স্টুডিওতে কাজকর্ম চলছে। আগে যেখানে বছরে প্রায় ষাট-সত্তরটি বাংলা ছবি নির্মিত হতো, আজ সেখানে বছরে মাত্র চব্বিশ-পঁচিশটি ছবি তৈরি হচ্ছে। বাংলা চিত্রপ্রযোজনার এই নিম্নগামী হারকে রোধ করতে না পারলে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পকে বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়বে। সংকটমুক্তি না ঘটলে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কলাকুশলীদের জীবিকার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। বাংলা চলচ্চিত্রের এই সংকটের মূলে রয়েছে একাধিক কারণ। দেশ বিভাগের ফলে বাংলা চলচ্চিত্রের প্রদর্শনক্ষেত্র স্বভাবতই অনেকখানি সংকুচিত হয়েছে। তার উপর রয়েছে হিন্দীচিত্রের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা। বাংলাদেশে হিন্দী ছবি বাংলা ছবির চেয়েও বেশী জনপ্রিয় এরকম একটা দাবি বা যুক্তি প্রায়ই শুনতে পাই। এই যুক্তির সমর্থনে সংখ্যাতত্ত্ব উদ্ধৃত করে বলা হয়, বাংলাদেশের প্রায় শতকরা আশিটি সিনেমা হলে হিন্দী ছবি প্রদর্শিত হয়, যদিও বাংলাদেশের ৩২০টি হলের মধ্যে শতকরা বিশ-পঁচিশটি হলে বাংলা ছবি (একক অথবা হিন্দী ছবির সঙ্গে যুগ্মভাবে) প্রদর্শিত হয়ে থাকে। হিন্দী ছবির উৎকর্ষই এই ব্যবসায়িক সাফল্যের মূল কারণ একথা ভাববার পেছনে কোন যৌক্তিকতাই নেই। বরঞ্চ কথাটাকে ঘুরিয়ে বলা যায় সাধারণ হিন্দী ছবিতে, কুরুচিই এই ব্যবসায়িক সাফল্যের মূল কারণ। হিন্দী ছবি প্রেমীদের হয়ত এই সহজ সরল কথাটি স্বীকার করতে ঘোরতর আপত্তি হতে পারে। তবুও এই সত্যটি দিবালোকের মতই স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। অবশ্য হিন্দী ছবির মধ্যেও ভাল ছবি রয়েছে, কিন্তু সংখ্যায় তা' নিতান্তই নগণ্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাংলাদেশে হিন্দী ছবির এই ব্যাপক প্রদর্শনের সংখ্যাতত্ত্ব বাঙালী জনমানসের সত্যিকারের নিরিখ নয়। একটির পর একটি হল যে হিন্দী ছবির কুক্ষিগত হচ্ছে, বাংলা ছবির 'রিলিজ চেন' ছিঁড়ে যাচ্ছে এর মূলে রয়েছে, এক সিনেমা হল-মালিকদের পৃষ্ঠপোষকতা। আমি প্রকৃত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সাধারণ দর্শক বাংলা ছবি পান না বলেই যে কোন হিন্দী ছবি দেখেই প্রমোদতৃষ্ণা (বা সিনেমা-তৃষ্ণা) নিবারণ করেন। বাংলাদেশের জেলা শহরগুলির সিনেমা হলে বাংলা ছবি খুবই কমই দেখানো হয় বলে স্থানীয় জনসাধারণ প্রবল অনীহাসত্ত্বেও হিন্দী ছবি দেখতে বাধ্য হন। এ প্রসঙ্গে আমার এক বন্ধুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ না করে পারছি না। উল্লিখিত বন্ধুটি (পেশায় ইঞ্জিনীয়ার) দক্ষিণ ভারতে কর্মস্থলে থাকবার সময় কেবলমাত্র সিনেমাতৃষ্ণা মেটাবার জন্যই তামিল-তেলেগু ছবি দেখতে বাধ্য হয়েছে, যদিও সেই ছবিগুলির বেশীর ভাগ অংশই দুর্বোধ্য থাকত। আমার মূল বক্তব্য এই যে দর্শক সাধারণ বাংলা ছবি পাচ্ছেন না বলেই বিকল্প হিসেবে হিন্দী সিনেমা দেখতে বাধ্য হচ্ছেন। তা ছাড়া হিন্দী ছায়াছবিকে নানাবিধ নাচগান ও অন্যান্য প্রলোভনের মাধ্যমে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টাও লক্ষণীয়। এ হেন বহু কার্যকারণের ফলে হিন্দী ছবির ক্ষেত্র ক্রমেই প্রশস্ত হচ্ছে আর অন্য দিকে বাংলা ছবির ক্ষেত্র ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে আসছে। বাংলা ছায়াছবির এই সংকটের কথা বাংলার লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, শিল্পী, শিক্ষাব্রতীদের ভাবিয়ে তুলেছে এটাই আজকের এই দুর্দিনে আশার কথা। বাংলা ছায়াছবির সংকট মোচন করবার উদ্দেশ্যে তাঁরা সরকারের কাছে কতগুলি প্রস্তাব করেছেন। তার মধ্যে একটি প্রস্তাবে বলেছেন, বাংলা দেশের প্রতি সিনেমা হলে বাংলা ছবির প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রতিটি সিনেমা হলে যদি বাংলা ছবি দেখানো হয়, তবে বাংলা ছবি প্রদর্শনের ক্ষেত্র অনেকখানি প্রসারিত হবে, যার ফলশ্রুতি হবে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের পুনরুজ্জীবন। আশার কথা, রাজ্য সরকার বাধ্যতামূলকভাবে বাংলা ছবি প্রদর্শনের ব্যাপারটি নিয়ে আদেশ জারী বা আইন প্রণয়ন করার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। তবে লক্ষ রাখতে হবে, আদেশ জারী করার ব্যাপারটি সরকারী লালফিতায় বাঁধনে না ফেঁসে যায়। এই আইন প্রণয়ন করার ব্যাপারে কোন প্রাদেশিকতা নেই, আছে শুধু শিল্পসমন্বিত বাংলা চলচ্চিত্রকে বাঁচিয়ে রাখার একটি সৎ প্রয়াস।

দিলীপকুমার [illegible]

কলকাতা-[illegible]

কলকাতায় বৃষ্টির রেকরড সৃষ্টি এই সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গত ৮ জুলাই সোমবার বিকালে শুরু হয়ে একনাগাড়ে একটানা মঙ্গলবার মাঝ রাত অবধি বৃষ্টি চলেছে। এইদিন বিকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টার মোট বৃষ্টির গড় পরিমাণ ২০৮·২ মিলিমিটার, গত ৬০ বছরের রেকরড। আবহাওয়াবিদদের মতে ১৯০৫ সালের পর এমন বিপর্যয় মহানগরীতে আর হয়নি। বর্ষণের মাঝে মাঝে ঝড়। ঝড়ের সর্বোচ্চ গতি ছিল ঘণ্টায় ৭২ কিলোমিটার। রাত ৯-২২ মিনিটে গঙ্গায় বান আসে। জল সর্বত্র, কোথাও হাঁটু জল, কোথাও বা কোমর জল। শত শত গাড়ি সেই জলে ডুবে বিকল হয়ে পড়ে। কয়েকটি অঞ্চলে পুরনো বাড়ি ধসে পড়ে। টিটাগড়ে একটি পুলিস ফাঁড়ির ছাদও ধসে যায়। দুইটি স্থানে নালার জলে ডুবে দুইটি বালক-বালিকার মৃত্যু হয়। ট্রাম-বাস ও অন্যান্য যানবাহন চলাচল বিপর্যস্ত হয়। অনেকগুলি বিমান বাতিল হয়ে যায়। জলে রেল লাইন ডুবে যাওয়ার ফলে দক্ষিণ সেকশনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। হাওড়া সেকশনেও বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। মাঠে ফুটবল খেলাও হয়নি। অফিসে, দফতরে এদিন কর্মচারীদের উপস্থিতির সংখ্যাও খুবই কম ছিল।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৮ জুলাই—আজ কিছু মেডিক্যাল ছাত্র-ছাত্রীর প্রচণ্ড বিক্ষোভের ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেন, সিনডিকেট ও সেনেটের প্রায় ২০ জন সদস্য, চারটি কলেজের অধ্যক্ষবৃন্দ প্রায় পাঁচঘণ্টা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে আটক হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত পুলিস এসে তাঁদের ঘেরাও-এর হাত থেকে উদ্ধার করে।

উপ-প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই আয়কর কমিশনারদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, দু' বছরের মধ্যেই হিসাব-নিকাশ করে সমস্ত বকেয়া আয়কর আদায় করা হোক তিনি দেখতে চান। এবং কর ফাঁকির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। গত ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনাদায়ী আয়করের পরিমাণ ৫৬৭ কোটি টাকা।

৯ জুলাই—পশ্চিমবঙ্গের বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীদের প্রধানমন্ত্রীও কিছুটা হতাশ করেছেন। শ্রীমতী গান্ধী আজ কলকাতায় তাঁদের অন্যতম নেতা শ্রীবিজয় সিং নাহারের সঙ্গে মিনিট দশ-পনেরো কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁদের কথা নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের কোন নেতার সঙ্গে কোন আলোচনা করেননি।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ দমদম বিমানঘাঁটিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, সোভিয়েত সরকার পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাতে আমি খুশী নই। এদিনই গৌহাটিতে তিনি বলেন, পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহের সিদ্ধান্তে বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

১০ জুলাই—রাশিয়া পাকিস্তানকে ঠিক কি কি অস্ত্র দিচ্ছে ভারত সরকারের হাতে এখনও তার পূর্ণ তালিকা পৌঁছয়নি। তবে জানা গিয়েছে, আয়ুব খান মসকো থেকে বিমান ও ট্যাঙ্কধ্বংসী নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র (গাইডেড মিসাইল) এবং ভারি টি ইউ বোমারু বিমান পাচ্ছে।

আজও কলকাতা এবং শহরতলিতে সারাদিন বৃষ্টি হয়। তবে আগের দিনের মত প্রলয়ঙ্কর নয়। কলকাতার উপকণ্ঠে বিভিন্ন জলমগ্ন এলাকা থেকে এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার দুর্গত নরনারী ও শিশুকে উদ্ধার করা হয়।

১১ জুলাই—শিক্ষার উন্নতির জন্য শিক্ষা দফতর থেকে জাতীয় আয়ের ছয় শতাংশ বিনিয়োগের যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে অর্থ-দফতর নীতিগতভাবে তা অনুমোদন করেছেন বলে জানা গিয়েছে। এই প্রশ্নে মতভেদের দরুন জাতীয় শিক্ষা নীতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হচ্ছে।

১২ জুলাই—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে সম্প্রতি যে চিঠি দিয়েছেন তার একটি ব্যাপারে নয়াদিল্লিতে বিস্ময়ের সঞ্চার হয়েছে। পত্রটিতে ফরাক্কা বাঁধ ও গঙ্গার জল নিয়ে ভারত-পাক বিরোধের উল্লেখ আছে। অনেকের মতে এই উল্লেখ কূটনৈতিক দিক থেকে অশোভন। কারও কারও মতে এটা সরাসরি ভারতের আভ্যন্তর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ। প্রধানমন্ত্রী পত্রটির উত্তর রচনায় ব্যস্ত।

গত কয়েকদিনের প্রচণ্ড বৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে দশ লক্ষের মত লোক দুর্গত, হাজার হাজার একর ধানের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্ধমান, নদীয়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার কোন কোন অংশে ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। একমাত্র হুগলী জেলাতে দুর্গতের সংখ্যা অন্তত আড়াই লক্ষ।

১৩ জুলাই—শ্রীগোবিন্দনারায়ণ সিংহ যদিও আশ্বাস দিয়েছেন যে, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করবেন না, তবু মধ্যপ্রদেশ মন্ত্রিসভার সংকট কাটেনি। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সংযুক্ত বিধায়ক দলের মধ্যে যে ভাঙন ধরেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওয়াকিবহাল মহলের খবর : মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ সিংহ ৫৫ জন সদস্যসহ নিঃসর্তে কংগ্রেসে ফিরে যেতে চান।

দুর্গাপুরে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলির সর্বত্র কর্মনিয়োগ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অবশ্য ছোটখাটো দুই-একটি কারখানায় সামান্য কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কিছু লোককে মাঝে মাঝে নিয়োগ করা হচ্ছে।

১৪ জুলাই—নয়াদিল্লির এক সংবাদে প্রকাশ : ভারতের বিরুদ্ধে পরিচিত পাকিস্তানী জেহাদী জিগির শোনা যাচ্ছে। এবার লড়কে লেঙ্গে আওয়াজ প্রথম তুলেছেন পাক পররাষ্ট্র-মন্ত্রী আরশাদ হোসেন। তারপর খোদ প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ। পাক বেতারে যথারীতি তা প্রচারিত হচ্ছে। দুজনেরই মূল বক্তব্য : কাশ্মীর ও ফারাক্কা সমস্যার ফয়সালা চাই, নতুবা পাকিস্তানী হাতিয়ার ও ফৌজ তৈরি রাখা হচ্ছে।

আজ বিকালে বালী ব্রিজের কাছে সশস্ত্র দুর্বৃত্ত একটি পেঁয়াজ বোঝাই থামিয়ে দুজন মহাজনকে জোর করে ধরে যায়। দমদম পুলিশ এ সম্পর্কে একজ গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনাটি ব্যারাকপুর মহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।

বিদেশী সংবাদ

৮ জুলাই—পাক প্রেসিডেনট আয়ুব খানের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনের প্রতিবাদে গত রাত্রে একদল ছাত্র লনডনে পাক হাইকমিশন অফিস আক্রমণ করে এবং অফিসটি দখল করে বসে থাকে। পুলিশ আজ সকালে অফিস থেকে তাদের সকলকে বের করে দেয়।

৯ জুলাই—আজ ক্রেমলিনে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোসিগিন ও ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের মধ্যে দেড় ঘণ্টা ধরে আলোচনা চলে। তখন পাকিস্তানকে অস্ত্র বিক্রির সোভিয়েট সিদ্ধান্তে ভারতের গভীর উদ্বেগের কথা ডঃ হোসেন জ্ঞাপন করেন বলে জানা গিয়েছে।

সামরিক দফতর আজ সায়গনে ঘোষণা করেছেন যে, ভিন লালং প্রদেশে দক্ষিণ ভিয়েতনামী সেনাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতকংরা শ্বাসরোধকারী গ্যাস ব্যবহার করেছে।

১০ জুলাই—ফ্রানসের প্রধানমন্ত্রী পঁপিদু (৫৭) আজ প্রেসিডেনট দ্য গলের নির্দেশে পদত্যাগ করেন। ইদানীংকালে পঁপিদুর মত দীর্ঘকাল ধরে প্রধানমন্ত্রিত্ব করার সৌভাগ্য আর কারো ভাগ্যে ঘটেনি। প্রেসিডেনট মরিস কু দ্য মরভিলকে নতুন সরকার গঠনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

১১ জুলাই—চেকোস্লোভাকিয়া সম্পর্কে প্রাগ ও মসকো থেকে নানা সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে বোঝা যায় যে, সেখানে একটি দারুণ সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক নাটক মঞ্চস্থ হতে চলেছিল। পরিশেষে যবনিকার অন্তরালে একটা মীমাংসা আপাতত ঘটেছে। উত্তেজনা এখনকার মত প্রকাশ্যে প্রশমিত।

১২ জুলাই—চেকোস্লোভাক সরকার এবং সামরিক নেতারা গতকাল জনগণকে এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, সোভিয়েট রাশিয়া চেকভূমি থেকে সকল রুশ সৈন্য সরিয়ে নিতে রাজি হয়েছে।

"স্বৈরাচারীদের স্বাগত জানানো চলবে না" লেখা ফেসটুন নিয়ে বিক্ষোভকারীরা প্রথমে স্টকহোমের বিমানবন্দরে ও পরে এক সমাবেশে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোসিগিনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করেন।

১৩ জুলাই—ছয় দিনের বন্যায় পূর্ব-পাকিস্তানের মোট ১৫০ জন ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। চট্টগ্রামেই মৃত্যুর সংখ্যা সব চাইতে বেশী। একটি বেসরকারী খবরে প্রকাশ, এই বন্যায় পূর্ব-পাকিস্তানের এক কোটিরও বেশী লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কম্যুনিস্ট চীন থেকে প্রতি মাসেই দেড় হাজারের মত লোক পালিয়ে এসে হংকং-এ ভিড় করছে। দু' বছর আগে লাল চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হওয়ার পর থেকে শরণার্থীদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে বলে মারকিন কংগ্রেস অধিবেশনে স্বরাষ্ট্র দফতর জানিয়েছেন।

১৪ জুলাই—আজ মারকিন বিমানবহরের বি—৫২ বোমারু বিমানগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে গিয়ে কামবোডিয়ার সীমান্তের কাছে কমিউনিস্ট সামরিক ঘাঁটিগুলির উপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করে।

চিরস্মরণীয় সৌন্দর্য!

পুনম চন্দিরমানী

সিকোবা

এমব্রয়ডারীকরা কাপড়

নিরুদ্বেগ আনন্দ—ছুটি উপভোগের মেজাজ—আপনা হতেই আসে সিকোভার "ষোড়শী" পরিধানে। নরম সাটিনের ওপর চাকচিক্যময় সোনালী এমব্রয়ডারী। রূপালী এমব্রয়ডারীকরা সিকোভাও পাওয়া যায়—সুতীর, সাটিনের, নাইলনের ও নাইলন জর্জেটের ওপর; সিকোভা এমব্রয়ডারীকরা কাপড়—নিশ্চিত নজরে পড়বেই।

প্রস্তুতকারক :
ভাদিলাল এমব্রয়ডারী ইউনিট

নিম্নোক্ত তাপ-নিয়ন্ত্রিত শো-রুমে পাওয়া যায় : স্টকিস্ট : ধ্যাকারসি ছগনলাল, রাজদা চাওল, সেকেণ্ড এণ্ড হনুমান ক্রস লেন, বম্বে—২। খুচরা বিক্রেতা : অশোক সিল্ক মিলস, রিটেল শপ, ৪০৬, শেখ মেমন স্ট্রীট, ক্রফোর্ড মার্কেটের কাছে, ২৩১, কলবাদেবী রোড, জাভের বাগ, বম্বে—২। ফ্যান্সি এম্পোরিয়ম, শপ নং ৪৬, তরদেও এয়ার-কন্ডিশনড মার্কেট, তরদেও মেন রোড, বম্বে—৩৪। অম্বিকা সিল্ক কর্ণার, ৫/৫৬, ডবলু ই এ আজমল খাঁ রোড, করোল বাগ, নিউ দিল্লি—৫। অর্জুন ট্রেডার্স, ১৩/৮, গোডাউন স্ট্রীট, মাদ্রাজ—১।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীরামেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৫ বর্ষ ॥ ৩৯ সংখ্যা
শনিবার ১১ আশ্বিন ১৩৭৫

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৪০ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	...	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	...	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	...	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষাণ্মাসিক „	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক „	...	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষাণ্মাসিক „	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক „	...	৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	...	৫২.০০
ষাণ্মাসিক „	...	২৬.০০
ত্রৈমাসিক „	...	১০.০০

আকাশ অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	৩৯.০০
ষাণ্মাসিক	...	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	...	১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাশুল (অতিরিক্ত) ২ পয়সা

DESH

Saturday, 28 Sept, 1968

দুর্গোৎসব

শান্ত নির্মল শিশির-ভেজা শারদ প্রভাতে আবার করে বোধনের বাজনাটি বেজে উঠেছে, আনন্দময়ী আবার এসেছেন। ইনি আনন্দময়ী, ইনিই আমাদের শারদীয়া প্রতিমা; কখনও দেবী দুর্গা, কখনও উমা মা। বঙ্কিমচন্দ্র এ'কেই বলেছেন, 'সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা'। আমাদের বঙ্গভূমিতে এই প্রতিমার আরাধনাই সর্বোত্তম আরাধনা, সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব, হয়ত তাই এই পূজাকে 'বঙ্গ-পূজা'ও বলা হয়েছে। বাঙলা দেশের আকাশবাতাস মাঠঘাট যখন শরতের মোহনরূপে নবীন, যখন এই ঋতু ফসল-খেতের ঋতু, যখন জলে স্থলে নবীনতার হিল্লোল তখনই আমরা তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়েছি, যিনি একাধারে আমাদের জননী ও কন্যা।

তিনিই 'দুর্গা' যাঁকে দুঃখে জানা যায়। শ্রীদুর্গার ধ্যানরূপে এই দুর্গতি-নাশিনীর ভাবটি আমাদের বহুকালের কল্পনা। অতি দুর্দিনে, ঘোর নিরাশা ও দুর্গতির মধ্যে দেবী দুর্গাকে আবাহন করা হয়েছিল, সর্বদেবের তেজোরাশি একত্র করে তিনি দুর্গতিনাশিনী দুর্গার মূর্তি ধারণ করেছিলেন—তাই তাঁর পদতলে বিমর্দিত অসুর, দশ দিকে দশ ভুজ আয়ুধসজ্জিত, তাঁর দক্ষিণে ভাগ্য-রূপিণী লক্ষ্মী, বামে বিদ্যাজ্ঞানমূর্তিময়ী সরস্বতী, বলরূপী কার্তিকেয় ও সর্বকর্মসিদ্ধিরূপী গণেশ।

দেবী দুর্গার এই ধর্মীয় ভাবটি আমরা বুঝি না-বুঝি তাঁর অন্য রূপটি আমরা অনুভব করি, সেটি আনন্দময়ীর রূপ। তিনি আমাদের আনন্দের মধ্যে আসেন, অথবা তাঁর আগমনেই আমাদের আনন্দ-উৎসব। এই উৎসব বাঙলা দেশের নাড়িতে বাঁধা, তাতে সাড়া না দেয় কে! বলা বাহুল্য, আজকের দিনে সেই বঙ্গ-দেশ আর নেই, শান্তি সচ্ছলতা থেকে আমরা বহু দূরে সরে এসেছি, অন্নের হাহাকারে, দুঃখদুর্গতির পীড়নে, হতাশা আর গ্লানিতে আমাদের জীবন ভারাক্রান্ত; তবু এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও, দীনতার মধ্যেও আমরা আনন্দময়ীকে আরাধনা না করে পারি না। জানি, এই আনন্দ কাম্য হলেও আমাদের সাধ্যাতীত হয়ে উঠেছে, তবু একে উপেক্ষা বা বর্জন করার উপায় আমাদের নেই। নেই যদি, তবে যার যতটুকু সাধ্য সেইমত আনন্দময়ীকে অভ্যর্থনা করেই আমাদের যতটুকু তৃপ্তি সেইটুকু লাভ করি। এই দুঃখদুর্দিনেও কয়েকটি দিনের জন্যে দেবীর আগমন আমাদের কিছু তৃপ্তি, কিছু বা আনন্দ দিক।

পত্রিকায় ধর্মঘট

গত ২৩ জুলাই থেকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র অসাংবাদিক কর্মীরা ধর্মঘট শুরু করায় 'দেশ' পত্রিকার বেশ কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ ২৭ জুলাই সংখ্যা থেকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ৯টি সংখ্যা প্রকাশ করা যায়নি। সুখের বিষয়, ৫৯ দিনের ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হওয়ায় আমরা ২৮ সেপ্টেম্বরের সংখ্যা থেকে পুনরায় 'দেশ' পত্রিকা প্রকাশে সক্ষম হচ্ছি। পাঠকগণ অবগত আছেন যে, সংবাদপত্রে অসাংবাদিক কর্মচারী ধর্মঘট শুধুমাত্র আমাদের প্রতিষ্ঠানে হয়নি, কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লি এবং মাদ্রাজের বিখ্যাত কিছু দৈনিক পত্রিকাতেও হয়েছে। দু' মাস এই ধর্মঘট চলার পর সম্প্রতি প্রায় সকল পত্রিকা থেকে তা প্রত্যাহৃত হয়েছে। আমাদের প্রতিষ্ঠানের তিনটি পত্রিকা—আনন্দ-বাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড এবং দেশ—ধর্মঘট উঠে যাবার পরই স্বাভাবিকভাবে তাদের কাজ শুরু করেছে। আশা করি, পাঠকবর্গ আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা করবেন। প্রসঙ্গত একটি কথা, অন্যান্য বৎসরের মতন আমাদের 'দেশ' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যার কাজ যথারীতি শুরু হয়েছিল, কিন্তু ধর্মঘটের জন্যে মাঝপথে পরিত্যক্ত হয়, আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের শারদীয় সংখ্যার ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। আমাদের পাঠক ও অনুগ্রাহকবর্গের কাছে আমাদের শারদীয় সংখ্যা আমরা পৌঁছে দিতে পারলাম না এ-বেদনা যেমন আমাদের তেমনই তাঁদের। আশা করি, অবস্থা বিবেচনায় তাঁরা আমাদের অক্ষমতা মার্জনা করবেন।

মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্রে শিরোনামা ছিল "ইণ্টারভেনশন"। অর্থাৎ হস্তক্ষেপ। নকশালপন্থীদের পত্রে ছিল : "সোবিয়েত সংশোধনবাদীচক্র বহু দিন পূর্বেই সামাজিক সাম্রাজ্যবাদে পরিণত"। আর ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির পত্রিকায় ছিল : "সমাজতন্ত্রের শত্রুরা কি-ভাবে সংগঠিত হচ্ছিল।" শিরোনামাগুলো লক্ষণীয়, কারণ অর্থপূর্ণ এবং সেহেতু গুরুত্বপূর্ণ। আরও লক্ষণীয় যে, মার্ক্সিস্ট পার্টির পত্রিকায় "ইণ্টারভেনশন" (বা হস্তক্ষেপ) কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। "অ্যাগ্রেশন" বা আক্রমণ কথাটিকে সযত্নে উহ্য রেখে। এই শিরোনামায় চেকোশ্লোভাকিয়া সম্পর্কে সোবিয়েত নেতৃত্বে ওয়ারশ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি দেশ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তাকে এক কথায় বলা হয়েছে হস্তক্ষেপ। এই "হস্তক্ষেপ" এক দিকে যেমন সোবিয়েত নেতৃত্বের সিদ্ধান্তর সমালোচনা বলে মনে হতে পারে, অপর দিকে তেমনি স্পষ্ট করে দেওয়া হয় যে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় যে পরিবর্তনের হাওয়া বইছিল তা রোধ করা প্রয়োজন ছিল। ফলে, চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনা সম্পর্কে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্ত সামনে রাখা হয়নি। বেশ কিছুটা অস্পষ্টতা রাখা হয়েছে, নিশ্চয়ই রাজনৈতিক কারণে। ঠিক তেমনিভাবে দেখা যাবে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্রের শিরোনামা চেকোশ্লোভাকিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট হলেও সোবিয়েত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় না। আর নকশালপন্থী-দের শিরোনামা অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে সোবিয়েত-বিরোধী। চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে পরিপূর্ণ কোন মতামত প্রকাশ করা হয়নি।

এই কারণেই শিরোনামাগুলো লক্ষণীয়। চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনাকে কোন বিচ্ছিন্ন অঘটন হিসাবে দেখার যে কোন যুক্তি নেই, তা ভারতের কম্যুনিস্ট সংগঠনগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। বোঝা যায়, ভারতেব প্রতিটি কম্যুনিস্ট সংগঠনের মধ্যে এক নিদারুণ দ্বিধা দেখা দিয়েছে। ভারতের জনসাধারণের মধ্যে সোবিয়েত হস্তক্ষেপের ফলে সোস্যালিস্ট ক্যাম্প সম্বন্ধে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে সেটা লক্ষ করেই কম্যুনিস্ট সংগঠনগুলো সুস্পষ্ট কোন মতামত সামনে রাখতে ভরসা পাচ্ছে না। এই দ্বিধা অবশ্য ভারতের কম্যুনিস্ট সংগঠনগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সমগ্র-ভাবে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের মধ্যেই আজ নানা প্রকারের প্রশ্ন ওঠার সুযোগ এনে দিয়েছে।

উত্তর ভিয়েতনাম কম্যুনিস্ট চীনের প্রতিবেশী এবং উগ্র সমর্থক। হ্যানয়ের স্পষ্ট অভিমত যে, সামরিক ব্যবস্থা নিতে হয়েছে চেকোশ্লোভাক কম্যুনিস্ট পার্টির "নিষ্ঠাবান" সদস্যদের অনুরোধে এবং রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে রক্ষা করার দায়িত্বে। কিউবার ফিদেল কাস্ট্রো এক বেতারবাণীতে বলেছেন, সোবিয়েত এবং ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর সামরিক ব্যবস্থা চেকোশ্লোভাকিয়ার সার্বভৌমত্বের পরি-পন্থী; কিন্তু রাজনৈতিক বিচারে এ সিদ্ধান্ত 'নির্ভুল'। তাঁর মতে, চেকোশ্লোভাকিয়ার নরমপন্থী নেতৃত্ব রাষ্ট্রকে পুঁজিবাদের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। সেকারণে চেকোশ্লো-ভাকিয়া দখল করা প্রয়োজন ছিল। চীনের, অথবা পিকিং রেডিওর বক্তব্য আরও স্পষ্ট : সংশোধনবাদী সোবিয়েত নেতৃত্ব চেকোশ্লো-ভাকিয়ার জনসাধারণের বিরুদ্ধে এক ঘৃণ্য পাপাচারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পিত প্ল্যান অনুসারেই সোবিয়েতের সংশোধনবাদী নেতৃত্ব এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই বলেন : এটা চেকোশ্লো-ভাকিয়ার জনসাধারণের বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম ক্রাইম হিসাবেই গণ্য করা হবে। অপর দিকে ইতালীর কম্যুনিস্ট পার্টি সোবিয়েত নেতৃত্বকে যথাশীঘ্র সম্ভব চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে সৈন্য সরিয়ে নেবার অনুরোধ জানায়। রুমানিয়ার মতে, সোবিয়েত সিদ্ধান্ত প্রথম পর্যায়ের ভুল সিদ্ধান্ত, এবং এই সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত দুনিয়ার শান্তি ক্ষুণ্ণ করতে পারে।

মোটামুটিভাবে দেখা যায়, দেশে বিদেশে বিভিন্ন কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে সোবিয়েত সিদ্ধান্ত ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করেছে। এই ঘাত-প্রতিঘাত দেখা দিয়েছে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে বলে। এই সন্দেহের ছায়াকে উপেক্ষা করা ভারতের কম্যুনিস্ট সংগঠন-গুলোর পক্ষে সম্ভব নয়। আরও সম্ভব নয় এই কারণে যে, গত কয়েক বছরের মধ্যে ভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলন প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এসে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছে। এই ঘাত-প্রতিঘাত নিঃসন্দেহে আদর্শগত প্রশ্নের ভিত্তিতেই দেখা দিয়েছে এবং এই সংঘাত আদর্শগত প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলে এর প্রতিক্রিয়া বাইরে তীব্র আকারে প্রতিফলিত হবার সুযোগ পায়নি। কিন্তু কম্যুনিস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে একটা প্রচণ্ড ব্যর্থতা দেখা দেবার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। যে মুহূর্তে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের বিভেদ ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টিকে দ্বিধাবিভক্ত করে দিল সেই মুহূর্তে দেখা দিয়েছিল তীব্র সংকট। তবু ভারতের আভ্যন্তরীণ অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সুযোগে দুটি কম্যুনিস্ট পার্টিই সে সংকটকে কাটিয়ে ওঠার সময় পেয়েছিল। সর্বশেষে চতুর্থ নির্বাচনের সময় কংগ্রেস-বিরোধিতার মধ্যে দ্বিধার শেষ চিহ্নটুকুও মিলিয়ে গিয়েছিল।

এটা সম্ভব হয়েছিল বলে চেকোশ্লো-ভাকিয়ার সংকটটা এত তীব্রভাবে ভারতের দু'টি কম্যুনিস্ট পার্টিকে নাড়া দিয়েছে। ধাক্কাটা আরো বেশী লেগেছে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই পশ্চিম বাংলা এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশে মধ্যবর্তী নির্বাচন হবে বলে। চতুর্থ নির্বাচনে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল বলেই আজ বিভিন্ন রাজ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই অনিশ্চয়তাকে দূর করা সম্ভব হবে নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাকে সুনিশ্চিত করে। সেই প্রতিষ্ঠাকে সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই দু'টি কম্যুনিস্ট পার্টিই পরিষদীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে নিবিড়-ভাবে জড়িয়ে পড়েছে। এই প্রতিষ্ঠার প্রথম অধ্যায় শুরু হয়েছে পশ্চিম বাংলায় নবেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের নির্বাচনকে সামনে

রেখে। ঠিক এমনি সময় এসেছে চেকোশ্লোভাকিয়ার সংকট।

দেখা গেল, সোবিয়েত এবং ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত অন্যান্য কয়েকটি রাষ্ট্রের সেনারা যেদিন চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করল সেই দিনই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি এই আক্রমণকে অপ্রত্যাশিত নয় বলে অভিহিত করল। কিন্তু কোন সুনির্ধারিত রাজনৈতিক মন্তব্য করা হল না। এরই কয়েক দিন পরেই পার্টির পলিট ব্যুরো সবিস্তারে সমগ্র অবস্থাটা আলোচনা করে একটা দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করে। এই বিবৃতি রাজনৈতিক বিচারে উল্লেখযোগ্য। কারণ, এই বিবৃতিতে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনে আদর্শগত সংঘাত থেকে আত্মরক্ষা করার সবিশেষ প্রচেষ্টা করা হয়েছে। পলিটব্যুরোর এই বিবৃতিতে চেকোশ্লোভাকিয়ার সংকট যে আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট ক্যাম্পে ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংশয় সৃষ্টি করেছে তা স্পষ্টভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এই সংশয়ের দিকে লক্ষ রেখেই বিবৃতিটি অতি সযত্নে নিষ্পন্ন করা হয়েছে।

মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির মতে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় ডুবচেকের নেতৃত্বে যে নরমপন্থা গ্রহণ করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে সোবিয়েতের সংশোধনবাদী নেতৃত্ব এবং এই নেতৃত্বের সমর্থকরা যথেষ্ট সচেতন ছিল না। ডুবচেকের নরমপন্থা যে প্রতিবিপ্লবের শক্তিকে উৎসাহিত এবং সংগঠিত করছিল সে সম্বন্ধে সচেতন ছিল না বলেই সোবিয়েতের "সংশোধনবাদী" নেতৃত্ব ডুবচেককে সমর্থন জানিয়েছিল। এটা সংশোধনবাদেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি; কারণ, সংশোধনবাদ ধীরে ধীরে প্রতিবিপ্লবকেই সাহায্য করে এবং শ্রেণীসংঘাতকে দমন করতে উৎসাহিত করে।

সোবিয়েত নেতৃত্বের সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির বিবৃতিতে চীনের প্রতিক্রিয়ারও তীব্র সমালোচনা করা হয়। চীনের প্রতিক্রিয়া এবং প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই-এর বক্তৃতা উদ্ধৃত করে বিবৃতিতে বলা হয় যে, এই প্রতিক্রিয়া এবং উক্তি নিরাশাজনক। কারণ, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির মতে, সোবিয়েতের সংশোধনবাদী নীতি এবং আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরোধিতা করতে গিয়ে চীনের নেতৃত্ব চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রতিবিপ্লবের যে ক্ষেত্র রচিত হয়েছিল তা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে গিয়েছে। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি বিশ্বাস করে যে, অতি সুনিশ্চিতভাবে চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রতিবিপ্লবের ক্ষেত্র রচিত হয়েছিল এবং প্রতিক্রিয়ার শক্তিরা সোস্যালিস্ট রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য সক্রিয়-ভাবে সংগঠিত হচ্ছিল।

এই ভীতিপ্রদ অবস্থাকে সামনে রাখলে, পলিটব্যুরো মনে করে, কোন কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ বিপদকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এটা সম্ভব নয় বলেই, সোবিয়েতের 'সংশোধনবাদী' নেতৃত্বের সিদ্ধান্তকে নিন্দা করা যায় না। বরং চীনের মতানুসারে সোবিয়েত ইউনিয়নকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দোসর হিসাবে গণ্য করলে চেকোশ্লোভাকিয়ার হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্তকে নির্ভুলভাবে বিচার করা সম্ভব হবে না। এইরকম ভুল বিচারের ফলে, বিভেদকে আরও তীব্র করা হবে এবং জনসাধারণকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত সম্বন্ধে সচেতন করা সম্ভব হবে না। তাই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি চীনের অভিমতের সঙ্গে একমত হতে পারেনি।

অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবেই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি বর্ধমান প্লেনামে গৃহীত আদর্শগত তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই আন্তর্জাতিক বিরোধ থেকে আত্মরক্ষা করার প্রচেষ্টা করেছে। সেই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যও অত্যন্ত স্পষ্ট। আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনে যদি কম্যুনিস্ট পার্টি হিসাবে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তা হলে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনে বিরোধের ছায়াকে সযত্নে দূরে রাখতে হবে। নির্বাচনী আসরে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রশ্ন উঠলে বিরোধের বাইরে থাকার পথটা খোলা রাখা সহজসাধ্য হবে। এমন কি সুনিশ্চিত-ভাবে কম্যুনিস্ট আন্দোলনকেও রাজনৈতিক নিশ্চয়তার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে অসুবিধা হবে না। তাই শিরোনামা দিতে হয়েছে 'ইন্টারভেনশন'।

মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির এই নীতি এবং বিবৃতি ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির দৃষ্টি নিশ্চয় এড়িয়ে যায়নি। কিন্তু ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে অবস্থাটা মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির মত সুগম হয়ত ছিল না। তাই দেখা যাবে, চেকোশ্লোভাকিয়া দখলের মুহূর্তে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে কোন প্রকৃত সরকারী বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি।

বরং ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদ যখন এই প্রশ্ন আলোচনা করার জন্য দিল্লীতে মিলিত হল, তখন পার্টির নেতৃত্বকে চরম সংকটের সামনে এসে দাঁড়াতে হল। পার্টির নেতৃত্বর কাছে সোবিয়েত সিদ্ধান্ত এবং হস্তক্ষেপ নিঃসন্দেহে সমর্থনযোগ্য। কিন্তু অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে পার্টির একজন নেতা শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী জাতীয় পরিষদের সকল আলোচনাকে ভিন্ন পথে মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোবিয়েত সৈন্য এবং সাঁজোয়া বাহিনী যখন ভিতরে ঢুকে সমগ্র রাষ্ট্রকে দখল করে নেয় তখন শ্রীলাহিড়ী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই ঘটনার পরেই অস্ট্রিয়ার কোন-রকমে চলে আসেন এবং তারপরই ফিরে আসেন দিল্লী। ফিরে এসেই বিমানবন্দর থেকে শ্রীলাহিড়ী সোজা চলে যান জাতীয় পরিষদের সভায়। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে এই কথাটাই পার্টির সামনে রাখলেন যে, সোবিয়েত নেতৃত্বর প্রতি আস্থা থাকলেও বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় চেকোশ্লোভাকিয়ার জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়াও উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

শ্রীলাহিড়ীর মতামত পার্টির নেতৃত্বর কাছে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করাও সম্ভব হয়নি। ফলে, পার্টির পক্ষে সরাসরি কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তে এক বিবৃতি প্রকাশ করা হল, যার মূল উদ্দেশ্য চেকোশ্লোভাক ও সোবিয়েত নেতাদের মধ্যে মস্কো আলোচনার ফলে যে মীমাংসার সূত্র গৃহীত হয় তার প্রতি সমর্থন জানান। কিন্তু একই সঙ্গে দেখা দিল পার্টির মধ্যে নেতাদের বিরোধ, যেমন দেখা দিয়েছে পার্টির পশ্চিম বাংলা শাখায়। এই বিরোধ বর্তমানে যে অবস্থারই থাক না কেন, চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাকে চরম পর্যায়ে আসতে দেওয়া হয়নি।

এটা সম্ভব হয়েছে রাজনৈতিক কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়ার ফলে। পার্টির পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছে যে, চেকোশ্লোভাকিয়ার সমগ্র ঘটনাবলীর যথার্থ মূল্যায়ন প্রয়োজন। সেই মূল্যায়ন সহজসাধ্য করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি কমিটি গঠন করা হয়েছে, যাদের কাজ হবে চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনাবলী সংগ্রহ করে তা যথাযথভাবে পার্টির সদস্যদের সামনে তুলে ধরা। এটার প্রয়োজন আরও এক কারণে: পার্টির সদস্যদের মধ্যে বারবার প্রশ্ন উঠছে, কেন প্রয়োজন হল চেকোশ্লোভাকিয়ায় এই হস্তক্ষেপ। প্রশ্ন উঠছে, কুড়ি বছর পরেও চেকোশ্লোভাকিয়ার মত একটি সম্পূর্ণ সোস্যালিস্ট রাষ্ট্রে প্রতিবিপ্লব সংগঠিত হবার সুযোগ পায় কি করে? স্বভাবতই এই সব প্রশ্ন ভারতে কম্যুনিস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে দ্বিধা ও সংকোচকেই তুলে ধরে। এটা যদি কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সামনে সংকটের লক্ষণ হিসাবে দেখা দেয়, তা হলে মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে তা তীব্রতর করা রাজনৈতিক সুবুদ্ধির পরিচয় বলে মনে হবে না। হয়ত সে কারণেই মূল প্রশ্নগুলোকে অনুচ্চারিত রাখার প্রচেষ্টা চলেছে। হয়ত এই সব প্রশ্নের সঙ্গে পার্টির নেতৃত্বর প্রশ্নও একদিন জড়িয়ে পড়বে। কিন্তু আপাতত চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনার রাজনৈতিক মূল্যায়নকে মূলতুবী রাখাই হয়ত সমীচীন। এই দ্বিধাই ভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের নূতন অধ্যায়।

বৈদেশিকী

চেকোস্লোভাকিয়ার শিক্ষা

জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ, মাত্র দুটি মাসের ব্যবধানে পৃথিবীর চেহারা বদলে গেছে অনেকখানি। কিম্বা হয়তো আসলে কিছুই বদলায় না; সেই চিরকালের চেনা ক্ষমতার লড়াই, কূটনীতির খেলা, প্রবলের উদ্ধত অন্যায় আর অনেক দুঃখের মাঝেও দুর্মর আশা, শেষ পর্যন্ত হয়তো অন্যায়ের পরাজয় অনিবার্য। সে আশা আপাতত সুদূর। দু মাস আগেও ভিয়েতনাম যদি ছিল রক্তের অক্ষরে লেখা একটি নাম, এখন তার চেয়েও জ্বলন্ত যন্ত্রণায় ক্ষোভে ও বিস্ময়ে বিস্ফারিত আর একটি নাম চেকোশ্লোভাকিয়া। মস্কোর কম্যুনিস্ট রাজচক্রবর্তীরা মার্কিন মহারথীদের পাশেই। এশিয়ায় ভিয়েতনাম, ইউরোপে চেকোশ্লোভাকিয়া: আমেরিকার ব্রত ভিয়েতনামকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র শিক্ষা দেওয়া, সোভিয়েট রাশিয়ায় সংকল্প চেকোশ্লোভাকিয়াকে সাচ্চা কম্যুনিস্ট আদর্শ শিক্ষাদান। মার্ক্স-লেনিন কি এ ধরনে কম্যুনিজমের প্রসার-কৌশল কল্পনা করতে পেরেছিলেন? স্টালিনও কখনও কখনও বলেছেন, বিপ্লব রপ্তানি করা যায় না; আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের আদর্শ প্রচার ও প্রসারের অছিলায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র আক্রমণ ও দখল মার্ক্স-লেনিন স্টালিন অন্ততপক্ষে তত্ত্বগতভাবে কখনও প্রতিপাদন কিম্বা সমর্থন করেছেন মনে হয় না।

সোভিয়েট রাশিয়া এখন মহাশক্তিধর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তিমপর্বে রাশিয়া নিজের নিরাপত্তার স্বার্থে পূর্ব এবং মধ্য ইউরোপে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। চেকোশ্লোভাকিয়া হাঙ্গেরি প্রভৃতি দেশে কম্যুনিস্ট রাজত্ব মার্ক্স-লেনিন বর্ণিত বৈপ্লবিক উপায়ে শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুত্থান মারফত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এসব দেশে কম্যুনিস্ট-রাজ চালু হয়েছিল সোভিয়েট লালফৌজের বন্দুকের জোরে। সে বন্দুকের জোর রাশিয়ায় এখনও আছে, জোর কমেছে কম্যুনিস্ট আদর্শ, কম্যুনিস্ট শাসন পদ্ধতি ও প্রকরণের মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ ক্ষমতার। খাস সোভিয়েট ভূমিতেই কম্যুনিজমের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং অবক্ষয়ের লক্ষণ সুস্পষ্ট। চেকোশ্লো-ভাকিয়া দখলের পিছনে সোভিয়েট রাশিয়ায় ব্যস্ত সমস্ত আচরণের কারণ দ্বিবিধ—প্রথমত সোভিয়েট রাশিয়ায় সামরিক নিরাপত্তারক্ষায় মামুলী হিসাব, দ্বিতীয়ত যে কারণটি আরও গুরুতর, সেটা হল কম্যুনিজমের সোভিয়েট ছাঁচ অটুট রাখবার ভাবনা। ধনতন্ত্রের অন্তর্বিরোধের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন মার্ক্স-লেনিন-স্টালিন। কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা, কম্যুনিস্ট অর্থনীতির বিন্যাসও নতুন এবং আরও যন্ত্রণাদায়ক অন্তর্বিরোধের জন্ম দিতে পারে (এবং দিয়েছেও), সেটা মার্ক্স-লেনিন স্টালিন হিসেব করেননি। সোভিয়েট রাষ্ট্রের জবরদস্ত প্রচণ্ড পীড়ননির্ভর ব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে লেনিন তাঁর জীবনের শেষ দিকে শঙ্কিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর স্বকৃত কর্মের জটিল জঞ্জাল সাফ করে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থাকে সুস্থ সহনীয় করবার সময় পাননি।

চেকোশ্লোভাকিয়া যে রাজনৈতিক পরি-বর্তনের উদ্যোগ নিয়েছিল সেটা অস্বাভাবিক নয়, হঠাৎ দেখা দেয়নি। এর পেছনে মার্কিন চক্রান্ত রয়েছে বললেই কম্যুনিস্ট সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের কঠিন সমস্যাগুলি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। স্টালিন এসব সমস্যা জবরদস্ত কায়দায় চেপে রেখে-ছিলেন, অনেক সমস্যা আরও জটিল যন্ত্রণাময় করে তুলেছিলেন। ক্রুশ্চেভ স্টালিনবাদী বিভীষিকার স্বরূপ যদি প্রকাশ নাও করতেন তবুও কম্যুনিস্ট তন্ত্রমন্ত্র শাসনপদ্ধতি পুনর্বিচারের দাবি ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হত না। চেকো-শ্লোভাকিয়ায় নতুন কম্যুনিস্ট নেতারা যে পথ ধরেছিলেন সে পথের শেষ পর্যন্ত পৌঁছুলে কম্যুনিস্ট দলের একাধিপত্য, চিন্তা-শাসনের নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা টিঁকতে পারত না। শেষ পর্যন্ত টিঁকতে পারত না ক্রেমলিনে কম্যুনিস্ট দলপতিগোষ্ঠীর যথেচ্ছ প্রশ্নাতীত ক্ষমতা। চেকো-শ্লোভাকিয়ার ব্যাপারে সাবেকী জবরদস্ত কম্যুনিস্টদের ভয় সেখানেই। সোভিয়েট কম্যুনিস্ট নেতাদের অভিযোগ চেক কম্যুনিস্ট পার্টি সোস্যালিজমের পথ থেকে সরে যাচ্ছে। প্রমাণ? প্রমাণ আর কী, চেক কম্যুনিস্ট খবর কাগজ ইত্যাদিতে কম্যুনিস্ট পার্টির স্পষ্ট প্রখর সমালোচনা ছাপা হচ্ছিল! তার মানে "বুর্জোয়া গণতন্ত্র", সেন্সরশীপ যদি না থাকে তাহলে কম্যুনিজম থাকে কী করে? তার মানে দেশসুদ্ধ মানুষের মুখচাপা দিয়ে তবেই কম্যুনিস্ট সমাজব্যবস্থার শনৈঃ শনৈঃ অগ্রগতি, উন্নতি এবং শোষিত মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তি!

সব জুলুমতন্ত্রেই শেষ পর্যন্ত ভাঙন ধরে, কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রতন্ত্রেও এখন ভাঙনের টান। সাবেকী কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রনেতারা জোর জবরদস্তি করে ভাঙন রোধ করতে চেষ্টা করছেন। সোভিয়েট-চেকোশ্লোভাক বিরোধ ও সঙ্কট সে চেষ্টারই বিষম পরিণাম। আইজাক ডয়শার তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল আগে প্রকাশিত গ্রন্থে সোভিয়েট বিপ্লবের ফলাফল আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের দেশ-গুলিতে কম্যুনিস্ট সমাজ ও শাসনব্যবস্থা স্থায়ী হবে কিনা সন্দেহ। "অবাধ্য" চেকোশ্লোভাকিয়াকে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা রাশিয়ার আছে। সে ক্ষমতা অস্ত্রের, কম্যুনিস্ট আদর্শের নয়। হাঙ্গেরির গণবিদ্রোহ সোভিয়েট ফৌজ অনায়াসে দমন করতে পেরেছিল, সেটা মোটেই বিস্ময়কর নয়। বেদনাকর বিস্ময় হল, দশ বছর কম্যুনিস্ট শাসনের পরেও সে শাসনব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য বহু একনিষ্ঠ কম্যুনিস্ট, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও আদর্শবাদী তরুণ স্বেচ্ছায় প্রাণ দিতে এগিয়েছিল। কম্যুনিস্ট তন্ত্রমন্ত্রের বাস্তব বিকার ও ব্যর্থতার এর চাইতে মর্মান্তিক প্রমাণ আর কিছু হতে পারে না। চেকোশ্লোভাকিয়ার উপর সামরিক, কূটনৈতিক চাপ দিয়ে রাশিয়া জয়ী হতে পারে, সে জয়ে কম্যুনিজমের অধোগতি হবে স্পষ্টতর।

২৩।৯।৬৮

জনতা কলেজ—ময়দান

chandi

সুনন্দর জার্নাল

'অ্যাড্‌মিশন ক্লোজ্‌ড'

অতএব সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। কলেজের দরজায় দরজায় ছেলেমেয়েদের ধর্না—তদ্বির, কান্নাকাটি, চিৎকার, গর্জন। কলেজে একটি সীট, অনার্সে একটু জায়গা। বিপন্ন কর্তৃপক্ষ 'অ্যাড্‌মিশন ক্লোজ্‌ড্' বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছেন—আর বন্যার জলের সঙ্গে মিশছে বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের চোখের জল। তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছে যারা—কোনো মতে যাদের নম্বর উঠেছে বিজ্ঞানের দ্বিতীয় বিভাগে—তাদের সামনে নিষ্ঠুর রুদ্ধ দুয়ার। জীবনের প্রথম পদক্ষেপেই তাদের সামনে ভাবিতব্যের ছায়া।

অথচ, মাত্র কয়েক বছর আগে এ ছবি ছিল না। অনার্সে একটু কড়াকড়ি ছিল বটে কিন্তু দু-একটি সরকারী আর মিশনারী কলেজ ছাড়া—প্রায় সর্বত্রই ছিল অবারিত দ্বার।

'স্যার, একটা সীট্—'

'জায়গা কোথায় হে? উপচে পড়ছে যে!'

'ওর মধ্যেই হয়ে যাবে স্যার। দয়া করুন।'

কলকাতার সর্বতারণ দৈত্যাকার (শিক্ষা ক্ষেত্রের পরিভাষায় 'বিগ জায়াণ্ট্‌স') ক লে জ গু লো দয়া করতেন—তাঁদের 'গারগাঁতুয়ান অ্যাপেটাইট' নিয়ে অবাধে আত্মসাৎ করতেন সবাইকে। তারপর ক্লাস? চারজনের বেঞ্চিতে ন'জন। একটি বুন্‌সেন্‌স বার্নার পাওয়ার জন্যে সাতজনের কিউ। অধ্যাপকেরা বিনা মাইক্রোফোনেই গগনভেদী চিৎকার করে জন-সমাবেশকে সম্ভাষণ করতেন। লেখাপড়া খুব চমৎকার রকমের হত, এমন অপবাদ পরম নিন্দুকেও দেবে না।

তারপরে উচ্চতর এবং উন্নততর শিক্ষা-পরিকল্পনা এল। যে শিক্ষকেরা চার শিফটে উড্ডীন হয়ে—সপ্তাহে বাহাত্তরটা ক্লাস নিয়ে বিদ্যা-বিতরণ করতেন, পক্ষচ্ছেদ হল তাঁদের; সীটের সংখ্যা বেঁধে দেওয়া হল কলেজে। যোগ্যতর স্নাতক চাই—দেশ গড়তে হবে।

খুব ভালো—আ ম রা—কমন-ম্যানেরা খুশিই হয়েছিলুম। কিন্তু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা তো প্রতি বছরই বাড়ছে, যাকে বলে 'ইন লীপস্ অ্যাণ্ড বাউণ্ড্‌স্!' অতএব গড়ে উঠতে লাগল নতুন নতুন কলেজ, সরকারী, স্পন্‌সর্ড, প্রাইভেট। যে অঞ্চলে সাতখানা গ্রামের মধ্যে একটি হাই স্কুল ছিল না—সেখানে তিনটে কলেজ মাথা ফুঁড়ে উঠল। দেখা দিতে লাগল নতুন নতুন ইউনিভার্সিটি। রবীন্দ্রনাথের 'তোতা-কাহিনী'র ভাষায় 'শিক্ষার হদ্দমুদ্দ!'

সবই হল, কিন্তু ছাত্রভর্তি সমস্যার সমাধান হয় না। হবার কোনো কারণ নেই—যেহেতু থার্ড ডিভিশন (এবং বিজ্ঞানে নীচের দিকে দ্বিতীয় ডিভিশনও) ইউ-জি-

বেকার ইনজিনীয়ার? টেস্ট রিলিফে মাটি কাটার কাজ দিতে পারি

সির মতে উচ্চতর বিদ্যালাভের অযোগ্য। সুতরাং যেভাবে মাছি তাড়ানো হয়, সেইভাবে কলেজের দরজা থেকে অবাঞ্ছিতদের তাড়াও। তারা পাড়াগাঁয়ের কোনো এঁদো কলেজে ঢোকে তো ঢুকুক—নইলে চরে খাক।

সেই অভাগা বালক-বালিকারা না হয় চরেই খাবে, কিন্তু এই নব-বিধানে কলেজী-শিক্ষার নিদারুণ কোনো উন্নতি হয়েছে কি? যাঁরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাকাণ্ডের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত আছেন—সেই পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক, এগ্‌জামিনেশন বোর্ড অথবা কন্ট্রোলারদের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে। না—শিক্ষার মান বাড়ে নি, এক ইঞ্চিও না। মেধাবী ছেলেমেয়েদের কথা বলছি না—সেই মুষ্টিমেয়রা চিরদিন ভালোই থাকে—কিন্তু সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ক্রমশ নিবিড় তিমির থেকে মহাতিমিরে নামছে। এমন দাঁড়িয়েছে যে, কোনো কোনো বিষয়ে কুড়ি নম্বর পর্যন্ত গ্রেস-মার্কস্ দিয়ে পাশের সংখ্যা বাড়াতে হয়। ছাত্রভর্তির সদাব্রত যখন ছিল, এমন দুর্গতি তখনো ঘটেনি।

রাজনীতি? ছাত্র-আন্দোলন? কাল-মানসের বিকম্পিত অনিশ্চয়তা? নিশ্চয়—খানিকটা স্বীকার করা চলে। কিন্তু শিক্ষাবিদ না হয়েও আপনার-আমার মতো সাধারণ মানুষ উনিশ শো ত্রিশ সাল থেকে আজ পর্যন্ত (আরো কুড়ি বছর পেরিয়ে গেলেও ছবিটা বদলাবে কিনা সন্দেহ) একটা বৎসরও কি ইতিহাস এবং স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে পারি—যে-বছর বাংলা দেশে কোনো-না-কোনো ঝড় ওঠেনি, শিক্ষা বিপর্যস্ত হয় নি, মধ্যে মধ্যে বা একটানা ছাত্র-ধর্মঘটে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে নি? ভালো হোক আর মন্দই হোক—বাংলা দেশের এই-ই ট্রাডিশন—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে উনিশ শো আটষট্টি সালের জুলাই মাস পর্যন্ত বাংলা দেশের শিক্ষা এই বিসর্পিত বিচিত্র রেখাতেই বয়ে আসছে।

চোখ-কান-বন্ধ আশাবাদী না হলে একথা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, শিক্ষার মান নামছে। পাব্লিক - সার্ভিস - কমিশনের

নাইট শিফ্‌টে কোন কলেজে সিট পেলাম না, সেজন্য মিড নাইট শিফ্‌টে ভর্তি হলাম, ভাই

পরীক্ষা থেকে যে-সব 'হাউজার' ছিটকে বেরিয়ে আসে, তা থেকে ইউ-জি-সিও সেটা টের পাচ্ছেন না—তা নয়। তা হলে অত কলেজের দরজায় এই ব্যারিকেড কেন? সবাই যখন এক—'ফলং মড়ুকং', তখন আবার সেই স্ট্রীমকেই তৈরি হোক, চারজনের বেঞ্চিতে দু-জন বসে পড়ুক—থার্ড ডিভিশন এবং কোনোমতে দ্বিতীয় ডিভিশনের অগ্রমোচন হোক। এবং—আজ যারা থার্ড ডিভিশন, তাদের মধ্য থেকেও যে ভবিষ্যতে ডি-এসসি ডি-লিটের সারপ্রাইজ প্যাকেট বেরিয়ে আসতে পারে, আশা করি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত সেটা জানা আছে।

নইলে?

নইলে বাড়তি ছেলেমেয়েদের বিকল্প-ব্যবস্থা? স্কুল-ফাইনাল কিংবা হায়ার-সেকেণ্ডারীর পরে তাদের সুনিশ্চিত জীবিকার পথ? সেটা কে দেখাবেন? সে প্রশ্নের উত্তর মিলবে না।

মনে পড়ল, কোনো ইয়োরোপীয় দেশের শিক্ষা-সংক্রান্ত একটি বুলেটিন। সেখানে আক্ষেপ করা হয়েছে—উচ্চ শিক্ষার জন্য, শিক্ষকতার জন্য আর তেমন প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না—তারা ষোলো-সতেরো বছর বয়েসেই টেক্‌নিক্যাল লাইনে জীবিকার সন্ধান করে নিচ্ছে।

আমি, কমনম্যান সুনন্দ, ক্ষীণতম কণ্ঠে গ্যারাণ্টী দিয়ে বলছি—সেই জীবিকার ব্যবস্থা হোক, অবাঞ্ছিত বিতাড়ন করতে হবে না, তারা আপনিই বিদায় হয়ে যাবে। যোগ্য স্নাতকেরাই শিক্ষার মান উন্নত করবেন। এখন পোস্টাল পিয়ন হতে গেলেও বোধ হয় এম-এর ডিপ্লোমা লাগে—নইলে বাংলা দেশের নব্বই ভাগ ছেলেমেয়েরই এই প্রাণান্তকর ব্যয়সাধ্য উচ্চশিক্ষার কোনো দরকারই ছিল না।

একটি মর্মঘাতী প্রহসনের মধ্যেই আমরা বাস করছি।

কাঠ-ঠোকরা

মিহির মুখোপাধ্যায়

ভোরবেলা। উঁচু উঁচু গাছের মাথায় নরম রোদ। পাখ-পাখালির ডাকাডাকি। নাইট-ডিউটি শেষ করে বাড়ি ফিরছিল অশোক। কারখানার গেট থেকে দলে দলে সাইকেল ছুটেছে।

এই ছোট শহরে সাইকেলই সকলের সম্বল। ইতর ভদ্র, ছোট বড় সকলেই সাইকেলের সোয়ার।

বড় বড় অফিসাররা কেউ কেউ কোম্পানীর গাড়ি পান, ড্রাইভার পান। কারো কারো আবার স্কুটার আছে। কিন্তু কারখানার খালাসী থেকে চার্জম্যান, অফিসের আর্দালী থেকে বড়বাবু অর্থাৎ হেডক্লার্ক পর্যন্ত অন্য সকলের সাইকেলই ভরসা।

হেমদা বলেন—শয়তানের চাকা।

কথাটা মিথ্যে নয়, ওই দুইটি চাকায় ভর দিয়ে যেন এই শহরের জীবনটা সচল থাকে।

হাট-বাজার, রেশন, স্টেশন, পোস্টাফিস, কারখানার ডিউটি—সব যেন ওই শয়তানের চাকা দুটির ভরসায় চলে। আজকাল অশোকেরও এমন হয়েছে যে, সাইকেল ছাড়া এক পা চলে না। সাইকেল না হলে কোথাও যেতেই ইচ্ছে হয় না।

জয়তী বলে, আমি তোমার সঙ্গে যাব না, তুমি ওই সাইকেল পাশে নিয়ে ট্যাঙস ট্যাঙস করে হাটবে, কেন একটা রিকশা ডাকতে পারো না?

মানুষের হাত-টানা রিকশা নয়, তিন চাকার সাইকেল-রিকশা।

অশোক বলে, তুমি রিকশায় ওঠো, আমি সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল চেপে যাব।

—এ মা, তুমি কি আমার চাপরাসী। কুলকুল করে হেসে ওঠে জয়তী।

—কেন, চাপরাসীর কি হলো?

—অফিসার-গিন্নীদের দেখ না, রিকশা করে যখন কেনা কাটা করতে যান, সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল চেপে চাপরাসীরা যায়।

সকালের ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছে চোখে-মুখে। আকাশটা মেঘলা। কাল রাত্তিরে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। কালো পিচের পথটা ভেজা-ভেজা। সামনে কালী-বাড়ি। বহুকালের পুরনো মন্দির। মন্দিরের পাশ দিয়ে রাস্তা। মস্ত একটা অশ্বত্থ গাছ। এ পাশে কয়েকটা উঁচু উঁচু মেহগনি গাছ। এই গাছগুলির ডালে ডালে, ঘন সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে হাজার পাখির ডাকা-ডাকি। নানা জাতের পাখি। অশ্বত্থ গাছটার পাশ দিয়ে যাবার সময় মাথার উপর ভীত ত্রস্ত পাখার ঝটপটি আর কয়েকটা কাকের কর্কশ চীৎকার কানে এল। পরক্ষণেই কি যেন একটা পড়ল।

পেছন থেকে হেমদা বললেন, অশোক, তোমার পিঠের উপর কি একটা পড়েছে, পাখিটাখি বোধ হয়—, ঠিক পিঠের উপর নয়, ডান কাঁধের পাশে। ডান হাতে সাই-কেলের হ্যাণ্ডেলটা সামলে বাঁ-হাত তুলে খপ করে ধরে ফেলল অশোক। বড় পাখি নয়, পাখির ছানা। একবার ককিয়ে উঠল, দুই পায়ের আটটি নখে কাঁধের কাছের জামাটা আঁকড়ে রাখার চেষ্টা করল। একরকম জোর করে ধরে এনে এক মুহূর্ত ছেড়ে দেবার কথা ভাবল অশোক। মাথার উপর কয়েকটা কাক তখনো উড়ে উড়ে বিশ্রীভাবে ডাকছিল। ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়বে। অশোকের মুঠোয় একটা অসহায় প্রাণ ধুকপুক করছে। না, ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না, বরং জয়তীকে চমকে দেওয়া যাবে। ভাবতে ভাবতে হ্যাণ্ডেলের সঙ্গে ঝোলানো কাপড়ের থলির মধ্যে পাখিটাকে ঢুকিয়ে দিল অশোক। থলির মধ্যে একটা তোয়ালে, টিফিন-কৌটো, সাবানের বাক্স। একবার

পাখা ঝাপটে ফরফর করে উঠল পাখিটা।

পেছন থেকে হেমদা'র হাসি শুনল, বউমাকে দিও, পুষবে—।

খোলা মেজাজের হাসিটা ডানদিকের পথে ঘুরে গেল। আরো সামনে সোজা যাবে অশোক। সুন্দর পিচের রাস্তা। দু পাশে বট, অশ্বত্থ, জারুল, শিরীষ, সেগুন, মেহগনি। শহরের শেষপ্রান্তে কোয়ার্টার। অশোক আর জয়তী। আর কেউ নেই। আর কারো আসার মত সময় হয়নি। মাস-পাঁচেক কেটেছে বিয়ের পর। প্রথম দু' মাস তো বাপের বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ির মধ্যে ঘোরাফেরায় কেটে গেল জয়তীর। বেশী দূরে দূরে নয়। ঢাকুরিয়া আর যাদবপুর। কিন্তু অশোকের চাকরি কলকাতা থেকে তিরিশ মাইল দূরের এই কারখানার শহরে। মেসে থেকে চাকরি করত অশোক। শনি-রবিবার যাদবপুরের বাড়িতে যেত। সেখানে বাবা-মা, দাদা-বউদি, ছোট ভাই-বোন। সেখানে বাড়তি কোন ঘর নেই। ছোট দুই ভাই যেখানে বসে পড়াশোনা করে, যেখানে অশোকেরও পড়ার জায়গা ছিল, শোয়ার জন্য তক্তাপোশ পাতা ছিল, সে জায়গাটা আসলে বাইরের ঘেরা-বারান্দা। নতুন বউ নিয়ে সেখানে থাকা চলে না। বিয়ের পর তাই মরিয়া হয়ে বাড়ি খুঁজেছে অশোক। শহরের এই শেষ সীমানায় ফাঁকা মাঠের পাশে নতুন কিছু কোয়ার্টার উঠেছিল, তারই একখানা জুটেছে অশোকের ভাগ্যে। এদিকটা বেশ নিরিবিলি, ছিমছাম বটে, কিন্তু মোটেই পছন্দ নয় জয়তীর। পাশের মাঠে রোজ রাত্তিরে দল বেঁধে শেয়াল ডাকে।

ভর-সন্ধ্যেবেলা দু একটাকে তো নিজের চোখেও দেখেছে সে। যদিও কথাটা তেমন আমল দেয়নি অশোক। বলেছিল, তুমি ভুল দেখেছ, কুকুর-টুকুর হবে।

আহা, কুকুর যেন আর চেনে না জয়তী। পাটকিলে রঙের লেজমোটা বুঝি কুকুর হয়। এসব কথা বেশী বলে লাভ নেই। বললেই কথার পিঠে কথা বাড়বে। আর কাটুস-কুটুস তো লেগেই আছে।

জানালার পরদায় কি রঙ হবে, কেমন করে মাংস রান্না ভাল হয়, বেশী ঝাল কিংবা সিগারেট খাওয়া উচিত কিনা, জামা-কাপড় কাচার সহজতম পদ্ধতি কোনটি ইত্যাদি যাবতীয় জটিল বিষয় নিয়ে হরদম খুনসুটি আর কথা কাটাকাটি চলে। এই তিন মাসেও কিন্তু ভয়ের ভাবটা পুরোপুরি কাটাতে পারলো না জয়তী।

সামনের রাস্তার শহরের শেষ বাতিটা অনেক রাতেই অন্ধ ভিখিরীর মত দাঁড়িয়ে থাকে। পাশেই একটা সেগুন গাছের ঘন পাতার অন্ধকার থেকে কোনো কোনো রাতে, রাত দুপুরে পেঁচার ভুতুড়ে ডাক শোনা যায়। সন্ধ্যা হলেই কেমন গা ছমছম করে জয়তীর। কোয়ার্টারের পেছনটা উঁচু পাঁচিল ঘেরা। পাঁচিলের গায়ে পাশাপাশি দুটো পেঁপে গাছ। কোনো কোনো দিন সন্ধ্যার কাছাকাছি কোথা থেকে একটা কুচকুচে কালো রঙের হুলো বেড়াল এসে পাঁচিলটার উপর ঘুর ঘুর করে। জয়তীর এই ভীতু-স্বভাব নিয়ে ঠাট্টা করে অশোক, ভয়ের কারণগুলি হেসে উড়িয়ে দেয়। তবে হ্যাঁ, নাইট-ডিউটির সপ্তাহ একা-একা থাকাটা ভয়ের ব্যাপার বটে।

শেয়াল, পেঁচা কিংবা হুলোর ভয় নয়। মানুষের ভয়, চোর-গুণ্ডার ভয়। এদিকের বাড়িগুলি একটু ছাড়াছাড়া। রাস্তার ওপাশে হালদারবাবুদের বাড়ি। একটু দূরে মিত্তিরদার কোয়ার্টার। চেঁচিয়ে ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আগেই যদি কেউ মুখ চেপে ধরে।

জয়তী বলেছিল, আমাকে তুমি কলকাতায় রেখে এস।

—তারপর? চিন্তিত চোখে তাকিয়েছিল অশোক।

—তারপর নাইট-ডিউটির সপ্তাহ শেষ হলে নিয়ে আসবে, তোমাকে আর যেতে হবে না, মিণ্টুকে সঙ্গে করে আমি একাই চলে আসতে পারবো।

—খুব আহ্লাদ, মুখ চোখের একটি বিশেষ ভঙ্গী করে বলেছিল অশোক, মাসের মধ্যে ঘুরে ফিরে আমার দু সপ্তাহ নাইট পড়ে, সে সময়টা তুমি কলকাতায় বসে আরাম করবে, বেড়াবে, সিনেমা দেখবে আর আমি শালা সারারাত জেগে এসে হাত পুড়িয়ে রান্না করে খাব।

—এই মুখ খারাপ করবে না, কারখানার কাজ করে ভারী মুখ খারাপ হয়েছে তোমার। জয়তী চোখ পাকিয়েছিল।

—কিন্তু তুমিই যদি না থাকবে তাহলে কোয়ার্টার নিলুম কেন, জানো এই কোয়ার্টার পাবার জন্য বড়বাবুকে কত তেল দিতে হয়েছে, নগদ তিরিশটা টাকা পকেটে গুঁজে দিয়েছি।

—তার আমি কি জানি, আমি কি তোমাকে ঘুষ দিতে বলেছি?

তুমি তো এখন কিছুই জানবে না, ছুতো-নাতা করে কলকাতা পালাতে চাও, খুব আহ্লাদ। আবার মুখভঙ্গী করেছিল অশোক—অথচ মনে আছে তুমিই কোয়ার্টার নেবার জন্য খুঁচিয়েছিলে, যাদবপুরের বাড়িতে আলাদা ঘর নেই, এভাবে থাকা যায় নাকি, হ্যানো-ত্যানো কতরকম কথা।

—তাই বলে আমি কি এমন বিশ্রী জায়গায় কোয়ার্টার নিতে বলেছি।

—বিশ্রী বলছো কেন, চারদিক কেমন খোলামেলা।

খোলামেলা না ছাই, সন্ধ্যের পর একটা মানুষের সাড়া পাওয়া যায় না, চারপাশে শুধু শেয়াল, পেঁচা আর ঝিঁঝিঁর ডাক।

—তা হোক, তোমাকে এখানেই থাকতে হবে, এখান থেকে যেতে পারবে না।

—ইস, তোমার হুকুম নাকি, রাত্তিরবেলা একা-একা আমি কিছুতেই থাকবো না।

—তার জন্য একটা ব্যবস্থা করে দেব।

—কি ব্যবস্থা করবে তুমি, শুনি?

—দেখতেই পাবে, অত ব্যস্ত কেন।

শেষ পর্যন্ত একটা ব্যবস্থা করল অশোক। ঠিকে ঝি ফুলমোতিয়াকে অনেক বলে-কয়ে রাজী করাল।

নাইট-ডিউটির সপ্তাহে রোজ রাত্রে এসে এখানে খাবে, শোবে। দু' টাকা মাইনেও বাড়াতে হল। তাও খুঁত্ খুঁত্ করে জয়ন্তী। ফুলমোতিয়ার বিছানা-পত্তর ভারী নোংরা। একটা ভ্যাপসা গন্ধ বেরোয়। একটু দূরে মেঝেতে বিছানাটা পাতে। খাটের উপর মশারির ভেতরেও যেন সেই বিশ্রী গন্ধটা টের পায় জয়ন্তী। ওর মাথায় নিশ্চয় উকুন আছে। কখন যে খাটে এসে উঠবে, জয়ন্তীর একরাশ কোঁকড়া চুলের মধ্যে বাসা বাঁধবে, সেই ভয়ে সে কাঁটা হয়ে থাকে। আরো একটা নোংরা অভ্যেস আছে। ফুলমোতিয়া বিড়ি খায়। রোজ রাতে শোবার আগে পর পর দুটো বিড়ি টানবে।

প্রথম দিন দেখে তো হতভম্ব জয়ন্তী। ছি ছি, তুই বিড়ি খাস, মেয়েরা বিড়ি খায় নাকি, আবার দাঁত বার করে হাসিস, লজ্জা করে না তোর?

—হামরা খাই মাইজী, হামাদের মুলুকের মেয়েরা বিড়ি খায়, হুঁকা খায়। নির্বিকার মুখে হেসেছিল ফুলমোতিয়া। ওই হাসি দেখে সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় জয়ন্তীর। ধমক দিয়ে বলেছিল, বিড়ি-টিড়ি খেতে হয় বাইরে থেকে খেয়ে আসবি, ঘরের ভেতর পারবি না, খবরদার।

এক এক সময় ইচ্ছে করে ডাক ছেড়ে কাঁদে। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে এই আপদটাকে সহ্য করতে হচ্ছে।

পরের দিন সকালে অশোক ফেরার সঙ্গে সঙ্গে হামলে পড়েছিল, তোমার ব্যবস্থা-গুণে আমার যে প্রাণ যায়।

—কেন কি হয়েছে? প্রথমে অবাক হয়েছিল অশোক, সবটা শোনার পর হেসে বলেছিল, তা আর কি করবে, ওদের অভ্যাস, ওরা ওই রকমই বিড়িটিড়ি খায়।

—তুমি যেমন সিগারেট খোর, ঝি-ও জুটিয়েছ তেমনি। মন্তব্যটা গায়ে মাখে নি অশোক।

জয়ন্তীর পরবর্তী অভিযোগ, ওর জামা-কাপড় বিছানা-পত্তর ভীষণ নোংরা।

—একটু সাবান-টাবান দিও ধুয়ে টুয়ে নেবে, ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নাও। অশোকের জবাব শুনে কোন কথা না বলে নাক কুঁচকে রান্নাঘরে ঢুকেছিল জয়ন্তী।

কিছুক্ষণ পরে এসে শেষ দফা অভিযোগ শুনিয়েছিল—ওর মাথায় নিশ্চয় উকুন আছে।

—সব মেয়েদের মাথায়ই থাকে।

—বাজে কথা বলো না, কটা মেয়েকে জানো তুমি?

—জানা দরকার হয় না, অত চুল যাদের মাথায়, অত চুলের মধ্যে দু' চারটে উকুন কি খুঁজলে পাওয়া যায় না!

—ফের বাজে কথা?

—ঠিক আছে, উকুন-মারার ওষুধ এনে দেব, ওর মাথায় তুমি লাগিয়ে দিও।

—কি-ই, আমি দেবো ওর মাথায় ওষুধ? প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল জয়ন্তী, তার আগে দেবো তোমাকে এই গরম খুন্তির ছ্যাঁকা, বুঝবে মজাটা—

হো হো করে হেসেছিল অশোক।

আজ অশোকের নাইট-ডিউটি শেষ। আবার দু' সপ্তাহ নিশ্চিত জয়ন্তী। সকালে উঠেই বিছানাপত্তর গুটিয়ে নিজের ঘরে চলে গেছে ফুলমোতিয়া। যাবার আগে অবশ্য বাসনধোয়া, ঘরমোছা, উনুনে ধরানোর কাজটা সেরে গেছে। ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে এসে মসলা পিষে দেবে। আজ কোনও তাড়া নেই।

আজ ছুটি অশোকের। সারা দিন ছুটি, সারা রাত ছুটি। বিকেলবেলা সিনেমা দেখতে যাবার কথা আছে। ধীরেসুস্থে হাত-মুখ ধুলো জয়ন্তী। উনুনে ডিমসেদ্ধ চাপাল। অশোক এলে পর চায়ের জল হবে। পাঁউরুটি কাটার সময় বাইরে কড়ানাড়ার শব্দ শুনতে পেল।

—যাই—সাড়া দিল জয়ন্তী। কার কথা কে শোনে। খটখট একনাগাড়ে কার নাড়ার শব্দ।

—যাচ্ছি গো যাচ্ছি, বাবা, বাবা—আঁচলটা গুছিয়ে নিল জয়ন্তী, দরজা খুলে বললো, আজ কি হয়েছে, এত তাড়া কিসের?

—গুড মর্ণিং, ম্যাডাম।

—আহা, আজ হয়েছে কি?

—নাও, ধরো এটা। কাপড়ের থলিটা এগিয়ে ধরলো অশোক, মুখে একফোঁটা হাসি। ওই হাসি দেখে কেমন সন্দেহ হল, ভুরু কুঁচকে বললো জয়ন্তী, কি আছে এর মধ্যে?

—আগে নাও, নিয়ে দেখো।

থলিটা এবার নিল জয়ন্তী। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ফরফর করে পাখার শব্দ হল।

—ওমা, কি এটা? থলির মুখ খুলে একটু উঁকি দিল, বাঃ কি সুন্দর, কোথায় পেলে পাখিটা?

একটু দমে গেল অশোক। ভেবেছিল চমকে উঠবে জয়ন্তী, বিরক্ত হবে, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করবে। সে সব কিছু হল না, বরং আহ্লাদে গলে গিয়ে বললো, কি নাম পাখিটার, পেলে কোথায়, কি সুন্দর ঝুঁটি, ওমা, আবার ঠকুরে দিতে চায়।

সাইকেলটা ততক্ষণে ভেতরের বারান্দায় এনে রেখেছে অশোক। এবার ভাল করে দেখল পাখিটাকে।

কালো রঙের লম্বা ঠোঁট, বুকের পালক

সাদা, পিঠের রঙ হালকা বাদামী আর কালো, মাথায় লাল ঝ‍ুঁটি। কি পাখি এটা? চেনা-চেনা মনে হলেও, ঠিক চিনতে পারলো না অশোক, পাখিটার দিকে চোখ রেখেই বললো, আমার কাঁধে এসে পড়েছিল, একপাল কাকের ডাকাডাকি শুনলাম, বাসা থেকে পড়ে গেছে বোধ হয়, হেমদা বললেন. তোমাকে দিতে।

—ভালই তো, আমি পুষব।

—খুব আহ্লাদ, মুখ বাঁকাল অশোক, এসব আজেবাজে পাখি কেউ পোষে নাকি?

—কি পাখি এটা, তাতো বললে না।

—জানি না। টুথব্রাশ মুখে গুঁজে বাথ-রুমে ঢুকল অশোক। একটু পরে খবরের কাগজ নিয়ে জানালার পাশে ইজিচেয়ারে বসল। একটা সিগারেট ধরিয়ে ডাক দিল, কই, চা দিয়ে যাও।

—একটু সবুর করো, দিচ্ছি। জয়ন্তী তখন পাখিটার পরিচর্যায় ব্যস্ত। চামচে করে জল নিয়ে একটু একটু করে ঠোঁটের ফাঁকে ঢেলে দিচ্ছিল। এদিকে একটু একটু বিরক্ত হচ্ছিল অশোক। সিগারেট শেষ হল, অথচ চা এল না। অন্যদিন অশোকের জন্যই ব্যস্ত থাকে জয়ন্তী। কাছাকাছি ঘুরঘুর করে। এটা-ওটা এনে দেয়, টুকটাক কথা বলে, খুনসুটি করে। ওদের হুটোপুটি দেখে, কথা-কাটাকাটি শুনে হাসে ফুল-মোতিয়া। আজ সে সব কিছু হচ্ছে না। আজ জয়ন্তীর সমস্ত মনোযোগ পাখিটার জন্য। পাখিটাকে এনে অশোক নিজেই এখন অসুবিধেয় পড়েছে, অস্বস্তি বোধ করছে।

এতক্ষণে ফুলমোতিয়া এসে মসলা পিষতে বসল। টোস্ট ডিমসেদ্ধ রেখে গেল জয়ন্তী।

অশোক মুখ তুলে তাকাল না। মোটা মোটা হরফের খবরগুলিতে বিশেষ দৃষ্টি দিল।

জয়ন্তী আপন আনন্দেই মশগুল। ফুলমোতিয়াকে বলে কিছু ছাতু আনিয়েছে। কয়েকটা গুলি পাকিয়ে পাখিটার ঠোঁটের মধ্যে গুঁজে দিতেই কপ্‌কেপ্‌ করে খেয়ে নিল।

—ওমা, কি সুন্দর খাচ্ছে, দেখে যাও। জয়ন্তীর ডাকাডাকি গ্রাহ্য করল না অশোক।

একটু পরে চা আনল জয়ন্তী। শুনেছো, তুমি তো নাম বলতে পারলে না, ফুলমোতিয়া বললো, লক্‌কেড় খোদ—।

লক্‌কেড়-খোদ! ভুরু কুঁচকে এক মুহূর্ত ভাবল অশোক। ওহো, কাঠ-ঠোকরা, খুকু, কাঠ-ঠোকরা কেউ পোষে নাকি, এখুনি বাইরে ছেড়ে দিয়ে এসো।

—আহা, ওইটুকু বাচ্চা, ভাল করে উড়তে পারে না, বাইরে ছেড়ে দিলে কাক কিংবা বেড়ালে ধরে নেবে।

—তাই বলে কাঠ-ঠোকরা কেউ ঘরে এনে পোষে নাকি?

—আমি রাখব, আমি পুষব।

—খুব আহ্লাদ, মাথায় করে রাখো গে যাও।

—মাথায় করে রাখবো কেন, খাঁচায় রাখবো। বলতে বলতে ইজিচেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে একটু সামনে ঝুঁকল জয়ন্তী, দু'হাতে অশোকের গলা জড়িয়ে আবদারের সুরে বললো, আমাকে একটা খাঁচা এনে দাও না গো।

অশোকের মাথা জয়ন্তীর বুকের মধ্যে সোনার হারের লকেটটা গালে ঠেকছিল কেমন ঠান্ডা ঠান্ডা।

অশোকের অবাধ্য হাত দুটি অস্থির হয়ে উঠতেই সোজা হয়ে দাঁড়াল জয়ন্তী, একটু দূরে সরে বললো, এই যাও, অসভ্য!

—কাছে এসো। হাত বাড়িয়ে ডাকল অশোক।

—এমা, দরজা খোলা, ফুলমোতিয়া রয়েছে, তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই।

—তা হলে আমি খাঁচা এনে দেবো না।

অশোকের শাসানি শুনে বিপন্ন মুখে একবার বাইরের দিকে তাকাল জয়ন্তী, বললো—আচ্ছা, ফুলমোতিয়া চলে যাক তারপর—।

একবেলার কাজ সেরে ফুলমোতিয়া চলে যাবার পর খাঁচার দাবি আদায় করে ছাড়ল জয়ন্তী। খুশী মনে হার মানল অশোক দুপুরের মধ্যেই খাঁচা নিয়ে এল।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলো। বাইরে ঝিরঝির বৃষ্টি। কাল রাত্রি থেকেই মধ্যে মধ্যে এক এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছিল। কখনো মেঘ, কখনো ম্লান রোদ। আরাম করে ঘুমোবার মতন চমৎকার দুপুর। এখন বেলা বারোটা। বিকেল চারটে অবধি টানা ঘুমুবে অশোক। ছটার শোতে সিনেমা দেখতে যাবার কথা আছে। কিন্তু জয়ন্তী এখনো আসছে না। খাটে শুয়ে শুয়ে দেখ

পাচ্ছে অশোক। পেছনের বারান্দায় খাঁচাটা সামনে রেখে বসে আছে জয়তী। খাঁচার ভেতর পাখিটা মুখ উঁচু করে জড়সড় হয়ে আছে। কালো লম্বা ঠোঁট একটু ফাঁক করা। পাশেই একটা মাটির খুরিতে জল দিয়েছে জয়তী। পাখিটা কিন্তু জল খাচ্ছে না, খেতে পারছে না বোধ হয়। চামচে করে অল্প অল্প জল ঠোঁটের ফাঁকে কয়েকবার ঢেলে দিয়েছে জয়তী। পাশে একটা বাটিতে ছোট ছোট কয়েকটা ছাতুর গুলি।

পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছে অশোক। পিঠময় একরাশ কোঁকড়া চুল। কপালে সিঁদুরের টিপ। ফর্সা নরম গলার পাশে রেশম চিকন চুল। কানে সোনার মাছ। মাছের চোখে লাল পাথর।

অশোক ডাকল—জয়া, এদিকে এসো।

—যাচ্ছি, একটু পরে।

—আজ সিনেমায় যাবার কথা ছিল, মনে আছে?

অশোকের কথা শুনে মাথা নাড়ল জয়তী—আমি যাব না।

—সে কি, কেন?

—পাখিটাকে দেখবে কে, হুলো এসে ধরে নেবে।

জয়তীর জবাব শুনে বললো অশোক—আচ্ছা ফ্যাসাদ হল দেখছি, তা হলে তো তোমার কোথাও যাওয়াই হবে না। একটু থেমে আবার বললো, তার চেয়ে আমি যেখানে পেয়েছিলুম সেখানেই ছেড়ে দিয়ে আসি।

—মোটেই না। জোরের সঙ্গে মাথা নাড়ল জয়তী, আর একটু বড় হোক, যখন উড়ে যেতে পারবে, তখন ছেড়ে দেব।

একটু সময় চুপচাপ। তারপর অশোক বললো, কাঠ-ঠোকরার স্বভাব খুনখারাপ, গাছের গায়ে ঠুকরে ঠুকরে ফুটো করে দেয় আর নিরীহ পোকামাকড় ধরে ধরে খায়।

কোন জবাব দিল না জয়তী। চামচে করে একটা ছাতুর গুলি নিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিল। কপ্ করে গিলে ফেলল পাখিটা। মাথা ঝাঁকাল। তিরতির করে দু' পাশের পাখা নাড়ল।

অশোক আবার বললো, তোমার স্বভাব ঠিক কাঠ-ঠোকরা পাখির মতন, কথায় কথায় আমাকে ঠুকরে দাও।

—কি বললে? এবার মুখ ফেরাল জয়তী, ভুরু কুঁচকে বললো—আমার স্বভাব কাঠ-ঠোকরার মত, আমি তোমাকে ঠুকরে দিই?

—নিশ্চয়। পাশ-বালিশটা আঁকড়ে ধরে চোখ বুজে মিটি মিটি হাসল অশোক।

—তা হলে তোমার স্বভাব কিসের মত বলবো—একটু থেমে হাসি-হাসি মুখে বললো জয়তী—তোমার স্বভাব ওই হুলোটার মত, দুই চোখে লোভ, লোভের চাউনি, খালি ছোঁক ছোঁক, খালি খাই খাই।

—থাক আর ঝগড়া নয়, এখন শুতে এসো।

—একটু পরে যাচ্ছি, পাখিটাকে জল খাইয়ে যাব।

—একটা পাখির বাচ্চার জন্য তুমি এমন করছো, নিজের বাচ্চা হলে পর তো আর আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না।

—তোমরা পুরুষেরা ভারী স্বার্থপর, নিজেদের সুখটাই ষোল আনা দেখো। জয়তীর অভিযোগ শুনে একটুকাল চোখ বুজে চুপচাপ ভাবল অশোক। ভেবে ভেবে বললো—আর তোমরা মেয়েরা নিজেদের স্বার্থে পুরুষকে ভোলাও, তাকে যন্ত্রের মত ব্যবহার করো, তারপর একবার মা হতে পারলেই বাস্, তখন তোমাদের পায় কে, তখন বাচ্চার জন্যই সব আনন্দ, সব আহ্লাদ, সন্তানের সুখেই তোমরা মশগুল হয়ে থাকো, তখন পুরুষ শুধু চাকরের মত ফাই-ফরমাশ খাটবে—বলতে বলতে মস্ত একটা হাই তুলল অশোক, মুখের কাছে দুবার তুড়ি দিল। তারপর উল্টোদিকে পাশ ফিরে পাশ-বালিশটা আঁকড়ে চোখ বুজল। অশোকের কথার পিঠে আর কোন কথা বললো না জয়তী। ঘুম পেয়েছে মানুষটার। সারা রাত জেগে ডিউটি করে এসেছে।

পাখিটাকে আরো একটা ছাতুর গুলি আর দু ঢোঁক জল খাওয়াল জয়তী। তারপর খাঁচার দরজাটা বন্ধ করে দিল। দরজাটা খুব মজবুত নয়, একটু নাড়াচাড়া করলে খুলে যেতে পারে। খাঁচাটাকে কোথাও ঝুলিয়ে রাখতে পারলে ভাল হত। কিন্তু তেমন কিছু চোখে পড়ল না। বারান্দার এক কোণে

লোহার তার টাঙাতে হবে। একা একা পারবে না সে। ওবেলা ফুলমোতিয়া আসুক কিংবা অশোক ঘুম থেকে উঠলে পর বলবে। তা ছাড়া এখন পেরেক ঠোকাঠুকি করলে ঘুমের অসুবিধা হবে অশোকের। উঠোনে কাপড় মেলে দেবার জন্য লোহার তার খাটানো আছে বটে, কিন্তু এই টিপ্‌টিপ বৃষ্টির মধ্যে সেখানে খাঁচা ঝোলানো অসম্ভব। অগত্যা বারান্দার একপাশে পুরনো খবরের কাগজ পেতে খাঁচাটা রাখল জয়তী। পাখিটা কেমন জবুথবু হয়ে মুখ উঁচু করে বসে আছে। ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক। জুলজুল চোখে তাকাচ্ছে। ছেঁড়া একটা চটের কাপড় এনে খাঁচাটার চারপাশে ঢাকা দিতে দিতে বললো জয়তী—ঘুমো, এখন ঘুমো—তারপর আলতো পায়ে ঘরে এল। আস্তে টেনে দরজা ভেজাল। শিয়রের জানালাটা আধ-খোলা। ঘরের ভেতর আবছা আলো। বাইরে মেঘে মেঘে অন্ধকার। ঝিরঝির বৃষ্টি, বৃষ্টির শব্দ। ওপাশে ফিরে ঘুমিয়ে রয়েছে অশোক। আস্তে আস্তে পিঠের কাছে শুয়ে পড়ল জয়তী। শুয়ে শুয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল খেয়াল নেই, হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল জয়তী। অশোকেরও ঘুম ভেঙে গেল—কি হল?

—হুলোটা এসেছে। তাড়াতাড়ি খাট থেকে নামল জয়তী। দড়াম করে দরজা খুলে হইহই করে তাড়া লাগাল। কুচকুচে কালো বেড়ালটা বারান্দায় উঠে এসে বার কয়েক ডেকেছিল। সেই ডাকেই ঘুম ভেঙে গেছে জয়তীর। উত্তেজনায় ছুটে গেল। হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে কয়লা-ভাঙা হাতুড়িটাই ছুঁড়ে মারল। কোন ক্ষতি হল না। উঠোনের শেষে দেয়ালের গায়ে ঠঙ্‌ করে আছড়ে পড়ল হাতুড়িটা। নর্দমার ফুটো দিয়ে বেশ মোলায়েম ভঙ্গীতে হুলোর নিঃশব্দ নিরাপদ প্রস্থান খাটে বসেই দেখতে পেল অশোক। বৃষ্টি নেই। ভাঙা ভাঙা মেঘের ফাঁকে বিকেল ফুরিয়ে যাচ্ছিল। ভেজা উঠোন মাড়িয়ে বারান্দায় ফিরে এল জয়তী। জোরে জোরে দম ফেলছিল। ওর আলুথালু অবস্থা দেখে হাসি পেল অশোকের।

জুতসই একটা ঠাট্টার কথা মনে মনে খুঁজতে খুঁজতে খাট থেকে নামল। পরক্ষণেই চীৎকার শুনে তাড়াতাড়ি বাইরে আসতে হল। খাঁচাটার সামনে মাটিতে উবু হয়ে বসেছে জয়তী, চেঁচিয়ে বলছে—শিগগির দেখে যাও, পাখিটা কেমন হয়ে গেছে।

ভালভাবে দেখার জন্য বারান্দার আলোটা জ্বালাল অশোক। খাঁচার মধ্যে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে পাখিটা। একপলক দেখেই বললো, ও তো মরে গেছে—

—আহা কি করে মরল? কান্না-ভেজা গলায় বললো জয়তী।

খাঁচার দরজা বন্ধ। গায়ে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। কোথাও রক্তের দাগ নেই। হুলোটা কোন ক্ষতি করতে পারেনি নিশ্চয়। পাখিটার মৃত্যুর কারণ স্পষ্টত বোঝা গেল না। খাঁচার নীচের দিকে একটা পা ঝুলে রয়েছে, ঠোঁটটা তেমনি সামান্য ফাঁক। এলাচদানার মত চোখ দুটি স্থির। ঘাড় গুঁজে থাকার জন্য মাথার লাল ঝুঁটিটা ছড়িয়ে পড়েছে, আরো স্পষ্ট হয়ে আছে। একটা বিলিতী সিনেমায় দেখা রোমান যোদ্ধার হেলমেটের উপরের লাল পালকের কথা একমুহূর্ত মনে হল অশোকের। পাখিটা আরো বড় হতে পারলে নিশ্চয় আরো রঙের বাহার খুলতো, আরো পরিপূর্ণ হত, আরো সুন্দর হত। দু' চারটে লাল লাল পিঁপড়ে ইতিমধ্যেই ঘোরাফেরা শুরু করেছে। কি করে ওরা টের পায়, আশ্চর্য। মাটিতে লেপটে বসেছে জয়তী। ডান হাঁটুর উপর হাত দুখানি ভাঁজ করা, তার উপর চিবুকের ভার। চোখের কোণে দু ফোঁটা জল। ওর মাথায় হাত রেখে বললো অশোক, কাঁদছ কেন জয়া, তুমি আর কি করবে বলো, তুমি তো অনেক চেষ্টা করেছ, অনেক যত্ন করেছ। অশোকের মুখে নরম কথা শুনে, সান্ত্বনার ভাষা শুনে চোখের জল আরো বেড়ে গেল জয়তীর। আঁচল তুলে দু' তিনবার চোখ মুছল।

কি করবে, কি বলবে ভেবে পেল না অশোক। একটু সময় চুপচাপ থেকে আবার

সন্ধ্যেবেলা চোখের জল ফেলতে নেই, ছিঃ।

জয়তী উঠল না, নড়ল না। যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল।

—এখন উঠে চোখে-মুখে জল দাও, ফুলমোতিয়া এসে পাখিটাকে বাইরে ফেলে দেবে। বলতে বলতে আবার ঘরে এল অশোক। খাটের উপর বসল। একটা সিগারেট ধরাল। ঘরের কোণে কোণে অন্ধকার জমছিল। বারান্দার উজ্জ্বল আলো দরজার মাপে ভেতরে এসেছে কিছুটা। শিয়রের জানালা খোলা। সন্ধ্যার সব পাখিরা ঘরে ফিরছে। সেগুনগাছটার ভেজা পাতার মধ্যে রহস্যময় অন্ধকার। রাস্তার পাশে শহরের শেষ বাতিটা জ্বলে উঠল। খাঁচার সামনে একইভাবে বসে আছে জয়তী। বসে বসে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলছে। একটুকাল পরে সিগারেটটা জানালার বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে অলসভঙ্গীতে আবার শুয়ে পড়লো অশোক। খাটে শুয়ে জয়তীকে দেখা যায় না। একপিঠ এলো চুল আর ডান পাশের কিছুটা চোখ পড়ে। একটুকাল ভেবে এবার অন্যপথ ধরলো অশোক।

জোরে জোরে বললো, সত্যি বলতে কি, তোমার জন্যই মরেছে পাখিটা, তোমার বুদ্ধির দোষে।

—কি বললে? এবার নড়ে-চড়ে বসল জয়তী, আঁচলে চোখের জল মুছে এপাশে মুখ ফেরাল।

—যা সত্যি তাই বললুম, তোমার বোকামির জন্য মরল পাখিটা, ওইটুকু বাচ্চাকে অতখানি ছাতু গেলালে, ওরা বুনো পাখি, পোকামাকড় খায়, ওদের চোদ্দপুরুষে কেউ কখনো ছাতু খেয়েছে, তোমার নির্বুদ্ধিতার কোন সীমা নেই।

—আমি বোকা, আমি নির্বোধ, আর তুমি খুব বুদ্ধিমান? বলতে বলতে আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল জয়তী।

—নিশ্চয়, আমি সামান্য চার্জম্যান হতে পারি, কারখানার খালাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করি, আমার মুখ খারাপ, আমার চালচলন ভাল নয়, সব ঠিক, কিন্তু তোমার চেয়ে বুদ্ধি-বিবেচনা আমার ঢের বেশী।

চিত হয়ে বিছানায় শুয়ে পা নাচাতে নাচাতে সিলিং পাখাটার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছিল অশোক, তোমার মত বোকা মেয়ে ভূ-ভারতে নেই, ছাতু খেলে আমাদেরই জলতেষ্টা পায়। শরীর আই-ঢাই করে, আর ওইটুকু বাচ্চা পাখি, ও তো জলের জন্য গলা শুকিয়ে মরে গেছে। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি নাকি আবার স্কুল ফাইনাল পাস করেছিলে, আশ্চর্য!

—তাই নাকি! দাঁড়াও—বলতে বলতে ছুটে এসে অশোকের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জয়তী।

কুবেরের বিষয়আশয়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

বাঁ হাতখানা মেলে ধরল কুবের। পাণ্ট শার্ট পরনে লোকটি ইংরাজী একটা নাম বলল কিসের। বার কয়েক শুনলে তবে মনে থাকে। কুবের বুঝতে পারেনি দেখে লোকটি বলল, পেশেণ্টকে নির্জলা সত্যি বললে শক্ খেতে পারে—তাই টি বি হলে প্রথমে আমরা বলি কল্ড ইনফেকশান।

বেশ ভোরের ট্রেন, লোক নেই বললেই একেবারে নেই। ছুটন্ত চৌকো জানালায় সবুজ ধান শুধু। কামরার মেঝেতে আঁসটে গন্ধ, জল। রাত থাকতে মাছ বোঝাই দিয়ে কলকাতা ছুটেছিল। এখন ফিরছে।

ভয়ের কিছু নয়—ড্রাই একজিমা। ধৈর্য ধরে ট্রিটমেণ্ট করতে হবে।

আরও কঠিন কিছু বললে কুবের অবাক হত না। কিছুদিন ধরেই ভয়ে ভয়ে আছে। হাতের আঙুলে কালচে এসব দাগ কোন সহজ ব্যাপার নয়। কুষ্ঠ হবে না ত? হলে বোধ হয় আস্তে আস্তে দাগের জায়গায় ব্যথা হয়, চামড়া ফাটে—শেষে ফুলুনি শুরু।

গলিতে খেলুড়ে ছেলেমেয়েদের দু একজনের হাঁটুতে কী আরও নীচে জিনিসটা দেখেছে। মাখন মাখানো পোড়া কালো টোস্ট। ঘা শুকোয়, আবার ক'দিন অন্তর ব্যাগ ব্যাগ করে পেকে ওঠে। সেও এক রকমের একজিমা। তবে কুবেরেরটা শুকনো।

অল্প দিন আগে পড়েছিলাম—

কুবের কিছুই শুনতে পেল না এর পর। সব-শুনেছি ভাবে তাকিয়ে থাকল। চোখ পোড়াচ্ছে। সকাল হতে না হতে বেরিয়ে এসেছে।

ফাঁকা কামরায় দেশলাই চেয়েছিল লোকটি—তা' থেকে এতদূর গড়াল। নাইণ্টিন থার্টিফোরের ম্যাট্রিক, ফাইন্যাল এম বি। সরকারী হেলথ্ সেণ্টারের ডাক্তার। মাস পয়লা—নিজের, স্টাফেদের মাইনে আনতে কলকাতা গিয়েছিল।

কুবের এতক্ষণ সবই লোকটির মুখে শুনেছে। আপত্তি করেনি, অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে নি। বছর কয়েক হল, ডাক্তার পেলেই ভেতরটা দেখিয়ে নেওয়ার জোর ইচ্ছে হয় তার। এমনিতে কুবের দুর্বল না। দুপুরে ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়ে বিকেলে পাঞ্জাবি গায়ে বেরোলে নিদেন পক্ষে মফস্বলের হিরো লাগে তাকে। তবে, এখনি মুঠো বাগিয়ে আগের সেই জোর আর পায় না ঘুষিতে।

লোকটি তার হাতখানা হাতে নিল, 'জার্নালেই একটা লেখা পড়েছিলাম—সেটা দুই কেসও দেখেছি—'

একদলা চাপ মত কী একটা বুকের ভেতর থেকে লাফিয়ে মাথায় উঠে এল কুবেরের। লোকটা এখন যা ইচ্ছে বলতে পারে। বছর চারেক আগেই যদি সাবধান হত। পাড়ার ডাক্তার একটা প্রেসক্রিপশনও করেছিল। বড় মুসুরির দানা—রঙও সেইরকম—ট্যাবলেট-গুলো কদিন খেয়েছিল কুবের। কিন্তু এমন ব্যথা শুরু হল বুকে—শেষে খাওয়াই ছেড়ে দিতে হল।

—খুব পুরনো ভি ডি থাকলে গাঁটে গাঁটে কালো ছোপ ধরতে শুরু করে—কলম্বোয় এক পেশেন্টকে দেখেছিলাম—

পাঞ্জাবির হাতা কনুই পার করে নিয়ে হাতখানা ঘুরিয়ে ধরল কুবের, 'পাড়ার ডাক্তার বলেছিল এক্সটার্নাল ডারমাটাইটিস—'

—হতে পারে, সব স্কিন ডিজিজই এক্সটার্নাল। পা দেখি।

খানিক দেখে লোকটি বলল, 'বুড়ো আঙুল দুটোই কালো হতে আরম্ভ করেছে।

কুবের জানে। গরমকালে পায়ের আঙুলে কেমন তেলেভাজা বেগুনি হয়ে যায়। শীতকালে ছাল ওঠে। এসপ্ল্যানেডে পায়খানা পেলেও গা এতখানি সিরসির করে না। দু হাতে লোকটার হাত জড়িয়ে ধরার ইচ্ছে হচ্ছিল। ভালো কিছুর শুরু হলেই মাঝামাঝি এসে ফি-বার কুবেরকে আগাগোড়া ভেঙে ফের কাঁচামাটি করতে হয়। অনেক কষ্টে নিজেকে বাগে রাখল কুবের, 'ধরুন যদি ওয়ার্স্ট কিছুই হয়ে থাকে—

'লং ট্রিটমেণ্ট লাগবে। কাজকর্ম সেরে

—হতে পারে, সব স্কিন ডিজিজই এক্সটার্নাল।..

আসুন না সেণ্টারে—এখানকার হাসপাতাল দেখে যাবেন।'

কুবেরও কদমপুরে যাচ্ছে। আজ বছর খানেকই যায়। এই প্রথম আলাপ হল কদমপুর হেলথ্ সেণ্টারের ডাক্তারের সঙ্গে। লোকটা চুয়াল্লিশ প'য়তাল্লিশ হবে। এরা মরলে কাগজে লেখে অকালবিয়োগ। মোটা রোজগারের আশায় ডাক্তারি পড়েছিল। সুবিধে হয়নি বলে বাঁধা মাইনের চাকরি নিয়েছে। ডাক্তার যখন কদমপুরে সবাই চেনে। তার সঙ্গে কথাবার্তার পর এবারে লেখানোর জন্যে রেজিস্ট্রি অফিসে মুহুরি-দের মাদুর-বিছানো খাটে বসে এমন দু' চারখানা কথা কুবেরের রগে বসে গেছে। তবে, ওইটুকু বিনয়ের জন্যে যে পরিমাণ সম্পত্তি থাকা দরকার তার সিকির সিকিও কুবেরের এখনও হয়নি।

মন্দের ভাল, ঠিক কোন্ দাগ কিনেছে—কিংবা আর কোন্ কোন্ দাগ কিনবে সেটুকু আর ভাঙেনি। প্যাকেট এগিয়ে দিতে লোকটা নিজের পকেট থেকে একটা রকমুনো সিগারেট বের করল, 'দেশলাইটা দিন বরং—'

ডেলি প্যাসেঞ্জারের দল সাইকেলে স্টেশনে ছুটছে

লোকটা আপারহ্যাণ্ড পেয়েছে। গোড়ের মাথায় শুধু ধেনো মাঠ দেখে যাচ্ছে।

রুদ্রনগরে এক মিনিটও দাঁড়ালো না ট্রেনটা। সরু পিয়াসলে ডবল লাইন বসছে বলে অনেকটা পথ হামা টেনে এগোতে হয়েছে। এদিকে ইলেকট্রিক ট্রেন চলবে আর কিছু দিন বাদে। তারই তোড়জোড়।

সকালের ডাউন লোকালগুলোর মধ্যে এটা মিড ট্রেন। সময়মত স্টেশনে আসতে কুবের দু'টো বাস বদলে রিকশায় এসেছে বাকিটুকু। টিকিট কেনার ভাঙানির ঝামেলা এড়াতে বুলু কাল রাতেই মাপা খুচরো পাঞ্জাবির ইনসাইড পকেটে রেখে দিয়েছিল। আটানব্বই পয়সাতেও কুবের কদমপুর যাতায়াত করতে পারে—আবার সারাটা পথ ট্যাক্সি দাবড়ে শেষ নোটখানাও উড়িয়ে দিতে পারে।

ডাক্তারের কাছে পয়লা আলাপেই এতখানি মন খোলা ঠিক হয়নি। *ভাবিয়া করিও কাজ —করিয়া ভাবিও না। উঃ! চিরটা কাল কুবের প্রথমে করে ফেলে—তারপর ভেবে ভেবে মরে আর পোড়ে।*

কোথায় যাচ্ছে বলার পর লোকটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানতে চাইল, কেন যাচ্ছে?

কুবের একবারে বলতে পারেনি সবটা। বাড়িঘর বিষয় আশয় হলে লোকে যেমন যেমন বিনয় করে খানিক ভেঙে খানিক চেপে বলে—তেমন ধারায় বলল, স্টেশনের ধারাধারি এটুখানি জমি রাখবার ইচ্ছে আছে। সামান্য—

এসব ভাষ আগে জানতো না। রাখবার মানে কেনার। ইচ্ছে আছে মানে কেনা কমপ্লিট রেলে যাতায়াত, পুরনো দলিল

হাতের সিগারেটের আগুন এগিয়ে দিতে লোকটা বলল, 'সুবিধে পাইনে দেশলাইটাই দিন।'

খারাপ অসুখ থাকলে আগুন ছোঁয়াচে হয়ে যাওয়ার কথা কোনদিন শোনেনি কুবের। দেশলাই দিল, ফেরৎ নিল—পকেটে রাখল।

'তা আপনি সেই শালকে থেকে এত দূরে এই কদমপুরে?'

লোকটাকে কুবের অনেক কিছু বলতে পারত। মুক্ত বায়ু, জায়গাটা নির্জন, ইলেকট্রিক ট্রেন চালু হলে আধ ঘণ্টার শেয়ালদা। কিন্তু, সব কথাই পেছনে লেজ ফেলে যায়—তা ধরে নতুন নতুন কথা পাততে বসবে লোকটা।

'চলে এলাম আপনাদের কদমপুরে—'

দু' নম্বর লাইন দিয়ে ট্রেন ইন করল। প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে রাস্তায় ওঠার আগে লোকটা তার নাম বলল, বিমল মজুমদার। কুবেরও তার নাম বলল।

তারপর রাস্তায় পড়ে কুবের বিমলের পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। মানকচু, বুনোসিম ডালায় চাপিয়ে ব্যাপারীরা বাজারে চলেছে। সাইকেল-ভ্যানে তাড়ির কলসী—ফুলতলা দিয়ে বাস আসছে ধুলো উড়িয়ে, বিড়ে পাকানো পুঁইশাকে ছাদ ভর্তি।

'দেখুন ছোটবেলায় খুব একটা ট্র্যাজিক', একটু থামতেই হল কুবেরকে, এত ভিড়ে কিছু বলা যায় না, 'স্যাড্ এক্সপিরিয়েন্স—ঘটনা বলতে পারেন—'

বিমল ডাক্তার রাস্তার লোকের নমস্কারে নমস্কার করল. 'আসুন না সময় করে—

ইরিগেশনের কাটা খালের পাড় ধরে এক মেঠো রাস্তায় উঠে এল। হাতে একটা পোলো। রাত থাকতে বসিয়েছিল। কল-কাতার এত কাছে জলের মাছ, মাঠের ধান, ফাঁদপাতা পাখির মিষ্টি মাংস—দাম কম না হলেও জায়গারটা জায়গায় বসে খাওয়ার সুখ, আরাম, স্বাদের কথা ভাবলেই কুবেরের মনে হয় খাঁটি শেকড়ের কায়দায় সরাসরি মাটি থেকে সে নিজে নিজেই রস টেনে নিচ্ছে। অথচ—

সকালের রোদে হাতের চেটো উপুড় করে কালো দাগগুলো আবার দেখল। ব্যথা নেই, চুলকোয় না—তবে, আগের চেয়ে আরও বেশি জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

'ট্রপিকালে দেখাতে পারেন।'

'একটা সমস্ত টমঙ্গা আছে ত—গেলেই কি দেখবে?'

বোধ হয় সোম আর বুধ'—হাঁটতে হাঁটতেই বিমল বলল, 'তবে, ওখানে লাইন দিয়ে দেখালে, কতকগুলো ওষুধ একেবারে খাঁটি পাওয়া যাবে—পয়সাও লাগে না—কিন্তু'—, ডেলি-প্যাসেঞ্জারের দল সাইকেলে স্টেশনে ছুটেছে। তার ভেতরেও হাঁটা না থামিয়ে বিমলের মুখে তাকিয়ে থাকল কুবের।

'নার্ভাস ব্রেকডাউন না হয় শেষে। চিকেন ডিজিজের, তাছাড়া অন্য সব অসুখের রুগী এত আসে—আর এক একখানা যা স্যাম্পেল, বীভৎস। এদের সঙ্গে লাইন দিয়ে কী ওষুধ নিতে পারবেন?'

বিমল ডাক্তার দাঁড়িয়ে পড়েছে। সে যাবে হেলথ্ সেণ্টারে, কুবের যাবে নয়ানদের বাড়ি। চারদিক জলে, মাটিতে, ধানে আগাগোড়া রসস্থ হয়ে আছে। সামনে তেমন কোন বাধা নেই—সবই সহজে হয়ে যাওয়ার জোগাড়। এসব মাঠ বুলুকে নিয়ে ক' মাস আগেও দেখে গেছে কুবের। কীভাবে কিনবে, কী দিয়ে কিনবে—কার জায়গা? —কিছুই জানত না তখন। রোজ মনে হত, টানাটানির মধ্যে এভাবে ট্রেন—বাস—ট্রাম করে পয়সাগুলো জলেই যাচ্ছে। কখন সব হয়ে আসছে—ঠিক তখনই—

'আপনি আছেন ত? নয়ানবাবুর বাড়ি কাজ সেরেই যাচ্ছি—'

বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলে বিষম হোঁচট খেল কুবের। আঙুলটার নীচে অনেকদিনের কড়া। মোষের তলপেটের চামড়া হলে কেল্লাপুরী স্যাণ্ডেল টেকসই হয়। গর্দানের হলে ছিঁড়বেই। কেনার সময় দোকানদার এরকমই বলেছিল। স্যাণ্ডেলটা এত টেকসই যে কিছুতেই ছিঁড়ছে না। [illegible]

দু তিনশো ফুট জুড়ে খালপাড় বিকট-ভাবে তাকিয়ে আছে। আশপাশের লোকেরা ইচ্ছে মত মাটি কেটে নেওয়ায় এই দশা।

এখন সকাল। আটটাও বাজেনি বোধহয়। ভোরের ডিউটিতে সি এল মেরে আজ কদমপুরে এসেছে কুবের। প্রায়ই আসে। ট্রেনের সময় এখন মুখস্থ। ফার্স্ট ট্রেন ভোর চারটে পঞ্চান্নয়, সেকেন্ড ছ'টা কুড়িতে, থার্ড আটটা পঁয়ত্রিশে। সর্দাপিয়াসলে মাঝে মাঝে মোবাইল চেক বসে। রুদ্রনগরে এ্যানাটোন মলমের ফিরিওয়ালা ওঠে।

এই খাল দিয়ে একদিন কলকাতার ময়লা জল আরও তিন চার স্টেশন পরে নদীতে গিয়ে পড়ত। ময়লার পলিতে সে নদীর বুক বুজে গিয়ে খালের এই দশা। নতুন নতুন বিয়েনে ভরাট ধানের গোছে ঢাকা পড়ায় নতুন কাটা খাল হঠাৎ নজরে আসে না। সেগুলো দিয়ে ইরিগেশনের ইঞ্জিনীয়াররা মাঝে মাঝে স্পীড্‌বোটে ছুটে যায়—মাঠ দিয়ে রেলের ওভারব্রীজের নীচে অন্ধকারে ঢোকে, ইন্সপেকসন। এই পুরনো খালের জল মাইলখানেক ধরে বহু-কাল আটকে আছে। কচুরিপানায় ফেঁপে উঠেছে—মাঝে মাঝে শোলের ঝাঁক পরিষ্কার আলোয় দেখা যায়।

কুবের খোঁড়াতে খোঁড়াতে খালপাড়ে উঠে এল। উনিশশো সাতাশের জেলা জরিপের নক্সায় জায়গাটা দেখেছে। মথুর আমিন দিয়ে মাপানো হয়েছে। চুয়ান্নর রিভাইজড্ সেটেলমেন্টের হিসেবের সঙ্গে মিলে গেছে।

মৌজা মেদনমল্ল, থানা কদমপুর, জেলা চব্বিশ পরগনা। সার্ভেয়ার রায়মশায় খাল-পাড় বলেন না—বলেন, এনব্যাংকমেন্ট। ফিতে ফেলে দেখেছেন, চওড়ায় সত্তর ফুট। আরও দশ ফুট ছিল। সেটুকু সোল-গোহালিয়া, নাড়িদানার লোকজন কেটে নিয়ে গেছে। কী মাটি। শক্ত লোহা। জল পড়লে দাঁড়ায় না। খালি পায়ে হাঁটলে গোড়ালি ব্যথা করে। বেঁটে বেঁটে বাবলার ঝাড়, সাপের গর্ত, একাদশীর বিকেলে এলে সবে ফেলে-যাওয়া লম্বা লম্বা ফ্যাকাশে খোলশ দেখা যায়—হ্যাজাকবাতির ম্যান্টেলের চেয়েও নিভাজ, ফটফটে শাদা।

নয়ান বলেছিল, এসব জায়গার দাম এত চড়বে জানলে কত জমি আমরা জলের দরে ধরে রাখতে পারতাম। কী ছিল এসব জায়গা। আমাদের বারন্দা থেকে সালতি চড়ে এদিকে আসতাম। করপোরেশন ময়লা ছেড়ে ছেড়ে নিকাশের পথ সব বুজিয়ে ফেলল। বাংলা তেত্রিশ সনে বিদ্যেধরী পিয়ালিও বুজে গেল। সেই থেকে বিশ বাইশ বছর একনাগাড়ে সারা তল্লাট জুড়ে ছিল বড় বড় হোগলার বন। তবে, মাছের সুখ কিছু গেছে। দলকে দল জাওলা পেতে, ঘুনি বসিয়ে, আলো-পোলোয় শাল-শোল, বান-বোয়াল ধরে শেষ করতে পারেনি। পাম্প বসিয়ে জল টেনে নেওয়ার পর আট দশ বছর চাষ হচ্ছে একটু আধটু—একেবারে নোনামাটি।

ট্রেন লাইনের ওপারে ইলেকট্রিক এসেছে। বাজার, ডিমের কারি, হোটেল, গম ভাঙানোর কল—সন্ধ্যেবেলা আলোর জ্বরে ঝাঁ ঝাঁ করে। এদিকটায় পোস্টে চড়ে তার এসেছে—কিন্তু আলো আসেনি। ইলেকট্রিক ট্রেন চালু হলেই আন্ডারগ্রাউন্ড কানেকশন দেবে। সকালবেলার রোদে লাইনের দু' ধারই একরকম দেখাচ্ছে।

নয়ানদের বাড়ি যেতে বিঘে তিনেকের এক ডোবা। না পুকুর না ডাঙা। শালী জমি—মাস দুই আগে কাদা করে ভাগচাষীরা বীজতলা করেছিল। এখন মোটা মোটা ধানের গোছে জায়গাটা সবুজে হয়ে আছে। কুবের দর করেছিল। পালেদের জায়গা, পয়সার অভাব নেই—দাম আরও চড়লে ছাড়বে।

জলের দর কথাটা শুনলে কুবেরের বড় দুঃখ হয়। ইস তখন যদি বয়স্ক থাকতাম

—হাতে টাকা থাকত! এক একদিন ট্রেনে বসে দু' পাশের মাঠ দেখে মনে হয়, সাইজমত বিরাট একলপ্তে অনেকটা জমি গালগল্পের জলের দরে পাওয়া যেত যদি। এদানী ব্রহ্মোত্তর দেয় না কেউ। তাহলে একেবারে কল্পবাড়ি করে তুলত। ভদ্রাসন, পুকুর, ফলের বাগান, সম্বচ্ছরের ধান মলানোর মাঠ—সব—সব একসঙ্গে হয়ে যেত।

কলকাতায় বাসে-ট্রামে ঠাসাঠাসি, ফালি ফালি ঘর, শীতকালে সন্ধ্যে হতেই ময়লা ভর্তি চাপ চাপ ধোঁয়ার দলা অতিকায় বাদুড় হয়ে ট্রামের তারে ঝোলে। তখন চোখ জ্বলে, নিঃশ্বাস টানা যায় না। আত্মঘাতী হওয়ারও ভাল জায়গা নেই। পুরোনো আলিপুরে এদিক সেদিক দু' চারজন বাপকেলে সম্পত্তি আগলাচ্ছে। রোজ সকালে পঞ্চাশ লক্ষ লোকের জিনিসপত্রের আন্ডার গ্রাউন্ড দিয়ে গঙ্গাযাত্রা। এতলোক দিনের মধ্যে কতবার জল সরে। ভাগ্যিস উপরটা রাস্তাঘাট দিয়ে মোড়া—দোকানপসার দিয়ে সাজানো।

দুই

' বারান্দায় এ্যালসেসিয়ান আজ চেঁচালো না। কুবের পাতা চেয়ারে বসতেই নয়ান বেরিয়ে এল, 'কতক্ষণ এসেছেন?'

'এই ত।' কুবের এর বেশি একবারে বলতে পারল না। বিমল লোকটা সকালবেলা আঙুল দেখে কী কী বলল তা নয়ানকে বলা যাবে না। বিমল এখানকার ডাক্তার। তার আঙুলে যদি কিছু না হয়েও থাকে—তবু, কিছু হয়েছে—এমন সন্দেহের কথা বিমলকে বলা ঠিক হবে না। ডাক্তারের মুখে রোগের কথা লোকে বিশ্বাস করবেই—তা যদি বানানোও হয়। বিশ্বাসী চাকর, ডাক্তার, ঠিকাদার, রেডিও মেকানিক, প্লাম্বার খুঁজে পাওয়াও কঠিন। তবে কুকুররা এখনও বিশ্বাসী।

নয়ান দালাল না, দারুণ গেরস্থও নয়। মোটা মাইনের অবস্থাপন্ন বাবার বড় ছেলে। প্রায় কল্পবাড়ির মত বাড়ি। পেছনে ধানীজমি, ফলের বাগান, পুকুর, বিরাট উঠোন, বসবার বারান্দার সামনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে নানান ফুলের বাগান। কোমর উঁচু দেওয়ালে সবটা ঘেরা।

নয়ান দত্ত কুবেরকে দাদা ডাকে। এই অল্প বয়সেই অনেকেই তার কাছে সলা-পরামর্শ নিতে আসে। রায়তী স্বত্ব, না-দাবি, হ্যান্ডনোট, মর্টগেজ, বেনামদার সবই নয়ান খানিক খানিক বোঝে। এখানকার [illegible] পান্ডা লাইব্রেরির ফাউন্ডার [illegible] নাইট গড' [illegible]

বৌটি ভাত দিল।..

চাকরীও করে—ছুটিছাটায় পুরী ঘাটশিলা-ঝাড়গ্রাম ছোটে।

বউটি আদর্শ সহধর্মিণী। একদিন জমি জায়গার ব্যাপারে সারাদিন ছুটোছুটি গেল। নয়ান তাকে সন্ধ্যে সন্ধ্যে ট্রেন ধরার আগে খেয়ে যেতে বলল। বউটি ভাত দিল। কী সুন্দর গোছালো—যত্ন করে তাকে ভেতরের বারন্দায় বসে স্বামীস্ত্রীতে খাওয়ালো।

'বলরাম এসেছিল। আপনি ছাব্বিশের ওপর কিছুতেই উঠবেন না। চেপে থাকবেন।'

'থাকতে থাকতে যাতায়াতেই যে গচ্ছের পয়সা বেরিয়ে যাচ্ছে—'

'জমি জায়গা করতে গেলে ওটুকু বেরোবেই। আগে বেশ খানিকটা নিয়ে বাড়িঘর করে বসে যান আপনারা—তারপর ধীরে সুস্থে দেখে শুনে কিনবেন। হুটোপাটা করেছেন কী দর চড়বে—'

'দর কী আমি চড়াই নয়ান! চড়ায় রেল—'

'মানে?'

'আসবার সময় রোজই দেখি রুদ্রনগরে ইলেকট্রিক ট্রেনের ওভারহেড তার টেনে নিয়ে যাচ্ছে—লাইনের দু' পাশে জরিপ

মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে না। এসব কী আর তোমাদের বলরাম, ভুবন ওদের চোখে পড়েনি?'

পড়ুকগে। আপনি চেপে থাকুন। নিজে হেঁটে এসে ও জমি আপনাকে লিখে দিয়ে যাবে। আগ্রহ দেখিয়েছেন ত কী মরেছেন।'

মরবারই কথা। এ তল্লাটে বিঘেটাক জমির যা দর তা দিয়ে কাঠা দুরে থাক—কলকাতার আশেপাশে ছটাক খানেক জায়গাও কেনা যাবে না। সস্তাই বলা যায়। কিন্তু মুস্কিল অন্যদিকে। ডাঙ্গা জমি নয়—শালী জমি সব। এ বছরও চাষ দিয়েছে। শুটকো শুটকো [illegible] হয় অনেক কষ্টে। জল দাঁড়ায় না উঁচু করে আল দিয়ে জল বেঁধে রাখতে হয়। ফি বছর আল সরতে সরতে কার জমি যে কোথায় তা আর জেলা জরিপের নকসা দেখে বোঝার উপায় নেই। তার ওপর মনোমত সাইজের জমি পাওয়াও কঠিন। কোনোটা ছিটকানো পায়েস—কোনোটা অষ্টাবক্র। মাপেই বারো কাঠা তেরো ছটাক—তাতে বড়ি শুকোতে দেওয়া যায়। পুকুর কেটে জায়গা ভরাট করে সেখানে আর বাড়িঘর তোলার জায়গা থাকে না। থাকলেও, সামান্য জমি—তাহলে আর ট্রেনে এতখানি আসা কেন? কলকাতায় থাকাই ভাল। তাই, কুবেরের মুখে জায়গার কথা শুনে আরও চার পাঁচজন তার সঙ্গে এখানে এসেছে। বাঁকাচোরা জায়গাগুলো সবাই মিলে এক লপ্তে কিনে পরে সাইজমত ভাগ করে নেওয়ার কথা হয়েছে।

কিন্তু নেওয়া আর হয়ে উঠছে না। বলরাম, ভুবন ওরা বড় ভোগা দিচ্ছে। আর ওদেরই বা দোষ কী। দালালের কান ভাঙানিতে কার না মনটা দপ্ দপ্ করে। দেব দিচ্ছি করেও বলরাম, ভুবন দিচ্ছে না।

'ওই ছাব্বিশের দরেই দেবেখন। দেখবেন—'

নয়ানের সঙ্গে তর্কে গেল না কুবের। এমন কোন দায় নেই নয়ানের যে, কুবেরকে তার জমি কিনিয়েই দিতে হবে। নয়ান না থাকলে এখানে তার জায়গা কেনা সহজ হত না।

'বলরাম দোকান আগলাতে গেছে। ভাইপোটাকে বসিয়েই আসবে। এখন ত ওর সকালবেলা—জোর বাজার—'

'আমি বরং ঘুরে আসি—তোমাদের এখানকার ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হল।'

'যেতে বলেছে?'

'বলছিল—'

'যান। তবে, দেরি করবেন না। বলরাম এসে পড়বে—'

[illegible]

কিনবেন—কাদের জমি—পল্টাপল্টি কিছু বলবেন না কিন্তু। ওরাই ঘা দিয়ে দর চড়ায়।'

এ কথাটায় কুবেরের মাথার মধ্যে প্রায়ই বড় বড় গুণ ভাগ আরম্ভ হয়ে যায়। নাইন্টিন টোয়েন্টিফোরে বালিগঞ্জ গার্ডেনে কাঠা ছিল চারশো। এখন? ভাবাই যায় না কত গুণ বেড়েছে। তখন যদি খানিকটা কিনে রেখে দেওয়া যেত। কিন্তু তার উপায় ছিল না। চব্বিশ সনের বেশ পরে কুবেরের জন্ম।

'না না আমি কিছু বলছি নে—'

নয়ান পরিষ্কার বলে দিয়েছে অনেক-বার—কারও সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কথা বলবেন না। ভালোমানুষি এখানকার অনেকে বোঝে না। নিজের গ্র্যাভিটি নিয়ে থাকবেন।'

আগ বাড়িয়ে কিছু বলাও বিপদ। কুবের তা এখন হাড়ে হাড়ে জানে। কী কুক্ষণে যে টিকিট কাটার কাউন্টারের লোকটির সঙ্গে কথা বলেছিল। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অনেক জিনিস কুবেরের মুখ দিয়ে শুনেছে। তখন সে কদমপুরে প্রথম প্রথম আসছে। তারপর দেখা গেল সিগন্যালের লোক, ক্রুম্যান, মায় ঘণ্টিওয়ালা—সবার খোঁজেই সস্তায় জমি আছে—অর্থাৎ দালালির গুড়ে সবারই লোভ।

বাস আসছে দেখে রিকসাওয়ালা মাঠে নামল কুবেরকে নিয়ে। নস্করদের ইটের পাঁজায় ধোঁয়া বেরোচ্ছে। বাতিল খোলা-গুলো ধানী জমির মাঝে মাঝে বর্ষার জলে এক একটি দিঘি হয়ে আছে। ইজারাদারের লোক ছুটির দিনে ছিপফেলার পাশ ছাড়ে। পঞ্চাশ ষাট বছরের সব গর্ত—এবড়ো-খেবড়ো। তিরিশ সের এক মণের সব মাছ দিঘি তোলপাড় করে রাজত্ব করে বেড়াচ্ছে। নয়ানের জ্যাঠাবাবু বড় ভোলার সঙ্গে সাতশো গজ নাইলন কর্ড বেঁধে কামার দিয়ে গড়ানো ম্যাগনাম সাইজ বঁড়শিতে বেড়াল গেঁথে ছেড়ে দিল চড়কের রাতে। পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা ভেলাটাকে মাঝ-দিঘিতে টানাটানি করে মাছটা একেবারে মাটিতে গিয়ে শুয়ে থাকল। কর্ড ধরে কিছুতেই তোলা গেল না। শেষে রাগে রাগে জ্যাঠাবাবু নিজেই কেটে দিল।

নয়ান বলেছিল, 'ওসব মাছ বঁড়শি গেলায় চোস্ত। মুখ একেবারে স্টিল হয়ে গেছে।'

সন্ধ্যেবেলা ইটখোলার গর্তগুলো দেখে কুবেরের বড় কষ্ট হয় আজকাল। খাবলা খাবলা মাটি তুলে নিয়ে যাওয়ার পর খন্দ-গুলোর আর সদ্গতি হয়নি—পিণ্ডি দেয়নি কেউ। ইটখোলা যে বানিয়েছিল, কাজ ফুরোতে কবে সে কেটে পড়েছে।

একটা বোড়াসাপ রিক্সার চাকা বাঁচিয়ে খালে নেমে গেল। বিমল ডাক্তার ওয়ার্ডের বাইরে অর্ধেক বয়সের এক ছোকরার সঙ্গে মাঠে দাঁড়িয়ে। তেল চপচপে ছোলা ছুঁড়ে ছুঁড়ে গালে দিচ্ছে। কুবেরকে দেখে এগিয়ে এল, 'ভেতরে বসুন—আসছি।'

'... পাকা খয়েরের তার পেছন ছাড়েনি

সেণ্টারে ঢোকার মুখে কুবের একখানা পুরনো মোটর দেখেছে এইমাত্র। সামনের বাঁ চাকাটি পাম্পার করে গাড়িটি বিকল। পেছনের সিটে হেলান দিয়ে ঘাড়ে গর্দানে দুই মক্কেল তাড়ির কলসি ফাঁক করছে। বাইরে দাঁড়ানো একটা লোকের চোখে গগলস্। বোধহয় ড্রাইভার। তারও হাতে একটি পকেট কলসি।

কুবেরকে এক ছোকরা ভেতরে বসাল। বাইরে ডাক্তারের সঙ্গে আড্ডাধারী ছোকরাটি চেনা চেনা লেগেছে কুবেরের। সে-ই ভেতরে এল, 'সাবধানে বসবেন। চাদ্দিকে ইনফেকসাস সব রোগ—'

কুবের চিনতে পেরেছে। মহা ফোক্কড়। নাম বিকাশ বোস। পেকে একেবারে খয়ের। অল্প বয়সেই বিয়ে থা করে বাপের সম্পত্তি আগলাচ্ছে। স্টেশনে আলাপ হয়েছিল। অতটুকু ছেলের তিন তিনটে পোনা প্ল্যাট-ফর্মেই বাপের কাছে পয়সা চাইতে এসে-ছিল। কুবেরের সঙ্গে প্রথম আলাপেই বলেছিল, 'আপনি শালকের কুবের সাধুখাঁ না? আপনাকে আমি চিনি।'

স্মার্ট কথাবার্তা—জগতের সব বোঝে এমন ঢঙের মুরুব্বিয়ানা হাঁটা চলায়। সংক্রামক রোগের কথা বলল কেন? এমন কাছাখোলা হওয়ার জন্যে নিজেকেই দুবেলা দুষছে কুবের। আপনাকে আমি চিনি বললে কুবেরের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। অথচ সে ফেরারী নয়।

ডাক্তার এল খানিক পরে। একেবারে ওয়ার্ডে নিয়ে বসাল। লাইন দিয়ে রুগীর দল। টিকিট দেখতে দেখতেই কথা চালাল। কুবের অনেকটা অবশ হয়ে পড়েছে। তার কী কোন অসুখ হবে। কিংবা হয়েছে। ধরতে দেরি হয়ে গেছে বলে হয়ত আর সারবে না।

ট্রেনের মত এখানেও আপারহ্যান্ড নিল ডাক্তারটা। দু'চারবার আঙুল এগিয়ে দিয়ে গুটিয়ে নিতে হল কুবেরের। কনক্লুশনে পৌঁছে গেছে এভাবে কিছুই দেখল না ডাক্তার। নিজে থেকেই আবার আসবার কথা বলে কুবের রিক্সায় বসল।

বিকাশ ফোক্কড় গেটেই ছিল, 'এ কি উঠলেন?'

'হ্যাঁ, আজ আসি—' একেবারে সিনেমার বিদায় নিয়ে ফেলল কুবের। ফেরার মুখে সেই গগলসধারী, বিকল মোটর—পিচের লম্বা ফিতে, সাইকেল রিক্সার ছায়া সামনে সমানে ছুটেছে।

'জমিজমা কন্দূর?' পাকা খয়ের তার পেছন ছাড়েনি।

'কোথায় আর হচ্ছে—' রিক্সা থেকেই ছ'ড়ে দিল কুবের।

কী একটা অন্ধকার জবর এই সকাল বেলার সব কিছু কালো করে দিচ্ছে। ঠিক এইভাবে ধানের কচি পাতায় লক্ষ্মী পোকা উঠে আসে। আগেভাগে কিছু জানা যায় না। বলরাম হয়ত একা বসে আছে। হেলথ সেণ্টারে না এলেই ভাল ছিল। কতলোকে অমন ঘুরে যাওয়ার নেমন্তন্ন করে থাকে। তা' বলে সব জায়গায় সবাই যায়?

সত্যি, বলরাম-ভুবনদের দাগটার পুরো কোবালা রেজিস্ট্রি হয়ে গেলে কুবের আর এসবে জড়াবে না। আসলে দাগ ওদের দুটো। জেলা জরিপে ১৩১৬ আর ১৩৭১। নতুন সেটেলমেণ্টে ২০০৮ আর ২০১১। মোট জমি একশো চব্বিশ শতক। তিন বিঘে পনর কাঠা দশ ছটাক! সার্ভেয়ার রায়-মশায়ের হিসেবে আরও আটত্রিশ স্কোয়ার ফুট। মৌজা—মেদনমল্ল। তৌজি নং তিন শো উনিশ। কুবেরের সব মুখস্ত। এখন সে আগাগোড়া ভুলতে চায়।

ক্রমশ

কালসন্ধ্যা

বুদ্ধদেব বসু

দ্বিতীয় অঙ্ক : ২

[কয়েক মুহূর্ত মঞ্চ অন্ধকার, দ্রুত অশ্বখুরধ্বনি ও রথঘর্ঘর, অগ্রসরমাণ সমুদ্রের শব্দ প্রবল থেকে প্রবলতর। তারপর মঞ্চ আলোকিত, ব্যাকুল বেগে কয়েকটি নারীর প্রবেশ। তারা দ্বারকার রাজপুরীর পরিচারিকা। ধাবমান যানে আন্দোলিত হবার ভঙ্গিসহযোগে তারা কথা বলবে।]

প্রথম নারী

ত্বরা কর, ত্বরা কর, ত্বরা কর,
পশ্চাতে ধাবমান সিন্ধু।

দ্বিতীয় নারী

স্বচক্ষে আজ তবে এও হ'লো দেখতে,
সমুদ্র দ্বারকার রাক্ষস!

তৃতীয় নারী

ফেনময়, দন্তিল, কুৎসিত উল্লাসে
ছুটে আসে উত্তাল বন্যা।

চতুর্থ নারী

যত যাই, তত আসে নিষ্ঠুর এগিয়ে,
গিলে নেয় উজ্জ্বল নগরী।

প্রথম নারী

গিলে নেয় উদ্যান, প্রান্তর, লোকালয়,
মুহূর্তে ডোবে জীবজন্তু।

দ্বিতীয় নারী

কে জানতো আমাদের এও ছিলো ভাগ্যে,
অতলে মিলিয়ে যাবে দ্বারকা!

তৃতীয় নারী

ক্রমশ আকাশ, জল হ'য়ে আসে নির্ভেদ,
তরঙ্গ যেন গিরিশৃঙ্গ।

[সমুদ্রের শব্দ মৃদু হ'লো।]

চতুর্থ নারী

সব যায়, ডুবে যায়, কুটির, অট্টালিকা,
প্রাসাদশিখর আর মন্দির।

তৃতীয় নারী

শুনছিস, তত আর নেই ভীমগর্জন,
ঐ বাঁকে স'রে গেলো সিন্ধু।

দ্বিতীয় নারী

স্বচক্ষে আজ তবে এও হ'লো দেখতে,
সমুদ্র দ্বারকার যমালয়!

তৃতীয় নারী

আর দেখা যাচ্ছে না অনন্ত জলরাশি,
পেরিয়েছি দ্বারকার প্রান্ত।

প্রথম নারী

কে জানতো আমাদের এও ছিলো ভাগ্যে,
অতলে লুপ্ত হ'লো দ্বারকা।

[নারীদের প্রস্থান। মঞ্চ আবার অন্ধকার হ'য়ে পরমুহূর্তেই আলোকিত। এখন প্রভাত, একটি বনভূমির আভাস দেখা যাচ্ছে। অর্জুন প্রবেশ করলেন। তাঁর পিছনে এলো ধনরত্নপূর্ণ সিন্দুক বহন ক'রে অনুচরবর্গ।]

অর্জুন

এই পঞ্চনদভূমি, সমৃদ্ধ, সুন্দর,
পরিপূর্ণ ধান্যে ও পশুতে।
এই বনে স্নিগ্ধ ছায়া, আছে নির্ঝরিণী।
এসো অনুচরবৃন্দ, যাদবের ভক্ত সেবকেরা,
ক্ষণকাল এখানে বিশ্রাম করি।
মুক্ত করো রথাশ্ব, দাও অন্ন ও সুস্বাদু জল
নারী, বৃদ্ধ, শিশুদের।
সর্বশেষ সর্বনাশ ঘটে গেছে, এর পর আর ভয় নেই।

[অতর্কিতে একদল দস্যুর আক্রমণ। অর্জুনের অনুচরবৃন্দের প্রতিরোধের চেষ্টা। নেপথ্যে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ।]

দস্যুদলপতি

[তলোয়ার ঘুরিয়ে]

হা রে রে রে রে রে,
তোদের যা আছে সব দে।

প্রথম অনুচর

আরে আরে আরে,
তোরা মরতে এলি কে।

দ্বিতীয় দস্যু

হাঃ হাঃ হাঃ!
আজ মারবো মস্ত দাঁ!

দ্বিতীয় অনুচর

না, না, না!
আর বাড়াসনে রে পা!

তৃতীয় দস্যু

যদি রুখতে চাস তবে আয় না!

তৃতীয় অনুচর

যদি বাঁচতে চাস তবে স'রে যা!

চতুর্থ দস্যু

যদি মরতে চাস আয় লড়বি!

চতুর্থ অনুচর

যদি যুঝতে চাস তবে মরবি!

দস্যুদলপতি

কেন রে যমের ভিটে মাড়াবি,
সাধ্য কী আমাদের তাড়াবি।

অর্জুন

[সরোষে]

কী, এত স্পর্ধা!
দুরাশয়, পাপাত্মা, পামর,
জানিস, আমি কে?
আমি পার্থ, সব্যসাচী, অজেয় অর্জুন।

[দস্যুরা অট্টহাসি ক'রে উঠলো।]

দস্যুদলপতি

হাঃ হাঃ হাঃ!
ইনি কী বলছেন, শোন!

দ্বিতীয় দস্যু

[ব্যঙ্গের সুরে]

ইনি আর কেউ নন, অর্জুন!
পার্থ, সব্যসাচী, অর্জুন!

অর্জুন

পাপিষ্ঠ, এই নে তবে তোর মৃত্যুবাণ!

[অর্জুন গাণ্ডীব হাতে নিলেন, কিন্তু শরযোজনা করতে গিয়ে তাঁর মুখে ফুটে উঠলো কষ্টের রেখা। ঢাল ও তলোয়ার হাতে দস্যু দলপতির আস্ফালন]

দস্যুদলপতি

ভয় নেই ভাই সব, ভয় নেই!
চেয়ে দ্যাখ অফুরান কাঞ্চন,
কত রতিরঙ্গিণী কামিনী—
সব হবে আমাদের, আমাদের!

অর্জুন

কী হ'লো? গাণ্ডীব কেন এত গুরুভার?

[অর্জুন বহুকষ্টে শরক্ষেপ করলেন, শর লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লো। অনুচরগণ বিস্মিত ও ভীত। সোল্লাসে হেসে উঠলো দস্যুরা।]

দস্যুরা

এই যে, এই যে, এই যে,
লুটছি লক্ষ হাতে কাঞ্চন,
নিচ্ছি অঙ্কে টেনে কামিনী,
সব আজ আমাদের, আমাদের!

অর্জুন

লক্ষ্যভ্রষ্ট!
লক্ষ্যভ্রষ্ট অর্জুনের বাণ!

[অর্জুন আরো কয়েকবার শরনিক্ষেপের চেষ্টা করলেন, কিন্তু গাণ্ডীব উত্তোলন করাই তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো। তাঁর নিক্ষিপ্ত প্রতিটি শর শিথিলভাবে খ'সে পড়লো, তারপর তূণে আর বাণ রইল না।]

অর্জুন

[দীর্ঘশ্বাসের সুরে]

নিঃশেষ!
নিঃশেষ অক্ষয়তূণ।
নিঃশেষ অর্জুন।

প্রথম অনুচর

হায় পার্থ, তুমি ক্লান্ত, আজ রিক্ত।
লোটে বিত্ত মদমত্ত যত বর্বর।

দস্যুদলপতি

[সোল্লাসে]

আয় দস্যু, হবি ইন্দ্র, পাবি স্বর্গ,
হান অস্ত্র, ভাঙ দর্প, কর লুণ্ঠন!

অর্জুন

ক্লান্তি—যেন তন্দ্রার আবেশ।
গতি নেই চরণে, স্তম্ভিত বাহু, হৃদয় নির্বাক।
নিদ্রাজয়ী—গুড়াকেশ—অর্জুন—কোথায়?

[অর্জুন অবসন্ন হ'য়ে ভূতলে শয়ন করলেন, তাঁর চক্ষু প্রায় নিমীলিত।]

প্রথম অনুচর

হায় পার্থ, আজ ব্যর্থ
হায়, দস্যু আজ দুর্বার!

দস্যুদলপতি

ভাই অর্জুন, খোলো চক্ষু,
দ্যাখো দৃশ্য অতি অদ্ভুত।

[দলপতির ইঙ্গিতে দস্যুরা কয়েকটি নারীকে বলপূর্বক আকর্ষণ ক'রে নেপথ্য থেকে নিয়ে এলো। মেয়েরা কেউ আর্তনাদ করছে, কারো কণ্ঠে বিলোল হাস্য।]

দস্যুদলপতি

ও বিধবা বৌ,
ওলো অমুক কুলের ঝি!
আয় আমাদের সঙ্গে, আবার
হবি এয়োস্ত্রী!

কয়েকটি নারী

[সমস্বরে]

ছী—ছি—ছি!
ওরা বলছে কী!

অন্য কয়েকটি নারী

[সমস্বরে]

হাঃ—হাঃ—হিঃ!
ওরা বলছে কী!

[মেয়েদের মধ্যে কেউ-কেউ পলায়নের ব্যর্থ চেষ্টা করলে, অন্য কেউ-কেউ দস্যুদের দিকে কটাক্ষপাত করতে লাগলো। অর্জুনের অনুচরগণ বিমূঢ়ভাবে একপাশে দাঁড়িয়ে।]

অর্জুন

[চোখ খুলে, অর্ধেক উঠে ব'সে]

কেন আর আসে না স্মরণে
সেই সব দিব্যাস্ত্র, আমার যাতে
অদ্বিতীয় ছিলো অধিকার?
শরজাল জ্যামুক্ত বিদ্যুৎ যেন,
অগ্নিগর্ভ অসি,
বজ্রতুল্য দণ্ড ও নারাচ,
পক্ষবান পাশ, প্রাস, পরশু, তোমর—]
এদের আহ্বানমন্ত্র—

[ক্ষণকাল নীরব থেকে]

এদের আহ্বানমন্ত্র—
প্রতারক! বিশ্বাসঘাতক!
তোদের কি অর্জুনেরে মনে নেই?

[ইতিমধ্যে নারীরা দুই দলে বিভক্ত হ'য়ে গেছে। তাদের লোলুপ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছে দস্যুরা।]

প্রথম নারী

আগুন জ্বাল, ঝাঁপিয়ে পড়ি এক্ষুনি।

দ্বিতীয় নারী

ঠমক ছাড়, এগিয়ে চল, লজ্জা কী?

তৃতীয় নারী

দস্যু, তোর অস্ত্র এনে আমায় বাঁচা।

চতুর্থ নারী

তার চেয়ে বোন মিন্সেটাকে বাঁদর নাচা।

প্রথম নারী

হে ভগবান, রক্ষা করো, হে দয়াময়!

দ্বিতীয় নারী

যা বলিস না, ওরা তেমন কুশ্রীও নয়।

তৃতীয় নারী

বিষ এনে দে গলায় ঢালি এক্ষুনি।

চতুর্থ নারী

ঠমক ছেড়ে হাত মেলা না! লজ্জা কী?

[দস্যুদল ও নারীগণের মধ্যে চাঞ্চল্য ও আন্দোলন। মেয়েরা কেউ-কেউ দস্যুদের গলা জড়িয়ে ধরলো, কেউ-কেউ চেঁচিয়ে উঠলো ভয় পেয়ে। কোনো-কোনো ভয়ার্ত নারীকে কোলে তুলে নিলো দস্যুরা, অন্য নারীরা এই দৃশ্য দেখে হেসে উঠলো।]

ভয়ার্ত নারীরা

এসো অর্জুন! দাও আশ্রয়! করো উদ্ধার!

অন্যান্য নারীরা

নেই অর্জুন! আর মিথ্যে কেন চীৎকার?

ভয়ার্ত নারীরা

হায় ঈশ্বর, কেন বন্যায় ডুবে মরিনি?

অন্যান্য নারীরা

রাখ ভাবনা, দ্যাখ, দস্যুই তোর তরণী।

[অর্জুন উঠে দাঁড়ালেন, দস্যুদের দিকে ছুটে যাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু দু-একবার পা ফেলেই, যেন এক বিশাল অবসাদে আচ্ছন্ন হ'য়ে, আবার ব'সে পড়লেন মাটিতে।]

অনুচরগণ

পার্থ আজ ব্যর্থ,
দস্যুরা আজ দুর্বার।
ছিন্ন গিরিশৃংগ:
নিম্ন ওঠে ঊর্ধ্বে।
চঞ্চল এই সংসার;
পরি- বর্তন সার সত্য।

অর্জুন

[বিহ্বল ভাবে]

দুঃস্বপ্ন—না সত্য?
এই দৃশ্য বাস্তব, না মতিভ্রম?
কে ওরা, উদ্দাম হাতে কেড়ে নেয় গচ্ছিত সম্পদ,
করে নারীধর্ষণ, অপ্রতিহত,
আমারই দৃষ্টির তলে?
কোনো-কোনো যাদবললনা
ধরা দেয় দুর্বৃত্তের আলিঙ্গনে—অনিচ্ছায় নয়—
আমারই দৃষ্টির তলে!
একদা কিরাতবেশী পশুপতিকেও
প্রসন্ন করেছিলাম দ্বন্দ্বযুদ্ধে।
—আমি?
একদা পেয়েছিলাম স্বর্গলোকে
ইন্দ্র, যম, বরুণের সংবর্ধনা।
—এই আমি, অর্জুন?

[দস্যুদের ধনরত্ন ও নারীদের নিয়ে প্রস্থানের আয়োজনে ব্যস্ত হ'লো।]

দস্যুদলপতি

হাঃ হাঃ হাঃ!
তোদের ভয়টা কী বল না,
ওরে মূর্খ মেয়েমানুষ!

দ্বিতীয় দস্যু

বাঃ বাঃ বাঃ!
কেমন এলিয়ে দিলি গা,
ওরে দুষ্টু মেয়েমানুষ!

তৃতীয় দস্যু

হাঃ হাঃ হাঃ!
আমরা সোনায় রাখি পা।
আর অঙ্গে বাঁধি তোদের, ওলো
মিষ্টি মেয়েমানুষ!

চতুর্থ দস্যু

বাঃ বাঃ বাঃ!
আজ আমরাই রাজা!
তবু কেন কাঁদিস, ওরে
মূর্খ মেয়েমানুষ!

দস্যুদলপতি

বল আমরা পেলাম রাজত্ব!

অন্যান্য দস্যুরা

[সমস্বরে]

আমরা পেলাম রাজত্ব!

দস্যুদলপতি

রত্নমণি সোনার খনি সুন্দরীদের স্বত্ব!

অন্যান্য দস্যুরা

[সমস্বরে]

রত্নমণি সোনার খনি সুন্দরীদের স্বত্ব!
বাঃ বাঃ বাঃ!
হাঃ হাঃ হাঃ।

[ধনরত্নপূর্ণ সিন্দুক ও নারীদের নিয়ে দস্যুদের প্রস্থান। অর্জুনের অনুচরগণ দুর্বলভাবে অনুসরণ করলো। কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।]

অর্জুন

হা কৃষ্ণ, কোথায় তুমি?
তোমারও কি আর
আমাকে পড়ে না মনে?
দেখা দাও, জনার্দন, নারায়ণ, অচ্যুত, কেশব,
দেখা দাও, পুরুষোত্তম।
দ্যাখো, আমি অপহৃত, পরাস্ত, অক্ষম—
আমি—
তোমার আজন্ম সখা, ভক্ত ও সেবক।
বন্ধু, প্রভু, দেখা দাও আর-একবার।

[তরুণ, শ্যামল, সুন্দর কৃষ্ণকে মুহূর্তের জন্য দেখা গেলো।]

কৃষ্ণ

[তাঁর কণ্ঠস্বর মোহন, কিন্তু তা যেন বহুদূর থেকে ভেসে এলো।]

পার্থ, শান্ত হও। পার্থ, শান্ত হও।

[অর্জুন উঠে দাঁড়ালেন, কৃষ্ণের দিকে ছুটে যাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু এবারেও যেন এক অদৃশ্য বাধা ঠেলে এগোতে পারলেন না।]

অর্জুন

এসো, কৃষ্ণ!
কিন্তু অত দূরে কেন তুমি?
অথবা আমারই চক্ষু দৃষ্টিহীন?
অথবা আমারই চিত্ত অন্ধকার?
চলো, বন্ধু, ছুটে যাই দুষ্ক্রিয়সংহারে।
রমণী ও রত্নের উদ্ধার ক'রে আমি পুনর্বার
হতে চাই জীবনের যোগ্য, আর বৈকুণ্ঠের উত্তরাধিকারী।
চলো, কৃষ্ণ, হও
আরূঢ় আমার রথে, তোলো শঙ্খনাদ,
আর আমি—আর আমি গাণ্ডীব টংকার তুলে—

কৃষ্ণ

[যেন আরো অনেক দূর থেকে]

পার্থ, শান্ত হও। পার্থ, শান্ত হও।

[কৃষ্ণ অন্তর্হিত।]

অর্জুন

এ কী!
আমি একা—কৃষ্ণ নেই!
অন্তহীন মহাশূন্যে
আমি যেন মজ্জমান—শরীরসর্বস্ব, জড়!
শ্রুতি নেই শ্রবণে, দ্যাখে না চক্ষু, ত্বকে আর নেই স্পর্শবোধ,
ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে স্ফুলিঙ্গ জ্বলে না—
নির্বাপিত, নষ্টবল, নিঃশেষ অর্জুন,
ধিক তোকে, ধিক তোকে, ধিক শতবার!

অর্জুনের কণ্ঠে প্রতিধ্বনি

ধিক শতবার!

যবনিকা

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

বিশ্ব বিজ্ঞান

নতুন বস্তু পরমাণু মেণ্ডেলেভিয়াম

মার্কিন বৈজ্ঞানিকরা হালে মেণ্ডেলেভিয়াম নামে এক বস্তু পরমাণু তৈরি করে দাবি করছেন যে, এর চেয়ে বেশি ভারি কোন পরমাণু এর আগে তৈরি হয়নি। মেণ্ডেলেভিয়াম হচ্ছে আইসোটোপ যার নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে ১০১টি প্রোটন ও ১৫৭টি নিউট্রন এবং নিউক্লিয়াসের চারিদিকে বলয়াকারে সাজানো আছে ১০১টি ইলেকট্রন। এটির পারমাণবিক ভার হচ্ছে ২৫৮। মেণ্ডেলেভিয়াম ২৫৮-এর অর্ধ-জীবনের মেয়াদ হচ্ছে প্রায় ২ মাস। সুতরাং রসায়নশাস্ত্রে ট্রেসার অ্যাটম অনুশীলনের ব্যাপারে এটি খুবই সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে আলফা কণিকা হিসাবে ব্যবহার করে কৃত্রিম মূল পদার্থ আইনস্টাইনিয়ামে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মেণ্ডেলেভিয়াম ২৫৮ পাওয়া যায়।

প্রাকৃতিক অবস্থায় প্রাপ্ত মূল পদার্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভারি হচ্ছে ইউরেনিয়াম। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি ভারি মূল পদার্থ লেবরেটরীতে সৃষ্টি করতে পারার ফলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন পৃথিবীর জন্মের সময় হয়ত এই সব পদার্থের অস্তিত্ব ছিল।

রুশ বিজ্ঞানীরা কিন্তু দাবি করেন যে, তাঁরা এমন এক পরমাণুর সন্ধান পেয়েছেন যার পরমাণু-ভার হচ্ছে ২৬০ এবং অর্ধজীবন এক সেকেণ্ডের ১০ ভাগের ৪ ভাগ।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ কেনেথ হুলেট বার্কলি শহরে অবস্থিত লরেন্স বিকিরণ গবেষণাগারে মেণ্ডেলেভিয়াম নামক মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করেছেন যার পারমাণবিক ভার ২৫৮। ডঃ হুলেটের হাতে রয়েছে মেণ্ডেলেভিয়ামের আইসোটোপ

প্রোটিন সংশ্লেষণ

জল বাদ দিলে মানুষের আরো ৫ রকমের খাদ্যের উপাদান চাই:—প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, চর্বি ও খনিজ লবণ। সব কটি মিলিয়ে মোটামুটি তিন হাজার বড় ক্যালরি প্রতিদিন খেতে না পেলে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য বজায় থাকে না। সেই জন্য বিজ্ঞানীরা এই সব উপাদানগুলির অভাব মেটাবার জন্য লেগেছেন কৃত্রিম উপায়ে (সংশ্লেষণ) উৎপাদন করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এখন যাচ্ছে সর্বক্ষেত্রে সমান সাফল্য লাভ এখনো সম্ভব হচ্ছে না।

খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন ও খনিজ লবণের প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম বলে বর্তমানে এই দুটির চাহিদা মেটানোর মত উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। অতিপক্ক চর্বিও আজকাল কারখানা শিল্পে তৈরি হচ্ছে বিষাক্ত গ্যাস কার্বন মনক্সাইড ও অন্যান্য স্বাভাবিক হাইড্রোকার্বন জারণ করে। চর্বির এক জরুরী উপাদান হিসাবে গ্লিসারিন উৎপন্ন হচ্ছে সস্তা দরের একরকমের গ্যাস থেকে যার নাম পলিপ্রোপিলিন।

কার্বোহাইড্রেট সংশ্লেষিত করা অপেক্ষাকৃত কঠিন কিন্তু চিনি ও শ্বেতসার সুলভ এবং কৃষির দ্বারাই সেগুলির অভাব মেটানো সম্ভব বলে আপাতত সেগুলি সংশ্লেষণ না করলেও চলে।

বাকি রইল প্রোটিন যা হচ্ছে আমাদের দেহকে নাইট্রোজেন যোগাবার একমাত্র উৎস। আমাদের পেটের মধ্যে গিয়ে নাইট্রোজেন খণ্ডিত হয়ে যে ২২ রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপন্ন হয় সেগুলি থেকে দেহ স্বয়ং নিজের প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরি করে নিতে পারে। সেই ২২টির মধ্যে ৮টি হচ্ছে অপরিহার্য অর্থাৎ সেগুলি খাদ্যের মধ্যে থাকাটা স্বাস্থ্যের পক্ষে আবশ্যক। বাকিগুলি দেহে আপনা থেকেই সংশ্লেষিত হয়। এই প্রোটিনই হচ্ছে আমাদের খাদ্যের সবচেয়ে মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য উপাদান। তাই থেকেই তৈরি হয় অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি শরীর নির্মাণের ইট হিসাবে। এগুলির অভাব থেকেই নানা রকমের মারাত্মক ব্যাধি আমাদের আক্রমণ করে।

কৃত্রিম কৌশলে প্রোটিন সংশ্লেষিত করার ব্যাপারে রসায়ন শাস্ত্রই আমাদের সাহায্য করতে পারে। এই রাসায়নিক

কৌশলের সহায্যেই আমরা যে কোন খাদ্য-বস্তুর সঙ্গে যে কোন অ্যামাইনো অ্যাসিড যোগ করতে পারি। লাইসিন, মিথিয়োনিন এই দুটিই প্রোটিন জাতীয় বস্তু। এগুলি আজকাল রাসায়নিক কৌশলে সংশ্লেষিত করে উদ্ভিজ্জ খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু কোষের মধ্যেকার প্রোটিনের সংশ্লেষণ এক অসাধ্য না হলেও দুঃসাধ্য ব্যাপার। সামগ্রিক ভাবে প্রোটিন তৈরি করা অত্যন্ত কঠিন হলেও প্রোটিনের বিভিন্ন উপাদানগুলি সংশ্লেষিত করা অনেক সহজ। সংশ্লেষিত হবার পর আমাদের খাদ্যবাহী নালীর মধ্যে গিয়ে সেগুলি রক্ত-স্রোতের মধ্যে প্রবেশ করে, যেমন হয় সাধারণ প্রোটিন পেটে গেলে। সুতরাং সামগ্রিক ভাবে গোটা আস্ত প্রোটিন যত দিন না সংশ্লেষিত করা যাচ্ছে ততদিন রাসায়নিক উপায়ে সংশ্লেষিত অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়েই কাজ চালাতে হবে। মিথিওনিন ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড আজকাল প্রোপিলিন নামে রাসায়নিক বস্তু থেকে সংশ্লেষিত করা হচ্ছে।

তবে সংশ্লেষিত খাদ্য ব্যবহারের পথে কয়েক রকমের বাধাও আছে। যে বাধা হজম সংক্রান্ত দৈহিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত সেগুলি এখনো গবেষণার গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। যেমন ধরুন খাদ্যের গন্ধ, স্বাদ ও চেহারার কথা। ওজনের দিক থেকে দেখতে গেলে মানুষের দৈনিক খাদ্যের মধ্যে থাকা চাই ৮০ থেকে ১০০ গ্রাম পর্যন্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড, ৪৫০ গ্রাম শ্বেতসার, ১০০ গ্রাম চর্বি এবং কিছু খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ লবণ। কিন্তু স্রেফ ওই কটি জিনিস মিশিয়ে যদি কাউকে খেতে দেওয়া যায় তাহলে তিনি কি সেই আজব মিশ্র বস্তুটি খেতে চাইবেন বা খাবেন, তা তিনি যতই ক্ষুধার্ত হোন না কেন? সেই জন্য সেই পুষ্টিকর মিশ্র পদার্থটি যাতে স্বাদে, গন্ধে উপাদেয় হয় এবং বিভিন্ন রকমের হয় তার ব্যবস্থা করা চাই। তাই সেই মিশ্র পদার্থ দিয়ে প্যাটি, জেলি, জ্যাম প্রভৃতি তৈরি করে না দিলে হবে না।

বিশুদ্ধ প্রোটিনের না আছে গন্ধ, না আছে স্বাদ। অ্যামাইনো অ্যাসিড, চিনি ও চর্বির পারস্পরিক বিক্রিয়ার ফলেই ওইসব গন্ধ তৈরি হয়। সুতরাং রসায়নবিদেরাও প্রকৃতির অনুকরণে স্বাদ ও গন্ধ সৃষ্টি করতে পারবেন। আর স্বাদের সম্পর্কে বলা যায় যে, মানুষ মিষ্টি, নোনা, তিক্ত ও টক এই চারটি স্বাদ মোটামুটি পায়। সুতরাং মিশ্র খাদ্যের সঙ্গে প্রয়োজন মত চিনি, লবণ, ক্যাফিন ও অম্ল মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

*

জৈব কোষের মধ্যে কিভাবে প্রোটিন উৎপন্ন হয় সে বিষয়ে হালে রুশ ও মার্কিন পদার্থবিজ্ঞানীরা নতুন আলোকপাত করে-ছেন। জীবন্ত স্নায়ুকোষকে দেহ থেকে আলাদা করে নিয়ে তাঁরা অনুবীক্ষণের সাহায্যে দেখেছেন যে স্নায়ুর ঘাতের (ইম্‌পালস্‌) দ্বারাই প্রোটিন উৎপাদন শুরু হয়। কোষের মধ্যে বিদ্যুতের উৎপত্তি ও প্রোটিনের উৎপাদন এই দুটি ব্যাপার পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। এই প্রশ্নটির সমাধানের উপর নির্ভর করছে মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা ও কৃষির ফলনের বিপুল সুযোগ সম্ভাবনা।

জৈব জগতের বৃহত্তম স্নায়ুকোষ পাওয়া যায় মণ্টরেশিয়া নামে একরকম কম্বোজ জাতীয় জীবে। সেই কোষের ব্যাস ১ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়। সেগুলির উপর পরীক্ষার পর বিজ্ঞানীরা শামুকের স্নায়ু-কোষ নিয়ে গবেষণা করেন। গবেষণার পর তাঁরা এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, প্রোটিনের অভাবের জন্য শরীরে প্রোটিন সংশ্লেষণ হয়, এতদিনকার এই ধারণা ভুল। আসলে বহিরাগত কোন ঘাতের প্রতিক্রিয়ায় কোষের মধ্যে প্রোটিন সংশ্লেষ শুরু হয়। তাঁরা নাকি এও দেখেছেন যে, নিউক্লিয়াসের কার্যকলাপও শুরু হয় এক স্নায়বিক ঘাত থেকে। কোষের বহিরাবরণের প্রবেশ্যতা বাড়ার সঙ্গে এই ব্যাপারের সম্পর্ক আছে। ওই সময় চারপাশের ক্যালসিয়াম আয়নগুলি স্নায়বিক ঘাতের ধাক্কায় কোষের বহিরা-বরণের মধ্যে দিয়ে চুঁয়ে ভিতরে যায়। তখন কোষের মধ্যেকার আয়নের সংগতি বদলে নিউক্লিয়াসকে সক্রিয় হতে বাধ্য করে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন সমস্ত কোষের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য এবং ব্যাপারটি ঘটে কোন বহিরাগত উত্তেজনার ফলে। কোষের বহিরাবরণের প্রবেশ্যতা (পার্মিয়েবিলিটি)। শুধু বৈদ্যুতিক ঘাত কেন শ্রবণাতীত শব্দের আঘাতেও বাড়তে পারে এবং স্নায়ুকোষ ছাড়াও পেশীকোষগুলিকে ওইভাবে সক্রিয় করা সম্ভব।

কোষের ভিতরের জৈব সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পারলে দেহের নানা-রকম ত্রুটি ও বিশৃঙ্খলার চিকিৎসা করা সম্ভব হবে।

*

হালে মস্কোর বিশিষ্ট চিকিৎসাবিজ্ঞানী আচার্য তালিজিন ও তাঁর সহকর্মীরা সাপের বিষঘ্ন এক ওষুধ বার করেছেন (আমাদের দেশে মিহিজামে) ওই ধরনের এক ওষুধ তৈরি হয়। ওষুধটি এক রক্তমস্তু যার নাম দেওয়া হয়েছে "অ্যান্টি গুর্জ"। এই ওষুধ পাউডারের মত গুঁড়া হওয়ার ফলে বহু বৎসর পড়ে থাকলেও এর গুণ নষ্ট হয় না। ৫ ঘন সেণ্টিমিটার মাত্রায় ওষুধটি ইঞ্জেকশন দিলেই সর্পদংশিত লোক আরোগ্য হয়ে যাবেন। ইঞ্জেকশনটা ঠিক চামড়ার নিচে দিতে হয়।

মধ্য এশিয়ায় একরকম কাকড়াবিছা আছে কামড়ালে মানুষ জীবজন্তু আক্রান্ত হয়ে পড়ে কারণ হুলের দ্বারা বিছা যে বিষ শরীরে ঢুকিয়ে দেয় তা শ্বাসযন্ত্রের পেশী-গুলির স্নায়ুর ডগাগুলি অসাড় করে দেয়। এইদিক থেকে বিষটি অনেকটা গোক্ষুরা সাপের বিষের মত। সেইজন্য নতুন ওষুধটি দিয়ে সাপে কামড়ানো এবং বিছায় কামড়ানোর চিকিৎসা করা চলে এবং দেখা গিয়েছে যে ওষুধ ইঞ্জেকশন করলেই খেঁচুনি থেমে যায়। এই প্রপিলগ্লেট জাতীয় ওষুধটি বহু জৈব রাসায়নিক ক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে সাপের বিষের প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে।

—অরুণ চট্টোপাধ্যায়

মনের সাগরে পুতুল

[আটাশ]

শহর কলকাতায় আরও কিছু আজব জীব আছে তারা কফি-হাউস ইন্টেলেকচুয়ালস্ নামে পরিচিত। এরা কফি হাউসের নির্দিষ্ট জায়গায় বসে নির্দিষ্ট সময়ে আড্ডা মারে। এদের বেশভূষায় চমক না থাকলেও প্রায়ই মুখের মেক্ আপ বদলায়। কখনও চাঁচা ছোলা কামানো, কখনও বা কাঁচি দিয়ে ছাঁটা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কখনও বা ফ্রেঞ্চ কাট্। মাথায় চুল থাকলে এরা তেল দেয় না, আর না থাকলে চকচকে টাককে ব্যক্তিত্বের ব্যবহার করে। চোখে পুরু কাচের চশমা আর নয়ত পাওয়ারহীন প্লাসের মোটা ফ্রেম। এদের বেশীর ভাগ লোকের পেশা বিজ্ঞাপনের জন্য ইংরাজী কপি লেখা। অস্বীকার করলে চলবে না ইংরাজী এরা লিখতে পারে তবে গল্প প্রবন্ধ বা ডিরেক্টারের স্পীচ্ নয়, স্রেফ বিজ্ঞাপনের বয়ান। কোন সুন্দরী তরুণীর মুখের ছবির পাশে বিজ্ঞাপিত বস্তুর গুণ বর্ণনা।

এদের পড়াশুনো বিদেশী পত্রিকাতেই সীমাবদ্ধ। কোথায় কোন দেশে নতুন নতুন বই ছাপা হচ্ছে তার সমালোচনা এদের কণ্ঠস্থ—যে কারণে আসল বই পড়ার প্রয়োজন বোধ করে না। ইন্টেলেকচুয়াল আসরে আলোচনা করার অসুবিধা হয় না কারণ, সকলেই তো ওই একই রিভিউ পড়েছে—নতুন কথা আর কে শোনাবে? এরা ধূমপান করে চারমিনার, অন্য সিগারেট খেলে ঠিক জমে না, তবে এদের মধ্যে যারা উগ্র তারা বিড়িতে টান দেয়। বিড়ি এখন ইন্টেলেকচুয়ালদের ধূমপানের শেষ কথা।

কফি হাউসে এরা কাপের পর কাপ কালো কফি খায় আর সন্ধ্যার পর পান করে মদ। পার্টিতে গেলে, বিশেষ করে কোন কনসুলেটে, স্কচ্ হুইস্কি ছাড়া ছোঁয় না, তবে জিন্-এর ওপরও দুর্বলতা যথেষ্ট। কিন্তু বিদেশী মাল না পেলে এরা নিজের পয়সায় খায় বাংলা দু' নম্বর. তা না হলে নাকি এদের নেশা জমে না।

এদের কথাবার্তার মধ্যে কয়েকটি স্টক ফ্রেজ্ আছে। কোনও কিছু ভাল লাগার উচ্ছ্বাস —'দারুন'। রসিকতার স্বীকৃতি—'জ্বালিয়ে দিল'। এরা যাকে মাথায় তোলে তাকে বাঁশ দিয়ে ঠেলে উঁচুতে উঠিয়ে দেয়, আবার যাকে ফেলে ধপাস্ করে মাটিতে আছাড় মারে। যে কোন গুণী, জ্ঞানী, রাষ্ট্রবিদ্, তার ডাক নামের উল্লেখ করে নিজেদের রায় দেয়—'ফট্‌কেটা ফুটে গেছে'। সঙ্গে সঙ্গে কোরাসে অন্যদের হাসি।

এদের প্রেম অবৈধ, নাবালিকা কুমারীদের নিয়ে এরা কেলেঙ্কারী করে কিংবা বিধবাদের পেছনে ছোটে, কিন্তু বিয়ে করে পরস্ত্রীকে। ধর্ম এদের কাছে কুসংস্কার। পুজো অর্চনা, মন্দির গুরুগিরি এদের কাছে ধাপ্পাবাজী. তবে নিজের অসুখ করলে বুড়ী পিসীমার অনুরোধে চরণামৃত গলাধঃকরন করতে দ্বিধা করে না। রাজনীতি এদের কাছে মনের সংকীর্ণতার পরিচয়—বলতে গেলে কোন নীতির বালাই নেই, কথায় কথায় এরা রাষ্ট্রবিদ্‌দের ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়। চিত্রকলার জগতে এরা শেষ পর্যন্ত কালীঘাটের পট নিয়ে পড়েছিল এখন সুর রিয়ালিস্টকের ধাক্কায় কিছুটা হাবুডুবু খাচ্ছে, ভালমন্দ ঘোষণা করতে পাচ্ছে না। নাট্য জগতে আভাঁগার্ড থিয়েটারের এরা চাম্পিয়ান। কথায় কথায় বেকেট, ইওনেস্কো, এল্‌বি আর পিন্টারের অ্যাবসার্ড নাটকের ঢেকুর তোলে আর বাংলা নাটকের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এরা সকলেই ফিল্ম সোসাইটির মেম্বার, বাংলা ছবি দেখতে গেলে এদের হাই ওঠে, ইংরিজী ছবির ছেলেমানুষিতে হাসি পায়, তাই কন্টিনেন্টের আন্‌সেন্‌সার্ড ছবি দেখে এদের তৃপ্তি।

বাংলাসাহিত্য এরা পড়ে না। এদের মতে রবীন্দ্রনাথ 'চিৎপুরের বুর্জোয়া কবি' শরৎসাহিত্য এক বান্ডিল সেণ্টিমেণ্ট আর আধুনিক সাহিত্য নক্কারজনক। তবে মাঝে মাঝে এরা আশার আলো দেখতে পায় টোটো মজুমদারের লেখায়, তার ভাষা নাকি আগুন, বিষয়বস্তু জীবনের খিস্তি।

অনভিজ্ঞ শ্রোতা হয়ত বোকার মত প্রশ্ন করবে, কে এই টোটো মজুমদার? তার কোন বই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে?

উত্তর শুনবে, সে লেখা এখনও ছাপা হয়নি, পাণ্ডুলিপিতে আবদ্ধ আছে। সাত বছর ধরে ঘষা মাজা চলছে; তারপর একদিন যখন ছাপার পাতা ফুঁড়ে বেরবে, তখন বাংলার সাহিত্যজগতে আনবে বিপ্লব।

এরা যখন তখন বিপ্লবের হাঁক দেয়। বাচ্চা ছেলেদের ঘুম পাড়াবার সময় মা মাসীরা যেমন 'জুজু'র ভয় দেখায়, ভারত সরকারকে যেমন খাড়া করতে হয় চীনে জুজুত তেমনি এই কফি হাউস ইণ্টেলেকচুয়ালরা আমাদের ভয় দেখায় বিপ্লব-জুজু দেখিয়ে — সাহিত্যে, শিল্পে, চিত্রে, সমাজে—সর্বত্র।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, জীবনের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই, বাস্তব অভিজ্ঞতার ধার ধারে না। এরা নিজেদের ফ্ল্যাটে বসে পায়রার মত বকম্ বকম্ করে, কোম্পানীর গাড়ী চড়ে অফিসে যায়, শীত-তাপনিয়ন্ত্রিত সাজানো কক্ষে বিজ্ঞাপনের কপি লেখে, কফি হাউসে আড্ডা মারে, নিজেদের ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। এর বাইরের বিরাট জগতের কথা কিছুই জানে না, বোঝে না, কাউকে চেনে না; তবু দেশী কাহিনী পড়ে ফরমান্ জারি করে, এ তো জীবনে ছবি নয়, এ মেলোড্রামা।

হায় মূঢ়! এরা জানে না জীবনে এমন ঘটনা ঘটে যা মেলোড্রামার চেয়েও নাটকীয়, সে ঘটনার ছবি আঁকলে কি জীবনের বাস্তব চিত্র দেওয়া হয় না? আর তাই যদি না হবে তবে কবিতা যেদিন তার মাকে নিয়ে অশান্ত মনে অপমানিত হৃদয়ে কিছুটা শান্তি পাবার আশায় বাবুদের বাড়ি কীর্তন শুনতে গেল, কি করে সেখানে তার মার সঙ্গে দেখা হল তার পাকিস্তানে হারিয়ে যাওয়া পাশের বাড়ির সই বকুল ফুলের সঙ্গে।

বকুলফুল।

তখনও পাকিস্তান হয়নি, পূর্ববঙ্গের এক গ্রামে দুই গৃহস্থবধূ। পাশাপাশি বাড়ি, প্রায় সমবয়েসী, দুজনে সই পাতিয়ে-ছিল যাতে এমনি কাছাকাছি তারা থাকতে পারে, পরস্পর পরস্পরের সুখেদুঃখে পাশে এসে দাঁড়াতে পারে। তখনও গ্রামের এই শীর্ণ চেহারা হয়নি, সেখানকার নদীতে জল ছিল, ক্ষেতে ফসল ছিল, গোলায় ধান ছিল, সবচেয়ে বড় কথা মানুষের মনে আনন্দ ছিল। সেদিনের লোক ভাবতে পারত না শুধু দুমুঠো অন্নের জন্যে মানুষকে ভিখারী হতে হবে।

কবিতার মা তখন সন্তান সম্ভবা। সই বকুল ফুল বলেছিল, যদি তোর মেয়ে হয় আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব।

কবিতার মা উত্তর দিয়েছিল, আমি তো তাই দিন-রাত প্রার্থনা করছি আমার এই প্রথম সন্তান যেন মেয়ে হয়, তোর ঘরে ঠাঁই পাবে, আমার কোন দুর্ভাবনা থাকবে না।

—আমার গোপাল পাঁচ বছরে পড়েছে, তোর মেয়ে হলে প্রায় ছ'বছরের তফাৎ হবে, ঠিক মানাবে, তাই না?

কবিতার মার আশঙ্কা, আমার মেয়ে যদি কালো হয়।

—সেই মেয়েই আমার ঘর আলো করবে।

সই বকুলফুল কবিতার মার অরুচি কাটাবার জন্যে কতরকম রান্না করে আনত, সেই সঙ্গে ক্ষীর, আমসত্ত্ব, কুলের চাটনী, লেবুর আচার।

এত জল্পনা-কল্পনা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের কপালে সইলো না। সুদূর দিল্লীতে বসে রাজনৈতিক নেতারা শকুনির পাশা খেলে দেশ ভাগ করে ফেললেন। নিজেদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখতে গিয়ে তারা উপেক্ষা করলেন কোটি কোটি নরনারীর হাসি-কান্নার সংসার। বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ ঝড় উঠল। রক্তের বন্যা ছুটল। হাজার হাজার উদ্বাস্তু ভিটে ছেড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে শুধু বেঁচে থাকার আশায় চলল কলকাতার দিকে, কে কার খবর রাখে। কোথায় হারিয়ে গেল বকুল ফুল, তার ছেলে গোপাল, তাদের সুখের সংসার। কত ঘাটের জল খেয়ে কবিতার মা-রা শেষ পর্যন্ত কলকাতায় এসে পৌঁছল, সীমান্ত পেরতেই বুঝতে পারল তারা এদেশে অবাঞ্ছিত। সেদিনের মুখ্য নেতারা সংবাদপত্রের মারফৎ উদ্বাস্তুদের আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন, কিন্তু বুঝতেও পারেন নি দেশের লোক তা চেয় নি। দিনের পর দিন কবিতার মায়েদের অনাহারে অবহেলায় পড়ে থাকতে হয়েছে শেয়ালদার স্টেশনে। কি নিষ্ঠুর জীবন। একদিন যাদের সব ছিল, তারা হল ভিখারী। সরকারি ডোল দেবার নাম করে ধরতে লাগল মেয়েমানুষের দালালরা। হাতে সরকারি ফাইল, সরকারি ছাপ, সতীত্বের ক্রয়তে।

কোথায় সত্য, শুধু দেখা গেল মিথ্যার বেসাতি। এরই মধ্যে কবিতারা জঙ্গলে বড় হল, কিন্তু মানুষ হতে পারল না। সুযোগ নেই, সুবিধে নেই। বেঁচে থাকার জন্যে ঝগড়াঝাঁটি মারামারি, অন্যের মুখ থেকে খাবার কেড়ে নেওয়া। ক্রমে মানুষ পশু হল, তখনও নেতারা নাকে গোলাপ-ফুল শুঁকে উদার মানবিকতার বক্তৃতা করছেন, আর উল্টোদিকে লালঝাণ্ডা উড়িয়ে কতগুলো সুবিধাবাদী নিজেদের দল ভারী করার চেষ্টা করছে। কবিতাদের নিয়ে কাড়খেলা শুরু হল, দেশের কথা, দশের কথা কেউ চিন্তা করল না।

সেই হারিয়ে যাওয়া বকুল ফুলকে কীর্তনের আসরে দেখতে পেয়ে কবিতার মা আনন্দে জড়িয়ে ধরল। প্রথমটা কথা বলতে পারে নি, শুধু কান্না আর উচ্ছ্বাস। দুজনেরই ইতিহাস এক, জ্বালাময় অভিজ্ঞতা, ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস। অতীতের কথা শেষ করে তারা এল বর্তমানে।

—হ্যাঁরে সই, তোর ছেলে হয়েছিল, না মেয়ে?

—এই তো আমার বড় মেয়ে, কবিতা। তোর মাসীকে প্রণাম কর।

বকুলফুল কবিতার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে, বাঃ, খাসা মেয়ে হয়েছে. মনে আছে তো আমরা কি কথা দিয়ে-ছিলাম।

কবিতার মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সে সব কথা স্বপ্নের মত মনে হয়।

—কিন্তু দেখ আমাদের কপালের জোর আছে, নইলে আবার তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কি করে?

—গোপাল এখন কি করছে?

—ওই তো গান করছে।

ওরা ফিরে তাকায়, কীর্তনের দলে বসে আছে গোপাল, নধরকান্তি ঘাড় পর্যন্ত বড় বড় চুল, [illegible] দোয়ারকি দিচ্ছে।

—এখনও গোপালের বিয়ে দিস্‌নি বুঝি?

এই তো মেয়ে খ‍ুঁজছি। বিয়ে বলে কথা, যার যেখানে লেখা আছে তা কি কেউ বদলাতে পারে?

—তোরা আছিস্‌ কোথায়?

—নবদ্বীপে।

—এত কাছে অথচ জানতে পারিনি।

—এবার চল নবদ্বীপ, আমাদের বাসায় থাকবি। গোপালদের আখড়ায় নিয়ে যাব, গান শুনবি, খুব ভাল লাগবে।

কবিতার মা মেয়ের দিকে তাকায়, কিরে যাবি তো?

ভয় ছিল পাছে কবিতা আপত্তি করে কিংবা চাকরির দোহাই পাড়ে। কিন্তু আশ্চর্য কবিতা আপত্তি করল না, গোপালকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে স্পষ্ট গলায় বলল, নিশ্চয়ই যাব। মার কাছে আপনাদের কথা কত শুনেছি। আরও শুনতে ইচ্ছে করে।

—কি আর শুনবে মা, সে রামও নেই সে রাজত্বও নেই।

—তবু শুনব। আমরা যে একদিন মানুষের মত ছিলাম সে কথা শুনলেও ভাল লাগে, শিগগিরি এক দিন যাব আপনার কাছে।

কবিতা কেন নিজে থেকে এতটা আগ্রহ প্রকাশ করল ঠিক বোঝা গেল না। সাতাই কি সে তাদের সুখী গৃহস্থ জীবনের কথা শুনতে চায়, না জানতে চায় ওই গোপাল ছেলেটিকে, জন্মের পূর্বে যার কাছে সে বাগ্‌দত্তা, কিংবা তার কৌতূহল নবদ্বীপ সম্বন্ধে। নবদ্বীপ নয় নবদ্বীপধাম। গোলকধামের মতই হরিপ্রিয়া আর বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমময়ের লীলাভূমি।

এই যে দুই সই বকুলফুলের সাক্ষাৎ, প্রায় দেড় যুগ বাদে রাণাঘাটের কীর্তনের আসরে; এই যে অতি সাধারণ চাকুরে মেয়ে কবিতার দৃষ্টি বিনিময় হল কীর্তনীয়া গোপালের সঙ্গে, উপন্যাসের পাতায় এ কাহিনী লিপিবদ্ধ করলে তাকে কি মেলোড্রামা ছাড়া আর কোন আখ্যা দেওয়া চলে?

সেই একই মেলোড্রামার সূত্র পাওয়া যায় অনাদিপ্রসাদের জীবনে। যে অনাদিপ্রসাদ নিজের লেখার উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে জীবন দেখতে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছেন, যে অনাদিপ্রসাদ লেখা থামিয়েছেন, শুধু অবাক বিস্ময়ে চোখ মেলে দেখেছেন চারপাশের জীবন। যিনি আত্মীয়তার নাগপাশ থেকে মুক্তি খ‍ুঁজেছেন, সেই তিনি আবার ধরা পড়লেন স্নেহের মায়াজালে, মীনা আর সমীর, দুটি হতভাগ্য জীবনকে বাঁচাতে গিয়ে।

ডাক্তার মীনাকে পরীক্ষা করে রায় দিল, যেরকম করে হোক ওর বাবা-মাকে খবর দিন। হয় তারা মেয়েকে নিয়ে যান, নয়ত ঝগড়াঝাটি মিটিয়ে ফেলে আসা যাওয়া শুরু করুন।

অনাদিপ্রসাদের প্রশ্ন, নইলে কি আপনি মনে করছেন,—

—ও মেয়ের এতটুকু মনের জোর নেই। সমীরবাবুর কথায় রাজী হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু সংসার করতে পারবে না। ক'দিন ওষুধপত্র দিয়ে তো দেখলাম, এতটুকু উন্নতি হচ্ছে না।

—ওর বাবা একেবারে অবুঝ মানুষ।

—তবু তাকে বোঝাতে হবে। যদি বেশিদিন এ কেস্‌ ফেলে রাখেন, এ মেয়েকে সারানো যাবে না।

ডাক্তারকে নিয়ে সমীর বেরিয়ে গেল। অনাদিপ্রসাদ ঢুকলেন মীনার ঘরে মেয়েটা বিছানার ওপর শুয়ে আছে। এই ক'দিনে চেহারাটা শুকিয়ে গেছে, আর সেই আগের লাবণ্য নেই, দুটো চোখে জমাট ভয়। জিজ্ঞেস করল, ডাক্তার কি বলল?

অনাদিপ্রসাদ মীনার কপালে হাত দিয়ে বলেন, ওষুধ পড়ছে সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে তুমি একটু মনের জোর কর। কিসের তোমার এত ভাবনা।

—ভাবনা—, সমীরের জন্যে। ওর যে কেউ নেই।

—তুমি তো আছ।

—আমি—কি জানি। আমার জন্যে না সমীরের জীবনটা নষ্ট হয়ে যায়।

—তোমার ওই এক কথা।

মীনা অনাদিপ্রসাদের দিকে তাকায়, জানেন, ওর কোন চাকরি নেই, দুটো টিউশানী করে। এত ডাক্তার, ওষুধ, ও কোথা থেকে টাকা পাচ্ছে? আমি তো জানি ওর টাকা নেই।

অনাদিপ্রসাদ ভরসা দেন, কেন, আমি তোমার চিকিৎসা করাতে পারি না বুঝি?

—আপনি কেন করাবেন, আমার বাবা করল না, মা করল না, বলতে বলতে মীনা হাউহাউ করে কেঁদে ফেলে।

—ছিঃ, ছিঃ, এমন করে কাঁদে না। লক্ষ্মী মা আমার, মনের জোর কর। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো। সমীরের মুখের দিকে চেয়ে—

মীনা চীৎকার করে ওঠে, আমি আর বাঁচতে চাই না কাকাবাবু, আমাকে ওষুধ না দিয়ে বিষ দিন।

অনাদিপ্রসাদ সমীরের সঙ্গে পরামর্শ করেন, ডাক্তার ঠিকই বলেছে মীনার বাবাকে খবর দিতেই হবে।

সমীরও মাথা নাড়ে, তাই মনে হচ্ছে, আমি তো আর মীনাকে সামলাতে পারছি না, সামর্থ্য নেই, ভেবেছিলাম দুজনে মিলে লড়াই করব, সব যেন কিরকম গোলমাল হয়ে গেল। ভাগ্যিস আপনি এসেছিলেন, তবু

ডাক্তার দেখাতে পারলাম, ওষুধপত্রও খাইয়েছি।

—সে কিছু নয় সমীর, আমি ভয় পাচ্ছি কোন দুর্বল মুহূর্তে মেয়েটা না আত্মহত্যা করে বসে।

সমীরের চোখে জল আসে, কেন এরকম হল?

—ভেবে কোন ফল হবে না, কর্তব্য ঠিক করে ফেলা যাক, ওর বাবার কাছে যেতে হবে।

—তাই যাব।

—তোমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে, যদি গালমন্দ করে।

—সে তো করবেই, মারধোরও করতে পারে।

—তাহলে উপায়।

—আর তো কিছু নেই।

অনাদিপ্রসাদ ঘরের মধ্যে দু'বার পায়চারী করলেন, তার চেয়ে বরং আমিই যাই। প্রথম ঝড়টা আমার ওপর দিয়েই বয়ে যাক।

সমীর শিউরে ওঠে, না, না, তা হয় না কাকাবাবু, আমি তো জানি মীনার বাবাকে, আপনাকে যাচ্ছেতাই অপমান করবে।

—করুক, আমি তো তার ভাল করতেই যাচ্ছি। তা ছাড়া তোমাকে এখন মীনার কাছে সব সময় থাকতে হবে।

সমীরের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে মৃদু গাঢ় স্বরে বলেন, ইয়ংম্যান, ভেঙে পোড় না। জীবনে ঝড়ঝাপটা অনেক আসবে. তাকে শক্ত করে যে এগিয়ে চলতে পারে সেই তো মানুষ।

সমীর জামার হাতা দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে হাসবার চেষ্টা করে. ধারণা ছিল তার খুব শক্ত, এখন বুঝতে পারছি নিজেকে শক্ত রাখা খুব কঠিন।

অনাদিপ্রসাদ সরাসরি গিয়ে হাজির হন সাধনবাবুর বাড়িতে। [illegible] মারফৎ দেখা হল সাধনবাবুর অফিস ঘরে। ও মানুষটারও কপালে রেখা পড়েছে, চোখেমুখে দুশ্চিন্তা। অনাদিপ্রসাদকে দেখে অতি শুকনো প্রশ্ন, কি ব্যাপার?

অনাদিপ্রসাদ কিভাবে কথাটা পাড়বেন ভেবে নেন, বলেন, কিছু না, একটা খবর দিতে এলাম।

—বলুন।

—মীনা আর সমীর—,

—কি বললেন?

—আপনার মেয়ে মীনা—,

—সে কথা আমি জানি, মীনা আমার মেয়ে, আপনি কি বলতে এসেছেন?

—ওরা গড়িয়াতে একটা বাসা নিয়ে আছে।

সাধনবাবু প্রথমটা চমকে উঠেছিলেন, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে সহজ গলায় প্রশ্ন করেন, ঠিকানা?

অনাদিপ্রসাদের কাছে ঠিকানা শুনে খাতায় লিখে নেন, আপনার বুঝি যাতায়াত আছে?

সমীর আমায় ডেকেছিল। মীনার শরীরটা খুব খারাপ, আমি এসেছি আপনাকে বলতে ওদের উপর রাগারাগি করবেন না। বড় বিপদের মধ্যে আছে।

এইবার সাধনবাবু নিজমূর্তি ধারণ করেন, আমার কি কর্তব্য তা আমি জানি, আপনার কাছ থেকে উপদেশ শুনতে আমি রাজী নই।

—তা নয়, আপনার মেয়ে মীনার জন্যে বলছি।

—আমার মেয়ের বিষয়ে আপনার চেয়ে আমি নিশ্চয় ভাল বুঝি, অনুগ্রহ করে আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে মাথা গলাবেন না।

সাধনবাবু নিজের মনে কিছু চিন্তা করেন, ততক্ষণে অনাদিপ্রসাদ ঠিক [illegible] কেউ যাচ্ছে মীনা আবার ফিরে আসবে। এই বার আমি তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাব।

ওর চোখ মুখ দেখে অনাদিপ্রসাদ ভয় পান, কিন্তু আপনি এখনও বুঝতে পারছেন না, আপনার মেয়ে খুব অসুস্থ।

—অসুস্থ। অসুস্থ না হলে কেউ বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়? অসুস্থ। তাকে অসুস্থ করেছে কে? রাস্তার লোফার, একটা ভ্যাগাবণ্ড—,

—যা হবার তা হয়ে গেছে—'

—শাট্ আপ, কিছুই হয়নি, আগে মেয়েটাকে নিয়ে আসি তারপর ওই হারামজাদাকে আমি দেখব, ওর সর্বনাশ করে ছাড়ব।

অনাদিপ্রসাদ তখনও বোঝাবার চেষ্টা করেন, অনুগ্রহ করে আমার কথা শুনুন—'

সাধনবাবু তখন অবুঝ গোঁয়ার, গলা উঁচিয়ে বলেন, বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে। আমার উঁচু মাথা আপনারা সবাই মিলে নীচু করেছেন, ফের যদি বকর বকর করেন চাবুক মেরে পিঠের চামড়া তুলে নেব।

ততক্ষণে সাধনবাবুর বাড়ির লোকেরা ঘরের মধ্যে জমা হয়ে গেছে। অনাদিপ্রসাদ অবাক হয়ে লক্ষ করলেন কেউ কোন প্রতিবাদ করল না। তবু নিজেকে সংযত রেখে বললেন, আমি যাচ্ছি তবে এমন কিছু করে বসবেন না যাতে মীনার জীবনটা চিরকালের মত নষ্ট হয়ে যায়।

আর একটা বন্য হুঙ্কার, গেট্ আউট্।

জীবন সন্ধানী লেখক অনাদিপ্রসাদ আস্তে আস্তে সাধনবাবুর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন।

এও তো মেলোড্রামা।

(ক্রমশঃ)

মস্কোর চিঠি

নির্বিতার যৌন সঙ্গমের আদি সমাজ থেকে মাতৃপ্রধান সমাজ ও পরিশেষে বর্তমানের একপতি পত্নী ভিত্তিক পরিবারের উদ্ভব দেখিয়ে এঙ্গেলস তাঁর বিখ্যাত বইটিতে এই সাবধানী মন্তব্য করেছিলেন যে ভবিষ্যৎ সমাজের লোকেরা কী করবে সেটা তারাই ভালো জানবে।

আর বিবাহ বিধির দিক থেকে ইউরোপের সবচেয়ে মধ্যযুগীয় দেশ রাশিয়ায় বিপ্লবের ঠিক দশ দিনের মধ্যেই লেনিন যে খসড়া আইন প্রকাশ করেছিলেন, তা দেখে অগ্রণী ইওরোপও চমকে উঠেছিল। এক লহমায় ধর্মীয় বিবাহের বদলে রেজেস্ট্রিকৃত নাগরিক বিবাহের আইন ও বিবাহ-বিচ্ছেদের সর্বাধিক অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাই নয়, কোনো রাষ্ট্র বা কখনো সাহস পায় নি, বিবাহ-বহির্ভূত সন্তানদের জারজ বলে গণ্য করার, লেনিনের কথায়, 'অশ্রুতপূর্ব রহমের ইতর, ন্যক্কারজনক নোংরা, পাশবিক রকমের নিষ্ঠুর, প্রথাটিও নিঃশেষে নাকচ হয়।

কিন্তু তারপর পঞ্চাশ বছর কেটেছে। জমেছে অভিজ্ঞতা। কিছু সমস্যা আজ অতীত, কিছু বা জেগেছে নতুন। তাই ঠিক কী রূপ নিচ্ছে বর্তমানের সোভিয়েত পরিবার, এ ঔৎসুক্য নিশ্চয় অনেকের থাকবে এবং সমান নিশ্চিত যে তা পুরো মেটানো সাংবাদিকের অসাধ্য।

তবু সম্প্রতি এখানে প্রকাশিত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিবাহ ও পরিবার সম্পর্কিত মূল আইনের খসড়া। এবং প্রকাশিত হওয়া মাত্র খবরের কাগজের পাতায় তা নিয়ে জমে উঠেছে তুমুল আলোচনা। মত দিচ্ছেন আইনবিদ, বিচারক এবং সাধারণ লোক, সকলেই।

এবারকার চিঠিতে তার কিছু মতামত তুলে দিচ্ছি।

*

বিশেষ করে বিপ্লবের প্রথম উত্তাল দিনগুলো নিয়ে লেখা সোভিয়েত গল্প উপন্যাসে এমন অনেক ঘটনা অনেকেই দেখেছেন যে ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির দেখা হচ্ছে, ভাব হচ্ছে, তারপর একদিন মেয়েটি উঠে এল ছেলেটির ঘরে এবং রয়েই গেল। তারা আনুষ্ঠানিক রেজেস্ট্রি করেছে কি না, ভোজ দিয়ে বিয়ের প্রকাশ্য ঘোষণা করেছে কিনা, এ নিয়ে লোকে মাথা ঘামাচ্ছে না। বিয়ের ব্যবহারিক দিকটা ছিল বড়ো, আনুষ্ঠানিক দিকটা তেমন নয়।

এবারকার খসড়ায় কিন্তু বলছে, বিয়ে রেজেস্ট্রি করতে হবে 'সমারোহের আবহাওয়ায়'। এবং দরখাস্ত দেবার এক মাস পরে।

কেন দরকার পড়ল সমারোহের খসড়ায় তা কিছু বলা নেই, কিন্তু বলেছেন আলোচকেরা। ব্যক্তি জীবনে ও সমাজে বিয়েটা যে একটা ধাক্কার ব্যাপার নয়, এই গুরুত্বটা লোকে অনুভব করুক। তাছাড়া দরখাস্ত থেকে রেজিস্ট্রির মাঝখানে একটা নির্দিষ্ট ব্যবধানেও অনেকে খুশী। তাঁরা বলছেন, 'বাকদানের' শুভ লোক ঐতিহ্যই এতে স্বীকৃত হল। বিয়েটা হোক চুপি চুপি না, ব্যাপকভাবে জানিয়ে শুনিয়ে। একজন অভিশংসক প্রস্তাব করেছেন, দরখাস্ত পাওয়া মাত্র রেজেস্ট্রি অফিস যেন আনুষ্ঠানিক পত্রে দু পক্ষের পিতা মাতা ও কর্মস্থলে জানায়। একজনের ইচ্ছে বাকদত্ত সময়টায় আনুষ্ঠানিকভাবে ছেলেটিকে বর এবং মেয়েটিকে কনে ঘোষণা করা হোক, যেমন হত আগে। এবং সমারোহ যখন, তখন শুধু বিয়ে কেন, সন্তানের জন্ম রেজেস্ট্রি হোক সমারোহের সঙ্গে, আগে যেমন হত গীর্জায়, সদ্য-প্রসূতের খ্রীষ্ট দীক্ষায়, যখন সন্তানের নিকট কোনো আত্মীয় হত তার 'কুম' বা কুমা' অনেকটা আমাদের 'ধর্ম-বাপ ও ধর্ম-মা'র মতো। 'খ্রীষ্ট দীক্ষার সাবেকী প্রথা ফিরিয়ে আনার কথা অবশ্যই কেউ ভাবছে না' লিখেছেন লেনিনগ্রাদ এলাকার গার্নোভস্কি, কিন্তু সন্তানের জন্ম রেজেস্ট্রির সময় এই ধরনের 'জামিনদার' নিমন্ত্রণ করা হবে না কেন? আইনে তা বলা দরকার।'

'দোহাই ভগবান!' লিখেছেন ভিলনুসের জন-বিচারিকা লেপেইকা এবং দর্শনের ডক্টর সক্রোভিয়েভ; 'স্বামী-স্ত্রী হতে ইচ্ছুক তরুণদের পক্ষে কিছুটা সময় বাগদত্ত ও বাগদত্তা হয়ে থাকাটা নিরর্থক হবে না!'

ভিলনুসের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তাঁরা বলেছেন, সেখানে দরখাস্ত দেবার পর বিয়ে রেজেস্ট্রিতে সাধারণত দেড় মাস সময় যায়। এবং এর ভেতর প্রতি ১০০টি দরখাস্তকারীর মধ্যে সাত-দশজন আর রেজেস্ট্রি করতে আসে না। কারণ, তারা বলে, 'ভালোবাসা আর নেই, মোহ ভেঙেছে।'

তাঁদের প্রস্তাব বাগদত্ত সময়টা করা হোক ছয় মাস, তাতে বিয়ের পর মোহ ভাঙ্গার ঘটনাটা কমবে।

তবে আইন যেহেতু বাস্তবকেই লিপিবদ্ধ করে, তাই খসড়ায় ওই বাগ্‌দান পর্ব (কতটা সময় তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও) ও সমারোহের কথাটা বলার আগেই কিন্তু সমাজে তা ফের চালু হয়ে গিয়েছিল। মস্কো লেনিনগ্রাদ প্রভৃতি শহরে আছে কমসোমলীদের সমারোহ করে বিয়ে করার বিশেষ প্রাসাদ। আমি যতকটি বিয়ে দেখেছি তাতে রেজেস্ট্রি আপিসে শ্যাম্পেনের ফেনায়িত গেলাস তুলে নব-দম্পতির সুখ কামনার পর সন্ধ্যায় অনিবার্যই সেই কাণ্ডটা ঘটেছে যাকে আমরা বলি বিয়ের ধুম। সেখানে সানাই না বাজলেও অবশ্যই বাজবে নাচের রেকর্ড এবং ভোজের টেবিলে নিমন্ত্রিতরা সুরা পাত্র ঠোঁটে তোলার আগে দল বেঁধে চিৎকার

জর্জিয়া অঞ্চলের বিবাহোৎসবে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি বৃদ্ধটি দাঁড়িয়ে মদ্যপান ক'রে উৎসব শুরু করছেন

করবে : গরকী! গরকা! অর্থাৎ কটু! কটু! বর বউ উঠে দাঁড়িয়ে সকলের সামনে পরস্পরকে চুমু না দেওয়া পর্যন্ত সে সুরা নাকি মিষ্টি হবে না।

তারপর চলবে টোস্টের পর টোস্ট। নব বধূকে অন্তত একবার করে নাচতে হবে সকলের সঙ্গে।

✻

তবে এটা ঘটে সাধারণত প্রথম বিবাহিত-দের ক্ষেত্রে। কিন্তু যারা বিয়ে করতে এল এই প্রথম নয়, এবং প্রথম যৌবনে নয়. তাদের বেলায় কী হবে? তাদের পক্ষেও কি সমারোহ বাধ্যতা মূলক?

একটা ঘটনা বলি। আমার পরিচিত একটি যুবক ভালোজ্যা, আগের পক্ষের বউয়ের সঙ্গে বিয়ে তার ভেঙে গেছে, একটি ছেলেও আছে। ভাব হল নতুন একটি মেয়ের সঙ্গে—ল্যুসা। ঠিক করলে ঘর বাঁধবে। কুমারী ল্যুসা এসে উঠল ভালোজ্যার সংসারে, শ্বশুর শাশুড়ী দেবর সবাই তাকে মেনে নিলে বধূ বলে। কিন্তু কোন একটা সঙ্কোচে যেন ভালোজ্যা ল্যুসা কেউই রেজেস্ট্রি করলে না, 'দোজবরে আমি, ওসব কী দরকার।'

কয়েক বছর কাটল, এক সময় মনে হল, না: রেজেস্ট্রি একটা করে রাখাই ভালো এবং একদিন সেটা করেও ফেললে।

কিন্তু অবশ্যই বিনা সমারোহে। নতুন আইনে কী করবে এই ধরনের লোকেরা?

মস্কোর কাপলুন প্রস্তাব করেছেন, দরখাস্ত ও রেজেস্ট্রির মধ্যে ব্যবধান রাখার দরকার নেই সেই সব ক্ষেত্রে 'যেখানে লোকে প্রথম যৌবনে বিয়ে করছে না। অনুরাগ যাচাইয়ের জন্য কোনো মেয়াদ তাদের দরকার হবে না। আর তারা চাইলে, বিবাহের অনুষ্ঠানটাও যেন হতে পারে অনাড়ম্বর, সহজ।'

গড়ে বছরে বিশ লাখ বিয়ের এই দেশটায় স্বভাবতই বেশ তর্ক উঠেছে বিয়ের ন্যূনতম বয়স নিয়ে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কনের বয়স থাকে বিশ থেকে চব্বিশ, ছেলে পঁচিশ থেকে ঊনত্রিশ। খসড়ায় বলেছে, বিয়ে করা চলবে আঠারো বছর বয়স হলেই। কোনো কোনো অঙ্গ প্রজাতন্ত্রে বিশেষ করে উষ্ণ দক্ষিণে তা কমানো চলবে আরো দু' বছর। অর্থাৎ মাত্র ষোলোয়। স্বভাবতই এতে সর্বাগ্রে আইত্তি জানাবেন শিক্ষয়িত্রী ছাড়া কে?

অর্জোনিকিদজে শহরের শিক্ষয়িত্রী ভাসিয়েভা লিখছেন : ডাক্তারদের অভিমত বিয়ে করা উচিত তেইশ বছরের আগে নয়। কিন্তু প্রশ্নটা শুধু তাই নয়। আঠারো বছরে তরুণদের অধিকাংশেরই না থাকে শিক্ষা, না রোজগার। অনেকেই বাপ মায়ের মুখাপেক্ষী স্টাইপেন্ডের টাকায় চালায়। সে আবার কেমন পরিবার যেখানে নব-বিবাহিতেরা মাত্র শিশুরই নয়, নিজেদের ভরণ পোষণও চালাতে অক্ষম।

এই মতটা দেখা গেল অনেকেরই। কিন্তু তৎক্ষণাৎ জবাব আসতে দেরি হয় নি।

'প্রথম প্রেমই সবচেয়ে প্রবল, সবচেয়ে কাব্যিক' ঘোষণা করেছেন কিরোভগ্রাদের কুবেৎস্কি, '১৮ বছরে প্রেম নিষিদ্ধ করা প্রকৃতি বিরুদ্ধ...এ রকম নিষেধের ফল হবে কেবল যৌন ব্যাভিচার।'

জানি না কুবেৎস্কি নিজেই তরুণ কিনা, কিন্তু মৈত্রী ভবনে সোভিয়েত আইনবিদ ও নারী আইনবিদ সমিতির সদস্যদের গোল-টেবল আলোচনায় দেখা গেল কুবেৎস্কির মতটাই শেষ পর্যন্ত সমর্থন পেলে। ইজভেস্তিয়ার রিপোর্টার তার বিবরণে বলেছেন, 'ও বয়সে বিবাহ নিষিদ্ধ করলে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের সংখ্যা বাড়তে পারে।'

কিন্তু শুধু তরুণ নয়, বৃদ্ধরাও কি কম সমস্যা? একজন সরোষ দাবি তুলেছেন, দুজনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান যদি থাকে অনেক বেশি তাহলে সে বিয়ে নিষিদ্ধ করতে হবে, কারণ, প্রায়ই দেখা যায় বুড়ো জেনারেল, অধ্যাপক বা উচ্চপদস্থের আয়ের বহরটাই এক্ষেত্রে তরুণী ভার্যার প্রধান আকর্ষণের কারণ।

"কবিকে বিশ্বাস করতে হলে 'সব বয়সই বশীভূত প্রেমের কাছে' তাহলেও" লিখেছেন পেনশনভোগী বুচেক, 'তাহলেও আমাদের ধারণা বিয়ে এ রকম দীর্ঘ স্থায়ী নয় এবং প্রায়ই ঘটে লাভালাভের হিসেব থেকে।'

'তাজ্জব প্রস্তাব!' জবাব দিচ্ছেন সম্ভবত অপেনশনভোগী জোগিন, 'বয়সের অনেক ব্যবধান সত্ত্বেও বহু সুখী পরিবার আমি জানি। সবাই তারা সুখেই আছে, ছেলেমেয়েও হয়েছে।'

✻

বলাই বাহুল্য ওপরকার সমস্যাগুলো গুরুত্বহীন না হলেও এবারকার খসড়ায় সবচেয়ে বেশি বিতর্ক চলছে প্রধানত দুটি ধারা নিয়ে : বিবাহ বিচ্ছেদের পদ্ধতি কতটা সরল করা সম্ভব এবং এরা যাদের বলে 'নিঃসঙ্গিনী মা', অর্থাৎ আইনসম্মত স্বামী ছাড়াই যারা সন্তানবতী, তারা তাদের সন্তানদের পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে কি ভাবে?

ব্যাপারটা একটু তলিয়ে বুঝতে হলে খানিকটা বোধ হয় ইতিহাসে ফেরা ভালো। অবাধ প্রেম এবং প্রেমের ক্ষেত্রে 'জলের গ্লাস' (এক গ্লাস থেকে অনেকেই জল খেতে পারে) তত্ত্বের ঘোর বিরোধী লেনিনের প্রেরণাতেই কিন্তু বিপ্লবের পরে বৈবাহিক ও পারিবারিক এমনই সব আইন এ দেশে চালু হয় যার কয়েকটি দিক অবাক করার মতো। যেমন, "অতীতের নৈতিক জের ও বর্তমানের সুকঠিন অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতির ফলে যতদিন নারীদের

একাংশ এরূপ অপারেশনে (অর্থাৎ গর্ভপাতে) এখনো বাধা হচ্ছে" ততদিন পর্যন্ত গর্ভপাত বৈধ বলে গণ্য হয়।

স্থির হয় বাপ বা মা বা উভয়ের লজ্জা বা নির্লজ্জতার দায়ভাগী হবে না সত্যকাম। সে সর্বদাই দ্বিজোত্তম, সত্যকুলজাত— অর্থাৎ পূর্ণ প্রশ্বেয় সোভিয়েত নাগরিক। কার্যক্ষেত্রেও যাতে সন্তানের নামে কোনো কলঙ্ক না থাকে, সেজন্য।

নিঃসঙ্গিনী মায়েদের নিজেদের খুশি মতো যে কোনো ব্যক্তির নাম ও পদবী সন্তানের পিতৃ পরিচয় হিসেবে রেজেস্ট্রি করার অধিকার ছিল এবং প্রমাণ থাকলে আদালত মারফত সন্তানের সত্যকার পিতৃত্বও প্রতিষ্ঠিত ও আনুসঙ্গিক অধিকার (যথা খোরপোষ) আদায় করতে পারত। বিবাহ বিচ্ছেদ ছিল অতি অবাধ, উভয়ের সম্মতি থাকলে এমন কি আদালত ছাড়াই রেজেস্ট্রি আফিসে গিয়ে বিয়ে খারিজ করা যেত।

এ ধারাগুলোয় খানিকটা বড়ো রকমের বদল ঘটে ১৯৪৪ সালে, প্রধানত গত মহা-যুদ্ধের ফলে যে অবস্থা দাঁড়ায়, তাতে। নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা কমে যায় অস্বাভাবিক মাত্রায়। জন্ম হার নেমে আসে ন্যূনতমে। প্রয়োজন হল, যে পরিবারগুলো টিকে রইল, তাদের টিকিয়ে রাখা, অথচ জন্মহার বাড়ানো। ফলে অনিবার্য হয় ব্যাপক হারে বিবাহ বহির্ভূত সন্তান।

স্বভাবতই নির্বিন্ধ হয় গর্ভপাত, এক-দিকে বিবাহ বিচ্ছেদের জটিলতা বাড়ানো হয় অনেক, অন্যদিকে বিবাহ বহির্ভূত সন্তানের পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠার অধিকার হারায় নারীরা, যদিও রাষ্ট্র থেকে একটা বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা হয় তাদের জন্য।

আইনবিদ্যার 'সুযোগ্য কর্মী' ব্রাতুস ও ফ্লোইশিৎস্ এবং আইন বিদ্যার ডক্টরেট পের্গামেন্ট ইজভেস্তিয়ায় লিখেছেন : 'সমস্ত সন্তানের সমাধিকার নীতি থেকে বিচ্যুত হতে ১৯৪৪ সালের আইন প্রণেতারা বাধ্য হলেন কিসে? পিতৃভূমির যুদ্ধের ফলে।...পরিবারের সংহতি ও জন্মহার বাড়ানোর জন্য দরকার ছিল বিশেষ ব্যবস্থার। সে কথা বলা আছে ১৯৪৪ সালের ৮ জুলাইয়ের আজ্ঞার উপক্রমনিকার। আজ্ঞায় যা আছে, সমস্যা সমাধানে ঠিক ওই সিদ্ধান্তেরই প্রয়োজন ছিল কিনা সে প্রশ্নে যাচ্ছি না। বর্তমানে আমাদের আগ্রহ হল নতুন আইনে সমস্যাটার সমাধান করা দরকার কী ভাবে।'

কেন না অবস্থাটা আমূল বদলে গেছে। নারী পুরুষের সংখ্যা বৈষম্য আজ আর নেই।

গর্ভপাতের কথাটা ছেড়ে দিচ্ছি। আবার সে অধিকারটা মায়েরা আগেই ফিরে পেয়েছিল তাছাড়া ও প্রশ্নটা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এলাকাধীন। নতুন খসড়ায় তা কিছু বদলায় নি। কিন্তু ধরা যাক বিবাহ বিচ্ছেদ। সেটা কি থাকবে আগের মতোই জটিল, ফলে কিছুটা দুষ্কর? এবং কেবল মাত্র আদালত মারফত?

দু পক্ষের মত থাকলে বিয়ে যদি করা যায় রেজেস্ট্রি আপিসে, তাহলে দু পক্ষের মত থাকলে রেজেস্ট্রি আপিসেই কেন সে বিয়ে খারিজ করা যাবে না? কেন যেতে হবে আদালতে, সাক্ষী সাবুদ, জেরা, শুনানীর একটা প্রকাশ্য যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যাতে দুজনের অতি স্পর্শকাতর অন্তরতম অনুভূতিগুলোই কেবল পীড়িত হবে?

ইজভেস্তিয়ায় ইউ কৎলিয়ার থেকে শুরু করে অনেকেই ঠিক এমনি একটা মতই প্রকাশ করেছেন। স্বভাবতই তাতে আপত্তি করার মতো যুক্তিও কম নেই।

'বিবাহ বিচ্ছেদের আদালতী পদ্ধতির উদ্দেশ্য ওজনদার কারণ না থাকলে পরিবারকে টিকিয়ে রাখা' বলেছেন আইন বিদ্যার রীডার গুরুভিচ্, 'রেজেস্ট্রি আপিস সে কাজটা করতে পারে না। সে শুধু বিবাহ বিচ্ছেদে সীল মোহর লাগাতে পারে। আমাদের দেশে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত যে অবস্থা গেছে, তাতেই তা প্রমাণ হয়।'

অর্থাৎ স্রেফ যুদ্ধপূর্ব রীতিতে প্রত্যাবর্তন নয়। সেটার অভিজ্ঞতাও যাচাই করে দেখছে লোকে। সেটা আরো বেশি করছে পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে।

নতুন খসড়ায় আছে পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যাবে (খোরপোষ প্রভৃতি তার আনুসঙ্গিক দায় সমেত) উভয়ের সম্মতি পেলে অথবা সন্তান জন্মের আগে মোটামুটি দীর্ঘকাল একত্র বসবাস বা পরে একত্রে সন্তান ভরণ পোষণের প্রমাণ থাকলে।

অনেকেই এতে আপত্তি করেছেন এই বলে যে, কেন মাত্র শুধু এই দুটি শর্তে? কেন গৃহীত হবে না সম্ভাব্য অন্যান্য প্রমাণ, যেমন চিঠিপত্র, সাক্ষ্য ইত্যাদি। তাছাড়া এমন ঘটনা কি অস্বাভাবিক যে একত্রে বসবাস করলেও পিতা হয়ত আসলে কোনো তৃতীয় জন? ফেরা যাক আগের প্রথায়, যখন সন্তানের পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ নারীদের ছিল অনেক বেশি।

'সন্দেহ নেই যে সন্তানের স্বার্থটি অবশ্যই দেখা উচিত' লিখেছেন সোভিয়েৎ ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সহ সভাপতি ডঃ কুলিকভ, 'কিন্তু ১৯৪৪ সালের আগের অবস্থাতেই কি ফিরতে হবে? তখন জটিল মামলাগুলিতে (আর সংখ্যা তাদের কম নয়) বিচারকেরা পিতৃত্বের প্রশ্নে প্রায়ই সন্দেহজনক রায় দিয়েছেন শুধু সন্তানের কথা ভেবে এবং এই যুক্তিতে যে বাপ ছাড়া তো আর সন্তান জন্মাতে পারে না।'

বাপ কে, তা প্রমাণ করা যাবে সাক্ষী-সাবুদ দিয়ে, এ প্রস্তাবে বিদ্রূপ করেছেন গাইনকলজি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান ডাক্তার শ্রীমতী কির্সানোভা।

'সাক্ষী সাবুদ দিয়ে? অর্থাৎ এই দেখেছি, এই শুনেছি? কিন্তু কী দেখা বা শোনা বা প্রমাণ করা আদৌ সম্ভব, যখন কথাটা হচ্ছে নরনারীর নিভৃততম ব্যাপার নিয়ে?

পিতৃত্ব নির্ধারণের নির্ভুল কোনো উপায় এখনো জানা যায় নি, বলেছেন দেমিরাই ও লেন্দেল, চিকিৎসাবিদ্যা শুধু বলতে পারে কে বাপ নয়। "চিকিৎসাবিদ্যা যতদিন না নির্ভুল রূপে পিতৃত্ব নির্ণয়ের মাত্রায় পৌঁছচ্ছে ততদিন সবুর করা যাক ও খসড়ার সমাধানই মেনে নেওয়া ভালো।"

মোক্ষম যুক্তি। তবে সমান মোক্ষম পাল্টা যুক্তিও কি নেই?

ব্যাপারটার লঘু দিকও কিছু আছে। খোরপোষের দাবি থাকলে পিতৃত্বটা আদালতে প্রমাণের প্রয়োজন মেনেছেন জনৈকা দালিনিনা।

'কিন্তু' সগর্বে ঘোষণা করেছেন তিনি, 'ছেলে জন্মাবার পর আমি যদি রেজেস্ট্রি আপিসে পিতা হিসাবে অমুক একটা লোকের নাম ও পদবী উল্লেখ করি, তাহলে তাতে বাধা দেবার অধিকার কারো নেই।'

এ রীতিটাও যুদ্ধের আগে ছিল। ফলে নামকরা অভিনেতা গায়ক লেখকদের কম সমস্যায় পড়তে হয়নি। তারা জানতেও পারত না কখন কোন টেলিভিশন, পর্দায় বা পত্রিকায় তাদের দেখে কোন নিঃসঙ্গিনী মা অজ্ঞাতে তার সন্তানের পিতৃত্বে তাদের বরণ করে বসেছে। মহাকাব্যিক, সন্দেহ নেই, কিন্তু, 'একজন নামকরা লেখক আমায় বলেন' লিখেছেন ডাক্তার, সর্গেইভ, 'যুদ্ধের আগে তাঁর এই ধরনের 'সন্তান' ছিল

পঞ্চাশটিরও বেশি।'

তাছাড়া, সন্তান যখন জানবে যে অমুক বিখ্যাত লোকটা আসলে তার পিতা নয়, তখন সেটা কি তার মনের পক্ষে শুভ হবে? জিজ্ঞেস করেছেন অকপটে।

*

স্ত্রী যদি অনুমতি না দেয় তাহলে তার গর্ভবতী অবস্থায় বা সন্তান জন্মের এক বৎসরের মধ্যে স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদের দরখাস্ত দিতে পারবে না, দীর্ঘকাল যারা একত্রে বাস করেছে, বিবাহ বিচ্ছেদের পরেও তাদের একজন যদি অকর্মণ্য হয়ে পড়ে তাহলে অপর জন সারাজীবন তার ভরণ পোষণে বাধ্য থাকবে, ইত্যাদি নতুন আইনের তর্কাতীত কয়েকটি মানবিক ধারা নিয়েও আলোচনা কম হৃদয়গ্রাহী হত না। কিন্তু ইতিমধ্যেই যথেষ্ট জায়গা নেওয়া এলোমেলো এই উদ্ধৃতিগুলো থেকে যেহেতু একটা পরিষ্কার ধারণায় পৌঁছনো হয়ত বা সম্ভব নয়, তাই উপসংহার টানা যায় কীভাবে?

অন্তত পক্ষে খানিকটা খতিয়ে দেখার জন্যে আইন প্রণেতাদের উদ্দেশ্যটা একটু জেনে রাখা ভালো।

খসড়ায় প্রথম ধারায় আছে :

"বিবাহ ও পরিবার সম্পর্কিত সোভিয়েত আইনের কর্তব্য হল : কমিউনিস্ট নৈতিকতার ভিত্তিতে গঠিত সোভিয়েত পরিবারের আরো সংহতি।

—নরনারীর স্বেচ্ছাধীন বৈবাহিক জোটের ভিত্তিতে এবং বৈষয়িক লাভালাভের হিসেব বহির্ভূত পারস্পরিক প্রেম, সখ্যতা, ও পরিবারের সমস্ত সদস্যদের মধ্যে শ্রদ্ধার ওপর পারিবারিক সম্পর্ক গঠন;

—মাতৃভূমির প্রতি নিষ্ঠা ও শ্রমের প্রতি কমিউনিস্ট মনোভাবের প্রেরণায় সামাজিক লালনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী মিলনে সন্তানদের পারিবারিক লালন এবং কমিউনিস্ট সমাজ গঠনে সক্রিয় যোগদানের জন্য সন্তানদের প্রস্তুতি;

—মাতা ও শিশুর পরিপূর্ণ কল্যাণ ব্যবস্থা এর প্রতিটি শিশুর সুখী শৈশবের নিশ্চিতি,

—পারিবারিক সম্পর্কে অতীতের অনিষ্টকর জের ও রীতির চূড়ান্ত মূলোচ্ছেদ;

—পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ গঠন।"

[১৭ জুন]

ননী ভৌমিক

পুনশ্চ : চিঠিটা পাঠাতে একটু দেরি হয়ে যাওয়ার ফাঁকে সর্বোচ্চ সোভিয়েতের ২৭শে জুনের অধিবেশনে খসড়াটা আইনে পরিণত হয়ে গেল। নিশ্চয় তার চূড়ান্ত রূপ দেখে সমালোচকরা খুশি হবেন। তাঁদের অনেক যুক্তিই মান্য হয়েছে এতে। যেমন, স্থির হয়েছে প্রতি রেজেস্ট্রি আপিসে সমারোহের ব্যবস্থা থাকবে, তবে যদি কেউ না চায় তাহলে রেজেস্ট্রি হতে পারবে বিনা সমারোহে। যেখানে জটিলতা নেই (যেমন, উভয়ের সম্মতি আছে, নাবালক সন্তান নেই, একজন নিখোঁজ, বা অপরাধী বলে প্রমাণিত ইত্যাদি) সে ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারবে আদালত ছাড়াই, রেজেস্ট্রি আপিসে, তবে তিন মাসের ব্যবধানে। সন্তানের পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় শুধু পূর্বকথিত দুটি অবস্থায় কথা নয়, "পিতৃত্ব প্রমাণের মতো সুপ্রতিষ্ঠিত অন্যান্য সাক্ষ্যও" বিচারকরা ভেবে দেখবেন।

লক্ষ্মীর কৃপালাভঃ বাঙালীর সাধনা

মহারাষ্ট্রে কৃতী বাঙালী শিল্প প্রতিষ্ঠান

পাঁচিশে জ্যৈষ্ঠের 'দেশ' পত্রিকায় সায়ান্টিফিক ইণ্ডিয়ান গ্লাস কোম্পানী বা 'সিগকল' সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলাম, তাতে বোম্বাইয়ের বাঙালী শিল্পপ্রতিষ্ঠান 'গ্যানসনস্'-এর উল্লেখ করে বলেছিলাম যে সুযোগ পেলে শীঘ্রই তাঁদের কথা লিখবো। তাঁদের বিষয়ে তথ্যসংগ্রহের চেষ্টা করছিলাম, এমন সময়ে তাঁরাই অনুগ্রহ করে সেই প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ডাকযোগে পাঠিয়ে দিলেন। সেই তথ্যের উপর নির্ভর করে আজ লিখতে বসেছি।

কিন্তু এই লেখাতে আমি যেন তেমন জোর পাচ্ছি না। তার কারণ হলো যে, লক্ষ্মীর কৃপালব্ধ প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা, কর্মকর্তা বা কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না করে, আর তাঁদের কাজ নিজের চোখে না দেখে তাঁদের বিষয়ে ভালো করে বুঝে-সুঝে লেখার মতো হাই-পাওয়ার মানসনেত্র আমার নেই। ভয় হচ্ছে যে, কেবল একটি চিঠি পড়ে 'গ্যানসনস্ প্রাইভেট লিমিটেড'-এর প্রতি কোনো অবিচার না করে ফেলি।

তাঁদের চিঠির খামটি খোলবার সময়ে আশা করেছিলাম যে, তাঁরা এমন সমস্ত তথ্য আমাকে যোগাবেন যাতে 'হিউম্যান ইন্টারেস্ট' অর্থাৎ কারখানার কলকব্জা গোড়া থেকে নাড়াচাড়া করে যাঁরা সেটাকে উন্নতির পথে নিয়ে এসেছেন সেই ব্যক্তি বা সমষ্টির রূপটি ফুটিয়ে তোলার সুযোগ আমি পাই। সে বিষয়ে আমি নিরাশ হলাম।

'গ্যানসনস'-এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীজ্ঞানেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যদি 'বেঙ্গল এনামেল'-এর ডাক্তার উমাপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো বড়োলোকের ছেলে আর নিজে মস্ত রোজগেরে লোক না হয়ে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের উচ্চাশাবিশিষ্ট পরিশ্রমী যুবক হিসেবে নিজের পরিচয় দিতেন তো তাঁর কৃতিত্বের কথা লিখতে আরও কত ভালো লাগতো। (অবশ্য পরিচয় তিনি অথবা তাঁর পুত্র দেন নি, দিয়েছে তাঁর কর্মচারী।)

সেসব কিছুই এই চিঠিতে নেই। সুরেনাথ ধনী বা মধ্যবিত্ত ছিলেন, না দরিদ্র ছিলেন, কী তাঁর জীবিকার বাহন ছিল, কোনো কিছুই নেই। উপরন্তু, 'গ্যানসনস্'-এর কর্তৃপক্ষ না পাঠিয়েছেন তাঁদের ব্যালেন্স-শীট, না দিয়েছেন তাঁদের উৎপন্ন দ্রব্যের ক্যাটালগ।

সেইজন্যেই আমার এই কুণ্ঠা ও দ্বিধা।

বোম্বাইয়ে বাঙালী শিল্পপ্রচেষ্টা সংখ্যায় কম হলেও নতুন নয়। ক্ষুদ্রশিল্পের মধ্যে বাঙালী স্বর্ণকারদের বোম্বাইয়ে কর্মক্ষেত্রের প্রসার গত শতকেই হয়েছিল বলে শুনেছি। বৃহতের মধ্যে আমাদের 'বেঙ্গল কেমিক্যাল'-এর বম্বে ফ্যাক্টরী বেশ পুরনো। তা ছাড়াও স্বর্গীয় নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের পরিচালনাধীনে বোম্বাই অঞ্চলে সেকালের হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড এর প্রকাণ্ড ব্যবসা এবং বাঙালী ফিল্ম স্টুডিও-র মধ্যে স্বর্গীয় হিমাংশু রায়ের 'বম্বে টকিজ' ও শ্রীশশধর মুখার্জি প্রমুখ বিশিষ্ট বাঙালী প্রযোজক-দের প্রতিষ্ঠিত 'ফিল্মিস্তান' নামক অধুনা-লুপ্ত সংস্থার কথা আমাদের অনেকেরই মনে আছে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে 'গ্যানসনস্' অপেক্ষাকৃত নবীন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এর জন্ম।

'গ্যানসনস্ প্রাইভেট লিমিটেড'-এর প্রতিষ্ঠাতা সাতাত্তর বৎসর বয়স্ক শ্রীজ্ঞানেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তিনপুরুষে এলাহাবাদের প্রবাসী বাঙালী ছিলেন। পূর্বপুরুষ এলাহাবাদ গিয়েছিলেন চব্বিশ পরগনার গোবরডাঙ্গা থেকে। জ্ঞানেন্দ্রনাথের পিতৃদেবের নাম স্বর্গীয় সুরেনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের পর জ্ঞানবাবু কিছুকাল এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে লেকচারারের কাজ করেন। তারপর তিনি এলাহাবাদে বাঙালী প্রতিষ্ঠান 'সায়ান্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্টস্ কোং লিমিটেড',

বিকল্পে 'সিকো'-র বোম্বাই শাখার ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হয়ে এলাহাবাদ ছাড়লেন। গ্যানসনস্-এর ম্যানেজার শ্রী এস সি দাশগুপ্ত মশায়ের চিঠিটি পড়ে মনে হয় যে. তখন থেকেই জ্ঞানবাবু বোম্বাইয়ে আছেন।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, 'সিকো' স্থাপিত হয়েছিল রুড়কি এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল স্বর্গীয় বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়ের প্রেরণায় এবং এলাহাবাদের বিখ্যাত বাঙালী মুদ্রক 'ইন্ডিয়ান প্রেস'-এর স্বত্বাধিকারী ঘোষ মহাশয়দের নিয়োজিত মূলধনে। বেণীমাধব ছিলেন ভারতবর্ষের কাচশিল্পে আবশ্যিক পেট্রল-গ্যাস এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের প্রবর্তক।

পঁচিশে জ্যৈষ্ঠের . উল্লেখিত প্রবন্ধে আমি 'সিগকল'-এর ননীগোপাল সরকার মহাশয়ের যোগানো তথ্যের ওপর নির্ভর করে লিখেছিলাম যে, জ্ঞান ব্যানার্জি মশায় বেণীমাধবের ভাগিনেয়। কিন্তু এঁদের চিঠিতে জানলাম যে. সে কথা ঠিক নয়। বেণীমাধব 'সিকো'-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন বলেই বোধ হয় ননীবাবু ভেবেছিলেন যে. দুই ব্রাহ্মণের রক্তের সম্পর্ক আছে। আসলে তা নয়।

কিন্তু সায়ান্টিফিক ইনস্ট্রমেন্টস্, পেট্রল-এয়ার গ্যাস প্রভৃতি তৈরি করা শেখবার উদ্দেশ্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথের একাধিকবার ফ্রান্স, জার্মেনি ইংল্যান্ড প্রভৃতি বিজ্ঞানে উন্নত দেশ পরিক্রমার কথাটা ভুল নয়। শিক্ষা ছাড়াও উত্তরকালে বাণিজ্যিক সফরেও তিনি বহুবার বিদেশে গেছেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ এখন দেশী ও বিদেশী কতকগুলি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সঙ্ঘের সম্মানিত সভ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে দেশের স্বাধীনতার পরেই আমাদের শিল্পায়নে অগ্রগতির বেগ হঠাৎ বেড়ে গেল। গবেষণাগার ও স্কুল-কলেজের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জটিল যন্ত্রপাতি দূরে থাক, সাধারণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও দুর্লভ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অভিজ্ঞ জ্ঞানেন্দ্রনাথ এই পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। ফলে, তিনি প্রায় বিনা মূলধনেই স্বাধীনভাবে এইসব সাজ-সরঞ্জাম তৈরির কাজে নেমে পড়লেন। কোনো সঙ্গীসাথী ছাড়া তিনি একা একাই 'গ্যানসনস্ প্রাইভেট লিমিটেড' নাম দিয়ে খুব ছোট করে একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের স্থাপনা করলেন।

জ্ঞানবাবু প্রথমেই Petrol-Air গ্যাস প্রস্তুতের সরঞ্জাম তৈরি আরম্ভ করেছিলেন, যার ফলে আজ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ৩০০০-এরও বেশী 'গ্যানসনস্' গ্যাস-প্ল্যান্ট নিত্য ব্যবহারে লাগছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি Burner এবং ল্যাবোরেটোরির প্রয়োজনীয় সাধারণ সরঞ্জাম, বাসনপত্র ইত্যাদি তৈরির কাজ হাতে নিলেন।

এইসব উৎপাদনও যখন গতানুগতিক দাঁড়ালো, তখন জ্ঞানবাবু যে কার্যক্রম হাতে নিলেন সেটাই সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি সাধারণ রাসায়নিক ও পদার্থবিজ্ঞানের গণ্ডী পার হয়ে পারমাণবিক গবেষণাগারের কাজের জন্যেও সরঞ্জাম তৈরি শুরু করলেন।

Isotopes, অর্থাৎ সহজ ভাষায় 'মৌল পদার্থের পরমাণু'-কে গবেষণার কাজে লাগানোর ব্যাপারে যে-সমস্ত জটিল সরঞ্জামের দরকার, 'গ্যানসনস' এবারে সেই তৈরি আরম্ভ করলেন, ট্রম্বের 'অ্যাটমিক এনার্জি এস্টাব্লিশমেন্ট'-এর (অধুনা, 'ভাভা পারমাণবিক গবেষণাগার'-এর) কর্তৃপক্ষের উৎসাহ ও অনুপ্রাণনায়। এখন ভারতবর্ষের বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক পদার্থবিদ্যায় প্রয়োগ ছাড়াও ওষুধ ও কেমিক্যাল তৈরি, ভূগর্ভের তেল ও স্বাভাবিক গ্যাসের ব্যাপারে, এমন কি, পাট. আলু এবং তামাকের চাষের উৎকর্ষের জন্যেও এই Isotopes কাজে লাগাচ্ছেন। এর ফলে 'গ্যানসনস্'-এর তৈরী জিনিসের চাহিদাও অনেক বেড়ে যাচ্ছে।

১৯৬০ থেকে আটষট্টি, এই আট বছরের সময়টিতেই 'গ্যানসনস্'-এর কাজ

বিশেষভাবে বেড়ে গেছে। স্টেইনলেস স্টীলের রাসায়নিক সরঞ্জাম ইত্যাদি তৈরির ব্যাপারে এঁরা কয়েকজন অভিজ্ঞ কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারের সহায়তায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে গেছেন। উচ্চ মানের জন্য এঁদের জিনিসের কদর বেড়েছে এবং চাহিদা যা হয়েছে তা সরবরাহ করে নাকি এঁরা কুলিয়ে উঠতে পারেন না। ১৯৬১ সালের শেষে স্থাপিত গ্যানসনস্-এর প্ল্যাণ্ট। রুক্তের আধুনিক কারখানাটি গত সাত বছরের মধ্যে দুবার বাড়াতে হয়েছে।

এঁদের আরও একটি ছোট কারখানা আছে। সেখানে ইনজেকশনের ampoule cutter জিনিসটি তৈরী হয়।

এ ছাড়াও এখন এঁরা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের জন্য নতুন নতুন যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম তৈরি করে ভারতবিখ্যাত হয়েছেন।

যে-সমস্ত কৃতী কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারের ওপর উৎপাদনের ভার ন্যস্ত আছে তাদের পেছনে জ্ঞানেন্দ্রনাথ ছাড়াও তাঁর যোগ্য পুত্র শ্রী এন এল ব্যানার্জি আছেন। তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং পাস করবার পর লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজে অয়েল অ্যাণ্ড গ্যাস টেকনোলজি-তে বিশেষজ্ঞ হয়ে এসেছেন।

কোম্পানীর বোর্ডে জ্ঞানেন্দ্রনাথ এবং তাঁর পুত্র ছাড়াও আরও ছ'জন ডিরেক্টর আছেন।

মোটামুটি এই হলো গ্যানসনস্-এর ইতিহাস। বিরাট কোনো ঐতিহ্য ছাড়াই কেবল দক্ষতা ও অধ্যবসায়ের গুণে গ্যানসনস্-এর বর্তমান বার্ষিক বিক্রি ৩৬ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

এই সফলতার জন্য আমরা বাঙালীর তরফ থেকে সপুত্র শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং গ্যানসনস্-এর সকল ডিরেক্টর ও কর্মিবৃন্দকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি। শিল্প ও বাণিজ্য মহলে বাংলা দেশের তথাকথিত নতশির বাঙালীর মাথা বাংলার বাইরেও উন্নত করার জন্য তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

আরও কোন্ বাঙালী প্রতিষ্ঠান মহারাষ্ট্র কিংবা ভারতের অন্য কোন্ অঞ্চলে নীরবে কী কাজ করে চলেছেন তার হিসেব এখনো পাইনি। সেরকম শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে নিশ্চয়ই, কারণ যতই এগোচ্ছি ততই দেখছি যে, নেই-নেই করেও শিল্প ও বাণিজ্যে বাঙালীর অনেক কিছু আছে—যা নেই তা হলো তার যথাযথ প্রচার। আর সংহতির অভাবও আছে ভীষণ।

প্রকৃত সঙ্ঘবদ্ধতার অভাবে, অনেক ক্ষেত্রেও আমরা আজ দুর্বল; রাম-শ্যাম-যদু আমাদের সেই দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর আত্মচরিতে বাংলা দেশ লুণ্ঠনের (the Plunder of Bengal) বিষয়ে ব্রিটিশ বণিক ও সরকারের ফান্দিফিকিরের উদাহরণ দিয়ে যে পরিচ্ছেদ কটি লিখেছিলেন তা নিশ্চয়ই অনেকেই পড়েছেন। সেই লুণ্ঠনকার্যটি তো এখনো বেশ চলছে বলেই মনে হয়, যদিও এখন 'ভূমিকা' বদল হয়ে গিয়েছে। শ্রমিক, মালিক নির্বিশেষে বাঙালী সঙ্ঘবদ্ধ না হলে তার প্রতিকার করা অসম্ভব।

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বারের সংবিধানে কী আছে তা আমি জানি না। যদি ধোঁয়াটে তত্ত্বকথা কিছু থাকে তো সভাপতি শ্রীবটকৃষ্ণ দত্ত এবং তাঁর কর্মসমিতির পক্ষে এখন বোধ হয় গভীর চিন্তা ও বিবেচনা করা দরকার যে, সেই সংবিধানকে আপাতত শিকেয় তুলে রেখে চেম্বারের মাধ্যমে বাঙালী শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে একতাসূত্রে বাঁধবার চেষ্টা করা কি না।

লিখতে লিখতে আমি কেবল কথার জালই বুনে ফেললাম। সারা ভারতের বাঙালী শিল্প ও বাণিজ্য প্রচেষ্টাকে একসূত্রে বাঁধার কাজটি তো সহজ নয়। ঠিক কোন্ প্রণালী অবলম্বন করলে ফল পাওয়া যেতে পারে তা জানি না—তবে এটা জানি যে, সে ফলটি প্রাংশুলভ্য।

বিশ্বকর্মা

ভ্রম সংশোধন

এই পত্রিকার ২২ আষাঢ় ১৩৭৫-এর ৩৬ সংখ্যায় প্রকাশিত 'লক্ষ্মীর কৃপালাভ'-এর 'এনামেল শিল্পে বাঙালী' শীর্ষক প্রবন্ধের ১০৯৯ পৃষ্ঠায় অনবধানতাবশতঃ দুটি শব্দ বাদ যাওয়াতে কেউ কেউ আপত্তি জানিয়েছেন। "কিন্তু কারণের হিসেবে সেকালের (পশ্চিমবঙ্গের) বাঙালী যুবকেরা ফেল হয়ে গেল। ফার্নেস-এর প্রচণ্ড উত্তাপে (স্থানীয়) মধ্যবিত্ত বাঙালী ছেলেরা পরাস্ত হয়েছিল।" আশা করি এই বাক্য দুটিতে 'পশ্চিমবঙ্গের' এবং 'স্থানীয়' এই দুটি শব্দ যোগ করে পাঠ করলেই আপত্তির কারণ দূর হবে।

সিলেট ও পূর্ণিয়ার বা ভারতের যে কোনো অঞ্চলের বাসিন্দাদের অসমিয়া কিংবা বিহারী ইত্যাদি না ধরে আমি বাঙালী বলেই ধরি। হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান যাই হোন না কেন, বাঙালী বাপমায়ের বাংলাভাষী ছেলেমেয়ে হলেই তাঁরা আমার কাছে 'বাঙালী'। এ কথাও উল্লেখ করলে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আমার ঊর্ধ্বতন পুরুষ পূর্ববঙ্গ আটাশ-নিবাসী।

—বিশ্বকর্মা

যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা সম্পর্কে নতুন চিন্তাধারা

যে-কোন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক নীতির অন্যতম লক্ষ্য আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা—যাতে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল সব অঞ্চলই সমানভাবে ভোগ করতে পারে। ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোয় আমরা আঞ্চলিক বৈষম্য দেখতে পাই; যেমন, শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্র যতটা উন্নত, হরিয়ানা ও উড়িষ্যা তত উন্নত নয়। এই আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে দিতে না পারলে জাতীয় সংহতির প্রচেষ্টা কখনই সার্থক হবে না। সেজন্য ভারত সরকার বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন প্রকার শিল্প প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি নয়াদিল্লীর জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের অধিবেশনে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে যে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন, তার কিছু অংশ অনগ্রসর অঞ্চলগুলির মাথাপিছু জাতীয় আয় এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির অবস্থিতির উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত বলে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ অভিমত প্রকাশ করেছেন। যদি এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়, তবে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য অনেক পরিমাণে কমে যাবে। বর্তমানে পঞ্চম ফিনান্স কমিশন কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে আর্থিক সম্পদের বাঁটোয়ারা কী নীতি অনুযায়ী হবে তার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত আছেন। এ সময়ে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ কর্তৃক গৃহীত এ প্রস্তাব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যে কোন যুক্তরাষ্ট্রেরই আর্থিক নীতি এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যাতে প্রান্তিক সামাজিক উপকার (Marginal social benefit) সব রাজ্যের ক্ষেত্রে সমান হয়; তবেই সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের শ্রীবৃদ্ধি হবে।

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে কিন্তু বিভিন্ন রাজ্য আর্থিক সম্পদ বাঁটোয়ারা সম্পর্কে বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করার কথা বলেছেন। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ এবং মহারাষ্ট্র জনসংখ্যার ভিত্তিতে রাজস্ব এবং আর্থিক সম্পদ বণ্টনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু মহীশূর, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্য কোন অঞ্চলের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাকেই রাজস্ব এবং আর্থিক সম্পদ বণ্টনের ভিত্তি হওয়া উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করেছে। রাজস্থান গুরুত্ব আরোপ করেছে মাথাপিছু জাতীয় আয়কে সম্পদ বণ্টনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার উপর।

আর্থিক ভারত

সম্প্রতি শ্রীনগরে জাতীয় সংহতি পরিষদের যে অধিবেশন হয়ে গেল, তাতে স্থির হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সাহায্যের বণ্টন শুধু জনসংখ্যার ভিত্তিতে হওয়া উচিত নয়, আঞ্চলিক অনগ্রসরতা এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির নির্মাণকার্য সমাধান করার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্পদের উপরও ভিত্তিশীল হওয়া উচিত। জাতীয় উন্নয়ন শেষ পর্যন্ত মাথাপিছু জাতীয় আয় এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অবস্থানকেই রাজ্যগুলির মধ্যে আর্থিক সাহায্য বণ্টনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার সুপারিশ করেছেন।

পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন

পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে, যেখানে পর্যটন শিল্প থেকেই অধিকাংশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। যেমন—সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী প্রভৃতি দেশ। ইউরোপে যাঁরাই বেড়াতে যান, তাঁরা প্যারিস না দেখে সাধারণত দেশে ফেরেন না। ফরাসী সরকারও পর্যটকদের কাছ থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন। ভারতে যে পর্যটন শিল্পের উন্নতির সম্ভাবনা প্রচুর এ বিষয়ে অতীতে বহু আলোচনা হয়েছে। সুখের বিষয়, ভারত সরকার স্থির করেছেন যে, চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় পর্যটন শিল্পের উন্নতির জন্য ৫২ কোটি টাকা খরচ করবেন। যদি ভারত সরকারের এই প্রকল্প সফল হয়, তবে প্রতি বছর শুধু পর্যটকদের কাছ থেকেই ভারত প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে। পর্যটন শিল্পের উন্নতির জন্য ভারত সরকার কলকাতা, বোম্বাই, নয়াদিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি শহরে বড় বড় হোটেল নির্মাণ করার কাজে হাত দেবেন বলে স্থির করেছেন। পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য বড় বড় হোটেলের খুবই প্রয়োজন আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আরও কয়েকটি বিষয় ভেবে দেখতে হবে। ভারতে পর্যটকদের বেড়াবার জায়গার অভাব নেই। একদিকে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-মণ্ডিত বিভিন্ন শৈলাবাস, অপর দিকে সমুদ্রসৈকত—বেড়াবার জায়গা আছে যথেষ্ট। তার উপর আছে বহু ঐতিহাসিক স্থান, যেগুলি আমাদের অতীত ঐশ্বর্য ও সংস্কৃতির নীরব সাক্ষ্য যুগ যুগ ধরে বহন করে চলেছে। কিন্তু পর্যটকগণ যখনই ভারতে আসবেন, তখনই তো একবার বড় বড় শহরগুলিতে আসবেন। কলকাতার কথাই ধরা যাক। এ শহরের জল নিষ্কাশনের অব্যবস্থার চূড়ান্ত প্রমাণ আমরা গত কয়েক দিন ধরেই দেখছি। আবর্জনায় রাস্তাঘাট পূর্ণ; ট্রামরাস্তা ট্রাম চলাচলের পক্ষে অযোগ্য; ভাঙ্গা রাস্তার উপর দিয়ে বিভিন্ন নামধারী রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাসগুলি যখন যাতায়াত করে তখন মনে হয় পর্যটকগণ এ শহরে বেড়াতে এলে আমাদের পৌরপিতাগণ নিজেদের লজ্জা ও কলঙ্ক ঢাকবেন কী করে? সেজন্য যে কথা আজ প্রথমেই মনে আসছে তা হচ্ছে পর্যটন শিল্প তো উন্নত করতেই হবে, তার আগে আমাদের বড় বড় শহরগুলিকে বিদেশীর কাছে আকর্ষক করে তুলতে হবে। শুধু বড় বড় হোটেল নির্মাণ করলেই চলবে না। তার আগে চাই একটি সুস্থ জীবনযাত্রার প্রস্তুতি। তা না হলে পর্যটনশিল্প উন্নত হবে না।

আর একটি কথা এ প্রসঙ্গে বলা দরকার। পর্যটন শিল্প উন্নত করার মত প্রচারকাজ পর্যটন বিভাগ থেকে উপযুক্তভাবে চালানো হয় না। কাশ্মীরের অথবা দার্জিলিং, সিমলা, মুসৌরী প্রভৃতি শহরের সাধারণ অধিবাসীদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় হচ্ছে বছরের কয়েক মাসের জন্য পর্যটকদের আগমন। পর্যটন শিল্পের উন্নতি যে আমাদের শুধু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেই সাহায্য করবে তা নয়; এ শিল্পের উন্নতি আমাদের দেশের বহু মানুষের কর্ম-সংস্থানের এবং জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু এ শিল্পের উন্নতির জন্য আমাদের পর্যটন বিভাগের বিদেশে যতটা প্রচারকাজ চালানো উচিত, ততটা যে করা হচ্ছে না, তা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী অবশ্য পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছেন। কিন্তু এই সঙ্গে আমাদের দেশে পর্যটকদের আকৃষ্ট করার সব ব্যবস্থা যাতে অবলম্বিত হয় এবং পর্যটকদের ক্ষেত্রে যাতে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি হ্রাস করা হয়, সেজন্য চেষ্টা করা দরকার।

সুব্রত গুপ্ত

দুই শতকের ফরাসী সাহিত্য

নন্দদুলাল দে

সাময়িক পত্রে আজকাল বিদেশী সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা প্রায়ই চোখে পড়ে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এই জাতীয় আলোচনা তথ্য এবং বিচারের দিক দিয়ে অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। এতে নানান ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় এবং সেই কারণেই লেখকবর্গের এইরূপে ভ্রান্তিবিলাস ঠিক উপেক্ষা করা যায় না।

সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে ইওরোপের কোনো এক সাহিত্যিক গল্প গড়ে তোলবার জন্য তাঁর টেবিলে তিনটি ট্রেতে পৃথকভাবে নায়ক-নায়িকা ও ঘটনার বর্ণনা সম্বলিত কার্ড রাখতেন। গল্পের প্রয়োজন হ'লে তিনি চোখ বুজে তিনটি ট্রে থেকে তিনখানি কার্ড তুলে নিতেন এবং তা দিয়েই একটি নিটোল কাহিনী গড়ে তুলতেন। এই সাহিত্যিকের কোনো পরিচয় দেওয়া হয়নি। এই প্রসঙ্গে আমার আল্যাকসাঁদর দ্যুমার কথা মনে পড়ছে। এই নামে পিতাপুত্র উভয়েই লেখক ছিলেন। এখানে আমি পিতার কথাই উল্লেখ করছি : তাঁর নাটক ও উপন্যাসের সংখ্যা পাঁচ শতেরও অধিক। প্রসঙ্গত আমাদের অনেকের কাছে তিনি ঔপন্যাসিক হিসাবে খ্যাত, কিন্তু তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা মাত্র দশ। ফরাসী সাহিত্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা নাট্যকার হিসাবে। তাঁর পাত্রপাত্রীদের সংখ্যাধিক্য হেতু তিনি লেখার টেবিলের দু'পাশে দুটি বাক্স রাখতেন সেই বাক্স দু'টির মধ্যে থাকতো পাত্রপাত্রীর নামাঙ্কিত লেবেল-আঁটা ছোট ছোট পুতুল। কোনো নাটক বা উপন্যাস লেখা শেষ হ'লে তার অন্তর্গত পাত্রপাত্রী-দের নামাঙ্কিত পুতুলগুলি একটি বাক্স থেকে অন্যটিতে তুলে রাখতেন, পাছে অজ্ঞাতসারে বা ভ্রমবশত পরবর্তী কোনো নাটক বা উপন্যাসে তাদের আবার আবির্ভাব ঘটে। বিশেষ করে যেসব পাত্রপাত্রীর একবার মৃত্যু ঘটেছে তাদের পুনরায় যাতে দেখা না যায়, তাই এই প্রয়াস, এই সতর্কতা।

বালজাকের (১৭৯৯-১৮৫০) কথাও এখানে অবান্তর হবে না। উনিশ শতকের এই বাস্তববাদী ফরাসী লেখক আমাদের কাছে সমধিক পরিচিত। তাঁর বড় গল্প ও উপন্যাসের সংখ্যা নব্বই, ছোট গল্প তিরিশ এবং নাটক পাঁচ। এর জন্য তাঁকে যে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল তা তাঁর নিজের জবানীতেই লিপিবদ্ধ করছি। অনেক [illegible] তাঁকে গুরুর পদে বরণ করেছিলেন। ১৮৩৪ সালে এই মহিলাকে বালজাক লিখছেন : "গুরুদ তো নয় যেন ক্রীতদাস; সন্ধ্যা ছটায় যখন আপনার সুদৃশ্য পিঞ্জরখানি বাতির আলোয় ঝলমল করে, জীবনের সাড়া জাগে,

দ্যুমা বালজাক

আপনার রূপসী দ্যুতির দীপ্তি ঠিকরে পড়ে, তখন সে শয্যা গ্রহণ করে,...তারপর ঘড়ির কাঁটা যখন রাত্রি সাড়ে বারোটার ঘরে এসে দাঁড়ায়, তখন তার ওঠার পালা, বারোটি ঘণ্টা কাটে কাজের মাঝে।" পাছে ঘুমিয়ে পড়েন সেইজন্য সর্বদা তিনি সুরা পান করতেন অথবা শুকনো কফি চিবোতেন। ছাপার সময় তাঁর আরো কাজ বাড়তো। তখন দরজাজানালার খড়খড়ি-শার্সি বন্ধ করে পর্দা ফেলে দিয়ে ক্রমান্বয়ে ছ' সপ্তাহ থেকে ছ' মাস ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকতেন। কাজে তখন ছেদ নেই, থামতে তিনি জানেন না। এই সময় চারটি বাতির আলোর সামনে একটানা আঠারো ঘণ্টা কাজ করে যেতেন। পরনে আলখাল্লা, যার রং যাজক-দের আলখাল্লার মত সাদা। কোন উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর পূর্ব পরিকল্পনা ও দীর্ঘ-কালের চিন্তা রূপায়িত হ'ত প্রবল উত্তেজনার মধ্য দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের প্রথম খসড়া তৈরি হয়ে যেতো। খসড়া প্রেস থেকে ফিরে এলে তিনি সংশোধন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনের কাজে লেগে যেতেন। ফলে মুদ্রকেরা কাজ ছেড়ে যাবার সম্ভাবনায় শঙ্কিত হত। এইভাবে একটির পর একটি লেখা গড়ে উঠতো। 'লা মেদ্সাঁ দ্য কাঁপাঙ্গন' লিখতে লেগে-ছিল বাহাত্তর ঘণ্টা, কম্পোজ হয়ে এলে প্রুফ সংশোধন করতে লেগেছিল ষাটটি রাত্রি। কোনো উপন্যাস প্রকাশিত হলেই কিন্তু তিনি ক্ষান্ত হতেন না। আগাগোড়া খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। প্রতিটি সংস্করণই পরিবর্তিত রূপ, ধারণ করতো। কিন্তু কেন এই অমানুষিক পরিশ্রম? যশ ও অর্থ-লাভ এর অন্যতম কারণ। শেষোক্তটির ছিল তাঁর বিশেষ প্রয়োজন : আপাদমস্তক তিনি ঋণে ডুবে ছিলেন এবং সারাজীবন কঠোর পরিশ্রমের ফলেও তিনি কোনোদিন তা থেকে মুক্ত হ'তে পারেননি। এছাড়া কাজের মধ্যে তিনি অফুরন্ত আনন্দ পেতেন; তাইতেই বিভোর হয়ে থাকতে তিনি ভালবাসতেন। এক শ্রেণীর লোক আছে, ক্লান্তিতে যাদের নেশা লাগে। বালজাক এই শ্রেণীর সম-গোত্রীয় ছিলেন বলে মনে হয়।

তথ্যগত এই অসম্পূর্ণতা অন্যত্রও দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন 'জ্যারমিনাল' সম্পর্কে বলা হয়েছে : জোলা কয়লার খনি অঞ্চল-

কুলিদের সঙ্গে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন। তাদের চাল-চলন, কথাবার্তা সুখ-দুঃখের কাহিনী, তাদের প্রেম নিবেদনের অভিব্যক্তি সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। তারই পরিচয় রয়েছে জ্যারমিনালে। কিন্তু উল্লিখিত উপন্যাস সম্পর্কিত এই উক্তি অসত্য না হলেও এতে জোলার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা নিতান্তই খণ্ডিত। বালজাক যেমন তাঁর সমগ্র রচনাবলীর নামকরণ করেন 'কমেদি যুম্যান্' জোলাও তেমনি তাঁর সমগ্র রচনাবলীর নাম দেন 'রুগ'-মাকার্'। রুগ্- মাকার তৃতীয় নেপোলিয়নের রাজত্বকালের একটি পরিবার। এই পরিবারই তাঁর রচনার বিষয়বস্তুঃ এক নারীর গর্ভে দুই ব্যক্তির সন্তান। কয়েক পুরুষ পরে স্বাস্থ্যবান পিতার সন্তানগুলি স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে ক্রমশ ভাস্বর হয়ে উঠছে, আবার রুগ্ন-পিতার সন্তানগুলি ধাপে ধাপে অধঃপতনের চরম সীমায় নেমে যাচ্ছে। এইরূপ রাজধানীর বাইরের পরিবেশ পাই 'লা ফর্ত্যুন্ দে রুগ'-র; হাট-বাজারের ছবি ফুটে উঠেছে 'ল্য ভাঁত্র্ দ্য পারি'-তে, গীর্জার পরিবেশ মেলে 'লা ফোত্ দ্য লাবে ম্যুরে'-তে; শুঁড়ি-খানার আবহাওয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'লাসম্ওয়ার' ইত্যাদি।...

১৮৭১ থেকে ১৮৯৩ সালের মধ্যে তিনি এই ধরনের কুড়িখানি উপন্যাস রচনা করেন এবং তাদের পাত্রপাত্রীর সংখ্যা হাজারেরও অধিক। তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মূলে আছে তাঁর সদাজাগ্রত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা। নথিপত্র অপেক্ষা প্রত্যক্ষ দর্শনকেই তিনি বেশী বিশ্বাস করতেন। তাই কত যে বিচিত্র জায়গায় গিয়েছেন, কত লোককে যে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন এবং তাঁর স্মৃতির সহায়ক হিসাবে তিনি যে কত কথা লিখে রেখেছেন তার আর ইয়ত্তা নেই।

বস্তুতপক্ষে জোলার মানসতা হৃদয়ঙ্গম করতে হলে তাঁর রচনার মূল তত্ত্বটি অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন। প্রকৃতি-বাদী (naturalistic) এই ঔপন্যাসিকের কয়েকখানি উপন্যাস ছাড়া তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্ম আবর্তিত হয়েছে দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করেঃ সমসাময়িক চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মত তিনিও মনে করতেন বংশগতি (heredity) এবং পরিবেশ এই দুই শক্তির দ্বারা মানুষ অপরিহার্যরূপে নিয়ন্ত্রিত।

সে যুগে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সাড়া জেগেছে। তার প্রভাবে দৈনন্দিন জীবনের ধারার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ ইতিহাস এবং সাহিত্য সমালোচনায় বিজ্ঞানসম্মত এক ধারার প্রবর্তন হয়েছে। প্রথমদিকে জোলা ছিলেন রোম্যাণ্টিসিজমেরই ভক্ত— কবিত্বহীন নগ্ন রিয়্যালিসমকে তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। কিন্তু তাঁন এবং ক্লদ বার্নার-এর প্রভাবে পড়ে তিনি

জোলা

সিমন'

সাহিত্যক্ষেত্রে এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীরই ধারক এবং বাহক হন। উদ্দেশ্য, সমাজ দেহের রোগ নির্ণয় করা। বিজ্ঞানী যেমন তাঁর গবেষণাগারে গবেষণার বিষয় নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন, তিনিও সমাজের বিভিন্ন পরিবেশকে নিয়ে অনুরূপ গবেষণা করছেন। এই কারণে তাঁর উপন্যাসকে বলা হয়েছে "পরীক্ষামূলক উপন্যাস" (roman experimental)।

শুধু তথ্যগত অসম্পূর্ণতা নয়, বিভ্রান্তিরও বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। কোনো একটি নিবন্ধে জর্জ সিমুন' (বা সিম্যন') (Georges Simenon) একজন "নামকরা ফরাসী লেখক" বলে অভিহিত হয়েছেন। কিন্তু ইনি ফরাসী নন, জাতিতে বেল্জিয়ান্, (১৯০৩ খৃষ্টাব্দে লিয়্যাজ-এ জন্ম) যদিও তিনি লেখেন ফরাসী ভাষায়। আর তাঁর খ্যাতি গোয়েন্দা কাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তিনি বছরে অক্লেশে এই ধরনের কুড়িখানি উপন্যাস রচনা করে থাকেন।

জর্জ সিমন' নাকি "প্রতিদিন একটি করে অধ্যায় লিখতেন। একদিন ছেদ পড়লে সমস্ত লেখা বাতিল করে দিতেন।" এই প্রসঙ্গে দুমা (পিতা) এবং বার্নার্ড শ'র সুনিয়ন্ত্রিত সাহিত্যিক জীবনের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। দুমা প্রতিদিন নিয়মিত কুড়ি পৃষ্ঠা লিখতেন। এইরকম লিখতে লিখতে তিনি যেদিন 'ত্রোয়া মুস্কত্যার' (থ্রি মাসকেটিয়ার্স) শেষ করলেন সেদিন তাঁর লেখা হল উনিশ পৃষ্ঠা। কিন্তু তাঁর দৈনন্দিন অভ্যাসে ছেদ পড়ল না— তিনি কুড়ি পৃষ্ঠা পূর্ণ করলেন 'কঁত দ্য মঁত ক্রিস্তো'র প্রথম পৃষ্ঠা লিখে। শ'র অভ্যাস ছিল প্রতিদিন চার পৃষ্ঠা লেখা। চতুর্থ পৃষ্ঠার শেষ বাক্যটি অসম্পূর্ণ থেকে গেলেও তিনি সেইখানেই থামতেন। যদি কোনদিন কোনো কারণ-বশত তাঁর এই অভ্যাসে ছেদ পড়ত, তাহলে তিনি পরের দিন তা পুষিয়ে নিতেন—একদিন বাদ পড়লে আট পৃষ্ঠা, দুদিন বাদ পড়লে বারো পৃষ্ঠা, এ রূপেই ছিল তাঁর লেখার অভ্যাস। আর তাঁর এই অভ্যাসকেই বলা হয়েছে 'লিটারারি অ্যাপ্রেনটিস্শিপ্।'

যে কয়জন ফরাসী সাহিত্যিককে নিয়ে আমাদের বাংলা সাহিত্যের আলোচনা হতে দেখেছি তাঁদের মধ্যে ফ্রাঁস্বাজ সাগাঁ অন্যতম। লেখকদের মৃত্যুর পর, কালের ব্যবধানে, অনেক সময় তাঁদের ঘিরে নানান্ কিংবদন্তী (legend) গড়ে ওঠে। কিন্তু তাদের সত্যাসত্য সম্পর্কে সন্দিহান হলে প্রমাণের উপায় কোথায়? এক যদি এ নিয়ে স্বয়ং লেখকের জবানবন্দি কোথাও লিপিবদ্ধ থাকে অথবা কোনো নথিপত্রে তার উল্লেখ থাকে তাহলে এ সন্দেহের নিরসন হয়। নতুবা অলিখিত অকথিত গল্প কাহিনী সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যাবে—তা যতই লেখকের সংশ্লিষ্ট ঘনিষ্ঠ মহল থেকে প্রচারিত হোক না কেন। কিন্তু লেখক যেখানে জীবিত সেখানে তাঁর জীবনের কোন ঘটনার সবচেয়ে বড় সাক্ষী তিনি নিজেই এবং তাঁর জীবদ্দশায় যদি কোনো পুস্তকে তাঁর জীবনের ঘটনা লিপিবদ্ধ হয় তবে তাকেও প্রামাণিক বলে ধরে নিতে পারা যায়।

বর্তমানে সাগাঁর বয়স মাত্র বত্রিশ (২১শে জুন, ১৯৬৩ সালে তাঁর ত্রিশ বছর পূর্ণ হবে)। তাঁর জীবদ্দশাতেই একটি বাংলা প্রবন্ধে তাঁর সম্পর্কে এমন কতকগুলি বিকৃত তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে যা তিনি কোনদিন জানতে পারলে নিজেই যুগপৎ স্তম্ভিত ও বিস্মিত না হয়ে পারবেন না। প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে "কেন লেখক হলেন এই প্রশ্নের জবাবে সবচেয়ে মজাদার কথা বলেছেন ফ্রাঁস্বাজ সাগাঁ। আঠারো বছর বয়সে বঁজুর ত্রিস্ত্যাস্ লিখে ইনি ফরাসী সাহিত্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। বঁজুর ত্রিস্ত্যাস্ এ'র প্রথম উপন্যাস। স্কুলের পরীক্ষায় ফেল করে ইনি কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসেন এবং লিখতে শুরু করেন। তিনি বলেছেন ঃ হাতে সময় ছিল প্রচুর, আর খুব লিখতে ইচ্ছা করছিল। অবশ্য আমার বয়সের মেয়ের পক্ষে এমন ইচ্ছা অস্বাভাবিক। ভেবেছিলাম শেষ করতে পারব না। রোজ দু' তিন ঘণ্টা করে লিখতুম, দু' তিন মাসে বই শেষ হয়ে গেল।"

ফ্রাঁস্বাজ সাগাঁর 'প্রথম উপন্যাস বঁজুর ত্রিস্ত্যাস্' এবং তা যে তাঁর আঠারো বছর বয়সে লেখা, এ সম্বন্ধে দ্বিমত হওয়ার উপায় নেই, কেননা লেখিকার জন্ম ২১শে জুন, ১৯৩৬ সালে এবং উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালের মে মাসে।

১। Francoise Sagan—'সাগঁ' কথাটির, বাংলা নয়, সংস্কৃত উচ্চারণ সর্বস্ব এবং সাগাঁ-র 'গাঁ' অক্ষরটি অনুনাসিক।

২। Bonjour Tristesse-এর ফরাসী উচ্চারণ বাংলায় ঃ বঁজুর ত্রিস্ত্যাস্।

...এবং তারপর ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে Julliard প্রকাশকের হাতে বইখানির পাণ্ডুলিপি গিয়ে পৌঁছায়।

(ক) কিন্তু ইতিমধ্যে এবং পূর্বে ১৯৫১-১৯৫২ সালে তিনি স্কুলের পরীক্ষায় যথারীতি উত্তীর্ণ হন (Bachelière en 1951-1952)। ডিগ্রী কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্যে একটি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করতে হয়। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক বছর সরবন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে Propedeutique কোর্সে অধ্যয়ন করেন। ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে যখন তার পরীক্ষা হয় তখন তিনি ফেল করেন।

(খ) বঁজুর ত্রিসত্যাস্ উপন্যাসখানি দু-তিন মাসে নয়, মাত্র তিন সপ্তাহে শেষ করেন এবং এর জন্য কালি-কলম অথবা পেন্সিল কিছুরই দরকার হয় নি, তিনি সরাসরি টাইপ-রাইটার মেশিনে ছেপেছিলেন।

(গ) যাঁরা বিশ্বসাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই উপন্যাসখানি এখনো পাঠ করেন নি, তাঁদের মনে স্বভাবতই কৌতূহল জাগবে—এর প্রতিপাদ্য বিষয় বা মর্মকথা কি? সমালোচক মোরিস নাদো সাগাঁ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অতি সংক্ষেপে বলছেন, এক তরুণী তার পিতার প্রণয়িণীর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। এই ঈর্ষা শেষ পর্যন্ত সেই প্রণয়িণীর মৃত্যুর কারণ হল। এই হল বঁজুর ত্রিসত্যাস-এর সার কথা।

(ঘ) আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক সাগাঁকে [illegible] কুমারী বলে অভিহিত করেছেন: ফলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে এরূপ অনুমান করা অস্বাভাবিক নয় যে তিনি এখনো অবিবাহিতা। বস্তুত তিনি বিবাহিতা এবং বিবাহবিচ্ছেদও ঘটেছিল।

যেমন লেখকের—অন্তত যাঁদের নামের সঙ্গে আমরা সুপরিচিত তাঁদের সম্বন্ধেও অনেক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। আজকাল দেখতে পাই, বাঙালী ফরাসী রসিকরা আলব্যার কামু ও জাঁ-পল সার্ত্র সংক্রান্ত আলোচনায় উভয়ের মধ্যে একই [illegible] প্রেরণা লক্ষ্য করেন। আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের মূল রচনাগুলির সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে তাঁদের পক্ষে এই 'মিশ্রবটিকা' হজম করা শক্ত।

বিশদ আলোচনার আসরে না নেমে ১৫ই নভেম্বর, ১৯৪৫ সালে এক সাক্ষাৎকারে কামু এ সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন তা উদ্ধৃত করে এই ভ্রান্তধারণা নিরসনের চেষ্টা করছি, 'না, আমি অস্তিত্ববাদী নই। সার্ত্র এবং আমি সব সময় আমাদের নাম একত্র দেখে আশ্চর্য হই। ভাবছি, আমরা একটি ছোট ইস্তাহার বার করব। তাইতে নিম্ন স্বাক্ষরকারীরা স্পষ্টভাবে জানাবেন দু'জনের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই এবং কেউ কারো

সার্ত্র কামু

প্রতি কোনো প্রকারে ঋণী নন। বস্তুতপক্ষে এটা একটা রসিকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় হবার আগেই আমাদের সব বই প্রকাশিত হয়। ' যখন আমাদের পরিচয় ঘটলো (১৯৪৪), তখন উপলব্ধি করলাম আমাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়। সার্ত্র হলেন অস্তিত্ববাদী এবং আমার একমাত্র মননধর্মী গ্রন্থ—'লা মিত্ দ সিজিফ্' (Le Mythe de Sisyphe) —রচিত হয় অস্তিত্ববাদের বিরুদ্ধেই।

বহু প্রচলিত শব্দের অপব্যাখ্যাও মাঝে মাঝে সহ্য করতে হয়। 'বুর্জোয়া' বলতে কেউ কেউ মনে করেন কেবল শিল্পপতি কিংবা জমিদারকেই বোঝায় এবং লেখক-গোষ্ঠী এই শ্রেণী বহির্ভূত একটি সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণী।

ক্রমবিকাশের ফলে শব্দটির অর্থের যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটেছে এবং তা বর্তমানে সাধারণত ব্যাপক অর্থেই প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এর অন্তর্গত বিভিন্ন স্তরের কথা বাদ দিলেও আজ বুর্জোয়া বলতে তো কেবল আর শিল্পপতি কিংবা জমিদারকেই বোঝায় না, তাদের মধ্যেও রয়েছে সমাজের মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়; শাসকগোষ্ঠী যাঁরা শিক্ষায়-দীক্ষায় সংস্কৃতিতে কম নয়। তাঁরা প্রচলিত সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের ঘোর বিরোধী, সচ্ছলতা, প্রাচুর্য, নিরপত্তা তাঁদের কাম্য। সুতরাং তাঁদের বলা যায় রক্ষণশীল।

হয়তো অনেক প্রগতিশীল লেখকের পক্ষে এ কথা খাটে না। আবার লেখকগোষ্ঠীর বেশ একটি অংশ—যেমন পল বুর্জো (১৮৫২-১৯৩৫), র‍্যানে বাজাঁ (১৮৫৩-১৯৩২), তাঁরি বর্দো (১৮৭০—) প্রমুখ ফরাসী সাহিত্যিকবৃন্দ, পুরোপুরি এই সম্প্রদায়ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ পল্ বুর্জোর 'ল্য দিভর্স' উপন্যাসখানি বিবাহবিচ্ছেদের বিরুদ্ধে লেখা; তাঁর 'লেমিগ্রে'-তে রয়েছে

প্রাচীন আভিজাত্যের প্রশস্তি; বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ আস্থা এবং ধর্মে অনাস্থার ঘোর বিরোধী বক্তা তাঁর 'লা দিসিপল' গ্রন্থে সাধারণভাবে আধ্যাত্মিকতা এবং 'লা সাঁস দা লা মর্'-এতে ক্যাথলিক ধর্মমতের জয়গান করেছেন। তিনি মনে করেন গণতন্ত্র এলিট এবং ধনসম্পদের পরিপন্থী—গণতন্ত্র সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করে, ব্যক্তিকে করে তোলে উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং ফলে তাতে পরস্পরের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়।

শব্দের এই অপব্যাখ্যার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে শব্দের হাস্যকর বিকৃতি— যার একটি দৃষ্টান্ত কয়েক মাস আগে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পেয়েছি। সংবাদটি ফরাসী সাহিত্যিক মারস্যাল এমে—সম্পর্কিত (Marcel Aymé)। রয়টারের খবর বাংলায় যেভাবে অনূদিত হয়, তাতে 'মারস্যাল্ এমে' রূপান্তরিত হয় 'মার্সেল মাইমি'-তে। মারস্যাল এমের সঙ্গে আমার আলাপ করার সুযোগ হয়েছিল এবং তিনিই যে পরলোকগমন করেছেন সেটা পরে জানতে পারলাম ফরাসী সংবাদপত্রের কল্যাণে।

ঘরে বাইরে

আভাদি'র সংসার

অনেকদিন পর আভাদি'র ওখানে গিয়েছিলাম। আভাদি'র ছোট্ট সংসার— স্বামী-স্ত্রী আর দু'টি বাচ্চা। আভাদি'র স্বামী বেশ ভাল চাকরি করেন, সংসারে অভাব অনটন নেই। আভাদি'র স্বামীও শুনেছি খুব ভাল লোক। শান্ত প্রকৃতি, কোনো বদখেয়াল নেই, অফিস আর বাড়ি ছাড়া তাঁর আর কোনো বাইরের আকর্ষণ নেই। আজকালকার দিনে আভাদি'র মত সুখশান্তি আর ক'জনের ভাগ্যেই বা হয়? অন্তত বাইরে থেকে তা' মনে হবারই কথা। আমারও তাই মনে হ'ত। কিন্তু সেদিন দুপুরে আভাদি'র মুখ দেখে প্রথমেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। কোথায় যেন একটা কি গণ্ডগোল আছে। এ'তো সুখী মেয়ের মুখ নয়! তা'হলে কি আভাদি'র মা-বাবার কারুর অসুখ? কারণ আমি জানি আভাদি'র শ্বশুরশাশুড়ী কেউ বেঁচে নেই। সংসারে আভাদি'ই সব। বললেন, "মা বাবা সবাই ভাল আছেন। পরশুই চিঠি পেয়েছি।" তবে? ম্লান একটু হেসে আভাদি বললেন, "তবে আবার কি? তোমার সবটাতেই বাড়াবাড়ি। বয়েস হচ্ছে তো? সব সময় কচিখুকীর মত কি হেসে লুটোপুটি খাব? ছেলে-মেয়েরা বড় হচ্ছে, গম্ভীর না হলে ওরা মানবে কেন?"

পরে অবশ্য সব কথাই জেনেছিলাম। সে সব কথা খুব নতুন কিছু নয়। অনেক সংসারের গৃহিণীই আভাদি'র মত নিজেকে তিলে-তিলে ক্ষয় করে সংসারের চাকা সচল রেখেছেন। 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে' — এই আপ্তবাক্যকে সার্থক করতে জীবনের অনেক সুখশান্তিকে তাঁদের জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে। নিজের দুঃখের কথা বলতে গিয়ে আভাদি'র দু'চোখে জল ছাপিয়ে এসেছিল। বলেছিলেন, "আমার দুঃখের কথা ধৈর্য ধরে শোনার মত লোকও নেই এই সংসারে।" অফিসের ছুটি আছে, স্কুলের ছুটি আছে; কিন্তু সংসার বারো মাস তিরিশ দিন খোলা। সংসারের কাজ সারা দিন পুরোদমেই চলে, বরং ছুটির দিন কাজের হাঙ্গামা বাড়ে ছাড়া কমে না। ছ'দিনের অফিসের খাটুনির পর সপ্তাহের একটি ছুটির দিন আভাদি'র স্বামী পুরো বিশ্রাম নেন। কিন্তু সারা সপ্তাহে সংসারের অনেক খুঁটিনাটি কাজ জমে যায়, যা আভাদি'র দ্বারা হয়ে ওঠে না। বেসিনের কলটা হয়ত পুরো আঁটলেও টিপ টিপ করে জল পড়ে, ওটা নিজেরাই ঠিক করে নেওয়া যায় কিংবা একটা কলের মিস্ত্রি ডাকিয়ে সারিয়ে নিতে হবে। বসার আর শোবার ঘরের পাখাগুলিতে ধুলো জমেছে, আলোর শেড, বাল্ব একটু ধুয়েমুছে সাফ করা দরকার। বুক-কেসে বইগুলোয় ধুলো জমেছে, একটু ঝাড়ামোছা করে সাজিয়ে রাখতে হবে। বসার ঘরে কার্পেটটা বর্ষার পর একদিনও রোদে পড়েনি। এমনি টুকি-টাকি কত কাজ থাকে। আভাদি আশা করেন, এইসব কাজে স্বামীর সাহায্য পাবেন। কিন্তু আভাদি'র স্বামী এসব পছন্দ করেন না। এসব কথা বললে বরং বিরক্ত হন। বাঁকা একটা উত্তরও তৈরি আছে অবশ্য—'সারা সপ্তাহে মেয়েদের আর ঘরের কাজটা কি? শুধু রান্নাবান্না আর ছেলেমেয়েদের একটু দেখাশুনো করা। বাকী সময়টা শুধু দিবানিদ্রা আর পাশের বাড়ির গিন্নীর সঙ্গে বারান্দায় দাঁড়িয়ে গালগল্প। তার সঙ্গে অফিসের কাজের তুলনা হয়?' আভাদিও তুলনা করতে চান না। তবে বাড়ির কাজের ঝক্কিটাও তো কম নয়। মেজাজী ঝি-চাকরকে নিয়ে মানিয়ে গুছিয়ে চলাটাই তো আজকাল সবচেয়ে বড় সমস্যা। এ-কাজ যথেষ্ট পীড়াদায়ক; তা ছাড়া, কৌশল আর ধৈর্যের একটা অগ্নিপরীক্ষা।

বাজার দর যতই চড়ুক না কেন, আভাদি'র স্বামীর মত অনেক স্বামীই চান, তাঁদের পছন্দ মত খাবারটি যেন থালায় সাজানো থাকে। তাছাড়া জামাকাপড়ের ব্যাপারে এবং ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি সব স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারেই এদের স্ত্রী-ই ভরসা। ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়া, জামাকাপড় আর খাওয়ার সব বায়না আভাদিকেই সামলাতে হয়। কারুর কোথাও পান থেকে চুন খসলেই আভাদি'কে অভিযোগ শুনতে হয়। এতে তিনি অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। সারাদিন অফিস থেকে খেটেখুটে বাড়ি ফিরে স্বামী চান আভাদি সেজেগুজে হাসিমুখে তাঁকে অভ্যর্থনা করবেন। কিন্তু আমার মনে হয় সর্বাগ্রে যে জিনিসটি তিনি চাইবেন, তা' স্ত্রীর গালভরা হাসি নয়, মনের মত এক প্লেট খাবার আর তার সঙ্গে গরম এক পেয়ালা চা, নয় তো কফি। ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে ফিরেই জামাকাপড় ছাড়তে না ছাড়তে যদি খাবার তৈরি না পায়, তাহলে নিশ্চয়ই জননীকে স্বর্গাদপি গরীয়সী বলে ক্ষমা করবে না। কিন্তু অফিস বা স্কুলফেরত স্বামী আর ছেলে-মেয়েদের হাতে হাতে মনের মত খাবারটি যুগিয়ে দিতে হলে তার জন্যে প্রস্তুতি চাই। এই কঠিন দিনে প্রত্যেকের মন রেখে রুচি অনুযায়ী আহার্যের ব্যবস্থা করার পিছনে সুগৃহিণীকে অনেক চিন্তা আর সময় ব্যয় করতে হয়। এইসব কাজ সেরে তাঁকে আবার নিজেকে তৈরি হতে হয়—মুখে ক্লান্তির ছাপ থাকবে না, হাসি-ভরা মুখ নিয়ে বৈকালিক অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত হতে হয়। সারা দুপুর এই প্রস্তুতিপর্বের পর লম্বা একটানা 'দিবানিদ্রা' দেবার বা 'পরচর্চা' করবার সময় পান না আভাদি। আভাদি এর জন্য দুঃখ করেননি। তাঁর দুঃখের কারণ অন্য।

স্বামী খেতে ভালবাসেন বলে আভাদি

হয়ত সারা দুপুর খেটেখুটে শখ করে একটা খাবার তৈরি করলেন। অফিস-ফেরত স্বামীদেবতাকে খুব উৎসাহ ভরে থালায় সাজিয়ে ভোগের নৈবেদ্য দেওয়া হল। কিন্তু দেবতার ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে উৎসাহ মুহূর্তে সব জল। আভাদি দেখলেন, অত্যন্ত নিরাসক্তির সঙ্গে তাঁর সাধের তৈরী খাবার অনেকটা যবের ছাতুর মত চর্বিত হচ্ছে। মনে মনে তখন নিজেকে এত অবহেলিত আর অপমানিত বোধ করেন তিনি যে মুখ ফুটে "কেমন হয়েছে" জিজ্ঞাসা করতেও প্রবৃত্তি হয় না।

স্বামী অফিস থেকে ফেরার পর আভাদি'র এক একদিন মনে হয় একটু বাজারে যান বা এদিক সেদিকে বিকেলের দিকে একটু বেড়িয়ে আসেন। সারাদিন তো ঘরেই বন্ধ। কিন্তু কর্তা অফিসের পর এত ক্লান্ত থাকেন যে, তিনি আর কোথাও বেরুতে চান না। চা-জলখাবার খেয়ে বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজটায় চোখ বুলোতে থাকেন কিংবা অন্য বই-টই পড়েন। আভাদিরও এই সময়টায় একটু অবসর। সারাদিন পর সংসারের খুঁটি-নাটি দরকারী-অদরকারী নানা কথা জমে

থাকে। স্বামীর কাছে বললে মনটা একটু হালকা হয়। কিন্তু খবরের কাগজের ওপর থেকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আর নিস্পৃহ গলায় দু'চারটে হুঁ-হাঁ ছাড়া আর কোনো উৎসাহব্যঞ্জক জবাব যখন মেলে না, তখন বাধ্য হয়েই আভাদি'কে কথা বন্ধ করতে হয়। কিন্তু মুখ বুজে একটা মানুষ খবরের কাগজের আড়ালে কতক্ষণ বসে থাকতে পারে? কি ভেবে হয়ত রেডিওটাই একটু খুলে দেন। সংবাদপত্রের অন্তরালবর্তী মানুষটি সঙ্গে সঙ্গে সবাক হয়ে ওঠেন—"কী যে তোমাদের এই প্যানপ্যানানি শুনতে ভাল লাগে! সারাদিন পর কান ঝালাপালা হয়ে গেল!" রেডিওর চাবি তক্ষুনি বন্ধ করতে হয়। অগতির গতি উল-বোনা। কর্তার যে ফুলহাতা সোয়েটারটা ধরেছেন, তাই নিয়ে বসেন আভাদি। কিন্তু তাতেও ভদ্রলোকের অ্যালার্জি। সামনে বসে উলের কাঁটা চালালে তিনি নাকি ভারী অস্বস্তি বোধ করেন। নিজের অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে আভাদি'র। কিন্তু সুগৃহিণী তিনি। তাঁর নিজের বিশ্রাম, অবসর যাপন সম্বন্ধ তাঁকে দার্শনিক হতে হয়। সংসারে সকলের সুখের পথ করে দিতে হবে তাঁকে, নিজের অসুবিধের কথা ভাবলে চলবে না। একেবারে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর মত মনে একটা নিরাসক্তির ভাব এনে আভাদি এবার খবরের কাগজের এপিঠে দাদের মলমের একটা বিজ্ঞাপনে মনঃসংযোগের চেষ্টা করলেন।

নিজের দেহ-মন অকৃপণভাবে দিয়ে আভাদি নিজের স্বামী আর সংসারকে সুখী আর সুন্দর করার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তার বিনিময়ে তিনি আর কি চাইবেন? তাঁর নিজের সংসারে সুগৃহিণী তিনি এই তো তাঁর পুরস্কার। কিন্তু তবু আছে বই কি! শখ করে তৈরি করা নিজের রান্নার একটু তারিফ—"বাঃ চমৎকার রান্না হয়েছে" কিংবা "এই শাড়িটায় তোমার বেশ মানিয়েছে" —এ ধরনের এক টুকরো অ্যাপ্রিসিয়েশন মাঝে মাঝে শুনতে কার না ইচ্ছে হয়! কিন্তু স্বামীর একটা নির্মম ঔদাসীন্য আভাদি'কে সবচেয়ে বড় আঘাত দেয়। মাসের শেষে শুধু একতাড়া নোট দিয়েই তিনি কর্তব্য শেষ করেন। তাঁর কোনো কাজে কোনো কথায় তাঁর আগ্রহ নেই, উৎসাহ নেই। বিয়ের পর নিজে পছন্দ করে কখনও একটা শাড়ি পর্যন্ত আভাদি'কে কিনে দেননি। আভাদি অনেকবার বলেছেন একথা। বলেন, ওসব শাড়িটাড়ি কেনার মহা হ্যাঙ্গাম। তুমি বরং কুতুকে সঙ্গে নিয়ে কিনে আনো যা পছন্দ হয়। টাকা যা লাগে নিয়ে যাও।" কুতু তাঁদের ভাগ্নে। আভাদি'র আর জীবনে শখ সাধ কিছু নেই। শুধু সংসারের চাকা সচল রাখতেই তাঁর অস্তিত্ব। স্বামী আর ছেলেমেয়েদের দাবি আর প্রয়োজন মেটাতেই তাঁর জন্ম। তিনি যে সুগৃহিণী!

কথায় কথায় বিকেল গড়িয়ে ঘড়ির কাঁটা যে পাঁচটার ওধারে কখন চলে গেছে খেয়াল করিনি। দরজায় ঘণ্টা বাজার শব্দে আভাদি শশব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন—"ওই উনি বোধ হয় ফিরলেন। ভালই হল, দেখা করে যাও। তোমায় দেখে খুশীই হবেন।" অফিস থেকে আভাদি'র স্বামীই ফিরলেন। আমায় দেখে খুশী হলেন কিনা বুঝতে পারলাম না। তবে বিরক্ত হননি মনে হল। আমাদের জন্যে চা জলখাবার নিয়ে এলেন আভাদি। একথা সেকথা অনেক কথার পর আভাদি'র কথা উঠতে তিনি বললেন—"আপনার বন্ধুর কথা আর বলবেন না! সারাদিন ঘরসংসার আর রান্না নিয়েই সে ব্যস্ত! আপনারা কি আর ঘরসংসার করেন না! যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। এই দেখুন না, আপনারা কত কাজ করেন—লেখেন, সমাজের কাজ করেন। এত ঘরকুনো হলে কি আজকাল চলে?" কথাগুলো বলে ভদ্রলোক এমন অবজ্ঞাভরে হাসলেন যে, শুধু আভাদি'র নয়, আমারও সর্বাঙ্গ ঘৃণায় শিউরে উঠল! আভাদি'র মত অভাগী সত্যিই সংসারে কেউ নেই!

টুকিটাকি

সূর্যের আলো সমস্ত প্রাণীর দেহরক্ষার উপযোগী সর্বশ্রেষ্ঠ টনিক। খোলামেলায় প্রকৃতির বুকে যারা মানুষ হয় তাদের স্বাস্থ্য কি সুন্দর। আমাদের দেশের সাঁওতালদেরই দেখুন না। কিন্তু নানাকারণে আধুনিক জীবনযাত্রায় খোলামেলা থাকার সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ। ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে সূর্যের আলোর মুখ না দেখেও আমাদের দিন কাটে। এর একটা আংশিক প্রতিকার আছে। সূর্যের আলোর মুখ আমরা দেখবার সুযোগ না পেলেও মাঠের শাকসবজি তো পাচ্ছে। কাজেই, সারাদিন সূর্যের আলোয় বেড়ে ওঠার ফলে শাকসবজিদের মধ্যে সূর্যের আলোর সব গুণই যথেষ্ট মাত্রায় বর্তমান আছে। এই শাকসবজিকে আমাদের খাদ্যতালিকায় বেশী করে স্থান দিলে সূর্যের আলো থেকে বঞ্চিত থাকার দরুন অভাব অনেকখানি পূরণ হবে। যতদূর সম্ভব শাকসব্জী কাঁচা খেতে পারলেই ভাল। কারণ, আগুনের তাপে এদের আসল গুণ প্রায় ষোল আনাই নষ্ট হয়ে যায়। তবে, নিতান্ত অসম্ভব ক্ষেত্রে অল্প আঁচে সামান্য সিদ্ধ করে খেতে হবে।

শাকসবজি কাঁচা খাওয়ার ব্যাপারে স্যালাড একটি ভাল পন্থা। স্যালাড বা রায়তার উপযোগী কয়েকটি সবজি ভিটামিন ও দেহ গঠনের উপযোগী বিভিন্ন মূল্যবান উপাদানে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। লেটুস আর বাঁধাকপির মধ্যে লৌহ আছে অধিক পরিমাণে। এতে শরীরে রক্ত সঞ্চালনের কাজ তো ভাল হয়ই তাছাড়া রক্ত জমাট বাঁধা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে এর মধ্যে। এইজন্যে হার্টের রুগীদের পক্ষে এই সবজি দুটি বিশেষ উপকারী। আমাদের বাংলাদেশের শুষনি কলমী শাকের মত লেটুসেও ঘুমপাড়ানী উপাদান আছে। লেটুস খেলে সুনিদ্রা হয়। টম্যাটোর ব্যবহার আজকাল ঘরে ঘরে খুব বেড়েছে। খাবারের তালিকায় এই মূল্যবান সবজটিকে নানাভাবে স্থান দিলে উপকার পাবেন। ভিটামিন এ ও সি ছাড়া এতে পটাশিয়াম থাকায় হার্টের পক্ষে টম্যাটো খুব উপকারী। পটাশিয়মের অভাবে শরীর অবসন্ন আর দুর্বল হয়ে পড়ে, বুক ধড়ফড় করে এবং আরো অনেক উপসর্গ দেখা দেয়। শশাতে ভিটামিন ছাড়া যথেষ্ট প্রোটিন আছে। মুড়ির সঙ্গে নুন লঙ্কা আর কাঁচা শশা শুধু মুখরোচক নয় খুব পুষ্টিকর। স্যালাডে শশা ব্যবহার না করে উপায় নেই। বীট শুধু রংদার নয়, বীটের মধ্যে যে চিনি আছে তা শরীরে কাজের উৎসাহ যোগায়। তবে পেটের গোলমাল থাকলে বীট না খাওয়াই উচিত। ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ গাজর আর একটি অত্যন্ত উপকারী সবজি যা অনায়াসে কাঁচা খাওয়া চলে। চোখের পক্ষে উপকারী সবজি হিসেবে গাজর অদ্বিতীয়। রুচি হিসেবে স্যালাডে কাঁচা পেঁয়াজ ব্যবহার করা চলে। পেঁয়াজ আর একটি সবজি যাতে ভিটামিন ও দেহরক্ষার উপযোগী বিভিন্ন উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে আছে এবং যা কাঁচা অবস্থায় খাওয়া চলে।

শ্রীমতী

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

তিরাশি

এবার ফিরে চলো। এখন অবতরণ। রাঢ়ের উত্তর থেকে দক্ষিণের ঢলে নেমে যাওয়া। মনের দৃষ্টি ভরে যেন প্রকাণ্ড এক আলখাল্লা দোলে! কত যে ধুলো, কত যে রঙ তার গায়ে! দেশান্তরের ধুলো রূপান্তরের রঙ। যত সেলাই, পট্টিতালি মারার রঙে। তালিতে তালিতে রঙ। ছেঁড়া ন্যাকড়া, কাঁথার তালি, কাপাসী নামাবলী, রেশমী পশমী কত ঝলক দেওয়া তালি এই আলখাল্লার।

এ আলখাল্লাটা যে কার গায়ে, তাকে দেখতে পাই না। কে যে ভিতর দিকে দৃষ্টি টেনে নিয়ে চোখের সামনে সেটাকে দোলায়, তা-ও দেখি না। মনে হয়, অনেক দূরে কোথায় যেন ডারা ডুপকি প্রেমজুরি, একতারা বাঁয়ার মিলিত শব্দ বাজে ক্ষীণ, সুরে। তার সঙ্গে গানের কলি,

দিনে দিনে হল আমার
দিন আখেরি
আমি কোথায় ছিলাম
কোথায় এলেম
সদায় ভেবে মরি।

কে গায়, কার গলা, চিনতে পারি না। যেন কোন এক আত্মভোলা আপন মনে গেয়ে চলে। তার গলায় নেই সুরের বাহার, অথচ স্বরে আবেগ। কাঁদে, না হাসে—বোঝা যায় না।

পথ চাঁজ। চলতে চলতে এমনি মনে হয়। চলার পথে যে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তা না। কিন্তু বুকের মধ্যে কেমন একটা ভার। অথচ একটা ব্যাকুলতা রয়েছে। কিসের ভার, তা জানি না। যে পথ পিছনে রেখে আসি, যা-কিছু ছেড়ে আসি, তার জন্যই কী না, কে জানে। তবু একটা ভার, কেমন একটা ব্যথা ধরানো।

ব্যাকুলতা যেন একটু বুঝতে পারি। যে আমাকে অচিনের খোঁজে ফেরায়, সে একটা পাগল, সন্দেহ নেই। পাগলই পাগল করে আমাকে। গাজীর নিমন্ত্রণের কথা মনে পড়ে বারে বারে। যেতে হবে। ব্যাকুলতার মধ্যে তার সেই কালো মুখের ভাঁজে ভাঁজে হাসি, ঝাঁকড়া চুল, গোঁফ-দাড়ি, আলখাল্লা-পরা চেহারাটা বারে বারে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আর পান-খাওয়া তার সেই লাল দাঁত। ওইটুকু মাপ করতে হবে। মুরশেদের নামে ফেরে, কিন্তু পানের পিক-ছোপানো লালিমাটুকু দাঁতে লেগে থাকে। তবু একটা মুখ, সমস্তটাই যেন হাসি।

জয়দেবের রাত পোহাতেই মাঘ মাস পড়ে যায়। তাই ফেরার পথে নবদ্বীপ হয়ে যাই। মাঘ মাসে ধুলট। ধুলট উৎসব। যত বৈষ্ণব কীর্তনিয়া, সকলের আগমন এখন নবদ্বীপে। যত নাম, তত গান, তত ধুলো-মাখামাখি। যে ধুলোয় নিমাই চলেছে, যে-ধুলোয় নিমাই গড়াগড়ি দিয়েছে, সেই ধুলোয় ভক্ত গায়কের গড়াগড়ি। যতেক কীর্তনিয়া, মেয়ে-পুরুষ, ভদ্রাভদ্র, সকলেই নিমাই-ক্ষেত্রে গান নিবেদন করতে আসে এ সময়ে। নবদ্বীপে মাঘ মাস গানের মাস। প্রথম নিবেদন এখানে। তারপরে গ্রামে জনপদে যত্রতত্র। যাঁর গান, আগে তাঁকে দিয়ে, তারপরে অন্যে পরে।

মাধবী দাসীর গান শুনে মনে হয়েছিল, গান না, আর কিছু শুনিনি। তার জীবনটা কেমন কে জানে। চওড়া কালো পাড় ঢাকাই শাড়ি পরে প্রৌঢ়া গায়িকাটি যখন আসরে নেমেছিল, তখন তেমন কোন আশা জাগেনি মনে। তার জামা শাড়ির বহর, পান খাওয়া ঠোঁট, সিঁদুরের ঔজ্জ্বল্য, পায়ের আলতা, হাতে পানের রুপার কৌটা, একটা রাজেন্দ্রাণী ভঙ্গি দেখে মনে হয়েছিল, মাইফেলের আসর তো না। কেমন যেন একটু 'অংখারের' ছাপ দেখা যায়।

কিন্তু মাথুর ছাড়া সে কিছু গায়নি। বিলম্বিত লয়ে তার শুরু, সেই লয়েতেই শেষ। দীর্ঘশ্বাস, কান্না, বিরহ। গরবিনী-রোশনী মাধবী দাসী আসলে বিরহিণী। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে নিজে গেয়েছে, শ্রোতারা সবাই কেঁদেছে। তার গলার সুরে কান্না ছিল। চোখে জল ছিল না। 'হেন এ অবলা, করেছে বিকলা, নিয়ে চল্ সখী মথুরাপুরে।' নিজেকে দেখিয়ে দেখিয়ে কান্নার সুরে সে গেয়েছে, 'চল্ চল্ চল্ নিয়ে চল্ সখী।' অন্যেরা কেঁদেছে। রাই সখী মথুরায় গিয়ে ধিক্কার দিয়ে আসে, 'ধিক ধিক ধিক তোরে হে কালিয়া, কে তোরে কুবুদ্ধি দিল।' মাধবী দাসী চোখ পাকিয়ে তর্জনী তুলে তুলে গেয়েছিল, 'কে বা [illegible] পীরিতি করিতে, মনে যদি এত [illegible]।' তারপরে চোখ বুজে রাগে অভিমানে আকুল স্বরে বলেছিল, 'তোমার কি একটু লজ্জা নাই হে, অ্যাঁ? একটা মেয়েকে কাঁদাতে বুঝি খুব ভাল লাগে! ওরে নষ্ট দুষ্টু!'

কিন্তু এক সময়ে মাধবী দাসীর চোখ ফেটেও জল এসেছিল, যখন নিজেকে দেখিয়ে আখর দিয়ে বারে বারে গেয়েছিল, 'এই অথির জীবন, অথির যৌবন, আর কতক্ষণ। ওহে, আর আর আর, আর কতক্ষণ।'...তখন সে গান যেন মাধবী দাসীর আপন গান হয়ে উঠেছিল। শ্রোতাদের সকলের গান হয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, আমার সারা রাত ঘুমের মধ্যে সেই গান শুনেছি।

সুদেব গোস্বামীর গানও ভাল লেগেছিল। বৃদ্ধ গায়ক, ধুলোয় গড়িয়ে গড়িয়েই গেয়েছিলেন। তাঁর গান নিমাই-হারা নদীয়াবাসীর গান। পুত্রশোকাতুরা শচীমায়ের গান। স্বামীহারা বিষ্ণুপ্রিয়ার গান। 'হাজার চাঁদে আলো করুক, নদের আকাশে আর

চাঁদ নাহি।' নদীয়াবাসীর অন্ধকারে হাহাকার। শচীর ক্রন্দন, 'এ-বাড়ির পরান কেন থাকে।' বিষ্ণুপ্রিয়ার একলা কান্না, 'তোমার কৃষ্ণের এ কি অভিলাষ।'

মন্দিরে মন্দিরে আখড়ায় গান শুনি। ধুলট উৎসব না দেখলে, এ গান না শুনলে নবদ্বীপের মরমে যে রসের ধারা বহে, তা জানা যেত না। রাসযাত্রা বা অন্যান্য উৎসবের আলো কোলাহল বেশী। সে রূপে এ রূপ নেই।

এই উৎসবের শেষে আবার পথ চলা। বারোই ফাল্গুনে হাড়োয়ার হাটে পীর গোরাচাঁদের মেলায় যেতে হবে। গাজীর নিমন্ত্রণ। কিন্তু এত ভাব, কোথা থেকে মনে নামে। চকিতে চকিতে সচকিত হয়ে কী দেখি। যেন কেমন একটা চমক লাগে থেকে থেকে। আর ব্যাকুলতা বাড়ে।

তবুও ফেরার পথে, ঘুরপথে যাই। মাঘের পূর্ণিমায়, বর্ধমানের কুলীনগ্রামে ঘুরে যাই। শ্যামের মন্দিরে এখন উৎসব, কুলীনগ্রামে মেলা। একটু না দেখে যেতে পারি না। কেবল শ্যামের মন্দির আর মেলা না। সেখানে ভক্ত হরিদাসের একটি স্মৃতি মন্দির আছে। মেলা পেরিয়ে সেখানে যখন যাই, বিশাল একটা গাবগাছের দিকে চেয়ে মনে হয়, যুগ-যুগান্তর দাঁড়িয়ে আছে যেন। এত বিশাল আর প্রাচীন গাব গাছ আর কোথাও দেখিনি। এমন বিশাল পাথরের মত এবড়ো খেবড়ো অবয়ব আর কখনো চোখে পড়েনি।

হরিদাসের স্মৃতিমন্দির দেখবার মত এমন কিছু না। অনেক দিনের পুরনো শ্যাওলা-ধরা খানিকটা ইঁট বাঁধানো জায়গা। তার এক পাশে একটি সামান্য ঘর। গাছ-পালার ছায়ায় ঘেরা, নিঃশব্দ নিরালা। বারো মাস জঙ্গলেই ঢাকা থাকে বোধ হয়। উৎসব উপলক্ষে একটু সাফ সুরত করা। মেলার কোন হট্টগোল এখানে নেই। দু-চারজন একাকী বা যুগল বৈষ্ণব সেখানে চুপচাপ বসা। তারাও সেই নিরালা নিঃশব্দের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে যেন।

কুলীনগ্রাম থেকে নৌগ্রামের জলেশ্বরের ক্ষেত্র দেখে যাই। শিব জলেশ্বর। ফাল্গুনে শিবরাত্রির উৎসবে মেলা হয়। সে মেলা কেমন জানি না। কিন্তু জলেশ্বর ক্ষেত্রের এই অরণ্যের নিবিড়তা মন ভুলিয়ে দেয়। চোখ জুড়িয়ে যায়। বনে, নিরালায়, কে এই শিব প্রতিষ্ঠা করেছিল, কে জানে। বাঙলা দেশের অধিকাংশ দেবদেবীর প্রতিষ্ঠাই দেখি নদীর কূলে, ঘর-গৃহস্থের দুয়ার পেরিয়ে, আকাশের নিচে, সুদূরে বিস্তৃতিতে। কোথাও বা অরণ্যে বনে নিরালায়। বছরের কয়েক দিন উৎসব মেলা যা কিছু সব সেখানেই।

মানুষ সেখানে আর-এক জগৎ সৃষ্টি করতে চেয়েছে। দেখি, পথ চলি, দেখি। 'তবু ভরিল না চিত্ত।' ভরবেও না। কিসের খোঁজে ফেরা, তার সন্ধান যে জানেনি, তার ভরাডুবির কোন কথা নেই। শুধু এই এক, দেখি, চলি আর দেখি, নানা মানুষ। ভাবের পটে, ছবির মতন। এত বিচিত্র, বিস্ময়কর, অন্তর মন-প্রাণের শূন্যতার কথা ভুলে যাই। বৈরাগ্য আমার নেই, আমি বৈরাগী না। তাই অনেক শূন্যতার মধ্যেও যে বিচিত্র বিস্ময়কে দেখি, তার সামনে দাঁড়িয়েই সহসা স্তব্ধ হয়ে যাই। বুকের কাছে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে পড়ি।

বসিরহাটগামী বাস ধরে বেড়াচাঁপার কাছে নামি। এবার হাড়োয়ার পথে। আমার গাজীর নিমন্ত্রণ। এতক্ষণ পুবে গতি ছিল। বেড়াচাঁপা থেকে সোজা দক্ষিণে। বেড়াচাঁপার ভিড় দেখেই বোঝা যায়, মেলা লেগেছে। দু'খানি বাস ছেড়ে দিতে হয়। ভিড়ের মধ্যে জায়গা পাই না। যাত্রী দেখলেই বোঝা যায়, সকলের গতি এক দিকে। হাড়োয়া, পীর গোরাচাঁদের মেলায়। বিদ্যাধরী নদীর কূলে।

সেখানে গিয়ে গাজীর সঙ্গে দেখা করেই নতুন কাজ, নৌকা আর মাঝির খোঁজ। যাব দক্ষিণে, দূর দরিয়ার কূলে। সুন্দরবন, সাগরসঙ্গমে।

গাড়িতে উঠে গাজীর কথাই বারে বারে মনে হয়। মনে মনে অনেকবার বলেছি, গাজী না পাজী। যেমন তেমন পাজী না। রসের পেজোমিতে ওর মন ভরা। আশমানী ছায়া দরিয়ার মত চোখ দেখলেই বোঝা যায়। তার জন্য কিছু নিয়ে যাবার নেই আমার, শুধু কয়েক প্যাকেট সিগারেট ছাড়া।

তা-ই নিয়েছি। মনে আছে, ইছামতী

ছিরগেটের কী খোশবু। ভারী মিঠে বাস ছাড়তিছে।' তার মানেই, একটু আস্বাদ দাও। সাধু-ফকিরদের এসব দেখলে যে বিরক্তি লাগে না, তা না। তবু একটা 'ছিরগেট' দিয়েছিলাম। কিন্তু সেটাকে দু' টুকরো করে সে যে নৌকার মাঝিকেও আধখানা দান করবে, তা ভাবিনি। সেই অধর মাঝিকেও ভোলবার নয়। পারাপারের অনেকটা সময়ই তাকে দেখেছিলাম। খালি গা, খড়ি-ওঠা দাগ, দুটি গভীর কালো চোখ, যেন একটা ঘোর-লাগা মানুষ। সে অধর মাঝি আমার কাছে অধরই থেকে গিয়েছে। তাকে আধখানা সিগারেট দিতে দেখে অবাক হয়েছিলাম। অমন জিনিসের ভাগ দেবার উদারতাও যে গাজীর আছে, বুঝতে পারিনি। মানুষ চিনি কতটুকু।

তারপরে তো মুরশেদের নামের মজুরি করে ফেরা গাজী গান দিয়েই মাত করেছিল। মনে আছে, কালীনগরের ঘাট থেকে মিনিদের নিয়ে যখন লগু ছেড়ে গিয়েছিল, সে গুনগুনিয়ে উঠেছিল, 'ও সে না জানি কি কুহক জানে/অলক্ষ্যে মন চুরি করে।' ......সেই মুহূর্তে কেন গেয়েছিল এই গান। গাজী সত্যি গাজী।

তা-ছাড়া, এবার তো শুধু গাজী না। সঙ্গে তার 'পিরিতি' ময়নতারার দেখাও পাওয়া যাবে। 'পিরিতি না হলি তো সাধন হয় না বাবু। একটি পিরিতি চাই।'

কেমন করে সেই প্রকৃতি প্রাপ্তি ঘটেছিল, তারও কাহিনি আছে। এই হাড়োয়ার মেলাতেই একদা এক যুবতী বৈষ্ণবী গাজীর গান শুনে নিজের দল আখড়া সব ছেড়ে গাজীর সঙ্গে চলে গিয়েছিল। নাম তার ময়নতারা। গাজীর পিরিতি।

এ কি যে সে গাজী। তারপরেও বলেছিল, 'বা, বলি, এ পুরুষ পিরিতি কিন্তু মিয়া-বিবির ঘর করা নয় বাবু। দুইজনের সাধনা, ছাওয়াল-পাওয়াল হতি পারবে না।'

দেহতত্ত্বের কথা বলেছিল। আর শেষ মুহূর্তের বিদায়ের সময় জানিয়েছিল, ঘরে তার চারটি ছাওয়াল-পাওয়াল নিয়ে ময়ন-তারা গাজীর অপেক্ষায় আছে। আমি থ হয়ে গিয়েছিলাম। তার জবাবে, 'আই মুরশেদের নাম নিয়িই ফিরি, সাধন-ভজন আর হল কমনে বাবু।' ...এর নাম গাজী। তবু সেই চারটি ছাওয়াল-পাওয়ালের বাবা গাজীকে কিছু অর্থ দিয়ে বলেছিলাম 'ছেলেপিলেদের একটু মিষ্টি কিনে দিও।'

জানি না, ময়নতারা পিরিতির সঙ্গে ছাওয়াল-পাওয়ালরাও আসবে কী না। তবে গাজী আর ময়নতারাকে আসতেই হবে। পীর গোরাচাঁদের স্মরণোৎসব বলে না। দুজনের মিলনের স্মৃতির দিনও তো বটে। মিয়াবিবি, কর্তা-গিন্নির বিবাহ বাৎসরিক না হতে পারে। প্রকৃতি প্রাপ্তি দিবস তো বটে। তাই হাড়োয়ার মেলায় একবার আসতে হবে। পীর গোরাচাঁদের থানে গান গাইতে হবে।

পথে শুধু মোটর বাস চলে না। তিন চাকার গাড়ি, যেগুলো মালপত্র টানে, আজ তাদেরও মালখানা থেকে ছুটি। তারাও মানুষ বহন করে চলেছে প্রায় মালের মতই বোঝাই করে। তার শব্দ যেন আর্ত চিৎকার। গরুর গাড়ির তো কথাই নেই। হিন্দু মুসলমান, সব রকমের যাত্রী। গাড়ির ছইয়ের মধ্যে কর্তা গিন্নি ছেলেমেয়ের গাদি। তার মধ্যে আবার নবীন প্রবীণদের ভাগা-ভাগি আছে। সাইকেল আর সাইকেল রিকশার যাত্রীও বিস্তর। পায়ে হাঁটার দলের কোন হিসাব নেই। সব নদী যেমন সমুদ্রে যায়, এই লোকজন যানবাহন, সকলই পীর গোরাচাঁদে যায়।

দু পাশে মাঠে এখন অনেকটাই শূন্যতা। কিন্তু নারকেল সুপারি আম জামের বন

নিবিড়তা। ফাল্গুনের বাতাসে, তারাও যেন মত্ত মাতোয়ারা।

অনেকক্ষণ থেকেই, পাশে এক বুড়ো দরবেশ কী যেন গুন গুন করছে। ঠিক গানের মত না। সুর করে পাঁচালি বলার মত। দেখলেই বোঝা যায়, হাড়োয়ার যাত্রী। মুসলমান ফকির বিশেষ। কিন্তু তার জামা কালো। কালো আলখাল্লা, কালো পায়জামা, মাথায় কালো টুপি। গলায় গুচ্ছের কাঁচ-পাথর পুঁতির মালা আর হার। রুপোর চৌকো তাবিজ। চোখাচোখি হলেই একটু হাসে। গুনগুনানি চলে সমানেই। বাধা দেওয়া উচিত না। বোধ হয় মন্ত্র জপ করে।

তারপর নিজেই এক সময়ে বলে, 'পীরের মেলায় চললেন বাবু?'

বাঙালী। একটু যেন সন্দেহ ছিল মনে। বলি, 'হ্যাঁ!'

দুই চারি কথার পরে সে আমাকে পীর গোরাচাঁদের কাহিনী শোনায়। অনেক তাঁর কিস্যা। তিনি ছিলেন অলৌকিক শক্তির অধিকারী। এসেছিলেন দলের সঙ্গে মক্কা থেকে। বালাণ্ডার রাজা চন্দ্রকেতুকে মুসলমান করতে চেয়েছিলেন। তিনি লোহার দলা পাকাতে পারতেন। বেড়ার গায়ে চাঁপা ফুল ফোটাতে পারতেন। তার জন্যেই নাকি এ জায়গার নাম বেড়াচাঁপা। তাঁর অভিশাপেই, চন্দ্রকেতুর তিন দিনের মধ্যে সর্বনাশ হয়। হাতিয়াগড়ের রাজা আকানন্দ, তার ভাই বাকানন্দর সঙ্গের লড়াই করে-ছিলেন তিনি। অকানন্দ মরেছিল, বাকানন্দ হারিয়েছিল। তাতে এমন আহত হয়ে-ছিলেন, মরবার মত। সে সময় তাঁকে সেবা করে ভার্গবপুরের কানু আর কিনু ঘোষ। সেখানেই মারা যান। তাঁর হাড় যেখানে কবর দেওয়া হয়, তার নাম হাড়োয়া, আর ভার্গবপুর নয়। তাঁর অলৌকিকতার জন্যে হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁকে পুজে। এই হল ইতিবৃত্ত।

ইতিমধ্যে গাড়িও গন্তব্যে এসে পৌঁছায়। মেলার অনেক আগেই গাড়ির পথ রুদ্ধ। মানুষের ভিড়ে সেখানে আর গাড়ির প্রবেশ অচল। থানা পেরিয়ে, সড়ক ধরে খানিকটা যাবার পরেই হঠাৎ একটা সমবেত ধ্বনি শুনতে পাই। তাড়াতাড়ি সবাই সরে দাঁড়ায়। জনা পঞ্চাশের একটা মিছিল প্রায় দৌড়েই চলে যায়। হাতে হাত ধরে জড়াজড়ি করে, পতাকা আর রঙীন ডুলি কাঁধে করে তারা ছুটে যায়। তাদের ধ্বনির মধ্যে শুধু এইটুকু বুঝতে পারি, 'হজরত শাহ সৈয়দ পীর গোরাচাঁদ রাজী!' ...কিংবা, 'আব্বাস আলী রাজী রহমতুল্লাহ।' ...একটা রঙীন কাগজও তারা ছড়িয়ে দিয়ে যায়। ছাপানো কাগজ ভিন্ন ভিন্ন পদ্য। পড়ে মনে হয়, পীর গোরাচাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনই তার উদ্দেশ্য। 'শিরিন সুরের আজান বহিয়া বহিছে বাতাস আজ ফজরে।/ ভক্তি উপহারে সাজিয়ে ডালি চল সে পীরের আরাধনে।/' কিংবা, 'নুরের নবি ঘুমিয়ে আছে/হাড়োয়াতে দেখবি যদি আয়।'

আমি এগিয়ে যাই। বাঁধানো পাকা সড়ক ধরে যেতে যেতে এক সময়ে থামতে হয়। সামনে নদী, বিদ্যাধরী। ঘাটে নৌকার ভিড়। ওপারের খেয়া পারাপার চলেছে। বাঁয়ের রাস্তা চলে গিয়েছে অর্ধ-বৃত্তাকারে বাঁধের ওপর দিয়ে। পাশে পাশে ঘর। সেদিকেও ভিড়, তবে কম। ডান দিকে ঠাস বুনোট হাটের চালা। অনেক দিন পরে আবার কালীনগরের গঞ্জের কথা মনে পড়ে যায়। গাজী কোথায় আছে কে জানে।

হাটের দিকে চেয়ে মনে হয় মেলার কলরবটা সেদিকেই বাজছে। কলের গানের যান্ত্রিক চিৎকার কেবল না। বাজীকরদের হাঁকডাকও যেন অস্পষ্টভাবে শোনা যায়। বিদ্যাধরী নদীর বুকে বেলা একটার রোদ ঝলকায়। পশ্চিম থেকে আসে নদী, দক্ষিণেতে যায়। সামনেই মাঝখানে এক চর। নাম না জানা এক ধরনের গাছে নিবিড় বনের মত দেখায়। গাছগুলোর ডালে ডালে, অজস্র হলুদ ঠোঁট শাদা বকের ভিড়। সম্ভবত এ পাখিরা মানুষের শিকার না তাই মানুষের হাতের কাছে এমন নির্বিবাদে ভিড় করে আছে।

আমি হাটের মধ্যে ঢুকে পড়ি। দু' পাশে নানা দোকান। কালীনগরের থেকেও যেন এখানে দোকানপাট বেশী। হাটের দিন কী না, জানি না। মেলার ভিড়েই ঠাসাঠাসি। জনস্রোতের চাপেই কোন একদিকে চলতে থাকি। কোনদিকে নিয়ে যায় বুঝতে পারি না।

খানিকক্ষণ চলার পরে এক জায়গায় এসে হাটের শেষ হয়। সামনেই দেখি এক মসজিদ। খোলা দরজা দিয়ে সামনে বাঁধানো চত্বর দেখা যায়। সেখানেও ভিড় কিন্তু কম। এক পাশে লেখা রয়েছে পীর গোরাচাঁদের সমাধি। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতেই আমার কানে এসে বাজে একতারার শব্দ, তার সঙ্গে, 'অহে, সাঁই আমার যখন খেলে, কী খেলা!'...

[illegible]

গলা, কে গায়। সেই গাজী গাজীটা নাকি। কিছু না ভেবেচিন্তে আমি সমাধিক্ষেত্রের দরজা দিয়ে ঢুকে বাঁধানো চত্বর পেরিয়ে যাই। চত্বরের শেষে আর এক দরজা। তার বাইরে নানান ভিড়। দেখি এক মস্ত খোলা আঙিনা। গাছের ছায়ায় শীতল। শুকনো পাতার ছড়াছড়ি। তার মধ্যে এখানে সেখানে গুচ্ছে গুচ্ছে বসে সবাই গান গেয়ে গোরা-চাঁদের ভজনা করে। এখানেও সেই ধূলি আলখাল্লা, ডারা ডুগকি খঞ্জনি একতারা।

একটা জায়গায় একটু বেশী ভিড়। সমাধির মূল দরজা সেখানে। সামনের এক মেলার যাত্রীকে জিজ্ঞেস করি, 'ওখানে কী হচ্ছে?'

'ওখানে সবাই পুজো-হাজোত দিচ্ছে। পীরের হাজোত দেয় না? তাই দিচ্ছে।'

হয় তো তা-ই। ব্যাপারটা সেইরকমই দেখাচ্ছে। ডালি ভরে বাতাসা কিংবা আরো অন্যান্য মিষ্টি এনে দিচ্ছে। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা মৌলবীই হবে বোধ হয়, তার হাতে দিচ্ছে। সে ভিতরে নিয়ে একটু বাদে আবার ফিরিয়ে এনে দিচ্ছে। তাই মাথায় করে সব নিয়ে চলেছে। অনেকটা মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রসাদ করে নেওয়ার মত। কিন্তু নিয়ে যেতে পারছে কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধের বিরাট দল ঝাঁপিয়ে পড়ছে, আমাকে দুখান দেন গো, দিয়ে যান বাবা!'...

এ সব পরে হবে, আগে গাজীকে দেখি। আমি গায়কদের দলের দিকে ফিরি। প্রতিটি মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে খুঁজি। সে মুখ দেখতে পাই না। সেই কালো মুখের ভাঁজে ভাঁজে হাসি, পান খাওয়া লাল ছোপ দাঁত, গহীন দরিয়া চোখ, মাথার ঝাকড়া চুলে গেরুয়া ফালির ফেট্টি বাঁধা। কমনে গেলে হে গাজী! তবে, আজ সে একলা তো থাকবে না। সঙ্গে তার নয়ন-তারা পিকিতিও থাকবে।

চারপাশে পাঁচিল ঘেরা গোরাচাঁদের সমাধির আঙিনায় কোথাও তাকে চোখে পড়ে না। দক্ষিণের পাঁচিলের ওপারে আর জায়গা নেই, তারপরে বিদ্যাধরী নদী। সুদীর্ঘ বাঁকের কোলে স্রোতে বাঁকা ঝিলিক দেয়।

পশ্চিমের দেউড়ি দিয়ে বেরিয়ে দেখি অপর্যাপ্ত দোকান। সবই বাতাসা আর মিষ্টির দোকান। পুজো হাজোতের সিধের দোকান সব। হঠাৎ মনে হয় আমিও কিছু মিষ্টি কিনে হাজোত দিই। পীরের পুজো তাতে কতখানি হবে জানি না। গাজী আর নয়নতারাকে ডালি ধরে দিতে পারব। গাজীর নয়নতারার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সেটাই উপহার।

বাতাসা আর কিছু মিষ্টির একটা ডালি [illegible] প্রতি-

কী চাইলেন বলেন মা?' ডালি নিয়ে গিয়ে সবাদের মত সমাধিমন্দিরের দ্বারীর হাতে দিই। একটু বাদে আবার ফিরে পাই। হাতে নিয়ে বুঝতে পারি পূজায় কিছু বাতাসা মিষ্টি লেগেছে। কিন্তু ডালি নিয়ে বেরোয় কার সাধ্য। চারদিক থেকে ছেঁকে ধরে। 'একখান দেন বাবু।...আমারে একটু মিষ্টি দেন। দেন দেন দেন।'...

মনে হয় অজস্র হাত আমার ডালি ঘিরে। আহ্, অভাগী একটা সোমত্ত মেয়ে আমার ডালিটা ধরেই টান দেয়। আমি তাকে ধমক দিতেই সে দাঁত বের করে হাসে। কিন্তু সবাইকে দিতে গেলে গাজীদের জন্য কী থাকবে। আমি তো হরির লুট দিতে আসি নি।

এ সময়েই লাঠি হাতে এক গ্রামীণ মানুষ খেঁকিয়ে ওঠে। লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে সবাই, 'এই, এই হাঘোরেরা, চক্ষির বিষ, যা সর্ বলতিছি। ঠ্যাঙারি শেষ করব।'

তাড়া খেয়ে অনেকেই সরে পড়ে। ধাক্কাধাক্কি করে আছাড় খায়। আমার সাধ্যানুযায়ী সবাইকে যা পারি দিয়ে ভিড় কাটিয়ে আসি। কাঁধের ঝোলার মধ্যে ডালি ঢুকিয়ে দিই। আবার পশ্চিমের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাই। বাতাসা মিষ্টি সিধের দোকান পেরিয়ে নাকে পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ লাগে। দেখি, বড় বড় হাঁড়িতে মাংস রান্না হচ্ছে। অনেকেই খেতে বসেছে। এত বড় বড় মাংস আর রুটি ভাতের ভোজনালয় কোন মেলায় দেখি নি। হুগলির পাণ্ডুয়ার মেলায় কিছুটা দেখেছি বটে, এত নয়। দেখে মনে হয়, অধিকাংশ দোকানই মুসলমানরা খুলেছেন।

তারপরেই মিষ্টির দোকান। যেমন শুনে হয় তেমনিই, খাজাগজা জিলিপি, রাজভোগ, রসগোল্লা, লেডিকেনি। মুড়ি-মুড়কির দোকানও অনেক। তারপরে মনিহারি, তার সীমানাও কম না। এ সীমানা পেরিয়ে গেলেই বাজীকরদের তাঁবু। তাও কি একটা আধটা। মৃত্যুকূপ থেকে শুরু করে অগ্নিকন্যা কী নেই। হাড়োয়ায় এত বড় মেলা আশা করি নি। এত বড় মেলা দেখেছিও খুব কম।

বিদ্যাধরী নদীর বালি মাটির বিশাল বিস্তৃত চড়ায় তাঁবুর পরে তাঁবু। শুধু বাজীকরের ভোজবাজী না। হাতী বাঘের খেলাওয়ালা সার্কাসও এসেছে। সেখানে নাগরদোলনায় দোলাখেলায় মেয়েরাও আছে।

আশেপাশে প্রচুর গরুরগাড়ি। তাতে যে শুধু গ্রামীণ নরনারীরা এসেছে তা না। কাজল মাখা চোখের কোলে কালি, পান রাঙানো ঠোঁট, চোখের ত্যারছা নজর আর সেই সঙ্গে বাঁকা সিঁথেয় একটু ঝ্যানো কেমন কেমন লাগতিছে। হা[illegible] আর [illegible] পুরুষদের হাতে। [illegible]কালী[illegible]

দর্গলদের কথা মনে পড়ে যায়। কে'দর্গলতে পূবের দিকে বিন্দ্ দিকশূল দেবার কথাও মনে পড়ে। এসবও যেন মেলার একটা অংগ।

কোথাও কোথাও পীর গোরাচাঁদের আখ্যায়িকা নিয়ে গানের আসর জমেছে। কোথাও ছোট ছোট ছেলেদের মেয়ে সাজিয়ে পায়ে ঘুঙুর দিয়ে নাচানো হচ্ছে। কোমর ঘুরিয়ে নাচতে নাচতে চোখে দেয় টিপ, ঘুরে ঘুরে গান করে, 'সজনী ভর ভরা কলসী ছপছপায়ে পড়ে গো।'...

তা যেন হল, নিমন্ত্রিত ঘুরে ফেরে, নিমন্ত্রণ কর্তার দেখা নেই কেন। পারাপারের ঘাটের কাছে আসি। সবখানেই কিছু দরবেশ, ফকির, বাবাজী বৈরাগীদের দেখা পাওয়া যায়। কেহ গায় বসে, কেহ ঘুরে ঘুরে। আমার গাজীটি কোথায়।

ঘাটে অনেক নৌকা। সেদিকেই এগিয়ে যাই। একটা নৌকা আমার দরকার। দু' একজন মাঝি জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়। একজন বুড়ো এসে জিজ্ঞেস করে, 'নৌকো চাই নাকি বাবু?'

'চাই?'

'যাবেন কমনে?'

'দক্ষিণে।'

'দিক্ষিণে যাবে? ফাগুন মাস, বাতাস উঠি গ্যাছে যে!'

'তা হলে কি যাওয়া যাবে না?'

'যেতি পারবেন, তয় ভাল মাঝি চাই। দাঁড়ান দিকি।'

বলে সে, হাঁকি দেয়, 'সত্য আছ নাকি, অ সত্য।'

মাঝারি একটা নৌকার ছইয়ের ভিতর থেকে একজন বেরিয়ে আসে। গেরুয়া রঙের লুঙ্গি না কাপড় তার পরনে বুঝতে পারি না। গলায় একখানি গামছা। বয়স বেশী না একটু থাটোর ওপরে শরীরখানি যেন পাথরে খোদা। যেমন শক্ত তেমনি বলিষ্ঠ। মাথায় উসকো খুসকো ঘাড় অবধি চুল। চোখ দুটি কেবল ডাগর না। বয়সের তুলনায় যেন অতিরিক্ত শান্ত, গভীর। এমন মাঝি কি সমুদ্রে যায়। কিন্তু গলার স্বর শুনে অবাক হয়ে যাই। গম্ভীর মোটা স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'কী বল খুড়ো।'

'এই বাবু দক্ষিণে যেতে চায়, নিয়ে যেতি পারবা?'

সত্য মাঝি আমার দিকে চায়। বলে, 'পারব।'

'তবে কথা কয়ি নাও।'

সত্য আবার আমার দিকে চায়। শান্ত গভীর চোখে চেয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করে, 'যাবেন কমনে, জায়গার ঠিকানা আছে?'

বলি 'না।'

'বনে যাবেন?'

'যাব।'

'সাগরে?'

'যাব।'

'চলেন। হিসাব করি যা হয় দিবেন। তবে কিছু চাল-ডাল তরিতরকারি এখান থেকিই কিনে নিতি হবে। দুইজন মাঝি আর আপনি। তিনজনের খাবার। মিঠে জল জালায় ভরে নেব।'

এমনই একটা শান্ত উদাস গাম্ভীর্য সত্য মাঝির, তাকে কোনরকমেই অবিশ্বাসী বা তস্কর ভাবতে পারি না। তার হাতে কিছু টাকা তুলে দিই। দিয়ে জিজ্ঞেস করি, 'যাত্রা কখন?'

মাঝি বলে, 'জোয়ার আরো ঘণ্টা তিন আছে। ভাটায় যাব।'

বলি, 'তা হলে আমি আর একটু ঘুরে আসি।'

'আসেন গিয়া। নৌকো এখানেই থাকবে।'

তবু জিজ্ঞেস করি, 'তোমার পুরো নাম কী।'

'সত্য বাউল।'

বাউল! বাউল কি পদবীও হয় নাকি। জিজ্ঞেস করি, 'বাউল পদবী নাকি?'

'আজ্ঞা। এ দেশে, গুণীনকে বাউল কয়। আমাদের বাউলোর বংশ।'

এ সেই বাউল না, গুণীন বাউল। তথাপি সত্য মাঝিকে যেন কেমন একরকম বাউল বলেই মনে হয়। তার এই গম্ভীর শান্ত নৈর্ব্যক্তিকতা আমার ভাল লাগে। তার গলায় তুলসীর মালা দেখে মনে হয়, সে ধর্মে বৈষ্ণব।

কিন্তু আমার আর দেরি সয় না। আবার মেলার দিকে ফিরে যাই। গাজী কি কোন কারণে এবার আসতে পারে নি। নাকি, আমিই এত লোকের ভিড়ে খুঁজে পাই না। এই বিশাল ভিড়ের মধ্যে একজনকে খুঁজে বের করাও কঠিন।

মেলা পেরিয়ে হাটের ভিড় ভেঙে বড় সড়কের দিকে যাই। সড়কের পূর্বদিকেও ছোটখাটো মেলার আসর আছে। সেখানে একবার খুঁজে দেখি। কিন্তু হাট পেরিয়ে বড় সড়কে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াই। মুখোমুখি, সামনাসামনি যার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, সেটা একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হয়।

আমি কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই উদ্গত চোখের জলে রুদ্ধ স্বরে ঝিনি বলে ওঠে, 'ঘুম ভাঙিয়ে ডাক দিয়ে এলেও তোমাকে আটকে রাখতাম না।'

বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে ওঠবার আগেই অপরাধভঞ্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। বলি, 'সজনা নয়, ভাবলাম শেষরাত্রের ঘুম। তুমি একলা নাকি?'

ঝিনির চোখ ছলছল। কথা বলতে পারছে না। ... যাচ্ছে এই

হাটের যত ধুলো ওর সারা শরীরে, মুখে ঘামে, রুক্ষ চুলে। রেশমী কাপড়ের ... নেই। এই প্রথম ওকে আমি কাপ... রঙহীন সাদা কাপড়ে দেখলাম। জামাটা তা-ই। কাপড়ের পাড়ে পর্যন্ত ... ঔজ্জ্বল্য নেই। হাল্কা বাসন্তী রং... পাড়। হাতের গোল কাপড়ের ব্যাগটাই একটু নাগরিকতা রক্ষা করেছে। হা... গলায় অলঙ্কার না থাক, হাতের ঘড়িটার কি দরকার নেই।

ঝিনি কয়েক মুহূর্ত পরে নদীর দি... ফিরে চোখ মোছে। আমি আবার জিজ্ঞে... করি, 'তুমি কি একলা এসেছ?'

মুখ না ফিরিয়েই বলে, 'সব স... দোকলা পাব কোথায় বল।'

ওর গলা এখনো ভেজা শোনাচ্ছে... জিজ্ঞেস করি, 'কখন এলে?'

'সকালের দিকে।'

আমার দিকে ফিরে বলে, 'খুব বির... হলে তো।'

'না, খুব অবাক হয়েছি তোমা... এখানে দেখে।'

ও আমার চোখের দিকে এক পলক চে... থাকে। তারপরে বলে, 'তুমি আস... বলেছিলে গাজীর নিমন্ত্রণ। তাকে আমার একটু দেখতে ইচ্ছে করল, তাই চ... এসেছি।'

বলতে পারি না, তা বলে এমনিভাবে ঝিনি কি নিজেকে এমনি করে ভুলে যায় তার কি স্থান কাল পাত্র ভুলে এমনি ক... হঠাৎ ছুটে আসা চলে।

ঝিনি জিজ্ঞেস করে, 'কী হল।'

বলি, 'তোমাকে দেখছি।'

ও যেন হঠাৎ একটু লজ্জা পায়। মু... নামিয়ে বলে, 'না এসে থাকতে পারলাম না দেড় মাস তো হয়ে গেল। তারপরে আবা... কবে কে জানে।'

এ বিষয়ে আমার কিছু বলবার নেই। জীবনের সবটাই আকস্মিকতায় ভরা, তা যেমন মানি না; তেমনি জীবনের অনেক কিছুই অজানা বলে জানি। বলি, 'কিন্তু যার নিমন্ত্রণে আসা, তার দেখা এখনো পাই নি।'

ঝিনি বলে, 'তাকে আমিও এখানো পাই নি। ভাবলাম, তোমাকে দেখতে পেলে তাকেও দেখতে পাব।'

আমি বলি, 'তবে চল, তাকেই দেখি।'

বলে, পূব দিকে পা বাড়াতে যেতেই ঝিনি বলে, 'ওদিকে সে নেই, এটুকু বলতে পারি। আমি সব দেখেছি।'

আমার মনে নিরাশার ভার নামে। বলি, 'তবে?'

ঝিনি জিজ্ঞেস করে, 'তাকে খুব ভালবাস, না?'

চেয়ে দেখি ঝিনির চোখে গভী...

জানি না। ভালবাসার ধার সে ধারে কি না কে জানে। তবে সে আমাকে আসতে বলেছিল, সে কথা আমার মনে আছে।'

ঝিনি কী বলতে গিয়েও মুখ নামিয়ে নেয়। তারপরে যেন অন্যমনস্ক সুরে বলে, 'এই বোধ হয় তুমি।'

কেন এ কথা ও বলে, জানি না। তারপরে হঠাৎ যেন ব্যস্ত হয়ে বলে, 'চল, তাকেই খুঁজে বের করি। তাকে না দেখে আমিও যাব না। সে নিশ্চয়ই সমাধির কাছে বা মেলার ওদিকে কোথাও আছে।'

সেই ভাল। আমারও সময় বেশী নেই। মেলার কাল ফুরালেই আমার যাত্রা। যাত্রীর ভিড়ে ঝিনি আমার সামনে চলে। আবার আসি সেই সমাধির আঙিনায়। ঝিনি বলে, 'এখানেও তোমাকে খুঁজে গিয়েছি।'

'আমিও খুঁজেছি।'

আবার সকলের কাছে গিয়ে গিয়ে দেখি। সে মুখ দেখতে পাই না। একজন বুড়ো দরবেশ জিজ্ঞেস করে, 'কারুরে খোঁজেন নাকি বাবু?'

'হ্যাঁ।'

'কারে?'

'মাহমুদ নামে এক গাজীকে।'

বুড়ো যেন স্মরণ করতে চেষ্টা করে, আপন মনে উচ্চারণ করে, 'মামুদ গাজী! কমনেকার লোক কন তো?'

বলি, 'বসিরহাটের।'

তার আগেই সে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, দীঘির পাড়ে ছিল, মামুদগাজী। গলাখানি বড় সোন্দর ছিল। জয় মুরশেদ।'

জিজ্ঞেস করি, 'সে কি আসে নি।'

বুড়ো দাড়ির ভাঁজে উদাস হেসে বলে, 'আসবে কমনে বাবু, নালিশ রুজু, মোক্তার-নামা সব তো তার খতম হয়ি গেছে, সে খালাস নিয়েছে।'

এ কথার অর্থ কী। বুকটা ধড়াস করে ওঠে। জিজ্ঞেস করি, 'তার মানে।'

বুড়ো বলে, 'সে তো আর নাই বাবু। এই মাঘ মাসের মাঝামাঝি সে তো ডানসায় ডুবি মরেছে।'

'ডানসায়?'

'ডানসা গাঙে নৌকো থেকে জলে পড়ি গিছল আর ওঠে নাই।'

মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের সামনে সব যেন অন্ধকার বোধ হয়। ডানসা গাঙে ডুবে গাজী মারা গিয়েছে। কেন, মুরশেদের নামের মজুরিতে বেরিয়েছিল নাকি। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে আমি চুপ করে থাকি। কিন্তু আমার ভিতরে শুনতে পাই, 'পাজী পাজী, সাচ্চা গাজীটা যে এত বড় পাজী, তা কোন দিন বুঝতে পারি নি। নিমন্ত্রণ জানিয়ে সে পালিয়ে যায়।'...আমি যেন তার সেই পাজী মুখটা দেখতে পাই। কালো মুখের ভাঁজে ভাঁজে পাজীর হাসি। গহীন দরিয়া চোখে পাজীর ঝিলিক।

বুড়ো ফকির জিজ্ঞেস করে, 'তাকে কোন দরকার ছিল বাবু?'

ঘাড় নাড়ি। না, এই বিশাল পৃথিবীতে মানুষের সহস্র দরকারের কোন কিছুই ছিল না গাজীর কাছে। বরং এক সুবিশাল অদরকারেই তাকে খুঁজেছি। যে অদরকারের কথা সংসারে কাউকে বলা যায় না। যে অদরকার, সংসারে নিতান্তই অদরকার।

বুড়ো দরবেশ বলে, 'অই যে দ্যাখেন মেয়েছেলেটি বসি রয়েছে, হ্যাঁ অই গাছতলার কাছে ও মামুদের বিবি।'

নয়নতারা! গাজীর পিরিতি! ঝিনির সঙ্গে চকিতে একবার আমার চোখাচোখি হয়। জলে ভেজা চোখেই ওর আলো দেখা দেয়। কাছে যাবার আগে আমি আর একবার দেখি। আশ্চর্য, পুজো দিয়ে ফেরবার সময় এই মেয়েলোকটি আমার কাছে একবার হাত পেতেছিল। এই কি সেই নয়নতারা। যার জন্য ডালি নিয়ে ফিরি। সামান্য একটা ময়লা শাড়ি তার পরনে। মাথার ঘোমটার পাশ দিয়ে তেলহীন রুক্ষ চুলের জটা বেরিয়ে আছে। দৃষ্টি যে তার কোনদিকে বুঝতে পারি না। চুপচাপ বসে আছে। যৌবন তার গত না, কিন্তু জীবন-যাপন শুষে নিয়েছে। শোকে শীর্ণ। পুরোনোদিনের কিছু কিছু চিহ্ন যেন এখনো চোখের টানায়, যাহুর গঠনে রয়ে গিয়েছে।

গাজীহীন নয়নতারা কেন এসেছে পীর গোরাচাঁদের মেলায়। গাজীর জন্যেই নাকি। এই তো সে-ই স্থান, যেখানে তারা পুরুষ প্রকৃতির প্রথম লীলায় নিজেদের দেখা পেয়েছিল।

আমি আর ঝিনি তার কাছে এগিয়ে যাই। সে খানিকটা অবাক কৌতূহলে আমাদের দিকে চোখ তোলে। জিজ্ঞেস করি, 'তোমার নাম কি নয়নতারা?'

সে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করে না। তাকিয়েই থাকে। আমার গলায় যেন কথা আসতে চায় না। জোর করে বলি, 'গাজীর সঙ্গে চেনাশোনা ছিল।'

সে একটু শব্দ করে, 'অ।'

তাড়াতাড়ি ঝোলা থেকে ডালি বের করি। ...র সেই কয়েক প্যাকেট সিগারেট। ছিরগেট, যার বাস বড় মিঠে। বলি, 'এগুলো তার জন্যেই রেখেছিলাম, তুমি রাখ।'

সে হাত পেতে নেয়, বলে, 'অ।'

কিন্তু চোখে তার জল আসে। অথচ সে যে কিছু বুঝতে পারে তা মনে হয় না। কেমন একটা মূঢ় ভাবলেশহীন মুখ। এমন নয়নতারার কথা একবারও ভাবি নি।

আবার জিজ্ঞেস করি, 'ছাওয়াল-পাওয়ালরা কোথায়?'

আবার যেন একটু অবাক হয় নয়নতারা। বলে, 'রেখি এসেছি। এবারে যাব। একবার না এসে পারলাম না, তাই। বাবু।'

নয়নতারা আমাকে ডাকে। গাজীর সেই চোখে ঝিলিক হানা, বৈষ্ণবী গায়িকা প্রকৃতি। ফিরে তাকাই, সে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কে?'

বলি, 'তুমি চিনবে না।'

'অ। কিন্তু ছিরগেটগুলান নিয়ে কী করব বাবু, সে তো নাই।'

বলতে বলতেই তার চোখ বুজে যায়। নিচু স্বরে কোনরকমে বলি, 'তার নামে রেখে দিও।'

বলে, আর দাঁড়াই না। সেখান থেকে চলে যাই। ঝিনির স্পর্শ অনুভব করি; ও আমার গায়ে গায়ে চলে। মেলা খেলা সকল কিছু পেরিয়ে, ঘাটের কাছে যাই। ঘাটে নেমে যাবার আগে জলোয় টান লাগে। ঝিনি জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় যাচ্ছ।'

বলি, 'নৌকায়।'

'কেন।'

'দক্ষিণে যাব।'

ঝিনি যেন চমকে ওঠে। গলায় শব্দ হয়, 'ওহ্।'

আমি ঝিনির দিকে ফিরি। ঝিনি অসহায় করুণ চোখে তাকায়। আবার জিজ্ঞেস করে, 'আবার কবে কোথায় দেখা হবে?'

একটু চুপ করে থেকে বলি, 'বলতে পারছি না যে।'

'কেন।'

'জানি না যে।'

ঝিনির ঠোঁটের ফাঁকে অস্পষ্ট শব্দ বাজে, 'বিষ।'

সত্য মাঝি গম্ভীর গলায় ডাক দেয়, 'বাবু আসেন, ভাটা পড়েছে।'

ঝিনির দিকে তাকাই। ঝিনি আমার বুকের দিকে চোখ রেখে বলে, 'যদি না জান, তবে কেমন করে বলবে। কবে আর কোথায় দেখা হবে। তবু দেখ—।'

ওর গলা বন্ধ হয়ে আসে। বলি, 'বল ঝিনি।'

ও ভাঙা ভাঙা নিচু গলায় বলে, 'বলি, বলি, বলবই তো। তবু দেখ নিতান্ত মেয়ে তো আমি। তাই একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে।'

'বল।'

'মনে থাকবে, আমাকে?'

'থাকবে।'

যেন সাপের ছোবলে ঝিনি আর্তনাদ করে ওঠে, 'উঃ, কী ভীষণ বিষ। মনে হয় অমৃতের মত গলায় ঢেলে দিই, দিয়ে জুড়িয়ে যাই। তবে, একটা কথা—।'

আবার ও থামে। বলি, 'বল।'

'মনে থাকুক না থাকুক, আমি বলি, একটু মনে রেখ।'

আমার ...

ধরে আবার ছেড়ে দেয়। আমি নেমে যাই ঘাটের দিকে। যাবার আগে আবার বলি, 'যাই।'

ও বলে, 'আমি আর একবার নয়নতারার কাছে যাই।'

ওর এই শেষ কথাটা যেন, সহসা কেমন এক তীব্র ভয়ংকর সুরে বেজে ওঠে। যেন মনে হয়, নয়নতারা আর ঝিনি, একাকার হয়ে গিয়েছে। তারা যেন দুজনে এক।

ও পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সত্য বাউল নোঙর তুলে নৌকা ঠেলে দেয় জলে। তারপরে হাত দিয়ে, বিদ্যাধরীর জলের গণ্ডূষ নিয়ে আমার মুখে মাথায় ছিটিয়ে দেয়। নিজের মনেই গম্ভীর স্বরে বলে, 'জয় গুরু, যাত্রা করি।'

বিদ্যাধরীর জল আমার মাথা থেকে মুখে এসে পড়ে। ঠোঁট চুইয়ে জিভে স্বাদ পাই জল লবণাক্ত। কিন্তু আমার চোখ ঝাপসা। ঝিনিকে আর দেখতে পাই না। হাড়োয়ার ভূমি পীর গোরাচাঁদের মেলা কিছুই চোখে পড়ে না। কেবল মনে হয় গাজীর গুনগুনোনি শুনি যেন,

'ক্ষ্যাপা, তুই না জেনে তোর আপন খবর
যাবি কোথায়?...

সত্য মাঝির নৌকা চলে বিদ্যাধরীর স্রোত বেয়ে।

সমাপ্ত

আলোয় কালোয়

ত্রিশঙ্কু

সন্ধ্যাবেলা সেদিন একখণ্ড চওড়া সাদা কাগজের ওপর ঝুঁকে নিজের মুখ দেখছিলাম। শুদ্ধ কুমারী মেয়ের মতো কাগজটা আমার সামনে চিৎ হয়ে পড়ে আছে, কথা বলছে না, সম্মত; কিন্তু আমি তার শরীরে একটাও আঁচড় কাটতে পারিনি। এক-এক সময় এমনি হয়। মাথার মধ্যে কোনো ভাবনা লাফালাফি করছে না, বিচ্ছিন্ন চিন্তা একরাশ ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাকাচ্ছে, ভাসছে মেঘের মতো। এমনি অবস্থায় পড়লে না যায় কিছু লেখা, না যায় টেবিল ছেড়ে ওঠা। গোলাম প্রাণীর মতো অস্পৃষ্ট মেয়েটির সামনে করজোড়ে বসে থাকা।

দরোজায় ঠুকঠুক করে শব্দ হলো। খুলতেই অমিতাভ ঘরে ঢুকলো। বেশ-বাস ঠিকঠাক থাকা সত্ত্বেও ওকে একটু বিপর্যস্ত মনে হলো আমার। বললাম, কী ব্যাপার? এইভাবে হঠাৎ? অন্য কেউ আছে সঙ্গে?

—কাজ করছিলে? বিরক্ত করলাম নাকি? অমিতাভ সঙ্কোচে প্রশ্ন করলো। উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললো—একটি মেয়ে আমার সঙ্গে আছে, আসতে বলি?

অমিতাভর সঙ্গে একটি মেয়ে! আশ্চর্য লাগলো। হঠাৎ ব্রহ্মার অগ্নিমান্দ্য! যাই হোক, বেরিয়ে এসে মেয়েটিকে ডেকে আনলাম ভেতরে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের সুশ্রী মেয়েটি। সপ্রতিভ, কিন্তু অপরিচিত একজনের মুখোমুখি হয়ে একটু দ্বিধাগ্রস্ত। বসতে বললাম। মেয়েটি এক গ্লাস জল চাইল।

—সন্ধ্যে থেকে ঘুরেছি রাস্তায় রাস্তায়, গলিতে গলিতে। হেঁটে হেঁটে বিষম ক্লান্ত আমরা। ভাবলাম, তোমার বাসায় এসে একটু বিশ্রাম করি। নিভৃত নিরুপদ্রব জায়গা কলকাতা শহরে একটাও নেই। তার ওপর টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। পরিচয় করিয়ে দিই, আমার বান্ধবী শোভনা।

দু হাত তুলে নমস্কার করলো শোভনা। —আপনার কথা এর কাছে অনেক শুনেছি।

ওরা এসে পড়ায় আমি যেন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলাম। তবু গল্পবলা ঠিক জমলো না। প্রথমত, মেয়েদের সঙ্গে আমি ঠিক সহজভাবে কথা বলতে পারি না। কেবল ভয় হয়, এই বুঝি বোকার মতন কিছু বলে বসলাম। দ্বিতীয়ত, অমিতাভর সঙ্গে একজন বান্ধবী, ওরা দুজনে নিভৃতি খুঁজছে—এক কথায় অমিতাভ প্রেম করছে, আমার ধারণার অতীত। খানিকক্ষণ পরে মেয়েটি কব্জি উল্টে হাতঘড়ি দেখলো। নটা বাজে। আমায় যেতে হবে। উঠে দাঁড়ালো। অমিতাভ উঠলো। দরোজা অবধি এগিয়ে গিয়ে বাইরের দিকে হাত বাড়িয়ে পরীক্ষা করলো বৃষ্টি থেমেছে কিনা। তারপর বললো, তুমি একা ফিরতে পারবে, না পৌঁছে দিয়ে আসবো শোভনা?

—না, না, আমি ঠিক চলে যেতে পারবো। একটু এগিয়ে গেলেই তো বাসস্টপ।

—তাহলে আমি আরো খানিকক্ষণ বসি এখানে। অমিতাভ আবার ফিরে এলো ঘরে। ওকে প্রশ্ন করার আগে ও-ই জিজ্ঞেস করলো আমায়—খুব আশ্চর্য হলে, না?

—আশ্চর্য হবার কী আছে, আমি জানালাম। দুনিয়ায় সবই সম্ভব। তবে কৌতূহল হচ্ছে ব্যাপারটা জানতে।

অমিতাভ আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু না। তবে, তিন-চার বছরের পরিচয়। মাঝে-মাঝে দেখাসাক্ষাৎ হয়। ওর সম্পর্কে কিছু কিছু শুনেছি অন্যান্য বন্ধুদের কাছে। বেসরকারি আপিসে চাকরি করে। একা থাকে একটা ফ্ল্যাটে। আয়ের চেয়ে ব্যয় অনেক কম। বই পড়ার অভ্যাস আছে—ডিটেকটিভ নয়, সাহিত্য। নানান বিষয়ে আলোচনায় প্রচণ্ড উৎসাহ। এবং কৃপণ নয়। সেই কারণে, লেখার বাতিক না থাকলেও অমিতাভ আমাদের বন্ধু। আরো শুনেছি, ওর পারিবারিক জীবনে কিছু অশান্তি ছিল। খুব ছোট বয়সে অভিভাবকদের প্রশ্রয়ে বিয়ে করেছিল, কিন্তু পাঁচ

আপনার কাছে অনেক শুনেছি

বছরের বেশি সে বিয়ে টেঁকেনি। একটি বাচ্চাসমেত ওর স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে যায় ওকে ছেড়ে, আইনসংগত বিচ্ছেদ হয়েছে তার পরে। এবং তারপর থেকে ওর স্ত্রীচরিত্রবর্জিত জীবন, কিঞ্চিৎ উচ্ছৃংখল।

অমিতাভ বললো, শোভনার সংগে আমার পরিচয় হয়েছে মাসখানেক আগে। দুঃসাহসী মেয়ে, কিছুতেই বাধবার না। ভয় দেখিয়েছি দু-একবার, আমার অতীত-বর্তমান প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি—তবু নিজে ও ঘনিষ্ঠতা করতে চায়, আমাকে জানতে চায়। অথচ মুশকিল কী জানো, আমি ঠিক তেমন গভীরভাবে ওকে ভালো-বাসি না, আমার পক্ষে ভালোবাসা সম্ভব নয়। আবার ওকে নষ্ট করতে মন চাইছে না। দুঃসাহসের মূলে তো ওর সততা—আমি ভাঙতে চাই না। ও এলেই [illegible] ফ্ল্যাটে তালা-চাবি দিয়ে বেরিয়ে যাই, আমরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি।

ওকে উত্তেজিত করার জন্যে বললাম, তা হলে খামোখা পণ্ডশ্রম করছো কেন? ছাব্বিশ বছর বয়সে রোমান্স কি জন্যে?

ঠাট্টাটা গ্রাহ্য করলো না অমিতাভ। বললো, সমস্যা ভালোবাসা বা তার অভাব

নিয়ে নয়। সমস্যা আমার একাকিত্ব নিয়ে। জানো ত্রিশঙ্কু, আড্ডা, নেশা, বই, খেলা-ধুলো কিছুই তোমাকে ভরাট করে রাখতে পারে না। এক-এক সময় ইচ্ছে করে, সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যাই। কিন্তু ভেতর থেকে তেমন তাড়া পাই না, অলসতা লাগে—নিজেকে ফেলে রেখে তো কোথাও যাওয়া যাবে না। না, না, আমার ব্যর্থ দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে কোনো গ্লানি নেই, মুক্তি পেয়ে আমি বেঁচে গেছি।

এবার আমি ওকে একটু আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম। শোভনাকে যতটুকু দেখেছি, তাতে ওকে আমার ভালোই লেগেছে। তোমার প্রতি ওর আকর্ষণ আছে অমিতাভ, ওকে যেতে দিও না।

অমিতাভকে কথায় পেয়েছে। ও বললো, আমি জানি। শোভনা আমার ওপর নির্ভর করতে চাইছে, যে কোনো স্বাভাবিক মেয়ে তার স্বামীর কাছ থেকে, তার প্রেমিকের কাছ থেকে যে-রকম নিরাপত্তা ও মনোযোগ প্রত্যাশা করে। ওর তো কোনো অভিজ্ঞতা নেই। ও তো জানে না, আমি কেবল সংসারের সঙ্গী খুঁজছি, এই অর্থহীন জীবনটাকে একটু বাঁচার যোগ্য করে রাখা। ওর নিষ্পাপ মুখখানা দু'হাতের মধ্যে ধরেও আমি কিছুতে বলতে পারি না—তোমাকে ভালোবাসি শোভনা, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। কারণ সেটা মিথ্যে কথা বলা হবে। যদি বিয়ে না করে আমরা একত্র থাকতে পারতাম, যতদিন ভালো লাগে ততদিন,—একঘেয়ে লাগলেই ছাড়াছাড়ির স্বাধীনতা থাকতো যদি, তা হলে আমার সমস্যার মোটামুটি সমাধান মিলতো। অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে অমিতাভ থামলো। তোমাকে বোর করছি ত্রিশঙ্কু, আমি উঠি।

যেতে-যেতে আপন মনে বললো, মেয়েটাকে নিয়ে কী যে করি! বেশ ছিলাম, এক উড়ো ঝামেলা জুটলো ঘাড়ের ওপর! অকারণ মনের শান্তি নষ্ট।

আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম, তোমার মতো লোকের পক্ষে এই বোধ হয় শেষ সুযোগ—হেলায় হারিয়ো না। যা করবে, ভেবে-চিন্তে কোরো অমিতাভ।

এর পনেরো কুড়ি দিন পরের কথা। সকালবেলা ন'টা নাগাদ হন্তদন্ত হয়ে অফিসে বেরুচ্ছি, এমন সময় দরজার মুখে শোভনা। একা। বিধ্বস্ত। অপরিপাটি চুল ও পোশাক। জিজ্ঞেস করলো, আপনি বেরিয়ে যাচ্ছেন? কিন্তু আমার যে আপনার সঙ্গে বিশেষ জরুরী কথা ছিল। এখুনি। আমায় পাঁচ মিনিট সময় দিন।

বিরক্ত হলাম প্রচণ্ড। ভব্যতা বজায় রেখে ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করলাম, কী জরুরী কথা, বলুন।

প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত, তারপর একটু কান্না-

কাল কোন ঝগড়াঝাটি হয়েছে

ভেজা গলায় প্রায় স্পষ্ট করে আস্তে আস্তে শোভনা বললো—অমিত......অমিত আমায় বলেছে......যেন ওর সঙ্গে আর দেখাসাক্ষাৎ না করি......এখন কী হবে......সারারাত ভেবেও কিছু ঠিক করতে পারলাম না......ভাবলাম, আপনার বন্ধু ও......আমি কী করবো আপনি বলুন।

জিজ্ঞেস করলাম, কাল কোনো ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছে, কথা কাটাকাটি?

—না, কিছু না। সন্ধেবেলা ওর বাসায় গিয়েছিলাম দেখা করতে। ও বসে বই পড়ছিলো। আমি যেতেই বললো, তুমি এখানে এসো না। তোমার পাড়ার লোকেরা জানে? কেন আসো রোজ? আমাকে একটু একা থাকতে দাও না।......হঠাৎ বিনা কারণে ওর রূঢ় ব্যবহারে আমি প্রথমে অবাক হয়ে গেছি, তারপর কেঁদে ফেলেছি—জিজ্ঞেস করলাম, কী দোষ করেছি আমি বলো? অমিত শুধু বললো, আমার ভালো লাগে না। তুমি আর এসো না।

আমি এবার জানতে চাইলাম — আপনি অমিতকে বিয়ে করতে চান?

—ওকে ছাড়া আমি বাঁচবো না।

—ওর সম্বন্ধে আপনি সব জানেন? ওর আগে একবার বিয়ে হয়েছিল, এখন ডিভোর্স হয়েছে? ওর বাচ্চা আছে একটা?

—হ্যাঁ।

—আপনি যতটা ভালোবাসেন, ও ততটা বাসে না?

—হ্যাঁ।

—ও মদ খায়, উচ্ছৃংখল প্রকৃতির।

—হ্যাঁ।

—স্বামী হিসেবে অমিতাভ যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য না-ও হতে পারে, জানেন?

—আমি ওর বোঝা হয়ে থাকবো না।

—মেয়েলী যুক্তি বাদ দিন। আপনি ঝুঁকি নিতে রাজি আছেন?

—আছি। শোভনা দৃঢ়স্বরে জানালো—আমি জানি, সব ঠিক হয়ে যাবে। অমিত বড়ো অসহায়, ত্রিশঙ্কুবাবু, আমি বুঝতে পেরেছি। ওর কোনো দোষ নেই। আমাকে একটা চান্স দিন, সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। অমিতকে আমার ওপর ছেড়ে দিন—ধরে না রাখলে ও ভেসে যাবে। আপনি ওর বন্ধু, ওর এই উপকার করুন, আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবো।

মেয়েকে নিয়ে বিষম মুশকিলে পড়া গেল। বললাম, ঠিক আছে, পরশু দিন রবিবার সকালে আমার সঙ্গে দেখা করুন। দেখি কী করা যায়। মনে মনে অমিতাভকে গালাগাল দিলাম, হারামজাদা, তুই ভাগ্যবান, তুই উদ্ধার হয়ে গেলি এবারের মতো। সকলের জীবনে শোভনারা এমন করে আসে না, তাই তারা ছারখার হয়ে যায়!

গানের আসর

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন

সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় যে প্রশ্নগুলি তুলেছেন সেগুলি যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীনীলরতন সেনের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। বাস্তবিকই পুঁথির সঙ্গে সম্পাদিত গ্রন্থের অসঙ্গতি থাকা উচিত ছিল না যখন দাঁড়ি চিহ্নের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে। এ ছাড়া তথাকথিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সাঙ্গীতিক উল্লেখ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত আলোকপাত করবার মত আলোচনা উচ্চতর পণ্ডিত মহলে হয়েছে বলে জানিনে। যাও বা হয়েছে তা নেহাৎ সাধারণ জ্ঞান দিয়ে বিচার, সঙ্গীতশাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে এই উল্লেখগুলির তাৎপর্য নির্ণয় করা হয়নি। নীলরতনবাবুর কাছে উক্ত গ্রন্থের সপ্তম সংস্করণ রয়েছে। তার মুখবন্ধে কিছু সাঙ্গীতিক আলোচনা আছে কিনা জানি না, তবে আমার কাছে যে চতুর্থ সংস্করণ রয়েছে তাতে এ বিষয়ে কোনও আলোচনাই নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদগুলির উপর রাগ এবং তাল ছাড়া আরও দু একটি উল্লেখ আছে যাতে বোঝা যায় এগুলি মধ্যযুগের প্রবন্ধ সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত ছিল। এই সব নানা কারণে বিষয়টি দীর্ঘকাল ধরে লেখকেরও অনুসন্ধানের বস্তু হয়ে আছে। শ্রী মুখোপাধ্যায় যখন বিষয়টি তুলেছেন তখন একটি ব্যাপক আলোচনার সুযোগ পাওয়া গেল। কেননা এই প্রসঙ্গে আরও কিছু সুচিন্তিত অভিমত পাওয়া যাবে আশা করি।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের মধ্যযুগীয় সাহিত্যের আলোচনায় সঙ্গীতাংশ নিতান্ত অবহেলিত বললে অত্যুক্তি হয় না। কেন যে এটা ঘটেছে তা বলা মুশকিল। বোধ করি এ রকম একটা ধারণা ছিল যে সঙ্গীতের উল্লেখগুলি থেকে বিশেষ কিছু তাৎপর্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কেউ কেউ আবার সঙ্গীতকে সাহিত্যালোচনায় অপাংক্তেয় মনে করতেন। এদিকে তাঁদের সামান্যতম আগ্রহও ছিল না। জয়দেবের গীতগোবিন্দের কথাই ধরুন। সব টীকার আলোচনা হয়েছে কিন্তু মহারাজ কুম্ভকর্ণের রসিকপ্রিয়া টীকার আলোচনা হয়নি। এই টীকাটি বিশ্লেষণ করলে জানা যায় মহারাজ কুম্ভকর্ণ গীতগোবিন্দকে নিয়ে কেমন একটি বিচিত্র গীতালেখ্য প্রস্তুত করেছিলেন। এর সঙ্গে জয়দেব অনুষ্ঠিত গীতগোবিন্দের সম্পর্ক নেই কিন্তু বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদ্ মহারাজ কুম্ভকর্ণ নিজে এর যে রূপ দিয়েছিলেন তার পরিচয় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কুম্ভ নিজে সঙ্গীত সম্বন্ধে একজন অথরিটি ছিলেন। তাঁর সময় সঙ্গীত যে কি রকম ছিল এই পুঁথিটি থেকে তারও পরিচয় মেলে। তিনি একই ধ্রুবপদে প্রতিবারই নতুন রাগ এবং বিভিন্ন তাল প্রয়োগ করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপে "রাধাবদন বিলোকন" গানটি ধরা যাক। এই গানে প্রথম শ্লোকটির পরে যে শ্লোকটি আছে সেটিই ধ্রুবপদ, জয়দেবের নির্দেশ অনুযায়ী এটি রবাড়ী রাগে, রূপক তালে গেয়। কিন্তু কুম্ভকর্ণ এই গানের প্রতিটি শ্লোকে রাগ পাল্টেছেন এবং ধ্রুবপদটি যদিও সমান তথাপি প্রতিবারই তারও রাগ এবং তাল পাল্টানো হয়েছে। সমগ্র গানে আটটি পদ আছে। এই আটটি পদে আটটি বিভিন্ন রাগ। গোড়ায় ধ্রুবপদটি একবার গাওয়া হয়েছে এবং পরে আরও আটবার এই ধ্রুবপদটি এসেছে, কিন্তু কোনবারই এক সুর বা তালের পুনরাবৃত্তি হয়নি। বলা বাহুল্য অভিনয়টি সঙ্গীতের দিক দিয়ে একটি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছিল। চর্যাপদ নিয়ে যখন আলোচনা আরম্ভ হয় তখনও এর সাঙ্গীতিক প্রয়োগ কিভাবে হত সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান হয়নি। তখন এ কথা কারুর মনে হয়নি যে সঙ্গীতশাস্ত্র এ সম্বন্ধে কি বলে, কেননা বস্তুটি আসলে সঙ্গীত। শাস্ত্রীমশাই ইচ্ছে করলেই সঙ্গীতশাস্ত্রে এর উল্লেখ এবং বর্ণনা পেতে পারতেন কিন্তু সে দিকে তাঁর আগ্রহ ছিল না এইটাই অনুমান করতে হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাজ্ঞ সম্পাদক বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন রায়ের সঙ্গে ১৯৪০ সাল থেকে

১৯৪২ সালের মধ্যে আমার প্রতিনিয়তই দেখা হয়েছে কেননা আমরা ব্যারাকপুরে এক পরিধিতেই বাস করতাম এবং তাঁর পুত্র আমার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁকে আমি সংগীত সম্বন্ধে কিছুমাত্র উৎসাহী দেখিনি। তিনি খুবই আলাপী লোক ছিলেন এবং পাণ্ডিত্যের অহংকার তাঁর কিছুমাত্র ছিল না। আমার মত তরুণের সঙ্গেও তিনি বহু বিষয়ে বহুক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনা করতেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা, রচনার সময়কাল, দীন-বড়ু-দ্বিজ এই তিন চণ্ডীদাসের সমস্যা এ সব নিয়েই তাঁকে খুব উৎসাহিত দেখেছি কিন্তু সংগীতের আলোচনায় আনতে পারিনি। তাঁর বিশ্বাস ছিল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঝুমুরে জাতীয় গান। এর থেকে বেশী তাঁর কাছ থেকে আর কিছু জানতে পারিনি। এই সময় তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তৃতীয় সংস্করণ তৈরি করছিলেন বলে আমাকে জানিয়েছিলেন। অবশ্য তখন আমি তাঁকে জোর করে কিছু বলবারও সাহস পাইনি কারণ আমার বয়স তখন অল্প এবং তাঁর গতিগম্ভীর পুত্র পছন্দ করতেন না যে আমি তাঁর সঙ্গে সাহিত্যালোচনায় প্রবৃত্ত হই।

যাই হোক। মুখ্য প্রসংগেই আসা যাক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গানগুলি সেকালকার প্রবন্ধ সংগীতের লক্ষণ বিশিষ্ট সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। তবে এগুলি খুব উঁচু দরের প্রবন্ধ কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ বর্তমান। অনেক সময় রাগসংগীতের উত্তম বিকাশ হওয়া এইসব গানে সম্ভব ছিল না। প্রায়ই দেখা যায় অনেক বড় বড় রাগের উল্লেখ এইগুলিতে আছে বটে কিন্তু পদের সংখ্যা অনেক। এক্ষেত্রে এই অনুমানই সংগত যে রাগের একটা কাঠামো নিয়ে একঘেয়ে ভাবেই এই পদগুলি গেয়ে যাওয়া হত। প্রবন্ধ সংগীতের চারটি কলি থাকত—উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব এবং আভোগ। এর মধ্যে উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব এই দুটি কলিকে বাদ দেবার উপায় ছিল না কেননা প্রত্যেক গানের প্রারম্ভ এবং একটা নিত্য অংশ থাকবেই। ধ্রুব হচ্ছে এই নিত্য অংশ। ধ্রুব এবং আভোগের (অন্তিম অবয়ব) মধ্যে আর একটি কলি ছিল—সেটি হচ্ছে অন্তরা। পরবর্তী কালে ধ্রুব অংশটি অন্তরার সংগে এক হয়ে যায়। বর্তমানে অনেক গান দেখা যায় যা কেবলমাত্র স্থায়ী আর অন্তরাতেই সীমাবদ্ধ। এইরকম সেকালেও অনেক গান দেখা যেত যাতে কেবলমাত্র উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব এই দুটি অবয়ব থাকত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই জাতীয় গান রয়েছে। চর্যাপদও ছিল এই জাতীয় গান।

এখন কথা হচ্ছে ধ্রুব অংশটি যে সব সময়েই প্রতিপদের শেষে পুনরাবৃত্ত হবে এমন নয়। এই ধ্রুব অংগটি সম্বন্ধে একটু বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে। অনেক সময় কোনও কোনও ছত্র বা পদ পরবর্তী প্রতি পদের শেষে পুনরাবৃত্ত হত। এই ধ্রুবটি আসত উদ্‌গ্রাহের পরেই। একে ধ্রুবা বা ধুয়োও বলা হয়। গীতগোবিন্দের "প্রলয়পয়োধিজলে কৃতবানসি বেদং" গানটিতে প্রযুক্ত "জয় জগদীশ হরে" ছত্রটি, হচ্ছে এইরকমের ধ্রুবা। কিন্তু ঠিক রাগ-সংগীতের নিয়মে যদি গীতের আকৃতি নিরূপণ করা যায়, অর্থাৎ, উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব এবং আভোগ—এই চারটি কলিকে যোজনা করা যায় তাহলে ধ্রুবপদটি বার বার ঘুরে আসবে না। প্রচলিত ধ্রুবার সংগে ধ্রুব নামক বিশেষ অবয়বটির পার্থক্য এইখানেই। মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যে সাধারণত যেসব দীর্ঘ গান দেখা যায় যাতে "ধ্রু" উল্লেখটি একবারই পাওয়া যায় এবং সেটি যদি বারম্বার আবৃত্তি করবার উপযুক্ত না হয় তাহলে পরবর্তী পদগুলিকে আভোগ বলেই ধরতে হবে। এইটিই সংগীতশাস্ত্রের বিধান।

চর্যাগান সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সন্দেহ নেই কারণ তার গায়নবিধি সংগীতশাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। এই গানের সবগুলি পদ যখন আবৃত্তি করে গাওয়া হত তখন তাকে বলা হত সমধ্রুবা। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে সবকটি পদই ধ্রুবের সংগে সমপর্যায়ভুক্ত। কিন্তু যখন কেবলমাত্র ধ্রুব অংগটির সমস্বরে আবৃত্তি হত তখন তাকে বলা হত বিষমধ্রুবা কারণ সে ক্ষেত্রে উদগ্রাহ অংশের একটা আলাদা অস্তিত্ব থাকত। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের ক্ষেত্রে এই রীতি আরোপ করা যায় কিন্তু আমাদের অনুমান যে সত্য হবে এমন কথা দৃঢ়তার সংগে বলা যায় না। অনেক গান সমধ্রুবা জাতীয় চর্যার মত সমস্বরে না আচরিত হয়ে একক কণ্ঠেও গাওয়া যেত পারত। বিশেষ করে উত্তর প্রত্যুত্তর যুক্ত গীতগুলি একক কণ্ঠে গাওয়াটাই বোধ হয় অধিকতর চিত্তাকর্ষক ছিল। এটাও বিচার্য যে চর্যার মত "অধ্যাত্মগোচর" সঙ্গীতে যে বিধি প্রযোজ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত শৃঙ্গার বা আদিরসাত্মক গানে সে বিধি প্রযোজ্য হবে কিনা।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কোন জাতীয় প্রবন্ধ সংগীত ছিল সেটাও আলোচনা করা দরকার। প্রধান প্রধান প্রবন্ধ সংগীত ছাড়া দেশের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নানারকম গান ছিল সেগুলিকে সংগীতশাস্ত্রে বলা হয়েছে "প্রকীর্ণক"। চর্যাকে এই প্রকীর্ণকের মধ্যেই ফেলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থেও কোনও কোনও গানের উপর "প্রকীর্ণক" শব্দটির উল্লেখ আছে। শ্রী মুখোপাধ্যায় যে কটি গান বিশেষভাবে উদ্ধৃত করেছেন তার অধিকাংশই "লগনী" জাতীয় গান, লগ্নী বা লগনী উত্তর ভারতের একটি বিশিষ্ট লোকগীতি। মিথিলা অঞ্চলে এর বিশেষ প্রসার ছিল। বলা বাহুল্য, সে যুগে এটিও একটি প্রকীর্ণ সংগীত ছিল। গ্রন্থে গান বিশেষে "লগনী প্রকীর্ণক" বা প্রকীর্ণক লগনী" এ রকম উল্লেখও আছে। এই জাতীয় গানে পদের সংখ্যা অনেকগুলি থাকে আবার অনেক সময় চার পাঁচটি পদেই গান সম্পূর্ণ হয়। এই রকম আর একটি প্রকীর্ণ প্রবন্ধ ছিল "দণ্ডক"। এটির ব্যবহারও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যথেষ্ট দেখা যায়।

শ্রীমুখোপাধ্যায় একটি গানে একাধিক ধ্রুবপদ কেন যোজিত হয়েছে সেই প্রশ্ন তুলেছেন। আমার মনে হয় গানগুলিতে প্রবন্ধ সঙ্গীতের বৈশিষ্ট রক্ষা করা হয়েছে। অর্থাৎ উদ্ধৃত গানগুলিতে উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব এই দুটি কলি পর পর চলে এসেছে। এক্ষেত্রে ধ্রুবের আগেকার চারটি ছত্রই হচ্ছে উদ্‌গ্রাহ অংশ। ব্যাপারটা সম্ভবত ছিল এই রকমঃ—

উদ্‌গ্রাহ

রাধাক মারিআঁ পুণী জিআইল কাহ্নে।
কৌতুক মনে কাহ্ন লুকায়িলা বনে॥
বড়ায়ি লইআঁ তাক চাহে বৃন্দাবনে।
রাধা হেন বুলিআঁ বচনে॥১॥

ধ্রুব

এথাঁ ছিলা কাহ্ন কথাঁ গেলা এখনে॥
সরূপে কহিআঁ বড়ায়ি রাখ পরাণে॥

উদ্‌গ্রাহ

থানে থানে বন বিচারিআঁ বড়ায়ি।
কুঞ্জের মাঝে দেখিল কাহ্নাঞি॥
কাহ্নের থানত রাধা চন্দ্রবল রাণী।
বড়ায়িক বুইল হেনন মধুরস বাণী॥

ধ্রুব

কাহ্নাঞি কিছু তোর দয়া নাহি মনে॥
নাগরী রাধাক এবে তেজসি কেহ্নে॥

পরবর্তী পদগুলি এই ভাবে চলেছে।

এই ধ্রুব অংশগুলি বিষমধ্রুবার মত সমবেত কণ্ঠে গাওয়া অসম্ভব ছিল না। সেকালের গীতি সাহিত্যে কেবলমাত্র ধ্রুব ব্যতীত অন্য কলির নির্দেশ দেওয়া হত না। এই কারণেই উদ্‌গ্রাহ বা আভোগের উল্লেখ পুঁথিতে নেই। আসলে প্রতিবারই ধ্রুব অংশে এসে গীত সম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যেহেতু রাগের বৈষম্য ঘটেনি এবং ভণিতাটি শেষের দিকে যুক্ত হয়েছে সেই কারণে সব পদ মিলিয়ে একটি গানকেই সমগ্রভাবে ধরা হয়েছে। এই গানের ক্ষেত্রে যে বিশেষ করে পৃথকভাবে ন'টি ধ্রুবের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে এইটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে প্রথম ধ্রুব, যেটি প্রথম পদের পরেই এসেছে, সেটি আর পুনরাবৃত্ত হবে না এবং এতে আভোগ রচনারও সুযোগ নেই।

—শার্ঙ্গদেব

আলোচনা

উন্নতির শর্ত

দেশের আলোচনা আসরে শ্রীদীপ্তেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবন্ধটি পড়ে যতোটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে এইটুকুই প্রমাণ হচ্ছে যে দীপ্তেনবাবু অধ্যাপক শ্রীঅম্লান দত্তের মতোই ভারতে শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নতি চান। তাঁদের মতপার্থক্য শুধু অর্থনৈতিক উন্নতির পন্থা ও আদর্শ নিয়ে। অধ্যাপক শ্রীদত্ত তাঁর "উন্নতির শর্ত" নিবন্ধে শ্রমবিমুখতা দূর হবার কারণ হিসাবে ইউরোপে ধর্মীয় পিউরিটান এথিকসদের অথবা জাপানে জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গ তুলেছেন; কিন্তু দীপ্তেনবাবুর মনে প্রশ্ন বোধ হয় এই যে, এইসব বিচ্ছিন্ন কতকগুলি উদাহরণের সাহায্যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির কারণ পরিপূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করা যায় না: তাই তিনি একটি বিশেষ সমাজ ব্যবস্থার উন্নতি প্রসঙ্গে মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রাম প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু মূলত, প্রশ্ন এই যে, ইতিহাসের সকল জাতির উন্নতির বা সামাজিক বিবর্তনের উদাহরণগুলি কি শ্রেণী সংগ্রামের ছকে ফেলা যায়? ইংলণ্ডে যখন রাজা এবং বুদ্ধিজীবীরা একত্রে রোমান ক্যাথলিক গির্জার একমাত্র কর্ণধার পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে জাতীয়তাবাদের সূচনা করেছিল তখন কি রাজা ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে সুনির্দিষ্ট শ্রেণী বিভাগের মাধ্যমে বিচার করে শ্রেণী চরিত্র নির্ণয় সম্ভব ছিলো? জার্মান জাতীয়তাবাদেরও সূচনা হয় এই প্রটেস্ট্যান্টিজমের মাধ্যমে যে আন্দোলনে জার্মান কৃষক ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের এক অংশ মার্টিন লুথারের নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। আবার জাপানের ক্ষেত্রেও কমডার পেরি, ব্ল্যাক ফ্লিট যখন জাপানের জাতীয়তাবাদকে চূড়ান্ত অপমান করেছিল তখন জাপানী সৈনিক এবং বণিক একযোগে গর্জে উঠেছিল এর প্রতিবাদে—এঁরাই জাপানের জাতীয়তাবাদের পথ সুপ্রশস্ত করেছিলেন। জাপানের ইতিহাসে মাইজিরেস্টোরেশনানের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে জাপানের সম্রাটও এক বিরাট জাতীয়তাবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ইতিহাসে অনেক উদাহরণ আছে যখন বিদেশীর কাছে লাঞ্ছিত হয়ে পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু জাতি নিজেদের অর্থনৈতিক বনিয়াদকে সুদৃঢ় করেছেন—যেমন জার্মানী ও জাপান। অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে দেশের অভ্যন্তরে বুদ্ধিজীবী ও বণিক সম্প্রদায় এমনকি সামরিক শক্তিও একত্রে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে দেশকে পরিচালিত করেছে; যেমন অতীতে তুরস্ক ও বর্তমানে ইসরায়েল। এই বাস্তব ঘটনাগুলিকে শুধুমাত্র শ্রেণীসংগ্রামের সাহায্যে বর্ণনা করতে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক। আশা করি এ কথা দীপ্তেনবাবু স্বীকার করবেন।

প্রত্যেক জাতির ঐতিহাসিক অগ্রগতিতে যেমন অর্থনৈতিক কারকতা অর্থাৎ Economic Determinism--এর একটি স্থান আছে—তেমনি স্থান আছে সেই জাতির ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক আবহাওয়া এবং সম্পদ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জাতীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ। তা না হলে এশিয়া মহাদেশে না হয়ে প্রথমে কেন ইউরোপে শিল্প বিপ্লব শুরু হল? এই সব ঘটনা কোনো একটি বিশেষ ছকে ফেলে সুচারুভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। Engels একটি চিঠিতে J Blochকে লিখেছিলেন যে:

According to the materialist conception of history, the ultimately determining element in history is the production and reproduction of real life. More than this neither Marx nor I have ever asserted.

....

Marx and I are ourselves partly to blame for the fact that the younger people sometimes lay more stress on the economic side than is due to it. We had to emphasize the main principle vis-a-vis our adversaries, who denied it, and we had not always the time, the place or the opportunity to allow the other elements involved in the interaction to come into their rights. But when it was a case of presenting a section of history, that is, of a practical application, it was different matter and there no error was possible. Unfortunately, however, it happens only too often that people think they have fully understood a new theory and can apply it without more ado from the moment they have mastered its main principles, and even those are not always correctly. And I cannot exempt many of the more recent "Marxists" from this reproach, for the most amazing rubbish has been produced in this quarter, too.

Extract from 'MARX ENGELS Selected Works. Volume II, Page Nos 488 and 490.

তবে কি শ্রেণীসংগ্রাম মিথ্যা, শ্রেণীবিরোধ কাল্পনিক? এর জবাবে বলতে হয় যে সমাজে শ্রেণী ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আছে এবং শ্রেণী বিরোধও আছে। কিন্তু শ্রেণী সংগ্রামই বস্তুত সামাজিক অগ্রগতির একমাত্র কারণ এ কথা অবাস্তব। কার্ল মার্কস যে সমাজে শ্রেণী সংগ্রামের কল্পনা করেছিলেন অর্থাৎ ইউরোপের শিল্প বিপ্লব ও প্রসারের ভিতরে যে শ্রেণীসংগ্রাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা তিনি দেখতে পেয়েছিলেন এবং আশা করেছিলেন যে পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহেই সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সার্থক হবে—তাঁর সে আশা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। পশ্চিম ইউরোপের অর্থনীতি যে শ্রেণীবিরোধকে শুধু বাড়তে দেয়নি তা নয় উপরন্তু নিত্য নূতন শিল্প বিপ্লব ও বিকাশের ফলে

সেখানকার উৎপাদন এমন পর্যায়ে বাড়িয়েছে যে সেখানকার পুঁজিবাদীরা তো সুখে আছেনই অধিকন্তু সে দেশের শ্রমজীবী ও কৃষক সম্প্রদায়ও বহু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমধর্মীদের চেয়ে অনেক উন্নত জীবনযাপন করছে। এ কথা দীপ্তেনবাবু নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না। তবে দীপ্তেনবাবু, যদি এই কথা বলেন যে ইউরোপীয় পুঁজিবাদীদের ভিতর উন্নত উদারনৈতিক (liberal) চিন্তাধারার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে এবং ভারতীয় পুঁজিবাদীদের ভিতর এই চিন্তাধারার সম্পূর্ণ সূচনা হয়নি—তাহলে আমি তাঁর সাথে একমত।

মূলত ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে দেশের শিক্ষিত এবং সচেতন নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর। তাঁরা যদি মনে করেন যে ভারতবর্ষের অগ্রগতির পথ একমাত্র শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে—তাহলে হয়তো ভিয়েতনামের পথই একমাত্র পথ। এই পথ ভয়াবহ রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের পথ এবং আজকেও সমাজতান্ত্রিক চীন এবং পূর্ব ইউরোপে যে রক্তাক্ষয়ী দ্বন্দ্ব চলেছে তাতে সে দেশগুলির সাধারণ মানুষ সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা সম্বন্ধে কতোখানি

আস্থাবান তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আর এ দেশের শিক্ষিত মানুষেরা যদি মনে করেন যে, কর্মের মাধ্যমে এবং বিজ্ঞানের সহায়তায় দেশের কল্যাণ সম্ভব তাহলে সেই পথে অগ্রসর হবার যথেষ্ট সুযোগ আছে। এই পথে অগ্রসর হতে হলে এক নতুন জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তি গঠন প্রয়োজন এবং এর নেতৃত্ব দিতে পারেন একমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। W W Rostow তাঁর Stages of Economic Growth নামক পুস্তিকায় বলেছেন যে এই অগ্রগতির নেতৃত্ব আসে সব সময়েই একদল তরুণ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যাঁরা ঐতিহ্যকে পেছনে ফেলে নতুন দেশ গড়ার কাজে বিজ্ঞানকে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে গ্রহণ করেন এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে শিল্প ও কৃষিতে বিপ্লবের সৃষ্টি করেন। এই তরুণ সম্প্রদায়কে Rostow—New Enterpreneur শ্রেণী বলে আখ্যা দিয়েছেন। দেশের সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্র কৃষিতে এই নতুন বিপ্লবের সূচনা হলে তা ক্রমশ সহজাত গ্রামকেন্দ্রিক ছোট ছোট শিল্পেও নতুন আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং পরে মধ্যম স্তর ও বৃহৎ শিল্পেও প্রসারলাভ করে। অতএব বড় বড় পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে আমাদের যতোই বিদ্বেষ থাক না কেন—এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতির জন্য ছোট ছোট শিল্পপতি ও ছোট কারবারীদের এক বিশেষ ভূমিকা আছে।

আজকে যদি দৃষ্টান্তস্বরূপে বাঙালাদেশের কথাই ধরা যায়—তাহলে দেখা যাবে যে বাঙালীদের মধ্যে এই নতুন Enterpreneur class এর বিশেষ অভাব আছে। ভাবপ্রবণ বাঙালী মধ্যবিত্ত শুধুমাত্র এক চাকুরি সন্ধানী সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে এবং বাঙালাদেশের বেশীর ভাগ শিল্প বাণিজ্য আজ অবাঙালী পুঁজিবাদীদের করায়ত্ত হয়েছে। এর জন্য দায়ী মধ্যবিত্ত বাঙালীদের ঔদাসীন্য ও ভাবপ্রবণতা এবং আরও দায়ী মুষ্টিমেয় বাঙালী ধনিকের ক্লীবতা। অতএব আজকে সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন শ্রেণী সংগ্রাম নয়—বাঙালীর সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেশকে কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

সমীরকুমার গাঙ্গুলী
কলকাতা-১৩

জীবনানন্দ প্রসঙ্গে

২৯ আষাঢ়ের 'দেশ' পত্রিকায় 'আলোচনা' বিভাগে প্রকাশিত শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়ের 'জীবনানন্দ সম্বন্ধে' শীর্ষক একটি চিঠির অন্তর্গত জীবনানন্দ-সংক্রান্ত একাধিক তথ্যগত বিভ্রান্তির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে:

১) 'জীবনানন্দবাবুর প্রথম চাকরি কলকাতায় সিটি কলেজে, দ্বিতীয় বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে।' না, জীবনানন্দের দ্বিতীয় চাকরি দিল্লির রামযশ কলেজে (১৯৩০-৩১), বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে নয়; ব্রজমোহন কলেজে তাঁর তৃতীয় চাকরি।

২) 'দেশ বিভাগ পর্যন্ত তিনি বরিশালেই ছিলেন।' না, শুধু দেশ বিভাগ পর্যন্ত নয়, তারপরেও কিছুদিন ছিলেন। ব্রজমোহন কলেজে তাঁর চাকরি (১৯৩৫-৪৮): ছুটি নিয়ে তিনি কলকাতায় আসেন, পরের বছর চাকরি ছেড়ে দেন।

৩) 'জীবনানন্দবাবু বছর দুয়েক সিটি কলেজে অধ্যাপক ছিলেন।' না, বছর দুয়েক নয়, জীবনানন্দ সিটি কলেজে কাজ করেন বছর সাতেক অর্থাৎ ১৯২২ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত।

৪) '১৯২৮ কিংবা ১৯২৯-এ সেখান থেকে তাঁর চাকরি যায়।' ১৯২৯-এ নয়, ১৯২৮-এ—'পরিচয়' পত্রিকায় তাঁর 'ক্যাম্পে' কবিতা প্রকাশিত হবার অব্যবহিত পরেই।

শ্রী রায় তাঁর চিঠিতে কবি জীবনের বহু-প্রচারিত একটি প্রধান ঘটনা (অশ্লীল কবিতা রচনার অপরাধে চাকরি যাওয়া—'ক্যাম্পে'-প্রসঙ্গ)-র উপরে যে নতুন আলোকপাত করেছেন তার সত্যাসত্য নির্ধারণ জীবনানন্দের বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ পরিজনেরা যাঁরা প্রায় সকলেই এখনও জীবিত আছেন—সে-বিষয়ে তাঁরা গ্রাহ্য সাক্ষ্য দিতে পারেন।

প্রসঙ্গত, একথা উল্লেখ না করে পারা যায় না যে, জীবনানন্দের (১) সমগ্র কবিতা সংগ্রহ এবং (২) প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ কবির মৃত্যুর চোদ্দ বছর পরেও এখনও অপ্রকাশিত দেখে আশ্চর্য লাগে! আমরা অপেক্ষার স্থপতি সেজে আছি!!

কবিরুল ইসলাম
সিউড়ি, বীরভূম

বটতলার বই

'বটতলার বই' অর্থে কলকাতার চিৎপুর রোডে অবস্থিত কয়েকটি অতি প্রাচীন প্রকাশন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত বই। 'বটতলার বই' বললেই অধিকাংশেরই কেমন যেন একটা উন্নাসিক ভাব। মাঝে-মধ্যে পত্র-পত্রিকায় আলোচনা প্রসঙ্গে 'বটতলার বই'

সম্বন্ধে অনেকেই বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করে থাকেন। এ সব সমালোচনা অধিকাংশ সময়েই তথ্য-প্রমাণবিহীন, অর্ধসত্য এবং অসত্য বলেই প্রমাণিত হয়। ইদানীং গুটিকয়েক পত্র-পত্রিকা এই বটতলার প্রকাশকদের পেছনে অকারণ এবং অনাবশ্যক আক্রমণ চালাতে শুরু করেছেন। এ ধরনের একটি রচনা গত ১৩৭৫-র ৩৭ সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় পড়লাম। সে জন্যে এই বটতলার পুস্তক ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক হিসেবে আমি আমার বক্তব্য আপনার পত্রিকার মাধ্যমে সাধারণ্যে পেশ করবার প্রয়োজন বোধ করছি।

অধুনা ব্যাঙের ছাতার মত রাতারাতি বই পাড়ার অলিতে গলিতে অনেক প্রকাশক গজিয়ে উঠেছে। এদের মধ্যে এমন কিছু ভুঁইফোঁড় প্রকাশকের কথা বলছি, যাঁদের পাকাপাকি কোন দোকান নেই। নিজের বাসার ঠিকানা, আত্মীয় বা কোন পরিচিত-জনের ঠিকানা কিংবা একেবারেই ভুয়ো ঠিকানা দিয়ে এ'রা বই প্রকাশ করে থাকেন। এবং এ'রা এ'দের 'প্রোডাক্ট' শহর, শহরতলি এবং পল্লীগ্রামের দোকানে দোকানে গিয়ে ফেরি করে আসেন। এ'দের কোনো ব্যবসায়িক রীতিনীতিও নেই। থাকে যে কমিশনে পারলেন বই গছিয়ে দিয়ে চলে এলেন। ফলে প্রকৃত ব্যবসায়ীদের এ'রা যথেষ্ট ক্ষতিসাধনই করে চলেছেন। সদর্থে প্রকাশক একজন সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন এবং মার্জিত রুচিসম্পন্ন মানুষকেই বোঝায়। এ'দের ওসব বালাই নেই। এ'রা হয় অশিক্ষিত নয় অর্ধশিক্ষিত। তাই এ'রা খুব সহজেই 'টু পাইস' করার 'শর্টকাট' রাস্তা বার করে নিয়েছেন। যেমন ধরুন, নামকরা সাহিত্যিকদের নামধারী দু' নম্বর লেখকদের লেখা এ'রা ছাপিয়ে যাচ্ছেন। এইসব লেখক লেখক-পদবাচ্য নন। কারণ, তাঁরা এক নম্বর লেখকের সঙ্গে নিজের নামের আগে 'শ্রী' বা 'শ্রীমান' ব্যবহার করে কোন পার্থক্য রাখার দরকার মনে করেন না—অতি বিশ্রীভাবেই একদেহেই লীন হয়ে যেতে চান। অর্থাৎ এ'রা নাম ভাঙিয়েই খেতে ভালবাসেন। ফলে সাধারণ পাঠক বিভ্রান্তিতে পড়েন এবং দু' নম্বর লেখক-দের লেখার দারুভাগ এক নম্বর আসল লেখকদের ওপর বর্তায়। দুঃখের কথা, কয়েকটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রকাশন সংস্থাও এইসব দু' নম্বর লেখককুলের পৃষ্ঠ-পোষকতা করে চলেছেন। বলা বাহুল্য, এ'রা কেউ বটতলার প্রকাশক নন।

এখন আমার বক্তব্য, এই ধরনের 'হাতি-ঘোড়া-উট' মার্কা বইয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে উপরোক্ত সাপ্তাহিকটিতে এমনভাবে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে, যেন একমাত্র 'বটতলা' অর্থাৎ চিৎপুর এলাকার প্রকাশকরাই এইসব বই বাজারে ছাড়ছেন। কিন্তু এ সংবাদ সর্বৈব ভিত্তিহীন। কারণ, আমি জানি বর্তমানে এই চিৎপুর এলাকায় যে কয়টি প্রকাশন সংস্থার অস্তিত্ব রয়েছে, তাঁদের মধ্যে কেউই আলোচ্য বই প্রকাশ করেন নি। এই ধরনের বিভ্রান্তিকর সংবাদ পরিবেশনার আগে একবার 'বটতলার' প্রকাশকদের ঘরে পদধূলি দিলেই ভ্রম দূর হয়। তথ্যের দিক থেকে আমরাও তাঁদের সঠিক সংবাদ দিয়ে আলোচ্য বিষয়ের ওপর সুষ্ঠুভাবে আলোকপাত করতে সাহায্য করতে পারতাম। তাঁদের সঙ্গে যখন আমাদের কোন বিরোধ নেই, এটুকু কণ্ঠস্বীকার তাঁরা অনায়াসেই করতে পারতেন।

বহুকাল আগে মারা গিয়েছেন, এমন অনেক লোকের নামে নতুন প্রকাশিত টেক্সট বইয়ের নোটবই বেরিয়ে যাচ্ছে। সেও কি বটতলা থেকেই? নোটবইয়ের ক্ষেত্রেও দু' নম্বর লেখকের আবির্ভাব সম্প্রতি ঘটেছে, সেও-কি বটতলার ব্যাপার? বটতলারই 'বাল্যশিক্ষা, প্রথমভাগ, ধারাপাত' দিয়ে শিশুদের হাতেখড়ি হয়। সেই শিশুরাই বড় হয়ে যখন অকারণে শিশু-সুলভ মানসিকতা নিয়ে 'বটতলার' বিরুদ্ধে কলম ধরেন, তখন দুঃখ হয়।

টাকায় দু' কিলো ক্লাসিক সাহিত্যও নাকি এই বটতলা থেকে বেরোয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে, সব বই না হলেও বটতলার কিছু কিছু বই দামে আনুপাতিক সস্তা, সে অর্থে আকারেও বড়। এ প্রসঙ্গে বলি, কিছুদিন পূর্বে শেক্সপীয়রের কমপ্লিট ওয়ার্কসের একটি বিলাতী সংস্করণ বাংলা দেশের বাজারে দেখেছিলাম। তার বিরাট বপু। দাম মাত্র ছ' টাকা। একেও কি তা হলে বটতলার বই-ই বলতে হবে? প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে অপেক্ষাকৃত কম দামে বাজারে বই ছাড়লেই কি তা বটতলার সম্পদ? এই যুক্তি অনুযায়ী তা হলে পুরাণ, পাঁচালী, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি যেহেতু বটতলা থেকে বেরোয়, সেই হেতু এদের সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার অধিকার নেই।

প্রফুল্লকুমার ধর
সম্পাদক

সাহিত্য সংবাদ

রক্তচক্ষুর সম্মুখে আর একজন রুশ লেখক

বরিস পাস্তেরনাকের পর সম্ভবত আর একজন প্রতিভাবান রুশ লেখক রাষ্ট্রের শাসন এবং রীতিনীতির সম্মুখীন হতে চলেছেন। এই লেখকটির নাম আলেকজান্দার সোলঝেনিৎসীন।

সোলঝেনিৎসীন ইতিমধ্যে বিশ্বখ্যাত। কয়েক বছর আগেও তিনি ছিলেন রাশিয়ায় অখ্যাত লেখক, স্বয়ং ক্রুশ্চেভ তাঁর উপন্যাস ছাপার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁকে মনে করা হয়েছে ইদানীংকার রুশ সাহিত্যে অন্যতম মহৎ প্রতিভাবান লেখক, তাঁর একটি উপন্যাসকে স্টালিন পরবর্তী-কালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে।

রাজনৈতিক হাওয়া বদলের সংগে সংগে রাশিয়ায় যে লেখকদের শাস্তিরও উত্থান-পতন শুরু হয়, এই ব্যাপারটা ভারী কৌতূহলের। রুশরা সাহিত্যকে এতখানি মূল্য দেয় কেন? সাহিত্য কি এতই ক্ষমতা-পূর্ণ যে, কোটি কোটি মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রা পালটাতে পারে? অত বড় সোভিয়েট দেশকে কি সামান্য একখানা উপন্যাস কাঁপিয়ে দিতে পারে নাকি? এক-খানা উপন্যাসে যদি দেশের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো শ্লেষ থাকে—তাতে শাসকদের কি আসে যায়? শাসকদের এই দুর্বলতা ও ভয় সত্যিই বিস্ময়কর। মংগল-ময় সাহিত্য তো কতই লেখা হয়েছে—তাতে মানুষের কোনোই মংগল হয় নি—এবং সেসব সাহিত্যের বন্দনা বা মূল্য নির্ণয় করতে কখনও রাষ্ট্রনায়কদের ব্যাকুলতা দেখা যায় নি, শুধু শ্লেষ বা ধ্বংসের কথা শুনলেই তাঁদের এত আতংক হয় কেন? সমষ্টিগতভাবে মানুষের মংগল বা ধ্বংসের ব্যাপারে সাহিত্যের কোনো হাত নেই, সেটা নির্ভর করে চাষের জমি ও কলকারখানায় —এবং কয়েকজন রাষ্ট্রনায়কের খেয়াল-খুশীর ওপর—যাঁরা সাহিত্য সম্পর্কে অনবহিত, প্রায় বলা যায় অক্ষরজ্ঞানশূন্য। যাই হোক, সোলঝেনিৎসীন বর্তমান রুশ-সমাজের প্রতি কোনো বিরূপ মন্তব্য করেন নি, কিন্তু তাঁর রচনাকে বলা হয়েছে—রুশ-জীবন সম্পর্কে "জঘন্য অপবাদ প্রচার"।

চেকোশ্লোভিয়ার সাম্প্রতিক উদারনীতি এবং সেন্সর-ব্যবস্থার কড়াকড়ি হ্রাস সম্পর্কে রুশ নেতারা যেমন উগ্র হয়ে উঠেছেন, স্বদেশে তারই প্রতিক্রিয়া—লেখকদের শাসন। সোলঝেনিৎসীন আবার চেকোশ্লোভাকিয়াতেও খুব জনপ্রিয়।

ক্রুশ্চেভের আমলে স্টালিন নীতির সমালোচনা উত্তুংগ হয়েছিল, রাশিয়া সমেত সমস্ত বিশ্ব জেনে গিয়েছিল স্টালিনের নির্যাতন প্রক্রিয়ার কথা। এখন আবার স্টালিন যুগের লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা হচ্ছে এবং মুছে ফেলা হচ্ছে ক্রুশ্চেভের আমলকে। এরই মধ্যবর্তী জাঁতাকলে পড়েছেন সোলঝেনিৎ-সীন।

আলেকজান্দার সোলঝেনিৎসীনের বয়েস এখন পঞ্চাশ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন গোলন্দাজ বাহিনীর ক্যাপটেন। ১৯৪৫ সালে তিনি পূর্ব জার্মানীতে যুদ্ধরত অবস্থায় নিজ বাহিনীর হাতেই গ্রেপ্তার হন—কারণ, তিনি স্টালিন সম্পর্কে নিন্দাসূচক মন্তব্য করে-ছিলেন। এর জন্যই তাঁকে দীর্ঘকাল কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে কাটাতে হয়েছে—কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে তাঁর সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলেই, সেখানকার জীবনের শিহরিত বাস্তব বর্ণনা দিয়ে লিখলেন তাঁর উপন্যাস, 'ওয়ান ডে ইন দা লাইফ অফ ইভান ডেনিসোভিচ'। (বাংলায় এই উপন্যাসটির অপূর্ব অনুবাদ করেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।)

১৯৬২ সালের নবেম্বর মাসে 'নোভি মির' পত্রিকায় এই উপন্যাসটি প্রথম ছাপা হয়—ছাপার আগে রাশিয়ার সিকিউরিটি সংস্থাসমূহ এবং কম্যুনিস্ট পার্টির আদর্শ নির্ণয়কারী মিখায়েল সুসলভ বইটি ছাপা সম্পর্কে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ বইটি সম্পর্কে ব্যক্তিগত আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং ছাপার আদেশ দেন। প্রকাশের পরই বইটি অসাধারণ জনপ্রিয় হয়, বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হতে দেরী লাগে না। সাহস ও সততার জন্য সোলঝেনিৎসীন অভি-নন্দিত হন সারা দেশে। ব্যক্তিগত ব্যবহারে তাঁর বিনয় ও নম্রতাও তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা বাড়ায়।

গত দু' বছর ধরে সোলঝেনিৎসীন কর্তৃপক্ষের বিরাগ ভাজন হতে শুরু করেছেন। '৬৬ সালে দু' জন রুশ লেখক-ড্যানিয়েল ও সিনিয়াভস্কির যখন বিচার হয়, তখন যে কয়েকজন লেখক তাঁদের পক্ষ সমর্থন করে বিচারের সমালোচনা করে-ছিলেন, সোলঝেনিৎসীন ছিলেন তাঁদের অন্যতম। (সিনিয়াভস্কি এবং ড্যানিয়েল—এই লেখক দু' জন এখন কয়েদীর পোশাকে ভোলগা নদীর তীরবর্তী ফোরসুভ লেবার ক্যাম্পে মেয়াদ খাটছেন)। গত বছর জুন মাসে সোভিয়েট লেখক কংগ্রেসের কাছে এক খোলা চিঠিতে সোলঝেনিৎসীন দাবি জানালেন যে, সমস্ত সেন্সর প্রথার অবসান হোক, লেখক সংঘের উচিত নির্যাতিত লেখকদের পক্ষ সমর্থন করা এবং সরকারী হস্তক্ষেপের সমালোচনা করা। তাঁর নিজের সম্পর্কে এবং তাঁর লেখা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ যে চাপ সৃষ্টি করছেন, তিনি তারও প্রতিবাদ জানালেন। প্রায় ৮০ জন লেখক সোলঝেনিৎসীনের দাবি সমর্থন করে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়েছিলেন—এই সব বিবৃতি আবার চেকোশ্লোভাকিয়াতে পুনর্মু-দ্রিত ও প্রচারিত হল।

সম্প্রতি সরকার-পৃষ্ঠপোষিত লেখক সংঘের মুখপত্র "লিটারেটুরনায় গেজেটা"র সম্পাদকীয় বক্তব্যে সোলঝেনিৎসীনকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। তাঁর যে উপন্যাস—"ইভান দেনিসোভিচের জীবনের একদিন"—এত দিন লক্ষ লক্ষ কপি প্রচারিত হয়েছে এবং সৎ সাহিত্য হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে—হঠাৎ সেই উপন্যাস সম্পর্কে বলা হল, ও বইটাতে রুশ-বিরোধী প্রচারকদের স্বেচ্ছায় সাহায্য করা হয়েছে। এবং তাঁর নতুন উপন্যাস "দি ক্যান্সার ওয়ার্ড" রাশিয়ায় প্রকাশ নিষিদ্ধ হয়েছে। গত বছর শরৎকালে এই উপন্যাসটি 'নোভি মীর' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য মনোনীতও হয়ে-ছিল—কিন্তু উচ্চবর্গের রাজনৈতিক নেতাদের আকস্মিক হুকুমে সেটা ছাপা বন্ধ হয়ে যায়।

সোলঝেনিৎসীনের ভাগ্য এখন অনিশ্চিত। লেখক ইউনিয়নের মুখপত্রে তাঁকে যে শাসানি দেওয়া হয়েছে, এটা শেষ ওয়ার্নিংও হতে পারে—অথবা তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও বিচার শুরু করার ভূমিকাও হতে পারে। যে-ক'জন লেখক নির্যাতিত হয়েছেন আগে, তাঁদের বেলাতেও পর পর ধাপগুলো এইরকমই ছিল।

রাশিয়ার বাইরে পশ্চিমী দেশগুলিতেও সুযোগসন্ধানী শকুনীর অভাব নেই।

সাহিত্য সম্পর্কে রুশ নেতাদের অহেতুক ভয়ের জন্যই বোধ হয় পশ্চিমের এই সব সুযোগসন্ধানীরা রুশ সাহিত্যকে রাজনৈতিক প্রচারের কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। বিশেষত, যে সমস্ত বই-এর প্রকাশ রাশিয়ায় নিষিদ্ধ হয়, সেই সব বই ছাপার জন্য ওদের আগ্রহ দেখবার মতন, প্রায় জিব দিয়ে জল পড়ে আর কি। সোলঝেনিৎসীনের নিষিদ্ধ বই, "দি ক্যান্সার ওয়ার্ড"ও রাশিয়ার বাইরে ছাপার চেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। নিষিদ্ধ হবার পর এই বই-এর সাইক্লোস্টাইল করা কপি রাশিয়ার উদারপন্থী সাহিত্যিকদের হাতে হাতে ঘোরে—তারই দু'-একটা কপি যোগাড় করেছেন পশ্চিমী প্রকাশকরা, এবং ছাপাতে শুরু করেছেন। এর প্রতিক্রিয়া রাশিয়ার কর্তৃপক্ষ মহলে কী রকম হবে, পূর্ব প্রমাণ অনুযায়ী তা সহজেই অনুমান করা যায়।

বরিস পাস্তেরনাকের দুর্ভাগ্যও এইভাবে শুরু হয়েছিল। সোলঝেনিৎসীনের ক্ষেত্রেও পুনর্বার সেইরকম ঘটুক—আমরা তা চাই না।

সনাতন পাঠক

ধর্ম ও দর্শন

পুস্তক পরিচয়

শ্রীনিম্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈত দর্শন। ডঃ অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য। প্রকাশক ঃ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দাস এম বি খড়্গপুর। বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বেদান্তের বিভিন্ন ভাষ্য বিভিন্ন দার্শনিক ও তাত্ত্বিকের দ্বারা নানাভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ভক্তি মার্গের সাধকগণ বেদান্ত-সূত্রকে কেন্দ্র করেই আবেগবহুল ভক্তি-ধর্মকে একটি দার্শনিক প্রত্যয়ের দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সাধারণত দ্বৈতবাদী নামে পরিচিত উক্ত দার্শনিকবৃন্দ অদ্বৈত-বাদী শঙ্করের শারীরিক ভাষ্যকে অস্বীকার করেন। তাঁদের ঈশ্বর কখনই শঙ্করাচার্যের নির্গুণ নির্বিকল্প ব্রহ্ম নন—অল্পাধিক্যতর পার্থক্য সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বিষ্ণু, হরি অথবা কৃষ্ণের সগুণ আধার বিশেষ। বলা বাহুল্য, দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের ভক্তি নিছক আবেগবাহিত ভাব্যে উপস্থিত নয়, তত্ত্ব, যুক্তি ও মননশীলতায় প্রখর অনুশাসনে পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শনে অভিব্যক্ত।

দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় বেদান্ত সূত্রের প্রধানত চার প্রকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। রামানুজের শ্রীভাষ্য, মধ্বাচার্যের দ্বৈতভাষ্য, নিম্বার্কের বেদান্ত পারিজাতসৌরভ এবং বল্লভাচার্যের অণুভাষ্য। শঙ্করাচার্যের মত হল, নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যতীত আর সমস্তই মিথ্যা। আর রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ব্রহ্মকেই একমাত্র সৎ পদার্থ বলে মানলেও জীব ও জগৎকে অস্বীকার করে না। তাঁর দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ও জীবের সম্পর্ক আগুন আর তার তাপের সম্পর্কের সমতুল। তাপই যেমন আগুন নয়, আবার আগুন থেকে পৃথকও নয়, সেরূপ জীবও ব্রহ্ম নয় কিন্তু ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ আলাদাও নয়। স্পষ্টতই রামানুজ শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে সংশোধিত করলেও সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন নি।

শ্রীনিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদই শঙ্করের বিরুদ্ধে প্রথম স্পষ্ট প্রতিবাদ। রামানুজের ঈষৎ পরবর্তীকালে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে দক্ষিণ ভারতে নিম্বার্কের জন্ম। তাঁর প্রবর্তিত দ্বৈতাদ্বৈত-বাদ বা ভেদাভেদবাদ সর্বযুগ থেকেই দর্শনে ধর্মে ও সাহিত্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। রামানুজ কথিত অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি থেকে এক ধাপ এগিয়ে এসে নিম্বার্ক-দর্শন জীবজগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে অংশ ও অংশীর সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিল। এ সম্পর্কে যেন এক পিণ্ড সোনার তাল আর তা থেকে নির্মিত অলঙ্কারের সম্পর্ক। অলঙ্কার অংশ হিসেবে পৃথক বটে কিন্তু, এই ভেদের মধ্যেও অভেদ আছে। ঠিক সেরূপ জীবজগতেরও ব্রহ্মাতিরিক্ত পৃথক সত্তা আছে কিন্তু তার মূল কারণ হিসেবে ব্রহ্মই একমাত্র অখণ্ড সত্তা। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ দ্বৈত এবং অদ্বৈত—এই দুইয়ে মিলেই দ্বৈতা-দ্বৈতবাদ।

আলোচ্য গ্রন্থে দ্বৈতাদ্বৈত দর্শন ও নিম্বার্ক সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে লেখক নিম্বার্ক সম্প্রদায়, নিম্বার্কের জীবন ও নিম্বার্ক দর্শন সম্পর্কে বহু প্রচলিত মত খণ্ডন করে নতুন তথ্য প্রমাণের ও বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে মৌলিক মতবাদের অবতারণা করেছেন। যেমন, নিম্বার্কের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে অধিকাংশ গবেষক-পণ্ডিত তাঁকে খ্রীষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। এবং প্রত্যেকেই তাঁকে শংকর ও রামানুজের পরবর্তী বলে মনে করেছেন। লেখক বিস্তৃত সমালোচনার পর এই মতবাদ খণ্ডন করে শ্রীনিম্বার্ককে সমস্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম এবং শ্রীরামানুজ ও শ্রীশংকরাচার্য থেকেও পূর্ববর্তী বলে দাবি করেছেন। এই আলোচনার গুরুত্ব ও অভিনবত্ব অবশ্য বিদগ্ধজনের বিচার্য।

এ ছাড়াও নিম্বার্কের জীবন বিষয়ক অনেক অপ্রকাশিত তথ্যও গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আছে ব্রহ্ম, জীব জগৎ ও মোক্ষ সম্বন্ধে নিম্বার্কীয় দার্শনিক মতবাদ সমূহের বিস্তৃত আলোচনা ও ব্যাখ্যা। ব্রহ্মের যুগপৎ সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব, অংশিত্ব ও অবিকারিত্ব, জীবজগতের সঙ্গে ব্রহ্মের

সম্বন্ধ বিষয়ে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ ব্রহ্মের পরিণামিত্ব ও অবিকারিত্ব ইত্যাদি পরস্পর-বিরোধী বিষয়গুলি নিম্বার্ক দর্শনে কীভাবে সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয় তাও দ্বিতীয় খণ্ডে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। আলোচনা সর্বত্র তথ্য-প্রমাণ নির্ভর, বিচার-বিশ্লেষণধর্মী ও তুলনাত্মক। বৃহদায়তন এই গবেষণামূলক গ্রন্থটির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থকার শ্রীভট্টাচার্যকে সম্মানিত করেছেন। গভীর মননশীল রচনাটি লেখকের বহু দিনের পরিশ্রম ও সাধনার ফল। সর্বত্র তাঁর অবিচল নিষ্ঠা আর অকম্পিত ভক্তিপ্রবণতা এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিদগ্ধ আলোচনাকেও একটি নম্র আবেগ ও অন্তরঙ্গতায় সমৃদ্ধ করেছে।

৫৯।৬৮

বিবিধ

নানান দেশের নানান সমাজ। ডঃ দিলীপ মালাকার। প্রকাশভবন, ১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। চার টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সামাজিক রীতিনীতি এবং ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে কিছু খুচরো আলোচনা

করা হয়েছে। এর মধ্যে বেশীর ভাগ পাশ্চাত্ত্য দেশীয় জীবনধারা সম্পর্কিত রচনা। ফরাসী দেশের সমাজবন্ধন, ইউরোপে নারীপ্রগতি, রুশ দেশের বিবাহপ্রথা প্রভৃতি নানা বিষয়ে লেখক স্বল্পবিস্তর আলোচনা করেছেন। এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক তথ্যের অবতারণা করে লেখাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। কোন কোন লেখায় রচয়িতার রসজ্ঞতার পরিচয় মেলে। যেমন, 'শরীরের ওপর শব্দের প্রভাব', 'ষষ্ঠীপুজো ও সন্তান পালন' প্রভৃতি রচনা। ঈষৎ হাল্কাচালে লেখা বলে রচনাগুলি বেশ অনায়াসগতি এবং উপভোগ্য। তবে আলোচনাসমূহ কোন ক্ষেত্রেই পূর্ণাঙ্গ নয়, কিংবা লেখক বিষয়কে গভীরতর ভাবনার সঙ্গে অন্বিত করে দেখবার চেষ্টা করেন নি। ফলে, লেখাগুলি উপযুক্ত গুরুত্ব পায় নি, বিবৃতিমূলক সংক্ষিপ্তসারে পর্যবসিত হয়েছে। এ বিষয়ে, লেখক আরো খানিকটা যত্ন নিলে আমরা লাভবান হতাম।

৮৫।৬৮

খেলার মাঠে

বিশ্ব অলিম্পিক আগতপ্রায়। হাতে সময় মাত্র দু' সপ্তাহ। ১২ অক্টোবর থেকে মেক্সিকোতে অলিম্পিকের আসর বসছে। বহু দেশের খেলোয়াড় ও অ্যাথলীট ইতিমধ্যেই মেক্সিকোয় পৌঁছে গিয়ে ওই উঁচু দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু ভারতের দল গড়া হয়েছে সবেমাত্র। তাও অনেক টালবাহানার পর।

হকি দল অবশ্য আগেই গড়া হয়ে গিয়েছিল। কোচ এবং কর্মকর্তা সমেত হকির ২০জন বাদে আর ১৬ জনকে নিয়ে মোট ৩৬ জনের একটি দল মেক্সিকো অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন। এই লেখার সময় পর্যন্তও প্রতিনিধিদের সব নাম ঘোষণা করা হয় নি। তবে ঠিক হয়েছে ৪জন কুস্তিগীর, ২জন অ্যাথলীট, ২জন রাইফেল চালক, ১জন ভারোত্তোলক ও ১জন মুষ্টিযোদ্ধা দলে থাকবেন। এই ১০জন বাদে বাকি ৬জন যাবেন কর্মকর্তা।

মেক্সিকো অলিম্পিকে ভারতের দল গঠন নিয়ে ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, অল ইণ্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিল ও ভারত সরকারের মধ্যে টানাপোড়েন ও মতবিরোধের কথা কারো অজানা নেই। এটাও কারো অজানা নয় যে, হকি ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে ভারতের প্রতিনিধিদের কোনও পদক পাবার আশা আকাশকুসুম কল্পনা। তাই হকি দল যে আগেই গঠন করে তাঁদের অলিম্পিকের পথে সময়মত রওনা করে দেওয়া হয়েছে সেটা ভাল কথা।

কেনিয়ার খেলা শেষ করে ভারতীয় হকি দল রোম যাত্রা করেছে। রোম থেকে যাবে মেক্সিকোয়।

হকি খেলায় ভারতের বিশ্বজয়ীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বৈতরণী পার হয়ে যে ১৮জন খেলোয়াড় চূড়ান্তভাবে অলিম্পিক দলে নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরা সবাই কষ্টিপাথরে যাচাই হওয়া খাঁটি সোনা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও আজ ভারতবাসী মাত্র সবারই একমাত্র কামনা এরা যেন অলিম্পিক আসর থেকে স্বর্ণপদক নিয়ে ঘরে ফিরতে পারে।

আমাদের ভুললে চলবে না বিশ্ব হকিতে আমাদের পর্যাপ্ত প্রাধান্যের দিন অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। বিশ্ব হকির অজেয় যোদ্ধা হিসাবে যাঁদের সুনাম ছিল আজ আন্তর্জাতিক খেলায় তাঁদের হার স্বাভাবিক ঘটনা। বহু দেশই ভারতীয় হকির কায়দা-কানুন শিখে ফেলেছে। তারপর মেক্সিকো অলিম্পিকে ফাইনালের আগেই আমাদের খেলতে হচ্ছে কয়েকটি শক্তিশালী দেশের সঙ্গে। আমাদের দিকে রয়েছে পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানী, স্পেন, জাপান ও নিউজিল্যাণ্ড। বলা বাহুল্য, পশ্চিম জার্মানী এবং স্পেন হকিতে এখন পরম শক্তিশালী। এ কথা ভুললেও চলবে না, ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ন অলিম্পিকের ফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের জয় ছিল কষ্টার্জিত। রোমে তো আমরা পরাজয়ই স্বীকার করেছিলাম। টোকিও অলিম্পিকের ফাইনালে উঠতেও যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। ফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১—০ গোলে জয়ও একটি পেনাল্টি পুশের ফল। সুতরাং আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের মত এলাম, দেখলাম, জয় করলাম—ভারতীয় হকির আর সেদিন নেই। তাই ভয় হয় খেলাধুলায় আমাদের একমাত্র পরিচয় হকির বিজয়মুকুটও না হারাই।

ভয়ের কারণ আরও বেশী এইজন্য যে, বিশ্ব হকিতে যে কেনিয়ার পরিচয় সাম্প্রতিক ঘটনা সেই কেনিয়ার সঙ্গে পাঁচ টেস্ট সিরিজের খেলায় আমরা ২—১ টেস্টে জয়ী হয়েছি একরকম কেঁদে ককিয়ে। অর্থাৎ কেনিয়া জিতেছে একটি টেস্ট আমরা জিতেছি দুটিতে, দুটি টেস্টে জয় পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয় নি। আরও ভয় দল গঠনে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকায়।

আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে ১৮জন খেলোয়াড় নিয়ে অলিম্পিক দল গড়া হয়েছে তাঁদের সাম্প্রতিক যোগ্যতা সম্পর্কে আমার ধারণা অস্পষ্ট। কয়েকজনের খেলা আমি দেখিনি, যাঁদের খেলা দেখেছি তাঁদেরও বর্তমান মান কেমন ঠিক বলতে পারব না। তবে ভারতীয় হকির সঙ্গে যাঁরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং খেলোয়াড়দের গুণাগুণ বিচারে যাঁরা বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচিত তাঁদের ধারণা, দলটির বাঁ দিক দুর্বল। কি ব্যাক, কি হাফ-ব্যাক, কি ফরোয়ার্ড সব বিভাগেই দুর্বলতা আছে।

তিনজন ব্যাকের মধ্যে পাঞ্জাবের পৃথিপাল সিং ও বাংলার গুরুবক্স সিং রাইট ব্যাক হিসাবেই বেশী পটু। লেফট ব্যাক হিসাবে নির্বাচিত পাঞ্জাবের ধরম সিং এঁদের তুলনায় দুর্বল। তবে গুরুবক্স লেফট ব্যাকেও খেলতে পারেন।

লেফট হাফে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে যাঁর সুনাম রেলওয়ের সেই রাজিন্দার সিংকে দলে নেওয়া হয়নি। সার্ভিসেস দলের বলবীর সিং এবং রেলওয়ের কৃষ্ণমূর্তি রাইট ব্যাক হিসাবে খ্যাত। পাঞ্জাবের জগজিত সিং ও অজিতপাল সিং সেণ্টার হাফের খেলোয়াড়। সুতরাং পাঞ্জাবের হরমিক সিংকেই হয়তো লেফট হাফে খেলানো হবে। কিন্তু এই জায়গায় হরমিকের যোগ্যতা সন্দেহাতীত নয়।

ফরোয়ার্ড লেফট আউট হিসাবে যাঁর নির্বাচন পাঞ্জাবের সেই তারসেম সিং-এর যোগ্যতা সম্পর্কেও সন্দেহ আছে। আলি সইদের গতিবেগ, বিশ্ববিদ্যালয় দলের উদীয়মান খেলোয়াড় শিব দত্তের উদ্দাম বা এয়ার লাইন্সের সহিদ নুরের কলা-কৌশল তারসেমের খেলার মধ্যে অনুপস্থিত। সুতরাং দলের বাম ভাগ যে দুর্বল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হকিতে অবশ্য সব দলেরই বাঁ দিক কিছু দুর্বল থাকে। কারণ, বাঁ দিকে স্টিকের কায়দা-কানুন আয়ত্ত বেশ শক্ত। তবু ব্যাক, হাফ ব্যাক, ফরোয়ার্ড—তিন ভাগেই দুর্বলতা ভয়ের কথা।

বাঁ দিকে যেমন সব দলেরই কিছুটা দুর্বলতা থাকে তেমন ডান দিক থাকে শক্তিশালী তাই প্রতিপক্ষের দক্ষিণ প্রান্তের খেলোয়াড়দের পক্ষে ভারতের বাঁ দিক দিয়ে আক্রমণ রচনার সম্ভাবনা থাকবে বেশী।

ভারতের পক্ষে গোলরক্ষক হিসাবে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরা কোচিং ক্যাম্পে নাকি ভাল খেলতে পারেন নি। অতীত দিনের নাম-করা গোলকিপার শঙ্কর লক্ষ্মণ, দেশমুখ বা ফ্রান্সিসের সঙ্গে এঁদের তুলনা চলে না। তবু আছে বস্তু নিয়ে বিচার হিসাবেই ক্লিন্ট ও মুনির সৈতকে নেওয়া

হয়েছে।

অতীত দিনের দিক্‌পাল খেলোয়াড় যাদুকর ধ্যানচাঁদ গোলরক্ষক এবং লেফট আউটের দুর্বলতার কথা আগেই বলেছেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান কিছু হয়নি বলেই মনে হচ্ছে।

তবে আশার কথা, নির্বাচকরা দল গড়ার সময় তারুণ্যের উপর জোর দিয়েছেন। দলের বেশীর ভাগ খেলোয়াড়ই তরুণ। ১৮ জনের মধ্যে ১০ জনই অলিম্পিক দলে নবাগত।

নীচে অলিম্পিক দলের ১৮ জনের নাম দেওয়া হল।

গোল—আর ক্রিস্টি (মহীশূর) ও মুনির সৈত (মাদ্রাজ);

ব্যাক—পৃথ্বীপাল সিং (পাঞ্জাব), গুরুবক্স সিং (বাংলা) ও ধরম সিং (পাঞ্জাব);

হাফ ব্যাক—বলবীর সিং (সার্ভিসেস), জগজিৎ সিং (পাঞ্জাব), অজিতপাল সিং (পাঞ্জাব), হরমিক সিং (পাঞ্জাব) ও কৃষ্ণমূর্তি (রেলওয়ে);

ফরোয়ার্ড—বলবীর সিং (রেলওয়ে), ভিক্তে পিটার (সার্ভিসেস), হরবিন্দার সিং (রেলওয়ে), ইন্দার সিং (রেলওয়ে), তারসেম সিং (পাঞ্জাব), ইনামউর রহমান (বাংলা), বলবীর সিং (পাঞ্জাব) ও গুরুবক্স সিং (রেলওয়ে)।

উপরের ১৮ জনের মধ্যে মুনির সৈত, বলবীর সিং (সার্ভিসেস), অজিতপাল সিং, হরমিক সিং, কৃষ্ণমূর্তি, বলবীর (রেলওয়ে), ইনামুর রহমান, তারসেম সিং, ইন্দার সিং ও গুরুবক্স সিং (রেলওয়ে) অলিম্পিক দলে প্রথম নির্বাচিত হয়েছেন। দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন পাঞ্জাবের পৃথ্বীপাল সিং। তবে বাঙলার গুরুবক্স সিংকেও অধিনায়কের সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

*

গত দুই মাসে আন্তর্জাতিক ও ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে অনেকগুলি ঘটনা ঘটে গিয়েছে। কলকাতার ফুটবলের ঘটনাও কম নয়। উল্লেখ করবার মত ঘটনার মধ্যে অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট-যুদ্ধ শেষ হয়েছে। ইংলন্ডের কৃষ্ণকায় ক্রিকেট খেলোয়াড় বেসিল ডলিভেরাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ইংলন্ড, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট সম্পর্কে চিড় ধরেছে। মারডেকা ফুটবল থেকে ভারতীয় দল ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে এসেছে। কলকাতায় গত বছরের অসমাপ্ত শীল্ড ফাইনালের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে এ বছরের শীল্ডের খেলাও শিকেয় উঠেছে এবং শুরুর সঙ্গেই সুপার লীগের উপর যবনিকা পড়ার উপক্রম। আমার হাতে যে খবর আছে তাতে সুপার লীগের খেলা আর হওয়া কষ্টকর।

সুপার লীগের প্রথম খেলায় একক লীগের প্রথম দল মোহনবাগান ১—০ গোলে একক লীগের দ্বিতীয় দল ইস্ট বেংগলকে পরাজিত করে। কিন্তু ওই দিন খেলার আগেই কলকাতার পুলিস কমিশনার এক চিঠিতে আই এফ একে জানিয়ে দেন, রাজ্যের অশান্ত অবস্থা এবং নানাবিধ কারণের জন্য শান্তি রক্ষার জন্য মাঠে পুলিস পাঠানো সম্ভব হবে না। পুলিসের উপস্থিতি সত্ত্বেও ফুটবল মাঠে যেখানে এত অশান্তি সেখানে পুলিস বিহীন মাঠে খেলা অসম্ভব। রাজ্যের অশান্ত অবস্থা, নানা সংস্থায় ধর্মঘট, পুজোর ডামাডোল তার উপর অন্তর্বর্তী নির্বাচন। ফলে খেলার ব্যাপারের চেয়ে অন্য ক্ষেত্রে পুলিসের কর্তব্য ও দায়িত্ব অনেক বেশী। কিন্তু আমার মনে হয় অন্য গুরু দায়িত্বই মাঠে পুলিস না পাঠাবার একমাত্র কারণ নয়।

আই এফ এ-র সভাপতি শ্রীস্নেহাংশু-কান্ত আচার্য বহু ব্যাপারে তাঁর সংস্থার কাজকর্মের সঙ্গে একমত হতে না পেরে পদত্যাগ করেছেন। ফুটবলের প্রশাসনিক গলদ সম্পর্কে রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরের কাছে শ্রীআচার্য এক অনুসন্ধান কমিটি স্থাপনেরও আবেদন জানিয়েছেন। এদিকে খেলার ব্যাপারে ইনজাংশন এবং আই এফ এ-র বিরুদ্ধে মামলা-মকদ্দমারও অভাব নেই। কে জানে, পুলিস কমিশনারের উল্লিখিত 'নানাবিধ' কারণের মধ্যে এসব কারণও আছে কিনা। যাই হোক, কম খেলার সুবিধার অজুহাতে ফিরতি লীগের বদলে একক লীগের আয়োজন করা হলেও পাঁচ মাসের মরসুমের মধ্যে লীগ এবং শীল্ড কোন খেলাই শেষ হল না—এটা পরিচালক সংস্থার অযোগ্যতার চরম নিদর্শন। অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ খেলা আবার আদৌ অনুষ্ঠিত হয় নি। আই এফ এ-র কর্মকর্তারা (মাঠের খেলার বদলে) সভায় বসে জয়-পরাজয়ের রায় দিয়েছেন।

কলকাতার ফুটবল এবং মারডেকা প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখার আছে। সেটা পরে। আজ অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্টের কথা খুব সংক্ষেপে সেরে নিই। প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্টের পর্যালোচনা আগেই হয়ে গিয়েছে।

অনিবার্য কারণবশত বর্তমান সপ্তাহে অরণ্যদেব প্রকাশিত হল না। আগামী সংখ্যা থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হবে।

*

ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ইংলন্ড ও অস্ট্রেলিয়ার এই ৪৯তম টেস্ট সিরিজের প্রথম খেলায় অস্ট্রেলিয়া ১৫৯ রানে ইংলন্ডকে পরাজিত করে; লর্ডস, এজবাসটন ও লীডস মাঠে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ টেস্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর ওভ্যাল মাঠের পঞ্চম ও শেষ টেস্ট খেলায় ইংলন্ড বিজয়ী হয় ২২৬ রানে। ফলে টেস্ট সিরিজ অমীমাংসিত থেকে যায়। বর্তমানে দুই দেশের খেলার ফলাফল এই রকম ঃ

টেস্ট সিরিজ ৪৯—অস্ট্রেলিয়ার রাবার ২২ বার, ইংলন্ডের রাবার ২১ বার, ৬ বার সিরিজ ড্র। মোট টেস্ট ২০৩—অস্ট্রেলিয়ার জয় ৮০ বার, ইংলন্ডের জয় ৬৬ বার, ড্র ৫৭ বার।

সুতরাং সিরিজ জয় এবং টেস্ট জয় দু' দিক দিয়েই অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে। অ্যাংলো অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট যুদ্ধের কাল্পনিক 'অ্যাশেজ'ও এখন অস্ট্রেলিয়ার হাতে।

তৃতীয় টেস্ট—এজবাসটন

ইংলন্ডের দুর্ভাগ্য সর্ব বিভাগে পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয় দিয়েও লর্ডসের দ্বিতীয় টেস্টে তারা জিততে পারেনি বৃষ্টির জন্য। এজবাসটন টেস্টেও জল বৃষ্টি ইংলন্ডের জয়ের প্রতিবন্ধক হয়েছে। জলের জন্য প্রথম দিনের খেলা আদৌ অনুষ্ঠিত হয় নি, অর্থাৎ মাঠে একটিও বল পড়ে নি। পঞ্চম ও শেষ দিনে খেলার অবস্থা যখন ইংলন্ডের অনুকূলে এবং অস্ট্রেলিয়ার পরাজয়ের আশঙ্কা তখন বৃষ্টি মধ্যাহ্নভোজের আগেই খেলার উপর যবনিকা টেনে আনে। আর খেলা হয় না। ফলে ফলাফল থাকে অমীমাংসিত।

তবে জলের জন্য ইংলন্ডের জয়ের সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছে বলা গেলেও লর্ডস টেস্টের মত এজবাসটনেও অস্ট্রেলিয়া বেঁচে গিয়েছে জলের জন্য, এ কথা বলা সাজে না। কারণ, প্রথম ইনিংসে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিলেও অস্ট্রেলিয়া ৩২৯ রানের ঘাটতি নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেছে। শেষ দিন মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে যখন খেলা বন্ধ হয়ে যায় তখন স্কোর বোর্ডে তাদের ১ উইকেটে ৬৮। ৯টি উইকেট তখনও বাকি। বাকি সাড়ে তিন ঘণ্টায় তাদের ৯টি উইকেট পড়ে যেতই, এ কথা বলা যায় না। জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করতে গেলে অবশ্য উইকেট পড়তে আরম্ভ করত। কিন্তু অবস্থানুযায়ী তাদের পক্ষে পরাজয় এড়ানো খুব অসম্ভব ছিল না, যদিও প্রথম ইনিংসের শেষ পাঁচটি উইকেট পড়ে গিয়েছিল মাত্র ৯ রানের মধ্যে। যাই হোক, খেলার অবস্থা যে সম্পূর্ণ ইংলন্ডের অনুকূলে ছিল এবং তাদের জয়েরও ছিল স্বর্ণসম্ভাবনা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইংলন্ডের মারমুখী ও চিত্তাকর্ষক ব্যাটসম্যান কলিন মিলবার্ন, যিনি লর্ডস টেস্টে ব্যাটিং-এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে সমগ্র দলের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন তাঁর অনুপস্থিতিতেও তৃতীয় টেস্টে ইংলন্ড সর্ববিভাগে ভাল খেলেছে। কাউন্টি ম্যাচে হাতের আঙুলে চোট লাগায় মিলবার্ন তৃতীয় টেস্টে খেলতে পারেন নি।

এজবাসটন টেস্টকে নিঃসন্দেহে ইংলন্ডের অধিনায়ক কলিন কাউড্রের টেস্ট বলে অভিহিত করা যায়। কারণ, এটি ছিল কাউড্রের জীবনের শততম টেস্ট। খেলেছেনও অধিনায়কের মত। বলা দরকার, জীবনের শততম টেস্টে তিনি সেঞ্চুরিও করেছেন—এই সিরিজে ওটাই ছিল দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রথম সেঞ্চুরি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর ঃ

ইংলন্ড—প্রথম ইনিংস ৪০৯ রান (এম সি কাউড্রে ১০৪, টম গ্রেভনি ৯৬, জন এডরিচ ৮৮, জিওফ বয়কট ৩৬, রে ইলিংওয়ার্থ ২৭; এরিক ফ্রিম্যান ৭৮ রানে ৪ উইকেট, অ্যালান কনোলী ৮৪ রানে ৫ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস ২২২ রান ইয়ান চ্যাপেল ৭১, বব্ কাউপার ৫৭, ডগ ওয়াল্টার্স ৪৬; রে ইলিংওয়ার্থ ৩৭ রানে ৩ উইকেট, ডেরেক আন্ডারউড ৩৭ রানে ৩ উইকেট)।

ইংলন্ড—(৩ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড) ১৪২ রান (জন এডরিচ ৬৪, টম গ্রেভনি ৩৯, জিওফ বয়কট ৩১; অ্যালান কনোলী ৫৯ রানে ২ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া—১ উইকেটে ৬৮ (বব্ কাউপার নট-আউট ২৫)।

[খেলা অমীমাংসিত]

চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

একলব্য

"সংঘর্ষ" হিন্দী চিত্রে দিলীপকুমার ও বৈজয়ন্তীমালা

"ব্রহ্মচারী" : প্রাণ, শাম্মী কাপুর ও মমতাজ

রংগ ব্যংগ

নতুন বাংলা ছবি

কিছু কাল আগেও যাঁরা আশঙ্কা করছিলেন পুজোয় নতুন বাংলা ছবি দেখতে পাবেন কী পাবেন না, এবার তাঁরা নিশ্চিন্ত। পুজোর আগে কয়েকটি বাংলা ছবি মুক্তি পেয়েছে। দর্শকেরাও নতুন ছবি পেয়ে আনন্দিত। প্রেক্ষাগৃহে তাঁদের ভিড় লেগেই আছে। সদ্য-মুক্ত কয়েকটি ছবির আলোচনা নীচে দেওয়া হল।

আলোচ্য মাসে তিনটি বাংলা ছবি মুক্তি পায়। ছবি তিনটি হল "রক্তরেখা", "আদ্যাশক্তি মহামায়া" ও "বাঘিনী"।

"রক্তরেখা" (উমাপ্রসাদ মৈত্র পরিচালিত) [illegible] বোম্বাই ক্রাইম চিত্রের আঙ্গিকে [illegible] নায়িকাও দেবশ্রী রায়ের [illegible] চৌধুরী। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় নায়ক। [illegible] কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখার্জী, নিরঞ্জন রায়, সাবিত্রী দত্ত প্রভৃতি।

আদ্যাশক্তি মহামায়া (পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী পরিচালিত) নিয়মমাফিক বহু অলৌকিক ঘটনা সংবলিত পৌরাণিক-ভক্তিমূলক চিত্র। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও [illegible] চক্রবর্তী ছবির মুখ্য শিল্পী।

গত দুই মাসে যে হিন্দী চিত্রগুলি মুক্তি পেয়েছে তার মধ্যে তিন বহুরানিয়াঁ, [illegible], দো কলিয়াঁ, পরিবার, আদমী, মেরে হমদম মেরে দোস্ত, ঝুক গয়া আসমান প্রভৃতি উল্লেখ্য। অধিকাংশ ছবিই তারকা-[illegible]। জেমিনির **"তিন বহুরানিয়াঁ"** এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। পরিবার-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথা "পরিবার" চিত্রে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। এরই সঙ্গে রয়েছে নাট্যকাহিনী। "দো কলিয়াঁ" এবং **"মেরে হমদম মেরে দোস্ত"** ছবি দুটিতেও দর্শকেরা কিছুটা নতুনত্ব পেয়েছেন। কলকাতার প্রযোজক [illegible] বনসালের প্রথম রঙিন হিন্দী ছবি **"ঝুক গয়া আসমান"**-এর কাহিনীও অনেকটা নতুন ধরনের। প্রমোদ-গুণ সংবলিত এই ছবিগুলি বিভিন্ন রসের ও মেজাজের। সমালোচকের দৃষ্টিতে অবশ্য কোন ছবিই সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন নয়।

বাঘিনী

রবিন হুডের বেলায় "এন্ড জাস্টিফায়েস দি মীনস" নীতি বেশ সহজেই মেনে নেওয়া যায়। "বাঘিনী"র (এস এম ফিল্মস) একদা-বিপ্লবী পরে চোলাই-মদকারবারী নায়কের ক্ষেত্রে **এই** ধরনের একটি সুবিধা-জনক যুক্তি কেমন যেন অস্বস্তিকর। রোমাঞ্চক গল্প শুধু গল্পই, তাতে যুক্তির বালাই না থাকলেও চলে। রোমাঞ্চটুকু পেলেই যথেষ্ট। "বাঘিনী" যে আবার বক্তব্যময়। সমাজের বিচার-অবিচার, ন্যায়-অন্যায়, ব্যক্তিজীবনে প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি নিয়ে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ কথা ছবিতে আছে। আসলে সিনেমার পর্দায় যা শুধুই গল্প হতে পারত (মূল রচনা: সমরেশ বসু), পরিচালক তাতে আবার কিছু প্রশ্ন ও গভীর চিন্তার ইন্ধন যুগিয়েছেন। দর্শকের মনে সমাজ-ভাবনা জাগাবার এই ইচ্ছা-কৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত প্রয়াস "বাঘিনী" নিশ্চিন্ত মনে উপভোগের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এই ছবি দেখে যাঁরা আধুনিক জীবন, নৈতিক অবক্ষয়, "ফ্রাস্ট্রেশন" ইত্যাদি বিষয়ে মনোযোগ দেবেন তাঁরা শুধুই বিপাকে পড়বেন। নতুবা চোলাই-মদের কারবারের টাকা দিয়ে গরীব-দুঃখীর উপকার করে গ্রামবাসীর কাছে রবিন হুডের মত দেবতা হয়ে যাওয়ার আধুনিক রূপকথা দেখতে তো ভাল লাগবারই কথা। তার উপর নায়িকা যেখানে বাঘিনী (গ্রামের লোক তাকে তাই বলে), অসম্ভব তেজী, পরনের কাপড় আঁট-সাঁট বাঁধা হাঁটুর অল্প নীচে, বেশ কিছু সময়ের জন্য ব্লাউজ-হীনা। নায়ক-নায়িকার প্রেম প্রায় শেষ অবধি নিরুচ্চার। বুঝি প্রেমপ্রকাশের সুযোগ তাদের নেই। অনবরত আবগারি পুলিসের সঙ্গে বুদ্ধির লড়াই, গোপনে মদ পাচারের ঝামেলা, পরোপকার ইত্যাদি কাজের ফাঁকে তারা হয়ত ঘর বাঁধবার কথা ভাবতেই পারে নি। নায়ক কিন্তু কিছুতেই ধরা পড়ে না। মাঝে-সাঝে আবগারি

দারোগাকে বেশ কটু কথা শুনিয়ে আসে। দারোগার স্ত্রীর মনে আবার নায়কের প্রতি ক্ষণে ক্ষণে অপরিসীম সহানুভূতি জেগে ওঠে। এমন সহানুভূতি যা প্রণয়কে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। পরিচালক-চিত্রনাট্যকার এখানে জীবনবোধসম্পন্ন একটি স্বাভাবিক জট সৃষ্টি করতে পারতেন। সেদিকে তিনি যান নি। দারোগার স্ত্রীকে দিয়ে স্বামীকে কিছু নীতিকথা শুনিয়েছেন, নায়ক প্রসঙ্গে। ওই চরিত্রটি যেন যাত্রার দলের বিবেক।

বিচার-বিশ্লেষণে যত ভুলত্রুটিই ধরা পড়ুক, "বাঘিনী" আমোদ-পিপাসুদের তুষ্ট করবে। দর্শকের উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার খোরাক ছবির প্রতি পর্বেই রয়েছে। ছবির গান (হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরারোপিত ও গীত) ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়েছে। পরিচালক বিজয় বসুর প্রয়োগ-কর্ম সাধারণভাবে সুষ্ঠু। কিছু কিছু দৃশ্যবিন্যাসে তিনি পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। আবার প্রয়োজনমত জলো আবেগও রেখেছেন। নায়ক কেন সমাজের প্রতি বিরক্ত এবং কেন সে মূল্যবোধ হারিয়েছে সে সব ঘটনা ফ্ল্যাশব্যাকে ভালভাবেই দেখানো হয়েছে।

দুর্বল বিষয়বস্তু সত্ত্বেও কয়েকজন শিল্পীর অভিনয়-ক্ষমতা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এঁদের মধ্যে প্রথমেই নায়কবেশী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম করতে হয়। রবি ঘোষ ও জহর রায়ের চরিত্রচিত্রণও দেখবার মত। সন্ধ্যা রায়কে বাঘিনী ভাবতে একটু অসুবিধা হয়। যদিও শিল্পী তাঁর স্বাভাবিক অভিনয়-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে বিকাশ রায়, রুমা গুহঠাকুরতা, অজয় গাঙ্গুলী, তরুণকুমার, শমিতা বিশ্বাস প্রভৃতির অভিনয় যথাযথ। একটি নৃত্যের দৃশ্যে রাখী বিশ্বাস (অতিথি শিল্পী) দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর অভিব্যক্তি চমৎকার।

দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ফটোগ্রাফি আগাগোড়া উঁচু মানের।

তিন অধ্যায়

"তিন অধ্যায়"-এর (অপ্সরা ফিল্মস) প্রতিটি অধ্যায়েই নাট্যচমক আছে। তার উপর রয়েছে নায়ক বাণীব্রতবেশী উত্তম-কুমারের অসাধারণ অভিনয়। কৌতুকেরও বিরাম নেই (জহর রায়, বঙ্কিম ঘোষ ও অনুপকুমার দর্শকদের প্রাণ খুলে হাসবার সুযোগ দিয়েছেন)।

নায়ক বাণীব্রত সহোদরা মল্লিকার মৃত্যুর পর (মোটর দুর্ঘটনায়) শোকে মুহ্যমান। যদিও শোকপর্ব দেখে মনে হয় না নায়ক ভগিনীবিয়োগের জন্য কাতর। পত্নী শোকের কথাই মনে হয়। বাণীব্রত বড় ব্যবসায়ী। তারই অফিসে চাকুরি নিয়ে এসেছে জয়ন্তী (সন্ধ্যা রায়)। দেখতে অবিকল মল্লিকার মত। এ ক্ষেত্রে সাসপেন্স-এর উপাদান রয়েছে। কাহিনী (শৈলেশ দে রচিত) ফাঁস করে দেওয়া সমীচীন নয়।

তবে এটুকু বলা যেতে পারে যে, বাণীব্রত ও জয়ন্তীর মেলামেশা নিয়ে জয়ন্ত ও জয়ন্তীর মধ্যে (এরা একই অফিসে চাকুরি করে এবং প্রণয়-প্রণয়ী) ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি। যথাসময়ে তার নিষ্পত্তিও ঘটেছে। এবং তখনই বাণীব্রত তার অফিসের একদা-কর্মচারী এবং পরে হোটেল নর্তকী শেফালীর (সুপ্রিয়া দেবী) অন্তরের পরিচয় জানতে পেরেছে, এবং তাকে জীবনে গ্রহণ করেছে। শেফালী ও তার বোন মিলির উপাখ্যানেও প্রবঞ্চিত নারী-জীবনের নাটক আছে।

এক কথায়, নাটকীয় ঘটনা ও ঘাত-প্রতিঘাতের ছবি "তিন অধ্যায়"। সব "সিচুয়েশন" যে বাস্তবধর্মী তা নয়। কাঁচা আবেগও যথেষ্ট। কোন কোন ঘটনার যুক্তি নেই বললেই চলে। তবু ছবিটি কৌতূহল নিয়ে দেখতে হয়। এইখানেই পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তীর কৃতিত্ব। তা-ছাড়া বড় বক্তব্যের কোন ভণিতা নেই ছবিতে। এটাও দর্শকের পক্ষে সুখের কথা। সুপ্রিয়া দেবীর অভিনয়ের জন্য (তাঁর

"অদ্বিতীয়া" ছবিতে ডেইজি ইরাণি ও প্রেমাংশু বসু

'বালুচরী'র নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
ফটো-দেশ

ক্যাবারে নাচও উল্লেখ্য) ছবিটি চিত্তাকর্ষক হয়েছে। দু'একটি মুহূর্তে শিল্পী চমৎকার অভিনয় করেছেন। জয়ন্ত ও জয়ন্তীর ভূমিকায় অজয় গাঙ্গুলী ও সন্ধ্যা রায়ের অভিনয় মনোগ্রাহী।

মান্না দে-র গাওয়া দুটি গান জনপ্রিয় হবে। ভাল সুর দিয়েছেন সংগীত পরিচালক গোপেন মল্লিক। কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজে বিশেষ প্রশংসনীয় ফটোগ্রাফি (রামানন্দ সেনগুপ্ত) ও শিল্প-নির্দেশনা (প্রসাদ মিত্র)।

এ-সপ্তাহে "বালুচরী"

রাধারানী পিকচার্স-এর "বালুচরী" (কাহিনী : আশাপূর্ণা দেবী) এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত এ ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, অনুপকুমার, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, জহর রায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, গঙ্গাপদ বসু, অজয় গাঙ্গুলী প্রভৃতি। রাজেন সরকার সংগীত পরিচালনা করেছেন।

ব্রহ্মচারী ও সংঘর্ষ

দুটি হিন্দী চিত্র এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। একটি "ব্রহ্মচারী", (পরিচালনা : ভাপী সোনী), অপরটি "সংঘর্ষ" (পরিচালনা : এইচ এস রাওয়েল)। শাম্মী কাপুর ও রাজশ্রী "ব্রহ্মচারী"র নায়ক-নায়িকা। দিলীপকুমার ও বৈজয়ন্তীমালা "সংঘর্ষ-র" দুটি প্রধান চরিত্রের শিল্পী। দুটি ছবিই ইস্টম্যান কালারে তৈরি।

অদ্বিতীয়া

এ আর সি প্রোডাকশন্স-এর "অদ্বিতীয়া" এ সপ্তাহেই মুক্তি পাচ্ছে। নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত এ ছবির প্রধান চরিত্রগুলির রূপ দিয়েছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, সর্বেন্দ্র ,বিকাশ রায়, ডেইজি ইরাণি, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, দিলীপ রায় প্রভৃতি। সংগীত রচনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

"প্রতীক" : একটি নতুন নাট্য-সংস্থার জন্ম

"প্রতীক" নামে নতুন নাট্যসংস্থা গঠিত হয়েছে। মঞ্চে অভিনয় করে এযাবৎ বহু দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন এমন একাধিক শিল্পী এই সংস্থায় রয়েছেন। এ'দের মধ্যে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম অগ্রগণ্য। তা ছাড়া চলচ্চিত্রে অভিনয় করে ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়েছেন এমন দুজন অভিনেতাও প্রতীক-এর নাট্যাভিনয়ে যোগ দিয়েছেন। এ'রা হলেন সর্বেন্দ্র ও শমিত ভঞ্জ। তা ছাড়া শিল্পীদলে রয়েছেন অসীমকুমার ও বাসবী নন্দী। প্রতীক রঙমহল মঞ্চে প্রথম অভিনয় করেন বিধায়ক ভট্টাচার্যের "মাটির ঘর"। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকটি পরিচালনা করেন। "মাটির ঘর"-এর অভিনয় আবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে। লতিকা দাশগুপ্ত, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, তপন চক্রবর্তী, আরতি চক্রবর্তী, সন্তোষ ঘোষাল, কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন।

প্রতীক-গোষ্ঠী মাটির ঘর-এর পর শ্যামলী, নতুন ইহুদী, কানাগলি, রবীন্দ্রনাথের শাস্তি প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করবেন।

বোম্বাই বিচিত্রা

বিখ্যাত কবি ও গায়ক, এককালের লোকসভার সদস্য, কিছু দিন যাবৎ অভিনেতা হিসেবে খ্যাত এবং পরিচিত মহলে অঙ্কনশিল্পী হিসেবেও প্রশংসিত হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কয়েক দিন আগে কলকাতা থেকে ফিরে এসেছেন। উনি কলকাতায় গিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়ের ছবি গুপী গাইন এবং বাঘা বাইন-এ অভিনয় করতে। পুরো বিংশ শতাব্দীটাই ও'র শরীরমনকে ঘিরে প্রায় ও'র বয়সের সাথেই একবিংশ শতাব্দী হতে চলেছে। তবু হারীনদা আজও এক পক্ককেশ শিশু। বর্তমানে বম্বের চিত্রজগৎ হারীনদার মুখে সত্যজিৎ রায়ের কথা শুনছে। ঘনিষ্ঠ মহল শুনছে তার থেকে আরও কিছু বেশী। সেই অতিরিক্তটুকু অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। বাঙালী পাঠক মাত্রেই সুকুমার রায়ের আবোলতাবোল-এর কথা জানেন। কিন্তু ভাবতে পারেন কী আবোলতাবোল-এর ইংরেজী অনুবাদের কথা? হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আবোলতাবোল-এর অধিকাংশ

কবিতাই ইংরেজীতে অনুবাদ করে ফেলেছেন। হারীনদা যে অসাধ্য সাধন করেছেন, তা যদি কোন কারণে ফাইলচাপা না হয়ে যায় তা হলে ইংরেজী পাঠক-সাধারণ এ অনুবাদের মাধ্যমে বাংলার অন্যতম শিশুসাহিত্যিককের সাথে পরিচিত হবে।

*

আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে 'নীচা নগর' করে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে পদার্পণ করেছিলেন লেখক-অভিনেতা-পরিচালক চেতন আনন্দ। তারপর আরো কয়েকটি ছবি তিনি করেছিলেন। তারপর আবার তিনি সরবে ফিরে এসেছেন 'হকিকৎ'-এর মাধ্যমে। সেই সময় থেকেই শ্রীআনন্দের ইচ্ছা যে, পাঞ্জাবের বিখ্যাত লোক-কথা 'হীর-রণঝা' নিয়ে একটি সঙ্গীত বহুল ছবি করেন। প্রচেষ্টাও শুরু হয়, কিন্তু পরিকল্পনা সময়সাধ্য হওয়ায় তিনি ইতিমধ্যে 'আখরি খত' ছবিটি করে ফেলেন। বর্তমানে চেতন আনন্দ 'হীর রণঝা' নিয়ে ব্যস্ত। পাঞ্জাবের একটি গ্রাম শ্রীআনন্দের হাতের মুঠোয়, সেই গ্রামে রাজকুমার এবং প্রিয়াকে নিয়ে 'হীর রণঝা'র কাজ আরম্ভ করতে কিছু-দিনের মধ্যেই রওনা হবেন চেতন আনন্দ। 'হীর-রণঝা'র কাব্যধর্মী সংলাপ এবং গীত লিখবেন বিখ্যাত উর্দু কবি ক্যায়ফি আজমী।

সরল শর্মা

রেকর্ডে "কবি"

এবার পূজোর গ্রামোফোন কোম্পানী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কবি" উপন্যাসের নাট্যরূপ লং-প্লে রেকর্ডে পরিবেশন করেছেন। সিনেমায় কবি, ঠাকুরঝি ও বসনের চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন রেকর্ডেও তাঁরা চরিত্রগুলির রূপ দিয়েছেন। এ'রা হলেন রবীন মজুমদার, অনুভা গুপ্তা ও নীলিমা দাস। এ ছাড়া হরিধন মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রভৃতি এতে অভিনয় করেছেন। কবির গানগুলি গেয়েছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। রেকর্ডিং শোনবার জন্য কাহিনীকার স্টুডিওতে গিয়েছিলেন।

তিন অধ্যায় : অজয় গাঙ্গুলী ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

তারাশঙ্করকে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন গ্রামোফোন কোম্পানির এ সি সেন, পিছনে পি দে

বাংলা রঙিন ছবি "চৈতালী"

অনেকদিন পর আবার রঙিন বাংলা ছবি তৈরি হচ্ছে। নাম "চৈতালী"। আর ডি বনসাল ছবিটির প্রযোজক। গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর কাহিনীর ভিত্তিতে ছবিটি পরিচালনা করবেন সুধীর মুখোপাধ্যায়। উত্তমকুমার ও তনুজা নায়ক-নায়িকা।

শচীন দেববর্মণ অনেককাল পর এই বাংলা ছবিতে সুররচনার দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁর সুররচনায় ছবির কয়েকটি গান লতা মঙ্গেশকার, মান্না দে ও আশা ভোঁসলের কণ্ঠে রেকর্ড করা হয়েছে।

এবার পূজায় মেগাফোন রেকর্ডে গান গেয়েছেন দুই জনপ্রিয় শিল্পী : সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও উৎপলা সেন ফটো—দেশ

রাণুর প্রথম ভাগ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের "রাণুর প্রথম ভাগ" ছবি হচ্ছে বলে সংবাদে প্রকাশ। "অদ্বিতীয়া"-র পরিচালক নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় ছবিটি পরিচালনা করবেন। আগামী মাসের শুরুতে শুটিং শুরু হবে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

বিভিন্ন রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের প্রতীক ধর্মঘট বর্তমান সপ্তাহের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গত ১৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বিভিন্ন স্থানে ধর্মঘটী কর্মচারী ও পুলিসের মধ্যে সংঘর্ষে এবং পুলিসের গুলি চালনার ফলে অন্তত ৬জন নিহত, প্রায় ৪০০জন আহত এবং সাড়ে চার হাজারের বেশী লোক গ্রেপ্তার হয়েছেন। পুলিসের গুলি চলেছে পাঠানকোটে, বিকানীরে এবং আসামের গৌহাটী ও মরিয়ানী স্টেশনে। গ্রেপ্তার হয়েছেন দিল্লিতে তিন হাজার, রাজস্থানে সাড়ে পাঁচ শো' পাঞ্জাব হরিয়ানায় ৮২৭, বিহারে ১২৬, উত্তরপ্রদেশে শতাধিক। সরকারী অফিসসমূহ ছুটি হবার পর যে খবর দিল্লিতে পাওয়া গিয়েছে তাতে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট অংশত সফল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ধর্মঘটের যে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে আসাম ছাড়া অন্যান্য রাজ্যে ট্রেন চলাচল প্রায় স্বাভাবিক ছিল। কলকাতা সহ এই রাজ্যের সর্বত্র কেন্দ্রীয় সরকারের নানা অফিস থেকে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার অস্থায়ী কর্মচারীকে প্রতীক ধর্মঘট পালনের জন্য বরখাস্ত করা হচ্ছে।

দেশী সংবাদ

১৬ সেপ্টেম্বর—সরকারী প্রশাসনমন্ত্রী ও তাঁর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে প্রশাসন সংস্কার কমিশন যে সুপারিশ পেশ করেছেন, তাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সংহতি, দ্রুত কার্যানুষ্ঠান এবং সুষ্ঠু ও বাস্তব পরিচালনার জন্য কেবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রীর (পূর্ণ মন্ত্রী) সংখ্যা ১৬-তে সীমিত করার প্রস্তাব করেছেন।

পারলামেন্টের ১২৫ জন অকম্যুনিসট সদস্য এক যুক্ত বিবৃতিতে পিকিং-এর সংগে কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ, রাষ্ট্রসংঘে চীনের সদস্যপদ লাভের সমর্থনে বিরতি এবং তাইওয়ান রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দানের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

১৭ সেপ্টেম্বর—বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের প্রস্তাবিত প্রতীক ধর্মঘটের মোকাবিলা করার জন্য সরকার যেমন প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছেন, তেমনি জলন্ধর থেকে আজ ৩০ জনের গ্রেফতারের সংবাদ পাওয়া গেছে। ভারত সরকার এই ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে যে-সব অরডিন্যান্স জারি করেছেন, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা সেগুলির বৈধতা চ্যালেনজ করবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

কলকাতা শহরে এখন প্রায় দু-হাজার জরাজীর্ণ ভগ্নদশাগ্রস্ত বাড়ি বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুলছে এবং যে কোন মুহূর্তে এগুলি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়া আরও প্রায় ১৬ হাজার বাড়ির অবস্থা খুবই খারাপ।

১৮ সেপ্টেম্বর—কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের প্রস্তাবিত ২৪ ঘণ্টাব্যাপী প্রতীক ধর্মঘট বৃহস্পতিবার শুরু হচ্ছে। এই ধর্মঘটের মোকাবেলার জন্য কলকাতাসহ পশ্চিম বাংলায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সর্ববিধ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিতে সামরিক বাহিনীর ও সশস্ত্র পুলিস বাহিনীর লোক নিযুক্ত করা হয়েছে।

পধান বিচারপতি শ্রী আই ডি ডুয়া এবং বিচারপতি শ্রী এস এন শঙ্করকে নিয়ে গঠিত দিল্লি হাইকোরটের মোশন বেঞ্চ আজ একটি দরখাস্ত গ্রহণ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের প্রস্তাবিত প্রতীক ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে যে অরডিন্যানস জারি করা হয়েছে, দরখাস্তটিতে তার বৈধতা চ্যালেনজ করা হয়েছে।

১৯ সেপ্টেম্বর—আজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে কলেজ স্ট্রীটের উপর নকসালপন্থী ছাত্রদের সংগে পুলিসের খণ্ডযুদ্ধ বাধে এবং তা চলে প্রায় দু-ঘণ্টা। অন্যান্য কাজে এদিনের হাঙ্গামায় কোন পক্ষ গ্রহণ করেননি।

কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যানডারড এবং স্টেটসম্যানের অসাংবাদিক কর্মচারীরা আজ সন্ধ্যায় তাঁদের ৫৯ দিনব্যাপী ধর্মঘট প্রত্যাহারের এবং আগামীকাল সকাল ১১টা থেকে কাজে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

২০ সেপ্টেম্বর—আলজিরিয়ার সংগে সম্পর্ক-উন্নতির নতুন প্রচেষ্টায় খুব উৎসাহী না-হওয়ার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতকে পরামর্শ দিয়েছে। সোভিয়েট-ভারত আলোচনাকালে রুশ প্রতিনিধি দল এই মন্তব্য করেছেন বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়েছে।

ধর্মঘটী রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কয়েকজন কর্মীর উপর পুলিসী জুলুমের প্রতিবাদে আজ বেলা দুটো নাগাদ নিউ সেকরেটারিয়েটের অধিকাংশ কর্মী হঠাৎ কাজ বন্ধ করে দেন। পরে তারা প্রবল বিক্ষোভ দেখান। ধর্মঘটী কর্মীদের উপর পুলিস লাঠি চারজ করে বলেও অভিযোগ করা হয়।

২১ সেপ্টেম্বর—আগামী ১৭ নবেম্বর পশ্চিমবঙ্গে অন্তবর্তী নির্বাচন হবে। ভারতের মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রী এস পি সেনবর্মা আজ মহাকরণে এক সাংবাদিক বৈঠকে এই চূড়ান্ত তারিখ ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট উভয়েই আনন্দ প্রকাশ করেন।

আজ দুপুরে ডায়মনডহারবারে এক ট্রেন দুর্ঘটনায় ৪ জন নিহত ও ৮ জন আহত হয়েছেন। একটি বিকল ট্রেন অন্য একটি ট্রেনের ধাক্কার চোটে শিকল ছিঁড়ে বাফার ভেঙে হুড়মুড় করে প্ল্যাটফরমের উপর প্রায় ৪০ ফুট উঠে গিয়ে স্টেশন অফিসের দেওয়াল চুরমার করে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে।

২২ সেপ্টেম্বর—একই দিনে মহালয়া, সূর্য-গ্রহণ এবং চূড়ামণিযোগ, কাজেই আজ কলকাতার গংগার ঘাটগুলি পুণ্যার্থীদের ভিড়ে ভোর থেকে রাত্রি পর্যন্ত সরগরম। এই ব্রহ্মস্পর্শে গংগায় স্নান করতে গিয়ে ছয়জন জলে ডুবে যান। তাঁদের মধ্যে একজনের হাসপাতালে মৃত্যু হয়। বাকি সব নিখোঁজ।

বন্যা-পীড়িত অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার পানীয় জল সরবরাহের জন্য দু হাজার নলকূপ খনন করছেন। এর জন্য খরচ পড়বে ৩২ লক্ষ টাকার মত।

বিদেশী সংবাদ

১৬ সেপ্টেম্বর—গত সপ্তাহের শেষের দিকে প্রবল বর্ষায় দক্ষিণ-পূর্ব ইংলনডকে বন্যা-প্লাবিত অঞ্চলে পরিণত করেছে। শত শত লোক গৃহহারা হয়েছেন এবং প্রচুর শস্য বিনষ্ট হয়েছে।

১৭ সেপ্টেম্বর—নিউ ইয়রকের মেমোরিয়াল হাসপাতালে অমনালীতে ক্যানসার অস্ত্রোপচারের পর মাদরাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীআন্নাদুরাই এখন স্বস্তির সংগে বিশ্রাম করছেন।

পরতুগালের একচ্ছত্র নেতা ৭৯ বৎসর বয়স্ক প্রধানমন্ত্রী ডঃ এনটোনিও সালাজার এখন মরণ মুহূর্ত গুনছেন। তাঁর মস্তিষ্কের রক্তের চাপ অপসারণের জন্য তাঁর ওপর অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল।

১৮ সেপ্টেম্বর—পরীক্ষামূলক সর্বশেষ সোভিয়েট রকেটটি চাঁদের কাছে গিয়ে আবার ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসছে বলে বৃটিশ বিজ্ঞানীরা যে খবর দিয়েছিলেন, আজ সোভিয়েট সরকারের একজন মুখপাত্র তা অস্বীকার করে বলেছেন যে, তা ঠিক নয়।

ইউ পি আই-এর খবরে প্রকাশ : এশিয়ার নবতম চাল রফতানিকারী দেশ ফিলিপিনস ভারতে ২৫ হাজার মেট্রিক টন চাল পাঠাবে।

১৯ সেপ্টেম্বর—আজ মালয়েশিয়া ম্যানিলা থেকে তার কূটনৈতিক কর্মচারীদের ফিরিয়ে আনা এবং অবৈধভাবে মাল পাচার বিরোধী চুক্তির অবসানের কথা ঘোষণা করেন।

২০ সেপ্টেম্বর—পশ্চিম জারমানীর মহাকাশ গবেষণা সংস্থার ডিরেকটর গতকাল বলেছেন—সোভিয়েট ইউনিয়ন চন্দ্রলোকে মানুষ পাঠাতে চলেছে এবং সেটা আসন্ন। সোভিয়েট মহাকাশ যান থেকে বেতারে যে মানব-কণ্ঠ শোনা গিয়েছে, তা থেকেই এ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে।

কিউবা সরকার গত শনিবার হাভানায় ভারতীয় উদ্ভিদ রোগ বিদ্যাবিদ ডঃ আর এস বাসুদেবকে গ্রেফতার করেছেন। ডঃ বাসুদেব রাষ্ট্রপুঞ্জের অধীনে কিউবার একটি কৃষি প্রকল্পে কাজ করছিলেন। কিউবা সরকারের অভিযোগ—ডঃ বাসুদেব নাকি কিউবার কফি গাছগুলিতে রোগ বীজাণু ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন।

২১ সেপ্টেম্বর—আজ লনডন বিমান বন্দরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সংগে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব ও কমনওয়েলথ সচিবের আধ ঘণ্টা ধরে কথাবার্তা হয়। লাতিন আমেরিকা যাবার পথে তিনি লনডন বিমান-বন্দরে অবতরণ করেন।

চেকোশ্লোভাক কম্যুনিসট সরকারের সরকারী বেতারে আজ ঘোষণা করা হয়েছে যে, জনমত নিয়ে দেখা যায়, সকলেই রুশ সেনাদের চেক-ভূমি ছেড়ে চলে যাওয়ার অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন। গত ২১ আগসট সোভিয়েট রাশিয়া চেকভূম দখল করে।

২২ সেপ্টেম্বর—মসকো থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, একখানা মহাকাশ-যান, রুশরা তার নাম দিয়েছে "জনড—৫" চাঁদের আকাশ-পথে ঘুরিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে এবং নির্বিঘ্নে ভারত মহাসাগরের নির্দিষ্ট স্থানে নেমে পড়েছে।

বুলগেরিয়ায় রুশ সৈন্য সমাবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আলবেনিয়া বুলগেরিয়ার কাছে চিঠি দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে : বুলগেরিয়া তার নিজ দেশকে আগ্রাসনের ঘাটিতে পরিণত করলে গুরুতর ঝুঁকি নেবে।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৫ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪০
শনিবার ১৮ আশ্বিন ১৩৭৫

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীদীপ্তাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	... ২৫.০০
ষাণ্মাসিক	... ১২.৫০
ত্রৈমাসিক	... ৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	... ৩০.০০
ষাণ্মাসিক „	... ১৫.০০
ত্রৈমাসিক „	... ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	... ৩০.০০
ষাণ্মাসিক „	... ১৫.০০
ত্রৈমাসিক „	... ৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	... ৫২.০০
ষাণ্মাসিক „	... ২৬.০০
ত্রৈমাসিক „	... ১৩.০০

অন্যান্য দেশে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	... ৬১.০০
ষাণ্মাসিক	... ১১.৫০
ত্রৈমাসিক	... ১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাশুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

DESH

Saturday 5 October, 1968

দুর্গোৎসবের পর

আমাদের পাঠক, অনুগ্রাহকবর্গ, লেখকদের বিজয়ার অভিনন্দন জানাই। যাঁদের সঙ্গে আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছার বন্ধন দীর্ঘকালের, যাঁদের সহানুভূতি, উৎসাহ ও আনুকূল্যে আমাদের পত্রিকার চলার পথটি নির্বিঘ্ন হতে পেরেছে তাঁদের সকলের প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা থাকল; প্রার্থনা করি তাঁদের জীবন সুখে সম্পদে আনন্দময় হোক।

বাংলা দেশের যিনি আনন্দের প্রতিমূর্তি সেই আনন্দময়ী মাত্র কয়েক দিনের জন্যে আমাদের মধ্যে এসেছিলেন, আবার বিদায় নিয়েছেন। এ কথা বলতে বাধে যে, তিনি বড় সুসময়ে এসেছিলেন, বরং এ বছরের দিনগুলি বেশ মলিন। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব ক'টি জেলা এবারে প্রচুর বর্ষণে বন্যাপ্লাবিত হয়েছে, বিশেষত গত অগাস্ট মাসের বন্যায় এই রাজ্যের বহু জেলা বন্যাবিধ্বস্ত, প্রাণহানি অত্যধিক না হলেও এই বন্যায় গৃহ, আশ্রয়, শস্যাদি এবং গবাদি পশুর ক্ষতি হয়েছে ভয়াবহ। বস্তুত এখনও সাড়ে ছ' হাজার বর্গমাইল এলাকার প্রায় সত্তর লক্ষ মানুষ এই বন্যার শোচনীয় ফলভোগ করছে। গৃহহীন, অন্নহীন দুর্গত এই মানুষদের কথা ভাবলে মনে হয় না আনন্দময়ীর আগমনে তেমন একটা আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেছে বাংলা দেশে। অবশ্য এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ করার ক্ষমতা আমাদের এখনও হয় নি এই মাত্র সান্ত্বনা পাওয়া যেতে পারে, এবং সেই বিবেচনায় আংশিক দুঃখ ও দুর্ভাগ্যকে আমরা ভুলে থাকার চেষ্টা করতে পারি। বন্যা মহামারীর মধ্যেও কি বাঙালীর দুর্গোৎসব থেমে থাকে! তা অবশ্য থাকে না। তার প্রমাণ এবারের দুর্গোৎসবের ঘটা ও আয়োজন। শহর, শহরতলি, গ্রামাঞ্চল কোথাও তেমন দুর্গাপুজার আয়োজনের অভাব ঘটে নি, পুজার সংখ্যা কোথাও কোথাও বেড়েছে। এ যেমন সত্য, সেইরকম এটাও সত্য যে, পুজোর মুখে এই রাজ্যের অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রতাও যথেষ্ট অনুভব করা গেছে। একদা শহর কলকাতায় পুজার বিকিকিনি চলত গোটা একটা মাস জুড়ে, বিশেষ করে শেষের এক পক্ষ ছিল চড়া মরসুম, সে তুলনায় এবার পুজোর বাজার অনেক নরম, শেষ কয়েক দিন কিছু কেনাবেচা হয়েছে। এর কারণ সহজেই অনুমেয়। মানুষের হাতে ইদানীং পয়সা কমছে, নানা কলকারখানায় হয় গোলমাল চলছে, না হয় ধর্মঘট, কিছু কিছু তো একেবারেই বন্ধ। আমাদের শিল্প দিন দিন এমন মুমূর্ষু হয়ে পড়ছে যে, একে পুনরুজ্জীবিত করার কথা চিন্তাই করা যায় না। এর ওপর গত উনিশে সেপ্টেম্বরের প্রতীক ধর্মঘটের জের এখনও চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরাই শুধু এতে জড়িয়ে পড়েন নি, সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী অনেক কিছুই এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। ছোটখাটো বিঘ্ন আরও অনেক ব্যাপারেই এবার আমাদের দুর্গোৎসবের প্রতিবন্ধক হয়েছে। একমাত্র আশ্বাসের কথা, সাধারণভাবে এবারে চালের বাজার ভাল, অর্থাৎ শহরতলিতে চালের দর কিলোপ্রতি টাকা দেড়েক নেমেছে এবং শহর কলকাতার উপকণ্ঠেও দু' টাকার অনেক কমে চাল পাওয়া যাচ্ছে। গত বছর এ সময় চালের দাম উঠেছিল কিলোপ্রতি পাঁচ টাকা।

পুজোর এই মরসুমে আরও একটি ব্যাপারে জোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে, সেটা হল : পশ্চিম বাংলায় মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি। আগামী নভেম্বরেই নির্বাচন। অনেকে আশা করেছিলেন নির্বাচন বুঝি শীতের মরসুমের আগে হবে না, এবং সেই আশায় খানিকটা গড়িমসি করছিলেন। নভেম্বরে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঠিক হয়ে যাবার পর মন্থরতা কাটিয়ে সকল দলকেই আসরে নামতে হয়েছে। হাতে সময় অল্প। পুজো শেষ হয়ে তার জের কাটতে কাটতে অক্টোবর মাসের একটা সপ্তাহ চলে যাবে; তারপর দেওয়ালী। অর্থাৎ চার-পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচনের সমরায়োজন সম্পূর্ণ করতে হবে। সেদিক থেকে একটা ব্যস্ততার ভাবও এসেছে। তবে পুজোর জের না শেষ হওয়া পর্যন্ত খুব একটা কর্মোদ্যম চোখেও পড়বে না। কে জানে এবার আনন্দময়ী কার কপালে আনন্দ, কারই বা চোখে জল এনেছেন!

দেশ দর্পণ

নির্বাচন

সরকারী হিসেব অনুসারে, রাষ্ট্রপতির শাসনকালে পশ্চিম বাংলায় ছয়টি 'রাজনৈতিক' মার্ডার বা খুন হয়েছে। রাজদণ্ডের বিধি অনুসারে মার্ডার গুরুতর অপরাধ। সে অপরাধ যদি রাজনৈতিক মতবিরোধকে , আশ্রয় করে সংঘঠিত হয়, তা হলে নিশ্চয়ই তা অমার্জনীয় অপরাধের পর্যায়ে পড়বে। কারণ, রাজনৈতিক মতামত সমাজ জীবনকে নিয়ম শৃঙ্খলার পথে সংগঠিত করতে সাহায্য করে। এমন কোন রাজনৈতিক মত বা আদর্শ নেই যা সর্বজন স্বীকৃত হবে বা সমাজ সমগ্রভাবে গ্রহণ করবে। তা নেই বলেই মতবিরোধ দেখা দেয় এবং সেই বিরোধ বা মতপার্থক্যই রাজনৈতিক জীবনকে উন্নত করতে সাহায্য করে। কিন্তু যে মতবিরোধ হিংসাত্মক কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দেয় বা উৎসাহিত করে, সে-বিরোধ সম্বন্ধে শঙ্কিত হবার কারণ নিশ্চয় আছে।

পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রেও সে আশঙ্কা আজ আর নিছক মতবিরোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দাঁতের বদলে দাঁতের নীতিতে ফিরে যাবার সুযোগ খুঁজছে। এই আশংকাই পশ্চিম বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেবার চেষ্টা করছে। রাজনৈতিক মার্ডারের নজীর এদেশে খুব বেশী নেই। হয়ত বিদেশে আছে, যেমন আছে ফিলিপিনস-এ। ফিলিপিনসে যখন সাধারণ নির্বাচন হয়, তখন মার্ডারের হিড়িক পড়ে যায়। নির্বাচন প্রার্থীদের মধ্যে হিংসার প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। কিন্তু এদেশের নির্বাচনে এমন কোন নজীর পাওয়া যায় না। এ দেশের মানুষ নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে সহজভাবেই গ্রহণ করে এসেছে। হয়ত পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক জীবনে ওলট-পালট ঘটে গেছে গত দেড় বছরে এবং হয়ত সে-কারণেই দেখা দিয়েছে নিয়ম শৃঙ্খলার অভাব, হিংসার প্রাচুর্য।

এটা হোল কেন? প্রশ্নটা বিচার করতে গেলে ফিরে আসতে হবে নির্বাচনে। গত চতুর্থ নির্বাচনের আগে যে-রাজনৈতিক আবহাওয়া পশ্চিম বাংলায় বা ভারতের অন্যান্য রাজ্যে দেখা দিয়েছিল তার পজিটিভ বা সুনির্দিষ্ট কোন প্রকৃতি হয়ত ছিল না। মূলত কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাবকে আশ্রয় করেই চতুর্থ নির্বাচনের রাজনৈতিক আবহাওয়া বিস্তার লাভ করেছিল। এই কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাবকে আশ্রয় করেই অকংগ্রেসী দলগুলো তাদের নির্বাচনী স্ট্রাটেজী ঠিক করে ফেলেছিল। এই স্ট্রাটেজীর মধ্যে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতামত প্রাধান্য লাভ করেনি। ফলে, নির্বাচন যখন হয়ে গেল তখন রাজনৈতিক মতামত বা মতপার্থক্যকে প্রাধান্য না দিয়ে কংগ্রেস-বিরোধী জোট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। এই অকংগ্রেসী জোটের মধ্যেও মূল কথা ছিল কংগ্রেস বিরোধী মনোভাবকে সক্রিয় রেখে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করা। রাজনৈতিক মতামতের প্রাধান্য ছিল না বলেই অকংগ্রেসী জোট বা মোর্চা জনসাধারণের মূল চাহিদা মেটাবার তাগিদকে উপেক্ষা করেছিল। তা ছাড়া, এটাও অজানা ছিল না যে, কুড়ি বছর কংগ্রেস শাসনের পর যেসব মূলগত সমস্যাগুলো দেশের সামনে এসে গিয়েছিল তার সঙ্গে যথাযথ মোকাবিলা করার কোন প্রোগ্রাম কার্যত ছিল না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করাই মূল উদ্দেশ্য ছিল বলে অকংগ্রেসী মোর্চা জনসাধারণের মনে গভীর কোন দাগ কাটতে পারেনি।

এই দাগ না কাটার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়েছিল জনসাধারণের মনে। সেটা বোঝা গেল যুক্ত ফ্রন্ট সরকার যেদিন ক্ষমতা থেকে অপসারিত হল। এই ঘটনা যখন ঘটেছিল তখন সাধারণের মনে আশংকা ছিল সারা পশ্চিম বাংলায় হয়ত রক্তক্ষরণ হবে। আশংকা ছিল যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের পরিবর্তে ডাঃ ঘোষের শাসন ব্যবস্থা বিপন্ন হবে, বিপর্যস্ত হবে। প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই দেখা দিয়েছিল। কলকাতা ময়দান তার সাক্ষী। আন্দোলন নিশ্চয়ই হয়েছিল রাজ্যপালের আদেশের প্রতিবাদে। কারণ কলকাতা শহরের রাজভবনের সামনে ১৪৪ ধারা আদেশ অমান্য করে দিনের পর দিন কয়েক হাজার মানুষ গ্রেফতার বরণ করেছে। হয়েছিল, প্রতিক্রিয়া ছিল জনসাধারণের মনে। কিন্তু সেই প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও অকংগ্রেসী শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিরাশাও কিছু মিশিয়ে ছিল। তাই প্রতিক্রিয়ার আন্দোলনও এক দিন থেমে গেল।

কংগ্রেস নেতারা অভিনন্দন জানালেন ডাঃ ঘোষের মুখ্যমন্ত্রীত্বকে। কড়া হাতে নিয়ম ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কড়াহাতের ব্যবস্থাটাই সবটা ছিল না। অনেকটাই ছিল জনসাধারণের নিষ্ক্রিয়তা। এটা যেদিন কংগ্রেস মহলে পরিষ্কার হয়ে গেল, সেদিনই রাজনৈতিক চেহারাটা সুনির্দিষ্ট পথে মোড় নিয়েছিল। পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের শাসনের ফলে কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব অনেকাংশে ফিকে হয়ে গিয়েছে। বুঝতে অসুবিধা হল না যে, কোলিয়ারী অঞ্চলে সংযুক্ত সোসালিস্ট পার্টির নেতার মার্ডারের পিছনে ছিল রাজনৈতিক দুর্বলতাকে ঢেকে রাখার চরম প্রচেষ্টা।

এই সেদিনও মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত কলকাতার ময়দানে বলেছিলেন, কংগ্রেসকে "খতম" করার নূতন নূতন হাতিয়ার এসে গিয়েছে কম্যুনিস্টদের হাতে। একটা হাতিয়ারের পরিচয়পত্র হাতে নিয়ে জন্ম নিয়েছে "১২ই জুলাই কমিটি", অর্থাৎ যে আন্দোলনে রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা "সংগ্রামের ময়দানে শামিল" হয়েছে। তবু দেখা গেল, রাজনৈতিক হিংসা প্রতিহিংসার পর্যায়ে নেমে আসার সুযোগ খুঁজছে। দাঁতের বদলে দাঁতের নীতি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করছে। তারই নিদর্শন ছয়টি রাজনৈতিক মার্ডার। রাষ্ট্রপতির শাসনযন্ত্র এই মার্ডার রোধ করতে পারেনি।

হয়ত পারা সম্ভব ছিল না। তবু রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর দাবি করেছেন পশ্চিম বাংলায় রাষ্ট্রপতির শাসনকালে আইন ও শৃঙ্খলার উন্নতি ঘটেছে। যে হিসাবেই দাবি করা হোক না কেন, অন্তত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে এটা সম্ভব হয়নি, তা ছয়টি মার্ডারকে সামনে রাখলেই বোঝা যাবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, নভেম্বর মাসে যে মধ্যবর্তী নির্বাচন পশ্চিম বাংলায় হবে সেই নির্বাচনের হাওয়া কি রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় কলুষিত হবে? প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া এখনই সম্ভব নয়; কিন্তু ছয়টি রাজনৈতিক মার্ডারও অনুপেক্ষণীয় নয়।

উপেক্ষা করার অবকাশ যে নেই, তা রাজনৈতিক দলগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনের মুখে দাঁড়িয়ে এটাই আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এবারের নির্বাচন মূলত কংগ্রেস ও অকংগ্রেসী দলের সংগঠিত মোর্চা যুক্ত ফ্রন্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। চতুর্থ

নির্বাচনের সময় বা আগেকার কোন নির্বাচনে এবারের মত রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এত স্পষ্ট ছিল না। চতুর্থ নির্বাচনেই সর্বপ্রথম বামপন্থী দলগুলোকে একটা জোটের মধ্যে সংগঠিত করার প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা হয়েছে। এই প্রচেষ্টাকে নিঃসন্দেহে উৎসাহিত করেছে কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব। তবু এই প্রচেষ্টা পুরোপুরি সফল হয়নি। দুই কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে দুটি পৃথক জোটের সৃষ্টি হয়। যে-দুটি কম্যুনিস্ট পার্টি এই দুই জোটের নেতৃত্ব দিয়েছিল তাদের বিশ্বাস ছিল কংগ্রেসকে পরাস্ত করে পার্টির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে।

বিভিন্ন দেশে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে এটাই দেখা গিয়েছে যে, এক একটা বিশেষ সময়ে কম্যুনিস্ট পার্টি এগিয়ে এসেছে সোশ্যাল ডেমক্র্যাটদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুক্ত ফ্রণ্ট গঠনের জন্য। এই রকম জোট বাধার স্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকত সুযোগ বুঝে যুক্ত ফ্রণ্টের পোশাকে ক্ষমতা দখল করা। একটা সুযোগ হল নির্বাচন। সেই রকম একটা সুযোগ এসেছিল বলেই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি এবং ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি দুটো জোট সংগঠিত করেছিল ক্ষমতায় আসার পথটা সুগম করার জন্য। সে উদ্দেশ্য ছিল বলেই নির্বাচনের পর যুক্ত ফ্রণ্ট গঠন করে দুটি জোটের অস্তিত্ব বিলোপ করতে কোন অসুবিধা হয়নি।

এই যুক্ত ফ্রণ্টের জোটকে মধ্যবর্তী নির্বাচনে আরও জোরদার করার প্রচেষ্টা হয়েছে; মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির এবং সমগ্রভাবে যুক্ত ফ্রণ্টের শ্লোগান : কংগ্রেসকে খতম কর। এবারে একটা জোটই থেকে গিয়েছে, কারণ, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতাদের স্পষ্ট ধারণা যুক্ত ফ্রণ্টের অন্যান্য দলগুলোর পক্ষে এককভাবে নির্বাচনের লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া বর্তমান যুক্ত ফ্রণ্টে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি তার নেতৃত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না পার্টির নির্বাচনী প্রচারের উদ্বোধনী সভায় শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের বক্তৃতা থেকে। শ্রীদাশগুপ্ত এবং শ্রীজ্যোতি বসুও এই কথাটাই বলার চেষ্টা করেছেন যে, মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুক্ত ফ্রণ্টের প্রধান কর্তব্য যদি হয় কংগ্রেসকে "খতম" করা, তা হলে সে কাজ সফল করার সর্বদায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে এসে পড়েছে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির উপর। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টিই সবচাইতে বেশী সংখ্যক প্রার্থী দিয়েছে এই নির্বাচনে এবং সে-কারণে যুক্ত ফ্রণ্টের প্রকৃত নেতৃত্ব এসে গিয়েছে পার্টির হাতে। কারণ, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির প্রার্থীদের পরাজয়ের অর্থই হবে যুক্ত ফ্রণ্টকে দুর্বল করা।

যুক্তি হিসাবে শ্রীদাশগুপ্ত এবং শ্রীবসুর দাবি কোনমতেই উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তা সম্ভব নয় বলেই আগামী নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস এবং মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। হয়ত সে-কারণেই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি নূতন নূতন হাতিয়ার সংগ্রহ করার কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত। শ্রীদাশগুপ্ত কলকাতার ময়দানে বলেছিলেন, শ্রমিক কৃষকের সঙ্গে মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে সংগ্রামের আসরে শামিল করাই হবে প্রকৃত হাতিয়ার। হয়ত সে-হাতিয়ার এসেছে

> **'বনফুল' তাঁর নব নব সৃষ্টির দ্বারা বাংলা সাহিত্যের রসজ্ঞ পাঠককে দীর্ঘকাল ধরে তৃপ্ত করে আসছেন। যদিও বয়সে প্রবীণ তবু উপন্যাস রচনার বিষয়বস্তু ও কারুকলায় তাঁর মনের ও দৃষ্টির নবীনতা সর্বদাই পাঠককে আকর্ষণ করে। 'দেশ' পত্রিকার আগামী ১২ অক্টোবরের সংখ্যা থেকে তাঁর উপন্যাস 'অসংলগ্না' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।**

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা যে এক দিনের ধর্মঘট করেছিল ১৯ সেপ্টেম্বর তারই সুযোগে।

হয়ত ১৯ সেপ্টেম্বর ধর্মঘট এত বড় হাতিয়ার হিসাবে দেখা দিত না, যদি না ধর্মঘটের জের হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারীদের আন্দোলনকে আরও ব্যাপকতর করার সুযোগ এনে না দিত। ১৯ সেপ্টেম্বরের ধর্মঘটের পরেই কেন্দ্রীয় সরকার এমন কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করে যার ফলে দেখা গেল কয়েক হাজার মধ্যবিত্ত কর্মচারী কর্মচ্যুত হয়ে গেল। এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ হিসাবেই সংগঠিত হল নিয়মমাফিক কাজ করার আন্দোলন। এই আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে নাগরিক জীবনের কর্মধারাকে পঙ্গু করে দিল। বিশৃঙ্খলা ব্যাপকতর হবার সুযোগ পেল। আর সেই সঙ্গে যে-কয়েক হাজার কেন্দ্রীয় কর্মচারী কর্মচ্যুত হল তারা অতি দ্রুত, শ্রীদাশগুপ্তের মতে সংগ্রামের আসরে শামিল হয়ে গেল। এই শামিল হবার অর্থই হল রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হওয়া।

যে-ভাবেই এটা আলোচনা করা যাক না কেন, দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কম্যুনিস্ট নেতৃত্বের হাতে এবং সেই অনুসারে যুক্ত ফ্রণ্টের হাতে একটি নির্মোক তুলে দিয়েছেন কংগ্রেসকে "খতম" করার জন্য। শোনা যায়, পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস ক্যাম্প থেকে এই হাতিয়ার সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বকে সচেতন করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, এই রকম কোন সচেতনতা কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বের মধ্যে ছিল না। কয়েক দিন আগে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায় এসেছিলেন। সেদিন বিমান বন্দরে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের উচ্চ স্থানীয় কোন নেতা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন না। পর দিন তিনি যখন দিল্লী ফিরে যান তখনও কোন কংগ্রেস কর্মী বা নেতা সেখানে ছিলেন না।

এটা যে কারণেই ঘটে থাকুক না কেন, গুঞ্জনের সৃষ্টি করেছে যথেষ্ট। গুঞ্জন উঠেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্ব পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা অথবা আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য সম্বন্ধে হয়ত বিশেষ উৎসাহ বোধ করছেন না। এটা অজানা নেই যে, এই নেতৃত্বের এক অংশ পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের বর্তমান নেতাদের সম্বন্ধে বিশেষ সহানুভূতিশীল নন। তা যদি সত্য হয়, তা হলে এটাই অনুমান করে নিতে হবে যে, আগামী নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে এখনও অস্পষ্টতা আছে। এই অস্পষ্টতাও যুক্ত ফ্রণ্টের কাছে নিশ্চয়ই রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে গণ্য হবে।

ফলে, আজ নির্বাচনের সংগঠনটা যেভাবেই বিচার করা যাক না কেন, অনির্দিষ্ট পথে দ্রুত চলে যাচ্ছে। এই সংগঠনটা হয়ত পুজোর পর আরও স্পষ্ট বোঝা যাবে। কিন্তু আপাতত এটাই ধরে নেওয়া হয়েছে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নূতন নূতন পথে তীব্রতর হবে। এই নির্বাচন যদি কংগ্রেসের পক্ষে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ফিরে পাবার সুযোগ হিসাবে গণ্য করা হয় তা হলে সে সংগঠনে কম্যুনিস্ট চ্যালেঞ্জের সঙ্গে মোকাবিলা করার প্রয়াস নিশ্চয় থাকবে। আগামী নির্বাচন তাই কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট ক্যাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন মিশে গিয়েছে বলেই নির্বাচনের আবহাওয়াকে শংকামুক্ত রাখার প্রয়োজনীয়তা এত বেশী দেখা দিয়েছে।

নভেম্বরের ফসল সম্ভাবনা—

মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবর্ষের শুভ সূচনায় আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

জন্ম : ১৮৬৯

আজ সকলই কিংবদন্তী

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আজ সকলই কিংবদন্তী, পাতালে বাস করলে গুঁড়ো
সন্ধেবেলা পা ছড়িয়ে বসতে নাকি পাহাড়চুড়োয়?
নিত্যি নতুন পোস্ত তাড়ি
সর্বনাশের স্বপ্নে-মেশা আঁধার-করা বিষের হাঁড়ির—
শান্তি, খেতে এক চুমুকে, মন্দ নয় সে-কাণ্ডখানা!
জগজ্জীবন চমকে দিয়ে ভাসতো সুবাস হাস্নুহানার—
আজ সকলই কিংবদন্তী!

রগচটা কোন্ পদ্যে জবর
থাকতো লেগে যাদুর ছিটে, সন্ন্যাসিনীর গোপন খবর
গোমাংসবৎ পরিত্যাজ্য—
আজ জিতেছো নকল রাজ্য সৌদামিনীর…
হয়তো ভালো
এই জীবনের সবটুকু নয় তীব্র আলোয়
জ্বলতে থাকা
পথ বললে সব ন্যাংটো তো নয়, পুচ্ছে ঢাকা।

কিন্তু, যারা বহির্মুখী
বিষণ্ণ ধান ভাঙছে নোড়ায় জনমদুখী
শব্দে-রঙে সাত শ' ঝাউয়ের কান্নাতে ছাই
ছড়িয়ে দিয়ে বলছে, তাকে এমনি সাজাই—
মতান্তরে, অ-ঘোরপন্থী
আজ সকলই কিংবদন্তী॥

দিনরাত্রির দার্জিলিং

আনন্দ বাগচী

সবারই বুকের মধ্যে শুনতে পাই দুর্লভ অর্কিড ঝুলে আছে,
সমস্ত সচ্ছল দৃশ্য, নীল পেন্সিলের উঁচু নিচু,
তুঙ্গে মেঘ ঘোরে ফেরে হাতের তাসের মত
মুহুর্মুহু উজ্জ্বল-মলিন,
শ্যাওলায় পিছল গাছ স্কাইক্র্যাপারের মত স্থির;
চকিত প্রেমের মত চপলকুয়াশা চোখ ঠারে।
রঙীন রুমাল বাঁধা কানামাছি ছটফটে কিশোরী
অবুঝ দু হাতে সব ছুঁতে চায়, নির্জনতা জীবন যৌবন
যে ছিল নিকটতমা সে কখন নিমীলিত জানালার ঘষাকাচ
তপ্ত নগ্ন ছায়া বুকে আলো জ্বলছে হলুদ কুসুম।

সবারই হৃদ্‌পিণ্ডে বাজে গির্জা-ঘড়ি, চোখে ভাসে
ভৌতিক রোদ্দুর,
প্রলয়ের মত পথ আঁকা-বাঁকা নিচে নেমে গেছে,
ক্ষুরের মতন নদী শান পাথরের ঘষা খেয়ে,
জিমখানা জমেছে মেঘলা গ্লাসে, যেন জীপের এঞ্জিন
রেডিওগ্রামের মধ্যে, তেল-তরঙ্গের ধ্বনি শুনি,
'ম্যাল' ঝাপসা হয়ে এলো বাইরে ঠাণ্ডা বৃষ্টির আঁধার
তন্দ্রাচ্ছন্ন চা-বাগান নিবিড় পাইন বহু নিচে,
সিগারেটের শেষ টুকরো পায়ের তলায় নষ্ট ক'রে
ভিজে ছাতা দ্রুত খুলে গোপন নখের দাগ
দেখতে বাড়ি ফেরা॥

অনেককেই তো অনেক দিলে

পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

আমি ছাড়া অনেককেই তো অনেক দিলে।
এর আকাশে ওর আকাশে ওষ্ঠপুটের অনেক পাখি উড়িয়ে দিলে।
পায়রাকে ধান খুঁটতে দিলে খোয়াই জুড়ে।
বুকের দুটি পর্দা ঢাকা জানলা খুলে
কত জনকে হাত ডোবানো বৃষ্টি দিলে।
কত মুখের রোদের রেখা কালো চোখের নীল রুমালে মুছিয়ে
দিলে।
আমি ছাড়া অনেককেই তো অনেক দিলে।
চায়ের কাপে মিষ্টি দিলে হাসির থেকে
নকশাকাটা কাঁচের গ্লাসে শরবতে সুখ মিশিয়ে দিলে।
নখের আঁচড় কাটতে দিলে ডালিমবনে
দাঁতের ফাঁকে লাল সুপারি ভাঙতে দিলে।
আমি ছাড়া অনেককেই তো অনেক দিলে।

একটা জিনিস দাওনি কেবল কাউকে তুমি।
আলমারিটার ঝুলন চাবি।
শূন্যতাকে রঙীন করার শাম্পু সাবান সায়া শাড়ির ভাঁজের নীচে
একটা ছোট কৌটো আছে, তার ভিতরে ভোমরা থাকে।

সে ভোমরাটি সকল জানে কোন হাসিতে রক্ত ঝরে ঠিক অবিরল
হাসির মত
সে ভোমরাটি সকল জানে কোন রুমালে কান্না এবং কোন আঁচলে
বুকের ক্ষত
দেয়াল জুড়ে বিকট ছায়া ভাবছো বুঝি অন্য কারো
কার ছায়াটি কিরূপ গাঢ় সে ভোমরাটি সকল জানে।

আমার কিছু লিখতে হবে, লিখতে গেলে ভোমরাটি চাই
তোমার ঘরের আলমারিটার ঝুলন চাবি আমায় দেবে?

সুনন্দর জার্নাল

'পুজো-ছুটি-আকাশ'

এবার পুজো, আবার ছুটি, আবার আকাশের সেই নীল, আবার ছায়া-রোদের লুকোচুরি। পুজোর বাজনা কানে আসছে। কাল সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরবার সময় দেখলুম, আলোর ঝলমলে এক বিরাট পুজো-প্যাণ্ডালে চলছে উদ্বোধন উৎসব, সিল্কের পাঞ্জাবীর ওপর গরদের চাদর চড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছেন দিকপাল অধ্যাপক : 'মা আসছেন—আসছেন সর্বমঙ্গলা—আবির্ভূতা হচ্ছেন অশিবনাশিনী মহাশক্তি—যা দেবী সর্বভূতেষু—'

বিদ্যুতের বিকল্পে পেট্রোম্যাক্স জ্বলবে হয়তো—ফিরে আসবে আমাদের ছেলেবেলার সেই কারবাইড ল্যাম্পেরা। কিন্তু কোনো আলোই কি জ্বলবে মেদিনীপুর-হাওড়া-হুগলীর সেইসব গ্রামগুলোতে—এবারের বন্যায় যেখানে এক আঁটি বীজ ধান মাথা তুলতে পারল না?

ছাঁটাই—সাসপেনসন—লক আউট। ছুটির মাইনে পাওয়া গেল না—পুজোর বোনাসও না। হাজার হাজার মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের ঘরে কিভাবে পুজো আসছে আমি জানতে চাই না—এখন বাংলা দেশের দিকে তাকাতেই আমার ভয় করে। জানলার বাইরে একটি ছোট্ট মেয়ের কান্না শুনতে পাচ্ছি : 'বাবা, তুমি যে কইছিলা পুজোয় আমার জুতা কিন্যা দিবা। দিলা না ক্যান—দিলা না ক্যান?'

বাজনার আওয়াজ শুনছি। প্যাণ্ডালে প্যাণ্ডালে সর্বমঙ্গলার আবির্ভাব। তবু এবারের পুজোয় বাংলা দেশে থাকতে আমার ভয় করছে। পয়সা থাকলে এবং উপায় থাকলে আমিও বেরিয়ে পড়তুম শরতের দিগ্বিজয়ে—কোনো নীল পাহাড়ের হাতছানিতে—কোনো সমুদ্রের ডাকে। তবু আমাকে কলকাতাতেই থাকতে হবে। এরই মধ্যে আমি খুশি হওয়ার চেষ্টা করব।

কিন্তু খুশি হতে চাইলেই কি হওয়া যায়?

শরতের সাহিত্যে ঝলমল করছে বই আর পত্রিকার স্টলগুলো। একটা শারদীয় সংখ্যা তুলে নিয়ে পাতা ওলটাচ্ছি—সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল দশ এগারো বছরের ছেলে একটা।

'ধূপকাঠি নিন না বাবু।'

বললুম, 'আমার দরকার নেই।'

'নিন না বাবু একটা। দয়া করুন গরিবকে। ভগবান আপনাকে অনেক দিয়েছেন—'

শেষ তথ্যটা কোথায় পেল, জানি না। আমার পকেট-ছেঁড়া পাঞ্জাবী আর জীর্ণ জুতো জোড়া ওর চোখ এড়িয়েছে এমন হতেই পারে না। তবু ব্যবসার খাতিরেই কথাটা বলতে হয় বোধ করি।

'বিরক্ত করিসনি। বললুম যে দরকার নেই?'

—ভোট দিয়ে গণতন্ত্রকে রক্ষা করুন

'পুজোর দিনে ঘরে খাবার নেই বাবু। বন্যায় সব গেছে। দয়া করে একটা প্যাকেট কিনুন—মা দুর্গা আপনাকে আশীর্বাদ—'

কী আশ্চর্য, ছোকরার চোখে জল নাকি? না, এও অভিনয়?

'যা—যা—জ্বালাসনি—' চোখের জলের কাছে হার মেনে পাছে চার আনা-আট আনা অপচয় করে ফেলি, সেই ভয়ে সরে যেতে হল। স্টলওলা হাত থেকে পত্রিকাটা কেড়ে নেবার আগেই একটা গল্প দ্রুতবেগে প্রায় শেষ করে এনেছিলুম—গেল সে সুখটুকুও।

নাঃ—খুশি হওয়ার উপায় নেই কোথাও। বিরক্ত হয়ে বাড়ি চলে এলুম। বসে পড়লুম হাত-পা ছড়িয়ে। সামনে নীল আকাশ ছেয়ে শাদা শাদা মেঘের আসা-যাওয়া। এই মেঘ এই আকাশ এখন বাংলা দেশের ভরা নদী আর ভরা ক্ষেতের ওপর মেলে থাকবার কথা। এবার কি পদ্ম-শালুক ফুটেছে, না তারাও ধানের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে চলে গেছে? বিলের জলকে শিউরে শিউরে এবারও কি বয়ে আসছে দূর গ্রামের ঢাকের আওয়াজ? আমার মুখে চোখে যে শরতের হাওয়া খেলে বেড়াচ্ছে—এক সময় তার সঙ্গে জড়ানো থাকত শিউলির গন্ধ। এবারেও কি শিউলি ফুটবে?

দূর করো—এমন ছুটির দিনে কী ব্রুত্ত করছি বসে বসে? নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে দু-তিনদিনের পুরোনো একটা খবরের কাগজই টেনে নিলুম। মনটা যেন কি রকম শোভিনিস্টিক হয়ে যাচ্ছে—খালি বাংলা দেশের কথাই ভাবছি তখন থেকে। এই তো মহাপৃথিবী—মানুষের জয়যাত্রার আর এক খবর। চন্দ্রলোক-পরিক্রমা করে সোভিয়েত মহাজাগতিক যান এসে নামল ভারত-সমুদ্রে—চন্দ্র যাত্রার পথ আরও পরিষ্কার হয়ে গেল। এরপরে কে যাবে?

মাসকয়েক আগে রুশ কসমোনট বাইকোভস্কি বলেছেন—সর্বাগ্রে চাঁদে যাবে লাইকার কোনো বংশধর—স্পেস-ফ্লাইটে সেই তো প্রথম শহীদ। সে ফিরে এলে তারপর মানুষের পালা। তারও পরে—একবিংশ শতাব্দীতে—অর্থাৎ দু হাজার খ্রীস্টাব্দে—

না—মহাশূন্যবিজয়েও [illegible] [illegible] [illegible] বাড়াবে না সুনন্দা। কিন্তু উত্তর

বিসর্জন কেবল ঢাকী ও পুরোহিতের

কাল তো আছে। তখন—যদি পুজো থাকে, তা হলে ছুটির বাঁশি নীল গগনেই বাজবে। শুধু চাঁদ কিংবা মঙ্গলের মতো মহাদেশে নয়, অনন্তের সমুদ্রের দ্বীপের মতো সেইসব বিচিত্র ছোট ছোট জগৎ—যাদের নিয়ে সায়ান্স ফিকশান লেখা হয়—

কিন্তু দু' হাজার খ্রীস্টাব্দ! মাথার মধ্যে ঝনঝন করে উঠল এই বছরের বিশ্ব স্বাস্থ্য-সংস্থার একটি রিপোর্ট : দু হাজার সালে আমেরিকার জনসংখ্যা পনেরো কোটি থেকে বত্রিশ কোটি, রুশিয়ার আঠারো কোটি থেকে পঁয়ত্রিশ কোটি, চীনের বায়ান্ন কোটি থেকে একশো কোটি, পৃথিবীর জনসংখ্যার পরিমাণ ছয়শো থেকে সাতশো কোটি। বিশারদেরা প্রশ্ন করেছেন, এই মানবিক বিস্ফোরণে আহার-বাসস্থান-শিক্ষার যে সংকট দেখা দেবে—কে নেবে তার দায়িত্ব? কী উপায়ে?

তা হলে দু হাজার খ্রীস্টাব্দ কোন্ বার্তা নিয়ে আসছে? নীল আকাশের ছুটির খবর? না বেঁচে থাকবার, মাথা গোঁজবার আর এক প্রাণান্তিক প্রতি-যোগিতার? মহাপৃথিবীও আমার গেল!

বাইরে একটা কান্নার শব্দ উঠেছে। স্ত্রী এসে খবর দিচ্ছেন, সুরতিয়া মারা গেল হঠাৎ।

সুরতিয়া? পাড়ার একটি হিন্দুস্থানী বধূ। আমাদের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করত এক সময়। ছেলেপুলে নিয়ে বিব্রত মেয়েটি প্রায়ই কামাই করত বলে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কী হয়ে মরল সুরতিয়া? কিছুই না। রেশনের লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল প্রায় তিন ঘণ্টা—আগের সপ্তাহে চাল পাওয়া যায়নি। সেই চাল নিয়ে ঘরে ফিরেছিল ঠিকই, কিন্তু ফুটিয়ে খাওয়ার সময় আর পেল না। শুয়ে পড়ল, আর উঠল না।

পুজোর বাজনার সঙ্গে কান্নার রোল। সুরতিয়া মরে গেল। পুজোর দিনে—এই কলকাতা, এই বাংলা দেশ—এই পৃথিবী সবাই চক্রান্ত করেছে আমার বিরুদ্ধে। কেউ আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না!

হাঁ—বলতে ভুলে গেছি। আপনারা সবাই সুন্দর পুজোর শুভেচ্ছা আর বিজয়ার ভালোবাসা নিন॥

"ভোট-মঙ্গল"

সেকালের বাঙ্গালীর চোখে ইলেকশন

নীরদচন্দ্র চৌধুরী

আমাদের দেশে পার্লামেণ্টারী ডেমক্রেসী চলিবে না, এই কথা বলিলে সেদিন পর্যন্তও আধুনিক বাঙালীরা ক্ষেপিয়া মারিতে আসিতেন। তাঁহাদের ভাবটা এই ছিল, যেন বিলাতী ডেমক্রেসীর প্রতি নিষ্ঠা ভারতমাতার পক্ষে সতীত্বের মত ব্যাপার, উহা না থাকিলে তিনি অসচ্চরিত্রা বলিয়া কুখ্যাতি লাভ করিবেন। ইউ-এফ গভর্নমেণ্ট বাংলাদেশে ১৯৬৭ সনে তাঁহাদের শাসনকালে অন্তত একটা ভাল কাজ করিয়াছেন। এই মোহ খানিকটা কাটাইয়া দিয়াছেন। এখন একমাত্র যাঁহারা ইলেকশন হইতে নিজেরা নিজেদের বৈষয়িক লাভের আশা রাখেন, ডেমক্রেসী ভাঙাইয়া করিয়া খাইতে চান, তাঁহারা ছাড়া আর বিশেষ কেহই ইলেকশনের জন্য উৎসাহী নন। আমার মনে হয়, এই বিতৃষ্ণা বাড়িবে বই কমিবে না।

এই মত পরিবর্তনকে খানিকটা বাঙালীর পুরাতন মনোভাবে ফিরিয়া যাওয়া বলা যাইতে পারে। লর্ড রিপন যখন মিউনিসিপালিটি বা "স্থানীয় আত্মশাসন" (কথাটা "লোকাল সেলফ্ গভর্নমেণ্ট"-এর বিদ্রূপাত্মক অনুবাদ) প্রবর্তন করিলেন তখন একদল বাঙালী একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন। ইঁহারা নব্যপন্থী, ইহারা লর্ড রিপনের স্তুতি-বন্দনায় একেবারে দেশকে মুখরিত করিয়া তুলিলেন। আর একদল বাঙালী উচ্ছ্বসিত না হইলেও মনে মনে খুবই খুশী হইলেন। ইঁহারা বাঙালী সমাজের ঝানু দলপতির দল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন এই নূতন বিলাতী হুজুগে তাঁহাদের লাভ বই ক্ষতি হইবে না, যে কাজে তাঁহারা বহু যুগ ধরিয়া অভ্যস্ত, যাহাতে হাত পাকাইয়া তাঁহারা ওস্তাদ হইয়াছেন, সেই দলাদলি, চক্রান্ত ও দাঁও মারিবার নূতন পথ খুলিল। তৃতীয় আর একদল বাঙালী অল্প দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন, ভোট ও ইলেকশনের সত্যকার রূপ বাংলাদেশে কি হইবে। সুতরাং "স্থানীয় আত্ম-শাসন" লইয়া ব্যঙ্গাত্মক রচনাও আরম্ভ হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের "লোক-রহস্যেও" এ-বিষয়ে একটু শ্লেষ আছে।

আমি সেদিন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এ-বিষয়ে সে-যুগে প্রকাশিত একটি বাংলা নাটক বা প্রহসন পড়িলাম। বইটার টাইটেল পেজের ছবি এই সঙ্গে প্রকাশিত করিতেছি। তাহা হইতে বইটার নাম ইত্যাদি পাঠক জানিতে পারিবেন। বইটার

ভোট-মঙ্গল

বা

দেবাসুরের মিউনিসিপাল-বিভ্রাট।

(সাময়িক মুষ্টিযোগ।)

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

ভগবান্ কল্কি অবতারের চেলা,

শ্রীমুদ্গরধারী হাস্য ভূষণ প্রণীত।

মজিলপুর,

লীলা নাট্যসমাজ সম্প্রদায় দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা;

৮নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, আর্টিষ্ট প্রেসে [illegible]
দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

নাটকের টাইটেল-পেজ
(ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে রক্ষিত বই)

দেবাসুরের মিউনিসিপ্যাল বিভ্রাট। ২৭

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—কক্ষ।

শয্যোপরি বকাসুর শায়িত ও পার্শ্বে
আমোদিনী উপবিষ্টা।

আমো। না প্রাণনাথ! আজ আমি তোমাকে কখন যেতে দেব না; আজ ১৫ দিনের পর তোমাকে দেখা পেয়েচি। আচ্ছা, তোমার মনে কি একটু মায়া দয়া নাই? মাগ্ ছেলে বিষয় আশয় ফেলে কেবল 'ভোট ভোট' করে ঘুরে বেড়াচ্চ! ছি ভাই, তুমি বড় বে-রসিক! আজ্ আর তোমাকে কখন যেতে দেব না। আজ তোমাকে হারমোনিয়মের সেই "পাদের তরণী আমার" ভাঙ্গা গৎ খানি সেখাতে হবে, আর সেই অলপ্পেয়ে ডেক্‌রা ঘোষ মন্ত্রী এলে, তারে ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দেবো।

আমোদিনীর হারমোনিয়ম আনায়ন)

বকাসুর। (শয্যা হইতে উঠিয়া) ক্যা-ক্যা-ক্যান্ত হও প্রিয়ে! প্রা-প্রা-প্রায় বেঁ-বেঁশে এনেচি, আর দু-দু দুটো দিন মেহোন্নত করে দেবতাদের গালে চ-চ-চড় মেরে চেয়ার ম্যানি নেবো। তো-তো-তোমার পায় প-প-পড়িচি ভাই, এ স-স-সময় বাধা দিওনা।

আমো। (নাকে হাত দিয়া) ওঃ—দশা আর কি! ভাল আর রসিক চূড়ামণি তুমি যা'হোক; কি এক অলক্ষণে ভোট রোগে ধরে আমার এমন রসময়েরসোনার অঙ্গটী কালী করে দিলে! না ভাই, আমার বড় ভয় হয়, এই রাত্তিরে ভিতরে বেড়াও, কখন কি বিপদ ঘটে! (মাটিতে আঙুল মট্‌কাইয়া) উচ্ছন্নে যাক্ দেবতারা, শিগ্‌গির উচ্ছন্নে যাক্, দেবতাদের বংশে যেন আর কেও বাতি দিতে না থাকে। সে দিন অমনি দেবতাদের সঙ্গে তোমাদের দাঙ্গা হবার কথা শুনে, আমার বুকের ভিতর গুর্ গুর কত্তে লাগ্‌লো। সেই শশধর বুড়টা কি সামানি! জোর করে অমনি বেস্পতি ঠাকুরের দে বেম্মা পুজো করালে। ভাবলুম, আবার বুঝি সেই অলুক্ষণে কাত্তিক পুজোর মত হয়! তাতেই বলি, আজ আর তোমাকে যেতে দিচ্ছি না, কাল না হয় তখন যেও।

আমো। (হারমোনিয়মের সুর দিয়া গীত।)

রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

যেওনা যেওনা প্রাণনাথ, আমার মাথা খাও।
মিছে ভোটের আশে কেন (ও নাথ) দিবা নিশি দুঃখ পাও।
যার জনার কুমন্ত্রণা
ও প্রাণনাথ আর শুনোনা,
ভোটেতে সে সুখ হবেনা
(ও নাথ) যে সুখ সংসারে পাও॥
ঘোষেদের ঐ ড্যাক্‌রা ছোঁড়া
তোমায় করে গৃহ ছাড়া,
সেটাও যেমনি লক্ষ্মীছাড়া,
(ও নাথ) তেমনি বুঝি হতে চাও॥

(নেপথ্যে) ও বাবা—বাবা, বাইরে সেই ড্যাকরা ঘোষ মন্ত্রী ডাকৃছে।

নাটকের দুইটি পৃষ্ঠা

আমোদিনী ও বকাসুরের কথাবার্তা। ইহার খানিকটা প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, নাটকে বকাসুরকে তোৎলা করা হইয়াছে

তারিখ নাই, তবে মনে হয়, ১৮৯০ সনের আগেই ছাপা হইয়াছিল। এই লেখক তৃতীয় দলের মুখপাত্র হিসাবে ইলেকশনের দুই নিদান আবিষ্কার করিয়াছেন—১। উহা পুরাতন বাংলার দলাদলি, রেষারেষি ও ঘোট-মঙ্গলেরই নূতন রূপ; ২। উহা ইংরেজ শাসনের প্রতি রাজভক্তি শিখাইবার একটা গুপ্ত প্রয়াস। গীতা হইতে যে শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা লেখকের মনোভাবের বিশেষ পরিচায়ক। তিনি ভোট-ইত্যাদিকে সনাতন ধর্মের বিরোধী বলিয়াও ধরিয়াছেন। তাই নিজেকে ম্লেচ্ছ বিনাশকারী কল্কির চেলা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইলেকশন সম্বন্ধে এই শ্রেণীর বাঙালীর মতামতের পরিচয় হিসাবে এই প্রবন্ধে বই-এর অনেক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। গল্পটা তুচ্ছ, তাই উহার চুম্বক আর দিলাম না, পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন।

ইলেকশনের উপক্রমণিকা

ইংরেজের উদারতা ও উদ্যোগে বাংলাদেশে সবেমাত্র মিউনিসিপালিটির প্রবর্তন হইয়াছে, উহার ফলে বাংলার সব দিকে উন্নতি হইতেছে অথচ স্বর্গরাজ্য পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে, এবং দেবাসুরেরা তাহাদের পুরাতন ঝগড়ায় লিপ্ত থাকিয়া শক্তির অপচয় করিতেছে, এই সব দেখিয়া স্বর্গরাজ ইন্দ্র মর্মাহত হইয়া দৈত্যরাজ বকাসুরকে এই পত্র লিখিলেন,—

"মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত বকাসুর-হাবল-মিত্রবর করকমলেষু। দৈত্যরাজ!

"একাল পর্যন্ত পরস্পর-অধিকৃত মিউনিসিপালিটির সর্বত্র বিজয়ী যশোরাশি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সর্বলোকে একাধিপত্য করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এরূপ একটি সুসমৃদ্ধিশীল স্বর্গরাজ্য মধ্যে সভ্যতা, বিদ্যা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি মহৎ মহৎ আবশ্যকীয় পদার্থের পূর্ণ উন্নতি হইল না। এতদ্ব্যতীত মহামহিম সর্বভুক্ বিরাট রাজ্যের* অধীনস্থ রাজাগণের মধ্যে রাজভক্তি ও রাজবিদ্যা শিক্ষা একটি মহৎ কার্য। এ সম্বন্ধে সর্বভুক্ সম্রাটের অধীন ব্যাঙ্গ দেশ একটি প্রধান উদাহরণস্থল। তদ্দেশবাসী ব্যাঙাচীরা রাজভক্তিগুণে এক্ষণে যেরূপ রাজ-অনুকরণ-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন, বোধ হয় অতি সত্বরই তাঁহারা গললগ্নকৃত-শৃঙ্খল হইয়া, তাঁহাদের ভক্তিগুণের পরিচয় প্রদানে ত্রুটি স্বীকার করিবেন না। কারণ, ইতিমধ্যেই তাঁহারা রাজদ্বারে আবদ্ধ থাকিয়া, ভক্তিরসপূর্ণ ঘেউ ঘেউ ধ্বনিতে জগৎ মাতাইয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু আমরা এতাদৃশ সুবিশাল স্বর্গরাজ্যের অধিপতি হইয়াও রাজভক্তি ও রাজ-অনুকরণ এতদুভয়ের কোনটিরও যোগ্য পাত্র হইলাম না। এই সমস্ত মহাবিঘ্নকর বিষয়ের অভাব দূর করিবার জন্য একটি মহৎ উপায় স্থির করিয়া মহাশয়কে জ্ঞাপন করিতেছি। আমাদিগের স্বর্গরাজ্যে যেরূপ সভ্যতা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে অতি সত্বরই এ সম্বন্ধে একটি পাকা বন্দোবস্তের আবশ্যক। আর তিন মাস পরে স্বর্গ মিউনিসিপালিটির ত্রৈবার্ষিক ইলেকশন হইবে। আমার ইচ্ছা, দেবাসুরের বৈরভাবের পরিবর্তে একতা ও রাজ্যোন্নতি বিষয়ে পরস্পর একটি চিরশান্তি স্থাপন হয়।"

দেবরাজ ইন্দ্রের এই প্রস্তাব দৈত্যরাজ গ্রহণ করিলেন এবং স্থির হইল, বারোয়ারী পূজা করিয়া এই মিউনিসিপাল নব্যধারা স্বর্গে প্রবর্তন করা হইবে। কিন্তু বারোয়ারী পূজা বাঙালী সমাজেই হউক বা দেবাসুর সমাজেই হউক, বারোয়ারী পূজার ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারে না। ইলেকশনও সেই ধর্ম অবলম্বন করিবে। নারদমুনি ইহা আগেই বুঝিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনিই দেবরাজের নিমন্ত্রণ দৈত্যরাজের কাছে আনিয়াছিলেন, এবং ইহার ফল কি দাঁড়াইবে তাহা ঋষিসুলভ দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়া চিঠি দিবার আগেই এই স্বগত উক্তি করিয়াছিলেন—

---

* ইংরেজ শাসনের এই সংজ্ঞা উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ সব খায়, সেই জন্য 'সর্বভুক্', আবার দেশের সকল সম্পদ গ্রাস করিতেছে সেজন্যও 'সর্বভুক্'।

"মন! স্বকার্য সাধন তোমার মৌরশী কার্য। অসুররাজ দেবতাদের গালে চড় মেরে, ফাঁকি দিয়ে যে মিউনিসিপালিটি কেড়ে নেবে, তা তো তুমি আভাসেই জেনেছ; এখন ফাঁকে ফাঁকে থেকে রগড় বাধিয়ে মজা দেখ। এখন ত দেবতাদের সুসভ্যতার ফেরে পড়ে গোঁপ-দাড়িতে কলপ দিলেম, চোনোট করা কাপড় চাদর আর বিলাতী জুতোও পরলেম, ইংরেজীও কিছু কিছু শিখতে হয়েছে, এখন যেনতেন প্রকারেণ বিবাদেন মহাফলং। হে নারায়ণ! যেন আমার চিরকেলে নামটা লোপ হয় না। দুরন্ত অসুর-মক্ষিকে চেয়ারম্যান-রূপ মধুর কলসী দেখিয়ে কলে ফেলে পেষণ দিতে হবে; এখন ছলেকলে বিবাদটা গুরুপাকে দাঁড় করাতে পারলেই মজা হয়।"

নারদঋষির মনোবাসনা একেবারে বারোয়ারী পূজো হইতে, অর্থাৎ ইলেক্শনের উপক্রমণিকা হইতেই পূর্ণ হইতে আরম্ভ হইল। পুরোহিত কে হইবে, দেবরাজের সভায় এই প্রশ্ন ওঠাতে কেউ কেউ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের নাম করিল। শুনিয়াই জ্বলিয়া উঠিয়া বৃহস্পতি বলিলেন—

"বটেই তো, বটেই তো, সেটা কে? সেই অসুরদের পুরুত শুক্রাচার্য—সেটা ভণ্ড, গণ্ড, বৌদ্ধিক, পতিত, তাকে ভাগ দেব, না তো দেব কাকে? বেটা বামন হয়ে গাড়োয়ানী করেছে, বেটা আবার পুরুতি করবে!"

নারদ স্বভাববশে কথাগুলি দৈত্যরাজ-সভায় শুক্রাচার্যকে বলিয়া দিলেন। আর যায় কোথায়! শুক্রাচার্য রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—

"কি, ব্যাটার এত বড় আস্পর্ধা! আমার উপর বড় কথা? বলি, ও নারদঠাকুর, সেটার বুঝি একঘরে হবার ভয় নেই? তার ঘরের কুচ্ছ বার কল্লে ঘাড়টা হেট করে 'বাপ বাপ' করে দৌড় মারতে হবে! জানে না, ব্যাটা হরমণি ব্যাওয়ার বাড়িতে ফলার করে চার আনা দক্ষিণা এনেছে, আর ব্যাটা হাটে-বাজারে একটা পয়সার জন্যে মেছুনী মাগীর ঝাঁটা খায়, ব্যাটা আবার গাড়োয়ান নাড়া নাড়তে আসে। (মহারাজের প্রতি)—ব্যাটাকে আনন্দবাজার থেকে ঘাড় ধরে বার করে দিন।"

যাহা হউক, সাধারণ ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়াই পূজো আরম্ভ হইল। এই ব্রাহ্মণ দেবপক্ষের। সে 'ও' বিষ্ণু, ও' বিষ্ণু' বলিয়া পূজো আরম্ভ করিল—

"ও' অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ কাশ্যপ গোত্রস্য শ্রীসহস্রলোচন-দেবশর্মণঃ সপরিবারস্য সদেবস্য শুভকর্মার্থায় শুভ মিউনিসিপালিটি কার্যনিষ্পন্নার্থায় 'বারোয়ারী পূজোং করিষ্যামি।"

চীৎকার করিয়া বাজনদারদের বলিলেন, "ওরে বাজাদারেরা, বাজা, বাজা!"

এমন সময়ে দৈত্যপক্ষের যুবরাজ হুতুমের দারোয়ানরা পূজো নষ্ট করিবার জন্য দৌড়িয়া আসিল। প্রথম দারোয়ান ডলণ্ড সিং বলিল,

"আরে নচমী সিং, পাকড়ো শালেকো, যুবরাজ হুতুম মহারাজকা বাত মানতা নেহি।"

নচমী সিং।—"আরে সবুর ভাই! ও লোক ব্রাহ্মণ হ্যায়, ওস্কো ক্যা দোষ হ্যায়? (পুরোহিতের প্রতি) এ ঠাকুরজী, আরে জলদি উঠো। যুবরাজ হুতুম কা হুকুম হ্যায় তোমকো নেহি পূজো করনে দেগা।"

পুরোহিত। (সকম্পনে)—"কেন বাবা, হামকো কি দোষ আছে, বাবা? কোথা যাব, বাবা? দেবরাজ ইন্দ্র বাবা, তোদের বাবা, পায়ে পড়ি বাবা, বামনী বাবা, একা ঘরে বাবা!"

জব্বর সিং।—"ক্যা শালে, তোম্ গালি দেতা হ্যায়? তোম্ বাবা হ্যায়? শালে আদমী জানতা নেহি, শনি মহারাজ, অসুররাজ, গজোদরবাবু আউর কলিরাজ আকে ওনকো সেলাম দেতা হ্যায়?"

কিন্ত আবার দেবপক্ষ হইতে সবেগে সদলবলে শশধরবাবুর (অর্থাৎ চন্দ্রের—দেবতারা সকলেই বাবু হইয়াছেন) প্রবেশ। তিনি বলিলেম,

"কে আছিস্ রে। ধর শালাদের, খুঁটিতে বেঁধে পাঁচিশ পাঁচিশ জুতো হাকুরা ও ব্যাটাদের। হুতমো ব্যাটার কথায় পূজো বন্ধ! ব্যাটার তো গুণের অবধি নাই। ধর ব্যাটাদের ধর, এক ব্যাটাকে ছেড়ো না!" সঙ্গে সঙ্গে হুতুম যুবরাজের দারোয়ানরা পলায়ন করিল। শশধরবাবু বলিলেন,

"পুরুত মশাই! আপনি পূজো করুন। কোন শালা কি করে দেখি।"

ইহার পর ইলেকশন-পর্ব আরম্ভ। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলিব যে, আমি অল্পবয়সে কলিকাতার উপকণ্ঠে বারোয়ারী পূজো এই-ভাবে সম্পন্ন হইতে দেখিয়াছি। একদল পূজো করিতেছে, এমন সময় পরাজিত দলের এক যুবক দৌড়িয়া আসিয়া অভিসম্পাত করিয়া পৈতে ছিঁড়িয়া ফেলিল। তখন বিজয়ী দলের নেতা যুবককে ধরিয়া হাড়ি-কাঠের দিকে টানিতে টানিতে বলিলেন, "শালাকে মায়ের কাছে বলি দেব!"

ইলেকশন অভিযান

নারদঋষি ইলেকশনের নোটিস পড়িয়া শুনাইলেন—

"এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আগামী ২৫শে জানুয়ারী তারিখে হেভেন মিউনিসিপালিটির ইলেকশন হইবেক। স্ব স্ব ওয়ার্ডের ভোটদাতাগণ উপস্থিত থাকিয়া কমিশনার নির্বাচন সম্বন্ধে ভোটপ্রদান করিবেন। সর্বভুক্ গভর্নমেণ্ট হইতে ম্যাজিস্ট্রেট আসিয়া ইলেকশন কার্য সম্পন্ন করিবেন।"

তাহার পর ভোট যোগাড়ের পালা আরম্ভ হইল। প্রথমে ঘরে পরামর্শ, কাহাকে দেওয়া

এবং কিসের জন্য দেওয়া বা না-দেওয়া। কাজেই নিজের বাড়িতে দুই পুত্র বৃশ্চিক ও ... উপরোধ ও ধমকের ফেরে পড়িয়াছেন। বৃশ্চিক বলিতেছে—

"না বাবা, তোমার মত হলেই গজোদরবাবুর জয় হয়। তোমার এইটি করতেই হবে।"

কিন্তু গজোদর সম্বন্ধে শনির ঘোরতর ব্যক্তিগত আপত্তি। তাই তিনি বলিলেন,—

"দেখ বৃশ্চিক, সেবারকার দায়রা সদরালাদের মোকদ্দমার কথা বুঝি মনে নেই? সরকারী উসুল ছাট টাকাকড়ি যা কিছু আমার সম্বল ছিল, ঐ গজোদর হতেই তো আমার সব গেছে। ঐ তো চৌগোপ্পা গেজেলকে সাহায্য করে আমাদের চোখের জলে নাকের জলে করেছে। না বাবা, আমি সে সব পারব না। আর দেবতাদের সর্বনাশ করি আর যাই করি, দেবতারা আমার অপর নয়।"

পিতার এই অমত শুনিয়া অন্য পুত্র কর্কটি একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহার শাক্তিগত শত্রুতা ইন্দ্রের উপর, সুতরাং তাহার পক্ষপাতিত্ব দৈত্যকুলের ক্যান্ডিডেটের দিকে। সে বাপকে ধমক দিল—

"আপনি অতি stupid-এর মত কথা বলেছেন। Past event-এর সূচনা করা মূর্খতা ভিন্ন আর কিছুরই পরিচয় নয়। সেদিন চিরবৈরী ইন্দ্র পুকুর-কাটা কথা নিয়ে রাজসভা মধ্যে আমাকে কি অপমানটাই না করেছে। Revenge! Revenge! প্রতিহিংসাই এর প্রধান ... চিরকালটাই যে একভাবে ... হবে, তার মানে কি? ... একজন সামান্য লোক নন। ... এদিকে দেবতারাও তো তোমাকে ... করেছে। পুজোর ভাগ গ্রহণ করে না, তুমি যেদিকে দৃষ্টিপাত কর ... ত্রিসীমানায় থাকে না। আবার ... নাককে দেখে ঠাট্টা করা হয়। এ সব দেখে ... বুঝি জ্ঞান জন্মায় না? Fie fie!"

... ঘোরতর ঝগড়া বাধিয়া উঠিল।

অন্য দিকে ভোট প্রার্থীরা ভাল করিয়াই জানেন যে, শুধু বড় লোকের ভোট যোগাড় করিয়া জেতা যাইবে না, "ছোটলোকেরা" বেশী সংখ্যক, সুতরাং ইহাদের ভোটের মূল্য বেশী। তাই ... পক্ষের ক্যান্ডিডেট গজোদরবাবু মুসলমান পাড়ায় গিয়া নেমকহারাম গাজী সাহেবকে হাত করিবার চেষ্টা করিলেন, সঙ্গে তাঁহার দালালরাও আছে। গজোদর বলিলেন,

"আচ্ছা, গাজী সাহেব! তুমি যত টাকা চাও দেবো, আমাদের পক্ষে ভোট দিতে হবেই; নয়ত তোমার এইখানকার* দ্বারদেশে পড়ে রইলুম। বুকে পা তুলে মেরে দেনা; জয় জগদীশ্বর! যা কর বাবা গাজী সাহেব! আজ তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।"

গাজী—"আরে শালার ভাই শালারা বড় ভগরে [ফক্করে] ভেনেনেক [ফেললেক] যে! সুমুন্দির ভাই নড়ে না যে! যেন পাষাণ হোই দেখ্, আত্তির দুপরের বেলায় যেন একটা অগড় [রগড়] পেয়েছে। ডাকবো নাকি লোকগর, ছেড়ে দেনা।

ব্যাপার দেখিয়া গজোদরবাবু দালাল অকালকুষ্মাণ্ড ক্যানভাস করিবার ভার নিল,—

"বাবা গাজী! তোর পায়ে পৈতে ছিড়বো!" (পৈতা জড়াইয়া গাজীর পদতলে পতন।)

গাজী—"আরে শালা বামোন কল্লাক্ কি! হুঁ হুঁ, আমার ছাবাল পোলাগার মোল্লি হোবাক যে, খেন্তো দে, খেন্তো দে।"

অকালকুষ্মাণ্ড—"বল্ বাবা, কালপেঁচা-বাবুর দুটো ভোট? তুই যত টাকা চাস দেবো।

গাজী (ক্ষণেক চিন্তার পর)—"আচ্ছা, বল শালা বামোন, ২৫ টাকা দিবি? হ্যা, জানলুম যে এক ঘা দায় অক্কো গেলা! দে ২৫ টাকা, দেবো তোমায় দুটো ভোট।"

ইলেকশন সম্বন্ধে নারীগণের আলোচনা

আজকাল মেয়েরা রাজনীতি ও ইলেকশনে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। ভোট দেওয়ার ব্যাপারে তাঁহাদের যে উৎসাহ, তাহা সংবাদ ও ছবি এই দুইটার সহযোগে খবরের কাগজে জাহির করা হয়। ভোটের নেশা তাঁহাদেরও ধরিয়াছে. সুতরাং সেই পুরাতন নিরপেক্ষ দৃষ্টি তাঁহাদের আর নাই। সে যুগে মেয়েরা এই হুজুগের বাহিরে ছিলেন, সুতরাং ব্যাপারটাকে অনেকটা সাদা চোখে দেখিতে পারিতেন। ইহার দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। স্বর্গ মিউনিসিপালিটির ইলেকশনের হাঙ্গামা যখন চলিতেছে, তখন নানাবয়সের কয়েকটি স্বর্গবাসিনী মানস সরোবরে জল নিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আছেন বৃদ্ধা ক্ষ্যামা দিদি (কলসী কক্ষে একটি বালিকা সহ), এবং সর্বমঙ্গলা, মধুমতী প্রভৃতি স্বর্গের ঋষিবালারা। ক্ষ্যামাদিদি বলিলেন,

"ওলো মধুমতী, তোর ভাতার নাকি টোলে পড়া ছেড়ে দিয়ে দেবতাদের ছেলেদের সঙ্গে ইংরেজী পড়া আরম্ভ করেছে? ওমা, যাব কোথায়! আমরা বামন-পণ্ডিতের

---

* 'খানকা' অর্থ মুসলমান ফকির-দরবেশদের থাকিবার জায়গা; পরে সাধারণ সরাই অর্থে ব্যবহৃত হইত; ইহা হইতেই 'খানকী' কথাটা আসিয়াছে।

বড় বড় ভট্টাচার্য দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন। তা ভাই, আজকাল কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়েছি।

কালে কালে দেখব কত,
দেখে শুনে বুদ্ধিহত।"

সর্বমঙ্গলা বলিলেন,

"তা ক্ষেমীদিদি, শুধু ওর ভাতার কেন, দেবতারা পর্যন্ত বিগড়ে গেছে। তার সাক্ষী দেখ না কেন, আমরা স্বর্গের ঋষিবালা, অধর্ম কাকে বলে তার নামটি পর্যন্ত জানতেম না; তা এখন তেমনই ধর্মকর্ম লোপ হয়েছে; দেবরাজ ইন্দ্র, (নাকে হাত দিয়া) ওমা, তাকে আর দেবরাজ ইন্দ্র বলবার যো নাই। তিনি এখন ইন্দিরবাবু হয়েছেন। আর সেই বুড়ো শশধর আর অগ্নি অবতার মিলে স্বর্গে যে মিছরিপালী এনেছেন, ইন্দিরবাবুও তাতে যোগ দিয়েছেন। ওপরওয়ালারা তাঁদের নাকি বড় ভালবেসেছেন। তাই স্বর্গের চারদিকে পাকা রাস্তা, বাঁধা ঘাট, ইসকুল-কলেজ, এই কুচ্ছিৎ করে একেবারে স্বর্গসুদ্ধ খিস্টান করে তোলবার উয্যোগ তুলেচেন।"

মধুমতী (ইনি ঋষিবালাদের মধ্যে আধুনিকতার পক্ষে) বলিলেন, "ও ঠানদিদি! বলি তোমরা কি আমাদের সভ্যভব্য হতে দেবে না? চিরকালটাই তোমাদের মুখে সেই মনসার ভাসান, আর দাতা কর্ণের পালা শুনব? এখন দেখ দেখি, আমরা কত নতুন নতুন বই পড়চি, কত দেশ-বিদেশের ইতিহাস, কত রাজারাজড়ার গল্প পড়চি। ইংরেজ সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে কোথায় কি কচ্চে, আমরা স্বর্গে বসে বসে তার সমস্ত খবর পড়চি, দেখ দিদি, কত সুবিধা।"

ক্ষেমা—"মর ছুঁড়ী, একেবারে গোল্লায় গিচিস্। আচ্ছা, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুই ইংরেজী-পড়া মেয়ে, মিছরিপালীর খবর-টবর কিছু জানিস? বলি, নারদে অলপ্পেয়ে যে, দিন নেই রাত্তির নেই কেবল 'ভোট' 'ভোট' করে ঢোল পিটে বেড়াচ্চে, এর মানেটা কি?"

মধুমতী। (স্বগত) "ভাল বুড়ীর হাতে পড়েছি, লেখাপড়া না জানলে এই দশা হয়।" (প্রকাশ্যে)—"ওগো, মিছরিপালী নয়, মিউনিসিপ্যালিটি, আর ভোট নয়, ভোট; শশধরবাবু, আর অন্য অন্য দেবতারা মিলে যে মিউনিসিপ্যালিটি এনেচেন, তারিরই তিন বচ্ছর অন্তর একটা করে ইলেকশন হয়।"

ক্ষেমা। "আ মলো! এ-লো-কা-শ-ন-টা আবার কি?"

মধুমতী। "তোমার মাথা! এলোকাশন্দী নয় ইলেকশন, অর্থাৎ একটা নূতন বন্দোবস্ত হয়ে, মিউনিসিপ্যালিটির কর্তা বাছা হবে, স্বর্গের সব লোক মিলে যারে এত ভোটের গোলমাল ২...."

ক্ষেমা।—"কে জানে ভাই! তোদের ও ইংরেজী-ফারসী কিছুই বুঝি নে।"

সর্বমঙ্গলা। "বলি, ও দিদি, এত দিন বোঝ নি, এখন বুঝতে হবে। সেদিন আমাদের কত্তাকে নিয়ে হুলস্থূল বেধে গেছলো। ইন্দিরবাবু বলেন, 'দুটো ভোট আমারে দিও', হুতুমবাবু বলেন, 'তা হবে না, আমাকেই দুটো দিতে হবে।' শেষে দাঙ্গার উয্যোগ আর কি! তার পর হুতুমবাবু রাত্রে কত্তাকে ডাকিয়ে নিয়ে এক থান বনাত, ২৫টে টাকা নগত, আর আমাদের হাঁস-চাঁদকে একখানা খেঁশ না চোঁশা কি বলে, আর এক জোড়া সিমলের জুতো দিয়ে ভোট দেবার জন্যে কত্তাকে কবলে করে নেচেন।"

নেপথ্যে ঢোলের শব্দ শোনা গেল। ক্ষেমা-ঠাকুরানীর সঙ্গের বালিকা সক্রন্দনে ভীত-স্বরে চেঁচাইয়া উঠিল, "ওই ভোট আসচে গো!"

ক্ষেমা।—"ও লো [illegible] পালা রে, পালা। এই সেই ভোট! ওরে দেবতাদের ভিটেয় ঘুঘু চরে অবধি [আর] সম্ভ্রম সব গেল রে! ওরে পালিয়ে আয় রে পালিয়ে আয়।"

এই ত গেল ঘাটের বিচার। এর পর ঘরের বিচার। বকাসুর স্বর্গ-মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী। [illegible] যোগাড়ের তাড়াতে অন্তঃপুরেও আসিতে পারেন নাই। আজ প্রাসাদের ভিতরে নিজ শয়নগৃহে শয্যায় শায়িত, পাশে রমণী আমোদিনী। আমোদিনী বলিলেন,

"না, প্রাণনাথ! আজ আমি তোমাকে কখনও যেতে দেব না। আজ পনেরো দিনের পর তোমাকে দেখা পেয়েছি। আচ্ছা, তোমার মনে কি একটু মায়াদয়া নাই? মাগ-ছেলে, বিষয়-আশয় ফেলে কেবল 'ভোট' 'ভোট' করে ঘুরে বেড়াচ্চ! ছি ভাই, তুমি বড় বেরসিক। আজ আর আমি তোমাকে কখনও যেতে দেব না। আজ তোমাকে হার-মোনিয়মের সেই 'সাদের তরণী আমার' ভাঙা গৎখানি শেখাতে হবে। আর সেই অলপ্পেয়ে ডেকরা ঘোষমন্ত্রী এলে তারে ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দেব।"

আমোদিনীর অতঃপর হারমোনিয়াম আনয়ন। ভয় পাইয়া বকাসুর অনুনয় করিতে লাগিলেন—

"ক্ষান্ত হও, প্রিয়ে! প্রায় ঘেঁষে এনেছি, আর দু'-দুটো দিন মেহোন্নত কল্লে দেবতাদের গালে চড় মেরে চেয়ারম্যানি নেবো। তোমার পায়ে পড়চি, ভাই! এ-সময় বাধা দিও না।" আমোদিনী না মানিয়া বলিয়া উঠিলেন,

"ভাল রসিকচূড়ামণি তুমি যা হোক্। কি এক অলক্ষণে ভোট রোগ ধরে আমার এমন রসময়ের সোনার অঙ্গটি কালি করে দিলে!"

"যেও না, যেও না, — আমার [illegible]
মিছে ভোটের আশে কেন [illegible]
[illegible] বানিশি [illegible]
ধার জনার কুমন্ত্রণা,
ও প্রাণনাথ, তার শুনো না,
ভোটেতে সে সুখ হবে না,
(ও নাথ) যে সুখ সংসারে পাও।"

কিন্তু বকাসুর ভোটের সন্ধানে বাহির হইয়া গেলেন।

শাশুড়ী ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন "[illegible] বউ, আমার সোনার চাঁদ ছেলে বেরিয়ে গেল, আর এই কি তোমার গান গাইবার সময়?" দুই দুঃখিনী নারী কথাবার্তা বলিয়া [illegible] ধর্মের কাছে নিবেদন করা ছাড়া আর কোনও পথ দেখিল না। তাই [illegible] দিনী প্রার্থনা করিলেন—

"[illegible] করি! তোমার মতন অধম [illegible] আর দুটি নাই। তোমার কৃপায় উপযুক্ত ছেলে বুড়ো বাপ-মার গলায় দড়ি দিয়ে দড়ী কাঁধে বহন করে; ভিখারী দ্বারে আসিলে ভিক্ষার পরিবর্তে প্রহার [illegible] খায়; তোমার কৃপায় হিন্দু, হিন্দুয়ানী [illegible] তোমারই অনুগত হয়; আর ওর মধ্যে [illegible] নাকি [illegible] মাতার [illegible] না করে বিপরীত [illegible] দিয়ে থাকে; তুমি যে দেবতাদের হুতুমের সহায় হয়ে দুষ্ট কার্যে উৎসাহ দান করে থাক, আর তাকে [illegible] স্বীকার করে [illegible] [illegible] করিয়েছ, সেই সব [illegible] আমার স্বামীকে চেয়ারম্যান করে দাও যেন দেশের সব লোক আমার স্বামীকে ভোট দেয়। আমি উপবাসী থেকে তোমার নামে এক পালা ভোটমঙ্গল গান দিব।"

* * *

ইলেকশনের প্রতি সে-যুগের বাঙালীর এই অভক্তি দেখিয়া কেহ কেহ যে এখনও উহাকে সেকেলে সংস্কার বা কুসংস্কার বলিবেন, তাহা আমি সম্ভব মনে করি। ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য শুধু এই, পুরাতনের প্রতি অবিচল আসক্তি যেমন সংস্কার, নূতন মাত্রেরই প্রতি চঞ্চল ভক্তিও তেমনই সংস্কার—দুইটা একই জিনিসেরই এ-পিঠ আর ও-পিঠ। সে যাহাই হউক, অনেকে যে ইহা হইতে আমোদ অনুভব করিবেন, তাহা সুনিশ্চিত। আমি করিয়াছি। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বসিয়া বাঙালীর পুরাতন রসবোধের এই প্রমাণ যে পাইব, তাহা আশা করি নাই। সর্বোপরি আনন্দ পাইয়াছি, আজকালকার বিলাত-ফেরত বাংলার বদলে একেবারে নেটিভ বাংলা ভাষা পড়িয়া।

২৮শে জুলাই, ১৯৬৮ সন

নিশানাথ একটু একটু করে রাজনীতির

বোঝার জন্যে হাত চোখ মুখ

অনিমেষই তাকে ডালহৌসি

থেকে ধরে এনেছিল। রাস্তার ধার থেকে ধরে এনেছিল এই বোহেমিয়ান জীবটিকে। তারপর হাওড়া কলকাতার বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থানগুলো তাকে দেখিয়ে দিয়েছে। বাংলা দেশের সেরা কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্যের স্বাদও দিয়ে দিয়েছে। সারা সময়টা হিপিকে নিয়ে টোটো ঘুরিয়ে খর রৌদ্রের দুপুরে হিপিকে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরে এনে ফেলেছিল। সেটা শেষ করার পর বেলা পড়ে গেল। তখনই নিশানাথের বাড়ির দিকে তারা আসছিল।...কলকাতা মহানগরীর বিখ্যাত ভিড়-ভাট্টা পার হচ্ছিল। আবর্জনা আর ভিড়, বিজ্ঞাপন আর মিছিল পার হচ্ছিল। হিপিকে নিয়ে বাস ট্রামের ঝঞ্ঝাট জ্যাম কাটাচ্ছিল। স্তূপীকৃত ময়লা পার হয়ে একশো চুয়াল্লিশ ধারার এলাকা ইত্যাদি কাটাকুটি করে শেষে হিপিকে

হয়ে গেল। তার পরেই সামনে ফিরেছে, তখন সানাকির মত করে তলপেট নাড়াচ্ছে...। শরীর স্থির, তলপেটটা নড়ছে কেবল...।

ঘরসুদ্ধ নিশানাথের বন্ধুবান্ধব 'আহা আহা আহারে' বলে চেঁচিয়ে উঠল।

তীব্র অথচ সুচারু

আছে। জায়গায় জায়গায় ইলেকট্রিকের মেটমেটে আলো। বেশির ভাগ জায়গায় বালব ভাঙা। পথে কাঁচের টুকরো পড়ে রয়েছে। কম আলোয় ধোঁয়া আর কুয়াশায় দমবন্ধ অবস্থা কাটিয়ে কাটিয়ে ওরা চলেছে। নিশানাথের বাড়ি পেরিয়েই খানিকটা অন্ধকার। জামরুল গাছের ছায়া। বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখছিল

সরজালের

স্মরজিৎ ব

নিশানাথের বাড়িতে তুলেছে। বিকাল বেলায় ওরা সকলে মোড়ের চায়ের দোকানটায় হিপিকে নিয়ে বসেছিল। ঘণ্টাখানেক। নোংরা ঝুলপড়া তেলচিটের ছোপ, বাঁশ বাখারির হাড়গোড় বেরনো চায়ের দোকানটায় লোকজনের ভিড় জমে যাচ্ছিল। হিপি বস্তুকে দেখার জন্যে পাড়ার ছেলে ছোকরা, আর বুড়োদের ভিড়। কিছু ড্রাং

মানুষ বেশী করে ভিড় বাড়াচ্ছিল।

বুড়িরাও ভিড় করছিল এই অদ্ভুত নিরাসক্ত জীবটিকে দেখার জন্য। ততক্ষণে নিশানাথ ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে—সন্ধ্যের পর এ বাড়িতে আসা চাই। ফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে সে বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করছিল : নিশ্চয়ই আসা চাই। হিপি এসেছে হিপি। হ্যাঁ।

তারপর ফোন পেয়েই যথাসময়ে নিশানাথের ড্রইংরুমে জড়ো হয়ে গেল সকলে।

হাওড়া শহরের একরাশ গলি ঘুঁজির মধ্যে জট পাকিয়ে যাওয়া নিশানাথের বাড়িটা। ছোট্ট সুন্দর ছিমছাম বাড়িটি। গ্রীলের সঙ্গে কাচের শার্সি দেওয়া একতলা বাড়ি—সঙ্গে এক ছটাক বাগান রয়েছে। গলির গোলকধাঁধার মধ্যে এই বাড়িটাকে আবিষ্কার করে সকলে এসে পড়ল সন্ধ্যের পর। ড্রইংরুমে সোফা কউচ টিপয়। দেয়ালে দেয়ালে দামী ছবি ক্যালেণ্ডার। দেরাজ বুক-সেল্ফ

দেয়াজে খুণ্ডপসের ঢাকা। পিতলের ছাই-দানি আর নিয়নের আলো, পর্দা, সব মিলিয়ে নিশানাথের ড্রইংরুমে একটা আলাদা জায়গা।

নিশানাথ নিজেই একবার আমেরিকা ঘুরে এসেছে। কয়েক বছর আগে। ঘুরে আসার সময় ওখান থেকে কিছু হিপিদের রেকর্ড সংগ্রহ করে কিনে এনেছিল। অবশ্য তখনও ঠিক গোটা আমেরিকা জুড়ে এতটা হিপি প্রভাব দেখা দেয়নি। যাই হোক, আজ একজন টাটকা গোটা হিপিকে বাড়ির মধ্যে পেয়ে যেতেই নিশানাথের অভিপ্রায় যেন ষোল আনা পূর্ণ হল।

অনিমেষ দত্ত, শীতাংশু রায়, সন্তোষ, অমিতাভ, গৌরাঙ্গ, পরিতোষ, নৃপেন, অসীম, বিজয় গোপাল। সকলেই সোফা কাউচে এদিক ওদিক করে বসে আছে। টিপয়ের ওপর নিশানাথের রেকর্ডপ্লেয়ার শব্দ তুলছে। রেকর্ড প্লেয়ারের দুপাশে নিশানাথ ও হিপি বসে আছে। ঘরের মধ্যে দেশী বিদেশী মানুষের ভিড়। রেকর্ড বাজছে। কিছু বাংলা গানে ঘরের আবহাওয়া পূর্ণ। সকলের একটি একটি করে ছায়া—পাতলা কাগজের মত ছায়া, মিশ্রিত জড়াজড়ি করে মোজাইক মেঝেয় পড়ে আছে। কালো রেকর্ডের ওপর নিশানাথ ও হিপির দুটো মসৃণ ছায়া দুপাশ থেকে পড়ে। শীতের রাত। বাইরেটা কুয়াশা আর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। অস্পষ্ট আবছা দমবন্ধ আবহাওয়া। হিপির আগমনের পর এ ঘরটায় কিছু ধূপ ধুনো দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন ঘরের আবহাওয়া গানে সুরে দেশী বিদেশী মানুষের মেলামেশায় পূর্ণ। গমগমে। অমিতাভ বলে উঠল : কিছু তালের গান দিন, ওরা একটু উদ্দীপ্ত চটুল সঙ্গীত পছন্দ করে।

নিশানাথ এবার বিদেশী গানের রেকর্ড পালটাল। 'আই স্য হার স্টান্ডিং দেয়ার' গান লাগাল। সেটা শেষ হয়ে যেতেই 'হোল্ড মি টাইট' শুরু হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আবহাওয়া ঘুরে গেল। এর মধ্যে কিছু কিছু খাবার-দাবার এসে গেছে। কফি আগে একবার হয়ে গেছে, আবার কফি এল। সঙ্গে টোস্ট আর ডিমের ওমলেট। গান পুরোদমে ঘর ফাটাচ্ছে।

হিপির গায়ে একধরনের হাতকাটা পাঞ্জাবি। তার সঙ্গে বেখাপ্পা ঘোর ব্লু রঙের জিন কাপড়ের চাপা প্যাণ্ট—কোমর থেকে পা পর্যন্ত চেপে বসে আছে। পায়ে কেডস জুতো। গলায় তুলসীর মালা। ছিপছিপে শক্ত রোগা চেহারা। রঙ ফর্সা, ঈষৎ লালচে। চোয়াল শক্ত অথচ দৃঢ়। পাতলা লালচে চামড়া, গায়ে মুখে টান টান হয়ে আছে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। এলো-মেলো। গালে পাতলা সোনালী অল্পস্বল্প দাড়ি রয়েছে।

আবার গান পালটে দিল নিশানাথ। 'অ্যান্ড আই লাভ হার'—।

সন্তোষ ঘড়ি দেখল। কাঁটা দুটো ঠ্যাং ফাঁক করে আছে। পেণ্ডুলাম গোঁত্তা মেরে মেরে সরাচ্ছে কাঁটা। সকলে এদিক ওদিক বসে কথাবার্তা সারছে। কেউ গান শুনছে, কেউ শুনছে না, হিপি দেখছে; বাঙালীরা যেমন করে দেখে, আড়চোখে অথচ ভিতর পর্যন্ত—তেমনি করে দেখছে। কেউ নিশানাথ আর তার ঘরের ঐশ্বর্য দেখছে। কেউ তার বাড়ির কথাটা ভাবছে, কেউ বাইরের দরজায় চেয়ে। গান শোনা লোকটা আবার ঘুরে পর্দা দেখছে আর বাংলাদেশ নিয়ে ভাবছে। নখ খুঁটছে, আর হিপি দেখছে। আর কেবল অনর্গল ভাবছে, আর হিপি দেখছে। তারপর বলে উঠল; দূর শালা বাংলাদেশ, বাংলাদেশে কিসসু নেই।

নিশানাথ কথা বলছিল।

হিপি উত্তর দিচ্ছিল স-স্-স করে।

বন্ধুরা কথা বলছিল, বোঝাচ্ছিল হিপিকে।

হিপি তাদের কথাটা অনভ্যস্তের মত বুঝতে চেষ্টা করছিল।

নিশানাথ আবার বোঝাচ্ছিল স্পষ্ট করে।

হিপি ঘাড় নেড়ে হাত পা দোলাচ্ছিল, স্-স্-স্ শব্দ তুলছিল। বুঝছিল।

বন্ধুরা নড়ছিল।

আবার রেকর্ড ঘুরে গেল। 'ইফ আই ফিল'—।

হিপি যখন বলছিল, সে বেনারসে আসার সময় 'ইংরেজী হটাও'-এর দল তাদের গায়ে থুথু ছিটিয়ে দিয়েছে—হিপি মুখ-খানাকে করুণ বোকার মত করছিল—।

বন্ধুরা ছিছি করছিল।

নিশানাথ একটু একটু করে রাজনীতির বুলি ছাড়ছিল।

হিপি বোঝার জন্যে হাত চোখ মুখ আগ্রহী করে তুলছিল।

বন্ধুরা কেউ টিটকিরি মারছিল।

সন্তোষ 'বক' দেখানোর মত মুখ নাড়ছিল।

হিপি হাসছিল।

বন্ধুরা হাসছিল, মিয়নো হাসি।

আবার রেকর্ড পালটাল। 'ফ্রম মি টু ইউ'—'থ্যাঙ্ক ইউ গার্ল'—।

হিপি বলছিল, এল, এস ডি—এল এস ডি—গাঁজা, আফিম।

বন্ধুরা হেসে বলছিল, হ্যাঁ, গাঁজা আফিম।

হিপি বলছিল, গার্ল ফ্রেন্ড অ্যাভেলবল?

বন্ধুরা চোখ মারছিল।

বেঙ্গলি গার্লস আর ভেরি প্লেজেন্ট, হিপি বলছিল।

বন্ধুরা বলছিল, ইয়েস, ঠিক বলেছ হিপি—মাইরি!

হিপি উৎসাহিত হয়ে বলছিল, ক্যান ইউ অ্যারেঞ্জ?

গৌরাঙ্গ ঠারে ঠারে বন্ধুদের বলছিল, তাড়ান, তাড়ান শালাকে। শালা, মেয়ে-মানুষের খাঁকতি নিয়ে এসেছে।

নিশানাথ তখনই রেকর্ড পালটে ফেলল—'লাভ মি ডু'—।

কফি খেতে খেতে হিপি বলল, সে নাচবে। নাচার জন্যে সকলে তৈরি হয়ে গেল। ড্রইংরুমের চেয়ার টেবিল এদিক ওদিক করে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার হল। হিপি তাড়াতাড়িতে কেডস জুতো খুলে ফেলল।

নিশানাথ রেকর্ড বের করে তৈরি হয়ে গেছে।

হিপিও রেডি। গান শুরু হয়ে গেল। হিপি তুলসীর মালা খুলে রাখতে দিল অনিমেষকে। ততক্ষণে রেকর্ড প্লেয়ারে গানের সুর তুলেছে—'লাভ মি ডু'—।

হিপি লম্বা লম্বা হাত পা ছড়িয়ে মুদ্রা, অঙ্গভঙ্গি ওলট পালট করছিল। হাত পা শরীরে ঢেউ তুলছিল। চোখে কাতর আর্তনাদ ফোটাচ্ছিল। গানের ভাষা অনুযায়ী চেহারা।

হিপি পায়ের গোড়ালি চেটো অল্প অল্প করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে শরীরটাকে কাঁটা তারের মত পাক খাওয়াচ্ছিল, বেদনা ফুটিয়ে তুলছিল। ঝাঁ করে ঘুরে দু হাত ঊর্ধ্ব-বাহু করে দিয়েই শুরু করল কোমরের দুলুনি।

হিপি শরীর দুলিয়ে ঝাঁকিয়ে চোখের কাছ থেকে মন্থর হাত ঢেকে, তারপর আস্তে আস্তে হাত সরিয়ে দিয়ে বোঝাচ্ছে ভালবাসা। ভালবাসার রূপ বোঝাচ্ছে। শরীরে ঢেউ তুলে হঠাৎ সুরের মূর্ছনায় ঝাঁ করে ঘুরে কুঁজো হয়ে গেল। তার পরেই সামনে ফিরেছে, তখন সার্নাকির মত করে তলপেট নাড়াচ্ছে...। শরীর স্থির, তলপেটটা নড়ছে কেবল...।

ঘরসুদ্ধ নিশানাথের বন্ধুবান্ধব 'আহা আহা আহারে' বলে চেঁচিয়ে উঠল।

ছোট ছোট তালে তীব্র অথচ সুচারু ভঙ্গিমায় হিপি গানের ভাষা মেলাচ্ছে, নাড়াচ্ছে, শরীর নাড়াচ্ছে। টলটল করে শরীর নাড়াচ্ছে, তলপেট সার্নাকির মত নাড়ছে। নাচটা প্রকৃতই শক্ত, অথচ উচ্ছল উদ্বেল করে তুলেছে ঘরসুদ্ধ লোকজনকে।

'প্লীজ প্লীজ প্লীজ মি', 'আস্ক মি হোয়াই' হবার পর 'আই এ্যাম এ লুজার' তারপর 'হেল্প' হয়ে গেল। পর পর ক'খানা নাচ শেষ করল। শেষের দিকটায় হিপি ঝড়ের মত তার দেহটা আন্দোলিত করেই শুরু করল কোমরের দুলুনি।

ঘরময় সকলেই 'আহা আহা আহারে' করে চেঁচিয়ে উঠল।

হিপিও একঘণ্টা নাচার পর হাঁপিয়ে বসে পড়ল সোফায়। গানও শেষ, হিপিও তার নাচ শেষ করেছে। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে সন্তোষ উঠে পড়ল। অন্যান্য সকলেই হিপির সঙ্গে শেষ পরিচয় করে বিদায় নিচ্ছিল।

দুই

হিপি নাচের পর সকলে গলির পথে হাঁটছিল। এখন রাত্রি হয়েছে। গলির চারপাশে ঠাস বাড়ি ঘর। গলি ঘুপচি আর বাড়িঘরের মধ্যে ধোঁয়া এবং কুয়াশা জড়িয়ে আছে। জায়গায় জায়গায় ইলেকট্রিকের মেটমেটে আলো। বেশির ভাগ জায়গায় বালব ভাঙা। পথে কাঁচের টুকরো পড়ে রয়েছে। কম আলোয় ধোঁয়া আর কুয়াশায় দমবন্ধ অবস্থা কাটিয়ে কাটিয়ে ওরা চলেছে। নিশানাথের বাড়ি পেরিয়েই খানিকটা অন্ধকার। জামরুল গাছের ছায়া।

চোখ বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখছিল শীতাংশু। দেয়ালে দেয়ালে হরতালের পোস্টার। আরো কিছু কিছু দাবি দাওয়ার পোস্টার ঝুলছে। কাঁচের টুকরো দেখে দেখে চলেছে অনিমেষ। গলির মধ্যে কিছু কিছু দোকান পসার রয়েছে। আট ন জনে দোকান থেকে সিগারেট কিনে ধরালো।

জীবন সকলের মাঝখানেই কথাটা বলল, জানে, যে কেউ কথাটার উত্তর দেবে। বলল, হরতালটা তাহলে কবে হচ্ছে? পরিতোষ উত্তর করল: চৌদ্দ তারিখে। জীবন আবার জিজ্ঞেস করল: তাহলে হচ্ছে ত! নাকি! নিশ্চয়ই। বলে পরিতোষ আবার বলল: এ মাসে বোধ হয় দুটো হরতাল হচ্ছে, তাই না! সকলের উদ্দেশে কথাটা বলল। শীতাংশু বলল, হ্যাঁ, তাই।

অনিমেষ একটু অন্যমনস্ক। রাজ্য সরকারের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মচারী। বদলির চাকরি। ফলে বাংলাদেশের বহু জায়গায় ঘুরেছে। বর্তমানে কলকাতায় বদলি হয়েছে। হিপি নাচের সময় নিশানাথের ড্রইংরুমে আরাম কেদারায় বসেছিল। অনিমেষ দত্ত। ছেলেপুলের সংখ্যা বেশি হয়ে যাওয়ায় একটু সুরে-সমঝে চলতে চাইছে; অথচ হচ্ছে না। বদলির চাকরি।

ফলে ছেলেপুলের লেখাপড়ায় অসুবিধা যেমন তার থেকে বেশি অসুবিধে হয়েছে অনিমেষের অর্থনৈতিক দিকটায়। ছেলে-পুলের সংখ্যা তিন চার ছাড়িয়ে গেছে। সব ব্যাপারে আধুনিক মানুষের মত জীবন নির্বাহ করলেও অনিমেষ এ ব্যাপারে একটু সেকেলে রীতি মেনে চলে। মেডিকেল সায়েন্সে তার বিশ্বাস নেই। মেডিকেটেড ওয়েতে চলতেও সে রাজী নয়। অথচ নিজের অর্থনৈতিক দিকটা ভেবে এবার একটা কিছু করে ফেলতে চাইছে। ছেলে-পুলের সংখ্যা আর না-বাড়িয়ে 'এই পর্যন্ত' করে রাখতে চাইছে। অথচ কি করে তা সম্ভব, আকাশ পাতাল ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। পথে যেতে যেতে এ কথাটাই ভাবছে কেবল।

অনিমেষ পথ চলতে চলতে বলল, শালা আর 'ভাল্লাগে' না। এক এক সময় মনে হয় মরে যাই। মরে 'ভূত' হয়ে ফিরে আসি, বাংলাদেশে মানাবে তবু। এ কথায় জীবন পরিতোষ বিজয় গৌরাঙ্গ হাসছিল খুব। অনিমেষ এ কথা থেকে আসল কথায় ফিরে এল। শালা কি যে করি—বউটাকে অপারেশন করাবো, না, নিজেরটাই করাবো—ভাবছি। বলতে বলতে অন্যরকম গলায় জীবনকে জিজ্ঞেস করল, জীবনবাবু, অপারেশন ব্যাপারে আপনার কি মত? কোনও চেনা ডাক্তার-ফাক্তার জানা আছে আপনার?

জীবন এ কথার কোন উত্তর করল না। সে হাঁটছিল। সন্তোষ হাই তুলল। তার দিকে চেয়ে গৌরাঙ্গও আর একটা হাই তুলে ফেলল। সন্তোষ হাত ঘড়িটা একবার দেখল। আবার বন্ধ হয়ে গেছে ঘড়িটা। ঘড়িটা বন্ধুর দোকানে সারাতে দিয়েছিল। সে শালা পার্টসগুলো যে কি করেছে! ঘড়ি শালা যেন চলতেই চায় না। ঝিম মেরে আছে। টাইম ত দিচ্ছেই না, উপরন্তু দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। নিশানাথের ঘরে ঢোকার সময় ঘড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আবার ঘরে ঢুকে মিলিয়ে দিতে কিচ কিচ করে চলল কিছুক্ষণ। আবার যে-কে সেই। ঘড়িটা দুটো ঠ্যাং চিরে মালখোরের মত পড়ে আছে। নট নড়ন চড়ন। সন্তোষ হরির নাম নিয়ে হাতটা ঝুলিয়ে নিতেই একটু নড়ন চড়ন হল, মুর্গির মত, তারপর আবার সেই মালখোরের অবস্থা।

পরিতোষ, আগে যে মার্চেন্ট ফার্মে চাকরি করত—অটোমেশন আসার ফলে সে ছাঁটাই হয়ে গেছে। প্রচুর জানা শোনা ছিল বলে অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে কম মাইনেয় একটা প্রাইভেট কন্ট্রাকটারি ফার্মে রিপ্রেজেন-টেটিভ-এর চাকরিতে ঢুকে পড়েছে। রিপ্রেজেনটেটিভের চাকরিতে অবশ্য একটা আলাদা শো আছে। টেরিলিন টেরিকটের স্যুট টাই এ্যাটাচি কেস। বর্তমানে যে জামা-কাপড়গুলো ওর গায়ে জড়ান আছে ওর খরচের মত একসঙ্গে অতগুলো টাকা মাইনেও পরিতোষ এক মাসে পায় না। দেখলে মনে হয়, পরিতোষ বেশি দামে বিক্রি করবার জন্যে তাদের শো-কেসে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। অথচ পরিতোষকে মাইনে দিচ্ছে টু-পাইস।

গৌরাঙ্গ পথ চলতে চলতে পরিতোষের পাশাপাশি এসে হাঁটতে শুরু করল। বলল, কিছু চাল কিনে রাখতে পারেন পরিতোষদা!

চাল! কেন? পরিতোষ যেন চমকে উঠে পরে মনে মনে এ কথার উপযোগিতা বিচার করছিল।

গৌরাঙ্গ বলল, চালের দামটা প্রচণ্ড হবে, দারুণ দাম বাড়বে।

কথাটা বলে ফেলে গৌরাঙ্গ পরিতোষের পাশে পাশে এমনভাবে হাঁটছিল—যেন পরিতোষ এ খবরটা জানত না, গৌরাঙ্গ বলে খুব ভালই করেছে। এবং এর পর থেকে পরিতোষও যেন এই চাল কিছু স্টক করবে কিনা সেই সিদ্ধান্তে অটল হচ্ছে, ভাবছে।

জীবন ও আরো দু-চারজন চাল কেনার কথাটায় কান রেখেছিল। চালের কথা শুনলেই কেমন হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের লোক তো! চাল কিনে রাখার কথা শুনে জীবন বলল, তাহলে কিছু ডালও কিনে রাখুন।

ডাল! পরিতোষ দ্বিতীয়বার চমকে উঠল।

হ্যাঁ, ডাল। বলে জীবন বলল, চালটা যদি কিনে রাখতে চান, তাহলে ডাল চিনি কেরোসিন তেল সরষের তেল বেবীফুড কাপড় চোপড়, মায় মানুষের সারাজীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস, যা পচে না, সবই কিনে মজুত রাখলে কি হয়!

অসীম বিজয় গোপাল বলে উঠল, বাঃ [illegible]! ফাইন! যা বলেছেন! সকলেই জড় হয়ে কথাটাকে নিয়ে নাচানাচি করছিল। [illegible] যেন তুড়ি মেরে মসকরা করছিল কথাটা নিয়ে। পরিতোষ আগে যতটা সিরিয়াস হয়ে উঠেছিল, এবার যেন ততটা শিথিল আলগা হয়ে ভেঙে পড়ল হাসিতে। তারপর বলল, দূর শালা, কিসসু কিনে [illegible] না। শালা দেশ যেমন চলবে আমিও তাই, যখন যা পাওয়া যাবে তাই কিনব।

সকলে আর একবার সিগারেট ধরালো। শীতাংশু সিগারেট নিল না। কি হল [illegible] না। বলে শীতাংশু পোস্টার দেখতে দেখতে চলল। নিশানাথের বাড়িতে শীতাংশু [illegible] কফি শেষ করে পরে [illegible] মুখে পুরে নিয়েছিল। তারপর থেকে আর মুখ ধোয়া নি। এটাই অভ্যাস হয়ে গেছে আজকাল। খাবার [illegible] খেয়ে [illegible] অভ্যাস। ডিম খেয়ে আঁচায় না। মুখ [illegible] নিজেদের পক্ষে কিছুক্ষণ ধরে [illegible] তার মুখে লেগে থাকবে। [illegible] নষ্ট করতে চাইছিল না। শীতাংশু হাঁটছিল।

নিশানাথের বাড়িতে হিপি নেচেছে। অনিমেষ সে দৃশ্যটা একবার ভেবে নিয়েই সেই গানটা ভাবছিল। আই অ্যাম এ [illegible]—।

অনিমেষ চলতে চলতে আবার বলল, কি করে বলুন তো! শালা বউটাকেই অপারেশন করিয়ে দেব!

জীবন বলল, দূর মশাই, ওসব ছুঁচের [illegible] করাতে যাবেন না। যা পারেন করে [illegible], যেখানে আটকাবে সেখানেই থামবেন।

জীবনের কথায় সকলেই আবার হেসে উঠল।

[illegible] গলির বাঁক নিল সকলে। গলিটা গোঁত্তা খেয়ে বেঁকে গেছে। একটা ওয়েল্ডিং-এর কারখানা। দপ দপ করে অক্সিজেন আলোর চোখ-মটকানি দিচ্ছে। গোপাল কথা বলছিল। বলল, বিজনেস-ম্যানরা যে গবর্নমেন্টের ধুদ্ধুড়ি নেড়ে কচলে দিতে পারে। বলার সংগে সংগে নৃপেন বলল, সেটা ভারতবর্ষেই সম্ভব। বলেই চুপ করে গেল হঠাৎ।

গৌরাঙ্গ বলল, কাগজে একটা খবর দেখেছেন, হেডিং ছিল, ডান দিকের নিউজ!

কি! বলে সকলে গৌরাঙ্গর দিকে চাইল। গৌরাঙ্গ খবরটা সকলের সামনে বলে দিল: ভারত নাকি পাকিস্তানকে শাসিয়ে দিয়েছে—বেশি বাড়াবাড়ি করলে ভারত পাকিস্তানকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে দেবে।

গোপাল ফিক্ করে হেসে ফেলল। তার দেখাদেখি কথাটা বুঝে ফেলে অসীমও। শীতাংশুও হেসে উঠল। পরিতোষ গম্ভীরভাবে চলছিল, সন্তোষ হাসল তারও পর।

জীবন বলল, সত্যি, কড়কে দিয়েছে ভারতবর্ষ। এ কথায় তো যে কোন দেশের রেগে যাবার কথা নয়; রেগে উঠে যাবার কথা।

সকলে আর একবার চিৎকার করে উঠল: যা বলেছেন মশাই!

গলিটা [illegible] বাঁয়ে [illegible] এঁকে বেঁকে একটা [illegible] সরল রাস্তা ধরেছে। পরিতোষ [illegible] মত কাকে যেন বলল, চাল [illegible] কি জানেন [illegible]?

[illegible] চোখ [illegible] দিয়ে [illegible] কথা জিজ্ঞেস করছে পরিতোষ।

[illegible] বলল, আজ্ঞে না, [illegible] এসব [illegible] জিনিস তো! ধরা পড়লে মুশকিল।

জীবন বলল, একটা কথা বলব, রাগ করবেন না?

কি? পরিতোষ জীবনের দিকে [illegible] ফেরাল।

জীবন বলল, আপনি নিজে কি চোলাই হয়ে এসেছিলেন?

তার মানে?

তার মানে, নিজে কি চোলাই মাল, অবৈধ সন্তান কি! চোলাই হয়ে পৃথিবীতে এসেছেন কি!

পরিতোষ রেগে যাচ্ছিল, এ কি যা তা বলছেন?

জীবন কথাটার যুক্তি নিয়ে এবার শেষ করতে চাইল। বলল, চোলাই বা অবৈধভাবে যখন আমরা কেউ পৃথিবীতে আসি নি, তখন খাদ্যটাও চোলাইভাবে কেন—বৈধভাবে পরিপূর্ণ খাদ্য দেওয়া উচিত। তাই নয় কি?

কারেক্ট কারেক্ট! বলে গলির গোটাকতক বাঁক ঘুরে গেল সকলে। তারপর সরু এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় চলতে শুরু করেছে।

কাল অফিস বেরোচ্ছেন? পরিতোষ জিজ্ঞেস করল গোপালকে।

গোপাল বলল, বেরোচ্ছি।

বলেই তখন আবার গলির পথে বাঁক নিল। সরু গলির দু পাশে বাড়িঘর ঠাসাঠাসি বোঝাই। [illegible] কালভার্ট-এর উপর দাঁড়িয়ে পড়ল কজনে। বোকালো না কেবল জীবন। সে মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে অন্য পথে যাবে ঠিক করল।

পরিতোষ জিজ্ঞেস করল কি হল যাবে না?

জীবন বলল, না। [illegible] যাব একবার, দেখি কি হয়। তারপর সকলের উদ্দেশেই বলল, ভাইটাকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে। গোলমালের সময় ওখানে দাঁড়িয়েছিল। বলার পর খানিক চিন্তিত হল জীবন। তারপর বলল, আচ্ছা চলি। ওরা সকলেই

আচ্ছা যাও, বলতেই জীবন হন হন করে বেরিয়ে গেল।

বাকি ক'জন কালভার্ট-এর ওপর দিয়ে একরকমের শব্দ করতে করতে চলেছে। আসলে ও তলাটায় নর্দমা। শব্দটা কিন্তু অদ্ভুত হচ্ছে। পায়ের স্লিপারের পেরেক লাগছে। অনিমেষ চটিটাকে কোনাকুনিভাবে পায়ে গলিয়ে ঘষে ঘষে চলেছে। বাংলা অক্ষরের ওপর জোর করে হিন্দীতে লেখা, তার ওপর কেউ ঘন আলকাতরা দিয়ে হিন্দী লেখাকে মুছে দিয়েছে। আলোর বাল্‌ব ভাঙা। পথের চার পাশে সোডার বোতল ভাঙা পড়ে আছে। দেয়ালে দেয়ালে প্রতিবাদমূলক নানারকম পোস্টার ঝুলছে। শীতাংশু পোস্টার পড়ছিল আবছা আলোয়। তারপর ওরা ক'জন মাফলার জড়িয়ে চাদর এঁটে বা কেউ কোটটাকে ঠিক ঠাক করে এঁটে নিয়ে এক এক দিকে ভেগে পড়ল।

তিন

রাত হয়েছে। নিশানাথ বিছানায় শুতে এসেছে। মানসী এখনও আসে নি। ঘুমের আগে নিশানাথ দুটো সিগারেট খায়। ডাক্তারের বারণ। তার একটা ধরিয়েও নিয়েছে। সিগারেট ধরিয়ে হিপি টিপি সম্বন্ধে চিন্তা করছিল। এতক্ষণ তার ড্রইংরুমে যে হিপি নাচছিল তাকেই ভাবছিল।

মানসী শুতে এল তারপর। এসেই নিশানাথকে একা পেয়ে হিপি নিয়ে অনেক কথা শুনতে চাইল। মানসী বলল, হ্যাঁগো, হিপিরা থাকে কোথায়? কেন মরতে এল সেদেশ থেকে এখানে?

নিশানাথ আধশোয়া অবস্থায় বলল, হিপিরা আসলে হল আমেরিকার। তবে এ হল ডাচ, সেরকমই ত ও বলল। তবে আমেরিকানরা হল মিকস্‌ড। বলে মানসীর দিকে চাইল নিশানাথ। কেন মরতে এল এদেশে—এ কথার কোন জবাব দিতে পারল না এখুনি।

মানসী বলল, কি আছে বল ত ওদের নাচের ভেতর। তা ছাড়া দেখ, দিনরাত নাচে, নেশা ভাঙ করে, গুলি চরোস খায়, নোংরা চুল দাড়ি কাটে না, মেয়ে-পুরুষ ঘুঁজি জায়গায় জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকে। এটাই কি পুরুষ মানুষের জীবন নাকি?

নিশানাথের হাসি পাচ্ছিল। কোনরকমে সম্বরণ করল। অ্যাসট্রের ছাই ফেলতে গেল। যতটুকু বিছানায় অসাবধানে পড়ে গেল সেটুকুন ঠুকে ঠুকে পরিষ্কার করল। তারপর বলল, তা নয়, এও এক সমাজ ব্যবস্থা, হিপিদের সমাজ।

মানসী মুখে পান পুরেছে। আঙুলের চুনটুকু টুক্‌ করে জায়গা মত মিটিয়ে দিয়ে বলল, যাই বল না কেন, সমাজ তৈরি করবে, অথচ কোন উদ্দেশ্য থাকবে না—এ হয় না।

তা ঠিক, নিশানাথ বুঝে পরে বলল, হিপিদের আসলে কোন উদ্দেশ্য নেই, কোন লক্ষ নেই, তবুও ওদের সম্বন্ধে শোনা যায় —বলে নিশানাথ গম্ভীর গলায় বলল, আমেরিকার ধনী মুনাফাভিত্তিক সমাজের বিরুদ্ধে ওরা মূর্তিমান বিদ্রোহ।

বা-রে, বলে মানসী বলে উঠল, তবে বলছ কেন ওদের কোন উদ্দেশ্য নেই। এটাই ত উদ্দেশ্য।

নিশানাথ যেন হেরে গেল। হেরে গিয়ে বলল, তা নয়, সোজাসুজি কিন্তু হিপিদের উদ্দেশ্য কিছু বোঝা যায় না মানসী।

বাসের ঝাঁকুনি লেগে মুখ থুবড়ে যাচ্ছিল জীবনের। ঘেঁষাঘেঁষি ক্যাপটা আপটি করে জীবন যেন চেপ্টে যাচ্ছে বাসে। ফুটবোর্ডের হ্যান্ডেলের ওপর গোটা হাত। মুঠো করে ধরে আছে হ্যান্ডেল। জীবন দুটো পা তার জন্ম করে খুঁজেও তার ভারের সন্ধান পায় নি। তাই একান্ত নিরুপায় হয়েই অন্য থানাগুলো দেখার জন্যে ডবল-ডেকারের ফুটবোর্ড-এ উঠে পড়েছে।

কলকাতার পথে পুলিস, লোকজন, ভিড় ভাট্টা, মিছিল, বিজ্ঞাপন, এক শো চুয়াল্লিশ ধারা, নোংরা, এবড়ো খেবড়ো রাস্তা, ট্রাফিক আর হিন্দী সিনেমার ন্যাংটোমো ও মেয়েমানুষের ন্যাকা ন্যাকা ছবিগুলোর পাশ দিয়ে নাচতে নাচতে গড়ান খেতে খেতে চলেছে ডবল-ডেকার।

জীবনের সামনে পিছনে ভারী রোগা মেয়েমানুষ রয়েছে। কুড়িটা হাতের বজ্র-মুষ্টিতে জড়িয়ে গেছে মানুষ। জনা চারেক মেয়ে উঠল এ অবস্থায়। উঠেই ওখানে আটকে গেছে। আঠার যোল বিশ বাইশ বয়স। উঠেই এই ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক জায়গাটা পার হয়ে বাসের ভিতরে যাবার জন্যে টানা হেঁচড়া করছিল।

চারজনেই হিপি গোছের মেয়ে। সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী। স্ক্রু, প্যাঁচ লাগিয়ে শাড়ি পরা, একজন স্ল্যাক পরা, একজনের কার্ডিগান। অবাঙালী মেয়েটার সর্বকিছু ব্যান্ডেজ বাঁধার মত। সকলের চুল যেন বাবুইয়ের বাসা। চুলের ঝাঁক থেকে মুখের চৌহদ্দি খুঁজে পাওয়া যাবে না। মুখে আঁচড়-টাঁচড় তৈরি করে চুম্বক হয়ে গেছে। কপালে কাঁচপোকার টিপ। চারজনেই ছটফট করতে শুরু করেছে। চারটি মেয়েকেই পা-দানির জীবনরা ভাগাভাগি করে নিয়েছে। জীবনের ভাগে পড়েছে বিশ বছরের হিপি গোছের মেয়ে। বাসটা বেধড়ক লাফাচ্ছিল বলে মেয়েমানুষগুলো ছটফট করছিল। আর জীবনরাও যেন বাসসুদ্ধ মেয়েমানুষ নিয়ে পথের পাঁচালী তৈরি করছিল।

মানসী তার আগেকার কথার জবাব পায় নি বলে নিশানাথকে আবার জিজ্ঞেস করল, তা হিপিরা এত দলে দলে আমাদের দেশে আসছে কেন গো?

নিশানাথ যেন [illegible] হয়ে গেছে মানসীর প্রশ্নে। বলল, তা জানব কি করে। ওরা কে বলে দেশ ঘুরতে এসেছে, কেউ বলে টাকায় দেশ ঘুরতে বেরিয়েছে। [illegible] দিনকতক আগে একদল হিপি ধরা পড়েছিল অবশ্য। ওরা নাকি সোনা নিয়ে এদেশ থেকে গাঁজা আফিম চরস চোরা পাচার করছিল। স্মাগলিং করছিল। অবশেষে পুলিস ধরেছে। নিশানাথ একটু অন্যরকম করে বলল, এই ডাচ হিপি ছোকরা বলছিল—ও নাকি বাপের টাকায় দেশ ঘুরতে এসেছে। বাপ হল বাগানের মালিক, ও নিজে একজন কবি। নিশানাথ [illegible], ওরা অনেক সময় আজে বাজে কথা বলে কিন্তু। কখনো কথায় গীতার কথা উল্লেখ করে। [illegible] নেশাভাঙ করার পর একদিন গীতা পড়ল, তার পড়েই সব স্বেচ্ছাচারের ভাব কেটে গেল। নেশা ভাঙ ছাড়ল। নিশানাথ এক এক করে হিপিদের স্বভাব প্রকৃতি [illegible] করছিল মানসীর সামনে। বলল, সব হিপি এদেশে এসে একইরকম কথা বলে। নিশানাথ কথা শেষ করে বলল, আসলে কি জান, হিপিরা একটা উদ্ভট বেলাল্লা সমাজ গড়ে তুলেছিল—এটা ঠিকই, তা সেভাবেই সেটা গড়ে উঠুক, আমেরিকান গভর্নমেন্ট এখন ওদের নিয়ে একটা বিরাট রাজনৈতিক কাজ করিয়ে নিচ্ছে কিন্তু।

মানসী চট করে বলে বসল, তার মানে এরা স্পাইগিরি?

নিশানাথ প্রথমটায় কিছু বলতে পারল না, পরে বলল, তা নয়, দেশের পলেটিক্যাল সিচুয়েশনটা কেমন দাঁড়াচ্ছে দেখছ ত! তা ছাড়া, বলে প্রচণ্ড হেসে উঠে বলল, স্পাইটাই নয়, আমাদের দেশে স্পাই পাঠাবার কোন দরকার দেখি না, এত খোলামেলা আর উদোম এ দেশ!

মেয়ে চারজন ডবল-ডেকারের ফুটবোর্ড কুড়িটা লোকের মধ্যে আটকে গেছে। আটকে গিয়ে তারা এই আটক গ্রেপ্তার অস্বীকার করে বাসের ভিতরে যাবার জন্যে ছটফট করছে। বাসের ভিতরের অবস্থা তথৈবচ। মেয়েমানুষে পুরুষমানুষে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝে লাফিয়ে নিচ্ছে। মেয়েরাও অস্বস্তি ভোগ করছে। একজন বাসযাত্রী মেয়েদের উদ্দেশে বলল, ভিড় বাসে উঠলেন কেন, আপনারা ত নেমে যেতেই পারতেন। কিন্তু জীবন ভাবল, এটা ত প্লানের কথা নয়—বলতে হয় বলেছে। মেয়েগুলি এদেশী হিপি গোছের। শাড়ি চুল ব্লাউজে একরকমের কারুকার্য করে চেহারাগুলো জম্পেশ করে ফেলেছে। আঠারো বছরের মেয়ের থলথলে পাছা, বুক ফেটে বেরিয়ে আসছে।

বাসের যাবতীয় লোকজন বারকতক করে নেচে কুঁদে নিল। কারণ রাস্তা। কারণ আবর্জনা দুর্গন্ধ। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়ে বাস হুড়মুড়িয়ে কাতরাতে কাতরাতে ছুটে যাচ্ছিল বলে পড়ো-পড়ো মেয়েমানুষ-গুলোকে পুরুষেরা আঁকড়ে ধরে রইল। সেই দুর্গন্ধ, নোংরা ডিজেলের বোটকা গন্ধে মেয়েমানুষ ফেয়েমানুষ নিয়ে নড়েচড়ে হন্দ হচ্ছিল সকলে। মেয়েরা কুঁকড়ে মুকড়ে জড়সড় হয়ে নিসপিস করছিল। ইস-স, উঃ আঃ ছিঃ ছিঃ ছাড়ুন—! মেয়েরা আপত্তি জানাচ্ছিল, অস্ফুট শব্দ বের করছিল। দামড়া একজন মিনসে রোগা ন্যাপসানো একটা মেয়ের পিঠ নাগাড়ে ধরে আছে। পাশের ভদ্রলোক খদ্দর-পরা। সামনেই একটা গয়লার গাই-এর মত মেয়েকে ভদ্রলোক পাঁজাকোলে করে ফেলেছে। মেয়েরা ইস-স! উঃ আঃ শব্দ করছিল। জীবন হিপির কণ্ঠস্বরে এমনি অজস্র শব্দ উদ্গীরণ শুনেছিল।

নিশানাথ তার দ্বিতীয় সিগারেট ধরিয়েছে। রাতও হয়েছে। ঘড়ির কাঁটা ছেতরে ত্রিভঙ্গমুরারী। দূরে কোথায় পটকা ফাটল, আকাশে ছিটনো একটু। নিশানাথ ওসব গ্রাহ্য করল না।

নিশানাথ বলছিল, বন্ধনহীন, মুক্তি, ওরা এসব কি শেখাবে আমাদের।

মানসী দুঃখ অনুশোচনা করছিল, ওদের প্রাচুর্যের মধ্যে এসব মানায়।

নিশানাথ বলছিল, ওরা ত স্বেচ্ছায় এ বেশ ধরেছে। কিন্তু আমরা—

মানসী বলল, আমরা বাধ্য হয়েই। আমরা কি বিতিকিচ্ছিরি নষ্ট হয়ে গেছি।

কথা বলতে বলতে মানসী আড় হয়ে গেছে বিছানায়। নিশানাথের চেহারা বিছানায় মচকানো। মানসী আড় হয়ে হাতটা ড্রয়ার পর্যন্ত লম্বা করে ধরেছে। ড্রয়ারে তার হারটা রাখবে। নিশানাথ দেখল মানসীর আড়-হওয়া দেহ। আঙুলে নেকলেশ জড়ানো, দুই পা হাঁটুর কাছ থেকে ভেঙে ঊর্ধ্বে তোলা, হাত লম্বা হয়ে ড্রয়ার ছুঁয়ে থাকা। তার শরীর থেকে ছায়া গড়িয়ে বিছানায় পড়েছে।

মানসীকে কিছুক্ষণ এভাবে দেখার পর নিশানাথ বলে উঠল, মানসী, তুমি নাচবে আজ একটু!

মানসী বলল, না না না। বলেই মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, অমন হিপির নাচও ত চেটে নিচ্ছিলে তোমরা। ছিঃ। তোমরা নিজেদের জিনিসকে কোনদিন বড় করে ভাবতে পার না, এটাই দুঃখ। তারপর থেমে চাপা গলায় বলল, তা ছাড়া নাচ যা শিখেছিলাম একদম ভুলে গেছি।

নিশানাথের মাথায় গোঁ চেপে গেল। মানসীর কোনরকম আপত্তি না শুনে ওকে জোর করে টেনে আদর করল। তারপর বলল, আমার ইচ্ছে হলে তুমি কিছু করতে চাও না। আমি শুনব না, তোমাকে নাচতে হবে।

নিশানাথ মানসীকে মেঝের ওপর দাঁড় করিয়ে পিছন ফিরেছে। মানসী ঠোঁট উল্টে একরকমের তাচ্ছিল্যের গলায় বলছে, আমি কিন্তু একটাই নাচবো, শুনেচো, একটাই।

নিশানাথ তখন রেকর্ড-প্লেয়ারের কাছে। গানের লাইন বলল : যেতে যেতে একলা পথে।

মানসীর ঠোঁটে বিরক্তি, ওফ্, আর পারি না বাপু! বলার সঙ্গে সঙ্গে গান বেজে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মানসীও শাড়ি চুল ঠিক করে নিয়ে শরীরের ঢেউ তুলেছে। গান অনুযায়ী হাতের মুদ্রা তৈরি করছে। নিশানাথ ছুটে এসে এবার টেবল ল্যাম্পের আলো টেনে নিল। মানসীর নাচের শরীর মুদ্রা লক্ষ করে আলো নিক্ষেপ করছিল এবার। মানসী নাচছে, নিশানাথ আলো ছায়ার কারুকার্য তৈরি করছে, ঘড়ির কাঁটা হাঁকছে, রেকর্ড ঘুরছে, ঘরের দরজা বন্ধ।

হঠাৎ কি থেকে কি হয়ে গেল। মেয়েদের ইঃ আঃ উঃ শব্দগুলো শোনা যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। মাঝে মাঝে ওরা কুঁকড়ে যাচ্ছিল। মেয়েদের মাঝ থেকেই অস্বস্তিতে ছটফটিয়ে কে যেন বলে উঠল : ছিঃ ছিঃ কি অসভ্য আপনারা, ছোটলোক।

কয়েকজন খুব ভয় পেয়ে গেল। জীবন ভাবল, ভয় পাওয়া লোক মানেই হল আনকোরা। কয়েকজন রীতিমত হুমড়ি খেয়ে কোথা কি করে বসছিল। আবার একজন অবাঙালী মেয়ে বলে উঠল : বদমাস, একেই বলে ইন্ডিয়া।

ভিড় থেকে মোটাসোটা লোকটা বলে উঠল, উনি কি থাইল্যান্ড থেকে আসছেন।

হাসি আরম্ভ হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে জীবনের হাতের ওপর ঘুষি পড়ল। মেয়েরা এদিক-ওদিক থেকে হাতের মুঠির ওপর ঘুষি চালাচ্ছে। এলোপাথাড়ি ঘুষি চালিয়ে জায়গাটাকে ফাঁকা করতে চাইছে। ভিড় বাসে জীবনরা সকলেই অতিষ্ঠ হচ্ছিল, তবুও বেধড়ক ঘুষির চোটে সকলেই অতিষ্ঠ। জীবন দাঁত মুখ টিপে মেয়েদের ঘুষি সহ্য করছিল।

জীবনরা সকলেই দু-চারটে করে ঘুষি খেয়ে নিচ্ছে। ভিড়, চাপ, বাসের মধ্যে ভলবেগল খেতে খেতে, টাল সামলে নিয়েই বাসের ঝাঁকুনি লাগাচ্ছিল। ঝাঁকুনি সমেত ঘুষি সহ্য করছিল।

পর পর কয়েকটা নাচল মানসী। নাচ শেষ। রেকর্ড প্লেয়ার থামল। মানসী নাচ শেষ করে চুপ করে বিছানায় শুলো। নিশানাথ বলল, বাঃ চমৎকার, বিউটিফুল!

মানসী ঘন ঘন প্রশ্বাস ছাড়ছে। নিশানাথ একটু সময় নিয়ে বলল, নাচটা তুমি শিখলে না—তা না হলে—।

মানসী নিজেকে শক্ত করার পর উত্তেজিত হল, কি বললে, শিখলাম না, না তুমিই কন্‌টিনিউ করতে দিলে না।

সেটা আমার একার অভিমত নয়, বাড়ির কেউ চায় না—এ বাড়ির বউ নাচুক।

বিয়ে ত তোমাকেই করেছি, বাড়িটাকে ত নয়।

থাম, তুমিও একটা সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙে দিতে চাও। নিশানাথ হাঁপাচ্ছে।

নিশানাথ স্থির শক্ত। মানসী চুপচাপ বসে। নিশানাথ নিজেকে দৃঢ় করে কথাটা অন্যভাবে বলল। শুধু নেচেই মরবে, নাচের উপযুক্ত জীবনটা কোথায়! আর কী নাচই বা নাচবে! দেশে খাদ্য নেই শুধু হাহাকার। জীবন যাত্রাটা যেখানে নিষ্ঠুর কমিক হয়ে যাচ্ছে, সেখানে রবিঠাকুরের নাচ!

মানসী দু হাঁটুতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। নিশানাথ দরাজ গলা করে বলল, দেশের এ অবস্থায় একটা নাচ নাচতে পার : প্রলয় নাচন নাচলে যখন, হে নটরাজ!

ঘুষি চালান থেমে গেছে। জীবন হাতের টাটানি ভোগ করছিল। মেয়েরা ঘুষি চালান থামিয়ে এবার চুটকি ইয়ার্কি, প্রশ্নোত্তর গল্প-গাছা, হাসি করতে করতে চলেছে। জীবনরা যেন ওদের ছুঁয়ে জড়িয়ে ধরে বৈতরণী পার হচ্ছে। জীবন অনেক আগেই একটা থানা পেরিয়ে গেছে। আবার একটা থানার স্টপেজ। জীবন নামল না, তার ভাইকে ভুলতে বসেছে। জীবন বাসে দাঁড়িয়ে তার ভাই নবজীবনের উদ্দেশে দুঃখ করছিল। ভাই নবজীবন, পুলিস জাতটা খুব ভাল লোক। তুমি ওদের কাছে অন্তত নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে। আপাতত ভারত-বর্ষ বা বাংলাদেশে কোন জায়গাই থাকার পক্ষে নিরাপদ নয়। থানাই তোমাকে শান্তি দিতে পারবে। মাঝে মাঝে বুড়ো বাপমাকে চিঠি চাপটা দিও। আপাতত আমাকে কেউ খুঁজো না। আমাকে কিছু মেয়েমানুষ আর ডবল-ডেকার ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

জীবন থানা পেরিয়ে যাচ্ছে। বাসটা টাল খেয়ে নাচতে নাচতে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাল পেয়ে জীবন সামনের মেয়েটার ঘাড়ের গচকায় স্যাটু করে চুমু খেয়ে নিল।

আলোয় কালোয়

ত্রিশঙ্কু

বাংলা দেশের বাইরে বাস করার কতকগুলো বিশেষ সুবিধে আছে। প্রধান সুবিধে সরকারী বিষনজরের বাইরে থাকা। প্রাত্যহিক অভাব-অনটন থেকে মুক্তি। শুধু বেঁচে থাকার জন্য যে কয়েকটি জিনিসের প্রয়োজন, যেগুলি বাংলা দেশে যেমন দুষ্প্রাপ্য, ভারতের আর কোথাও তেমন নয় হয়তো। যেমন ধরুন, এই দিল্লি শহরে দেরাদুনের চাল, খাঁটি গরুর দুধ, শিশুর খাদ্য ও মরশুমী ফলমূল প্রত্যেক মধ্যবিত্ত পরিবারের আয়ত্তের মধ্যে। দিল্লির অব্যবহিত পূর্বে ও পশ্চিমে যে দুটি রাজ্য —সেখানে এই সব সামগ্রী আরো সুলভ। ১৯৬৮ সালে যে বাঙালি সন্তান শুধু খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে চান—তাঁর পক্ষে অবিলম্বে বাংলা দেশ—সোনার বাংলা ছেড়ে চলে আসা উচিত।

মুশকিল বাধে কেবল ভাষা নিয়ে। রাস্তায় ঘাটে হাটে বাজারে অনর্গল হিন্দী বা ইংরেজী ভাষায় কথা বলতে বাধ্য হলে এক-এক সময় বিরক্তি লাগে। নাদুস-নুদুস ভেতো বাঙালীদের চেহারা দুবেলা চোখের সামনে না দেখতে পেলে মনে হয়, এই বিদেশ-বিভুঁই ছেড়ে পালিয়ে যাই। কাজ নেই সাচ্ছন্দ্যে, আমার বাংলাদেশের পচা ডোবা, কাদা-মাটি, নোংরা জঞ্জালে ভরা অনটনের জীবন ঢের ভালো।

অশোকদা একদিন এসে বললেন, তোমাদের পাড়ায় একজন বাঙালী থাকেন, আলাপ হয়েছে? আকাশ থেকে পড়লাম—এ পাড়ায় বাঙালী কোথায়! পরে জানলাম, আছেন একজন—হেনা প্যাটেল। কৃতী ছাত্রী ছিলেন অর্থনীতির, এখন একজন গুজরাটী অধ্যাপকের পত্নী। আলাপ হলো, ভারি চমৎকার ভদ্রমহিলা, মিশুক, সজ্জন—কিন্তু বড়োই প্রাদেশিকতা-মজে। সর্বভারতীয় ঐক্যবোধ যেন একটি বিশুদ্ধ বাঙালিনীর সর্বনাশ করেছে। হেনা দত্ত—এখন হেনা প্যাটেলের জন্য মমে মনে আমার বিষম কষ্ট হলো।

আন্তর্প্রদেশীয় বিবাহ এমন কিছু নতুন জিনিস না। আকছারই হচ্ছে। আমাদের পিতৃ-পিতামহদের অনেকে তো বিদেশিনী-দের বিবাহ করে এনেছিলেন। সম্ভবত সেই মহিলারা অনেকেই খাঁটি বাঙালী হয়ে গেছেন শেষ পর্যন্ত, যাঁরা হননি তাঁরা স্বামীদের সাহেব করে দিয়েছেন। এক পক্ষকে অন্তত তার স্বাজাত্য ত্যাগ করতে হয়। আমার দুঃখ সেইখানে। মাতৃভাষায় গান গাইতে পারবো না, ইচ্ছেমতো কাঁদতে পারবো না, ঝগড়া করতে পারবো না—ভাবলে আমার নিজেরই কান্না পেয়ে যায়। হঠাৎ খুব জ্বর হলে, মাথার যন্ত্রণা হলে, নিকটতম আত্মীয়কে কেমন করে সে কষ্টের কথা বলবো অন্য ভাষায়? যারা পরস্পরকে ভালোবাসে, ভাষার সমস্যা তাদের কাছে হয়তো তুচ্ছ—তবু সব ভালোবাসা ছাপিয়েও তো এক এক সময় একা পড়ে যেতে হয়। তখন কি এই সব উদারহৃদয় পুরুষ ও মহিলারা নিজেদের প্রক্ষিপ্ত মনে করেন না?

আপনি ত বাঙালী, আপনার জন্যে মাছ

সুদর্শন চোপড়া নামে এক তরুণ সাহিত্যিকের সঙ্গে সম্প্রতি ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে। খুব তেজী লেখক। সংগ্রামী। অনেক সময় শুধু লিখে যথেষ্ট আয় হয় না, ওর স্ত্রী চাকরি করে সংসার চালায়। যেন ও নিজের লেখা লিখতে পারে ইচ্ছে মতো। সুদর্শন প্রায়ই কৃষ্ণার কথা উল্লেখ করে গর্ববোধ করে। একদিন ও বাসায় নিমন্ত্রণ করলো। নানান রকম অন্ন-ব্যঞ্জনের

সাধ হয় না চুটিয়ে ঝগড়া করতে বাংলা ভাষায়?

ব্যবস্থা হয়েছিল, তার মধ্যে হঠাৎ বড়ো বড়ো কাটামাছের সরষে-ঝাল দেখে অবাক। কৃষ্ণা সাবলীল বাংলায় বললেন—ওদের জন্যে কাবাব-টাবাব বানিয়েছি, আপনি তো বাঙালী, আপনার জন্যে মাছ। এরা কাঁটা-মাছ বেছে খেতে পারে না। আপনি এলেন বলে অনেককাল পরে আমারও খাওয়া হবে। দেখুন, খেতে কেমন হয়েছে, ওসব রান্না তো ভুলেই গেছি।

সেদিন আবার [illegible] আমার কান্না পেয়ে গিয়েছিল। দিল্লি শহর থেকে কিছু দূরে কৃষ্ণনগর পাড়ায় যেন এক নির্বাসিত বাঙালিনী আজ হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। সেদিন আর কোনো কথা না, সাহিত্য-আলোচনা না, আধুনিক মানুষের জীবন-সমস্যা নিয়ে কোনো বাক-বিতণ্ডা না—সেদিন আমরা দুজন অনেকক্ষণ ধরে বাংলায় গল্প-সল্প করলাম। কৃষ্ণার ঘর-কন্নার গল্প, সুদর্শনের বোহিমেবিপনার গল্প, বাংলা সিনেমা, এইসব। ওদের ভালোবাসার সংসারে কোনো ফাটল নেই, কোনো গ্লানি নেই, গড়গড় করে হিন্দী বলতে পারেন কৃষ্ণা, সুদর্শনও ভাঙা-ভাঙা বাংলা শিখেছে, তবু কোথায় যেন একটা ছোট্ট মন কেমন লুকোনো রয়েছে, আমার মনে হলো। একটু অভিমান। হয়তো আমারই মনের ভুল।

সুদর্শন একবার বাধা দিয়ে বলে—তোমরা এত নিবিড়ভাবে কথা বলছো, যেন কৃষ্ণার বাপের বাড়ি থেকে কেউ এসেছে। তোমাদের কথা যেন ফুরোচ্ছে না।

একটু সচকিত হলাম। সত্যি, অন্য সব অভ্যাগতদের প্রতি মনোযোগ দিইনি আমরা। বললাম, বাস্তবিক আমি ওর বাপের বাড়ির লোক। তোমার সম্বন্ধী বলতে পারো।

সবাই হেসে উঠলো। আহারাদি শেষ হলে আমি কৃষ্ণাকে একটা গান গাইতে বললাম। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন কৃষ্ণা। তারপর যেন অনেক দূর থেকে টেনে আনলেন স্মৃতি। মনে মনে গুনগুন করতে লাগলেন কিছুক্ষণ। বললেন, ভুলে গেছি, কিন্তু গাইতে খুব ইচ্ছে করছে। ভুল হলে আপনি ধরিয়ে দেবেন।

তারপর খুব সংকোচের সঙ্গে গান ধরলেন—'শ্রাবণ মেঘে নাচে, নটবর রমঝম রমঝম রমঝম—ঘুমঘোরে এলে মনচোর, নমো নম, নমো নম, নমো নম।' আমি যেন স্তম্ভিত হয়ে নজরুলের এই অপূর্ব গানটি আত্মসাৎ করতে লাগলাম। চোখের সামনে যেন দেখতে পেলাম, এক কিশোরী মেয়ে বংশীধারী মূর্তির সামনে নেচে-নেচে গান করছে, তার নূপুরের শব্দে আমাদের আড্ডার আসর যেন দুলে দুলে উঠছে। এ গানের কোনো হিন্দী অনুবাদ হয় না....

এইসব নির্বাসিত বাঙালী মেয়েদের মনে কি কোনো অভিমান থাকে না? আমার মনে এক এক সময় এই প্রশ্ন জাগে। আমরা কেউ যেন কোথাও কোনো কর্তব্যে ত্রুটি করেছি। চলে যেতে দিয়েছি এইসব আত্মীয়াদের। যে স্নেহ ওদের প্রাপ্য, তা ওদের দিইনি, ভালোবাসিনি। অন্য কেউ সে স্নেহ-ভালোবাসা দিয়েছে, পরিপূর্ণ ভরে রেখেছে সোনার প্রতিমাদের। কর্তব্যচ্যুত আত্মীয়ের মতো আমরা পরে ওদের দেখে কষ্ট পাই।

শুধু একটিমাত্র বাধা। হয়তো ঠিক বাধা নয়। ব্যবহারিক অসুবিধে কিঞ্চিৎ। কিংবা তাও নয়। মূল জায়গায় মনের মিল থাকলে ভাষার ব্যবধান তুচ্ছ হয়ে যায়। তবু কিছুতেই যেন ভুলতে পারি না, এইসব হেনা প্যাটেল বা কৃষ্ণা চোপড়াদের কি ইচ্ছে করে না কখনো গলা ছেড়ে বাংলায় গান গাইতে, বাংলায় কাঁদতে। খুব রেগে বিরক্ত হলে কি ওদের সাধ হয় না চুটিয়ে ঝগড়া করতে বাংলা ভাষায়? প্রিয়তমকে যখন চিঠি লেখেন এঁরা, তখন অমোঘ বাংলা শব্দগুলো কলমের মুখে এসে ভিড় করে না?

বুদ্ধদেব বসু

কালসন্ধ্যা

[মুহূর্তকাল পরেই যবনিকা আবার উঠলো। ব্যাসদেবকে দেখা গেলো তাঁর আশ্রমে, ভূর্জপত্র ও লেখনী নিয়ে গ্রন্থরচনায় রত। ব্যাসদেব ঘোর কৃষ্ণকায় ও কুদর্শন, তাঁর কণ্ঠস্বর অতি গম্ভীর, ঈষৎ কর্কশ। তাঁকে দেখে যুবা, বৃদ্ধ কিছুই মনে হয় না; তিনি যেন বয়সের অতীত, শিলাখণ্ডের মতো স্থির ও অবিচল। ধীরে, শান্তভাবে মাঝে-মাঝে বিরতি দিয়ে তিনি কথা বলবেন। শ্লথ চরণে গাণ্ডীবধারী অর্জুনের প্রবেশ।]

অর্জুন

[প্রবেশ ক'রে]

পিতামহ, ব্যাসদেব,
আমার প্রণাম নিন।
আমি পার্থ, স্বনামের অযোগ্য যদিও আজ,
অকৃতার্থ, ক্ষমাভিক্ষু।

ব্যাসদেব

বৎস, কেন এই পরিতাপ?

অর্জুন

[নিশ্বাস ফেলে]

ভাষা নেই, পিতামহ, কণ্ঠ নেই করি উচ্চারণ!
আমি আজ ঈর্ষা করি কর্ণ, দুর্যোধনে
মৃত্তিকায় রক্ত ঢেলে যাঁরা
পুণ্যধামে চ'লে গিয়েছেন।
তাঁরা বীর, সার্থক ক্ষত্রিয়।
আর আমি, অর্জুন, অপ্রতিদ্বন্দ্বী,
চিরকাল জয়ে নিঃসংশয়,
অবশেষে জীবন্মৃত — জীবন্মৃত।
কেন এই অক্ষমতা, যার তুলনায়
মৃত্যু ছিলো শত গুণে বরণীয়?
উর্বশীর অভিশাপ শতগুণে ছিলো বরণীয়?
কেন তবে দুই মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়েছিলাম?
কেন—শুধু সংবৎসরব্যাপী নয়—
আমরণ, অচিকিৎস্য ক্লীবত্ব করিনি লাভ?
আমি কি তাহ'লে এতদিন
ছিলাম পুত্তলি শুধু, স্বেচ্ছাচারী দেবতার হাতের পুত্তলি?

ব্যাসদেব

থামো।
বাহুল্য তোমার উক্তি।
সব আমি জেনেছি অগ্রিম।

[পুঁথি বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন।]

প্রপৌত্র, প্রপিতামহ, সকলের সমানবয়সী,
আমি সব জেনেছি, করেছি সহ্য :
পুরুষ ও নারীর প্রণয়,
পুরুষ ও নারীর বিদ্বেষ।
সৌহার্দ্য, অসূয়া, দয়া, আত্মগ্লানি।
পার্থ তুমি দূষ্য নও, শ্লাঘ্য নও।
তুমি জয় করোনি অলোকজাতা
দ্রৌপদীকে, কুরুক্ষেত্রে সংহার করোনি শত্রু।
সব দেবতার দান। তুমি পেয়েছিলে
প্রচুর, অপরিমাণ, মানবের প্রাপ্যের অধিক।
তার মূল্য দিতে হবে।
খাণ্ডবদাহকালে অগ্নি ও অর্ণব

স্বভাববৈরিতা ভুলে সমবায়ী,
তোমাকে দিয়েছিলেন গাণ্ডীব, অক্ষয় তূণ।
তোমার দিব্যাস্ত্রপুঞ্জ পশুপতি শিবের প্রসাদ,
কিংবা যম, ইন্দ্র, আর বরুণের স্নেহচিহ্ন।
সব দেবতার দান—কিন্তু কে দেবতা?
তাঁর বহু নাম, বহু রূপ।
আপাতত কৃষ্ণের প্রচ্ছদে
ছিলেন তোমার সঙ্গী, সহকর্মী, নির্দেশক।
তোমার রথাগ্রে তিনি শত্রুকুল দগ্ধ করেছেন,
তুমি শুধু নিক্ষেপ করেছো শর
যারা হত, তাদেরই উদ্দেশে।
তুমি নও ধনঞ্জয়, জিষ্ণু, পরন্তপ—
সব তিনি।
কিছু নেই, যা তাঁর অজ্ঞাত ছিলো,
কিছু নেই, যা তাঁর অসাধ্য ছিলো।
তবু সৃষ্টি যেহেতু সীমায় বদ্ধ, এবং স্রষ্টাও
স্বরচিত নিয়মের বশবর্তী,
তাই তিনি বিনা প্রতিবাদে
সব হ'তে দিয়েছেন যথাকালে, যথোচিতভাবে।
কিন্তু আর প্রয়োজন নেই—
আপাতত — তাঁর, যা তোমার।

তাই তিনি, তোমাকে বিদায় দিয়ে
দ্বারকায় আরণ্যক বৃক্ষতলে যখন শয়ান
দূরে থেকে তাঁকে বন্য পশু ভেবে, এক ব্যাধ
বাণ ছুঁড়ে দিলো। তিনি তা মেনে নিলেন।
এইভাবে তাঁর মৃত্যু।

[অর্জুন চকিত হ'য়ে একবার মুখ তুলে তাকালেন।]

যদি একে মৃত্যু বলো।
অতএব অর্জুন, তুমিও আজ সমাপ্ত, নিঃশেষ—
যদি কোনো সমাপ্তি কোথাও থাকে।
তাই—আপাতত— —
দস্যুরাই হ'লো জয়ী। অঙ্গনারা
কেউ নিগৃহীত, আর কেউ বা স্বেচ্ছায়
হলেন তাঁদের ভোগ্যা। কৃষ্ণ ক্ষণিকের জন্য
তোমার মানসপটে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেলেন।
কিন্তু এতে তুমি কেন হতাশ্বাস?
এ-ই কি যথেষ্ট নয়, তুমি আজ অনন্যদের স্মৃতি,
ভূর্জপত্রে অবিরল নবজাত,
ভবিষ্যতে উত্তীর্ণ অতীত—এক চিরবর্তমান?
তুমি, পার্থ, কখনো হবে না প্রাজ্ঞ। তবু শেখো
অন্তত বিনয়, দৈন্য, আত্মসমর্পণ।
শেখো :
অনাচার, সদাচার, ধর্মাধর্ম, সব আপাতিক।
যা-কিছু সময়োচিত, তা-ই যথাযথ।
শেখো :
অসামান্য প্রতিভাও দণ্ডনীয়, বিনামূল্যে লভ্য কিছু নেই,
সব দান ছদ্মবেশী ঋণ।
শেখো :
কাল সেই গর্ভ, বীজ, ধাত্রী ও শ্মশান,
যা ঘটায়, নিরন্তর আবর্তনে, জন্ম, বৃদ্ধি, অবক্ষয়, অবলুপ্তি,
আনে কীর্তি, এবং কীর্তির ধ্বংস,
আনে, যাকে লোকে ভাবে যুগান্তর,
কিন্তু যা নিতান্ত পুনরাবৃত্তি, শুধু বধ্য-ঘাতকের স্থান-
বিনিময়।
যাও, বৎস, শান্ত মনে স্বীয় পথে; গর্বিত গাণ্ডীব, তূণ
দাও তাঁকে ফিরিয়ে, যিনি দিয়েছিলেন। আর অস্ত্র
ধারণ কোরো না।
ভুলে যাও বীরত্ব, যুদ্ধ ও জয়। এ-মুহূর্তে
আছেন হতাবশিষ্ট মহিলারা—
সুভদ্রা, রুক্মিণী, সত্যভামা,
বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, শিশুগণ।
তাঁদের স্থাপন করো অভিপ্রেত রাজ্যে বা আশ্রমে।
হোন পরীক্ষিৎ রাজা হস্তিনায়।
তারপর পঞ্চভ্রাতা তোমরা বেরিয়ে পড়ো
পাঞ্চালীকে সঙ্গে নিয়ে। প্রস্থান সুন্দর হোক তোমাদের।
জেনো, আজ এক বৃত্ত পূর্ণ হ'লো, অন্য এক বৃত্ত এর পরে—
হয়তো বা আরব্ধ এখনই।
যাত্রা করো, বিদায়।

অর্জুন

পিতামহ, বিদায়।

[অর্জুন শ্লথ চরণে বেরিয়ে গেলেন।]

ব্যাসদেব

[অর্জুনের চ'লে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে]

এই সব কুশীলব—ক্ষণজীবী প্রাণের ফুৎকার,
একমাত্র অক্ষরেই নির্ধারিত এদের উদ্ধার।

[ব্যাসদেব আবার আসীন হ'য়ে পুঁথিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে, লেখনী তুলে নিলেন। মঞ্চে আলো ম্লান হ'য়ে এলো। রচনায় নিবিষ্ট ব্যাসদেবকে কিছুক্ষণ দেখতে পাচ্ছি আমরা—কোনো শিলাখণ্ডের মতো অস্পষ্ট ও স্থির। ধীরে যবনিকা নামলো]

সমাপ্ত

বিশ্ব বিজ্ঞান

উদ্ভিদবিদ্যার নতুন শাখা—অ্যাল্‌গোলজি

অ্যাল্‌গোলজি নামটির উদ্ভব এক-কোষবিশিষ্ট অ্যাল্‌গা জাতীয় সবুজ জলজ উদ্ভিদ ক্লোরেলা থেকে। এই উদ্ভিদটির কথা নিয়ে এই ১৫।২০ বছর আগেও কেউ সে রকম মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু মহাকাশ বিজয়ের যুগে উদ্ভিদটি জাতে উঠেছে গ্রহান্তরে যাত্রীর খাদ্যের এক অন্যতম উৎসরূপে। আর জিনিসটি যদি মহাকাশযাত্রীর খাদ্যের উৎস হতে পারে তা হলে আমাদের মত মাটির মানুষের ক্ষেত্রেই বা সেটি খাদ্যের উৎস হতে পারবে না কেন? সুতরাং ক্লোরেলাকে আমরা মানুষের খাদ্যসম্পদ বৃদ্ধির এক উপকরণ হিসাবেই দেখতে পারি। কিন্তু ক্লোরেলা খাদ্য যোগানো ছাড়া অন্য কতকগুলি কাজে উপকারে আসতে পারে। সেগুলিও আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করব।

রাশিয়া আর আমেরিকা এই দুটি দেশেই বোধ হয় মহাকাশযাত্রীর খাদ্য হিসাবে ক্লোরেলা নিয়ে সবচেয়ে বেশী কাজ হচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদী মহাকাশ পরিক্রমার ব্যাপক পরিকল্পনায় এই দুটি দেশই সবচেয়ে অগ্রগামী। সেই রকম দীর্ঘমেয়াদী যাত্রায় যাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ রসদ যোগানো মামুলী খাদ্যের পক্ষে অসম্ভব। কারণ, অত বেশী খাবার দিতে গেলে মহাকাশযান অত্যধিক ভারী হয়ে যাবে। সেই অবস্থায় ক্লোরেলাই হবে যাত্রীর বেঁচে থাকার একটি উপায়। জাহাজের ভিতরে যাত্রীর প্রশ্বাসের অঙ্গারক বাষ্প শোষণ করে নিয়ে ক্লোরেলা সেখানে ক্রমাগত অক্সিজেন যোগান দেবে, যেমন সবুজ গাছ দিয়ে থাকে। তার মানে মহাকাশযানের ভিতরের বায়ু এইভাবে শোধিত হবে। শুধু তাই নয়, ভিতরের জলও সে শোধন করবে। যাত্রীর ঘাম ও মলমূত্রের মধ্যকার জৈব পদার্থ আলাদা করে তার সঙ্গে খনিজ পদার্থ মিশিয়ে ক্লোরেলা যে জল উৎপন্ন করবে পানীয় জলের আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সেই জলের মানের কোন তফাত থাকবে না। ১০ মাস পরীক্ষার দ্বারা এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। মানুষের পরিত্যক্ত আবর্জনার উপর যে ক্লোরেলা জন্মাবে তা ৪৫ দিনের মধ্যে যাত্রী খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন, আধপেটা নয়, পুরোপেটা। বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ভেসে যাওয়ার পথে এই জলজ উদ্ভিদটি জাহাজের ভিতরের দূষিত জল ও বায়ু

এই টেস্ট টিউবগুলির মধ্যে কোটি কোটি এককোষী জলজ উদ্ভিদ আছে

মহাকাশবিজয়ে ক্লোরেলার ভূমিকা অনুশীলন করে এই ছাত্রটি ডিপ্লোমা (ডক্টরেট) পাবার প্রত্যাশা করেন

আবার বিশুদ্ধ করতে পারবে এবং খাদ্যের এক প্রধান উৎস হয়ে উঠবে।

আগেই বলেছি মহাশূন্য ছাড়াও এই পৃথিবীর মাটিতেই ক্লোরেলা অন্য বহু কাজে লাগবে। কীয়েফ শহরের উপকণ্ঠে ফিওফানিয়া নামে ছোট জনপদ আছে, যেখানে উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে গবেষণা হয়ে থাকে। ভিতরে ঝোলানো কিছু বস্তু সমেত কতকগুলি সারবন্দী বকযন্ত্র ল্যাবরেটরীর মধ্যে লুমিনোস্টাটের উপর স্পন্দিত হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে কম্প্রেসারের গুঞ্জনধ্বনি। কতকগুলি কাচের টিউবের উপর বিজলীর আলো পড়ায় ভিতরে ক্লোরেলাগুলিকে নড়াচড়া করতে দেখা যাচ্ছে।

কিছুদিন আগে এখানে বিভিন্ন প্রজাতির ক্লোরেলার উপর বিভিন্ন পুষ্টিকর পদার্থের রাসায়নিক ও দৈহিক প্রতি-ক্রিয়া এবং ফলনের তারতম্য পরীক্ষা করা হত। এখন আরো নানা দিকে গবেষণাকে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। যেমন—গৃহপালিত জীবজন্তুকে যে খাদ্য দেওয়া হয় ক্লোরেলার দ্বারা তার সঙ্গে আরো কিছু প্রোটিন ও খাদ্যপ্রাণ যোগ করা যায় কি না, পরিত্যক্ত ময়লা ও আবর্জনা পরিষ্কার করায় জিনিসটি কোন কাজে আসতে পারে কি না ইত্যাদি।

পরিত্যক্ত ময়লা (সিউয়েজ) সাফ করা একটা খুব বড় সমস্যা। কীয়েফ শহরে যে কৃত্রিম ও সংশ্লেষিত তন্তুর কারখানা আছে সেখান থেকে ময়লা ও আবর্জনা হিসাবে বার হয়ে আসে দস্তার লবণ, হাইড্রোজেন সালফাইড, কার্বন বাইসালফাইড, সাল-ফাইড প্রভৃতি জিনিস। কোন রকমেই সেগুলি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করা যায় না, সেগুলি কোন ট্যাঙ্কে তলানি হিসাবেও পড়ে না বা জমা হয় না। ফলে, সেগুলি যখন নীপার নদীতে গিয়ে পড়ে তখন সেখানকার নদীর জল বিষাক্ত হয়ে যায়। কিন্তু ঐ জলে ক্লোরেলা জাতীয় অ্যালগির চাষ করে সেগুলির দ্বারা ঐ পদার্থগুলি শোষণ করানো যায় কিনা তাই নিয়ে বছর তিনেক পরীক্ষার পর আজ বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন যে সেই কাজ ক্লোরেলার দ্বারা সম্পূর্ণ সম্ভব। কারখানার ঐ সব পরিত্যক্ত আবর্জনার সঙ্গে যদি ক্লোরেলার পক্ষে পুষ্টিকর কিছু দ্রব্য মিশিয়ে দেওয়া যায় তা হলে মাত্র দিন তিনেক পরে দেখা যাবে যে, ঐ আবর্জনা থেকে দস্তা, হাইড্রোজেন সালফাইড, সাল-ফাইড, গন্ধক ও লোহা ষোল আনা মুক্ত হয়ে গিয়েছে, কেবল কার্বন বাইসালফাইড ষোল আনা মুক্ত না হয়ে হয়েছে ৬০ শতাংশ। তা ছাড়া ঐ আবর্জনায় অক্সি-জেনের পরিমাণ বেড়ে যায় দেড় থেকে দ্বিগুণ।

বর্তমানে চিনি পরিশোধনাগারেও আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য ক্লোরেলা ব্যবহার করা হচ্ছে, উলসুতার (ওয়র্সটেড) কাপড়ের কলেও।

ক্লোরেলা হচ্ছে পুষ্টিকর দ্রব্যে সমৃদ্ধ উদ্ভিদ। ওর মধ্যে রয়েছে প্রচুর প্রোটিন, খাদ্যপ্রাণ ও অন্যান্য জিনিস যা কৃষির উপকারে আসবে।

শীতকালে পাড়া মুরগির ডিমের কুসুমের অনেক সময় দেখা যায় যে তার রংটা অত্যন্ত ফ্যাকাশে সাদা। মুরগির খাদ্যে খাদ্যপ্রাণ-১-এর অভাবের জন্যই এটা হয়। কিন্তু তার খাদ্যের সঙ্গে ক্লোরেলা মিশিয়ে দিয়ে দেখা গিয়েছে কুসুমের রং স্বাভাবিক হয়েছে। এক গ্রাম শুকনো বা ৪ গ্রাম ক্লোরেলার মণ্ড মুরগিকে দৈনিক খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে ডিমের সংখ্যা দুই থেকে আড়াই গুণ বাড়ে এবং বাচ্চা-গুলি বড় হয় খুব তাড়াতাড়ি। গরু, শুয়োর ইত্যাদি পালিত পশুর ক্ষেত্রেও ফলাফল একই রকম। ক্লোরেলা মেশানো খাদ্য দিলে পশুগুলি বেশী নধর ও স্বাস্থ্যবান হয়।

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

ধনঞ্জয় বৈরাগী

মনের সাগরে পুতুল

(উনত্রিশ)

সাধনবাবুর হুংকার পাড়াপড়শীরা বোধ হয় শুনতে পেয়েছিল, তাই অনাদিপ্রসাদ যখন ও'র বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন লক্ষ করলেন অনেকগুলি কৌতূহলী চোখ জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে। তাঁর নিজের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে রমলা বউদি এবং বড় ছেলে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেই স্ত্রীর উদ্বিগ্ন প্রশ্ন শোনা গেল. তুমি আবার ও বাড়িতে গিয়েছিলে কেন?

অনাদিপ্রসাদের চিরাচরিত ছোট্ট উত্তর এমনি।

—তুমি জান সাধনবাবু তোমাকে পছন্দ করেন না, তবু—

—কি করব, না গিয়ে উপায় ছিল না।

ইচ্ছে করে স্ত্রীকে পাশ কাটিয়ে অনাদিপ্রসাদ শোবার ঘরে চলে যান। মনে দুশ্চিন্তা, পাগলা বাপ সত্যিই না মেয়ের সর্বনাশ করে। তেমনি ওদের বাড়ির লোকগুলো! কারুর কি মীনার জন্যে এতটুকু সহানুভূতি নেই! মীনার মাকেও বলিহারি! চেলাকাঠের মত শুকনো. নিজের মতামত বলতে কিছুই নেই. স্বামীর ভয়ে সব সময় তটস্থ। হয়ত সাধনবাবু এখনই রওনা হবেন সমীরদের গড়িয়ার বাসার উদ্দেশে, কিন্তু তারপর কি যে ঘটবে! অথচ না বলে উপায় ছিল না। মীনার যা মানসিক অবস্থা!

এমন সময় অনাদিপ্রসাদ শুনতে পেলেন পাশের ঘরে মাতা-পুত্রের আলোচনা—তাঁর সম্বন্ধে, কানটা খাড়া করলেন।

ছেলের অনুযোগ, মা, তুমি বাবাকে ভাল করে বোঝাও, কেন এভাবে যেচে অপমান মাথায় নিতে যান। সবাই এ নিয়ে হাসাহাসি করে।

রমলা বউদির শান্ত উত্তর, তোরা তো দেখেছিস, আগে উনি এরকম ছিলেন না, কারুর সাতে পাঁচে থাকতেন না, এখন কি যে হয়েছে!

—মামার সঙ্গে পরামর্শ কর, দরকার হলে ডাক্তার দেখাও, আমার এক বন্ধুর বাবার ঠিক এইরকম হয়েছিল, এখন একেবারে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

—চুপ, চুপ, ওসব কথা বলে না।

—তোমাকে তো বাড়ির বাইরে যেতে হয় না, আমরা পাঁচ জায়গায় ঘুরি, কত লোক জিজ্ঞেস করে বাবার কি হয়েছে? কেন লিখছেন না? যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ান, ও'র মত একজন নামী লোক—

রমলা বউদির চাপা দীর্ঘশ্বাস পড়ে, রোজই তো ঠাকুরকে ডাকছি।

ছেলে বিরক্ত হয়, ঠাকুর-টাকুর ক'দিন তাকে তুলে রেখে ডাক্তার ডাকো, চিকিৎসা করাও।

কথাগুলো শুনতে অনাদিপ্রসাদের বেশ মজা লাগল; আমরা কেউ কাউকেই বুঝতে পারি না, চেষ্টাও করি না, হঠাৎ কেন যে একটা মানুষ বদলে যায়, কেন যে নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়, কেন হঠাৎ স্বার্থপর দৈত্যের বাগানে ফুল ফোটে, শিশুরা খেলা করতে আসে, কিরকম করে ওলট-পালট হয়ে যায় ধরাবাঁধা ছককাটা জীবনে, কে তার খবর রাখে।

অনাদিপ্রসাদ গিয়ে দাঁড়ালেন মাছের অ্যাকোয়ারিয়ামের সামনে, যা ভেবেছিলেন তাই, শুঁড়ওয়ালা রুপোলী মাছটা অন্যদের বিরক্ত করে মারছে। ক'দিন আগে ওটা দোকান থেকে এনেছিলেন, নতুন জাতের মাছ—কস্টিং জেরাম, কিন্তু এখানে এসে জলে ফেলতেই ওর স্বভাবটা বোঝা গেল। নিরীহ ব্ল্যাক মলি, শান্ত গোল্ড ফিশ, এমন কি চঞ্চল ফাইটারগুলোও ওর জ্বালায় অস্থির। ওরা পালিয়ে গিয়ে পাতার নীচে, শ্যাওলার তলায় কিংবা ছোট্ট ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

ইতিমধ্যে রমলা বউদি স্বামীর কাছে এসে দাঁড়ায়। অনাদিপ্রসাদকে নিজের মনে হাসতে দেখে জিজ্ঞেস করে, হাসছ যে?

অনাদিপ্রসাদ বললেন, ঐ নতুন মাছটাকে লক্ষ কর রমি, ঠিক যেন আমাদের সাধনবাবু, কাউকে শান্তিতে থাকতে দেবে না।

—ও মাছটাকে ওখান থেকে তুলে নিলেই পার, আপাতত একটা কাঁচের জারে রেখে দাও।

—কিন্তু সাধনবাবুকে মীনাদের জীবন থেকে সরিয়ে নেব কি করে, কোন জারের মধ্যে ও'কে তুলে রাখব?

রমলা বউদি ভুরু কুঁচকে বলেন, আজকাল তুমি কি যে বল আমি বুঝতে পারি না।

অনাদিপ্রসাদ হাসলেন, সন্দেহ হচ্ছে মাথাটা ঠিক আছে কিনা। বেশ তো, ডাক্তার দেখাও না, আমার কোন আপত্তি নেই। মজা কি জান, যতদিন আমি চরম স্বার্থপর ছিলাম, আমার বউ-ছেলে-সংসার ছাড়া আর কিছু ভাবতাম না, যতদিন এই বাড়ির চৌহদ্দিই ছিল আমার রাজত্ব, দরজা জানালা বন্ধ করে বাইরের আলো-বাতাস ঢুকতে দিইনি, ততদিন আমাকে তোমরা বিচক্ষণ বুদ্ধিমান মনে করেছ। আর যেদিন থেকে হঠাৎ বাইরের টানে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম, যেদিন থেকে মনে হতে লাগল জীবনটাই অ্যাকসিডেন্ট, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে নাও হতে পারত, যে রাস্তার ছেলেটা ধুলোর কাদার আগাছার মত বেড়ে উঠছে সেও হয়ত আমার ছেলে হতে পারত, আমি লেখক না হয়ে অন্য কিছু হতে পারতাম, যে জীবনটা চাই, যা পাই না সেটা

হয়ত ফসকে গেছে, যদি পেতাম, আমি কি হতাম বলতে পার? আমি মনে করি আমি সৎ, সে হয়ত অসৎ হবার সুযোগ পাইনি বলে। যদি আমি ব্যবসাদার হতাম কে বলতে পারে আমি কালো টাকার মোহে পড়তাম কি না? যদি প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হতাম, হয়ত মদ খেতাম, মেয়েমানুষ রাখতাম। সে সব হইনি, হইনি, তা নিয়ে বড়াই করবার কিছু নেই, যে কোন মুহূর্তে পা পেছলাতে পারে।

অনাদিপ্রসাদ একদৃষ্টে স্ত্রীকে লক্ষ করেন, প্রশ্ন করেন, এখনকার চেয়ে আগেই আমি ভাল ছিলাম, তাই না?

রমলা বউদি ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয়, অনেক ভাল।

—তখন ছিলাম সেলফিশ জায়াণ্ট, স্বার্থপর দৈত্য। কেন সে রকম থাকতে পারলাম না! কে আমার চারপাশের দেয়াল সরিয়ে নিল, ওরে ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, ভাঙ্গ কারা, আঘাতে আঘাত কর, ওরে আজ কি গান গেয়েছে পাখি এসেছে রবির কর।

অনাদিপ্রসাদকে জুতো পরতে দেখে রমলা বউদি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে তুমি কি আবার বেরুচ্ছ?

—হ্যাঁ।

—কোথায়?

—জানি না।

—তুমি আমায় খুলে বল তোমার কি হয়েছে, আমার বড় ভয় করে।

অনাদিপ্রসাদ স্মিত হাসেন, কিসের ভয়, তোমার চারপাশের দেয়াল তো আমি সরিয়ে নিইনি, তোমার জীবনে ঝড় আসবে না, জল আসবে না। তুমি দুই ছেলের মা, তুমি একজন লেখকের স্ত্রী, তোমার বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, ব্যাঙ্কে টাকা আছে, কিসের ভয় তোমার?

অবুঝ রমলা বউদি তবুও বলে, আমি তোমার সঙ্গে যাব, কোথায় তুমি যাও আমি দেখব, ঘুরব।

—তাতে তোমার তেষ্টা বাড়বে, জীবনের তেষ্টা, আমার মত ছটফট করে মরবে, অথচ জল খেতে পারবে না। কেন সুখে থাকতে ভূতে কিলোবে, তার চেয়ে এই ভাল। আয়নার মধ্য দিয়ে নিজেকে দেখ, নির্ভয় হবে। আমি চলি।

অনাদিপ্রসাদ বেরিয়ে যেতেই বড় ছেলে ঘরে ঢুকল, আমি বলছি মা, বাবার শরীর ভাল নেই, তুমি আর ফেলে রেখ না।

—তাই মনে হচ্ছে, আজই একবার দাদার কাছে যাই।

অনাদিপ্রসাদ ইচ্ছে করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন, কোন নির্দিষ্ট জায়গায় যাবার উদ্দেশ্যে নয়, শুধু জনতার মধ্যে মিশে যেতে। এই বিরাট শহরের সব রাস্তা দিয়েই সারাক্ষণ জনস্রোত বইছে। যে কোন একটি ধারায় গা ভাসিয়ে দিতে পারলে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া যায়, অথচ নিজেকে একা মনে হয় না। কথাও বলতে হয় না কারুর সঙ্গে, শুধু হাঁটা চলা, অন্যদের কথা শোনা আর চোখ মেলে দেখা। অবশ্য দেখবার মত চোখ থাকা চাই। চারদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ। গত বিশ বছরে যা ভয়ঙ্কররকম বেড়েছে তা হল মানুষ। এন্তার মানুষ—পথে ঘাটে ট্রামে বাসে ঘরে বাইরে বস্তিতে মাঠে শুধু মানুষ। অনাদিপ্রসাদের মনে পড়ে, তাঁদের যৌবনে অফিসের ব্যস্ততা ছাড়া অন্য সময় ফাঁকা ট্রামে বসে শহর বেড়িয়ে এসেছেন, দুপুরে বা সন্ধ্যের পর কোন দিনই ভিড় থাকত না। মোহনবাগানের ফুটবল খেলা থাকলে হয়ত ট্রামে বসবার জায়গা পাওয়া যেত না, কিন্তু দাঁড়িয়ে আসা যেত স্বচ্ছন্দে। কিন্তু আজকালকার ছেলেরা এসব কথা বিশ্বাস করে না। কারণ তারা সব সময় দেখছে ট্রামে বাদুড়-ঝোলা হয়ে মানুষকে যেতে হয়, যেখানে দাঁড়াবার জায়গা নেই সেখানে বসবার স্বপ্ন কে দেখবে। কারণ মানুষ বেড়েছে, কিন্তু ট্রাম বাড়েনি, মানুষের অনুপাতে কিছুই বাড়েনি। প্রয়োজনের সময় কোনদিনই ট্যাক্সি পাওয়া যায় না অথচ যাত্রিভর্তি ট্যাক্সি মিটার ডাউন করে অবিরাম চলছে। তার সঙ্গে পাশাপাশি চলছে ঠেলাগাড়ি, রিকশা, মাল-বোঝাই ভাঙ্গা লরি আর টেম্পো। চলতে চলতে হঠাৎ রাস্তায় জট পাকিয়ে যায়, কোন গাড়ি অচল হয়েছে কিংবা ট্রামের সঙ্গে ধাক্কা মেরেছে কোন ট্যাক্সি, হয়ত বা মানুষ চাপা পড়েছে। চীৎকার চেঁচামেচি হইচই, বেশ কিছুক্ষণের জন্যে ট্রাফিক জ্যাম। কিন্তু পাশ দিয়ে ঠিকই জনস্রোত বয়ে চলেছে, উত্তরে দক্ষিণে, পূবে পশ্চিমে।

একেই উনুনের ধোঁয়ায় কলকাতার আকাশ দেখা যায় না তার ওপর স্টেট বাসের অত্যাচার। অনর্গল কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে না এমন কোন স্টেট বাস কলকাতার রাস্তায় দেখতে পাওয়া যায় না। পথচারীদের চোখ জ্বালা করে, কাশি পায়, কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারে না। বাঘ মার্কা সরকারী বাস কে তার বিরুদ্ধে কথা বলবে। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এ বাস ফুট-পাথের ওপর চড়ে মানুষ চাপা দেয়, ভেঙ্গে দেয় ল্যাম্প পোস্ট, খালার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। নড়বড়ে দেহ, আঁকা বাঁকা চাকা দেখলেই বোঝা যায় মাসের পর মাস অযত্নে অবহেলায় এ গাড়িগুলোকে রাখা হয়। কোম্পানী কা মাল দরিয়ামে ঢাল। জাতীয় সম্পদের অপচয় অথচ সেদিকে নজর দিচ্ছে কে? কর্মবিমুখ কর্মীদের শাসন না করে, নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত নেতারা তাদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক জিগির তোলেন, 'আমাদের দাবি মানতে হবে।' এ প্রহসন কিন্তু বেশী দিন চলবে না জনতা ক্রমশ সজাগ হয়ে উঠছে, একদিন সেই গণ-আদালতে ঐ নেতাদের বিচার হবে। সেখানে কিন্তু উকিল খাড়া করা যাবে না, জনতা এদের মুখোশ খুলে দেবে, কঠিন শাস্তি দেবে এতদিনের পুঞ্জীভূত অপরাধের।

অনেকক্ষণ পথ চলার পর ক্লান্ত অনাদিপ্রসাদ ঢুকে পড়লেন রাস্তার ধারের একটা পার্কে। বসলেন বেঞ্চের ওপর। বেশী লোক নেই, কয়েকজন অবাঙালী এক কোনায় বসে তাস খেলছে। অদূরে গাছের ছায়ায় একটি লোক ঘুমোচ্ছে। দু-চারটি ছোট ছেলেমেয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে স্লিপ খাচ্ছে, দোলনাটা ভাঙ্গা, নয়ত ওরা দুলত। পার্কের গেটের মুখে একটা চাওয়ালা, তার পাশে একজন গনৎকার খদ্দেরের আশায় উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে।

যে লোকটা ঘুমোচ্ছিল উঠে বসল, বয়স হয়েছে, ময়লা রং, ভুরে চুল। চার-পাশটা ভাল করে দেখে নিয়ে উঠে এল অনাদিপ্রসাদের কাছে। জিজ্ঞেস করল, একটা দেশলাই হবে?

অনাদিপ্রসাদ বললেন, না।

—একটা বিড়ি খেতাম।

লোকটা অনাদিপ্রসাদের পাশে বেঞ্চিতে বসল, উঃ যা মাগগীগণ্ডার বাজার, দেড় টাকা কিলোর কম কোন আনাজ নেই। ঢেঁড়স এখন দু' টাকা, শালা মানুষ না হয়ে

তরকারি হলে ভাল হত. চড়া দামে বিকোত্তাম। কি বলুন?

কথা শুনে অনাদিপ্রসাদের হাসি পেল। বললেন, তার চেয়ে মাছ হলে আরও ভাল, সাত টাকা। ইলিশ হলে কথা নেই, এগার।

—মাছ-মাংসের খবর রাখি না মশায়, ওসব দূরে থেকে দেখা ভাল, ছুঁলেই হাতে ফোস্কা পড়ে। তবে কেনবার লোকও আছে। সেদিন বাজারে এক মেছো এক জোড়া ইলিশের দাম হাঁকলো তিরিশ টাকা, আমি শুনে হাসলাম, এত দাম দিয়ে কে মাছ কিনবে। ও মা, কিছুক্ষণ বাদে দেখি এক ভদ্রলোক করকরে তিনখানা দশ টাকার নোট দিয়ে মাছ দুটো নিয়ে চলে গেল। তবেই বুঝুন টাকাওয়ালা লোক নিশ্চয় আছে, খদ্দের আছে, কিন্তু মাল কম তাই দাম বাড়ছে। আমাদের মত লোকের আঁটি চোষা ছাড়া উপায় নেই।

লোকটা কিছুক্ষণ থেকে উসখুস করছিল, বলল, দাঁড়ান, বিড়িটা ধরিয়ে আনি, নয়ত ঠিক জমছে না।

অনাদিপ্রসাদ স্বভাবতই গম্ভীর মানুষ, কারুর সঙ্গেই গায়ে পড়ে কথা বলেন না; তাই ভাবছিলেন লোকটা যখন চাওয়ালার কাছে গেছে বিড়ি ধরাতে, এই বেলা প্রস্থান করলে হয়। কিন্তু তার সুযোগ পেলেন না। মুখে জ্বলন্ত বিড়ি, দু' হাতে দু' ভাঁড় চা নিয়ে লোকটা ফিরে এল, নিন, চা খান।

অনাদিপ্রসাদ আপত্তি করলেন, এই অবেলায় চা?

—আপনি হাসালেন, চায়ের আবার সময় অসময় আছে নাকি? সকালেও চা, দুপুরেও চা, বিকেলেও চা, সন্ধ্যায়ও চা, বৃষ্টিতে চা, রোদে চা, সুখে চা, দুঃখে চা। আর— লোকটি থামে, চোখে কৌতুক।

অনাদিপ্রসাদের কৌতূহল, আর কি?

—আর আফিম। ঠিক চায়ের মত, আনন্দে, শোকে, শিহরনে, আঁতুড়ঘরে, শ্মশানে—

—কি বলছেন?

—স্বর্গসুখ মশায়। আঃ, যে খায়নি সে বুঝবে না। তখন মনে হয় আমি নবাব, বাদশা, কত সুন্দরী বেগম আমার, কত বাঁদী। আহা, আপনি কখনও খেয়েছেন?

—না।

—আমাকে খেতে বলেছিল হাঁপানির জন্যে, এখন আর হাঁপানির দোহাই দিই না, নেশার জন্যেই আফিম খাই।

—বাড়িতে চেঁচামেচি করে না?

—কে করবে?

—স্ত্রী, পুত্র।

লোকটা হাসল, আমি তাদের সঙ্গে থাকি না।

—তার মানে?

—যদ্দিন জোয়ান ছিলাম, ভাল রোজ-

গার করতাম বউ ছেলে নিয়ে চুটিয়ে সংসার করেছি। এখন রিটায়ার্ড লোক, রোজগার কম তাই ওসব ঝামেলা চুকিয়ে দিয়েছি। বউ আছে ছেলেদের সংসারে, তারা সবাই রোজগেরে, তা ছাড়া আমার ভাইয়ের সংগে চিরকালই ওর একটা নটখটে সম্বন্ধ ছিল। আমি চলে আসার সকলেই খুশী, তা ছাড়া বিধবা তো হয়নি। দিব্যি মাছ মাংস ওড়ায়, সিঁথিতে সিঁদুর দেয়। বলেই লোকটা হি-হি করে হাসে।

অনাদিপ্রসাদ বিস্মিত হন, আশ্চর্য লোক আপনি, এ জীবনটাকে মেনে নিতে পেরেছেন?

—বললাম তো, সংসার করার সাধ মিটে গেছে। ছেলেগুলোকে মানুষ করে দিয়েছি, প্রভিডেন্ট ফান্ডে যে টাকা পেয়েছিলাম বউয়ের জন্যে রেখে দিয়েছি, আমি মশায় এখন ঝাড়া হাত-পা। দিব্যি আছি, আফিম খাই আর মৌজ করি।

—থাকেন কোথায়?

—এই সামনের বস্তিতে, একজন ফল-ওয়ালার সংগে। সপ্তাহে রেশনের টাকাটা ওকে দিয়ে দিই।

—তা হলে তো এখনও রোজগার করতে হয়।

—করি। দরকার পড়লেই ট্যাক্সি চালাই, মাসে দশ দিন খাটি, বিশ দিন ঝিমুই। মহা আনন্দে আছি। এখন আমার ঝিমোবার পালা। এই যে সংগে ঝোলাটা দেখছেন, এর মধ্যে সব সরঞ্জাম আছে। টুক করে মুখের মধ্যে ফেলে দেবো, ব্যাস, দুলুনি শুরু হয়ে যাবে। বাজনা বাজবে, কত রকম স্বপ্ন দেখব, তারপর ঐ গাছতলায়, মাঠের ওপর সুখনিদ্রা—মনে হবে মখমলের বিছানায় আরামে শুয়ে আছি। আবার সেই হি-হি করে হাসি।

অনাদিপ্রসাদ জানতে চান, আপনার নামটা?

লোকটির জবাব, সংসার ত্যাগ করার পর সন্ন্যাসীরা যেমন নিজেদের নাম বদলায়, আমিও তেমনি সংসারী নামটা ত্যাগ করেছি। তবে পদবীটা বদলাইনি। ওই বস্তিতে গিয়ে যাকে বলবেন আফিম মিস্তিরকে ডেকে দাও, সে তখনি আমায় ডেকে দেবে।

—আগে কি করতেন?

—সে কথাও কাউকে বলি না। এ একটা অন্য জীবন। বিশ্বাস করুন, দিব্যি আছি মশায়, তবে আর দেরি করব না, এখন উঠি। মৌতাতের সময় হল, ঘরে গিয়ে দেখি, গোয়ালিনীটা হয়ত আমার জন্যে বসে আছে।

—গোয়ালিনী?

—জানেন না, আফিম খেলেই দুধ খেতে হয়, আর তার সংগে একটু রোমান্স মেশাতে হলে চাই একজন গোয়ালিনী। স্রেফ আদিরসের ব্যাপার।

লোকটা হাসতে হাসতে উঠে পড়ে, মশায় ওই আফিমের ঘোরেই একদিন পটল তুলব, ব্যাস, সোজা মহাপ্রস্থানের পথে। ভয় নেই, কাউকে বিপদে ফেলে যাব না, দাহ খরচাটা গয়লানীর কাছে গচ্ছিত রেখেছি, আর নয়, চলি।

লোকটা স্ফূর্তিতে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে চলে গেল, 'দারা পুত্র পরিবার, তুমি কার কে তোমার, বলে জীব ক'রো না ক্রন্দন।'

অগত্যা অনাদিপ্রসাদও উঠে পড়েন। পথ চলতে কত রকম চরিত্রের সংগে পরিচয় হল। এই আফিম মিস্তির তাদেরই একজন, তবে লোকটার জীবনদর্শনকে অগ্রাহ্য করা যায় না। সত্যিই হয়ত সংসার করার সময় হাতে তেল মেখে কাঁঠাল খেয়েছে, তা না হলে এত নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে কি করে।

ক্রমশ সন্ধ্যা নামছে, এইবার আস্তে আস্তে রাস্তার আলো জ্বলে উঠবে। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি চলার বিরাম নেই, বিরাম নেই জনস্রোতের। তবু ফুটপাথের এক একটা জায়গা অপেক্ষাকৃত নির্জন। চৌরংগীমুখো হাঁটলে, যাদুঘর পেরোলেই এই ধরনের জায়গা পাওয়া যায়, যা শুধু নির্জন নয়, কিছুটা রহস্যাবৃত।

অনাদিপ্রসাদের পিছনেও ফেউ লাগল, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছোকরা, ফার্স্ট ক্লাস, ওনলি ফাইভ মিনিটস ফ্রম হিয়ার।

অনাদিপ্রসাদ ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে চললেন, দালালটা কিন্তু তখনও সংগে লেগে রয়েছে, ওথেলোর কানে ইয়াগোর মত মন্ত্র জপছে, 'নেভ ইণ্ডিয়ান গার্ল', সামনের ময়দানে, রাস্তা পেরোলেই দাঁড়িয়ে আছে। ঐ যে দেখুন, ওমর বিশ সাল।

কৌতূহলের বশে অনাদিপ্রসাদ রাস্তার ওধারে চোখ ফেরালেন, সত্যিই মাঠের মধ্যে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওষুধ ধরেছে বুঝে লোকটা বড় রাস্তা পার হয়ে অন্য দিকে চলে যায়, হাতছানি দিয়ে ডাকে, বাবু, জলদি আইয়ে।

অনাদিপ্রসাদের মনে হল, দেখাই যাক ব্যাপারটা কি। উনিও রাস্তা পার হয়ে প্রায় অন্ধকার মাঠের মধ্যে ঢুকলেন। কিন্তু মেয়েটির কাছ পর্যন্ত এগোতে পারলেন না, হঠাৎ দুটো লোক এসে পেছন থেকে জাপটে ধরল। নিমেষের মধ্যে খুলে নিল •

হাতঘড়ি, আর একজন তুলে নিল পকেটের ব্যাগ, সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ের ওপর এক ধাক্কা মেরে ফেলে দিল মাটিতে, শাসিয়ে বলল, ভাল চান তো চিল্লাবেন না, নিজেরই বদনাম হবে।

অনাদিপ্রসাদের দুরবস্থা দেখে মেয়েটি দূরে থেকে খিল খিল করে হাসছিল. এবার কাছে এগিয়ে এল, বোধ হয় দুর্বৃত্তদের কাছ থেকে লুঠের টাকার ভাগ নিতে। কিন্তু অনাদিপ্রসাদকে দেখে সে চমকে উঠল, বাবুজী আপনি?

অনাদিপ্রসাদও চিনতে পারলেন, এ সেই মিস কলকাত্তা।

মেয়েটির হুকুম, এই কল্লু, বাবুর জিনিস যা নিয়েছিস ফেরত দিয়ে দে, অন্ধকারে চিনতে পারলি না। উনি তো আমাদের লোক। মাফ করবেন বাবুজী, গলতি হয়ে গেছে।

অনাদিপ্রসাদ হারানো জিনিস ফেরত পেলেন। ভাবছেন কোন দিকে যাবেন, এমন সময় মিস কলকাত্তা বলল, আসুন বাবুজী, আমাদের সঙ্গে, সেই বাচ্চাটাকে দেখাব।

অনাদিপ্রসাদ না করতে পারলেন না।

(ক্রমশ)

লক্ষ্মীর কৃপালাভঃ বাঙালীর সাধনা

বাঙালীর বেকারী ও কনফেক-শনারী (কেক-পাঁউরুটির প্রতিষ্ঠান)

'অলরাইট ভেরী গুড পাঁউরুটি বিস্কুট'

ছেলেবেলায় ডাংগুলি, লাট্টু, আর মার্বেল খেলার সময়ে আমাদের যেসব রানিং কমেণ্টারি চলতো তার মধ্যে 'নাথিং নট কিচ্ছু' আর 'অলরাইট ভেরী গুড'-টা আমরা খুব বলতাম। আরও কী কী যেন বলতাম মনে নেই।

সব বাড়িতে তখনো সকাল বিকেল পাঁউরুটি টোস্ট খাবার রেওয়াজ হয় নি। কেউ খেতো বাড়ির তৈরী লুচি তরকারি, কেউ মুড়ি চিঁড়ে, আবার কারও চলতো দোকানের জিলিপি কচুরি। আমাদের বাড়িতে কিন্তু আমরা সবাই সকাল বেলায় জলখাবার খেতাম রুটি মাখন দিয়ে। আগের দিন বিকেলে রাজাবাজারের মুসলমান রুটিওয়ালা তার বাজরাতে (চ্যাপ্টা গোল ঝুড়িতে) থাকে থাকে সাজানো গরম গরম পাঁউরুটি থেকে আমাদের দুটো একটা দিয়ে যেতো। তার গন্ধ ছিল অপূর্ব। এখনকার মতো ওয়াক্স-পেপারে মোড়া দুগ্ধহীন মিল্ক-ব্রেড আর মাখনের নামগন্ধ ছাড়া 'বান' (Bun) তখন ছিল না।

কিন্তু সেই হাতে-গরম তাজা রুটি মা আমাদের খেতে দিতেন না; বলতেন, পাঁউরুটি বাসী না হলে খেতে নেই। কেন খেতে নেই তার বৈজ্ঞানিক কারণটা আমাদের মা-ও বোধ হয় ঠিক জানতেন না।

এতকাল পরে সেদিন 'আর্য বেকারী অ্যান্ড কনফেকশনারী'-র মালিক শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ মশায় ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন।

ময়ান দিয়ে ঠাসা ময়দায় খামির-এ (Dough-তে) নুন, চিনি ও দু একটা কেমিক্যালের সঙ্গে মদ অর্থাৎ বীয়ার-এর গাদ—এক কথায় যার নাম Yeast—মিশিয়ে নিতে হয়। Yeast-এর বিকল্প আরও একটা বস্তু আছে Hops; তারও প্রয়োজন হয়। তারপরে আবার কিছুটা দলাইমালাই করে রুটির ছাঁচে সেই খামির ভরে দিতে হয়। এক দেড় ঘণ্টা ফেলে রাখলেই দেখা যাবে কাঁচা রুটিটা ফুলে ফেঁপে উঠছে—কচি কাঁচা মেয়েটা যেন বাল্য আর কৈশোর পেরিয়ে এক লাফেই মদালসা যুবতী হয়ে উঠছে।

আসলে সেটা তখন গাঁজিয়ে, মানে তার মধ্যে fermentation হয়ে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস হচ্ছে আর নানা ব্যাক্টিরিয়া জন্মাচ্ছে। এর পরে সেই ফোলা ফোলা খামির সুদ্ধ ছাঁচগুলোকে oven বা তন্দুরে ঢুকিয়ে আধ ঘণ্টা সেঁকে বের করবার পর তৈরী রুটির মধ্যে পুঞ্জীভূত গ্যাস ও ব্যাক্টিরিয়াবাহিনীকে উপে যেতে দিতে হয়। সেটা হতে ৫।৬ ঘণ্টা লাগে। ততক্ষণ ওই তাজা বর্ণচোরা পাঁউরুটি বিষের আড়ত হয়ে থাকে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরে সেই রুটিই খেয়ে হজম করা এত সহজ হয় যে, ডাক্তাররা রোগীদেরও তাই দিয়ে পথ্য করান।

সুধাংশুবাবুর বাবা স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের লেখা 'পাশ্চাত্য পাক প্রণালী ও বেকারী দর্পণ' বইটিতেও দেখলাম একই কথা আছে। আরও জানলাম যে, বিলেতে যে-সব কড়া কড়া Bread Laws আছে তাতে নাকি আছে যে, তৈরির ছয় না আট ঘণ্টা পেরোবার আগে কোনো পাঁউরুটি গ্রাহককে বিক্রি করলে 'বেকার'-এর কঠিন দণ্ড হবে এবং তার রুটি তৈরির লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

শরৎবাবুর বইটিতে আরও অনেক টীকা ও ভাষ্য আছে। পড়তে জিবে জল আসে। বইটা এখন আর পাওয়া যায় না। তাতে এ-ও আছে যে, Yeast বা Hops পাওয়া না গেলে খাঁটি স্বদেশী তাড়ির গাদ দিয়েও পাঁউরুটি বানানো যায়।

গ্রন্থটির মুখবন্ধে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র লিখছেন : "প্রিয় শরৎচন্দ্র, তুমি যে উন্নত এবং আধুনিক ধরনের 'বেকারী' স্থাপন করিয়া একটি নূতন অর্থোপার্জনের পন্থা সাধারণকে দেখাইয়া দিয়াছ, ইহাতে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি।...বিভিন্ন কারবার বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তোমার ন্যায় যদি স্বীয় অভিজ্ঞতার দ্বারা বেকার সমস্যা সমাধানের ভিন্ন ভিন্ন পথ দেখাইয়া দেন তবে দেশের ও জাতির অশেষ কল্যাণ হয়।"

আর গ্রন্থপ্রণেতার পরিচয় দেওয়া আছে **Late Officer-in-charge Bengal Criminal Intelligence Bureau** অর্থাৎ বাংলা পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের অন্যতম কর্তা। সেকালের রায় সাহেবের পুত্র, স্বয়ং পুলিস অফিসার ভদ্রলোকের চরিত্রের এই দিকটা আমায় চমৎকৃত করলো।

শরৎচন্দ্রের বাবা রায়সাহেব তারাপদ ঘোষ মহাশয় ছিলেন ২৪ পরগনা—আলিপুরের

রেজিস্ট্রার। অর্থাৎ বাপ-ছেলে দুজনেই সরকারী চাকুরে ছিলেন।

সুধাংশুবাবু বললেন যে, শরৎচন্দ্রের চাকরিতে স্পৃহা কোনোদিনই ছিল না। মনে-প্রাণে তিনি প্রফুল্লচন্দ্রের অনুগামী ছিলেন। তাই শরৎচন্দ্র তাঁর বড়ো দুই ছেলে সুধাংশুকুমার ও হিমাংশুকুমারকে কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়িয়েই পড়া ছাড়িয়ে ব্যবসাতে ঢুকিয়ে দিলেন।

ভবানীপুরের চক্রবেড়িয়াতে শরৎবাবুর নিজ বাড়ি। ১৯২৭ সালের ১৯ নবেম্বর চার আনা, মানে আজকের পঁচিশ পয়সার ময়দা এনে রুটি তৈরির ট্রায়াল হলো। ট্রায়াল সাকসেসফুল—এবারে শুরু হলো ছোট সাইজের পুরো একটি 'বেকারী' বসানোর তোড়জোড়।

বাড়ির সংলগ্ন জমিতে একটি জার্মান 'Habamfa' মিক্সিং মেশিন (ময়দা মাখা ও ঠাসার জন্যে) ও দু'টি ছোট ছোট fire-brick-এর তৈরী তন্দুর বসিয়ে কিছু দিনের মধ্যেই 'আর্য' বেকারী অ্যাণ্ড কনফেকশনারী'-র জন্ম হলো। শরৎবাবু এই প্রতিষ্ঠানের দেখাশোনার সঙ্গে সঙ্গে কাজ শেখার ভার দিলেন বড়ো ছেলে সুধাংশুকুমারের ওপর।

এখন যেমন আমাদের মফস্বল শহরে সাইকেল-রিকশাতে গ্রামোফোনের বাজনা বাজিয়ে, গান বাজিয়ে আর লাউডস্পীকারে ঘোষণা করে করে সিনেমা-থিয়েটার আর সার্কাসের বিজ্ঞাপন করা হয়, সেদিন তেমনি আর্য বেকারী কাজ শুরু করার পর 'ব্যাণ্ড-পার্টি' নিয়ে ঘটা করে সুধাংশুবাবুদের উৎপন্ন কেক-পাঁউরুটির হ্যাণ্ডবিল বিলি করা হলো। রাস্তায় রাস্তায় রঙবেরঙের পোস্টারও মারা হলো সারা শহরময়—বাঙালীর প্রথম মেশিন-মেড মিল্কব্রেড।

আর্য বেকারীর তৈরি কেক-পাঁউরুটির কথা লোকের মুখে মুখে প্রচার হতে লাগলো। বাঙালীর তখন দেশাত্মবোধ ছিল, স্বদেশী জিনিস কেনার আগ্রহ ছিল। তাই আর্য বেকারীর রুটি-কেক প্যাটি পেস্ট্রি হু হু করে বিক্রি হতে থাকলো।

আর্য বেকারীর আগে কলকাতা শহরে বাজার-চালু মেশিন-মেড ব্রেড বলতে আমরা যে যে বেকারীর বা হোটেলের নাম শুনেছি তা হলো, 'উইলসন হোটেল' অর্থাৎ 'গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল'-এর রুটি এবং নিউ মার্কেটের পাশে লিণ্ডসে স্ট্রীটে এখন যেখানে 'ফেয়ারলন' আছে সেইখানে পুরনো একটা বাড়িতে 'ওয়ালেস' নামে যে রেস্তোরাঁটি ছিল তার তৈরি রুটি। যতটা মনে পড়ে, ফারপো (অতীতে Costello Brothers-এর হোটেল) অথবা গ্র্যাণ্ড হোটেল কেবল হোটেলে অভ্যাগতদের জন্যেই রুটি তৈরি করতেন, বাজারে বেচতেন না। এ'রা সব ছিলেন কুলীন।

মীর্জাপুর-রাজাবাজার অঞ্চলের মুসলমান রুটিওয়ালাদের কথা তো আগেই বলেছি।

তিন নম্বর ছিল বউবাজারের 'বামুনের রুটি'। বয়স্ক বাঙালীর মনে থাকারই কথা যে, বর্ধমান, হুগলি, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের নিম্নমধ্যবিত্ত হিন্দু ব্রাহ্মণ রুটি-ওয়ালারা বউবাজারেই বিশেষ করে (শহরের ও শহরতলির অন্যত্রও কিছু কিছু ছিল) কতকগুলি ছোট ছোট 'বেকারী' খুলে-ছিলেন। দোকানে বিক্রি ছাড়াও তাঁরা ধামায় করে সেই 'বামুনের রুটি' ফেরি করে বেড়াতেন। বিশুদ্ধ ময়দা, নুন-চিনি এবং স্নেহপদার্থজাত পাঁউরুটি বলেই তাঁরা চালাতেন। কিন্তু একটু তাড়ির গাদের অনুপান ছাড়া কি সে রুটি ফুলতো? তা হলোই বা, কারণবারি তো পবিত্র জিনিস, মুনিঋষিরা পান করতেন। বিদগ্ধ ব্যক্তিরা এখনো করেন।

আর্য বেকারী যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন স্বাধীনতা-আন্দোলনের মধ্যযুগ। সারা দেশে উত্তেজনা ও উন্মাদনা। ১৯৩০ সালে গান্ধিজীর লবণ-আইন ভঙ্গ ও বিদেশী বয়কট আন্দোলন শুরু হলো। সশস্ত্র বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করলেন।

কিন্তু তার আগেই ১৯২৮ সালের শীতকালে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়ে সদ্যোজাত আর্য বেকারী-র ডাক পড়লো অধিনায়ক সুভাষ-চন্দ্রের বিরাট চতুরঙ্গ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী 'বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স'-এর ঘোড়সওয়ার, মোটর-সাইক্লিস্ট, সাইক্লিস্ট এবং পদাতিক ছেলেমেয়েদের পাঁউরুটি যোগানোর জন্যে। পুরো দায়িত্বটাই সুধাংশুবাবুদের ওপর পড়লো।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সেবারে সভাপতিত্ব করেছিলেন, আর গান্ধিজী

থেকে শুরু করে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রায় সকল নেতা ও নেত্রীই অধিবেশনে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯২৫-এ দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে তখন ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বসু, স্বর্গীয় বিধানচন্দ্র রায়, স্বর্গীয় কিরণশঙ্কর রায়, স্বর্গত নির্মলচন্দ্র চন্দ্র এবং অপেক্ষাকৃত তরুণ দলে নেতাজীর মতো বিরাট ব্যক্তিবর্গ। বাঙালী নেত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী, স্বর্গতা মোহিনী দেবী, স্বর্গীয়া হেমপ্রভা মজুমদার প্রমুখ মহিলারা। স্বর্গতা সরোজিনী নাইডুও নিশ্চয়ই ছিলেন, কিন্তু তিনি যেন ঠিক বাঙালী নেত্রীর দলে পড়তেন না।

অধিবেশনে এক প্রকাণ্ড গানের দল ঐকতানে সবাইকে দেশাত্মবোধ অসংখ্য গান শুনিয়েছিলেন। সেই বৈতালিকের নেত্রী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী স্বর্গীয়া সরলা দেবী চৌধুরানী।

সমস্ত মণ্ডপটির চারিদিক ঘিরে স্বদেশী পণ্যের বড়ো প্রদর্শনী হয়েছিল। সেখানে আর্য বেকারীর স্টলও ছিল।

আমরা তখন পরাধীন ছিলাম বটে, কিন্তু তবুও যেন আজকের চেয়ে তখনকার দিনগুলি অনেক দিক দিয়ে ভালো ছিল। শিকল ছিঁড়ে ফেলার প্রতিজ্ঞা ছিল, আবার সংহতি ও সংগঠনের দৃঢ়তাও ছিল সেদিনের মানুষের মনে।

যা বলছিলাম, সকলকে খাওয়াবার যে ব্যবস্থাটি হয়েছিল তাতে পাঁউরুটি সরবরাহের ভার পড়েছিল আর্য বেকারীর ওপর। সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে সুধাংশুবাবুরা একজন দক্ষ বিদেশী 'বেকার'কেও নিয়োগ করেছিলেন।

সমস্ত কাজটি তাঁরা ভালো করেই করতে পেরেছিলেন বলে সুভাষচন্দ্র "I am glad to certify" ইত্যাদি বয়ান দিয়ে 'S. C. Bose, G. O. C., Bengal Volunteers' সই করে চমৎকার একটি শংসাপত্র আর্য বেকারীকে দিলেন। সুধাংশুবাবুরা সেটা এখনও সযত্নে রেখে দিয়েছেন ভালো ফ্রেমে বাঁধিয়ে।

সুধাংশুবাবু বললেন যে, নেতাজী আর সেদিনের বাঙালী এইভাবে আমাদের তুলে না ধরলে আমরা কি আর সেই ব্রিটিশ রাজত্বে বেশী দিন টিঁকতে পারতাম? তাঁর কণ্ঠে কৃতজ্ঞতার আবেগ ফুটে উঠলো।

এর পরেই একে একে এলো ত্রিশ ও বত্রিশ সালের লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন। সঙ্গে রইলো বিলিতী বয়কট। ইংরেজের তৈরী কোনো জিনিস ছোঁয়া হবে না বলে সকলে পণ করলেন।

নেশাখোরেরাও এই ব্রতে যোগ দিয়েছিলেন। বিলিতী সিগারেটের বদলে দেশী বিড়ি জোরসে চালু হলো। যাঁদের বিড়ি চলতো না তাঁরা জাপানী আর চীনে সিগারেট খেতে লাগলেন। ধূমপানরতা চৈনিক সুন্দরীর (নাকটা কিন্তু চ্যাপটা ছিল না) ছবিওয়ালা 'চিমাই' মার্কা সিগারেটের কথা এখনও আমার মনে আছে। আমার দাদারা খুব খেতেন। রসপিপাসুদের মধ্যে অনেকে সেই যে স্কচ হুইস্কি থেকে ধান্যেশ্বরীতে সরে এসেছিলেন, তাঁরা শুনেছি সেই অপূর্ব নতুন স্বাদটি পেয়ে আর স্কচ-এ ফিরে যাননি।

আন্দোলনে যোগ দেওয়া হাজার হাজার বন্দী কলকাতা ও দমদমের স্পেশাল জেল-গুলি ছেয়ে ফেললেন। বন্দী নেতারা বললেন যে, তাঁরা স্বদেশী বেকারীর পাঁউরুটি ছাড়া খাবেন না, আর 'কে সি বোস'-এর বার্লি ছাড়া পথ্য করবেন না। সরকার তখন বাধ্য হয়ে 'আর্য বেকারী'কে ডাকলেন। সুধাংশুবাবুরা আটাশ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে বড়ো এক ধাপ উঠেছিলেন, এবারে আরও বড়ো এক ধাপ উঠলেন, কারণ এটা তো আর কয়েকদিনের অধিবেশন নয়, এই সাপ্লাই চলবে যতদিন না লড়াই থামে।

এর পরে আসতে হয় ১৯৩৪ সালে। সুধাংশুবাবু তাঁর 'আর্য বেকারী'কে পৈতৃক চক্রবেড়ের বাড়ি থেকে রানী শংকরী লেনের (ভবানীপুর থানার কাছে) একটা বাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে এলেন। পুরনো মেশিনের সঙ্গে যোগ করে সম্প্রসারণ নয়, দুটো নতুন মিক্সিং মেশিন এবং গোটা পাঁচেক firebricks-এর তৈরী তন্দুর বসিয়ে আর্য বেকারীর বড়ো কারখানা স্থাপিত হলো।

সঙ্গে সঙ্গে বাবা শরৎবাবু মস্ত বড়ো একটা কাজ হাতে নিলেন। চক্রবেড়িয়ার একটা 'মিক্সার' ও দুটো তন্দুর নিয়ে শরৎচন্দ্র ১৯৩৪ সালেই 'বেকারী ট্রেনিং কলেজ' নাম দিয়ে এক শিক্ষায়তন খুললেন। রবার্ট প্যাটন নামে এক সাহেব বেকারী এক্সপার্টকে শিক্ষক-পদে আনলেন মোটা মাইনে দিয়ে। উত্তরকালে সুধাংশুবাবুর পরের ভাই হিমাংশুবাবু কাজ শিখে এই কলেজে শিক্ষকতার ভার নিয়েছিলেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য শরৎচন্দ্র ঘোষ মশায় ব্যবসাতে নিজের লাভের দিকটাই কেবল ভাবতেন না। যে বিদ্যা আয়ত্ত করে তিনি লাভবান হয়েছিলেন, আরও দশজন বাঙালী যাতে সেটা শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সেইটাই ছিল শরৎচন্দ্রের মহৎ উদ্দেশ্য।

কলেজের প্রেসিডেন্ট হলেন শিল্পায়নের ও র একজন খ্যাতনামা গুরু, স্বর্গীয় জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয়।

এইরকম একটি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জানতে পেরে বাঙালী ছাড়াও সুদূর মালয়, নেপাল প্রভৃতি দেশ থেকেও ছাত্ররা এসে ভর্তি হয়েছিলেন। বাঙালী ছাত্ররা কেউ কেউ কলেজ থেকে বেরিয়ে নিজেদের বেকারী খুলেছিলেন। সেইসব বেকারীর মধ্যে কোনো কোনোটা এখন মস্ত বড়ো হয়ে নাম করেছে। শুনলাম তার মধ্যে একটি বেকারী এখন আয়তনে আর্য বেকারীর চাইতেও বড়ো হয়েছে।

প্রাচীন রোমের ইতিহাসে এইরকম একটি কলেজের কথা আছে। তার নাম ছিল 'কলেজিয়াম পিস্টোরাম্'। 'পিস্টর' মানে 'বেকার'। খুব কড়া আইনকানুন ছিল সেই কলেজের ছাত্রদের জন্যে। একবার যে সেখানে ঢুকতো তাকে এবং তার অধস্তন চোদ্দ পুরুষকে বাধ্যতামূলকভাবে 'বেকার'-এর কাজই করতে হতো। আর রাজনৈতিক কারণে 'বেকার'রা কোনো সভা-সমিতি বা জনসমাগমে যোগ দিতে পারতেন না। বেকাররা তো বড়ো বড়ো লোকদের, নেতাদের বাড়িতে চাকরি নিতেন, স্বাধীন ব্যবসা করতেন না—তাই পাছে তাঁরা সেকালের সুপ্রচলিত প্রথা অনুযায়ী মদ খেয়ে তাঁদের ক্ষমতাশালী প্রভুদের বিষ

পাইতো মেরে না ফেলেন সেইজন্যেই এত কড়াকড়ি ছিল বোধ হয়।

'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' অর্থাৎ বাইবেলের আদিকাণ্ডের শুরুতে 'জেনেসিস' অধ্যায় থেকেই পাতায় পাতায় 'ব্রেড' ও 'বেকার' শব্দ দুটির উল্লেখ আছে।

উত্তরকালে ইহুদী জাতির মহান নেতা, সুদর্শন ইহুদী যুবক ক্রীতদাস জোসেফের প্রেমোন্মত্তা ও প্রত্যাখ্যাতা প্রভুপত্নী পটিফার-জায়ার কুচক্রে জোসেফ যখন ফারাওর (মিশর সম্রাটের) বন্দীশালায় নিক্ষিপ্ত হলেন তখন সেখানে আর একজন বন্দীর সঙ্গে জোসেফের আলাপ হয়েছিল। তিনি ছিলেন ফারাওর 'চীফ বেকার'। জেনেসিস-এর চত্বারিংশৎ শ্লোকের এই উল্লেখই সম্ভবত (পরোক্ষে) পাউরুটির প্রথমতম ইতিহাস। তারপরে অবশ্য বাইবেলের পাতায় পাতায় পাউরুটির উল্লেখ আছে।

(ভাষাতে গুরুচণ্ডালী হয়ে গেল। রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল—এইসব ধর্ম-গ্রন্থের আদিরসের কথা লিখতে গেলেই আমার কাঁচা রচনাশৈলী আরও তালগোল পাকিয়ে যায়। নব্য বাংলা ভাষার ডি এইচ লরেন্স আর জেমস জয়েসদের কাছে নাড়া বাঁধাটা দরকার, যাতে সোজা কথায় সহজ ব্যাপারটি খুলে বলতে পারি। যেমন, সোজাসুজি লিখলেই হতো, পটিফারের কামুক বউটা কর্তার পেয়ারের নফরটার সঙ্গে শুতে চেয়েছিল...ইত্যাদি ইত্যাদি।)

ফিনিশিয়া, গ্রীস, পম্পিয়াই, ক্রীট, রোম, স্পেন, গল (ফ্রান্স) হয়ে পাউরুটি ক্রমে ক্রমে সারা ইওরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। রোমে বারোয়ারী তন্দুরও ছিল। সরকার সেটা চালাতেন, আর জনসাধারণ নিজের নিজের তৈরী খামির নিয়ে সেই তন্দুরখানায় রুটি সেঁকে আনতেন।

পাঠান-মুঘলরা তন্দুরী রুটি অনেক আগেই এনেছিলেন, কিন্তু 'পাঁউরুটি' শব্দটা থেকে পরিষ্কারই বোঝা যায় পোর্তুগীজরাই এ-দেশে খাদ্যটির প্রচলন করেছিলেন। পোর্তুগীজ 'pao' শব্দের মানে হলো পাঁউরুটি। আধুনিক পাঁউরুটি না হলেও তা ছিল একই কুল ও মেলের।

তাল তাল ময়দা ঠেসবার জন্য রুটি-ওয়ালারা হাতের বদলে পা ব্যবহার করতেন, তাই এর নাম হয়েছে 'পাঁউরুটি' (পাওরুটি) বলে যে প্রবাদ আছে, তা ভুল।

ছাঁচে ঢালা খামির তন্দুরে সেঁকার পর ফুলে উঠে অনেক বড়ো দেখায় বলে উত্তর ভারতে এর নাম 'ডবল রোটি'।

১৯৪১ সালে শরৎচন্দ্রের কর্মময় জীবনের অবসান হলো। আর একচল্লিশেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গন পূর্ব এশিয়ায় প্রসারিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে 'কন্ট্রোল'-এর যুগও আরম্ভ হলো। খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহে দেশে নানারকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো আর সেই সময়েই বাংলা দেশে পঙ্গপালের মতো এলো কালোবাজারী আর মজুতদারের দল।

রুটি তৈরিতে সেই যে বিশৃঙ্খলার শুরু হয়েছিল আজ ২৭ বছর পরেও তার কোনো প্রতিকার তো হয়ই নি, বরং দিন দিন অবনতিই হয়ে চলেছে। গত বছরের এপ্রিল থেকে কয়েক মাস আগে পর্যন্ত রুটির দুর্ভিক্ষের কথাটা আমাদের মনে তাজাই আছে। ঠিক গম বা ময়দার অভাবেই যে এসব ঘটে তা যে নয়, সে কথাটাও আমরা এখন ভালো করেই বুঝতে পেরেছি সংবাদ-পত্রের গম পচতে দেওয়া বা খোলা ওয়াগনে ভিজতে দেওয়ার সচিত্র খবর থেকে। সরকারী

অকর্মণ্যতা এবং অপবণ্টনই এর মূল কারণ। এই অনাচারের বিষয়ে এত আলোচনা আর এত হিঁচিচাপাটি হয়ে গেছে যে, নতুন করে বলার মতো আমার আর কিছু নেই।

কিছু দিন আগে পর্যন্ত বেকারীর মালিকরা কখনো সারা মাসে ময়দা পেতেন ২০০।২৫০ মন, আবার কোনো মাসে পেতেন ৩।৪০০০ মন। ওদিকে এস্টাব্লিশমেন্ট বহাল রাখতে হতো উৎপাদনের ক্ষমতা বরাবর। ছিরিছাঁদ কিছুই থাকতো না কাজ করার।

সেদিন অবশ্য সুধাংশুবাবুর বড়ো ছেলে 'আর্য বেকারী'র বর্তমান সক্রিয় কর্তা সুশান্তবাবু বললেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেকারীদের নাকি চার শো মন করে ময়দা 'বাফার-স্টক' রাখার আদেশ দিয়েছেন। সরকার যদি ময়দার কলগুলিকে যথেষ্ট গম সরবরাহ করে সেই অবস্থাটা বজায় রাখতে পারেন তো অতি আনন্দের ও প্রশংসার কাজ হবে সেটা। দেখা যাক—ব্যাপারটা সরকারী তো!

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, যে-সমস্ত বেকারী ও কনফেকশনারীতে মেশিন-মেড বিস্কুট তৈরী হয় না তাঁরা ময়দার 'কোটা' পান রাজ্য সরকারের কাছ থেকে, আর যাঁদের বিস্কুট মেশিনে তৈরী হয়, যেমন 'ব্রিটানিয়া' বা 'কোলে' তাঁরা পান ভারত সরকারের কাছ থেকে।

ময়দা ছাড়া রুটি তৈরির অন্য যে-সমস্ত প্রধান উপাদান আছে তার মধ্যে Yeast এখন এখানে (শ' ওয়ালেস কোম্পানীর উদ্যোগে) তৈরী হলেও তার অপ্রতুলতা ঘটে এবং Hops আমদানি হয় 'স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন'-এর মারফত। Hops-এর আবার চমৎকার একটি কালোবাজার আছে। পাঁচ টাকার এক প্যাকেট hops নাকি চল্লিশ টাকাতেও বিক্রি হয়।

'কন্ট্রোল'-এর কথায় আবার সুধাংশুবাবুর ব্যক্তিগত জীবনের কথা এসে পড়ে। ১৯৩৩ সালে সুধাংশুবাবু সেদিনের বর্ধিষ্ণু চাল ও তেলকল মালিক মাকড়দা-র স্বর্গীয় অন্নদাপ্রসাদ দত্তের কন্যা শ্রীমতী সতীরানী ঘোষের পাণিগ্রহণ করেন। বর্ধমান থেকে কোলাঘাট পর্যন্ত বেশ কয়েকটা মিল ছিল অন্নদাবাবুর; তা ছাড়া তিনি শ' ওয়ালেস কোম্পানীর ডিরেক্টরও ছিলেন।

শিল্পপতির মেয়ে সতীরানী বাণিজ্যের ওঠাপড়াটা বুঝতেন। তাই বিয়ের দু'-তিন বছরের মধ্যেই যখন কন্ট্রোলের ঠেলায় স্বামী বিপন্ন হয়ে পড়লেন, তাঁর নগদ টাকার অভাব পড়লো, তখন গায়ের দামী দামী গয়না স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "এখন এই দিয়ে সামলাও, সময় ফিরলে আবার চুনিপান্না দিয়ে মুড়ে দিও।"

এমন মেয়ে যাঁর সহধর্মিণী, জীবনযুদ্ধে তাঁর কিসের ভয়? সুধাংশুবাবু লড়ে চললেন।

বাজারে বিক্রি ছাড়াও হাসপাতাল, ছাত্রাবাস আর মেস-বোর্ডিং-এও আর্য বেকারীর রুটির চল হলো। ততদিনে কলকাতায় বাঙালীর মালিকানায় আরও কয়েকটা বেকারী হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কারও কারও এবং উত্তরকালে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি বেকারী-র নাম নীচে লিখছি ঃ—

প্রতিষ্ঠানের নাম	কর্তা বা মালিক
এরিয়ান বেকারী	চট্টোপাধ্যায় পরিবার
লর্ডস বেকারী কনফেকশনারী অ্যান্ড বিস্কুট কোং	শ্রীঅনিল ঘোষ
সুধাংশু বেকারী	শ্রীপ্রভাত দত্ত
বড়ুয়া বেকারী প্রাঃ লিঃ	শ্রীমনোরঞ্জন বড়ুয়া
রয়নস্ বেকারী	শ্রীদীপক রায়চৌধুরী
ইস্ট ইন্ডিয়ান বেকারী	শ্রীচিত্তরঞ্জন ও শ্রীগোষ্ঠেশ্বর সাহা
সন্তোষ বিস্কুট কোং প্রাঃ লিঃ	শ্রীমণীন্দ্রনাথ সাহা
জলযোগ ফুড প্রোডাক্টস	শ্রীগোপালচন্দ্র সিংহ রায়

মেশিন-মেড পাঁউরুটি আরও কোনো বাঙালী প্রতিষ্ঠান করছেন কিনা জানি না। খুঁটে খুঁটে এইসব তথ্য বের করা শক্ত কাজ। বেংগল ন্যাশন্যাল চেম্বার যদি এ বিষয়ে তৎপর হন তো আমরা ইতরজনেরা উপকৃত হই। 'ওয়েস্ট বেংগল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশন' নামে এঁদের একটা সংঘ আছে। সেই সংঘ 'ভারত চেম্বার অব কমার্স'-এর অন্তর্ভুক্ত। সেই চেম্বার অবাঙালী-প্রধান। বেংগল ন্যাশন্যালের সংবিধানেও অবশ্য বাঙালী অবাঙালী বলে কোনো ভেদাভেদ নেই, কিন্তু বাস্তবে তা বাঙালী-প্রধান। তাই বলছিলাম যে, বেংগল ন্যাশন্যাল চেম্বারের পরিসংখ্যান বিভাগ যদি এই-সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে রাখেন তো খুব ভালো হয়। বাঙালীর সমস্যা যে বড়ো কঠিন সমস্যা!

১৯৫০ সাল থেকে আর্য বেকারী নতুন রূপ নিল। পণ্ডিতিয়া রোডে ক্যালকাটা কেমিক্যালের কারখানার অদূরে এক বিঘা জমির ওপর সুধাংশুবাবু বর্তমান দোতলা কারখানাটির স্থাপনা করলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল যে, রুটি কেক ইত্যাদির সংগে মেশিন-মেড বিস্কুটও তৈরি করবেন। পাঁউরুটির জন্যে ইওরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আনিয়ে আধুনিক মেশিনারী বসালেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, 'ডবল-ডেকার স্টীম ওভেন' এবং পাঁউরুটি স্লাইস করার মেশিন। এই প্রসংগে উল্লেখ্য যে, বাংলা দেশে স্লাইস করা রুটির প্রবর্তক হলেন আমাদের সুধাংশুবাবু।

এই মেশিন ও তন্দুর বসিয়ে আর্য বেকারীর উৎপাদন-ক্ষমতা দাঁড়ালো দিনে ১৫০ মন ময়দার পাঁউরুটি, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি তৈরি করার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কখনো ময়দার অভাবে, কখনো শ্রমিক সমস্যার জন্যে উৎপাদনে এতদিন নানা ব্যাঘাত ঘটে এসেছে।

সুধাংশুবাবু বছর তিন চার মেশিনে তৈরী বিস্কুটও করেছিলেন, কিন্তু শ্রমিক আন্দোলন হওয়ার জন্য বহু দিন আগেই সে কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

তখন থেকে আর্য বেকারী-র উৎপাদন নানারকমের রুটি, কেক, প্যাটি এবং হাতে-গড়া নিমকি বিস্কুট ও মিষ্টি নানখাটাইয়ে সীমাবদ্ধ আছে।

আর্য বেকারীর বিক্রি এখন বছরে ১২।১৩ লক্ষ টাকা। শ্রমিক সংখ্যা এক শো-র কিছু বেশী।

ম্যানেজার শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য ও সেলস্ ম্যানেজার শ্রীতারাশংকর দে-কে সংগে নিয়ে সুধাংশুবাবুর মেজো ছেলে সুশান্ত আমাকে বেকারীর কাজ দেখালেন। অনিলবাবু এখানে আছেন ৩০ বছর, আর তারাশংকর-বাবু আছেন ৩৪ বছর। তারাশংকর চোদ্দ বছর বয়সে আর্য বেকারী-র জগুবাবুর বাজারের স্টল-এ দোকানদারের যোগানদার হয়ে ঢুকেছিলেন; এখন তিনি কলকাতা ছাড়াও বাইরে বিহার, উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত আর্য বেকারী-র মাল বিক্রির কাজে সুধাংশুকুমার ও সুশান্ত-র সহায়তা করেন।

সুধাংশুবাবুর যে পাঁচ ছেলে আজ

প্রতিষ্ঠানের শরিক, সেই সুশান্ত, শ্যামল, কমল, গৌতম ও কল্যাণের অন্নপ্রাশনে কোম্পানীর এই প্রাচীন বিশ্বস্ত কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ছিলেন না শুধু সুধাংশুবাবুর বড়ো ছেলে রবির মুখেভাত-এ। রবি আজ নেই। একচল্লিশ সালে, মাত্র সাত বছর বয়সে সে তার পিসীমা, ময়মনসিংহের আঠারো-বাড়ির জমিদার গৃহিণী শ্রীমতী বীণাপাণি রায়চৌধুরানীর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। ইনি এ'র ছোট ভাই সুধাংশু আর তাঁর পরিবারের সকলকে খুব ভালোবাসেন। সুধাংশুকুমারের আর্থিক অনটনের সময়ে আর্য বেকারী-কে রক্ষা করার ব্যাপারে ইনি অনেকখানি সহায়তা করেছিলেন।

সেই পিসীমার বাড়িতে আর কোন্ কোন্ ছেলের সঙ্গে খেলা করতে গিয়ে একটা টোটাভরা বন্দুকের গুলি ছুটে গিয়ে রবি মারা যায়।

কোনো প্রতিষ্ঠান দেখতে গিয়ে সেখানকার মেশিনের চাইতেও আমি মানুষগুলিকে বেশী করে দেখি। তাঁদের জীবনের ওঠাপড়া আর হাসিকান্নার সঙ্গেই তো এইসব মেশিনের চলা বা অচল হওয়া জড়িয়ে থাকে। কখনো কখনো তাঁদের অন্দরমহলের পর্দা সরিয়েও তাঁদের মা, বোন, স্ত্রী আর মেয়েকেও পাদপ্রদীপের আলোর সামনে উপস্থিত করি এইটা প্রমাণ করবার জন্যে যে, সেই শক্তিরূপিণী-দের সহায়তা ছাড়া কর্তারা কর্মে পটুত্ব দেখাতে পারতেন না; আর তা হলে কারখানাও বসতো না, মেশিনও চলতো না। সুধাংশুবাবুর বেলায় যেমন তাঁর দিদিকে আর সতীরানী দেবীকে একেবারে স্পট-লাইটের আলোয় টেনে আনলাম।

কথায় কথায় অপ্রাসঙ্গিক আরও কত কিছু এসে পড়ে—সুধাংশুবাবুর ধর্ম-জীবনের কথা, তাঁর গুরু শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারীর আর গুরুভাই শ্রীমদ্ মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের প্রভাবে তিনি কত প্রভাবান্বিত তার কথা—কিন্তু ভালো কথা হলেও সে-সমস্ত এই প্রবন্ধে অবান্তর হবে। অথবা বঙ্গভঙ্গ-রোধ আন্দোলনের সময়ে সুধাংশুবাবুর মামার বাড়ি, বাগ-বাজারের স্বনামধন্য স্বর্গত পশুপতিনাথ বসু মহাশয়ের বাড়িতে বাঙালীর রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানের বর্ণনার অবকাশও এখানে নেই।

কলকাতার কনভেন্ট রোডে একটি সরকারী প্রশিক্ষণ সংস্থা আছে। তার নাম 'কেটারিং অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড নিউট্রিশন কোর্স'। সেখানে 'বেকারী ও কনফেক-শনারী'র প্রয়োগগত দিকটা শেখানো হয় বলে শুনলাম। অনেক বাঙালী ছেলে তার ছাত্র। আর্য বেকারীতেও তাঁদের একজন আছেন। তাঁর নাম শ্রীসমীর সেনগুপ্ত। সমীরবাবুর কাছে জানলাম যে, দিল্লীতে ভারত সরকারের উদ্যোগে 'মডার্ন বেকারীজ প্রাইভেট লিমিটেড' নামে যে প্রতিষ্ঠান আছে তার ম্যানেজিং ডিরেক্টর একজন বাঙালী, নাম শ্রীপ্রেমাংশু দত্ত। তিনি অস্ট্রেলিয়া থেকে উচ্চশিক্ষা পেয়ে এসেছেন।

অন্য বিদেশী ভাষা জানি না, কিন্তু ইংরেজী "The Modern Baker Confectioner And Caterer" (Author—John Kerkland).
নামক মোটা মোটা চার খণ্ডের একটি বইয়ের পাতা উল্টে উল্টে দেখলাম যে, কী নিষ্ঠার সঙ্গে বিদেশীরা সব কাজ করেন এবং কোন সুদূর অতীতকাল থেকে। অতীতে আমাদের মুনিঋষিরাও এই ধরনের সংহিতা ও শাস্ত্র রচনা করে গেছেন অবশ্য।

ইংরেজী বইটিতে পাঁউরুটি বিষয়ে বেশ কয়েকটা কবিতাও আছে, যেমন একটা হল Though Flesh, Fish, Whitemeat All in fitting season|Nourish the body being used with reason. Yet no man can deny (to end the strife)| Bread is worth all being the staff of life. —তার মানে, মাছ মাংস সবার চাইতে ভালো পাঁউরুটি (আর ঝোলাগুড়!)

পদ্যটদ্য না লাগালে নাকি সাহিত্য রচনা হয় না। আমি পাকা সাহিত্যিক হবার আশায় লেখাটা শুরু করেছি একটা ছড়া দিয়ে, মাঝে আর একটু পদবৃদ্ধির জন্যে দিলাম ইংরেজী পদ্য; এখন পরমপাকা হবার চেষ্টায় আর একটা ছড়া দিয়ে শেষ করি। সবই পাঁউরুটি সাহিত্য।

নিনি বাবা নিনি
মাখন রুটি চিনি,
খা বা বাবা খা—বা—
লাল পালংকে পর শো—বা— ॥

বিশ্বকর্মা

ওয়াশিংটনের চিঠি

এপ্রিলের সপ্তাহান্তে দগ্ধ নগরীর একাংশ

খুব গাঢ় ঘন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে রেজারেকশন সিটির পাশ ঘেঁষে হেঁটে আসছি পা টিপে টিপে। কী জানি হয়ত কেউ জানতে পারলে অনর্থ ঘটবে। আজ ভয়ানক দুর্যোগের রাত। আমেরিকায় আজ একটা হাহাকারের রাত। গত ক'দিন আগে জোরালো বৃষ্টি হয়ে গেছে। পথ এখনো পিছল। কেননা এটা রেজারেকশন সিটির লাগোয়া একটা প্রায় পরিত্যক্ত পথ। আমার পা পিছলে যাচ্ছিল পদে পদে। আমি ভয় পাচ্ছিলুম। আমি ভারতবাসী। পদস্খলনে আমার ভয়। এ দেশে এখন মনুষ্যত্বের স্খলনের যুগ। প্রতিপদে আমার গা শিউরে উঠছিল। তৈলাক্ত কাদাকে আমার রক্ত বলে ভ্রম হচ্ছিল। আজ ছয়ুই জুন। আজ সারা দিন আকাশে সূর্য হেসেছে। খটখটে বাতাস গায়ে ল্যাভেণ্ডার মেখে ঘুরে বেড়িয়েছে। কোথাও বাদলের ছিটেফোঁটাও নেই। তবু আজকের চেয়ে ভীষণতর রাত্তির এখানে আমি দেখিনি। আশা করছি আর দেখতেও হবে না। খুব শীগগিরই আমি এ দেশ থেকে পাততাড়ি গুটোচ্ছি।

চোঠো এপ্রিল থেকে যে চিঠিটা আমি লিখে আসছি, পুনর্জীবন-পুরীর আলেখ্য দিয়ে ইতি টানব ভেবে যেটা আজও শেষ করে উঠতে পারিনি, যার জন্যে পাঠকদের কাছে আমি অপরাধী, গত তিরিশ বত্রিশ ঘণ্টায় সে চিঠির ভাষা তছনছ হয়ে গেছে। এখন চোঠো এপ্রিল আর ছয়ুই জুন পাশাপাশি শুয়ে আছে কবরে। আজ আমার রোজনামচায় একটি ব্ল্যাকপ্রিন্স আর একটি গন্ধরাজের যুগলবন্দী জলসা। আমি ভিনদেশী। আমার চোখের জল শুকোতে তিরিশ ঘণ্টাই অনেক সময় ...পাকা দুটো মাস তো যুগান্তের কথা। আমেরিকার কান্না নিয়ে আজ আমি কথকতা করব।

ছেলেবেলার এক বাউলের গান শুনেছিলুম : "তারা গাছপাকা হর্তুকির মতন দেবলোকেতে চলে যায়...।" অর্থাৎ সেইসব স্বর্গীয় দূতেরা ধরাধামে তাঁদের ব্রত সমাপন ক'রে দিব্যলোকে ফিরে যান। অভিমন্যু, ক্ষুদিরাম টেগুরাবল...গান্ধীর গাণ্ডীবী শিষ্য মার্টিন লুথার কিং, জন কেনেডির লক্ষণ ভাই বব কেনেডি...বৃক্ষপক্ক হর্তকীর মতই ওরা দুর্লভ জন্মা। অনেককাল ধরে গাছতলায় মাটিতে পড়ে ওরা ধুলো মাখে না; বেশিদিন যাবৎ খুব বেশি পাখিরা ওদের ঠোকরাতে সুযোগ পায় না; বহু শিলাবৃষ্টির আঘাতে ওদের রূপ কদর্য, আর চরিত্র বিকৃত হতে পায় না।

আমি খুব বড় আশাবাদী নই। সত্য ও ধর্মের জয় এবং অন্যায়-অনাচারের পতন ঘটিয়ে তবেই যবনিকা টানেন—সৃষ্টি-স্থিতিসংহারের কর্তাকে আমার ঠিক ওই জাতীয় কমেডি প্লেরাইট্ ব'লে মনে হয় না। তাই, ডঃ মার্টিন লুথার কিংয়ের নীতির ব্যবহারিক সাফল্যে আমার আস্থা অটুট ছিল, তা বলতে পারব না। আমেরিকার মৃত্তিকায় তাঁর মহাজাতি মিলনের স্বপ্ন সার্থক হবে, এমন বিশ্বাসেও আমার জোর ছিল না। ধনতন্ত্রের বড় বড় লোমশ থাবার ওপর সরাসরি পদাঘাত ক'রে রবার্ট কেনেডি যখন নিঃস্ব নিগ্রো আর নির্জিত রেড ইণ্ডিয়ানদের প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে নির্বাচনে দাঁড়ালেন, তখন থেকেই আমি জেনেছি তিনিও নিষ্ফলের হতাশের দলে। আমার প্রবাসজীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ, মানবদরদী এই দুই মহান্ আমেরিকানের সংগে আমার দেখা হল না। এপ্রিলের প্রতিবাদ সমাবেশে ওয়াশিংটনে ডঃ কিংয়ের সংগে সাক্ষাৎকারের কথা পাকা হয়েছিল। জুনের মাঝামাঝি, ক্যালিফোর্নিয়ার প্রাইমারী শেষ ক'রে রাজধানীতে ফিরে, সেনেটের কেনেডি আমার সংগে আলাপ করবেন, সে কথাও পাকা ছিল। দুজনেই ফাঁকি দিলেন। গুণমুগ্ধ এক বিদেশীর তুচ্ছ অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট বাতিল করে দিয়ে কিং আর কেনেডি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। এ হতাশা আমি কোনাদন ভুলতে পারব না।

আমেরিকার টেলিভিশনকে সাধুবাদ জানাই। তাঁদের কল্যাণে দু'চোখ ভরে যা দেখলুম, দু কান ভরে যা শুনলুম তার তুলনা নেই। মৃত্যুর চব্বিশ ঘণ্টা আগে মেম্ফিসের জনসভায় কিংয়ের দৃপ্তকণ্ঠে অহিংসার বিজয় ঘোষণা শুনেছি। মৃত্যুর চব্বিশ ঘণ্টা আগে লস এঞ্জেলসের যুদ্ধ শিবিরে বিজয়ী কেনেডির সলজ্জবিনয়ের হাসিমুখ শেষবারের মত দেখে নিয়েছি। আফসোস নেই। টেলিভিশনকে ধন্যবাদ। বিজয়ের সমারোহে কেমন করে বিসর্জনের বাজনা বেজে ওঠে, উৎসবের সভামণ্ডপ কেমন করে ব্যাধের গায়ের গন্ধে ভরপুর হয়ে ওঠে—টেলিভিশনের ঐন্দ্রজালিক নেটওয়ার্ক তার নিপুণ ছবি পরিবেশন করেছে। ভাগ্যে আমার টি-ভি সেট্টা রঙীন নয়। রক্তপাতের রঙ্, খুন-খারাপীর আসল রঙ আমাকে দেখতে হয়নি। পর পর দুটি মৃত্যুর ঐতিহাসিক গরিমা, দুটি উন্মত্ত জিঘাংসার বীভৎস কালিমা—আমার সাদা কালো টি-ভি সেটের পিক্চার টিউবে চমৎকার ফুটে উঠেছিল। তাই যথেষ্ট। এথেল কেনেডির মর্মান্তিক কালো পোশাকে আর কোরেটা কিংয়ের নিঃশব্দ রিক্ততায় একই মহাশোকের নিরক্ত শুভ্রতা দেখতে দেখতে চোখ পাথর হয়ে গেছে।

দু' মাসের ব্যবধানে পরপর দুটো আকস্মিক দুর্ঘটনা আমার ভাবনাকে দু' রকমভাবে আক্রান্ত করেছে। কিংয়ের মৃত্যুতে আমার ভাবনায় উথালপাথাল আলোড়ন উঠেছিল। বিষণ্ণ উদ্বেগ নিয়ে আমি ভাবতে চেষ্টা করেছিলুম অতঃপর কী পরিণতি?

যাঁরা মনে করেন উন্মাদ শোক প্রচণ্ড হিংসার নরমেধ যজ্ঞে মোড় ফিরতে পারে না, আমি তাঁদের দলে নই। শোকে উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য থাকবে না, কাণ্ডজ্ঞান-লুপ্তির চিহ্ন প্রকট হবে না, এ রকম প্রাজ্ঞ সমাজের শোক সাধারণ মানুষ অশিক্ষিত মানুষের কাছে আশা করা অন্যায়। যুক্তরাষ্ট্রের চিরনিঃস্ব চিরলাঞ্ছিত কালো মানুষদের একটিমাত্র মশাল নিবে যাওয়ায় ক্ষোভে তারা পাগল হয়ে উঠবে, এটাই স্বাভাবিক; পটোম্যাকের তীরে বসে রামধুন গাইবে, এটা অনুচিত প্রত্যাশা। আমার সে প্রত্যাশা ছিল না। আমি তাই আতংকিত হয়েছি। উগ্রপন্থী নিগ্রো নেতা স্টোকলি কারমাইকেলের ভবিষ্যদ্বাণীই সত্যি বলে আমার মনে হয়েছিল। স্টোকলি বলেছিলেন : "সুতীব্র মতভেদ থাকা সত্ত্বেও কিং আমাদের অবিসংবাদিত রাজা। তাঁকে হত্যা করে শ্বেতকায় গোষ্ঠী কালোদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। অতঃপর সর্বনাশের দাবানল কেউ ঠেকাতে পারবে না।" ইন্দ্রপতনের অগ্নিগর্ভ প্রহরে, এই ঘোষণাকে আমার রণহুংকার বলে মনে হয়েছিল। চৌঠো এপ্রিলের গভীর রাত্তিরে, রাষ্ট্রপতি জনসনের শান্তির আবেদন, কিংয়ের অন্তরঙ্গ শিষ্য রেভারেন্ড ফন্টরয়ের অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠের আকুল মিনতি, দেশসুদ্ধ সাদাকালো নেতার অহিংসার আহ্বান...সব ছাপিয়ে কারমাইকেলের উদ্ধত চ্যালেঞ্জ—"ভাইসব, আজ রাত্তিরে সবাই ঘরে ফিরে যাও। নিরস্ত্র হয়ে পথে বেরিও না। আজ সাদারা হন্যে নেকড়ের মতন তোমাদের খুন করবে। যদি পারো, কাল পিস্তল বন্দুক যোগাড় করে পথে নেমো। যাতে আততায়ীর রক্ত ঝরিয়ে তবে মরতে পারো। অসহায় হয়ে মরো না।" শুনে সেদিন আমি বিচলিত, শংকিত হয়েছিলুম। অহিংসা আর শান্তি আর মিলনৈষণার শেষ বাতিটি নির্বাপিত হওয়ায় আমার উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না।

কিন্তু পাঁচুই জুনের রাত্রিশেষ আমায় অসাড় করে দিয়েছে। আমেরিকার ঋজু তারুণ্যের অপঘাত মৃত্যু, একটি ঋতধ্বনি শঙ্খের অন্যায় শ্বাসরোধ, আমার শুভ বিশ্বাসের পাঁজরা ভেঙে দিয়েছে। সান্‌ফ্রানসিসকোর স্বর্ণসেতু, চন্দ্রমুখী অ্যাপোলো ...দক্ষিণ এশিয়ার কোতোয়ালী, নিম্নবিত্ত দেশের অভিভাবকত্ব...কোনো গৌরবই বোধ হয় এই ঘোর কলংকের ক্ষতিপূরণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এক অদৃশ্য ভূগোল শিক্ষক আমায় কান মলে শিখিয়ে দিয়ে গেল : আরণ্য আফ্রিকা নয়, আজকের উত্তর আমেরিকার মহান্ গণতন্ত্রেরই রাশ নাম : ডার্ক-কন্‌টিনেন্ট।

রবার্ট ফ্রানসিস কেনেডি মার্কিন রাজনীতির সাম্প্রতিক ইতিহাসে কয়েকটি স্মরণীয় ঝড় ও কয়েকটি জটিল আবর্ত রচনা করেছিলেন। তাঁর অবিশ্বাস্য মৃত্যুর

দহনযজ্ঞের মধ্যে অক্ষতদেহ ধনিক শ্বেতাঙ্গদের ইমারত

মূঢ় আকস্মিকতায় সেগুলির গতিরুদ্ধ এবং ঘূর্ণন স্তব্ধ হবে কিনা; তাঁর কোনো যোগ্য উত্তরাধিকারী ব্রত সম্পাদনের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসবেন কিনা, এ ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা আমার কর্ম নয়। তবে জন এফ্ কেনেডির একটি ঘোষণা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। কেনেডি, তখনো প্রেসিডেন্ট হননি, বোধ হয় সেনেটর ছিলেন, —বলেছিলেন : "কেনেডিদের একটা মিশন আছে। আমার বড় ভাই জো'র অকাল মৃত্যুর পর তার পতাকা আমি কাঁধে নিয়ে চলেছি। সফল হব কিনা জানি না। না হলেও দুঃখ নেই। আমি যদি চলতে চলতে ম'রে যাই, ববি আমার কাজের ভার নেবে। ববি গেলে টেড্ আছে। কেনেডিরা মাঝ পথে থামতে শেখেনি..।" কনিষ্ঠ কেনেডি এডোয়ার্ড, ছত্রিশ বছরের দুটি বলিষ্ঠ হাতে শোকশ্লথ পরিবারের লাগাম তুলে নিয়েছেন। আমি জানি, রাষ্ট্র শাসনের রজ্জুও তিনি উপেক্ষা করতে পারবেন না। ওটা তাঁর বংশের ঐতিহ্যের দাবি। ওটা তাঁর ভ্রাতৃপরম্পরার মহিমার, সংগ্রামের, মৃত্যুর উত্তরাধিকার।

রেভারেন্ড মার্টিন লুথারের আততায়ী একজন শ্বেতাঙ্গ। সেদিন সন্ধ্যায় ইণ্ডিয়ানাপোলিসের গরীব নিগ্রো জনসমাবেশে কিংয়ের মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন রবার্ট কেনেডি। বলেছিলেন : "আজ এই শোচনীয় মুহূর্তকে কেন্দ্র করে গোটা আমেরিকা সাদা আর কালো দু ভাগে ভাগ হয়ে যাক, একে অপরের ওপর হিংসা-দ্বেষকে সম্বল করে, আমরা কি তাই চাইব? নাকি আমাদের প্রিয় নেতার আদর্শ অহিংসা আর শান্তির পথে আমাদের সকলের আমেরিকাকে নিষ্কলংক করে তোলার সাধনা করব? এই দুই পথের বাইরে কোনও পথ নেই।...আমি জানি আপনাদের মনে এখন ঝড় বইছে, আমার মনেও। আমি শুনেছি ডক্‌টর কিংয়ের হত্যাকারী শ্বেতাঙ্গ। মনে রাখবেন আমার ভাইকে যে খুন করেছিল, সেও শ্বেতাঙ্গ...।" সেই সন্ধ্যায় বিক্ষুব্ধ, বিমর্ষ, শোকার্ত একদল কৃষ্ণচর্ম ছিন্নবেশ মানুষের বুকে যে আগুন জ্বলে ছিল, সমস্ত জনপদকে তা ছারখার করে দিতে পারত অনায়াসে। যদি ববি কেনেডি না থাকতেন। গোটা মার্কিন মুলুকে সাদা কালো লাল বাদামী এমন দ্বিতীয় নেতা ছিলেন না, যাঁর শক্তি ছিল সে আগুন নেবানোর, সাহস ছিল তার মোকাবেলা করার। রবার্ট কেনেডি অনন্যসম। ঘেটোয় গিয়ে তিনি আইন আর শৃঙ্খলাবোধের কথা বলেন, দক্ষিণের দুর্ধর্ষ বেপরোয়া বন্দুকবাজদের কাছে গিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণের আইনের আলোচনা করেন; ঐশ্বর্যের গুমোরে প্রমত্ত মার্কিন সমাজের বিলাসবহুল প্রেক্ষাগৃহের দেয়ালে দেয়ালে তিনি দৈন্যের আর বুভুক্ষার নোংরা, কালো নগ্ন ছবি টাঙিয়ে দিয়েছেন। মার্কিন রাজনীতির ভোটার্ভার্থীর মতলববাজরা তাঁকে মূর্খ ভাবুক, ধূর্ত ভাবুক বিশ্বের শুভবুদ্ধি মানুষের চোখে তিনি আমেরিকার মহতী সত্যনিষ্ঠার, তার দৃপ্ত তারুণ্যের প্রতিনিধি হয়েই বেঁচে থাকবেন।

সেদিন একটা দুর্লভ ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হয়েছিলুম আমি। জাতীয় শোকদিবস, কংগ্রেসের সৌধচূড়ায় সার্ধ-দুদিন অর্ধনমিত পতাকা এসব তো দেখেছিই। কেনেডির আহত হবার খবরের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যাকার্থির অভিযান-শিবিরে শ্মশানের অবসাদ নেমেছে। লক্ষ লক্ষ লোকের রোরুদ্য জনতার মধ্যে থেকে ডেমোক্রাট রিপাবলিকান চেনার উপায় থাকেনি। আশি ডিগ্রি উত্তাপ মাথায়, খর মধ্যাহ্নে নিউয়র্কে ক্যাথিড্রালের পাশে লক্ষাধিক নরনারী ঠায় দাঁড়িয়ে শেষ শোক-শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে এসব আগেই টেলিভিশনে দেখেছি। এই জনতার অনেকে হয়ত এদেশের ষোলো আনা নাগরিক ছিল না। অনেকের হয়ত ভোটাধিকারই ছিল না। কেনেডি বেঁচে থাকলে হয়ত এরা অনেকেই তাঁকে ভোট দিত না। শ্বেতাশ্বেত-পীতপিঙ্গল নির্বিশেষে বিয়োগবেদনায় চোখের জল ফেলেছে। যে-বিদেশি কোনদিন তাঁকে চোখের দেখাও দেখেনি, গভীর রাতের নির্জন অন্ধকারে সে শোকের প্রহর জেগেছে...এ সব কম কথা নয়। কিন্তু সেদিন রাজধানী ওয়াশিংটনে যা প্রত্যক্ষ করলুম সে দৃশ্যের তুলনা হয় না। কথা ছিল নিউয়র্ক থেকে বেলা একটায় স্পেশাল ট্রেনে বাহিত হয়ে কেনেডির শবাধার রাজধানীতে পৌঁছবে বিকেল চারটে নাগাদ। বেলা দেড়টা

রেজারেকশন সিটি বা পুনর্জীবন পল্লী

দুটো থেকে ভিড় জমতে শুরু করে।—ইউনিয়ন স্টেশনের সামনে থেকে নিয়ে সেনেটের সামনে দিয়ে, জাস্টিস্ ডিপার্ট-মেণ্ট, রেজারেক্শান সিটি হয়ে বরাবর আরলিংটন জাতীয় সমাধিভূমি পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ পথের দুধার, ঠাসবুনট মানুষের কেয়ারিতে মোড়া হয়ে গেল বিকেল চারটের অনেক আগেই। শবাধারবাহী স্পেশাল ট্রেন, তিন ঘণ্টার পথ পাড়ি দিতে পাকা ন' ঘণ্টা সময় নিলো। সমস্ত রেলপথের ধারে ধারে অবিশ্বাস্য অকল্পনীয় জনস্রোত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ি থামিয়ে শোকাঞ্জলি দিয়েছে। ওয়াশিংটনও অচঞ্চল, এত ধৈর্য-শীল জনতা এর আগে দেখেনি। অপেক্ষ-মান দর্শনার্থীদের সুদীর্ঘ কাতারের এক ধারে দাঁড়িয়ে জহুরী সদাগরও নিঃশব্দে শেষ শ্রদ্ধা অর্পণ করেছে। কেনেডি কথা দিয়ে কথা রাখেন নি। আমি কিন্তু কথা রেখেছি। প্রেসিডেন্ট হয়ে রাজধানীতে ফিরে আসতে পারেন নি রবার্ট কেনেডি। নেতাকে ওরা ফিরিয়ে এনেছে কাস্কেটের শোভাযাত্রায় বজ্রাহত রাজধানীর বুকে... Home they brought her warrior dead.

*

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহান্তে রাজধানীতে যে অগ্নিযজ্ঞ শুরু হয়েছিল শহরের ইতিহাসে তার নজীর নেই। মাঝ শহরের বুকের ওপর বাড়িঘর দোকানপাট পুড়ে গেল। অল্প কয়েকজনের প্রাণ গেল বহু লোকে আহত হল আর বেশ কয়েক লক্ষ ডলারের সম্পত্তি নষ্ট হল। বীমা প্রতিষ্ঠান-গুলোর মোটারকম লোকসান হয়ে গেল। গুজব উঠল, অদূরভবিষ্যতে কয়েকটা ছোট-খাট বীমার ব্যবসা লাটে উঠবে। আর কার ক্ষতি হল? হ্যাঁ, ক্ষতি হয়েছে জনকয়েক ছোট পুঁজির কালো দোকানীর। কিছুকাল আগে বীমা কোম্পানির চড়া হারের নতুন প্রিমিয়াম দাবির দরুণ যাঁরা ইনসিওর করাতে পারেননি। বড় বড় দোকানের কিছুই হয়নি, তা নয়। পুড়ে খাক হয়ে গেছে—উডওয়ার্ডলথ্রপ, উলওয়ার্থ, জি সি মারফি, সেফওয়েয়ের মতন সুবিশাল বহুমুখী বিপণি। কিন্তু ব্যবসার কোনও বনিয়াদী ক্ষতি হতে পারেনি। সকলেরই বীমা করা আছে।

ক্ষতি হয়েছে উপদ্রুত অঞ্চলের কালো বাসিন্দারেই বেশি। ওই এলাকায় সাদারা সংখ্যায় খুবই কম বাস করে এখন। যারাও করে, তাদের মধ্যে দুই শ্রেণী। এক, খুব ধনী; তারা এত সুরক্ষিত যে, কালোদের ক্রোধের দাবানল তাদের নাগাল পায়নি। দুই, খুবই গরীব। তারা গোলমালের আভাস পেয়েই নিরাপদ এলাকায় পালিয়ে বেঁচেছে। কিংবা বাড়ির দরজায় Soul Brother লিখে বেসমেণ্টে আত্ম-গোপন করেছে। ওদিকে আগুন আবার বর্ণান্ধ। কালোদের লাগানো আগুন সাদা মার্চেণ্টের সদাগরী ইমারত পুড়িয়েই ক্ষান্ত হয়নি। তার লাগায়ো কালো বস্তিকেও ছারখার করেছে। এসব অবিশ্যি মোটেই নতুন কথা নয়। এর আগেও যেখানে, যতবার গোলমাল বেধেছে, হাঙ্গামা হয়েছে, ততবারই পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীর মেজরিটি থেকেছে নিগ্রোদের। কারমাইকেল ব্রাউন কোং এর কী জবাব দেবেন জানি না। মনে হয় তাঁরা বলবেন, এমন করে জীবন্মৃত হয়ে টিঁকে থাকার চেয়ে, পুড়ে কিংবা গুলি খেয়ে মরাই শ্রেয়; জঘন্য নরকে বাস করার চেয়ে অনিকেত হয়ে আকাশের নিচে মহোৎসব করা অনেক মানবীয়। বিপ্লবের মধ্যে গা বাঁচানোর প্রশ্রয় নেই, হিসেবী কৃপণতা নেই, আছে বরং ধ্বংসকামিতা। চরমপন্থী নেতারা তাই চান মনে হয়। দগ্ধে মরার দরকার নেই। একেবারে ঝাঁপ দিয়ে মর। আর মরার আগে কিছু শত্রুর মেরে মর।' —এই নীতি।

এপ্রিলে ওয়াশিংটন-হাঙ্গামার রেকর্ড দেখে কিন্তু মনে হয়, চরমপন্থী নেতৃত্বেরও ঘোর পরাজয় ঘটেছে। তাই এ কথাও বলতে পারি যে, র‍্যাপ-স্টোকলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ক্ষতির খতিয়ান পুরোপুরি এখনো তৈরি হয়নি। একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পের পরেও যেমন মাঝে মাঝে ছোট-খাট ভূকম্পন হতে থাকে, তেমনি খুচরো উপদ্রব এখানে ওখানে হয়েছে। তা বলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হতে পারেনি। এবার ওয়াশিংটনে পুলিসের ভূমিকা প্রশংসনীয় ছিল। দলে দলে ছেলে-বুড়ো দোকানপাট লুঠ করেছে, পুলিস অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছে। লুঠ করে নির্বিঘ্নে চলে যাবার সুযোগ দিয়েছে। যারা আগুন লাগাতে এসেছে, তাদের বাধা দিয়েছে, তাড়া করেছে, পারতপক্ষে গুলি চালায়নি। গুলি চালানোর চেয়ে আগুন নেভানোর দিকেই খেয়াল করেছে বেশি। বোধ হয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশই ছিল এইরকম। হিংসাপন্থীদের একতরফা ক্রিয়াকলাপ এবং তার অসারতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোই কর্তাদের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁরা পুরোপুরি সফল হয়েছেন। সপার্ষদ স্টোকলির গরম হুমকির পর দিনই ওয়াশিংটনে বড় রকম আগুন জ্বলে উঠেছে। কিন্তু সেই অগ্নিকাণ্ডের তথ্যচিত্র যত ভয়াবহ তার দ্বিগুণ কলংকজনক; যত-না বেদনাদায়ক তার চতুর্গুণ প্রাহসনিক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কতকগুলো অপ্রাপ্তবয়স্ক ছোকরা স্পোর্ট হিসেবে দোকানে আগুন লাগিয়েছে, আর তার আগে এনতার লুঠ করেছে। লুঠের সময়ে সব বয়েসের লোকই এসে যোগ দিয়েছে। গোটা পরিবারসুদ্ধ এসে লুণ্ঠন-যজ্ঞে শামিল হয়েছে। তারা কলস্বরে হাসতে হাসতে রেডিও ক্যামেরা, টি ভি-স্টিরিও, সোফাকৌচ, পোশাক জুয়েলারী নিয়ে বাড়ির পথে চলেছে, টেলিভিশনে সেই দৃশ্য দুনিয়াসুদ্ধ লোক দেখেছে। দেখে-শুনে মর্মাহত কৃষ্ণ গায়ক স্যামি ডেভিস বললেন : 'কিং মারা যাবার পর তে-রাত্তির পেরোয়নি; এখনই যারা হাসতে

পারে, হাসতে হাসতে লোভের সামগ্রী লুঠে করতে পারে, তারাও হয়ত মানুষ; কিন্তু তারা কিংপন্থী নয়। জাগ্রত নিগ্রো সমাজের তারা কেউ নয়।' শিক্ষিত, যত্নশীল, রুচিবান, সংযতবুদ্ধি, কৃষ্ণাঙ্গদের এই ক্ষোভের মর্ম আমরা বুঝি। কিন্তু প্রশ্ন হল, তাঁরাই কি নিগ্রো সমাজের প্রতিনিধি? 'একথা কি হলফ করে বলা যায় যে, আজকের নিগ্রো সংখ্যাসমাজ কায়মনে গরীব উঁচু নিঃস্ব মূর্খ বস্তিবাসী নিগ্রোর প্রতিবেশি? তার 'আত্মার সহোদর?' স্টোকলি ক্যাসিয়াসরা যাদের টমচাচা বলেন, তাঁরা কিংবা এলিজা মহম্মদের মার্কামারা কৃষ্ণবর্ণের বাসিন্দারা, কিংবা নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্বের অধিকারী প্রতিভাগর্বী নিগ্রোরা দলবদ্ধ লড়িয়েরা আসনওয়ালাদের আপনার লোক কারা?' ওদের যারা বিপ্লবের নামে ক্ষেপায় তারা হয় নিরাক্রান্ত নয় ফন্দিবাজ। কিন্তু ওদের যাঁরা নিন্দে করেন তাঁরা কারা? তাঁরা ক'জন শেয়ার মালিকের আড্ডা চাতালে বসে ওদের ভালমন্দ ভাগ করে নিয়েছেন? ...সেদিন টি ভি-তে দেখলুম স্টোকলি কারমাইকেল ওয়াশিংটনে এক প্রাসাদতুল্য বাড়ি কিনেছেন অর্থাৎ তাঁর মিলিওনেয়ার

গায়িকা পল্লীর টাকায়। প্রবল বর্ষণে রেজারেকশান সিটির তাঁবু ভেসে যাবার পর নিরাশ্রয় দুস্থ দুয়োগত নিগ্রোরা কারমাইকেলের গৃহপ্রবেশের খবরে কতটা উল্লসিত হয়েছিল সে-খবর এখনো পাইনি। পেলে জানাব। পরলোকগত রেভারেন্ড কিংয়ের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্যে সংগায়ক বেলাফন্টে মোটা টাকার বীমা করে দিয়েছেন; প্রশংসনীয় কাজ। তবু আমার মনে হয় অন্য কোনো বুভুক্ষু নিগ্রো সন্তানের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে তিনি যদি এই ব্যবস্থাটা করতেন তবে কিংয়ের আত্মা অধিকতর তৃপ্তিলাভ করতো।

বহুল বিতর্কিত রেজারেকশান সিটি অর্থাৎ পুনর্জীবন পুরীর জীবনে পর পর কটা দুর্বিপাক হানা দিয়ে গেল। উপর্যুপরি এমন ধারাবর্ষণ হল ক'দিন ওয়াশিংটনে যা সচরাচর দেখা যায় না। একহাঁটু কাদার মধ্যে ডুবে গেল তাঁবুগুলো। তার চেয়েও বড় দুর্বিপাকঃ রেভারেন্ড অ্যাবার্নাথির অহিংস নেতৃত্বে পুনর্জীবন পুরবাসীর সাময়িক অশ্রদ্ধা এবং দলাদলির দুর্গন্ধ। কৃষি দপ্তরের দরজায় দাঁড়িয়ে এদের কেউ কেউ রক্তপাতের হুমকি দেখিয়েছে, বিচার দপ্তরের জানলার কাচ গুঁড়িয়েছে। অ্যাবার্নাথি ব্যথিত কণ্ঠে আবার অহিংসার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কেনেডির মৃত্যু এদের কাছে আর-এক বিপর্যয়ের বার্তা বহন করে এনেছে। বহু ভুল বোঝাবুঝি বহু কটূক্তি ব্যঙ্গবিদ্রূপ অনেক সময় এদের ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। বিদেশী নাগরিকের কৌতূহল এদের কাছে আমল পায়নি, স্বদেশী সগোত্রীয় সাংবাদিকের ক্যামেরা কেড়ে নিয়ে তাকে লাঞ্ছিত করেছে। কেউ বলেছে, ওখানে ঝাঁকে ঝাঁকে ক্যাডিলাক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। অনেকে নাকি দরিদ্র পুরবাসীদের হাতে হাতে ট্রানসিসটর, তাঁবুতে তাঁবুতে টেলিভিশন দেখতে পেয়েছেন। সব দেখে এবং শুনে আমেরিকার ধনপ্লাবিত সমাজের ওপর ধিক্কার এসে গেছে। এদের চিন্তায় কথায় আচরণে পদে পদে স্ববিরোধিতা। এত হাঁকডাক করে দুনিয়াসুদ্ধ লোককে এরা বোঝাচ্ছে—এদের মহাজাতিত্বের মহিমা। এবং সেটা আগাগোড়াই ফাঁকি তা বলতেও বিবেকে বাধে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাসিন্দারা এখানে বসবাস করে, পরিপূর্ণ নাগরিক মর্যাদা ভোগও করে। গত বিশ বছর ধরে বিলেতে এবং আমেরিকায় বাস করে আসছেন এমন একজন ভুক্তভোগী উপমহাদেশীয় ভদ্রলোক দুই দেশের তুলনা করতে গিয়ে বললেন : "ভেদবুদ্ধির দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে এদেশ ইংলণ্ডের তুলনায় স্বর্গ। ওখানে সাতপুরুষ বাস করলেও ওরা চামড়ার রঙ বিচার করে দুই-দুই ভাব করবে। আবার এদের স্থূলত্ব এক-এক সময় অসহ্য হয়ে পড়ে। তখন মনে হয়, অপমান স'য়েও বিলেতে ফিরে যাই। এদের কতকগুলো অদ্ভুত রীতি-রেওয়াজ কৌতুকের খোরাক দেয়। মোটর ড্রাইভিং লাইসেন্সে বাদামী হিন্দু, হলুদ চীনে সকলকারই বর্ণ 'শ্বেতাঙ্গ' বলে হিসেবে ধরা হয়। 'কৃষ্ণকায়' বা 'রঞ্জিত' বলতে একমাত্র নিগ্রোদেরই বোঝায়; অথচ অনেক নিগ্রোর গায়ের রঙ স্প্যানিশভাষী শ্বেতাঙ্গর চেয়ে অনেকাংশে ফরসা। এমনিতে এত বড় মিলনতীর্থ মানবমুক্তির বারাণসী গণতন্ত্রের জিম্মৎ স্বাধীনতার মক্কা। কিন্তু দেশের প্রেসিডেন্ট বেজাত নয়, বিধর্মী নয় ক্যাথলিক শাখাবলম্বী বলেই তাই নিয়ে কত হইচই, কথা বাগাড়ম্বর। প্রেসিডেন্টের মেয়ে ক্যাথলিককে বিয়ে করছে বলে হোয়াইট হাউসে তার বিয়ে হতে পারে না। ডারুইনের থিওরি পড়াবার অপরাধে, ক'দিন আগেও বিজ্ঞানী অধ্যাপকের চাকরি যেতো। এরা ঘটা করে বিদেশে অন্নসত্র খুলতে যায়, আবার তাই নিয়ে যে-পরিমাণ ঢাকের বাদ্যি বাজায়, তাতে গ্রহীতাদের সে-অন্ন হজমে ব্যাঘাত ঘটায়। এদিকে হাজার হাজার বুভুক্ষু এসে রাজধানীতে ক্ষুধা মিছিল বার করে। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অপচেষ্টাই বলব—এইসব ক্ষুধিত মানুষদের জাল বা মেকী বলে প্রমাণ করা যায়নি। এদের অস্তিত্বকে ধামাচাপা দিতে গিয়ে প্রভুরা আরও বেশি করে একসপোজড হয়ে যাচ্ছেন।

পুনর্জীবন পুরীর শেষ খবর—তার ফাঁসির পরওয়ানা জারী হয়ে গেছে। ক্যাপিটল হিলে বিক্ষোভ জনতাকে পরিচালনা করার সময় অ্যাবানাথি এবং অন্যান্যেরা যেদিন গ্রেপ্তার হলেন, তার পরদিন সন্ধ্যায় দিকে আবার গিয়েছিলুম রেজারেকশান সিটি দেখতে। নিহত সৈনিকের মতন অস্থায়ী তাঁবুগুলোর শবদেহ সারা ময়দান জুড়ে পড়ে রয়েছে। কাল পরশুর মধ্যে সব সাফ হয়ে যাবে। কিন্তু তারপর? সিটিকে ধ্বংস করলেই কি রেজারেকশানকে ঠেকানো যাবে?

*

রাজধানীর অঙ্গের পোড়া ঘা এখনো পুরোপুরি সারেনি। তবে আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে আসছে। মানুষের মনের ক্ষত ইতিমধ্যেই নিরাময় হয়ে গেছে। রঙ্গরস, ক্রীড়াকৌতুক, রাজনীতি, চাপা উত্তেজনা... সব আবার যথাযথ ফিরে এসেছে। এই দেশেরই দুটো মানুষ ছিল, একজন কালো অন্যজন সাদা। মহৎ স্বপ্নের এক দুরন্ত ব্যাধিতে ভুগে তারা দু'জনেই সরে গেল। তাদের কচি বাচ্চাগুলো কী হারালো ভাল করে কেউ বুঝল না, কেউ বুঝে গুমরে রইল। বুড়ো মা-বাপ ভাঙা পাঁজরে শোকের দিন গুনতে লাগল। বন্ধু আর অনুগামীরা শেষকৃত্যের পর আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এখন আবার নির্বাচনী পালে হাওয়া লেগেছে। কিন্তু সে হাওয়ার জোর নাই। বক্তারা আবার সব মুখ খুলেছেন কিন্তু বক্তৃতায় ধার নেই। পত্রপত্রিকায় রাজনৈতিক মনঃসমীক্ষণ আবার শুরু হয়েছে তবে সেটা একটা পানসে রুটিন ওয়ার্ক।

খুব পা টিপে টিপে সেদিন রাত্রিরে আমি লিংকন মেমোরিয়ালের পাশ ঘেঁষে পথ হাঁটছিলুম। তখনও চাঁদ ওঠেনি রাস্তায় আলো আঁধারি। আমার ভয় করছিল। হোঁচট খাবার ভয়। আমি মাথা হেঁট করে কোমর বেঁকিয়ে হাঁটছিলুম। এ দেশে এখন সোজা হয়ে পথ চলা বিপজ্জনক। অবিশ্যি, আর বেশী দিন আমায় থাকতে হবে না। ঘরে ফেরার ডাক এসেছে।

এখন যেখান দিয়ে আমি পা ফেলছি, ক'দিন আগেও সেখানে পুনর্জীবনপুরীর শিবির ছিল। বেশ জোরে হাওয়া দিচ্ছে, পাইন-পপলারের দল যেন শাসিয়ে উঠছে। লিংকনের মর্মর মূর্তিকে সাক্ষী রেখে ওরা শপথের নিশ্বেস ফেলছেঃ এসব বেশিদিন সইব না।

জহুরী সদাগর

বর্তমান খাদ্য-পরিস্থিতি

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে খাদ্য-পরিস্থিতি নিয়ে নতুনভাবে আলোচনা হয়েছে। বন্যাক্রান্ত দেশ আবার খাদ্যসংকটের সম্মুখীন। গত দু' মাসে আমরা দেখেছি বন্যার রুদ্র রূপ, যাতে হারিয়ে গেছে সবুজ ধানের শ্যামলিমা। খাদ্যে স্বয়ম্ভরতার পথে যখন দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, তখন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেল। ১৯৬৭-৬৮ সালে ভারতের জাতীয় আয় বেড়েছে শতকরা ৯·৩ ভাগ; অথচ এর আগেকার বছরে জাতীয় আয় বেড়েছিল মাত্র শতকরা ১·৭ ভাগ। জাতীয় আয় দ্রুত বৃদ্ধির কারণ ছিল গত আর্থিক বছরে আশাতীতভাবে কৃষির উৎপাদন-বৃদ্ধি। কৃষির উৎপাদন বেড়ে যাবার স্বাভাবিক প্রতি-ফলন হয় খাদ্য-পরিস্থিতির উন্নতির মধ্যে। সম্প্রতি বন্যার জল কমতে শুরু করেছে; অবশ্য দেড় ফুট থেকে দুই ফুট জল যদি জমিতে থাকে তবে বোরো ধান উৎপাদনের পক্ষে তা খুবেই উপযোগী হবে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, গত কয়েক মাসে খরিফ শস্যের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। কৃষি-মূল্য কমিশন খরিফ শস্য সংগ্রহের লক্ষ্য বর্তমান বছরে ৫·৭ মিলিয়ন টন ধরেছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে এ লক্ষ্য অবাস্তব মনে করা হয়েছে।

বিপদ যে শুধু খাদ্য-পরিস্থিতির ক্ষেত্রেই হয়েছে তা নয়, বন্যাকবলিত অঞ্চলের ত্রাণ-কার্যের জন্য প্রয়োজন রয়েছে অনেক। অথচ সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা এমন এক অসহনীয় স্তরে এসেছে যখন ইচ্ছানুযায়ী ত্রাণকার্যে এগিয়ে আসার সামর্থ্য নেই। অনেক খাদ্যশস্য নষ্ট হয়েছে বন্যার করাল গ্রাসে। যদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় না দেখা দিত, তবুও বর্তমান বছরে আমাদের ৭·৫ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য আমদানি করার কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল। এই ৭·৫ মিলিয়ন টনের মধ্যে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেই ৬·৫ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য পাওয়া যাবে ধরা হয়েছিল। কিন্তু পি এল ৪৮০ অনুযায়ী প্রতিশ্রুত অর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও আমাদের দেয়নি। শুধু আমাদের দেশেই নয়, সব অনগ্রসর দেশেই মার্কিনী সাহায্যের পরিমাণে ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এ বছর এখন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পি এল ৪৮০ অনুযায়ী মাত্র তিন মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য পাওয়া গেছে। খাদ্য সংগ্রহের অবস্থাও শোচনীয়। কৃষি-মূল্য কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আগামী মরসুমে ৪১ লক্ষ টন চাল সংগ্রহের কথা ছিল; কিন্তু ৩৩ লক্ষ টনের বেশী চাল সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না।

অর্থনৈতিক ভারত

১৯৬৮-৬৯ সালের জন্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন-লক্ষ্য ১০০ মিলিয়ন টন ধরা হয়েছে; কিন্তু বর্তমান অবস্থার পরি-প্রেক্ষিতে আমরা লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। তবে মেদিনীপুর অঞ্চল বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-পরিস্থিতি খুব খারাপ নয়। তা-ই আজ কথা উঠেছে, অদূর ভবিষ্যতে হয়ত পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের বিনিয়ন্ত্রণ হতে পারে। আমাদের মনে হয়, এই মুহূর্তেই খাদ্যশস্যের বিনিয়ন্ত্রণ করার কথা চিন্তা করা উচিত হবে না; বরং খাদ্য-পরিস্থিতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য-চলাচলের উপর কড়াকড়ি হ্রাস করা যেতে পারে এবং নিয়ন্ত্রণের কাঠামো বজায় রেখেও খোলা বাজারে খাদ্যশস্য কেনাবেচার উপর কড়াকড়ি হ্রাস করা যেতে পারে। খাদ্যশস্য বিনিয়ন্ত্রণ করা হলে ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া এবং রেশনিং বিভাগের হাজার হাজার সরকারী কর্মচারীকে উদ্বৃত্ত বলে ঘোষণা করতে হবে এবং তার ফলস্বরূপ কর্মচারী ছাঁটাই করার সম্ভাবনা খুবই বেশী। সরকারের পক্ষে এরকম ঝুঁকি গ্রহণ করা উচিত হবে না; বিশেষ করে যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিপুলসংখ্যক সরকারী কর্ম-চারীদের বিকল্প কাজের ব্যবস্থা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সরকারের খাদ্যনীতি এমন-ভাবে পরিবর্তিত করা উচিত হবে না।

খাদ্য-পরিস্থিতির দীর্ঘকালীন উন্নতির জন্য এবং খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য বন্যা-নিরোধ, ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্পের উন্নয়ন, একই জমিতে একাধিকবার ফসল ফলানোর পদ্ধতি প্রবর্তন, ভাল সার প্রয়োগ এবং ভাল বীজ বপনের ব্যবস্থা করা দরকার। সম্প্রতি অধ্যাপক ডি আর গ্যাডগিল চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনাকে ঢেলে সাজাবার যে প্রস্তাব করেছেন তাতে কৃষিক্ষেত্রের সুদূরপ্রসারী উন্নয়নের জন্য কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আছে। আমরা আশা করব, খাদ্য-পরিস্থিতির দীর্ঘকালীন উন্নতির জন্য এ প্রস্তাবগুলিও যথাযথভাবে বিবেচিত হবে।

চতুর্থ যোজনার জন্য অর্থের সন্ধানে

চতুর্থ যোজনার অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করতে এক দিকে অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই গেছেন ওয়াশিংটনে, অপর দিকে পরিকল্পনা কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক গ্যাডগিল গেছেন মস্কোয়। মোরারজী দেশাই-এর উদ্দেশ্য, আন্ত-র্জাতিক অর্থভাণ্ডার, বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও সাহায্য পাওয়া যায় কিনা তার চেষ্টা করা। তা ছাড়া পি এল ৪৮০ অনুযায়ী মার্কিনী দাক্ষিণ্য প্রকাশে যে ভাঁটা পড়েছে তার কোনো সুরাহা করা যায় কিনা তার চেষ্টা করাও শ্রীদেশাই-এর আমেরিকা যাত্রার অপর একটি উদ্দেশ্য। অধ্যাপক গ্যাডগিল মস্কোয় গেছেন চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় রুশ কারিগরি সাহায্যের ব্যবস্থা করার জন্য।

সতেরো বছর ধরে অর্থনৈতিক পরি-কল্পনার যে অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে তার থেকে সাধারণ মানুষ এ ধারণা এখনও করতে পারছে না যে, বিদেশী সাহায্য ছাড়াই আমাদের দেশ উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে। হয়তো আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়নি, কিন্তু এজন্য কি মার্কিনী অথবা সোভিয়েট সাহায্য ছাড়া আমাদের পক্ষে চতুর্থ পাঁচসালা যোজনা রচনা করাও অসম্ভব? বর্তমান আর্থিক বছর আরম্ভ হবার সময় জানা গিয়েছিল যে, সেপ্টেম্বর মাসেই চতুর্থ যোজনার খসড়া প্রকাশিত হবে। এখন শোনা যাচ্ছে,

জানুয়ারী মাসে চতুর্থ যোজনার খসড়া বেরোবে এবং নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী, অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকেই তার কাজ শুরু হবে। পরিকল্পনার রূপরেখা চূড়ান্তভাবে স্থির করা এখনও সম্ভব হয়নি; হয়তো অর্থের সন্ধানে যাঁরা বাইরে গেছেন, তাঁরা ফিরে এলেই এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হবে। নিজের সীমায়িত উপায়ের মধ্যেই পরিকল্পনাকে সাজাবার প্রয়োজনীয়তা আমরা বুঝেও বুঝতে পারছি না।

অর্থের সন্ধানে যখন আমরা বিদেশে হাত পাতছি, তখন দেশের ভিতরেই কর-কাঠামোর সংস্কার করে আরও অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেদিকে আমরা উপযুক্ত দৃষ্টি প্রদান করছি না। ভুতলিংগম কমিশনের রিপোর্ট বেরিয়েছে ১৯৬৭ সালের মে মাসে। কিন্তু এখনও সরকার কর-কাঠামোর সংস্কার করে কিভাবে আরও অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায় সে সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করতে পারেন নি। প্রশাসনিক দুর্বলতার জন্য ব্যয়-কর তুলে দিতে হয়েছে, কিন্তু কালো টাকা জমানো বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে উদ্বৃত্ত লাভ তো দূরের কথা, অনেক প্রতিষ্ঠানে লোকসান আরম্ভ হয়েছে। ভ্রান্ত শ্রমনীতির জন্য অনেক ক্ষেত্রে শুরু হয়েছে শিল্প-বিরোধের, যার স্বাভাবিক পরিণতি দেখা গেছে শিল্প-উৎপাদন হ্রাসের মধ্যে। আমাদের মনে হয়, বিদেশের উপর আমাদের যতটা নির্ভর করা উচিত বলে আমরা ভাবছি, তার চেয়ে একটু কম নির্ভর করে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়-বৃদ্ধি এবং কালো টাকার ক্রমবর্ধমান গতি প্রতিরোধ করার প্রচেষ্টা আরও জোরদার করা উচিত।

সুব্রত গুপ্ত

কুবেরের বিষয়আশয়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

তিন

নয়ানদের বাঁধানো বারান্দার কিনারে বলরাম বসে, নয়ান চেয়ারে। কুবের বারান্দায় উঠতে উঠতেই বলল, 'ডাক্তারটি কেবল আড্ডা মারে দেখলাম—তাও আবার আধখানা বয়সের এক ছোকরার সঙ্গে—ওই তোমাদের বিকাশ বোস ছেলেটা—'

'কিছু না, কিছু না—রুগীদের কাছে পয়সাও নেয় শুনেছি। জুটেছে আর ওই এক ফোক্কড়।'

'আমাকে যেতে বলে খানিক বসিয়ে রাখল শুধু—'

'পাওয়ার দেখালে আর কি! যাওয়াই ঠিক হয়নি আপনার।'

কুবের আজ কিছুকাল কদমপুর যাতায়াত করে এখানকার লোকজন, জায়গা-জমি, ধানের ফলন, পঞ্চায়েত ইলেকশন—সব কিছুর খানিক খানিক জেনেছে। অথচ একবারে ঘরবাড়ি করে বসতে না পারায় সব কিছুর সঙ্গে পুরোপুরি জড়াতেও পারছে না নিজেকে। সেই সালকে থেকে এত দূর আসে দু'-তিন ঘণ্টার জন্যে। আবার ছুটে গিয়ে ট্রেন ধরতে হয় তাকে—আবার কলকাতা, ট্রাম-বাস-অফিস—কত কী।

'বলরামদা আর ভোগা দিও না ভদ্রলোককে। তোমাদের এখানে আসবেন, তোমার খুড়োর দরেই জমিটা ছেড়ে দাও।'

বলরাম খানিক হেসে বলল, 'আমি কি করব বলুন, লোকেই ত দর বাড়িয়ে দেয়, আমি ত বাড়াই নি—'

কথাটা সত্যি। যার জমি সে ত হপ্তায় হপ্তায় দর চড়াতে পারে না। লোকজন এসেই চড়ায়। ফি ছুটির দিন কত লোক এসে, খালপাড় ধরে জায়গা দেখতে দেখতে যায়। দরদাম শুনলে কার না মনটা দপ দপ করে।

'তবু ভাই কিছুটা লাভ না-হয় ছেড়ে দাও। দু'-চারশো টাকা, আমি এখানে এলে অন্য দিক থেকে পুষিয়ে দেব তোমায়।'

'বাজার যা বলে তাই দেবেন—'

এই এক কল। খুবই ন্যায্য কথা। কিন্তু বাজার যে রোজ ব্যাঙ লাফাচ্ছে। কুবেরের ভারি অস্বস্তি লাগল। রোজই আসে প্রায়—এসেই শুধু জমি কেনার দরদস্তুর, দাগ-নম্বর কিংবা না-দাবি লেখানো—এসব নিয়েই কথা চলে। নয়ানের নিজেরও ত জীবন আছে।

আজ আর কথা বাড়ালো না কুবের। বলরামও উঠি উঠি করছিল। এখন ভর সকালবেলা—জোর বাজার বসেছে।

নয়ান ভেতর থেকে চা-বিস্কুট নিয়ে এল। বলরাম টাঙ টাঙ করতে করতে রাস্তায় গিয়ে উঠল। কুবেরের মাথায় এখন খাল-পাড়ের মাঠখানা দুলছে। অন্য কেউ কেনার আগে তাকে সবটা কিনে ফেলতেই হবে। জায়গার নকশা পাওয়া এক ঝকমারি। আপত্তি ওঠায় মৌজা কে মৌজার নকশাই বাতিল। ডি এল আর অফিসে একতলায় সিঁড়ির নীচে একজন মুহুরি সেই বাতিল নকশা বেশী টাকায় ঝাড়ে। নকশা পেলেও সাবেক আর হাল দাগ মেলানো বাকি থাকে। সব শেষে চাই খাজনার হাল দাখিলে। থতেন, দাখিলে—কোন জায়গাতেই কুবের সব শরিকের নাম পায়নি। সর্বত্র লেখা বলরাম গং, ভুবন গং, সুযোধন গং। অর্থাৎ দিগর। সব জমিই শরিকানি। অতএব দিগর থাকবেই। কিন্তু সেই দিগরের মধ্যে কে কে লুকিয়ে আছে বের করে কার সাধ্য। যে জানে, পয়সা না খসালে সেও মুখ খুলবে না।

ক' মাস আগে নয়ানই তাকে ডাঙ্গায় তুলে এনেছিল। না হলে আজও বোধ হয় কুবের মেদনমল্ল মৌজায় দাগ নম্বরে নম্বরে জল খেয়ে বেড়াত। এত দিনে হাবুডুবু খেয়ে তার ফুলে ঢোল হয়ে যাওয়ার কথা। সারাটা দেশ এমন দাগ নম্বর দিয়ে খুঁটে খুঁটে তোলা যায় ভাবলেই পায়ের নীচে মাটি খুলে যাচ্ছে মনে হয়।

'আপনারা ক'ঘর বসে গেলে দেখবেন রাস্তা আপনাআপনি ভাল হয়ে গেছে। আলোও এসে যাবে বছর খানেকের ভেতর।'

'তা আসবে। কিন্তু, বলরাম আর ক'দিন ভোগাবে বলতে পার?'

'হয়ে এল। আপনার ফের কেটে যাওয়ার মুখে।'

'কাটলেই ভাল—'

'অতটা মুষড়ে পড়বেন না। জায়গাটা কেমন দেখতে হবে ত। বাবা আপনাকে গোড়াতেই ডিসকারেজ করেছিলেন—এদিকে না আসতেই বলেছিলেন।'

তা ঠিক। প্রথম দিনই নয়ানের বাবা পই পই করে বারণ করেছিলেন—'এদিকে আসবেন না, লোকজন সব মামলাবাজ, তাড়ি খেয়ে গজল্লা বাধাবে রাত-দুপুরে—শেষে তিষ্ঠোতে পারবেন না।'

তা সে অসুবিধে কোথায় নেই। কান্তবাবু এখন কুবেরকে তুমি বলেন। একসময় হাজার বিঘের লোনা ভেড়ি জমা নেওয়া ছিল। রাখতে পারেন নি। বাঁধ কেটে জল বেরিয়ে গিয়ে সেখানে এখন ধান হয়। ফসল তোলার পর কলাই মটর ফেলে দেন সেখানে। মাস গেলে মোটা টাকার সরকারী মাইনে। পুরু চশমা লাগিয়ে মাঝে মাঝে কুবেরের কাগজপত্রও দেখে দেন। সে সময় তাঁর কাছে নানান দরের চাষী আসে। কেউ চায় পুকুর জমা, কেউ সুপুরি-নারকেল গাছ, কেউ আবার ধান তোলার পর সেখানকার মাটি খুবলে ইঁদুরে গর্ত থেকে চোরাই ধান তুলে নেওয়ার আর্জি নিয়ে আসে। কুবের এক দিন কথা বলতে বলতে দেখেছে কান্তবাবুর শার্টের কলারের ভেতর 'মৃণাল' ছাপ রয়েছে। এসব শার্ট ধর্মতলায় তিন টাকা সাড়ে তিন টাকায় ফুটপাতে গুচ্ছের বিকোচ্ছে।

'আজ উঠি নয়ান। ন'টা আটত্রিশের ট্রেনটা ধরতে পারলে সকাল সকাল পৌঁছনো যাবে।'

'তাড়া কিসের। খাওয়া-দাওয়া করে দুপুরের ট্রেনে যাবেন। নয়ত বাস তো আছেই।'

'আছে ঠিকই।' কিন্তু দু' দিকের ধান-ক্ষেত ঘুরে বাস যখন এগোয় তখন নির্জন পিচের রাস্তায় টায়ার থেকে একটানা বিজ্ বিজ্, বিজ্ বিজ্ শব্দ হতে থাকে। তার হাত থেকে নিস্তার নেই। চলতেই থাকবে। কুবের একদম সহ্য করতে পারে না। এর চেয়ে ট্রেন ভাল। আধঘণ্টা চল্লিশ মিনিটে শেয়ালদা।

'নাঃ। উঠি আজ। কাল বোধ হয় কয়লাঘাটে ফোন করতে পারি তোমায়। অন্য দাগগুলোর খতেন পেয়ে গেলে পরিষ্কার বুঝে নেব তোমার কাছ থেকে।'

'আমি কি পারব! সবাইকে চিনিও না—', নয়ান হেসে ফেলেছে। হিন্দু আইনের পর ভাইয়ের সঙ্গে বোনেরও সমান অংশ। আট বছরের মেয়ে বিয়ে হয়ে ভিন্‌গাঁয়ে চলে গেছে সেই কবে। বত্রিশ বছরের কালে কোলে বাচ্চা নিয়ে এসে টিপ-ছাপ দিতে এলে কে চিনবে তাকে—কে সনাক্ত করবে—কে বলবে এই সেই আট বছরের বৃহস্পতিদাসী জওজে ভদ্রেশ্বর নস্কর, সাকিন নাটাগাছি। অন্ধিসন্ধির কোথায় কোন্‌ বড় ফাঁক থেকে গেল, কুবের তা আজকাল বোঝে।

নয়ানের পরের ভাই ভোম্বল বহীরডাঙা রেজিস্ট্রি অফিসে বলরামের খুড়োর অংশ কোবালার দিন কুবেরের সঙ্গে সনাক্ত করতে গিয়েছিল। কুবেরকে ন' ছটাক চৌদ্দ তিল জমি তিন দিয়ে ভাগ করে মুখে মুখে দুই দিয়ে গুণ করতে দেখে ভোম্বল বলেছিল, 'আপনি পাগল হয়ে যাবেন—এত হিসেব, দর—এসব দিয়ে হবে কী! কলকাতায় এর চেয়ে ভালো থাকেন না?'

আচমকা এ কথায় কোন উত্তর দিতে পারেনি কুবের। সত্যিই কি একটুখানি ভাল থাকবার জায়গা বানাতে গিয়ে সে আগাগোড়া বিষয়ে ডুবে যাচ্ছে।

'না-হয় তোমার বাবাকে দেখাব। শনিবার আসছেন ত তিনি—'

'বসুন না আপনি। এখনও পনেরো মিনিট দেরি ট্রেনের। সরু পিয়াসল থেকে ন'টার গাড়ি আসবে।

ফিরে বসতে গিয়ে নিজের হাতখানাই আগে চোখে পড়ল কুবেরের। আঙুলের খানিকটা খানিকটা কালো হয়ে আছে। পায়ের গোড়ালিও ক্যালাটি মেরে যাচ্ছে। দেখা যায় আর বসে থাকতে পারল না। সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'বসুন ত আপনি। জল পেঁপে হয়েছে। ভোম্বলকে কাটছে বীজ—'

অথচ এরা যদি কোন দিন শোনে কুবের সাধুখাঁর হাতের কালো কালো দাগগুলো খারাপ অসুখের, তা হলে কী আর বাড়ির কাপে চা দেবে, প্লেটে পেঁপে। কুবের মনে মনে স্থির করল, আমার কোন খারাপ অসুখ হয়নি। হওয়ার কথা নয়। থাকলে ত অনেক আগেই ধরা পড়ত।

এক্ষুণি যদি জানা যেত, তার ঠিক কী হয়েছে আঙুলে। ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি, ভেজাল তেলের আফটার এফেক্ট কিংবা নিদেন পক্ষে চামড়া খারাপ হয়েছে।—এমন একটা রায় এখনই জানতে পারলে কুবের বেঁচে যেত।

অ্যালসেসিয়ান ঘুমোচ্ছে। দূরে পীচ রাস্তায় জোকার বাস এসে দাঁড়াল। পেছনের সিঁড়ি বেয়ে কণ্ডাক্টর কুমড়ো নামাচ্ছে। সামনের কাঁচা রাস্তা দিয়ে পুরো একটা সাপুড়ে পরিবার মৈত্রী আবাসের দিকে চলে গেল। কিছু দিন পরেই খেনো কেউটে ধরার সময়। এর পরে সেই যে গর্তে ঢুকবে—ফাল্গুন-চোতের ফুরফুরে হাওয়া দেওয়ার আগে আর বাইরেই আসবে না। বসন্তকালে হাওয়া খেয়ে খেয়ে চন্দ্রবোড়া ত ফুলে ফুলে ওঠে—তখন চলাফেরার গতিকও মন্দ। নয়ানের মুখে শোনা, বাড়ির ঝি যশোদা নাকি গত অঘ্রাণে গরুর খড় কুঁচোতে গিয়ে একটা আস্ত গোখরো বঁটিতে কুঁচিয়ে ফেলেছিল। খড় কোটার বঁটি কালচে রক্তে সড়সড়ে হয়ে গিয়েছিল। যশোদা নাকি তাতে ভ্রূক্ষেপও করেনি, দিব্যি ঘাটলায় গিয়ে সাবানে হাত ধুয়ে গোয়ালে ধোঁয়া দিয়ে এসেছে।

আজই বিকেল বিকেল শিবপুরের টি ডি মুখার্জীকে আঙুলগুলো একবার দেখাতে হবে। পেঁপে খেয়ে জল খাওয়া গেল না। সিগারেট ধরিয়ে কুবের বেরিয়ে পড়ল। নয়ান বারান্দা থেকেই বলল, 'এদিককার খবর আপনাকে ফোনে অফিসে জানাব।'

'দশটার পর ফোন করো।'

ট্রেনে জানলার ধারে বসল কুবের। আজও একটা সি এল গেল। এ বছর সবসুদ্ধ ন'দিন ক্যাজুয়াল লিভ নিতে হয়েছে তার। আজকাল বড়ু স্পষ্টই বলে, 'তোমার কদমপুরের পাট কবে চুকবে বলতে পার?'

কুবের তাড়াতাড়িই মেটাতে চায়। কিন্তু মিটছে না। তার ওপর সাত আটজনের জমি কিনিয়ে ভাগ করে দেওয়ার ভার রয়েছে। কেনাই শেষ হল না এতদিনে! সরু পিয়াসলে আজ স্পেশাল চেক্‌। কালো কোট, লাল টাই, চেকারদের হাতে কাইন

করার বই। পকেট থেকে মান্ধাতা বের করে সইয়ের জায়গায় সই করল কুবের। বয়েস লিখল বত্রিশ। তার এখনও বত্রিশ হয়নি ঠিক—মাসে চারেক বাকি। ভাঙা হিসেব লিখতে কার ভাল লাগে।

গোড়ায় কুবের একাই এসেছিল এদিকে। তখন তার সঙ্গে থাকত বুলু। দুজনের কী সখ্য। একবার নস্করদের বড় ছেলে জমি দেখাবে বলে দুজনকে মে মাসের ভরদুপুরে খড়খড়ে শালি জমির ওপর দিয়ে আধ ক্রোশ হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে তার সঙ্গে এখন সাত আটজন একই জায়গায় একলপ্তে জমি কিনেছে। দর শুনে সবার চোখ একেবারে চক্ চক্ করে। লোভ। কিন্তু পষ্টাপষ্টি ভাবতে গিয়ে কুবেরের কষ্ট হয়। লোভ কেন? সবাই বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে বাস করতে চায়।

রুদ্রনগরে এক মুড়িওয়ালা ওঠে রোজ। লংকা নেই, আদা নেই, তেল নেই—তবু মুড়িওয়ালা। কয়েকটি টিনের কৌটো, কিছু নুন আর কালচে খানিকটা আমের আচার। তাই সে দশ পয়সা করে বেচে। লোকটাকে পেলে হত।

চলতি ট্রেনেই হাতল ধরে একটা লোক উঠে এল, 'কি রে সকালে যাওয়া হয়েছিল?' গৌরবে আহ্বান। কুবের বুঝল অভিমানের কথা, 'মিড্ ট্রেনে। আপনি কোত্থেকে?'

'কদমপুর থেকেই। আমি আবার কোথায় যাব?'

কুবের তাকিয়ে আছে দেখে বলল, 'ছিলাম পিছন দিকে—মাছের গন্ধে কে বসতে পারে। পাল্টে যেটায় উঠলাম, সেটায় এক বৈরিগি পয়সার জন্যে হরদম গাইছে—

পড়ুয়া আমার জগাই মাধাই
তাহে গৌর আমার হেডমাস্টার—'

মাঝখানে থামিয়ে দিল কুবের, 'আপনিও তো বৈরিগির আলখাল্লা ধরেছেন। আপনাকে দেখে কেউ যদি কামরা পালটায়?'

থতমত খেয়ে গেল ব্রজদা, তারপর ঝপাং করে বলে দিল, 'তুই যেমন কদমপুরে আমার বাড়ির রাস্তা মাড়াসনে—কেমন তো!'

'না না, আমি যাই না হাতে সময় থাকে না বলে। নয়ানদের বাড়ি কথাবার্তা বলে প্রায়ই দৌড়ে ট্রেন ধরতে হয়—'

'বুঝি রে বুঝি সব—', তারপর নিজেই মাথা দুলিয়ে হাসল, সঙ্গে গুণ গুণ করে গাইল—শেষে আসন করে বসে ঝোলা থেকে প্রুফ নিয়ে ডট্পেন বের করে ব্রজদা তাতে ডুবে গেল।

কুবের অনেক কিছু বলতে পারত। কোনোটাই জোরালো শোনাবে না বলে চুপ করে গেল। ব্রজ প্রুফ থেকে মাথা না তুলে একবার শুধু বলল, 'কতদূর এগোলি?'

'বলুন, কতখানি পেছোলাম!'

একবার মুখ তুলল ব্রজদা, 'কেন? বেশ

ছিলাম পেছন দিকে—মাছের গন্ধে কে বসত্তে পারে

তো এগিয়ে গেছিস। একটু আধটু যা খবর পাই—'

'রাগ করো না ব্রজদা। তুমি তো জায়গা-জমি ছেড়ে এসেছ তাই এর মর্ম বোঝ না। এক ছটাক কিনতে গেলে ন' মাসের ধাক্কা—কোন জমি পরিষ্কার পাবে না, শতেক শরিকানি—তারপর মর্টগেজ এখন সাফ কোবালা। নতুন ফন্দ হয়েছে এগ্রিমেণ্ট। কোথায় যে পেছনের তারিখ দিয়ে চুক্তি করে রাখবে তার ঠিক নেই। কিনেও শান্তি নেই—শেষে মামলায় শত হাত জলে—'

'থামবি—', দাবাড়ুর মত চেঁচালো ব্রজদা, 'ঠাকুরঝিতে নেমে যাচ্ছি। তোর সঙ্গে মেশা যায় না—কী হয়ে গেছিস ক'মাসে। কী সব

যায়। যাবে না কেন? সারাদিন বাইরে থাকি—আমার সঙ্গে যেতে পেলে খুব ভালবাসে—একদিন তুই এসে কলকাতা নিয়ে যাবি

বললি তড়বড় করে এতক্ষণ! সে সব—এক নম্বরে ইন করল আজ—'

গাড়ি থামতেই ব্রজদা লাফিয়ে নামল, 'তোর বউদিকে না তুই অম্বলের ওষুধ দিয়ে আসবি বলেছিলি?'

'ওঃ! কালই দিয়ে আসব। আজকাল কেমন আছেন বউদি—হাঁটা চলা?'

'সারা দিন হাঁটছে। আমি তো বাড়ি পালটেছি—সেখানে না হেঁটে উপায় নেই। বড় বড় ঘর—বিরাট ইঁদারা, এক মাইল নীচে জল—পাতাল থেকে আসে, সত্যি বলছি!'

'মিথ্যেও বল তাহলে!'

'কখোন?'

'মাঝে মাঝে! মানে কখনও কখনও—'

'কোথায়? কবে দেখলি? এই দেখ চুপ করে আছে বাবু। বল না', শেষে আপনা-আপনিই বলল, 'আমি তো ফকির—'

'ফকির না কচু!' রাগাবার জন্যই কুবের বলল। কিন্তু কোন ফল হল না।

'তাড়াতাড়ি বলে ফেল এইবেলা। ডাউন দিয়েছে—'

'তুমি বলে আর সভাসমিতি কর না?'

'কোথায় দেখলে?'

'দেখিনি, শুনেছি। কদমপুর বাজারের মাঠে আজকাল সন্ধ্যের দিকে সভা করে তুমি গান গাও, গীতা বিক্কিরি কর।—সত্যি কি না?'

'সে তো সার্ভিস—'

'বউদিকেও নিয়ে যাও বলে—'

'যায়। যাবে না কেন? সারা দিন বাইরে থাকি—আমার সঙ্গে যেতে পেলে খুব ভালবাসে—একদিন তুই এসে কলকাতা নিয়ে যাবি?'

'খুব। কোথায় যাবেন?' ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ব্রজদা চেঁচিয়ে বলল, 'মাথা ভেতরে নে। ইলেকট্রিকের পোস্টে লেগে যাবে—'

মাথা ভেতরে এনে জায়গায় বসে ব্রজ ফকিরকে আর দেখা গেল না। পায়ে নাগরা, ওপরে রাঙানো আলখাল্লা, পরণে লুঙির মত রাঙানো ধুতি, মাথায় বাবরি, কাঁধে ঝোলা—সামনে আড়াল না পড়লে এসব দেখা যেত।

ঝোলায় কি আছে কুবের জানে। গুচ্ছের প্রুফ। রুদ্রনগরে এক ভাঙা প্রেসে শুধু লক্ষ্মীর বিলই ছেপে বেরোয়। মান্ধাতা আমলের তিন কেস টাইপ আছে। ব্রজদা নিজেই বলেছিল। সেখানে ট্রেডল মেসিনে আজ পাঁচ বছর ধরে ছাপা হচ্ছে ব্রজ ফকিরের বাবার আত্মজীবনী। লেখক—ব্রজ ফকির। বিষয় বাবা। ভদ্রলোক বছর দশেক হল গত হয়েছেন। মহাগুরু নিপাতের বছরটি ব্রজদা পুরো বারো মাস ন্যাড়া ছিল। গোড়ার দিককার ছাপা হলদে হয়ে গেছে। আজও পুরো লেখা বই হয়ে বেরুলো না। ব্রজদা শেষ করে উঠতে পারে নি।

চার

খুব বেশি দিন আগের কথা না—দেড় দু' বছর হবে। নারায়ণ পুজো করতে এসে একদিন বিকেলবেলা ঠাকুরমশাই বলল, 'ভাটিখানার ওদিকে সিরিটি ছাড়িয়ে একখানা একতলা বাড়ি আছে পাঁচ কাঠা জমির ওপর। নেবেন?'

কোত্থেকে নেবে কুবের। অল্পদিন হল স্যান্ডেল ছেড়ে পেজাকিটের পাম্প ধরেছে। চামড়ার বাইরে পায়ের মাংসে আরামি লোকের কায়দায় ফুলে থাকে খানিক। কোঁচা পকেটেও রাখে, কোমরেও গোঁজে। তবু বাড়ি কেনার মত টাকা কোথায় পাবে। খুব বেশি একখানা হারকিউলিস নয়ত হাতটানা রিকসা কিনতে পারে।

ঠাকুরমশাই কুবেরের ভারি গাল দেখে হয়ত মালদার পার্টি ঠাওরেছে তাকে, 'জলের দরে কুবেরবাবু—জলের দর। আমার সম্বন্ধীর বাড়ি বাদিপোতা—সেখান থেকে খানিকটা ভেতরে—'

বুলু দাঁড়িয়েছিল সামনে। বুলুর বড় বাড়ির সখ। সখ মেটানোর মত টাকা কুবেরের নেই। তবু, কিনব বলে বাড়ি দেখতে যাচ্ছি—এই নামে নামে দুজনে আধখানা কলকাতা ঘুরে আসা যাবে। ঢালাই ব্রিজ পেরোবার সময় বুলু হাত তুলে গঙ্গা প্রণামও সারবে। ফাইন—

জলের দর। আমার সম্বন্ধীর বাড়ি... বাদিপোতা—সেখান থেকে খানিকটা ভেতরে

তিন চারদিনের ভেতর এক বেস্পতিবার ভোরের ডিউটি সেরে বেলাবেলি খেয়ে নিল কুবের। তারপর বুলু বিয়ের জরদ রঙের বেনারসীখানা পরল, কুবের পাম্পসুর সঙ্গে আটচল্লিশ বহরের ধুতি।

আদি গঙ্গার ওপর কংক্রিটের ঢালাই ব্রিজ পার হয়ে বাঁ হাতে ভাটিখানার পথ। তারপর সিরিটি। খানিক দূর রিকশাসাইকেল এগোনোর পর কুবেররা এমন জায়গায় এসে হাজির হল, যেখানে আর কলকাতা নেই। শুধু খোয়ার রাস্তা। মাঝে মাঝে হোগলা বন—খানিকটা ডাঙা জমি, একটা রঙের কারখানা—তারপর চার পাঁচখানা ইটের ঝাঁকচার। বাড়ি বলা মুশকিল। একখানা শুধু ইটের পর ইট সাজিয়েই বানানো—ভেতরে কোন মশলা নেই—ঝড় উঠলে পাছে পড়ে যায়, তাই ওপরের করোগেটে আধলা ইট চাপিয়ে ছাদ বানানো হয়েছে। সেই বাড়িখানাই ঠাকুরমশাই দেখাল। পাঁচ কাঠার ভেতর অনেকটা জায়গা মাটি কেটে উঁচু করার জন্যেই লাগানো হয়েছে। আসল ঝাঁকচার কোনক্রমে আধ কাঠার কিছু বেশি।

কেনার টাকা নেই, থাকলেও এ জিনিস কুবের কিনত না। বুলুও দেখেশুনে মুষড়ে পড়ল। ঠাকুরমশাই অনেকক্ষণ বাড়িখানায় প্রশংসা করছিল। কুবের দাবড়ি দিতে থামল। মাঝখান থেকে গাড়িভাড়ার তিনটে টাকা জলে গেল।

ফেরার পথে ঠাকুরমশাই বলল, 'আর একটু যদি পেছনে যান তা হলে ছ'শো টাকায় বিঘে পাবেন। হাজরা মোড়ের এক বড় ডাক্তার আড়াই শো বিঘে কিনে লেক কাটাচ্ছেন—পরে প্লট করে বাজারে ছাড়বেন।'

সেদিন আর বুলুকে কিছু বলল না কুবের। ছুটির দিন দেখে একাই গেল। ছ'শো টাকা বিঘে কোথায়—খালি জমির বিঘেই দশ বারো হাজার। এক জায়গায় উঁচুমত কাঠা তিনেক জমি পাওয়া গেল—মোট দাম চব্বিশ শো, পাশে দু'চারখানা বাড়িও হয়েছে।

বুলুকে নিয়ে একদিন দেখিয়ে আনল। যার জমি সে উত্তরপাড়ায় থাকে। লোকাল দালালই সব কথা চালালো। বুলুর মন্দ লাগেনি জায়গাটা। কিন্তু কেনার মত টাকা কোথায় পাওয়া যায়। বুলু মোটামুটি একটা আন্দাজও করে ফেলেছে, কী ধাঁচের বাড়ি হবে। কুবের এসব ভাবনায় বাধা দেয়নি। আলোচনাতেই কত সুখ—হলে না জানি আরও কত!

শেষ পর্যন্ত জায়গাটা কেনা হল না। কারণ, টাকা পাওয়া গেল না। বুলুকে সে কথা বলা গেল না, মাকে না, বাবাকেও না। মুখে বলল, 'আটশো টাকা করে ওই জমির কাঠা কে কিনবে?'

বুলু একদিন হাসতে হাসতে বলল, 'জমি না হোক—দেখতে গিয়েও সব মিলিয়ে আঠারো উনিশ টাকা বেরিয়ে গেল। এই টাকায় তোমার একটা রেডিমেড পাঞ্জাবি, হ্যান্ডলুমের ধুতি হয়ে যেত—'

ক্লিন হিসেব। কথা বলার সময় ঘরে কেউ ছিল না। এর পর বুলু কী বলত কুবের জানে। 'নগেনবাবুর ছেলের বউর মত একটা স্টিলের ট্রাঙ্ক আনবে?—সাতাশ ইঞ্চি সাইজেরগুলো আঠারো উনিশ টাকা—'

এসব কথা অনেকবার বলেছে বুলু। এবারও বলত। চারদিক তাকিয়ে ঠিক ঠোঁটের ওপর বড় একটা চুমু বসিয়ে দিল কুবের। তা সরিয়ে দিয়ে ঠিক যখন ট্রাঙ্কের কথাটা পাড়তে গেল বুলু—তখন কুবের বেশ জাপটে বুলুর কাঁধ কামড়ে ধরল। ভালবাসার লাইনে কতরকম যে আছে। যা ইচ্ছে একটা করে দিলেই তা লেগে যায়। অন্তত কুবের তাই মনে করে। মাথার তেল, কয়েকটা চুল জিভে—তবু ছাড়ল না কুবের।

তখন বুলু, 'ছাড়বে?' বলে এক ধাক্কায় কুবেরকে সরিয়ে দিল।

বিকেল ছিল। ট্রাম চেঁচাচ্ছে, প্যাসেঞ্জার চেঁচাচ্ছে, ঠেলার আগা রাস্তার জন্যে বাসের পেছন সমানে খোঁচাচ্ছে—বিকেল বেয়ে ঝুলন্ত ধোঁয়া সমস্ত বাতাসটুকু শুষে নেবার তাল খুঁজছে। ঠিক এখন যদি এক বিঘের ওপর তাদের একটা বাড়ি থাকত (বাবার জন্যে ছোট হামানদিস্তেয় শব্দ করে পান ছেঁচছে ঝি),—গ্রিল দেওয়া জানলা (পশ্চিমের জানলাটার চোখ কানা—এক চৌকোয় কোন কাঁচ নেই), চাঁদোয়া টানাবার জন্যে দোতলায় ছাদ (এ বাড়ির ছাদে হনুমানরা এসে নিয়মিত এরিয়াল ছেঁড়ে), হলঘরের মত টানা বারান্দা (কুবের বারান্দায় দাঁড়ালেই ট্রামবাসের সঙ্গে এ বাড়ি কেঁপে ওঠে—খুব আনসেফ লাগে তার)—শীতে, বর্ষায় চিক নামিয়ে ঘর বানিয়ে ফেলা যায়—

সবচেয়ে ভাল হত, বাড়ির সামনে যদি মাঝারি একটা নদী থাকত। ক্ষ্যাপা নদীতে লাভ নেই। বুলুর তা হলে শান্তি থাকত না। সেদিন রাতে শুয়ে শুয়ে কুবের বলেছিল, 'একুশ বছর বয়স অবধি আমার বড় হারিয়ে যাওয়ার ভয় ছিল—একা কখনও বেরোতাম না—'

বুলুকে কামড়ানোর পর দিন ভোরে ডিউটি ছিল কুবেরের। হাওড়ার কয়েক স্টেশন পরেই ন্যাশনাল মেটালস্। কারখানা গেট থেকে মেল্টিং শপ সবচেয়ে দূরে—চিমনি এক-স্টেশন আগে থেকে দেখা যায়। একতলায় মাটির নীচে ব্রিক চেম্বার—থরে থরে নানান ইট জাফরি করে সাজানো। কোনোখানার দাম দু' টাকা, কোনোখানা পাঁচ টাকা। এসব কোৎরঙের এক নম্বর ইট নয়—হাজার দরেও বিকোয় না—দূর জাপান থেকেও আনতে হয়। ইস্পাত বানানোর চুলোয় অনেক তাপ চাই। ওপেন হার্থ ফার্নেসে স্ক্র্যাপ, পিগ আয়রণ, লাইম-স্টোন, ডলোমাইট, ম্যাঙ্গানিজ সব ফুটিয়ে জল করে ফেলতে হয়। তাই কয়লা জ্বালিয়ে—সঙ্গে হাওয়া মিশিয়ে মাটির নীচের এসব ইট-কুঠুরির ভেতর দিয়ে গরমটা দ্বিগুণ চৌগুণ করে দোতলায় ফার্নেস বেড়ে ছাড়া হয়। কুবের এখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট মেল্টার।

সেদিন দোতলায় ফার্নেস বেড়ে দাঁড়িয়ে কুবেরকে অনেকখানি ঘোল খেতে হল। গোড়া থেকেই অন্যমনস্ক ছিল। কাল রাতে গোড়ার দিকে বুলুর মাথাধরা ছিল—শেষ রাতে তাকে খালি অ্যাভয়েড করেছে। শুধু 'উহু, না না, বললাম ত—'

চারদিক তাকিয়ে ঠিক ঠোঁটের ওপর...

এমন বুলুকে কুবের কোনদিন চিনত না।

একবার ট্রেনে উঠে গেলে কারখানা পৌঁছনো কঠিন না। অবিশ্যি মুশকিল হয় গেটে এসে। ইলেকট্রিক ফার্নেস, রোলিং মিল, ফাউন্ড্রি, ড্রয়িং অফিস, রিফ্র্যাক্টরি শপ, সান্টিং ইয়ার্ড—মায় হিন্দিতে লাল বড় বড় হরফে রাম লেখা মারবেল পাথরের সাবান মার্কা মন্দিরটা অব্দি নরম পাড়ায়। রিফ্র্যাক্টরি শপের সামনে ত একটু বাগানও আছে। রোলিং মিলের ফোরম্যান যখন ট্রেনে ফেরে কুবের তার হাতে পেঙ্গুইনের বই দেখেছে। কিন্তু গেটে এসেও কুবেরের ওপেন হার্থ ফার্নেসে যেতে একদম ইচ্ছে করে না।

কারখানা বাড়তে বাড়তে এ-পাড়ায় এসে শেষ হয়েছে। মেল্টিং শপের পরেই হোগলা বন, জলা। সবচেয়ে বিশ্রী, একটা বুড়ো গাছে সারাদিন গুচ্ছের ছাতা ঝুলছে। কুবের বাজি রেখে বলতে পারে—সব কটা শকুন বুড়ো। ওদিকে তাকালেই দিনটা গণ্ডগোল।

রাতের সিফটের লোক ভোরের হাতে ফার্নেস যখন বুঝিয়ে দিয়ে গেল—তখন ভেতরে তিরিশ টন ইস্পাত ফুটছে। মুশকিল ফার্নেসের ছাদ নিয়ে। গরমটা বেশি হয়ে যাওয়ায় ছাদের সিলিকা ইট খানিকটা গলে নীচের ফুটন্ত ইস্পাতে মিশে যেতে লাগল। চার ব্লেডের ঢাউস ফ্যানের হাওয়ায় পোড়া চুন চারদিকে উড়ছে। দোতলায় ফার্নেসের চাতালে দাঁড়িয়ে বারোবার স্যাম্পেল নিয়েছে কুবের। মাত্র দু' ঘণ্টার মধ্যে। ফার্নেসের দরজা ওপরে তুলে ভেতরে পনের হাত লম্বা লোহার চামচ ডুবিয়ে বাটি বাটি ফুটন্ত ইস্পাত এনে সুপার কংক্রিটের মেঝেতে ঢেলে দেখেছে। চোখ বাঁচানোর চশমার কাঁচ নীল। ভাঁটি ঘামের ভেতর গরম ভাপ তুলছে। তিরিশ টন মাল নানান কসরত করে ভীমের বিয়ের সাইজের ল্যাডেলে যখন নামিয়ে দিল তখন দুটো বেজে পাঁচ। ইভিনিং সিফটের লোকও হাজির। পৌনে দুটোর ট্রেন এতক্ষণে হাওড়ায়—পরের গাড়ি সেই তিনটে দশ।

কোথায় যায় তখন। ওয়েলফেয়ার অফিসার ধনরাজ কিছুকাল ভগবানকে খুব ভালবাসছে। বিশ্বকর্মা পুজোয় যেখানটায় রামযাত্রা হয়—তারই উত্তরে ম্যারাপ বেঁধে ধর্মসভা বসিয়েছে। গত হপ্তায় ছিল কংসপালা—এ দু' দিন বিচারসভা চলছে। সিম্পল তর্ক—রাম বড় না নারায়ণ বড়, কৃষ্ণ না রাধা। শোনা যাচ্ছে, বেয়াড়াদের বশে আনার জন্যেই এত কাণ্ড। ধনরাজের ভাষায় আনরুলি এলিমেন্টদের ওপর সোবারিং এফেক্ট আর কি—

অনেক মাথার ওপর দিয়ে উঁকি মেরে অবাক। কুবের ঠিক চিনতে পেরেছে, গেরুয়াধারী যে নেচে নেচে গাইছে, ছড়া কাটছে ও ত ব্রজ দত্ত। কত রকমই

দেখাল ব্রজদা। ধনরাজের পুরো ব্যাপারটাই যে জুয়োচুরি তাতে আর কোন সন্দেহ থাকল না কুবেরের। না হলে ব্রজদা নাচে যেখানে—

কিছুকালই কুবের পথে ঘাটে আধা-সাধুর পোশাকে ব্রজদাকে দেখেছে। আর পাঁচটার মত সাধুগিরিতেও ব্রজদার কিছু দিন কাটবে—কিন্তু এ যে প্রায় মিশনে আসার মত ঘাড়ি ধরে নেচে যাচ্ছে।

ট্রেন ছাড়ার খানিক আগে ব্রজদাই লাফিয়ে ভেতরে ঢুকল। ছোট ঢোল, ঘুঙুর, চামর, একখানা পকেট আয়নার ফ্রেমে রাধাকৃষ্ণর পট বসানো—সবই ব্রজদার হাতে, ডানে বাঁয়ে দু' দুটি সাকরেদ। কুচো ছেলে দু'টো বেঞ্চে বসেই পা তুলে ঘুঙুর খুলতে বসল।

'এসে গেছিস?'

কোথায় কুবের জানতে চাইবে আগে, তা-না ব্রজ দত্তই পয়লা কথা পাড়ল। কুবের থতমত খেয়েছিল, সামলে বলল, 'আমায় দেখতে পেয়েছ অতদূর থেকে? তুমি ত স্টেজে লাফাচ্ছিলে?'

'পষ্ট দেখলাম তুই। এখানে কাজ করিস সে তো তুইই একদিন বলেছিলি—'

'তোমার না চশমা ছিল চোখে?'

'কবে?'

'যখন ম্যাজিসিয়ান ছিলে—'

'সে তো ফলস্!'

সাকরেদ দু'টি কুবেরের দিকে জোড় মিলিয়ে হাসল। ম্যাজিকের আমলে এদের দেখেনি কুবের। কত বদল হচ্ছে। সেই সিনেমার পিরিয়ডে কুবের নিজেই ছিল ব্রজ দত্তর সাকরেদ! অনেক আগে।

'আজকাল থাকা হয় কোথায়?'

'কাউকে বলবি নে? কদমপুর—'

কুবের নামও শোনেনি কোন দিন। মুখে চিনিয়ে দিল ব্রজদা। শেষে বলল, 'ফাইন জায়গা। ঘর ভাড়া আট টাকা—সব সেপারেট—আর একটা পুকুর অব্দি সেপারেট—তোর বউদি আর আমি একসঙ্গে সাঁতার কাটি, নো ডিস্টারব্যান্স!'

'সরস্বতী বউদি সাঁতার কাটছে আজকাল?

'তিনি ত সিঁথিতে থাকেন।'

'তবে?'

'তোর আভা বউদি কদমপুরে থাকেন—'

প্রথমজনার নাম ত আভা ছিল না। তিনি ত বেহালায় আছেন, তাই-ই কুবের জানে। কুবের তাকিয়ে আছে দেখে ব্রজ দত্ত বলল, 'একটা বিয়ে করেছি নতুন—গত চোতে আমাদের মাল্যবদল হল—'

কলকাতার কাছাকাছি আট টাকায় এমন সেপারেট কেলির পুকুর পাওয়া যায়—জায়গাটা নিশ্চয় গোপিনীদের বস্ত্রহরণ

মার্কা ক্যালেন্ডার [illegible]
এনে বাড়িওয়ালা ব্রজদার জন্যে বাঁধিয়ে দেয়নি। সরস্বতী বউদিকে কুবের চেনে। তিনি সাঁতার কাটার লোক নন। যেহালায় বউদির কথা বললে মা-হয় বিশ্বাস হত। নাম মনে আসছে না। অনেক দিন আগে দেখেছে। সে ব্রজদার জন্যে সব পারে। বিধবা হওয়ার পর পাঁচ ছেলে মেয়ে নিয়ে ব্রজ দত্তর সঙ্গে বিয়ের আগের দিন পিচ রাস্তার ওপর দোতলা বাড়ি ব্রজদাকেই লিখে দিয়েছে।

'তোর নতুন বউদি বাউল গাইয়ে পিরেলি দাশের বড় মেয়ে—'

প্রথমজনার কথা হিসেবেই আসে না আজকাল। কুবের বলল, 'সরস্বতী বউদি?'

'আছে।'

'একই বাড়িতে?'

'পাগল নাকি? দু' দুটো পার্সোনালিটি একই জায়গায় থাকতে পারে!' তিনি ছেলে-দের নিয়ে সিঁথিতে থাকেন।'

'তোমারই ছেলে ত?'

'হ্যাঁ, দুই ছেলে—বড়টা খুব হেলদি।'

'খরচপাতি?'

'সেই চালাচ্ছে। এল-আই-সি'র কাজ তো ছাড়েনি—শুনেছি, আমাকে ছাড়ার পর আরও প্রমোশন হয়েছে।'

হাওড়ায় ভিড়ের ভেতরে মিশে যাওয়ার আগে অনেক কথা বলল ব্রজদা। আট টাকায় দু'খানা ঘর—তবে টালির ছাদ। স্টেশন কাছেই—শেয়ালদা আধ ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট লাগে। হাতে টাকা থাকলে দু' পাঁচ বিঘে ধরে রাখত ব্রজদা। ইচ্ছে ছিল একটা আশ্রম বানায়।

জমি দেখার গাড়ি ভাড়া উনিশ টাকা গচ্চা যাওয়ার কথাটা চাপা দিতে সদ্য সদ্য আগের দিন বিকেলে কুবের বুলুর মুখে চুমু বসাতে গিয়েছিল। তেমন সুবিধে হয়নি। ব্রজদার মুখে জমির দর শুনে তখনই কদমপুর যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল কুবেরের। ব্রজদা বলল, 'কাল ভোরে ছ'টা পয়তাল্লিশের ট্রেনে আসিস—'

পরদিন ভোরে বুলুকে নিয়ে যখন কদম-পুরে নামল তখন প্ল্যাটফর্মে কেবল ব্যাপারীদের ভিড়। ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের আসল ভিড় তখনও শুরু হয়নি। কালো কালো কাঠের পিপে, কাছে যেতে তাড়ির গন্ধ। পরে শুনেছে, কলকাতার বড় বড় ভাটিখানার এখানে গাছ জমা নেওয়া আছে। তাদেরই তাড়ি রোজ সকালে পিপে বোঝাই হয়ে কলকাতায় যায়। ভেন্ডারের কামরাটা ডিমে ভর্তি।

সারাটা ট্রেন বুলুকে ধাতস্থ করার চেষ্টা করেছে কুবের। একটা লোক, তার তিনটে বিয়ে। তিনজনই জীবিত। প্রথমজনকে পাঁচ ছেলেমেয়ে সুদ্ধ বিধবা অবস্থায় বিয়ে করে [illegible] ছেলে হয়। তখন কুবের [illegible] মালটিকন্যাল ফিল্ডভেঞ্চারে অ্যাসিস্ট্যান্ট। বাচ্চাটির বছর দুই বয়স ছিল তখন। সেবার কুবেরকে সঙ্গে নিয়ে ব্রজদা তার জন্যে দরদাম করে ফুটপাথ থেকে একজোড়া মোজা কিনেছিল।

তারও বেশ কয়েক বছর পরে চৌরঙ্গীতে দশাসই এক মহিলার সঙ্গে কুবেরের হ্যান্ডসেক করিয়ে দিয়েছিল ব্রজ দত্ত। তিনি সরস্বতী বউদি। আর আজ যাকে দেখবে তিনি থার্ড। তাঁকে কুবের জানেও না। এরপরেও কুবের বুলুকে বোঝায় কী করে, ব্রজদা লোকটা খারাপ নয়। হয়ত ভাল নয়, কিন্তু খারাপ বলে কী করে। কুবের ব্রজ দত্তকে যতটুকু জানে তার সবটাই ধাঁধানো চমকে ভর্তি। জানে আর কতটুকু!

ডিরেকসন মত প্ল্যাটফর্ম শেষ করে কাঁচা পথ ধরে শ' দুই গজ যাওয়ার পর ব্রজদার সবকিছু—সেপারেট সেই পুকুর মায় টালির ঘর পাওয়া গেল। ভাড়াখাটানোর বারোয়ারি বাড়ি—তবে, দিব্যি খোলামেলা বলে বেশ লাগে।

ব্রজদা উরু অবধি লুঙ্গি তুলে বারান্দায় আসন করে সন্ধ্যে করছিল। চানের পর মাংস মাথানো পিঠে পেটে জলের ফোঁটা লেগে আছে। কুবেরদের ভেতরে নিয়ে বসালো ব্রজদার তিন নম্বর বউ। বেশ লম্বা, চোখে একটা ঢুলুনি, গলায় কালো পুঁথির ডুমো মালা। বুলুর একটু রাগ হল। বউটি তাদেরই বয়সী। এতটা কেয়ারলেস হওয়ার মানে হয়। কালো ব্লাউজ পরেছে—অথচ পাউডার মাথার পর কী হাল হল দেখার সময় পায়নি। পাউডারের সাদা গুঁড়ো কাঁধে, বুকে পড়ে আছে।

বুলুর ওপর ব্রজদা'র বউ তিন চার ইঞ্চি লম্বা। বুলুর কাঁধ ধরে ঘরে এনে বসালো। ঘরে ঢোকার মুখে কুবের দেখল, নতুন বউদির পায়ে খড়ম।

প্রথম আলাপে যেমন যেমন হয় তা সবই হল। বুলু কিন্তু অনেকক্ষণ কাঠ হয়ে বসে থাকল। কুবেরের একটুও খারাপ লাগল না। বরং পস্ট বলতে পারে, সেদিন ব্রজদা আর তা'র বউর আন্তরিকতায় একটুও খাদ ছিল না।

'জমি দেখাবার জন্যে ডেকেছো—দেখালে না?'

বউদি বলাই ভাল। কুবেরের চেয়ে বয়সে ছোটোই হবে। গলায় বেশ ঝাঁঝ।

'উঠছি।' কুবেরকে বলল, 'কিন্তু তুই কি এখান থেকে কারখানা যাতায়াত করতে পারবি? তারপর বউমা আমাদের কলকতার বাইরে—'

বুলু তেড়েফুঁড়ে উঠল, 'আমি আবার কবে কলকাতার মেয়ে? অবিশ্যি রেশন

[illegible] রেজা। এইখানে রেল পড়েনো বাঁদনের [illegible] পথ আনা হয়েছে। হাওলে [illegible] রয়েছে

এসিছি লাইন দিয়ে মির্জাপুর স্ট্রীটে থাকতে—'

বউদি বলল, 'দেখাবে ত নিয়ে চল—আমিও যাচ্ছি—'

'উহ্ঁ, তুমি যেও না। হাঁটলেই আবার মাথা ঘুরবে। এতটা পথ—হয়ত, শেষে পড়ে টড়ে যাবে—'

'আমার কথা ভাবতে হবে না—তোমরা এগোও তো—আমি আসছি।'

জমি দেখে ফেরার পথে রেলের ছড়ানো ঝিলের ধারে আড্ডা বউদির সঙ্গে দেখা হল। কদমপুরের মত জায়গায় লেস লাগানো শাড়ি, অথচ পায়ে খড়ম, কপালে লম্বা করে আবিরের টিপ—ঝিলের স্থির জল ব্যাক গ্রাউন্ডে। বেশ দেখাচ্ছিল।

'দেখানো হয়ে গেল?' বলে হেসে ফেলল বউদি। কেন কী মিস করল। নিজেই বলল, 'জায়গাটা আপনাদের ভাল লাগবে। এসব জায়গা কী সস্তা ছিল! টাকা থাকলে ঠিক কিনে ফেলতাম।'

'পাগল নাকি? দু'জন মানুষ আমরা—বাড়ি ঘর করে লাভ কি?'

'তুমি বুঝবে না।'

আগের দিন ব্রজদা যখন বলেছিল, দু-

চার বিঘে ধরে রাখতাম, তখনই সন্দেহ হয়েছিল। এমন কথা ত ব্রজদার মুখে বসে না। সেদিন কুবের বুঝল, এ-বচন বউদির। দর শুনে সত্যি ঘাবড়ে যেতে হয়। এক-দিন নিশ্চয় জমি আরও অনেক সস্তা ছিল। তবে এখন যখন কলকাতার আশেপাশে জমির দর চড়া তখন কদমপুরে বোধ হয় বাইরের হাওয়া ঢোকেনি। সবাই নিটোল আপেলের কায়দায় নির্দোষ এক তল্লাট খুঁজে পেতে চায় বোধ হয়। কোথাও একেবারে নখের দাগও পড়েনি এমন জায়গা।

কয়েক বছর আগেও কদমপুর হয়ত তা ছিল—চারদিক দেখে তখন ওইটুকু বুঝেছে কুবের।

সীতাকুণ্ড-বেগমপুর বাস রুটের ওপর বাঁ হাতে বিঘে দুই জমি দেখিয়েছে ব্রজদা। জমির মালিক চটিরাম বুড়ো মানুষ, জামাইর বাড়ি গেছে মৌটয়ারিতে—ফিরতে সেই সন্ধ্যে। ঠিক হল ব্রজদাই সব জেনে রাখবে।

ফেরার পথে আবার ঘরে গিয়ে বসল। বসতে গিয়ে বুলু টেবিলের ওপরে বসানো একখানা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি তুলে নিল হাতে, 'কার?'

কুবের দেখেই বুঝতে পেরেছে, ন্যাংটো দুই ছেলেকে তেল মাখাচ্ছে সরস্বতী বউদি। ফটোর আধখানা জুড়ে একখানা হাত। ভাগ্যিস ক্যামেরায় তেলের ছবি ওঠে না।

'মেজদির—', কথা বলতে বলতে নতুন বউদি কাজুবাদামের জোড় খুলছিল। অনেক দিন ঘরে থাকায় দুটো একটার ভেতর সাদা সাদা পোকা হয়েছে। বাদাম বেছে এনামেলের প্লেটে রাখল। পাড়ার এক রাখাল ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে মিষ্টির ভাড় বারান্দায় নামিয়ে দিয়ে তেমনি ছুটে বেরিয়ে গেল, 'ট্রেন আসছে—অনুকূলান মাঠে নামিয়ে এসে পয়সা ফেরত দেবখন—', ছেলেটার ডান হাতে একটা পাচন।

'আপনাদের দেখা হয় না?'

'আগে ত এক বাড়িতেই থাকতুম। ছেলে দুটো আমার হাতে জমা দিয়ে সরস্বতীদি অফিস যেত—'

এখানে কুবের ভেবে নিতে পারল—কী কী হয়ে থাকতে পারে। প্রধান চরিত্র ব্রজ দত্ত। গান জানে, ম্যাজিক পারে, ইংরেজী বলে ফটফট—স্মার্ট, তাকে যদি পাশের ভাড়াটের আইবুড়ো মেয়ের ভাল লেগে যায় তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

'আমাকে পেলে ছেলে দুটো হামলে পড়ে—আমারও ছেড়ে আসতে কষ্ট হয়—সং মা হওয়ার আগে থেকেই দুজনার মায়ের কাজ করেছি কত—', এইখানে এসে ভাঙা বাদাম হাতে জানলা দিয়ে ডিসট্যান্ট সিগন্যালের দিকে তাকিয়ে থাকল ব্রজ দত্তর তিন নম্বর বউ।

'ব্রজদা যায় না?'

'আমি যাই—মানে আগে যেতাম, সরস্বতীদি অফিস যাওয়ার পর—', তারপর নতুন বউদি গুণগুণ করে বলল, 'মেজদির সঙ্গে কেউ বেশিক্ষণ থাকতে পারে না, যা শক্ত—ভীষণ কঠিন, কী করে যে আপনাদের দাদা পাঁচটি বছর একসঙ্গে ছিলেন—'

ব্রজদা মাথা দুলিয়ে হেসে ক্রেডিট নিল, 'আরও কতজনের সঙ্গে থাকব দেখো। কষ্ট হলেও আমি ঠিক থেকে যাব। হাতে আমার পাঁচ বিয়ে—'

ব্রজদার মেলে ধরা হাতখানার আঙুল-গুলো হলদে। কুবের যখন ব্রজদাকে চেনে, তখন থেকে দেখে আসছে—ব্রজ দত্ত সিগারেটের তামাক ফেলে দিয়ে ভেতরে গাঁজা পুরে টানে।

'না না—দেখবেন, আপনাদের দাদা আর বিয়ে করবে না—'

বুলু আভার গলা শুনতে শুনতে তার সিঁথি দেখল—সিঁদুর নেই, চুলগুলো শুকনো, চোখে সুরমা, শাড়ির লেসের সঙ্গে মানিয়ে ব্লাউজের একদিককার হাতায় লেস লাগানো। পায়ের খড়মের দিকে বুলু তাকিয়ে আছে দেখে আভা বউদি অনেক-খানি হেসে বলল, 'আপনাদের দাদার যা সব বিতিকিচ্ছিরি জিনিসে পছন্দ—!'

'উঁহু, আমি আরও দুটো বিয়ে করব—হাতে আছে', হাত মেলে ধরল সবার সামনে। মুখে হাসি মাখানো। লুঙ্গি আবার হাঁটু অবধি গুটিয়ে এনেছে। বাবড়ি ঘাড়ের ওপর দুলছে।

'তা হলে মেজদির কাছেই ফিরে যেও—' হাসতে হাসতেই বলল নতুন বউদি, 'কী শক্ত মানুষ মেজদি—সেবারে গট গট করে হাসপাতালে গিয়ে অপারেশন করিয়ে নিজেই রাতের দিকে গাড়ি ডাকিয়ে টলতে টলতে ফিরে এল—'

কুবের বলল, 'আপনারা খানিকটা জায়গা কিনে এখানে বসে যান—'

আমারও তাই ইচ্ছে। বলুন না আপনার দাদাকে—'

ব্রজদা তখন সুটকেস খুলে তিন-চারখানা অ্যালবাম নামিয়েছে। ফটোগুলো কুবেরের চেনা। কুবেরও অনেকগুলো ছবি এর আগে ব্রজদার নানান ডেরায় নানান বছরে দেখেছে। কোনোটায় ভারতখ্যাত ফিল্ম-ডিরেক্টরের সঙ্গে ব্রজদা আউটডোরে টোকা মাথায় দিয়ে রোদের মধ্যে বসে বসে চা খাচ্ছে, কোনোটায় কালো কোট গায়ে ম্যাজিক ওয়ান্ড হাতে ব্রজদা ঝুঁকে পড়ে বাও করছে, কোনোটায় টি বি পেশেণ্ট ব্রজদা। বুলু একটার পর একটা দেখে যাচ্ছিল। নতুন কতকগুলো ছবি পড়ল। ব্রজ ফকির দীক্ষান্তে ন্যাড়া মাথায় বিশ্বনাথের মন্দিরের সামনে দাঁড়ালেন—এরকম আরও অনেক।

কাজুবাদাম, মিষ্টি খেতে অসুবিধে হল না কুবেরের। কিন্তু চায়ের কাপ দেখে ঘাবড়ে গেল। এইমাত্র যেন পুরনো বাসনের দোকান থেকে চেয়ে আনা হয়েছে। হাতলে ছাতকুড়ো। ব্রজদা কতরকম জায়গায় ঘুরেছে—থেকেছে। নতুন বউদি না হয় সব মিলিয়ে ব্রজদাকে নিয়েছে। কিন্তু এ কাপে চা খেয়ে বুলু আর তার সারা গায়ে যদি কিছু বেরোয়। নতুন বউদি কেমন শুকনো পানপাতা হয়ে গেছে।

সিগারেট, ধুলো, ধোঁয়া আরও কত কি এই শরীরটার ভেতরে ভাঁজে ভাঁজে জমে যাচ্ছে। কুবেরের প্রায়ই ইচ্ছে হয় তার সারাটা শরীর যদি কোন সাইকেল সারানোর দোকানে আগাগোড়া খুলে ফেলে ডবল চেনে সিলিং থেকে ঝুলিয়ে দিতে পারত—তাহলে জয়েণ্টে জয়েণ্টে তেল ঢেলে ঘষে মেজে নিত। বলা ত যায় না, এত দিনের মেশিন—কোথায় কী হয়ে আছে। বাঁ হাত উল্টে আঙুলের কালো কালো দাগগুলো দেখল।

একবার ছোট বেলায় টাইফয়েডের পর আর ভালো করে ডাক্তার দেখান হয়নি। অবিশ্যি আর কোন ট্রাবলও হয়নি। কেবল বাঁ হাতের আঙুলের গাঁটে গাঁটে মরচে পড়ে যাচ্ছে।

চা খেল না কুবের। বুলুকেও খেতে দিল না, 'তুমি আবার চা খাবে কি—ট্রেনেই ত তিন খুরি খেলে।'

ব্রজদা ওদের দুটো কাপই নিজের গ্লাসে ঢেলে নিল। বুলু এক খুরিও খায়নি ট্রেনে। কুবেরের মুখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

ক্রমশ

চিত্র প্রদর্শনী

সাপ্তাহিক পত্রিকার সীমাবদ্ধ স্তম্ভে সব সময় সমসাময়িক সমস্ত প্রদর্শনীর আলোচনা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তা ছাড়া সময় পরম্পরার একটি মূল্য আছে। সুতরাং গত দুই মাস যাবৎ কাগজ বন্ধ থাকাকালীন যে প্রদর্শনীগুলির অনুষ্ঠান হয়েছে সে বিষয়ে এখন আর কিছু বলা যুক্তিসংগত বোধ করি না—আশা করি শিল্পীবৃন্দ আমাকে ক্ষমা করবেন। তবে এ কথা সত্যি যে, গত দুই মাসে শহরের বিভিন্ন গ্যালারীতে বহু শিল্পী তাঁদের প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এই প্রসংগে শিল্পী নীরদ মজুমদার, বিগত যুগের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান শিল্পী পরলোকগত ফ্র্যাংক ব্রিংগার স্কালান (St. Ignatius Parish Club-এর সৌজন্যে), রাখাল দাশ ও ভাস্কর শিল্পী মীরা মুখার্জীর নাম উল্লেখযোগ্য। শহরে যে প্রদর্শনীগুলি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে বা যেগুলি এখনও চলছে সেইগুলিরই আজ আলোচনা করব।

অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে শিল্পী নির্মল দত্ত তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। তরুণ শিল্পীদের মধ্যে তিনি পরিচিত ও ইতিপূর্বে তাঁর কয়েকটি একক প্রদর্শনী দেখার সুযোগ হয়েছে। শিল্পী এবারে প্রধানত তেলরঙ মাধ্যমে কাজ করেছেন। নিদর্শনগুলির মধ্যে নিসর্গদৃশ্যই ছিল অধিক, যদিও কয়েকটি ফিগারেটিভ কম্পোজিশনও দেখা যায়। শিল্পীর রঙ মনোনয়ন যথাযথ। তবে মনে হয় ব্যবহার-পদ্ধতি বিষয়ে আরও সচেতন হলে অধিকাংশ রচনাই রসোত্তীর্ণ হত। কয়েক ক্ষেত্রে রঙ ব্যবহার অত্যধিক ও পরিব্যাপ্ত হওয়ার জন্য মূল বিষয়বস্তুটুকু চাপা পড়ে গেছে। শিল্পীর নীল রঙ ব্যবহারে কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই একই রঙের স্তরভেদ সৃষ্টি করে তিনি কয়েক ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করেছেন। যেমন ব্লু মিরর ও গ্রেজিং ইন মুনলাইট। আর একটি রচনাও চোখে পড়ে—মনসুন ইন বেংগল। ফিগারেটিভ রচনাবলীর সব কয়টিই পরীক্ষামূলকভাবে আঁকা, অংকনরীতিও সব ক্ষেত্রে এক নয়। তা হলেও দুই-একটি নেহাত মন্দ লাগে না—যেমন রাষ্টিক ইনোসেন্স ও ট্রাইব্যাল বেল। তবে শিল্পীর কাজ দেখে বোঝা যায় যে, তিনি নিয়মিত-ভাবে ছবি আঁকেন ও নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিত্য নতুন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার জন্য তিনি উন্মুখ হয়ে থাকেন। শিল্পী হিসাবে এটাই বড় কথা।

ট্রাইব্যাল বেল —নির্মল দত্ত

✻

শিল্পী তপন ঘোষের প্রদর্শনী হচ্ছে আর্টিস্ট্রি হাউসে গ্যালারীতে। তরুণ শিল্পীদের মধ্যে তপন ঘোষ বয়ঃকনিষ্ঠ—বয়স মাত্র ২৫ বৎসর। মাত্র তিন বছর আগে সরকারী আর্ট কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তা সত্ত্বেও ইতিপূর্বে তিনি দুটি একক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। এই বছরেরই পশ্চিমবংগ শিল্প ও নাট্য অ্যাকাডেমি আয়োজিত সমসাময়িক চিত্র প্রদর্শনীতে শিল্পীর একখানি ছবি আমার নজরে পড়ে। রচনাটি দেখেই বুঝেছিলাম যে, এই তরুণ শিল্পীর মধ্যে সম্ভাবনার বীজ নিহিত আছে। সুখের বিষয়, বর্তমান প্রদর্শনী দেখে আমার সেই বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হয়েছে।

তপন ঘোষের রচনা প্রধানত লোকচিত্র-ভিত্তিক। প্রাচীন মন্দির ও দেবালয়ের দেওয়ালে যে বিভিন্ন লোকচিত্র দেখা যায় শিল্পীর অংকনরীতি মূলত সেগুলিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। তবে বর্তমান ক্ষেত্রে তিনি লোকচিত্রের সংগে বিমূর্ত ও প্রায়বিমূর্ত রীতির সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা করেছেন। ফলে প্রায় সব-গুলিতেই সমসাময়িক চিন্তাধারার ছাপ পড়েছে। কাঠামোটুকু বজায় রেখে

কম্পোজিশন—৫ —তপন ঘোষ

শিল্পী সরল আকারকে নানাভাবে ভেঙ্গে ফেলে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন, অধিকাংশ স্থলে তাদের ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করে দেখেছেন, অথচ পরস্পর বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন অংশগুলির সামগ্রিক অখণ্ড রূপটুকু বজায় থাকার ফলে সেগুলি দৃষ্টিকটু হয়নি—যেমন কম্পোজিশন ৫, বা কম্পোজিশন ৭। তবে এ কথা ঠিক যে, কয়েক ক্ষেত্রে সুপরিচিত শিল্পী অরুণ বোসের অংকন-রীতির প্রভাব দেখা যায়। অবশ্য সব সময়েই যে সেটি ইচ্ছাকৃত, তা নাও হতে পারে। দুই একটি রচনায় প্রাচীরচিত্রের লক্ষণ দেখা যায়। হঠাৎ দেখলেই মনে হয়, বুঝি কোনও প্রাচীন গুহার গায়ে খোদাই করা কোনও ভাস্কর্য বা রিলিফ নিদর্শন। এই প্রসঙ্গে কম্পোজিশন ৮-এর নাম করা যায়। অংকন পদ্ধতি, বিশেষ করে হালকা রঙের সুন্দর স্তরবৈচিত্র্যের জন্য এই রচনা-খানি সকলেরই চোখে পড়ে। প্রদর্শনীতে কয়েকটি ড্রইং-এর নমুনাও দেখলাম। এগুলি ছোট, প্রধানত চীনা কালি মাধ্যমে আঁকা। অঙ্কনরীতির বিশেষ গুণে দুই একটিতে গ্রাফিক কারুকার্য ফুটে উঠেছে—যেমন ১১, ১২ ও ১৪নং নিদর্শন।

✻

চিত্রাংশুর উদ্যোগে অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে এক বিচিত্র প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের পরিচিত ও অপরিচিত নানা ভূচর, খেচর ও জলচর জীবজন্তুর ছবি প্রদর্শনীতে পেশ করা হয়। ছবিগুলি এঁকেছেন শিল্পী জীবেন সেন। এ জাতীয় ছবি যে প্রামাণিক ও রিয়ালিস্টিক হবে সেটা স্বাভাবিক। তা হলেও গ্রাফিক পদ্ধতিতে রচনা করে শিল্পী সেগুলির মধ্যে নতুন বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন।

তার ওপর প্রত্যেক জীবজন্তুর বিষয়ে শিল্পী ক্যাটালগে নানা জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করেছেন—ফলে প্রদর্শনীটি খুবই শিক্ষাপ্রদ হয়, বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে।

✻

বন্যাবিধ্বস্ত দেশবাসীদের সাহায্যকল্পে শুভমস্তু পত্রিকার পক্ষ থেকে কলিকাতা তথ্য কেন্দ্রে একটি চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

✻

অ্যাকাডেমি পরিচালিত স্টুডিওর ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক প্রদর্শনী সম্প্রতি অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্রপ্রিয়

মেক্সিকো অলিম্পিক

ধ্রুবেন সেন

আর ক'দিন বাদেই মেক্সিকোতে উনিশতম অলিম্পিক শুরু হবে। অক্টোবর ১২ থেকে ২৭ অর্থাৎ ১৬ দিনের জন্যে পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকেই অ্যাথলিটরা এসে এই শহরের প্রান্তে নতুন যে সর্বাঙ্গসুন্দর ও রমণীয় অলিম্পিক গ্রাম তৈরী হয়েছে তাতে প্রতিযোগিতার জন্যে জমায়েত হবেন। অলিম্পিক স্টেডিয়ামে এই অনুষ্ঠান শুরু হবে। বলাই বাহুল্য, এই অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ কি রাজনৈতিক মতবাদ-এর কোন ইতরবিশেষ হবে না। যাঁরা জমায়েত হবেন তাঁরা এক সুস্থ খেলোয়াড়ী মনোভাব নিয়েই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করবেন।

জাপানে ১৯৬৪ সালের অলিম্পিকে পৃথিবীর সব দেশই প্রায় যোগ দিয়েছিলেন এবং এই অলিম্পিকে যে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের স্বরূপ ফুটে উঠেছিল তা কারোর নজর এড়ায় নি। মাত্র কয়েক মাইল জায়গা জুড়ে আধুনিক অলিম্পিক গ্রামে সারা পৃথিবীর হাজার হাজার বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষাভাষী অ্যাথলিট জড় হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের ভেতরে সুমধুর বন্ধুত্বপূর্ণ সুস্থ মনোভাব থাকায় আজকের কলহমুখর পৃথিবীর কোলাহল তাঁদের স্পর্শ করতে পারে নি।

বর্তমান মেক্সিকো শহরের দক্ষিণে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির কাছে এক বিরাট বনজঙ্গল ঘেরা পাহাড়ী এলাকা পড়ে ছিল। কয়েক হাজার বছর আগে কাছের কোন আগ্নেয়গিরি থেকে ওই জায়গায় লাভার প্রস্রবণ বয়ে এসেছিল। এই গ্রাম প্রায় নব্বুই হাজার স্কোয়ার মিটার জমি নিয়ে তৈরি। এখানেই সমাগত লোকেরা থাকবেন। খুব কাছেই লাগোয়া অলিম্পিক স্টেডিয়াম।

এই খেলার বিশ্বযজ্ঞে মেক্সিকো গভর্নমেন্ট বিরাট আয়োজন করেছেন। আগের যে সব স্টেডিয়াম ও খেলাধুলোর জায়গা ছিল তা আরও বেশী আসনের জন্যে বাড়ানো হয়েছে ও সংস্কার করা হয়েছে। এ ছাড়া আজটেক্ স্টেডিয়াম, অলিম্পিক পুল, অলিম্পিক জিমন্যাসিয়াম, স্পোর্টস প্যালেস বড় বড় হোটেল তৈরি শেষ হয়েছে। কয়েক হাজার ট্যাক্সির ব্যবস্থা হয়েছে। অলিম্পিক গেমসের সঙ্গে আবার চলবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সবশুদ্ধ উনিশটি খেলাধুলোর কর্মসূচী আছে। ১৯৬৮র মেক্সিকো অলিম্পিকে বাস্কেট বল, বক্সিং, ক্যানোইং, সাইক্লিং, ইকুয়েস্ট্রিয়ান স্পোর্টস, ফেন্সিং, ফুটবল, জিমন্যাস্টিকস্, হকি, ওয়েট লিফটিং, রোয়িং, সুইমিং ও ডাইভিং, মডার্ণ পেন্টাথলন্ (রাইডিং, ফেন্সিং, স্যুটিং সুইমিং, অ্যাথলেটিকস) রেস্লিং, স্যুটিং ইয়টিং, ভলিবল, ওয়াটার পোলো।

অ্যাথলিটদের থাকার জন্যে অলিম্পিক গ্রামে উনত্রিশটি বড় বড় বাড়ি তৈরী হয়েছে। এ ছাড়া অ্যাথলিটদের খাবার জন্যে সেণ্ট্রাল ডাইনিং হল, আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্র আর অন্যান্য সুযোগসুবিধা করা হয়েছে। থাকার বাড়িগুলো ছ' তলা আর দশ তলা উঁচু। এ বাড়িগুলোতে ন' শো চারটা ফ্ল্যাট আছে। প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটেই তিনটে করে শোবার ঘর, বসার ঘর আর রান্নার ঘর আছে। এক একটা ঘরে দশ থেকে বারোজন অ্যাথলিটকে থাকতে হবে। প্রত্যেক বাড়িতে ওঠা-নামার জন্যে দুটো করে এলিভেটর আছে। বাড়িগুলোর চারি পাশে সবুজ ঘাসের আচ্ছাদন আর আরও দূরে সবুজ ঘাসের সারি।

অলিম্পিক গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে এই বাড়িগুলোর ভেতর পাঁচটা বাড়ি খালি থাকবে শুধু প্রেসের লোকেদের জন্যে। ঠিক তার পাশেই থাকবে প্রেস সেন্টার। অলিম্পিক গ্রাম সুচারুরূপে তৈরী শেষ হয়ে গিয়েছে। মেক্সিকো সরকার অলিম্পিক শেষ হবার পর এই গ্রাম তাঁদের হাউসিং ডেভেলপমেণ্ট স্কীম অনুযায়ী মধ্যবিত্ত, শ্রমজীবী ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভাড়া দেবার মনস্থ করেছেন।

অলিম্পিক গ্রামকে খেলাধুলোর আধুনিক শহরে পরিণত করার জন্যে আড়াই হাজার ইঞ্জিনিয়ার, কারিগর ও শ্রমজীবী দৈনিক

আজটেক স্টেডিয়াম। এখানে ফুটবল খেলা হবে

অলিম্পিক সুইমিং পুল ও জিমনাসিয়ামের জন্য দুটি আলাদা ছাদের তলায় লাগোয়া যমজ ভাই

বারো ঘণ্টা কাজ করেন। মে ১৯৬৭তে জঙ্গল সাফ করে জমি সমতল করে কাজ শুরু হয়েছিল। জমির নীচে ইলেকট্রিক আর টেলিফোন লাইনের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। মেক্সিকো গভর্নমেন্টের দুটি বিভাগ এই অলিম্পিক গ্রাম সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে তৈরি করতে ব্যস্ত ছিলেন ও কাজও খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেছে।

এ ছাড়া অলিম্পিক গ্রামে অনেক স্বল্পস্থায়ী আবাস তৈরী হয়েছে যা খেলার পর সরিয়ে ফেলা হবে। যেমন ধরুন, সাতটা ডাইনিং হল, ইন্টার ন্যাশনাল ক্লাব আর দুটো ব্যায়ামের অনুশীলন কেন্দ্র। ডাইনিং হলগুলো এক তলা আর তা তৈরীও শেষ হয়ে গিয়েছে। এক একটাতে একসঙ্গে দু' শো বাইশজন খেতে বসতে পারবেন। এর ভেতর ছ'টা ডাইনিং হলে দু' বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা হবে। বাকি ডাইনিং হলটার নাম ইণ্টারন্যাশনাল ডাইনিং হল, অনেকটা ইণ্টারন্যাশনাল ক্লাবের মত সেখানে সব অ্যাথলিটরা এসে জমায়েত হতে পারবেন, চা, কফির সঙ্গে আলাপ ও গল্পগুজব করতে পারবেন।

সবচেয়ে বড় হবে উনিশতম অলিম্পিকের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সমস্ত মেক্সিকো শহরকে ও লাগোয়া অলিম্পিক গ্রামকে তা নবরসে সঞ্জীবিত করবে। মনুমেণ্ট সদৃশ স্থাপত্য এই অলিম্পিক গ্রাম-চত্বরে শোভন হবে। গ্রীক স্টাইলে একটা থিয়েটারও হয়েছে চারিপাশ খোলা—লোকসংগীত ও লোকনৃত্যের জন্যে। এই থিয়েটারের কাছে অনুশীলনের মাঠের পাশেই বহু পুরোনো পিরামিড পাওয়া গেছে। এই অলিম্পিক গ্রাম তৈরির শুরুতে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে প্রাচীন এক সভ্যতার ভূগর্ভস্থ ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে যা প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে অসীম মূল্যবান। মেক্সিকোয় এবার যাঁরা যাবেন তাঁরাও দেখবেন এক প্রাচীন সভ্যতার মৃত্যু আর জন্মতিথি।

১৯৬৮র মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসে আনুমানিক আট হাজার অ্যাথলিট ও তাঁদের সঙ্গে আরও ন' হাজার প্রতিনিধি অর্থাৎ অফিসিয়ালস, কোচ, ডাক্তার ইত্যাদি আসবেন। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির এক শো তেইশটি সভ্য দেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সাউথ আফ্রিকাকে এই প্রতিযোগিতায় বর্ণবৈষম্যের জন্যে বাতিল করা হয়েছে। প্রায় একশোটি দেশ এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্যে তাঁদের অ্যাথলিটদের পাঠাচ্ছেন। গত টোকিও অলিম্পিকে সে জায়গায় তিরানব্বইটি সভ্য দেশ যোগদান করেছিলেন।

আজটেক স্টেডিয়াম : মেক্সিকো অলিম্পিকে সবচেয়ে সুন্দর ও বেশী সংখ্যার আসন-বিশিষ্ট স্টেডিয়ামের ভেতর হল আজটেক স্টেডিয়াম। এই স্টেডিয়ামে দর্শক ও প্রতিযোগী উভয়েরই সব রকম স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেক্সিকো শহরের দক্ষিণ দিকে বড় রাস্তার উপর আজটেক স্টেডিয়াম আধুনিক যুগের এক নয়নাভিরাম স্থাপত্য। এই স্টেডিয়াম শুধু ফুটবলের জন্যেই তৈরী হয়েছে। আগের বছর মে মাসে মেক্সিকোর প্রেসিডেণ্ট এই স্টেডিয়ামটির উদ্বোধন করেন। তারপর থেকেই বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলা হয়ে গেছে এই স্টেডিয়ামে। এই স্টেডিয়ামের একটি বিশেষত্ব আছে। এখানে সবচেয়ে ভাল জায়গায় তিন সারি বক্স তৈরি করা হয়েছে। প্রতি বক্সে দশটা করে বসার আসন। বক্সের মোটামুটি আসন হল পাঁচ শো চুরাশিটি। দর্শক গাড়ি নিয়ে স্টেডিয়ামের বিশেষ দরজা দিয়ে ঢুকে একেবারে বক্সের দরজায় তাঁর গাড়ি ভেড়াতে পারবেন। শুধু ওই কটি বক্সের জন্যেই লাগোয়া একটি উঁচুদরের ক্লাব করা হয়েছে। তার ভেতর এক উঁচুদরের রেস্তোরাঁ আর বার সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে। সামান্য নোটিশে ওই বড় ক্লাবে সামাজিক ফাংশন, নাচ কি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

এ ছাড়া বিভিন্ন টিকিটমূল্যে বিভিন্ন জায়গানুযায়ী আরও বহু সুযোগসুবিধে সাধারণ দর্শকদের জন্যে করা হয়েছে। সমস্ত স্টেডিয়ামে বসার জায়গা প্রায় এক লক্ষেরও বেশী। এইবার অলিম্পিকে ফুটবল প্রতিযোগিতা হবে এই অতি আধুনিক মনোরম স্টেডিয়ামে। এ ছাড়া আরও তিনটে স্টেডিয়ামে এবার ফুটবল প্রতিযোগিতা হবে মেক্সিকোতে।

স্পোর্টস প্যালেস : অলিম্পিক গ্রামের স্পোর্টস প্যালেস তৈরি শেষ হয়ে

গেছে। এই গোলাকার স্পোর্টস প্যালেস তৈরির জন্যে হাজার হাজার কিউবিট মিটার কংক্রীট আর হাজার হাজার টন লোহার রড ব্যবহার করা হয়েছে। ওপরে চমৎকার এক ডোম তৈরি করা হয়েছে। এখানে পঁচিশ হাজার দর্শক বসে অলিম্পিক বাস্কেট বল প্রতিযোগিতা দেখতে পাবেন। দর্শকদের সুবিধের জন্যে অন্য সব ব্যবস্থাও তৈরি।

সুইমিং পুল ও জিমন্যাসিয়াম: অলিম্পিক সুইমিং পুল আর অলিম্পিক জিমন্যাসিয়ামের কাজও শেষ হয়ে গেছে। দুটি আলাদা ছাদের তলায় লাগোয়া যেন যমজ ভাই। একই ইউনিট তাই দেখতে হবে বড় চমৎকার ও শিল্পীসুলভ। এই পুলের ছাদ এমনভাবে তৈরী হবে যাতে ভেতরে চারি পাশের সূর্যের আলো এসে পড়ে। ভেতরে চারিপাশ থেকেই যাতে এই সাঁতার ও জিমন্যাসিয়াম দেখা যায় তার জন্যে ভেতরে কোন দৃষ্টি অবরোধকারী থাম নেই। এই সুইমিং পুলে সাঁতার, ডাইভিং ও তার সংগে ওয়াটার পোলো ফাইন্যাল খেলা হবে। এই পুলের চার ধারে প্রায় দশ হাজার লোকের বসার জায়গা আছে। জিমন্যাসিয়ামে হবে ভলিবল। এই দুটি বাড়ির চারিপাশে প্রায় এক হাজার গাড়ি রাখার ব্যবস্থা আছে। অলিম্পিক পুলে এবার ইলেকট্রনিক টাইমকিপার বসানো হয়েছে। এবারে ষোলটি টিম ওয়াটার পোলো প্রতিযোগিতার প্রতিযোগিতা করার জন্যে নাম লিখিয়েছে। বত্রিশটি খেলা হবে। বেশীর ভাগই ইউনিভার্সিটি সিটি পুলে হবে শুধু গোটা পনেরো খেলা হবে এই অত্যাধুনিক অলিম্পিক পুলে। প্রত্যেক টিমই সমান সংখ্যক খেলা খেলবে।

ইয়টিং: ইয়টিং হবে অ্যাকাপুলকো বে তে। মেক্সিকো অলিম্পিকের জন্যে অ্যাকাপুলকোর ক্লাব ডি ইয়েটসকে গত বছর মেক্সিকান নেভি বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে আরও বড় ও সর্বাঙ্গসুন্দর করা হয়েছে। যেখানে এই ইয়ট বা প্রমোদতরণীগুলো বাঁধা থাকবে তা বড় মনোরম। সমুদ্রে প্রতিযোগিতায় বেরুবার জন্যে এই সব তরণীর কোনই অসুবিধা হবে না। এ ছাড়া এই ক্লাবে প্রতিযোগী, কোচ, ম্যানেজার ও ডাক্তারদের জন্য সব সুবিধে করে রাখা হয়েছে। প্রায় পঁচিশটি ডবল মোটর লাগানো রক্ষী লঞ্চ যে কোন বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যে এই প্রমোদতরণী প্রতিযোগীদের সংগে সমুদ্রে যাবে।

রোয়িং কোর্স: এই বছর দেড়েক আগে বিদেশী কাগজে মেক্সিকান অলিম্পিকের উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছিল। ইণ্টারন্যাশনাল রোয়িং ফেডারেশন-এর সন্দেহ ছিল যে, সিওমেনকো খাল অলিম্পিক শুরু হবার আগে তৈরী হয়ে

উনিশতম অলিম্পিকের স্মারক মুদ্রার দুই দিক

যাবে কি না। তিন শো বিদেশী ক্যানাল বিশেষজ্ঞ ও কুশলী শ্রমজীবী নিয়ে এসে দু বছর ধরে কাজ করলে তবে যদি এই খালের কাজ শেষ হয় এই ছিল বিদেশী সমালোচকদের মত। কিন্তু মাত্র মাস ছয়েকের ভেতর মেক্সিকোর মেয়রের আগ্রহে শুধুমাত্র মেক্সিকান শ্রমজীবী ও বিশেষজ্ঞ দিয়ে এই অপূর্ব খালের কাজ শেষ হয়ে গেছে। মেক্সিকো শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এই সিওমেনকো ক্যানালে এবার অলিম্পিকের ক্যানোইং, রোয়িং হবে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর যেখানে যেখানে অলিম্পিক গেমসের রোয়িং হয়েছে তার তুলনায় এই খালটি বর্তমানে সবচেয়ে বড় ও সর্বাংগ সুন্দর।

অলিম্পিক স্টেডিয়াম: মেক্সিকো শহরের দক্ষিণে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সিটির ভেতরে অলিম্পিক স্টেডিয়াম। এই স্টেডিয়ামটিকে বাড়ানো হয়েছে, সংস্কার করা হয়েছে। এখানেই যাবতীয় অ্যাথলেটিকস হবে যেমন শটপুট, জ্যাভেলিন থ্রো, রান, পোল ভল্ট, ডিসকাস থ্রো, রিলে রেস, ম্যারাথন প্রভৃতি।

অলিম্পিক ভেলোড্রোম: অলিম্পিক ভেলোড্রোমে শুরু হবে সাইকেল প্রতিযোগিতা। এ ছাড়া বাইরের ট্র্যাকেও সাইকেল প্রতিযোগিতা হবে।

এবার হকি হবে মেক্সিকোর মিকস্‌হুকো স্পোর্টস সিটিতে।

সুটিং, রাইডিং প্রভৃতি হবে মেক্সিকান আর্মি ফিল্ডে।

ওয়েট লিফটিং, আর ফেন্সিং হবে ইনসারজেন্টস্ থিয়েটার ও ইনসারজেন্টস আইস্ রিঙে।

যে দুটো অস্থায়ী জিমন্যাসিয়াম তৈরি করা হচ্ছে তার ভেতরে বক্সিং, রেসলিং আর ওয়েটলিফটিং-এর অনুশীলন করার ব্যবস্থা থাকবে।

ছ'টি দৌড়ের ট্র্যাক তৈরি শেষ। এই ট্র্যাকগুলি অনেক যত্ন করে তৈরি করা হয়েছে। উপরে টার্টান বলে এক প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। সিনথেটিক রেসিন দিয়ে তৈরি এই টার্টানের প্রলেপ দৌড়ানোর ট্র্যাকের উপর দেওয়া আছে। এর ফলে সারা বছর রোদ, বৃষ্টিতে এই ট্র্যাকের কোন ক্ষতি হবে না। এই চমৎকার, সুন্দর, মসৃণ টার্টান ট্র্যাক সম্বন্ধে বার্লিন অলিম্পিকের সেই বিখ্যাত জে সি ওয়েন্‌স্ বলেন যে, এই টার্টানের ব্যবহারে ট্র্যাক ও ফিল্ড কম্পিটিশনের বহু উন্নতি হল। এতে দৌড় প্রতিযোগীরা যথেষ্ট সুবিধে পাবেন।

মেক্সিকান অলিম্পিক কর্তৃপক্ষ সাংবাদিকদের সুবিধের জন্যে সবরকমের সুবিধে করে দিয়েছেন। চমৎকার পাঁচটি বাড়ি শুধুই সাংবাদিকদের থাকার জন্যে আলাদা করে রাখা হয়েছে তা আগেই বলেছি। তাদের কাজের সুবিধের জন্যে যে মেন প্রেস সেণ্টার করা হয়েছে তা উঁচু নীচু জমির জন্যে দু' ভাগে ভাগ করা। রাস্তা থেকে প্রেস সেণ্টারের হলে ঢুকতে হবে। এখানে রেজিস্ট্রেশন আর ফাইলের কাজ হবে। এই হলের এক কোণায় প্রেসের রিপোর্টারদের কাজের সবরকম সুযোগ-সুবিধে করে দেওয়া আছে যাতে ওরা ইণ্টারভিউ নিতে পারেন, অন্যান্য জায়গার সংগে খবরাখবর করতে পারেন। এর জন্যে আলাদা আলাদা ঘর করা হয়েছে।

কম্পিউটার রাখা হয়েছে এই বাড়ির অন্যত্র। এর সংগে ফটোগ্রাফিক, ল্যাবরেটরি আর ডেটা ট্রান্সমিশন ও ডুপ্লিকেশন-এর ব্যবস্থা করাও হয়েছে।

ইউনিভার্সিটি সিটির মেন স্টেডিয়ামে এক-একটি করে টেলিভিশন সেই সংবাদদাতাদের প্রেস বক্সে দেওয়া হবে যাতে দূরের প্রতিযোগিতাকে কাছ থেকে আরও ভালভাবে তাঁরা দেখতে পাবেন। মেক্সিকো সিটিতে বর্তমানে চারটি টেলিভিশন চ্যানেল আছে, এটিকে ছ'টিতে পরিণত করা হবে যাতে একই সংগে বিভিন্ন খেলার ছবি পাঠানো যেতে পারে। প্রতি সেণ্টারের প্রেসরুমে বিশেষত অলিম্পিক ভিলেজের মেন প্রেস সেণ্টারে খুব বড় স্ক্রীনওলা টেলিভিশন

সেট বসান হবে যাতে সমাগত রিপোর্টাররা অন্য কাজের ফাঁকেও প্রতিযোগিতা দেখতে পারেন।

সংবাদ দেওয়া ও নেওয়ার জন্যে মেক্সিকো অলিম্পিক কর্তৃপক্ষ আয়োজনের কোন ত্রুটি রাখেন নি। মেক্সিকো গভর্নমেণ্ট দুটি জার্মান রেডিও ফটো মেশিন (একটি পাঠানর আর আরেকটি গ্রহণের জন্যে) কিনেছেন। মেক্সিকান বিশেষজ্ঞরা ওই মেশিনে জাপানে ছবি পাঠিয়ে নিখুঁত ফললাভ করেছেন তাই অলিম্পিক কর্তৃপক্ষ এবার সংবাদ আদান-প্রদানের জন্যে ওই দুটি মেশিনকে এই অক্টোবরের অলিম্পিকে কাজে লাগাবেন।

স্যাটেলাইট দ্বারা ট্রান্সমিশনের ফলে সঙ্গে সঙ্গেই খবর ও কোন কোন দেশে প্রতিযোগিতার ছবি চাক্ষুষও দেখতে পাওয়া যাবে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও জাপানে চুক্তিমত টেলিভিশনের রঙিন ছবি পোঁছবে। পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপে কিন্তু টেলিভিশনের ছবি পোঁছবে সাদা আর কালোয়। আফ্রিকার কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিরা জানাচ্ছেন যে, তাঁরা ইউরোপীয়ান টেলিভিশন কোম্পানিগুলোর সঙ্গে একটা চুক্তি করবেন যাতে টেলিভিশন মারফত

অলিম্পিক গেমস তাঁরা আফ্রিকান দেশগুলোকেও দেখান।

সাংবাদিকদের সুবিধের জন্যে অলিভেটি কর্পোরেশন বিভিন্ন ভাষার এক শো'টি টাইপরাইটার মেশিন যোগান দেবেন। কোন মেশিনে ফরাসী, কোন মেশিনে জার্মান, কোন মেশিনে বা আরবীক টাইপ হতে পারবে।

সাংবাদিকদের সুবিধের জন্যে অলিম্পিক ভিলেজ ও অন্যান্য প্রতিযোগিতার জায়গায় যতক্ষণ প্রতিযোগিতা চলবে ততক্ষণ প্রচুর সংখ্যক বাস এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলাচল করবে ও মাত্র কয়েক মিনিটেই পৌঁছে দেবে। এই সব বাসে করে সংবাদদাতারা নিজের পরিচয়পত্র দেখিয়ে বিনামূল্যে যে কোন জায়গায় যত বার ইচ্ছে ঘুরে আসতে পারবেন। কতকগুলো বাস আবার অলিম্পিক ভিলেজ থেকে লাগোয়া মেক্সিকো শহরেও যাতায়াত করবে।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক নিয়মাবলীর আর্টিকল ৪৯ অনুযায়ী সংবাদদাতারা অলিম্পিক অর্গানাইজিং কমিটির প্রেস বিভাগ কর্তৃক সরকারীভাবে স্বীকৃত হবেন না। তারা শুধু নিজের নিজের দেশের অলিম্পিক কমিটির প্রতিনিধি। ইউনাইটেড প্রেসের অধীনে ফটোগ্রাফাররা একটি "পুল" করবেন। যারা এই "পুলের" মেম্বার... তারা এই "পুল" থেকে যে কোন ছবি কিনতে পারবেন। যেসব ফটোগ্রাফাররা এই পুলের মেম্বার নন তারা মেক্সিকো অলিম্পিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোয় গিয়ে ছবি তুলতে অনুমতি পাবেন না, যেমন ধরুন, প্রতিযোগিতার শুরু ও শেষ বিন্দুতে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা ইত্যাদি। তাদের অন্যান্য ছবি তুলেই চালাতে হবে। ল্যাবরেটরি, ডার্করুম আর ছবি তোলার অন্য সব সুবিধেও দেওয়া হবে। প্রয়োজনে খুব কাছেই সবরকম টেকনিক্যাল পরামর্শ পাওয়া যাবে। রাত্রিতে যেসব জায়গায় প্রতিযোগিতা হবে সেখানে অন্যান্য বারের অলিম্পিকের তুলনায় লাইটিং-এর ব্যবস্থার আরও ভাল বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কেননা এবারে রঙিন টেলিভিশনে রঙিন ছবির ব্যবস্থা হয়েছে।

আগের বছর অর্থাৎ ১৯৬৭র অক্টোবরে সে সময়ের অর্ধসমাপ্ত মেক্সিকো অলিম্পিক গ্রামে, ইউনিভার্সিটি অলিম্পিক স্টেডিয়ামে ও অন্যান্য স্টেডিয়ামে তৃতীয় আন্তর্জাতিক খেলাধুলা প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। এই আন্তর্জাতিক খেলাধুলার প্রতিযোগিতা ১৯৬৮'র মেক্সিকো অলিম্পিকের মহলা বলে ধরা হয়। এ বছর যেসব দেশ তাদের অ্যাথলিট পাঠাবেন তার প্রায় শতকরা পঞ্চাশভাগ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে নিজেদের কৃতিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, কোথাও কোথাও আগের অলিম্পিক রেকর্ডও ভাঙা হয়েছে। মেক্সিকো অলিম্পিকের কর্তারাও এই প্রায়-তৈরি অলিম্পিক গ্রামের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই খেলাধুলো মারফত নিজেদের ভুল-ত্রুটি, তা যদিও খুব সামান্য, শুধরে নেবার চেষ্টা করেছেন।

সবচেয়ে বড় কথা সমতলভূমি থেকে উঁচু মেক্সিকো শহরের জলবায়ু সম্বন্ধে যে গালগল্প এতদিন চলে আসছিল তা যে বাস্তব নয় সে কথা এক প্রেস কনফারেন্সে ত্রিশটি বিভিন্ন দেশের অ্যাথলিটদের সঙ্গে আগত ত্রিশজন ডাক্তার আলোচনা করেন। মেক্সিকো শহরের উচ্চতার জন্যে অ্যাথলিটদের শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য হয় এ কথা তারা মানেন না। নতুন জলবায়ু সইয়ে নেওয়ার জন্যে অ্যাথলিটরা যদি মেক্সিকোয় অন্তত দু' সপ্তাহ আগে এসে অনুশীলন করেন তা হলে অবশ্য খুবই ভাল হয়। এই স্পোর্টস প্রতিযোগিতায় ব্যাভেরিয়ার শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রী, কিউবার সংস্কৃতি মন্ত্রী ও কঙ্গোর একজন মন্ত্রীও এসেছিলেন। অন্য এক প্রেস কনফারেন্সে এরাও স্বীকার করেন যে তাঁদের দেশের অ্যাথলিটদের কোন শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য কি দমের কোন কষ্ট হয় নি। কঙ্গোর মন্ত্রী আরও বলেন যে, ১৯৬৮'র মেক্সিকো অলিম্পিকে যেসব দেশের অ্যাথলিটরা আসবেন তারা যেন শীতের পোশাক নিয়ে আসেন কেন না অক্টোবরে মেক্সিকো শহরে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে যায়। রুমানিয়ার অলিম্পিক কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট এই প্রেস কনফারেন্সে বলেন যে, মেক্সিকোর উচ্চতার জন্যে অ্যাথলিটদের যে শারীরিক কষ্টের কথা শোনা গেছিল, তাঁর দেশের অ্যাথলিটরা তা এই তিন সপ্তাহ মেক্সিকোর জলবায়ুতে অভ্যস্থ হয়ে সে সংকট থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

এবারকার অলিম্পিকে যেসব দেশ সর্ব-বিভাগে প্রতিযোগী পাঠাতে পারবেন না তারাও যাতে এই বিশ্বভ্রাতৃত্বের আনন্দযজ্ঞে যোগদান করতে পারেন তার জন্যে একটি কালচারাল প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কুড়িটি কর্মসূচী রাখা হয়েছে যার ভেতর কয়েকটি জলসার আকারে অনুষ্ঠান আর কয়েকটি জলরঙ তেলরঙের প্রাচীন ও আধুনিক শিল্প নিদর্শন। মেক্সিকোর অলিম্পিক গ্রামের নতুন তৈরি চত্বরে মেক্সিকোর যুবক-যুবতীরা সারা পৃথিবীর যুবক-যুবতীদের সাদর আহ্বান জানাবেন। দশ হাজার কিশোর-কিশোরী একসঙ্গে জিমন্যাস্টিক দেখাবেন এই অনুষ্ঠানে। ঠিক তার পরের দিন এথেন্সের অলিম্পিক টর্চ এসে পৌঁছবে টিওটিহুয়াকান-এর পুরাতত্ত্ব ভূমিতে। এ অনুষ্ঠানে প্রায় এক হাজার শিল্পীর একটি সুবৃহৎ ব্যালে হবে আর কয়েক শো সঙ্গীত শিল্পী ও যন্ত্রশিল্পী এ অনুষ্ঠানে পরে অংশ গ্রহণ করবেন। সারা পৃথিবী থেকে আগত অ্যাথলিট, প্রতিনিধি

দর্শকেরা এ আগুনের পরশমণি ছোঁয়াবেন নিজেদের প্রাণে। এই অনির্বাণ আগুন আগামী চার বছর "পিরামিড অফ দি সান"-এর উপর জ্বলবে। আগুন জীবনের প্রতীক তাই মেক্সিকো অলিম্পিকের কর্মাধ্যক্ষরা আশা করেন এথেন্স থেকে নিয়ে আসা আগুন মেক্সিকোর অলিম্পিকে এসে নতুন করে জীবনের স্পন্দন দেবে। গড়ে তুলবে বিশ্বভ্রাতৃত্বের সেতু।

এরই সঙ্গে শুরু হবে আর্ট ও হ্যাণ্ডিক্রাফটের এক প্রদর্শনী। প্রাচীন ও আধুনিক দু' সময়ের কাজ থাকবে এই প্রদর্শনীতে। অলিম্পিকে এই শিল্প প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য হচ্ছে এথেন্সের ঐতিহ্য-বাহী শারীরিক পটুতার সঙ্গে শিল্পের মাধ্যমে মনের বৃদ্ধি অর্থাৎ শরীরের সঙ্গে আত্মার বিকাশ ও আনন্দ।

এ ছাড়া পাঁচটি মহাদেশ থেকে বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যালে দল আসবেন। এগুলি পরিচালনা করবেন পৃথিবীখ্যাত ডিরেক্টররা। এ ছাড়া আরও বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। এই সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কোন প্রতিযোগিতা হবে না ও কোন পুরস্কারও নেই।

শিশুদের অঙ্কনশিল্পের যে কর্মসূচী এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে থাকবে তা সংস্কৃতি বিভাগের একটি চিত্তাকর্ষক প্রোগ্রাম হবে। সর্বদেশের শিশু অঙ্কন-শিল্পী প্রতিযোগীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যাতে তারা মেক্সিকোয় এসে এ প্রতিযোগিতায় যোগদান করে।

শিশুদের অঙ্কনশিল্প বস্তুতজীবনের গভীরে মানুষের কল্পনার ছায়া তাই মেক্সিকোর শিল্পীরা এই শিশু শিল্পীদের উৎসাহ দেবার ব্যবস্থা করেছেন। প্রতি দেশ থেকেই দশটি করে শিশু শিল্পীর আঁকা ছবি আসবে। এই উনিশতম অলিম্পিকের অবদান হবে সারা পৃথিবীর লোকেদের আরো কাছে নিবিড় করে নেবার। শান্তি ও মৈত্রীর বাণী প্রচারে মেক্সিকো অলিম্পিক সজাগ। শিশুদের তাই এই বিশ্বমেলায় দরকার। একটি প্রদর্শনী হবে সারা পৃথিবীর শিশুদের আঁকা ছবি ও মুরাল দিয়ে। এই প্রদর্শনীর নাম "এ ওয়ার্ল্ড অফ ফ্রেণ্ডসিপ"। এই সব শিশুরা মেক্সিকো অলিম্পিকে মান্য নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত হবে। এই সব ছবি ও মুরাল মেক্সিকো শহরের কয়েকটি জায়গায় প্রদর্শনী হিসেবে টাঙ্গান থাকবে।

ইতিমধ্যেই একটি ছোট ফিল্ম তোলা হয়েছে ও তা সারা পৃথিবীতে দেখান হবে। ডকুমেন্টারি ছবি, নাম "মেক্সিকো ডচ।" এ ছাড়া একটি ফিল্ম ফেস্টিভাল হবে "ফেস্টিভাল অফ সর্ট ফিল্মস অন দি মিশন অফ ইউথ।"

উনিশতম অলিম্পিকের স্মারক হিসেবে মেক্সিকান সরকার ডাকের স্ট্যাম্প বার করেছেন। প্রদর্শনীর ভেতর "ইণ্টারন্যাশনাল অলিম্পিক ফিলাটেলিক একজিবিশন" নিশ্চয়ই দর্শকদের ভেতর যথেষ্ট আগ্রহের সঞ্চার করবে। এই অলিম্পিক গেমসের সম্মানার্থে মেক্সিকো সরকার একটি নতুন মুদ্রা কিছু দিন হল চালু করেছেন। এই মুদ্রার একদিকে "গেমস অফ দি নাইনটিনথ অলিমপিয়াড মেক্সিকো ১৯৬৮" ছাপা আছে। ইউরোপে, আমেরিকায় ও কানাডায় এখন এই মুদ্রা কিনতে পাওয়া যাচ্ছে।

গত বছরের ডিসেম্বরে অলিম্পিক গেমসের প্রধান বিচারকেরা পাঁচ দিন মেক্সিকান ফিজিকাল এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টে একটি ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল—'উনিশতম অলিম্পিকে প্রধান বিচারকদের গুরুত্ব' আর "খেলাধুলোর সঙ্গে মানবিক সম্বন্ধ।" অ্যাথলিটদের গুণগত বিচারের জন্যে ত্রিশজন প্রধান বিচারক থাকবেন আর তাদের নিচে প্রায় ন' শো' সাধারণ বিচারক থাকবেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মেক্সিকোয় যে হাজার হাজার অ্যাথলিট, প্রতিনিধি, দর্শক ও পর্যটক এসে জমায়েত হবেন তাদের থাকার জন্যেও ব্যবস্থা হয়েছে। বেসরকারী ছোট হোটেল, ভিলা, বাড়ি, বোর্ডিং হাউস ছাড়াও তিন শো'টি ঘর নিয়ে একটি আরামপ্রদ হোটেল তৈরি শেষ হয়ে গেছে, নাম "আরিস্টস।" এতে সাতাশটি সুইট থাকবে আর এক শো আশিটি গাড়ি রাখার জায়গা থাকবে। এর চেয়েও আরেকটি বড় হোটেল মেক্সিকোর একটি পার্কের পাশে তৈরী হয়ে গিয়েছে, নাম তার "ক্যামিনো রিয়েল।" এই হোটেলে দু' শো ছিয়াত্তরটি ঘর থাকবে, চোদ্দটি সুইট আর প্রায় ছ' শোটি গাড়ি রাখার জায়গা থাকবে। এই দুটি হোটেলেই আবাসিকদের সুবিধের জন্যে সর্ববিধ ব্যবস্থা থাকবে যেমন চুলকাটার স্যালুন, বিউটি শপ, বলরুম, রেস্তোরাঁ, বার, কফি আর অজস্র দোকান। এই জুলাই মাসে মেক্সিকো অলিম্পিক কর্তৃপক্ষ সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে আবেদন পত্র পাঠাবেন। যাঁরা আসবেন তাঁরা ওই আবেদন পত্র ভর্তি করে পাঠালে অলিম্পিক গেমসে দর্শক হিসেবে প্রবেশ পত্র ও ওপরের দুটি হোটেলে, কি মেক্সিকোর অন্য কোন হোটেলে থাকতে চাইলে তার জন্যেও টিকিট পাঠান হবে। পুরো অক্টোবর মাস মেক্সিকান সরকার মেক্সিকো শহরের যত হোটেল আছে তা নিয়ন্ত্রণে রাখবেন।

সমস্ত শহরে ও লাগোয়া অলিম্পিক গ্রামে দু' হাজার পাঁচ শো' নতুন ট্যাক্সি ছোটাছুটি করবে। এই ট্যাক্সিগুলো শুধু আগত দর্শকদের নিয়ে যাতায়াত করবে। প্রতি আগন্তুককে একটি করে ব্যাজ দেওয়া হবে কোটে লাগাবার জন্যে। এই ব্যাজ দেখিয়ে যে কোন আগন্তুক ওই সব বাড়তি ট্যাক্সিতে করে খুবই অল্পমূল্যে শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে বিভিন্ন স্টেডিয়াম ও প্রতিযোগিতার জায়গায় যাতায়াত করতে পারবেন। অ্যাথলিটদের জন্যে আরও সুবিধে করে রাখা হবে। অলিম্পিক গ্রামের ভেতর মিনি-বাস অনবরত চলাচল করবে। যে কোন অ্যাথলিট আজটেক স্টেডিয়াম থেকে অলিম্পিক রোয়িং অ্যাণ্ড কেনোইং কোর্স কিংবা অন্য কোন প্রতিযোগিতার জায়গায় সহজেই সামান্য খরচে যাতায়াত করতে পারবেন।

শপিং সেণ্টারে ব্যাংক, পোস্ট অফিস, টেলিফোন ও টেলিগ্রাম, ট্রাভেল এজেণ্টস, ড্রাগ স্টোর, চুলকাটার স্যালুন সবই থাকবে। এ ছাড়া লাইব্রেরী সিনেমা, আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্র ও সুইমিং পুল তো আছেই।

মেক্সিকো শুধু সারা পৃথিবীর নামী নামী অ্যাথলিটদের আবাহনের জন্যেই তৈরি নয় পরন্তু একালে রুচিশীল দর্শকদের জন্যেও তৈরি যাঁরা আর্টের সমজদার। এ ছাড়া সারা পৃথিবীর নামী নামী স্পোর্টস রাইটারও আসছেন। মেক্সিকো অলিম্পিকের কর্মকর্তারাও এঁদের সঙ্গে উষ্ণ হৃদয়ের যোগসূত্র স্থাপন করবেন প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

সৈয়দ মুজতবা আলী

প্রাগ্

গত ৩০ শা সেপ্টেম্বর দিন, ঠিক ত্রিশ বৎসর পূর্বে, সাধনোচিতধামলব্ধ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ে ম্যূনিক শহরে বসে শিশু-রাষ্ট্র চেকো-স্লোভাকিয়া নামক অজবৎসটিকে হ্যার হিটলারের পদপ্রান্তে বলি দেন।

বড় দুর্ভাগা দেশ চেকো-স্লোভাকিয়া। যে-রাশা সেদিন এই বলিদান ঠেকাবার চেষ্টা করেছিল আজ সেই রাশাই চেকো-স্লোভাকিয়ার টুঁটি চেপে ধরেছে।

রাশা ভালো করছে কি মন্দ করছে সে নিয়ে বিস্তর তর্কাতর্কি করা চলে; শুনেছে পাই, রুশ-প্রধানদের ভিতরেই এ প্রশ্ন নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু আমাদের কাছে বড় বিস্ময় লাগে, যখন দেখি, চেম্বারলেন ও দালাদিয়েরের বংশধরগণ আজ হঠাৎ চেকো-স্লোভাকিয়ার প্রতি দরদী বনে গিয়ে তাকে ক্রমাগত রুশের বিরুদ্ধে টুইয়ে দিচ্ছেন।

একদা—১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে—চেম্বারলেনই পোলানডকে টুইয়ে ছিলেন হিটলারের বিরুদ্ধে। শপথ করেছিলেন, 'তুমি আক্রান্ত হলে আমি আছি, ফ্রান্স আছে। আমরা তোমাকে হিটলারের গুণ্ডামি থেকে বাঁচাবো।' কি প্রকারে বাঁচাবেন, সে প্রশ্নটা অনেকেই তখন শুধিয়েছিল—এক পোলানড ছাড়া। সে তখন মরিয়া। যে কোনো খড়কুটো আঁকড়ে ধরে কোনো গতিকে দায়ের উপর মাথাটি ভাসিয়ে রাখতে চায়।

তারপর কি হল সেও লজ্জাকর। হিটলার শব্দার্থে পোলানডের উপর দিয়ে স্টীম-রোলার চালিয়ে গেল। বাবুরা—অর্থাৎ ফরাসীংরেজ মাজিনো লাইনের পিছনে থাপটি মেরে বসে রইলেন। সে লাইনের দুর্গ থেকে বেরিয়ে—হিটলার যখন পূব বাগে পোলানডকে চাটনি বানাচ্ছে—পশ্চিম বাগ থেকে ফরাসীংরেজ কোনো হামলা করলো না। কান্নাকাটি আরম্ভ করলো সেই মুসসলীনির পায়ের তলায় যিনি ১৯৩৮-এ ম্যূনিকে চেকো-স্লোভাকিয়া - অজশিশুটির বলিদানপর্বে প্রধান পুরোহিতের কাজ করেছিলেন। তিনি যেন দয়া করে আবার একটা সমঝাওতা করে দেন। হিটলারের পদপ্রান্তে আর একটি অজবৎস।

হিটলারকে আক্রমণ না করে ফরাসীংরেজের এই চুপসে বসে থাকাটাকে (জিৎস্) মারকিন সাংবাদিকরা মস্করা করে নাম দিয়েছিলেন 'ফোনি উয়োর' ('ভুতুড়ে-লড়াই' অর্থাৎ ভূত তো আদপেই নেই, তার আবার লড়াই কি?) জরমনরা ব্যঙ্গ করে নাম দিয়েছিলেন, 'ব্লিৎস্-লড়াইয়ের' সঙ্গে ধ্বনির সামঞ্জস্য রেখে, 'জিৎস্ (ব'সে ব'সে) লড়াই'! জরমন 'জিৎস্'—ইংরিজী 'সিট্'।

এই যেরকম এক নিগ্রো কোনো মারকিনকে বাইসিকিলে চড়ে যেতে দেখে বলেছিল, 'তাজ্জব ব্যাটারা। ব'সে ব'সে হাঁটতে চায়!'

ফ রা সী ং রে জ চেকো-স্লোভাকিয়াকে তাতিয়ে দিয়ে এই দোসরা মোকায় বসে বসে হাঁটবেনও না। সেরেফ বসে থাকবেন।

শক্তিমানের অত্যন্ত অধর্ম দুর্বলকে তাতানো। যদি শক্তিমান তার শক্তি দুর্বলের সাহায্যে প্রয়োগ না করতে চায়।

* * *

অধম চেকো-স্লোভাকিয়ায় যায় ১৯৩৪ সালে।*

আহা, কী পরিপাটি ছিমছাম সুন্দর দেশ!

লোকে বলে, মধ্য ইয়োরোপে তিনটি মনোহর শহর আছে: প্যারিস, প্রাগ, ভিয়েনা।

ঝাঁ-চকচকে একখানা খাসা ট্রেন তখনকার দিনে ভিয়েনা-প্রাগ গমনাগমন করতো। কামরাতে আমরা তিনজন। স্বর্গত দেশসেবী আনন্দমোহন বসুর পুত্র প্রখ্যাত চিকিৎসক 'অজিত বসু, তাঁর পত্নী ও আমি।

চেক্ ফ্রনটিয়ার কাস্টম্সের মত ভদ্র কাস্টম্সের সঙ্গে আমি এক মাত্র পেত্রাপোল-বেনাপোল কাস্টম্সের তুলনা করতে পারি। উভয়ই অতিশয় চতুর। চটাক্সে বুঝে কে নিরীহ, কে চোরাই। নিরীহকে বড়ই আপ্যায়ন করে।

চেক অপিসার চেক্, ফরাসী, ইংরিজী, জরমন ভাষায় শুধোলে, আমাদের কাছে কোনো-কিছু 'ডিক্লেয়ার' মত আছে কি না।

এ-ফরমুলা আমাদের জানা আছে। এস্থলে অস্কার ওয়াইল্ড্ নাকি আমেরিকা অবতরণ সময় তাঁর মাথায় আঙুল দিয়ে ট্যাপ্ করে বলেছিলেন, 'আমার জিনিয়স্'। তারই স্মরণে আমি বললুম, 'আমার স্টুপিডিটি — আমার আহাম্মুখী।'

অপিসার হকচকিয়ে গেল। আমার বক্তব্যটা ঠিক বুঝতে পারেনি। আমি তখন তাকে ব্যাপারটা সালঙ্কার সবিস্তর সমঝিয়ে বললুম।

ঠাঠা করে হেসে উঠলো। শুধু তাই নয়। পত্রপাঠ উধাও। সঙ্গে নিয়ে এলো তার আধ-ডজন সহকর্মচারী। কাহিনীটি আমাকে পুনরায় বলতে হল।

প্রথম খাস চেক স্টেশনে পৌঁছনো মাত্রই সে আমাদের আপত্তির প্রতি কণামাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে কফি-সসিজ্ খাওয়ালে, বিস্তর ইংরিজী -ফরাসি-জরমন ছবিওলা সাপ্তাহিক দিলে। আমাদের এক ভারতীয় বন্ধু ভিয়েনা স্টেশনে আমাদের এক বোতল শ্যাম্পেন দিয়েছিলেন। সেটা তাকে দিতে গেলে তুলকালাম। শেষটায় যখন আমি সব ভাষা ছেড়ে দিয়ে খাস সিলট্যাতে বললুম, সে এটা না নিলে আমি অপমানিত বোধ করবো, তখন ভাষার ডরের মারে সেটা নিলে।

করে করে আমরা প্রাগ পৌঁছলুম। আহা! কী সুন্দর শহর!

---

* এ-দেশে চেকো-স্লোভাকিয়া সম্বন্ধে সর্ববিদ্যাবিশারদ্ শ্রীযুত মোহন গাঙ্গুলী। তিনি ও-দেশ সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রামাণিক কেতাব লিখেছেন।

ট্রামে বাসে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক মুখপাত্র নাকি বলিয়াছেন যে, ডঃ সেন আবার নির্বাচিত হইলে তাঁহার হাত আরো শক্তিশালী হইবে। সহযাত্রী বলিলেন —"কিন্তু কই, আমরা তো তাঁর ডাম্বেল বা চেস্ট এক্সপেনডার নিয়ে শরীর চর্চার কথা শুনিনি !!"

সাম্প্রতিক এক সংবাদে প্রকাশ, রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদিরিপাদ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, 'মনে হচ্ছে এই সম্মেলন কেরলের খাদ্য চাহিদা মেটাবার জন্য তেমন আগ্রহী নন; পরিস্থিতি যদি তাই হয় তবে ভগবান আমাদের রক্ষা করুন।' সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম বলিয়া ওঠেন: 'তা হলে আপনিও ভগবান মানেন।' নাম্বুদিরিপাদ সলজ্জে বলেন, 'না, না, আমি তা বলিনি। আমার কথা হচ্ছে ওরকম অবস্থা হলে কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না।' শ্যামলাল বলিল—"কিন্তু এতে তাঁর লজ্জার কোন কারণ নেই। শ্রীনাম্বুদিরিপাদ পূজার প্রাক্কালে কয়েকটা দিন কলকাতায় এসে বসবাস করলে জানতে পারতেন, কংগ্রেস আর বামপন্থীর নীতিতে বিশ্বাসী —সকল দলের ছেলেই খাতা হাতে মহামায়ার পূজোয় চাঁদা সংগ্রহে ওঠেপড়ে লেগেছে, ভগবানে বিশ্বাস থাক আর না-ই থাক।"

মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রী এস. পি. সেনবর্মা বলেন: বন্যাপ্লাবিত চারটি জিলায় ঘুরে তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, নবেম্বরে নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোন অসুবিধা নেই। সহযাত্রী বলিলেন—"হক কথাই বলেছেন, বন্যাত্রাণে অর্থ সংগ্রহ, বাঁচবার জন্য খাদ্য সংগ্রহ যত অসুবিধেই থাকুক, ভোট সংগ্রহে কোন অসুবিধে কোন কালেই হয়নি এবং এখনো হবে না।"

সরকারী প্রেস নোটে বলা হইয়াছে, যে-সব সরকারী কর্মী মন্থরগতিতে কাজ করার নীতি গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। —"কিন্তু তা কেন, সর্বজন স্বীকৃত নীতি তো হল, স্লো অ্যাণ্ড স্টেডি উইন্‌স দি রেস্"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

গান্ধী শতবার্ষিক কর্মসূচী অনুযায়ী কলিকাতা টাঁকশালে মহাত্মাজীর ছবি সহ ব্যাজ তৈয়ার হইতেছে। উহার মূল্য মাত্র ১৬ পঃ। বিশুখুড়ো বলিলেন— "বেশ সস্তাই বলতে হয়। মহাত্মাজী নিজেও স্বল্পব্যয়ে বিশ্বাসী ছিলেন বলে কংগ্রেস সদস্যের চাঁদা চার আনা মাত্র ধার্য করেছিলেন। তবে আমাদের বক্তব্য, উপস্থিত ব্যাজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পুরণো গান্ধী টুপি নিশ্চয় টেণ্ডার বলে ঘোষিত হবে তো!"

রাশিয়া নাকি বলিয়াছে ভারত যেন চীনের সঙ্গে ভাব না করে। —"মাঝখানে আমরাই দোটানায় পড়ে গেলাম— ডান দিকেতে তাকাই যখন, বাঁয়ের লাগি কাঁদে রে মন—মানে ভড়কাও গেল, ফ্রায়েড রাইসও গেল"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

সংবাদে শুনিলাম, গঙ্গায় দ্বিতীয় সেতু নির্মাণের বিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। সহযাত্রী বলিলেন—"অবিশ্যি একটি অসমর্থিত সংবাদে শুনলাম নাগাড়ে, খবে কম করেও বিশ বছর, গঙ্গা দিয়ে কত জল গড়ায় তার হিসেব দাখিলের আগে সেতু নির্মাণের কাজে হাত দেওয়া হবে না!!"

অন্য এক সংবাদে প্রকাশ, উদয় নারায়ণপুরের সোনাইচণ্ডী বরাতি বাড়ি পূজা মণ্ডপে ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে। "অতঃপর উদ্যোক্তারা ঘরে বসেই যা দেবী সর্বভূতেষু, ১৪৪ রূপেণ সংস্থিতা মন্ত্র গড়গড় করুন"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

সম্প্রতি প্রাচ্যবিদ্ ডঃ ফ্রেডারিক উইলহ্যাম রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের রাজধানী সম্বন্ধে বলেন: মহাভারতের ইন্দ্রপ্রস্থ, মুসলিম হিন্দুস্থানের দিল্লী, ইংরেজী ও স্বাধীন ভারতের নয়াদিল্লি সংলগ্ন প্রায় একই স্থানে, দূরত্ব সামান্য। ভারতের কেন্দ্রভূমির মূলে কেন্দ্র এই নগরী। খুড়ো বলিলেন—"ভাগ্যিস তিনি কলকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরের সময় জনৈক দূরদর্শীর কথাটা উত্থাপন করেননি, তিনি বলেছিলেন: সাত সাতটা দিল্লী ধ্বংস হয়ে গেছে, অষ্টমটি হতে যাচ্ছে। ডঃ উইলহ্যাম নবমটির আয়ুরেখা হয়ত গণনা করেননি !!"

আনন্দবাজার পত্রিকায় "বাজার সরকার" মাছ-ভাতের ব্যবস্থা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন: কিন্তু মাছের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। মাছের দর চূড়োয় উঠে বসে আছে।—"—আছে। কিন্তু বাজার সরকার খবরটি নিশ্চয়ই পড়েছেন যে, ইনজেকশন দিয়ে মৎস্য প্রজনন বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে। আমরা অবশ্য ওসবে বিশ্বাস করিনে, বংশ হ্রাস করায় লুপ-এর এলেম দেখেছি, সুতরাং বৃদ্ধিতেও ওসবে আর আস্থা নেই। তার চেয়ে বাজার সরকার জেলেপাড়ায় বারোয়ারী ষষ্ঠীপুজোর জন্য সরকারকে মৎস্য ঋণদানের জন্য অনুরোধ করুন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় তাঁর এক সাম্প্রতিক বক্তৃতায় বলিয়াছেন: 'জনগণকে শুভ পথ বেছে নিতে হবে।' বিশুখুড়ো বলিলেন—"তা তো বটেই। কিন্তু বাছাবাছির আর কি কিছু বাকী আছে, সব পথেরই যা দুরবস্থা!"

সংবাদে শুনিলাম, যাঁহাদের ছেলেমেয়ে তিনটির কম, তাঁহাদের আয়কর ছাড়, জীবনবীমায় প্রিমিয়ামের সুবিধা এবং বার্ষিক বোনাস দেওয়ার সুপারিশ করিয়াছেন ক্ষুদ্র পরিকল্পনা কমিটি। সহযাত্রী বলিলেন—"যাঁরা আঁটকুড়ো তাঁদের কী কী সুবিধে দেওয়া হবে তা ঘোষণা করলে অনেকে অন্তত কনসোলেশন প্রাইজের আনন্দ পেতেন!!"

আই এফ এ-র পদত্যাগী সভাপতি শ্রীস্নেহাংশু আচার্য বলিয়াছেন: আই এফ এ কায়েমী স্বার্থের গোষ্ঠীচক্র, ভালো কিছু করা সম্ভব নয়।—"ভদ্রলোক, অপ্রিয় সত্য যে বলতে নেই এই নীতি শিক্ষা করেন নি"—বলেন বিশু খুড়ো।

বিশ্বনাথ বসু

সুন্দরবনের ব্যর্থ বাউলী

"বড় শেয়ালে মেরেছে", "লাশ উদ্ধার করে এনেছে"—অস্পষ্ট আলাপের বিক্ষিপ্ত কথাগুলি আমাকে উৎকর্ণ করে তুললো। ভোরের তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব তখনও কাটেনি—বিছানায় শুয়ে আছি। বন্ধুবর সতীশ মন্ডল, মণিমোহন ব্যানার্জি তখনও ঘুমিয়ে। সুন্দরবন সংলগ্ন শেয়ালফেলী অঞ্চলের মেছো-ভেড়ির মালিক সতীশ মন্ডলের অতিথি আমরা। কৌতূহলী মনে মশারি ঠেলে বাইরে এলাম।

মাতলা নদীর চরে উঁচু বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে কথা বলছিল দুজনে। হেড়েভাঙ্গা উদ্বাস্তু কলোনীর তিন নম্বর ব্লকের বৃদ্ধ বাউলী (বাঘের গুণিন) শীতল মন্ডল জঙ্গলে মাছ ধরতে গিয়ে বাঘের হাতে মারা পড়েছে। সঙ্গী জেলেরা অর্ধভুক্ত মৃতদেহ তার উদ্ধার করে গত রাত্রে গ্রামে ফিরেছে।

আঁকা বাঁকা বাঁধের বুকে দ্রুত পা চালিয়ে প্রায় পাঁচ মাইল দূরবর্তী তিন নম্বর ব্লকের খাল ধারে পৌঁছুতে দেড় ঘণ্টার বেশী লাগলো না আমার। অদূরে ঝাউয়ের তলায় একটি ছোট জটলা। আমাকে দেখে সমীহভরে এগিয়ে এলো কয়েকজন। চেহারায় তাদের চরম দারিদ্র্যের ছাপ—আতংকভরা চোখের চাহনিতে বিহ্বলতার চিহ্ন।

খালের মধ্যে একটি ছোট খোলা ডিঙিতে কাপড়ে মুখ ঢাকা অবস্থায় মৃতদেহ শায়িত। আমার দেখবার সুবিধার জন্য কাপড়টি সরিয়ে দিল একজনে। সবিস্ময়ে দেখলাম কোমর থেকে হাটু পর্যন্ত সম্পূর্ণ বাম উরুটি বাঘে খেয়ে ফেলেছে। মাত্র সরু একটি চামড়ার ফালিতে দেহ ও হাটুর নিম্নাংশ তখনও যুক্ত। কানের পাশে ও গলদেশে বাঘের চারটি দীর্ঘ দন্তের গভীর দংশন ক্ষত। বোধ হয় বয়স্ক লোকের আঙ্গুল ঢুকে যেতে পারে এমনই সেই ক্ষতের বিস্তৃতি ও গভীরতা। গলদেশের ক্ষত অধিক উন্মুক্ত। দুই স্কন্ধে সুতীক্ষ্ণ নখের রক্তাক্ত আঁচড়। বৃদ্ধের মাথার কাঁচা-পাকা চুল যেন আঠায় মেখে মাথার খুলির সাথে লেপটে শক্ত চাপ বেঁধে গিয়েছে। চক্ষুগোলক দুটি স্ফীত—যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কি বীভৎস দৃশ্য। চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

উপস্থিত লোকদের নিয়ে একটি ঝাউ-গাছের ছায়ায় বসলাম। প্রত্যক্ষদর্শী দু-একজনকে পেলামও সেখানে। বিস্তারিত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ঘটনার সম্পূর্ণ নিখুঁত চিত্রটি যেন ধীরে ধীরে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

"বাবু, কিভাবে বোঝাব আপনারে। মনে হল যেন জঙ্গলের পাড় থেকে তিড়িং করে একটা হলদে পাখি উড়ে এলো। আর মামার মাথাটা শূন্যেভরে গিলে নিয়ে বড় শেয়ালটা ঝপাত করে খালের হাটুসমান কাদার মধ্যে এসে পড়লো—আমার থেকে দেড় দু হাত দূরে। কাদা ছিটকে চারিদিক ছত্রাকার—আমারও গায়ে মাথায় একাকার।"

নির্বাক বিস্ময়ে বর্ণনা শুনছি আলগা গায়ের রোদে পোড়া রুক্ষসুক্ষ তামাটে চেহারার একদল ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পরিবৃত অবস্থায়। বক্তা মৃত শীতল মন্ডলের ভাগ্নে। সংশ্লিষ্ট জেলে দলের মুখ্য সংগঠক ছিল সে।

সংবৎসরের ফসল ফলে না কলোনীর নোনা জমির অনুর্বর বুকে। ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য চারিদিকে। খেত-মজুরি মেলাও দায়। পূর্ব বঙ্গের এককালের সম্পন্ন কৃষক দেশের স্বাধীনতার মূল্যে চিরস্থায়ী বেকারী কিনেছে আজ। লাঙ্গলের ফলার কর্ষণে মন্থনে মৃত্তিকা গর্ভ থেকে স্বর্ণখনি

উত্তোলন করে এককালে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পূর্ণ করতো যারা, সাতচল্লিশের কুটিল রাজনৈতিক দাবা খেলার অর্থনৈতিক লোকসানের বেশীর ভাগ অংশ পূরণ করে দিতে হয়েছে পূর্ব বঙ্গের সেই লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবী মানুষকে তাঁদের যথাসর্বস্ব খুইয়ে।

হেড়েভাঙ্গা উদ্বাস্তু কলোনীর বাঁধ-আলের সর্পিল পথে পথে আমি দীর্ঘ পরিক্রমা করেছি আর ভেবেছি—এ যেন তৎকালীন পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে একটি পূর্ব পরিকল্পিত চক্রান্ত-জাল। এ বোধ হয় জাতির সব চাইতে তেজী ও সৃষ্টিশীল অংশকে দুর্বল ও বিধ্বস্ত করে ফেলার সুচিন্তিত কৌশল। সর্বস্বের বিনিময়ে স্বাধীনতা এনে দিয়ে দীন ভিখিরিতে পরিণত হয়েছে যারা, জীবন-সংগ্রামে অসীম ধৈর্য ও শক্তির অধিকারী তাদেরকে দিয়ে যেন উদ্দেশ্যমূলকভাবে অন্ন ও আশ্রয়ের লোভ দেখিয়ে দেশের যত বন, বাদাড়, আস্তাকুড় সাফ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু বঞ্চনাভরা পরিকল্পনায় মাথা গুঁজবার ঠাঁই মিললেও ভরপেট অন্নের সুরাহা হয়নি। পেটের ক্ষুধা তাই টেনে নিয়ে যায় তাদেরকে সুন্দরবনের গভীরে মাছ, মধু, কাঠের সন্ধানে।

ওরাও গিয়েছিল পাঁচজনের একটি দলে। নির্বাচিত নেতা বা বাউলী ছিল অভিজ্ঞ শীতল মণ্ডল—অবিভক্ত বাংলার খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমা থেকে আগত উদ্বাস্তু।

কুখ্যাত চামটা ব্লকের লাগোয়া এলাকা—মৎস্যরাজের জমজমাট রাজধানী। তাই হয়ত রক্ষক হিসাবে তীক্ষ্ণ নখদন্তে সজ্জিত মহা-পরাক্রমশালী বন-বিবির বাহনের সদা সর্বদা প্রহরা এখানে। সব জেলেই ভয় পায় জাল পাততে এই এলাকায়।

পূর্ব বাংলার সুন্দরবনের দুর্গম জঙ্গলের কোলে মানুষখেকো শয়তানের ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে কৈশোর যৌবন কেটেছে যে লোকের, পশ্চিমবঙ্গের হালকা জঙ্গলে তার প্রাণ ডরায় না। মাছের পাথালী দেখে বাউলীর নির্দেশে একটি খাড়ি খালের মুখে জালের বন্ধনী দিল জেলেরা।

মধ্যরাত্রে ঘেরাওয়ের কাজ সেরে পরিশ্রান্ত জেলেরা নদীর স্নিগ্ধ হাওয়ায় নৌকোর ছইয়ের মধ্যে গভীর ঘুমে নিমগ্ন।

ভোর রাতে ভাটার টান ধরেছে। জোয়ারের তোড়ে প্রচুর মাছ ঢুকেছে খালে। এক মুখ-মজা খাড়িখালের বাইরের মুখ জালে বন্ধ থাকায় ভাটার টানে খালের মাছ বেরুতে পারবে না—জালে আটকা পড়বে। পুনরায় জোয়ার আসার পূর্বেই কাদায়ভরা খালের বুক থেকে ছোট বড় সমস্ত মাছ খুঁজে পেতে কুড়িয়ে ঝাঁকায় তুলে নিতে হবে। কাজেই পুব আকাশ ফিকে হবার সাথে সাথেই শীতল মণ্ডল ডিঙ্গির ক্ষুদ্র ছইয়ের মধ্যে কুণ্ডুলী পাকানো নিদ্রিত সাথীদের তাড়া দিয়ে বের করে খালের চরে নামালো।

বনের ভিতর দিকে খালের মজা মুখ থেকে মাছ কুড়নো শুরু করতে হবে—সেইটাই পদ্ধতি। ভাটার টানে খালের জল তোড়ে বেরিয়ে আসছে বাইরের দিকে। খাল ও নদীর মোহনায় জালের বাইরে ডিঙ্গিখানা আড়াআড়িভাবে দুই মাথায় দুটি লম্বা কাছি দিয়ে ডাঙ্গায় মোটা গাছের গুঁড়িতে বাঁধা। তা সত্ত্বেও নিরাপত্তার তাগিদে লগি পুঁতে বা নোঙর ফেলে ডিঙ্গিটিকে জলের মাঝ বরাবর রাখতে হয়েছে। অন্তত সুন্দর-বনের খালে এইভাবে নৌকো বাঁধা অধিক নিরাপদ। ভাটার সময় নৌকো স্বাভাবিক-ভাবে নিম্নগামী জলের লেভেল নামতে চায়। তাই দুই মাথার কাছিও ঢিলা রাখতে হয়।

সুন্দরবনের দুর্ধর্ষ মানুষখেকো বাঘ এমনই চতুর যে, রাতের অন্ধকারে ডাঙ্গায় গাছের আড়ালে লুকিয়ে কাছির গায়ে বক্র নখের আঁচড়ে বা দাঁতের কামড়ের মৃদু টানে ডিঙ্গি ধীরে ধীরে কূলে এনে নিদ্রিত আরোহীকে তুলে নিয়ে জঙ্গলে অন্তর্হিত হয়। অসুবিধা বুঝলে সন্তর্পণে সাঁতরে এসে নৌকায় উঠতেও তারা ইতস্তত করে না। সুন্দরবনে হামেশাই এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। তবুও জীবন ধারণের অনিবার্য তাগিদে সুন্দরবন সংলগ্ন পল্লী অঞ্চলের বুভুক্ষু মানুষদের দলে দলে ব্যাঘ্র অধ্যুষিত জঙ্গলে গতায়াতের বিরাম নেই। না গিয়ে বাঁচার মত বিকল্প কোন উপায়ও নেই তাদের।

খালের উভয় তীর সংলগ্ন জঙ্গলের সীমানা তখনও আবছা অন্ধকারে ভরা। বাউলী শীতল মণ্ডল বয়সে বৃদ্ধ হলেও আরণ্যক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে মনের দিক দিয়ে সে যেন বাঘের মতই তেজী। চোখের দৃষ্টি যেন তার এখনও হিংস্র শ্বাপদসুলভ তীব্র ও অন্তর্ভেদী। কাপড় হাঁটুর উপরে তুলে মালকোচা দিয়ে বেঁধে গিঁট এঁটে তেল সিঁটানো গামছাখানা মাথায় ফেটি করে ঘুরিয়ে বাঁধলো বাউলী। দীর্ঘস্থায়ী অনাহারজনিত নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়ায় বাহুর পেশী শুষ্ক—যেন কাঠামোই আছে, শাঁস নেই। চেতালো বুকের ছাতির পাঁজর সুস্পষ্ট—রূপ লাবণ্য অদৃশ্য। তবুও বৃদ্ধের মাথায় পাগড়ী বাঁধার কায়দায় অতীত শৌর্যের পরিচয় মেলে।

ভোর রাতে নদীর ঠাণ্ডা হাওয়ায় জড়-সড় হয়ে তিনজন জেলে গামছা গায়ে চরে নামলো। কারো হাতে মাছের ঝাঁকা, কারো হাতে জ্বলন্ত হ্যারিকেন, শেষজনের হাতে একটি কাটারি। কাঁচা ঘুমের জড় তাদের এখনও।

ডিঙ্গির গলুই টেনে রেখে শীত[illegible] যখন অন্যান্যদের চরে নামাচ্ছে-দৃষ্টি তার তখনও ইতস্তত ঘুরছে পাশের জঙ্গলের আনাচে-কানাচে। খেকো বাঘ অফুরন্ত ধৈর্যের অ[illegible] সারাটা রাত ঘাপটি মেরে বসে থাক[illegible] ভোরে নৌকো থেকে লোক নামে[illegible] ধরতে, কাঠ কাটতে, প্রাতঃকৃত্য দাঁতন ভাঙ্গতে বা নৌকোর কাছি যে বাঘের ধৈর্য একটু কম বা ক্ষিধের তাগাদা বেশী তাদের কৌশল আমি পূর্বেই উল্লেখ করে[illegible]

চরে নেমে বাউলীর প্রথম ও প্রধ[illegible] হচ্ছে বনবিবির নামে সহযাত্রীদের 'মাটিপড়া' দেওয়া—কেউ যেন বাদ ন[illegible] এই 'মাটিপড়া'ই হচ্ছে আগ্নেয়াস্[illegible] তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাসী সংস্কারান্ধ অ[illegible] মানুষদের তথাকথিত একমাত্র রক্ষা[illegible]

খালের চরে তখনও বহির্মুখী তোড়—পায়ের পাতার উপর দু[illegible]তি ডুবে যায়। খালের মজা মুখ প্রায় মাইল দূরে। সে পর্যন্ত পৌঁছুতে [illegible] লাগবে তার মধ্যে জল অনেকটা নেমে একে একে সবাইকে মাটিপড়া দেওয় হলে শীতল নিশ্চিন্ত হল। নিশ্চি[illegible] এই কারণে যে, বাউলী তখনও তো মাত্র আভাস পায় নি যে ঠিক সেই ম[illegible] তারই অলক্ষ্যে তারই মন্ত্রশক্তির এক প্রতিদ্বন্দ্বীর দুটি শুর্তে চোখ জ[illegible] আড়াল থেকে ক্রূর দৃষ্টিতে লক্ষ মন্ত্রঃপূত জেলেদের গতিবিধি, ক্রিয়া —শেষ সুযোগের আশায়।

বাউলীকে সামনে নিয়ে চার [illegible] দলটি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল খাল[illegible] জঙ্গলের কিনারা ঘেঁসে। পায়ে পায়ে ছপ ছপ জলের শব্দ। ডিঙ্গিতে রইল একজন রান্নাবান্নার জন্য। ডিঙ্গিটি যথা এনে লগি পুঁতে বাঁধতে বাঁধতে সে করলো প্রজ্বলিত হ্যারিকেন হাতে স[illegible] তার এগিয়ে চলেছে সম্মুখের দিকে। শুকোলে পর মাছ কুড়নো শেষ করে ফিরে আসতে যথেষ্ট দেরীই হবে। ক[illegible] আরো কিছু সময় ঘুমিয়ে নেওয়া [illegible] পারে। চাদর মুড়ী দিয়ে লোকটি ছ[illegible] মধ্যে শুয়ে পড়লো।

মানুষখেকোর রাজত্বে এই মুহূ[illegible] সম্পূর্ণ একা সে। গা ছম ছম করছে—আর আসে না। কি এক অকল্প[illegible] অমঙ্গল অনুভূতি যেন তার মনকে আ[illegible] করে আনছে—শরীরে শিহরন তুল[illegible] উৎকর্ণ হয়ে রইল সে। সাথীদের পা[illegible] শব্দ আর শোনা যায় না। উঁকি [illegible] দেখলো—হ্যারিকেনের আলোও অদৃ[illegible]

খালের প্রথম বাঁক পেরিয়ে গিয়েছে হয়ত সাথীরা।

চাদরে কান ঢাকা দিয়ে আয়েস করে শতে গিয়ে লোকটির কানে এলো—জেলেরা যে পথে এগিয়ে গিয়েছে সেই পথের জলে পায়ের ছপ ছপ শব্দ তুলে পুনরায় কে যেন ঐ দিকেই যাচ্ছে। সাথীদের কেউ কি প্রাতঃকৃত্যে বসেছিল? না, তা হলে আলো হাতে অন্যান্যরা নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে যেত—কখনই তাকে একা রেখে এগিয়ে যেত না। তা হলে কে হতে পারে? কার পায়ের শব্দ? ঘাড় ঘুরিয়ে আবছা অন্ধকারে কিছু দেখাও গেল না—বোঝাও গেল না। ইচ্ছে হল চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করতে। কিন্তু গলায় স্বর ফুটলো না। 'নিশি' পেল নাকি? কাঁচা বাদা—বলা যায় না। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে চোখ বুজে পড়ে রইল লোকটি।

চতুর্দিকে ফর্সা হয়ে গিয়েছে। মাছ ধরা শেষ হলেই লোকজন সব এসে পড়বে। শয্যা ত্যাগ করে হাত মুখ ধুয়ে নৌকোর লোকটি রান্নায় মন দিল। কিন্তু অন্তর্মনের অস্বস্তি তার কাটে না। উপরের ঠাসা জঙ্গলের ভিতরে আগাছার ডালপালা অতি সন্তর্পণে ঠেলে কোন একটি জানোয়ারের এগিয়ে আসার মৃদু শব্দ কানে এল। কান খাড়া করে শুনলো লোকটি। জঙ্গলের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে অভ্যস্ত কান তার ভুল শোনেনি। মনও অযথা সজাগ হয়নি। শরীরে যেন বিদ্যুতের শক্ লাগলো। মন বলছে—শব্দটি নিশ্চিতই একটি ভারী জানোয়ার চলাচলের। কোন্ সে জানোয়ার সুন্দরবনের মানুষকে সে কথা বলে দিতে হবে না।

সচকিত ও সন্ত্রস্ত লোকটি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো—'ছবির', 'ছবির।' আদ্যিকালের কোন এক অরণ্য-ফকিরে নাম 'ছবির।' বাঘেরা নাকি তার নামে ভয় পায়। চিৎকারের পর সব চুপ চাপ। জঙ্গলের শব্দ জঙ্গলেই মিলিয়ে গেল। সন্ত্রস্ত মনে উনুনের আগুন উসকে দিয়ে লোকটি রান্নায় মন দিল।

খাড়ি খাল শুকিয়ে গিয়েছে। চারজন জেলে খালের হাঁটুসমান জলকাদার মধ্যে আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে মাছ কুড়িয়ে এগুচ্ছে। যেদিক থেকে ওরা এসেছিল সেই দিকে পাড়ের ঢালুতে প্রথমে বাউলী শীতল মণ্ডল— খালি হাতে। চার পাঁচ হাত দূরে বাউলীর ভাগ্নে—সেও খালি হাতে। খালের মধ্য শিরা ছেড়ে বিপরীত পাড়ের ঢালুতে প্রায় এক হাত উপরে তৃতীয় জন—হাতে একটি তীক্ষ্ণধার কাটারি। সবশেষে শেষজন—হাতে মাছের ঝাঁকা ও নেবানো হ্যারিকেনটি।

বিভিন্ন রকমের অজস্র মাছ। সবাই মাছ কুড়োতে ব্যস্ত। উবু হয়ে মাছ কুড়োতে

কুড়োতে কোমর ধরে যায়। মধ্যে মধ্যে সোজা হয়ে দেহ টান টান করে না দাঁড়ালে চলে না। ঐ সময় পাড়ের জংগলের দিকে নজর পড়তেই সতর্ক চোখের অনুসন্ধানী দৃষ্টি ঘুরপাক খেতে থাকে ঝোপ ঝাড়ের গলি-পথে। কিন্তু যাকে খোঁজা তার আবির্ভাব কি আর সহজে বোঝা যায়? শুকনো লতা-পাতার স্বাভাবিক রঙে নিজ দেহকে মিলিয়ে দিয়ে দক্ষ ছদ্মবেশী সে নিঃশব্দে অপেক্ষা করে তার নির্বাচিত মানুষটির লোভে।

সারা জীবনে অপরাজিত বৃদ্ধ বাউলীর হাব ভাব বোঝা দায়। সুন্দরবনের জলে জঙ্গলে এমন ঘটনাও শীতল মণ্ডলের জীবনে বিরল নয়—সাথীদের কেউ যখন বিন্দুমাত্র কোন ইঙ্গিত পায় নি—বাউলী তখন সতর্ক দৃষ্টি, সজাগ কান ও শক্তি-শালী অন্তর্মনের নির্দেশে মহা দুর্ঘটনার হাত থেকে অপরের জীবন রক্ষা করেছে। মন্ত্র কাউকে রক্ষা করেনি—সাহস সতর্কতা ও অচঞ্চল সরব দাপটেই জীবন রক্ষা পেয়েছে। শীতলও যে এ কথা মর্মে উপলব্ধি করে না এমনও নয়। তাই মুখে মন্ত্রোচ্চারণের সাথে সাথে সবার অজ্ঞাতে সতর্ক থাকে সে সর্বক্ষণ।

কিন্তু বিচারটা তো এক তরফা করলেই চলবে না। মানুষ আর মানুষখেকো—খাদ্য খাদক সম্পর্ক। জীবনের ভয়ে খাদ্য যেমন কখনও অসতর্ক হবে না—খাদকও সেইরূপ জীবনধারণের অপরিহার্য প্রয়োজনে স্বল্প কৌশল বা চাতুর্যের পরিচয় দেবে না।

সূর্যকরোজ্জ্বল নোনা নদীর জল চিক চিক করছে। ঘন সবুজ আবরণে প্রকৃতি দেবীর কি অপূর্ব রূপ! সব কিছু ভুলিয়ে দিতে চায়। সংসারী মন ঐ রূপের মোহে যেন উদাসীন হয়ে যায়। কিন্তু অলক্ষ্যে অপেক্ষা-রত নরমাংসলোভী ক্ষুধার্ত কৌশলী শত্রু—সে তো উদাসীন নয়!

'ঝপাত্'—অকস্মাৎ বজ্রপাত হল। আচমকা শব্দে আশপাশের সবাই বিহ্বল—বিস্ফারিত নেত্র। প্রথম চীৎকার দ্বিতীয় জেলে—শীতলের ভাগ্নের। "ওরে শালা, মামারে ছেড়ে দে, ছেড়ে দে আমার মামারে, শালা, ছেড়ে দে আমার মামারে", "বাবু, আমার চোক্ষের সামনে এহনও যেন সব ভাসতিছে। কনুই দিয়ে বড় শিয়ালডার মাথায় গুঁতোচ্ছি আর চেঁচাচ্ছি—ওরে শালা, মামারে ছেড়ে দে—ছেড়ে দে মামারে—ছেড়ে দে। মামার পুরো মাথাডা শালার মুখির মধ্যি—আর আমি সমানে তার কপালে কনুই ঠুকতিছি। তহন তো আমি বেহুঁশ হয়ে গেছি—ভয়-ডর কিছুই ছেলো না।" "ওর হাতটা তো বাবু কাদা আর বাঘের মাথার লোমে লেটিপেটি হয়ে ছিল"—বলল ... উপবিষ্ট অন্য একজন জেলে।

তাপদগ্ধ মধ্যাহ্নে আমাকে ঘিরে ঝাউত... তখন অনেক লোকের ভিড়। "গলায় ... দুটি অতটা উন্মুক্ত কেন? জিজ্ঞে... করলাম ওদের। বাঘ যখন বাউলীর ম... কামড়ে ধরে কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে আ... বাউলীর ভাগ্নের হম্বিতম্বিতে সাহস পে... তৃতীয় লোকটি ছুটে এসে উপর্যু... কাটারির কোপ মারতে থাকে বা... মাথায়। মনে সাহস এলেও হাতে জো... আসেনি—তাই কোপেও কাজ হয়নি। কি... প্রতিবার কোপের সাথে সাথে গলায় মৃ... গর্জনের ধমকানি দিয়ে বাঘ এক পা দু'... করে পেছনে হটে গিয়েছে—তবু মুখে... কামড় ছাড়েনি কিছুতেই। ফলে প্রতিবারে হেঁচকা টানের ঝটকায় দংশনবদ্ধ গলা... পাতলা চামড়ার ক্ষত ক্রমান্বয়ে উন্মুক্ত হ... গিয়েছে।

কাটারির কোপ খেয়েও বাঘ যখ... পালালো না বা বাউলীকে ছাড়লো না... তখন ওদের হুঁশ ফিরে এল এবং সবা... নৌকোর দিকে পালাতে লাগলো। মাঝ পথ... পৌঁছে একবার সাহস করে তারা পেছ... ফিরে দেখে—বাউলীর মাথাটি পুরো... কামড়ে ধরেই মধ্যখালের হাঁটুসমান কাদা...

মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘাড় উঁচু করে রোষকষায়িত দৃষ্টিতে বাঘ তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

ঝটপট নৌকো খুলে নদীর অপর পারে গেল তারা। সেখানে একই গ্রামের অন্য কয়েক দল জেলে মাছ ধরছিল। তাদের মধ্য থেকে আট দশজন লাঠিসোঁটা নিয়ে একজোট হয়ে ফিরে এলো লাশের খোঁজে। বাঘের পায়ের দাগ দেখে হইহই করতে করতে ঢুকলো গিয়ে তারা বনের মধ্যে। খাল থেকে প্রায় ষাট সত্তর গজ দূরে লাশ পাওয়া গেল অর্ধভুক্ত অবস্থায়। বাঘ ওখানেই বসেছিল। অত মানুষের হল্লায় ভাঁট দেখাতে সাহস হয়নি—তাই সরে গিয়েছিল কিছুটা দূরে ঝোপের আড়ালে। মুখের শিকার হাতছাড়া হচ্ছে দেখে বিরক্ত হয়েছে যথেষ্ট এবং গজরাতে গজরাতে উদ্ধারকারী দলকে অনুসরণ করে গিয়েছে খালধার পর্যন্ত। কিন্তু প্রতি-আক্রমণের সাহস হয়নি তার।

বিস্তারিত বর্ণনা শুনে যা বুঝলাম তাতে মনে হয় শীতল মণ্ডল ভোর রাতে জেলেদের ডিঙি থেকে যখন চরে নামিয়েছে—বাঘ তখন জঙ্গলের আড়ালে বসে সর্বক্ষণ ওদের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ করেছে এবং পরে খালের জল ভেঙে জেলেদের পিছু নিয়েছে। নৌকোয় অপেক্ষারত লোকটি জেলেদের গমন পথে খালের জলে দ্বিতীয়-বার যে 'ছপ' 'ছপ' শব্দ শুনেছিল নিশ্চিতই তা বাঘের পায়ের শব্দ। জ্বলন্ত হ্যারিকেন হাতে সর্বক্ষণ জোট বেঁধেই এগিয়েছে জেলেরা। ফলে পিছু নিয়েও শেষ পর্যন্ত তাদের উপর হামলা করার সাহস বা সুযোগ হয়নি বাঘের। অনেক ভাবনা চিন্তার পর বাঘ ভোরের দিকে জঙ্গল ঠেলে ফিরে এসেছিল নৌকোয় নিঃসঙ্গ মানুষটির লোভে। কিন্তু জঙ্গলের শব্দে জানাজানি হয়ে যাওয়ায় এবং লোকটির ছাঁবির' 'ছাঁবির' চীৎকারে বিব্রত বাঘ 'ছাঁবির' নামক বন-ফাঁকিরের ভয়ে না হলেও লোকটির রহস্যজনক হই হল্লায় এ চেষ্টা ত্যাগ করে পুনরায় ফিরে গিয়েছিল জেলেরা যেখানে মাছ কুড়োচ্ছে সেখানে। পর পর দুটো প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় বাঘের জেদও বেড়ে গিয়েছিল এবং পেটের রাক্ষসী ক্ষিধেও জ্বালাচ্ছিল।

জেলেরা মাছ কুড়োচ্ছে একমনে। সব-চাইতে নিকটের লোকটির চাউনি কড়া কড়া। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিকটে থাকায় ওকে নেওয়াই বেশী সুবিধার। সিদ্ধান্ত ঠিক রেখে অসীম শক্তির আধার পেশী-বহুল ডোরাকাটা দেহটিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে স্থির লক্ষ্যে চরম উত্তেজনায় নক্ষত্র বেগে বাঘ ঝাঁপ দিল কাদাভরা খালের বুকে। নিয়তি সহায়—এই তৃতীয় চেষ্টা তার ব্যর্থ হোল না। তন্ত্রমন্ত্রের সমস্ত বন্ধনী ও রক্ষাকবচ ছিন্ন করে জেলের দলের একমাত্র ভরসা বাউলী, অর্থাৎ গুণিনকেই বাঘ হত্যা করলো।

ঝাউতলায় বসে ঘাড় ঘুরিয়ে শীতলের মৃতদেহের দিকে পুনরায় তাকালাম। মাথার চুলে যেন সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হচ্ছে। আক্রান্ত হবার পর গোটা মাথাটি অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাঘের মুখের মধ্যে ছিল। রক্তলোলুপ শ্বাপদের মুখনিঃসৃত লালাস্রাবে মাথার চুল ভিজে গিয়েছিল। পরে রোদ হাওয়ায় শুকিয়ে চাপ বেঁধে গিয়েছে—তাই চক্ চক্ করছে। কি মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের চিত্র আমার চোখের সামনে! নিকটে বসে থাকা আর সম্ভব হল না। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে চললাম বাঁধের পথে।

রুদ্ধবাক ছিন্নবাস একটি যুবক সাশ্রু-নয়নে প্রণাম করলো আমাকে। শীতলের হতভাগ্য পুত্র সে। নিজেরও চোখের জল সামলে নিলাম অতি কষ্টে।

কয়েকজন ধীর পায়ে অনুসরণ করলো আমাকে। কিছুদূর এগিয়েছি পেছনে ধপ্ করে শব্দ হল। ফিরে চেয়ে দেখি—ছাতি হাতে একটি লোক বাঁধের ওপর মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। শুনলাম—ঝড়খালি বাজারের মাছের আড়ত-দার সে। গরীব জেলেদের অনেকগুলি দলকে জাল, দড়ি, নৌকো ও সাজ সরঞ্জাম কিনবার মূলধন যুগিয়েছিল। মাছ যা ধরা পড়বে জেলেরা তাকেই দেবে এবং দাম থেকে কিছু কিছু করে ধীরে ধীরে দেনাও শোধ হবে—এই চুক্তি। কিন্তু শীতলের মৃত্যু সংবাদে ভীত সন্ত্রস্ত জেলেদের সব কটি দলই হাত গুটিয়ে জাল দড়ি নিয়ে গ্রামে ফিরে এসেছে। এই অনাহারী, অর্ধাহারী গরীব লোকদের কাছ থেকে দেনার টাকা পরিশোধ হবে কিভাবে? চরম দুর্ভাবনায় জ্ঞান হারিয়েছে উক্ত স্বল্প পুঁজির উদ্বাস্তু মহাজনটি।

"বাবু, আমার নিবেদনটা একটু শুনলেন না।" হাতজোড় করে বিনীতভাবে লোকটি এগিয়ে এলো আমার বাঁ পাশে। "কি কথা তোমার?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে। "এক খেপ মাছ বাজারে পেঁৗছে দিয়ে ভোর রাতে ভাঁটার গোন ধরে নেমে চলেছি আমরা তিন জোড়া দাঁড়ের টানে নদীর কূল ঘেঁসে।" ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছে লোকটি। "আবছা আলোয় দেখি একটা জানোয়ার যেন বনের লাগোয়া চর বরাবর এগোচ্ছে। প্রথমে মনে করলাম হরিণ টরিণ হবে। কিন্তু ছোট ছোট নালাগুলো যখন সে এক এক লাফে পেরোচ্ছে দেখলাম—তখন বুঝলাম, বাঘ পিছু নেছে। হালের কোলটানের এক ঝটকায় ডিঙির মুখ বার-জলে দিয়ে দাঁড়ে জোর দিলাম। ডিঙির গতি যত বাড়ে দুরন্ত বাঘ জল-কাদা ভেঙে তত ছোটে। হঠাৎ তার সামনে একটা চওড়া নালা পড়ে গেল। লাফের পাল্লার বাইরে সে নালা। থমকে দাঁড়ায় পড়ে এমন এক ডাক ছাড়লো বাঘ—বাবু, মনে হল যেন ভাঁটির গন্তে বান ডেকে গেল। আর এগোল না সে। এদিকে সকালে জঙ্গলে পেঁৗছেই শীতল বাউলীর খবর শুনি। জাল না নামিয়েই যে ভাবে গিয়ে-ছিলাম ঐ ভাবেই গ্রামে ফিরে আসি আমরা।"

"কিন্তু কথা হচ্ছে বাবু, কি করে এই যমদূতের রাজত্বে বাঁচবো আমরা তাই বলেন? আপনারা শহরের শিকারীরা বন্দুক টন্দুক নিয়ে আসেন। আমরা নৌকো দেব, মাঝি দেব, গাইড দেব, বাঘের আসল ডেরায় নিয়ে গিয়ে হাজির করে দেব। দয়া করে আমাদের বাঁচান—বাবু, আমাদের বাঁচান।" নির্বাক শ্রোতা হয়ে শুনলাম তার কথা—কি ভরসা দেব ভেবে পেলাম না।

আলু থালু বেশে কে ঐ নারী ছুটে আসছে খালের দিকে? দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলাম নিকটে। দুজন প্রতিবেশী দৌড়ে এসে বৃদ্ধার হাত ধরলো। অনুসন্ধানে জানলাম—মৃত শীতল মণ্ডলের স্ত্রী। কাল রাত থেকে কলোনীর ঘাটে বাঁধা নৌকায় শায়িত স্বামীর মৃতদেহকে আঁকড়ে বসেছিল বাংলার এই অভাগিনী গৃহস্থ-বধূ। দীর্ঘ সময় ধরে জীবনের সবটুকু চোখের জল নিঙড়ে নিঃশেষ করে দিয়ে এখন শুধু নিজের অনাহারক্লিষ্ট কঙ্কাল-সার বক্ষপঞ্জরে ক্রমাগত করাঘাত করে ঊর্ধ্বাকাশের দিকে চেয়ে উন্মাদিনীর মত প্রাণফাটা আর্তনাদে অদৃশ্য দেবতাকে অভিসম্পাত দিচ্ছে সে। নিরপরাধ এই বিধবা মহিলার কাতর সে আর্তনাদ স্বর্গের দেবতার কানে পেঁৗছেছিল কিনা জানি না। তবে বাদা কেটে আবাদ করা জমিনের এক প্রান্ত থেকে ধ্বনিত তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে ভরা ব্যর্থ সেই করুণ কান্না রক্তক্ষরা অভিশপ্ত সুন্দরবনের দূরে শ্যামলিমায় প্রতিধ্বনিত হয়ে যে ফিরে এসেছিল তার সাক্ষী আমি নিজে।

শহরবাসীর কাছে অজ্ঞাত হলেও সত্য এ ঘটনা আমি জেনে এসেছিলাম যে, গত পাঁচ বছরের মধ্যে একমাত্র হেড়েভাঙা উদ্বাস্তু কলোনীর অধিবাসী শীতল মণ্ডল সহ কম করে পাঁচজন তথাকথিত মন্ত্রসিদ্ধ বাউলী বেঘোরে প্রাণ দিয়েছে সুন্দরবনের হিংস্র নরখাদক বাঘের আক্রমণে।

দিল্লীর ডায়েরি

খেই হারিয়ে ফেলেছি। দুটো মাস ছিল একেবারে শূন্যতা। আমাদের আর 'দেশ'-এর মধ্যে একটা ধর্মঘটের দেয়াল, সৌভাগ্যবশত আজ আর তা নেই।

কিন্তু সেই যে আসামের উত্তরাঞ্চলে উড়ে উড়ে আমরা দেখছিলাম ভারতীয় বিমান বাহিনীর কার্যকলাপ, দেখছিলাম দেশের নদী-পর্বত-অরণ্য অভিভূতকারী সৌন্দর্য, আর পার্বত্য আদিবাসীদের সরল জীবন-নকশা, তারই মাঝে এখানে ওখানে পাহারায় মোতায়েন ভারতের আরক্ষা বাহিনী।

কিন্তু খেইটা ফেলেছি হারিয়ে, যদিও খুঁজে পেতে পেয়ে গেলাম নোটবইটা, আর মনে করিয়ে দেওয়ার মতো কয়েকটা ফটো। নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার থেকে আসামের লিডো রোড ধরে ব্রহ্মদেশ সীমান্ত অবধি। তারই কয়েকটা ছোটখাটো আলেখ্য এইখানে।

একদিন ড্যাকোটায় চড়ে উড়ে গেলাম পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে 'জিরো' নামে জায়গায়। না যাওয়া অবধি তার মূল্য আমাদের কাছে ছিল শূন্য। লাল কোট পরা 'আপাতানী' সর্দাররা দাঁড়িয়ে, কোমরে মস্ত বড় দাও, আদিবাসীদের অতি প্রয়োজনীয় আরক্ষা অস্ত্র। ডেপুটি কমিশনার দুগ্গাল সাহেব সৈন্য বিভাগের প্রাক্তন অফিসার। এই বয়সেও আতসবাজীর মতো এনার্জি শরীরের ভিতর ঠাসা ভরা। জিপে করে তাঁর সঙ্গে ঘোরার শেষ নেই। শেষ হোল আপাতানীদের এক গাঁয়ে।

সরু কর্দমাক্ত রাস্তার দুপাশে বাঁশের কাঠের বাড়ি, মাচানের উপর। তিনচার ধাপ কাঠের সিঁড়ি উঠে পৌঁছুতে হয় মাচানে (বারান্দার মতো, সেইভাবে ব্যবহারও হয়ে থাকে), তারপর হেঁট হয়ে ঢুকতে হয় লম্বা একটি ঘরে। ওখানেই শোয়া-বসা-রান্না সব।

আমাদের অভ্যর্থনা সভাও সেই ঘরে, বাঁশের পাটাতন বাঁশের মেঝে। হয়তো জানালা নেই, তা না-হলে অতো অন্ধকার কেন ঘরে? ঠিক মাঝখানে একটা ঝোলানো পাটাতনের নিচে কাঠের আগুন জ্বলছে। ওটা উনুন। একটা কেটলির মতো কিছু চাপানো। ঘর ধোঁয়ায় ভরা। উনুনের পাশে শুয়ে একটা কালো কুকুর, বসা কয়েকজন পুরুষ, কয়েকটি মেয়ে।

বোতল থেকে প্রত্যেককে দিল ঘরে তৈরি রাইস্ বিয়ার। দুগ্গাল সাহেব অহমিয়া ভাষায় কিছু বলছিলেন। সর্দার ও আরো কেউ কেউ একটু অহমিয়া ভাষা বোঝে। হিন্দিতে বলতে শিখেছে 'জয় হিন্দ' (আর কী চাই?) 'আচ্ছা হ্যায়' 'ভালা হ্যায়' এমনি।

আপাতানী মহিলা

আমাদের ভিতর ছিলেন একজন সাংবাদিক যাকে এবং যাদের আমি আখ্যা দিয়েছি 'হিন্দিস্থানী' (আমরা ৫০ কোটি ভারতবাসী হলাম দুই শ্রেণীর: এক 'হিন্দুস্থানী' দুই 'হিন্দিস্থানী')। ইনি অত্যন্ত ব্যগ্র কেন আদিবাসীরা শুধু হিন্দি ভাষা শিখছে না, কেন এদের প্রাচীন জীবন-সমাজ প্রথা পুরোপুরি মিলে যাবে না ভারতের (তাঁর মতে হিন্দিস্থানীর উন্নত পর্যায়ের জীবন ধারার সঙ্গে। তাঁর মতে ভেরিয়ের এলুউইন্ হলেন ভারতের শত্রু, কারণ তাঁর 'নেফা দর্শন' নাকি ভারত সরকারকে বাধ্য করেছে আদিবাসীদের প্রতি ভুল নীতি গ্রহণ করতে।

আমি ও হিন্দুস্থান টাইমস-এর পৃথ্বীশ চক্রবর্তী তাঁকে শুধু 'হিন্দিস্থানী' আখ্যারূপ অস্ত্রে জর্জরিত করে ঠাণ্ডা করে দিলাম। তলে তলে রেগে আগুন।

আপাতানী পুরুষরা খুব গাট্টাগোট্টা জোয়ান, চেহারা বলিষ্ঠ। কিন্তু মেয়েরা তেমন নয়। এরা নাক এমনভাবে ফুটো করে যে ২০।২২ বছর বয়সেই একটা কদর্যতা আসে মুখে, যা প্রৌঢ়াদের বেলায় হয়ে দাঁড়ায় সামথিং টেরিবল্। অধিকন্তু মুখে অনেক নীল উল্কি।

একজন সর্দারের ত্রয়োদশ পত্নীকে দেখলাম হাসপাতালে। সে তখনো এতো অল্প বয়সের যে কুশ্রীকরণপ্রথা শুরু করেনি। দার্জিলিং-এর ছোট্ট কিশোরদের মতো ফুট-ফুটে গোলাপী-গাল মেয়ে। কিন্তু দশ বছরেই এ হবে কুৎসিৎ! আমাদের সমাজের উল্টোটা: যেখানে প্রৌঢ়ারাও সাজে (অন্তত চেষ্টা করে) যুবতীদের মতো।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দেখতে রুগ্ন: ফোলা পেট, নাকে ঘা, হাতে পায়ে চর্মরোগ। এরাই আবার বড় হয়ে হবে তাগড়া জোয়ান। কোনো সন্দেহ নেই যে এদের কল্যাণের জন্যে প্রয়োজন আরো অনেক অর্থের, অনেক নেতৃত্বের,—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, হাতের কাজ সমস্ত ক্ষেত্রে। কিন্তু শহর থেকে অতো দূরে,—সভ্যতা থেকে দূরে, কে যেতে চায় কাজ নিয়ে, এবং গেলেও কে নেয় সে-কাজ একটা আদর্শ অথবা ব্রতের অঙ্গ হিসেবে। একজন শিক্ষিকার সঙ্গে স্কুলে দেখা হলো। অল্প বয়সের, এসেছেন সুদূর কেরল থেকে। খুব ভাল লেগেছিল।

জিরোর কাছে একটি আপাতানী গ্রামে রাস্তার দৃশ্য

যখন জিরো ছেড়ে গেলাম, তখনো কানে আসছিল তাদের আওয়াজ 'আইয়াপা আতো' (স্বাগতম), বলেছিল যখন আমরা পৌঁছেছিলাম। এই সুবর্ণশ্রী এলাকায় (একদা নাকি সুবর্ণশ্রী নদীতে পড়িয়া যেত সোনা-মেশানো বালি) আছে প্রায় ৮০ হাজার আদিবাসী, তার ভিতর আপাতানীরা প্রায় ১৪ হাজার—বেরু, হারু, দুতো এমনি ১৩টি গ্রামে। তার দফলারা আছে ৬২ হাজার। মাত্র ১৮ বছর আগে এই সমস্ত জায়গা ছিল অরণ্য। আজ সেখানে আছে হাসপাতাল, স্কুল, হাতের কাজ শেখার জায়গা ইত্যাদি।

তার পরদিন গেলাম এক জায়গায়, নাম 'দাপোরিজো'। সেখানকার প্রসাশন-কর্তা হলেন শ্রীলাকার, অসমীয়া, ভাল বাঙলা বলেন। তাঁর স্ত্রী হলেন মাধুর্যময়ী আমাদের অনেক আপ্যায়ন করলেন নিজের বাড়িতে ডেকে। পৌঁছোনোর আগে বিমান থেকে কাঠের বাক্সে বন্দি ছাগল-পাঁঠা খোলা হোল আকাশ থেকে। ধাক্কা দিয়ে ফেলার আগেই তারা একটা অজানা ভয়ে কম্পমান। আমার চোখের কাছেই। প্রত্যেক বাক্সে গোটা তিনেক। প্যারাসুটের ছাতা খুলে ছাগলরা নেমে গেল, কিন্তু তাদের অনেকেই মাটিতে পৌঁছয় মৃত। প্রতিটি ছাগলের দাম গড়ে এসে দাঁড়ায় প্রায় ৪০।৫০ টাকা।

বিমান ওড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে। উড়ে যায় নদীকে নিচে রেখে আর নদীর আঁকা-বাঁকা রেখায়, হঠাৎ নেমে আসে চার হাজার ফিট আবার সোজা উঠে যায় তিন হাজার ফিট, গোল হয়ে সে ঘোরে আর কেউ কেউ করে বমি, ছাগলেরা মাটিতে নামে মৃত, মানুষদের কেউ কেউ বিমানের ভিতরেই অর্ধমৃত।

একটি দৃশ্য অবিস্মরণীয়। বাঁ-হাতে নিচে নীল জল একটি শাখানদী, আকাশ আর গাছের পাতা হামানদিস্তা দিয়ে গুড়োলে যে-নীল হয় তেমনি নীল, ইংরাজিতে হয়তো বলে এমারেল্ড নীল, অদ্ভুত নীল তার রঙ, দেখলাম, গিয়ে মিললো সুবর্ণশ্রী নদীতে, যে নিজে গিয়ে মেলে ব্রহ্মপুত্রে।

দাপোরিজোতে তাগিং মেয়েরা গান গেয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলে। সহজ সরল গান; মাত্র তিনটি স্বর মনে হলো (পা পা, ধা ধা, পা পা সা সা)। তোরণে লেখা 'আলেবে আলাকা' (স্বাগতম)। আমরা তখন একেবারে ভি-আই-পি। অভ্যর্থনার বক্তৃতা, আদিবাসী ছেলেমেয়েদের গান (ভূপেন হাজারিকার একটা গানের সুরে)। আমাদের প্রত্যুত্তর, তারা আমাদের স্মারক-দ্রব্য দিল একটা করে দাও। যদি দিল্লি পুলিশ সার্চ করে কোনো দিন, আমাকে নিশ্চয়ই নিয়ে পুরবে তিহার জেলে—এমনি আকৃতি সেই দাও-এর।

হ্যাঁ, চলছিল এমনি দিন। ঘড়ির কাঁটা ধরে ওঠো, দাড়ি কামাও, চান করো, প্রাতঃরাশ, আর তারপরই আকাশে আকাশে অভিযান। বাইশ-চব্বিশ বয়সের ছেলেরা উড়ছে বিমান নিয়ে, তারাই বিমান বাহিনীর নওজোয়ান। অনেক এনার্জি, অনেক সাহস, অনেক তাদের উদাম। আমার মনে হয়েছে, তারা ভারতের যুব সম্প্রদায়ের অগ্রণী প্রতীভূ, তারা খুব ভাল।

আমরা একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছি, পান করেছি, গানবাজনা করে[ছি] এমন কি ঝগড়া করেছি (আমাকে [...] দিয়ে)। তারা আমার চোখে তেমনি [...] গেছে ভ্রাতৃপ্রতীম, প্রিয় ও প্রশংসাযোগ্য।

ছাবুয়াতে একজন ডাক্তার। ছেলেমান[ুষ] কিন্তু খুব মিশুক। গানবাজনা করে। [...] বোধ হয় সেনগুপ্ত। আরেকজন, তার ব[...] হয়েছে, গানবাজনায় খুব প্রাণ। মেসে এ[...] রাত্রে বললেন, আপনি বাঙালী, নিশ্চ[য়ই] গান করেন, আসুন। বলি, না মশাই গ[ান] গাওয়া আমার গলায় চলে না। তবে [...] বাজনা—। বাজনা? আসুন, এলো বেহা[লা] চললো বেহালা, চললো গীটার, মাউ[থ] অর্গ্যান্। মেস্‌বাড়ি সচকিত। উনি ছিলে[ন] আমাদের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। তাঁর [...] চলতো রাত দুটো অবধি বাজনা। উ[নি] নিজে বাজান বেহালা, বেশ ভাল।

তাঁকে পুরোভাগে নিয়ে একদিন আম[রা] রওনা হলাম, এবার আকাশপথে ন[য়] মাটির পথে। এটা পরের কথা। তার আ[গে] ছিল অরণ্য আর বুনো কলাগাছের ব[...] শুধু কলাগাছ পাহাড়-জোড়া। কতো গা[ছ] বিরাট গাছ যাদের গায়ে লাগা শতাব্দী মস্ আর অর্কিড, যারা হয়তো হাসছিলে[া] আমাদের দিকে চেয়ে।

অমনি অরণ্যে চলছে সামরিক বাহিনী বুলডোজার। তারা ঠিকঠাক করছে জায়গ[া] আর্মি ক্যাম্পের জন্যে। একজন জোয়ানে[র] তাঁবুর চারদিকে আছে দুই ফিট গভী[র] নালা। সে বলল, ওখানে অনেক সাপ তাই এই নালা। ওটা পেরিয়ে তাঁবুর দিকে সে আসবে না।

তার চোখের দিকে তাকালাম। [...] দক্ষিণ ভারতের সন্তান। একটা খাঁচায় দুটো মুরগী। দিনের বেলায় তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওপাশে চলছে বজ্ররবে বুলডোজার, নিষ্ঠুর উৎপাটক যন্ত্র একজন মানুষের হাতে।

আরো দেখে এসেছিলাম অরণ্যের প্রান্তে আমাদের সৈন্য শিবির। তারা কী খুশী আমাদের দেখে, কতো আদর আপ্যায়ন। এটা খাও, ওটা খাও, এটা পান করো, আবার কবে আসবে। সেলাম হুজুর দিল্লিসে বহুত দূর হ্যায়। দেয়ালে দেয়ালে যুদ্ধের ছবি।

তা হোক। একদিন সকালে আমরা রওনা দিলাম ব্রহ্মদেশ সীমান্তের উদ্দেশ্যে। চারটি জীপে, নাম তার 'জোংগা' (জংগী হলে ভাল হোত,—এটা জাপানী নিস্সান্ জীপের দেশজ প্রকরণ)। তিরাপ্ অঞ্চলকে লক্ষ্য রেখে আমাদের যাত্রা।

সে কী যাত্রা? কোমর ভাঙা হাড়-দমড়ানো যাত্রা, হিসেব নেই কতো মাইল। মাইলের শেষ নেই।

একই দিনে আমরা ফিরে এলাম সীমান্ত থেকে, লিডো রোড সিটলওয়েল

রোডের ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত থেকে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে এই রাস্তায় গেছে সামরিক রসদ চীন দেশের কুনমিং অবধি,—লিডো থেকে ১৭২৬ কিলোমিটার। লিডোতে আছে মস্ত এক সাইনবোর্ড। তাতে লেখা কোন্ কোন্ জায়গা পেরিয়ে যাচ্ছে এই রাস্তা, কী তাদের দূরত্ব। পাবলিক্ রোডে সাইন্ বোর্ড, কিন্তু যখন ফটো নেওয়া হলো, আমাদের অতিরিক্ত আরমি মন্ত্রণালয় বললেন, না ঐ ফটো যাবে না, ছাপানো চলবে না। (মনে মনে বলি: তোমার মুণ্ডু!)

সীমান্তে আছে বনের জোঁক। আর ধরবি তো ধর পৃথ্বীশবাবুকে! মোজা ভেদ করে জোঁক মহাশয় দিব্যি রক্ত খাচ্ছিল। তাইতো, চুলকোচ্ছে কেন? আরে আরে, মাই গড্, ও খগেনবাবু, আমাকে জোঁকে ধরেছে। তাতে কি, কানে ধরে ফেলে দিন, ব্যাটা জোঁক কোথাকার! কী করবেন, বাঁশ গাছের পাতা থেকে আসছে জোঁক, ছিনে জোঁক, ছোট কিন্তু মারাত্মক, যেমনি পৃথ্বীশ বাবু দেখেছিলেন ভুটানের রাস্তায়।

ঐ আমাদের শেষ দিন ঐ অঞ্চলে। অনেক কষ্ট অনেক রহস্য, অনেক জ্ঞান। কিন্তু একটি কথা অতি স্মরণীয়। যেতে যেতে রাস্তায়, আমাদের ভীষণ জল পিপাসা। সঙ্গে যা জল ছিল (আমাদের জোংগায়), তা শেষ হয়ে গেছে। তখনো আমরা সীমান্ত থেকে দূরে। এক জায়গা থেকে দৃষ্টি পড়ল একটা বাংলো বাড়িতে, রাস্তা থেকে দুশো গজ দূরে।

চলো, লেট্ আস্ গো দেয়ার! কী আর হবে। চলো। বাড়ির চারদিকে কাঁটা তারের বেড়া। কয়েকজন গেল, যেন পেট্রল পার্টি। বেরিয়ে এল একজন ভৃত্য (চেহারায়)। আমরা জল খেতে চাই। আইএ, আসুন। এল জল। বাড়ির কর্তা কোথায়? সব বাহার চলা গায়া। মেমসাব? হাঁ, মেমসাবও গেছেন বাইরে। ঐ দূরে শহরে (হয়তো মার্গারিটা)। তাহলে? আমাদের পানি পিলাও।

এল পানি। আমরা সেই বাড়ির বারান্দা দখল করে বসলাম। একজন বলল: দাও, বরফ আছে, হ্যায়? হাঁ জী হ্যায়। প্রশ্নকর্তা নিজেই এগিয়ে গেল, আবিষ্কার করল একটা ফ্রিজ্, হুকুম করল, দাও বরফ আর ঠান্ডা জল।

ইতিমধ্যে অন্য একজন জোংগা থেকে নিয়ে এল অন্য ধরন পানীয়ের এক বোতল। আমরা জন-আটেক গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজেরাই নিলাম তাঁর আতিথেয়তা। দুজন ভৃত্য খুব ভাল মানুষ। আমাদের অভ্যর্থনা করল সমস্তভাবে, কোনো দ্বিধা না-করে। তারা ছাড়া বাড়িতে কেউ নেই, কিন্তু আমরা উড়ে এসে জুড়ে বসেছি।

জাপাতানী যুবকেরা সরকারী কারুশিল্প শিক্ষালয়ে ছুতারের কাজ শিখছে

গেলাস, জল, বরফ সব এল। চললো আমাদের বিশ্রাম, পান। বিদায় নেওয়ার আগে আমরা লিখলাম একটি পত্র আমাদের অজানা অদৃষ্ট গৃহস্বামী গুহ চৌধুরী (বড়গোলাই গ্রামে) মহাশয়ের নামে। আমরা সবাই তাতে দিলাম সই: আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার আতিথেয়তা আমরা নিজেরাই নিয়েছি। নিচে আমাদের নাম ও পরিচয়।

জানিনা, কোনোদিন গুহ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হবে কি না। দেখা হলে আবার জানাব আমাদের কৃতজ্ঞতা।

খুব জানতে ইচ্ছা করে যে সেদিন আমাদের ঐ স্বীকৃত জ্ঞাপনা পেয়ে উনি কী মনে করেছিলেন। ইতি—

খগেন দেসরকার

সাহিত্য সংবাদ

পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষার সংস্কার

কিছু দিন আগে পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের কিছু কিছু খবর কানে এসেছিল। পুরো খবর বিস্তৃতভাবে জানা যায় নি। যত দূরে শোনা গেছে, পাকিস্তান সরকারের উদ্যোগে গঠিত এক বিশেষজ্ঞ কমিটি বাংলা বর্ণমালা থেকে স্বর ও ব্যঞ্জন মিলিয়ে পাঁচটি বর্ণ বাদ দেবার জন্য সুপারিশ করেছেন। বর্ণগুলি হচ্ছে ঈ, ঐ, ঙ, ঞ এবং ষ। পাকিস্তানের লোক ও শিক্ষাবিদদের অধিকাংশই এটাকে একেবারেই ভালোভাবে গ্রহণ করেন নি। তাঁদের মতে, উর্দুবাদী পাকিস্তানের শাসকরা বাংলা ভাষাকে খর্ব করার জন্য আর একটি নতুন কায়দা উদ্ভাবন করেছে। তাঁরা এই প্রয়াস রোখার জন্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আমাদের পশ্চিম বাংলাতেও এই নিয়ে অনেক প্রতিবাদ উঠেছে এবং একে অপপ্রয়াস আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কলকাতা আকাশবাণীর ভাষ্যকার ব্যঙ্গ করে বলেছেন, 'ঐ' দিয়ে একটা কথা হচ্ছে ঐতিহ্য। পাকিস্তানের কোনো ঐতিহ্য নেই বলেই কি ঐ বর্ণটাকেই তারা উড়িয়ে দিতে চায়?

এ কথা ঠিক, করাচী-রাওয়ালপিণ্ডির সরকার বারবার অনেক কুৎসিত উপায়ে পাকিস্তানের বাংলা ভাষার মর্যাদা নষ্ট করার চেষ্টা করেছে। বাংলা ভাষার সম্মান প্রতিষ্ঠার দাবিতে পুলিসের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে ঢাকার ছাত্ররা। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার গ্রন্থ আদান-প্রদান বন্ধ করেছে পাকিস্তান সরকার। ভারত-বিদ্বেষ ও তমদ্দুনের নাম করে বাংলা ভাষা থেকে সংস্কৃত শব্দ ছেঁটে উর্দু শব্দ ঢোকাবার নির্বোধ চেষ্টা হয়েছে। এই বর্ণমালা সংস্কারের পেছনেও যদি পাকিস্তান সরকারের সে-রকম কোনো নষ্টবুদ্ধি থাকে —তবে তা নিশ্চিত প্রতিবাদযোগ্য।

কিন্তু সাধারণভাবে বিচার করলে, এ কথা অবশ্যই বলা যায় যে, বর্ণমালা সংস্কারের যে-কোনো চেষ্টাই অবান্তর নয়। বর্ণমালা, বানান, বাক্যের গঠন ইত্যাদি প্রত্যেক ভাষাতেই বদলায়। যে-কোনো ভাষারই এক শো বছর আগে-পরের রচনা দেখলে তা বোঝা যায়। অনেকের যুক্তি এই যে, লোকের মুখে মুখে বা স্বাভাবিকভাবে সে বদলটা আসাই ভালো। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সংস্কারের প্রস্তাব কেন আনা যাবে না—তারও কোনো যুক্তি নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা সংস্কার কমিটি—যার সভাপতি ছিলেন রাজশেখর বসু—যেসব সুপারিশ করেছিলেন—তাতে বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিই হয়েছে।

যে-কোনো নতুন পরিবর্তনই অনেকে মানতে চান না। প্রথম প্রথম চোখে এবং কানে একটু খট্‌কা লাগে—কিন্তু সেটা সহ্য হয়ে যেতে বেশী সময় লাগে না। বিদেশী শব্দের বানানের ব্যাপারে আনন্দবাজার পত্রিকা যে সরল পদ্ধতি চালু করেছিলেন তা নিয়ে অনেকে এক সময় হাসাহাসি করেছিল, এখন স্বাভাবিক হয়ে গেছে। রাজশেখর বসুর সুপারিশ সত্ত্বেও অনেক লেখক বেশ কিছু দিন জোর করেই ব্যঞ্জনের পর দ্বিত্বই চালু রাখতে চাইলেন —কিন্তু এখন সেই বানান চোখে দেখলেই পাঠকের খট্‌কা লাগে। সাধু এবং চলিত নামে দু' রকম ক্রিয়াপদ টিঁকিয়ে রাখারও কোনো যুক্তি নেই। অনেক লেখক আবার বেশ মজা করেন, একই লেখক তাঁর কোনো লেখা 'সাধু ভাষায় কোনো লেখা চলিত ভাষায় লেখেন। এঁদের আমরা পুরো সাধু বলতে পারি না। যাঁদের যুক্তি এই, চলিত ভাষায় গাম্ভীর্যযুক্ত রচনা সম্ভব নয়— তাঁরা রাজশেখর অনূদিত মহাভারত পড়েন নি।

বাংলা ভাষা প্রধানত শ্রুতিনির্ভর। পি ইউ টি পুট, আর বি ইউ টি বাট-এর সুযোগ এখানে নেই, কিংবা রাফ্ বা থরো ধরনের উচ্চারণ-পার্থক্য বাংলায় হয় না। উচ্চারণ-রীতি সময় অনুযায়ী বদলায়। বাংলায় 'ষ'-এর উচ্চারণ এখন আর কানে শোনাই যায় না—শুনলেও চিনতে পারবো না। সুতরাং 'ষ'কে টিঁকিয়ে রাখার সত্যিকার যুক্তি কি? নিষেধ না বদলে নিশেধ লিখলে চোখ মানতে চাইবে না, প্রবল আপত্তি জানাবে— কিন্তু কান নিরপেক্ষ থাকবে—এবং বেশ দু' চারদিন বাদেই মত বদলাবে। 'ঐ' বর্ণটিরও শুদ্ধ উচ্চারণ এখন হয় না— দু' রকমভাবে উচ্চারিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের বেতার শুনে দেখেছি, সেখানেও 'ঐ'-এর উচ্চারণ আমাদেরই মতন সঠিক নয়, দু' রকম। সেই জন্যই শব্দের ধ্বনি সম্পর্কে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে কবিরা 'ঐ'-এর বদলে 'অই' কিংবা 'ওই' লেখেন। তা হলে আর ঐটি রাখার দরকার কি?"

শততম ধ্রুপদী

সুশীল রায় সম্পাদিত ধ্রুপদী কবিতা পত্রিকার ১০০নং সংখ্যা বেরিয়ে গেছে। কবিতার একটি মাসিক পত্রিকা একবারও বন্ধ না হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে এসেছে, এটা সত্যিই অবাক হবার মতন ঘটনা। ১০০নং ধ্রুপদী বর্ধিত আয়তনে বেরিয়েছে। এবং জানা গেল, আর একটি মাত্র সংখ্যা বেরিয়ে ধ্রুপদী বন্ধ হয়ে যাবে।

১০০নং সংখ্যার প্রকাশ উপলক্ষে একটা ছোটখাটো উৎসব হয়ে গেছে একটু নতুন পরিবেশে। পার্ক সার্কাসের কবরখানায় মাইকেল মধুসূদনের সমাধির কাছে ঘাসের ওপর বসেছিলেন কয়েকজন কবি। উপস্থিত ছিলেন সুশীল রায়, তারাপদ রায়, শংকর চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচী, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, নচিকেতা ভরদ্বাজ, পার্থ চৌধুরী, লীলা রায়, শামশের আনোয়ার, মিহির রায়-চৌধুরী এবং আরও অনেকে। এবং ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু। সমরেশ বসু এবং উপস্থিত কবিরা মাইকেলকে শুনিয়ে কবিতা পড়লেন—যত দূর মনে হয়, মাইকেল মধুসূদন তাঁর মুখ ফিরিয়ে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন।

মানিক স্মরণে

এই শরতে ছোট বড় নানা পত্রিকা ও সংকলন বেরিয়েছে, তার মধ্যে এই একটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে—উৎপলেন্দু চক্রবর্তী সম্পাদিত 'মানিক স্মরণে'। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কয়েকটি আলোচনার সংকলন। বাংলা দেশ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভুলে যাচ্ছে কিনা এ নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ নেই। এখনকার পাঠকরা তাঁর বই পড়েন কিনা সে কথা না জেনেও নিশ্চিতভাবে বলা যায়—রবীন্দ্রনাথের পর আর কোনো এমন একক ব্যক্তিত্ব এত বিপুলভাবে বাংলা সাহিত্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। আজকের বাংলা দেশের অধিকাংশ তরুণ গদ্যলেখকদের লেখা ও প্রকাশভঙ্গিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপস্থিত। শুধু দারিদ্র্য বা ক্ষুধার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নয়, সমগ্রভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই সংকলনে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুদিনের বর্ণনা লিখেছেন, এ ছাড়াও আছে তাঁর সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ।

সনাতন পাঠক

রম্যরচনা

হারেম। শ্রীপান্থ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯। পাঁচ টাকা।

ইতিহাসভিত্তিক রম্যকাহিনী রচনায় শ্রীপান্থের দক্ষতা বাঙালী পাঠক মহলে সুবিদিত। 'হারেম' এ-পর্যায়ের একখানি সফল প্রয়াস, গ্রন্থখানি ইতিপূর্বে এক বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত হলে পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'হারেম' মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রীয় বিকৃত বিলাসবিধির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপকরণ। গ্রন্থটি কোন এক বিশেষ হারেমের আনুপূর্বিক বিবরণ মাত্র নয়, তুর্কী, পারস্য, আরব, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন রাজপরিবারের হারেম সম্পর্কিত টুকরো টুকরো তথ্য সম্বলিত বিবরণমালা। তবে, তুর্ক অটোমান সাম্রাজ্যের হারেম সম্পর্কিত বিবরণ এ গ্রন্থের অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে। মুঘল হারেম এবং হিন্দু রাজাদের অন্তঃপুর বিষয়ে আলোচনা গ্রন্থখানিকে পূর্ণতর করার সুযোগ দিয়েছে। হারেমের বিকৃত বিলাস বাহুল্যের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে গ্রন্থখানিকে আকর্ষণীয় করে তোলার দিকে লেখক চটুল হাত বাড়ান নি। তিনি হারেমের সামগ্রিক রূপটিকে সরসতার সঙ্গে চিত্রবদ্ধ করতে মনোযোগী হয়েছেন। হারেমের নিষিদ্ধ-নিভৃতি কিভাবে গোপনে গোপনে সাম্রাজ্যের ভাঙাগড়ার পোষকতা করেছে লেখক তার নিপুণ রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হারেমের সংস্থান-বিবৃতি তথ্যযোগে পাঠকের ঐতিহাসিক কৌতূহলকে চরিতার্থ করেছে। রাজঅন্তঃপুরের বিন্যাস ব্যবস্থা, হারেমের সদর ও অন্দর মহলের কার্যাবলী, রীতিনীতি, নিষ্ঠুরতা, বিকৃতি, হামামের বিলাসমন্দির চিত্র, খাস হারেমের ক্লান্তিকর জীবনযাত্রা ও ঐশ্বর্য তথ্যযোগে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে কিছু কিছু আকর্ষণীয় কাহিনীর অবতারণা করে লেখক সমগ্র রচনাটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। স্বেচ্ছায় শিক্ষিতা বিদেশিনীর হারেমে প্রবেশ, আনারকলির জীবন কাহিনী, রোজেলানার ক্রীতদাসী থেকে সম্রাজ্ঞী হওয়া, ক্রীতদাসী সফির ক্ষমতা লাভ এবং মর্মান্তিক পরিণতি—ইতিহাসের প্রাণহীন তথ্যবস্তুকে সজীবতা দিয়েছে। খোজা-সম্পর্কিত পরিচ্ছেদটি গ্রন্থের এক উল্লেখযোগ্য অংশ। ইতিহাসভিত্তিক রম্যকাহিনী রচনায় যে দক্ষতা, প্রয়োগনৈপুণ্য প্রয়োজন শ্রীপান্থ তা অর্জন করেছেন। উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য এই ধরনের রচনায় একজাতীয় মূল্য যে আছে, সন্দেহ নেই।

উপন্যাস

প্রতিনায়ক। পার্থ চট্টোপাধ্যায়। আনন্দধারা প্রকাশন। ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-১২। সাত টাকা।

ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রতিক উপসর্গ দলত্যাগ। দলত্যাগ ভালো কি মন্দ তা নিয়ে একটানা বিতর্ক চলতে পারে কিন্তু এই ফাঁকে শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায় একটি উপন্যাস লিখে ফেলেছেন সেই বিতর্কিত বিষয়টি নিয়ে। বর্তমান রাজনীতির আবহাওয়াটি তিনি অবিলম্বে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু উপন্যাসের উপবীজ্য রাজনীতি বলে পাঠকদের নিরুৎসাহিত হবার কারণ নেই, কেননা কাহিনী যথেষ্ট স্রোতস্বিনী। একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং সেই সঙ্গে দলত্যাগ। হঠাৎ তিনি এমন সৃষ্টি ছাড়া কাণ্ড করতে গেলেন কেন? কেননা, তিনি সৎ ও বিবেচক এবং দুর্নীতির সঙ্গে কোনক্রমে আপস করতে সম্মত নন। তাঁর নতুন এক দল গঠন করা থেকেই এই কাহিনীর নাটকীয়তা। লেখক যদিও একটি স্বচ্ছ আড়াল রেখেছেন অর্থাৎ আসল স্থান ও পাত্রকে তিনি স্বরূপে ও সশরীরে হাজির করেন নি তবু বুঝতে বিলম্ব হয় না, কী বা কারা তাঁর লক্ষ্য ও উপলক্ষ! রাজনৈতিক উপন্যাসকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলাই হল সবচেয়ে কঠিন কাজ। সংবাদ ও কাহিনীর ঊর্ধ্বে তার বোধ ও বিস্তৃতি প্রয়োজন, চাই অন্য এক আয়তন। সস্তা বিদেশী রাজনৈতিক উপন্যাসগুলোতেও এর আশ্চর্য মুন্সীয়ানা দেখতে পাই আমরা। এখানে লেখকের চেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়, বিশেষ করে তিনি যখন একটি জরুরী বিষয়কে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু উপন্যাসটিতে সাময়িকতা ছাড়িয়ে কোন গভীরতর পরিপ্রেক্ষিত আনা সম্ভব হয় নি। এর কারণ, বোধ হয় দুটি। এক, লেখক শেষ পর্যন্ত গল্পের হাত ছেড়ে বেরুতে পারেন নি। অর্থাৎ মূল প্রশ্নটি গল্পপ্রিয়তার দরুণ পল্লবে পল্লবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দুই, লেখকের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ আরো তীক্ষ্ণ ও অন্তর্ভেদী হওয়া প্রয়োজন ছিল। শুধু কালোবাজারীদের সম্বন্ধে নেহরুর সেই বহুশ্রুত উক্তি, মার্কস অ্যাঙ্গেলস-এর উদ্ধৃতি কিংবা অসৎ ব্যবসায়ীদের দুষ্টচক্রের উদাহরণ দিয়ে আর বোধ হয় আমাদের উৎসাহিত করা যাবে না। আমরা এখন আরো ভিতরে প্রবেশ করতে চাই। উপন্যাসের একেবারে শেষটুকু সুপরিকল্পিত—চমকপ্রদ বলাই শ্রেয়। বাস্তবতার প্রশ্নকে অব্যাহতি দিলে চমকটুকু দীর্ঘস্থায়ী।

পত্র সাহিত্য

জাগৃহি। সম্পাদক : দুলাল তপাদার। জাগৃহি সংঘ : কাটজুনগর, কলিকাতা-৩২। মূল্য ১·০০।

লিটল ম্যাগাজিন শ্রেণীর পত্রিকাগুলির মধ্যে 'জাগৃতি'র এই বিশেষ সংখ্যাখানি সাহিত্যরসিকদের ভাল লাগবে। এতে প্রকাশিত প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতাবলীর একটা বিশেষ মান আছে। রচয়িতাদের মধ্যে আছেন ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত, হীরেন্দ্র চক্রবর্তী, আদিত্য ওহদেদার, গণেশ চক্রবর্তী, মিহির সেন, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আশিসকুমার সান্যাল, অভ্র রায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, অরুণ ভট্টাচার্য, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, সামসুল হক, ভাস্কর চৌধুরী, প্রশান্ত দত্ত, দিলীপকুমার সান্যাল প্রভৃতি।

কিশোর ভারতী। সম্পাদক : দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ৫·০০।

কিশোরদের মন ও মেজাজকে তুষ্ট ও পরিপুষ্ট করে তোলার উপযোগী পত্রিকার অভাব অপনোদনে একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ প্রকাশন 'কিশোর ভারতী'। এবারের পুজোর বাজারে ছোটদের জন্য প্রকাশিত পত্রিকাবলীর মধ্যে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে আলোচ্য সংখ্যাখানি। বাঙলার বিশিষ্ট কথাশিল্পী, প্রবন্ধকার ও কবিদের রচনাসম্ভারে এবং নন্দলাল বসুর আঁকা ছবি সহ বিশিষ্ট শিল্পীদের ছবি ও

অলংকরণে বেশ একটা বৈশিষ্ট্যের চেহারা নিয়ে পত্রিকাখানির আবির্ভাব কিশোর-জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করবে। বিভিন্ন বিভাগে রচনা এবং আঙ্গিকের দিক থেকে পরিবেশন ব্যাপারেও গতানুগতিক পথ না ধরে নতুনত্বের রূপটা চোখে পড়ে। স্বাগত জানাবার মতো একটি প্রচেষ্টা। পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ হবে জেনে খুশী হচ্ছি।

সোনার কাঠি। সম্পাদক : সুকুমার রায়। এ১৫ সি আই টি বিল্ডিং, ৩০ মদন চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ১·৫০।

ছোটদের পত্রিকার মধ্যে অল্পকালের মধ্যে 'সোনার কাঠি' যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে, এবারের দ্বিতীয় বর্ষের আলোচ্য বিশেষ সংখ্যায় তার সে মর্যাদা অক্ষুন্ন আছে। এ সংখ্যায় লেখকদের মধ্যে আছেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, অন্নদাশঙ্কর রায়, মনোজিৎ বসু, কালিদাস রায়, পরিমল ভট্টাচার্য, অহিভূষণ মালিক, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গিরিজা গঙ্গোপাধ্যায়, স্বপন বুড়ো, ধীরেন্দ্রলাল ধর, শান্তিকুমার মিত্র, বন্দে আলি মিয়া, নির্মলেন্দু গৌতম, ইন্দ্রনীল, সুনীত ঘোষ, গোপাল ভৌমিক প্রভৃতি। প্রকাশ কর্মকারের আঁকা প্রচ্ছদ সংখ্যাখানির মর্যাদা বাড়িয়েছে।

ঊষা। শারদীয়া ১৩৭৫। সম্পাদক : বিমলচন্দ্র ঘোষ। ২ টাকা।

বর্তমান সংকলনে অনেকগুলো কবিতা, গল্প আর প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। একটা বৈশিষ্ট্য, এই বৃহৎ পত্রিকায় কোন উপন্যাস নেই। উল্লেখযোগ্য রচনা, সুনীতিকুমারের একটি প্রবন্ধ। বিশেষত, অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাস সম্পর্কে একটি সুন্দর আলোচনা। সম্পাদনায় গতানুগতিকতা মুক্ত সুরুচির ছাপ।

সচিত্র শ্রীমতী। প্রধানা সম্পাদিকা—শ্রীমতী আভা চট্টোপাধ্যায়। শারদীয়া—৭ম বর্ষ—১৩৭৫

সচিত্র শোভন এই বিশেষ সংকলনে ৫টি উপন্যাস ছাড়া সুনির্বাচিত লেখকের গল্প কবিতা রম্য-রচনায় সংখ্যাটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। রচনাকারদের মধ্যে আছেন : প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, বনফুল, বিমল কর, আশাপূর্ণা দেবী, মনোজ বসু, সমরেশ বসু, দিনেশ দাস, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, আভা পাকশাড়ী ও শান্তনু দাস।

ফ্যাশন, ঘর সাজানো, রান্নাবান্না এবং বিভিন্ন চিত্র-তারকার ঘরোয়া সংবাদ এ সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

প্রাপ্তি স্বীকার

হোমিওপ্যাথিক রূপকথা। ডাঃ খগেন্দ্রনাথ বসু। সুন্দর হোমিও সদন : ১১৩ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১। মূল্য ৩·২৫।

বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা। সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। সুবর্ণরেখা : ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ১৮·০০।

পৌরাণিক প্রেমকথা। বনফুল। ডি লাইট বুক কোম্পানী : ২৪ অরবিন্দ সরণী, কলিকাতা-৫। মূল্য ২·৭৫।

কুরঙ্গিনী। মনোরঞ্জন ঘোষ। ডি লাইট বুক কোম্পানী : ২৪ অরবিন্দ সরণী, কলিকাতা-৫। মূল্য ৩·০০।

দুটি একাঙ্কিকা। শ্রীকণ্ঠ। আলফা-বিটা পাবলিকেশনস : ৯৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা-১৪। মূল্য ১·৬০।

মানবমন : সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশক পাভলভ ইনস্টিটিউট, ১৩২।১এ বিধানসরণী, কলকাতা-৪। মূল্য ২·৫০। ৭ম বর্ষ শেষ সংখ্যা।

আমাদের পুজোর বাজনা থেমে যাবার প্রায় সংগে সংগে অলিম্পিকের দামামা বেজে উঠছে। ১২ অক্টোবর থেকে মেক্সিকো শহরে আরম্ভ হচ্ছে ঊনিশতম বিশ্ব অলিম্পিকের পক্ষকালব্যাপী মহা অনুষ্ঠান। উপরের চিত্র মেক্সিকো ইউনিভার্সিটি সিটি অলিম্পিক স্টেডিয়ামের চিত্র, যেখানে মূল অনুষ্ঠান হবে

খেলার মাঠে

কলকাতার ফুটবল মরসুমের উপর যবনিকা নেমে এলেও আই এফ এ শীল্ড এবং সুপার লীগ শেষ হয়নি। শীল্ডের খেলা শেষ হয়নি ইস্ট বেংগল ক্লাবের ইনজাংশনের ফলে। সুপার লীগ শেষ হয়নি মাঠের শান্তিরক্ষার জন্য পুলিসের সাহায্য না পাওয়ায়।

আই এফ এ-র বিরুদ্ধে ইস্ট বেংগলের অপর একটি মামলাও আছে। ইস্ট বেংগলের অভিযোগ—১৯৬৭ সালের শীল্ড ফাইনাল খেলার তারিখ ঝুলিয়ে রাখার জন্য ইস্ট বেংগলের খেলোয়াড়দের কলকাতায় আটকে রাখতে হয় এবং তার জন্য খরচ হয় ২০ হাজার টাকা। ইস্ট বেংগলের তরফ থেকে ক্ষতিপূরণের জন্য আই এফ এ-র কাছে এই টাকা দাবি করা হয়েছে। মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিচারপতি আই এফ এ-র স্থাবর সম্পত্তির কোনরকম বিলি ব্যবস্থা না করার আদেশ দিয়েছেন। শীল্ডের ইনজাংশনের রুলের উত্তরের দিন ঠিক করেছেন পুজোর ছুটির পর হাইকোর্ট খোলার প্রথম সোমবারে।

সুতরাং ১৯৬৭ সালের মত ১৯৬৮ সালের শীল্ড খেলা শেষ হবার সম্ভাবনা একরকম নেই বললেই চলে। কারণ, একটি নয়, তিন-চারটি খেলা বাকি এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে আছে কলকাতার বাইরের একটি দল।

তবে আই এফ এ এখনো সুপার লীগ শেষ করার আশা রাখেন। কিন্তু তারও অনেক বাধা এবং কে জানে, মাঠের বদলে হাইকোর্টের এজলাসে সুপার লীগের শব-ব্যবচ্ছেদ হবে কি না।

*

এদিকে আই এফ এ-র পদত্যাগী সভাপতি শ্রীসুধাংশুকান্ত আচার্যের বিবৃতি নিয়েও ক্রীড়ামহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্য। পদত্যাগ সম্পর্কে শ্রীআচার্য বলেছেন, অনেকগুলি কারণ তাঁর পদত্যাগের মূলে থাকলেও মহমেডান স্পোর্টিং ও ইস্ট বেংগলের শীল্ড সেমি-ফাইনাল খেলার তারিখ এক দিন পিছিয়ে দেবার জন্য ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের আবেদন প্রতিযোগিতা কমিটির দ্বারা অগ্রাহ্য হওয়াই শেষ কারণ। তিনি চেয়েছিলেন, খেলাটি অনুষ্ঠিত হোক এবং ইস্ট বেংগলের যৌক্তিক দাবি অগ্রাহ্য হলে তাঁর পক্ষে সভাপতি-পদে থাকা সম্ভব নয় বলেও নাকি আগে আভাস দিয়েছিলেন।

এখন দেখা যাক, ইস্ট বেংগলের দাবির পেছনে কতখানি যুক্তি ছিল এবং আই এফ এ-র আচরণই বা কতটা যুক্তিসংগত।

চ্যারিটি হিসাবে আয়োজিত ওই খেলায় ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব সাড়ে ছ' হাজার টিকিটের দাবি জানিয়েছিল। এ কথাও জানিয়েছিল, ওই টিকিট না হলে তারা চ্যারিটি খেলবে না, সাধারণ ম্যাচ হিসাবে খেলবে। আই এফ এ প্রথমে টিকিটের দাবি স্বীকার করেনি। পরে ইস্ট বেংগলের অভিপ্রেত টিকিট মঞ্জুর করেছে। কিন্তু এই টিকিট প্রাপ্তি এবং বিলি সম্পর্কে দুটি দৈনিক সংবাদপত্রে দুরকমের খবর থাকায় ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে সভ্যদের কাছে যথাসময়ে টিকিট বিলি করা সম্ভব হয়নি। তাই সভ্যদের কাছে টিকিট বিলি করার জন্যই ইস্ট বেঙ্গল একদিন সময় চেয়েছিল। অন্যথায় চেয়েছিল সাধারণ ম্যাচ হিসাবে সেমিফাইনাল খেলতে। তাতে সভ্যদের কাছে টিকিট বিক্রির কোন ঝামেলা ছিল না।

আমি বলব, ইস্ট বেংগলের খেলা পেছোবার আবেদন গ্রাহ্য করলে কোনই অসুবিধা হত না, বরং নির্দিষ্ট দিন

শুক্রবারের চেয়ে শনিবার বা রবিবার খেলার ব্যবস্থা করলে খেলার আকর্ষণ বেড়ে যেত। তাই ইস্ট বেঙ্গলের সভ্যদের কাছে টিকিট বিলির জন্য সময় চাওয়ার পেছনেও নিশ্চয়ই যুক্তি ছিল।

কিন্তু আমি এ কথাও বলব, সাড়ে ছ' হাজার টিকিট দাবির পেছনে কোন যুক্তি ছিল না। কারণ, গত বছর তাঁরা এত টিকিট পাননি। ইস্ট বেঙ্গলের কর্তৃপক্ষেরই স্বীকৃতি, লীগের অনিশ্চয়তা এবং একক লীগের ফলে তাঁদের শতকরা ২৫ জন সভ্য এ বছর সভ্য কার্ড 'রিনিউ' করেননি। পুলিস কর্তৃপক্ষ ৪ বছরে তাঁদের ৫০০ সভ্য বাড়াবার যে অনুমতি দিয়েছেন, পর্যায়ক্রম হিসাবে তাতে না-হয় ১২৫ জন নতুন সভ্য বেড়ে থাকতে পারে। তাতেও তাঁদের এ বছরের সভ্য-সংখ্যা গতবারের তুলনায় অনেক কম হবার কথা। তবু তাঁরা সাড়ে ছ' হাজার টিকিটের দাবি জানিয়েছেন।

আই এফ এ যদি এই টিকিট মঞ্জুর না করে খেলাটি বহাল রাখতেন তবে কিছুই বলবার থাকত না। টিকিটের দাবি মঞ্জুর করেও টিকিট বিলি-বাটোয়ারার সুযোগ না দেওয়া আই এফ এ-র পক্ষে ঠিক হয়নি। যখন টিকিটই দিলেন তখন সময়ও দিতে পারতেন। যাই হোক, সভাপতির পদত্যাগের এটি শেষ কারণ হলেও তিনি জানিয়েছেন, নানা ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে এবং প্রশাসনিক ব্যাপারে নানা গলদের ফলেই তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আই এফ এ-কে কায়েমী স্বার্থের এক গোষ্ঠিচক্র বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন, 'ওখানে থেকে ভাল কিছু করা সম্ভব নয়।'

সাংবাদিকদের কাছে শ্রীআচার্য আরও বলেছেন, তিনি অনেক আশা নিয়ে আই এফ এ-র সভাপতি হয়ে এসেছিলেন। তিনি আই এফ এ-কে আরও গণতন্ত্রসম্মত করতে চেয়েছিলেন, প্রথম ডিভিসন লীগে দলের সংখ্যা কমিয়ে (ফিরতি লীগ বজায় রেখে) খেলার সংখ্যাও কমাতে চেয়েছিলেন, লীগের কাঠামো পুনর্গঠনের পর প্রথম ডিভিসনের সব ক্লাবের প্রতিনিধিকে পরিচালকমণ্ডলীতে স্থান দিতে চেয়েছিলেন, লীগে ওঠা-নামার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন এবং চেয়েছিলেন ১৯৬৭ সালের শীল্ড ফাইন্যাল খেলা শেষ করতে। কিন্তু কিছুই করতে পারেননি। প্রথম ডিভিসনে দলের সংখ্যা আরও বাড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে, ১৯৬৭-র শীল্ড ফাইন্যাল শেষ হয়নি, লীগের কাঠামোও বদল হয়নি। তিনি দুঃখ করে বলেছেন, ১৯৪০ সালে যখন তিনি আই এফ এ পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন তখন আর যাঁরা পরিচালকমণ্ডলীতে ছিলেন আজো তাঁরা প্রায় সবাই বহাল তবিয়তে পরিচালকমণ্ডলীতে আছেন, শুধু যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁরা বাদে।

শ্রীআচার্য অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেননি। খেলাধুলার সামগ্রিক উন্নতির জন্য তিনি এখনো কিছু করার আশা রাখেন। স্টেডিয়ামের জন্য তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং ফুটবলের প্রশাসনিক গলদ সম্পর্কে এক অনুসন্ধান কমিটি গঠনের জন্যও রাজ্যপালের কাছে তাঁর আবেদন ফলপ্রসু হতে চলেছে।

*

১৯৬৯ সালে এম সি সি-র দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বাতিলের পেছনে দক্ষিণ আফ্রিকারই কেপটাউনে জন্মগ্রহণকারী কৃষ্ণকায় ক্রিকেট খেলোয়াড় বেসিল ডলিভেরা। যদিও ডলিভেরা এখন ইংলণ্ডের নাগরিক তবু তাঁর গায়ের রং কালো বলে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী প্রধানমন্ত্রী জন ভরস্টার এম সি সি দলে ডলিভেরার নির্বাচন স্বীকার করতে পারেননি। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন, তাঁকে দলে রাখলে সফর বাতিল হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার এই অযৌক্তিক দাবি ইংলণ্ডের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষও স্বীকার করতে পারেননি। ফলে, পাকাপাকিভাবে সফর বাতিল হয়ে গিয়েছে।

আমি ভাবছি, এইভাবেই চাকা ঘোরে এবং নিজেদের আচরণে নিজেদের উপরেই আঘাত আসে। বর্ণবৈষম্যের উৎকট দাবিতে দক্ষিণ আফ্রিকা ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের বাইরে (এখন কমনওয়েলথ ক্রিকেট কনফারেন্স) থাকলেও ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড বে-সরকারী-ভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ক্রিকেট সফর ও টেস্ট খেলার ব্যবস্থা এতদিন বজায় রেখেছে। অলিম্পিকে দক্ষিণ আফ্রিকাকে স্থান করে দেবার জন্য ইংলণ্ড অনেক ওকালতি করেছে, তাদের বর্ণবিদ্বেষের অনেক সাফাই গেয়েছে। কিন্তু আজ? নিজেদের ঘাড়েই কোপ পড়ল।

আমরা চিরদিন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী নীতির ঘোর বিরোধী। আমরাই কি ভাবতে পেরেছি তাদের ওই নীতিই একদিন না একদিন আমাদের সুযোগ এনে দেবে? সফর বাতিলের ফলেই আজ এম সি সি পাক-ভারত সফর করতে আসছে। কথাবার্তা প্রায় পাকা। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড আগ্রহ-ভরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে পথের দিকে; এম সি সি-র ভারতে আসার সমান আগ্রহ। এখন কোন বড় রকমের অঘটন না ঘটলে এবং বিদেশী অর্থের দায়দাবি অন্তরায় সৃষ্টি না করলে আগামী শীতকালে এম সি সি-র ভারত সফর নিশ্চিত।

*

ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার এই সিরিজের তিনটি টেস্টের পর্যালোচনা দেশের পাতায় আগেই প্রকাশিত হয়েছে। বাকি দুটি টেস্টের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

চতুর্থ টেস্ট—লীডস

লীডসের চতুর্থ টেস্টে দুই দলের দুই অধিনায়ক কলিন কাউড্রে ও বিল লরি অসুস্থ থাকায় খেলায় যোগ দিতে পারেন নি। ফলে ইংলণ্ডের অধিনায়কত্ব করেছেন টম গ্রেভনি, অস্ট্রেলিয়ার ব্যারী জারমান।

অস্ট্রেলিয়া টসে জিতে প্রথম ব্যাট করে। তারা প্রথম দিনে ৫ উইকেটে ২৫৮ ও দ্বিতীয় দিনে ৩১৫ রানে ইনিংস শেষ করবার পর ইংলণ্ড ৩ উইকেট হারিয়ে ১৬৩ রান করে। তৃতীয় দিন ৩০২ রানে ইংলণ্ডের ইনিংস শেষ হয় বাকি সময়ে অস্ট্রেলিয়া তোলে ২ উইকেটে ৯২। চতুর্থ দিন অতি মন্থরভাবে অস্ট্রেলিয়া ব্যাট চালিয়ে ৬ উইকেটে ২৮৩ রান তোলে। শেষ দিন ৩১২ রানে তাঁদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হবার পর ২৯৫ মিনিট সময় ছিল। জয়ের জন্য ইংলণ্ডের প্রয়োজন ছিল ৩২৬ রান। ৪ উইকেটে তারা ২৩০ রান করলে খেলাটি শেষ হয়। এ টেস্টেও কেউ সেঞ্চুরি করতে পারেন না।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

অস্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস ৩১৫ (ইয়ান রেডপাথ ৯২, ইয়ান চ্যাপেল ৬৫, ডগ ওয়াল্টার্স ৪২; আণ্ডারউড ৪১ রানে ৪ উইঃ, স্নো ৯৮ রানে ৩ উইকেট)।

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস ৩০২ (রজার প্রেয়ারহ্‌ ৬৪, জন এডরিচ ৬২, কেন ব্যারিংটন ৪৯; অ্যালান কনোলী ৭২ রানে ৫ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া—২য় ইনিংস ৩১২ (ইয়ান চ্যাপেল ৮১, ডগ ওয়াল্টার্স ৫৬, ইয়ান রেডপাথ ৪৮; রে ইলিংওয়ার্থ ৮৭ রানে ৬ উইকেট)।

ইংলণ্ড—২য় ইনিংস (৪ উইঃ) ২৩০ (জন এডরিচ ৬৫, কেন ব্যারিংটন নট আউট ৪৬)।

খেলা অমীমাংসিত

পঞ্চম টেস্ট—ওভাল

ওভালের শেষ টেস্টে ইংলণ্ডের ২২৬ রানে জয়ের মূলে প্রধানত জন এডরিচ ও ডলিভেরার সেঞ্চুরি এবং ডেরেক আন্ডারউডের মারাত্মক বোলিং। এই খেলায় এডরিচের টেস্ট খেলায় দু' হাজার রানও পূর্ণ হয়।

খেলার সর্ববিভাগে প্রাধান্যের পরিচয় দিয়ে জয়ের মুখে পৌঁছলেও শেষ দিনের খেলা শেষ হতে যখন মাত্র ৭৫ মিনিট বাকি তখনও অস্ট্রেলিয়ার হাতে ছিল ৫টি উইকেট। কিন্তু ডেরেক আন্ডারউড মারাত্মকভাবে বল করে ৫০ রানে ৭টি উইকেট দখল করেন এবং খেলা শেষ হবার নির্দিষ্ট সময়ের ৭ মিনিট আগে ২২৬ রানের ঘাটতি নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর :

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস ৪৯৪ (জন এডরিচ ১৬৪, বেসিল ডলিভেরা ১৫৮, টম গ্রেভনি ৬৩)।

অস্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস ৩২৪ (বিল লরি ১৩৫, ইয়ান রেডপাথ ৬৭, ম্যালেট নট আউট ৪৩; স্নো ৬৭ রানে ৩ উইঃ, ব্রাউন ৬৩ রানে ৩ উইঃ)।

ইংলণ্ড—২য় ইনিংস ১৮১ (কলিন কাউড্রে ৩৫; কনোলী ৬৫ রানে ৪ উইঃ)।

অস্ট্রেলিয়া—২য় ইনিংস ১২৫ (ইনভেরারিটি ৫৬; আন্ডারউড ৫০ রানে ৭ উইকেট)।

(ইংলণ্ড ২২৬ রানে বিজয়ী)

একলব্য

শত টেস্ট ও সাত হাজার রানের নায়ক

শুধু শত টেস্ট এবং সাত হাজার টেস্ট রানের নায়কই নন—ক্রিকেট-স্রষ্টা ইংলনডের দলনায়ক কলিন কাউড্রের দখলে আজ ক্রিকেটের একাধিক বিশ্ব রেকর্ড।

টেস্টের সংখ্যা ১০১, অর্ধশত রান ৫৭ বার, ৪২ বার সেঞ্চুরি, ১১০টি টেস্ট ক্যাচ—সবই বিশ্ব রেকর্ড। মোট রান এবং সেঞ্চুরিতে অবশ্য এখনো বিশ্ব রেকর্ড করতে পারেন নি। টেস্টরানে ডন ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড (৭২৪৯ রান) ভাঙ্গতে কাউড্রের আর দরকার দেড় শোর মত রান। ব্র্যাডম্যানের ২৯টি সেঞ্চুরির রেকর্ড ভাঙ্গতেও ৯টি সেঞ্চুরি দরকার।

অচিরে টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিদায় নেবার ইচ্ছা নেই কলিন কাউড্রের। আরও পাচ-সাত বছর ক্রিকেট খেলার ইচ্ছা। সুতরাং টেস্ট ক্রিকেটের আরও অনেক রেকর্ড তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। রেকর্ড ভাঙ্গার জনাই রেকর্ডের সৃষ্টি। কিন্তু ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণের সময় রেকর্ড বইয়ের যেখানে যেখানে কাউড্রের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে আর কোন্ ক্রিকেট-নট কত দিনে সে রেকর্ড ভাঙ্গতে পারবেন কে জানে।

১৪ বছরের টেস্ট ক্রিকেট জীবনে কলিন কাউড্রের অনেক কীর্তি। বহু দিন থেকেই কাউড্রে বিশ্ব ক্রিকেটের স্মরণীয় নাম। ব্যাটের কর্নিকে মাঠে মাঠে গড়ে তুলেছেন যশের তাজমহল। কিন্তু ইংলণ্ড ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা কি কাউড্রের যোগ্যতার উপর সব সময় সুবিচার করেছেন? কিংবা দিয়েছেন তাঁর ক্ষমতা ও যোগ্যতার পূর্ণ মর্যাদা?

উত্তরে বলব, না। পিটার মে-র দলের সহ-অধিনায়ক হওয়া সত্ত্বেও বারবার তাঁর অধিনায়ক হবার দাবি উপেক্ষিত হয়েছে। মে-র পরে টেড ডেক্সটার অধিনায়ক হয়েছেন, মাইক স্মিথ অধিনায়ক হয়েছেন, ব্রায়ান ক্লোজ অধিনায়ক হয়েছেন। কিন্তু অতি নম্র ও অতি বিনয়ী বলে কাউড্রেকে অধিনায়ক করা হয় নি। নম্রতা বা বিনয় অবশ্য অপবাদ নয়—তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ দুর্বলতার। ঘুরিয়ে বলা হয়েছে, 'কাউড্রে ইজ টু সফট।' অধিনায়ক হবার পক্ষে এই সফটনেস নাকি প্রতিবন্ধক।

সত্যিই কি কাউড্রে দুর্বল? তাই যদি হবে তবে অজেয় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে অধিনায়ক হিসাবে তাঁর জয়-জয়ন্তী কেন? কেনই বা অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ড আজ পূর্ণ প্রভায় পরাক্রান্ত?

আসল কথা, কাউড্রের চরিত্রে ভারতীয় মহানুভবতার ছাপ। সৌম্যদর্শন চেহারা এবং সুন্দর স্বভাবের সঙ্গেই তাঁর ক্রিকেটের জীবনদর্শন।

ভারতীয় মহানুভবতা কেন? না, ভারতেই কাউড্রের জন্ম। জন্ম ব্যাঙ্গালোরে ১৯৩২ সালের ২ ডিসেম্বর। ভারতের জল-হাওয়াতেই কেটেছে কাউড্রের শিশুজীবন। ক্রিকেটের হাতে খড়িও ভারতের মাঠে।

বাবা ছিলেন ব্যাঙ্গালোরের নিকটবর্তী নীলগিরি পাহাড়ের টি প্ল্যান্টার্স—চা-এর চাষের কারবারী। ক্রিকেটে তাঁর শুধু আসক্তিই ছিল না—নিজেও ছিলেন একজন নাম-করা ক্রিকেট খেলোয়াড়। ১৯২৬-২৭ সালে আর্থার গিলিগানের নেতৃত্বে এম সি সি-র প্রথম যে দল ভারতে এসেছিল, কলিনের বাবা ই এ কাউড্রে সেই দলের বিরুদ্ধে মাদ্রাজে ইউরোপীয়ান একাদশের হয়ে খেলেছিলেনও। ক্রিকেটের প্রতি অনুরাগ এবং ক্রিকেট-প্রীতির বশেই সম্ভবত ছেলের নাম রেখেছিলেন ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা এম সি সি-র নামে। কাউড্রের পুরো নাম মাইকেল কলিন কাউড্রে, সংক্ষেপে বলা যেতে পারে এম সি সি।

কাউড্রের খেলা আমি একবার দেখেছি এই কলকাতার ইডেনের মাঠে। ১৯৬৪ সালে ভারত সফরকারী মাইক স্মিথের এম সি সি দলের শক্তিবৃদ্ধির জন্য তিনি উড়ে এসেছিলেন ইংলণ্ড থেকে। অবশ্য ভারত সফরের জন্য তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন এম সি সি-র অধিনায়ক। কিন্তু মাস কয়েক আগে ইংলণ্ডের মাটিতে টেস্ট খেলার সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের 'দৈত্য বোলার' ওয়েসলী হলের বলের গোলায় তাঁর হাত ভেঙে যাওয়ায় ভারতে আসার দায়িত্ব নিতে চান নি। পরে এসেছিলেন প্রয়োজনের তাগিদে। কিছুটা বা বাল্যস্মৃতি রোমন্থনের আশায়।

ইডেনে কাউড্রের কি রূপ দেখেছিলাম? শূন্যের কোঠা পার হতে তাঁর ৪০ মিনিট সময় লেগেছিল। ফলে নেট প্র্যাক্টিসের সময় দর্শকদের অভিনন্দনের অত্যাচারে যিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, তাঁকেই শুনতে হয়েছিল দর্শকদের ধিক্কার, 'গো ব্যাক কাউড্রে'। কিন্তু হাবে-ভাবে তিনি দর্শকদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি কানে কালা। ধিক্কারে এতটুকু বিচলিত নন। একবারও ঝুঁকি নিয়ে ব্যাট চালান নি। শেষ পর্যন্ত দর্শকদের তিনি উপহার দিয়েছিলেন একটি নয়নাভিরাম সেঞ্চুরি। তাঁর অতি সংযমের সোপানে গাঁথা বহুসঞ্চয় সেঞ্চুরি (৩৬৫ মিনিটে করা) অনেকের হয়তো সমাদর পায় নি। কিন্তু মেজাজগত নৈপুণ্যে এবং প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যে কাউড্রের সে খেলা ছিল অনন্য ও অনবদ্য। সে ইনিংসকে বলা যায় বড় আসরের উপযোগী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। ক্রিকেটের গুণী রসিক এর মধ্য থেকে অনেক রসের সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু যাঁরা লঘু সঙ্গীতে মাতাল হতে চান তাঁদের মন ভরে নি। আমরা দেখতে চলেছি কাউড্রের খেলা। এই শীতে এম সি সি এলে হয়তো তিনিই হবেন অধিনায়ক।

১৯৫৪-৫৫ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে মেলবোর্ন টেস্টে কাউড্রের সেঞ্চুরি দেখে ক্রিকেটের মহাকবি নেভিল কার্ডাস তাঁর উপর নিপুণ শিল্পীর ছাপ এঁকে দিয়েছিলেন। বিল ওরেলি বলেছিলেন, তাঁর দেখা শ্রেষ্ঠ ইনিংস।

মুকুল

সাংবাদিক বৈঠকে শিল্পী সংসদের জহর গাঙ্গুলি, উত্তমকুমার, বিকাশ রায়, তরুণ মিত্র, জয়শ্রী সেন, মলিনা দেবী, মাধবী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি

ফটো—দেশ

ঃশিল্পী-সংসদঃ শিল্পীদের নতুন সংস্থা

শিল্পী সংসদ নতুন গঠিত হয়েছে। শিল্পীদের অন্য সংস্থার সঙ্গে সংসদের পার্থক্য রয়েছে। শিল্পী সংসদে সব শিল্পীরই প্রবেশাধিকার। নাটক, যাত্রা এবং সিনেমার যাঁরা পেশাদার অভিনেতা-অভিনেত্রী তাঁরা তো আছেনই। তা ছাড়া, নৃত্যশিল্পী, সংগীত শিল্পী, মূকাভিনেতা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের শিল্পীরাও এই সংসদের সভ্য হতে পারেন। সংসদের সভাপতি শ্রীউত্তমকুমার গত সপ্তাহে এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান, আমরা একটি বড় 'প্ল্যাটফর্ম' চেয়েছিলাম। যেখানে সব শিল্পীরা এসে যোগ দিতে পারেন। শিল্পীরা যাতে একত্র হয়ে নিজেদের সমস্যার কথা ভাবতে পারেন, এবং তাঁদের মধ্যে একতা যাতে গড়ে উঠতে পারে সেজন্যই এই সংসদ তৈরি হয়েছে। দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্য এবং অসুস্থদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য আমরা ইতিমধ্যেই একটি পরিকল্পনায় হাত দিয়েছি। আমাদের সভ্যদের মধ্যে যাঁদের মাসিক আয় ২৫০ টাকার কম তাঁদের এবং তাঁদের পরিবারের জন্য আমরা "মেডিকেল বেনিফিট স্কীম" অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি। আমরা ডাক্তার নিযুক্ত করেছি। তিনি বিনা পয়সায় সপ্তাহে দু দিন আমাদের সভ্যদের দেখবেন। এক কথায়, চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

সংসদের তরফ থেকে বিবৃতি পাঠ করেন শ্রীউত্তমকুমার। পরে তিনি এবং শ্রীবিকাশ রায় সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন। শ্রীরায় জানান, বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য কিছুকালের মধ্যেই তাঁরা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন। তিনি আরও বলেন, সকল ধরনের শিল্পীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। প্রবীণ শিল্পীরাও আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শ্রীউদয়শঙ্কর জানিয়েছেন, সংসদের অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেবেন।

বন্যার্তদের জন্য রাজপথে সাহায্য ভাণ্ড নিয়ে শিল্পী সংসদ বেরোচ্ছেন না কেন এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীউত্তমকুমার ও শ্রীবিকাশ রায় জানান, অতীতে একাধিকবার আমরা পথে বেরিয়েছি। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, পথে স্টার দেখবার জন্য যত ভিড়ই হোক না কেন, সাহায্য-ভাণ্ড তেমন পূর্ণ হয় না। শ্রীউত্তমকুমার বলেন, আগে আমিও ভিক্ষাভাণ্ড নিয়ে বেরিয়েছি। এতে হইচই হয় খুব। কিন্তু আশানুরূপ টাকা ওঠে না।

সংসদের সভা-সভ্যাদের মধ্যে শ্রীজহর গাঙ্গুলী, শ্রীমতী মলিনা দেবী, শ্রীমিহির ভট্টাচার্য, শ্রীজহর রায়, শ্রীমতী মাধবী মুখোপাধ্যায়, শ্রীতরুণ রায়, শ্রীতরুণ মিত্র, শ্রীঅর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামল মিত্র, শ্রীমতী জয়শ্রী সেন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। নিম্নলিখিত শিল্পীদের নিয়ে কমিটি গঠিত ঃ

সহ-সভাপতি : শ্রীমতী মলিনা দেবী, শ্রীজহর গাঙ্গুলী; শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও শ্রীপঙ্কু সেন। **সম্পাদক :** শ্রীঅর্ধেন্দু মুখার্জি। **সহ-সম্পাদক :** শ্রীঅনিল চ্যাটার্জি ও শ্রীশ্যামল মিত্র। **কোষাধ্যক্ষ :** শ্রীজহর রায়। **সভ্যবৃন্দ :** শ্রীবিকাশ রায়, শ্রীতরুণ-কুমার, শ্রীনির্মলকুমার, শ্রীমতী মাধবী মুখোপাধ্যায়, শ্রীদ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী জয়শ্রী সেন, শ্রীঅজয় গাঙ্গুলী, শ্রীমিহির ভট্টাচার্য, শ্রীতরুণ রায়, শ্রীআনন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীতরুণ মিত্র।

নরেশ মিত্র নেই

পরলোকে নরেশ মিত্র ফটো—দেশ

পরিণত বয়সেই নরেশ মিত্র পরলোকগমন করেছেন। কিন্তু কর্মব্যস্ততার মধ্যে তাঁর মৃত্যু এমন আকস্মিকভাবে এসেছে যে, ওই খবর বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিকালে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতার রঙ্গজগতে বিষাদের ছায়া নেমে আসে। মাত্র তিন দিন আগে বৃদ্ধ বয়সে (তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০) তিনি যাত্রা-নাটকে অভিনয় করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। ছায়াছবির পর্দায় শেষবারের মত তাঁকে দর্শকরা দেখেছেন "পরিশোধ" চিত্রে। শিল্পী জীবনের শেষ দিনগুলিতেও শিল্পরসিকদের আনন্দ দিয়ে গেছেন। তাঁর জীবন এক বিরামহীন শিল্পসাধনার নিদর্শন। তাঁর মৃত্যু যেন একটি যুগের অবসান।

শিশিরকুমারের সহযোগী হিসাবে তিনি অভিনয়জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। মঞ্চে তিনি যোগ দেন ১৯২২ সনে। ওই বছরেই মিনার্ভা থিয়েটারে তিনি "প্যালারামের স্বাদেশিকতা" নাটকে অভিনয় করেন। পরবর্তী অভিনয় "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকে চাণক্যের চরিত্রে। তার আগে ছাত্রজীবনেই তিনি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে নবীন সেনের "কুরুক্ষেত্র" নাটকে শিশিরকুমারের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে বহু বিখ্যাত নাটকে তাঁর অভিনয় দর্শকের অন্তর জয় করেছে।

সিনেমার জগতে তিনি আসেন ১৯২২ সনে। "আঁধারে আলো" ছবির সঙ্গে তিনি যুক্ত হন। তিনি কয়েকটি নির্বাক ছবি পরিচালনা করেন। তাতে অভিনয়ও করেন। সিনেমায় "টাইপ"-চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। তাঁর অভিনীত কাত্যায়ন, (চাণক্য) পানুবাবু, (গোরা) জিতেন্দ্রনাথ (বাংলার মেয়ে) চরিত্রগুলি ভোলবার নয়। তাঁর পরিচালিত অনেক ছবি জনপ্রিয় হয়েছে। তার মধ্যে স্বয়ংসিদ্ধা, বিদুষী ভার্যা, কঙ্কাল, বৌঠাকুরাণীর হাট, নিয়তি, উল্কা, কালিন্দী, অন্নপূর্ণার মন্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমিত্র ১৮৮৮ সনে আগরতলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিঃসন্তান, কয়েক বছর আগে তাঁর স্ত্রী মারা যান। বুধবার বিকালে তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে রঙ্গালোক ও চিত্রজগতের বহু ব্যক্তি এবং শিল্পীর অসংখ্য অনুরাগী কেওড়াতলা শ্মশানে গিয়ে উপস্থিত হন। পরের দিন রঙ্গালয়ে অভিনয় বন্ধ থাকে।

শোকসভা

রঙমহলে "নহবত" নাটকের শততম অভিনয়ের স্মারক উৎসব সম্পন্ন হবার কথা ছিল গত সপ্তাহে বৃহস্পতিবার। আগের দিন আকস্মিক নরেশ মিত্র পরলোকগমন করেন। তাই ওই উৎসব বন্ধ রাখা হয়। পরিবর্তে শোক-সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বনফুল। "নহবত" নাটকের শততম অভিনয় পূর্তি উপলক্ষে রঙ্গালয়ের সকল শিল্পী ও কর্মীকে আগেই বিশেষ বোনাস দেওয়া হয়।

"শাজাহান" নাটকে মৃত্যুর অল্পকাল আগে অভিনয় করেন নরেশ মিত্র ফটো—দেশ

শিল্পী-সংসদের শোক সভা

নটশেখর নরেশ মিত্রর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে নবগঠিত শিল্পী-সংসদ ২রা অক্টোবর ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে এক শোক-সভার ব্যবস্থা করেন। সভার আহ্বায়ক ছিলেন সংসদ-সভাপতি উত্তমকুমার।

বি কে প্রোডাকশন্স-এর "শুক-সারী" ছবিতে নায়ক-নায়িকা উত্তমকুমার ও অঞ্জনা ভৌমিককে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক সুশীল মজুমদার (ডাইনে) (বাঁ-দিকে) একটি দৃশ্যে নায়ক-নায়িকা ফটো—দেশ

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

চৌরঙ্গী

দর্শকরা জানেন, কোন্ ছবিতে নতুন কী মিলবে। তারকাদীপ্ত বলেই "চৌরঙ্গী"-র (পল্পি ফিল্মস) আকর্ষণ তাঁদের কাছে অনিবার্য নয়। শংকরের কাহিনীর (ওই নামের উপন্যাসের ভিত্তিতেই ছবি) যে চরিত্র, পরিবেশ ও 'সিচুয়েশন' তা এর আগে যে বাংলা ছবিতে রূপ নেয়নি এই তথ্য দর্শকের অবগত।

তবে চিত্রনাট্যে বৈচিত্র্য পুরোপুরি রূপ নিয়েছে কিনা সে অবশ্য ভিন্ন প্রশ্ন। প্রত্যাশা যদি কিছু পরিমাণে অপূর্ণও থাকে তবু বলব, "চৌরঙ্গী" ভিন্ন স্বাদের ছবি। ছবির একটা "ভিস্যুয়াল" দিক আছে যেখানে "চৌরঙ্গী" বিশিষ্ট। কলকাতার একটি বড় হোটেলে ছবির অনেক দৃশ্য গৃহীত। ছাদেও কিছু দৃশ্যের উপস্থাপন। হোটেলের বাইরে যে দৃশ্যগুলি দেখি তারও দৃষ্টি-বাহিত বা "ভিস্যুয়াল" আবেদন যথেষ্ট! এক কথায়, ছবির বহিরঙ্গের বা দৃশ্যগত আঙ্গিক গঠনের গুণে "চৌরঙ্গী" দর্শকের দৃষ্টি সদা আকৃষ্ট করে।

বাইরের রূপ বেশী বলে "চৌরঙ্গী"-তে অন্তর্গুণ নেই তা বলছি না। একটি হোটেলের পটভূমিতে বিভিন্ন বাস্তব চরিত্রের মিছিল সুন্দরভাবেই দেখানো হয়েছে। হোটেলে যাঁরা সন্তর্পণে অথবা সগৌরবে আসেন এবং নিঃশব্দে চলে যান তাঁদেরই গল্প নিয়ে "চৌরঙ্গী" ছবি। চিত্রনাট্য আরও ঘনবদ্ধ হলে ছবির সুখ-ভোগ্যতা বাড়ত সন্দেহ নেই। তবু ছবি দেখে চরিত্রগুলি চেনা যায়, বোঝা যায়। শব্দগ্রহণ ভাল হলে ছবিটি আরও চিত্তাকর্ষক হতে পারত। কারণ, এর সংলাপ সত্যিই চমৎকার। দুঃখের বিষয়, সব কথা পরিষ্কার শোনা যায়নি।

সে কথা যাক। ছবিতে দুটি উপাখ্যানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। একটি আপারওয়ালার হোস্টেস করবীর, অপরটি হোটেলের রিসেপশনিস্ট স্যাটা বোস ও এয়ার-হোস্টেস সুজাতার। দুটি উপ-কাহিনীরই পরিণতি প্রেমে। এবং দুটি আখ্যানই বিয়োগান্ত। করবী বিষ খেয়ে মরেছে। তার মৃত্যু জীবন-জটিলতার সহজ সমাধান কিনা সে সাহিত্য-বিচারের বস্তু। ছবিতে অবশ্য করবীর বিবেকদংশন (কারণ, সে ভাবী শাশুড়ীর গোপন ও অবৈধ প্রণয়ের ছবি দেখিয়ে শিল্পপতি পাকড়াশীর পুত্র অনিন্দ্যের সঙ্গে বিয়ের অনুমতি পেয়েছিল) এবং মৃত্যু বাঞ্ছিত করুণ রস সৃষ্টি করতে পেরেছে। তার চেয়েও মনে বেশী দাগ কাটে স্যাটা বোসের জীবনের ট্র্যাজেডি। হোটেলের রিসেপশনিস্টের কাজ করে তার জীবন হয়ে গিয়েছিল রুটিনের মত। তাতে সুখবিশৃঙ্খলা এল সুজাতার প্রেমে। সুজাতার জন্য হোটেলের চাকুরিও ছাড়ল স্যাটা বোস। কিন্তু তাদের মিলন হল না। বিয়ের আগেই বিমান-দুর্ঘটনায় মারা গেল সুজাতা। প্লেন-দুর্ঘটনার পরক্ষণেই স্যাটা বোসকে নিয়ে "ফ্রিজ শট"টি মনে রাখবার মত। তারপর সুজাতার একদা গাওয়া সেই রবীন্দ্রসংগীতের কলি—এই কথাটি মনে রেখো" ভেসে আসার পরি-কল্পনা সুন্দর। ছবিতে আরও কিছু সুন্দর মুহূর্ত আছে যার জন্য পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায় ধন্যবাদ পাবেন।

একটি বড় হোটেলের বিলাসিতা, আভিজাত্য, উন্নাসিকতা ও আধুনিকতার মাঝখানে লিনেন-ইন-চার্জ ন্যাটাহরিকে বেমানান, ছন্দোপতনের মত মনে হয়েছে। ওই মেক-আপে এমন একটি হোটেলে (কাহিনীতে হোটেলের নাম "শাজাহান" হলেও আসলে কোথায় ছবি তোলা হয়েছে দর্শকের তা বুঝতে অসুবিধা হয় না) ন্যাটাহরির মত শুচিবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তির অতিরিক্ত আনাগোনা বিসদৃশ। তার উপর তাকে দিয়ে (করবীর প্রতি তার কন্যার মত স্নেহ) মেলোড্রামার রস-সঞ্চার যেন গতানু-গতিক। দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য অতি পরিচিত উপচার আরও আছে। স্যাটা বোসের মুখে গান যেমন। অনিন্দ্যও গেয়েছে সিনেমার নিয়মানুযায়ী। কিছু কিছু মামুলী পরিস্থিতির মধ্যেও "চৌরঙ্গী"-র নতুনত্ব ও কাহিনীগত বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য।

প্রধান চরিত্রের শিল্পীদের সকলের অভিনয়ই উঁচু মানের। উত্তমকুমারের স্যাটা বোস মুগ্ধ করে রাখেন। ওই চরিত্রচিত্রণ যেমন হওয়া উচিত শক্তিমান অভিনেতা তা-ই করেছেন। তাঁর অভিনয় অদ্ভুত সহজ, বুদ্ধিদীপ্ত এবং স্মার্ট। স্বাভাবিক চরিত্রাঙ্কনে সুপ্রিয়া দেবী, শুভেন্দু চট্টো-পাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, অঞ্জনা ভৌমিক, দীপ্তি রায়, তরুণকুমার প্রভৃতিও তাঁদের দক্ষতা দেখিয়েছেন। একাধিক দৃশ্যে সুপ্রিয়া দেবীর অভিব্যক্তি ও অভিনয় স্মরণীয়। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় অবিশ্বাস্য চরিত্রেও নিজের অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার, জহর রায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত ও দীপক মুখার্জির চরিত্রাঙ্কনও যথাযথ।

ছবির বিশেষ সম্পদ সংগীত। সংগীত পরিচালিকা অসীমা ভট্টাচার্য (ইনি চিত্র-প্রযোজিকা) আবহ সুর রচনায় ও ব্যবহারে রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর দেওয়া দুটি গানের (গেয়েছেন মান্না দে ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়) সুর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। রবীন্দ্র-সংগীতের (গানটি গেয়েছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়) ব্যবহার চমৎকার। ক্যামেরায় দীনেন গুপ্ত কয়েকটি শট-গঠনে প্রশংসনীয় শিল্পজ্ঞানের প্রমাণ রেখেছেন। কালী রাহার সম্পাদনা সন্তোষজনক।

সত্যজিৎ রায়ের "গুপী গাইন বাঘা বাইন" ছবিতে সন্তোষ দত্ত ও জহর রায়—ছবির শুটিং শেষ **ফটো—দেশ**

অদ্বিতীয়া

অদ্বিতীয়া বিশেষণে যে ভূষিতা সে বাঈজি। যদি কুলবধূ হয়েই সে থাকত তবে অদ্বিতীয়া হত কী করে? দুশ্চরিত্র স্বামীর পীড়ন ও প্ররোচনায় তাকে পতিতালয়ে এসে জনতোষণে প্রবৃত্ত হতে হয়েছে। "অদ্বিতীয়া" (এ-আর-সি প্রোডাকশন্স) ছবির নায়িকা এই বাঈজি, নাম লক্ষ্মী।

বারবনিতাও যে প্রেমে একনিষ্ঠ হতে পারে এবং পাপ-পরিবেশে থেকেও যে তার পক্ষে অপাপবিদ্ধা হওয়া সম্ভব তা-ই বোধহয় পরিচালক-কাহিনীকার নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় দেখাতে চেয়েছেন। বারাঙ্গনার মমতা, ত্যাগ, প্রেম ইত্যাদি বাংলা ছবির দর্শকের কাছে নতুন তত্ত্ব কিছু নয়। নায়ক রাজীবকে তথা প্রেমিককে খুনের দায় থেকে বাঁচাবার জন্য লক্ষ্মী স্বামী হত্যার অপরাধ নিজের মাথায় নিয়ে যাবজ্জীবন কারাবাসে গেছে (জানি না ছবিতে নিরপরাধের শাস্তি হল কেমন করে?)। মহান ত্যাগ সন্দেহ নেই। কিন্তু ত্যাগের লক্ষণ অদ্বিতীয়া বাঈজির চরিত্রে এর আগে একটু দেখালে ভাল হত। রাজীবের স্ত্রী যখন তার কাছে এসে স্বামীকে ভিক্ষা চেয়েছে তখন কিন্তু লক্ষ্মী নীরব। পরেও, যখন সে এই ঘটনা বলেছে প্রণয়ীকে। এখানে অদ্বিতীয়া রীতি-মত স্বার্থপর। একটি ঘর সে ভাঙছে বলে তার কোন অনুশোচনা নেই।

গল্প শুরু হয়েছে দার্জিলিংয়ে, যেখানে লক্ষ্মী ও রাজীবের পরিচয় হয় এবং ওরা পরস্পরের প্রেমে পড়ে। এবং হিন্দী চিত্রের নায়ক নায়িকার মত যখন তখন গান গায়। রাজীব তখন জানত না তার প্রেমিকার পেশা। পরে রাজীবের বিয়ে হয়। নায়কের বিবাহিত জীবন নিয়ে আরও দ্বন্দ্ব ও জটিলতা বিস্তারের অবকাশ ছিল। স্বামী-গৃহ ত্যাগ করে রাজীবের স্ত্রী গেছে বান্ধবীর বাড়িতে। ওখানে গল্প শুরু হতে না হতেই শেষ। সেখানে অকারণে একটি ভিলেন-জাতীয় লোককে দেখা গেল।

বিষয়বস্তুর দুর্বলতা সত্ত্বেও ছবিটি আগাগোড়া দর্শকের কৌতূহল আকৃষ্ট করে। নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় ছবিটি পরি-চালনা করেছেন। তাঁর প্রয়োগকর্ম অবশ্য সুষ্ঠু। স্বচ্ছন্দগতি এই ছবিতে আমোদের উপকরণ অনেক। সবার উপর রয়েছে বোম্বাইয়ের ডেইজি ইরাণির নাচ এবং কয়েকটি সুশ্রাব্য গান (হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরারোপিত)। মাতালের মুখে মান্না দে'র গাওয়া গানটি বেশী চিত্তাকর্ষক। এই গানের দৃশ্যবিন্যাসও ভাল।

চিত্রনাট্যের শর্ত অনুযায়ী লক্ষ্মীর চরিত্রের সব রূপই মাধবী মুখোপাধ্যায় বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। বাংলা ছবির নায়ক হিসাবে সৌমিত্রকে দর্শকরা সাদরে গ্রহণ করবেন। তাঁর চলন-বলনে বৈশিষ্ট্য আছে। লক্ষ্মীর কুটিল প্রকৃতির স্বামীর চরিত্রে বিকাশ রায় স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। লিলি চক্রবর্তী, দিলীপ রায় ও পদ্মা দেবীর অভিনয় বেশ সুন্দর। অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, গীতা দে প্রভৃতি। এঁরা চিত্রনাট্যের দাবি যথাযথভাবেই পালন করেছেন।

শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামেরার কাজ প্রশংসনীয়। দার্জিলিংয়ের দৃশ্যগুলি সুন্দর নেওয়া হয়েছে।

শিল্পীর বিদেশ যাত্রা

প্রখ্যাত তবলিয়া শ্রীকানাই দত্ত "আমেরিকান সোসাইটি ফর ইস্টার্ন আর্টস" কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে ২রা অক্টোবর এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানযোগে আমেরিকা যাত্রা করেছেন। আমেরিকার লস এঞ্জেলস, কলোরেডো স্প্রিং, ওহিও, পেনসালভেনিয়া, বালটিমোর, নিউ ইয়র্ক সিটি, ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি স্থানগুলির বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চল্লিশটি অনুষ্ঠানে তিনি শ্রীনিখিল বন্দ্যো-পাধ্যায়ের সেতারবাদনে সঙ্গত করবেন এবং তবলালহরা পরিবেশন করবেন। দুই মাস আমেরিকা সফরান্তে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে প্রায় দশটি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে তিনি দেশে ফিরে আসছেন।

রেকর্ড সমালোচনা

পুজোর গান

আধুনিক বাংলা গানের যাঁরা অনুরাগী, পুজোর সময় এইচ-এম-ভি এবং কলাম্বিয়ার নতুন রেকর্ডের জন্য তাঁরা স্বভাবতই উন্মুখ। গ্রামোফোন কোম্পানি পুজোর আগেই বহু শ্রোতার হাতে রেকর্ড পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

জনমনোরঞ্জনের নানা প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে পুজোর গানের রূপান্তর চলছে। গত বছর দুই যাবৎ দেখছি আধুনিক কাব্য-সংগীতে পশ্চিমী ঢঙ ও সুরের দৌরাত্ম্য। ফলে গানের কথাও হয়েছে হাল্কা ও হাস্যকর। সুখের বিষয়, এবার পশ্চিমের প্রকোপ কম। যদিও কোন কোন সুরকার সম্পূর্ণভাবে বিদেশী সুরের মোহ ত্যাগ করতে পারেননি। কেউ কেউ আবার দেশী-বিদেশী সুরের সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। তাই গানের কাব্যগুণ কিছুটা ব্যাহত। বেশির ভাগ গানের কথায়ও কাব্য-মূল্য কম। সেদিক থেকে গান যেমন ছিল তেমনই আছে। সেই বহু ব্যবহৃত, পরিচিত শব্দ এবং স্টাইল। যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, মুকুল দত্ত, শ্যামল গুপ্ত, সলিল চৌধুরী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কিশোরকুমারের পীড়াদায়ক "বোম চিকে বোম বোম" কৌতুকগীতি কিংবা আশা ভোঁসলের গানের সঙ্গে অরুচিকর সংলাপ ("এই এসো না, কাছে এসো না প্লীজ—আসবে না?") সত্ত্বেও বলব, অধিকাংশ গান এবার আনন্দ দিয়েছে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মান্না দে, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী (লোক-সংগীত), দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, সুবীর সেন, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিন্টু ভট্টাচার্য প্রভৃতি শিল্পীদের গানের রেকর্ড ঘরে ঘরে বাজবে। এঁদের মধ্যে সবাই সমান কৃতিত্বের সঙ্গে গেয়েছেন কিংবা সকলের গানই সমান জনপ্রিয় হবে এমন বলা কঠিন। মহিলা শিল্পীদের গাওয়া কোন্ গানগুলি হিট করতে পারে, তার একটা তালিকা দিচ্ছি। বলা বাহুল্য, এই নির্বাচন সর্বসম্মত নাও হতে পারে। লতা মঙ্গেশকারের "যদি বারণ কর" (রবীন্দ্র-সংগীত নয়, সলিল চৌধুরীর লেখা), আরতি মুখোপাধ্যায় "আকাশ কথা বলে", প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মিছে দোষ দিয়ো না আমায়", বনশ্রী সেনগুপ্ত "নিঃঝুম রাত", সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের "কান্ত কোকিল কেন ডাকো", সুমন কল্যাণপুরের "বাদলের মাদল বাজে", ইলা বসুর "কানে কানে সেই কথাটি" এবং নির্মলা মিশ্রর "যায় রে এ কি বিরহে"।

পুরুষ-শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা এবার নিজের গানের সুর রচনা করেছেন (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র এবং নির্মলেন্দু চৌধুরী) তাঁরা সকলেই রসিক শ্রোতার ধন্যবাদার্হ হবেন।

সুর-রচনার বৈশিষ্ট্যের জন্য আর যাঁরা প্রশংসার্হ তাঁদের মধ্যে নচিকেতা ঘোষ, সুধীন দাশগুপ্ত, রতু মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সলিল চৌধুরী, নিখিল চট্টোপাধ্যায়, হিমাংশু বিশ্বাস, অভিজিৎ, অশোক রায়, রবীন্দ্র প্রশান্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রসংগত বলা যেতে পারে, হেমন্তকুমার, তালাত মামুদ (তাঁর দুটি গানই সংগীত) ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের সুর চমৎকার দিয়েছেন। নচিকেতা ঘোষের সুরে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও আরতি মুখোপাধ্যায়ের চারটি গানই (গাওয়ার গুণ তো আছেই) বারবার শোনার মত। মান্না দে-র সুরারোপের অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে হবে তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান শুনে। অবাক করে দিয়েছেন সংগীত পরিচালক হিমাংশু বিশ্বাস: বনশ্রী সেনগুপ্তের গাওয়া দুটি গানেরই সুর দিয়েছেন শ্রী বিশ্বাস। "নিঃঝুম রাত" গানে পশ্চিমের ঢঙ ও কীর্তনের সংমিশ্রণ লক্ষ করার মত। লোকসংগীতের আঙ্গিকে সুমন কল্যাণপুরের "বাদলের মাদল বাজে" গানটির সুর-মাধুর্যের জন্য রতু মুখোপাধ্যায় সাধুবাদ পাবেন।

কিশোরকুমারের "বোম চিকে" এবং আশা ভোঁসলের সংলাপহীন গান ছাড়াও ভাল গান আছে (রাহুল দেববর্মণের সুরে)। মুকেশের বাংলা গান উচ্চারণের দোষে তেমন আকর্ষক নয়। সবিতা চৌধুরী ও মাধুরী চট্টোপাধ্যায়ের গান নিরাশ করেনি।

কৌতুক-নকশা এবং প্যারডি-গানের মধ্য দিয়ে দর্শকের চিত্তবিনোদনের ভার যথাক্রমে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও মিণ্টু দাশগুপ্তের উপর অর্পিত। ওঁরা দুজনেই নিজেদের সুনাম ও জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

লং-প্লেয়িং রেকর্ডে "কবি" নাটক (তারাশঙ্কর রচিত) মনোগ্রাহী। রবীন মজুমদার, অনুভা গুপ্ত, নীলিমা দাস ও সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ের কৃতিত্ব তো আছেই। তা ছাড়া মানবেন্দ্রর কণ্ঠে কবির গান (অনিল বাগচি সুরারোপিত) মনমাতানো। নাটক পরিচালনার জন্য প্রশংসা পাবেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। "মেমোরেবল পুজো হিটস" লং-প্লেয়িং রেকর্ডটিতে মোট বারোটি গান আছে। বিভিন্ন শিল্পীরা ইতিপূর্বে পুজোয় গেয়েছেন। এতে গত বছরের গানও আছে। এর কি দরকার ছিল? স্মরণীয় গানের ডালিই যখন সাজানো হল, তখন আরও অতীতে দৃষ্টি দিলে ভাল হত। তা ছাড়া গানের নির্বাচন নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। পুজোয় গাওয়া উৎপলা সেনের স্মরণীয় গান কি একটিও নেই?

ই-পি রেকর্ডে বৈচিত্র্য আছে। ছড়ার গান (সনৎ সিংহ ও আরতি বসু), কীর্তন (ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়), আধুনিক গান (শচীন দেববর্মণ) রবীন্দ্র-সংগীত (চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়), অতুলপ্রসাদের গান (কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়), এবং ইলেকট্রিক গীটারে হিন্দী গানের সুর (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) ই-পি রেকর্ডে পরিবেশিত। শচীন দেববর্মণের গানে আগের মত প্রাণ-প্রাচুর্য আশা করা অন্যায়। তবে শিল্পীর কণ্ঠ-মাধুর্য ও ঢঙ রেকর্ডটিতে অবশ্যই শুভ। শ্রোতাদের মন অনায়াসে জয় করে নেবেন চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়। ওঁদের গানগুলি যেন কিশোর সম্পদ। চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া "বলি গো সজনী যেয়ো না" কিংবা "ভালবেসে যদি সুখ নাহি" চমৎকার। কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের আমার "ঘুম ভাঙানো চাঁদ" এবং অন্যান্য গান শ্রুতিমধুর। কীর্তনে ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবারের মতই আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ করেছেন। ছড়ার গান এবং ইলেকট্রিক গীটারও আদরণীয় হবে। আদর হবে না সম্ভবত "মহিষমর্দিনী" (পরিচালনা ঃ সূত্রধার—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র) রেকর্ডটির। নতুনত্ব নেই বলে। এই আঙ্গিকে দেবী-আবাহন বছর বছর শ্রোতারা শুনে আসছেন।

নির্মল মিত্র পরিচালিত "প্রথম বসন্ত" ছবিতে অঞ্জনা ভৌমিক ফটো—দেশ

বোম্বাই বিচিত্রা

সেদিন 'নিউ সিনেমা মুভমেন্ট' প্রসংগে আলোচনার জন্য আমরা ভি শান্তারামের সংগে দেখা করতে গিয়েছিলাম। কথা ছিল, মিনিট পনেরো উনি সময় দেবেন আমাদের। কিন্তু কথায় কথায় সেই পনেরো মিনিট পুরো আড়াই ঘণ্টায় গিয়ে দাঁড়াল। প্রায়-বৃদ্ধ শান্তারামের চোখে-মুখে ফুটে উঠলো ফেলে আসা দিনের উত্তেজনা। এমন অনেক কথা বলে ফেললেন, যেসব কথা অনেক খুঁচিয়েও ও'র মুখ থেকে বার করা যায় না। অনেক পরিচালকের নাম করে, অনেক ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। বললেন, 'অনেকের কাছ থেকেই অনেক কিছু আশা করেছিলাম—কিন্তু...' তারপরই ও'র যন্ত্রণা-লাঞ্ছিত অবয়বে এক অদ্ভুত অসহায়তা ছড়িয়ে পড়ল. "বেচারীরা করবেই বা কী, দর্শকের যা চাহিদা, পরিবেশের যা তাগিদ, স্টার সিসটেমের যা অপচয়, তাতে করে ভাল ছবি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। টু মেক ওয়ানস আর্ট লীভ, দ্য আর্টিস্ট মাস্ট লীভ অ্যাণ্ড লীভ প্রপারলি"। কখনও সরলভাবে, কখনও এ'কেবে'কে, কখনও 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' করে কখনও সমস্যার সংগে অভিন্ন হয়ে আলোচনাটা 'আলোচনা-সমালোচনার' পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াল। উত্তেজনার খাতে কথোপকথন উদ্দাম হয়ে উঠলো। আমরাও ক্ষোভ প্রকাশ করলাম, "আপনার কাছ থেকেও তো আমরা প্রত্যাশিত কিছু পাচ্ছি না. বম্বের চলচ্চিত্র জগতে আপনিই একমাত্র প্রতিষ্ঠাবান চিত্র-নির্মাতা যিনি আজও স্টার সিসটেমের শিকার হননি, তবু সেই শান্তারাম কোথায়, যে শান্তারাম, 'পড়োশি', 'ডক্টর কোটনিস কি অমর কহানী' এমনকি 'দো আঁখে বারাহ হাত'-এর মত-ছবি আমাদের দিয়েছেন। উনি যে এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন ভাবেন নি। আলতো হেসে জবাব দিলেন, 'যেসব ছবির নাম করলেন সেগুলো আমি যখন করেছিলাম, তার থেকে আজ আমি সব দিক থেকেই বেশী অভিজ্ঞ, তবু ওই ধরনের ছবি আজকাল আমি করছি না; আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি না, অনেক এক্সপেরিমেণ্ট মাথায় আসে, কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে এসে ছবিতে রূপান্তরিত হয় না। হতে পারে না। আরও বললেন, "আপনারা যে আমার সম্বন্ধে এখনও এমনভাবে ভাবছেন, সত্যিই আনন্দের বিষয়; দেখা যাক, ভবিষ্যৎ আমাকে কোন্ পথে নিয়ে যায়—"

এরপর সভা ভংগ। শ্রীশান্তারামের সেক্রেটারী শ্রীঈশ্বরণ, যিনি আজ দীর্ঘ বিশ বছর ও'র সংগে কাজ করছেন, আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললেন, "আজ বড় আনন্দ পেলাম, এত দিন ও'র সংগে আছি, এই স্পিরিটে ও'কে (শান্তারামকে) কখনও আলোচনা করতে দেখিনি। মাঝে মাঝে এ ধরনের আলোচনা হলে হয়তো আমরা আবার সেই পুরোনো দিনের শান্তারামকে নতুন করে ফিরে পাবো।"

সরল শর্মা

শিল্পী-দম্পতি : প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও উৎপলা সেন গত সপ্তাহে (২৬ সেপ্টেম্বর) পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন

উদয়শঙ্কর ও তাঁর শিল্পি দলের আমেরিকা যাত্রা

গত শনিবার উদয়শঙ্কর তাঁর শিল্পিদল নিয়ে আমেরিকা যাত্রা করেন। তাঁর দলে আছেন ২৯ জন শিল্পী। তাঁরা তিন মাস ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিভিন্ন অঞ্চল সফর করবেন। অনুষ্ঠানে উদয়শঙ্কর নিজেও যোগ দেবেন জানা গেল।

অরণ্যদেব ✲ লী ফক

র‍্যাউডি, চমক হচ্ছে, তুমি আমাদের অনেক দূরে নিয়ে যাচ্ছ।
বেশ করছি।

নীচে ওটা কী?
ওরে হাঁদা, ওটার নাম প্রশান্ত মহাসাগর।

পথ যে আর ফুরোচ্ছে না!
হেলিকপটারটা কোথায়?
আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

এ আমরা কোথায় এলুম?
গাছপালা একেবারে অন্যরকম।
মনে হচ্ছে, গুণ্ডার দল!

এবারে কোথায় যাব, র‍্যাউডি?
এক রকমের কেমিক্যালের সন্ধানে।
হেলিকপটার পরীক্ষা করে দ্যাখো, এক্ষুনি রওনা হব।

সব ঠিক আছে, র‍্যাউডি।
মালপত্তর নিয়ে সবাই তাহলে উঠে পড়ো। এক্ষুনি রওনা হব।
কিসের খোঁজে যাচ্ছি, তা শুধু আমি জানি।
2/11

আমাকে চিনতে পারছ? আমি সেই ভ্যালেট। জানতুম সোনার লোভে তুমি ফিরে আসবে।
সে তো কাদামাটি, সোনা নয়।

আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা কোরো না। আমাকে যদি সোনার ভাগ না দাও তো কথাটা রটিয়ে দেব।
বেশ, তুমিও তাহলে সঙ্গে চলো।
প্রথম সুযোগেই তোমাকে যমের বাড়ি পাঠাব।

র‍্যাউডি, আমি পাইলট, ম্যাপটা আমাকে দাও।
ওস্তাদি কোরো না। যা বলছি, শোনো। পশ্চিমে চলো।

কীলাউয়ির সোনাবেলায় বিদেশী মানুষেরা আবার এল.....
কী চমৎকার জলাভূমি। যেন সোনার মত জ্বলছে।
পৌঁছে গেছি। এবারে হেলিকপটারটা নীচে নামাও।
?

সাপ্তাহিক সংবাদ

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের নিয়মমাফিক কাজের আন্দোলন প্রত্যাহার এই সপ্তাহের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। ডাক ও তার কর্মীদের জাতীয় ফেডারেশন এবং সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের নেতারা আজ তাঁদের 'নিয়মমাফিক কাজ' আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কর্মীদের প্রতি এক আবেদনে ফেডারেশন বলেছেন যে, স্বাভাবিক অবস্থা যেন অবিলম্বে ফিরিয়ে আনা হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীযশোবন্তরাও বলবন্তরাও চ্যবনকে ফেডারেশনের নেতারা তাঁদের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেছেন। নেতাদের আশা তাঁদের এই আরামসূচক মনোভাব প্রকাশের পর সরকার বরখাস্ত কর্মীদের পুনর্নিয়োগ করবেন। চ্যবন কোন কথা দেন নি। শুধু বলেছেন, তাঁরা আমাদের কর্মচারী। তাঁদের ব্যাপার আমাদের উপর ছেড়ে দিন। ডাক ও তার কর্মীদের 'নিয়মমাফিক কাজের' আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ার পর কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানে স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু হয়েছে বলে সরকারী সূত্রে সংবাদ পাওয়া যায়।

দেশী সংবাদ

২৩ সেপ্টেম্বর—গত বৃহস্পতিবার প্রতীক ধর্মঘটে যোগদানের অপরাধে সাময়িকভাবে বরখাস্ত প্রায় তের হাজার ডাক পিওনকে পুনর্নিয়োগ না করতে ডাক কর্তৃপক্ষ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। তাঁদের জায়গায় নতুন লোক নিয়োগের কাজও তারা শুরু করে দিয়েছেন। সেজন্য গতকাল একটা পরীক্ষা নেওয়া হয়ে গিয়েছে। নতুন ডাক পিওনরা আগামী সপ্তাহেই কাজে যোগ দেবেন মনে হচ্ছে।

প্রতীক ধর্মঘটে যোগদানকারী বেশ কিছু সংখ্যক কর্মীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিবাদে সোমবার কলকাতা এবং শহরতলির অধিকাংশ ডাক ও তারঘরে নিয়ম-মাফিক কাজ চলে। ফলে কাজকর্ম প্রায় অচল অবস্থায় পৌঁছয়। অন্যদিকে এদিনই কলকাতা টেলিফোনের দুইশত অস্থায়ী অপারেটরের উপর ছাঁটাইয়ের নোটিস পড়ে। বেলা ১১টার পর টেলিফোন ভবনেও কাজকর্ম প্রচণ্ড বিঘ্নিত হয়। কার্যত ট্রাংক লাইন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

২৪ সেপ্টেম্বর—নিখিল ভারত রেলকর্মচারী ফেডারেশনের অন্তর্গত ছয়টি রেলকর্মচারী ইউনিয়নের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের বিনা ভাড়ায় যাতায়াত ও সভানুষ্ঠানের ব্যাপারে ফেডারেশনের যেসব সুযোগ-সুবিধা ছিল তাও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। প্রতীক ধর্মঘটে যোগদানের সাজা হিসাবে ইউনিয়নের স্বীকৃতি বাতিলের যে সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন তদনুযায়ীই ওই ব্যবস্থা।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দফতরে নিয়ম-মাফিক কাজ করার ফলে আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর কর্মীদের বেতন না পাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আজ ডাক ও তার বিভাগের কয়েকজন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ইউ-নিয়নের নেতাদের ডেকে এই আশঙ্কার কথা জানান। ইতিমধ্যে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, আজ এক হাজার ট্রাঙ্ককল বাতিল করতে হয়েছে।

২৫ সেপ্টেম্বর—ইন্দ্রপ্রস্থের ঘটনা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীমহীশূর সিংকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত হবে। তদন্ত করবেন দিল্লি প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন এমন একজন ব্যক্তি। ইনি দিল্লির অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রী এম কে কাওরের আচরণ সম্পর্কেও তদন্ত করবেন। শ্রীকাওরকে একজি-কিউটিভ নয় এমন একটি পদে বদলি করা হয়েছে।

২৬ সেপ্টেম্বর—পশ্চিমবঙ্গের তদারক কমিশন রাজ্যের ১৩ জন প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসারের 'ব্যাঙ্কের পাস-বই' আটক করেছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেল। এই অফিসারদের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়া, বেনামী ব্যবসায় লিপ্ত হওয়া, আয়ের তুলনায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধি নানা দুর্নীতির বহু অভিযোগ রয়েছে। গত মে মাসে কমিশন রাজ্য সরকারের কাছে যে রিপোর্ট দেন তার সূত্র ধরেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পাস-বই আটক করা হয় বলে প্রকাশ।

এ পর্যন্ত সারা দেশে সাড়ে সতের হাজারেরও বেশী ডাক ও তার কর্মীকে চাকুরি থেকে বরখাস্তের জন্য এক মাসের নোটিস দেওয়া হয়েছে। এদিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে রাশি রাশি চিঠিপত্র জমে গিয়েছে। যেসব কর্মী ১৯ তারিখের প্রতীক ধর্মঘটে যোগ দেন বা মন্থর-গতিতে কাজ করার নীতি নিয়েছেন তাঁদের চাকরি থেকে বরখাস্তের জনাই ডাক কর্তৃপক্ষ এখন তৎপর।

২৭ সেপ্টেম্বর—ডাক ও তার অধিকার চারটি সদ্য গঠিত ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ১৯ সেপটেম্বর ধর্মঘটের পর ডাক ও তার কর্মচারীদের জাতীয় ফেডারেশন ও অপর নয়টি ইউনিয়নের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কর্মচারী প্রতিনিধিরা যাতে বিকল্প স্বীকৃতি ইউনিয়ন মারফত সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন সেজন্যই নতুন ইউনিয়নকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

আজ হাওড়া শালকিয়ায় জে এন মুখার্জী রোডে দুটি গুদামে আগুন লাগলে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। আশপাশের বাড়ির বাসিন্দারা জিনিসপত্র হাতে নিরাপদ স্থানে ছুটতে শুরু করেন। বিকাল পৌনে পাঁচটা নাগাদ আগুন লাগে—প্রথমে মোবিলের ড্রাম-ভর্তি তেলের বড় একটি গুদামে। তারপর পাশে তুলোর গাঁট বোঝাই একটা দোতলা গুদামে।

২৮ সেপ্টেম্বর—দলত্যাগ সংক্রান্ত সর্বদলীয় কমিটি আজ এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, দলত্যাগীদের এক বছরের মধ্যে মন্ত্রী অথবা অন্য কোন উচ্চপদে নিয়োগ করা চলবে না। অধ্যক্ষ বা সহকারী অধ্যক্ষের পদেও নির্বাচিত করা চলবে না এবং আইনসভার সদস্য হিসাবে যে বেতন বা ভাতা পাবার কথা তার চেয়ে বেশী বেতনের পদেও নিযুক্ত করা চলবে না। অবশ্য সংশ্লিষ্ট সদস্য যদি নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা ওই সময়ের মধ্যে পুনর্নির্বাচিত হন তাহলে এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হবে না।

দীর্ঘকাল ধরে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী হাস-পাতালগুলিতে ভেজাল ওষুধ সরবরাহের ব্যাপারে যে একটি দুর্নীতিচক্র সক্রিয় রয়েছে, তদারকি কমিশন তা ধরে ফেলেছেন। কমিশন রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের সংশ্লিষ্ট অফিসারদের শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছেন।

২৯ সেপ্টেম্বর—প্রকাশ্যে কঠোর মনোভাব বজায় রাখলেও গত ১৯ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের যেসব কর্মচারী একদিনের প্রতীক ধর্মঘটে যোগদান করেছিলেন ভারত সরকার তাঁদের প্রায় সকলকেই পুনরায় কাজে ফিরিয়ে নেবেন বলে মনে হচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন গ্রাম উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা নীতি পরিবর্তনের প্রস্তাব করেন। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ করে ব্যাপকভাবে সেগুলির উন্নয়ন সাধনই তার উদ্দেশ্য। তিনি আশা করেন চতুর্থ যোজনা প্রণয়নের সময় তাঁর এই প্রস্তাব আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনা করে দেখা হবে।

বিদেশী সংবাদ

২৩ সেপ্টেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ রিও দ্য জেনিরোতে বলেন, তাঁর ব্রাজিল সফরের ফলে ভারত ও ব্রাজিলের মধ্যে সমঝোতা বাড়বে এবং এই দেশ দুটি আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে।

২৪ সেপ্টেম্বর—রুশ-চেক বিরোধের আপস-মীমাংসার জন্য চেক কমিউনিস্ট দলের প্রতি-নিধিদের মসকো যাওয়ার কর্মসূচী দ্বিতীয়-বারের জন্য বাতিল করা হয়েছে বলে ওয়াকিবহাল মহল জানিয়েছেন।

২৫ সেপ্টেম্বর—আজ কাঠমাণ্ডুতে নেপাল মন্ত্রিসভায় বড় রকমের অদল-বদলের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই অদল-বদলের ফলে নতুন মন্ত্রিসভায় ১৪ জন মন্ত্রী থাকবেন—৫ জন পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকীর্তিনিধি বিসতা সহ বিগত মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সহকারী মন্ত্রী বাদ পড়েছেন।

২৬ সেপ্টেম্বর—সোভিয়েট ইউনিয়ন পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি নতুন পরিকল্পনার কথা মারকিন যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়েছে। মারকিন সরকারী কর্মচারিগণ গতকাল রাত্রে ওই সংবাদ সমর্থন করেছেন। উক্ত কর্মচারিগণ জানান, গত কয়েক সপ্তাহে এই ধরনের আবেদন জানানো হয়েছে, তবে ওইগুলি সম্পর্কে তাঁরা বিস্তৃতভাবে কিছু বলেননি। ওয়াশিংটন থেকে এ সম্পর্কে এখনও কোন সাড়া পাওয়া যায়নি।

২৭ সেপ্টেম্বর—ইন্দোনেশিয়ার ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট ডঃ সুকর্ণ নাকি দুদিন আগে সামরিক বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ : কম্যুনিস্ট আত্ম-গোপনকারীদের তৃতীয় বিদ্রোহের প্রচেষ্টার সঙ্গে তিনি জড়িত।

২৮ সেপ্টেম্বর—প্রেসিডেন্ট দ্য গল আজ ঘোষণা করেন : ইউরোপে মর্মান্তিক সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়লে ফ্রান্স ও পশ্চিম জারমানী এক জোট হয়ে তার মোকাবিলা করবে।

২৯ সেপ্টেম্বর—আলেকজানডার ডুবচেক সহ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে চেক কম্যুনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে অপসারিত করার জন্য সোভিয়েট সরকার উদ্যোগী হয়েছেন বলে সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পার্টির কর্মীরা এ কাজ ঠেকাবার চেষ্টায় আজ কোমর বেঁধে নেমেছেন।

প্রমথনাথ বিশীর
নূতন উপন্যাস

বিপুল সুদূর তুমি যে ৭॥

লালকেল্লা ১৪, কেরী সাহেবের মুন্সী ৮॥

আশাপূর্ণা দেবীর নূতন উপন্যাস

বিজয়ী বসন্ত ৬৲

প্রথম প্রতিশ্রুতি ১৪৲ সুবর্ণলতা ১৩৲

বিমল করের নূতন উপন্যাস

বাড়ি বদল ৪৲

পরবাস ৪৷৷৹ সীমারেখা ৪৷৷৹ পান্থশালা ৩৷৷৹

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

নতুন তোরণ ৪॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কাজললতা ৬৲

স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি ৯৲

বিমল মিত্রের

কলকাতা থেকে বলছি ৬৲

কড়ি দিয়ে কিনলাম ১ম—১৬৲ ২য়—১৪৲

একক দশক শতক ১৪৲

প্রবোধকুমার সান্যালের

নগরে অনেক রাত ৪॥

উত্তর হিমালয় চরিত ১১৲

শঙ্কু মহারাজের নূতন ভ্রমণ কাহিনী

উত্তরস্যাং দিশি ১০৲

বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা ৭,

অবধূতের

নীলকণ্ঠ হিমালয় ৮॥

উদ্ধারণপুরের ঘাট ৫৲

স্বামী দিব্যাত্মানন্দের

পুণ্যতীর্থ ভারত ১০,

(ভারতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ তীর্থ ভ্রমণ কাহিনী)

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর

বাঙালী জীবনে রমণী ১০,

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

নগরপারে রূপনগর ১৮৲

কাল, তুমি আলেয়া ১২॥

অলকাতিলকা (নূতন সং) **৫৲**

লীলা মজুমদারের অমৃত স্মৃতিকথা

আর কোনখানে ৫৲

সুমথনাথ ঘোষের

বনরাজানালা ৭,   মালাঞ্জনা ৭॥

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের

ইষ্ট বাকল্যাণ্ড রোড ৮৲

প্রফুল্ল রায়ের

পূর্বপার্বতী ১১৲ কিন্নরী ৪৷৷৹ মস্কো ৫৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অপরাজিত ১০৲ অনুবর্তন ৬৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

একদা কী করিয়া ১৩৲ উপকণ্ঠে ৯,

বহ্নিবন্যা ৮৷৷৹

জরাসন্ধের

(সমগ্র) লৌহকপাট ২০৲

কালিকারঞ্জন কানুনগোর

রাজস্থান কাহিনী ৮॥

টলস্টয়ের

ওঅর অ্যাণ্ড পীস

১ম—৬৲ ২য়—৫৲ ৩য়—৫৲

আনাকারেনিনা ৩॥

তারাশংকরের

শুকসারী কথা ৮৷৷৹ গন্নাবেগম ৮৲

প্রশান্ত চৌধুরীর

আলোকের বন্দরে ৪॥

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

গঙ্গাবতরণ ৫,

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২   ফোন : ৩৪-৩৪৯২ ॥ ৩৪-৮৭৯১

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৫ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪১
শনিবার ২৫ আশ্বিন ১৩৭৫

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রী[illegible]
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০ ২৩-৮৬৫১

চাঁদার হার
কলিকাতায়
বার্ষিক ... ২৫.০০
ষাণ্মাসিক ... ১২.৫০
ত্রৈমাসিক ... ৬.২৫

ভারতে
বার্ষিক সডাক ... ৩৩.০০
ষাণ্মাসিক ,, ... ১৬.০০
ত্রৈমাসিক ,, ... ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)
বার্ষিক সডাক ... ৩৩.০০
ষাণ্মাসিক ,, ... ১৬.৫০
ত্রৈমাসিক ,, ... ৮.০০

ভারতের বাইরে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক সডাক ... ৫২.০০
ষাণ্মাসিক ,, ... ২৬.০০
ত্রৈমাসিক ,, ... ১৩.০০

[illegible]
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক ... ৩১.০০
ষাণ্মাসিক ... ১১.৫০
ত্রৈমাসিক ... ১০.০০

দাম ৩০ পয়সা
[illegible] বিমান মাশুল (অতিরিক্ত) ৫ পয়সা

DESH
Saturday 12 October, 1968

ধ্বংসের খেলা

ইদানীং আমাদের দেশে একটি জিনিস বোধ করি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, অন্তত যাঁরা দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য তীব্র সংগ্রাম, ধর্মঘট ইত্যাদি করার পক্ষে তাঁদের এক শ্রেণীর মধ্যে তো বটেই। এই জিনিসটিকে চলতি বাংলায় আমরা গায়ের জোর বলতে পারি, কিন্তু তাতে সবটুকু বোঝায় না; কাজেই একে গায়ের জোর না বলে বলা উচিত ধ্বংস বা নষ্ট করার প্রবৃত্তি। লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, কখনও সামান্য, কখনও বা তুচ্ছ কারণে আমাদের মধ্যে নষ্ট করার প্রবৃত্তিটি কিভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। যে কোনো কারণে ট্রাম বাস তো পোড়েই, উপরন্তু একটু বড়গোছের কারণ পেলে রেলগাড়ি, সরকারী অফিস, ডাকঘর—এ-সবেও অগ্নিসংযোগ আবশ্যিক হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ধর্মঘট বলি বা প্রতিবাদ বলি—সবই যেন এখন ধীরে ধীরে একটা বিকৃত আক্রোশ ও ক্ষতি-সাধনের ইচ্ছের দিকে চলেছে। একথা বলা অনুচিত যে, সবরকম ধর্মঘট বা বিরোধের ক্ষেত্রেই এ-রকম ঘটছে। সবক্ষেত্রেই চূড়ান্ত হবে এমন হয় না; সেটা স্বাভাবিকও নয়, কিন্তু যেখানে বেশি হয় না সেখানে অল্প হয়। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের গত উনিশে সেপ্টেম্বরের ধর্মঘটের সময় কলকাতারই কোনো কোনো অফিসে অত্যুৎসাহী ধর্মঘটীরা তাঁদের কোনো কোনো সহকর্মীর প্রতি (ধর্মঘটে যাঁদের উৎসাহ বিশেষ ছিল না)—নারী পুরুষ নির্বিশেষে—যে ধরনের ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ শুনেছি তাতে মনে হয় এঁদের একদল গায়ের জোর এবং ভীতি প্রদর্শনকেই অস্ত্র করে নিয়েছিলেন। সরকারের বেলায় যেটা ঘটলে আমরা বলি স্বেচ্ছাচারিতা, অত্যাচার, দমননীতি—সেই একই জিনিস সামান্য হেরফের হয়ে একদল বিক্ষুব্ধ মানুষের হাতে ঘটলে কি বলব?

দুঃখের কথা হলেও, এটা ঠিক যে, ইদানীং আমরা—যারা বিক্ষোভ দেখাবার চেষ্টা করি, ধর্মঘট করি বা অসন্তোষ জানাতে চাই—তারা অন্য পক্ষকে চাপ দেওয়ার জন্যে অনেক ক্ষেত্রে অনুচিত এমন কিছু করি যাকে বলা হয় নাশকতামূলক কাজ। এ জিনিসটি এতকাল এভাবে ছিল না, এখন বাড়ছে। দুর্গাপুরের ঘটনা স্মরণ করলে বোঝা যাবে—কত তুচ্ছ কারণে কত বড় অনিষ্ট এই সেদিন একদল লোক ঘটিয়েছে। এই ক্ষতি এবং লোকসান কার? দেশের না ব্যক্তিগত কারুর। এই যে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ পর্ষদের ধর্মঘটী কর্মীরা সারাটা বাংলা দেশ জুড়ে তাদের ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছেন তাতে কি জনসাধারণ কিছু বলেছে! কিন্তু পুজোর মুখ থেকে শুরু করে এ-যাবৎ ওই ধর্মঘটী কর্মীদের একাংশ যা করছেন, তাতে আজ কার না বিরক্তি এসেছে। পর্ষদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সর্বত্র এঁদের তরফ থেকে নাশকতামূলক কাজ করা হচ্ছে। অভিযোগটি মিথ্যা এমন মনে করি কি করে? পুজোর মুখে বাংলা দেশের কত জায়গায় অন্ধকার নেমেছিল তার হিসেব কি কেউ রেখেছেন? কত বিদ্যুৎবাহী তার যে কাটা হয়েছে তার একটি হিসেবও পেলে বোধ হয় চমকে উঠতে হবে। এর ওপরও অন্যান্য ধরনের নাশকতামূলক কাজ রয়েছে, যা অভ্যস্ত ও দক্ষ কারিগর ছাড়া অন্যের দ্বারা হবার নয়। উত্তরবঙ্গের নানা জায়গা থেকে শুরু করে বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, চব্বিশ পরগণা জেলার নানান এলাকা রাতে আঁধার হয়ে থেকেছে, থাকছে। সম্প্রতি এক জায়গায় ট্রান্সমিশান টাওয়ার পর্যন্ত মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধর্মঘটী কর্মীদের তরফ থেকে যাই বলা হোক না কেন, কাজগুলি যে নাশকতামূলক, তাতে সন্দেহ করার কারণ নেই। মাঠেঘাটে তার কাটার জন্যে ভূত নিশ্চয় ঘুরে বেড়াচ্ছে না। যা যারা ধরা পড়েছে, এরা যে বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মী তা-ও দেখা যাচ্ছে। স্বভাবতই বোঝা যায়, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ধর্মঘটী কর্মীদের একাংশ এখন ধ্বংসমূলক কাজের মধ্য দিয়ে জনসাধারণকে নাস্তানাবুদ করে, কষ্ট দিয়ে পর্ষদকে নরম করতে চান। এঁদের ধারণা, ক্ষতি লোকসান এবং বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে নিজেদের দাবি আদায় করা সহজ হবে। বেশ কিছু কর্মী বুঝেছেন, এ-পথ ঠিক হচ্ছে না, তাঁরা কাজে যোগদানও করেছেন। আমরা মনে করি জাতীয় সম্পত্তি নষ্ট করার মূলে যে অবিবেচনা ও বিকৃত মনোভাব রয়েছে, তা দূর করতে না পারলে এই জিনিসটি সংক্রামক রোগের মতন আরও ব্যাপক হয়ে দাঁড়াবে।

চমক লাগাবার মত একটা মন্তব্য শোনা গিয়েছে ভারতের এক কম্যুনিস্ট নেতার কাছ থেকে। এই কম্যুনিস্ট নেতাকে আজকাল বিরোধী কম্যুনিস্ট মহল থেকে বলা হয় হঠকারী বা উগ্রপন্থী দলের নেতা। তিনি হঠকারী, কিম্বা উগ্রপন্থী কিনা সেটা অবশ্যই তর্কের ব্যাপার; কিন্তু শ্রীচারু মজুমদারকে ভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের

দেশ দর্পণ

ইতিহাস থেকে কোন মতেই মুছে ফেলা সম্ভব নয়। বেশ কিছুদিন ধরে শ্রীমজুমদার অসুস্থ এবং সে-কারণে অধিকাংশ সময়ই তাঁকে কাটাতে হয় তাঁর নিজগৃহে শিলিগুড়ীতে। তবু কম্যুনিস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁর ধ্যান ও ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তীব্র। সে তীব্রতায় তিক্ততার ঝাঁঝ নিশ্চয়ই আছে, কারণ, যে-ভাবেই আজ ভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে বিচার করা যাক না কেন, বিরোধের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আজ বাস্তবরূপে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

এই বিরোধকে অস্বীকার করার উপায় নেই বলেই শ্রীচারু মজুমদারকে আজ প্রকাশ্যে বলতে হয়েছে 'বিপ্লবী পার্টি গড়ার কাজে হাত দিন'। অর্থাৎ তৃতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি ভারতের মাটিতে জন্ম নেবার সুযোগ খুঁজছে। তবু এই সুযোগের অপেক্ষায় থাকার মুহূর্তে শ্রীচারু মজুমদারকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করতে হয়েছে। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে, এতদিন ধরে যে-সব শ্রমিক ও কৃষক পার্টির সঙ্গে যুক্ত থেকে কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে বিপ্লবের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন সেই প্রচেষ্টার মধ্যে ব্যর্থতাই ছিল অনেকখানি। বহু কমিটি ছিল যেখানে শ্রমিক ও কৃষকের সভ্যসংখ্যা মধ্যবিত্তের তুলনায় অনেক বেশী ছিল; তবু শ্রীচারু মজুমদার লক্ষ্য করেছেন "আমাদের পার্টি বিপ্লবী পার্টি হল না"। কেন?

প্রশ্নটা শ্রীচারু মজুমদারই সামনে তুলে ধরেছেন। এবং তাঁরই জবানীতে এই কথাই ফুটে উঠেছে যে, শ্রমিক পার্টি সভ্যদের সামনে কোন বিপ্লবী রাজনীতি ছিল না। কাজ ছিল না। তাদের মূলতঃ ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনেরই পরিপূরক শক্তি হিসাবে কাজ করানো হোত। এই কারণেই শ্রীচারু মজুমদার মনে করেন তাদের স্বাধীন বিকাশের পথ রুদ্ধ হত, আইনানুগ আন্দোলন করে "মধ্যবিত্ত পার্টি নেতার" নির্দেশ পালনই তাদের প্রধান কাজ হত। ফলে, পার্টি একটি খাঁটি সংশোধনবাদী পার্টিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

শ্রীচারু মজুমদারের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল বেশ স্পষ্ট। কোন জটিলতার অবকাশ না রেখেই তিনি বর্তমানে ভারতের কম্যুনিস্ট বা শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের দায়িত্ব যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রতি তিনি তাঁর আত্ম-বিশ্লেষণকে নিক্ষেপ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, তাহলে বর্তমানে যে-সব শ্রমিক আন্দোলন পশ্চিমবাংলার শিল্পাঞ্চলে দেখা যাচ্ছে তার যথার্থ প্রকৃতির মূল্যায়ন শ্রমিক কৃষকের কাছে স্পষ্ট হবে কি করে? শ্রমিক আন্দোলনকে আজ যেভাবে প্রধানতঃ পরি-চালনা করা হচ্ছে, তার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ দেখা যাচ্ছে ক্রমাগত ব্যর্থতার মধ্যে শ্রমিকের দাবীদাওয়া ডুবে যাচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় বিগত কয়েক মাসে যে-কয়টি আন্দোলন প্রাধান্য লাভ করেছিল তার হিসাব-নিকাশ করলে দেখা যাবে শ্রমিকের হাতের একটা হাতিয়ার, অর্থাৎ ধর্মঘট, অত্যন্ত দুর্বল ও নিষ্ফল মনে হবে।

তবু শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য প্রচেষ্টার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্ত নেই। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেতৃত্ব যাঁরা করেন তাঁরা সেই সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই নিবিড়ভাবে যুক্ত যে-সব দল বা পার্টি শ্রীচারু মজুমদারের মতে "খাঁটি সংশোধনবাদী" পার্টিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই সব পার্টির মধ্যে নিশ্চয় আছে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি, ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি, অথবা আর-এস-পি বা অন্য কোন দল। এই সব দলের নিজস্ব দলগত মতবাদকে সামনে রেখেই শ্রমিক আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রচেষ্টা চলেছে। শ্রমিক-কৃষক অব্যর্থভাবে রাজনৈতিক গণ্ডীর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। ফলে, যে-সব দলের নেতৃত্বের আওতায় শ্রমিক আন্দোলন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক ছাপটাই বড় বেশী চোখে ঠেকছে।

শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনের সামিল হবে না এমন কোন নীতিবাক্য সর্বজন স্বীকৃত হতে পারে না। মধ্যবিত্ত শ্রমিক কর্মচারী যখন ছাঁটাইয়ের বা মজুরী বা বেতনবৃদ্ধির দাবীতে আন্দোলন করে তখন তাকে রাজনৈতিক ছাপ মেরে প্রতিহত করার চেষ্টা হয়। এটা নিশ্চয়ই মেনে নিতে বাধা নেই যে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দাবীদাওয়া সৃষ্টি করে মূল রাজনৈতিক কাঠামো। রাজনৈতিক প্রকৃতিকে আশ্রয় করেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্বলতা বা অস্থিরতা প্রকাশ পায়। তাই অটোমেশনের বিরুদ্ধে যদি শ্রমিক কর্মচারী সঙ্ঘবদ্ধ হবার চেষ্টা করে, তাতে রাজ-নৈতিক প্রভাব মুক্ত থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই বা সাংবিধানিক নির্দেশ নেই। অটোমেশনের ফলে শ্রমিক কর্মচারীর ছাঁটাই অনিবার্য হবে কিনা সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। (কারণ, যে-সব দেশে অটোমেশন প্রতি শিল্পে স্থান পেয়েছে, সেই সব দেশের অভিজ্ঞতা লক্ষ্য করলে এটাই প্রমাণিত হবে যে, অটোমেশন আজ শিল্প প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে, অটোমেশন আজ নূতন নূতন পথে কর্মসংস্থানের পথ খুলে দিয়েছে।) কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে ভারতের শিল্প উন্নয়ন এখনও এমন পর্যায়ে আসেনি যে-অবস্থায় অটোমেশন শিল্পে উৎপাদন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছে। যদি সে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে একথাও উঠতে পারে যে, অটো-মেশনের প্রথমাবস্থায় কর্মসংস্থান সঙ্কুচিত হবে কিনা। যদি সে আশংকা শ্রমিক-কর্মচারী মহলে দেখা দেয়, তাহলে আন্দোলনের প্রশ্নও উঠবে; কারণ, সমাজের অর্থনৈতিক চাহিদাকে রাজনীতি থেকে আলাদা রাখা সম্ভব নয়।

আরও সম্ভব নয় এ-কারণে যে, পশ্চিম-বাংলায় বিশেষভাবে সমগ্র রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা একমুখী হয়ে উঠেছে।

যেমন কম্যুনিস্ট ক্যাম্পে, তেমনি কংগ্রেস ক্যাম্পে রাজনৈতিক সচেতনতা বর্তমানে সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সংসদীয় গণতন্ত্রকে কেন্দ্র করেই শ্রমিক আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রকৃতি রূপায়িত হয়। এই রূপায়ণের স্ট্রাটেজী দলগতভাবে পৃথক হতে পারে, কিন্তু মূলগতভাবে পার্থক্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এটা যদি যুক্তি হিসাবে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে দেখা যাবে কংগ্রেস বা কংগ্রেস-বিরোধী ক্যাম্পের সংসদীয় গণতন্ত্র ভিত্তিক রাজনৈতিক চেহারাটা একই জায়গায় এসে মিশে যায়।

পশ্চিম বাংলার মধ্যবর্তী নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বক্তব্যগুলো যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে এ-যুক্তিকে মেনে নিতে অসুবিধা হবে না। কয়েকদিন আগে কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ, কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, কংগ্রেস সোশ্যালিজমে শুধু বিশ্বাসই করে না, তাকে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পথে রূপায়িত করতেও বদ্ধপরিকর। অর্থাৎ, শ্রীঅতুল্য ঘোষের মতে, কংগ্রেস আদর্শগতভাবে বিশ্বাস করে শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এদেশে সম্ভব। তা যদি হয়, তাহলে কম্যুনিস্ট ক্যাম্পের মূলগত আদর্শের সঙ্গে কংগ্রেসের মূল বিশ্বাসের পার্থক্য কোথায়? এ প্রশ্ন ওঠে এই কারণে যে, আজ দুটি কম্যুনিস্ট পার্টিই দ্বিধাহীনভাবে শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যে সম্ভব তা স্বীকার করে নিয়েছে। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির বর্ধমান প্লেনামে গৃহীত "মাদুরাই দলিল" অথবা ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির পাটনা কংগ্রেসে গৃহীত দলিলকে সামনে রাখলে সেই স্বীকৃতির উক্তি স্পষ্ট খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলেও আজ এ কথা উচ্চারিত হচ্ছে এবং আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। লোকদলের আদর্শগত বিচার যাই হোক না কেন, লোকদলের নেতা শ্রীহুমায়ুন কবীর এই প্রশ্নটাই তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন নির্বাচনী মূল বক্তব্যে। শ্রীহুমায়ুন কবীরের মতে, "বাংলার মানুষ কম্যুনিজম চায় না, এবং কম্যুনিস্ট প্রভাবে কংগ্রেস যে-সমস্ত ভ্রান্ত নীতি অবলম্বন করেছে, সেগুলোও চায় না।" তাঁর এটাই বদ্ধমূল ধারণা যে, কংগ্রেস যেদিন গণতন্ত্রের পথ বর্জন করে টোটালিটেরিয়ানিজম-এর (যার বাংলা তিনি করেছেন "সমষ্টিসর্বস্ব") দিকে ঝুঁকেছে সেদিন থেকেই কংগ্রেসের অবনতি শুরু হয়েছে। শ্রীকবীর অবশ্য এ কথা স্পষ্ট করে বলেননি যে, এই অবনতি তাঁর কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার পর থেকে শুরু হয়েছে কি না। কিন্তু মন্তব্য রেখেছেন তাঁর লোকদলের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে। অর্থাৎ, তাঁর দিক থেকে কংগ্রেসকে কম্যুনিস্ট ক্যাম্পের মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে লোকদলের কম্যুনিস্ট-বিরোধী ভূমিকা সবলভাবে প্রতিষ্ঠা করাই একমাত্র সক্রিয় প্রচেষ্টা।

অপরদিকে, ঠিক একই যুক্তি অবতারণা করা হয়েছে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে শ্রীচারু মজুমদারের দল সম্বন্ধে। কলকাতার ময়দানে সেদিন বক্তৃতা দেবার সময় পার্টির দুই নেতা শ্রীজ্যোতি বসু এবং শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত অত্যন্ত সচেতন করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন জনসাধারণকে কংগ্রেস এবং উগ্রপন্থীদের সম্বন্ধে। একদিকে কংগ্রেস যেমন অর্থনৈতিক সংকটের পর রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে ডুবে গিয়েছে, তেমনি শ্রীবসু ও শ্রীদাশগুপ্তর ধারণা উগ্রপন্থীরা সক্রিয়ভাবে এবং সযত্নে নির্বাচনে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করবার প্রচেষ্টা করছে। শ্রীদাশগুপ্ত লেনিনের উদ্ধৃতি দিয়ে উগ্রপন্থীদের বোঝাতে চাইছিলেন যে, বিপ্লব-বিপ্লব বলে চীৎকার করলেই বিপ্লব আসে না। সংসদীয় রীতিনীতিরও প্রয়োজন হয় বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করে ক্ষমতা দখল করার জন্য।

মোট কথা, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট নেতাদের কাছে উগ্রপন্থীদের নির্বাচন বয়কট করা শ্লোগান অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এই অস্বস্তির হাত থেকে এড়িয়ে যাবার জন্যই শ্রীবসু এবং শ্রীদাশগুপ্তকে বলতে হয়েছে, উগ্রপন্থীরা সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসকে নির্বাচনে সাহায্য করছে মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের হারিয়ে দেবার জন্য। এটা থেকে এটাই অনুমান করে নিতে হয় যে, নির্বাচনের আসরে মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের সামনে দুটি শত্রু: এক কংগ্রেস এবং দুই "উগ্রপন্থী" কম্যুনিস্ট দল। তা যদি হয়, তাহলে শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলনকে নির্বাচনের হাতিয়ার ছাড়া আর কিছু মনে হবে না। কারণ গণতান্ত্রিক নির্বাচনে নির্ভরশীল হয়েও প্রোগ্রেসিভ ছাপটা রাখতে হলে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের রাজনীতিকে সরব করে তোলা ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা থাকে না।

ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সামনে অবশ্য উগ্রপন্থী কম্যুনিস্টরা প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গণ্য নয়। হয়ত সে কারণে উগ্রপন্থীদের সম্বন্ধে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির কোন উদ্বেগ তেমন প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের শরিক হিসাবে হয়ত এটা আর বেশী উপেক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে নির্বাচনের মুখে। তাছাড়া অন্য প্রশ্নও এসে গিয়েছে। সেটা কম্যুনিস্ট আন্দোলনের তৃতীয় ভাগ। এই তৃতীয় ভাগ যদি আজ বাস্তব হিসাবে গ্রহণ করতে হয়, তাহলে পরোক্ষভাবে কম্যুনিস্ট আন্দোলনকেই স্পর্শ করবে না, ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির উপর সংশোধনবাদের ছাপটা আরও গাঢ় হয়ে ফুটে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেবে। এটা অজানা নেই যে, উগ্রপন্থীদের কাছে সোভিয়েত নেতৃত্ব আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আসরে পুরোপুরি সামিল হয়ে গিয়েছে। সেই অভিযোগকে যদি নির্বাচনের প্রাক্কালে সাধারণের সামনে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরার চেষ্টা হয়, তাহলে কংগ্রেস-বিরোধী মহলে দলগত প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

সে-কারণেই, সম্প্রতি প্রচার করা হচ্ছে উগ্রপন্থীদের রাজনৈতিক প্রকৃতিকে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তুলে ধরা। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির বক্তব্য হিসাবে এটাই প্রচার করা হচ্ছে যে, উগ্রপন্থীরা কম্যুনিস্ট আন্দোলনের আওতায় পড়ে না। তারা সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করছে পুরোনো পরিত্যক্ত সন্ত্রাসবাদকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে। সন্ত্রাসবাদের ব্যর্থতাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য চে গুয়েভারার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে যে, সন্ত্রাসবাদ ভারতের কাছে অপরিচিত নয়। এটাও অজানা নয় যে, সন্ত্রাসবাদের আওতা থেকে মুক্ত না হলে প্রোলিতারিয়ান সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। উগ্রপন্থীদের কর্মপন্থাকে নয়া সন্ত্রাসবাদ আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে যে, এটা কম্যুনিস্ট আন্দোলন এবং প্রোলিতারিয়ান বিপ্লবকে পিছিয়ে দেবার সচেষ্ট পদক্ষেপ।

মূলগতভাবে তাই দেখা যাচ্ছে, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি এবং ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি সযত্নে এই কথাটাই প্রচার করার চেষ্টা করছে যে, উগ্রপন্থীদের সঙ্গে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের কোন সম্পর্ক বা অন্তরঙ্গতা নেই। এই প্রচারের মূলকথা নির্বাচন; এবং সে-কারণেই শ্রীচারু মজুমদার তাঁর ভাষায় বলেছেন, একটি সংশোধনবাদী পার্টির মতই "আমাদের পার্টিও" (মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি) একটি নির্বাচন থেকে আর একটি নির্বাচন পর্যন্ত যে সব আন্দোলন পরিচালনা করেছে তার মূল লক্ষ্য ছিল "পরবর্তী নির্বাচনে বেশী আসন দখল করা"। তাই, শ্রীচারু মজুমদারের মতে, শহরে আন্দোলন সৃষ্টি করার মধ্যেই দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল।

একথা বিচার করেই শ্রীচারু মজুমদার আজ একটি "বিপ্লবী" পার্টি গঠনের কথা প্রচার করেছেন। হয়ত এইরকম একটা তৃতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি সংগঠনের পথে আভ্যন্তরীণ কোন বাধা থাকতে পারে। কিন্তু 'নির্বাচন বয়কট কর' এই শ্লোগানের সামনে দাঁড়িয়ে দুটি কম্যুনিস্ট পার্টিকেই তৃতীয় পার্টি সম্বন্ধে আরও বেশী সচেতন হতে হয়েছে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রস্তুত
সেন বর্মা
মোরারজীর মার্কিন সফর বিফলে যায় নি।
বিশ্ব ব্যাঙ্ক

নৈসর্গিক

হরপ্রসাদ মিত্র

বৃষ্টি-ভেজা পূর্ব-আকাশে সূর্যোদয়ের আভাস যখন,
যখন শুকতারা আর শেষরাতের চাঁদ ফিকে হয়ে আসে,
অন্ধকার বাড়িগুলোর জানলা বন্ধ,
ঘর নিরালোক,
আমি তখন সেই সব পুরোনো নাটকের পথ খুঁজি
যারা স্মৃতির বাইরে এখন আর কোথাও নেই।

সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত
সম্ভাবনার প্রত্যেক স্তরই আমার দেখা হয়ে গেছে।
এই দোপাটিরা যখন বীজ ছিল
তখন থেকেই সাদা, লাল, বেগুনী
ফুলগুলোকে দেখেছি—
যেমন, শরৎকে দেখতে পাই বাদলে,
বাদলকে চৈত্রের আম্রমুকুলে।

জীবনের বড়ো বড়ো ঘটনার রক্ত, অশ্রু, মোহ,
হাহাকার উজিয়ে যেতে যেতে
কপালের ঘাম মুছতে গিয়ে
যখন মুহূর্তের জন্যে ঠান্ডা হয় আঙুলের ডগা,

তখন নিজেরই গভীরে দেখি
রাত শেষ হচ্ছে,
একটু পরেই রোদ ছড়িয়ে পড়বে আবার।

মানব-সংসারের বড়ো বড়ো ঢেউ যেখানে
ক্ষীণ হয়ে আসে,
আমরা সেই সুদূরতায় জীবিত।
আমাদের হৃদ্যতার দাম কানাকড়ি।
আমাদের প্রত্যেকের পৃথক চেহারা ঝাপসা।
ওরা, যারা সময়ের প্রধান নায়িকার
আঁচল লুটোতে দেবে না বলে
মুখ্য-গৌণের বড়ো বড়ো বিভাগে বিশ্বাস করে,
ওরা বলে, আমরা কেবলমাত্র নৈসর্গিক—
যেমন ভোরের শিউলি,
মানব-পরিবেশের উপলক্ষ, শুধু উপলক্ষ।

সমস্ত যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে
আমাদের এই অস্তিত্বের সীমা চিহ্নিত হলো, শিউলি।
একই নৈসর্গিকতায় আমরা মিলেছি।

গৌরী

বিনোদ বেরা

গড়া কি সকল রূপের পুণ্যে দিয়ে
গৌরী, তোমার কোরক বয়সখানি,
আমার হৃদয় নয় কোনো রাজধানী
শিশির জীবনে জ্বলবো তোমাকে নিয়ে।

ঘন সুগন্ধি কিশোরী বয়সখানি
রাঙা লোভ জেলে বাদল ঘনিয়ে তোলে,
আমার আকাশে মেঘেরা পাপড়ি খোলে
ফুলে ও ফসলে উতরোল কানাকানি।

হৃদয় ইন্দ্রনয়নে তাকিয়ে দেখে
মোহিত স্নিগ্ধ মনের গাঢ় সোহাগ—
বিকীর্ণ হয় কি উষ্ণ রূপরাগ
তোমার বিকচ শরীরের শিখা থেকে।

ও রূপে তোমার না শুধু নিদ্রানিভ
নবানুরাগের জ্যোৎস্না ও রোদ ওতে
নদীর মতন বইছে অধীর স্রোতে
রহস্যময়, মদির, অপার্থিব॥

তখন

তুষার রায়

যতোই কেননা সুগন্ধি সকলের ব্যবহার করুন
আমি জানি মেয়েদের গন্ধ ঠিক পেঁয়াজেরই মতো
ঈষৎ আঁশটে আর
ঠিক পেঁয়াজেরই মতো যেন ছাড়াতে ছাড়াতে
খোশা শেষ নেই,

কোনো কোনো সময়ে রক্তের মধ্যে গুরগুরে শব্দ হয়
তখন সমস্ত ঘড়ির মধ্যে টান-টান স্প্রিং ও ব্যালান্স
সার্কাসের এরিনায় মাদী বাঘ গর্জনে লাফিয়ে পড়ে
রিং মাস্টারের ওপর, তখন—

যখন পিচকিরি দিয়ে কাঁদা ভাঁড়টাকে দেখে
হেসে আকুল হন মহিলারা

তখন আমার যেন সাত হাজার ঘোড়া নিয়ে
লাফাতে ইচ্ছে করে
ভয়ংকর খাদে।

সুনন্দর জার্নাল

'ভ্যাকুয়ামে'

রোজকার মতো আজও সকালে চা এল, মধ্যবিত্ত সংসারের প্রাতরাশ এল। শুধু একটি জিনিস এল না— সে খবরের কাগজ। কাগজ আজ বেরুবে না।

কাগজ এল না। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, আজ সকাল বেলায় ঘণ্টা দেড়েক আমারও কোনো কাজ নেই। সচেতনভাবে রাত্রি দিনের একটা হিসেব আমরা করে রাখি না, কিন্তু তবু কোথায় অভ্যাসের একটা ছক আছে যেন—এমন কি আড্ডা দিতে দিতেও এক সময় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলি : আজ আর থাক—এইবারে উঠতে হবে। তাসের বাজিতে একটু দেরী যদি হয়ে যায়, অফিস থেকে ফেরবার মুখে যদি ট্রাম-স্টপে দাঁড়িয়ে কারো সঙ্গে একটু বেশি গল্প করি—তৎক্ষণাৎ মনে হয়, কোথায় যেন ফাঁক পড়ে যাচ্ছে—কোন্‌খানে বুঝি সময়কে ফাঁকি দিয়েছি খানিকটা।

সংবাদপত্রের উপকারীতা

'এসো চলে এসো যেখানে সময় সীমানা-হীন—' আধুনিক কবির অল্প বয়সে লেখা রোম্যান্টিক কবিতার লাইন। আমার তরুণ-যৌবনে মনের ভেতরে গুণ গুণ করে সেতারের ঝঙ্কারের মতো বাজত : 'সময়হীন বিরহে কাঁপে না রাত্রিদিন।' কিন্তু এখন জীবনের কঠিন মুঠোর ভেতর—'ইন দ্য গ্রিপ অব লাইফ', আর সময়হীনতার ওই স্বপ্নলোকে ফিরে যেতে পারি না। এখন অবচেতনায় একটা ছকে রাত দিন এমন করেই সাজানো যে রবিবারের ছুটির সঙ্গে সোমবারটাও উপরি এসে গেলে কখনো কখনো মনে হয় : সময় বড়ো বেশি হাতে এসেছে, কী করব, এ নিয়ে আমি কী করব?

অতএব আজ সকালে আমার দেড় ঘণ্টা ভ্যাকুয়াম। আমার কাগজ পড়বার সময়টুকু।

খোলা জানলাটা দিয়ে দেখছি, সামনের বাড়িগুলোর নীচু ছাত ছাড়িয়ে কিছু দূরের সেই পাম গাছগুলোর মাথায় বাতাসের দোলা, তার ওপরে ঘোলাটে মেঘ। চিল ভাসছে তার কোলে—আর ব্যস্তবাগীশ কাকের আনাগোনা। এক জোড়া চড়ুই এসে কিচির কিচির করছে জানলার ওপর। এই দেড় ঘণ্টা কি আমি ওই আকাশটার দিকে চেয়ে থাকতে পারি—ভাবতে পারি : 'কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ?'—নাঃ, আমার স্থূল-চিন্তায় ও-সব আসবে না, তা ছাড়া কোনো অরুণিমা সান্যালই আমার জীবনে কখনো আসেনি।

তা হলে কি বাজারে যাওয়া চলে? কিন্তু আমার মধ্যবিত্ত সংসারে এখন আর দৈনিক বাজারের বিলাসিতা সম্ভব হয় না—আজ বাজারের দিন নয়। কী করতে পারি তা হলে? আমার ঘরে এমন কোনো শিশু নেই যে পড়াবার নাম করে যাকে ঘণ্টা দেড়েক কাঁদিয়ে ছাড়ব, কয়েকটা চড়-চাপড় বসিয়ে বাইরের নীরস ব্যক্তিত্বকে খানিক স্টিমুলেন্ট করে তুলব। গোটা পাঁচেক জরুরী চিঠি লিখবার আছে—বসব নাকি তাই নিয়ে? উঁহু, সন্ধ্যের পর ছাড়া আমার চিঠি লেখার 'মুড' আসে না। পেশেন্স খেলব নাকি? না—বাড়িতে তাস নেই, আর থাকলেও সকাল-বেলায় তাস খেলা কোনো দিক্‌পাল ফ্ল্যাশ বিশারদও ভাবতে পারে না। বই পড়ব? আরে, সে তো শোবার আগে—নিদ্রাকর্ষণের জন্যে, এই সাত সকালেই ঘুমুই কী করে?

ঘুম ভাঙানীয়া

একটা অব্যর্থ ব্যাপার আছে অবশ্য। পাড়া গাঁয়ে লোকে আগে সময় কাটাবার জন্যে অকারণেই খুল্লতাতকে গঙ্গাযাত্রা করাত, ট্রেন ছাড়বার দেরী দেখলে অদূরের কোর্টে মামা-পিসে-জ্যাঠা যার নামে হোক একটা

আগামী ২১ অকটোবর আজাদ হিন্দ ফৌজের পঞ্চবিংশতি প্রতিষ্ঠা দিবস। এই উপলক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে একটি বিশেষ রচনা—নেতাজী সুভাষচন্দ্র। লেখক ডঃ বা ম। ব্রহ্মদেশের প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ বা ম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিনগুলিতে ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহযোদ্ধা। ভারতের সংগ্রামী মহানায়ককে তিনি অত্যন্তই কাছের থেকে তখন দেখেছেন। সেই দেখারই ফলশ্রুতি এই রচনা। ডঃ বা ম'র গ্রন্থ 'ব্রেকথ্রু ইন বার্মা' থেকে সংগৃহীত এই রচনা দুটি সংখ্যায় সমাপ্ত হবে। নিবন্ধটির প্রথম অংশ প্রকাশিত হচ্ছে আগামী ১৯শে অকটোবর।

কাগজ নেই! উনুন জ্বালব কি দিয়ে?

মামলা ঠুকে দিয়ে আসত। আমার ওসব কিছুর দরকার নেই—শুধু কায়দা করে স্ত্রীকে একটা বাঁকা কথা বলতে পারলেই যথেষ্ট। তারপর আর আমার কোনো ভূমিকা নেই—বাকী দেড় ঘণ্টা স্ত্রীই পরম উৎসাহে চালিয়ে নেবেন।

কিন্তু না—এই সকালে যখন আকাশে একরাশ ঘোলাটে মেঘ, যখন ঠান্ডা হাওয়ার উচ্ছ্বাসে একটা স্নিগ্ধ দিনের (দোহাই ঈশ্বরের—যথেষ্ট হয়েছে, আপাতত দিন কয়েক ঝরঝর বরিষণ না হলেও চলবে) আভাস, তখন রৌদ্র-রসে আমার উৎসাহ হচ্ছে না।

এই ভাবনার মধ্যে মনে হল, আচ্ছা—খবরের কাগজ আমি পড়ি কেন? অবশ্য গোড়াতেই আমি 'কর্মখালি'র বিজ্ঞাপন দেখি। যদিও যোগ্যতার দিক থেকে চলনসই একটা চাকরি আমার আছে, আর এই বয়সে আমাকে একটি দুর্লভ রত্ন বলে আর কেউ ভ্রমও করবে না—তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ করে সেই যে 'সিচুয়েশান ভেকান্ট' খোঁজা অভ্যেস করে ফেলেছি—ওটা আর গেল না। একজিকুটিভ এনজিনীয়র থেকে ভেটিরিনারী সার্জন—সব পোস্টেরই বিশদ বিবরণ আমি পড়ে যাই। বলা যায় না—হঠাৎ দু' হাজার টাকা মাইনে দিয়ে এই আমাকেও কেউ চেয়ে বসতে পারেন।

একবার সিনেমার পাতায় চোখ বুলোই—অথচ ছ' মাসেও একবার ছবি দেখবার সুযোগ জোটে না। খেলার খবর—আমি তো সকলেরই সাপোর্টার—মোহনবাগান-ইস্ট-বেঙ্গল-মোহামেডান-দুই রেল-বালী প্রতিভা-জর্জ টেলিগ্রাফ-উয়াড়ী ইত্যাকার সকলেরই জয়-পরাজয়ে আমি সমভাবে আনন্দিত এবং বিমর্ষ। তারপর 'পাত্র পাত্রী'রও সন্ধান নিই, বাজার দর, শিপিং নোটস, চাল সাবানের কারখানা বিক্রয়—সবই এক কৌতূহল নিয়ে পড়ে যাই।

এগুলো নিশ্চয়ই অনাবশ্যক। তা হলে

পাওনাদার ফাঁকি দেওয়া....

কী বাকী রইল? পলিটিকস? তিনটে কাগজে ত্রিবিধ রাজনীতির চর্চা দেখি—যত পড়ি ততই—নাঃ 'মগজে গাঁজিয়ে ওঠে আক্কেল' এ কথা বলতে পারি না, বরং মাথার ভেতরে তালগোল পাকিয়ে যেতে থাকে। কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?

মনে পড়ে, ছাত্রজীবনে মেসে বসে যখন আমরা দুই বন্ধু আস্তিন গুটিয়ে রাজনীতির তর্ক করতুম, তখন আমাদের তৃতীয় বন্ধুটি যে খুব নরম আর করুণ কবিতা লিখত, সে হাই তুলে মিহি গলায় বলত: 'কী যে কচকচি ভালোবাসিস তোরা—খালি উটের মতো কাঁটা গাছ চিবুতে চাস। তার চাইতে চুপ করে বোস—আমি তোদের শঙ্খমালার কবিতা শোনাই।'

বলা নিষ্প্রয়োজন, আমরা তাকে গুরুত্ব দিতুম না। তখন দাঁত আর চোয়ালের জোর ছিল, কাঁটা গাছই খুব উপাদেয় বোধ হত। এখন ভয় করে—বিস্বাদ লাগে তার চেয়েও বেশি। তখন বরং পথগুলো চেনা যেত—এখন ক্রমেই গোলোক ধাঁধা তৈরী হচ্ছে।

তা হলে আন্তর্জাতিক ব্যাপার?

ভারত-পাকিস্তান, আরব-ইজরাইল, চেক-রুশ—থাক, থাক—আর দরকার নেই। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের খবর, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক—প্রতিটি জিনিসই মেজাজ খারাপ করবার মতো। একটি ভদ্রলোকও কি গলা চড়িয়ে খুশি হওয়ার মতো একটা কথাও বলতে পারেন না? আর স্বদেশ? অর্থনীতির মন্দা—বেকারের বন্যা—কয়েক হাজার এনজিনীয়র—! নাঃ, স্পষ্ট বলা ভালো: 'ইট লীভস এ বিটার টেস্ট ইন মাই মাউথ!'

তা হলে কাগজ পড়ি কেন? আত্মপীড়নের আনন্দে?

কিন্তু কারণ যাই হোক—আজ এই দেড় ঘণ্টা আমার দুঃসহ ভ্যাকুয়াম। ভরব কী দিয়ে?

গৃহিণীকেই তবে উত্তেজিত করব নাকি?

অসংলগ্না

বনফুল

॥ প্রথম পর্ব ॥

১

সকালবেলা শীত ছিল বেশ। মেঘ ছিল আকাশে, চাপ চাপ তুলোর মতো। বারান্দায় রোদ আসেনি। তবু বারান্দায় পাতা লেখার টেবিলে এসে বসলেন সুভদ্রবাবু। এসে লেখার খাতাটা খুললেন। কিন্তু লিখলেন না কিছু। আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। চোখে পড়ল হলদে রঙের তিনতলা বাড়িটা—পূর্ণেন্দুবাবুর বাড়িটা। পূর্ণেন্দুবাবুর স্মৃতির মতন বাড়িটার জৌলুসও কমে গেছে। হলদে রঙের উপর কালো কালো 'কাজলি' লেগেছে। পূর্ণেন্দু রায় সেকালের 'আধুনিক' ছিলেন। মদ খেতেন, গো-মাংস খেতেন, মেম বিয়ে করে এনেছিলেন বিলেত থেকে। প্রচুর টাকা ছিল, ইংরেজ সরকারে বড় চাকরি করতেন, সুতরাং সমাজের বুকে বসেই সমাজের দাড়ি ওপড়াতে পেরেছিলেন তিনি। কেউ কিছু বলতে সাহস করেননি। খোশামোদই করত বরং সূর্যকান্ত শিরোমণি—গোঁড়া হিন্দুদের কট্টর নেতা। পূর্ণেন্দু কিন্তু চোট খেয়েছিলেন তাঁর মেম-সাহেবের কাছেই। মেমসাহেব এ-দেশে এসে বাংলা সংস্কৃত শিখে এ-দেশের ধর্মশাস্ত্র পাঠ করে হয়ে গেলেন গোঁড়া হিন্দু। পাটের কাপড় পরে গঙ্গাস্নান শুরু করে দিলেন তিনি। তেতলার চিলেকোঠার ঘরে স্বপাক নিরামিষ আহারের আয়োজন করে অবাক করে দিলেন সকলকে। সুভদ্রবাবুর কল্পনা-তুরঙ্গম হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কাঠঠোকরা পাখিটা দেখে। ছাতে যে এরিয়েলের বাঁশটা আছে তারই উপর এসে বসেছিল পাখিটা। তার লাল ঝুঁটি আর সোনালী পিঠ আর তার ট-র-র-র-র-র শব্দ যেন সতর্ক করে দিলে সুভদ্রবাবুকে, বললে—মশাই, বাড়াবাড়ি হচ্ছে। উইশফুল থিংকিং-এরও (Wishful thinking) একটা সীমা থাকা উচিত। সুভদ্রবাবুর তখন সত্য ঘটনা মনে পড়ল। মিসেস পূর্ণেন্দু হিন্দু হননি। হয়েছিলেন মিসেস চ্যাটার্লির নকলে পূর্ণেন্দুবাবুর তাগড়া বাবুর্চি ইসমাইলের প্রণয়িনী, পূর্ণেন্দুবাবুর আকস্মিক মৃত্যুটাও সন্দেহজনক ঠেকেছিল অনেকের কাছে। মিসেস পূর্ণেন্দু মেমসাহেব ছিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের এবং এস পি-র বান্ধবী ছিলেন, তাই পূর্ণেন্দুবাবুর পোস্টমর্টেম হয়নি। পূর্ণেন্দুবাবুর ডাক্তার অবিনাশবাবু সন্দেহ করেছিলেন স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি তাঁর। কিন্তু বাঙালী ডাক্তারের সন্দেহ বিলাতী মেমসাহেবকে কাবু করতে পারেনি একটুও। তিনি যতদিন সবলা এবং স্বাস্থ্যবতী ছিলেন .....কাঠঠোকরা পাখিটা উড়ে গেল। মেঘও সরে গেল। রোদ উঠল। এক ঝলক এসে পড়ল সুভদ্রবাবুর টেবিলে। সুভদ্রবাবু ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন তাঁর বাড়ির দেওয়াল ঘেঁষে যে রক্তকরবীর গাছটা আছে (যেটাকে সম্প্রতি ছেঁটেও একেবারে শাখাপত্রহীন করতে পারা যায়নি) তারই ছায়ায় দেওয়ালের উপর দুটি শালিক খুব ঘনিষ্ঠভাবে পাশাপাশি বসে আছে। ওরা সুভদ্রবাবুর হাতাতেই থাকে। ওরা এ-বাড়ির পরিজন হয়ে

গেছে। বাড়ির সর্বত্র নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। এমনকি খাবার টেবিলেও আসে। মনে পড়ল এই প্রসঙ্গে চড়ুই-পাখি আর কাকদেরও। তারাও বাড়ির পরিজন। সুভদ্রবাবুর হাতায় অবশ্য আরও নানারকম পাখি আছে। দোয়েল, বুলবুল, ঘুঘু, হলদে পাখি, দরজী পাখি, টুনটুনি, মোহনচূড়া, ফিঙে, নীলকণ্ঠ, কাজল পাখি (Shrike), তালচোঁচ এবং আরও কয়েকরকম নাম-না-জানা পাখি। কিন্তু এরা কেউ পরিজন হয়ে উঠতে পারেনি। ওরা সুভদ্রবাবুর শোয়ার ঘরে খাওয়ার ঘরে যায় না কখনও। ওরা সুভদ্রবাবুর এঁটো ভাত বা চায়ের টেবিলের বিস্কুট-পাঁউরুটির টুকরো খাওয়ার জন্য গোপনে বা প্রকাশ্যে লোভ প্রকাশ করেনি কখনও। এইজন্যেই ওরা আপন হতে পারেনি। চড়ুই, কাক, শালিকদের হ্যাংলামি, চোরামি আর লোভই ওদের আপন করেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এইজনাই আমাদের প্রিয়। শালিক দুটি সুভদ্রবাবুর দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসেছিল। সুভদ্রবাবু তাদের দিকে চাইতেই তারা একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। তারপর উড়ে গেল। সুভদ্রবাবুর এ অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে। তিনি অনুভব করেছেন দৃষ্টির একটা আঘাত আছে, পাখিরা এ বিষয়ে বড় বেশী সচেতন। পিছন ফিরে থাকলেও তারা অনুভব করতে পারে কেউ তার দিকে চেয়ে দেখছে। মানুষরাও পারে অনেকে। পিছন ফিরে আছে মেয়েটি, তুমি তার দিকে চেয়ে থাক, সে ঠিক ঘুরে দেখবে তোমাকে। সুভদ্রবাবুর মনে হল, মিসেস পূর্ণেন্দুও বোধ হয় এই রকম দৃষ্টিস্পর্শ-সচেতন মেয়ে ছিলেন।

সুভদ্রবাবুর যখন জন্ম হয়নি, তখনই মিসেস পূর্ণেন্দুর লীলাখেলা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু মিসেস পূর্ণেন্দুর এত রকম কাহিনী শুনেছেন তিনি যে, তাঁর কল্পনাও তাঁকে ঘিরে নানারকম ছবি এঁকেছে, অনেক সময় আজগুবি অসম্ভব ছবি, কিন্তু সে-সব ছবি এঁকে ভারি আনন্দ পেয়েছেন তিনি। মিসেস পূর্ণেন্দু গোঁড়া হিন্দু মহিলাতে রূপান্তরিত হয়ে মাতাল গোখাদক পূর্ণেন্দুকে শায়েস্তা করবার চেষ্টা করছেন এ কল্পনাটা এত পেয়ে বসেছিল তাঁকে যে ওটা যে তাঁর কল্পনা এটা ভুলে গিয়েছিলেন দিন কতক। এখনও মাঝে মাঝে ভুলে যান। আজই তো ভুলে গিয়েছিলেন। কাঠ-ঠোকরা পাখিটা তাঁর ভুল শুধরে দিয়ে উড়ে গেল। পাখিটা যেদিকে উড়ে গিয়েছিল, সেই দিকে চাইলেন তিনি। তারপর ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

সুভদ্রবাবু ঠিক প্রকৃতিস্থ লোক নন। অনেক ডাক্তার তাঁকে পাগল বলেছেন। তাঁর পাগলামির প্রধান লক্ষণ তিনি স্বাভাবিকভাবে খান না, স্নান করেন না, ঘুমোন না। তাঁকে নাওয়াতে খাওয়াতে আর ঘুম পাড়াতে পারলে তাঁর নাতনী মহুয়া নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু তাকে তিনি কখনও নিশ্চিন্ত হতে দেন না। মহুয়া সুভদ্রবাবুর আপন নাতনী নয়, পাতানো নাতনী। সাঁওতাল পরগনার এক মহুয়া গাছের তলায় ওকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন প্রায় কুড়ি বছর আগে। তখন তাঁর মেয়ে শ্যামলী সদ্য বিধবা হয়ে এসেছিল তাঁর কাছে। শ্যামলীই মানুষ করেছিল মহুয়াকে। মহুয়া নাম তারই দেওয়া। মহুয়ার বাবা-মার খোঁজ অনেক চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। সম্ভবত কোন ভর্তৃহীনা সাঁওতালনী জবালার ক্রোড়ে ওর জন্ম। মহুয়ার চেহারা দেখেও মনে হয়, ও সেই আদি-বাসীদের একজন যাদের জীবনবীণা প্রকৃতির সুরে বাঁধা। যদিও কৃত্রিম পরিবেশে মানুষ হয়েছে, স্কুল-কলেজে পড়েছে, সাঁওতালী ভাষা জানে না। কিন্তু তবু পূর্ণিমা রাত্রে যখন জ্যোৎস্নার পাথার আকাশে থই থই করতে থাকে, যখন প্রখর সূর্যালোকে রুক্ষ প্রান্তরে চিলের ডাকে মূর্ত হয় সুরের মরীচিকা, অন্ধকারে নিশাচর পেচকের ডাকে সহসা ঘনীভূত হয়ে ওঠে যখন অজানার রহস্য, তখন মহুয়া কেমন যেন হয়ে যায়। মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। হনহন করে হেঁটে আসে খানিকক্ষণ। কিছু দূর গিয়ে কিন্তু ফিরে আসে

আবার। মনে পড়ে যায়, সুভদ্রর এখনও খাওয়া হয়নি, কিংবা নাওয়া হয়নি। সুভদ্রর পাগলামিই বাড়িতে বেঁধে রেখেছে তাকে। তা না হলে সে যেদিকে দু চক্ষু যায় চলে যেত, ক্রমাগত চলতে থাকত আর ফিরত না। দিনে রাত্রে জ্যোৎস্নায় অন্ধকারে পথ প্রান্তর অরণ্য পেরিয়ে চলতেই থাকত সে, ফিরত না। কিন্তু সুভদ্র তাকে বেঁধে রেখেছে। বার বার তাকে ফিরে আসতে হয়। বাড়িতে আছে তিনজন চাকর, একটি বুড়ী ঝি, আর ওদের ছেলেপিলেরা। সুভদ্র-বাবুর আপন লোক কেউ নেই। আগে তিনি অধ্যাপক ছিলেন। রিটায়ার করেছেন অনেক দিন। শ্যামলীর মৃত্যুর পর পাগলামি দেখা দিয়েছে নানারকম। রোজ সকালে উঠে লেখেন। ওই লেখাটাই এখন তাঁর মনের একমাত্র অবলম্বন। তাঁর আর সব বিষয়ে ভুল হয়। কিন্তু লেখার টেবিলে এসে বসতে ভুল হয় না কখনও। সকালে এসেই বসেন ওখানে। তারপর আর উঠতে চান না। মহুয়াকে অনেক সাধ্য-সাধনা করে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাঁকে। তিনি যে খাতাটায় লেখেন, সে খাতার নামকরণ করেছেন 'মেঘ'। নানারকম লেখা লেখেন তাতে। এই লেখা থেকেই সুভদ্রবাবুর মনের খবর পাওয়া যায়। কিন্তু সবটা স্পষ্ট হয় না। মিসেস পূর্ণেন্দু কেন জানি না তাঁর মনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছেন। কিভাবে করেছেন, তা ওঁর খাতাটা পড়লেই বুঝতে পারা যাবে। পূর্ণেন্দুবাবুর প্রকাণ্ড হলদে বাড়িটা ওঁর চোখের সামনে অহরহ দাঁড়িয়ে আছে, তার বিরাট ভগ্ন অস্তিত্ব নিয়ে। ও বাড়িতে এখন কেউ থাকে না—শেষ ভাড়াটেরা দু বছর আগে উঠে গেছে। ভয় পেয়ে উঠে গেছে নাকি? পূর্ণেন্দুবাবু অপুত্রক ছিলেন, তাঁর এক ভাগ্নে তাঁর উত্তরাধিকারী। তিনি থাকেন মাদ্রাজে। বাড়িটা বিক্রি করতে চাইছেন অনেকদিন থেকে। দাম চাইছেন এক লাখ টাকা। খদ্দের জোটেনি। বাড়িটা সুভদ্রবাবুর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রোজ সকালে এসে ওরই দিক চেয়ে থাকেন তিনি। ওই বাড়ি থেকেই মিসেস পূর্ণেন্দু নানারূপে আবির্ভূত হন তাঁর মনে, নিত্যনতুন রূপ লাভ করেন তাঁর কল্পনায়, লিপির কারাগারে বন্দিনী হয়ে থাকেন কখনও সুস্পষ্ট মাধুর্যে, কখনও অস্পষ্ট হেঁয়ালীতে।

'মেঘ' থেকে উদ্ধৃত করছি কিছু কিছু।

"সমাজে বাস করতে হলে মানুষের সঙ্গে বাস করতে হয়। নিরাপদে বাস করবার জন্যেই মানুষ সমাজ সৃষ্টি করেছিল একদিন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেকটি মানুষই প্রচ্ছন্ন শ্বাপদ হয়ে উঠেছে। ভদ্রতার ছদ্মবেশ পরে থাকে, সুবিধে পেলেই পেছন থেকে কামড়ে দেয়। বেদ-উপনিষদ কোরান-বাইবেল শুনিয়েও ওদের সংশোধন করা যাচ্ছে না। সাহিত্যকেও ওরা পশুত্বের রঙ্গমঞ্চ করে ফেলেছে। বকুল-ফুলের গন্ধ মেখে ফুরফুরে হাওয়াটি কাল যখন এল, তখন তাকে তাই বললাম—দেখ মিসেস পূর্ণেন্দু, তোমার ছদ্মবেশটি মন্দ হয়নি। তুমি লোকের ঘরে ঘরে ঢুকে সুবাস বিতরণ করছ। ভালোই তো। ভদ্রতা করছ—খুব ভালো কথা। কিন্তু একটা বিষয়ে সতর্ক করে দিই তোমাকে। মানুষের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার কর, কিন্তু খুব গভীরভাবে কারো সঙ্গে মিশবার চেষ্টা ক'রো না। তুমি তো জানই সমুদ্রের তলাতেও ডুবো-পাহাড় থাকে। তুমি পূর্ণেন্দুকে সমুদ্র ভেবেছিলে, কিন্তু তার ভিতরে যে পাহাড়টা ছিল, তার ধাক্কায়, তোমার জাহাজের তলা ফেঁসে গেল। কিন্তু তুমি......এর পরই আশ্চর্য কাণ্ড হল একটা। হাওয়াটা থেমে গেল। মনে হল সে চলে গেল হঠাৎ, কোথা গেল, আবার আসবে কি—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বোঁ করে বোলতা ঢুকল একটা, আর তার পেছনে একটা ভীমরুল। কোনটা মিসেস পূর্ণেন্দু? কোনটা ইসমাইল? স্বর্ণকান্তি বোলতাটাকেই মিসেস পূর্ণেন্দু বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু ভীমরুলটাই আমার ভুল ভেঙে দিল। হেসে উঠল। বলল—চেয়ে দেখ ভালো করে, আমিই মিসেস পূর্ণেন্দু। মিসেস পূর্ণেন্দুর বিলিতী নাম কি ছিল? মেরী? রুবি? জেন? রিটা? আনন্দে উচ্ছ্বসিত একটা নীলকণ্ঠ পাখি কর্কশ অট্টহাস্যে ভরিয়ে দিল আকাশটাকে। সে যেন হাসতে হাসতে আমাকে বলে গেল, আসল কথাটা তুমি খুলে বলছ না কেন? তোমার ধারণা, মহুয়াই পূর্বজন্মে মিসেস পূর্ণেন্দু ছিল। মিসেস পূর্ণেন্দুকে তুমি দেখনি, কিন্তু তাকে ভালোবেসেছ তার গল্প শুনে। তাই মহুয়ার বেশে সে এসেছে তোমার কাছে। এ কথাটা বলছ না কেন স্পষ্ট করে? ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম নীলকণ্ঠ পাখিটা উড়ে উড়ে ওই কথাটাই বলছে কেবল, আর তার সঙ্গে দুলছে কচি বাঁশের ডগাগুলো। মিত্তিরদের বাগানে ছোট একটা বাঁশ-ঝাড় আছে। তার কয়েকটা ডগা দেখা যায় আমার বারান্দা থেকে। নীল আকাশের পটভূমিকায় তাদের দোলন প্রায় দেখতে পাই। আজ মনে হল, তারা শুধু দুলছে না, হাসছেও।"

আর একটা লেখা।

"গন্ধরাজ গাছটার কাছে লতিয়েছে একটা কুমড়ো গাছ। কুমড়ো গাছ গাছ নয়, তবু আমরা ওকে লতা না বলে গাছ বলি, কারণ লতা হওয়া সত্ত্বেও ওর মধ্যে একটা পুরুষালী ভাব আছে, আইভিলতা বা তরুলতার মধ্যে যা নেই। গন্ধরাজ গাছটার চারদিকে নিজেকে ছড়িয়েছে কুমড়ো গাছটা। তারস্বরে যেন বিজ্ঞাপিত করছে নিজেকে। অনেক ফুল ফোটাচ্ছে, জালিও হয়েছে অনেক। কিন্তু জালিগুলো পচে যাচ্ছে। কেন? পাতাগুলো প্রাণরসে টলমল, ডাঁটাগুলো বেশ মোটা মোটা, ফুলও বেশ চমৎকার—ফলগুলো পচে যাচ্ছে কেন তাহলে! একটা থিয়োরি খাড়া করেছি। আমার মনে হচ্ছে কুমড়োগাছটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে (Inferiority Complex) ভুগছে। ও যদিও গন্ধরাজ গাছটাকে নানাভাবে বেষ্টন করে বিব্রত করেছে, কিন্তু ও মনে মনে জানে গন্ধরাজ ওর চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। এই হিংসার বিষ সঞ্চারিত হচ্ছে ওর সারা দেহে। তাই ওর ফলগুলো মরে যাচ্ছে। কি বল? প্রশ্নটা করে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। ভেবেছিলাম পাশেই বুঝি মিসেস পূর্ণেন্দু দাঁড়িয়ে আছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম ছোট্ট একটা ধুতরো গাছে সাদা ধুতরো ফুটেছে একটা। তার পাশের ডালেই ছোট্ট সবুজ কচি একটি ধুতরো ফল। সেই ধুতরো ফলটির উপর ভর করে স্বচ্ছ সরু রেশমের সিঁড়ি উঠে গেছে আকাশের দিকে। সেটা যে মাকড়সার জাল তা প্রথমে বুঝতে পারিনি। সেটা বেয়ে মহুয়ার মন যে নেমে এসে আমার সঙ্গে তর্ক জুড়বে তা-ও আমার কল্পনাতীত ছিল। মহুয়ার মন অনেকটা জোনাকির মতো। টিপটিপ করে জ্বলে আর নেবে, দিনের বেলাতেও তার আলো দেখা যায়, একটু করে অন্ধকার সর্বদাই ঘিরে আছে তার মনকে, তারই পট-ভূমিকায় তার মনের আলো জ্বলে। সেই মহুয়ার মন আলো টিপটিপ করতে করতে নেমে এল মাকড়শার জাল বেয়ে। বলল—'মানুষদেরই হিংসে থাকে? গাছেদের থাকে না। যে-সব মানুষ জীবন-যুদ্ধে হেরে গেছে তারাই মক্ষিকা হয়, মধুপ হতে পারে না। কুমড়ো গাছকে তুমি অত্যা হীন ভেবো না। কুমড়ো গাছ যোদ্ধা, সে ওই গন্ধরাজের সঙ্গে

যুদ্ধ করছে, শুধু গন্ধরাজের সঙ্গে না, আশপাশের সকলের সঙ্গে। ওই যে সব গোছা গোছা ঘাস রয়েছে, ওই যে মাথায় ছোট্ট বেগুনী ফুল নিয়ে চওড়া-পাতা লম্বা লম্বা ডাঁটাগুলো, ওই যে ও-পাশে পুটুসফুলের ঝাড়টা, এই ধুতরোগাছটা, সকলের সঙ্গে নীরবে যুদ্ধ করছে এই কুমড়োগাছ। একে তুমি তোমার বন্ধু হরেন লাহিড়ীর সঙ্গে তুলনা করছ কেন! তোমার বন্ধুর সান্নিধ্যে এলে মনে হয় কোনও সিনেমা ল্যাভেটরিজে বা কারো অপরিষ্কৃত খাটা-পায়খানায় ঢুকে পড়েছি। কুমড়োগাছের কাছে এসে কি তা মনে হয়? ওর ফল পচে যাচ্ছে, তার কারণ এমন কোনও রোগের শত্রু এসে হানা দিয়েছে, যার সঙ্গে ও পেরে উঠছে না। কিন্তু তা নিয়ে ওর হাহাকার নেই। ও নিজের পচা ফল নিয়ে কোনও প্রদর্শনীও খোলেনি, কারও সহানুভূতি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেনি। ওর ফল যে পচে যাচ্ছে, এ খবর তোমরাই বার করেছ খুঁজে খুঁজে, নিজেদের স্বার্থের জন্য!"

মহুয়ার মনের আলোটা হঠাৎ যেন দপ দপ করে জ্বলতে লাগল। মনে হল চটেছে।

হেসে উত্তর দিলাম—'গভীর রাতে উস্রী নদীর ঢেউয়ে দোল খেতে খেতে জ্যোৎস্না যে গান গায়, সেই গানের আভাস তোমার গলায় পাব আশা করে বসে আছি। তুমি এ কি ওকালতি-সুরে কথা কইলে। তোমাকে যে মূর্তিমতী কবিতারূপে মনে করে বসে আছি আমি।'

কবিতা-বেলুনে আলপিনের খোঁচা লাগল। মহুয়া সশরীরে এসে হাজির।

'এবার ওঠ না দাদু—আড়াইটে যে বেজে গেল। কখন নাইবে?'

'আজ নাই বা নাইলুম—'

'তিন দিন নাওনি। আজ তোমাকে নাইতেই হবে। তোমার জন্যে ভালো ফুলেল তেল আনিয়েছি আজকে......'

'তাই নাকি? তা হলে উঠছি; কিন্তু একটি শর্ত আছে—'

'কি—'

'ফুলেল তেল আমি মাথায় মাখব না, পিঠে মাখব—'

কলকণ্ঠে হেসে উঠল মহুয়া। একটা ঝাড়লণ্ঠন যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

'বেশ; বেশ, পিঠেই মাখিয়ে দেব। তুমি ওঠ এখন—'

উঠতে হল।

'টিউ।'

হলদে পাখির ডাক। ডাকটাতে একটু ব্যঙ্গের সুর ধ্বনিত হল যেন। দুষ্টু পাখি। যদি ওকে কখনও ধরতে পারি, ওর সর্বাঙ্গে ফুলেল তেল মাখিয়ে দেব।

'ফুলেল তেল কতখানি কিনেছিস?'

'বড় এক বোতল। কেন?'

'মনে করছি হলদে পাখিটাকেও মাখিয়ে দেব—'

'ও পাখিকে ধরবে কি করে?'

'ধরেছি অনেক দিন আগে। নাম রেখেছি মহুয়া—'

আবার একটা ঝাড়লণ্ঠন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।"

(ক্রমশ)

অনুসন্ধান

প্রলয় সেন

রাত বাসি হয়ে এলে অনঙ্গমোহনের ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। ঘোর কাটবার পরেও তিনি চোখ মেলতে পারছিলেন না। গলার ভাঁজে অল্প ঘাম, চোখের পাতা ভারি, মাথার ভেতর এক ধরনের কুয়াশাময় আচ্ছন্নতা। সমস্ত শরীর ভেজা ভেজা অসাড়। বুকের খাঁচায় অতি ক্ষীণ হয়ে একটা শব্দ কাঁপছে। ঈষৎ স্ফুরিত ঠোঁট ও জিভের ডগা শুকনো। কোমর থেকে দেহের নিম্নভাগ যেন শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন, অনুভূতিবিহীন। শুধু, কপালের দু পাশে জটিল রগগুলোয় খানিকটা উষ্ণতা থেকে থেকে লাফিয়ে উঠছে। দিনকতক হল শরীর ভাল যাচ্ছে না। ঘুসঘুসে সর্দি, চোরা জ্বর, বুকেপিঠে বেদনা, নতুন সব উপসর্গ চারিয়ে উঠছে। বস্তুত, গত রাতে কখনই তিনি গাঢ় ঘুম ঘুমুতে পারেননি। শ্লেষ্মার টানে অনবরত ছটফট করেছেন। এগারোটা বাজতে আলো নিবিয়ে তরঙ্গ মেঝেয় নেমে গেলে অন্ধকার অনঙ্গমোহনকে বড় অসহায় করে দিয়েছিল। তারপর, ঘণ্টা ছয়েকের দুঃসহ নির্জন রাত্রি। দুর্বল দেহমন তার ভাবনাকে বারবার এলোমেলো করে ফেলছিল। নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হয়েছে। ঘুমের মধ্যে বাঁ হাতটা কেবলই বুকে উঠে এলে তিনি ক্ষণে ক্ষণে জেগে গেছেন। আর, সেই কিছুক্ষণের জাগরণে, তৎপর অনঙ্গমোহন, বাঁ হাতটা বিছানায় নামিয়ে নিতে ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছিলেন। মুহূর্তে তার শরীর বিদ্যুৎ-শূন্য হয়ে পড়ছিল। আর সেই সুযোগে তার শরীরের কোষে কোষে রক্তে মজ্জার স্নায়ুতে অসংখ্য হিমশীতল বীজকণার তীব্র আক্রমণ চলছিল। অসহায় অনঙ্গ-মোহন একবার তরঙ্গকে ডাকবেন ভেবেও ছিলেন। কিন্তু, কণ্ঠনালীতে এক ধরনের মৃদু প্রবাহ এবং জিভের ডগা অত্যন্ত ভারি থাকায় তিনি সামান্যতম শব্দও উচ্চারণ করতে পারেন নি। ফলত, প্রতিকারহীন অনঙ্গমোহন ঘুমের অপেক্ষায় অন্ধকারের দিকে অর্থহীন তাকিয়েছিলেন। এবং রাতে যতবার ঘুম ভেঙেছে, তার শুধুই মনে হয়েছে, খাটটা যেন শব্দ করে নড়েচড়ে উঠে একটা ছোট নৌকোর মত অন্ধকারে ভাসতে শুরু করল। চতুর্দিকে অন্ধ অকরুণ শব্দহীন শূন্য, খাটটা কেবলই দুলছে—অনির্দিশ্য ভেসে

চলেছে কোথাও, বাইবেলের সেই নোয়ার নৌকোর মত, সীমাহীন মহাপ্লাবনে কুজ্ঝটিকা, আর তিনি একমাত্র মানুষ, জাগ্রত, বড় অসহায়।

অন্ধকার ফিকে হয়ে খুব ভোরের মিঠে তাপ চোখে মুখে এসে পড়তে অনঙ্গমোহন আর স্থির থাকতে পারলেন না। চোখ মেলতেই মাথার কিছু ওপরে বিচিত্র ঝাড়লণ্ঠনটা দেখতে পেয়ে প্রসন্ন হলেন। ধীরে ধীরে ফের তিনি সবকিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত হবার সুযোগ পেলেন। এই তার প্রিয় ঘর. চল্লিশ বছরের নানা স্মৃতিতে সমৃদ্ধ। তিনি দৃষ্টিকে চারপাশে ছড়িয়ে দিলেন, রাতের অস্বস্তি থেকে মুক্ত হতে চাইলেন। পশ্চিমের দরজার মাথায় কাঠের ঢাকনা, তাতে প্রাচীন পাটালীপত্রের কারুকর্মের সাক্ষ্য। নিচে নিষ্কম্প্র রেশমী পরদা, লতাপাতাকাটা, পাঠানযুগের বয়ন-শিল্পীর শিল্পকার্যের নিদর্শন। দেয়াল-আলমারির খোপে নানা মাপের ট্যাবলেট সংরক্ষিত। মহেঞ্জোদারো হরপ্পার পশুপতির দেবতার প্রতিকৃতি। কষ্টিপাথরে খোদিত নিঁখুত ভঙ্গিমায় ধ্যানরত অবলোকিতেশ্বর। সাঁওতাল দেবতা মারাং বুরুর মৃন্ময় মূর্তি। ব্রোঞ্জে ঢালাই এশিরীয় নৃপতির বিজয় উৎসব। অনঙ্গমোহনের শ্রম ও ইতিহাস-প্রেমের তিল তিল নিদর্শন। দেয়ালে কয়েকটা বিখ্যাত মুরাল, দামাস্কাসের প্রসিদ্ধ মসজিদের রেখাচিত্র, কাংড়া উপত্যকার বর্ণবহুল গোষ্ঠলীলার ছবি। দরজার পাশে যেখানে ব্রহ্মদেশীয় শান্ত সৌম্য বুদ্ধদেবের করুণাঘন মূর্তি। তার পাশেই চিনেমাটির মস্ত এক ভিক্ষাপাত্র। অনঙ্গমোহনের দৃষ্টিতে পরিতৃপ্তির আভাস দেখা দিল। বুকের ভেতর থেকে নিঃসঙ্গতা মুছে যাচ্ছে। তিনি একটু একটু করে স্বচ্ছন্দ বোধ করছিলেন।

শুধু তরঙ্গ ঘরে নেই। অনেকক্ষণ থাকতে উঠেছে, তার বিছানার চারপাশ মশারির চালটা গোটা অবধি টেনে দিয়ে মাথার বালিশ উঁচু করে একতলায় নেমে গেছে, অনঙ্গমোহন কিছুই টের পাননি। এমনটা চলছে আজ দু বছর ধরে। দিল্লি থেকে ফেরবার কিছু দিনের ভেতরেই তিনি বিছানা নিলেন। প্রথম বাঁ দিকটা ধরেছিল, অনেক ভেবে ডাক্তার বদ্যি এল, শরীরের গোঁ ফেরানো গেল না কিছুতেই। দিনে দিনে গোটা দেহটা বিকল হয়ে পড়ল। তবু, তরঙ্গর কি এক বিশ্বাস, প্রতিদিন শেষ রাতে উঠে নিচে নেমে রামপীরিতের ঘুম ভাঙাচ্ছে, গাড়ি চেপে কালীঘাট যাচ্ছে।

অনঙ্গমোহন দক্ষিণের জানালার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। কাঁচের শার্সিতে ফোটা ফোটা রাতের শিশির, কেমন অবাস্তব বোধ হচ্ছে। গলার ভাঁজে ফের ঘাম জমছে, কপালের দুপাশের রগগুলোর দপদপানি সমান আছে। জানালার ওধারে ছোট্ট ব্যালকনি। তার এক পাশে মাধবীলতার ঝোপ। অনঙ্গমোহন সেদিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন। তরঙ্গ নেই, সকালের এই সময়টুকু ওদিকে তাকিয়ে বেশ কেটে যায়। মাধবীলতার ডালপালায় ভোরের বাতাস খেলা করছে। ওর ভেতরে দুটি রঙীন পাখি কিছুদিন হল বাসা বেঁধে আছে। রোদের সাড়া পেলে ওরা ঘন সবুজের সংসার থেকে বেরিয়ে আসবে। রেলিঙের নগ্ন অংশে বসে কিছুক্ষণ পাখা ফুলিয়ে আলস্য তাড়াবে, এ ওর ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে আদর করবে, শেষে এক সময় সোনালী শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সারাদিন ধরে একই খেলা। বারবার ঠোঁটে করে খড়কুটো নিয়ে ফিরবে, লতাপাতার গভীরে নিরাপদ আশ্রয় রচনা করার জন্যে। অনঙ্গমোহন সেদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। পাখি দুটোর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। রেলিঙের ওধারে নির্জন রাস্তার ব্যবধান। তারপর দত্তবাড়ির ছাদের কার্নিশ ছুঁয়ে একফালি আকাশ, শেষ শরতের প্রশান্তিতে পতাকার মত কাঁপছে। সেদিকে চোখ পড়তে অনঙ্গমোহনের দৃষ্টি গাঢ় হয়ে এল। হৃদয় এক উজ্জ্বল অনুভূতিতে দুলে উঠছে। তিনি মুহূর্তে পারিপার্শ্বিকতা ভুলে দূরে অতীতে চলে যাচ্ছেন। পায়ের তলায় সকালের স্বচ্ছ-তমসা, পিছনে অস্ফুট তপোবন, আশ্রম ঋষিগণ ঊর্ধমুখ, ব্রাহ্ম মুহূর্তের ঈষৎ নীল মহাকাশের দিকে তাকিয়ে কারা যেন সাম গান গাইছে। দেখতে দেখতে আকাশ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল, ক্রমশ নীলাভ, বৈদূর্যমণির মত। তারপর নানারঙের খেলা, লাল-কমলা-বেগুনী...। যেন একখণ্ড পাথরে ষোড়শ শতাব্দীর কোন এক মুঘল শিল্পী ঘষে ঘষে নানাবিধ রঙ ফুটিয়ে তুলছে। অনঙ্গমোহন আর স্থির থাকতে পারলেন না। বুকের বাঁদিকে যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। সজোরে তাঁর নিক্ষেপের পর ধনুকের ছিলা যেমন স্বস্থানে ফিরে আসে, অনঙ্গমোহনও তেমনি ঈষৎ কাতরোক্তি করে পুনরায় বিছানায় চিৎ হয়ে পড়লেন। এবং ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে লাগলেন।

এমন সময় পশ্চিমের ঘরে পিয়ানো বেজে উঠল। এ ঘর ওঘরের মাঝখানে বড় হল ঘর, চেয়ার টেবিলে সাজানো, অনঙ্গমোহন অতিথি অভ্যাগতদের জন্যে ঘরটা তৈরি করেছিলেন। তারপর পশ্চিমের ঘর, কনিষ্ক ওঘরে থাকে, তার একমাত্র ছেলে। ওর বিদেশিনী স্ত্রী মার্গারেট, অনঙ্গমোহন তার একটা ভারতীয় নাম দিয়েছেন, অপালা। এ সময় প্রতিদিন কিছুক্ষণ পিয়ানো বাজায়। একটা নরম উজ্জ্বল সুর ঢেউয়ের মত ক্রমাগত কাঁপছে। সেই

ধ্বনিস্পন্দ স্পষ্টতর হয়ে শরৎ সকালের তাজা আলো-হাওয়ার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে এই বাড়ি, তরঙ্গর সাজানো সংসার, এই প্রিয় ঘর—সব কিছু অনঙ্গ-মোহনের কাছে তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। তিনি নড়েচড়ে উঠে মাথাটাকে বালিশের দিকে ঠেকে দিলেন। বুকের ভেতর পদ্মকলির মত কিছু সুপ্ত স্মৃতি যেন পাপড়ি মেলতে চাইছে। অনঙ্গমোহন জমিটা কিনেছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু পরে। মৈত্রেয়ী তখন তরঙ্গার পেটে, কনিষ্ক বছর সাতেকের। প্রথমবার বিদেশ থেকে ঘুরে এসে বাড়ি তৈরির কাজে হাত দিয়েছিলেন। শহরের দক্ষিণের এদিকটা তখন বেশ ফাঁকা ছিল। গাছগাছালি, পাখির ডাক, মাঝমধ্যে একটি দুটি মাঠ-কোঠা, অঢেল নিরিবিলি। সে সময় তিনি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব বিষয়ে গবেষণা করছিলেন। এখনো নিচে, সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে বাঁদিকে মুখ তুলে তাকালে দেখা যাবে শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা, 'স্বপ্নদ্বীপ, ১৯২৭'।

পিয়ানো চড়া পর্দায় দ্রুতলয়ে চলছে

চলতে হঠাৎ থেমে গেল। কাচের শার্সিতে অভ্রগ‍ুঁড়োর মত রৌদ্রকণিকা চিকমিক করছে। হালকা রেশমী কাপড়ে মৃদু আঁচড় পড়লে যেমন হয়, বাতাসে তেমনি একটা সূক্ষ্ম শব্দ কেঁপে উঠল। অনঙ্গমোহন পাশ না ফিরেও বুঝতে পারলেন, মাধবীলতার ঝোপ থেকে বেরিয়ে রঙীন পাখি দুটো এতক্ষণে রোলিঙের ওপরে এসে বসল। ওদিকে উপরের ঘর থেকে শিস দিতে দিতে বুদ্ধদেব, কনিষ্কর বড় ছেলে, হল ঘরে এসে ঢুকল। তারপর একটা ক্ষিপ্র পদশব্দ ঘোরানো সিঁড়ি ধরে নিচের দিকে হারিয়ে গেল। বুদ্ধদেব টেনিস ক্লাবে যাচ্ছে। অনঙ্গমোহনের বুকের একটা উদ্বেগ যেন পাশ ফিরল। তরঙ্গ ফিরছে না এখনো। এত বড় শহর, রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার ভিড়, মুহূর্তে অঘটন ঘটতে পারে। তরঙ্গর দোষের মধ্যে ওই একটাই, একবার মাথায় কিছু চেপে বসলে সহজে সেটাকে আর নামানো যাবে না। একে ভারি শরীর, ছোটখাটো অসুখ নিত্য লেগেই আছে, তায় গঙ্গার জলে রোজ সাতসকালে স্নান। অনঙ্গমোহন ছটফট করতে লাগলেন।

খানিক বাদে রঘু ঘরে ঢুকে আস্তে করে ডাকল, কর্তাবাবু—। অনঙ্গমোহন চোখ নামালেন। ওর এক হাতে গরম জলের পাত্র, আরেক হাতে সাদা ধবধবে একখানা তোয়ালে। রঘু মাথার কাছের গোলটেবিলে গরম জলের পাত্রো রাখল। তারপর জানালার দিকে এগিয়ে গিয়ে কাচের পাল্লা দুটো খুলে দিতে অনঙ্গমোহন বললেন, তোর মা ফিরে এলে একবার ডেকে দিস তো।—রঘু, এখন এ সংসারের একজন। ত্রিশ সালে অনঙ্গমোহন দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলেন, হীনযানীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে। মাদ্রাজ শহরের কাছে এক বৌদ্ধবিহার থেকে ওকে নিয়ে এসেছিলেন, শ্রমণদের ফাইফরমাস খাটত, অনাথ ছেলে।

গোলটেবিলের কাছে ফিরে এসে রঘু তোয়ালেটা গরম জলের পাত্রে ভিজিয়ে আলতো করে নিঙড়ে নিল। তারপর এগিয়ে গলায় ভাঁজে ঠোঁটে চোখের পাতায় কপালে নরম করে বুলিয়ে দিল। চাদর তুলে বাঁ হাতের পাতায় তোয়ালে ঘষে দিতে অনঙ্গমোহনের আরাম বোধ হল। শরীর এতক্ষণে উষ্ণতর হচ্ছে। এলোমেলো ভাবনার জট খুলে যাচ্ছে। চারপাশের সব কিছু স্পষ্ট ধরা যাচ্ছে। জিভের ডগা ফের সজলতা পাচ্ছে, ঠোঁটের পাতায় কাঁপন জেগে উঠছে। ধূপকাঠি জ্বালিয়ে শিয়রের কাছের ধূপদানিতে বসিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে রঘু বলে গেল, আজ রবিবার, মন্দিরে ভিড়, মার ফিরতে দেরী হবে। অনঙ্গমোহনে বুকের ভেতর খুশির ঘর ঘর শব্দ কেঁপে উঠল। আজ সারাটা দিন তরঙ্গকে কাছে পাওয়া যাবে। কনিষ্কর অফিসে যাবার তাড়া নেই। বুদ্ধদেবের কলেজ বন্ধ। অপালা সন্ধ্যায় নিউ মার্কেটে যাবে না।

দক্ষিণের জানালা দিয়ে কোণাকোণি হয়ে গাঢ় কমলা রঙের রোদ এসে পড়েছে চিনেমাটির জলপাত্রটার ওপর। পাশে বুদ্ধের প্রস্তরমূর্তি, অনন্ত ধ্যান-তন্ময় দৃষ্টি, মুখমণ্ডলে প্রশান্তি; শরতের কাঁচা আলোয় আরো সৌম্য এবং প্রগাঢ় বলে মনে হচ্ছে। পাখি দুটো নিশ্চয়ই এতক্ষণে খড়কুটোর সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে। মাধবীলতার ঘন সবুজের জাফরী থেকে শুকনো পাতা ঘরে উড়ে এসে ইতস্তত খেলা করে মেঝেয় নেমে যাচ্ছে। ডানদিকের দেয়ালে চোখ পড়তে অনঙ্গমোহনের দৃষ্টি থমকে গেল। রুপোরঙের ফ্রেমে বাঁধানো মানপত্রখানা দেখা যাচ্ছে। বেশিদিনের কথা নয়, গত বৈশাখের শুরুতে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে দেশের পশ্চিম প্রান্তের এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিছু লোক এসে মানপত্রখানা দিয়ে গেছে। সেদিন সকাল থেকে রাত নটা অবধি এ বাড়ি জমজমাট, হলঘরে শুভার্থীজনের ভিড়। আগের দিন সন্ধ্যায় পাড়ার মেয়েরা এসে এ ঘরের মেঝেয় চমৎকার আলপনা এঁকে গিয়েছিল। সকাল দশটা নাগাদ কেউ একজন দেবভাষায় মঙ্গলাচরণ পাঠ করে তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করেছিল। অনঙ্গমোহন শুয়ে শুয়েই সবকাকে প্রীতি নমস্কার জানিয়েছিলেন। তারপর এক সপ্তাহ ধরে তাঁর জন্মদিনকে স্বাগত জানিয়ে দেশবিদেশে থেকে কত চিঠি এসেছে। বিগতদিনের সহকর্মী এবং বন্ধুবর্গের প্রীতিশুভেচ্ছা। রোজ বিকেলে অপালা এসে তাঁকে সেসব চিঠি পড়ে শুনিয়েছে।

ধূপকাঠি পুড়ে পুড়ে মৃদু আধ্যাত্মিক সুগন্ধে ভরে যাচ্ছে ঘর। ধীরে ধীরে চারদিক আলোকিত হয়ে উঠছে। এমন আলোহাওয়াময় সকালে সব কিছু নতুন তাৎপর্য পাচ্ছে। বেঁচে থাকার গভীরতর অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন অনঙ্গমোহন। একতলা থেকে ঘোরানো সিঁড়ি ধরে হলঘরে উঠে আসতে বাঁ দিকের দেওয়ালে তাকালে এখনো তাঁর পঞ্চাশ বছরের সকল জীবনের টুকরো টুকরো আভাস চোখে পড়বে। মৈত্রেয়ী অ্যালবাম থেকে বেছে বাঁধিয়ে পরপর ঝুলিয়ে রেখেছে অনেকগুলো ছবি, তাঁর নানা বয়সের কৃতিত্বের স্মৃতি-স্মারক। তাঁর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানজনক উপাধি লাভের ছবি, পশ্চিমের এক বিখ্যাত রাজপরিবারের সঙ্গে খাবার টেবিলের আলোকচিত্র, দেশবিদেশের মনীষীদের সঙ্গে তোলা ফটো, বিদেশের কোন এক বড় শহরে পৌর-সম্বর্ধনার চিত্র। সব শেষে তাঁর রোগশয্যার একখানা তৈলচিত্র, দেশের একজন

নামকরা শিল্পীর আঁকা। ছবিটা তরঙ্গ কিছুতেই এ ঘরে টাঙাতে রাজী হয়নি।

অনঙ্গমোহন একটু একটু করে অনেক কিছু ভাববার প্রেরণা প্যাচ্ছেন। তাঁর বিগত দিনের শ্রম ও অধ্যবসায়ের কথা, পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠার কথা। যার অনেকখানি এখনো অম্লান রয়েছে এই বাড়ির একতলায়। সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে উত্তরের টানা বারান্দায় পড়লে যেখানে সহজেই পৌঁছনো যায়। বাঁ দিকে পর পর অনেকগুলি ঘর, এখন তালাবন্ধ, তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরী, যেখানে তরঙ্গেরও প্রবেশাধিকার নেই। তাঁর একান্তই ব্যক্তিগত সম্পত্তি। প্রথম ঘরে সিন্ধুসভ্যতা ও বৈদিক সংস্কৃতি, দ্বিতীয়টিতে মহাচীন ও মধ্যএসিয়া, তৃতীয় ঘরে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, চতুর্থ ঘরে খ্রীষ্টধর্ম ও ইউরোপ, তার পরের ঘরে দ্রাবিড় সভ্যতা ও দক্ষিণ ভারত। সব শেষে মধ্যপ্রাচ্য ও মিশর। সমস্ত গ্রন্থ তিনি নিজের হাতে ঠিক ঠিক মত সাজিয়ে রেখেছেন। একটা বই এদিক-ওদিক হলে একসময় তিনি ছেলেমানুষের মত কাঁদতে বসতেন, তার পর চীৎকার করে বাড়ির লোকজনদের তটস্থ করে তুলতেন। অনঙ্গমোহন বুক থেকে অনেকখানি হাওয়া ছেড়ে দিলেন। সারাটা জীবন পেছনের পৃথিবীকে আলোকিত করার চেষ্টা করেছেন। অতীতকে নতুন তাৎপর্যে ধরতে চেয়েছেন। সভ্যতার আশ্বাসের দিকগুলিকে তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করেছেন। মানবসভ্যতার যা-কিছু কল্যাণবহ, সৃষ্টি, শান্তি ও অহিংসার— সব কিছুকে নতুন করে ব্যাখ্যা করেছেন। এই সব প্রচেষ্টার অনেক কিছু উপকরণ সঞ্চিত আছে নিচের ঘরগুলোতে; যা এখন আলো হাওয়াহীন, অব্যবহৃত।

ঘরের ভেতর মৃদু পদশব্দ জেগে উঠতে অনঙ্গমোহনের চিন্তায় ছেদ পড়ল। এতক্ষণে তরঙ্গ এল। ওর পরণে লালপাড় একখানা গরদ। স্পষ্ট সরল সিঁথির দু' পাশ থেকে কিছু কাঁচাপাকা চুল ভেঙে কপালে নেমেছে। ঢলঢলে স্নিগ্ধ দুই চোখ, যা সকল দুর্ভাবনা ভুলিয়ে দেয়। তরঙ্গ অনঙ্গমোহনের পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল। গরদের আঁচল তুলে গলার ও-পাশ দিয়ে জড়িয়ে নিঃশব্দে মাথা নামিয়ে চাদরের ওপর দিয়েই তার পায়ে ছোঁওয়াল। এই সেই তরঙ্গ, ভাবতে অনঙ্গমোহনের অবাক লাগে, তেরো বছর বয়সে তাঁর সংসারে এসেছিল, তারপর দুঃখে-সুখে সমান হাসতে হাসতে বয়সের উজান পেরিয়ে তাঁর অস্তিত্ব ছুঁয়ে এখনো অম্লান আছে।

তরঙ্গ মাথা তুলে চিবুকে হাসির আভা টেনে বলল, কেমন আছো?—অনঙ্গমোহন উদাস জবাব দিলেন, ভালই।—তরঙ্গ কাছে এল, ওর হাতে লোহার তারে তৈরি ছোট্ট একটা ফুলের সাজি; বলল, আজ ঘাটে এক সাধুর সঙ্গে দেখা, সিদ্ধাই পুরুষ, কি ভিড়, তোমার কথা বললুম, সব শুনে একটা শিকড় দিল, শনি-মঙ্গলবার বাদে ধারণ করতে হবে, তাই দেরি হয়ে গেল।

তরঙ্গর কপালে মস্ত এক সিঁদুরের টিপ। অনঙ্গমোহন লক্ষ্য করলেন, কথা বলতে বলতে ওর মুখের ভাঙাচোরা রেখাগুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে, সরল তৃপ্ত তরঙ্গ অল্পেই ডগমগ, বরাবর ও একইরকম। তরঙ্গ সাজি থেকে কিছু ফুল বের করল, এগিয়ে অনঙ্গমোহনের চাদরের অনেকখানি অনাবৃত করে ফেলল, বুকে ফুল ছুঁইয়ে বলল, একি, গরম লাগছে কেন?—তারপর দ্রুত হাতটা তুলে কপালে চেপে ধরে ফের বলল, হুঁ, জ্বরটা আবার এল দেখছি।

তরঙ্গকে চিন্তিত দেখলে এখনো অনঙ্গমোহনের কৌতূহল জাগে। ওর শঙ্কিত রক্তাভ মুখ মুহূর্তে বয়সের ব্যঞ্জনা হারিয়ে ফেলে, চিরকালের তরঙ্গ ধরা পড়ে যায়। অনঙ্গমোহন বাঁ হাত তুলে ওকে স্পর্শ করে বললেন, ও কিছু নয়। ব্যস্তসমস্ত তরঙ্গ প্রশ্ন করল, জ্বর এল কখন?—অনঙ্গমোহন ঝাপসা জবাব দিলেন, কি করে বলব। —তরঙ্গ মুখ নামিয়ে গভীর দৃষ্টি ফেলল, চোখ দুটোও দেখছি বেশ লাল। রাত্তিরে ঘুম হয়েছিল তো?—অনঙ্গমোহন উত্তরে মাথা নেড়ে জানালেন, না। ও বলল, আমায় ডাকনি কেন?—তারপর চাহনিতে কপট রাগ তুলে দ্রুত পদে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে জোরে ডাকল, বুবু, বুবু—।—পশ্চিমের ঘর থেকে খানিক বাদে কনিষ্কর ভারি গলা শোনা গেল, যাই মা—।

কনিষ্ক আসতে তরঙ্গ বলল, দ্যাখ্ তো, তোর বাবার ফের বোধ হয় জ্বরটা এল। মুখটাও কেমন শুকনো শুকনো।

কনিষ্কর পরনে ডোরাকাটা স্লিপিং স্যুট, চোখ-মুখ ফোলা ফোলা। বেশ বোঝা যাচ্ছে, ছুটির সকালটা এতক্ষণ ও বিছানায় গড়িয়ে উপভোগ করছিল। এগিয়ে এসে স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে হেসে বলল, গুড মর্নিং বাপি।—অনঙ্গমোহন উত্তরে নীরব হাসলেন। বিদেশী সওদাগরী অফিসে উচ্চপদের চাকুরে। চলনে-বলনে এক ধরনের কেতা, দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে ওটা এখন ওর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিশে গেছে। অনঙ্গমোহনের কাছে এসে কনিষ্ক ওঁর কপালে হাত রাখল। তারপর তরঙ্গর দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল কই মা, টেম্পারেচার আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।—অনঙ্গমোহন সঙ্গে সঙ্গে বলতে চাইলেন, ভালই আছি।—তরঙ্গ তেড়ে উঠল, তুমি থামো তো, সব ব্যাপারেই ছেলেখেলা, না।—কনিষ্ক বেরিয়ে যাবার আগে বলে গেল, আজ সারা দিন তো ঘরেই আছি। তেমন কিছু বুঝলে না-হয় ডক্টর হাজরাকে একটা ফোন করা যাবে।

এইজন্যে অনঙ্গমোহন চাইছিলেন না এ-সময় কনিষ্ক তার ঘরে আসুক। তুচ্ছ ব্যাপারে তাঁকে নিয়ে তরঙ্গের উদ্বেগ ওদের কাছে স্বাভাবিকভাবেই বাড়াবাড়ি বলে মনে হতে পারে। অথচ, এ-বিষয়ে তরঙ্গকে কিছু বলা চলবে না।

সকালের খাবার নিয়ে রঘু ঘরে ঢুকল। তরঙ্গ ফুলের সাজি গোলটেবিলে রেখে বিছানার এক পাশে উঠে বলল, আমাকে দে।—অনঙ্গমোহনের চিবিয়ে খাবার শক্তি নেই, তার দিনে দিনে জিবে জড়তা আসছে। তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ হয়ে আসতে তিনি মাথা নেড়ে জানালেন, তাঁর খেতে রুচি নেই। তরঙ্গ ঝুঁকে দুধের গ্লাসটা মুখের কাছে ধরল। গলার স্বরে মমতা এনে বলল, দুধটুকু অন্তত খাও। কিছু না খেলে শরীর টিঁকবে কি করে।—অল্প শ্বাসকষ্ট বোধ হচ্ছে, দুধ গিলতে অনঙ্গমোহনের কষ্ট হচ্ছিল। রঘু চলে যাচ্ছে। তরঙ্গ সজল গলায় বলল, শীতটা পড়ুক, আমি আর নিচে নামছি না। সংসারের চাবি অপালার হাতে তুলে দিয়ে সারা দিন তোমার কাছেই পড়ে থাকব।— অনঙ্গমোহন মনে মনে হাসলেন। তিনি বিলক্ষণ জানেন, তরঙ্গ তা পারবে না। অন্তত তার জন্যেই পারবে না। তরঙ্গ বাড়িময় ঘুরে না বেড়ালে কেউ তেমন করে তার অস্তিত্বটা স্বীকার করতে চাইবে না। হলঘরে বুদ্ধদেবের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ও টেনিস ক্লাব থেকে ফিরল। এ ঘরের দিকে মুখ করে চেঁচিয়ে ডাকল; ঠাকুমা, খেতে দাও।—শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে তরঙ্গ নিচে নামল। গ্লাস-বাটি হাতে তুলে নিয়ে হেসে বলল, এক্ষুনি আসছি।

তরঙ্গ বেরিয়ে যেতে অনঙ্গমোহন আবার একা। অবসন্ন দেহ, মন বিষণ্ণ, সেই দুঃসহ একাকিত্ব। নিজের মুখোমুখি। চারপাশে অনেকেই আছে, তবু কিছুই যেন নেই। বুকের অতলে শূন্যতার এক চোরা পাহাড়। শিয়রের ওপাশে ঘড়ির চলন্ত কাঁটায় সময় মন্থর হাঁটছে। সেই শব্দ হৃদস্পন্দনের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। গলার ভাঁজে ফের ঘাম জমছে, জিবের ডগা শুকিয়ে আসছে। শিরদাঁড়ার ভেতর একটা তরল যন্ত্রণা চলাফেরা করছে। আবার সেই পুরনো খেলাটা শুরু হয়ে গেল শরীরের অভ্যন্তরে। লক্ষ লক্ষ হিমশীতল বীজকণার নীরব সঞ্চরণে শরীরের অস্থিসন্ধি উষ্ণতা হারাচ্ছে। শুধু, থেকে থেকে মাথার দু' পাশের জটিল রগগুলোয় সাঁই সাঁই করে আগুন ছুটছে। অনঙ্গমোহন চার পাশে তাকাবার চেষ্টা করলেন। চিনেমাটির জলপাত্র থেকে রৌদ্র হারিয়ে যাচ্ছে। সত্তবাড়ির কার্নিশের মাথায় গাঢ় সোনালী আকাশটা কাঁপতে কাঁপতে একসময় স্থির হয়ে এল। পাখি দুটো এখনো ফেরেনি। বুদ্ধের প্রশান্ত মূর্তিটা রৌদ্রের দিক্-পরিবর্তনে উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে।

মাথার ভেতর ভাবনাগুলো ফের জট পাকাতে শুরু করেছে। বুকের কোথাও একটা বাঁশি করুণ হয়ে বেজে উঠল। ঠিক দু' বছর আগেকার এক ভয়ঙ্কর সন্ধ্যার কথা অনঙ্গমোহনের মনে পড়ে যাচ্ছে। সেবার ইউরোপ থেকে দেশে ফিরবার পথে কয়েক দিনের জন্য মিশরে থেমেছিলেন। সেখানে আবু সিম্বেলের আশ্চর্য মন্দির দেখে বিষয়টা প্রথম তার মনে ধরেছিল। কলকাতায় এসেই তিনি মিশরের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে ঘাটাঘাটি শুরু করেছিলেন। এবার তার গবেষণার বিষয় ছিল দ্বিতীয় র‍্যামেসাস। এ সম্পর্কে দু'-একটা প্রবন্ধও তৈরি করেছিলেন। তারপর সেই নির্মম সন্ধ্যা। দুপুর থেকে তিনি নিচের ছ' নম্বর লাইব্রেরী ঘরে বসে। তরঙ্গ বাড়িতে ছিল না, দেশের মাটিতে পা দিয়েই ও ছটফট করছিল, দিন কয়েকের জন্যে কাসাসগড়ে গেছে, মৈত্রেয়ীর কাছে, ওর স্বামী রমেন রেলের চাকুরে। সন্ধ্যার কিছু আগে রঘু এসে কফি দিয়ে গিয়েছিল। গরম কফিতে চুমুক দিতে হঠাৎ মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। দোতালায় একটানা পিয়ানো বেজে চলছিল। অনঙ্গমোহন রানী নেফার্টির মন্দিরের কতগুলি আলোকচিত্র নিয়ে ঘাটাঘাটি করছিলেন। কিছুতেই ছবিতে দৃষ্টি স্থির রাখতে পারছিলেন না। বুকের বাঁ দিকে একটা মৃদু যন্ত্রণা তখন মোচড় খাচ্ছে। জ্যৈষ্ঠের শেষ, বিশ্রী গুমোট চলছে কয়েক দিন ধরে। অনঙ্গমোহন ভাবলেন, একবার ছাদে উঠে কিছুক্ষণ খোলা আকাশের নিচে হাঁটাচলা করলে মাথা ধরাটা ছেড়ে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়ালেন, ঘরের বাতিটা নেবাবার মত উৎসাহও অবশিষ্ট ছিল না। বাইরে এসে বারান্দার সংক্ষিপ্ত পথটুকু কোনরকমে হেঁটে এলেন। তারপর, সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিতেই টলতে শুরু করলেন। বুকের বাঁ দিকটায় তখন রক্তস্রোত টগবগ করে ফুটছে, মাথার ভেতর হাজার হাজার সূঁচ তীক্ষ্ণ হয়ে বিঁধতে শুরু করেছে। চোখের সামনে সব ছবি এলোমেলো, দ্রুত মিলেমিশে জট পাকিয়ে যেতে লাগল। সিঁড়ির কয়েক ধাপ উঠে একসময় পড়ে গেলেন। তরঙ্গ এল তারপরের দিন বিকেলে। অনঙ্গমোহন তখন পাকাপাকিভাবে বিছানা নিয়েছেন, বাঁ দিকটা সম্পূর্ণ অসাড়।

মাধবীলতার জাফরী থেকে কিছু ঈষদুষ্ণ হাওয়া ছুটে এসে ঘরময় খেলা করছে। একটু গরম বোধ হচ্ছে। চোখের পাতা টনটন করছে। অনঙ্গমোহন জানালার দিকে পাশ ফিরতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন, কোমর-পিঠে অসহ্য ব্যথা। চোখ বুজে পড়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ধীরে ধীরে বুকের ভেতর একটা অক্ষম বাসনা জেগে উঠল। নিচের-তলায় সারি সারি ঘর, আজ দু' বছর ধরে আলোহাওয়াহীন, কনিষ্ক তার উত্তরাধিকার পেল না। দেহের ভেতরকার হিমশীতল বীজকণার মতই তার পঞ্চাশ বছরের শ্রম ও সাধনাকে অসংখ্য কীট কুরে কুরে খাচ্ছে। অনঙ্গমোহন ভাবলেন, জীবনটা কত সংক্ষিপ্ত, নিজের অজ্ঞাতে অকস্মাৎ শেষ হয়ে গেল, এক গভীর ঘুমে দেখা টুকরো টুকরো কিছু স্বপ্ন; হায়, যদি আরও কিছুটা সময় পাওয়া যেত, কয়েকটা বছর, তবে তিনি বত্রিশ শ' বছর আগেকার নীল-নদের সভ্যতা সম্পর্কে নতুন কিছু আলোকপাত করে যেতে পারতেন।

খবরের কাগজ হাতে রঘু এল। এতক্ষণ পশ্চিমের ঘরে কনিষ্ক কাগজগুলো পড়ছিল। ওর পড়া শেষ হলে প্রত্যহ রঘু এসময় আসে। অনঙ্গমোহন রঘুর দিকে অর্থপূর্ণ তাকালেন। ও বলল, মা রান্নায় বসেছে, ঠাকুরের শরীর খারাপ।—তারপর একটা কাগজ খুলে অনঙ্গমোহনের চোখের সামনে মেলে ধরল। এই বিধি, নিজের হাতে ধরে কাগজ পড়তে এখন তাঁর কষ্ট হয়।

অনঙ্গমোহন খুক করে কেশে উঠতে বুকের খাঁচাটা যেন ঝনঝনিয়ে উঠল। রঘু কাগজ হাতে নিশ্চল দাঁড়িয়ে। ওকে কিছু একটা বলতে গিয়েও অনঙ্গমোহন থেমে গেলেন, দম পাচ্ছিলেন না, তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। অগত্যা কাগজে চোখ রাখলেন। পশ্চিমের কোনো প্রার্থনাসভায় একজন জননেতাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ফুটবল খেলার মাঠে দুই বিরোধী দলের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছে। পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তিবৈঠক ব্যর্থ হতে চলেছে। ময়দানে এক মুণ্ডহীন নারীদেহ পাওয়া গেছে। বৈজ্ঞানিকগণ সুনিশ্চিত যে, পরীক্ষামূলকভাবে অতিরিক্ত আণবিক বোমা ফাটানোর ফলে বায়ুমণ্ডল ক্রমশ দূষিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার আশঙ্কা করছেন, দেশের উত্তর-পশ্চিমে এক বিরাট পঙ্গপালের ঝাঁক শস্যক্ষেত্রগুলির ওপর হানা দিতে পারে। অনঙ্গমোহনের দু' চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। বুকের বাঁ দিকে কেউ যেন পেরেক ঠুকতে শুরু করল। গলার ভাঁজে ঘাম ভীষণ হয়ে উঠছে। এইজন্যে তিনি সংবাদপত্র পড়তে পারেন না, তার ভাল লাগে না। কেবলই ব্যর্থতা আর অকল্যাণের সংবাদ। তিনি ছটফট করতে লাগলেন। মানবসভ্যতা আণবিক বোমা, বৌদ্ধ সংস্কৃতি, তরঙ্গ, লাইব্রেরীঘর, খ্রীষ্টধর্ম, দুর্ভিক্ষ, বৈদিক-যুগ, হত্যা সৃষ্টি অহিংসা যুদ্ধ শান্তি—মাথার ভেতর নানান ভাবনা ঘুরপাক খেতে খেতে কুয়াশাময় হয়ে যাচ্ছে। ঘাড়ের রগ দুটো মোটা হয়ে রক্তস্রোত উন্দাম বইছে। শরীরটা ভূমিকম্পের মত কেঁপে কেঁপে উঠছে। খাটটা ফের দুলতে শুরু করল, প্রবল, বাইবেলের সেই নোয়ার নৌকার মত। সিসের অক্ষরগুলো ঘোলাটে হয়ে ক্রমে মিলেমিশে একটা ঝড়ের আকার পাচ্ছে। অনঙ্গমোহন রঘুর দিকে চোখ ফেরালেন। ওকে চেনা যাচ্ছে না। রঘু একটা মমিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। মাথার ওপরের ঝাড়লণ্ঠনের কাচে কুচো কুচো আগুন জ্বলছে। অনঙ্গমোহন বাঁ হাতটা চাদরের ভেতর থেকে বের করতে চাইলেন, পারলেন না। কিছু একটা বলতে গেলে বুক থেকে একটা দুর্বোধ্য আওয়াজ ঠেলে উঠল। চারপাশের কোন কিছুই আর স্বতন্ত্র করে চেনা যাচ্ছে না। সব ছাই রঙের হয়ে যাচ্ছে। রঘু কাগজ নামিয়ে আর্তস্বরে ডাকল, কর্তাবাবু।

উন্দাম রক্তস্রোত ক্রমশ শ্লথ হয়ে শরীরের অসংখ্য ঝাঁঝরি দিয়ে পায়ের দিকে নেমে আসছিল। অনঙ্গমোহনের ঘুম পাচ্ছিল। তিনি বড় অসহায়, নিঃসঙ্গ। চেতনা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হবার আগে তিনি এইটুকু শুধু ভাবতে পেরেছিলেন, পাখিদুটো কি খড়কুটো নিয়ে ফিরে এল।

মনের পুতুল সাগরে

(একত্রিশ)

ট্রাম রাস্তা পার হয়ে ময়দান, তারই একপাশে পুকুর, চার কোণে চারটি ঘর, দেখলে মনে হয় যিনি পুকুর কেটে-ছিলেন তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠা করারও বাসনা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধ হয় করে যেতে পারেন নি। আবার এমনও হতে পারে এগুলি পথিকদের জিরোবার জন্যে তৈরী পান্থশালা। উত্তর-পশ্চিমে অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল মিস কলকাত্তা, বাবুজি এই আমার ঘর।

অনাদিপ্রসাদ তাকিয়ে দেখলেন ঘরটি অপ্রশস্ত নয়। পাকা মেঝে, ওপরে মন্দিরের মত গম্বুজ। অনেকগুলি খিলান, তবে দেয়াল নেই, জল ঝড় থেকে বাঁচবার জন্যে দরমা দিয়ে আড়াল করা হয়েছে। ঘরের মধ্যে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। কয়েকটা কাঠের বাক্স, খান কয়েক ঝুড়ি, একপাশে মাদুরের উপর শোবার বিছানা, সব কিছুই নোংরা, ময়লা, ছেঁড়া। তার মধ্যে একখানা ঝকঝকে বেতের দোলনা। বোঝা গেল বাচ্চাটা তার মধ্যে শুয়ে আছে। মেয়েটি বলল, ঘুমিয়ে পড়েছে।

অনাদিপ্রসাদের কিছু বলার ছিল না। শুধু অবাক হয়ে চারদিকটা দেখছিলেন। মিস্ কলকাত্তা হঠাৎ প্রশ্ন করল: বাবুজী, সত্যি কি আপনি ছোকরির খোঁজ করতে এদিকে এসেছিলেন?

অনাদিপ্রসাদ পাল্টা প্রশ্ন করেন, কেন, তাহলে কি হবে?

—আমার হাতে অনেক ছোকরি আছে। বাঙালী, হিন্দুস্থানী। বাবুরা আসে, আমার কাছে দাম ঠিক করে অন্ধকারে ময়দানের মধ্যে চলে যায়।

অনাদিপ্রসাদ কথাগুলো শুনছিলেন কিনা বোঝা গেল না, জিজ্ঞেস করলেন, মাঠের মধ্যে এই ঘরে একলা থাকতে তোমার ভয় করে না?

মিস্ কলকাত্তা হাসল, কিসের ভয়? আদমীর? তারা তো আমাকে ডর করে, আমার বডি গার্ডদের দেখেন নি? কাল্লু ওস্তাদ, জোন্স্, এ শহরের খুব নাম করা গুণ্ডা। ওরাই তো আমাকে মিস্ কলকাত্তা বানিয়েছে।

অনাদিপ্রসাদের কৌতূহল জাগে, মিস্ কলকাত্তা ব্যাপারটা কি?

—কাল্লু ওস্তাদদের যখন কোন মেয়েকে পসন্দ্ হয় ওরা তাকে মিস্ কলকাত্তা বানায়। এ বছর আমাকে নিয়েছে, এই জায়গায় থাকবার কোয়াটার দিয়েছে, দু-বেলা খিলায়, পরবার শাড়ি দেয়, আবার ছিনতাই পকেটমার হলে কিছু কমিশান ভি দেয়। এ সাল আমাকে আর খাটতে হবে না। তার ওপর ভগবান কৃপা করলেন, একটা বাচ্চা ভি পেয়ে গেলাম।

—তোমার সাদী হয়নি?

—সাদীওয়ালা মেয়ে কি মিস্ কলকাত্তা বনতে পারে?

—তুমি আগে কোথায় থাকতে?

—আমার ঘরের লোকেদের সংগে, গঙ্গার ধারে, তাঁবুর মধ্যে, যেখানে আপনি আমায় দেখেছিলেন।

—তোমাদের দেশ কোথায়?

মেয়েটি সহজ গলায় বলে, আমার বাপ-দাদারা রাজস্থান থেকে এসেছিল, সে অনেক সাল আগে, এই কলকাতাই এখন ঘরবাড়ি হয়ে গেছে। আমরা কুকুরের ব্যবসা করি।

—কুকুর?

—হাঁ বাবুজী, একদিন গঙ্গা কিনারে গিয়ে দেখবেন।

—হাঁ, আমি লক্ষ্য করেছি কাঠের বাক্সর মধ্যে ছোট বড় কুকুর থাকে। সেসব বুঝি তোমরা আনাও?

—সব জাতের কুকুর, নেপাল থেকে আসে। নীলগিরি পাহাড় থেকে, ওইখানে গঙ্গার ধারে আমাদের সংগে থাকে, বাচ্চাও হয়, বাবুরা কিনে নিয়ে যায়। আলিপুরের এক বোস সাহেব আছে, কুকুরের ব্যবসা করে, কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, কিন্তু কুকুর তো নিয়ে যায় আমাদের কাছ থেকে।

অনাদিপ্রসাদ স্বীকার করতে বাধ্য হন, আমি কলকাতার লোক অথচ এসব কথা তো জানি না।

মিস কলকাত্তা অনাদিপ্রসাদকে আরও বিস্মিত করার জন্যে সগর্বে ঘোষণা করল, আমার পিতাজী কিন্তু গোরা সাহেব।

—সে কি?

—দিনের বেলা দেখবেন আমার চোখ নীল, চুলের রঙ্ বাদামী। আমার মার কাছে শুনেছি আমার বাবা ছিল বিলাতি জাহাজের খালাসী। তখনকার দিনে জাহাজ যখন গঙ্গার মাঝখানে নোঙ্গর করত তখন মা'রা সাঁতার কাটতে নামত জলে, জাহাজের খালাসীরা মাল চুরি করে পুলিসকে ছাঁপিয়ে ফেলে দিত গঙ্গার জলে। মা'রা সেগুলো তুলে আনত। পরে রাত্রিবেলা খালাসীরা ডাঙগায় নেমে চুরির মালের ভাগ নিত। সেই সময় আমার মার সঙ্গে খুব আলাপ হয়েছিল একজন গোরা খালাসীর, তার নাম ছিল জনি, সেই আমার বাবা।

নিজের বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে গৌরবে মিস্ কলকাত্তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

অনাদিপ্রসাদ মন্তব্য করেন, তাহলে তো তুমি যে সে মেয়ে নও, কাল্লু ওস্তাদরা

তোমায় ঠিক চিনেছে।

মেয়েটি কি বুঝল কে জানে, কিন্তু খিল খিল করে হাসল।

ঠিক এই সময় কাল্লু আর জোন্‌স্‌ এসে হাজির, একটা মনিব্যাগ দিয়ে বলল, ছিপিয়ে রাখ, একটা মারওয়াড়ী বাবুর পকেট সাফাই করেছি, শালা টাকার চেয়ে কাগজ বোঝাই করে রেখেছে।

মিস্‌ কলকাত্তা নিমেষের মধ্যে ব্যাগটা একটা ঝুড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলে জিজ্ঞেস করল, কত টাকা আছে।

—অন্ধকারে ভাল গুণতে পারি নি, মনে হল তিরিশ, তারপরেই গলা নামিয়ে বলল, খুব সাবধান, ঐ যে লোক দুটো আসছে, সাদা ড্রেসের পুলিশ, ফট্‌ করে কোন জবাব দিবি না, আমরা কাছেই আছি।

কাল্লুরা সরে যেতেই অনাদিপ্রসাদ লক্ষ করলেন অন্ধকারের মধ্যে থেকে পায়জামা পাঞ্জাবী পরা দুটি জোয়ান লোক ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

দুজনেই কাঠখোট্টা, গোঁয়ার গোবিন্দ, সরাসরি এসে মেয়েটাকে বলল, মদের একটা ছোট বোতল ছাড়ু দেখি—।

মিস্‌ কলকাত্তা যেন আকাশ থেকে

পড়ে, কি বলছেন বাবুজি।

—বুঝতে পারছ না, মদ চাইছি, মদ, হুইস্কি, রাম, জিন্। এখন বোধহয় দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, তাই তোমার দুয়ারে এসেছি মা জননী, বাজারদর থেকে দু' টাকা বেশি দেব, মাল ছাড়।

—আরে রাম, এসব কি বলছেন বাবুজি।

দু'জনেই হাসে, মাগীর আদিখ্যেতা দেখে বাঁচি না, এখান থেকে রোজ ডজন ডজন বোতল পাচার হয় আমরা জানি না। ভাল কথায় যদি না দিস এখুনি তাল্লাসী করে বোতলগুলো বাজেয়াপ্ত করে নেব।

মেয়েটা রুখে ওঠে, কর না, আমার বয়ে গেছে, কিন্তু খবর্দার আমার বাচ্চার ঘুম ভাঙাতে পারবে না, এই বাবুজী সাক্ষী রইল।

দু'জনেই এবার অনাদিপ্রসাদের দিকে তাকায়, দেখে রাখি বাবুজীটিকে, নিশ্চয় কোন ছিনতাই পার্টির মেম্বার, নয়ত এ মাগীর কাছে বসে গল্প করছে।

এদের কথার ধরনে অনাদিপ্রসাদের গা ঘিন ঘিন করে ওঠে কিন্তু মুখে কিছু বলেন না।

একজন গলা বাড়িয়ে ভেতরে উঁকি মেরে মন্তব্য করে, মাগীর কথা মিথ্যে নয় রে, সত্যিই একটা বাচ্চা শুয়ে আছে।

অন্যের জবাব, কার বাচ্চা কে জানে।

—এখানে হুজ্জতি করে কোন লাভ হবে না, তার চেয়ে মাঠের মধ্যে চল, জোড়ায় জোড়ায় সখাসখীরা শুয়ে আছে, ধমকালেই দশ পনের টাকা নজরানা দেবে।

—সেই ভাল। চল ময়দানে যাই, কিন্তু এই মাগী, তোকে সাবধান করে দিয়ে গেলাম, ছিনতাই পার্টিদের সঙ্গে মিশবি না, বেআইনী মাল বিক্রী করবি না, ধরা পড়লে নির্ঘাৎ জেল হবে।

লোক দুটো টলতে টলতে চলে গেল। অনাদিপ্রসাদের বুঝতে বাকি রইল না, লোক দুটো আগে থেকেই নেশা করে এসেছে। ও মেয়েটার কাছ থেকে সস্তায় কিনতে না পেরে এখন চলল অবৈধ প্রণয়ীদের কাছ থেকে ঘুষের টাকা আদায় করতে।

মিস্ কলকাতাও মুখ ভেংচে বলল, ঐ শালারা শকুন, মড়ার মাংস খায়, ঘুষ আর ঘুষ।

অনাদিপ্রসাদের তখনও কৌতূহল মেটেনি, জিজ্ঞেস করেন, সত্যিই কি তুমি মদ বিক্রী কর?

মেয়েটা খিল খিল করে হাসে, নয়ত আমাদের চলবে কি করে?

অনাদিপ্রসাদের আরও বিস্ময়, তার মানে? এখন, এই ঘরে তোমার মদের বোতল আছে?

মেয়েটা উঠে গিয়ে দোলনা থেকে বাচ্চাটা কোলে তুলে নেয়, দেখা যায় গদীর তলায় আট দশটা চ্যাপটা পাঁইট বোতল।

অনাদিপ্রসাদ না বলে পারেন না, তুমি বাহাদুর, কি বুকের পাটা, যদি ওরা তাল্লাসী করত?

মেয়েটা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে, ওরা তো বুদ্ধু, ঘড়িগুলো দেখত, কিন্তু বাচ্চাকে তুলতে সাহস করত না। মজা দেখবেন বাবুজী, এখন তো ঘুষ নিতে এসেছিল, কিছুক্ষণ পরে যখন তেষ্টায় ছাতি ফাটবে ঐ শালারা আমার কাছে ঘুরে আসবে। আমার পায়ের কাছে টাকা রেখে মাল কিনবে, ওদের আমি চিনি না।

অনাদিপ্রসাদ উঠে পড়েন, এবার আমি চলি।

মেয়েটা ঠাট্টা করে, কি বাবুজী পুলিশ দেখে আপনিও ভয় পেয়ে গেলেন নাকি?

—তা নয়, রাত হল বাড়ি ফিরতে হবে তো?

—আবার কবে আসবেন?

—একদিন এসে যাব। ঘুরতে ঘুরতে, আমার তো কোন ঠিক নেই। এই দশটা টাকা রাখ।

—কেন বাবুজী?

—ঐ বাচ্চাটার জন্যে জামা বানিয়ে দিও, বোল তার মামা দিয়েছে।

মেয়েটার চোখ ছল ছল করে ওঠে।

সত্যি বাবুজী, আমার কোন ভাই নেই, আপনার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে।

অনাদিপ্রসাদ যদিও ঐখান থেকে উঠে পড়লেন কিন্তু এগ্‌তে পারলেন না, কে বলবে দারিদ্র্যপীড়িত এই শহর কলকাতা, আলো জ্বলছে আর নিভছে, হাজারো প্রলোভনের ইশারা, কতরকমের মেকআপ। সর্বত্র নিয়ন লাইট, হয়ত বা রাস্তায় স্থির হয়ে আছে, নয়ত বর্ণচ্ছটায় জ্বলছে আর নিভছে, এ শুধু শহরের হাতছানি, কানে কানে বলে, এস আমাকে দেখে মুগ্ধ হও, গ্রহণ করো, শুধু নিজের মতামত প্রকাশ কোর না।

তবু অনাদিপ্রসাদ মনের জোর করে এগিয়ে চললেন। অন্ধকার ময়দান, আলোকিত রাজপথ, সচঞ্চল গাড়ি, অবিরাম জনস্রোত, সব কিছু উপেক্ষা করে চলতে চাইলেও যেখানে তিনি বাধা পেলেন সে হল যাযাবর মানুষের রাজ্যে। তাদের রাজত্ব ফুটপাথে, স্বামী স্ত্রী ছেলে মেয়ে, গৃহপালিত পশু, পক্ষী সবাই এক ফুটপাথে, পাহাড় প্রমাণ আবর্জনার পাশে চুপ করে বসে আছে, রাঁধছে, সংসার করছে। আজব শহরবাসী, কেউ এ দৃশ্য দেখে শিউরে ওঠে না, ভাবে না কিভাবে মানুষগুলোর দিন চলবে, স্বাচ্ছন্দ্য আর দারিদ্র্যের দুটো আলাদা স্রোত বইছে, কোথাও বোধ হয় এদের মেলবার সম্ভাবনা নেই। অনিবার্য মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এরা জিগীর তুলছে, আমরা মরব না, আমরা বাঁচব। কিন্তু কে এর জবাব দেবে?

আদিম সভ্যতার ইতিহাস বিচার করলে দেখা যায় পশু জীবনের ভেতর থেকেই মানুষের উৎপত্তি। হিংস্র জন্তুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে মানুষ পর্বতের গুহার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে, প্রকৃতির বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে শিখেছে। ক্রমশ বৈরীভাব ভুলে পশুকে পালন করেছে, তারপর যুগ যুগ ধরে চলেছে এই মানব সভ্যতার বিকাশ। আজ আমরা চীৎকার করে বলছি 'আমরা বর্বর নই, আমরা সভ্য'। অথচ ভাগ্যের একি নিষ্ঠুর পরিহাস, যার ফলে ক্রমশ মানুষকে আমরা পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে আনছি, শুধু বেঁচে থাকার জন্যে, শুধু খাওয়া আর পরার লোভে মানুষ আজ স্বার্থপর জন্তুতে পরিণত হয়েছে। তবু মুখ ফুটে বলতে পারছে না, আমাকে জন্তু করে দাও তাহলে অন্তত এই নকল সভ্যতার হাড়িকাঠ থেকে রেহাই পাই।

রাস্তার জঞ্জাল, ফুটপাথের ফেরিওয়ালা মানুষ, গরু, ছাগল টপকাতে টপকাতে বেশ ঘণ্টাখানেক সজোরে হাঁটার পর অনাদিপ্রসাদ এসে হাজির হলেন অশোক জানার প্রেসে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ,

মৃদু আলো জ্বলছে, অনাদিপ্রসাদ কড়া নাড়লেন।

ভেতর থেকে অশোক জানার শঙ্কিত প্রশ্ন, কে?

—দরজা খোল।

আবার প্রশ্ন, কে?

—আমি অনাদি।

অশোক জানার চিন্তিত কণ্ঠস্বর, ও তুমি, আচ্ছা দাঁড়াও দরজা খুলছি। তবু দরজা খুলতে বেশ দেরী হল। অশোক জানার চোখ মুখ দেখে অনাদিপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? মুখখানা থমথমে, প্রেসের ভেতরটা কেমন যেন ছমছমে, কি করছিলে?

—ভেতরে এস, বলছি।

অশোক জানা দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে, নিজের হাতে মেশিন চালানোর অভ্যেস অনেকদিন চলে গেছে, তবে খুব একটা জরুরী কাজ ছিল তাই নিজেকেই করতে হল, অনভ্যাসের জন্য একটু গলদঘর্ম হয়ে গেছি।

—তোমার প্রেসের লোকজন সব কোথায় গেল?

—ছুটি হয়ে গেছে।

—সেকি, তোমার এখানে তো অনেক রাত পর্যন্ত কাজ হয়।

অশোক জানা অন্যমনস্ক স্বরে জবাব দেয়, হয় তবে আজকে সবাই ছুটি নিয়েছে তাই আমি নিজেই কম্পোজ করে ছাপালাম।

—কি?

—একটা সার্টিফিকেট, এখুনি ডেলিভারী নিতে আসবে।

অনাদিপ্রসাদ ক্যানভাসের ইজিচেয়ারে বসে পড়ে প্রসঙ্গ বদলান, অনেকদিন তোমার সংগে দেখা হয়নি তাই একবার খবর নিতে এলাম, কাজকর্ম কেমন চলছে?

—ভালই।

—তোমার সেই এম এল এ বন্ধুটির কি খবর?

—শশধর বোস? শুনেছি গভর্নমেন্ট ফেলে দেবার জন্যে দল পাকাচ্ছে। ব্যাটা এখন বেশ চালু হয়ে গেছে।

—তোমার এখানে একটা ছোঁড়া আসত লম্বু না কি নাম—,

—কেন তার কি হয়েছে?

অনাদিপ্রসাদ মধ্য কলকাতার ঝুনুদার সাংস্কৃতিক ক্লাবের বর্ণনা করে বলেন, ঐখানে লম্বুকে দেখলাম ঘোঁতনের সংগে নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে।

অশোক জানা মন্তব্য করে, ওরা সব বাস্তু ঘুঘুর সাগরেদ, সব সময় টাকা রোজগারের ধান্দা, হাজারো রকম ফন্দি-ফিকির। আবার ওদের হাতে না রাখলেও চলে না, কোনদিন ক্ষেপে গিয়ে প্রেস জ্বালিয়ে দেবে কে বলতে পারে। অনাদিপ্রসাদ বাঁধাই ঘরের দিকে তাকাতে মনে পড়ে যায় এখানকার সরস্বতী পুজোর কথা, জিজ্ঞেস করেন, সেই কবিতা মেয়েটি কেমন আছে?

—ভালই আছে, তবে বোঝই তো অভাবের সংসার, মাঝে মাঝে কামাই করে, মুখে বলে বাড়িতে অসুখ বিসুখ, অথচ বুঝতে পারি হয় কোন গুঁড়ো মশলার কারখানায়, নয়ত ওষুধের শিশি তৈরীর দোকানে কাজ করে কিছু বেশি টাকা রোজগার করছে। আমিও কিছু বলতে পারি না, মাসে মাত্র আটত্রিশ টাকা দিই তো।

—তার মানে এখন আসছে না।

—ছুটি নিয়ে নবদ্বীপ গেছে।

—হঠাৎ নবদ্বীপ?

—ঠিক বুঝতে পারলাম না। বোধ হয় কোন আত্মীয় স্বজনের সংগে দেখা করতে গেছে।

ঠিক এমনি সময় দরজার কড়া আবার নড়ে উঠল, সংগে সংগে অশোক জানার চোখ মুখ আগের মত কঠিন হয়ে যায়। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে দরজা খোলে। বাইরে থেকে যে ঢুকল সে আর কেউ নয় মিঃ দত্ত। বোঝা গেল অশোক জানা তারই প্রতীক্ষা করছিল, বলল, আপনার কাজ হয়ে গেছে, ভেতরে চলুন দিচ্ছি।

অনাদিপ্রসাদকে বসতে বলে অশোক জানা মক্কেল সমেত পাশের ঘরে চলে যায়, গলা নামিয়ে কথা বলে, আপনার জন্যে এই প্রথম নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটা নকল সার্টিফিকেট ছাপিয়ে দিলাম। এই নিন।

সার্টিফিকেটটা হাতে নিয়ে মিঃ দত্ত প্রায় কেঁদে ফেলে, আপনি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন অশোকবাবু।

—আপনাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেকে মেরেছি, বিবেকের ছুরি কেটে কেটে বসছে, যন্ত্রণায় ছটফট করছি।

বিচক্ষণ মিঃ দত্ত পকেট থেকে মলম বার করে, তিনখানা করকরে একশ টাকার নোট।

অশোক জানা কিন্তু শিউরে ওঠে, না, না, ওসবের দরকার নেই, আপনি সার্টিফিকেটটা নিয়ে চলে যান।

মিঃ দত্তর মনে হয় অশোক জানা দর বাড়াতে চাইছে, বলে, বিশ্বাস করুন আমার হাতে আর টাকা নেই, থাকলে নিশ্চয় দিতাম।

এ কথায় অশোক জানা চটে যায়, আমি তো বলছি, টাকা চাই না।

মিঃ দত্ত তখনও অবুঝ, আপনি এখন এই তিনশ' টাকা রাখুন, আমি চাকরি পেলে আরও দুশো টাকা দেব।

অশোক জানা ক্ষেপে ওঠে, আপনি একটা আহাম্মক, আমি কি বলতে গেলাম তা বুঝতেই পারলেন না, জেনে বুঝে শুধু আপনার মুখ চেয়ে এতবড় অন্যায় কাজ আমি করেছি, করেছি নিজের হাতে, কাউকে ভাগী হতে দিইনি। কম্পোজ করেছি, ছেপেছি, আপনি তার দাম দিতে চান টাকা দিয়ে। বিবেকের সংগে কতখানি লড়তে হয়েছে তা বুঝতেও পারলেন না? এই নিন আপনার সার্টিফিকেট, বাড়ি যান, আর কখনও এখানে আসবেন না।

মিঃ দত্ত থতমত খেয়ে যায়, সার্টিফিকেটটা বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে ভাঙ্গা গলায় বলবার চেষ্টা করে, আপনি মিথ্যা রাগ করছেন, কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব—।

অশোক জানা তখনও বিরক্ত, ঢের হয়েছে এখন যান।

লোকটা আর অপেক্ষা করে না, অনাদিপ্রসাদের পাশ দিয়ে গিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে যায়।

ওদের কথাবার্তার কিছু অংশ অনাদিপ্রসাদের কানেও গিয়েছিল, উনি উঠে গেলেন অশোক জানার কাছে। জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না অশোক, তোমাকে এত উত্তেজিত হতে আগে তো কখনও দেখিনি।

অশোক জানা বাঁ হাতের তালুতে ঘুষি মেরে কঠিন স্বরে বলে, ঠিক বুঝতে পারছি না অনাদি, ভুল করলাম না ঠিক করলাম। ইলেকশানের সময় ভুল করে শশধর বোসকে দাঁড় করিয়েছিলাম, সেই ভুলের মাশুল দিতে হচ্ছে দেশের কত লোককে। আমি না বুঝে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন তৈরী করেছি, সে এখন রাজনীতির ক্ষেত্রে তাণ্ডব নাচ শুরু করেছে। জানি না আজকেও আবার ভুল করলাম কি না। বুঝতে পারছি না ঐ মিঃ দত্তকে, লোকটা সৎ না অসৎ।

—এত কথা কিসের জন্যে, কি ছাপিয়ে দিলে তাকে?

—একটা জাল সার্টিফিকেট।

অনাদিপ্রসাদ অবাক হয়ে বন্ধুর মুখের দিকে তাকালেন—সে যেন ব্রোঞ্জের মূর্তি, কোন অভিব্যক্তির প্রকাশ নেই। (ক্রমশ)

লক্ষ্মীর কৃপালাভঃ বাঙালীর সাধনা

প্রবাসী বাঙালী স্টিভেডোর

স্নেহের মঞ্জু ও মীনা,
বাণিজ্যের বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার মালমশলার সন্ধানে গিয়ে যে তোমাদের মতো সুন্দর, পরিচ্ছন্নরুচি পরিবারের সঙ্গে এমন করে আত্মীয়তাসূত্রে বাঁধা পড়ে যাবো বিশাখাপত্তনে যাবার আগে তা একেবারেই ভাবিনি। দুই নবীন কর্তা, তোমরা দুজন তরুণী কর্ত্রী আর ভুলু, বিউ, মিঠু, টুকু আর মিলুর মতো মিষ্টি মিষ্টি ছেলেরা আর মেয়েরা- সকলের আদরে আমার মন এখনো ভরপুর হয়ে আছে।...ফেরার পথে স্টেট ওয়ালটেয়ার স্টেশন ছাড়ার পরে যেন স্বজনবিচ্ছেদের বেদনা বোধ করলাম।..."

এটা আমার লেখা একটা চিঠির অংশ। লিখেছিলাম বিশাখাপত্তনের পুরনো বাঙালী 'স্টিভেডোর' প্রতিষ্ঠান রায় অ্যান্ড চ্যাটার্জি প্রাইভেট লিমিটেড-এর ডিরেক্টর ও কার্যাধ্যক্ষ শ্রীদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী মীনা দেবী আর দুলালবাবুর বড়ো ভাই 'হিন্দুস্থান শিপ-ইয়ার্ড'-এর উচ্চপদস্থ অফিসার চার্টার্ড এঞ্জিনীয়ার শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী মঞ্জু দেবীর কাছে।

এই দুই ভাই আর তাঁদের স্ত্রীরা এরকম কত চিঠি পেয়েছেন তা জানি না। তবে এঁরা যদি পেয়ে থাকেন বিশ পঞ্চাশটা, তো তাঁদের পিতৃদেব, অর্থাৎ পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চয়ই এই ধরনের চিঠি পেতেন শত শত।

কারণ ভাইজাগ মানে অধুনা বিশাখাপত্তনমের স্টিভেডোরগোষ্ঠীর অন্যতম নায়ক সুরেন ব্যানার্জি মশায়, ওরফে ভনুবাবুর পরিণত বয়সে এক অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল, প্রায় দুপুর বেলায় মেন রোডের অফিস বাড়ির দোতলায় নিজের বাসার বারান্দায় বসে পথের দিকে চেয়ে থাকা। কোনো অচেনা বাঙালী পথিককে দেখলেই ওপর থেকে ডাকাডাকি করে ভনুবাবু তাকে ঘরে তুলতেন। অবেলায় হলেও প্রায় রোজই নবাগত সেই এক বা একাধিক বাঙালীকে সুরেনবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করে অন্তত সে বেলার খাওয়াটা সেখানে সেরে যেতে হতো; দরকার হলে অতিথি রাতের আশ্রয়ও পেতো। বিয়ের পরে কলকাতা থেকে এসে নববধূরা শ্বশুরের এই কাণ্ড দেখে অবাক। অনেকদিন এমন হতো যে, বাড়ির মেয়েরা, অল্পবয়সী সেই দুই বউ, না খেয়ে নিজেদের ভাগের মাছভাত তুলে দিতে বাধ্য হতেন। শেষে ছেলেরা অনুযোগ করাতে কর্তা নিয়ম বেঁধে দিলেন যে, অন্তত একজনের খাবার যেন প্রতিদিন বেশি রাঁধা থাকে। অতিথি পাওয়া গেল তো ভালো, 'না গেলে দিও ফেলে সে ভাত ভাল!'

কাজেই ভনুবাবুর ছেলে-বউ আর বাচ্চা বাচ্চা নাতি নাতনীরা যে ব্যবসা বাণিজ্যের লোক দেখানো সৌজন্যের আবহাওয়াতে মানুষ হয়েও অন্তর দিয়ে অতিথিকে আপন করে নিতে পারেন সেটা হলো জ্যামিতিক 'করোলারি'-র মতন। আমি তাঁদের সম্বন্ধে লিখতেও পারি বা লিখবো, এই প্রত্যাশাতেই যে আমার প্রতি তাঁদের সৌজন্য, তা নয়; ভাইজাগের অনেক বাঙালীর মুখে একই কথা শুনলাম। দুলালবাবুদের কাছে অতিথি নারায়ণ এই মার্গাগ গণ্ডার দিনেও।

অনেক প্রবাসী বাঙালীর সঙ্গেই আলাপ করার সুযোগ হলো বিশাখাপত্তন 'বাঙালী সঙ্ঘ'-এর সান্ধ্য আড্ডায় গিয়ে। ১৯৩১ সালে তারকেশ্বর নিবাসী এক ভদ্রলোক, যাঁর নাম বর্তমান কর্মসচিবরা বহু চেষ্টা করেও জানতে পারেননি, এই সঙ্ঘ গঠন

করেছিলেন। বোঝা যাচ্ছে যে গোড়ার দিকে সঙ্ঘের কাজ বেশি গুছিয়ে করা হয়নি। কিন্তু এখন এটা একটা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, যার মাধ্যমে বাংলা দেশ থেকে ছসাত শ' মাইল দূরে থেকেও ভাইজাগ ও ওয়ালটেয়ারের হাজার বারো শ' বাঙালী পুরুষ বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ভালো করেই বাঁচিয়ে রেখেছেন।

তিন চারদিন ওখানে ছিলাম; তারই মধ্যে এক সন্ধ্যায় আমি গিয়ে দেখলাম দুর্গাপূজামণ্ডপে অভিনয়ের জন্যে তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষ' নাটকের জোর মহড়া চলেছে। পরিচালক হলেন আমাদের কমলবাবু—দুলালবাবুর দাদা। তিনি পার্ট করছেন 'নুটবিহারী'র আর তাঁর স্ত্রী মঞ্জু 'বিমলা'র। নাট্যপাগল শ্বশুরকুলের অন্যান্য গুণের সঙ্গে অভিনয় নৈপুণ্যটিও বধূ মঞ্জু রপ্ত করে নিয়েছেন। সহজ সুন্দর অভিনয়, মনে হয় খুব স্টেজ-ফ্রী। চমৎকার অভিনয় করেছেন ভাইজাগের আর এক পুরনো বাসিন্দা, ক্লিয়ারিং অ্যাণ্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্সীর মালিক এবং বাঙালী সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীকৃষ্ণকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র অমূল্যকৃষ্ণ, ওরফে গোপাল-

বাবু। (শাশ্তিজায়াই দেখছি বিশাখাপত্তনের বাঙালী সমাজের পাণ্ডা)।

'কল্যাণী' মহড়ায় সেদিন অনুপস্থিত ছিলেন; তাঁর প্রক্সি দিচ্ছিলেন অপর্ণা দত্ত নামে একটি মেয়ে। মেয়েটিকে আমার বড়ো ভালো লাগলো; অনেকক্ষণ কথা বলে মনে হলো এ যেন সেই 'দুদণ্ড শান্তি দেওয়া নাটোরের বনলতা সেন'। ইংরেজীতে এম এ অপর্ণাও এখানকার পুরনো এক বাসিন্দার কন্যা। বিশাখাপত্তনের বিরাট ** "ক্যালটেক্স কলোনি"-র স্কুলের সে শিক্ষিকা। অপর্ণার দুঃখ যে শিশুকাল থেকে ভাইজাগের বাসিন্দা হয়ে সে বাংলায় লেখাপড়া করার সুযোগ পায়নি। কিন্তু বাংলায় অভিনয় করছে খাশা।

উল্লেখযোগ্য আরেকজন হলেন প্রম্পটার দ্বিজেন রায়। আমাদের ক্যালকাটা কেমিক্যালের ভাইজাগ সেলস অফিসের কর্মচারী। সেই অফিসের ম্যানেজার কিন্তু অন্ধ্রদেশীয় শ্রীসূর্যনারায়ণ রাও। বাঙালী প্রতিষ্ঠানের এই নীতিটা একদিক দিয়ে ভালোই। 'চিলড্রেন অব দি সয়েল'-কে উচ্চপদে নিয়োগ করা। রায়-চ্যাটার্জি'র নীতিও তাই। তাঁদের অধিকাংশ কর্মচারীই সে-দেশের লোক। দুলাল-বাবুরা বাঙালী যুবকদের রেখে দেখেছেন: তাঁরা নাকি বেশিদিন বাংলা দেশ, তথা কলকাতা ছেড়ে থাকতে পারেন না। অথচ কলকাতার অবাঙালী প্রতিষ্ঠানে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব দেশের লোকই তো দেখি বছরের পর বছর টিঁকে থাকেন। বাংলায় এই বেকারত্বের বাতাবরণে থাকতে, বাপ-খুড়োর গলগ্রহ হয়ে থাকতে খারাপ লাগে না, কিন্তু বাংলার বাইরে গিয়ে স্বাবলম্বী হতে খারাপ লাগে! কথাটা শুনে মোটেই উৎফুল্ল হলাম না।

সেখানে আর একজন শান্তিজলা বাঙালী দলের হয়ে দারুণ একটা কাজ করে চলেছেন। লাইব্রেরিয়ান তপন বন্দ্যো-পাধ্যায় সঙ্ঘের লাইব্রেরীতে হেন বাঙালী লেখক নেই যাঁর বই জমা করেননি। বই কী করে বাছাই করেন প্রশ্নের উত্তরে বললেন ওই 'দেশ' পত্রিকার পাতায় পাতায় বিজ্ঞাপন দেখে। 'ওটা তো আমাদের ক্যাটালগ'। পেশায় তপনবাবু বাঙালী কার্গো-সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠান 'মিত্র এস কে প্রাঃ লিমিটেড'-এর স্থানীয় ম্যানেজার।

সপ্তমী পুজোর দিন থেকে নবমী পর্যন্ত ভাইজাগের কোনো বাঙালী বাড়ির হেঁসেলেই আগুন জ্বলে না। 'বাঙালী দুর্গাবাটী সমিতি'-র উদ্যোগে সবাই পুজো-মণ্ডপে খিচুড়ি বেগুন ভাজা আর মিষ্টান্ন ভোগ দুবেলা খান। দুলালবাবু গোপাল-বাবুর মতো পুরনো ব্যবসায়ীরা এক একজন এক একদিনের ভোগের পুরো খরচটাই প্রায় যোগান। নাটকাভিনয়: ভ্যারাইটি পারফর্মেন্স হয়, আর এবারে পুজোর আগেই মহালয়ার দিন হবে কলকাতা থেকে বিখ্যাত প্রযোজক শ্রীঅসিত চৌধুরী মহাশয়ের পাঠানো বাংলা ছবির শো। ছবিটা অসিতবাবু প্রবাসী বাঙালীর বুভুক্ষু মনে উৎসাহ দেবার জন্যে কোনো ভাড়া চার্জ না করেই পাঠিয়েছেন। শুনলাম শ্রীনেপাল দত্ত মশায়ও নাকি তাঁর 'ছুটি' বা

** বিশাখাপত্তনের 'ডলফিন্স্ নোজ' পাহাড়ের নীচে সমুদ্রের খাঁড়ির গা ঘেঁষে ক্যালটেক্স কোম্পানীর প্রকল্প। পেট্রল শোধন ইত্যাদি তো হয়ই, উপরন্তু কিছুকাল আগে পৃথকভাবে প্রকাণ্ড সার তৈরীর কারখানাও ক্যালটেক্স খুলেছেন। কর্মী সংখ্যা অনেক, তাই সেখানে এক উপনগর গড়ে উঠেছে। তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্যে আলাদা স্কুলও আছে, যদিও পুরনো ভাইজাগে অনেকগুলি ভালো ভালো স্কুল আগে থেকেই ছিল। অন্ধ্র ইউনিভার্সিটি ওয়ালটেয়ারের সমুদ্রতীরে অবস্থিত। আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন অতীতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন।

'হাটেবাজারের' একটা কপি শিগগীরই ওইভাবেই পাঠাচ্ছেন।

এবারের লেখাটার—আমায় মাপ করবেন আপনারা—চায়নীজ চাও-চাও-এর মতো চেহারা হচ্ছে। ডায়েরী, জীবনচরিত আর বাণিজ্য বৃত্তান্তের চচ্চড়ি হয়ে যাচ্ছে। রায় অ্যান্ড চ্যাটার্জির বিষয়ে আবার একটু বলে নিই।

সালটা ১৯৩৫। চব্বিশ ঘণ্টার নোটিসে সুরেনবাবুকে এক জরুরী কাজের তাগিদে কলকাতা ছেড়ে ভাইজাগে চলে যেতে হলো। দিনটাও ছিল এক যাত্রা-নাস্তির তিথি। ভনুবাবু আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবকে বলে এলেন যে, এই তিথিতে যাত্রা মানে অগস্ত্য যাত্রা, দেশে ফেরার পথ আর থাকবে না। হলোও তাই; সেই যে বঙ্গভূমি ছেড়ে চোল-চালুক্যদের দেশে পৌঁছলেন, তখন থেকে ভনুবাবু সেখানকারই বাসিন্দা হয়ে গেলেন। কালে ভদ্রে দেশে আসা ঘটতো।

ভনুবাবুর বাবা পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মশায়ের কথা আপনাদের নতুন করে বলার কী আর আছে। অন্যের কথা জানি না, আমি তো এখনো জঞ্জালনগরী কলকাতার রাস্তায় বেরিয়ে আলিবাবার দাসী মর্জিনার সেই 'ওপনিং সং'টা আজও গাই গুন গুন করে, "ছিঃ ছিঃ, এত্তা জঞ্জাল!" আর আজকের বস্তাপচা বদরসিকতা পড়ে-শুনে বারবার ভাবি যে, মনের সেই 'হিউমার' নিয়ে আজ যদি ক্ষীরোদপ্রসাদের মতো রসিকশ্রেষ্ঠরা আমাদের নতুন কিছু দেবার জন্যে বেঁচে থাকতেন তো আমরা হয়তো দিনরাত 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' জিগির না তুলে মর্জিনার সেই গান গেয়ে গেয়ে ঘরঝাঁট দেবার মতো তাঁর নতুন কোনো নাচানো সুরের গানের তালে তালে হাতুড়ি আর কাস্তে চালিয়ে কাজ করতে পারতাম। আর গলা ফাটিয়ে তিনবার 'চিচিং ফাঁক' বলে আমাদের ব্যর্থপ্রায় তিনটি ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানকে সার্থক করে তুলতে পারতাম। আমাদের মনে এখন 'হিউমার' নেই, খালি আছে রাগ।

ক্ষীরোদপ্রসাদের আর এক পৌত্র (দুলাল-বাবুদের খুড়তুতো ভাই) কলকাতা করপোরেশনের বর্তমান কাউন্সিলার শ্রীপরেশ ব্যানার্জি মশায়ের কাছ থেকে কয়েকটি অদ্ভুত তথ্য জানতে পারলাম।

নন্দনতত্ত্বের রাজা ক্ষীরোদপ্রসাদ এক-দিকে সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যের জন্যে নবদ্বীপ পণ্ডিত সভার প্রদত্ত 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধি পেয়েছিলেন; আবার কেমিস্ট্রিতে ছিলেন এম এ (তাঁর সময়ে কলকাতায় এম এস সি ডিগ্রি চালু হয়নি)। জেনারেল অ্যাসেম্বলি (বর্তমান স্কটিশ চার্চ) কলেজে কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু খাঁটি রস, কাব্য-রস তাঁকে রসায়ন থেকে টেনে আনলো সাহিত্যে, বিশেষ করে নাট্য রচনায়। ছাত্রাবস্থায় ১৮৮৫ সালে দুই খণ্ডে 'রাজনৈতিক সন্ন্যাসী' থেকে শুরু করে মৃত্যুর বছরখানেক আগে ১৯২৬-এ জীবনের শেষ রচনা 'নরনারায়ণ' পর্যন্ত একচল্লিশ বছরে সাতান্নোটি নাটক উপন্যাস ও প্রবন্ধমালা রচনা করে গিয়েছিলেন। সবই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', 'নন্দকুমার' এবং 'দাদা ও দিদি' পুলিস বাজেয়াপ্ত করেছিল। 'দাদা ও দিদি' প্রহসনটার যত কপি পুলিস হাতে পেয়েছিল, অত্যন্ত রাজদ্রোহী সাহিত্য বলে তার সব কপিই পুড়িয়ে দিয়েছিল। বইটা ১৯০৮-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

কিন্তু বিষয়বুদ্ধিতে ক্ষীরোদপ্রসাদ ছিলেন ইনফ্যান্ট ক্লাসের ছাত্র। বাগবাজারে পৈতৃক বাড়ি, খড়দায় কিছু জমিজমা, বাঁকুড়াতেও কিছু, এইসব নিয়ে বিষয় আশয় মন্দ ছিল না। থাকলে কি হবে, তিনি সে সবের দেখাশোনা করতে পারতেন না। থিয়েটারের নাটক আর বই লিখেও যা রোজগার করতেন তাও ছিল অপ্রতুল। তাই তাঁর বড়ো ছেলে সুরেন্দ্রনাথ বা ভনুবাবুরে খুব অল্পবয়সেই লেখাপড়া ছেড়ে জীবিকার অন্বেষণে বেরোতে হলো। ইতিমধ্যে ভনুবাবুর শুভবিবাহ কার্যটিও সম্পন্ন হয়ে গেছে, যেমন হতো সেকালের কম বয়সের ছেলেদের।

ভনুবাবু প্রথমে এক আত্মীয়ের সুপারিশে কেরানীর কাজ পেলেন স্ট্যান্ডার্ড লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে। কিন্তু স্বাধীন ব্যবসা করার আগ্রহে সে চাকরি তিনি ছেড়ে দিলেন।

স্বাধীন ব্যবসাতে যাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন এরকম বহু বাঙালী ও অবাঙালীর জীবনের ইতিহাস ঘেঁটে দেখলে জানা যায় যে, হালে পানি পাওয়ার আগে অনেকেই উঞ্ছবৃত্তির ওপর নির্ভর করে নানা কাজে হাত লাগিয়ে কাল কাটিয়েছেন—কেউ বেশি আর কেউ কম। স্ট্যান্ডার্ড ইনসিওরেন্সের চাকরি ছাড়ার পর থেকে বিশাখাপত্তনে এসে স্টিভেডোরিং ব্যবসাতে ভনুবাবুর স্থিতি-লাভ করার মধ্যে সময়ের ব্যবধানটি ছিল দীর্ঘ। তিনি জন্মেছিলেন ১৮৮৫ সালে আর ভাইজাগে গেলেন ১৯৩৫-এ, পঞ্চাশ বছর বয়সে।

ইংরেজী শব্দ stevedore-এর ব্যুৎপত্তি স্প্যানিশ estivador শব্দ থেকে। ইতিহাস পড়ে যতটা জেনেছি, ১৭৮৮ খৃস্টাব্দে নিয়মিতভাবে এই স্টিভেডোরিং ব্যবসাটির প্রবর্তন হয়েছিল ইংল্যান্ডে। স্টিভেডোর-দের কাজ হলো মালবাহী জাহাজ থেকে আমদানি করা পণ্য খালাস করা আর জাহাজে চালানীর পণ্য বোঝাই করা। এ কাজে বিশেষজ্ঞ হওয়া চাই, কিছু ট্রাক-ট্রেলার

যন্ত্রপাতি ইত্যাদি থাকা চাই এবং লোকবল ও ধনবল আবশ্যিক। বন্দর অধিকর্তার অনুমতিপত্র অর্থাৎ লাইসেন্স না পেলে কাজ করা বারণ, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো হলো বিভিন্ন স্টীমার কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা চাই। প্রত্যেক স্টিভেডোর কোনো না কোনো 'স্টীমশিপ লাইন'-এর নিযুক্ত প্রতিষ্ঠান। এই 'লাইন'-রা ভালো করে যাচাই না করে স্টিভেডোর নিয়োগ করেন না। বহু যুগের প্রথা অনুসারে কোনো দেশেরই চালানী বা আমদানির কাজ একেবারেই চলে না স্টিভেডোর ছাড়া। অবশ্য কমিউনিস্ট দেশেরা এ বিষয়ে কোন পদ্ধতিতে কাজ করেন তা ঠিক জানি না।

স্টিভেডোরের দারুণ ঝুঁকির কাজ। দশ বিশ হাজার টন মাল নিয়ে বন্দরে জাহাজ ঢুকছে—সঙ্গে সঙ্গে স্টিভেডোরকে কোমর বেঁধে তৈরী হতে হবে। দশ হাজার টন মানে প্রায় তিন লক্ষ মণ মাল সেই জাহাজ থেকে দু এক দিনের মধ্যে নামিয়ে গন্তব্য স্থানে পাঠাতে হবে, বিশেষ করে বন্দরের লাগোয়া রেললাইনে মালগাড়িতে বোঝাই করে। লরিতেও কিছু কিছু পাঠানো হয়। সেই সময়টুকুর মধ্যে আবার আছে cargo-surveying বা পণ্যসমীক্ষা—যে মাল এলো বা যাচ্ছে তার মান ও ওজন ঠিক আছে কিনা সেটা করার জন্যে। সে দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে গ্রাহক খরিদ্দারের নিযুক্ত 'কার্গো-সার্ভেয়ারের' ওপরে (১৩-৭-৬৮-র ৩৭ সংখ্যক 'দেশ'-এর বাঙালী 'এস্‌ক্যাপস' প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। তাঁদের সঙ্গে স্টিভেডোর-এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা একান্ত প্রয়োজন। আর দরকার বন্দর কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা। ধীরে সুস্থে মাল খালাস করলে চলবে না, কারণ বন্দরে berthing অর্থাৎ জাহাজ ভিড়িয়ে রাখার সময় সীমাবদ্ধ। নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজ বার্থিং-এর জন্যে মোটা ভাড়া তো লাগেই, কোনো কারণে দেরী হয়ে গেলে আরও মোটা জরিমানা দিতে হয়। আর সেই জরিমানার চোট এসে পড়ে স্টিভেডোরের ওপর। মাল বোঝাইয়ের ব্যাপারেও একই কথা। অবশ্য এই উৎকণ্ঠা, পরিশ্রম আর ঝুঁকির পারিশ্রমিকও প্রচুর।

এই ব্যবসার আনুষঙ্গিক আরও একটি কারবার সাধারণত স্টিভেডোররাই করে থাকেন। সেটা হলো ship chandler-এর কাজ। শিপ-শ্যান্ডলাররা নাবিকদের রসদ, মালমশলা, দড়িদড়া, শিকলি প্রভৃতি ছোট বড়ো যা কিছু জিনিস সাগরপাড়ি দিতে গেলে জাহাজদের লাগে, সবই সরবরাহ করেন। তাতে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ কিছুই বাদ পড়ে না। এতেও মোটা লাভ।

রায় অ্যান্ড চ্যাটার্জি'র বাণিজ্য সূচীতে স্টিভেডোরিং ও শিপ-শ্যান্ডলিং ছাড়া আরও যা যা আছে তার কথা পরে বলছি।

স্টিভেডোরিং-এর ব্যাকরণে কিছুটা জ্ঞান দিলাম, এবারে কাহিনীতে ফিরে যাবার আগে ভারতবর্ষের বন্দর, নৌবাণিজ্য এবং জাহাজ তৈরীর শোচনীয় ইতিহাসটাও আপনাদের ছোট করে বলে নিই।

বিশাল ভারতে এখন মাত্র আটটা প্রধান বন্দর আছে। পূর্ব উপকূলে চারটে—কলকাতা, পরদীপ, বিশাখাপত্তন ও মাদ্রাজ, এবং পশ্চিমে চারটে—কান্দলা, বোম্বাই, মর্মাগাঁও এবং কোচিন। এই আটটির মধ্যে বোম্বাই বৃহত্তম, কলকাতা দ্বিতীয় হয়েও তার প্রায় অর্ধেক, এবং পরদীপ কনিষ্ঠতম। এই কনিষ্ঠতমটির কোথায় তাজা তারুণ্যের উজ্জ্বলতা হবে, না উল্টে সেটি হয়েছে এক রুগ্ন শিশু। সম্প্রতি দৈনিক কাগজে এর দুর্দশার কথা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। আটটি বন্দরে ১৯৬৬-৬৭ সালে আমদানি ও রপ্তানির মালের মোট ওজন ছিল ৫ কোটি ৩৬ লক্ষ টন, যার মধ্যে বিশাখাপত্তন আমদানিতে ২৩ লক্ষ আর চালানীতে ৩৮ লক্ষ টন মাল দেয়ানেয়া করে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিল। ওই এক বছরে মোট ৮৯০৪টে জাহাজ এই ৮টা বন্দরে যাতায়াত করেছিল।

ভারতে এ ছাড়াও পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে কোকোনদা (বর্তমান কাকিনাদা), পণ্ডিচেরী, কানানোর প্রভৃতি কতকগুলি ছোট ছোট বন্দর আছে যেখানে জাহাজ তীরে না ভিড়ে কিছুদূরে নোঙর ফেলে বোট-লোডিং অর্থাৎ গাদাবোট, ল্যাণ্ডিং ক্রাফট ইত্যাদির সাহায্যে মাল ওঠানো নামানো করে।

বিশাখাপত্তনের বিশেষত্ব হলো বন্দরের সংলগ্ন সরকারী প্রকল্প হিন্দুস্থান শিপ-ইয়ার্ড লিমিটেড—আদার ব্যাপারী ভারত সরকারের জাহাজ তৈরীর প্রয়াস। শুনেছি সেখানকার কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীরা কাজের লোক, কিন্তু তাঁদের কর্মক্ষমতা স্তম্ভিত-প্রায় হয়ে রয়েছে ফরেন এক্সচেঞ্জের অভাবে। স্বাধীনতার উষাকাল ১৯৪৭ সালে আমাদের মাননীয় সরকার বাহাদুর এক কমিটি বসিয়েছিলেন। চেয়ারম্যান স্যার রামস্বামী মুদালিয়ারের নামে তার নাম রাখা হয়েছিল 'মুদালিয়ার কমিটি'। তাঁর সুপারিশে সরকারী নীতি নির্ধারিত হয়েছিল যে, পাঁচ বছর অর্থাৎ ১৯৫২ সালের মধ্যে দেশের নৌবাণিজ্যের শতকরা ৫০ ভাগ পণ্য বহন করবে ভারতের বাণিজ্যিক নৌবহর। তখন প্রয়োজনীয় স্পেশাল স্টীল ও সাজ সরঞ্জাম বিদেশ থেকে আমদানি করার মতো যথেষ্ট বৈদেশিক ব্যাংক ব্যালেন্সও ছিল। সুতরাং উদ্যম ও সাধুতা থাকলে সেই নীতির রূপায়ণ মোটেই অসম্ভব ছিল না। কিন্তু এক্ষেত্রেও পর্বত মুষিক প্রসব করলেন। আমাদের বিশাল বিশাল ইস্পাত প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও আজ স্বাধীনতার একুশ বছর পরে হিন্দুস্থান শিপ-ইয়ার্ড স্টীল শীটের প্রায় সবটাই এবং সাজসরঞ্জামের অনেকটা আমদানি করতে হচ্ছে; একটা জাহাজ তৈরী করতে যা লাগে তার শতকরা ৬০।৬২ ভাগই ইমপোর্ট করতে হচ্ছে। একুশ বছরে ভারতীয় জাহাজের মাল বহন ক্ষমতা এসে দাঁড়িয়েছে ১৫ পারসেন্টে, অর্থাৎ উল্লিখিত ৫২ কোটি টন মালের মধ্যে ১৯৬৬-৬৭ সালে ভারতীয় জাহাজ বহন করেছে আন্দাজ ৮০ লক্ষ টন। কী পারফরম্যান্স!

কিন্তু বিশেষ করে আকরিক ধাতু রপ্তানির ব্যাপারে মালগাড়ি চলাচলের দিকটায় ওয়ালটেয়ারের রেলপথের উল্লেখ্য উন্নতির মাধ্যমে ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ড এবং দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে অভাবনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বছর আট দশ আগে যেখানে ওয়ালটেয়ার স্টেশন দিনে ২০০।২৫০ ওয়াগন সামাল দিতে পারতো আজ সেখানে পারে ৭০০ আন্দাজ। এইসব ওয়াগন টানাটানির জন্যে আবার স্টীমের বদলে ডীজেল এঞ্জিনেরই বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে। এই বিশাল ক্রমবর্ধমান ট্র্যাফিকের চাপ সইবার জন্যে নানা কায়দায় নতুন নতুন লাইন পাতা, সরঞ্জাম বাড়ানো, পুরনো স্টেশন ভেঙে সুন্দর করে গড়া—স্বীকার করতেই হয়, রেল-বোর্ডের এটা দারুণ পারফরম্যান্স।

ইস্টার্ন রেলের ব্যাপারিক (কমার্শিয়াল) বিভাগের এক উচ্চপদস্থ বাঙালী অফিসার শ্রীকল্যাণকুমার দাস (ইনি আবার সরকারী কর্মচারী হয়েও অপূর্ব কর্মকুশলতায় 'দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ' সদৃশ) মহাশয়ের

সংগে কিছুদিন আগে আলোচনা করেছিলাম। গতবারের রেল-বাজেটে বিরাট ঘাটতির প্রসংগে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী রেলওয়ের আয়োজন ও সম্প্রসারণ শত শত কোটি টাকা খরচ করে সূচী মাফিকই করা হয়েছিল কিন্তু মন্দার চোটে বছর দুই যথেষ্ট মাল রেলপথে চলাচল করলো না—যত লোহা, যত কয়লা আর সিমেন্ট ইত্যাদি যতটা রেলে আনাগোনার কথা ছিল তার ভগ্নাংশ মাত্র বহন করার ফলে মাশুলের খাতে প্রচণ্ড মার খেলো ভারতীয় রেলপথ। মানে, দু হাজার যাত্রী-বাহী লাক্সারি-লাইনার 'কুইন এলিজাবেথ' (জাহাজ) যেন দুশ' যাত্রী নিয়ে সাগর পাড়ি দিল।

কিন্তু এ বছরে পরিস্থিতি অন্যরকম। চালানীর কাজ অনেক বেড়েছে; আর বোধ হয় ঘাটতি হবে না।

এভাবে কাজ না করলে, মন্দালিয়ার কমিটি দর্শিত পথে চললে আজ বিশাখাপত্তনে বছরে আড়াইটে ১২৫০০ টনি জাহাজের জায়গায় ৮।১০টা করে জাহাজ তৈরী করা দুঃসাধ্য হতো না, অন্যান্য শিপ-ইয়ার্ড এবং

আমাদের কলকাতার গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপ'-এও (এখন এটাও সরকারী সম্পত্তি) সমুদ্রগামী অনেক ছোট ও বড়ো জাহাজ তৈরী হতে পারতো। আর তাহলে এখন যেটা বিদেশী জাহাজ কোম্পানীকে আমরা দিই সেই বাৎসরিক ২০০ কোটি টাকার ফরেন এক্সচেঞ্জ বাঁচানো যেতো।

শুধু বিশাখাপত্তনের কথাই ধরি। কী না হতে পারতো পাহাড় ঘেরা নৈসর্গিক শোভায় সমৃদ্ধ এই বন্দরের শিপ-ইয়ার্ডে আর তার অনতিদূরে অবস্থিত পরিত্যক্ত-প্রায় বিমলিপত্তনম্ বন্দরে!

স্থানমাহাত্ম্য বলে যদি কিছু থাকে তা বিশাখাপত্তনের পবিত্র বেলাভূমিতে আরব্ধ কোনো শুভ কাজে সফল হওয়া উচিত ছিল বই কি! পুরাকালে অন্ধ্রদেশের এক ধর্ম-প্রবণ রাজা বারাণসীতে তীর্থযাত্রার সময়ে এই স্থানের সৌন্দর্য ও পবিত্রতায় মুগ্ধ হয়ে * * বিশাখদেবের এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। বহুকাল আগে সমুদ্র এগিয়ে এসে মন্দিরকে গ্রাস করে নেওয়া সত্ত্বেও নাকি বিশাখাপত্তনের পবিত্রতা আগের মতোই আছে।

কেবল প্রাকৃতিক শোভাই বিশাখাপত্তন, তথা অন্ধ্রের বৈশিষ্ট্য নয়—অন্ধ্রের নরনারীর অঙ্গসৌষ্ঠবও মনোহর। বিশেষ করে কামিনীকুল—কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশার মতো কৃষ্ণকুন্তলা মেয়েরা—না থাক তাদের মুখে শ্রাবস্তির কারুকার্য, তুঙ্গভদ্রা-গোদাবরীতটের পীনবক্ষ ক্ষীণকটি ঘন-নিতম্ববতী সুদেহী কন্যাদের বিশাখা-পত্তনের উচ্চাবচ সরণিতে স্বভাবসুন্দর চরণক্ষেপ এ স্থানকে করে তুলেছে পরম-রমণীয়।

জার্মান Hansa লাইনের এজেন্ট, পরবর্তীকালে ইণ্ডিয়া স্টীমশিপ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা, খোদ লায়োনেল এডওয়ার্ডস সাহেব বললেন, "ভনু, আই ওয়াণ্ট ইউ টু প্রোসীড টু ভাইজাগ বাই দি নেক্সট অ্যাভেলেবল ট্রেন। ওখানে আমাদের লাইনের একটা মাল-জাহাজ ভিড়বে পরশু-তরশুর মধ্যেই। সেটা আনলোড করার দায়িত্ব 'রয় অ্যান্ড চ্যাটার্জির' অ্যাকাউন্টে তোমাকেই দিলাম।"

স্ট্যান্ডার্ড লাইফের চাকরি ছাড়ার পর ভনুবাবু নানা কাজের মধ্যে 'ইউনিভার্সাল লাইব্রেরী' নামে একটা বইয়ের দোকানও দিয়েছিলেন কলেজ স্ট্রীটের বই পাড়ায়। কিন্তু তাতে সুবিধে হলো না। তখন তাঁকে অন্য জীবিকার সন্ধানে বেরোতে হলো।

লায়োনেল এডওয়ার্ডস কোম্পানীর আংশিক কাজ দুটি স্টিভেডোর প্রতিষ্ঠান নির্বাহ করতেন—হুগলি-ভান্ডারহাটির ধনী রায়চৌধুরী পরিবারের স্বর্গীয় অতুলচন্দ্র রায়চৌধুরীর এ সি রায় অ্যান্ড কোং এবং শরৎ চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোং। লায়োনেল সাহেবের নির্দেশে এঁদের একটি যুক্ত প্রতিষ্ঠান গঠিত হলো রায় অ্যান্ড চ্যাটার্জি নাম দিয়ে। এ সি রায় অ্যান্ড কোং এবং শরৎ চ্যাটার্জি কোম্পানী অবশ্য তা সত্ত্বেও তাঁদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে এসেছেন এবং তাঁরা এখনও ভারতের নানা বন্দরে বড়ো ব্যবসা করছেন। কিন্তু লায়োনেল এডওয়ার্ডস-এর ক্ষেত্রে 'রায় অ্যান্ড চ্যাটার্জি'ই' একমাত্র স্টিভেডোর হলেন।

ত্রিশ দশকের গোড়ায় ভনুবাবু রায় অ্যান্ড চ্যাটার্জির কর্মচারী হিসেবে যোগ দিলেন এবং কর্মপটুতার জন্য কিছুদিনের মধ্যেই ব্যক্তিগতভাবে লায়োনেল সাহেবের নজরে পড়লেন।

লায়োনেল সাহেব প্রায় একবস্ত্রে ভনু-বাবুকে ভাইজাগ রওনা করিয়ে দিলেন। ভালোই হলো। ভনুবাবুর কাছে তখন জনাকীর্ণ কলকাতা শহর মরুভূমির মতো হয়ে গিয়েছিল। দুই ছেলে আর চার মেয়ে রেখে ভনুবাবুর স্ত্রী ক'দিন আগেই চোখ বুজেছিলেন। বুড়ি মা আর ছোট দুই ভাই যতিনাথ ও ডাক্তার সতীনাথের (পরেশবাবুর বাবা) কাছে পাঁচ বছর বয়সী দুলাল আর তার দাদাদিদিদের রেখে ভনুবাবু যেন দৌড়ে ভাইজাগ পালিয়ে গেলেন।

তাঁর সঙ্গে এক সহকর্মীও গিয়েছিলেন। তাঁরা পৌঁছে দেখেন জাহাজটা বন্দরে ঢুকছে। আজকের ছিমছাম বিশাখা-পত্তনমের মতো তখন ভাইজাগ বন্দরে কোনো সুবন্দোবস্ত ছিল না—না ছিল যথেষ্ট 'ক্রেন, না-এটা না-সেটা, আর দক্ষ মজুরের অভাব তো ছিলই। ভনুবাবুরা এক বুদ্ধির কাজ করেছিলেন ওস্তাদ কুলি-সর্দার সাত্তিয়া নামে এক যুবককে কাজে বহাল করে। সাত্তিয়া চটপট লোকজনের ব্যবস্থা করে ফেললো।

কিন্তু তখন ভাইজাগে এক ধূর্ত ফিরিঙ্গী স্টিভেডোর স্টিভেডোরগোষ্ঠীর প্রায় একচ্ছত্র আধিপতি ছিলেন। ভনুবাবু-দের ভাইজাগে এসে কাজ শুরু করার খবর পেয়ে তিনি মহা ক্ষাপ্পা। তাঁর মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে এসেছে এরা! তিনি জবর জবর চাল চালতে লাগলেন। একটা পুরো দিন সাত্তিয়ার লোকদের মদ খাইয়ে বুঁদ করে ফেলে রাখলেন নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে। এমন কি, ভনুবাবুদের প্রাণের ভয় দেখালেন। কিন্তু কিছুতেই ভনুবাবুকে টলাতে পারলেন না। জাহাজের মাল খালাস হলো। সে দিনগুলি ভনু-বাবুদের কাছে ছিল বিভীষিকার মতো—স্নান নেই, খাওয়া নেই, উপরন্তু কেবল মারের ভয় নয়, একেবারে মৃত্যুভয়।

সেই হলো ভনুবাবু অর্থাৎ সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের সার্থক জীবনের সূচনা।

১৯৪৮ পর্যন্ত অতুল্য রায় ও চ্যাটার্জিরা এক সঙ্গে কাজ করার পর তাঁদের পার্টনারশিপে ছেদ পড়লো। চট্টো-পাধ্যায়রা আলাদা হয়ে যেতে চাইলেন। তখন অতুল্য রায় মশায় এবং তাঁর বড়ো ছেলে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ (রায়) চৌধুরী চ্যাটার্জিদের অংশটি তো কিনে নিলেনই, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করলেন। অধিকন্তু তাঁরা ভাইজাগের ম্যানেজার ভনুবাবুর বিশ্বস্ততার পুরস্কার দিলেন কোম্পানীর কিছু শেয়ার দিয়ে।

অতুল্যবাবুর মৃত্যুর পর অমরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর দুই ভাই শ্রী বি এন এবং শ্রী এফ এন চৌধুরীই এখন রায় অ্যান্ড চ্যাটার্জির

* * একদা ইন্দ্র ও স্কন্দের মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ হয়। তখন ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে স্কন্দের দক্ষিণ অঙ্গ থেকে এক সুন্দর যুবকের আবির্ভাব হয়। কার্তিক ঠাকুরের বাই-প্রোডাক্ট এই দেবতাটির নাম রাখা হয় বিশাখ। তাহলে এই স্থানের নাম হওয়া উচিত ছিল আকার বর্জিত বিশাখপত্তন! বোধ হয় 'আকার' প্রিয় অন্ধ্রবাসীরা বিশাখ-কে 'বিশাখা' রূপ দিয়েছেন, উত্তর ভারতে যেমন দিল্লীওয়ালারা অশোক হোটেলকে অশোকা হোটেল বলেন।

বড়ো শরিক। দুলালবাবুরা ছোট তরফ।

আটচল্লিশ সালে রায় অ্যান্ড চ্যাটার্জির কাজে ভাটা পড়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে চ্যাটার্জি'রা আলাদা হয়ে যাবার পরে। ভনুবাবু অক্লান্ত পরিশ্রমে তাতে নতুন করে যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। বাণিজ্যের পরিবেশও বেশ অনুকূল হয়ে উঠছিল। বিশাখাপত্তন বন্দরের উন্নতি হচ্ছিল আর ভারত সরকার তখন রকমারি প্রকল্পের জন্যে লাখ লাখ টন মাল আনাচ্ছিলেন। সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর প্রাণপুরুষ স্বর্গীয় বালচাঁদ হীরাচাঁদ প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লিমিটেড'-ও ভারত সরকার কিনে নিলেন. আর ভারতীয় নৌবহরের বড়ো ঘাঁটিও বিশাখাপত্তনেই স্থাপিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে ভনুবাবুর দক্ষ পরিচালনায় রায় অ্যান্ড চ্যাটার্জিরও শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগলো।

বড়ো ছেলে কমলবাবু কলকাতায় স্কুল কলেজে পড়ে বি এস্‌সি পাস করার পর যাদবপুর থেকে মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং পাস করলেন। বাবাকে তিনি আগেই বলে রেখেছিলেন যে, তিনি এঞ্জিনীয়ারের পেশাই নেবেন, ব্যবসাতে ঢুকবেন না। তিনি

বিলেতের শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার অব এঞ্জিনীয়ারিং পাস করে দেশে ফিরে হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ডে জাহাজ তৈরীর কাজে লাগলেন। তা ছাড়া তিনি লন্ডন 'ইনস্টিটিউট অব মেরিন এঞ্জিনীয়ারিং'-এর মেম্বার এবং তার ভাইজাগ শাখার সেক্রেটারি।

ওদিকে দুলালবাবু কলকাতা থেকে বি-কম পাস করে ভাইজাগে এসে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পাস করলেন। কমলবাবু তখন বিলেতে পড়তে যাবার তোড়জোড় করছেন। ভদ্রবাবু ঠিক করলেন কমলকে তো নিশ্চয়ই দুলালকেও বিয়ে দিয়ে দেবেন। বিয়ের পরে কমল বিলেত চলে গেলেন।

দুলালজায়া মীনা আমাকে বললেন, "বিয়ের পরে দেখি আমার কর্তা বাবার সঙ্গে অফিসে বেরোন না। জিগ্যেস করলে বলেন, কলকাতা ছেড়ে এই নিজঝুম টাউনে কে থাকবে!" আঠারো বছর বয়স হলে কী হবে, দারুণ বুদ্ধি ছোট বউয়ের। বড়ো জা মঞ্জু কলকাতায় বাপের বাড়িতে থেকে কলেজে পড়ছেন। তাঁকে দিয়ে বলালে ভালো হতো, তা তিনি যখন নেই তখন লজ্জার মাথা খেয়ে মীনা নিজেই শ্বশুরকে গিয়ে বললেন, "বাবা, আপনার ছেলে কেবল বলেন আপনার ব্যবসায় ঢুকবেন না, কলকাতায় গিয়ে প্র্যাকটিস করবেন, কী হবে বলুন তো?"

শ্বশুরে পুত্রবধূতে কী যেন একটা চক্রান্ত হলো। ফলে দুলালবাবুর বাণিজ্যবিমুখ মন হঠাৎ যেন বদলে গেল। বুদ্ধিমান ছেলে কিছুদিনের মধ্যেই স্টিভেডোরিং শিপ-হ্যান্ডলিং সব ব্যবসাই শিখে ফেললেন। ভদ্রবাবু ইহলোক ত্যাগ করলেন ১৯৫৮ সালে। রায় অ্যান্ড চ্যাটার্জির বড়ো শরিক রায়চৌধুরীরা থাকেন কলকাতায়। তাই ভাইজাগের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়লো সাতাশ বছরের ছেলে দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরে। রায়চৌধুরীদের আস্থার মর্যাদা দুলাল পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখলেন।

সাধে কি আমি আমার প্রবন্ধে শিল্প ও বাণিজ্যের রথী মহারথীদের উদ্যম ও মনোবলের উৎস খুঁজতে গিয়ে তাঁদের অন্দর মহলের সমাচারও যোগাড় করি! নেপথ্যে মীনার হস্তক্ষেপ আর প্রেরণা না থাকলে কি দুলাল এই দশ বছরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানকে এতটা এগিয়ে দিতে পারতেন?

রায় অ্যান্ড চ্যাটার্জির বর্তমান কার্যক্রমের যে বিবরণ পেলাম ও কিছুটা নিজের চোখে দেখলাম তার সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ করছি।

সরকারী সংস্থা M. M. T. C (মিনারেলস অ্যান্ড মেটালস ট্রেডিং করপোরেশন) এবং গম, চাল ইত্যাদি আমদানির ব্যাপারে খাদ্যমন্ত্রকের কাজ ধরে 'রায় অ্যান্ড চ্যাটার্জি' এখন (ইন্ডিয়া স্টীমশিপ কোম্পানী সহ) ১৫টি বড়ো বড়ো এক্সপোর্টার, ইম্পোর্টার ও জাহাজ কোম্পানীর স্টিভেডোর। রকমারি ধাতু, বিশেষ করে আকরিক লোহা ও ম্যাঙ্গানীজ রপ্তানিতে 'হ্যান্ডলিং এজেন্ট' হয়েছেন M. M.T. C এবং আরও ৪টি প্রতিষ্ঠানের। ধাতু ছাড়া অন্যান্য পণ্যের হ্যান্ডলিং এজেন্ট হয়েছেন ৭টি কোম্পানীর।

কিন্তু রায় অ্যান্ড চ্যাটার্জির সবচেয়ে বেশি মর্যাদা বেড়েছে বিদেশী ও দেশী স্টীমশিপ কোম্পানীর 'এজেন্ট' পদাভিষিক্ত হয়ে। এঁরা 'ইস্ট এশিয়াটিক', 'সুইডিশ ইস্ট এশিয়া' এবং 'উইলহেলমসন' লাইনের বুকিং এজেন্ট। সাব-এজেন্টও হয়েছেন 'ইউনাইটেড লাইনার এজেন্সিজ অব ইন্ডিয়া', 'ডি এস আর' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের।

কোকোনদার (অধুনা কাকিনাদার) অপেক্ষাকৃত ছোট বন্দরেও রায় অ্যান্ড চ্যাটার্জি অফিস খুলেছেন, আর বিমলিপত্তনমেও কাজ করেন। বছরে ৭০।৭৫টা জাহাজে মাল দেয়া-নেয়া করেন প্রায় ৫ লক্ষ টন।

দুলালবাবু আমাকে তাঁর পার্টির চালানী ম্যাঙ্গানীজ বোঝাই পর্ব দেখাতে একটি জাহাজে নিয়ে গেলেন। 'গ্রীক লাইন'-এর 'আরিসটাইডস' জাহাজের ক্যাপ্টেন কারাংসকাকে বিদেশীর তুলনায় এদেশের এবং এই বন্দরের স্টিভেডোরদের কর্মতৎপরতার কথা জিগ্যেস করলাম। তিনি তাঁর ভাঙা ইংরেজীতে বললেন, "মিঃ ব্যানার্জি ভেরী স্মার্ট; শিপ অলওয়েজ লোডেড ইন টাইম।" কারাংসকা উলটে আমাকে একটা প্রশ্ন করলেন। বেয়াড়া প্রশ্ন, "হোয়াই ইজ সো মাচ ডিফারেন্স ইন ইওর কান্ট্রি 'বিটুইন রিচ অ্যান্ড পুওর?' বিদেশীর কাছে নিজের দেশের কুৎসা গাইতে পারলাম না। মোরারজী ভাইয়ের মতো আমিও বললাম উন্নতিশীল দেশে এমনটি হয়েই থাকে; বছর দশেক পরে এলে দেখতে পাবেন আমরা সবাই রাজা। (মোরারজীভাই বেঁচে থাকলে তদ্দিনে আমরা একেবারে 'বাদশা-বেগম ঝম্‌ঝমাঝম্‌ বাজিয়ে চলেছি'।)

ভদ্রবাবুর একটি অতৃপ্ত বাসনা দুলালবাবু এতদিনে পূর্ণ করেছেন। সেটা হলো বিশাখাপত্তনে রায় অ্যান্ড চ্যাটার্জির একটি বাড়ি তৈরি করানো। শহরের কেন্দ্রে স্টেট ব্যাংকের অফিসের মুখোমুখি সুদৃশ্য তেতলা বাড়িটা দুলালবাবুর কীর্তিসৌধ। ভাইজাগের জনকল্যাণেও কমলবাবু ও দুলালবাবুর অবদানের কিছু কিছু নিদর্শন চোখে পড়লো। কিন্তু তার লিস্ট দিতে গেলে লেখাটা আরও লম্বা হয়ে যাবে।

মোট কথা, এঁরা হলেন বাঙালীর খেইহারা জীবনতরীর পক্ষে তিমির রাতে বাতিঘরের দীপ—'ডলফিনস্‌ নোজ' লাইটহাউসের চল্লিশ মাইল রেঞ্জের আলোর ঝলকের মতো।

বিশ্বকর্মা

বিশ্ব বিজ্ঞান

অভিনব যন্ত্রপাতির সংবাদ

বৃহত্তম জেনারেটার

লেনিনগ্রাদের 'ইলেকট্রোসিলা' কারখানার নাম আমাদের দেশে অজ্ঞাত নয়। বিশেষ করে যেসব কর্মী ও ইঞ্জিনীয়াররা সোভিয়েট সাহায্যে নির্মিত বা নির্মীয়মান প্রকল্পগুলির সঙ্গে জড়িত তাদের কাছে এই নামটি সুপরিচিত। ভাকরা প্রকল্পের দক্ষিণ পারের হাইড্রোজেনারেটর এই ইলেকট্রোসিলা কারখানায় নির্মিত।

বর্তমানে ইলেকট্রোসিলা কারখানা পৃথিবীর বৃহত্তম হাইড্রোজেনারেটার নির্মাণ করছে। ১৯৬৪ সালে যেটি নির্মিত হয় ইয়েনেসি নদীর উপর ক্রাসনোইয়াস্ক জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য সেটির শক্তি ৫ লক্ষ কিলোয়াট যা হাইড্রোজেনারেটার নির্মাণের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব। তার আগে ব্রাৎস্ক জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য যে হাইড্রোজেনারেটার নির্মিত হয়েছিল, নতুনটি ওজনে তার সমান এবং উৎপাদন শক্তিতে দ্বিগুণ। মার্কিন স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ উডাল সেটি দেখে মন্তব্য করেন যে, এত শক্তিশালী জেনারেটার তাঁর দেশে এখনো তৈরি হয়নি।

মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর দৃশ্য

আমেরিকার লুনার আর্বিটার-৫ চাঁদের দিকে যাবার পথে ৩৪৩০০০ কিলোমিটার দূর থেকে পৃথিবীর এই ফটো তুলে পাঠিয়েছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ভূমণ্ডলের সূর্যালোকিত অংশের ৬ ভাগের ৫ ভাগ যার মধ্যে রয়েছে ভূমধ্যসাগর থেকে কেপ্ অফ গুড হোপ পর্যন্ত আফ্রিকার পূর্ব উপকূল (বাঁয়ে নিচের দিকে), ইউরোপ (বাঁয়ে উপর দিকে), সুয়েজ খাল ও আরব উপদ্বীপ (বাঁয়ে মাঝখানে) এবং ভারত (মাঝখানে)। স্পেনের ম্যাড্রিদ শহরের কাছে ট্র্যাকিং স্টেশনে এই ছবি এসে পৌঁছায়।

৩৪৩০০০ কিলোমিটার ওপর থেকে পৃথিবীর দৃশ্য

নতুন কাপড়ের

সোভিয়েটের অর্থনীতিক সাফল্য সম্পর্কে এক প্রদর্শনীতে একটি অভিনব কাপড়ের কল সাজানো রয়েছে। এই যন্ত্রটি একসঙ্গে ৪ রকমের যন্ত্রের কাজ করতে পারে। এটি একই সঙ্গে চরখার কাজ করে, সুতো পাকায় ও জড়ায় এবং অন্য একটি মেশিনের কাজ করে। তুলাজাত সুতো ও রাসায়নিক কৌশলে সংশ্লেষিত সুতো নিয়ে ঐ চারটি কাজ করে। হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে, যে ৪ রকমের যন্ত্রের কাজের দায়িত্ব এই নতুন যন্ত্রটি গ্রহণ করছে সেগুলির তুলনায় এটির উৎপাদিকা শক্তি হবে শতকরা ৬০

অদ্ভুত জায়গায় পাখির ডিম

ভাগ বেশি। বিদ্যুৎশক্তির সাশ্রয় হবে শতকরা ৫০ ভাগ এবং বছরে ৫০০০ রুবল খরচ বেঁচে যাবে।

মেশিনটির সোভিয়েট দেশ ছাড়াও আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ ও জাপানে পেটেন্ট নেওয়া হয়েছে।

ব্রনোয় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক যন্ত্র প্রদর্শনীতে মেশিনটি স্বর্ণপদক লাভ করে।

নতুন ধরনের ওয়েল্ডিং কৌশল

পশ্চিম জার্মানীর ক্রুপ প্রতিষ্ঠান এবং আর একটি রসায়ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এক নতুন ধরনের ধাতু ওয়েল্ড করার কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে। এই কৌশলের কল্যাণে আজকাল এমন সব ধাতু ওয়েল্ড করা যাচ্ছে যা আগে যেত না। সব ধাতু সমান তাপে গলে না। গলবার জন্য কোনটির বেশি তাপ লাগে কোনটির কম। উদাহরণ হিসাবে ইস্পাত ও টিটানিয়ামের নাম করা যেতে পারে। এই দুটি ধাতু আগে একসঙ্গে ওয়েল্ড করা যেত না। কিন্তু এই নতুন কৌশলে এই দুটি ধাতুকে একত্র সংলগ্ন করে ৫০ হাজার আবহ চাপ দিয়ে তারপর ঠান্ডা চাপ দিলেই দুটি একসঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে। এই কৌশলে নাকি পড়তা খরচাও কম লাগে এবং ওয়েল্ড-করা ফলকটি আগেকার দিনের চেয়ে মজবুত হয়।

পাখির ডিমে যন্ত্রের তাপ

পশ্চিম জার্মানীর কোন এক গৃহনির্মাণ স্থলে ছুটির দিনে একটি সিমেণ্ট মেশাবার কলের উপর লোকে দেখে খড়কুটোর মধ্যে ৬টি পাখির ডিম রাখা রয়েছে—খঞ্জন পাখির ডিম। পাখিটি ডিমগুলি রেখেছে ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারের উপরে। কিন্তু পাখিটির পক্ষে অসুবিধা হল এই যে, দিনের বেলা কলটিতে যখন সিমেণ্ট মেশানোর কাজ হয় তখন সে আর এসে ডিমে তা দিতে পারে না। একমাত্র রাত্রিতে বা সপ্তাহান্তে ছুটির দিনে সে ডিমে তা দেবার সুযোগ পায়। কিন্তু দেখা গেল তাতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না, কারণ দিনের বেলা কাজের সময় কলের ইঞ্জিন চালু থাকলেই ডিমগুলি ৪০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড (১০৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট) তাপ পায়। পক্ষীবিজ্ঞানীদের মতে ঐ মাত্রার উত্তাপ ডিম ফুটতে সাহায্যই করবে।

ক্ষুদ্রতম কম্পিউটার

আমেরিকায় নির্মিত এই গণনা যন্ত্র বা কম্পিউটারের মত অত ছোট ঐ জাতীয় যন্ত্র আর নেই। এটি তৈরি করেছে মিনিয়াপলিসের "কণ্ট্রোল ডেটা কর্পোরেশন।" যন্ত্রটির বিদ্যুৎকোষ ওর ভিতরেই বসানো আছে। এটি ১০ সংখ্যাবিশিষ্ট ৪০৯৬টি সাংখ্য শব্দ মনে রাখতে পারে। মহাশূন্যে বিজয়ে এবং সামরিক স্বার্থে এটি কাজে লাগতে পারে। কর্পোরেশনের মুখপাত্ররা মনে করেন যে ভবিষ্যতের গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার্য কম্পিউটারের এটি হচ্ছে মূল প্রতিরূপ।

ক্ষুদ্রতম কম্পিউটার

৫৬ হাজার লোকের জন্য লবণমুক্ত সমুদ্রের জল

ফ্লোরিডায় কী ওয়েস্টে নির্মিত সমুদ্র জল নির্লবণ করার কারখানায় লবণমুক্ত মিষ্টি জলে রূপান্তরিত হয়ে এই জল শহরের ৫৬ হাজার বাসিন্দার জলাভাব দূর করেছে। আগেকার দিনে দারুণ জলকষ্টের জন্য এই শহরে জলের রেশন চালু ছিল। আজ সেই রেশন ব্যবস্থা তুলে নেওয়া হয়েছে।

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

কুবেরের বিষয়আশয়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

পাঁচ

চুটিরামের জমি কিনতে গিয়ে শুধু হেনস্তাই হল। বুড়োর জমি বিক্রি খুবই দরকার। কিন্তু লোভ সামলাবার ক্ষমতা নেই। মোট দু'বিঘের মধ্যে প্রায় সবটাই ভাইপোদের। নিজের অংশে আঠারো শতক—দশ কাঠা চৌদ্দ ছটাক। সাড়ে তিনশো করে কাঠা ঠিক হল।

মাস মাস মাইনে থেকে যদি জমিয়ে আসত কিছু কিছু। কেউ যদি ধার দিত চার হাজার টাকা—কুবের তাকে কিস্তিতে কিস্তিতে শোধ করে দিত। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে খোঁজ নিয়ে জানল, সাত বছর চাকরি না হলে ওখানে হাত দেওয়ার জো নেই। কোথায় পাওয়া যায়। সামান্য হাজার চারেক টাকা হলে স্টেশনের ধারাধারি জায়গাটুকু আটকানো যেত। ক' কামরার বাড়ি হবে কুবের তা ভেবেও ঠিক করতে পারে না। তবে, বাড়ির সামনে খানিক ফাঁকা জায়গা থাকবে। সেখানে গরমের দিনে বিকেলে বেতের চেয়ার পেতে বসে বাসি খবরের কাগজ পড়া যাবে।

আত্মীয়ের ভেতর একজনকে টেলিফোনে বলল সব। মাসে মাসে একশো করে ফেরত দেবে কন্টেসুন্টে। সব শুনে তিনি ফোনেই বললেন, তার আগাগোড়া ওভার ড্রাফটে মোড়া। রাসেল স্ট্রীটের বাড়িখানা নাইন পারসেণ্ট লোনে তৈরি। দশ বছর হয়ে গেল আজও আসলের অর্ধেক শোধ হয়নি। এদিকে ডায়েবেটিস—কবে আছেন কবে নেই তার ঠিক কি!

অতএব ধনরাজ শরণং। ওয়েলফেয়ার অফিসার হলেও কোম্পানির নানা কাণ্ডে জড়ানো ধনরাজকে অনেক টাকা নাড়াচাড়া করতে হয়। একদিন সকালবেলা কুবের তার বাড়ি গিয়ে হাজির হল। ধনরাজ নতুন কেনা বাড়ির লনে চীনে ফুলের তোয়াজ করছিল ঝারি হাতে। কুবের বোগেনভেলিয়া না কী একটা জমকালো ফুলের নাম জানতো। জিনিসটা ফুল নাও হতে পারে। কোনদিন চোখে দেখেনি। তাই নিয়েই খানিক কথা চালালো। বেতের চেয়ারে বসতে বসতে ধনরাজ চীনের ভূগোল টেনে আনলো। কুবের

'কিছু সই করতে হবে না?'

গভর্নমেণ্ট স্কুলের স্টুডেণ্ট ছিল। বেতের ডগায় হোয়াং হো, ইয়াং সিকিয়াং করেছে পুরো ক্লাস এইট। চোখ বুজে চীনের প্রদেশগুলো, নদী এমনকি পাহাড়—শেষে ভাষা নিয়ে দৌড়োদৌড়ি আরম্ভ করে দিল।

ধনরাজ তখন চীনের দুর্ভিক্ষ নিয়ে পড়ল। কোন্ পোলিস সাহেব হিটটিটমেণ্ট ফার্নেসের রিফ্র্যাক্টরি কারখানা বসানোর ব্যাপারে দিল্লি থেকে এসেছিল ক'দিন আগে। তারই মুখে শোনা, চীনেরা এখন খাবারের অভাবে পুরনো ভারি ভারি ডিকসনারির মলাট জলে ভিজিয়ে সকাল বিকেল টিফিন সারে।

এই জায়গায় খানিক থেমে থেমে কুবের গড় গড় করে বলে গেল, 'জীবনের সাকসেসের মাঝখানে আপনি আজ দাঁড়িয়ে,' কথাগুলো প্রবন্ধ হয়ে যাচ্ছে দেখে মুখটা অনেকখানি ভাবালু করে বলল, 'খানিকটা জায়গা দেখেছি—বাড়ি করে উঠে যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কোথাও অতগুলো টাকা জোগাড় করতে পারলাম না—অথচ পেলে আমি মাসে মাসে শোধ করে দিতাম।'

'কত?'

'চার হাজার—'

'অত ত হবে না। আড়াই হাজার নিয়ে যেও—বাকিটা দেখ আর কেউ দিতে পারে কি না—'

কুবেরের বিশ্বাস হচ্ছিল না।

পরদিন কারখানায় টিফিনে ধনরাজের ঘরের সামনে গিয়ে স্লিপ দিতেই ভেতরে ডেকে পাঠাল কুবেরকে। মেঝে থেকে টেবিল অব্দি থাকে থাকে একশো টাকার নোটের বাণ্ডিলের সাজানো সিঁড়ি। রেডি করা ছিল। কুবের গুণে দেখল পঁচিশখানা।

'কিছু সই করতে হবে না?'

'দরকার নেই', বলে একখানা বাঁধানো খাতা খুলে কুবেরের নামের পাশে টাকার অঙ্কটা লিখে রাখল ধনরাজ, 'এখন পঞ্চাশ করে কাটব মাসে মাসে—শেষে কিন্তু বেশি কাটবো, আমার কণ্টিঞ্জেন্সি ফাণ্ড থেকে দিলাম। তাড়াতাড়ি ফেরৎ দিলে অন্যদেরও দরকারে টাকাটা দিতে সুবিধে হয়।'

'নিশ্চই নিশ্চই—সেতো একশোবার।' আরও অনেক কিছু বলতে পারত অন্য সময় হলে। এখনই ঠিক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতার মত কোন কথাই মুখে এল না কুবেরের। তাহলে জায়গা বোধহয় কেনা হবেই।

রাতে বাড়ি ফিরে টাকাটা বুলুর হাতে দিল, 'আরও দেড় হাজার দরকার।'

বুলু বলল, 'কদমপুর থেকে তোমার রজদা লোক পাঠিয়েছিল—চটিরাম জমি ছেড়ে দিতে পারে—আজকালের ভেতর বায়না করতে হবে।'

সেদিন কদমপুর যাওয়ার পর কুবের অন্তত দশবার চটিরামের ওখানে গেছে। যাতায়াত করে দর ঠিক হওয়ার পর টাকার ধান্দায় আজ হপ্তা দুই চৌদিক ঘুরে বেড়িয়েছে। তাই আর এ'কটা দিন ওদিক মাড়ানো হয়নি। তা বলে জমি ছেড়ে দেবে চটিরাম।

কিছুকালের ভেতর কুবের খানিকটা খানিকটা করে অন্যরকম হয়ে গেছে। রবিবার সকালের আড্ডা আজকাল জমে না। ফার্নেসে দু' চারজনকে জমি কিনে বাড়ি তৈরির প্ল্যান বলেছে। গুপ্তবাবু বলেছেন, আমরা কলকাতার বনেদী ভাড়াটে —পাঁচ পুরুষের ওপর ভাড়াটে। কদমপুর গিয়ে অ্যাতখানি পথের হ্যাপা পোয়াতে

পারব না। দিব্যি মাসের শেষে ভাড়া দিয়ে যাও—কোন ঝামেলা নেই।

'কালই বায়না করবো—'

'বাকি টাকা?'

'জোগাড় করতেই হবে—'

আবছা আবছা শুনেছিল, জমি কেনার আগে সার্চ করাতে হয়। আরও নাকি কী সব কাগজপত্র লাগে। পরদিন সকালেই কুবের বুলুকে নিয়ে শিবপুরে সারদা চ্যাটার্জি লেনে চলে গেল। সেখানে কুবেরের বন্ধু প্রসূনের শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুর নিত্যগুপ্ত রায় বাড়িই ছিলেন। মানুষটি বড়দরের সার্ভেয়ার। বায়নায় কী করতে হয় তাও কুবের জানে না। রায়মশায় আর বুলু কদমপুর চলে গেল মিড্ ট্রেনে। পরের ট্রেনে প্রসূনকে নিয়ে কুবের সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে গেল। দু খানা ডেমি আর দু টাকার স্ট্যাম্প নিয়ে ওরা যখন কদমপুরে চটিরামের বাড়ি পৌঁছাল তখন বেলা প্রায় এগারোটা।

গুপ্তরায় মশায় এতক্ষণ জামাইর বন্ধুর জন্য চটিরামকে নরম গরম কথা দিয়ে আটকে রেখেছে। কত লোক নাকি ওই

দশ কাঠা চৌদ্দ ছটাক কেনার জন্যে হাঁটা-হাঁটি করছে।

শ্রীশ্রীকালী দিয়ে বায়না পত্রের শুরু হল—

বায়নাপত্র গ্রহিতা—শ্রীকুবেরচন্দ্র সাধুখাঁ, পিতা শ্রী৺বেন্দুলাল সাধুখাঁ, জাতি হিন্দু, পেশা চাকুরী আদি, সাং ১৩।২, মুন্সী জেল্লার রহিম লেন, সালকিয়া, হাওড়া, থানা গোলাবাড়ি।

বায়নাপত্র দাতা—শ্রীচটিরাম সরদার, পিতা মরূরে সরদার, জাতি হিন্দু, পেশা চাষ, সাং কদমপুর, থানা ও সাবরেজিস্ট্রি বহরিডাঙ্গা, জেলা ২৪ পরগণা।

কোথাও দাঁড়ি কমার বালাই নেই।

তারপর অন্তত পঞ্চাশখানা দলিল করে কুবেরকে খুচখাচ্ শরিকানি জমি কিনে দাগ ধরে এগোতে হয়েছে। এখন তার এসব প্রায় মুখস্থ—

কস্যারায়ত স্থিতিবান স্বত্বের ভাগী বিক্রয়ের বায়না পত্রমিদং কার্যাঞ্চাগে... নিরাংশে অবিবাদে নির্দায় নির্দোষ নিঃগোল পরিষ্কার সুস্থ অবস্থায় খাসে ভোগ বাস দখলীকার আছি।

অদ্য তারিখে বায়নার বাবদ আদায় ১০০ একশত টাকা লইয়া অঙ্গিকার করিতেছি যে, অদ্য হইতে ১ মাহার মধ্যে পনের অবশীষ্ট তিন হাজার নয় শত টাকা দিলেই মহাশয়ের খরচে মহাশয়ের নাম বরাবর রিতীমত সাফ কোবালা লিখিত পঠিত সহি সম্পাদন ও রেজিস্টারি করিয়া দিতে বাধ্য থাকিলাম।'

বানানগুলো সব খোদ বিদ্যাসাগরের।

বায়নাপত্র লেখার পর মাঠে নামতে হল। বেলা তিনটে থেকে ফিতে ধরে মাপতে মাপতে সন্ধ্যে হয়ে এল। চটিরাম একখানা লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, ভাইপো-দের অংশ আগেই বিক্রি হয়ে গেছে। কিনেছে এখানকারই এক বাগ। হারি বাগ —ব্যাংকশাল কোর্টে কী একটা কাজ করে।

মাপামাপির পর গুপ্তরায় মশায় বললেন, 'বোডে' ফেলে দেখতে হবে কতটা জায়গা আছে—'

চটিরাম তখনও দাঁড়িয়েছিল, 'মেপে আর কী দেখবেন! দলিলের চেয়ে কাঠা দুই বেশিই আছে। দু' কুড়ি বছর চাষ নিজেই দিয়ে আসছি—আল সরে গিয়ে দু' কাঠা জমি বেড়ে গেছে—'

'যা দখলে আছে—দলিলে আছে তাই কিনব আমরা।'

চটিরাম হাসল, 'দু' কাঠা মুফতে পাবেন —তার জন্যে কিছু টাকা আমার হাতে ধরে দিতে হবে।

'তা কেন?'

'মেপে আর কী দেখবেন'

'যে জমি আপনার না—তার জন্যে দাম দিতে পারব না—'

'ও হবে না বাবু!'

কুবের আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। গুপ্ত রায়মশায় তাকে থামাল, ' বেশ তো, আগে বাড়িতে আঁক কষে দেখি—ঠিক কতটা জমি আছে—কমেও তো যেতে পারে।'

'বেশ তো কষে দেখুন—'

চটিরাম স্টেশন অবধি এগিয়ে দিতে আসছিল। লোকাল লোক—যজমানি করে বলে মনে হল, আগ বাড়িয়ে কথা আরম্ভ করল, 'যা জমি আছে তার দাম দেবেন না?'

সারাদিন দৌড়োদৌড়িতে সবাই টায়ার্ড। প্রসূনকে যে কী বলে কৃতজ্ঞতা জানাবে। এমন সময় এ আবার কী ফ্যাকড়া। কুবের নিজেকে সামলাতে পারল না, 'আপনার জমি?'

'না।'

'তবে?'

'আমাদের এখানকার লোক—আমরা দশ-জনই ত বলব, দেখবো—ঠিক দর পাচ্ছে কিনা।

'বেশ তো বলবেন। কিন্তু, কিন্তু আগে কষে দেখি কতটা জায়গা আছে—'

'রোজ রোজ আমিনবাবুকে টেনে এনে তাঁর পিছনে দশ-পনেরো টাকা না ঢেলে একদিনে সব মেপে দেখে নিন না—'

কুবেরের মাথায় আগুন চড়ে গেল। পকেট থেকে গুপ্ত রায়মশায়ের কার্ডখানা বের করে দেখালো, 'দশ পনের নয়—রোজ একশো দেড়শো টাকা ফি ভদ্রলোকের—আমিন নয়, সার্ভেয়ার—'

লোকটা চমকে গেল, মুখের চেহারা নরম হয়ে এল, 'আমারই ভুল হয়েছে—আপনারা এসেছেন যখন, একবার আমার বাড়ি ঘুরেই যেতে হবে—'

'আমাদের সময় নেই মশাই—সন্ধ্যের ট্রেনে ফিরব—'

'সে অনেক দেরি—বাড়ি আমার স্টেশনের উল্টোদিকেই—চলুন, দু' মিনিট বসবেন—'

দু' মিনিটের জায়গায় দশ মিনিট বসতে হল। শান বাঁধানো পুকুর। প্রসূন, গুপ্ত রায়মশায়, বুলু আর কুবেরকে চণ্ডী মণ্ডপের বারান্দায় বসিয়ে প্লেট ভর্তি মিষ্টি খাওয়ালো। লোকটির নাম প্রবোধ মণ্ডল। মণ্ডপের কোণে বড় বড় তামার বাসনের ডাঁই—জং ধরে নীল হয়ে গেছে, ওপরে মাকড়সার জাল, এক সময় সেখানে ধুমে-ধামে পুজো হত। তখন ঘাটলা বোধ হয় এমন ভেঙে যায়নি, ধসে যায়নি।

বায়নাপত্রে চটিরাম সই দেবার পর বুলুকে একবার একা পাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল কুবেরের। বুলুর নামেই কেনা হচ্ছে। স্টেশনে কেনা পান খেয়ে বুলুর ঠোঁট এখন শুকিয়ে কালো হয়ে আছে।

ট্রেন যখন কদমপুর ছাড়ল তখন, লালজী আর ঘনরাম চাটুয্যের ইটখোলার মাথায় দগদগে লাল আর নিখুঁত গোল হয়ে সূর্য ঝুলছে—যেকোন মুহূর্তে গাছ-পালার আড়ালে টুপ করে খসে পড়বে।

আলো প্রায় নেই, কামরায় বাতি জ্বলতে জ্বলতে শেয়ালদা এসে যাবে। ছুটন্ত মাঠে মেটে জ্যোৎস্নার কায়দায় সূর্যের ফ্যাকাশে আলো নিভে আসছিল। তার ভেতরেই গুপ্ত রায়মশাই বললেন, 'কেমন প্লেন জমি দেখেছেন? এক সময় সি বেড ছিল', একটু থেমে বললেন, 'দু' চার শো বছর আগে এখানে নদী বইত—'

তার মানে এসব জায়গার ওপরে জল ছিল। ভাবাই যায় না। এখন তাহলে জলের ভেতর দিয়ে ট্রেন এগোচ্ছে। তার চেয়ে কামরার জানলায় বসে ফুটি ফুটি তারা দেখা ঢের সোজা।

বায়না করে একদিকে কুবেরের যেমন সুখ হচ্ছিল, অন্য দিকে তার মন বেশ খুঁত খুঁত করছিল। মোটে দশ-বারো কাঠা। কতটুকুই বা জায়গা। আশা ছিল অন্তত দেড় বিঘে। সামনের দিকে কাঠা পাঁচেক ছেড়ে দিয়ে বসতবাড়ি। পেছনে দশ-বারো কাঠার পুকুর, পাড় ধরে কলাগাছ আর সুপুরির চারা বসিয়ে দেবে—এক কোণে থাকবে জালে ঘেরা পোলট্রি। হাঁসের আস্তানা কত কী। সেই যে ঠাকুরমশাই মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল পঞ্চাশ টাকা কাঠা! তা যে দেখা যায় যে অব বেঙ্গলের পাশ ঘেঁষে পাওয়া যায়। সেখানে বড্ড ঢেউ।

(ক্রমশ

মেলবোর্নের চিঠি

কথা ছিল এবারকার চিঠিতে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করব। মাঝখানে মেলবোর্ন থেকে আঠারশ' মাইল দূরে উত্তর অস্ট্রেলিয়ার কিছু অংশে ঘোরার সুযোগ ঘটায় সেখানকার আদিবাসী নেতাদের সঙ্গে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ আলোচনাও করেছি। কিন্তু জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা এখানে ছ' দিন ধরে ভারত-উৎসব অনুষ্ঠান করলেন, এবং গত চিঠি লেখার পর এদেশে পর পর কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয়ের আগমন ঘটেছে। সুতরাং ঠিক করেছি এ চিঠিতে সে বিষয়ে কিছু লিখে পরের চিঠিতে আবার আদিবাসীদের আলোচনায় ফেরা যাবে।

প্রথমে উৎসবপর্ব: আমাদের বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের একটি সংগঠন আছে, নাম ইণ্ডিয়ান স্টাডিজ্ সোসাইটি। ক্লাসের পড়াশুনোর বাইরেও এঁরা ভারতবর্ষ নিয়ে আলোচনা-সভা, নৃত্যসংগীত অনুষ্ঠান, ভারতবর্ষ থেকে ছাত্রছাত্রী অথবা বিশিষ্ট অতিথি এলে তাদের সম্বর্ধনা ইত্যাদি ব্যবস্থা করে থাকেন। তাছাড়া, এঁরা চাঁদা তুলে বোম্বাই, কেরল, যাদবপুর প্রভৃতি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তির টাকা পাঠিয়েছেন। কবি-অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তী যখন আমাদের অতিথি হয়েছিলেন তখন এঁরাই তাঁর অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত করেন। এই সূত্রে জানিয়ে রাখি, এ পর্যন্ত আর কোনো ভারতীয় অতিথি এঁদের মনে অমিয়বাবুর মত গভীর দাগ ফেলতে পারেননি, এবং যেহেতু আমি অমিয়বাবুর ছাত্র এবং তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি, আমার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তাঁর এই অনুরাগের সম্পর্ক আমাকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছে।।

যাই হোক, এই সোসাইটির ছেলেমেয়েরা ঠিক করেন যে, জুলাইয়ের গোড়াতে সোম থেকে শনি পর্যন্ত তাঁরা ভারত-উৎসব অনুষ্ঠান করবেন। উৎসব শুরু হয় প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায়ের দুটি ছবি "দেবী" এবং "পথের পাঁচালী" দেখিয়ে। উদ্বোধন করেন অস্ট্রেলিয়ার সবচাইতে প্রবীণ এবং খ্যাতিমান দার্শনিক অধ্যাপক বয়েস গিবসন; প্রধান অতিথি ছিলেন ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রীযুক্ত টমাস; এবং সত্যজিৎ রায়ের মানবতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করেন মেলবোর্ন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের পরিচালক এরউইন রাডো। এত লোক হয়েছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের থিয়েটারে সকলকে যায়গা দেওয়া যায়নি; অনেকে টিকিট কিনেও হলের শেষে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন।

পরের দিন ছিল আধুনিক ভারতবর্ষ সম্পর্কে আলোচনা সভা। পাঁচজন বক্তা সমকালীন ভারতবর্ষের শিল্পবিপ্লব, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, গ্রামোন্নয়ন প্রচেষ্টা, সংবাদপত্র এবং স্ত্রীলোকের অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে তথ্য সহকারে বিশদ বিচার-বিশ্লেষণ করেন। তৃতীয় সন্ধ্যায় হিন্দী ছবি "ঘরওয়ালা" দেখানো হয়। চতুর্থ এবং পঞ্চম সন্ধ্যায় ছিল রবীন্দ্রনাথের দুটি নাটক। শেষ সন্ধ্যায় ভারতীয় নৃত্যগীত অনুষ্ঠান এবং তারপর ভারতীয় খানার ব্যবস্থা। সবসুদ্ধ প্রায় দেড় হাজারের মত লোক এই দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তদুপরি ভারতবর্ষ থেকে আনা হাতের কাজের প্রদর্শনীও খুলেছিলেন— তাতে হাজার পাঁচেক টাকার জিনিস বিক্রি হয়।

মেলবোর্ন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে শ্রীসত্যজিৎ রায়

উৎসবের সবচাইতে উল্লেখ্য অনুষ্ঠান ছিল রবীন্দ্রনাথের দুটি নাটক। রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় করা এমনিতেই কঠিন, তার ওপরে ইংরেজি তর্জমার ব্যাপারটা রীতিমত দুঃসাহসিক। দুটি নাটকের মধ্যে "বিসর্জন" ইতিপূর্বে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা একবার করেছেন: এবার অভিনয় আগেরবারের মত অতটা উৎকৃষ্ট হয়নি। এবারে "রক্তকরবী" এখানে প্রথম অভিনয় হোল; এবং যদিও এটি অত্যন্ত জটিল রূপক নাট্য, আমাদের ছাত্রছাত্রীরা এর মূল রসটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে "রক্তকরবীর" অভিনয়ে নন্দিনীর ভূমিকায় ভারতবিদ্যা বিভাগের ছাত্রী কুমারী শার্লি কিয়ার

"রক্তকরবী" এবং তার ইংরেজি অনুবাদ দুটি-ই বোধহয় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে। এর রূপক তত্ত্ব নিয়ে কবি স্বয়ং আলোচনা করেছেন, তাছাড়া অনেক গ্রন্থ প্রবন্ধাদিও লেখা হয়েছে। নৈর্ব্যক্তিক যান্ত্রিকতা এবং সঞ্চয়লোভী শক্তির সাধনার বিরুদ্ধে প্রাণের সাবলীলতার, সৃষ্টির এবং সৌন্দর্যের আত্মপ্রকাশ প্রচেষ্টা—নাটকীয় সংঘাতের এটিই মুখ্য উপজীব্য। কবির জীবদ্দশায় এ নাটকটি পশ্চিমে বিশেষ কদর পায়নি; এবং যদিও আমাদের দেশে কিছু কম্যুনিস্ট মতাশ্রয়ী অভিনেতা এটিকে তাঁদের রাজনৈতিক প্রচারকার্যের সমর্থনে ব্যবহার করার প্রয়াস পেয়েছেন তার দ্বারা তাঁদের শিল্পবোধের স্থূলতাই প্রতিপন্ন হয়েছে। আসলে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে যান্ত্রিকতা, নৈর্ব্যক্তিকতা এবং শক্তির প্রমত্ততা পুঁজিবাদী সমাজের চাইতে বেশী ছাড়া কম নয়। বরং সম্প্রতি পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে কিছু তরুণতরুণী যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে যে নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করেছেন "রক্তকরবী"-র সুরের সঙ্গে তার খানিকটা মিল চোখে পড়ে। কংক্রীটের জংগলে একগুচ্ছ ফুলের আবির্ভাব, বস্তুরীতির সাম্রাজ্যে নির্লোভ আনন্দের অভিব্যক্তি, অসূয়ক শক্তির উৎপ্রাসনকে অগ্রাহ্য করে তরুণ প্রেমের স্বয়ম্ভরতা—এই রোমান্টিক প্রতিন্যাসের সূত্রে এঁরা নন্দিনীর স্বজন।

হয়ত বা এই কারণেই আমাদের ছাত্র-

উইলসন হলের অনুষ্ঠানে সমবেত নাগরিক প্রতিষ্ঠানগুলির তরফ থেকে ইন্দিরা গান্ধীকে আইরিস ফুলের গুচ্ছ উপহার দিচ্ছে কুমারী মৈত্রেয়ী রায়

ছাত্রীরা "রক্তকরবী"-র মধ্যে নিজেদের মনের মুকুর খুঁজে পেয়েছিলেন। মোদ্দা শার্লি কীয়ার (Shirley Kear) নামে যে মেয়েটি নন্দিনীর অংশে নেমেছিলেন, তাঁর অভিনয় দেখলে, আমার অনুমান, স্বয়ং কবিও খুশী হতেন। শার্লির চলাফেরা, কথা এবং গানের মধ্যে তারুণ্যের ললিত বিদ্রোহ, অহেতুক আনন্দ এবং নিষ্পাপ বেদনা বড় আশ্চর্য প্রকাশ লাভ করেছিল। তাছাড়া, রাজার অংশে জন হুড (John Hood), অধ্যাপকের অংশে রেন ওয়র্টলি (Renn Wortley) এবং সর্দারের অংশে ডেনিস ওকলি (Denis Oakley) চমৎকার অভিনয় করেন। একমাত্র বিশুর চরিত্রে অভিনয় ততটা সুবিধের হয়নি: আশা করা যায়, পরে যখন এরা আবার এই নাটকটি অভিনয় করবে তখন এই ত্রুটি শুধরিয়ে নেবে। উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আমাদের ছাত্রী এবং এই সোসাইটির সম্পাদিকা এলিজাবেথ বাচুকোভস্কী।

যে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে উৎসব হচ্ছিল তখন এখানকার কিছু ভারতানুরাগী অন্য আরেকটি উদ্যোগ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ভারতবর্ষকে নানাভাবে সাহায্য করার ব্যাপারে এখানকার বেসরকারী প্রচেষ্টার কথা ইতিপূর্বে "দেশ" পত্রিকায় লিখেছি। শ্রীযুক্তা ময়রা ডাইনন (Moira Dynon) এদিকে একজন বিশেষ উৎসাহী। ইনি গত তিন বছরে একক প্রচেষ্টায় অস্ট্রেলিয়া থেকে ভারতবর্ষে এক হাজার টনের ওপরে গুঁড়ো দুধ উপহার পাঠিয়েছেন; এখানকার বাজার দর হিসেবে এর দাম পঞ্চাশ লক্ষ ডলার অর্থাৎ আমাদের চার কোটি টাকার কিছু বেশী; এই গুঁড়ো দুধ এক কোটি আশী লক্ষ পাইট পানীয় দুধ তৈরী করার পক্ষে যথেষ্ট। শ্রীযুক্তা ডাইনন প্রতি বছর অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে দাতাদের কাছ থেকে এই দুধ সংগ্রহ করেন, এবং তারপর ভারতীয় শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজ মারফৎ সে দুধ ভারতবর্ষে বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে পাঠানো হয়। এ বছর ভিক্টোরিয়াতে দুধ তোলার জন্য জুলাইয়ের গোড়াতে শ্রীযুক্তা ডাইনন একটি সভার ব্যবস্থা করেন; তাতেও প্রধান অতিথি ছিলেন ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রীযুক্ত এ এম টমাস। সারা জুলাই ধরে ভিক্টোরিয়ার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এই দুধ কেনার জন্য নানাভাবে টাকা তুলবে।

এবারে ভারতবর্ষ থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের কথা বলি। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অস্ট্রেলিয়া সফর সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছে। এদেশের সাধারণ মানুষ তাঁকে প্রচুর সম্মান দেখিয়েছে, কিন্তু ভিতরের খবর যতটুকু জানি সরকারী মহলে তিনি বিশেষ দাগ কাটতে পারেন নি। তার নানা কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। এখনকার প্রধানমন্ত্রী গর্টন ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী হোল্টের মত এসিয়া-অস্ট্রেলিয়া মৈত্রীর ব্যাপারে সম্ভবত ততটা উৎসাহী নন। তবু ইন্দোনেশিয়ার প্রতি তাঁর কিছুটা অনুরাগ আছে, কিন্তু ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি মনে হয় নিস্পৃহ। তাছাড়া, পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ এবং অস্ট্রেলিয়ার দৃষ্টিভঙ্গীতে খুব মিল নেই। কম্যুনিস্ট চীনের সম্প্রসারণশীল কার্যকলাপ সম্পর্কে ভারত সরকার মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করেন বটে, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার দেশগুলির আত্মরক্ষার ব্যাপারে ভারত সরকারের বিশেষ মাথাব্যথা দেখা যায় না। (যতদূর জানি, সিঙ্গাপুরের লী কুয়ান ইউ এবং মালয়েসিয়ার টুঙ্কু আবদুল রহমানের সঙ্গে আলোচনা করে ইন্দিরা গান্ধী এ সম্পর্কে কিছুটা সচেতন হয়েছেন।) তৃতীয়ত, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্য এখনো খুব সীমাবদ্ধ, এবং ফলে দুই দেশের মধ্যে আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্র খুব ব্যাপক নয়।

তা সত্ত্বেও সাধারণ অস্ট্রেলিয়ান নাগরিকের মনে ভারতবর্ষ সম্পর্কে কৌতূহল এবং অনুরাগ সম্প্রতি লক্ষণীয়-ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং এদেশে অল্প কয়েকদিন থাকার মধ্যেই ইন্দিরা গান্ধী এদের গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। এই উপলক্ষে সবচাইতে বড় দুটি বেসরকারী সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান হয় মেলবোর্নে। প্রথমটি টাউনহলে মেয়রের নেতৃত্বে, এক হাজারের ওপরে নিমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয়টি মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলসন হলে; প্রায় দেড়শ' বিভিন্ন নাগরিক প্রতিষ্ঠান একত্রিত হয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জানায়। যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সকলেই নিমন্ত্রিত, এবং প্রতি নিমন্ত্রণপত্রের মূল্য ধরা হয়েছিল চার টাকা। তা সত্ত্বেও হলে দু' হাজারের ওপর স্ত্রীপুরুষের সমাগম হয়েছিল, এবং স্থানাভাবে হলের বাইরে অনেকে দাঁড়িয়েছিলেন। এখানকার

মেলবোর্নে 'মিল্ক ফর ইণ্ডিয়া ক্যাম্পেন' অনুষ্ঠান সভা। ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রী এম টমাস বক্তৃতা দিচ্ছেন। পাশে বসে আছেন শ্রীযুক্তা সমরা ডাইসন

ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের মতে মেলবোর্নের ইতিহাসে এতবড় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান ইতি-পূর্বে কখনো হয়নি। এই অনুষ্ঠান থেকে যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকে তা দিয়ে উদ্যোক্তারা ভারতবর্ষ সংক্রান্ত পুস্তকাদি কিনে মেল-বোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে উপহার দিয়েছেন।

বিভিন্ন প্রেস কনফারেন্সে, রেডিও, টেলিভিশন এবং সম্বর্ধনা সভায় ইন্দিরা গান্ধী আধুনিক ভারতবর্ষের যে রূপটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন, এদেশের সাধারণ মানুষ তার সঙ্গে ততটা পরিচিত নয়। প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদের কথা তারা কিছুটা শুনেছে; রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী এবং নেহরুর নাম তাদের অজানা নয়; কিন্তু সমকালীন ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের খবরটাই এদেশে সবচাইতে বেশী বিজ্ঞাপিত। ফলে শ্রদ্ধার চাইতে করুণার ভাবটাই এখানে বেশী প্রবল। ইন্দিরা বিশেষ করে জোর দিয়েছিলেন আধুনিক ভারতবর্ষে যে ব্যাপক সামাজিক রূপান্তর ঘটছে তার ওপরে—সে পরিবর্তনের নায়ক-নায়িকা সাধারণ স্ত্রীপুরুষ যারা গ্রামে এবং শহরে অজস্র বাধা এবং সমস্যা সত্ত্বেও জীবনকে সমৃদ্ধতর করার উদ্যোগে ব্যাপৃত। দেশের কৃষিব্যবস্থায়, কলকারখানায়, স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, শিশুদের জীবনে নতুন যে সব সম্ভাবনার সূচনা ঘটছে তারি বর্ণনা করে তিনি বলেন যে, এই রূপান্তরকে আরো দ্রুত এবং বহুমুখী করার জন্য সমৃদ্ধতর দেশগুলির সহযোগিতা বিশেষ-ভাবে কাম্য। তাঁর কথার মধ্যে ভারতবর্ষের দুঃখদারিদ্র্যের চাইতে প্রচেষ্টা এবং সম্ভাবনার দিকগুলি প্রাধান্য পায়।

ইন্দিরা গান্ধী মেলবোর্ন আসেন ২৩শে মে সকালে, আর তার আগের রাতে মেল-বোর্ন টাউন হলে ছিল শ্রীযুক্ত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতার বাজনা। নিখিল-বাবুর সঙ্গে তানপুরা বাজিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী রমা, এবং তবলা সঙ্গত করেছিলেন শ্রীমহাপুরুষ মিশ্র। এই কনসার্টে এত শ্রোতা এসেছিল যে উদ্যোক্তারা পক্ষকাল পরে আবার মেলবোর্নে তাঁর দু সন্ধ্যা প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করেন। কয়েক বছর আগে এখানে যখন প্রথমে রবিশঙ্কর এবং তারপরে আলি আকবর খাঁ আসেন তখন কিন্তু এরকম সাড়া পাওয়া যায়নি। এখনো যে মেলবোর্নে ভারতীয় সংগীত বিষয়ে বোদ্ধা ব্যক্তির সংখ্যা খুব বেশী তা নয়, কিন্তু বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে ভারতীয় সংগীতের প্রতি অনুরাগ সম্প্রতি লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে গেছে। এখান থেকে চলে যাবার আগের রাতে নিখিলবাবু, তাঁর স্ত্রী এবং মিশ্র মহাশয় আমাদের গৃহে আসেন, এবং সেই সূত্রে কিছু সংগীতানুরাগীকে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করানোর জন্য আমরা নিমন্ত্রণ করি। নিখিলবাবুর সেতার সম্পর্কে কিছু বলা আমার সাধ্যের বাইরে; কিন্তু তাঁর সহজাত সৌজন্য এবং তাঁর স্ত্রীর মিষ্ট ব্যবহার আমাদের সকলকে মুগ্ধ করেছে।

অতঃপর মেলবোর্ন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের প্রধান অতিথি হিসেবে আসেন শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায়। ফেস্টিভ্যালের পরিচালক শ্রীযুক্ত রাত্রো রায় মহাশয়ের মহা ভক্ত; প্রতি বছরই ওঁকে আনাবার চেষ্টা করেছেন, এবারে সে চেষ্টা সার্থক হোল। আমার স্ত্রী এবং আমি সত্যজিৎ রায়ের বিশেষ অনুরাগী, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রায় মহাশয় যখন মেলবোর্নে এলেন তখন আমি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণে কুইন্সল্যাণ্ডে। ফলে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, কিন্তু মেলবোর্নে ফিরে এদেশী বন্ধুবান্ধবদের মুখে যে বর্ণনা শুনেছি তাতে মনে হয়, অন্তত মেলবোর্নে সত্যজিৎ রায় ইন্দিরা গান্ধীর চাইতে কম সম্মান পাননি। অস্ট্রেলিয়ার নিজস্ব চলচ্চিত্রশিল্প এখনো বিশেষ গড়ে ওঠেনি, কিন্তু এদেশে যাঁরাই ফিল্মের সমজদার সত্যজিৎ রায় তাঁদের কাছে এ যুগের একজন মহাশিল্পী। দোসরা জুন তারিখে তিনি এখানকার প্যালে থিয়েটারে ফিল্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন; তাতে প্রায় তিন হাজার শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শোনে। তাঁর দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর, অভিজাত আচরণ, মানব-তন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গী,—এবং সব মিলিয়ে তাঁর প্রতিভাচিহ্নিত ব্যক্তিত্ব এখানকার মানুষ অনেকদিন স্মরণে রাখবে।

—শিবনারায়ণ রায়

চা-শিল্প উন্নয়নের প্রয়াস

চা ভারতীয়দের প্রধান পানীয়। চা উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতের স্থান প্রথম, চা পানের অভ্যাস দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে খুবই বেড়ে গেছে। আগে লোকের মনে প্রশ্ন ছিল, "চা পান না বিষ পান?" আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কেন একথা বলেছিলেন, তা নিয়ে আজ আর গবেষণা হয় না। চায়ের জনপ্রিয়তা বাড়াবার জন্য তথাকথিত বিজ্ঞাপন, "ইহাতে নাহিক' মাদকতা দোষ, কিন্তু পানে করে চিত্ত পরিতোষ", আজ যথেষ্ট নয়। চা আজ আমাদের নিত্য পানীয়। দেশে চায়ের জন্য চাহিদা যতটা বেড়েছে বিদেশের বাজারে চায়ের চাহিদা আমরা ততটা বাড়াতে পারিনি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশে আমাদের চায়ের বাজার অনেকটা নষ্ট হয়েছে। ১৯৬৬-৬৭ সালে বৃটেনে যে চা ব্যবহার করা হ'ত তাতে ভারতীয় চায়ের পরিমাণ ছিল শতকরা ৪৫ ভাগ এবং সিংহলী চায়ের পরিমাণ ছিল শতকরা ২৫ ভাগ। বলা বাহুল্য, এর দু'বছর আগে বৃটেনে মোট চায়ের পরিমাণ ছিল শতকরা ৬০ ভাগ।

চা শিল্পের উন্নতির জন্য একদিকে যেমন দেশে ভাল শ্রেণীর চায়ের উৎপাদন বাড়াতে হবে, অপরদিকে তেমনি চায়ের রপ্তানি বাড়াতে হবে। আজ পর্যন্ত চা শিল্পের উন্নতির জন্য যত ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে, তার কোনটিই পর্যাপ্ত নয়। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের অন্যতম প্রধান উৎসটি অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হয়েছে। সুখের কথা, সম্প্রতি ভারত সরকার চা-শিল্পের উন্নতির জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাস থেকে চা-শিল্পে উৎপাদন শুল্ক আরও কমানো হয়েছে এবং রপ্তানি শুল্কের ছাড়ের (rebate) হার আরও বাড়ানো হয়েছে। চায়ের মৌল উৎপাদন শুল্কের উপর শতকরা ২০ ভাগ বিশেষ উৎপাদন শুল্ক এতদিন প্রচলিত ছিল। গত ১লা অক্টোবর থেকে তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। রপ্তানি শুল্কে আগে কিলো প্রতি ২৪ পয়সা ছাড় দেওয়া হ'ত; এখন হচ্ছে ৩৫ পয়সা। আশা করা যায়, এ ব্যবস্থার ফলে চা শিল্পে তিন কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হবে এবং এই অর্থ চা বাগিচার এলাকা বৃদ্ধি এবং চা শিল্পের নানাবিধ উন্নয়নে ব্যয় করা হবে। চায়ের রপ্তানি বাড়াবার জন্য শুধু রপ্তানি শুল্কের ছাড় বাড়িয়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। চায়ের মান-উন্নয়ন, চায়ের গুণগত উৎকর্ষ সম্পর্কে সুপরিকল্পিত প্রচার ব্যবস্থা এবং রপ্তানির জন্য জাহাজে চায়ের মাল-বোঝাই

আর্থিক ভারত

করার আগে বিশেষ পরীক্ষা—চায়ের রপ্তানি বাড়াবার জন্য অপরিহার্য। ধীরে ধীরে সিংহল বিদেশের বাজারে ভারতীয় চায়ের চাহিদাকে কেন কমিয়ে দিচ্ছে, তার কারণ বিশ্লেষণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ১৯৬৬ সালের জুন মাসে ভারত যখন মুদ্রামূল্য হ্রাস করে, সিংহল তখন মুদ্রামূল্য হ্রাস করেনি। অথচ সেদিক দিয়ে বিচার করলে বিদেশীদের পক্ষে সিংহলের পরিবর্তে ভারত থেকে চা আমদানি করা অধিকতর লাভজনক। তবু কেন বিদেশে ভারতীয় চায়ের চাহিদা বাড়ছে না, অথচ সিংহলের চায়ের চাহিদা বাড়ছে তার কারণ বিশ্লেষণ করা দরকার। বিদেশে চায়ের ব্যবহার আগের অনুপাতে অনেক বেড়ে গেছে। বৃটেনেও চা এখন একটি অন্যতম প্রধান পানীয়। ভারতকে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে যাতে ভারতীয় চায়ের চাহিদা আরও বাড়ে।

বিশ্ব ব্যাঙ্ক কর্তৃক আরও ঋণ প্রদানের আশ্বাস

১৯৬৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে বিশ্ব ব্যাঙ্ক বলেছেন যে ভারতকে ভবিষ্যতে আরও সাহায্য বাবদ ঋণ দিতে হতে পারে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, বর্তমান শর্তে যদি উন্নতিকামী দেশগুলিকে অর্থ সরবরাহ করা হতে থাকে তাহলে ঐসব দেশগুলির অনেকেরই ঋণ পরিশোধে চরম অসুবিধা হতে পারে; দাতা দেশ-গুলিরও সমস্যা বাড়তে পারে। বিশ্ব-ব্যাঙ্কের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ঋণ পরিশোধের জন্য অনেক উন্নতিশীল দেশকে রপ্তানির পরিমাণ বাড়াতে হবে। ভারতের ঋণ পরিশোধ সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যাঙ্কের অভিমত হল যে, রপ্তানি বৃদ্ধি-জনিত নীতি সহ আর্থিক ও রাষ্ট্রনীতির সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থার উপরেই দীর্ঘ-মেয়াদী সমাধান নির্ভর করছে। তাছাড়া সুবিধাজনক শর্তে ঋণদান ও ভারতীয় মালের জন্য ভাল বাজার সৃষ্টিও এই সমস্যা সমাধানের আর একটি উপায়। বিশ্ব-ব্যাঙ্কের কাছ থেকে যখন আরও সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া গেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কিন্তু তখনি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কতটা সাহায্য দিতে পারে তা স্থির করার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব মার্কিন কংগ্রেসের, বিশেষত সিনেটের। রাষ্ট্রপতি জনসন সিনেটের কাছে আবেদন করে বলেছেন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারসাম্য রক্ষা করতে গেলে এবং অনগ্রসর দেশগুলির মার্কিন নীতির প্রতি সমর্থন বজায় রাখতে গেলে ঐ দেশ-গুলিকে আরও উদার শর্তে সাহায্য করার নীতি চালিয়ে যাবার পন্থা যেন সিনেট অনুমোদন করেন। ভারতের দিক থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে—ভারত বিদেশী ঋণ গ্রহণ করতে প্রস্তুত, এবং তা গ্রহণ করা দরকারও বটে; কিন্তু সেই ঋণ হতে হবে নিঃশর্ত, রাজনৈতিক দর্শন তথা নীতির বিসর্জন দিয়ে অথবা তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে ভারত বৈদেশিক সাহায্য চায় না।

ভারতে মোট বৈদেশিক বিনিয়োগ

সম্প্রতি প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় ১৯৬৭-৬৮ সাল পর্যন্ত ভারতে মোট বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ হয়েছে ১৯৩২·১ কোটি টাকা। তার মধ্যে বৃটেনের অংশ হচ্ছে ৫২৯·৩ কোটি টাকা (শতকরা ৫৬·৬ ভাগ), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হচ্ছে ১৯৩·২ কোটি টাকা (শতকরা ২০·৭ ভাগ) এবং পশ্চিম জার্মানীর অংশ হচ্ছে ২৪·৫ কোটি টাকা (শতকরা ২·৬ ভাগ)। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অংশ কত হয়েছে তা জানা যায়নি। তবে ভারতের সঙ্গে পূর্ব-ইউরোপীয় দেশগুলির বাণিজ্যিক সম্পর্কের সম্প্রসারণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই লণ্ডনে ঘোষণা করেছেন যে, বিশ্বের যে কোন দেশ থেকেই ভারত সাহায্য গ্রহণ করতে পারে অথবা বিশ্বের যে কোন দেশই ভারতে তার মূলধন বিনিয়োগ করতে পারে যদি এই সাহায্য প্রদানের অথবা বিনিয়োগের শর্ত ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী না হয়। চতুর্থ পাঁচসালা যোজনার কাজ এখনও আরম্ভ হয়নি; এমন কি যোজনার আকৃতি কিরূপ হবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনও শেষ হয়নি। বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার অন্যতম শর্ত হচ্ছে দেশের অর্থ-নৈতিক নীতির মধ্যে যাতে কোন অনিশ্চয়তা না থাকে তার ব্যবস্থা করা। আরেকটি জিনিসের প্রয়োজন খুবই বেশী; তা হচ্ছে একটি সুষ্ঠু শ্রমনীতি। ভারতে শ্রমিক-মালিক বিরোধ শুধু বেসরকারী ক্ষেত্রেই আবদ্ধ নয়; সরকারী ক্ষেত্রেও তা ছড়িয়ে পড়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত শিল্প সম্পর্কে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত না —

পর্যন্ত বিদেশী বিনিয়োগকারী নিশ্চিন্ত মনে তার মূলধন বিনিয়োগ করতে পারেন না। দীর্ঘকালীন পরিপ্রেক্ষিতে রপ্তানি উন্নয়ন অপেক্ষাও আমদানির বিকল্প সামগ্রী উৎপাদনের গুরুত্ব বেশী। রপ্তানি উন্নয়ন বিদেশের চাহিদা এবং বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতার তীব্রতার উপর নির্ভরশীল এবং তা যে কোন সময়েই দেশের প্রতিকূল হতে পারে। অপরপক্ষে আমদানির বিকল্প সামগ্রীর উৎপাদন বাড়াতে পারলে শুধু যে বৈদেশিক মুদ্রাই বাঁচবে তা নয়—দেশের ভিতরেও উৎপাদন বৃদ্ধি জনিত আয় বাড়বে এবং কর্ম-সংস্থানের সুযোগ বাড়বে। বৈদেশিক বিনিয়োগ আমাদের দেশে যা হবে তা যাতে আমাদের আমদানির বিকল্প জিনিসের উৎপাদনে নিয়োজিত হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আমদানির বিকল্প উৎপাদনের জন্যই বিদেশী বিনিয়োগকারী-দের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে আমাদের আর বিদেশের উপর নির্ভর করে না থাকতে হয়।

সুব্রত গুপ্ত

আলোয় কালোয়

ত্রিশঙ্কু

মেনুরার বিয়েতে এই কিছুদিন আগে বেক্সটারের সঙ্গে দেখা হলো আবার। সেই তেমনিই আছে। এক বছর পরে একটুও টশকায়নি। সাহেবরা এক বছর ভারতবর্ষে থাকলে টলটলে চেহারাটি বদ্খৎ হয়ে যায় সাধারণত—উপর থেকে বাতাস আর তলা থেকে জল খেতে খেতে। পেটের মধ্যে বা রক্তের নুনের ভেতর দুশ্চিকিৎস্য কিছু ব্যাধি সঞ্চয় করে ফেলে। কিন্তু বেক্সটার তেমনি সজীব। ওর টাক-মাথার তিন পাশে সাদা ঝালর, ওর ফ্রেঞ্চ-কাট নির্ভেজাল সাদা দাড়ি ফুরফুর করছে, বাঁধানো দাঁতের পাটি পরিপাটি।

—কী খবর, আরে! তুমি এখনও এদেশে? আমি একটু আশ্চর্য হলাম। ও ভিড় ঠেলে ছুটে এসে আমার হাত ধরলো। ওর প্রকাণ্ড চওড়া ষাট বছরের পোড়খাওয়া পাঞ্জা ও পাঁচটি আঙুল যেন গিলে ফেললো আমার মেয়েলী হাতের পাঞ্জা। উলটো প্রশ্ন করলো আমাকে—তোমার খবর কি বলো। শুনেছি ইতিমধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে তোমার।

—তেমন কিছু না। আমি আশ্বাস দিলাম। ছোট-বড় নুড়িরা টুপটুপ করে পড়ে, চক্কর কাটে জলে, তারপর ডুবে যায় অতলে গভীরে। আর নড়ে না। ওদের ওপর দিয়ে তোড়ে বহে যায় স্রোত—নির্বিকার জীবন।

বেক্সটার বললো, আই অ্যাম স্টাক। ভারতবর্ষে আমি আটকে গেছি। কলকাতাকে কেন্দ্র করে গত এক বছর ধরে আমি এদেশের নানান জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছি। দেশে ফিরতে আমার আদৌ ইচ্ছে নেই। অন্য কোথাও যেতে চাই না।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। বেক্সটার একজন ইংরেজ। বয়স ষাট বছরের বেশি হবে তো কম নয়। গত বছর যখন ওর সঙ্গে আলাপ হয় তখন কথায় কথায় ও বলেছিল, কর্মজীবন আমি শুধু পয়সা রোজগার করেই নষ্ট করেছি। জাহাজ তৈরীর কারখানায় চল্লিশ বছর—যেসব জাহাজ সারা পৃথিবী জুড়ে ঘুরে বেড়ায়। আমার তৈরী জাহাজেরা আজ স্যানফ্রান্সিসকো, কাল হংকং, পরশু হামবুর্গে চরে বেড়িয়েছে, অথচ চল্লিশ বছর

...যেন গিলে ফেললো আমার মেয়েলি হাতের পাঞ্জাটা

আমি গ্লাসগোর কেন্ট রোডে একটা কালো বাড়ির দোতলায় বাস করেছি। রিটায়ার করে এবার জীবন উপভোগ করবো। দুনিয়া দেখবো।

জিগ্যেস করলাম, তুমি না বলেছিলে, আরো অনেক দেশ ঘুরবে? তার কী হলো?

জবাব না দিয়ে বেক্সটার বললো, মনে পড়ে তোমাদের কয়েকজনের সঙ্গে সেই আন্ডার-গ্রাউন্ড অভিযান। পিঁয়াজের মতো ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে মানুষ দেখা। রূপ ও উল্লাসের ভেতরে রোগ, স্যাফ্রন কাপড় মোড়া সৌম্যকান্তি সাধুর ভেতরে ভিক্ষুক। ক্রিমিনালদের শক্ত বুকের ভেতর থেকে দুধ নিঃসরণ। মনে পড়ে তোমরা কেউ কেউ—যুবক বলে হয়তো আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলে। আমি চমকে চমকে উঠেছি। তোমাদের সেদিন বার করে নিয়ে এসে-ছিলাম, এই বৃদ্ধ আমি। তারপর নিজেই ঢুকে গেছি। এক এক সময় সমুদ্রের মাছের মতো আমি সূর্য ও নিয়নের আলোভরা সামাজিক জগতে ভেসে উঠি নিশ্বাস নেবার জন্যে। যেমন আজ। বেশ ভালো লাগছে। •মনুরার বিয়ে হচ্ছে, আমি খুশী হয়েছি।

খাওয়া দাওয়ার জন্যে ডাক পড়লো। আমি বললাম, বেক্সটার, আমি প্রবাসী, তোমার গায়ে কলকাতার গন্ধ মাখা। যদি খুব অসুবিধে না হয় তবে এখান থেকে বেরিয়ে চলো কোথাও বসি। তারপর দরকার হলে তুমি আমার বাহু ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে যেয়ো। এখানে আমার তেমন কোনো বন্ধু নেই।

ওখান থেকে বেরিয়ে এসে আমরা দুজন নিভৃতে এক জায়গায় বসলাম। ছোট্ট মাছ ভাজার দোকান। সামনে প্রকাণ্ড কড়াইয়ে আড় ও বোয়াল মাছ মশলা দিয়ে ভাজা হচ্ছে, ভেতরে সেই মাছ ভাজা সহযোগে সান্ত্রা-নাম্নী এক উপাদেয় বস্তু। আমরা দুজন একটা ছোট টেবিল দখল করে বসলাম। কলকাতার স্বাস্থ্য সেবন ক'রে বেক্সটারকে বললাম, দেখ বন্ধু, তুমি একা মানুষ, আমার ভাবনা হচ্ছে, কোনদিন না বেঘোরে মরে থাকো অন্ধকার ঘুপচিতে বুড়ো বেড়ালের মতো। কলকাতা শহরের মজার মধ্যে ঢের বিপদ লুকিয়ে থাকে, তুমি হয়তো জানো না।

বেক্সটার চোখ দুটো নাচিয়ে সম্পূর্ণ সাদা একটা হাসি হাসলো। আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছো? তোমরা মৃতদেহকে নিয়ে উৎসব করো না? হুগলী নদীর ধারে শ্মশানে আমি কতদিন গেছি অধিক রাত্রে, শোকের চিহ্ন দেখতে পাই না। ডেডবডি-দের এত ম্যাজেস্টিক লাগে যে আমার এক এক সময় ইচ্ছে হয় একটা পছন্দসই উনন বেছে নিয়ে তার ওপর শুয়ে পড়ি।

বললাম, হাজার হোক, তুমি বিদেশী, তোমার রং ফর্শা, কেউ তোমায় আত্মীয়ের মতো ভালোবাসবে না।

—কলকাতা কাউকেই ভালোবাসে না। তাই তো আমার এত ভালো লাগে। অথচ সারা শহর জুড়ে ছড়িয়ে আছে এক ধরনের ভালোবাসা। হঠাৎ বোঝা যায়। সেই কারণে আমি ভদ্রসমাজে মিশি না। কতক-গুলো ওপরকার জিনিস ভদ্রসমাজের লোকেরা ভুলতে পারে না। তোমার সঙ্গে আলাপ হবার আগেই তোমার কাছ থেকে এক ধরনের ব্যবহার ওরা প্রত্যাশা করবে। আমি রাত্রে একা একা ঘুরে বেড়াই পাজামা আর কুর্তা পরে। কিংবা ভর-দুপুরবেলা।

জিগ্যেস করলাম, গ্রীষ্মকালে দুপুরবেলা কোনদিন হাওড়া ব্রিজের ওপর দিয়ে হেঁটে গেছ? পায়ের নিচু দিয়ে গঙ্গা বয়ে যায় হু-হু ক'রে, দেখেছ?

—একবার। আর কোনোদিন যাবো না। বেঙ্কটার যেন শিউরে উঠলো।

—কেন কী হয়েছিল? পকেট মার? আমি সকৌতুক প্রশ্ন করি।

—না, না। একটা দৃশ্য দেখেছিলাম। ফুটপাথের ওপরে একটা রোগা লোক কুঁকড়ে শুয়ে আছে। অর্ধেক শরীরে রোদ পড়েছে তার। প্রথমে মনে হয়েছিল ঘুমোচ্ছে বুঝি। একটু লক্ষ করে দেখলাম—না, লোকটা মরছে। তখনো মরে যায়নি। অনেকক্ষণ পর পর নিশ্বাস নিচ্ছিল, ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে একটু একটু ফেনা বেরোচ্ছিল। কতকগুলো মাছি মৃত্যুর গন্ধ পেয়ে আগেভাগে ওর মুখের ওপর, ওর কানের ভেতর, ওর হাতের একটা ঘায়ের চার পাশে হেলিকপটারের মতো নামছে। সারবন্দী পিলগ্রিমের মতো একদল পিঁপড়ে ওর খোলা কাঁধের ওপর দিয়ে উঠে—ওর চিবুক পেরিয়ে—চোখ দুটোর ওপর মেলা বসিয়েছে। একবার মনে হলো কী বীভৎস এই দৃশ্য। সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, ব্রিজের নিচু দিয়ে ঘোলা জলের নদী—তোমার ভাষায় নির্বিকার জীবনের মতো—বয়ে যাচ্ছে। কী অকিঞ্চিৎকর ওই সামান্য লোকটা এই পরিবেশে। মনে হলো, ছোট ছোট মাছি ও পিঁপড়ের রূপ ধরে ঈশ্বর যেন ওপর থেকে এসে ওকে অধিকার করছেন। লোকটির দুপাশ দিয়ে পথ ক'রে হেঁটে যাচ্ছে পথচারীরা—নির্বিকার। কারণ তখনো ওদের ওপর তাঁর করুণার দৃষ্টি পড়েনি। আমি ভাবলাম, লোকটাকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিই—কোথাও নিয়ে গিয়ে একটু ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে দিই ওর মুখ।

ছুটতে লাগলাম

যেমনি ছুঁতে গেছি ওকে, অমনি সেই নির্বিকার পথচারীদের একজন রুখে এল। কী করছো একে নিয়ে? নিশ্চিন্তে মরতে দাও না। আমি আমতা-আমতা করে বললাম, একটু জল যদি পেতাম...। আরো রুদ্রস্বরে সে আমায় ভর্ৎসনা করলো, জল দিয়ে বাঁচাবে? তারপর ওকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে? নাকি তোমার নিজের কাজে লাগাতে চাও? ছবি তুলে তুলে বিদেশে পাঠাবে। তোমাদের চিনতে বাকি নেই সাহেব, এক্ষুনি যাও এখান থেকে। যেন একজন এঞ্জেল এসে আমায় শাসিয়ে দিয়ে গেল।

বিপদ বেড়ে যাওয়ার ভয়ে আমি পালালাম। ছুটতে লাগলাম। ব্রিজ পার হয়ে হুগলীর ধার ঘেঁষে দৌড়তে দৌড়তে এক সময় পৌঁছলাম সেই বার্নিং ঘাটে—যেখানে ডেথ নিয়ে লোকে উৎসব করে, যেখানে মানুষের ডেডবডিকে ভারী ম্যাজেস্টিক দেখায়।...

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

রেকর্ডে
আধুনিক গান

গ্রামোফোন রেকর্ডে এক শ্রেণীর আধুনিক গান শুনতে শুনতে আজকাল সন্দেহ হয় আমরাই বুঝি যুগের সঙ্গে মিলিয়ে চলতে পারছি না—বোধ হয় পেছিয়ে পড়ছি। আবার এও মনে হয় অগ্রগামিতার লক্ষণ তাহলে কি কতকগুলো ধ্বনি যা বিদেশী সস্তা রেকর্ড থেকে সহজেই আহরণ করা যায়? এই অনুকরণ কি শ্রদ্ধেয়? এই প্রগতি কি বাঞ্ছনীয়?

সম্প্রতি একটি বড় রকমের অনুষ্ঠানে দেখলাম আমাদের সঙ্গীত জগৎ আর আগেকার মত নেই। সেই সৌম্য প্রাচ্য-শালীনতা বিদায় নিচ্ছে। এ গানের আসরে বিদেশী ঔদ্ধত্য সমাদরে সুপ্রতিষ্ঠিত। ধুতি পাঞ্জাবীপরা পরিচালকবর্গ বিদেশী কন্ডাকটারদের কায়দায় সংগীত পরিচালনা করছেন। তাঁদের হস্তসঞ্চালন, মাথানাড়া, অঙ্গভঙ্গী সবই বিজাতীয় ধরনের। হায় ধুতিরই বা কি দরকার ছিল? পোশাকটা পাল্টে নিলেই বোধ হয় সব দিক থেকে মানানসই হত। শিল্পীরাও নিশ্চেষ্ট নন। কায়দা-কানুন তাঁরাও ভাল করেই আয়ত্ত করেছেন। বিশেষ করে কোনও কোনও গায়িকা, তাঁরা আবার এরই মধ্যে কিছু কিছু বিদেশী লাস্যও বিতরণ করেছেন। মনে হচ্ছে অদূরে ভবিষ্যতে নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকার পরিচালনাও এইভাবেই হবে। একজন কন্ডাকটার একবার বাদকের দিকে, একবার নৃত্যরতা শিল্পীর দিকে আর একবার গায়ন সম্প্রদায়ের দিকে নানা ভঙ্গীতে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে থাকবেন এবং এই ভাবে পরিচালনায় মহিমা ঘোষিত হবে।

আধুনিক সঙ্গীতে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবং এগিয়ে যাবার ছবিটা হচ্ছে এইরকম। এখন কথা হচ্ছে এ যজ্ঞের হোতা কারা এবং সমর্থক কারা? এর আদর্শ কি এবং উদ্দেশ্যই বা কি? এই সব প্রশ্নের প্রথম উত্তর হোতা বিভিন্ন রেকর্ড কোম্পানী এবং তাঁদের নিয়োজিত সুরকার। সমর্থক সাধারণ অর্থে জনসাধারণ কিন্তু আসলে লাভের অংশীদার, যাঁরা হোতাদের মধ্যেই পড়েন। উদ্দেশ্য সধারণ অর্থে চিত্তবিনোদন কিন্তু আসলে রুচির বিকার ঘটানো যাতে লঘুমনের উত্তেজনা ঘটে এবং চাহিদার সৃষ্টি হয়। ফলে অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হয়। আর আদর্শ এমন সব বিদেশী গান যাতে আর্টের চেয়ে হুল্লোড় বেশী—যা ও দেশেও একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

মজা হচ্ছে এই যে এই সব বিষ যাঁরা সমাজে প্রচ্ছন্নভাবে প্রবেশ করাচ্ছেন তাঁরা এর দায়িত্ব নিতে নারাজ। যদি আপনি ভাল বলেন অর্থাৎ বিষকে অমৃতবৎ প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেন তাহলে তাঁরা অবশ্যই কৃতিত্বের দাবী করবেন। কিন্তু যদি আপনি বিরুদ্ধ সমালোচনা করে বলেন—মশাই এই ধরনের গান কেন আপনার লোকদের দিচ্ছেন? তা হলে তৎক্ষণাৎ উত্তর পাবেন—আরে মশাই লোকে এই সবই চায়। দোষটা সম্পূর্ণ চাপিয়ে দেওয়া হয় জনসাধারণের ঘাড়ে। অভিযোগটা কি সত্য? লোকে বিজাতীয় উদ্ভট গান শুনতে চাইবে কেন বলুন তো? তারা হালকা জিনিস চাইতে পারে কিন্তু যার সঙ্গে তাদের নাড়ীর যোগ নেই এমন বস্তু তারা কখনই চাইতে পারে না। আসলে ব্যবসায়ের মূল নীতিই হচ্ছে পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তন যত ব্যবসায়ী-দের পরিকল্পনা অনুযায়ী সাধিত হয় ততই লাভের সম্ভাবনা বেশী। প্ল্যানটা আমরা যতটা ভাবি তার চেয়ে অনেক সুদূর প্রসারী এবং এর প্রধান সহায় কতিপয় বশম্বদ সুরকার এবং অনুগত শিল্পী। লোকরুচির অধঃপতনের জন্য দায়ী এই ত্রয়ী আর কেউ নয়। লোকরুচি যে সাধারণভাবে খারাপ এমন প্রমাণ দাখিল করা যাবে না কিন্তু যুগে যুগে পতনশীল রাজসভার মনোরঞ্জনের জন্য বা বাবুদের বিলাসের জন্য কতিপয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিকৃতির সৃষ্টি করেছে এমন প্রমাণ দুর্লভ নয়। অতএব লোকরুচির ওপর দোষ চাপিয়ে নিজেদের দোষ ঢাকা যায় না এবং সে প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয় নয়।

আমার বক্তব্য হচ্ছে রুচির পরিবর্তনই যদি ঘটাতে হয় তা হলে নিকৃষ্টস্তরের বিদেশী গানের অনুকরণ করবার প্রয়োজন কি? ভাল বিদেশী সংগীতও তো আছে যার একটা সার্বজনিক এবং মানবিক আবেদন আছে। বিশেষ করে বিদেশীরা যখন ভারতীয় সংগীতের সবচেয়ে ভালকে পেতে চাইছেন, ভারতীয় রাগসংগীতে তাঁরা মুগ্ধ হচ্ছেন তখন আমরা তাঁদের মন্দকে ঘরে তুলে আনছি—এটা কি পরিতাপের বিষয় নয়? যেসব গানের আমরা অনুকরণ করছি সেগুলি বিদেশী ভদ্রসমাজে তেমন পাংক্তেয় নয়। ওদেশেও সেগুলি একই উদ্দেশ্যে রচিত হচ্ছে। আমাদের সুরকারদের মধ্যে বিদেশী সংগীতে দিগ্গজ পণ্ডিত বড় বেশী নেই। একটু আধটু পিয়ানো বাজাতে জানলেই পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতে ওস্তাদ হওয়া যায় না। আসলে বিদেশী রেকর্ড থেকে কয়েকটা মার্কামারা আওয়াজ আমাদের সঙ্গীতে বসিয়ে দেওয়াটাই হচ্ছে এঁদের সাধনা এবং কৃতিত্ব। এক সময় ছিল যখন রেকর্ড জগতে ভদ্র শিল্পীদের প্রবেশ খুব কমই ছিল কিন্তু তখনও এই ধরনের পরি-কল্পনা ব্যবসায়ীদের মনে জাগে নি। তখনকার মন্দ গানও এমনভাবে জাতির ওপর ধিক্কারের মত বাজত না। বর্তমানে শিল্পীরা ভদ্রসমাজভুক্ত এবং শিক্ষিত। কিন্তু আশ্চর্য--আজ তাঁরা যা পরিবেশন করছেন তা আমাদের গায়ে অপমানের মত বাজছে। যখন দেখি কোনও কোনও ভদ্রগায়িকা কণ্ঠ-স্বরকে বীভৎস করে হুলাহুলাবালার অনুকরণে বাংলা গান গাইছেন এবং তাঁদের সুরকারগণ অকুতোভয়ে পরিচালনা করে যাচ্ছেন তখন লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়।

স্বাধীন ভারতের বিশ বছরে এই আমাদের রুচির উন্নতির নমুনা। এই আমাদের শিক্ষিত, ভদ্র ও প্রগতিশীল সঙ্গীত সমাজ।

রেকর্ডে
বড়ে গোলাম আলী

ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ বাঙালীর হৃদয়ে অসীম সমাদরে প্রতিষ্ঠিত। বাঙালী শ্রোতার কাছে শ্রেষ্ঠ বস্তু হচ্ছে রস। বাঙালী উঁচুদরের সংগীতের কলাকৌশল বোঝে। নানা কূট প্রয়োগের তত্ত্বও তার কাছে অবিদিত নয়। কিন্তু শিল্পীর কাছ থেকে সে কেবল এইটাই চায় না, সে চায় সংগীতশিল্প তার সৌন্দর্য, আকর্ষণ এবং লাবণ্য নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠুক। নূতনত্বের দিক থেকে মহৎ না হলে বাংলা দেশে কোনও শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। রসাত্মক বাক্যকে বলা হয়েছে কাব্য, তেমনি রসাত্মক ধ্বনিকেই বোধ করি সংগীত বলা যায়। যিনি সার্থকভাবে রসের সঞ্চার করতে পেরেছেন তিনিই এ দেশে গৌরবলাভ করেছেন এবং দেখা গেছে সারা ভারতও বাংলার বরমাল্যকেই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়েছেন। বড়ে গোলাম আলী খাঁ নিঃসংশয়েই ওস্তাদ কিন্তু অনুপম রসস্রষ্টা। অতি কঠিন কর্তব্যগুলি তিনি এমনভাবে প্রয়োগ করতেন যা কৃতিত্ব হিসাবেই গণ্য ছিল না যা মর্মস্পর্শী আবেদন বলেই মহত্তম আর্ট বলে স্বীকৃত। তাঁর অতি দুরূহ সাপট তান, সরগম প্রভৃতি সবই কৌশল বলেই অভিনন্দিত নয়, সৌন্দর্য সৃষ্টি বলেই গৌরবান্বিত।

সম্প্রতি লোকান্তরিত এই মহৎ শিল্পীর চারটি লং প্লেইং রেকর্ড গ্রামোফোন কোম্পানির কাছ থেকে পাওয়া গেছে। এর মধ্যে দুটি এইচ এম ভির পরিচয়যুক্ত এবং অপর দুটি ওডিয়নের নামাঙ্কিত।

এইচ এম ভি-র ই এল্ পি ১২৫৮ রেকর্ডটিতে গুণকলি (গুণক্রী বা গুণকরি) এবং মালকোশে দুটি খেয়াল বিধৃত হয়েছে। মালকোশ বহুশ্রুত রাগ কিন্তু গুণকলি কমই শোনা যায়। গুণকলি গান্ধার ও নিষাদবর্জিত এবং কোমল ঋষভ ও কোমল ধৈবতযুক্ত। গানটিতে একটি অতি শান্ত এবং গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছে যা ভোরের স্বপ্নের মত মনে আবেশ সঞ্চার করে। ই এল পি ১২৬৫ রেকর্ডের একদিকে দরবারী কানাড়া অপরদিকে কোশীধানী (?)। খাঁ সাহেবের মনোহর গম্ভীর কণ্ঠে দরবারী সুন্দরভাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয়টি রেখাব ও পঞ্চমবর্জিত উত্তম ধুন। এটিও মধুরভাবে রূপায়িত হয়েছে।

ওডিয়নের এম ও এ ই ৫০০৪ রেকর্ডটির একদিকে রয়েছে গুর্জরী টোড়ী, দেশী টোড়ী, ভীমপলশ্রী, কামোদ এবং পাহাড়ী, অপর দিকে রয়েছে কেদারা, জয়জয়ন্তী, দরবারী কানাড়া, আড়ানা, মালকোশ এবং পরজ। এর মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত "হরি ওঁ তৎসৎ" গানটিও রয়েছে। এই গানগুলি অনেকেরই পরিচিত এবং খাঁ সাহেবের মধুর ব্যক্তিত্ব ও সুললিত ভঙ্গির পরিচয় প্রত্যেকটিতেই গভীরভাবে মুদ্রিত রয়েছে। এম ও এ ই ৫০০৫ রেকর্ডটিতে এক পিঠে পাঁচটি প্রসিদ্ধ ঠুংরী রয়েছে। এর মধ্যে আছে সর্বজনপ্রিয় "আয়ে না বালম" গানটি। অপর দিকে আছে আরও ছ'টি উল্লেখযোগ্য ঠুংরী অঙ্গের গান যাদের মধ্যে রয়েছে প্রসিদ্ধ ঠুংরী "প্রেম কি মারে কাটার"। এই গানগুলিতে খাঁ সাহেবের সুললিত ঠুংরী ঢংটিই যে উল্লেখযোগ্য তাই নয় তাঁর বিশিষ্ট কতকগুলি অনুপম পাঞ্জাবী ঢং যা তাঁর গাওয়া গীতগুলিতে পাওয়া যেত তাও রয়েছে। এই উপভোগ্য বস্তুটি বোধ হয় তাঁর সঙ্গেই অন্তর্হিত হল।

গ্রামোফোন কোম্পানী রেকর্ডগুলিকে সব দিক দিয়ে সার্থক করবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি। শিল্পীর কণ্ঠধ্বনি সুন্দর-ভাবে আবদ্ধ করা হয়েছে। শুনতে শুনতে মনে হয় আমরা যেন তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করছি। জ্যাকেটগুলির পরিকল্পনাও মনোরম।

কয়েকটি বই

ইতিমধ্যে আমরা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই পেয়েছি। এইগুলির মধ্যে স্বর্গত নরেন্দ্রকুমার বসু লিখিত "Melodic Types of Hindusthan" বইটি বিশেষ বিদগ্ধ রচনা। সাত শ' চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী এই গ্রন্থে লেখক উত্তর ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতের তাবৎ বিষয় নিয়ে ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আলোচনা করেছেন। বর্তমানে অধিকাংশ গ্রন্থে যে ধরনের আলোচনা দেখা যায় তাতে এই অনুমানই বদ্ধমূল হয় যে, লেখকদের মূলে শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ধারণার অভাব। ফলে এই গ্রন্থগুলি ছাত্রদের পক্ষে কতটা নির্ভরযোগ্য হতে পারে সে সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়। এই গ্রন্থটি সেইভাবে লিখিত হয়নি। প্রতি বিষয়ে লেখকের প্রত্যক্ষ এবং সুস্পষ্ট জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বরগ্রাম এবং রাগ সম্বন্ধে লেখকের সুগভীর গবেষণা এই বিষয়ে আগ্রহী পাঠকদের বহু জিজ্ঞাস্যের সদুত্তর প্রদান করবে এবং তাঁদের উপলব্ধিগুলি প্রকৃত তত্ত্বের অভিজ্ঞতায় যথার্থ হয়ে উঠবে। এই গ্রন্থটিকে আমরা উচ্চতর সঙ্গীতশিক্ষার পাঠ্যরূপে নির্বাচন করতে অনুরোধ করি। বইটি Jaico Publishing House থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

ওড়িশা থেকে প্রকাশিত "রাগচিত্র" নামক গ্রন্থটি আমাদের গভীর আনন্দ প্রদান করেছে। ওড়িশায় একদা রাগমালা চিত্র অঙ্কনের প্রচলন ছিল এবং এই গ্রন্থের চিত্রগুলি তারই উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সঙ্গীত-দামোদরে উদ্ধৃত ছত্রিশটি এবং এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি রাগরাগিণীর চিত্র এই গ্রন্থে প্রদান করা হয়েছে। এইগুলির সঙ্গে সংস্কৃত শ্লোক ও তাদের ইংরেজি ও হিন্দী তর্জমাও দেওয়া হয়েছে। সম্পাদক উৎকলের প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার কবিচন্দ্র শ্রীকালীচরণ পট্টনায়ক বিশ্বাস করেন যে, ওড়িশী গান চিরায়ত সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। এই বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য তিনি ওড়িশার নানা স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। একটি গ্রামে এক অশীতিপর বৃদ্ধা তাঁর গৃহে যে সব তালপাতার পুঁথি ছিল সেগুলিকে চন্দন এবং সিঁদুর মাখিয়ে পুজো করতেন। পট্টনায়ক মহাশয় তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার পর ক্রমে তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্র হন এবং সেই সব পুঁথি দেখবার সুযোগ পান। এইগুলির মধ্যে তিনি এই রাগচিত্র পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। ঘটনাটি ঘটে ১৯৩৬ সালে। অবশেষে ১৯৬৬ সালে এই সচিত্র পুঁথিটি ওড়িশা সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রতিলিপি সহ প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীঅসিত মুখোপাধ্যায় কীটদষ্ট চিত্রগুলির উপযুক্ত সংস্কার সাধন করেছেন। ওড়িশা মিউজিয়ামের শ্রীকেদারনাথ মহাপাত্রের ভূমিকা থেকে জানা গেল যে, পুঁথিটি ১৭১৩ সালে রচিত হয়। এর লেখকের নাম রঘুনাথ প্রধান। চিত্রগুলি ওড়িশার নিজস্ব রীতিতে অঙ্কিত। এই চিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এগুলি তালপাতার ওপর খুব সরু স্টীলের কলম দিয়ে আঁকা। প্রতিটি চিত্র যে গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে আঁকতে হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। রঙ, তুলি ছাড়াও কেবল সাদাকালোর এই রেখাচিত্রগুলি মনোহারিত্বে অতুলনীয় এবং এর মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের চিত্রের কোনও প্রভাব নেই। চিত্রজগতে গ্রন্থটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীসন্তোষকুমার দে এবং শ্রীকল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য রচিত "কবিকণ্ঠ" গ্রন্থটি রবীন্দ্র সঙ্গীতের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট সংযোজন। এই গ্রন্থটি কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হলেও সম্প্রতি দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে বলে জানা গেল। এর পুনঃপ্রকাশ কিন্তু নিতান্তই বাঞ্ছনীয় কেননা এটি এমন একটি গবেষণা যা সকলের পক্ষে করা সম্ভব নয়। সন্তোষবাবু রেকর্ড জগতে থাকায় তাঁর পক্ষে এটি সম্ভব হয়েছে এবং অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভূমিকা থেকে জানা গেল যে, তিনি বৎসরের পর বৎসর যেভাবে এই কার্যে অনুসন্ধান করেছেন তা বনেদি গবেষকসমাজেও দুর্লভ। বস্তুত এই নাতিবৃহৎ গ্রন্থটিতে আমাদের দেশে রেকর্ড বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ কি করে ঘটেছে সেইটি জানানো হয়েছে। এই ইতিহাস খুবই চিত্তাকর্ষক। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সে কি কি গান কিভাবে রেকর্ড করা হয়েছে তার ইতিবৃত্ত জানতেও সকলেরই বিশেষ ঔৎসুক্য থাকবার কথা। সন্তোষবাবু অতি যত্নের সঙ্গে সেই সব তথ্য আমাদের গোচর করেছেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করাও কম দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। এই কাজটিও বিশেষ পরিশ্রম সহকারে করা হয়েছে এবং এতে সহায়তা করেছেন শ্রীকল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক পরিচয় জানতে গেলে এই গ্রন্থটিও অবশ্য পাঠ্য। যেসব প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রসঙ্গীতের ডিগ্রী ডিপ্লোমা প্রদান করেন তাঁরা এটিকে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন কিনা জানি না; অন্তত করাটা খুবই আবশ্যক বলে আমাদের মনে হয়। গ্রন্থের চিত্রগুলিও তথ্যের প্রমাণ হিসাবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এইগুলি জোগাড় করতেও কম পরিশ্রম করতে হয়নি। এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সঙ্গীতে গবেষণার একটি নতুন দিক খুলে গেছে। এইভাবে আরও অনেক খ্যাতনামা কবি ও গায়কের গান সম্বন্ধে আলোকপাত করতে পারা যাবে। সন্তোষবাবুর কাছে আমাদের অনুরোধ কবি অতুলপ্রসাদ সেনের যেসব গান রেকর্ড করা হয়েছে তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তিনি প্রস্তুত করুন। বর্তমানে আমরা এর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

চিত্র প্রদর্শনী

সম্প্রতি তিনজন শিল্পী অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারীতে তাঁদের প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। তাঁদের নাম : অ্যানা মারিয়া নুনজি (Anna Maria Nunzi), দিলীপ মুখার্জি ও মুজাফফর আলি।

*

শিল্পী অ্যানা মারিয়া নুনজি ইতালীয় মহিলা। নিজ দেশে থাকার সময়ে ভারতের ঐতিহ্য, দর্শন তথা সংস্কৃতির কথা শুনে তিনি মুগ্ধ হন ও গত বছর তিনি এদেশে চলে আসেন। বলা বাহুল্য, তিনি ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করেছেন ও বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন রূপ ও নরনারীর সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা পদ্ধতি দেখে তিনি অভিভূত হয়েছেন। তার ওপর তাঁর আছে শিল্পীসুলভ অনুসন্ধানী চোখ—তাই তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানের আলেখ্য ফুটে উঠেছে।

শিল্পীর অঙ্কনরীতি মিশ্র, অর্থাৎ রচনায় প্রচলিত নানা রীতির সন্ধান পাওয়া যায়, তবে বিষয়বস্তু নির্বাচন ও রঙ ব্যবহার পদ্ধতি দেখে তাঁর বিদেশী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকটি কাজে মাতিস ও তোলোজ-লত্রেকের প্রভাব দেখা যায়—যেমন স্টিল লাইফ ও অন্নপূর্ণা স্টেশন। অন্যান্য রচনার মধ্যে থ্রি এজেস ও লাইফ সাইকেল উল্লেখযোগ্য।

*

শিল্পী দিলীপ মুখার্জি তরুণ, মাত্র দু বছর পূর্বে তিনি সরকারী আর্ট কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এটি তাঁর প্রথম প্রদর্শনী। শিল্পীর মাধ্যম প্রধানত তেলরঙ ও প্যাস্টেল, অঙ্কনপদ্ধতি মিশ্র। প্রদর্শনীতে নানা জীবজন্তু থেকে শুরু করে ফিগারেটিভ ও প্রায়বিমূর্ত রচনার প্রচেষ্টাও দেখা যায়।

শিল্পীর যে সচেতন মন ও চিন্তাধারা দু-একটি রচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় এ প্রদর্শনীতে যেন তার অভাবটুকুই বিশেষভাবে চোখে পড়ল। শিল্পীর অধিকাংশ রচনাই স্কেচ জাতীয়, কয়েকটি দেখে নিখিল বিশ্বাসের স্কেচের কথা মনে পড়ে যায়। একটি ন্যুড স্টাডি অবশ্য মন্দ লাগে না। প্রকৃত কথা এই যে শিল্পী নানা রীতি ও মাধ্যমে নানা বিষয়বস্তু রচনা করেছেন ফলে অধিকাংশই রসোত্তীর্ণ হয়নি। অবশ্য শিল্পীর নিষ্ঠা আছে এবং তিনি যে নিয়মিতভাবে কাজও করে থাকেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে আমার মতে আরও কিছুকাল পরে প্রদর্শনীর আয়োজন করলে শিল্পী ভাল করতেন। শিল্পীর রচনাগুলির মধ্যে এ টাইগ্রেস কর্নার ও ডাস্ক মন্দ লাগে না।

*

শিল্পী মুজাফফর আলি আনুষ্ঠানিকভাবে শিল্প শিক্ষা করেননি—তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের স্নাতক, বর্তমানে একটি প্রচার সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন।

শিল্পীর অঙ্কনরীতি বিমূর্ত। তাঁর রঙ ব্যবহার পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য। বাস্তবিক নানাভাবে নানা রঙ ব্যবহার করে তিনি নানা ইমেজের সৃষ্টি করে গেছেন। নির্বাচিত রঙ তিনি কখনও ক্যানভাসের ওপর তরলভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আবার কখনও বা স্প্রে বা ড্রীপিং প্রথা অবলম্বন করেছেন। তাঁর রঙ ব্যবহার প্রণালী দেখে সহজেই গার্সটন ও পোলকের কথা মনে পড়ে যায়। তবে পার্থক্য এই যে, যেখানে খ্যাতনামা ওই দুই শিল্পী একেন রঙ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে রসসৃষ্টি করেছেন, মুজাফফর আলি সেখানে কেবল রঙের বৈচিত্র্যই সৃষ্টি করেছেন। আসল কথা, এক্ষেত্রে শিল্পী রঙের মাধ্যমে নানা পরীক্ষা করে গেছেন—ফলে কয়েকটি রচনাতে পুনরুক্তির আভাস দেখা যায়। তাছাড়া কেবলমাত্র রঙকে কেন্দ্র করেও সার্থক শিল্প সৃষ্টি করা যায় না। রঙের অবশ্যই একটি মূল্য আছে। নরনারীর দৈহিক সৌন্দর্য বিচারেও রঙের ওপর আমরা গুরুত্ব দিই কিন্তু সেখানেও ফিচারস বা শারীরিক গঠনলালিত্যের ওপর আমাদের নজর থাকে অধিক। তাই সার্থক শিল্পসৃষ্টিতেও রঙ ছাড়া প্রয়োজন হয় অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলার—যাকে একজন মনীষি বলেছেন internal order। মুজাফফর আলির বিভিন্ন রচনায় চোখে পড়ে কেবল নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নানা পরীক্ষা—তাই এ গুলি কেবলমাত্র পরীক্ষাই—শিল্প হিসাবে শেষ কথা নয়। দু একটি অবশ্য ভাল লাগে—আফটার দি রেন, দি বিগিনিং। তবে অধিকাংশই মনে রেখাপাত করে না—কারণ রঙ ও সেই সঙ্গে বৈচিত্র্য থাকলেও তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা দেখা যায় না। একজন খ্যাতনামা সমালোচকের উক্তি উদ্ধৃত করা এখানে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

'. . . . Today the artist's symbols are perforce a private vocabulary. . . . The gap between the contemporary painter and the contemporary public is so wide that we can hardly tell whether any first step is in the direction of closing or off on another tangent.'

শিল্পীর ক্রেয়ন রচিত কয়েকটি কাজ চোখে পড়ে—তাদের মধ্য দিয়ে তাঁর চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

*

ইউনেস্কো আয়োজিত একটি ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয় সরকারী আর্ট কলেজ গ্যালারীতে। ১৯০০ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত রচিত কয়েকজন খ্যাতনামা পাশ্চাত্ত্য শিল্প গুরুদের রচনার প্রতিলিপি প্রদর্শনীতে দেখা যায়। এ বিষয়ে আগামী সংখ্যায় আলোচনা করব।

*

হাওড়ার মুসাফির সম্প্রদায়ের সভাবৃন্দ শিবপুর প্রাণকৃষ্ণ তর্কালংকার লেনে তাঁদের বার্ষিক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন।

চিত্রপ্রিয়

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

ভিয়েনা-প্রাগ

ইউনাইটেড নেশন্সের এক বড় কর্তা একদা আমাকে বলেন, তাঁরা যে-সমস্যা নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন তার প্রধানতম ছিল সংখ্যালঘুকে কি প্রকারে অবিচারের হাত থেকে রক্ষা করা যায়—তা সে-সংখ্যালঘু ভাষাগত, ধর্মগত, রক্তগত যাই হোক না কেন। তার পর দুঃখের সঙ্গে বলেন, 'আমরা বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারিনি।' ভদ্রলোক জাতে ছিলেন ফরাসী; তাই এটা বলার পর তিনি ফরাসী কেতায় শোল্ডার শ্রাগ করলেন—অর্থাৎ যুগ্মস্কন্ধ ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে পুনরায় স্বস্থানে ফেরে নিয়ে এলেন। শেষ করলেন 'এলাস্' বলে। আমি সহানুভূতি জানিয়ে বললুম, 'কার, হেলাস্! ভোয়ালা এ পিতি।'

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে হিটলার চেকোস্লোভাকিয়া দখল করার পূর্বে যারাই ঐ-দেশে গিয়েছেন তাঁরাই জানেন এই ক্ষুদ্র দেশ, রাষ্ট্রটি কী আপ্রাণ চেষ্টাই না দিয়েছিল আপন দেশে গণতন্ত্র সফল করে তোলার—এবং গণতন্ত্রের যে মূলমন্ত্র, অর্থাৎ সংখ্যালঘুকে উৎপীড়ন থেকে বাঁচিয়ে রাখা, সেইটে সে কার্যে সফল করে তুলতে চেয়েছিল। চেকোস্লোভাকিয়ার পশ্চিম প্রান্তে—জরমন সীমান্তের লাগাওয়া এলাকায় বাস করতো জরমনভাষী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, অবশ্য সেই বিশেষ এলাকায় সংখ্যাগুরু, এবং চেকরা সর্বপ্রকারের প্রচেষ্টা দিয়েছিল, সরকারের বিরুদ্ধে এই সংখ্যালঘু জরমন সম্প্রদায়ের কোনো ফরিয়াদ-নালিশ যেন না থাকে। এই এলাকারই জরমন ভাষায় নাম জুডেটেন (ল্যান্ড) এবং এরই অছিলা ধরে হিটলার ১৯৩৮ সালে 'ম্যুনিক চুক্তি' করিয়ে নেন। সে-ইতিহাস পূর্বেই নিবেদন করেছি।

আমি জুডেটেন যাই প্রাগ দেখার পর। তবু যে এ-স্থলেই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলুম তার কারণ চেকোস্লোভাক দেশে পদার্পণ করার অল্পকাল মধ্যেই চেকদের গণতন্ত্র-প্রীতি লক্ষ্য করলুম। শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়,—সামাজিক, অর্থনৈতিক আচার-আচরণেও। সেকথা পরে হবে।

*

ভিয়েনা ও প্রাগের মাঝখানে একটা বড় ইস্টিশেনে গাড়ি দাঁড়াল।

স্বর্গত অজিত বসু রাজনীতিতে হিস্সে না নিলেও বিশ্ব-পলিটিক্স্ বাবদে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কৌতূহলী, স্পর্শকাতর ও সচেতন। হিটলার রাজ্যে তখন একটা সঙ্কট যাচ্ছে। জরমন প্রেস সে বাবদে সম্পূর্ণ নীরব—ডঃ গ্যোবেলস-এর সেনসারীয় চাপে। অস্ট্রিয়ান, সুইস, চেক্ কাগজগুলো কিন্তু নানা প্রকারের গুজোব জনরব গুজোরব ছাড়ছে। ডঃ বসু আমাকে বললেন একটা দৈনিক জোগাড় করতে—ভিয়েনাতে বন্ধুগণ দিয়েছিলেন শুধু সাপ্তাহিক এবং মাসিক।

বিস্তর চেল্লাচেল্লি সত্ত্বেও কাগজ জোগাড় করতে পারলুম না। গাড়ি দাঁড়ায় কুল্লে তিন মিনিট।...আমাদের এই সোনার ইস্টিশান 'বন্দমানে' গাড়ি কুড়ি মিনিট দাঁড়ালেও ভাঁড়ের চা ভিন্ন অন্য চা জোগাড় করা অসম্ভব। আমার সাতচল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা।

কামরায় ফিরে এসে দেখি আমাদের সামনের আসনে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। এই ইস্টিশেনে উঠেছেন। বেশ মোটাসোটা, 'ভদ্রস্থ' ভুঁড়ি, টকটকে লাল হাঁড়িপানা মুখ, সমুদ্রপারের গভীর নীলাকাশের আসমানিয়া রঙের চোখ, অনামিকায় দুটি আঙটি। একটি প্লেন সোনার বিয়ের আঙটি, অন্যটি হীরে বসানো বাগদানকালের। মুখোমুখি বসেছেন বলে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন বটে এবং সে তাকানোতে কৌতূহলও ছিল বটে সে আমলে এবং আজও কটা ভারতীয় চেকোস্লোভাকিয়ায় যেত, বায়?) কিন্তু তাতে কণামাত্র রূঢ় জ্বলজ্বলি ভাব ছিল না।

আমার মনে হল, ভদ্রলোক যেন আমাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে চায়। আর ডঃ বসুও চাইতেন বিদেশীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাদের মনের কথা জানতে। আমার দোভাষী হতে কোনো আপত্তি ছিল না।... আমার আরো মনে হল, ভদ্রলোক আন্দেশা করছেন, এ-রকম অদ্ভুত বিদেশীদের সঙ্গে হঠাৎ কথাবার্তা আরম্ভ করাটা বেয়াদবী হবে কি না।

লক্ষ্য করলুম ভদ্রলোক যেন একবার অভ্যাস বশত বেখেয়ালে তাঁর সিগার-কেসটি বাজুর নিচের পকেট থেকে বের করতে গিয়ে সেটা আবার চেপে দিলেন।

বেশ! আমি মিনিট পাঁচেক পরে আমার সিগারেট প্যাকেট বের করে, তাঁর সামনে এগিয়ে দিয়ে বললুম, 'ইচ্ছে করুন!'

ভদ্রলোক এর জন্য যেন আদপেই তৈরী ছিলেন না। প্রথমটায় বোকার মত তাকিয়ে থেকে তারপর অন্তত দশবার, 'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ—' বললেন।

সিগারেট নিলেন, কিন্তু মিসিস বসুর দিকে আড় নয়নে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু মহিলাটি—তাঁর আপত্তি নেই তো?'

আমি হেসে বললুম, 'দুশ্চিন্তা করবেন না। তাঁর ঠাকুর্দা হুকোর চেন-স্মোকার ছিলেন, তাঁর পিতা—'

'অ! ওয়াটার-পাইপ! আমি ছবিতে দেখেছি।'

এ ধরনের কথাবার্তা হাজার হাজার ভারতীয়ের সঙ্গে হাজার হাজার বিদেশীর হরহমেশাই হচ্ছে; খুব কিছু একটা নূতনত্ব থাকার কথা নয়। কিন্তু চেক জাতের সঙ্গে এই আমাদের প্রথম পরিচয়—না, ভুল করলুম, কিছু কাল পূর্বে কলকাতার বাটা কোম্পানীর (এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের হেড আপিস প্রাগ শহরে) চেক জেনরেল ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—তাই সহযাত্রীর সঙ্গে, আমার রসালাপ আমি বাঙলায় অনুবাদ করে বসুদম্পতিকে শোনাচ্ছিলুম।

ভদ্রলোক কথার ফাঁকে মাপ করবেন বলে বেরিয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ পরে ফিরলেন একখানা জরমন দৈনিক নিয়ে। সবিনয় বললেন, 'আমি গাড়িতে ওঠবার সময় দেখলুম আপনি খবরের কাগজের জন্য ছুটোছুটি করছেন। এই নিন।'

ধন্যবাদ জানিয়ে শুধালুম, 'পেলেন কোথায়?'

একটুখানি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'এতে আর অসুবিধাটা কি?'

আমি চেকারকে গিয়ে বললুম যে একটি ভারতীয় পরিবারের একখানা দৈনিকের প্রয়োজন। আর যাবে কোথা। সঙ্গে সঙ্গে কাকে যে কোলড ব্লডেড মরডর করে কাগজটা এনে দিল জানিনে। যেন ভারতের সম্মুখে চেকোশ্লোভাকিয়ার মান-ইজ্জৎ যায়—'

কথা ফুরোবার পূর্বে চেকার আরেকখানা খবরের কাগজ এনে আমাকে দিতে দিতে শুধলো, আমরা ফরাসী, ইংরিজী খবরের কাগজ চাই কি না? আমি তারস্বরে প্রতিবাদ জানিয়ে বললুম একটা কাগজই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

কেবা শোনে কার কথা!

প্যারিস, ৎস্যুরিষ, ভিয়েনা, লণ্ডনে দৈনিক একটার পর একটা দিয়ে যে লাগলো।

আমি বহু দেশ দেখেছি—এ-পাপ স্থলে বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হল-কিন্তু চেকদের মত সরল, অতিথিবৎসল জাত বিরল, বড়ই বিরল।

ট্রামে বাসে

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নাকি বলিয়াছেন যে, অনুন্নত সরকারী কর্মচারীদের রক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। —"তিনি কতটা কী করবেন জানিনে, তবে তাঁকে স্বর্গত লালচাঁদ বড়ালের অনবদ্য ভাষার রেকর্ড করা গানের চরণটি শুনিয়ে রাখছি—অনুন্নত জনে কেন কর এত অবহেলা, তুমি মারিলে মারিতে পার, রাখিলে কে করে মানা"—সহযাত্রী সুর করেই শুনাইলেন।

গান্ধী জন্ম তিথিতে সত্যরঞ্জন এক সঙ্গে সুতো কাটিতে দেখিলাম পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন দুই মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন এবং শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়কে। "ভোট কাটা করার জন্য সুতোয় মাঞ্জা তাঁরা এক সঙ্গেই দিয়েছেন কিনা তা অবশ্য দেখিনি"—বলেন বিশু খুড়ো।

সংবাদে প্রকাশ, অন্তর্বর্তী নির্বাচনে ভোটদাতার সংখ্যা কম পক্ষে ২০ লক্ষ বাড়িবে।—"ভুয়া ভোটদাতার সংখ্যা এ হিসেবে ধরা হয়েছে কিনা তা অবশ্য বলা হয়নি"—বলে শ্যামলাল।

এবার পুজোয় বাইরে যাওয়ার ভিড় খুব বেশি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল।—"কিন্তু যাত্রীরা অবশ্য (অর্থমন্ত্রী ক্ষমা করবেন) গুচ্ছের টাকা গচ্চা দিলেন, এবারে কলকাতায় মাইকের সংখ্যা কিন্তু খুবই কম"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

কলিকাতার নর্দমা সাফ করিবার উদ্দেশ্যে মেসর বৃটেন হইতে জেট মেসিন আনিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।—"আমরা বলি জেট-এর বদলে অটোমেশন যন্ত্রে কাজ ভালো হবে, আরো ভালো হবে যন্ত্রের বদলে যদি কোন ফুস মন্তর ব্যবহার করতে পারেন"—মন্তব্য সহযাত্রীর।

দলত্যাগ সংক্রান্ত সর্বদলীয় কমিটি এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত নিয়াছেন যে, দলত্যাগীদের এক বছরের মধ্যে মন্ত্রী বা অন্য কোন উচ্চ পদে নিয়োগ করা চলিবে না।—"দলত্যাগেচ্ছুরা নিশ্চয়ই ভাবছেন পেট না ভরলে আর জাত দিয়ে লাভ কী?"—বলে শ্যামলাল।

একটি সংবাদে প্রকাশ, ট্রেড ইউনিয়ন মহলে কিছু আত্মজিজ্ঞাসা শুরু হইয়াছে।—"অতি উত্তম সংবাদ। আত্মানং বিদ্ধি হল ভারতের সেরা বাণী, অন্তত অফুরন্ত অভিযানে সোচ্চার বাণীর চেয়ে ভালো; এতে সংঘাত নেই, পুলিস নেই, ট্রাফিক জ্যাম নেই" বলেন বিশু খুড়ো।

সংবাদে জানা গেল আজমীরে ১৬ জন মেয়ে পকেটমার ধরা পড়িয়াছে।—"কিন্তু এটা কোন সংবাদই নয়। মেয়ে-পকেটমার প্রায় প্রতি বাড়িতেই আছে। তাদের ধরিলে, শুধু গান গাই—তোমার কাছে যে-হার মানি সেইত মোর জয়"—সহযাত্রীরা আজ ট্রামটাকে গানের জলসা করিয়া ছাড়িল।

দিল্লী পুলিসের হাতে এবারে লাঠির বদলে হাল্কা ধরনের গদা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।—"যাত্রার দলের ভীমের গদা যুদ্ধ এবার জমবে ভালো"—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

শুনিলাম কলিকাতায় নাকি সম্প্রতি লবণের অনটন চলিতেছে।—"মনে হয় এইজন্যেই হয়ত আপাতত লবণ হ্রদে গৃহনির্মাণ করতে দেওয়া হবে না"—বলে শ্যামলাল।

বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতে হেকিমি চিকিৎসা ও ঔষধ চলিয়া আসিতেছে। ভারতে ঐগুলির নাম গ্রীক ঔষধ কিন্তু ইউরোপে ঐ ঔষধগুলি এবং চিকিৎসা পদ্ধতি আরবীয় বলিয়া চিহ্নিত। এই কথাগুলি দিল্লী ক্লাবের হলে বলিয়াছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব স্যার আশুতোষ অধ্যাপক ডঃ এম, জেড, সিদ্দিকী।—"ডঃ সিদ্দিকী হাজুড়ে চিকিৎসার ব্যাপারে কিছু ইতিহাস শোনাতে পারতেন, এটা গ্রীক নয়, আরবীয় নয়, নির্ভেজাল খাঁটি ভারতীয়"—বলেন সহযাত্রী।

জলপাইগুড়ি হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, সেখান হইতে ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত কোন এক খরাপীড়িত এলাকার তরুণীরা বিবস্ত্রা হইয়া জোয়াল কাঁধে তুলিয়া নেন। সেখানকার অধিবাসীদের বিশ্বাস নগ্ন মহিলারা মাঠে লাঙল ধরলেই তবে বরুণদেব সন্তুষ্ট হন। সহযাত্রী বলিলেন—"বরুণদেব একটি এন্ড হাউস ড্যাড" !!

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী বলিয়াছেন, শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ-র অনেকখানি পরিবর্তন হইয়াছে।—"কথাটা বিশ্বাস করা শক্ত, আমরা ত জানতাম নাম্বুদ্রিপাদ-র পাদমেকং নট নড়ন চড়ণ"—বলে শ্যামলাল।

গান্ধী শতবার্ষিকীর কর্মসূচী অনুযায় কলিকাতার বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সবরমতিতে অবস্থিত গান্ধীজীর কুটীরের একটি প্রতীক নির্মাণ করিতেছেন। খুড়ো বলিলেন—"গান্ধী নামাঙ্কিত তরণীতে যাঁরা নির্বাচন অর্ণব পার হতে ইচ্ছুক কিংবা বাপু নামমন্ত্রের তুরুপের তাস হাতে নিয়ে মন্ত্রিত্বের গদি, ছেলের হিল্লে নিদেন একটি পারমিটের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী তাঁরা ঘাবড়াবেন না, কুটীরটি স্বগৃহ নির্মাণের মডেল বলে ময়দানে স্থাপন করা হয়নি, রেওয়াজ শ্বেত শার্দুলের মতো প্রদর্শনীর জন্যই করা হয়েছে !!"

বিশু খুড়োই বলিতে লাগিলেন "ট্রামে-বাসে আমাদের লিখিত মন্তব্য পাঠ করতে করতে পাঠক-পাঠিকাদের হয়ত মনে হচ্ছে বিশু-শ্যামলালেরা নাস্তিক হয়ে গেছে, তা নইলে...কিন্তু না, নাস্তিক আমরা হইনি, এ পাড়ায় ওপাড়ায় চাঁদা দিয়ে দিয়ে যখন অস্তিকতা প্রমাণ করেছি তখন বিনি পয়সার বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে আপত্তি করার মতো গর্দভ আমরা নই, পাঠক-পাঠিকা গ্রহণ করুন।"

দিল্লীর ডায়েরি

দুর্গাপূজো উপলক্ষে রাজধানীর বাঙালী-দের জোটে বেশ হাই ডোজের সাংস্কৃতিক টনিক। প্রত্যেক বৎসরই জোটে, যেমনি এবারও। নাচ, গান, কৌতুক, অভিনয়, আবৃত্তি, ফ্যান্সি ড্রেস এবং সর্বোপরি রবীন্দ্র সংগীত, শেষোক্তটি বাদ দেওয়া মানে স্পিরিটহীন টনিক। তাও কি হয়?

এবং রবীন্দ্র সংগীত ক্ষেত্রে ইদানিং এই দ্বিতীয়বার শনিবার অবকাশ হোল যার নামকরণ হয়েছে "কাহিনী সমৃদ্ধ" রবীন্দ্র সংগীত। প্রথমবারের মতো এবারও আমাদের সামনে এনেছেন শ্রীসুধীর চন্দ, তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে "রবীন্দ্রগীতিকা" প্রতিষ্ঠানের সৌজন্যে।

রবীন্দ্রনাথের অনেক গান-সুর রচনার সঙ্গে জড়িত আছে কোনো না কোনো কাহিনী, একে-ওকে নিয়ে, যা কিনা গানের সঙ্গে দেয় নতুন একটা পরিপ্রেক্ষিতে। কাহিনী না-জানলেও গানগুলোর (ভাল গাইতে পারলে) সমৃদ্ধি কমে না, কিন্তু জানলে আরো ভাল লাগে। মন তখন বলে : ও, তাই বলো, এমনি করে হয়েছিল এটির শুরু, এমনি করে সাধারণ ব্যক্তি অথবা ঘটনাকে কেন্দ্র করে কবির সংগীত পাখা মেলে উঠে গেছে সর্বময়তার নীল আকাশে, দৈনন্দিনের গদ্য থেকে পদ্যরসের সংগীতে।

সেদিন স্থান ছিল প্যাটেল নগরের পূজো মণ্ডপ। অন্যান্য যে কোনো মণ্ডপের মতই, কিন্তু সংগীত-কাহিনী সে রাত্রে সেই মণ্ডপকে দিয়েছিল রাজধানীর বাঙালী সমাজে একটা বৈশিষ্ট্য। ক্ষিতিমোহন সেনের প্রথম গান-শোনা রবীন্দ্র কণ্ঠে বোলপুরে থেকে; অখ্যাতদিনের কবির গান; ছবি দেখে কবির "সুরের আগুন" জ্বালানো; ছত্র নীলমণিকে নিয়ে "মাধবী দ্বিধা কেন" প্রশ্ন; সেই টিউবওয়েল নিয়ে গান; আরো কতো।

সবগুলো প্রামাণ্য পুস্তক ঘেঁটে বের করেছেন সুধীর চন্দ, ঘষেমেজে শিখিয়েছেন ছাত্রছাত্রীদের এবং নিজে পরিবেশন করেছেন নিজের সক্রিয় পরিচালনায়। তাঁর এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয়, বিশেষত এই কারণে যে, গানগুলো গীত হয়েছে (একক, দ্বৈত ও সমবেতকণ্ঠে) উচ্চমানে। তাদের মধ্যে ছিল :

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৭ই শ্রাবণ (১৩০২) এক পত্রে "প্রিয় রবীন্দ্রবাবু"কে জানিয়েছেন কোনো এক ভদ্রলোক তাঁকে কী বলেছেন। কিনা এক মাঘোৎসবের সময় কলকাতার একটি উপাসনা মন্দিরে কতকগুলো গুণ্ডা ছেলে এমন জুতোর শব্দ করিতে লাগিল যে ভয়ানক গোলযোগ বাধিয়া গেল। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় গলবস্ত্র হইয়া তাহাদিগকে অনেক মিনতি করিলেন, কেই বা শোনে।" উদ্ধার করল একটি গান, "অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ।" গুণ্ডারা সবাই চুপ এবং গানটা সেই ভদ্রলোকের খুব ভাল লেগেছিল। গায়ককে তিনি দেখতে পাননি, কিন্তু "লোকে বলিয়াছিল রবীন্দ্রবাবুর গান"।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন যখন ১৯০৮ সনের আষাঢ় মাসে শান্তিনিকেতনের আশ্রমের কাজে যোগ দিতে আসেন, সে রাত্রে বোলপুর স্টেশনে খুব বৃষ্টি। উনি লিখেছেন : "পরদিন সকালে পদব্রজেই আশ্রমে রওনা হইলাম। বোলপুরে তখন এতো বাড়িঘর ছিল না। স্টেশন হইতে নামিয়াই শুনিলাম কবি গাহিতেছেন, 'তুমি আপনি জাগাও মোরে।' কী শক্তি তাঁহার কণ্ঠে ছিল! শান্তিনিকেতনে তাঁহার 'দেহলী' নামক গৃহের দোতলায় তিনি দাঁড়াইয়া গাহিতেছেন, আর বোলপুরে তাহা শুনা যাইতেছে। অবশ্য তখন বোলপুরের পথ বড় নির্জন ও শান্ত ছিল।"

কোনোদিন ভাবিনি যে অসিতকুমার হালদারের মতো চিত্রশিল্পীর অবদান রয়েছে "তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে" এই গানে। এটির পেছনে তাঁর আঁকা "সুরের আগুন" ছবি। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন সরস্বতীর একটা ছবি, 'দিব্যপ্রজ্ঞা' সরস্বতী, ক্যালেণ্ডারের নয়। "রবিতীর্থে" অসিত হালদার লিখেছেন, "তিনি যেভাবে বর্ণনাকালে জ্যোতির্দৃপ্ত ভাব প্রকাশ করেছিলেন, তাতে তাঁর সরস্বতীর আভাস পেয়ে একটি 'অগ্নিময়ী সরস্বতী' আঁকলুম। রঙিন ছবিটি সম্পূর্ণ করে রবিদার সামনে ধরতেই তাঁরও মনে সুরের রঙ ধরলো, তিনি তুড়ি দিতে দিতে তাল দিয়ে গুঞ্জন করে রচনা করলেন 'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে'"।

শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশ লিখেছেন কেমন করে কবি কণ্ঠে এল "তোমার বীণা আমার মনো মাঝে"। কোনো একটা ছেলে কবিকে তার লেখা কবিতা পড়ে শুনিয়েছিল। ছেলেটা ছিল পাগল। তার কথা ভাবতে ভাবতে কবি হয়েছিলেন বিষণ্ণ। গানটা তৈরি করে সুর বসিয়ে সেদিন বিকেলেই শেখালেন নির্মলকুমারীকে। "গাইবার সময় বল্লেন, 'সারাদিন ওকে ভুলতে পারছিলুম না বলে মনের মধ্যে গানটা তৈরি হয়ে উঠলো। ও-বেচারার কেবলই তার ছিঁড়ে যায়, তাই বীণাপাণির দরবারে ঢুকতে পারলো না।'"

বান মরা গাঙেও আসে, তরীও ভাসায় লোকেরা। বাউল সুরের এই লোকগীতির গানটা আমরা কতো শুনেছি। অথচ তার সঙ্গে জড়িত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের স্বদেশী যুগ। অনুলেখনে অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন "মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ"-এ : প্রথম বালিকা বিদ্যালয়ে গান শিখতেন শান্তিময়ী দত্ত। ১৯০৬ সনে। "হঠাৎ একদিন ডাক এলো রাস্তার অপরদিকের সার জগদীশ বসুর বাড়ি থেকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সদ্যলেখা স্বদেশী গান শোনাবেন সেখানে। পরম উৎসাহে গিয়ে দেখি কবিকে। কী রূপ! উজ্জ্বল গৌরবর্ণ কালো রেশমের মত চুলগুলি থোকা থোকা করে পাকানো, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা,—সুগৌর কপালে কয়েক গোছা পাক খাওয়া খাটো চুল, উন্নত নাসা, পদ্মপলাশ লোচন, দীর্ঘাঙ্গ সুপুরুষ তরুণ কবি। পরিধানে তসরের ধুতি-চাদর।

"অর্গানে বসেছেন সি আর দাশের ভগ্নী অমলা দাশ। কবি এসে পকেট থেকে নোট বই খুলে গাইলেন—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', এবং 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী'। প্রথমে তিনি একবার গাইলেন শুধু গলায়। তারপর অমলা দাশের বাজনার সঙ্গে।"

(আমরা আর কবিকণ্ঠে কী করে শুনবো? সে ভাগ্য ছিল আর কজনের! এর কিছু কিছু গান সে রাত্রে শুনে আমাদের আনন্দও কম হয়নি।)

হয়তো অতুলপ্রসাদের আনন্দের মতো নয় যেদিন উনি কবিকণ্ঠে শুনেছিলেন, "এই লভিনু সঙ্গ তব"। "পিতৃস্মৃতি"তে লিখেছেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৪ সনের ঐ কাহিনী। গরমে তাঁরা সবাই গেছেন রামগড়ে, যেখানকার 'স্নোভিউ' বাড়ির নামকরণ করলেন কবি "হৈমন্তী"।

দিনেন্দ্র ও মুকুল দে-কে নিয়ে বদরিকাশ্রম তীর্থ দর্শন করে যখন রামগড় এলুম তখন দেখি 'হৈমন্তী' বাড়ি ভর্তি। লখনৌ থেকে এসেছেন কবি অতুলপ্রসাদ ও পরে এলেন সি এফ এণ্ড্রুজ। বাড়ি জমজমাট, দিনেন্দ্রের আগমনে আরো জমে উঠলো। গায়কের ত্র্যহস্পর্শ—এক জায়গায় বাবা, অতুলপ্রসাদ ও দিনেন্দ্রনাথ। 'হৈমন্তী'তে গানের ফোয়ারা ছুটল। বাবা অন্য কাজ ছেড়ে প্রতিদিন নতুন গান রচনা করে তাতে সুর দিতে লাগলেন।"

গান গাওয়ার জায়গা ছিল পাহাড়ের এক গম্বুজমত জায়গায়, যেখানে সকালে বসত আড্ডা। পাহাড়ের ঢেউ তিব্বতের দিকে ধাবমান।

রথীন্দ্রনাথ বলছেন : "মনে পড়ে, অতুলপ্রসাদ একদিন বাবাকে অনুরোধ করলেন, 'আপনি কাল যে সুরটি গুনগুন করছিলেন আপনার ঘরে, আমার বড়ো ভাল লাগছিলো শুনতে, গান-বাঁধা নিশ্চয়ই হয়ে গেছে, ঐ গানটি আমাদের শুনিয়ে দিন।'

'বাবা বল্লেন, সেটা যে দিনুকে এখনো শেখানো হয়নি, তাহলে আমাকেই গাইতে হয়।

"বাবা গাইলেন, 'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।'"

"প্রকৃতির সেই প্রফুল্লতা, গানের কথা, গানের সুর, সব মিলে এক অপরূপ রস-সৃষ্টি করলো। শুনতে শুনতে অতুলপ্রসাদ অভিভূত হয়ে পড়লেন। যতবার গাওয়া হয় তাঁর কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, আর একবার শোনবার জন্যে আকুল হয়ে পড়েন।"

"সম্পাদকের বৈঠকে" জানাচ্ছেন সাগরময় ঘোষ সেই গানটির কথা যা কিনা এসেছিল রাতের বেলায় এবং যখন "তুমি ছিলে না মোর সনে"। নিশিকান্ত ও সাগরময় ছিলেন "মাণিকজোড়" এবং এক সকালে বেড়াতে বেড়াতে তাঁরা এলেন দিনেন্দ্রনাথের উঠোনে। সাগরময় ঘোষের কথায় :

"দিনদা অশ্বত্থ গাছের নিচে একটি আরামকেদারায় বসে আছেন, কোলের কাছে একটা বাঁধানো খাতা, হাতে পেন্সিল। গুনগুন করে সুর ভাঁজছেন আর খাতায় কি টুকছেন। আমাদের দেখেই সোৎসাহে বলে উঠলেন—

'এই যে মাণিকজোড়, আয় আয়। ওগো শুনছো, মাণিকজোড় এসেছে, এবার আমাদের দাও।'

"দিনদা, আপনি খাতায় কি লিখছিলেন?"

"দিনদা বল্লেন, 'আর বলিস কেন? রবিদার কাণ্ড। শেষরাত্রে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন একটা সদ্যরচিত গান তুলে নেবার জন্য। গানটা কালরাত্রে বিছানায় শুয়ে রচনা করেই সুর দিয়েছেন। সারারাত ঘুমোননি পাছে ঘুম থেকে উঠে সুর ভুলে যান।"

"বলতে বলতে দিনদা রবীন্দ্রনাথের সদ্যরচিত গানটি গেয়ে উঠলেন, 'কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে, তখন তুমি ছিলে না মোর সনে।',

"গান থামিয়ে দিনদা বল্লেন :

'তোরাই বল, গানটা যদি রাতের বেলায় এসেছিল, তাহলে তখনই আমাকে ডেকে পাঠালেই তো হত। তা নয়, সারারাত না ঘুমিয়ে জেগে রইলেন, কখন আমি যাব।'"

ভৃত্য নীলমণিকে নিয়ে লেখা "হে মাধবী দ্বিধা কেন" (নির্মলকুমারী মহলানবিশ লিখেছেন "কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে"); কর্ণাটকী সুরে "বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী", আরো অনেক অনেক গান। গেয়েছিলেন : সুধীর চন্দ, কণিকা রায়, শর্মিলা বিশ্বাস, নূপুর মজুমদার, শ্রীপর্ণা বিশ্বাস, অনিতা রায়, মন্দিরা সেন, সুপর্ণা বিশ্বাস, রণেন ঘোষ, শ্যামল রায়, মহেন্দ্র স্রফ ও নরেন্দ বিশ্বাস, মৃদংগ ও অন্যান্য তাল যন্ত্রে প্রদীপ দত্ত।

শুনেছিলাম চমৎকার গানটি : "আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে।" এর পেছনের কাহিনী জানিয়েছেন শান্তিদেব ঘোষ, তাঁর "রবীন্দ্র সংগীত" পুস্তকে। বলছেন :

"১৩২৯ সালে কলকাতায় বিশ্বভারতীর তরফ থেকে 'বর্ষামঙ্গলের' আয়োজন উপলক্ষে অনেক বর্ষার গান রচিত হয়েছিল। আমরা সব গানের দল কলকাতায় কিছুদিন পূর্বে জড়ো হয়েছি। খুব জোর মহড়া চলছিল। জোড়াসাঁকোর বাড়ি সরগরম হয়ে উঠেছিল। এর মধ্যে একদিন হঠাৎ ঠাণ্ডায় গুরুদেবের গলা গেল বসে, বর্ষামঙ্গলে তাঁর আবৃত্তি ইত্যাদি ছিল প্রধান আকর্ষণ। ভাঙ্গা গলা নিয়ে মহা ভাবনায় পড়লেন, নানা প্রকার ওষুধ পাঁচন নিজে খাচ্ছেন, আমাদেরও খাওয়াচ্ছেন, আমাদেরও গলা যাতে না ভাঙ্গে। সেই ভাঙ্গা গলায় একটি গান রচনা করে দিনেন্দ্রনাথ ও আমাদের সকলকে ডেকে শিখিয়ে দিলেন সন্ধ্যায় গাইবার জন্য।

'আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে।'"

খগেন দে সরকার

সাহিত্য সংবাদ

আর্থার মিলারের নতুন নাটক

আর্থার মিলারের নতুন নাটকের প্রকাশ সব সময়েই আকর্ষণীয় সংবাদ। আমেরিকান পাঠকদের কাছে তিনি একজন বিতর্কিত লেখক, তাঁর অনুরাগী ও অপবাদকারীদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান, কিন্তু বাকি পৃথিবীতে ডেথ অব এ সেলসম্যানের নাট্যকারের কাছ থেকে আরও নতুন কিছু পাবার প্রত্যাশা নষ্ট হয়ে যায়নি।

তাঁর পূর্ববর্তী নাটক 'আফটার দি ফল' প্রকাশের পর তিনি যুগপৎ আমাদের উদ্দীপ্ত ও নিরাশ করেছিলেন। 'আফটার দি ফল'-এ তিনি তাঁর ভূতপূর্বা স্ত্রী মেরিলিন মনরোর চরিত্রের ছায়া ও আত্মহত্যার পটভূমিকায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্মৃতি-রূপক প্রভৃতি যেমনভাবে মিলিয়েছিলেন—তাতে প্রত্যাশা অনেক উদ্দীপ্ত হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাটকটিকে খাপছাড়া ও আড়ষ্ট মনে না হয়ে পারে না।

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নতুনতম নাটক 'দি প্রাইস'। নাটকটি আমরা পড়তে পেলাম স্প্যান পত্রিকার জুন ও জুলাই-এর দু' সংখ্যায়, নাটকটি ব্রডওয়েতে অভিনীত হয়েছে বছরের গোড়ার দিকে এবং পরিচালনার আংশিক দায়িত্বও নিয়েছিলেন মিলার নিজেই। নাটকটি আমেরিকার পত্র-পত্রিকায় উচ্ছ্বসিতভাবে নিন্দিত হয়েছে। আমেরিকান সমালোচকদের কথায় সহজে বিশ্বাস করা যায় না। আমরা নিজেরাও নাটকটি পড়ে দেখলুম, বড়ই দুঃখ পেলাম। মাঝারি লেখকদের অসার্থক রচনা পড়লে তেমন খারাপ লাগে না, কিন্তু কোনো মহৎ লেখকের ব্যর্থ রচনা পাঠের পর দুঃখবোধ বড় গভীর হয়।

লেখকদের অনেকগুলি বিপদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই যে, লেখক অনেক সময় তাঁর চরিত্রের মুখে নানা যুক্তিজাল সমন্বিত সংলাপ বসাবার পর এই ভেবে তৃপ্ত বোধ করেন যে, এর দ্বারা তিনি একটা নতুন দর্শন প্রচার করে ফেললেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলো হয় নিছক ভুয়ো দর্শন, রচনাটি শেষ হবার পরও পাঠকের মনে হয়, এহ বাহ্য, আগে কহো আর। মিলার এখানে সেই বিপদে পড়েছেন।

নাটকটিতে আয়োজন ও উপাদানের ত্রুটি ছিল না। দু' অঙ্কের নাটক। নিউইয়র্কের একটি পুরোনো বাড়ি ভেঙে ফেলা হচ্ছে, সেই বাড়িরই ছাদের ঘরে স্তূপীকৃত পুরোনো আসবাব বিক্রি করা হবে, এখান থেকে নাটকের শুরু।

চরিত্র সবসুদ্ধ চারজন। একজন মধ্যবয়স্ক পুলিস অফিসার ও তাঁর স্ত্রী—এঁরা দুজন অপেক্ষা করছেন, একজন ফার্নিচারওয়ালা এসে দরদাম যাচাই করবে। এই পুলিস অফিসার ও তাঁর স্ত্রীর নাম ভিকটর ও এস্থার। পুরোনো ফার্নিচারের ব্যবসা করে যে লোকটি, সে নিজেও অত্যন্ত প্রাচীন, তার বয়েস নব্বই, তার নাম সলোমন, একজন ইহুদী। একটু পরে প্রবেশ করবে ভিকটরের দাদা ওয়াল্টার—একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডাক্তার।

পরিবেশ ও চরিত্রবিন্যাস মিলার অনুরাগীদের কাছে পরিচিত। পারিবারিক মূল্যবোধ ও ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের সম্পর্ক। এদের পরিবারটি এক সময় বেশ সচ্ছল ছিল, সেই আমলের কেনা সব দামী ফার্নিচার—এখন যেগুলো সেকেলে ও মূল্যহীন হয়ে গেছে। দামী কাঠের বিরাট পালঙ্ক—এখন আধুনিক কালের অনেক শয়নঘরের দরজা দিয়ে সেগুলো ঢোকানোই যাবে না। বাবা বেঁচে থাকতে থাকতেই হঠাৎ একদিন দারুণ আর্থিক বিপর্যয় আসে, পরিবারটি সর্বস্বান্ত হয়ে যায়, শেষে মা মারা যান, বাবা অথর্ব হয়ে পড়েন। সেই সময় বড় ভাই ওয়াল্টার সার্থকতার প্রথম ধাপে সবে পা দিয়েছে, অথর্ব বাবাকে দেখাশুনো করার জন্য সে নিজের কেরিয়ার নষ্ট করতে চায়নি, মাঝে মাঝে বাবাকে পাঁচ ডলার মাত্র সাহায্য পাঠিয়ে সে আলাদা থাকে। তখন আমেরিকাতে ডিপ্রেশান চলছে, চাকরি পাওয়া বিষম কঠিন, খাদ্যদ্রব্য অগ্নিমূল্য—ছোট ভাই ভিকটর এই দুঃসময়ে বাবাকে ছেড়ে যেতে চায় নি। সে বিজ্ঞানের ভালো ছাত্র ছিল কিন্তু অর্থাভাবে পড়াশুনো চালাতে পারলো না, ডিগ্রি নিতে পারলো না, পঙ্গু পিতার ভরণ-পোষণের জন্য সে শেষ পর্যন্ত পুলিস বিভাগে একটা ছোট চাকরি নিতে বাধ্য হলো—সারা জীবন সেই সামান্য চাকরি করেই কাটাতে হলো। ওদিকে ওয়াল্টার ক্রমশ উন্নতি করেছে, সুনাম ছড়িয়েছে তার, অর্থোপার্জন করেছে প্রচুর—বাবার কথা চিন্তাও করে নি, ছোট ভাই সাহায্য চাইতে গেলে প্রত্যাখ্যান করেছে—এমন কি দেখা করতে গেলে বা টেলিফোন করলেও উত্তর দেয়নি। গত আঠারো বছরে দু' ভাইতে কোনো সম্পর্ক ছিল না।

ফার্নিচারগুলোর আইনমত মালিক দু' ভাই। বাড়ি ভাঙা হচ্ছে, সেগুলো বিক্রি না করে উপায় নেই, ভিকটর তাই বিক্রির ব্যবস্থা করেছে, ওয়াল্টারের কাছ থেকে অনুমতি নেবার জন্য টেলিফোন করেছিল, সে উত্তর দেয়নি। ঐ সামান্য টাকায় ওয়াল্টারের কিছু যায় আসে না।

পুরোনো ফার্নিচারওয়ালা সলোমন এক বিচিত্র ব্যক্তি। নব্বই বছর বয়েসে সে আর ব্যবসার কথা ভাবে না—তার সংসারে কেউ নেই, কত দিন আর বাঁচবে ঠিক নেই—তার দোকানে সামান্য কিছু আসবাব এখনো আছে—সেগুলো বিক্রি করতে পারলেই সে নিশ্চিন্ত হয়—এতগুলো ফার্নিচার আবার কেনার কোনো দরকার নেই তার—তবুও শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে যায় এই কারণে যে, এতগুলো ফার্নিচার কেনার পর আবার সেগুলো বিক্রি করার জন্য সে আরও দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার প্রেরণা পাবে। দরাদরি করে কিন্তু কৌশলে, এগারো শো ডলার মাত্র দর দেয়।

এই সময় আসে ওয়াল্টার। সে অনেক বদলে গেছে। সে খ্যাতিমান, অর্থবান, কিন্তু তার দাম্পত্য জীবন অসুখী, জীবনে সে অতৃপ্ত, ভাইয়ের কাছে সে এসেছে কিছুটা অনুতপ্ত ভঙ্গিতে, যা হবার হয়ে গেছে, সেসব ভুলে আবার নতুন করে শুরু করা যাক—এইরকম মনোভাব নিয়ে। ফার্নিচারের দামের অর্ধেক নিতে সে অস্বীকার করে। এর থেকেও লোভনীয় প্রস্তাব তার মাথায় আসে—ফার্নিচারগুলো বিক্রি না করে যদি দান করা যায় কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানে—এবং এগুলোর দাম যদি বাড়িয়ে বাড়িয়ে পঁচিশ হাজার ডলার বলা হয়—তা হলে, পঁচিশ হাজার ডলার মূল্যের আসবাব দান করতে পারলে ওয়াল্টারের ইনকাম ট্যাক্স বেঁচে যাবে বারো হাজার ডলার—তার অর্ধেক, দু' হাজার ডলার সে অনায়াসেই দিয়ে দিতে পারে ভাইকে। এস্থার এ প্রস্তাব লুফে নেয়। কিন্তু ভিকটর এত সহজে সব ভুলতে পারে না। ওয়াল্টার বাবাকে ছেড়ে পালিয়েছিল, আর বাবার জন্য ভিকটর লেখাপড়া শেষ করতে পারেনি—নিজের জীবনটা নষ্ট করেছে—এই অভিমান তাকে বারবার ধাক্কা দেয়। ওয়াল্টারের প্রতি সে মাঝে মাঝে একটু নরম হয়ে উঠলেও—পরক্ষণেই এক একটা পুরোনো অভিযোগ উত্থাপন করে। ওয়াল্টার আর একটা প্রস্তাব দেয়, ভিকটর নতুন করে আবার জীবন শুরু করতে পারে—পুলিসের চাকরি সে ছেড়ে দিক—ওয়াল্টার তাকে তার হাসপাতালে বড় কাজ দেবে। ভিকটর এ সবই প্রত্যাখ্যান করে, সে জানে হাসপাতালে চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা তার নেই—ভাইয়ের দয়ায় দেওয়া চাকরি সে নেবে না। সে ওয়াল্টারের কাছে আর কিছুই চায় না—পুরোনো ফাটা আর জোড়া লাগবে না।

এর পর ওয়াল্টার, অন্য কোনো প্রস্তাবের বদলে, আত্মপক্ষ সমর্থনে বাছা বাছা যুক্তি দিতে শুরু করে। এখানেই আর্থার মিলার কতকগুলো কুযুক্তির অবতারণা করেছেন।

ওয়াল্টার বলতে চায় যে, ভিক্টর যে বাবার জন্য জীবনটা নষ্ট করেছে বলে—সেটার কোনো পার্থিব কারণ নেই। আসলে, মহত্ত্ব, আত্মত্যাগ এইসব দেখিয়ে সে নিজের কাছে হীরো সাজবার মোহে পড়েছিল। এতখানি আত্মত্যাগের কোনো প্রয়োজনও ছিল না—বাবা সত্যিই অতটা পঙ্গু ছিলেন না—দায়ে পড়লে তিনি ঠিকই নিজের রুজি-রোজগার করতে পারতেন—আসলে এক ছেলে যে তাঁকে ভালোবাসে, তাঁর সেবা করে— বাবা এটা উপভোগ করতে চেয়েছিলেন স্বার্থপরের মতন—এমন কি ভিকটরকেও তিনি পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন না—তিনি সব সময়েই সন্দেহ করতেন—ভিকটরও যে-কোনো দিন তাঁকে ছেড়ে যাবে, তাই, শেষ পর্যন্ত যে তাঁর ব্যাংকে লুকোনো চার হাজার ডলার ছিল সে কথা ভিকটরকেও বলেন নি, ভিকটরের পড়া বন্ধ হবার সময়ও দেন নি। এবং ভিকটর এত করা সত্ত্বেও, যে-হেতু ওয়াল্টার সার্থক এবং খ্যাতিমান সেইজন্য ছেলে হিসেবে ওয়াল্টার সম্পর্কেই তাঁর বেশী গর্ব ছিল। সুতরাং ভিকটর নিজের জীবন নষ্ট করেছে নিছক একটা মহত্ত্বের আদর্শের মিথ্যে মোহে।

মুশকিল এই, ওয়াল্টার এমন কিছু দারুণ সত্য উদ্ঘাটন করেনি। এগুলো কোনো স্থির সত্য নয়। এগুলো ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে বদলায়। কারুর কাছে ঐ মহত্ত্বের মোহটাই সত্য। সুতরাং আর্থার মিলার মূল্যবোধকে ভাঙার যে উল্লাস নিয়ে নাটকটা লিখেছেন সেটা শেষ পর্যন্ত অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে।

সেক্সবিহীন এই নাটকটি স্ত্রী-ভূমিকা-বর্জিতও হতে পারতো। এস্থারের কোনো ভূমিকাই নেই। দুই ভাইয়ের কথা-কাটাকাটির সুযোগ দেবার জন্য সলোমনকে যে কায়দায় বারবার পাশের ঘরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে—অতিশয় কাঁচা নাট্যকাররাই সে পন্থা গ্রহণ করে। বেশ কিছু জায়গায় আর্থার মিলার নিজের রচনারই পুনরুক্তি করেছেন। 'অল মাই সন্‌স' এবং 'ডেথ অব এ সেল্‌সম্যান'-এর কথা বারবার মনে পড়ে। নাটকটিতে প্রশংসার কি কিছুই নেই? মাঝারি নাট্যকারের রচনা হলে অনেক কিছুরই প্রশংসা করা যেতো, আর্থার মিলারকে করা যায় না।

সনাতন পাঠক

যে বই রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ কী কী বই পড়তেন, কোন ধরনের বই পড়তে ভালোবাসতেন তা জানার জন্যে আমাদের অনেকের মনেই কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। সুদীর্ঘ আশি বছরের জীবনে অসংখ্য—অজস্র বই পড়েছেন তিনি। কিন্তু কোনোদিনই সেই-সমস্ত বইয়ের কোনো তালিকা পাওয়া যাবে না—সেটা সম্ভবও নয়। কোনো পাঠকই বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার তালিকা রাখেন না—তা আশা করাও অসঙ্গত। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর পঠিত বই সম্বন্ধে এখানে-ওখানে যৎসামান্য উল্লেখ করেছেন। শৈশবে ও প্রথম যৌবনে শিক্ষাগ্রহণকালে যে-সমস্ত বই পড়েছেন তার উল্লেখ 'জীবনস্মৃতি'তে আছে। আর অপেক্ষাকৃত পরিণত জীবনে 'ছিন্নপত্রাবলী'তে কয়েকটি বইয়ের প্রসঙ্গে বলেছেন।

'ছিন্নপত্রাবলী'তে উল্লেখিত বইগুলির মধ্যে অ্যানিমেল ম্যাগনেটিজম, আনা কারেনিনা ('এরকম সব sickly বই পড়ে কী সুখ বুঝতে পারিনে'—পত্রসংখ্যা ৪), রঘুবংশ, চেয়ার্ডের-র ফিলজফিক্যাল এসেজ, নেপালীজ বুদ্ধিস্টিক লিটারেচার, এমিয়েল'স জারনাল ('এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু তার খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি'—পত্রসংখ্যা ১১৭), ক্রিটিসিজমস অন কনটেম্পোরারি থট অ্যাণ্ড থিঙ্কারস্, পোলিশ উপন্যাস দি জু, শঙ্করাচার্যের আনন্দলহরী, শেলির এপিসাইকিডিয়ন, বিহারীলালের সারদামঙ্গল, কীটসের কবিতা, ইন্দিরা দেবী প্রেরিত ক্রিস্টিনা রসেটির কবিতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী, ডাউডন সাহেবের লেখা শেলির জীবনচরিত, 'কীটসের একটি ক্ষুদ্র জীবনচরিত' কবির পদ্মাবাসের সঙ্গী ছিল। আর ছিল মহাকবি গ্যেটের জীবনী। কবি লিখছেন—'আমি খড়খড়ি তুলে দিয়ে ভাইমার রাজসভায় গ্যেটের কীর্তিকাহিনী অধ্যয়ন করছি। কোথায় নদীতীরে পতিসর, বোটের মধ্যে আমি, আর কোথায় বিচিত্র কর্মসঙ্কুল ভাইমার রাজসভায় রাজকবি গ্যেটে!' বর্ষার দিনে কবি বৈষ্ণব কবিদের শরণ নিয়েছেন। পড়েছেন পদরত্নাবলী—'কালরাত্তির থেকে খুব ঘন বর্ষা করে এসেছে।...মনের ভিতর একটা উতলা-উন্মনা ভাব নিয়ে আজ প্রাতঃকাল থেকে পদরত্নাবলীর পাতা ওল্টাচ্ছি—বৃন্দাবন-নামক বিরহ-মিলনের একটা মানস রাজ্য দেখতে পাচ্ছি......' (পত্রসংখ্যা—১৬৯)।

তবে ছিন্নপত্রাবলীতে ভ্রমণ-বৃত্তান্তের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ বেশী লক্ষ করা যায়। অক্ষয় উৎসাহে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়েছেন—চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী কুড়িয়েছেন সেখান থেকে। এর কারণ-প্রসঙ্গে কবি লিখছেন—'কাল...একটি তিব্বত ভ্রমণের বই পড়েছি। এরকম নির্জন জায়গায় একলা বসে ভ্রমণের বই পড়তে আমার ভারী ভালো লাগে। এরকম জায়গায় নভেল আমি ছুঁতে পারিনে।...ভ্রমণ-বৃত্তান্তের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, তার মধ্যে অবিশ্রাম গতি আছে, অথচ প্লটের বন্ধন নেই—মনের একটি অবারিত স্বাধীনতা পাওয়া যায়।' (পত্রসংখ্যা ১৬৫) এই তিব্বত-ভ্রমণ কাহিনীর লেখক একজন ফরাসী—রবীন্দ্রনাথ তাঁর নামোল্লেখ করেন নি। ২০৮ সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ আবার ঐ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তিব্বত ও আফ্রিকার ভ্রমণ-কাহিনী তাঁর পড়া হয়ে গেছে। চীনদেশের একটি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত তাঁর হাতে থাকলেও পড়তে ইচ্ছে করছে না। কারণ চীন সম্বন্ধে অনেক বই তিনি পড়েছেন। জনৈকা মহিলা-রচিত পারস্য-ভ্রমণের কাহিনী কাছে থাকলেও তা পড়ার বাসনা নেই। কেননা, তাঁর মতে, 'মেয়েরা ভালো ভ্রমণকারী নয়।' আরো লিখছেন—'যদি দক্ষিণ আমেরিকার খুব-ছবিওয়ালা ভালো বই থাকত তো পড়তুম। কিন্তু থ্যাকারের দোকানে মনের মত বই খুঁজে পাইনে।'

এই হল রবীন্দ্রনাথ-পঠিত বইয়ের এক-গ্রন্থ বিবরণ। এসব ছাড়াও তাঁর বিশাল রচনাবলীর মধ্যে কখনও কখনও অন্যান্য লেখকদের রচনা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দেখতে পাই—রবীন্দ্রনাথ যে সেই সব লেখকদের রচনার সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন তা সহজেই অনুমেয়।

এখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ব্যবহৃত বই নিয়ে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের লাইব্রেরি আরম্ভ হয়। তার থেকেই বর্তমানের বিশ্বভারতীর বিশাল গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজের পড়ার জন্যে যে-সব বই কিনতেন আর পরবর্তী যুগে দেশ-বিদেশের ভক্ত ও অনুরাগীজনের কাছ থেকে যে-সব বই উপহারস্বরূপ পেতেন সবই তিনি ঐ গ্রন্থাগারে পাঠিয়ে দিতেন। কিছুকাল ধরে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র-সদন কর্তৃপক্ষ, রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরযুক্ত এবং তাঁকে উপহৃত বইগুলি উদ্ধার করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এখন যখনই কোনো বইয়ে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর প্রভৃতি দেখা যায় তখনই তা গ্রন্থাগার থেকে রবীন্দ্র-সদনে সংরক্ষণের জন্যে পাঠানো হয়। এই-ভাবে রবীন্দ্র-সদনের গ্রন্থাগারে রবীন্দ্রনাথের পঠিত ও ব্যবহৃত যে বই সংগৃহীত হয়েছে তার সংখ্যা প্রায় দেড় শ'। প্রধানত তিনটি ভাষার বই আছে—বাংলা, সংস্কৃত আর ইংরেজি। ফরাসি ও জার্মান ভাষার বইও দু'একখানি আছে। তবে ইংরেজি বই-ই সবচেয়ে বেশি। দেশি-বিদেশী সাহিত্যের বই ছাড়া আছে ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বই—আছে ইতিহাস, বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ধর্মশাস্ত্রীয় বই। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ বহু বিচিত্র ধরণের বই পড়েছেন—'জ্ঞানের দীনতা পূরণ করেছেন 'ভিক্ষালব্ধ ধনে'।

ইংরেজি ও বিদেশী সাহিত্যের যে-সমস্ত বই আছে তার মধ্যে মহাকবি গ্যেটে সম্বন্ধে রচনাই বেশী। যথা—দি স্টোরি অব গ্যেটে'জ লাইফ, গ্যেটে'জ ড্রামাটিক ওয়ার্কস (রবীন্দ্র-স্বাক্ষরযুক্ত), জার্মান ভাষায় ফাউস্ট, দি ফার্স্ট পার্ট অব গ্যেটে'জ লাইফ প্রভৃতি। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর-সহ অন্যান্য বই হল—দি অক্সফোর্ড বুক অব ইংলিশ প্রোজ, জার্মান ভাষায় হাইনের কাব্যসংকলন, বেনেডেত্ত ক্রোচে'র ইউরোপীয়ান লিটারেচার ইন দি নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি, দি কমপ্লিট ওয়ার্কস অব ব্রেট হার্ট, উইলিয়ম রাফ ইঙ্গের স্টাডিস অব ইংলিশ মিস্টিক্স, রুশ উপন্যাস দি লিটল্ ডেমন, লুকাস ম্যালেটের রচিত উপন্যাস দি ওয়েজেস অব সীন, জেমস রাসেল লোয়েলের লিটারেরি এসেজ, লাভ ইজ এনাফ (নাটক), টু লাইভস (কাব্য), দি স্টারস লুক ডাউন। যে সমস্ত বই রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত বলে রক্ষিত হয়েছে তার মধ্যে আছে ওমর খৈয়াম, নোগুচি'র ফ্রম দি ইস্টার্ন সী, আপটন সিনক্লেয়ারের ড্যামেজড গুডস, মনোমোহন ঘোষের সঙস অব লাভ অ্যান্ড ডেথ, আর সি ট্রেভেলিয়নের নাটক ও কবিতা-সংগ্রহ দি ব্রীজ অব ডাইনাস্টস, আরনেস্ট রীজের সঙ অব দি সান, আর এল স্টিভেনসনের দি মাস্টার অব ব্যালানট্রে, আই এ বুনিনের দি জেনটেলম্যান ফ্রম সান্ফ্রান্সিসকো, ডন কুইকসোট, রবার্ট ব্রীজেসের নিউ ভারস, এজরা পাউণ্ডের রিপোসটেস, স্টার্জ মুরের দি লিটল্ স্কুল,

পল ভ্যালেরি'র ভ্যারাইটি, সরোজিনী নাইডুর—দি বার্ড অব টাইম, সরলা দেবীর উপহার লাইফ অ্যান্ড লেটারস্ অব রবার্ট ব্রাউনিঙ (রৈমা'র জন্মদিনে সপ্লি), ভনমুডির দি পোয়েমস অ্যান্ড প্লেজ মেসফিল্ডের পোয়েমস, উইলফ্রেড ওয়েনের পোয়েমস প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, বইগুলি সবই প্রায় রবীন্দ্রনাথকে উপহৃত—বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লেখক-লেখিকারাই উপহার দিয়েছেন।

ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ জাতীয় কিছু বই আছে—তার মধ্যে রয়েছে সুধীরচন্দ্র মজুমদারের বাগ্‌ধারা-সংগ্রহ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দি ওরিজিন অ্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট অব দি বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ—দুইখণ্ড ও বেঙ্গলি ফোনেটিক্স, প্রাকৃত ব্যাকরণ প্রাকৃত-পৈঙ্গল আর এলিমেন্টস অব দি কমপ্যারেটিভ গ্রামার অব দি ইনদো-জার্মানিক ল্যাংগুয়েজ। বাগ্‌ধারা-সংগ্রহ সযত্নে পড়ে কোনো কোনো বাগ্‌ধারা পেনসিল-চিহ্নিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সুনীতিবাবুর ও-ডি-বি-এল-এর দ্বিতীয় খণ্ডে ৬৯৫ পৃষ্ঠায় নী, আনি প্রভৃতি প্রত্যয় সম্বন্ধে যেখানে আলোচনা আছে সেখানে ডানদিকের মার্জিনে কবি পেনসিলে লিখছেন, 'উকীলনী কেন হল না? ব্যারিস্টারিণী হতে আটক নেই।' আট, আটী প্রত্যয়ের পাশে আবার লিখে রেখেছেন—'ভরাট' 'জমাট'। বলা বাহুল্য, ঐ উদাহরণ দুটি সুনীতিবাবু দেননি। প্রত্যয়ের মত উপসর্গ পর্যায়ে যেখানে বি, বে উপসর্গ সম্বন্ধে আলোচনা আছে সেখানে 'বেঘোরে' শব্দটা নেই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'বেঘোরে মারা যাওয়া'। প্রাকৃত-পৈঙ্গল গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ 'অরু' শব্দের পাশে লিখে রেখেছেন 'অপর=অরু=আর'। এরকম মন্তব্য ইন্ডো-জার্মানিক গ্রামারেও পাওয়া যায়।

এবার বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের যে অল্প কয়েকটি বই আছে তাদের সম্বন্ধে বলি। 'জীবনস্মৃতি'-তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কর্তৃক সংকলিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতাম।' ঐ কাব্যসংগ্রহটিও রবীন্দ্রসদনে সযত্নে রক্ষিত আছে। এর মধ্যে আছে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস, রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ, মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল। পদাবলীর বিভিন্ন পদের পাশে পাশে পেনসিলে তিনি শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন-ভাষাতাত্ত্বিক টীকা রচনা করেছেন। এছাড়া আছে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, কবিকঙ্কণ চণ্ডী। আর রয়েছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উপহার সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদকল্পতরু, সর্বসংবাদিনী, বৌদ্ধগান ও দোহা, ন্যায়দর্শন, নেপালে বাংলা নাটক, সারদামঙ্গল প্রভৃতি। সংস্কৃতগ্রন্থের মধ্যে আছে রামায়ণ, মালতী-মাধব ও কাদম্বরী।

ধর্মশাস্ত্র, দর্শন ও শিক্ষাবিষয়ক বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ অনূদিত ও সম্পাদিত বৃহদারণ্যক, ঈশ, কেন, কঠ, মণ্ডুক ও মাণ্ডুক্য, ছান্দোগ্য ও প্রশ্ন প্রভৃতি উপনিষদ সমূহ, দীনবন্ধু শাস্ত্রী সম্পাদিত ঋগ্বেদসংহিতা ও অথর্ববেদ সংহিতা, দেবেন্দ্রবিজয় বসুর পদ্যানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ শ্রীমদ্ভাগবতগীতা (নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির দিনে কবিকে উপহৃত)। রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরযুক্ত মোহিতচন্দ্র সেনের দি এলিমেন্টস অব মোরাল ফিলজফি, জেমস মার্টিনিয়ানের টাইপস অব এথিকেল থিয়োরি (এতে প্লেটো, স্পিনোজা, দেকার্তে সম্বন্ধে আলোচনা আছে), রায় ঈশ্বের যেথ প্রভৃতি দর্শনের বইগুলি রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত। আর অন্যান্য দর্শনের বই হল আউটলাইনস অব দি ফিলজফি অব রিলিজিয়ন (এণ্ডরুজ পিয়ার্সনের উপহার), আর বি হ্যালডেনের দি পাথওয়ে টু রিয়ালিটি (বইটি দ্বিজেন্দ্রনাথও ব্যবহার করেছেন), আলবার্ট সোৎয়াইৎজারের দি কোয়েস্ট অব দি হিস্টরিক্যাল জেসাস (লেখক কবিকে উপহার দিয়েছেন)। শিক্ষা সংক্রান্ত বই জন ডিউই রচিত এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড নেচার, নোয়েল ডেভিসের এডুকেশন ফর লাইফ রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন।

বিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ আবাল্য। তাই তাঁর ব্যবহৃত বইগুলির মধ্যে বেশ কিছু বিজ্ঞানের বইও পাই। যে বইটি রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরযুক্ত তা হল জর্জ মিভার্টের অ্যান ইনট্রোডাকশন টু দি এলিমেন্টস অব সায়েন্স। অন্যান্য বইয়ের মধ্যে আছে হার্বার্ট স্পেনসারের দি প্রিনসিপ্যালস অব বায়োলজি (রবিকা'র জন্মদিনে উপহার—সুরি ও বিবি অর্থাৎ সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবী), জর্জ ডবলু গ্রে'র নিউ ওয়ার্ল্ড পিকচার (পদার্থবিদ্যার বই)। বিজ্ঞানী বন্ধু জগদীশচন্দ্রের বই আছে বেশ কয়েকখানি। যেমন—দি নারভাস মেকানিজম অব প্ল্যান্টস (জগদীশচন্দ্র উপহারপত্রে লিখেছেন—টু মাই লাইফলঙ ফ্রেন্ড রবীন্দ্রনাথ টেগোর), লাইফ মুভমেন্টস ইন প্ল্যান্টস (শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বন্ধুবরেষু), দি ফিজিওলজি অব দি অ্যাসেন্ট অব স্যাপ, প্ল্যান্ট রেসপনস ইত্যাদি। তারই মাঝে রয়েছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্পাদিত 'রাসায়নিক পরিভাষা'।

চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় আছে। পাঁচখানি চিকিৎসা সংক্রান্ত বই তাঁর লাইব্রেরিতে পেয়েছি। যথা—দি বায়োকেমিক সিস্টেম অব মেডিসিন, ইনডিজেনাস ড্রাগস অব ইণ্ডিয়া, লিডার্স ইন হোমিওপ্যাথিক থেরাপেটিকা, লিডিং রেমিডিস, আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এন এম চৌধুরীর এ স্টাডি অন মেটিরিয়া মেডিকা।

ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে বইগুলির মধ্যে আছে ভিনসেণ্ট স্মিথের দি আর্লি হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া, হার্বার্ট স্পেনসারের দি স্টাডি অব সোসিওলজি (রবিকা'র জন্মদিনে উপহার—সুরি ও বিবি), এইচ ফিল্ডিং হলের এ পিপল অ্যাট স্কুল (বর্মা সম্বন্ধে বই), ভেরনন লী'র ইউফোরিয়ান (শেষোক্ত বই দু'খানি রবীন্দ্র-স্বাক্ষরযুক্ত), স্যার জন ল্যাববক বার্টের দি বিউটিজ অব নেচার অ্যান্ড দি ওয়ানডার্স অব দি ওয়ার্ল্ড উই লিভ ইন (রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরের নীচে তারিখ লেখা আছে ১৮৯৩ সাল), জর্জ রাসেলের (যিনি A E নামে খ্যাত) দি রিনুয়্যাল অব ইয়ুথ (রবীন্দ্র-স্বাক্ষরযুক্ত) ও দি হিরো ইন ম্যাপ, জি ভুলিয়ারের হিস্টরি অব ড্যান্সিং, সুইডেনের প্রখ্যাত সাহিত্যিক সেলমা ল্যাগারলোফের রচনার অনুবাদ দি ওয়ানডারফুল অ্যাডভেনচারস অব নাইলস প্রভৃতি। এর মধ্যে ভিনসেন্ট স্মিথের ইতিহাসে চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসার সম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদে যেখানে 'রিপোর্টার' শব্দের প্রতিশব্দ 'প্রতিবেদক' লেখা আছে সেখানে রবীন্দ্রনাথ পেনসিলে লিখেছেন—'Report=প্রতিবেদন'। কুমার মুনীন্দ্র দেব রায়ের গ্রন্থাগার বইখানি সযত্নে পড়ে কবি ঐ বইয়ের প্রচ্ছদের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় স্বহস্তে মন্তব্য লিখেছেন—'বাংলা দেশে গ্রামে নগরে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা সর্বত্র ব্যাপ্ত লাভ করবে। এই প্রচেষ্টা যাতে কেবলমাত্র চিত্তবিনোদনের উপলক্ষ্য মাত্র না হয় এবং সংস্কৃতিসাধনাকে লোকসমাজে বিস্তারিত করতে পারে সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি দেবার সময় এসেছে। কুমার শ্রীমুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের গ্রন্থাগার পুস্তকখানি এই পথে দেশের মনকে চালনা করতে পারবে সেইজন্য তাঁর এই পুস্তকখানির সফলতা কামনা করি।'

এই হল রবীন্দ্রনাথ যে-সব বই পড়েছেন, যেগুলি রবীন্দ্র-সদনে সংরক্ষিত হয়েছে তার মোটামুটি বিবরণ। সংখ্যায় বেশী না হলেও বৈচিত্র্যে তারা যে বিপুল তাতে সন্দেহ নেই।*

* এই রচনাটির জন্যে রবীন্দ্র-সদন কর্তৃপক্ষের সহায়তা পেয়েছি।

পুস্তক পরিচয়

সাহিত্য সমালোচনা

সোনার তরীর দিগ্‌দর্শন। ইন্দ্রজিত। ইন্দ্রলোক প্রকাশনী : ৬নং শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-২০। মূল্য তিন টাকা।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা সম্বলিত সাতষট্টি পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটিতে লেখক রবীন্দ্রনাথের সোনারতরী কাব্যের কবিতাগুলির তত্ত্বদর্শন বিশ্লেষণ করেছেন। সোনারতরী রবীন্দ্রনাথের বহু বিতর্কিত কাব্যগ্রন্থ, কারণ সোনার তরী থেকেই রবীন্দ্রকাব্যধারা একটি বিচিত্র মোড় নিয়েছে। শুধু তাই নয়, এ-ই রবীন্দ্র সাহিত্যের সোনার ফসলের যুগ। সোনার তরীর তত্ত্বালোচনা এই প্রথম অবশ্য নয়, তবে কাব্যমূল্য বাদ দিয়ে তত্ত্ব তল্লাস এই প্রথম বলেই মনে হয়। সেই হিসাবে এই ধরনের গ্রন্থ রচনা খানিকটা দুঃসাহসী কাজ। লেখক আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গেই সে কাজ সম্পন্ন করেছেন। তাঁর সঙ্গে সবাই হয়ত একমত হবেন না, অনেক তত্ত্ব এবং প্রতীক বিশ্লেষণ অপ্রত্যাশিত মনে হবে কিন্তু লেখকের মৌলিকতা এবং নূতনত্ব অস্বীকার করার উপায় থাকবে না। মুদ্রণ বিষয়ে প্রকাশকের আরও যত্নবান হওয়া উচিত ছিল।

২৫৫।৬৮

বিপ্লবের ইতিহাস

অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম (প্রথম খণ্ড)। অনন্ত সিংহ। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯। এগার টাকা।

ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে উনিশ শ' ত্রিশ খ্রীষ্টাব্দ একটি স্মরণীয় বৎসর। বাংলা দেশের চট্টগ্রামে এই সময় সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে সূর্য সেনের নেতৃত্বে এক সশস্ত্র যুববিদ্রোহ হয়েছিল। ওই বিদ্রোহের অন্যতম সহযোদ্ধা বিপ্লবী শ্রীঅনন্ত সিংহ আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা। চট্টগ্রামের যুববিদ্রোহ কোন বিচ্ছিন্ন সশস্ত্র সংগ্রাম নয়, সমগ্র জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য। এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি আনুগত্য রেখেই আলোচ্য গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে। এই কারণে গ্রন্থখানিকে সাতটি ক্রমবাহিক পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চট্টগ্রামের যুববিদ্রোহের মূল্যায়নে ব্রতী হয়েছেন। পরাধীন যুগে আমাদের জাতীয় নেতৃত্বের দুটি প্রধান দিক, সহিংস সংগ্রাম এবং অহিংস আন্দোলন—এই দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে সশস্ত্র বিপ্লবের তুল্য-মূল্য বিচার করা হয়েছে। আমাদের দেশে সন্ত্রাসবাদের অভ্যুত্থান ও বিকাশের রূপরেখাটিকে শ্রীসিংহ নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। বস্তুত, চট্টগ্রামের যুববিদ্রোহের পটভূমিকায় স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীচেতনা এবং সক্রিয়তার যে ছবি লেখক এঁকেছেন এ গ্রন্থে তার মূল্যও অনেকখানি।

শুধু তথ্য বা পরিকল্পনার দিক থেকেই নয়, গ্রন্থখানির আকর্ষণ আরো অনেক কারণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিপ্লবী সংস্থার দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মের টুকরো টুকরো ছবি, দুঃসাহসিকতা, আত্মত্যাগ এবং মরণ-পণ সংগ্রামের ঘটনাবহুল চিত্রগুলির প্রতি পাঠক তীব্র আকর্ষণ অনুভব করবেন। শ্রদ্ধেয় অনন্ত সিংহ যেহেতু ওই বিদ্রোহের অন্যতম নেতা এবং কর্মী, ফলে অনেক অনাবিষ্কৃত ঘটনা এবং কর্মপন্থা সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল হতে পেরেছি। ডাকাতি, রেল কোম্পানীর টাকা হস্তগত করা, নাগা পাহাড়ের যুদ্ধ—অসংখ্য ঘটনা, যার অংশীদার স্বয়ং গ্রন্থকর্তা, অভিজ্ঞতা এবং রচনাগুণে আমাদের কাছে দৃশ্যময় হয়ে উঠেছে। বস্তুত, শ্রীসিংহ নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের মত ইতিহাসের অন্তর্গত ঘটনাসমূহের নীরস বিবরণ দেন নি। বাস্তব ঘটনাগুলিকে উল্লেখযোগ্য এবং আকর্ষণীয় কাহিনীর ফ্রেমে সাজিয়ে গেছেন। এবং প্রতিটি ঘটনাই পাঠককে অভিভূত করে। কেননা, প্রত্যেকটি ক্রিয়াকলাপের সঙ্গেই লেখক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। এর মধ্যে আবার অনেকগুলি তাঁরই নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। গ্রন্থখানিতে আরো একটি বিশেষ দিক লক্ষণীয়, তা হল—সর্বত্রই প্রতিটি ঘটনার ব্যাখ্যায় লেখক এক অনন্য আবেগকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, যে আবেগ আমাদের মনে অতীত দিনগুলির মুক্তি যুদ্ধ সম্পর্কে দেশপ্রেমের সঞ্চার করে। গ্রন্থ শেষে তথ্যপঞ্জী এবং নির্ঘণ্ট অংশের যোজনা করায় প্রতিটি ঘটনা এবং উল্লেখিত চরিত্র ঐতিহাসিক এবং প্রামাণিক মর্যাদা পেয়েছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এখনও অসম্পূর্ণ এবং অবিন্যস্ত। প্রস্তুয়মান জাতীয় জীবনের প্রেরণা এবং মূল্যায়ণ কখনই সম্ভব হয়ে উঠবে না, যদি না স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে সুযোগ্যতার সঙ্গে অনুসন্ধান করা হয়। এই দিক থেকে গ্রন্থখানির মূল্য অসীম। আলোচ্য গ্রন্থে উনিশ শ' ত্রিশের যুববিদ্রোহের প্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্বে শেষ হয়েছে। আরো দুটি খণ্ড রচিত হলে চট্টগ্রামের যুববিদ্রোহ এবং অস্ত্রাগার অধিকারের কাহিনী ও তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা সমাপ্ত হবে। আমরা আশা রাখি শ্রদ্ধেয় অনন্ত সিংহ অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করে স্বদেশবাসীকে অসীম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করবেন।

১৬৩।৬৮

শারদ সাহিত্য

কালি ও কলম। সম্পাদক : বিমল মিত্র। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট : কলকাতা-১২। মূল্য ২·৫০।

স্বল্প সংখ্যক নিছক সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকাবলীর মধ্যে 'কালি ও কলম'-কে নির্দ্বিধায় প্রথম সারিতে ফেলা যায়। তথ্য ও তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ ও রসসমৃদ্ধ গল্পের সমাবেশে আলোচ্য আশ্বিন সংখ্যাখানি সাহিত্য-রসিকদের মনোরঞ্জনে সক্ষম হবে। লেখকের তালিকায় বিশিষ্টদের মধ্যে আছেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, গোপাল হালদার, বিমল মিত্র, সুশীল রায়, সমরেশ বসু, ওঙ্কার গুপ্ত, বারীন্দ্রনাথ দাশ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু গৌতম, শংকর, তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রমিত্র, বিভূতি পট্টনায়ক, আশিষ মজুমদার, যজ্ঞেশ্বর রায় প্রভৃতি।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি। সম্পাদক : সঞ্জীব-কুমার বসু। চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ : ১০ হেস্টিংস স্ট্রীট, কলকাতা-১। মূল্য ৩·০০।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসারে একনিষ্ঠ এই ত্রৈমাসিকখানি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে তার ঐতিহ্য এবারেও অক্ষুণ্ণ রেখেছে। পত্রিকাখানির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে চিন্তাশীল পাঠকদের তৃপ্ত করার মতো এই সংখ্যায় লেখকদের মধ্যে আছেন প্রবোধচন্দ্র সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দেবকুমার চক্রবর্তী, কালিদাস দত্ত, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাই সামন্ত, তারকনাথ ঘোষ, সুনীলচন্দ্র সরকার ও সুখময় মুখোপাধ্যায়। সচরাচর দেখা যায় না এমন কতক ছবির সংযোজন সংখ্যাখানির সৌষ্ঠব বাড়িয়েছে। সংগ্রহ করে রাখার মতো একটি সংকলন।

পথিক। পূজা সংকলন। যুগ্ম সম্পাদক : শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅমিয় চট্টোপাধ্যায়। ১ টাকা ৫০ পয়সা।

আলোচ্য সঙ্কলনে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ

ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ, খেলাধুলো এবং রাজনীতি বিষয়ক রচনাও স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধ লিখেছেন ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, ডঃ সুরেশ মৈত্র, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রভৃতি। গল্প-লেখকদের মধ্যে আছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, মতি নন্দী প্রভৃতি। কবিতা হরপ্রসাদ মিত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির।

শারদীয় কথাসাহিত্য। সম্পাদক: গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ। ৩ টাকা ৫০ পয়সা।

এই সংকলনে দুটি উপন্যাস, গল্পও আছে অনেকগুলো। কবিতাগুলো বিশেষ এক ধরনের। প্রবীণদের পাশাপাশি তরুণরাও যেন এখানে অনাধুনিকতার সঙ্গে রফা করতে ব্যস্ত। গল্পের মধ্যে পরিমল গোস্বামীর 'জোড়-কলম' এক কথায় দারুণ লেখা। হাসির গল্পের মন্দার বাজারে তাঁর লেখাটা খুব ভালো লেগেছে। শরৎ-চন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনা তিনটেও বেশ ভালো আবিষ্কার। যতীন্দ্রমোহন দত্তের ক্লাসিকসের টিপ্পনী বিষয়ক লেখাটি নতুন ধরনের এবং উল্লেখযোগ্য। সব মিলিয়ে ৩০০ পৃষ্ঠার প্রমাণ সাইজের সংকলন বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকদের ভালো লাগবে।

কৃশানু। সম্পাদক: দীনেশ সিংহ ও মৃন্ময় চক্রবর্তী। ১৮ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১·০০।

প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতার সম্ভারে সংখ্যা-খানি সমৃদ্ধ। অধিকাংশ লেখক অখ্যাত হলেও সামগ্রিক বিচারে রচনাবলীতে সাহিত্যানুরাগিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভাবীকাল। সম্পাদক: সুধাংশু গুপ্ত। ১১৬/১সি বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা-১০। মূল্য ১·৫০।

ভাবীকাল সাহিত্য বাসরের মুখপত্রের এই বিশেষ সংখ্যাখানিতে স্বনামধন্য কথাশিল্পী ও চিন্তাবিদদের কয়েকজনের রচনা আছে। কিন্তু চেহারায় এবং উপাদানে এমন বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য পাওয়া যায় না যে-জন্যে রাষ্ট্রপতি থেকে দেশের জনকতক মনীষীর অভিনন্দন লাভের যোগ্য—যে সব পত্র সংখ্যাখানিকে সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মুদ্রিত হয়েছে।

অভিযান। সম্পাদক: তপনকিরণ রায় ও জয়নারায়ণ সাহা। রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর। মূল্য ১·০০।

কয়েকজন নামকরা ছাড়া আলোচ্য পত্রিকাখানির অধিকাংশ লেখকই অখ্যাত। ফলে গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে কিছু কিছু দুর্বল রচনা স্থান পেয়েছে। তবে মফস্বল থেকে প্রকাশিত পত্রিকা বিবেচনা করলে সাহিত্যের প্রতি নিষ্ঠার দিক থেকে প্রকাশক প্রশংসা লাভ করবেন।

মননী। সম্পাদক: অমরনাথ ভট্টাচার্য। ১০ বিন্ধ্যবাসিনীতলা রোড, কলিকাতা-৫৭। মূল্য ০·৫০।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শক্তিপদ রাজগুরু, আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শংকর চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, সুবোধ রায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ, ডঃ প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ রায়, শিশিরকুমার ভট্টাচার্য প্রভৃতির রচনা সংখ্যাখানি প্রধান আকর্ষণ। আকারে ছোট্ট হলেও একটা মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা লক্ষ করা যায়।

বার্তা। সম্পাদক: রবীন্দ্রনাথ সিকদার। জলপাইগুড়ি। মূল্য ১·০০।

দু'একজন ছাড়া সংখ্যাখানির পাতা ভর্তি করেছেন স্থানীয় লেখক ও লেখিকা। সেদিক থেকে একটি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা।

কাঁচা লেখা। সম্পাদনা: সুশান্ত চক্রবর্তী। জনকল্যাণ সমিতি: দেশবন্ধু নগর, কলিকাতা-৫৯। মূল্য ১·০০।

লেখকের তালিকায় নামকরা বলতে কয়েকজন মাত্রই দেখা যায়। অধিকাংশ রচনাই শিক্ষানবীশদের লেখা। পত্রিকার নামেতেই প্রকাশক অকপটে সেটা জানিয়ে দিয়েছেন। শিক্ষানবীশদের হলেও অনেকেরই রচনা প্রতিশ্রুতিপূর্ণ।

মানবমন: সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশক পাভ্‌লভ ইনস্টিটিউট, ১৩২।১এ বিধানসরণী কলকাতা-৪। মূল্য ২·৫০। ৭ম বর্ষ শেষ সংখ্যা।

মানবমনের এই সংখ্যা বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছে। শিল্প ও সাহিত্য সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরে বিষ্ণু দে ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ দ্বিজেন গাঙ্গুলীর ছাত্র বিশৃংখলতা নিয়ে সমীক্ষা ও ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বপ্নতত্ত্ব বিশেষ মূল্যবান প্রবন্ধ। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বিশেষ যুগের স্বল্প সমন্বিত নাটক "যুগান্ত" সত্যই এক অপূর্ব সৃষ্টি। মনোবিজ্ঞানের, জীববিজ্ঞানের, সমাজ-বিজ্ঞানের একমাত্র বাংলা পত্রিকার বহুল প্রচার কামনা করি।

প্রাপ্তি স্বীকার

অভিশপ্ত নায়ক। শ্রীঅনঙ্গ পাণ্ডা। গ্রন্থপীঠ: ২০৯বি বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ৪·০০।

মুক্তিপথ। মাস্টারমশাই। ইণ্ডিয়ান বুক ডিস্ট্রিবিউটিং কোং: ৬৫।২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা। মূল্য ৫·০০।

পাক-ভারতের রূপরেখা। প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী। শ্যামা প্রকাশনী: চাকদহ, নদীয়া। মূল্য ১৩·০০।

সুখের বড় কাছে। শৈলেশ ভট্টাচার্য। সেকাল একাল: ৭ টেমার লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ৩·০০।

অগ্নি বনাম মসী। সুনীত ঘোষ। লক্ষ্মী প্রিন্টিং প্রেস: ৩৩/৪ রামদুলাল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩·৫০।

স্নেহলতা। কুসুমকুমারী রায়চৌধুরানী। গ্রন্থপ্রচার: ২০/এ গোবিন্দ সেন লেন, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪·০০।

লোকগীতি+স্বরলিপি। বারিন দেববর্মণ। ম্যানস মিউজিক্যাল সাপ্লায়ার্স: ধানবাদ। মূল্য ১·৭৫।

অন্ধকার থেকে আলো...মুক্তি। কান্তি গুপ্ত। বি চৌধুরী: ১৪৪এ বকুলবাগান রোড, কলিকাতা-২৫। মূল্য ৩·২৫।

চাবুক আন্দোলনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রথম পদক্ষেপ। শ্রীরামকৃষ্ণ দাশ। ৩৬ আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ০·৫০।

গাথা গীতিকায় চিরন্তনী বাঙলা। অজিতকুমার মিত্র। সেঞ্চুরী পাবলিশার্স: ৫৩ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ৪·০০।

কিন্নরলোক। জ্যোতি চৌধুরী। ছাত্র-শিক্ষা নিকেতন: ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৬·০০।

গল্প বলি গল্প শোনো। নরেন্দ্র দেব। অশোক প্রকাশন: ৫৬২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩·৫০।

গল্প বলি গল্প শোনো। মণীন্দ্র দত্ত। অশোক প্রকাশন: ৫৬২ কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা-১২। মূল্য ৩·৫০।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী। ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ। অশোক প্রকাশন: ৫৬২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৫·০০।

মহা আবির্ভাব। শ্রীপূর্ণেন্দু সেন। সারস্বত ভবন: রামসীতাপাড়া, নবদ্বীপ। মূল্য ১·০০।

গুরুগোবিন্দ সিং। হরবন্স সিং। অনুবাদ: উপেন্দ্রকুমার দাস। গুরুগোবিন্দ সিং ফাউণ্ডেশন: চণ্ডীগড়। মূল্য ৫·০০।

কাঁচের দেওয়াল। রূপক গুপ্ত। সিগনেট প্রেস: ২৫-৪ একবালপুর রোড, কলিকাতা-২৩। মূল্য ৫·০০।

অরণ্যদেব ✱ লী ফক

কী সুন্দর সমুদ্রতীর! আরে, সবুজ রঙের ছোট্ট একটা ঘরও রয়েছে!
চলো সমুদ্রে নামা যাক।
চমৎকার সাঁতার কাটা যাবে।
ও-সব পরে হবে। আগে মালপত্তর নামিয়ে কাজে হাত লাগাও!

?

কালাডীঘির সোনা-খেলা .....
আরে, এই বালি দেখছি জুতোয় আটকে যাচ্ছে!
ঠিক বালি নয়, গন্ধক জাতীয় জিনিস।

শুধু তুমি জানো আর আমি জানি যে, এ হচ্ছে সোনা।
চুপ! চুপ!
চটপট এ ব্যাটাকে খতম করতে হবে!

কাউডি, এই সবুজ রঙের ঘরটা কার?
তা দিয়ে তোমার কী হবে? থলের মধ্যে বালি বোঝাই করতে থাকো।
ও লোকটা আবার কে?

2/18

কী বলছে ওই লোকটা?
ওদের ভাষা আমি একটু একটু বুঝি। লোকটা বলছে, এখানে প্রবেশ নিষেধ, এটা অরণ্যদেবের জায়গা।

লোকটা বলছে, ওই হচ্ছে অরণ্যদেবের চিহ্ন।
এখান থেকে আমাদের চলে যেতে বলছে।

বটে?
উঃ...

লোকটা একে-বারে মরে যায়নি তো?
না। ওকে বেঁধে রাখো। তারপর থলিগুলো বোঝাই করো। দেরি কোরো না।

চলবে (১২)

খেলার মাঠে

অলিম্পিক খেলাধুলার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ। পৃথিবীর সব দেশের প্রতিনিধিও অনুষ্ঠান কেন্দ্রে সমবেত হয়েছে। এই শনিবার, ১২ অক্টোবর উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো শহরে আধুনিক অলিম্পিকের উনিশতম অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার কথা। অলিম্পিকের আদি ভূমি গ্রীসের অলিম্পিয়া পর্বতের সানুদেশে জিউস দেবের মন্দিরে অতসী কাচের সাহায্যে প্রজ্বলিত পূত অনল জলপথ ও স্থলপথে অ্যাথলীটদের হাতে হাতে বাহিত হয়ে মেক্সিকোর মাটিতে পৌঁছে গিয়েছে। তবু মনের কোণে সংশয় : অলিম্পিক নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে তো? সংশয়ের কারণ মেক্সিকো সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র-আন্দোলন। শুধু ছাত্রই বা বলি কেন, ছাত্রদের সঙ্গে ক্ষেতমজুর এবং শ্রমিকরাও যোগ দিয়েছে, গেরিলাদেরও সক্রিয় অংশ রয়েছে। ইতিমধ্যে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গিয়েছে। প্রাণহানিও কম হয়নি। যদিও সামরিক বাহিনী যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে মেক্সিকোর সারা শহরে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। উদ্যোক্তারাও সুষ্ঠু-ভাবে অলিম্পিক পরিচালনার জন্য বদ্ধপরিকর। তবু কেউ আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। আশঙ্কা, যে-কোন সময়ে আন্দোলন আরম্ভ হতে পারে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। অলিম্পিক খেলাধুলার ইতিহাসে এমন অনিশ্চয়তা আর কোনদিন দেখা দেয়নি। ভাবছি, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি কি কুক্ষণেই মেক্সিকো শহরকে উনিশতম অলিম্পিকের স্থান হিসাবে নির্দিষ্ট করেছিলেন!

প্রথম থেকেই নানা বাধাবিপত্তি। প্রথম আপত্তি ওঠে বহু দেশের অলিম্পিক কমিটির তরফ থেকে মেক্সিকো খুব উঁচু জায়গা বলে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মেক্সিকোর উচ্চতা ৭৩৪৯ ফুট। আপত্তির কারণ এত উঁচু জায়গায় ক্রীড়াবিদরা তাঁদের যথাযথ উৎকর্ষের পরিচয় দিতে পারবেন না এবং তাঁদের শ্বাসপ্রশ্বাসেরও কষ্ট হবে। এই আপত্তি কাটাতে উদ্যোক্তাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। দেহবিজ্ঞানী চিকিৎসকদের পরীক্ষানিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করতে হয়—উচ্চতা অ্যাথলীটদের উৎকর্ষের প্রতিবন্ধক হবে না। আবহাওয়ার সঙ্গে একটু খাপ খাইয়ে নিতে পারলে অ্যাথলীটরা সমতল ভূমির মতই মেক্সিকোতে সুযোগ-সুবিধা পাবেন। তাতেও অনেকের সন্দেহের ঘোর না কাটায় উদ্যোক্তাদের তিন-তিনবার প্রাক-অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে হয়।

আধুনিক অলিম্পিকের প্রবর্তক ব্যারন পিয়ের দ্য কুবার্তী

দ্বিতীয় বিঘ্ন আসে আমেরিকার নিগ্রো অ্যাথলীটদের কাছ থেকে। তার সঙ্গে অবশ্য মেক্সিকোর সম্পর্ক নেই। নিগ্রোরা তাদের প্রতি শ্বেত সম্প্রদায়ের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে মেক্সিকো অলিম্পিক বয়কটের হুমকি দেয়। শেষ পর্যন্ত তারও মীমাংসা হয়।

কিন্তু তৃতীয় বিঘ্ন উপস্থিত হয় দক্ষিণ আফ্রিকার অলিম্পিকে যোগদানের প্রশ্নে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকাকে অলিম্পিকে যোগদানের অনুমতি দিলে এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশ অলিম্পিক বয়কট করতে বদ্ধপরিকর হয়। শেষ পর্যন্ত তারও মীমাংসা হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভায় দক্ষিণ আফ্রিকাই অলিম্পিক থেকে বাদ পড়ে।

আবার একটা ছোট সমস্যা দানা বেঁধে ওঠে—রোডেশিয়ার অংশ গ্রহণকে কেন্দ্র করে। ইউনাইটেড নেশনস সিকিউরিটি কাউন্সিলের সাম্প্রতিক সনদ অনুযায়ী রোডেশিয়ার অলিম্পিক থেকে বাইরে থাকবার কথা। কিন্তু যেহেতু রোডেশিয়া আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সদস্য দেশ, সেহেতু উদ্যোক্তা কমিটি রোডেশিয়াকে আমন্ত্রণ করতে বাধ্য হন। তবে রোডেশিয়ার কোন নাগরিকের বিদেশী পাসপোর্ট পাবার সম্ভাবনা নেই এবং কোন বিমান পরিবহণ সংস্থাও কোন রোডেশিয়া-বাসীকে বিমানে তুলবে না। তাই তাদের অলিম্পিকে যোগদানেরও সম্ভাবনা নেই।

উচ্চতার প্রশ্ন, নিগ্রো সমস্যা, দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপার এবং রোডেশিয়ার ঝামেলা মিটে যাবার পর মেক্সিকো শহরে আরম্ভ হয় ছাত্রদের সরকারবিরোধী আন্দোলন। তার আগে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যায় মেক্সিকোর বহু বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে যায় এবং এক লক্ষ মানুষ হয় গৃহহারা। ছাত্র-আন্দোলন এখনো তীব্র। তাই বলছিলাম, অলিম্পিক ইতিহাসে কোন উদ্যোক্তা সমিতিকেই এত ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা পোহাতে হয়নি মেক্সিকোর মত।

প্রাচীন অলিম্পিকে গ্রীক অ্যাথলীটের আবরণহীন দেহ-সৌন্দর্য

অলিম্পিক এক বিরাট অনুষ্ঠান। সর্ব-বৃহৎ এবং ব্যাপক চতুর্বার্ষিক অনুষ্ঠানও বলা যায়। পৃথিবীর কোন অনুষ্ঠানই এত ব্যাপক এবং বিরাট নয়। এর জন্য কত প্রস্তুতি, কত পরিকল্পনা, কত উদ্যোগ-আয়োজন এবং কী বিপুল অর্থব্যয় হয়, তা কারো অজানা নয়।

আবার পক্ষকালব্যাপী অলিম্পিক অনুষ্ঠান পৃথিবীর প্রথম সারির ক্রীড়াবিদদের চরম উৎকর্ষ দেখাবার মাধ্যমই শুধু নয়। অলিম্পিক নানা রকমের খেলা-ধুলার শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা হলেও এর সঙ্গে আচার, নিষ্ঠা, ধর্ম, সংস্কৃতির যোগ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের উদ্দেশ্য, এক জাতি, এক প্রাণ, একতার মহামন্ত্র, মহত্তর সংগ্রামের আদর্শ।

*

অলিম্পিক গ্রীকদের দান। অনাদি কালের স্রোত বেয়ে আজ আমাদের সামনে উপস্থিত। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল এই অলিম্পিক। সেকালে সুদীর্ঘ বারোশো বছর ধরে খেলার এই উৎসব হয়ে এসেছে। একবারও ব্যতিক্রম হয়নি। ইতিহাস-নির্ণীত অতীতের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী এই বারোশো বছরের

প্রথম পুরস্কার : ২৫,০০০৲ টাকা
মিনিকুইজ বি-তে লিলতার ভিশ

- ২৲ টাকা পাঠালে লিটকুইজ সাপ্তাহিকের ৮টি সংখ্যা পাবেন
- স্বনাম ঠিকানা লেখা ১০ পয়সা দামের পোস্ট কার্ড পাঠালে অবিলম্বে সমাধান জানানো হবে।
- ৩৭নং লিটকুইজের সকল পুরস্কার পাঠানো হয়েছে।

18 CLUES

(1) Man has within himself tremendous powers and latent faculties of which he has really never had any **CONCEPTION|INTIMATION.**

(2) A necessary prerequisite in the progress of civilization has always been the **CONCORD|CONTACT** between peoples.

(3) Education, through the medium of English, has doubtless been responsible for several **CONFLICTS|EVILS** in our midst.

(4) To the man who enjoys without **CONTENTMENT|DISCERNMENT,** life is a long disease.

(5) A people may be highly civilized but may not be as highly **CULTURED|DEVELOPED.**

(6) Life is both light and **DELIGHT|LEARNING** to the discerner, pursuit and attainment, pleasure and pilgrimage.

(7) True **DEMOCRACY|HISTORY** must not suppress facts, however unpalatable.

(8) The heart's sway is absolute: the head, **EFFICIENT|EXCELLENT** though it is, must take a subordinate place.

(9) There is no universal order outside the pale of universal **EQUALITY|MORALITY.**

(10) No man of sense will hesitate to agree that reason has a vital role to play in man's search for **FREEDOM|WISDOM.**

(11) Even in the midst of miseries and bitter agonies of life there exist moments of **LAUGHTER|LIGHT.**

(12) If God is there in every man, then everyone has got to be **LIBERAL|LIBERATED** as a matter of course.

(13) Love of justice will lead you to recognize every person's right to **LIBERTY|LIFE.**

(14) There is no end to our desire for possessions and **PLEASURE|POWER** and it grows by what it feeds on.

(15) A person who lacks **PRESTIGE|PRIVILEGE** may bear prejudice against one who enjoys it.

(16) Love and devotion are blind without wisdom and useless without **SACRIFICE|SERVICE.**

(17) There is no rest or **SANITY|SECURITY** anywhere.

(18) Man in the present age is far more **SENSIBLE|SENSITIVE** and tolerant then he ever was in the past.

১। মানুষের মধ্যে কত যে প্রচণ্ড শক্তি আর ক্ষমতা সুপ্ত রয়েছে সে সম্বন্ধে প্রকৃত **ধারণা/খবর** কখনো মেলেনি।

২। মানুষে মানুষে **মিল/সম্পর্ক** থাকা, সব সময়ই সভ্যতার বিকাশের এক প্রয়োজনীয় শর্ত।

৩। ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা—নিঃসন্দেহে, আমাদের মধ্যে অনেক **সংঘর্ষের/অনর্থের** জন্যে দায়ী।

৪। যে জন **সন্তুষ্টি/বিবেচনা** না ক'রে ভোগ করে, জীবন তার এক দীর্ঘ পীড়া ছাড়া কিছু নয়।

৫। কোন কোন লোক খুব সভ্য হলেও বোধহয় ঠিক ততটা **সুসংস্কৃত/বিকশিত** নন্।

৬। বিবেচক মানুষের কাছে জীবন আলোকময় আর **আনন্দময় / জ্ঞানময়,** অন্বেষণ ও সিদ্ধি, ভোগ আর তীর্থযাত্রা—দুই-ই।

৭। সত্য **গণতন্ত্রে/ইতিহাসে** সত্য যতই অরুচিকর হ'ক, তাকে দমন করা উচিত নয়।

৮। হৃদয়ের শাসন পূর্ণময়—বুদ্ধি যতই **কার্যক্ষম/উৎকৃষ্ট** হ'ক না কেন, অধস্তন তার আসন।

৯। বিশ্বব্যাপী **সাম্যের/নৈতিকতার** সীমার বাইরে বিশ্বব্যাপী কোন ব্যবস্থাই নেই।

১০। মানুষের **মুক্তির/জ্ঞানের** সন্ধানে রয়েছে বিবেকেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, এ কথা স্বীকার করতে কোন বিবেচক মানুষই ইতস্তত করবে না।

১১। জীবনের সব দুর্দশা আর তিক্ত যাতনার মাঝেও রয়েছে **হাসিভরা/আলোকময়** মুহূর্ত।

১২। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যদি ঈশ্বর থাকেন তা হ'লে স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেকের **উদার/মুক্ত** হওয়াই উচিত।

১৩। প্রত্যেক মানুষের **স্বাধীনতার/জীবনের** দাবী স্বীকার করার দিক আপনাকে নিয়ে যাবে ন্যায়প্রিয়তা।

১৪। সম্পদ, **আনন্দ/অধিকার** কামনার অন্ত নেই আমাদের, আর এসব ভোগের জিনিষ পেলে তা বেড়েই চলে।

১৫। **প্রতিষ্ঠা/বিশেষ অধিকার** যে লোকের নেই, যারা তা ভোগ করে তাদের বিরুদ্ধে সে হয়ত দ্বেষ পোষণ করে।

১৬। বিবেক বিনা প্রেম ও আসক্তি অন্ধ, আর **ত্যাগ/সেবা** বিনা তা নিষ্ফল।

১৭। কোথাও নেই বিশ্রাম কিম্বা **সুবুদ্ধি/নিরাপত্তা।**

১৮। আজকের যুগে মানুষ, অতীতে যতটা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী **বিবেচনাশীল/সংবেদনশীল** ও সহনশীল।

দ্রষ্টব্য :—ওপরের ধাঁধাগুলি বিভিন্ন ভারতীয় লেখকদের লেখা থেকে নেওয়া কয়েকটি প্রশ্ন। এগুলি সব সম্পূর্ণ বাক্য ও নিজস্ব সম্পূর্ণ অর্থ বহন করে। লেখক/প্রবন্ধকারের নাম ও তাঁহাদের রচনার নাম সরকারীভাবে সমাধানের সঙ্গে লিট্‌কুইজ উইকলিতে প্রকাশ করা হবে।

প্রাচীন গ্রীসের মন্দিরের গায়ে হকি খেলার চিত্র। হকি খেলায় ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্যের জন্য অনেকে হকিকে ভারতীয় খেলা বলে মনে করলেও হকি যে বিদেশী খেলা এই চিত্রই তার প্রমাণ

মেয়াদী কাল। পৃথিবীর কোন রাজবংশ এতকাল ধরে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে পারেনি, কোন নিরূপিত সমাজ-ব্যবস্থা, কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এতকাল রূপান্তরিত না হয়ে একাদিক্রমে টিকে থাকতে পারেনি। তাই প্রাচীন অলিম্পিকের এই খেলার কথা ভাবলে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, কী ছিল এই খেলার মধ্যে, যা একে অফুরন্ত প্রাণরসে প্রীত, সম্পুষ্ট, সমৃদ্ধ করে বারোশো বছরের দীর্ঘায়ু করে রেখেছিল।

প্রাচীন অলিম্পিকের বিরাট চন্দ্রাতপের তলে এককালে ফুটে উঠত আবরণহীন মানবদেহের সুঠাম সুন্দর ছবি—যা পটুয়াকে যোগাতো শিল্পপ্রেরণা, কবিকে দিত ছন্দের ব্যঞ্জনা। সেখানে সুন্দরের সঙ্গ পেয়ে, শান্তিসৌন্দর্যভরা স্বপ্নের কল্পনায় কবির হৃদ্‌গগনে সৌরভেতে পবন হত মন্থর, রূপস্রষ্টা শিল্পীর চিত্ত হত রঞ্জিত।

প্রাচীন অলিম্পিকের ইতিহাস রূপ-কথার মত বিচিত্র। অলৌকিক ইতিকথার কাহিনীতে বিরাট। সে সব কাহিনীর অবতারণা না করেও বলা যায়, খৃষ্টপূর্ব ১৪৫৩-এর আগে গ্রীসকে বলা হত 'হেল্লাস'। হেল্লাস ছিল বহু খণ্ডে বিভক্ত। অগণিত দলপতি ও ছোট ছোট দেশের নায়ক স্বার্থের সংঘাতে যখন যুদ্ধ বিগ্রহে মেতে উঠেছিলেন—যুদ্ধের লেলিহান শিখা সমস্ত গ্রীসকে যখন প্রায় গ্রাস করে ফেলেছিল— অত্যাচার, উৎপীড়ন আর লাঞ্ছনায় গ্রীসের আপামর জন-সাধারণের জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ তখন তারা অলিম্পিক খেলাধুলার মধ্যেই নাকি খুঁজে পেয়েছিল শান্তি ও মৈত্রীর জ্যোতির্ময় রূপ। অলিম্পিক খেলাধুলার মধ্য দিয়েই নাকি যুদ্ধোন্মাদ গ্রীসে শান্তি ফিরে এসেছিল।

'অলিম্পিক' কথাটির উৎপত্তির বিবরণ হয়তো সকলেরই জানা আছে। গ্রীসের দক্ষিণ দিকে এথেন্স শহর থেকে প্রায় ১২৫ মাইল দূরে এক সুন্দর ও সমতল ভূমি, যার একদিকে আলফিয়াস ও ক্ল্যাডিয়াস নদীর মোহনা, অন্যদিকে সবুজ গাছপালায় ঘেরা ছোট ছোট পাহাড়। এই সমতল ভূমির নাম 'অলিম্পিয়া'। আর পর্বতমালার শিখর দেশকে বলা হত 'অলিম্পাস'। গ্রীক ভাষায় অলিম্পাস কথার অর্থ স্বর্গ বা দেবতাদের আবাস-ভূমি। কবি হোমারের মহাকাব্যে অলিম্পিয়া পর্বতের বর্ণনায় বলা হয়েছে, অলিম্পিয়া পর্বতমালার শিখরে ছিল দেবতাদের বাসভূমি। এই অলিম্পিয়াতেই সেকালের খেলাধুলো হত বলে নাম হয়েছে 'অলিম্পিক'।

অলিম্পিকের নানা উপকথা ও নানা কাহিনীর মধ্যে একটি কাহিনী হচ্ছে দেবতাদের আদেশেই অলিম্পিক খেলাধুলার প্রবর্তন। উপকথাই হোক, আর কাহিনীই হোক, খৃষ্টপূর্ব ৭৭৬ থেকে খৃষ্টোত্তর ৩৯৪ পর্যন্ত প্রায় বারোশো বছর ধরে যে গ্রীসে অলিম্পিক খেলাধুলো চলেছে তা ইতিহাসস্বীকৃত।

রোম সাম্রাজ্যের উত্থান ও গ্রীসের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অলিম্পিকের গৌরব এবং মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। খেলার মধ্যে ন্যায়, নীতি, পবিত্রতা ও ধর্মীয়-ভাবের বদলে অনাচার, অর্থলিপ্সা ও পাপ ঢুকতে আরম্ভ করে। ফলে ৩৯৪ খৃষ্টাব্দে রোম সম্রাট প্রথম থিওডিসাস অলিম্পিক বন্ধ করে দেন। ক্রমে বর্বর বহিঃশত্রুর আক্রমণে অলিম্পিয়ার ক্রীড়া নিকেতন এবং মন্দিরগুলিও ধ্বংস হতে থাকে। ৪২৬ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় থিওডিসাস অলিম্পিক স্টেডিয়াম ঘিরে যে পাঁচিল দেওয়া ছিল তাও ভেঙ্গে দেন। অলিম্পিয়ার যে স্মৃতিচিহ্ন তখনো বাকি ছিল প্রায় ১০০ বছর পরে তাও ভূমিকম্পে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। তারও পরে আলফিয়াস নদীর বন্যায় সমস্ত ধ্বংস-স্তূপ চলে যায় মৃত্তিকার অতল গহ্বরে।

অনাদিকালের স্রোতে অলিম্পিকের অতুল ঐশ্বর্য এবং অতীত ঐতিহ্যের ইশারা পেয়ে জার্মানীর আর্কিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউট অলিম্পিয়ার প্রান্তরে খোঁড়া-খুঁড়ি আরম্ভ করে। ৭ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর অন্ধকারের অন্তর থেকে মানবজাতির প্রাচীনতম গৌরবময় ইতিহাস আবিষ্কৃত হয়। প্রায় দেড় হাজার বছর পরে ১৮৯৬ সালে এথেন্স শহরেই আরম্ভ হয় আধুনিক কালের প্রথম অলিম্পিক।

আধুনিক অলিম্পিকের প্রবর্তক ফরাসী মনীষী ব্যারন পিয়ের দ্য কুবার্তা। তিনি ছিলেন লেখক, দার্শনিক ও শিক্ষা-বিদ। তিনি ঘুরেছেন ইংলণ্ড, আমেরিকা ও গ্রীসের পথে পথে, অলিম্পিয়ার বিজন পথহীন প্রান্তরে। ঝোপ-জঙ্গলে ঢাকা সেকালের খেলার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে খুঁজেছেন খেলার দেবীকে। কুবার্তা খুঁজেছেন গ্রীকদের জীবনের ক্রীড়াছন্দকে। ধ্যাননিমগ্ন সাধক গাছপালা, ঝোপঝাড় এবং মাটির ঢিবির মধ্যেই পেয়েছেন খেলার দেবতার সন্ধান। তাঁরই প্রচেষ্টায় আধুনিক অলিম্পিকের প্রবর্তন এবং অলিম্পিক খেলাধুলো আজ শান্তি মৈত্রীর সহায়ক।

সেই অলিম্পিকের উনিশতম অনুষ্ঠান আজ মেক্সিকো শহরে। আমরা আশা করব, অলিম্পিকের পূত অনল শিখার আলোর আর পাঁচ মহাদেশের প্রতীক চিহ্ন সম্বলিত অলিম্পিকের শ্বেতশুভ্র পতাকার আদর্শে সব মানুষের মধ্যে শুভবুদ্ধি উদয় হবে। অলিম্পিকও সমাপ্ত হবে নির্বিঘ্নে।

একলব্য

অলিম্পিকে আমরা

তপন ঘোষ

প্রথম পুরুষই নিখোঁজ! কুলজি-কোষ্ঠীর কোন হদিস নেই—তাই তাঁকে নিয়ে ভূমিকা ফাঁদাও এক সমস্যা। মনঃক্ষুণ্ণ হবার জো থাকলেও সমাধানের পথ কিছুতেই যে নজরে ঠেকে না। কে—কি—কেন—কবে—কোথায়?—এই প্রশ্নপঞ্চকে 'গাইড' নিয়েও প্রথম ভারতীয় অলিম্পিয়ানের অক্ষত চেহারা হাজির করা হয়ে উঠল না। এতাবৎ পাওয়া গেছে ছড়ানো ছিটানো কতকগুলো

অলিম্পিকে আমাদের প্রথম পুরুষ নর্ম্যান প্রীচার্ড

উপাদান—তাও বিদেশীর কলম থেকে দাদন নেওয়া। ওই সব এক জায়গায় জমা করলে ছোট গল্পটি দাঁড়ায়—যুবকটির নাম ছিল নরমান প্রীচার্ড, কলকাতার এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ঘরের ছেলে। ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাবে খেলতো। ঔৎসুক্যবশত নিজের খরচে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের প্যারী অলিম্পিকে পাড়ি জমিয়েছিল ৬০, ১১০ ও ২০০ মিটার হার্ডলসে এবং দুশো মিটার দৌড়ের প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে। প্রথম ও দ্বিতীয়টিতে বিশেষ সুবিধা না হলেও শেষের ইভেণ্ট দুটি প্রীচার্ড শেষ করেছিল মাত্র একজনের পিছনে। সাকুল্যে পয়েণ্ট যোগাড় হয়েছিল ৬। ফলত ভারত পেয়েছিল চতুর্থ সম্মান। প্রীচার্ড ফুটবলার হিসাবেও নাকি সুনাম পেয়েছে এবং অবস্থাবিশেষে আই॰ এফ এ-র অবৈতনিক সম্পাদকের দায়িত্বও কাঁধে নিয়েছিল। অতঃপর প্রীচার্ড প্রসঙ্গ কিছুটা চিকের আড়ালে চলে গেছে। শেষ খবর, প্রীচার্ড আর নেই।

এত বড় কৃতিত্ব হলেও তৎকালীনেরা প্রীচার্ডকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবার ফুরসত পায় নি। তাই পরের কুড়িটি বছর কেটেছে একটানা অন্ধকারে। এই নিরুত্তাপ অবস্থার অবসান ঘটিয়ে বেসরকারী প্রচেষ্টায় মদত দিলেন ধনাঢ্য শিল্পপতি ডোরাব টাটা। তাঁরই একান্ত চেষ্টায় আন্তোয়ার্প অলিম্পিকে ভারতীয়দের প্রবেশ। দলে ছিলেন পি ব্যানার্জি (২০০ ও ৮০০ মিটার), পি এফ চাউগুলে (১০ হাজার মিটার দৌড়), কাইক্কাদি (ক্রস কাণ্ট্রি) ও দুজন মল্ল সিন্ধে ও নাভালে। অ্যাথলীট ও কুস্তিগীরেরা দল বেঁধে নিরাশ করল। ওরই মধ্যে বলার মত কৃতিত্ব দেখালেন চাউগুলে দশ হাজার মিটার দৌড়ে—তাও চৌদ্দজনের পিছনে।

চার বছর পরে আবার প্যারীতে অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের জন্ম হয়েছে। কলকাতা থেকে জে হল, ডবলিউ হিলস্ট্রেথ, টি কে পিট এবং ভারতের অন্যান্য প্রান্তের ভেঙ্কট রামানস্বামী, লক্ষ্মণম, এম আর সিং এবং দলীপ সিং প্রভৃতিকে উৎকর্ষ দেখাতে পাঠান হলো—কিন্তু ও'দেরও ব্যর্থ ভূমিকা।

আমস্টার্ডাম উনিশ শো আটাশ। ভারতের ভাগ্যে সোনার তকমার বরাত খুলল। তবে একক প্রচেষ্টায় নয়—এ সম্মানের প্রথম ভাগ্যবান হকি দল। বিজয় অভিযানের পয়লা খেলায় অস্ট্রিয়া চূর্ণ হল আধ ডজন গোলে, বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে পৌনে এক ডজন গোল এবং ডেনমার্ক ও সুইজারল্যাণ্ড যথাক্রমে ০—৫ ও ০—৬ গোলে পরাজিত। ফাইনালে শেষ কাঁটা হল্যাণ্ড অপসারিত হয়েছিল তিন গোলে। কিন্তু অ্যাথলীটদের মধ্যে আর এল বার্নেশ (১০০/২০০ মিটার দৌড়), হল (২০০/৪০০ মিটার দৌড়), মারফি (৮০০ মিটার দৌড়), গুরুবচন (১৫০০/৫০০০ মিটার দৌড়), চৌহান (১০ হাজার মিটার দৌড়), আব্দুল হামিদ (১১০ ও ৪০০ মিটার হার্ডলস) এবং দলীপ সিং (ব্রডজাম্প) কেউই কিছু করতে পারেননি; তবুও মন্দের ভালো, ওই শেষোক্ত দলীপ

হকির অনন্য মনীষা ধ্যানচাঁদ

সিংজী অষ্টম হয়েছেন ব্রডজাম্পে ২১ ফিট ২ ইঞ্চি লাফিয়ে।

অলিম্পিকে সম্মান পেলে তাকে রেখে-ঢেকে জীইয়ে রাখা খুবই কঠিন কাজ। সেই অধ্যায়ের শুরু হল বত্রিশের অলিম্পিক লস অ্যাঞ্জেলস থেকে। হকি দলের অলিম্পিক যাবার পথে নানা অনিশ্চয়তা ভিড় করেছিল—এমন কি অলিম্পিকে আদৌ সে বছর হকি খেলা হবে কিনা তারও ঠিক ছিল না। যা হোক, সময়মত সব কিছু সম্ভব হয়ে ওঠে। লাল-শা-বোখারির নেতৃত্বে ভারতীয় হকি দলকে প্রথম বাধা দিতে হকি স্টিক হাতে নামল জাপানী যুবকেরা। ভারতীয়রা ১১—১ গোলে জিতল। পরবর্তী খেলায় আমেরিকা হারল ২৪—১ গোলের মালা পরে। ভারতের হাতে অলিম্পিকের দ্বিতীয় স্বর্ণপদক। বেশী গোল করেছিলেন রূপ সিং (১৩) ও ১২টি গোল করে ধ্যানচাঁদ দ্বিতীয়। সাটন, ভার্নে এবং ধাওয়ান প্রমুখ অ্যাথলীটরা চিরাচরিতের রাস্তা ধরে ব্যর্থতা নিয়ে ফিরে এলেন।... বাঙালী অলিম্পিয়ান সাঁতারু নলিনী মালিকও ১৫০০ মিটার

অলিম্পিক হকিতে প্রথম জয়ের সারথী জয়পাল সিং

লস এঞ্জেলস অলিম্পিকে জয়ের কাণ্ডারী
লাল শাহ বোখারী

সাঁতারে পাল্লা দিতে জলে নেমেছিলেন কিন্তু ফলাফল তথৈবচ।

দ্বিতীয়বার বিশ্ব হানাহানির তোড়জোড়ে ব্যস্ত জার্মানী অলিম্পিকের আসর পাতল বার্লিনে। গ্রুপের খেলায় জাপান হারল ৯—০তে, হাঙ্গেরীর গোলে ঢুকল এক গণ্ডা এবং আমেরিকা সাত গোলে পরাস্ত। সেমিফাইনালে ফ্রান্সকে পুরোপুরি দশটি গোলে হারিয়ে ফাইনালে জার্মানীর মুখো-মুখি। অতি বড় আশা নিয়ে জার্মান দল নেমেছিল, কিন্তু ৮—১ গোলের তোড়ে ভেসে গেল। তবু জার্মান দর্শকদের আক্ষেপ থাকেনি কেননা তারা ধ্যানচাঁদ ও রূপসিংকে চুটিয়ে উপভোগ করেছে। ধ্যানচাঁদকে দিয়েছে হকি উইজার্ডের খেতাব।

মাঝে বিশ্ব লড়াইয়ের হুজুগে বিশ্ব মিতালি ব্যাপারটি গা-ঢাকা দিল—এই ফাঁকে দুটো অলিম্পিক তলিয়ে গেছে। মরণযজ্ঞের পর ১৯৪৮-এ মিলনযজ্ঞের ডাক এল লণ্ডন থেকে। ভারতীয়দের বুকে নতুন রক্ত, মুখে অন্য আস্বাদ। দু'শো বছরের পরাধীনতার ভার নেমে গেছে। কিন্তু দেশ দু'ভাগ

অলিম্পিকে ভারতের পতাকাবাহী

হয়েছে। যাঁরা মিলেমিশে এতদিন এক সঙ্গে স্টিক চালিয়েছেন তাঁদের কেউ বিরোধিতায় ভেড়ে কথা হইবেন না। আরো চিন্তা, ধ্যানচাঁদ বা রূপ সিং-এর মত হকি খেলোয়াড়ও নেই।

তবু ভারত শক্তিশালী করেই হকি দল গড়ল লণ্ডন অলিম্পিকের জন্য। হকির

লণ্ডন অলিম্পিকের হকি অধিনায়ক
কিষেণ লাল

সঙ্গে ফুটবল দলও প্রথম গেল অলিম্পিকে। সেই সঙ্গে সাইক্লিং, ওয়াটার পোলো, বক্সিং ও ওয়েট লিফটিং দলেরও প্রথম অলিম্পিক। অ্যাথলীট, মল্লবীর এবং সাঁতারুরাও ছিল।

এই বড়সড় ভারতীয় দলের মধ্যে সাফল্য শুধু হকি দলেরই। লণ্ডনে অলিম্পিকের চতুর্থ স্বর্ণপদক। অস্ট্রিয়া, আর্জেণ্টিনা, স্পেন ও নেদারল্যাণ্ড পর পর ৮—০, ৯—১, ২—০ ও ২—১ গোলে পরাজিত। ফাইনালে গ্রেট ব্রিটেন পরাজিত ৪—০ গোলে।

ওয়াটার পোলো খেলায় স্পেনের কাছে ভারতীয় দল ১১—১ গোলে পরাজিত হওয়ায় এবং সাঁতার-ক্ষেত্রে প্রীতি বিষয়ে নাবালকের ভূমিকা নেওয়ায় প্রমাণিত হল, আমরা সাঁতারে বিশ্বমানের ধারে-কাছেও যেতে পারিনি।

মেলবোর্নে হকির বিজয়ী অধিনায়ক
বলবীর সিং

হেলসিঙ্কির অধিনায়ক দিগ্বিজয়ী হকি
খেলোয়াড় দিগ্বিজয় সিং (বাবু)

উড়ন্ত শিখ মিলখা সিং

লণ্ডন অলিম্পিকে ফুটবল খেলোয়াড়রা অবশ্য ভালই খেলেছিলেন। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সত্যিই কলানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে এবং দুটি পেনাল্টি কিকের অপব্যবহার করে ২—১ গোলে হেরে গিয়েছিল।

লণ্ডনে আর কিছুটা উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছিলেন ট্রিপল জাম্পার রেবেলো। সেমিফাইনাল পার হবার পর উরুর মাংসপেশীতে টান ধরায় ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন নি।

শুধু দল ভারি করে অলিম্পিক যোগ দিলেই যে ঝুড়িভর্তি মেডেল আনা যায় না—এই সহজ কথাটি অনেকে বুঝলেও ভারতীয় অলিম্পিক কর্মকর্তারা বোঝেন নি এবং বাহান্নয় হেলসিঙ্কিগামী ভারতীয় দলকে বেশ ভারি করতেও পিছপা হননি। তাঁরা কয়েকজন মহিলাকেও হেলসিঙ্কিতে পাঠালেন। ওই দলে ছিলেন মেরী ডিসুজা ও নীলিমা ঘোষ (অ্যাথলীট), ডলি নাজির ও আরতি গুপ্তা (সাঁতারু)। শুধু যাওয়াই সার হয়েছে কোন সম্মানই ওঁরা কুড়িয়ে আনতে পারেন নি। পুরুষদের মধ্যে লেভি পিন্টোর ১০০/২০০ মিটারে সেমিফাইনালে যাওয়া ছাড়া অন্যরা সকলেই হতাশের দলে। এই একটানা ব্যর্থতার মাঝে হাসি ফুটিয়েছেন মল্লবীর কে ডি যাদব ব্যাণ্টম ওয়েটে ব্রোঞ্জ মেডেল পেয়ে। যাদবের আনন্দসংবাদ বিস্বাদ করেছিল ওয়াটারপোলো টিম ইটালীর কাছে ১৬—১ গোলে হারার নজিরে। ফুটবলাররাও ১০—১ গোলে যুগোস্লাভিয়ার কাছে হারলেন।

তবে ভারতের হকি খেলোয়াড়রা হেলসিঙ্কিতে আবার ওড়ালেন হকির বিজয়-কেতন। অস্ট্রিয়া, গ্রেট ব্রিটেন এবং হল্যাণ্ড যথাক্রমে ৪—০, ৩—১ ও ৬—১ গোলে হার স্বীকার করল ভারতের কাছে।

ঝড় যে আসছে তার পূর্বাভাষই মেলবোর্ন অলিম্পিকে ভারতীয় হকি খেলোয়াড়রা পেয়ে গিয়েছিলেন। প্রথামত 'না পারা'র পুরনো রেকর্ড ভারতীয় অ্যাথলীটরা অটুট রেখেছে। শুধু বুক ভরা খুশি দিয়ে অবাক করেছে ফুটবলাররা। ফলাফল ফোর্থ। খেলার অন্য বাঁধ দেখে কেউ ভুলেও ভাবেনি যে, ভারতীয়রা এর আগের হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে আধ কুড়ি গোল খেয়েছিল। প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ানরা হারল ৪—০ গোলের বোঝা নিয়ে। পরের ধাপ সেমি-ফাইনালে যোগ্য দল যুগোস্লাভিয়ার কাছে ভারতের হার স্বীকার হল চার-একের পার্থক্যে। অন্য পট—প্রথম থেকেই সস্তায় বাজিমাত করে চলেছে হকি দল। আমেরিকাকে ১৬ গোলে, আফগানিস্থানকে ১৪ গোলে এবং সিঙ্গাপুরকে ৬ গোলে। এর পরেই শক্ত লড়িয়ে জার্মানী। আটজন সারি সারি ওই ছোট্ট গোলের ঘাটি পাহারা দিচ্ছে—শেষে মেরে-কেটে এক গোলে জয়। ফাইনালে সাতচল্লিশের অভিশাপ পাকিস্তান এবার রণং দেহি মূর্তিতে দাঁড়িয়ে। খেলার চেয়ে স্নায়ুর কামড়ই বেশী। হকির লকড়িবাজিতে মেজাজ সপ্তমে চড়েছিল। এরই মাঝে একটি গোল করলেন জেণ্টল, মানও বাঁচল। ওই গোলেই ভারত পেল হকির ষষ্ঠ স্বর্ণপদক।

কিন্তু ১৯৬০-এর রোম অলিম্পিকে টাইবারের কালো জলের নীচে চাপা পড়ল ভারতীয় হকির কীর্তিস্তম্ভ। ফাইনালে প্রতিবেশী পাকিস্তানের কাছে আমরা হার স্বীকার করলাম ওই একটি গোলে। তবে রোমে রহিমের ফুটবল দল যথেষ্ট ভাল খেলেছিল চিলি, ফ্রান্স ও হাঙ্গেরীর সঙ্গে। আর উড়ন্ত শিখ মিলখা সিং, যাঁকে কেন্দ্র করে আমরা অ্যাথলেটিকসের প্রথম পদকের স্বপ্ন দেখেছিলাম, তিনি ৪৫·৬ সেকেণ্ডে ৪০০ মিটার দৌড়েই (জীবনের শ্রেষ্ঠ দৌড়) পেয়েছিলেন চতুর্থ স্থান।

টোকিওর অষ্টাদশ অলিম্পিকে হকির স্বর্ণ-পদক বিজয়ী ভারতের সপ্তদশ রথী। ফুলের মালার মধ্যে খেলোয়াড়দের মুখ। ১৭ জন খেলোয়াড়কে ১৭টি মালা উপহার দিয়েছিলেন ক্রীড়ানুরাগী 'দেশ' সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার

১৯৬৪-র টোকিও অলিম্পিকের ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকেই হারিয়ে আমরা হকির সপ্তম স্বর্ণপদক পেয়েছি। টোকিওতে আমাদের আর কোন ক্রীড়াবিদ কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি একমাত্র ১১০ মিটার হার্ডলসে গুরবচন সিং-এর পঞ্চম স্থান লাভ করা ছাড়া।

মেক্সিকোতে আমরা কি পাব? বলা শক্ত। কারো উপরেই আস্থা নেই। শুধু হকি খেলোয়াড়দের দিকে চেয়ে আছি। কিন্তু সাম্প্রতিক খেলার যা নমুনা তাতে সফলতা সম্পর্কে সংশয় কাটিয়ে উঠতে পারছি কি?

বব্ সীগ্রেন

এক শো বছর আগে গ্রেট ব্রিটেনের অ্যাথলীটরা ছিল পোলভল্টে বিশ্ব-শ্রেষ্ঠ। এমন কি ১৮৮৭ সালে উলভার-স্টনের টম রে আমেরিকাতে গিয়ে অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ইউনিয়নের প্রতিযোগিতায় পোলভল্টে প্রথম স্থান অধিকার করে-ছিলেন। কিন্তু অলিম্পিক খেলাধুলোর ইতিহাসে এই বিষয়ে আমেরিকার কাছ থেকে কেউই স্বর্ণপদক ছিনিয়ে নিতে পারেনি। সুদূর ১৮৯৮ সাল থেকে বিশ্ব-রেকর্ডের তালিকাতেও আমেরিকান পোল-ভল্টাররা পর পর শীর্ষস্থান দখল করে চলেছেন। ব্যতিক্রম শুধু দুবার নরওয়ের চার্লস হপ্ ১৩ ফুট ১১½ ইঞ্চি লাফিয়ে ১৯২২ থেকে ২৫ পর্যন্ত বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হয়েছিলেন, আর ১৯৬২-৬৩-তে ১৬ ফুট ২½ ইঞ্চি লাফিয়ে ফিনল্যাণ্ডের পেণ্টি নিকুলা বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন। কিন্তু আজ আবার পোলভল্টে পৃথিবীর প্রথম ১৫ জনের মধ্যে ৯ জনই আমেরিকার অধিবাসী।

অ্যাথলেটিকসের কোন বিষয়ে বিশ্বমানে পৌঁছবার পর আধ ইঞ্চি বা সিকি ইঞ্চি উন্নতির জন্য কত সাধনা, কত প্রয়াস ও কত অনুশীলনের দরকার তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু আধ ইঞ্চি এক ইঞ্চি নয়, পোলভল্টের প্রতিযোগিরা ফাইবার গ্লাস পোলের সহায়তায় ইঞ্চির পর ইঞ্চি এগিয়ে চলেছেন।

বব সীগ্রেনের কথাই ধরা যাক। মাত্র ১ বছরের মধ্যে সীগ্রেন ৭ ইঞ্চি বেশী লাফিয়েছেন। পোলভল্টে সাউদার্ন ক্যালি-ফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্র এখন ক্রম পর্যায়ের স্থানে। ডিঙিয়েছেন ১৭ ফুট ৭ ইঞ্চি। সীগ্রেনেরই সহপাঠি পল উইলসন ওর চেয়ে ½ ইঞ্চি বেশী লাফিয়ে শীর্ষস্থানে আছেন। কিন্তু মেক্সিকো অলিম্পিকে স্বর্ণ সম্ভাবনা সীগ্রেনেরই বেশী। কারণ, উরুর মাংস-পেশীতে টান ধরায় পল উইলসন মার্কিন অ্যাথলীটদের অলিম্পিক ট্রায়ালে অংশ নিতে পারেন নি। উইলসন এখনো সুস্থ হয়ে উঠেছেন কিনা খবর পাওয়া যায় নি। আর সুস্থ হলেও তিনি সীগ্রেনের মত অনুশীলন করতে পারেন নি।

দুটি আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সীগ্রেন দু' বছর ধরে অনুশীলন করে চলেছেন। এক : অলিম্পিকের স্বর্ণ পদক। দুই : পৃথিবীর প্রথম প্রতিযোগী হিসাবে পোলভল্টে ১৮ ফুট অতিক্রম।

সীগ্রেনের দৃঢ় বিশ্বাস ১৮ ফুট তো বটেই, এক দিন পৃথিবীর মানুষ ২০ ফুটও অতিক্রম করতে পারবে।

সীগ্রেনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল মেক্সিকো অলিম্পিকে কতখানি লাফাতে পারলে স্বর্ণ পদক পাওয়া যাবে?

—বলা শক্ত, সম্ভবত ১৭ ফুট ৮ ইঞ্চি। আবার ১৮ ফুটের বাধাও অতিক্রম হতে পারে। সীগ্রেনের সহজ উত্তর।

পল উইলসনের অনুপস্থিতিতে অলিম্পিক ট্রায়ালের সময় ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্র বব্ সীগ্রেন এবং জন ভগান, দুজনই ১৭ ফুট ৮ ইঞ্চি লাফিয়ে উইলসনের বিশ্ব রেকর্ড ভাঙতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ৪ বারের প্রচেষ্টাতেও কেউ সফলকাম হন নি। সীগ্রেন ১৭ ফুট ৪ ইঞ্চি লাফিয়েছিলেন।

২১ বছর বয়সী সীগ্রেনের দেহের উচ্চতা ৬ ফুট। ফাইবার গ্লাস পোলের সাহায্যে লাফাবার ভঙ্গিও চমৎকার।

কাচের তন্তুতে তৈরি পোল যেমন পোল-ভল্টের উৎকর্ষের পরম সহায়ক তেমন এই পোলের প্র্যাক্টিসের জন্যও উন্নত কলা-কৌশলের প্রয়োজন। দৌড় শেষে ভল্ট-বক্সে পোল স্থাপন করে শরীরকে ঊর্ধে তোলার সময় পেলব পোলের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় গতিশীলতার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। বাঁক নেওয়া তন্তু পোল তখন স্প্রিং-এর মত কাজ করে। সময় ও গতির সূক্ষ্মতার উপরই নির্ভর করে সাফল্য।

সীগ্রেন প্রতি দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনু-শীলন করে সময় ও গতির সূক্ষ্মতার সংগে সামঞ্জস্য করে নিয়েছেন। তাই প্রতি প্রতি-যোগিতার শেষেই তিনি আশা করেন পরের প্রতিযোগিতায় ১৮ ফুটের বাধা ভাঙবেন।

এমন আত্মবিশ্বাসী অ্যাথলীটও কিন্তু অলিম্পিকের মুখে বেশ বিচলিত হয়ে উঠেছেন। বলেছেন, অন্যান্য দেশের পোল-ভল্টাররা এখন অনেক দক্ষ। এই বিষয়ে আমেরিকার অলিম্পিক স্বর্ণ পদক বজায় থাকবে সে কথা জোর করে বলা যায় না।

মুকুল

"গড় নাসিমপুর" চিত্রে (অজিত লাহিড়ি পরিচালিত) মাধবী মুখোপাধ্যায় ও দেব মুখার্জি— ছবিটির মুক্তির বিলম্ব নেই ফটো—দেশ

চলচ্চিত্র শিল্পের সংরক্ষণ

পশ্চিমবঙ্গ চিত্রশিল্প সংরক্ষণ সমিতির নেতাদের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনার মাধ্যমে সমিতির নতুন পর্যায়ের আন্দোলনের আভাস পাওয়া গেল। কলকাতার বাংলা ছবির 'চেন'-এর মালিকরা সমিতির দাবি আগেই মেনে নিয়েছেন। যদিও ওই সব চিত্রগৃহে এখনও পুরনো 'কনট্রাক্ট' অনুযায়ী ছবি চলছে। এই বছর একাধিক ছবি সমিতির নিজস্ব কমিটি মারফত মুক্তি পেতে পারে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বাংলাভাষী অঞ্চলে অর্থাৎ যে-সব এলাকায় অধিক সংখ্যক বাঙালীর বাস, ওই সব স্থানে কয়েকটি এমন চিত্রগৃহ আছে যে-গুলিতে নিয়মিত হিন্দীচিত্র বিদেশী ও অন্যান্য ছবি দেখানো হয়। কোন কোন চিত্রগৃহ হিন্দী ছবির 'চেন' হিসাবেই চিহ্নিত। সমিতি এখন ওই হলগুলিতে বাংলা ছবির 'স্ক্রীনিং টাইম' বা চিত্রপ্রদর্শনীর সময় বাড়াবার জন্য সচেষ্ট হবেন। ইতিমধ্যে তাঁরা ওই সব হলের মালিকদের সঙ্গে পত্রালাপ করেছেন। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অনুকূল সাড়া পাওয়া গেছে। সুতরাং ওই সব হাউসের সামনে শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহের প্রয়োজন হবে কিনা তা এই মুহূর্তে বলা কঠিন। আশা করা যায়, আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়েই সমস্যার সুরাহা হবে। বাংলা ও বাংলা দেশের ছবির প্রদর্শনের ক্ষেত্র প্রসারিত হোক তা সব সময়েই কাম্য। সংরক্ষণ সমিতি যখন প্রথমে তাঁদের এই সংগ্রামের কথা ঘোষণা করেছিলেন তখন সংবাদপত্র মহল তাঁদের সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাতে দ্বিধা করেন নি। এই আন্দোলনের মধ্যে প্রাদেশিক সংকীর্ণতা নেই। বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে বাংলার ছবির প্রদর্শনের পূর্ণ সুযোগের ব্যবস্থা করতেই হবে। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের প্রকৃত সংকটের কারণ দুর্বোধ্য নয়। বাংলা ছবির প্রদর্শনের সুযোগ অতি সামান্য, এর ব্যবসাক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ। সংরক্ষণ সমিতি বাংলার ছবির ব্যাপকতর প্রদর্শনীর জন্য যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তা অচিরেই অনেকাংশে সফল হয়। রাজ্য সরকারও অবিলম্বে এ বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন। বাংলার ছবির প্রদর্শনীর বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা হয়। তবে সারা বছরে আবশ্যিক প্রদর্শনীর যে সময় নির্ধারিত তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন উঠেছে। এ কথা সত্য, বাংলা ছবি যাঁরা নিয়মিত দেখান তাঁরা আইনের সুযোগে বছরে মাত্র দশ সপ্তাহ বাংলা ছবি দেখাবেন এমন আশঙ্কার কোন কারণ নেই। বাংলা ছবির চেন-এ বাঙালী অঞ্চলে অতি বড় স্টার-মার্কা হিন্দীচিত্রও দুই-তিন বা খুব বেশী করে চার-পাঁচ সপ্তাহের বেশী চলে না। তা ছাড়া হিন্দী চেনগুলির চাহিদা মিটিয়ে বড় বাজেটে বা স্টারের হিন্দী ছবি কতই বা বাংলা চেন-এ সরবরাহ করা যেতে পারে? সুতরাং বাংলা "চেন" নিয়ে আশংকা অমূলক। বরং বাংলার ছবির বাধ্যতামূলক প্রদর্শনী চালু হলে সব সিনেমা হলেই বছরে কয়েক সপ্তাহ বাংলা ছবি দেখানো সম্ভব। এতে বাংলার ছবির ব্যবসাক্ষেত্র প্রশস্ত হবে।

বাংলা ছবির ব্যাপকতর প্রদর্শনীর সম্ভাবনা যখন দেখা যাচ্ছে তখন সিনেমা কর্মচারীদের দীর্ঘকালব্যাপী ধর্মঘটের পরেই বাংলা ছবির চেনগুলির সামনে সংরক্ষণ সমিতির সত্যাগ্রহ অপরিহার্য কিনা এই প্রশ্ন সাংবাদিকরা সংরক্ষণ সমিতির নেতাদের করেছিলেন। উত্তরে আন্দোলনের

পীযূষ বসু পরিচালিত "স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে" ছবিতে স্বরূপ দত্ত ও মাধবী মুখোপাধ্যায়
ফটো—দেশ

তা শুধু প্রয়োজনীয়ভাবে কথাই তাঁরা জানেন। এবং তাঁদের কথায় স্পষ্ট জানা যায়, তারকাহীন ছবির স্বার্থে এবং সমগ্র চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতির জন্য চিত্রপ্রদর্শকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। যে ব্যবস্থা ও অবস্থায় বাংলা ছবি এতদিন মুক্তি পাচ্ছিল তাতে গলদ ছিল ঠিকই—যা চিত্রপ্রযোজকের স্বার্থহানিকর। এই সব অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সব সময়েই সহানুভূতি ও সমর্থনের যোগ্য। তবে চলচ্চিত্র শিল্পের সংকট যে অন্যত্রও বর্তমান সে সম্পর্কেও সংরক্ষণ সমিতির নেতাদের সঙ্গে সাংবাদিকদের আলোচনা হয়েছে। সমস্যা ও অব্যবস্থা প্রযোজনার ক্ষেত্রেও অনেক। প্রসঙ্গত, "ব্লক ম্যাস প্রোডাকশন", মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক, স্টার-সিস্টেমের প্রতি অকারণ মোহ ইত্যাদি সংকটের প্রধানতম কারণ যে অতি-সীমিত ব্যবসাক্ষেত্রে সে-কথা কেউ অস্বীকার করবেন না। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সংরক্ষণের জন্য তৈরি সংরক্ষণ সমিতি সব বিষয়েই সজাগ থাকবেন, এবং শুধু চিত্রপ্রদর্শকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যই এর জন্ম নয় এই আশ্বাস নেতারা সাংবাদিকদের দিয়েছিলেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে, যে চিত্রপ্রদর্শনী ব্যবস্থায় চিত্র প্রযোজক ক্ষতিগ্রস্ত, তার বিরুদ্ধে যে-কোন সুস্থ আন্দোলন সমর্থনযোগ্য। কিন্তু এই সঙ্গে ছবি রিলিজের ব্যাপারে সংরক্ষণ সমিতির বিশেষ শর্ত অর্থাৎ একটি ছবি প্রদর্শকরা পছন্দ করে নেবেন, পরবর্তী ছবি সমিতির রিলিজ কমিটি নির্বাচন করবেন, এই নীতি অগণতান্ত্রিক এবং স্বাধীন ব্যবসার উপর হস্তক্ষেপ কিনা এই সংশয় সাংবাদিকরা বিভিন্ন প্রেস কনফারেন্সে প্রকাশ করেছেন। সমিতি অবশ্য বলেছেন, তারকাহীন ছবির প্রতি প্রদর্শকদের বিমাতাসুলভ মনোভাব এবং এক্ষেত্রে তাঁদের "বর্জন-নীতির" জন্যই এই ব্যবস্থা। সাংবাদিকরাও নিরুত্তর থাকেন নি। বহু স্টারহীন ও এক্সপেরিমেণ্টাল ছবি এ দেশে মুক্তি পেয়েছে। যে ব্যবস্থায় সেগুলি মুক্তি পেয়েছে (যদি তা "অব্যবস্থা" হয়) তার বিরুদ্ধে অবশ্যই সংগ্রাম চলতে পারে। তদুপরি, বাংলার ছবি প্রদর্শনীর সম্ভাবনা যেখানে ব্যাপকতর হচ্ছে সেখানে তো ধীরে ধীরে সব ছবিরই মুক্তির উপায় হতে পারে। সরকারী সাহায্য নিয়ে আর্ট সিনেমাও তৈরি সম্ভব, সব দেশেই যা আছে। চলচ্চিত্রের সংকট নিয়ে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের আলোচনা সভায় সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক শিল্পীরা এই প্রস্তাব করেছিলেন।

তবু বলি, সংরক্ষণ সমিতির লক্ষ্য যে শুভ তা নিয়ে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। সংরক্ষণ সমিতির সভ্যদের আন্তরিকতা নিয়েও কোন প্রশ্ন ওঠে না। সমস্যা শুধু লক্ষ্যসাধনের উপায় নিয়ে। চলার পথে যদি কোন ভুল হয় আত্মসমালোচনার ভিতর দিয়ে তারা সেই ভুল একদিন শুধরে নিতে পারবেন, এই আশা আমাদের আছে। গত সপ্তাহে এক ঘরোয়া আলোচনায় সংরক্ষণ সমিতির নেতারা বাংলাভাষী অঞ্চলের সিনেমাগুলিতে (বাংলা ছবির চেন নয়) বাংলার ছবির স্ক্রীনিং সময় বাড়াবার জন্য যে কর্মসূচী নিয়েছেন তা বাংলা ছবি ও বাংলা সংস্কৃতির অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই পরিপূর্ণ সমর্থন পাবে। সমিতি যে-কোন প্রকার গোঁড়ামি বা প্রাদেশিকতা বর্জন করে চলতে বদ্ধপরিকর। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প বাঁচলেই ভারতের চলচ্চিত্রের কল্যাণ একথা তাঁরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন। সমিতির নেতৃবৃন্দ আরও জানিয়েছেন, তাঁরা একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন। যে সমস্ত বাংলা ছবি অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে আছে সেগুলি সম্পূর্ণ করার জন্যই প্রধানত এই সমবায় প্রতিষ্ঠান। কলাকুশলীদের বেকারত্ব যাতে ঘোচে তার জন্য প্রত্যেক পরিচালকের তিনজন সহকারী নিয়োগের বিষয়েও তাঁরা তৎপর হবেন। তা ছাড়া, কলাকুশলীদের আর্থিক দুর্গতি দূর করার জন্য সাহায্য তহবিল অবিলম্বে গড়ে তোলার জন্যও সমিতি সচেষ্ট। অসম্পূর্ণ বাংলা চিত্র সম্পূর্ণ করা কিংবা প্রযোজকদের চিত্রনির্মাণে সহায়তা করার জন্য তিন লক্ষ টাকার "ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল" নিয়ে কীভাবে সমবায় প্রতিষ্ঠান হবে এবং কী তার উদ্দেশ্য তা সাংবাদিকদের বিশদভাবে বলা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংরক্ষণ সমিতি একটি চিত্রনির্মাণেরও উদ্যোগ করেছেন। এতে শিল্পী ও কলাকুশলীরা বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করবেন। সরকারী সাহায্যও পাবেন বলে সংরক্ষণ সমিতি মনে করেন।

এক কথায়, সংরক্ষণ সমিতির ভবিষ্যত কর্মসূচী যা রয়েছে তার প্রত্যেকটিই চলচ্চিত্র শিল্পের কল্যাণের জন্য। তাঁরা এখন চান, নিজেদের সমিতিকে শক্তিশালী করে তুলতে। শক্তি সঞ্চয়ের পথে কখনও হয়ত তাঁদের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য দৃঢ় ও কঠোর মনোভাব অবলম্বন করতে হবে।

তবে নেতারা জানিয়েছেন, এমন কিছুই তাঁরা করবেন না যা ব্যক্তিস্বাধীনতা-বিরোধী এবং যা কোন প্রযোজকের স্বাধীন ব্যবসা বা পরিকল্পনার উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ বলে গণ্য হতে পারে। শুধু সঙ্ঘবদ্ধতা তাঁদের চাই।

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

বালুচরী

প্রেম, মিলন, বাসরঘর কিংবা তার আগে আগে একটু ভুল বোঝাবুঝি, কিছুটা চোখের জল ও পুনর্মিলন—এ যেন একটা অপরিবর্তনীয় নিয়ম, সিনেমায় যা বিতৃষ্ণার সঙ্গে বার বার আমাদের দেখতে হয়। "বালুচরী"-র (রাধারাণী পিকচার) প্রেম এর বিপরীত, বিশেষ ফরমুলাটি মেনে চলেনি। এতে যা পাই তা অনেকাংশে জীবনের শর্তে নিয়ন্ত্রিত। নায়িকা মন্দিরা ভালবেসেছে নায়ক অভিজিতকে। সুখের [illegible] তাদের মন ছুঁয়ে গেছে। কিন্তু [illegible] ও সাধ তারা কেউ কাউকে তেমন [illegible] করে মুখ ফুটে বলতে পারেনি। [illegible] প্রণয় বাইরে নির্মল বন্ধুত্বের রূপ নিয়ে দুটি হৃদয়কে বেঁধে রাখে। মন্দিরার সংসারের সমস্ত কাজ যখন সাঙ্গ, তখন [illegible] উভয়েই জানে অনেক দেরী হয়ে গেছে। [illegible] এই মুহূর্তগুলি চমৎকার, যেখানে মন্দিরা ও অভিজিত হঠাৎ যেন আবিষ্কার [illegible] তাদের বয়স হয়েছে। একে অপরের [illegible] দু'টি পাকা চুল দেখে নিজেদের মধ্যে [illegible] এই হাসির অন্তরালের বেদনায় [illegible] দর্শকের মন ভারাক্রান্ত। নিরুচ্ছার [illegible] বিন্যাসের কোন অংশে অতি-নাটকীয়তা নেই। সহজ সুরে একটি [illegible] ও [illegible]শাসিত জীবনবাসনার চিত্র [illegible] পরিচালক-চিত্রনাট্যকার অজিত [illegible] এই অধ্যায়টি প্রায় আর্টের [illegible] উঠেছে।

[illegible] (মূল রচনা : আশাপূর্ণা [illegible]) অন্য সব অংশে নাটকীয়তা আছে, [illegible] বহু ঘটনাই সাজানো। বাবা-মায়ের [illegible] পর ছোট ভাই ও বোনদের বড় করে [illegible] দায়িত্ব (যে কারণে নায়িকা নিজের [illegible] কথা ভাবতে পারেনি), নিজের [illegible] মন্দিরার স্কুল তৈরি করা (যাকে [illegible]গতিক নিয়মে মন্দিরার 'তপস্যা' বলে অভিহিত করা হয়েছে), একমাত্র ভাইয়ের [illegible]ভাবে বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করা ([illegible]নেও নাটকীয় ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার), ধনীদুহিতা তথা নায়িকার ভ্রাতৃবধূর অশিষ্ট ব্যবহার ও পরে অনুতাপ, নায়িকার দুই বোনের মধ্যে একজনের স্বার্থপরতা ও অপরজনের আদর্শপ্রীতি, [illegible] অবস্থায় নায়িকার মহত্ত্ব এবং শেষে মন্দিরা ও অভিজিতের মিলন ইত্যাদি ঘটনার মধ্যে সেই পূর্ব অধ্যায়ের (মন্দিরা ও অভিজিতের অস্পষ্ট প্রেম) অভিনবত্ব ও জীবনবোধ অবশ্যই নেই। বোঝা যায়, [illegible]প্রিয় দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্যই একটি পর একটি নাটকঘটনা সযত্নে তৈরি। কিন্তু পরিচালককে ধন্যবাদ, এইসব পরিস্থিতি উপস্থাপনে তিনি যথেষ্ট মাত্রাজ্ঞান ও রুচিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। কর্তব্যময় সংসারের বালুচরে যে নায়িকা বালুচরী, সে যখন বাসরসঙ্গিনী হতে চলেছে ওই মুহূর্তটিও অর্থাৎ ক্লাইম্যাক্স খুবই পরিমিত। এক কথায়, রুচি ও পরিচ্ছন্নতা দিয়ে ছবিটি তৈরি। মামুলী ধারা যদিও সর্বাংশে বর্জিত নয়, তবু পরিচালক নতুনভাবে ছবিটি উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন। আধুনিক গান যথাবিহিত ছবিতে আছে (সংগীত পরিচালক রাজেন সরকার-কৃত গানের সুর এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গানের কথা সুন্দর) কিন্তু যথাবিহিত নায়ক-নায়িকার মুখে গান দেওয়া হয়নি। এবং এ-ছবির নায়ক-নায়িকার আচার-ব্যবহার ও কথাবার্তা (সংলাপও জায়গায় জায়গায় চমৎকার) সংযত, মার্জিত ও ভদ্র—অর্থাৎ যেমনটি হওয়া উচিত। তাই ছবিতে তথাকথিত উপাদান যদি কিছু থাকেও, তবু "বালুচরী" দেখে মন ভরে যায়, এর মধ্যে এমন একটা হার্দ্যগুণ আছে যা অন্তর স্পর্শ করে।

ছবি দেখে যে মন ভরে তার অন্যতম প্রধান কারণ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অসাধারণ অভিনয়। একটি চরিত্রকে এমন জীবন্ত করে তোলা কিংবা এর অন্তরের সবটুকু বেদনা ও আকুতি এমনভাবে প্রকাশ করার যে শক্তি শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন তা সত্যিই অবাক করে। মন্দিরা তাঁর শিল্পীজীবনের স্মরণীয় সৃষ্টি। অভিজিতের চরিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায়ের দক্ষতাও সামান্য নয়। ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল। সামান্য কথায় ও অভিব্যক্তিতে তিনি অভিজিতের অকথিত প্রেম, দ্বন্দ্ব ও ব্যথা ফুটিয়ে তুলেছেন।

তপন সিংহের "আপন জন" ছবিতে নির্মলকুমার ও সুস্মিতা সান্যাল ফটো—দেশ

অভিনয় সকলেরই ভাল। অনুপকুমার, লিলি চক্রবর্তী জ্যোৎস্না বিশ্বাস, গঙ্গাপদ বসু, রেণুকা রায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং মলিনা দেবী নিজেদের অভিনীত ভূমিকায় দর্শকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কলাকৌশলের সকল বিভাগের কাজই সুষ্ঠু। বিজয় ঘোষের ফটোগ্রাফি এবং বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনা বিশেষ প্রশংসনীয়।

ব্রহ্মচারী

আর সব হিন্দী চিত্রের তুলনায় "ব্রহ্মচারী"র কাহিনীগত নতুনত্ব (শচীন ভৌমিক রচিত) স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু ফরমুলাসর্বস্ব "ট্রিটমেণ্ট"-এর সংক্রমণে ভিন্ন ধরনের গল্পটিও কেমন যেন জলো হয়ে উঠেছে। নতুবা চিত্রনাট্যের শুরুতেই দর্শক দেখতে পান, শাম্মী কাপুর আর সব হিন্দী ছবির নায়কের মত নয়। কয়েকটি অনাথ শিশুর অভিভাবক নায়ক, তাদের বাবা-মা বলতে সবই সে। নায়ককে সবাই ডাকে ব্রহ্মচারী বলে। তার বাড়ির দরজায়, অর্থাৎ ব্রহ্মচারী আশ্রমে গোপনে ফেলে-যাওয়া অবাঞ্ছিত, অবৈধ সন্তান যখন ডুকরে কেঁদে ওঠে, তখন ব্রহ্মচারী গিয়ে তাকে ঘরে নিয়ে আসে এমনিভাবেই ব্রহ্মচারীর সংসার বড় হয়। শিশুদের নিয়েই তার দিন কাটে, তাদের জনাই নায়কের যত কিছু আত্মত্যাগ।

ব্রহ্মচারী একদিন প্রেমে প্রবঞ্চিত, আত্মহত্যায় বদ্ধপরিকর শীতল নামে এক তরুণীকে (রাজশ্রী) বাড়িতে নিয়ে আসে। একই বাড়িতে বাস করেও উভয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক, এবং শীতলকে তার প্রেমিকের

"বৌদি" (পরিচালনা : দিলীপ বসু) ছবিতে অনিল চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর, সন্ধ্যারানী ও লিলি চক্রবর্তী

সঙ্গে (প্রাণ, আসলে সে খলচরিত্র) মিলিয়ে দিয়ে তাকে সুখী করার জন্য ব্রহ্মচারীর যে প্রাণান্তকর চেষ্টা, তার মধ্যে অভিনবত্ব আছে। পরে একটি মুহূর্তে যখন ব্রহ্মচারীর সঙ্গে শীতলের প্রণয়-সম্বন্ধ প্রকাশ পায়, তখনও দেখি সুন্দর রুচিবোধ। এর আগে প্রণয়ের প্রস্তুতিপর্বেও সংযম, হিন্দী ছবিতে যা সাধারণত দেখা যায় না। কিন্তু হলে হবে কী! বিধিবহির্ভূত কিছুই বুঝি হবার জো নেই। প্রেম হয়ে যাবার পরেই ব্রহ্মচারী ও শীতলকে যথাবিহিত গান গেয়ে নাচতে হয়েছে। এবং ছবি শেষ হবার কিছুক্ষণ আগেই রবি নামক দুশ্চরিত্রের (প্রাণ) "ভিলেনি" আরম্ভ হয়। খল ব্যক্তির পতন, এবং ব্রহ্মচারী ও শীতলের মিলন অবশ্য অবধারিত নিয়মেই ঘটেছে। পরিচালক বাপি সোনি সম্ভবত ছবিটিকে "কমেডি"র আঙ্গিকেই তৈরি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা অসফল। শেষ অবধি তো সেই প্রেম ও ক্রাইম। কমেডির উপকরণ যা আছে, তা প্রথানুগ, এবং মোটা দাগের, হিন্দী চিত্রে যা প্রায়শ দ্রষ্টব্য।

অভিনয় মোটামুটি সকলেরই ভাল। বিশেষ পার্শ্বচরিত্রে মমতাজ (যাকে খল-নায়ক স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়) উল্লেখযোগ্য। ইস্টম্যান কালারে রঞ্জিত এই ছবির টেকনিক্যাল কাজ উঁচুদরের। শংকর-জয়কিষণ সুরারোপিত গান আরও ভাল হতে পারত।

সংঘর্ষ

সংঘর্ষ বাইরে, সংঘর্ষ অন্তরে। "সংঘর্ষ" (এইচ এস রাওয়েল প্রযোজিত-পরিচালিত) হিন্দীচিত্রে অবশ্য বাইরের সংঘর্ষই বড় করে দেখানো হয়েছে। পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির, এবং সংস্কার ও প্রেমের সংঘর্ষ ছবিতে প্রায় অনুপস্থিত। অতএব মহাশ্বেতা দেবীর কাহিনীর রস এই ছবিতে পুরোপুরি অলভ্য।

সাধুবেশে একদা ঠগীরা যে অমানুষিক অত্যাচার চালাত তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই গল্প। ঠগী-সর্দার ভবানীপ্রসাদের নাতি কুন্দন (দিলীপকুমার) বড় হয়ে এই পাপাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং কী-ভাবে সে পিতামহের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে তা-নিয়ে চিত্রনাট্যের একটি বিশেষ অংশ গঠিত। অন্যদিকে কুন্দন ও লয়লা আশমানের (বৈজয়ন্তীমালা) প্রেমের কাহিনীই প্রধান। লয়লা বিখ্যাত বাঈজী। বাল্যসাথী কুন্দনকে সে ভোলেনি। কিন্তু কয়েক বছর পর সে কুন্দনের সঙ্গে মিলিত হয়। চিত্রনাট্যের পরিণতিতে কুন্দন ও লয়লার মিলন দেখানো হয়েছে। কুন্দনও পিতামহের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ করতে পেরেছে। যে-সব ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে চিত্রের পরিসমাপ্তি তাতে রোমাঞ্চ ও উত্তেজনার অনেক উপকরণই রয়েছে। তা-ছাড়া নায়িকা যেখানে নর্তকী সেখানে নাচ-গানেরও অভাব নেই। এক কথায়, ইস্টম্যান কালারে রঞ্জিত "সংঘর্ষ" [illegible] চিত্র হিসাবে আদরণীয় হবে। এবং সব চেয়ে বড় কথা ছবিতে একটি [illegible] রয়েছে, যদিও তা সম্পূর্ণ [illegible]। চিত্রপরিচালনার কাজও ভাল।

দুটি প্রধান চরিত্রে দিলীপকুমার ও বৈজয়ন্তীমালা প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন। জয়ন্ত ও বলরাজ সাহনীর অভিনয়ও মনোগ্রাহী।

নৌশাদ সুরারোপিত গানগুলিও দর্শকদের তুষ্ট করবে।

ফাল্গুনী সংস্থার "মেঘদূত" নৃত্যনাট্যে ছবি দাশগুপ্ত ও কাকলি ঘোষ।

বোম্বাই বিচিত্রা

হৃষিকেশ মুখার্জি "আশীর্বাদ" শেষ করেছেন। মাত্র পঞ্চাশ দিন শুটিং করে বম্বেতে একটি রঙীন ছবি শেষ করা রীতিমত জয়ঢাক পিটিয়ে বলার মত খবর। হৃষি মুখার্জির "আশীর্বাদ" নাকি বম্বে চলচ্চিত্রের আচলচ্চিত্র সুলভ অভিশাপের পরিপ্রেক্ষিতে সত্যি সত্যি আশীর্বাদ হিসেবে প্রতিভাত হবে। হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, গুলজার, সঞ্জীবকুমার প্রত্যেকেই হৃষি মুখার্জি এবং 'আশীর্বাদ'এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। গুলজারের কাছে বিশদ শুনলাম 'আশীর্বাদ' বিষয়ে। আশা করছি আমার পাঠক সাধারণ গুলজারের নাম জানেন। যাঁরা জানেন না তাদের জ্ঞাতার্থে কয়েক কলমে গুলজারের একটা ছোট্ট পরিচয় দিই। গুলজার আসলে কবি এবং ছোট গল্প লেখক। বর্তমানে চলচ্চিত্রের চক্করে পড়ে গীতিকার, সংলাপ লেখক এবং চিত্র-পরিচালক হয়ে পড়েছেন। 'আশীর্বাদ'এর গান এবং সংলাপ গুলজারের।

✻

বাংলা দেশের স্বনামধন্য অভিনেতা ছোট্ট [illegible]ড় মানুষ রবি ঘোষ কয়েকদিনের জন্য বম্বে এসেছিলেন। দেখা হ'ল হৃষি মুখার্জির বাড়িতে শ্রীমুখার্জির "সত্যকাম" ছবিতে অভিনয় করতে এসেছিলেন শ্রীঘোষ। প্রথমে আলাপ পরিচয়, তারপর আড্ডা। আড্ডার মহফিলে নামতেই বম্বে তলিয়ে গেল আরবসাগরের নোনা জলের অতলে। ভেসে উঠলো কোলকাতা রাজনীতি। নাটক। আলোচনা। সমালোচনা। সমালোচনার সমালোচনা। গুপী গাইন বাঘা বাইন। সত্যজিৎ রায়। সঙ্গীত। সংরক্ষণ সমিতি। ধর্মেন্দ্র দারুণ ভাল ছেলে। বিশুর (মানে বিশ্বজিৎ) বাড়িতে রাত দুটো অবধি জমিয়ে আড্ডা। বম্বে শহরটা বেশ। কলকাতায় দারুণ ভীড়। কিন্তু যাই বলুন কোলকাতার লাইফই আলাদা। কাছাকাছি কোথাও চাইনীজ খাওয়া যায়? আজ সুটিং লাঞ্চের পর।

রবি ঘোষের অভিনয় প্রতিভাকে ভাল-ভাবে এক্সপ্লয়েট, করতে ছবির দক্ষিণ দেশীয় চরিত্রটিকে বঙ্গীয় করে দিয়েছেন পরিচালক হৃষিকেশ মুখার্জি। কারণ অভিনেতা যদি উচ্চারণ সচেতন হয়ে যান তাহলে অভিনয় ঠিকমত ফোটে না। আশা করি রবি ঘোষের বাঙালী সুলভ হিন্দী এবং অভিনয়ের মুন্সিয়ানা হিন্দী দর্শকদের মন জয় করবে।

✻

প্রযোজক-পরিচালক-অভিনেতা রাজ-কাপুর 'মেরা নাম জোকার'-এর ম্যাজিক সিকোয়েন্স পিকচারাইজ করতে রাশিয়া যাবেন বলে যে রব উঠেছিল সেটা বোধ হয় শেষ পর্যন্ত কার্যকর হচ্ছে না। রাশিয়ায় নাকি শুটিং করতে খরচ অনেক বেশী হবে। দেশী ট্রিক ফটোগ্রাফীর যাদুকর বাবুভাই মিস্ত্রীকে ডেকে রাজ পরামর্শ করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত ম্যাজিক সিকোয়েন্সের শুটিং এই দেশের মাটিতেই হবে। 'মেরা নাম জোকার'এর ৩য় পর্বে রাজের নায়িকা শর্মিলা ঠাকুর। শর্মিলা শেষ অবধি রাজের সঙ্গে মস্কো যাচ্ছেন না এ খবর শুনলে শর্মিলার অন্য প্রডিউসাররা যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হবেন।

সরল শর্মা

"কাবুলিওয়ালা" নাট্যাভিনয়

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে প্রতি বুধ ও শুক্রবার অভিনীত হচ্ছে "কাবুলিওয়ালা"। তপন সিংহের চিত্রনাট্য অবলম্বনে "কাবুলি-ওয়ালা"র নাট্যগ্রন্থনা করেছেন নাট্যপরি-চালক তৃপ্তি চট্টোপাধ্যায়। মিনির চরিত্রে রয়েছে রিংকু ঘোষ। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রের শিল্পী মিহির ভট্টাচার্য, জীবেন বোস, তরুণ মিত্র, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, শীলা পাল, ইরা চক্রবর্তী, মিলি চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষাল প্রভৃতি। বিশিষ্ট চিত্রাভিনেত্রী অনুভা গুপ্তা একটি চরিত্রের শিল্পী। তিমির-বরণের সুরসৃষ্টি নাটকের অন্যতম আকর্ষণ। আলো ও মঞ্চের দায়িত্বে আছেন যথাক্রমে তাপস সেন ও সুরেশ দত্ত।

"গুপী গাইন বাঘা বাইন"

পূর্ণিমা পিকচার্স প্রযোজিত সত্যজিৎ রায়ের গুপী গাইন বাঘা বাইন ছবির কাজ সমাপ্ত। উপেন্দ্রকিশোর রায়ের কাহিনীর ভিত্তিতে এই ফ্যান্টাসি ছবি। এতে তপেন চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, জহর রায়, সন্তোষ দত্ত, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, অশোক মিত্র, দুই নতুন শিল্পী ভাস্বতী চট্টো-পাধ্যায় ও ইভা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অভিনয় করেছেন। ছবির গানগুলি গেয়েছেন অনুপ ঘোষাল। সত্যজিৎ রায় চিত্রপরিচালনা ও চিত্রনাট্যরচনা ছাড়া ছবির সংগীত পরিচালনা দায়িত্বও সম্পন্ন করেছেন। ব্যয়বহুল এই ছবির প্রযোজক নেপাল দত্ত ও অসীম দত্ত।

"চিরদিনের" ছবিতে উত্তমকুমার
ফটো—দেশ

॥ মল্লারের অনুষ্ঠান ॥

রবীন্দ্র সদনে সম্প্রতি সংগীত শিক্ষায়তন মল্লার দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের "শাপমোচন" নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করলেন। তার আগে ছাত্রছাত্রীরা সুজিত-নাথ এবং প্রভাস দত্তের পরিচালনায় সমবেত গীটার বাদ্যের অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। শাপমোচনে কমলিকার ভূমিকায় নৃত্য পরিচালিকা রুবী দত্ত এবং অরুণেশ্বরের ভূমিকায় উমা ঘোষ নৃত্য-কুশলতার পরিচয় দেন। 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে' গানের সঙ্গে পশ্চাদপটে ছায়ানৃত্যের সাহায্যে অরুণেশ্বরের অতীত দিনের স্মৃতি রোমন্থনের দৃশ্য পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্ন মঞ্চসজ্জার জন্য নির্দেশক শ্যামল দস্তরায় প্রশংসা অর্জন করেন। নেপথ্যে গান করেন রাজেশ্বর ভট্টাচার্য, সুমিত্রা সেন, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থনা ও সংলাপে কণ্ঠদান করেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরী মজুমদার ও পার্থ ঘোষ।

পেরুর সামরিক অভ্যুত্থান আলোচ্য সপ্তাহের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গত ৩ অকটোবর পেরুতে এক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে প্রেসিডেণ্ট ফারনানডো বেলানডি টেরি ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। ভোর রাত্রে সামরিক বিভাগের ট্যাঙ্কগুলি সিমার সরকারী ভবনসমূহ ঘিরে ফেলে। রাত্রি তিন টার সময় সামরিক অফিসাররা পঞ্চান্ন বছর বয়স্ক প্রেসিডেণ্ট টেরিকে প্রেসিডেনটের ভবন থেকে একখানা জিপে করে তুলে নিয়ে যান। আসছে জুলাইয়ে তাঁর প্রেসিডেনট পদের মেয়াদ (৬ বছর) শেষ হবার কথা। বুয়েনস আয়ারসের এক খবরে প্রকাশ, প্রেসিডেনট ফারনানডো বিলনডি টেরি পেরুর সামরিক অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরে বিমানযোগে আরজেনটিনায় পালিয়ে যান। তিনি নাকি আরজেনটিনা সরকারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। নতুন বিপ্লবী সরকার জেনারেল জুয়ান ভেলাসকো আলভারডোকে পেরুর প্রেসিডেনট নিযুক্ত করেছেন। সমরিক বাহিনীর লোক দের নিয়ে একটি মন্ত্রিসভাও গঠিত হয়েছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৩০ **সেপটেম্বর**—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী চাবন বলেছেন, কেন্দ্রের অস্থায়ী কর্মচারী-দের চাকরিতে ফিরিয়ে নেবার প্রশ্ন কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে এবং এই সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। আজ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের যুক্ত সংগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধি দল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলে তিনি এই কথা বলেন। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন শ্রীপিটার আলভারেজ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সর্বশ্রী এস এন ব্যানারজি, ডি জ্ঞানিনা ও পি গুপ্ত এবং এস কে ব্যাস।

১ **অকটোবর**—গতকাল পি টি আই পরিবেশিত সংবাদে বলা হয়েছে, যে সব কর্মচারী-দের বরখাস্ত করা হয়েছে বা সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে, তাদের বিষয় বিবেচনা করা হবে বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী চাবন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আজ কিন্তু আভ্যন্তরীণ বিষয় সংক্রান্ত কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, ১৯ সেপটেম্বরের প্রতীক ধর্মঘটে যে-সব সরকারী কর্মচারী যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে যে নীতি অবলম্বন করা হয়েছে, তা বর্তমানে কোনক্রমেই শিথিল করা হবে না বলে ইউ এন আই সংবাদ পরিবেশন করেছেন।

২ **অকটোবর**—আজ মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবার্ষিক উৎসবের সূচনায় সারা দেশের সঙ্গে একযোগে বাংলা দেশও জাতীয় জনকের উদ্দেশে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এই উপলক্ষে এদিন সকালে ব্যারাকপুরে গান্ধীঘাটে এবং কলকাতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান্ধীজীর সত্য অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী ধ্বনিত হয়।

সোমবার (৭ অকটোবরের) মধ্যে কাজে যোগ না দিলে ধর্মঘটী কর্মীদের বিরুদ্ধে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবেন বলে পর্ষদ সূত্রে জানা যায়। এমনকি বহু ক্ষেত্রে চাকুরি থেকে বরখাস্তও করা যেতে পারে। পূজার ছুটির পর ৭ অকটোবর পর্ষদ অফিসগুলি খুলেছে।

৩ **অকটোবর**—অনুগত কর্মীদের ব্যাপক হারে ভীতি প্রদর্শন ও নাজেহালের অভিযোগের জন্য ১৯ সেপটেম্বরের প্রতীক ধর্মঘটে যোগদানকারী সরকারী কর্মীদের প্রতি ভারত সরকারের মনোভাব আরও কঠোর হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তাঁদের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত যে সব অস্থায়ী সরকারী কর্মীর বিরুদ্ধে ছাঁটাই নোটিশ দেওয়া হয়েছে, তা প্রত্যাহার করা হবে না। এদের সংখ্যা বিশ হাজারেরও বেশী। আর যাঁরা ইতিমধ্যে বরখাস্ত হয়েছেন, তাঁদেরও কাজে যোগ দিতে হবে না।

দুর্গাপুরে ইসপাত কারখানায় অটোমেশন যন্ত্র বসানোর ফলে এখনই ৬ হাজার কর্মী উদ্বৃত্ত হচ্ছেন। পর্যায়ক্রমে এদের ছাঁটাই হওয়ার আশংকা। ওই ইসপাত কারখানায় সব বিভাগে যখন অটোমেশন যন্ত্রের কাজ শুরু করা হবে তখন আরও ৮ হাজার কর্মী উদ্বৃত্ত হবেন। হিন্দুস্থান স্টীল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এই আশংকা ও অভিযোগ করা হয়।

৪ **অকটোবর**—আজ শেষ রাতে নদীয়া জেলার চাকদহ থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে গয়েশপুরের কাছে বিদ্যুৎ সরবরাহের ট্রান্সমিশন টাওয়ার ভেঙে পড়ায় সীমান্ত জেলা নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে অন্ধকার হয়ে যায়। তবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওই দুই জেলার প্রধান প্রধান কয়েকটি শহরে বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

মিজো পার্বত্য অঞ্চলে ছয় বছরব্যাপী বিদ্রোহে এই প্রথম ভারত সরকার আজ প্রামাণিক দলিল-পত্র নিয়ে হাজির হয়েছেন। ওই দলিলপত্রের সাহায্যে ভারত সরকার এই কথাই প্রমাণ করেছেন যে, পাকিস্তান আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি লঙ্ঘন করে বৈরী নাগা ও মিজোদের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রকের জনৈক মুখপাত্র আরও জানান যে, এই ব্যাপারে রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে পারে।

৫ **অকটোবর**—চতুর্থ যোজনায় শিক্ষা সম্পর্কিত জাতীয় নীতিতে অন্যান্য বিষয় ছাড়াও ৬ থেকে ১১ বছর বয়সের সব ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার লক্ষ্য স্থির করা উচিত। তাছাড়া ১৯৭৫ সালের মধ্যে বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূর করার কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। শিক্ষা সম্পর্কিত উপদেষ্টা প্যানেল এই সুপারিশ করেছেন।

ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা ও ধস—সব মিলিয়ে উত্তর-বঙ্গে প্রলয়কাণ্ড। শিলিগুড়ি-দারজিলিং রেলপথে ট্রেন পড়ে গিয়েছে খাদের ভিতরে। তিস্তা পোল ভেসে গিয়েছে জলের তোড়ে। দারজিলিং-কালিমপং গ্যাংটক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। একের পর এক ধস। সঠিক মৃত্যু সংখ্যা কেউ জানে না। পি টি আই জানান, ১৩৫ জন। দারজিলিং সংবাদদাতা বলেন, ১৮৩ জন।

৬ **অকটোবর**—পাহাড়ী নদীর জলের ঢল জলপাইগুড়ি, কোচবিহার আর পশ্চিম দিনাজপুরের শত শত গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সর্বাধিক ক্ষতি জলপাইগুড়ি শহরের। বাঁধ ভাঙা জলের তলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে শহর এখন পলিমাটি চাপা পড়ে আছে। সংখ্যা কত তার হিসাব নেই। এখন পর্য খবর পাওয়া গিয়েছে, তাতে এই সংখ্যা কা দুইশত।

স্বতন্ত্র দলের সভাপতি অধ্যাপক এন জি আজ ভুবনেশ্বরে দলের পঞ্চম বার্ষিক সম্মে প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ সময় কেন্দ্রে ও রাজ্যে বিকল্প সরকার গ উদ্দেশ্য নিয়ে কংগ্রেস ও কমিউনিসটদের দিয়ে সর্বত্র গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তে প্রয়োজন আছে বলে জোড়ালো অভিমত করেন।

বিদেশী সংবাদ

৩০ **সেপটেম্বর**—দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পরর মন্ত্রী ত্রাণ ছান থান আজ শান্তি প্রতিষ্ঠার উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মধ্যে সরা আলোচনার প্রস্তাব করেন। এক সাংবাদি সম্মেলনে শ্রী থান বলেন, যে আলোচনায় দক্ষি ভিয়েৎনাম যোগ দেয়নি বা যে আলোচনার পিছ তার সুস্পষ্ট অনুমোদন ছিল না, সে আলো চনায় যদি কোন চুক্তি সম্পাদিত হয়, তবে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করবেন।

১ **অকটোবর**—মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সাহায্য যে পরিমাণ হ্রাস করা হয়েছিল, মারকিন সেনেট তার সবটাই ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন বলে যে-খবর বেরিয়েছে, তাতে দিল্লিতে কিছুটা রেখে-ঢেকে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে।

২ **অকটোবর**—আজ রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে মারকিন পররাষ্ট্র সচিব শ্রীডীন রাসক ভাষণ দিতে উঠলে দর্শকদের আসন থেকে প্রায় ডজনখানেক লোক উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তৃতায় বাধা দেয়। শ্রী রাসকের ভাষণে ভিয়েৎনাম প্রসঙ্গ আসতেই তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, "ভিয়েৎনামে যুদ্ধ থামাও"।

৩ **অকটোবর**—সোভিয়েট নেতৃত্ব তাঁর কমিউনিসট দুনিয়া ও আন্তর্জাতিক নীতির ব্যাপারে তীব্র মতভেদের সম্মুখীন হয়েছেন। পূর্ব ইউরোপের রাজধানীর পর রাজধানী থেকে লনডনে যে খবর এসেছে, তাহলে চেকভূমি আক্রমণের প্রাক্কালে ক্রেমলিনের নীতিতে যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল, প্রাগের শাসক-বর্গকে দমনে ব্যর্থতার দরুন তা আবার প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

৪ **অকটোবর**—আজ মসকোতে চেক-সোভিয়েট আলোচনা শেষ হয়েছে। চেকভূমিতে ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলির সৈন্যদের অস্থায়ী-ভাবে মোতায়েন করার ব্যাপারে দু-দেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে বলে ওই আলোচনায় স্থির হয়েছে। 'টাস' প্রচারিত একটি যৌথ ইস্তাহার থেকে একথা জানা যায়।

৫ **অকটোবর**—পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীআরসাদ হোসেন রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদের বৈঠকে ভারতকে আক্রমণ করে যে বক্তৃতা করেছিলেন, গতকাল ভারত তীব্র ভাষায় সেই বক্তৃতার নিন্দা করে এটাকে, "বিদ্বেষ প্রণোদিত প্রচারকার্য" বলে বর্ণনা করে।

৬ **অকটোবর**—সোভিয়েট ইউনিয়ন চীন সীমান্তে একটি নতুন ক্ষেপণাস্ত্র ঘাটি তৈরি করেছে বলে টাইমস পত্রিকার এক খবরে প্রকাশ। এই নতুন ঘাটি থেকে যে-সব ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া হবে, সেগুলির পাল্লার দূরত্ব ৪০২০ থেকে ৪৮২৮ কিলোমিটার পর্যন্ত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুসোলিনী ও মুক্তিফৌজ ॥ সৌরীন সেন
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ প্রহরের ইতালীর অকথিত কাহিনী এবং কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত লিবারেশন ফ্রন্টের মহান প্রতিরোধ সংগ্রামের ইতিহাস॥ ৯·০০

প্রতিনায়ক ॥ পার্থ চট্টোপাধ্যায়
আজকের রাজনৈতিক খেলার—ডিফেকশনের, নতুন নতুন দল গড়া ও ভাঙার এবং ভাঙানোর ইতিহাস; এক দুঃসাহসিক রাজনৈতিক উপন্যাস॥ ৭·০০

লোপামুদ্রা ॥ নির্মলচন্দ্র মৈত্র
উপরতলার মানুষের সবই মেকি—মেকি ভালোবাসা, মেকি সৌজন্য, মেকি সরলতা, মেকি আদর্শবাদ। একমাত্র খাঁটি লেখকের অপার রসবোধ॥ ১০·০০

উত্থিত আফ্রিকা ॥ অংশু দত্ত
ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে আফ্রিকার জনজাগরণের সামগ্রিক ইতিহাস। বহু আর্টপ্লেট ও মানচিত্র সম্বলিত॥ ১২·০০

উদ্যত খড়্গ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
জ্বলন্ত যৌবনমূর্তি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রদীপ্ত জীবনী। সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন সমগ্র বিপ্লববাদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস॥ ১ম : ৬·৫০, ২য় : ৭·০০

মহাভারতের চরিতাবলী ॥ সুখময় ভট্টাচার্য
পঞ্চাশটি চরিত্রের আলোচনার মাধ্যমে তৎকালীন রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক আচার-ব্যবহার ও জানা-অজানা বহু প্রেমোপাখ্যানের উত্থাপন॥ ১৮·০০

গন্ধরাজ ॥ বনফুল
লিচ্ছবি বংশের মনোরম পার্বত্যরাজ্য গঞ্জনগ্রামের শেষ রাজপুত্র গন্ধরাজ ও স্বেচ্ছাচারিণী রানী সুরোপিণীর প্রেমোপাখ্যান। এক সুধাবর্ষী উপন্যাস॥ ৮·০০

বাদশাসিক্রীগড় ॥ শীতাংশুবিকাশ সেনগুপ্ত
প্রেম, প্রতারণা ও প্রতিহিংসার অনন্য উপন্যাস যে উপন্যাসে প্রেম শুধু এক আনন্দিত বেদনা—যে প্রেম মোহনে নয় দহনে॥ ১০·০০

যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দ ॥ দিলীপকুমার রায়
মুনি, জ্ঞানী, প্রেমী, যোগী, গুরু, ঋষি ও কবি—এই সাতটি অধ্যায়ের মাধ্যমে অরবিন্দ-জীবন-দর্শন ও কাব্য প্রতিভার আলোচনা॥ ১০·০০

তিন দুয়ারী ঘর ॥ কণিষ্ক
জীবনযুদ্ধে রক্তাক্ত আইভি ব্যারেট, নিঃসঙ্গ এমিলি, স্বপ্নলগ্ন রুক্মিণী স্বামীনাথন ও সমীরকে নিয়ে সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস॥ ৮·০০

শত গল্প ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
একশোটি বিস্তৃত-আয়তন পূর্ণাঙ্গ গল্পের সমারোহ। কত মানুষ, কত দৃশ্যপট, কত বিষয়, কত ঘটনা। শত তারার চিরন্তনী দীপ্তি দিয়ে তৈরী॥ ২০·০০

শিপ্রানদীপারে ॥ দীপ্তি ত্রিপাঠী
কাশ্মীর, তাম্রলিপ্ত, ভাকাটক ও সিংহলের পটভূমিকায় সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত, নবরত্ন, ফা-হিয়েনের সমাবেশে রচিত ক্ল্যাসিকাল উপন্যাস॥ ৬·০০

আরাবল্লী থেকে আগ্রা ॥ শ্রীপারাবত
উদয়সিংহ, রাণাপ্রতাপ, আকবর বাদশাহ, রাজা মানসিংহ, লালিমা বেগম প্রভৃতি চরিত্রের সমাবেশে রচিত এক মহান উপন্যাস॥ ১৮·০০

জাতিস্মরের শিল্পলোক ॥ পঞ্চবর্ষী
বিগত একশত বছরের সংগীত ও সংগীতশিল্পীদের সম্পর্কে বহু জানা-অজানা তথ্য ও ঘটনাসমৃদ্ধ রম্যরচনা॥ ৬·০০

একটি আগুন-রাঙা বই

১৯০৫ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত বাংলার স্বদেশী যুগের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস

সমুদ্রগুপ্ত রচিত বঙ্গভঙ্গ

মূল্য : ১২·৫০

কার্জন ছুঁড়েছিলেন মৃত্যুবান। ফুলার ছুটিয়েছিলেন নির্যাতনের খ্যাপা ঘোড়া। গঙ্গা আর পদ্মার বুকে লক্ষ কণ্ঠে বেজে উঠল প্রতিবাদ, ধিক্কার আর 'বয়কট'। নিঃশঙ্ক সুরেন্দ্রনাথ এগিয়ে এলেন যোদ্ধারূপে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে পাওয়া গেল সেদিনের মরণ-পণ সংগ্রামের রণ-ধ্বনি 'বন্দেমাতরম্'। রবীন্দ্রনাথের কলমে বইল স্বদেশী গানের বন্যা। নিবেদিতা বাজালেন জাতীয়তার জয়শঙ্খ। লাগল আগুন বিলেতী কাপড়ে, বিদেশী শাসনে। সতীশ মুখুজ্যের নেতৃত্বে গড়া হল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। অশ্বিনীকুমার দত্ত বরিশালকে গড়লেন 'স্বদেশীর পীঠস্থান'। মাণিকতলার বাগানে গড়ে উঠল বারীন ঘোষের বোমার কারখানা। কংগ্রেস নিয়েছিল আবেদন-নিবেদনের নরম পথ। চরমপন্থী অরবিন্দ, বিপিন পাল আর চিত্তরঞ্জনের দল ঘোষণা করলো পূর্ণ স্বরাজের দাবী। তারপর নির্যাতন নির্বাসন, ফাঁসীর মঞ্চ। তারপর সারা ভারতবর্ষের মাটিতে রক্তশিখার আগুন।

আনন্দধারা প্রকাশনা ॥ ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(সি ৯৮১১)

প্রকাশিত হয়েছে

দাম ৬·০০

স্বনামধন্য শিবরাম চক্রবর্তীর বাছা বাছা একুশটি সাম্প্রতিক গল্পের এক অনবদ্য সংকলন "ভালোবাসার অনেক নাম"। এটিকে শুধু একটি সংকলন না বলে বরং শিবরাম চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ গল্প বা নির্বাচিত গল্প বললেই যেন ঠিক হয়। তবে এ গল্পগুলির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণত শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পগুলি "ইউ" মার্কা অর্থাৎ বয়স নির্বিশেষে "সর্বসাধারণের জন্য"। কিন্তু এ গল্পগুলি তা নয়। এগুলি একেবারেই "এ" মার্কা গল্প: অর্থাৎ, "কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য"।

শিবরাম চক্রবর্তীর

মজার গল্পের সংকলন

ভালোবাসার অনেক নাম

নানান কারণে আজকের দিনে মানুষের মন থেকে আনন্দ নামধেয় বস্তুটি যখন ক্রম-অপাস্রিয়মাণ, তখন এই গল্পগুলি পাঠকদের কাছে যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা এক গুচ্ছ আশীর্বাদের মত মনে হবে।

● এই লেখকের অন্যান্য বই ●

ঘরণীর বিকল্প ৩·০০ হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন ২·৫০
ইতুর থেকে ইত্যাদি ৩·০০

শ্রুতি ভালোবেসে বিয়ে করেছিল অর্জুনকে। রাকেশও ভীষণ ভালোবাসতো তার স্ত্রী রুমানিকে—মেয়ে এলা ছিল তার চোখের মণি; তবু এক আশ্চর্য দুর্বলতা ছিল তার শ্রুতির উপর। শ্রুতি তা জানতো। রাকেশের দুর্বলতাকে তার গ্রাম্যতা বলে মনে হতো। তাই সে বরাবর উপেক্ষার শীতলতা উপহার দিয়েছে রাকেশের আবেগের উত্তপ্ততায়।

বহুকাল পরে শ্রুতির সঙ্গে আবার দেখা হল রাকেশের—প্রৌঢ় বিপত্নীক নিঃসঙ্গ রাকেশের—নিবিড় অরণ্যের নগ্ন নির্জনে। স্বামীর কাছ থেকে প্রত্যাশিত সুখার্জনে ব্যর্থ শ্রুতি যৌবনের প্রান্তে এসে যেন এক নতুন চোখে

বুদ্ধদেব গুহর

নতুন উপন্যাস

নগ্ন নির্জন

দেখল রাকেশকে। এককালে যাকে কামনার লোলিহস্ত মনে হয়েছিল, এখন যেন তাই ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হল তার চোখে।

রোমান্টিক প্রেম-কাহিনী তরুণ লেখক বুদ্ধদেব গুহর কলমের ছোঁয়ায় এমন এক অদ্ভুত মাদকতায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে, যা পাঠকের মনকে এক মধুর আবেশে আবিষ্ট করে যেন যৌবনের কোনও এক প্রার্থিত কল্পরাজ্যে নিয়ে যায়—তার "হলুদ বসন্ত" যাঁরা পড়েছেন তাঁরা এ কথা না স্বীকার করে পারবেন না। তাঁর নতুন উপন্যাস "নগ্ন নির্জন" বন-জঙ্গল এবং শিকারের নির্জন ভয়াবহ পটভূমিকায় রচিত এক বিচিত্র ধরনের প্রণয়কাব্য।

প্রকাশিত হয়েছে

দাম ৪·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলকাতা ৯ ॥ ফোন ৩৪-১৪৮৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা ৯ ॥ ফোন ৩৪-৮২৬৪

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৫ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪২
শনিবার ২ কার্তিক ১৩৭৫

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২০-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়
বার্ষিক ... ২৫.০০
ষাণ্মাসিক ... ১২.৫০
ত্রৈমাসিক ... ৬.২৫

ভারতে
বার্ষিক সডাক ... ৩০.০০
ষাণ্মাসিক " ... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক " ... ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)
বার্ষিক সডাক ... ৩০.০০
ষাণ্মাসিক " ... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক " ... ৮.০০

ভারতের বাইরে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক সডাক ... ৪২.০০
ষাণ্মাসিক " ... ২১.০০
ত্রৈমাসিক " ... ১০.০০

অন্যান্য অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক ... ৬১.০০
ষাণ্মাসিক ... ৩১.৫০
ত্রৈমাসিক ... ১৬.০০

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাশুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

DESH
Saturday 19 October 1968

উত্তরবঙ্গে প্রলয়

দেবী দুর্গা এবছরে নাকি ঘোটকে এসেছিলেন, গিয়েছেনও ঘোটকে। কথায় বলে, ঘোটকে আগমন ও গমন কোনোটাই শুভলক্ষণ নয়, বরং বিপর্যয়ের লক্ষণ। বিশ্বাস করি আর না করি দুর্গার আগমনের পূর্বে ও পরে যে এই বাংলাদেশে একটা মহাবিপর্যয় ঘটে গেল তা তো আর অস্বীকার করা যাবে না। মায়ের মনে কি ছিল কে জানে তবে প্রকৃতির মনে যে একটা দুরভিসন্ধি ছিল তাতে সন্দেহ নেই। পুজোর আগে পশ্চিম বাংলার অর্ধেকটাই প্রবল বন্যার কবলে পড়েছিল, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, নদীয়া থেকে চব্বিশ পরগণার নানা এলাকা—বিস্তীর্ণ এক অঞ্চল বন্যাবিধ্বস্ত হয়েছে, সাড়ে ছ' হাজার বর্গ মাইল ধরে সেই বন্যার ক্ষত, প্রায় সত্তর লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। এই ক্ষত এবং ক্ষতি সামলে নেবার উপায় করতে না করতেই পুজোর ঠিক পরেই উত্তরবঙ্গের বন্যা। উত্তরবঙ্গে যা তাকে শুধু বন্যা বললে সব বুঝি বলা হয় না, প্রাকৃতিক এক তাণ্ডব যেন অকস্মাৎ এই পার্বত্য অঞ্চলে ঘটে গিয়ে সব লণ্ডভণ্ড করে দিল। উত্তরবঙ্গের প্রায় গোটাটাই এই তাণ্ডবের ক্ষেত্র, দার্জিলিং থেকে দিনহাটা, কালিম্পং থেকে কোচবিহার। এই ধ্বংসের লীলা শেষ হতে না হতে বন্যার দৃষ্টি পড়েছে বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর আর মালদহের ওপর। অর্থাৎ, গোটা পশ্চিমবঙ্গই এবার বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের অভিশাপে অভিশপ্ত হল।

তবু মনে হয়, উত্তরবঙ্গের—বিশেষ করে জলপাইগুড়ি শহর ও ওই জেলার যে ভয়াবহ অবস্থা হয়েছে তা বোধ হয় ইদানীং কালের মধ্যে পশ্চিম বাংলায় আর ঘটেনি। অনেকেই মনে করেন, গত যুদ্ধের সময় দামোদরের বন্যা ও মেদিনীপুরের উপকূলে ঝড়ঝঞ্ঝার মতন এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যা অবিশ্বাস্য অথচ সত্য। এত প্রাণহানী সচরাচর বড় দেখা যায় না, শত শত মানুষ বন্যার জলে ভেসে গেছে, অসংখ্য জীবজন্তু পচে গলে একাকার হয়েছে। আমরা নাকি বিশ শতক—অর্থাৎ বিজ্ঞানের যুগে বাস করি—যে-যুগে মানুষ বিপদকে আগে থেকে ঠেকাতে পারে, তার সঙ্গে লড়তে পারে। অথচ জলপাইগুড়ির অবস্থা শুনলে মনে হয় না নির্বোধের মতন ভাগ্যের হাতে নিজেদের সমর্পণ করা ছাড়া আমাদের অন্য কোনো পথ আছে। থাকুক না বাঁধ, থাকুক না সেই ব্যবস্থা যাতে নদীর জল বিপদসীমা অতিক্রম করলেই মানুষকে সাবধান করে দেওয়া যায়; কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, বাঁধ তুচ্ছ, সতর্ক করার রীতিনীতিও শিকেয় তুলে কর্তৃপক্ষ নিদ্রামগ্ন। বস্তুত, এ-অভিযোগ আজ প্রত্যেকের যে, সময়মতন কেন বিপদবার্তা জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হল না, হলে ঘুমের ঘোরে এভাবে শত শত ভাগ্যাহতকে প্রাণ হারাতে হত না। এই অভিযোগের কোনো জবাব নেই। তার চেয়েও লজ্জার কথা, জনৈক কর্তাব্যক্তি যিনি সরকারী তরফে নানা দায়িত্ব পালনের জন্যে মাইনে পান, তিনি তাঁদের অক্ষমতার দোহাই দিতে নিজেদের বিপদ-বিঘ্নের কথা তুলেছেন। অর্থাৎ যুক্তিটা এই রকম, আগে নিজে বাঁচি পরে অন্যকে বাঁচাব। এই সব দায়িত্বহীন নির্লজ্জ কর্মচারীরা কি করে উচ্চপদে বসে থাকেন সেটাই আশ্চর্যের।

যাঁরা অর্ধমৃত তাঁদের জন্যেই আপাতত চিন্তা করতে হবে। দেখা যাচ্ছে, শহরে যখন গলিত শব, মৃত গবাদি পশু আর বন্যার রেখে-যাওয়া ধ্বংসস্তূপ ছাড়া কিছু নেই তখনও আমাদের সরকারী ব্যক্তিদের শিরদাঁড়া সহজে সোজা হয় না। বিস্ময়ের চমক ভাঙতে আঠারো ঘণ্টা। স্বয়ং কুম্ভকর্ণও লজ্জা পেতেন। তারপর সেনাবাহিনীর তলব, কলকাতার খোদ সরকারী ভবনে হাড়াহুড়ো। কোথায় খাদ্য, কোথায় পানীয় জল, কোথায় বা আশ্রয়? মহামারীর আতঙ্ক রোধ করতেই বা কে ছুটবে? সরকারী কর্তব্য স্থির হতে যদি লাগে আঠারো ঘণ্টা, তা হাতে কলমে কাজ করতে লাগে তিন গুণ সময়। বলা বাহুল্য, এই অভিযোগ ভুক্তভোগী মাত্রেই করেছেন। এই আমাদের ত্রাণকার্য বা সরকারী তৎপরতার নমুনা। বুঝি না, প্রশাসনের এই গড়িমসি ভাব কবে ঘুচবে!

বন্যার্তদের জন্যে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অতি তৎপরতার সঙ্গে করা চাই এ যেমন সত্য তেমনই সত্য নিছক সরকারের ভরসায় থাকলে কিছু লাভ হবে না—বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণকেও আজ এই দুর্দিনে এগিয়ে আসতে হবে আত্মপরিজন ভাই বন্ধু প্রতিবেশীকে বাঁচাতে।

মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রী পি সুন্দরাইয়া বলেছেন, শ্রীধর্মবীরকে বরখাস্ত করে শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জির নেতৃত্বে গঠিত যে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অপসারিত করা হয়েছিল তাকে গদিতে বসাও। শ্রীসুন্দরাইয়া অবশ্যই জানতে চান না যে, এটা কোনমতেই করা সম্ভব কি না; কারণ গত ফেব্রুয়ারী মাসে যে বিধানসভাকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে তাকে সংবিধান অনুসারে কোনমতেই বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব নয়। শ্রীসুন্দরাইয়ার বক্তব্য, যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সরিয়ে দেওয়া ত' ছিল সংবিধান বহির্ভূত কাজ। কাজেই ওটা সম্ভব হলে এটাই বা হবে না কেন।

শ্রীসুন্দরাইয়ার রাগটা প্রধানতঃ রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরের প্রতি। শ্রীধর্মবীর ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে জানিয়েছেন, উত্তর বঙ্গে আগামী নভেম্বর মাসে ত' দূরের কথা কয়েক মাসের মধ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচনের ভোট গ্রহণ সম্ভব নয়। রাজ্যপাল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে এই কথাই বলেছেন যে, উত্তরবঙ্গে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে বেশ কিছু সময় লাগবে; এবং শ্রীমোরারজী দেশাই-র মতে বর্তমান অবস্থায় নির্বাচনের কথা চিন্তা করাও অস্বাভাবিক মনে হবে। রাজ্যপালের বর্ণনা থেকে এবং সর্বত্র প্রচারিত সংবাদ থেকে এটা কলকাতায় বসেও অনুমান করা যায় যে, উত্তরবঙ্গে প্রকৃতির এমন রুদ্ররোষ আগে আর কখনও হতে দেখা যায়নি। চারদিকে আজ ধ্বংসের গভীর চিহ্ন; রেল লাইন, সড়ক, সেতু, ঘরবাড়ি সব তছনছ হয়ে গিয়েছে। কত মানুষ হারিয়ে গিয়েছে তার হদিস নেই। কেউ বলেন কুড়ি হাজার; আবার অনেকে বলেন তিরিশ হাজার। কত মানুষের হাড় যে মিশে গিয়েছে গবাদি পশুর হাড়ের সঙ্গে তার কোন হদিস নেই। সঠিক সংখ্যা অনুমান করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কারণ, জলপাইগুড়ি শহরে তিস্তার সর্বনাশা জলোচ্ছ্বাস যখন ঘুমন্ত মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন আর কিছু করার ছিল না।

প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রূপ দেখা দিয়েছিল ৪ অকটোবরের রাতের অন্ধকারে। তার দুদিন আগে থেকেই, বলতে গেলে দশমী রাতে বিসর্জনের বাজনা বন্ধ হতে না হতেই শুরু হয়েছিল বৃষ্টি। সে-বৃষ্টির মধ্যে ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত ছিল কিনা জানা যায়নি; কিন্তু এটা জানা গিয়েছে, পরদিন থেকে বৃষ্টির তোড় ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবিশ্রান্ত, অবিরাম বৃষ্টিধারা নেমে আসতে থাকে হিমালয়ের গা বেয়ে। ৩ অকটোবরের মধ্যে তিস্তার জল প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পায় এবং তিস্তাবাজারের কাছে তিস্তার জলস্ফীতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। তিস্তাবাজারের কাছেই ছিল নদীর জল মাপার ঘাঁটি। সরকারী তথ্য থেকে জানা যায়, তিস্তাবাজারের ঘাঁটি থেকে ঊর্ধ্বতন অফিসারদের কাছে ৪ অকটোবর সকালে একটি তার আসে 'ভীষণ বিপদ', তিস্তার জলস্ফীতি অতিদ্রুত বিপদসীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যের পর ঘাঁটিগুলো থেকে আর কোন সাড়া মেলেনি। কিন্তু সকালে পাওয়া বিপদসংকেতও জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়নি। তাছাড়া বৃষ্টির বেগও ৪৮ ঘণ্টা পরে এতটুকু কমেনি। অনেক রাতে তিস্তা থেকে ছুটে এল ১৫ ফিট উঁচু এক জলের দেওয়াল। ভাসিয়ে নিয়ে গেল সামনে যা পড়ল। ভোর হবার আগেই জলের নীচে তলিয়ে গেল জলপাইগুড়ি, মেখলিগঞ্জ, গ্রাম গঞ্জ, মাঠঘাট। ভেসে গেল গবাদি পশু, হারিয়ে গেল ঘুমন্ত মানুষগুলো।

কলকাতায় খবর এল জলপাইগুড়ির কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। দার্জিলিং থেকে সংবাদ এল, পাহাড়ে ঢল নেমেছে তীব্র বেগে। নবীন পাহাড় হিমালয়ে ধস নেমেছে, ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে দিয়েছে হিল কার্ট রোড, (দার্জিলিং-শিলিগুড়ি সড়ক), গুঁড়িয়ে গিয়েছে পাহাড়ী খেলনা ট্রেন দার্জিলিং মেল, কার্সিয়াং, তুং, সোনাদা, ঘুম সবত্র শোনা যাচ্ছে মানুষের হাহাকার! কালিম্পং শহর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, কারণ তিস্তার বেগে ভেসে গিয়েছে তিস্তাবাজারের পুল, ভেঙ্গে পড়েছে রেল সেতু, তিস্তাবাজারের অর্ধেক নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে জলের স্রোতে, মানুষের দেহ চাপা পড়েছে পাহাড়ী ধসে। শিউরে উঠল গোটা দেশের লোক; কারণ, মৃতের সংখ্যা অগণিত। যতটুকু এ-পর্যন্ত জানা গিয়েছে (১২ অকটোবর পর্যন্ত) মৃতের সংখ্যা দেড়হাজারের মত। এখনও স্তূপ হয়ে আছে মৃতদেহ নানা জায়গায়। কারণ, সরাবার লোক নেই। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ছাড়া কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর এবং মালদহ থেকেও এল ধ্বংসের সংবাদ। এক নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল, ডাক তার, রেল চলাচল, পরিবহণ ব্যবস্থা। হাজার হাজার মানুষ, যারা পুজোর ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিল পাহাড়ে, আটকে পড়ল দুর্লঙ্ঘ্য বাধার মধ্যে। উৎকণ্ঠায় ভরে গেল চারদিক।

এমনি একটা বাস্তব অবস্থাকে সামনে রেখেই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক বললেন, অপসারিত যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ফিরিয়ে আন, দুদিনে ঠিক করে দেবে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ। দুদিনের মধ্যে ঠিক করে দেবে রাস্তাঘাট, ভাঙ্গা সেতু; মুছে দেবে ধ্বংসের চিহ্ন। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাঁচিয়ে তুলতে পারলে উত্তরবঙ্গে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে, তবু প্রশ্ন ওঠে রাস্তাঘাট মেরামত হলে, বা ধ্বংসের চিহ্নগুলো সরিয়ে ফেললেই কি নির্বাচনের অবস্থা ফিরে আসবে? তাহলেই কি উত্তর বঙ্গের মানুষের বিপর্যস্ত দেহমন জোড়া লাগবে? রিলিফের আশায় যারা দিন গুনছে, খাদ্যের পানীয়ের অভাবে যারা ধুঁকছে, গলিত শবের পাশে বসে যারা মড়কের আশংকায় পরিত্রাণের পথ খুঁজছে তারা কি আসবে নির্বাচনের আসর জমাতে?

প্রশ্নটার কিছু উত্তর জুগিয়েছেন রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর নিজে। তিনি দার্জিলিং ছিলেন দুর্যোগের সময়। তিনি নিজে ঘুরে দেখেছেন বিধ্বস্ত এলাকা। গিয়েছেন জলপাইগুড়ি উদ্ধারকার্যে এবং রিলিফের ব্যবস্থা তদারক করতে; সমগ্র সমস্যার কিনারা করতে। স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছেন রাজ্যপাল। তিনি অনুভব করেছেন জলপাইগুড়ি এলাকায় শাসনযন্ত্র অচল

হয়ে গিয়েছে; কারণ, বে-সরকারী কর্মচারী বা অফিসারদের উপর ভার ছিল শাসন-যন্ত্রকে চালিয়ে নেবার তারাও সপরিবারে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিরাপদ জায়গায়। ফলে, বিধ্বস্ত এলাকার মানুষের মনোবল ভেঙে গিয়েছে। রাজ্যপাল বলেছেন, অতি কষ্টে তিনি শাসনযন্ত্রকে কিছুটা সক্রিয় করতে পেরেছেন এবং রিলিফের জন্য কিছু ব্যবস্থাও চালু করতে পেরেছেন।

এটা কারও দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি যে, শুধু উত্তরবঙ্গে নয় কলকাতায়ও পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের শাসনযন্ত্রের এমন কোন তৎপরতা দেখা যায়নি যার ফলে বোঝা যায় প্রয়োজনের তাগিদ সম্বন্ধে সবিশেষ উদ্বেগ আছে। দুর্যোগ কেটে যাবার সাতদিন পরেও দেখা গিয়েছে, সরকারী সাহায্যকে ব্যাপকতর করার কোন প্রচেষ্টা চালু করা হয়নি। ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে কিছু চাল গিয়েছে, খাবার যায়নি। মড়ক নিবারণ করার কিছু ওষুধপত্র হয়ত পাঠান হয়েছে, কিন্তু বিলিব্যবস্থার কোন বন্দোবস্ত করা হয়নি। রিলিফ-এর সমস্যা পর্যবেক্ষণ করার জন্য কলকাতা থেকে দলে দলে সরকারী অফিসার কর্মচারী বিমানযোগে উড়ে গিয়েছেন উত্তরবঙ্গে। ফিরে এসেছেন তথ্য নিয়ে। কিন্তু সাহায্যদানের ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সরকারী মহল থেকে অবশ্য জানান হয়েছে যে, যুদ্ধকালীন অবস্থার মত বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে রিলিফের কাজের জন্য। কিন্তু উত্তর-বঙ্গের মানুষ তাতে খুশী হতে পারেনি।

বরং উপপ্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই যখন উড়ে গেলেন জলপাইগুড়ি তখন তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বিক্ষোভ জানাতে। ফুলের মালার পরিবর্তে শ্রীদেশাইকে গ্রহণ করতে হয়েছে ইঁটের টুকরো, কাদার প্রলেপ। উত্তর বঙ্গের মানুষ সহানুভূতি চায়নি, চেয়েছিল রিলিফ, চেয়েছিল খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়। দিল্লী ফিরে যাবার আগে শ্রী দেশাই তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করলেন উত্তর বঙ্গের ডিভিশনাল কমিশনারকে, বলে গেলেন, নির্বাচনের কথাও এখন আর উত্তর বঙ্গের মানুষের কাছে উচ্চারণ করা যাবে না। উত্তর বঙ্গের দুর্যোগ শাসন-যন্ত্রকেও বিকল করে দিয়ে গিয়েছে, নির্বা-চনের আবহাওয়াটা সম্পূর্ণরূপে মুছে গিয়েছে।

কাজেই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য বা দাবী উত্তর বঙ্গের বর্তমান অবস্থায় অবাস্তব বলেই মনে হবে। এটা শুধু রাস্তা ঘাট মেরামত করার প্রশ্ন নয়, এটা নির্বাচনের মানসিক প্রস্তুতির প্রশ্ন। সে-প্রশ্নটা সামনে রাখলে শ্রীসুন্দরাইয়ার একথারও কোন গুরুত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না যে, প্রয়োজন হলে নির্বাচন কমিশনার প্রতি ঘরে ঘরে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খুলতে পারেন। হয়ত পারেন, কিন্তু ভোট-গ্রহণ কেন্দ্রে ব্যালট পেপার দেবার বা নেবার লোক পাওয়া যাবে কিনা সেটা একমাত্র সরকারই বলতে পারে। হয়ত প্রকৃতপক্ষে সব কথাটাই শ্রীসুন্দরাইয়ার প্রকৃত কথা নয়। কারণ, ঠিক একই সময় দেখা যাচ্ছে, যুক্ত-ফ্রণ্টের সভায় নির্বাচনের বিষয়কে মুলতুবী রেখে উত্তরবঙ্গে রিলিফের কাজ কিভাবে করা যেতে পারে তা নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া এ-কথাও তখন যুক্ত ফ্রণ্টের কাছে পৌঁছে গিয়েছে যে, কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ শিলিগুড়ি চলে গিয়েছেন উত্তরবঙ্গে রিলিফের কাজ তদারক করার জন্য। এই কাজের জন্য উত্তর বঙ্গে যাবার আগে কংগ্রেস ভবনে বসে তিনি একটি বে-সরকারী সাহায্য কমিটিও গঠন করে দিয়েছেন। আর বলে গিয়েছেন, এখন আর নির্বাচনের কথা নয়, রিলিফের কথা। সে-কথাই তিনি বলবেন উত্তরবঙ্গবাসীদের কাছে।

এটার মধ্যে রাজনৈতিক দিক নিশ্চয়ই আছে কিন্তু সেটা আপততঃ উহ্য। তা উহ্য আছে বলেই যুক্তফ্রন্টকে নির্বাচন ছেড়ে বেসরকারী রিলিফের কথা চিন্তা করতে হয়েছে। সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে যে, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু এবং ফ্রন্টের অন্যান্য কয়েকজন নেতা উত্তর বঙ্গে গিয়ে সকল সমস্যা আলোচনা করে বে-সরকারী রিলিফের কাজ শুরু করবেন। তাছাড়া যুক্তফ্রন্টের কাছে নির্বাচন প্রশ্নে অন্য অসুবিধাও দেখা দিয়েছে। সেটা রাজ-নৈতিক অসুবিধা। এর আগে যখন নির্বা-চনের তারিখ নির্ধারণের প্রশ্ন ওঠে, তখন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নভেম্বরের নির্বাচন পিছিয়ে দেবার দাবী জানান হয়েছিল। তখন জানান হয়েছিল, নভেম্বর মাসে পশ্চিম বাংলার অনেকাংশ জলে ডুবে থাকে বলে ভোটদাতাদের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আসা-যাওয়ার অসুবিধা ঘটতে পারে। সে দাবীর বিরোধিতা করেছিল যুক্তফ্রন্ট অত্যন্ত তীব্রভাবে। তারপর যখন মেদিনীপুরে অঞ্চলে বন্যা এল, তখন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রীসেনবর্মা নিজে সরেজমিনে তদন্ত করে বললেন, নির্বাচন নভেম্বরেই সম্ভব এবং সেই অনুসারে তিনি ১৭ নভেম্বর নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক বিচারে নিঃসন্দেহে কংগ্রেসের অনুকূল ছিল না।

ফলে, উত্তর বঙ্গের বিপর্যয় যখন দেখা দিল, তখন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাদের রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজীটা সম্পূর্ণরূপে বদলে দেওয়া হল। এবার যখন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কলকাতায় এলেন উত্তর বঙ্গের অবস্থাটা জানতে, তখন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁর [illegible] কোন নির্দিষ্ট বক্তব্য রাখেননি। তিনি এটাই জানিয়েছিলেন যে, নির্বাচনের সকল দায়িত্ব মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের এবং তিনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন তার দায়িত্বও সম্পূর্ণরূপে তাঁর। কংগ্রেসের পক্ষে বর্তমান অবস্থায় অন্য কোন বক্তব্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে রাখা হয়ত সম্ভব ছিল না; ফলে, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পক্ষে এবং যুক্তফ্রন্টের কাছে নভেম্বরে নির্বা-দিন স্থির করা একটা গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবেই দেখা দিয়েছিল। কোন কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল উত্তর বঙ্গের নির্বাচনকেন্দ্র-গুলোকে বাদ দিয়ে পশ্চিম বাংলার অন্যান্য কেন্দ্রে নভেম্বরেই নির্বাচন করা হোক; কিন্তু কংগ্রেস তাতে আপত্তি জানায়।

এই কারণেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে প্রধানতঃ রাজ্যপালের রিপোর্টের উপরই নির্ভর করতে হয়েছিল। স্বভাবতঃই রাজ্যপালের পক্ষে উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে এমন কোন আশ্বাস মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে দেওয়া সম্ভব হয়নি যার ফলে নভেম্বরের সিদ্ধান্তকে বহাল রাখা যায়। সেটা সম্ভব হয়নি বলেই শ্রীসুন্দরাইয়া তাঁর দলগত রাজনীতিটাকে প্রত্যক্ষভাবে সরকারের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি শুধু রাজ্যপালের অপসারণই দাবী করেন নি, স্পষ্টভাবে অভিযোগ করেছেন সরকারী অফিসার কর্মচারীদের হাতে শাসনক্ষমতা অটুট রাখার জন্যই রাজ্য-পাল মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে জানিয়ে-ছিলেন যে, খুব শীঘ্র উত্তরবঙ্গের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না। তাঁর মতে, এটা নিছক অজুহাত।

শ্রীসুন্দরাইয়ার আক্রমণটা যে-ভাবেই বিচার করা যাক না কেন দেখা যাবে, তাঁর বক্তব্যের মধ্যে একটা নিরাশার সুরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। যে-কারণেই হোক, রাজনৈতিক বিচারে পশ্চিম বাংলার মধ্যবর্তী নির্বাচন মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে ছিল গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তা ছিল বলেই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পার্টি কংগ্রেসের দিন ধার্য করা হয়েছিল ঠিক নির্বাচনের পর। নভেম্বরের নির্বাচন ছিল পার্টির কম্যুনিস্ট আন্দোলনে নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করার প্রধান সোপান। হয়ত সে-কারণেই শ্রীসুন্দরাইয়ার মন্তব্যে তীব্রতা ছিল।

কিন্তু উত্তর বঙ্গের জীবনের বাস্তব চিত্র অত্যন্ত মর্মান্তিক বলেই নির্বাচনের প্রসঙ্গ অবাস্তব মনে হবে। এই অবাস্তবকেই শ্রীসুন্দরাইয়া সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। উত্তর বঙ্গের মানুষের প্রশ্নটাকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে এবং মানবতার মানদণ্ডে বিচার করলে শ্রীসুন্দরাইয়ার মন্তব্য খাপ-ছাড়া বলেই মনে হবে।

অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনা থেকে
এ-যাত্রা রেহাই!

ভুবনেশ্বরে স্বতন্ত্রপার্টি সম্মেলন।

হাতে হাত মিললেও বিবাদ
কি মিটেছে?

বিদেশিকী

মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোটদান পর্ব আগামী ৫ নভেম্বর। প্রতি চার বছর অন্তর এই গণতান্ত্রিক ব্রত উদ্‌যাপন, জনসাধারণের ইচ্ছামত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পরিচালক নির্বাচন। জনসাধারণের এ ব্যাপারে উৎসাহ থাকারই কথা। কিন্তু এ যাত্রা উৎসাহ দেখা যাচ্ছে সামান্যই। আমেরিকায় নিশ্চয়ই নক্সালপন্থীদের ধরনে কোন চরম বামপন্থী দল প্রচার করছে না যে, ভোটাভুটি জিনিসটাই মস্ত একটি ভাঁওতা, অতএব হে মার্কিন নাগরিক সাধারণ, তোমরা ভোট নিয়ে মাতামাতি করো না। মার্কিন নক্সালপন্থী নাই থাকুক, ভোট দেব কি দেব না, "টু ভোট অর নট টু ভোট", এ-প্রশ্ন মার্কিন নাগরিকদের মনে উঠেছে। রবার্ট কেনেডী যদি নিহত না হতেন, যদি মার্কিন প্রেসিডেন্টপদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন, তা হলে ভোটার-সাধারণ সত্যিই উৎসাহিত হত, আশা করতে পারত জনসনের বন্ধ্যা নীতি আমেরিকার ঘরে বাইরে যে দুর্ভোগ সৃষ্টি করেছে তার থেকে নিষ্কৃতির সুযোগ হবে। কেনেডী মারা গেলেন, সেনেটর ম্যাকার্থি যদি ডেমোক্রাট দলের তরফ থেকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেতেন তাহলেও মার্কিন ভোটাররা কিছুটা উৎসাহিত হতে পারত। এখন যিনি ডেমোক্রাটপ্রার্থী, ভাইস-প্রেসিডেন্ট হুবার্ট হামফ্রে, তিনি প্রেসিডেন্ট জনসনেরই দোসর, জনসন-নীতির প্রতিটি সংকল্পই হামফ্রে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছেন। অপর পক্ষে রিপাবলিকান প্রার্থী নিক্সন তো জনসনের চাইতে আরও জবরদস্ত রাষ্ট্রনীতির প্রবক্তা। তৃতীয় প্রার্থী ওয়ালেস দাক্ষিণী অঞ্চলের গোঁড়া শ্বেতাঙ্গ নিগ্রো-বিদ্বেষীদের সমর্থন পাওয়ার আশায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। সব মিলিয়ে মার্কিন নাগরিকদের অনেকের মনেই প্রশ্ন, এই তিন প্রার্থীর মধ্যে কারে বলি ভালো মন্দ।

ডেমক্রাট প্রার্থী হামফ্রের সাধ্য নেই ভিয়েতনাম যুদ্ধ সম্পর্কে জনসন নীতি বর্জন করে নতুন কোন পথের সন্ধান করা। নিক্সন এবং রিপাবলিকান দল তো এ ব্যাপারে আরও উগ্রপন্থী। তৃতীয় প্রার্থী ওয়ালেসের ধুয়ো হল আমেরিকায় আইন-শৃঙ্খলার বনিয়াদ আরও শক্তসমর্থ করা চাই এবং তার নিহিতার্থ আর কিছু নয় নিগ্রোদের শায়েস্তা করতে পুলিসী-রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। ভিয়েতনাম-যুদ্ধের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন-শৃঙ্খলাও এবারকার নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটা বৃহৎ সমস্যা। হামফ্রে, নিক্সন, ওয়ালেস, তিনজন প্রার্থীই এই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা সম্পর্কে তাঁদের নিজ নিজ মতামত ঘোষণা করতে বাধ্য হচ্ছেন। সমস্যাটা আসলে অবশ্য আইন-শৃঙ্খলার নয়, মার্কিন সমাজে নিগ্রোদের সমানাধিকার ব্যবস্থা কীভাবে কতদূর চালু করা যায় সেটাই মূল প্রশ্ন। এ-প্রশ্নের সমাধান যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ নিগ্রো অসন্তোষ এবং শ্বেতাঙ্গ মহলের উগ্র বর্ণান্ধতা সংঘর্ষ সৃষ্টি করবেই, শহরে শহরে দাঙ্গাহাঙ্গামাও ঘটতে থাকবে।

হামফ্রে তাঁর নির্বাচনী প্রচারে বলেছেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা অবশ্যই চাই, কিন্তু আমেরিকায় পুলিসী-রাষ্ট্র কখনই চাই না; হিংস্র জন-বিক্ষোভ কিংবা পুলিসী বর্বরতা আমেরিকায় কোনটারই ঠাঁই নেই। শিকাগোয় কিছুকাল আগে পুলিসী বর্বরতা অবশ্য শিকাগোর ডেমক্রাট মেয়রের প্রযোজনা ও পরিচালনাতেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। মার্কিন গণতন্ত্রের অনুরাগীরাও এতে স্তম্ভিত হয়েছেন, অনুযোগ করেছেন যে, নাৎসীদের কিংবা স্টালিনের পুলিসী সন্ত্রাস আর শিকাগো পুলিসের অহেতুক অত্যাচারের মধ্যে কিছুমাত্র তফাত নেই। তফাত অবশ্য আছেই, কারণ হিটলার কিংবা স্টালিনের অত্যাচারের প্রতিকার দূরের কথা, প্রতিবাদ পর্যন্ত অসম্ভব ছিল। মার্কিন গণতান্ত্রিক শাসনের অতখানি অধোগতি এখনও হয়নি। কিন্তু নিগ্রো-সমস্যা এবং ভিয়েতনাম-যুদ্ধ সম্পর্কে মার্কিন তরুণ মহলের অসন্তোষ যদি ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের ক্রমাগত বিব্রত করতে থাকে তাহলে মার্কিন গণতন্ত্রেও পুলিসী জবরদস্তি আরও প্রবল এবং বিস্তৃত হওয়া অসম্ভব নয়। তৃতীয় প্রার্থী ওয়ালেস তো স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন, আর কোনও উপায় নেই, একমাত্র পুলিসী শাসনই আমেরিকাকে অরাজকতার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। ওয়ালেস অবশ্য এ যাত্রা ভোটে জয়ী হতে পারবেন না, কিন্তু তাঁর জবরদস্ত ঘোষণার অনেকখানি অন্য দুজন প্রার্থী হামফ্রে এবং নিক্সনেরও মনের কথাই।

"ভোট দেব কি দেব না, কিম্বা কাকে দেব", এ প্রশ্ন অতএব বহু মার্কিন ভোটারদের মনে যে দোটানার সৃষ্টি করেছে, সেটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। মার্কিন বুদ্ধিজীবী ও তরুণ মহলের কাছে ডেমক্রাট আর রিপাবলিকান, এ দল আর ও দল দুই-ই সমান, "টুইডলডাম" আর "টুইডলডি"! হামফ্রে যখন লিণ্ডন জনসনেরই পতাকাবাহী, পদাঙ্ক-অনুসারী, নিক্সনকেও এমন কোন নতুন পথসন্ধানী দেখা যায় না, তখন ভোটে এ-পক্ষ বা ও-পক্ষের হার-জিতে কী আসে যায়! লিণ্ডন জনসনের গত চার বছর রাষ্ট্রপতিত্বের পরিণাম, মার্কিন জনসাধারণ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশাচ্ছন্ন, শঙ্কাকুল। ওয়ালটার লিপম্যান মন্তব্য করেছেন, হামফ্রে, নিক্সন, ডেমক্রাট ও রিপাবলিকান প্রার্থী দুজনেরই রাজনৈতিক ভূমিকা, চিন্তা চরিত্র জনসাধারণের কাছে প্রেরণাহীন। এঁদের রাজনৈতিক কাজকর্মের রেকর্ডে এবং মেজাজে কিছু তফাৎ থাকতে পারে, কিন্তু দুজনের একজনের উপরেও জনসাধারণের আস্থা নেই, মানে ভোটাভুটির মরশুমে হামফ্রে ও নিক্সন যেসব কথা বলছেন, আশ্বাস দিচ্ছেন সেগুলি বিশ্বাস করবার মত যুক্তির জোর মার্কিন জনসাধারণ পাচ্ছে না। জনসনের আমলে সৃষ্টি হয়েছে যে "ক্রেডিবিলিটি গ্যাপ" অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি ও জনসাধারণের মধ্যে পরস্পর বিশ্বাসে যে বিরাট ফারাক, হামফ্রে কিম্বা নিক্সন কেউই সেই ফাঁকটা ভরাট করতে পারছেন না।

৫ নভেম্বর গণতান্ত্রিক প্রথামত মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন তা বলে ঠেকে থাকবে না। ভোটের হারজিতে হামফ্রে, নিক্সনের ভাগ্য নির্ধারিত হবে, হয়তো এ যাত্রা নিক্সনই উতরে যাবেন, কারণ ডেমক্রাট সমর্থকদের মধ্যে বড় একটা অংশ জনসনের বিশ্বস্ত অনুচর হামফ্রেকে জিতিয়ে দেওয়ায় উৎসাহী নয়; তারপর তৃতীয় প্রার্থী ওয়ালেস দাক্ষিণী অঞ্চলে যে ভোট ভাঙাবেন তার অনেকটাই ডেমক্রাট ভোট, যা সাধারণত হামফ্রের পাওয়া উচিত। এরপর নুইয়র্ক টাইমস পত্রিকা আশঙ্কা করছেন, কোন প্রার্থীকেও ভোট দিতে গররাজী যারা তাঁদের উপরই নির্ভর করছে এবার মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল।

১৪।১০।৬৮

সুনন্দর জার্নাল

শক্তি—প্রাকৃতিক এবং মানবিক

ছবিটা এইরকম ছিল। জীবিকার কলকাতা — বাঁচবার কলকাতা—ক্লান্তির কলকাতা। তারই ওপরে আকাশ কখন বিদেশী মেয়ের চোখের মতন নীল হয়ে এল। সোনার ছুরির মতো ঝলকে উঠল রোদের রঙ।

কলকাতায় কাশফুল ফোটেনা তবু একটা ফাঁকামতন পথের ধারে দাঁড়িয়ে চোখে পড়ল—তাদের পাঁচীলের ওপারে শিউলি গাছটার শেষ রাতের তারার মতো একটি শেষ ফুল; তার পাশেই কদম গাছের ঘন উজ্জ্বল পাতার ভেতর কেশরঝরা গুটি; সামনে দিয়ে বোঁ করে উড়ে গেল একটি সবুজ পোকা। কলকাতায় শরৎ।

সুতরাং বেরিয়ে পড়ো। চলো বাংলা দেশের উত্তরে—হিমালয়ের চিরকালের হাত-ছানিতে। শিলিগুড়ি থেকে দুদিকে পথ। একদিকে খর্সাং-দার্জিলিং, আর একদিকে কালিম্পং।

দার্জিলিং তো পুরোনো হয়ে গেছে। এবার বরং পাড়ি দাও কালিম্পঙের দিকে। সেখান থেকে যাওয়া যেতে পারে গ্যাংটকে—সেই ছবির মতো শহরে, তার আশ্চর্য বৌদ্ধ মন্দিরে। যদি উৎসাহ থাকে —আরো এগিয়ে যেতে পারো, একেবারে নাথুলার গিরিসংকট পর্যন্ত।

কিন্তু সে তো পরের কথা। তারও আগে কালিম্পঙের পথ। দার্জিলিঙের রাস্তাও মনোরম, কিন্তু তুলনা হয় এই পথের সংগে? লছমনঝোলাকে মনে পড়িয়ে দেয় শিভকের যে করোনেশন ব্রীজ—অথচ যা লছমনঝোলার চাইতেও স্নিগ্ধ—তাকে পাশে রেখে এইবারে দু চোখ ভরে দ্যাখো রুদ্র-সুন্দরের রূপ। বাঁয়ে পাহাড়—তার কোথাও কোথাও ঝুলে আছে বিপজ্জনক বোল্ডার। আর ডাইনে—

ডাইনে তিস্তা। দু একবার লুকোচুরি খেলে সরে যাবে—তবু গিয়েলখোলার তিস্তা, ব্রীজ পর্যন্ত সে তোমার সংগী। পাহাড়-বনের ভেতর দিয়ে নেমে আসছে অসংখ্য ঝোরার অর্ঘ্য নিতে নিতে—তার শেশিয়ার গলা হিমশীতল জলে কখনো ক্ষিপ্ত গর্জন, কখনো উদার নৈঃশব্দ্য। দেখতে দেখতে নেশা ধরবে তিস্তার রূপে, সংগে ক্যামেরা থাকলে লোভ সামলাতে পারবে না বার বার ছবি তোলবার জন্যে—

কিন্তু তোমার ক্যামেরার লেন্সে এবার অন্য ছবি। ধস্-ধস্--ধস্। বস্তির পর বস্তি নিশ্চিহ্ন। পরিপাটি শান্ত কালিম্পং বিচ্ছিন্ন মৃত্যুর দ্বীপ। আর সেই স্বপ্নের তিস্তা—

এখন তার দানবমূর্তি। ব্রীজের পর ব্রীজ এক নিশ্বাসে উড়িয়ে দিয়েছে। সমতলের জলপাইগুড়ি শহর তার বাঁধভাঙা বন্যায় শ্মশান। লক্ষ লক্ষ জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে অট্টহাসি হাসতে হাসতে সে ছুটে চলে গেল ব্রহ্মপুত্রের দিকে।

তিস্তার কথা ভাবলে চোখে আর মোহ আসে না। রোদ-কুয়াশা মেঘ মাখানো পাহাড়ী পথের চড়াই-উৎরাইকে করাল সরীসৃপের মতো, মনে হয়। লেওপার্দির কবিতা যেন চাবুকের মতো এসে পড়েঃ

"প্রকৃতি—সেই হিংস্র পশুশক্তি—
যে মানুষের চরম সর্বনাশের
অধিদেবতা—"

এবার যাঁরা দার্জিলিং থেকে ফিরলেন—বহুকাল পর্যন্ত তাঁরা পাহাড়ের নামে শিউরে উঠবেন; রবীন্দ্রনাথের কবিতাও এর পর থেকে সহজে কালিম্পঙের দিকে মনকে টানবে না; ভরা তিস্তার গর্জন শুনে দুঃস্বপ্নের চমকে জেগে উঠবেন। জলপাই-গুড়ির মানুষ। প্রকৃতির আদিম নখ-দন্তের ক্ষতচিহ্ন ভোলবার জন্যে, নিরুপায় শোককে প্রশমিত করবার জন্যে, আরো অনেকদিন তাঁদের অপেক্ষা করতে হবে।

বন্যাজন্তুর মতো বিদ্রোহী-বিরোধী প্রকৃতি

আয়রে আয় A. T. নায়ে জল্লা দিয়ে

বশ মেনেছে মানুষের শাসনে। তার সবটাই নম্র-কমনীয় সমতল নয়, শুধু ফুল-পাতা-পাখি-প্রজাপতি-ফল-শস্যের সম্ভার সাজিয়ে সে বসে নেই! অগ্নিগিরিবিশারদ হারুণ তাজিয়েফ জানিয়েছেন তার অতলের ফুটন্ত লাভার অশ্রান্ত ক্রোধ টগবগ করে ফুটছে—কোনো আগ্নেয় পর্বত ঘুমোয়নি—কারো মৃত্যু হয়নি—যে-কেউ যে-কোনোদিন হাজার হাজার বছরের তন্দ্রা ভেঙে জেগে উঠতে পারে পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তে। তবু হারুণ তাজিয়েফ বলেছেন—মানুষের শক্তি আর বিজ্ঞান একদিন তারও মোকাবেলা করবে। মানুষ প্রকৃতির দাস নয়, তার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর রূপকেও সে বশ মানাবে।

তবু তিস্তাকে শাসন করা গেলনা—যেমন করা গেলনা পশ্চিম বাংলার বন্যাকে। হুগলী-হাওড়া-মেদিনীপুর যখন অশ্রু-বন্যায় ভাসছিল, উত্তর বাংলায় তখন খরা চলছিল; সেই চোখের জলের পর্ব না মিটতে জলপাইগুড়ি-কুচবিহার সর্বনাশের অতলে তলালো। এইবারে মালদহ আর পশ্চিম দিনাজপুরের পালা।

এত বাঁধ, এত আয়োজন, বিপদ-সংকেতের এত ব্যবস্থা! উত্তর বিহারকে বাঁচানোর জন্যে এমন উদার কুশী পরিকল্পনা! কী হল?

সবটাই প্রাকৃতিক বিদ্রোহ?

উত্তর বাংলার নতুন রেল লাইন তৈরী হওয়ার পরে স্থানীয় একটি ভদ্রসন্তানের ক'টা কথা মনে পড়ছে আমার।

'দেখবেন রেলের ব্রীজ ভাঙবে, বন্যা হবে, আরো বিস্তর দুর্গতি আছে আমাদের কপালে।'

'এসব বলছেন কেন?'

'লোক্যাল কনডিশন না বুঝেই এসব যে তৈরী হল—তার মানে বুঝতে পারেন? চারদিকের যে সব শুকনো খাতকে এরা আমল দিলে না, যত্রতত্র পথ বাঁধলে, তার ফল কী হবে, জানেন? পাহাড় থেকে জল নামবে পাগলের মতো—নিকাশের পথ পাবেনা—তখন দেখা দেবে বন্যা—ভেঙে একাকার করে দেবে—কোনো বাঁধ তা রুখতে পারবে না!'

এবং সেই ভবিষ্যদ্বাণীর পরের বছরই বর্ষার তিস্তা নতুন রেলের ব্রীজকে কুটোর মতো উড়িয়ে দিয়েছিল।

সত্যি মিথ্যে বিশারদরা বলতে পারবেন, কিন্তু দূর ভবিষ্যতে যারা আগ্নেয়গিরিকেও লাগাম পরাবে—সেই মানুষের এত বড়ো পরাজয় আমি কল্পনাও করতে পারছি না। লোহার বাসর তৈরী করে আমরাই কোথাও মৃত্যুছিদ্র রেখে দিয়েছি—আমরাই জন্তুটাকে পোষ মানাতে পারিনি।

আজ দুর্গত দেশের জন্যে আমাদের হৃদয় এবং মুঠি এক সঙ্গে খুলে যাক। কিন্তু শেষ কথা সেখানে নয়। প্রকৃতির কাছে এই পরাভবের গ্লানি যেন আমরা কখনো না ভুলি, এবারের এই দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে তাই আমাদের সংকল্প হোক॥

জার্মানীর ম্যুনিখ শহরের নিকটস্থ ব্ল্যাক ফরেস্টের 'অলটেনমাখ' নামক স্থানে আজাদ হিন্দ ফৌজের শিক্ষণ-শিবির স্থাপিত হয়। সেই শিবিরে ফৌজের প্রথম পতাকা-উত্তোলন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

বা ম

সুভাষচন্দ্র বসু একজন অবিস্মরণীয় মানুষ। যে-লোক মাত্র একবার তাঁকে দেখেছে, সেও কখনো তাঁকে ভুলতে পারবে না। এমনি প্রকট তাঁর মহত্ত্ব। তিনি বিপ্লব-বাদী, এবং অন্যান্য বিপ্লববাদীদের মতই তাঁরও মহত্ত্ব এইখানে যে, একটিমাত্র কাজ, একটিমাত্র স্বপ্নকে কেন্দ্র করেই তিনি জীবনধারণ করেছেন। সেই কাজ আর স্বপ্নের উপরেও তাঁর নিজস্বতার স্পষ্ট ছাপ। তাঁর বিরাট স্বপ্ন, অন্তত অংশত, এক সময়ে সফল হতেও চলেছিল। হল না, তার কারণ তাঁর অনুকূলে বিশ্বশক্তি সেদিন জয়লাভ করতে পারেনি। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু যে সেদিন মূলত ব্যর্থ হয়েছিলেন, তাও নয়। যুদ্ধের সময় যে স্বাধীনতা তিনি অর্জন করেছিলেন, তারই মধ্যে ভারতবর্ষের পরবর্তী স্বাধীনতার সূচনা। কয়েক বছর বাদেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। সচরাচর যা ঘটে থাকে, এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছে। একজন বীজ বপন করেছেন, অন্যেরা ফসল কেটেছে।

যুদ্ধের সময় আমরা ছিলাম পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। অন্যান্য নানা কারণে আমাদের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। আমাদের লক্ষ ছিল এক, সমস্যা ছিল এক, বিপদও ছিল একই রকমের। তা ছাড়া আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও মোটামুটি মিল ছিল। যুদ্ধের বছরগুলিতে অনেকটা সময়েই আমি তাঁর সান্নিধ্যে ছিলাম; তখন তাঁর কাজ আমি আদ্যন্ত দেখেছি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানান জায়গায় ছড়িয়ে থাকা মানুষদের নিয়ে যে একটি ভারতীয় রাষ্ট্র, সরকার ও সেনাবাহিনী গড়ে তোলা যেতে পারে, তা কেউ কখনও কল্পনাও করেনি। কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে আমি সেই অসাধ্য-সাধনও করতে দেখলাম; চোখের সামনে দেখলাম যে, বিশ্বযুদ্ধে তিনি তাদের একটি বড়-রকমের শক্তি হিসেবে গড়ে তুললেন। এটা সম্ভব হয়েছিল তাঁর একাগ্রতার জন্যে, তাঁর নিষ্ঠার জন্যে। চিত্তের এই একাগ্র সংকল্পই বিশ্বের অর্ধাংশ জুড়ে সেদিন ভারতবর্ষের স্বপ্নকে অনুসরণ করে ফিরেছে। মধ্যপ্রাচ্যের ভিতর দিয়ে এগিয়েছে, রাশিয়ায় গিয়ে ঢুকেছে, তারপর সেখান থেকে জারমানিতে, জারমানি থেকে পূর্ব-এশিয়ার দূরতম প্রান্তে, সেখান থেকে আবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং তারপর ব্রহ্মদেশে সেই সংকল্পের অগ্রগতিই আমরা লক্ষ করেছি। অবিশ্বাস্য সেই সপ্তাহগুলির কথা মনে পড়ে, সীমানা অতিক্রম করে সুভাষচন্দ্রের সংকল্প যখন ভারতভূমির মধ্যে গিয়ে প্রতিষ্ঠা পেল। একটি জীবন আর তার জ্বলন্ত বিশ্বাস যেন দেখতে-দেখতে সেদিন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তিরিশ লক্ষ ভারত-বাসীর বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে সেদিন সমস্ত কিছুই দিয়েছিল তারা।

সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাবের মাত্র এক বছরের মধ্যেই আজাদ হিন্দ একটি ষোল-আনা রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। অন্যান্য নটি রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিয়েছিল তাকে। অনেকখানি জমি তখন তার দখলে, তার সেনাবাহিনী তখন ব্রহ্ম-ভারত সীমান্তের আটটি জায়গায় যুদ্ধ করছে। কয়েক মাসের মধ্যেই সেই বাহিনী ভারত-ভূমিতে গিয়ে প্রবেশ করল, দেশের মাটিতে উড়িয়ে দিল স্বাধীন ভারতের জয়পতাকা। জয়টা যে বড়-রকমের হল না, কিংবা স্থায়ী হতে পারল না, সে নেহাত অল্পের জন্যেই। একটা বিরাট স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। অর্ধেক বিশ্বের সঙ্গে তাঁর গড়া সেই বাস্তব মূর্তি যেদিন ভেঙে পড়ল, তখনও তিনি তাঁর স্বপ্নকে বিসর্জন দেন নি। বিয়োগান্ত নাটকের নিঃসঙ্গ নায়ক তখনও তাঁর স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বলা যায়, তাঁর স্বপ্নের সঙ্গেই তিনি সেদিন মৃত্যুবরণ করেছেন।

সুভাষচন্দ্রের কথা বলতে গিয়ে তাঁর স্বপ্নের উপরে আমি গুরুত্ব দিয়েছি এই-জন্যে যে, আমার বিশ্বাস, তাঁর ব্যক্তিত্বের সবচাইতে গভীর অংশ এই স্বপ্ন দিয়েই গড়া ছিল। একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন, "এক-এক সময়ে মনে হয়, সবকিছু ছেড়ে দিয়ে প্রার্থনা আর ধ্যান করে জীবন কাটাই। কিন্তু ভারতবর্ষ যতদিন না স্বাধীন হচ্ছে, ততদিন তো আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে।" আর একবারের কথা বলি। ঠাট্টাচ্ছলে কে যেন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি বিয়ে করবেন কবে। উত্তরে তিনিও হেসে উঠলেন। বললেন, "ভারতবর্ষ স্বাধীন হলেই বিয়ে করব।" স্বাধীন ভারত-বর্ষের স্বপ্ন যেন সারাক্ষণের জন্যে তাঁকে দখল করে রেখেছিল। মাঝে মধ্যে যে বিশ্রাম নিতেন না, তা নয়, কিন্তু সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন সেই স্বপ্নের দ্বারা গ্রস্ত একজন মানুষ। জাতীয় সংকটের দিনে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক সেই মানুষটি তাঁর আরব্ধ কাজকে, তাঁর স্বপ্নকে কখনও ভুলে থাকতে পারতেন না।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা সিঙ্গাপুরে। ১৯৪৩ সনের

জুলাই মাসের কথা। সিঙ্গাপুরের নাম তখন শোনান। তোকিয়ো থেকে সুভাষচন্দ্রকে সেই সময়ে শোনানে নিয়ে আসা হয়েছে। দু-এক দিনের মধ্যে জাপ প্রধানমন্ত্রী তোজোরও সেখানে আসবার কথা। ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মুহূর্ত তখন আসন্ন। তাই নিয়ে কিছু প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। সেগুলির ফয়সলা করবার জন্যে তোজোর সঙ্গে দেখা করা দরকার, সেইজন্যে আমাকেও তখন শোনানে যেতে হয়েছিল। তার আগে, জুন মাসে, তোকিয়োতে জনসমক্ষে সুভাষচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব উপলক্ষে তাঁকে আমি একটি বার্তা পাঠিয়েছিলাম। তাতে বলেছিলাম, "তোকিয়োতে আপনার প্রথম বক্তৃতাটি সাহসে, তাৎপর্যে সমুজ্জ্বল। ব্রহ্মদেশের জনচিত্তে এই বক্তৃতা গভীর রেখাপাত করেছে। আমাদের দুই দেশের মানুষেরা দীর্ঘ দিন ধরে যে মুহূর্তটির প্রতীক্ষায় ছিল, সেই মুহূর্ত আজ সমাগত। এখন আমরা যেন ঠিকমত তাকে বরণ করে নিতে পারি।" চাঞ্চল্যকরভাবে অর্ধেক পৃথিবী পাড়ি দিয়ে এসেছিলেন সুভাষচন্দ্র, তারপর তোকিয়োতে তাঁর এই চাঞ্চল্যকর আত্মপ্রকাশ। ঘটনাটি এই বিশাল অঞ্চলকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছিল। এশিয়ার মানুষেরা এর ফলে এশিয়ার ঐক্যে আর সংহতিতে যেন আরও আস্থাবান হল।

প্রধানমন্ত্রী তোজোর জন্যে সিঙ্গাপুর বিমানঘাটিতে আমরা প্রতীক্ষা করছিলাম। সেইখানেই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। সুভাষচন্দ্র কান্তিমান সুশ্রী পুরুষ, দীর্ঘদেহী: তাঁকে ঘিরে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের সবার চাইতেই মাথায় তিনি উঁচু। স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে তাদের সঙ্গে তিনি কথা বলছিলেন। তোজো এসে পৌঁছলেন, আন্তরিকভাবে আমাদের শুভেচ্ছা জানালেন। তার ঠিক পরেই জাপ অফিসাররা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেন। তাঁদেরই একজন ঈষৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে হঠাৎ বললেন, "এ এক ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার।" কথাটা তিনি সম্ভবত ঠিকই বলেছিলেন, তবে কিনা ঠিক তখনই আমি ব্যাপারটাকে ওভাবে দেখিনি, আমার মন তখন অন্য দিকে, আমি দেখছিলাম যে, সামরিক আড়ম্বর আর সামর্থ্যের সেই ঝকমকে দৃশ্যপটেও একটি মানুষের ব্যক্তিত্ব যেন আর-পাঁচজনের থেকে স্বতন্ত্র করে তাঁকে চিনিয়ে দিচ্ছে। অতীত আর বর্তমানকে আমি যেন একই সঙ্গে দেখতে পেলাম। আমার মনে হল, দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষে যে ঐকান্তিক বিপ্লবসাধনা চলেছে, সুভাষচন্দ্র যেন তারই মূর্ত প্রতীক। মনে হল, সেই বিপ্লবসাধনা যেন এশিয়ার বৃহত্তর বিপ্লবের সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে এবং এশিয়াকে তা যেন পালটে দেবে। এই হচ্ছে তখন আমার মনের অবস্থা। শুধু তাই নয়, আমার মনে হয়েছিল, ভারতীয় বিপ্লবের অন্তঃস্থ আর-এক বিপ্লবকে যেন আমি প্রত্যক্ষ করছি। সুভাষচন্দ্র আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত। এই উপস্থিতিই যেন বলে দিচ্ছে যে, ভারতবর্ষের দীর্ঘ সহিষ্ণুতার পর্ব এবারে সমাপ্ত, সে তার নিষ্ক্রিয়তার দর্শন পরিহার করে বাস্তবকে স্বীকার করে নিচ্ছে, অর্ধেক পৃথিবী যখন বাকী-অর্ধেকের সঙ্গে যুদ্ধনিরত, ভারতবর্ষও তখন বাহুবলের সাহায্যেই বাহুবলের মোকাবিলা করবে। বরাবরই আমি বিশ্বাস করেছি যে, ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মের মুক্তি-সংগ্রাম এক ও অবিচ্ছেদ্য; ভারতবর্ষের ভূমিকার এই পরিবর্তন দেখে তাই আমার পক্ষে উৎফুল্ল হওয়াই স্বাভাবিক। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আমার সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় ছিল সংক্ষিপ্ত। ঠিক হল যে, শিগগিরই তিনি আবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

পরের ক'টা দিন তিনি খুবই ব্যস্ত হয়ে রইলেন। অনেক কাজ। চটপট নিজের কর্মসূচী ঠিক করলেন, শক্তি-সামর্থ্য সংহত করে নিলেন, প্রবাসী ভারতীয়দের সভা ডাকলেন, পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের নেতৃত্ব নেবার জন্যে সেই সভায় তাঁকে অনুরোধ করা হল, তাতে তিনি রাজী হলেন, প্রায় রাতারাতি যে সৈন্যবাহিনী তিনি গড়েছিলেন, জাপ প্রধানমন্ত্রী তোজোকে সঙ্গে নিয়ে সেই আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিদর্শন করলেন, তারপর আবার ভারতীয়দের সভা ডাকলেন, বিশাল সেই সভা, সেখানে তিনি বক্তৃতা দিলেন, আহ্বান জানালেন : চলো দিল্লি। আশ্চর্য সেই ধ্বনি, উপস্থিত মানুষদের কানে তা যেন প্রায় মার্চ করে এগিয়ে চলবার নির্দেশের মত শোনালো, ওই একটি ধ্বনিতেই সুভাষচন্দ্র সকলের হৃদয় জয় করে নিলেন। তাঁর নির্দেশ : এ সংগ্রামে সবাইকে যোগ দিতে হবে। কার্যত তা-ই হল, সিঙ্গাপুরের গোটা ভারতীয় সমাজ তাঁর নির্দেশে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সে এক আশ্চর্য ঘটনা।

সিঙ্গাপুরের জনসভা। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সবাই সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা শুনছে। সুভাষচন্দ্র বললেন, "১৯৩৯ সনে ফ্রান্স যখন জারমানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং অভিযান শুরু হয়ে যায়, জারমান সৈন্যদের ওষ্ঠ থেকে তখন মাত্র একটি ধ্বনিই মুহুর্মুহু উচ্চারিত হয়েছে : চলো প্যারিস, চলো প্যারিস। ১৯৪১ সনের ডিসেম্বর মাসে নিপ্পনের বীর সেনারা যখন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখনও তাদের ওষ্ঠে মাত্র একটি ধ্বনিই উচ্চারিত হয়েছে : চলো সিঙ্গাপুর, চলো সিঙ্গাপুর। বন্ধুগণ, এই যুদ্ধে আপনাদের ধ্বনি হোক—চলো দিল্লি, চলো দিল্লি। শেষ পর্যন্ত আমরা জিতবই। আমাদের যে-সব বীর সেনা বেঁচে থাকবেন,

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও ডঃ বা ম (তোকিয়ো, ৬ নবেম্বর, ১৯৪৩)

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবরভূমি দিল্লির লালকেল্লায় যতক্ষণ না তাঁদের বিজয়-কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, ততক্ষণ আমাদের কাজ ফুরোবে না।"

তোজো বিদায় নেবার পরেই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আবার আমার দেখা হয়। এই প্রথম স্বাচ্ছন্দভাবে কথাবার্তা বলা গেল। নানান বিষয়ে কথা হল, তবে যুদ্ধই ছিল প্রধান বিষয়, স্বজাতির মুক্তির ব্যাপারে এই যুদ্ধকে আমরা কীভাবে কাজে লাগাতে পারি, তাই নিয়ে সেদিন আমাদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। প্রথম দর্শনে সুভাষচন্দ্র বসুকে আমার কেমন লেগেছিল, চিরকাল তা আমার মনে থাকবে। কিছু দিন আগেই তাঁর সঙ্গে জারমান আর রুশ নেতাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল, পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে যুদ্ধের সর্ববিসারী রূপ তিনি দেখেছিলেন, বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে তার ছাপ পড়েছিল, এ-ব্যাপারে তিনি তখন পুরোপুরি বাস্তববাদী। আমিও আমার নিজের সংগ্রাম থেকে এবং সেই সঙ্গে জাপানীদের দৃষ্টান্ত থেকে বাস্তববাদের শিক্ষা নিয়েছিলাম। সুভাষচন্দ্র আর আমার মধ্যে তাই মনের মিল ঘটতে দেরি হয় নি। তবে স্বভাবতই আমি একটু উচ্ছ্বাসপ্রবণ, ভাববিলাসী; সুভাষচন্দ্র সেক্ষেত্রে ঠাণ্ডা মাথায় সবদিক ভেবেচিন্তে তবেই সিদ্ধান্ত নেন। তাই বলে যে তিনি আদৌ উচ্ছ্বসিত হতেন না, তা নয়। আসল কথা, বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলার প্রয়োজনে আবেগ উচ্ছ্বাসকে তিনি শক্ত হাতে চেপে রেখেছিলেন। আমার মনে হয়, এটাই তাঁর শক্তির একটা বড় উৎস। আত্মপ্রবঞ্চনা করতেন না, যে-কোনও অবস্থার মুখোমুখি হয়ে শান্তভাবে প্রতিটি তথ্য বিচার-বিশ্লেষণ করতেন, ভেবে দেখতেন, অবস্থাটা ভাল না মন্দ, নাকি ভালয়-মন্দে মেশানো, সমস্ত তথ্য মিলিয়ে একটি সামগ্রিক ছবি তৈরি করে ফেলতেন, বাস্তবভাবে সবকিছু বিচার করে তবেই সিদ্ধান্ত নিতেন। অতঃপর সে সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের পালা। তখন তিনি একেবারে অন্য মানুষ। মনে হত, যেন নিয়তির অমোঘ তাড়নায় তিনি তখন কাজ করে যাচ্ছেন।

সুভাষচন্দ্র বসু যখন ভারতের সংগ্রামের কথা বলতেন, শ্রোতার তখন মনে হত, তিনি যেন একটিমাত্র মানুষের কথা শুনছেন না, যেন সমগ্র জাতিই সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠে কথা বলছে, দীর্ঘ দিনের নিপীড়িত একটি জাতীয় শক্তি যেন অকস্মাৎ তাঁর কথার মধ্যে মুক্তি খুঁজে পেয়েছে। একবার যদি তাঁর আবেগ কোনক্রমে ছাড়া পেত, তাহলে তৎক্ষণাৎ সেই শক্তির মূল চরিত্রলক্ষণ—চরিত্রশুদ্ধতা, আত্মত্যাগ, লক্ষ্যাভিমুখিতা—তাঁর কথার মধ্যে যেন মূর্ত হয়ে উঠত। তাঁর সঙ্গে যখন প্রথম আমার দেখা হয়, তখনও একথা আমার মনে হয়েছিল, এখনও হয়।

বিদায় নেবার আগে সেদিন যুদ্ধবিষয়ক মূল প্রশ্নগুলি আমরা আলোচনা করেছিলাম, সে-বিষয়ে আমাদের মতৈক্যও হয়েছিল। আমরা একমত হয়েছিলাম যে, এ যুদ্ধ সর্ব অর্থেই আমাদের যুদ্ধ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের শত্রু, সেই শত্রুর সঙ্গে আপোস-রফা সম্ভব নয়, এই যুদ্ধে আমাদের শত্রুর শত্রুরা আমাদের বন্ধু, সহযোগী, এবং যে-পথ আমরা নিয়েছি তা পরিহারের কোনও কথাই ওঠে না। আমাদের বন্ধুত্বের সেই সূচনা। সেদিন যা আমরা বলেছিলাম, পরে কখনও তার নড়চড় হয়নি।

তারপর ব্রহ্মদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করল,

এবং সেই উপলক্ষে রেঙ্গুনে আবার আমাদের দেখা হল। নেতাজী যাতে আমাদের উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দেন, তার জন্য আমি নিজে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তিনি এলেন, আমাদের অনুষ্ঠান দেখলেন। ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। সেই ঘোষণা শুনলেন তিনি। ইতিপূর্বে তাঁর চোখে যে স্বপ্ন দেখেছি, সেদিনও সেই স্বপ্ন তাঁর চোখে। কিন্তু তাতে একটু যেন বিষণ্ণতার ছায়া। তাঁর হাসিও ঈষৎ ম্লান। কারণ বুঝতে আমার দেরি হয়নি। ব্রহ্ম তখন স্বাধীন, কিন্তু তাঁর স্বদেশ তখনও শৃংখলিত। তিনি হয়ত সামনের দিনগুলিকে মনশ্চক্ষে দেখছিলেন। দীর্ঘ পথ তাঁর সামনে। সেই পথ তাঁকে পেরোতে হবে, অনেক রক্ত ঝরবার পরে তবেই স্বাধীন হবে তাঁর মাতৃভূমি। সেই অভিযানের কথাই হয়ত তিনি ভাবছিলেন।

সিঙ্গাপুরে ফিরবার পরে দ্রুত এগোতে লাগল তাঁর কাজ। ১৯৪৩ সনের ২১ অক্টোবর তারিখে তিনি স্বাধীন ও সার্বভৌম আজাদ হিন্দ রাষ্ট্রের সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করলেন। একই দিনে

আজাদ হিন্দ রাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করল ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে, এবং সুভাষচন্দ্র বসু ঘোষণা করলেন যে, সেই বছরেই, অর্থাৎ আর মাত্র বারো মাসের মধ্যেই, আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতবর্ষে প্রবেশ করবে। পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ দিচ্ছে, সুভাষচন্দ্র তাঁর কথা রেখেছিলেন। তোকিয়োতে বৃহত্তর পূর্ব-এশীয় জাতি-সম্মেলনে তিনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন ঃ সেখানে সবাই তাঁকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। পরনে খাকি সুভাষচন্দ্রকে দেখেই সকলের মনে হয়েছিল, ইনি একজন সাহসী, তেজস্বী, সংগ্রামী পুরুষ। বিরাট তাঁর দেশ, সেই দেশের সম্পর্কে সর্বত্র কত না কাহিনী-কিংবদন্তী ছড়িয়ে আছে, সুভাষচন্দ্র যেখানেই যান, সেই আশ্চর্য দেশের মহিমা যেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরত। সিঙ্গাপুরে ফিরবার পর এক মাসের মধ্যেই তিনি আমাকে অনুরোধ জানালেন যে, ব্রহ্মদেশে তিনি তাঁর সদর-দফতর সরিয়ে নিতে চান, আমি যেন অনুমতি দিই। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষের যথাসম্ভব নিকটবর্তী জায়গা থেকেই যে তাঁর কাজ চালানো দরকার সে-কথা আমাকে বুঝিয়ে বলবার কোনও দরকারই ছিল না। আমি মুক্ত কণ্ঠে তাঁকে স্বাগত-অভ্যর্থনা জানালাম; ১৯৪৪ সনের ৬ জানুয়ারি থেকে নেতাজী বসু, তাঁর সরকার ও ফৌজ ব্রহ্মে এসে পৌঁছতে লাগলেন, ১৯৪৫ সনে জাপান চূড়ান্তভাবে পরাজিত না-হওয়া পর্যন্ত তাঁরা ব্রহ্মেই ছিলেন। ব্রহ্মদেশের মানুষদের কাছ থেকে তাঁরা তখন চমৎকার আতিথেয়তা ও সহযোগিতা পেয়েছেন। ভারতবাসীদের সঙ্গে ব্রহ্মদেশীয়দের সম্পর্কও আরও দৃঢ় হল। ব্রিটিশ সরকারের আমলে দুই দেশের মানুষদের মধ্যে মাঝে-মাঝেই খিটিমিটি বাধত, উত্তেজনা দেখা দিত, সেই তিক্ততার লেশমাত্রও তখন ছিল না। নেতাজীর সঙ্গে প্রায়ই আমার দেখা-সাক্ষাৎ হত, নিজেদের নানা সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করতুম, পরস্পরকে তখন আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করবার জন্য সতত সচেষ্ট থেকেছি।

নেতাজী যে এক বিরাট শক্তি, সেকথা আমি আগেই বলেছি। ব্রহ্মদেশে সেই শক্তি যেন ঘূর্ণি ঝড়ের মতন জাগিয়ে দিল। তিনি এসে পৌঁছবার পরে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "এবারে কী করবেন?" অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "কেন, যুদ্ধ করব।" সত্যি তা-ই হল। এক মাসও গেল না, তার আগেই তিনি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ১৯৪৪ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। আজাদ হিন্দ ফৌজ সেদিনই সর্বপ্রথম ব্রহ্মদেশের পশ্চিমে আরাকানে গুলিবর্ষণ করেন। নেতাজী বসুর সেদিন খুবই গৌরবের দিন। ১৮ মার্চ আরও গৌরব বয়ে নিয়ে এল, আজাদ হিন্দ ফৌজ সেদিন ভারত-ভূমিতে প্রবেশ করলেন। পরের ইতিহাস সবাই জানেন। ঘটনার পর ঘটনা দিয়ে সেই ইতিহাস ঠাসা। দক্ষিণে আরাকান থেকে হুকং আর চিন পাহাড়ের মধ্য দিয়ে উত্তরে কোহিমা আর ইম্ফলের সমতলভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ৮০০ মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনের আটটি জায়গায় আজাদ হিন্দ ফৌজ তখন মরণপণ সংগ্রাম চালাচ্ছেন। নেতাজী বসু তাঁর বেতার-বক্তৃতায় এই রণাঙ্গনের কথা বলেছিলেন।

মার্চ মাসে আক্রমণ আরও ব্যাপক হল। জাপানী আর ভারতীয় সেনারা আবার সীমান্ত অতিক্রম করে মণিপুর ও আসামে গিয়ে ঢুকলেন। কোহিমা আর ইম্ফলের গুরুত্ব খুবই বেশী; তারই দখল নেবার জন্য যুদ্ধ চলছে তখন, মার্চ আর এপ্রিলে সেই লড়াই তুঙ্গে উঠেছিল। ভারতীয় বাহিনী তাঁদের শ্রেষ্ঠ লড়াই সেখানে লড়েছেন, ছিনিয়ে নিয়েছেন শ্রেষ্ঠ জয়মালা। তাঁদের সবচাইতে বৃহৎ বিপর্যয়ও সেইখানেই ঘটল। লোকবল কম, অস্ত্রবল কম, একটিও বিমান নেই, এই বিষম অবস্থায় কতদিন টিকে থাকা যায়, বিপর্যয় এ অবস্থায় খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তার আগে তাঁরা ভারতের মধ্যে অনেকখানি এগিয়েছিলেন এবং কোহিমা ও তার চারপাশের পাহাড়গুলি দখল করে নিয়েছিলেন। অতঃপর যখন তাঁরা ইম্ফলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ছিনিয়ে নিতে উদ্যত, তখন জাপ পক্ষ হঠাৎ তাঁদের বাধা দিল। জাপানীদের এই কাজের মূলে সামরিক কিংবা রাজনৈতিক যে ব্যাখ্যাই থাক, ব্যাপারটার পরিণাম এই দাঁড়াল যে, সুভাষচন্দ্র ও তাঁর ফৌজ অকস্মাৎ বৃহত্তম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন। আঘাতের পর আঘাত, সংকটের পর সংকট। জাপানী আর ভারতীয় সেনাদের অস্ত্র রসদ ইত্যাদি তখন প্রায় শূন্যের কোঠায়, সমস্ত বিমান নষ্ট হয়ে গিয়েছে, মরিয়া হয়ে অন্ধের মত তাঁদের তখন লড়তে হচ্ছিল। ওদিকে ব্রিটিশ সরকার তখন বিমানে করে নতুন নতুন সেনাদলকে সেখানে নামিয়ে দিচ্ছেন।

বৃহত্তর পূর্ব-এশীয় জাতি সম্মেলনে (৬ নবেম্বর, ১৯৪৩) যোগদানকারী নেতৃবৃন্দ। (বাঁ থেকে ডাইনে) ডঃ বা ম (ব্রহ্মদেশ), প্রধানমন্ত্রী চ্যাং চুং-হুই (মাঞ্চুকুয়ো), রাষ্ট্রপতি ওয়াং চিং-ওয়েই (চীন), প্রধানমন্ত্রী হিদেকি তোজো (জাপান), প্রিন্স ওয়ান ওয়াইথায়াকন (থাইল্যান্ড), রাষ্ট্রপতি জোসে পি লরেল (ফিলিপিন), নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু (আজাদ হিন্দ রাষ্ট্রের প্রধান)

তারই মধ্যে, প্রত্যাশিত সময়ের অনেক আগেই, হঠাৎ তুমুল বর্ষা নামল। শৃঙ্খলা নষ্ট হল, বিভ্রান্তি দেখা দিল, পশ্চাদপসরণ না করে ভারতীয় সেনাদের আর কোনও উপায় রইল না।

সেই পরাজয়কেও বীরের মতন গ্রহণ করলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। তাঁর মনের অবস্থা তখন কী রকম, তা আমি জানি না, কিন্তু বাইরে তখনও তিনি একই মানুষ, সেই ভয়ংকর দিনগুলিতেও তাঁর কথায় কিংবা কাজে বিন্দুমাত্র নৈরাশ্যের পরিচয় কেউ পায়নি। সত্য গোপন করলেন না, রণাঙ্গনে কী ঘটেছে, তৎক্ষণাৎ তাঁর দেশবাসীদের তিনি তা জানিয়ে দিলেন, সেই সঙ্গে বললেন যে, একটিমাত্র যুদ্ধের উপরে তো মহাসমরের ফলাফল নির্ভর করে না, শেষ-যুদ্ধে জয়ী হওয়াটাই আসল কথা। বললেন, "ভারতবর্ষ বিরাট দেশ, সে দেশের মানুষ দূরত্ব দেখে ভয় পায় না, দীর্ঘ পথ তারা পায়ে হেঁটে পাড়ি দেয়, লংমার্চে তারা অভ্যস্ত।"

পরবর্তী যুদ্ধের জন্য নেতাজী অতঃপর তৈরি হতে লাগলেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সৈয়দ মুজতবা আলী

বিশ্বভারতী-প্রাগ্

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বভারতীর জন্য এ-দেশে বিশ্ববিখ্যাত একাধিক পণ্ডিত আনিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতনামা ছিলেন অধ্যাপক মরিংস্ ভিন্‌টার্‌নিংস। এঁকে এদেশের অনেক সংস্কৃত-পণ্ডিত চিনতে পারবেন। ১৯০৯ থেকে ১৯২২ জুড়ে জরমন ভাষায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস।' এরই ইংরিজী অনুবাদ বেরয় এদেশে ১৯২৭ থেকে ১৯৩২। এ ছাড়া আছে, 'গৃহ্যসূত্র' 'প্রাচীন ভারতে বিবাহ অনুষ্ঠান' 'ভারতীয় ধর্মে রমণী' ইত্যাদি তাঁর প্রচুর গ্রন্থরাজি।

এসব ক'টি বই-ই পণ্ডিতদের জন্য।

কিন্তু তিনি আমাদের মত সাধারণজনদের জন্য একখানি পুস্তিকা লিখে গিয়েছেন—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে। এ-পুস্তিকা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে, অন্য অবকাশে, আমি দু-একটি কথা বলেছি। এ-স্থলে পুনরায় বলি, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যত লেখা বেরিয়েছে তার ভিতর আমি এটিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি। তার প্রধান কারণ অধ্যাপকের সমস্ত জীবন কাটে বেদ, উপনিষদ, সংস্কৃত কাব্য নিয়ে। এদেরই ভিতর দিয়ে যে ঐতিহ্য ভারতবর্ষে চলে আসছে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কতখানি সংযুক্ত, কতখানি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তাঁর ধর্মমত কিভাবে গড়ে উঠেছিল এ সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী বলার অধিকার ছিল অধ্যাপক ভিন্‌টার্‌নিংসেরই। তিনি বাঙলা ভাষা জানতেন।

বইখানি অতিশয় সরল জরমন ভাষায় রচিত। ইংরিজী বা বাঙলায় এর অনুবাদ হয়েছে বলে শুনিনি। হওয়া উচিত। বই-খানির এক খণ্ড শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র-ভবনে আছে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার জনসাধারণ অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরির, জরমন এবং পরবর্তী যুগে খাস জরমনির জরমনগণ দ্বারা নিপীড়িত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের কৃষ্টি সভ্যতার অনেকখানি জরমন সভ্যতার কাছে ঋণী। তা ছাড়া অনেক জরমনও চেকোশ্লোভাকিয়ায় বাস করতো।

অধ্যাপক ভিন্‌টার্‌নিংস চেক নন। তিনি জন্মেছিলেন দক্ষিণ অস্ট্রিয়ায় ও প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের শেষে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি যখন টুকরো টুকরো হয়ে যায় তখন তাঁর জন্মভূমি পড়ে নব নির্মিত রাষ্ট্র চেকো-শ্লোভাকিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশে, অবশ্য অস্ট্রিয়াই (হিটলারেরও জন্ম এই অঞ্চলে এবং তাঁর ধমনীতে নাকি কিঞ্চিত চেক রক্তও ছিল; মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন, চেকদের যে তিনি সর্বনাশ করতে চেয়েছিলেন তার কারণ, ওই করে তিনি তাঁর চেক রক্ত অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন)। কিন্তু সেইটে আসল কথা নয়। তিনি ভালো-বাসতেন প্রাগ শহরকে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সেখানে তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১৮/১৯ খৃষ্টাব্দে চেকোশ্লোভাকিয়া জন্মগ্রহণ করে মাতৃ-উদর থেকে যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তখন তিনি ইচ্ছে করলেই ভিয়েনা (এই মাত্র বলেছি, তাঁর মাতৃভূমি পড়েছিল অস্ট্রিয়ায় এবং অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা তখন প্রাগ ইত্যাদি শহর থেকে তার আপন-জনকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে) বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যেতে পারতেন কিন্তু তিনি যান নি।

অধ্যাপক ভিন্‌টার্‌নিংস ১৯০২ খৃষ্টাব্দ থেকে বরাবর ১৯৩৭ অবধি তাঁর পরলোক-গমন অবধি প্রাগেই থেকে যান।

তিনি ছিলেন জাতে, ধর্মে ইহুদি। (১) ইহুদিরা কোনো জায়গায় পত্তন জমালে সেখানে যেসব ইহুদি পরিবার আছে তাদের সঙ্গে মিলেমিশে এমনই এক হয়ে যায় যে, পরে ভিন্ন জায়গায় উৎকৃষ্ট সুযোগ-সুবিধা পেলেও এদের ত্যাগ করাটা নিমকহারামী বলে মনে করে। ওই একই কারণে ইজারায়েলের শত ক্রন্দনরোদন সত্ত্বেও আমেরিকার লক্ষ লক্ষ ইহুদি পরিবার-সমাজ-দেশ ছেড়ে ওই দেশে যেতে চায় না।(২)

*

প্রাগ শহর বড় বিচিত্র শহর। সেখানে চেক আছে, জরমন আছে, ইহুদি আছে, আরো কত জাত-বেজাতের লোক আছে। এবং বড় মিলেমিশে থাকে।

আর, পূর্বেই বলেছি, শহরটি বাস্তবিকই বড় সুন্দর।

মধ্যিখান দিয়ে মলডাও নদী চলে গিয়েছে।

---

(১) আমি শুনেছি তিনি যখন শান্তি-নিকেতনে ভিজিটিং প্রফেসাররূপে ছিলেন তখন কলকাতার ইহুদি সম্প্রদায়ের নিমন্ত্রণে সেখানকার ইহুদি ধর্ম মন্দিরে তাঁদের বাৎসরিক পুজোয় উপস্থিত থাকেন।

(২) অন্য কারণও হয়তো আছে। ১৯৩৫ সালে যখন আমি প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের কেন্দ্রভূমি তেল্-আভিভ শহরে যাই তখন এক ইহুদি আমাকে বলেন—মস্করা করে, কী কি, বলা কঠিন—'কাকে কাকের মাংস খায় না। সব ইহুদি, সব কাক, এক জায়গায় জড়ো হলে তো উপবাসে মরতে হবে। দুনিয়ার কুল্লে জাত স্বজাতের সঙ্গে থাকতে চায়। আমরা ব্যত্যয়।'

ঠিক যে-রকম ভিয়েনার মাঝখান দিয়ে ড্যান্যুব, প্যারিসের মধ্যিখান দিয়ে সেন, বুডা-পেশ্‌টের মাঝখান দিয়ে ড্যান্যুব।

*

অধ্যাপক ভিন্‌টার্‌নিংসকে নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাবো।

হোটেলওলাকে শুধোলুম, হোথায় কোন্ ট্রামে বা বাস-এ যেতে হয়।

সেদিন কি একটা পরব ছিল। ভিড়ে ভিড়ে হুলুস্থুল।

অতএব বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চয়ই বন্ধ। কিন্তু একটা স্কেলিটেন স্টাফ থাকবে তো। তারা নিশ্চয়ই অধ্যাপকের বাড়ির ঠিকানা দিতে পারবে।

ইতিমধ্যে এই হুলুস্থুল না কাটা পর্যন্ত ট্রাম-বাস তো চলবে না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডান হাত দিয়ে ঘাড়ের বাঁ দিকটা চুলকোচ্ছি. এমন সময়,

এমন সময়ে, এক অপরূপ সুন্দরী এসে আমাকে শুধোলে, 'আপনার কি কোনো সাহায্যের প্রয়োজন?'

এ শুধু প্রাগেই সম্ভবে।

অন্য দেশের মেয়েরা পুরুষকে মদ্দ্ দেবার জন্য এরকম এগিয়ে আসে না।

অসংলগ্না

বনফুল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এই ধরনের লেখা থাকে তাঁর খাতায়, যার নাম দিয়েছেন তিনি 'মেঘ'।

সেদিন তিনি অনেকক্ষণ খাতা খুলে বসে রইলেন, কিন্তু কোনও লেখা মাথায় এল না। আকাশের তুলোর মতো মেঘরা ভেসে ভেসে চলে গেল নিরুদ্দেশ যাত্রায়। নতুন একদল পাশক মেঘ এল কোন এক অজানা সুপর্ণের খবর নিয়ে। সুভদ্রবাবুর মাথায় কিংবা খাতায় কেউ এল না অনেকক্ষণ। তারপর এল। হঠাৎ এল। সুভদ্রবাবু লিখলেন।

"সকালে যে মেঘের দল আকাশে ছিল তাদের চেহারা ছিল চাপ চাপ তুলোর মতো। তাদের দেখে মনে পড়েছিল রহমন ধুনকরকে। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, তখন রহমন ধুনকর এসে আমাদের বাড়িতে তুলো ধুনে লেপ তোশক তৈরি করত শীতের একটু আগে। ধন্ ধপাৎ, ধন্ ধপাৎ ধন্ ধপাৎ—তুলো ধোনার শব্দটা এখনও কানে বাজছে। আমি আকাশে কান পেতে ছিলাম, আশা করছিলাম, ওই তুলোর মতো মেঘগুলোকেও রহমন ধুনকর এসে ধুনে দেবে বুঝি, ধন্ ধপাৎ, ধন্ ধপাৎ, ধন্ ধপাৎ শব্দটা আবার শোনা যাবে। কিন্তু গেল না। তার পরেই ওই হলদে বাড়িটার দিকে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। স্পষ্ট যেন দেখতে পেলাম মিসেস পূর্ণেন্দু কাঁদছে। তার এ কি চেহারা! মেমসাহেব নয়, শ্যামলী কিশোরী। মনে হল, তার কান্না যেন কথা কইছে। আমি দৃষ্টির ভিতর দিয়ে গিয়ে নিজেকে মূর্ত করবার চেষ্টা করলাম তার পাশে, কিন্তু পারলাম না, আমার ভাষা-জ্ঞান দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম তার কান্নার ভাষাকে, তা-ও পারলাম না। শেষকালে আমার এই না-পারাটাকেই ভেলা করে তার দিকে ভেসে যেতে চেষ্টা করলাম সেই সমুদ্রের উপর দিয়ে যে সমুদ্রের নাম নেই, কোন বিশেষণ দিয়ে যার নিদারুণ ভয়াবহতা বর্ণনা করা যায় না, যে সমুদ্রে অসহায় দুরাকাঙ্ক্ষীরা ডুবে মরে চিরকাল, যে সমুদ্রের পার আছে, কিন্তু তবুও যা অপার। এই সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে যখন ভাসছি তখন হঠাৎ পেলাম শ্যামলীর না রহস্যকে। দেখতে পেলাম তার কনে চন্দন-আঁকা মুখটা যা বিয়ের রাত্রে শুভদৃষ্টির সময় দেখেছিলাম চল্লিশ বছর আগে। এই চল্লিশ বছরে কত রঙের আলো পড়েছে ওই মুখের উপরে, কত রঙের পরদা দুলেছে ওই মুখের সামনে কিন্তু আশ্চর্য, একটুও বদলায় নি সে মুখশ্রী। সেই সম্রত দৃষ্টি, অধরের সেই ভাষাময়ী ব্যঞ্জনা, সলজ্জ নীরবতার সেই আশ্চর্য মহিমা অবিকল তেমনি আছে। আমি সবিস্ময়ে দেখছি এমন সময়ে আমাকে আরও বিস্মিত করে সে চোখ তুলে চাইল আমার দিকে। আশ্চর্য, যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন একবারও সে এমনভাবে তাকায় নি। এ দৃষ্টিকে বর্ণনা করবার ভাষা নেই আমার। একসঙ্গে অনেক কথা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে হলদে পাখির 'টিউ' ডাকের সঙ্গে যেন সাদৃশ্য আছে এর। এক ঝাঁক টিয়ে এসে বসল আর উড়ে গেল ইউক্যালিপ্টাস গাছটার মগডাল থেকে। এ দেখে মগডালের সাদা ফুলের গোছাটার যে অবাক ভঙ্গী জাগল তার সঙ্গেও সাদৃশ্য আছে। আর সবচেয়ে সাদৃশ্য আছে আমাদের সেই অনিশ্চিত মনোভাবের সঙ্গে যখন আমরা কিছু না বুঝেও সায় দিয়ে বলি—হ্যাঁ, তা তো বটেই। এর প্রত্যেকটির সঙ্গে ওই দৃষ্টির সাদৃশ্য আছে, তবু এই তিনটি উপমার সাহায্যে ওর স্বরূপ বোঝানো যাবে না। এইসব ভাবছি এমন সময় এক কাণ্ড হল। আদালতে যেমন কাঠগড়া থাকে তেমনি একটা কাঠগড়ার ছবি ফুটে উঠল আকাশে আর সেই কাঠগড়ার উপর সেই দৃষ্টি মূর্ত হল স্ফুরিতাধরা যুবতীরূপে। তার হাতে একটা লাল রুমাল। মনের 'সুইচ'টা হঠাৎ অকেজো হয়ে গেল যেন। আলো নিবে গেল। আমার অন্তরতম সত্তার প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে কে যেন সভয়ে বলে উঠল—লাল রুমালটা ছিল তা জানি, ও যে ওর রহস্য নামের মর্যাদা রেখেছে তা-ও আমার অজানা নয়—কিন্তু ওসব আর দেখতে চাই না,

শুনতে চাই না, পরদা ফেলে দাও, পরদা ফেলে দাও। মনে হল কোন এক অজানা প্রেক্ষাগৃহ থেকে হাততালি দিচ্ছে অসংখ্য দর্শক। তীক্ষ্ন কণ্ঠে কে যেন বলে উঠল—আংকোর, আংকোর। তারপর সব নিস্তব্ধ।"

প্রায় সংগে সংগেই মহুয়া এল—"দাদু, খাবে চল, আড়াইটে বেজে গেছে—ওঠ, আর দেরি নয়—"

"তুই কোথায় ছিলি এতক্ষণ?"

"কলেজ থেকে আসছি—আমি আজ না খেয়েই কলেজ গিয়েছিলাম। চল, এক সংগেই খাব আজ।"

"চল।"

কোনও আপত্তি না করেই উঠে পড়লেন সুভদ্র। তারপর হঠাৎ যেন আবিষ্কার করলেন ব্যাপারটা। "এ কি, তুই এই ভেলভেটের কোট গায়ে দিয়ে কলেজ করিস নাকি?"

মহুয়া যে ব্রাউন রঙের বেঁটে কোটটা গায়ে দিয়েছিল সেটা ভেলভেটিনের। আর সত্যিই চমৎকার সেটা। তাতে হাত বুলিয়ে সুভদ্র বললেন—"এতো শৌখিন জামা গায়ে দিয়ে আমাদের কালে কলেজ যাওয়া যেত না। তোর ছাত্ররা কিছু বলে না?"

"আজকাল ছাত্র বলে কিছু নেই। যাদের আমি পড়াই তাদের মধ্যে কেউ বন্ধু, কেউ শত্রু, কেউ স্তাবক।"

"এমন চমৎকার কোটটা তুই কবে কিনলি?"

"তুমিই তো কিনে দিয়েছিলে গতবার আমার জন্মদিনে। এতো ভুলো তুমি—"

"কাল, না পরশু, না তার আগের দিন—ঠিক মনে পড়ছে না, তোকে একটা রামধনু রঙের শাড়িও দিয়েছিলাম, তাতে বিদ্যুতের পাড় বসানো। তোকে রোজ এত জিনিস দিই যে, সত্যিই মনে থাকে না কিছু। বিধাতা উজাড় করে গ্রহনক্ষত্র ঢেলে দিয়েছেন আকাশের বুকে, কোনটা কবে দিয়েছেন, তা তাঁর মনে আছে কি?"

"ইস্—"

ঘাড় ফিরিয়ে চাইল মহুয়া হাসিমুখে।

তার হাসিমুখ দেখে যেন ভরসা পেলেন সুভদ্র।

সাহস করে জিজ্ঞেস করলেন—"কাল রাত্রে কোথায় যাওয়া হয়েছিল?"

একটু অবাক হবার চেষ্টা করল মহুয়া।

"কাল তুমি ব্রোমাইড খাওনি?"

"খেয়েছিলাম। কাজ হল না। চোখ বুজে শুয়ে ছিলাম। তুমি যাওয়ার আগে আমার বোজা চোখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে খানিকক্ষণ। তা-ও টের পেয়েছিলাম। তারপর খুট করে ছিটকিনি খোলার শব্দ হল, একটু ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকল, হাস্নুহানার গন্ধও ঢুকল এক ঝলক, সাঁওতালী বাঁশীর সুরও শোনা গেল দূরে, বুঝলাম তুমি চলে গেলে। কোথায় গিয়েছিলে বল তো?"

"যদি বলি তেপান্তরের মাঠে। বিশ্বাস করবে?"

"করব। তুমি যাওয়ার পরমুহূর্তেই পক্ষিরাজটা এসেছিল যে। তাতে আমি সওয়ার হয়েলাম। দেখলাম মহুয়া আলেয় হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তেপান্তরের মাঠে।"

"ইস্!"

আবার ঘাড় ফিরিয়ে চাইলে মহুয়া হাসিমুখে।

২

তিরিশ বছর আগে ফিরে যাওয়া যাক।

কলেজ স্কোয়ারের দক্ষিণ দিকে তিনতলা একটি বাড়ির মির্জাপুর স্ট্রীটের দিকের ঘরটিতে বসে একটি যুবক তন্ময় চিত্তে সবুজ মরক্কো দিয়ে বাঁধানো টেনিসনের গ্রন্থাবলী পড়ছিলেন। পিছন থেকে এক ফালি সূর্যালোক ঢুকেছিল ঘরে। চশমার সোনার ফ্রেমে প্রতিফলিত হয়ে সে আলো বইয়ের পাতায় অদ্ভুতরকম ছবি আঁকছিল একটা। মনে হচ্ছিল ছোট্ট একটা সোনার

হরিণ যেন নেচে বেড়াচ্ছে। মাথাটা একটু নাড়ালেই ছুটোছুটি করছে সেটা পাতার উপর থেকে নীচে পর্যন্ত। 'লেডি অব দি শ্যালট' পড়ছিলেন যুবকটি। লিলি ফুল, উইলো আর অ্যাসকেন গাছ, চারিদিকে সোনার ফসল, প্রকাণ্ড নদীর স্বচ্ছ জলধারা আর সেই বিরাট দুর্গ, যে দুর্গে একাকিনী থাকেন সুন্দরী লেডি অব শ্যালট—মুগ্ধ হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন যুবকটি। চলে গিয়েছিলেন কলকাতা ছেড়ে Camelot-এ, বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে কল্পনা-নেত্রে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করছিলেন সেই সুপ্রাচীন ব্রিটিশ বীরকে যিনি Saxonদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। সেদিনকার খবরের কাগজটা টেবিলে পড়ে ছিল, তাতেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক খবর ছিল, কিন্তু সেদিকে কৌতূহল ছিল না তাঁর। Idyles of the king নিয়ে তন্ময় হয়ে ছিলেন তিনি। হঠাৎ ওই সোনার হরিণটা এসে অন্যমনস্ক করে দিলে তাঁকে। তিনি একটা খেলা পেয়ে গেলেন যেন। মাথাটা একটু নাড়ালেই ছুটে পালাচ্ছে হরিণটা! লেডি অব শ্যালট থেকে সহসা তিনি চলে গেলেন লেডি অব রামায়ণের কাছে। মনে পড়ে গেল সীতার কথা। এই সোনার হরিণের জন্যেই বিপদে পড়েছিলেন তিনি। যুবকটিও পড়লেন। তিনি ভুলে গেলেন যে আর আধ ঘণ্টা পরেই 'নি' আসবে। এসেই টেনিসনের সম্বন্ধে লেখাটা চাইবে—কিন্তু কিছু লেখবার আগে যে পড়াটা দরকার তাই তো হয়নি এখনও—সোনার হরিণটা এসে সব গোলমাল করে দিল। সুভদ্র সেন ঠিক করলেন [illegible] সেই সুভদ্র সেন যে সুভদ্র সেন চিরতরে হারিয়ে গেছে, যার সঙ্গে এখনকার সুভদ্র সেনের কিছুমাত্র মিল নেই (ফুলের সঙ্গে ফলের মিল থাকে কখনও?)—সুভদ্র সেন হঠাৎ ঠিক করলেন কবিতা লিখে ফেলবেন একটা। ফাউন্টেন পেন বার করলেন পকেট থেকে। তারপর টেবিল থেকে একটা ছোট খাতা তুলে ভাবতে লাগলেন চোখ বুজে। অনেকক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। একটা ভাব মনে এল। ভাবলেন লেখবার আগে আর একবার দেখে নেওয়া যাক হরিণটাকে। চোখ খুলে দেখলেন হরিণ নেই, পালিয়ে গেছে। সূর্য সরে গেছে আকাশ থেকে। চশমার ফ্রেমে আর আলোর রেখা পড়ছে না। এই আবির্ভাব ও তিরোভাবকে সৃষ্টির একটা মহাসত্য বলে মনে হল সুভদ্র সেনের। মহাশূন্যে প্রতি মুহূর্তে হয়তো কতো জ্যোতিষ্কের জন্ম ও বিলয় হচ্ছে এইরকম। হয়তো...হঠাৎ মনে হল 'নি'-ও কি হারিয়ে যাবে? ভ্রূকুঞ্চিত করে রইলেন। তারপর লিখে ফেললেন কবিতাটা।

টেনিসনের কাব্যকুঞ্জে
হঠাৎ এসেছিল সোনার হরিণ
আকাশ থেকে।
ছুটোছুটি করে বেড়াল খানিকক্ষণ;
মনে হল তেষ্টায় ছটফট করছে
মনে হল খুঁজছে সীতাকে।
উঁচু-পর্দায়-বাঁধা
ওগো সুর-সপ্তকের নিখাদ,
ওগো 'নি'

তুমিই কি তার তেষ্টার জল
তুমিই কি তার সীতা
তা ভালো করে বোঝবার আগেই
সে চলে গেল।
আকাশেই চলে গেল সম্ভবত।
কোন আকাশে?
আকাশ তো একটা নয়
তুমিও একটা আকাশ তো,

সে আকাশে সূর্যচন্দ্রনক্ষত্র নেই
আছে ফানুস
নানা রঙের ফানুস
কে জানে
ওই সোনার হরিণটা
ফানুস হয়েই উড়ছে সেখানে হয়তো।

এর পরেই 'নি' এল সশরীরে। ছিপ-ছিপে গড়নের মেয়েটি। দেহের কোন অংশেই রূপ নেই, বাদামী রং, কাঠি-কাঠি হাত পা, ছোট চোখ, বড় দাঁত, নাকটা খাঁদা —কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—সমস্তটা মিলিয়ে এমন একটা তীক্ষ্ণ অপরূপ শ্রী—যা অগ্রাহ্য করবার উপায় নেই। মুগ্ধ হতেই হবে। একাধিক লোক হয়েছে। ওর প্রথম প্রণয়ী ওর নাম রেখেছিল 'ফড়িং'। 'ফড়িং'-এর মতই অপ্রত্যাশিতভাবে লাফ দিয়ে ও পালিয়ে এসেছে তার কাছ থেকে। ওর আসল নাম নাকি কৈবল্যদায়িনী। ওর দ্বিতীয় প্রণয়ী সেটাকে নাকি ছোট করে নিয়েছিল—'কই'। 'কই'-এর কাঁটার ঘায়ে অতিষ্ঠ হতে হয়েছিল নাকি ভদ্রলোককে। বহু কিংবদন্তী, নানা ইতিহাস আছে ওর সম্বন্ধে। সুভদ্র সেনের সঙ্গে তার পরিচয় কিভাবে হয়েছিল তা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর বন্ধু সৌরেন মিত্তির। সুভদ্র সেন যে জবাব দিয়েছিলেন তা অবিশ্বাস্য। বলেছিলেন—"ও হঠাৎ একদিন আবির্ভূত হয়েছিল আমার সামনে—"

"কিরকম? কোথা থেকে আবির্ভূত হল?"

"আকাশ থেকে। সবুজ একটা প্যারা-সুট থেকে নামল আমার সামনে। হাতে লাল রুমাল ছিল একটা। নিকটকে এলে। আর ওর সমস্ত সত্তা কাঁপছিল চড়া নিখাদের মীড়ে মীড়ে!"

সৌরেন মিত্তির হেসে বলেছিলেন—"আমি কিন্তু ও মেয়েকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি একটা পার্কে। পাশে একটা মদের বোতলও ছিল—"

সুভদ্র সেন হাসিমুখে চেয়ে ছিলেন বন্ধুর দিকে। অনেকক্ষণ চেয়ে ছিলেন। তারপর বলেছিলেন—"তুমি হয়তো ওর দেহটাকে দেখেছ, ওকে দেখনি। নি-কে দেখা যায় না, নি-কে অনুভব করতে হয়—"

সেই নি সশরীরে উপস্থিত হল এসে।

"লেখাটা এখনও হয়নি কিন্তু। আশ্চর্য একটা সোনার হরিণ—"

"লেখার আর দরকার নেই। পড়াশোনা খতম হয়ে গেল। এক্সপেলড (expelled) ফ্রম দি কলেজ"

ধাপে ধাপে গলা চড়িয়ে উঠল নি। হাসতে হাসতে বেঁকে গেল। তারপর হঠাৎ থেমে সুভদ্রর কাছে এসে তার থুঁতনিটা নেড়ে দিয়ে বলল—"ফেলে দাও টেনিসন। তোমার গীটারটা নিয়ে চল বেরিয়ে পড়ি—"

"কোথা যাবে? বটানিকাল গার্ডেন?"

"বড্ড পুরোনো হয়ে গেছে ও জায়গা।

—'ফেলে দাও টেনিসন। তোমার গীটারটা নিয়ে চল বেরিয়ে পড়ি"

চল না নতুন জায়গা খুঁজে বার করি একটা। ঘন বনের ধারে ছোট্ট একটু ফাঁকা মতন। পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে নদী বইছে। দূরে নীল পাহাড় দেখা যাচ্ছে। সেইখানে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে তুমি গীটার বাজাবে, আর আমি নাচব আমার এই লাল রুমালটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। আমার নাচ দেখে বন থেকে বেরিয়ে আসবে হরিণ, আর তোমার গীটার শুনে বেরিয়ে আসবে বিরাট শংখচূড়, কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে ফণা তুলে শুনবে তোমার ভৈরবী, যে ভৈরবীতে কোমল 'নি' লাগে..."

আবার হাসি ধাপে ধাপে গলা চড়িয়ে।

"তারপর?"

"তারপর নদী বেয়ে ভেসে আসবে ময়ূরপঙ্খী। আর ময়ূরপঙ্খী থেকে নেমে আসবে অদ্ভুত পোশাক-পরা ইটালিয়ান নাবিক একটি। তার পোশাক আর টুপি, তার ছুঁচলো দাড়ি, আর চোখের দৃষ্টি থেকে তুমি বুঝতে পারবে লোকটা জলদস্যু। কিন্তু আমার মনে হবে কী মিষ্টি ওর মুখের হাসি। আমাকে দেখে এক মুখ হেসে, টুপিটি খুলে ঘুরিয়ে এমনভাবে অভিবাদন করবে সে যে, আমি মুগ্ধ হয়ে যাব। সে বলবে—হ্যাঁ, তার কথা বেশ বুঝতে পারব আমি, যদিও আমি ইটালিয়ান ভাষা জানি না—তবু বুঝতে পারব। সে বলবে—"সিনিয়রিন্যা (signorina), আমার অকপট অভিনন্দন গ্রহণ করুন। মহামান্য সীজার ক্যালিগুলার বংশধর সিনিয়োরা (signora) আলফাবীটা আপনার নাচের খ্যাতি শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পাঠিয়েছেন এই ময়ূরপঙ্খী। আসুন—এই বলে সে একটু ঝুঁকে দু হাত প্রসারিত করে অভ্যর্থনা করবে আমাকে। তার ওই হাসি দেখে আমি পা বাড়াতে যাব—এমন সময়—"

থেমে গেল 'নি'—তার চোখে চিকমিক করতে লাগল দুষ্টু হাসির ঝিলমিলি আলো।

"তারপর?"

আবার সেই ধাপে ধাপে গলা চড়িয়ে হাসি।

"তারপর যা হল তা আশ্চর্য কাণ্ড (miracle) — রূপকথা — নানা কাব্যের কোয়ালিশন। তুমি বলে উঠবে—না, তুমি যাবে না। হঠাৎ তোমার গীটার হয়ে যাবে তলোয়ার আর তার হাতের টুপি হয়ে যাবে কাট্লাস (cutluss), মানে নাবিকদের হাতে যে তলোয়ার থাকে তাই। যুদ্ধ বেধে যাবে তোমাদের। ওই শংখচূড় সাপটা নাগবংশীয় বীর রূপ ধারণ করে তোমার পিছনে পাঁয়তারা কষতে থাকবে। আর সেই হরিণটা আমাকে কানে কানে বলবে—এই সুযোগ, আমার পিঠে চড় এবার। আমি বিস্মিত হব। জিজ্ঞেস করব, কে তুমি? সে বলবে—আমি গ্রীক বন্য-দেবতা

প্যান। ওরা যুদ্ধ করুক, আমি চল তোমাকে নিয়ে যাই। কোথায় নিয়ে যাবে, জিজ্ঞেস করব আমি। সে বলবে, প্রথমে নিয়ে যাব লংকায়, তারপরে ট্রয়ে। মুচকি হেসে উঠে বসব তার পিঠে আমি। আর সে ছুটতে থাকবে. তারপর হঠাৎ দেখব প্রকাণ্ড একটা মেঘের উপর চড়ে ভেসে যাচ্ছি, প্যান আর হরিণ নেই, মানুষ হয়ে গেছে, কন্দর্পকান্তি যুবক, বাঁ হাত দিয়ে আমার কোমরটা জড়িয়ে ধরেছে। তারপর সে আমার কানে কানে বলবে—এই দেখ, তোমার জন্যে কি কাণ্ড হচ্ছে। দেখতে পাব—বিরাট যুদ্ধ হচ্ছে। রাম, রাবণ, আগামেমনন, ভীম, অর্জুন, আজাক্স, একিলিস, কর্ণ, দ্রোণ, প্যারিস, ভীষ্ম সবাই যুদ্ধ করছে আমার জন্য। প্যান আমার কানে কানে বলছে—তুমি কখনও সীতা, কখনও দ্রৌপদী, কখনও হেলেন—"

আবার সে হাসতে লাগল ধাপে ধাপে গলা চড়িয়ে। ক্রমাগত হাসতে লাগল। ক্রমশ সে হাসি রোদনে পরিণত হল। সে বলতে লাগল—"হবে না, হবে না, হবে না, আমি জানি এসব কিচ্ছুই হবে না—সেই বোসের কেবিনে গিয়ে নড়বড়ে ময়লা রেক্সিন মোড়া টেবিলে বসে ধারে জলো চা খেতে হবে ফাটা পেয়ালায়—"

নি কাঁদতে লাগল হু হু করে!

কতক্ষণ কেঁদেছিল তা সুভদ্র সেনের মনে নেই। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন নি নেই, চলে গেছে। পড়ে আছে সেই লাল রুমালটা। মনে হচ্ছিল এক ঝলক রক্ত যেন।

সুভদ্র সেন কুড়িয়ে রেখে দিয়েছিলেন সেটা। বাক্সের ভিতর লুকিয়ে রেখেছিলেন, ভেবেছিলেন 'নি' ফিরে এসে চাইবে। 'নি' আর ফিরে আসেনি। অনেকদিন পরে এই চিঠিখানা এসেছিল।

সুভদ্র,

আমি এখন মহাসমুদ্রের ঢেউয়ের উপর ভাসছি। ঝড় উঠেছে। জাহাজটা দুলছে। সামনে টেবিলের উপর দুলছে শ্যামপেনের বোতলটা। ওপাশে চেয়ারে বসে দুলছে তোমার বন্ধু সোরেন মিত্তির। তাকেই বিয়ে করেছি। সেই আমাকে নিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা। সমুদ্রের নাম অ্যাটলাণ্টিক—যার বাংলা তোমরা করেছ অতলান্তিক—আর জাহাজের নাম পেগেসাস (Pegasus)—গ্রীক পুরাণের পাখাওলা সেই ঘোড়া—যা নক্ষত্ররূপে এখনও আকাশ উজ্জ্বল—যার বাংলা নাম করতে পার পক্ষিরাজ বা উচ্চৈঃশ্রবা! হঠাৎ তোমাকে চিঠি লিখছি কেন, এ প্রশ্নের সদুত্তর নেই। তুমি উত্তর দেবে না জানি, উত্তরটা আমার যে অজানা তা-ও নয়, তবু প্রশ্ন করছি, তুমি কি তোমার 'নি'কে—আসলে যে স্বৈরিণী—তোমার জীবন-সঙ্গিনী করতে পারতে? আমি জানি পারতে না। আমি যে তোমার সঙ্গে মিশতাম এটা যখন জানাজানি হয়ে গেল তখন তুমি বেশ বিব্রত বোধ করতে আমি লক্ষ করেছিলাম। তোমার শখ ছিল,

লোভ ছিল, কিন্তু সাহস ছিল না। সৌরেন কিন্তু দুর্দান্ত। সে সমস্ত ত্যাগ করে আমাকে নিয়ে সমুদ্রে ভাসতে পেরেছে। কিন্তু তবু—। এইখানেই শেষ করি...।

এই 'তবু'র উপর সুভদ্র সেন অনেক তাজমহল, অনেক পিরামিড, অনেক ইফেল টাওয়ার বানিয়েছেন। একে একে সেগুলো মূর্ত হয়েছে, কিছুক্ষণ থেকেছে, আবার বিলীন হয়ে গেছে। সেদিন ওই 'তবু'টা অজন্তার গুহার রূপ ধারণ করেছিল, আর সেই গুহার ভিতর সুভদ্র সেন দেখেছিলেন সেই বিখ্যাত ভিখারিনীকে—'নি'ই যেন সেই ভিখারিনী—নি-ই যেন আকুল উৎসুক নয়নে তাঁর দিকে চেয়ে আছে।

কিন্তু নি আর ফেরেনি সশরীরে। অশরীরিণীরূপে কিন্তু এখনও সে ঘোরা-ফেরা করে সুভদ্র সেনের মানস-লোকে।

অতীতের যবনিকা একটু সরিয়ে দেখে নেওয়া গেল বটে সেকালের সুভদ্র সেনকে, একজন প্রেমিক লোকের দেখা পাওয়া গেল, কিন্তু আসল লোকটিকে দেখা গেল না। অর্থাৎ সে লোকটির দেখা পাওয়া গেল না যে লোকটি রূপকথালোকে বাস করে। বাস করে বলছি বটে কিন্তু সে বাস করে না কোথাও. সে সঞ্চরণ করে বেড়ায়। অনেক 'নি'র সঙ্গে দেখা হয় তার, কোথাও কিন্তু বাঁধা পড়ে না। অনেক স্থাবরকে জঙ্গম করেছে সে, অনেক জঙ্গমকে স্থাবর, কিন্তু বাঁধা পড়ে না কোথাও। সুভদ্র সেনের দেহটা জরার কারার মাঝে মাঝে বন্দী-যন্ত্রণা ভোগ করে, মন কিন্তু সদা-উড়ন্ত। কত দেশের অরণ্য পর্বত সাগর আকাশ যে পার হয় তার ঠিক নেই। সত্যিই একটা পাখির মতন, সে পাখি কখনও হাঁস, কখনও ঈগল, কখনও আবার নাম-না-জানা ঝড়ের পাখি। বহু দিন আগে কাহিনীর যে টুকরোটি তিনি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন সেই কাহিনী—সেই মিসেস পূর্ণেন্দুর কাহিনী—আর কাহিনী মাত্র নেই তাঁর কাছে, তা তাঁর কাছে সৃষ্টির প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিসেস পূর্ণেন্দুকে তিনি নানাভাবে সৃষ্টি করছেন প্রত্যহ। ডাক্তাররা বলেন, ওইটেই পাগলামির লক্ষণ। কিন্তু মহুয়ার ধারণা অন্যরকম। তার ধারণা, দাদু প্রেমে পড়েছে। কার প্রেমে তা সে ঠিক জানে না। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়—তখন মুচকি হাসি ফুটে ওঠে তার পুরু সাঁওতালী ঠোঁটে।

(ক্রমশ)

(বত্রিশ)

স্বরূপ লাহিড়ীর সংসারে শান্তি কোনদিনই ছিল না, কিন্তু অশান্তি আরও বাড়ল যে সন্ধ্যায় মনুয়া বাবার আপত্তি অগ্রাহ্য করে মোহনচাঁদের গাড়ি চড়ে চাকরি বজায় রাখতে খেতে গেল দামী হোটেলে।

মেয়ে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপ লাহিড়ী তেতো গলায় স্ত্রীকে বলল, শুধু তোমার জন্যে মেয়েটা এতখানি বেয়াড়া হয়েছে।

মনুয়ার মা আপত্তি করে, আমার কি দোষ, মেয়ে তোমার মত একগুঁয়ে হয়েছে।

—প্রত্যেকদিন রাত করে ফেরে।

—আমাকে শোনাচ্ছ কেন, মেয়েকে বললেই তো পার।

—বলবার মুখ রেখেছো, তোমার যত রকম নোংরামী, ইতরামী, বাঁদরামী মনুয়া ছোটবেলা থেকে দেখেছে, কিছু বলতে গেলেই তো সেইসব কথা শোনায়। মিসেস লাহিড়ী বিরক্ত হয়ে বলে, সারাজীবন তো তোমার কাছে শুধু গালাগালি খেলাম, মেয়ে আমাকে আজ মানবে কেন? সে তো জানে আমি এ বাড়ির ঝি, তার বেশি কিছু নই।

স্বরূপ লাহিড়ী গর্জায়, বাড়ির ঝি, থাক আর কথা বাড়িও না, যা সব কেলেঙ্কারি করেছ, জানতে কারুর বাকি নেই। ওই মেয়েটাও আমার কিনা কে জানে?

মনুয়ার মা চীৎকার করে ওঠে, আঃ, কি যা তা বলছ।

—তুমি সব পার, যে কোন পুরুষ মানুষের সঙ্গে শুতে পার। তোমার মেয়েও পারে।

মিসেস লাহিড়ী আর কথা না বাড়িয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

স্বরূপ লাহিড়ী তখনও বাইরে নোংরা ভাষায় গালাগাল করছে। ঠিক যেন দুটো বুনো জন্তু, কেউ কাউকে দু'চোখে দেখতে পারে না অথচ একই জায়গায় রয়েছে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে মোহনচাঁদের গাড়িতে উঠে মনুয়া শুধু মনকে শক্ত করল না সেই সঙ্গে যুক্তি দিয়ে বোঝাল বাবার কথা শুনতে গিয়ে নিজের কর্মজীবন নষ্ট করার কোন মানে হয় না। তাছাড়া বাবা-মার কাছ থেকে সে পেয়েছেই বা কি? দুজনেই চরম স্বার্থপর, নিজেদের সুখ-সুবিধে নিয়েই চিরকাল ব্যস্ত ছিল কোনদিন মেয়ের দিকে ফিরেও তাকায়নি। মনুয়া মানুষ হয়েছে আগাছার মত, মনুয়া কি চায়, কি ভাবে তার মা কতটুকু খবর রাখে। বলতে গেলে মনুয়াকে সে একেবারেই চেনে না, আরও দূরের মানুষ স্বরূপ লাহিড়ী, বাবা আর মেয়ের মধ্যে কোনরকম কোমল সম্পর্কই গড়ে ওঠেনি। আগে ও বাড়িতে ছিল দুজন প্রাণী একজন শিশু, এখন সেখানে বাস করছে তিনজন প্রাণী। সম্পর্কবিহীন তিনটে আলাদা জগতের মানুষ, তবে আজ হঠাৎ বাবার হুকুম শুনে মেয়ে ভয় পাবে কেন? মোহন-চাঁদ তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ দিয়েছে, নতুন জীবনটা তার ভালোও লেগেছে। কত লোকের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে, কতরকম ব্যবসার কথা শুনছে, ঠিকমত চলতে পারলে মনুয়া যথেষ্ট রোজগার করতে পারবে মনুয়াকে সে আশ্বাস দিয়েছে। বাবা-মার তিক্ত দাম্পত্য জীবন আশৈশব দেখে সংসারের উপর বিতৃষ্ণা জন্মেছে মনুয়ার, ঠিক মনের মতন মানুষ না পেলে বিয়ে করার তার ইচ্ছে নেই। ভাল রোজগার করতে পারলে নিজেই ফ্ল্যাট নিয়ে থাকবে। ক্ষতি কি?

মোহনচাঁদের গাড়ি মনুয়াকে সোজা নিয়ে গেল নির্দিষ্ট হোটেলে। উপরে উঠে গিয়ে মোহনচাঁদের টেবিল খুঁজে পেতে দেরি হল না। সুদৃশ্য কার্পেট মোড়া স্বল্প আলোকিত কক্ষে যেখানে ক্যাবারে নাচ হয় সেইখানে মোহনচাঁদ এক যুবকের সঙ্গে বসে গল্প করছিল, মনুয়াকে দেখে তারা দুজনেই উঠে দাঁড়াল, হেসে বলল, মিস লাহিড়ী তোমার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি।

মনুয়ার অপ্রস্তুত প্রশ্ন, আমার কি আসতে দেরি হয়েছে?

—না, তা ঠিক নয়, আমরাই বোধ হয় একটু আগে এসেছি। পরিচয় করিয়ে

দিই. ইনি আমার তর্ণ বন্ধ্, শেঠিয়া আর ইনি—।

শেঠিয়া সহাস্যে পাদপ্রণ করে দিল, আপনার স্ন্দরী পার্সোন্যাল অ্যাসিস্টেণ্ট।

তারা তিনজনেই হাসল, মন্য়া ভাল করে চেয়ে দেখল শেঠিয়াকে, বেশ লম্বা চওড়া চেহারা, ফর্সা রঙ, মাথায় কোঁকড়ান কালো চুল, ঠোঁট দ্টো প্র্, ভুর্ জোড়া। ঝ্লফির সঙ্গে মানানসই সর্ গোঁফ তার ওপর কৌতুকভরা দ্টো চোখ। এরকম চেহারা হঠাৎ চোখে পড়ে না। একবার তাকালে যে কোন মেয়ের দ্ষ্টি এরা আকর্ষণ করতে পারে আর প্র্ষরা ইচ্ছে করে এদের এড়িয়ে যায়, হয়ত বা হিংসের জ্বালায়।

শেঠিয়ার কথা বলার ধরন অতি সহজ। মোহনচাঁদের উদ্দেশ্যে বলল, আপনার ভাগ্যকে আমি ঈর্ষা করি, এমন স্ন্দরী পি এ পেলে আমিও দেখতেন সারাদিন কাজ করছি। আর বাউণ্ডুলের মত রেসের মাঠে কিম্বা ঘোড়ার আস্তাবলে ঘ্রে বেড়াচ্ছি না।

মোহনচাঁদ মন্য়াকে জানায়, এত কম বয়েস হলে কি হবে মিঃ শেঠিয়ার সাত

আটটি দামী দামী ঘোড়া আছে, প্রায়ই দেখবে বাজী জেতে।

মনুয়া খুশী হবার ভান করে বলল, তাই নাকি? আপনার তো এদিকে খুব শখ আছে দেখছি।

শেঠিয়া হেসে উত্তর দিল, এটা ঠিক শখ নয়, এ থেকে পয়সাও রোজগার করি, একরকম ব্যবসা বলতে পারেন। আমার বাপ দাদারা পাট আর চটের ব্যবসা করে টাকা রেখে গেছে, আমি তাই খাটাচ্ছি ঘোড়ার রাজত্বে। আপনি একদিন রেস কোর্সে আসুন না।

মনুয়া উৎসাহ প্রকাশ করে, যাব একদিন।

মোহনচাঁও সায় দেয়, মিস লাহিড়ী ঠিক পারবে সকলের সঙ্গে অবাধে মিশতে পারে, কথা বলতে জানে, তোমাদের কাছ থেকে ঘোড়ার টিপস ও নিয়ে আসতে পারবে, আবার আমাকে জ্যাকপট-এর জেতা টিকিটও কিনিয়ে দিতে পারবে। শেঠিয়ার মন্তব্য, তা পারবে। মিস লাহিড়ী রেসের মাঠে তোমার বসকে ছেড়ে সারাক্ষণ আমার সঙ্গে ঘুরবে, এক সীজন-এ তোমাকে বড়লোক করে দেব।

মোহনচাঁদ এক সময় অনুযোগ করল, শেঠিয়া তোমার স্ত্রীকে নিয়ে আসা উচিত ছিল, এত ভাল মেয়ে।

—কি করব, সে জানে আপনি বিপত্নীক তাই আসতে চাইল না। নিজে ড্রিংক করে না বলে হোটেল, ক্লাব, পার্টি, এড়িয়ে চলে। অবশ্য মিস লাহিড়ী আসবেন জানলে—শেঠিয়া সকৌতুকে মনুয়ার চোখের ওপর চোখ রাখল। সঙ্গে সঙ্গে মনুয়ার ধারাল জবাব, স্ত্রী সঙ্গে থাকলে আমার সম্বন্ধে বোধ হয় এতটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পারতেন না।

—কেন?

পুরুষ মানুষরা ভারি দুষ্টু।

এ কথায় যদিও তারা তিনজনেই হাসল কিন্তু মোহনচাঁদের বুঝতে বাকি রইল না প্রথম আলাপেই এদের দুজনেরই দুজনকে পছন্দ হয়েছে। বয়েসের টান, চেহারার আকর্ষণ, তাছাড়া কথাবার্তাতেও যেন কোথায় একটা মিল আছে। অভিজ্ঞ মোহনচাঁদ এদের কথা বলার সুযোগ দিয়ে কোন এক অছিলায় টেবিল থেকে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শেঠিয়া মুখর হয়ে উঠে, মিস লাহিড়ী, এত চমৎকার তুমি ইংরিজী বল, কোথায় লেখাপড়া শিখেছ?

—কনভেন্টে।

—আশ্চর্য, সাধারণত বাঙালীর মেয়েরা তোমার মত কম বয়েসে চাকরি করে না। বিয়ের জন্যে তৈরি হয়ে বসে থাকে।

মনুয়া লঘু গলায় বলে, আমি বিয়েই করব না।

—একলা থাকবে?

—ক্ষতি কি?

—কিছু না, ওদেশে কত মেয়ে এরকম থাকে, আমাদের দেশের মেয়েদের মনের জোর নেই তাই।

মনুয়া প্রতিবাদ করে, আমার কিন্তু খুব মনের জোর।

—দেখা যাবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব কোথায়? টেলিফোন নম্বর কত? বাড়ির ঠিকানা?

মনুয়া দুষ্টুমি করে, উহুঁ বলব না।

আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না, আমি ঠিক বার করে নেব।

মোহনচাঁদ এসে পড়ায় ওদের এ আলোচনা থেমে যায়।

সে সন্ধ্যায় মোহনচাঁদ কত টাকা খরচা করেছিলেন কে জানে, প্রথমেই শ্যাম্পেনের বোতল খোলা হল। ফেনিল উচ্ছল শুভ্র তরল পদার্থ, বিশেষ করে মেয়েদের কাছে যা স্বর্গীয় সুখ এনে দেয়। আজকাল আমাদের দেশে এসব জিনিস বড় একটা দেখা যায় না। খাবারের সঙ্গে 'ওয়াইন'-এর অর্ডারও দেওয়া ছিল, মাছের সঙ্গে হোয়াইট ওয়াইন, মাংসের বেলায় রেড ওয়াইন। কফির আগে 'খমারে'—কাঁচা সোনার রং-এর যে তরল পদার্থ জ্বলতে জ্বলতে গলা বয়ে বুকে নেমে যায়। মনুয়া কোনদিনই এ ধরনের ভোজসভায় আসেনি, খাদ্য ও পানীয়ের গুণে নিজেকে তার রানীর মত মনে হল।

অন্যদিকে ক্যাবারে নাচ চলছে। একটি সুন্দরী বিদেশী তরুণী-দেহটা চাবুকের মত—বাজনার তালে তালে যেখানটা যেমন খুশি নাচাচ্ছে আর দেহ থেকে এক একটা আবরণ খুলে ফেলে নগ্নতাকে ক্রমশ প্রকাশ করছে। দর্শকদের মধ্যে শিহরন—গুঞ্জন বাহবার হাততালি।

শেঠিয়া নীচু গলায় বলল, মেয়েটার নাম সোফিয়া, ওকে আমি চিনি। নাচে ওর জুড়ি নেই।

মনুয়া একটা ভুরু উঁচু করে বলল, ওর চেয়ে আমি ভাল নাচতে পারি।

—তাই নাকি।

একদিন যে ফ্লাওয়ারে এস, দেখিয়ে দেব।

শেঠিয়া মুখ নীচু করে মনুয়ার কানে কানে বলল, তাহলেও ওই ভাবে জামা খুলতে তো পারবে না।

মনুয়ার মাথায় তখন নেশা চেপে ধরেছে, বলে ফেলল, খুলে দেখিয়ে দেব, তবে শুধু তোমার সামনে, এরকম এক ঘর লোকের সামনে নয়।

শেঠিয়া চোখ মারে, বেশ, এই কথা রইল, পরে কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভুলে যেও না।

মোহনচাঁদ ইচ্ছে করেই এদের কথাবার্তা শুনছিল না, অন্যদিকে নাচ দেখছিল, তবে নিজের ব্যবসার কথাটা বলে নিতে ভোলেনি শেঠিয়া, বড় অংকের গোটা তিনেক জ্যাকপটের জেতা টিকিট আমাকে যোগাড় করে দিও ভাই।

শেঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, মোহনচাঁদজী, একথা দু'বার আমাকে বলতে হবে না। এমন সুন্দরী পি এ কে ভিড়িয়ে দিয়েছেন, দেখবেন আপনার কত কালো টাকা সাদা করে দেব।

মোহনচাঁদ মনে মনে হাসল, বুঝল, দাওয়াই ধরেছে। সেইজন্যে খাওয়া দাওয়ার পর শেঠিয়া যখন বায়না ধরল নিজের গাড়ি করে মনুয়াকে তার

বাড়িতে ছেড়ে দেবে মোহনচাঁদ কোন আপত্তি করেনি, শুধু এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করে নিয়েছিল, মিস লাহিড়ী, তুমি ওর সংগে যেতে রাজী আছ তো?

মনুয়া সম্মতি দিয়েছে, নিশ্চয়।

শেঠিয়া তার বিরাট ওপেল গাড়ির সামনের সিটে মনুয়াকে বসিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিল। অসম্ভব জোরে চালায় গাড়ি, ডানদিক বাঁদিক কোন গ্রাহ্য করে না, যখন তখন ওভারটেক করে, লালনীল আলোর হুমকি গ্রাহ্য করতে চায় না, গাড়ি তো নয় যেন তেজী ঘোড়া, সারাক্ষণ দৌড়বার জন্যে পা ঠুকছে।

মনুয়া এক সময় মন্তব্য করল, এত জোরে গাড়ি চালাও কেন?

শেঠিয়ার উত্তর, আমি স্পীড ভালবাসি। যদি জোরেই না চলব, গরুর গাড়ি চড়া ভাল। আমি কখনও ট্রেনে চড়ি না, প্লেনে যাই। আমাদের জীবন এমনিতে এত মন্থর যে একঘেঁয়ে লাগে, তাই আমি চাই স্পীড, চাই অ্যাডভেঞ্চার, যদি তুমি চাও আমি সোজা তোমাকে নিয়ে এখন ডায়মন্ড-হারবার চলে যেতে পারি।

—সে কি এত রাত্রে?

—রাত ভাবলেই রাত। ডায়মন্ডহারবারে যাব, জলের ধারে খানিকটা পায়চারী করব, আবার গাড়ি ছুটিয়ে চলে আসব, তখনও দেখবে ভোর হয়নি।

—বাড়িতে চেঁচাবে।

—এদেশের মেয়েরা বড় ভীতু, অ্যাডভেঞ্চার ভালবাসে না।

গাড়ি হঠাৎ বাঁদিকে ঘুরতে দেখে মনুয়া জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছ?

শেঠিয়ার সহজ উত্তর, যখন ডায়মন্ড-হারবারে যাবেই না, চল আমার ফ্ল্যাটে নিয়ে যাই।

—পাগল হয়েছ, আজ বড় বেশি ড্রিংক করা হয়ে গেছে, এ অবস্থায় কিছুতেই আমি তোমার স্ত্রীর সংগে দেখা করতে পারব না।

শেঠিয়া হাসে, ও ফ্ল্যাটে কেউ থাকে না, শুধু নিজের জন্যে রেখেছি। আমার দুর্বলতা তেজী ঘোড়া আর নতুন মেয়ের ওপর। ফ্ল্যাটটা দেখে যাও, যখন খুশি আসতে পার, দরকার হলে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দেব, আমি না থাকলেও ক্ষতি নেই, বয় ফ্রেন্ডকে নিয়ে এসে 'এনজয়' করতে পার।

তবু মনুয়া আপত্তি করল, আজ অনেক রাত হয়ে গেছে।

আরে বাবা পনের মিনিটের ব্যাপার, দুজনে দুটো বড় পেগ হুইস্কি খাব, তারপর তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসব বাড়িতে।

—প্লীজ শেঠিয়া, আজ আর টিক করব না, এমনিতেই মাথাটা কিরকম ঘুরছে।

শেঠিয়া আর জোর করল না, রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে তার ফ্ল্যাটটা দেখিয়ে দিল, বলল, আমার নিমন্ত্রণ রইল, যখন খুশী আসবে। এই আমার কার্ড সংগে রেখে দাও, ঠিকানা, ফোন নম্বর সব পাবে।

আবার গাড়ি ছুটল।

মনুয়ার বাড়িতে পৌঁছে শেঠিয়া মনুয়ার হাতটা টেনে নিয়ে নরম গলায় বলল, তোমার সংগে আলাপ হওয়ায় খুব ভাল লেগেছে, আমার পছন্দ অপছন্দ জ্ঞান মারাত্মক, যাকে ভাল লাগে না তার সংগে কথাই বলি না। বিশ্বাস কর প্রথম দেখাতেই আমি তোমাকে একরকম ভালবেসে ফেলেছি।

মনুয়া না বলে পারল না, তুমি বড় অদ্ভুত কথা বল।

—কবে আবার দেখা হবে? কাল সকালে, দুপুরে, বিকেলে, রাত্রে—

—মনুয়া হাসল, আমি ফোন করব।

—ভুলে যেও না, আমি ছটফট করব ফোনের জন্যে। বাই বাই।

—বাই বাই।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে শেঠিয়া হুস করে ফিরে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে মনুয়া বুঝতে পারল শুধু তার মাথাই ঘুরছে না, পাও টলছে। এতটা পান করা তার উচিত হয়নি। দরজায় নক করারও দরকার হল না, খোলা রয়েছে। সোফায় স্বরূপ লাহিড়ী স্বয়ং বসে, বোঝা গেল মেয়ের ফেরার প্রতীক্ষা করছিল। মনুয়া ঘরে ঢুকতেই বাবার ব্যঙ্গ স্বর শুনতে পেল, এতক্ষণে ফেরবার সময় হল মেয়ের, বাকি রাতটুকু কাটিয়ে এলেই তো পারতে।

মনুয়া ছোট্ট জবাব দিল, একটু দেরি হয়ে গেছে, পার্টি ভাঙ্গল এই মাত্র।

—একজনের গাড়িতে গেলে, আর একজনের গাড়িতে ফিরলে দেখছি। মদ খেয়েছ মনে হচ্ছে, সোজা হয়ে তো দাঁড়াতে পারছ না। ছিঃ, ছিঃ,

—কি করব, চাকরি করতে গেলে ওরকম—

স্বরূপ লাহিড়ীও এতক্ষণ শুধু শুধু বসে থাকেনি, সেও পান করেছে অতিরিক্ত মাত্রায়, ঝোঁকের মাথায় বলে, চাকরি? মিথ্যে কথা বলার আর জায়গা পাওনি, ইউ আর এ ক্যাড গার্ল, টেলিফোনে ডাকলেই তোমাদের পাওয়া যায়। বড়লোকের নষ্ট ছেলেগুলো তোমাদের নিয়ে স্ফূর্তি করে।

আঃ, কি যা তা বলছ।

ঠিকই বলছি, আমার বাড়িতে থেকে এসব বেলেল্লাপনা চলবে না।

মনুয়াও রেগে জবাব দেয়, বেশ, এ বাড়ি ছেড়ে আমি চলে যাব। নিজেই ফ্ল্যাট খুঁজে নেব।

স্বরূপ লাহিড়ী ক্ষেপে যায়, কোথায়, বেশ্যা পাড়ায়?

—সে যেখানেই হোক, এই নরকে আর থাকব না। যেমনি মা, তেমনি তুমি, ছোট-বেলা থেকে আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছ তোমরা, এখন আবার শাসন করা হচ্ছে। শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে।

—খুব বড় বড় কথা শিখেছ, উঠে দাঁড়িয়ে স্বরূপ লাহিড়ী টলতে টলতে মনুয়ার দিকে এগিয়ে যায়।

মেয়ের ব্যঙ্গ প্রশ্ন, কি গায়ে হাত তুলবে নাকি? তুমি সব পার, অসভ্য জানোয়ার। মার গায়ে কম কালশিরে ফেলেছ?

বাবার গর্জন, শাট্ আপ্, আর আমি কোন কথা শুনতে চাই না, কাল সকালে তুমি এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে।

—তাই যাব।

নিজের ঘরে গিয়ে মনুয়া খাটের ওপর বসে পড়ল, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল রাত তিনটে বাজে। চেঁচামেচির ফলে নেশার ঘোর অনেকটা কেটে গেছে, অন্যদিন হলে হয়ত মনুয়া কাঁদত, কিন্তু আজ চোখে জল এল না। কিছু দিন বাদে এ বাড়ি থেকে তাকে চলে যেতেই হত, এখানকার পরিবেশ ক্রমশঃ তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। একপক্ষে ভালই হল, বিচ্ছেদের দিন ত্বরান্বিত হওয়ায়। মোহনচাঁদ তাকে নিশ্চয় সাহায্য করবে, থাকবার ব্যবস্থাও করে দেবে, নয়ত কয়েকদিনের জন্যে হোটেলে ওঠা যেতে পারে। হাতে পয়সা থাকলে কলকাতার শহরে থাকবার ভাবনা কি। মনে পড়ল বাবির কথা, ছেলেটা দার্জিলিং থেকে আর ফিরল না, এ সময় কাছে থাকলে মনুয়া আরও ভরসা পেত। রম্ভা কুমারী আর অনুভা, ওই ডাইনী দুটো ছেলেটার সর্বনাশ করেছে। তাছাড়া ছেলেটার একেবারে মনের জোর নেই, তাই পা হড়কে গেল। মনুয়া নিজে কিন্তু অনেক শক্ত। আজকের রাতের মধ্যে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে কাল সকালে বাবা ওঠার আগেই সে বাড়ি থেকে চলে যাবে। হঠাৎ মনে হল শেঠিয়ার ফ্ল্যাটের কথা, লোকটা বার বার তাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে, ক'দিন সেখানে থাকলেই বা ক্ষতি কি? হয়ত লোকে বদনাম দেবে, দিক, তাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন এরা শুধু বদনামই দিতে পারে, আর অন্য কিছু দিয়ে সাহায্য করতে পারে না।

এতরকম চিন্তা করেও ভোর রাতে মনুয়া ঘুমিয়ে পড়লো—চোখ দুটো যেন টেনে আসছিল। যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন বেলা দশটা। স্বরূপ লাহিড়ী অফিসে চলে গেছেন—মনুয়া খবর নিয়ে জানলো মাও বাড়িতে নেই বাজার করতে গেছে মার্কেটে।

কাল রাত্রে স্বরূপ লাহিড়ী যে কুৎসিত ভাষায় তাকে গালমন্দ করেছে তা মনে পড়তেই মনুয়ার ভেতরটা বিদ্রোহ করে উঠল—আর এখানে থাকা চলে না; ভালোই হয়েছে বাবা মা কেউ বাড়ি নেই—এই বেলা বিদায় নিতে হবে।

মোহনচাঁদকে জানাতে তার সাহস হল না, কারণ চাকরি নেবার সময় সে বলেছিল বাবার সঙ্গে থাকে না সেইজন্যেই গার্জেন হিসাবে খাড়া করেছিল অনাদিপ্রসাদকে: এখন আবার উল্টো কথা বলা ঠিক হবে না। একবার ভাবলো অনাদিপ্রসাদের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ করবে কি না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল লোকটা বড় ভালো মানুষ, এসব ব্যাপারে সাহায্য করতে ভয় পাবে। শেষপর্যন্ত ফোন করল শেঠিয়াকে।

—হ্যালো—আমি মনুয়া কথা বলছি।

অন্যদিক থেকে শেঠিয়ার ঘুম জড়ানো কণ্ঠস্বর কে মনুয়া?

—বাঃ কাল রাত্রে মোহনচাঁদজীর সঙ্গে—

বাস আর বলতে হল না, শেঠিয়ার উচ্ছ্বাস শোনা গেল। আরে মিস লাহিড়ী তুমি! আমি যে এতটা আশা করতে পারিনি— ও ডার্লিং তুমি আমার আকাশের তারা। তুমি আমার রাতকী রাণী। তুমি আমার—

মনুয়া থামিয়ে দিয়ে বলে। আমি বড় বিপদে পড়েছি। কাল অত রাত করে বাড়ি ফিরেছি বলে বাবা-মা রেগে গেছেন—

—কুছ পরোয়া নেই। এঞ্জেল, তুমি তৈরি থাকো আমি এখুনি আসছি। কোন সুন্দরী তরুণী বিপদে পড়েছে শুনলেই আমার 'সিভালরি' জেগে উঠে পুরোনো দিনের নাইটদের মত। সার শেঠিয়া এখুনি ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়লো বলে—হাজার হাজার চুমু নিও ডার্লিং—আমি এলাম বলে।

(ক্রমশঃ)

বিশ্ব বিজ্ঞান

আর একটি 'প্রথম' (১)

সোভিয়েত মহাকাশযান জন্ড-৫ পৃথিবী থেকে যাত্রা করে চাঁদের চারি দিকে চক্কর কেটে ও সেই সঙ্গে চান্দ্রভূমির সাধারণ ও টেলিভিশন ফটো তুলে আবার নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরে সারা দুনিয়ার মানুষকে যেমন অবাক করে দিয়েছে তেমনি মহাজগত ও গ্রহ নক্ষত্র বিজয়ের অভিযানকে যে এক নতুন অধ্যায়ে উন্নীত করেছে এ বিষয়ে ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও দলনিরপেক্ষ তথাকথিত তৃতীয় দুনিয়ার বিজ্ঞানী মহলে সবাই একমত। জন্ড-৫ চন্দ্রমুখী শূন্যচারী পোতের এই সাফল্য সোভিয়েত ইউনিয়নের ললাটে মহাকাশবিজয়ের অভিযানে আবার এ'কে দিল এক নতুন জয়টিকা, পৃথিবীতে আবার একবার 'প্রথম' বা শীর্ষস্থানে উন্নীত করে দিল। মাত্র অর্ধশতাব্দী আগে যে দেশ পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত ছিল, সমাজতন্ত্রের পথ অবলম্বন করে আজ সেই দেশ মহাজাগতিক বিজ্ঞানে অন্য সকলকে ছাড়িয়ে গেল কি করে, এটা একটা গভীর চিন্তার খোরাক সন্দেহ নেই। দুনিয়ার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ বা 'স্পুৎনিক', সর্ব প্রথম একজন মানুষবাহী মহাকাশযান ভস্তক প্রেরণ, তারপরে একজন মহিলা প্রেরণ, সর্বপ্রথম একই মহাকাশযানে ('ভশ্‌খদ্‌') একাধিক যাত্রী ও বৈজ্ঞানিক প্রেরণ, প্রথম মহাশূন্যে পদচারণা, প্রথম পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদের উপ-উপগ্রহ সৃষ্টি ও স্বয়ংচালিত যানের প্রথমে চাঁদে ও পরে শুক্রে অবতরণ, মহাশূন্যে দুটি মহাকাশযানের প্রথম পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন হওয়া, এবং জন্ড-৫ মহাকাশযানের ইতিহাসে প্রথম চাঁদের চারিদিকে আবর্তন করে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন—এতগুলি প্রথমের অধিকারী আজ সোভিয়েত ইউনিয়ন। তবে জন্ড-৫ মহাকাশযান এতদিনকার মত সোভিয়েত দেশের জমিতে না নেমে ভারত মহাসাগরের জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে কেন, তার জবাব সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকরাই দিতে সক্ষম, কারণ যানটির ভারত মহাসাগরে অবতরণ ব্যাপারটা তাঁরা বলছেন, 'পূর্ব-পরিকল্পিত'। যাই হোক সোভিয়েতের একটি জাহাজ হালে মহাকাশযানটি তুলে নিয়ে বোম্বাই-এর বিমান বন্দরে পেঁছে দিল। যানটি সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এরোপ্লেনে সোভিয়েতে চালান দেওয়া হয়েছে।

কজ্‌মস্‌-১১২ এবং কজমস-১১৩ মহাকাশ লেবরেটরী দুটির মহাশূন্যে একসঙ্গে যুক্ত হবার (উপরের ছবি) এবং আবার আলাদা হয়ে যাবার (নিচের ছবি) টেলিভিশন চিত্র

এই নিয়ে যতদূর মনে পড়ে, সোভিয়েত ও আমেরিকা থেকে সাতটি মহাব্যোমযান চাঁদের ভূমিস্পর্শ করেছে এবং দশটি স্বয়ংক্রিয় যান লুনা, সার্ভেয়ার প্রভৃতি চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে ছবিটবি তুলে পাঠিয়েছে। তার ফলে চাঁদ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান আগেকার চেয়ে অনেক বেশি বস্তুনিষ্ঠ হয়েছে, পরিবর্জিত হয়েছে বহু পুরাতন অনুমিত ধারণা ও আন্দাজ।

ভস্তক থেকে ভশ্‌খদ্‌ ও সোয়ুজ

'জন্ড-৫' মানে এর আগে জন্ড নামধারী আরো চারটি মহাশূন্য পোত তার পূর্বসূরী হিসাবে তার এই সাফল্যের রাস্তা বেঁধে দেয়। 'জন্ড' এবং কজ্‌মস—এই দুই রকমের স্বয়ংচালিত মহাকাশযান বা মহাশূন্য লেবরেটরী আছে। এ ছাড়া সোভিয়েত মানুষ যাত্রিবাহী মহাকাশযানের এ পর্যন্ত তিনটি সংস্করণ তৈরি হয়েছে—একজন যাত্রিবাহী ভস্তক ও একাধিক যাত্রিবাহী ভশ্‌খদ্‌ (এগুলি ভূমণ্ডলের মহাকর্ষের বাইরে যায় না) এবং সোয়ুজ যা শুধু একাধিক যাত্রিবাহী নয়, পৃথিবীর মহাকর্ষ ভেদ করে গ্রহ-উপগ্রহে যেতে সক্ষম যদিও সোয়ুজ প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি বলে মহাবৈমানিক কোমারফকে অকালে অপঘাত মৃত্যু বরণ করতে হয়। তবুও এর

চন্দ্র প্রদক্ষিণে লুনা-১০

ঠিক যে সেই পরীক্ষার অন্য সব 'পেপারে' সোরজ্ঞ সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়, কিন্তু 'ফেল' করে শেষ পেপারে অর্থাৎ পৃথিবীতে ধীরে ধীরে নিরাপদে অবতরণের ব্যাপারে। ফলে কোমারফের সংগৃহীত বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীও তাঁর মরদেহের সঙ্গে সঙ্গে চিতাভস্মে পরিণত হয়। যতদূর মনে হয়, কজমস্ নামধারী স্পুৎনিকগুলি পৃথিবীর মহাকর্ষ ক্ষেত্রের ভিতরে থেকে বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণ করে পাঠায় এবং জণ্ড মহাকাশযানগুলি পৃথিবীর রাজ্যের শেষ বৈমানিক সীমান্ত অতিক্রম করে চাঁদ এবং অন্যান্য গ্রহের রাজ্যে প্রবেশ করে খবরাখবর যোগাড় করে পৃথিবীতে পাঠাবার জন্য। সেইজন্য সেগুলিকে আমরা 'মহাজাগতিক স্টেশন' বা 'মহাশূন্যে লেবরেটরী' বলতে পারি। আমার এই বক্তব্যে হয়ত কিছু গলতি থাকতে পারে কারণ সব দেখেশুনে এতদূরে বসে আমার যা ধারণা হয়েছে, সেটাই এখানে লিপিবদ্ধ করলাম। এ ছাড়া উপায় নেই, কারণ এই সব বিভিন্ন ধরনের মহাকাশযানের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলির কোথাও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। যে সব লেখা জোকা আসে সেগুলির আঙ্গিক সাংবাদিকসুলভ ভাসাভাসা এবং তাতে বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর আত্মপ্রচারের প্রাধান্য। এখনো পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ যত পড়েছি, সেগুলির মধ্যে ব্রিটিশগুলি সবচেয়ে তথ্যসম্পদে সমৃদ্ধ এবং সেগুলির অধিকাংশই কোন না কোন পারদর্শী বিজ্ঞানীর লেখা বলে বৈজ্ঞানিক ভুলভ্রান্তি থাকে না এবং সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। আমাদের গরীব দেশে সংবাদপত্র বা পাক্ষিক পত্রিকায় যাঁরা নিয়মিত বিজ্ঞান সম্পর্কে লেখেন, তাঁরা কেউই পলিটেকনিক্যাল বৈজ্ঞানিকশিক্ষাপ্রাপ্ত নন বা বিজ্ঞানের সমস্ত শাখা উপশাখার ডিগ্রীধারীও নন। প্রায় প্রত্যেকেই বিজ্ঞানের যে-কোন একটি বিষয়ের পণ্ডিত (আবার এমন বৈজ্ঞানিক সংবাদদাতা বা ভাষ্যকারও আছেন, যাঁরা সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন এবং বিজ্ঞানের ধার ধারতেন না)। কিন্তু পাশ্চাত্যের নামকরা পত্রিকাগুলিতে বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিশেষজ্ঞ রাখা হয়, আমাদের দেশে সে রেওয়াজ আজও চালু হয় নি, সব বিষয়েই লিখতে হয় একজনকে। সুতরাং যিনি আদার ব্যাপারী তিনি জাহাজেরও খবর রাখতে বাধ্য হন। ফলে অবস্থাটা দাঁড়ায় সংস্কৃত ভাষায় বললে অনেকটা "অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী"র মত। Jack of all trade কি কখনো master of all হতে পারেন? কাজে কাজেই তাঁদের লেখায় ভুলভ্রান্তি কিছু কিছু ঘটতে বাধ্য। সেই ভুলভ্রান্তি এড়াবার একমাত্র উপায় হচ্ছে বিশেষজ্ঞ ও প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের রচনা, নিজের প্রবন্ধের মূল উৎস হিসাবে ব্যবহার করা। ঠিক এই দিক থেকে ব্রিটিশ (এবং কিছুটা জার্মানও বটে) বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি অদ্বিতীয় ও নির্ভরযোগ্য। সেগুলির মধ্যে আত্মপ্রচার থাকলেও তার মাত্রা খুব কম; তথ্যের মাত্রাই বেশি।

জণ্ড্-১ থেকে জণ্ড্-৫

জণ্ড্-৫ মহাকাশযান যে মহাজগৎ বিজয় ও গ্রহ-গ্রহান্তরে যাতায়াত সংক্রান্ত বিজ্ঞান ও যন্ত্রকৌশলের ক্ষেত্রে এক নতুন সমস্যার সমাধান করেছে তাতে সন্দেহ নেই। তার উপর এই সাফল্য চেকোস্লোভাকিয়ার সশস্ত্র হস্তক্ষেপের কলঙ্ক আপাতত কিছুটা ধামাচাপাও দিতে পারে। রাজনীতি আমার আলোচ্য নয় বলে এই প্রসঙ্গটি সম্পর্কে আর কিছু বলতে চাই না। মহাশূন্যে স্বয়ংচালিত স্টেশন বা লেবরেটরী পাঠিয়ে সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহগুলির বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য ওই সব স্টেশন ও লেবরেটরীতে সংগ্রহ ও 'রেকর্ড' করে সেগুলি পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার পথ খুলে দিল জণ্ড্-৫। সেই সব তথ্য বিচার বিশ্লেষণ করে দেখে, সেগুলির রহস্যের মর্মোদ্ধার করে তবে কোন মানুষকে কোন গ্রহ বা উপগ্রহের রাজ্যে পাঠানো এবং তাকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার নিখুঁত ব্যবস্থা করা যাবে, কারণ মানুষের সেখানে যাওয়ার পথে এখনো অনেক গুরুতর সমস্যা আছে যেগুলির সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কাউকে সেখানে পাঠানো উচিত হবে না। জণ্ড্-৫ মহাকাশযানের সাফল্যের পর সারা দুনিয়ায় "এবার মানুষকে চাঁদে পাঠানো হবে" বলে যে রব উঠেছে তা জ্ঞানের অভাব ও অত্যুৎসাহের পরিচয়। কেন একথা বলছি, সেটা প্রবন্ধের শেষের দিকে আলোচনা করব।

জণ্ড্-১ মহাশূন্য স্টেশন পৃথিবী থেকে যাত্রা করে ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে। জণ্ড্-২এর যাত্রাকাল ওই সালেরই নভেম্বর। এই দুটির কি কার্যসূচী ছিল তা মনে পড়ছে না। জণ্ড-৩ পৃথিবী ত্যাগ করে ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে। ১৯৫৯ সালের অক্টোবরে লুনা-৩ চাঁদের পিছন দিকের আংশিক ফটো তুলে টেলিভিশনে পৃথিবীতে পাঠায়। কিন্তু চাঁদের পশ্চাদ্ভাগের যে অংশটির ফটো লুনা-৩ তোলেনি, সেটির আলোকচিত্র গ্রহণ করে পৃথিবীতে পাঠায় জণ্ড-৩। ১৯৬৬ সালেই লুনা-৯ ধীরে ধীরে প্যারাসুটে ঝুলে ভাসতে ভাসতে চাঁদে গিয়ে নামে এবং চন্দ্রপৃষ্ঠের এক ধারাবাহিক টেলিভিশন চিত্র তুলে পাঠায় এবং লুনা-১০ মে মাসের শেষে চান্দ্র-শিলার গামা-রশ্মির বর্ণচ্ছত্রের ছবি নিয়ে প্রমাণ করে যে চাঁদের উপর অবস্থিত পাথরগুলি চরিত্রে পৃথিবীর কৃষ্ণ আগ্নেয় (Basalt) শিলার সমতুল্য। এই ধারণা আবার সত্য প্রমাণিত করে মার্কিন মহাকাশযান "সার্ভেয়ার-৫" ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। লুনা-১০ ১৯৬৬ সালেই চন্দ্র প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীর এই উপগ্রহটির অভিকর্ষ ক্ষেত্র ও বিকিরণ ধর্ম পরীক্ষানিরীক্ষা করে। জণ্ড-৪ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করে ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে অর্থাৎ, গত মার্চে। যতদূর মনে পড়ে, সেটি মহাকাশের পৃথিবীর নিকটবর্তী অংশের দূর-সীমান্ত অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক তথ্য চয়নের ও প্রেরণের জন্য পাঠানো হয়েছিল পৃথিবী ও সেই সীমান্তের মধ্যবর্তী কোন স্পুৎনিকের কক্ষপথ থেকে পূর্ব-নির্ধারিত এক গতি পথ বা বিক্ষেপমার্গে (trajectory) পরিক্রমা করার জন্য।

জণ্ড-৫ মহাকাশযান চন্দ্র প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীতে ফিরে এল এবং এই সাফল্য যে প্রথমে মানুষের মহাকাশযানে চন্দ্র প্রদক্ষিণের সূচনা করেছে তা অনস্বীকার্য। পৃথিবী থেকে চাঁদের মহাশূন্য রাজ্যে যাতায়াত করতে তার লাগল এক সপ্তাহ। যানটি যাত্রা করেছিল গত ১৫ই সেপ্টেম্বর। তারপর ভূকেন্দ্রিক কক্ষপথ থেকে তাকে

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রকৌশলে চাঁদের দিকে পাঠানো হয়। আমাদের মনে আছে সোভিয়েতের প্রথম শুক্রগামী যানটি মহাকাশে এক স্পুৎনিক থেকে শুক্রের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। জণ্ড-৫এর ক্ষেত্রে সেই কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল কি না, সে সম্পর্কে কোন খবর বার হয়নি।

জণ্ড-৫এর সাফল্যের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। তার আগে কোন মহাকাশ-যান দ্বিতীয় মহাজাগতিক বেগে এত বৈজ্ঞানিক তথ্য নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মহাজাগতিক বেগ তিন রকমের:—(১) **প্রথম মহাজাগতিক বেগ বা প্রদক্ষিণ** (circulation) **বেগ** যা হচ্ছে সেকেণ্ডে ৭·৯ কিলোমিটার। এই বেগে **পৃথিবীর মহাকর্ষের বাইরে যাওয়া যায় না** এবং যে যানটি এই বেগে যাবে সেটি হয়ে যাবে পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ।

(২) **দ্বিতীয় বা অধিবৃত্তাকার মহাজাগতিক বেগ**—এটি হচ্ছে সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটার অর্থাৎ ঘণ্টায় ৪০ হাজার কিলোমিটার। প্রথম বেগটি এর ৫/৭ ভাগ অর্থাৎ ঘণ্টায় ২৮৭৫১ ৩/১০ কিলোমিটার। এই বেগে যে মহাকাশযান যাবে সে **পৃথিবীর মহাকর্ষ জয় করে চাঁদ বা অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের দিকে চলে যাবে।**

(৩) **তৃতীয় বা মহাজাগতিক মুক্তি** (liberation) **বেগ**—এটি সেকেণ্ডে ১৬·২ কিলোমিটার অর্থাৎ ঘণ্টায় ৫৪০২০ কিলোমিটার। এই বেগে যে মহাজগতিক জাহাজ যাবে সে **সৌরজগতের মহাকর্ষ ভেদ করে অন্য নক্ষত্রের রাজ্যে চলে যেতে পারবে।**

দ্বিতীয় মহাজাগতিক বেগে বা সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটার বেগে ভূপতিত হওয়া এক সাংঘাতিক ব্যাপার। সম্ভবত সেই জন্যই জণ্ড-৫কে সমুদ্রের জলে নামানো হয়। পূর্বনির্ধারিত কার্যক্রম অনুসারে ১৭ই সেপ্টেম্বর মস্কোসময় ভোর ৬টা ১১ মিনিটে মহাশূন্য পোতটির গতিপথ সংশোধন করে এবং মহাশূন্যে তার দিক্‌ সম্পর্কিত অবস্থা Orientation এবং ঠিকমত মোড় নেওয়ার ব্যবস্থা করার পর তার আর একটি প্রচালনযন্ত্র স্বয়ংক্রিয় সুইচের দ্বারা চালিয়ে দেওয়া হয়। ফলে নতুন অভিঘাত-বল লাভ করে বা সোজা কথা নতুন একটা ধাক্কার জোরে মহাজাগতিক স্টেশনটি একটা মোড় নিয়ে নতুন এক গতিপথে এগিয়ে যেতে আরম্ভ করে যা চলে গিয়েছে মহাশূন্যের ভিতরে একেবারে চাঁদের রাজ্যে। চাঁদের চারি পাশের বহিরাকাশের চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও বাস্তব অবস্থা পরীক্ষা করা এটাই ছিল তার লক্ষ্য।

১৮ই সেপ্টেম্বর স্টেশনটি চাঁদকে যখন প্রদক্ষিণ করে তখন চাঁদ থেকে তার দূরত্ব ছিল ১৯৫০ কিলোমিটার। সব সময় পৃথিবীর সঙ্গে স্টেশনটির বেতার যোগাযোগ ছিল এবং ভিতরের সরঞ্জাম নিয়মিত পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক তথ্য 'রীলে' করে পাঠাতে থাকে। কোথাও কোন কলকব্জা বিগড়ে যায়নি এবং স্টেশনের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা পূর্ব-নির্ধারিত সীমার বাইরে যায়নি।

মস্কো সময় অপরাহ্ন ৬টা ৫৪ মিনিটে (২১শে সেপ্টেম্বর), জণ্ড-৫ আবার পৃথিবীর আবহমণ্ডলে ফিরে আসে দ্বিতীয় মহাজাগতিক বেগে (সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটার) কারণ বেগ তার চেয়ে কম হলে সেটি হয়ত পৃথিবীতে না ফিরে স্পুৎনিকের মত কৃত্রিম উপগ্রহ হয়ে পৃথিবীর চারদিকে চক্কর দিতে থাকত। শেষে সেটি ভারত মহাসাগরের পূর্ব-নির্দিষ্ট এলাকায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মস্কো-সময় সন্ধ্যা ৭টা ৮ মিনিটে। যে জায়গাটিতে জণ্ড-৫ এসে নামে তা ৩২ ডিগ্রী ৩৬ মিনিট দক্ষিণ দ্রাঘিমা এবং ৬৫ ডিগ্রী, ৩৫ মিনিট পূর্ব অক্ষরেখার সংযোগস্থল।

আবহমণ্ডলে বায়ু বেগের গতিরোধক অংশটির মধ্যে দিয়ে যাবার সময় মহাকাশ-যানটি ক্ষেপণাস্ত্রের মত গতিপথে যেতে থাকে। আবহমণ্ডলের সেই গতিরোধক অংশটি পার হবার পর জণ্ড-৫ থেকে একটি প্যারাস্যুট খুলে যায় যেটি তাকে ধীরে ধীরে সমুদ্রে নামিয়ে দেয়। ২২শে সেপ্টেম্বর জাহাজে করে সেটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

বিনাকা ফ্লোরাইড দিয়ে ক্ষয় রোধ করে আপনার দাঁত শক্ত করে তুলুন!

দাঁত ক্ষয়ে যায় কেন?

খাওয়ার পর আপনার দাঁতে খাবারের যে ছোট ছোট টুকরো আটকে থাকে তা অ্যাসিডে পরিণত হয় যা দাঁতের রক্ষাপ্রদ এনামেলকে দুর্বল করে তোলে। ফলে দাঁতের তাজা টিস্যুগুলো ক্ষয়কারী বীজাণুদের দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হয়। আর ক্ষয় মানেই যন্ত্রণাদায়ক ফাঁক (কেরীজ), যাতে দাঁত পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কী করা দরকার?

ফ্লোরাইড দিয়ে দাঁতের এনামেল দৃঢ় করে তুলুন। ফ্লোরাইড এনামেলের সঙ্গে একহয়ে ক্ষয় ও অ্যাসিড রোধ করবার জন্য তা আরও দৃঢ় করে তোলে।

কেমন করে তা করতে হবে?

সক্রিয় ফ্লোরাইড কম্পাউণ্ড সোডিয়াম মোনাফ্লোরোফোসফেট যুক্ত একমাত্র টুথপেস্ট বিনাকা ফ্লোরাইড দিয়ে দাঁত মাজুন আর মাঝে মাঝে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার জন্যে আপনার ডেন্টিস্টের কছে যান। বিনাকা ফ্লোরাইড দিয়ে মেজে আপনার দাঁত অতিরিক্ত দৃঢ়তা সঞ্চারিত করে দিন—এই টুথপেস্ট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে বিশেষভাবে উপকারী।

CIBA Cosmetics

Binaca Fluoride toothpaste

প্রত্যেক টিউবের সাথে সুন্দর পুরস্কার

লক্ষ্মীর কৃপালাভঃ বাঙালীর সাধনা

সাধনী (স্মল টুলস) তৈরির কারখানা

Homo Sapiens—চিন্তাশীল মানুষ অর্থাৎ বস্তুবিচারের বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষ, পৃথিবীতে ঠিক করে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেটা পণ্ডিতেরাও চকাক্ষ করে বলতে পারেন না। মনে হয় লাখ পাঁচেক বছর আগে ন্যাজ বা লাঙ্গুলহীন বানরজাতির কোনো কোনো অংশ বিবর্তনের ধারায় উপ-মানবের রূপ নিয়েছিল। সোজা শিরদাঁড়া, পুরু মাথার খুলি আর এক বিন্দু মেধা নিয়ে সেই উলঙ্গ বানরমূর্তি 'near-men' বা পাইথেকানথ্রোপ জীবনধারণ ও আত্মরক্ষার জন্য বানরসুলভ নখদন্ত ব্যবহার বর্জন করে পাথর ভেঙে কুঠারের মতো হাতিয়ার তৈরি করলো। সে হাতিয়ারের হাতল ছিল না; কারণ সেই বনমানুষের যেটুকু জ্ঞানের উন্মেষ হয়েছিল তা দিয়ে বেশি কিছু উদ্ভাবনের সামর্থ্য তার ছিল না। সেই হাতল-বিহীন পাথরের কুঠারই উদ্‌ভ্রান্ত আদিম যুগের প্রথমতম tool বা হাতিয়ার। প্রত্নতাত্ত্বিক আর নৃতাত্ত্বিকরা চীন দেশে 'দি পিকিং ম্যান'-এর এবং যবদ্বীপে 'দি জাভা ম্যান'-এর এই আদি কারিগরীর নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন। (কী বিচিত্র এই চীন দেশ, কী বিবর্তন। পিকিং ম্যান থেকে মাওৎসেতুং—ভাবলেও অবাক হতে হয়।)

আমাদের ভারতবর্ষ, তথা বাংলা দেশও কম যায় না। বাঁকুড়ায় শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে গন্ধেশ্বরী নদীর শুষ্ক বক্ষ সংলগ্ন ভূমিতে প্রত্নপ্রস্তর যুগের (old stone Age-এর) যে-সব পাথরের কাটারি-কুঠার আবিষ্কৃত হয়েছে সে সমস্তও লক্ষাধিক বছরের পুরনো বলে পণ্ডিতরা অনুমান করেন।

তারপর এলেন 'the Dawn People' 'ঊষার মানব'—প্রায় পাইথেক্যানথ্রোপের মতো ছোট মাথার পুরু খুলিতে আরও কয়েক বিন্দু মস্তিষ্ক নিয়ে তাঁদের আবির্ভাব হলো। অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক জন্তু জানোয়ারের এবং ভিন্ন গোষ্ঠীর আদি মানবের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা, আহার্যের জন্য শিকার আর গুহার দেয়ালে চিত্রকলার জন্য তাঁরা near-men এর মোটা হাতিয়ারের চাইতে কিছুটা উন্নত ধরনের অস্ত্র আর যন্ত্র সেই পাথর ভেঙেই করলেন।

মানবজাতির ব্রাহ্মমুহূর্তের এইসব আবিষ্কারের আনুমানিক কালও নির্ণীত হয়েছে। কাল—আড়াই লক্ষ বছর আগে, প্রথম ও দ্বিতীয় তুষার যুগের অন্তর্বর্তী গ্রীষ্মকাল। স্থান—পৃথিবীর নানা অঞ্চল।

'নিয়ানডার্থাল' মানবের উৎপত্তি হয়েছিল বর্তমান জার্মেনীর রাইন নদের অববাহিকায়। মাথায় তাঁদের ঘিলুর ওজন আরও একটু বেড়েছিল। কত হবে, এক কাচ্চা? তাই দিয়ে তাঁরা আরেকটু ভালো করে যন্ত্রপাতি তৈরি করলেন।

অতঃপর, মানে হাজার বিশেক বছর আগে, ক্রোমানিয়ন (Cromagnon) মানবজাতি জন্ম নিলেন। চেহারা, বুদ্ধি আর স্বভাবগুণে তাঁরাই আমাদের নিকটতম বলে কেউ কেউ বলেন; আবার একদল নৃতাত্ত্বিক বলেন যে ক্রোমানিয়নরা ছিলেন পশমী চুল-অলা negroid শ্রেণীর। আফ্রিকা, আন্দামান (উলঙ্গ জারোয়া আর অর্ধোলঙ্গ ওংগে অধ্যুষিত) এবং অস্ট্রেলীয় ও নিউ-গিনির (মেলানেশিয়ান) আদি মানবরা এই ক্রোমানিয়ন কুলের বংশধর কিনা তা পণ্ডিতেরা বলতে পারবেন। দক্ষিণ আমেরিকাতেও এখনো কিছু কিছু আদিমানব আছেন যাঁরা লজ্জানিবারণের কথা আদৌ ভাবেন না। বন্যপশুর জন্য সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মতো সেই সব আদি-মানবের বংশধরদের কোনো কোনো গোষ্ঠীর বসতি বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। নৃতাত্ত্বিকদের পর্যবেক্ষণ ছাড়া আর কোনোরকমে তাঁদের জ্বালাতন করা হয় না। দক্ষিণ আমেরিকার এই আদিম জাতির নারীরা সুন্দরী ও সুদেহী। আজকের সভ্যজগতের উঠতি রেওয়াজ top-less কে হার মানিয়ে এরা সম্পূর্ণ নগ্নিকা; কিন্তু সেই নগ্নতার ইতরতার লেশমাত্র নেই।

ক্রোমানিয়ন মানুষেই বোধ হয় ফ্লিন্ট অর্থাৎ চকমকি পাথরের ব্যবহার করলেন সর্বপ্রথম অস্ত্র ও হাতিয়ার তৈরি আর আগুন জ্বালানোর কাজে।

তারপরে, হাজার আষ্টেক বছর আগে নব-প্রস্তরযুগে (New Stone Age-এ) পাথরের আরও সব 'স্মল টুলস্' চালু হলো। সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস হলো অতীতের 'শাম্'। সেখানকার প্রাচীন সভ্যতার অপূর্ব এক নিদর্শন হচ্ছে আমার ফোল্সা বন্দনার প্রিয় শামি কাবাব।) মাসখানেক আগে দামাস্কাসের কাছে 'তেল রামাদ' নামে এক পাহাড়ী জায়গায় সাত আট হাজার বছরের পুরনো প্রাগৈতিহাসিক মানবের এক বসতির ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া গেছে। ফরাসী আবিষ্কারক Henri de Contenson বলেছেন যে, তেল-রামাদের মানুষ স্থাপত্য ও যন্ত্রপাতির প্রবর্তনে সে যুগের চরম উৎকর্ষে উপনীত হয়েছিল।

ছ' হাজার বছর আগে মেসোপটেমিয়ার আদম ও হবা-র (Adam and Eve-এর) ইডেন উদ্যানের কাছাকাছি তামা ধাতুটি আবিষ্কৃত হয়েছিল। তামার সঙ্গে সীসে ও টিন মিশিয়ে তৈরি হলো ব্রোঞ্জ (bronze)। এই সময়েই মনে হয়, হাতিয়ার নির্মাণে ধাতুর ব্যবহার হলো সর্বপ্রথম। প্রত্নতাত্ত্বিকরা সে কালটির নাম দিয়েছিলেন Bronze Age। সে যুগের কুশলী যাযাবর শিল্পীরা দেশে দেশে ঘুরে ধাতুর হাতিয়ার তৈরি করে দিয়ে আসতেন। সব দেশেই তাঁদের সমান আদর ছিল। কোনো দেশের স্থানীয় লোক সেই ওস্তাদদের নেকনজরে পড়লে ওস্তাদরা তাঁদের গুপ্ত মন্ত্র এই পেটোয়া লোকদের শিখিয়ে দিয়ে যেতেন—খানিকটা রামপুরের উজীর খাঁ সাহেবের কুমিল্লার আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবকে সঙ্গীত

শিক্ষা দেবার মতো, অনাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও।

কিন্তু পাথর তামা ব্রোঞ্জকে হারিয়ে দিল তিন হাজার বছর আগেকার লোহা আবিষ্কার। তারপরে এলো ঢালাই-লোহা, ইস্পাত, হাইস্পীড স্পেশাল স্টীল, কত কি! আমরা এখনও লোহযুগেই আছি। (কেবল ধাতুটির জন্যেই নয়, হিটলার, সার্থকনামা স্ট্যালিন, এস, কে, পাতিল, অতুল্য ঘোষ প্রমুখ লৌহমানবদের জন্যেও; মোরারজীভাইও আছেন, তবে তিনি কোন জাতের লোহা সেটা আমরা ইতরজনেরা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।)

বাংলা দেশে নব-প্রস্তরযুগের পাথরের হাতিয়ার আবিষ্কারের উদাহরণ হলো অজয় নদের তীরে 'পাণ্ডুরাজার ঢিবি' আর আমাদের অজয় মুখুজ্যে মশায়ের দেশ মেদিনীপুরে পাওয়া পাথরের যন্ত্রপাতি। এই কালচারের নাম হয়েছে 'চাপাখাল বা চম্পাখাল সভ্যতা', সম্ভবত যার পরিণতি হয়েছিল তাম্রলিপ্তে অর্থাৎ অজয়বাবুর গত নির্বাচনকেন্দ্রদ্বয়ের অন্যতম বর্তমান তমলুকে।

আজকের মানুষ তার সুমহৎ এবং ভয়ংকর মনীষায় যান্ত্রিকতার চরমে পৌঁছেছে। একদিকে ইঞ্চির ১০০০০ ভাগের এক ভাগ মাপের সূক্ষ্মতা বজায় রেখে জগতের হিতে যন্ত্রাংশ তৈরি করছে, আবার অন্যদিকে অশুভ ডেকে আনছে মহাপ্রলয় ঘটাবার ক্ষমতাযুক্ত মারণাস্ত্র নির্মাণ করে।

এত সব তত্ত্বকথা আমি ভাবছিলাম STM অর্থাৎ 'স্মল টুলস্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের' ভি-আই-পি রোড মাণিকতলার কারখানা পরিদর্শনের সময়ে। স্ট্রীম্‌লাইনড্ গ্রাইণ্ডিং মেশিনের কার্বোরেণ্ডাম্ পাথরের চাকায় নির্মীয়মান যন্ত্রপাতির সংঘর্ষে উড়ন্ত আগুনের ফুলকি আমাকে আদিমানুষের চকমকি পাথরের কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছিল; আর আমি আমার ভীষণ অল্প-বিদ্যা দিয়ে ভূমিকাতেই আপনাদের পেছু হটিয়ে নিয়ে গেলাম সৃষ্টির আরম্ভযুগের স্তম্ভিত অন্ধকারের দিকে।

কলকাতায় একটি পুরনো বাঙালী প্রতিষ্ঠান আছে। তার নাম 'অ্যাংগাস্ কীথ্ অ্যাণ্ড কোং'। এই শতকের গোড়ার দিকে এটির মালিক ছিলেন দুজন স্কটল্যাণ্ডের বণিক। তাঁদের ব্যবসা ছিল জুট মিলের স্টোর্স সাপ্লাই। সে কালে বাংলা দেশের অধিকাংশ পাটকলেরই মালিক ছিলেন স্কচ্। স্কচরা খুব স্বজাতিবৎসল। অতএব দেশের লোকের পৃষ্ঠপোষকতায় অ্যাংগাস কীথ-এর ব্যবসা বেশ ভালোই ছিল।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধবার পর দেশপ্রেমিক অ্যাংগাস আর কীথ সাহেব স্বদেশের হয়ে লড়াই করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানটি বিক্রি করে চলে যাওয়া স্থির করলেন। তাঁদের এক পুরনো বাঙালী কর্মচারী স্বর্গীয় প্রকাশচন্দ্র দত্ত তখন টাকার যোগাড় করে কোম্পানীটা কিনে নিলেন।

প্রকাশবাবুর ছোট ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স তখন বছর চব্বিশ। তিনি বছর দুই আগে 'অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল সেণ্ট্রাল রেভিনিউ' এর অফিসের সরকারী চাকরিতে ঢুকেছিলেন। যুদ্ধের বাজারে পরিশ্রমী প্রকাশচন্দ্রের পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা যখন বেশ বেড়ে গেল তখন একার পক্ষে কাজ সামলানো কঠিন হয়ে পড়লো বলে, ১৯১৬ সালে প্রকাশচন্দ্র ছোট ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথকেও চাকরি ছাড়তে রাজী করিয়ে অ্যাংগাস কীথে টেনে নিলেন।

দুই ভাই ব্যবসা আরও বাড়ালেন। জুট মিলের সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াও অ্যাংগাস-কীথ তখন থেকে রেঞ্চ-হাতুড়ি, ডাই-স্টক প্রভৃতি স্মল টুলস্ আমদানি করতে লাগলেন। এটা তাঁদের একটা নতুন লাইন হলো।

১৯৩৬ সালে প্রকাশচন্দ্রের মৃত্যুর পর দ্বিজেন্দ্রনাথই অ্যাংগাস-কীথের কর্ণধার হলেন। বিশ বছর ধরে স্মল টুলস্ ঘেঁটে ঘেঁটে দ্বিজেনবাবু তখন পাকা লোক হয়ে উঠেছেন; আর মনে জেগেছে তাঁর আর একটি বাসনা—আমদানির ওপর নির্ভর না করে একটা যন্ত্রনির্মাণের কারখানা খোলার আগ্রহ। কিন্তু বৃটিশ আমলে তার সম্ভাবনা প্রায় ছিলই না বলে তাঁর ইচ্ছেটা মনে মনেই রয়ে গেল। দেশ স্বাধীন হবার পরে দ্বিজেন্দ্রবাবু নতুন উদ্যমে এতদিনের চেপে রাখা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি 'স্মল

টুলস্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং অব ইণ্ডিয়া' নামে একটি লিমিটেড কোম্পানীর স্থাপনা করে কাজ শুরু করে দিলেন।

আটাত্তর বৎসর বয়স্ক প্রবীণ দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বর্তমান পরিচালকদের সমস্যা সমাধানে মাঝে মাঝে পরামর্শ দেওয়া ছাড়া আজ আর আইনত এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নেই। কিন্তু বাঙালীর কর্তৃত্বে বাংলা দেশের এক বিশিষ্ট 'স্মল টুলস্'-এর ফ্যাক্টরীর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে এই শিল্পোদ্যোগের ইতিহাসে তাঁর নাম সসম্মানে লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। তিনি স্মল টুলস্ বিষয়ে বাঙালী কির্লোস্কার। আমার আজকের প্রবন্ধের আখ্যানভাগে সেইজন্যে তাঁর কথাই প্রথমে লিখলাম।

প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসটা আমাকে বলতে শুরু করেছিলেন STM-এর টেকনিক্যাল ডিরেক্টর শ্রীদেবপ্রসাদ রায়। ইনি কলকাতার বি এস সি এবং শিবপুরের মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ার। ১৯৪৮ থেকে ৫০ সাল পর্যন্ত দু বছর ম্যাঞ্চেস্টারের 'ইংলিশ স্টীল' ও 'লেমন আর্চার অ্যান্ড লেন' এবং সুইজারল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ Reishauer Tool Works-এ দেবপ্রসাদ যন্ত্রবিদ্যায় উঁচু ধরনের তালিম নিয়ে এসেছিলেন। বিলেত যাবার আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দেবপ্রসাদ কিছুদিন বাংলা সরকারের স্টেট ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টেও কাজ করেছিলেন।

তখন মোটরের পেট্রলের খুব অভাব পড়েছিল বলে সরকার পেট্রল রেশনিং করেন। বড়ো বড়ো গাড়ি পিছু মাসে ১২ গ্যালন (৫০ লিটার আন্দাজ) পেট্রল পাওয়া যেতো; সেইসব গাড়ির পক্ষে ওই ১২ গ্যালন ছিল ৩।৪ দিনের খোরাক। অনেক ধনীলোক এবং বড়ো সরকারী অফিসার তখন গাড়ি গ্যারাজে তুলে রেখে সাইকেল বা ট্রামে বাসে চলাফেরা করতেন। 'সেনর্যালের' স্বর্গীয় সুধীর সেন মশায় তাঁর ৫০।৫২ বছর বয়সেও যে সেদিন সাইকেল করে দিনে ১৩।১৪ মাইল যাতায়াত করতেন সে কাহিনী আপনাদের আমি ইতিপূর্বে শুনিয়েছি। লোকসভার কমিউনিস্ট সদস্য শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্ত মশায়ের দাদা, তখনকার নামজাদা সিভিলিয়ান রণজিৎ গুপ্ত, আই সি এস, মহাশয়কেও আমি প্রায়ই দেখতাম রাইটার্স বিল্ডিং থেকে বিকেলবেলা সাইকেলে করে ফিরছেন রেড রোড ধরে। তাই বলে ভাববেন না যে কলকাতার পথ চলা নিরাপদ ছিল। অসংখ্য মিলিটারি গাড়ি আর লরির তীব্র বেগে শহরে দৌড়ে বেড়ানোর জন্যে এখনকার চাইতে তখন রাস্তাঘাট বেশি বিপদজনক ছিল।

সেই সময়ে পেট্রলের বদলে মোটরকার চালাবার এক বিকল্প ব্যবস্থা হলো। গাড়ির পেছনে কাঠকয়লার চুল্লি বসিয়ে তার গ্যাসে মোটরের এঞ্জিন চালানো হতো। তাকে বলা হতো Producer Gas Plant। বেশ চলতো গাড়িগুলো এই গ্যাসে। দুম্বা ভেড়ার অতিরিক্ত মাংসপিণ্ডের মতো পশ্চাতে এই প্রোডিউসার গ্যাসের বাক্স বয়ে বয়ে কলকাতায় তখন অনেক গাড়ি বাস আর লরি ছুটে বেড়াতে শুরু করলো।

এই প্রোডিউসার গ্যাস প্ল্যান্টের কথা, একটু অবান্তর হলেও, এখানে উল্লেখ করার কারণ আছে। কলকাতায় তিনটি প্রতিষ্ঠান এই কলটি তৈরি করতেন। তার মধ্যে দুটিই ছিল বাঙালীর। একটি হলো কংগ্রেস নেতা খগেন দাশগুপ্ত মশায়ের 'ইন্দো-সুইস ট্রেডিং কোম্পানী'; আরেকটি স্বর্গীয় জে আর ঘোষ মশায়ের 'আইডিয়্যাল গ্যাস প্লান্ট', যাতে আর্থিক সহযোগিতা করেছিলেন বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক জ্ঞানপ্রকাশ এবং যশস্বী অভিনেতা চারুপ্রকাশ ঘোষ মহাশয়েরা চার ভাই। তাঁদের প্রাচীন প্রতিষ্ঠান 'রেডিও সাপ্লাই স্টোর্স' আইডিয়্যালের সোল ডিস্ট্রিবিউটর ছিলেন। বাঙালীর মাথায় চিরকালই যে কত কিছু খেলে এসেছে তারই এক অভিব্যক্তি এটা।

দেবপ্রসাদের ওপর লরি আর বাসে ব্যবহৃত গ্যাস-প্লান্ট সরকারীভাবে পরীক্ষা করে ছাড়পত্র দেবার ভার ছিল।

দ্বিজেন দত্ত ছিলেন দেবপ্রসাদের পিতৃবন্ধু। আটচল্লিশ সালে দ্বিজেনবাবু বন্ধুপুত্রকে STM-এ নিলেন এবং তার অল্প পরেই দেবপ্রসাদ স্মল টুলস্ বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত গেলেন। তাঁর জ্ঞান ও অধ্যবসায়ের জন্যেই তিনি আজ STM-এর উৎপাদন বিভাগের কর্তা। তাঁর সঙ্গে আছেন ওয়ার্কস ম্যানেজার শ্রীপ্রভাস মিত্র এবং প্রোডাকশন ম্যানেজার শ্রীহিমাংশু ব্যানার্জি। প্রভাসবাবু শিবপুরের মেটালার্জি (ধাতুবিদ্যা) বিষয়ে স্নাতক এবং ইংলণ্ড, জার্মেনী ও সুইজারল্যাণ্ডে স্মল টুলস্ বিষয়ে শিখে এসেছেন। আর হিমাংশুবাবু সরকারী অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে এইসব tools নির্মাণে হাত পাকিয়ে এখানে এসেছিলেন। উপরন্তু তিনি মেরিন এঞ্জিনীয়ার হিসেবে কয়েক বছর জাহাজেও কাজ করেছিলেন।

১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে বিদেশ থেকে সামান্য কয়েকটা মেশিন আনিয়ে দ্বিজেনবাবু কাজ আরম্ভ করলেন। সেই বছরেই এক মণিকাঞ্চন যোগ হলো। আমাদের মাননীয় ইলা পালচৌধুরী, এম পি, মহোদয়ার পরলোকগত স্বামী অময় পালচৌধুরী মহাশয় STM-এর অনেক শেয়ার কিনে ডিরেক্টর হিসেবে যোগ দিলেন। সঙ্গে তাঁর ছোট ভাই শ্রীরণজিৎ পালচৌধুরীও যোগ দিলেন।

রাণাঘাটের পালচৌধুরী বংশের বিশদ

পরিচয় বাঙালী পাঠকের কাছে নিষ্প্রয়োজন, কারণ ইলা দেবীর পরিচিতির মাধ্যমে তার বহুল প্রচার হয়ে গেছে। ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙালী চা-করদের মধ্যে এঁদের বিশিষ্ট আসন। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং-এর পথে পা বাড়ালেই ছোট গাড়ির রেল লাইন আর মোটরের রাস্তার ডানহাতি, সকলের চোখে-পড়া মোহরগং চা-বাগিচাটি, তার সংলগ্ন গুলমা বাগান এবং ডুয়ার্সের ওয়াশাবাড়ি বাগিচা পালচৌধুরীদের পারিবারিক সম্পত্তি। তিনটির মোট আয়তন ২৩০০ একর অর্থাৎ প্রায় ৭০০০ বিঘা।

STM-এর পরিচালনায় এই পালচৌধুরীরাই হলেন দ্বিজেনবাবুর উত্তরসাধক। এখন স্মল টুলস্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড এর ৮২ পারসেণ্ট শেয়ারেরই মালিক এঁরা। ব্যক্তিগত কারণে দ্বিজেনবাবু বাহান্নো সালে STM-এর শেয়ার পালচৌধুরীদের কাছে বিক্রি করে কেবল তাঁর 'অ্যাংগাস কীর্থ' নিয়েই রইলেন।

এমনিতেই STM-এর তৈরী জিনিসের বাজারে বেশ চাহিদা হয়েছিল, পালচৌধুরীদের হাতে আসার পরে উন্নতির

গতি আরও বেড়ে গেল। ১৯৬৭-র ৩০ জুনের ব্যালেন্স শীটের কয়েকটি অংক থেকেই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা বোঝা যায়।

পেড-আপ ক্যাপিট্যাল — ১৪,৫০০০০ টাকা
রিজার্ভ — ৩২,২৯০০০ টাকা
ধার দেনা — ৩৩,০০০০০ টাকা

সম্পত্তির (জমিবাড়ি, মেশিনারী ইত্যাদির) ক্রয়মূল্য ৯১,৮০০০০ টাকা
* * ঐ—ডেপ্রিসিয়েশনের পর এখন— ৪৫,৪৩০০০ টাকা

ইনকাম-ট্যাক্স ইত্যাদি বাদ দিয়ে সংরক্ষণ ও বণ্টনের জন্য লাভের অংক— ৫ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা

স্বর্গীয় অমিয় পালচৌধুরী ও শ্রীমতী ইলা দেবীর দুই ছেলে। বড়ো অমিতাভ এখন STM-এর কর্ণধার। দার্জিলিং সেণ্ট পলস্ স্কুল এবং কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র অমিতাভ ধাতু-বিদ্যায় (মেটালার্জিতে) ইংল্যাণ্ডের ওয়েলস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এস সি। কৃষ্টিবান ধনী পরিবারের সন্তান—উচ্চ-শিক্ষার সুযোগের পুরোটাই কাজে লাগিয়েছেন, সেটা বড়ো কথা নয়। যেটা আমার মনে দাগ কাটলো, তা হলো শ্রীমান অমিতাভের সৌজন্য আর সহজ ভাষায় কথাবার্তা। এই উনচল্লিশ বছর বয়স্ক যুবকটির দম্ভ তো নেই-ই উপরন্তু, রসিকতা ও রসগ্রাহিতা—সহজ বাংলা ভাষায়, চিবোনো দাঁতভাঙা ইংরেজীতে নয়—অমিতাভের সহজাত গুণ বলেই মনে হলো। এর আগে অমিতাভেরই সমগোত্রীয় দুচারজন কৃতী বাঙালী যুবকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে যাঁরা বাংলা ভাষাটাকে সেকেণ্ড কেন, ফিফথ্ ল্যাংগুয়েজের মতো ব্যবহার করে থাকেন, আর নমস্কারের উত্তরে 'নড্' করেন। তাঁরাও গুণে বা সৌজন্যে কম ন'ন, কিন্তু তবুও তাঁদের সান্নিধ্যে এই গণ্ডারের-চামড়া আমিও যেন স্বচ্ছন্দ হতে পারি না। কিন্তু ইনি ইলা দেবীর ছেলে তো! এঁর ব্যবহারই আলাদা।

শ্রীঅমিতাভ পালচৌধুরী এখন ইণ্ডিয়ান এঞ্জিনীয়ারিং অ্যাসোসিয়েশনের উপ-সভাপতি, এঞ্জিনীয়ারিং এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিলের কর্মসমিতির সভ্য, স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার স্থানীয় ডিরেক্টর, বেঙ্গল ন্যাশান্যাল চেম্বারের কর্মসমিতির সভ্য, সেন অ্যাণ্ড পণ্ডিত, বেঙ্গল ল্যাম্প এবং বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ কোম্পানীর ডিরেক্টর। তার মানে, তিনি বাংলার শিল্প ও বাণিজ্যজগতে উদিত ভানু এবং ভারতের এক উদীয়মান তারকা।

STM-এর যে একটি কন্যা আছে সে কথাটা আমার জানা ছিল না। তার নাম Taps & Dies Ltd। অমিতাভের কাছেই সেটা শুনলাম। কন্যা মানে, সেই কোম্পানীর অনেক শেয়ার STM-এর কেনা এবং উৎপাদনের ব্যাপারেও দুই সংস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ১৯৫৭ সালে পাল-চৌধুরীরা এই কোম্পানীর স্থাপনা করেছিলেন। দেবপ্রসাদ রায় এটারও ডিরেক্টর। এঁদের কারখানাটি কৃষ্ণনগরে। তার তত্ত্বাবধান করেন অমিতাভের ছোট ভাই শ্রীঅনীক পালচৌধুরী। তাঁর বয়স চৌত্রিশ। দাদার মতো তিনিও দার্জিলিং সেণ্ট পলস্ ও কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ে বিলেত গিয়েছিলেন। মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং-এ লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতক হয়ে দেশে ফিরেছিলেন। শ্রীঅনীক পালচৌধুরী 'ইণ্ডিয়ান এঞ্জিনীয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন'-এর Tea Machinery বিভাগের কমিটি মেম্বার ছাড়াও কয়েকটা চা-কোম্পানীর ডিরেক্টর। তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ হয় নি, কিন্তু শুনেছি সৌজন্যে তিনিও দাদার মতন।

TAD-র (ট্যাপস্ অ্যাণ্ড ডাইজ-এর) কারখানাটি ছবির মতো। বিস্তৃত এক আমবাগানের শ্যামল পরিবেশে এই ফ্যাক্টরীর অবস্থান। কর্মীরা অনেকেই স্থানীয় কৃষক পরিবারের সন্তান। তাই ধান বোনা আর কাটার সময়ে কারখানা প্রায়

* * ডিভ্যালুয়েশনের পর আজ এমন একটি কারখানা বসাতে খরচ হবে এর চারগুণের কাছাকাছি—অর্থাৎ প্রায় দুই কোটি টাকা।

ফাঁকা • হয়ে যাবার উপক্রম হয়। রেগু হাতুড়ি আর মেশিন ফেলে তাঁরা সকলে নিজেন আর কাস্তে হাতে মাঠে ছোটেন। তখন লোকাভাবে কর্তারা বেশ মুশকিলে পড়ে যান।

TAD-র কার্যক্রমে স্মল টুলস তৈরি ছাড়াও একটি বিশেষ মেশিন তৈরিও আছে। সেটা হলো চা-বাগিচার জন্যে C. T. C. মেশিন নির্মাণ। C. T. C. অর্থাৎ চা-এর পাতা শুকিয়ে সেঁকে নেবার পর Cutting, Twisting এবং Curling করার প্রণালীটি বেশি দিনের নয়। মাত্র বছর বিশ পঁচিশ আগে এর প্রবর্তন হয়েছে। তার আগে এই পদ্ধতি অজানা ছিল। আদি প্রণালীতে তৈরি চা-কে এখন বলে Orthodox অর্থাৎ 'সনাতনপন্থী' চা। সি. টি, সি-র চা-তে লিকার হয় গাঢ়, কিন্তু ফ্লেভার তেমন নয়। এই চা-এর প্রধান খদ্দের হলো ইংল্যান্ড। ইংরেজ জনসাধারণ কম খরচে বেশি লিকারের জন্যে এটি কেনেন। ভারতে তো প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয়ই, পাকিস্থান, সিংহল, পূর্ব আফ্রিকা, নিউ-গিনি, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশেও সি,

টি, সি-র বেশ চল হয়েছে। TAD-র সি, টি, সি মেশিন এই সব দেশের মধ্যে অনেকেই কেনেন; ভারী সুনাম এই মেশিনের।

স্মল টুলস্ তৈরিতে STM এবং TAD ছাড়াও আরও কয়েকটি বাঙালী প্রতিষ্ঠান নাম করেছে। তাঁদের মধ্যে শ্রীপ্রণব নাগ পরিচালিত 'হিন্দুস্থান স্মল টুলস্' এবং শ্রী এস কে মজুমদারের 'স্টীল অ্যান্ড অ্যালায়েড প্রোডাক্টসের' কথা অমিতাভ বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন।

STM-এর মস্ত বড়ো কারখানার এপাশ থেকে ওপাশ পরিক্রমা করে বেড়ালাম। সারি সারি মেশিন—রকমারি লেদ, ড্রিল, থ্রেডিং, মিলিং ও গ্রাইন্ডিং মেশিন।

নাম শুনে যতটা 'বস্তু বিশ্ববক্ষোদংশ ধ্বংস-বিকট-দন্ত' মনে হয়, দেখতে কিন্তু আসলে তা নয়। ফ্যাক্টরীর ভিতরে স্ট্রীমলাইনড্ মেশিনের বিন্যাস—সবই খাকির কাছাকাছি একটা রঙের। যেন ইউনিফর্মপরা এন, সি, সি-র মেয়েরা কুচকাওয়াজের জন্যে সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। (মেশিনকে আমি নারীর সঙ্গে তুলনা করি, কারণ তারা পণ্যের জননী।)

চার্জহ্যান্ডদের (বিভাগীয় ইন-চার্জদের) মধ্যে প্রৌঢ় সমর বসু ও লোকেন জানা আর নানা বয়সের যুবক রাধাকান্ত প্রামাণিক, গুণেন ঘোষ, সুরেন সামন্ত, অমল রায়—সকলের সঙ্গেই আলাপ হলো। Heat Treatment-এর রতন দাস আবার রাজনীতি করেন; এ পাড়ার কংগ্রেসকর্মী। ভ্রাতৃগর্বে গর্বিত লোকেন জানার এক ভাই এম, এস-সি (টেক) G E C-র উচ্চপদস্থ অফিসার এবং আর এক ভাই, তিনিও এম, এস-সি (টেক), সরকারী কাজে উচ্চপদে আছেন শুনে খুব ভালো লাগলো। দুজনেই লোকেনবাবুর ছোট ভাই।

কারখানা রাতদিন চলে; তাই এক এক বেলার জন্যে একজন করে ফোরম্যান আছেন। তরুণ ফোরম্যান শ্রীরথীন দাশ-গুপ্তের সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি সুশিক্ষিত; ফিজিক্সে কলকাতার এম, এস-সি আর ইংল্যান্ড জার্মেনীতেও উচ্চতর শিক্ষা লাভ করে এসেছেন।

হিমাংশু ব্যানার্জির সঙ্গে কারখানা পরিক্রমার সময়ে কর্মীদের দু' একটা কথা কানে আসছিল। Male and Female threading নিয়ে তাঁরা পরস্পর কী একটা টেকনিক্যাল আলোচনা করছিলেন। মেল ও ফীমেল থ্রেডিং কাকে বলে তা জানতে চেয়ে আমার জ্ঞানবৃক্ষের আরও একটি শাখা গজালো। হিমাংশুবাবু ব্যাখ্যা করে বললেন যে, নাট-বল্টুর মধ্যে নাটু-এর থ্রেডিং, অর্থাৎ ভেতরে যে প্যাঁচ কাটা হয়, তা হলো 'ফীমেল', আর নাটের মধ্যে যে বল্টু ঢুকিয়ে প্যাঁচে প্যাঁচে মিল খাওয়াতে হয় সেই বল্টুর প্যাঁচকাটাকে বলে 'মেল' থ্রেডিং। যান্ত্রিক সেকসুওলজিটা আমার কাছে জলের মতো সহজ হয়ে গেল।

প্রতিষ্ঠানের আরও কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে পরিচয় হলো। স্টোরের সুবোধ মল্লিক এবং তাঁর ভাই, অন্যতম ফোরম্যান সুনীত মল্লিক; আর STM-এর গোড়া-পত্তন থেকেই যিনি আছেন সেই নরেশ সেন। নরেশবাবু নাকি ভালো গাইয়ে। আমার যে আবার গাইয়ে বাজিয়েদের প্রতি দুর্বলতা আছে সেটা আপনারা জানেন। STM-এর সেক্রেটারি শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তীর কার্যসূচীতে আইনকানুন আর কোম্পানী মিটিং-এর সঙ্গে সঙ্গে মাথুর আর নৌকাবিলাসও চলে শুনে তাঁর প্যান্ট শার্ট পরা নধর অথচ বলিষ্ঠ দেহটিতে মনে মনে আমি ধুতি-উত্তরীয় চড়িয়ে, কপালে চন্দন তিলক পরিয়ে, হাতে তুলে দিলাম ভারী এক জোড়া করতাল—হ্যাঁ, মানায় বটে!

'স্মল টুলস্' এবং 'ট্যাপস অ্যান্ড ডাইজ'-এর কারখানা ও অফিস মিলিয়ে যথাক্রমে ৪৭৫ ও ১৭৫ কর্মীর মধ্যে শতকরা সাড়ে নিরানব্বই জনই বাঙালী। লোকে বলে বাঙালী অক্ষম, অপদার্থ—কিন্তু সে অপবাদটা যে কত বড়ো মিথ্যা তা প্রমাণিত হচ্ছে অমিতাভ-দেবপ্রসাদ-অলীক দের নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রিসীশন যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ, ট্যাপ, ডাই, চেজার ও ড্রিল, যে পুরোপুরি বাঙালী কারিগরের হাত দিয়ে বেরোচ্ছে, সেই সত্যটির মধ্য দিয়ে।

তবে হ্যাঁ, 'blackmarket-oriented' শিল্প ও বাণিজ্যে বাঙালী যে বহু পিছনে পড়ে আছে সে কথাটা ঠিক।

১৯৫১ সালে STM-এর বিক্রি হয়েছিল সাকুল্যে ২৫০০০ টাকার; সেই জায়গায় ১৯৬৭-তে বিক্রির অংক দাঁড়িয়েছিল ৬৩,৫০,০০০, টাকায়।

১৯৬০ সালে TAD-র বিক্রি ছিল ১০০০০, টাকার, আর চৌষট্টি থেকে সাতষট্টি পর্যন্ত প্রতি বছরে গড়ে বিক্রি হয়েছিল ১৮ লক্ষ টাকার।

তারপরেই এলো মন্দা আর সংকটের চোট। STM-এর বিক্রি নেমে গেল ৪৬ লক্ষ টাকায়, আর TAD-র ১৪ লক্ষ টাকায়। এখন আবার রপ্তানির উন্নতি হচ্ছে; তাই এঁদের বিক্রিও বাড়বে বলে মনে হচ্ছে।

STM-এর কারখানায় যে যন্ত্রপাতি আছে তা দিয়ে বছরে এক কোটি টাকার মাল হেসে খেলে তৈরি হতে পারে; সেই জায়গায় মন্দার বাজারে এখন হচ্ছে তার অর্ধেক। উৎপাদন না বাড়ালে পণ্যের পড়তা কমানো যাবে না; অতএব ভারত সরকারের 'এঞ্জিনীয়ারিং এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল'-এর পক্ষে রপ্তানি বৃদ্ধির বর্তমান গতিবেগ বজায় রাখলেই চলবে না, অনেক বাড়াতে হবে; আর বাংলা দেশকে সেই পদক্ষেপের সঙ্গে তাল রেখে চলতেই হবে। নাহলে পিছু হটতে হটতে আমরা বাঙালীরা আবার অজয় মুখুজ্যে মশায়ের দেশের চাঁপাখাল সভ্যতার যুগে ফিরে যাবো।

বিশ্বকর্মা

এমন যে হবে মনে মনে জানত জয়ন্তী। তবু অশোকের মুখটা মনে পড়তেই কেমন যেন একটা আশাও হচ্ছিল। হয়তো কথা রাখবে অশোক। সে মিছেমিছি ভয় চিন্তা করছে। এটা তারই মনের ভুল। কিন্তু...কিন্তু তবু যেন যথেষ্ট ভরসা পাচ্ছিল না জয়ন্তী। সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠেছে ঘরে-ঘরে। শুধু তার ঘরই অন্ধকার। ইচ্ছে করছে না আলো জ্বালাতে। এই অন্ধকারের মধ্যে ডুবে চুপচাপ মুহূর্তগুলোর স্বাদ নিতে নিতে কাটিয়ে দিতে হচ্ছে।

তবু আলো জ্বালাতে হয়, উঠে দাঁড়াতেও হয়। হরি এসে ডাকে, ছোট বউদি বাবু ডাকছেন?

জয়ন্তী একটু যেন চঞ্চল হয়, বাবা কোর্ট থেকে ফিরেছেন?

—হ্যাঁ। ডাকছেন আপনাকে।

—চল। জয়ন্তী তিন তলার সিঁড়িগুলো ভেঙে ভেঙে এসে দাঁড়ায় প্রশান্তবাবুর ঘরের সামনে। দরজার পরদাটা কাঁপছে হাওয়ায়। জয়ন্তী বাইরে থেকে ডাকে, বাবা।

—এস। প্রশান্তবাবু ডাকেন।

জয়ন্তী নতমুখে ঘরে প্রবেশ করে। তার মনে নানা প্রশ্ন, কি বলবেন, কেন ডেকেছেন —এমন তো ডাকেন না। বাড়ির কারুর সঙ্গে বড় একটা কথা বলেন না। তবে?

বইটা বন্ধ করলেন প্রশান্তবাবু। বললেন, অশোক ফেরে নি?

মাথা নাড়ে জয়ন্তী, না এখনও ফেরেন নি।

—এত রাত করে ফেরা সকলের বড় দৃষ্টিকটু লাগছে।

জয়ন্তীর মুখখানা গম্ভীর, ভাবলেশহীন।

—এস বউমা। এই জন্য তোমায় ডেকেছিলুম। কাগজটা হাতে নেন প্রশান্তবাবু।

জয়ন্তী উঠে দাঁড়ায়। বলে, আপনার কফিটা এখানে পাঠিয়ে দেব?

—না মা। আজ কফি থাক।

জয়ন্তী চলে যায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দেখা হয় বড় জা হেনার সঙ্গে। হেনা বলে, নীচে গিয়েছিলি কেন, জয়ন্তী?

জয়ন্তী হাসে। অবাক হয়ে গেছ না, দিদি?

—হ্যাঁ অবাক হয়েছি। তার চেয়ে অবাক হয়েছি তোর সাজ-গোজের বহর দেখে। এত সেজেছিস কেন?

—আহা ও কথা পরে। কেমন লাগছে তাই বল তো আগে।

—সে তোমার কর্তাটির মুখে শুনো বাপু। আমি কি আর তেমন ভালবেসে বলতে পারব।

হঠাৎ জয়ন্তীর নুয়ে পড়া মুখটা অন্ধকার হয়ে যায়। মনে পড়ে অশোকের কথা। অশোক এল না। মিছিমিছি এমন প্রতিজ্ঞা তাহলে কেন করল জয়ন্তীর কাছে। বিয়ের পর থেকেই দেখে আসছে জয়ন্তী অশোক অনেক রাত করে বাড়ি ফেরে। তখন বুঝেও বুঝতে চাইত না। অশোকের মধ্যে যে-ফাঁকি

তখনও চোখে পড়ে নি। অন্তত প্রথম প্রথম সেরকম মনে হত। চোখে পড়ল অনেক পরে—তখন আর ফেরার পথ নেই। তবু চেষ্টা করেছে, অনুরোধ করেছে, উপদেশ দিয়েছে, ঝগড়া করেছে। বেশি হলে, অশোক ক্ষমা চেয়েছে। পরে আর সেকথা মনে রাখে নি। ঘড়ির কাঁটা যখন বারোটার ঘর ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে তখন সেই চির-পরিচিত শব্দটি শুনতে পাওয়া গেছে মুখুয্যেবাড়ির বাগানে, সিঁড়িতে। তারপর চুপিচুপি এসে থেমেছে জয়ন্তীর ঘরের সামনে। টুকটুক শব্দ করেছে। খুলে গেছে দরজা। কোন প্রশ্নও করে নি জয়ন্তী। কথাও বলে নি একটা। অশোক নিঃশব্দে খেয়ে শুয়ে পড়েছে। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছে। জয়ন্তী বসে থেকেছে জানালায়। পায়চারি করেছে সারা ঘরে। ঘুমোতে পারে নি। ছটফট করেছে কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায়। অথচ সকালে উঠে হেসেছে—কথা বলেছে—অনেক স্বাভাবিক সহজ হয়েছে। কিন্তু আবার সেই রাত্তির—আবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

ভালো লাগে না। নোংরা লাগে জয়ন্তীর। মনে হয় বড় জা, ভাসুর তার এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন। কিন্তু তাঁরা কিছু করেন না। কিছু বলেন না। কেমন করে জানবে জয়ন্তী তার বিয়ের আগে এই নিয়ে অশোক আর অনিলের মধ্যে কত মনান্তর হয়ে গেছে। তারপর থেকে দুই ভাইয়ের বাক্যালাপ বন্ধ। আর প্রশান্তবাবু ভেবেছেন বিয়ে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। বউ এসে সব শুধরে দেবে। কিন্তু পারে নি জয়ন্তী। হেরে গেছে। কাল শেষ চেষ্টা করেছে। অশোককে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েছে, বলো কাল সকাল সকাল বাড়ি আসবে। অশোক হেসেছে—কেন? ......আমার কিছু দরকার আছে—জয়ন্তীর জেদ চেপে গেছে। বলেছে হ্যাঁ। দরকার আছে। তোমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। অশোক গম্ভীর হয়েছে, বেশ। জয়ন্তী অশোকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার শুভ্র হাত দুটি অশোকের দিকে বাড়িয়ে বলেছে—না, ছুঁয়ে বলো আসবে। অশোক একটুও দ্বিধা করে নি। নিশ্চিন্তে সেই হাত দুটি আঁকড়ে ধরে সহজ সুরে বলেছে, আসব।

জয়ন্তী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। মনে হয়েছে সে বুঝি তার পরম মূল্যবান সম্পদ ফিরে পেয়েছে। কিন্তু ভুল করেছে সে। মদের নেশা ও আনুষঙ্গিক যে প্রতিজ্ঞার চেয়ে কত বড় তা বুঝতে পারে নি। এমন জানলে জয়ন্তী অশোককে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করাত না। এতে সে যেন অনেক ছোট হয়ে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে কখন ভূতের মত নিজের ঘরের দরজার সামনে এসেছিল টেরই পায় নি জয়ন্তী। মিঠু ঘরের ভেতর

থেকে বেরিয়ে এসে ডাকে, ও বউদি, তোমায় এই সন্ধ্যেবেলা নিশিতে পেল নাকি?

জয়ন্তী সজাগ হয়। ও তুমি, বাপরে—আমি যা চমকে উঠেছিলাম। কখন ফিরলে বন্ধুর বাড়ির থেকে?

—এই তো একটু আগে। কাপড় জামা ছেড়ে তোমার কাছে এসেছি।

—বন্ধুর আশীর্বাদে কি রকম খেলে বল?

—ভালো। অনেক রকম।

—পাত্রপক্ষ কি দিয়ে আশীর্বাদ করলেন?

—একটা জড়োয়া সেট। সুন্দর।

—বন্ধুর মনে খুব খুশী না?

মিঠু জবাব দেয় না। মুখ নীচু করে হাসতে থাকে।

জয়ন্তী বলে, দাঁড়াও তোমারও পালা আসছে।

—অনেক দেরী বউদি। অনেক দেরী।

—দেরী কি? এই সামনের ফাল্গুনে তোমায় চালান করব।

—কেন আমি কি তোমার গলার কাঁটা?

—কাঁটা বলে কাঁটা!—জয়ন্তীও সমানে হাসে। যেদিন কাঁটামুক্ত হব সেদিন গঙ্গা চান করব।

কল কল করে। মিঠু জোরে জোরে মাথা নাড়ে। তারপর বলে, আচ্ছা বউদি তুমি কি আজ কোথাও বেরোবে?

—আমার কোথাও বেরোতে দেখেছ?

—তাই তো অদ্ভুত লাগছে। কিন্তু তোমার সাজগোজ—

জয়ন্তী বাধা দেয়। ভেবেছিলাম বেরোব। কিন্তু আর ইচ্ছে করছে না।

মিঠু ঝাঁকিয়ে ওঠে, সত্যি বউদি তোমাকে [illegible]। তাহলে চল বেড়িয়ে আসি। কি যে বাড়ির মধ্যে বুড়ীর মত বসে থাক। ভালো লাগে না।

—আজ থাক মিঠু। মাথাটা বড্ড ধরেছে।

—দূর, তোমার তো ইচ্ছেই হয় না। যখনও বা ইচ্ছে হল তখনও আবার মাথা ধরল। মিঠু জয়ন্তীর কাছে উঠে আসে। বলে, আচ্ছা বউদি তুমি আমার চেয়ে মাত্র কয়েক বছরের বড়। কিন্তু তোমাকে আমার ঠিক মায়ের মত মনে হয়। কেন বল তো?

জয়ন্তী মিঠুর কপালের চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বলে, বেশী ভালোবাস তাই।

—মনে আছে বউদি, তোমার সঙ্গে বিনা কারণে কত ঝগড়া করতাম। ছোড়দা অবধি রাগ করত। বলত, তোমায় আমার সঙ্গে কথা না বলতে। কিন্তু তুমি পারতে না। ছোড়দাকে লুকিয়ে লুকিয়ে ঠিক চলে আসতে। মনে আছে? কেন তখন রাগ করতে না?

—রাগ করতাম। কিন্তু বেশীক্ষণ রাগ করে থাকতে পারতাম না। আমার স্বভাবটাই ঐ রকম। কারুর সঙ্গে ঝগড়া করে থাকতে পারতাম না। কেউ যদি ঝগড়া করত আমি ছুটে যেতাম মেটাতে।

মিঠু বলে, এমন করে ঘরে বসে থাকতে তোমার ভাল লাগে?

—কেন লাগবে না? এই তো তোমার সঙ্গে গল্প করছি।

—দূর, আমার সঙ্গে সব সময় গল্প করতে ভালো লাগবে কেন?

—সে কি কথা!

—আহা তুমি যেন কিছু বোঝ না। মিঠু লজ্জায় লাল হয়ে সেখান থেকে পালায়।

জয়ন্তী হাসল। কিন্তু হঠাৎ মিঠুর কথার ইঙ্গিতটা ধরতে পেরে তার মুখ লাল হয়ে উঠল। সত্যি তো। মিঠু বড় হয়ে উঠেছে। সব বুঝতে শিখেছে। তাকে দোষ দেওয়া যায় না। সুযোগ পেলেই মনের কথা বলে। [illegible] লোক আর সম্পর্কশালীই হোক।

কিন্তু সে সুযোগ দিয়েছে কি অশোক, না সে নিজে। অশোকের ওই বাইরের খোলসটা ছাড়াবার জন্য সে কি কখনো চেষ্টা করে দেখেছে? সত্যি কি সে মনের কথাটা নিয়ে [illegible] করেছে [illegible]।

মনে পড়ছে, এই তো কিছুদিন আগের কথা। অশোক অফিস থেকে ফিরেছে অনেক রাত করে। বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। ঘরের নীল আলোটা জ্বলছে। জয়ন্তী বলেছে, একটা কথা বলব?

—বল। অশোকের গলার স্বরটা ক্লান্ত। সর্বাঙ্গে [illegible] গন্ধ।

—এই ছাই পাঁশগুলো খাও কেন?

—কি জানি!—অশোক জয়ন্তীর মুখোমুখি হতে হয়তো সাহস করে নি।

—জান না। জানতে ইচ্ছে করে।

অনেক ভেবেছি, আজও তার মানে পাই না।

—তুমি বলতে পার? কি আছে?

অশোক কোনো জবাব দেয় নি।

কিন্তু সত্যি কি আর কি অশোককে না বাইরের জীবন থেকে ফিরিয়ে এনেছে? না, পারে নি। এই বদ অভ্যেসটা ছাড়াতে চেষ্টা করেও সব নেশাটা ছাড়াতে [illegible]। তারপর অনেক অনুনয়ে ছলে-বলে কৌশলে অশোককে সংযত করেছে জয়ন্তী। কত ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু কিছু হয় নি। কোন ফল হয় নি...শেষ পর্যন্ত গতকাল প্রতিজ্ঞা অবধি করিয়েছিল অশোককে দিয়ে। কিন্তু কি হল? জয়ন্তীর কাজল পরা চোখ দুটোতে জল ছলছলিয়ে এল। মা মারা গেছেন কবে। অনেক ছোটবেলায়। বাবা মানুষ করেছেন তাকে। তাঁর প্রশস্ত বুকের আড়ালে আগলে রেখেছেন তাঁর জয়ন্তী মাকে। তারপর বড় হয়েছে সে। বিয়েও হয়েছে। বাবাও মারা গেছেন। স্নেহ-ভালোবাসা আবদারের জায়গা আস্তে আস্তে শূন্য হয়ে গেছে। শ্বশুরবাড়িতে এসে সকলের স্নেহ পেয়েছে, বিশেষ করে প্রশান্তবাবুর আর মিঠুর।

বিয়ের পরে এসে দেখেছে জয়ন্তী প্রশান্তবাবু নীরব, শান্ত। কথা বলেন না বড় একটা। স্ত্রী মারা যাবার পর নাকি এমন হয়ে গেছেন। বড় ছেলে তাঁর ছেলেপিলে সংসারের কর্তৃত্ব নিয়ে ব্যস্ত। মিঠু আছে তার গান বাজনা আর কলেজ নিয়ে। এই সংসারের সকলের কিছু না কিছু কাজ আছে। কিন্তু জয়ন্তী কর্মহীনা। শ্বশুরের দেখাশোনা ছাড়া আর কোন কাজ নেই তার। দিনের মধ্যে প্রশান্তবাবু ডাকেনও না। শুধু সময়মত ওঁর খাবারগুলো, দরকারি জিনিসগুলো পাঠিয়ে দিতে হয়। কিন্তু সেটুকু করতেই বা কত সময় লাগে। বড় জার ছেলে-মেয়েরাও বড় হয়ে গেছে। জামা-কাপড় ওরা নিজেরাই পরতে পারে। জয়ন্তীকে আর ডাকে না—ছোট মা জামা পরিয়ে দাও, ফিতে বেঁধে দাও। এগুলো করেও যেন আগে অনেক সময় কাটত জয়ন্তীর। কিন্তু এখন সে নিতান্ত একা। এই ঘর আর বারান্দা ছাড়া পৃথিবীতে যে আরো কত জায়গা আছে তা যেন ভুলেই গেছে জয়ন্তী।

কোথায় যাবে সে? কোনো বেড়াবার জায়গাও নেই তার। আর বেরোলে সবাই অশোকের কথা জিজ্ঞেস করে। কৈফিয়ত দিতে দিতে তখন অস্থির হয়ে যায় জয়ন্তী। বেশীক্ষণ বসে তখন কথাও বলতে পারে না, কোনমতে উঠে পালিয়ে আসে। তারপর থেকে লোকের বাড়ি যাওয়া-আসাটুকু ত্যাগ করেছে জয়ন্তী।

জয়ন্তী বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীরবে রাস্তার দিকে তাকায়। তার কৌতূহলী দৃষ্টি শুধু যেন কাকে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু ওরা কারা? চেনা চেনা মনে হচ্ছে। শান্তা আর তার বর ছেলেকে নিয়ে বোধ হয় বেড়াতে যাচ্ছে। জয়ন্তীর বুক চিরে একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। ভুল করেছে সে। মনে মনে নিজেকে মিথ্যে মিথ্যে সুখী ভেবে এসেছে এতদিন। কি তার আছে? কিসে তার সুখ হবে? বুকের মধ্যে সেই অব্যক্ত

ব্যথাটা আবার খোঁচা মারতে থাকে জয়ন্তীকে।

মিঠু এসে ডাকে—বউদি তুমি এখানে? খাবে না?

—চল।

—মাথা ধরা কমে গেছে?

—হ্যাঁ।

—খেয়ে উঠে একটু বেড়িয়ে আসবে লেকের ধার থেকে।

—না আজ থাক।

—কেন কি হয়েছে? কত লোক এখন বেড়াচ্ছে দেখবে চল। গরমকাল যে, লেকে যা চমৎকার হাওয়া।

—বেশ যাব।

—সত্যি? মিঠু আনন্দের আতিশয্যে জয়ন্তীর হাতটা সজোরে চেপে ধরে।

—হ্যাঁ রে সত্যি যাব। কেউ তো বলে না—তুই যখন এত করে বলছিস।—জয়ন্তী সস্নেহে মিঠুর মুখটা তুলে ধরে।

জয়ন্তী মিঠুকে ইদানীং তুমি বলে। মিঠু রাগ করেছে কত। বলেছে—আবার তুমি কেন? বেশ তো তুই বলতে।

—ওরে বাবা তুমি হলে আজকালকার আধুনিকা। তোমায় তো গো আপনি বলা উচিত। একেবারে আপনি বলা আমার পক্ষে কষ্টকর। তাই ধাপে ধাপে উঠছি। এখন তুমি আর ক'দিন বাদে আপনি কেমন! তবুও মাঝে মাঝে পুরনো রীতিটাকে ঝালিয়ে নেয় জয়ন্তী।

মিঠু বলে—চল তাড়াতাড়ি খেয়ে নিই দুজনে।

হ্যাঁ, মিঠুর কথাই শোনে জয়ন্তী। তাড়াতাড়ি সে খেতে পারে না কোনদিন। কিন্তু আজকে কেমন করে জানি না পারল। খেয়ে উঠে হাত ধুয়ে বলল—চল।

মিঠু অবাক—সে কি কাপড় ছাড়বে না?

—কেন, এটা কি খারাপ? তাছাড়া এই রাত্তিরে কেউ দেখতেও পাবে না।

—তাতে কি? তোমার কত ভালো শাড়ি আছে। পর না একটা। সেই চামেলী ফুলের রং যে শাড়িটার সেইটে পর। ওটা পরলে তোমায় ভীষণ সুন্দর দেখায়।

—বেশ। —সত্যি শেষ অবধি আলমারি খুঁজে চামেলী রঙের শাড়িটাই পরল জয়ন্তী।

মিঠু বলে—টিপ পরলে না? মা টিপ না পরে বাইরে বেরোতেনই না।

সিঁদুরের টিপটা পরে জয়ন্তী মিঠুর

দিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে বলল, এবার হয়েছে?

—হ্যাঁ। খুব ভালো দেখাচ্ছে। দাঁড়াও বউদি।—মিঠু ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ফিরে এল এক গুচ্ছ রক্তাক্ত গোলাপ বুকে চেপে ধরে। জয়ন্তীর দিকে গুচ্ছটা এগিয়ে দিয়ে বলল—ধর।

—কেন?

—বাঃ। মিঠু আবার হাসল। আজকে যে তোমার বিয়ের তারিখ।

—ও। জয়ন্তী স্থির হয়ে গেল। বলল—ওই ফুলদানিটায় রাখ মিঠু। তুমি মনে না করিয়ে দিলে সত্যি একদম ভুলেই থাকতাম আজকের দিনটা।

অশোকও কি ভুলে গেল। হয়তো বা গেছে। জয়ন্তীকে হয়তো ভুলে গেছে। বাড়ি আসে খায়-দায় ঘুমোয়। জয়ন্তী কি করে, কেমন আছে দেখার আগ্রহ তার নেই। মনে আছে, বছরের এই বিশেষ দিনটি উপলক্ষ্য করে অশোক এক সময় কোথা থেকে ফুল এনে ঢেলে দিত জয়ন্তীর হাতে।

মিঠু তাড়া দেয়, বউদি কি এত ভাবছ? চল দেরি হয়ে যাচ্ছে যে—

হ্যাঁ। যাই। —জয়ন্তী ঘরের আলো নিবিয়ে নিচে নেমে আসে। গেট খুলে দুজনেই নামে রাস্তায়। উঃ, কত দিন, কত দিন পরে আজ বেরোল জয়ন্তী। কত দিনের পর এমন বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল বাতাসের? কত দিন পরে দেখল এমন তারাফোটা আকাশ?

মিঠু বলল, লেকে চল।

লেকের ধারে গিয়ে চুপটি করে বসে রইল জয়ন্তী। মিঠু বললে, বউদি কথা বল—।

—তুমি বল, আমি শুনি।

—দূর আমি আবার কি বলব?

—কি যেন হয়েছে তোমার। এমন কিন্তু তুমি আগে ছিলে না, কত হাসতে, গল্প করতে। বেশ তুমি বসে বসেই লেকের জলই দেখ।

হ্যাঁ, দু চোখ ভরে তাই দেখছে জয়ন্তী। দেখছে সে অনেক দিন পর। মনে হচ্ছে একটা যুগ। আজ দেখছে নতুন দৃষ্টি দিয়ে। এমন করে সে কোনদিন দেখে নি। মনে হচ্ছে ওই জল...ওই আকাশ...ওই গাছের পাতার সঙ্গে তার যেন কোথায় মিল আছে। সকলের মধ্যে থেকেও ওরা একা—সেও তেমনি একটা সংসারের মধ্যে বাস করে একদম একা। কিন্তু ওই চাঁদ? এমন করে তাকে দেখে নি, ইচ্ছেও হয় নি অনেককাল। এ আনন্দের স্বাদ সে ভুলেই গিয়েছিল মুখুজ্যেবাড়ির অন্দর মহলে প্রবেশ করে। হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করে—মিঠু, আমি যদি চলে যাই—

—কোথায় যাবে বউদি?

—অনেক দূরে।

—কেন? অন্ধকারের মধ্যে জয়ন্তীর মুখটা দেখতে চেষ্টা করে মিঠু।

জয়ন্তী সচকিত হয়। হাসে। না এমনি বলছিলাম। বাইরে একটা চাকরি পেয়েছি। নেব কি না বুঝতে পারছি না। চল বাড়ি ফিরি।

—চল। কিন্তু চাকরি-বাকরি তোমায় কিছু করতে হবে না বাপু।

বাড়ি ফিরে হরির সঙ্গে দেখা। জয়ন্তী জিজ্ঞেস করে—হরি, বাবুর খাওয়া হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ।

—ঠাকুর সব ঠিক করে দিয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—বাবু জেগে আছেন?

—হ্যাঁ। বই পড়ছেন।

মিঠু ওপরে চলে যায়।

জয়ন্তী নিঃশব্দে এগোয় প্রশান্তবাবুর ঘরের দিকে। পরদাটা এক হাতে সরিয়ে ঘরে ঢোকে। প্রশান্তবাবু চমকে ওঠেন—কে?

—আমি!

—ছোট বউমা!

—হ্যাঁ। পড়ছেন?

—এইমাত্র বন্ধ করলাম। অনেকক্ষণ পড়েছি। একটানা পড়তে আর ভালো লাগছে না। কোন জিনিসই বেশীক্ষণ ভালো লাগে না? ক্লান্তি আসে, অবসাদ আসে। তুমি কি কিছু বলবে?

—বাবা! —ইতস্তত করে জয়ন্তী। অনেক চেষ্টার পর বলে ফেলে, আমি একটা বাইরে চাকরি পেয়েছি। —আর কিছু বলতে পারে না। গলা ধরে আসে।

প্রশান্তবাবু স্পষ্ট তাকান জয়ন্তীর দিকে।

জয়ন্তী অপলকে তাকিয়ে থাকে প্রশান্তবাবুর দিকে। জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গেছেন প্রশান্তবাবু। রঙটা হয়ে গেছে তামাটে। বড় একা, বড় অসহায়, ঠিক তারই মত। দু চোখের চাউনিতে শিশুর সারল্য।

জয়ন্তী বেরিয়ে এল। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। এই ক' বছরে তার বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে। অনেক দেখে অনেক ঘুরে যে ক্লান্তি সেই ক্লান্তি এসে জমা হয়েছে তার মনে তার শরীরে। ঘরে ঢুকে ভূত দেখার মত চমকে ওঠে জয়ন্তী। —একি তুমি!

অশোক এসে দাঁড়িয়েছে একদম জয়ন্তীর সামনে। জয়ন্তীর চোখের পাতা পড়ছে না। অশোক জয়ন্তীর হাত ধরে—তুমি অবাক হচ্ছ? তোমার জন্য কি এনেছি দেখ।

দেখে জয়ন্তী। টেবিলে পড়ে আছে রাশি রাশি যেন শিশির সিক্ত চামেলী ফুল। জয়ন্তী কথাও বলতে পারে না। মনটা খুশী হয়ে উঠতে চায়। জানে কাল অশোক আবার যথারীতি দূরে সরে যাবে, আবার আসবে অনেক রাত্তিরে। তবু এই একটা দিন এই একটি মুহূর্তের কি কম দাম নাকি? জয়ন্তী সহজ হয়। ছোট্ট হাসি ফুটে ওঠে তার ঠোঁটের ফাঁকে। খাটের তলা থেকে সুটকেসটা টেনে বার করে। দু'-চারটে শাড়ি পাট করে রাখে তার মধ্যে।

অশোক কৌতূহল বোধ করে। কি ব্যাপার?

জয়ন্তীর গলা একটুও কাঁপে না। চলে যাব।

—কোথায়?

—বাইরে একটা চাকরি পেয়েছি। নাম-ঠিকানায় তোমার আর কি দরকার বল। নইলে নিয়ে যেতাম।

অশোক নীরব। স্বামিত্বের অধিকার সে প্রতিষ্ঠা করতে পারত কিন্তু কোথায় যেন তার বাধে। অনেক কথা বলতে গিয়ে তাই তার গলার স্বরটা আটকে যায়।

জয়ন্তী বলে, কাল সকালে যাব। বাবাকে বলেছি। তুমি শুধু গাড়ির ব্যবস্থাটা করে দিও।

অশোক বলে, কালই?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু বাবার মত কি তুমি পেয়েছ?

—পাই নি। তবে আপত্তিও করেন নি।

অশোক কিছু ভাবে। এবার বুঝি জয়ন্তীকে আর ধরে রাখা যাবে না।

জয়ন্তী হাসে, কি গো এমন চুপচাপ? কথাবার্তা বলবে না নাকি? আর কিন্তু সুযোগ পাবে না।

অশোকের ইচ্ছে করে জয়ন্তীর মুখখানা একটিবার দেখে। সত্যি সত্যি বলছে, না ঠাট্টা করছে জয়ন্তী। কিন্তু আজ ঘরটা অন্ধকার। আলোটা বুঝি ইচ্ছে করেই জ্বালে নি জয়ন্তী।

আজ কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে। জয়ন্তী ঘুমোয় নিঃসাড়ে। কিন্তু অশোকের ঘুম নেই। চুপটি করে শুয়ে সে জয়ন্তীর নিঃশ্বাসের শব্দ আর ঘড়ির টিকটিক শব্দ শুনতে থাকে।

এক সময় রাত্তির শেষ হয়। ভোরের আলো ফুটে ওঠে পূব আকাশে।

জয়ন্তী ধড়মড় করে উঠে পড়ে। রোজকার মত আজও স্নান সেরে গরদের লাল পাড় শাড়িটা পরে পুজো করে। পুজো শেষ করে চায়ের টেবিলে ডাকে অশোক আর মিঠুকে। ওরা দুজনেই বাড়িতে সবচেয়ে দেরী করে। বড় জার ছেলে-মেয়েরা সেই সাত সকালে দুধ-রুটি খেয়ে স্কুল চলে যায়। বড় ভাসুরের সকালে বেড়ানো অভ্যাস। তিনি ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে প্রাতঃরাশ সারেন। বড়জাও চা খেতে বাকি রাখেন না। জয়ন্তী সেই সময়টা পুজো করে। বেলা করে চায়ের টেবিলে এসে মিঠু আর অশোকের খাবার-দাবার গুছিয়ে দেয়। প্রশান্তবাবুর খাবার পাঠিয়ে দেয়। এখন

পাঠায় এক কাপ হরলিকস, আপেল, বিস্কুট। ভোরবেলায় পাঠিয়ে দেয় গরম গরম এক কাপ চা।

অশোকই হঠাৎ প্রশ্ন করে, মিঠু তোর বউদি চলে যাবে জানিস?

চায়ের কাপটা ঠোঁটের কাছে তুলে ধরেই নামিয়ে রাখে, কি বলছ ছোড়দা। ঠাট্টা করছ নাকি?

অশোক বলে, ঠাট্টা নয়। তুই জানিস না? মিঠু অবাক। কাল বলছিল, বিশ্বাস করি নি। কবে যাবে?

—আজই।

—সে কি?

—হ্যাঁ। এবার জয়ন্তীই কথা বলে, আর একটু পরেই।

—কেন বউদি?

জয়ন্তী চুপ করে থাকে।

—আমাদের ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে বউদি!

—দেখি চেষ্টা করে যদি পারি। না পারলে আবার চলে আসব।

মিঠু রাগ করে, কি যে ঠাট্টা কর—

—ঠাট্টা নারে, সত্যি। মানুষ তো কত কি চেষ্টা করে। দেখি না আমিও পারি কি না—

মিঠু বলে, তবু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

—যখন চলে যাব তখন হবে তো।

মিঠুর মুখখানা গম্ভীর হয়ে যায়। খাবারটুকু রেখে উঠে চলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে অশোকও। আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সারা বাড়িতে রাষ্ট্র হয়ে যায় জয়ন্তীর চলে যাওয়ার কথা। বড়-জা ছুটে আসে। বলে, জয়ন্তী তোর মাথায় কি ভূত চেপেছে?

জয়ন্তী বলে, না দিদি চাপবার আগেই পালাচ্ছি।

—সব জিনিসে ঠাট্টা তামাশা। কোনো জিনিসটে পরিষ্কার করে বলিস না।

—পরিষ্কার করে বলার তো কিছু নেই। তুমি তো জান ব্যাপারটা দিদি। চাকরির কথা তোমায় আমি বলি নি?

—সে অনেক দিন আগে।

—সেই অনেক দিন আগের ব্যাপারটা এখন হতে চলেছে।

—যা ইচ্ছে কর। তোর বর বুঝবে। আমি কেন মাঝে নাক গলাই। হেনা রাগ করে চলে যায়।

জয়ন্তী লেবুর খোসা ছাড়িয়ে প্রশান্তবাবুর জন্যে ফলের রসটুকু তৈরী করে। ফলের কাটা [illegible] ফেলে আলমারিতে ঢুকিয়ে রাখে। [illegible] ডাকে। বলে, খাবার টেবিল [illegible] ভালো করে ঝাড়িস। বড় নোংরা [illegible] ঘরের চেয়ারগুলোর ঢাকা [illegible] বাগানের গোলাপ গাছে পোকা [illegible] একটা ব্যবস্থা করিস।

জয়ন্তী উঠে ওপরে যায়। তার জিনিস-[illegible] গোছগাছ হয়েই গেছে। কি আর এমন [illegible] সামান্য কটা শাড়িটাড়ি মাত্র [illegible] ছিল। জয়ন্তীকে দেখে বলল, [illegible] গাড়ি এসে গেছে।

—[illegible] কেন?

—[illegible]

—[illegible]

ক্ষতি কিছু নেই।

—[illegible] হতে পারে।

—[illegible] তোমায় [illegible]

কি করে?

—আমার ক্ষতি হচ্ছে দেখেও কি তুমি [illegible]

—তোমার মায়া-দয়া কম। ক্ষতি কে বা [illegible]

—কিন্তু তুমি তো অন্যরকম।

—ছিলাম। এখন নেই।

—[illegible] কতক্ষণ?

—আর হওয়া যায় না। তোমাদের ফেলে যাচ্ছি।

—সে তো নিজের মনটাকে বাঁচিয়ে রাখতে।

—[illegible] পারি না।

—[illegible] সকলে অস্বীকার করে।

—[illegible] বলেই করে।

—[illegible] করত না।

—না, জটিল জিনিস যে বোঝাতে হবে।

—তোমার কথাগুলোর মানে হয় না।

—তোমারও না।

—বাপের কথা।

—তোমারও।

এবার জয়ন্তী উঠে দাঁড়ায়। শাড়ির আঁচলটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নেয়। একবার তাকায় অশোকের দিকে। তার কালো বড় বড় চোখের কোণে কি এই ছেড়ে চলে যাওয়ার বেদনাটুকু ভেসে ওঠে। বুঝতে পারে না অশোক। শুধু বুঝতে পারে একটা মস্ত জিনিস হারাচ্ছে সে। একটু প্রেম—অনেকটা স্নেহ, একটু আরাম, অনেকটা শান্তি সব যেন চলে যাচ্ছে তাকে শূন্য করে দিয়ে। তবু জোর করে বলে, চলো জয়ন্তী।

—এই যে যাই। জয়ন্তীর ঠোঁটের ফাঁকে সেই চির-পরিচিত হাসি ফুটে ওঠে। শেষবারের মত ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখে সে। ক্যালেণ্ডারের পাতাগুলো হাওয়ায় উড়ছে ফরফর করে। বুদ্ধমূর্তির সামনে গতকাল সকালে জ্বালা ধূপের কিছু ছাই পড়ে আছে। টেবিলের ওপর ফ্রেমে বাঁধানো অশোক আর তার ছবিটার ওপর রোদ্দুর পড়ে চকচক করছে। কিন্তু এখনও তার আসল কাজটাই বাকি পড়ে আছে। পারবে কি সে? মনে মনে শক্ত হয় জয়ন্তী।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে প্রশান্তবাবুর ঘরে ঢোকে। বাড়িটা যেন বড্ড বেশি ফাঁকা। কাউকে বারান্দায় দেখতে পায় না।

—বাবা।

মুখ তোলেন প্রশান্তবাবু।

জয়ন্তী এগিয়ে গিয়ে জানালার পরদাগুলো সরিয়ে দেয়। এক ঝলক আলো এসে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। সঙ্গে ভেসে আসে আমের বোলের গন্ধ। জয়ন্তী জানালার সামনে এসে দাঁড়ায়। আম গাছটা আমের মুকুলে ভরে গেছে। অনেক মুকুল। কচি সবুজ রঙ—সবে প্রাণভরে বাতাসটুকু নিতে শিখেছে তারা। জয়ন্তী তাকের বইগুলো গুছিয়ে রাখে। ফুলদানির বাসি ফুলগুলো ফেলে দেয়। এবার এসে দাঁড়ায় প্রশান্তবাবুর সামনে। ফতুয়ার বোতামগুলো খোলা। বুকটা দেখা যাচ্ছে। হাড়গুলো উঁকি মারছে। প্রশান্তবাবু কি খুব রোগা হয়ে গেছেন? চোখের কোণে কালি। মাথার চুলগুলো এলোমেলো, রুক্ষ।

জয়ন্তী বলে, বাবা কত দিন চুলে তেল দেন নি?

—কি জানি মনে নেই মা। তবে যেদিন মনে পড়ে সেদিন দিই।

—রোজ মনে পড়ে না বাবা?

—না, মা।

—দশটার সময় লেবুর রসটা খাবেন বাবা।

—খাব। প্রশান্তবাবু ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারেন না। তুমি পাঠিয়ে দেবে না?

জয়ন্তী সতর্ক হয়। তবে কি বাবা ভুলে গেছেন তার চলে যাওয়ার কথা। জয়ন্তী কেশে গলাটা পরিষ্কার করে, বাবা আমি এখন চলে যাচ্ছি।

প্রশান্তবাবু চমকে ওঠেন। কি একটা কথা বলার জন্য ঠোঁটটা থরথর করে কেঁপে ওঠে। চোখের পাতাগুলো কাঁপতে থাকে। অনেক কষ্ট করে অনেক চেষ্টায় অবশেষে থামল সে কাঁপুনি। কিন্তু কোন কথা বললেন না প্রশান্তবাবু।

জয়ন্তী আবার বলে, আসি বাবা।

প্রশান্তবাবু এবার মুখ ঘুরিয়ে নেন।

জয়ন্তীর কালো চোখ দুটো কেমন হয়ে যায়। চলে যেতে গিয়েও সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ফিরে দেখে প্রশান্তবাবুকে। মনে হয় যেন, একটা ছোট্ট শিশু অবাক দৃষ্টিতে বুঝি এই প্রথম দেখছে বাইরের পৃথিবীটাকে। সে শিশু বড় অসহায়, বড় দুর্বল, বড় একা।

দরজার বাইরে পা দিল জয়ন্তী।

অশোক বললে, চল।

জয়ন্তী বললে—না।

—যাবে না?

—না।

অশোক বললে, কবে যাবে?

জয়ন্তী সহজ সুরে বললে, যাব না।

গতকাল আকাশের সেই অফুরন্ত তারাগুলো আর লেকের সেই স্নিগ্ধ হাওয়াটুকু আজকে এসে উচ্ছল আবেগে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল মুখুজ্যেবাড়ির ছোট বউ জয়ন্তীকে।

নিউজিল্যাণ্ডের চিঠি

১ এই অগাস্টের দুপুরে নিউজিল্যাণ্ডের দক্ষিণ দ্বীপের ক্রাইস্ট চার্চ* বিমানবন্দরে নামলাম। সিডনী হয়ে এসেছি। দুই জায়গার আবহাওয়ার পার্থক্যটা বেশ বোধগম্য হল। ক্রাইস্ট চার্চে যখন পৌঁছলাম তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এবং বৃষ্টি সহ ঝড়ো হাওয়া বইছে বাইরে। বলা বাহুল্য, আমরা বিমানবন্দরে যাত্রীদের জন্য গরমকরা বিশ্রামাগারে বসে ঐ মুহূর্তে বাইরের স্বাভাবিক আবহাওয়ার পরিচয় তখন পাচ্ছিলাম না যদিও কাচ দিয়ে ঘেরা বিমানবন্দরের সমস্ত অফিসঘর ও বিশ্রামঘর থেকে বাইরের অবস্থাটা বেশ মালুম হচ্ছিল। আমরা কলকাতার গরম থেকে সবে নেমেছি আর ঐ অবস্থা দেখে সত্যিই শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম। নতুন দেশে আমাদের আনন্দও ঝিমিয়ে আসত যদি না এ দেশের মানুষের সহৃদয় ব্যবহারের উষ্ণতা তাকে উদ্দীপ্ত না করত।

আমাদের পোশাক বলা বাহুল্য এরকম ঠাণ্ডার উপযোগী ছিল না, কেননা এমন ঠাণ্ডার কথা ভাবতে পারিনি। প্যারী বা লণ্ডনে যখন গিয়েছিলাম, তখন সেসব দেশে বসন্তকাল। কাজেই ঠাণ্ডাটা সহনীয় ছিল। আফ্রিকার যে দেশে ছিলাম, উগাণ্ডার কাম্পালায়, সেখানে তো সারা বছর একই আবহাওয়া। আমাদের দেশের ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকের মত। ওইটেই ছিল আমাদের বিদেশ যাত্রার প্রথম আবহাওয়ার অভিজ্ঞতা। তাই কলকাতার ভাদ্রের ভ্যাপসা গরমে কষ্ট পাওয়া মানুষের পক্ষে প্রথম বিদেশ যাওয়ার আর বিদেশী আবহাওয়ার কথা ভেবে মনে মনে আনন্দিত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। ক্রাইস্ট চার্চ বিমানবন্দরে নেমে যখন চতুর্দিকের মানুষদের গায়ে মোটা মোটা নানারকমের গরমের পোশাক দেখলাম তখন বুঝলাম এ আবহাওয়া সে আবহাওয়া নয়। শীতের ভয়টা তাইতে আরও বেড়ে গেল। আমাদের, বিশেষ করে আমার স্ত্রীর গায়ে গরমকাপড়ের অপ্রাচুর্যের কথা ভেবে গরম করা ঘরেই শীতে প্রায় কাঁপতে শুরু করলাম। আমাদের পরনে সোয়েটার, গরম কোট ও ওভারকোট প্রভৃতি যে সব পোশাক ছিল তা সবই কলকাতার শীতের উপযোগী। তা এখানকার শীতের পক্ষে এখানকার লোকের কাছে অপ্রচুর বলে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

বিমানবন্দরে একজন বৃদ্ধা জার্মান ইহুদি মহিলার (বর্তমানে এদেশবাসী) সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। আমার স্ত্রীর পোশাক দেখে বললেন, "তোমার ত' খুব কষ্ট হবে না এই ঠাণ্ডায় এই পোশাকে। যদি কিছু মনে না কর তবে আমার এই গরম কোটটা দিচ্ছি। ডান-ইডনে পৌঁছে সুবিধেমত আমাকে ফেরত দিও। আমার ঠিকানা ও ফোন নম্বর তোমাকে দিচ্ছি। তাছাড়া ইউনিভার্সিটিতে আমিও যোগাযোগ করে নেব।"—শুনে সবারই অভিভূত হবার কথা, আমরাও হয়েছিলাম। কিন্তু ভারতের বাইরে সকলেই ভারতীয়দের দারিদ্র্যের জন্যে করুণা করে দেখেছি। এ প্রসঙ্গে সে কথাও মনে হ'ল। তাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর মনে কোন কষ্ট না দিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করি। ডান্-ইডনে পৌঁছে ভদ্রমহিলা টেলিফোনে এবং নিজে এসে আমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা খোঁজ নিয়ে গেছেন। বিদেশী মানুষের কাছে এমন আন্তরিকতা অমূল্য। এ কদিনে এমন আন্তরিক সহানুভূতির অনেক ঘটনার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। তাই বার বার মনে হচ্ছে এখানকার শীত যত প্রচণ্ডই হোক না কেন এখানকার আবহাওয়া যত অশান্ত ও কষ্টদায়ক হোক না কেন এখানকার মানুষগুলির আন্তরিকতা ও উদারতা তার চেয়ে অনেক বেশী উত্তপ্ত ও অনুকূল—সেজন্যে এখানে নানা জাতের লোক থাকা সত্ত্বেও বোধহয় আজ পর্যন্ত কোন বিদ্বেষ দেখা যায়নি। এ দেশ সম্পর্কে প্রথম দর্শনে তাই শেক্সপীয়রের "Here shall be see no enemy but winter and rough weather." উক্তিটি খুব প্রযোজ্য মনে হল।

এখানকার একটা বিষয় সবচেয়ে লক্ষণীয়—তা হ'ল বর্ণবিদ্বেষের কোন অস্তিত্ব নেই। দুটি প্রধান বর্ণ—বাদামী (মাওরি) এবং সাদা (অর্থাৎ ইংরেজ ও অন্যান্য য়ুরোপীয় আগন্তুকেরা, যাদের মাওরিরা বলে পাকেহা) মানুষদের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা, কর্মসংস্থান

---

* বর্তমানে নিউজিল্যাণ্ডের দঃ দ্বীপের সর্ববৃহৎ শহর ক্রাইস্ট চার্চ। ক্রাইস্ট চার্চ নামকরণের পেছনে একটা কিংবদন্তী এখানে প্রচলিত আছে। বলা হয়, এখানে বসবাস করবার জন্য যে ইংরেজ ভদ্রলোক প্রথম এসেছিলেন তিনি এখানকার পোর্ট হিল পাহাড়ের চূড়োয় উঠে উজ্জ্বল সমতলভূমি দেখে বিস্ময়ে "ওঃ ক্রাইস্ট চার্চ" বলে চিৎকার করে উঠেছিলেন। তাই থেকে এ নামের প্রচলন। এ শহরটা অত্যন্ত ইংলিশ (It is very very English)।

ও আর্থিক কোন ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য কোথাও চোখে পড়ে না।

এ-দেশের শুল্ক বিভাগের ক্ষেত্রে এক নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল। এরা অন্য জিনিসপত্র কোন কিছু তেমন দেখল না—কেবল ব্যবহৃত জুতো ও স্লীপারগুলি ছাড়া। এগুলি নিয়ে গেল বিমানঘাঁটির এক পরীক্ষাগারে। কিছুক্ষণ পর প্যাকেটে মুড়ে সেগুলি ফেরত দিয়ে গেল। খুবই বিস্মিত হলাম, বিশেষ করে যখন দেখলাম নতুন কেনা দু' জোড়া স্লীপার ও জুতো তারা স্পর্শও করলে না। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ব্যবহৃত জুতো এরা শোধন করে দেয়। এ ব্যবস্থাটা এদেশের কৃষি বিভাগ থেকে করেছে। এখানকার পশুদের মুখ ও পায়ের রোগের প্রতিরোধক হিসেবে। এদেশের অর্থনীতির বড় অংশ পশুপালন নির্ভর। পশম ও মাংস এদেশের অন্যতম রপ্তানি পণ্য এবং এদের সমৃদ্ধির মূলে এই রপ্তানি জাত আয় রয়েছে। তাই এত সতর্কতা।

আমরা ক্রাইস্ট চার্চ থেকে সন্ধ্যা ছটায় প্লেনে রওনা হই, রাত ন'টায় [illegible] বিমানবন্দরে [illegible] যেন ভাল ছিল। [illegible] (Motel) [illegible] ভেবেছিলাম, বিমানবন্দরে [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কেউ [illegible] এই শহরে এলাম। [illegible] বিমানবন্দরে নামতেই [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] আমাদের [illegible] একটি, [illegible] নীতির অধ্যাপক। একজন [illegible] লোক, নাম ডঃ জন চাইল্ড। অপরজন [illegible] ডঃ জন চাইল্ড। প্রথম সম্ভাষণের পর প্রথম কথাই উঁরা বললেন, "আমরা [illegible] দিন নিউজিল্যাণ্ডে থেকেও এই [illegible] তোমাদের [illegible] পোশাকে [illegible] সাহস পেলাম না। আমাদের বলতে হবে, [illegible] ছিল না। তাহলে আমরাও দুঃসাহস করতাম না।" কথা বলতে বলতেই দেখি ডঃ জন চাইল্ড আমাদের প্রত্যেকটি ২০ কিলো ওজনের দুটি স্যুটকেশ অম্লানবদনে ঘাড়ে করে ছুটলেন তাঁর গাড়ির দিকে এবং বললেন, "ছুটে এস, গাড়িতে হীটারের ব্যবস্থা আছে।" বিস্ময়ে যেমন অভিভূত হলাম তেমনি লজ্জিত বোধ করলাম। ভাবতে চেষ্টা করলাম আমাদের দেশে এই পরিস্থিতি হলে কি করা হত? অবশ্য আমাদের দেশে মাল বহার লোকের

অভাব নেই। কাজেই ঠিক হুবহু এই সমস্যা হয়ত হ'ত না। তবে এটা ঠিক, এই পরিস্থিতিতে শীতের কথা কিছুতেই মনে থাকবার নয়। তাই বলছিলাম হৃদয়ের উত্তাপের কাছে নিউজিল্যান্ড কেন, দক্ষিণ মেরুর শীতকেও হার মানতে হবে।

নিউজিল্যান্ডে এখন শীতকাল। এখানকার আবহাওয়া আমাদের দেশের ঠিক উল্টো। জুন, জুলাই, অগাস্ট এখানকার শীতকাল এবং ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী গ্রীষ্মকাল। তবে গ্রীষ্মকাল সম্পর্কে আমাদের জানা সংজ্ঞা বোধ হয় এখানকার বেলায় প্রযোজ্য নয়—কেননা গ্রীষ্মকালেও এখানকার ঠাণ্ডার বহর শীতের কাছাকাছি থাকে—কোন কোন সময় বরফও পড়ে। অবশ্যই নিউজিল্যান্ডের উত্তরাঞ্চল দক্ষিণাঞ্চল থেকে উষ্ণতর। এই পার্থক্য এই দুটি অঞ্চলের আর্থনীতিক বিবর্তনের পার্থক্যের একটি কারণও বটে। অবশ্য নিউজিল্যান্ডের বিবর্তনের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ ১৯ শতকের শেষে এদেশের সর্বাপেক্ষা বড় ও ধনী শহর ডান-ইডেন দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত। কিন্তু পরবর্তীকালে এ শহর এদেশের চতুর্থ শহরে পরিণত হয়। উত্তরাঞ্চলের ওয়েলিংটন ও অকল্যান্ড আজ রাজনীতিক, আর্থনীতিক ও শিক্ষাগত দিক দিয়ে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র বলে গণ্য। তৃতীয় শহর [illegible] ক্রাইস্টচার্চ। দক্ষিণাঞ্চলে যেমন শীত বেশী উত্তরাঞ্চলে তেমনি বৃষ্টি হয় [illegible] দুটি অঞ্চলের রেষারেষিরও [illegible] নেই। তাই একটা কথা এখানে প্রচলিত, দক্ষিণাঞ্চল থেকে উত্তরাঞ্চলকে পৃথক করে রেখেছে a stretch of [illegible] sea and a lot of jealousy। (উত্তর ও দক্ষিণ দ্বীপের মধ্যেকার কুক প্রণালীকে উদ্দেশ্য করে বলা)। দক্ষিণ দ্বীপের লোকেরা মনে করে, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে চায় না তারাই [illegible] উত্তর দ্বীপের অধিবাসী।

কলকাতার মানুষ আমরা। আমাদের [illegible] সচেতনতা নেই এবং থাকবার [illegible] কারণও নেই। কিন্তু এখানে এসে [illegible] বৃষ্টি ও অকল্পনীয় ঠাণ্ডার [illegible] থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য রোদের [illegible] প্রথম ক'দিন ঘুম থেকে উঠে রোজই [illegible]। অবশ্য ৩।৪ দিনের মধ্যেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে রোদ উঠল—পাহাড়ে ঘেরা [illegible] শহরটা রোদে ঝলমল করে উঠল। [illegible] ঘর থেকেই ইস্পাত রং-এর প্রশান্ত মহাসাগরকে পরিষ্কার দেখলাম সেদিন। এমন উজ্জ্বলতা বোধহয় আগে কোথাও দেখিনি। মনে হয় মাওরিরা এমন একটা দিনেই এদেশটাকে দেখেছিল এবং আনন্দে [illegible] হয়ে বলে উঠেছিল 'আওতিয়ারোয়া' (A Long bright Land)। অবশ্য

একটি মাওরি বালক

আওতিয়ারোয়ার সাম্প্রতিক ইংরেজী তর্জমায় বলা হয়েছে A Land of a long white cloud—শীতের দিনে দেখা আওতিয়ারোয়া সম্বন্ধে এ উক্তি প্রযোজ্য। সেপ্টেম্বর থেকে এখানে বসন্ত শুরু। আকাশ ক্রমশই পরিষ্কার হয়ে আসছে, সূর্যকে প্রতিদিনই দেখছি। রোদে ঝলমল দিনগুলির প্রথমদিকে এখানকার মানুষের মধ্যে অদ্ভুত এক উল্লাস দেখেছি। বাসে, রাস্তায়, দোকানে চেনা অচেনা সকলকে ডেকে ডেকে এরা সোল্লাসে বলেছে, আঃ কি সুন্দর উজ্জ্বল দিন! দেখেছো? এ স্বভাবটাও ইংরেজদের অনুকরণে গড়া—অবশ্য প্রচণ্ড শীতের পর সুন্দর উজ্জ্বল দিনগুলি দেখলে সবারই উল্লসিত হবার কথা। কিন্তু পথে-ঘাটে চেনা-অচেনা লোককে ডেকে সুন্দর দিনের কথা কলকাতার লোক বলে না। কলকাতাতেও দিনের পর দিন প্রবল বর্ষণের পর যখন আকাশ পরিষ্কার হ'ল তখন কি একদিনও আমরা পথের মানুষ দূরের কথা চেনা লোককেই ডেকে বলেছি আহা দেখ কি সুন্দর দিন! মনে তো হয় না। ঠাণ্ডার প্রকোপ কিন্তু এখনও তেমন কমেনি। উত্তাপ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ডিগ্রীর মধ্যে এখনও ওঠানামা করে। রাতে ইলেকট্রিক ব্ল্যাংকেট এবং ঘর গরমের ব্যবস্থা না হলে আমাদেরও চলতো না।

একটা কথা বলা হয়নি। যত খারাপ আবহাওয়াই এখানে হোক না কেন যদি কেউ বলেন, উঃ কি Bad weather তাহলে এখানকার লোক দুঃখিত হন। আবহাওয়া খুবই খারাপ হ'লে এ'রা বড় জোর Rough weather পর্যন্ত নামতে রাজী আছেন।

কলকাতার মানুষের চোখে যানবাহন ব্যবস্থা প্রথমেই চোখে পড়ে। এখানে নিজেদের গাড়িতে চলাচলই বোধহয় অধিক—কেননা ট্যাক্সি বা বাসের সংখ্যা বেশী দেখিনি। ট্যাক্সিগুলি সুন্দর ও বেশ বড়, ভাড়াও খুব বেশী। মোটামুটি একটা অনুমান করা চলে এইভাবে। ধরুন, শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড় থেকে ট্যাক্সি নিলেন, যাবেন শিয়ালদা। লাগবে ৫ টাকার মত। তবে কলকাতার মত ট্যাক্সির জন্যে রাস্তায় ছোটাছুটি করবার দরকার নেই। অধিকাংশ রাস্তাতেই মাঝে মাঝে ট্যাক্সিশেড মত রয়েছে। সেখানে বসবার সুন্দর ব্যবস্থা। ঐ শেডে ঢুকে দেখা যাবে একজন পরিচারক আছেন, তাঁকে গন্তব্যস্থানটি জানিয়ে বসবার জায়গায় গিয়ে অপেক্ষা করতে হয়। দেখবেন অনেকেই অপেক্ষা করছে—এর জন্যে কিছু দিতে হয় না। ট্যাক্সির মধ্যে টেলিফোনের ব্যবস্থা আছে—তার সাহায্যেই এরা খবর পায় ও নির্দিষ্ট ট্যাক্সি-শেডে আসে। আপনার পালা এলে ওরা ডেকে দেবে এবং আপনার সঙ্গে যত ভারী মালই থাক না কেন ট্যাক্সিড্রাইভার নিজে ঘাড়ে করে ট্যাক্সিতে তুলে দেবে; এর জন্যে কিছু দিতে হয় না। অবশ্য, বলা বাহুল্য, ভাড়াতেই তা উঠে যায়। ড্রাইভারদের পোশাকপরিচ্ছদ ও চালচলন সবই বেশ উঁচুদরের।

তবে বাসের ব্যবস্থা সত্যিই লক্ষণীয়। বাদুড়-ঝোলা বাসে চলাফেরা করা মানুষ আমরা যখন দেখি, প্রায় সবসময়েই বাসে অর্ধেক থেকে সিকি ভাগ সিট খালি তখন কলকাতার আমাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের কথা ভেবে বড় কষ্ট বোধ করি। এ আমাদের প্রথম দর্শনের অনুভূতি। আর একটু ভাল করে লক্ষ করতেই আর একটা বিষয় চোখে লাগল। বাস-যাত্রীদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক, তাদের মধ্যে আবার বৃদ্ধাদের সংখ্যাই বেশি। অল্পবয়স্কা যারা আছে তাদের সঙ্গে রয়েছে তাদের ৪।৫ মাসের থেকে ১০।১২ বছরের ছেলে মেয়ে। মনে হয় এই অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কারা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের জন্যেই বাসে চড়েছেন, না হ'লে হেঁটেই যেতেন। প্রত্যেকটি বাসের সম্মুখে প্যারামবুলেটার বহন করবার ব্যবস্থা আছে। এখানকার অনেকগুলি বাসেই চড়েছি এবং দেখেছি তাতে অতি অল্পসংখ্যক পুরুষ যাত্রী এবং তাদের প্রায় সবাই বৃদ্ধ। এর পেছনে মনে হয় দুটি কারণ আছে। একটি হ'ল, দীর্ঘসময়ের ব্যবধানে বাস আসে এবং চলেও মন্থর-গতিতে। সে সময়ের মধ্যে অল্পবয়স্ক যুবক-যুবতী, ছেলেমেয়েরা হেঁটেই গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারে। শহরটা ছোট এবং পথে ভীড় কম। আর শীতের দেশের মানুষ। হেঁটে যেহেতু শরীর গরম রাখতে চান। তাছাড়া [illegible]—এ'রা স্বভাবে

অত্যন্ত স্বচ্ছ—কাজেই যতটা পারে ব্যয় সংকোচ করে চলে। একদিনের কথা মনে পড়ছে। আমরা যাব ইউনিভার্সিটিতে। স্ট্যান্ডে বাসের জন্য অপেক্ষা করে আছি। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকও দাঁড়িয়ে আছেন, যাবেন একই বাসে। আগেই বলেছি এ'রা খুব মিশুকে। বিদেশী দেখলেই এগিয়ে আসবেন কথা বলতে। ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে এবং উজ্জ্বল দিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যাবে তোমরা?" বললাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ—"নামবে কোন খানে?" ইউনিভার্সিটির সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী স্টপের কথা বললাম। ভদ্রলোক বললেন, "এখানে নামবে কেন? তাতে ত ১০ সেণ্ট লাগবে। এক স্টপ আগে নামলে ৫ সেণ্টেই হবে। একটু বেশি হাঁটতে হবে এই যা।" ভদ্রলোকই আমাদের এই নতুন স্টপটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের কিন্তু শীতের মধ্যে যতটা সম্ভব পথ বাসেই যেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু ভদ্রলোক দুঃখিত হবেন ভেবে ঐখানেই নামলাম। এখানকার বাসকে বলে ট্রলিবাস। ইলেকট্রিকে চলে। আমাদের দেশের ট্রামের মত।

স্বভাবতই ট্রামের মত লাইন নেই। রোমেও দেখেছি এমন বাস। কিন্তু এখানে বাস চলে খুব ধীর গতিতে। যেতে যেতে খুব বিরক্তি বোধ হয়। আর একটি কথা হল, এখানকার বাসের ভাড়াও খুব বেশি—ধরুন গড়িয়াহাটের মোড় থেকে যাবেন রাসবিহারী ও আশুতোষ মুখার্জী রোডের সংযোগে লাগবে ৫ সেণ্ট অর্থাৎ ৪০ পয়সা মত। পদযাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধির মূলে এইটেও একটা কারণ। বাসে যাত্রীর সংখ্যা কম বলে এখানকার বাস ব্যবস্থা তার খরচ পোষাতে পারে না, লোকসান দিতে হচ্ছে। মনে হয়, ভাড়া কমালে যাত্রীর সংখ্যা বাড়ে—তাতে আয় বাড়ে বটে, কিন্তু খরচ বাড়বে না। এটা কেন যেন এঁরা করেন না বুঝতে পারলাম না।

এদেশে আসবার আগে পৃথিবীর মানচিত্রটা একবার দেখছিলাম। মানচিত্রের একেবারে শেষপ্রান্তে ছোট দুটি ফুটকি দেওয়া দুটি জায়গা খুঁজে পাওয়া ভার। কেউ যেন তখন বলেছিলেন, দেখ জাহাজে যেও না; কেননা অতদিনে হয়ত গিয়ে দেখবে, দেশটা সমুদ্রের ঢেউয়ে ডুবে গিয়েছে। প্লেনেই যাও। কথাটা নিতান্তই রহস্য করে বলা। কিন্তু এখানে এসে দেখি, এখানকার মানুষের মনে নিউজিল্যাণ্ডের আয়তন ও অবস্থান নিয়ে বেশ একটু হীনমন্যতার ভাব রয়েছে। তাই এখানকার রাজনীতিবিদদের সর্বদাই চেষ্টা to put New Zealand on the map। এ কথাটা এখানে খুব প্রচলিত। অবশ্য কথা অনুযায়ী কাজও তাঁরা করছেন। পৃথিবীতে সব জায়গায় সবরকম সম্মেলন, মিটিং হচ্ছে প্রায় সব জায়গাতেই এঁদের মন্ত্রীরা উপস্থিত। সম্প্রতি এদেশের প্রধানমন্ত্রী সহ ৮জন মন্ত্রীই বিদেশে নানা সভা সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছেন। অধিকাংশেরই বিদেশে উপস্থিতিকাল এক মাসেরও বেশি। এই সময় দেশে থাকবেন মাত্র দুজন। সম্প্রতিকালে বৈদেশিক মুদ্রাগত সংকট থাকলেও মন্ত্রিমহোদয়দের এই বিদেশ যাওয়া বাবত বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় নিয়ে দেশে সাধারণ মানুষ বা বিরোধী দলের মধ্যে কোন সমালোচনা দেখা গেল না।

এদেশের আয়তন' ও অবস্থান নিয়ে এখানে একটা খুব উপাদেয় কৌতুক প্রচলিত আছে। এদের ভয়, ভূমণ্ডলের মানচিত্রকরেরা যদি আঁকবার সময় ভুল করে মানচিত্রে এদেরকে বাদ দেয় বা এদেশের মানচিত্রের উপর কোন বিজ্ঞাপন সেঁটে দেয় তাহলে এদের অবস্থা কি হবে?

পৃথিবীতে যখন মিশর, ভারত, চীন, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে বড় বড় সভ্যতার উত্থান ও পতন ঘটেছিল তখনও আজকের নিউজিল্যাণ্ড বলে পরিচিত দ্বীপপুঞ্জে কোন জনমানব ছিল না, সভ্যতা ত দূরের কথা।

মাত্র ১৫০০ বছর আগে আওরি নামে এক পলিনেশীয় জাতি নিউজিল্যাণ্ড প্রথম আবিষ্কার করে। এরা আসে হাইতির কাছাকাছি ছোট ছোট দ্বীপগুলি থেকে। কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের দু' শ' বছর আগেকার এ ঘটনা। মাওরিদের এই বিচিত্র অভিযানের কাহিনী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক—প্রসঙ্গান্তরে তা বলা যাবে।

মাওরিরা সেদিন নিউজিল্যাণ্ডের নাম দেয় ওদের ভাষায় আওতিয়ারোয়া অর্থাৎ একটা লম্বা উজ্জ্বল দেশ (The long bright Land)। আগে বলেছি, মনে হয় পরিষ্কার আবহাওয়ার কোন শুভক্ষণে মাওরিদের এ-দেশে প্রথম পদার্পণ ঘটে, তাই ঐ নামকরণ ঘটে। আওতিয়ারোয়া আজও উজ্জ্বল। তবে বছরের সব দিন নিশ্চয়ই নয়। প্রখ্যাত সাহিত্যিক মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিউজিল্যাণ্ডের স্বল্প কথায় বর্ণনাটা মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন, a small but long country। আমরা যারা সেদিন একথাটা শুনি তাদের সবারই কথাটা খুব ভাল লেগেছিল। মনে হয়েছিল কোন কবিতার অংশ বুঝি। এদেশে আসবার পর প্রথম কদিনের অভিজ্ঞতায় মাওরিদের 'লম্বা উজ্জ্বল দেশ' নামটা দাগ কাটতে পারেনি। সে কদিন মোহনলালবাবুর বর্ণনাটাই বারবার মনে পড়েছে। অবশ্য কদিন বাদে আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে এলে দেশটা সত্যিই ঝলমলে হয়ে উঠল।

য়ুরোপীয়দের আবির্ভাবের পর আওতিয়ারোয়া হল নিউজিল্যাণ্ড, প্রায় সওয়া তিন শ' বছর আগে। প্রথম য়ুরোপীয় যাঁর এই দ্বীপপুঞ্জের উপর দৃষ্টি পড়ে তিনি হলেন বিখ্যাত ওলন্দাজ অভিযাত্রী আবেল তাসমান (Abel Tasman)। সেটা ছিল ১৬৪২ সন। তাসমান সাহেব স্বদেশ হল্যাণ্ডে তাঁর জন্মস্থান নিউজিল্যাণ্ডের নামানুসারে এই দ্বীপগুলির নাম রাখলেন নিউজিল্যাণ্ড। অবশ্য তাসমান সাহেব নিউজিল্যাণ্ডে বসবাস করতে পারেন নি—মাওরিদের বিরোধিতার ফলে স্বদেশে ফিরে যান। এরপর ১৭৬২ সালে এলেন বিখ্যাত আবিষ্কারক টমাস কুক। তিনি এসে মাওরিদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেন। তারপর থেকে দলে দলে ইংরেজরা এসে এখানে বসবাস শুরু করে এবং ক্রমশ ১৮৪০ সালে নিউজিল্যাণ্ড ইংলণ্ডের উপনিবেশে পরিণত হল।

আজ এদেশের মোট জনসংখ্যা সাড়ে সাতাশ লক্ষ, তার মধ্যে শতকরা ৯৭ ভাগই য়ুরোপীয় এবং বাকী শতাংশ প্রথম অধিবাসী মাওরি। অবশ্য মাওরিদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। উত্তরাঞ্চলে প্রায় সব মাওরিদের বাসস্থান, দক্ষিণে সচরাচর চোখে পড়ে না। সামান্য কিছু সামোয়াবাসী ভারতীয় ও চীনা অধিবাসী আছে। ভারতীয়দের সংখ্যা ৬০০০ মত। এদের শতকরা ৯৯জন শাক-সবজীর ও ফলের ব্যবসায়ী—আর কিছু সংখ্যক শিক্ষক, অধ্যাপক ও চিকিৎসক। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই গুজরাটবাসী। আর আছে কিছু সংখ্যক ফিজিবাসী ভারতীয় ও মালয়েশীয়। দেশের মোট জনসংখ্যার ৬০ ভাগেরও বেশি উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী। উত্তর দ্বীপ অপেক্ষাকৃত উন্নত। সম্ভবত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী ও যোগাযোগ অপেক্ষাকৃত সহজ বলে এবং দক্ষিণ দ্বীপের তুলনায় অনুকূল আবহাওয়াই উত্তর দ্বীপের অধিকতর উন্নতির মূলে রয়েছে। আগেই বলেছি উত্তর দ্বীপে নিউজিল্যাণ্ডের সর্ববৃহৎ বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্র অকল্যাণ্ড এবং রাজনৈতিক কর্মকেন্দ্র রাজধানী ওয়েলিংটন অবস্থিত।

অবশ্য ১৯ শতকের শেষভাগে নিউজিল্যাণ্ডের সর্ববৃহৎ প্রদেশ দক্ষিণ দ্বীপের ওটাগোর রাজধানী ডান-ইডুন সর্বাপেক্ষা উন্নত ও সমৃদ্ধ ছিল। নিউজিল্যাণ্ডে ডান-ইডুনেই প্রথম শিল্পের পত্তন ঘটে। শহরটির সেদিন এই সমৃদ্ধির মূলে ছিল ১৮৬৪ সালে ওটাগো প্রদেশে সোনার খনির আবিষ্কার। কিন্তু পরবর্তীকালে এই শহরের অবনতি ঘটে এবং আজ তা নিউজিল্যাণ্ডের চতুর্থ শহরে পরিণত হয়েছে।

এ-দেশটাকে ইংলণ্ডের ধাঁচে গড়ে তোলবার প্রথম থেকেই চেষ্টা করা হয়েছিল, তার প্রভাব নিউজিল্যাণ্ডের প্রত্যেকটি শহরে চোখে পড়ে। ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, রাস্তাঘাটের নাম, চার্চ, লোকজন ও তাদের পোশাক পরিচ্ছদ সব যেন ইংলণ্ডের একটা কার্বন কপি। কোন খুঁত নেই। স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী যেমন এডিনবরা, ওটাগো প্রদেশের রাজধানী তেমনি ডান-ইডুন। ১৮৪০ সালে

স্কচ আগন্তুকরা (Scotch Settlers) এ শহর প্রতিষ্ঠা করে এবং স্কটল্যান্ডের ফ্রি চার্চের পরিকল্পনানুযায়ী এ শহরটা গড়ে তোলা হয়। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়, চার্চ প্রভৃতি দেখলে মনে হয় যেন এডিনবরা থেকে তুলে এনে বসানো। শুধু ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট নয়, এখানকার লোকগুলির স্বভাবে স্কচদের অদ্ভুত মিল রয়েছে। এখানকার লোকদের কৃপণ স্বভাবের কথা অজানা নেই কারও। ডান-ইডনের লোক শুনলেই অন্য লোক বলে they are very Scotch এবং সঙ্গে সঙ্গে হাত মুঠি করে বুঝিয়েও দেবে সে কি বলতে চায়। এই শহরে অবস্থিত ওটাগো বিশ্ববিদ্যালয় নিউজিল্যান্ডের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত।

আবার অন্য তিনটি বড় শহর অর্থাৎ অকল্যান্ড, ওয়েলিংটন এবং ক্রাইস্ট চার্চে ইংলিশমানদের সংস্কৃতির প্রভাব বেশ লক্ষণীয়।

নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল—এখানে ছোটখাট চুরি নেই। শহরের লোকেরা তাদের ঘর বাড়িতে তালা না দিয়েই তাদের কাজে বেরিয়ে যায় কিন্তু কোনও দিন কিছু চুরি যায় না। আমরা প্রথম যেদিন এলাম সেদিন রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি তালা বা ছিটকিনির কোন ব্যবস্থা নেই। বাড়ির পরিচারিকাকে জিজ্ঞেস করায় সে বললে, এখানে দরজায় তালা দেবার প্রয়োজন হয় না। কারণ, এ-দেশে সাধারণ কোন চুরি নেই। প্রথমে বিশ্বাস করিনি। কিন্তু ২।৩ দিন পরেই দেখি শুধু এ বাড়ি নয় পরিচিত প্রায় সকলের বাড়িতেই ওই ব্যবস্থা। এখানে দারিদ্র্য নেই এবং সবারই কাজ আছে। যাদের নেই তাদের সরকার থেকে মাসিক ভাতা দেওয়া হয়। ছেলেমেয়েদের পড়ার খরচও বহন করে সরকার। লোকসংখ্যা কম বলে স্ত্রীপুরুষ সকলেই কিছু না কিছু কাজ করে। ঘরের কাজ করবার লোক পাওয়া যায় না। অবশ্য সেই কারণে জীবনযাত্রার সর্বক্ষেত্রেই যন্ত্রের প্রভাব দেখা যায়। প্রতিটি বাড়িতেই কাপড় ধোয়ার যন্ত্র, ঘর পরিষ্কার করার যন্ত্র, বাসন ধোয়ার অতি সুবিধে-জনক ব্যবস্থা, ইলেকট্রিক বা গ্যাসচুল্লী রয়েছে। এখানে জনসংখ্যা কম বলে মজুরী খুব বেশি, কাজেই ঘরের কাজের জন্য লোক রাখার ক্ষমতা খুব কম মানুষেরই আছে। তা ছাড়া, অফিসে, দপ্তরে, কারখানায় চাষ-বাসের ক্ষেত্রে মজুরী অনেক বেশি—তাই এসব ক্ষেত্রে বাইরে কাজ করবার লোক পাওয়াই দুষ্কর। বাড়ির ছেলেমেয়েরা অল্প বয়স থেকেই যন্ত্র চালিয়ে ঘরের কাজ করতে অভ্যস্ত। এদেশের মাথাপিছু আয় প্রায় ১২০০ ডলার (নিউজিল্যান্ডের এক ডলার ≈৮ টাকা মত—মার্কিন ডলারের অপেক্ষা নিউজিল্যান্ড ডলারের মূল্য সামান্য বেশি) ইংলন্ড প্রভৃতি অনেক উন্নত দেশের চাইতে বেশি। এদিক থেকে দেশটাকে অতি উন্নত অর্থনীতির দেশের পর্যায়ে ফেলা যায়—কিন্তু যদি আমরা এদেশের উৎপাদনের চরিত্র বিশ্লেষণ করি তা হলে আমাদের দেশের চেয়েও অনুন্নত বলা চলে। এদের অর্থ-নৈতিক উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্রই কৃষি এবং পশুপালন (pastoral); বরং পশুপালনই এদের অর্থনীতির প্রধান নির্ভর। এখানকার কৃষকগোষ্ঠী (farmer) দেশের রাজনৈতিক ও আর্থিক নীতি নির্ধারণ করে থাকে। ভেড়ার লোম, মাংস, গরুর দুধ, চিজ মাখন এদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। এবং এই রপ্তানিজাত আয় এদেশের সমৃদ্ধির প্রধান ভিত্তি। এই রপ্তানির চাহিদার উত্থান পতন এদেশের অর্থনীতিতেও সংকট সমৃদ্ধির সৃষ্টি করে। গত ২।৩ বছরে পশমের চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারে হ্রাস পাওয়ায় এদের অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিয়েছে। কিছুকাল ধরে বেকারের সংখ্যাও বেড়েছে—প্রায় ১০ হাজার। তবে বেকার ভাতার ব্যবস্থা থাকায় তেমন সংকট সৃষ্টি করেনি এখনও। অবশ্য আজ এ-দেশের রাষ্ট্রনায়করা আর্থনীতিক পরিকল্পনার কথাও ভাবছেন। কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত এদেশে আর্থনীতিক পরিকল্পনা একটা অত্যন্ত নোংরা কথা বলে গণ্য হত। আর আজকেও যে পরিকল্পনার কথা বলা হচ্ছে, তা সোভিয়েট ধাঁচের কথা দূরের কথা, ভারতের মতও নয়। এঁরা কোন নিয়ন্ত্রণ ভিত্তিক আর্থিক পরিকল্পনার কথা আজও ভাবতে পারেন না। এঁরা যে পরি-কল্পনার কথা ভাবছেন তা হল Target planning।

কিন্তু নিউজিল্যান্ডের রাজনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির কয়েকটি ক্ষেত্রে সে যে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে রয়েছে সে সম্পর্কে উল্লেখ না করলে আজকের চিঠি অসমাপ্ত থাকবে।

নিউজিল্যান্ড খুব ছোট্ট দেশ [illegible] পৃথিবীতে প্রথম এদেশে সার্বিক ভোটাধিকার প্রবর্তন করা হয় এবং নারীর ভোটাধিকারও এদেশে পৃথিবীতে প্রথম স্বীকৃত হয় ১৮৯৩ সালে।

তা ছাড়া পৃথিবীর মধ্যে এদেশে প্রথম ১৮৯৪ সালে শ্রমিক মালিকের মধ্যে শান্তি-পূর্ণ সম্পর্ক রক্ষার জন্য জাতীয় সালিস ব্যবস্থা এবং ১৮৯৮ সালে বৃদ্ধ বয়সের ভাতার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এ গেল ১৯ শতকের কথা। বিশ শতকেও সামাজিক কল্যাণের ক্ষেত্রে এদেশ সর্বাগ্রগণ্য। পৃথিবীতে এই দেশেই প্রথম ১৯০৭ সালে জাতীয় শিশুকল্যাণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় এবং সোভিয়েট দেশ ছাড়া এদেশেই প্রথম ১৯৩৮ সালে সুসংবদ্ধ সামাজিক বীমা-ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। এতে বেকার ভাতা, বিনাব্যয়ে সার্বিক চিকিৎসা, হাসপাতাল ও মাতৃসদন ব্যবস্থা, পরিবার ভাতা এবং বৃদ্ধ ও বিকলাঙ্গ ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। এ-দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থনীতিক জীবন বড় বিচিত্র। এ নিয়ে পরে লিখবার ইচ্ছে রইল।

প্রিয়তোষ মৈত্রেয়

কুবেরের বিষয়আশয়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

ছয়

বায়নার বয়ানে ছিল, '১ মাহার মধ্যে পণের অবশিষ্ট' টাকা দিয়ে সাফ কোবালা লেখাতে হবে। কুড়ি দিন পার হয়ে গেল। কুবের বাকি দেড় হাজার কিছুতেই জোগাড় করতে পারল না। পাড়ার কাবুলি-দের লিডার গোছের তিন মণ ওজনের এক খাঁ সাহেব তার অনেক দিনের বন্ধু। সে বলতেই রেডি। কিন্তু বুলু পই পই করে বলল, 'তাহলে ডুববে তুমি—'

এক মাস পুরতে দিন পাঁচেক বাকি থাকতে কুবের কদমপুর গিয়ে দেখে, হরি বাগ তার খুঁটো পোঁতা জমির হাত দশেক ভেতরে পিলার পুঁতে তার লাগোয়া জমির দখল নিয়েছে। চটিরাম বলল, 'কী করব বাবু? আজ দু' কুড়ি বছর চাষ দিয়ে আসছি—ও জায়গা আমার। বাগ মশাই তো মানা না শুনেই পিলেপ বসিয়ে দিলে শনিবার।'

বাগের সঙ্গে দেখা করলে কুবের। লোকটা আইন বোঝে, কোর্টে কাজ করে। চা খাওয়াল কুবেরকে, তারপর বলল, 'আমি মেপেই পিলার দিয়েছি—ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা কাঠা দুই জায়গা খেয়ে ফেলেছে। সেটুকু সব শরিকের ঘাড়ে ভাগ দিয়ে আমার কেনা অংশটুকু সব পাচ্ছিলাম না। তাই চটিরামের গা থেকে খুঁজে বের করে তবে পিলার দিলাম।'

কুবের বুঝল, হরি বাগের সঙ্গে পারা যাবে না। আর চটিরামেরও জায়গা অন্য কেউ কিনুক হরি চায় না। কেননা, হরির ওটা পেতেই হবে। এদিকে তারও বাকি টাকা জোগাড় হয়নি। স্টেশনে ফেরার পথে চটিরামকে বলল, 'আপনি দখল দিতে পারছেন না—আমি কিনব কি করে?'

'হরেনবাবু উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি মামলা ঠুকে আপনাকে দখল দেব।'

'ততদিন আমি বসে থাকব?' এবারে উল্টো চাপ দিল কুবের, 'আমি কিনব বলে তৈরি—পাঁচ দিনের ভেতর দখল দিন, আমি কিনছি।'

'সে আমি কোত্থেকে পারব—শরীরটাও হেলে গেছে ক'দিনের ঠান্ডায়—'

—কুবের বলতে যাচ্ছিল, গত বছর জমির বিঘে ছিল আড়াই হাজার। সে জিনিস ক'দিনের তফাতে সাত হাজারে ছাড়ছো!—তখন শরীরের কথা মনে ছিল না? কিন্তু এসব কিছুতেই বলতে পারল না। রেলের এই বরো পিট এই ভিজে কচুবন—এদের পাশাপাশি চটিরাম অনেকদিন এখানকার লোক। কদমপুরের কত কথা লোকে ভুলে গেছে—সেসব মাটি চাপা জিনিস চটিরাম চেষ্টা করলে এখনও মনে করতে পারে হয়ত।

বিকেলবেলা পাশের মৌজা কমলপুরের দিকে সূর্য ঢলে গেছে। থাক থাক আলে ভাগ করা জমির গায়ে সবুজ ঘাস—রোগা রোগা তালের চারা মাথা ধরে উঠেছে—এ সবের মাঝে আদুল গায়ে চটিরাম দাঁড়ানো—চোখের কোণ ভাল ধোয়া নয় বলে কেমন অস্পষ্ট—মনে মনে ঠিকও করেছে হয়ত, আর পাঁচ দিনের ভেতর সাফ কোবালা হয়ে গেলে কুবেরবাবুর হাজার চারেক টাকা কোন দফায় কী রকম লাগাবে।'

'কিন্তু আমিই বা বসে থাকি কি করে?'

'তাহলে কাল এসে বায়নার টাকা নিয়ে যাবেন—আর বায়নাপত্রখানা সঙ্গে নিয়ে আসবেন বাবু।'

চটিরামের নীচের ঠোঁটের ওপর মুখের বাকিটুকু দাঁতের অভাবে চেপে বসে গেছে—পাকানো শরীরখানা খুব অবহেলায় তালের আঁটি মাথাটা ধরে আছে। কুবেরের এই বিকেলবেলায় তার জন্যে খুব কষ্ট হল। ষাট সত্তর বয়স হবে। মাথার ওপর বাপ মা নেই, চটিরামের ছেলেবেলার লোকজনও কমে যাচ্ছে চার দিকে। অতগুলো আল ডিঙিয়ে চটিরাম এখন তার বাপকেলে ভিটের গিয়ে উঠবে। —সন্ধ্যে হতে দেরি নেই। বায়না করার দিন কুবের উঠোনের গোলাটা দেখেছে—একেবারে ফাঁকা, এককালে নাকি চার-পাঁচশো মণ ধান থাকত। মাটির বারান্দা বুক সমান উঁচু, চটিরাম কারও হাত না ধরে উঠতে পারে না—নামতেও পারে না।

ঠাকুরমশাই একদিন ভাটিখানার ওদিকে বাড়ি দেখাতে নিয়ে গিয়ে কুবেরকে কী করে দিল। তার কারখানার কলিগরা কেউ এখন ফার্নেসে—কেউ অফ ডে বলে ঘুমোচ্ছে, নয়ত ঘুরতে বেরিয়েছে। আর কুবের। এমন ফাইন বিকেলে!

কদমপুরে প্রথম আসার পর কিছুদিন কেটে গেছে। কুবের এখন জায়গাটা প্রায় তার মনে ধরেছে বলতে পারে। মাত্র কিছু দিন আগেও কদমপুর সে একদম চিনত না। এত ঘোরাঘুরির পর সব ঠিক হতে হতে হল না। সেদিন বিকেলে মাপামাপির সময় প্রসূন আর বুলু জায়গার পাশে উঁচু কিনারে সারা দিনের ছুটোছুটির পর বসে ছিল। প্রসূন বুলুর মাথার ওপর রোদ বাঁচিয়ে ছাতা খুলে ধরেছিল। গুপ্তরায় মশায়ের সঙ্গে ফিতে ধরার সময় কুবের দেখছিল, বুলু প্রসূনের ছাতা ধরার সময় লজ্জায় আপত্তি করছে—প্রসূন শুনছে না। বন্ধুর স্ত্রীর মাথায় ছাতা ধরতে সবারই ভাল লাগে। বুলুর লজ্জাটাও নর্মাল।

...আদুল গায়ে চটিরাম দাঁড়ানো

কালো শান্তিপুরের পাড় ঘেঁষে লাল সুতোর লতাপাতা তোলা বুলুর শাড়ি মাটিতে খাগরা হয়ে ঘরে ছড়িয়ে আছে। শাড়িটা সবুজ হলে সেদিন বিকেলে বুলুকে কুবের বনদেবী বলে ডাকতে পারত।

কিন্তু আজ বাড়ি ফিরে বুলুকে কী বলবে। এ যে সেই ভাটিখানার বাড়ি দেখার মত শেষ অব্দি শুধু গাড়িভাড়াতেই গুচ্ছের পয়সা গচ্চা গেল। কদমপুর-শেয়ালদা রেলের টিকিটেই কম করে পঞ্চাশ টাকা গেছে এ' ক'দিনে।

বায়নার পর বুলু বলেছিল, 'একবারেই দোতলা বাড়ি করতে হবে। ঢালাই ছাদ চাই।' করোগেট ভীষণ অপছন্দ। একতলা তিনখানা ঘরের মোটামুটি বাড়িতে ইট চাই পঁচিশ ত্রিশ হাজার—ছাদে, ভিতে, দেওয়ালে—সব নিয়ে সিমেণ্টও প্রায় আট ন' টন। দোতলায় অবশ্য খরচ কিছু কম লাগে। তার ওপর আছে জানলা, দরজা, স্যানিটারি ফিটিংস—কত কী। এত জিনিসের কত দাম—তার একটা হিসেব মনে মনে কষতে গিয়ে কুবেরের মাথার ভেতর নোটের পাহাড় ভাই হয়ে উঠেছিল।

এ লাইনই ছেড়ে দেবে কুবের। ধনরাজ

মাস মাস মাইনে থেকে যেমন কাটান দিচ্ছে দিক। টাকাটা দিয়ে বুলুকে একজোড়া চুড় বানিয়ে দেবে। বিয়ের আঙটিটা সুদে-আসলে দিয়ে ছাড়িয়ে আনবে—তারপর ফার্স্ট ক্লাস ট্রেনে চড়ে লটবহরসুদ্ধ চেপে যাবে—রাজগীর নয়ত নেতারহাট।

শেয়ালদা থেকে একখানা প্যাসেঞ্জার এসে দাঁড়াল। সামনের স্টেশনে কোনদিন যায়নি কুবের। ঢুকতে একটা ব্রীজ আছে। কদমপুর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সেটাই শুধু দেখা যায়।

প্যাসেঞ্জারের লেজে মালগাড়ি থেকে কুলিরা কিম্ভুত সাইজের যন্ত্রপাতি নামাচ্ছে। গায়ে লেখা ও এন জি সি। তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন। গুপ্তেরায়মশাই সেদিন মাপামাপির পর ট্রেনে বসে ঠিকই বলেছিলেন, দাম কী পেলেন—এদিকটা সিলেড হিল্ম। সারা তল্লাট জুড়ে গভর্নমেন্ট গর্ত খুঁড়ছে, তাঁবু গাড়ছে। সকালের দিকে কদমপুর বাজারে নতুন নতুন জিপে চড়ে সরকারী অফিসারেরা ঠাকুর চাকর দশ পনের মাইল দূরের মাঠ থেকে বাজার করতে আসে। কোনদিন রাস্তিরে সেই পড়ে গেলে ওদের জিপের জন্যে আবার পথ খুলে যায়।

প্রাগৈতিহাসিক আমলের সমুদ্র যা কিছু গিলেছিল তা সবই এখন মাটির চাপে পড়ে এতদিনে বদলে গেল। কোনদিন হয়ত চটিরামের জমিতে টিউবওয়েল বসাতে গিয়ে হরি বাগ তেল পেয়ে যাবে।

কুবের উচ্চকিত ভাবল। দূরের স্টেশনে ওপরের সেই ব্রীজটা এখন একটু দেখা যাচ্ছে। ওদিক থেকে শেয়ালদার দিকে গাড়ি আসছে। আসতে ডিসট্যান্ট সিগন্যালে আলো দেখা যাবে। একদিন কুবের ওদিকে যাবেই—যেতে যেতে নাকি সমুদ্র পাওয়া যায় শেষে। এক একদিন ফার্নেস বেড়ে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা হাওয়ার জন্যে কুবের হাঁপিয়ে ওঠে। ফার্নেসের দরজা তুলে তাকেই বেলচায় করে পোড়াচ্ছে। ফুটন্ত ইস্পাতের জলে ঢেলে দিতে হয়। স্ল্যাগের ফেনা সরিয়ে গুঁড়ো চুনের দলা ভেতরে গিয়ে পড়ে। কোন শব্দ নেই—শুধু গলন্ত ইস্পাতের বুক বেয়ে নীলচে আগুন তখন পাক খায়।

'কখন এসেছিলেন?'

লোকটা কাউন্টারে টিকিট দেয়। ভীড় দেখে কুবেরকে একদিন ভেতর থেকে টিকিট দিয়েছিল। নিজে নিজেই লোকটা আবার বলল, 'তিনটে কুড়ির?' একটু থামল, 'জায়গা পছন্দ হল?'

এখন একে সব বলতে গেলে রামায়ণ হয়ে যাবে। তার চেয়ে অন্য কথাই ভাল। কিন্তু কী নিয়ে এখন কথা বলা যায়। আজ বোধ হয় লোকটার ছুটি। কাজেই কোয়ার্টার—পায়চারির পক্ষে এমন বাঁধানো প্ল্যাটফর্মই প্রশস্ত—তাই বোধ হয় এখানে। কথা বলতে বলতে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে ঢুকল দুজনে। অন্যদিন দারোগার টুপি মাথায় যে টিকিট নেয় সে একটি অল্পবয়সী ছোকরার সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে।' কুবেরের দিকে আড্ডা ঘুরে গেল। কী করে যেন ওরা জানে, কুবের জমি কেনার জন্যে ঘোরাঘুরি করছে।

ছোকরার কাছে তিনটে বাচ্চা দাঁড়িয়ে—ছোটটা বছর তিনেকের, চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবা—'

আরও কী যেন বলল। কুবের অবাক, এই

"আমার নাম বিকাশ বোস—"

ছোকরার তিন তিনটে পোনা! এলেম আছে তো।

'আমাকে চিনতে পারছেন?'

ছোকরা উঠে কুবেরের দিকে এগিয়ে এল, বাচ্চা তিনটেও পায়ে পায়ে এল। ঠিক মনে করতে পারল না। কোথায় দেখেছে?

'আমি কিন্তু আপনাকে চিনি—'

ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে। কুবের সাবধান হয়ে গেল।

'শালকের কুবের সাধু খাঁ না আপনি?'

কুবের মাথা নাড়ল। আর কি জানে ছোকরা? সাদা সার্ট, মালকোঁচা ধুতি, কব্জিতে মানানসই ঘড়ি। এই বয়েসে তিন তিনটে বাচ্চা—নিশ্চয়ই পয়সা আছে।

'আমার নাম বিকাশ বোস—'

কুবেরের কথা কী জানে? কোন্ সময়ে কুবেরকে চিনত? রিজার্ভড্ কুবের? ফ্রিভোলাস কুবের? কুবের দ্য মিন? লিবারাল কুবের? কিংবা, প্রায় ভবঘুরে?

'আমরা যেবার ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হলাম—আপনারা ফোর্থ ইয়ারে—'

কুবের হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কীভাবে চেনে কে জানে। কখন কোথায় দেখেছে। এত কষ্টের পর চটিরামের জমিটা কেনা হল না। কাল আবার ভোরের ট্রেনে এসে বায়নার টাকাটা ফেরৎ নিয়ে যেতে হবে। তখন না আবার কোন ঝামেলা পাকায়। মনটা একটু খিচড়ে ছিল—খানিক ডিস্টার্বড, বিকাশ তার দিকে দাঁত কেলিয়ে তাকিয়ে আছে।

ফোর্থ ইয়ারে যখন পড়ত, তখন স্নেহের অঙ্কি তাজা ছিল। সে বছর পনের আগের কথা। প্রায় কিছু মনে নেই। তখনকার এমন কি মনে থাকতে পারে? কী জানে এই ছোকরা? কেউ চেনে বললে কুবেরের সবচেয়ে বেশি ভয় করে। তখনকার একখানা ছবি দেখে বুলু নাক কুঁচকে বলেছিল, 'এ মা কি রোগা। মাথা অমন হেলিয়ে বসেছ কেন।' এখনও কুবের কারও সঙ্গে কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে ডানে কিংবা বাঁয়ে মাথা কাৎ করে ফেলে। ওই অভ্যেস।

অতীত কুবেরের কাছে প্রায় ভূত।

বিকাশ তার কথা কী জানে, তা বের করতে না পেরে কুবের মনে মনে কাঁটা হয়ে থাকল। এখনি ট্রেনটা এলে লাফিয়ে উঠে বসত। অথচ আজই দশ মিনিটের ওপর লেট। কথায় কথায় জানা গেল, বিকাশ বোসের বাবা নন্দী বোস বছর তিরিশেক আগে কলকাতার এক কলেজ থেকে ভাইস-প্রিন্সিপাল হিসেবে রিটায়ার করেন। তখন যা পেয়েছেন, তা দিয়ে এখানে স্টেশনের ধারাধারি তিনি বেয়াল্লিশ বিঘের ঝিল সমেত একশ' আশি বিঘে জায়গা এক লপ্তে কেনেন। ঝিলে মাছ চাষ, ডাঙায় ইট আর টালির ব্যবসা—সবই নন্দী বোস চুটিয়ে করেছে। কথায় কথায় মনে হল, বিকাশ তার বাপের আট আনায় কেনা কাঠা এখন বুঝে বুঝে হাজার-দেড় হাজারে বেচে যাচ্ছে। কেননা, বিকাশ বার বার জানতে চাইছিল, কী দরের ভেতরে কুবের জমি চায়—মানে, তার কেউ কত, সে হদিশ পাওয়াই আসল মতলব।

সাত

আমি যখন গড়পার হইতে চলিয়া আসি, তখনও প্রবোধিনী পড়াশুনার হাত দেয় নাই। বেহালার দুশ' আশি টাকায় আড়াই বিঘা জমি কিনিয়া কোনমতে দোতলা তুলিলাম একখানা। প্রথম প্রথম মা-বাবা-ভাইয়ের একান্নবর্তী পরিবার ছাড়িয়া আসিয়া খুবই কষ্ট হইত। দুঃখটা দৈহিক অপেক্ষা মানসিকই বেশি। বাবা চান নাই, আমি প্রবোধিনীকে বিবাহ করি। সে-ও বড় আনাড়ি ছিল। কতদিন ভাতের হাঁড়ি বসাইয়া ফার্স্ট বুকে এমন ডুবিয়া গিয়াছে—শেষে, ফেন উথলাইয়া আমাদের নতুন পাতা চুলার ঝিক গলিয়া গিয়া কষ্টের একশেষ। আমার বয়স তখন পঁয়ত্রিশ।'

এখানে এসে ব্রজ থামল। বাবার আত্ম-জীবনী লেখা বড় কঠিন কাজ। তখন কি রজনী দত্তর বয়স পঁয়ত্রিশ ছিল? রজনীর একচল্লিশে ব্রজ হয়। ততদিনে প্রবোধিনী ম্যাট্রিকুলেট। তার হাতেখড়ির

সময় প্রবোধিনী বড়িশার উচ্চ প্রাইমারিতে ইতিহাসের দিগ্দর্শন।

গ্রন্থের প্রুফ পড়ে আছে। আভা খানিক দেখে দিলে কাজ অনেক এগিয়ে থাকত। সামনের আশ্বিনে তার এতদিনের পরিশ্রম

উঁহু, একটু জড়িয়ে শোও তো

বই হয়ে বেরিয়ে যেত। হেরিকেন জ্বালিয়ে রাত আটটা নাগাদ লিখতে বসেছিল। খাওয়া-দাওয়ার পরেই লিখতে সুবিধে। আভা অতটা রাত জাগতে পারে না। লাস্ট ট্রেন বেরিয়ে গেছে সেই কখন। এখন কেবল মালগাড়ি যাবে—শব্দ শুনলেও চোখে দেখা যাবে না—বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তেল পাওয়ার আশায় কিছুদিনই সারারাত ধরে যন্ত্রপাতি যায় মালগাড়ি বোঝাই হয়ে। একদিন শেষরাতে কদমপুরে একটা মাল-গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল—হাতির শুঁড়ের কায়দায় দফায় দফায় খোলা ক্রেনের মাথা বগির ছাদ দিয়ে বেরিয়েছিল।

খাটে ওঠার আগে আভা ব্রজর পিঠের ওপর একখানা শাড়ি দু' ভাঁজ করে মেলে দিয়ে গেছে। খুব মশা। শাড়িখানা নামিয়ে আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল। রজনী দত্ত লোকটা তার বাবা ছিল ঠিকই। কিন্তু তার আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে রোজই মনে হচ্ছে, ছেলে হয়েও ব্রজ তার কথা একেবারেই জানে না। কী করে রজনী ডায়মণ্ডহারবার রোডের ওপর আড়াই বিঘের বাস্তুজমি দশ বিঘেতে তুলেছিল সেসব ব্রজ জানে। কিন্তু পঁয়ত্রিশ কিংবা বিয়াল্লিশে এক শনিবার কী বেস্পতির সন্ধ্যায় রজনী কী ভেবে থাকতে পারে, কিছুতেই তা ব্রজর মাথায় আসতে চায় না।

হেরিকেনটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে ব্রজ খাটে উঠলো। আভা সুড়সুড়ি খেয়ে জেগে গেল, 'হচ্ছে কি লাগে না? দেব তোমায় একটা—'

আভার চিমটি, টিপুনিতে বড় লাগে। ব্রজ কি বলতে যাচ্ছিল, পারল না, একখানা নরম হাত তার মুখে চাপা দিল, 'উঁহু, একটু জড়িয়ে শোও তো।'

জড়াজড়ি ব্রজ অনেক করেছে। বাঁ কাতে শুলে ডান হাতের ওপর মাথা রাখতে হয়—বেশিক্ষণ একধারা থাকলে রক্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। হঠাৎ ব্রজ তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। আজই দুপুরে বৌবাজারের মোড়ে দু' পুরিয়া কিনেছে। গাঁজা টেনে টেনে তার বুকের চাঁদি লাল হয়ে গিয়েছিল। ভেতরে সব সময় আঁচ ধরে থাকত। কী পিপাসা! এদানী মোদকই তাকে খাড়া রাখে।

'না। ওসব আজ খেতে পারবে না—আমিও পারিনে।'

আভার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। শুয়ে শুয়ে কথা বলছে। ব্রজ উঠে দাঁড়াতে মাথার বাড়তি অনেকখানি অন্ধকার আরও ঘোলা হয়ে গেল।

'একপোবার খাবে—'

কুলুঙ্গিতেই ছিল। রাস্তার মোড়ে

সুরুচিপূর্ণ ফরাসী স্টাইল

স্নানাগারে বিলাসিতার উদ্দেশ্যে এক দৃঢ় পদক্ষেপ

যা একেবারে নতুন···একেবারে অভিনব···
সম্পূর্ণ ফরাসী ষ্টাইল—তা হোল পরশুরাম স্যানিটরীওয়্যার। বিখ্যাত স্যানিটরীওয়্যার নির্মাতা পোর্সার-ইউরোপ এর কারিগরী দক্ষতার সহযোগিতায় ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। এ বিলাসিতা আপনার আয়ত্তের মধ্যে। চিড় প্রতিরোধক, টেকসই, রন্ধ্রবিহীন "ভিট্রিঅ্যাস চায়না" বা কাচতুল্য চিনেমাটি থেকে তৈরী। ঝকঝকে সাদা এবং মনোরম বিভিন্ন রংয়ে পরশুরাম স্যানিটরীওয়্যার পাওয়া যায় যা দিয়ে আপনার ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী স্নানাগারের প্রয়োজন মেটাতে পারেন। পরশুরামের তৈরী চকচকে কাচের মত টালীও (গ্লেজড্ টাইল) সাদা এবং বিভিন্ন রংয়ে পাওয়া যায়।

Parshuram

পরশুরাম স্যানিটরীওয়্যার

- ভারতীয় মানকসংস্থার মান অনুযায়ী উৎকর্ষতা বজায় রাখা হয়
- ডি জি এস ও ডি রেট কন্ট্রাক্ট প্রাপ্য
- [illegible]

বিস্তৃত বিবরণের জন্য এখানে লিখুন:
পরশুরাম পটারী ওয়ার্কস্ কোং লিঃ মরভি, ভারতবর্ষ।
নিম্নলিখিত স্থানে কারখানা আছে: থানগড়, ওয়াঙ্কানের, ধ্রাংগধ্রা।
বম্বে অফিস: কমার্স হাউস, করিমভাই রোড, ব্যালার্ড এস্টেট, বম্বে-১।

প্রস্তুতকারকের প্রতিনিধি:
লক্ষ্মী পটারী এজেন্সীজ
৭, রাধাবাজার লেন, কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৩০১৪ টেলি: SOAPDISH

আর্থিক ভারত

বাণিজ্য মন্ত্রকের রপ্তানি পরিকল্পনা

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রক চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় শতকরা সাত ভাগ রপ্তানি বাড়াবার এক কর্মসূচী তৈরি করেছেন। এই কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রক কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রস্তাবগুলির সারবত্তা বিবেচনা করা দরকার। বাণিজ্য মন্ত্রক মনে করেন, দেশের প্রতিটি উৎপাদককেই কিছু-না-কিছু রপ্তানি করার অনুপ্রেরণা দেওয়া আবশ্যক। বর্তমান মুহূর্তে আমাদের দেশের উৎপাদকগণ রপ্তানি করার মত বিশেষ প্রেরণা পাচ্ছেন না; কারণ, তাঁরা যা-ই উৎপাদন করুন, তা দেশের ভিতরেই বিক্রি করা সম্ভব এবং সেক্ষেত্রে দামও কোথাও কম পাওয়া যায় না। সুতরাং এখন তেমন বিশেষ উৎপাদন-প্রয়াস দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু উৎপাদকগণ যাতে রপ্তানি করার জন্য উৎপাদন বাড়াতে সচেষ্ট হন, অথবা উৎপাদিত সামগ্রীর একটি বড় অংশ বাইরে রপ্তানি করতে অনুপ্রাণিত হন সেজন্য বাণিজ্য মন্ত্রক রপ্তানিকারীদের আয়-কর প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু ছাড় দেওয়ার সুপারিশ করেছেন। বলা বাহুল্য, পূর্বে ডিসজা কমিটি ও মুদালিয়র কমিটিও অনুরূপে আয়-করের সুবিধা যাতে রপ্তানিকারীদের দেওয়া হয়, তার সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু বাণিজ্যমন্ত্রকের বর্তমান সুপারিশটি আরও বেশী স্পষ্ট। বর্তমান প্রস্তাব অনুযায়ী যদি কোন উৎপাদকের আয়ে সুস্পষ্টভাবে রপ্তানিজনিত আয়ের কোন উপাদান থাকে, তবে সেই উৎপাদক আয়করের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধার অংশীদার হতে পারবেন। বাণিজ্যমন্ত্রকের সুপারিশ অনুযায়ী যদি কোন উৎপাদকের বাৎসরিক আয় হয় এক লাখ টাকা, এবং যদি তার মধ্যে কুড়ি হাজার টাকা রপ্তানি থেকে পাওয়া যায় তবে আয়কর দেওয়ার সময় তিনি বিশেষ সুবিধা ভোগ করবেন। বাণিজ্যমন্ত্রক মনে করেন, যে এই সুবিধা শুধু যে সাময়িকভাবে দেওয়া উচিত তা নয়, বরাবরই উৎপাদকগণ যাতে উক্ত সুবিধা পেতে পারেন, তার নিশ্চয়তা থাকা উচিত। বর্তমানে রপ্তানিকারীগণ প্রায় কুড়ি প্রকারের সুবিধা পেয়ে থাকেন। বাণিজ্য মন্ত্রক মনে করেন, এই সুবিধাগুলির কোন পরিবর্তন করা উচিত নয়; যদি পরিবর্তন করতেই হয়, তবে এগুলির এমন পরিবর্তন করা উচিত যাতে উৎপাদকগণ রপ্তানি বাড়াবার জন্য আরও প্রেরণা পান। বাণিজ্য মন্ত্রকের মতে রপ্তানি শুল্ককে নিছক একটি রাজস্বের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে রপ্তানি শুল্কের বিচার করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ চায়ের উপর রপ্তানি শুল্কের বিচার করা যেতে পারে। গত বছর ব্রিটেন ও সিংহল মুদ্রামূল্য হ্রাস করার পর ভারত সরকারকে চায়ের উপর থেকে রপ্তানি শুল্ক প্রত্যাহার করতে বেশ কয়েক মাস লেগে গেছিল। রপ্তানি শুল্ককে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা উচিত; তার থেকে যে রাজস্ব পাওয়া যায় তা হচ্ছে আনুষঙ্গিক। বাণিজ্যমন্ত্রক আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে, কৃষিজাত সামগ্রীর যে রপ্তানি বাজার গত এক বছর গড়ে তোলা হয়েছে, তার পিছনে রয়ে গেছে অনেক পরিশ্রম; কোন কারণে কৃষির ফলন যদি কমও হয়, তবুও যাতে কষ্ট করে গড়ে তোলা কৃষি-রপ্তানি বাজারে জিনিস সরবরাহ অক্ষুণ্ণ থাকে তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। বাণিজ্যমন্ত্রক প্রয়োজনবোধে রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর তালিকা সংশোধন করার কথা বলেছেন।

কিছুদিন আগে অধ্যাপক গ্যাডগিলও চতুর্থ পরিকল্পনায় শতকরা সাত ভাগ রপ্তানি বৃদ্ধির কর্মসূচী গ্রহণ করার যৌক্তিকতা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তখন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক মনে করেন যে, কোন অবস্থাতেই প্রতি বছর শতকরা তিন ভাগের বেশী রপ্তানি বাড়ানো চতুর্থ পরিকল্পনায় সম্ভব হবে না। বর্তমানে বাণিজ্যমন্ত্রক যে প্রস্তাবগুলি দিয়েছেন সেগুলি বিশেষ অনুধাবন করা দরকার। আমাদের মনে হয়, সরকারী তৎপরতা বাড়লে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বেসরকারী ক্ষেত্রের সহযোগিতা ঠিকভাবে পাওয়া গেলে বাণিজ্যমন্ত্রকের প্রস্তাবিত কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করা অসম্ভব হবে না।

মস্কো প্রত্যাগত ডক্টর গ্যাডগিল

পরিকল্পনা কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক গ্যাডগিল চতুর্থ যোজনায় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে কতটা কারিগরি সাহায্য পাওয়া যাবে তা নিরূপণ করার জন্য মস্কোয় গিয়েছিলেন। রাশিয়া থেকে ফিরে এসে ডক্টর গ্যাডগিল জানিয়েছেন যে, চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় ফার্টিলাইজার সরবরাহ, এবং ভারতে ফার্টিলাইজার কারখানা স্থাপনে সহযোগিতা করতে রাশিয়া খুব ইচ্ছুক। ডক্টর গ্যাডগিল রাশিয়াকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, যেহেতু ভারত শিল্পক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে গেছে, সেজন্য এখন ভারতের পক্ষে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির বেশী দরকার; অর্থসাহায্যের চেয়েও এখন বেশী প্রয়োজন প্রকল্প অনুযায়ী সাহায্য—যাতে ক্ষেত্র-বিশেষে ভারতও তার উৎপাদিত যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বাইরে রপ্তানি করতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে যন্ত্রাংশ বা যন্ত্র আমদানি করতে সক্ষম হয়। রাশিয়া থেকে ফিরে ডক্টর গ্যাডগিল জানিয়েছেন যে, তিনি রাশিয়াকে এ জিনিসটি ভালভাবে বোঝাতে পেরেছেন। ভিলাই ইস্পাত কারখানায় তৈরি ইস্পাত, রেলওয়ে ওয়াগন এবং সোভিয়েট সাহায্যপ্রাপ্ত অন্যান্য প্রকল্পের উৎপাদিত সামগ্রী আমদানি করতে রাশিয়া স্বীকৃত হয়েছে, এবং তার বিনিময়ে ভারত আমদানি করবে ফার্টিলাইজার, জাহাজ এবং নিউজ প্রিন্ট। তা ছাড়া রাশিয়া ভারতে একটি পেট্রো-কেমিক্যাল কারখানা স্থাপন করার প্রস্তাব দিয়েছে; তবে ১৯৭১ সালের আগে সে প্রস্তাব কার্যকর হবে কিনা বলা শক্ত। রাশিয়া আমাদের দেশ থেকে ইস্পাত ও রেলওয়ে ওয়াগন আমদানি করবে—এ প্রস্তাবটি শুভ সন্দেহ নাই। কিন্তু রাশিয়া আমাদের দেশে যে যে জিনিস রপ্তানি করবে তার সবগুলিই আমাদের প্রয়োজন কিনা, অথবা আমাদের যেমন প্রয়োজন সেভাবে রাশিয়া বিভিন্ন সামগ্রী পাঠাতে রাজী হবে কিনা, তা ভেবে দেখতে হবে। এ সমস্যাটি যে রয়ে গেছে, অধ্যাপক গ্যাডগিল সে কথা উল্লেখ করেছেন। আমদানির কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক গ্যাডগিল বলেছেন, ১৯৬৬ সালে রাশিয়া যে ৩০০ মিলিয়ন রুবল ধার দেওয়ার প্রস্তাব করেছিল, আমরা এখনও তার সদ্ব্যবহার করতে পারিনি; তাই রাশিয়া থেকে ফার্টিলাইজার, নিউজ প্রিন্ট প্রভৃতি আমদানি করে আমরা রাশিয়া কর্তৃক প্রতিশ্রুত ঋণের সদ্ব্যবহার করতে পারি। রাঁচী হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের সভাপতি শ্রী কে ডি মালব্য ও অধ্যাপক গ্যাডগিলের সাথে মস্কোয় গিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছেন যে, রাশিয়া শীঘ্রই ৪২ জন কারিগরি বিশেষজ্ঞ পাঠাচ্ছেন কর্পোরেশনের কাজে সাহায্য করার জন্য, এবং তার ফলে সোভিয়েট সহযোগিতায় রাঁচী হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের কাজ আরও উন্নত হবে।

সুব্রত গুপ্ত

আলোয় কালোয়

ত্রিশঙ্কু

এক রবিবার বিকেল পাঁচটায় আমরা তিন-জন মিস্টার পলের বাড়িতে হাজির হলাম। ভেতর থেকে তাঁর স্ত্রী বেরিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন, বসতে বললেন। খানিক পর ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, তখনো তাঁর কানের দুপাশে সাবান লেগে আছে। দাড়ি কামাচ্ছিলেন। সেদিন কাজকর্মের ছুটি। সন্ধ্যা ছটায় মিস্টার পলের মিটিং, তৈরি হচ্ছিলেন। আমরা এসে পড়ায় হয়ত ব্যাঘাত হলো ভদ্রলোকের রুটিনে। কী বা করা যায়! আমাদের কৌতূহল প্রচণ্ড। তিনজন অসহায় যুবক হঠাৎ হাজির হলে মিস্টার পলের পক্ষে সময় দেওয়া ছাড়া উপায় কী। তিনি তাঁর নৈতিক দায়িত্ব পালন করলেন।

পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় বিনিময় হলো। নামটুকু ছাড়া তিনি আর কিছু জানতে চাইলেন না। পান খেতে খেতে আমাদের তিনজনের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ফেললেন। শেষ পর্যন্ত, বোধ হয় কোনো সমাধান না পেয়ে জিগেস করে ফেললেন মিস্টার পল : আপনাদের মধ্যে কে অসুস্থ? কিছুক্ষণ পরস্পরের মুখচাওয়া-চাওয়ি করে, তারপর জানালাম, তিনজনেই। সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলেন না মিস্টার পল। এত অল্প বয়সে এই রোগ তো হবার কথা নয়। তা ছাড়া একসঙ্গে তিন বন্ধুর! তবু, ভালোই হয়েছে, আপনারা ঠিক সময়ে আমাদের সন্ধান পেয়েছেন।

মিস্টার পল বোঝাবার চেষ্টা করলেন—অ্যালকোহলিসম্ (বা সুরাশক্তি) একটা অসুখ, আমরা বিশ্বাস করি। আমরা, মানে এই 'অজ্ঞাত অ্যালকোহলিক' সংস্থার সদস্যরা। এ-অসুখের কোনো ডাক্তারি চিকিৎসা নেই। সারা জীবন ধরে রোগী যুদ্ধ করে হারে, হারার জন্যে যুদ্ধ করে। অভ্যাসের ফলে শরীরে এক ধরনের অ্যালার্জি থেকে তৃষ্ণার সঞ্চার, এবং সেই সঙ্গে মনের মধ্যে একটা যুক্তিহীন ঝোঁক রোগীকে অস্থির করে তোলে। সুরাপান ছাড়া তার জীবনের কোনো লক্ষ্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না। নিজে আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আশি হাজার টাকা উড়িয়ে দিয়েছি এক বছরে, বাড়ি

কিছুক্ষণ পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি...

বিক্রি করে দিয়েছি, স্ত্রী চলে গেছেন বাপের বাড়ি, ছেলেমেয়েদের স্কুল ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে, কারণ আমার চাকরি নেই। তিন বছর আগে এমনি অসহায় অবস্থায় আমি এক সহকর্মীর সাক্ষাৎ পাই, তারপর এই সংস্থায় যোগ দিয়ে নিষ্কৃতি পেয়েছি। স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়েছি আবার। মিস্টার পল থামলেন।

এই হয়। যে দাগী, সে যাবতীয় অপরাধের জন্যে দণ্ডিত হয়। ইচ্ছে হলো, তর্ক করি, মিস্টার পল, এক বছরে আশি হাজার টাকা ওড়ানো মানে মাসে ছ' হাজার টাকা, প্রতিদিন দুশো টাকা। যেকোনো একজনের পক্ষে শুধু মদ্যপান করে এত টাকা ওড়ানো অসম্ভব। আপনার অন্য কোনোরকম ব্যারামও ছিল। সেদিকে না গিয়ে আমি বললাম, এই সমস্যা নিয়ে একটা ইংরেজী ছবি দেখেছিলাম, মনে আছে। সুরাসক্ত স্বামীকে সুস্থ করার উদ্দেশ্যে স্ত্রী যোগ দিল, স্বামী বাড়িতেই নেশা করতো। এক-এক সময় বিগড়ে যেত তবু। তারপর এই সংস্থার সন্ধান পেয়ে বেঁচে গেল, কিন্তু স্ত্রীটি ক্রমশ ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়লো। বাড়ি ছেড়ে চলে গেল একদিন, দুষ্ট লোকের খপ্পরে পড়লো, শেষপর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে সম্বল। নিজে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবার পর স্বামী একদিন তার স্ত্রীকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখতে পেল, কিন্তু তখন কিছু করার নেই।

আমার সঙ্গে যে-দুজন গিয়েছিল, তাদের একজন মৃদু আপত্তি করলো। দেখ, আমি গত দশ বছর ধরে এই জিনিস খাই। এবং লক্ষপতি নই। মাঝামাঝি গোছের চাকরি করি, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার করি, কোনো দায়িত্ব এড়িয়ে চলি না। মাঝে মাঝে পত্নীর সঙ্গে একটু খটাখটি লাগে—সে তাস খেললেও লাগতো, বাড়িতে বসে মার্গ-সংগীতের রেওয়াজ করলে তো নিশ্চিত।

দুঃখিনীর মতো মুখ বুজে থাকা মদ্যপের স্ত্রীদের স্বভাব।

মিস্টার পল বিচলিত হলেন না। বললেন, প্রত্যেকটি মদ্যপ কিন্তু অ্যালকোহলিক নয়। কতকগুলো প্রশ্ন করলে এই রোগ পরীক্ষা করা যায়। যেমন ধরুন :

১। পানাভ্যাসের জন্যে আপনার কখনো কি অনুশোচনা হয়েছে?

২। আগে অনেক উচ্চাশা ছিল আপনার, এখন আর নেই, এমন হয়েছে?

৩। প্রতিদিন কোনো বিশেষ সময়ে পান করতে ইচ্ছে হয়?

৪। আপনি কি মানসিক দুশ্চিন্তা বা ক্লান্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্যে পান করেন?

৫। আপনার ব্ল্যাক-আউট হয়? অর্থাৎ, আগের রাত্রের ঘটনা পরের দিন ভুলে যান, যদিও আপনি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে ছিলেন তখন।

৬। আপনি কি সকালে পান করেন?

৭। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে গেলে আপনার কি অন্যদের চেয়ে দু-গেলাস বেশি খেয়ে নিতে ইচ্ছা করে?

৮। পান করা ছেড়ে দিয়েছেন, আবার ধরেছেন, এমন হয়েছে?

৯। কোনো বন্ধুর সদুপদেশ কি আপনার অসহ্য লাগে?

১০। মদ্যপানের ফলে আপনার কাজকর্মের ক্ষতি হয়?

মনে-মনে প্রশ্নগুলির উত্তর দিন, আমাকে বলতে হবে না। যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর যদি 'হাঁ' হয়, তবে বুঝতে হবে, আপনি অসুস্থ। আপনার চিকিৎসা দরকার। ডাক্তারি শাস্ত্রে এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। 'অজ্ঞাত আলকোহলিক' সংস্থার নিরাময় সূত্রের শরণাপন্ন হলে আবার স্বাভাবিক সুন্দর জীবনে ফিরে যেতে পারবেন।

আমাদের তৃতীয় সন্ধ্যাটি এবার মুখ খুললো। দশটি প্রশ্নের প্রত্যেকটির উত্তর যদি সম্মতিসূচক হয়, তবে কি বুঝতে হবে, আমার আর কোনো আশা নেই, আমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী?

—না, না, তা কেন। বুঝতে হবে, আপনি আলকোহলিক, নিঃসন্দেহে। তারপর আপনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন, চেষ্টা করে দেখুন। আমরা এক সময়ে সকলেই রোগগ্রস্ত ছিলাম। অনেকে সেরে উঠেছি। অনেকে চেষ্টা করছি সেরে উঠতে।

"সুরার কাছে আমরা অসহায়"

প্রশ্ন করি, আপনাদের চিকিৎসার ধরণটা কীরকম। মানে, কোনো ওষুধ-বিষুধ খাওয়া, ইঞ্জেকশন, ব্যায়াম, না কি?

চোখে-মুখে নিবিড় ঔদাসীন্য ফুটিয়ে তুললেন মিস্টার পল। সংক্ষেপে, বারোটি সূত্র ধরে আমাদের প্রোগ্রাম। প্রতি রবিবার আমরা এক জায়গায় বসে আলোচনা করি এই সূত্রগুলি, কেউ কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে সমাধানে সাহায্য করি। তাতে নিজের প্রতি বিশ্বাস বাড়ে। সূত্রগুলো এইরকম:

১। আমরা ধরে নিয়েছিলাম, সুরার কাছে আমরা অসহায়, এবং নিজেদের আমরা সামলাতে পারছি না।

২। সুস্থ করতে পারে আমাদের চেয়ে শক্তিমান কেউ বা কিছু।

৩। নিজের নিজের বিশ্বাস মতো—আমরা ঈশ্বরের আশ্রয়ে নিজেদের নিবেদন করবো, স্থির করলাম।

৪। দ্বিধাহীনচিত্তে আমরা নিজেদের প্রকৃতির দেখতে ও বুঝতে চেষ্টা করলাম।

৫। তারপর আমাদের প্রত্যেকের দোষগুলি নিজের কাছে, ঈশ্বরের কাছে—এবং একজন বন্ধুর কাছে স্বীকার করলাম।

৬। ঈশ্বর আমাদের দোষমুক্ত করবেন এই বিশ্বাসে আমরা প্রস্তুত রইলাম।

৭। তাঁর কাছে প্রার্থনা জানালাম—অন্য যে কোনো অপরাধীর মতো।

৮। যাদের যাদের ক্ষতি করেছি, অপমান করেছি, তাদের নামের তালিকা প্রস্তুত করলাম একটা। তারপর প্রত্যেকটি অপরাধ সংশোধন করবো স্থির করলাম।

৯। যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব, তাদের কাছে ক্ষমা চাইলাম, বা ক্ষতিপূরণ করলাম।

১০। নিজের অপরাধপ্রবণতা সম্পর্কে সবসময় সজাগ রইলাম।

১১। প্রার্থনা ও উপাসনা করে ঈশ্বরের কাছে শক্তি চাইলাম, অধঃপতন থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে করুণা।

১২। অর্জিত আস্থা ও বিশ্বাস পরে ক্রমশ অন্যান্য রোগীদের মধ্যে সঞ্চারিত করবো প্রতিজ্ঞা করলাম।

আমাদের প্রোগ্রামের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেহারা দেখে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। মিস্টার পল আশ্বাস দিলেন। কোনো বিশেষ ধর্মসংগঠনের সঙ্গে আমাদের যোগ নেই। প্রত্যেককে নিজের নিজের বিশ্বাস ও ধর্ম অনুসরণ করতে দেওয়া হয়। বিশ্বসহমিতা—ভগবানের প্রতি অনাস্থা এ যুগের প্রধান ব্যাধি। এবং তাই থেকে অন্য সব ব্যাধির উৎপত্তি, আমাদের ধারণা। তাই এই দিকে 'অজ্ঞাত আলকোহলিক-এ' ঝোঁক। আমাদের সংস্থায় নাম-ধাম সমস্ত গোপন রেখে কাজ করা যায়।

এর পর মিস্টার পল জিগেস করলেন, আমরা সাপ্তাহিক মিটিংএ যেতে ইচ্ছুক কিনা। সেখানে অনেকের সঙ্গে আলাপ হতে পারে, যাঁরা এককালে প্রচণ্ড অসুস্থ ছিলেন, এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

তিনজন পরস্পরের মুখের দিকে চাইলাম। আমাদের কাজ তো মিটে গেছে—খবরাখবর যা সংগ্রহ করার, পেয়ে গেছি। আর গভীরে গিয়ে কাজ নেই। শেষকালে না জেনে প্রার্থনা ও উপাসনার গহ্বরে পড়ে যাবো!...তা ছাড়া, আজ সন্ধ্যায় এক জায়গায় পার্টি আছে, তিনজনে একত্রে যাবার কথা। সবিনয়ে মিস্টার পলকে বললাম, "আজ থাক। আর-একদিন যাবো।

বলা বাহুল্য, তারপর আর ওদিকে মাড়াইনি।

ঘরে বাইরে

শিশুপালনের সংহিতা

বই পড়ে বা নিয়ম কায়দা ঘেঁটে ছেলে মানুষ করা ব্যাপারটা নেহাত অল্প দিনের। আমাদের দেশে অন্ততঃ তাই। কত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, কত মহীয়সী মা তাঁদের লালনপালন করেছেন, কত অসীম শ্রদ্ধা নিয়ে সেই মহাপুরুষেরা মাকে চিরকাল দেবীর মত শ্রদ্ধা করে গেছেন কিন্তু কটি মা নামতা পড়ার মত শিশুর যত্ন করার বিধি আয়ত্ত করতেন? ভারতবর্ষের কথা বাদ দিলেও এমন দেশ আছে যেখানে বিশেষজ্ঞের অনুশাসনে শিশুপালনের ধারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। হলেও সেটা সমাজের সামান্য অংশেই সীমাবদ্ধ। স্পেনে নাকি প্রবাদবাক্য আছে যে ঠাকুমা যেমন করে শিশু মানুষ করার উপায় সন্ধান জানেন তেমন কি কোন ডাক্তার জানেন? কাজেই শিশুকে ভবিষ্যতের সুস্থ নাগরিক করে গড়ে তুলতে বিশেষজ্ঞের কেতাবী তথা মা দিদিমার দেওয়া উপদেশের চেয়ে কার্যকর কিনা বলা কঠিন। তবে এটুকু বলা যায় সুস্থ নাগরিক, পরিবারের যোগ্য প্রিয় সন্তান—এর মান বা উপযুক্ত গুণাবলী সম্বন্ধে ধারণা সব দেশে, সবকালে এক নয়। বিদেশী পত্রিকার মাধ্যমে জানলাম এই যে লম্বা চুল, অপরিচ্ছন্ন বেশবাসে চণ্ডুচরসে আসক্তি নিয়ে কিছু কিছু কিশোর সারা দুনিয়াকে ভাবিয়ে তুলেছে, কোন কোন বিশেষজ্ঞ তাদেরও নিন্দনীয় মনে করেন না।

মার্কিন দেশের এক বিশেষজ্ঞ, নাম তাঁর ডাঃ স্পক, মায়েদের দুনিয়ায় দারুণ প্রতিপত্তি জমিয়েছেন। তাঁর বইখানা নাকি ২৯টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। তার মধ্যে উর্দু আছে, তামিলও আছে। স্পক পড়া কোন মার সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ না হলেও আন্দাজ করছি কিছু ভারতীয় মা স্পক সাহেবের অনুশীলনের সাহায্য সন্ধান করছেন। ১৯৪৬ সালে স্পক-এর বই প্রকাশিত হয়। একমাত্র আমেরিকার যুক্তরাজ্যেই তার ২১০ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে। মধ্যবিত্ত সমাজের মা বাবা তো প্রায় বাইবেলের বদলে স্পক মুখস্থ করতেন। দিনের কাজের শেষে সামান্য যেটুকু সময় পড়াশুনো করতে পাওয়া যায় তা কাটতো স্পকের পাতা উল্টিয়ে '৪৬ থেকে ৬৮ সাল। এক প্রস্থ স্পক পড়া বাবা মার সন্তান কিশোর কিশোরী এমন কি যুবক যুবতীরাও হয়তো কেউ কেউ সেই ধারায় গড়ে উঠেছেন। তাই নূতন করে প্রশ্ন জাগতে পারে ডাক্তারের বিদ্যায় মানুষ হওয়া ছেলেমেয়ে কি সত্যই সম্যক সুস্থ জীবন পেয়েছে? বয়স্কদের সমস্যা হিসাবে দুরন্ত যুবসমাজ যতই চিরাচরিত প্রথাকে বুড়োআঙুল দেখাচ্ছে, বাপমায়ের বিশ্বাসকে উপেক্ষা করে চলছে ততই তাঁরা চিন্তায় আকুল হচ্ছেন—এর জন্য দায়ী কে? ডাঃ স্পক বা তাঁর মত অন্যান্য দশজন যাঁরা অনুশীলন করে নূতন নূতন পদ্ধতি পরিবেশন করেছেন, তাঁরাই কি?

সব দেশের আদর্শও এক নয়। মা-বাবা অথবা গুরুজনের বাধ্য হওয়াকে আমরা যতটা প্রয়োজন মনে করি হয়তো মার্কিন মুল্লুকে করে না। কিন্তু তাতে তাঁরা কখনও বিব্রত বোধ করেন না। বাধ্যতাকে এমন কোনও স্থান দিতে তাঁরা রাজী নন। গর্ব করে বলেন মার্কিন ছেলেমেয়েদের অবাধ্যতা অন্যকে যতটা আঘাত করে বলে মনে হয়, মাতাপিতাকে ততটা আঘাত করে না। তাঁরা ভালবাসার ভিতকে বড় মনে করেন। অথচ ভিতটা ভালবাসার কিনা তাও আমরা জোর করে বলতে পারি না। অন্যান্য দেশের ছেলেমেয়ের চেয়ে মার্কিন ছেলেমেয়ে মা-বাবাকে বেশী ভালবাসে এমন প্রমাণও কিছু পাই নি। এটুকু অবশ্য সত্য যে ধরা-বাঁধা নিয়মানুবর্তিতা ছেলে-মেয়েদের অনেক অন্য দেশের চেয়ে কম শেখানো হয়। একটি মার্কিন মহিলাই একবার লিখেছিলেন এই কথা। তিনি মার্কিন সামরিক অফিসারের পত্নী ছিলেন ও যুদ্ধোত্তর জার্মানীতে কিছুদিন ছিলেন। একদিন দেখলেন বালির ঢিবি নিয়ে একদল মার্কিন ছেলেমেয়ে খেলা করছে। কেউ বা হাতে করে বালির কেক বানাচ্ছে আবার কেউ বা কোদাল দিয়ে চেঁছে তুলছে বালুকারাশি। হঠাৎ তারা চলে গেল। একদল জার্মান বাচ্চা এসে বালির ঢিবিতে খেলতে বসলো। মুহূর্তে খেলার কায়দা গেল বদলে। সবচেয়ে বড় ছেলেটি খেলার দলের দলপতি হয়ে বেশ একটি নিয়মকানুন গড়ে ফেলে খেলার রকমটিতে অদ্ভুত শৃঙ্খলা এনে দিল। মার্কিন মা বাবা হয়তো বলবেন শিশুরা খেলবে তাতে আবার নিয়মকানুনের ঘটা কেন? অথচ অনেকের চোখে হয়তো ওই শৃঙ্খলার একটা দাম আছে। বলা যায় কি কোনটা ভাল। শুনেছি নাকি জার্মানরা নিজেরাও একটু কমিয়েছেন এই কড়া শৃঙ্খলার শিক্ষা। সেই যে কিন্ডারগার্টেন থেকে শিশুকে আদেশ মানতে আরম্ভ করতে হতো, শিক্ষয়িত্রী হুকুম দিতেন ডলি-পুতুলকে কেমন করে আদর করতে হবে, ডলির পাশে টেডি ভাল্লুককে শুতে দিয়ে কি ভাবে কার গায়ে হাত বুলোনো হবে সেরকম কড়া নিয়ম অনেক কমেছে। এই যে দেশবিশেষের বৈশিষ্ট্য, জাপানী শিশুর

বেলায়ও যথেষ্ট আছে। জাপানী মায়েরা শত ব্যস্ততায় সহস্র গৃহকার্যের মধ্যেও শিশুকে দারুণ আদর করেন। খেলতে খেলতে দৌড়ে এসে গোলগাল মাথামুখ মায়ের গায়ে ঘষে বায়না বা আবদার জাপানী শিশু যখন তখন করে। মাও সেই আবদার যথাসাধ্য পালন করেন। কখনও বিরক্ত হন না। কেঁদেকেটে ছেলে অনর্থ বাধালেও বকেন না। বিদেশীরা দেখে অবাক হয় মা দাঁড়িয়ে ট্রেনে চলেছেন অথচ ছোট্ট ছেলেটিকে বসবার জায়গা করে দিয়েছেন। অথচ জাপানী শিশু কি কিছুই শেখে না? পরিবারের প্রত্যেকের প্রতি কর্তব্য সে করতে শেখে অল্প বয়স থেকে। অতিথি এলে অভিবাদন করে তাকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করে ঠিক বড়দের মত সৌজন্য দিয়ে। তার জন্য জাপানী মাকে মারধোর করতে হয় না কোনদিন। বরং এই চিরাচরিত ছেলেমানুষ করার বিধি পশ্চিমের হাওয়ায় একটু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের মতই যৌথ সংসার ভেঙে যাচ্ছে বলে দিদিমা ঠাকুমার মাঝে শিক্ষার সোপানের প্রথম ধাপগুলি আর অত সহজ রয়নি। যে সব শিক্ষা আপনা থেকে অবলীলাক্রমে হতো তার

জন্য মা কেতাবী উপদেশ বা Kyoiku mama ঘাঁটেন। শহরে থেকে গ্রামের চাল-চলন বাদ দিয়ে তাঁরা বোতলে ভরে গংড়ো দংধে জল মিলিয়ে খাইয়ে দেন আর পশ্চিমী পত্রিকার পড়া ধরনধারনকে বেশী দংরস্ত মনে করেন।

রাশিয়ার বেলায়ও কেতাবী কায়দা কায়েম হবার লক্ষণ সংস্পষ্ট। ডাঃ স্পকের বইখানার মত রাশিয়ার বিশেষজ্ঞ ডাঃ ম্যাকারেঙ্কো একখানা বই লিখেছিলেন স্ট্যালিনের আমলে। অবশ্য বইখানাতে ডাঃ ম্যাকারেঙ্কো শিশংর জীবনে মাতাপিতার স্নেহের বিশেষ স্থানের কথা ভাল করে বংঝিয়েছেন। মা-বাপের ভালবাসার বিকল্প নেই। এই ভালবাসার অভাব হলে শিশং সংস্থ নাগরিক হতে পারবে না। রাশিয়ার বিশেষজ্ঞরা আরও বলেন যে, শিশংর ব্যক্তিগত বিকাশ দরকার কিন্তু শিশংর সেই বিকাশ যেন তাকে সমাজের সঙ্গে মিলে মিশে থাকবার শক্তি দেয়। এই শিক্ষাই আসল শিক্ষা। শিশংর স্বাধীনতার বেলায়ও ওই কথা। সবার সঙ্গে মিলে জীবনযাপন করতে হবে তো। শিশং-পালন বিশেষজ্ঞ শ্রীমতী মার্কোভা তাই মনে করেন স্বাধীনতার দংই দিক আছে। জানালার কাচ ভেঙ্গে খান খান করার স্বাধীনতা আবার তাকে সংন্দর করে লাগাবার স্বাধীনতা, দংয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টি কি বেশী বাঞ্ছনীয় নয়? কথা ঠিকই তবে কিভাবে সেটা শেখালে উত্তরকালের নাগরিক অনায়াসে সেটা মানবে। কাচ না ভেঙ্গে, জানালা গড়াকে বড় মনে করবে তাই সমস্যা। মাতাপিতা থেকে নিয়ে দেশের সব কল্যাণ-কামী মানংষ শিশংর ভবিষ্যতের ভালমন্দ সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে চান তবে পথ নিয়ে প্রশ্ন। পরীক্ষা ও গবেষণার পক্ষে কঠিন দায়িত্ব।

আমাদের মায়েরাও এখন শিশং পালনের বইপত্র ঘাটতে আরম্ভ করেছেন। ফলে তাঁরা বিদ্যাসাগর, রামমোহন, নেহরং বা গান্ধীর চেয়ে মহান সন্তান সংসারকে কি দিতে পেরেছেন? আজকাল শিশংর জন্য গংড়ো দংধের ব্যবসায়ী পর্যন্ত শিশংপালন সংহিতা প্রকাশ করেন। তাঁদের দিকের প্রচার তাতে প্রচুর হয়, হয়তো হাতের কাছে অমন একখানা 'রেডি রেফারেন্স' থাকলে মাও ভরসা পান। বোলতার কামড়, হংপিং কাশী এমনকি দংধতোলা নিয়ে নংতন মাকে কম নাজেহাল হতে হয় না। কিন্তু শিশংর মানসিক বিকাশ কি রেডি রেফারেন্স-এর পাতায় পাওয়া যাবে? ডাঃ স্পক বা শ্রীমতী মার্কোভার সব কথাই ভুল তা নয়, কিন্তু ফরমংলা করে শিশংপালনের উপদেশ কার্যকর হয় কিনা বলা কঠিন। বরং মা বাবা বা অভিভাবক নিজেদের বিষয় একটং সতর্ক হবার ব্যবস্থা করে নিলে বিশেষজ্ঞের উপদেশ বেশী কাজে লাগে। স্পক সাহেব বলেছেন, relaxed atmosphere-এ ছেলে মানংষ করা দরকার। এই atmosphere তৈরি করতে হবে তো বড়-দেরই। এমনকি একা মা অথবা মা-বাবা দং'-জনের চেষ্টাও হয়তো যথেষ্ট নয়। Relaxed atmosphereটি নষ্ট করার আরও লোক থাকতে পারে, আরও কারণ থাকতে পারে। সেসব হয়তো স্পক সাহেবদের বিদ্যার বাইরে। এসব ক্ষেত্রে মা-এর কতটা স্নেহ, বাপের কতটা আগ্রহ এবং যত্ন relaxed atmosphere-এর অভাব কিছংটা মিটিয়ে দিতে পারবে তা ভাববার দায়িত্ব তাঁদেরই। মোটের উপর বলতে পারি শিশংমনের সামনে বাপ মায়ের সম্বন্ধে সংন্দর ও স্নেহ-পংর্ণ একটি ছবি থাকা দরকার। সব ভরসার সেরা বাপ মায়ের স্নেহ, যত্ন ও সমাদর। সমাদর মানে শিশংর মংন্ডু চিবিয়ে আদর দেওয়া নয়। সমাদর মানে তার মনে বিশ্বাস সঞ্চয় হয় এমন ব্যবহার। অনেক মা আছেন যাঁরা কখনও অত্যধিক আদর দেন আবার কখনও শাসনের মাত্রার হিসাব রাখেন না। এ ক্ষেত্রে আবার সেই বিশেষজ্ঞদের অনং-শাসন উল্লেখ করেই বলছি, শিশংমনের উপর এ ধরনের পরস্পর বিরোধী ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া ভাল নয়' মায়ের মনের ঝাল মিটিয়ে শিশংকে দংঃখ দিতে যথেষ্ট দেখা যায়। আবার পরক্ষণে মা নিরপরাধ শিশংর উপর করংণার প্রতিমংর্তি হয়ে ওঠেন। এ খামখেয়ালীপনায় শিশংরা অনেক সময় বেপরোয়া হয়ে ওঠে। কর্তৃত্ব বা authority বিনা দ্বিধায় মেনে নেবার যংগ আমরা পিছনে ফেলে এসেছি। শাসন সেই করবে যার প্রতি শিশংর মনে ভালবাসা আছে। শ্রদ্ধা আছে। মা বাবা যেমন শিশংকে দংনিয়ার সমাদরের যোগ্য দেখতে চান অবচেতন মনে শিশংও মা বাবাকে সম্মানের যোগ্য করে পেতে চায়। অন্যথায় যে ব্যথা আঘাত সে পায় তার মংল্য তাকে জীবন-ভোর দিতে হয়। ভালবাসা না পাবার আঘাত ভালবাসতে না পারার চেয়ে বেশী নয়। সব শিশং এক নয়, সব পরিবেশ এক নয়, সব দেশ এক নয়, সব দেশের ভাল-মন্দের বিচার এক নয়, সব মা-বাবা এক নয়। কাজেই সংহিতায় যে অনংশাসন, তা মা-বাবাকে সাহায্য করবে কিন্তু বেঁধে ফেলবে না। এইখানেই প্রতিষ্ঠান গত শিশংপালনের আজও পরাজয়। ঘরের স্নেহ কোন প্রতিষ্ঠান দিতে পারে না। প্ল্যাস্টিকের থলিতে লাল নীল মাছ ঝংলিয়ে শিশংর দোলনার উপরে টাঙিয়ে নানা সংরের রেশ শংনিয়ে তাকে নাকি আজকাল শিক্ষা দেওয়া চলছে জন্মের অল্প দিন পর থেকে। হাঁটতে শেখার আগে সে নানা কিছংতে পণ্ডিত হয় প্রতিষ্ঠানের নংতন নংতন শিক্ষায়, কিন্তু উত্তরকালের সংস্থ নাগরিকের জন্য তাই কি সব?

শ্রীমতী

ট্রামে বাসে

নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণের দায়িত্ব একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের কিন্তু উহার দিনক্ষণ লইয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করায় অনেকেই বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন।—"আমরা আরো বিক্ষুব্ধ হয়েছি এই মনে করে যে, নির্বাচনের দিনক্ষণের জন্য কোন সময়ে পাঁজি দেখা হয়নি সুতরাং বারবেলা, অশ্লেষা, মঘা কোথা দিয়ে এসে যে নির্বাচন কেন্দ্রে একটা প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড করে বসবে তার কোন ঠিকঠিকানা পাওয়া যাবে না"—বলেন বিশুখুড়ো।

উত্তরবঙ্গে বিপন্ন আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ নিতে হইলে লিখিতভাবে রাইটার্স বিলডিংস্থ ইনফরমেশন ব্যুরোতে জানাইবার কথা ঘোষণা করা হইয়াছিল। জানাইয়াছেন অনেকে কিন্তু জানিতে পারেন নাই প্রায় সবাই।—"তা হোক, সরকারী সিদ্ধান্তটা ছিল মোক্ষম, ভাবতেই মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে"—বলে শ্যামলাল।

সংবাদে প্রকাশ, বন্যায় জলপাইগুড়ি ট্রেজারির টাকা পয়সা সমস্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সহযাত্রী বলিলেন—"বন্যা বাদেই অনেক ট্রেজারির টাকা জলে যায়, সেটা আরো ট্র্যাজিক!!"

অন্য এক সংবাদে শুনিলাম, কৃষি দপ্তর নাকি বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে, বন্যা ও ধসে ফসলের বিশেষ ক্ষতি হইবে না।—"তা কি আর হয়, ফসল কা পরাণ কৈমাছ কা পরাণ হ্যায়, ধাড়ি ধাড়ি ইঁদুরের পেটে গিয়েও দিব্যি বেঁচে থাকে, মরতে মরে শুধু মানুষ"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা নাকি আবার নিয়ম মাফিক কাজ শুরুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সহযাত্রী বলিলেন—"অনিয়ম মাফিক কাজ শুরুর তারিখের জন্য বিল দেখুন।"

সংবাদে শুনিলাম বোম্বাইয়ে দশ লক্ষ লোক ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগিতেছেন।—"কিন্তু শিব সেনারা কোথায়, এটা তো শিবের অসাধ্যি ব্যাধি নয়"—বলেন সহযাত্রী।

স্থানে স্থানে বিদ্যুৎ স্তম্ভ ভাঙিগয়া দেওয়া প্রসঙ্গে বিশুখুড়ো সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন—"৪২০ ভোল্ট। সাবধান!!"

হুগলি নদীতে জল ট্যাক্সি প্রবর্তন করা হইয়াছে। উহাতে চড়িয়া চাঁদপাল ঘাট হইতে বেলুড় এবং শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেনে যাওয়া যাইবে।—"এই সঙ্গে বর্ষার দিনে টালা থেকে টালিগঞ্জ এবং বিভিন্ন রুট ধরে ডালহৌসী যাবার জন্য কয়েকটি জল ট্যাক্সির ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হয়" —বলেন সহযাত্রী।

কেন্দ্রীয় সরকার ময়ূরপুচ্ছ রপ্তানি বন্ধের কথা ভাবিতেছেন।—"এর আর ভাবাভাবি কী, আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে হলে এ বন্ধ করতেই হবে। তবে ময়ূরপুচ্ছ পরিহিত মানুষ রপ্তানি যাতে না বন্ধ হয় সেদিকে কেন্দ্রীয় সরকার সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন বলেই আশা করি"—বলে শ্যামলাল।

'দুধের যোগানও কমবে'—একটি সংবাদ শিরোনামা।—"পিটুলি গোলার যোগান বহু আগেই কমে গিয়েছে সুতরাং দুর্ভাগা অশ্বত্থামাকে এখন হাওয়ার জন্য পবননন্দনের কৃপার ওপরেই নির্ভর করতে হবে"—বলেন সহযাত্রী।

সংবাদে শুনিলাম, টেলিফোনে নাকি মহাত্মাগান্ধীর কণ্ঠস্বর শোনা যাবে, অবশ্য কিঞ্চিৎ নয়, বেশ কাঞ্চন মূল্যে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কণ্ঠ শোনার পর কেউ যে 'ও-কার কণ্ঠস্বর' বলে এগিয়ে এসে সীতা নাটক জমাবেন তার সম্ভাবনা নেই, বরং সে কণ্ঠস্বর শুনে অনেকেরই পিলে স্থানচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা, যেমন ক্লাসের হট্টগোলে হঠাৎ হেডমাস্টার মশাইর কণ্ঠ শুনে হয়!!"

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি লটারি করিয়া টাকা উঠাইবার কথা চিন্তা করিতেছেন।—"খুব ভালো কথা, এই সঙ্গে জ্যাকপট-এর কথাটাও চিন্তা করুন, লাগাতে একবার পারলেও মার দিস কেল্লা"—বলেন সহযাত্রী।

অলিম্পিকে ইতালীয় প্রতিনিধিরা নাকি নিজেদের দেশের ওয়াইন এবং অলিভ অয়েল নিয়া আসিয়াছেন।—"আমরা সব সময়েই পিছনে পড়ে থাকি, তা নইলে বিরিয়ানি বা নিদেন ফুচকা নিয়ে যেতে পারতাম না কি"—সহযাত্রীরা আজ অলিম্পিক নিয়া মাতিয়া উঠিয়াছেন।

মেক্সিকো যাত্রার প্রাক্কালে শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত নাকি সাংবাদিকদের বলিয়াছেন যে, আই এফ এ একটি বিশেষ গোষ্ঠীর হাতের পুতুল।—"পুতুলটি প্লাস্টিকের, না মাটির তা বলে দিলে পারতেন"—বলেন অন্য সহযাত্রী।

সংবাদে শুনিলাম, সম্প্রতি ইতালীতে একটি তিন ফুট লম্বা ইঁদুরকে গুলি করিয়া মারা হইয়াছে।—"অনেক দিন থেকেই ত পর্বত মূষিক প্রসব করে আসছে। তাদের মধ্যে একটা হয়ত শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এখন সাবালক হয়েছে সুতরাং তিন ফুট লম্বা শুনে অবাক হবার কিছু নেই"—বলে শ্যামলাল।

সহযাত্রী পড়িয়া গেলেন : অলিম্পিক গ্রামে যে-সব অ্যাথলীট আছেন তাঁরা খাবেন ৭৭৮ টন মাংস, মাছ এবং হাঁস মুরগী, ৯০,০০০ ডিম, ৬৭,০০০ পাঁউরুটি, ১.২০০,০০০ কার্টন দুধ, ৭২,৬০০ পাউণ্ড চীজ, ২৬,৪০০ পাউণ্ড মাখন—"আর পড়িস নি, খিদেয় পেট চুঁচুঁ করছে, এদিকে দালদায় ভাজা সিঙ্গাড়াটা ঠাণ্ডা ভূত মেরে গেল"—বলেন অন্য সহযাত্রী।

সংবাদে শুনিলাম, এবার অলিম্পিক টর্চটি জ্বালাইবেন একটি মহিলা, তিনি কেশ প্রসাধন করিবেন না, লিপস্টিক ব্যবহার করিবেন না। সহযাত্রী বলিলেন—"তবে আর হলটা কী!!"

বিশুখুড়ো এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, পরে বলিলেন—"মোক্ষম সংবাদটিই বলনি, সেটা হল প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে অফিসিয়ালদের সংখ্যা দ্বিগুণ"—এখানে সব দেশই একমত অর্থাৎ বাজনার চেয়ে বাজনা বেশি।"

দিল্লীর ডায়েরি

এর ডাকনাম দেবু, দেবব্রত চৌধুরী। এখানে যারা ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত ভালবাসেন সেতারের মাধ্যমে, তাঁরা সকলেই দেবব্রতকে জানেন, প্রশংসা করেন।

সেতার বাজনায় আজকাল কয়েকজন খুবই নাম করেছেন, এবং কে বেশি ভাল কে একটু কম, বলা কঠিন। কারণ কর্ণ নামক যন্ত্রটি মানুষের এতো ব্যক্তিগত যে তা নিয়ে না চলে নালিশ, না-চলে অভিমান। কিন্তু ইদানিংকালে বিদেশে সেতার বাজিয়ে যে দু'একজন খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের একজন হলেন এই দিল্লির দেবব্রত, দরিয়াগঞ্জের দেবু।

গত বৎসর আমেরিকা ও ইউরোপে (ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানী ইত্যাদি) দুমাস পাঁচদিনে সেতার কনসার্ট বাজিয়েছেন ৫৫ বার নানাস্থানে, এবং একুনে বিমান-ভ্রমণ করেছেন ৭২ হাজার মাইল। বিদেশে অভিজ্ঞতার কথা প্রশ্ন করায় বল্লেন : আমার ভ্রমণ ও সেতার বাজানোর উপলক্ষে আলাপ হয়েছে অনেক প্রথম শ্রেণীর সংগীতজ্ঞের সঙ্গে, যেমন ডক্টর দানিলুয়ে, ইয়েহুদি মেনুহিন, ডিক বুচ্, মিলটন্ হোল্যান্ড, কুর্ট্ বারট্সন্, ডক্টর বোট্রাইট্।

"কিছুতেই ভুলতে পারি না, প্যারিসে শ্রোতারা প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে হাততালি দিয়ে আমার বাজনাকে সম্মান জানিয়েছিল। নিউইয়র্কে হলঘরে শুনেছি কেউ কেউ কেঁদে ফেলেছেন যখন আত্মহারা হয়ে বাজনা বাজিয়েছি। আমেরিকায় দুই জায়গায় আমাকে ভিজিটিং প্রফেসর-ভাবে যোগদান করতে আহ্বান জানিয়েছিল—নিতে পারিনি। বিদেশের শ্রোতারাও অন্য ধরণের : দু ঘণ্টা বাজনা চলে, একবারের জন্যেও কেউ বাইরে বেরিয়ে যায় না, একটি কথা নেই, কাশি নেই,—একটা নিরব নিথর আবহাওয়া,— বাতাসে শুধু সেতারের ধ্বনি, রূপ নেয় আমাদের শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিনী," বল্লেন দেবব্রত।

রবিশঙ্কর, বিলায়েত খাঁ, নিখিল, দেবব্রত, এ'দের মতো সেতারীদের শিল্প মাহাত্ম্যে আজ সেতার ইউরোপ-আমেরিকায় অতি পরিচিত এবং এই যন্ত্রটির মাধ্যমে ভারতের শাস্ত্রীয় সংগীতও এই প্রথম পাশ্চাত্ত্য শ্রোতারা গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে। তাই রবিশঙ্কর ও বিলায়েতের মতো দেবব্রতের বাজনাও লণ্ডনে এইচ-এম-ভি লং-প্লেয়িং রেকর্ড করেছে।

বয়েস এখন তেত্রিশ, বাঙলা দেশের ছেলে। জন্ম ময়মনসিংহ জেলায়।

ওস্তাদ মুস্তাক্ আলী খাঁর সুযোগ্য শিষ্য, গোড়ায় বছর দুয়েক শিখেছেন পাঁচুগোপাল দত্তের কাছে। সেতার নিয়ে শ্রোতাদের সামনে প্রথম এসেছেন সেই তেরো বছর বয়সে। আকাশবাণীর ন্যাশন্যাল প্রোগ্রামে স্থান পেয়েছেন ১৯৬৩ সনে, এবং তারপর থেকে অনেকবার বাজিয়েছেন এবং আকাশবাণীর একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী বলে স্থান পেয়েছেন। এ-দেশেও এইচ-এম-ভি তার বাজনা রেকর্ড করেছে। ইনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখান এবং ভারতীয় কলা কেন্দ্র নামক সংস্থার সঙ্গে জড়িত আছেন। ছাত্র-ছাত্রী প্রায় ৫০ জন আছে। বিয়ে করেছেন মাস তিনেক আগে, স্ত্রীর নাম মঞ্জুশ্রী।

যুক্তরাষ্ট্রের দূত চেস্টার বোলস্ একটি পত্রে দেবব্রতকে বলেছেন : "আমার বাড়িতে আপনি বাজিয়েছিলেন, তার জন্যে আমি ও আমার স্ত্রী কৃতজ্ঞ। যাঁরা যাঁরা সেদিন শুনেছিলেন, তাঁরা আপনার বাজনা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন।"

দেবব্রত আবার যাচ্ছেন সেতার নিয়ে আমেরিকায়, এই মাসেই। আমেরিকার রাষ্ট্র-

মিসেস চেস্টার বোলস্-এর সঙ্গে দেবব্রত চৌধুরী

আলাপরত দেবব্রত চৌধুরী—জার্মানীতে তোলা একটি ছবি

দত্ত সেই উদ্দেশ্যে শুভ কামনাও জানিয়েছেন। এবার প্রায় চার মাসের ভ্রমণ, এবং বাজাবেন আমেরিকার ত্রিশটি রাজ্যে, এবং ফেরার পথে বাজাবেন লণ্ডনে কুইন্ এলিজাবেথ্ হল্-এ।"

"ইচ্ছা আছে কানাডা, বেলজিয়ম, জার্মেনী, ফ্রান্স ও রোম ঘুরেও আসব। হয়তো অনেক জায়গাতেই বাজাতে হবে। বিদেশে অতো প্রশংসা শুনে ও তাদের কাগজে পড়ে, সময় সময় যেন লজ্জাও পাই। অভ্যস্ত নই কিনা," একটু হেসে বললেন।

সংগীতে শাস্ত্রজ্ঞ দানিলিয়ু একটি চিঠিতে বলেছেন বার্লিন থেকে: "প্রত্যেকে আপনাকে এখনো স্মরণ করে, শুধু সংগীতজ্ঞ হিসেবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে আপনার মানবিক দিকটাও মনে করে। আপনি জানেন, এটা আপনাদের সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। সত্যিকার শিল্পী হলেন শিল্পের বিনীত সেবক: সে তার (সংগীত) ঐশ্বর্য নিজের মহিমার জন্যে শুধু ব্যবহার করেন না।"

দেবব্রতকে অভিনন্দন জানাই।

খগেন দে সরকার

বন্যাবিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গ

পরিমল ভট্টাচার্য

ময়নাগুড়ি যাওয়ার পথে সেই বৃদ্ধের আকুতি হয়ত কোনদিন ভুলবো না। দীর্ঘ পথ হাঁটার পর আর চলতে পারছিলেন না। রাস্তার একপাশে বসে পড়েছেন। হাতের লাঠিটা পাশে কাত হয়ে পড়ে আছে। নৈরাশ্য চোখেমুখে, অবসন্নতা—ফুলো ফুলো। ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন তিনি। অসুস্থ, তবুও চলেছেন।

আমরা গাড়ি থেকে নামতেই বৃদ্ধ তাকালেন। জোর করে, অতি কষ্টে। কিন্তু সেই চাহনিতেও আশা জ্বলজ্বল।—'আমাকে ময়নাগুড়ি নিয়ে যাবে বাবা?'

থমকে দাঁড়ালাম। আশার দোলায় হাঁফাচ্ছেন তখন বৃদ্ধ। বললাম—'গাড়ি আর যাবে না। সামনে রাস্তা ভাঙা।'

আবারও বললেন,—'নিয়ে চল না বাবা। মেয়েটা ময়নাগুড়ি আছে। শুনেছি সব ভেসে গেছে। হয়ত—' —কেঁদে ফেললেন বৃদ্ধ। আমি মাথা নিচু করে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। ময়নাগুড়ি তখনও অনেকটা দূর—পাঁচ-ছয় মাইল। মাঝে মাঝে ধরলা নদীর পোল ভাঙা। নদীর জল ভেঙে যেতে হবে।

ধ্বংস, কেবলই ধ্বংস। তিনদিন অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের জীবন যেন শুষে নিয়েছে। অদ্ভুত শতাব্দীর নীরব সাক্ষী, শান্ত-হৃদয় হিমালয়ের বুকে অসংখ্য ধস। জমাট বাঁধা পাথর ভেঙে খান খান। তিস্তা হঠাৎ ফুলে ফেঁপে একাকার,—পাগল বুনো হাতির মত গর্জন, গতি। সবকিছু ভেঙে চুরমার করে দিতে চায়। করলা, ধরলা, তোরসা, বালাসন, মহানন্দাও তিস্তার তালে তালে উত্তাল। ভৈরব নৃত্যে মত্ত পাহাড়ী জলধারা, প্রতি বিন্দুতে কালাপাহাড়ী মেজাজ। ভাঙো, ধ্বংস করো—সবকিছুকে তালগোল পাকিয়ে উঠুক। মহাপ্রলয় নেমে আসুক এই ধরায়।

কালিমপঙের পথ বন্ধ, দার্জিলিং সড়কে বাধা দুস্তর। দার্জিলিং, কারশিয়াং, কালিমপঙ বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রচণ্ড আঘাতের পর রক্তাক্ত দেহে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকার মত অবস্থা। রাস্তা নেই, টেলিফোন নেই, রেল নেই, এমন কি ওয়ারলেস ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত। নেই বিজলী,—অন্ধকার হিমালয় জুড়ে। পানীয় জলও নেই। একমাত্র সম্বল হিমালয়ের বুকচেরা ধন অকৃপণ ঝর্ণার জল। 'ড্রপসিন' পড়ার মত হঠাৎ ধস পাহাড়ী জীবনটাকে সমতলভূমির কাছ থেকে যেন ছিনিয়ে নিয়েছে। পাহাড়ের কান্না পাহাড়েই প্রতিধ্বনিত। অসহ্য।

সেবক স্টেশনের রেলসেতু ভেঙে চুরমার। সেবক ছেড়ে কালিমপঙের রাস্তায় কিছু দূরেই ধস, এনডারসন ব্রিজ ভেঙে টুকরো টুকরো। এগোবার উপায় নেই। কালিমপঙের ধসবন্দী মানুষের বুকফাটা কান্না, তবুও না। দূরে থেকে তাদের সান্ত্বনা জানানো ছাড়া উপায় নেই।

অকটোবর ছয়। ধস চাপা পড়ার পর দেড়দিন। পাহাড়ের কোল বেয়ে গাড়ি ছুটেছিল আমাদের দার্জিলিং সড়কে। রংটংয়ের কাছে একটা জায়গায় গাড়ি থামিয়ে দিলেন চালক। তাকিয়ে দেখলাম, সামনে বাধা—ধস। মাটি ও পাথরের বিরাট স্তূপ। ছোট রেলের লাইন ঝুলেছে, কোথাও বা উড়েও গিয়েছে। পাহাড় ভেঙে কিছুদূর গিয়ে ফিরে এলাম। এগোনো সহজ নয়। হেঁটে আসছেন অনেকে ওদিক থেকে। তাঁদের মুখে শুনলাম কার্শিয়াংয়ের কথা। ধসে কার্শিয়াং থেকেও দার্জিলিং যেন অনেক দূরে সরে গিয়েছে।

শিলিগুড়ি পৌঁছেই সোজা জলপাইগুড়ি। সারি সারি লরি, গাড়ি চলেছে সেদিকে। লরি বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জল, খাদ্য। শিলিগুড়ির মানুষ ছুটেছেন দলে দলে। কারণে অকারণে শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির মনকষাকষির পাট শেষ। জলপাইগুড়ির এক লক্ষ মানুষকে বাঁচানোর সংকল্পে শিলিগুড়ি তখন সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। বিদ্যুৎ নেই, অন্ধকার ঘুটঘুটে। জলপাইগুড়ি শহরে ঢোকার মুখে আনন্দচন্দ্র কলেজ। কলেজের সামনে রাস্তায় মানুষের ভিড়। কারও মুখে কথা নেই। পাশেই শ্মশানে চিতা জ্বলছে

ঝাউদাউ, সারি সারি। সেই শ্মশানের স্তব্ধতা শহরময়।

জল সরে গিয়েছে। আমরা ঢুকলাম শহরে এক হাঁটু সমান পলিমাটি ভেঙে। এগোনো মুশকিল, পা পিছলে যায়।

কয়েক পা এগিয়ে দেখলাম এপাশে ওপাশে অসংখ্য গরু মরে পড়ে আছে। যেন কেউ তাদের দাঁড় করিয়ে মেরেছে, ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুঁড়ে। ততক্ষণে, শহর ছেড়ে পালাতে শুরু করে দিয়েছেন জলপাইগুড়ির মানুষ, দুর্গত, ভাগ্যহত। তাঁদের মুখে মৃত্যুর বিভীষিকা। শহর জুড়ে ধ্বংসের চিহ্ন, কোথাও বেশি, কোথাও কিছু কম। কে জানে ঘুমন্ত অবস্থায় কত মানুষ যে জলে ভেসে গিয়েছেন! যাঁরা পালাচ্ছেন শহর ছেড়ে তাঁদেরও অনেক প্রিয়জন পড়ে থাকছেন পিছনে, মৃত্যুর গহ্বরে।

মৃত্যু, ধ্বংস প্রতি পদে। শহর ছেড়ে আশপাশের কয়েকটি গ্রাম, চর নিশ্চিহ্ন। মণ্ডলঘাট, টেলর্টালিয়া, কাদাপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলের কয়েক হাজার মানুষকে ভাগ্য কোথায় নিয়ে দাঁড় করিয়েছে? আরও দূরে দোমহানি, মাল থানা, ময়নাগুড়িতেও সেই মৃত্যু, সেই ধ্বংস! আরও আরও দূরে মেখলিগঞ্জ, এদিকে ফাঁসিদাওয়া, নকশাল-বাড়ি, শিলিগুড়ির এপাশ এবং ওপাশ?

কালিমপঙ থেকে নাকি বিপদ সংকেত দেওয়া হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ সেই সংকেতের কথা সময়মত জানান নি, এ অভিযোগ সকলের। সময়মত সংকেত পেলে হয়ত কিছু লোক প্রাণে বেঁচে যেতেন। হয়ত তিস্তার চরের বাসিন্দারা শেষ রাতে জলের টানে ভেসে যেতেন না। রাত দুটোর পর তিস্তা নদীতে পাহাড়ী ঢল নামে। জলপাইগুড়ি শহর ভাসাতে লেগেছিল বড়জোর দশ মিনিট। সোঁ সোঁ, হু হু করে শহরে জল ঢুকেছিল রাত চারটা নাগাদ। মাত্র কয়েক মিনিটে ছয় থেকে চৌদ্দ ফুট জল শহরের নানাস্থানে। একতলা, একচালা বাড়ির মানুষ দিশেহারা হয়ে উঠেছিলেন তখন—কোথায় দোতলা বাড়ি, উঁচু জায়গা কোথায়?

জলে দমবন্ধ হয়ে মারা গিয়েছে তিন-চার হাজার গরুবাছুর কেবল জলপাইগুড়ি শহরে। অনেক মানুষও মরেছেন। এখনও তাদের সঠিক সংখ্যা কেউ জানে না। জানা সম্ভবও নয়। কত লোক যে নদীর স্রোতে ভেসে গিয়েছেন এদেশে ওদেশে। পূর্ব-বঙ্গের নানাজায়গায় নদীপারে অনেক মৃত-দেহ গিয়ে ঠেকেছে। ভারত থেকে পাকিস্তানে। তাদের কেউ কেউ দেশ বিভাগের পর ভারতে এসেছিলেন আশ্রয়ের সন্ধানে। মৃত্যু তাদের আবার পূর্ববঙ্গে ঠেলে দিয়েছে।

দোমহানি ঢোকার মুখে তিনটি মৃতদেহ পাশে রেখে জলভেঙে হেঁটে যাই। কাছেই ছয়-সাতটি মরা গরু পড়ে। ফুলে ঢোল, গলিত। বিকট গন্ধে দোমহনির বাতাস ভারাক্রান্ত। আমাদের মত আরও অনেকে সেই মৃতদেহ পাশে রেখেই পথ চলেছেন। ঠিক হাঁটা নয়, দৌড়ে পালানোর মত অবস্থা। নাকে কাপড় চাপা সকলের।

ময়নাগুড়ি যাওয়ার পথেও ছয়-সাতটি মৃতদেহ। ধরলার ভাঙা পোলের নিচে, জলডোবা ঝোপঝাড়ে। একজনকে গাছে ঝুলতে দেখি। বন্যায় বাড়ির নয়জনের মধ্যে আটজনই মারা গিয়েছেন। বাকি ছিলেন কেবল তিনি। বাঁচার প্রয়োজন তাঁর ফুরিয়ে গিয়েছিল।

জলপাইগুড়ি শহরেও মানুষের শব পড়েছিল এখানে সেখানে। শেয়াল কুকুরে গুঁতো মেরে মেরে খেয়েছে সেগুলো। জল সরে যাওয়ার চার দিনের মধ্যে মানুষ ও গরুর গলিত শব সরানোর চেষ্টা তীব্র হয়নি। জলপাইগুড়ির তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত মানুষ সেই পচা গন্ধে আরও শুকিয়ে গিয়েছেন। জল নেই, খাদ্য নেই। বন্যায় ক্ষতবিক্ষত শহরটা যেন নরককুণ্ড!

সর্বস্বান্ত হয়েছেন জলপাইগুড়ির মানুষ। বিশেষ করে একতলা ও একচালার বাসিন্দা, উদ্বাস্তু পল্লী ও চর এলাকায় দুই আড়াই লক্ষ লোক। ডজনখানেক গ্রাম একেবারে মুছে গিয়েছে। এখন সেখানে গেলে মনে হবে যেন তিস্তার চর। শহরের বেশির ভাগ দোকানের জিনিসপত্র, গুদামে খাদ্যশস্য জলে ভিজে একাকার, পলিমাটির পাঁকে বিনষ্ট। একতলা, একচালা বাড়ির জিনিসপত্রও। একবস্ত্রে সর্বাঙ্গে কাদামাখা হাজার হাজার লোককে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। উত্তরবঙ্গের অন্যতম বর্ধিষ্ণু শহর জলপাইগুড়ি বন্যায় প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। যেটুকু বাকি আছে তা নেহাতই বেঁচে থাকা, ধুকধুক করে।

জলপাইগুড়ি, দারজিলিংয়ের পর পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহে। বন্যা এই দুই জেলাতেও কয়েক হাজার মানুষকে বিপন্ন করেছে। বালুরঘাটের পথে পথে সেই বাস্তুহারাদের ভিড়। তবুও রায়গঞ্জ, বালুর-ঘাট, গঙ্গারামপুর, মালদহ সব জায়গাতেই লোকে জলপাইগুড়ির খবর জানতে চেয়েছেন। জলপাইগুড়ির বিভীষিকা সর্বত্র।

আমি সবাইকে জানিয়েছি, বন্যা জলপাই-গুড়ির মানুষকে একেবারে শেষ করতে পারেনি। জীবন ও মৃত্যুর মাঝ দিয়ে তাঁরা আবারও এগিয়ে চলতে শুরু করেছেন। কোমর বেঁধেছেন বন্যাদুর্গত প্রতিটি মানুষ। তাঁদের পাশে অসংখ্য দরদী মন,—শিলিগুড়ি, কলকাতা এবং আরও অনেক অনেক জায়গায়।

সংস্কৃতি চর্চা

পুস্তক পরিচয়

A Marvel of Cultural Fellowship by Sisir Kumar Mitra; Lalvani Publishing House, Bombay-1; New Edition, 1967; Pp. 6+140; Price Rs 22.00.

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীঅরবিন্দ-শিষ্য ও দীর্ঘকাল যাবৎ পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের আবাসিক ও কর্মী শিশিরকুমার মিত্রের এককালীন সুপরিচিত গ্রন্থের আলোচ্য নূতন সংস্করণ প্রকাশ বঙ্গ সংস্কৃতি অনুরাগীমাত্রেরই পক্ষে সুসংবাদ। নানা বিচিত্র ধারার সমন্বয়ে বঙ্গ সংস্কৃতির ঐতিহাসিক বিকাশ কিভাবে ক্রমশ পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়েছে, তাই গ্রন্থকারের মুখ্য আলোচ্য বস্তু। তাঁর বক্তব্যকে তিনি দু' ভাগে বিন্যস্ত করেছেন। প্রথম অংশের দু'টি অধ্যায়ে যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতি-কথা ও বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের এক সংক্ষিপ্ত সামগ্রিক পরিচয় সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। প্রসঙ্গ দু'টি বর্তমান সংস্করণে নূতন সংযোজন হলেও গ্রন্থকারের মূল বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন নয়; কেননা, রবীন্দ্রনাথের মত সংস্কৃতি-সমন্বয়ের প্রতিমূর্তি এযুগে আর কজন জন্মেছেন? আর এ কথা তো সুবিদিত, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রায় প্রতি পদে লৌকিক ও ধ্রুপদী ঐতিহ্যের সংমিশ্রণের চিত্র অতি সুস্পষ্ট এবং বিশেষ করে প্রতীচ্য চিন্তা ও সাহিত্যাদর্শ সার্থকভাবে আত্মস্থ হওয়ার ফলেই গড়ে উঠেছে এর আধুনিক পর্ব। রবীন্দ্র-স্মৃতি শীর্ষক অধ্যায়টিতে সাধক, শিক্ষাগুরু ও সৌন্দর্য-স্রষ্টা কবির যে অন্তরঙ্গ পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে, তা একাধারে শ্রদ্ধাস্নিগ্ধ ও স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত অংশটি সম্ভবত অবাঙালী পাঠক-সমাজের কথা মনে রেখে লেখক রচনা করেছেন। মননশীল তথ্যপিপাসু বাঙালী পাঠকের এটিকে কিছুটা পল্লবগ্রাহিতা-দোষযুক্ত মনে হওয়া সম্ভব। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার গৃহীত ও ব্যবহৃত কিছু তথ্য সম্পর্কেও তর্ক উঠবে। প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসিগণের ব্যবহৃত ভাষা সংস্কৃতের আদি রূপ (Proto-Sanskrit); বৈদিক সংস্কৃতের সঙ্গে পালি ভাষার মূল রূপের সমান্তরাল উৎপত্তি ও বিবর্তন; মহাযান বৌদ্ধধর্ম হতে মঙ্গলকাব্যের অধিকাংশ দেব-কল্পনার উদ্ভব; মনসাপূজা বাঙলা দেশে প্রচলিত অতি প্রাচীন শক্তিপূজার অন্যতম বিকাশ; বৌদ্ধধর্ম ও প্রাচীন বৈদিক ধর্মপ্রভাবের সঙ্গে মধ্যযুগীয় ধর্মপূজার সংস্রব; প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্য-গবেষকগণ মেনে নেবেন কি না সন্দেহ। রামমোহনের প্রথম বাঙলা গ্রন্থ was a Bengali rendering of some of the upanishads নয়। তা হল 'বেদান্ত-গ্রন্থ' অথবা বাঙলা ভাষায় ব্রহ্ম-সূত্রের বিস্তারিত ভাষ্য (প্রকাশকাল—১৮১৫)। এই অধ্যায়ের শেষে যে গ্রন্থপঞ্জী এবং আধুনিক সাহিত্যিক-গণের শ্রেণীবিভক্ত তালিকা যুক্ত হয়েছে, সেগুলিও অসম্পূর্ণতামুক্ত নয়। অচ্যুত গোস্বামীর 'বাঙলা উপন্যাসের ধারা' যেখানে তালিকাভুক্ত হতে পারল, সেখানে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' বাদ গেল কি হিসেবে বোঝা যায় না। অসিতকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়ের গ্রন্থের নাম কি 'বাঙলা ইতিহাসের ইতিবৃত্ত'? আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের কৌতুকরসস্রষ্টাদের তালিকায় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজশেখর বসু (পরশুরাম) নামদ্বয়ের অনুল্লেখ ত্রুটি হিসাবে অসামান্য। জীবনানন্দ দাশের নাম মুদ্রিত হয়েছে 'জীবানন্দ'। এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও কিন্তু সমগ্র প্রসঙ্গটি লেখকের রচনাগুণে সুখপাঠ্য হয়েছে এবং এ কথা স্বীকার্য, সাহিত্যের আধুনিক পর্ব-আলোচনাকালে তিনি স্থানে স্থানে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তার স্বাদ পেয়ে মনে আক্ষেপ থেকে যায় প্রসঙ্গ আরও বিস্তারিত হল না কেন?

দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা ও পর পর পাঁচটি অধ্যায়ের গ্রন্থনা অধিকতর সুবদ্ধ। এগুলির মধ্য দিয়ে গ্রন্থকার

সংক্ষেপে প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাঙলা দেশ ও বাঙালী জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি খসড়া প্রণয়ন করবার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর মূল বক্তব্য হলো এই সংস্কৃতি চিরদিন গ্রহণক্ষম ও সমন্বয়ভিত্তিক। প্রথম অধ্যায়ে এই সমন্বয়ের কেন্দ্রস্বরূপ বাঙলা দেশের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসসমূহের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় বঙ্গের বাহিরে বঙ্গসংস্কৃতির বিস্তার। পরবর্তী অধ্যায়ে ধর্মমতসমূহের পরস্পর সংস্পর্শ ও সমন্বয়মুখী দৃষ্টির উদ্ভব প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। এর পর স্বভাবত এসেছে মধ্যযুগের হিন্দু ও মুসলিম মানসের পরস্পর পরিচয়ের কাহিনী এবং সর্বশেষ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা দেশের নবজন্ম। গ্রন্থকার তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় পাণ্ডিত্য ও মনীষার পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নেই। তাঁর অধ্যয়ন বিস্তীর্ণ, মনন সুপরিণত, যুক্তিগুলি সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত। ইতিহাস তাঁর নিকট বিশৃঙ্খ ঘটনাপ্রবাহ নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের ঘাত-প্রতিঘাত মাত্রও নয়। এর মধ্যে তিনি এক সর্বনিয়ন্তা ঐশী চৈতন্যের নিত্যনবোন্মেষশালিনী লীলাশক্তির কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করেছেন। মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দের মঙ্গলপ্রভাব এইখানে তাঁকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছে। তাঁর মূল প্রতিপাদ্যের সঙ্গে এই পর্যন্ত একমত হতে কারও দ্বিধা হবে না যে, আদিমকাল থেকে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত বঙ্গসংস্কৃতির বিবর্তন ধারাবাহিক আলোচনা করলে তার মধ্যে একটি সমন্বয়সূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, এই সমন্বয়মুখিতা কতখানি বঙ্গ-সংস্কৃতির একান্ত বৈশিষ্ট্য? ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিচারে এর কতটুকুই বা সচেতন প্রক্রিয়া? এবং এই সমন্বয়-ক্রিয়ার প্রতিটি পর্ব ইতিহাসে সমান গুরুত্বপূর্ণ কিনা? সাধারণভাবে একথা চিন্তাশীল মহলে স্বীকৃত যে সমন্বয়মুখিতা ভারতীয় জীবন চর্যারই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বহু বৈচিত্র্যকে স্বতন্ত্রভাবে স্বীকার ও আত্মসাৎ করে একটি সমগ্র ভারত-চৈতন্যের উদ্ভাবন ইতিহাসে যেমন ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির অন্যতম কীর্তি, তেমনি ধর্ম, দর্শন, শিল্পের ক্ষেত্রে নানা ঐতিহ্য; তথ্য ও প্রণালীকে আত্মগত করে একটি সমীকৃত ভূমিতে উত্তরণ এদেশের মননেরও এক সামান্য-লক্ষণ। সুতরাং সমন্বয়-চিন্তা ও সমীকরণ-প্রক্রিয়াকে কতখানি বঙ্গসংস্কৃতির বিশেষ লক্ষণ বলা যাবে তা এই প্রসঙ্গে বিচার্য। দ্বিতীয়ত, সমন্বয় বা সমীকরণ কি (বৃহত্তর ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে) মাত্র ভারতবর্ষ তথা বাঙলা দেশেরই বৈশিষ্ট্য, না বিশ্বের সমস্ত উল্লেখযোগ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অল্পাধিক্যতর সংমিশ্রণ-ভিত্তিক? তা যদি হয় তা হলে একথাও খানিক দূর অন্তত মানতে হবে, সংস্কৃতি-সংমিশ্রণ ইতিহাসের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং অল্পাধিক্যতর বিশ্বের সর্বত্র তা কার্যকরী। ইতিহাসের প্রতি পর্বে সচেতনভাবে বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কোনও জাতি তার সংস্কৃতিকে পূর্বাপর গঠন করেছে এমন সিদ্ধান্তের পক্ষে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক প্রমাণ দাখিল করা প্রায় অসম্ভব। তারপর এও তো সত্য যে, ইতিহাসে সংমিশ্রণের নিদর্শনের সকলগুলিই সমান গুরুত্বপূর্ণ হয় না। ভারতীয় চিন্তাধারার সমন্বয়মুখী প্রকৃতিতে দৃঢ় আস্থাশীল রাধাকৃষ্ণন পর্যন্ত এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে বাধ্য হয়েছেন :

"....there are dangers incident to such a breadth of view. Often it has led the Indian thinkers to misty vagueness, lazy acceptance and cheap electicism."

গ্রন্থকারের অতি প্রাঞ্জল আলোচনাতে কিন্তু সমস্যাগুলির কোনও সমাধান পাওয়া গেল না। দ্বিতীয় খণ্ডেও তথ্যগত কয়েকটি অসংগতি দৃষ্টিগোচর হল। 'নরনারী সকলেরই সমান অধিকার; যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি নাহি জাতবিচার' —ব্রাহ্মসমাজের এই বিখ্যাত নগর-সংকীর্তনটি কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান-ঘোষণা উপলক্ষে (২৫ জানুয়ারী, ১৮৮০) গীত হয় নি; ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে (২৪ জানুয়ারী, ১৮৬৮) হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলেও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁর স্বীয় সাধন-

সম্পর্ক লাভ করেন নি, তিনি দীক্ষিত হয়েছিলেন মানস সরোবর প্রান্তনিবাসী নানকপন্থী সাধু পরমহংস ব্রহ্মানন্দের নিকট। উত্তরকালে গোস্বামী মহাশয়ের এক শিষ্য তাঁকে রামকৃষ্ণদেবের নিকট অধ্যাত্মঋণী বলাতে তিনি শিষ্যের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ধর্মপ্রতিষ্ঠানের আদিনাম 'ব্রাহ্ম-সমাজ'ই ছিল; যদিও তাকে ব্রহ্মসভা বলেও উল্লেখ করা হত। রামমোহন-স্থাপিত ব্রহ্মসভা উত্তরকালে ব্রাহ্মসমাজ বলে পরিচিত হয় এমন উক্তি ঐতিহাসিক সত্য নয়। এই জাতীয় ছোটখাট ত্রুটিগুলি ভবিষ্যৎ সংস্করণে সংশোধন করে নিলে গ্রন্থের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে।

গ্রন্থকারের সঙ্গে সব বিষয়ে আমরা একমত হতে না পারলেও তাঁর আলোচনাটি আমাদের ভাল লেগেছে এ কথা আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করব। গ্রন্থের মূল্য অত্যধিক ধার্য হয়েছে পরিশেষে তা উল্লেখ না করে পারছি না।

প্রাপ্তি স্বীকার

অমরেশ চন্দ্রাহত হলো। বিধায়ক ভট্টাচার্য। আলফা-বিটা পাবলিকেশন্স : ৯৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা-১৪। মূল্য ২·৫০।

ইতি বিনীতা মানসী। সুনীলকুমার ভট্টাচার্য। ডি লাইট বুক কোম্পানী: ২৪ অরবিন্দ সরণী, কলিকাতা-৫। মূল্য ২·৫০।

প্রলয়কেতুর নিদ্রাভঙ্গ। গুরুনেক সিং। আলফা-বিটা পাবলিকেশন্স : ৯৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা-১৪। মূল্য

পঙ্ক থেকে পঙ্কজ। মপসাঁ। অনুবাদ : অরুণ চক্রবর্তী/গীতা গুহরায়। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী : ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩·৫০।

সুখের নাম প্রজাপতি। জীবন ভৌমিক। ডি লাইট বুক কোম্পানী : ২৪ অরবিন্দ সরণী, কলিকাতা-৫। মূল্য ২·০০।

সুস্মিতার সাহস ছিল। দীপঙ্কর পাঠক। আলফা-বিটা পাবলিকেশন্স : ৯৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা-১৪। মূল্য ৬·০০।

মনের উষা। সুধীররঞ্জন রায়চৌধুরী। ডি লাইট বুক কোম্পানী : ২৪ অরবিন্দ সরণী, কলিকাতা-৫। মূল্য ৩·৫০।

দর্গত ভারত। শ্রীপ্রফুল্ল চৌধুরী। ২৯ আর এন মুখার্জি রোড, কলিকাতা-১। মূল্য ১·০০।

মন মিতা। রানী গঙ্গোপাধ্যায়। ডি লাইট বুক কোম্পানী : ২৪ অরবিন্দ সরণী, কলিকাতা-৫। মূল্য ১·৭৫।

তান। শ্রীনিত্যপ্রিয় ঘোষ দস্তিদার। শ্রীমতী অঞ্জলী ঘোষ দস্তিদার, ৯১।৪ টালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা-৩৩। মূল্য ৮·০০।

নৃত্যে ভারত। মঞ্জুলিকা রায় চৌধুরী। রবি রায় চৌধুরী : ২৯০বি ডাঙ্গর অ্যাভিন্যু, কলিকাতা-৫৮। মূল্য ১০·০০।

সঙ্গীত প্রবীণ। শ্রীনিত্যপ্রিয় ঘোষ দস্তিদার। শ্রীমতী অঞ্জলী ঘোষ দস্তিদার : ৯১।৪ টালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা-৩৩। মূল্য ৮·০০।

মেক্সিকোর রূপসী কন্যা, হার্ডলস রেসের প্রতিযোগিনী এনরিকোয়েটা ব্যাসিলিও উনিশতম অলিম্পিকের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মশাল হাতে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করছেন।

খেলার মাঠে

সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আজ উত্তর আমেরিকার উন্নতিশীল শহর মেক্সিকোর দিকে। সেখানে এখন উনিশতম অলিম্পিক খেলাধুলোর মহামেলা। প্রায় সমস্ত দেশের প্রথম সারির ক্রীড়াবিদরা ১৯ রকমের খেলাধুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ। পক্ষকালব্যাপী খেলার এই মহা উৎসব ২৭ অক্টোবর শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু কোন দিনই শেষ হবে না এর স্মৃতিকথা। অলিম্পিকের কোন কথাই কোন দিন শেষ হয় না। খেলার ইতিহাসের বহু পাতায় জড়িয়ে থাকে এর নানা কাহিনী। অনির্বাণ অলিম্পিক অগ্নিশিখার মতই প্রতি অলিম্পিকের কাহিনী চিরজীবন্ত।

মেক্সিকোতেও ইতিমধ্যে অনেক কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে, সৃষ্টি হতে যাচ্ছে ক্রীড়া-কীর্তির কত উপাখ্যান। রেকর্ডও অনেক। যে অলিম্পিকের উদ্যোক্তাদের মাঝে মাঝে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে পথ খুঁজতে হয়েছে, কে জানে, সেই উদ্যোক্তারাই শেষ পর্যন্ত সর্বকালের স্মরণীয় অলিম্পিক উৎসবের কৃতিত্ব পাবেন কিনা।

অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠার কথা আগেও বলা হয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭৩৪৯ ফুট উঁচু দেশে অলিম্পিকের আয়োজনে বহু দেশের আপত্তি, নিগ্রো অ্যাথলীটদের অলিম্পিক বর্জনের হুমকি, দক্ষিণ আফ্রিকার অংশ গ্রহণের প্রতিবাদে এশিয়া এবং ইউরোপের অনেক দেশের মেক্সিকো অলিম্পিক বর্জনের সিদ্ধান্ত এবং শেষ পর্যন্ত স্বদেশীয় ছাত্রদের সরকারবিরোধী প্রচণ্ড বিক্ষোভ এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। একটি একটি করে সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে। সুখের কথা, মেক্সিকো অলিম্পিকের উদ্যোক্তারা সব সমস্যারই সমাধান করেছেন এবং সব পক্ষের শুভবুদ্ধির ফলে মেক্সিকোর খেলার আসর বিশ্বমানবের মহামিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, যেখানে খেলাধুলোর চরম পরীক্ষা মুখ্য হলেও বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ।

*

ছোট ছোট খবর দিয়ে শুরু করা যাক। যোগদানকারী দেশ এবং অংশ গ্রহণকারী প্রতিযোগী দু দিক দিয়েই মেক্সিকোয় নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। আগের রেকর্ড আগের ১৮বারের অলিম্পিক-তালিকায় দ্রষ্টব্য। মেক্সিকোয় যোগ দিয়েছে ১১৯টি দেশ এবং প্রায় সাড়ে সাত হাজার প্রতি-যোগী।

*

প্রাচীন অলিম্পিকের পীঠভূমি গ্রীস দেশের অলিম্পিয়া পর্বতের জিউস দেবের মন্দির থেকে পূতাগ্নি আনিয়ে অলিম্পিক উৎসবের নজির ১৯৩৬-এর বার্লিন অলিম্পিক থেকে। এই নজিরে মেক্সিকোর নতুনত্ব একজন মহিলা অ্যাথলীট দ্বারা স্টেডিয়ামের অনলাধারে পূতাগ্নি প্রজ্বলন। মেক্সিকোর হার্ডলস রেসের প্রতিযোগিনী এনরিকোয়েটা ব্যাসিলিও মশাল হাতে যখন জনাকীর্ণ স্টেডিয়ামে প্রবেশ করেন তখন জনাকীর্ণ ইউনিভার্সিটি সিটি স্টেডিয়াম উল্লাসে প্রায় ফেটে পড়ে। আরও নতুন খবর, মেক্সিকোর রূপসী কন্যা এনরিকোয়েটা সম্পূর্ণভাবে প্রসাধনবর্জিতা থেকে পূত অনল প্রজ্বলন করেন। তিনি কেশ প্রসাধন করেননি, মুখে পাউডারের প্রলেপ দেননি, ঠোঁটেও রঙ মাখেননি—প্রকৃতির কন্যাই যেন পূত অনল হাতে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করেছেন।

*

১৯৬৪ সালে অলিম্পিকের উদ্বোধনের সময় টোকিও অলিম্পিকের ব্যবস্থাপকরা এরোপ্লেন থেকে গ্যাসের লিপিতে দিক-বলয়ে অলিম্পিকের প্রতীক পঞ্চবলয় এঁকে দিয়েছিলেন। মেক্সিকোর ব্যবস্থাপকেরা উদ্বোধন দিনে আকাশের বুকে এঁকে দিয়েছেন পাঁচ মহাদেশের মিলনগ্রন্থি হেলিয়াম গ্যাসের বিরাটাকায় রঙ-বেরঙের পঞ্চবলয়। অভিনব পরিকল্পনা।

*

আধুনিক অলিম্পিকের প্রবর্তক

মনীষী ব্যারন পিয়ের দ্য কুবার্তাঁর বাণী, যে বাণী কুবার্তাঁ দিয়েছিলেন গ্রীসের প্রথম অলিম্পিকের উদ্বোধন দিনে সেই বাণীর রেকর্ড বাজানোও মেক্সিকো অলিম্পিকের এক বিশেষত্ব। বলা বাহুল্য, এই বাণীর মর্ম কথা : অলিম্পিকে জয় নয়, অংশ গ্রহণই বড় কথা। বিজয়ীর পুরস্কারের চেয়ে বিজয়ের জন্য সংগ্রামই অলিম্পিকের আদর্শ।

❋

টোকিও অলিম্পিকের মহা-উৎসব শেষে দুটি দৃশ্য সমবেত দর্শক ও প্রতিযোগীদের মধ্যে যুগপৎ বিষাদ ও আনন্দের সৃষ্টি করেছিল। বিদায় সঙ্গীতের মধ্যে ধীরে ধীরে অলিম্পিক পতাকা নামানোর মধ্যে ছিল বিষাদের সুর, আর আলোর মালায় ফুটে ওঠা—'উই উইল মিট এগেইন ইন মেক্সিকো সিটি ইন নাইনটিন সিক্সটি এইট' লেখার মধ্যে ছিল আবার মহামিলনের বাণী। সার্থক সেই বাণী। মেক্সিকোয় ৬জন মেক্সিকো সুন্দরীর হাতে ৬ জন জাপানী মেয়ের অলিম্পিক পতাকা দানের দৃশ্য নাকি হয়েছে অভিনব এবং হৃদয়গ্রাহী। যাঁরা প্রায় সব অলিম্পিকের সাক্ষী এবং সুন্দর ও শোভনতার পূজারী তাঁরা সবাই মেক্সিকোর উদ্বোধন উৎসবকে একবাক্যে বলেছেন, অপূর্ব, চমৎকার—এমন আর হয়নি।

❋

বোম্বাইয়ে জন্ম এবং বর্তমানে বিটিশ নাগরিক মরিস স্টিভস ভারতের একমাত্র মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদন নিয়ে লণ্ডন থেকে মেক্সিকোয় উড়ে গিয়েও ভারতীয় পাসপোর্ট না থাকায় অলিম্পিকে যোগ দিতে পারেননি। এতে স্টিভসের যত লজ্জা তার চেয়ে বেশী লজ্জা পাওয়া উচিত ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের। তবে অলিম্পিকের ব্যাপারে লজ্জার কি সীমা আছে! বোধ করি, সবচেয়ে বেশী লজ্জা পেয়েছেন ৪টি সন্তানের মা এবং ৮টি নাতি-নাতনীর ঠাকুমা ৫৭ বছর বয়স্কা আমেরিকার ফেন্সিং প্রতিযোগিনী মিসেস ম্যাকসিন মিসেল, তিনি সত্যি সত্যিই নারী কিনা—সেই ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যাপারে।

❋

কালোবাজার পৃথিবীর সর্বত্র। অলিম্পিকেও তার রেহাই নেই। খবর—উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভারতীয় মুদ্রায় ১৮০ টাকার টিকিট নাকি ৭৫০ টাকা কালোবাজারী দামে বিক্রি হয়েছে।

❋

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির ৮১ বছর বয়সী আদর্শবাদী আমেরিকান সভাপতি আভেরী ব্রাণ্ডেজ যিনি মেক্সিকো অলিম্পিকে দক্ষিণ আফ্রিকার আমন্ত্রণ প্রত্যাহারের পর সভাপতির পদ ত্যাগ করবেন বলে প্রায় ঠিক করে ফেলেছিলেন, তিনি আবার আই ও সি-র সভাপতি হয়েছেন। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তবে ব্রাণ্ডেজের 'আদর্শের' জন্য বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাতে কিছু বিস্ময় আছে বই কি। আই ও সি-র সভায় ঠিক হয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকা অলিম্পিকের সভ্য থাকবে, তবে আমন্ত্রণ না পেলে অলিম্পিকে যোগ দিতে পারবে না। অর্থাৎ তুমি আমার সংসারেরই সভ্য, কিন্তু খেতে না ডাকলে খেতে আসতে পারবে না। বেচারা দক্ষিণ আফ্রিকা না হয় অলিম্পিকের আদর্শ-বিরোধী এবং বর্ণবিদ্বেষী। তাই বলে সংসারে রেখে তাদের না খাইয়ে রাখার কি

টোকিও অলিম্পিকে সোনা-রুপো-ব্রোঞ্জের তালিকা

। রোম অলিম্পিকের মোট পদক-সংখ্যা শেষ ঘরে বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল।

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট	১৯৬০ মোট
রাশিয়া	৩০	৩১	৩৫	৯৬	(১০৩)
আমেরিকা	৩৬	২৬	২৮	৯০	(৭১)
জার্মানী	১০	২২	১৮	৫০	(৪২)
জাপান	১৬	৫	৮	২৯	(১৮)
ইটালী	১০	১০	৭	২৭	(৩৬)
পোল্যাণ্ড	৭	৬	১০	২৩	(২১)
হাঙ্গেরী	১০	৭	৫	২২	(২১)
অস্ট্রেলিয়া	৬	২	১০	১৮	(২২)
ব্রিটেন	৪	১২	২	১৮	(২০)
ফ্রান্স	১	৮	৬	১৫	(৫)
চেকোস্লোভাকিয়া	৫	৬	৩	১৪	(৮)
রুমানিয়া	২	৪	৬	১২	(১০)
বুলগেরিয়া	৩	৫	২	১০	(৭)
নেদারল্যাণ্ড	২	৪	৪	১০	(৩)
সুইডেন	২	২	৪	৮	(৬)
ডেনমার্ক	২	১	৩	৬	(৬)
তুরস্ক	২	৩	১	৬	(৯)
ফিনল্যাণ্ড	৩	০	২	৫	(৫)
নিউজিল্যাণ্ড	৩	০	২	৫	(৩)
যুগোস্লাভিয়া	২	১	২	৫	(২)
ক্যানাডা	১	২	১	৪	(১)
সুইজারল্যাণ্ড	১	২	১	৪	(৬)
বাহামাস	১	০	০	১	(০)
ইথিওপিয়া	১	০	০	১	(১)
ভারত	১	০	০	১	(১)
দক্ষিণ কোরিয়া	০	২	১	৩	
টাঙ্গানিকা	০	১	২	৩	
টিউনিসিয়া	০	১	১	২	
ইরান	০	০	২	২	
কিউবা	০	১	০	১	
আর্জেণ্টিনা	০	১	০	১	
পাকিস্তান	০	১	০	১	
ফিলিপাইন	০	১	০	১	
ব্রাজিল	০	০	১	১	
ঘানা	০	০	১	১	
আয়ার	০	০	১	১	
কেনিয়া	০	০	১	১	
মেক্সিকো	০	০	১	১	
নাইজেরিয়া	০	০	১	১	
উরুগুয়ে	০	০	১	১	

অলিম্পিকের আদর্শ বজায় থাকবে? খেলাধুলোর পবিত্র অঙ্গনে যারা ঘৃণা ও বিদ্বেষ আজও জীইয়ে রেখেছে তাদের সঙ্গে আই ও সি-র এখনো সন্ধি প্রচেষ্টা সত্যিই হাস্যকর।

একলব্য

ব্যাক স্ট্রোকে বিশ্বের সেরা

উনিশ শো ছেষট্টিতে রোনাল্ড ম্যাথেসের নাম কেউই জানত না। ব্যাক স্ট্রোক সাঁতারে পৃথিবীর প্রথম ২০ জনের মধ্যেও তার নাম ছিল না। এমন কি, ইউরোপের প্রথম ২০ জনের মধ্যেও তার নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি। শুধু পূর্ব জার্মানীর সাঁতারে কিছুটা নাম ছিল। তাও তিন নম্বরে। এক শো মিটার চিত সাঁতারে সময় ছিল ৬৩·৬ সেকেন্ড। দু' শো মিটারে ২ মিনিট ১৮·৬ সেকেন্ড।

কিন্তু সাতষট্টিতে মাত্র সাত সপ্তাহের সাফল্যের নজিরে সারা বিশ্বে রোনাল্ড ম্যাথেসের নাম। আজ মেক্সিকো অলিম্পিকের সম্ভাবনারও শীর্ষস্থানে।

গত বছর সেপ্টেম্বরের শেষের দিক থেকে নভেম্বরের গোড়ার দিক পর্যন্ত সাত সপ্তাহে ম্যাথেস পাঁচটি আশ্চর্যজনক রেকর্ড সৃষ্টি করে।

সেপ্টেম্বরের ২০ তারিখে ১১০ গজ (পিঠ সাঁতার) সাঁতরায় ৬০·১ সেকেণ্ডে। সময়টা ১৯৫৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার জন মংকটনের করা বিশ্ব রেকর্ড, যা তখনও বিদ্যমান, সেই সময় থেকে ১·৪ সেকেন্ড উন্নত।

সেপ্টেম্বরের ২১ তারিখে ব্যাক স্ট্রোকেই ১০০ মিটার টানে ৫৮·৪ সেকেণ্ডে। এই সময়ও বিশ্ব রেকর্ডকে ম্লান করে দেয়। মাত্র ৩ সপ্তাহ আগে টোকিওতে বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় খেলাধুলোয় মার্কিন ছাত্র চার্লস হিককক্স ও ডগ রাসেল ৫৯·১ সেকেণ্ডে এই বিষয়ে যে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন তা ভেঙে যায়।

অক্টোবরের ২৯ তারিখে ২০০ মিটার পিঠ সাঁতারে ম্যাথেস করে ইউরোপের নতুন রেকর্ড। সময় দাঁড়ায় ২ মিনিট ১১·১ সেকেণ্ড। বলা দরকার, মেক্সিকোর উঁচু জায়গায় এই কৃতিত্ব এবং সময়টা নিজের সব চেয়ে ভাল সময়ের চেয়ে ৭½ সেকেণ্ডে উন্নত।

নভেম্বরের ৭ তারিখে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টিকারী (৪×১০০ মিটার মেডলে রিলে) পূর্ব জার্মানীর রিলে দলে ম্যাথেস প্রথম শত মিটারের প্রতিযোগী।

এবং ৮ নভেম্বর তারিখে ২০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে হিককক্সের বিশ্ব রেকর্ডকে দেড় সেকেন্ড পিছনে ফেলে ২ মিনিট ৭·৯ সেকেণ্ডে রোনাল্ডের নতুন বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি।

ষোলো বছরের একটি ছেলের পক্ষে সত্যিই এটা অবিশ্বাস্য কৃতিত্ব। প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেননি লিপজিগ সুইমিং পুলের শ' খানেক সাঁতার-উৎসাহীও। নভেম্বরের হাড়-কাঁপানো শীতে ১১০ গজের প্রথম ৫৫ গজ যখন ম্যাথেস ২৭·৭ সেকেণ্ডে শেষ করল তখন কারোই সন্দেহ রইল না—বিশ্ব রেকর্ড অবশ্যম্ভাবী। ১১০ গজে বিশ্ব রেকর্ডের পর পরিচালকদের মধ্যে শলাপরামর্শ এবার ম্যাথেস কোন বিষয়ের বিশ্ব রেকর্ড ভাংগবে? কেউ

রোনাল্ড ম্যাথেসের চিৎ সাঁতার

বললেন ২২০ গজের। কেউ বললেন—না, মেট্রিক পরিমাপে, কারণ ওটাই অলিম্পিকের বিষয়। তবে ২০০ মিটার নয়। ১০০ মিটারেই দেখা যাক কী সময় দাঁড়ায়।

ম্যাথেস সাঁতার আরম্ভ করল। ২৭·৮ সেকেণ্ডে প্রথম ৫০ মিটার, পরের ৫০ মিটার অবিশ্বাস্য ৩০·৬ সেকেণ্ডে। ফলে ৫৮·৪ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার, যা অনেক খ্যাতনামা ফ্রি স্টাইলের সাঁতারুর পক্ষেও গর্বের কথা।

আন্তর্জাতিক সাঁতার ফেডারেশনের নিয়ম অনুযায়ী রোনাল্ডের রেকর্ডগুলি অনুমোদন পাবার কথা নয়। কারণ, অনুষ্ঠানের অন্তত তিন দিন আগে সর্বসাধারণের কাছে অনুষ্ঠানের ঘোষণা না করা হলে সেই অনুষ্ঠানের রেকর্ড স্বীকৃতি পায় না। কিন্তু রোনাল্ড ম্যাথেসের রেকর্ড আজ আন্তর্জাতিক সুইমিং ফেডারেশনেরও স্বীকৃতি পেয়েছে—সম্ভবত তার অসাধারণত্বের জন্য।

গত বছর মেক্সিকোর প্রাক-অলিম্পিকে ম্যাথেসের সাঁতার কাটার ভঙ্গি দেখে নেদারল্যাণ্ডের ন্যাশনাল কোচ রব কারথোভেন বলেছেন, 'সহজাত প্রতিভার প্রদীপ্ত রোনাল্ড ম্যাথেস। হাওয়া-ভরতি বলের মত ওর শরীর জলের উপর ভেসে থাকে, যখন জল টানার জন্য হাত চালনা করে তখন স্বাভাবিকভাবেই কাঁধ জলের উপরে ওঠে, কিন্তু দেহের ভারসাম্য পুরোপুরি বজায় থাকে। সাঁতারের সময় ওকে খুবই সহজ বলে মনে হয়। কোন জড়তা নেই—উদ্বেগহীন অনায়াস ভঙ্গি।

দু' বছর আগের খ্যাতিহীন ম্যাথেসের মত ওর কোচ এখনো প্রায় 'নাম'হীন। এবং বলবার কথা, পুরুষ কোচ নয়, একজন মহিলা। নাম মারলিস গ্রোহে-গিসলার। তবে গ্রোহে-গিসলারের উপর ম্যাথেসের অগাধ আস্থা। তাই এখনো ওই মহিলাই ওর সাঁতার-শিক্ষিকা। ম্যাথেসের দেহের উচ্চতা ৫ ফুট ৬½ ইঞ্চি। ওজন ৬৪ কিলোগ্রাম। অনুশীলনপদ্ধতিও সহজ। সপ্তাহে আট-নয়বার পনেরো শো মিটার থেকে দু' হাজার মিটার অনুশীলন।

ম্যাথেসকে নিয়ে পূর্ব জার্মানীর অনেক আশা। টোকিও অলিম্পিকে একটি ছাড়া সাঁতারের সব সোনার মেডেল গিয়েছিল আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায়। ইউরোপে মাত্র একটি। এবারও ইউরোপে যদি একটিই স্বর্ণপদক যায়, সেটা যাবে পূর্ব জার্মানীতে এবং ম্যাথেসের গলায়—এটাই সাঁতার-বিশেষজ্ঞদের দৃঢ় অভিমত।

মুকুল

অরণ্যদেব ★ লী ফক

১

ওর উপরে হামলা করা ঠিক হয়নি, ব্রাউডি। জঙ্গলের লোকেরা টের পেলে দলে-দলে তেড়ে আসবে।

যা করছি করতে দাও। আমার উপরে ওস্তাদি কোরো না!

আকাশ থেকে খারাপ মানুষ নেমেছে--- অরণ্যদেবের আসা দরকার---

কিলাউইয়ির সোনা-বেলায় ...

আকাশ থেকে খারাপ মানুষ নেমেছে --- অরণ্যদেবের আসা দরকার---!!

ওরা ঢাক পিটোচ্ছে? কেন পিটোচ্ছে?

সংকেতিক বার্তা। আমাদেরই সম্পর্কে।

তাতে আমি ভয় পাবার পাত্র নই। কামান তৈরী রাখো।

স্রেফ গন্ধকের জন্যে এত কাণ্ড?

গন্ধক বেচে কত আর পাওয়া যাবে?

ব্রাউডি, আসল ব্যাপারটা শুধু আমরা দুজনে জানি।

বকবক কোরোনা, চটপট খুঁড়ে বোঝাই করো।

2/25

ধীরে। তোরা কাজ করছিস না কেন?

ঢাকের শব্দে ভয় লাগছে!

গা-ছমছম করছে। কী হবে কে জানে।

গাছের মাথায় উঠে ঢাক বাজাচ্ছে। রাইফেলটা দে তো।

!

এক মুহূর্তের স্তব্ধতা। তারপরেই একসঙ্গে বেজে উঠল অনেকগুলি ঢাক। -----

আকাশ থেকে খারাপ মানুষ নেমেছে

... অরণ্যদেবের আসা দরকার—

৬

ফিল্ম ইনস্টিটিউটে

সমাবর্তন

"ডিপ্লোমা পেলেই ছাত্ররা যেন মনে না করেন তাঁদের শিক্ষার কাল শেষ হয়ে গেছে। চলচ্চিত্রকারদের শিক্ষার শেষ নেই, তাঁদের শিক্ষার ক্ষেত্র ও সময় সীমাবদ্ধ হতে পারে না"—পুনায় ফিল্ম ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ার সমাবর্তন ভাষণে শ্রীসত্যজিৎ রায় এই কথা বলেন। গত ১০ অক্টোবর উৎসব সম্পন্ন হয়। অসুস্থতাবশত শ্রীরায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাঁর ভাষণ পাঠ করে শোনান ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ শ্রীজগৎ মুরারি।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীকে কে শাহ ডিপ্লোমা প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় চলচ্চিত্র শিল্পসেবীদের আধুনিকতা এবং বড় রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে এগিয়ে যাবার জন্য আবেদন জানান। এ-ছাড়া চলচ্চিত্রের শিল্পের পক্ষে এ-যুগে উন্নতি সাধন করা অসম্ভব। ফিল্ম সেন্সর সম্পর্কে তিনি বলেন, সেন্সরের ব্যাপারে এমন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন যাতে তা পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে। অবশ্য দেখতে হবে, সাহিত্যে ও আর্টে প্রকাশভঙ্গির স্বাধীনতা অন্য ক্ষেত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ না করে।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার-মন্ত্রী শ্রী কে কে শাহ প্রতিষ্ঠানের কৃতী ছাত্রদের (মোট ৩৮ জনকে) ডিপ্লোমা প্রদান করেন। শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালনা ও শ্রেষ্ঠ ডিপ্লোমা ফিল্মের জন্য "স্ক্রীন" স্বর্ণপদক পান ডি গৌতমন। তিনি "ডাঃ পি ভি পাথে স্মৃতি পুরস্কার"ও লাভ করেন। মোশান পিকচার ফটোগ্রাফি বিভাগে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার "বলে, দাশগুপ্ত স্বর্ণপদক" পান প্রেম সাগর। ফটোগ্রাফির দিক থেকে শ্রেষ্ঠ ডিপ্লোমা ছবির জন্যও তিনি "আর ভি মাথুর রৌপ্যপদক" লাভ করেন। অভিনয়ে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার "স্টার অ্যান্ড স্টাইল স্বর্ণ-পদক" অর্জন করেন নবীন নিশ্চল। সাউন্ড রেকর্ডিং ও ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে "বলে, দাশগুপ্ত স্বর্ণপদক" লাভের কৃতিত্ব মদন প্রকাশের। চিত্রসম্পাদনা বিভাগে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার (স্টার অ্যান্ড স্টাইল গোল্ড মেডেল) পান অমর ভট্টাচার্য।

ফিল্ম ইনস্টিটিউটের উপদেষ্টা সমিতি ওই প্রতিষ্ঠানে একটি ফিল্ম স্টুডিও স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শিকার : আশা পারেখ

গুরু দত্ত ফিল্মসের "শিকার" (পরিচালনা—আত্মা রাম) এ-সপ্তাহে রিগাল সিনেমা (প্রধান রিলিজ হাউস), প্রিয়া প্রভাত এবং অন্যত্র মুক্তি পাচ্ছে। আশা পারেখ, ধর্মেন্দ্র, সঞ্জীবকুমার, বেলা বোস, জনি ওয়াকার, রেহমান প্রভৃতি ছবির প্রধান শিল্পী। সংগীত পরিচালনা করেছেন শংকর-জয়কিষণ।

লতা মঙ্গেশকর : অন্য পরিচয়

লতা মঙ্গেশকর তাঁর লকেটটি দেখাচ্ছেন—তাতে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি

ফটো—দেশ

বিখ্যাত গায়িকা লতা মঙ্গেশকরের পরিচয় কারো অজানা নয়। ভক্তিমতী লতার কথা বোধহয় অনেকেই জানেন না। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে লতা ছোটবেলা থেকেই অনুপ্রাণিত। তাঁর পরিবারের সকলেই তাই। বিশেষ করে লতার ভাই হৃদয়নাথ।

গত শুক্রবার লতা মঙ্গেশকর কলকাতায় আসেন একটি অনুষ্ঠানে গান গাইবার জন্য। ওইদিনই তিনি বিকালে এক ঘরোয়া বৈঠকে সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হন। কথায় কথায় তিনি আমাকে বলেন স্বামী বিবেকানন্দের কথা। "জানেন, স্বামীজীর সব বই আমার আছে। অনেকদিন ধরে পড়ছি। ভগিনী নিবেদিতার বইও সব রয়েছে আমার কাছে। আমাদের আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ। আমার ভাই তো স্বামীজীর ভক্ত"—একটু অবাক হয়েই শুনছিলাম লতার কথা। পরক্ষণেই তিনি দেখালেন তাঁর গলার হারের লকেটটি—স্বামীজীর ছবি। বহুকাল ধরে এই লকেট তিনি পরছেন। হঠাৎ লতা মঙ্গেশকরের প্রশ্ন : "আচ্ছা, বাংলাদেশে আজ স্বামীজীর আদর্শ ও ভাবধারা নিয়ে তেমন আন্দোলন নেই কেন? বাংলার ছেলে-মেয়েরা আজ আর তেমন করে স্বামীজীর বই পড়ে না—তাই না? আমাদের মহারাষ্ট্রে কিন্তু উল্টো। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি ছোট—বড় সকলেরই খুব ভক্তি।"

আর অন্য কোন কথা যেন লতার ভাল লাগছিল না। গান, ফিল্ম, জলসা—কোন কিছুই নয়। "স্বামীজীর কথা উঠলে যেন শেষ হতে চায় না—" লতা নিজেই বললেন। তারপর একটু যেন অন্যমনস্ক হলেন শিল্পী। বললেন, "কাল সকালেই বেলুড় মঠে যাব। কলকাতায় এলেই যাই। চার বছর আগে এসেছিলাম, আর এই এলাম কলকাতায়।"

বেশ বুঝতে পারছিলাম লতা এই মুহূর্তে তাঁর পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন। ভাবলাম, কেমন করে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি তাঁর এমন অনুরাগ এল। জিজ্ঞাসা করলাম। "আপনা থেকেই। ছোটবেলা থেকেই বিবেকানন্দ আমার আইডল। তাঁর বই পড়েছি পরে, তাঁর সম্বন্ধে অনেক জেনেছি।" কথায় কথায় আরও বললেন লতা, "বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা।

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং আরও অনেকের বই পড়েছি। তবে বাংলায় পড়তে পারলে ভাল হত। আমি তো বাংলা পড়তে পারি না, তবে শুনে বুঝতে পারি সব কথা।"

"রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েছেন কখনো?"—অন্য প্রসঙ্গে চলে এলাম। "গেয়েছি বৈকি। তবে অন্য ভাষায়। আমি বাংলায় রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে চাই। সুন্দর কথা, তাই না?"—বলে একটু থামলেন লতা। গানের কথায় তাঁকে বেশীক্ষণ বেঁধে রাখা গেল না। আবার চলে এলেন স্বামীজীর কথায়, "বেলুড়ে আসবেন নাকি? এলে আবার স্বামীজীর কথা হবে", অবাক হয়ে তাকালাম ওঁর দিকে। লতা যেন অন্য জগতের লোক। ফস করে প্রশ্ন করলাম—বাইরের জগতের এত হৈচৈ, এত ফিল্মের গান, যশ, লোকের ভিড়—এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলেন কী করে? আপনার ভিতরের মানুষটি যে সম্পূর্ণ আলাদা।

একটু চুপ করলেন লতা। ওঁর দুই চোখে কেমন একটু বিষাদ, একটু ক্লান্তি। আস্তে আস্তে বললেন, "অনেক সময় ইচ্ছা করে সব ছেড়ে চলে যাই। নিজের ভিতরে ডুব দিই।"

—বিশেষ প্রতিনিধি

চিত্র-সমালোচনা

অরুন্ধতী দেবীর "মেঘ ও রৌদ্র" ছবিতে হাসু বন্দ্যোপাধ্যায় ফটো—সেন

দিওয়ানা

রাজ কাপুরের জন্য দিওয়ানা চরিত্র, নাকি দিওয়ানা চরিত্রটির জন্য রাজ কাপুর এই প্রশ্নের মীমাংসা মুলতুবী থাক। আওয়ারা, দিওয়ানা ইত্যাদি চরিত্র যে রাজ কাপুরের এক্তিয়ারের মধ্যে তা হিন্দী চিত্রের দর্শক মাত্রই জানেন। তবে আওয়ারা ও দিওয়ানাও মধ্যে তফাত আছে।

দিওয়ানা চরিত্রটি অতিমানবোচিত বহু গুণের আধার। সে সৎ, সাহসী, সত্যবাদী, সরল, সহনশীল। শুধু বিদ্যার্জনই করতে পারেনি। তবে মহামূর্খ হয়েও সে মহা-পাণ্ডিতের মত কথা বলে। এই অধিকারটুকু হিন্দী চিত্রের সব অবিশ্বাস্য চরিত্রেরই আছে। দিওয়ানার সাধারণ বুদ্ধি কম। কিন্তু সতর্ক প্রহরার মধ্যেও হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়া এবং দুর্ধর্ষ ডাকাত বা ভীষণ গুণ্ডাপ্রকৃতির লোককে অবলীলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলার এক অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী সে। নিজে যে দিওয়ানা এই তত্ত্বটি সে গান গেয়ে সকলকে জানিয়ে দেয়। অবশ্য লোকে তার এই স্বীকারোক্তির অপেক্ষা না রেখেই তাকে দিওয়ানা (পাগল) বলে ডাকে।

নায়িকা (সায়রা বানু) শিল্পপতির একমাত্র কন্যা, উচ্চশিক্ষিতা, বিলিতী পরিবেশে মানুষ। বাবা সবে মারা গিয়েছেন। বাবার ব্যবসার পার্টনারই নায়িকার অভিভাবক (যে আসলে "দৌলত কা কুত্তা", কুচক্রী তথা ভিলেন)। নায়িকার সম্পত্তি আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যেই বৃদ্ধ ভিলেনটি একজনকে নিজের ছেলে সাজিয়ে (নিজের ছেলের সন্ধান সে পায়নি—বলেই দিই, দিওয়ানাই তার পুত্র) নিয়ে আসে নায়িকার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য। নায়িকা অবশ্য এত তত্ত্ব জানে না। পাত্র পছন্দ নয় বলে সে বাড়ি ছেড়ে পালায়। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, ছবিতে সায়রা বানু নাবালিকা বলেই কুচক্রীরা আইনের দিক থেকে সুবিধা পেয়েছে। তাকে ধরে আনার জন্য সচেষ্ট। পলাতকার সঙ্গে দিওয়ানার সাক্ষাতের পরই "দিওয়ানা"-র (অনুপম চিত্র) "গল্প" শুরু হয়। নায়কের গরুর গাড়ি চালিয়ে যাওয়া (এই গাড়ি চালিয়েই সে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়), নায়কের ওই ভোলে-ভালে চরিত্র, সব কথার শেষে একটি বিশেষ উক্তি (জয় জয়), পলাতকা নায়িকার সঙ্গে দেহ-দূরত্ব বজায় রেখে পথে নির্জনে রাত্রি-যাপন ইত্যাদি পরিস্থিতি দেখে ভুলেও তিসরী কসম-এর কথা ভাববেন না। দুটি ছবির মধ্যে ফারাক আকাশ-পাতাল। সে যাক। নায়িকার ললাটলিখন খণ্ডাবে কে। এই মূর্খ দিওয়ানাকে যে নায়িকার ভালবাসতে হবে এই ভবিতব্য সে নিজে না জানলেও দর্শকের অজ্ঞাত থাকেনি। বিশেষ করে নায়ক যেখানে রাজ কাপুর। তবে নায়িকা প্রথমে ভালবেসেছে দিওয়ানার শানাই বাজনা। তার এই গুণটির কথা আগে বলা হয়নি। এবং মুগ্ধ হয়েছে নায়কের নির্লোভ চরিত্র দেখে। তাদের মিলনের পথের সব জঞ্জাল (অর্থাৎ ভিলেনদের চক্রান্ত—যার ফলে দিওয়ানাকে খুনের দায়ে পড়তে হয়েছিল) যথাসময়ে অপসারিত। পরিচালক মহেশ কাউলের এই ক্রাইম ও কথাসর্বস্ব ছবিটি ক্লাইম্যাক্সের দিকে এগিয়েছে নায়কের গরুর গাড়ির মতই ঢিমে তেতালায়।

রাজ কাপুর যে বড় অভিনেতা তার প্রমাণ এত অবিশ্বাস্য ঘটনার মধ্যেও তাঁর অভিনয় জায়গায় জায়গায় মনে দাগ কাটে। সংগীত শঙ্কর জয়কিষেণের। ছবির রঙ ইস্টম্যান কালার।

বোম্বাই বিচিত্রা

বম্বেতে বাঙালী ক্যামেরাম্যানদের মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে প্রশংসাধন্য, রাধু কর্মকার। কিন্তু রাধুবাবু কোন সময়েই খুব বেশী ছবিতে কাজ করেন না বা রাজকাপুরের ছবির সঙ্গে যুক্ত বলে করা সম্ভব হয় না। রাধুবাবুর সঙ্গে আর যাঁর নাম আসে তিনি তারু দত্ত। বর্তমানে আর যাঁদের চাহিদা বেড়েছে তাঁদের মধ্যে কমল বোস অন্যতম। কমল বোসও নিউ থিয়েটার্সের, পরে বিমল রায় প্রডাকশন্সের মাধ্যমে বম্বেতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। অধুনাখ্যাত ডকুমেন্টারী নির্মাতা শুকদেবের সমাপ্তপ্রায় 'মাই লাভ'-এর কাজ দেখে অনেকেই কমল বোসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন। শুনছি বম্বে এবং মাদ্রাজে কমল বোস বেশ কয়েকটি রঙীন ছবির জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এ ছাড়া আর একজন উদীয়মান আলোকচিত্রশিল্পী ভাল এবং দ্রুত কাজ করার জন্য আজকাল সংশ্লিষ্ট মহলে যথেষ্ট আলোচিত হচ্ছেন। এঁর নাম অলোক দাশগুপ্ত। বম্বের চলচ্চিত্র জগতে ভদ্রলোককে সবাই 'খুকেলু' বলে জানেন। এঁর প্রথম রঙীন ছবি 'অভিলাষ' সমাপ্তপ্রায়। ছবির পরিচালক তরুণ সম্পাদক অমিত বোস। অমিত বোস বম্বেতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন বেশ কিছুকাল আগেই। 'মধুমতী'র পর যখন বিখ্যাত সম্পাদক হৃষিকেশ মুখার্জি বিমল রায় প্রোডাকশন্স ছেড়ে দেন, তখন সদ্য বিদেশ প্রত্যাগত অমিত বোসের হাতে বি. আর. পি'র ছবির সম্পাদনার ভার ন্যস্ত হয়। 'সুজাতা', 'পরখ', 'উসনে কহা থা' প্রমুখ ছবি অমিত বোস সম্পাদিত। এ ছাড়া অমিত বোস একটি শিশুচিত্র পরিচালনা করেছিলেন। শিশুচিত্রটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের সম্মানে ভূষিত। অমিত বোসের সমাপ্তপ্রায় ছবি 'অভিলাষ'-এ অলোক দাশগুপ্ত প্রসংশনীয় কাজ করেছেন শুনে অনেক প্রযোজক বর্তমানে শ্রীদাশগুপ্তকে নিয়ে আলোচনা করছেন। আরো একজন, শ্রীঅপূর্ব ভট্টাচার্য, ইনিও তরুণ বাঙালী আলোকচিত্র শিল্পী; অপূর্বর খ্যাতিকেও কম খাতির করে না স্থানীয় প্রযোজকরা।

সরল শর্মা

নরেশ মিত্র স্মরণে

পরলোকগত শিল্পী শ্রীনরেশ মিত্রর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে অভিনেতৃ সঙ্ঘ গত শুক্রবার এক শোকসভার আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীমন্মথ রায়। শ্রীমনোজ বসু, শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত, শ্রীসুশীল মজুমদার, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনুপকুমার প্রমুখ বিভিন্ন বক্তা শ্রীনরেশ মিত্রর কর্মজীবনের বহু ঘটনার উল্লেখ করে তাঁর নিষ্ঠা ও চরিত্রমাধুর্যের কথা আলোচনা করেন। শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত বলেন, শিশির যুগে, শিশিরকুমারের আকৈশোর বন্ধু ও সহ-শিল্পী হয়েও নরেশচন্দ্র সম্ভবত ওই কালের একমাত্র অভিনেতা যাঁর অভিনয়ে শিশিরকুমারের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। উন্নত, সুঠাম দেহ কিংবা সুললিত কণ্ঠ তাঁর ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও শুধু অভিনয়ের দক্ষতায় এবং চোখের ভাষায় দর্শকের চিত্ত জয় করেছেন। 'নরেশ মিত্রর দুটি চোখ কথা বলত", বললেন বক্তা শ্রীমনোজ বসু। চলচ্চিত্রে উত্তরসুরীদের নরেশচন্দ্র কেমন করে অভিনয় শেখাতেন তা বর্ণনা করেন শ্রীসুশীল মজুমদার।

বিশ্বরূপা মঞ্চে এক শোকসভায় গত ৯ অক্টোবর শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্রর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে শ্রীরাসবিহারী সরকার বলেন, তিনি প্রায় অর্ধশতাব্দী বাংলা মঞ্চের সেবা করে গিয়েছেন। তাঁর পরিচালিত "সেতু" নাটক ১০৮৪ রাত্রি অভিনীত হয়ে এক রেকর্ড স্থাপন করেছে। সভায় আর যাঁরা শিল্পীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমনোজ বসু, শ্রীজহর গাঙ্গুলি, শ্রীকানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসতু সেন, ডঃ অজিত ঘোষ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

"শেষ থেকে শুরু" চিত্রে সবিতাব্রত দত্ত
ফটো—দেশ

বিশ্বজিতের বদান্যতা

অভিনেতা বিশ্বজিৎ সম্প্রতি বন্যাত্রাণের জন্য রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরের হাতে দশ হাজার টাকার একটি চেক দিয়ে এসেছেন। প্রতিবারের মত এ বছরেও তিনি পুজার সময় কলকাতার সকল ফিল্ম স্টুডিওর কর্মী ও কলাকুশলীদের নতুন বস্ত্র দিয়েছেন। তা ছাড়া গত লক্ষ্মীপুজার দিন উৎসবের আড়ম্বর বর্জন করে শিল্পী বাড়িতে সহস্রাধিক দরিদ্রকে আপ্যায়িত করেছেন। এবং বস্ত্র ও অর্থও দান করেছেন।

রেকর্ড সমালোচনা

হিন্দুস্থান রেকর্ড

রবীন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদের গান, কীর্তন, ভক্তিগীতি আধুনিক গান, ছড়ার গান, যন্ত্রসংগীত এবং ব্যঙ্গগীতি বা প্যারডি—এই সব নিয়েই হিন্দুস্থান রেকর্ডের শারদীয় উপহার।

৭৮ আর-পি-এম রেকর্ডে শান্তিদেব ঘোষের গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গান (অধরা মাধুরী ধরেছি এবং যা হবার তা হবে) রবীন্দ্রসংগীত অনুরাগীদের কাছে বিশেষ সম্পদ বলে মনে হবে। তিনি চমৎকার গেয়েছেন বলেই নয়, রবীন্দ্রনাথের গান নিখুঁতভাবে কেমন করে গাইতে হয় তা শেখবার জন্যও বটে। চিত্রলেখা চৌধুরীর গাওয়া দ্বিজেন্দ্রলালের (বসিয়া বিজনে এবং বেলা যে যায়) গান দুটি শিল্পীর গায়কি ও সুরেলা কণ্ঠের জন্য বিশিষ্ট। রাজেশ্বর মিত্র পরিচালনায় এই গান দুখানি এবং সুব্রতা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া অতুলপ্রসাদের (ওহে নীরব এসো নীরবে এবং ভব পারে যাব কেমন করে) দুটি গান রেকর্ডে বাণীবদ্ধ। এই রেকর্ড দুখানির জনসমাদর হবে বলা বাহুল্য। রাধারানী দেবী, অমর পাল ও পূর্ণ দাস বাউল হিন্দুস্থান কোম্পানির তিনজন বিশিষ্ট শিল্পী। এ'রাও এবার শ্রোতাদের প্রভূত আনন্দ দেবেন তাঁদের গানের মধ্য দিয়ে। রাধারানী দেবীর কীর্তন (বন্ধুরে লইয়া কোলে ও বলি কি লাগি), অমর পালের "জাগো জাগো নগরবাসী" ও "হরিনাম দিয়ে নিতাই" এবং পূর্ণ দাসের "যেমন বেণী তেমনি রবে" ও "গোঁসাই এবার পড়েছি" গানগুলি শুনে মন ভরে। ছড়ার গানে জপমালা ঘোষের সুনাম আছে। এবারের দুটি গানে তা অক্ষুণ্ণ। হীরালাল সরখেল ও বেচু মুখোপাধ্যায়ের যথাক্রমে রামপ্রসাদী গান ও ভক্তিগীতি (শ্রীরামকৃষ্ণ প্রশস্তি) সংগীত। শোভা রায়ের ভক্তিগীতি প্রশংসনীয়। যন্ত্রসংগীতের আসরে হাসি বিশ্বাস একটি নতুন নাম। তিনি রেকর্ডে রাগের ভিত্তিতে চমৎকার বাঁশী বাজিয়েছেন। শিল্পীর এই প্রথম রেকর্ড তাঁকে সংগীতের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। বিদ্যুৎ বসুর গিটারও মনোগ্রাহী। দীপেন মুখোপাধ্যায়ের প্যারডি গান (একটি "বাঘিনী" ছবির গান নিয়ে, অপরটি দ্বিজেন্দ্রগীতির অনুকরণে) এবারেও খুব জনপ্রিয় হবে।

আধুনিক গানগুলি সামগ্রিকভাবে আরও ভাল হতে পারত। কথায় এবং সুরে। যাঁদের গান শুনতে ভাল লাগে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, দিলীপ সরকার, শেফালী মুখোপাধ্যায়, সুকুমার মিত্র, অনুপম মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ বিশ্বাস প্রমুখ। কয়েকজন নতুন ও অপেক্ষাকৃত তরুণ শিল্পীর গানের রেকর্ড বের করে কোম্পানি শ্রোতাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। এ'রা সকলেই প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন। শিল্পীরা হলেন দুর্গা ভট্টাচার্য, মিহির দত্ত, শ্যামল দত্ত, শান্তিনাথ গাঙ্গুলি, বাসুদেব গাঙ্গুলি, নিতাই গোস্বামী, সুভাষ দত্ত, মিলনকুমার চৌধুরী, সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির সরকার, বিনয় ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

কলকাতায় নির্মীয়মাণ "সুবো কাঁহি শাম কাঁহি" হিন্দী ছবিতে (পরিচালনা : দিলীপ বসু) মৃণাল মুখোপাধ্যায় ও অর্চনা ফটো—দেশ

মেগাফোন

দীর্ঘকাল পর ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের গানের রেকর্ড বের করেছেন মেগাফোন কোম্পানি। এত বছর পর ভীষ্মদেবের গান আবার রেকর্ডে শোনা গেল। শ্রোতাদের পক্ষে তা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। শিল্পীর দুটি রেকর্ড প্রকাশিত। একটি রেকর্ডের (৭৮ আর-পি-এম) টপ্পা-ঢঙের দুটি গান "সখি কি করে লোকেরই কথায়" এবং "এত কি চাতুরি সহে প্রাণে" শ্রোতাকে তন্ময় করে। ই-পি রেকর্ডে গাওয়া বাহার ও ভৈরবী সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। সংগীতরসিকের কাছে এই রেকর্ড দুটির মূল্য আজও অপরিসীম।

মেগাফোনের পুজো রেকর্ডে এবার দুই জনপ্রিয় শিল্পীর গান রয়েছে। এ'রা হলেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও উৎপলা সেন। সতীনাথের গাওয়া দুটি আধুনিক গান (জানি একদিন, এবং সব কিছু ফেলে) সুরের মাধুর্যে (শিল্পীর নিজেরই দেওয়া) ও মেজাজের গুণে এমন রমণীয় যে, কয়েকবার শুনেও সাধ মেটে না। চলতি কথায়, গান দুটি "হিট" করবে বললে যেন কম বলা হয়। এমন গান শিল্পী অনেক দিন করেননি। সতীনাথের দেওয়া সুরে উৎপলা সেনের "মন রে বরষা এল নয়নে" ও "বোঝাতে পারিনি কোনদিন" গান দুটিতে যেন আবার নতুন প্রাণের পরিচয় পেলাম। প্রথম গানটিতে লোকসংগীতের আদল আছে বলে শুনতে বেশী ভাল লাগে। সত্যি বলতে কী, শিল্পীদম্পতির গানগুলি এবারকার শরৎকালের বড় আকর্ষণ। গানগুলি ভাল লিখেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।

মেগাফোনের আর একটি স্মরণীয় উপহার বটুক নন্দীর এল-পি রেকর্ড। ইলেকট্রিক গিটারে শ্রীনন্দী রবীন্দ্রনাথের বারোটি গানের সুর সুন্দর বাজিয়েছেন। শিল্পীর গিটার কথা বলে, মন নাড়া দেয়। ফিল্ম স্টার বিশ্বজিতের অভিনয়ের ফ্যান অসংখ্য, তাঁর গানের 'ফ্যান'ও কম নয়। তাঁদের জন্য মেগাফোন এবারেও একটি গানের রেকর্ড বের করেছেন। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুন্দর রচনায় সুর দিয়েছেন শ্যামল চক্রবর্তী। দরদ দিয়ে গেয়েছেন বিশ্বজিৎ।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের আবৃত্তি শ্রোতাদের কাছে সম্প্রতি খুবই প্রিয়।

শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের মুখে রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের "হতভাগ্যের গান" এবং "সুপ্রভাত" কবিতা দুটির আবৃত্তি শুনে শ্রোতারা খুশী হবেন। রেকর্ডে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুললিত কণ্ঠের আবৃত্তিও (বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের "সবহারাদের গান" এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের পূর্ব-পশ্চিম) চমৎকার। এ ছাড়া মেগাফোনের পুজো-রেকর্ডে রয়েছে তন্ময় চট্টোপাধ্যায় ও শিশুলাল সরকারের আধুনিক গান, অরুণ ঠাকুরের শ্যামাসংগীত, এবং নন্দিতা রায়ের ইলেকট্রিক গিটার বাজনা। এই রেকর্ডগুলিও শোনবার মত।

সাপ্তাহিক সংবাদ

প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষের পরলোকগমন এই সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং প্রেস ট্রাসট অব ইণ্ডিয়ার কলকাতা ব্যুরোর ম্যানেজার শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ ৮ অকটোবর মঙ্গলবার পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বৎসর। শ্রী ঘোষের স্ত্রী, দুই কন্যা ও এক পুত্র বর্তমান। মৃত্যুর দুদিন আগে শ্রী ঘোষ হৃদ্‌ রোগে আক্রান্ত হন। হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সততা, কর্মনিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার জন্য তিনি বহু বিশিষ্ট মনীষীর স্নেহভাজন ছিলেন। তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, শরৎচন্দ্র বসু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, এ কে ফজলুল হক, এম এন রায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। শ্রী ঘোষ দেশ সেবার উদ্দেশ্যে সরকারী চাকুরির মোহ ত্যাগ করে সাংবাদিকতার জীবন বেছে নেন। তিনি মাত্র ৩০·০০ টাকা বেতনে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রকাশিত ইংরাজী দৈনিক বসুমতীতে সাংবাদিকতা শুরু করেন। শ্রী ঘোষের জন্ম বরিশালের গাভার বিখ্যাত ঘোষ-দস্তিদার পরিবারে। ১৯২৯ সালে তিনি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে যোগ দেন। ১৯৪৯ সালে প্রেস ট্রাসট অব ইনডিয়ার প্রতিষ্ঠা হলে তিনি সেখানে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি অবৈতনিক সাংবাদিকের পদ বেছে নেবেন বলে স্থির করেছিলেন, কিন্তু তার আগেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

দেশী সংবাদ

৭ অকটোবর—বন্যার জল জলপাইগুড়ি শহর থেকে নেমে গিয়েছে। সেখানে এখন আলো, পানীয় জল, খাদ্য কিছুই নেই। এমন কি আইন শৃঙ্খলা পর্যন্ত বিপর্যস্ত। সেখানে সম্ভবত এখন লুঠেরাদেরই প্রাধান্য। জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ি শহরে খাদ্যের গুদাম লুঠ হয়েছে। জলপাইগুড়ি স্টেশনের গুদামও রক্ষা পায়নি। জলপাইগুড়ি পুলিস জেলা শাসককে অনুরোধ জানিয়েছে, জলপাইগুড়ি শহরের কর্তৃত্ব আপাতত সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হোক।

৮ অকটোবর—বন্যাবিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গ থেকে যে সব খবর আসছে তাতে জানা যায়, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বন্যার্তদের বিরাট অংশের কাছে সাহায্য পৌঁছয়নি। এদিকে নয়াদিল্লির খবরে প্রকাশ : সৈন্যবাহিনী ও বিমানবাহিনীর লোকেরা জলপাইগুড়ি, দারজিলিং এবং সিকিমের বিভিন্ন স্থান থেকে পাঁচ হাজার লোককে উদ্ধার করেছে। ভারতীয় বিমানবহরের হেলিকপটারগুলি হলদিবাড়ি, কোচবিহার ও মেখলিগঞ্জে খাদ্যদ্রব্য নামিয়ে দিয়েছে। সৈন্যরা ময়নাগুড়ি এলাকায় খাদ্য বিতরণ করছে।

৯ অকটোবর—সর্বনাশী বন্যা দারজিলিং জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভাসিয়ে এবার পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ জেলার কয়েকটি মহকুমায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এ পর্যন্ত যে-সব খবর পাওয়া গিয়েছে তাতে প্রকাশ, পশ্চিম দিনাজপুরের সমস্ত নদীর জল বিপদ-সীমার উপরে পৌঁছে গিয়েছে। মালদহের নব্বইটি গ্রামের পঞ্চাশ হাজার লোক ক্ষতিগ্রস্ত। জল ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

আত্মানুসন্ধানের এক অসাধারণ দলিলে আজ মারকসবাদী অর্থাৎ বাম কমিউনিসট পারটির কেন্দ্রীয় কমিটি স্বীকার করেছেন যে, রুশ এবং চীন কমিউনিসট পার্টি মারকসবাদ-লেনিনবাদ ও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের নামে বিশ্বের বিভিন্ন কমিউনিসট পারটির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জঘন্যভাবে হস্তক্ষেপ করে।

১০ অক্টোবর—উপপ্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই আজ জলপাইগুড়িতে বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনে এলে প্রচণ্ড বিক্ষোভের মুখে পড়েন। তাঁর শহর প্রদক্ষিণ মাঝপথে বাতিল করতে হয় এবং তিনি ফিরে যান। জলপাইগুড়ি ত্যাগ করার আগে উপপ্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা কালে সুদৃঢ় আশ্বাস দেন, কেন্দ্রীয় সাহায্যের কোন অভাব হবে না। 'যা দরকার হবে, তাই দেওয়া হবে।'

কেরল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির এক প্রতিনিধিদল "কেন্দ্রকে অমান্য" করায় কেরলের যুক্ত ফ্রন্ট সরকারকে বাতিল করার জন্য কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। কংগ্রেস প্রতিনিধিরা এখন নয়াদিল্লিতে আছেন।

১১ অক্টোবর—শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন সেনবর্মা এখনও চূড়ান্ত রায় দেননি, কিন্তু উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে রাজ্যপাল মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে যা শুনিয়েছেন তাতে এটা প্রায় নিশ্চিত, পূর্ব ঘোষণা মত ১৭ নবেমবর পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্বর্তী নির্বাচন হচ্ছে না। ১৭ নবেমবর না হলে অনেকের অভিমত, জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহের আগে সম্ভব নয়।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বন্যাবিধ্বস্ত জেলাগুলি থেকে একদিকে যেমন প্লাবনের প্রকোপ হ্রাসের সংবাদ আসছে, তেমনি আবার ক্ষয়ক্ষতির প্রচণ্ডতাও ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে পড়ছে। চারদিকে সাহায্যের জন্য আর্তনাদ উঠছে। মানুষ দিশাহারা। চাষ-আবাদ নিশ্চিহ্ন। ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত। যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় ক্ষেত্রেই অপ্রতুল। অনেক অঞ্চলে নেই বললেই হয়।

১২ অক্টোবর—মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী এস পি সেনবর্মা আজ ঘোষণা করেন যে, পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ফেব্রুয়ারিতে। শ্রীসেনবর্মা বলেন, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের মুখ্য নির্বাচন অফিসারদের সঙ্গে এক সম্মেলন শেষে চলতি মাসের শেষাশেষি নির্বাচন তারিখ জানানো হবে।

১৩ অক্টোবর—গতকাল পুরী জেলার জেহানাবাদ মহকুমার মতিপুর গ্রামের কাছে একটি পুলিস পারটির উপর একদল গ্রামবাসী চড়াও হলে পুলিস আত্মরক্ষার তাগিদে গুলি-ছোড়ে। ফলে ৫ জন মারা গিয়েছেন, আহত হয়েছেন ৪ জন।

সহকারী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই আজ দৃঢ়তার সঙ্গে এই কথা বলেন যে, বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা যাই হোক না কেন, ভারত তার উন্নয়নমূলক কাজের গতি বজায় রাখবে।

বিদেশী সংবাদ

৭ অক্টোবর—গতকাল একজন সরকারী সাক্ষী জানিয়েছেন, মেকসিকো অলিম্পিক আরম্ভের আগে কয়েকজন বিপ্লবী ছাত্রনেতা ও স্থানীয় কমিউনিস্ট পারটির নেতৃবৃন্দ একযোগে মেকসিকো সরকারকে গদিচ্যুত করে ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করেছিলেন।

৮ অক্টোবর—মস্কো আলোচনার ফলাফল স্লোভাক কমিউনিস্ট পারটির সভাপতিমণ্ডলীতে অনুমোদিত হয়েছে বলে আজ চেক বেতার থেকে ঘোষণা করা হয়। এর অর্থ—টেলিভিশনে সংবাদাদি প্রচার ও ভাবাকারদের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত স্লোভাক পারটি নিলেন।

৯ অক্টোবর—আজ লণ্ডনের 'টাইমস' পত্রিকার এক পত্র মারফত বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক বারট্রাণ্ড রাসেল, সাহিত্যিক জাঁ পল সার্ত্রে, ঐতিহাসিক ভ্যাদিমির ডেডিজার ও গণিতজ্ঞ লরেন্ট মোয়ারৎস এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় রাশিয়ার বিসমারকসুলভ কার্যকলাপ বলকানের শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।

১০ অক্টোবর—চেক কমিউনিস্ট পারটির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মণ্ডলীর বৈঠক শেষে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে গত জানুয়ারীর কর্মসূচী অনুযায়ী সংস্কার কার্য পুরাদমে চালিয়ে যাওয়ায় ও বড় বড় পদ থেকে "সমাজতন্ত্রবিরোধী শক্তিসমূহকে বিচ্ছিন্ন করার" সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

১১ অক্টোবর—চাঁদে মানব অভিযানে আমেরিকার আশার প্রতীক অ্যাপোলো-৭ মহাকাশযান আজ মহাকাশের দিকে উড়ে গেল। একটি স্যাটারেন-১বি রকেট মহাকাশযানটিকে তার এগার দিনের পরিক্রমায় পথে পৃথিবীর কক্ষপথে তুলে দিয়েছে। এই মহাকাশযানে তিনজন আরোহী আছেন।

১২ অক্টোবর—কেপ কেনেডি থেকে কক্ষপথে নিখুঁতভাবে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার ঠিক ২ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট পরে পরিকল্পনা মত আমেরিকার অ্যাপোলো-৭ মহাকাশযান আজ দ্বিতীয় ও শেষ পর্যায়ের উৎক্ষেপণ রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন হন। হাওয়াইয়ের উপর এই বিচ্ছেদ ঘটে।

১৩ অক্টোবর—মারকিন মহাকাশযান অ্যাপোলো-৭'-এর আজকের খবর ভালোই। মহাকাশযানটি ১১ দিন থাকবে। আজ তার তিনজন মহাকাশচারীই সর্দিতে ভুগছেন। এটা এক নাগাড়ে বিশুদ্ধ অকসিজেন নেওয়ার প্রতিক্রিয়া। তাঁদের মনমেজাজ অবশ্য ভালোই আছে।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীমানব বড়ুয়া

অপরূপ আকারের বৈচিত্র্যে প্রত্যেকটি নিখুঁতভাবে তৈরী।

সুন্দর ঢঙের চকচকে ইয়েরা গেলাস

অ্যালেম্বিক গ্লাস ভারতের কাচের জিনিস প্রস্তুতকারকদের অগ্রগণ্য এবং যেমনি সুন্দর তেমনি মজবুত স্বচ্ছ কাচের জিনিস উৎপাদনে ওঁদের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা। হোটেল, রেষ্টুরেণ্ট, হাসপাতাল ও অন্যান্য বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে যেখানে বৃহৎ পরিমাণে কাচের জিনিসের ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, সেখানে দেখা গেছে যে ইয়েরা কাচের জিনিসের অসাধারণ উৎকৃষ্টতার জন্য আখেরে অনেক বেশী মিতব্যয়িতা ঘটে। বাড়ীতেও, ইয়েরা গেলাস অতি আধুনিক ও হাল ফ্যাশানের সৌন্দর্য্য এনে দেয়।

- বিশেষধরণের ডিজাইনে ও আকারে, সুবিধাজনক সাইজে—এবং স্থায়ী রঙের কাচের জিনিস।
- অতি মজবুত গেলাস, অনেক বেশী উত্তাপ সইতে পারার মতন বিশেষভাবে প্রস্তুত।
- স্বচ্ছ, নিখুঁত গেলাস থেকে বোঝা যায় যে অ্যালেম্বিক গ্লাস উৎকর্ষতা নিয়ন্ত্রণের বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।
- ইয়েরা গেলাস বিশিষ্ট যান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা প্রস্তুত হওয়ার জন্য গেলাসের কিনারা অতি মসৃণ হয়।

Yera আধুনিক সুন্দর গৃহসজ্জার জন্য

ইয়েরা কাচের জিনিস

প্রস্তুতকারক :

অ্যালেম্বিক গ্লাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড, বরোদা-৩

ভারতের সর্ববৃহৎ সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় কাচকারখানা

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৫ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪৩
শনিবার ৯ কার্তিক ১৩৭৫

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৪৩ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	...	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	...	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	...	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষাণ্মাসিক „	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক „	...	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষাণ্মাসিক „	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক „	...	৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	...	৫২.০০
ষাণ্মাসিক „	...	২৬.০০
ত্রৈমাসিক „	...	১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	৩৯.০০
ষাণ্মাসিক	...	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	...	১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাশুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

DESH

Saturday, 26th October 1968.

জীববিজ্ঞানী ডঃ খোরানা

আধুনিক বিজ্ঞানের চমৎকারিত্ব নানা দিকে। তবু কয়েকটি বিশেষ বিস্ময়ের অন্যতম হল জীবরহস্য-বিজ্ঞান। মানুষ অশেষ কৌতূহল ও একনিষ্ঠ সাধনায় জীবনের এ-রহস্য অনুসন্ধান করে চলেছে, সাফল্যও অর্জন করছে। এ-বছরে শরীরতত্ত্ব ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জন্যে যাঁদের নোবেল পুরস্কারের দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে তাঁরা জীবরহস্যেরই বিজ্ঞানী, জীববিজ্ঞানী। সম্মানিত বিজ্ঞানীরা হলেন : ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা, অধ্যাপক রবার্ট ডবলু হোলি ও অধ্যাপক মারশাল নিরেনবার্গ। নোবেল কমিটি এই ত্রয়ীকে সম্মান জানানোর প্রসঙ্গে বলেছেন, তিনজন এককভাবে কাজ করলেও তাঁদের গবেষণা একই সমস্যা সমাধানের পথ সুগম করছে। এঁদের গবেষণার বিষয় কি, স্বভাবতই তা আমাদের জানতে ইচ্ছা করে। এই বিষয়টিকে বলা হয়েছে 'জেনেটিক কোড'। বিষয়টি বিশেষজ্ঞজনেই বুঝতে পারেন, আমাদের পক্ষে সে-চেষ্টা করা অনর্থক। আমাদের পক্ষে এইমাত্র বোঝার যে—এই গবেষণার ফলে মানুষের আজন্মকালের অনেক ব্যাধির রোগনির্ণয় হতে পারবে ও ভবিষ্যতে তা থেকে মানুষ আরোগ্য-লাভ করবে। আমরা এই তিন মানব-হিতৈষী বিজ্ঞানীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে কৃতার্থ বোধ করছি।

ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা নোবেল পুরস্কার পাবার পর এদেশে রীতিমত একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। তার কারণ বোধ হয় এই যে, ডঃ হরগোবিন্দ খোরানার একদার স্বদেশ এই ভারত। সেই হিসেবে তিনি ভারতীয়। যদিও এই দাবি আত্মশ্লাঘা বোধ করার জন্যে। নচেৎ ডঃ খোরানার সঙ্গে ভারতের কোনো বাস্তব সম্পর্ক নেই, বরং এই দেশই তাঁকে বিদেশবাসী হতে বাধ্য করেছে। সেই লজ্জা এবং ধিক্কারই আমাদের প্রাপ্য। একদা এই প্রতিভাবান যুবক ভারতবাসী ছিলেন; পাঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে রসায়নশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করেন, বৃত্তি নিয়ে যান ব্রিটেনে। স্বদেশে ফিরে এসে যাঁর পক্ষে গবেষণার ও কাজ করার সুযোগ-সুবিধে, স্বাধীনতা পাওয়া উচিত ছিল, তাঁকে আমাদের পক্ষ থেকে কিছুই দেওয়া হয় নি। এদেশের জাতীয় গবেষণা সংস্থাগুলি তাঁকে বাহুল্য মনে করেছে, এমন কি দিল্লির ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চও তাঁকে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি চাকরি দেয়নি। ফলে ব্যর্থমনোরথ ও হতাশ হয়ে ডঃ খোরানা আবার ব্রিটেনে চলে যান; সেখান থেকে পরে কানাডা ও আমেরিকা। স্বদেশ এই প্রতিভাবান তরুণ বিজ্ঞানীকে দিয়েছিল শর্ত-সাপেক্ষ একটি বৃত্তি মাত্র; তার বেশী কিছু নয়—; না কাজ করার সুযোগ, না বা চাকরি। ভেবেছে, এর প্রয়োজন নেই। অথচ বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তাঁকে স্বাধীনভাবে নিজের গবেষণা করার জন্যে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধে করে দিয়েছে। কাজেই ডঃ খোরানার সাফল্যের গৌরব বিদেশের, এদেশের নয়। বরং এদেশ ধিক্কারের যোগ্য।

ইদানীং একটা ধুয়ো উঠেছে : 'ব্রেন ড্রেন' বন্ধ করতে হবে। সঙ্কল্পটি সাধু, তবে এদেশে থাকলে প্রতিভা অনাদরে অবহেলায় মরে, বিদেশে অন্তত তারা নিজের কাজের মতন পরিবেশ ও সুযোগ পায়। মানবসভ্যতার পক্ষে ডঃ খোরানার মতন মানুষের প্রয়োজন আছে, ভারতের থাক আর না থাক, এই আমাদের সান্ত্বনা।

স্বজন বিয়োগ

শ্রীসরোজ আচার্য গত শুক্রবার, ১৮ অক্টোবর, পরলোকগমন করেছেন। তিনি ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক, আমাদের প্রবীণ সহকর্মী। তেষট্টি বছর বয়সে সহসা তাঁর বিদায় আমাদের কাছে বজ্রঘাত-তুল্য। বস্তুত যে মানুষটিকে আমরা যথারীতি অফিসে আসতে এবং নীরবে তাঁর নিজের ঘরে বসে কাজ করতে মাত্র সেদিনও দেখেছি, তিনি যে অকস্মাৎ আমাদের সকলের মধ্য থেকে চলে যাবেন এমন চিন্তা দুঃস্বপ্নেও করা সম্ভব ছিল না। সামান্য শারীরিক অসুস্থতা আচমকা যে হৃদরোগের রূপ নেবে এ আশঙ্কা কেই বা করেছিল। অপ্রত্যাশিতভাবেই তিনি বিদায় নিয়েছেন।

শ্রী আচার্যের জন্ম ১৯০৫ সালে, কুষ্টিয়ার আচার্য পরিবারে। পিতা দক্ষিণারঞ্জন আচার্য। কুষ্টিয়া হাইস্কুল থেকে ১৯৩২ সালে সরোজবাবু ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা দিয়ে কলকাতার কলেজে পড়তে চলে আসেন। সেন্ট পলস কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন, পরে কৃষ্ণনগর কলেজে। সরোজবাবু ছিলেন ইংরেজী ভাষায় ছাত্র; তিনি ইংরেজী ভাষায় অনার্সসহ বি এ পাশ করেন এবং লিভিং-স্টোন মেমোরিয়াল ও মোহিনীমোহন পুরস্কার পান।

সরোজবাবু তরুণ বয়স থেকেই রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। তখন থেকেই তাঁর মনে রুশ বিপ্লবের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মায়। তিনি রুশ বিপ্লব সম্পর্কে একটি বই লিখতেও শুরু করেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর ১৯৩০ সালে ব্রিটিশ সরকার দুটি বিভিন্ন ধারায় তাঁকে আটক ও গ্রেফতার করে। বকসা ও দেউলি শিবিরে কারাজীবনের মধ্যে তিনি পাঠচর্চা অক্ষুণ্ণ রাখেন এবং ইংরেজী ভাষায় এম এ পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি কিছুকাল কলেজের অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। সেই থেকে এ-যাবৎ আনন্দবাজার পত্রিকা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বিচক্ষণ সাংবাদিক হিসেবে সরোজবাবুর পরিচয় যেমন সংশ্লিষ্ট মহলের সকলেই জানেন, সাধারণ বাঙালী পাঠক-সমাজও সেই রকম জানেন এই মানুষটির সাহিত্যিক পরিচয়। তিনি মূলত ছিলেন প্রথম শ্রেণীর প্রাবন্ধিক; ইংরেজী ও বাঙলা দুই ভাষাতেই তাঁর দক্ষতা ছিল অসামান্য; নানা বিষয়ে—বিশেষত রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবন্ধ রচনায় তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টি, উদার মন ও যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ পাঠককে অশেষ তৃপ্তি দিত। তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের সম্পদবিশেষ। মার্কসীয় দর্শনে তাঁর অনুরাগ ও পাণ্ডিত্য ছিল সবিশেষ। 'দেশ' পত্রিকার তিনি পরম সুহৃদ ছিলেন; আমরা তাঁর কাছে শুধু মাত্র রচনা চেয়েই পাইনি, তিনি আমাদের নানা বিষয়ে বন্ধুর মতন উপদেশ দিয়েও উপকৃত করেছেন। গত কয়েক বছর তিনি নিয়মিতভাবে 'দেশ' পত্রিকার 'বৈদেশিকী' বিভাগটি লিখতেন। তাঁর পরলোকগমন আমাদের কাছে স্বজনবিয়োগের আঘাতের মতন। আমরা তাঁর পরিবার-বর্গকে এই শোকে আন্তরিক সমবেদনা ও সহানুভূতি জানাই। তাঁর প্রতি জানাই আমাদের শ্রদ্ধা।

সরোজ আচার্য

সদ্যপ্রয়াত লোকান্তরিত সরোজ আচার্যের বন্ধুত্ব দাবি করবার অধিকার আমার নেই। (প্রসঙ্গত, কারই বা বন্ধুত্ব দাবি করতে পারি? বন্ধুত্ব বস্তুটাই বোধ হয় বিলীয়মান। পরিচিতি অসংখ্য। বন্ধুত্ব অন্য ও বিরলতর পদার্থ।) তবু সরোজ আচার্যের সঙ্গে শুধু পরিচয় বোধ হয় সম্ভব ছিল না। প্রথম আলাপেই আত্মীয়-তার একটা সূত্র কোথায় যেন মিলে যেত। আপনি জেলে গিয়েছিলেন? জেলের কথা বলুন। সরোজবাবু চুপি চুপি বলবেন, অস্ত্রহীনের অহিংসায় তাঁর আস্থা ঘুচে গেল সেদিনই যেদিন তিনি বক্সার বন্দী-শালায় দেখলেন কীভাবে একটি পিস্তল-হস্ত ইঙ্গ-ভারতীয় সার্জেণ্ট পর্যুদস্ত হ'ল অসংখ্য কয়েদীদের হাতে। মাছ বা বাড়িভাড়ার কথা বলবেন? সরোজবাবু রাজী। অমুক বইটা পড়েছেন? আলোচনা করতে চান? সরোজবাবু সেটা তো পড়েছেনই; ওই বিষয়ে ইতিপূর্বে যত বই লেখা হয়েছে তাও সরোজবাবুর কণ্ঠস্থ। সরোজ আচার্য কখনোই একটা পাবলিক ইমেজ বা প্রদর্শনীয় প্রতিকৃতি গঠন করতে সমর্থ হননি। বোধ হয় কখনো সেদিকে বিশেষ সচেষ্টও ছিলেন না। সাধারণ্যে আজ তাই লোকটাকে বোঝানো এত শক্ত। সরোজ আচার্য? সে কে?

ব্যক্তিগত না হয়ে উপায় নেই। আমার সঙ্গে সরোজ আচার্যের প্রথম পরিচয় ১৯৫৫ সালে। আমি তখন সবে একটি বিদেশী পরিচালিত সাপ্তাহিক পত্রিকা ছেড়ে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও আনন্দবাজার পত্রিকার চাকরি নিয়েছি। দেশসেবা নয়। কোনো মহৎ আদর্শের প্রতি আনুগত্য নয়। শুধু চাকরি, শুধু জীবিকা, তার সঙ্গে মিশ্রিত কিঞ্চিৎ কর্মনিষ্ঠা। অভিভাবক

সতীর্থদের জ্ঞাতার্থে হয়তো যোগ করা প্রয়োজন যে, বর্মণ স্ট্রীটে সেদিন এমন ধারণা ছিল একান্তই ছিঁ বিদেশী ফুল। বাঙলা দেশে সাংবাদিকতা সেবা থেকে পেশায় উত্তীর্ণ বা অবতীর্ণ হয়েছে মাত্র সেদিন।

সংবাদপত্রের সম্বন্ধেও বিদেশী ভণ্ডামিতে আমি অবিশ্বাসী। বলতে তাই দ্বিধা নেই যে, আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানে আমার উপস্থিতি সর্বথা উপাদেয় ছিল না। বিরোধ শুধু টাইপরাইটারটার আর হাতের কলমে নয়। আমি স্বার্থভোগী রাজনৈতিক কর্মী নই। আমি ধুতি পরিনে। আমার অনবগুণ্ঠিত খাদ্যাভ্যাস ও পানরুচি স্পষ্টতই বর্মণ স্ট্রীটে অগ্রহণীয়। অধিকাংশ সহকর্মীর সঙ্গে দীনতাদের সামান্য বার্তায় ছিল একান্তই অবশ্যম্ভাবী। সরোজ আচার্য কদাচ নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দু জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেন নি। এমন জীবনের গরিমা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অতি মাত্রায় মোহাক্রান্ত ছিল বলে মনে করিনে, কিন্তু এর প্রতি তাঁর সহজ আনুগত্যকে শ্রদ্ধা না করে উপায় ছিল না। এই মৌলিক বৈষম্য সত্ত্বেও সহসা আবির্ভূত হলো অন্যতর আত্মীয়তার বন্ধন। উভয়েই আমরা ইংরেজী শব্দের যোজনায় আর ইংরেজী বাক্যের কাঠামোয় সমান অনুসন্ধানী। আমাদেরই অন্তর্হিত হলো কলম আর টাইপরাইটারের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ। সাহিত্যের মধ্যে যে 'সহিত' কথাটা লুকিয়ে আছে তা আত্মপ্রকাশ করতে বিলম্ব করল না। সরোজ আচার্য আর অনেকের সাহিত্যপ্রীতির প্রভেদ এই যে, একটা বই পড়ে আত্মস্থ করা আর বিলিতী সাপ্তাহিকে তার সংক্ষিপ্ত পুস্তক সমালোচনা পাঠ করা এক বস্তু নয়। সরোজ আচার্য আর তাঁর অধিকাংশ সহ-বাঙালীর ঠিক সেই প্রভেদ ছিল, যা থাকতে বাধ্য একটি সার্থক সাহিত্যকীর্তি আর তার চতুর সমালোচনার মধ্যে। সংক্ষেপে বলি, সরোজ আচার্য রীডার'স ডাইজেস্ট ছিলেন না।

সরোজ আচার্য ছিলেন নিষ্ঠাবান মার্কসিস্ট: একাধারে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। সহকর্মী হিসাবে এই দুই সত্তারই পরিচয় আমি পেয়েছি বইকি। আমি না মার্কসিস্ট, না বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। (সংবিধানে কী লেখা আছে বলেই তো আমি আর জাতিভেদের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারিনে। পূর্ব বঙ্গ আর পশ্চিম বঙ্গও নয় শুধু ভৌগোলিক বিভাগ)। সরোজবাবু আর আমার মধ্যে কিঞ্চিৎ দূরত্ব তাই আদৌ অস্বাভাবিক ছিল না। তবু "খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে/বনের পাখি ছিল বনে/একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে/কী ছিল বিধাতার মনে।"

বয়স ও বিদ্যাবত্তার ব্যবধান অতিক্রম করা সহজ করে দিলেন সরোজবাবু নিজেই। তিনি তাঁর বিশাল পাণ্ডিত্য বহন করতেন সেই অনায়াস মাধুর্যের সঙ্গে, যা আমাদের চোখের ভুরুকে দেয় সৌন্দর্য আর মায়ের স্তনকে স্বাভাবিক পূর্ণতা। সরোজবাবু বিদ্যার জাহাজ ছিলেন না। পাণ্ডিত্যের বোঝা তিনি কুলির মতো বয়ে বেড়াতেন না। তাঁর বিদ্যা পাইপ বা চুরুটের মতো মুখাগ্রে সর্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করত না। নিকটতর তুলনা সিগারেট, একটি বড়াইবিহীন নেশা, নামগন্ধ নাই তায়।

খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, সাফল্য ইত্যাদি অভিলাষ থেকে সরোজবাবু সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন এমন বললে অনৃতভাষণ হবে। তিনি সংসারী ছিলেন, স্বামী ও পিতা হিসাবে তাঁর কর্তব্যবোধ প্রখর ছিল। জীবনের অগ্রগতির পথে বাধা উপস্থিত হলে তার অপসারণ প্রয়াসের পদ্ধতি সরোজবাবুর অজানা ছিল না। বৈষয়িক জীবনে আপসের অনিবার্যতা সরোজবাবু জানতেন এবং বাক্যে বা আচরণে তিনি না ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের নন্দলাল, না আজকালকার নকশালপন্থী। এ থেকে যেন মনে না হয় যে, সরোজবাবু স্বভাবে শীতল ছিলেন। আদৌ নয়। একাধিক স্বদেশী ও আন্তর্জাতিক ঘটনার প্রতি তাঁর অবিলম্বিত প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেছি। উত্তাপ ছিল, কিন্তু তা ইতিহাসের উপলব্ধিতে উদ্ভাসিত। তিনি জানতেন যে পদ্মানার নজির আছে।

সংবাদপত্রের এই ধারাবাহিকতা সম্পর্কে সচেতনতা দিয়েছিল একটা অসাধারণ সহিষ্ণুতা। এই সহিষ্ণুতাকে ঔদাস্য বা ঔদাসীন্য বলে ভুল করা মোটেই কষ্টসাধ্য ছিল না। আমার নিজেরও কোনো কোনো সময় মনে হয়েছে যে, লোকটার মার্কসিজম বোধ হয় প্রধানত পোশাকী; নইলে এত ফরমায়েশ সহজে হজম করেন কী করে? আপন বিশ্বাস আর বাইরের ফরমায়েশের মধ্যে সীমারেখা নির্দেশ করা অধিকাংশ সাংবাদিকের জীবনেই এক বিশাল সমস্যা। সরোজবাবু সমস্যাটাকে বহুলাংশে সরল করে নিয়েছিলেন দুটি উপায়ে। এক, আমার বেনামী সাংবাদিকতার সঙ্গে আমার বিবেকের বৈবাহিক সম্বন্ধ নেই। দুই, আমার প্রথম ধ্যান তো সাহিত্যের রূপসাগরে ডুব দেওয়া। পথে কোথাও সাংবাদিকতার টিউবওয়েলে জল খেলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। এসব জীবনদর্শনে সামান্য আত্মপ্রবঞ্চনা একেবারে অনুপস্থিত নয় হয়তো; কিন্তু সরোজবাবু হাসতে জানতেন। তাঁর ধ্যান সম্বন্ধে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করলে তিনি যেমন বিব্রত হতেন তেমনি তাঁর ধ্যান নিয়ে আদর্শগত আলোচনায়ও তাঁর রুচি ছিল না। আরেকটা সিগারেট দিন না। এক কাপ চা?

নিপাটভাঙা বাঙালীয়ানা সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা অপরিমিত নয়। সরোজবাবুর বাঙালীত্ব আমার শ্রদ্ধেয় ছিল, এই কারণে যে, তাঁর ধুতি পাঞ্জাবির অন্তরালে কোথায় একটা কঠোর ডিসিপ্লিন ছিল। (ইংরেজী কথা ব্যবহার করতে হলো, কেননা নিয়মানুবর্তিতা ডিসিপ্লিনের যথাযথ বাঙলা প্রতিশব্দ নয়। কার নিয়ম? কে অনুবর্তী? কী কারণে?) একটা বই আর এক প্যাকেট সিগারেট পেলেই সরোজবাবু খুশী; আর কিছুতে প্রয়োজন নেই। এমন ধারণা বিস্তৃত ছিল। কিন্তু অরসিককে বোঝাবে কী করে যে, একটা সম্ভবত মৃত্যু আকর্ষণী সিগারেট জ্বালানোর পিছনে থাকতে পারে একটা লোকের গোটা জীবনদর্শন? যে একটা বই পড়তে প্রয়োজন শুধু পাঠকের সারা ব্যক্তিত্বের সশ্রম প্রসরণ?

অবিস্মরণীয়তা সম্বন্ধে সরোজ আচার্যের ধারণা ছিল একান্তই মোহমুক্ত। আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও দেশ বহু লেখককে ভুলেছে অনায়াসে। সংবাদপত্রের ধর্মই তাই। আসন্ন বিস্মৃতিতে তাই তিনি আদৌ ভগ্নহৃদয় হতেন না। বেনামী কলমচীর পুরস্কার দেয়ালপঞ্জীর নির্দিষ্ট তারিখে প্রাপ্য। নিঃসীম শূন্যের কথা বাড়িওয়ালা শুনতে চায় না। সরোজবাবুর বাড়িভাড়া-ঘটিত বিভ্রাটের কথা আমার কিছু জানা আছে যে। তবু ভঙ্গুর প্রয়াসও সার্থক যদি তার পিছনে না থাকে লেখকের হয়তো আংশিক কিন্তু সম্পূর্ণ আন্তরিক নিষ্ঠা। পেশাদারী সাংবাদিক হিসাবে সরোজ আচার্য সার্থক হয়েছিলেন এই জন্যই যে, বাইরের আদেশ আর অন্তরের নির্দেশের মধ্যে তাঁর বিবেকের বিভাজন কখনো রক্তক্ষয়ী হয়নি। এটা তাঁর সহজ সহিষ্ণুতার শুধু অপর একটা দিক নয়। মোদ্দা কথা এই যে, সাংবাদিকতার শিবির থেকে তিনি যে-কোনো সময় আপন অধ্যয়নের আশ্রমে আত্মগোপন করতে পারতেন। সেই আশ্রমে মালিক বা সম্পাদকের প্রবেশাধিকার ছিল না।

এমন দ্বিজাগতিক আবাস স্বভাবতই সুবিধাবাদের অপবাদ আকর্ষণ করে। সরোজবাবু অভিযোগটা অস্বীকার করতেন না। তবু তাঁর অপরাধস্বীকৃতির অন্তরালে থাকত অবর্ণনীয় একটা আন্তরিকতা, যার তুলনীয় বর্তমান বঙ্গীয় জীবনে খুঁজে পাইনে। নিঃস্বার্থ জ্ঞানস্পৃহা এক কালে শিক্ষিত বাঙালী জীবনের অঙ্গ ছিল। আজকের দিনে এমন দাবি একান্তই অমূলক বলে সরোজ আচার্যের অন্তর্ধান শুধু একদা-সহকর্মীর বিদায় বলে মনে হচ্ছে না। শুধু একটা লাইব্রেরি থামল; একটা লোক গেছে।

রঞ্জন

দেশ দর্পণ

সরোজ আচার্য কম্যুনিস্ট আন্দোলনের একটা বড় অধ্যায়ের সাক্ষী। মার্কসবাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় বহুদিনের এবং সে-পরিচয়কে তিনি একান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে বার বার যাচাই ক'রেছেন। হয়ত এই যাচাই করার অভিজ্ঞতা দিয়েই জীবনের শেষ পর্যন্ত কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ওঠা নামা অন্তরঙ্গভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। লক্ষ্য ক'রেছিলেন মার্কসবাদের অনুশীলন কি ভাবে বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হ'য়ে গিয়েছে। সৃষ্টি হ'য়েছে বিতর্ক, বিরোধ এবং অনৈক্য। মতবাদের সংঘাত হ'য়েছে বার বার। এই সংঘাতে মার্কসবাদ মূলতঃ বিতর্কের বিষয়বস্তু হ'য়ে গিয়েছে। হয়ত এ-কারণেই আজ বিভিন্ন কম্যুনিস্ট গোষ্ঠী সংগঠিত হ'য়েছে এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে মার্কসবাদের চেহারাটা বহুরূপীর মত ভিন্ন ভিন্ন রূপপরিগ্রহ ক'রে অদ্ভুত জটিলতা সৃষ্টি ক'রেছে।

এই ধরনের বিচারকে যদি সামনে রাখা যায়, দেখা যাবে এই জটিলতাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা ক'রে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে নানা প্রসঙ্গের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হ'চ্ছে। দেখা দিচ্ছে ভিন্ন ধরনের শ্লোগান; নূতন ধরনের কর্মপন্থা। প্লাবন ও ধস বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গের কথাই ধরা যাক। বাস্তব অবস্থাকে সামনে রাখলে নিঃসন্দেহে প্রয়োজনটা উপলব্ধি করতে অসুবিধা হবে না। জীবনহানি বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি বা হ'য়েছে তার হিসাবটাই আজকের বাস্তব অবস্থার মূল কথা নয়। মূল কথা প্লাবন ও ধসের পর উত্তরবঙ্গের এক বিরাট অঞ্চলের যে কঙ্কালটা পড়ে আছে তাকে পুনর্জীবিত করা; যে অর্থনৈতিক ধসের নীচে উত্তরবঙ্গের সমৃদ্ধ একটা অংশ তলিয়ে গিয়েছে, তা পুনরুদ্ধার করা; যে অগণিত দুঃস্থ মানুষগুলো অনাহারে অর্ধমৃত বা শীতে জর্জরিত তাদের সঞ্জীবিত করা।

এই প্রয়োজনের মধ্যে কোথাও ফাঁক নেই। কোন রাজনৈতিক মতবাদের বিরোধও তাতে নেই। তবু প্রলয়ের একপক্ষকাল পরেও শোনা যাচ্ছে মানুষের হাহাকার, সাহায্যের আবেদন। হাহাকার উঠেছে এই কারণে যে, প্লাবনের মুখে ভেসে গিয়েছে খাদ্য, লবণ, আরও অনেক কিছু। মহামারীর প্রকোপ দেখা দেবার আশংকা দেখা দিয়েছে, কারণ, পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব। মোট কথা উত্তরবঙ্গের বিধ্বস্ত অঞ্চলে এখনও সংগঠিত হয়নি সরকারী, বা বে-সরকারী সাহায্য ব্যবস্থা। সরকারী ব্যবস্থা যে-টুকু চালু করা হ'য়েছে, সেটা কোনমতেই পর্যাপ্ত নয়; বরং প্রয়োজনের তুলনায় বহু বহু অংশে কম। অথচ রিলিফ ব্যবস্থা সংগঠিত করার জন্য সরকারী আড়ম্বরের কোন ত্রুটি দেখা যাচ্ছে না। প্রতিদিন ঝাঁকে ঝাঁকে সরকারী অফিসাররা বিমানযোগে ছুটে যাচ্ছেন শিলিগুড়ী, কিম্বা জলপাইগুড়ি, অথবা দার্জিলিং-এ। যে-সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হ'য়েছে, সে-গুলোকে পুনরায় চালু করা যায় কিনা এবং কত শীঘ্র তা করা সম্ভব তা নিয়ে গবেষণা চালাবার জন্য, সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য দলে দলে ছুটে গিয়েছে বিশেষজ্ঞরা রাইটার্স বিল্ডিং থেকে। ফিরে এসে রিপোর্ট দাখিল হবে, বিবেচিত হবে এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত সরকারী দফতরের কোন একটা কোণে পড়ে থাকবে ধুলোর আস্তরণ মাথায় নিয়ে। রিলিফের কাজ চালু করতে যাঁরা গিয়েছেন বা যাচ্ছেন তাঁরা রিপোর্ট দিচ্ছেন কোন কোন অসুবিধা এবং বাধা অপসারিত না করতে পারলে সাহায্য ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হ'চ্ছে না। সাড়ম্বরে এইসব অসুবিধার কথাই বর্ণনা করেছেন রিলিফ কমিশনার সাংবাদিকদের কাছে। রিলিফের ব্যবস্থায় গাফিলতি হ'লে কড়া সাজা দেওয়া হবে বলে শাসিয়েছেন রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর। কিন্তু ব্যবস্থা হ'য়েছে কতটুকু? বিপর্যস্ত মানুষ সাহায্য বা আশ্বাস পেয়েছে কতটুকু?

সরকারী অবহেলা যদি সব মানুষের চোখে বিসদৃশ মনে হ'য়ে থাকে, আরও বেশী বেদনাদায়ক মনে হবে বে-সরকারী প্রচেষ্টার প্রারম্ভিক তৎপরতা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি রিলিফ ব্যবস্থা চালু করতে দ্বিধাগ্রস্ত হ'য়ে থাকে, বে-সরকারী প্রচেষ্টায় ঠিক সেই পরিমাণ রাজনৈতিক তৎপরতাই দেখা দিয়েছে বেশী। আর সেই সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও। বে-সরকারী সাহায্য ব্যবস্থা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে রাজনীতির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। হয়ত সে কারণেই, উত্তরবঙ্গের মানুষ বে-সরকারী সাহায্য যেটুকু পাচ্ছে, তার চাইতে অনেক বেশী শুনেছে রাজনীতির কথা। ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গ ঘুরে এসেছেন বিভিন্ন দলের বিভিন্ন নেতা, এক সঙ্গে, কিম্বা এককভাবে।

বাংলা কংগ্রেস ও যুক্তফ্রণ্টের নেতা শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের সঙ্গে একই বিমানে ফিরে এসেছেন কলকাতা শিলিগুড়ি থেকে। ফেরার পথে শ্রীমুখার্জি বলেছেন, সরকারী ত্রাণ ব্যবস্থা এখনও পর্যাপ্ত নয়। দাবী করেছেন; খাদ্য ও ঔষধের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে, গৃহনির্মাণের জন্য অর্থসাহায্য বেশী করে দিতে হবে ইত্যাদি। তাঁর বলেছেন, উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তফ্রণ্টের পরবর্তী সভায় আলোচনা করা হবে এবং সরকারের কাছে দাবী পেশ করার আন্দোলনসূচী গ্রহণ করা হবে। আন্দোলনটা অবশ্যই দাবীর জন্য; কিন্তু আন্দোলনের বাইরে আর কোন কর্মসূচী আছে কিনা, বা থাকলেও তা চালু করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা তা পরিষ্কারভাবে বলা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে, সাহায্য পৌঁছে দেবার পথে এখনও অনেক বাধা এবং অসুবিধা; যেমন, ট্রাকের অভাব, রাস্তাঘাটের অভাব ইত্যাদি। কাজেই এ-ব্যাপারে রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

অথচ মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট নেতাদের প্রধান শ্লোগান রাজ্যপালের অপসারণ চাই। শ্রীসুন্দরাইয়া এ কথা বলেছেন, শ্রীজ্যোতি বসুও তাই বলেন এবং শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত জিগ্যেস করেছেন: বন্যাপীড়িত মানুষদের জন্য শ্রীধর্মবীরের সরকার কি করেছে? এই রাজ্যপাল ধর্মবীর দার্জিলিং-এ বসে যখন ঠাণ্ডা হাওয়া খাচ্ছিলেন, তখনই তিস্তার জল জলপাইগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গকে প্লাবিত করলো; অথচ উত্তরবঙ্গের মানুষকে সাইরেন বাজিয়ে সতর্ক ক'রে দেওয়া হ'ল না কেন? শ্রীদাশগুপ্ত নিশ্চয়ই এ-কৈফিয়ৎ তলব করতে পারেন এবং বাংলা দেশের মানুষ নিশ্চয়ই জানতে চাইবে সেচ বিভাগের সতর্ক বার্তা কেন প্রচার করা হয়নি সাধারণ মানুষের মধ্যে। কিন্তু এই সঙ্গে এটাও জানতে চাইবে, সরকারী সাহায্য প্রচেষ্টা যদি প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম হ'য়ে থাকে, তাহ'লে উত্তরবঙ্গের বিপর্যস্ত মানুষগুলো কি সেই অপ্রতুল সাহায্যের উপরেই নির্ভরশীল হবে? শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছেন, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি এবং সম্মিলিতভাবে যুক্তফ্রণ্ট বন্যাপ্রপীড়িত মানুষের সাহায্য করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করছে এবং সেখানে কর্মরত রয়েছে।

কিন্তু মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র বলছে: বন্যার্তদের, দুর্গত মানুষদের যথার্থ রিলিফ দেবার জন্যই তো চাই জনগণের নির্বাচিত সরকার। প্রশ্ন করেছে: মানুষের এই চরম দুর্দশা কি মানুষের সৃষ্টি নয়? অর্থাৎ, মানুষের সৃষ্ট দুর্দশার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হ'লে, শ্রীসুন্দরাইয়ার ভাষায় বলতে হয়, যুক্তফ্রণ্টকে এখনি ক্ষমতায় বসিয়ে দাও। মূলতঃ রিলিফের যে-কথা শোনা গিয়েছে শ্রীদাশগুপ্ত বা শ্রীজ্যোতি বসুর মুখে, তা চাপা পড়ে গিয়েছে নির্বাচনের মধ্যে, ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের মধ্যে। এই লড়াইয়ের মধ্যে নিছক মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি, বা যুক্তফ্রণ্টের সবকয়টি দলই যে শুধু জড়িয়ে

পড়েছে তা নয়, যুক্তফ্রন্টের প্রতিপক্ষ দলগুলোও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে নির্বাচন গড়ে তোলা হয়েছিল, সেই সংগঠনকেই নিয়োগ করা হয়েছে উত্তরবঙ্গের জন্য। আর যে-সব দল আছে যুক্তফ্রন্টের বাইরে তাদের নির্বাচনী অস্তিত্ব ছাড়া আর কোন অস্তিত্বের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষেও ঠিক একই সুরে বলা হয়েছে রাজ্যপালের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কংগ্রেস "বন্যার ভয়াবহ অবস্থার রামধুন গাইতে" আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। নিঃসন্দেহে রামধুনের প্রতি মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির কোন আস্থা নেই। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টিরও কোন আস্থা নেই। যেমন নেই যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদের। তাই বলা হয়েছে বন্যার্ত মানুষের দাবী নিয়ে আন্দোলন শুরু করার কথা। বলা হয়েছে, নির্বাচনী সংগঠনকে জোরদার ক'রে সংগ্রামী হাতিয়ারে পরিণত করার কথা।

অবস্থাটা আরও পরিষ্কার ভাষায় প্রকাশ করেছে নক্সালপন্থী কম্যুনিস্টদের মুখপত্র। তাদের বক্তব্যঃ উত্তর বঙ্গের ধ্বংসের শ্মশানেই শুরু হয়ে গিয়েছে কংগ্রেস ও "তথাকথিত বামপন্থী দলগুলোর" মধ্যে রিলিফ দেওয়া নিয়ে কামড়াকামড়ি। সবারই ভয়, কে আগে রিলিফ দিয়ে ভোট বাগিয়ে নিয়ে যায়। সবারই মাথায় নির্বাচন, সবারই গদি দখলের তাগিদ। মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের আক্রমণ করে বলেছে যে, যারা নিজেদের বিপ্লবী বলে প্রচার করে, তারা চেঁচিয়ে বলছে, এর মধ্যেই নির্বাচন করতে হবে। তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বলছেঃ যারা গদিতে বসে মানুষের পাঁচ টাকা কিলো চাল খাওয়া রোধ করতে পারেনি, তারা দাবী করছে আবার যদি পেলে উত্তর বঙ্গের বন্যার্দুর্গতদের দুঃখ ঘুচিয়ে দেবে! তারা রাষ্ট্রযন্ত্র দেখছে না, আমলাতন্ত্র দেখছে না, আসল শাসকশ্রেণী দেখছে না—দেখছে শুধু গদি। "উত্তরবঙ্গে মানুষের চোখে কংগ্রেস ও 'মার্কসবাদী' পার্টির কোন তফাৎ নেই, তাদের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে সবাই চায় গদি"।

অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাষায় রাখা হয়েছে বক্তব্যটা। এই মন্তব্য সহজভাবে রাখা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, উত্তর বঙ্গের মানুষের দুর্দশা রাজনীতির বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে বলে। এটা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, 'বন্যাত্রাণ' কথাটা দুর্গত মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারছে না অথচ রাজনীতির খোরাক জোগাচ্ছে বলে। নক্সাল পন্থী যারা তাদের কিতাবে অবশ্য "ত্রাণ" কথাটা লেখা নেই; কারণ, এদের মতে, বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং বর্তমান আমলাতন্ত্র ও পুলিসতন্ত্র যতদিন থাকবে, ততদিন উত্তর বঙ্গের মত বন্যা হবেই, তাকে কেউ রুখতে পারবে না; এদের মতে, রুখতে পারে চীনের মত বিপ্লব। পারে কি না সেটা ভিন্ন প্রশ্ন; বর্তমানের প্রয়োজনে এটাই উল্লেখযোগ্য যে, নক্সালপন্থী কম্যুনিস্টদের মতে, যারা নির্বাচনে জিতে মন্ত্রীত্ব পেলে বন্যা রুখে দেবে বলে দাবী করছে, তারা "ধাপ্পাবাজ"।

ফলে, দেখা যাচ্ছে, একদিকে সরকারী প্রচেষ্টায় যেমন আন্তরিকতার পরিচয় এখনও উত্তর বঙ্গের মানুষ পায়নি, অন্যদিকে তেমনি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজী। এই ধাপ্পাবাজীর অভিযোগ যদি সামনে রাখা যায়, দেখা যাবে বর্তমানে কম্যুনিস্ট-আন্দোলনের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে রাজনৈতিক দুর্নীতি প্রশ্রয় পাচ্ছে। কম্যুনিস্ট পার্টিগুলি এ সম্বন্ধে সচেতন কিনা বলা দুষ্কর, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক চিন্তাধারার স্বাধীনতা দাবী করে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি, অথবা ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি অত্যন্ত সুনিশ্চিতভাবে কম্যুনিস্ট আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পথকে সুগম করে দিচ্ছে। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের স্বীকৃতি অনুসারে, চারটি দেশের কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে এদের সম্পর্ক এখনও টিঁকে আছে। অথচ সারা দুনিয়ায় প্রায় ৯০টি কম্যুনিস্ট পার্টি আজ সংগঠিত।

এটা যদি নিঃসন্দেহে বিচ্ছিন্নতার লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না কোন্ রাজনৈতিক কারণে আজ কম্যুনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একজোট হবার শ্লোগান দিচ্ছে। হয়ত সেই বিচ্ছিন্নতাকে এড়িয়ে চলার জন্যই মার্ক্সিস্ট পার্টির বন্যাত্রাণের কর্মসূচীকে যুক্তফ্রন্টের সম্মিলিত প্রচেষ্টার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আন্দোলনের কর্মসূচীকে সামনে রাখবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে, এখনো সহজে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

রাত্রিগুলি
এখনো বাঘের মত পিছু নেয়।
স্বপ্নগুলি
এখনো নিদ্রার পিঠে
ছুরি মেরে হেসে ওঠে।
কিছু চিহ্ন এখানে-ওখানে
থেকে গিয়েছিল।
পেট্রোলে-ভিজোনো ন্যাকড়া, দেশলাই-কাঠির টুকরো, এইসব।
স্মৃতিগুলি
তারই সূত্র ধরে, হাওয়া শুঁকতে শুঁকতে, পা টিপে পা টিপে
হেঁটে আসে জানালার ধারে
নিঃশব্দে দাঁড়ায়।
অতর্কিতে
হো-হো শব্দ ছুটে যায় অন্ধকার থেকে অন্ধকারে।

অর্থাৎ এখনো মরে যাইনি। এখনো
বাতাসে পুরনো যুদ্ধ
হানা দেয়।
রাত্রিগুলি, স্বপ্নগুলি, স্মৃতিগুলি
চতুর্দিকে
কখনো জন্তুর মতো, কখনো দস্যুর মতো, কখনো-বা
ধূর্ত জেদী গোয়েন্দার মতো
ঘোরাফেরা করে।
অন্ধকারে
চোরাগোপ্তা আক্রমণ চলতে থাকে সারাক্ষণ।

অর্থাৎ এখনো আমি বেঁচে আছি। চৌমাথার
যে-লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, বস্তুত আমাকে
সে-ও চোখে-চোখে রাখছে। আমি তার
হিংসার ভিতরে বেঁচে আছি।
এবং তুমিও আছ নারী।
আছ, তাই অসংখ্য শত্রুর সঙ্গে এই যুদ্ধ
কিছুটা তাৎপর্য পায়,
তাই যুদ্ধক্ষেত্রে আমি এখনো সহজে
বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাওয়ায়
শব্দ করে চুম্বন রটিয়ে দিতে পারি।

শামুক

জ্যোতির্ময় দত্ত

শামুককে ভালো ক'রে দেখলে
তাকে কোনো প্রাকৃতিক জীব ব'লে
প্রত্যয় হয় না
তার যেন জন্ম হয়েছিলো
লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মতো কোনো
চতুর এঞ্জিনিয়ারের উদ্ভট কল্পনায়
যিনি জীবনকে কেবল যুদ্ধ মনে ক'রে
একে এক সাঁজোয়া যানের মতো সাজিয়েছেন

শামুকের সবটুকুই যেন কোনো কাল্পনিক
শত্রুকে ঠেকানোর জন্য
শুঁড়শীর্ষে গুপ্ত চোখ
প্রয়োজন হ'লে শুঁড়ের মধ্যে গুটিয়ে নেওয়া যায়
শামুকের নাক তার চোখমুখের
ধারে-কাছে কোথাও নেই
কটিদেশে গোঁজা তার নাসারন্ধ্র
যদি অবশ্য শামুকের কোমরকে
কটিদেশ বলা যায়

শামুক যদিও আমার প্রতিবেশী
বিশ্বাস করা শক্ত যে সে এই গ্রহেরই জীব
দুর্গেশ শামুককে দেখতে দেখতে
আমার তিমির জন্য মন কেমন ক'রে ওঠে

আমাদের থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে
তিমি একা একা ঘুরে বেড়ায়
কখনো বিশাল উদর এলিয়ে
স্তন্যদান করে তার শিশুদের
শামুকের তুলনায় তিমির গড়ন
বেশ ছিমছাম মনে হয়
তিমির স্নেহমমতা কল্পনা করতে পারি
শামুকের তুলনায় তিমি
আমাদের পরমাত্মীয়

সুনন্দর জার্নাল

'একাল এবং আমরা'

এ-বারের এই বন্যার সব ক্ষত-ক্ষতি-যন্ত্রণার ভেতরে লাভের ঘরেও একটা জমা পড়ল। অনেকদিন বাঙালীর এই হৃদয়মুক্তি আমি দেখিনি—এমন অকৃত্রিম চোখের জল আমরা বহুকাল ভুলে গিয়েছিলুম। তার মানে এখনো আমরা ভালোবাসতে পারি, তার মানে—আজও আমাদের আশা আছে।

সেইসব তরুণ—যাদের মতি-গতি-ভবিষ্যৎ নিয়ে কালও আমাদের দুর্ভাবনার অন্ত

আর্তত্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়ে

ছিল না—আমাদের হিসেবী, বয়স্ক আর বিরূপ চিন্তাকে তারাই লজ্জা দিয়েছে সবচেয়ে বেশি। সরকারী কর্তা আর শহরের নেতারা যখন আঠারো ঘণ্টা আগেই খবর পেয়েও তিস্তার বাঁধের দুর্ভেদ্যতায় নিশ্চিন্ত মনে সুখসুপ্ত ছিলেন—মৃত্যু এসে ঝাঁপিয়ে পড়বার পরে যখন আমলারা চাণক্য মতে আত্মরক্ষার নীতিকেই সর্বাগ্রে গ্রহণ করেছিলেন—তখন ওই মতিচ্ছন্নেরাই সেবা-সাহস আর সাহায্য নিয়ে ছুটে এসেছিলেন সকলের আগে। প্রশাসন যখন মৃত—এক লক্ষ মানুষের ভাগ্য যখন ঈশ্বরের করুণায় সমর্পিত, তখন শিলিগুড়ির বরাভয় এঁদের মধ্য দিয়েই প্রসারিত হয়েছিল প্রেতপুরী জলপাইগুড়ির ওপর। এই ঋণ ইতিহাসে জমা হয়ে রইল।

এমনি এক-একটা নিদারুণ দুঃখঘাতেই আমাদের আত্মদর্শন ঘটে। অতি-সরলীকৃত সিদ্ধান্তগুলো চমকে ওঠে, মনে হয়—আমরা যারা পেছনে সরে এসেছি—একালের ভবিষ্যৎ নিয়ে সেই আমাদের অত বেশি দুশ্চিন্তা না করলেও চলে। সময় এবং চেতনায় যারা আমাদের ছাড়িয়ে চলে গেল—ঈর্ষা করি বলেই অবিচার করি তাদের ওপর: আমাদের ঐতিহ্যে তাদের যদি শ্রদ্ধা না থাকে—তার কারণ তারা জটিলতর এবং কঠিনতর কালের মধ্যে জন্মেছে—তাদের ইতিহাস নিজেরাই তারা রচনা করবে। স্বার্থ, সংস্কার আর অভ্যাসে আঘাত লাগে বলেই তাদের বিদ্রোহকে আমাদের অন্যায় আর অসহ্য বলে বোধ হয়—প্রতিদিন তাদের ধিক্কার দিয়ে আত্মতৃপ্তির সুখভোগ করি। বাংলা দেশের যে আজো নাভিশ্বাস ওঠেনি, বাঙালীর তারুণ্য যে আজও শ্রদ্ধা আর সম্মানের যোগ্য—উত্তর বাংলায় বন্যা সেই সত্যই তো প্রমাণ করল।

আমি সুনন্দ—জন্মান্তর মানি না। কিন্তু পুনর্জন্ম যদি সত্যি সত্যিই থাকে—এই দুঃখ, এই যন্ত্রণা, এই বঞ্চনায় বিদ্ধ বাংলা দেশেই আমি হাজারোবার ফিরে আসব। ভালোবাসব এই 'ভয়ংকর' শহর কলকাতাকে, ভালোবাসব বাংলা দেশকে, বাঙালীকে, বাংলা ভাষাকে। কৈশোরে এই বাংলা দেশে আমি স্বপ্ন দেখব, যৌবনে বিদ্রোহ করব, প্রৌঢ়ত্বে-বার্ধক্যে নতুনকালকে ঈর্ষাকাতর সমালোচনা করব, তারপর একদিন এই রকম এক-একটি প্রাণের উল্লাস দেখে উচ্চকিত আনন্দ অনুভব করব : আমি চরিতার্থ। দু-হাত বাড়িয়ে নতুন কালকে বুকে টেনে নিয়ে বলব : 'তোমরা আছো, তোমরা থাকবে, তোমরা সত্য, তোমরাই আমার বাংলা দেশ।'

ইতিহাস—ঐতিহ্য।

কোনো ইতিহাসই আমাদের জন্যে চিরকালের মতো লেখা হয়ে যায়নি; কোনো ঐতিহ্যই চিরবৃত্ত লাভ করে না—সে বহতা স্রোত—এক ট্র্যাডিশন আর এক ট্র্যাডিশনে এগিয়ে যায়। আমরা আঁকড়ে থাকব, না ধারা রক্ষা করব?

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবে চলেছিলুম। পথটি আপার সার্কুলার রোড—কিছুকাল যাবৎ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নামে পুনর্গৌরবিত। ট্র্যাডিশনের কথা মনে পড়তেই দৃষ্টিটা চলে গেল এক পাশে। আজ তেইশ বছর ধরে এই পথ ধরে আমি প্রায়ই চলি, আর বারবার একই জায়গায় এসে যেন চুম্বকের আকর্ষণে দৃষ্টিটা একটা পুরোনো দোতলা লাল রঙের বাড়ির দিকে ঘুরে যায়। তার সামনে পাঁচিলে একটা চিঠির বাক্স, ভেতরে দুটো একটা আমের গাছ, একটু কাত হয়ে ঝুলে থাকা একটা বিবর্ণ কালো সাইনবোর্ড : 'প্রবাসী', 'মডার্ন রিভিউ', 'বিশাল ভারত—'

বাংলা-ইংরিজি-হিন্দী—তিনটি মাসিক-পত্রিকার নাম। এককালে সারা ভারতের তিনটি অসাধারণ পত্র। ইংরিজি পত্রিকাটির মর্যাদা তো ছিল আন্তর্জাতিক। এখন বাংলা কাগজটির মুমূর্ষুপ্রায় উপস্থিতি বইয়ের স্টলে কখনো কখনো চোখে পড়ে, হিন্দিটির সন্ধান জানি না—যে ইংরিজি কাগজটিতে দেশ-বিদেশের মনীষীরা শ্রদ্ধা-ভরে রচনা পাঠাতেন সেটির অস্তিত্ব আছে কিনা তাও নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না।

তবু আমি বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখি। অল্প বয়সে সুনন্দরও সাহিত্য-চর্চার দুরাশা ছিল, 'প্রবাসী'র খাতায় একটি কবিতা প্রকাশিত হওয়ার সেই অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চ সে আজো ভুলতে পারেনি। এই বাড়ির সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছেন সর্বকালের

এখন তিনি সত্যই প্রবাসী

অদ্বিতীয় সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ভগিনী নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ, সি-এফ-অ্যাণ্ড্রুজ, জহরলাল নেহেরু—নতুন ভারত-বর্ষের সব নেতৃত্ব, সব প্রতিভা; এই পত্রিকা গোষ্ঠীই জাতীয় আন্দোলন-সমাজ চিন্তা-সাহিত্যধারার একটা অবিসংবাদী অধিনায়ক; এখানেই অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্র-অসিত-মুকুল-নন্দলালের পঞ্চদীপে 'বেঙ্গল স্কুল অব আর্টে'র ঐতিহাসিক আলোকোৎসব। 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় একটি রচনা মুদ্রিত হওয়া নবীন-সাহিত্যিকের চিরস্বপ্ন—সে তার সারস্বত-সাধনার সগৌরব সম্মতিপত্র।

কিন্তু চোখ পড়তেই চমকে উঠতে হল। ম্যাজিকের মতো মনে হল সবটা। বাড়িটা নিশ্চিহ্ন। না—ঠিক নিশ্চিহ্ন নয়, লাল রঙের

বাঙালী তর্ুণেরাই শীতে কেঁপে
রাত্রি জেগে গান শোনে

ভাঙা দেওয়াল এক টুকরো এখনো দাঁড়িয়ে—নইলে বোঝাই যেত না। কাল ওটুকুও থাকবে না আশা করা যায়।

কোনো পত্র-পত্রিকাই অমর নয় এবং ভাড়াটে বাড়ির মালিক তাঁর বাড়ি নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারেন। পরে জেনেছি, এখানে নাকি বিশাল পেট্রোল-পাম্প বসবে। পেট্রোলও অতি দরকারী জিনিস।

কিন্তু প্রবাসী-মডার্ণ রিভিউ-বিশাল ভারত সম্বন্ধে কি একটু অন্যভাবে ভাবা যেত না? এরা তো কেবল পত্রিকা নয়—এরা ইতিহাস; রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তো কেবল ব্যক্তিপুরুষ নন—সর্বকালের প্রতিষ্ঠান তিনি। পত্রিকার মৃত্যু শোকাবহ নয়, কিন্তু ইতিহাসের হত্যাও কি চোখ মেলে দেখবার মতো? পেট্রোল-পাম্প বসুক—কিন্তু একটি স্মারক-স্তম্ভও কি থাকতে পারত না এখানে?

একাল প্রবাসী-মডার্ন রিভিউকে ভুলে গেছে—কিন্তু আমরা তো ভুলিনি। ঐতিহ্যের কথাই ভাবছিলুম—সেই ঐতিহ্যের জন্যে আমাদের দুশ্চিন্তা কতখানি?

উত্তর বাংলার যে তারুণ্য আজ দারুণ দুর্দিনে উদ্ভাসিত হল, তারই জয় হোক। সামনের বিলুপ্ত বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ভাবছি, আমরাই মৃত, আমাদেরই বিদায়ের সময় এসেছে।

চায়ের পয়সা বাঁচিয়ে বাঙালী তরুণেরাই লিটল ম্যাগাজিন বের করে

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

বা ম

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ভারতীয় সেনারা ইমফলে পরাজিত, বিপর্যস্ত হলেন কেন, এ-প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না। ব্যাখ্যা অনেক রকম হয়েছে, তা নিয়ে মতান্তরও কম ঘটেনি। আজাদ হিন্দ ফৌজের মতে, জাপানী ও ভারতীয়দের মধ্যে উদ্দেশ্যগত সংঘর্ষ ঘটার ফলেই এই বিপর্যয়। দুই পক্ষই চেয়েছিলেন যে, তাঁরাই প্রথম ইমফলে ঢুকবেন এবং জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করবেন। ১৯৪৪ সনের ১৮ এপ্রিল তারিখে আজাদ হিন্দ ফৌজ অনায়াসেই ইমফলে ঢুকতে পারতেন; জনৈক অফিসারের মুখেই আমি শুনেছি যে, ইমফল তখন তাঁদের হাতের মুঠোয়। অধিকৃত এলাকার শাসনভার অর্পণের জন্য একজন সামরিক গভরনর ইতিমধ্যেই নিয়োগ করা হয়েছিল, চটপট বাজারে ছাড়বার জন্য নতুন মুদ্রার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল, সামরিক দখলের উদ্যোগ আয়োজনে কোনও ফাঁক ছিল না। এই সময়ে জাপানীরা হঠাৎ বাগড়া দিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, ইমফল-জয়ই হবে ভারতভূমিতে প্রথম সত্যিকারের সাফল্য, সেই সাফল্যের গৌরব আজাদ হিন্দ ফৌজকে না-দিয়ে তাঁরা নিজেরাই পেতে চেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ২৯ এপ্রিল জাপ-সম্রাটের জন্মদিন, জাপ-অফিসাররা তার আগে ইমফল দখল করতে চাইলেন না, তাঁরা ভাবলেন, ইমফল হবে তাঁদের সম্রাটের জন্মদিনের উপঢৌকন। এ যে-সময়ের কথা বলছি, জাপানীরা তখন বিভিন্ন রণাংগনে বিশেষ এঁটে উঠতে পারছিলেন না, ইতস্তত পরাজিত হচ্ছিলেন, সম্ভবত সেই পরাজয়ের অগৌরবকে ঢাকা দেবার জন্যই ইমফল-জয়কে তাঁরা তখন কাজে লাগাতে ব্যগ্র। জাপানী সংযোগকারী অফিসার করনেল হিরাওকা আমাকে বললেন যে, আমি যেন একটা বেতার-ভাষণ তৈরী করে রাখি: সম্রাটের জন্মদিনে সেটি প্রচারিত হবে, এবং তাতে বলা হবে যে, জন্মদিনের উপহার হিসেবে ইমফলকে সম্রাটের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে; জাপ-সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও সেই ভাষণে কিছু বলব।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কিন্তু এই প্রস্তাবে একেবারেই সায় ছিল না। তাঁর লক্ষ্য, তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক এবং তাঁর বক্তব্য ছিল সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। তিনি বললেন, ব্যাপারটা যদি এইরকম দাঁড়ায় যে, জাপানীরাই ভারত-অভিযান চালাচ্ছেন, ভারতবাসীদের অনেকেই তাহলে ব্যাপারটাকে সুনজরে দেখবেন না; চাই কী, তাঁদের অনেকে সেক্ষেত্রে হয়ত ব্রিটিশদেরই সমর্থন করবেন। পক্ষান্তরে, ভারতীয় মুক্তিফৌজ তো ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করেছেন, এখন ভারতভূমিতে তাঁদের এই বৃহৎ-আবির্ভাবের ফলে দেশ জুড়ে একটা মস্ত বড় উদ্দীপনার সঞ্চার হবে। বিশ্ববাসী এই প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজের নাম ও তাঁদের কীর্তিকাহিনী শুনবেন, এবং ভারতবর্ষে হাজার-হাজার মানুষ এই মুক্তিফৌজকে সাহায্য করতে ছুটে আসবেন। ইমফলের দখল কে নেবে, জাপ ও ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে এই নিয়ে যখন বিতর্ক চলছে, লগ্ন তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেল, ব্রিটিশ সরকার দ্রুত সেখানে নতুন সেনাদল পাঠালেন, বিমান আর ট্যাংকের অভাবে জাপ আক্রমণের গতিও ক্রমে স্তিমিত হয়ে এল, ইমফল আর দখল করা গেল না, শুরু হল পশ্চাদপসরণের পালা।

দুই অসম প্রতিপক্ষের মধ্যে যখন যুদ্ধ চলছে, তারপর যখন পশ্চাদপসরণের পালা এল, এবং ধ্বস্ত বিপর্যস্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের টুকরো-টুকরো অংশ দিয়েই যখন আবার গড়ে তোলা হল এক প্রায়-নূতন সেনাবাহিনী, তখনই সম্ভবত সুভাষচন্দ্রকে তাঁর দীপ্ততম মহিমায় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সেই সংকটের মধ্যেই যেন জীবনের শ্রেষ্ঠ লগ্নটিকে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন, সেই দুর্যোগের দিনগুলিতেই প্রকট হয়েছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ রূপ। মুখে বিষাদের ছায়া কিন্তু বুকে তখনও দুর্জয় সাহস, যুদ্ধ চালিয়ে যেতে তখনও তিনি সমান বদ্ধপরিকর। আমি লক্ষ্য করেছি, ইমফলে পরাজয়ের জন্য কাউকে তিনি দোষ দেননি।

ভারতীয় ফৌজের কথা বলতে পারি। এই যে তাঁদের হাতের মুঠো থেকে জয়কে ছিনিয়ে নেওয়া হল, এর দুঃখ তাঁদের ভীষণভাবে বেজেছিল। স্বদেশের মৃত্তিকায় পদার্পণের পর থেকেই আশায়-আগ্রহে তাঁদের চিত্ত এমনভাবে মথিত হচ্ছিল যে, পরাজয়ের আঘাতে তাঁরা যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। শত্রুর হাত থেকে স্বভূমির একটা বড় অংশ ছিনিয়ে নিতে চলেছেন, এই চিন্তার উত্তেজনায় তাঁরা তখন অস্থির,

আনন্দে আত্মহারা। নতজানু হয়ে তাঁদের অনেকেই তখন দেশের মাটিকে চুম্বন করেছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে দুজন জাপ সাংবাদিক ছিলেন। তাঁদের বিবরণ থেকেই বোঝা যাবে, ভারতীয় সেনাদের মনের অবস্থা তখন কী রকম ঃ

স্বদেশের পাহাড়, স্বদেশের নদী যখন প্রথম চোখে পড়ল, ভারতীয় সৈন্যদের আনন্দ তখন ধরে না। আত্মহারা আনন্দের সেই চিত্র দেখে আমরাও অভিভূত বোধ করছিলাম। ...একজন ভারতীয় সৈন্যের কথা একটু বিশেষভাবেই উল্লেখ করবার মতো। হাঁটতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল, তবুও তিনি সঙ্গীদের কাঁধে ভর দিয়ে এগোচ্ছিলেন। স্বদেশের পুণ্য-ভূমিতে প্রবেশ করবেন এই আগ্রহে তিনি, সেই অবস্থাতেও, জোরে-জোরে পা ফেলছিলেন। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, আর একটু হলেই তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়তেন। কাছেই একটি পাহাড়ী নদী। একজন নিপ্পনী সেনা পাহাড় বেয়ে নীচে নেমে গিয়ে সেই নদী থেকে জল

জার্মানীতে আজাদ হিন্দ
সংঘ শিক্ষণ শিবিরে
নেতাজী সুভাষচন্দ্র

A. Dutta

নিয়ে এলেন, তারপর ভারতীয় সেনার দিকে জলের পাত্র এগিয়ে ধরে বললেন, "এই নিন আপনার স্বদেশের জল, নীচের ওই নদী থেকে নিয়ে এসেছি।" ভারতীয় সেনাটি পাগলের মত সেই জল খেলেন। নিস্পনী সেনাটি তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "কেমন জল? মিষ্টি?" ভারতীয় সেনাটি বললেন, "হ্যাঁ।" তাঁর চোখে তখন জল, আবেগে তিনি কথা বলতে পারছিলেন না।...চতুর্দিক থেকে মুহুর্মুহু ধ্বনি উঠছিল—জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। সীমান্তের ঘন অরণ্যের ভিতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল সেই ধ্বনি, শত্রু-শিবিরে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছিল।

ইম্ফল থেকে পশ্চাদপসরণের পর সুভাষচন্দ্র বসু রেঙ্গুনে এলেন। জাপানী-দের সঙ্গে তাঁর তখন নানান ব্যাপারে মতের অনৈক্য ঘটতে থাকে। জাপ সৈন্যবাহিনীতে কিছু মানুষ ছিলেন অন্য-জাতির প্রতি অতিশয় বিদ্বেষভাবাপন্ন, উপরন্তু দারুণ রকমের জঙ্গী। যেমন আমাকে, তেমনি সুভাষচন্দ্রকেও তাঁদের সঙ্গে যুঝতে হত। এক হিসেবে তাঁর অসুবিধে ছিল আমার চাইতেও বেশী। তার কারণ, জাপানীরা তখন যে বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন, ভারতবর্ষ তার বৃত্তের মধ্যে পড়ে না। ফলত ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহ ছিল কম। ভারত প্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় আগ্রহটা আরও কমে যায়। সুভাষচন্দ্র কিন্তু তখনও কিছুমাত্র দমেননি।

নতুন করে আবার সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে তিনি বদ্ধপরিকর। তিনি ভাবছিলেন যে, জাপানীদের সাহায্য যদি না-ই পাওয়া যায়, তাহলে বর্মী বাহিনীর সঙ্গে একযোগে তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। তার জন্যে অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া দরকার। সেই অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের জন্যে জাপানীদের উপরে তিনি ক্রমাগত চাপ দিচ্ছিলেন। কিন্তু অত অস্ত্র দেবার ক্ষমতা জাপানের তখন ছিল না। প্রয়োজন অনুযায়ী যাতে অস্ত্র সরবরাহ করা হয়, তার জন্যে শেষবারের মতন চেষ্টা চালাবার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৪৪ সনের নবেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্র তোকিয়ো গেলেন। গিয়ে বুঝতে পারলেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপান তার নিজের সৈন্যদেরই ঠিকমত অস্ত্র যোগাতে পারছে না। সুভাষচন্দ্র এদিকে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তখন নতুন করে আবার যুদ্ধ শুরু করতে চান। তার জন্যেই তিনি প্রস্তুত হতে চাইছিলেন। জেনারেল ইসোদা আর তাঁর হিকারি কিকান সংগঠনের উপরে সেই সময়ে ভার ছিল যে, আজাদ হিন্দ সরকারকে তাঁরা পরামর্শ দেবেন। কিন্তু কার্যত তখন তাঁরা আজাদ হিন্দ সরকারের কাজকর্মকে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখতে চাইছিলেন। ফলত সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে প্রায়ই তাঁদের ঘোর মতান্তর ঘটত। আমি এমনও শুনেছি যে, বসুর সঙ্গে ইসোদা কিংবা তাঁর সহকারীর মাঝে-মাঝে এতটাই মতের অমিল ঘটত যে, টেবিলের দু দিকে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, নিজের নিজের দাবি থেকে কেউ এক চুল সরতে চাইতেন না, এবং ওই অবস্থাতেই বৈঠক শেষ হত।

তবে স্থানীয় জাপ অফিসারদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর সম্পর্ক যা-ই হোক, পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ব্যাপারে জাপানের প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল অটল। ছোটখাটো বিবাদ-বিসংবাদ মূল প্রশ্নটিকে আড়াল করে দিচ্ছে, এমনটা তিনি কখনও ঘটতে দেননি। জরমান আর জাপানীরা ভাল কি মন্দ, সেটা তাঁর বিবেচ্য বিষয় ছিল না; সাম্রাজ্যবাদী যে-সব শক্তি এশিয়ার দেশগুলিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, এবার তাদের ধ্বংস করা উচিত কিনা এবং কে তা করবে, এইটেই ছিল তাঁর প্রশ্ন। উত্তর খুঁজে পেতে দেরি হয়নি। সুভাষচন্দ্র দেখলেন, একমাত্র জারমানি আর জাপানই এ-যুদ্ধে তা করতে পারে, সুতরাং তারা যাতে জেতে, তারই জন্যে এশিয়ার ঔপনিবেশিক দেশগুলির সংগ্রাম করা উচিত।

সংকটকালে অনেককেই আমি ভেঙে পড়তে দেখেছি। কিন্তু সুভাষচন্দ্র ভেঙে পড়বার মত মানুষ ছিলেন না। বরং

প্রতিটি সংকটে তিনি নতুন করে এই সংকল্প উচ্চারণ করেছেন যে, সংঘর্ষের শেষ পর্যন্ত তিনি জাপানীদের সঙ্গেই থাকবেন। ১৯৪৪ সনের জুলাই মাসে মহাত্মা, গান্ধীর উদ্দেশে প্রচারিত এক বেতার-ভাষণে তিনি প্রকাশ্যেই জাপান ও এশিয়ায় তার নীতিকে সমর্থন করেন। তিনি বলেন, "জাপান তার কথা রাখে।" সেই বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসের কথা। প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে জাপানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তখন ভেঙে পড়ছে। কালবিলম্ব না করে প্রধানমন্ত্রী কাইসোকে তিনি তখন জানিয়ে দেন যে, "যতক্ষণ না আমাদের জয় হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সর্বাবস্থাতেই" তিনি "নিপ্পন ও তার বন্ধু রাষ্ট্রের পাশে দাঁড়িয়ে একযোগে" সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। অকটোবরে শুরু হল ফিলিপিনের উপরে মার্কিন অভিযান। এখনও তিনি জাপানের সঙ্গে একযোগে যুদ্ধ করবার সংকল্প আবার নতুন করে উচ্চারণ করলেন। ১৯৪৫ সনের জানুয়ারি মাসের কথা। খাস জাপান তখন ধসে পড়ছে। সেই অবস্থা প্রত্যক্ষ করেও সুভাষচন্দ্র জাপানীদের জানিয়ে দিলেন যে তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী ও অনুগামীদের নিয়ে "কামিকাজের মতই [illegible]ভাবে যুদ্ধ চালাবেন।" ১৯৪৫ সনের ৪ ফেব্রুয়ারি। আরাকানে [illegible] বিদ্রোহী ভারতীয় সৈন্যদের প্রথম আক্রমণের [illegible] বার্ষিকী অনুষ্ঠান। সেই উপলক্ষেও, শেষ বিন্দু রক্ত [illegible] নেতাজী তাঁর অনুগামীদের [illegible] জানালেন। বললেন, "এই [illegible] আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিটি [illegible] রক্ত—রক্ত, রক্ত, রক্ত। [illegible] নিজেদের রক্ত দেব, শত্রুর রক্ত [illegible]" আজাদ হিন্দ ফৌজকে একটি 'জন্য বাহু' বা আত্মোৎসর্গকারী বাহিনীতে পরিণত করবার জন্যে তিনি [illegible] তাঁর সৈন্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

[illegible] বন্ধু যখন বিপন্ন, সুভাষচন্দ্র তখন আরও ঘনিষ্ঠভাবে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। লক্ষ্য যখন আবছা হয়ে আসছে, তখন [illegible] অর্জন করবার জন্য তাঁর সংকল্প আরও [illegible] হয়ে উঠত। এইটেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। বৃহৎ ব্যাপারে মস্ত বড় গুণ হলেও ছোটখাটো ব্যাপারে এর কিছু কুফলও ফলেছে। তার কারণ, চারিত্রিক এই বৈশিষ্ট্যই অনেক সময় তাঁর দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দিত, লোকচরিত্র কিংবা পরিস্থিতিকে তিনি তখন ঠিকমত বুঝতে পারতেন না। অনুগামীদের চরিত্র বিচারেও মাঝে মাঝে তাঁর ভুল হয়েছে। তাঁর বাহিনী ছিল এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে ছড়ানো, সেই বাহিনীর অনেকেই ছিলেন নিতান্ত বৈষয়িক মানুষ, জন্মভূমির সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগ ছিল না, নিজের কতটা লাভ হবে না হবে, তারই নিরিখে তাঁদের অনেকে পরিস্থিতি-বিচার করতেন। তাঁদের অধিকাংশই অবশ্য সুভাষচন্দ্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁর পাশেও ছিলেন, তবে সকলের সম্পর্কে সে-কথা বলা যায় না। নেতার আস্থার, নেতার অনুরক্তির সম্মান যারা রাখেনি, তাদের সংখ্যাও কম নয়।

১৯৪৫ সনের এপ্রিল মাসে সূচনা হল চূড়ান্ত বিপর্যয়ের। আমাদের চারপাশে সবকিছুই তখন ধসে পড়ছে, আপার-বর্মার প্রায় সবটাই আবার ব্রিটিশ বাহিনীর দখলে চলে গেছে, এবং ব্রহ্মের সৈন্যবাহিনী ও তাদের সহযোগীরা ইতিমধ্যে দল-বদল করেছে। জাপানীরা সেই সময়ে রেঙ্গুন থেকে আড়াই শো মাইল দক্ষিণ-পূর্বে মৌলমিনের দিকে হটে যেতে থাকেন; আমরাও তাঁদের সঙ্গে পিছিয়ে যাই। তার আগে নেতাজী বসুর সঙ্গে শেষবারের মত আমার দেখা হয়; সেদিনকার কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। [illegible] আমরা ঠিক করেছিলাম যে, গোটা ব্রহ্মদেশও যদি আবার ব্রিটিশ বাহিনীর দখলে চলে যায়, তবু আমরা একযোগে যুদ্ধ চালিয়ে যাব। কিন্তু ব্রহ্মের সৈন্যবাহিনী ব্রিটিশের পক্ষে চলে যাওয়ায় সেই পরিকল্পনা আমাদের বর্জন করতে হয়। আমাদের দুজনেরই চিত্ত তখন ভারাক্রান্ত। ব্রহ্মের বাহিনী এইভাবে দল-বদল করায় নেতাজী খুবই সমস্যায় পড়েছিলেন। তাঁকে তখন একেবারে শুরুর থেকে আবার নতুন করে সব শুরু করার কথা ভাবতে হচ্ছিল।

সেদিন আমরা আমাদের পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে বিশেষ কিছু কথাবার্তা বলিনি। তার কারণ, পরস্পরের মনের খবর আমাদের জানা ছিল; আমরা জানতুম, এই পরাজয় আমাদের দুজনের একজনেরও মনের পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। তবু, একটা কিছু তো বলতেই হয়, তাই নেতাজীকে আমি প্রশ্ন করলাম, এর পরে তিনি কী করবেন। "কেন," আমার প্রশ্ন শুনে শান্তভাবে তিনি একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'নতুন করে আবার শুরু করব। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, প্রস্তুতির পর্ব শেষ হলেই আবার যুদ্ধে নামব। তা ছাড়া আর

করবার কী আছে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, এই যুদ্ধে তো আর দাঁড়ি টেনে দেওয়া যায় না, যুদ্ধ চালাতেই হবে।"

নেতাজীর মুখে আমি যেন আমার মনের কথাই শুনতে পেলাম। আমার চোখে সেদিন প্রায় জল এসে গিয়েছিল।

ব্রহ্মদেশ আর বর্মী বাহিনী ব্রিটিশের হাতে চলে গিয়েছে,—এই অবস্থায় আমার পক্ষে তখন কিছু করা সম্ভব ছিল না। নেতাজীকে আমি সে-কথা বললাম। আমার অসুবিধের ব্যাপারটা তিনি বুঝলেন। পরে শুনলাম, তাঁর অনুগামীদের উদ্দেশে সেই সময়ে তিনি নাকি বলেছিলেন, "জারমানি আর ইতালি পরাস্ত, এই অবস্থায় শুধু জাপানের সাহায্যেই আমাদের লড়তে হবে। জাপানও যদি পরাস্ত হয়, তবু আমরা হাল ছাড়ব না। নিজেরা যেটুকু পারি, যুদ্ধ চালিয়ে যাব।" জীবনের চরম সংকটকালে এই কথাগুলি তিনি বলে-ছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র যে কেমন মানুষ ছিলেন, তাঁর এই কথার থেকেই তা বুঝতে পারা যায়।

পরস্পরের কাছ থেকে আমরা বিদায় নিলুম। সামনে দীর্ঘ পথ। নিজের নিজের

অনুগামীদের নিয়ে আলাদাভাবে এবারে আমরা মৌলমিনের দিকে যাত্রা করব। মৌলমিনে পৌঁছতে আমাদের দু সপ্তাহেরও বেশী সময় লেগেছিল। শত্রু-পক্ষের বিমান তখন অহোরাত্র আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। মনে হত, যেন এক দীর্ঘ দুঃস্বপ্নের ভিতর দিয়ে আমরা চলেছি, রাত আর ফুরোবে না। ২৪ এপ্রিল নেতাজী রেঙ্গুন ত্যাগ করেন। তার আগে তাঁর ফৌজের উদ্দেশে তিনি এক বেতার-ভাষণ দেন। শুনেছি, তাঁর সেই বিদায়-ভাষণ শুনে অনেকেই চোখের জল সামলাতে পারেননি। ব্রহ্মদেশের বর্মী ও ভারতীয় বন্ধুদের কাছ থেকেও তিনি বিদায় নিলেন।

"বন্ধুগণ", আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশে নেতাজী বললেন, "এই সংকট-কালে মাত্র একটি কথাই আমি আপনাদের বলতে পারি। তা হল এই যে, সাময়িক-ভাবে যদি আপনাদের ভূমিশয্যা নিতেও হয়, তাহলেও, জাতীয় ত্রিবর্ণ-পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে রেখে, লড়াই করতে করতে আপনারা ভূমিশয্যা নিন। বীরের মত মৃত্যুবরণ করুন, আপনাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সম্মান ও শৃঙ্খলার আদর্শ যেন অম্লান থাকে।"

বর্মী ও ভারতীয় জনসাধারণের উদ্দেশে উচ্চারিত তাঁর শেষ কথাগুলি ঈষৎ বিষণ্ণ, ম্লান, কিন্তু পরাজয়ের আর্তি তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। "আমি সব সময়েই বলেছি যে, উষালগ্নের আগের মুহূর্তটিই সবচাইতে অন্ধকার। সেই অন্ধকারই এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, আর সেইজন্যেই জানি যে, সূর্যোদয়ের দেরি নেই। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই।"

মৌলমিনে পৌঁছে আমি সেইখানেই রয়ে গেলাম। ঠিক করেছিলাম, যতদিন যুদ্ধ চলছে, অন্তত ততদিন আমি ব্রহ্মদেশ ছেড়ে যাব না। সমগ্র ব্রহ্মদেশ তখনও ব্রিটিশের দ্বারা অধিকৃত হয়নি। নেতাজী ব্যাংকক রওনা হয়ে গেলেন। রেঙ্গুন থেকে ব্রহ্ম-থাই সীমান্তের নানপালেদকে পৌঁছতে নেতাজী আর তাঁর অনুগামীদের তিন সপ্তাহেরও বেশী সময় লেগেছিল। পূর্ব এশিয়ার এক ভয়ংকর অরণ্য-অঞ্চলের মধ্য দিয়ে তাঁদের এগোতে হচ্ছিল। দিনের বেলা তাঁরা লুকিয়ে থাকতেন, রাত্রে আবার শুরু হত যাত্রা। নেতাজী ঠিক করেছিলেন সিঙ্গাপুরে পৌঁছে তিনি আবার নতুন করে কাজ শুরু করবেন। ব্যাংকক থেকে তিনি সিঙ্গাপুরে রওনা হয়ে গেলেন।

ব্যাংককে পৌঁছে এমন একটি কাজ তিনি করেছিলেন, আপাতদৃষ্টিতে যার গুরুত্ব হয়ত কম, কিন্তু আমি ও আমার পরি-বারের লোকজনেরা যার কথা আজও ভুলতে পারিনি। আমার পরিবারের লোকজনেরা যে ব্যাংককে পৌঁছেছে, এ-কথা শুনবামাত্র তিনি গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করলেন, তাঁদের প্রয়োজন ও অসুবিধের খবর নিলেন। শুধু তা-ই নয়, নিজের লোকদের তিনি নির্দেশ দিলেন যে, আমার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের যেন কোনও ব্যাপারে কোনও অসুবিধে না ঘটে, টাকাকড়ি খেলনা মিষ্টি ইত্যাদি যা-কিছু প্রয়োজন, সবই যেন তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। সিঙ্গাপুর রওনা হবার আগে আবার তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তাঁর সেই স্নেহ ও সৌজন্যের কথা কখনও আমরা ভুলব না।

পরস্পরের কাছ থেকে ইতিমধ্যে আমরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম, যোগা-যোগ রক্ষার কোনও উপায়ই ছিল না। তোকিয়ো যাবার পথে, ১৯৪৫ সনের ২২ অগস্ট তারিখে, আমার প্লেন তাইওয়ানে নেমেছিল। সেখানে তাঁর খবর পেলাম। বড় ভয়ংকর খবর। যে-জাপানী অফিসারটি বিমানঘাটিতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তিনিই আমাকে সেই মর্মান্তিক খবর শোনালেন। দিবারাত্র আমি তখন সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছি, এমনিতেই মুহ্যমান হয়ে ছিলুম, অফিসারটির কথা যেন আমি ঠিকমত বুঝতেই পারলাম না। আকাশে উড়তে উড়তে, কিংবা মাটিতে নেমে মানুষ যেভাবে বুলেটিন-রিপোর্ট শোনে, বিমূঢ়ভাবে সেই-ভাবে তাঁর কথাগুলি শুনে গেলাম আমি। রাত্রে বিশ্রাম নিলাম। পরদিন এয়ারপোর্টে এলাম। এসে সেই অফিসারটিকে ডেকে পাঠালাম। সম্পূর্ণ তথ্য জানতে চাইলাম তাঁর কাছে। অফিসারটির কথা শেষ হবার পর আমার প্লেনের পাইলট আমার কাছে এগিয়ে এল। বলল, পথ খুবই বিপজ্জনক, তোকিয়ো যাওয়া সহজ হবে না। পাইলট প্রশ্ন করল, নেতাজীর খবর তো শুনলুম, এর পরেও কি আমি তোকিয়ো যেতে ইচ্ছুক? "নিশ্চয়ই," চিৎকার করে আমি বলে উঠলাম, "এখুনি আমি রওনা হব। এইভাবেই যদি সবকিছু শেষ হয়ে যায় তো যাক।" প্রায় অবিশ্বাস্যভাবে সেদিন আমরা তোকিয়ো পৌঁছেছিলাম। শহরের সমস্ত কাগজে তার পরের দিন প্রথম পৃষ্ঠায় খুব বড় করে নেতাজীর মৃত্যু—সংবাদ ছাপা হল।

এই হচ্ছে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কাহিনী। আমি তাঁকে যেমন জেনেছি, বললাম। জীবনের একটা পর্যায়ে আমরা পরস্পরের খুব কাছে এসেছিলাম, অসংখ্য অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একসঙ্গে এগিয়েছি, যুদ্ধ আমাদের দুজনের জীবনে প্রায় একই ফলাফল বহন করে এনেছিল, একই রকমের সংকটের মোকাবিলা আমরা করেছি, একই সঙ্গে একাধিক শত্রুর সঙ্গে আমাদের লড়তে হচ্ছিল। সামনে ছিল ব্রিটিশ বাহিনী; পিছনে, ভিতরে, চার পাশে ছিল গুপ্ত শত্রুরা। সে-সব দিনের কথা যখন ভাবি, চোখের সামনে তখন যেন একটা সুরারিয়ালিসট ছবি ভেসে ওঠে। এত বাস্তব, অথচ এত অবাস্তব। ভালয়-মন্দে, আশায়-আনন্দে-বেদনায় সেই দিনগুলি ছিল আপ্লুত। একদিকে ছিল আশ্চর্য উল্লাস, অন্যদিকে—অন্ধকার, নিবিড় নিরাশা।

সমাপ্ত

[ডঃ বা ম'র গ্রন্থ 'ব্রেকথ্রু ইন বার্মা' থেকে গৃহীত।]

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

মানুষ-গির্জা-রাষ্ট্র

সন্ধের সময় প্রাগের হোটেল-লাউন্জে বসে খবরের কাগজ পড়ছি আর মাঝে মাঝে বিরাট কাঁচের জানলা দিয়ে দেখছি, কর্মক্লান্ত প্রাগ শহরের নারীপুরুষ বাড়ি ফিরছে। এদের চোখেমুখে কেমন যেন একটা হাসিখুশী ভাব—দিনাবসানের ক্লান্তি সত্ত্বেও। আমার কেমন যেন মনে হল, হ্যাঁ, এরা স্বরাজ পেয়েছে মাত্র ষোল বছর হল; ষোল বছরের তরুণদের মুখে আনন্দ ফুটে বেরুবারই কথা!— তা হোক না তাদের কারো বয়স চোদ্দ, কারো চল্লিশ। বয়স তো অনেক রকমেরই হয়।

সেই যে-রকম এক স্পানিয়ার্ড যুবা এসেছিল প্যারিসে। একে তো স্পানিয়াডরা হয় দারুণ লেডি কিলার, পেটিকোট শিকারী, তদুপরি তাকে পই পই করে বলে দেওয়া হয়েছিল, প্যারিসবাসীরা অতিশয় কায়দা-কেতা মেনে চলে, তাদের রোম রোমে এটিকেট; সাবধানে না চললে সর্বনাশ। ভাবে গাইয়া ভূত, পর্সেলিনের দোকানে ষাঁড়টা যেন।

প্যারিসে পৌঁছে প্রথম সন্ধ্যাতেই আমাদের স্পানিয়ারডকে নিয়ে তার বৃদ্ধ হোস্ট-হোস্টেস বেরিয়েছেন 'ইভনিং ইন্ প্যারিস' শুঁকতে, দেখতে, চাখতে।

বিরাট নৃত্যভবনে ব্যান্ড হঠাৎ বাজাতে আরম্ভ করলো, 'স্প্যানিশ টাঙ্গো!' আর যাবে কোথা? এ-নৃত্য তো নাজামুড়ো তার আপন দেশ স্পেনের। সঙ্গে সঙ্গে লম্ফ মেরে উঠে কায়দামাফিক গৃহকর্ত্রীকে এ-নৃত্যে সঙ্গদান করার জন্য বাও করে আমন্ত্রণ জানালে।

নৃত্যের তালে তালে মৃদু মধুর গুঞ্জরন করতে করতে কিঞ্চিৎ রসালাপ করতে হয়—আপ্তবাক্য।

স্পানিয়ারড বললে 'মাদাম, আপনি কী চারমিং।'

বৃদ্ধা মাদামের রসবোধের সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ডজ্ঞানও ছিল। একটু হেসে বললেন, 'থ্যাংক্যু মসিয়ো। কিন্তু বয়স আমার আশী। এ বয়সে আবার চারম্!'

বিগলিত কণ্ঠে স্পানিয়ারড বললে 'কী যে বলেন! আশী আবার একটা বয়স!'

মাদাম বললেন, 'ঠিক। একটা ক্যাথিড্রেলের পক্ষে অবশ্য তেমন কিছু নয়!'

তবেই দেখুন বয়স নানা প্রকারের হয়।

আমার নিত্যসঙ্গী প্রিয় কুকুরটির বয়স, ষোল—সে যাই যাই করছে। পক্ষান্তরে একটা রাষ্ট্রের পক্ষে তিন শ বছর কোনো বয়সই নয়। হিটলার গর্বিত কণ্ঠে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, তিনি যে রাষ্ট্র নির্মাণ করলেন সেটা 'হাজার বছরের রাষ্ট্র।' গণৎকার 'সামানাই' ভুল করেছিলেন।

সে-রাষ্ট্র মারা যায় মাত্র বারো বছর বয়সে। তাঁরই চোখের সামনে। এবং তাঁকেও সতীদাহের মত একই শ্মশান শয্যায় শুয়ে নাৎসিদের স্বর্গ 'ভালহাল্লাতে' প্রবেশ করতে হয়।

*

দিবাস্বপ্ন ভঙ্গ হল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি মধুর স্বপ্ন দেখি সামনে দাঁড়িয়ে।

সেই যে সুন্দরী মেয়েটি আমাকে আজ সকালে পথ বাৎলে দিয়েছিল সেই মেয়ে। সঙ্গে আবার একটি উনিশ বিশ বছরের ছেলে। বুঝলুম, কোনো মেয়ের পক্ষে একা একা একটা যুবকের সঙ্গে দেখা করতে, আসাটা তার খুব শোভন বলে মনে হয় নি; তাই ছেলেটাকে 'শেপরন-গোছ' সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

আমি সানন্দে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাদের বসতে বললুম।

মেয়েটি শুধোল 'কি স্বপ্ন দেখছিলেন?' —একটুখানি মৃদুহাস্যের ঝিলিমিলি লাগিয়ে।...কী চমৎকার দাঁত! তবে কি চেকদের দাঁত ইয়োরোপীয়দের মধ্যে সর্বোত্তম? উপস্থিত প্রশ্নটা মুলতুবি থাক।

বললুম 'বয়স।'

অবাক হয়ে শুধোল 'সে আবার কি?'

আমি দমে না গিয়ে বললুম, 'আপনার বয়স ষোল।'

হেসে কুটি কুটি হয়ে বললে, 'হায়, হায়, হায়! ষোলর সঙ্গে আমার এ-জীবনে আর দেখা হবে না।'

আমি বললুম 'আর আপনার বন্ধুটির বয়সও ষোল।'

সে বেচারীও আপত্তি জানালে।

আমি আরো তেড়ে বললুম, 'এদেশের সক্কলের বয়স ষোল।'

ওরা হয়তো ভাবলো, এ বুঝি প্রাচ্য দেশীয় কোনো বেখাপ্পা বিদকুটে রসিকতা। তাই সৌজন্য দেখাবার জন্য একটুখানি মৃদু হাস্যের সম্মতি জানালো।

তখন আমি বয়স বাবদে আমার 'দার্শনিক' দিবাস্বপ্ন সবিস্তর বুঝিয়ে বললুম। মায় স্পানিয়ারডের মাত্রাহীন সৌজন্য প্রকাশের কাহিনী।

এইটুকু বলতে পারি, তাদের কাছে জল খেতে বেশীক্ষণ সময় লাগেনি।

*

মেয়েটি একটু চিন্তা করে বললে,

'ঠিক বলেছেন। কিন্তু দেখুন, বয়সের সঙ্গে আচরণের মিলও সব সময় থাকে না। চেক্ রাষ্ট্রের বয়স ষোল। সে আপ্রাণ চেষ্টা দিচ্ছে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকবার। ওদিকে দেখুন, হিটলারের থার্ড রাইষের বয়স এখন মাত্র দেড়। অথচ এরি মধ্যে সে প্রাচীন রাষ্ট্র অস্ট্রিয়ার দিকে চোখ রাঙাতে আরম্ভ করেছে।

আমাদের কপালেই বা কি আছে, কে জানে!'

বড় হক্ কথা বলেছিল মেয়েটি সেদিন। কারণ, এরই ছয় বৎসর পর চেম্বারলেন দালাদিয়ের চেক রাষ্ট্রটিকে হিটলারের দরগায় জবাই করেন।

উত্তর যৌবনের উপাখ্যান

কল্যাণশ্রী চক্রবর্তী

একে একে ওরা সবাই চলে গেল। সন্ধ্যায় অন্ধকার ঘন হয়ে আসার পর যে শব্দ ও কোলাহল ক্রমশ দানা বাঁধতে শুরু করেছিল, এই একটু আগে তা চরমে উঠে হঠাৎ যেন সব স্তব্ধ হয়ে গেল। কোন কিছু স্থায়িত্ব পেল না। সেই তখন থেকে এই সম্মিলিত হাসি-ঠাট্টা কোলাহল একটা বহুব্যবহার-স্নিগ্ধ সুচতুর প্রয়োগ বলে মনে হচ্ছিল তার। যেগুলোর বহুদিন অব্যবহারের মরচে এই সুযোগে ঘষেমেজে নিল যে যার মত। কোথাও যেন প্রাণের স্পন্দন পেল না। অথচ এরজন্য কোনো বেদনা বোধ হচ্ছে না তার। শুধু একটা ভাবনা ঘুরেফিরে তাকে স্বস্তির আশ্বাস দিচ্ছিল : দায় শেষ হল!

তারা কলকাতা থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিল। তখন ভরা দুপুর। চারিদিকের উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল। এত আলোয়, এত উত্তাপে দূরের কোন জিনিস তেমন স্পষ্ট দেখা যায় না। চারিদিকে শুধু যেন লক্ষ লক্ষ স্বচ্ছ শিখা নাচতে নাচতে অনন্ত আলো-আতপের উৎসের দিকে উঠে যাচ্ছে। ঘাম আজ কম হচ্ছে। লোকাল ট্রেনটা যত ছুটেছে, বাইরের হাওয়া তত তার চোখে মুখে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। মনে হল তার, জানালার কাছে বসা ভুল হয়েছে।

স্টেশনে নেমে সে হাঁফ ছাড়ল। চারিদিকে একবার ভাল করে তাকাল। অনুরাধার চোখ মুখ ভাবলেশহীন। ধীরেসুস্থে ওভার ব্রীজ পেরিয়ে একটা রিক্‌শা নিল। সে ভাবতে লাগল, অমূল্য ইলা ইত্যাদি ওরা কেন আমাদের সঙ্গে এল না। ভাল হত এলে। অনুরাধা সেই যে কখন কি কথা বলেছে, তারপর থেকে একেবারে চুপ। ওরা থাকলে অন্তত এই অস্বস্তিকর নি-কথায় কাটত না। ঝাঁঝাঁ রোদ আর খাঁখাঁ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে পড়ে থাকা সোজা রাস্তাটার মত তপ্ত নিরুপায় মনে হচ্ছিল। হাওয়ায় হাওয়ায় রিক্‌শাওয়ালার ঘামের গন্ধ আরো বিরক্ত নিজীব করে দিচ্ছিল তাকে। অনুরাধা নির্বিকার। সামনের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে। অথচ তার চোখ জবাব্দা করছিল তাকিয়ে থাকতে। কি দরকার ছিল এমন তাড়াহুড়ো করে ফিরে আসার। অনায়াসে সমস্ত পাট চুকিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে রাতে বাড়ি ফেরা যেত চমৎকার। তারপর, তারপর কত—কত সুন্দর হত!

বিকেল হতে একটা জোলো পুবেল হাওয়া দিচ্ছিল। বাতাসে ভিজে ভিজে বাদলার গন্ধ। কিন্তু ঘরের ভেতর ভ্যাপসা গরম। মনে হচ্ছে, বেশ বৃষ্টি হবে। দুপুরের আকাশ নির্মেঘ ছিল। বেকেল হতে ঈশান কোণে যেন একটু একটু কালো মেঘ জমতে শুরু করে দিয়েছিল। পড়ন্ত বিকেলে শেষ রোদের ছটায় রক্তিম হয়ে টানা পুব দিকের অনেকটা পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়ে যেন গুড়িগুড়ি এগিয়ে আসছিল মেঘ। পুবে বাগানের বিরাট আমগাছটার শুধু পাতাগুলো থর থর করে কাঁপছিল। আর তার সামনে ন্যাড়া সজনে গাছটা গোটা কয়েক ফেটে-যাওয়া শুকনো সজনে ডাঁটা প্রেতের মত নাড়ছিল। অনেক অবকাশ থাকলেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার কোন ইচ্ছা হচ্ছিল না তার। অনুরাধা ঠায় ঠাকুরের কাছে দাঁড়িয়ে। প্রত্যেক পদক্ষেপে নির্দেশ দিচ্ছে। সে এক মুহূর্ত দেখল ঐ ঋজু দেহখানা। খোঁপা ভেঙ্গে ঘাড় পর্যন্ত পড়ায় গ্রীবা সবল মনে হচ্ছিল। একটু ঝুঁকে থাকায় মুখ পুরো দেখা যাচ্ছিল না; কিন্তু নাক তির্যক তীক্ষ্ণভাবে কিছুটা এগিয়ে ছিল। মনে হল তার, অনুরাধা যেন বহুকাল ধরে এই সংসারের দায়দায়িত্ব নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে। আজই যে সে প্রথম পাকা-পাকি এসেছে, দেখে যেন মনে হয় না। তার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। অনুরাধাকে নিয়ে একটা কল্পনা তার মনে তোলপাড় করে আসতেই, তা জোর করে সরিয়ে দিল। পরে হাসল।

এক সঙ্গে গোটা কয়েক হাঁস তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। তার আবার হাঁস মুরগী-গুলোর কথা মনে পড়ল। আজ আর ওদের দিকে তেমন নজর দিতে পারেনি। খুব অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু হলেও তো কোন উপায় ছিল না। অবশ্য হরিকে বলে গিয়েছিল ওদের দেখাশুনো করবার জন্য। গমের গুঁড়ো, শুকনো মাছের বা শাঁখের গুঁড়ো কোথায় কি আছে, হরির তো সব জানা। এ সময় ম্যাশ থাকলে কোন ঝামেলা ছিল না। কতদূর কি করেছে হরি কে জানে। মন থেকে চিন্তাটা সরিয়ে দিতে চাইল সে। কিন্তু ঘুরে ফিরে ওদের কথাই যেন চেপে মনের মধ্যে বসতে চাইল।

এই হাঁস মুরগী নিয়েই তার এতদিন কাটল। বেশ কাটছিল। তার শিক্ষকতার সঙ্গে এই প্রতিপালকতার কোন বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছিল না। শূন্য সময়ের পূর্ণতা এনে দিয়েছিল। এই পূর্ণতার আশায় সে হাঁস মুরগী প্রতিপালন করেনি, করেছিল ব্যবসার জন্য। কিন্তু কতদূর কি হল! এই এত বয়স অবধি শুধু বৃত্তির ধাঁধায় ঘুরে মরল। শেষ পর্যন্ত এই শিক্ষকতা আর পশুপালন। সাংসারিক জীবনের অন্য কোন কিছুতে ঢুকতে আর সাহস হল না। অর্থমনর্থম! ভাবতে ভাবতে সে বাগানের দিকে পা বাড়াল।

"কোথায় যাচ্ছ?"

প্রশ্ন শুনে সে যেন চমকে উঠল। অনুরাধা হাসছে। দুজনের চোখাচোখি তাকাতে কেমন যেন লজ্জা লাগল। বলল সে, "বাগানে যাচ্ছি। হাঁস মুরগীগুলোর—"

"হরি তো সব কিছু—"

"তবু একবার—; যা শেয়ালের উপদ্রব! একটু অসাবধান হলে আর—"

"বাকি কাজগুলো সেরে রাখলে ভাল হত না? ওরা তো একটু বাদে—"

"সন্ধ্যাও তো হয়নি।"

"সন্ধ্যা হয়ে গেছে।"

"এই আলো থাকতে থাকতে—"

"আজ থাক। বরং তুমি তৈরী হয়ে নাও।"

সে একটু হেসে সরে এল সেখান থেকে।

আজকার দিনে অন্য সব কাজ ফেলে রাখা ভাল বোধ হয়। ভাবতে চাইল, অন্তত আর বছর কুড়ি আগে আজকার এই দিন যদি আসত, তবে মা বাবা আরো অনেকে থাকতেন। তখন সে এই দিনে কি করত এবং অনুরোধাই বা কি রকম থাকত—! হঠাৎ হাসি পেল তার। ভাবল, জ্যাঠাইমার যদি গোঁফ থাকত। কুড়ি বছর আগেই যদি সব কিছু হত আজকার ঘটনাই বা ঘটত কি করে। ঘরে এসে সে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। ঘরের কোণে কোণে অন্ধকার ক্রমশ দানা বেঁধে উঠে সমস্ত ঘরখানার দিকে ময়ালের মত ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল। আলো জ্বালবে কিনা ভাবল। আলোটা জ্বালানো উচিত। কিন্তু তার আলো জ্বালতে ইচ্ছা করছিল না। এই সান্ধ্য-অন্ধকার তাকে একটা মোলায়েম স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ এনে দিচ্ছিল। এই অন্ধকারই ভাল লাগছে।

বড্ড গরম। পাখার হাওয়াতেও তেমন কাজ হচ্ছিল না। এই এক বস্তা জামাটামা খুলে বসতে পারলে ভাল হত। এই মুহূর্তে সে ভীষণ বিরক্ত বোধ করল অনুরাধার ওপর। বিরক্ত বোধ করল ওর এই অহেতুক ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নেওয়ার জন্য। তিনজন আর পাঁচজন—এই আট; আর তারা দুজন এই তো ছিল সবসুদ্ধ। একটা ভাল রেস্তোরাঁয় ঢুকে এই আট-দশজন খেয়েদেয়ে হাসিঠাট্টা করে দায় চুকানো যেত অনায়াসে। আরে, আসল পাট চুকলো যখন ম্যারেজ অফিসারের কাছে বসেই, তখন আর নিমন্ত্রণ করে বাড়ি ডেকে এনে খাওয়ালে কি আশ মিটবে! কথাটা ভেবে হঠাৎ মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। ঘরের ঘোলাটে অন্ধকার আরো ঘোলাটে হয়ে এসেছে। সে অনেকটা নির্বোধের মত তাকিয়ে থেকে অন্ধকার সারাৎসার হওয়ার ক্রমপরিণতি দেখতে লাগল।

"একি, ঘর অন্ধকার করে বসে আছ?" বলে সে সুইচ টিপে আলো জ্বালল। কিছুটা বিরক্তি ও অনুসন্ধিৎসার চোখ নিয়ে অনুরাধা তার দিকে তাকাল। পরে একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, "গুম্ হয়ে বসে অত কি ভাবছ? হাঁস মুরগীগুলোকে একবার দেখতে যাবে? মন খারাপ না করে বরং যাও একবার।"

"ঠাট্টা করছ। বহুদিন ওদের পুষেছি। প্রতিপালক প্রায় পিতার মত।"

অনুরাধা এবার হেসে ফেলল। কি একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, "ওদের মা হওয়া আমার হয়তো বাও সহ্য হতে পারে। সে যাক, ওরা সবাই হয়তো এখুনি এসে যাবে। আলোটালো নিবিয়ে আমার চুপচাপ বসে থেকো না।" অনুরাধা বেরিয়ে গেল।

'মা হওয়া' কথাটা ভাবতে গিয়ে সে কৌতুক বোধ করল। ভাবল, সহ্য না করতে পারারই কথা। অনেকদিন আগে থেকেই তো বলেছিল, "ওগুলো ঘরবাড়ি তো ভীষণ নোংরা করে।" উত্তরে সে বলেছিল, "করে, তবে ওদের ব্যবস্থাও তো আলাদা।

"আপনার ঘেন্না করে না?"

"না।"

"প্রথম প্রথমও করত না?"

"না।"

উত্তর শুনে অনুরাধার মুখ প্রসন্ন হয়েছে বলে মনে হচ্ছিল না। চুপ করে থেকে ও নোংরার পরিমাণ উপলব্ধি করছিল, না নীরব প্রতিবাদ করছিল, বোঝা গেল না। কিছুক্ষণ পরে বলল, "আপনার খারাপ না লাগলে আর বলার কি আছে।" শুনে সে শুধু হেসেছিল।

সেদিন থেকে সে হাঁস-মুরগী সম্বন্ধে অনুরাধার মনোভাব বুঝতে পেরেছিল। যদিও অনুরাধা মুখে আর কিছু বলেনি। বরং কোন কোনদিন 'রানওয়ের' কাছে গিয়ে কোন মুরগী বা মোরগের প্রশংসা করেছে।

বিস্ময় প্রকাশ করেছে। ওদের জাত কুল দেশ জানতে চেয়েছে :

"ঐ কালো কালো মুরগীগুলোর কি নাম? কি বিশ্রী দেখতে!"

"ব্লাক্ অস্টারলো। অস্ট্রেলিয়া থেকে কথাটা এসেছে হয়তো।"

"আর লালগুলো?"

"রোড আইল্যাণ্ড। আর ঐ যে কোণের ঘরটার, ওগুলো দেশীর সঙ্গে রোড আইল্যাণ্ডের ক্রস্ ব্রীড। আমার এখানেই তৈরী।"

"ঐ মুরগী কটাকে কি তেল মাখিয়েছেন? কি সাদা!"

"ওগুলো মোরগ। লেগ্ হর্ন। ঐ রকমই চকচকে। ন' দশটা মুরগীর ওরা এক একজন গার্জিয়ান।" বলে সে হাসছিল।

"ওদের ছেড়ে দেন না কেন?"

"কতগুলো বিশেষ বিশেষ মেথডে পুষতে হয় ওদের। ছাড়লে কি করে হবে।"

"তাই নাকি? তা আপনার কি মেথড?"

"আপনিও পোলট্রি করবেন নাকি?" সে ঠাট্টা করেছিল।

"জানতে ইচ্ছা হচ্ছে।"

"ও!" বলে হেসেছিল সে। পরে বলেছিল, "আমার মোটামুটি ডীপলিটার সিসটেম। তবে এই পদ্ধতিতে রানওয়ে থাকে না; আমার আছে।"

যদিও সে কখনও এই অগ্রহ অনুসন্ধিৎসার ঔচিত্য নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে উৎসাহভরে উত্তর দিয়ে গেছে, তবু কি সে তখনিই জানতে পারেনি যে অনুরাধা বেশ কিছু পরিমাণে শুচিবাইগ্রস্ত? অনেক কিছুই সে ঘৃণার চোখে, বিতৃষ্ণার চোখে দেখে। যা একজন শিক্ষিতার সম্বন্ধে ভাবতে গেলে অস্বস্তি লাগে।

হঠাৎ এক দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে এসে ঢুকল। পাখা আরো জোরে শোঁ শোঁ করে উঠল। সে একটু আরাম বোধ করল। হয়ত আর কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টি নামবে। সে একটা সিগারেট ধরাল। আয়েস করে টানতে লাগল। ভাবল, বৃষ্টি নামলে ভাল হয়। তা না হলে এই ভ্যাপসা গরম—অসহ্য!

মাসখানেক আগের কথা মনে পড়ল তার। ঝাঁঝাঁ রোদ মাথায় করে নিয়ে হাজির হয়েছিল অনুরাধার বাড়ি। ওর ছোট বোন দরজা খুলে তাকে দেখে সবিস্ময়ে হেসে বলল, "হঠাৎ এই সময় আপনি?"

"কেন, অসুবিধা আছে?"

"অন্তত আমার নেই।"

"তুমি সেজেগুজে এখন কোথায় চললে?"

"ডিউটিতে।"

"এই সময়?"

"হ্যাঁ।"

"আমার মনে ছিল না।" সে হাসবার ভান করল। "তোমার দিদি আছে?"

"কি জানি, আজ তো যায়নি স্কুলে।" বলে দুষ্টুর মত হাসল।

"ডেকে দাও।"

"একটু দেরী হবে।"

"কেন?"

"বাথরুমে ঢুকেছে।" বলে হাসতে লাগল।

"তাতে দেরী হবে কেন?"

"হবে। প্রথম দেখবে, জলে কোন ধুলো নোংরা পড়েছে কিনা। পড়ে থাকলে সেগুলো বাছবে, সম্ভব হলে ছেঁকে নেবে। তারপর বাথরুম ধুয়েটুয়ে নিয়ে তবে তো স্নান করবে।"

"ইয়ার্কি রেখে খবর দাও।"

ও ঘুরে এসে বলল, "দিদিকে বলেছি। আপনি বসুন। আমার সময় নেই—চললাম।" বলে না দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

অদ্ভুত সংসার! সে ভাবল, এক বোন শিক্ষিকা, আর একজন নার্স। মা নেই, বাবা নেই। এক ভাই নাকি আছে; বাংলার বাইরে কোথায় কি যেন চাকরি করে। বিশেষ সম্পর্ক আছে বলেও মনে হয় না। আর কোন আত্মীয়স্বজন আছে কিনা কে জানে। তার এই সব ভাবতে ভাল লাগছিল না। আর তা ছাড়া তার অসহ্য লাগছিল এইভাবে চুপচাপ বসে থাকতে। অনুরাধা কি শুনেও একটু তাড়াতাড়ি করতে পারে না! বাইরের চৈত্রের অশান্ত হাওয়া মাঝে মাঝে খড়কুটো ধুলোবালি নিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে ঊর্দ্ধে উঠে গিয়ে পরে ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়ছে: আর জ্বরো রোগীর তপ্ত নিঃশ্বাসের মত তার গায়ে পড়ে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। এই সময় অনুরাধাকে মূর্খ বলে মনে হতে লাগল।

এক সময় অনুরাধা হাসি মুখে ঘরে ঢুকল। সদ্যস্নাত শরীর ও চুল থেকে তেল সাবানের ঈষৎ মিষ্টি গন্ধ আসছিল। তার অশান্ত মনটা দপ করে শান্ত হয়ে গেল। সে অনুরাধার মুখের দিকে তাকাল। বড় ভাল লাগছিল তার।

"ওভাবে তাকাবার বয়স নেই আর।" অনুরাধা হাসতে লাগল।

"ভাল লাগাটা বয়সনিরপেক্ষ।"

"কি জন্য আজ থাকতে বললে?"

"এই ফর্মটার জন্য।" বলে সে পকেট থেকে একটা ছাপানো কাগজ বার করল।

"কিসের ফর্ম?" জিজ্ঞাসা করে অনুরাধা হাত বাড়াল।

"মাসখানেক আগে ম্যারেজ অফিসারকে ইন্টিমেশান দিতে হয়। এটাই আইন।"

তার কথা শুনে অনুরাধার মুখটা হঠাৎ লাল হয়ে উঠল। একটু একটু সলজ্জ হাসতে লাগল। কেমন আড়ষ্ট কাঠ কাঠ দাঁড়িয়ে থাকল।

"ওটা ইনটেনডেড ম্যারেজ ফর্ম—অন্য কিছু নয়। সই কর।"

আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শেষে বলল, "ও-ঘরে এসো।"

পাশের ঘরের টেবিলের কাছে এসে কাগজখানা নিল অনুরাধা। চেয়ার টেনে নিয়ে বসে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় কি লিখব।"

সে একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বলল, "তোমার জন্মের সন তারিখ লেখ।"

অনুরাধা তার মুখের দিকে তাকাল। চোখের দৃষ্টি কেমন অসহায়।

"সার্টিফিকেটে যে বয়স আছে, সেটা লেখ।"

অনুরাধা লিখতে শুরু করল। সে মনে মনে বয়সের হিসাব কষে ফেলল। একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাস তার দুই ফুসফুসের মধ্য থেকে প্রবল বেগে বেরিয়ে আসতে চাইল। কেমন একটা হাঁপ বোধ করল সে। আটত্রিশ বছর দশ মাস।

অন্য সব সই শেষ করে অনুরাধা ওর দিকে তাকাল। সে হেসে বলল, "ঠিক আছে। আজই জমা দিয়ে আসব।" কথা বলতে বলতে হাত কাঁপছিল তার। অনুরাধা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে সে অনুরাধাকে সজোরে কোমর ধরে তার বুকের কাছে টেনে আনল।

"ছিঃ, এসব কি হচ্ছে!" অনুরাধা চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

সে কোন কথা না বলে নিজের বুকের ওপর অনুরাধাকে চেপে ধরে উত্তপ্ত ঠোঁট দুটো অনুরাধার ঠোঁটের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল। অনুরাধা ঘাড় ঘোরাল। চুমুটা গিয়ে ঘাড়ে পড়ল। শেষে জোর করে ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে ধরল সে।

অনুরাধা কোনক্রমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "দুটো দিন সবুর কর। কেউ তো এসেও পড়তে পারত।"

সে কোন কথা না বলে যুগপৎ অপ্রস্তুত ও বেহায়ার মত হাসতে হাসতে পাশের ঘরে চলে এল। তার পেছন পেছন অনুরাধা এল।

"এখন আসি।" সে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

"এসো।"

বাইরের প্রখর আলো ও তপ্ত হাওয়ায় এসেও সে বেশ স্বস্তি বোধ করল। মনটা বেশ ফুরফুরে লাগছিল। সে হাঁটতে হাঁটতে একবার পেছন ফিরে তাকাল। তাকিয়ে তার ভীষণ খারাপ লাগল। দেখল, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অনুরাধা ঘনঘন থুতু ফেলছে, সাবধানে। দেখে তার দুঃখ হল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিল: একেবারে নতুন, তাই অস্বস্তি বোধ করছে।

এ সবের কি দরকার ছিল আর এই বয়সে এসে। বেশ তো কেটে যাচ্ছিল। বয়স পেরিয়ে অসময়ে এই ঝঞ্ঝাট। সময় থাকতে কিছু কিছু চুল-পাকা, জীবন সংগ্রামে জড়িয়ে পড়া।......আচ্ছা, ক' বছর আগেও কখনো কি ভাবতে পেরেছিল, সে বিয়ে করবে? অথবা অনুরাধার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরও কি ভাবতে পেরেছিল, এই কিছু কিছু চুল-পাকা জীবন সংগ্রামে বিধ্বস্ত ঈষৎ রুক্ষ—শুকনো ভদ্রমহিলাকে ভালবাসবে, তাদের প্রেম হবে, বিয়ে করবে?

তাদের স্কুলে সকালে বসে মেয়েদের স্কুল। ওরা বেরিয়ে গেলে তারপর তারা ঢোকে। যাওয়া আসার পথে কতদিন ধরেই তো দেখাসাক্ষাৎ। সাধারণ আলাপ পরিচয় তো অনেকদিন ধরে। কিন্তু হঠাৎ কি করে তাদের মধ্যে প্রেম জন্ম নিল! অবাক লাগে।

অনুরাধা হঠাৎ ঘরে ঢুকে ওর দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর চারিদিক একবার দেখে নিয়ে বলল, "তুমি আচ্ছা বিপদে পড়েছ দেখছি।"

সে চমকে উঠল। পরে জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"আজ এখানে এসে অব্দি দেখছি, তুমি মুখ গোমড়া করে শুধু ভাবছ আর ভাবছ। কি ভাবছ অত?"

"না ঘুমোনো পর্যন্ত মন অলস থাকে না। ভাবছি যা তার না আছে মাথামুণ্ডু না আছে কিছু। তবে ভাবছি।"

"কাজ করলেই তো পার।"

"কি করব?"

"সব প্রস্তুত। কোথায় বসে খাওয়ানো হবে তা দেখবে এসো।"

"তা তো তুমিই ঠিক করে রেখেছ। আমি আর গিয়ে কি করব।"

"ওই ওরা আসছে মনে হয়, এসো।"

ওরা ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল।

অমল্যে বলল, "আমাদের সঙ্গে তোমাদেরও বসতে হবে। একলা ঘরে মুখো-মুখি দুজনে বসে খাওয়া চলবে না। তাতে অস্বস্তিতেই পড়বে আদিত্য।"

"কেন?" একজন জিজ্ঞেস করল।

"আরে, আগে থাকতে যতই জানাশোনা থাক না কেন; প্রথম দিন, আরে লজ্জা বলে তো একটা কথা আছে। আর একটা জিনিস: অনেক আদিমতার মধ্যে খাওয়াটাও একটা আদিম ব্যাপার। তুমি একটু লক্ষ করো সতীশ; খাওয়ার সময় মানুষের মুখের চেহারা কেমন হয়!"

"এ সময় এই কথা বলে ভাল করলে না অমল্যেদা!"

"তাতে কি হয়েছে। আমি তো বাবা মুখ-ব্যাদান করে খাব।"

অনুরাধা বলল, "আমরা যদি বসি, আপনাদের পরিবেশন করবে কে?"

"কেন আমরা তো খুব বেশী লোক নই।

আপনার ঠাকুর আর ঐ লোকটি মিলে খুব পারবে।” অমূল্য বলল।

অন্য সবাই হই হই করে এই প্রস্তাবে সমর্থন জানাল।

“বুঝলে আদিত্য, তুমি তো রেস্টুরেন্টে সব কাজ সারতে চেয়েছিলে। তার চেয়ে এ ব্যবস্থা অনেক ভাল হয়েছে, যাই বল।”

“ভাল তো হল”, একজন বলে উঠল, “কিন্তু খেয়াল করেছ, টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।”

“আহা জলে তো আর পড়িনি! তবে, নামুক না বৃষ্টি মুষল ধারায়। ধরণীটা খুব শীতল হবে।”

“আর শেতল হলে জমবে ভাল।” বলে অর্থপূর্ণ চোখে সহাস্যে আদিত্যর দিকে তাকাল একজন। তাই দেখে অনুরাধা ঘাড় ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল। না দেখবার ভান করল।

“আদিত্য, এত ভাল চাল কোত্থেকে পেলে—রেশনে?”

“না। খোলা বাজারে।”

“কত করে নিল?”

“দু’ টাকা আশি।”

“বহু আয়োজন করেছেন তো অনুরাধা দেবী!”

উত্তরে অনুরাধা হাসল শুধু।

“আয়োজন যাই হোক, তুমি পেট ভরে খাও অমূল্য।” সে বলল।

“পেট আমার হলেও কি বেসামাল যাই দেখ না। বাব্বা জাতে মাস্টার। বামুন আর মাস্টার বুঝলে কিনা খাওয়ার ব্যাপারে এক।”

“ইলা দেবী আপনি কিন্তু খাওয়ার চেয়ে ভাত নাড়াচাড়া করছেন বেশী।” সীতেশ অনেকটা অনুজ্ঞার সুরে বলল।

“ওভাবে তাকিয়ে আছেন বলেই তো খেতে পারছি না।”

“অবশ্য একটু আড়াল আবডাল পেলে আপনারা বেশ সুবিধা করতে পারেন।”

“এটা কিন্তু অসভ্যতা হচ্ছে।”

“অনেক সভ্যতাই অসভ্যতা। যাই হোক আমি আর কিছু বলছি না। আপনি সুবিধা করুন।”

সবাই হাসতে লাগল।

এদিকে বৃষ্টি আস্তে আস্তে চেপে এল। বাইরে বেশ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দু’একজন মেঘ ডাকার সংগে সংগে সভয়ে বাইরে তাকাচ্ছে। সে খেতে খেতে হাঁসমুরগী-গুলোর কথাই বার বার ভাবতে লাগল। ওদের একবার দেখে আসতে পারলে ভাল হত। কিন্তু কি আর করা—উপায় নেই।

অমূল্য সীতেশ ও অন্যরা গাল-গল্প রসিকতার মধ্য দিয়ে খাওয়াদাওয়া এগিয়ে নিয়ে চলল।......

“ওহে আদিত্য যা খেলাম, তাতে ভবিষ্যৎ খেলাম কিনা বলতে পারছি না। ...কি হল তোমাদের? অনুরাধা দেবী ইলা দেবীকে এবার তাড়াতাড়ি সারতে বলুন। আমরা আর ওঁর দিকে তাকাচ্ছি না।”

“আপনি কিন্তু বেহায়া।” হাসতে হাসতে বলল ইলা।

“কি করি বলুন। যেভাবে বৃষ্টিটা চেপে এসেছে তাতে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরাই সমীচীন।”

“এই বৃষ্টি মাথায় করেই কি যেতে চান?”

“আপনার মতলবটা কি? এমন সুন্দর রাত ওদের এখানে থেকে মাটি করবেন নাকি?”

“এটা ভালগার—”

“কোনটা ভালগার আর কোনটা না তা আমি বিলক্ষণ বুঝি। তবে বুঝলেন কিনা—হার্ট, এই বুড়ো বয়সেও হার্ট”, বাঁ হাত দিয়ে নিজের বুক চেপে ধরে বলল, “এই হার্টটা শুকিয়ে যায়নি।”

“আপনি বুড়ো হয়েছেন অমূল্যদা?”

“এ্যাঁ—না না, অন্তত আজকে নয়। কি বল আদিত্য? ওঠ ওঠ ওঠ সব।” বলে অমূল্য আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

ওরা একে একে কলঘর থেকে ঘুরে আসতে লাগল। সে সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে ধরল।

“এ তো তোমার ব্রেণ্ড নয়।” একজন বলল।

“না। আজ অন্তত একটু ভাল ব্রেণ্ড খাও।”

“বটেই তো। একি আর যে-সে দিন! এ হল তিন শ’ পঁয়ষট্টি দিনের এক বিশেষ দিন। দাও দেখি একটা।”

অমূল্য একটা বিরাট প্যাকেট, অনুরোধার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, “ধরুন এটা। আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানবেন।” তারপর আদিত্যর কাছে এসে ঘনিষ্ঠভাবে খুব নীচু গলায় বলল, “ওঁরা অনেকে ইয়ার্কি করে ই-য়ে দিতে চেয়েছিল কিছু। আমি বারণ করলাম। এখন আর কি পর কিছু দরকার আছে।” বলে সে অশ্লীলভাবে হাসতে লাগল।

ওদিকে কি কথায় সকলে উচ্চকণ্ঠে হাসতে লাগল।

“খুব তো কথা হচ্ছে; এদিকে রাত যে অনেক হল!” বলল একজন।

“যাব কি করে? বাইরে যে অঝোরে ঝরছে!” ইলা বলল।

“এ বৃষ্টি তাড়াতাড়ি কমবার নয়। তবু এখন একটু কমকম বলে মনে হচ্ছে।”

“না না বেরিয়ে পড়া যাক।” অমূল্য বলল।

“জলে তো আর পড়িনি।” সে বলল।

“ভদ্রতা করছ; কর। আমাদেরও তো ভদ্রতা দেখাতে হবে। চল সব, চল। এ বৃষ্টিতে এমন কিছু হবে না। গায়ে লাগালে বরং ভাল লাগবে।”

ওরা একে একে কল কল করতে করতে বেরিয়ে গেল। ওরা দুজনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখল। তার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মনে মনে বলে উঠল: দায় শেষ হল! বৃষ্টির ছাট অল্প অল্প ওদের গায়ে এসে পড়ছিল। সে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, “তোমার বোন এল না?”

“না। ওর কাজ আছে। কাল আসবে।”

“খুব আনন্দ হল, না?”

অনুরাধা কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

বড় ক্লান্তি লাগছিল তার। কেমন একটা অবসাদ সমস্ত শরীরটাকে জড়িয়ে ধরেছে। ইজিচেয়ারে শুয়ে সে একটা সিগারেট ধারাল। টানতে একটু হাঁপ মত লাগছিল। আর একবার স্নান করবে কিনা ভাবল। যদিও এখন আর কোন গরম বোধ হচ্ছে না। পাখার হাওয়া বড় মোলায়েম লাগছে। সন্ধ্যার ঘাম এই গায়ে শুকিয়েছে ভেবে খারাপ লাগল। অনুরাধা বাইরের কি সব কাজ গুছোচ্ছে। ছেঁড়া ছেঁড়া অনেক ভাবনার মধ্যে অনুরাধার ভাবনা ঘুরে ঘুরে এসে জট পাকাচ্ছে! —অনুরাধার অন্তত আজ তাড়াতাড়ি আসা উচিত।

“তুমি আর ওই সিগারেট খেও না।” অনুরাধা ঘরে ঢুকে বলল, “এতদিনের নেশা তো আর ছাড়তে পারবে না; বলছিও না।”

“এটা ছাড়া আমার নেশা হয় না!”

“তুমি দেখ চেষ্টা করে। ওই সিগারেটে

"বিচ্ছিরী গন্ধ সহ্য করতে পারি না।"

"বাইরের কাজ মিটেছে?"

"হ্যাঁ। ওরা খেয়ে দেয়ে গর্ছিয়ে রাখছে।"

"তা হলে দরজাটা বন্ধ করে দাও।"

অনর্রাধা হাসল। ওর হাসিটা উজ্জ্বল আলোয় কেমন যেন ম্লান—ব্যথিত মনে হল। সে বর্ঝতে পারল না, কেন। হয়তো এমনি। জীবনের এতদূর এসে ও উজ্জ্বল-ভাবে হাসতে ভুলে গেছে। "তুমি ইচ্ছা করলে পরে দরজা বন্ধ করতে পার।"

অনর্রাধা তেমনি হাসতে হাসতে দরজার হর্কটা তুলে দিল।

"আচ্ছা অনর্, তুমি এতদিন বিয়ে করনি কেন?"

"তুমি করনি বলে।"

সে হেসে ফেলল। বলল, "তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ।"

"আজ এখন এই প্রশ্নের কোন অর্থ হয়?"

"তা সত্যি।" বলে সে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল।

শর্য়ে পড়ে সে বলল, "আর রাত করছ কেন। রাত অনেক হয়েছে।"

"আলো জ্বলবে?"

"তোমার ইচ্ছা।"

অনর্রাধা আলো নেবাল।

তার পাশে এসে অনর্রাধা আস্তে আস্তে বলল, "তুমি এতদিন বিয়ে করনি কেন?"

সহসা সে অনর্রাধাকে সজোরে জড়িয়ে ধরে বলল, "তোমার জন্য, তোমার জন্য, তোমার—তোমার—"

রক্তের উচ্ছ্বাস অনিয়ন্ত্রিতভাবে শিরায় উপশিরায় আছড়ে পড়তে লাগল। ঢেউ-এর মত প্রবল বেগে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল—পড়তে লাগল। এক জোড়া অশক্ত ফর্সফর্সে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। ঘরের অক্সিজেন বর্ঝি অনেক কমে গেছে। আস্তে আস্তে এক সময় শিরা উপশিরা শিথিল হয়ে এল। তার গাঢ় শ্বাস নিতে নিতে মনে হল, সে যেন শর্ন্য নিরর্চ্চার আকাশে ফসলশর্ন্য মাঠে রিক্তের মত দাঁড়িয়ে আছে। অনর্রাধা নিষ্প্রাণ কাঠের মত শর্য়ে আছে। একটা গভীর অবসাদ তাকে ক্রমে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ অনর্রাধা উঠে বসল। তারপর বলল, "আমি বাথরর্ম থেকে আসছি।" অনর্রাধা খাট থেকে নেমে আলো জ্বালল। তারপর দরজা খর্লে স্খলিত পায় বাইরে বেরিয়ে গেল।

সে কিছর্ক্ষণ পর বাথরর্মে প্রবলভাবে জল ঢালার শব্দ শর্নতে পেল। অনর্রাধা স্নান করছে। সে নিশিপাওয়া মানর্ষের মত উঠে এসে জানালার শিক ধরে বাইরে—মেঘে ঢাকা আকাশের দিকে তাকাল। এখনও বর্ষ্টি পড়ছে। কয়েকটা মর্রগী ঝর্ঝি কোঁকাচ্ছে। অনর্রাধা এখনো স্নান করছে। হয়তো সাবান মাখছে। থর্তু ছেটাচ্ছে—ঘৃণা ভরে।

সে আকাশের দিকে তাকিয়ে, ঐ মেঘের জলের মধ্য দিয়ে অনন্ত তারাভরা আকাশের কাছে কি একটা কথা বলে পাঠাতে চাইল।

এসপ্ল্যানেড

বনফুল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৩

সুভদ্র সেন লিখছিলেন :

"সময়টা কাল হতে পারে, হাজার বছর আগেও হতে পারে তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। কারণ, এ ঘটনা কোন ঐতিহাসিক ঘটনা হবার দাবী রাখে না, এর গায়ে তারিখের কোনও লেবেল লাগানো প্রয়োজন মনে করি না। কিন্তু ঘটনাটা যে ঘটেছিল তা আমার স্পষ্ট মনে আছে। জায়গাটা পাহাড়ে। কাছে দূরে ছোট-বড় অনেক পাহাড়। কেন জানি না মনে হচ্ছিল সুইজারল্যাণ্ড। আমার ঠিক সামনে দিয়ে পাহাড়ী রাস্তাটা এঁকে-বেঁকে উপরে উঠে গিয়েছিল, তার দু' পাশের ঝোপে থোকো থোকো বেগুনী ফুলের শোভা দেখে আমার উঠোনের শিম্বি-নগরকে মনে পড়ল। সত্যি, আশ্চর্য কাণ্ড হল একটা। অনেকদিন আগে আমার উঠোনে একটা শিম গাছ লাগিয়েছিলাম। সেই শিমগাছ শাখা-প্রশাখা বিস্তার ক'রে দু'দিন পরে যা হয়ে দাঁড়াল তা বিস্ময়কর। ছোটখাটো মাচার সীমাকে অগ্রাহ্য ক'রে সে উদ্দাম হয়ে উঠল। নতুন বাঁশ, পুরোনো ডালপালা, এমন কি লোহার জাল দিয়েও রোখা গেল না তাকে। সে দেওয়ালের মাথায় উঠে আকাশের সঙ্গে কথা কইতে লাগল। ঢলঢলে ঘন-সবুজ পাতা দিয়ে একটা সবুজ নগরই পত্তন ক'রে ফেলল দেখতে দেখতে। বাধ্য হয়ে নাম দিতে হ'ল সে নগরের শিম্বি-নগর। সে নগরে টুনটুনি, চড়াই, বুলবুলি ছাড়াও দর্জি পাখীদের অবাধ যাতায়াত, বাসও করেছে কেউ কেউ। ফড়িং, প্রজাপতি কাঠবিড়ালীরা ক্রমাগত ঢুকছে বেরুচ্ছে। আর ফুটেছে অজস্র বেগুনী রঙের ফুল। অজস্র। শিমও ফলেছে অনেক, হনুমানরা মাঝে মাঝে এসে লুটপাট ক'রে খেয়ে যায়—তবু অনেক থাকে। হঠাৎ দেখলাম সেই শিম্বি-নগরটা যেন হন হন ক'রে উঠছে ওই পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে। স্ফুরিতাধরা বলিষ্ঠা মানবী-মূর্তি তার। সবুজ শাড়ি, গাছ-কোমর-বাঁধা, মাথার খোঁপায় বেগুনী ফুলের থোপনা গোঁজা। সে ওই ঝোপগুলোর কাছে গিয়ে বলছে শুনলাম—আমার ফুল তোমরা চুরি করেছ কেন। ঝোপের গাছরা অপ্রতিভ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মৃদু হাওয়ায় দুলছে শুধু, কোনও উত্তর দিচ্ছে না। আমি ভাবলাম ওর পিছু পিছু উঠে গিয়ে ওকে থামাই। আমার উঠোনের শিম্বি-নগর বিদেশে এসে দুটো ফুলের জন্য এমন ঝগড়া করছে এতে আমারই যেন লজ্জা করতে লাগল—কিন্তু আমাকে যেতে হল না। মানে, আমার ভুল বুঝতে পারলাম। দেখলাম মানবীতে রূপান্তরিত শিম্বি-নগর নয় ও সত্যিই একজন মানবী, এই পাহাড়টারই মালকাইন সম্ভবত। যে তার ফুল চুরি করছিল সে দেখলাম ছুটে পালাচ্ছে বন-বাদাড় ভেঙে। মানুষ নয়, প্রকাণ্ড একটা পাখী। বার্ড অব প্যারাডাইস—ছবি দেখেছিলাম ব'লে চিনতে পারলাম। পিঠের দিক থেকে বেগুনী পালকের প্রপাত নেমেছে যেন, মুখে বেগুনী ফুলের পাপড়ি। খাচ্ছে আর মুচকি হাসছেও যেন।

"দুষ্টু কোথাকার—"

তাড়া ক'রে গেল মেয়েটি। তারপর আমার সঙ্গে চোখাচোখি হ'য়ে গেল। দু'-জনেই অবাক হ'য়ে গেলাম। মিসেস পূর্ণেন্দুকে এমনভাবে এখানে দেখব আশা করিনি।

"একি মিসেস পূর্ণেন্দু, আপনি

"ওমা, আপনি! আজকাল এখানেই তো থাকি। এই পাহাড়গুলো ইজারা নিয়েছি—"

"কেন?"

"স্বপ্নের চাষ করি এখানে। ওই দেখলেন না, একটা স্বপ্ন পাখী হয়ে গেছে। আমার স্বপ্নের ফুলগুলো খেয়ে ফেলছে—একটা স্বপ্ন আর একটা স্বপ্নকে খেয়ে ফেলছে—আশ্চর্য, নয়? স্বপ্নরাও হিংস্র হতে পারে এ কখনও ভাবিনি!"

মিসেস পূর্ণেন্দুর অজ্ঞতা দেখে হঠাৎ আমার একটু মজা লাগল। আমিও এতক্ষণ মিসেস পূর্ণেন্দুর মতোই অজ্ঞ ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ একটা আলোর রেখা এসে উড়িয়ে দিল আমার অজ্ঞতার কুয়াশাটাকে। আমি জ্ঞান-লাভ ক'রে মিসেস পূর্ণেন্দুকে অনুকম্পা করতে লাগলাম।

"আপনি ও পাখীটাকে চিনতে পারেন নি দেখছি।"

"ওটা তো বার্ড অব প্যারাডাইস—ওর ছবি কে না দেখেছে?"

"কিন্তু ওর মধ্যে লুকিয়ে আছে শকুনি, তাকে আপনি দেখতে পাননি।"

"শকুনি?"

"হ্যাঁ, মিস্টার পূর্ণেন্দু!"

"ছি, ছি, পূর্ণেন্দুকে আপনি শকুনি বলছেন। তাকে তো আপনি চিনতেন না—"

"না, সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে যা শুনেছি—"

"কি শুনেছেন?"

"অনেক কিছু। সেসব শুনে আর কি করবেন!"

আমি কেবল একটা ব্যাপারে তাঁর শকুনি-পরিচয় পেয়েছিলাম। আপনি যে জীবন্ত

একথা তিনি মানতে চানান। তিনি আপনাকে মড়া ভেবেছিলেন, এবং নিজে মড়াটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবেন ঠিক করেছিলেন—”

বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মিসেস পূর্ণেন্দু। আমি বললাম—“তারপর আপনি হঠাৎ দেখিয়ে দিলেন যে, আপনিও জীবন্ত। আপনি কিংবা ইসমাইল কেউ ঠিক আইনস্টাইন নন, তবু আপনারা প্রমাণ করেছিলেন যে, প্রেমেরও একটা ফোর্থ ডাইমেনসন আছে—যা সদা-জীবন্ত, সদা-পরিবর্তনশীল। সেই সদা-পরিবর্তনশীল ফোর্থ ডাইমেনসন অদৃশ্য স্রোতে কবে আপনাকে এখানে ভাসিয়ে এনেছিল, কবে থেকে আপনি এই পাহাড়ী দেশে স্বপ্নের চাষ করছেন, কবে মনুষ্য-রূপী শকুনি মিস্টার পূর্ণেন্দু বার্ড অব প্যারাডাইসের ছদ্মবেশে আপনার স্বপ্নের দেশে প্রবেশ করেছে এসব খবর কোথাও বিজ্ঞাপিত হয়নি। তবু বলব হয়েছে, তা না হলে আমি জানলাম কি করে। আমি কি করে এলাম এখানে।”

মিসেস পূর্ণেন্দু কিশোরীর মতো ঘাড় নেড়ে দুষ্টুমি মাখানো হাসি হেসে বললেন—“জানি না। জানতে চাইও না—আর একটা কথা জানি কিন্তু—”

আর একটা আশ্চর্য কাণ্ড হল।

যিনি বলিষ্ঠা মানবীরূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন, তিনি সত্যিই কিশোরী হয়ে গেলেন দেখতে দেখতে। ঘাড় বেঁকিয়ে অপাঙ্গে আমার দিকে চেয়ে বললেন—“আপনি যে আসবেন তা আর একজন জানতে পেরেছে, কাল থেকে কাঁচকলা আর উচ্ছে খুঁজছে সে, পেয়েছে কিনা জানি না—”

মনে পড়ি পড়ি করেও মনে পড়ল না। মনে হতে লাগল অন্ধকারে কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, নূপুরও বাজছে, কিন্তু তার সঙ্গে কলকল ধ্বনি, একটা নদী বইছে কি? দেখতে পাচ্ছি না, কেবল মনে হচ্ছে অনেক দূরে, অনে—ক দূরে। নদীর ওপার থেকে ডাকছে যেন কে—এসো, এসো। তবু মনে পড়ল না।

“রহস্য, রহস্য গো, আপনার বউ। সে-ও এখানে আছে যে—আপনি সেকালে সুক্তো ভালবাসতেন—তাই রান্না করছে সে আপনার জন্যে—”

হেসে লুটিয়ে পড়ল কিশোরীটি, তার সবুজ শাড়ির আঁচল উড়তে লাগল হাসির হাওয়ায়।

“রহস্য আছে এখানে?—কোথা আছে?”

“ওই যে—ওই যে—ওই যে—ওই বাড়িটায়—কাঁচকলা, উচ্ছে, বাড়ি, রান্নাঘর

পেয়েছে সে—"

হাসি, হাসি, হাসি, ক্রমাগত হাসি, হাসির তুফান উঠল একটা। পাহাড়গুলো সব উড়ে গেল, রইল শুধু সেই হাসা-পরা কিশোরীটির ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত হাতটা।

"ওই যে—ওই বাড়িটায়—"

তারপর হাতটাও মিলিয়ে গেল। মনে পড়ল নি এইরকম ফোয়ারা-হাসি হাসত। হঠাৎ বাড়িটা দেখতে পেলাম। আশ্চর্য হয়ে গেলাম দেখে। ওটা তো পূর্ণেন্দুবাবুর সেই হলদে বাড়িটা, আমার পাশের বাড়ি, হলদে রঙের উপর কালো কালো কাজলির দাগ, সবই সেই, তবু সেটা দেখে আশ্চর্য হলাম। বাড়িটা আমার বাড়ির কাছে সরে এসেছে, বেশ খানিকটা সরে এসেছে। একটা জানলা দিয়ে ভিতরের ঘরের একটা দেওয়াল দেখা যাচ্ছে। দেওয়ালের গায়ে একটা কপাট। কপাটটা ফাঁক করে সে মুখ বাড়িয়ে চাইল আমার দিকে—হাসি-ভরা চোখ—হ্যাঁ, রহস্যই—তবু যেন রহস্য নয়। নানারকম গন্ধ যেন এক ঝাঁক ভ্রমরের মতো গুঞ্জন করছে ওর মুখের চারদিকে—মুখের ওপর ছায়া ফেলেনি—গন্ধের ছায়া পড়ে না—কিন্তু তবু মুখটাকে একটু যেন বদলে দিয়েছে—আমার স্বপ্নে বুদ্ধির গন্ধকাঠি দিয়ে পরি-বর্তনটা মাপবার চেষ্টা করছি, পারছি না, কেবলই পারছি না, এই রকম যখন অবস্থা, তখন হঠাৎ আমি হারিয়ে গেলাম। চারিদিকে সমুদ্র—উত্তাল তরঙ্গ উঠছে আর পড়ছে—হঠাৎ এক মৎস্যনারী এসে সাঁতার কাটতে লাগল আমার পাশে। বললে, আমাকে চিনতে পার? পারলাম না। সে তখন বললে—আমি এককালে ছিলাম রোহিতানী। আমার 'তা' স্বপ্নের ডিমের উপর বসে আছে—কবে থেকে এখন তা-হীনা রোহিণী। তোমার নি কিন্তু আছে আমাকে জড়িয়ে। আকাশের চন্দ্রের আমি প্রেয়সী আর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আমি নায়িকা। তোমরা—এ যুগের লেখকরা—আমার নাগাল পাওনি—নাগাল পেয়েছ যোনির, যে যোনি তোমাদের বাবা-মায়ের ছিল, ছেলেমেয়েদের আছে, ছাগল-কুকুর পোকা-মাকড়, কার নেই? তাই নিয়ে ঘাঁটছ তোমরা—নায়িকার দেখা পাওনি, প্রেয়সীর তো নয়ই। সরে যাও, আমাকে ছুঁয়ো না। ইন্দ্রধনু সন্নিভ তার পুচ্ছ আন্দোলন করে অন্তর্ধান করল সে সেই নীলসাগরের জলে, যার উপর পূর্ণিমার চাঁদ আলো ফেলে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছে মনে হল।

আমি আরও হারিয়ে গেলাম।

তারপর আবার দেখলাম—হলদে বাড়িটা সত্যিই অনেক কাছে সরে এসেছে। আমার বাড়ির দেওয়ালে ঠেকেছে তার দেওয়াল। সবিস্ময়ে চেয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। তারপর কানে কানে কে যেন বললে—কথাটা কাউকে ব'লো না যেন। কে বললে! অতীত নিশ্চয়ই নয়, অতীতকে কবি কত সেধেছেন—কথা কও, কথা কও। সে তো কোন কথা বলেনি। কত ঐতিহাসিক অনুমানের জাল ফেলেছেন হারিয়ে-যাওয়া কথা-মুক্তাদের বিস্মৃতির সমুদ্র থেকে তোলবার জন্য। পারেন নি, কত ভূতত্ত্ববিদ তার প্রস্তর কঠিন ঔদাসীন্যকে কাটাবার চেষ্টা করেছে গাঁইতি-শাবল-ডিনামাইট দিয়ে—কিছু জানা গেছে কি? যায় নি। যায় নি, যায় নি, যায় নি—কিছু জানা জানা যায় নি—কিছু জানা যায়নি। 'নি'—'নি'—'নি'।"

সুভদ্রবাবু চোখ তুলে চাইলেন। দেখলেন এরিয়েলের বাঁশের ডগায় বসে দোয়েল সুরের জাল বুনে চলেছে, নি সুরটা নানাভাবে লীলায়িত হচ্ছে। হলদে বাড়ির দেওয়ালটা আরও অনেক এগিয়ে এসেছে। এরিয়েলের বাঁশটাও। দোয়েলের সাদায়-কালোয় পালকগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, সাদা আর কালো, আলো আর অন্ধকার, দিন আর রাত্রি, কাক আর বক মিতালি করেছে যেন ওর সর্বাঙ্গে। 'কথাটা কাউকে বলো না যেন'—আবার কে যেন বললে কানে কানে! সুভদ্র সেন দেখলেন—ঠিক দেখলেন নয়, নিজের চোখকে আর বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি—মনে হল অনুভব করলেন—সামনে ছায়াময়ী কে একজন দাঁড়িয়ে আছে। কিছু দেখা যাচ্ছে না অথচ যেন দেখা যাচ্ছে একটা আবছা হাসি। সেই হাসি থেকেই যেন নিঃশব্দ ভাষায় আবার বিচ্ছুরিত হল—আমিই বলেছি ও কথা। আমি বর্তমান নই, অতীত নই, আমি ভবিষ্যৎ। অমৃতের প্রতি আমার লোভ, কিন্তু অমৃত আমি পাইনি, অমৃতের কাছাকাছি আসতেই কেটে দিয়েছে আমাকে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, বলেছে আমি নাকি দৈত্য! বারবার আমি হয়ে গেছি রাহু। ক্রমাগত গ্রাস করেছি চন্দ্রসূর্যকে কিন্তু হজম করতে পারিনি। ওরা যদি সর্বদাই আমাকে কেটে ফেলবার জন্যে উদ্যত না হ'ত তা হলে হয়তো আমি অন্যরকম হতাম। তা হলে হয়তো আমার ফুরফুরে হাওয়া বেদনার ঝড়ে পরিণত হত না, তা হলে হয়তো আমার ছায়ার ভীতি প্রেমের বাহুবন্ধনে পরিণত হ'ত, তা হলে আমি রাহু হতাম না। আমার অর্ধেকটা অমর, অর্ধেকটা সাপ। আমি ওই সাপকেও অমর করব এই আমার পণ। কিন্তু একথা জানতে পারলেই ওরা বাধা দেবে, ছুটে আসবে বিষ্ণু তার সুদর্শন চক্র নিয়ে। তাই বলছি, কথাটা ব'লো না যেন কাউকে! কোন কথাটা গোপন রাখতে হবে? ভাবতে লাগলেন সুভদ্র সেন। তারপর দেখতে পেলেন সামনের বাড়ির দেওয়ালটা হাসছে। হাসির রং থাকে নাকি! এ হাসির কিন্তু রং আছে। হলদে রং, তার উপর কালোর ডোরা। হাসি, না বাঘ? অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন সুভদ্র সেন।

৪

অন্ধকারের ভিতর সুরের ঝড় উঠেছে। বীণা, বেণু, সেতার এস্রাজ, পিয়ানো বাজছে, আর বাজছে চেলো, ম্যাণ্ডোলিন, তার সঙ্গে ঢোল আর মৃদঙ্গ, মাঝে মাঝে শানাইয়ের সরু সুর আর খঞ্জনীর খনখন আওয়াজ, অনেক দূরে গর্জন করছে ভেঁপু, আর রামশিঙে। ঢাকের গমগমে শব্দে অন্ধকার গম্ভীর হবার চেষ্টা করছে মাঝে মাঝে আবার ডুগিতবলার চটুল বোলে চঞ্চল হয়ে উঠছে। সবগুলো যেন কিসের দোলায় দুলছে, হাসির না কান্নার, তা ঠিক করতে পারছে না মহুয়া। সে কেবল ছুটছে এই অন্ধকারের মধ্যে। সব সময়ে ছুটছে না। মাঝে মাঝে থামছে। থেমে পিছু ফিরে দেখছে সে আসছে কি না। কে সে? মিস্টার চ্যাটার্জি? মোহিত সোম? মঙ্গলময়? তার দাদু? নিতান্ত ছেলেমানুষ বাবুল বোস? না, কেউ নয়। কাউকে চিনতে পারছে না সে। দেখছে কেবল কতকগুলো চাহনি... সব চাহনির একই ভাষা...। বাজনা থেমে গেল হঠাৎ। শানাইটা কেবল বাজতে লাগল। তারপর তুমুল উলুধ্বনি। খানিকটা অন্ধকার আলো হয়ে গেল। ওগুলো কি পড়ছে? খই? না, ফুল? পুষ্পবৃষ্টি নাকি! অজস্র ফুলে ছেয়ে গেল চারিদিক। তারপর এল একটা মোটরকার। পদ্মফুলে মোড়া। মোটর থেকে যে নামল তার মাথায় বরের টোপর। মুখটা কিন্তু দেখা গেল না। ঝনঝন ক'রে বেজে উঠল অ্যালার্ম ঘড়িটা। মহুয়া ঘুমোয়নি। জেগে শুয়েছিল। উঠে বসল। অ্যালার্ম ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখল। কাঁটায় কাঁটায় দুটো। রাত দুটো। উঠে পড়ল বিছানা থেকে। নিঃশব্দে আলমারি খুলে রঙীন শাড়ি বার করল। আর তার সঙ্গে বার করল ছন্দ মিলিয়ে জামা ওড়না আর দুল। নিঃশব্দে পরল সেগুলি। তার-পর রবার-সোল জুতো পায়ে সন্তর্পণে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ছিটকিনির শব্দ হল খুট করে। সুভদ্র সেনের ঘরের দিকে চেয়ে দেখল একবার। ঘর অন্ধকার। সুভদ্র সেন চোখ বুজে শুয়ে ছিলেন। ঘুমুচ্ছিলেন না। ব্রোমাইডে সেদিনও কাজ হয়নি। ছিটকিনির শব্দে তাঁর বোজা চোখ খুলে গেল। তিনি এতক্ষণ চোখ বুজে হলদে বাড়িটা দেখছিলেন, ভাবছিলেন, ওটা অত কাছে সরে এসেছে কেন। খোলা চোখে দেখলেন, মিসেস পূর্ণেন্দু—তম্বী শ্যামা রূপসী মিসেস পূর্ণেন্দু—অন্ধকারের অজানায় পাড়ি দিচ্ছে। অভিসারে? হঠাৎ

মহুয়ার মুখটা ভেসে উঠল। সে মুচকি হেসে চুপি চুপি বলল—না, অনুসন্ধান। অনুসন্ধানের তেপান্তর পার হচ্ছে না কি মহুয়া? যাবে তুমি ওর সঙ্গে? প্রশ্নটা জিজ্ঞাসাচিহ্নের মতো দুলতে লাগল সুভদ্র সেনের চোখের সামনে। দ্বিধার দোলায় দুলতে লাগলেন সুভদ্র সেন। ওই প্রশ্নটার পিঠে চড়ে যদি বেরিয়ে পড়েন (স্বপ্নের ছোঁয়া লেগে প্রশ্ন যে-কোনও মুহূর্তে পক্ষিরাজ ঘোড়া হয়ে যেতে পারে তা তিনি জানেন), তাতে লাভ হবে কি? মহুয়া আলেয়া হয়ে গেছে এ তো তিনি আগেই দেখেছেন। এক রঙের আলেয়া নয়, লাল, নীল, সবুজ, হলুদ চার রঙের চারটি পরী একে একে হাসিমুখে উঁকি দিয়ে গেল তাঁর মনের বাতায়নে। লাল পরী বললে, আমি মহুয়া। নীল বললে, আমি নয় কেন? সবুজ কিছু বললে না, হাসি মুখে চেয়ে রইল খালি। হেসে কুটিকুটি হল হলুদ পরীটা—সে বললে, কি আশ্চর্য, আমাকে চিনতে পারছ না, দাদু? বেড সুইচ টিপে ঘরে আলো জ্বাললেন সুভদ্র সেন। সামনেই দেখতে পেলেন সদ্য বিধবা শ্যামলীর ফোটোটা। দেখতে পেলেন তার চোখের উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি। শুনতে পেলেন শ্যামলীর সেই কথাগুলো, 'ওকে একটু দেখো বাবা, ও বড় দুরন্ত, বড় খেয়ালী।' দেখো? তিনি তো আগেও দেখেছেন এখনও দেখছেন—কিন্তু শ্যামলীর চোখে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি কেন? তার দৃষ্টি সহসা যেন সুভদ্র সেনের চোখে ফুটে উঠল। তিনি দেখলেন একটা বাঘ যেন হরিণকে দেখছে। এ কোন হরিণ? অনেক দিন আগে একটা সোনার হরিণকে দেখেছিলেন। টেনিসনের কাব্য-কুঞ্জে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল। আলোর হরিণ আলোর দেশে চলে গেছে। নি চলে গেছে সুরের সুরলোকে। একটা জটিল প্রশ্ন জাগল মনে হঠাৎ। আলোর অভাবই তো অন্ধকার, তাহলে অন্ধকারের মধ্যেও আলো আছে, অন্ধকার মানে নি-আলো। ওর মধ্যে নি-ও আছে তাহলে। তাহলে...... সবটা গোলমাল হয়ে গেল, জলটা ঘুলিয়ে উঠল, স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তব, সংশয়ের সঙ্গে প্রত্যয়, দেখার সঙ্গে না-দেখা ঘুরপাক খেতে লাগল। সুভদ্র সেন অনুভব করলেন, ইলেকট্রিক আলোতে সত্যকে দেখা যাবে না। সুইচ টিপে আলোটা নিবিয়ে দিলেন। দেখলেন হলদে বাড়ির সামনের দেওয়ালটা তাঁর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে জানলা সুদ্ধ। জানলায় পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে কে যেন! পিঠের উপর বেণী দুলছে। চিনতে পারলেন তাকে। তবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কে?'

'আমাকে তো চেনো। তবে আবার জিজ্ঞাসা করছ কেন?'

'তোমার মুখ তো দেখতে পাচ্ছি না।'

তুমি একটু ফিরে দাঁড়াও না। তোমার মুখটাও দেখি-

'আগে তো আমার বেণীটাকেই বেশী চিনতে।'

পা পিছলে গেলে বা জুয়োচুরি ধরা পড়ে গেলে লোকে যেমন অপ্রস্তুত হয়, তেমনি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন সুভদ্র সেন মনে মনে। একটু আশ্চর্যও হলেন। ওর চুলও তো—।

'তুমি একটু ফিরে দাঁড়াও না। তোমার মুখটাও দেখি—'

'মুখ তো দেখানো যাবে না। মুখ যে পোড়া।' সুভদ্র সেন জানতেন, এই উত্তর পাবেন।

'কিন্তু চুলটাও তো পুড়েছিল। বেণীটা তাহলে—'

'বেণী নেই, ওটা তুমি দেখছ, কারণ ওটা তোমার কল্পনায় অমর হয়ে আছে—'

'মুখটাও কি নেই?'

'না। সতী মেয়েদের মুখ কারও কল্পনায় আজকাল অমর হয়ে থাকে না। অমর হয়ে থাকে এই সব—'

বাঁ হাতটা তুলে সে লাল রুমালটা দেখাল। সুভদ্র সেন দেখতে পেলেন, বাঁ হাতের অনামিকায় পান্নার আংটিটাও জ্বল জ্বল করছে। হঠাৎ মনে পড়ল রহস্য প্রথম যেদিন আংটিটা পরেছিল, কি অপরূপ হাসিই না ফুটেছিল তার মুখে। সে মুখ আর দেখা যাবে না? কল্পনাতেও না? হঠাৎ মিসেস পূর্ণেন্দু বেরিয়ে এলেন চলাদে বাড়ির দেওয়াল ভেদ করে। বললেন —'আপনার কল্পনার দৃষ্টি-শক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে। আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি।'

লাল বনেট আর সবুজ গাউন পরা মিসেস পূর্ণেন্দু মুচকি হেসে বেরিয়ে গেলেন।

সুইচ টিপে আবার আলো জ্বালালেন সুভদ্র সেন। গত বছরের ক্যালেন্ডারটা চোখে পড়ল। লক্ষ্মীর ছবি। লক্ষ্মীর বাহন পেঁচাটা মনে হল মুচকি মুচকি হাসছে। আগে গম্ভীর হয়ে থাকত। পেঁচাটাও আজ মহুয়াকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে নাকি? তারপর হঠাৎ মনে হল, মিসেস পূর্ণেন্দুও বোধ হয় ওরই খোঁজে বেরিয়ে গেল। তাই কি? ভ্রূ কুঞ্চিত করে বসে রইলেন সুভদ্র। তারপরই সবুজ গঙ্গা ফড়িংটা লাফিয়ে ঢুকল জানলা দিয়ে। বাতির শেডের উপর বসে এক পা তুলে চেয়ে রইল সুভদ্রর দিকে। সুভদ্র ভাবলেন এও নিশ্চয় মহুয়ার খবরই এনেছে। তারপরই লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল ফড়িংটা। সুভদ্র সেনের মনটাও বেরিয়ে গেল তার সঙ্গে গঙ্গা ফড়িং-এর পিঠে সওয়ার হয়ে। দেহটা বসে রইল।

মহুয়া যখন রাস্তায় নেমেছিল, তখন নীরব নিথর ছিল সব। মিসেস পূর্ণেন্দুর বাড়ির পূর্ব দিকে যে রাস্তাটা সাপের মতো এঁকে বেঁকে গঙ্গার ধারে গেছে সে রাস্তায়

গেল না মহুয়া। গঙ্গায় যদি নৌকো থাকত আর সে নৌকোয় থাকত যদি মাঝি যে মাঝি সাগরের খবর রাখে, তাহলে হয়তো যেত। সাগরেই যেতে চায়। কিন্তু সুযোগ পায় না। মহুয়া জানে সুযোগ সে পাবেও না। সে জানে তাকে হেঁটেই যেতে হবে, হেঁটেই অতিক্রম করতে হবে প্রান্তর, অরণ্য, পর্বত, মরুভূমি। সে বেরিয়ে দেখল চারদিক নীরব নিথর। ঝিঁঝি পোকাও ডাকছে না। দূরে একটা ছোট্ট ঝোপের ধারে সামান্য একটু আলো দেখা গেল। মাঠের মাঝে ঝোপটা। সেই দিকেই চলল মহুয়া। রোজ যায়। কিন্তু কখনও পৌঁছতে পারে না। ঝোপটা সরে সরে যায় ক্রমাগত। সে জানে পৌঁছতে পারলে দেখা যাবে—হয় মিস্টার চ্যাটার্জি, না হয় মোহিত সোম, না হয় মঙ্গলময়, না হয় দাদু (সেই দাদু যার তেড়ি-কাটা ফোটোটা টাঙানো আছে তার শোবার ঘরে। কেউ না কেউ নিশ্চয় বসে আছে সেখানে। কিন্তু মহুয়া পৌঁছতে পারে না। চলতে চলতে তাকে ঘিরে কখনও বাজনা বাজে, কখনও বাজে না। ঝোপের ধারের আলো কখনও উজ্জ্বল হয়, কখনও হয় না। টিপ টিপ করে আলো জেলে জোনাকিরা ওড়ে আশেপাশে। সুভদ্র সেন দেখতে পেলে বলতেন—ওর মনই জোনাকি হয়ে উঠেছে। চুলও উড়ছে। উড়ছে বাদুড়ের দল। উড়ছে স্বপ্ন আর কল্পনা। এর পর যা ঘটল, তা কি কল্পনাই? কার নিশ্বাস যেন গায়ে লাগল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মহুয়া। আজ তার চলার ছন্দে পিয়ানো বাজছিল : হঠাৎ থেমে গেল সেটাও।

দেখল, তার পাশে দীর্ঘকান্তি কে যেন দাঁড়িয়েছে এসে। চোখ মুখ কিছু দেখা যাচ্ছে না। পাওয়া যাচ্ছে শুধু অদ্ভুত একটা ফুলের গন্ধ। বকুল? রজনীগন্ধা? হাস্নুহানা? না এ গন্ধ সে চেনে না। মনে হল—পিয়াল? পিয়াল ফুলের গন্ধ থাকলে এই রকম হত হয়তো। এ কথা কেন মনে হল, তাও জানে না মহুয়া। পিয়াল ফুলের গন্ধ আছে কিনা তাও জানে না!

'কে আপনি?'

'তুমি তো মহুয়া।'

'হ্যাঁ।'

মহুয়া গাছের তলায় তোমার জন্ম হয়েছিল বলে তোমার নাম মহুয়া—তাই না?'

'হ্যাঁ—'

'আমার নাম শালিম। শাল গাছের তলায় জন্ম হয়েছিল আমার। লিবাং বনে এখনও আছে সেই শাল গাছ। আর আছে সেই তিতির নদী, যার জলে শাল গাছটার ছায়া পড়ে, যে ছায়ার সঙ্গে খেলা করে মেঘের ছায়া আর রামধনুর রং, যে নদীর জলে সকালে আসে উষা বিকেলে সন্ধ্যা, জ্যোৎস্নার সঙ্গে যার মিতালি, অন্ধকারের বিস্মৃতিতে হারিয়ে যায় না, রূপান্তরিত হয় স্বপ্নে। এর সঙ্গে তুমিও আছ মহুয়া—'

'আমি?'

'হ্যাঁ তুমি। তুমি তো শহরের নও। তুমি বনের। বন এখনও তোমায় ডাকে। শুনতে পাও না?'

'না—'

'কান পেতে শোন—'

একটা আকুল মর্মর ধ্বনিতে পূর্ণ হয়ে উঠলো অন্ধকার। অভিভূত হয়ে পড়ল মহুয়া। এ মর্মর ধ্বনি তো সে শুনেছে আগে। কেবল অন্ধকার মাঠে নয়, তার রক্তের মাঝখানে।

'শুনলে?'

'শুনলাম। কিন্তু এর মানে বুঝতে পারি না।'

'তোমার ভাষায় অনুবাদ করে দিলে হয়তো বুঝবে। বল তো করে দিই। কবিতায় করব কিন্তু—সুরে বলব—'

'বল—'

শালিম গুনগুন করে গান গাইতে লাগল।

'তোমারি পথের পানে
চেয়ে থাকি সাঁঝ বিহানে
তবু তো পাই না দেখা
জোছনা আঁধার রাতে
জেগে থাকি তারার সাথে
একা একা
তবু তো পাই না দেখা।

ওগো মনে পড়ছে না কি
পিয়াল বনে দোয়েল পাখী
সুরের রাখী
বেঁধেছিল তোমার প্রাণে
সে রাখী ছিঁড়ল কবে
কে-উ বা জানে।
ছিঁড়ল কেন ছিঁড়ল কবে
কিসের টানে
পাই না দিশা ও মহুয়া
বুঝি না কোনই মানে।

গান থেমে গেল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তারা। দুজনের মাঝখান দিয়ে যা প্রবাহিত হতে লাগল তা নিঃশব্দ সময়ের স্রোত নয়, তা গুঞ্জন বহুল ছন্দ-ধারা, তা অস্ফুটের ফোটার বাসনা, তা অপ্রকাশের প্রকাশ হবার আকুতি। অস্পষ্ট কি একটা যেন স্পষ্ট হতে চাইছে মনে হল। মহুয়া বলল—"আমি কিছু বুঝতে পারছি না—"

"না পারাটাই স্বাভাবিক। তোমার ইহজন্ম আর পূর্বজন্মের মাঝখানে যে পরদাটা দুলছে তা দৃষ্টি দিয়ে ভেদ করা যায় না। কেবল অনুভূতি দিয়ে আর কল্পনা দিয়ে যায়। আমি অনেক কষ্টে তা ভেদ করেছি, অনেক যুগ যুগান্তরে লীন হয়ে গেছে, আমার ভাষাকে তোমার ভাষা করতে আরও কত দিন কত রাত্রি লেগেছে—তবু নিজেকে স্পষ্ট করতে পারছি না, অন্ধকার এখনও জড়িয়ে আছে আমাকে—শালিমকে তোমার সেই পূর্বজন্মের শালিমকে দেখতে পাচ্ছ না তুমি—আমার ব্যক্তি-সত্তাটাকে স্পষ্ট করতে পারিনি এখনও, কিন্তু তুমি যদি সময় দাও পারব—আমার আশার টানেই তুমি রোজ রাতে বেরিয়ে আস তা আমি জানি—"

মহুয়া বলল—"না, আমি বেরিয়ে আসি ব্রাহ্ম মুহূর্তের মোহে অভিভূত হয়ে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত আমাকে রোজ ডাক দেয়। বলে—বাইরে এস, বাইরে এস বাইরে এস। তারই ডাকে চলে আসি আমি!"

"ব্রাহ্ম মুহূর্তের খবর কে দিয়েছিল তোমায়?"

"মঙ্গলময়—"

"কে সে?"

"আমার সহকর্মী অধ্যাপক একজন। সে বলেছিল ব্রাহ্ম মুহূর্তেই জীবন দেবতার দেখা পাওয়া যাবে। তাই আমি রোজ—"

হঠাৎ শালিমের দেহটা একটু বেঁকে গেল। মনে হল একটা ধনুকেও মূর্ত হল তার সামনে। তারপর—বং—। একটা কালো তীর ছুটে চলে গেল।

"আমি আবার আসব, আবার আসব, বারবার আসব—" শালিম অন্তর্ধান করল। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মহুয়া। সহসা তার স্তব্ধতাকে চিরে ডাক দিয়ে চলে গেল একটা রাত-জাগা পাখী—মিচেচে—মিচেচে—মিচেচে। মহুয়ার মনে হল মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে। শালিম? আবার আসবে? বারবার আসবে? তারপর সে আবিষ্কার করল বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে বেশী দূর যায়নি। পূর্ণেন্দুবাবুর বাড়ির পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা সাপের মতো এঁকে বেঁকে গঙ্গার ঘাটের দিকে চলে গেছে, তারই একটু দূরে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ঝোপটা নেই, আলোটাও নেই। তারপর রোজ যা হয় সে দিনও হল, মনে পড়ল দাদু এখনও হয়তো ঘুমোননি। নিশ্চয়ই জেগে এপাশ ওপাশ করছেন। কে যেন তাকে পৌঁছিয়ে দিলে বাড়ির দিকে। সুভদ্র সেন চুম্বকের মতো টানতে লাগলেন তাকে। তারপর একটা হিমের আবর্ত উদ্বেলিত হয়ে উঠল তাকে ঘিরে, হতাশার আবর্ত। ব্রাহ্ম মুহূর্তে সে রোজ যাত্রা করে, কিন্তু কোথাও পৌঁছতে পারে না কেন। কেন এ ব্যর্থতা! যে ঐশ্বর্য অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে আছে, যে ঐশ্বর্যের সন্ধান কত লোক পেয়েছে, সে পাবে না কেন।

"সে ঐশ্বর্য নেই—" কে বলেছিল? মনে নেই, কিন্তু কোথায় পড়েছিল? তারই স্মৃতি যেন কথা কয়ে উঠল।

"নেই?"

"না—"

"কে আপনি—"

"আমি তারুন অল রশিদের পুত্র অল মামুন। আমি ঐশ্বর্য পাব বলে বিদীর্ণ করেছিলাম পিরামিডক। কিছু পাইনি—"

যে বইয়ে ঘটনাটা পড়েছিল সেই বইয়ের নাম মনে পড়ল না, মলাটটা কেবল মূর্ত হয়ে উঠল মানসপটে। তারপর সেইটেই যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল তাকে।

বাড়ি ফিরে দেখল সুভদ্র সেন আলো জ্বেলে ঘরের মাঝখানে একটা হাত একটু তুলে দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হল যেন কার সঙ্গে কথা কইছিলেন। মহুয়াকে দেখে যেন একটু থতোমতো খেয়ে গেলেন।

"তুমি কি মঙ্গলময়ের কাছে গিয়েছিলে?"

"না। কেন?"

"এখুনি খবর পেলাম যে, মঙ্গলময় অসুস্থ—"

"বাজে খবর শুনেছ। কে বললে?"

"মিসেস পূর্ণেন্দু। [illegible] একটু আগে বেরিয়েছিলেন—"

"মিসেস পূর্ণেন্দু!"

হেসে উঠল মহুয়া, আবার ভেঙে পড়ল একটা ঝাড়লণ্ঠন। কেঁপে উঠল রাতের অন্ধকার।

"ব্রোমাইড খেয়েছ?"

"খেয়েছি। কাজ হয়নি—"

"তাহলে শোও—। আমি তোমার মাথায় অডিকোলন দিয়ে একটু হাওয়া করি—"

"করবি? সত্যি করবি?"

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর মুখ। মনে হল যেন কৃতার্থ হয়ে গেলেন।

"মিসেস পূর্ণেন্দু কিন্তু মিথ্যে নয়। তুই আসার একটু আগে এসে খবরটা দিলেন আমাকে। তুই আসার সঙ্গে সঙ্গে তোর মধ্যেই মিলিয়ে গেলেন যেন। মাঝে মাঝে আমার কি সন্দেহ হয় জানিস?"

"বাজে না বকে তুমি শুয়ে পড়তো—"

শুয়ে পড়লেন সুভদ্র সেন।

তারপর হঠাৎ চিৎকার করে উঠল মহুয়া—"ওটা কি! ওটা কি! শালগাছ এখানে এল কি করে?"

সুভদ্র সেন বললেন—"ওটা তো পূর্ণেন্দুবাবুর বাড়ির দেওয়াল। দেওয়ালের গায়ের কালো দাগ ওটা, গাছের মতো দেখাচ্ছে—"

"দেওয়াল? দেওয়াল এখানে আসবে কি করে।"

ফিসফিস করে সুভদ্র সেন বললেন—"রোজই এগিয়ে আসছে আস্তে আস্তে—"

মহুয়া চেয়ে রইল দীর্ঘ শাল গাছটার দিকে। এরই তলায় কি শালিম জন্মেছিল?

ক্রমশ

ব্যাংকিং কমিশন গঠনের প্রস্তাব

ভারতের ব্যাংকিং ব্যবস্থার খোঁজখবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা সবাই জেনে আনন্দিত হয়েছেন যে, ভারত সরকার একটি ব্যাংকিং কমিশন গঠন করতে চান। ১৯৩১ সালের পর এ ধরনের কমিশন আর গঠন করা হয়নি। প্রস্তাবটি ভারতের ব্যাংক ব্যবসায়, তথা শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে ব্যাংকগুলির ভূমিকা মূল্যায়নের পক্ষে খুবই উপযোগী হবে।

ভারতে গত একুশ বছরে ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য যেমন রিজার্ভ ব্যাংকের দায়িত্ব ও ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে, অপর দিকে তেমনি দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অর্থ-সংস্থানে—বিশেষ করে কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নে রিজার্ভ ব্যাংক এবং অন্যান্য ব্যাংক-গুলিও ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শিল্পোন্নয়নে অর্থসংস্থান করার জন্য স্থাপিত হয়েছে শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক। আগেকার ইম্পিরিয়াল ব্যাংককে জাতীয়-করণ করে এবং তার সাথে তৎকালীন আরও কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের ব্যাংক একত্রিত করে ১৯৫৫ সালে স্টেট ব্যাংক গঠন করা হয়; কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পকে ঋণ সরবরাহ করার জন্য স্টেট ব্যাংক সক্রিয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া গঠন করা হয়েছে বেসরকারী ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্পকে দীর্ঘ-মেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও ক্ষুদ্রমেয়াদী ঋণ সরবরাহ করার জন্য বিভিন্ন ঋণ প্রদানকারী সংস্থা। শিল্পক্ষেত্রে ঋণ সরবরাহে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির চেয়ে অনেক বেশী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলি। রিজার্ভ ব্যাংক শুধু যে এ সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে তা-ই নয়, এগুলিকে অর্থ সাহায্যও করে থাকে। কৃষিক্ষেত্রে সমবায় সমিতিগুলি শুধু রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে সাহায্যই পায় না, রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীনেও ওরা এখন এসে গেছে। পরাধীন ভারতে রিজার্ভ ব্যাংকের ভূমিকা এত গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ ছিল না। স্বাধীনতার পর অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে রিজার্ভ ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিজের দায়িত্ব কতটা পালন করতে পেরেছে তার মূল্যায়ন করা দরকার। এজন্যই ব্যাংকিং কমিশন গঠন করার প্রস্তাবকে স্বাগত জানাই।

ব্যাংকিং কমিশন গঠনের আরও অনেক কারণ বিবেচনা করা যেতে পারে। ১৯৪৮ সালে আমরা দেশের সর্বত্র এবং বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় ব্যাংক-ব্যবসায়ের বিপর্যয় দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর ১৯৪৯ সালে ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ আইন করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির উপর রিজার্ভ ব্যাংকের কর্তৃত্বকে আরও জোরদার করা হয়। ১৯৫৬, ১৯৬০ এবং ১৯৬৫ সালে পুনরায় ঐ আইনটির সংশোধন করা হয় এবং প্রতিবারেই রিজার্ভ ব্যাংককে সমগ্র ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়। এখনও আমরা দেখতে পাচ্ছি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, যার ফলে শুধু ব্যাংকের মালিকানাটুকু থাকবে ব্যাংকারদের হাতে, নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা থাকবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাংকের হাতে। রিজার্ভ ব্যাংককে জাতীয়করণ করা হয় ১৯৪৮ সালে। সুতরাং রিজার্ভ ব্যাংক যখনই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তখন প্রকৃতপক্ষে সরকারই ব্যাংকগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ব্যাংকের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ভাল ও মন্দ সব দিকই প্রস্তাবিত ব্যাংকিং কমিশন বিবেচনা করবে। শুধু সামাজিক নিয়ন্ত্রণের (social control) সুবিধা-অসুবিধা নয়, কার্যক্ষেত্রে ব্যাংক-গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে আইনের বিধান আছে তার খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে দেখাও কমিশনের অন্যতম কাজ হবে। তা ছাড়া, আমানতকারীদের আমানত বীমা করার যে ব্যবস্থা হয়েছে, বিল-বাজার (Bill market) সম্প্রসারিত করার যে ব্যবস্থা হয়েছে, ব্যাংক এবং ব্যাংক নয় এমন যেসকল ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান আছে (non-banking financial institutions) সেগুলির ক্রিয়াকলাপ, মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি যা যা চালু হয়েছে তাদের কার্যকারিতা বিচার—সবই প্রস্তাবিত কমিশনের বিচার্য বিষয় হবে। ব্যাংকিং ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য আঞ্চলিক ভিত্তিতে ক্ষমতাসম্পন্ন আঞ্চলিক ব্যাংক গঠন করার প্রস্তাবটিও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গত বছর ডিসেম্বর মাসেই অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই এ ধরনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এ ধরনের আঞ্চলিক ব্যাংকের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের এবং আধা-শহরাঞ্চলের আমানত একত্রীকরণ করার কাজ আরও সহজ হবে। আশা করা যায়, প্রস্তাবিত ব্যাংকিং কমিশন এদিকটিও বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখবেন। গত আর্থিক বছরে কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন আশাতীত বেড়ে যাওয়ায় জাতীয় আয় শতকরা ৯·৩ ভাগ বেড়েছে। এই বাড়তি জাতীয় আয়ের অধিকাংশ সৃষ্ট হয়েছে গ্রামাঞ্চলে। গ্রামাঞ্চলে এই উদ্বৃত্ত আয় যদি সুসংহত এবং বিনিয়োগের কাজে ব্যবহার করা যায় তবে জাতীয় আয় ক্রমবর্ধমান হারে বাড়তে থাকবে। এই সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র ব্যাংকিং ব্যবস্থার কাঠামো কিভাবে কাজ করছে এবং এই কাঠামো আরও ভালভাবে কাজ করতে পারে কিনা, অথবা যদি না পারে, তবে কেন পারবে না, ইত্যাদি সব দিকই ভাল-ভাবে বিচার-বিবেচনা করা দরকার। এজন্যই ব্যাংকিং কমিশন গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। আশা করা যায়, বর্তমান বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই প্রস্তাবিত কমিশন গঠিত হবে। এই কমিশনের কী কাজ হবে সে সম্পর্কে বিস্তৃত কর্মসূচী এখনও তৈরি হয়নি। তবে যত দূর শোনা যাচ্ছে, আমাদের দেশের বড় এবং ছোট, এই দুই শ্রেণীর ব্যাংকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

এবং দুই শ্রেণীর ব্যাংকগুলিই নিজ নিজ ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের অথবা ঋণ গ্রহণের কতটা সুবিধা পেয়ে থাকে তা কমিশন বিবেচনা করবে। বহু দিন ধরে আমাদের দেশের কতিপয় ক্ষুদ্র দেশীয় ব্যাংক (যেগুলি প্রধানত বড় বড় মহাজনদের দ্বারা পরিচালিত) এমনভাবে ব্যবসায় চালিয়ে যাচ্ছিল যা ঠিক রিজার্ভ ব্যাংকের অনুসৃত মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণ নীতির সঙ্গে খাপ খায়নি। সম্প্রতি ঐ ব্যাংকগুলিকে রিজার্ভ ব্যাংকের কর্তৃত্বাধীনে আনা হলেও সম্পূর্ণভাবে রিজার্ভ ব্যাংকের কর্তৃত্ব এখনও সু-প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অনেক বড় বড় সরকারী ও বেসরকারী অফিসে সমবায় ব্যাংক আছে যেগুলির উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রস্তাবিত কমিশনের কাজ হবে এ বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করা। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজের সঙ্গে তাল রেখে ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে এগোতে হবে, এবং তা কিভাবে সম্ভব, প্রস্তাবিত ব্যাংকিং কমিশনই তার নিশানা দেবে।

সুব্রত গুপ্ত

লক্ষ্মীর কৃপালাভ: বাঙালীর সাধনা

বর্ষাতি ও রাবারের জিনিস তৈরির প্রতিষ্ঠান

মনটা আমার বেশ কিছুদিন ধরেই খুঁতখুঁত করছিল; কতকটা ত্রুটি হলে যে অস্বাচ্ছন্দ্যে মানুষ ভোগে সেই রকম একটা কষ্ট হচ্ছিল। ইন্দিরা গান্ধী Hevea Brasiliensis-এর দেশ ব্রেজিল যাবার পরে চিত্তচাঞ্চল্যটা বেড়ে গেল।

এতগুলি বাঙালী প্রতিষ্ঠানের কথা আপনাদের আমি বলেছি, স্বর্গীয় সুরেন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের কথাও একাধিক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি, অথচ তাঁর নিজের গড়া বাঙালীর আর একটি গর্বের বস্তু বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কসের কাহিনী এখনও বলিনি, এটাই আমার মনঃকষ্টের কারণ।

ব্রেজিলের প্রসঙ্গে আমার ভাবানুষঙ্গ (অ্যাসোসিয়েশন অব থটস্) এই রকম হলো: ইন্দিরা দেবী—ব্রেজিল—হিভিয়া ব্রেজিলিয়েনসিস্, মানে আগে কেবল ব্রেজিল অঞ্চলে গজাতো বলে রাবার গাছের এই ল্যাটিন নাম—সেই গাছের রস হলো ল্যাটেক্স—ল্যাটেক্স জমে গেলে হয় রাবার—রাবার থেকে ওয়াটারপ্রুফ (টায়ার টিউবের কথা আগে লিখেছি)—এদেশে ওয়াটারপ্রুফ প্রথম তৈরি হয়েছিল বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফে, যাঁদের 'ডাকব্যাক' মার্কা বর্ষাতির ভারত-জোড়া নাম—অথচ সে বৃত্তান্ত আমার লেখা হয়ে ওঠেনি।

নানা কারণে সেটা হয়ে ওঠেনি। প্রধান হেতুটি হলো লেখার মালমশলা যোগাড়ের তোড়জোড় করতে না করতেই শ্রমিকের অস্থিরতার গত ২০ মে তারিখ থেকে বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের কারখানাটি বন্ধ হয়ে থাকে। সুখের বিষয়, এই প্রবন্ধ লেখার ঠিক আগে খবর পেলাম যে, শ্রমিক-মালিক বিরোধ নিষ্পত্তি হয়ে ১৯ অক্টোবর থেকে কারখানা আবার খুলেছে।

স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ এবং বিখ্যাত বিপ্লবী স্বর্গত ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে একটা উদ্ধৃতি দিয়ে বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় সুরেন্দ্রমোহন বসু মশায়ের ব্যক্তিগত ইতিহাস আরম্ভ করি। এই শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে যে সমস্ত তেজস্বী যুবক পৃথিবীর সব দেশে ছড়িয়ে পড়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন সুরেন্দ্রমোহন তাঁদের অন্যতম। তিনি তখন আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল কেমিস্ট্রিতে A. B. (স্নাতক) ডিগ্রি পেয়ে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে M. Sc. পড়ছেন। ভূপেন্দ্রনাথ 'আমেরিকায় প্রচেষ্টা' শীর্ষক অনুচ্ছেদে লিখেছেন: "...১৯১৩ খৃষ্টাব্দে 'হিন্দুস্থান স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন' নামে ছাত্রদের মধ্যে নিখিল আমেরিকা সঙ্ঘ গঠন করা হয়। এই সঙ্ঘের পক্ষ হইতে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করা হইয়াছিল। ডক্টর সুধীন্দ্রনাথ বসু ইহার প্রথম প্রেসিডেন্ট হন এবং প্রত্যেক স্টেটে ইহার শাখা গঠিত হয়।...এই সময়ে ১৯১২ হইতে ১৯১৪ পর্যন্ত 'সুরেন্দ্রনাথ (স্পষ্টতই নামে একটু ভুল থেকে গেছে) বসু, 'বসন্তকুমার রায়, 'ডঃ সুধীন্দ্রনাথ বসু ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। ফলে তিনজনই ইংরেজ গভর্নমেন্টের রোষে পতিত হন এবং এক প্রকারের নির্যাতন ভোগ করেন।..."

ভূপেন দত্ত মশায়ের এই উল্লেখটুকু খুবই অসম্পূর্ণ। সুরেন্দ্রমোহন ও তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু খগেন্দ্রচন্দ্র দাশ (ক্যালকাটা কেমিক্যালের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা), খগেন্দ্রচন্দ্রের ভাগ্নে সত্যেন সেন, শ্রীভাটাল নামে এক পাঞ্জাবী ছাত্র এবং রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সারদানন্দের ভাই নরেশ চক্রবর্তী U. S. A সরকারকে ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য করার বিষয়ে রাজী করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বৃটিশ ও আমেরিকান সরকারের মিতালির জন্যে তাঁরা যে সে চেষ্টায় সফল হননি তা বলা বাহুল্য।

সুরেন্দ্রমোহন দেশে ফিরে আসার পরেও অনেক বছর ধরে সরকারী উৎপাত সহ্য করেছিলেন। গদরপার্টির সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একবার গ্রেপ্তার হয়ে ছাড়া পাবার কথা গত ৪ঠা শ্রাবণের 'ক্যালকাটা কেমিক্যাল' বিষয়ক প্রবন্ধে লিখেছি। জাপানী জাহাজ কোমাগাটা মারুতে গদরপার্টির সঙ্গে শিখের ছদ্মবেশে একজন বাঙালীও ছিলেন। তাঁর নাম ছিল সত্যেন সেন। এই অসমসাহসী যুবক আমেরিকা থেকে 'কোমাগাটা মারু'-তে

কলকাতায় পৌঁছেই অনুশীলন পার্টির অন্যতম নেতা হয়ে উগ্র সন্ত্রাসবাদী হিসেবে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি সুরেনবাবু ও খগেনবাবুর ঘনিষ্ট বন্ধুও ছিলেন। এইসব যুবকদের দমন করার উদ্দেশ্যেই * * ১৯১৯ সালে ভারত গভর্নমেণ্টের কুখ্যাত রাওলাট অ্যাক্ট পাস হয়েছিল।

গদর-পর্বের কিছুদিন পরে শিল্পায়নে উচ্চশিক্ষিত সুরেন্দ্রমোহন করদ রাজ্য রেবা স্টেটের শিল্পোন্নয়নের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন ভারত সরকারের ওই ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট-এর খড়্গ তাঁর ওপরে পড়লো। তিনি যুক্তপ্রদেশের (অধুনা উত্তরপ্রদেশের) হামীরপুরে অন্তরীণ হলেন।

এই হলো সুরেন্দ্রমোহনের চরিত্রচিত্র যার শেষ অভিব্যক্তি আমরা নতুন করে আবার দেখেছিলাম ১৯৪৬ সালে তাঁর মৃত্যুর বছর দুই আগে। নেতাজীর আই এন এর সৈনারা যখন গান্ধীজী ও কংগ্রেসের চেষ্টায় বৃটিশের কবল থেকে ছাড়া পেলেন তখন তাঁদের মধ্যে অনেককে সুরেন্দ্রমোহন ডেকে ডেকে বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফে কাজ দিলেন জাতিধর্ম নির্বিশেষে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও কাজ করছেন। কোম্পানীর একটি গাড়ির ড্রাইভার পাঞ্জাবের শ্রীবুটা সিং-এর সঙ্গে আমার আলাপ হলো। তিনি আই এন এ-তে আর্মি-ড্রাইভার ছিলেন। বাইশ বছর বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফে কাজ করে বার্ধক্যের জন্য এবারে তিনি রিটায়ার করছেন।

সেকালে দুর্লভ বিদেশী ডিগ্রির জোরে সুরেন্দ্রমোহন মুক্তি যুদ্ধে সক্রিয় অংশ না নিয়ে বৃটিশ ভারতে মোটা মাইনের সরকারী চাকরি কিংবা কৃতী অধ্যাপক হতে পারতেন। কিন্তু ঢাকা বিক্রমপুর জেলার সুভদ্দা (সুভদ্রা) গ্রামের সুরেন্দ্রমোহন সে রকম নরমপাকের ধাতুতে গড়া ছিলেন না, দেশপ্রেমের ব্যাপারে তিনি ছিলেন ইস্পাত।

হামীরপুরে বন্দী অবস্থায় সুরেন্দ্রমোহন খবরের কাগজে পড়লেন যে রেইনকোট আর ওয়াটারপ্রুফ ক্যানভাসের অভাবে পল্টনের (ইণ্ডিয়ান আর্মির) ভারতীয় সেনাদের দুর্গতির শেষ নেই। যুদ্ধের জন্যে বিলেত থেকে ওইসব জিনিসের আমদানি বন্ধ; যেটুকু আসে তাও যায় এখানকার গোরা সৈন্যদের ব্যবহারে, আর ভারতবর্ষে ওয়াটারপ্রুফের কোনো ফ্যাক্টরীই নেই তখন। সুরেনবাবুর বৈজ্ঞানিক মন সজাগ হয়ে উঠলো। কষ্টেসৃষ্টে একটা ছোট ল্যাবোরেটরির সরঞ্জাম যোগাড় করে হামীরপুরেই তিনি রাসায়নিক পদ্ধতিতে (কেমিক্যাল প্রুফিং) ওয়াটারপ্রুফ কাপড় ও ক্যানভাস তৈরির গবেষণা নিয়ে মেতে উঠলেন। গবেষণায় তিনি সফল হলেন বটে, কিন্তু তা কাজে লাগাবেন কী করে সেই অন্তরীণ অবস্থায়! যুদ্ধাবিরতি পর্যন্ত তাঁকে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হলো।

যুদ্ধশেষ হওয়ার কিছু পরে সরকার তাঁকে মুক্তি দিলেন। সুরেন্দ্রমোহন বাংলাদেশে ফিরে এলেন।

সুরেন বসুর বাবা মোহিনীমোহন ছিলেন ময়মনসিংহের এক নামকরা স্কুলের হেডমাস্টার। শিক্ষাব্রতী হিসেবে তিনি সেকালের পূর্ববঙ্গের লোকের বিশেষ

---

* * বিশেষ করে বাঙালী টেররিস্টদের কার্যকলাপে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ১৯১৮ সালে ভারত সরকার স্যার সিডনী রাওলাট-এর সভাপতিত্বে কুমারস্বামী শাস্ত্রী এবং প্রভাসচন্দ্র মিত্রকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। সেই কুখ্যাত রাওলাট কমিটির সুপারিশে ১৯১৯-এর মার্চ মাসে যে আইন পাস করানো হয়েছিল তাতে ভারতের সমস্ত প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট "were given powers to arrest persons reasonably believed to be connected with certain offences, the commission of which threatened public safety and to confine them in such places and under such conditions as were prescribed. Further, dangerous characters already under control or in confinement could be continuously detained under the Act".

প্রণ্যাজন ছিলেন। সুরেন্দ্রমোহন ছিলেন তাঁর চার ছেলের মধ্যে বড়। অন্য তিনজনের নাম যথাক্রমে যোগেন্দ্রমোহন, অজিতমোহন ও বিকুপদ। এই তিন ভাইয়েরই সাহচর্যে সুরেন্দ্রমোহন ১৯২০ সালে তাঁদের কলকাতার বাসাবাড়িতেই 'বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস'-এর স্থাপনা করলেন।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের প্রাথমিক কার্যসূচীর অন্তর্গত ছিল কেমিক্যাল-প্রুফিং প্রণালীতে জিনিস তৈরি করা। রাবারের ব্যবহার তখনো তাঁরা আরম্ভ করেননি। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে ভালো কোয়ালিটির ওয়াটারপ্রুফ ইত্যাদি কেমিক্যাল প্রুফিং প্রণালীতেই হয়ে থাকে, কিন্তু তার পড়তা ও বিক্রির দাম রাবারের তৈরি জিনিসের চেয়ে বেশ কিছুটা বেশি। সুরেনবাবু ভালো জিনিসই তৈরি করে বাজারে ছাড়লেন। তার মার্কা হলো 'ডাকব্যাক'—যে নামের আজ ভারতজোড়া খ্যাতির। বাঙালী ডাকব্যাক-কে আদর করে নিলো।

কলেজ স্ট্রীট আর হ্যারিসন রোডের মোড়ের বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের বড়ো দোকানটার কথা ভাবলেই আমার নিজের স্কুল লাইফের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বর্ষাকালে ছাতা মাথায় দিয়ে স্কুলে যাওয়া আসা একটা উৎপাতের মতো মনে হতো। তখন সতৃষ্ণ নয়নে বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের দোকানে ঝোলানো বর্ষাতির দিকে চেয়ে চেয়ে পথ চলতাম। আহা, ওইরকম একটা রেইনকোট যদি আমার হতো, আর সঙ্গে একটা রেলওয়ে গার্ডের টুপির মতো টুপি। কলেজে উঠে দেখলাম চৌরঙ্গীতেও ডাকব্যাকের একটা দোকান আছে হরেকরকম জিনিসে ভরা—টিপল, হটওয়াটার আর আইসব্যাগ, গামবুট প্রভৃতি কত কি। তখন আবার রেইনকোটকে চালের মাথায় বলতে শিখেছি 'ম্যাকিনটশ'। (১৮২৩ সালে স্কটল্যাণ্ডের চার্লস ম্যাকিনটশ ওয়াটারপ্রুফ কোটের উদ্ভাবনা করেছিলেন বলে তাঁর নামেই এই নাম)। কলকাতার রাস্তায় জল জমলেই বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতাম যে ডাকব্যাক-এর একটা গাম-বুট থাকলে বেশ হতো।

চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে উৎপাদনের তাল রাখার জন্যে এবং কেমিক্যাল-প্রুফিং করা দামী জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে কম দামী রাবারের রেইনকোট ইত্যাদি তৈরি করার প্ল্যান করলেন বসু ভ্রাতারা। এইবারে সুরেন্দ্রমোহন Hevea Brasiliensis অথবা Weeping Tree-র জমাট বাঁধা অশ্রু, অর্থাৎ স্বাভাবিক রাবারের ব্যবহার শুরু করলেন।

ইনচেক ও ন্যাশানাল রাবার বিষয়ক প্রবন্ধ (১৫ আষাঢ়ের 'দেশ' দ্রষ্টব্য) লেখার সময়ে আমি হিহিবয়া ব্রেজিলিয়েনসিসের কথা জানতাম না; সেটা জেনেছি তার কিছু পরে। ইতিহাস নিয়ে চিরকালই এইরকম বিভ্রমে আমরা পড়ে এসেছি। 'ইতি হ আস' অর্থাৎ 'এইরকম ছিল' বলে শুরু করে বৈদিক যুগের মুনিঋষিরা শিষ্যদের নানান গল্প শোনাতেন; তারই নাম হলো 'ইতিহাস'। এক এক মুনি একই বিষয়ে রকম রকম করে বলে আমাদের বিভ্রান্ত করে গেছেন। বেদে যা আছে পুরাণে তা অন্যরূপ নিয়েছে; দুই পুরাণে একই কাহিনী বলা হয়েছে, কিন্তু তাতেও যথেষ্ট প্রভেদ আছে। আজও ইতিহাস রচনায় অনেক ক্ষেত্রে তাই ঘটে। কে যে কখন কোন্ কথা চেপে যান কিংবা রঙ চড়িয়ে কোন্টা জুড়ে দেন তা বলা প্রায় অসম্ভব।

ভাগবত-পুরাণের মতো না হলেও রাবারের ইতিহাসে কিছু কিছু গরমিল আছে বলে মনে হয়। 'ইনচেকের' কাহিনী লেখার সময়ে দেখছি ইন্টারেস্টিং একটা ঘটনা বাদ পড়ে গেছে।

একটা বড়ো স্মাগলিং-এর গল্প, যাকে বলে আজকের যুগোপযোগী গল্প, তখন আমার জানাই ছিল না।

ইংরেজ একটা জাত বটে। একদিকে ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রীর মতো 'বৃটিশ জুরিসপ্রুডেন্স'-এর আইনে প্রজাবৃন্দকে শৃঙ্খলা পাশে বদ্ধ করেন আবার অন্যদিকে আইন ভাঙতে উৎসাহ দেন। তাও যদি কোনো যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে হতো তো এক কথা। ১৮৭০-৭৫ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অপার শান্তিময় রাজত্বকালের একটি ঘটনা এটা। লণ্ডনের 'রয়্যাল কিউ গার্ডেনস'—এর ডিরেক্টর স্যার জোসেফ হুকার খবর পেলেন যে হেনরি উইকহ্যাম নামে এক বনজ-বিশারদ দক্ষিণ অ্যামেরিকার অ্যামাজন এবং ওরিনোকো উপত্যকা পরিক্রমা করে হিহিবয়া ব্রেজিলিয়েনসিস বিষয়ে অনেক কিছু জেনে এসেছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি উইকহ্যামকে ডেকে পাঠালেন। কয়েকদিনের মধ্যেই ইণ্ডিয়া-সেক্রেটারি লর্ড সলসবেরির সনদ নিয়ে উইকহ্যাম সেই গাছের বীজ সংগ্রহের অভিযানে যাত্রা করলেন। ব্রেজিল রাজ্য থেকে রাবার গাছের বীজ বা চারা রপ্তানি আইনত নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সে হলো অন্য দেশের আইন, ইংল্যাণ্ডের তো নয়! উইকহ্যাম সব বাধা ভেঙে পাকেপ্রকারে ৭০০০০ রাবার গাছের বীজ স্মাগল করে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। ১৮৭৬ সালের ১৬ জুন তিনি সেই বীজ হুকার সাহেবের কব্জায় পৌঁছে দিয়ে ভারত সরকারের তহবিল থেকে প্রকাণ্ড পারিশ্রমিক আদায় করলেন। শুধু তাই নয়, স্মাগলিং-এ অদ্ভুত কৃতকার্যতাই বলুন বা স্বদেশের হিতকর্মের জন্যেই বলুন উইকহ্যাম সত্বর মহারাণীর কাছ থেকে 'স্যার' উপাধি, মায় নাইটহুড পেয়ে গেলেন। (সোনাচাঁদির চোরাচালানের রাজা ওয়ালকটকে মোরারজী ভাই পদ্মবিভূষণ খেতাবে বিভূষিত করুন, এই আমার প্রস্তাব। ওয়ালকট আর ভোগ—না ভোংগে—তো আমাদের অতি-প্রয়োজনীয় সোনাই এনে দিচ্ছেন)।

কিন্তু স্যার হেনরি উইকহ্যাম সত্যিই স্বদেশের পরম উপকার করলেন। 'কিউ গার্ডেনস'-এ বপন করা সেই বীজের চারা উত্তরকালে মালয়, সিংহল, ভারত ও সিঙ্গাপুরে রোপণ করে বৃটিশের বিশাল রাবার সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল।

'ডাকব্যাক' মার্কা রাবারের হাসপাতাল-সরঞ্জাম, এয়ারবেড এবং বালিশ-ও সারা ভারতবর্ষের বাজারে বাজারে ছড়িয়ে পড়লো। ভারত সরকার-ও বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের অন্যতম প্রধান গ্রাহক হয়ে দাঁড়ালেন। সেটা সম্ভব হলো কলকাতার আর এক প্রসিদ্ধ বাঙালী প্রতিষ্ঠান ইনচেক ও ন্যাশন্যাল রাবারের জননী জি ডি ব্যানার্জি অ্যান্ড কোম্পানীর কর্ণধার স্বর্গীয় রায় বাহাদুর বিনোদগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তায়। সেই প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের মাল রেলওয়ে, মিলিটারি প্রভৃতি সরকারী সব বিভাগেই চালু করে দিলো। জি ডি ব্যানার্জির বর্তমান কর্ণধার শ্রীমোহনকুমার মুখোপাধ্যায় এখন বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের অন্যতম ডিরেক্টর এবং বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের বর্তমান মূলধনের (শেয়ার ক্যাপিটালের) অনেকটাই যুগিয়েছেন এই মুখোপাধ্যায় মহাশয়রা।

১৯৩১ সালে বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কসকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করা হলো। এই বছরেই স্থান সংকুলানের জন্যে কারখানাটিকে কলকাতার ১২ মাইল দূরে পানিহাটির বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর কাছে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। ফ্যাক্টরীর আয়তনও অনেক বেড়ে গেল।

১৯৪০ সালে মূলধন আরও বাড়িয়ে কোম্পানীকে পুরোপুরি পাবলিক লিমিটেড করা হলো। মধ্য ভারতে ডাকব্যাক মার্কা মালের দ্রুত সরবরাহের জন্যে (এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ব্যবস্থা) ১৯৪২-এ নাগপুরে এই প্রতিষ্ঠানেরই আর একটি ইউনিট বসানো হলো। প্রয়োজন ফুরোবার পরে অবশ্য সেখানকার সাজ-সরঞ্জাম তুলে এনে সেই নাগপুর ইউনিট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কর্ণধার সুরেন্দ্র-মোহনের বড়ো ছেলে দেবব্রত তখন দশ এগারো বছর বয়সের ছেলে। পারিবারিক শিক্ষা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পা ফেলে তিনি ধীরে ধীরে এগোচ্ছেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিবেশটি গড়ে উঠেছিল একদিকে মোহিনীমোহন ও সুরেন্দ্রমোহনের জন্যে, অন্যদিকে দেবব্রতর মাতৃকুলের ঐতিহ্যে। সুরেন্দ্রমোহন বিবাহ করেছিলেন ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত ডাঃ ডি এন রায়ের কন্যা মালতী দেবীকে। সেই সম্পর্কে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন তাঁর আপন মেসোশ্বশুর এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছিলেন একটু দূর-সম্পর্কীয় মামাশ্বশুর—সুরেন্দ্রমোহনের শাশুড়ি শৈলবালা দেবীর আপন জেঠতুতো ভাই। নিজের বংশধারা আর এই কুটুম্বিতায় সুরেন্দ্রমোহনের পরিবার সেদিনের কলকাতার খাঁটি 'কালচার্ড' সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিবার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু আজকাল যেমন 'কালচার্ড' মা-বাবা হতে গেলে ইংরেজী বা মিশনারী 'স্কুলে আর সেন্ট জেভিয়ার্স' বা প্রেসিডেন্সী

কলেজে ছেলেমেয়েকে পড়াতে হয় অগ্নিযুগের আদর্শবাদী সুরেন্দ্রমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী সে রকম ছিল না। তিনি তাঁর বড়ো ছেলে দেবব্রতকে ভর্তি করলেন আর এক আদর্শপরায়ণ শিক্ষাব্রতীর স্কুল 'বয়েজ ওন হোম'-এ। সেই বিদ্যালয়ে ছেলেরা বিদেশীর অনুকরণ না শিখে নিজের দেশের, নিজের জাতির গুণগ্রাহী হওয়ার শিক্ষা পেতো। দেবব্রত কিছুদিন সেই স্কুলে পড়বার পর সুরেন্দ্রমোহন ছেলেকে ভর্তি করলেন দার্জিলিং-এর 'নর্থ পয়েন্ট' স্কুলে। দেশী ও বিদেশী দুই ধারার সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে দেবব্রত সাদা চশমা পরেই বিদেশী শিক্ষাপ্রণালীর ভালোটুকু নিতে পারলেন, অন্ধ অনুকরণ এড়িয়ে। তাছাড়া বড়োলোকের ছেলে বলে মনে যাতে দম্ভ বা বিলাসিতা স্থান না পায় সেইজন্যে সুরেনবাবু প্রথম থেকেই দেবব্রতকে তৈরি করছিলেন। বয়েজ ওন হোম-এ পড়বার সময়ে দেবব্রতর পকেট-মানি ছিল দৈনিক দু আনা, মানে বারো নয়া পয়সা।

বাপ-মায়েরা ছেলেমেয়ের কচি মনকে যে পথে পরিচালিত করেন সাধারণত তারা বড়ো হয়ে সেই দিকটাই বেছে নেয়। দেশ-প্রেমিক সুরেন্দ্রমোহন শুধু যে ছেলের মনে জাতীয়তাবোধটাই জাগিয়ে তুললেন তাই নয়, বিজ্ঞানী সুরেন্দ্রমোহনের প্রভাবে সেই বাল্যকাল থেকেই দেবব্রতর মনে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পিপাসা জন্মালো। সহপাঠীদের মতো খেলাধুলো আমোদ-প্রমোদ তিনি ভালোবাসতেন বটে, কিন্তু তার চেয়েও তাঁর কাছে অধিকতর প্রিয় হয়ে উঠলো তাড়িৎ-বিজ্ঞানের নেশা। মাইকেল ফ্যারাডে কেমন করে ডায়নামো আবিষ্কার করলেন, এডিসন কি করে ফনোগ্রাফ তৈরি করলেন আর অ্যালকজান্ডার গ্রেহাম বেল টেলিফোনের উদ্ভব করলেন সেইসব জিজ্ঞাসাই দেবব্রতর কাছে গানবাজনা খেলাধুলোর চাইতে প্রবল হয়ে উঠলো।

কেবল বৈদ্যুতিক ব্যাপারেই নয়, দেবব্রত একটু উঁচু ক্লাসে ওঠার পর থেকেই বাবার নির্দেশে গ্রীষ্মের লম্বা ছুটিতে কলকাতায় এসে তাঁকে বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের ফ্যাক্টরীতে রীতিমতো শিক্ষানবিসী করতে হতো।

সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাস করার পর কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হয়ে দেবব্রত কেবল কলেজের পড়া নিয়েই খুশি রইলেন না; তড়িৎ বিজ্ঞানের নেশাটা তাঁর তখন বেশ দানা বেঁধেছে। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে 'ইলেকট্রনিকসের' আবির্ভাব ভালো করেই হয়েছে। কলেজের ছুটির পর তিনি তখন প্রতিদিন তাঁর নিকট আত্মীয়, বেনারেস হিন্দু ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন অধ্যাপক এবং 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'-এর অধ্যাপক স্বর্গীয় নগেন্দ্রচন্দ্র নাগের কাছে যাতায়াত করতে শুরু করলেন। প্রফেসর নাগের সব বিজ্ঞানেই পাণ্ডিত্য ছিল; ফিজিক্স কেমিস্ট্রি সব কিছুতেই তিনি চৌকস ছিলেন। কিন্তু তাঁর চোখ দুটি খারাপ হয়ে আসছিল, নিজে দেখে দেখে ল্যাবোরেটারির কাজ করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না। দেবব্রত হয়ে দাঁড়ালেন তাঁর চোখ, তাঁর ডান হাত। তাঁর বাড়িতে সম্পূর্ণ একটি ল্যাবোরেটরি ছিল। সেখানে বসে তিনি দেবব্রতকে নির্দেশ দিতেন আর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেবব্রত তাঁকে ফলাফল জানাতেন। সেই গবেষণার ভিত্তিতেই অধ্যাপক নাগ তাঁর বিখ্যাত থিসীস এবং রিসার্চ-পেপারস (গবেষণামূলক নিবন্ধ) তৈরি করতেন। লেখার কাজটাও শিষ্যকে দিয়েই করাতেন।

তার ফলেই আজ এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, মস্ত বড়ো একটা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সর্বেসর্বা হয়ে সারাদিনের ধকল সামলাবার পরেও সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে তাঁর নিজের ল্যাবোরেটারিতে বসে দেবব্রত ইলেকট্রনিকস নিয়েই মেতে থাকেন, আর সেইজন্যেই আজ উনচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত ক্ষণপ্রভার প্রেমে মশগুল দেবব্রতর বিয়ে করে সংসারী হওয়াটাই ঘটে উঠলো না।

উচ্চতর শিক্ষার জন্যে দেবব্রতর ইচ্ছে ছিল অ্যামেরিকা যান, কিন্তু সুরেন্দ্রমোহন সেটা নামঞ্জুর করে ছেলেকে পাঠালেন ইংল্যান্ডের 'নর্দার্ন পলিটেকনিক'-এ। এটা হলো ১৯৪৮-এর কথা।

দেবব্রত সবে সেখানে পড়াশোনায় মন দিয়েছেন এমন সময়ে দেশ থেকে নিদারুণ এক দুঃসংবাদ এলো। সেই বছরের ১১ অক্টোবর সুরেন্দ্রমোহন দেহত্যাগ করলেন। মায়ের আদেশে শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখেই দেবব্রত কলকাতায় ফিরে এলেন।

তারপরে একে একে কাকারাও গেলেন—অজিতমোহন গেলেন ১৯৬০-এ, বিষ্ণুপদ একবছরের মধ্যে সে তুলনায় ...

অজিতমোহন গেলেন ১৯৬০-এ, বিষ্ণুপদ একষট্টিতে আর যোগেন্দ্রমোহন চৌষট্টি সালে। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের গুরুদায়িত্ব এসে পড়লো ৩৫ বছর বয়স্ক দেবব্রতর ওপর। সেটা কিন্তু এমন সময়ে এসে পড়লো যখন একটানা দশ বছর ধরে বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের লোকসানের পর লোকসান হয়ে মোটা রিজার্ভ ফান্ডের সবটাই ধুয়ে মুছে গেছে। তারপরে মোড় ফিরে মন্থর অগ্রগতিতে ১৯৬১ পর্যন্ত না-লোকসান না-লাভ এই পরিস্থিতিতে কাজ চললো। উল্লেখযোগ্য লাভ আবার হতে আরম্ভ হলো ১৯৬২ থেকে। এই বিষয়ে দেবব্রত-বাবুর যোগানো তথ্যের কিছুটা আমি লিপিবদ্ধ করছি। বিক্রির অংকগুলি আমি নিয়েছি ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠান যখন 'বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিমিটেড'-এ পরিণত হলো তারপর থেকে, আর কোম্পানীর বর্তমান আর্থিক অবস্থা মোটামুটি বোঝাবার জন্য কয়েকটি অংক নিয়েছি ১৯৪৬ এবং ১৯৪৭র ব্যালেন্স-শীট থেকে।

বিক্রির অংক

১৯৪১	—	৪০,৪২,০০০, টাকা
১৯৬০	—	৬০,০৫,০০০, টাকা
১৯৬৫	—	১,০৫,২১,০০০, টাকা
১৯৬৭	—	১,১৮,৬০,০০০, টাকা

ব্যালেন্স-শীটের ছবি

সাল	পেড-আপ্ ক্যাপিটাল	রিজার্ভ ও উদ্বৃত্ত	নীট লাভ
১৯৬৪	১৪,০০,০০০,	১৪,৭০,০০০,	৫,৫৪,০০০,
১৯৬৭	ঐ	২০,০০,০০০,	৭,০৫,০০০,

উল্লেখ্য বিষয় এই হলো যে, অর্ডিনারি শেয়ারের ওপর ৮।১০ পারসেন্ট ডিভিডেন্ড দিয়ে এঁরা রিজার্ভ ফান্ড বাড়াবার দিকেই নজরটা বেশী রেখেছেন। এইভাবে সোনার ডিম-পাড়া হাঁসটিকে জিইয়ে রাখাটাই কৃতী শিল্পপতিত্বের লক্ষণ। অদূরদর্শীদের হাতে পড়ে এই রকম কাঠামোর কোম্পানীর ডিভিডেন্ড অনেক বেশী দেওয়া হতো। এই বছরেই বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ শ্রমিক আন্দোলনের জন্য পাঁচমাস বন্ধ থেকে নতুন করে যে কত লক্ষ টাকা লোকসান হলো তা কে বলতে পারে: তা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত রিজার্ভ ফান্ড এঁদের রক্ষাকবচ।

কেউ বলতে পারে না যে, কখন কীভাবে কোন্ প্রতিষ্ঠানের বিপদ ঘটতে পারে। আজকাল শ্রমিক মালিক বিরোধের মহামারী তো লেগেই আছে, মন্দা বাজারের ব্যাধিও কঠিন রূপ নিয়েছে, উপরন্তু সেদিন যে ধস আর প্লাবনে উত্তরবঙ্গে এক খণ্ড-প্রলয় হয়ে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারালো আর শত শত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সমূহ ক্ষতি হয়ে গেল সে রকম আকস্মিক বিপদের জন্যেও প্রাজ্ঞ শিল্পপতির হুঁশিয়ার থাকা কর্তব্য। যতদূর মনে পড়ে বেশ কয়েক বছর আগে আসামের একটি প্রকাণ্ড saw mill (করাত-কল) ব্রহ্মপুত্রের প্রবল বন্যায় এইভাবে প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শুনে-

ছিলাম যে, সেই পুরনো লিমিটেড কোম্পানীর ইংরেজ ম্যানেজিং এজেন্সী বহুকাল ধরে এত বড়ো রিজার্ভ ফান্ড জমিয়ে রেখেছিলেন যে কারখানাটা প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও অংশীদাররা ক্ষতিগ্রস্ত হননি। অথবা তাঁদের ক্ষতি হলেও তা সামান্যই হয়েছিল।

মানুষের সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সব কিছুর বিরুদ্ধেই লড়বার ক্ষমতা রাখতে গেলে বাংলা দেশের বিজ্ঞ শিল্প-পরিচালকদের এখন আরও সাবধান হতে হবে। কাগজে পড়লাম যে ভবিষ্যতে প্লাবনের প্রকোপ থেকে বাঁচতে হলে জলপাইগুড়ি শহরটিকেই নাকি স্থানান্তরিত করতে হবে। CMPO-র লবণ হ্রদ পরিকল্পনা এবং খানিকটা ভারত সরকারের তিনটি পাঁচসালা সেচ-পরিকল্পনার কল্যাণে আমাদের সাধের কলকাতা আর বাংলা দেশের কয়েকগাছি বড়ো বড়ো শহরকেও না শেষে বন্যার ভয়ে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়!

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের ভালো ব্যালেন্স শীটের জন্যে শ্রীদেবব্রত বসু ছাড়াও বাকী তিনজন ডিরেক্টর প্রশংসার যোগ্য। তাঁরা হলেন জি ডি ব্যানার্জি কোম্পানীর কর্ণধার শ্রীমোহনকুমার মুখোপাধ্যায়, সেন-র‍্যালে ও ন্যাশান্যাল ট্যানারির শ্রীসঞ্জয় সেন এবং গত সংখ্যার 'দেশ'-এ যাঁর পরিচয় দিয়েছি STM-এর সেই শ্রীঅমিতাভ পাল-চৌধুরী।

সঙ্গে আছেন সুরেন্দ্রমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্রয় শ্রীঅসীম, শ্রীঅজয় ও শ্রীমোহিত বসু, আর আছেন অভিজ্ঞ সেক্রেটারি শ্রী এস কে দাস প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মচারী যাদের সহায়তা ব্যতিরেকে ডিরেক্টরবৃন্দ বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের সুষ্ঠু পরিচালনায় সফল হতে পারতেন না।

ব্যক্তিগতভাবে আমি দুজন কর্মচারীর কাছেও কৃতজ্ঞ—শ্রীপূর্ণানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীজয়রামন; প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে বিবিধ তথ্য সংগ্রহে এঁরা আমাকে খুব সাহায্য করেছেন। তার মধ্যে একটা হলো শ্রীদেবব্রত বসুর নানা বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান এবং জন-কল্যাণমূলক সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার বিবরণ। । তিনি 'ইণ্ডিয়ান রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রাক্তন সভাপতি, গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল ও কলেজের পরিচালক সমিতির সভ্য, সেন অ্যান্ড পণ্ডিত ইন্ডাস্ট্রিজ প্রভৃতি একাধিক কোম্পানীর ডিরেক্টর এবং কলকাতা রোটারি ক্লাবের একজন বিশিষ্ট সভ্য।

আপাতত এই পর্যন্তই থাক। এই সব প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে বলার অনেক কিছু বাকী থেকে যায় এবং এঁদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে নতুন বক্তব্যও গড়ে ওঠে দিনে দিনে। তবু আমি মনে শান্তি পেলাম এই জন্যে যে, অকথিত একটি রমণীয় কাহিনী—সুরেন্দ্রমোহন বসুর কীর্তিকাহিনী এতদিনে আমি বলতে পারলাম।

বিশ্বকর্মা

(তেত্রিশ)

কবিতা যে মায়ের সখী বকুলফুলের নবদ্বীপের বাসায় যেতে রাজী হয়েছিল—সে এই একঘেয়ে দিনযাপনের গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার আশায়। প্রতিদিন ট্রেনে করে বিনা টিকিটে রাণাঘাট কলকাতায় যাতায়াত করা, বিরামহীন ছাপাখানা মেশিনের জন্যে অক্ষর জুগিয়ে যাওয়া, নয়ত বসে বসে শুধু ফর্মা ভাঁজাই করা, ক্রমশ তার জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে। এত খেটেও তো দু বেলা পেট ভরে খাওয়া যায় না, বাড়ির কারুর জন্যেই কিছু করা যায় না। ছোট বেলায় স্বপ্ন দেখত, নিজে রোজগার করে বাড়ির লোককে খাওয়াবে, রোজগেরে ছেলের অভাব পূরণ করবে, এখন বুঝতে পেরেছে ওসব অলীক চিন্তায় কোন লাভ নেই। অভাবের মধ্যেই মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকতে হবে। নিজে স্বার্থপর হতে পারলে হয়ত এ থেকে মুক্তির পথ ছিল, মিতার পথ অনুসরণ করলে। কোনো বাবুর রক্ষিতা হয়ে থাকলে মোটামুটি জীবনটা সুখে কাটত, অবশ্য মিতারও ভবিষ্যৎ কি আন্দাজ করা খুব কঠিন। কোন দিক থেকেই আলো দেখতে না পেয়ে কবিতা ভেবেছিল নবদ্বীপে গেলে হয়ত কিছুটা শান্তি পাবে। সেই আশা নিয়ে একদিন মায়ের সঙ্গে এসে নামল নবদ্বীপে।

তীর্থক্ষেত্র নবদ্বীপ। প্রেমধাম। স্টেশনের নাম নবদ্বীপ ধাম। ব্রাহ্মণ-প্রধান যুগে যখন জাতিভেদের বাঁধনে ক্ষত্রিয়-শূদ্রেরা অন্ত্যজের মত ব্যবহার পেতে লাগলেন, বেদ মন্ত্র কেবলমাত্র টিকি পৈতাধারীদের সর্বস্বরূপে পরিগণিত হল—তখন উদ্ভব ঘটল তান্ত্রিক দলের। তাদের সাধনা পঞ্চ মকারে; মৎস্য, মদ্য, মুদ্রা ও মৈথুনের বিচিত্র আচরণে তাদের হ্লাদিনী রূপের প্রকাশ। বাংলার বুকে সতীদাহের সঙ্গে শুরু হল শব সাধনার বীভৎস ধর্মাচরণ।

এহেন সময় এক নবধর্মের স্রোতে স্বস্তি পেলো আচণ্ডালদ্বিজ শান্তিকামী জাতি—নব উদ্ভাবিত বৈষ্ণব ধর্মে, যে ধর্মে ভেদাভেদ নেই, দ্বেষ-হিংসা নেই, যার মন্ত্র প্রেম, যার ভক্তি প্রেম, যার ক্ষমা প্রেমে।

জয়দেব গীতি, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির পদাবলী গীত হতে থাকলো ঘরে ঘরে। পল্লীর নিভৃত শান্তিছায়ে 'কৃষ্ণ ধামালী'র গানে আম-কাঁঠালের পত্র-পল্লব শিহরিত হলো, আর নবদ্বীপে বেজে উঠল প্রেমের মৃদঙ্গ—শ্রীচৈতন্যের জন্মলগ্নে। পিতা জগন্নাথ মিশ্রের নিবাস ছিলো শ্রীহট্টে, তাঁদের পূর্বপুরুষেরা ওড়িষ্যার জাজপুরের অধিবাসী—শেষে এই নবদ্বীপের কোলে এসে 'নিমাই' জেলা ও দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে হয়ে রইলেন সর্বজনীন প্রেমমূর্তির জীবন্ত বিগ্রহ। তাই নবদ্বীপ নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই একীভূত হয়ে যান প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ—যিনি করেছিলেন পাষণ্ড দলন—বিধর্মী হুসেন শাহকেও করেছিলেন মুগ্ধ, মুচি রুইদাসও পেয়েছিলেন তাঁর প্রেমের স্পর্শ।

কবিতাদের স্টেশন থেকে নিতে এসেছিল গোপাল। হাসিমুখে তাদের অভ্যর্থনা জানাল, ভক্তিভরে কবিতার মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাল, নমস্কার বিনিময় করল কবিতার সঙ্গে। মিহি গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনাদের সব কুশল তো?

কবিতার মা বললেন, হ্যাঁ বাবা, আমার সই বকুলফুল ভাল আছে তো?

—শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় আমাদের সব মঙ্গল, চলুন বাসায় যাওয়া যাক।

যে কোনও নতুন জায়গায় গেলে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া বদলের জন্য প্রথমটা সকলেরই ভাল লাগে। কবিতারও তাই মনে হল, মনে হল রাণাঘাটের চেয়ে নবদ্বীপ অনেক ভাল জায়গা; মনে হল, শহর কলকাতার কৃত্রিমতা এখানে নেই, মনে হল এখানকার মানুষ অনেক সহজ, অনেক সরল।

কিন্তু এ মনে হওয়া বেশিদিন টিঁকলো না। প্রথম প্রথম দুই বকুলফুলে সই-এর গল্প শুনতে তার খুব ভাল লাগত, নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত ফেলে আসা দিনের সেই কল্পরাজ্যে—সহজ গ্রাম্য জীবন, বৃষ্টি ঝড়ের দিনে আম কুড়োবার ধুম, গ্রীষ্মের বৈকালী রৌদ্রে ঝলমল টোপাকুলের বন, শীতে বংশী নদীর পাড়ে বসে ছেলেদের মাছ ধরা, আরও কতরকম ছবি—মায়েদের কত সুখস্মৃতি। কিন্তু ক'দিন পরেই কবিতার মনে হল, ওই 'ছিলেন বাবুর দেশে' বাস করার স্বার্থকতা কি। সবই তো 'ছিল', কিন্তু এখন তো কিছু নেই। যা ছিল তার জন্যে হা হুতাশ করে যেমন কোন লাভ হয় না, তেমনি ছিলর রাজ্যে উটপাখির মত মুখ লুকিয়ে পড়ে থাকলেই বা চলবে কেন। নেইটা সত্য, কারণ তা বর্তমান। ছিলটা মিথ্যে না হলেও তার কোন সার্থকতা নেই, কারণ তা অতীত।

মায়েদের গল্পের কথা ভুলে কবিতা দেখতে লাগল নবদ্বীপের চলমান জীবন—এখানে, ওখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কৃষ্ণ রাধার মন্দির—আখড়া। প্রতি সন্ধ্যায় এই আখড়াগুলিতে বুড়োবুড়ি, নেড়ানেড়ি, যুবা-শিশুর সমারোহ। বহু দূরাগত প্রবাসী, শ্রান্ত ভক্ত সকাল-বিকালে আশ্রয় নেয়, বিশ্রাম করে এই সব আখড়ার স্নিগ্ধ সুশীতল মেঝের ওপর। তুলসীর বায়ে কখন অজান্তে ঘুম নেমে আসে নিদ্রাতুর চোখে, তারপর বিকেল চারটের পর শুরু হয়ে যায় মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহ দর্শনের ভীড়, শহরের দ্রষ্টব্য স্থল পরিক্রমা, মায়াপুরী যাত্রা।

কবিতাও এদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে, হৃদয়ে ভক্তি আনার চেষ্টা করেছে, আশা করেছে তার হৃদয়ের তন্ত্রীতে কীর্তনের সুর বাজবে, কিন্তু কেন জানা নেই সেই সহজিয়া সুর বাজেনি।

গোপাল জিজ্ঞেস করেছে, এ জায়গা তোমার কেমন লাগছে?

কবিতা ঘুরিয়ে উত্তর দিয়েছে, অন্য রকম।

—ভাল না মন্দ?

—জানি না।

এ উত্তর খাঁটি শহরের মেয়ের। প্রশ্নের বেড়াজালে নিজেকে ধরা দিতে অনিচ্ছুক।

গোপাল চেষ্টা করেছে কবিতাকে নিয়ে কোন অছিলায় বেড়াতে যাবার, কিন্তু মেয়েটির দিক থেকে খুব বেশি সাড়া পায় নি। বরং কবিতার কথাবার্তা শুনে বিস্মিত হয়েছে।

কবিতার গম্ভীর প্রশ্ন, গোপালদা, এর পর আপনি কি করবেন?

গোপালের সহজ উত্তর, নাম কীর্তন করাই আমার কাজ, আর নতুন কি করব?

—এভাবে চলবে কি করে?

—গৌরাঙ্গের কৃপায় ঠিকই চলে যাবে।

—আজকালকার দিনে এ বিশ্বাস রাখা কি সম্ভব?

গোপাল অসহায় বোধ করে, আমি এর কি জবাব দেব, কিন্তু চলে তো যাচ্ছে। সংসারে তো শুধু আমি আর আমার মা।

—তারপর সংসার যখন বাড়বে?

গোপাল নির্বোধের মত প্রশ্ন করে, কেন?

কবিতা না হেসে পারে না, লোকটা অসম্ভব বোকা। শরীরটাই শুধু বেড়েছে, সে অনুপাতে একটুকু বুদ্ধি বাড়ে নি। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল, কেমন যেন মেয়েলী ভাব। পুরুষমানুষ বলে বিশ্বাস হতে চায় না।

কবিতার মা বোধ হয় মেয়ের মতিগতি দেখে শঙ্কিত হয়েছিল তাই রাত্রে শোবার সময় চুপিচুপি এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে, গোপালকে তোর ভাল লাগে নি? বেশ তো বিনয়ী, ভদ্র—

কবিতার শুকনো উত্তর, হাঁ ভালই তো।

—তবে?

—তবে কি?

—যে জন্যে এসেছি তা তো জানিস, মানে গোপালের সঙ্গে তোর—

কবিতা এড়িয়ে গেল, খুব ঘুম পেয়েছে মা, এখন আমি শুয়ে পড়ছি।

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তোদের কিছুই আমি বুঝতে পারি না।

কবিতার সঙ্গে কথায় এঁটে উঠতে না পেরে গোপাল তার এক বন্ধুকে ধরে এনেছিল। বলেছিল, এর নাম মাধব সখা, এ তোমার কথার ঠিক জবাব দিতে পারবে কবিতা।

এ ছেলেটিকে কবিতা গোপালদের আখড়ায় আগেই দেখেছে, বেশ ভাল গান করে। ময়লা রং, কিন্তু চোখ দুটো টানা টানা, চুল ছোট করে ছাঁটা। গোপালের মত মেয়েলী ধাঁচের নয় মোটেই, কথায়বার্তায় পটু, দেখলেই বোঝা যায় চালাক এবং চতুর।

কবিতার প্রশ্নের জবাবে সে বলল, টাকা রোজগার করাই যদি বড় কথা হয়, তাহলে এখানেও তার যথেষ্ট সুযোগ আছে ঠাকরুন।

কবিতা বলল, আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

—বেশ তো, আমার সঙ্গে অন্য আখড়ায় চলুন, দেখিয়ে দেব কেমন করে লোকে রোজগার করছে। বলুন, যাবেন আমার সঙ্গে?

—নিশ্চয় যাব।

মাধব সখা জিজ্ঞেস করে, গোপাল তোর কোন আপত্তি নেই তো?

গোপালের মেয়েলী কণ্ঠস্বর. গৌর-এর যা ইচ্ছে, আমি তাতে বাধ সাধব কেন?

সেই সন্ধ্যায় কবিতা বার হল মাধব সখার সঙ্গে।

সুখের বিষয় এই নবদ্বীপে, ভারতের অন্যান্য তীর্থ স্থানের মত পান্ডা মহাপ্রভুদের দাপট অনেক কম, নেই বললেই চলে। বোধ হয় কারণটা বৈষ্ণব পীঠস্থানের মাহাত্ম্যের জন্যে—বিনয় বিগলিত, সৌজন্যে সুভাষিত এহেন পান্ডাদের কয়েকজন আবার খুবেই জনপ্রিয়।—তাদের নামডাকে শহরের আখড়াগুলিও মুখরিত। পান্ডাদের বদলে এখানে গাইড পাওয়া যায়, বৃদ্ধ, যুবক, নানা বয়েসের। হয়ত ইলেকট্রিকের দোকানে একটা প্যাকিং বাক্সের উপর কোন বৃদ্ধ বসে, কিন্তু যেই ট্যাক্সী বা সাইকেল রিকশা চড়ে কোন যাত্রীকে আসতে দেখে, অমনি কোঁচান ধুতিটা এক হাতে ধরে এগিয়ে যাবে তাদের দিকে—জোড়ে দেখলে মোলায়েম স্বরে আমন্ত্রণ জানাবে, জামাই নেমে এস, তোমাদের দেখিয়ে দেব সোনার গৌরাঙ্গ, মহাপ্রভুর খড়ম আর মায়াপুরী। সম্বোধন শুনে যাত্রীদম্পতি বিস্মিত হবে, কিন্তু বৃদ্ধ ততক্ষণে পাতানো মেয়ে-জামাইকে গাড়ি থেকে নামিয়ে ফেলেছে, তাদের নিয়ে ঘুরবে বিভিন্ন আখড়ায়। তীর্থ পরিক্রমা সেরে দু' এক টাকা যা পাবে তাতেই খুশী।

বেশী পয়সা এরা পায় না, কারণ অনেক আখড়াতেই তীর্থযাত্রীদের ভেট দিতে হয়। গৌরাঙ্গের রুপোর খড়ম দেখতে গেলে শুধু যে তার ইতিহাস শুনতে হবে তাই নয়, সেই এক নিঃশ্বাসে আখড়াবাসী চেয়ে বসবে ভেটের পয়সা। এক দিনে কবিতা সব কিছুই লক্ষ করেছে, বাকি ছিল বোধ হয় কোন যুবক গাইডের সঙ্গে অভিযান। সে অভিজ্ঞতাও হয়ে গেল মাধব সখার সঙ্গে বেরিয়ে।

মাধব সখা প্রথমে যে দুটো একটা আখড়ায় গেল কবিতা সেখানে নতুনত্বের কোন সন্ধান পেল না। একই রকম পরিবেশ, একই রকম কীর্তন। কোথাও নাম গান—বহু কণ্ঠে গাইছে, 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে'।

কিংবা

'ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ
গৌরাঙ্গের নাম রে,
যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে সে যে
আমার প্রাণ রে।'

কবিতা জিজ্ঞেস না করে পারল না, আমাকে কি দেখাতে এনেছিলেন মাধব সখা?

ছেলেটি উত্তর দিল, দেখাতে ঠিকই পারি, তবে সংশয় জাগছে যদি আপনি ভয় পান।

—কিসের ভয়? আমি তো কলকাতার মেয়ে—

মাধব সখা হাসে, সেই ভরসাতেই তো আপনাকে নিয়ে এসেছি। আসুন আমার সঙ্গে।

মাধব সখা কবিতাকে নিয়ে গেল আখড়ার পেছনে নির্জন ঘরে। মেঝের ওপর একটা মাদুর পাতা রয়েছে, তার ওপর একটা বালিশ। হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে, ঘরের কোণায় রাখা জলের কুঁজো আর গেলাস।

কবিতার প্রশ্ন, এখানে কেন?

—আপনি বসুন, আমি এখুনি আসছি।

কবিতার অদ্ভুত লাগল। ফাঁকা ঘরে বসে কীর্তনের সুর সে শুনতে পাচ্ছে, আখড়ার গান, মানুষের কলরব। অথচ এ ঘরটি অতি নির্জন। অল্প আলোয় ভালো করে সব দিক দেখা যায় না।

একটু পরে মাধব সখা ফিরে এল, কিন্তু একা নয়, সঙ্গে একটি মোটাসোটা দোহারা চেহারার মানুষ। সরু তরোয়ালের মত গোঁফ, মাথার ওপরে টাক পড়েছে। লোকটা বলতে বলতে ঢুকল, আর নাকে দড়ি দিয়ে কত ঘোরাবে মাধব সখা, কেত্তন শুনে শুনে ভক্তিভাব জেগে উঠছিল আর কি, কোন রকমে চেপে রেখেছি। কোথায়, তোমার বিদ্যেধরীকে একবার দেখি।

কবিতা মাদুরে বসেছিল, চট করে উঠে দাঁড়াল। ওর বুঝতে বাকি রইল না, যে-মানুষটা মাধব সখার সঙ্গে আসছে তার

উদ্দেশ্য, খুব সাধু নয়। লোকটা মাতাল। লোকটি বলল, আহা, আমাকে দেখে উঠলে কেন, বোস। তোমার খবর পেয়ে আমি নৌকা ভাড়া করে ওপার থেকে আসছি। যদিও স্ফূর্তি করতে প্রায়ই আমি এ অঞ্চলে আসি। কিন্তু আজকাল আর কোন মজা পাই না। আখড়া মারফত যারা আসে তারা সব পিঁজরাপোল ফেরত।

কথা শুনে কবিতার মনে পড়ে গেল হলধরবাবুর কথা, এ মানুষগুলোর এক জাত, একই ধরনের কথাবার্তা, একই চাহিদা, একই রকম উচ্ছ্বাস। না বলে পারল না, জন্তু, জন্তু।

লোকটার হেঁচকি উঠল, ও মাধব সখা, এ কাকে ধরে এনেছ, কি সব বলছে?

কবিতার তীক্ষ্ণ স্বর, কেন, কানের মাথা খেয়েছ, শুনতে পাচ্ছ না? বলছি তুমি একটা জানোয়ার, আর তোমার ওই দালালটা ইতর।

—তা হলে তুমি কে?

—তোমাদের যম।

লোকটার নেশা ছুটে যাবার জোগাড়, মাধব সখা চল, কেটে পড়ি। এ বড় বেয়াড়া ঘোড়া।

কবিতার চটপটে উত্তর, পিঁজরাপোলের নয়, রেসের মাঠের।

অপমানটা বোধ হয় মাধব সখারও গায়ে লাগে, বলে, নাচতে নেমে আবার ঘোমটা কেন, তুমি তো টাকা রোজগার করতেই চেয়েছিলে।

—এ রোজগারের জন্যে নবদ্বীপে আসার দরকার নেই।

মাধব সখা একটা চোখ ছোট করে বলে, তোমার বুদ্ধি ছিল, এ জায়গায় লেগে থাকলে কিন্তু অনেক পয়সা বানাতে পারতে, ঐ বুদ্ধু গোপালটাকে স্বামী সাজিয়ে সামনে রেখে দিব্যি কারবার চালাতে। বদনামও হত না, টাকাও পেতে।

—থাক, তের হয়েছে, দরজা ছাড়ুন, আমি এখন বাড়ি যাব।

কবিতা ভেবেছিল হয়ত মানুষ দুটো গায়ের জোর ফলাতে পারে, কিন্তু সে অভদ্রতাটুকু করতে বোধ হয় সাহস পেল না। বাইরে বেরিয়ে এসে মিতার বাসার সেই কালরাত্রির কথা মনে পড়ল, হলধরবাবুকে কি মারাত্মক ভয় পেয়েছিল, অথচ আজ এ লোক দুটো তাকেই ভয় পেল। ঠিক যে চাকা ঘুরেছে তা নয়, এই হল অভিজ্ঞতার দাম। জীবন দিয়ে কবিতা বুঝেছে নিজে নষ্ট হতে না চাইলে কেউ কাউকে খারাপ করে দিতে পারে না। আরও বুঝেছে, গোপাল নির্বোধ হলেও সে সৎ, তার বিশ্বাসের মধ্যে কোন ভেজাল নেই। সে ভক্ত, সে মনে করে ভক্তের ভগবান। তার সঙ্গে কবিতার কোন জায়গায় মিল নেই, মিল হতেও পারে না। গোপালের মত লোকও যেমন এখানে আছে, তেমনি আছে ঐ মাধব সখারা, যারা ধর্মের ভেক নিয়ে মেয়েমানুষের দালালী করে। এরা চিরকালই মানুষকে ঠকায়, অন্যের বিশ্বাস ভেঙে দেয়, এরা সমাজের শত্রু, শুধু এদের বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারে না।

তাই কবিতা যখন ফিরে এল, গোপাল জিজ্ঞেস করল, মাধব সখা তোমাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল?

—নদীর ধারে একটা আখড়ায়।

—ভাল লেগেছে?

—না।

—তা হলে?

—কাল আমরা রাণাঘাটে ফিরে যাব।

—এত তাড়াতাড়ি?

—কলকাতায় যেতে হবে, অনেক দিন কাজে যাইনি। প্রেসের থেকে মাত্র দুদিনের ছুটি নিয়ে ছিলাম, জানি না চাকরিটা আছে কিনা। কাজ যখন করতে হবে ফিরে যাওয়াই উচিত। আপনি ভালো লোক, আপনার ভক্তি আছে, এ পথে নিশ্চয় শান্তি পাবেন। তবে মাধব সখার মত লোককে বন্ধু বলে প্রশ্রয় দেবেন না।

আর কিছু বলেনি কবিতা। এ থেকে গোপাল কি বুঝেছিল সেই জানে।

বিছানায় শুয়েও কবিতার চোখে ঘুম এল না। তার পাশে ঘুমচ্ছে মা—বকুলফুলের অতিথি। আতিথ্যের বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটেনি। মনে পড়ছে ট্রেনে করে কলকাতায় প্রথম কাজ করতে আসার কথা, কত হইচই, আনন্দ। গান করতে করতে মেয়েরা দল বেঁধে আসত। কিন্তু ক্রমশ সে দল ভেঙে গেল, এখন সকলেই বিচ্ছিন্ন, যে যার ধান্দায় ঘুরছে। গান বাঁধার ইচ্ছে ছিল—কিন্তু হল না। অনাদিপ্রসাদ মানুষটা ভাল, তাকে লেখবার জন্যে উৎসাহ দিয়েছিল, কিন্তু ও সবই তো পিঠ চাপড়ানি। অনাদিপ্রসাদ শেষ পর্যন্ত তার জন্যে কিবা করতে পারে? অদৃষ্ট তাকে জীবনের এই সামান্যতম অনুভবে কত কি শেখিয়েছে, জানিয়েছে—দেখেছে মিতার ঐ উচ্ছৃঙ্খল জীবন, রাতের পর রাত দেহবুভুক্ষার শিকার হওয়া, দেখেছে গড়ের মাঠে 'নরতীর্থ' ছিংলাজের আসরের বেলাল্লাপনা—চরম ধ্বংসের সিংহদ্বার খুলে উদাত্ত, মত্ত আহ্বানের পদধ্বনি। তারপর এই আজকের এই ছোট্ট ঘরে শুয়ে থাকা, নবদ্বীপের বিনিদ্র রজনী, বিশ্রী, একঘেয়ে, বিরক্তিকর, অসহ্য। অথচ মা কত আশা নিয়েই না এসেছিলেন—কবিতার মনেও কি ছিল না কিছুটা কৌতূহল। মায়ের যেমন তেমনি তারও স্বপ্নভঙ্গ। যেন সব কিছু অক্ষর গেঁথে, প্রুফ রেডি করে, চেসে এঁটে মেশিনে চড়াতে যাবার আগেই হঠাৎ ঝুর ঝুর করে একের পর এক টাইপ খসে পড়া—সব কিছু নতুন করে শুরু, ভঙ্গুর একঘেয়েমির পুনরাবৃত্তি।

তবু তো বেঁচে থাকতে হবে। কাজ করতে হবে।

হঠাৎ একটা মুখের ক্লোজাপ ভেসে উঠল মনের পর্দায়। সে নিরঞ্জন। আশ্চর্য, এর কথা আগে কোনদিনই কবিতা বিশেষ করে ভাবেনি। আজ এই নিঃসঙ্গ মুহূর্তে মনে হল তার জীবনের কোন এক চোরাগলিতে—কতদিনের কত গোপন অভিজ্ঞান তিল তিল করে সঞ্চিত হয়েছে যার খবর কবিতা আগে রাখেনি—যে জুগিয়েছে তাকেও সে বুঝতে পারেনি।

কবিতার মনে হল হয়ত আবার চলতে পারা যাবে। প্রেসের চৌহদ্দির বাঁধা জীবনে একঘেয়েমিকে অগ্রাহ্য করে, যদি মেশিনম্যান নিরঞ্জন সুখে-দুঃখে তার পাশে এসে দাঁড়ায়। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল, কবিতা নিজের মনেই বলে, নবদ্বীপ আর নয়, কাল সকালে উঠেই প্রথম ট্রেন ধরে কলকাতা।

(ক্রমশ)

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

কদিন আগে কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলুম, রেডিওটা খোলা ছিল—কানে গেল একটা পরিচিত বাজনার আওয়াজ। চট্ করে ধরতে পারলুম না কিন্তু কেমন যেন আকৃষ্ট হয়ে গেলুম। সরোদ? না সরোদের আওয়াজ এমন হবে না, তাছাড়া ধ্বনিরই তফাৎ, তবে কি ব্যাঞ্জো? তার আওয়াজ অনেকটা এই ধরণের, কিন্তু আজকাল বাংলা অনুষ্ঠানে ব্যাঞ্জো বাজাতেও তো কাউকে শুনি না। সন্দেহ হল তবে কি আমাদের দোতারা? মাইক্রোফোনে আওয়াজটা একটু ভারী ঠেকছে। কিছুক্ষণ পরেই ঘোষণা হল দোতারাই বটে। আমরা সাধারণত গানের সঙ্গে দোতারা শুনি। পল্লী গীতির সঙ্গে দোতারা প্রায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গানের ফাঁকে ফাঁকে অনুপম লাবণ্যে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে দোতারা। গান ছাড়া দোতারার আওয়াজটা তাই একটু নতুন লাগছিল। তা ছাড়া আকাশবাণীতে একক দোতারার অনুষ্ঠান! দোতারার এতো সম্মান ও সৌভাগ্য হবে এটা আমার অন্ততঃ ধারণার বাইরে ছিল। কতদিন কতজনের হাতে মিষ্টি দোতারার ঝঙ্কার শুনে ভেবেছি বেতারে দোতারার অনুষ্ঠান হলে কেমন হত। আবার মনে হয়েছে না, যে বাজনা গাছের ছায়ায় বাড়ির আঙিনায়, মাঠের আসরে বা হাটের এক কোণে বাজে তাকে নাই-বা নেওয়া হল বেতারের অভিজাত স্টুডিওয়। কিন্তু যুগ পাল্টেছে আজ বেতার কর্তৃপক্ষ স্বীকৃতি দিলেন এই গ্রাম্য যন্ত্রটিকে একক বাদ্যের প্রাপ্য দিয়ে। হয়তো কেউ কেউ নাক সিঁটকেছেন প্রোগ্রামে দোতারা শুনে, বলেছেন এটা বাড়াবাড়ি, অজাতকে এনে জাতে তোলা। আমার কিন্তু বড় ভাল লাগল দোতারার এই স্বীকৃতিটুকু। আকাশবাণী ভাল করেছেন কি মন্দ করেছেন আমি বলতে পারব না কিন্তু তাঁদের কর্তৃপক্ষের মধ্যে কেউ হয়তো আমাদেরই মতন দোতারার মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং নানা দ্বিধা সত্ত্বেও পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছেন দোতারার আওয়াজ কেমনভাবে ফুটে ওঠে বেতারের মাধ্যমে।

আজকাল কলকাতায় অনেকেই পল্লী-সংগীত করেন কিন্তু দোতারা বাজাতে দেখি সামান্য কজনকে। অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি দোতারা বাজান না কেন, তাঁরা জানিয়েছেন গান সংগ্রহে তাঁদের যত আগ্রহ ছিল দোতারা সম্পর্কে ততটা ছিল না। কিন্তু যদি তাঁরা দোতারা বাজিয়ে গাইতেন তাহলে তাঁদের গানের আবেদন আরও বাড়াতে পারতেন বলে আমার বিশ্বাস। দোতারা এমন একটি যন্ত্র যা নিজে না বাজালে খোলে না। গায়কের অনুভূতিই যেন যন্ত্রটাকে বাজিয়ে নিয়ে চলে। বাউল যে নিজে একতারা বাজায় বা ডুগডুগি বাজায় তার কারণ হচ্ছে তার প্রেরণাটা একমাত্র সেই সুর সঞ্চারিত করতে পারে, আর কেউ সেটা পারবে না।

দোতারা সম্বন্ধে বহু চিত্র আমার স্মৃতি-পটে মুদ্রিত হয়ে আছে। একজন প্রখ্যাত বৈরাগী আসত আমাদের শহরে আশ্বিন কার্তিক মাসে। শরতের সোনালি রোদ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে, ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে, আমাদের বাড়িতে একটা সজনে গাছের ছায়ায় বসে সে একটার পর একটা গান শুনিয়ে যেত। তার দোতারাটা ছিল শৌখিন, জায়গায় জায়গায় পেতল দিয়ে বাঁধানো। গানের মাঝখানে সে এক একটা আবেগপূর্ণ মুহূর্তে গলাকে পৌঁছে দিত তারসপ্তকের গান্ধারে, আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকত বেশ খানিকক্ষণ। সেই সময়টা সে ঝংকারের পর ঝঙ্কার দিয়ে চলত তার দোতারায়। তার রেশ কাঁপতে থাকত সেই সোনালি রোদ্দুরে, ছড়িয়ে যেত হাল্কা হাওয়ায়, সমস্ত সকালটা যেন পূর্ণ হয়ে উঠত একটা নিটোল সুরে। আর একজন মোহন্তের কথা মনে পড়ে। কষ্টি পাথরের মত কালো ছিল তার গায়ের রঙ। সুঠাম দেহ, কমনীয় মুখশ্রী। লম্বা চুল কপালের ওপর চুড়ো করে বাঁধা। তার দোতারায় ছিল সুন্দর কাজ করা। তবে এখনকার মত তারকশার দোতারা কিন্তু তখনও বেরোয়নি। সেই মোহন্ত বাবাজী একটা বারমাসী গেয়ে শোনাতো। সুরটা একঘেয়ে কিন্তু আশ্চর্য ছিল তার আবেদন। প্রতিটি লাইনের পরেই সে অতি সুললিত সুরে খানিকটা দোতারা বাজাত। আমার মনে আছে— "আমার ঘরে নাই কৃষ্ণ কে খাবে নবনী" বলে সে যখন দোতারায় তার অন্তরের আকুতিকে ফুটিয়ে তুলত তখন অনেকেরই চোখ শুকনো থাকত না। সেই সকালবেলার ব্যস্ততাতেও কতজন দাঁড়িয়ে যেত তার গান আর বাজনা শুনতে। একজন পল্লী গায়ক ছিল সারা দেশজুড়ে ছিল তার খ্যাতি, জাতে মুসলমান কিন্তু ভাবে বৈষ্ণব। সে গাইত নানা ধরণের গান—গুরুভজন, মনঃশিক্ষা, বিরহ, মিলন, ভোরাই ইত্যাদি। তার দোতারাও ছিল শোনবার মত। সে আবার দোতারায় খোলা আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একরকম চাপা আওয়াজ দিয়ে অনুভূতিকে করুণ করে তুলত। এই ধরণের আওয়াজকে বলে মুর্দা আওয়াজ। কীর্তনেও খোলা গলায় গাইতে গাইতে হঠাৎ গলা চেপে অস্ফুট স্বরে গাওয়া হয়, যেন মনের কথা মনেই গুমরে উঠতে থাকে। সে একটা বিচ্ছেদের গান গাইত। বর্ষার অভিসার নিশা শেষ হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ বিদায় নিচ্ছেন রাধিকার কাছ থেকে—

নিশীথ ফুরায়ে যায়
কোকিলে পঞ্চমে গায়
পূর্বদিকে উদয় হৈল ভানু
ধরিয়া রাধার হাতে
বিদায় মাগে ব্রজনাথে
বিদায় মাগে রাধার কাছে কানু।

এই অংশটা সে গাইত চড়া গলায় কিন্তু দোতারায় দ্রুত ধ্বনি তুলেই তাকে স্তিমিত করে নিয়ে আসত যাতে মনে হত বিদায়ের এই করুণ ব্যথা যেন আর কাউকে জানাবার নয় তা কেবল প্রণয়িনীর অন্তরকেই একান্তভাবে মথিত করে চলেছে। দোতারার বাজনাতে এইরকম নানা উপলব্ধি ঘটানো যায়। সারিন্দা বাজিয়ে বা সারঙ্গ বাজিয়ে পল্লীগীতি গাইতে শুনেছি। কিন্তু দোতারার মত রসসৃষ্টি কোনটাতেই হয় না। এই দুটি বাজনাতেই পল্লী গায়কেরা ছড়ির টানকে খুব মোলায়েম করতে পারে না, ফলে একটা কর্কশ স্বর যেন সব সময়েই লেগে থাকে। বেহালাও পল্লী গায়কের হাতে খুব মিষ্টি হয়ে ফুটে ওঠে না। অথচ বহু শতাব্দীর নিপুণ অনুশীলনে দোতারা একটি আর্টে পরিণত হয়েছে। তার আকৃতি প্রকৃতি, ধ্বনি, বাজনা সবই মনোরম।

গানের সঙ্গ ছাড়া দোতারা একক বাদ্য হিসাবে কতখানি সার্থক হবে বলতে পারি না। ড্রয়িং রুমে বসে বেতার মারফৎ দোতারা বাজনা শুনতে কেমন লাগবে সেটাও বলা শক্ত। তবে, অল্পস্বল্প সময় দোতারার বিচিত্র ধ্বনিতে অন্তরকে পুলকিত এবং রসঘন করবে এটা বলতে পারি। আজকাল দোতারায় আরও অনেক তার চড়ানো হচ্ছে বাজাবার কলা-কৌশলও হয়তো পাল্টে যাচ্ছে। এ সব পরীক্ষা নিরীক্ষা কতটা সার্থক হবে বলবার ক্ষমতা আমাদের নেই, তবে সেই আদিম দোতারা নির্ভেজাল পল্লীগীতির সঙ্গে যেভাবে মধু বর্ষণ করে এসেছে আজও তা করবে। খালি দুঃখ এই যে সেই পরিবেশ ছেড়ে এসেছি, কলকাতায় বসে কল্পনায় সেই পরিবেশে ফিরে যাবার চেষ্টাই কেবল মাঝে মাঝে করি।

কয়েকটি রেকর্ড

মেগাফোনে শ্রীদেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুখানি আবৃত্তি খুব ভাল লাগল। একদিকে শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের রচনা "পূব-পশ্চিম" অপরদিকে শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় "সর্বহারাদের গান" দুটি কবিতাই কণ্ঠের আবেগ এবং মাধুর্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

শ্রীমতী নমিতা ঘোষালের গাওয়া "আমার প্রাণের মাঝে" এবং "তোমার খোলা হাওয়া" এই দুটি রবীন্দ্রসংগীত বেরিয়েছে কলম্বিয়া রেকর্ডে। গায়িকা এরই মধ্যে রবীন্দ্রসংগীত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এ'রই কণ্ঠে শ্রীসত্যজিৎ রায় মহাশয়ের রচিত "ভালবাসার তুমি কি জান" গানটিও সিনেমায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই দুটি রবীন্দ্রসংগীত শ্রোতাদের মুগ্ধ করবে।

শ্রীমতী নিরুপমা রায় হিন্দুস্থান রেকর্ডে দুটি আধুনিক গান গেয়েছেন—"বাঁধব কারে ফুলের হারে" এবং কৃষ্ণ চূড়ার বনে বনে।" দুটি গানই লিখেছেন শ্রীমোহিনী চৌধুরী এবং সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন শ্রীঅমল দাশগুপ্ত। গান দুটি শুনতে মন্দ লাগবে না।

প্যারিসের চিঠি

স্বামী ঋতজানন্দের আমন্ত্রণ-লিপি এসে পৌঁছল : কলকাতা থেকে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ আমেরিকা যাবার পথে দু-একদিন গ্রেৎস'এর আশ্রমে কাটিয়ে যাচ্ছেন: রবিবারে, উপনিষদের বাণীর তাৎপর্য আলোচনা করবেন এবং তাঁর ভাষণের পরে কিছু জলযোগের আয়োজন থাকছে, উপস্থিত সকলের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সুবিধার্থে।

গোপালকাকার সঙ্গে লাঞ্চ ছিল 'শে উজুন' রেস্তোরাঁয়। বললেন, "তোমরা দুই ভাই রোববারে গ্রেৎস যাচ্ছ তা হলে? মুখুজ্যেদের প্রতিনিধি রইলে তোমরা, কারণ আমি দক্ষিণে যাচ্ছি তোমাদের কাকিমা ও নিকোলাকে আনতে।"

ফ্রাঁসোয়া শাঁ আমার পারী-জীবনের প্রথম দিনের বন্ধু। যাকে বলে ইংরেজী ভাষায়, বন্ধু, দার্শনিক ও কাণ্ডারী। এয়ার-টার্মিনাল থেকে সবে মঁসিয়া মরিসে'র বাড়িতে পা দিয়েছি, ভাল্দা-দিদি টোস্ট-মাখম-জেলি-ফলের রস দিয়ে আপ্যায়ন করছেন সবে, এমন সময় মঁসিয়া মরিসে ফোন পেয়ে পুলকিত কণ্ঠে বলেছিলেন, "ফ্রাঁসোয়া আসছে, তোমার আর ভাবনা নেই, পথহীন!" সেই যে ফ্রাঁসোয়ার সঙ্গে শুভদৃষ্টি হল, দায়ে-অদায়ে সেই মুহূর্ত থেকেই সে নিজেকে অপরিহার্য ক'রে তুলতে পেরেছিল। ওর দাদামশাই মঁসিয়া পোচ্যেট ছিলেন সুকবি ও নাট্যকার; সেই সূত্রে তাঁর কিছু বন্ধুদের ফ্রাঁসোয়া চিনত—যাঁদের মধ্যে রোমাঁ রোলাঁ'র সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটি দিন ফ্রাঁসোয়া আজও মনে রেখেছে। বিশ-বাইশ বছরের ওপর সে শ্রীঅরবিন্দের যোগ-সাধনার সঙ্গে পরিচিত এবং সেইসূত্রে, ভারতবর্ষের প্রতি অনুরক্ত। রবীন্দ্রনাথের উপরে এবং ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে তার দুটি একক সংকলন বিশেষ প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা; দ্বিতীয়টির ভূমিকায় শ্রীবলদুন ধিংড়াও এ-কথা স্বীকার করেছেন।

মোদ্দা কথা, শনিবার সকালে ফ্রাঁসোয়া ঘরে ঢুকেই প্রথম প্রশ্ন করল, "কাল কখন গ্রেৎস যাচ্ছ?" বললাম। ও জবাব দিল, "এখুনি স্বামী রঙ্গনাথানন্দের ফোন পেলাম—"

"বল কি? উনি পৌঁছে গেছেন? তো তোমার সঙ্গে—"

বিনীত ফ্রাঁসোয়া জানাল যে কয়েক বছর আগেও স্বামীজী যখন পারীতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, ভারতের সাংস্কৃতিক দূত আমাদের পণ্ডিচেরীর ছেলে শ্রীপুষ্পদাস ফ্রাঁসোয়াকে অনুরোধ করেছিলেন দোভাষীর কাজ করতে। স্বামীজী তাকে মনে রেখেছেন, এবং এবারেও তারই শরণাপন্ন।

গ্রেৎস হচ্ছে পারীর দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে, প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটারের পথ। ১৯৩৬ সালে, শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে পারী-তে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বেদান্ত অধ্যয়নের একটি কেন্দ্র ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠা করবার। মিশনের তরফ থেকে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দকে তখন পারীতে পাঠানো হয়। এবং স্বামীজী অক্লান্ত কুড়ি বছরের নিষ্ঠায়, ফ্রান্সের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অসংখ্য বক্তৃতা দিয়ে ফরাসীদের মনে বেদান্তের যে অনুরাগ সঞ্চার করেন তা এদেশে সুবিদিত। ১৯৪৭ সালে তিনি গ্রেৎস'এ এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা ক'রে জীবনের শেষ দশ বছর তার পিছনেই নিয়োজিত ক'রে এখানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা অনুযায়ী মানবতার সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সহায়তা করা হচ্ছে এই কেন্দ্রটির লক্ষ্য; সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর একান্ত অভিলাষ ছিল University of Man-রূপে পরিণত হক এই কেন্দ্রটি।

গ্রেৎস'এ ভাষণরত স্বামী রঙ্গনাথানন্দ: পাশে স্বামী ঋতজানন্দ ও ফ্রাঁসোয়া শাঁ

এখানকার বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী ঋতজানন্দ হচ্ছেন তামিলনাদের ছেলে; নেহাত কাঁচা বয়সে ঠাকুরের শিক্ষা প্রভাবে তিনি ধন্য হন। কলকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বিদ্যালয়ে তিনি যখন পড়াতেন, রমণদা ব'লে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তিনি ছাত্র-মহলে। প্রথম পরিচয়েই আপন ক'রে নেবার গুণটি এঁর সহজাত; মনে পড়ে, আমায় উনি জিগ্যেস করেছিলেন, "আলাপ করি কোন ভাষায়?" বাংলা, না ইংরেজী না ফরাসী?" বিনা দ্বিধায় বলেছিলাম, "বাংলা ছাড়া আর কোনও ভাষায় কি প্রাণের কথা বলা যায়, স্বামীজী?" পরে অবশ্য ওঁর মুখেই শুনলাম যে তামিলনাদে ওঁর জন্ম। "অর্থাৎ আপনি তামিলনাদে জন্মেছেন, কিন্তু মানুষ হয়েছেন বাংলাদেশে; আর আমি বাংলাদেশে জন্মে প্রতিপালিত হয়েছি তামিলনাদে!" বলেছিলাম ওঁকে। এবং স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম দিন আলাপের সময় বারে বারে আমার মনে পড়েছিল পণ্ডিচেরীর অমৃতদার কথা; তিনিও তামিলনাদের ছেলে, নাবালক বয়সে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে শ্রীঅরবিন্দের কাছে যাতায়াত শুরু ক'রে সেই যে ঘরের মায়া ত্যাগ করেছিলেন, আজও তিনি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমেই প্রবীণ সাধকদের অন্যতম-রূপে শুধু বিরাজমান নন, আশ্রম-জীবনে অপরিহার্য রসের স্বাদ যাঁরা সঞ্জীবিত করেন, অমৃতদা তাঁদের শীর্ষ-স্থানীয়। বাংলা, ইংরেজী, ফরাসী, তামিল ছাড়াও দু-তিনটে ভাষায় অবাধে তাঁর রসিকতা বিতরিত হয় উঠতে বসতে; আমার মনে হয়, আনাতোল ফ্রাঁস যদি পঞ্চাশ বছর সাধনা করতেন, তবে হয়তো দ্বিতীয় অমৃতদা পেতাম আমরা।

গ্রেৎস আশ্রমে যতবারই গিয়েছি বিনা আমন্ত্রণে বা আমন্ত্রিত হয়ে, অভিভূত হয়েছি সত্যকার আশ্রমসুলভ শান্তির পরিবেশ পেয়ে। সেই শান্তির প্রাণ-ভোমরা লুকিয়ে রয়েছেন আশ্রমের তিন-তলায়, ঠাকুর-ঘরে। নিত্য আরতি, উৎসবে-অনুষ্ঠানে ষোড়শোপচারে বিধিমতো পুজো, এবং আন্তরিক আবাহনে সাধন-মন্দিরে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার যে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে এখানে, তা অসাধারণ। প্রতি রবিবারেই অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার বিভিন্ন প্রসঙ্গে ভাষণ দেবার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে; চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূর থেকেও শ্রোতারা আসেন, আনন্দ পান। এই অভি-ভাষণগুলির বৈচিত্র্য দেখে প্রত্যয় জন্মায় যে এঁরা বাস্তবিক 'যত মত তত পথ' উক্তির যাথার্থ্য জীবনে উপলব্ধি করতে বদ্ধ-পরিকর : বেদান্ত, বুদ্ধ, মোজেস, যীশু, শঙ্কর, রামানুজ, মহম্মদ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ থেকে শুরু ক'রে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম যোগের তাত্ত্বিক ও সাধনার নানা দিক নিয়েই আলোচনা হয়ে থাকে

এখানে। স্বামীজী স্বয়ং বীণা বাজান এবং পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় সঙ্গীতের রসে সমবেত শ্রোতাদের তৃপ্ত করতে তাঁর উদ্যমও কম নয়। এবং আশ্রমের অনাড়ম্বর অথচ ভারতীয় রন্ধনশাস্ত্র-সম্মত প্রসাদের মাহাত্ম্য একবার যাঁদের রসনাকে স্পর্শ করেছে, তাঁদের কাছে তা অপার্থিব। স্বামীজীর সকল কাজের সহযোগী হচ্ছেন স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ—জন্মসূত্রে মার্কিন।

গত বছরে ১৫ই আগস্টে আমি পারী-র বিখ্যাত একটি হাসপাতালে শয্যাশায়ী; স্বামী ঋতজানন্দ দেখতে এলেন। বললেন, "কি খেতে-টেতে ইচ্ছে করছে? একটু শুক্তো রেঁধে পাঠাব?" বললাম, "না স্বামীজী, পাঠাবেন না, নিজে গিয়ে খাব।" স্বামীজী তা ভোলেননি এবং যে ফরাসী ব্রহ্মচারিণী আশ্রমে রাঁধেন, তাঁকে ঠিক শুক্তো রাঁধতে শিখিয়ে আমায় আপ্যায়িত করেছিলেন।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দের অভিভাষণের খ্যাতি ভারতবর্ষে থাকতেই কর্ণগোচর হয়েছিল এবং বহু বছর ধরে তাঁকে জানবার প্রবল বাসনা আমার ছিল। স্বামী ঋতজানন্দের মধ্যস্থতায় এইভাবে তাঁকে কাছে পেয়ে এবং তাঁর সেদিনের ভাষণ শুনে শুধু আমি নই—উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ দেখলাম। সেইসঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করল আমাদের বন্ধু ফ্রাঁসোয়া শাঁর দোভাষীর ভূমিকায় নৈপুণ্য।

*

গোপাল কাকার কথা ওপরে বলেছি। আগের কোনও চিঠিতে ক্লদ-খুড়িমা এবং নিকোলা-ভায়ার উল্লেখও করেছি যেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রথম পর্বে বিপ্লবী বাংলার যেসব শান্ত ছেলেরা গৃহ-হারা লক্ষ্মীছাড়া হয়ে পড়েছিলেন, তাঁদেরই কেউ কেউ বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন দেশের কাজের ব্রত নিয়ে। ডাঃ তারকনাথ দাস, শ্রীশ সেন, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নাম তাঁদের অগ্রগণ্য। ধনগোপাল অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে কতটা সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন জানি না। কিন্তু দেশের কাজ তিনি করেছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। মিস মেয়ো'র দুরভিসন্ধিপ্রসূত গ্রন্থ 'মাদার ইণ্ডিয়া'র জবাব দেবার মতো কলমের জোর সেদিন যিনি রাখতেন, তিনি ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়; রাডিয়ার্ড কিপলিঙের রচনায় কল্পনা ও বাস্তবের জগাখিচুড়িতে ভারতের যে-রূপ প্রচারিত হতে শুরু করেছিল পশ্চিমী দেশগুলোর সেই রূপেরই সত্যকার শ্রী সেদিন কিশোর-পাঠ্য পুস্তকের আকারে প্রকাশ দেবার স্পর্ধা যিনি রাখতেন, তিনি ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়। তাঁর 'গে-নেক্' (চিত্রগ্রীব), 'কারী দি এলিফ্যাণ্ট' (গণপতি) প্রভৃতি বই শুধুমাত্র পুলিৎজার প্রমুখ সাহিত্য-পুরস্কারই পায়নি, এই সেদিন অবধি বহু পঠিত গ্রন্থাবলীর তালিকাভুক্ত ছিল; আবার ভারতের আধ্যাত্মিকতার বিস্ময়কর প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী 'দি ফেস অব্ সাইলেন্স' লিখে সেদিন যিনি পাশ্চাত্ত্য পাঠক-সাধারণে শান্তির বিত্ত বিতরণ করেছিলেন, তিনি ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়। ধনগোপালই বোধ হয় সর্ব-প্রথম রোমাঁ রোলাঁকে অবহিত করেন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, যার ফলে রোমাঁ রোলাঁ লিখতে শুরু করেন শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতির জীবন-চরিত। ইওরোপ-আমেরিকায় আজো 'মুখার্জী' বলতে লোকে ধনগোপালের কথাই প্রথম ভাবে। সংক্ষিপ্ত তাঁর জীবনে তিনি সেদিন অবাধে মিশেছিলেন সমসাময়িক ইওরোপ-

ধনগোপাল মুখার্জি (জুনিয়র), মাদাম রুদ মুখার্জি, টোগো মুখার্জি: নিকোলা মুখার্জি ডাকছে, "চলে এস, ছবি তোলা হচ্ছে!"

আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রশস্ত প্রাণী তাঁর মতো নিবিড়ে নিভৃতে দৈনন্দিন জীবনের আনাচে কানাচে কম লোকেরই পৌঁছতে পেরেছিল, আইনস্টাইন থেকে স্টোকোভস্কি পর্যন্ত কারও সঙ্গে তাঁর কম ঘনিষ্ঠতা ছিল না (ভুললে চলবে না, রবীন্দ্রনাথ-আইনস্টাইন সাক্ষাৎকারের উদ্যোক্তা ছিলেন ধনগোপাল); সংস্কৃত, পরিশীলিত এই ভারতীয় শান্তি প্রাণের সম্যক জীবনী আজও লেখা হয়নি —অকালে যিনি আত্মহত্যা ক'রে বিদায় নেন ইহলোক থেকে।

শৈশবে, অপ্রত্যাশিত রোগের ফলে যখন বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক আমার সাময়িকভাবে অত্যন্ত সীমিত হয়ে গেল, সৌভাগ্যক্রমে অভিভাবকেরা আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন গ্রন্থাগারের চাবিকাঠি। সুরেশ বাঁড়ুজ্যের তর্জমায় ধনগোপালের বইগুলো পড়তে পড়তে কৈশোরের দিনগুলো কী রোমাঞ্চময় মনে হত! পুরনো 'প্রবাসী'র পাতায় ধনগোপালের আত্মহত্যার সংবাদ গভীর রেখাপাত করেছিল আমার মনে। নেতাজীর স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে কতজনে দেখা ক'রে বিবরণ লিখে পাঠাতেন দেশের কাগজে, সাগ্রহে তা পড়তাম আর ভাবতাম, "কই, ধনগোপালের স্ত্রী-পুত্র প্রসঙ্গে কেউ কোন কথা লেখেন না কেন?"

সেই ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র গোপালকাকার সঙ্গে যে আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে যাবে পারী-তে এসে, জানতাম না। শুনেছিলাম, ধনগোপালের মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা পোষণ করতেন, তাঁর পুত্র গোপালকাকা এসেছেন—মাত্র বার দুই-তিন দেশে ফিরেছিলেন অল্প কিছু সময়ের জন্য।

পারীর শাঁজেলিজে এক রেস্তোরাঁয় প্রথম দিনের রাঁদে-ভু: গোপালকাকাকে দেখেই মনে পড়ে গেল কোন্ ছেলেবেলায় দেখা বিপ্লবী নেতা যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের মুখটা। যাদুদাদু হচ্ছেন গোপালকাকার আপন জেঠামশাই। হুবহু ওই মুখ। কথায় কথায় আমার সংশয় ঘুচে গেল; উনিও বললেন, "জান, আমার প্রথম পক্ষের বউ ছিলেন মার্কিনী; কয়েক বছর হল আমি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছি—কিন্তু রুদ তো ফরাসী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কথা বলতে পারে না ব'লে আমি চট ক'রে বাড়িতে কাউকে নিয়ে যাই না। কিন্তু তোমার পক্ষে যখন ভাষার প্রশ্ন কোথাও ওঠে না দেখছি, শীঘ্রই রুদ তোমায় নেমন্তন্ন করবে মনে হচ্ছে।"

কথা চলছিল কখনও ইংরেজীতে, কখনও ফরাসীতে। খাওয়া-শেষে মিষ্টি-পর্ব। দুষ্টু হেসে গোপালকাকা বললেন, "লেট মি সী, হোয়েদার দি বেঙ্গলী বাবু ক্যান আউটডু হিস আঙ্কল ইন টেকিং সুইট্স্।" অর্থাৎ মিষ্টান্ন-প্রেমে উনি যে বাঙালী রয়ে গেছেন, সগৌরবে তা জানিয়ে দিলেন।

গোপালকাকার জন্ম ১৯১৯ সালের ২৭শে অগাস্ট। ওঁর পুরো নামও ধনগোপাল মুখার্জি। ওঁর বাবা ছিলেন ভ্রমণ-প্রিয়। ফলে গোপালকাকার বিদ্যাশিক্ষা কতক ফ্রান্সে, কতক ইতালীতে এবং কতক আমেরিকায়। ফরাসী, ইতালীয়, ইংরেজী—তিনটি ভাষায় সহজ অধিকার ওঁর। আরও কিছু কিছু ভাষা জানেন। ওঁর বাবা ছিলেন বিস্ময়কর ভাষাবিদ। ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ে Science Po (Political Science) অধ্যয়নের পরে আরো বিভিন্ন বিচিত্র পাঠ্যক্রম ও অভিজ্ঞতার পথে উনি ডাকসাইটে কত মানুষকে খুব নিকিড়ে দেখেছেন, কত বিশ্ববিশ্রুত মনীষীর সংস্পর্শে এসেছেন! মাদাম চিয়াং-কাইশেকের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর কাজ থেকে শুরু করে প্যান-আমেরিকান বিমান বহরের কর্তৃপক্ষমণ্ডলীর সদস্যও ছিলেন উনি। ইউরোপ-আমেরিকার ইতিহাস থেকে শুরু করে ইউরোপীয় ও মার্কিন সমাজের উচ্চ মহলের সর্বত্র অবাধ ওঁর গতি। সৌম্য সুদর্শন সুশিক্ষিত এই মানুষটার সঙ্গে যখনই আলোচনা করেছি, মনের পরিধিই বিস্তৃততর হয়নি, নতুন দৃষ্টিভঙ্গীও অর্জন করেছি। বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এমন যথাযথ ধারণা ও তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুষ্ঠু অভিমত খুব কম লোকেরই থাকে। জগতের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বর্তমান অবস্থা ও তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিষয়ে গোপালকাকার প্রত্যয় অনন্য।

বড় বড় সওদাগরী সংসদের নিত্য আনাগোনা ওঁর দপ্তরে। ফ্রাঙ্কো-মার্কিন এক কোম্পানির উনি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। ওঁর নিত্য নতুন উদ্ভাবনী শক্তি ব্যবসায়ী মহলের যথেষ্ট ভরসা-স্থল মনে হয়।

ব্যক্তিগত জীবনে উনি শান্তিপ্রিয়। প্রথম পক্ষের দরুন ওঁর দুই কন্যা চন্দ্রা ও জেনিনা আমেরিকায় থাকে। দ্বিতীয় পক্ষের শিশুপুত্র নিকোলা ওঁদের সুখী দাম্পত্য-জীবনের অনেকটা জুড়ে আছে। ধনগোপাল মৃত্যুর অনতিকাল আগে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন স্বামী নিখিলানন্দের সঙ্গে। গোপালকাকা তাঁরই কাছে দীক্ষা নিয়েছেন, এবং একমাত্র পুত্রের নামকরণ হয়েছে নিখিলানন্দজীর নামেই। নিয়মিত পূজো-আহ্নিক করা ছাড়াও, গ্রেৎস আশ্রমের পরিচালনার আড়ালে গোপালকাকার অবদান যথেষ্ট। সম্প্রতি উনি মেতে রয়েছেন পারীতে স্বামী বিবেকানন্দ যে ঘরটিতে থাকতেন, সেখানে একটি স্মৃতি-ফলক লাগানোর প্রচেষ্টায়।

গোপালকাকা জাত গপ্পে মানুষ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় ওঁর গল্প শুনতে শুনতে। বলি, "লিখুন না কেন?" অভয় দেন, "একটু সুস্থির হয়ে নিয়ে লিখব'খন। কত কথাই তো লেখবার আছে।"

রুদ-কাকীমা আদর্শ গৃহিণী। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও আগ্রহ। নিকোলা একটু বড় হলেই তাকে নিয়ে ওঁরা ভারতবর্ষে যাবেন, যাদুদাদুর আশীর্বাদ

নিয়ে আসবেন। ভারতের খবর পাবার জন্য প্রতি সপ্তাহেই ওঁরা অপেক্ষা করেন।

গত ১৫ই অগাস্ট লণ্ডনের হেওয়ার্ড গ্যালারিতে আরি মাতিসের শিল্প-প্রদর্শনী দেখে আমরা ক'জন চা খাচ্ছিলাম: ডিক ব্যাটস্টোন (আমার বন্ধু, ইংরেজ কবি), জর্জ হ্যারিসন (বীটলে নন), জেনিনা ও শিল্পী জন্ ইয়েগেস্ (পোপলকাকার মেয়ে-জামাই, হানিমুন করতে ইউরোপে এসেছে), টোগো ও আমি। জেনিনা বলল, "আমার খুব ইচ্ছে, দাদুর একটা জীবনী লিখি। তুমি যদি আমায় সাহায্য কর তো হাত দিই। তা ছাড়া যাঁরা তাঁকে চিনতেন তাঁদের অনেকেই মারা গিয়েছেন; তবু যদি দেশের থেকে কেউ তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানাতে পারতেন, খুব সুখী হতাম।"

এই চিঠি মারফৎ জেনিনার আবেদন দেশে পৌঁছে যাবে আশা করি। ইংরেজীতে লেখা হলেই তার পক্ষে অধিক কাম্য হবে।

*

লণ্ডনে আমাদের প্রথম পার্টিতেই থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন ডঃ হারাণ বসু। সজ্জন বলে তাঁর যে সুনাম শুনেছিলাম, তা প্রত্যক্ষ করতে করতে সেই সঙ্গে চোখে পড়ল তাঁর

বিপুল কর্মধারা, একাদিক্রমে যা বহুমুখী। কথায় কথায় তাঁর এক বন্ধু প্রশ্ন করলেন, "ডঃ বসু, তা হলে এখানেই আপনি পাকা-পাকিভাবে বসবাসের কথা ভাবছেন?"

"একদিন হয়তো ভাবতাম, কিন্তু ইমিগ্রেশন বিল পাশ হয়ে অবধি—"

এই কথারই সমর্থনে আমাদের হোতা শ্রীযুক্ত কালিপদ ঘোষের মুখে শুনলাম যে, প্রায় তিরিশ বছর ধরে ইনি ওদেশে আছেন, 'মিস্টার' সম্বোধন বা ভদ্র ব্যবহার থেকে কোনদিন বঞ্চিত হননি; কিন্তু ইদানীং মান-সম্মান হাতে নিয়ে বার হতে হয় কালার্ড যে কাউকেই।

ভারতী ও তার স্বামী বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়—দুজনেই লণ্ডনে ডাক্তার; তাঁদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতী তো স্পষ্ট সাবধান করে দিল, "পৃথ্বীনমামা, বিশেষত ছোকরাদের দল দেখলে বরং ফুটপাথ বদলে নিতে পারো। আর সন্ধ্যের দিকেও পথ চলবে চোখ-কান খুলে।"

এ কথা সত্যি যে, প্যারীর পথে পাগড়ি বা দাক্ষিণী লুঙ্গি বা সালোয়ার বা শাড়ি দর্শন নেহাতই কালে-ভদ্রে ঘটে, যে তুলনায় লণ্ডনে প্রতি আড়াই মিনিটে এক বা ততোধিক সংখ্যক উপরোক্ত বেশধারীর আনাগোনা বিরল নয়। প্যারীতে ভারতীয় রেস্তোরাঁ নামধারী দুটি টিমটিমে পণ্ডিচেরীওয়ালা, একটি ফরাসী মহিলা-পরিচালিত মাঝারিগোছের, আর-একটি ফরাসী ভদ্রলোক পরিচালিত (দিল্লিওয়ালা বাবুর্চি সমেত) এলাহি ব্যাপার যার একটি থালার দাম শুনেছি সত্তর ফ্রাঁ, যা ভারতীয় মুদ্রায় অন্তত একশ' টাকা। সেক্ষেত্রে লণ্ডনের অঞ্চল-বিশেষেই অন্তত এক ডজন ভারতীয় (বা পাকিস্তানী) রেস্তোরাঁ বহাল তবিয়তে বিরাজমান দেখা যায়। এবং সাম্প্রতিক ভারত-বিদ্বেষী আন্দোলনের ধাক্কায় তাই গড়পড়তা ইংরেজের চোখে কে ভারতীয়, কে ওয়েস্টইণ্ডিজের, কে পাকিস্তানী, কে সিংহলী, বিচার করা দূরে থাক—'নিগ্রো'দের সঙ্গে একই নিশ্বাসে ওদের সবাইকে নরকে পাঠাতে পারলেই সবাই যেন সুখী হয়।

জেঠামশাই (কালিপদবাবু) বললেন, "মার্বেল আর্চের কাছে হাইড পার্কের স্পীকার্স কর্নারটা দেখে এস, হয়তো ভাল লাগবে।"

সেখানে একটি আফ্রিকান ছোকরা, যেমন ধী, তেমন প্রত্যুৎপন্নমতি, তেমনি সরস কথাবার্তা—বক্তৃতা দিচ্ছে দেখলাম। "আমরা ইংরেজরা কী দিয়েছি জগৎকে?" ও তখন বলছিল। "ভারতবর্ষে পা দিতে না দিতে সোনার সেই দেশে আমরা দুর্ভিক্ষ এনেছি।..." তারপর অস্ট্রেলিয়ায়, আফ্রিকায় "আমরা ইংরেজ জাতির কীর্তির কাহিনী সে সুন্দরভাবে বেশ ঠুকে ঠুকে বলে চলছিল।

চোখ টিপলাম নেমে আসতে। অন্য একজন স্পীকার ততক্ষণে বচন দেবার জন্য ছটফট করছেন দেখে ও নেমে এলেই হাত মেলালাম, "ব্রাদার, তুমি কোন দেশের ইংরেজ বট হে?"

বলল, "ওদিকে চল, এখানে সাদা পোশাকে পুলিস আছে, বেচাল কথা শুনলেই শ্রীঘরে চালান করে দেবে।" তারপর একটু উঁচু গলায় পাশ দিয়ে দুজন ইংরেজ যাচ্ছে দেখে আমায় বোঝাতে লাগল, "ওই যে মইটা দেখছ, ওটা হচ্ছে প্রভু যীশুর মহিমার কথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য।"

লোক দুটো চলে যেতেই বলল, "আর আমি যে মই থেকে নামলুম, ওটা ছিল নক্রুমা প্রভৃতির প্রিয় জায়গা।"

পার্কের শেষ মুড়োয় হটডগ খেতে খেতে জানলাম, ছোকরার নাম ডেভী—নাইজিরিয়ায় বাড়ি। কথা প্রসঙ্গে ওর বক্তৃতার দু-এক জায়গায় ভারত-সম্পর্কে ওর জ্ঞানের উৎস সঠিক নয় জানালাম; বিশেষ উৎসাহে ভারতের বিষয়ে ওর জ্ঞাতব্য আরো কিছু প্রশ্ন করে বলল, "যদি পার, আর-একটু শুনে যাও, তোমার দেওয়া কাঁচামালের কি গতি করি।"

ডেভী আবার আসরে নামতেই অনন্য কণ্ঠে স্বাগত ধ্বনি যেমন উঠল, তেমনি কয়েকজন ইংরেজ শ্রোতাদের তরফ থেকে শুরু হল বাঁদরামি। তাদের দিকে তাগ করে চলল তখন ডেভীর তীব্র শ্লেষের বাণ। একটি ইংরেজ খেপে গিয়ে অশ্লীল ভাষায় বিশ্রী গাবভাবে চেঁচাতে লাগল; ডেভীর বাঁশ পড়ল তার ঘাড়ে, "দোহাই, আমরা ইংরেজরা এইসব অসভ্য কালো মানুষদের সামনে যেন আমাদের সংস্কৃতির পুরো বস্তা উজাড় না করে দিই।—"

অবশ্য আমার অভিজ্ঞতায়— আমার ইংরেজ বন্ধুদের আন্তরিকতা বাদ দিলেও, ভদ্র ইংরেজের সংখ্যা কম নয় দেখলাম। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের রক্ষী থেকে শুরু করে লাইব্রেরিয়ানেরা, কমনওয়েলথ-লাইব্রেরী অন্তর্ভুক্ত ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির সামান্য পিওন থেকে কর্তারা সবাই যে অমায়িক সহযোগিতার নমুনা দেখালেন, তা সত্যিই অপ্রত্যাশিত ছিল। বিশেষত আমার গবেষণার বিষয় ছিল যখন ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলন সংক্রান্ত। একটি পিওন আমায় একটা উডপেন্সিল ধার দিয়েছিল; ফেরত দেবার সময় কিছুতেই নিতে চায় না, "ওটি তোমায় উপহার দিয়েছি।" বললাম, "বেশ তো, রেখে দাও, আবার যখন আমি আসব, তোমার কাছ থেকে ওটি চেয়ে নিয়ে তাতেই লিখব খন।"

হাইড পার্কের অদূরে এক ভারতীয় দোকানে, শুনেছিলাম ভাল বাঁশের বাঁশি বিক্রি হয়। একটি দোকান ঠাহর করতে পারলাম মার্বেল আর্চের কাছে। ঢুকেছি যখন, কানে মধু বর্ষিত হল বামাকণ্ঠে বাঙালী আড্ডার রেশ কাউণ্টার থেকে আসতে শুনে। ভাবলাম, যাক, এও বাড়তি লাভ, যা প্যারীতে মেলে না। কিন্তু আমার দেশী গলাবন্ধ কোটে, না এমন আলপাকা বরণ লেদারে—ওঁরা আমায় সাহেব ভেবে ইংরিজিতে প্রশ্ন করলেন ইটিস-ফিটিস কি সব, যার সদর্থ বুঝলাম, আমি কি কিনব ওঁরা জানতে চান। বোকার মত বাংলাতেই বলে ফেললাম, "বাঁশের বাঁশি পাওয়া যাবে?" আবার ইংরিজিতে নির্দেশ এল, ওঁকে অনুসরণ করবার। এক ঝুড়ি আধা-খেলনা আধা-ফেলনা বাঁশের বাঁশির সামনে দাঁড় করিয়ে দিতেই, যেগুলো ভাঙা নয় তার থেকে মনমত একটা বাছব কিনা ভাবছি—অবশেষে বাংলা ফুটল, "সবই তো বি-স্কেল, যে কোন একটা নিয়ে নিন।" হেসে বললাম, "সামান্য বাঁশির জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বলে দেবে আপনাকে যে মোটা খোলের বাঁশিগুলো বি-স্কেল হতেই পারে না, সম্ভবত জি!" এবং, বলা বাহুল্য, 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ' বাজাতে হাত এমন নিসপিস করছিল যে, ওই থেকেই একটা কিনে নিয়ে সেণ্ট গ্যাব্রিয়েলস রোডের বাসায় ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে মারলাম অনভ্যস্ত ফুঁ, এবং ভুলে গেলাম লণ্ডনের বিশ্রী বাদলা দিনের কথা।

লণ্ডনে সবচেয়ে সুন্দর অভিজ্ঞতা হল শ্রীঅরবিন্দের ৯৬তম জন্মোৎসবের অঙ্গ হিসেবে ১৪ই অগাস্ট ফ্রেণ্ডস্ হল-এ অনুষ্ঠিত সভাটিতে। ডিক, মিঃ পরীখ, ধীরুভাই প্রভৃতির উদ্যোগে মনোরম পরিবেশে রেভারেণ্ড ফ্র্যাঙ্ক হোয়েলিং 'শ্রীঅরবিন্দ ও তেইয়ার দ্য শারদ্যাঁ' প্রসঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত চিত্তাকর্ষক একটি ভাষণ দিলেন। এটি হচ্ছে রেভারেণ্ড হোয়েলিং-এর ডক্টরেটের থিসিস থেকে নির্বাচিত অংশ। সভাশেষে আলাপ হল তরুণ এই গবেষকের সঙ্গে; অনুরোধ করলেন পত্রালাপ সূচনা করতে। বললাম, তথাস্তু।

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মাত্র ৭ দিনে সুনীতার মুখশ্রী হয়ে উঠল আরো পরিষ্কার, কোমল, লাবণ্যমণ্ডিত; আর এই অঘটন ঘটিয়ে দিল

পণ্ড্স-এর ৭-দিনে রূপলাবণ্যের পরিকল্পনা

১

কলেজ সোশ্যালের আর মাত্র ৭ দিন বাকি। অরুণ তো সেখানে থাকবেই। আমার দিকে কি ওর নজর পড়বে? কিন্তু আমার—মুখের যা চেহারা হয়েছে—শুকনো, ফ্যাকাশে—ঠিক তখন আমার জ্যোতির কথা মনে পড়ে গেল। ৭ দিনেই ওর চেহারা ফিরে গিয়েছিল পণ্ড্স-এর ৭-দিনে রূপলাবণ্য ফিরিয়ে আনার পরি-পরিকল্পনা কাজে লাগিয়ে।

২

পরিকল্পনা ও তার কাজ

এক সপ্তাহ ধরে রোজ রাত্তিরে দুবার আমি পণ্ড্স কোল্ড ক্রীম মাখতে লাগলুম। প্রথমবারে ওপরের ময়লা এবং মেক-আপ পরিষ্কার হয়ে গেল।

৩

তারপর খুব নরম টিস্যু কাগজ দিয়ে ক্রীম মুছে ফেললুম।

৪

দ্বিতীয় বার আবার ক্রীম মাখলুম। এবং এটাই হল আমার রূপলাবণ্যের চাবিকাঠি। এবারের ক্রীম ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে এমন সব লুকানো ময়লা বের করে দিল, জল ও সাবান যার নাগাল পায় না।
এই দুবার ক্রীম মাখার ফলে মুখশ্রী সত্যিই ফুটফুটে, তাজা আর কমনীয় হয়ে উঠল।

Pond's
COLD CREAM
C

পার্টিতে—৭ দিনের দিন আমার মুখশ্রী হয়ে উঠল উজ্জ্বল, মসৃণ, লাবণ্যে ঝলমল। আর হ্যাঁ, অরুণ যে আমার চেহারার তারিফ করল তা বলাই বাহুল্য।

আমি ঠিক করে ফেললুম, পণ্ড্স কোল্ড ক্রীম দিয়ে নিয়মিতভাবে রূপচর্চা চালিয়ে যাবো যাতে আমার মুখশ্রী সব সময় ফুটফুটে, কোমল ও লাবণ্যমণ্ডিত থাকে।

আজই মাখুন পণ্ড্স কোল্ড ক্রীম—পৃথিবীতে এই মুখশ্রী-পরিষ্কারক ক্রীমই কাটতিতে সবার ওপরে

পণ্ড্স

কোল্ড ক্রীম

(পৃথিবীতে এই মুখশ্রী-পরিষ্কারক ক্রীমই
কাটতিতে সবার ওপরে

চীজব্রো-পণ্ড্স ইনক (সীমিত দায়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

আলোয় কালোয়

ত্রিশঙ্কু

তখন আমার সাত-আট বছর বয়েস। সমস্তিপুরে কাছারির মাঠে সেবার প্রকাণ্ড এক সার্কাস পার্টি এসেছিল। প্রায় সমস্তটা মাঠ জুড়ে পড়েছিল ওদের তাঁবু। চাকা-লাগানো খাঁচা ভর্তি বাঘ সিংহ ভাল্লুক বাঁদর ইত্যাদি। আর ছিল আট-দশটা হাতি—একটা বাচ্চা, আর একটার দাঁত ছিল বিরাট লম্বা ও সোনা দিয়ে বাঁধানো।

তাঁবুর পেছনে আড়ালে বাঘ-সিংহের আস্তানা হয়েছিল। আমরা শুধু মাঝে মাঝে, বিশেষ করে মধ্যরাতে, ওদের হুংকার শুনতাম। আর স্বপ্ন দেখতাম, শিকারে গিয়েছি—মাচার ওপর বসে রয়েছি, হাতে উদ্যত বন্দুক। শব্দ অনুসরণ করে আলো ফেলা হচ্ছে, দুটো সবুজ রঙের চোখে প্রতিফলিত হওয়া মাত্র আমাদের গুলি ছুটবে—দু-চোখের মাঝখানটা লক্ষ্য করে। তারপর এক ভীষণ গর্জন, জঙ্গল তোলপাড়, এবং ভোরবেলা সেই অতি ভয়ঙ্কর জন্তুটার মৃতদেহের ওপর পা রেখে দুঃসাহসী শিকারীদের ছবি। এই সব স্বপ্ন দেখতাম, আর বন্ধুদের সঙ্গে মিলিয়ে নিতাম। মুন্সেফবাবুদের কোয়ার্টারও ছিল কাছারির কাছেই, টুকু-টাটুরাও এইরকম স্বপ্ন দেখতো, তবে ওরা তো মেয়ে—ভয় পেয়ে যেতো। মাঝরাত্তিরে উঠে হয়ত মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতো।

আমাদের বাড়ি আর কাছারির মাঠ—তার মাঝখানে ছিল একটা আম-লিচুর বাগান। জেলের এলাকা। সেইখানে বাঁধা থাকতো সার্কাসের হাতিগুলো। এক-একটা গাছের সঙ্গে এক-একজন। শুধু বাচ্চা হাতিটা তার মায়ের কাছাকাছি ছাড়া অবস্থায় ঘুর-ঘুর করতো। কখনো-কখনো শুঁড় দিয়ে ওর মায়ের পেটের কাছে স্তন খুঁজতো। আমাদের কাছে ওরাই ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয় দৃশ্য। দূর থেকে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতাম ওদের কান নাড়ানো, অবিরাম মাছি তাড়ানো। রাশি রাশি কলা ও খিচুড়ি খাওয়া। পর্বতপ্রমাণ বিষ্ঠা-ত্যাগ। আট-দশটা হাতিকে আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলাম। একান্ত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও দাঁত-

[illegible]

ওলা হাতিটাকে আমি নিইনি—মুন্সেফবাবুর বড়ো মেয়ে টুকুকে দিয়ে দিয়েছিলাম। হাজার হোক ও মেয়ে, বড়োমুখ করে চাইলে আমি কি নিরাশ করতে পারি? তেমন স্বার্থপর আমি কোনোদিন ছিলাম না।

রং-করা ঘোড়ার মতো একটা জেব্রাও ছিল এদের মধ্যে। সারাদিন যে জেলের মাঠে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছুটে বেড়াতো। কী রকম যেন অদ্ভুত দেখতে ও, আমরা কেউ ভালোবাসতাম না। হাতিদের কাছে ও ছিল একেবারে ছেলেমানুষ, ব্যক্তিত্বহীন।

বাবার সঙ্গে একবার, টুকুদের সঙ্গে আর একবার আমি সার্কাস দেখেছি। আমাদের হাতিগুলো এরিনার চারপাশে ঘুরতো কয়েকবার—টুংটুং করে ঘণ্টা বাজতো ওদের গলায়, তারপর পিরামিড করে দাঁড়াতো। একজনের পিঠে সামনের পা দুটো দিয়ে আর-একজন এবং মাঝখানে একটা গোল পিপের ওপর পা রেখে লম্বা উঁচু দাঁত-ওলা হাতিটা। টুকু হাততালি দিয়ে উঠেছিল ওর হাতির প্রধান ভূমিকা দেখে। গ্যালারি ভর্তি লোকজনও খুব হাততালি ও হর্ষ-ধ্বনি দিয়েছিল। আমার ভালো লাগেনি, কারণ আমার হাতি দুটোই ছিল দু-পাশে একদম শেষের দিকে। একটু পরে হাতে একটা ভাঙা লাঠি নিয়ে মুখে চুনমাখা জোকারটা এসে হাতিগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল ভেতরে, নানান রকম অঙ্গভঙ্গি করে আবহাওয়া হালকা করে দিয়েছিল। আমি জোকারকে দেখে হাততালি দিয়েছিলাম।

এই যে জোকার—সারাক্ষণ ডিগবাজি খেয়ে বেড়ানো, ট্রাপিজ থেকে পড়ে গেল হাত ফসকে (ভাগ্যিস জাল পাতা ছিল নিচে), উল্টে গেল ঘোড়া থেকে, প্রচণ্ড প্রহার খেলো সকলের হাতে—আশ্চর্য হয়েছিলাম একদিন সকালে ওকে খেলা শেখাতে দেখে। ঠিক খেলা শেখানো নয়, প্র্যাকটিস চলছিল। প্রথমে লোকটাকে চিনতে পারিনি শেখাতে শেখাতে এক সময় ও হঠাৎ সেই কণ্ঠস্বর বার করে বললো, রিপীট। তাঁবুর ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে এই দৃশ্য দেখে আমি তো হতভম্ব। তবে কি ওই আসল রিং মাস্টার? বাকি সব শেখানো পুতুল? সেদিন আমার মন থেকে একটা বিশ্বাস ঝরে গেল। সেই থেকে আমি কোনো বিদূষককে সম্পূর্ণ বিদূষক ভাবতে পারিনি। বরং খুঁজতে চেয়েছি তার মধ্যেকার শক্ত সক্ষম লোকটাকে—যে খেলোয়াড়দের খেলোয়াড়। তারপর বড় হয়ে আমার ধারণার সমর্থন পেয়েছি ঢের। বুঝতে পেরেছি, যারা সেই অর্থে ভাঁড়ামি করে লোক হাসায়, তাদের নিজেদের জীবনের হাসির বিষয় খুব বেশি নেই। তারা প্রত্যেকে ওস্তাদ খেলোয়াড়।

পরে শুনেছিলাম, এ জোকার নাকি এক সময় বুকে হাতি রাখতো। একবার হাতি নামতে দেরি করে ফেলেছিল, নিশ্বাস পড়ে গিয়েছিল ওর। তার ফলে গুঁড়ো হয়ে

ত্রিশঙ্কুর সার্কাস

গিয়েছিল বুকের ভেতরকার হাঁড়পাজরা। মরে নি কপালের জোরে। এখন জোকার হয়ে খেলা দেখায়। অনেকদিন ঘুরঘুর করে জোকারের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। ও আমায় চিনেবাদাম খাইয়েছিল। তাঁবুর ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল আয়না-লাগানো গ্রীনরুমে, যেখানে খেলোয়াড়রা সাজগোজ করে। আরো ভিতরে—যেখান থেকে সার্কাসের জন্তু জানোয়ারদের এরিনার মধ্যে ঢুকতে হয়। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা আমার এত রহস্যময় মনে হয়েছিল—এই জন্তু জানোয়ারদের সঙ্গে মানুষদের বসবাস, সবাই খেলোয়াড়—যে ইচ্ছে হয়েছিল আমি ওদের দলে ভিড়ে যাই।

অথচ যেদিন জোকার আমায় সত্যি সত্যি জিগ্যেস করলো—খোঁখাবাবু, সার্কাসকা খেল শিখেগা? আমি যেন একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। মুন্সেফবাবুর মেয়ে টুকুর সঙ্গে আলোচনা করলাম, ও বললো, যাসনি, তোর মা-বাবা ভীষণ বকবে, ভীষণ মারবে। একথা বলিসনি কাউকে। আসলে ওরা ছেলেধরা। চুরি করে নিয়ে গিয়ে তোকে দিয়ে চাকরের কাজ করাবে। হাতির নাদ পরিষ্কার করাবে।

স্বভাবতই আমি ঝুঁকি নিতে চাই নি। হতে পারে জোকারের প্রস্তাবটাও ছেলেখেলা গোছেরই ছিল। তবু টুকুর পরামর্শে একটা সুযোগ হারানোর দুঃখ আমার মনের মধ্যেই রয়ে গেল। এ দুঃখের কথা কোনোদিন কাউকে বলিনি, আমি বলতে পারবো না। যেদিন সার্কাস পার্টি তাঁবু গুটিয়ে মাঠ ছেড়ে চলে গিয়েছিল, সেদিন লুকিয়ে কেঁদেছিলাম জানলা ধরে।

সমস্ত বাল্যকাল ও কৈশোর জুড়ে একটা দৃশ্যের স্মৃতি আমায় হানা দিয়েছে বারবার। সার্কাসের এরিনা—তার মধ্যে সার-সার হাতিদের পিরামিড, মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড দাঁতওলা হাতি সবার নেতা—শুঁড় তুলে দর্শকদের অভিবাদন করছে। আর গোল গ্যালারি ভর্তি মেয়ে পুরুষ—তার মধ্যে মুন্সেফবাবুর মেয়ে টুকু—আনন্দে উচ্ছল, হাততালি দিয়ে খেলার প্রশংসা জানাচ্ছে। আমার মনে হয়েছে, ওই হাতিটার মতো কোনো শক্ত খেলা দেখাতে পারি না, যা দেখে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক লাফিয়ে উঠবে খুশিতে? অন্তত বুকের হাড়-পাঁজরা ভাঙা জোকারটার মতো উল্টে-পাল্টে, হাত ফসকে, হাসাতে পারি না।

কিন্তু আমি তো খেলা শিখিনি। ভালো করে না শিখে কি কোনো খেলা দেখানো যায়। গুরুর কাছে তালিম নিতে হয় মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, তবে তো সম্ভব। শুধু একটা খেলা হয়তো গোপনে শেখা যায়—চুপচাপ, কেউ জানতে পারে না। একজন গুরুর কাছে বা গুরু বদলে-বদলে—তাতে ক্ষতি হয় না কিছু। এমন কি গুরুদের মাথা ডিঙিয়ে লাফিয়ে গেলেও তার অসম্মান করা হয় না—সে হোল, এই লেখা-লেখা খেলা। সেই অর্থে হয়ত এটা খেলা নয়, নিজেকে খেলানো। নিজেকে উল্টে-পাল্টে দেখানো পাঠকদের সামনে। এবং সেই জন্যেই গ্যালারির হাততালিগুলো তত সশব্দ নয়। না হলে আসে যায় না তেমন, কারণ নিজেকে খেলিয়ে একটা আনন্দ আছে—এক ট্রাপিজ থেকে লাফিয়ে আরেক ট্রাপিজে যাওয়ার আনন্দের চেয়ে কিছু বেশি।

আজ তাই পাততাড়ি গুটোবার সময় আমি জিগ্যেস করবো না—ত্রিশঙ্কুর কোন্ খেলাটা আপনাদের ভালো লাগলো? জোকারের খেলা, না হাতির খেলা? না মুন্সেফবাবুর মেয়ে টুকুর পাশে বসে থাকা একটা ছেলের বুকের ওপর দিয়ে সারিবন্দী হাতি-ঘোড়া-জেব্রা-ভাল্লুক - বাঘ - সিংহ—ওদের চলে যাওয়ার খেলাটা?

বিশ্ব বিজ্ঞান

চন্দ্রলোক যাত্রার পথে নতুন পদক্ষেপ

গত ১১ অক্টোবর মার্কিন মহাকাশযান 'অ্যাপোলো-৭' (৬·৩ টন ওজন, ২২৪ ফুট লম্বা। তিনজন যাত্রী নিয়ে মহাশূন্যে উড়ে গিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে ভূকেন্দ্রিক কক্ষপথে পরিক্রমা শুরু করে। অ্যাপোলো-স্যাটার্ন-১বি রকেটের উদ্ভাবক ভার্নার ভন ব্রন। কার্যসূচী অনুসারে সেটির মহাকাশচারণা ১১ দিনে শেষ হবার কথা। অ্যাপোলো-৭ মহাকাশযানকে কক্ষপথে উৎক্ষিপ্ত করে বিশাল একটি স্যাটার্ন-১-বি রকেট যার

বর্তমান সংখ্যায় জন্ড-৫ সম্পর্কে আলোচনা করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু অ্যাপোলো-৭ সাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বলে সে সম্পর্কেই আলোচনা করা হল। জন্ড-৫ সম্পর্কে পরবর্তী সংখ্যায় আলোচনা করা হবে।

ক্ষেপণের ঘাতের পরিমাণ হচ্ছে ১৬ লক্ষ পাউন্ড। ভারতীয় সময় পূর্বাহ্ণ আটটা ৩৩ মিনিটে তাঁরা পৃথিবী থেকে যাত্রা করেন। যাত্রার আড়াই মিনিট পরে রকেটের প্রথম পর্যায় , (ভাগ) খসে পড়ার পর মিঃ শিরা জানান যে, দ্বিতীয় পর্যায়ে রকেটটি একটু ঝাঁকুনি খেতে খেতে চলছিল (যেমন পুরানো ডাকোটা বিমানগুলি চলে আমাদের দেশে—লেখক): দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিচালক ইন্ধন ছিল তরল হাইড্রোজেন যার তাপমাত্রা প্রায় নিরিকল্প শূন্য ডিগ্রী অর্থাৎ ১৭৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড যাতে তাপ উৎপন্ন হতে পারে না। অ্যাপোলো-৭ মহাকাশযানের ১১ দিন ভূপ্রদক্ষিণ করার কথা। (মোট ১৬৫ বার এবং ৪৫০০০০০ মাইল।) এই পরিকল্পনা সফল হলে মানুষ যাত্রী নিয়ে আমেরিকার পক্ষে মহাকাশ পরিক্রমার ঘণ্টার যোগফল হবে ৭৮০ ঘণ্টা অর্থাৎ রাশিয়ার চেয়ে বেশি। গত বছর জানুয়ারীতে প্রথম মানুষবাহী অ্যাপোলো মহাকাশযানটিতে মহড়ার সময় আগুন ধরে যাবার ফলে তিনজন মহাকাশযাত্রীর অপঘাত মৃত্যু ঘটেছিল বলে সেই বিপদের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেইজন্য রকওয়েল থেকে বিশিষ্ট মহাকাশযানের ইঞ্জিনীয়ার উইলিয়াম বার্গেনকে নিয়ে আসা হয় এবারকার মহাকাশযানটিতে কিছু কিছু অদল বদল ও সংশোধন করার উদ্দেশ্যে। আশা করা যায় যে, সেরকম দুর্ঘটনা আর ঘটবে না এবং যাত্রীরা নিরাপদে ফিরে আসবেন তাঁদের সমস্ত কর্তব্য সমাধা করে। আমি প্রবন্ধে প্রতিটি ক্রিয়াপদে ভবিষ্যৎকাল ব্যবহার করছি। তবে এ লেখা যখন ছেপে বার হবে তখন এই ভবিষ্যৎগুলি সম্ভবত অতীতে রূপান্তরিত হবে।

বিজয়ী মহাবৈমানিক তিনজন : আইজেল, শিরা ও কানিংহাম

উড়ে যাবার মাত্র ১০½ মিনিট পরে শিরা বেতারে জানান যে মহাকাশযানটি ঘণ্টায় ১৪০০৫ মাইল বেগে তার যে ভূকেন্দ্রিক কক্ষপথে প্রবেশ করছে পৃথিবীর থেকে তার উচ্চতা ২২৪ থেকে ২৭৮ কিলোমিটার (১ কিলোমিটার=⅝ মাইল অর্থাৎ ৫ ফার্লং) অর্থাৎ ১৪০ থেকে ১৭৪ মাইল উঁচু। যদিও পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে তার কক্ষপথ হওয়ার কথা ছিল ২২৭ থেকে ২৮২ কিলোমিটার (১৪২ থেকে ১৭৬ মাইল) উপরে। কিন্তু এইটুকু ত্রুটি নেহাতই তুচ্ছ।

এই তিনজন মহাবৈমানিক দ্বিতীয়বার পৃথিবী পরিক্রমার সময় হাওয়াই দ্বীপের উপরের আকাশে রকেটের ৬২ ফুট দীর্ঘ উপর দিকের পর্যায় থেকে তাঁদের যানটি আলাদা করে নেন। তাঁরা তো কেবল যাত্রী নন। তাঁরা একাধারে যাত্রী ও চালক। তারপর অ্যাপোলো-৭-এর বর্মের মত খোলসটি কমলা লেবুর খোসার মত খসিয়ে দেওয়া হয়। যানের মধ্যে যে ছোট ছোট জেটচালিত ঘাতযন্ত্র (থ্রাস্টার) সন্নিবিষ্ট সেগুলির ঠেলায় সেটি রকেটের ওই বিচ্ছিন্ন প্রথম পর্যায় থেকে দূরে সরে যায়। তারপর শিরা অ্যাপোলো যানটি ১৮০ ডিগ্রী পাক খাইয়ে সেটি এমনভাবে পরিচালিত করেন যেমন করতে হবে চাঁদে নামবার যানের সঙ্গে চন্দ্রপ্রদক্ষিণকারী মহাকাশযানকে একেবারে ডগায় ডগায় যুক্ত করার সময়। সেই সময় শিরা অ্যাপোলোকে তার পরিত্যক্ত বর্মের ৪।৫ ফুটের মধ্যে নিয়ে যান। এইজন্য এটা করা হয় যে চন্দ্রলোকে যাত্রার পথে অ্যাপোলো মহাকাশযানকে চাঁদে পাঠাবার এক চতুষ্পদ যানের সঙ্গে মুখোমুখি যুক্ত অবস্থায় যেতে হবে।

তৃতীয় দফা ভূপ্রদক্ষিণে অ্যান্টিগুয়ার উপর দিয়ে ভেসে যাবার সময় শিরা অ্যাপোলোর গতিবেগ কিছুটা বাড়িয়ে দেন গত ১২ তারিখে রাত্রি আড়াইটার সময় স্যাটার্ন রকেটের দ্বিতীয় পর্যায়ের সামনে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে পৌঁছবার জন্য। গতিবেগ বৃদ্ধির সময় ২টির মধ্যে দূরত্ব ছিল ৮৩ মাইলের মত। দ্বিতীয় পর্যায়টি আলাদা করে দেওয়া হয় বেতার কৌশলে।

এই প্রসঙ্গে যে বিষয়টি লক্ষনীয় তা হচ্ছে এই যে, অ্যাপেলো মডেলের মহাকাশযানের একটি অন্যতম বিশেষত্ব হচ্ছে যে সেগুলিতে কোন বেগ কমাবার পাল্টা রকেট (রেট্রো-রকেট) নেই। এর আগেকার একজন যাত্রীবাহী ৬টি মার্কারী মহাকাশযান এবং ১০টি ২ জন যাত্রীবাহী জেমিনী মহাকাশযানে ওই রকম বেগমন্দায়নের রকেট বসানো ছিল কক্ষপথে মহাকাশযানের বেগ কমিয়ে (উল্টোদিকে ঘাত দিয়ে) তাকে কক্ষচ্যুত করে নির্দিষ্ট দিকে ও বেগে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে নামিয়ে আনার জন্য। কিন্তু অ্যাপোলোতে সেরকম কোন কলকৌশল নেই কারণ ওই মডেলের মহাশূন্যতরী ভূকেন্দ্রিক কক্ষপথে না থেকে সেকেন্ডে ১১·২ কিলোমিটার বেগে (দ্বিতীয় মহাজাগতিক বেগ) চন্দ্রকেন্দ্রিক কক্ষপথে চলে যাবে এবং সেখান থেকে চাঁদের জমিতে চতুষ্পদ যানটি নামিয়ে দেবে। সুতরাং বেগমন্দায়নের রকেটের প্রয়োজন হবে না।

কিন্তু তাহলে যাত্রীরা চাঁদ থেকে পৃথিবীতে ফিরবেন কি করে সেটাও তো একটা সমস্যা? সে সমস্যার সমাধান করার জন্য অ্যাপোলো-৭ মহাকাশযানে অন্যরকম কল-কৌশল সন্নিবেশ করা হয়েছে। যার সার্থকতা পরীক্ষা করাও এবারকার যাত্রার একটি উদ্দেশ্য। চাঁদ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যানটির ৯·৮ টন ওজনের প্রধান এঞ্জিন (যাকে বলা হয় "সার্ভিস প্রোপালশান সিস্টেম") তাকে বিপুল বেগে পৃথিবীর দিকে নিয়ে আসবে। মনে হবে যে ওই পথে এবং ওইভাবে চললে যানটির পৃথিবীর সঙ্গে বুঝি সাংঘাতিক সংঘর্ষ হবে। কিন্তু তা হবার কথা নয় কারণ মাঝপথে প্রয়োজনমত জায়গায় পেঁছে ওই এঞ্জিনটির সাহায্যেই যানের গতি-দিক সংশোধন করে তাকে ইচ্ছামত দিক থেকে পার্থিব আবহমণ্ডলে নামিয়ে আনা সম্ভব এবং পরিকল্পনা ঠিক এইসব দিক বিবেচনা করেই রচনা করা হয়েছে যদিও চাঁদের রাজ্যে যাওয়া, অ্যাপোলো-৭-এর কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়। অন্তরীক্ষযানটির শুধু পৃথিবীকেই প্রদক্ষিণ করার কথা ১৬৪ বার এবং ১৬৫-তম বারে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে নেমে পৃথিবীর থেকে যাত্রাকালের ১০ দিন ২১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট পরে তার অতলান্তিক মহাসাগরে বারমুদার ২০০ মাইল দক্ষিণে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা। সেই প্রত্যাবর্তনের তারিখ ২২শে অক্টোবর এবং ভারতীয় সময় অনুসারে বিকাল ৪টে ৪৩ মিনিটে। তারপর নিকটস্থ জাহাজ এক্সে জাহাজ ও যাত্রীদের উদ্ধার করবেন। ২ জন যাত্রী নিয়ে জেমিনী-১২ মহাকাশ পরিক্রমা করে আসে ১৯৬৬ সালের ১১ থেকে ১৫ নভেম্বর। তারপর আবার মানুষ যাত্রীবাহী মার্কিন মহাকাশযানের তিনজন যাত্রী নিয়ে মহাকাশ পরিক্রমার এই নতুন দৃষ্টান্ত ঘটল ২৩ মাস পরে। প্রথম অ্যাপোলো তিনজন যাত্রী সহ যদি ১৯৬৭ সালের ২৭ জানুয়ারী পুড়ে না যেত তাহলে মানুষযাত্রী সহ দুটি মহাকাশযানের অন্তরীক্ষ যাত্রার মধ্যে এতটা ব্যবধান থাকত না। কোমারফের অপঘাত মৃত্যুও সামগ্রিক বিচারে দেশনির্বিশেষে মানুষের মহাকাশ পরিক্রমার ক্ষেত্রে এই ব্যবধানের আর একটি কারণ।

বিপরীতমুখী রকেট না থাকলে অ্যাপোলো কোন পৃথিবীতে ফিরবে কিসের জোরে? আগেই বলেছি 'সার্ভিস প্রোপালশানের' সাহায্যে। সেটা কি ব্যাপার এবং অ্যাপোলো-৭ যখন ভূকেন্দ্রিক কক্ষপথেই থাকছে তখন বেগ কমাবার রকেট বাদ দেওয়াই বা কেন? এইজন্য যে চাঁদের রাজ্যে যাতায়াতের ক্ষেত্রে এই যান্ত্রিক কৌশলে সাফল্য লাভ করা যাবে কিনা সেটা আগে থাকতে পরীক্ষা করে দেখা। বিপরীতমুখী রকেটের বদলে যে যন্ত্রকৌশল ব্যবহারের কথা বল্লাম তা হচ্ছে কতকগুলি জেট-চালিত

এই দুই কিলো ওজনের টেলিভিশন ক্যামেরার সাহায্যে মহাকাশে অ্যাপোলো-৭ থেকে চিত্রমালা পাঠানো হয়। রেডিও কর্পোরেশন অফ আমেরিকার কর্মী মিঃ ডিক ডার্নাফ (যাঁর হাতে ক্যামেরাটি রয়েছে) এই দূরবীণের উদ্ভাবক। পিছনে অ্যাপোলো-৭

গ্যাস-এঞ্জিনের সমষ্টি। সেগুলি সময় ও প্রয়োজন অনুসারে যানের গতি সংশোধনের জন্য ছোঁড়া হবে। মহাজাগতিক যাত্রীরা সেগুলির নাম দিয়েছেন "দহন" (বার্ন)। চাঁদে যাবার ও আসবার সময় গতিদিক সংশোধনের জন্য সেগুলিকে বেশ বারকতক চালু করতে হবে। অ্যাপোলো-৭ এর মহাশূন্য পরিক্রমায় ৮ বার দহনের প্রয়োজন হবে বলে বৈজ্ঞানিকরা ধারণা করেন। সেগুলির মেয়াদ আধ সেকেণ্ড থেকে ৫৭ সেকেণ্ড পর্যন্ত ওঠানামা করার কথা যার ফলে অ্যাপোলোর কক্ষপথ প্রতিবারই অল্প-স্বল্প বদলে যাবে। ১৬৪-তম ভূপ্রদক্ষিণের সময় দহন হবে ১০ সেকেণ্ড যা যানটিকে কক্ষচ্যুত করে আবহমণ্ডলে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম। মহাকাশ পরিক্রমার সময় কয়েকটি দহনের পরেই এঞ্জিনটিকে এক নাগাড়ে ঘণ্টাকতক সূর্যমুখী অবস্থায় রাখার নিয়ম যাতে সেটি সৌর তাপে ১২০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত গরম হতে পারে। বাকি সময় এঞ্জিনটির মুখ থাকবে ছায়ার দিকে অর্থাৎ মহাশূন্যের প্রচণ্ড ঠাণ্ডার দিকে যার ফলে দহনের মুখে তার তাপাঙ্ক দাঁড়ায় প্রায়—১৫৫ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড। তাছাড়া পরিকল্পনা অনুসারে প্রতি ১ বা ২ দিনে যন্ত্রকৌশলটি একবার করে চালু করার ব্যবস্থার দরকার বলেই প্রায় ১১ দিন মহাকাশ পরিক্রমার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই এঞ্জিনগুলির সাফল্যের উপরই আমেরিকার প্রথম যাত্রীবাহী মহাকাশযানের চন্দ্রলোকে যাত্রা প্রধানত নির্ভর করে। দহনের ২০৫০০ পাউণ্ড ঘাতসম্পন্ন বৃহত্তম রকেটটি গত ১২ তারিখে শিরা চালু করে পরীক্ষা করেন।

আর একটি কৃতিত্বের বিষয় এই যে, অ্যাপোলো-৭-এর গতি ও কার্যকলাপ পৃথিবী থেকে স্বয়ংক্রিয় কৌশলের উপর নির্ভরশীল নয়। স্বয়ং যাত্রীদেরই অবস্থা বুঝে জাহাজটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে। অত্যন্ত দুরূহ কাজ সন্দেহ নেই; মোট ৮টি দহনের ফলে অ্যাপোলোর সর্বোচ্চ কক্ষপথ ছিল পৃথিবী থেকে ৪৪৮ কিলোমিটার উপরে। যাত্রীদের আর একটি কর্তব্য ছিল ছোট একটি টেলিভিশন ক্যামেরা ও যোগাযোগ উপগ্রহের সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের মাথার উপর দিয়ে যাবার সময় শনিবার (১২ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে আটটা থেকে কয়েক মিনিট টেলিভিশন চিত্র ওই উপগ্রহের মারফত পৃথিবীতে টেলিভিশনের পর্দায় প্রতিফলিত করা এবং তারপর থেকে প্রতিদিন ১০ মিনিট করে টেলিভিশন চিত্র দেখানো। মহাকাশচারীদের যে কার্যসূচী দেওয়া হয় তার শতকরা ৯০টি শেষ করে ফেলার জন্য সময় দেওয়া হয়েছিল ৪৮ ঘণ্টা অর্থাৎ ২ দিন। কারণ তারপরে তাঁরা কিছুটা অবসাদ বা ক্লান্তি বোধ করতে পারেন—কার্যসূচীর অধ্যক্ষ মিঃ শ্নাইডারের এই হচ্ছে অভিমত। তবুও পরিক্রমার মেয়াদ ১১ দিন করা হয় কারণ চাঁদে গিয়ে ফিরে আসতে অন্তত এক সপ্তাহ লেগে যাবে। মহাকাশ যাত্রীদের প্রতিদিন ১৬ ঘণ্টা জেগে থাকা এবং ৮ ঘণ্টা ঘুমানোর কথা।

এবার রকেটের শক্তিদাতা ইন্ধনের সম্পর্কে ২।৪ কথা বলা দরকার। স্যাটার্ন-১-বি (২২ তলার সমান উঁচু) রকেটের প্রথম পর্যায়ে ছিল ৪২০০০ গ্যালন সরেশ কেরাসিন তৈল ও নির্বিকল্প শূন্যে ডিগ্রী তাপাংকের তরল হাইড্রোজেন এবং দুটি পর্যায়েই দহনক্রিয়ার জন্য প্রচুর তরল অক্সিজেন ভরে দেওয়া হয়। মার্কিন বিজ্ঞানীদের মতে ইন্ধন হিসাবে হাইড্রোজেন ব্যবহারে তাঁরা রাশিয়াকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। প্রকৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকরী রাসায়নিক মূল পদার্থ হচ্ছে হাইড্রোজেন। আমেরিকা ১৯৬০ সালে প্রথম হাইড্রোজেন রকেট নির্মাণ করে। সেগুলি বহুবার মহাকাশ ভেদ করে নির্দিষ্ট পথে গিয়েছে (যেমন সেণ্টর রকেটের এবং অ্যাপোলো-৭-এর সামনের দিকের পর্যায়।) আমেরিকার পরমাণু শক্তিচালিত রকেট নিয়ে গবেষণা চলে আসছে গত ১০ বছর কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন যে ওই রকম রকেট বাস্তবে রূপায়িত করতে আরো ৫।৭ বছর লাগবে। মানুষের চন্দ্রলোকে যাত্রার জন্য যে অ্যাপোলো-স্যাটার্ন-৫ রকেট তৈরি ও পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে সেগুলি ৩৬৩ ফুট লম্বা, ওজনে ১ লক্ষ পাউণ্ড।

স্যাটার্ন-৫ রকেটের ঘাত-শক্তি ৭৫ লক্ষ পাউন্ড। আমেরিকানরা বলেন রাশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী রকেটের ঘাতশক্তি—যতদূর জানা যায়—৩৫ লক্ষ পাউন্ডের বেশি নয়। এ পর্যন্ত দুটি যাত্রীবিহীন মহাকাশযানের ৪টি উৎক্ষিপ্ত করে স্যাটার্ন-বি-১ এবং ২টি স্যাটার্ন-৫।

অ্যাপোলো-৭-এর যাত্রীদের কেবিন (কম্যান্ড মডিউল) ১২ ফুট লম্বা ও মেঝেতে ১৩ ফুট চওড়া। ওইখানেই রয়েছে সমস্ত কিছু পরিচালনার কলকৌশল যেগুলির সাহায্যে যাত্রীরা ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে ২০ দফা কার্যসূচীর ১৪টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সমাপ্ত করেন। বাকি ৬টির গুরুত্ব অনেক কম এবং সেগুলি করতে না পারলেও আবার একবার যাত্রার প্রয়োজন হবে না। কেবিনটি ঘনমান ২১০ ঘনফুট। তারই মধ্যে যন্ত্রপাতি, চালকের বসবার কামরা, বেতারযন্ত্র, রান্নাঘর, কলঘর এবং শোবার জায়গা আছে। শোবার জন্য কৌচ আছে কিম্বা ঘুমোবার থলির মধ্যে ঢুকে কৌচের নিচেও শোওয়া যায়। যাত্রীদের সবসময় ধড়াচুড়া পরে থাকার দরকার নেই। কাপটন নামে এক নতুন অগ্নিনিবারক পদার্থ কেবিনটির দেয়ালে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে আগুন লাগতে না পারে। কেবিনে দরকার মত গরম বা ঠাণ্ডা জল পাওয়া যায় এবং আরো নানা সুবিধা আছে। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনকে বৈদ্যুতিক কৌশলে মিশিয়ে জল উৎপাদন করা হয়।

এ পর্যন্ত যতগুলি অ্যাপোলো মহাকাশযান মহাশূন্যে গিয়েছে সেগুলির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মার্কিন বৈজ্ঞানিকরা আন্দাজ করছেন যে এর পরে যাত্রীবাহী অ্যাপোলোর ৫টি চন্দ্রমুখী মহাকাশযাত্রার পরেই এই বছরে ২টি এবং পরের বছর তিনটি এবং প্রয়োজন বোধে আরো দুটি। মানুষ চাঁদের ভূমিস্পর্শ করতে পারবে। ইতিমধ্যে আসছে ডিসেম্বরে বড়দিনের আগে বা বড়দিনের সময়ে অ্যাপোলো-৮ মহাশূন্যে যাত্রা করবে অন্য তিনজন যাত্রী নিয়ে।

ভার্জিনিয়ার ওয়ালপ দ্বীপের উপর একটি হেলিকপ্টার থেকে প্যারাস্যুটের সাহায্যে মহাকাশযানের একটি মডেল বৈজ্ঞানিকদের নিয়ন্ত্রণের আয়ত্তে পূর্ব জায়গায় নেমে আসছে

এবার যাত্রী তিনজনের সম্পর্কে একটু পরিচিতি দিয়ে শেষ করব যাঁদের অধিনায়ক হচ্ছেন শিরা।

শিরা—এবার নিয়ে তাঁর তিনবার মহাকাশ-যাত্রা হবে যা এ পর্যন্ত কেউ করতে পারেনি। ১৯৬৫ সালে যে দুটি মার্কিন মহাকাশযানের মহাশূন্যে সাক্ষাৎ হয় তার একটির চালক ছিলেন তিনি। ওই দুটি যানের মধ্যে ব্যবধান দাঁড়ায় মাত্র ১ ফুট। তার তিন বছর আগে তিনি ১ জন যাত্রীবাহী মার্কারী জাতীয় মহাকাশযান সিগমা-৩ পরিচালনা করেন এবং মহাকাশযাত্রী হিসাবে পৃথিবীতে ৯ম ও আমেরিকায় ৫ স্থান অধিকার করেন। আগেকার দিনে তিনি ছিলেন নৌবহরের বৈমানিক। তাঁর বাবা ইঞ্জিনীয়ার।

আইসেল—মহাজগতের অভিযাত্রী হবার আগে তিনিও ছিলেন নৌবহরের বৈমানিক এবং তখনই তিনি মহাকাশ বিজ্ঞানে এম এস পাশ করেন। তিনি কিছুদিন টেস্ট পাইলট ছিলেন।

কানিংহাম—ক্যালিফোর্নিয়ার র‍্যান্ড কর্পোরেশনের একজন বিজ্ঞানী ছিলেন। এ ছাড়া নৌবহরে তিনি কিছুদিন বিমান চালনা শিক্ষা করেন।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

কুবেরের বিষয়আশয়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আট

চটিরাম বাবনার টাকাটা ফেরত দেওয়ার পর কথাটা বলুকে জানানো গেল না। কদমপুরে এবারে ভালো ধান হবে। সময়মত ঝাইন বৃষ্টি হচ্ছে। সেই বিন্দু কুবেরের গায়ে ফোস্কা পড়ার জোগাড়। ফার্নেস বেড়ে দাঁড়িয়ে তিরিশ টন গলন্ত ইস্পাতের মুখোমুখি দূরের মাঠে বৃষ্টি পড়া দেখতে ভালোই লাগে। তবে বাতাসের সঙ্গে উড়ন্ত চুন ভলো ভাবটা শুষে নিয়ে গায়ে বসছে—আর গা চুলকোচ্ছে।

এবারও অনেকগুলো টাকা গচ্চা গেল তাহলে। বলু কেন, বাড়ির সবাই জানে কদমপুরে এবার বাড়ি-ঘর বানানোর মত একটুখানি জায়গা হচ্ছে। অথচ হচ্ছে না আসলে। মন্দের ভালো, বড়ো সংলোক। বাবনার টাকাটা পুরোই ফেরত দিয়েছে।

কেন যে এই ভজকট ব্যাপারে জড়াতে গেল! এই টাকায় পুরী কি দেওঘর দিব্যি ঘুরে আসা যায়। তাও ঘুরবে না বলু। জমি কিনতেই হবে—সেখানে থাকবার মত একখানা বাড়িও একদিন করতে হবে।

হাতের মরচে-ধরা আঙুলগুলো দেখে একবার ইচ্ছে হল কারখানার ডাক্তারকে গিয়ে দেখায়। কিন্তু এখানকার ডাক্তার পোড়া, কাটা আর থ্যাঁতলানোর ড্রেস শুধু জানে। ড্রাম বোঝাই কালি বানানো আছে। হাত পুড়লে তাতে ডুবিয়ে রাখলে ঠাণ্ডা লাগে। সরল চিকিৎসা। ভদ্রলোক ভালো ফুটবল খেলে।

দেড়টা নাগাদ তিরিশ টন ইস্পাত ভাল-রকম ফুটে উঠল। গরম গরম পাক ক্রেনে ঝোলানো বিরাট বালতিতে নামিয়ে দিয়ে কুবেরের কাজ শেষ হল। একটু আগে বেরিয়ে একটা-পঞ্চাশের ট্রেনটা ছুটতে ছুটতে ধরল। জানলার ধারে বসতে চিরকাল ভালবাসে। সাদা-শার্ট গায়ে একটা লোক সেখানে বসে। আর তিনটে জানলা তিনটে বাচ্চা আগেভাগেই দখল করে আছে।

সাদা শার্টের গায়েই বসল। লোকটার ঠোঁট হাতের আঙুল, গলায় শ্বেতী। কতবার শুনেছে—এসব জিনিস ইনফেকসাস নয়। তবু একটু ফাঁক রেখে বসল। লোকটা গল্পবাজ। নিজেই আলাপ করল। কী মনে হতে জানতে চাইল, 'রোগটা কি?'

শ্বেতীওয়ালা যা বলল তা এই—

ঠিকাদারের সঙ্গে মাঠে মাঠে কাজ মাপত। রোদের আলো নাকি এইসব রোগে চামড়ার শত্রু। আগেকার শভার চিনির বড় বড় দানার মত আমাদের গায়ে কালো রঙের দানা আছে। রোদে সেসব দানা জ্বলে গিয়ে তার ঠোঁটে, গলায়, হাতে এই অবস্থা।

শেষে বলল, 'গোড়াতেই যদি ডাক্তার দেখাতাম—'

'কি হত?'

'প্রথমে ত সামান্য ছিল। ছড়াবার আগে স্পটে অ্যারেস্ট করতে পারতাম।'

কুবের তার আঙুলগুলো উলটে লোকটাকে দেখালো, 'খুব দেরি হয়ে গেছে?'

'কতদিনের?'

বিমল ডাক্তারকে যা বলেছিল তা সবই কুবের ফিরে বলল।

'রোদ বাঁচিয়ে চলবেন—আমাদের মত লোকের বড় শত্রু সূর্য।'

তাকে ঐ লোকটার দলে টানায় কুবের শিউরে উঠল। তার মানে কিছুদিনের মধ্যে কুবেরের হাত-পার আঙুল, গলা, ঠোঁট সবই আস্তে আস্তে রঙ হারাবে—আর ফিরবে না।

ট্রেনের জানলা দিয়ে এদিকে শুধু কার-খানার চিমনি, ছোট ছোট ঢালাই ঘরের কিউপোলা ফার্নেসের টোপর আর ইয়ার্ড দেখা যায়। কদমপুরের দিকে এখনও কার-খানা যায়নি বিশেষ। মাঝে মাঝে কুয়ো খুঁড়ে পেট্রল বের করার সরকারী যন্ত্র-পাতি যায় মালগাড়িতে।

বলু, রজদা ইত্যাদি পরিচিত ইউজুয়াল এলাকা থেকে তাকে একদিন না সরে আসতে হয়। আঙুলের মরচেগুলোর বয়েস এখন প্রায় চার বছর। আরও বছর চারেক পরে হয়ত তার গায়ের রঙের দানাগুলো রোদে-জলে জ্বলে ফ্যাকাশে হয়ে আসবে। তখন আর বলুর সঙ্গে মেশা যাবে না। সব সময় ফুলহাতার শার্ট পরে থাকতে হবে। অথচ জমি দেখতে গিয়ে তাকে কিছু দিন ভীষণ রোদে পুড়তে হচ্ছে। তাও চটিরামের জায়গাটা হল না।

এসপ্ল্যানেডে এসে বাস থেকে নেমে রেডি-মেড জামাকাপড়ের দোকানের শোকেসে একটা নীল রঙের শার্ট দেখে কুবেরের পা আটকে গেল। দারুণ জামাটা। পরলে তাকে রুখাল দেখাবে। কতকাল সঙিন জামাকাপড় পরে না। এতদিন আধুলি এত সাবধানে খরচ করে আজকাল। শুধু মনে হয়: যেদিন থেকে টাকা পয়সা আয় করে আসছে—তখন থেকেই যদি খরচ না করে সব যদি জমাতে পারত তাহলে আজ অন্তত চার-

এদিকে শুধু কারখানার চিমনি

পাঁচ বিঘে জমি ক্যাজুয়ালি কিনতে পারত।

শার্টটা দেখে তার খুব ইচ্ছে হল, কিনে ফেলে। সেই সঙ্গে একটা দাগদার ট্রাউজার। আর একটা চকচকে কালো শু—মাথার চুল ছোট, ডিস্টিংগুইস্‌ড হবে, মেট্রোর সামনে থেকে জওহরলাল নেহরু রোড ধরে সে স্কেট করে এগোবে—হাত দুখানা চলতি দুলুনির সঙ্গে ব্যালেন্স করে বিশাল পাখির ডানার ধারায় দুলবে—যানবাহন সব বন্ধ—ফুটপাথে লোক ধরে না, তখন কুবের সাধুখাঁর মুখে একস্‌টাসির চূড়ান্ত হাসি। ছেলেছোকরারা বলবে, কী ফিগার! কুবের জানে তার ফিগার ভালো নয়। দর্জীর মাপে চাল্লিশ—কিন্তু ঢোলা প্যান্ট পরলেই তার নীচের দিকটা ফ্যাশান ব্যাগ হয়ে যায়।

কিংবা—

ফার্নেস থেকে ভিলাইয়ের স্টিল উইজার্ড সুক সেন, দুর্গাপুরের পি কে পাল বার্নপুরের ডাকসাইটে এক্সপার্ট মার্কা দাঁড়ানো। সালকের কুবের সাধুখাঁ ফার্নেস ডোর উঁচু করে স্যাম্পেল স্পুনে আধ বাটি গলন্ত ইস্পাত বের করে সিলিকা প্লেটে ঢেলে দিল। মাইল্ড স্টিল। ম্যালিয়েবল অ্যান্ড ডাকটাইল।

গলন্ত ইস্পাতটুকু প্লেটে পড়ে আস্তে ঠান্ডা হলে কুবের সেটাকে চোদ্দ পাউন্ড ওজনের হাতুড়ির তিন বাড়িতে দু খণ্ড করল। তারপর ভাঙা জায়গাটায় ইস্পাতের দানার ফরমেশন সেন-পল-মাফেতকে দেখিয়ে বলল, 'পারফেক্ট।'

ল্যাবরেটারিতে পাঠিয়ে দেখা গেল অ্যানালিসিসে কুবেরই ঠিক।

তখন ফার্নেস ইস্পাতের বুকটা নীলাভ আগুনে চেটে চেটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কুবের, সুকু সেন, পি কে পাল আর মাফেট ফাইভ লেগেছে। প্রেসের [illegible] ভেতর দিকের পাগুলো জোড় মিলিয়ে নাচতে শুরু করল—গলায় কোরাস—'পারফেক্ট! পারফেক্ট! মাইটঃ [illegible]!! মানিয়েছেন অ্যান্ড ডাকটাইল!!!'

—

'কী রে?'

আচমকা চড় খেয়ে ফিরে তাকালো কুবের। এসপ্লানেড ভর্তি লোক। তার বুক-পকেটে ঘামে ভেজা সুতোয় পেঁচানো ফার্নেস গ্লাসের মাথা উঁকি দিচ্ছে। চুলে বোধ হয় ফার্নেসের চুন লেগে আছে। সামনে একখানা হাসি মাখানো মুখ, 'খুব রেসপেকটেবল হয়ে গেছিস—চেনাই যায় না। সেই হ্যাগার্ড লুক কোথায়!'

কুবের একটুও চিনতে পারল না। কোথায় আলাপ করেছিল। কলেজে? রেলে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে? স্কুলে নিশ্চয় নয়। প্ল্যাটফর্মে?

কুবেরের পা টিপে বলল, 'মোটাও হয়েছিস। ভাল কথা, তুই নাকি জমিজমা কিনেছিস খুব—কোথায় আছিস—বাড়ুল টু পাইস হয়?'

স্কুলেরই। সনৎ। চিনতে পেরেছে—খালিশমারির নগেনের বড় ছেলে সনৎ। খেয়া পার হয়ে স্কুলে আসতে। কী চেহারা হয়ে গেছে! কথা না বাড়িয়ে বলল, 'চল—শরবত খাব ব্যালি সিং-এ।'

'হসপিটালিটি? চলো।'

শরবত ছাড়াও আরও কিছু খেলে ভালো হত। কিন্তু সনৎ সুদ্ধ বিল চড়ে যাবে।

'কত মাইনে পাস?'

'শ' দুই', তিন শ' টাকার ওপর কমিয়ে বলল কুবের। সনতের যা চেহারা হয়েছে, তাতে সত্যি বললে ওর গায়ে লাগত।

'অনেক! আমায় একটা কাজ দেখে দে না—শ' দেড়েক হলেও চলবে।'

'কতদূর পড়লি?' দেখা হয়নি বহুকাল। কুবের আন্দাজে ঢিল ছুঁড়তে থাকল। ক্লাশের ফার্স্ট বয়, লাল টকটকে গায়ের রঙ, হেড স্যার বলতেন—'ফলো সনৎ—সনৎকে ফলো করো সবাই।'

সেই সনৎ! হাতের আঙুলে উপড়ে করে আর একবার দেখলো কুবের। আজই ট্রেনের

আমি আর তুই দুজনে সাইকেল রিকশায় ফেরিঘাটে চলে গেলাম

লোকটা বলেছে, সূর্যই আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। দোকানের ভেতরটা ছায়া।

'আই এস-সিতে গিয়ে এমন আটকে গেলাম—ছ' ছটা ভাইস চ্যান্সেলার হজম হয়ে গেল—আমি কিন্তু এক জায়গাতেই।'

'জমিজমা কিনেছি কে বলল?'

'খবর পৌঁছয়। আমাদের বাড়ি বিজন মুহুরীর ছিল মনে আছে—সে ত এখন তোদের সেই জায়গার সাবরেজিস্ট্রি অফিসে বসে। তোকে দেখেছে কাগজপত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে।'

'আচ্ছা সনৎ—একদিন দুপুরের কথা তোর মনে পড়ে?'

'কবে?'

'ফার্টিফোরের সামারে—বীরেন লস্কর স্যারের ফেয়ারওয়েলের আগের দিন, ক্লাশ এইটে আমি আর তুই দু'জনে সাইকেল রিকশায় ফেরিঘাটে চলে গেলাম—'

'আমার হাতে বাবার সাদা তামাক কেনার টাকা, তোর কাছে র‍্যাশন আনার ব্যাগ, টাকা—'

'ফেয়ারওয়েলের প্রাইজ কেনার টাকাও ছিল—'

'লরি লরি সৈন্য যাচ্ছিল—'

'টিফিনে বেরিয়ে সেভেনথ্ পিরিয়ডে ফিরে এলাম আমরা।'

সনৎ হাসতে হাসতেই বলল, 'ফেয়ারওয়েলের ধুমধামে কেউ আর কিছু বলল না সেদিন। নয়ত হেড স্যার লম্বা করে দিত।'

'তারপর তো তুই দেশের বাড়ি চলে গেলি। বম্বিং-এর ভয়ে সেখানে ভর্তি হয়ে গেলি—আমরাও বছর দেড়েকের ভেতর কলকাতায়—'

'একবার দেখা হয়েছিল—তোরা যেদিন প্ল্যাটফর্মে ট্রেনে উঠতে এসেছিস—'

'কোথায়? আমি তো দেখিনি—তোকে সনৎ?'

'সামনেই যাইনি। আমরা সেদিন দেশের বাড়ি থেকে শহরে ফিরে আসছি—তোর চেহারা কী খারাপ হয়ে গেছে—ন্যাড়া, এমনিতেই হ্যাগার্ড দেখতে ছিলি, আরও বিচ্ছিরি হয়ে গেছিস—'

'কেন জানিস?'

সনৎ অবাক হয়ে তাকাল, 'বাঃ! এতকাল পরে কি করে জানব?'

কুবের অনেক কিছু মনে করার চেষ্টা করল। কিছুই মনে করতে পারল না। শেষে বলল, 'আচ্ছা, সেদিন প্ল্যাটফর্মে দেখেও এলি নে কেন?'

সনৎ হাসতে হাসতেই বলল, 'এখন এত ছেলেমানুষি মনে হবে বলে হাসি পাচ্ছে। কেননা, এখনো তো আমি প্রায়ই যাই—কত লোক যায়, কেউ কেয়ারও করে না—'

কুবের চুপ করে তাকিয়ে আছে, আয়নায় কালো শার্টটা দেখা যাচ্ছে না। সনৎ অ্যাট ইজ বলল, 'দেশে ফিরেই হপ্তা দুই বাদে তোদের বাড়ি গিয়েছিলাম—বারান্দা থেকেই তোর দাদা হাঁকিয়ে দিল—রীতিমত থ্রেটেনিং—আমি তো ভড়কে গেলাম। কী হল। শেষে ভয় হল, তুই কি এতই কাঁচা—সব বলে ফেলেছিস—?'

'আচ্ছা, তারপর তোর কিছু হয়নি?'

'কি হবে? কতবার গেলাম—'

কুবেরের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। একদিন দুপুরের কাণ্ড তার কত কি গণ্ডগোল করে দিল।

'যাঃ। গ্রেড করে দিচ্ছিস চারদিক! বিয়ে করেছিস?'

কুবের মাথা নাড়ল।

'ছেলেপিলে?'

'একটা ছেলে—তোর? মানে, বিয়ে করেছিস?'

'কবে! কিন্তু, মাইরি বউটাই আঁটকুড়ো—' একটু থেমে নিজেই বলল সনৎ, 'এক দিক দিয়ে ভালো—নো রিস্ক ফল গেইন!'

কুবের চুপ করেই ছিল। খালি পেটে সরবৎ নড়ে গা ঘোলাচ্ছে। কথা না বলে বাড়ি চলে গেলে ভালো হত। পাহাড়ী দেশে একরকম জন্তু আছে—তার খানিকটা কেটে খেলেও আবার গজায়—আবার খাওয়া যায়। আয়নার দিকে পিঠ ফিরিয়ে সনৎ বসে। কথা বলছে, মুখের ভেতরটা অনেক দূর দেখা যাচ্ছে—কালচে, কেমন খাওয়া খাওয়া পোকায় কাটা।

'তবে অন্য জায়গায় যাস কেন?'

'এক গ্লাস শরবতে এত কথা হয় না। কি খাবি বল?'

'পকৌড়া নে।'

টমেটোর সস্ মাখিয়ে একটা বড়া অনেকক্ষণ ধরে তারিয়ে তারিয়ে চিবিয়ে বলল, 'ভাল লাগে। হবিষ্যির পর মুখ ফেরায় না কে?' সনৎ নিজেই বলে গেল, 'বিয়ে দিয়ে বাবা স্বর্গে রওনা হলেন। মা গিয়ে মামাবাড়ি উঠল। এক বউ নিয়ে কতকাল কলকাতার ভাড়াটে খোপে নতুন লাগে তুই বল?'

'ডাক্তার দেখালে পারিস—অনেক বেশী বয়সে কনসিভ করে।'

'মানে?'

'বেশী বয়সে গর্ভ হয়। কতরকম চিকিৎসা হয়েছে আজকাল—'

সনৎ থামিয়ে দিল, 'বেশ আছি। ডাক্তারের কাছে গিয়ে কি হবে—', এ ব্যাপারে আর কথা বাড়াতে না দিয়ে সনৎ বলল, 'দে না মাইরি একটা চাকরি, শ' দেড়েক হলেই চলবে—এক কেয়ারটেকারের অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে আছি—দোবেলা ফ্রক পরা বুড়ি-ধাড়ির মড়া বাক্সে ভরছি, পার ক্রস টাকায় তিন পয়সা কমিশন—'

'মাইনে নেই?'

'সে বেলায় টাইট! অ্যালাউন্স—মানে জলখাবার, আর ট্রামের একখানা অল সেকশন মান্থলি। তুই বল কুবের, টাকায় তিন পয়সা হলে কত লোক মরলে তবে মাস গেলে এক শ' টাকা হয় আগে তবু সবাই বেলেপাথরের ক্রস দিত, আট দশ টাকার ভেতর হয়ে যায়। তারপরও কম্পিটিশন। নতুন নতুন লোক ব্যবসায় এসে স্রেফ কাঠের ক্রস পাঁচ টাকার ভেতর ছাড়ছে—নিজেদের পায়েই কুড়ুল মারছে—'

কুবের পুরো ব্যাপারটা শর্টকাট করার জন্যে বলল, 'তবু প্রিয়জন মরলে লোকে একটা স্থায়ী জিনিসই বানায়। দেখবি কাঠের জায়গা পাথর আবার দখল করে ফেলবে। পাথরের মত আবার জিনিস আছে নাকি। কেটে কেটে নাম লিখে রাখো—শ্যাওলা পড়লেও জেগে থাকবে—'

সনৎ এসব কিছুই শুনতে পায়নি। ছোট্ট নাক দিয়ে গরম জল ছেটাতে ছেটাতে একটা ডবল ডেকার এসে শব্দ করে ব্রেক কষলো। প্যানিক প্যাসেঞ্জারেরা পাড়মরি করে নামছে।

সেই গণ্ডগোলের ভেতরেও সনৎ শুরু করে দিল, 'গত চোতের আগের চোতে স্মলচিকেন মিলিয়ে তালতলা, কিড স্ট্রীটে বেশ ব্যবসা হয়েছিল! সব মিলিয়ে পুরো সিজিনটা দেড় শ' দুশো টাকা মাস গেলে পেয়েছি। অবিশ্যি স্ফূর্তির চোটে পয়সাও ধরে রাখতে পারিনি। এসেছে—গেছে। সরকারী টিকেদারদের এমন আঠা কাজে—গত বছর অ্যায়সান টিকে দিয়ে গেল যে, সারা চোত-বোশেখ একেবারে লবডঙ্কা। মেটে সাহেবদের পাড়া বেপাড়া মিলিয়ে শতখানেক ক্রসও বিকলো না।' কুবের শুনছে কিনা বোঝার চেষ্টা করল। কিছু বোঝা গেল না। তার দিকে মুখ, চোখ রাস্তা পার হয়ে মনুমেন্ট দেখছে।

মাসান্তে দেড় শ' টাকা দেয় এমন একটা পাকা চাকরি সনতের খুবই দরকার।

'এখন তো বর্ষার সময়—লাস্ট টেন ইয়ার্সে ফি বছর কত বড় বড় সাহেববাড়ি কলেরায় বিলকুল ফৌত হয়ে গেছে, শুধু পাথরের অর্ডার। এবার দ্যাখ কি ফাইন বর্ষা, এক একদিন কলকাতা ভেসে যাচ্ছে—তাও সিজিন জমছে না—'

'থামবি?'

থামাতে গিয়ে কুবের প্রায় চীৎকার করে উঠেছে। কাউন্টারে ম্যানেজার গোল করে তাকালো। সনৎ চমকে উঠেছে। সামলে নিতে গিয়ে মুখ বেঁকে গেল, 'কেন?'

'সে তুই বুঝবি নে—'

'ওঃ! হিউম্যানিটি! তা তুই হিউম্যানিটি চোষ গে—'

'হিউম্যানিটি? এসব কথা তুই জানলি কি করে?'

'লোকে বলে।' শুনি, সনৎ থামল না, তবে—আস্তে গুনগুন করে বলল, 'না, তুই কিনা বললি প্রিয়জন! আজকাল আবার প্রিয়জন কি রে? যে যার কাছে প্রিয়—যে যার কাছে—'

'কেন? তোর বউ? প্রিয় না?'

'বুঝি নে। তবু, একসঙ্গে থাকি। শেষ রাতে ঠাণ্ডায় কুকুরকুণ্ডলী মেরে ঘুমোতে দেখলে নিশ্চয় উঠে গিয়ে পায়ের দিকের জানলা আটকে দিই—ওই আর কি? বললাম না একসঙ্গে থাকি।'

'কষ্ট হয় না কখনো?'

সনৎ মনে করতে পারলো না। শেষে অনেক মাথা খাটিয়ে বলল, 'ফুর্তির দিনে চোলাই পেটে গেলে দেখেছি অম্বল হয়ে আমার বুক ব্যথা করে—দম আটকে আসে, ভেতরের সব বাতাস বোধ হয় একসঙ্গে ওপর দিকে উঠতে চায়—

'কিংবা কুবের—তুই বিশ্বাস করবি কিনা জানি নে, ছ' আউন্স রামের পর তিন আনার গাঁজা টেনে বিকেলের দিকে গড়ের মাঠে চিত হয়ে শুয়ে থাক—দেখবি তুই খালি পিছলে পড়ছিস, পৃথিবী লাটিমের মত পাক খাচ্ছে, আর তুই কোনক্রমে ব্যালান্স করে শুয়ে আছিস, টাল খাচ্ছিস, পৃথিবী ঘোরার সাঁই সাঁই শব্দও শুনতে পাচ্ছিস—

'তখন মাইরি কুবের, আমি নাকি সঙ্গের লোকজনকে বলি—আমাকে কাইন্ডলি বউয়ের কাছে পৌঁছে দিবি—একেবারে বিছানায়—তখন যদি কেউ আমাকে জাপটে জড়িয়ে ধরে—'

'ধ্যাত শালা—বউ, বউ—তুই!' বলতে বলতে কুবের উঠে দাঁড়াল, 'কথায় কথায় বিকেল কাবার করে দিলি—'

'ঠিকানাটা দে।'

অফিস ছুটির ভিড় শুরু হয়ে যাচ্ছে। এখন ট্যাঙ ট্যাঙ করে সালকে ছুটতে হবে। সেই পিলখানার ধারে। সনৎ বাড়ি চিনে চিনে গেলে বিপদ। কি বলতে কি বলবে। বাবা ঠিক চিনে ফেলবে।

'রোজ ট্রামে নতুন গজানো এক স্নো কোম্পানির ভয়ঙ্কর সব বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে যায়। কত নম্বর ক্যানাল ওয়েস্ট রোড যেন লেখা থাকে। রাস্তার নামটা দিয়ে বলল, 'লিখে নে, সাতের দুই—দোতলায় উঠে বাঁদিকের ফ্ল্যাটের দরজায় কড়া নাড়বি।'

(ক্রমশ)

চিত্র প্রদর্শনী

দেশের বাইরের যাবার যাঁদের সুযোগ হয়েছে তাঁদের মধ্যে অনেকেই ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন গ্যালারীতে সযত্নে রক্ষিত বহু শিল্পীর মৌলিক রচনা দেখে থাকবেন। যাঁদের সে সৌভাগ্য হয়নি তাঁরা পত্রপত্রিকা, প্রামাণিক গ্রন্থ, ফিল্ম বা প্রতিলিপি প্রদর্শনীর মাধ্যমে এগুলির পরিচয় লাভ করেন। সম্প্রতি সরকারী আর্ট কলেজে ইউনেস্কো আয়োজিত এরূপ এক ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। ১৯০০ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত ৫৯ জন খ্যাতনামা বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য শিল্পীদের রচনা নিদর্শনের মোট ৯০টি নিদর্শন প্রতিলিপি প্রদর্শনীতে দেখা যায়।

শিল্পরসিক মাত্রেই জানেন যে, পাশ্চাত্ত্য শিল্পকলার ইতিহাসে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দুই শতকের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। এই কয় বছরের মধ্যে অংকনরীতির নানা পরীক্ষা ও বিবর্তন সংঘটিত হয় ও বহু বিশিষ্ট শিল্পী নতুন চিন্তাধারা ও মৌলিক রচনাপদ্ধতির সূত্রপাত করেন। সুতরাং এক হিসাবে প্রতিলিপি প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে অনেকেই পাশ্চাত্ত্য শিল্পজগতের কয়েকটি বিশিষ্ট ধারার পরিচয় পান।

ইমপ্রেশানিজম যুগের চারটি নিদর্শন থাকলেও (মনে ও রেনোয়া) প্রদর্শনীতে প্রধানত পোস্ট ইমপ্রেশানিজম, ফভিজ্‌ম, জার্মান ইমপ্রেশানিজম, কিউবিজম তথা সমজাতীয়, নন-ফিগারেটিভ, আধুনিক ফিগারেটিভ, ডাডাইজম ও সুররিয়ালিজম রীতির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দেখা যায়। বলা বাহুল্য, চমৎকার মুদ্রণশিল্পগুণে রচনাগুলির নানা রঙ ও সূক্ষ্ম কারুকার্য-গুলি এতই স্বাভাবিকভাবে ফুটে উঠেছে যে, সেগুলিকে মৌলিক রচনা বলে ভুল হয়। কয়েকটি রচনা আমাদের অনেকের পরিচিত যেমন পিকাশোর দি ভায়োলিন, ভ্যান গঁর কর্নফিল্ড উইথ রিপার অ্যান্ড সান, ডুশাম্নের ন্যুড ডিসেন্ডিং এ স্টেয়ারকেস, শাগালের আই অ্যান্ড দি ভিলেজ, গগাঁর তাহিতিয়ান উইমেন, সিজান-এর বয় ইন এ রেড ওয়েস্টকোট ও মাতিস-এর স্টিল লাইফ উইথ গোল্ড ফিশ। বিশেষ করে পিকাশোর সিটেড উওম্যান ও গার্ল উইথ ম্যান্ডোলিন দেখে শিল্পীর রচনারীতির পার্থক্য বোঝা যায়। অপরাপর শিল্পীদের মধ্যে এডওয়ার্ড মাঞ্চ, টোলো-লত্রে, জেমস এনসর, ব্রাক, ককসকা, লেজার, ক্লী, উৎরিলো, মদিলিয়ানি, আর্নস্ট ও ক্যানডিন্‌সকির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন ললিতকলা আকাডেমি। বলা বাহুল্য, স্বনামধন্য শিল্প-পন্ডিতদের চিন্তাধারা, পরীক্ষাগ্রহ, সাধনা ও রঙ ব্যবহাররীতির সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় করিয়ে দিয়ে ললিতকলা আকাডেমি সকলের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

*

চিত্রকলা ক্ষেত্রে ভাস্কর্যশিল্পের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। চিত্রপ্রদর্শনী দেখে

স্টোন ফর্ম দিলীপ সাহা

আমরা এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, অনেক সময়ে শিল্পকলার এই বিশিষ্ট অংশটিকে আমরা যেন একেবারে ভুলে যেতে বসি। তাই সরকারী আর্ট কলেজে তৃতীয় বার্ষিক ভাস্কর্য প্রদর্শনী দেখে সকলেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। প্রতিবারের মত এবারেও কলেজ সংলগ্ন সুবিন্যস্ত বাগানের মধ্যে প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয় ও অকাল-বর্ষণবিক্ষুব্ধ মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ভ্রূকুটি সত্ত্বেও বহু শিল্পরসিক প্রদর্শনীতে পদার্পণ করেন। আকার ও গুরুত্ব অনুযায়ী ভাস্কর্য নিদর্শনগুলিকে বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হয়। তার ওপর সুকৌশল আলোক নিয়ন্ত্রণের ফলে বিচ্ছুরিত আলোকধারার মায়াময় পরিবেশে এক একটি মূর্তি যেন বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে।

যে ছয়জন প্রদর্শনীতে যোগদান করেছেন তাঁরা সকলেই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। এঁদের মধ্যে একজন বর্তমানে কলেজেই শিক্ষকতা করেন ও দুজন ভারত সরকারের বৃত্তিধারী হিসাবে এখানেই স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভ করছেন। প্রদর্শনীতে মোট ১৯টি গঠন নিদর্শন দেখা যায়—একটি অবশ্য অধ্যক্ষ চিন্তামণি করের তৈরি। পাথর, কংক্রীট, পোড়ামাটি ও কাঠ মাধ্যমেই সব নিদর্শন গঠিত অর্থাৎ অধিকাংশই খোদাই করা কাজ।

প্রদর্শনীটি প্রদক্ষিণ করলেই সমসাময়িক গঠনরীতির বৈশিষ্ট্যটুকু বিশেষভাবে চোখে পড়ে। প্রায় সকলেই প্রগতিবাদী। পরিকল্পনা ও খোদাই পদ্ধতিতে কয়েকজন আধুনিকপন্থী। সুতরাং কয়েকটি কাজে যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব দেখা যায় সেটা স্বাভাবিক। তাহলেও প্রায় প্রত্যেকেই আপন চিন্তাধারা অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করেছেন। প্রতি ক্ষেত্রেই বিভিন্ন মাধ্যমস্তূপ থেকে নতুন আকার সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায় ও কয়েক ক্ষেত্রে নেগেটিভ ফর্মের প্রাধান্য বিশেষভাবে ধরা পড়ে। তবে পরিকল্পনা ও গঠন রীতি প্রায় একরূপ হওয়ার ফলে দুই-এক স্থলে অবশ্য বিভিন্ন শিল্পীর কাজে বিশেষ কোনও পার্থক্য দেখা যায় না।

দিলীপ সাহার কাজে প্রতিভার স্বাক্ষর আছে। ভারী ও নীরেট পাথর স্তূপ থেকে খোদাই করে তিনি যে বিশিষ্ট আকার সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে তাঁর পরিকল্পনা বিচার ও সমতাবোধের পরিচয় পাই, যেমন, অনলংকার। বিমান দাশের কিস্ট (পোড়া-মাটি) অনেকের চোখে পড়ে। দেবব্রত চক্রবর্তীর গঠনরীতি ভিন্ন জাতীয়। তিনি পজিটিভ আকারের পক্ষপাতী ও তাঁর ভাস্কর্য মূর্তিগুলি ঈষৎ দীর্ঘ অথচ চ্যাপটা—অনেক সময়ে চ্যাডউইকের গঠন কৌশলের কথা মনে পড়ে। তাঁর ফসিল অনেকের ভাল লাগবে। পরিকল্পনার দিক থেকে করবী ঘোষের ফ্লাইট (কাঠ) উল্লেখ-যোগ্য হলেও আর একটু নমনীয় হলে বোধ হয় এটি সার্থক হয়ে উঠতে পারত। অশেষ মিত্রের দুটি কংক্রীট কাজেই গঠন কারু-কার্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নিরঞ্জন প্রধানের ভাস্কর্য শিল্প অনেকটা মনুমেন্টাল জাতীয়, বহিরাঙ্গনে স্থাপন যোগ্য। সে হিসাবে তাঁর টেক অফ (কংক্রীট) সকলেরই চোখে পড়বে। ওপরের অংশ ঈষৎ উচ্চতর হলে বোধ হয় ড্রিম বোট (কাঠ)-এ কাবোর সুললিত ছন্দরূপটুকু আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠত। চিন্তামণি করের শক্তি (কাঠ) একটি অনবদ্য সৃষ্টি। ভিত্তিস্থলে মহিষের মুখ, লম্বমান, সাবলীল অথচ শক্তির প্রতীকরূপী দেহ ও ঊর্ধ্বে অসীমের দিকে স্থাপিত দুটি আবদ্ধ হাতের মধ্য দিয়ে ভাস্করশিল্পী মহিষাসুরমর্দিনীর একটি নতুন মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রদর্শনীটি ২০শে অক্টোবর পর্যন্ত খোলা থাকবে।

শিল্পী অজয় মুখার্জি সম্প্রতি অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারীতে তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। শিল্পী ১৯৫৩ সালে সরকারী আর্ট কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করেন ও ইতিপূর্বে তিনি দুটি একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন। প্রদর্শনীতে জল ও তেলরঙে আঁকা ২৫টি নিদর্শন দেখা যায়।

অ্যাকাডেমির গত বার্ষিক প্রদর্শনীতে ক্যালিগ্রাফিক প্রথায় রচিত শিল্পীর একখানি ছবি আমার চোখে পড়ে। তবে এ প্রদর্শনীতে শিল্পীর বিষয়বস্তু ও অঙ্কন-রীতির পরিবর্তন লক্ষ করলাম। ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রের নিগূঢ় তথ্য ও অন্তর্নিহিত বিভিন্ন রূপই শিল্পী রঙ ও রেখা মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি হাতে-তৈরী-করা কাগজের ওপর জলরঙ ব্যবহার করেছেন এবং কয়েক ক্ষেত্রে সব বিমূর্ত রীতিতে কাজ করেছেন। ফলে শাস্ত্রোক্ত নানা মূর্তিকে তিনি রেখা জ্যামিতিক ক্ষেত্র ও ত্রিকোণ মাধ্যমে ভেঙে ফেলে একটি সমগ্র রূপে বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং তাঁর রচনার মধ্যে রেখা ও বিশেষভাবে প্রতীকের প্রাধান্য দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় শিব-শক্তির। প্রধানত রেখা ও বৃত্তকে ভিত্তি ক'রে শিল্পী শিব ও শক্তির একটি অখণ্ড রূপ প্রকাশ করেছেন। হালকা রঙ ও রেখাজালের মধ্য দিয়ে শিল্পীর বক্তব্যটুকু সহজেই বোঝা যায়। বৃত্তের মধ্যে ছোট ছোট সমরেখাক্ষেত্র চাপা নীলরঙে ভরিয়ে ফেলে তিনি কয়েকক্ষেত্রে রঙীন কাচের কারুকার্য সৃষ্টি করেছেন—যেমন, শ্মশানেশ্বরী। অপরাপর ছবির মধ্যে কুল-কুণ্ডলিনী চিন্মালার দুই একটি চোখে পড়ে—বিশেষ করে ৭ নং। তবে একথা ঠিক যে স্তরভেদের অভাবে কয়েক স্থলে বিভিন্ন রচনার মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য দেখা যায় না, অর্থাৎ অনেক সময়ে পুনরুক্তির আভাস দেখা যায়।

*

বালুকাময় সৈকতের বুকে সমুদ্রতরঙ্গ ভেঙে ভেঙে পড়ে ফেনিল আকারে ছড়িয়ে পড়ছে, ঘরের নিভৃত বাতায়ন কোণে বসে কোনও তরুণী আপনার মনে প্রসাধন করে চলেছে, ছোট শিশুর কলহাস্যের মত কয়েকগুচ্ছ ফুল পাপড়ি মেলে ফুলদানি আলোকিত করে আছে অথবা দীর্ঘ ও দুর্গম নদীপথ বেয়ে এসে কোনও মাঝি নৌকায় বসে বিশ্রাম করছে—এক কথায় নানা বিষয়বস্তু ও নানা রীতিতে আঁকা বিভিন্ন ছবির একটি প্রদর্শনী দেখলাম অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে। ছবিগুলি কোনও একজন বাঙালী শিল্পীর নয়। কর্ম উপলক্ষ্যে বা অন্য কারণে গুজরাত থেকে এসে যাঁরা আজ কলকাতায় বসবাস করছেন তাঁদেরই সম্প্রদায়ের সভাবৃন্দ বিভিন্ন মাধ্যমে ছবিগুলি এঁকেছেন। এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেন কলকাতার গুজরাতী সাহিত্য মণ্ডল ও উদ্বোধন করেন শিল্পী যামিনী রায়। প্রথমে ভেবেছিলাম শখের শিল্পীদের প্রদর্শনীর উল্লেখমাত্র করে কর্তব্য শেষ করব। বলতে দ্বিধা নেই যে প্রদর্শনী প্রদক্ষিণ করে চকিত হলাম। অবশ্য অধিকাংশ শিক্ষার্থীসুলভ ও কয়েকটি অনুকরণও দেখলাম। তা সত্ত্বেও কয়েকজনের কাজ দেখে মনে হয় তাঁরা যে কেবল শিল্প-অনুরাগী তা নয়, তাঁরা সকলেই নিয়মিতভাবে শিল্পচর্চা করে থাকেন। সব চেয়ে বড় কথা কয়েকটি রচনায় প্রগতিবাদের পরিচয় পাই। যাঁদের কাজে প্রতিভার আভাষ পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে নির্মলা শা, বাপালাল চৌধুরী, লক্ষ্মী সিক্কা, টি বি মারচেন্ট-এর নাম উল্লেখ-যোগ্য। আগুনে সাহায্যে কাষ্ঠখণ্ডের স্থানে স্থানে ছিদ্র সৃষ্টি করে (আউল) শশীকান্ত শেঠ সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। সিরামিক টাইলখণ্ড দিয়ে রচিত মাদার অ্যান্ড চাইল্ড-এর জন্য বিনোদ মেহতা সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। আশা করি এঁরা সকলেই শিল্পবিষয়ে সচেতন থাকবেন ও অদূর ভবিষ্যতে এঁদের শিল্প-কাজ দেখার সুযোগ দেবেন।

চামুণ্ডা —অজয় মুখার্জি

*

বিড়লা অ্যাকাডেমিতে তরুণ গুজরাতী শিল্পীদের আর একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয় এবং এতে যোগদান করেন শিল্পী মানু পারেখ, মানু রাথোড়, মধু পারেখ ও জেফিন মুছালা। মানু পারেখ কলকাতার শিল্পমহলে পরিচিত। মানু রাথোড় ও জেফিন মুছালা বোম্বাই জে জে আর্ট স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। শিল্পীদের মধ্যে তিনজন তেলরঙ ও একজন রঙীন কালি-মাধ্যমে রচনা করেছেন। মানু পারেখ ছাড়া প্রত্যেকের রঙ ব্যবহার প্রণালী দেখে গুজরাতী মিনিয়েচারের কথা মনে পড়ে। প্রদর্শনীতে প্রত্যেক শিল্পী ছয়খানি রচনা নিদর্শন পেশ করেন।

মানু পারেখ তেলরঙ মাধ্যমে ও কোলাজ প্রথায় স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন। সম্ভবত সুসংগত স্থাপনার অভাবে দুই এক স্থলে শিল্পী প্রয়োজনীয় রূপটুকু ফোটাতে পারেন নি। তবে তাঁর রঙ নির্বাচন করবার একটি সহজাত ক্ষমতা আছে এবং এই সোচ্চার রঙ ব্যবহারের ফলে দুই একটি কাজ অনেকের চোখে পড়ে। বিশেষ করে ২০ নং রচনা। অন্যান্য ছবির মধ্যে ২১ নং উল্লেখযোগ্য। মানু রাথোড়ের রচনা-রীতি সম্পূর্ণ বিমূর্ত। পশ্চাদ্‌ভূমিটুকু শূন্য রেখে তিনি পাদভূমি নানা লোকচিত্র জাতীয় মূর্তি ও রেখা মাধ্যমে ভরিয়ে ফেলেছেন। এক স্থলে ওড়িষ্যার পটস্থাপনা করে বিশেষ কোনও বিষয়বস্তু সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। সে হিসাবে তাঁর রচনায় চিন্তা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন অ্যাটাক অ্যান্ড কাউন্টার অ্যাটাক। অপরাপর ছবির মধ্যে এ পেল গ্রাউন্ড-এর নাম করা যায়। জেফিন মুছালা মূলত বিমূর্ত শিল্পী। বিভিন্ন আকার ও প্রতীক সুসংগত ভাবে স্থাপন করে তিনি অঙ্কনক্ষেত্রটুকু ভরে ফেলেছেন এবং দুই এক স্থলে কারুকার্যের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাজ পরিচ্ছন্ন ও চিন্তাপ্রসূত যদিও ক্লী ও কান্ডিন্স্কির প্রভাব দেখা যায়। তাঁর রচনার মধ্যে ফ্যানটাসি ও কম্পোজিশন অনেকের ভাল লাগে। মধু পারেখ আনুষ্ঠানিকভাবে শিল্পশিক্ষা করেন নি। তাঁর কাজ অনেকটা স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর ছবিগুলি সূচিশিল্প জাতীয়, অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম কলমের রেখাবৈচিত্র্য দেখে মনে হয় বুঝি কাঁথা বা কাপড়ে তোলা রঙীন সুতোর কারুকার্য। বলা বাহুল্য, সরল পদ্ধতিতে আঁকা ছবিগুলিতে মিনিয়েচারের আভাস পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে গাঁয়ের কালীমাতা উল্লেখযোগ্য।

গাঁয়ের কালীমূর্তি —মধু পারেখ

চিত্রপ্রিয়

যুক্ত ফ্রণ্ট হইতে বলা হইয়াছে যে, উত্তর বঙ্গের বিধ্বংসী বন্যা-পীড়িতদের পুনর্বাসনের সমস্ত ব্যয়ভার কেন্দ্রকে বহন করিতে হইবে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"ন্যায্য কথা বলেছেন। আমরা তাঁদের সঙ্গে একমত। এই সঙ্গে আমরা সবিনয়ে বলতে চাই আগামী নির্বাচনে বিধ্বংসী ধস ও ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত পার্টির ব্যয়ভারও কেন্দ্রের বহন করা উচিত!!"

উত্তর বঙ্গবন্যা পীড়িতদের সম্পর্কে বিদেশ হইতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরার সমবেদনাসূচক বার্তা আসিয়াছে। "বেটার লেট দ্যান নেভার"—বলে শ্যামলাল।

শ্রীমতী গান্ধী দক্ষিণ আমেরিকা সফর সম্বন্ধে বলিয়াছেন: ভারত এবং এই দেশের মধ্যে সেতু নির্মাণের উদ্দেশ্যেই আমি সফরে এসেছি—"এখন বুঝতে পারলাম গঙ্গার ওপর দ্বিতীয় সেতু নির্মাণ কেন বিলম্বিত হচ্ছে"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

সারা ভারত প্রতিরক্ষা কর্মচারী সঙ্ঘের সভাপতি শ্রী এস এন ব্যানার্জি ১৬ অকটোবর গণ-অনশন পালনের আহ্বান জানাইয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"রিলে অনশনের আহ্বান আরো জোরদার হত!!"

রাজনীতি ক্ষেত্রে কার্য হইতে অবসর গ্রহণের বয়স সম্পর্কে বিবেচনা করা হইতেছে। এই বৎসরের গোড়াতে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে জনৈক সদস্য ৭২ বৎসর অবসর গ্রহণের ন্যায্য বয়স বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। —"আর একটু বাড়িয়ে ৮২ করুন, কেননা ৭২ হলে লোকনিন্দা হবে, বলবে বাহাত্তুরে"—মন্তব্য করেন বৃদ্ধ খুড়ো।

স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড আন্দোলন প্রত্যাহার করা প্রসঙ্গে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন বোর্ডের সেক্রেটারী বলিয়াছেন: বোর্ডের কর্মী এবং উত্তর বঙ্গের বন্যা-বিধ্বস্ত নরনারীদের কথা ভাবিয়াই তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সহযাত্রী নাটকীয় ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিলেন—"সম্রাট মহানুভব!!"

ট্রামে বাসে

নূতন পৌর কমিশনার নাকি নির্দেশ দিয়াছেন যে এখন হইতে বেতন নিতে হইলে সশরীরে আসিয়া নিতে হইবে। সহযাত্রী বলিলেন—"কিন্তু সত্যি সত্যি একদিন তারা সশরীরে উপস্থিত হলে তাদের দেখে ভিরমি যাবে না ত!!"

রক্ত ক্ষরণ করিয়া এবং পরে নূতন রক্ত দেহে ইনজেক্ট করিয়া সাপে-কাটা রোগীকে আরোগ্য করা যায় বলিয়া আনন্দবাজারে প্রবন্ধ পড়িলাম। —"কিন্তু আমাদের যে শিরে কৈল সর্পাঘাত, সেটা বোধ হয় শিবের অসাধ্য"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

কুট্টির কার্টুনে দেখিলাম শেখ আবদুল্লাকে "কাশ্মীর সিংহ" বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। —"দিল্লীবাসী কুট্টি নিশ্চয়ই স্কুপ নিউজ আবিষ্কার করতে গিয়ে বুঝেছেন শেরে আর শানাচ্ছেনা। আমরা শুধু বলি—সিংহ মশাই, সিংহ মশাই, মাংস যদি চাও, রাজহংস খেতে দেব হিংসা ভুলে যাও"—বলে শ্যামলাল।

শ্রীসেন বর্মা নাকি নির্বাচনে পোস্টার লিফলেট কম করিয়া ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। —"মোস্ট আনকাইন্ডেস্ট কাট অব অল। দেয়ালচিত্রে এইসব চিত্রাবলী নির্বাচনের বহু পরে পর্যন্ত পথচারীকে স্মরণ করিয়ে দেয়: কী ভুলই করা হল ভোট না দিয়ে এবং কী ভুলই হল ভোট দিয়ে, সুতরাং দলিলটা উভয় দিক থেকেই সংরক্ষণের দাবি রাখে"—বলেন সহযাত্রী।

বৈজ্ঞানিক পন্থায় নাকি অপরিণত ফল পাকানোর পন্থা আবিষ্কার করা হইয়াছে। সহযাত্রী বলিলেন—"বহু [illegible] আবিষ্কার, যে-কোন ইঁচড়ে-পাকাদের জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন।"

সহযোগী "বসুমতী" মধ্যপ্রদেশের রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শিরোনামা দিয়াছেন—মধ্যপ্রদেশে আবার নাটক। বিশুখুড়ো সবিনয়ে বলিলেন—"মধ্যপ্রদেশে আবার যাত্রা বললে হয়ত আরো জোরদার হত, কেননা গদা হস্তে প্রবেশ-প্রস্থান-পতন মূর্চ্ছার এত ছড়াছড়ি নাটকে কোথায় পাবেন।"

প্রেসিডেন্সী জেলে শ্রীঅরবিন্দের মর্মর মূর্তি সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে। সহযাত্রী বলিলেন—"পিণ্ডান্তে পিণ্ড শেষ করে একটা কাজের কাজই আমরা করলাম।"

ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ছাত্রসমাবেশে ডঃ জাকির হোসেন নাকি বলিয়াছেন—বিশ্ববিদ্যালয় মানুষের অগ্রগতির হাতিয়ার। —শ্যামলাল বলিল—"হাতিয়ার আবার না, স্বয়ং বাপুজী পর্যন্ত ছাত্র-হাতিয়ারের অব্যর্থতা স্বীকার করেছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছিলেন—হিমালয়ান ব্লাণ্ডার!!"

অলিম্পিকে প্রথম হকি খেলায় ভারত নিউজিল্যাণ্ড-এর কাছে পরাজিত হইয়াছে—"অর্থাৎ সিংজীরা নিউজী (ল্যাণ্ড)-দের কাছে হেরেছেন"—বলেন বিশুখুড়ো।

দিল্লীর ডায়েরি

চিত্র শিল্পীর নাম শান্তনু উকিল, বয়েস এই ৩৮। পদবীটা শুনে নিশ্চয়ই অনেকের মনে পড়বে বিখ্যাত একটি শিল্পী পরিবারের কথা, সারদা উকিল, বরদা উকিল, রণদা উকিল,—এমনি সব প্রথম শ্রেণীস্থ ছবি আঁকিয়েদের কথা। এবং সেটা ঠিক।

শান্তনুও সেই পরিবারের এবং সেই দলের যাদের কাছে রং তুলি আর ক্যানভাস্ তৈরি করে গোটা দুনিয়া, মানুষের সভ্য দুনিয়ার একটা দিক, ছবি—ছবি যারা শুধু ছবি নয়, আরো একটু কিছু, যারা পটের লেখা থেকে উঠে আসে মনের পটে।

খুব বড় পরিবার এই উকিলদের। "উকিল" তাদের পদবী কেউ সত্যি ওকালতি করতেন কিনা আমি জানি না। জানতাম এ'দের আঁকা ছবির প্রতিকৃতি বেরিয়েছে বাঙলা দেশের কয়েকটি সাময়িকীতে,—মর্ডান রিভিয়ু. প্রবাসী, ভারতবর্ষ ইত্যাদি। আমার মনে পড়ে এ'দের ছবির মাধ্যমেই প্রথম চোখ মেলে দেখেছিলাম ভারতীয় পদ্ধতির ছবি যা আমাকে একদিন নাড়া দিত অন্তরে এবং যাঁরা ভারতবর্ষে প্রথম এনেছিলেন যাকে বলা হয় আকৃতি-প্রকৃতির অবাস্তবতা যা কিনা একদিন ইউরোপে এল আধুনিকতার মুখোশ পরে এবং যার অন্ধ পূজারী আজ আমাদের অনেক শিল্পীরা। হ্যাঁ. ভারতীয় পথিকৃত শিল্পীদের পূজারী নয় সাদা-চামড়া সায়েব-শিল্পীদের পদসেবাকারী, কেন না তারা একে সায়েব তাতে গায়ের চামড়া হোল গিয়ে সাদা।

শিল্পের পেরিয়ে গেছে একটা যুগ। তার আরম্ভ হয়েছিল কোলকাতায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তুলিতে, এসেছিলেন নন্দলাল বসু, সারদা উকিল ও আরো অনেকে। আর একদিন আধুনিকতার নকল মহিমায় তাঁরা সকলে গেলেন বিস্মৃতির গহ্বরে, উঠে এল উপরে অনুকৃতীদের ছাগল-ভেড়া।

সেদিন শান্তনু উকিলের ছবি দেখে আর তার সংগে কথা বলতে বলতে অনেক কথা মনে আসছিল। মনে এল যে, এই রাজধানীর অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এই উকিল পরিবারের দিকে যাঁরা দিয়েছেন মূল্য আঁকা-ছবির প্রতি, রঙ-তুলি শিল্পীদের প্রতি, সেই কতো কাল আগে।

শান্তনুর পিতৃদেব সারদা উকিল মহাশয় এসেছিলেন এই রাজধানীতে ১৯১৮ সনে। উনি ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র নন্দলাল বসুর সহশিল্পী—ভারতীয় অঙ্কন পদ্ধতীর একজন সেরা চিত্রকর। তাঁরই পুত্র শান্তনুর কাছে শুনছিলাম পুরোনো দিনের কথা যদিও তাঁর বয়েস এখন মাত্র ৩৮। হ্যাঁ, এও ঠিক যে পুত্রও

শান্তনু উকিলের প্রদর্শনীতে : ডান থেকে : দ্বিতীয়—শিল্পী নিজে, তারপর তথ্য-বেতার মন্ত্রণালয়ের সচিব শ্রীঅশোক মিত্র

আজ আর পিতার চিত্র-পদ্ধতির শিষ্য নয়, কিন্তু পিতার প্রতি তাঁর আছে অসীম শ্রদ্ধা,—পিতা বলে নয়, শিল্পী বলে।

আলাপ করতে করতে বলছিলেন সেদিন আইফাকস্ হলের একটি ঘরে যেখানে ছিল তাঁর অনেক ছবি। খুব কম লোকেই জানেন যে, সারদা উকিল মহাশয় ছিলেন একটি ব্যক্তি যিনি এই রাজধানীর ইংরিজি আবহাওয়ায় এনেছিলেন ভারতীয় চিত্র-শিল্পের নন্দন-ছোঁয়া আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। (জানেন, আজ ঠিক তার উল্টো। আজ সমস্ত ভারতীয় আঁকিয়েরা ছবি তৈরি করে পাশ্চাত্যের অনুকরণে বিনা লজ্জায়, বিনা সরমে)।

উনি এসেছিলেন ১৯১৮ সনে। জীবিকার জন্যে আঁকতেন তেল রঙে ছবি, আর শিল্প-জীবনের জন্যে আঁকতেন নিজ-পদ্ধতির ছবি যা তিনি শিখেছেন অবনীন্দ্রনাথের পদতলে কলকাতায়। ন'জন ভাই-এর মধ্যে উনি ছিলেন ষষ্ঠ, তারপর বরদা উকিল, তারপর রণদা উকিল, কি অমনিই—এই তিন-জন হলেন ভারতীয় চিত্রজগতের ধারক।

শান্তনুর নিজের ছবিতে আজ আর তাঁদের প্রভাব নেই। যেন, পিতৃদেবের শিল্প-

জগতে ছিল ধুতি-চাদর, আজ সেখানে কোট-প্যাণ্ট কিংবা বুশকোট—কেউ মন্দ নয়। প্রত্যেকের একটা আলাদা যুগ, আলাদা জগত কিন্তু একই ধারাবাহিকতা, শিল্পের একান্ত একক স্রোত, নদীর মতো পাহাড়ের ঝর্নার মতো। সে চিরন্তন এক, কিন্তু কোনো একটি কালে সে এক নয়, সে ভিন্ন।

শান্তনু হলেন ওই উকিল বংশে আজ একমাত্র শিল্পী মানে চিত্রশিল্পী যিনি ছবি আঁকেন এবং যাঁর জীবিকা শুধু ছবির উপর। পরিবারের অন্যান্যরা ছবি বোঝেন, ছবির ইতিহাস জানেন, ভালবাসেন কিন্তু চিত্রজগতের সক্রিয় শিল্পী নন। তাই শান্তনুর হাতে একটিমাত্র বংশ-পতাকা, তুলি ধরা।

শান্তনুর ছবি তেল-রঙের। যাকে বলা যায়, স্মৃতির সৃষ্টি। জয়পুর শহর, বাঙলা দেশের দুর্গাপুরের চিমনির ধোঁয়া, পুরোনো একটা দুর্গ, একটি বিষ্টি-ভরা দিন কিংবা একটি অতি সামান্য শাল গাছ যার মাথায় অনেক অনেক শাদা ফুল, আরো আছে আধুনিক তুলিতে নৈসর্গিক দৃশ্য, ইত্যাদি।

একটা ছবি মনেতে গেঁথে যায়। শিল্পী তা ভোলে না। একদিন মনের কুয়ো থেকে তুলে আনে সেই এক ঘড়া জল যাতে থাকে ঐ স্মৃতির ছবি, নিজের তৈরি ছবি।

অনেক বৎসর আগে একবার সারদা উকিল মহাশয় বেরিয়েছিলেন দেশ ভ্রমণে, এখানকার নামকরা বিদ্যালয় মডার্ন স্কুলের স্থাপনকারী লালা রঘুবীর সিং-এর সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে ছিল তুলি আর রঙ। কাশ্মীরে এসে দেখলেন, অফুরন্ত চিত্রসামগ্রী, আঁকার বস্তু। এতো বেশি যে আঁকতে পারছেন না কিছু, এ যেন বিরাট সমুদ্র—সাঁতার জানলেও সাঁতার-কাটা যায় না। সারদা উকিল সেদিন তাঁর গুরুদেব অবনীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন —আমার এতো আঁকা ও রঙের জিনিস, কিন্তু আমি একটিকেও দিতে পারছি না প্রাণ। বলুন, আমি কী করি।

উত্তরে উনি নাকি বলেছিলেন : জানো, সবকিছু কাগজে-তুলিতে তখুনি ধরার চেষ্টা করো না। তাদের রেখে দাও নিজের অন্তরে। একদিন তারা তোমার মাধ্যমে পাবে প্রকাশ, তাদের শিল্প প্রকাশ।

এই একটি শিল্পধর্ম তাঁর পুত্র শান্তনু এখনো আঁকড়ে আছেন। তারই চিহ্ন ছিল আইফাকস্ হলের ঘরে তাঁর আঁকা ছবিগুলোতে। হ্যাঁ, ঐ ছোট্ট ছবিটা—শাল গাছে সাদা ফুল, অনাড়ম্বর একটি ছবি। ভারি সুন্দর। জাপানের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী তেৎসুজো সুগিমোতো। উনি তাঁর প্রদর্শনী করেছেন কোলকাতায় অনেক আগে। তাঁর পুত্র ইচিরো ছবিটা কিনেছেন। তাঁর ভাল রবি। দেখা মাত্র প্রেমে হাবুডুবু খেতে ইচ্ছে

তেলরঙের একটি ছবি : শিল্পী শান্তনু উকি

হয়। আরো ভাল-ভাল ছবি রয়েছে। গাঢ় লাল রঙ, হরিদ্রাভ রঙ ও কালো রঙ—এদের ব্যবহার কয়েকটি চিত্রকে মায়াবী করে তুলেছে।

বল্লেন : 'আমি দশ বছর আমার পিতার স্টাইলে ছবি এঁকেছি। তারপর ঘুরে এলাম ইওরোপ এবং তাদের নতুনত্বে আমার তুলি গেল ঘুরে। কিন্তু আমি বিশ্বাস হারাইনি যে, যতো আধুনিকই আমরা হই না কেন, আমাদের প্রথম ধর্ম হোল ভারতীয় হওয়া। জানেন, তাই আমি শ্রদ্ধা করি আমার শিক্ষক শৈলজ মুখার্জিকে, আর হুসেনকে। আমি আধুনিক, আমার চিন্তা-ভাবনা প্রকাশে কিন্তু ভারতীয়, ভারতের সন্তান।'

আমার মনে হয়, আমরা এখনো সমুচিত মূল্য দিই নি এই উকিল পরিবারকে ভারতের শিল্প জগতে। সারদাবাবু দিল্লি এসেছিলেন সেই ১৯১৮ সনে। একদিন পাতিয়ালার মহারাজ এলেন তাঁর কুটীরে ১৯২০ সনে তাঁর নাম শুনে, আর কিনলেন প্রায় দশ হাজার টাকার ছবি। তাতেই হোল শুরু এই রাজধানীর একটা শিল্প-ধারা।

তাতেই সম্ভব হয়েছিল উকিল স্কুল অব আর্ট (১৯৪০-এর পরে সারদা উকিল স্কুল অব আর্ট) এবং অল ইন্ডিয়া ফাইন্ আর্টস অ্যান্ড ক্রাফট্স্ সোসাইটি—যার নাম জানে না এমন কোনো শিক্ষা-প্রাপ্ত লোক নেই এই শহরে। সারদাবাবু স্বর্গত হয়েছেন ২১শে জুলাই, ১৯৪০ সনে। আজ তাঁর স্মরণে শিল্প বিদ্যালয়টি আছে জনপথের ছয়ষট্টি নম্বর বাড়িতে। সেখানে শেখানো হয় সব রকম চিত্রশিল্প।

শান্তনু বললেন : 'জানেন আমার মাথা নত হয় আমার গুরুদেব শৈলজ মুখোপাধ্যায়ের চরণে। উনি আজ আর নেই। চলে গেছেন ইহলোক ছেড়ে কয়েক বছর আগে। উনি বলেছিলেন : আগে চেয়ে দেখ, ভাবো, তারপর আঁকো। অনেক আঁকতে হবে।' (আমি শান্তনুকে জানালাম : 'আমি শৈলজবাবুকে চিনতাম। তাঁর শিল্পের আমি ছিলাম একজন ভক্ত, তাঁকে নিয়ে আমি একাধিকবার লিখেছি, তাঁর স্মৃতি আমার মনে খুব তাজা।')

উকিল শিল্প-বংশের ধ্বজা নিয়ে আজ আছেন শান্তনু। তাঁর প্রতি সকলের শুভেচ্ছা। উনি আরো একটি শিল্প পরিবারকে তাঁর একান্ত করেছেন। বিখ্যাত শিল্পী মুকুল দে মহাশয়ের একমাত্র সন্তান শ্রীমতী মঞ্জুরীর উনি স্বামী। (ইনি এখন হচ্ছেন ইন্দ্রপ্রস্থ কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপিকা, এঁর ডক্টরেট প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে—বরাবর বিশ্বভারতীর ছাত্রী।)

শান্তনু অনেক কথা জানালেন তাঁর পিতৃদেবের সম্বন্ধে। বাঙলা দেশ ও ভারতের জানা উচিত সারদা উকিল মহাশয়ের অবদানের কথা এবং আমার বিশ্বাস আমরা একদিন ভালো করে জানতে পারবো তাঁকে।

তাঁর আঁকা অনেক ছবি আছে পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশের রাজা মহারাজদের কাছে। কোনওটি আদৃত, কোনওটি অনাদৃত, কারণ অনেকেই জানেন না শিল্পের মূল্যায়ন এবং যাঁরা জানেন তাঁদের পক্ষ থেকেও কোনো প্রচেষ্টা নেই উদ্ধার সাধনের। এই আমার দেশ !!

শুনলাম শান্তনুর কণ্ঠ থেকে : 'আমার পিতার শেষ ছবি। জানেন ১৯৪০ সনে হিমাচলের বিলাসপুরের রাজা স্বপ্ন দেখেছিলেন কোনো শিল্পীর যিনি আঁকবেন কৃষ্ণজীর ছবি তাঁর গোপালজীর মন্দিরের জন্যে। তাঁরা খুঁজে পেতে এলেন আমার পিতার কাছে। তাঁর জীবনের শেষ সনটিতে। উনি খুব বড়ো বড়ো চিত্রে আঁকলেন শ্রীকৃষ্ণের জীবন, প্রায় ৪০টি ছবি। তা' আছে এখনো ওই গোপালজীর মন্দিরে।'

খগেন দে সরকার

ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা

নকুল চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীর প্রত্যেক সাহিত্য-পুরস্কারের পক্ষে এবং বিপক্ষে নানা অভিযোগ যুক্তি ও মতবাদ পুঞ্জিকৃত হয়ে আছে। সাহিত্য-বিচারের পদ্ধতি নিয়েও আজ দেশে দেশে নানা প্রশ্ন উঠেছে। বর্তমান যুগে নোবেল-পুরস্কার সম্বন্ধেও ওই একই অভিযোগ প্রযোজ্য।

কিন্তু প্রতি বছরে যখন পুরস্কার প্রাপকের নাম ঘোষিত হয় তখন তা নিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র আলোচনা হয়। প্রাপকের গ্রন্থ ও জীবনী সম্বন্ধে পাঠককুল কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। কিন্তু তা খুবেই ক্ষণস্থায়ী। কিছুকাল পরেই দেখা যায় প্রাপকের সাহিত্য-কৃতি কখন অজ্ঞাতে মানুষের বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। অথচ দেখা গেছে যাঁরা নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন নি এমন অনেক সাহিত্যসেবী বিশ্ববাসীর মনের মণি কোঠায় আজো চির ভাস্বর হয়ে আছেন।

এবারে নোবেল পুরস্কারের প্রাপক হিসেবে একজন জাপানী সাহিত্যিকের নাম ঘোষিত হয়েছে। তিনি হলেন ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা।

প্রতিভাবান সাধারণত শক্তিশালী ও খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের জীবনে ঘটে ইয়াসুনারি কাওয়াবাতার জীবনেও ঘটেছিল। অবিমিশ্র খ্যাতি বা প্রশস্তি কোন সাহিত্যিকই পান না এবং তিনিও পানান। পশ্চিমের সমালোচকরা তাঁর সাহিত্য কীর্তির মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছেন যে একমাত্র পশ্চিমের অতি-ভাবপ্রবণ পাঠকরাই ইয়াসুনারি কাওয়াবাতাকে পছন্দ করেন। কিন্তু কাওয়াবাতার সাহিত্য-সম্পর্কে এ মত তর্ক সাপেক্ষ। সমালোচকের যুক্তি যে অনেকাংশেই ভিত্তিহীন সুইডিশ অ্যাকাডেমী ইয়াসুনারি কাওয়াবাতাকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করে তা প্রমাণ করে দিয়েছেন।

ইয়াসুনারি কাওয়াবাতার জন্ম জাপানের ওশাকায় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে। বাবা ছিলেন ডাক্তার। নিজে সাহিত্যিক বা শিল্পী ছিলেন না বটে, কিন্তু সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। যখন কাওয়াবাতার বয়েস মাত্র তিন বছর তখন তাঁর বাবা মারা যান আর তাঁর মাকে তিনি হারান মাত্র চার বছর বয়সের সময়। অল্প বয়সে মাতৃপিতৃহীন হয়ে ঠাকুরমা আর ঠাকুরদাদার কাছেই মানুষ হতে থাকেন। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে ঠাকুরমার স্নেহ ভালবাসাও তিনি বেশীদিন ভোগ করতে পারেননি। আট বছর বয়সে ঠাকুরমা মারা যান এবং যখন তাঁর ষোল বছর বয়েস তখন ঠাকুরদাদাও বিদায় নেন পৃথিবী থেকে।

ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা হতে চেয়েছিলেন শিল্পী (চিত্রকর) কিন্তু ভাগ্য তাঁকে ঠেলে দিয়েছিল সাহিত্যের দিকে। তিনি যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডী পেরিয়ে মাত্র মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হন সেই সময়ে তিনি সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হন। ষোল বছর বয়সের সময় তিনি তাঁর ঠাকুরদাদাকে হারান। সেই সময়ের কিছু পূর্বে তিনি Jurokusai no Nikki (Diary of a sixteen year old) লিখেছিলেন, যদিও বইটি প্রকাশিত হয় কয়েক বছর পরে। কলেজ জীবনেই তিনি সাহিত্যকে পুরোপুরিভাবে জীবনের একমাত্র কাম্যবস্তু হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি ১৯২০ খৃষ্টাব্দে টোকিও ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজী সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে অন্যান্য সহপাঠীদের সাহায্যে তিনি একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় কাওয়াবাতার "Shokonsai Ikkei" (A memorial Day scene) শীর্ষক গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটি শুধু যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অধ্যাপক ও ছাত্রদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করল তা নয়—প্রতিষ্ঠিত জাপানী গল্পকাররা পর্যন্ত গল্পটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে কাওয়াবাতার প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাটি সাহিত্যিক সাংবাদিক মহলে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। আর তার ফলে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে গ্র্যাজুয়েট হবার পূর্বেই Bungei Shunzu পত্রিকার অন্যতম কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হন। কাজ ছিল সাহিত্যের খবর লেখা এবং সাহিত্যের সমালোচনা করা। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি গ্র্যাজুয়েট হন আর সেই বছরই তিনি নিজে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন (Bungei Jidai—আর্টের যুগ)। এই পত্রিকা প্রকাশে তাঁকে যিনি সাহায্যে করেছিলেন তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক। তাঁর নাম Riichi Yokomitsu। এই পত্রিকার মাধ্যমেই জাপানী সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই আন্দোলনকে বলা হয় Neo-Perceptionism-এর আন্দোলন।

ইয়াসুনারি কাওয়াবাতার প্রথম জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি "Izu no odariko" (The dancing maid of Izu). এটি Bungei Shunzi পত্রিকার জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী (১৯২৫) সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই গল্পটি গড়ে উঠেছে ভ্রাম্যমান নাচ-গানের দলের একটি যুবতী নর্তকীকে ঘিরে। কাওয়াবাতা যখন মাত্র স্কুলের ছাত্র তখন ইজু অঞ্চলে এই নর্তকীকে দেখেছিলেন। গল্পে লেখক তাঁর বাল্যের অনেক ঘটনা এবং অভিজ্ঞতাকেই অত্যন্ত ভাবপ্রবণতার সঙ্গে গল্পের মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন। সমালোচকের মতে এ রচনাটি হচ্ছে "...the first masterly example of the restrained, evocative prose in which he tells his sad and sensuous stories".

শ্রীকাওয়াবাতা তাঁর "Asakusa Kurenaidan" (The Kurenaidan of of Asakusa, 1929) এবং "Flower waltz" প্রভৃতি রচনায় নর্তকীদের জীবন নিয়ে কাহিনী লিখেছেন। "Kunzu"—Birds and animals—১৯৩৩, এই গল্পটিতে নির্জনতার সুন্দর রূপ এবং আত্মাভিমানের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

"Yukiguni"—(Snow Country বা বরফের দেশ) অনেকের মতে কাওয়াবাতার শ্রেষ্ঠ রচনা। এই উপন্যাসটি লেখক প্রথমে Bungei Shunzu (1935-37) পত্রিকায় প্রকাশ করেন। কাহিনীটির শুরু হয় "প্রথম-প্রেম" আঙ্গিকে। কাহিনীর নায়ক হচ্ছেন শিমামুরা। শিমামুরা টোকিওর বাসিন্দা, ধনী এবং পশ্চিমী নৃত্যকলা

রূপমার্জে ওয়াকিবহাল। সাতদিন পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণ করার পর ক্লান্ত দেহ ও মন নিয়ে শিমামুরা পার্বত্যগ্রামের সরাইখানায় এসে হাজির হয়েছিল। সরাইখানায় তিনি একজন গেইশা নর্তকীর সান্নিধ্য পাবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তখন কোন গেইশাই সেখানে ছিল না। তারা গিয়েছিল একটি উৎসবে যোগ দিতে। তাই গেইশার বদলে তার কাছে যাকে পাঠানো হলো সে হচ্ছে কোমাকো—নৃত্য-শিক্ষকের বাড়িরই একটি নাচিয়ে মেয়ে। শিমামুরা কোমাকোর সারল্য ও মানসিক পবিত্রতার মুগ্ধ হলো। সরাইখানার সেই পরিবেশে কোন সহজ-সরল পবিত্র মেয়ের দেখা পাবে সেকথা সে কল্পনাও করেনি। তাই কোমাকোর প্রতি শিমামুরা একটি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করল। মেয়েটির বয়স ছিল তখন মাত্র উনিশ। পরের দিন যখন কোমাকো শিমামুরার ঘরে এল তখন শিমামুরা তাকে একটি গেইশা নর্তকীকে আনবার জন্য অনুরোধ জানালো। কারণ শিমামুরা কোমাকোর কুমারীত্ব হরণ করে তার পবিত্রতা নষ্ট করতে ইচ্ছুক ছিল না।

গেইসা এল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই শিমামুরার দেহ-মন নিরুত্তাপ হয়ে এল। বিশেষ কাজের অছিলায় সে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে গেল। ফিরে এসে দেখলো যে কোমাকো একটা গাছের তলায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। শিমামুরা অনুমানে বুঝতে পারলো যে মেয়েটি তাকেই খুঁজতে বেরিয়েছে।

সেদিন রাত্রে কোমাকো আবার শিমামুরার ঘরে এল। কোমাকোর সমস্ত দেহ টলছিল। কারণ তার গেইসা বন্ধুরা তাকে জোর করে অত্যধিক মদ খাইয়ে দিয়েছিল। রাত্রি দুটো পর্যন্ত কোমাকো শিমামুরার ঘরেই রইল কিন্তু শিমামুরার মানসিক বল ও সদিচ্ছার কাছে তার বুভুক্ষু কামনা সে রাত্রে পরাজয় স্বীকার করলো। নিষ্পাপ দূরত্বই সেদিন কোমাকো ও শিমামুরার দৈহিক পবিত্রতা রক্ষা করতে সাহায্য করলো।

শিমামুরা যখন আবার সেই সরাইখানায় এল, তখন শুনলো যে তার পবিত্র কোমাকো আর পবিত্র নেই। সে ঘৃণ্য গেইসা হয়ে গেছে। একথাও শুনলো যে কোমাকো ইউকিও নামে এক পুরুষের প্রতি আসক্ত। আর তার সঙ্গে বিয়ের পাকাপাকি কথাও হয়ে গেছে। কিন্তু ইউকিও এখন অসুস্থ আর তার চিকিৎসার খরচ চালাবার জন্যই সে এ বৃত্তি বেছে নিয়েছে। শিমামুরা কোমাকোকে দ্বিতীয়বার দেখল। তার সম্পর্কে সমস্ত গুজবও শুনলো। সব শুনেও কিন্তু সে কোমাকোকে ঘৃণা করতে পারলো না। আসলে কোমাকোর প্রতি তার আকর্ষণ আরও বেড়ে গেল।

কয়েক বছর পরের কথা।

কোমাকোর বয়স এখন চব্বিশ। শিমামুরা আবার এসেছে সেই সরাইখানায়। ইতিমধ্যে কোমাকো যে নৃত্য-শিক্ষকের আশ্রয়ে ছিল, সে এখন মারা গেছে। এক ভদ্রলোক তাকে রক্ষিতা হিসেবে দীর্ঘ পাঁচ বছর তার আশ্রয়ে রেখেছে। কিন্তু কোমাকো তাকে ভালোবাসতে পারেনি। সে চায় শিমামুরাকে। সে চায় শিমামুরাকে একান্তভাবে পেতে। এমনি সময় শিমামুরার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এক গেইসা মেয়ে ইওকোর সঙ্গে। সে পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

শিমামুরা কোমাকোর ঐকান্তিকতা দেখে এবং নিজের মনের রাজ্যে শূন্যতা অনুভব করে শুধু ব্যথিত হলো। সে স্থির করেছিল আর কোনদিনই কোমাকোর কাছে আসবে না। কোমাকোও উপলব্ধি করলো যে তারা একে অন্যের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

একদিন রাত্রে হঠাৎ বিপদসংকেত বেজে উঠলো। গ্রামে একটা রেশমের গুদামে আগুন লেগেছে। শিমামুরা ও ইওকো তুষারবিস্তীর্ণ পথ অতিক্রম করে এসে সেখানে হাজির হলো। পরিষ্কার আকাশের বুকে তখন ছায়াপথ চকচক করছে। সেখানে পৌঁছে শিমামুরা অনুভব করলো যে এক্ষুণি হয়ত কোমাকোর কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। হঠাৎ কি যেন ঘটে গেল। যে বাড়িটা আগুনে জ্বলছিল তারই ছাদ থেকে একজন মহিলা এসে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। শিমামুরা এগিয়ে গেল। দেখল সে আর কেউই নয়—ইওকো। তার চোখ বোজা। তবুও যেন শিমামুরা তার চোখে আগুন দেখতে পাচ্ছিল।

টলতে টলতে সে এগিয়ে গেল কোমাকোর দিকে—কোমাকোর কোলে তখন ইওকোর মৃতদেহ। আর উজ্জ্বল আকাশে তখন চকচকে ছায়াপথ।

সমালোচকের ভাষায় কাওয়াবাতার Yukiguni (Snow Country) উপন্যাসটিতে :

"The sparkling love, mingled with the cold realization of actuality, between the hero, who has observed life only through art, and the woman, who has been leading a lonely life in the remote mountainous region, dominates the story."

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার আগেই কাওয়াবাতা "Diary of a sixteen-year-old", "The Izu Dancer", "The Kurenaidan of Asakusa", "Flower watz", "Snow Country", প্রভৃতি রচনার মাধ্যমে **জাপানের জাতীয় জীবনের শাশ্বত বাণী আধুনিক ভাবধারায় প্রকাশ করে জাপানী সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিজের স্থান সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।** যুদ্ধের সময় তিনি খুব কমই লিখেছেন। যুদ্ধের পর তাঁর যে কয়টি বই প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

"yu kiguni" [1937 and 1947] Snow Country—এ পর্যায়ের তিনি ১৯৩৫-৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম লিখেছিলেন); "Sembazuru" (A thousand cranes, 1949); "Yama no Oto" (Sound of the Mountain, 1949); "Saikon-sha" (Remarried, 1953); "Tokyo no Hito" (Tokyo people, 1955); "Mizuumi" (The Lakes, 1955).

বিংশ শতাব্দীতে এমন একটি দেশও বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে সাহিত্য নিয়ে মনোমালিন্য হয় না—তর্ক হয় না—দলাদলি হয় না। জাপানেও যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে দলাদলি নেই এমন নয়। তবে ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা হচ্ছেন এমন একজন সাহিত্যিক যিনি এ সমস্ত থেকে অনেক কষ্টে নিজেকে প্রচ্ছন্নভাবে সরিয়ে রেখে সাহিত্যসেবা করে যাচ্ছেন। **তাঁর ভাবনা বা চিন্তার সঙ্গে অনেক আধুনিক সাহিত্যিকেরই ঐক্য নেই। কিন্তু যেহেতু তাঁর চিন্তা এবং রচনা জাপানের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূলসুরের সঙ্গে গাঁথা সেজন্য কোনদিনই বোধ হয় তা সেকেলে হয়ে যাবে না।** শ্রীকাওয়াবাতা তাঁর সাহিত্যিক জীবনের অভিজ্ঞতা লিখেছেন "Bunga kuteki Jijoden" (1937) গ্রন্থে। শৈশবে ও বাল্যে পর পর অনেকগুলো মৃত্যুকেই তিনি দেখেছেন—সেই স্মৃতি কখনই তিনি বিস্মৃত হতে পারেননি। আত্মস্মৃতির অনেকটা অংশ জুড়েই রয়েছে মৃত্যু সম্পর্কে লেখকের ভাবনা চিন্তা। এই গ্রন্থেই তিনি লিখেছেন :

"Love is to me the only string to hold life together."

ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা শুধু গল্পকার বা ঔপন্যাসিকই নন, তিনি একজন বিদগ্ধ সমালোচকও। তিনি তাঁর সাহিত্যিক জীবনে পেয়েছেন কান কিকুচির মত সাহিত্য গুরুর পৃষ্ঠপোষকতা আর তিনিও কোন সমসাময়িক অনেক বিখ্যাত জাপানী সাহিত্যিকের আবিষ্কর্তা বা পৃষ্ঠপোষক। যিনি সাহিত্যের সমালোচক তাঁর সবচেয়ে বড় পুরস্কার আবিষ্কারের সার্থকতায়। বর্তমানে অনেকের বিশ্বাস আধুনিক জাপানী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, মিশিমা ইউকিওর আবিষ্কর্তাও ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা। যাঁরা সাহিত্যে নবাগত—কাওয়াবাতা তাঁদের বন্ধু, উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক।

শ্রীকাওয়াবাতা জাপানের পি ই এন ক্লাবের চেয়ারম্যান পদে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে জাপান আর্ট আকাডেমিতেও অন্যতম সভ্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

আমরা ইয়াসুনারি কাওয়াবাতাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাচ্ছি।

ইয়াসুনারি কাওয়াবাতার রচনা বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কাওয়াবাতার রচনার সার্থক অনুবাদকের নাম এডওয়ার্ড সাইডেনস্টিকার।

অরণ্যদেব ✲ লী ফক

কীলা-উয়ির ঢাকীকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে

কিন্তু তার বার্তাকে তাই বলে থামিয়ে রাখা যায়নি-----

আকাশ থেকে কীলা-উয়িতে খারাপ মানুষ নেমেছে, অরণ্যদেব, তাড়াতাড়ি আসুন!

?!

ওহে পাইলট, ওই ঢাকের বাজনার অর্থ কী?

ঢাক বলছে: 'আকাশ থেকে কীলা-উয়িতে খারাপ মানুষ নেমেছে----- অরণ্যদেব, তাড়াতাড়ি আসুন "

অরণ্যদেব কে?

তা জানি না, তবে ওই লোকটা বলেছিল, এই চিহ্ন অরণ্যদেবের।

একা থাকতে চাইছে ওরা। সন্দেহ হবার আগেই সরে পড়তে চায়।

তা হবে না। এখনও অনেক 'গন্ধক' তুলতে হবে। তাই না রাউড়ি?

ঠিক কথা। ঢাকের শব্দ ভুলে গিয়ে কাজ চালাও।

৪/৩

সাংকেতিক শব্দ ওদিকে এগিয়েই যাচ্ছে-----

-- অরণ্যদেব, তাড়াতাড়ি আসুন- আকাশ থেকে খারাপ মানুষ নেমেছে-

সাংকেতিক বার্তা গিয়ে অরণ্যদেবের গোপন গুহায় পৌঁছল-----

-- অরণ্যদেব, আসুন আকাশ থেকে খারাপ মানুষ নেমেছে-

সম্ভবত প্লেন নেমেছে। কারা নামল?

জাহাজ-ডুবির সেই লোকটাই নয়তো?

কীলা-উয়ির সোনা-বেলা এক অমূল্য ঐশ্বর্য। লোভী মানুষদের সেখানে হাত দিতে দেব না।

সাহিত্য সংবাদ

আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর সঙ্গে কাল্পনিক সংলাপ

আমি : রবীন্দ্রনাথের রচনার যথাযোগ্য মহত্ত্ব নিরূপণ করার জন্য আপনি যে নিরলস চেষ্টা করছেন, তাতে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করি। কৃতজ্ঞতা এই কারণে যে, আপনার দৃষ্টি খুবই মোহমুক্ত ও স্বচ্ছ, নিছক গুরু পূজার বদলে শিল্প-নিরীক্ষাই আপনার সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য। কিন্তু আধুনিকতা বা আধুনিক কাব্যধারার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথকে বিচার করতে গিয়ে আপনি যে যুক্তিজালের অবতারণা করেছেন, সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা মনে হয়েছে আমাদের। বলবো কি?

আইয়ুব : (সহাস্যে) নিশ্চয়ই। বলুন, আমি শুনতে চাই।

আমি : আপনার তুলনায় আমি নিতান্তই মূর্খ এবং অর্বাচীন। বাংলা আপনার মাতৃভাষা না হলেও আপনি এ ভাষায় অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছেন, আপনি আমাদের গুরুস্থানীয়, আপনি যে রকম নিখুঁত ও জীবন্ত ভাষায় আপনার বক্তব্য বোঝাতে পারেন, আমি সে রকম মোটেই পারবো না। আমার বক্তব্য যদি একটু এলোমেলো হয়ে যায়, তা হলে আমাকে ক্ষমা করবেন। মানে, আমি বলছিলুম কি, আপনি যেন অনেক সময় হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। আধুনিক সাহিত্যে আপনি যে অশুভ ও অমঙ্গলবোধের উল্লেখ করেছেন, সে-সব আপনি পেলেন কোথায়? বোদলেয়ারের এতখানি প্রভাব আপনি কি করে দেখলেন?

আইয়ুব : এই বাংলা দেশেই যে, পরীক্ষা নিরত বহু নবীন কবির পক্ষে এখন একথাটা মেনে নেওয়া অত্যন্ত বেশী সহজ হয়ে গেছে যে তিনি (অর্থাৎ বোদলেয়ার) 'প্রথম দ্রষ্টা কবিদের রাজা, সত্য দেবতা'। ইদানীংকালে সাহিত্যকেও এই সমস্যাটি পেয়ে বসেছে যে জগতের মধ্যে অমঙ্গলের একচ্ছত্র আধিপত্য। দুঃখ ও পাপের মাত্রা আধুনিককালে আগের চেয়ে বেড়েছে কিনা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে; কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের ওপর তার ছায়া যে অতি বৃহৎ আকার ধারণ করেছে তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এবং আমার সন্দেহ ক্রমে বিশ্বাসে পরিণত হচ্ছে যে, রোমান্টিকতার মোহ থেকে মুক্তি লাভের ঐকান্তিক সাধনায় আধুনিক কবিরা এমন কিছু থেকে নিজের মনকে বিমুক্ত করছেন যাতে কবির চিরন্তন এবং অব্যর্থ পরিচয়।

আমি : ঠিক বুঝতে পারলুম না। আপনি কি এখনকার ছেলে ছোকরা বাঙালী কবিদের কথা বলছেন? তারা সবাই বোদলেয়ার প্রদর্শিত অমঙ্গলের পূজারী? এবং রবীন্দ্র বিদ্রোহী?

আইয়ুব : সব আধুনিক কবিদের সম্বন্ধে একথা খাটে না। সম্মানিত ব্যতিক্রম অবশ্যই রয়েছেন, বিদেশে এবং এদেশেও। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যাঁদের কবি-জন্ম, ঠিক রবীন্দ্র বিদ্রোহী তাঁদের বলা যায় না, কারণ তাঁরা আদৌ ঐ কাব্য সাম্রাজ্যের রাজানুগত নাগরিক ছিলেন না। বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো, মালার্মে, ভালেরি, গটফ্রিড বেন, আঁদ্রে ব্রেঁত, সামুয়েল বেকেট, জাঁ জেনে, অ্যালেন গীন্সবার্গ—কাব্যের এই জগৎ রবীন্দ্রনাথের জগৎ থেকে বহু দূরে অবস্থিত। অবশ্য এ'রা পুষ্ট হয়েছেন কেবল বিদেশী সাহিত্যের কোলে এমন কথা আমি বলতে চাই না। বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যও এঁদের লেখাকে স্পষ্টতই প্রভাবিত করেছে। তবে সে ঐতিহ্য রবীন্দ্র কাব্য রচিত নয়। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসুর অধিকারী এ'রা। উত্তমর্ণদের মধ্যে যে লক্ষণগুলি পরিমাণ ও সংযম রক্ষা করে প্রকাশ পেয়েছিল, সেই লক্ষণগুলিকে এই নবীন কবিরা উগ্র এবং বল্গাহীন করে তুলেছেন তাঁদের পদ্যে ও গদ্যে। অমিয় চক্রবর্তী কিংবা বিষ্ণু দে-র প্রভাবও যথেষ্ট পড়েছে পঞ্চাশের কবিদের ওপর, কিন্তু যাঁরা ঐ প্রভাব গ্রহণ করেছেন তারা আমার এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নন।

আমি : বুঝতে পেরেছি, আপনি কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর ছোকরাদের কথা বলছেন। কিন্তু তার আগে, সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ আর বুদ্ধদেব বসুকে একদিকে আর অন্যদিকে অমিয় চক্রবর্তী ও বিষ্ণু দে-কে রেখেছেন—এটা যেন কেমন শুচিবাই-এর মতন মনে হচ্ছে। আপনি নিশ্চয়ই বলতে চান না—অমিয় চক্রবর্তীর মতন নিরামিষ শব্দ ব্যবহার না করলেই কিংবা বিষ্ণু দে'র মতন রাজনীতিতে বিশ্বাসী না হলেই অমঙ্গলের কবিতা হবে। বিদেশী যাদের নাম করেছেন, সেটাও যেন কেমন খুবই সোজা সোজা—অর্থাৎ যাকে বলে অতি সরলীকরণ হয়ে গেছে। আপনাকে একটা গোপন খবর জানাই। বাংলা দেশের এইসব কবিরা যে খুব একটা বিদেশী সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনো করে, তা নয়। মাঝে মাঝে উল্টেপাল্টে দেখতে দোষ নেই। কিন্তু বোদলেয়ার-কাব্য কারুর বালিশ-সঙ্গী নয়, মালার্মে নিরীক্ষকর, গীনসবার্গ দুষ্পাঠ্য। তবে আপনি যে আধুনিকতার সাধারণ লক্ষণের কথা বলেছেন, তার একটা মিল থাকলেও থাকতে পারে। সেটা কি করে হয় জানেন? আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, রবীন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতিতে এক ব্যক্তির উল্লেখ আছে, রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার যখন বিলেতে যান—তাঁর একজন ল্যাটিন শিক্ষক ছিল—তিনি বিশ্বাস করতেন, বিশেষ একটা যুগে বিশেষ একটা চিন্তা পৃথিবীর সব দেশেই আপনা-আপনি ছড়িয়ে পড়ে—তার জন্য কোনো যোগাযোগের দরকার হয় না। আমিও অনেকটা এই রকম বিশ্বাস করি। কিন্তু এই সাধারণ লক্ষণকে আপনি বিস্ময়বোধের অসারতা বা অমঙ্গলপ্রীতি ভাবলেন কেন?

আইয়ুব : রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে। তুমি বিচিত্র রূপিণী'। আধুনিকরা সংক্ষেপের পক্ষপাতী, তাই তাদের উপলব্ধিও একটি সংক্ষিপ্ত—জগতের মাঝে বিকৃত তুমি হে। তুমি বিকৃত রূপিণী। চিত্ত দুটির একটি চিত্ত দুঃখের, অন্যটি পাপের। দুঃখ ও পাপের যুগ্ম সত্তাকে ইংরেজিতে evil বলে অভিহিত করা হয়, তারই বাংলা করেছি অমঙ্গল।

আমি : (চিন্তিত) ঐটেই তো হয়েছে মুশকিল।

আইয়ুব : (সহাস্যে) আপনি তা হলে স্বীকার করছেন?

আমি : না, আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। পাপ কথাটা ইংরেজি Sin-এর সমান করে তোলার খুব একটা চেষ্টা চলছে বটে, কিন্তু সে রকম কোনো বোধ আমাদের এখনও জাগে না। আর দুঃখ কথাটা তো বিরাট একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের মতন—ওর মধ্যে যে কি নেই তা বলা যায় না। সে কথা থাক। আমি মুশকিল বলছিলাম এই জন্য যে,

ফরাসী সাহিত্যের প্রসঙ্গ বাংলা কবিতার আলোচনায় একেবারেই থাপ খায় না। ফরাসীরা সাহিত্যের এক একটা পর্বের সুচিন্তিত নাম না দিয়ে ছাড়েন না। সমালোচকরাও সেই অনুযায়ী ধাবিত হন। এই নিয়ে টানা হ্যাঁচড়াও কম হয় না। র‍্যাঁবোকে সিম্বলিস্ট, সুররিয়েলিস্টরা পুরোধা হিসেবে গণ্য করেন, আপনি যাঁকে বলেছেন, অন্ধগলির কবি—সেই র‍্যাঁবোকেই আবার গুরু ঠাউরেছিলেন পোল ক্লদেল—যাঁর কবিতায় আবার মঙ্গলবোধের পরাকাষ্ঠা। সে যাই হোক, বাংলায় ওভাবে কবিতা লেখা হয় না, কখনো সে রকম কাব্য আন্দোলন হয়নি। এখনকার বাঙালী কবিদের গায়েও ওরকম কোনো লেবেল আঁটা যাবে না। প্রতিবাদ, আঘাত বা ধ্বংস বাসনাও অমঙ্গল বোধ নয়। এগুলো বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের মানসিক অভিব্যক্তি। এ সবেরই মূলে আছে বেঁচে থাকার ইচ্ছে। বোদলেয়ার ছিলেন জীবন পরাঙ্মুখ এবং অসুস্থ। কে তাঁকে গ্রাহ্য করে এখন? কে তাঁকে মনে রেখেছে? বুদ্ধদেব বসু তাঁর লেখা বাংলায় বিস্তৃতভাবে অনুবাদ করেছেন বটে, কিন্তু বাংলা দেশে তাঁর কোনো প্রভাব পড়েছে—এ চিন্তা একেবারেই অমূলক, জীবনবোধ তো দূরের কথা—বোদলেয়ারের কবিতাও আমাদের কাছে এখন নিছক পানসে লাগে।

আইয়ুব : আপনি উত্তেজিত হয়ে বড্ড তাড়াতাড়ি কথা বলছিলেন। সব কথা ঠিক ধরতে পারিনি। আপনি আবার বলবেন?

আমি : (লাজুক হাস্যে) ঐ তো আমার দোষ, ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারি না। আমি বলতে চাইছিলাম যে, বাংলা সাম্প্রতিক কবিতায় বোদলেয়ারের প্রভাব কিংবা অমঙ্গলবোধের সর্বগ্রাস খুঁজতে যাওয়া—ঠিক রজ্জুকে সর্পভ্রমও বলবো না, বলা যায় অনেকটা যেন কাকদন্ত গবেষণা। * আসলে ব্যাপারটা দার্শনিক হিসেবে আপনাকে বিচলিত করেছে—এর একটা সামাজিক বহিরঙ্গ ছবি থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু এটা কোনো সাহিত্যের সমস্যা নয়। কবিরা এখন কবিতা লিখছেন নিজের জীবন নিয়ে, দলকে দল সবাই আত্মহত্যা করতে চাইছেন—এটা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করা যায় না। এমন কি কোনো কবি আত্মহত্যা বিষয়ক তীব্র কবিতা লিখলেও না। যুবা বয়েসে অনেক সময়ই আত্মহত্যার প্রবল ইচ্ছে জাগে, সেই বাসনাপ্রসূত প্রবল আত্মধ্বংসী সার্থক কবিতাও লেখা সম্ভব—কিন্তু সেই কবির কবিতার বা জীবনের কোনো স্থির সত্য নয়। বস্তুত সেই বিশেষ কবিতার যে ধ্বনিমাধুর্য সেটাই...

আইয়ুব : আপনিও বুঝি বিশ্বাস করেন, শুধু ধ্বনি মাধুর্যই...কাব্যের কাব্যার্থ বা আভিধানিক অর্থ ছেঁটে ফেললেও ক্ষতি নেই? কবিতার ময়ূরপঙ্খী নায়ে যে শৌখিন ভাষা ভেসে বেড়ায় তার সঙ্গে অর্থের মানপত্র থাকলে নৌকাডুবি হবার আশঙ্কা?

আমি : এবার আপনি আমাকে দারুণ যুক্তির মারপ্যাচে ফেলবেন বুঝতে পারছি। আগে থেকেই আমি এ ব্যাপারে পশ্চাদপসরণ করছি। এ সম্পর্কে কিছুতেই গুছিয়ে বলতে পারবো না। জানি, কবিতার বাহন শব্দ, সব শব্দেরই একটা না একটা অর্থ আছে, উন্মাদ ছাড়া অর্থ না ভেবে শব্দ ব্যবহার করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়—তবুও শব্দের ধ্বনির রহস্যেই শেষ পর্যন্ত কবিতা কবিতা হয়ে ওঠে। কিন্তু এই ধ্বনি রহস্যটা ঠিক সংগীত নয়, চিত্রকলায় বর্ণের সমাহারও ঠিক নয়, এটা কি তা বলা যায় না বলেই—অর্থটাকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে ভরসা হয় না। কিন্তু আপনি যে উপমা দিয়েছেন ব্যঙ্গচ্ছলে—ঐ ধরনের উপমাই কিন্তু ঠিক বিপরীত অর্থেও দেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথই তো বলেছেন যৌবন বয়েসে, যখন সমালোচক হবার দায়িত্ব তাঁর ছিল না—যে অর্থের ভার থেকে মুক্ত হয়েই তাঁর কবিতা প্রথম নিজস্বতা পেল। কবিতাকে তিনি তুলনা করেছিলেন খেয়া নৌকোর সঙ্গে, বলেছিলেন, খেয়া নৌকোর ফসল আনা হয়নি কেন—এ অভিযোগ অবান্তর। যদি ফসল থাকে তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু না থাকলে অনুযোগ জানানো যায় না।

* আইয়ুবের উক্তিগুলি যথাসম্ভব তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত "আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

সনাতন পাঠক

শারদ সাহিত্য

পুস্তক পরিচয়

চলন্তিকা। সম্পাদক ঃ শান্তি সরকার। পোঃ এবং জেলা মুর্শিদাবাদ। মূল্য ১·২৫।

মফঃস্বল শহর থেকে প্রকাশিত হলেও আলোচ্য পত্রিকাটির কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি সাহিত্যরস পরিবেশনের দিকে। খ্যাত ও স্বল্পখ্যাত লেখকদের রচনায় সংখ্যাখানি সমৃদ্ধ। এঁদের মধ্যে আছেন কবিতা বিভাগে কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, নরেন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন বসু, বিমল ঘোষ, শক্তিপদ রাজগুরু, দিলীপচন্দ্র রায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ প্রভৃতি। গল্প লিখেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্ত চৌধুরী। একটি নাটিকা লিখেছেন ভোলা সেন। ডঃ মদন রাণা, নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধও পাঠকদের ভাল লাগবে।

মুর্শিদাবাদ সাহিত্য সংকলন। সম্পাদক ঃ ফজলুল হক। জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। মূল্য ০·৭৫।

মুর্শিদাবাদের সাহিত্যসেবীদের আর একটি প্রশংসনীয় প্রকাশন আলোচ্য সংকলনটি। অধিকাংশই স্থানীয় লেখক হলেও রচনাবলীর মধ্যে একটা সামগ্রিক মান রক্ষার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সম্পাদক ফজলুল হক ও জীবনকৃষ্ণ দাসের প্রবন্ধ দুটি, মাসুম হকের ভ্রমণ কাহিনী; স্বপন বাগচী, পূর্ণচন্দ্র জানা, অরুণ ভট্টাচার্য, জগবন্ধু দাস চৌধুরী ও তৃপ্তিশ্রী মুখার্জীর গল্প। কবিতা লেখকদের মধ্যে আছেন তরুণ আচার্য, নন্দলাল শর্মা, অসীম মাহাতো, যতীন্দ্রনাথ বালা, সৈয়দ খালেক নৌমান, হরিপদ রায়, শ্যামল রায়, শুভ বসু, আদিত্যনাথ ঘোষ প্রভৃতি।

অনন্ত। সম্পাদক ঃ সুনীলকুমার নন্দী। ২২ বর্নফিল্ড লেন, কলিকাতা-১। মূল্য ২·৫০।

রচনা বৈভবে এবং আঙ্গিক সৌষ্ঠবে 'অনন্ত' এবারকার বিশিষ্ট প্রকাশনগুলির অন্যতম। প্রকৃত সাহিত্যরসিকদের কাছে সংখ্যাখানি বিশেষভাবেই সমাদর লাভ করবে। সুসম্পাদিত এই সংখ্যাখানির লেখক তালিকার মধ্যে আছেন, প্রবন্ধে ঃ সুকুমার সেন, হরপ্রসাদ মিত্র, চণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিখিলকুমার নন্দী। কবিতায় ঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, জগদীশ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সিদ্ধেশ্বর সেন, সুনীলকুমার নন্দী, শঙ্খ ঘোষ, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত প্রমুখ সুপ্রতিষ্ঠিত কবিবৃন্দ। দুটি গল্প লিখেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও অমিয়ভূষণ মজুমদার। একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস ও একটি নাটকের রচয়িতা যথাক্রমে জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তীন্দ্রনারায়ণ দেব।

তরুণের অভিযান। সম্পাদক ঃ পিনাকীরঞ্জন চক্রবর্তী ও সুনির্মল চট্টোপাধ্যায়। ১৭ জাস্টিস দ্বারকানাথ রোড, কলিকাতা-২০। মূল্য ১·৫০।

লিটল ম্যাগাজিন পর্যায়ের একটি পত্রিকা। আলোচ্য সংখ্যায় রচনাবলী সাহিত্যসেবায় প্রকাশকদের নিষ্ঠার পরিচয় দেয়। লেখক ও লেখিকাদের অধিকাংশই নবব্রতী। তাহলেও প্রকাশিত প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্পের মধ্যে একটা সাহিত্যমান রক্ষার চেষ্টা আছে।

ঘরণী। সম্পাদিকা ঃ করুণা মুখোপাধ্যায়। ২৪৬, মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-৫। মূল্য ৩·০০।

মহিলাদের নিজস্ব এই পত্রিকাখানির শারদীয় সংখ্যার বৈশিষ্ট্য এবারও অক্ষুণ্ণ আছে। আকর্ষণীয় করে সাজানো সংখ্যাখানিতে চারটি উপন্যাস ও দশটি গল্পই প্রাধান্য পেয়েছে। প্রবন্ধ ও রম্যরচনাও অবশ্য আছে, আর আছে নিয়মিত বিভাগগুলি। লেখক তালিকায় আছেন ডঃ রমা চৌধুরী, অবধূত, লীলা মজুমদার, দীপক চৌধুরী, রমাপদ চৌধুরী, জ্যোতির্ময় নন্দী, বিমল কর, বাণী রায়, প্রশান্ত সেন, দিব্যেন্দু পালিত, ধরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তিপদ রাজগুরু, আভা পাকড়াশী, সুজাতা প্রভৃতি।

আসর পত্রিকা—সম্পাদক—সত্যচরণ ঘোষ। ২।১।এ, নারায়ণ সুর স্ট্রীট, কলিকাতা—৫। মূল্য ১·৫০ পয়সা।

এই শারদীয়া সংখ্যাখানিতে গল্প লিখেছেন—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রাণতোষ ঘটক এবং শওকত আলি প্রভৃতি। সমরেশ ঘোষের নাটিকাটি বেশ সুখপাঠ্য হয়েছে। কবিতা লেখকদের মধ্যে রয়েছেন—নচিকেতা ভরদ্বাজ; পবিত্র মুখোপাধ্যায়, পার্থসারথি, মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

গল্প চতুষ্টয়—সম্পাদক মানস গুহ। ৬৬, সুইন হো লেন, কলিকাতা-৪২। দাম ৫০ পয়সা।

অভিনব ব্যবস্থায় প্রকাশিত এই শারদীয় সংখ্যাখানির বৈশিষ্ট্য হল—এটি ছোট গল্পের একমাত্র মাসিকপত্র। এই সংখ্যাখানিতে মোট সাতটি ছোট গল্প রয়েছে। লেখকগণের মধ্যে আছেন—বীরু মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ ঘোষ, নীরদ ভট্টাচার্য এবং মানস গুহ প্রভৃতি। মুদ্রণপ্রমাদ অত্যন্ত দৃষ্টিকটু।

লেখা ও রেখা—সম্পাদক ভাস্কর মুখো-ধ্যায়। প্রকাশ কেন্দ্র অক্ষয় গ্রন্থাগার, ন্তিপুর। দাম: দু' টাকা।

মফস্বল শহরের ত্রৈমাসিক পত্রিকার লোচ্য শারদীয়া সংখ্যাখানি অনেকগুলি বিতা, বেশ কয়েকটি ছোট গল্প এবং ন্ধ সহযোগে আত্মপ্রকাশ করেছে। কবিতা খকদের মধ্যে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, ীন্দ্র রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম লেখযোগ্য। ছোট গল্প লিখেছেন—সৈয়দ স্তাফা সিরাজ, অমল দাশগুপ্ত, বিবেক মাজ প্রভৃতি। প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে রয়েছেন কিরণশংকর সেনগুপ্ত, রণেন নাগ, নেপাল মজুমদার ইত্যাদি। রচনাগুলি সবই বেশ উপাদেয় হয়েছে। প্রচ্ছদপট এবং অভ্যন্তরের কয়েকটি রেখাচিত্রও উল্লেখের দাবি রাখে।

গ্রন্থ পারম্পর্য (বাংলা উপন্যাস সংখ্যা।) সম্পাদক : অপর্ণাপ্রসাদ দাশগুপ্ত। ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১·৫০।

প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার আলোচনার জন্যে এই পাক্ষিক পত্রিকাখানি বাঙলা সাহিত্যের মূল্যায়নে একটি মূল্যবান প্রকাশন। আলোচ্য সংখ্যাখানি বাঙলা উপন্যাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে সুচিন্তিত প্রবন্ধসম্ভারে সমৃদ্ধ। লেখকদের মধ্যে আছেন ভবতোষ দত্ত, জগন্নাথ চক্রবর্তী, গোপাল হালদার, দেবীপদ ভট্টাচার্য, সরোজ বন্দ্যো-পাধ্যায়, শিশির চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত মুখো-পাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র-নাথ দাশগুপ্ত, সুশান্ত বসু প্রমুখ সাহিত্য সমালোচকবৃন্দ। বাঙলা উপন্যাসের মূল্যায়নে সংখ্যাখানি প্রভূত সহায়ক হবে।

খেলার মাঠে

মেক্সিকো অলিম্পিক খেলাধুলোর নানা চমকপ্রদ ও তাজা খবরের ডামাডোলের মধ্যে কলকাতা ও ভারতের খেলাধুলোর খবর প্রায় চাপা পড়ে গিয়েছে। এ ব্যাপারে দৈনিকে ও সাপ্তাহিকে কোন পার্থক্য করা

বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্য আয়োজিত প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় বলে প্রথম কিক করছেন রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর

যাচ্ছে না। তবু দেশের খেলাধুলোর কিছু আভাস দেওয়াও দরকার।

আমরা সবাই জানি, আদালতের ইনজাংশনের ফলে এ বছরের আই এফ এ শীল্ডের যে দশা হয়েছে, এখন সুপার লীগেরও সেই দশা। লীগেও আদালতের ইনজাংশন এসেছে এবং শীল্ডের মত লীগও এ বছর অসমাপ্ত থাকার সম্ভাবনা। ফুটবলের অন্য খবর—দিল্লিতে ডি সি এম ট্রফির খেলা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

ক্রিকেটের বড় খবর—এম সি সি ভারত সফরে আসছে এই শীত মরসুমেই। কিন্তু এম সি সি দল কতখানি শক্তিশালী হবে আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে না। টুকরো টুকরো যেসব খবর আসছে তাতে ইংলণ্ডের নাম-করা খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেকেরই ভারতে আসার অনিচ্ছা। কেন ব্যারিংটন তো অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ভারতে ইংলণ্ড দল তিনটি টেস্ট কি চারটি টেস্ট খেলবে, এখন পর্যন্ত তারও ফয়শালা হয়নি।

এদিকে এই শীতে অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ভারতের স্কুল ক্রিকেট দল গড়া হয়ে গিয়েছে। কলকাতার ছাত্র রাজা মুখার্জি, যে ছেলেটি ইংলণ্ড সফরে বেশ সুনাম কুড়িয়েছিল সেই হয়েছে স্কুল দলের অধিনায়ক। কড়া ম্যানেজার হেমু অধিকারী ভালবাসা ও সামরিক অনুশাসনে যিনি স্কুল ক্রিকেট দলকে ইংলণ্ড নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরই তত্ত্বাবধানে ১৮ নভেম্বর তারিখে ভারতের স্কুল ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়া যাত্রা করার কথা।

ক্রিকেট সফর ব্যবস্থায় টাকাকড়ির দেনা-পাওনা নিয়েও ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সঙ্গে তিনটি দেশের ক্রিকেট বোর্ডের চিঠিপত্র আদান প্রদান চলছে। ভারতে তিনটি টেস্ট ও তিন চারটি সাধারণ ম্যাচের জন্য এম সি সি চেয়েছে ২০ হাজার পাউণ্ড বিদেশী মুদ্রা। ১৯৬৯-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে তিনটি টেস্ট ও তিনটি সাধারণ ম্যাচের জন্য নিউজিল্যাণ্ডের দাবি ভারতীয় মুদ্রায় ৪ লক্ষ টাকা। ওই বছর অর্থাৎ ১৯৬৯-৭০-এর ক্রিকেট মরসুমে ভারতে পাঁচটি টেস্ট ও তিনটি সাধারণ খেলার জন্য অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড ভারতীয় মুদ্রায় ১৫ লক্ষ টাকা দাবি করেছে। পাঁচদিনব্যাপী প্রতি টেস্টের জন্য আড়াই লক্ষ করে এবং তিনটি সাধারণ খেলার জন্য মোট আড়াই লক্ষ। ভাবছি ব্যাট-বলের খেলা, না টাকার খেলা? হবেই বা না কেন। সফরের ব্যাপারে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের যে কাণ্ডাকাণ্ডনা এবং এখানকার দর্শকদের টেস্ট আসরে হাজির থাকার (ঠিক খেলা দেখার জন্য নয়) যে উৎকট আগ্রহ তাতে সফর ব্যবস্থা প্রায় ব্যবসায়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। না হলে ইডেনে ভারত-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ লঙ্কাকাণ্ডের টেস্ট থেকেও সাত লক্ষ টাকার মত লাভ হয়?

মেক্সিকো অলিম্পিকের প্রথম স্বর্ণপদক বিজয়ী কেনিয়ার নাফতালি তেমু

পৃথিবীর ক্ষিপ্রতম মানুষ জিম হাইনস। নতুন বিশ্ব রেকর্ডে ১০০ মিটারের অলিম্পিক স্বর্ণপদক পেয়েছেন

*

মিউনিকে ডেভিস কাপের আন্তঃ আঞ্চলিক সেমি-ফাইন্যালে ৩—২ খেলায় জয়ের ফলে ভারত এখন আঞ্চলিক ফাইনালে আমেরিকার সম্মুখীন। পোর্টোরিকায় আমেরিকার সঙ্গে ভারতের খেলার তারিখ নভেম্বরের ৯, ১০ ও ১১ ঠিক আছে। ওখানে যারা জিতবে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে তারাই খেলবে অস্ট্রেলিয়ার

সঙ্গে ডেভিস কাপ লাভের জন্য। ডিসেম্বরের ২৬, ২৭ ও ২৮ তারিখে এডিলেডে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলার সব ব্যবস্থাও এক রকম পাকা। এখন ভারতের সামনে বড় প্রশ্ন, ১৯৬৬ সালের মত এবারও কি ভারত চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলার সুযোগ পাবে?

বলা বাহুল্য, সেবারও ভারতের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলার কোন সুযোগ ছিল না। কলকাতায় আন্তঃ আঞ্চলিক সেমি-ফাইনালে ব্রাজিলের কাছে প্রায় হেরেই গিয়েছিল ভারত। কিন্তু যমরাজের মুখ থেকে মৃত মানুষকে ফেরাবার মত প্রায় পরাজিত খেলাকে জয়ের মধ্যে ফিরিয়ে এনেছিলেন ভারতের টেনিস প্রতিভা রামনাথন কৃষ্ণন। মিউনিকের আন্তঃ আঞ্চলিক সেমি ফাইনালে এবারও ভারতের জয় কিছুটা অপ্রত্যাশিত। কারণ, পশ্চিম জার্মানীর বিস্ময় সৃষ্টিকারী খেলোয়াড় উইলহেলম বুংগার্ট বড় শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। বাডিং-এর সুনামও বিশ্ব টেনিসে কম নয়। তবু কৃষ্ণন ও প্রেমজিত দুটি সিঙ্গলসে বুংগার্টকে পরাজিত করতে না পারলেও বাকি দুটি সিঙ্গলস ও ডাবলস-এ জয়ের সংবাদে জিতে এসেছিলেন। ডাবলসে অবশ্য কৃষ্ণনের সঙ্গী হিসাবে খেলেছেন জয়দীপ। আঞ্চলিক ফাইনালে এখন আমেরিকাও শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। ওদের কালো খেলোয়াড় আর্থার অ্যাশ ও সাদা গ্রেবনার, দুজনই নাম-করা খেলোয়াড়। অপর দিকে, ১৯৬৬ সালের কৃষ্ণনের সঙ্গে ১৯৬৮-র কৃষ্ণনের অনেক পার্থক্য। ২৫ বছর বয়সী অ্যাশ ও গ্রেবনারের সঙ্গে বর্ষীয়ান কৃষ্ণনের খেলার ফলাফল আমাদের অনুকূলে যাবে এমন কথা জোর করে বলা যায় না। তবু কৃষ্ণনও অসাধ্য সাধনের ক্ষমতা রাখেন। জয়দীপ-প্রেমজিৎও আগের চেয়ে অনেক অভিজ্ঞ খেলোয়াড়, যদিও তাঁদের খেলাতেও বয়সের ছাপ আসতে আরম্ভ করেছে।

আমেরিকার বিরুদ্ধে জিতলে ভারতের

পর পর চারটি অলিম্পিকে ডিসকাস ছোঁড়ার স্বর্ণপদক পেয়ে নতুন নজির সৃষ্টি করেছেন আমেরিকার অল অরটার

ডেভিস কাপ লাভের সর্বপ্রথম সুযোগ কিন্তু সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। যদিও কথাটা 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল'-এর মত শোনাচ্ছে; তবু আমরা আশা করতে পারি, ভারত যদি চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলার সুযোগ পায় তবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয়লাভ হবে অপেক্ষাকৃত সহজতর। কারণ, প্রোফেশনাল টেনিসের আকর্ষণে অস্ট্রেলিয়ার অ্যামেচার টেনিস আজ প্রায় নিঃস্ব। নাম-করাদের মধ্যে শুধু বিল বাউরি ও রাফেলস। নিশ্চয়ই বিশ্ব টেনিসে কৃষ্ণন-জয়দীপ-প্রেমজিতের চেয়ে ওঁদের নাম বেশী নয়। এডিলেড আমাদের কাছে হলেও এখনো অনেক দূরে। তার আগে দূরের জায়গা পোর্টোরিকার দিকে চেয়ে থাকা যাক।

*

অলিম্পিকের চমকপ্রদ অনেক খবর এবং চোখ-ঝলসানো কৃতিত্বের অনেক ছবির মধ্যে কলকাতার খেলার এক ছবিও আমাদের মনের উপর দিয়ে বেশ দাগ কেটে গিয়েছে। ছবিটি হচ্ছে উত্তরবঙ্গ বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্য মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রদর্শনী ফুটবল খেলা এবং সেই অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ধর্মবীরের প্রথম কিকের দ্বারা খেলা আরম্ভ আর বিরতির সময় বলের নিলাম। খেলা যেমন দেহ মনের আনন্দ লাভের উপকরণ, শারীরিক পটুতা, উৎকর্ষ ও নৈপুণ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে এবং পারস্পারিক মিলনের অঙ্গ—তেমন খেলাধুলা যে আর্তত্রাণেরও সহায়ক ওই ছবিই তার প্রমাণ। কোন প্রতিযোগিতামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হলেও ওই প্রদর্শনী প্রতিযোগিতা থেকে বন্যার্তদের জন্য ১৫ হাজার টাকা পাওয়া গিয়েছে, বলের নীলাম থেকে পাওয়া গিয়েছে ৩ হাজার টাকা, মোহনবাগান ক্লাবও দিয়েছে সাড়ে তিন হাজার টাকা। খেলার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আগেই এবং সর্ব প্রথম এক হাজার টাকা দিয়ে ক্রীড়া সঙ্ঘের আর্তসেবার পথ দেখিয়েছে। যে ক্লাবের যতটুকু শক্তি সেই ক্লাব যদি এই-ভাবে এগিয়ে আসে, প্রদর্শনী খেলার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে আর্তের সেবার দান করে তবে এই সর্বনাশা বন্যায় যারা সর্বস্বান্ত হয়েছে তাদের দুঃখের আংশিক লাঘব হয়। সেবার ডাকে খেলোয়াড়কুল কোন দিন পশ্চাৎপদ নন, সর্বনাশের পরি-মাপে এবার তাঁরা দ্বিগুণ উৎসাহে এগিয়ে আসবেন—এটাই আশা করব।

*

অলিম্পিকের কোন্ খবর লিখব? ওখানে রেকর্ড ভাঙ্গা-গড়ার মত ক্ষণে ক্ষণে আমার কল্পনা ভেঙেছে গড়ে উঠেছে। এক-বার ভেবেছি প্রথম স্বর্ণ পদক বিজয়ী তেমুর কথা বেশী করে লিখব; একবার ভেবেছি, পৃথিবীর ক্ষিপ্রতম পুরুষ জিম হাইনসের কথা লিখব; একবার ভেবেছি পর পর চারটি অলিম্পিকে স্বর্ণপদক বিজয়ী এবং নতুন ইতিহাস সৃষ্টিকারী ডিসকাস ছুঁড়িয়ে অল অরটারের কথা লিখব। আবার বিজয়মঞ্চে দাঁড়িয়ে পুরস্কার নেবার সময় নিগ্রো অ্যাথলীটদের কালো দস্তানা পরা হাতের বজ্রমুষ্টি দেখিয়ে আমেরিকার বর্ণবৈষম্যের প্রতিবাদ জানানোর কথাও মনে এসেছে। মনে এসেছে হকিতে ভারতের প্রথম খেলায় পরাজয়ের কথাও। কিন্তু স্থানাভাবের জন্য কিছুই লিখতে পারছি না। পরের সপ্তাহের জন্য মুলতবী রাখছি।

ক্রীড়া কাণ্ড

উড়ন্ত মানব বব্ বীমন

অ্যাথলেটিকসের দৃষ্টিকোণ থেকে উনিশ শ' আটষট্টির অক্টোবরের ১৮ তারিখটি চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে, যেমন স্মরণীয় হয়ে আছে উনিশ শ' প'য়ত্রিশের মে মাসের ২৫ তারিখ। সেদিন অ্যাথলেটিক—জগতের বিস্ময় আমেরিকার 'জেসি' ওয়েন্স অ্যান আরবরের অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় ২৬ ফুট সওয়া ৮ ইঞ্চি লাফিয়ে বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন। 'জেসি' ওয়েন্সের দীর্ঘ-লাফের সেই বিশ্ব বেকর্ড অটুট ছিল দীর্ঘ পঁচিশ বছর। ওই ২৫ বছরের মধ্যে অ্যাথলেটিক-জগতে কতজনের কত কীর্তি, কত রেকর্ড ভাঙ্গা-গড়া, কিন্তু জেসি ওয়েন্সের লং জাম্পের রেকর্ড কেউ ভাঙ্গতে পারেননি। ২৫ বছর পরে ভেঙ্গেছিলেন ওয়েন্সেরই দেশের মানুষ এবং নিগ্রো সম্প্রদায়েরই লাফিয়ে রালফ বোস্টন। তারপর বোস্টন এবং সোভিয়েট রাশিয়ার তের ওভানেসিয়ান রেকর্ড ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু সুদীর্ঘ ৩৩ বছরের মধ্যে ওয়েন্সের রেকর্ডের চেয়ে দূরত্ব সাড়ে ৮ ইঞ্চির বেশী বাড়েনি। গত ১৮ অক্টোবর মেক্সিকো অলিম্পিকের সপ্তম দিনে ওয়েন্স ও বোস্টনের দেশেরই আর এক নিগ্রো লাফিয়ে বব্ বীমন বিশ্ব রেকর্ডকে ভেঙ্গেচুরে একেবারে খানখান করে দিয়েছেন। অর্থাৎ বোস্টন ও তের ওভানেসিয়ানের বিশ্ব রেকর্ড ২৭ ফুট ৪ঽ ইঞ্চি ছাড়িয়ে বীমন এগিয়ে গিয়েছেন পৌনে ২২ ইঞ্চি।

আধুনিককালের বিজ্ঞানভিত্তিক অনুশীলন ও চর্চা প্রথম সারির অ্যাথলীটদের শক্তিসামর্থ্যে এবং নৈপুণ্যে ও উৎকর্ষে প্রায় চরম সীমায় পৌঁছে দিয়েছে। বিশেষ করে হাতিয়ারবিহীন স্পোর্টস—যে স্পোর্টসে শারীরিক শক্তি-গতি ও আঙ্গিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াই নৈপুণ্য প্রকাশের শেষ কথা—সেই স্পোর্টসে। এখানে এক ইঞ্চির বা এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ উন্নতিও অনেক কৃতিত্বের পরিচায়ক এবং তার জন্য বহু সাধনারও প্রয়োজন।

কিন্তু এক-দুই ইঞ্চি নয়—বীমন এক লাফে ২৭ ইঞ্চি থেকে ২৮ ইঞ্চির বাধা ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন পৌ-নে-বা-ই-শ ইঞ্চি। তাই অলিম্পিক অঙ্গনে ওই অবিশ্বাস্য লাফের পর অ্যাথলেটিকসের বিচারকরা অলিম্পিক রেকর্ড বা বিশ্ব রেকর্ডের নিরিখে দূরত্বের পরিমাপ করেননি। অলৌকিক কিছুর আন্দাজ করে পাঁচ মিনিট ধরে ফিতে দিয়ে লাফের দূরত্ব বারবার মেপে বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে বলেছেন—'অ্যাথলেটিকসে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কীর্তি'।

সত্যিই শ্রেষ্ঠ কীর্তি, সাড়ে ৮ ইঞ্চি এগিয়ে যেতে সারা বিশ্বের যেখানে ৩৩ বছর লাগে সেখানে এক লাফে ২২ ইঞ্চি এগিয়ে যাবার কথা কল্পনায় আসে না।

মেক্সিকো ইউনিভার্সিটি সিটি স্টেডিয়ামের ৬০ হাজার দর্শক তো বটেই, স্টেডিয়ামের লক্ষ লক্ষ দর্শক স্কোর বোর্ডে লেখা বীমনের দূরত্ব দেখে নিজেদের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারেননি। অ্যাথলীট বিশারদরা কাগজ-কলম নিয়ে এই অবিশ্বাস্য লাফের তুলনামূলক হিসাব কষে বলেছেন, এই কীর্তি ৯·৬ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার দৌড়ানো, কিংবা ৩ মিনিট ২৩ সেকেণ্ডে ১৫০০ মিটার পার হওয়া অথবা উঁচু লাফে ৭ ফুট সাড়ে ১০ ইঞ্চি ডিঙ্গানোর সমান কীর্তি।

স্মরণ থাকতে পারে, ১০০ মিটার দৌড়ে জেসি ওয়েন্সের ১০·২ সেকেণ্ডের রেকর্ড ভাঙ্গতেও কুড়ি-বাইশ বছর লেগেছে। এখন বিশ্ব রেকর্ড ৯·৯ সেকেণ্ড। ৯·৬ সেকেণ্ডে আসতে কতকাল লাগবে? কিংবা হাইজাম্পে ৭ ফুট সাড়ে ১০ ইঞ্চি উঠতে লাগবে কত বছর?

জামাইকায় জন্ম বাইশ বছর বয়সী নিগ্রো অ্যাথলীট বব্ বীমনের দেহের উচ্চতা ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি। দেহের অনুপাতে পা দুখানা বেশী লম্বা। অ্যাথলেটিক-জগতে 'আমেরিকান ক্যাঙ্গারু' নামে ওর সাম্প্রতিক পরিচিতি। মাত্র ১৬ বছর বয়সে লাফিয়েছিলেন ২৪ ফুট ১ ইঞ্চি। তের ওভানেসিয়ানের রেকর্ড ভেঙ্গে এই বছরই ইনডোর রেকর্ড করেছিলেন। আমেরিকার অলিম্পিক ট্রায়ালে ২৭ ফুট সওয়া ৬ ইঞ্চি লাফিয়ে বোস্টন ও তের ওভানেসিয়ানের বিশ্ব রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছিলেন। তবু অলিম্পিক সাফল্য সম্পর্কে খুব আশাবাদী ছিলেন না। বলেছিলেন, 'প্রথা-প্রকরণের উপর আমার আস্থা নেই, সহজাত শক্তিই আমার সম্বল।'

সহজাত শক্তিতেই বীর হনুমান এক লাফে সাগর পার হয়েছিল, আর কলির বীর বব্ বীমন এক লাফে বিশ্ব জয় করে নিলেন।

মুকুল

বাঁ দিক থেকে ডাইনে
সাতষট্টি
আর তেত্রিশ
এ আবার
কেমন কথা ?

দেখুন তবে ! বাঁ দিক থেকে ডাইনে সেই একই
রূপসী—শাড়ীটিও একই। তবে আবার
৬৭-৩৩ এর কথা আসে কিসে? ও হো-বুঝেছি।
ক্যালি-কাট শাড়ীতে শতকরা সাতষট্টিভাগ
রাসায়নিক সুতো, আর তেত্রিশ ভাগ তুলোর
সুতো। তাই তো ক্যালি-কাট শাড়ী দেয়
আরাম, আর কখনো কুঁচকে যায় না। কেমন
সুন্দর লাগছে ওঁকে—না ?
ক্যালি-কাট শাড়ী প'রেছে যে।

cali—kut special

ক্যালি-কাট স্পেশাল
বোনা কাটা কাজ করা
আর সোনালী ছাপা
শাড়ী

Shilpi cm 2/69 A bcx

পশ্চিমবঙ্গ চিত্রশিল্প সংরক্ষণ সমিতির বর্তমান কর্মসূচী ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী সে সম্পর্কে সমিতির নেতাদের সঙ্গে আলোচনার সংক্ষিপ্ত সংবেদন সম্প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে। একটি আশঙ্কার সুর ওই সংবাদে ছিল। নেতারা জানিয়েছিলেন, সংরক্ষণ সমিতির সভ্য নয় এমন কোন প্রযোজকের ছবির মহরৎ অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ সমিতির সভ্য না হলে কেউ ছবি তৈরি করতে পারবেন না। চলচ্চিত্র-শিল্পের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য সমিতির সভ্য হতে আপত্তি কী?—এই হল নেতাদের সরাসরি প্রশ্ন।

অতঃপর......

ই-আই-এম-পি-এ'এর অস্তিত্ব যতদিন আছে, ততদিন যদি কোন চিত্রপ্রযোজক সংরক্ষণ সমিতির সভ্য হওয়ার যৌক্তিকতা অথবা অপরিহার্যতা স্বীকার না করেন তাহলে কি তিনি ছবি তৈরি করতে পারবেন না? প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। এমন চিত্রপ্রযোজকও থাকতে পারেন যিনি সংরক্ষণ সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে দ্বিমত না হলেও সংস্থার উদ্দেশ্যসাধনের উপায় সম্পর্কে একমত নাও হতে পারেন। তিনি কী করবেন? সংরক্ষণ সমিতি জানিয়েছেন, এমন প্রযোজকের সংখ্যা দুই কী তিন, অর্থাৎ একেবারেই নগণ্য। সমস্যাটি যদি নীতিগত হয়, তবে একজনও যা একশ'জনও তা। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন এই, ই-আই-এম-পি-এ'র সভ্য না হয়ে কি কেউ পূর্বাঞ্চলে ছবি তৈরি করতে পারেন না? তা ছাড়া নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যই প্রযোজকরা ই-আই-এম-পি-এ'র সভ্য হয়ে থাকেন। এমন দিনও তো আসতে পারে যেদিন প্রত্যেক প্রযোজকই অনুভব করবেন যে সংরক্ষণ সমিতির সভ্য না হলে তাঁর নিজেরই ক্ষতি। সেই স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্যের জন্য অপেক্ষা করা বাঞ্ছনীয় নয় কি?

সংরক্ষণ সমিতি চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতির জন্য যে কর্মসূচী নিয়েছেন তা যদি অচিরেই সফল হয় তবে প্রতিটি প্রযোজক নিজের মঙ্গলের কথা ভেবেই সমিতির শক্তি বৃদ্ধির জন্য তৎপর হবেন। এবং ওই সুদিন ত্বরান্বিত করার জন্য সমিতিকে এখন থেকে চলচ্চিত্র-ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রত্যেকের মৌলিক অধিকার স্বীকার করে নিয়ে অতি সাবধানে ও সহৃদয়তার সঙ্গে চলতে হবে। কাউকে বশীভূত ও বাধ্য করার চাবিকাঠি আয়ত্ত করতে পারলেই শক্তি অর্জন সম্পূর্ণ হয় না। সংশ্লিষ্ট সকলের আস্থা ও সহানুভূতি অর্জনের মধ্যেই যে প্রকৃত শক্তিলাভ, সংরক্ষণ সমিতির সভ্যরা তা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। যদি কোন কারণে সমিতির কর্ম-নীতি দেখে কিছু সংখ্যক পরিচালক, কলা-কুশলী ও শিল্পী নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন, কারও উৎসাহে যদি ভাঁটা দেখা দেয় কিংবা কেউ যদি সমিতির বাইরে থাকাই শ্রেয় মনে করেন তবে সেটা সমিতিরই নৈতিক পরাজয়। তাই সমিতিকে জানাতে চাই, লক্ষ্য যত ভাল লক্ষ্য সাধনের উপায়ও তত ভাল হওয়া দরকার। সামান্য ভুলের জন্য অনেক বড় কল্যাণযজ্ঞও বিফল হয়, এই নজির আছে।

বার বার এত কথা বলার প্রয়োজন হত না। কিন্তু সম্প্রতি দেখছি, চলচ্চিত্রলোকে কী যেন এক চাপা অশান্তি, কেমন যেন একটা অস্থিরতা, কোথায় বুঝি কী অনিশ্চয়তা। একের সঙ্গে অপরের মত-বিরোধ, কোন একটি কাজে অনেকেই আছেন অনেকেই নেই, একটি ব্যাপারে কেউ কেউ এগিয়ে এসেছিলেন আবার সরে দাঁড়িয়েছেন, এক একটি গোষ্ঠী যেন দুই দলে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যেন কোন কিছুরই মধ্যে নেই, কেউ কেউ আবার দূরে দাঁড়িয়ে দেখছেন কবে সংহতি ফিরে আসবে—কলকাতার চলচ্চিত্র জগতের দিকে তাকালে এমনিতরো কতকগুলি খণ্ড খণ্ড নিরাশার চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে। স্বীকার করি, পুরনো ব্যবস্থা যখন ভাঙতে শুরু করে নতুন ইমারত গড়ে ওঠে, বিবর্তন বা পরিবর্তনের সেই সন্ধিক্ষণে এই ধরনের সাময়িক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এর স্থিতি-কাল যাতে সুদূর প্রসারিত না হয় সে বিষয়ে সংরক্ষণ সমিতিই একমাত্র দৃষ্টি দিতে পারেন।

শুনতে পাই, আবার নাকি সংরক্ষণ সমিতির সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হবে। এবারের সংগ্রামস্থল বাংলাভাষী অঞ্চলের

রামানন্দ সাগরের আঁখে হিন্দী ছবিতে নায়িকা মালা সিনহা—এ-সপ্তাহে ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে

শ্যাডো প্রোডাকশন্স-এর "গড় নাসিমপুর" চিত্রে (পরিচালক—অজিত লাহিড়ী) অসিতবরণ ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়

ফটো—দেশ

সেইসব সিনেমাগৃহে যেখানে প্রধানত হিন্দী চিত্র চলে। সমিতির নেতারা অবশ্য এ সম্বন্ধে স্পষ্ট করে এখনো তাঁদের কর্মসূচীর কথা বলেননি। সিনেমা হলের সামনে সত্যাগ্রহ অর্থাৎ সিনেমা বন্ধ কোন অবস্থায়ই কাম্য নয়। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ এড়িয়ে অন্য কোনভাবে লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় কিনা সে-কথা সমিতির এখনই ভেবে দেখা দরকার। আরও ভাবা দরকার, ওই সব চিত্রগৃহে প্রকৃতপক্ষে বাংলা চিত্র চলার সম্ভাবনা কতখানি। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, রাজ্য সরকার বছরে কমপক্ষে প্রতি হাউসে দশ সপ্তাহের জন্য বাংলা চিত্র-প্রদর্শনী বাধ্যতামূলক করেছেন। অপেক্ষা করে দেখা যেতে পারে, ওইসব হলে বাংলা ছবি বছরে দশ সপ্তাহ কেমন চলে। যদি ভাল চলে তবে চিত্রপ্রদর্শকরা বাংলা ছবি দেখাতে আগ্রহশীল হবেন। বাংলা ছবির ব্যবসাক্ষেত্র প্রসারিত হোক তা আমরা সকলেই চাই। রাজ্য সরকার যে আজ বাংলা ছবির বাধ্যতামূলক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন—যা কেউ দিন সম্ভব হবে বলে কেউ ভাবেননি—সেটা সংরক্ষণ সমিতির আন্দোলনের ফলেই অনেকখানি সম্ভব হয়েছে। সাফল্য যেখানে ধীরে ধীরে করায়ত্ত হচ্ছে সেখানে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়ে পরিস্থিতি অকারণে ঘোলাটে করে তোলা কোনমতেই কাম্য নয়।

তদুপরি বাংলা ছবি বর্তমানে যে হারে তৈরি হচ্ছে তাতে এখন, বাধ্যতামূলক প্রদর্শনীর পর সব বাংলা ছবিই দেখানো সম্ভব। অসম্পূর্ণ যেসব বাংলা ছবি পড়ে আছে, যার মধ্যে কিছু সংখ্যক ছবি চিত্র-পরিবেশকরাও গ্রহণ করতে চাননি, সেগুলি সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব অবশ্য সংরক্ষণ সমিতি নিতে চান। তাও সময়সাপেক্ষ। দেখা যাক না, ইতিমধ্যে বাংলা চিত্রপ্রদর্শনীর অবস্থা কী দাঁড়ায়।

প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে, বাংলা ছবির ব্যবসার প্রসারের সঙ্গে বাংলা ছবির গুণগত উৎকর্ষের যোগ অবিচ্ছিন্ন। ছবি যদি উৎকৃষ্ট না হয় তবে দর্শকরাই তা বর্জন করবেন। প্রদর্শনীর নানা সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও ছবি চলবে না।

বাংলা ছবির আসল সংকট কিন্তু এইখানেই। যে ছবির কদর হবে না তার জন্য আমরণ আন্দোলন করেও লাভ নেই। সিনেমার সংকট তাই আসলে সাংস্কৃতিক সংকট। এবং সিনেমা সংরক্ষণের আন্দোলনও প্রকৃতপক্ষে সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এবিষয়ে সংরক্ষণ সমিতির ভাবনা কী এবং প্রচেষ্টাই বা কতটুকু তাও অবিলম্বে ঘোষণা করা দরকার।

নিয়ন্ত্রণ-নীতির বিরুদ্ধে চলচ্চিত্রকার

"রেখে-ঢেকে কথা বলতে আমি আর ফিরে যাব না। মন খুলে যেখানে কথা বলতে পারব না সেখানে কথা না বলাই

ভাল"—বলেছেন চেকোশ্লোভাকিয়ার বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার জান কাদার। "শপ অন দি মেন স্ট্রীট" (১৯৬৫ সনে অস্কার-লাভের সম্মানে চিহ্নিত) ছবির নির্মাতা কাদার, এবং "লাভস অব এ ব্লণ্ড" ছবির পরিচালক মিলস ফরমান-সহ চেকোশ্লোভাকিয়ার আরও তিনজন প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক মনস্থ করেছেন তাঁরা দেশে ফিরে যাবেন না। তাঁদের পক্ষে রুশ নিয়ন্ত্রণ মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাঁদের সিদ্ধান্ত ঃ যদি রুশ শক্তি চেক সিনেমা-শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করে তবে তাঁরা বিদেশে থেকেই ছবি করবেন।

নিউইয়র্ক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষে পরিচালকরা সম্প্রতি তাঁদের ছবি নিয়ে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা বিভিন্ন সাংবাদিক বৈঠকে এবং আলোচনা-চক্রে আগস্ট মাসের রুশ অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের ভাবনা ও পরিকল্পনার কথা বলেন।

জাক নেমেক তাঁর "অরেটোরিও ফর প্রাগ" ছবির বিশেষ প্রেস-শো'র পর এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার বিবরণ দেন। আমেরিকায় প্রবাসী জনৈক বিত্তবান চেক ব্যবসায়ী এই চিত্রটি তৈরি করান। ত্রিশ মিনিটব্যাপী এই তথ্যচিত্রের কাজ আগস্ট মাসেই শুরু হয়। আলেকজাণ্ডার ডুবচেকের আমলে চেক জনজীবনের স্বস্তি ও মুক্তির প্রামাণিক চিত্র ফুটিয়ে তোলার মধ্য দিয়েই নেমেক শুটিং আরম্ভ করেন। কয়েকদিনের মধ্যেই ছবির বিষয় যায় পাল্টে। পরিচালককে দেখাতে হল চেকোশ্লোভাকিয়ার বুকের উপর রুশ ট্যাঙ্ক ও সৈন্যদলের অভিযান। ফলে ছবির নেপথ্য ভাষণ কখনও হয়েছে তিক্ত, কখনও ক্ষুব্ধ। বলা হয়েছে ঃ "দুর্ভাগ্যবশত বাস্তব যুদ্ধচিত্র তৈরি করতে আমরা সক্ষম হলাম"। পরে আছে ঃ "হিউম্যান সোস্যালিজম-এর স্বপ্ন তারা চূর্ণ করতে পারবে না...এমন ছেলে-মেয়ে একদিন আসবে যারা ভালবাসতে চাইবে, যুদ্ধ করতে নয়"।

রুশ অভিযান যখন চরমে উঠেছে তখনই নেমেক ছবিটি গোপনে দেশের বাইরে এনে ফেলেছেন। "ইটালিয়ান লাইসেন্স প্লেট" আঁটা একটি গাড়িতে। কেমন করে তিনি ছবিটি পাচার করেন সে-ঘটনা রোমাঞ্চকর। ভাগ্যিস তাঁর কয়েকটি ইটালিয়ান কথা জানা ছিল। যখন তাঁকে চ্যালেঞ্জ করা হয় তিনি ইটালিয়ান কাগজপত্র দেখিয়ে সেই কথাগুলি বলে দেন। এইভাবে তিনি ভিয়েনায় আসেন, তারপর নিউইয়র্কে।

চিত্রপরিচালকদের মধ্যে জাক নেমেক ও জিরি মেঞ্জেল অবশ্য এখনই দেশত্যাগী হতে চান না। নেমেক দৃঢ়স্বরে বলেন, অনেক বুদ্ধিজীবী এখন দেশের বাইরে। আমাকে সেখানে গিয়ে দেশবাসীর জন্য কিছু করতে হবে। আমাকে তৈরি করতে হবে চেক "প্রোফেটিক ইন কারেজ"-এর মত একটা কিছু—চেক জনসাধারণের সাহসের চেহারা।

"ক্লোজলি ওয়াচড ট্রেন"-এর পরিচালক জিরি মেঞ্জেল বলেন, "দেশে যে এখন কী ঘটছে কিছুই বলতে পারছি না। আমি যাব এবং কাজ করব এই ভাব নিয়ে যেন কিছুই ঘটেনি। এতকাল আমরা যা করেছি তার উপর কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। প্রেস ও টেলিভিশনের মত ফিল্মের তো তেমন রাজনীতিক তাৎপর্য নেই। রুশদের ঝোঁক এই দুটির উপরেই।"।

মিলস ফরমান এখন নিউইয়র্কে একটি কমেডি ছবির কাজে হাত দিয়েছেন। চেক চলচ্চিত্রকারদের এই সংবাদ ছেপেছেন আমেরিকার "দি ওয়াশিংটন পোস্ট"।

বি কে প্রোডাকশন্স-এর "শুক-সারী" চিত্রে উত্তমকুমার ও অঞ্জনা ভৌমিক
ফটো—দেশ

"আঁখে" চিত্রের নির্মাতা রামানন্দ সাগর

দেশে এবং বিদেশে এমন একাধিক চিত্র-পরিচালক আছেন যাঁরা প্রথমে ছিলেন সাংবাদিক। শ্রীরামানন্দ সাগর তাঁদের মধ্যে একজন। গল্পকার হিসাবেও তাঁর সুনাম আছে। শ্রীসাগরের প্রথম সাহিত্য রচনা "দি ডায়েরি অব এ টি বি পেশেণ্ট"। টি বি রোগীর দিনলিপি। স্যানাটোরিয়ামে রোগ-শয্যায় শুয়ে লেখা। দারিদ্র্য ও রোগের সঙ্গে সংগ্রাম তাঁর অল্পবয়স থেকে। জীবিকার জন্য অতি সাধারণ কাজও তিনি এককালে করেছেন। ট্রাক পরিষ্কার করা থেকে কেরানিগিরি কোনটাই বাদ যায়নি। "ডেইলি মিলাপ"-এ সাংবাদিকতা করা কালে তাঁর "আউর ইনসান মর গয়া" উপন্যাসটি পাঠক মহলে সাড়া জাগায়। পরবর্তীকালে ফিল্মের গল্প লিখেও তিনি প্রভূত যশ অর্জন করেন। বরসাত, পয়গাম, কোহিনুর, ইনসানিয়াৎ, ঘুংঘট, জিন্দগী, আরজু প্রভৃতি ছবির গল্প তাঁরই। শেষ তিনটি ছবির তিনিই প্রযোজক-পরিচালক।

আপনি ফিল্ম তৈরি করেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসাগর বলেন, জনসংযোগের সব চাইতে শক্তিশালী মাধ্যম ফিল্ম। আমি যদি বইয়ের মধ্য দিয়ে আমার চিন্তাগুলি প্রকাশ করি, তা পড়বেন শুধু কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তি। অসংখ্য জনসাধারণ তা জানতে পারবেন সিনেমার মাধ্যমে।"

রামানন্দ সাগর

শুক্রবার ২৫শে অক্টোবর শুভমুক্তি

স্বদেশপ্রেমের সুমহান প্রেরণায় গুপ্তচরবৃত্তির নির্মম সমরাঙ্গনে যারা
জীবনের মধুর মুহূর্তগুলিকেও অতিবাহিত করেছিল, তাদের কাহিনী...

ধর্মেন্দ্র
মালা সিনহা
মেহমুদ
অভিনীত

SORA

রামানন্দ সাগরের

আঁখেঁ

ইস্টম্যানকলার

কাহিনী ও পরিচালনায় রামানন্দ সাগর সংগীত রবি গীত সাহির

সোসাইটি - প্রিয়া - মুনলাইট - মিত্রা - রূপালী
ইণ্টালী - ভবানী - ছবি তসবীর মহল - বঙ্গবাসী • ন্যাশনাল • কমল
রূপশ্রী • নবরূপম • অশোক • জয়া
নারায়ণী • সন্ধ্যা • জয়ন্তী • রাজকৃষ্ণ • অন্নপূর্ণা • নটরাজ ও অন্যান্য।

—প্রভা পিকচার্স রিলিজ

সাগিনা মাহাতো : তপন সিংহের নতুন ছবি

গৌরকিশোর ঘোষের লেখা "সাগিনা মাহাতো"র ভিত্তিতে তপন সিংহর পরবর্তী ছবির শুটিং আরম্ভ হবে ডিসেম্বরে। প্রথম-পর্যায়ের দৃশ্য গ্রহণ আউটডোরে, দার্জিলিংয়ে।

দিলীপকুমার ছবির নায়ক। সায়রা বানুকেও এই বাংলা ছবিতে একটি উল্লেখ-যোগ্য চরিত্রে দেখা যাবে। অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সুমিতা সান্যাল দুটি বিশেষ চরিত্রের শিল্পী।

প্রসংগত স্মরণ করা যেতে পারে, কিছুকাল আগে চিত্রপ্রযোজক হেমেন গাঙ্গুলী কলকাতায় সাংবাদিকদের কাছে তাঁর এই প্রযোজনার কথা ঘোষণা করে-ছিলেন। জে কে কাপুর এই ছবির সহ-প্রযোজক। তাঁদের সংস্থা রূপশ্রী ইন্টার-ন্যাশনাল কলকাতায় পর পর কয়েকটি বাংলা ছবি তৈরি করবেন।

আগামী সপ্তাহে 'গড় নাসিমপুর'

শ্যাডো প্রোডাকশন্স-এর "গড় নাসিম-পুরে" আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। এক রাজ পরিবারকে কেন্দ্র করে হিংসা, ষড়যন্ত্র, দুষ্টদমন ও প্রেমের কাহিনী "গড় নাসিমপুরে"। ছবির মুখ্য চরিত্রগুলিতে উত্তমকুমার, মাধবী মুখোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, দেব মুখার্জি, বিকাশ রায়, তরুণকুমার, রমা গুহঠাকুরতা, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। শ্যামল মিত্র সুরকার।

সত্যজিৎ রায়ের পরবর্তী ছবি কী?

"গুপী গাইন বাঘা বাইন" শেষ। এর পর সত্যজিৎ রায় কোন্ ছবির কাজে হাত দেবেন? "দেশ"-এর প্রতিনিধির নিকট শ্রীরায় জানান, অনিবার্যকারণে "দি অ্যালিয়েন" ছবির কাজ শীগগির আরম্ভ হচ্ছে না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ইচ্ছামতী" নিয়ে ছবি করবার ইচ্ছা তাঁর আছে। সম্ভবত "গুপী গাইন..."এর পরেই "ইচ্ছামতী"।

পান্না-হীরে-চুনী

দীনেশ চিত্রমের "পান্না হীরে-চুনী" ছবির শুটিং শেষ। সুখেন দাসের গল্প নিয়ে ছবিটি পরিচালনা করেছেন অমল দত্ত। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। অনুপকুমার, দিলীপ রায়, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, রত্না ঘোষাল, বেবি গুপ্ত, সুখেন দাস, স্বপনকুমার প্রমুখ ছবির প্রধান চরিত্রের শিল্পী। সংগীত পরিচালনা করেছেন শ্যামল মিত্র।

বোম্বাইয়ে "সুবহ কাহি শ্যাম কাহি" হিন্দী ছবির গান রেকর্ড করা হয়—রেকর্ডিং অনুষ্ঠানে সংগীতপরিচালক হিমাংশু বিশ্বাস ও সুমন কল্যাণপুর, পিছনে পরিচালক দিলীপ বসু ও গীতিকার আর এস প্রীতম; ছবিটি কলকাতায় তৈরি হচ্ছে

বোম্বাই বিচিত্রা

গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বম্বেতে বেশ কয়েকটা বড় বড় ছবি রিলিজ হয়েছে এবং দুঃখের বিষয় এই যে একটা ছবিও তেমন জমিয়ে চলছে না।

উপরোক্ত প্রতিটি ছবিই লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরী, সুতরাং এই ছবিগুলি না চলা মানে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের বাজার মন্দা হওয়া। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক দিক থেকে এ ধরনের ঘটনা অশুভ। এ ছবিগুলি কেন ভাল চলছে না তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল এক স্টুডিওর চত্বরে। অনেকের অনেক কথা শোনার পর এক প্রবীন সাউন্ড রেকর্ডিস্ট মন্তব্য করলেন : "এত আলোচনা কেন বাবা, যার ছবি চলে সে ছবি বানাতে জানে, জনতার পাল্‌স বোঝে ইত্যাদি ইত্যাদি—আর যার ছবি চলে না, তার কপাল খারাপ।" এতদিন বম্বেতে আছি, ছবি চলা না চলার ওপর এত ভাল মন্তব্য কখনো শুনিনি।

এই মন্তব্য প্রসঙ্গে একটা পুরোনো ঘটনা মনে পড়ল। অনেকদিন আগের কথা। একজন নামকরা পরিচালক তাঁর প্রথম ছবি করেই সমালোচকদের সাধুবাদে ধন্য হলেন কিন্তু বক্স অফিসের মাপ-কাঠিতে তাঁর দর বাড়ল না। কিছুদিন বাদে সেই ভদ্রলোক বক্স অফিস ফরমুলায় একটি ছবি তৈরী করতে লাগলেন। ছবিটা যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন একদিন ভদ্রলোককে কপাল চাপড়াতে দেখলাম। কারণ জিগ্যেস করায় বললেন, "পেটের দায়ে এই কাজ করছি, কি ছবি বানাতে চাই, আর কি ছবি বানাতে হচ্ছে—সংসারের ভাবনা যদি ভাবতে না হ'ত তাহলে দেখিয়ে দিতাম।" সেদিন ভদ্রলোকের এই অনুতাপ আমাকে স্পর্শ করেছিল। কিন্তু এর কয়েকমাস পরেই যখন ভদ্রলোকের সে ছবি রিলিজ হ'ল এবং দারুণ হিট হয়ে গেল তখন ভদ্রলোক যা শোনালেন, তাতে ত আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া। মাত্র কয়েকমাস আগেই ভদ্রলোক আমাকে উক্ত ছবি তৈরীর ব্যাপারে যা যা বলেছিলেন, ততদিনে তিনি সে সব ভুলে মেরে দিয়েছেন, যাই হোক ছবি হিট হবার পর ভদ্রলোক আমাকে সবিস্তারে বোঝালেন, কি[illegible] মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এই ছবিটি ব[illegible]ছেন—বোঝালেন যে আলোচ্য ছবি [illegible] বানাতেই উনি প্রথম আবিষ্কার ক[illegible] যে, আমাদের দেশের শতকরা আশি[illegible] লোক নিরক্ষর এবং হিন্দী ছবি ক[illegible] তাদের জন্যই বানানো—"সাধারণ [illegible]ষের কাছে শিল্পকে পৌঁছোতে হবে [illegible]রণভাবে—সাধারণকে অসাধারণ কথা [illegible]ঝাতে হবে তার নিজের ভাষায়—[illegible]ক আমাদের ভাষা শেখাতে গেলে চ[illegible]না—ওদের ভাষা আমাদের শিখতে হ[illegible]।"

সরল শর্মা

বহুরূ[illegible]নাটকাভিনয়

এ-মাসের [illegible] ২৯ ও ৩০ অক্টোবর, বহুরূপী [illegible]দের দুটি স্মরণীয় নাট্য প্রযোজনা [illegible] খেলা, এবং 'রাজা অয়দি-পাউস' [illegible] উপস্থিত করবেন। সন্ধ্যা সাতটা[illegible] শুরু হবে। শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি[illegible]ক দুটিতে অভিনয় করবেন। সা[illegible] পাল বহুরূপীর অভিনয়ের [illegible] করেছেন।

নোটিসপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত আলোচ্য সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গত ১৯ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের একদিনের প্রতীক ধর্মঘটে যোগদানের জন্য যে পঞ্চাশ হাজার অস্থায়ী কর্মীর প্রতি চাকুরির অবসানের নোটিস দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা এখন ইচ্ছে করলে কাজে যোগ দিতে পারবেন। গত ১৮ অক্টোবর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে এই নোটিস প্রত্যাহার এবং 'নরম' মনোভাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে যাঁদের বিরুদ্ধে প্ররোচনা বা হিংসাত্মক কার্যকলাপের অভিযোগ আছে তাঁদের ক্ষেত্রে এই মূল আদেশের এই শিথিলতা প্রযোজ্য হবে না। যে সমস্ত কর্মচারীকে কাজে যোগ দিতে দেওয়া হবে তাঁদের চাকুরি স্থায়ী বা আধা স্থায়ী করার আগে তিন বছর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণাধীন থাকতে হবে। প্রবেশনারদেরও তাঁদের কাজ এবং আচরণ সন্তোষজনক না হওয়া পর্যন্ত সেভাবেই থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে সরকারী কর্মচারীদের যুক্ত সংগ্রাম সমিতির চেয়ারম্যান শ্রী কে জি বসু বলেন যে, কেন্দ্রীয় অস্থায়ী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাদি প্রত্যাহার শর্তহীন না হলে তাঁরা বর্তমান নিয়মমাফিক কাজ-এর আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। যোগাযোগ মন্ত্রী ডঃ রামসুভগ সিং এবং রেলমন্ত্রী শ্রী সি এম পুনাচা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার তরফ থেকে ধর্মঘটী কর্মীদের সম্পর্কে কঠোর মনোভাব নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১৪ **অকটোবর**—আজ রাজ্য মহাকরণে রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর সাংবাদিকদের জানান যে, বন্যাবিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গের দুর্গত অধিবাসীদের পুনর্বাসনই এখন তাঁদের সম্মুখে প্রধান সমস্যা। কেন্দ্র এজন্য সবরকম সাহায্য দিতেই প্রস্তুত। দুর্গতদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কেন্দ্রের কাছ থেকে পাওয়া যাবে।

চলতি মাসের ২৫ তারিখ থেকে পর্যায়ক্রমে কলকাতা টেলিফোনের ১২০০ শত অস্থায়ী কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হবে। তাঁদের মধ্যে দুই শতের কিছু বেশী মহিলা টেলিফোন অপারেটর আছেন। আজ কলকাতা টেলিফোনের জেনারেল ম্যানেজার এই কথা জানান।

১৫ **অকটোবর**—বন্যাবিধ্বস্ত হতভাগ্য জলপাইগুড়ি শহরের মানুষ এগারদিন পরে আবার পরিস্রুত পানীয় জল পেতে শুরু করেছেন। সেখানে আবার ডাক সংযোগও স্থাপিত হয়েছে। শিলিগুড়ির সংবাদে প্রকাশ, দোমোহানীর রেল-কলোনীর কয়েকটি পাকা বাড়ি ছাড়া আর সব নিশ্চিহ্ন।

সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃসম্মেলন একটি স্বায়ত্তশাসিত পার্বত্য রাজ্য গঠন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব মেনে নিয়ে আজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে সেই সঙ্গে স্পষ্টভাবে কথাও জানানো হয় যে, আসামের সকল পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে একটি সম্পূর্ণ পৃথক রাজ্য গঠনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে।

১৬ **অকটোবর**—আজ কোচবিহারের মেখলিগঞ্জে ভারতীয় [illegible] বাহিনীর একটি ডাকোটা বিমান থেকে চাল [illegible] গম নিক্ষেপ করার সময় চার-পাঁচ বছরের এক ছেলে বস্তা চাপা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা [illegible]। আরও আটজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় শিলিগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ[illegible]। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম এবং [illegible]পাল শ্রীধর্মবীরের কয়েক মিনিট পরে [illegible]কপটারে সেখানে নামার কথা ছিল। কিন্তু [illegible] সফর বাতিল করে দেওয়া হয়।

১৭ অকটোবর—প্রতীক [illegible] যোগ দেওয়ার অপরাধে সাসপেনডে[illegible] ছাঁটাই কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েক হাজার কর্মচা[illegible] সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত কী ব্যবস্থা নেওয়া হ[illegible] স বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলতে প্রধানমন্ত্রী [illegible] তবে তিনি আশ্বাস দেন যে, সরকার [illegible]হিংসা-পরায়ণ হবেন না, সঙ্গে সঙ্গে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে নিয়মশৃংখলা বজায় রাখতেও তাঁরা বদ্ধপরিকর।

শেখ আবদুল্লা প্রবোধিত জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য গণ-সম্মেলন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী রাখা হয়েছে। স্পষ্টতই সম্মেলন কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ সহ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা, আবদুল্লা জটিল পরিস্থিতির জালে জড়িয়ে পড়েছেন।

১৮ **অকটোবর**—কলকাতা মহানগরীতে প্রাইভেট বাস চালানোর অনুমতি দেওয়া নিয়ে রাজ্য পরিবহণ দফতর এবং কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ করপোরেশনের মধ্যে জোর বিরোধ বেধেছে। করপোরেশনের অভিযোগ হল, যাত্রীদের সুবিধার নামে সরকারী বাসের বদলে প্রাইভেট বাস মালিকদের নতুন করে পারমিট দিয়ে পরিবহণ দফতর সরকারের মূল নীতি জলাঞ্জলি দিচ্ছেন।

১৯ **অকটোবর**—আজ সন্ধ্যায় কলকাতা ময়দানে এক জনসভায় যুক্ত ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন : উত্তরবঙ্গের বন্যা বিপর্যয়ে রাজ্যপাল ও সরকারী অফিসাররা "চরম অযোগ্যতা ও হৃদয়হীনতার" পরিচয় দিয়েছেন। তাই যুক্ত ফ্রন্টের দাবি : রাজ্যপালের অপসারণ এবং জলপাইগুড়ি বিভাগের "অযোগ্য" সরকারী অফিসারদের সাময়িক বরখাস্ত। সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

আনন্দবাজার পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক শ্রীসরোজ আচার্য গতকাল রাত্রি একটা চল্লিশ মিনিটে তাঁর যাদবপুরের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তিনি বৃদ্ধা মাতা, পত্নী এবং দুই পুত্র রেখে গিয়েছেন।

২০ **অকটোবর**—কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব থেকে মনে হয় যে, ডঃ খোরানাকে ভারতে ফিরে আসার অনুরোধ জানানো হবে না। তাঁকে কাজ করার সুযোগ দানের জন্য একটি জা[illegible] জীব-বিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপনের যে প্র[illegible] উঠেছে, তাও গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ আজ এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, রাজ্যগুলি সম্পর্কে কেন্দ্রের বর্তমা[illegible] মনোভাব যদি বজায় থাকে, তা হলে রাজ্য-কেন্দ্র সম্পর্ক বরাবরই একটা উত্তেজনার ভাব থেকে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো সমগ্র রাজনৈতিক কাঠামোই ভেঙে পড়তে পারে।

বিদেশী সংবাদ

১৪ **অকটোবর**—চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী ওল্ডরিখ সারনিক আজ মসকো এসে সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আরেক দফা আলোচনা শুরু করেন। বিষয়—চেকভূমি থেকে রুশ সৈন্যের অপসারণ।

আজ ভিয়েতকংরা কোয়াংগাই শহরের বুকে রাশিয়ার তৈরি ১৩টি বড় আকারের রকেট ছুঁড়েছে। ফলে চারজন অসামরিক ব্যক্তি নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ৮ জন।

১৫ **অকটোবর**—চীনের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাও সে তুং গোষ্ঠীর তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, পূর্বতন প্রেসিডেন্ট লি সাও চি-র দলের ভিতর ও বাইরের সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

১৬ **অকটোবর**—চেকভূমিতে রুশ সৈন্য মোতায়েনকে বিধিসম্মত করে আজ রাতে দুই দেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চেক প্রেসিডেন্ট স্বভোদার উপস্থিতিতে পররাষ্ট্র দফতর ভবনে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর দেন সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী আলেকসি কোসিগিন ও চেক প্রধানমন্ত্রী ওলডরিচ সারনিক। চুক্তির শর্তাবলী এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

১৭ **অকটোবর**—[illegible] শ্রীইয়াসুনারি কাওয়াবাতা সাহিত্যে ১৯৬৮ সালের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এখন তাঁর বয়স ৬৯ বছর। সাহিত্যে জাপানের এই নোবেল পুরস্কার [illegible] এশিয়া হিসাবে শ্রীকাওয়াবাতা হলেন [illegible] জন।

পরীক্ষায় [illegible] মহাকাশযান সফল হয়েছে।

১৮ **অকটোবর**—[illegible] প্রকাশিত সংবাদে প্রকাশ : [illegible] ৫ জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের অপরাধ : তাঁরা বিদেশী [illegible] ও [illegible] উপর [illegible] বেশী নির্ভর করেন।

ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য পাকিস্তান ২০০টি মার্কিন প্যাটন ট্যাংক কিনতে চায়। এই ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে বলে ওয়াশিংটন পোস্টের খবরে প্রকাশ।

১৯ **অকটোবর**—আজকালের মধ্যে কিংবা আগামী সোম-মঙ্গলবার ওয়াশিংটনের সর্বশেষ প্রস্তাবে হ্যানয় জবাব দেবে। আজ রাতে উত্তর ভিয়েতনামী মহল থেকে একথা বলা হয়। ভিয়েতনামে শান্তি ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যেই আমেরিকা শর্ত সাপেক্ষে বোমাবর্ষণ বন্ধের প্রস্তাব দিয়েছে।

২০ **অকটোবর**—প্রেসিডেন্ট টিটো আজ প্রতিবেশী বুলগেরিয়ার সঙ্গে সখ্য স্থাপনের প্রস্তাব করেছেন। তিনি পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট দেশগুলির কাছেও ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, "সোভিয়েট হুমকিতে আমরা আদৌ ভীত নই।"